১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা] শুক্রবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

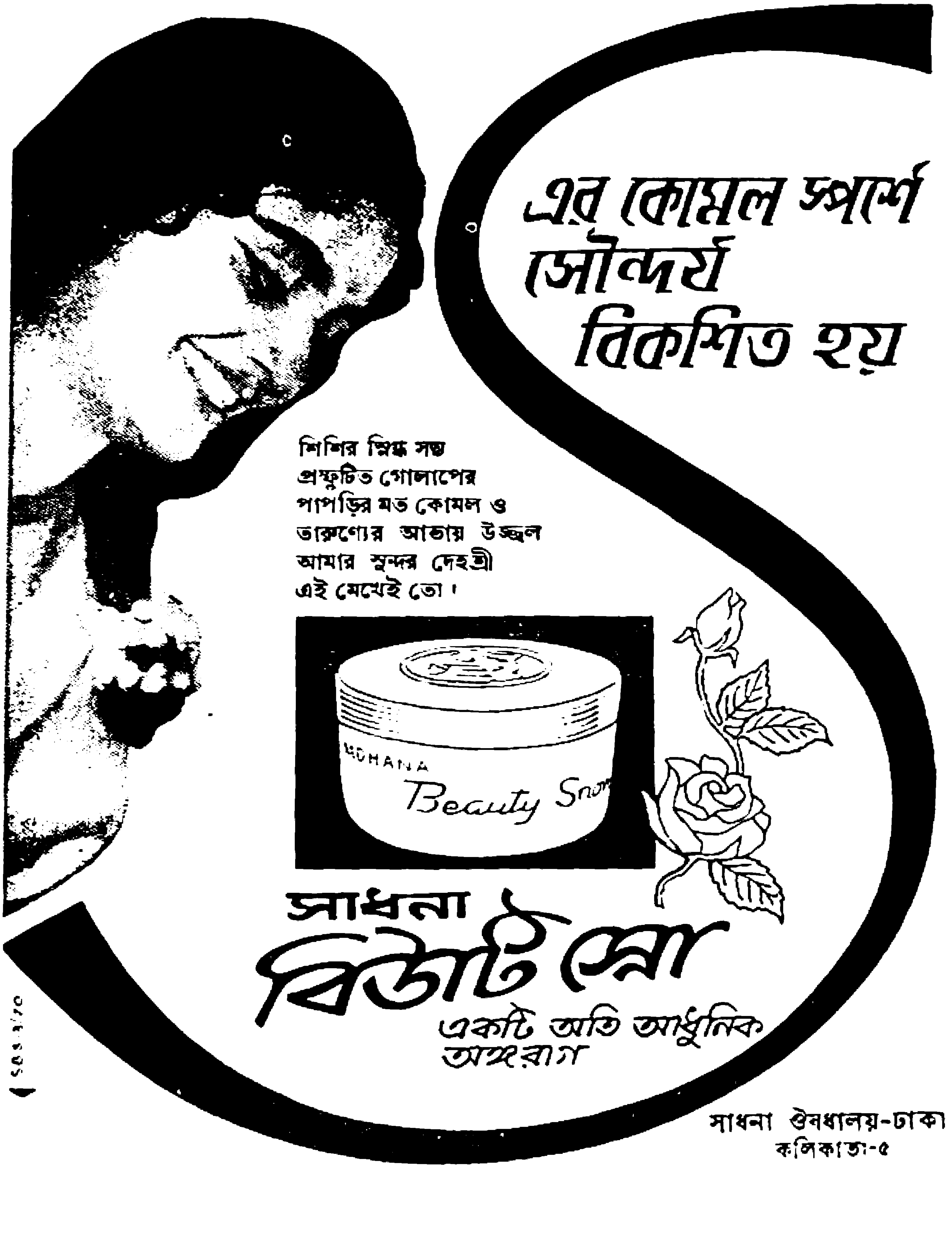

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

জাতীয়করণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে

ইউবিআই এর

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

অগণিত আমানতকারী, ঋণগ্রহীতা ও পৃষ্ঠপোষকগণকে ইউবিআই এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছে। জাতীয়করণের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ইউবিআই-এর কর্মচারীবৃন্দ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেদের পুনরায় নিয়োজিত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন।

১৯শে জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই ১৯৭১, এই জাতীয়করণ পক্ষে যে কোন শাখা পরিদর্শনের জন্য ইউবিআই আপনাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(একটি ভারত সরকারের সংস্থা)

naa/ubi-371

একই ধোপে ৩ সুরে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে — অন্য যে-কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১। ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সবকেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।

২। ডেট কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে জমতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।

৩। ডেট কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়, জামাকাপড় উজ্জ্বল করে—সাদা কাপড় আরো বেশী সাদা করে আর রঙীন কাপড় ক'রে তোলে আরো বেশী ঝলমলে। (এতে নীল বা সাদা করবার জন্য কিছুই মেশাতে হবেনা)

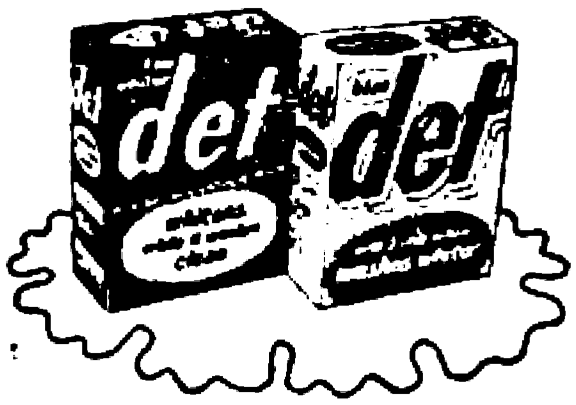

আজই কিনুন—ডেট! একমাত্র ডেট-এই পাবেন দুরকমের পাউডার—সাদা ও নীল।

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

Swastik-HPMA 21A/71 Ben

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১২শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 23rd July 1971 শুক্রবার—৭ই শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
754·3

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৯৭২	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৯৭৩	সম্পাদকীয়		
৯৭৪	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৯৭৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৯৭৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৯৭৯	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৯৮৪	চিত্রশিল্পী দীনবন্ধু এন্ড্রুজ		—শ্রীনন্দ বসু
৯৮৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৯৯০	মৃত্যুর খেদ	(কবিতা)	—শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়
৯৯০	স্বপ্নজ্যোতি	(কবিতা)	—শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
৯৯০	আত্মনিপীড়ন	(কবিতা)	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৯১	খিল	(গল্প)	—শ্রীদেবল দেববর্মা
৯৯৭	সাংবাদিকের চোখে		—শ্রীসন্দিহান
১০০০	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১০০৩	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১০০৮	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১০১১	তোমাকে	(উপন্যাস)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১০১৫	অবিস্মরণীয় রাজীব রায়		—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১০১৯	চাণক্য চকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা	(রহস্য উপন্যাস)	—শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
১০২৩	জয়	(গল্প)	—শ্রীকল্যাণ সেন
১০২৮	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১০৩১	বিবরের কুঠী	(গল্প)	—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
১০৩৬	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
১০৩৭	শ্রাবন্তী		—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
১০৪০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১০৪৬	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
১০৪৮	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বলে
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

রঙীন মাছ, মাছের খাবার, মাছের সরঞ্জাম ও এ্যাকোরিয়াম বিক্রেতা

মান্না এ্যাকোরিয়াম

প্রোঃ—শ্রীসুজন মান্না
১৬, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলি—৪
[হাতিবাগান বাজারের পিছনে]

এক নজরে

দাম্পত্য কলহে গুরুক্রিয়া :

দাম্পত্য কলহকে যাঁরা অম্ল-মধুর বা [illegible] স্বাদের মতো সাড়া জমানো সংসারের হাসা-কান্নার পরিণতি ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে চান তাঁরা ১৯৬১ সালে ভারতে আত্মহত্যার তালিকাটি পর্যালোচনা করলে অবশ্যই হতবাক হবেন। সম্প্রতি সংসদে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৯৬১ সালে সারা ভারতে আত্মহত্যার যে সরকারী হিসাব পেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, ঐ বছরে যে ৪০,৮০০টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার মধ্যে প্রায় আট শতাংশ হল দাম্পত্য কলহের শোচনীয় পরিণতি। মোট ৩,৪১১জন স্বামী বা স্ত্রী অপর পক্ষের বাক্যবাণ বা পীড়ন সহ্য করতে না পেরে আপন হাতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। শতকরা হিসাবে এত অধিক আত্মহত্যা আর কোন কারণে হয়নি।

দাম্পত্য কলহের পরেই স্থান নিয়েছে পারিবারিক কলহ। পিতামাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের সঙ্গে বিরোধ করে আত্মঘাতী হয়েছে শতকরা সাড়ে সাতজন। একে নিত্য ও বর্তমানকালের মারাত্মক বিরোধও বলা যায়, যা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য এখনো যে বছরে হাজার দুয়েক ছেলেমেয়ে লজ্জায় দুঃখে বা হতাশায় আত্মহত্যা করে থাকে সেটা অনেকের কাছেই একটা বড় রকমের সংবাদ বলে মনে হবে। পরীক্ষায় ফেল করার ব্যাপারটা যেযুগে 'আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার' বলে মনে করা হয়ে থাকে সেসময়ে এক বছরে ১১৬৮জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য আত্মহত্যার সত্যই উল্লেখ করার মতো সংবাদ।

১৯৬১ সালে প্রেমে ব্যর্থতার জন্য আত্মহত্যা করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়েছে মোট ১৪০১জন। অন্যান্য কারণে আত্মঘাতীর সংখ্যা ছিল মোট ২০,৭২৫জন। আত্মহত্যার সব ঘটনা সরকারের কাছে ঠিক মতো পৌঁছায় না। বহু আত্মহত্যাকে অপঘাত বা আকস্মিক মৃত্যু বলে প্রচার করা হয় এবং পারিবারিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও তা এক রকম মেনে নেন। এসব দিক বিবেচনা করলে বছরে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষের স্বহস্তে জীবননাশের ঘটনাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

যুক্তি সবেরই আছে :

সেদিন রোমে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন ইতালির বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বিরোধী আন্দোলনের নেতা, ক্যাথলিক আইন অধ্যাপক সিনর গ্যাব্রিও লম্বার্ডি। উদ্দেশ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে অতি স্বল্পকালের ব্যবধানে যে বিপুল সংখ্যক গণ-স্বাক্ষর (১০,৭০,১০৪) সংগৃহীত হয়েছে এবং যেভাবে জনমত সংগঠিত হয়েছে সে বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত রাখা। কেন তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের বিরোধী তাও তাঁরা জানাতে চেয়েছিলেন দেশের "মোহগ্রস্ত" বুদ্ধিজীবী মহলকে। সাংবাদিক সম্মেলনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সিনোরা লিনা মার্লিন অধ্যাপক লম্বার্ডির পাশে উপবিষ্ট থাকাতে। ইতালির সর্বজন শ্রদ্ধেয়া ঐ নারী নেত্রীর আন্দোলনের ফলেই ১৯৫৮ সালে ইতালিতে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়। সিনোরা মার্লিন একজন সেনেটরও।

সিনর লম্বার্ডির বক্তব্যের সার কথা হল—যদি বিবাহের অচ্ছেদ্য বন্ধনের মর্যাদা রক্ষায় অপারগ হও তবে বিবাহ ক'রো না; যদি পরিবারসূত্রের বন্ধন ভারি বলে মনে হয় তবে প্রেম সূত্রেই বাঁধা থাকো চিরকাল; ঐ প্রেমবন্ধনকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার কথা রাষ্ট্র না হয় নতুন ক'রে ভাবতে পারে (একটা 'লিগ্যাল কনকুবাইনেজ' জাতীয় আইন পাশ করে)। কিন্তু বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, ধর্মকে অপবিত্র ক'রো না, আর দূষিত ক'রে তুলো না ইতালির নারীকুলকে।

ইতালির নারীদের সম্মুখে যে দুঃখের দিন অপেক্ষা করছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক লম্বার্ডি বলেন, নারীর রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং পুরুষদের যদি পছন্দমতো স্ত্রী-বদলের সুযোগ রাষ্ট্রই আইন ক'রে সহজলভ্য ক'রে দেয় তবে তাতে ইতালির চল্লিশোর্ধ্ব মায়েরাই বিপন্ন হবেন সবচেয়ে বেশি। এখন থেকে তাঁরা বাড়িতে কোন যুবতী নবাগতা দেখলেই নিজের আশঙ্কিত দুর্দিনের আতঙ্কে শিউরে উঠবেন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে নারীরা হয়ে উঠবেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, সংসারের শান্তি হবে নষ্ট এবং ইতালির সমাজজীবনের নৈতিক মান নেমে যাবে কোন রসাতলে।

অধ্যাপক লম্বার্ডির যুক্তিগুলি অবশ্য সাংবাদিকদের মনে কোনই দাগ কাটতে পারেনি। পরন্তু একজন সাংবাদিক—'এগুলি নয়া ফ্যাসিবাদীদের কথা' বলে মন্তব্য করলে অধ্যাপক লম্বার্ডি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তারপর চিৎকার ও হৈ হট্টগোলে সভার কাজ আর চলা সম্ভব হয়না। কিন্তু সিনর লম্বার্ডির যুক্তিগুলি, বিশেষ ক'রে ইতালির মাতৃজাতি সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা-শিহরিত উক্তিগুলি যদি কারও মনে বিন্দুমাত্রও দাগ কাটে তাদের জানা দরকার যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের উপায় এতদিন ইতালিতে ছিল না বলেই দেশের দশ লক্ষাধিক নরনারী এমনভাবে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন যেটা সমাজ ও আইনের চোখে জঘন্য ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামী বা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাঁরা অন্য পুরুষ বা নারীর সঙ্গে বাস করছেন বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ না করেই। সুতরাং ইতালির নারীজাতির অমর্যাদা যদি কিছু হয়ে থাকে ত তা এতদিনই হয়েছে, একমাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনই তাদের সে অমর্যাদাকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। দাম্পত্যজীবন যখন অসহনীয় হয় তখনই মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে, তার সঙ্গে রূপ-যৌবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো স্বভাব যাদের তারা অন্য লোক, তাদের অল্পই বিবাহ করে, করলেও সে বিবাহ সুখের হয়না, তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের প্রয়োজন। আর যাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন তাঁদের কজনই বা বৃদ্ধাকে ত্যাগ করেন যুবতীর পাণিপীড়নের উদ্দেশ্যে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এক বিগতযৌবন ডাইভোর্সি নতুন ক'রে ঘর বাঁধছেন আর এক বিগতযৌবনার সঙ্গে। পশ্চিমী দুনিয়ায় ষাটোত্তীর্ণ নরনারীর নতুন করে সংসার পাতার ঘটনা নিতান্তই স্বাভাবিক। ডাইভোর্স যেসব দেশে ব্যাপক-প্রচলিত অতি সাধারণ বিধি, সেসব দেশে গেলেও দেখতে পাওয়া যাবে, 'ওল্ড এজ হোম' বা পার্কের নির্জন কোণগুলি গোধূলির ম্লান মুহূর্তেও গুঞ্জরিত হচ্ছে পলিত-কেশ প্রায়-চলৎশক্তিহীন অতিবৃদ্ধ পতি-পত্নীদের নিভৃত আলাপনে। অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তবু কথার শেষ নেই। সে মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে মৃত্যু, আইন নয়।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সমস্যা ও ভারত

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা দুনিয়ার দরবারে এমন একটা ইঙ্গিত রাখবার চেষ্টা করছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারটা আসলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যারই নামান্তর। সুতরাং এ সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে কথা বলে একটা নিষ্পত্তি করা যায়। পাকিস্তানের সুহৃদ কিছু কিছু দেশ এই অপপ্রচারে রীতিমত বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং যখন বিদেশে গিয়েছিলেন, তখন কোনো কোনো দেশে তাঁকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়া সম্ভব কি না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণা কত অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত। ভারত যেহেতু প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেই কারণে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেই বিষয়টির সুরাহা হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

খুব সরলভাবেই তাঁরা সমস্যার সমাধান করতে চান এবং সেজন্যই পাকিস্তানকে নিন্দা করা বা তাকে সাহায্য বন্ধ করার উৎসাহ অনেক মুরুব্বি দেশেরই তেমন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সমস্যায় ভারত জড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে। এত বৃহৎ একটি গণ-অভ্যুত্থান এবং এমন নৃশংস গণ-হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের মাটি ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিতাড়িত শরণার্থীদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। মানবিক কারণেই ভারত এই দুর্বহ বোঝা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত সরকার পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাবে কেন?

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন যে, সামরিক জয়ই বাংলাদেশ পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান। বাংলাদেশের কোনো এক স্থানে জাতীয় পরিষদের ১১০ জন সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদের ২০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই হাতে ন্যস্ত। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা অস্ত্রশক্তি দিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দেবার যে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম। একে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চালানোর পুরানো সাম্প্রদায়িক কায়দায় কোনো ফল হবে না। বোঝাপড়া ইসলামাবাদকে করতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সঙ্গে।

আইরিশ পার্লামেন্টের দুজন সদস্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি সরেজমিন তদন্ত করে যাবার পর কলকাতায় বলেছিলেন যে, তাঁরা এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছেন। এই মধ্যস্থতা নিশ্চিতই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়। তাঁরা নিজেরাই পরে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন যে, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এই বিরোধের সালিশী হিসেবে কাজ করতে রাজী। কিন্তু কার সঙ্গে সালিশী? বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের সদস্যদের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে পূর্ববাংলার ধ্বংসের এক মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিদেশীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তাঁরাই বলেছেন যে, সমগ্র পূর্ববাংলায় যে-ধ্বংসের চিত্র দেখে এসেছেন তা পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো এলাকার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা একটি দখলদারী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের চণ্ড আক্রমণের দ্বারা। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা, অর্থনীতি বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক কর্মীদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদের হাতের কাছে পায়নি তাঁদের সম্পত্তি ক্রোক ও বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মুক্তিসংগ্রামীরা কার সঙ্গে আপোস আলোচনা করবেন? যাঁরা মধ্যস্থতার কথা ভাবছেন তাঁদের সদিচ্ছার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কথাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার দাবির স্বীকৃতি ছাড়া কোনোরূপ মধ্যস্থতার আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। পাকিস্তান কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দুই পাকিস্তান সৃষ্টি করে গিয়েছিল ভারতকে দুই দিক থেকে সব সময় চাপ দেবার জন্য। গত ২০ বছর সেই অপকর্মই করেছে পাকিস্তানীরা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুরের নেতৃত্বে বাঙালীর চেতনা জাগ্রত হয়ে সেই বিষবৃক্ষ মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে। পাকিস্তানের সমাধি রচিত হয়েছে বাংলাদেশে। বন্দুক বেয়নেট দিয়ে সেই সমাধি হয়তো আরও কিছুদিন পাকিস্তানীরা আগলে রাখবে। কিন্তু বাংলাদেশের নবজন্ম তারা রোধ করতে পারবে না। সেই নবজন্মের স্বীকৃতিই যে কোনো আপোস আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাদের দুই পক্ষ হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন সরকার। অন্যথায় এর মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা রাজনৈতিক প্রহসনমাত্র।

পটভূমি

এই বছরই মার্চের নির্বাচনের আগে যা সম্ভব হয়নি, আগামী নির্বাচনের আগে সেই সি-পি-এম বিরোধী ফ্রন্ট কি পশ্চিম বাংলায় গড়ে উঠবে? এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলার সময় আসেনি, কারণ এখনও কিছুই জমাট বাঁধে নি, সবই নিতান্ত ভাসা ভাসা। শুধু নেতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা আর কোনো কোনো দলের নেতাদের মনে সি-পি-এমকে একঘরে করার বাসনা।

সি-পি-এম বিরোধী একটি ফ্রন্টের সম্ভাবনা পশ্চিম বাংলার হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছে সেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকেই। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে অজয় মুখোপাধ্যায় যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে উদ্যত হয়েও পিছিয়ে এসেছিলেন তখন মোটামুটি একটা সমঝোতা হয়েই গিয়েছিল যে তিনি এই রাজ্যে একটি কম্যুনিস্ট-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনে নেতৃত্ব দেবেন। ১৯৭০ সালের মার্চে অজয়বাবু যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মৃত্যুদণ্ডে সই করলেন তখন সেরকম কোনো স্পষ্ট সমঝোতা হয়নি, কিন্তু সি-পি-এম বিরোধী একটা সরকার গঠনের আশা বজায় ছিল জুলাই পর্যন্ত। সেই জন্যেই বিধানসভা তখনও জীইয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই আশা তখন পূর্ণ হল না। কারণ তখন যারা আটপার্টি জোট বলে পরিচিত ছিল, তারা মনে-প্রাণে সি-পি-এম বিরোধী হলেও কংগ্রেস বিরোধিতার অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষতঃ সোস্যালিস্ট ইউ-নিটি সেন্টার ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগের দ্বারা নিজেদের বামপন্থী চরিত্র মসীলেপনে মোটেই উৎসাহী ছিল না।

ইতিমধ্যে ঐ বছরই সেপ্টেম্বরে কেরলে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে কংগ্রেস সি-পি-আই নির্বাচনী আঁতাত মিনি ফ্রন্টকে সাফল্য এনে দিল। তখনই কথা উঠল, তা হলে পশ্চিম বাংলাতেও কি ঐ ধরনের আঁতাতের সাহায্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দেয়া সম্ভব? কেরলের রাজনীতির ছায়া এর আগেও পশ্চিম বাংলার ওপর পড়েছে। কেরলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ছিল এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার সূচনা। সেইজন্যেই কথাটা বিশেষ করে উঠল। কিন্তু সি-পি-আই তখনও মনস্থির করতে পারেনি। তবু আট পার্টি জোটের অন্যান্য দল, বিশেষতঃ এস-ইউ-সি ও ফরওয়ার্ড ব্লক, জানতে চাইল যে, সি-পি-আই পশ্চিম বাংলাতেও কংগ্রেসের সংগে হাত মেলাবে কিনা। সি-পি-আই নেতারা তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, না, তাঁরা তা করবেন না।

অবশ্য সি-পি-আইয়ের মনস্থির করতে বেশি সময় লাগল না। অক্টোবরেই জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে পার্টির রণকৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'কংগ্রেস বিরোধিতার বস্তাপচা নীতি' বিসর্জনের ডাক দিয়ে সি-পি-আই পশ্চিম বাংলায় সি-পি-এম-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করল। প্রথমে আট পার্টি জোটকে ন'-পার্টি জোট করে তোলা হবে বাংলা কংগ্রেসকে দলে টেনে, তারপর সেই ন'-পার্টি জোট কংগ্রেসের সংগে করবে নির্বাচনী সমঝোতা—এইভাবে এগোনোই ছিল সি-পি-আই-এর লক্ষ্য। কিন্তু সে-লক্ষ্যও পূর্ণ হল না।

তার কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ আট পার্টি জোটের অনেকেই তখনও কংগ্রেসের সংগে এইভাবে হাত মেলানোতে রাজী ছিল না। বাংলা কংগ্রেসের সকলেই আট পার্টি জোটে ভিড়তে উৎসাহী ছিলেন না। বিশেষতঃ সুশীল ধাড়া সবরকম কম্যুনিস্টদের সম্পর্কেই ছিলেন সন্দিহান, তা সি-পি-আই মার্কাই হোক, আর সি-পি এম মার্কাই হোক। আট পার্টি জোটের সংগে বাংলা কংগ্রেসের বোঝাপড়া হলে মেদিনীপুরে আসন ভাগাভাগির কী হবে, সে প্রশ্নও ছিল। তা ছাড়া, সি-পি-আই-এর ঐ প্রস্তাব গ্রহণের কিছুদিন পরেই কংগ্রেসের অধিবেশনেও কম্যুনিস্ট পার্টির সংগে দেশব্যাপী সমঝোতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। ঐ সময়েই সি-পি-আই চেয়ারম্যান এস এ ডাঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে 'প্রগতিপন্থী কংগ্রেসীদের' কাছে সরাসরি চিঠি লিখে আরো জল ঘোলা করে তুললেন, কারণ অনেক কংগ্রেস নেতাই এটাকে ভালো চোখে দেখলেন না। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও যে সকলে সি-পি-আইয়ের সংগে প্রকাশ্যে আঁতাতে আগ্রহী ছিলেন তাও নয়।

তবে সি-পি-আই-এর উদ্যোগ বানচাল হয়ে গেলেও নির্বাচনের আগে প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চলেছে সি-পি-এম বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার। আট পার্টি জোটকে সঙ্গে না পেলেও অন্ততঃ কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেসের আঁতাত হতে হতেও শেষ পর্যন্ত হল না। তার মধ্যে একদিকে যেমন দায়ী সুশীল ধাড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তেমনই অপর দিকে ছাত্র পরিষদ ও যুব-কংগ্রেসের মনোভাব। নির্বাচনে যে বিপর্যয় বাংলা কংগ্রেসের জন্যে অপেক্ষা করেছিল, সুশীল-বাবু তার আঁচ তখনও পাননি, তাই তাঁর দাবি ছিল শতাধিক আসনের। শেষ পর্যন্ত যে তিনটি আসন নিয়ে তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিলেন, সেই তিনটি আসনেই সে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীদের জমানত জব্দ হয়েছে, একথা সুশীলবাবুর সঙ্গে ঝগড়ার পর অজয়বাবুই জানিয়েছেন। কংগ্রেসের মধ্যে একাংশ বাংলা কংগ্রেসের এই অতিরিক্ত দাবি মেনে নিতে খুব অরাজী ছিলেন না, কিন্তু বেঁকে বসেছিল ছাত্র-পরিষদ যুব-কংগ্রেস। তারা অতগুলি আসন বাংলা কংগ্রেসকে ছাড়তে রাজী ছিল না, কারণ তাদের ধারণা ছিল একা লড়াই করে কংগ্রেস অনেক ভালো ফল দেখাতে পারবে। তাদের ধারণা যে মিথ্যে নয়, নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ।

•

এই পুরোনো কাসুন্দি ঘাটবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, এইসব কথা মনে রাখলে ভবিষ্যতের ছবিটা বুঝতে সুবিধে হয়। এথেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা যাবে যে, পশ্চিম বাংলায় একটি সি-পি-এম-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার আগে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে হবে : (১) কংগ্রেস এই ফ্রন্ট গড়তে কতোটা আগ্রহী ; (২) সি-পি আই-এর নীতি কী হবে ; এবং (৩) এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড ব্লক সি-প-এম-বিরোধী-তার জন্যে কংগ্রেস-বিরোধিতা ত্যাগ করবে কিনা।

এস-ইউ-সি'র কথা বাদ দিলে এই সব দলের সামনে এখন একটি পথ রয়েছে —গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে জীইয়ে রাখা। সি-পি-এমকে ক্ষমতায় আসতে না-দেওয়ার জন্যেই এই কোয়ালিশন গড়ে উঠেছিল। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরই যাতে এই জোট ভেঙে না যায় তার জন্যে চেষ্টা শুরু হয়েছে গোড়া থেকেই। বিজয় সিং নাহার এই জোট জীইয়ে রাখার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক দেন, তাঁর সুরে সুর মেলান অজয়বাবুও। সি-পি-আই-এর আগ্রহও চাপা থাকে না, কারণ, কোয়ালিশনের ন্যূনতম কর্মসূচী যাতে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় রূপায়িত হয় তার জন্যে নাগরিকদের আন্দোলন গড়ে তুলতে ডাক দেয় সি-পি আই। মুসলিম লীগও এই ধরনের জোট বাঁচিয়ে রাখতেই চায়, কারণ এই জোটই তাদের পশ্চিম বাংলার মতো রাজ্যে প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেতে সাহায্য করেছে।

কংগ্রেসের সকলেই কিন্তু আঁতাতের পক্ষপাতী নয়। তার কারণ, তাঁদের একাংশ বিশেষ করে নবীনদের অনেকেই 'একলা চল

CENTRAL LIBRARY

রে' নীতিতে বিশ্বাসী। একলা চললেই কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, কারণ জোড়াতালি দেওয়া ফ্রন্টের ওপর ভোটদাতাদের অনেকেরই আস্থা নেই। গত নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি-পি-এম-এর সাফল্যই তার প্রমাণ। তবে 'একলা চল-রে' নীতি হিসেবে গৃহীত হবে কিনা তা নির্ভর করবে দু'টো জিনিসের ওপর। এক, দিল্লী অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী চান এবং দুই, সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কতোটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু কংগ্রেসের সকলে ঠিক এক কদমে চলতে পারছেন না।

অবশ্য আসন ভাগাভাগির মতো বড় প্রশ্নটাকেও কখনই লঘু করে দেখা উচিত নয়। যে-কোনো জোটের সামনেই এটা বড় প্রশ্ন। সি-পি-এম বিরোধী জোটে কংগ্রেস কটি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? দশ-বারোটি দলকে নিয়ে জোট গড়লে কংগ্রেসের মতো বড় শরিকেরও শ' খানেকের বেশি আসন পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই চান অন্ততঃ দেড় শ'র বেশি আসন। এই প্রশ্নটার ফয়সালা না হলেও জোট গড়ার আলোচনা খুব বেশি এগোতে পারবে না।

সি-পি-আই এখনও সি-পি-এম বিরোধী জোট গড়তে খুবই আগ্রহী। কিন্তু পার্টির ভবিষ্যৎ নীতি অক্টোবরের আগে পাকা হবে না। ঐ সময়েই পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

মার্চের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর অসাধারণ সাফল্য দেশের রাজনীতির চকটাকে পালটে দিয়েছে। তার আগে লোকসভায় তিনি ছিলেন কয়েকটি বামপন্থী দলের ওপর নির্ভরশীল। সেই দলগুলির মধ্যে সি পি আই ছিল পুরোভাগে। রাষ্ট্রপতি পদে ভি ভি গিরির নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করলেও পরে তারা আবার দূরে সরে যায়। ফলে, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সি পি আইয়ের প্রভাব স্বাভাবিক বেড়ে যায়। ভূপেশ গুপ্তই দেশের 'আসল প্রধানমন্ত্রী' — এমন বক্রোক্তিও সেই সময় অনেক মহলে শোনা যেতে থাকে।

কিন্তু এই বছর মার্চে সব কিছু পালটে যায়। শ্রীমতী গান্ধী দেশের অবিসম্বাদিত নেত্রী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর পরনির্ভরতার বিপদও কেটে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় সি পি আইয়ের পথ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে দলের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এখন কংগ্রেসের ওপর চাপ দিয়ে তাকে 'প্রগতির পথে' নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনই তার সর্বোত্তম প্রমাণ। সি পি আইয়ের বিরোধিতার জন্যে শ্রীমতী গান্ধী গত বছর এই ধরনের আইন লোকসভায় আনতে সাহস পান নি। কিন্তু এবার আর শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, কারণ তিনি জানেন বিরোধী পক্ষ চেঁচামেচির বেশী আর কিছু করতে পারবে না।

বিহারে ভোলা পাসোয়ান মন্ত্রিসভার প্রতি সি পি আই যে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল, তা কি পার্টির নীতি পরিবর্তনেরই সূচনা? নাকি এটা একটা বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ? এই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছে। সি পি আইয়ের দাবী অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সীমা ও শহরের সম্পত্তির সীমা নির্ধারণে প্রগতিশীল বিধায়ক দল রাজী হয়েছিল। তাতে ভোলা পাসোয়ানের সঙ্কট কেটে যায়। কিন্তু তারপরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বাতিলের প্রশ্নকে একটি ইস্যুতে পরিণত করে সি পি আই কংগ্রেস-প্রভাবিত জোট থেকে বেরিয়ে এল। এর ফলে বিধায়ক দল এখনই হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় নি, কিন্তু সরকারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর এই বিচ্ছেদ ঘটল ঠিক তখনই যখন অত্যন্ত জোর কেরলে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসার জন্যে তোড়জোড় করছেন। বিহারে সি পি আইয়ের মনোভাব কেরলের রাজনীতিতে কী প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং তার জল সারা দেশেই না কতদূর গড়ায় সেটা এখন দেখার মত। সি পি আই এখনও পর্যন্ত যে-কোন মূল্যে কংগ্রেসকে সমর্থনে যে রাজী নয়, বিহারের ঘটনা কি তারই প্রমাণ?

তবু পার্টি হিসেবে সি পি আই এখন রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেই বলা চলে। পার্টি এখন দক্ষিণ দিকে কংগ্রেসের প্রয়োজনেও তাকে সমর্থন করবে, অথবা বাঁদিকে ফিরে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে সেটা তাকে তাড়াতাড়িই ঠিক করতে হবে। সি পি আই কোন্ দিকে চলবে, তার ওপর পশ্চিম বাংলার রাজনীতি কোন্ দিকে চলবে তা-ও অনেকটাই নির্ভর করবে। অক্টোবরে সেই পথের হদিশ মিলবে।

•

এক হিসেবে এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পিও এখন রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়ে। গত নির্বাচনে আর এস পি সম্পূর্ণই একলা চলেছিল, তার মাশুলও তাকে দিতে হয়েছিল। নির্বাচনের পরে অবশ্য এই দল বিধানসভায় মোটামুটি মার্কসবাদীদেরই সমর্থন করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি কংগ্রেস ও সি পি এম থেকে সমদূরত্বের নীতিরই পক্ষপাতী ছিল, তাই কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত হতে পারে নি। কিন্তু মধ্যপন্থার মাশুল এই দুটি দল তথা সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকেও দিতে হয়েছিল। বৃটিশ শ্রমিক নেতা অ্যানিউরিন বিভানই সম্ভবত একবার বলেছিলেন যে, মাঝ রাস্তা দিয়ে চললে গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। গত নির্বাচনে ইউ-এল-ডি-এফ প্রায় গাড়ী চাপাই পড়েছিল।

গত নির্বাচনে এস ইউ সি বা ফরোয়ার্ড ব্লক যদি কংগ্রেস-বিরোধিতার সাবেকী নীতি ত্যাগ করতে না পেরে থাকে তবে এখন কি পারবে? গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, কিন্তু এখন এই দল বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুনভাবে সব জিনিসটা ভেবে দেখতে চায়। সি পি এম সম্পর্কে অবশ্য দলের সম্পাদক অশোক ঘোষের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। তিনি বরাবরই লিখেছেন, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে মার্কসবাদীরা বিপজ্জনক। কংগ্রেসকেই তিনি বরং বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল বলেছেন। কিন্তু তবু ফরোয়ার্ড ব্লক এখনও পাকা কথা দিতে নারাজ।

এস ইউ সি'র আচরণেও দ্বিধা এখনও কাটে নি। যেহেতু কংগ্রেস-বিরোধী এই দলটির স্থান মতাদর্শের দিক থেকে সি পি এমের বামেই হওয়া উচিত, দক্ষিণে নয়। কিন্তু তবু তার পক্ষে সি পি এমের সঙ্গে চলা যে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে সি পি এম সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা। বাস্তিগত ব্যাপারও যে এর মধ্যে নেই তা নয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শ্রম দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সি পি এম শ্রমদপ্তর কিছুতেই ছাড়তে চায় নি। এস ইউ সি এটাকে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে সুবোধবাবুর শ্রমনীতির সমালোচনা বলেই মনে করেছিল।

এস ইউ সি'র দ্বিধা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি এসব সত্ত্বেও এই দল বিধানসভায় মার্কসবাদীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এস ইউ সি কি এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠবে? সি পি এম সম্পর্কে যদি এই দল বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকে তবে কি তারা কংগ্রেস-বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ করবে? এস ইউ সি এখন ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পিকে নিয়ে নতুন ফ্রন্ট তৈরীর চেষ্টা শুরু করলেও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করার বিশেষ কারণ নেই। কারণ, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মাঝ-পথটা ক্রমশই বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

১৬।৭।৭১ —দেব দত্ত

CENTRAL LIBRARY

দেশ বিদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার নয়াদিল্লি থেকে প্যারিসে যাওয়ার পথে ইসলামাবাদে নেমেছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কিছু দূরে নাথিয়াগলি নামে একটি নিরিবিলি জায়গায় তাঁর বিশ্রামের বন্দোবস্ত হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং সেই কারণে তাঁর প্যারিস যাত্রায় কয়েকদিন দেরীও হয়ে গেছে।

ডাঃ কিসিঙ্গার কি সে সময়ে সত্যই অসুস্থ ছিলেন? অথবা, সম্পূর্ণ গোপনে তিনি যাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে পারেন সেজন্য এই অসুস্থতার খবর ছড়ান হয়েছিল? তিনি কি এই সময়ে চুপে-চাপে আওয়ামী লীগের আইন-বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ প্রশ্নের মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন? অথবা, স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই কি তাঁর এই ফাঁকে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল? সংবাদপত্রে এই ধরনের কিছু জল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত যখন ডাঃ কিসিঙ্গারের নাথিয়াগলিতে থাকার কথা সে সময়ে তিনি আসলে ছিলেন পিকিংয়ে। সেখানে কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তিনি প্রায় ২০ ঘণ্টা কাল গোপনে কথাবার্তা বলেছিলেন।

এই গোপন ও নাটকীয় দৌত্যগিরিরই চমকপ্রদ পরিণতি।—প্রেসিডেন্ট নিকসনকে চীন সফরের আমন্ত্রণ এবং প্রেসিডেন্ট নিকসন কর্তৃক সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতবড় চাঞ্চল্যকর ও তাৎপর্যময় সংবাদ আর পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ও সবচেয়ে ধনবহুল দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমানো বরফ অবশ্য কিছুকাল আগে থেকেই গলতে শুরু করেছে; কিন্তু চীনের দেওয়ালের ওপার থেকে যে এত তাড়াতাড়ি সাড়া আসবে এবং খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য পিকিংয়ে লাল কার্পেট বিছানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে, এটা সম্ভবতঃ অনুমান করা যায় নি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই হাওয়া বদল যে ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে ঘটছে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এটা যে কত বড় হাওয়া বদল সেটা সদ্য অতীতের ইতিহাস স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। ১৯৫৭ সালের কথা। সাত বছর আগেই চীনের মূল ভূখণ্ড কম্যুনিস্ট শাসনের অধীন এসে গেছে। ঐ বছর সানফ্রান্সিস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস একটি বক্তৃতায় বললেন, চীনে কম্যুনিস্ট শাসন 'একটা সাময়িক ঘটনামাত্র, স্থায়ী ব্যাপার কিছু নয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'ঐ শাসনের অবসানে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের নিজেদের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি ও চীনা জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য।'

অন্যদিকে, চীনের নেতারাও ক্রমাগত 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের' বাপান্ত করেছেন। ফরমোজা প্রণালীতে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে দুই দেশ একাধিকবার বিপজ্জনকভাবে পরস্পরের প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তাইওয়ান প্রশ্ন নিয়েও দুই দেশের বিরোধ ঘনীভূত হয়েছে।

কিন্তু প্রকাশ্যে প্রচণ্ড বাগ্‌বিসম্বাদের মধ্য দিয়েও আমেরিকার সঙ্গে চীনের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ ছিল। ষাটের দশকের গোড়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে কম্যুনিস্ট শাসন উৎখাত করার আশা নিতান্তই মিথ্যা। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে সানফ্রান্সিস্কো শহরে একটি বক্তৃতায় মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের 'ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ'-এর সেই সময়কার ডিরেক্টর রোজার হিলসম্যান বললেন, 'আমাদের একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, চীনে কম্যুনিস্ট শাসনের উচ্ছেদ ঘটবার কোন সম্ভাবনা রয়েছে।' কিন্তু রোজার হিলসম্যানের এই বক্তৃতারও আগে থেকে, এমনকি ডালেসের বক্তৃতারও আগে থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। প্রথমে জেনিভাতে ও পরে ওয়ারসতে এইসব আলোচনা নিরবচ্ছিন্নভাবে না হলেও ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। এইসব আলোচনার বিবরণ সাধারণত গোপন রাখা হলেও এটুকু জানা আছে যে, এইসব আলোচনার ভিতর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসা ও অন্ততঃ আংশিকভাবে সেই বোঝাপড়াকে কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্পাদিত ঐ চুক্তির বলে চীন আটক ৪০ জন আমেরিকানকে মুক্তি দেওয়ার কথা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে চারজন বাদে আর সকলে মুক্তি পেয়েছিলেন। অবশিষ্ট ঐ চারজনের মুক্তির প্রশ্নেই ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ওয়াশিংটন-পিকিং সংলাপ নিষ্ফল হয়ে যায়। সে সময়ে চীন দ্বিপাক্ষিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, পারস্পরিক বাণিজ্য, সাংবাদিক বিনিময় ইত্যাদি যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল সেগুলি সবই আমেরিকা অগ্রাহ্য করেছিল—১৯৫৫ সালের চুক্তি পুরোপুরি চালু করার দাবীতে। পরবর্তীকালে এই আলোচনায় প্রতিবন্ধকতা এসেছে চীনের তরফ থেকে। পর্যবেক্ষকদের খবর এই যে, ওয়ারসতে পিকিংয়ের প্রতিনিধি ১৯৫৮ সাল থেকে ক্রমাগত বলে এসেছেন, আমেরিকা চীনের ভূখণ্ড ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যকার কোন বকেয়া সমস্যার কথা আলোচনাই করা যাবে না, অর্থাৎ ফরমোজার উপর কম্যুনিস্ট চীনের অধিকার মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সমস্যা আলোচনা করতে চীন অনিচ্ছুক।

যদিও জেনিভা ও ওয়ারসর আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি তথাপি প্রমাণ আছে

যে, ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে চীন ও কমেকোডার মধ্যে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠলেও ১৯৬১ সালে লাওসের সঙ্কটের সময় ঐ দুই দেশের যোগাযোগ উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করেছিল। এটা লক্ষণীয় যে, দুই পক্ষ প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যতই দোষারোপ করুক যোগাযোগের সূত্রটি তারা নষ্ট করতে চায় নি। তারা চায় নি বলেই জেনিভা ও ওয়ারসতে দুই দেশের দূতেরা এযাবৎ প্রায় দেড়শ গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

রিচার্ড নিকসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেন, 'চীনের গণ-প্রজাতন্ত্র নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তারা যখনই এই বিচ্ছেদ কাটিয়ে উঠবে তখনই আমরা তার নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে আছি।'

চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ইদানীং প্রেসিডেন্ট নিকসন একজন ভাল মধ্যস্থ পেয়েছেন। তিনি হলেন রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চোসেস্কু। নিকসন ও চোসেস্কু একে অন্যের দেশ সফর করে গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে নিভৃত আলোচনাও হয়েছে। আর পূর্ব ইউরোপে রুমানিয়াই একমাত্র কম্যুনিস্ট দেশ যার সঙ্গে চীনের সদ্ভাব আছে। পাকিস্তানের নেতারাও এই ঘটনা-গুলিতে সাহায্য করে থাকতে পারেন।

অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময় চীন তার আগেকার অন্তর্মুখিতা পরিত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে। সেই আগ্রহের সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটল তার 'পিংপং কূটনীতির' মধ্যে। আমেরিকান টেবিল টেনিস টীমকে চীনে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে পিকিং সারা পৃথিবীকে চমকিত করে। এরই পর প্রেসিডেন্ট নিকসন কয়েক দফায় চীনের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেদেশে মার্কিন নাগরিকদের যাতায়াত সংক্রান্ত বাধানিষেধ শিথিল করার কথা ঘোষণা করেন।

সব শেষে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এল প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই ঘোষণা: "মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীন সফর করার ইচ্ছা করে কিসিঙ্গারের কাছ থেকে জানতে পেরে চীন আগামী বছর যে মাসের মধ্যে সফর করতে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।"

আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন ভারত-বর্ষকেও তার চীনা নীতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এতদিন যাবৎ পিকিং-নয়াদিল্লি সম্পর্ক পিকিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কের সমান্তরাল ধারায় চলে এসেছে। এখনও যদি সেই সমান্তরাল ধারা বজায় রাখতে হয় তাহলে ভারতকে চীনের সঙ্গে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে যে ভারত-মার্কিন বৈঠক হয়েছিল তাতে মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারত সরকারকে আমেরিকার চীনা নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সে সময়কার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ তখন রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সেকথা জানিয়েছিলেন।

এখন নয়াদিল্লি যদি পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগী হয় তাহলে পিকিং থেকে কি সাড়া পাওয়া যাবে? ভারত-চীন সম্পর্কের দিকে নজর রাখা যাদের কাজ তাঁরা হাওয়া বোঝার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হংকং-এ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদদাতা যে ককটেল পার্টি দিয়েছিলেন তাতে চীনা সাংবাদিকরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মেলামেশা ও হাসি-গল্প করেছিলেন, এটাও লক্ষ্য করে ভারতীয় সাংবাদিকরা তার মানে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

চীন থেকে আরও একটি প্রত্যাশিত সংকেতের জন্য পর্যবেক্ষকরা অপেক্ষা করছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, চীন এবার 'পিংপং কূটনীতির' খেলায় ভারতকেও জড়াতে পারে। আগামী নভেম্বর মাসে পিকিংয়ে যে আফ্রো-এশিয়া টেবিল টেনিস খেলার আয়োজন করা হয়েছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ করা হয় কিনা সেদিকে পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য রাখছেন।

ইতিমধ্যে ভারতের পক্ষে একটি বিপজ্জনক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর এশিয়ায় চীনের নীতিতে কোন বাধা দেবে না। যদি তাই হয় তাহলে ভারতবর্ষ ও পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পাকিস্তান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। পাকিস্তান ও চীনের মিতালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয় ভারতকে আরও সমস্যায় ফেলবে এবং পূর্ববঙ্গের মুক্তি-সংগ্রামকে কঠিনতর করে তুলবে।

•

পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সোহাগ ও শাসন করতে চেয়েছে আমেরিকা। অন্তর জুড়ানো সোহাগের নমুনা সারা দুনিয়া দেখেছে। শাসনের দৌড় কতদূর, আশা করা গিয়েছিল, সেটা বোঝা যাবে ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার ইসলামাবাদ থেকে ফেরার পর। দিল্লির রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা খবর দিয়ে-ছিলেন ইসলামাবাদে যাওয়ার পথে নয়াদিল্লীতে ডাঃ কিসিঙ্গার বলে গেছেন যে, পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে বাংলাদেশ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করাবার চেষ্টা তিনি করবেন এবং সেই চেষ্টার ঠিকমত সাড়া না পেলে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনকে পাকিস্তান নীতি পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দেবেন অর্থাৎ কিনা শাসনে কাজ না হলে তিনি সোহাগের মাত্রা কমাতে বলবেন।

বাংলা সাহিত্যের একখানি অতুলনীয় উপন্যাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অহিংসা

দাম ৭·৫০

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দিবারাত্রির কাব্য ৫·০০ অতসীমামী (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)

মাঝির ছেলে ৩·৫০

লেখাপড়া ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

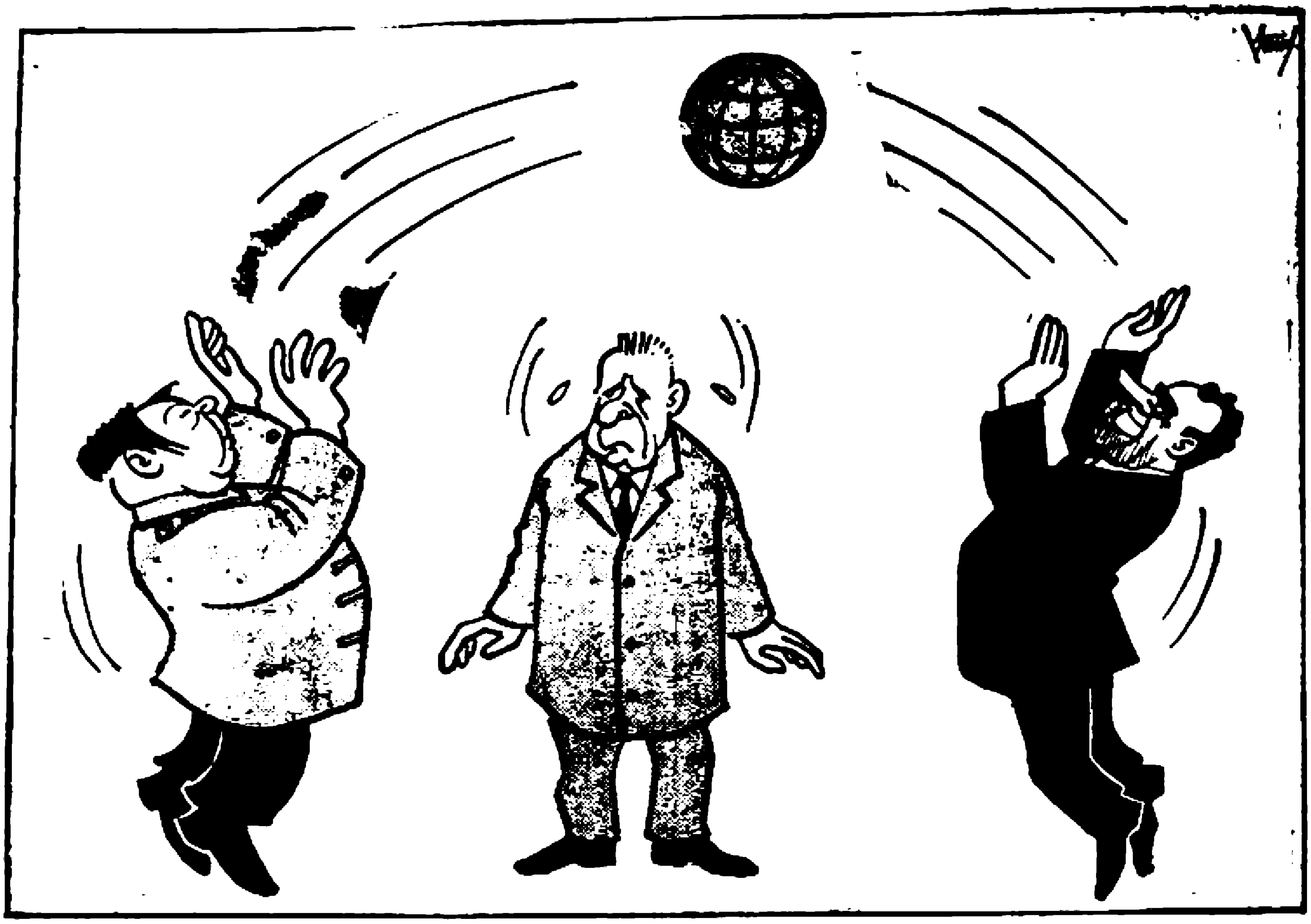

কিন্তু ডাঃ কিসিঞ্জারের এই পাকিস্তান সফরের ফল কি হল? দৃশ্যতঃ, কিছুই না। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, পূর্ববঙ্গ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমেরিকা 'উচ্চ পর্যায়ে' পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাঃ কিসিঞ্জারের সঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁর যে আলোচনা হয়েছে সেটাও এই 'উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা'র মধ্যে পড়ে কিনা অথবা এই সব আলোচনার ফল কি হয়েছে সেবিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র কিছুই বলেন নি। অন্যদিকে, একথা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী আর্থিক বছরে পাকিস্তানকে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য মার্কিন সরকার আইনসভায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন না।

এটা হতে পারে যে, আমেরিকা যখন চীনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চলেছে তখন তারা চীনের মিতা পাকিস্তানকে খুব অখুশী করতে চায় না। আর সেই কারণেই পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার শাসনের চেয়ে সোহাগের মাত্রাটাই বেশী।

ইতিমধ্যে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা পাকিস্তান সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দলের রিপোর্টটি ফাঁস করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক [illegible] নিয়ে গঠিত এই প্রতিনিধি দল পূর্ববঙ্গের ১২টি জেলায় ঘুরে স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখে এসে ১১ হাজার শব্দের যে রিপোর্টটি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তান সরকারের সমস্ত প্রচার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এশিয়া বিভাগের প্রধান পিটার কারগিলের (জাতিতে বৃটিশ) নেতৃত্বে গঠিত ঐ প্রতিনিধি দল তাঁদের রিপোর্টে পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থাকে জাপানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর দিনের সকালবেলার সঙ্গে, বোমাবিধ্বস্ত জার্মান শহরের সঙ্গে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মাই লাই গ্রামে অত্যাচারের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা যেসব শহরে গেছেন সে সব শহরের কোন কোন অংশ ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আর প্রতিটি জেলায় তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া গ্রামের চেহারা দেখেছেন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বড়-বড় অনেক সড়ক-সেতু ও রেল-সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট-ছোট অনেক পুল ও কালভার্ট নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে 'মিলিটারি যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সাধারণভাবে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।'

ইয়াহিয়া বাহিনীর উৎপাতে পূর্ববঙ্গের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শুধু মাত্র সরকারী ক্ষতি যা হয়েছে তার পূরণ করতেই ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে একটা প্রাথমিক হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু, প্রতিনিধি দল মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে, এই খরচের অঙ্ক অনেক বেশী হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রতিনিধি দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পূর্ববঙ্গে মিলিটারীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে না কমালে শান্তির পথে পদক্ষেপ করা আদৌ সম্ভবপর হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁদের সুপারিশ হল, পাকিস্তানকে উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখা হোক, কেননা এই সাহায্য দিয়ে 'এখন বিশেষ কিছু কাজই হবে না।' তাঁদের মতে, এই সাহায্য আপাতত বছর খানেক বন্ধ রাখা উচিত।

এই রিপোর্ট যাতে প্রকাশ না পায়, এমন কি বিশ্বব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের হাতেও যাতে না যায় সেজন্য আমেরিকা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন আমেরিকায়, ও অন্যত্র যাঁরা পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন তাঁদের হাত আরও শক্তিশালী হল।

১৩-৭-৭১ —পুণ্ডরীক

অবিশ্বাসের কাল

অসীম রায়

(উপন্যাস)

'বড়ী, ও বড়ী, ফকস্ মানে কি শেয়াল?'

'ধোৎ! ফক্স মানে তো শেয়াল।'

'তাহলে ফকাস্ মানে কী?'

'ফকাস্ মানে ... ফকাস্ মানে... বড়ী ওরফে গায়ত্রী চৌধুরী, বয়স আট, এদিক ওদিক চায়। একবার এস-ডি-ও কোয়ার্টারের লম্বা টানা বারান্দার মাথায় পুরু সেগুনের কড়িগুলোর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেই সামনের মাঠে নিঃসঙ্গ ঝাড়ালো রোদে ঝকমকে কামিনী গাছটার দিকে চেয়ে থাকে। সেদিকে চেয়েই মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আচার খাবি?'

'আমাকে কিন্তু বেশী করে দেবে, হ্যাঁ, বলেই অনিন্দ্য চৌধুরী, ডাকনাম টুটুল, বয়স পাঁচ, তার পেছনে পেছনে বারান্দার শেষ প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

'ম্যাখ দ্যাখ!' টুটুল চেঁচিয়ে ওঠে। বারান্দার কোণে একটা বিশাল ফাটার পাশে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের সার। সার বেঁধে তারা উঠছে বারান্দার গায়ে সদ্য হলুদে ছোপানো পাঁচিল বেয়ে একটা নিষ্ফলা, ঢ্যাঙা পেঁপে গাছের পেছনে কোন গর্তে অথবা ঘাসে ঠিক বোঝা যায় না।

টুটুল খপ্ করে গোটা দুয়েক ডেঁয়ো তুলেই ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে। পরমুহূর্তেই সেই ন্যাংচানো জীব দুটোর মাথা টিপে ধরে আবার ছেড়ে দেয়।

'ছিঃ ছিঃ! কি নিষ্ঠুর! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

'এক গেলাস জল নিয়ে আয় বড়ী, ডাক্তারি করব।'

বড়ী তার ভাইয়ের দিকে একবার তাকায়। পরনে বাড়িতে তৈরী ইজের, হাড়ে মাংসে জড়ানো কালচে বাদামী খালি গা, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, এ ভাইটা অন্য ভাইবোনদের চেয়ে তার প্রিয়। একবার ইতস্তত করে বললে, 'তুই দাঁড়া, আমি আসছি।'

সন্তর্পণে পাশের বন্ধ দরজা টানতেই বিরাট ভারী পাল্লাটা কোঁ করে ওঠে। বড়ীর বুক ছলাৎ করে। পা টিপে টিপে অন্ধকার ঘরে ঢুকেই সে জড়ভরত বনে যায়। মা নড়ছে। পাশে চোঙা ঘুমোচ্ছে অকাতরে। ঘরের মধ্যে টানা পাখার ঝিরঝিরে ঠাণ্ডায় ঝিম মেরে থাকে। মা-র নড়া বন্ধ হয়। অন্ধকারেও ফর্সা! ম্যাস্প্যাচ্ছন্ন স্বর্ণ-সুন্দরীর চেহারাখানা তার আরো ঠাওর করতে পারে। আবার মৃদু নাক ডাকতে সুরু করেছে। বড়ী হাল্কা লাফে ঘরখানার শেষে এসেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার ভেজানো দরজার পাল্লা খুলতেই আরও বেয়াড়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ ওঠে। ভ্রূক্ষেপ না করে বড়ী বেরিয়ে আসে ভেতরের বারান্দার। রোদ ঝলমলে উঠোন। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ। উঠোনের এক কোণে বিশাল আমগাছের নীচেই গোয়ালের সামনে ছায়ায় মঙ্গলা গরুটা চোখ বুজে মরার মতো শুয়ে, পা ছড়িয়ে, মাছির উদ্দেশ্যে কখনো কখনো তার ধাবমান ল্যাজেই শুধু জীবন প্রতীয়মান। নানা ঘুমোচ্ছে উঠোনের আর এক প্রান্তে রান্নাঘরের দাওয়ায়, পাশে কৃত্তিবাস রামায়ণের ওপরে রাখা তিন-চার মাস আগে কটক থেকে কেনা চালশে চশমা। বারান্দার প্রান্তে টিনের ভরা টব থেকে এক মগ জল নিয়ে বড়ী আবার ফেরে, অতি-মাত্রায় সাবধানতার দরুণ ল্যামবাবুর সেলাই করা হলুদ মার্কিনের ফ্রকটার গোটা বুক ভিজে যায়। দরজার পাল্লা খুলবার আগে থমকে দাঁড়ায় বড়ী। কমলীর মা পাখা চালাতে চালাতে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে অকাতরে অথচ তার একখানা হাত ঘরের ভেতরের দড়িটা টেনে যাচ্ছে। ক্রমশঃ আস্তের দিকে যেতে যেতে তার হাতখানা থমকায়। পরমুহূর্তেই পুরাতন গতি সঞ্চারিত হয় তার হাতে। কমলীর বাবা বাসিন্দে, কমলীর মা ঝি নে। বেতন মাসে চারটাকা, সরকার থেকে বরাদ্দ।

হাতের তেলোতে জল নিয়ে বড়ী ছিটোয়। চমকে তার তেল-সিঁদুর সিঁথি আর ঠাস চুলভরা মাথাখানা তুলেই কমলীর মা বলে তার সুরেলা হিন্দুস্থানী গলায়, 'মা-কে বলে দেব।' তারপর আবার মাথা ঝুঁকিয়ে পাখার দড়ি নাড়তে নাড়তে ঝিমোতে থাকে।

অন্ধকারে স্বর্ণসুন্দরী পাশ ফেরেন। বড়ী আবার চট করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আরও খানিকটা জল ছলকে তার বুক ভেজায়। দরজার শব্দ সামলিয়ে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বড়ী তখন চোত-মাসের গরম হাওয়া পাক খাচ্ছে সামনের ন্যাড়া মাঠে। বারান্দায় টাঙানো ক্যালেন্ডার খড়মড় খড়মড় করে হাওয়ায়।

টুটুল ইতিমধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ডেঁয়ো পিঁপড়ের বিরুদ্ধে। শত্রু আক্রমণের খবর হঠাৎ যাওয়ায় ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল ছত্র-ভঙ্গ হয়ে একদল পাঁচিলের দিকে আর একদল বারান্দার কোণে বিশাল ফাটার মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। প্রায় বারো-চোদ্দটা ডেঁয়ো সৈনিক সামনে, কয়েকটার পা নড়ছে।

কয়েকটা আধমরা ডেঁয়োর গায়ে জল ঢালে টুটুল। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'এখনই উঠে পড়বে দেখিস।'

দুজনে উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ পর্য-বেক্ষণ করতে থাকে। বড়ীর চকচকে কালো লাল টুটুলের চুলগুলো হাওয়ায় সুড়সুড়ি দেয়। বাস্তবিক লেংচে লেংচে উঠে চলতে থাকে ডেঁয়োগুলো।

'দেখলি দেখলি,' টুটুল হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপর হুকুম করে, 'একটা কাগজ দে, দে না।'

লম্বা বারান্দার এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত খাঁখাঁ করছে, কাগজের কুটি নেই। টুটুল উঠে গিয়ে টুল লাগায় দেয়ালে। তারপর বড়ী কিছু বলবার আগেই ক্যালে-ন্ডারে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের পাতা-খানা চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলে।

'কি করলি? কি করলি তুই? এ মাসের পাতাটা ছিঁড়ে ফেললি!' জবাব না দিয়ে টুটুল ন্যাংচানো ডেঁয়োগুলো তুলে নিয়ে টপাটপ কাগজটার ওপর রাখে। বারান্দার কোণে গিয়ে মেঝেতে নদীর ধারার মতো লম্বা আঁকাবাঁকা গর্ত জলে ভর্তি করে ডেঁয়োগুলো ছেড়ে দেয় তার ভেতর। সাঁতরে সাঁতরে পিঁপড়েগুলো ওপরে উঠবার চেষ্টা করলেই টোকা দিয়ে আবার জলে ফেলে দেয় সেগুলো।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবার মৃদু দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বড়ী বললে, 'আমি আচার খেতে চললাম।' বলবার সময় তার লাল মুখখানা দেখে যে, সেখানে ওপরের পাটিতে এখনও পড়ে যাওয়া দুধের দুটো দাঁত ওঠেনি।

'আমিও যাব,' টুটুল লাফিয়ে ওঠে।

কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের গায়ে বারান্দা সংলগ্ন পাঁচিলটার কাছে এসেই বড়ী থমকে

দাঁড়ায়। বাইরে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে তার চোখ চকচক করে উত্তেজনায়। ফিস-ফিস করে বলে, চূর্ণী নদীতে যাবি?'

'মা বকবে।'

'জানতেই পারবে না। নে, ওঠ।'

একটা ট্রাংক লাগিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ে বুড়ী। এইসব চটপটে কাজে সে ভাইবোনদের মধ্যে খুব দড়। সে যখন হাত বাড়িয়ে ভাইকে ওপরে টেনে তোলে তখন পাৎলা ফিরফিরে বেণীটা গালের পাশে এসে পড়ে। ওপাশে হাঁটু নামাতেই কোকর। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বুড়ী চট করে নেমে পড়ে। তারপর আলসেতে হাত আঁকড়ানো ঝুলন্ত টুটুলের পা আর কোমর জাপটে নামিয়ে নেয়।

বাইরে ১১০ ডিগ্রি তাপে ঠাঠা মাঠ। কিন্তু পাঁচিলের পাশেই তাদের খাটো পায়খানার মাথায় সারা গায়ে এ'চড়ভর্তি বোকনগুজো কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়া। সেখানে দাঁড়িয়ে টুটুল সেই নিস্পন্দ দীপ্ত মধ্যাহ্নের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অদূরে জেল-খানা। সেখান থেকে পেটা ঘণ্টার ঢং ঢং করে দুবার আওয়াজ সমস্ত মাঠ, তাদের বাবার সযত্নে লালিত ঘের-দেওয়া বেগুনের ক্ষেত, মাচায় রোদ-পোওয়ানো কুমড়ো, তাদের বাড়ির গা দিয়ে পায়ে চলার পথ আরও নির্জন থমথমে করে তোলে।

'কিরে হাবার মতো দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?' বুড়ী তাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারে। তারপর চড়াই পাখির মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে জেলখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতেই আবার থমকে দাঁড়ায়। বুড়ী তার ভাইয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে নামায় পাশের শুকনো নালাটায়।

'হায়! ঐ যে।' বুড়ী আঙুল দিয়ে দেখায় জেলখানার দিকে।

কর্সা লম্বা গয়া জেলার অধিবাসী রামসুভগ সিং খড়ম পায়ে এদিকের দালানে আসছে। হাতে চকচকে মাজা ঘটি। মধ্যাহ্ন-ভোজন বোধহয় শেষ। দালানের ধারে উবু হয়ে বসে সে মুখ ধোয়, ঘন ঘন কুলকুচো করে। তারপর দাঁড়িয়ে ঠোঁটে না ঠেকিয়ে ঢকঢক করে ঘটি থেকে জলপান করে। দু-তিনবার আওয়াজ করে ঢেক তোলে। একবার তার শক্ত চোয়ালের মাঝখান থেকে দুটি চোখ নিরীক্ষণ করে সামনের বিরাট ছড়ানো নিস্পন্দ মধ্যাহ্ন। তারপর দরজার শব্দ মিলিয়ে যায়।

এবার নালা থেকে উঠেই বুড়ী টুটুলের হাত ধরে দৌড় মারে। এ-রাস্তাটায় নদীর আগ পর্যন্ত গাছপালাগুলো কত বেঁটে বেঁটে, চারদিকে ঝোপ-ঝাপই বেশী। গরম হাওয়ায় তাদের চিবুক কপাল পুড়ে যায়। রোদে পুড়ে থমথম করে তাদের মুখ। কিন্তু আনন্দে আর উত্তেজনায় চোখ জ্বলে।

'দিদি, ব্যাং ব্যাং!'

টুটুল দেখায়। রোদ্দুরে ঝলমল করছে ফুলন্ত বেঁটে কাঁটালচাঁপা। এই গরম হাওয়া আর রোদ্দুরেও গাছের নীচটা গন্ধে ভুরভুর। অনেকগুলো ঝরা ফুল কুড়ায় বুড়ী তার ফ্রকের কোঁচড়ে। দূরে চূর্ণী নদীর জল চিকচিক করে। দুজনে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে নদীর ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় বসে।

চূর্ণীর দুধার নির্জন। বসতি খুব ছাড়াছাড়া। এই ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসেও অনেক বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাসে' বর্ণিত নদীর পরি-বেশ প্রায় অটুট। একটা কলসী-ভর্তি নৌকো আসছে বাদামী পাল তুলে। কাছে আসতেই তারা টের পায় গুণ টেনে আসছে। এক মুখ দাড়ি আর সবুজ লুঙ্গি পরে ঘামে চকচকে পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়ে মাল্লাটা দড়ি টানতে টানতে তাদের নীচ দিয়ে চলে যায়। বুড়ী বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার পায়ের গোড়ালির দিকে। কতগুলো শিরা জট পাকিয়ে জমে আছে সেখানে।

'আজ সাহেব আসবে আমাদের বাড়ি, জানিস?'

টুটুল সাহেব দেখেনি, অথবা তার মনে পড়ে না দেখেছে কিনা। বলে, 'কেন আসবে?'

'বাঃ! বাবাকে ভালবাসে না!' বুড়ী ঘাড় নাড়িয়ে বলে।

এতক্ষণে তারা খেয়াল করে শিমুলের তুলো ভাসতে ভাসতে হাওয়ায় নামছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলে একটা চার-পাঁচতলা লম্বা নীলাভ সাদা শিমুলের গাছে তুলো ফাটছে। সূর্যের আলোয় সেই অসংখ্য উড়ন্ত সাদা রেশমের টুকরো কখনও হাওয়ায় স্থির, কখনও দমকা হাওয়ায় লুটোপুটি খায়।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ছলছল চোখে বুড়ী হঠাৎ বললে, 'বাবার কি কষ্ট।'

টুটুল অবাক হয়ে তাকায় দিদির দিকে। এযাবৎ পারিবারিক ঘটনা সমস্যা সে দিদির মারফতই প্রধানত শুনে আসছে। কাজেই শিমুল তুলোর খেলা থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকায় দিদির দিকে।

'সেইজন্যেই তো সাহেব আসছে। সাহেব তো বাবাকে ভালবাসে।'

সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। গোলমেলে ঠেকে টুটুলের কাছে। বলতে কি বুড়ীর কাছেও ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। কিন্তু সে তার দাদার কাছে কিংবা বাড়ির বখন ছুটিতে কলকাতা থেকে আসে তার কাছ থেকে এই রকম ব্যাপার শুনেছে কয়েকবার। সেই কথাটাই ভাবা দেবার চেষ্টা করে বুড়ী তার বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে।

'বাবাকে সব বন্দেমাতরম্ করছে তো', বেশ খানিকটা চিন্তা করে বুড়ী বলে, তারপর চিন্তার গুরুভারে অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস কিনা, তুই একটা বোকা!'

এস ডি ও বাংলোর সামনে বিশাল মাঠটার কোণায় একদিকে জেলখানা, উল্টোদিকে কাছারি। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যেবেলা যখন তারা ভাবের খোলা দিয়ে ফুটবল খেলছিল, তখন রামসুভগ সিং আরও দু-তিনজন কনস্টেবল কোমরে দড়ি দিয়ে কয়েকজন বাঙালী তরুণকে আদালত থেকে নিয়ে আসছিল জেলে। তারা খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে শুনেছিল কয়েকজন তরুণের চীৎকার, 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম।'

এ সত্ত্বেও টুটুলের হৃদয়ঙ্গম হয় না ব্যাপারটা। কিন্তু তারও চোখ ছলছল করতে থাকে বুড়ীর মতো।

বুড়ী আবার জুড়ে দেয়, 'বাবার কত কষ্ট তুই তো জানিস না!'

'কষ্ট কেন?'

'রোজ কাছারিতে যায়!'

'যায় কেন?'

'বাঃ, টাকা-পয়সা আনতে হবে না।'

টুটুলের আর ভাল লাগে না এইসব পারিবারিক প্রসঙ্গ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'চাই না, টাকা-পয়সা চাই না।'

'বাঃ, কি বোকা!'

'টাকা-পয়সায় কি হয়? চাই না পচা টাকা।'

সেই রোদ্দুরে লাল ঠোঁট ফোলানো পাঁচ বছরের ভাইয়ের দিকে চেয়ে বুড়ীর মায়া হয়। বলে, 'বাঃ, চাল পাবি কি করে? টাকা না হলে চাল পাবি কি করে? ভাত খাবি কি করে?'

টুটুল আর এসব প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে এক দৃষ্টিতে যেখানে নদীটা বাঁক খেয়েছে সেদিকে চেয়ে থাকে। আর একটা নৌকো আসছে, খালি নৌকো। ছইয়ের নীচে লোকটা হুঁকো টানছে। কাছে আসতে সে আশ্চর্য হয়ে ঝোপের ধারে বসে থাকা ছেলেমেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করে। তারপর আবার জলের দিকে চেয়ে তামাক টানতে থাকে। দূর থেকে জেলখানার পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজার আওয়াজ ভেসে আসে।

'ওমা, মা উঠবে এখনই, চল চল।' বুড়ী লাফিয়ে উঠে পড়ে। খানিক দূর এগোতেই জেলখানা আর নদীর মাঝামাঝি জায়গায় পাশের পায়ে চলার পথ ধরে সামনের ঝোপের পেছন থেকে মাঝবয়সী একজন লোক এগিয়ে আসছে। তার গালে দাড়ি, কপালে লাল টিপ। বুড়ী হঠাৎ তার ভাইয়ের হাত ছেড়ে তো দৌড় দেয়, আর তারস্বরে চেঁচাতে থাকে 'কাপালিক, কাপালিক!'

টুটুল একমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থাকে। লোকটা এগিয়ে আসতে আসতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে। প্রকাণ্ড ভয়ের আক্রমণ-তায় তার হাত-পা চেপে ধরে। কোন্ সুদূর জগৎ থেকে বুড়ীর স্বর ভেসে আসে, 'টুটুল পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।' হঠাৎ চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড়তে থাকে। জেলখানার কাছে এসেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। পা ছড়ে যায়। এবারে সে কেঁদে ফেলে। আর বাড়ির কাছাকাছি আসামাত্রই বুড়ী তার অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। সে আর টুটুল দুজনেই মার পাশে ঘাপটি মেরে শুয়েছিল, আর টুটুলই প্রথমে বারান্দায় পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রোদে-পোড়া কান্নায় ভেজা তার ভাইয়ের মুখখানা দেখে তার মা নিশ্চয় এসব

কথা ধর্তব্যে আনবে না। আর তার মায়ের সেই সিংহী মূর্তি কল্পনা করে বড়ী তাড়াতাড়ি তার ভাইয়ের কাছে ছুটে এসে তার হাঁটু থেকে ধুলো ঝেড়ে, চোখ-মুখ ফ্রকের খুঁট তুলে মুছিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কাঁদিস নে।'

কিন্তু টুটুল জেলখানার দেওয়ালের ছায়ায় কিছুক্ষণ ফোঁপায়। বলে, 'তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছিলে, মা-কে বলে দেব।'

'দূর বোকা! কিছু হয়নি, বলছি না। মা-কে বলবি না, তাহলে কোনদিন চূর্ণী নদীতে নিয়ে যাব না।'

শত্রু-পরিবেষ্টিত অঞ্চল যেভাবে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে পার হয় লোকে তেমনিভাবে দুজন মাঠ পার হয়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। বড়ী ভাবছিল, সে যদি এই মুহূর্তে মাছি আরশোলা টিকটিকি কিংবা ঐরকম কোন নগণ্য সরীসৃপ হয়ে তাদের অন্ধকার শোবার ঘরে সেঁধিয়ে যেতে পারত। স্বর্ণ-সুন্দরী এই সময় উঠে পড়েন। তাঁর চলা-ফেরা থেকে ঘড়ির কাঁটা মেলানো যায়। এই ঠাঠা রোদ্দুরে মাঠ পার হতে দেখলে নিশ্চয় ঠাস করে চড় মারবে মা। বড়ী প্রায় চড়ের শব্দটা শুনতে পায়। তার সৌভাগ্যে সে নিজেই অবাক হয়। অবলীলাক্রমে বারান্দায় উঠে আসে। পাল্লাটার কোঁ সত্ত্বেও অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়তে ব্যাঘাত হয় না। টানা পাখার ঠাণ্ডা এক ঝলক হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়। বেড়ালের নিঃশব্দ গতিতে তাদের নির্দিষ্ট বালিশে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। বড়ী প্রবল আত্মবিশ্বাসে তার এক-খানা পা চাপিয়ে দেয় মার গায়ে। এতক্ষণ উত্তেজনার পর চট করে ঘুম আসে দুজনের। ঘণ্টাদুয়েক নিষ্বাদিত্রার আরামে টান্ টান্ হয়ে শোন স্বর্ণসুন্দরী। তাঁর হাতটা চলে পড়ে মাথার কাছে তালপাকিয়ে শোওয়া টুটুলের গায়ে। তারপর নিশ্চিন্তে তাঁর নিজের গোল ফর্সা বাহুর ওপর কাল তিলটা নিরীক্ষণ করেন। এই তিলটার পাশে শোওয়ার জন্যে কোন কোনদিন বড়ী আর টুটুলের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। চিৎ হয়ে শুতেই বড়ীর ঘুমন্ত পা গা থেকে গড়িয়ে পড়ে। স্বর্ণসুন্দরী ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত বুলোন। ফ্রকটায় হাত পড়তেই মনে পড়ে যায় গোপাল ধোপার কথা। সাহেব আসছে ছুটিয়। ছেলেমেয়েদের একটাও ভাল জামা কাচা নেই। কমলীর মা-কে এখনই পাঠাতে হবে। স্বর্ণসুন্দরী উঠে পড়েন।

২

স্বর্ণসুন্দরীর গর্ব স্বামীর চেয়েও তাঁর বাবা। বিহারের আরা জেলার কালেক্টার অক্ষয়চন্দ্র বসু তাঁর সামনে আদর্শ পুরুষের চিত্রকল্প। তাঁর পাশে ভবনাথ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে, সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞ, এমনকি অনুগ্রসর। বলতে গেলে কি ভবনাথের অসম্ভব কর্মনিষ্ঠা সত্ত্বেও একটু দৈন্যতো লাগে তাঁর স্ত্রীর কাছে। তিনি টের পান কর্মক্ষেত্রে বাপের নতুন নতুন উদ্ভাবন শক্তি স্বামীর মধ্যে অনুপ-স্থিত। তাঁর মতে কাজ শুধু করলেই চলে না, কাজ খেলাতে হয়। স্বর্ণসুন্দরী বরা-বরই ভেবে আসছেন তিনিই তাঁর স্বামীকে ঠেলে চালাচ্ছেন, সবাইকে ধোঁকায় দেড়াচ্ছেন।

আর এই ধারণা চাপরাশী বলাই তাদের ঠাকুর বা বড়ীদের নানা অর্থাৎ গোপীনাথ ত্রিপাঠী, জেলা কটক, তৃত্য ও মালি জগা, জেলের হেড কন্সটেবল রাম-সুভগ সিং, এমনকি সার্কল অফিসার বোকির বাবা, কাছারির পেস্কার সুরেন, বাজারের মুদী বিলাসীপ্রসাদ, টাউন স্কুলের হেডমাস্টার শ্যামবাবু এবং আশেপাশে প্রায় সকলেরই। গত এক বছরে রাণাঘাটে আসার পর থেকেই সবাই মেনে নিয়েছে আসল হাকিম পর্দার অন্তরালে।

কারণ শুধু ১৯০২ সালেই নয়, যে-কোন কালে এবং যে-কোন দেশেই তো দুরকম লোক দেখা যায়, একদল লোক হুকুম করে আর একদল লোক সেই হুকুম মনেপ্রাণে তামিল করে জীবনের সার্থকতা খোঁজে। ভবনাথের হুকুম করার চাকরী, কিন্তু তিনি পারেন না। বাড়িতে কাউকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার হুকুমও কখনো করেননি। বৃটিশ শাসনের যা প্রথা-গত লিপিবদ্ধ হুকুম তাই তামিল করে আনন্দ পান। আর স্বর্ণসুন্দরী ঠিক উল্টো। হুকুম না করতে পারলে তাঁর প্রাণ আইঢাই করে। তিনি সবাইকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ান—তাঁর ছেলেমেয়েকে, স্বামীকে, বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর। এমনকি দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সদ্য প্রতিষ্ঠিত নারীমঙ্গল সমিতিতেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী।

স্বর্ণসুন্দরী বিশাল হাই তোলেন। টুটুলের গোঁজ-করা মাথাটা ভালভাবে এলিয়ে দেন বালিশে। একবার তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে উঠে পড়েন। দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে তিনটে বাজল।

ভেতরের বারান্দায় তাপ কম। ভোলা টবের জলে চোখেমুখে ঝাপটা দিতে দিতে হাঁক দেন, 'কমলীর মা, আজ তুরন্ত ধোবি-কোঠি যাও। কাপড়া লে আনে বোল। তুরন্ত যাও।'

স্বর্ণসুন্দরীর ধারণা বাপের সঙ্গে দকালে বিহারের কোন কোন অঞ্চল ঘোরার দরুণ তাঁর হিন্দী ভাষায় দখল আছে। সুবিধে পেলেই হিন্দী ব্যবহার করতে ছাড়েন না।

মা-র সাড়া পেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় গোপীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কষ্ঠে ছেঁট-খাটো পেটা গড়ন। রামরণ ও চশমা তুলে সেও সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরী হয়।

'দূর হয়েছে?'

'দূর হইয়াছে কখন পার! ময়লা বোঁচকা দিল আমি জানি।'

১৯২০ সালে হাওড়ায় যখন ভবনাথের তৃতীয় পোস্টিং তখন থেকেই গোপীনাথ ত্রিপাঠী এ পরিবারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। সেই ছিপছিপে আঠারো-উনিশ বছরের ছোকরা এখন সক্ষম কষ্ঠে ত্রিশ বছরের যুবক। কিঞ্চিৎ উড়িয়ামিশ্রিত সাধু বাংলায় কথা বলতে সে অভ্যস্ত।

পিঁড়িতে বসে সিঙাড়ার পুর গড়তে-গড়তে স্বর্ণ বলেন, 'কলার সাহেবের সঙ্গে আরও এক সাহেব আসছে—ব্র্যাণ্ডি।'

'ব্র্যাণ্ডি সাহেব ভোলায় গিয়াছিল?' কড়া নামাতে-নামাতে গোপীনাথ বলে।

'দূর। ভোলায় আবার কবে গিয়েছিল?'

'হঁ। ব্র্যাণ্ডি ভোলায় যায় নাই? সেই স্টীমারঘাটায় আসিয়াছিল। চারিদিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আমরা রাত্রির আমরা ঠায় বসিয়া আছি। বাহিরে সড়কি, বল্লম, আল্লা হো আকবর! বন্দেমাতরম! আপনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন!'

বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই

বাল্মীকি সর্বদা এতখানি বর্তমানের মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকেন স্বর্ণসুন্দরী যে, কয়েক বছর আগের ঘটনার খুঁটিনাটি বিস্মরণ হয়। গোপীনাথের কথায় আবার স্মরণে আসে। বলেন, 'তবে আমাদের বাড়ি আসেন নি।'

'সার্কিট হাউসে উঠিয়াছিলেন পাদ্রা' টুটুলের তখন তো ছ মাস। বাইরের বারান্দায় চৌকিটায় কলবল করিত।'

এখন স্পষ্ট ছবিটা ভেসে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর মনে। শীতের রোদ্দুরে মোটা-সোটা ছেলেটাকে তেল মাখিয়ে দিয়েছেন বাইরের চৌকিতে। থপ-থপ করে সে পা দাপাচ্ছে আর বড় মেয়ে পাশে বসে নামতা পড়ার মত দুলতে-দুলতে চেঁচাচ্ছে, 'উইলিয়াম দি কংকারার, উইলিয়াম দি কংকারার' আর ছেলেটাও সশব্দে দুলে-দুলে চেঁচাচ্ছে, 'আঃ কি মিষ্টি! মরে যাই!'

চার টাকা সেরের বিশুদ্ধ ঘিয়ের গন্ধে রান্নাঘর ভুর-ভুর করে।

'ফকির এসেছে?'

'করুণার ঘরে।'

করুণার ঘরের সংলগ্ন যে ছোট চাতাল সেখানে সাহেবখানা বানাতে পটু আর এক আর্দালী ফকির মুর্গী কাটছে।

স্বর্ণসুন্দরী সেখানে গিয়ে দেখলেন ছেলে-মেয়েরা সেখানে ঠিক হাজির। টুটুল ছুটে এসে বললে, 'ফকির কেটে দিল, ফকির কেটে দিল। ছটফট-ছটফট, ছটফট-ছটফট। কি লাল-লাল রক্ত!'

মায়ের ডান পা জড়িয়ে দুলতে থাকে টুটুল।

'টুটুল কি অসভ্য জানো মা, ও একটা ডানা ধরে টানাটানি করছিল।' বুড়ী অভিযোগ করে।

'তোমরা এসব কাটাকাটি দেখতে এলে কেন?'

'আমি কিন্তু মা দুটো কাটলেট খাবো' বুড়ী বললে।

'আমি তিনটে', টুটুল বললে সঙ্গে-সঙ্গে।

খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে স্বর্ণসুন্দরী দেখতে পান ভবনাথ ফিরছেন কাছারী থেকে। লম্বা-চওড়া ব্যায়াম-মজবুত শক্ত শরীর, কিন্তু মুখের চেহারা অস্বাভাবিক কোমল। প্রসারিত চোখে ঠাণ্ডা গভীর চাহনি, শুধু ছোট ছোট চোখের চার পাশে সরু নিষ্কম্পিত চাহনি থেকে একদম আলাদা। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকটার বয়স বড়জোর লাগে পঁয়ত্রিশ। কেবল মাথায় তালুতে কয়েক বছর হল বিকশিত টাক ছাড়া বয়সের ছাপ ভবনাথের চেহারায় নেই।

সাদা টুইলের হাফশার্ট আর মাথন জিনের প্যান্ট। জিনের কাপড়টা বদখদে একদম পারেন না এই একমাত্র দৌর্বল্য।

ভবনাথ আসছেন কোনদিকে না তাকিয়ে, পেছনে-পেছনে বলাই বাঁধা হ্যাণ্ড-ব্যাগ, হাতের ওপর কাপড় গায়ে একগাদা ফাইল, আর মুখে পেশী সঙ্কোচনের কোন লোমে সর্বদা আম্বর জমাট হাসি। বকা খেলেও এই হাসি মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না বলাই।

আসতে আসতে একটু বেঁকে বাড়ির প্রায় পেছনে বেড়া-দেওয়া ক্ষেতের ফাঁপি ফুলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভবনাথ। এই বাগান দেখা তাঁর নিয়মমাফিক। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভেতরের বারান্দায় এসে ঢুকলেন। হাতে একখানা খাম। কিছু না বলে স্ত্রীর হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন। ঠিকানায় চোখ পড়তেই চিনলেন স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথের মেজদা বিশ্বনাথ চৌধুরীর লেখা :

ভবনাথ,

তোমার বহুদিন দেশের বাড়ির সঙ্গে যাতায়াত আর বিশেষ নেই এবং তোমার পক্ষে তোমার অংশ তদারক করারও সময় নাই, অতএব আমি স্থির করিয়াছি তোমার অংশ আমি কিনিয়া লইব। পূর্বদিকে তোমার অংশের দোতলা দালান এবং পেছনের এক বিঘে মেটেল সমেত তোমার সম্পত্তির বর্তমান দাম হইবে (গত বিশ বছরের wear and tear ধরিয়া) পাঁচ হাজার টাকা। এই দাম নির্ধারণে আমাদের জমিদারীর মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়াই বলিতেছি। অর্ধেক দাম আড়াই হাজার টাকা সামনের পূজায় এবং বাকী অর্ধেক পরের বছর দিবার ব্যবস্থা করিতেছি। এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে। নন-র বিবাহ বৈশাখ মাসে। ঐ সময় তোমার একবার পাবনায় আসা বিশেষ প্রয়োজন। অধিক আর কি লিখিব! আমা কাঁর বৌমা ও পুত্রকন্যাসহ কুশলে আছো। —মেজদা

এ তো আগেই জানা ছিল। পাবনার বাড়ি মেজঠাকুরের গর্ভে যাবে। ও টাকাও পাবে না। দুশো তিনশো টাকা হয়তো ঠেকাবে। আর যাই করো, নন-র বিয়েতে যেও না। ওবার বড় মেয়েটার বিয়েতে মনে আছে পালাবার পথ পাই না।। এটা দাও, সেটা দাও। সে কি লম্বা ফিরিস্তি। তুমি লিখে দাও, ও সময় তোমার অনেক কাজ, ছুটি পাবে না।......গোপীনাথ, দুটো গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে এসো বাবুর জন্যে।'

ফুঁ দিয়ে সিঙ্গাড়া খেতে খেতে ভবনাথ বললেন, 'পাবনার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা এবার পাকাপাকিভাবে চুকল। আর থেকেই বা কি হত। থাকতে পারতাম না। বাবা যাবার পর থেকেই সব ওলোটপালট হয়ে গেল।'

'কলকাতায় যে জমি কিনছিলে সেটার কদ্দূর?'

'হ্যাঁ যাব, সামনের বুধবারে একটা দিন ছুটি নিয়ে যাব। সাউথ ক্যালকাটায় ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট জমি বেচছে। জায়গাটা ভাল। [illegible] দাম থাকে। তিন হাজার সাড়ে তিন হাজা[illegible] কাঠা।'

[illegible]

তাই [illegible]। [illegible] তো আর [illegible] যাবে না। তবে ওদের সামনের বছর যাঁর প্রতাপকে বিলেত পাঠাতে হয়। কি থেকে কি হবে বুঝতে পারছি না।'

'ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতায় এখন জমি না কিনলে আরও দাম বেড়ে যাবে। আর এখনই যদি বাড়ি না বানাও তবে কবে ভোগ করবে?'

'সুলেখাকেও জানো দিয়েছ?' গোয়ালের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন ভবনাথ।

'ও-সব কথা এখন ভাবতে হবে না। তোমার মুরুলীর কোন অযত্ন হবে না। তুমি তাহলে মঙ্গলবার কলকাতায় যাও। আর কথাল, যখন বাড়িতেই আসছে তখন একটু বল না নিজের সম্বন্ধে। তুমি যেন কেমন! নিজের সম্বন্ধে একটু বলা কওয়া করতে পারো না? নিজের মনে কাজ করে গেলে কেউ পুঁছবে না তোমাকে। দেখো না সুরেশ গুহ। তোমার এক বছর আগে পোস্টেড। কি রকম চড় চড় করে বেড়ে উঠছে। বাবা কি বলতেন জানো, সাহেবরা খাতির করে তাদের যারা শুধু একমনে কাজই করে না, সমানে সমানে টক্কর দিতে পারে।

'টুটুল কোথায়?'

'করুণার ঘরের ওদিকে। ফকির কাটলেট বানাচ্ছে, তাই দেখছে।'

'তাই নাকি! ফকির এসেছে?'

ভবনাথ উঠতে যাচ্ছিলেন স্বর্ণ তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, 'একটু বোস না। তুমি যেন কেমন! কাজের কথাগুলো গুছিয়ে ভাবতে বলতে পারো না। কাজের কথা বললেই উসখুস করো। মুরুলী জাবনা পাচ্ছে কি না, ফকির ঠিক কাটলেট বানাচ্ছে কি না, এগুলো তোমাকে দেখতে হবে না। এগুলো সব ঠিক হয়ে যাব। দরকার হলে খবরদারি আমি করব, তুমি কেন করবে? বাবা কখনও হুকুম দিয়ে খবরদারি করতেন না। নিজের হুকুমের ওপর এমন বিশ্বাস যে ঠিক তামিল হয়ে যেত।'

তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকেন, 'বাবা সেই সাদা ধবধবে ওয়েলার ঘোড়া হাঁকিয়ে অফিস থেকে ফিরত। মুঙ্গেরের কোর্ট থেকে। ফিরে এসেই ডাকতেন, 'কোথায়রে'। আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গম্ গম্ করত। তার সামনে কারও চেঁচিয়ে কথা বলার জো ছিল না। —আমি ছাড়া। আমাকে এসেই ডাকতেন—মামী। তারপর সেদিন আদালতে কি হোল, কোন সাক্ষী কি বলল, তিনি কি রায় দিলেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতেন। আর তুমি? তুমি তো একটা জড়ভরত। অফিস থেকে ফিরে এসেই বাগান দেখবে, গরু দেখবে, আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়বে।'

'শশুরমশাই আর আমি আলাদা জাতের লোক, তাঁর অনেক কর্মক্ষমতা, আমার অত ক্ষমতা নেই স্বর্ণ।'

স্বামীর এই স্বাভাবিক বিনয় ও শান্ত মেজাজের সামনে স্বর্ণসুন্দরী জানেন তিনি বেশীদূর এঁটে উঠতে পারবেন না। এ-রকম লোকের সঙ্গে তো ঝগড়া করা যায় না। যে মেনে নেয় তর্ক না করে তার সঙ্গে তো

CENTRAL LIBRARY

বেশীক্ষণ উত্তেজিতভাবে কথা বলা যায় না। আর স্বর্ণসুন্দরীর পছন্দ এই উত্তেজনা। স্বামীর এই শান্ত মূর্তিটিকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর মন তাকিয়ে থাকে তাঁর বাবার মত কোন চরিত্রের দিকে, যে চেঁচিয়ে কথা বলবে, ঠাট্টা মস্করায় এমন কি অন্যাকে অন্যায় খোঁচা দিয়েও চারপাশ সরগরম করে তুলবে, যে শুধু চুপ করে মেনে নেবে না, প্রতিবাদ করবে, যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে অভিমত, যার সঙ্গে কথা বলে চেঁচিয়ে হেসে চীৎকার করে বাধা পেয়ে একেবারে হাফসে যাওয়া যায় এ-রকম লোকের সঙ্গ কামনায় স্বর্ণসুন্দরীর মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়। বড় মেয়ে হেনার বরকে তাই তাঁর ভাল লাগে। হেনার বর মদন মিত্র বিয়ের তিন বছর পর সম্প্রতি জার্মানীতে গিয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্যে। সে লোকটা যখন শ্বশুরবাড়ি আসত বেশ কদিন জমজমাট লাগত স্বর্ণসুন্দরীর।

স্বামীর বড় বড় ম্লান চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার কর্মক্ষমতা কম কিসের। অফিস বয়ে সন্ধেবেলায় ফাইল ক্লিয়ার করো, দরকার হলে রাত জেগে কাজ দেখো। কিন্তু তুমি শুধু খেটেই যাও, শুধু খেটেই যাও। একটা সেই কবেকার ঠেঁটে সাহেবে বানিয়েছো, তারপর সাত-আট বছর কেটে গেল।'

'চেনা বামনের পৈতে লাগে না।'

'খুব লাগে খুব লাগে। আমার বাবার লাগত। শ্বশুরমশাইয়ের লাগত না? বিয়ের পর পাবনা বাড়িতে গিয়ে দেখি নি? গাড়ি বারান্দায় জুড়ি দাঁড়িয়ে। কর্তাকে চোগা-চাপকান। বাবাজীর মাথায় একদিন পাগড়ী না থাকায় কি ধমক! তোমার মত প্যাংলা ছিল না কেউ।'

'হ্যাঁ বাবা খুব সৌখীন ছিলেন।' ভবনাথ স্বপ্নময় চোখে গোয়ালের পাশে পড়ন্ত রোদ্দুরের আলোয় ঝলমল জাম গাছটার পাতাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে বলেন, 'আর রাগও ছিল প্রচণ্ড। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন হাঁক-ডাকে বাড়ি কাঁপত। আর মা থাকতেন ঠিক নতুন বৌয়ের মতো, একগলা ঘোমটা দিয়ে, রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ারে। আবার ভাঁড়ার থেকে রান্নাঘরে। বড়দা নিয়ে আসত মক্কেলদের দেওয়া টাকার তোড়া বৈঠকখানা থেকে। অনেক দিন অর্ধেকের বেশী পৌঁছয় নি মার কাছে। কিন্তু মা কোনদিন তা খুলে দেখেন নি।'

'তুমি কিন্তু মকান-কে নিজের সম্বন্ধে একটু বলবে। এখনও যদি ডিস্ট্রিক্ট না পাও তাহলে কবে পাবে। এটা তো কিছু অন্যায় দাবী নয়। এতদিন কাজ করছো, তোমার কাজের সবাই প্রশংসা করে। কিন্তু এভাবে তো চলবে না। বাড়ি তুলবে বলছো ছেলেকে বিলেত পাঠাবে। নিজের ওপর কষ্ট করে তো সংসার চালানো যায় না।'

ভবনাথ উঠে পড়েন। স্বর্ণ যা বলছেন তার যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার করেও তিনি উৎসাহিত বোধ করেন না। এত হাঁই-চাই করবার কি আছে? ডিস্ট্রিক্ট তাঁর অনেক আগে পাওয়া উচিত ছিল, তাঁর জুনিয়র কেউ কেউ পেয়েছে বটে। কিন্তু সে রকম ব্যাপার তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘটেই থাকে। তার জন্যে নিজেকে অহেতুক তাড়িয়ে বেড়ানোর তাঁর সময় নেই। আর ভবনাথের এক একবার মনে হয়, সাহেবদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন না। তাদের কতগুলো জিনিষ তাঁর খুব ভাল লাগে, যেমন অফিসপত্তরে তাদের লেখা কিংবা চিঠি। এমন সংক্ষেপে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলার ক্ষমতাটা ফ্লাস ব্রাণ্ড এইসব সাহেব খুব রপ্ত করেছে। তারপর কথা দিলে তার মর্যাদা দিতে জানে, তার জন্যে যদি অন্যায় করতে হয় তাতেও পরোয়া করে না। কিন্তু ভবনাথ টের পান এই ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তিতে একাত্মতা বেশী দূর নিয়ে যায় না। ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভারত সাম্রাজ্য যে জীবনধারা বা ওয়ে অব লাইফ সে সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ থাকার প্রয়োজন। যে প্রয়োজনীয়তার ধাক্কা ভবনাথের ক্ষেত্রে সীমিত। কখনও কখনও ক্লাবে যান বটে, টেনিসও অনেকের চেয়ে ভাল খেলেন, কিন্তু ঠিক ক্লাব-গাইণ্ডেড তিনি নন। খানিকক্ষণ পর তিনি ছটফট করেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে কপির বাগানটা দেখলে এতক্ষণে কাজ দিত, এই ধরনের কিংবা হঠাৎ কোন পারিবারিক কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উসখুস করেন। ব্রাণ্ড তো একদিন খোলাখুলি বলেইছিলেন, 'ইউ আর এ গুড অফিসার ভবনাথ, বাট এ ভাল কম্পানী।' সবচেয়ে যেটা ভবনাথের অসুবিধে তা হল ইংরেজীতে যাকে বলে স্মল টক' তাতে তাঁর পরিপূর্ণ এলার্জি। কাজেই স্বর্ণসুন্দরী এবং ব্রাণ্ড উভয়েই একমত যে ভবনাথ শুধু খাটতেই জানেন।

উঠোনে নেমে ভবনাথ আস্তে ডাক দিলেন, 'গোপীনাথ, ভাল চা এসেছে?'

গোপীনাথ রান্নাঘর থেকে নেমে এসে বলে, 'সবচেয়ে ভাল দার্জিলিং চা। আড়াই টাকা পাউণ্ড।'

ভবনাথ খুশি হলেন। এই একমাত্র চায়ের সুগন্ধের ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধভাবেই জেদী। দার্জিলিং চা ছাড়া খান না। আর প্রত্যেকবার প্রথম চুমুক খেয়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেন, 'গ্র্যাণ্ড!' ভাল না লাগলে চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখেন।

কতকাল ঘরের কোণ থেকে চমৎকার কাট-লেট ভাজার গন্ধ আসছে।

'কটা হল?'

ভবনাথের প্রশ্নে ফকির উঠে দাঁড়াল পিঁড়ি ছেড়ে। কর্সা মঙ্গোলীয় মুখে চাপ দাড়ি। কুতকুতে চোখ চকচক করে। গোঁফ আর সরু জুলপিটা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফকির বললে, 'বোলটা হয়েছে সাহেব।'

'বেশ বেশ। বুড়ী, তুমি টুটুলকে শিখিয়ে দিয়েছো তো, আমি যা তোমাকে বলেছি।'

টুটুল চীৎকার করে ওঠে 'আমি ডিনার খাব বাবা।'

সেদিকে না তাকিয়ে ভবনাথ বারান্দায় ওঠেন। প্যান্টের বোতামগুলো ঠিক আছে কিনা এই বেলা তাঁর দেখে নিতে হবে। ধোপা ব্যাটা বড্ড ফাঁকাচ্ছে।

ভবনাথের কথায় বুড়ীর কিন্তু মুখ মলিন হয়ে গিয়েছিল। যদি একবার ফিরে তাকাতেন, ভবনাথ তাহলে একথাটা ধরা পড়ে যেত যা টুটুলকে শেখানোর কথা ছিল তা শেখানো হয় নি। দুপুরে চুণী পর্ব আর বিকেলে ব্যাডমিন্টন পর্বে কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল বুড়ীর। এখন তাড়াতাড়ি বললে, 'এদিকে শোন টুটুল। তোকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ইওর নেম? তুই কি বলবি?'

'আমি বলব—গ্যাট ম্যাট প্যাট ক্যাট।' ক্রিকেটের গন্ধে টুটুলের বোঁয়া ভাব এসে গেছে।

'ধৎ ওসব বলবি না। সাহেবরা আসছে না? ওসব বললে রাগ করে যাবে। আর চুণী নন্দীও খেতে পারবে না। সাহেবরা যখন বলবে তুই বলবি, মাই নেম ইজ...বল, মাই নেম ইজ।...'

'মাই নেম ইজ'

'তারপর নামটা বল'

'তারপর নামটা বল'

'ধেৎ! বল—মাই নেম ইজ অনিন্দ্য চৌধুরী।'

'সাহেবরা জিজ্ঞেসই করবে না।'

ভাইকে বশ না মানাতে পারায় বাধ্য হয়ে বুড়ী বলে, 'তোকে আর কোন দিন আচার দেব না।'

'আচ্ছা বলছি বলছি।'

'আর যদি জিজ্ঞেস করে—হোয়াট ক্লাশ ডু ইউ রিড? —তুই বলবি—আই রিড ইন বেবী ক্লাশ।'

'বেবী মানে?'

'বেবী মানে? বেবী মানে?' প্রবল বার্থতায় বুড়ী ঠাস করে চড় কসিয়ে দেয় টুটুলের গালে।

টুটুল হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। তারপর দাঁত কিড়মিড় করে তার ছোট ছোট হাত মুঠি করে পা দাপিয়ে দাপিয়ে চীৎকার করে, 'তুই মরন তুই মরন...'

বুড়ী চটে ওঠে ভাইয়ের কথায়। ফকির সেই জলজ্যান্ত চোখ আর ঈষৎ ফর্সা রক্তাভ গালে টোল পড়া দাপানো ছেলেটার দিকে চেয়ে মিট-মিট করে হাসতে থাকে।

'ছেলেমেয়েরা, জামাকাপড় ছাড়বে এসো।' স্বর্ণসুন্দরী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে টুটুল দৌড়ে উঠোন দিয়ে।

[ক্রমশঃ]

চিত্রশিল্পী দীনবন্ধু এনড্রুজ

সন্ধ্যা বসু

উন্নত স্তরের মানুষের মধ্যে দুটি ভিন্ন সত্তা থাকে ক্রিয়াশীল। একটি ভাবময়, দ্বিতীয়টি কর্মময়। এই দুটি সত্তা যেখানে সমন্বিত রূপে ও সমভাবে জীবন্ত, জাগ্রত ও ক্রিয়াচঞ্চল, সেখানেই মানুষ অসাধারণত্ব লাভ করে। সমুচ্চ ভাব-ভাবনা ও মহৎ আদর্শের প্রেরণা সঞ্জাত কর্ম সর্বদাই সুন্দর, সহনীয় ও কল্যাণকর। যুগে যুগে, দেশ-দেশান্তরে এই জাতীয় মানুষের জন্ম ও কর্মকীর্তির ফলেই পৃথিবী মহান সৃষ্টি-সম্ভারে হয়েছে সমৃদ্ধ : জগত ও জীবন হয়েছে রমণীয় ও আনন্দ-সুন্দরের উৎস।

চার্লস ফ্রিয়ার এন্ডরুজ ছিলেন এই জাতীয় একটি মানবাত্মার সার্থক দৃষ্টান্ত। ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুসন্তান এন্ডরুজ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল সহজাত সৌন্দর্য-বোধ, মানব-প্রীতি ও ধর্মপ্রাণতা। সেবা-পরায়ণতাও ছিল তাঁর স্বভাবের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই গুণটি তিনি পেয়েছিলেন জন্মসূত্রে তাঁর মায়ের কাছ থেকে। এন্ডরুজের পিতামাতা ছিলেন প্রকৃত খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীর উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত। আশৈশব সেই পবিত্র ভাবধারায়ই তাঁর জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

ছাত্রজীবন শেষ হতেই এন্ডরুজ স্বদেশে শিক্ষকের জীবনবৃত্তি অবলম্বন করেন। সেই অধ্যাপনার দায়িত্ব ভার নিয়েই তাঁর ভারতে আগমন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কল্পনার ধৃত স্বপ্ন ও সাধনার পুণ্যতীর্থ। ভারতের মাটিতে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন ১৯০৪ সালে। ভারতবর্ষে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন তিনি দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে।

১৯১২ সালে ভারতে নয়, লন্ডন শহরে এন্ডরুজের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই দেখা-সাক্ষাৎ এন্ডরুজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-চেতনা, বিশ্বজনীন ভাবধারা ও সাহিত্য প্রতিভাকে পুষ্ট করার আরও অধিকতর অবকাশ এনে দিয়েছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, যে শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে যে সুন্দর অমলিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল, এন্ডরুজ তার মধ্যে পেলেন তাঁর ভাবময় ও কর্মময় দুটি সত্তারই পূর্ণ বিকাশের অপূর্ব সুযোগ। তিনি আফ্রিকা ও ফিজী দ্বীপে যে মানবতার মুক্তি সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই সেবা-কাজের সংগেও কবিগুরুর বিশ্বপ্রেমের বাণী ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টার অপূর্ব মিল খুঁজে পেলেন। তদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় কাব্য-প্রতিভা, সমুচ্চ মনীষা ও মনন-সৌকর্য, সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং অসীম সৌন্দর্যানুভূতি এন্ডরুজকে দিল্লী ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাপনা কর্মে ব্রতী হতে প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি অবিলম্বে শান্তিনিকেতনের তরুশাখা-পল্লবিত আশ্রমিক পরিমণ্ডলের শ্যামল সৌন্দর্য-স্নাত প্রকৃতির কোলে তাঁর সাধন-পীঠ স্থাপনা করে অধ্যাপনা ও সাহিত্য-চর্চা ও জনসেবার ব্রত উদযাপনে করলেন আত্মনিয়োগ।

আর তাঁর মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ ও কবি-মন এতদিন সুপ্তিমগ্ন ছিল তা শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের অলৌকিক প্রভাব-স্পর্শে নতুন লীলা চেতনায় হোল উন্মুখ। শিক্ষাব্রতী, দার্শনিক, সমাজসেবী ও মানবদরদী এন্ডরুজ এবারে আত্মপ্রকাশ করলেন কবি ও শিল্পী-রূপে।

তিনি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংলন্ডে। তিনি আশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্রদের জীবন-ধারা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যলহরী দেখে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হন। অতঃপর দিল্লীতে গিয়ে কবিকে একখানি চিঠি লিখে (৮ই মার্চ, ১৯১৩) তাঁর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ-বিস্ময় সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে এন্ডরুজ সেখানে স্বহস্তে তাল-বীথিকার যে চিত্রাংকন করেছিলেন তারও চমৎকার বর্ণনা

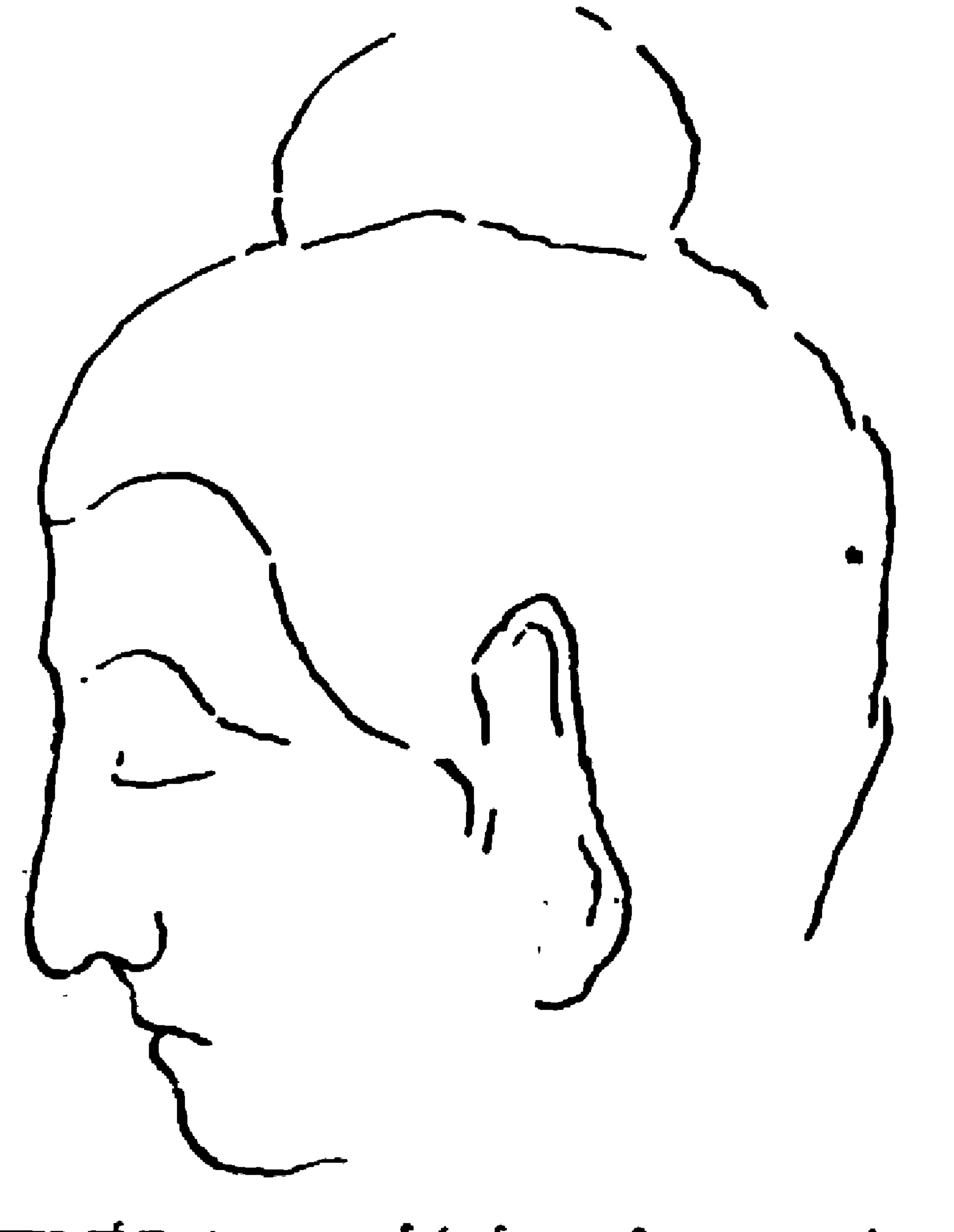

এন্ডরুজ অঙ্কিত মাতার মুখমূর্তি (বিশ্বভারতী কলাভবনের সৌজন্যে)

এন্ডরুজ অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী কলাভবনের সৌজন্যে)

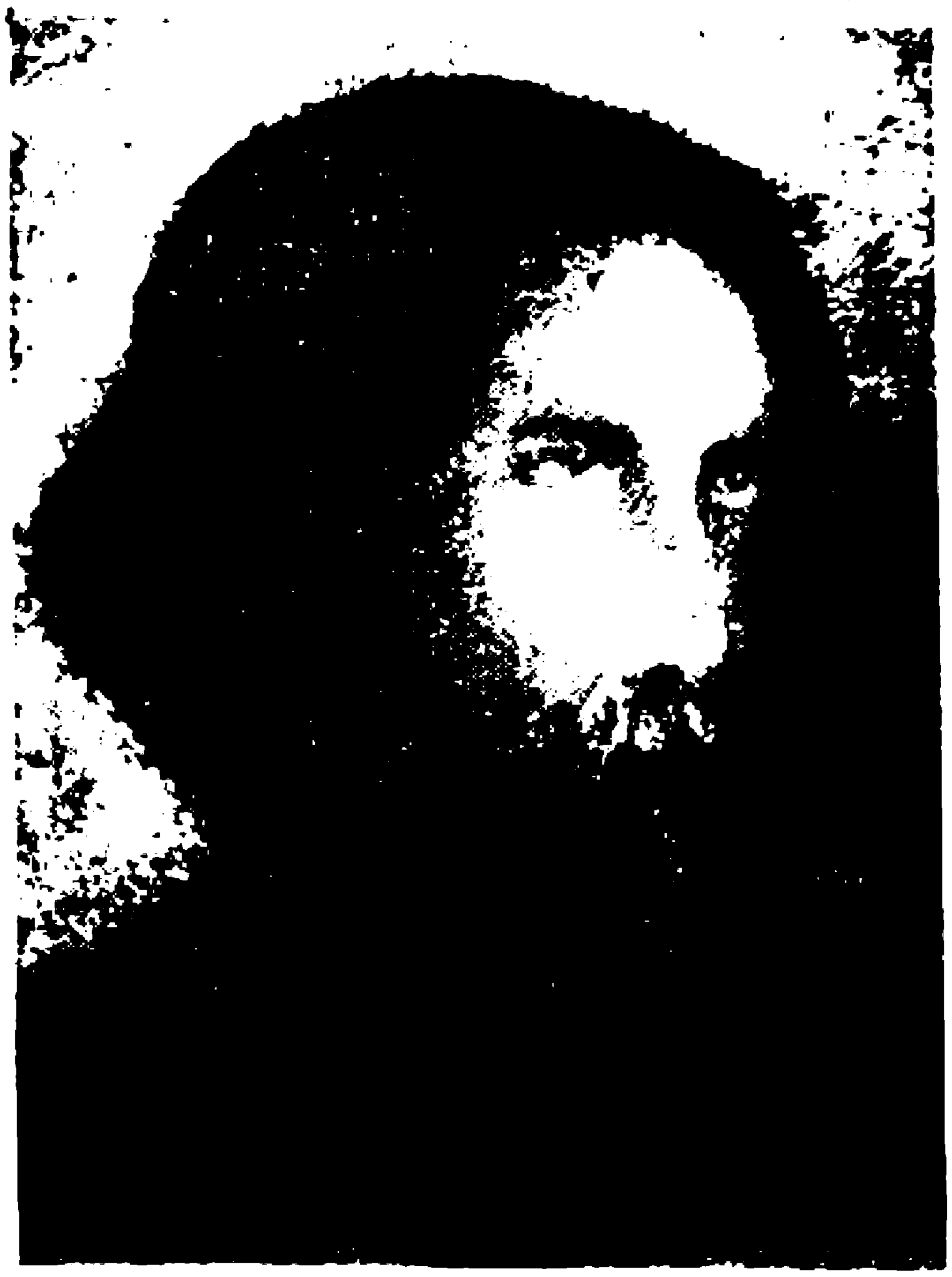

লিখেছিলেন। সেই বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ—

"দুটি তালগাছের ফাঁক দিয়ে রঙিন কুয়াশা-ছড়ানো নতুন চাঁদ উঁকি দিচ্ছে— কী যে চমৎকার দেখাচ্ছে সেদিন আমি দেখেছি তার বর্ণনা চলে না। তাড়াতাড়ি সেটিকে রঙ দিয়ে আঁকার জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। স্কুলে ছেলেদের ড্রইং শেখার তার কাছ থেকে খুব সাধারণ একটি বাক্স জোগাড় করে, আমি ছোট্ট ছেলের রঙের বাক্স নিয়ে সকালবেলা আঁকতে বসে গেলাম। এসব সামান্য জিনিস দিয়ে আঁকা সত্ত্বেও যখন সেই দৃশ্যের ঠিকঠিক বাস্তবতাটি আনা গেল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না। তাই সেই মায়াময় রাতের স্মৃতির একটি আলেখ্য আমার কাছে ধরা রয়েছে।"

বাঁধের পাড়ে তালগাছের ছবিটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। সেটি পেয়ে কবিগুরু এন্ডরুজকে একটি চিঠিতে (১১, আগস্ট, ১৯১০) লিখেছিলেন—

"I must thank you for the water-colour picture you have sent me of the It is like a dream - - picture that I have in my heart and those palm-trees seem to be standing a tip-toe to catch a glimpse of their lover across the sea".

তালগাছ সম্বন্ধে এন্ডরুজ কেবল ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি। একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতার শিরোনাম—

"The Palms At Santiniketan".

প্রথম স্তবকটি এই –

"When the last glow of day is dying
For in the still and silent west
The Palm-trees cease their plaintive sighing
And slowly lull themselves to rest"

শান্তিনিকেতনে আগমনের পূর্ব থেকেই এন্ডরুজের মধ্যে একটি কবিমন ও শিল্পীর দৃষ্টি ছিল ক্রিয়াশীল। এখানকার পরিবেশ প্রভাবে ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ করে তিনি তাঁর শিল্প-বোধকে প্রকাশ করলেন আবহমান প্রকৃতি ও অপরিবর্তনীয় অথচ সম্ভাবনাময় রূপ কল্পনার মাধ্যমে। তাঁর অধিকাংশ চিত্রগুলোর মূল বিষয়বস্তু গ্রাম-নির্ভর নিসর্গ-প্রকৃতি। নিঃসীম ধুলি-ধূসর প্রান্তরের মধ্যে ছবি। তার বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশেই প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। তার ছন্দ ও সংঘাতে রূপ গড়ার কোন প্রশ্ন নেই। প্রকৃতির অন্তহীন আবেগ অনুভূতির স্বরূপ এবং কবি ও শিল্পীদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর রয়েছে প্রতিফলন।

তালগাছের ছবি জল-রঙের। সবুজ পরিবেশ উদ্ভাসিত হয়েছে চমৎকার। গাছের পাতার আন্দোলিত রূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্কিডকশ্যুলের চিত্র রয়েছে অনেক ছবিটি রস সম্ভারে সিক্ত করেছে।

১৯১২ সালে এন্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি রচনা করেন। সেই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় শিল্পী এতে দিয়েছেন মানবপ্রেমী মূর্তি। এন্ডরুজ যে মানবপ্রেমিক কবিগুরুর রূপটি দেখেছিলেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই চিত্রে। শিল্পীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আর এক নতুন রূপে উদ্ভাসিত। মানব-প্রেম ও বিশ্বমানবিকতায় তিনি কবিকে যীশুর সাথে একাত্ম করে দিয়েছেন। যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি যেমন তাঁর হৃদয়পটে মুদ্রিত ছিল, তাই-ই তিনি আরোপ করেছেন এখানে। এই রূপসৃষ্টি মানসিকতায় এন্ডরুজের হৃদয়ের প্রতিফলন। তা সত্ত্বেও কবির এ রূপটি আমাদের কাছে অচেনা ও অজানা হয়ে থাকে না।

এই ধরনের কয়েকটি ছবি বাদেও এন্ডরুজের শিল্পকলার স্বাক্ষর মিলে পাওয়া যায় আরও দু-একখানা। তার অধিকাংশই জল-রঙে আঁকা দেশীয় ও স্বদেশধর্মী। সম্ভবতঃ কলমের আঁচড়ে অঙ্কিত। তিনি বাংলা ভ্রমণে গিয়ে বোলপুরকেও

• অ্যালকালেকা টনিক • কিংস হোমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিকা সিরাপ • ইস্ট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধাবলি
এবং আধুনিক সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
৯০/৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
৮৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
GRACEKAMEB
কিং এণ্ড কোম্পানীর সকল শাখা ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদি দর্শন করে এই চিত্রাবলী অংকন করেন। কিছু সংখ্যক সেখানে প্রত্যক্ষভাবে অংকিত। বাকি কয়েকটি পরে স্মৃতিচারণার ফলশ্রুতি। এই প্রসংগে আরও কৌতূহলের ও উল্লেখনীয় বিষয় হোল এই যে হোটেল বোরোবুদুরের লেটার-পেপারে তিনি এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন। তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই চিত্র অংকনের জন্য তাঁর কোন পূর্ব প্রস্তুতি ও আয়োজন ছিল না।

মন্দিরের রূপের মন্দির গাত্রে রমণীয় রূপের মূর্তি প্রতিমা দেখার ফলে তাঁর ভাবরূপ, প্রজ্ঞা পরিণত মানস মুকুরে যে সৌন্দর্যানুভূতির তরঙ্গলীলা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, তারই খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ রূপ রঙ ও রেখায় হয়েছে বিধৃত। ইহা রস পরিবেশিত সজ্ঞানে নিষ্পাদিত নয়। কোন দার্শনিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও পরিমার্জিত আংগিক শৈলীর সমস্যা নেই এখানে। আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদ বা উদার গাম্ভীর্য এবং মহনীয় ভাবচেতনার উদ্ভব হয়নি কোথাও। ইহা অবচেতনিক সৃষ্টি-প্রয়াস মাত্র। কিন্তু কয়েকটি রেখা-চিত্রে ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তার প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন বুদ্ধের মুখমণ্ডলসমূহ।

ভারতের গুপ্ত যুগীয় বুদ্ধমূর্তিতে রসনির্যাস ও রূপ-সুষমার বর্তনা ভংগিমা নিয়েই হয়েছিল যাভার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তির রূপায়ণ। ভারতীয় বুদ্ধ-প্রতিমার সেই অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও অতীন্দ্রিয় সার্বভৌম স্থির দীপ্তির অনেকখানি প্রকাশ দেখা যায় এণ্ডরুজ অংকিত বুদ্ধ-বদনে।

সুবশ, শিথিল ও ভগ্ন রেখা-সমাহারে রচিত মূর্তিচিত্রেও কিন্তু ভাব-গরিমার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয় না। স্থাপত্যাংশের রূপরেখায় ও আলঙ্কারিক নক্সায় রেখাঙ্কনে বরং কিছু প্রাণশক্তি ও জোরালো ভাব হয়েছে পরিস্ফুট। চণ্ডী মেন্দুতের সিঁড়ি-সোপানের গঠন ও মকরমূর্তি অতি সুন্দর ও সামঞ্জস্যময়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী পদ্মপাণি কয়েকটি মাত্র রেখায় অদ্ভুত সুন্দর রূপ করেছে লাভ। স্বল্প আয়োজনে এই জাতীয় ব্যঞ্জনাময় রূপ সৃষ্টিই এণ্ডরুজের ছবির মূল মর্মকথা।

প্রজ্ঞার মূর্তিটিও উল্লেখনীয় সৃষ্টি। স্বল্প রেখায় মহত্তর ভাবকল্পনার প্রকাশ হয়েছে এই মূর্তিতে। সমাসীন ধ্যানী বুদ্ধের রেখাচিত্র Impressionistic রচনা। চোখমুখ, হাত কিছুই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব নয়। কিন্তু মহাজ্ঞানী ও ধ্যানমগ্নতা অপরিস্ফুট থাকেনি। শৈবমন্দিরের 'ঋষি'-এর মূর্তি-শ্রেণীর রেখাঙ্কন দুর্বল, কিন্তু ভাস্কর্যের মূল ভাবটি প্রস্ফুট হতে বাধা পায়নি।

কীর্তিমুখ-সমন্বিত তোরণ অংকনে সূক্ষ্মাংশের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তোরণের গঠন ও কীর্তিমুখের অভিব্যক্তি হয়েছে নিখুঁত ও জীবন্ত। চণ্ডী পাওয়ানের দানব-মূর্তির ভাবাভিব্যক্তিও অতি চমৎকার। মূল স্থাপত্যাংশে এবং আলংকারিক নকসায় রেখাচিত্র আংগিক কৌশলে প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত নয় ঠিকই, কিন্তু বিষয় গৌরবের আসল ভাবসত্তার সন্ধান যে আদৌ পাওয়া যায় না, তা বলা চলে না। আলঙ্কারিক নকসা রচনায় কোন কোন নিদর্শনে তিনি বেশ খানিকটা decorative ও Space Sense — -এর পরিচয় দিয়েছেন ভালোভাবেই।

যাভার রেখাচিত্রসমূহের সংগে দুই-তিনখানি বর্ণময় চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হোল—রাজলীলাসনে উপবিষ্ট পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব। হাল্কা জলরঙ-এ অংকিত। সেইরূপ পূর্ণাংগ নয়। এটিকেও Impressionistic বলা যায়। কিন্তু অসম্পূর্ণ অবয়ব কল্পনায় মধ্যেও ভাবের প্রকাশ সম্পূর্ণতার পথে গিয়েছে এগিয়ে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি জলরঙ-এর দৃশ্যপট। নীল ও সামান্য কালোরঙ-এ রচিত পাহাড়ের রূপ ফুটে উঠেছে অতি অদ্ভুতভাবে। মাঝে মাঝে লাল রঙ-এর টাচ-এ অভিনব সৌন্দর্য ও মহিমার ব্যঞ্জনা দিয়েছে এনে। পশ্চাৎপটে আকাশে রক্তিমছটা একটা দূরাভাসের আমেজ এনে, গভীর ভাবদ্যোতনার সঞ্চার করেছে। এই ছবিটি দেখলে ভাবতে ইচ্ছে হয় না যে এণ্ডরুজ চিত্রকলায় শিক্ষা-চর্চাবিহীন নিছক খেয়ালখুশীর শিল্পী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাই-ই ছিলেন। যাবতীয় রচনাই আকস্মিক ও আয়োজন-বর্জিত। তবে এ শিল্পচেষ্টা কেন?

এর কারণ মনে হয়—তাঁর সংবেদনশীল মনের অভিব্যক্তির ইহা বিকল্প একটি পন্থা হয়েছিল। তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও গভীর আবেগ অনুভূতির প্রবাহ তাঁর অচেতন মনের নিগূঢ় কন্দর ভেদ করে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই-সকল সৌখীন রূপাঙ্কনে বহু বিস্তারের পথ খুঁজে নিয়েছিল। সুতরাং ইহাকে সাধারণ শিল্পবিচারের মানদণ্ডে যাচাই না করে এই বলা বোধহয় সঙ্গত যে এই রেখাচিত্ররাজি এণ্ডরুজের বিশেষ মানসপ্রক্রিয়া, অধ্যাত্মচেতনা ও আত্মসত্তার অদ্ভুত, অভিনব ও অচিন্তনীয় প্রতিবিম্বন। আবার প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত না হলেও স্কেচধর্মী চিত্রাঙ্কনও বটে। তাঁর রেখাচিত্রের এই অক্ষম ও অসম্পূর্ণ আলোচনা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বছরে সেই শিল্পীসত্তার প্রতি ক্ষুদ্র কুসুমপুটে শ্রদ্ধার অঞ্জলিমাত্র।

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-০০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড	কিলোসাইকলস্
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫১৬৫, ১১৭০০
মিডিয়ম-ওয়েভ	১১৮৭৫ ও ১৫৮০
১৯০ মীটার	১৫৮০

সোভিয়েত কবি আঁদ্রে

বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে সোভিয়েত কবি আঁদ্রে ভজনেসেনস্কীর 'ওজা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি ষাটের দশকে [illegible] ভাষায় রচিত [illegible] কবিতাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম [illegible]। [illegible] হারমাউট [illegible] সম্পাদিত কবিতা-সংকলনে আঁদ্রের কবিতার কিছু নির্বাচিত অংশ সংযোজিত হয়েছিল। [illegible] সম্পর্কে অনুবাদ [illegible] [illegible] ইউনিভার্সিটির [illegible] আঁদ্রে ভজনেসেনস্কীর কবিতাবলীর অনুবাদ 'আনটি ওয়ার্ডস' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ইভতুশেংকো যেমন [illegible] [illegible] কবিতা লিখে থাকেন, ভজনেসেনস্কীও তেমনই সেই পথ অনুসরণ করছেন মনে হয়। ওদেশে কবিতা-রসিক, জনগণের সামনে কবিতা পড়ার রেওয়াজ আছে, যার ফলে কবিদের নাম সকলেই কাগজে জানবার আগ্রহ [illegible] থাকে, কিন্তু ইভতুশেংকোর মতো আঁদ্রের [illegible] [illegible]। আঁদ্রের কবিতায় [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]। 'এমনকি অনুবাদেও আঁদ্রের কবিতার রস [illegible] হয়েছে মনে হয় না। অবশ্য [illegible] যাঁরা অনুবাদ করেছেন আধুনিক সাহিত্য-জগতে তাঁরা [illegible]।

সমবেদনা ও সহানুভূতিতে কবির চিত্ত [illegible]। [illegible] [illegible] কল্পনারত তরুণী কিংবা [illegible] রমণীর [illegible] [illegible] [illegible] নিশা যাপন ইত্যাদিতে তিনি [illegible] হলেও দ্রুত পট পরিবর্তনে তিনি কুশলী শিল্পী। [illegible], [illegible] ও [illegible] রচনায় তিনি অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী।

'ওজা' কবিতাটির কথাই ধরা যাক, এই কবিতার আঙ্গিক ডায়েরীধর্মী। [illegible] [illegible] [illegible] ডায়েরী। কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, কোনো রকম সুসংবদ্ধ ঘটনাও নেই। ঘটনাবলী [illegible]-ধারার বিদ্যুৎ, কিছু গদ্য কিছু অংশ পদ্য। এক অসার্থক প্রেম-ঘটনাকে ঘিরে [illegible] [illegible] প্রসারিত হয়ে আছে। বর্ণনার মধ্যে আতঙ্কের মুহূর্ত, প্রেমের কামনা ও আবেগ, আবার মাঝে মাঝে [illegible] [illegible] [illegible]।

'ওজা' মেয়েটি প্রেমের পাত্রী। কিন্তু এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নন। [illegible] ওজা না [illegible] [illegible] [illegible] এই দুটি কথা একই শব্দের রূপান্তর [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাৎ জীবন। এই ওজা বা [illegible] নিয়তই রূপান্তরিত হওয়ার [illegible] [illegible] [illegible] রূপান্তরিত হবে, [illegible] [illegible] ইত্যাদি এবং এই সবই ঘটবে কোনো অতিপ্রাকৃত বিপর্যয়ের ফলে নয়, এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাইক্লোট্রোন [illegible] মাধ্যমে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সাইক্লোট্রোন এমন এক যন্ত্র যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তার সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি আবার নবভাবে সাজানোর জন্য। কবি লিখছেন—

> "They came out transformed. One had an ear screwed to his forehead, with a hole in the middle, like a doctor's mirror. "Lucky devil" people consoled him "very convenient [illegible] [illegible] holes ; You can look and hear at the same time."

বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীলতার প্রতি [illegible] [illegible] হওয়া সত্ত্বেও কবি [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করেন —সেই নির্বোধ কর্মাধ্যক্ষ একদা বলেছিলেন—মুহূর্ত তুমি সুন্দরী, তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো—'

ওজার কবিতাংশ মাঝে মাঝে ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ এবং [illegible] [illegible] [illegible] সেখানে [illegible] প্রকাশিত। এই গদ্য বক্তিমণ্ডিত এবং নির্মম [illegible] এবং অতিপ্রাকৃত [illegible] [illegible]—

> "The speaker stuck his chest out. But his head, like a celluloid doll's, was back to front. "Forward to the art of the future!" Everybody agreed with him but which way was forward?"

কবি [illegible] সিঁড়ির উপর দিয়ে কারা যেন ইচ্ছে করেই যাতায়াত করছে নিরন্তর, কল্পনা [illegible] তাই লেখছেন।

[illegible] মত গদ্য অংশও [illegible] সংহত। 'ওজা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি অনেক দিক থেকে একালের এক [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্ধৃতি [illegible]—

> "As [illegible] [illegible] feel an orange" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই তুলনা আঁদ্রের [illegible]।

যাই হোক পরিশেষে কবি এমন এক জগতের আশ্বাস [illegible] যেখানে সব-কিছু ঠিক ঠিক নির্ধারিত হয়ে যাবে। যা বিকল তা আবার [illegible] জোড়া লাগবে। আর সেই নতুন জগতে বিজ্ঞানীরা পরমাণুর [illegible] করবেন।

[illegible] [illegible] নামক কবিতায় আঁদ্রে আরেক পা এগিয়ে গিয়েছেন। [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible]—

> "Give me your wife"
> I have a weakness" it says, "for brunettes; I love them at 30 rpm."

[illegible] যুগের এই সব দানব বিষয়ে আঁদ্রের চিত্তে ঘোরতর আতঙ্ক বর্তমান। অতীতের অত্যাচারী [illegible] কথা কবির মনে হয়েছে যন্ত্র সম্পর্কে—

> "Machines as barbarous as Batu Khan have enslaved us men."

[illegible] নাটকের লেখকদের তিনি শ্রদ্ধা করেন। যেমন [illegible] কথা স্মরণ করেছেন। সাহিত্যিক [illegible] খেয়ালের জন্য তাকে দণ্ডিত করা হয়। [illegible] [illegible]

সাহিত্য সংস্কৃতি

সেনানী হিসাবে কাজ করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। জার এবং মান্দবাগ জাতীয় অত্যাচারী পিশাচদের প্রতি তাঁর ধিক্কার ফেটে পড়েছে—এরা সর্বকালের নরপিশাচ, এবং অত্যাচারী শাসক। এরা শিল্পী ও লেখকদের যন্ত্রণা দিয়েছে, জনতার উৎপীড়িত করেছে—তার কারণ এই সব মানুষের প্রতিভা এমনই শক্তিশালী যে—

> "...it could knock a crown off
> its head and shake the seats of
> power

কথিত আছে যে, আইভান দি টেরিবেল রেড স্কোয়ারের সেন্ট বেসিল্স ক্যাথিড্রালের স্থপতিদের এবং বারমার চোখ উপড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে চোখ উপড়ে নিয়ে শিল্পীকে সমাদর জানানোর বিবরণ আরো পাওয়া যায়। শিল্পী আর এই রকমটি যেন তৈরী করতে না পারেন, তার জন্যই এই মধ্যযুগীয় বর্বর সতর্কতার ব্যবস্থা ছিল। কবি বলছেন—

> "...for an artist 'true-born'
> revolt is second nature"

পিকাসোকে দেখতে গিয়েছিলেন ফ্রাংকো তাঁর মনে হয়েছে তিনি—

"Knotting things into centuries' এর পর আঁদ্রের মনে হয়েছে—পিকাসোর কাছে ফ্রাংকোর পোর্টরেট আঁকার আবেদন এল। পিকাসো বললেন—ফ্রাংকোর পোর্টরেট? তার মুন্ডটা আমার কাছে নিয়ে এসো, তারপর আঁকব?'

নিগ্রোদের সম্পর্কে কবির সমমর্মিতা অসীম—

> "We Negroes, we poets,
> in whom the planets splash
> lie like sacks full of legends
> and Stars
> Trample upon us
> and you kick the firmament."

আঁদ্রের অবিখ্যাত কবিতা 'আই অ্যাম গইয়া' পৃথিবীর নৃশংসতা ও বিপর্যয়ের মাঝে কবি ও শিল্পীর বার বার যে বিজয় ঘটেছে, তারই বলিষ্ঠ ঘোষণা উচ্চারিত—

> "I am the gullet
> of a woman hanged whose
> body like a bell
> tolled over a blank square
> I am Goya"

আর শেষপর্যন্ত বলেছেন—

> "I am Andrei, not just
> anyone—

কবি—কবি, তিনি যে সে বা যে কেউ মাত্র নন। তিনি যে মানবদরদী, মানবিক সমস্যায় বিজড়িত।

—অভয়ঙ্কর

ANTIWORLDS : (Poems) by ANDREI VOZNESENSKY : Translated by
W H AUDEN Jean Garrigue, Max Hayward, Stanley Kunitz, Stanley Moss, William Jay Smith Richard Wilbur : (OXFORD PAPER BACKS) OXFORD UNIVERSITY PRESS PRICE . 7s-6d.

সাহিত্যের খবর

কবিশেখর কালিদাস রায় সম্বর্ধনা-- কবিশেখর কালিদাস রায় বর্তমান বাংলার প্রবীণতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর ৮২তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে বাণীবিতান নামক একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান কবির 'সন্ধ্যার কুলায়' নামক বাসভবনে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ এই সভায় উপস্থিত হয়ে কবিকে প্রশস্তি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কবি আজ বার্ধক্যের ভারে জীর্ণ, তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, দেহ অশক্ত এবং দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। স্বভাবতই এই অভিনন্দন গ্রহণ করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন—পিঞ্জরে পিঞ্জরে প্রাণপাখী ছটফট করছে। বিদায়ের গান গাইছে। বিদায় আসন্ন। তথাপি এই বিদায়লগ্নে যারা পিছু ডাকে তাদের ডাককে অস্বীকার করা যায় না, অন্তরে গ্রহণ করতে হয়।

কবির 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির কথা প্রায় সকলেই উল্লেখ করেন। কবির অনুরোধে তাঁর কয়েকটি কবিতা এই সভায় আবৃত্তি করা হয়। এই সভায় কয়েকখানি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

•

লোকশিল্পের নিদর্শন বাংলার পুতুল: ম্যাক্সমূলার ভবনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় আশিস বসু বাংলার মাটির পুতুল বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন দেশে লোকশিল্পীদের হাতে গড়া পুতুলের ক্রমবিকাশের কথা বর্ণনা করেন। নানা বিষয়ের মধ্যেও পালা-পার্বণ এবং লৌকিক আচারের মাধ্যমে পুতুল শিল্প আজো সজীব বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত প্রায় পঞ্চাশটি পুতুলও তিনি এই সভায় প্রদর্শন করেন।

জনপ্রিয় হিন্দী লেখক গুলশন নন্দ : গুলশন নন্দ বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় উপন্যাস লেখক। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কাটি পতং' (কাটা ঘুড়ি)—এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে তার এতাবৎ মোট বিক্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০,০০০। ভারতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা নাকি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

•

আচার্য ভানুভক্তের জন্ম-জয়ন্তী : নেপালী কবি আচার্য ভানুভক্তের ১৫৭তম জন্ম-জয়ন্তী বিগত ১৩ জুলাই তারিখে দার্জিলিংয়ের সর্বত্র পালিত হয়েছে। প্রভাত ফেরী দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু করা হয় এবং কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। নেপালী সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত মূল সভায় আধুনিক নেপালী ভাষায় রামায়ণে ভানুভক্তের দান বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক স্বীকৃত হয়। রামায়ণ গ্রন্থের অনুবাদ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম একথা অনেকে বলেন। কিছুদিন পূর্বে আচার্য ভানুভক্ত প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত আলোচনা 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়।

•

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা : খড়্গপুর আই আই টি'র অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছরের রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা দান করেছেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সম্বন্ধবাদ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব'। এই বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

•

চার্লস ডিকেন্স সেমিনার : চার্লস ডিকেন্সের জয়ন্তী উপলক্ষে দিল্লীর হংসরাজ কলেজে একটি সারাদিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ বলেন—চার্লস ডিকেন্স দারিদ্র্যের জ্বালা এবং যন্ত্রণা তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তোলেন। শ্রীমতী নয়নতারা সায়গল বলেন—ডিকেন্সের রচনার ফলে সরকারি-দপ্তর, শ্রমশিল্পের ব্যাপারে কিছু কিছু সংস্কার সাধনে বাধ্য হন। আশ্রয়হীন অনাথ বালক-বালিকার জীবনে সংস্কার সাধনেরও প্রচেষ্টা হয় ডিকেন্সের রচনার অনুপ্রেরণায়। সভায় ডিকেন্স বর্ণিত চরিত্রাবলীর একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

নতুন বই

মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য (আলোচনা) : পুলকেন্দু সিংহ। আলফা পাবলিশিং কনসার্ণ। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংগীত ও লোক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীপুলকেন্দু সিংহ। পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে লেখক এই জেলার অসংখ্য সাধারণ মানুষ কবিয়াল, ছড়াকার, বাউল, দরবেশ কীর্তনীয়া, পটুয়া, মৃদঙ্গ-বাদক, জারিগানের শিল্পী, ভাদু গানের শিল্পীদের সংগে মিশে আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এদের সঙ্গীত ও সাহিত্যে মাজা ঘেষে সোঁদা মাটির গন্ধ, সহজ, স্বচ্ছন্দ অসংস্কৃত ভাষার সন্ধান। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন: 'গ্রাম গ্রামান্তর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে তাদের কাছ থেকে শোনা ছড়ায়, পাঁচালীতে মনে হোল তাদের অনেক কথা ছড়ান আছে ছিটান আছে। তাদের মনের কথা জানতে হলে এই ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালী থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। তারা নানাবিধ আর্থিক, সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের বন্ধনে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে যা কোনদিনও প্রকাশ করতে পারে না তা তাদের লৌকিক গানে, পাঁচালী গানে, পল্লীসংগীতে স্বাচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তারা নির্ভয় মুক্তকণ্ঠ, মুক্ত হৃদয়। একমাত্র এখানেই তাদের মনের দরজা খোলা। এমনি করে তাদের হাঁড়ির খবর নিতে এসে মনের খবর পেয়ে গেলাম।' রাঢ় মুর্শিদাবাদের ব্রতকথা, কীর্তন, ভাদুই, বাউল বোলান আঞ্চলিক লোকসংগীতে লোকজীবন, গাজন গানে সমাজচিত্র, জারিগান নিয়ে লেখকের আলোচনাগুলি লোক সংগীত গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে। লেখকের আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু বিষয়ের গভীরতর স্তরে তিনি পৌঁছাতে পারেননি। যে মনের খবর লেখক পেয়েছেন তাকে পূর্ণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা উচিত ছিল।

টেমস থেকে তিস্তা (উপন্যাস) — অজিত দত্তগুপ্ত। ১১৭ হাজরা রোড, কলকাতা—২৬। ৬·০০ টাকা।

আর্থার জবসন-জয়োশী উইলসন, শুভময়, শিউলি, দেবজ্যোতি, নন্দিতা এদেরই আশা-ভালবাসার কাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় আবর্তিত হয়েছে টেমস থেকে তিস্তা অবধি। প্রশংসনীয় প্রয়াস। প্রথম উপন্যাসের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী লেখায় কাটিয়ে উঠবেন লেখক—এটুকু আশা করা যায়।

শাড়ী অনেকেই দেয়, মধুমিলনী হয় ক'জন — পেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবা অ্যান্ড কোং, হাওড়া—১। ৪·১০।

নামকরণ নজর টানে, বিষয়বস্তুও। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' — এই প্রতিপাদ্যকে কিছু গার্হস্থ্যচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনব এবং প্রশংসনীয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিত্রাপদা (বাংলাদেশ সংখ্যা)—সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ভারত ফটো-টাইপ স্টুডিও। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁর নির্যাতনের অসংখ্য আলোকচিত্রশোভিত এই সংখ্যাটি হাতে নিয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। এমন দুঃসংবাদ ইন্দোচীনে মার্কিন সেনাদের বর্বরতাকেও হার মানায়। দীর্ঘদিনের শোষণ এবং নির্যাতনের অবশেষে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে, তারই তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যাবে 'চিত্রাপদায়'।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন তাজউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কামারুজ্জমান, হোসেন আলী এবং বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির পক্ষ থেকে আসাদুল হক। গণ-সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধের ওপর লিখেছেন অনেকেই। পর্যবেক্ষক, নিজস্ব প্রতিনিধি, আসহাবউল হক, সুধা সেন, ফজলুল হক এবং আরো কয়েকজনের রচনা বিশেষ মূল্যবান। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবরের দুটি ভাষণের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ডিংকে প্রকাশিত ২৫ মার্চ-এর ঘটনার বিবরণ অনুবাদ করেছেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। কয়েকটি কবিতা আছে। বাংলাদেশের পতাকা প্রচ্ছদটিকে যেমন আকর্ষণীয় করেছে, তেমনি শেষের প্রচ্ছদে বাংলাদেশের মানচিত্রটিও কম মূল্যবান নয়।

অচলো সাহিত্য (জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৮)—সম্পাদক : সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়। হাজিনগর। ২৪ পরগণা।

দুটি গল্প লিখেছেন আশিস ঘোষ এবং সমীরকান্তি বিশ্বাস। যামিনী রায়ের চিত্রকলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রীতিভূষণ চাকী। কবিতা লিখেছেন রণেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, দীপনারায়ণ সাউ, ক্ষিতীশ দেবসিকদার এবং নবীন দত্ত।

সমকাল (দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৭১) সম্পাদক—সুবোধবিকাশ দত্ত। ৩৩।১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—১। ৩০ পয়সা।

মণিদির স্বত্বাধিকারী সম্পাদনায় সুখপাঠ্য সমকাল মাসিক পত্রিকাটি এপ্রিল সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা কথিকা, নাটিকা, রম্য-রচনায় বিশেষ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া আছে কিশোরমহল ও মহিলা সংসদ। বহু অনুরাগীরা পেলে খুশী হবেন।

পার্থসারথি (বৈশাখ '৭৮)—সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ, ৫এ অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা—৪। ৪৫ পয়সা।

ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদ এ পত্রিকার মুখ্য উপজীব্য। বিবিধ তত্ত্বসম্পর্কীয় প্রবন্ধ যাঁরা পড়তে ভালবাসেন পার্থসারথির এই সংখ্যাটি পেলে খুশি হবেন। প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক যোগাবে। লিখেছেন : হরিদাস সাহা, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অনিলবরণ রায়, রাধাচরণ রায়, সুনন্দন ঘোষ ও ভাগবৎ দাস বর্মা।

আলেখ্য (দ্বিমাসিকপত্র, এপ্রিল ১৯৭১)। সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল। ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ। কলকাতা—৩২। এক টাকা।

অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকা বাহ্যরূপে যতই আকর্ষণীয় হোক অন্তরঙ্গ বিষয়বস্তু প্রকাশভঙ্গি বৈভবের অভাবে বৈশিষ্ট্যহীন, শিথিল, অগভীর। কোনরকমে টিকে থাকা যেন একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য। এই জনারণ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট আদর্শশঙ্কাবিমুক্ত পত্র-পত্রিকার জোয়ারজলের বন্যার মধ্যে আলেখ্য এ আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মননশীলতার নিরপেক্ষতার নির্ভীকতার ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সমাহার আলেখ্য। সাহিত্য-ভাবনার প্রতিটি দিক আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত। বিষয়সূচী বিষয়-বৈচিত্র্য তারই নিদর্শন। সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ইসলাম ও ভারত', যোগেন্দ্রনাথ সিনহার 'পথের পাঁচালীর বিশ্বচিত্রবাদ', প্রদ্যুম্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়িকার প্রকারভেদ', সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের টলস্টয়ের আর্ট চিন্তা, তীর্থেন্দু দাসের 'একাডেমীর সাহিত্য গোষ্ঠীর আলাপন' প্রণবরঞ্জন রায়ের 'ঈশ্বর ও বিদ্যাসাগর' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বার্ট্রাণ্ড রাসেল', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মনুষ্যত্ব কি' প্রভৃতি রচনাগুলি 'সিরিয়াস' পাঠকদের 'বস্তুর চিন্তার খোরাক জোটাবে। 'সাহিত্য পরিক্রমা', 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গ', 'সমাজচিন্তা', 'গ্রন্থ-সমালোচনা' শিরোনামে আলোচনাগুলি সুলিখিত।

প্রাপ্তিস্বীকার 'সংকলন ও পত্র'

আগমনী (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)। সম্পাদক : দেবকুমার বসু। ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা—৬। ২৫ পয়সা।

অমৃত্য (চতুর্মাসিক পত্রিকা)। সম্পাদিকা দেবযানী রায়। ৮।১০০ বিজয়গড় কলকাতা—৩২। আশী পয়সা।

সম্রাটের খেদ ॥ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধ হচ্ছি, ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে—হায় বিদূষক!
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পার্ষদ সব ডাইনে-বাঁয়ে
হেলছে, আমি বুঝতে পারছি এবং বুঝছে সমস্ত লোক
রাজ্য আমার ভাঙবে এবার ষড়যন্ত্রের কুঠার ঘায়ে।

ইন্দ্রভোগ্য রাজভোগ আর এ-পাকযন্ত্রে হয় না হজম,
সয় যেটুকু, তাও জানি হয় পানপাত্রের আনুকূল্যে
গুণ-কীর্তন যদিও শুনি ভালো বুঝি না রকম-সকম
কম্প হবে তোমার মত দু' দশজনা চোখ বুজলে।

একটি গোপন কথা শোনো : ঐ যে চামর-সঞ্চালিনী
তপ্ত প্রহর যে-নিপুণিকা করতো শীতল, আলিঙ্গনে,
দিনে দিনে শুকিয়ে এলো তারও প্রেমের মন্দাকিনী,
তরুণ সেনাপতির সঙ্গে মত্ত সে প্রেম আলাপনে।

রৌপ্যকেশে এই যে আমার সর্বনাশের চিহ্ন আঁকা
মুছতে পারো এ-পরোয়ানা সৈন্য এনে অক্ষৌহিণী?
রাজকোষ দাও শূন্য করে, দাও বিলিয়ে অঢেল টাকা
তার বদলে না হয় আমি অনাক্রমণ চুক্তি কিনি।

চতুর্বর্গ ফলের সেরা মোক্ষে নেইক আমার মোহ,
সন্তান তো অনেক আমার এবং আছে লক্ষ নাতি,
সবার বিবেচনায় বোধহয় নয় সমুচিত এমন দ্রোহ
খোঁজ করো না, তাদের মধ্যে হতেও পারে কেউ যযাতি!

স্বগতোক্তি ॥ অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

এই সব দিন গত হলে
ঘাসেদের নরম শরীরে
জ্যোৎস্নার ভিজে আলোর
আশ্রয় আর কি পাবো?
কোন গর্ভবতী কুঁড়ি
অথবা, লজ্জাবতীর লজ্জা দেখে
শিহরিত আর কি হব?
এই সব দিন গত হলে
পিটিয়ে শক্ত করা মনটা
কোন মুখ দেখে শান্তি
আর কি পাবে?

এই সব দিনে
প্রকৃতির মূক কান্না ভেসে আসে
কোকিলেরা দৈবাৎ শব্দ করে
অবিকল মেশিনের মত
এই সব দিনে
হৃদয়ের বহু নিচে চাপা দেওয়া
সবারই হৃদয়ে ক্ষত।

এই সব দিন গত হলে
আলমারীর কোণে রাখা
সিঁদুর কৌটো খুলে
সিঁথিতে সিঁদুর রাঙিয়ে
ঘষা আয়নায় মুখ দেখে
আমার কথা আগের মত
আর কি কেউ ভাববে?

আত্মনিপীড়ন ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি তো জেনেই
গেছি এই খেলা
আত্মনিপীড়ন
সারাটা দিন
ভ্রষ্টবেলা
ধ্বস্ত আলো—
বার বার ফিরে
জ্বালা।

খিলি

দেবল দেববর্মা

দরজা খুলে ওকে দেখেই লতিকা ভুরু কোঁচকাল। হাতে একটা রঙচটা, পুরোনো স্যুটকেস নিয়ে সে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি সুশ্রী, চেহারায় চটক আছে। একনজরে ওকে ভদ্রঘরের বলেই মনে হল, পরনে নকশা পাড় হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি। গায়ের রঙ খুব ফর্সা নয়, ঈষৎ চাপা, চোখ দুটি বড়ো না হলেও ভাসা-ভাসা। ডিমালো মুখ। ছোট কপাল। মুখের ডৌলটি বেশ মিষ্টি বলা যায়।

লতিকা ভাবছিল মেয়েটি কে? সাজ-সজ্জা, হাতের স্যুটকেসের দিকে তাকালে মনে হয় পড়তি অবস্থা। অর্থাৎ পুরোনো অসুখের মত দারিদ্র্যে জর্জর। ঘরে অভাব-অনটন। তাই সাত-সকালে সাহায্যের আশায় গেরস্থের দরজায় হাজির। কিম্বা এমনও হতে পারে মেয়েটি কোনো ক্ষুদে কোম্পানীর সেলস-গার্ল অথবা ক্যানভাসার। ধূপকাঠি, নেল পালিশ, আলতার শিশি, কম-দামী স্নো পাউডার বেচে। ওর টিনের স্যুটকেসটা এই সব মালপত্রে বোঝাই নানা সামগ্রীর [illegible]

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে লতিকা অপ্রসন্ন মুখে শুধোল,—'আপনার কি চাই বলুন তো?'

মেয়েটি কথায় সহজ, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি। সে হেসে বলল,—'আমায় আর আপনি বলবেন না দিদি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোটই হবো, আমায় তুমি বলবেন।'

গলায় নরম সুর, নম্র, বিনীত ভঙ্গি। যা মানুষকে খুশি করে, কিন্তু তবু লতিকার মুখের অপ্রসন্নভাব ছেঁড়া মেঘের মত এদিক সেদিক সরল না। সে তেমনি ভুরু কুঁচকে শুধোল, —'কোথা থেকে আসছ তুমি?'

মেয়েটি তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা বন্ধ করা খাম বের করল। লতিকার হাতে সেটি তুলে দিয়ে বলল,—'আমাকে মাধবীদি পাঠালেন আপনার কাছে। নিউ আলিপুরের মাধবী বসু। আপনার নাকি একজন সর্বক্ষণের লোকের দরকার দিদি—'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, লতিকার মনে পড়ল এবার। দিন সাতেক আগে মাধবীর সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটে দেখা।

ছেলের জন্য কটা বই কিনতে, তাই অতদূর থেকে বইপাড়ায় আসা। তাকে দেখে মাধবী মুচকি হেসে বলল,—'তোর অবস্থা তো দেখছি সাংঘাতিক। এই শরীরে ঘরের কাজ-কর্ম, স্কুলের চাকরি কেমন করে সামলাচ্ছিস?'

—'সামলাতে হচ্ছে। নইলে উপায় কি বল?' লতিকা জবাব দিল, দুঃখ করে বলল,—'বাড়িতে একটা ঠিকে লোক আছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ থাকে? সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা সব আমার ঘাড়ে. অনেক চেষ্টা করেও সর্বক্ষণের জন্য একটা লোক জোগাড় করতে পারিনি। নইলে হয়ত শরীরটা একটু বিশ্রাম পেত।'

তার অবস্থা দেখে মাধবীর বোধ করি মায়া হল। সহানুভূতি জানিয়ে সে বলল,—'না, না। এই অবস্থায় এত খাটা-খাটনি ভাল নয় রে, তা সর্বক্ষণের জন্য লোক রাখবি তুই?'

—'তেমন লোক আছে তোর সন্ধানে?' লতিকা সাগ্রহে শুধোল।

—'আছে একজন', মাধবী এক মুহূর্ত ভাবল, 'আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে কাজ করে, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ দিল্লীতে ট্রান্সফার হয়েছেন। এই সপ্তাহেই সেখানে যেতে হবে। সেই মেয়েটি কাজ চায়। তোর পছন্দ হলে রাখতে পারিস।'

—'লোক পাওয়াই যায় না। পছন্দ-অপছন্দের কথা কে তুলছে? শুধু একটা খবর জানা দরকার। মেয়েটি বেশ বিশ্বাসী তো? মানে ঘর-দোর সব ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়?'

—'নিশ্চিন্তে।' মাধবী ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল। 'আমার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে ওকে আজ বছরখানেক দেখছি। ছুটিছাটায় ওরা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে গেছে। আবার সন্ধ্যার দিকে এখানে-সেখানে ঘুরত ফিরত। তখন তো বাড়ি-ঘর ওরই হেপাজতে। জিনিসপত্র, বাক্স-বিছানা সব ওই আগলাত।'

লতিকা খুশি হয়ে বলল,—'এমনি এক-জন লোকই তো আমি খুঁজছি রে। ও যদি রাজি থাকে, তাহলে তুই ওকে কালই পাঠিয়ে দিস।'

—'উঁহু। কাল হবে না।' মাধবী মাথা নাড়ল। বলল,—'আমি ওকে কাল ডেকে পাঠাব। এলে পর তোর কথা বলব। মেয়েটি রাজি হলে পাঠিয়ে দেব তোর কাছে, কেমন?'

—'দেখিস, বাড়ি ফিরে আবার সব কথা ভুলে যাস নে যেন,—' কণ্ঠে আন্তরিকতার লতিকা এবার সন্দেহ প্রকাশ করল।

মাধবী হেসে বলল,—'কিচ্ছু ভুলে যাব না। সব আমার মনে থাকবে। তুই নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যা,—বুঝলি?'

তা সত্যি। মাধবী তার কথা রেখেছে। একটি অক্ষরও ভোলেনি। [illegible] পেরোয়নি। জলজ্যান্ত একটি কাজের মানুষ লতিকার-বাড়ির দরজায়-যে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

ওর হাতে কয়েক ছত্রের একটি পত্র। মেয়েটি কাজ করতে রাজি। খাওয়া পরা ছাড়া মাসে তিরিশ টাকা মাইনে চায়। ইচ্ছে করলে লতিকা ওকে এখনই কাজে বহাল করতে পারে।

মনের গুমোট কখন গলে জল। কোঁচকানো ভুরু এখন সহজ, স্বাভাবিক। ফটফটে নীল আকাশের মত অন্তরে উপচানো খুশি। লতিকা এবার হেসেই বলল,—'ওকি! তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিতরে এসো।'

নেহাৎ ছোট ফ্ল্যাট। পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে একফালি বারান্দা। সেখানে দুখানা চেয়ার, একটা স্টীলের টেবিল পাতা। পায়রার খোপের মত রান্নাঘর, বাথরুম।

নিশীথ ঘরে, এখনও বিছানা ছাড়েনি। ভীষণ আলসে লোক। কখন শয্যা ছেড়ে উঠবে, বাজার-হাট যাবে তা সেই জানে। লতিকা ঘরে পা দিয়ে দেখল খবরের কাগজের পাতায় মুখ গুঁজে নিশীথ নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে।

লতিকা প্রায় নিঃশব্দে ওর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখের উপর খবরের কাগজের আড়াল বলে নিশীথ একে দেখতে পায় নি। দুষ্টুমী করে লতিকা ওর পায়ের তলায় আলতো আঙুলে বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজটা ফেলে নিশীথ উঠে বসল।

লতিকা অনুযোগ করে বলল,—'দিন দিন কুঁড়ের বাদশা হয়ে উঠছ। এবার বিছানা থেকে নামো। বাজার-হাট যেতে হবে না?'

নিশীথ মুখ কুঁচকে বলল,—'কটা বেজেছে? বাজার যাওয়ার জন্য এত তাড়া কিসের?'

—'তাড়া আছে। তুমি এবার বিছানা থেকে নামো দিকি। একটা দরকারী কথা বলব।' লতিকা ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে নামল নিশীথ। হাই তুলল, চোখ কচলাল। মাথার চুলে একবার হাত বুলোল। তারপর বউয়ের গলাটা প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল,—'কি আদেশ, কহ দেবী।'

লতিকা স্বামীর ঠোঁটের উপর ডান হাতের দুটো আঙুলে প্রায় চেপে ধরল। ফিস ফিস করে বলল,—'চুপ কর। বাইরে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কি ভাববে—'

নিশীথ স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে শুধোল,—'কে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে? এত সকালে এল কে?'

—'বলছি এখুনি। একটু ধৈর্য ধরে শোন।' লতিকা এক মুহূর্ত থামল। ফের বলল,—'মাধবী আমাকে একজন সর্বক্ষণের লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। ওকে রাখব তো?'

—'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' নিশীথ ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। 'মাধবী কে? হঠাৎ তোমাকে লোক জোগাড় করে দিল যে!'

—'আহা! মাধবীর কথা তোমাকে বলিনি?' লতিকা স্বামীকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বলল,—'আমার পুরানো বন্ধু। সেদিন কলেজ স্ট্রীটে দেখা। ওর সন্ধানে একজন লোক আছে বলেছিল। তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছে।'

—'বেশ তো, ওকে তাহলে বহাল করো। তোমার শরীর ভাল নয়। একজন লোক তো খুব দরকার—।'

—'দরকার তো বটেই।' লতিকা আরো কিছু বলবে এমনি একটা ভাব করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল,—'কত মাইনে নেবে জানো?'

—'কত?'

—'তিরিশ টাকা।'

—'ড্যাম্ চীপ। এর চেয়ে কমে একজন হোল-টাইম কাজের লোক পাওয়া যাবে না।' নিশীথ প্রায় ঘোষণা করল।

—'তাতো বুঝলাম।' লতিকা খাটো গলায় বলল। 'কিন্তু আরো একটা কথা ভাববার আছে। মেয়েটিকে একবার দেখ না তুমি। বেশ ইয়ং, আর দেখতেও মন্দ নয়। সোমত্ত বয়সের এমনি মেয়ে রাখব? ওর হাতে ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে?'

—'অত ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার করে কি লোক রাখা যায়? বেশী খুঁতখুঁত করে লাভ নেই লতিকা—'

—'তাহলে ওকে রেখে দিই।' লতিকা স্বামীর মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে। সুটকেসটা নীচে নামিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেওয়ালের কোণের ঝুল, বারান্দার এক কোণে জমিয়ে রাখা টুকরো কাগজপত্রের আবর্জনার উপর চোখ বুলোচ্ছে।

লতিকা শুধোল,—'আচ্ছা, তোমার কি নাম বললে না তো?'

—'আমার নাম পারুল ঘোষ। আপনি পারুল বলে ডাকবেন দিদি।'

—'বেশ, তাই ডাকব।' লতিকা হেসে ফেলল। বলল,—'তুমি তাহলে আজ থেকেই শুরু কর। ঘরদোরের অবস্থা দেখছ তো। আমার আর ক্ষমতা নেই পারুল। ঠিকে ঝিকে বলে বলে হয়রান। কি যে ঝাটপাট দেয়, দরজার কোণের ময়লাগুলো পর্যন্ত ফেলে না।'

পাশের ঘরেই ওকে থাকতে দিতে হল। নইলে এ বাড়িতে আর জায়গা কোথায়? বাড়তি লোকজন এলে খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু উপায় নেই। লতিকার শরীরের যা অবস্থা, ওকে পেয়ে তবু নিশ্চিন্ত। না হলে কদিন পরে দুটো ডাল-ভাত কে ফুটিয়ে দিত কে জানে—।

তবু নিশীথকে সে জানিয়ে রাখল। 'পাশের ঘরেই ওকে থাকতে দিলাম, বুঝলে?'

—'দাও। তুমি যা ভাল বোঝ, কর।' নিশীথ অন্যদিকে তাকাল।

লতিকা আর কথা বাড়াল না। নিশীথ এমনি মানুষ। সংসারে সে মাথা গলাতে নারাজ। লতিকা যা করবে তাই। মাস-কাবারে মাইনে পেয়ে, সে স্ত্রীর হাতে টাকাটা তুলে দেয়। এর বেশী সে জানে না। ঘরের ব্যাপারে লতিকাই সর্বেসর্বা। তার ইচ্ছে, মত সে খাটাতে পারে।

তবু লতিকার মনটা খুঁতখুঁত করছিল। ঠিক তাদের শোবার ঘরের পাশেই একটি সোমত্ত মেয়েকে সে থাকতে দিতে চায় নি। ফ্ল্যাট বাড়ি,—পার্টিশন দেওয়ালগুলো ভীষণ পাতলা। এ ঘরে বসে একটু জোরে কথা বললে ও ঘরে শোনা যায়। আর হাসলে তো কথাই নেই। পাশের ঘরের মানুষ ঠিক তা টের পাবে।

দুটো ঘরের মাঝখানে ছোট দরজা। এতকাল সেটা খোলা থাকত। কালে-ভদ্রে লতিকা বন্ধ করেছে। আজ পাশের ঘরে ঢুকে প্রথমেই সেটা ভেজিয়ে দিল। ঘরের চার পাশে একবার চোখ বুলোল লতিকা। অনেক জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কিছু সে ও ঘরে নিয়ে যাবে। কিছু এখানেই থাকবে। পারুলকে ডেকে বলল, —'এই ঘরে সুটকেসটা রাখ। এখানেই তুমি শোবে'। ফের ভেজানো দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, — 'রাত্তিরে ঘুমোবার আগে খিলটা তুলে দিও, কেমন?'

পারুল সুটকেসটা ঘরের এক কোণে রেখে বলল,—'আমি কাপড়টা পাল্টে নিই দিদি। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যাই। আপনাদের তো আবার আপিস আছে,—সকাল নটায় নিশ্চয় ভাত দিতে হবে।'

ওর ব্যস্তভাব দেখে লতিকা খুশি হল। মেয়েটা কাজের হবে মনে হয়। তাছাড়া বেশ চটপটে আর পরিস্কার। দেখে-শুনে তো মনে হয়, ও ভদ্রঘরের মেয়ে। অবস্থার ফের। তাই পরের বাড়িতে কাজে ঢুকেছে।

লতিকা হেসে বলল,—'আমি অফিসে যাই না পারুল। স্কুলে পড়াই। আমার অত সকালে ভাত না হলেও চলবে। তবে ওর অফিস আছে। নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তার আগেই ভাতের জন্য তাড়া দেবে দেখো।—'

বারান্দায় এসে লতিকা দেখল নিশীথ মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী। থলি হাতে নিয়ে বসে আছে। অন্য দিন বাজার যাবার জন্য স্বামীকে সাতবার তাগাদা দিতে হয়। লতিকা তাই মুচকি হেসে শুধোল,—'কি ব্যাপার, আজ একেবারে গুড-বয়। থলি হাতে বসে আছ যে—'

—'টাকা দাও।' নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাজারের টাকা নিয়ে এল লতিকা। কি কি আনতে হবে মুখে তার একটা ফিরিস্তি দিল। তারপর খাটো গলায় স্বামীর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'তাড়াতাড়ি এসো। আমি চায়ের জল উনুনে বসিয়ে রাখব।'

নিশীথ বেরোলে পর লতিকা ফের রান্নাঘরে ঢুকল। পারুলকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে হবে। তার ভাঁড়ারে কোথায় কি আছে ওকে জানিয়ে রাখা দরকার। নইলে এটা-ওটা দিতে রান্নাঘরে তাকে দশবার ছুটে আসতে হবে।

পারুল উনুন ধরাতে ব্যস্ত ছিল। লতিকার পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বলল,—ঘুঁটে কিন্তু ফুরিয়ে গেছে দিদি। এবেলা কোনমতে হল। ওবেলায় আনতে হবে।'

—'তাই বুঝি?' লতিকা ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকাল। বলল,—'আমি অত খেয়াল করি নি পারুল। ঠিক আছে, স্কুলে যাবার পথে আমি ঘুঁটে-কুড়ুনিকে বলে যাব। দুপুরবেলায় ও দিয়ে যাবে। তুমি একটু দেখে-শুনে নিও, কেমন?'

পারুল ঘাড় হেলিয়ে ফের কাজকর্ম সারতে লাগল। লতিকা দেখছিল। সত্যি, মেয়েটা কাজের। এক ফাঁকে কখন রান্নাঘরে ঝাঁট দিয়েছে পারুল। জিনিসপত্রগুলি এদিক-ওদিক গুছিয়ে রেখেছে। উনুনে আঁচ দিয়ে নিশ্চয় চায়ের সরঞ্জাম নামাবে।

—'আপনার কথা মাধবীদি আমাকে বলেছেন।' পারুল মুখ না তুলেই বলল।

—'ওমা! কি বলেছে মাধবী?' লতিকা শুধোল।

—'মানে, এই আপনার বাচ্চা-কাচ্চা হবে।'

—'ও, তাই বলো।' লতিকা মুচকি হাসল।

—'এখন ক মাস চলছে দিদি?' পারুল জানতে চাইল।

'ন মাস। তাই তো আর খাটতে পারি না।' লতিকা ক্লান্ত গলায় বলল। 'খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তোমাকে পেয়ে আমার খুব সুবিধে হল পারুল।'

—'ওমা! ন মাস? বলেন কি দিদি? দেখে তো মনেই হয় না।' পারুল লতিকার দেহের উপর ধীরে-ধীরে নজর বুলোল। ফের বলল,—'বাচ্চা খুব ছোট্ট হবে দেখবেন। তবে তার জন্য চিন্তা নেই। সেবার মাধবীদির মেয়ে হল মোটে প'চ পাউন্ড। কিন্তু হলে কি হবে? ওষুধে আর বেবী ফুডে সেই মেয়ে এমন দুরন্ত, গোলগাল হয়ে উঠল যে, মায়ের কোলে আর ধরে না।'

বাজার নিয়ে নিশীথ ফিরল। লতিকা টেবিলে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। নানা ধরনের সব খবর। কলহ-বিবাদ-দুর্ঘটনা। সিনেমা-থিয়েটার-জলসা। আরো কত ফাংশন। নতুন শাড়ির ঝকঝকে বিজ্ঞাপন।

থলিটা নামিয়ে রেখে নিশীথ চেয়ারে বসল। স্ত্রীর মুখোমুখি হল।

লতিকা গলা বাড়িয়ে বলল, — 'কই আমাদের চা দিয়ে যাও পারুল।'

মিনিট চার-পাঁচ পরেই পারুল এল। তার হাতে চায়ের ট্রেতে তিন কাপ চা। প্লেটে টোস্ট-পাঁউরুটি।

টেবিলের উপর সেগুলি নামিয়ে রাখল পারুল। নিশীথকে চা দিল। লতিকার দিকেও চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। নিজে একটা কাপ নিল। প্লেট থেকে টোস্ট নিতেও ভুলল না।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল পারুল। বলল — 'নিশীথদা, চা কেমন হয়েছে? চিনি কম হয় নি তো?'

ওর মুখে স্বামীর নাম শুনে লতিকা তাকাল।

নিশীথ হেসে বলল,—'চা ভালো হয়েছে চিনি কম হবে কেন?' ফের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল, — 'কি লতিকা, তোমার কেমন লাগছে বলো।'

—'ভালোই তো।' লতিকা আড়চোখে পারুলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলোল। তারপর ওকে সরিয়ে দেবার জন্যই যেন বলল,—'বাজারের থলিটা এখান থেকে নিয়ে যাও পারুল। মাছটা তাড়াতাড়ি কুটে ফেল। কি তরকারি হবে আমি বলে দেব তোমায়—'

অফিস যাবার আগে নিশীথ বলল,— 'পারুল রান্না ভালো করেছে। চচ্চড়িটা বেশ খেতে লাগল।'

—'হ্যাঁ, মেয়েটা কাজের। তবে একটু গায়ে-পড়া ভাব আছে। তোমাকে কেমন 'নিশীথদা' বলে ডাকছে দেখো না। যেন কতদিনের জানা-পরিচয়।'

নিশীথ কোন উত্তর দিল না। স্ত্রীর বিরক্তির কারণ বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

একটু থেমে লতিকা ফের বলল,— 'অবশ্য ওর কথাবার্তাই ওই রকম বলে মনে হয়। সকালে মাধবীর কথা হল। তাকেও মাধবীদি বলছিল। এর আগে যে বাড়িতে কাজ করত, সেখানেও কর্তাকে বোধহয় অমুকদা বলে ডাকত।'

নিশীথ শুধোল,—'আচ্ছা পারুলকে তো বিবাহিতা বলে মনে হল। ওর সিঁথিতে সিঁদুর দেখলাম যেন। স্বামী কোথায় কি করে, খোঁজ নিয়েছ কিছু?'

—'উঁহু,' লতিকা ঘাড় নাড়ল। 'স্বামী কি করে, কোথায় থাকে, তা জেনে আমার কি দরকার? ও এসেছে কাজ করতে, ভাল করে কাজ করবে। আমি এই বুঝি—'

মাঝের দরজাটা ভেজান ছিল। ওধার থেকে খিল তুলে দেয় নি। হাওয়া লেগে সেটা খুলে গেল। এদিকেও একটা ছিটকিনি আছে। লতিকা দরজার পাল্লা দুটো টেনে ছিটকিনিটা এঁটে দিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল,—'এখন এই থাক। পারুলকে বলেছি ওদিকের দোর খিল দিয়ে ঘুমোয়।'

—নিশীথ অফিস বেরিয়ে গেলে লতিকা ঠিক গ্রীষ্মদিনের ঝিমিয়ে পড়া লতার মত নির্জীব, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল। মাথাটা মাঝে-মাঝে ঘোরে... কেমন ঝিমঝিম করে। ডাক্তার তো প্রায়ই বলে, লো প্রেসার। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এমন স্কুল তার। হেড মিস্ট্রেস দু মাসের বেশী ছুটি দিতে কিছুতেই রাজি নয়। সুতরাং আরো কটা দিন স্কুলে যেতে হবে। অথচ উঁচু ক্লাসের মেয়েরা ব্যাপারটা বোঝে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। তখন এমন লজ্জা করে লতিকার।

রাত্তিরে শোবার সময় লতিকা বলল,— 'ওগো শুনছ। তুমি পারুলের স্বামীর কথা

বলছিলে না? সেকথা ওকে আজ জিজ্ঞেস করছিলাম।—'

নিশীথ পাশ বালিশটা জড়িয়ে ধরে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই শুধোল,—'কি বলল পারুল?

—'কি আবার বলবে? কথা শুনে এমন হু-হু করে কেঁদে উঠল যে, আমারই কষ্ট হচ্ছিল।'

নিশীথ এবার মুখ ফেরাল। স্ত্রীর গায়ে একটা হাত রেখে বলল,—হঠাৎ কেঁদে উঠল কেন?'

—বারে! কাঁদবে না? এমন পোড়া কপাল মেয়েটার। বিয়ের তিন মাস পরেই স্বামী একরকম নিরুদ্দেশ। ভিলাই না কোথায় চাকরি খুঁজতে বেরোল। বাস, সেই যাকে বলে নিপাত্তা। আর ফিরে আসে নি। অনেক চেষ্টা-চরিত্র, সম্ভব-অসম্ভব বহু জায়গায় খোঁজ-খবর করেছে পারুল। কিন্তু স্বামীর সন্ধান পায় নি।'

—তাই নাকি?' নিশীথ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ভেরী স্যাড কেস।'

লতিকা বড়-বড় চোখ করে কথা বলছিল। জানো, ও ভদ্রঘরের মেয়ে। পারুলের বাবা ডায়মণ্ড-হারবার কোর্টে মুহুরির ছিলেন। ওরা দুই বোন। পারুলের দিদির নাম চম্পা। ওর বিয়ে হয়েছে বর্ধমানের কাছে রসুলপুরে। তারও অবস্থা নাকি তেমন ভালো নয়। বরের কিছু জমিজমা আছে, এই পর্যন্ত। এদিকে মা-বাপ দুজনেই মারা গেল। মেয়েটার আর দিন চলছিল না। তাই পরের বাড়িতে চাকরি করে দুটো খেতে পাচ্ছে।'

স্ত্রীর মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিশীথ মনে-মনে হাসল। লতিকা এমনি। অথচ আজ সকালে সে পারুলের উপর রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন? পারুলের জন্য তার কষ্ট....কত মায়া, আঁচ বসানো উথলে ওঠা এক পাত্র দুধের মত লতিকা সহানুভূতিতে উছল।

দিন দশেকের মধ্যে ঘরের রূপটাই বদলে দিল পারুল। কোথাও ধুলো-বালি জমে নেই, নোংরা-আবর্জনা সব পরিষ্কার। দুবেলা ঘর মুছছে। সিলিঙে, দেওয়ালের কোণে আগে ঝুল জমে থাকত। পারুল নিজের হাতে সব দূর করল। জানালা-দরজার পর্দাগুলো কতদিন কাচা হয় নি। মশারি, বালিশের ওয়াড়, মায় বিছানার চাদরগুলো পর্যন্ত ময়লা। পারুল সেগুলি কাচল, নিজে ইস্ত্রি করল। ধবধবে সাদা বালিশের ওয়াড়ে মাথা রেখে নিশীথ বলল,—সত্যি, পারুলের ক্ষমতা আছে। দু হাতে কত দিক সামলাচ্ছে দেখো।'

ওর কাজকর্মে লতিকাও সন্তুষ্ট। সে বলল,—তা ঠিক। ঘরকন্নার কাজে পারুলের জুড়ি নেই। সব দিকে নজর আছে মেয়েটার। ওষুধ খাওয়ার কথা কত দিন মনে থাকে না আমার। কিন্তু পারুলের খেয়াল আছে। আমি ভাত খেয়ে উঠলেই ওষুধের শিশি, চামচে, গেলাস সব এনে হাজির করবে।' দুঃখ করে লতিকা ফের যোগ করল,—অথচ মেয়েটার কি দুর্ভাগ্য দেখ। ঘর-সংসারে মন ঢেলে দিচ্ছে, এমন সেবাযত্ন করছে। হায়, ওই মেয়ের কপালেই ঘর-বর কিছুই সইল না।'

এ বাড়িতে পারুল আসার পর থেকে নিশীথেরই সবচেয়ে বেশী সুবিধে হয়েছে। নটা বাজলেই তাকে অফিসে দৌড়ুতে হয়। বেশী দেরী করলে ট্রাম-বাস সব বড়-বোঝাই গোরুর গাড়ির মত, মানুষজনে ঠাসাঠাসি। শেষ দিকে সে প্রায়ই লেট হচ্ছিল। সংসারের ভারী জোয়ালটা লতিকা ক্লান্ত শরীরে আর টানতে পারছিল না। ডাল-ভাত, আলু-সেদ্ধ, তাও সময়ে হত না। অথচ পারুল এসে রান্নাঘরে ঢোকার পর থেকেই অন্য ছবি। নটা বাজার অনেক আগেই সে তাগাদা দিয়ে যায়—'নিশীথদা, স্নান-টান হল আপনার? আমার কিন্তু ভাত-তরকারি সব রেডি। আপনি খেতে বসতে পারেন।'

টেবিলে ভাতের থালা, তরি-তরকারি, ঝোলের বাটি সাজিয়ে দেয় পারুল। সব দিন লতিকা সামনে এসে বসতে পারে না। মাথা ঘোরে। তখন পারুলই নিশীথের সামনে এসে বসে। জোর করে এটা-ওটা খাওয়ায়। ভাত ফেলে উঠে যেতে দেয় না। ফের তরকারি কিম্বা আর এক টুকরো মাছ এনে পাতে দেয়। বলে,—একটি ভাতও ফেলা চলবে না নিশীথদা। সব খেয়ে যেতে হবে আপনাকে।'

শুধু তাই নয়। অফিসে বেরোবার সময় নিশীথ রুমাল খোঁজে। লতিকা বিছানায় শুয়ে থাকে। রুমাল কেন, সংসারের অনেক কিছুরই খবর সে এখন রাখে না। নিশীথের গলা শুনে ওঘর থেকে পারুল দৌড়ে আসে। রুমাল খুঁজে এনে দেয়। ধবধবে পরিষ্কার রুমাল। পারুলের নিজের হাতে কাচা। রুমালটা পকেটে গুঁজে নিশীথ দ্রুত বেরিয়ে পড়ে।

কদিন পরে লতিকা হঠাৎ বলল,—'শোন একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলাম।'

নিশীথ বিছানায় শুয়ে হাল্কা একটা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। সে মুখ না তুলেই শুধোল,—'কি কথা বলবে ভাবছিলে?'

—'এই পারুলের কথা।' লতিকা ফস করে যেন দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালাল।

—'পারুলের কথা? কেন কি হল?' নিশীথ ভুরু কোঁচকাল।

—'দেখ, পারুল কিছুতেই দরজায় খিল দিয়ে শোবে না। আমি বলে-বলে হার মেনেছি—'

—'সে আবার কি? কোন দরজায় পারুল খিল দেয় না?'

লতিকা বিরক্ত মুখে বলল,—'কোন দরজায় আবার? দুটো ঘরের মাঝখানের এই দরজাটায়। ওকে পই-পই করে বলেছি, রাত্তিরে ঘুমোবার আগে যেন খিল দিয়ে শোয়। কিন্তু অদ্ভুত মেয়েমানুষ। কিছুতেই দরজায় খিল লাগাবে না।'

—'তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো। ঘরে খিল দিতে অসুবিধে কিসের?—'

—'কি জানি বাপু। ওকে বোঝাতে হয় তুমি চেষ্টা কর। আমি আর মুখ খরচ করতে পারব না। সোমত্ত মেয়েছেলে। ঘরে খিল না দিয়ে শোয় কেমন করে?'

নিশীথ ব্যাপারটা সহজ করতে চেষ্টা করল। 'দরজা তো বন্ধই থাকে। তুমি রোজ রাত্তিরে ছিটকিনি এঁটে দাও না?'

—'তা দিচ্ছি। কিন্তু আমারও তো ভুল-চুক হতে পারে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজের দরজায় খিল দেওয়া কি ওর উচিত নয়?' লতিকা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের বলল,—'বেশী টিক-টিক করলে আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসে। বলে খিল দেবার কথা মনে থাকে না দিদি। তাছাড়া পাশের ঘরে আপনি তো রইলেন। আমার ভয়টা কিসের?'

দিন দুই-তিন পর। অনেক রাত্তিরে পিঠের উপর স্ত্রীর কোমল করস্পর্শ অনুভব করল নিশীথ। না, সোহাগ নয়। লতিকা তাকে জাগাবার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখে নিশীথ তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—'কি ব্যাপার?' সে স্ত্রীকে শুধোল।

—চুপ।' লতিকা ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে নিশীথকে কথা বলতে নিষেধ করল। গলা নামিয়ে বলল,—'দেখবে আজ অত বললাম। তবু পারুল খিল না দিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

নিছক মেয়েলি কৌতূহল। এই সামান্য ব্যাপারে তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলবার কোন মানে হয় না। মনে-মনে খুব বিরক্ত হল নিশীথ। কিন্তু রাত দুপুরে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাগানুবাদ করতে ইচ্ছে করল না।

—'নেমে এসো বিছানা থেকে।' লতিকা ফিস-ফিস করে বলল।

স্ত্রীর পিছু-পিছু নিশি-ডাকা মানুষের মত পা ফেলছিল নিশীথ। দরজার ছিট-কিনিটা লতিকা প্রায় নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে খুলল। তার কথাই সত্যি। পারুল আজও খিল দেয় নি। দরজা ঠেলতেই আবছা অন্ধকারে ঘরের ভিতরটা প্রায় স্পষ্ট দেখাল। বিছানায় পারুল শুয়ে। ঘুমে অচেতন। দরজা খুলে দুটো মানুষ ঘরে ঢুকেছে তাও সে টের পায় নি।

লতিকা মুখ কুঁচকে বলল,—'কি, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয় দেখছ? রাত দুপুরে কেউ যদি সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়, তাও বোধহয় ওর ঘুম ভাঙবে না।'

নিশীথ তাড়াতাড়ি বলল,—চুপ, চুপ। অত কথা বলো না। হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের দেখলে ও ভাববে কি?'

দিন কয়েক পরে লতিকা ফের বলল,—'জানো, পারুল আবার এক পাগলামি শুরু করেছে।'

—'পাগলামি?' স্ত্রীর কথা শুনে নিশীথ ফিরে তাকাল। 'কি ব্যাপার?'

'—একে পাগলামি ছাড়া আর কি বলতে পারি? পারুল সব কিছুতেই আমার সমান হতে চায়।'

অভিনব অভিযোগ। নিশীথ তাই কৌতূহলী হল। স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'ব্যাপারটা খুলে বলো, নইলে কেমন করে বুঝবো?'

—'অত খুলে-টুলে এসব ব্যাপার বলা যায় না। খানিকটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।' ভাববার জন্য একটু সময় নিল লতিকা, ফের বলল,—'খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, সব ব্যাপারেই পারুল আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়।'

—'কি রকম?' নিশীথ জানতে চাইল।

—'এই ধরো, রাত্তিরে যদি আমার জন্য দু-টুকরো মাছ রাখি, তাহলে পারুলেরও দু-টুকরো মাছ চাই। সকালে যদি আমি একটা সেদ্ধ ডিম খাই, তাহলে পারুলও তাই খেতে চাইবে। বিকেলে আমি দুটো কলা খাই, পরশুদিন দেখি পারুলও কলা নিয়ে খাচ্ছে। কিছু বললেই মুখ অমনি আষাঢ়ের আকাশ। বলবে 'কেন দিদি? আমার কি এসব খেতে ইচ্ছে করে না?'

—'ভারী মজার ব্যাপার।' নিশীথ হাসতে লাগল।

—'শুধু কি এই?' লতিকা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'পরশুদিন দুপুরে এক ফিরিওলা এসেছিল। তার কাছ থেকে আমি একটা জামা কিনলাম। লনের ব্লাউজ,—সাড়ে তিন টাকা দাম নিল। সুন্দর গোলাপী রঙটা। আমার খুব পছন্দ। কাল বিকেলে সেই জামাটা পরলাম। ওমা! সন্ধ্যেবেলায় দেখি, পারুলও ঠিক তেমনি গোলাপী রঙের একটা জামা পরে এ-ঘর, ও-ঘর করছে। আমি শুধোলাম, 'এ জামা কোথা থেকে কিনলে পারুল?' ও হেসে বলল—'দোকান থেকে কিনলাম দিদি। রঙটা খুব পছন্দ হল।' একটু থেমে লতিকা আবার বলল,—'এখন আমার কি জ্বালা বল দিকি। আমি যে জামা গায়ে দেব, যে রঙের কাপড় পরব ও সেই জামা, সেই রঙের কাপড় পরে তোমার সামনে ঘুরবে, বেড়াবে?'

নিশীথ হেসে বলল,—'পারুল দেখছি একবারে ছেলেমানুষ। নইলে এমনি পাগলামি করে—'

—'ছেলেমানুষি নয়, এ হল ওর শয়তানী। দাঁড়াও না, পারুলের পাগলামি আমি বের করছি।' লতিকা দাঁতে দাঁত চিপে কথা বলল। 'নার্সিং হোম থেকে একবার ফিরে আসি। তারপর ওকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। অমন সোমত্ত মেয়েছেলেতে আমার দরকার নেই। আমি একজন বয়স্ক, কাজ-জানা লোক রাখব। তাতে যদি দু-পাঁচ টাকা বেশী দিতে হয়, তাও সইবে।'

সোমবার শেষ রাত্তিরে লতিকার হঠাৎ শরীর খারাপ হল। সমস্ত শরীরে একটা অস্বোয়াস্তি। যন্ত্রণা, ব্যথা। ভোর হতে আর একটু বাকি ছিল। কিন্তু নিশীথ অপেক্ষা করল না, আবছা অন্ধকারের মধ্যেই মোড় থেকে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরল।

গাড়িতে উঠে লতিকা বলল,—'আজই কিন্তু দমদম থেকে পিসীমাকে নিয়ে আসবে। আমাকে ভর্তি করে দিয়ে তুমি চলে যেও, কেমন?' একটু থেমে সে ফের শুধোল,—'পিসীমা তোমার সঙ্গে আসবেন তো?'

—'নিশ্চয় আসবেন।' নিশীথ স্ত্রীকে আশ্বাস দিল। 'সেইরকমই তো বলা আছে। তুমি যে কটা দিন নার্সিং হোমে থাকবে, অন্তত সে কটা দিন পিসীমা এসে বাড়ি-ঘর সামলাবেন।'

—'হ্যাঁ, তাই করো বাপু। ওই শয়তানীকে আমার একটুও বিশ্বাস নেই। ও সব করতে পারে।'

স্ত্রীর চোখের উপর চোখ বুলোল নিশীথ। হেসে বলল,—'ওকে না হোক, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তো?'

—'বিশ্বাস করি বৈকি।' লতিকা চোখ নামিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা জানো তো? মুনিদেরও মতিভ্রম হয়।'

নার্সিং হোম থেকে যখন বেরোল নিশীথ, তখন বেলা প্রায় নটা। ব্যথাটা এখন কম। ডাক্তার বলেছেন ফলস্ পেইন হতে পারে। পেশেণ্টকে অবজার্ভেশনে রাখা দরকার।

একটা ট্রাম ধরে সে ডালহৌসীতে এসে নামল। তার পিসতুতো ভাই অশোক কাছেই টার্নবুল কোম্পানীতে কাজ করে। নিশীথ ভাবল খবরটা অশোককে দিয়ে যাবে। কাছাকাছি বাড়িতে নিশ্চয় টেলিফোন আছে। তাদের মারফৎ সে মাকে খবর দিয়ে রাখবে। বিকেলে নিশীথদা তাকে আনতে যাচ্ছে।

সব শুনে অশোক বলল,—'কিন্তু মা তো আজ বাড়িতে নেই নিশীথদা। কেষ্টনগরে তুলসীমাসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে। ফিরতে রাত্তির হবে।'

—'তাই নাকি?' নিশীথ ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করল।

অশোক বলল,—'তোমাকে আর যেতে হবে না, কাল সকালে মাকে আমি নিয়ে বেরোব। তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব—'

'আচ্ছা তাই।' নিশীথ অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়াল।

বাড়ি ঢুকতেই পারুল শুধোল,—'নিশীথদা, দিদি কেমন আছেন?'

—'ভালোই।' কলকোসে পাখাটা ঘুরিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসল নিশীথ। বলল,—'তুমি এক কাপ চা করে আনো দেখি।'

—'না। এতবেলায় আর চা খেতে হবে না।' হুকুম শাসনের ভঙ্গীতে তাকাল পারুল। বলল,—'আপনি বসুন। আমি এক গ্লাস লেবুর শরবৎ করে আনছি।'

—'থাক। লেবুর শরবৎ আমার চাই না।' নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

—'বাব্বা! কি রাগ আপনার। বসুন, বসুন। আমি এখুনি চা করে আনছি।' পারুল মিষ্টি হাসল।

এই মুহূর্তে ওর 'গিন্নিপনা' ভালো লাগছিল নিশীথের। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এতক্ষণ উনুনের আঁচে কাজ করছিল বলে মুখখানা ঈষৎ লাল। পারুলের গায়ের রঙ ফরসা নয়, বরং একটু চাপা। কিন্তু সুন্দর গড়ন, চমৎকার মুখশ্রী।

টেবিলে চায়ের কাপ রেখে পারুল শুধোল,—'দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীমাকে আনতে যাবেন তো নিশীথদা?'

—'না, আজ আর যেতে হবে না।' নিশীথ চায়ের কাপে চুমুক দিল। বলল,—'কাল সকালে পিসীমা নিজে আসবেন। আমার পিসতুতো ভাই অশোক এসে রেখে যাবে।'

চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতায় ডুব দিল নিশীথ। আজ সকালে কাগজটা দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে পারুলকে দেখছিল। পারুল ছুটোছুটি করে কাজ করছে। উনুনে কি একটা বসাল, তাতে জল ঢালল। ফের নামাল। তাকের উপর থেকে ছোট একটা কৌটো বের করে গরমমশলা অথবা অন্য কিছু ঢেলে নিল। তারপর প্রায় ছুটে ও-ঘর থেকে একটা এনামেলের বাটি নিয়ে এল। অন্যদিন অফিস থাকে, বাড়িতে লতিকা থাকে। পারুলের এই কাজকর্ম, ছুটোছুটি, ব্যস্ত ভঙ্গী নিশীথের তেমন চোখে পড়ে না। আজ সে বারবার তাই ওকে দেখছিল।

রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে পারুল ফের ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল,—'নিশীথদা, জামা-কাপড় পরে বসে রইলেন যে? আপনার গেঞ্জিটা, রুমালটা ফেলে দিন। ওগুলো কাচতে হবে না?'

দুপুরবেলায় খুব ঘুমোল নিশীথ। অত ভোরে কস্মিনকালে ওঠেনি। তাই বিছানায় পড়তেই গাঢ় নিদ্রা। কখন সে ঘুমোল তাও খেয়াল নেই।

চোখ খুলেই সে পারুলকে দেখতে পেল। লতিকার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পারুল চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে। ঘুম ভেঙে উঠে মনটা বিগড়ে গেল তার। সত্যি পারুল একটু বাড়াবাড়ি করছে। এর আগে কোনোদিন পারুল এ ঘরে বসে চুল বেঁধেছে বলে তার মনে হল না। অথচ আজ। তার শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসে পারুল চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে, প্রসাধন

CENTRAL LIBRARY

সাজছে। লতিকা বলেছিল বটে। পারুল তার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। তার সমান হতে চায়। তবে কি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গৃহিণীর অধিকারটুকু সে পুরোপুরি দখল করবে?

—ঘুম ভাঙল নিশীথদা?' পারুল তাকাল। ফের বলল,

—উঃ! কি ঘুম বাবা আপনার। আমি দু-তিনবার ডেকেছি। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই।' সে ঠোঁট টিপে হাসল।

নিশীথ কোনো উত্তর দিল না। আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল। তারপর বিছানা থেকে নামল।

পারুল ফের বলল—যান, হাত-মুখে জল দিয়ে আসুন। আমি এখুনি আপনার চা করে আনছি।'

মিনিট পাঁচ-সাত পরে চায়ের কাপ নিয়ে সে ফের ঢুকল। শুধোল,—'এখন কিছু খাবেন নিশীথদা?'

—'পাগল! দুপুরে কম খেয়েছি নাকি? আমি এখন আর কিছু খেতে পারব না।'

চা-পান শেষ করে নিশীথ বেরোবার জন্য তৈরি হল। পারুল সামনে এসে বলল,—তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু নিশীথদা?'

—'কেন? কোনো দরকার আছে নাকি?' সে জানতে চাইল।

পারুল হাসল। ভুরু নাচিয়ে বেশ সুন্দর মুখভঙ্গি করে বলল,—'আজ সারা দুপুর ধরে আমি আপনার জন্যে চপ তৈরি করেছি। সন্ধ্যেবেলায় গরম গরম ভেজে দেব। খাবেন কিন্তু নিশীথদা—'

—'কেন মিছিমিছি এসব হাঙ্গামা করতে গেলে? রাত্রে আমি কখন ফিরব, তার কি ঠিক আছে?' নিশীথ একটু রূঢ়ভাবে বলল।

রাত দশটা নাগাদ ফিরল নিশীথ। নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে আড্ডা, গল্প-গুজব। বাড়ি ফেরার কথা যখন খেয়াল হল, তখন দশটা বাজতে আর দেরি নেই।

ঘরে পা দিতেই দমকা হাওয়ার মত এক নিঃশ্বাসে বলল পারুল,—উঃ। এতক্ষণে ফিরলেন নিশীথদা। আমি সন্ধ্যে থেকে ভেবে ভেবে মরি।—'

—কি এত ভাবছিলে?' নিশীথ সকৌতুকে শুধোল।

—'বারে! ভাবনা বুঝি হতে নেই?' পারুল মুখ বিরক্ত একটু ঘুরে সরে গেল। ফের বলল,—'এত রাত্তির অব্দি একা বাড়িতে থাকতে ভয় করে না আমার?'

মেয়েলি অভিমান। নিশীথ মনে মনে হাসল। দেরি করে বাড়ি ফিরলে লতিকাও এমনি সব কথা বলে। এমনি মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়, মুচকি হাসে। আশ্চর্য! পারুল কেন লতিকার মত কথা বলছে? সে চপ খেতে ভালবাসে বলে ছুটির দিনে সারা দুপুর পরিশ্রম করে লতিকা চপ বানায়। তার অনুপস্থিতিতে পারুল কি তবে লতিকা হতে চাইছে?

হঠাৎ ওর শাড়ির দিকে নজর পড়তে নিশীথ অবাক হল। এ কার কাপড় পরেছে পারুল? নিশীথের মনে খটকা লাগছিল। নিশ্চয় শাড়িটা লতিকার। এত দামী কাপড় পারুল কোথায় পাবে? কেমন করে কিনবে? তাছাড়া লতিকার অঙ্গে এই শাড়িখানা দেখেছে নিশীথ। ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন এলেও সে নিজেকে সংযত করল। কি হবে শুধিয়ে? মিছিমিছি কেলেঙ্কারী। কিন্তু লতিকার শাড়ি-জামা কেন পরেছে পারুল? আর কতখানি সে অগ্রসর হবে? আর কতদূর?

নিশীথ তাকিয়ে দেখল পারুলের মুখে চাপা হাসি। চোখের তারায় কৌতুক, —রহস্যের ইঙ্গিত। সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে পারুল খুব মজা পাচ্ছে। নিশীথের গম্ভীর মুখ, কোঁচকানো ভুরু, কপালে চিন্তার রেখা দেখে সে মনে মনে হাসছে।

তবু অবাক হতে আরো বাকি ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে ঢুকে ঠিক ভূত দেখার মত চমকে উঠল নিশীথ। ইদানীং লতিকার শরীরে কুলোয় না বলে পারুলই বিছানা করে। মশারি টাঙিয়ে দেয়। কিন্তু আজ একি শয্যা? পাশাপাশি দুটো বালিশ। একটা তার,—অন্যটি লতিকার। কিন্তু লতিকা তো নার্সিং হোমে। সে কথা পারুল জানে। তবে?

সমস্ত শরীর কাঁপছিল নিশীথের। আকণ্ঠ ভয়ের হিম। একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড বেয়ে নীচে নামছে, ফের উঠছে। নিশ্চয় ভুল হয়েছে পারুলের। বিছানা করবার সময় তার খেয়াল হয়নি। প্রতিদিনের মত আজও করেছে। ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক। তবু মনকে ঠিক বোঝাতে পারল না নিশীথ। সমস্ত দিনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি বারবার তার মনে পড়ছিল। দুপুরে সে ঘুমোচ্ছিল, তখন পারুল তাকে ডেকেছে। সে ঘরে আছে জেনেও পারুল আয়নার সামনে বসে অনায়াসে চুল বাঁধল। প্রসাধন করল। সন্ধ্যে-বেলায় লতিকার শাড়ি-জামা পরে সে নিশীথের প্রতীক্ষায় বসেছিল। পারুলের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি, কৌতুক মেশানো দৃষ্টি, বিছানায় পাশাপাশি দুটি বালিশ।

লতিকার ভূমিকায় পারুলের আর একটি দৃশ্যই তো বাকি।

ঠিক সেই মুহূর্তে পারুল এসে ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর জলের গ্লাস রেখে একটা পোস্টকার্ড চাপা দিল। বলল,—'ওমা! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে নিশীথদা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হল না—'

নিশীথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখল, তার আড়ষ্ট, বিব্রত ভাব দেখে পারুল মুখ টিপে হাসছে।

মাথা তুলে একবার সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকাল পারুল। বলল, —'ইস্! তাই এত গরম লাগছে। পাখাটা জোর করে দিই নিশীথদা? নইলে ঘুমোবেন কি করে?'

ফুলস্ফোর্স পাখাটা চালিয়ে দিয়ে পারুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুইচ অফ করে আলো নিভিয়ে দিল নিশীথ। থমথমে অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার একটুকরো আলো এসে বিছানায় পড়ছে। নিশীথ ভাবছিল সে কি করবে? সিগারেট কেনার অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে এখন? তারপর রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা দমদম। এত রাত্তিরে পিসীমা তাকে দেখে কি ভাববেন? আর পারুল? কাল সকালে একটা ভীরু, পুরুষের দিকে সে কোন দৃষ্টিতে তাকাবে?

ধীরে ধীরে তার দেহটা উত্তপ্ত, হিংস্র হয়ে উঠছিল। অন্তরের নিভৃতে কোথায় যেন একটা জানোয়ার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় জন্তুটাকে সে সযত্নে রেখেছিল। অন্ধকারে এখন সেটা ফুঁসছে, গজরাচ্ছে।

বিছানায় উসখুস করছিল নিশীথ। পারুল কোথায়? এত দেরি করছে কেন সে? টুকটাক কাজকর্ম সারতে আর কতক্ষণ লাগে? একটু আগে পাশের ঘরে একবার আলো জ্বলে উঠেছিল। ফের সেটা নিভে গেল। তবে কি পারুল লজ্জা পাচ্ছে? শেষ দৃশ্যে লতিকার ভূমিকায় অংশ নিতে সংকোচ হচ্ছে?

মশারি তুলে নিশীথ নীচে নামল। মাঝখানের দরজাটা শুধু ভেজানো। অন্য-দিনের মত ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করেনি। তবে কি পারুলের ভুল হল? দরজা বন্ধ ভেবে সে নিজের বিছানাতেই শুয়ে পড়েছে?

কপাটের গায়ে চাপ দিল সে। প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর জোরে। ছিটকিনি তোলা নেই। একটু ঠেলা দিলেই তো দরজা খুলবার কথা। তবে,—?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও নিশীথ একবার বিছানার উপর চোখ বুলোল। আশ্চর্য! পাশাপাশি বালিশ দুটো কি শুধু পরিহাস? দুপুরের খাটাখাটুনি, বিকেলের প্রসাধন, সন্ধ্যায় সাজসজ্জা সবই কি অর্থহীন?

ধীরে ধীরে কপাটের গা থেকে সে হাত নামিয়ে নিল। দরজাটা বন্ধ। কোনোদিন যা করেনি, আজ তাই করেছে। এতদিনে লতিকার কথা রেখেছে পারুল।

ঘুমোবার আগে দরজায় সে খিল তুলে দিয়েছে।

ডাক্তারের চোখে

জাতীয় সম্পদের মূলে রয়েছে শ্রমিক-স্বাস্থ্য : বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়

দিন কয়েক আগে কথা হচ্ছিল ডঃ বি, বি. চ্যাটার্জির সঙ্গে। ডঃ চ্যাটার্জি সেন্ট্রাল অ্যাভিনুর ওপর ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টো-দিকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। পুরোনাম বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়।

বারিদবাবু নিজে ডাক্তার, বাবাও ছিলেন ডাক্তার। আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে মেডিক্যাল অফিসার বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোটা জীবনটাই চাকুরীর সুবাদে পূর্ব-বাংলা আর আসামে কাটিয়েছেন। দেশ যদিও হাওড়া জেলায় বেলুড়ে। বাবা মার সঙ্গে সঙ্গে বারিদবরণ ছোট একটি ভাই ও দিদির সাথে ছেলেবেলায় বহু জায়গায় ঘুরেছেন। শেষ পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন, তখন বয়স মোটে চোদ্দ। দু বছর বাদে স্কটিশ কলেজ থেকেই আই. এস, সি পাশ করে প্রেসি-ডেন্সীতে ভর্তি হলেন কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে। ফর্টি ফোরএ (কলকাতায় বোমা পড়ার জন্য তেতাল্লিশ সালে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি) বি. এস, সি. পাশ করে দুম করে লাইন পাল্টে চলে এলেন ডাক্তারীতে। ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। উনপঞ্চাশে এম. বি. ডিগ্রী পেলেন। পরের বছরই বিয়ে থা করে চাকুরী জুটিয়ে সংসার ফেঁদে বসলেন। ইচ্ছে ছিল সার্জেন হবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব বদলে গিয়ে আজ শিক্ষকতা করছেন—কি বিষয়ে? না, শিল্প স্বাস্থ্য ও শ্রম-স্বাস্থ্য বিষয়ে।

নাম শুনেই চমক লাগে। তবে কি একজন শ্রমিকের স্বাস্থ্য আপনার আমার মত মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মানুষের চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র যে আলাদা পড়াশোনা বা গবেষণার প্রয়োজন হচ্ছে? না, একজন শ্রমিক ও চাকুরীজীবী একই ধাতুতে গড়া—জ্বর-জ্বারি থেকে যক্ষ্মা, ট্রিটমেন্ট দুজনেরই এক। তবে পার্থক্য কোথায়?

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে অধ্যাপক চ্যাটার্জি উল্টে আমায় একটা প্রশ্ন করে বসলেন—এটা মানেন তো যে নোট ছাপিয়ে দেশের আর্থিক অবস্থা পাল্টানো যায় না, তার জন্য চাই বেশী উৎপাদন?

—এটা মানতেই হবে। আর যদি মানতেই হয় তো খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেশী দূরে নয়, সারা দেশ চুঁড়তে হবে না, এই শহরেরই ভেতরে ও আনাচে কানাচে যে শত শত ফ্যাকটরী আছে সেখানে উৎপাদনের যারা প্রধান স্রষ্টা সেই শ্রমিকরা কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন? না, না, আপনাকে খোঁজ নিতে হবে না। আমরাই খোঁজ নিয়েছি। পাবলিক হেলথ ইনস্টি-টিউটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন শাখাটির বয়স আজ প্রায় একুশ। আর গোড়া থেকেই আমি রয়েছি এখানে। সেই সুবাদে খোঁজ-টোজ নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হল আর্থিক অনটন ছাড়াও দু ধরনের ঝামেলা শ্রমিকদের পোয়াতে হয়—(১) যে পেশায় তাঁরা নিযুক্ত থাকেন সেই পেশাগত রোগের শিকার তাঁদের সহজেই হতে হয় (২) পারি-পার্শ্বিক অবস্থার দৈন্য তাঁদের নিত্যনতুন রোগের শিকার করে তোলে। কয়েকটা উদাহরণ দিই তাহলেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

—ধরুন একটা কয়লা খনি। হাজার দেড়হাজার ফুট গভীরে কাজ চলছে। প্রচণ্ড গরম, হাওয়া কম তার ওপর স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া। নাগাড়ে এ ধরনের পরিবেশে যে মানুষ দীর্ঘদিন কাজ করবে তার চোখের, বুকের অসুখ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। প্রায়ই দেখা যায় কয়লা খনির শ্রমিকরা হাঁপানীতে ভুগছেন। একজন হাঁপানীর রোগী, নেহাৎ পেটের দায়ে কাজ করে, কতটুকু কাজ দিতে পারে? এভাবে হাজার হাজার শ্রমিক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার ফল কি হবে? টোটাল প্রোডাকসন যাবে কমে।

—অথবা একটা স্টীল ফ্যাকটরী। [illegible] ওভেন বা ব্লাস্ট ফার্নেসের নিত্যসঙ্গী কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। গলা টিপে মানুষ মারলে, কোর্টে তার বিচার হয় কিন্তু এই গ্যাস একটু একটু [illegible] সঙ্গে মিশে যখন শ্রমিকের [illegible]

কালে হয়, তখন? কোন কোর্টে তার বিচার হবে?

—যে কোন ইন্জিনিয়ারিং শিল্পই ধরুন না কেন দেখবেন সেখানে যন্ত্রপাতির কাজের জন্য এক ধরনের কাটিং অয়েল ব্যবহার করা হয়। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, যে শ্রমিক দিনের পর দিন ঐ জাতীয় কাটিং অয়েল ব্যবহার করছে, তার বা তাদের মধ্যে চর্মরোগ বেশী হয়।

—বা ধরুন কোন জুট মিল। উইভিং সেকশনে যাবেন, দেখবেন যন্ত্রের কি প্রচণ্ড আওয়াজ। ঐ আওয়াজ বহু শ্রমিকের বধিরতার কারণ।

—বা কোন প্রিন্টিং প্রেস বা টাইপ ফাউণ্ড্রী। অথবা যে কোন রসায়ন শিল্প। লেড-পয়জনিং কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ওটা হয় দিনরাত সীসা নিয়ে কাজ করার ফলে। আস্তে আস্তে পেটের গোলমাল, অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

—এরকম হাজারটা এগজাম্পল দিতে পারি, যেখানে শ্রমিকের স্বাস্থ্য তার পেশার জন্যই তিল তিল করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে কি এ সমস্ত ইনডাস্ট্রি আজ বন্ধ করে দিতে হবে? ন্যাশনাল নট—তাহলে তো গোটা দেশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু দরকার একটুখানি প্রিকশন, দরকার প্রতিকারের ব্যবস্থা গোড়া থেকেই নেওয়া।

—কিভাবে? তাহলে আমাদের এই বিভাগের কাজকর্মের ডিটেলসটা আপনাকে দিই—সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে তিন রকমের কাজ হয়—(১) পঠন-পাঠন, (২) গবেষণা, (৩) সার্ভিস।

পঠন-পাঠন বলতে তো বুঝতেই পারছেন যে, এখানে পড়ানো হয়। আমাদের এই ইনডাস্ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগে পাঁচজন শিক্ষক আছেন। আমরা পড়াই তাঁদের, যাঁদের মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হল এম. বি. বি. এস. ডিগ্রী। সারা ভারত থেকেই ছাত্র আসেন পড়তে, এমন কি দেশের বাইরে থেকেও আসেন। তার কারণ শুধু ভারতবর্ষ নয় গোটা সাউথ-ইস্ট এশিয়া ও মিডল ইস্ট মিলিয়ে এধরনের পড়াশোনার কেন্দ্র এখনো আর কোথাও নেই।

দ্বিতীয় কাজ আমাদের গবেষণা। গবেষণার কথা বলার আগে বরং সার্ভিসের কথাটা একটু বলে নিই। আমাদের এই বিভাগেই একটা মোবাইল মাস চেস্ট এক্স-রে ইউনিট আছে। দেশ আমাদের অনুন্নত। এই অনুন্নত দেশে শ্রমিকেরা যা মাইনে পান তাতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ন্যূনতম সংস্থানও হয় কি না সন্দেহ। ফলে যক্ষ্মারোগ তো ঘরে ঘরে লেগেই আছে। তাই যখনই কোন ফ্যাক্টরী থেকে ডাক আসে আমাদের এক্স-রে মোবাইল ইউনিট তখনি সেখানে হাজির হয়। আমরা চেস্ট-এর ফোটো তুলে জানিয়ে দি কারো যক্ষ্মা হয়েছে কি না? এর জন্য এক পয়সাও কাউকে দিতে হয় না। সমস্ত খরচ বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এভাবে গত বিশ বছরে প্রায় সোয়া লাখ ছবি আমরা তুলেছি। তাছাড়া মাঝে মাঝে স্যাম্পল সার্ভে করি। এক একটা শিল্প বেছে নিয়ে সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ কতখানি সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। এ ধরনের সার্ভে আজ পর্যন্ত আমরা যে সব ইনডাস্ট্রিতে করেছি তাহল—জুট, টেক্সটাইল, ম্যাচবক্স, ফাউন্ড্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্যানারী, পেট্রো-লিয়াম, পেপার-পাল্প, কেমিক্যাল ইত্যাদি। এই ধরনের সার্ভের কাজেও খুব কম করে হাজার পঞ্চাশেক ছবি তুলেছি আমরা।

এতো গেল শুধু যক্ষ্মার ব্যাপার। নানা ধরনের বিচিত্র সব প্রবলেম আসে আমাদের কাছে। এই তো কিছুদিন আগে শিবপুরের একটা ভারত বিখ্যাত ফ্যাক্টরীর মেডিক্যাল অফিসার ছুটে এলেন আমাদের কাছে। কি ব্যাপার? না ফ্যাক্টরীর হুইল-প্রেস প্ল্যান্টে সত্তর পঁচাত্তর জন লোক কাজ করে। তাদের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ লোকই ভুগছে চর্মরোগে। কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার যোগাড়। আমরা গেলাম। পর পর কয়েকদিন ধরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে যা দেখলাম তাহল ঐ প্ল্যান্টে শ্রমিকদের এক ধরনের কাটিং অয়েল ব্যবহার করতে হয়। তেলটা ভাল নয়। দ্বিতীয়ত হুইল-প্রেস প্ল্যান্টের পাশেই রয়েছে একটা ডি-গ্রিজিং প্ল্যান্ট। ইস্পাত প্লেটের গা থেকে যখন গ্রিজ ছাড়ানো হয় তখন বাতাসে ভেসে আসা সূক্ষ্ম তেলের কণা শ্রমিকদের হাতে পায়ে গায়ে লাগে। আমরা তখন সাজেস্ট করলাম—(১) এখুনি ঐ কাটিং অয়েল যা ব্যবহার করছ ওটা পালটাও; (২) শ্রমিকদের হাতে দস্তানা পরানোর ব্যবস্থা কর; (৩) হুইল প্রেস প্ল্যান্ট আর ডি-গ্রিজিং প্ল্যান্টের মাঝে উঁচু পাঁচিল তুলে দাও যাতে আর গ্রিজের সূক্ষ্ম কণাটনা বাতাসে ভর করে এদিকে না আসতে পারে।

সেই হুইল প্রেস প্ল্যান্ট এখন স্বচ্ছন্দে চলছে—চর্মরোগের উৎপাত নেই বললেই চলে। অসুস্থতার জন্য শ্রমিকদের গরহাজিরাও হয়েছে বন্ধ। বেড়েছে উৎপাদন।

এ জাতীয় সার্ভিস প্রায়ই দিতে হয়। আমরা দিইও।

এবার আসুন গবেষণার কথায়। আমাদের এই ইনডাস্ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ জন গ্রান্ট-এর দান অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন এখানকার ডিরেক্টর। ভদ্রলোক আমেরিকান। ও'র উদ্যোগেই এই বিভাগটির পত্তন ঘটে। কারণ আর কিছুই নয়—সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইস্তক বৃটিশ প্রভুরা এদেশে কোনরকম ইনডাস্ট্রিয়াল এক্সপানশন ভাল চোখে দেখে নি। কিন্তু যুদ্ধের ঠেলায় ওরাও ওদের নীতি পাল্টাল। পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে জার্মান সাবমেরিনের থাবা পেরিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য সাপ্লাই করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই নিরুপায় হয়েই ওরা শিল্প নীতির বন্ধ দরজা একটু ফাঁক করে দিল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র নানা ধরনের কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল। ডকটর গ্রান্ট সব ওয়াচ করছিলেন। ও'র মনে হোল যেভাবে এলোপাতাড়িভাবে ইনডাস-ট্রিয়াল এক্সপানশান হচ্ছে তার ফলে শীগগিরই শ্রমিক-স্বাস্থ্যের একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হওয়া দরকার। তখন ও'রই উৎসাহে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ আমাদের এই ইনস্টিটিউটে 'ইন-ডাস্ট্রিয়াল হেলথ রিসার্চ' নামে একটা ছোট ইউনিট খুললেন এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার জন্য। এসব ফর্টি সিক্স-সেভেনের কথা।

বছর-চারেকের মধ্যেই সরকার দপ্তরের গুরুত্ব বুঝে পুরোপুরি একটা বিভাগ খোলবার অনুমতি দেন। এবং সেই শুরু থেকে গত বছর পর্যন্ত যিনি এই বিভাগের

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

শুরু করেছিলেন, সেই ডঃ এম এন রাও তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এই গবেষণাগারটিকে। কি সব প্রচণ্ড পায়োনিয়ারিং কাজ এখানে হয়েছে তা বাইরের লোক অনুমানও করতে পারবেন না। আমেরিকায় এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্স বা ইকোলজি আজ অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। যন্ত্র-সভ্যতার কুফল কিভাবে মানুষের জল, বাতাস, মাটি পরিবেশকে বিষিয়ে দিচ্ছে, তাই নিয়ে সেখানে গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই। ডঃ রাও সেই গবেষণা এখানে শুরু করেছিলেন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালে। কলকারখানার দূষিত জল কিভাবে হুগলী নদীকে বিষাক্ত করে তুলছে এই নিয়ে তখনি তিনি কাজ শুরু করে দেন।

হাজার হাজার বাস, ট্যাক্সি, লরী, টেম্পো, শত শত কলকারখানা দিনরাত দূষিত বাষ্প আমাদের প্রাণধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বাতাসকে দিচ্ছে বিষিয়ে। এই ব্যাপারে আজ থেকে দশ বছর আগে আমাদের গবেষণাগারে রিসার্চ শুরু হয়েছিল। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কুফল সম্পর্কেও সারা ভারতে প্রথম কাজ শুরু করি আমরাই।

এসব পায়োনিয়ারিং ওয়ার্ক ছাড়াও আরো নানা ধরনের ইনটারেস্টিং কাজ হয়েছে এখানে। একটা উদাহরণ দি, শুনুন। কাজ বুঝে তো লোক নেওয়া উচিত। সেই ব্যাপারটাই এদেশে হয় না। কারণ আমাদের বেশির ভাগ শিল্পপতিরাই এসব ব্যাপারে তেমন খোঁজ রাখেন না। একটা লোককে চাকরী দেওয়ার সময় কোথাও কোথাও মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা দেখা যায়, লোকটির স্বাস্থ্য কেমন আছে, সেটুকু জানার জন্য। পরীক্ষায় হয়তো দেখা গেল যে, লোকটির স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তাকে ব্লাস্ট ফার্নেসের কাজে নিয়োগও করা হোল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যে পরিমাণ কাজ ঐ লোকটির কাছে আশা করা যায়, তার সিকিভাগও সে দিতে পারছে না। কেন?

কারণ গলদ গোড়াতেই। নেওয়ার আগে যদি ওর দেহের ঘাম পরীক্ষা করে দেখা হোত, তাহলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ত। কি রকম? আমাদেরই সহকর্মী ডঃ রমানাথন গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে তিন ধরনের লোক আছে পৃথিবীতে—এক, যাদের ঘামের সংগে খুব নুন বেরোয়; দুই, যাদের ঘামে জলের ভাগটাই খুব বেশী; তিন, যাদের ঘামে নুন আর জলের ভাগ সমান থাকে। এখন প্রথম শ্রেণীর লোকের প্রচণ্ড গরমে যত ঘাম ঝরবে, ততই মাংসপেশীতে টান ধরবে, ফলে তার কাজের ক্ষমতা যাবে কমে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক প্রচণ্ড গরমে অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে ডিহাইড্রেশনের জন্য। ফলে যেসব কারখানায় টেম্পারেচার স্বাভাবিক কারণেই খুব বেশী হবে, সেখানে যদি ঐ তৃতীয় শ্রেণীর লোক নেওয়া হয়, তাহলে কাজের ব্যাপারে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।

এছাড়া আরো অনেক গবেষণার কাজ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেই বা তাকে কাজে লাগায়, কেই বা শোনে আমাদের কথা?

—কেন ডঃ চ্যাটার্জি? কেন একথা বলছেন? জিজ্ঞাসা করি আমি।

শক্ত ঋজু কাঠামোর মানুষটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। চশমার কাচের আড়ালেও ওঁর কালো গভীর দুটি চোখের দুঃখকে ঢেকে রাখতে পারলেন না। এক নাগাড়ে ঘন্টাখানেক ধরে আমার নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। পাঁচতলা ইনস্টিটিউট ভবনের চারতলায় ওঁর ঘর। এই ঘরে পার্টিশন ওয়ালের ধারে দেয়াল জুড়ে বই-এর আলমারী, টেবিলে ছড়ানো শুধু বই আর বই, পাশে জানালার ধারে হাই-ভোল্টেজ নানা যন্ত্রপাতি। সবকিছুর মাঝখানে বসে একটি মানুষ যেন ক্লান্তির ভার অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হোল আর ওঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরের আর্তিকে চেপে রাখা।

আমাদের কাজ যথা সম্মান পাচ্ছে না। অর্থের অভাবে আজ এক বছর ধরে ন্যাশনাল [illegible] এক্স-রে ইউনিটটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। টাকার অভাবে গবেষণা প্রায় মাথায় উঠতে বসেছে। কাগজে, কাগজে পড়ি ভারতের অন্যান্য প্রান্তে সি এস আই আরের নানা ইউনিটে কত কাজ হচ্ছে—যেসব কাজ একদিন আমরাই হয়তো শুরু করেছিলাম। আজ চালাতে পারছি না—কারণ, টাকা পাই না, লোক নেই।

কি আর বলব। তাই ম্লান হেসে জবাব দিলাম—ডঃ চ্যাটার্জি, এদেশে এখনো সেই পরিবেশ হয়তো আসেনি—তাই আপনাদের কাজের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছেন না। অপেক্ষা করুন, দিন আসছে। যেদিন আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন শিল্প এক পাও এগুবে না।

—শামানন্দ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটেনে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঃ নার্ভিকে আক্রমণের বিতর্ক

১৯৪০ সালের বসন্তকাল ইউরোপে জীবনের কোন বসন্ত-সৌন্দর্য লইয়া দেখা দিল না, বরং যৌবনের প্রত্যাশা ও আনন্দের মৃত্যু পরোয়ানা লইয়া যেন দেখা দিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধের মহাপ্রলয় আরম্ভ হওয়ার মুখে, আর উত্তর ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে (ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক নরওয়ে) তখন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়াছে এবং নরওয়েতে (বাল্টিক সাগরের মুখ থেকে মেরু সীমানা পর্যন্ত অঞ্চ দৈর্ঘ্য হাজার মাইল) বৃটেনের অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কেবল ব্যর্থ নয়, একটা চরম কেলেঙ্কারিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ ১লা এপ্রিল তারিখেই লণ্ডনে এই খবর পৌঁছিয়াছিল যে, নরওয়েতে হিটলারী আক্রমণ আসন্ন। মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শীরার লিখিয়াছেন যে, সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার এটা বিশ্বাস করেন নাই—যদিও ৩রা এপ্রিল সমর-মন্ত্রিসভায় এটা নিয়া আলোচনা পর্যন্ত হইয়াছিল। আর ৪ঠা এপ্রিল তারিখ রক্ষণশীলদের এক সভায় চেম্বারলেন নির্বিকার চিত্তে ঘোষণা করিলেন যে, এই যুদ্ধের আরম্ভের সময়ের চেয়ে এখন তিনি জয় সম্পর্কে দশগুণ বেশী বিশ্বাসী এবং হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই— Hitler missed the bus.'

এই বিখ্যাত মন্তব্য—'হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই', যুদ্ধের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এবং তখনকার দিনে সারা পৃথিবীতে এই মন্তব্য নিয়া নানা বিদ্রূপাত্মক আলোচনা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু এমন মানসিকতা কেবল চেম্বারলেনের নয়, মন্ত্রীসভায় চার্চিলের পর্যন্ত ভুল ধারণা হইয়াছিল এবং এর আগের কয়েক মাস বৃটেনে সমরোৎপাদন বৃদ্ধি দেখিয়া চার্চিল হর্ষোৎফুল্লভাবে মন্তব্য করিলেন—'যুদ্ধায়োজনের এই অতিরিক্ত মাসগুলি আমাদের কাছে দৈবানুগ্রহের মত। সেই হিটলার ইতিপূর্বেই তাঁর সর্বোত্তম সুযোগ হারাইয়াছেন।'

কিন্তু নরওয়ের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর দেখা গেল হিটলার তো 'বাস ধরিয়াছেন' বটেই, বরং ইঙ্গ-ফরাসীই 'খেয়া পার' হইতে পারেন নাই। তখন বৃটেনে (এবং ফ্রান্সেও) রাজনৈতিক ঝড় বহিতে শুরু করিল এবং খাস রক্ষণশীল দলের মধ্যেই যে ক্ষোভ ধূমায়িত হইতে শুরু করিয়াছিল, তা ক্রমশঃ বহ্নিশিখায় পরিণত হইতে লাগিল। কারণ, তাঁরা অনুভব করিলেন যে, চেম্বারলেনের নেতৃত্ব শান্তির সময়েই যদি এত খারাপ হইয়া থাকিতে পারে, তবে যুদ্ধের সময়ে নিশ্চয়ই বিপর্যয়কর হইবে। যাঁরা মিউনিক চুক্তি ও নীতির বিরোধী ছিলেন, কমন্স ও লর্ডস সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য নিয়া তাঁদের একটা 'পর্যবেক্ষণ কমিটি' ছিল। লর্ড স্যালিসবারির মত প্রবীণ ও সম্মানভাজন রক্ষণশীল নেতা এবং লিওপোল্ড আমেরির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সময় নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তেজনায় ভারী হইয়া উঠিল। এবং ৭ই মে, ১৯৪০ কমন্স সভার অধিবেশনে এই উত্তেজনা সর্বপ্রথম ফাটিয়া পড়িল। রক্ষণশীল দলের যে সমস্ত এম-পি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নরওয়ের উপকূলে ব্যর্থ অবতরণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লিওপোল্ড আমেরি তাঁদের ক্ষুব্ধ মনোভাবের যে-ভাষা দেন, তা স্মরণীয় ঃ

> Their indignation was expressedby Leopold Amery, who demanded the formation of a genuine coalition Government and made the most dramatic denunciation of Chambertain repeating Crotwell's address to the Long Parliament: 'You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go!' (1).

অর্থাৎ ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ভাগুন!— চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে এই নাটকীয় আক্রমণ এবং ক্রমওয়েলের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার প্রতিধ্বনিতে সভাকক্ষ কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু চেম্বারলেন তখনও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন ৮ই মে কমন্সসভার পুনরধিবেশনে যখন চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উঠিল, তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮১ জন সদস্য তাঁকে সমর্থন করিয়াছেন, অথচ সাধারণতঃ ২০০ জনের মেজরিটি তিনি পাইয়া থাকেন। এর অর্থ এই যে, কেবল বিরোধী লেবর ও লিবারেলরাই নয়, তাঁর স্বীয় দলের রক্ষণশীলদের মধ্যেও অন্ততঃ ১০০ জনের বেশী সদস্য তাঁর বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন, কিম্বা তাঁকে সমর্থন জানাইতে বিরত রহিয়াছেন। তখন চেম্বারলেন বুঝিলেন যে, তাঁর পদত্যাগ না করিয়া উপায় নাই। তবু তিনি শ্রমিক দলকে হাতে আনিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদে কে বসিবেন?—চার্চিলকে চেম্বারলেন পছন্দ করিতেন না, কারণ, তোষণ-নীতির তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে যিনি অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন, সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে গদীতে বসাইবার জন্য চেম্বারলেন চেষ্টা করিলেন, যদিও এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া হ্যালিফ্যাক্সের নাকি 'একটা পেট ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল!'

he felt a bad stomachache (2)

তবু চেম্বারলেন পররাষ্ট্রদপ্তরের সহকারী সচিব আর ও বাটলারকে বলিলেন হ্যালিফ্যাক্সকে তাঁর মত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিতে। কিন্তু বাটলার টেলিফোনে জবাব দিলেন—তাঁর কিছুই করিবার নাই, কারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দাঁত দেখাইতে গিয়াছেন ডেন্টিস্টের কাছে!

তখন ১০ই মে, ১৯৪০ (ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছে) সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় দেখা গেল একজন বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া ১০নং ডাউনিং স্ট্রীট থেকে একটা মোটরগাড়ীতে চড়িলেন এবং সোজা বাকিংহাম প্যালেসে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ২০ মিনিট কাটাইলেন এবং তারপরেই ঘোষিত হইল 'দি রাইট অনারেবল' নেভিল চেম্বারলেনের পদত্যাগের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে উইনস্টন চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য ডাক

---

1. British Foreign Policy during world war II V. Trukhanovsky, 1970, P 88.

---

(২) হেনরি পেলিং প্রণীত 'ব্রিটেন এন্ড দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার', পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

ম্যাজেস্টির আমন্ত্রণ। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জও চার্চিলকে সুনজরে দেখিতেন না (অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ব্যাপারে চার্চিলের পক্ষপাতিত্বের জন্য) বরং তিনি লর্ড হ্যালিফাক্সকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এমনকি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের মত রক্ষণশীল বিরোধী লোকও হ্যালিফাক্সের জন্য ওকালতি করিয়াছিলেন।

নরওয়ে বিপর্যয় উপলক্ষে চার্চিলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন তাঁর বিরোধী ছিলেন। ওলিভার স্ট্যানলি, স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি মন্তব্য করিলেন যে, যে-ব্যক্তির জন্য নরওয়ের এই কেলেঙ্কারি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হইল। বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ লীডেল হার্ট লিখিয়াছিলেন : 'ইতিহাসের এটা প্রকান্ড বিদ্রূপ যে, চার্চিল নরওয়ে উপলক্ষে চরম ক্ষমতালাভের সুযোগ পাইলেন, অথচ নরওয়ের বিপর্যয়ের জন্য তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশী।'

কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে যিনি 'ইতিহাসের প্রকান্ড বিদ্রূপরূপে' নিন্দাভাজন হইলেন, সেই চার্চিল মহাযুদ্ধের তীব্রতম সঙ্কট ও ভয়ঙ্কর দুর্দিনে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কেবল অপরাজেয় জাতীয় নেতার আসনেই অভিষিক্ত হইলেন না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলার-বিরোধী নেতৃত্বের অন্যতম মহানায়করূপেও প্রতিভাত হইলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর সাহস, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর দৃঢ়তা এবং বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁর অতুলনীয় বক্তৃতা বৃটেনের মরা গাঙে যেন বান ডাকিয়া আনিল। কোন একক ব্যক্তির নেতৃত্ব কিভাবে একটা জাতিকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করিতে পারে, উইনস্টন চার্চিল তার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।......

৬৫ বছর বয়সে চার্চিল (জন্ম ৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৪) বৃটেনের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন এবং ১১ই মার্চ তাঁর সমর-মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন পাঁচজন সদস্য লইয়া—প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রীর পদে চার্চিল, চেম্বারলেনও অপেক্ষাকৃত একটি সাধারণ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন—লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স, লর্ড প্রীভিসিল সি আর এটলি ও দপ্তরহীন মন্ত্রী আর্থার গ্রীণউড। এছাড়া এ ভি আলেকজাণ্ডার নৌসচিব, এন্টনি ইডেন সমর-সচিব এবং লর্ড বীভারব্রুক বিমান উৎপাদন দপ্তরের নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন (চার্চিল দ্রুত বিমান উৎপাদনের উপর জোর দিয়াছিলেন)। রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদারনীতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়া যুদ্ধকালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। অবশ্য চেম্বারলেন তখনও রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন, এই পদ থেকে তিনি বিদায় নিলেন ৮ই অক্টোবর ১৯৪০, যখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ৯ই নভেম্বর, ১৯৪০, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন চার্চিল রক্ষণশীল দলের পুরোপুরি নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

একথা বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় চার্চিলের অনেক বক্তৃতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সমস্ত বক্তৃতার সুর এখনও যেন অনেক জীবিত ব্যক্তির কানে বাজিতেছে। বৃটেনে প্রধানমন্ত্রীরূপে কমন্সসভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা—১৩ই মে, ১৯৪০, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং এই বক্তৃতাতেই তিনি ঘোষণা করিলেন :

> "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. You ask, what is our policy? I will say: It is to wage war, by sea, land an' air, with all our might and with all the strength that God can give us...... you ask, what is our aim? I can answer in one word: Victory — victory at all costs, victory inspite of all terror, victory, however long and hard the road may be".

চার্চিলের এই বক্তৃতার 'রক্ত, শ্রম, অশ্রু, ও ঘর্মের' প্রতিশ্রুতি সারা পৃথিবীর বহু বক্তার মুখে প্রবাদ-বাক্যের মত বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তবে, চার্চিলের এই উদ্দীপনাময় কথাগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। তাঁরও বহু আগে ঊনবিংশ শতকে ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই রোম নগরীতে এক বক্তৃতায় তাঁর অনুচরদের বলিয়াছিলেন :

> "I offer neither pay, nor quarter, nor provisions; I offer hunger, thirst, forced marches, battles and death"

আর প্রথম মহাযুদ্ধের ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ অধিনায়ক ক্লেমেন্স Clemenceau বলিয়াছিলেন (২০শে নভেম্বর, ১৯১৭) :

> "Finally you ask what are my war aims? Gentlemen, they are very simple : victory."

আর ১৯১৮ সালের ৮ই মার্চ তিনি পুনরায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

> "My formula is the same everywhere Lome pol' y? I wage war. Foreign policy? I wage war. All the •ime I wage war" (3)

লক্ষ্য করিবার এই যে, তিনজন ইতিহাসখ্যাত নায়কের এই তিনটি বক্তৃতাই যুদ্ধের সঙ্কটে একই সুরে এবং একই ভঙ্গীতে প্রদত্ত।......

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনেক আগেই ফরাসী মন্ত্রিসভারও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং ফ্রান্সে রাজনৈতিক সঙ্কট বৃটেনের চেয়েও গভীর ছিল এবং সেই সঙ্কট অনেক দিনের। এজন্য কোন ফরাসী মন্ত্রিসভাই দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। চেম্বারলেনের অনুরূপ দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল এবং [illegible] ১৯৪০ [illegible] নীতি-বিরোধী পক্ষ রেনো দালাদিয়েরের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন।

•

গত কয়েক মাস ধরিয়া লণ্ডনে ও প্যারিসে যখন রাজনৈতিক উঠানামা এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে 'ভেজাল যুদ্ধের' ফাঁকা আওয়াজ চলিতেছিল, তখন কিন্তু বার্লিনে জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা নিষ্কর্মা বসিয়া নাই। হিটলার অবিলম্বেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের কথা ভাবিতেছিলেন এবং পোল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাজসজ্জা, সমাবেশ ও পরিচালনা সম্পর্কে ভুলত্রুটি সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য সামরিক নেতাদের তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু জার্মানবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে এমন একটা গ্রুপ ছিল, যাঁরা হিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বাধাইয়া দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সামরিক শক্তি জার্মানীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জার্মানবাহিনীর আগু বাড়াইয়া আক্রমণ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না। বরং আত্মরক্ষা বা ডিফেন্সিভ পলিসি অনুসরণ করিয়া যাওয়াই ভালো। কিন্তু ১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯ হিটলার শীর্ষ সামরিক নেতাদের এক বৈঠকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎগতি আক্রমণের এক পরিকল্পনার উপর জোর দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এমন গতিশীল যুদ্ধ চালাইতে হইবে যাতে জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়ামের শহর ও জনপদের সারিবদ্ধ বাড়ীঘরগুলির মধ্যে হারাইয়া না যায়।...

হিটলারকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ব্রাউশিৎস এবং সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হালডার তখন কতকগুলি টেকনিক্যাল কারণ দেখাইলেন—যেমন, পোল্যাণ্ড থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্যদল পাঠানো, সৈন্যদের যান্ত্রিক পুনর্সজ্জা এবং আসন্ন শীতকালের অনেক দিন পর্যন্ত রণক্রিয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। আসলে সেনাপতিদের এই ধরনের আপত্তির পিছনে কিছুটা রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব ছিল। হিটলারের বিরোধী যে ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠী ছিল, যেমন সেনানীমণ্ডলীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল বেক, রোমের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হ্যাসেল, গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল অস্টার, অস্ত্রপাতি দপ্তরের জেনারেল টমাস প্রভৃতি সেনানীদের বিশ্বাস ছিল যে, কোনও প্রকারে হিটলারকে অপসারণ করিতে পারিলে বৃটেনের সঙ্গে একটা শান্তিসন্ধি ও আপোষরফা করা সহজতর হইতে পারে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক সমস্যায় চেম্বারলেনের সঙ্গে হিটলারের প্রস্তাবিত আলোচনার সময় এই সমস্ত সামরিক নেতা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘটাইয়া জোরপূর্বক [illegible]

3) English History 1914-1945 — A. J. P. Taylor, Pelican 1970, P. 579

গ্রেপ্তার ও বন্দী করার এক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা-বৈগুণ্যে সেই চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল। এবারও সামরিক নেতাদের সেই গ্রুপটি সক্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েকদিন চুপ-চাপ থাকিবার পর হিটলার অকটোবর মাসের শেষে হুকুম দিলেন যে, ১২ই নভেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইতে হইবে। তখন প্রধান সেনাপতি ব্রাউসিৎসে বিষম বেকায়দায় পড়িলেন। হয় তাঁকে হিটলারের আদেশ অনুসারে আক্রমণ চালাইতে হইবে, নতুবা বিরোধী গোষ্ঠীর চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলাইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান' ঘটাইতে হইবে। কিন্তু হিটলার ছিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডার, যুদ্ধের দিনে শীর্ষতম নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানো কোন দিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত বা নীতিসম্মত নয়—এই কারণেই ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারকে অপসারণের চক্রান্তে সামরিক নেতারা বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে সায় দিতে পারেন নাই। এবারও সেই ধরনের সঙ্কটে পড়িয়া জেনারেল ব্রাউসিৎসে হিটলারকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করার আশায় ৫ই নভেম্বর, রবিবার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হিটলারের কাছে তিনি এমন ধমক ও ধাতানি খাইলেন যে, ব্রাউসিৎসের প্রায় নাড়ী ছাড়িবার জো হইল! তারপর থেকে ব্রাউসিৎস ও হ্যালডার আর হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ধারকাছ দিয়াও যান নাই। (৩)

কিন্তু এই সময় সেনাপতিদের ভাগ্য-ক্রমে আবহাওয়ার প্রতিকূল রিপোর্টের জন্য ৭ই নভেম্বর আক্রমণের তারিখ (১২ই নভেম্বর) স্থগিত রাখিতে হইল। তথাপি এই টানাপোড়েনের আবহাওয়ার মধ্যে আর একটা ভয়ানক চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটিল। হিটলার বরাবরই মিউনিকে তাঁর ১৯২৩ সালের 'পুশ' (জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা) উপলক্ষে বার্ষিকী পালন করিয়া থাকেন। এবারও ৮ই নভেম্বর যখন তিনি তাঁর বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়া নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে হলের মধ্যে বোমা বিস্ফোরিত হইল। নাৎসী পার্টির কয়েকজন সদস্য নিহত হইল এবং অনেকে আহত হইল।

কিন্তু এই বোমা বিস্ফোরণ ছিল একটি সাজানো চক্রান্তের ঘটনা। ডাচাউ বন্দী-শালার এলসার নামে একজন দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রীকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া হিটলারের গোয়েন্দা পুলিশ বা গেস্টাপো এই বোমা বড়যন্ত্র ঘটাইয়াছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের মূল্যবান জীবন ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করিয়া তোলা। মিউনিকে বক্তৃতা দেওয়ার পর হিটলার যখন ট্রেনযোগে বার্লিনে ফিরিতেছিলেন, তখন নুরেম-বার্গে এই ঘটনার সংবাদ হিটলারের কানে পৌঁছিল। তাঁর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে, এই সংবাদ শুনিয়া হিটলারের চোখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল এবং তিনি তাঁর আসনে হেলান দিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'একণে আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি যে আগেই বক্তৃতা শেষ করে উঠে পড়েছিলাম, এটা ভাগ্যবিধাতারই ইচ্ছা, অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে দিবেন।'

বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার পুরো সুযোগ গ্রহণ করিল গোয়েবলসের প্রচার-দপ্তর এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিল যে, হিটলারের যুদ্ধযাত্রা ও জার্মানীর নেতৃত্ব সমস্তই ভগবানের বিধান। অন্যথা হিটলার কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইলেন?......

পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারী আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ধৃত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১০ই জানুয়ারী (১৯৪০) হিটলার হুকুম দিয়াছিলেন যে, ১৭ই জানুয়ারী সূর্যো-দয়ের ঠিক ১৫ মিনিট আগে আক্রমণ শুরু হইবে। কিন্তু তিনদিন পর আবার সেই আক্রমণের তারিখ স্থগিত রহিল এবং ২০শে জানুয়ারী সম্ভবতঃ আক্রমণের চূড়ান্ত তারিখরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ১০ই জানুয়ারী যেদিন হিটলার হুকুম দিলেন ১৭ই তারিখ আক্রমণ শুরু হইবে, সেদিন মুন্স্টার থেকে জার্মান বিমানবাহিনীর একজন অফিসার কলোন অভিমুখে বিমানযোগে যাইতেছিলেন এবং তাঁর হাতব্যাগে (ব্রীফ কেস) পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমস্ত নক্সাটি ম্যাপ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বিমানটি মাঝ-পথে বেলজিয়মের উপর মেঘের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিল। ফলে বিমানটি বেল-জিয়মের মাটিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তখন জার্মান বিমান-অফিসারটি—মেজর হেলমুট রেইনবার্জার পাশেই জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল সেই গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণের দলিল ও নক্সা ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। যখন কাগজপত্রগুলিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন পাহারারত নিকটবর্তী বেল-জিয়ান সৈন্যদের দৃষ্টি এই অভিনব 'অগ্নিকাণ্ডের' দিকে আকৃষ্ট হইল, তারা আসিয়া জার্মান অফিসারকে ঘিরিয়া ধরিল এবং আগুন নিভাইয়া ফেলিল এবং আগুনের হাত থেকে দলিলপত্রের যেটুকু বাঁচিয়াছিল, সেগুলি তারা ছিনাইয়া লইয়া গেল। অবশ্য মেজর রেইনবার্জার ব্রুসেল-সের জার্মান দূতাবাসের মারফৎ জার্মান-বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন যে, সব কাগজ-পত্রই পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, আগুনের ফলে সেগুলি নিতান্ত আঙ্গুলের মত ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিটলারসহ জার্মান সমর-কর্তারা এই রিপোর্টে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না, তাঁরা সন্দেহ করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের নক্সা অপর পক্ষের হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১টার সময় জেনারেল জড্ল টেলিফোন-যোগে জেনারেল হ্যালডারকে হুকুম দিলেন All movements to stop অর্থাৎ সমস্ত সৈন্য চলাচল বন্ধ রাখিতে হইবে।৪

তথাপি ১৫ই এবং ১৭ই জানুয়ারীর ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, বেলজিয়মের জেনারেল স্টাফ সতর্ক হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁরা বিভিন্ন ঘাঁটিতে সৈন্য সমাবেশের তোড়জোর করিতেছেন। আর বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরিক স্পাক জার্মান রাষ্ট্রদূতকে স্পষ্টই বলিলেন যে, জার্মানী যে বেলজিয়াম আক্রমণের তোড়জোড় পাকা করিয়াছিল, সেই দলিলপত্র তাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

যদিও ফরাসী ও বৃটিশ জেনারেল স্টাফকে এই ধৃত দলিলের কপি দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাঁদের গবর্ণমেন্ট সতর্ক হন নাই। কিন্তু এই ঘটনা বা বিমান দুর্ঘটনার পর হিটলার ১৩ই জানুয়ারী তারিখ আক্রমণের তারিখ আবার নিশ্চিত রূপে পিছাইয়া দিলেন এবং বসন্তকালের আগে আর আক্রমণের কথাবার্তা শুনা গেল না। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই বিমান দুর্ঘটনার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমগ্র রণনৈতিক পরিকল্পনারও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।......

অবশ্য এপ্রিল মাসের (১৯৪০) গোড়ার দিকে হিটলার এক দুঃসাহসিক পরি-কল্পনার দ্বারা ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করিয়া লইলেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে একেবারে বেকুব বানাইয়া দিলেন। সে-কাহিনী আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

(৩) Hiter — Allan Bulloc': Pelican, 1962, P. 553-57.

(৪) Hiter — Allan Bullock. Pelican, 1962, P. 553-57.

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোনঃ ৬৭-২০৫৯।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(১)

নরেন্দ্রনগর রাজবাড়ীর বিশাল চত্বর লুটের মালে ভর্তি হয়ে গেল। একটা রাজবাড়িতে যেসব মূল্যবান জিনিস থাকা উচিত তার প্রায় সমস্তই আর একটা রাজবাড়িতে এসে পৌঁছেছে, সোনা, রূপা, হীরা, জহরৎ প্রভৃতি ধাতু ও পাথর থেকে আরম্ভ করে তৈজস হাতীর দাঁতে ও নানারকম কাঠের তৈরী শিল্পদ্রব্য; সুতী রেশমী বস্ত্রাদি আছে। অস্ত্রশস্ত্রর মধ্যে ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, চর্ম ইত্যাদি। তাছাড়া বাহিরের মহল হাতী, ঘোড়া, উট ও গাভীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকলে বিশিষ্ট আওয়াজ তুলে স্বকীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। আরেকটা মহল ভরে গিয়েছে বন্দীতে। এইসব বন্দীদের কতক রাখা হবে রাজবাড়িতে সাধারণ মজুর রূপে আর অবশিষ্ট তক্ষশিলার বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বিক্রীত হবে, মুনাফা পৌঁছবে রাজতহবিলে। লুণ্ঠিতবস্তুর এটিই প্রকাশ্য বিবরণ। আর অপ্রকাশ্য অংশের কিছু উদাহরণ আগেই দেখা দিয়েছে। বন্দিদের তক্ষশিলার বাজারে বিক্রয় করে যে মোটা মুনাফা লুটেছিল সেটা প্রধান সেনাপতি আত্মসাৎ করেছিল। আর তাছাড়া ছোট বড় সৈনিক এক বা একাধিক থলি পূর্ণ করে যা নিয়েছে তার হিসেব নরেন্দ্রনগরে পৌঁছয়নি।

ওদিকে সুমন্তপুরে রাজপুরী ও রাজধানী কঙ্কালটি মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। সৈন্যরা চলে যেতেই চারদিকের গাঁওয়ার লোক এসে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল লুটে নিয়ে গিয়েছে মায় দরজা-জানলার পাল্লাগুলো অবধি। এ মূর্তিকে কঙ্কালসার ছাড়া আর কি বলবো জানি না।

অপরপক্ষে নরেন্দ্রনগর রাজপুরী অপ্রত্যাশিত মেদবৃদ্ধিতে এমন স্ফীত হয়ে উঠেছে যে তার মাংসপেশী দেহের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে খসে পড়ে আর কি। এক স্থানে হরণ না হলে আর একস্থানে পূরণ হয় না, হরণে পূরণে সংসার মোটের উপরে তাল রক্ষা করে চলেছে।

নরেন্দ্রনগররাজ বলে উঠলেন, সেই বর্বরটা কোথায়?

প্রধান সেনাপতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, মহারাজ এই যে আপনার পায়ের কাছেই।

রাজা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন সুগঠিত সুঠাম দেহ, কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

রাজা বললেন, লোকটা এমন নির্জীব কেন, মারা যাবে নাকি?

সেনাপতি বলল, এমন আশঙ্কা করবেন না মশাই। ও আসল কালির চর, ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে, ছেড়ে দিলেই উঠে পালাবে। তাই না হাত-পা শক্ত করে বেঁধেছি।

রাজা বললেন, কালির চর হোক আর যাই হোক লোকের তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আগে ওকে কিছু খাইয়ে আনো।

রাজার আদেশে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল লোকটার গর্দান যাবে, তার বদলে কিনা বরযাত্রীর সমাদর, ভাবলো রাজামশায়ের মতিগতি আলাদা।

সেনাপতি সাহস সঞ্চয় করে বলল মহারাজ লোকটার গর্দান নেওয়ার হুকুম হওয়া উচিত।

রাজা হেসে বললেন, সে হুকুম খাওয়ার পরেও হতে পারে, গর্দান গেলে বোধকরি খাওয়া সম্ভব নয়।

রাজার আদেশে, কাজেই জরার বাঁধন খুলে তাকে পানাহারের জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যে রাজা দাঁড়িয়ে সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধানদের মুখে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে লাগলেন। সমস্ত শুনে রাজা বললেন, সবই তো বুঝলাম কিন্তু সুমন্তরাজ ও রাণীর সংবাদ কি, তাদের কথা তো তোমরা কিছু বলছো না।

বলবে কি, তারা কেউ রাজারাণীকে চোখে দেখেনি, অথচ কিছু একটা না বললে রাজসম্মান রক্ষিত হয় না তাই প্রধান সেনাপতি বলল মহারাজ, যুদ্ধ সূচনার আগেই তাঁরা গোপন সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়েছেন।

তোমাদের উচিত ছিল আগে থেকেই সুড়ঙ্গের মুখে লোক রেখে দেওয়া।

কেমন করে জানবো মহারাজ? মহারাজার হয়ে কত লড়াই করেছি, কখনো কোন রাজাকে যুদ্ধের সূচনাতেই পালিয়ে যেতে দেখিনি।

রাজা বললেন, এর পরিণাম কি জানো? যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হলো না। সুমন্তরাজ যুদ্ধের জের টেনে আবার ফিরে আসবেন।

সে কি কথা মহারাজ, রাজপুরী গেল, রাজধানী গেল, যুদ্ধ করবেন কি নিয়ে?

তুমি বলছো অনেক লড়াই করেছো, কিন্তু লড়াইয়ের কিছুই শেখোনি। যে দেশে রাজার জীবনমরণের উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় হয়ে থাকে সে দেশে পরাজিত রাজা যদি একটা দেওদার গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, অমনি কাতারে কাতারে প্রজা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। জল অত্যন্ত কোমল, কিন্তু সেই জলের ধারাতেই কালক্রমে পাহাড় ছিন্ন হয়ে যায়। এদেশের রাজা ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল বলেই অত্যন্ত দৃঢ়। যাক, অনেক লড়াই জিতে করেও যখন এসব কথা বোঝোনি এখনও বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না।

উপস্থিত সকলে অনুমোদনসূচক মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল মহারাজা যখন বলছেন তখন অবশ্যই বুঝতে পারবো না। রাজার কাছে চিরনাবালক সেজে থাকলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়।

এমন সময়ে দুজন সৈনিক জয়াকে নিয়ে প্রবেশ করলো।

কি হে তোমাকে খেতে দিয়েছে না তোমার নাম করে ভাঁড়ার থেকে খাদ্য নিয়ে এসে নিজেরাই খেয়েছে। এরা সব পারে।

জয়া জানালো, মহারাজের কৃপায় খানাহারের ত্রুটি হয় নি।

এবারে রাজার সঙ্গে জয়ার কথোপকথন শুরু হলো।

তুমিই সেদিন আমার পোষা পায়রাটাকে তীর দিয়ে মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলেছিলে?

হ্যাঁ মহারাজ, সে অপরাধ স্বীকার করছি। এর আগে কখনো পোষা পশুপাখী মারিনি।

তবে সেদিন কেন মারতে গেলে?

জয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

নরেন্দ্রনারায়ণ বুঝলেন যে, সুযোগ-সুবিধার জন্যই কাজটা করেছিল। প্রভুর উপরে দোষ দিতে চায় না তাই নীরবতা অবলম্বন করেছে। মনে মনে খুশী হলেন। বুঝলেন যে, লোকটা পাথরের চাঙরের মধ্যে সোনা, নিষ্কাশিত করে নিতে পারলে খাঁটি রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। আপাতত সেই ইচ্ছা স্থগিত রেখে শুধোলেন তীর-ধনুকে তোমার হাত এমন সই হলো কি করে?

মহারাজ, বাল্যকাল থেকে তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরেছি। জন্তু-জানোয়ার মারতে মারতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জন্তু-জানোয়ার তো মেরেছো স্বীকার করলে, সবাই অমন মেরে থাকে। ওটা তীর-ধনুকের স্বভাব। হাতে পড়লে কাউকে না কাউকে মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সত্যি কথা বলো দেখি সব সেরা জন্তু কটা মেরেছো?

ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে জয়া রাজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

যদি কটা মানুষ মেরেছো।

এই একটি ছোট্ট প্রশ্নে জয়ার দেহ-দণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেল। যে কথা আজ প্রাণধানের সুদূর-পুরে থাকাকালে রাজভোগের তলে চাপা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ প্রশ্নে উত্তরে চাওয়ার তা বেরিয়ে পড়ে তার অনিচ্ছায় অপর্যাপ্ত নির্দেশ করলো জয়ার দিকে।

জয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। তার পা কাঁপতে লাগল। সে প্রায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়বার মতো হলো। রাজা বুঝলেন লোকটা নিতান্তই শিকারে শিকারজীবী কখনো মানুষ মারেনি, তাই এই ইঙ্গিতে এমন হতবুদ্ধি হয়েছে। আরো বুঝলেন যে লোকটার দীর্ঘ বিশ্রাম আবশ্যক। একজন অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

সে যখন অনুচরের সঙ্গে যেতে উদ্যত রাজা বললেন : হ্যাঁ হে বাপু, তোমার নামটা কি?

নির্বোধ জয়া এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধির কাজ করলো, স্বনামের স্থানে জানালো, মহারাজ আমার নাম রাজা।

নিতান্ত মিথ্যা ও জানায় নি, কারণ খাঁটোস তাকে রাজা পদবী দান করেছিল।

রাজা হেসে বললেন, এই বাছো মন্ত্রী, কার কি রকম ভাগ্য। তুমি পঞ্চাশ বছর রাজার পাশে থেকেও মন্ত্রীর বেশি হতে পারলে না, আর আমি কত দুঃখ-হাঙ্গামা, কত নররক্তপাত করে তবে রাজা। আর এই নিরীহ লোকটা যে সেরা জন্তু মারার ইঙ্গিতেই কাঁপতে শুরু করেছিল, সে হলো কিনা রাজা। ভাগ্য আর কাকে বলে? যাও রাজা, এখন বিশ্রাম করোগে। এখন এক রাজ্যে দুই রাজা হলে শেষ পর্যন্ত রাণীর ভাগাভাগির ব্যাপারে রাজশক্তির প্রয়োজন না হতে হয়।

এই বলে তিনি হেসে উঠলেন। হাসলে রাজার বয়স দশ দিন বৎসর কমে যায়। হাসলে যার বয়স বেশি বলে মনে হয়, সেই লোককে কেউ যেন কখনো বিশ্বাস না করে।

এই একটুখানি রাজ-অনুগ্রহ লাভ করলো জয়া তাতেই তার কাল হলো। রাজঅনুচরেরা পছন্দ করে না যে, তারা ছাড়া আর কেউ রাজানুগ্রহের ভাগী হয়। তারা মনে মনে স্থির করলো মহারাজার তো শুধু দুটি চোখ আমাদের সকলে মিলে রাজার চোখ, সহস্রাক্ষ, বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ তো হুকুম দিয়েই খালাস, তারপরে ও হুকুমের কি অর্থ হয় সে দেখবার ভার আমাদের উপরে। অতএব 'রাজার' রাজসী ভাল করেই চলাবো। জয়াকে আহার ও বিশ্রামের নামে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে জানালো, দেখো বাপু, আমরা যা দিই তাই খাবে, যা বলি তাই করবে, যেখানে থাকতে বলি সেখানে থাকবে। কোনো সুযোগে এসব কথা যদি রাজার কানে তোল তবে প্রাণ বাঁচাতে পারবে না, এই কথা বেশ করে মনে রেখো। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এই আনন্দে জয়া বললো, আপনারাই এখন আমার কাছে রাজা-মহারাজা, আপনাদের ইচ্ছাই আদেশ। আমি দিনান্তে দুটি খেতে পেলেই মনে করবো যথেষ্ট হলো। তারা বললো, এই তো ভালো মানুষের মতো কথা মনে থাকে যেন।

তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিল এবং আহারান্তে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে বললো, এখন বিশ্রাম করো। অতঃপর কি করতে হবে তাও স্থির করে ফেলেছিল রাজ-অনুচরগণ। এখানে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজধানীর একটু ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা চেঁচে সমতল করে ফেলে মস্ত জায়গাটা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিয়ে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত। সমতল জমি থেকে রাজধানীতে পৌঁছবার একটি মাত্র আঁকাবাঁকা পথ, যেমন পাহাড়ে হয়ে থাকে আর কি। সে পথ সংকীর্ণ আর খাড়া, তার উপরে আবার মাঝে মাঝে তোরণ তুলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। শত্রুসৈন্যকে আসতে হলে পাহাড়ের গা বেয়ে আসতে হবে, এ-পথ বেয়ে আসবার উপায় নেই। এ পথে কেবল রাজবাড়ির লোকেরা চলাচল করে। পাহাড়টার নীচে চারদিকে সমতল জমি, খেতে গম ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। দূরে-অদূরে আটকেও অনেকগুলো পাহাড় আছে, মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি ফসলের পরিণতি অনুসারে রং বদলায়। যে উপত্যকাটা একটু কিন্তু তাতে ছোট একটি পাহাড়ী নদী খরস্রোত, বর্ষায় জল নামলে নদীটার দুই কূলের অনেকটা জায়গা অধিকার করে নেয়, অন্য সময়ে নদীগর্ভে বালুতে জলে ভাগাভাগি, বালুর ভাগটা বেশী। খরস্রোতের ধারে ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে পাথরভাঙ্গা গ্রাম। এই নামকরণ মিথ্যা নয় কারণ পাথর ভেঙ্গে গ্রামটা তৈরী। বাড়ি-ঘরের পাহাড়ের দেওয়াল, পাতলা পাথরের টালির ছাদ। অধিবাসীরাও পাহাড়ের সন্তান, পাথরে তাদের গায়ের রং।

রাজধানীতে একটা নূতন মন্দির তৈরী হচ্ছে। ঐ অত নীচে থেকে পাথর কেটে বয়ে নিয়ে আসে মজুরের দল। এইসব মজুর স্বাধীন, বেতনভুক নয়। মাঝে মাঝে লড়াই হয়ে যেসব লোককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়, তাদের উপরেই এই শ্রম-সাধ্য কর্মের ভার। তা নইলে দৈনিক একটা দুটো পয়সা বা একমুঠো গমের জন্যে কে আসবে খাড়া পাহাড়ে ভারী পাথর মাথায় করে বয়ে আনবার জন্যে। এইসব মজুর দিনে যায় দুই খেতে পায় আর সন্ধ্যা হলে লম্বা একটা পাথরের ঘরের মধ্যে চাবি-দিয়ে তাদের বন্ধ করে রাখা হয়। তাদের পরনে এক টুকরো কাপড়, সারা অঙ্গে আর কোন আবরণ নেই; কেবল গলায় সুতো দিয়ে একটা লোহার তকমা ঝোলানো, তার উপরে একটা সংখ্যা খোদাই করা আছে। ওটাই তার একমাত্র পরিচয়। কেউ মরলে সংখ্যাটা শূন্য হয়। নূতন লোক এসে আবার তা পূর্ণ করে তোলে। আর তাদের প্রত্যেকের পায়ে ঢিলে করে বেড়ি পরানো, হাঁটতে পারে তবে দূরপাল্লায় পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এইরকম চার-পাঁচশো মজুর সকালে উঠে কাজ আরম্ভ করে, তাদের তত্ত্বাবধানে থাকে বিশ-পঁচিশজন বেতনভুক রাজপেয়াদা, যাদের প্রত্যেকের হাতে লম্বা একখানা করে চাবুক। এই চাবুকের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ ঘটেনি এমন মজুর বিরল। রাজ-অনুচরেরা স্থির করলো জয়াকে এই মজুরের দলে ভর্তি করে দিতে হবে।

পরদিন প্রত্যূষে জয়াকে ঘর থেকে জাগিয়ে পাহাড়তলীতে নিয়ে যাওয়া হলো, পরিয়ে দেওয়া হলো মজুরের পোষাক, গলায় তকমা, পায়ে বেড়ি আর হুকুম হলো সবাই যেমন কাজ করছে তেমনি করতে থাকো। বিস্তারিত বলার আবশ্যক ছিল না। জয়া দেখল সবাই শাবল দিয়ে পাথর ভাঙছে আর মাথায় তুলে নিয়ে রাজধানীর

CENTRAL LIBRARY

দিকে চলেছে। জরা নিঃশব্দে সেই কাজে প্রবৃত্ত হলো। কোন মজুর পাহাড়তলী থেকে রাজধানী পর্যন্ত পাথর বয়ে নিয়ে যেত না, কারণ খাড়া পাহাড় বেয়ে কোন একজনের পক্ষে রাজধানীতে পৌঁছানো সম্ভব নয়, পাথরখানা দু'তিন মাথা বদল হয়ে উপরে এসে পৌঁছাতো। জরা নীচের দিকেই রইলো, কাজেই কোনরকমে যে রাজার চোখে পড়বেই এমন সম্ভাবনা থাকলো না। 'রাজার' নতুন রাজধানী দেখে রাজানুচরগণ খুশী হয়ে নগরে ফিরে এল। তার আগে জরার উপরে তদারকির ভার চালু করে তাকে ইসারায় জানিয়ে দিল একটু চোখ রেখো। সুমন্তপুরে এসেছিল রাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নরেন্দ্রনগরে হলো পাথর-ভাঙা মজুর। জরার কপাল বড় মন্দ নয়।

দুঃখের পাঠশালায় যথারীতি তন্দ্রা ভেঙে জীবনপণ্ডিত আবার জেগে উঠেছে, খোঁজ করছে সেই লিকলিকে লম্বা বেতগাছা গেল কোথায়। না হাতের কাছেই আছে। কিন্তু পড়ুয়ারা এই সুযোগে পাঠশালা ছেড়ে বের হয়ে আমবাগানের ছায়ায় হুটোপুটি খেলা আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ গুরুমশায়ের নাসিকা গর্জন নিঃস্তব্ধ হতে তারা ভালমানুষের মতো ফিরে এসে যে যার যায়গায় বসে পুঁথিতে গভীর মনোযোগের ভান করতে শুরু করেছে। কিন্তু জীবন-পণ্ডিতকে ভোলানো অত সহজ নয়। সারাটা জন্ম তার কেটে গেল দুঃখের পাঠশালায় ছাত্র পড়াতে।

এই রূপকের অর্থ আর কিছুই নয় জীবনপণ্ডিতের অকালনিদ্রার সুযোগে জরা মনে করেছিল বুঝি তার দুঃখের পাঠশালার পালা শেষ হলো। মাস দুই কাল ছিল সে সুমন্তপুরে। সেখানকার সাময়িক রাজভোগকেই তখন মনে হয়েছিল চিরন্তন বাসুদেবকে হত্যার পর থেকে ক'মাসের দুঃখ আর তারও আগে ব্যাধজীবনের দীর্ঘায়িত অভাব ও কষ্ট সমস্তই স্বভাবের ব্যতিক্রম বলে তার মনে হয়েছিল। ভেবেছিল সুমন্তপুরের পর্বটাই সত্য আর স্থায়ী ভবিষ্যৎ বলে যে একটা কাল আছে আর সে কাল যে এমন সুখদায়ক না হতেও পারে ক্ষণেকের জন্যেও এমন মনে হয় নি। বর্তমান যখন ভূত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়ে দেয় বুঝতে হবে তখন মতিচ্ছন্ন হতে আর বাকি নেই। বর্তমান একটি কাল্পনিক রেখামাত্র সমস্তটাই হয় অতীত নয় ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ বর্তমানের মুখোশ পরে আসে বলে তাকে সবসময়ে বুঝতে পারা যায় না। জরাও বুঝতে পারেনি। আরম্ভ হলো আবার জরার দুঃখের জীবন। জরা বনে বনে শিকার করে বেড়াত সেটাও সুখের জীবন নয় তবে তাতে স্বাধীনতা ছিল আর এমন শিরদাঁড়া টনটন করতো না। পাথরের চাঙড়াগুলো যখন মাথায় চাপিয়ে দেয় আর তদারককারকের ইঙ্গিতে সর্বদা বেশী ভারীখানাই চাপিয়ে দেয় টনটন করে ওঠে সমস্ত শিরদাঁড়াটা। তার উপরে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠবার অভ্যাস তার কোথায়! সমতলভূমির অধিবাসী সে। পাথরের চাঙড় মাথায় করে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রথম প্রথম তার মাথা ঘুরে যেত, পা টলতো, ঠিক সেই মুহূর্তে কড়া চাবুকখানা পড়তো এসে পিঠের উপরে। রাগ হতো, দুঃখ হতো নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা হতো আর রাগে দুঃখে ধিক্কারে জল দেখা দিত দুই চোখে। সে জল তদারককারকের চোখে পড়লে কঠিন বাগাড়ম্বরে শুনতে পেত, আবার কান্না হচ্ছে আহা মহারাজ রাজার চোখের জলটি দেখতে পেলেন না। জরা টাল সামলে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। কখনোবা শুনতে পায় মহারাজ দুটো মিষ্টিকথা বলেছিলেন আর ভেবেছিলো আকাশের চাঁদ হাতে মিললো। সে ওঠ, পাথরখানা পড়ে যদি ভাঙে তবে আর মাথা আস্ত থাকবে না। জীবনপণ্ডিত জেগে উঠে জরার শাস্তিবিধানে মনোযোগ দিয়েছেন।

একদিন নরেন্দ্রনমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে, সেই ব্যাধকে তো দেখছিনে। তাকে নিয়ে এসো। লোকটার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে, দেশবিদেশের খবর রাখে।

অমাত্যদের একজন বললো, মহারাজ সে লোকটা আস্ত কলির চর ছিল।

রাজা বললেন, বাসুদেবের মৃত্যুর পরে কলি যুগ আরম্ভ হয়েছে, এখন আমরা সকলেই কলির চর।

অমাত্য বললো, মহারাজ যথার্থ বলেছেন, কিন্তু লোকটা পালিয়েছে।

পালাবে কেমন করে? রাজপুরী থেকে পালানোত সহজ নয়।

তবে আর কলির চর বলছি কেন মহারাজ। আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো লোকটা।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, হয় তোমরা সবাই অন্ধ, নয় চোখ বুজে ছিলে।

অমাত্য রাজাকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে বললো, ঠিক কথা মহারাজ, মহারাজই আমাদের চোখ কান নাক মুখ পঞ্চেন্দ্রিয়।

তাই যদি হয় তবে তোমাদের টাক দিয়ে মাথাটাই বৃথা। হয় লোকটাকে এনে হাজির করো নয় কার দোষে পালালো আমাকে জানাও।

অমাত্য বশ্যতার ভাব দেখিয়ে বললো হে আজ্ঞে মহাশয় এখনই আসামীকে হাজির করে দিচ্ছি এই বলে সে দ্রুত প্রস্থান করলো।

নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ না হলে কেউ নিশ্চিত রাজামাত্য হতে পারে না। এ লোকটি মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিল, সে জানতো যে আর দশটা জরুরী কাজের মধ্যে রাজ এমন ব্যস্ত থাকবেন যে কিছুকাল আর জরার কথা তার মনে পড়বে না তারপরে যখন মনে পড়বে তখন কোন কর্ম বিধিমতে। যাহোক একটা কিছু আন্দাজে চালাবে। আপাততঃ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা যাকগে।

(১০)

সংসার যদি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হত তবে একরকম মন্দ ছিল না কারণ দুঃখের অনুভূতিই হত না। সুখ সম্বন্ধেও সেই কথা। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বসংঘাতে সংসারটা দোলে বলেই খেলা এমন জমে ওঠে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বুক চাপড়ায় আর এই গোলোকধাঁধা কর্মটি যিনি রচনা করেছেন তিনি উপর থেকে নির্বিকারভাবে দেখেন।

জরার পরিশ্রম ও দুঃখ একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ছিল বললে ভুল হবে। রাজার জন্মদিন, রাণীর জন্মদিন, নানারকম তিথি-পার্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে মজুরদের কাজ বন্ধ থাকত। সেদিন তাদের ছুটি তবে ছুটি পালাবার উপায় নেই। কেননা পথের খোঁজ কোন উপলক্ষেই খোলা হত না, তবে লাভের মধ্যে এই যে খড়ভাঙ্গা খাটুনিতে বিরাম আর কাছাকাছিতে ঘোরাফেরা করবার আরাম। এইরকম একটা ছুটি উপলক্ষে জরা ঘুরতে ঘুরতে পাথরভাঙা গ্রামটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সমতল দেশের অধিবাসীর চোখে এ রকম ঘর বাড়ী আগে পড়ে নি। দেওয়াল গুলো পাথরের আবার ছাদের ছাউনিটাও পাতলা করে কাটা পাথরের টালির, গবাক্ষ বলতে কিছু নেই, দরজা সরল গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী। এই রকম গায়ে গায়ে বাড়ী চলেছে এমনি দশ পঁচিশখানা বাড়ী নিয়ে এই পাথরভাঙা গ্রাম। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট একটুকরো আঙিনা।

হাটুজল খরস্রোত নদী পার হয়ে জরা এই রকম একটা বাড়ীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, দেখতে পেল বাড়ীর উঠানে পাথরের উদুখলে কাঠের মুষল দিয়ে গম ভাঙছে একটি অল্পবয়সের মেয়ে। আর বছর দুই তিনেকের একটি ছেলে আঙিনার মধ্যে টলমল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লান্ত হলে এসে উদুখলটা ধরে সামলে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন একটা মস্ত বাহাদুরী করা হল, মা তার মুখে গোটা কয়েক ভুট্টার খই পুরে দিচ্ছে, ছেলেটা খুশী হয়ে আবার টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দিকে যাচ্ছে।

এক খণ্ড পাথরের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে জরা এই দৃশ্যটি দেখল। হঠাৎ তার বুকের ভিতর থেকে অনেক কালের চাপা একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল আর সেই সঙ্গে হাঁটুর উপরে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। চমকে উঠল জরা। অনেক অনেক কাল সে কাঁদে নি। অনেক অনেক কাল সে এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেনি। হঠাৎ এমন হতে গেল কেন বুঝতে পারল না। নিজের মন বিশ্লেষণ করবার শক্তি যদি থাকত তবে বুঝত সমুখের এই দৃশ্যের মধ্যে চমক দিয়ে যাচ্ছে আর এক দৃশ্য, অথবা ছেলেটির অস্তিত্ব সম্ভাবনার মধ্যে। তারও একটি এই রকম বাড়ী ছিল, এমন পাহাড়ের গায়ে নয় বটে কিন্তু তার চেয়েও ভাল, সমুদ্রের ধারে। পাহাড় চিরকাল এক রকম, নিত্যনূতন সমুদ্র। ওই বধূটির মত তারও পত্নী ছিল। সে এমনি ভাবেই গৃহস্থালীর কাজ করত জরা যখন বনে বনে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় বরা কিম্বা হরিণ কাঁধে নিয়ে

এক দম করে উঠোনের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলত দম করা কে এনেছি। জয়ন্তী মনে মনে খুসী হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করত না। বলত, বেশ করেছ এখন স্নান করে এসে খাও। যেদিন সময় থাকত সমুদ্রে গিয়ে স্নান করে আসত, নইলে বাড়ীর কাছের একটা খাড়িতে।

এক দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। জয়ন্তী বলেছিল প্রত্যেক দিন হরিণ আর বড়া ভাল লাগে না, একটা নতুন কিছু খাওয়াতে পার?

জয়া বলেছিল দাঁড়া তোকে একদিন রাজমাংস খাওয়াব।

জয়ন্তী বলল, রাজহাঁস পর্যন্ত জানি, রাজমাংস আবার কি গো? তুমি কি শেষে রাজাকে মারবে নাকি?

যদিই বা মারি, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর কি? শূলে যাবে।

এবারে জয়া বলল, আরে না না তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা নয় গো। তুমি কোনদিন শিকারে গিয়ে রাজাগজা হত্যা করে ফেলবে, আর সকলেই আমাদের মরতে হবে শূলের উপরে।

জয়া বলল, দূর পাগলী! বনের মধ্যে রাজাগজা আসতে যাবে কেন?

তা কি বলা যায়? রাজাগজাদের মতি-গতিই আলাদা।

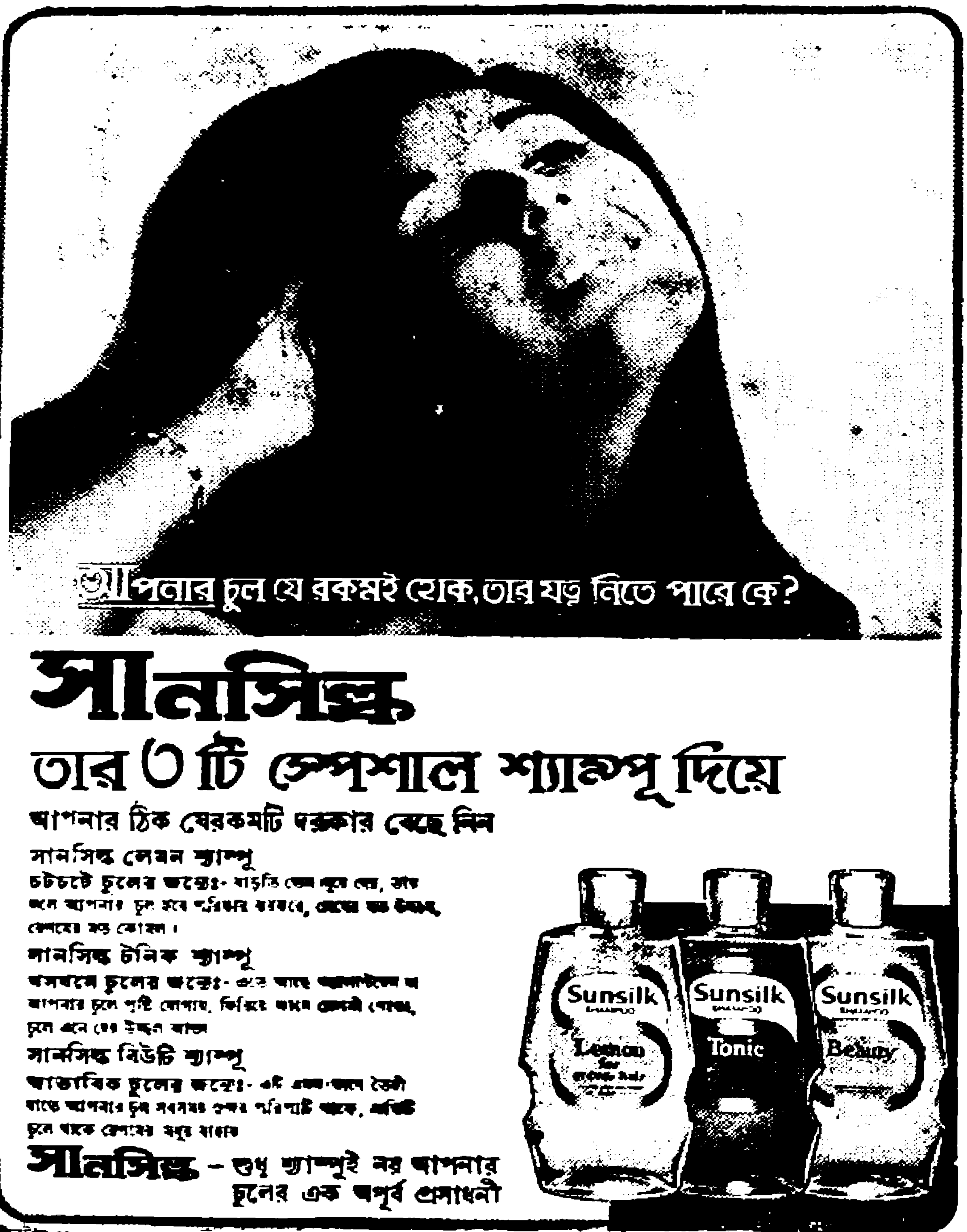

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

CENTRAL LIBRARY

তা যদি রাজবাড়ী ছেড়ে তারা বনের মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকে, তবে মরবে।

নদীর স্রোতে অসহায় নৌকাখানার মত তার মন চিন্তাস্রোতে হঠাৎ চোরাপাহাড়ে এসে গোত্তা মারল। প্রথমেই মনে হল বিপদটা গুরুতর নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, গলগল করে জল উঠছে, কোনক্ষণ আর সামাল দেওয়া যাবে না নৌকোটাকে। নৌকায় চাপা, হাল খোলা, স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেওয়া এ সমস্তই কখন তার অগোচরে ঘটে গিয়েছে। চোখে যখন দেখছিল সম্মুখের এই শিশু ও জননীকে, মন তখন ভিতরে ভিতরে আর একটি দৃশ্যকে অনুসরণ করছিল। সেই দৃশ্যের জের ঠেলতে ঠেলতে ফেলল এনে তাকে চোরাপাথরের উপরে। এখন নৌকা সামলায় কে? মানুষের মন চলে দাবার ছকের ঘোড়ার মত। এও সেই সংসারের সুখ-দুঃখে বুনোনের আর একটি নমুনা। সুখের দৃশ্য হঠাৎ তাকে এনে ফেলল দুঃখের তুবজলের মধ্যে। জয়া যদি বিশ্লেষণপরায়ণ হত তবে বুঝত জীবন-পণ্ডিতের দুঃখের পাঠশালায় এও একরকম দণ্ড। কাউকে দণ্ড লাঠি দিয়ে, কাউকে দণ্ড ভালোমানুষের সৌভাগ্যের তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়ে দিয়ে। কাউকে দণ্ড স্মৃতির চাবুকে, কাউকে দণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে। এতরকম ভাবে সাজা দিতেও জানে জীবনপণ্ডিত।

এবারে শিশুটি টলতে টলতে জয়ার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল, ভেবেছিল বাবা, এবে নূতন লোক। তার কান্নায় মায়ের চোখ পড়ল জয়ার দিকে, শুধালো, তুমি বুঝি রাজবাড়ীর মজুর?

কি করে বুঝলে? শুধালো জয়া।

মেয়েটি নীরবে তার পায়ের বেড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

পরিচিত বেড়িজোড়া নতুন করে দেখে জয়া লজ্জিত হল।

মেয়েটি বলল, নিত্য দেখি কিনা, বেড়ি পায়ে মজুররা পাথর কাটছে। কখনও আবার এদিকেও আসে। তোমাকে নতুন দেখছি।

জয়া বলল, হাঁ, আমি অল্পদিন হল এখানে এসেছি।

বুঝেছি, তোমাকে সমুদ্রপুর থেকে বন্দী করে এনেছে, তাই না?

জয়া বলল, তাই বটে।

কিন্তু, তোমাকে তো আমাদের এদেশী লোক বলে মনে হয় না।

কি করে জানলে?

এদেশী লোকের মুখ-চোখ, আচার ব্যভার সব জানি কিনা।

জয়া বলল, না সত্যিই আমি এদেশের লোক নই।

কোথায় তোমার বাড়ী গা?

সে অনেক দূরদেশে। নাম বললে চিনতে পারবে না।

মেয়েটি তক্ষশীলার হাটে বাজারকরতে গিয়েছে। অনেক দূরদেশে শুনে বলল, তক্ষশীলার নাকি?

না। আরও অনেক অনেক দক্ষিণে একেবারে সমুদ্রের ধারে।

ওমা, সে যে অনেকদূর, বলে [illegible]। এতক্ষণ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ চলছিল। হাঁ, অনেক দূরই বটে।

তবে এখানে এলে কি করে?

জয়া অনেকটা আপনমনেই বলল, পাপ করেছিলাম, তা সাজা পেতে হবে তো।

মেয়েটি এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেনি। পাপই বা কি, আর তার সাজাই বা কেন, কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল জয়ার মুখের দিকে। জয়া বুঝল মেয়েটিকে আরও বলা দরকার। সে বলল, পাপের সাজা ভোগ করছি।

সে শুধালো, পাপ কাকে বলে?

এবারে মেয়েটির প্রশ্ন শুনে জয়ার অবাক হবার পালা। কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। জয়ার দোষ দেওয়া যায় না। যে প্রশ্নের সদুত্তর সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করেও পাওয়া যায় না অবোধ জয়া তার কি উত্তর দেবে? তবু একবার চেষ্টা করা উচিত তাই সে বলল, ধর কেউ কাউকে মারল, সেটাই পাপ।

কেন পাপ হতে যাবে কেন? আমি আমার ছেলেটাকে দরকার হলে মারি, আমার লোকটা কখনও কখনও মাতাল হয়ে এসে আমাকে মারে, আবার গাঁয়ের লোকেরা পরবের দিনে মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটায়। এ তো নিত্যকার ব্যাপার। একে বুঝি তোমাদের দেশে পাপ বলে?

জয়া দেখল, না, মারামারির উদাহরণ দিয়ে সুবিধা হবে না। তাই এবারে নতুন দৃষ্টান্ত গ্রহণ করল। বলল, ধর কেউ এমন কাজ করল, যাতে তোমার মনে কষ্ট হল। তাকে কি পাপ বলবে না?

ওমা, পাপ বলব কেন? কষ্ট বলব।

জয়া হতাশ হয়ে পাপের মর্ম বোঝাবার আশা ছেড়ে দিল। জয়া বলল, আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে গল্প করব, আজকে সন্ধ্যা হল, উঠি।

মেয়েটি বলে উঠল, সেকি, কিছু না খেয়ে যাবে? এই বলে পাতার ঠোঙায় কুঁড়োর খই এনে দিল, আর পাথরের বাটীতে পানীয় জল। রাজবাড়ীর মজুর হিসাবে যে খাদ্য সে পেত তার তুলনায় এই শুকনো খই অমৃত বলে মনে হল জয়ার মুখে। সমস্ত খইগুলি খুঁটে খেল, তারপরে এক নিশ্বাসে সেই শীতল নির্মল জল পান করে আরামের আঃ শব্দ উচ্চারণ করল। তারপর বলল, পাপ কাকে বলে তোমাকে বোঝাতে পারলাম না, তবে এটা জেনো, পাপের উল্টো পুণ্য। এ শব্দটা আরও অদ্ভুত লাগল মেয়েটির কানে। বলল, সেটা আবার কি?

এই যে আমাকে খেতে দিলে, পান করতে জল দিলে, এই তো পুণ্য।

পুণ্যের এই ব্যাখ্যা শুনে মেয়েটি হেসে কুটিকুটি হল, তাহলে তো আমি রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পুণ্য করি।

জয়া বলল, তেমনি নিশ্চয় রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পাপও কর। ছেলেটাকে মারো, সবাইর মনে কষ্ট দাও।

মেয়েটি পুনরায় গম ভাঙতে ভাঙতে বলল, না বাপু, তোমাদের পাপ পুণ্য বুঝবার ক্ষমতা আমার নাই। তার চেয়ে অনেক সহজ কাজ করা, গম ভাঙা আর—

তার বাক্য শেষ হতে পারল না, দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনল ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। দুজনেই তাকাল, তবে কোনদিকে তাকাতে হবে জানত মেয়েটি। সে বলে উঠল, ওই যে মহারাজ শিকার করে ফিরছেন। এক নিমেষের মধ্যে নরপুঙ্গবরাজের ঘোড়া মেয়েটির কুটীর কাছে এসে পৌঁছাল। রাজা ঘোড়া থামিয়ে কুটীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুরমা, সব খবর ভাল তো?

সে ছোট্ট একটি অভিবাদন করে বলল, মহারাজার অধীনে আমরা সুখেই আছি।

এমন সময়ে রাজার চোখ পড়ল জয়ার দিকে, চমকে শুধালেন, একি, 'রাজা' হে, তোমার এ অবস্থা কে করল?

জয়া রাজানুচরের কৌশল কিছুই জানতো না। সে নীরবে কপালে হাত ঠেকিয়ে বোঝাতে চাইল, এ অবস্থা করেছে অদৃষ্ট।

রাজা বললেন, এবারে সব বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি। বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন রাজধানীর দিকে। জয়া কিছুই বুঝতে পারলো না, ধীরে ধীরে পায়ের বেড়ী বাজিয়ে কয়েদখানার দিকে চলল।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

সময় ও প্রযুক্তিবিদ্যা

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী?

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—সময়। মানুষের লিখিত ইতিহাসে এমন নিদর্শন প্রচুর যা থেকে বোঝা যায়, সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে তাই নিয়েই মানুষের অন্তহীন ভাবনাচিন্তা। সময়ের পার হয়ে যাওয়াটাকে একটা হিসেবের মধ্যে আনতে কত ভাবেই না সে চেষ্টা করেছে। সুখের বিষয়, এমনকি আজকের দিনেও যখন প্রায় কোনো বিষয়েই কোনো দেশের সঙ্গে কোনো দেশের মিল নেই তখন অন্তত সময়ের মাপ নেবার ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির এমন এক পর্বে আমরা বাস করছি যখন সময়ের নিখুঁততম মাপ নেবার একটি ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। একটি দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই জানেন, মিডিয়াম তরঙ্গে কলকাতা-ক বেতার-প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় ৬৭০ কিলোহার্ৎস-এ। কথাটার মানে কি? এই বিশেষ মাপের তরঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে ৬৭০ হাজার কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে সাইকল-এর সংখ্যাকে বলা হয় হার্ৎস। সংখ্যাটিকে কিলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলে ৬৭০ কিলোহার্ৎস কথাটার মানে দাঁড়াচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ৬৭০ হাজার সাইকল। এই মাপটি অবশ্যই নিখুঁত হলে পরেই আমাদের বেতার গ্রাহকযন্ত্রে প্রোগ্রামটি আমরা ঠিকমতো ধরতে পারি। সহজেই অনুমান করা চলে সেকেন্ডে ৬৭০ হাজারের মাপ যদি নিখুঁতভাবে নিতে হয় তাহলে আমাদের হাতে অবশ্যই এমন যন্ত্র থাকা দরকার যার সাহায্যে সেকেন্ডের ৬৭০ হাজার ভাগের একভাগ হিসেবও ধরা পড়ে। আবার কলকাতা-ক থেকে যে-সময়ে বেতার-প্রচার হচ্ছে সেই একই সময়ে কলকাতা-খ কলকাতা-গ ইত্যাদিতেও প্রচার চলছে। একটির সঙ্গে অপরটি মিশে যায় না তার কারণ তরঙ্গের মাপ ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা নিখুঁতভাবে বজায় থাকে বলেই বেতার গ্রাহকযন্ত্রে প্রত্যেকটি স্টেশনকে পৃথকভাবে ধরা চলে। এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, তরঙ্গের মাপ নিখুঁত হওয়াটা কতখানি জরুরি।

সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে কী ঘটছে বা না-ঘটছে তাও এখন বিজ্ঞানীদের জানবার প্রয়োজন ঘটে। তা জানবার ব্যবস্থাও হয়েছে। একটি বুলেট একটি তাসকে আড়াআড়ি ফুঁড়ে যেতে কত সময় নেয়? কিছুকাল আগেও এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব ছিল। এখন বলা চলে, এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। এ থেকে অনুমান করা চলে, সময়ের মাপ নেবার ব্যবস্থা আজকাল কতখানি নিখুঁত।

আর শুধু তো মাপ নেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে তার ছবি নেবার ব্যবস্থাও। অসিলোস্কোপ যন্ত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, সেকেন্ডে কয়েক হাজার সাইকল বিশিষ্ট এই যে তরঙ্গ—তারও একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা চলে। তেমনি, তাসের মধ্যে দিয়ে বুলেট চলে যাচ্ছে তার ছবিও অতিবেগসম্পন্ন ক্যামেরায় ধরে রাখাটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

মানুষের গলার স্বরের কম্পাঙ্ক শুরু সেকেন্ডে ৭৫ সাইকল-এর কাছাকাছি মাপ থেকে। টেলিফোন যন্ত্র থেকে যদি ঠিকভাবে কাজ পেতে হয় তাহলে এই মাপ ঠিকভাবে জেনে রাখা দরকার। অন্যদিকে সম্প্রতিকালে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন যন্ত্রও চালু হয়েছে যার মাপ সেকেন্ডে কোটি কোটি সাইকল-এর মাত্রায় বাঁধা।

ভাবলে অবাক হতে হয়, যে-মানুষ এককালে চাঁদের কলার হিসেব রেখে সময়ের হিসেব রাখত সেই মানুষই এখন সেকেন্ডকে দশ লক্ষ ভাগে ভাগ করছে! অবশ্যই ব্যাপারটি ঘটাতে সময় লেগেছে শত শত বৎসর। 'স্প্যান' পত্রিকার গত মে সংখ্যায় রবার্ট ক্যারেল বিষয়টি নিয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে এই প্রবন্ধের বক্তব্য ও আরো কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই। এই লেখার সঙ্গে যে-ছবিটি দেওয়া হল তাও 'স্প্যান' পত্রিকা থেকে।

•

সময়ের মাপ নেবার ব্যাপারে প্রথম অবদান প্রাচীন মিশরীয়দের। তারা লক্ষ করেছিল নীলনদে বান আসার সময়ে ভোরের ঠিক আগে পূবে আকাশে বিশেষ একটি তারা ওঠে। তারপরে দিন গুণে গুণে তারা দেখল এই বিশেষ তারাটি ৩৬৫¼ দিন পরে পরে পূব আকাশে ওঠে। এই হিসেবটি মোটামুটি সঠিক ছিল। কিন্তু ক্যালেন্ডার তৈরি করতে গিয়ে তারা কিন্তু এই ভগ্নাংশটিকে বাদ দিয়ে পুরো ৩৬৫টি দিনে একটি বছরের হিসেব করল। তার মানে, একটি দিনের সিকিভাগ সময় বাদ পড়ল ক্যালেন্ডারের হিসেব থেকে। ফল হল এই যে নীলনদের বন্যা ক্যালেন্ডারের এক বছরের হিসেব থেকে ক্রমেই পিছিয়ে যেতে লাগল। অর্থাৎ বন্যা আসতে লাগল এক বছর পার হয়ে যাবারও আরো কিছুকাল পরে পরে। যতো বছর পার হয় পিছিয়ে যাওয়ার মাত্রাও ততো বাড়ে।

বোঝা গেল, এই সিকি-দিন নিয়েই বড়ো সমস্যা। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যাচ্ছে এই সিকি-দিনের হেরফের থাকার জন্যে। বছরে সিকি-দিন মানে চার বছরে পুরো একটি দিন। ব্যাপারটা অবশ্যই তুচ্ছ করার নয়। এই সমস্যার একটা সমাধান করলেন জুলিয়াস সীজার প্রতি চার বছরে একটি করে লীপ-ইয়ার প্রবর্তন করে। এই লীপ-ইয়ারের বছরে একটি দিন থাকে অতিরিক্ত—অর্থাৎ, লীপ-ইয়ারের বছর ৩৬৬ দিনে। এ-ঘটনা খৃস্টজন্মের ৪৫ বছর আগে। সে-সময়ের লীপ-ইয়ারের ব্যবস্থায় মার্চ শুরু হবার ছ-দিন আগের তারিখটি (আমাদের ২৪এ ফেব্রুয়ারি) দু-বার করে আসত। পরবর্তীকালে একই তারিখ দু-বার করে না এনে লীপ-ইয়ারের ফেব্রুয়ারি মাসটিকে করা হল ২৯ দিনের। জুলিয়াস সীজারের আগে বছর শুরু হত মার্চ মাসে, কিন্তু সীজারীয় ক্যালেন্ডারে শুরু হল জানুয়ারি মাসে। বছর যে মার্চ মাসে শুরু হত তার প্রমাণ এখনো কয়েকটি মাসের নামের মধ্যে রয়ে গিয়েছে—যেমন, সেপ্টেম্বর মানে সপ্তম মাস। জুলিয়াস সীজার আরো একটি কাণ্ড করলেন। কুইন্টিলিস বা পঞ্চম মাসের নামটি পাল্টে রাখলেন নিজের নামে—জুলাই। তাঁর উত্তরাধিকারী অগাস্টাসও পরের মাসে সেক্সটিলিসের নাম পাল্টে রাখলেন—অগাস্ট। যাই হোক, আমাদের আলোচনার মূল কথাটি হচ্ছে—খৃস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে লীপ-ইয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কিন্তু এতেও কি সমস্যার সমাধান হল? না, হয়নি, সীজারীয় ক্যালেন্ডারেও প্রতি ১২৮ বছরে একদিনের হিসেব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। কেন? সিজারীয় ক্যালেন্ডারে হিসেবের গরমিল মেলানো হয়েছে সিকি-দিনের বা ৬ ঘন্টার। আসলে কিন্তু গরমিলটা পুরোপুরি ৬ ঘন্টার নয়, তার চেয়েও কিছু কম। একটি বছরের সঠিক পুরো মাপ হচ্ছে ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৯ মিনিট (সেকেন্ডকে হিসেবে ধরলে ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৬ সেকেন্ড)। সে-জায়গায় ক্যালেন্ডারে বছরের মাপ যদি ধরা হয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা তাহলে ক্যালেন্ডারের বছর আসল বছরের চেয়ে ১১ মিনিট বড়ো হয়ে যায়। তার মানে, আসল বছর শেষ হয়ে যাবার পরেও ক্যালেন্ডারের বছর থেকে যাচ্ছে—প্রথম বছরে আরো ১১ মিনিট, দ্বিতীয় বছরে ২২ মিনিট, এমনি চলতে চলতে ১২৮ বছরে পুরো একটি দিন। অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে প্রবর্তিত ক্যালেন্ডার খৃস্টীয় ৮০ অব্দে এসেই একটি দিনের গরমিলে পড়ে যাচ্ছে। আসল বছর

বছর শেষ হখনো এই ক্যালেন্ডারে বছর শেষ হত একদিন বাদে। এমনি যদি চলতে দেওয়া হত তাহলে তো ঋতুচক্রের সঙ্গে ক্রমেই বেড়ে যাবার কথা। তাই বেড়েছিল। এমনি চলতে চলতে ১৫৮২ সালে এসে দেখা গেল পর্যায়ক্রমের মধ্যে একদিনের নয়, দু-দিনের নয়, পুরো দশ দিনের। ক্যালেন্ডার এগিয়ে গিয়েছে দশ দিন—সূর্য আকাশের যে-অবস্থানে আসার কথা ২১এ মার্চ তারিখে (মহাবিষুবে), সেখানে এসে যাচ্ছে ১১ই মার্চ তারিখেই। এই পর্যায়ক্রম দূর করার জন্যে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে পোপ গ্রেগরি আরো একবার ক্যালেন্ডারের সংস্কার করলেন। প্রথমত, ক্যালেন্ডার থেকে পুরো দশটি দিন বাদ দিয়ে দিলেন একেবারে ১৫৮২ সালের ৪ঠা অক্টোবরের পরের দিনটিকে ঘোষণা করা হল ১৫ই অক্টোবর। মাঝখানের ৫ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত পুরো দশটি দিন বেমালুম বাদ। দ্বিতীয়ত, সংস্কার করলেন শতাব্দীর সালগুলো—অর্থাৎ ১৬০০, ১৭০০, ১৮০০ ইত্যাদি সালগুলো

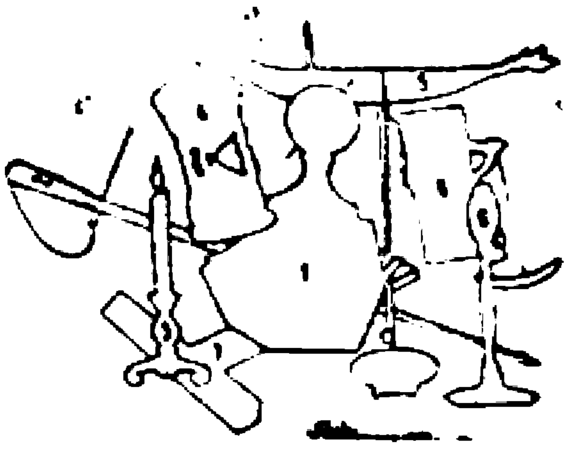

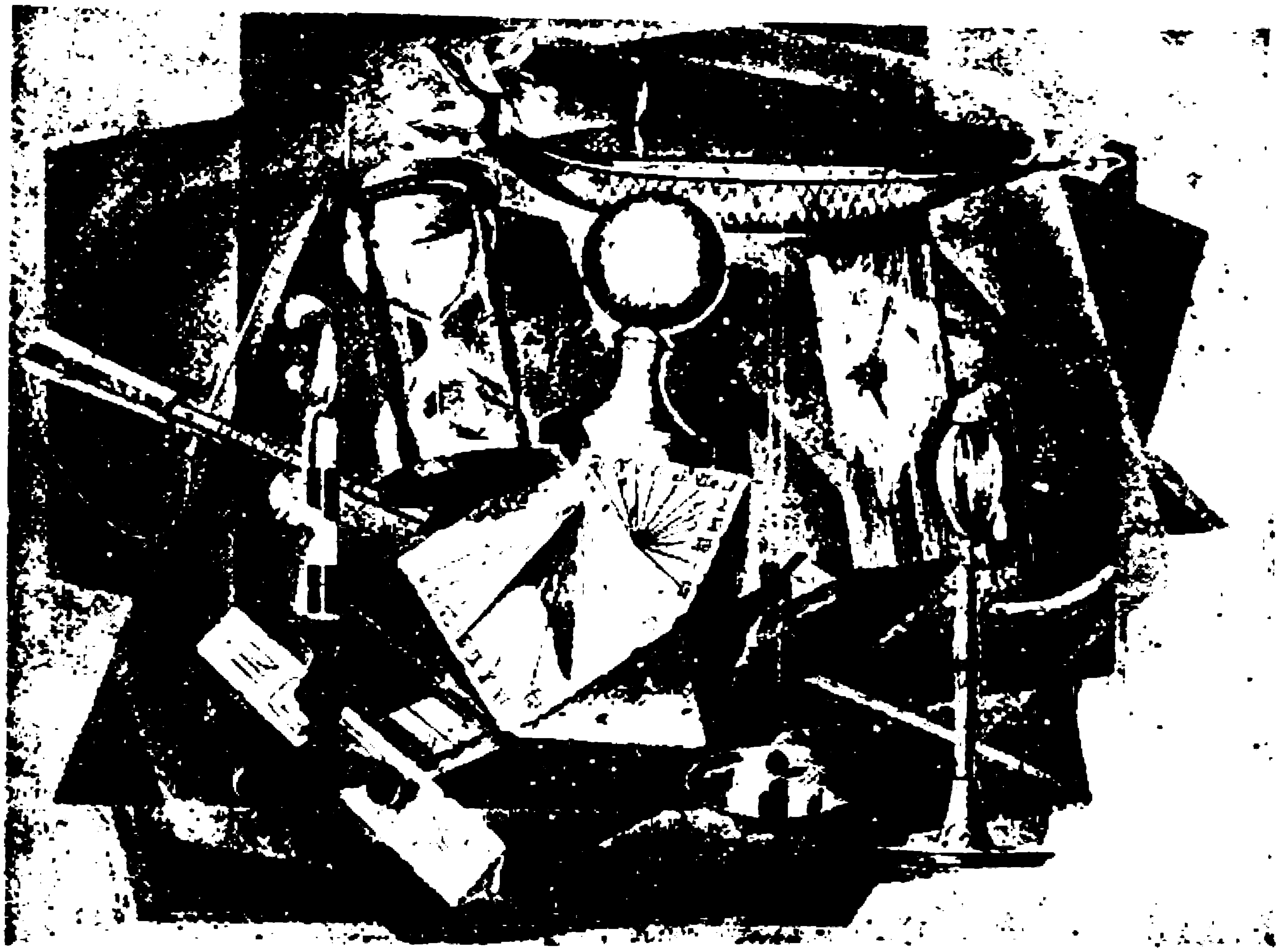

অতীতের কয়েকটি সময় নির্দেশক ব্যবস্থা

১। প্রাচীন রোমান সূর্যঘড়ি
২। ভারতীয় সময়-নির্দেশক লাঠি। এই লাঠির মাথায় আছে একটি ফুটো, ফুটোর মধ্যে ঢোকানো আছে একটি ছোট পেরেক—লাঠির সমকোণে। লাঠির প্রান্তে লাগানো দড়ির সাহায্যে লাঠিটি তুলে ধরা হয়। পেরেকের ছায়া পড়ে লাঠির ওপর, তা থেকেই সময়ের নির্দেশ।
৩। মোমবাতি ঘড়ি। গোড়ার দিকে মোমবাতিতে পর পর রং-এর ছোপ থাকত। এক-একটি ছোপের মোম পুড়তে সময় লাগত এক ঘণ্টা করে।
৪। বালি ঘড়ি
৫। চীনা ড্রাগন অগ্নি ঘড়ি। একটি ছোট নৌকার আকারের পাত্রে বসানো থাকত কাঠের গুঁড়ো ও পিচ দিয়ে তৈরী একটি দণ্ড। দণ্ডের ওপর দিয়ে ঝোলানো থাকত সুতো দিয়ে বাঁধা দুটি গোলক। দণ্ডের একদিকে আগুন লাগানো হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরে আগুন পৌঁছে যেত সুতোর জায়গায়। সুতো পুড়ে যেত। আর গোলক দুটি সশব্দে গিয়ে পড়ত একটি ধাতুর থালার ওপরে।
৬। তৈল ঘড়ি। আধারের গায়ে দাগ দেওয়া থাকত। তেল পুড়তে পুড়তে [illegible] নামত। কতটা নিচে নামল তা থেকেই সময় সম্পর্কে ধারণা।
৭। মিশরীয় ছায়া ঘড়ি।
৮। পেন্ডুলাম ঘড়ি।

যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করা চলে তবেই লীপ-ইয়ার, নইলে নয়। ১৬০০ ও ২০০০ সাল দুটি লীপ-ইয়ার, কিন্তু ১৭,১৮০০, ১৯০০ সাল তিনটি নয়।

এই গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব দেশে প্রবর্তিত হয়নি। যেমন, রুশদেশে নয়। রুশদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে। ফলে 'বিপ্লব-পূর্ব' রুশদেশের ঘটনাবলীর তারিখ অনেকের কাছেই এখনো গোলমেলে ঠেকে। যেমন, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিবসটি পালন করা হয় ৭ই নভেম্বর তারিখে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিবস নভেম্বরে পড়ে কি করে? আসলে বিপ্লবটি যে-সময়ে ঘটেছিল রুশদেশে তখনো জিজারীয় ক্যালেণ্ডার চালু। এই ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তারিখটি ছিল ২৫এ অক্টোবর ১৯১৭। কিন্তু গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তারিখটি হওয়া উচিত ৭ই নভেম্বর ১৯১৭। লেনিনের জন্ম জিজারীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১০ই এপ্রিল ১৮৭০, গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২২এ এপ্রিল ১৮৭০। রুশদেশের বিপ্লব-পূর্ব ইতিহাসে সাধারণত ঘটনার তারিখ দেওয়া হয়ে থাকে পুরনো স্টাইলে (জিজারীয় ক্যালেণ্ডারে) এবং বন্ধনীর মধ্যে নতুন স্টাইলের (গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে) তারিখ উল্লিখিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারই চলছে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে বছরের হিসেব মোটামুটি একটা পদ্ধতি মেনে চলেছিল। কিন্তু মাসের হিসেব? দিনের হিসেব? ঘণ্টার হিসেব? এসব ক্ষেত্রে কিন্তু বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের অদ্ভুত একটি সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ব্যাবিলোনিয়ার জ্যোতির্বিদ-পুরোহিতেরা আকাশকে বারোটি রাশিতে ভাগ করেছিলেন। সূর্য এক-একটি রাশিতে মোটামুটি অবস্থান করে, চাঁদের কলার একটি চক্র (যেমন, অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা—এই একটি চক্র) সম্পূর্ণ হতেও মোটামুটি লাগে। বছরকে ১২টি মাসে ভাগ করার মূলেও এই ঘটনার প্রভাব বড়ো রকমের।

সহজেই অনুমান করা চলে, প্রাচীনদের কাছে '১২' এই সংখ্যাটির মাহাত্ম্য খুবই প্রবল হবার কথা। কেননা আকাশে রাশির সংখ্যা ১২, সারা বছরে সূর্যের পরিক্রমা যে-কটি রাশিতে তার সংখ্যা ১২। অতএব দিন ও রাত্রিকে ঘণ্টায় ভাগ করতে গিয়ে প্রাচীনরা এই ১২ সংখ্যাটিকেই অবলম্বন করলেন। ১২ ঘণ্টার দিন ও ১২ ঘণ্টার রাত্রি—দুয়ে মিলিয়ে মোট ২৪ ঘণ্টা।

আর ঘণ্টা ও মিনিটের বেলায়? এখানেও ব্যাবিলনীয়দের একটি সংস্কার থেকে গিয়েছে। ৬০ সংখ্যাটিকে তাঁরা মনে করতেন অলৌকিক এবং তাঁদের সকল কাগজপত্রে এই সংখ্যাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে গিয়েছেন। ৬০ সংখ্যাটি অবশ্যই পছন্দ করার মতো, কেননা এই সংখ্যাটিকে অনেকগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা চলে। মাপজোখের জন্যে এই সংখ্যাটি থাকলে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। অতএব ঘণ্টাকে মিনিটে ভাগ করার সময়ে এই ৬০ সংখ্যাটিকেই অবলম্বন করা হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বছর, মাস, ঘণ্টা ও মিনিটের হিসেব নিয়েই আমাদের এবারে এসে দাঁড়াতে হবে একেবারে আধুনিক কালে। আগেই বলেছি, সময়ের হিসেব এখন ক্রমেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে চলেছে এবং যতোদূর মনে হয়, অনন্তকাল ধরে হয়ে চলবে। তবুও একথা বলতেই হবে, সময়ের পরিমাপ সংক্রান্ত অনেকগুলো খুঁটিনাটি বিষয়ের মীমাংসা হয়েছে একেবারেই সম্প্রতিকালে। যেমন, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সময়ের মধ্যে একটা সমন্বয় ও শৃঙ্খলা আনতে পারা গিয়েছিল মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৮৮৪ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াশিংটনে। এই সম্মেলনেই প্রথম গোটা বিশ্বকে চব্বিশটি সমান এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি এলাকার সময় নির্ধারিত হয় গ্রীনউইচ মধ্যরেখার সময়ের ভিত্তিতে।

আরো একটি বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটল বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে। বিজ্ঞানীরা সময়ের মাপ নেবার আরো সঠিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করছিলেন। আরো সঠিক পদ্ধতি কেন বলা হচ্ছে? প্রচলিত পদ্ধতি কি যথেষ্ট সঠিক ছিল না? দৈনন্দিন কাজের পক্ষে অবশ্যই সঠিক ছিল এবং এখনো আছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা ততোদিনে জেনে গিয়েছেন যে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের বেগ স্থির নয়। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক দেয় ২৪ ঘণ্টায়। এই পাক দেওয়ার বেগ যদি স্থির থাকে তাহলেই গ্রীনউইচের সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত অন্য সমস্ত এলাকার সময়ের যাথার্থ্য বজায় থাকে, নইলে নয়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রবর্তন করলেন এক ধরনের নতুন সময়, নাম 'এফিমেরিস টাইম' (ই, টি)। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমার ওপরে নির্ভর করে এই সময়। ১৯৫৫ সাল থেকে ই, টি সেকেণ্ডকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল প্রয়োজনে যথাযথতার প্রয়োজন যেখানে এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও অধিক সেখানে সময়ের মাপ নেওয়া হয় এই ই টি সেকেণ্ডে।

১৯২৮ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে প্রথম নির্মিত হয় কোয়ার্টজ বা ক্রিস্টালের ঘড়ি। ব্যাপারটি ঘটে এইভাবে: সঠিক আকারের একটি ক্রিস্টালের যদি ঠিক মতো বিদ্যুৎপ্রবাহ সরবরাহ করা হয় তাহলে ক্রিস্টালটিতে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় কম্পন সৃষ্টি হতে থাকে—প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক। এই কম্পনের সাহায্যে অলটারনেটিং বিদ্যুৎপ্রবাহকে (এ সি) নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ঘড়ি চলে এই নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে। পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের বেগ যে স্থিরমাত্রায় নয় তা এই কোয়ার্টজ ঘড়ির কাছেই প্রথম ধরা পড়েছিল। স্বীকার করতেই হবে যে কোয়ার্টজ ঘড়ির যথাযথতা খুবই উচ্চমাত্রার। একটি ভালো কোয়ার্টজ ঘড়ির সময়ের নির্দেশে সারা দিনে এক সেকেণ্ডের ৫০,০০০ ভাগের এক ভাগের বেশি হেরফের ঘটে না।

এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে সময়ের মাপে অধিকতর যথাযথতার প্রয়োজন ঘটছে। বিজ্ঞানীরা এবারে তাকালেন অণু ও পরমাণুর দিকে। বিজ্ঞানীদের আসলে প্রয়োজন একটি কম্পনের উৎস। প্রকৃতিজগতে কম্পনের উৎস হিসেবে অণু ও পরমাণুর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই। অ্যামোনিয়া গ্যাসকে যদি উচ্চ-কম্পনবিশিষ্ট বেতারতরঙ্গের সাহায্যে উত্তেজিত করা হয় তাহলে অ্যামোনিয়া অণুর পরমাণুগুলোতে একটি অবিশ্বাস্য মাত্রায় কম্পন সৃষ্টি হয়ে থাকে—সেকেণ্ডে ২,৮০৭ বিলিয়ন বার (এক হাজার মিলিয়ন বা ১,০০০,০০০,০০০ বার)। ১৯৪৯ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতেই এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের সাহায্যে একটি মাইক্রোওয়েভ অ্যাম্প্লিফায়ার নির্মিত হয়েছে এবং এই অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে নিঃসরিত সঙ্কেতের সাহায্যে একটি ঘড়ি চালিত হয়েছে।

এখানেও শেষ নয়। সিজিয়াম নামে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে আরো একটি ঘড়ি যাতে ৩০ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত কম্পাঙ্কের মাপ নির্ধারিত হতে পারে। আর এই ঘড়িতে সময়ের হেরফের ঘটার সম্ভাবনা হাজার বছরে এক সেকেণ্ড মাত্র।

বলা বাহুল্য, এই ঘড়িটিই শেষতম ঘড়ি—এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ সময় সম্পর্কে ধারণা করত মাটিতে পোঁতা একটা কাঠির ছায়া দেখে। পেণ্ডুলাম ঘড়ি নির্মিত হয়েছিল ১৬৫৭ সালে। ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের সময় দেখার জন্যে প্রকাশ্য স্থানে ঘড়ি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রথম ১২৮৮ সালে। তারপরেও আরো প্রায় দুশো বছর ঘড়ি থাকত শুধু গির্জায়। শুধু ঘড়ির দিকে তাকালেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়—কত অল্প সময়ের মধ্যে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি! আর কোথায় যাব তা কল্পনাও করা চলে না।

—অয়স্কান্ত

CENTRAL LIBRARY

তোমাকে

নিমাই ভট্টাচার্য

চতুর্থ পর্ব

চিত্রলেখার ঘর থেকে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। চুপ করে শুয়ে আছি ঠিকই অথচ ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজনাবোধ করছি।

আমার প্রশ্নের জবাব ও দেয়নি। দিতে পারেনি। হাজার হোক মেয়ে। বাঙালী মেয়ে। লজ্জা পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া সংকোচবোধ করাও স্বাভাবিক। আমার হয়ত অমন করে হঠাৎ ও-কথা বলাও ঠিক হয়নি। আমি কেন বললাম, তা জানি না। ও-কথা বলতে আমি ওর ঘরে, ওর কাছে যাইনি। ভাবিনি এত বড় কঠিন কথা এত সহজভাবে ওকে বলতে পারব। মানসীর সঙ্গে ছোটবেলা থেকে মিশেছি। খেলা করেছি, গল্প করেছি, মারামারি করেছি। আস্তে আস্তে আমরা দুজনে বড় হয়েছি কিন্তু তবুও দুজনে দুজনকে দূরে রাখতে পারিনি। কেউই পারতাম না। কোনদিনই না। ও যখন কলেজে পড়ে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ে তখনও না। ওর সঙ্গে সব রকম কথা বলেছি। শুনেছি। কেউই লজ্জা পেতাম না।

পরে আর কারুর সঙ্গে অমন করে মিশতে পারিনি। চাইনি। বন্যার সঙ্গে মিশেছি, গল্প করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল লেগেছে কিন্তু দুর্বলতা বোধ করিনি। বন্যা এলে ভাল লাগত, বন্যার কাছে গেলেও ভাল লাগত। ভাল লাগত ওর হাসি-ঠাট্টা-কথাবার্তা। ওর সান্নিধ্যেই আমার ক্ষত-বিক্ষত আহত মন সুস্থ হয়। স্বাভাবিক হয়। ওকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে। বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্র জ্বালা অনুভব করেছি কিন্তু ওকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিনি। বন্যা আমাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি তো?

জানি না।

এখানে এসে চিত্রলেখাকে দেখে, ওর সেবা-যত্নে মুগ্ধ হয়ে বন্যার প্রতি কোন অন্যায় করছি না তো? আমি বুঝতে পারছি না। বন্যা কোন প্রত্যাশা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কি?

আমি চলে আসার পর ওর মন নিশ্চয়ই কিছুদিন খারাপ ছিল। খুবই স্বাভাবিক। ওর চিঠিতে আমি তার স্পষ্ট আভাস পেয়েছি। আস্তে আস্তে ওর চিঠির সুর পাল্টেছে।...জানেন সাগরবাবু, আমার মনে হয় আমাদের এই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে। যেভাবে আমরা মেলামেশা করেছি তাতে অনেক কিছু হবারই সম্ভাবনা ছিল। সুযোগ ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়ত কিছু হওয়াই উচিত ছিল। কারণ ছিল। বোধহয় দু পক্ষেরই। সে-স্মৃতি মধুর হতো নাকি তিক্ত হতো, বলতে পারব না। সম্ভব নয়। তবে আজ মনে হয় ভালই হয়েছে। এমন অম্লান মধুরতার স্মৃতি সারাজীবন উপভোগ করব। আপনিও করবেন। তাই না?

মানসী আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে রইবে চিরদিন। চিরকাল। কিন্তু বন্যাকেও ভুলব না। কোনদিনই না। প্রথম প্রথম যখন জ্বর হচ্ছিল তখন ওর কথা খুব মনে হতো। মনে হতো মিসেস রায়ের কথা। তখন তো চিত্রলেখাকে কাছে পাইনি। পরমানন্দের কাছে মাঝে মাঝে ওর ডাক্তারদিদির কথা শুনেছি তবে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনিনি। শুনতে চাইনি। পারিনি। আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। দেখাও হয়নি। মুখোমুখি দেখা হয়নি। দূর থেকে কয়েকদিন দেখেছি। তাও সন্ধ্যার পর। আবছা আলোয়, আবছা অন্ধকারে ওকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। ভালভাবে দেখতে পারিনি। তখন ভাবতে পারিনি, কল্পনা করতে পারিনি ওকে এত কাছে পাব।

প্রথম যখন জ্বর হলো তখন গ্রাহ্য করিনি। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম করেছি। পরমানন্দ বারণ করেছিল। শুনিনি। ডাক্তার দেখাতে বলেছিল। রাজী হইনি। পরে যখন ও চিত্রলেখাকে ডাকল তখন আর আমার মতামত দেবার অবস্থা নেই। জ্বরে বেহুঁস। কোন চৈতন্য নেই। অনেক রাতে জ্বর একটু কমলে বিছানার পাশে একজন মেয়ে ডাক্তারকে দেখে হঠাৎ ভেবেছিলাম মানসী! মানসী যে বহুকাল আগেই সমস্ত হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে পাড়ি দিয়েছে, তা তখন খেয়াল হয়নি। মনে আসেনি। আমি নিশ্চয়ই ওকে মানসী বলে ডেকেছি, হুকুম করেছি, বকাবকি করেছি। হয়ত আরো কিছু।

অসুখ হলে আমার ভীষণ ভয় করে। ছোটবেলা থেকেই। কেন জানি না। অসুখ করলে একা থাকতে পারি না। আগে আগে অসুখ করলে মাগোকে আমার কাছে আটকে রাখতাম। কোন কাজকর্ম করতে দিতাম না। রান্না-বান্নার জন্য মাগোকে উঠতেই হতো। তখন মামা এসে বসতেন আমার কাছে। মামা অফিস যাবার পর মাগোকে আমার কাছ থেকে উঠতে হলে মানসীকে ডিউটি দিতে হতো। একটু বেশী জ্বর-টর হলে তো মামার অফিস যাওয়া, মানসীর স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ হতো। এবার দেখলাম আমার সে-অভ্যাস এখনও বদলায়নি। সারাদিন পরমানন্দকে কাছে রাখতাম। ঘরের বাইরে যেতে দিতাম না বললেই চলে। পরমানন্দও আমাকে একলা রেখে কোথাও যেত না। চিত্রলেখাকেও তাই। সকালে উঠেই ওকে হাসপাতালে যেতে হতো। যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো কিন্তু আমার জন্য ওর রাত্রে বিশ্রাম জুটত না। কত রাত্রে, কখন যে খাওয়া-দাওয়া করত, তাও জানি না। তখন আমি ওসব জানতে চাইতাম না। ওর সুখ-দুঃখের চাইতে আমার প্রয়োজনটাই তখন বড় মনে হতো।

প্রথম দিন রাত্রের কথা মনে নেই। পরের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখাকে আমার জন্য অত ঝামেলা সহ্য করতে দেখে ভীষণ লজ্জিত হলাম। এক হাতে সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা করা সহজ নয়। পরমানন্দ যাবার পরই ও দরজার পর্দা ছিঁড়ে, আমার বিছানা পরিষ্কার করে আমার টেম্পারেচার দেখল, স্টেথিসকোপ নিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করল, পেট টিপল, জিভ দেখল, পায়ের-হাঁটুর জয়েন্টগুলো টিপল। আরো কত কি! আমাকে ওষুধ খাওয়ালো। আমি এতক্ষণ কোন কথা বলিনি। চুপ করে ওর কথা শুনেছি। এবার একটু বিশ্রাম করবার জন্য চিত্রলেখা পাশের চেয়ারে বসল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'কেন?' চিত্রলেখা সত্যি অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'আমার জন্য আপনাকে কত কষ্ট করতে হচ্ছে অথচ......

'ওসব কথা এখন থাক।'

'আপনাকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার আমার নেই কিন্তু......

এবারও ও আমার কথা শেষ করতে দিল না, ডাক্তারের কর্তব্য আমি করেছি। রোগী হিসেবে এটুকু আপনার ন্যায্য প্রাপ্য।

রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমি হাসলাম। আপন মনে আবৃত্তি করলাম, আমার প্রাপ্য।

'নিশ্চয়ই।'

আবার হাসলাম। একটু চুপ করে রইলাম।

'আচ্ছা কাল রাত্রে আমি খুব চেঁচা-মিচি-বকাবকি করেছি, তাই না?'

'কি করে জানলেন?'

'অসুখ হলেই আমি সবাইকে জ্বালাতন করি।'

'সব ডাক্তার-নার্সকেই এসব জ্বালাতন সহ্য করতে হয়।'

আমি কচি বাচ্চা নই। আমি জানতাম, আমার জন্য কোন ডাক্তারই এমন জ্বালাতন সহ্য করবে না। করতে পারে না। কেন করবে? তার কি গরজ? রোগীর চিকিৎসা করা এক কথা আর তার দেখাশুনা সেবা-যত্নের ভার নেওয়া অন্য কথা। তাছাড়া চিত্রলেখা যে দরদ দিয়ে, আন্তরিকতার সঙ্গে, মনে-প্রাণে আমার চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন করেছে তার তুলনা হয় না। আমি মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে ভেবেছি ও এমন করে কেন আমাকে দেখেছে, আমার সেবা করছে। উত্তর পাইনি। তবে ওকে দেখে, দিনের পর দিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে কোথায় যেন ও আঘাত পেয়েছে। দারুণ আঘাত পেয়েছে। কেউ যেন ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।

চিত্রলেখার বয়স বেশী নয়। আমার চাইতে একটু ছোটই হবে। টল টল করছে ওর যৌবন। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন মধু ঝরছে। মৃগনাভী হরিণীর মত ও তো এখন পাগল হয়ে ছুটবে। মাতাল হয়ে ঘুরবে। ওর গন্ধ, স্পর্শ, চাঞ্চল্য আর সবাই মদির হয়ে উঠবে। কিন্তু চিত্রলেখা কেমন যেন নির্লিপ্ত। উদাস। নির্বিকার। আমি অবাক হয়েছি, বহুদিন অবাক হয়েছি ওর নির্বিকার নির্লিপ্তভাব দেখে।

একবার নয়, দু বার নয়, এক-দু দিন নয়, দিনের পর দিন ওকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে, নিবিড় ভাবে পেয়েছি। নানা সময়ে পেয়েছি। গোধূলির মিষ্টি আলোয়, রাতের অন্ধকারে। দারুণ বর্ষার দিনে ঝড়ের রাতে। কখনো ঘুমের মধ্যে, কখনো তন্দ্রায়। জেগে জেগেও ওর মৃগনাভীর গন্ধ পেয়েছি। দুর্বল শরীরেও চাঞ্চল্য বোধ করেছি।

'ডাক্তার!'

'বলুন।'

'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

মাথা টিপে দেব?'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

ডাক্তার কেমন একটু হাসল। আপন মনে, ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে। 'কষ্ট পাব বলেই তো এসেছি।'

আমি ওর হাসি, ওর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। তখন শরীর বা মন, কোনটাই তা চায়নি। আমি চুপ করে শুয়েছি। চোখ বুজে শুয়ে থেকেছি। চিত্রলেখা চেয়ারটাকে আমার চৌকির পাশে টেনে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার কপালে। মাথায়। বেশ লাগত। মাথার যন্ত্রণা কমত কিনা জানি না; তবে মনের যন্ত্রণা, অপরিতৃপ্ত মনের ব্যথা নিশ্চয়ই কমত।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে পড়েছি। অঘোরে ঘুমিয়েছি। খিদে পেলেও ঘুম ভাঙেনি। চিত্রলেখা ঘুম থেকে তুলেছে।

'সাগরবাবু! সাগরবাবু!'

ঘুমের মধ্যেই একবার চোখ মেলেছি। দেখেছি ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ডাকছে, সাগরবাবু! উঠুন।

আমি তবুও উঠিনি। এবার ওর ডাকাডাকিতে চোখ মেলে দেখেছি চিত্রলেখা আমার পাশে বসে গায় হাত দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে ওর কোলে হাত রেখেছি, হাতে হাত রেখেছি। বলেছি, আজ আর কিছু খাব না।

'না, না, তাই কি হয়?'

'সত্যি খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও একটু খেতে হয়।' চিত্রলেখা হরলিক্সের গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে আমাকে তুলেছে। মাথার তলায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে তুলেছে। আমার মুখের সামনে হরলিক্সের গেলাস তুলে ধরেছে। 'নিন। আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।'

আমি এক চুমুক খেয়েই মাথা কাত করেছি। ওর হাতে, গলার কাছে, বুকের পর। অসুস্থতার মধ্যে ঘুমের ঘোরেও আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি। নতুন অনুভূতির রসে মনটা ভিজে গেছে কিন্তু চিত্রলেখার কোন পরিবর্তন, কোন চাঞ্চল্য দেখতে পাইনি। কোন দিন পাইনি। মনে হয়েছে ও আমাকে কাছে নিয়েও যেন কত দূরে থাকত। হাতের পাশে থেকেও ও যেন দূরের আকাশে ভেসে বেড়াত। মহাশূন্যে বিচরণ করত।

ডাক্তারকে দেখতে ভারী সুন্দর। মুখটা ভারী মিষ্টি। কমনীয়। ও আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে যখন স্টেথো দিয়ে আমার বুক-পিঠ পরীক্ষা করত, তখন আমি এক দৃষ্টিতে ওকে দেখতাম। রোজ। না দেখে পারতাম না। দেখতে দেখতে মনে তৃপ্তি পেতাম। শান্তি পেতাম। আর? নতুন আশায় মন ভরে যেত।

মানসী চলে গেছে। আর কোনদিন ওকে পাব না। ওর গন্ধ স্পর্শ আর কোনদিন পাব না। অনেকদিন পাই না কিন্তু চিত্রলেখার গন্ধ-স্পর্শে পুরানো দিনের স্বাদ পাচ্ছি। পেয়েছি।

'কি দেখছেন?' চিত্রলেখা হঠাৎ জানতে চাইল।

'অনেক কিছু।'

'তার মানে?'

'অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত—অনেক কিছুই দেখছি।'

স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করতে করতে আমার দিকে তাকাল। 'কার? আমার না আপনার?

'হয়ত দুজনেরই।'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না।'

'কেন?'

'কেন?' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো ডাক্তার। একটু থামল। 'আমাকে নিয়ে কেউ ভাবে না। ভাববে না। আমিও ভাবি না।'

এসব কথা আমি বলতাম না। বলতে চাইনি। কিন্তু ডাক্তারকে যত দেখেছি তত বেশী মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে, আমার চাইতেও ওর অতীত ইতিহাস দীর্ঘ ও দুঃখের। আমার মনে অনেক ব্যথা, বেদনা। অনেক দুঃখ, অনেক চোখের জল। ডাক্তারের জীবনে যেন আরো কিছু, অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, চাপা পড়ে আছে। ওর চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়।

'একদিন আমিও আমাকে নিয়ে ভাবতাম না।'

আমার কথায় ডাক্তার হাসল। আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

আমি আর ওর কথার জবাব দিইনি। কি দেব? দেবার কি দরকার? ও যেভাবে আমাকে দেখত, সেবা-যত্ন করত, চিকিৎসা করত তাতে আমি বেশ বুঝতে পারতাম ওর মনটা কত নরম, কত দুঃখের। স্পষ্ট করে বুঝতে পারতাম আমার সেবা করে ও যেন ওর দুঃখের ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে। অতীতের কোন ব্যথা-বেদনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

চিত্রলেখা এখানে না থাকলে আমার কি হতো, জানি না। একা পরমানন্দ নিশ্চয়ই সামলাতে পারত না। মারা যেতাম না ঠিকই কিন্তু হাসপাতালের জেনারেল

CENTRAL LIBRARY

ওয়ার্ডে পড়ে থাকতে হতো দু' সপ্তাহ। না, না, ওসব ভাবার দরকার নেই।

•

পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে বসে আছি। ভাবছি। ওর ঘর থেকে ফেরার পর থেকেই ভাবছি। ঘুম আসছে না। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। বেশ রাত হয়েছে। বোধহয় সাড়ে এগারটা-বারোটা। হঠাৎ টেবিলের পর নজর পড়ল। ফ্লাস্কটা রয়েছে। পরমানন্দ যেভাবে রেখে গেছে ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে। ঘুমুতে যাবার আগে ঐ ফ্লাস্কের দুধ খাবার কথা। রোজ। দুধ খাবার দশ-পনেরো মিনিট পরে একটা ট্যাবলেট খেতে হয়। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই। ভাবি, ঘুমবার আগে দুধ আর ট্যাবলেট খেয়ে নেব। হয় না। ঠিক ঘুম আসার সময় ভুলে যাই। ঘুমিয়ে পড়ি। চিত্রলেখা এসব জানে। ও নিজে দুধ আর ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে বেশ কয়েক দিন। আজও দুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। ভাল লাগছে না। নিজের জন্য বেশী ঝুট-ঝামেলা ভাল লাগে না। সারা দিন পরিশ্রম করে রোজগার করা সম্ভব কিন্তু নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরী করতে বা এক মুঠো ভাত ফুটিয়ে নিতে বড় বিরক্ত লাগে।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। অসুখের সময় দু' সপ্তাহ এই দরজা সারা রাত খোলা থাকত। চিত্রলেখা অনেক রাত পর্যন্ত আমার এখানে থাকত। একদিন কি দুদিন সারা রাত থেকেছে। চিত্রলেখা যাবার পর চৌকিদার চেয়ার নিয়ে দরজার গোড়ায় থাকত। এখন আবার দরজা বন্ধ করে শুতে হয়।

'কে?' মনে হলো কে যেন উঁকি দিল।

'আমি, চৌকিদার।' বোধহয় সার্কিট হাউসের দিকে যেতে যেতেই উত্তর দিল।

বোধহয় ঘরে আলো জ্বলছে দেখে গেল। দেখে গেল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। ওর উৎকণ্ঠা, চিন্তা দেখে হাসি পেল। বই ডেরাডুনে এক আই-এর গেস্ট হাউসে তো কেউ এমন করে দেখে যায়নি। কত রাত কাজ করতে করতে আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু চৌকিদার আমার খবর নিতে আসেনি। আমি অসুস্থ হবার আগেও এই বুড়ো চৌকিদার এমনি করে আমাকে দেখত। বেশী রাত পর্যন্ত কাজ করতে দেখলে বারণ করত। আজ তো কিছু বলল না?

চিত্রলেখা? এত রাত্রে? চৌকিদারের কাছে খবর পেয়েই এলো?

আমি কিছু ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পেলাম না। ও প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের দুধ একটা কাঁচের গেলাসে ঢেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, খেয়ে নিন।

আমি একবার ওর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছু না বলে দুধের গেলাসে চুমুক দিলাম। দুধ খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের গেলাস হাতে তুলে দিল। দুধের গেলাসটা টেবিলে রেখে ট্যাবলেটটা তুলে নিল।

'ট্যাবলেটটা খেয়ে নিন।'

নিলাম। কিছু না বলেই খেয়ে নিলাম। ও জলের গেলাসটা টেবিলের 'পর রাখতে রাখতে বলল, শুয়ে পড়ুন। আলো বন্ধ করব।

'আপনি যান। আমি একটু পরে শোব।'

'আর পরে নয়, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে।'

'অনেক রাত হয়েছে বলেই কি ঘুম আসে?' একটু থেমেই আবার বললাম, এত রাত হলো অথচ আপনার তো ঘুম আসেনি?

ওর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললাম।

'চৌকিদার হয়ত কিছু ভাবছে। আমি যাই।'

আমার টেবিল লাইটের সুইচটা অফ করে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। ঘুম এলো না। আমার কি ঘুমুচ্ছে? একবার দেখতে পারলে হতো। ওকে দেখতে তীব্র ইচ্ছা করছে। একবার যাব? ঘুরে আসব ওর ঘর? যদি চৌকিদার দেখতে পায়? জানতে পারে? তাহলে তো সর্বনাশ! মহা কেলেঙ্কারী হবে। সকালে আর কারুর কাছে মুখ দেখান যাবে না। চিত্রলেখাও মুখ দেখাতে পারবে না।

না, না, তা হয় না। আমার একটা মর্যাদা আছে। সুনাম আছে। সবাই আমাকে ভাল মনে করে। ভাল বলেই জানে। সামান্য একটু ভাবাবেগের জন্য এই সুনাম, এই মর্যাদা নষ্ট করা উচিত? সাধ্য সম্ভব?

অসম্ভব। কল্পনাতীত।

কিন্তু ওকে দেখতে যে বড় বেশী ইচ্ছা করছে। দারুণ ইচ্ছা করছে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। এক মুহূর্ত দেরী সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা চৌকিদার শুয়ে পড়েনি তো? ও তো রাতভোর পরেই সার্কিট হাউসের বড় ড্রইংরুমের দরজার ধারে বিছানা করে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয়। রোজই ঘুমোয়। আমার অসুখের সময় আমার ঘরের দরজায় থাকত। ঘুমিয়ে থাকত। তবে মাঝে মাঝেই উঠত। আমাকে দেখত। জিজ্ঞাসা করত কিছু দরকার আছে কিনা। ওটা অভ্যাস। চৌকিদারী করার অভ্যাস। দরকার মত ঘুমুতে পারে, উঠতে পারে। এখন ঘুমুচ্ছে কি?

উঠতে গিয়েও পারলাম না। একবার নয়, অনেকবার। কিছুতেই পারলাম না। চিত্রলেখার জন্যই পারলাম না। আমার ঢেঙ্কানলের কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমার যাবার পালা। আমি চলে যাবার পর লোকে নিন্দা করলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওকে তো এখানে থাকতে হবে! চাকরি করতে হবে! আমি এমন কিছু করতে পারি না যার জন্য ওর কোন ক্ষতি হয়।

উঠলাম না। শুয়েই রইলাম। চুপ করে শুয়ে রইলাম। ঢেঙ্কানল ছাড়তে হবে। এবার কিছুদিন কটকে কাজ করতে হবে। তারপর ভুবনেশ্বরে। ঢেঙ্কানল ছাড়তে, ডাক্তারকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। মানসী যেন নতুন করে আমার কাছে এসেছে। ধরা দিয়েছে। ও যেন কটা বছর লুকিয়ে ছিল। আমাকে পরীক্ষা করছিল। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ও খুশী হয়েছে। আমার তীব্র ভালবাসার টানে আবার আমার কাছে এসেছে। ও যদি আবার লুকিয়ে পড়ে তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাব। এই এত বড় পৃথিবীতে আর একলা একলা থাকা সম্ভব নয়। একলা একলা সব দুঃখ সহ্য করলাম, করছি কিন্তু আনন্দের অংশীদার হবার সৌভাগ্য হলো না। হচ্ছে না।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই মনে হলো রাত ফুরিয়ে আসছে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘড়িটা দেখলাম। পাঁচটা বাজে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘড়িটা দেখলাম। পাঁচটা বাজে। চৌকিদার নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। এখন আমি উঠতে পারি। এখনও অন্ধকার আছে ঠিকই তবে অন্ধকারও ফিকে হয়ে এসেছে। এখন কেউ আমাকে দেখলেও কিছু ভাববে, সন্দেহ করতে পারবে না। মনে করবে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি।

সামনের দিক থেকে দরজাটা বন্ধ করে সার্কিট হাউসের দিকে এগুলাম। বারান্দায় উঠেই দেখলাম চৌকিদার মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

বেশী দূর এগুতে হলো না। চৌকিদারকে পিছনে ফেলে কয়েক পা যাবার পরই দেখি ডাক্তার। ও সন্ধ্যাবেলায় এই বেতের চেয়ারে বসে থাকে, জানি, কিন্তু এখন?

'এলেন?' খুব মিষ্টি শান্ত গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'এই শরীর নিয়ে সারারাত জেগে রইলেন?'

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন, ঘরে আসুন।

আমি ওকে অনুসরণ করে ঘরে গেলাম। বসলাম। দুটো বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে ওর বিছানায় বসলাম। ডাক্তার সামনের চেয়ারে বসল। মুখ নীচু করে বসল।

'সারা রাত বারান্দায় ছিলেন?'

'না।'

'এত ভোরে বারান্দায় গেলেন?'

'জানতাম আপনি আসবেন।'

'জানতেন?'

'হ্যাঁ?'

'আর কি জানেন?'

ও জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবছিল। ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে।

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি আপনার কথা।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ?'

'আমার কথা কি ভাবছেন?'

'ভাবছি না জেনে-শুনে আপনার কি ক্ষতি করলাম।'

'ক্ষতি?'

'ক্ষতি বৈকি!'

আমি হাসলাম।

'হাসবেন না সাগরবাবু। সত্যিই ক্ষতি করলাম কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ক্ষতি করতে চাইনি......

কথাগুলো শেষ হলো না। শেষ করতে পারল না। গলার স্বরটা বন্ধ হয়ে এলো।

'না, না, আপনি ক্ষতি করবেন কেন?'

'ক্ষতি করেছি নিশ্চয়ই। তা না হলে আপনার চোখের ঘুম কেড়ে নিল কে?'

'সে অপরাধে তো আমিও অপরাধী।'

বাইরের আকাশ একটু একটু ফর্সা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে এখনও বেশ আবছা অন্ধকার। তবুও আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডাক্তার কাঁদছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে গেলাম ওর কাছে। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললাম, কাঁদছেন কেন? কাঁদবেন না।

ওর চোখের জল বন্ধ হলো না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমি যে পরিত্যক্ত। আমি যে একজনকে নিয়ে ঘর করেছি। আমি তো আর......

আর পারল না। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমিও আর পারলাম না। দু' হাত দিয়ে ওকে টেনে নিলাম। বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। 'আপনি তো একজনের দ্বারা পরিত্যক্ত আর আমি যে সবার দ্বারা পরিত্যক্ত!'

'আমিও। আজ আর আমারও কোথাও স্থান নেই।'

'আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করেও বলছেন কোথাও স্থান নেই?' ...

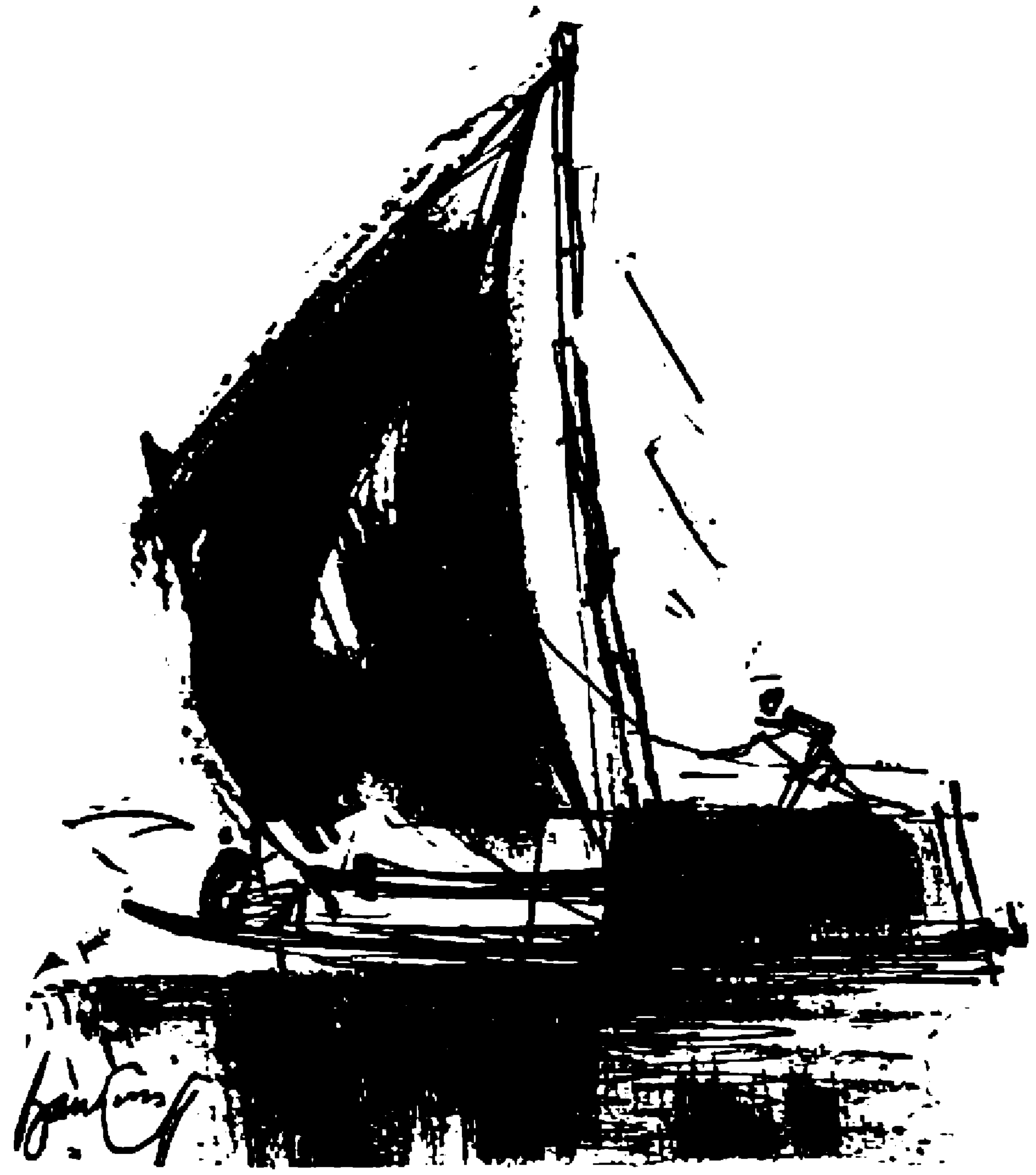

ডাক্তার কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ।

'চা করব?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'কেন?'

'আগে আসল প্রশ্নের জবাব দিন।'

'কোন প্রশ্নের?'

'আমি কি ঢেঙ্কানল ছেড়ে চলে যাব?'

'কেন? আমাকে সহ্য হচ্ছে না?'

'ভীষণ অসহ্য লাগছে।'

দুজনেই হাসলাম। প্রায় একসঙ্গেই হাসলাম।

'সত্যি চলে যাবেন?' আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'আজকালের মধ্যে কটকে যাবার কথা কিন্তু ইচ্ছা করছে না।'

'এখান থেকে যাতায়াত করলে চলবে না?'

'চলবে?'

'তাহলে যাবেন কেন?'

'যাব না?'

ডাক্তার আবার মুখ নীচু করল। আমি আলতো করে ওর মুখ তুলে ধরে দেখলাম দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে কাঁদছে। আমি আমার শেষ প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলাম, যাব না?

ও শুধু মাথা নেড়ে বল্লো, না।

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চীৎকার করলাম, ডাক্তার!

'আপনি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবেন না তো?'

আনন্দে, খুশীতে, উত্তেজনায় হঠাৎ বলে ফেললাম, শেষে কি ছেলেমেয়েদের কাছে ধর্কুনি খাওয়াবে?

লজ্জায় ডাক্তার আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল। পারল না। হঠাৎ এক ঝলক প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'চা করি?'

'কর।'

[সমাপ্ত]

অবিস্মরণীয় রাজীব রায়

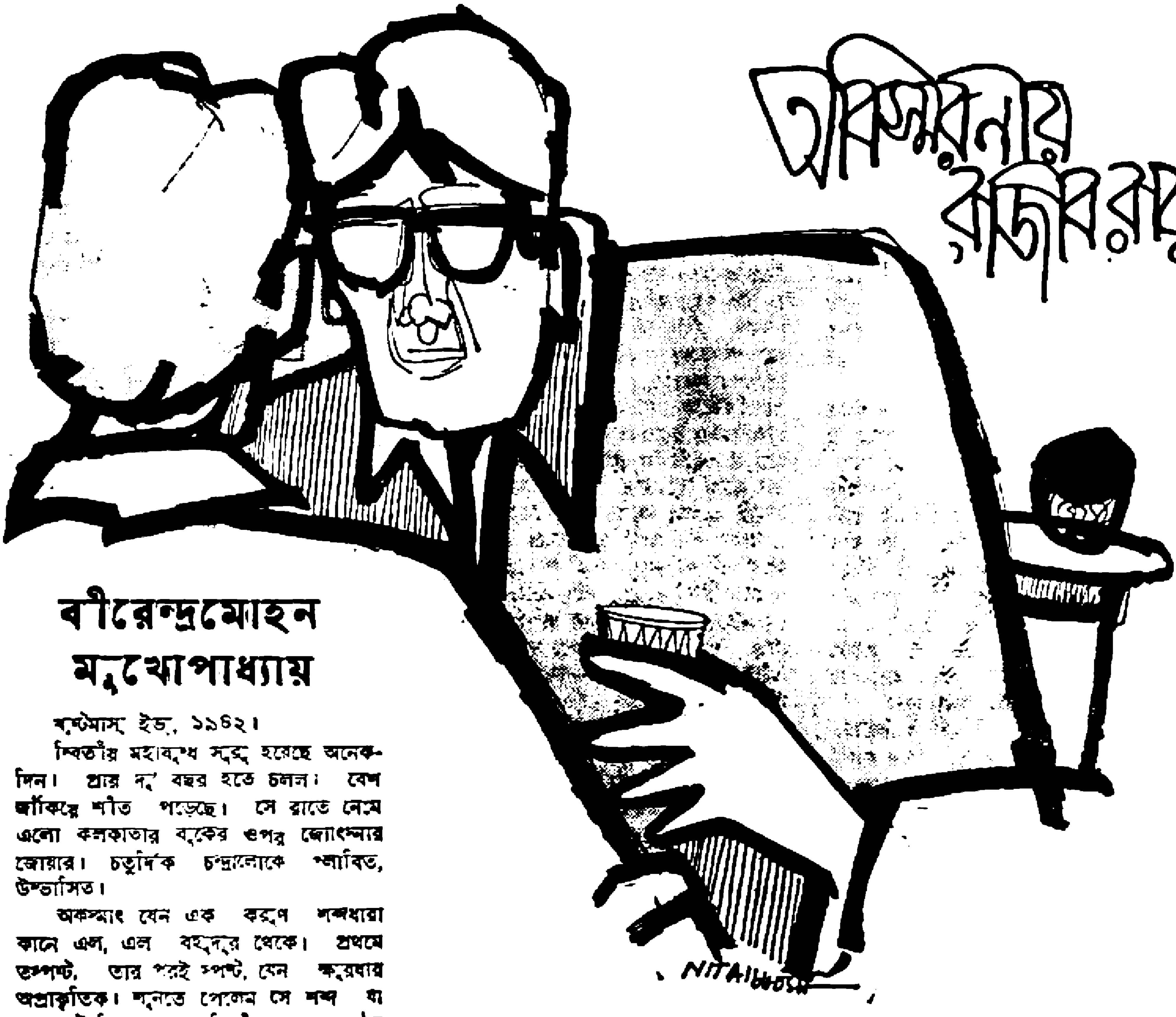

বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টমাস ইভ, ১৯৪২।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে অনেকদিন। প্রায় দু' বছর হতে চলল। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সে রাতে নেমে এলো কলকাতার বুকের ওপর জ্যোৎস্নার জোয়ার। চতুর্দিক চন্দ্রালোকে প্লাবিত, উদ্ভাসিত।

অকস্মাৎ যেন এক করুণ শব্দধারা কানে এল, এল বহুদূর থেকে। প্রথমে অস্পষ্ট, তার পরই স্পষ্ট, যেন কুৎসিত অপ্রাকৃতিক। শুনতে পেলেম সে শব্দ যা থেকে, উৎক্ষিপ্ত হয়ে ধরিত্রীর জ্বলন্ত জঠর থেকে, উৎক্ষিপ্ত হয়েছে চক্রবাল সন্নিহিত গভীর সানুদেশ থেকে, প্রথমে মৃদুস্বরে, তারপর ধীরে ধীরে তার ঊর্ধ্বগতি—তারা, তারা, সুনারা ছাড়িয়ে সপ্তগ্রামে গিয়ে পৌঁছল, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম হয়ে উঠল, ভেঙে পড়ল যেন নিস্তব্ধ, ভয়-ভীষণ স্পন্দহীন মহাশ্মশানে অজস্র ডাকিনীর মহাডাকে, মৃত্যুর মহা-আহ্বানে। সে যেন কুহকিনী সমুদ্র-নারীর অপার্থিব, বিরতিহীন, মায়াময় ক্রন্দনধ্বনি, যার সুর একবার নামে, আবার উঠে যায়, আবার নামে, আবার উঠে যায়।

সাইরেন। সাইরেন বাজছে। সাইরেনের কৌতূহলাক্রান্ত শব্দ, অপার্থিব শব্দ, নির্গত হচ্ছে যেন প্রেত-নিলয় থেকে, যে শব্দের মাঝে নিহিত হয়ে আছে ভয়াবহ অর্থ, অনিবার্য মৃত্যুর রহস্যময়তা, অনিবার্য ধ্বংসের মহাবার্তা। উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনলেম কয়েক মুহূর্ত। তারপরই সে শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল স্তব্ধ-পারাবারে।

জাপানী বোমা পড়ল। জাপানী বোমারুরা কলকাতার আকাশে হানা দিয়েছে। বোমা পড়ল লালবাজার ষ্ট্রীটে, বোমা পড়ল ওয়েস্টন ষ্ট্রীটে—কম্বুলিয়ার আশে পাশে, বজবজের ধারে ধারে। সবগুলোই মানুষ-মারা বোমা। কোথায় আগুন জ্বলে উঠলো, কোথায় ছাপাখানা জ্বলে গেল, সর্বত্রই আতঙ্ক। তবু দেখলেম, মানুষ কি করে বিপর্যয়ের রাত্রে সব মেনে নিয়েও বে-পরোয়া হয়ে যায়।

যখন সে জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছেচি, তখন দেখি চারিধারে বিভীষিকার চিহ্ন—সর্বত্রই ভয়ার্ত মানুষের দলে দলে অনুসন্ধান। কি হয়েছে? কত লোক মরেছে? কত ধ্বংস হয়েছে? নানা প্রশ্ন।

সেই সঙ্গেই সবার অলক্ষে, নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে সুরু হয়ে গেছে আর এক মারাত্মক আক্রমণ। কলকাতার হাটে-বাজারে জাল-ভারতীয় নোটে ছেয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মানুষ-মারার থেকে এটা আরও সাংঘাতিক, আরও ভয়ঙ্কর। এটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অতর্কিত আক্রমণ। এটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যকে পঙ্গু করে দেয়। এতে দেশবাসীরা আস্থা হারায় সরকারের ছাপা কারেন্সী নোটের ওপর। কোন্‌টা তারা নেবে? বিদেশীর ছাপা জাল নোট, না, সরকারের ছাপা নোট? বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল জনসাধারণের মনে—কিন্তু উপায় কি?

কি করে ধরা পড়ল জাপানী জাল সেটাই আমার বলা প্রয়োজন। এক দিন এক বাক্স একশ টাকার আর দশ টাকার নোট কারেন্সীতে পৌঁছল। আসল নোট আর জাল নোটে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু নম্বরে। একই নম্বর বারে বারে বিভিন্ন নোটের উপর ছাপা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল এ অদ্ভুত জাল-নোটের সৃষ্টি হোল কি করে? নোট কোথা থেকে এল? কেমন করে এল? কে ছাপালে? ইত্যাদি আশু তদন্তের হোল প্রয়োজন এবং সেই তদন্তের ভার শেষ পর্যন্ত আমারই বরাতে জুটল।

আমার তদন্তের কি ফলাফল হোল, কেমনভাবে তদন্ত করলেম এবং তার শেষ কোথায় হোল, সে সব আমার আখ্যান বস্তু নয়। উদ্দেশ্য আমার, যাঁর সাহায্যে তদন্ত

জানিয়েছিলাম, তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের ব্যর্থ আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পাঠকের কাছে তুলে ধরা। তাঁকেই আমি আমার চলার পথে পেয়েছিলেম নিবিড়ভাবে। বহুদিন হোল তিনি এ পৃথিবীর আলো-বাতাসের সম্পর্ক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন, জীবনের সব কিছু হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে বহুদিন হোল চলে গেছেন। কিন্তু তবু তাঁকে ভুলতে পারিনি। আজও তিনি আমার মনের কোণে, অলস মুহূর্তে সহসা ভেসে ওঠেন, বিস্মৃতির চিরান্ধকার ঠেলে দিয়ে। আজও যেন শুনতে পাই তাঁর ভারী গলায় মিনতিভরা শেষ প্রশ্ন, "বল ভাই, আজ যে অঙ্গীকার করলে তা রাখবে তো?"

নাম ছিল রাজীব রায়। এ নামে কারোর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। জানতাম না—চিনতাম না তাঁকে। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের এক প্রাচীন বান্দু সহ-আরক্ষাধ্যক্ষ আমাকে বললেন, "দেখ, সত্যি যদি এই নোট-জালের কিনারা করতে চাও, তবে যাও রাজীব রায়ের কাছে। আমি চিঠি দিচ্ছি। সেই চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তিনি সাহায্য করবেন যথাসাধ্য। এই আমার অনুমান। তিনি এখন একেবারে জীবন পালটেছেন—এখন আর সেই আগেকার দিনের মত, ভয়ঙ্কর জালিয়াৎ নন।"

প্রথমেই খট্‌কা লাগলো। জালিয়াৎ? জালিয়াৎ কি সাহায্য করবে? আর কেনই বা তাঁর সাহায্য নেবো? এতো অসঙ্গত কার্যপ্রণালী? এ তো বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থা? আমার মনের কথা যেন বহুদূর থেকে তিনি বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে অধর-প্রান্ত থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, "মাষ্টার! বুঝতে পারছো না। আগে তোমার জানতে হবে নোট জালিয়াতী কি? যেতে হবে বিশেষজ্ঞের কাছে, তাঁর পরামর্শ নিতে হবে। সরকারের ভাণ্ডারে এমন একজনও নেই যিনি তোমাকে এ বিষয়ে দক্ষ পরামর্শ দিতে পারেন। যদি সত্যি কেউ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকে তাহলে সে একমাত্র রাজীব রায়।"

গেলাম রাজীব রায়ের কাছে। মধ্য কলকাতায় এক বিখ্যাত ছাপাখানার তিনি ফটো-লিথো ডিপার্টমেন্টের কর্ণধার। পরিচয় দিলেন নিজের। পরিচয়-পত্রও দিলাম। তাঁর কাছে আসার কারণও জানালাম এবং দেখালাম আসল এবং নকল দশ ও একশ টাকার নোট, যা বাজারে ছেয়ে গেছে।

রাজীব রায় প্রথমে কোন মন্তব্য করলেন না। ধীরে ধীরে চুরুটে টান দিতে দিতে, একদৃষ্টে, একমনে সেই নোটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি চুপচাপ বসেই আছি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বলুন কি জানতে চান?"

প্রশ্ন করলাম,—এটা কি ধরণের জাল নোট? কি পদ্ধতিতেই বা ছাপা হয়েছে? আসল-আর নকলের তফাৎই বা কোথায়?

এগিয়ে আসুন কাছে। দেখুন। প্রথমতঃ এটা হাতে তৈরী নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা লিথোগ্রাফিও নয়, অর্থাৎ প্রস্তরাঙ্কন থেকে কাগজেও ছাপা নয়, যাতে হাত দিয়ে রং চড়ানো হয় আর বাদবাকীটা লিথিও-গ্রাফীর পদ্ধতি অনুসারে হয়। তা যদি হোত তবে নকল নোটের মুদ্রাঙ্কন নির্জীব হয়ে যেতো। স্পষ্টতার কোন চিহ্নই থাকতো না। একের পর এক যখন নোট ছাপা হোত তখন সে অঙ্কনের হোতো আরও দুরাবস্থা। তৃতীয়তঃ এটা ফটো-লিথোগ্রাফিও নয়, যেখানে এক আসল নোটের আলোকচিত্র লিথোগ্রাফের পাষাণ ফলকে স্থানান্তরিত করা হয়। তার আলোকচিত্রের একটা অঙ্কন কাগজে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। লিথোগ্রাফীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ত্রুটি থাকে, সেগুলো এ পদ্ধতিতেও থেকে যায়, একেবারে মিলিয়ে যায় না। তবে কি এটা ফটো রিলিফ ব্লক প্রণালীতে হয়েছে? তাও নয়? যখন বিরাট সংখ্যায় জাল নোট তৈরী করার প্রয়োজন হয় তখন সব সময়ে এ পদ্ধতি কার্যকরী হয় না। তবে আমার মনে হয় এ নোট তৈরী হয়েছে ফটো এচিং এবং ফটো এনগ্রেভিং প্রসেস-এ। এই পদ্ধতি অনুসারে তাম্রপত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটাই সব থেকে সুবিধাজনক পদ্ধতি, যার দ্বারা মুদ্রাঙ্কন কালি আর রং-এর সাহায্যে নোটের ছাপ তৈরী করা যায়।

যাক্! আপনি অত শত এক নিশ্বাসে বুঝে ফেলার চেষ্টা করবেন না—আর করলেও কিছুই হদিশ পাবেন না। শুধু এইটুকুই জেনে রাখলে যথেষ্ট হবে যে আসল নোট যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে, নকল নোট সেই একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আসল নোট যে অর্থব্যয়ে ছাপানো হয়েছে, নকল নোট ছাপানোর জন্যে প্রায় একই অর্থ খরচ হয়েছে।

আর আসল আর নকলের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন? সাধারণের দৃষ্টিতে কোন তফাৎই নেই। প্রথমেই দেখুন, কাগজের খড়মড়ে শব্দ এবং কাগজের আকুঞ্চন আসল আর নকল দুটো নোটেই এক। দুটো নোটকে মুড়লে দুটোই হাতে শক্ত ঠেকবে। কাগজের বুনানি দেখুন, দেখুন এর মনমরতা দুটোতেই এক। দুটোই ছাপা হয়েছে পার্থক্য প্রকাশক কাগজে। লক্ষ্য করুণ দুটোতেই বর্ণবিন্যাস এক, বর্ণের বিভিন্নতা দুটোতেই নেই। দুটোতেই অক্ষর ও সংখ্যা নির্ভিক ও স্পষ্ট। দেখুন রাজার মুখের গবাক্ষ, জলছবির বাতায়ন, অভরসূত্র। দুটোতেই কোন তফাৎ নেই। দুটো নোটেই লক্ষ্য করুন ছিদ্রচিহ্ন, যার উদ্ভব হয় তার দিয়ে নোট গাঁথা থাকলে, সে ছিদ্রচিহ্ন দুটোতেই বর্তমান এবং প্রতিটি নোটের দুটো ছিদ্রের দূরত্ব, ব্যবধান ও আকৃতি একই। আর একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করুন যে নোটের প্রান্তসীমায় সে চিত্রাঙ্কন এবং ভেতরকার নকসার যে সূক্ষ্ম রেখা-গুলি এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে গেছে সে-গুলো দুটোতেই স্পষ্ট, অভঙ্গ, কোন স্থানে এক রেখা অন্য রেখার উপর গড়িয়ে পড়েনি—কোথাও ডাবলিং-এর দোষে দুষ্ট নয়। তফাৎ শুধু নাম্বারিং প্যানেল-এ। এই নকসার সজ্জিতকরণ ঈষৎ বাঁকা। কিন্তু এটা সাধারণের চক্ষে ধরা পড়া অত্যন্ত কঠিন। দুটো নোটই ছাপা হয়েছে মুদ্রাঙ্কন বিশারদের দ্বারা, মহামূল্য যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আসল আর নকল নোট। তাম্রপত্র যা মহামূল্য লৌহপাত্র ব্যবহার করা হয়েছে দক্ষ সুকৌশলী এনগ্রেভার বা শিল্পক্ষোদনকারীর সাহায্যে।

কিন্তু কেন এক নম্বর! এটা তো বুঝতে পারলাম না? প্রশ্ন করলাম।

উত্তর অত্যন্ত সহজ। যাঁরা ঐ নোট ছেপেছেন তারা আমাদের দেশে নোট চালাতে চাননি। তারা চেয়েছেন বিভ্রান্তি। জনসাধারণের মনে এক প্রচণ্ড বিভ্রান্তি নিয়ে আসতে। তা হলেই তো তাঁদের কাজ হাসিল।

যখন তিনি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নোট-গুলোকে পরীক্ষা করছিলেন, তখন তাকে দেখাচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ আর্কিমিডিস। দেখছি তার বিরাট চশমায় আবৃত তীব্র দৃষ্টি। দেখছি—তার উদাত্ত গভীর রেখা-সঙ্কুল ললাটের নীচে ভ্রু-যুগল সুকুঞ্চিত। তার শ্বেতশুভ্র কেশদামের এক গুচ্ছ গড়িয়ে এসে পড়েছে কপালের উপর। কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। কোন পারাবারে জানিনে।

সেদিনকার মত বিদায় নিলাম। কিছুদিন পর তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের আদেশে নাসিকে গেলাম, সিকিউরিটি প্রিণ্টিং প্রেসে। আসল নোট ছাপা শিক্ষার জন্যে। রাজীব রায় যা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তার থেকে বেশী কিছু শিখিনি। সেই একই কথা।

এরপর কলকাতা ফিরে এসে রাজীব রায়ের সঙ্গে বহুবারই পরামর্শ করেছি। বহুবারই তার উপদেশ নিয়েছি, ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে চলে এসেছি তার অসঙ্গ-সঙ্গে, ঠাঁই করে নিয়েছি তার হৃদয়ের অন্দর মহলে। এখন আমি তার কাছে 'আপনি' নয়, চলে এসেছি 'তুমি'র পর্যায়ে।

একদিন কথায় কথায় বললেন, তুমি ভাই, আমার বাড়ীতে আসো না কেন? আমার সংসারের খবর তো তোমার জানার দরকার? গোয়েন্দা তো তুমি? তোমার তো জানা উচিত।

উত্তর দিলাম,—নিশ্চয়ই যাবো। সামনের শনিবারে।

সে শনিবারে, সন্ধ্যাকালে, রাজীব রায়ের গৃহে আমি হাজির। মারকাস স্কোয়ার অঞ্চলে তার ভাড়া বাড়ী। বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি আর বিলাসিনী। যাবামাত্র রাজীব রায় স্বয়ং দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, তারপর উচ্চৈস্বরে ডাকলেন 'বিলাসিনী। বিলাসিনী!' দেখলুম তাকে ছেলেমানুষের মত উৎফুল্ল, বোধকরি কিঞ্চিত মদ্যপানের ফলে। তাকে অফিসে যেভাবে দেখেছি সেভাবে যেন আর নেই।

উপর তলার সুসজ্জিত বসবার ঘরে বসলাম। টেবিলের উপর অর্ধনিঃশেষিত

বিদেশী হুইস্কির বোতল, কয়েকটি সোডা আর চুরুটের বাক্স।

প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আই মদ খাও? দেবো কি—একপাত্র?

উত্তর দিলাম—আজ্ঞে না। আমি খাই না। হঠাৎ তিনি বললেন, আজ আমার অনেক কিছু তোমায় বলার আছে। সেই কারণেই তোমাকে আমি এখানে ডেকেছি। বয়স আমার সত্তর বছরের আঙিনায় পৌঁছেছে। বয়সের ভারে ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়ছি। কতদিন যে বেঁচে থাকবো তা আমি জানি না। যাবার আগে তোমাকে যদি সব বলে যেতে না পারি—তোমাকে একটা ভার যদি দিয়ে যেতে না পারি, তবে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো না। সে কারণেই তোমাকে আমার আমন্ত্রণ।

জানিনে আমার দ্বারা তোমার কতটুকু উপকার হয়েছে, হয়তো হয়েছে, হয়তো বা নয়! কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ আর নয়। আজ তোমার কাছে আমার একটা আবেদন, একটা অনুরোধ! সেটা তোমায় রাখতেই হবে।

কড়া হুইস্কিতে দু চুমুক দিয়ে তিনি বলতে সুরু করলেন,—এতদিনে নিশ্চয়ই তুমি আমার ইতিবৃত্ত গোয়েন্দা বিভাগের ফাইলে দেখেছ—তার মধ্যে অনেক সত্য আছে আবার অনেক মিথ্যাও আছে। আমি যুধিষ্ঠির নই, বাল্মীকিও নই বা পাপাত্মা দুঃশাসনও নই। আমি যা, আমি তাই। কেউ আমাকে ছোট করে দেখে, কেউ বা মায়া করে আমাকে বড় করে ভাবে। আমার কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমার জীবনের যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে জানাবার সময় এসেছে—সেটা হয়তো তোমার গোয়েন্দা দপ্তরের রেকর্ডে পাবে না। মুস্কিল কি জানো? বড় ঘনিষ্ঠ তুমি হয়ে গেছ আমার কাছে। তোমার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর যে কোন উপায় নেই।

—জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার এক গ্রামে, এক ধার্মিক পরিবারে। পিতা ছিলেন তখনকার দিনে ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের এক উচ্চ কর্মচারী। পড়াশুনোয়, বিশেষতঃ বিজ্ঞানে আমি সব সময়েই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি—কোথাও পেয়েছি মেডেল, কোথাও বা পারদর্শিতার জন্য স্কলারশিপ। যখন কলেজের শেষ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলাম তখন পিতা আনন্দে আত্মহারা। পুত্রের কৃতিত্বের গর্ব কোথায় যে রাখবেন তা জানেন না। স্থির করলেন বিলাতে পাঠাবেন ছাপাখানার কাজে পারদর্শিতা লাভ করার জন্যে। জানতে চাইলেন আমার মনোভাব। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। বিলাত যাবার সব ব্যবস্থাই ঠিক হোল।

কিন্তু বাদ সাধলেন আমার মা। বললেন, না, না বিয়ে করে ওকে যেতে আমি দেবো না। বিয়ে করুক। তারপর চলে যাক। মার মনে কেন এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল জানিনে। হয়তো বা ভালোর জন্যে। হয়ত বা ভুলবশতঃ। যাই হোক আমার বিয়ে হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড সম্ভ্রান্তশালী ঘরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে—অর্থের শেষ নেই, সম্পত্তির নেই পারাপার। বিলাত যাত্রার বিলম্ব হয়ে গেল—কেটে গেল দু বছর। কিন্তু তার মধ্যেই আমার দুটি পুত্রসন্তান হয়ে গেছে।

তারপরই বিদেশে পাড়ি দিলাম অকূল সমুদ্র-যাত্রায়। বোঝো তুমি, তখনকার দিনে সমুদ্র-যাত্রা কাকে বলে? যেন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছি সমস্ত বন্ধন। মাতার অশ্রুপাত, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুই আমাকে দমাতে পারলো না।

বিলেত গিয়ে এক বিরাট ছাপাখানায় যোগ দিলাম, সেই সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে। এক বছরের মাঝেই সেই বছরের শ্রেষ্ঠ লিথোগ্রাফার এবং শ্রেষ্ঠ এনগ্রেভারের পদক পেলাম। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। পিতাকে জানালাম এখানে যা শেখার সবই শিখে নিয়েছি, ডিপ্লোমা পেয়েছি, সার্টিফিকেট পেয়েছি। ছাপাখানার সব কাজেই দক্ষতা আহরণ করেছি। এখন চলে যেতে চাই। অন্য কোথাও, যেখানে আরও গবেষণার ব্যবস্থা হতে পারে। পিতা জার্মাণীর এক বিখ্যাত ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারা রাজী হলেন আমাকে শিক্ষানবীশ রাখতে। এক বছরের মধ্যেই আমি এনগ্রেভিং বিভাগের কর্মকর্তা হলাম।

কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রপাত। যখন আমি অনুশীলন করছি একটার পর একটা, তখন এক পার্টিতে দেখা হোল কুমারী রিক্মীর সঙ্গে। অশুভ মুহূর্তে, অশুভ দৃষ্টি। একসঙ্গে মদ্যপান করলাম, নৃত্য করলাম বাহুবন্দী হয়ে। কিন্তু তারপর হাজার চেষ্টা করেও রিক্মীর উপর আসক্তি থেকে মুক্তি পেলাম না। সে তীব্র আকর্ষণ কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। রিক্মী ভিড়িয়ে দিলেন কয়েকজনের সঙ্গে যাদের অতীত জীবন হয়তো বা পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আমি তাদের পছন্দ করতাম না। তবু তাদের অবাধ অনুসন্ধানের পথ থেকে সরে থাকতে পারলাম না। রিক্মীর মোহে তখন আমি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

মনে পড়ে একদিন সুইটজারল্যান্ডে বেরুন-এর পথে পথে ঘুরছি। আমার সঙ্গিনী রিক্মী। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি তো ছাপাখানা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো, নোট জাল করার পদ্ধতি আমার বন্ধুরা শিখতে চায়—তাদের তুমি শিখিয়ে দাও না কেন? তারা বলেছে যা রোজগার হবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমাকে দেবে।'

মনে হোল যেন রিক্মীকে ছুঁড়ে মারি, আছড়ে মারি, এই অসম্ভব রোমহর্ষক প্রস্তাবের জন্যে। কিন্তু তারপর। পারলাম না। রিক্মীর চোখের জলে আমার যত রাগ, যত স্পন্দন কোথায় যেন ধুয়ে মুছে গেল। তার প্রস্তাবে রাজী হলাম দুই শর্তে। আমি শিখিয়ে দেবার পর কোনদিন আর তারা আমার সঙ্গে দেখা করবে না। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ যা কিছু রোজগার হবে তার এক তৃতীয়াংশ যেন তারা আমাকে দিয়ে দেয় রিক্মীর মারফৎ।

তিন বছর ছিলাম জার্মাণীতে। অর্থ অভাব ছিল না! প্রায় লক্ষপতি হয়ে দিরে ছিলাম। তারপরই হয়ত একদিন ধরা পড়ত কিন্তু তার আগেই আমি জানতাম রিক্মীর দলটাও ওরা ধরা পড়বে। ডিপ্লোমা, ডিগ্রী আমি বহু পেয়েছি। কিন্তু জার্মাণীর কাছে শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমা নেবার আগেই আমি দেশে পাড়ি দিলাম।

মনে পড়ে রিক্মী পথপথে অনেকটা এগিয়ে দিল। এখনও চোখে ভাসে বিদায়-কালে তার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল। ভারতে এসে রিক্মী ও তার বন্ধুদের কোন খোঁজ রাখিনি। তিন বছর পরে খবর পেলাম কারা যেন রিক্মীকে খুন করেছে। আমি বেঁচে এসেছিলাম দলের আওতা থেকে। কিন্তু কেউ যদি আমাকে যথাসময়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে, তবে সে রিক্মী। যখন দল ধরা পড়ল, ওদের দলের একজন আমার সত্যাকারের নাম ধাম, পাবার জন্যে রিক্মীর কাছে জোর করে আদায়ের চেষ্টা করল। কিন্তু রিক্মী নিরুত্তর—সে আমার কোনদিনই ধরিয়ে দেবে না—এই ছিল তার অঙ্গীকার। রিভলবারের গুলীতে সে প্রাণ দিল—তবু অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা কখনও তার মনে হোল না। আমি বেঁচে গেলাম, রইলাম অনেক দূরে, হয়তো অনেক শান্তিতে।

কিন্তু ভুল? আমি কি শান্তি পেলাম আমার দেশে? কাজ পেয়ে গেলাম এক বিরাট ছাপা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু শীঘ্রই সেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানের এক অংশীদারের সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা হোল। তিনি আমার জাল নোট করার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

সুরু হয়ে গেল কাজ, জাল নোট ছাপা। সেই ছাপাখানাতেই একাংশে সুরু করলাম জাল নোট করার ব্যবসা। এক এক দিনে হাজারও নোট তৈরী হয়। জাল করবার চলতে লাগলো বেশ—দু তিন মাসের মধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আমার ভাগে এল। কিন্তু তারপরই ঘটল বিপর্যয়। আমার এক বিশ্বস্ত কর্মীর সঙ্গে মতবিরোধ হোল টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে। সে আমাকে ব্যবসা গুটোতেও সময় দিলে না। পুলিশে খবর দিল।

একদিন প্রত্যুষে কাকপক্ষী জাগবার আগে গোয়েন্দারা আমার বাড়ী আর ছাপাখানা ঘিরে ফেললো। আমার বাড়ীতে ও প্রেসে জাল নোট তৈরী করার অনেক কিছু সরঞ্জাম পাওয়া গেল—আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীসবুদের অভাব হোল না। মামলায় আমার দশ বছর জেল হোল। আমার দুঃখ ছিল না, ক্ষোভ ছিল না, আমি অপরাধী! অপরাধের শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। শুধু এই ভেবে দুঃখ পেয়েছিলাম যে কেউ কাউকে যদি হত্যা করে থাকে, তবে সে আমি নিজেকেই নিজে করেছি। জানো! জানো তারপর কি হোল?

উত্তর দিলাম, জানি। আমি আপনার ডাইরী পড়েছি। আপনার চিঠি দেখেছি সব চমৎকার লেখা। কি অদ্ভুত হস্তাক্ষর যেন ক্যালিগ্রাফিক আর্ট। কেউ বুঝবে না যে সেটা জাল নয়। সেই চিঠিতে পরিবেশন ছন্দে কৃত জন্য আপনার অনু-সার—আপনার বিনীত প্রস্তাব।

ঠিক বলেছ! আমি যে একজন আর্টিস্ট এটা ওরা ভুলেই গিয়েছিল, আমি ছিলাম

সব্যসাচী। দুই হাতই আমার চলত। একাধারে আমি আর্টিস্ট, ডিসাইনার, ফটোগ্রাফার, প্রোসেসার, এনগ্রেভার, ব্লক-মেকার কি নই? স্যর চার্লসকে জানিয়েছিলাম যদি কেউ কোনদিন জাল নোটের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে, তবে সে আমিই পারবো। আমি অনুতপ্ত। দশ বছরের মধ্যে পাঁচ বছর জেল জীবন কাটিয়েছি, এবার আমার মুক্তি দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার সাহায্যে নিশ্চয়ই আসব।

সে সব দিনে পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতার অন্ত ছিল না—বিশেষ করে স্যর চার্লসের মত দক্ষ কর্মচারীর। তিনিও দেখলেন এই সুযোগ, আমার সহায্যে জালিয়াতীর কেন্দ্রগুলিকে সমূলে উৎপাটন করবেন। তার ক্ষমতা যেন চীফ সেক্রেটারীর মত, তখনও পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ স্যর জোন অন্তার্যমান অস্তিত্বের ধারা তার মত লোকই অব্যাহত রেখেছেন। নিজের দেশে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন তার নিরলস কর্মোদ্দীপনার জন্য, সেই আন্দোলনের সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের অভ্যুত্থান তিনি নির্মম হস্তে দমন করতে তখন বদ্ধপরিকর। কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে?

স্যর চার্লসের হস্তক্ষেপের ফলে পাঁচ বছর জেল খাটার পর রাজীব রায় মুক্তি পেলেন। সেই থেকে সুরু হয়ে গেল রাজীব রায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দীর্ঘ পদযাত্রা। সেই থেকে সুরু হোল অঙ্গীকার পালনের জন্য অকুণ্ঠ ক্লেশ স্বীকার। স্যর চার্লস রাজীবের কল্যাণে জালিয়াত গোষ্ঠী নির্মূল করলেন। তার মনোভিলাষ পূর্ণ হোল।

জেল থেকে যখন ফিরে এলাম জানো? দেখলাম আমার কেউ নেই। আমাকে কেউ চিনতেই পারে না। আমার স্ত্রী নয়, আমার দুই ছেলেও নয়। মাতাপিতা দুজনেই তখন স্বর্গত। স্বগৃহে যেন অপরিচিত, অবাঞ্ছিত, অনাহূত। শুধু সেই বাড়ীতে কাটালাম দশ মাসকাল জোর করে। কিন্তু তার পরই বিদায় নিতে বাধ্য হলাম। স্ত্রী আমাকে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন যে চোরের সঙ্গে সহবাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাছাড়া তার ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার একমাত্র অনুরোধ আমি যেন কোনদিন তার বাড়ীতে পদার্পণ না করি। মেনে নিলাম বাধ্য হয়ে স্ত্রীর নির্দেশ। তাছাড়া বাড়ীর ওপর তার কি অধিকার? সে সম্পত্তি তো নিছক তার স্ত্রীর? কিন্তু গৃহত্যাগের আগে জানলাম এক অমোঘ সত্য, আমার স্ত্রী তৃতীয়বারের মত সন্তান-সম্ভবা।

তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী। আমাকে দেখবার কেউ নেই। শুধু আছে বিলাসিনী। বাড়ী ভাড়া করলাম মার্কাস স্কোয়ারে তারপর পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় চাকরী পেলাম, বড় চাকরী প্ল্যাটো মাইনে। এর থেকে চোদ্দগুণ বেশী মাইনে পেতাম জার্মানীতে, কিন্তু সে কথা ভুলে যাওয়াই ভালো।

যখন আমি নোট জাল করি তখন এক সন্ধ্যায় বিলাসিনীর সঙ্গে দেখা তারই গৃহে। তিনি তখন ছিলেন নিছক বারবণিতা। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিলাসিনী আমার সঙ্গে হৃদয় বদল করলেন। আমাকে শ্রদ্ধা, স্নেহ, যত্নে ঘিরে ফেললেন। তখন থেকে বিলাসিনী পৃথিবীর কাছে বারবণিতা হতে পারেন—আমার কাছে তিনি স্ত্রী, আমার সহধর্মিণী। আমার ব্যবসা নিয়ে বিলাসিনীর সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডা, কত না তর্ক বিতর্ক হয়েছে। বিলাসিনী আমায় বারে বারেই বারণ করেছে সে পথে যেতে। কিন্তু তার কোন কথার দাম দিইনি, যেহেতু সে দাম দাবী করেনি কোনদিন। মনে পড়ে, যখন আমি জেলে, কতদিন কত ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় সে আমার জেলখানার দরজায় হাজির হয়েছে খাবার নিয়ে। রোগক্লান্ত দেহ নিয়ে রোজই হাজির আমার কাছে। কত মানা করেছি আমি, করেছি কত ভর্ৎসনা, কিন্তু কোন মানাই সে আমার শোনেনি। তারই অনুরোধে আমি বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম সহজ সরল জীবনযাপন করব বলে। কিন্তু সে আমার ভাগ্যে জুটল না। কেন সে এরকম করবে? কেন? সবাই যখন ছেড়ে গেল বিলাসিনী কেন ছাড়ল না? তার পয়সা নেই, কড়ি নেই, তবু কেন ধন করে সে আমার সুখের দিকে, শান্তির দিকে চেয়ে থেকেছে। স্ত্রী-চরিত্র আমি কিছুই বুঝি না। দেবতারাই বোঝেন না, আমি তো সাধারণ মানুষ। আমি মনস্তাত্ত্বিকও নই। তবে আমার মনে হয় কি জানো। মনে হয় যখন কোন নারী সত্যকারের কোন পুরুষকে হৃদয় দিয়ে দেয়, তখন সে দানের তুলনা হয় না—সেখানে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না সবটাই দেওয়া—কোথাও মন ভোলানো নয়, মন খেয়ালে, কোথাও স্বার্থের বস্তু-কামনা নয়, ত্যাগের আত্মাহুতি। সে প্রেমে সুখ নেই, আছে আনন্দ, আক্রম নেই, আছে মধুর অবকাশের দিগন্তের প্রান্তর, আহার নেই, আছে মুক্ত বিহার, বলগাহার প্রাধান্য নেই, আছে নিঃস্বতার গৌরব। সেখানে দোহন নেই, বন্ধনও নেই।

আজ আমার বিলাসিনীর যৌবন নেই, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। তবু সে আমাকে ভোলে নি। আমার কেউ নেই জীবনে আছে শুধু বিলাসিনী আর আমার ছোট ছেলে যার কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

বড় ছেলে আমার ইঞ্জিনিয়ার, বিরাট ফ্যাক্টরীর কাজ করে। দ্বিতীয় ছেলে সেও সুবিখ্যাত রাজকর্মচারী। কিন্তু আমার ছোট ছেলে? স্কুলে তখন পড়ছে। কি সুন্দর চেহারা। মনে পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে যেতাম খেলনা কিনে নিয়ে তখন সে শিশু। সে এলেই কত না চুমা খেতাম, কত না আদর করতাম। সে সর্বদিন আজ স্বপন বলে মনে হয়। আমার বাড়ীর বাসিন্দারা কেউ যে আমার শিশুর সঙ্গে মিলনের খবর জানতেন না তা নয়—সবাই তা জানতো, লক্ষ্য করতো, কিন্তু আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে দিতো না।

কিন্তু বিধির বিপাক কেউ রোধ করতে পারে? কিভাবে আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমারই মত কীর্তিমান হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ করার পর তাকে জার্মানীতে উচ্চশিক্ষাতে পাঠানো হোল। আমার কত আনন্দ, কত গৌরব সে কারুর কাছে প্রকাশ করিনি—শুধু আনন্দ পেয়েছে বিলাসিনী আমার ছেলের গৌরবে। কিন্তু তারপর? আমারই মত উচ্চশিক্ষার্থে গেল জার্মানীতে। সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে এলো। তারপর বিহার গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরী পেল। কিন্তু তারপর? জানো? জানো? এক অস্বাভাবিক স্বপ্ন তার গলায় পর্দায় চড়ে উঠলো। জানো? শোন তো? জান কি? সে আমারই পথ নিয়েছে, আমাকেই অনুকরণ করেছে। নোট জাল করার জন্যে বিহারে ধরা পড়েছে। তুমি? তুমি কি তাকে বাঁচিয়ে বলবে না ক্রাইম নেভার পেইস?

সেদিন রাত্রি গড়িয়ে আসছিল। বললাম, এবার তো আমায় যেতে হবে?

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বিলাসিনীর প্রবেশ। সুদীর্ঘ দেহ, বয়স প্রায় পঞ্চাশোর্ধ। সামনে নিয়ে এসেছেন উজাড় করে খাদ্যের পূর্ণ তালিকা। পরিচয় করে দেয়, এই আমার বিলাসিনী। আর এই আমার গোয়েন্দা ভাই।

বিদায় সময় হোল। রাজীব রায়ের কাছে যখন বিদায় নিলাম তখন তার অনেক মদ্যপান হয়ে গেছে। প্রশ্ন করলেন, আমি পুরো পড়বো তাই। উত্তর দিলাম নিশ্চয়ই। যখন চলে যাচ্ছি তখন বিলাসিনীকে দেখি দরজার পাশে, আধো আলো, আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছেন।

কিন্তু সেই থেকে বেশ কিছুদিন রাজীববাবুর কাছে যাওয়া হয় নি। কার্যোপলক্ষে চার মাসকাল কলকাতার বাইরে ছিলাম।

এক সন্ধ্যায় রাজীববাবুর গৃহে হাজির হলাম। সব যেন নিস্তব্ধ, নিঝুম, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়লাম। বিলাসিনী এসে ধীরে ধীরে দ্বার খুলে দিল। প্রশ্ন করলাম, রাজীববাবু কি নেই? সংক্ষিপ্ত উত্তর, হাঁ! আছেন। উপরে। আপনি আসবেন?

দেখি রাজীববাবু শয়নকক্ষে শয্যাশায়ী, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে। রক্তহীন, নিষ্প্রভ চোখের স্তিমিত দৃষ্টি অসহায়ের মত আমার মুখে পড়ে রয়েছে। দেখলাম তার দীর্ঘ অধর-যুগল ঈষৎ কেঁপে উঠলো। কি যে বললেন বোঝা গেল না। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, —আপনি কি কিছু জানাতে চাইছেন আমাকে?

সামান্য ঘাড় নাড়লেন। একবার তার হাত আমার হাতের উপর রাখলেন। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, ভাই মনে রাখবে তো তোমার অঙ্গীকার? আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জীবনের সহজ পথে, সরল পথে। বুঝিয়ে দেবে তো ক্রাইম নেভার পেইস।

উত্তর দিলাম কথা দিচ্ছি। খুব চেষ্টা করবো। সেই সময়ে দূরে শয্যার এক পাশে বসে আছেন বিলাসিনী। বসে আছেন ধীর, স্থির, নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

মাসা দাউদের মড়ার চোখ নির্ণিমেষে চেয়েছিল আধখানা করোটির দিকে। বীভৎস সেই দৃশ্য। মিসেস ফ্যান্টোমাসের এহেন হাল—এ যে কল্পনারও অতীত। দারিদ্রেও যাকে ভয় পেয়েছে, লোহডোমও যার শক্তির কাছে বালখিল্য, ফ্যান্টোমাস কাহিনীর দুর্ধর্ষ ফ্যান্টোমাসের মত যার আসুরিক ক্রিয়াকলাপ—সেই স্ত্রীলোকটি আজ বিগতপ্রাণ। ধূলি ছাতু। মজ্জা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত।

মিসেস ফ্যান্টমাস মৃত। কিন্তু তার ঘাতক যে তার চাইতেও কি বিপুল শক্তির ধারক—শোচনীয় এই মৃত্যুই তার প্রমাণ। মাসা দাউদের বরফ খণ্ড চোখ বরফ খণ্ডই থাকে, কিন্তু চঞ্চল হয় মস্তিষ্ক। ভয়াবহ সত্তাটা যেন বৃশ্চিক হয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে মগজটাকে।

থানডার! থানডার! নৃশংস থানডার! অশরীরী ছায়ামানবের মতই যার কীর্তি কিংবদন্তীতে পরিণত! ভয়ঙ্কর সেই চাণক্য চাকলাদারের অবিশ্বাস্য শক্তি স্বচক্ষে দেখে মাসা দাউদও আজ চঞ্চল।

ঘরে ঢুকল মাংচু—"সর্বনাশ হয়েছে।"

বরফ খণ্ড ফিরল সেইদিকে—"কি হয়েছে?" ঠাণ্ডা গলা। বরফের মতই।

"ট্রান্সমিটার বাগিয়েছে থানডার।"

"কোথায়?"

"ওপরতলার জানলায়। ছোট্ট রেডিও-ট্রান্সমিটার। বেলুনে দিয়ে এরিয়েল হয়েছে। এতক্ষণে ওদের সকলে সজাগ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই খবর যাচ্ছে তো।"

"হুঁ।" কিছুক্ষণ চুপ। "হীরের বাক্স আছে, না, গেছে?"

"গেছে। থানডার সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

চেয়ে রইল মাসা দাউদ। তুষারবৎ মুখ নির্বিকার—"পাহারায় কারা ছিল?"

"কেউ বেঁচে নেই। চক্ষের নিমেষে খুন হয়েছে।"

"হুঁ।" চিবুক চুলকোলো মাসা দাউদ।

"হুকুম দিন। কি করবো?"

"আটজনকে ওরা দুজন শেষ করেছে। হাতে আছে আরও ছিয়াশিজন। চারজন আমার সঙ্গে লণ্ডনে চলুক। তুমিও। বাকি সবাই ওদের খুন করে হীরে নিয়ে লণ্ডনে আসুক। যাও।"

"লণ্ডনে?"

"উত্তরে। এক ঘণ্টার মধ্যে এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে। রেডিও ট্রান্সমিটারের খবর পেয়ে ওরা বসে নেই। ধরা পড়তে চাও?"

"না।"

"তবে যাও।"

উধাও হল মাংচু।

●

ইঁদারার তলায় পড়ে রইল হীরে ভর্তি পেটিকা।

ইসাবেলকে কাঁধে নিয়ে তরতর করে নেমে এল চাণক্য। বিড়াল ঠাকুরের মত ক্ষিপ্রতা। ফসফরাস চোখে শ্বাপদ চাহনি।

পাহাড় যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে, সেইখানে শেষ হয়েছে গোপন সিঁড়ি। নিঃসীম অন্ধকার। তাই একটা পেন্সিল টর্চ দাঁতে কামড়ে ধরল চাণক্য।

ছ'ঘণ্টার পাহাড় আর খোপ পেরিয়ে, মূল পথ এড়িয়ে, অন্ধকারে গা ঢেকে কিভাবে বন্দরের আড়ালে পৌঁছোলো দুজন—বিস্তারিত সেই কাহিনী এখানে

মিশ্রয়োজন। দুই বালিয়াড়ির মধ্যে একটা ভাঙা দেউল। শীর্ষে মহাকালের প্রস্তর মুখ সাগরের দিকে ফেরানো। প্যাগোডা দ্বীপে এককালে ব্রাহ্মণধর্মের আধিপত্য ছিল—বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে গড়া এই মন্দির তার শেষ চিহ্ন।

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ তখন সবে উঁকি দিয়েছে। দূরে কাঠের জেটিতে ভাসছে লঞ্চ। আরও দূরে মাসা দাউদের জাহাজ।

আলো জ্বলছে লঞ্চে। জাহাজেও। গুলীবর্ষণের শব্দে সচকিত সবাই। অর্থাৎ চুপিসাড়ে লঞ্চ দখল এখন অসম্ভব।

ইসাবেলা এলিয়ে পড়েছে। দুপাশে বালির পাহাড়ের মধ্যে শুয়ে আছে চিত হয়ে। তারা দেখছে। চাঁদের আলোয় বিবর্ণ মুখ ব্লটিংয়ের মত শুষ্ক।

ঝুঁকে পড়ল চাণক্য। রক্তক্ষরণে বাহিল হয়ে পড়েছে ইসাবেলা। তাই আগে প্রয়োজন ফার্স্ট-এইড। পেন্সিল টর্চের তীক্ষ্ণ রশ্মিরেখা গিয়ে পড়ে ঊরুর ক্ষতে।

পর-পর দুটি ছিদ্র। রক্তে ভেসে গেছে প্যান্ট। রক্তে মাখামাখি চাণক্যের পিঠও। তবুও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চাণক্য। কেননা, ঊরুর ঠিক ছেদেও দুটি ছিদ্র।

মন্ত্র মানে। সাবমেশিনগানের জোড়া বুলেট ঊরুতে প্রবেশ করলেও হাড়ে আটকে নেই—ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে পেছন দিয়ে।

জ্যাকেট খুলে ফেলল চাণক্য। খুলল নেভেনরঙের টি-সার্ট। কুকরি দিয়ে শার্ট ছিঁড়ে তৈরি হল ব্যাণ্ডেজ-পট্টি। কষে বাঁধা হল ক্ষতস্থান। শক্ত গিঁট দিয়ে দুদিকেই রক্ত চুয়োনো বন্ধ করল চাণক্য।

এবার পলায়নের চিন্তা।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেক দূর। বালিয়াড়ির মাথায় উঠল চাণক্য। উঁকি দিতেই দেখল চারটি মাথা।

মাসা দাউদের স্যাঙাতরা ঝুঁকে ঝুঁকে তাল হয়ে খুঁজছে ওদের। এ দলে রয়েছে চারজন। বালির ওপর চাণক্যের পায়ের ছাপ আর ইসাবেলার রক্তচিহ্ন দেখে এগুচ্ছে এইদিকে। ঝুঁকে হেঁটে আসছে যেন চার-চারটে অতিকায় শুঁয়োপোকা।

বালিয়াড়ির মাথায় চাণক্যের উঁকি মারা ওদেরও চোখ এড়োয় নি। কেননা, সহসা বালির ঝলক। কারবাইনের শব্দ শোনা গেল। বুলেটের ঘায়ে বালির কণা বয়ে গেল চাণক্যের মাথা দিয়ে।

উল্টে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এসেছিল চাণক্য। গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল ইসাবেলার পাশে। কথা বলল না। অটো-মেটিক রাইফেলটা নিয়ে দৌড়োলো বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে।

বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছোলো চাণক্য। দেখল ওরা দুদল হয়ে গেছে। দুজন আসছে সিধে ওর দিকেই। অন্য দুজন যাচ্ছে বালিয়াড়ির অপর প্রান্তের প্রবেশ পথে। দূরে সোরগোল শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে হট্টগোল। গুলীবর্ষণের আওয়াজ ওদের কানেও গিয়েছে।

প্রমাদ গনল চাণক্য। পালাবার পথ বন্ধ। একমাত্র সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া নান্যপন্থা।

সামনে মাসা দাউদের পুরো দল। উদ্বেগ যার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। এ পরিস্থিতিতেও বিচলিত হল না সে। রাইফেল বাগিয়ে তাক করল দূরের দুজনকে। পর-পর দুটি গুলী। বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল দুজন।

এদিকে আগুয়ান দলটি গুলীবর্ষণের শব্দে চমকে গিয়ে বালিয়াড়ির আড়াল নিয়েছিল বলেই বেঁচে গেল। উঁচুনিচু বালির আড়ালে লক্ষ্য স্থির থাকে না। মিছিমিছি গুলী খরচ করে লাভ কি?

●

চাণক্যের বাঘের চোখ যখন মাসা দাউদের স্যাঙাতদের প্রতীক্ষায়, ঠিক তখন অসহায়া ইসাবেলা অন্য কাজে ব্যস্ত।

প্রথমে কোমরবন্ধনীর কোল্ট পাইথন নেড়েচেড়ে দেখল গুলীভরা কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে রিভলবার রাখল বেল্টের খাপে।

তারপর খুলল দুপায়ের বুট। হ্যাঁচকা টান মারতেই চড় চড় করে খুলে এল রবারের সোল দুটো। দেখা গেল, শুকতলা দুটো আসলে শুকতলা নয়—খাঁজকাটা ঢালাই লোহার ওপর সিকি ইঞ্চি ঢালাই করা রবার। বাইরের দিকে ঢেউ খেলানো শুকতলা প্যাটার্ন। ভেতরের দিকে রবারের আস্তরণ নেই। সেখানে দুসারি হুক লাগানো। দুটো শুকতলার রবারহীন ভেতর দিক দুটো গায়ে গায়ে লাগিয়ে টান মারতেই আটকে গেল খাটে-খাটে। সম্পূর্ণ হল অত্যন্ত শক্তিশালী হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। হাতবোমা।

কেননা, বাঁদিকের লোহার বাক্সে আছে তিন আউন্স প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরক। ডানদিকের লোহার বাক্সে আছে স্প্রিং চালিত হাতুড়ি, ডিটোনেটর-টুপি, আড়াই সেকেণ্ড জ্বলবার মত গানপাউডার পলতে আর পারামিশোনো এক জাতীয় বারুদ। দুটো বাক্সেই সরু ছিদ্র রয়েছে। পলতে ঢুকিয়ে বাক্স দুটোর বারুদ এক করে দিল ইসাবেলা। যে পিন-টি টানলে পলতে জ্বলে উঠবে, সেটির ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল বালিয়াড়িতে।

ইসাবেলা জানে মৃত্যু আসন্ন। বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণের মধ্যে দুজনের টিকে থাকা বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আচিন, এ্যান্ডরুলাস যদি এসে যায়, ভাল। হীরেও পাবে, চাণক্য ইসাবেলাকেও পাবে। দেরি হলে, শুধু হীরেই পাবে—ফুগারির কাছে সে খবর তো রইলই। আর পাবে দুটি লাশ—ডানপিটে চাণক্য আর ইসাবেলার।

মরণেও এত সুখ? বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে চোখ রাখল ইসাবেলা। ঐ তো হাফডাঙা মানুষটা দুপা বালিতে গেঁথে রাইফেলের মাছিতে চোখ রেখে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। নির্বিকার, নির্লিপ্ত। ইসাবেলা তাকে ভালবাসে। ভালবাসে চাণক্যও। কিন্তু স্নেহাতীত প্রেম। ইসাবেলার যে স্বপ্ন নিয়ে এত হন্য পুরুষ মরলে, চাণক্য তা নিয়ে মোটেই ব্যস্ত নয়।

আশ্চর্য পুরুষ চাণক্য চাকলাদার! আশ্চর্য তার মানসিকতা।

সোরগোল এগিয়ে আসছে। চমক ভাঙে ইসাবেলার। তাকায় চোখ ফেরায় বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে।

চাণক্যের চোখ সামনের দিকেই শুধু নয়—পাশের দিকেও বটে। কাঠের জেটিতে বাঁধা লঞ্চ। নজর সেই দিকেই।

কারণ, চাণক্যের মন বলছে, মাসা দাউদ এখুনি চম্পট দেবে। মাসা দাউদ ভাণ্ডিকার ধুরন্ধর—গোঁয়ার মোটেই নয়। যে মুহূর্তে আবিষ্কৃত হবে রেডিও-ট্রান্সমিটার, সেই মুহূর্তেই ধূর্ত-শিরোমণি লম্বা দেওয়ার ফন্দী আঁটবে। রেডিও সিগন্যাল যাদের কাছে পৌঁছেছে, তারা নিশ্চয় বসে নেই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে তারা আসছে প্যাগোডা-দ্বীপে হানা দিতে। আসবার আগেই গা-ঢাকা দেওয়াই বুদ্ধি-মানের পরিচয়।

কাজেই এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে পাততাড়ি গুটোবে মাসা দাউদ। সদলবলে উঠবে লঞ্চে। সেখান থেকে জাহাজে। তারপর সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, বোর্ণিওর মধ্যবর্তী দ্বীপময় ভারতের যে কোনো অংশে হারিয়ে যাবে তার কদাকার মূর্তি।

কাঁসার মূর্তির মতই কঠোর হয়ে ওঠে চাণক্যের মুখ। মালয়, শ্যাম, লাওস, কম্বোজ, আনামের প্রতিটিতে ঘাঁটি রয়েছে মাসা দাউদের। পালের গোদাটিকে নিপাত করতে পারলেই ছত্রভঙ্গ করা যেত ওর সংগঠন।

কিন্তু একটিমাত্র রাইফেল দিয়ে অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। কটাই বা গুলী আর অবশিষ্ট। আত্মরক্ষা আগে, দাউদ-নিধন পরে।

সোরগোল এগিয়ে আসছে। দলে ভারি ওরা। চাণক্য একা। ইসাবেলা চলৎশক্তিহীন।

ঘাড় ফেরায় চাণক্য। গুলীবিদ্ধ পা-টাকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ইসাবেলা। এক হাতে একটা বস্তু। চাঁদের আলোয় দূর থেকেও চিনতে পারল চাণক্য। হাতবোমা। শুকতলার ছদ্মবেশে সেই প্রলয়ঙ্কর হাতবোমা। ইসাবেলার অন্যতম কীর্তি।

ঈষৎ কোমল হয় চাণক্যের কঠোর চক্ষু। ইসাবেলা অতি কষ্টে এগুচ্ছে ভাঙা মন্দিরটার দিকে। চূড়ার মহাকাল-মুখ যেন ডাকছে ওকে—সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়েও বরাভয় দিচ্ছে। ইসাবেলা মন্দিরের চত্বরে গা-ঢাকা দিয়েছে। এবার ও সুরক্ষিত। বালিয়াড়ির অন্য প্রান্ত আগলানোর ভার ইসাবেলার।

ঘড়ি দেখল চাণক্য। প্যাগোডা থেকে বেরোনোর পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট গিয়েছে। আর বড়জোর আধ ঘন্টা। এর মধ্যেই পালাতে হবে মাসা দাউদকে। ভোর পর্যন্ত লড়বার সাহস ওর হবে না। কারণ, চাণক্যর মন বলছে বাটাভিয়া থেকে এমন কিছু বেশি দূরে নয় এই প্যাগোডা দ্বীপ।

তবে হ্যাঁ, যাবার আগে মরণ-মার মেরে যাবে ওর দলবল।

তারই প্রস্তুতি চলছে সামনে।

দুটি দল এগুচ্ছে। একদল বালিয়াড়ির ওপরের দিকে। আর একদল সিধে

চাপকার দিকে। এক-একদলে আঠারো উনিশজন মুশকো ষণ্ডা। গাট্টাগোট্টা বেঁটে শক্তপোক্ত চেহারা। খাকি পোশাক। হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চাপকার দিকে যে দলটি আসছে, তার পুরোধা একজন [illegible]। [illegible] মাথায় [illegible] টুপি। [illegible] দিতে বাধ [illegible] নেই।

লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপল চাপকা। শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল লন্টা। আছড়ে পড়ে আর নড়ল না।

বাদবাকি ম্যাকাতরা শুয়ে পড়েছে। চাপকাও তাই চায়। গুলী খরচ কমিয়ে [illegible] বাধাই এখন দরকার। দরকার সময় নষ্ট করার।

ওদিকের দলটা [illegible] অনেক [illegible] চাপকার দিকে [illegible] [illegible] নিষ্কম্প হল একটা বস্তু। হৃষ্যবেণী মাণিকজোড় লুকতলা।

মাত্র আড়াই সেকেণ্ডের পলকে জঙ্গল গেল যেন চোখের নিমেষে। পুরো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঝাঁপিয়ে উঠল [illegible] মাথায়।

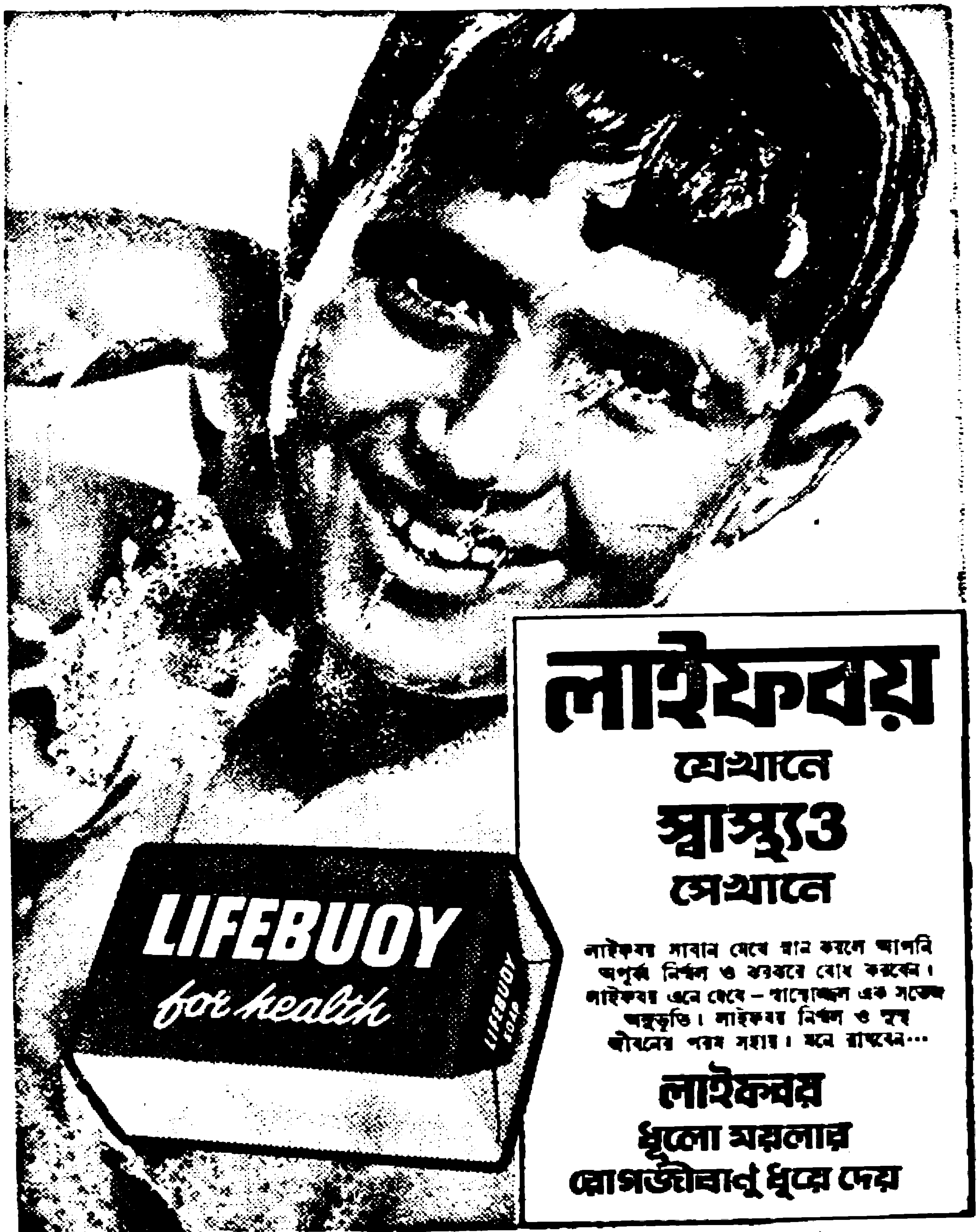

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বালির খাঁজে আগেই নিজেকে আড়াল করেছিল চাণক্য। বোমারু উড়ুকো শন শন শব্দে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

তারপর মুখ তুলল। উঁকি দিল।

পুরো দলটাই ধরাশায়ী হয়েছে বালির ওপর। দু'একজন গোঙাচ্ছে। ছটফট করছে। বাকি নিস্পন্দ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর বাজের ছাতার মত ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখে নিশ্চয় চোখ কপালে উঠেছিল চাণক্যর সামনের দলটির। ওদের স্নায়ু এখন অসাড়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল চাণক্য।

গুঁড়ি মেরে এল বালিয়াড়ির আড়ালে। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়োলো এলোপাথাড়ি পাউন্ডবাহিনীর দিকে। হাতিয়ারগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে সেদিকে। চাণক্যর লক্ষ্য সামনের সাব-মেশিনগানটির দিকে।

কিন্তু পৌঁছোনোর আগেই ধরাশায়ী একটা হাতে কাঁপতে কাঁপতে উঠল পুনো। টলতে টলতে কোনমতে বসে চাণক্যর দিকে রিভলভার তাগ করল একজন।

পরমুহূর্তে মন্দিরের দিক থেকে গর্জে উঠল ইসাবেলার কোল্টপাইথন। লোকটা পাকসাট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। চাণক্য কিন্তু এই কাণ্ডের মধ্যেও দাঁড়ায়নি —থমকায়নি। উল্কাবেগে দৌড়ে এসে সাবমেশিনগানটা তুলে নিয়েই ফিরে গেল বালিয়াড়ির প্রবেশমুখে।

হলটা এখনো পড়ে আছে। কলাপাতিচক ইটি গেড়ে বসে চেয়ে রয়েছে এইদিকেই। চাণক্যর আবির্ভাব ঘটতেই ধমক দিল ওদের হাতিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব গেল এদিক থেকে। লেলিহ আগুনের যেন তরল ধারা বয়ে গেল সাবমেশিনগানের নলচে দিয়ে। বালির ঝড় সৃষ্টি হল সামনে।

উড়ন্ত বালির মধ্যে দিয়েই দেখা গেল ওরা দৌড়োচ্ছে। পেছন ফিরে দৌড়োচ্ছে। মনোবল ওদের ভেঙে গেছে। প্রলয়ের বিস্ফোরণ ওদের দুর্বল করে দিয়েছে থানডার এখনো মরেনি। অতীতের বিভীষিকা আবার মূর্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় যাদের পায়ের বন্দী করা হয়েছিল তাদেরই হাতে রেডিও-ট্রান্সমিটার এবং বোমা কি করে আসে—এ রহস্যের কিনারা করতে গেলে জাদুবিদ্যা আর অলৌকিক শক্তিকে বুঝি বিশ্বাস করতে হয়। কি দরকার ঐ ভিগাডিগ শরীরী আতংকে আর ক্ষ্যাপাটাকে ঘাঁটিয়ে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

অতএব ওরা চম্পট দিল।

ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে চাণক্যর কালো মুখে। বাজের চোখ ফেরায় কাঠের জেটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় মুখের হাসি।

অনুমান মিথ্যে হয়নি। ভুল হয়নি হিসেবে। মাসা দাউদ পালাচ্ছে।

বালির ছোট বড় টিলার আড়ালে আড়ালে গা ঢেকে এগুচ্ছে পাঁচজনের একটা দল। দলের পুরো ভাগে রয়েছে মর্কট মূর্তি। দূর হতেও ও নরবানরকে চেনা যায়। মাচু। মাসা দাউদ তার পেছনেই। তাকে ঘিরে স্টেনগান বাগিয়ে চলেছে তিন সাগরেদ। মার্জার চরণে ওরা চলেছে কাঠের জেটির দিকে।

বালিতে চিবুক ঠেকিয়ে শুয়ে রইল থানডার। বাঘের চোয়ালের মতই শক্ত হল চোয়াল। নির্মম হল চোখ। অদৃশ্য শক্তি যেন অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল অবয়ব ঘিরে। কানে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ। লঞ্চের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

পেছনে কোল্ট পাইথনের ধমক শোনা গেল আবার। চোখ ফেরালো না চাণক্য। ও জানে ইসাবেলা আর একজনকে যমালয়ে পাঠালো।

সাবমেশিনগান রেখে অটোমেটিক রাইফেলটা তুলে নিল চাণক্য। মাটির ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে গেল দু সেকেন্ড। পরের দুটি সেকেন্ডে দুটি নির্ঘোষ শোনা গেল। দুটি তপ্ত বুলেট ধেয়ে গেল সামনে। দু সেকেন্ডে ধরাশায়ী হল দুজনে। আগে মাসা দাউদ। পরে মাচু।

•

দাউদ-নিধনের পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে ঘটল পর-পর কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা।

লঞ্চের ইঞ্জিন আরো জোরদার হয়ে উঠেছিল। শোনা গেল তীব্র বংশীধ্বনি। জাহাজের বাঁশিও বেজে উঠল। সমুদ্রের ডাকিনীরা বুঝি অকস্মাৎ দাউদ নিধনে মুহ্যমান হয়ে মড়াকান্না জুড়েছে।

মাসা দাউদ আর মাচু মর্কটের লাশ টপকে উর্ধশ্বাসে জেটির দিকে দৌড়োচ্ছে বাকি তিন সাকরেদ। আবার বুঝি ডাকিনীরা কেঁদে ওঠে। বাঁশির ডাকে কেঁপে কেঁপে ওঠে বাতাস।

বালিয়াড়ির আড়াল থেকে দৌড়ে আসছে আরো স্যাঙাত। পড়ি কি মরি করে দৌড়োচ্ছে কাঠের জেটির দিকে।

অবাক হল চাণক্য। বাঁশির সংকেতে যে দলবলকে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে, তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু আচম্বিতে এই জরুরী তলব কেন? দাউদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেওয়ার প্রচেষ্টা? না, আরো কিছু?

এই 'আরো কিছু'টা চাক্ষুস দেখা গেল পরের মিনিটেই।

প্রথমে শোনা গেল দূরাগত গুঞ্জন। যেন হাজার বোলতা খেপেছে। গোঙাচ্ছে। গজরাচ্ছে গজরাতে তেড়ে আসছে।

তারপর দেখা গেল চন্দ্রালোকিত আকাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক টেরো-ড্যাকটিল জাতীয় উড়ন্ত বস্তু। অতিকায় ফড়িং।

ভ্রম কাটল পরমুহূর্তেই। বিশাল ছায়া দানবের মত দুলতে দুলতে বালিয়াড়ির ওপরে ঘুরে গেল বস্তুটা।

হেলিকপটার।

মাথার ওপর ঘূর্ণ্যমান পাখার বনবনে প্রপেলারের গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল চাণক্যর। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ও। ইসাবেলাও পা টেনে টেনে বেরিয়ে এসেছে মন্দিরের বাইরে। দুটিব সোয়েটার খুলে নাড়ছে পুনো।

চাণক্যও চিনেছিল। হেলিকপটারের ঠিক তলায় আঁকা ধর্মচক্র। অর্থাৎ বৌদ্ধ রিভ নাংপোর নিজস্ব সম্পত্তি। উড়ন্ত আকাশযানের পাইলটের পাশ দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে দুটি পুরুষ। দেখছে চাণক্যকে। ইশারাতে কাঠের জেটির দিকে যেতে নির্দেশ করল চাণক্য।

উড়ে গেল হেলিকপটার। বোমাবর্ষণ শুরু হল তারপরেই।

প্রথম বোমাটা ফাটল কাঠের জেটির ঠিক ওপরে। নিশ্চিহ্ন হল পুল।

দ্বিতীয় বোমাটা ফাটল লঞ্চের ওপর। কাৎ হল লঞ্চ।

তৃতীয় বোমাটা ফাটল পলায়মান লোকগুলোর ঠিক মাঝখানে। অনেকেই ধরণীকে আশ্রয় করল। যে-কজন খাড়া রইল, তারা হাতিয়ার ফেলে হাত তুলে দাঁড়াল। আত্মসমর্পণ।

যুদ্ধ শেষ। দুই বালিয়াড়ির ফাঁকে হাতিয়ারহীন লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল উড়ন্ত হেলিকপটার। তারপর জমি স্পর্শ করতেই লাফিয়ে নামল আচিন আর চান্দকলাল। একটু পরেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে স্বয়ং রাজা নাংপো।

চাণক্য সাবমেশিনগান ফেলে দিয়ে হেঁটে গেল বালির ওপর দিয়ে। এগিয়ে এলেন রিভ নাংপো। পিগমি বপুর জালা-পেট রইল সবার আগে। প্রবল বেগে আলিঙ্গন করলেন চাণক্যকে—'ও মাই ডিয়ার থানডার! গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি দেখছি।'

'সব কথা পরে। জাহাজ নিয়ে ওরা কিন্তু পালাবে এখন।'

'পালিয়ে যাবে কোথা? আমার লোক জাহাজে আসছে। সব পোর্টে ট্রান্সমিটারে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাঝপথেই ধরা পড়বে।'

আর কিছু বলল না চাণক্য। চান্দকলাল বলল—'খুব বেশি দেরি হয়নি নিশ্চয়?'

'না,' হাসল চাণক্য। 'তবে ইসাবেলা জখম হয়েছে।' বলে তাকালো ভাঙা মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের ছায়ায় শায়িত দুটি দেহ। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধরে আবদ্ধ অধর।

আচিন আর ইসাবেলা।

শব্দহীন অট্টহাসে অকস্মাৎ নেচে ওঠে চাণক্য চাকলাদারের ঈগল চক্ষু।

(শেষ)

ভয়

কল্যাণ সেন

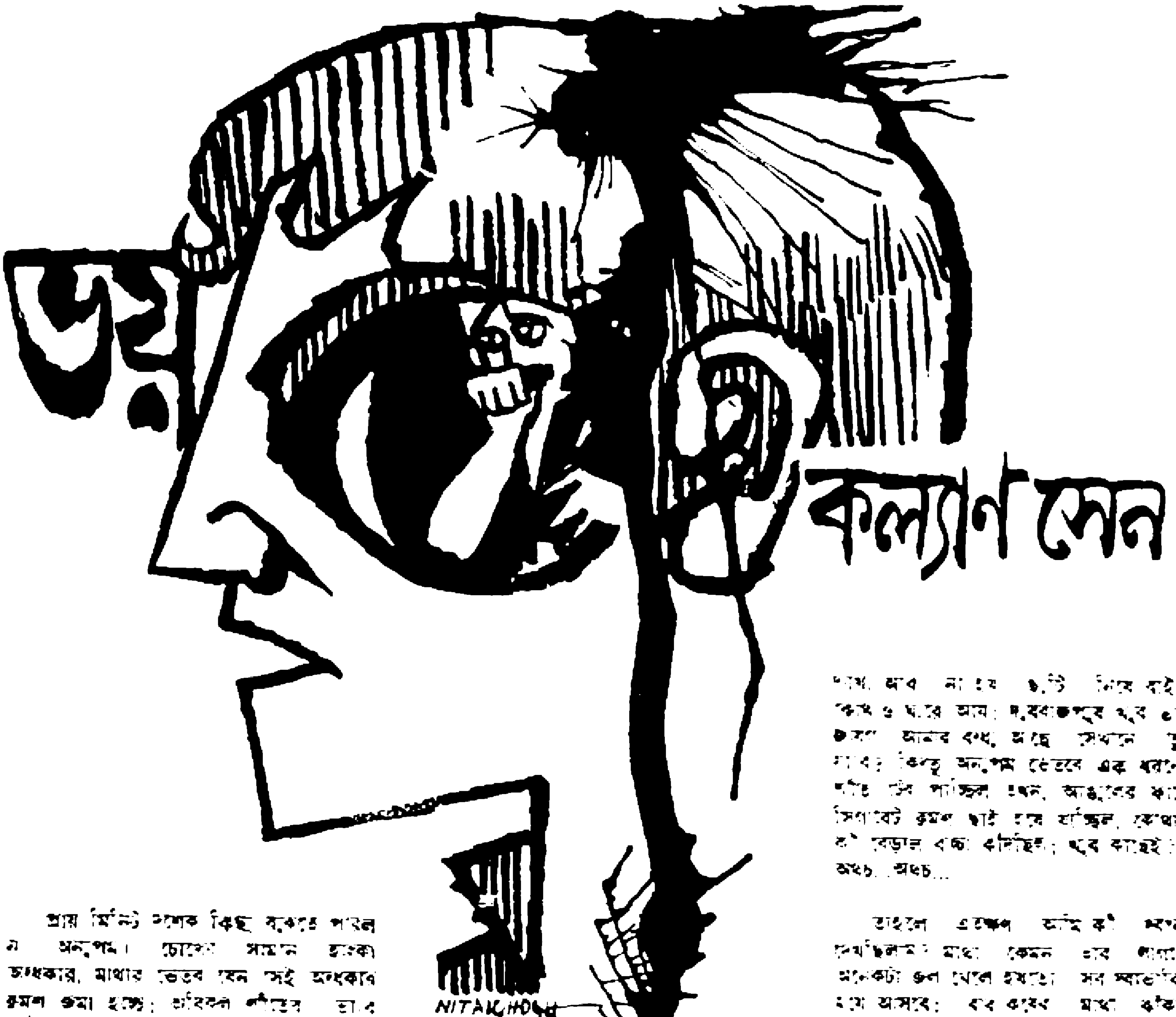

প্রায় মিনিট পনেরো কিছু বুঝতে পারল না অনুপম। চোখের সামনে হালকা অন্ধকার, মাথার ভেতর যেন সেই অন্ধকার ক্রমশ জমা হচ্ছে; [illegible] ভাব ধোঁয়ার মত। সকাল হয়ে গেছে অথচ তার চোখে, চোখের পাতায়, কপালে, গালের নিচে এখনো শীতল অন্ধকারের স্পর্শ; একবার চারপাশে তাকাল অনুপম, চোখ খুলে, কিছুই আলাদা করে যেন দেখতে পাচ্ছে না এখন, সব কেমন ঝাপসা, অনেকক্ষণের বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কোনো দৃশ্য চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। ঘরের দেয়ালে, জানলার ওপরে, এখনো ফিকে অন্ধকার; এই ঘর, দেয়াল, দেয়ালে ফোটো, টেবিল, জানলার বাইরে পরিচিত গাছ, বাড়ি, অনেকটা খোলামেলা আকাশ, ইলেকট্রিক পোস্ট, সব কিছু চোখের ওপর ভারি কুয়াশায় দুলে উঠল হঠাৎ; অনুপম ক্রমশ সব গুলিয়ে ফেলছিল, তাহলে কী আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে যেমন দেখা যায় পরিচিত মাঠ কখন নদী হয়ে গেল আর সেই নদীতে ভাসছে কার মাথার মুকুট, সোনার শরীর জলে ভিজে নীলচে হয়ে গেছে...অথবা আর একদিন সে যেমন স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের অফিসের সামনে গেট বাঁধা হয়েছে, নহবৎ বসেছে, আর সকাল [illegible] জ্যোৎস্নায় সে অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে [illegible] যেন কাঁদছে; বড় অদ্ভুত! স্বপ্ন ভেঙে গেলে সে শরীরে ক্লান্তি, ঘাম আর এক ধরনের দুঃখ টের পেয়েছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল, উঠতে গিয়ে ভয়ে আঙুল কাঁপছিল তার, কী জানি, হয়তো সত্যিই এখন কোনো বাড়ির ভেন্টিলেটরে একটা পাখি আটকে গিয়ে ছটফট করে মরছে; অনুপম বুঝতে পেরেছে রাত বেশি হয়ে গেলে, এসব কথা, এরকম কথা, মাঝে মাঝে মনে হয়, বুক শুকিয়ে যায় তার...কেন যে...বোধহয় গভীর রাতেই মানুষ বেশি বেঁচে থাকে; এক বিশাল আকাশের শূন্যতা তখন চেপে ধরে তাকে। তখন তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দেয় সে... ভয়, সমস্ত রোমকূপের মধ্যে ভয় যেন ঘাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; পরে এক সময় পার্থকে বলতেই ও বলেছিল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোও, অথবা না হয় ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আয়; মধুবনকুণ্ডে [illegible] আমার বন্ধু আছে সেখানে তুই যাবি; কিন্তু অনুপম ভেবেছে এক ধরনের শীত টের পাচ্ছিল যখন, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ক্রমশ ছাই হয়ে যাচ্ছিল, কোথাও কী বেড়াল বাচ্চা কাঁদছিল; খুব কাছেই... অথচ...অথচ...

তাহলে এতক্ষণ আমি কী স্বপ্নই দেখছিলাম? মাথা কেমন ভার লাগছে, অনেকটা জল খেলে হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে; ধর ধরে মাথা ঝাঁকাল অনুপম, তারপর চোখ কচলে উঠে বসার চেষ্টা করল সে, আর উঠে বসার চেষ্টা করতেই সে টের পেল কপালের পাশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ক্রমশ পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাড়ের কাছে শিরাগুলো দপদপ করছে, সমস্ত শরীর ঘামে বিশ্রী লাগছে তার; তাহলে জ্বরটর হয়েছে নাকি আমার? নাকি অন্য কোনো অসুখ, যার ফলে আজীবন তাকে এই বিছানায় এইভাবেই শুয়ে থাকতে হবে? মাথা তুলে আর একবার বাইরে তাকাবার চেষ্টা করতেই দেখল, পাশের টেবিল জলের গ্লাস, সব কেমন দুলে উঠল, দুলতে থাকল।

ঠিক ভয় নয়, অথচ ভয়ের মত কিছু যেন এখন তাকে নিচের দিকে টানছে, অনুপম চোখ বুজলো, খুললো, তারপর আবার চোখ বন্ধ করতেই সকলের চোখের সামনেই বোধহয় সে জলের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে, জিভ টানছে তার, পা ভারি হয়ে আসছে, একবার ইচ্ছে হল কারো নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে উঠে; কিন্তু কোনো শব্দ হল না মুখে, সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে অবসাদ; বড়

অপারেশনের পর খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে আবার যেন সে পৃথিবীতে ফিরে আসছে, মাথার ভেতর অন্ধকার না কি ধোঁয়া জমে আছে এখন? অনুপম হাত তুলে কিছু ধরার চেষ্টা করছিল, মনে হয়, অসংখ্য টুকরোয় শরীর ভেঙে যাচ্ছে তার, এক লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছে নাকি কানের ভেতর? তাহলে...তাহলে...

পুরনো কোনো সিনেমার ভাল লাগা দৃশ্যের মত অনুপমের ধীরে ধীরে সব যেন মনে পড়ছিল। অনেকটা হাওয়া টেনে নিল বুকের ভেতর। আহ! যেন তার সমস্ত শরীর কার ইচ্ছের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সে।

কাল অফিস থেকে বেরিয়ে সে ঠিক করেছিল বাড়ি ফিরে শ্যামলকে একটা চিঠি লিখবে; দিন পনের আগে ওর একটা চিঠি পেয়েছে, পুরুলিয়ায় একা একা পড়ে থাকায় জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল বলে খুব দুঃখ করেছে শ্যামল; না, ওকে বুঝিয়ে লেখা দরকার—কোথাও সুখ নেই রে, কলকাতায় তো আমরা চাপাক মাছির মত বেঁচে আছি, আর দেখ চারপাশে শুধু অঠারো কুড়িতলা বাড়ি উঠে যাচ্ছে... তারপর মনে পড়েছিল খাবু হরলিক্স ফুরিয়েছে, নিয়ে যেতে হবে; মানে এইভাবে কর্তব্য ও সংসারিকতার একটা উত্তেজনায় সে সকাল সকাল বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিল। অথচ আশ্চর্য! তখনই তার হঠাৎ আড্ডার কথা মনে পড়েছিল। স্বদেশ কাল দুটো টাকা ধার চেয়েছিল; হঠাৎ অনুপম উল্টোদিকের বাসের ভিড়ে নিজেকে চালান করে দিল।

তারপর যথারীতি সে আড্ডায় জমে গিয়েছিল। অনেকদিন পর তাপস এসেছে আসাম থেকে। তাপস নেপাল টেম্পাল নিয়ে গলা ভারি করে কথা বলছিল, শেখর সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা মন্দির বানিয়ে ফেলল পেন দিয়ে; চাকরি নেই বলে অমল নির্বিকারভাবে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। স্প্যানিশের গল্প কোন এক গুজরাটী মেয়ে অনুবাদ করেছে এই নিয়ে অশোক ওকে খোঁচাচ্ছিল, অমল হঠাৎ দুটো বড় বড় সাদা চাকলেট খেয়ে নিয়ে বলল, আমাদের ওদিকে পুলিশ খুব ঝামেলা করছে...কোন এক মাস্টারনী সুরেনের গল্প পড়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, মানে এইরকম হতে হতে, আসলে আড্ডায় যা হয়, তারপর রাত দশটা বেজে গেলে সে এক সময় বেরিয়ে একটা প্রায় ফাঁকা দোতলা বাসের জানলার ওপর মাথা নামিয়ে রেখেছিল। আর বাসে টিকিট লাগে নি বলে নামবার সময় নিজেকে খুব স্মার্ট লাগছিল তার। বাস থেকে নেমে সিগারেট ধরাতে আঙুল একটু কেঁপে গিয়েছিল; রাস্তাটা মনে হয়েছিল বড় বেশি চওড়া, ক্রমশ টের পাচ্ছিল সে, তার হাত, পা, মাথা সব খুব হাল্কা লাগছে, বাড়িগুলো কী আকাশ ভেদ করে কোথাও উঠে গেছে? গোলাকার আকাশ নেমে আসছে তার হাতের মুঠোয়, দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে, গায়ে হাত দিয়ে টের পাচ্ছিল ভেতরটা খুব গরম, তাহলে কী জ্বর...নাকি বাড়ি ফিরে স্নান করলেই—ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে রাস্তা ডিঙিয়ে বাড়ির পথ ধরেছিল এক সময়।

তার বাড়ি ফিরতেই সে দেখেছিল বাবার ঘর অন্ধকার, বড়দার ঘরে রেডিওটা তখনো ঘ্যানঘ্যান করছে। বৌদি কিছু করার নেই বলে খবরের কাগজটা উল্টে যাচ্ছে, আর কিছু তার মনে পড়ে না তার, মানে, সে খেয়েছিল কী না, অথবা কারো সঙ্গে কথা বলেছিল কী না, কিছুই আলাদা করে ভেবে নিতে পারছিল না অনুপম, তবে খুব আবছা, কেন মিহি কুয়াশার মত এখন মনে পড়ল, সেই সময় তার মাথার বালিশটা বোধহয় খুব বাড়াছিল, সমস্ত পিঠে জ্বালা. মিনুর কাছ থেকে চেয়ে কী যেন স্যারিডন না অ্যানাসিন্‌ কী একটা খেয়েছিল, আর সেই মুহূর্তে সে টের পাচ্ছিল তার সমস্ত শরীরে, রক্তের ভেতর, শিরা-উপশিরায় দ্রুত কুচকাওয়াজের শব্দের মত কিছু ছুটে যাচ্ছে...অনেকদূর থেকে মৃদু হাতের ঘন্টা-ধ্বনির মত সে শুনতে পেয়েছিল মার গলা, তাহলে আর খেয়ে টেয়ে কাজ নেই তোর, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি, শুয়ে একটা টানা ঘুম দিলেই...দিনরাত টো-টো করে সাতরাজ্য ঘুরে বেড়ান, শরীরের আর দোষ কী?...

অনুপম নিজেও তখন অনেকটা সেই রকমই ভেবেছে। সত্যিই শরীরটা একটু কাহিল হয়েছে, তাছাড়া তার তো পেসার আছেই, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে বড় বেশি অনিয়ম করে; কথাটা মনে হতেই কেমন অসহায় বোধ করল সে, এইবার হয়তো একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসবে সে; নতুন চাকরি তার! পিঁপড়ের কামড়ের মত কথাটা বুকের কাছে ছড়িয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সে।

অন্ধকার মশারির ভেতর, মশারির বাইরে। সেই অন্ধকার ক্রমশ তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছিল। বাইরে কোথাও কী গাড়ির হর্ন আটকে গেছে? সব কেমন নাগরদোলার মত ঘুরে যায় তার চোখের ওপর। মনে হয়, এই ঘর নেই, দেয়াল নেই, মশারি নেই, তার শরীর এখন ভাসছে অন্ধকারে, তার হাত, পা, বুক, কে খুলে নিচ্ছে এক এক করে; হাতের ওপর মশা পিন ফোটাল, তার মনে মশারির ভেতর সে একলা নয়; জানলার দিকে পাশ ফিরল অনুপম, সেই মুহূর্তে হাতুড়ির শব্দের মত কথাটা তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। পড়তে থাকল। ক্রমশ অনুপম মনে করতে পারছিল অস্তত মুখগুলো...ধোঁয়া, অনেকগুলো টেবিল, ফিকে সবুজ দেয়াল, দেয়ালে ঘড়ি আর স্বদেশের চোখ, ঠোঁটের ভাঁজ... সব অবিকল মনে পড়ে গেল তার।

স্বদেশ হঠাৎ মুখটা ছুঁচলো করে অনেকটা আলো ভেতরে টেনে নিয়ে ওর হাতের রেখাগুলো মাপছিল, তারপর সিগারেটটা পায়ের নিচে পিষে দিতে দিতে কেমন যেন ওর গলাটা শুকনো হয়ে উঠেছিল, মানে যা দেখছি, তোর সময়টা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে, মানে রাহু আর শনি দুটোই তোকে খুব ট্রাবল দিচ্ছে, একটা অসুখ টসুখ হতে পারে, আর তার চেয়েও যেটা ডেঞ্জারাস, মানে, তোর একটা বড় রকম ক্ষতিটতি হতে পারে; তুই বরং...কী অসুখ? অনুপম কষ্ট করে হেসেছিল। তার চোখে আলোগুলো বড় বেশি লাগছিল। চারপাশে বড় বেশি শব্দ, মনে হল খুব কাছেই কোথাও বাজ পড়ে যাচ্ছে, শেখরকে দেখে ডোরাকাটা জামায় কী রকম হিংস্র লাগল তার চোখে, সব কটা মুখই কেমন একরকম হয়ে যাচ্ছে, স্বদেশের চোয়ালের গড়নটা সিনেমার ভিলেনের মত হয়ে যাচ্ছে কেন? কেউ কী এখন তার বুকে লাফা দেবে...

—ঠিক করে বলতো, কী ক্ষতি হবে, মানে কে আবার ক্ষতি করবে, আমার তো কোনো—

—সেটা তো হাত দেখে ঠিক বলা যাবে না, তবে তুই একটু সাবধান থাকার চেষ্টা করিস; একটা 'স্টোন' পড়ে দেখতে পারিস।

স্বদেশের কথায় অনুপম শব্দ করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু সে টের পাচ্ছিল তার কপাল ক্রমশ ঘেমে উঠছে আঙুল কাঁপছে তার, পরপর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরিয়েছিল; একটা উত্তেজনা যেন তার রক্তের মধ্যে আবর্ত তৈরি করছে, অনেকটা জল খেল অনুপম; তার কানের পাশে কী সাইরেনের শব্দ উঠছে?

—আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে এসব ঘটবে বলে তোর মনে হয়? হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সে।

—তুই কিন্তু সত্যিই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিস, স্বদেশ দেশলাইটা নাচাতে নাচাতে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল কথাটা, স্বদেশ কী হাসছে এখন?

অনুপম টের পাচ্ছিল তার গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে এঁটে বসে গেছে অশোক এখনো হাসিয়ে যাচ্ছে খুব, অমল হাত তুললো কার দিকে, কার গলা হঠাৎ শোনা গেল কলকাতা কী রকম কলকাতার মত এখন...ম্যাগিশ! আমি শালা জাম্বিয়া চলে যাবো' অনুপম শুনতে পাচ্ছিল সাতুর গলা : তুরুমোহনো পরশুদিন আমাকে ডিমভাজা খাওয়ার জন্য বেছে বলেছেন... তাপস প্রায় হীরের কায়দায় সবাইকে শোনাতে লাগল : ধুত্তোর! কী রকম তাড়াতাড়ি বাবা-বাছা হয়ে যাচ্ছি! তোরা বেশ আছিস! কেমন ল্যাজ তোলা ঘোড়ার মত...অনুপম এখন আর একটা মুখও যেন আলাদা করে নিতে পারছে না, অনেকদিন পর কোনো পুরনো ছবি দেখছে সে, সব গোলাটে সব ঝাপসা; সকলের মুখের ওপর মাকড়সা কী জাল বুনে চলেছে? টেবিল ছুঁয়ে দেখল একবার... আলো ক্রমশ উজ্জ্বল লাগছে চোখে, দুলছে, তার চোখের ওপর অসংখ্য আলোর বিচ্ছুরণ!...চোখ বন্ধ করে ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে: মানে, এই মুহূর্তে সমস্ত কলকাতায় কারফিউ ঘোষণা হবে,

CENTRAL LIBRARY

অথবা...অথবা এইমাত্র ডানায় আগুন লেগে গেল প্লেনের, বেল্ট দিয়ে তার শরীর বাঁধা, দেখছে সে, আশিস, শেখর, অমল ওরা সবাই কেমন লাফিয়ে পড়ছে, অথচ...ধোঁয়ায় সে কী অন্ধ হয়ে যাচ্ছে?...

—কী রে? হঠাৎ ঝিম মেরে গেলি কেন? স্বদেশ ঝুঁকে পড়ে কাঁধে চাপ দিল তার।

দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপম, ঠোঁট ঘসল রুমাল দিয়ে তারপর জলের ওপর মুখ ভাসানোর মত অবসন্নতায় বলল—নে, চল, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে; মাথার ভেতরটা কেন—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল অনুপম, দুএকজন মহিলার শরীরের গন্ধ ভেসে গেল পাশ দিয়ে, সিঁড়ির কোণে থুথু ফেলার বাক্সে কী রঙ পড়ে আছে? দেয়ালে দুএকটা পত্রিকার কভার আঁটা, নিচে সিগারেটের দোকানে ট্রানজিস-টারের শব্দ, এখন সেই শব্দ ট্রামের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেনের শব্দের মত তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাসস্টপে দাঁড়াল ওরা। স্বদেশ দেশলাই কিনতে পিছিয়ে গেল একটু; অনুপমের শরীরে অজস্র হাওয়া, মাথা তুলে আকাশ দেখল একবার, মসৃণ অন্ধকারে কয়েকটি দুর্বল নক্ষত্রের বিন্দু চোখে পড়ে...মাথার ওপর বিশাল রহস্যময় ওই গ্রহজগৎ: আশ্চর্য! অনুপম এতদিন ভুলে ছিল!... হঠাৎ তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, রাতে খেয়ে দেয়ে ছাদে চলে আসতো সে আর দাদা, তার ধারণা ছিল একদিন সে চিনে নিতে পারবে তার নিজস্ব গ্রহজগৎ...কিন্তু যখন রাত ভারি হয়ে উঠতো, সাদা জ্যোৎস্নার টুকরো লেগে থাকত ছাদের কার্নিসে, জ্যোৎস্নার মাঠ, পুকুর, সদরঘাটের রাস্তা, সাইকেল রিকসার স্ট্যান্ড, নতুন বাজারের কাছে সেই উঠতে থাকা সিনেমা হল, সব ক্রমশ একটা অলৌকিক ছবি হয়ে উঠত।... আরএকবার তাকাল অনুপম, বুক খালি হয়ে যাচ্ছে তার; কতদিন...কতগুলো বছর...কী জানি, আর হয়তো কোনোদিন এভাবে আকাশ দেখতে পাবো না, কী জানি, স্বদেশ হয়তো সব জেনে গেছে...

মুখের ভেতর যেন কোনো স্বাদ নেই, অথচ একটু আগেই তো জল খেয়েছে, কিন্তু আবার জল খেতে ইচ্ছে করছিল; আবার যদি কোথাও বসতে পারত সে।

—আচ্ছা, তুই যে বললি অসুখ টসুখ, মানে কী রকম অসুখ, ধর যদি লিউকোমিয়া হয়, তাহলে তো...স্বদেশের মুখের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে এখন, কী রকম শক্ত হয়ে উঠেছে ওর মুখ, স্বদেশ কী কিছু ভাবছে?

—কী রে কথা বলছিস না যে?

স্বদেশ একবার তাকাল ওর মুখের দিকে। দোকানের ছিটকে আসা আলোয় ওকে এখন খুব সুখী আর নিশ্চিন্ত মনে হয় অনুপমের; ওর কপালে কোনো দাগ নেই...ছোট করে হাসল স্বদেশ।

—তোর দেখছি মাথার ভেতর ও সব ঘুরছে এখনো; আরে দুর। কী সব ভুলে মারলাম, আর তুই সিরিয়াসলি নিয়ে একেবারে ঘামতে শুরু করে দিলি?...চা খাবি আর একবার? অনুপম আবার তাকাল ওর মুখের দিকে, খুব বড় একটা সাফল্যের পর মানুষের মুখে, চোখের ভেতর এক ধরনের চকচকে উত্তেজনা ফুটে ওঠে, স্বদেশের মুখ এখন সে রকম লাগছে; হঠাৎ ইচ্ছে হয় অনুপমের ওর পা জড়িয়ে ধরে; তুই আমাকে বাঁচা স্বদেশ, এভাবে যদি একটা কিছু ঘটে যায়...

চুলের ভেতর, কপালে, বাতাসের ঠান্ডা স্পর্শে এক ধরনের আমেজ পাচ্ছিল অনুপম। একটা বাস না থেমেই বেরিয়ে গেল। বাসস্টপের ময়লা বোর্ডটা হঠাৎ তাকে কোনো আশ্চর্য যাদুপ্রদর্শনীর কথা মনে পড়িয়ে দিল। ওদিকের ফুটপাথে রেলিঙে এখনো বইয়ের দোকান সব বন্ধ হয় নি, দেয়ালের গায়ে লেখা সংগ্রাম চলছে, চলবে: কী রকম স্নায়ু ঢিলে হয়ে আসছিল তার, ছোট্ট এক টুকরো আলোয় স্বদেশকে কেমন অপরিচিত মনে হয়; টের পাচ্ছিল সে, তার হাত ঘামছে, খুব উত্তেজনায় বা দুর্বলতায় এরকম হয় তার: ক্রমশ তার বুকের ভেতর, গলার ভেতর একটা বস্তু যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। বাসস্টপের কাছে দুতিনটি ছেলেমেয়ে, সেন্টিনারি বিল্ডিংএর জোরালো আলোগুলো এখনো সব নেভে নি। চারপাশে আর একবার সব কিছু সে ভাল করে দেখে নিতে চাইল। মানুষ, শব্দ, বাস, নিভেআসা আকাশ, পার্কের ভেতর উদাসীন বিদ্যাসাগর...সব কিছু যেন দৃষ্টিতে হারিয়ে যাচ্ছে। নাকি কুয়াশা ঝুলে আছে চোখের ওপর? কী জানি, আর হয়তো কখনো এই বাসস্টপে এসে দাঁড়াতে পারবো না, আর হয়তো কখনো শেখর পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকবে না...আর কখনো...

স্বদেশ মুখ তুলছে না কেন? ও কী তবে কোনো কিছু প্ল্যান ঠিক করে নিচ্ছে? আর একটু পরেই শক্ত আঙুলগুলো তার গলায় বসিয়ে দেবে?

বাসে ওঠার আগে ওর কাঁধে হাত রেখে সামান্য হাসল স্বদেশ।

বাসে তেমন ভিড় নেই। সমস্ত শরীর ছড়িয়ে অনুপম এক ধরনের আরাম টের পেল। যেন হাত তুললেই এই বাস ওকে পাহাড়ের মধ্যে ঘন জঙ্গলের পথে পৌঁছে দেবে; চোখের ভেতর হলুদ আলো ঢুকে যাচ্ছিল তার, জ্বরের মত উত্তাপ টের পাচ্ছিল শরীরে; জানলার ফ্রেমে মাথা নামিয়ে অনড় অনুপম, দোকানের আলো, সিনেমার পোস্টারের দারুণ সুন্দরী তার দিকে তাকিয়ে আছে, ময়দান চলুন, পানের দোকানের সামনে সুখী মানুষ, সামনেই লাল রঙের বাস, ট্রামের গায়ে বলরামের গোঁফ, রিকসায় বসে থাকা গোল গোল চেহারার চীনা না মারাঠী মেয়ে...সমস্ত দৃশ্যটা ওকে যেন টানছিল। কেউ কী কোথাও আসার জন্য অপেক্ষা করছে? তারপর সে সামনেই রুপ আলোয় ঝকঝক করে উঠলো তার হাতের মুঠো।

না, যন্ত্রণাটা এখন পিঠের দিকে নেমে যাচ্ছে, সামনের সীটে বসা একজন লোক ছোট চোখে একবার ওর দিকে তাকাল। এরকম আড়ষ্টতা তার আগে কখনো হয়নি; জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত পিঠ; ছোটবেলা থেকেই সে নানা অসুখে ভুগেছে, কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বুকের শব্দ যেন বাসের চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আসলে তার ভয় করছিল, আঙুল কাঁপছিল; পেছনের বাসেই কী কেউ তাকে ফলো করে আসছে? হয়তো; একটু সুযোগের অপেক্ষা, তারপর কোনো গাছের নিচে পড়ে থাকা তার শক্ত দেহ...রক্তের দাগ...ঠোঁট চাটল অনুপম। একবার ইচ্ছে হল কন-ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করে বাসটা কী ঠিক পথেই যাচ্ছে! নাকি কোনো স্বপ্নের মধ্যে নেমে যাচ্ছে সে? বাসের আলোগুলো যেন হাজার হাজার জোনাকি হয়ে তার মাথার ভেতর ছুটে আসছে, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইল অনুপম, মাথার ভেতর জমা হচ্ছে নীল কুয়াশা, চোখের সামনে দেয়াল, আলো, চেয়ার, অনেকগুলো মুখ সব ঘুরে যাচ্ছে, মাথা তুলতে পারছে না অনুপম, স্বদেশ, তুই একটা ইডিয়ট, তোর জেল হওয়া উচিত, এভাবে মানুষকে নার্ভাস করে দিয়ে তুই কী...আসলে...আমি তুই এসব বাজে অভ্যাস ছেড়ে দে স্বদেশ, কালকেই ডাক্তারকে ফোন করে ওর সঙ্গে একটা ফ্লুরোস্কোপির ছবি দেখতে যাব, স্বদেশ তোর এসব চালাকির জন্য ভুগতে হবে তোকে...সামান্য ঠোঁট নড়ল অনুপমের, ঘুমের মধ্যে মশা তাড়াবার মত হঠাৎ তার হাত উঠেই আবার নেমে গেল।

ঘাড়ের নিচের জ্বালাটা ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত পিঠে; তার শরীরে কী কেউ পিন ফুটিয়ে যাচ্ছে? চাদরটা জড়িয়ে যাচ্ছে বুকে পিঠে। না, ঘুমের আর কোনো চান্স নেই। এর পর পাহারাওয়ালার লাঠির শব্দ, কুকুরের বিচ্ছিরি চিৎকার, মাঝে মাঝে দূর থেকে মাটি কাঁপিয়ে ট্রেন চলে যাওয়া, হঠাৎ ট্যাক্সির হর্ন, সব তার মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাবে, ক্রমশ একটা অন্ধকারের ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে সে শুনতে পাবে একটা বাজে, দুটো বাজে তিনটে...তারপর ভোরের নরম হাওয়ার পায়ের শব্দ, ট্রাম বেরিয়ে পড়ার ঝনঝন শব্দ।...

বিছানায় উঠে বসল অনুপম। অন্ধকার। অন্ধকার। মশারির ভেতর। মশারির বাইরে। জানলার ওপিঠে সমস্ত পৃথিবী এখন যেন বাদামী আলোয় ভরে আছে, অনেকটা মেটে জ্যোৎস্নার মত। এইরকম আলোয় হঠাৎ কার জন্য বুক ভারি হয়ে আসে; কেন নিজেকে খুব পাপী মনে হয়; এই আলোয় দেয়াল ভেদ করে বহুদূর ইচ্ছে মেন সে দেখতে পাচ্ছে। চোখের সামনে মশারি দুলছে, ছাদ, টেবিল, জলের গ্লাস, দেয়ালের ক্যালেন্ডার সব ঘুরে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করল অনুপম।

খুলল। আবার বন্ধ করল। একসময় মশারির বাইরে চলে এল অনুপম। অন্ধকার সমস্ত ঘরে সরের মত ভাসছে, তার কপালে, চোখের পাতায় শীতল অন্ধকার, অনেকটা বাতাসে বুক ভরে নিল সে। তারপর সমস্ত ঘরে পায়চারি শুরু করল অনুপম। টেবিলের নিচে দেয়ালের আড়ালে কেউ কী সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে? হয়তো... না, আর কিছুই আলাদা করে ভাবার শক্তি নেই তার। হাজার হাজার লক্ষণ যেন ছুটে যাচ্ছে তার মাথার ভেতর, সে কী এখনি মাটিতে পড়ে যাবে?

না, এ হতে পারে না। নির্ঘাৎ স্বদেশ ইয়ার্কি করেছে আমার সঙ্গে। আমি সুস্থ। স্বাভাবিক। ঠিক আর পাঁচজন মানুষের মত। সংসারে খুব আরামে আর পাঁচজনের মতই জলছবি হয়ে বেঁচে আছি। আমার কোনো দুরন্ত রোগ নেই, অ্যাম্বিশন নেই। তবে আমার কী হবে? কী ক্ষতি হতে পারে আমার? কে ক্ষতি করবে? হোয়াই?... আমি পাবলিক ম্যান নই, চোরাকারবারী নই, লেখক নই, অভিনেতা নই, রাজনীতি করি না আমি, আমার ত্রিংশ বছর বয়স হয়ে গেল, আমি অনুপম, অনুপম সেন। অত্যন্ত নিয়মিত জীবনযাপন করি। অফিস করি, গাড়ি বাড়ি নেই, বড়বাবু মেজাজ দেখালে ব্যাটাকে মনে মনে তুলো-ধুনো করি, ভিড়ের গুঁতোতে কষ্ট পাই, টাইপ সেকশানের নন্দবাবুকে মেয়েটিকে কেমন দুঃখী বলে ভাবতে ভাল লাগে আমার, অফিসারের ধমক খেয়ে দাঁত বের করে থাকি অনেকক্ষণ; আড্ডা মারি, ঘুমোই, মাঝে মাঝে গোপাল কেবিনে বসে রাস্তার লবণ চোখরাখ জরিপ করি, ভিখিরিকে দুপয়সা দিলে দারুণ অহংকার হয় আমার, বাড়িতে অনুরোধের আসর শুনি, মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে লটারির দশ লক্ষ টাকা জিতে যাই, সুচিত্রা সেনের ছবি এলে দুতিনবার করে দেখি, মিনু মাঝে মাঝে দু একটাকা চেয়ে নেয় আমার কাছ থেকে, কখনো শরীর খারাপ লাগলে খুব ট্যাক্সি করতে ইচ্ছে হয় আমার, পাড়ার ড্রাইভাররা আমাকে পাত্তা দেয় না। আমার মাথায় একটা পাকা চুল বার করে মিনু একদিন খুব জোরে হেসেছিল—ছোড়দা, তুই এবার একটা বিয়ে কর; মাও হেসেছিল; আর ফিরেফিরে বুকের আটদশদিন ছুটি নিয়ে সুন্দর একটা জায়গায় হয়তো চলে যাব, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলব; বৌকে যেমন সবাই খালি বৌয়ের মত ভাবে, আমিও তাই ভাবতে থাকব। আহা! সন্ধ্যাবেলা ভিড়ের মধ্যে বৌকে নিয়ে হেঁটে যাওয়া... শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গরম সিঙ্গাড়া খাওয়া, খাম আর সেফটিপিন কিনে আনা; তার মানে সবাই যেভাবে বেঁচে আছে, মানে এক দুই তিন সবার যা যা হলে সুখ, আমিও সেই সুখের জন্য হাত বাড়িয়ে বসে থাকব। তবে আমার নতুন কী হতে পারে? কী ক্ষতি হবে আমার? চাকরি চলে যাবে?

বাসে অ্যাকসিডেন্ট হবে? স্বদেশ তুই কী শেষ পর্যন্ত মানুষ ঠকাতে শুরু করলি?

আবার বিছানায় ফিরে এল অনুপম। চাদরটা উল্টে দিল। বালিশগুলো সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। রাত্রির মধ্যের নির্জনতার গন্ধ বাতাস ভারি করে তুলছে এখন। চোখে কপালে বুকের ওপর অন্ধকার আর হাওয়া; কোথাও কী ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছে? আজ কী শেষ রাতে জ্যোৎস্না উঠবে? চোখ বন্ধ করল অনুপম। অনেকগুলো টুকরো ছবি এক-সঙ্গে চোখের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছে এখন। সেই বিরাট দুন্যমার্গ, একটা জীর্ণ কালো হয়ে আসা শিবমন্দির, তাদের মাঠের গোলপোস্ট, পূর্বদিক দিয়ে আসানসোলের লাইন, এগারোটার লোকো প্যাসেঞ্জার চলে গেল, এবার বাবার বাড়ি ফিরে আসা, সরস্বতী পুজোর দিনরাত জাগা, বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলে জ্বর বানিয়ে পরীক্ষা না দিতে পারা... আর একদিন কার্তিকের ছোট বিকেলে গাছের মাথায় রোদ যখন অভিমানের মত ছড়িয়ে ছিল তখন সুধাদির রেললাইনে মাথা পেতে দেওয়া; রক্ত... শরীর বেঁকে দুমড়ে যাওয়া...ইংরেজিতে অনার্স পড়ত সুধাদি; তাকে একটা নীল রঙের সোয়েটার বানিয়ে দিয়েছিল, সার্কাস দেখতে গিয়ে যার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ...সব সব অবিকল মনে পড়ল, মনে পড়ছে এখন। শান্তির একটা ছোট নিঃশ্বাসে বুক ভরে গেল তার। ঠিক আছে। তাহলে সব ঠিক আছে। স্মৃতি অবিকল আছে আমার। অনেকদিন পর রোদ দেখলে যে রকম মানুষ খুশি হয়ে ওঠে, অনুপম তার ভেতরে অবিকল সে রকম কিছু টের পাচ্ছিল এখন। শিস দিল একবার। হাততালি দেবো একবার? ঠোঁট ফাঁক হল অনুপমের। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের কথা ভাবল অনুপম।

হাওয়ার ভেতর যেন ফিহি একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা তার জানলার ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই শব্দটা ধরতে চেষ্টা করল অনুপম। বাইরে কে তাকে ডাকছে। সব কেমন গুলিয়ে ফেলছিল সে: এত রাতে কে তাকে ডাকবে? মানে কে তাকে ডাকতে পারে? পাড়ার কেউ? কিন্তু সে তো পাড়ার তেমন একটা মেশে না কারো সঙ্গে; তবে?...

জানলার বাইরে আবার নিজের নাম পরিষ্কার শুনতে পেল অনুপম। ভুল নেই, কেউ তারই নাম ধরে ডাকছে। অস্বস্তি বাড়ছিল তার, ঠিক দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকে থাকার মত, কে আবার জনমানবশূন্য শব্দ করল এত রাতে? রাবিশ! কী চায় তার কাছে? নাকি কারো বাড়িতে অসুখ বিসুখ, একটা ফোন করতে চায়, কিন্তু ফোন তো বড়দার ঘরে: তাহলে? পুলিশের লোক? সে বেরোলেই তাকে... না, মাথার ভেতর ঝনঝন করে ওঠে: অনুপম উঠে দাঁড়াল। জানলার বাইরে এখনো বাদামি

আলো, দূরের বাড়িগুলো এখন কেমন পরিত্যক্ত মনে হয়, একটু যেন শীত টের পাচ্ছিল সে: হঠাৎ নিজের জন্য অদ্ভুত এক কষ্ট টের পেল অনুপম: অফিস, কাজ, দেয়ালের পোস্টার, পরিবার ছোট ভাইদের, ট্রামের তার ছিঁড়ে যাওয়া, বোমার আঘাতে সাতজন আহত,... এসব যেন অন্য কোন গ্রহের কথা মনে হয়... এই মুহূর্তে বিশাল অন্ধকারে সে একা; নির্জনতায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে শুধু: এই অন্তের দীর্ঘকাল কার জন্য অপেক্ষা করে থাকার কথা মনে হয়; কোথাও কী পাখি ডেকে উঠল? এখন কী পাতায় টলটল করছে নীলাভ শিশিরের ফোঁটা?...

আর একবার তার নিজের নাম ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আর তখন পরিষ্কার হয়ে গেল সব কিছু: বাইরে স্বদেশের গলা: স্বদেশ ডাকছে তাকে। তৃপ্তিতে চোখ বুজে এল তার।

দ্যাখো, তখন একটা বাজে ইয়ার্কি করে এখন সেটা সামলে নিতে এতদূর ছুটে এসেছে স্বদেশ। হয়তো বাড়ি ফিরে ওর মনে হয়েছে কথাটা আমি অন্যভাবে নিতে পারি, আর তার ফলে প্রেসার ট্রেসার বেড়ে গিয়ে একটা অনর্থ...কিন্তু ও এল কী করে? বাস ট্রাম তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে; তাহলে হেঁটে? এতটা পথ? সেই হরীন দাস রোড থেকে টালিগঞ্জ? কী জানি। হয়তো বাড়ি ফিরে স্বদেশও ঘুমোতে পারেনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এল অনুপম।

মধ্যরাতের এক ধরনের নিঃশব্দতায় এখন বাতাস ভারি হয়ে আছে। গাছের পাতা খুব হালকাভাবে দুলছে, কাঁপছে। আকাশকে মনে হয় খুব গভীর, রহস্যময়। অনেক কিছু মনে পড়ে এই রকম গোলাকার আকাশের নিচে দাঁড়ালে। হাওয়া ছুঁয়ে যায় তাকে। চারপাশে তাকাল অনুপম, একটুকরো জমির ওপর ফিকে আলোয় স্বদেশ দাঁড়িয়ে আছে; ওকে এখন কী রকম পাথরের মূর্তির মত মনে হয়; লিচু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে স্বদেশ।

—কী রে, তুই এত রাত্তিরে?

অনুপম তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে গেল। এই মাত্র রাত্তিরে তোকে আসতে হল তো?... কিন্তু লিচু গাছের নিচে স্বদেশের ছায়ামূর্তি অচল। এগিয়ে এল না, কথা বলল না: ভৌতিক ছায়ার মত বাদামি আলোয় গাছের সঙ্গে যেন মিশে আছে। অনুপম দেখতে পেল লিচু গাছের ডালপালা ভেঙে একটা অদ্ভুত ছায়ার কারুকার্য জড়িয়ে আছে ওর সমস্ত শরীর; অবাক হয়ে গেল সে, শরীরে শুধু একটা চাদর জড়ানো, খালি পা স্বদেশের। ও কী তবে বিছানা থেকে সোজা উঠে চলে

এসেছে? ওর খালি পা কেন? তাহলে কী ওদের বাড়িতে কোনো বিপদ আপদ...

অনুপম হাত তুলল। একবার জোরে স্বদেশের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল; কিন্তু কথা ফুটলো না, কী রকম ভেঙে ভেঙে ওর স্বর হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে ভেসে গেল। শুধু আর একবার চেষ্টা করল অনুপম; ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।

ফিকে আলোর গাছের জড়িয়ে থাকা ছায়ার ভেতর স্বদেশের শরীর একটা পাহাড়ী ভালুকের মত নড়েচড়ে উঠল; আঙুল তুলল স্বদেশ, চল, বাইরে চল।

—কোথায়?...

কিছুই বুঝতে পারছিল না অনুপম। কোনো উত্তর না দিয়ে স্বদেশ তখন হাঁটতে শুরু করেছে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল অনুপম—কী হয়েছে তোর? তুই কী কিছু চুরি করে পালাচ্ছিস নাকি?... এত জোরে হাঁটছিস কেন?

অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এল অনুপমের। এই গন্ধে স্নায়ু কেমন ঢিলে হয়ে আসে, চোখ ভার ভার লাগছে, ধোঁয়ায় যেন ভরে যাচ্ছে তার চোখ; চারপাশের রাত্রির মন্থর নির্জনতা লক্ষ হাত বাড়িয়ে টানছিল তাকে। আর আশ্চর্য! তখন সে খিদে টের পেল পরিষ্কার মনে পড়ল রাতে তার খাওয়া হয়নি, তলপেটে কেমন চিনচিন ব্যথা করছে; রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় বুক কেঁপে ওঠে, আহ! যদি একটু জল খেতে পারা যেত!... অদ্ভুত! এই পথে সে কোনোদিন হেঁটে যায়নি, এসব বাড়ি সে জীবনে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না, অনেক গাছ আকাশ চিরে শূন্যে উঠে আছে, ফিকে জোৎস্নার আলো তার গায়ে পিছলে যাচ্ছে, আর একটু আগেই স্বদেশের ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে যাচ্ছে অনুপম টের পাচ্ছিল তার পা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। কয়েকবার দ্রুত দম ফেলল সে, আঙুলগুলো কী বসে যাবে মাটিতে?... টের পাচ্ছে অনুপম, বিশাল আকাশ আর চারপাশের সীমাহীন নিস্তব্ধতা তার রক্তের ভেতর শিরাউপশিরায় একটা করুণ ঘন্টাধ্বনির মত ছড়িয়ে যাচ্ছে...ক্রমশ...তার হাতে কী রক্ত লেগে যাচ্ছে?...

—এই স্বদেশ; কী হচ্ছে তোর?...

সমস্ত ব্যাপারটা অসহ্য লাগছিল তার, এসব কী আরম্ভ করেছে স্বদেশ? থামছে না, ডাকলে উত্তর দিচ্ছে না? তবে কী শেষ পর্যন্ত স্বদেশ আমাকে...

অনুপম পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল একবার।

পায়ের নিচে জলের মত ঠান্ডা একটা স্পর্শ টের পেল অনুপম। জলই হবে হয়তো। সেই ঠান্ডা স্পর্শটা ক্রমশ তার সমস্ত শরীরে উঠে আসছে, রক্তপ্রবাহ জমিয়ে দিচ্ছে তার, গোড়ালির মাংসে কী খুলে পড়ে যাবে? দূরে স্বদেশের ছায়ামূর্তিও দাঁড়িয়ে। অনুপম আর একবার হাত তুলল, সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন শিথিল হয়ে আসছে তার, এই অন্ধকার যেন ছুটে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে; ঠোঁট সামান্য ফাঁক হল তার, জিভ দিয়ে অন্ধকার চাটল একবার, আকাশ না গাছ কোথায় আগুন লেগেছে এখন? শেষ চেষ্টা করল একবার;

স্বদেশ শোন, এভাবে তুই আমাকে...

ক্রমশ জায়গাটা চিনতে পারছিল অনুপম। এখন আর চোখের ভেতর ধোঁয়ায় অস্পষ্টতা নেই, জোৎস্না ঝকঝক করে উঠল, খুব স্বাভাবিক হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস। যেন মধ্যরাতে ঘুম না এলে সে এমনি পথে ঘুরতে বেরিয়েছে। ভাল করে তাকাল চারদিকে; সেই পুরনো মাঠ, তাদের গোলপোস্ট, বৃষ্টির মধ্যে বল নিয়ে ছুটছে তারক, একটু দূরেই টিলার ওপরে নীল রুমাল হাতে স্বদেশ দাঁড়িয়ে আছে... ছেইশে জানুয়ারি আঙুল বিঁধিয়ে শপথ নিচ্ছে তারা, ওই তো একসারি তাল গাছ পর পর সাজানো, এখানেই পিকনিক করতে এসে মীরাদির শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল, সূর্যাস্তের অলৌকিক আলোর মধ্য দিয়ে মাঠের ওপর সাইকেলে তাদের ইতিহাসের টীচার ভুবনবাবু কোথায় যেন যাচ্ছেন; বাবলা কাঁটার জঙ্গলে ছবিটা হারিয়ে গেল। ঝমঝম শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন; অদ্ভুত মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ; ঘুম ভেঙে চোখে পড়ে তার আকাশ ঝুঁকে আছে তাদের জানলায়, তার হাতের মুঠোয় অসংখ্য নক্ষত্র, তাড়াতাড়ি বালিশ সরিয়ে মার শরীরে মুখ ঢাকে সে; ছুটে আসছে বাচ্চু, তপু খোকন... রেললাইনের ওপর পড়ে আছে মুন্নাদির কাটা শরীর! রক্ত! দলাপাকানো নরম শরীর!... অথচ মুন্নাদির আঙুলগুলো মনে হত মোমের তৈরি... ম্যাটিনি শো দেখতে গেল মা... অনুপম চিৎকার করে উঠতে চাইল; মুন্নাদি, ট্রেন আসছে!...

আর তখনই সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা তার চোখে আটকে গেল। তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্বদেশ, চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, স্বদেশের হাত রক্তহীন হয়ে ক্রমশ ফুলে উঠছে... আবার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল অনুপম। আলো তীরের ফলার মত বিঁধে যাচ্ছে চোখে, সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠছে বোধহয়; পরিষ্কার দেখল অনুপম, জোৎস্নায় স্বদেশের হাতের মুঠোর ছুরিটা ঝকঝক করে উঠল। ওর সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে যাচ্ছে এখন, ক্রমশ স্বদেশের ফ্যাকাসে হাত তার বুকের কাছে উঠে আসছে, অনুপমের শরীর কী ওর নিশ্বাসে পুড়ে যাবে?...

—কী চাস তুই? তোর চোখমুখ এরকম অশ্লীল হয়ে উঠছে কেন? স্বদেশের হাত আরও এগিয়ে আসছে, এইবার এই ছুরিটা সোজা তার বুকে...স্বদেশ, তুই কী এখানে টেনে এনে এভাবে আমাকে খুন করবি এখন?... দ্যাখ, আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি। তুই আমার হাফপ্যান্ট পরার সময় থেকে বন্ধু, আমায় তুই ছেড়ে দে, প্লীজ!... আমার মা, মিনু, আমার বিয়ের জন্য মা আজকাল ফোটোটটো দেখে বেড়াচ্ছে, সামনের মাসে আমার ইনক্রিমেণ্ট; স্বদেশ একবার সবটা ভেবে দ্যাখ তুই...

ছায়াজড়ানো পাহাড়ী ভালুকের মূর্তিটা শুধু একবার নড়েচড়ে উঠল। আর পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে অনুপম দেখল সমস্ত আকাশ লাল হয়ে উঠছে আগুনে, স্বদেশের হাতের ছোরাটায় তাজা রক্ত!...

স্বদেশ, তুই আমায় ছোরা মারলি!...

চিৎকার শুনে মিনু ছুটে এ ঘরে এল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই দরজায় ক্রমে পাথর হয়ে গেল মিনুর শরীর। শুধু কোনোরকমে মুখ দিয়ে আর্ত স্বর বেরিয়ে এল একটা—মা, বড়মা, একবার শিগগির এসো, ছোড়দার ঘরে!...

তখন সবাই এল। সবাই দেখতে পেল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। স্বাভাবিক, স্নিগ্ধ হাওয়া ঘরের ভেতর, বাইরে গোলাকার চকচকে আকাশ, একটা কাঠগোলাপ গাছে পাখির কিচিরমিচির... মশারিটা হাওয়ায় দুলছে, একটা বালিশ পড়ে আছে মেঝেতে, অনুপমের একটা হাত ঝুলে আছে বাইরে, চাদরটা পেঁচিয়ে গেছে বুকে পিঠে; সমস্ত শরীর রক্তে ভাসছে অনুপমের, বালিশে রক্তের দাগ, এমন কী মেঝেতেও রক্ত গড়িয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

—কী হল অনুরে?... বড়মা ছুটে এলেন বিছানার কাছে।

—এ কী সর্বনাশ হল!... মার গলা বসে যাচ্ছে কান্নায়।

—ছোড়দাকে কে খুন করেছে? একটা বিহ্বল প্রশ্ন মুখ থেকে বেরিয়ে এল মিনুর।

চাদরটা সরাতে সরাতে বড়মা বললেন—কাল অনেক রাতে স্বদেশ ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, অনু ঠিকমত বাড়ি ফিরেছে কীনা;—এরই বা মানে কী?...

তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে বড়মা অনুপমের শরীর ধরে ঝাঁকানি দিলেন; অনু...এই অনু...

কিন্তু কিছু দেখতে পেল না, কিছু শুনতে পেল না অনুপম।

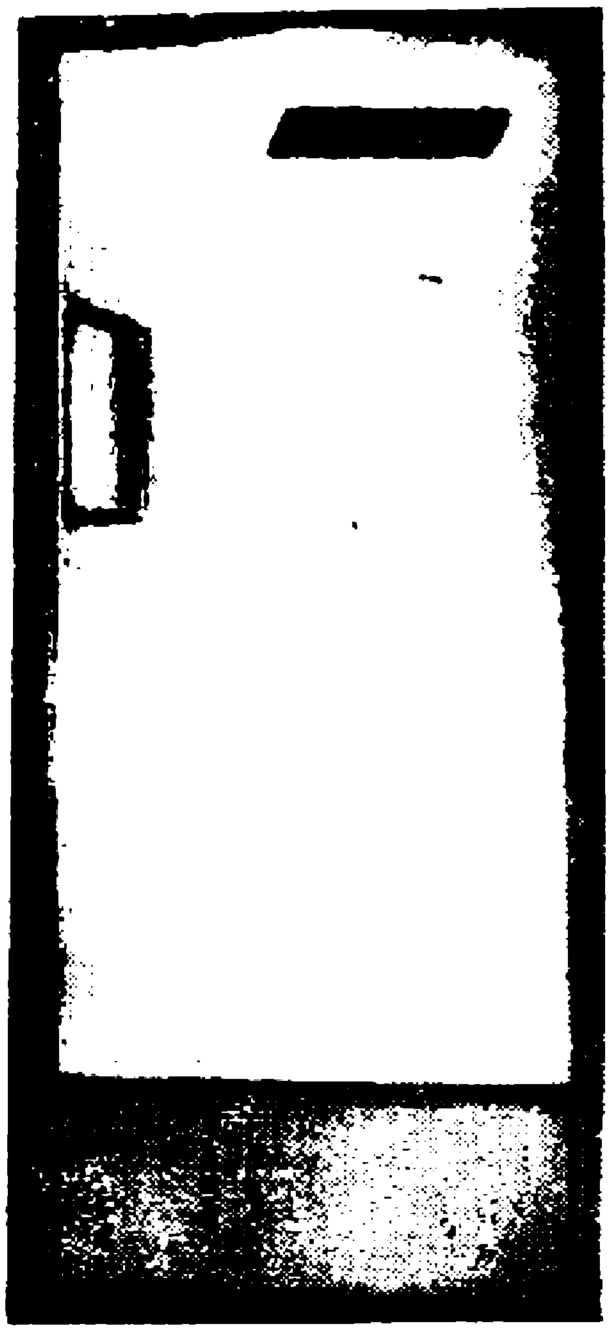

অঙ্গনা

সরল ছন্দে

শীতকালে কলকাতা শহরে সন্ধ্যা নামলেই এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়। রাস্তার আলোগুলি টিমটিম করে জ্বলে। একটু দূরের কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ধোঁয়া আর কুয়াশার জট পাকিয়ে এই পরিবেশের সৃষ্টি। এর নাম ধোঁয়াসা। বর্ষার এই প্যাচপ্যাচানির মধ্যে শীতের সেই নির্মেঘ দিনগুলির জন্য অস্থির হয়ে দিন গুনছি। কিন্তু ধোঁয়াসার কথা মনে পড়তেই সেখানেও সব আনন্দ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। প্রাণে ধরে আর কোনদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা যায় না।

ধোঁয়ার জ্বালায় এমনিতেই আমরা অস্থির। সকালবেলা ঘরে ঘরে উনুন জ্বলে। কয়লা-ঘুঁটের ধোঁয়ায় পাড়া ছায়। এমনি আর একবার হবে সন্ধ্যেবেলা। ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াকার। এই দুই বেলার জীবনই আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কলকাতা শহরে বাস করতে গেলে এটুকু বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসাবেই গণ্য করতে হবে। রাতে মশা আর দিনে মাছির সঙ্গে দুবেলার এই বাড়তি উপদ্রবটুকুকেও মানিয়ে নিতে হবে। এর হাত থেকে রেহাই নেই। এদিকে স্বাস্থ্যবিদদের সতর্কবাণী অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে, এই ধোঁয়ায় নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এতো বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু প্রশ্নের পথ নেই। দুবেলা উনুন জ্বলবে। কারণ, 'জঠরজ্বালার সঙ্গে এর সম্পর্ক'। কোন নিষেধ এখানে খাটবে না। স্বাভাবিকভাবেই ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস ভারি হবে। কার্বনের ভাগ বাতাসে এমনিতেই বেশি। কল-কারখানার চিমনি-নির্গত ধোঁয়ায় এই পরম উপকারটুকু সাধিত হয়। উনুনের ধোঁয়ায় এই মাত্রা একটু বাড়ে। অক্সিজেনের পরিবর্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সম্পর্কটাই নিবিড় হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের সব সম্পর্কই প্রায় এমনিভাবে ছিন্ন হয়ে পড়ছে দিনে দিনে।

শহরেই এই সমস্যা প্রবল। গ্রামে তেমন নয়। কাঠের উনুনে ধোঁয়া খুব একটা হয় না। আর গ্রামে জনবসতিও তেমন ঘন নয়। সেদিক থেকে সেখানকার জীবন এমনিতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। কিন্তু শহরজীবনে এই প্রথম শর্তটুকুই লঙ্ঘিত হয়। স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন কিন্তু এই শেষ নয়, শুরু বলা চলে। ঘুঁটে-কয়লার রান্নায় খাদ্যপ্রাণও নষ্ট হয় বেশ। এই ক্ষতিটা কাঠের জ্বালে হয় না। অন্য সব ক্ষতির সঙ্গে এটুকুও আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ, এই শহরের নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষায় কারো তেমন উৎসাহ নেই। সবাই উপদেশ দিয়েই খালাস।

এদিকে শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন উপায় নেই। একটা কিছু করতেই হবে। অবশ্য ইলেকট্রিসিটিকে রান্নাবান্নার কাজে হামেশা লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও একটা 'কিন্তু' আছে। প্রথমত, এর ব্যবহারবিধি সবাইকে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, খরচের দিকটা এতে বাড়বে বই কমবে না। অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে এই বাড়তি বোঝা বহন করা অসুবিধাজনক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। তবে কোন কোন বাড়িতে নিজ নিজ উদ্যোগে বিদ্যুতে রান্নাবান্না করা হয়। এতে শুধু যে শহর ধোঁয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় তাই নয়, বাড়িটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার সুযোগ পায়। আসবাবপত্র কয়লার ধোঁয়ায় মলিন হওয়ার সুযোগ পায় না। খরচ হয়তো এতে কিছু বেশি পড়ে কিন্তু বাঁচোয়া অনেক দিক থেকে। সেটা ভেবেই কেউ কেউ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

এতো গেল গোটা শহরে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের কথা। এর বাইরে রয়েছে অসংখ্য পরিবার যাঁরা কয়লার উনুনের হাত থেকে রেহাই পেতে চান।

কয়লার ধোঁয়ায় স্বাস্থ্য তো নষ্ট হয় সকলের কিন্তু বাড়িঘর নোংরো হওয়া অসহ্য। বিশেষ, বাড়ি করতে সবাই টের পেয়ে যান কেমন খরচ পড়ে। ইদানীং যাঁরা বাড়ি করছেন, তাঁরা একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়ির নক্সা তৈরি করছেন। এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা ছবি। শহরের কয়েকটি অঞ্চল দেখে তাই মনে হয়। কয়লার ধোঁয়ায় এ-বাড়ি নোংরা হোক কার প্রাণে তা সহ্য হয়। এদিক থেকে একটা বিকল্পের সন্ধান করছিলেন এঁরা। এঁদের এই সুযোগ এনে দিয়েছে গ্যাস। এতে ধোঁয়ার উৎপাত নেই। প্রয়োজনে বার্নারটি খুলে দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে নেওয়া। রান্না করতে সময় বেশ কম লাগে। সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হলো, আঁচ ওঠার জন্য পাখার হাওয়া করতে হয় না আর আঁচ পড়ে যাওয়ার আশংকাও নেই। কয়লা-ঘুঁটে-কেরোসিনের ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এজন্য আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত করতে হতো। সেদিক থেকে কিছুটা জায়গারও সুবিধে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি উনুন ঠেলার দায় থেকে গিন্নিরা অব্যাহতি পাচ্ছেন।

গ্যাসে রান্না করা সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমদিকে একটু খরচ বেশি পড়ে যায়। কারণ, এজন্য আলাদা উনুন কিনতে হয়। কোমর-সমান উঁচু করে এই উনুন বসাতে হয়। গ্যাস সিলিণ্ডার ফুরিয়ে গেলে কোম্পানী খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সিলিণ্ডার নিয়ে যায়। নানা কোম্পানী গ্যাস যোগানের দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া সরাসরি গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থাও আছে। এই ব্যবস্থা গিন্নিদের খুবই মনে ধরেছে। রান্নাবান্নায় গ্যাসের ব্যবহারও ক্রমেই বাড়ছে। রান্নার প্রায় অর্ধেক ঝামেলাই কমে গিয়েছে। আগে যেখানে উদ্যোগ-আয়োজন করতে করতেই অনেকখানি সময় কেটে যেতো, সেটা আর নতুন ব্যবস্থায় হয় না। এটা কম আশার কথা নয়। রান্নার দেরির জন্য অফিস লেট হওয়ারও আশংকা নেই। রোজগেরে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই সহায়ক।

গ্যাসের অনেক আগেই আর একটি জিনিস গিন্নিদের পরম সহায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেটি হলো রেফ্রিজারেটর। আমাদের দেশে সবাই রোজ রান্না করেন। আসলে আমরা রান্না করতে ভালবাসি। একদিন রেঁধে তিনদিন চালানো আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। বাসি খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যবিধিতে আটকায়। যতদিক দিয়ে যত স্বাস্থ্যহানিই হোক এটুকু কিন্তু আমরা বরাবর রক্ষা করে আসছি। বাসি খাবার মুখে তুলতে সবাই নারাজ। ফ্রিজ থাকলে রান্নাকরা খাবারদাবার আর বাসি হবার সুযোগ পায় না।

ফ্রিজ কেউ কেউ ভাবেন বিলাসের সামগ্রী, বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়। এখন আর ওটা বিলাসের বস্তু নয়—প্রয়োজনীয় জিনিস। হায়ার-পারচেজে তা কেনাও যায়। একবার একটা ফ্রিজ কিনতে পারলে নানা-

দিক থেকেই সুবিধা। আমাদের পরিশ্রম অনেকখানি বেঁচে যাবে। কয়লার উনুন থেকে যেমন গ্যাসে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা সারাদিন উনুন ঠেলানোর দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, তেমনি ফ্রিজ কিনতে পারলে রোজ রান্নার ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবো। এতে সময়ই শুধু বাঁচবে তা নয়, খরচও কমবে।

ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার খেতে যদি অসুবিধে হয় তো একটু গরম করে নিলেই চলবে। এজন্য হট প্লেটের ব্যবস্থা রাখলে আর কোন ঝঞ্ঝাটই নেই। অবশ্য গ্যাস উনুনে কেউ কেউ গোড়াতেই হট প্লেট বসিয়ে নেন। আবার যাঁরা বিদ্যুতে রান্না করেন, তাঁরাও হট প্লেটযুক্ত উনুন ব্যবহার করেন। এর পর সংসার করা আর কোন সমস্যাই নয়। সব সমস্যারই সমাধান প্রায় হয়ে গেল।

ঘরসংসার করতে গেলে রান্না ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়। কাপড় কাচা, ঘর ধোওয়া মোছা, জানালা-দরজা পরিষ্কার করা এমনি আরো কত কি। আগেকার দিনে ঘর ধুতে মুছতে বা জানালা-দরজা পরিষ্কার করতে কোমর ব্যথা হয়ে যেতো। উবু হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে এসব কাজ করতে হতো। এখন আর এ-কাজে তেমন সমস্যা নেই। স্পঞ্জ আর ক্লিনিং ডাস্টারের সাহায্যে এসব কাজ করতে তেমন কষ্টও হয় না আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর-পিঠ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না। কয়েক মিনিটেই সব কাজ সাফ করে গা টানটান করা যায়।

এর চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কাপড় কাচা। এমনি খুচখাচ কাচাকাচি রোজই থাকতো। মাঝে মাঝে একদিন বাড়ির সমস্ত কাপড় কাচতে হতো। তার নাম ছিল ক্ষার কাচা। আগের দিন রাত্রিবেলা সেসব কাপড় সেদ্ধ করা হতো। পরদিন সকালবেলা শুরু হতো কাচা। এতো কাপড় কাচতে বেলা কটা বাজবে কেউ জানে না। যেদিন ক্ষার কাচা হতো, সেদিন খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এমনি ছিল ব্যবস্থা। সে-ব্যবস্থার এখন অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। কাপড় কাচার

বাঙলা দেশের মেয়েরা এক চরম দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি

মেশিন বেরিয়েছে। তাবৎ নোংরা কাপড়ও সেখানে কাচা হয়ে যায় মুহূর্তে। কাচতে কোনরকম কায়িক শ্রমের দরকার হয় না। কাচা হয়ে যাওয়ার পর জামাকাপড় নিংড়ে টাঙিয়ে দেওয়া। এতে পরিশ্রম কমে শুধু নয়, খরচও বেশ কমে। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলসনের স্ত্রী বলেছিলেন, আমার স্বামী এখন প্রধানমন্ত্রী। কোন বিলাস আমার কাম্য নয়। একটি কাপড় কাচার মেসিন কিনে এবার সর্বশেষ ঝিটিকেও বিদেয় করে দেব। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, কাপড় কাচার মতো কাপড় শুকনোর মেসিনও আছে। এতে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কাপড় কাচার পর বর্ষা-বাদলা যদি বাদ সাধে, সে-পথ বেশ শুরে দেওয়া হলো। এখন আর কারো মুখাপেক্ষী নয়।

যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে আমাদের কায়িক শ্রম অনেক কমেছে। বাড়তি সময় পেয়ে পেয়ে একদিন হয়তো আমরা পুরোপুরি শ্রমবিহীন হয়ে পড়বো। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে অটোমেশনের পদ-ধ্বনি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাজকর্মে যেটুকু সময় ব্যয় হয়, তখন হয়তো আর তারও প্রয়োজন হবে না। যন্ত্রের কৃপায় সব কাজ ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হবে। সে-দিনের কথা ভাবতেও বেশ রোমাঞ্চ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কর্মহীন মানুষের দিনগুলি কাটবে কি করে? তবে এ-ভাবনাটা আপাতত মাথায়ই ঘুরঘুর করুক। ঝেড়ে ফেলার দরকার নেই, আবার খুব একটা মাথা ঘামানোরও কারণ নেই। এর সঠিক হিসেবনিকেশ হবে ভবিষ্যতের সেই বিশেষ দিনক্ষণে। তবে এই পরিশ্রম লাঘবের জন্যে কর্তারা কিছুটা ব্যাজার হয়েছেন। কারণ, তাঁরা ভাবেন যে, যন্ত্রের দৌলতে গিন্নিরা দিন দিন কুঁড়ে হয়ে পড়ছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তকেই বিশ্রামসুখে ভরিয়ে তুলছেন। হয়তো কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বিছানা বা আরামকেদারায় গা এলিয়ে তাঁরা বসে থাকেন। এদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কর্তাদের রোজগার করতে হচ্ছে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। এই মন কষাকষি থেকে বাঁচবার একটা পথই আছে। সেটা হলো কর্তাদের ব্যাজার মন খুশি করতে একটা সহজ রোজগারের উপায় যদি গিন্নিরা মাথা খাটিয়ে বের করতে পারেন। গিন্নিরা একটু ভেবে দেখুন।

—প্রমীলা

বিধবার কুঠী

সুধাংশু কুমার গুপ্ত

চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে আজও একখানি পুরোনো জীর্ণ বাড়ির কঙ্কাল দেখা যায় যার ইতিহাস সুদূর অতীতের স্মরণীয় অনেক কাহিনীর মতোই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজরা যখন এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন ওরা যে ধাঁচে বাড়ি তৈরী করত, এ বাড়িখানি ছিল তারই অনুরূপ। স্থানীয় লোকেরা এ বাড়ির নাম দিয়েছিল 'বিধবার কুঠী'। কিন্তু কেন যে বাড়িখানি ঐ নামে অভিহিত হয়েছিল সে ইতিহাস পরবর্তীকালে কেউ আর মনে রাখেনি। শতাধিক বৎসর পরে ঐ রহস্য সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে। ইংলণ্ডের ওরুস্টারশায়ারে এক জমিদার বাড়ির পুরোনো আসবাবপত্র বিক্রি হবার পর সেই ভাঙ্গাচোরা জিনিসপত্রের মধ্যে হেক্টার নজরে পড়ে একরাশ চিঠিপত্র ভরা একটা পুরোনো কাঠের বাক্স। চিঠিগুলি লেখা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। লেখক কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী। চিঠিগুলি সে লিখেছে ওরুস্টারশায়ারের বাসিন্দা তার এক বন্ধুকে। চিঠিগুলির বেশীর ভাগই লেখকের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার বিবরণেই ভরা। তবে ওরই ফাঁকে ফাঁকে পত্রলেখক তৎকালীন প্রবাসী ইংরেজ সমাজের নানান খবর পরিবেশন করেছে বন্ধুর কাছে। এদিক থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজের কাছে চিঠিগুলির যে একটা মূল্য আছে এটা অনস্বীকার্য। চিঠিগুলি যে একদা সর্বসাধারণের চোখে পড়তে পারে, এ সম্ভাবনা লেখকের মনে আদৌ জাগেনি আর সেই কারণেই সবকিছু সে ব্যক্ত করেছে অকপটে। প্রবাসী ইংরেজদের চারিত্রিক দুর্বলতা গোপন করার চেষ্টা করেনি কোথাও। এই পত্রাবলী থেকেই আমরা জানতে পারি কলকাতার বাসিন্দা এক ইংরেজ দুহিতার কথা প্রেমের প্রতি যার নিষ্ঠা উপন্যাসের নায়িকার প্রেমকেও ম্লান করে দেয়। স্বামীর অকালমৃত্যুর ফলে সে এমনি শোকাহত হয়ে পড়ে যে যৌবনেই সংসারের সকল সুখ পরিহার করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দেয় চুঁচুড়ার গঙ্গার তীরে এক নিরালা পুরীতে—শুধু স্বামীর স্মৃতিটুকু সম্বল করে।

যে সময়কার কাহিনী আমরা বলছি তখন ইংলণ্ডে অভিজাত সমাজের একদল তরুণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এদেরই একজন ছিল রডনি লিন্ডসে। অল্পবয়সেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে শিক্ষার সুযোগ সে পায়নি। পিতা প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু জমিদারী চাল বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে রডনি যে সম্পত্তিটুকু পায় তার আয়ে তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানো অসম্ভব

CENTRAL LIBRARY

হয়ে পড়ল। বর্ডান যে শুধু বিলাসিতায় ছিল তা নয়, জুয়া খেলায় নেশা ছিল তার প্রচণ্ড। জুয়ায় প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় সে হয়ে উঠল বেপরোয়া। সেই সময় ফ্রান্স থেকে গোপনে মদ আর বেশ কিছু চালান করে মোটা টাকা রোজগার করছিল একদল অর্থলোভী দুর্বৃত্ত। বড়লোক হবার আশায় বর্ডান যোগ দিল সেই দলে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মাল আনার কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না ওদের। দিন কতক ওরা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই কাজ চালিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন অকস্মাৎ বিপদ এল ঘনিয়ে। রাত্রির অন্ধকারে মাল নিয়ে ওরা ফিরছিল সাসেক্সের সমুদ্রোপকূল থেকে। আগে থেকে খবর পেয়ে শুল্ক অফিসাররা ফাঁদ পেতেছিল ওদের ধরবার জন্যে। বেপরোয়াভাবে পিস্তল চালিয়ে পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে ওরা পালিয়ে গেল কোনরকমে। সংঘর্ষের সময় গুরুতরভাবে আহত হল একজন শুল্ক অফিসার। যারা ঐ বেআইনী ব্যবসা চালিয়ে আসছিল এতদিন, ওরা সবাই ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিল সঙ্গে সঙ্গে। বর্ডান আশ্রয় নিল গ্রামাঞ্চলের এক নিভৃত পল্লীতে। ভাবল, কিছুদিন কেটে যাবার পর সে ফিরে আসবে শহরে। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোন সূত্রে খবর পেল, ঐ ঘটনার সঙ্গে বর্ডান জড়িত এবং ওর সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠল। আর্থিক অবস্থায় ভাটা পড়লেও বর্ডানের আত্মাভিমান এতটুকু কমেনি। সে যে এক বনেদী জমিদারবংশের সন্তান এ গর্বটা ছিল তার পুরোমাত্রায়। আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখে অবশেষে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের শরণাপন্ন হল সে। ইনি ব্যবসায়ী ছিলেন বলে বর্ডান এঁকে এতকাল অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় ইনি ঐ কোম্পানীতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন বর্ডানকে এবং ভারতগামী জাহাজে তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাংলা মুলুকে।

বর্ডান ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও একগুঁয়ে। বয়সটা তার তখন এমন যে সদুপদেশে কান দেওয়া দূরের কথা, সদুপদেশ কেউ দিলে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। বর্ডানকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন যিনি, তিনি অবশ্য ওকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন যেন সে অসৎপথে কুসংসর্গে না মেশে, সৎভাবে জীবন যাপন করে বিদেশে। বর্ডান কিন্তু সহৃদয় আত্মীয়ের উপদেশ তো শুনলই না, বরং ও যে [illegible] চলবে এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন কলকাতায় পৌঁছেই একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবককে বেছে নিল সঙ্গী হিসেবে। ওরা ছিল সব ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর অনুগামী ও অন্ধ স্তাবক। ফ্রান্সিস-এর প্রতি ওদের শ্রদ্ধা ছিল এমনি উৎকট ধরনের যে ওরা তাকে বলত, 'কিং ফ্রান্সিস দা ফার্স্ট'। ওদের কারও কোন প্রতিভা ছিল না, ওরা শুধু নেতার চালচলন অনুকরণ করত অন্যের মতো আর সব কিছুই করত এবং একটা বদখেয়ালের ভাব প্রদর্শন করত যাতে সবাই মনে করে শিক্ষাদীক্ষায় ওরা সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। প্রতি রবিবার সকালে ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে ফ্রান্সিস-এর কুকুরগুলো নিয়ে শিকারে যেত ওরা এবং ঐ ঘোড়ায় চড়ার পোশাকই ওরা পরে থাকত সারাদিন। এমন কি নাচের আসরেও ওরা হাজির হত ঐ পোশাকেই শিকারের চাবুকটা সগর্বে দোলাতে দোলাতে। এদেশের কোনো কিছুই ফ্রান্সিস-এর কাছে প্রীতিকর ছিল না বলে ওরা ভারতীয় ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা অশোভন গর্বের সঙ্গে জাহির করে বেড়াত। শুধু তাই নয়, উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রচেষ্টাকে ওরা অশ্রাব্য ভাষায় উপহাস করত প্রকাশ্যভাবে। ফ্রান্সিস-এর অনুগ্রহপুষ্ট হওয়ায় ওদের স্পর্ধা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, একবার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সামনেই অভদ্র আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি ওরা। ওয়ারেন হেস্টিংস অবশ্য ওদের এই অপরাধ উপেক্ষা করেছিলেন, তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, ওদের [illegible] দমনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনি। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে তাঁর যে বিরোধটা ছিল সেটাকে তিনি আর বাড়িয়ে তুলতে চাননি ঐ সব অপদার্থ যুবকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে হেস্টিংসকে নিষ্ক্রিয় দেখে ওরা ধারণা করে বসল, ওরা এত শক্তিমান যে কেউ ওদের অঙ্গস্পর্শ করতে সাহস করে না এবং ঐ ধারণার ফলে ওদের উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিন চরমে গিয়ে পৌঁছল। পথেঘাটে যখন তখন ঝগড়া মারামারি করা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপমান করা এসব ওদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়াল।

এই উচ্ছৃঙ্খল দলগুলোর মধ্যে বর্ডানের প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। একে তো সে জমিদারের ছেলে, তার ওপর সে ছিল এক সময় লণ্ডনের ডাকসাইটে ক্লাবগুলোর সদস্য। পরে যখন ওরা শুনল বর্ডানের সাহস ও বিক্রমের কথা, পুলিশের সঙ্গে তার মুখোমুখি লড়াই আর পিস্তলের গুলিতে একজন শুল্ক অফিসারকে জখম করে অন্তর্ধান, তখন তাকে রীতিমত ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগল ওরা। কারণ ওদের বেশীর ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এবং স্বদেশে থাকার সময় ওরকম বেপরোয়া দস্যুগিরির সুযোগ পায়নি কোনদিন।

বর্ডানকে দলের গৌরব বলে মনে করলেও তার সাহচর্য সবসময় বরদাস্ত করতে পারত না ওরা। বর্ডান ছিল উগ্রস্বভাব ও খামখেয়ালী। চুঁচুড়ায় একখানা বাড়ি কিনেছিল সে। হয়তো তার মতলব ছিল, বিলাতী অভিজাত ক্লাবের ধরনে এখানে একটা ক্লাব গড়ে তুলবে প্রমোদবিলাসীদের জন্যে। কিন্তু তার ঐ খেয়ালী স্বভাবের দরুণ সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। একবার বহু বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হয়েছিল তার বাড়িতে। সবাই যখন হাসিপরিহাস ও খোশগল্পে মশগুল সেই সময় হঠাৎ বর্ডান হল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা বার করল আস্তাবল থেকে, তারপর তার পিঠে চেপে রাতের অন্ধকারে কোথায় যে চলে গেল কেউ তা জানতে পারল না। অতিথিরা কিছু বুঝতে না পেরে বর্ডানের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল ক্ষুব্ধচিত্তে।

পরিচিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বর্ডান টাকা ধার করত নির্লজ্জের মতো এবং যতক্ষণ হাতে টাকা থাকত ততক্ষণ সে খরচ করত বেপরোয়াভাবে। টাকা যেই ফুরিয়ে যেত অমনি বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে কোন সহায়ক বন্ধুর স্কন্ধে ভর করত তিলমাত্র সংকোচ না করে। কিন্তু মজার কথা এই যে, বন্ধুদের আতিথেয়তার সুযোগ নিতে দ্বিধাবোধ না করলেও তাদের প্রসন্ন রাখার চেষ্টা সে করত না কোনদিন। তারা যে অতি সাধারণ স্তরের মানুষ ও নিতান্ত ভাগ্যগুণে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে একথাটা সে তাদের শুনিয়ে দিত সুযোগ পেলেই।

বর্ডানের প্রতি বন্ধুদের অনুরাগ কমে এল দিনে দিনে এবং বর্ডানের মানসিক অস্থিরতা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছল যে জীবনের যা কিছু আনন্দ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল।

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর এসে পড়ল বড়দিনের উৎসব। নাচের আসর বসল লাটসাহেবের বাড়িতে। শহরের শ্বেতাঙ্গিনীরা সবাই এল সেই আসরে—লাট সাহেবের প্রণয়িনী থেকে শুরু করে নিম্নতম কর্মচারীর কন্যা পর্যন্ত। সেদিন ফ্রান্সিস-এর প্রণয়পাত্রী ছিল রূপসী মাদাম গ্রান্দ। সে-ও এসেছে চটকদার পোশাক পরে। ফ্রান্সিস এর ভক্ত তরুণদের কয়েকজন ঘোরাফেরা করছে তার চারপাশে, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করছে তাকে আর মাঝে মাঝে দলপতির অশালীন রসিকতার তারিফ করছে কৃত্রিম হাসি হেসে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়াল বর্ডান।

বর্ডানের চেহারা ছিল সুন্দর, মেয়েদের আকর্ষণ করবার মত। তাছাড়া অর্থগৃধ্নু স্বৈরিণী বলে বর্ডান ওকে অবজ্ঞা করত বলে মাদাম গ্রান্দেরও চেষ্টা ছিল বর্ডানকে বশ করবার। কোন পার্টি বা সমাবেশে যখনই বর্ডান কাছে এসে দাঁড়াত তখনই লালসাভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকাত তার দিকে। বর্ডান যেই লক্ষ্য করল মাদাম গ্রান্দ-এর নীল চোখদুটো তার মুখের ওপর নিবদ্ধ অমনি সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। যেখানে মদ পরিবেশন করে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হচ্ছে সে-জায়গাটার আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশী।

এই হৈ-হুল্লোড় বর্ডান পছন্দ করত না মোটেই। ঐ যে দুর্বিনীত যুবকগুলো যারা

মুখোশ বর্ণ-আলখাল্লা জামা কোর্ট পরে বর্ণাঢ্যদের নাচছে আর ওদের ঐ লাস্যময়ী সঙ্গিনীরা যাদের সারা মুখে রং ও পাউডারের পুরু প্রলেপ, পোশাকের আড়ম্বরে দেহের কুশ্রীতা ঢাকবার জন্যে যারা সচেষ্ট—কোনোদিনই ওরা মোহ জাগায় না তার মনে। ওরা তার ঘৃণার পাত্র।

হলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বর্তনি লক্ষ্য করল, এক জায়গায় একটা টেবিলের ধারে বসে রয়েছে ন্যাথানিয়াল পিকারিং। লোকটি তার পরিচিত। ঘোড়ার সাজের ছোট্ট একটা দোকান আছে তার, কয়েকবার টুকিটাকি কাজও সে করেছে তাকে খুশী করবার জন্যে। তারই পাশে বসে রয়েছে উনিশ কুড়ি বছরের একটি তন্বী তরুণী। চকচকে কালো সিল্কের পোশাক তার পরনে। মুখে রঙের প্রলেপ নেই, অলঙ্কারের বাহুল্যও নেই। শুধু গলার কাছে রংবেরঙের পাথর-বসানো ছোট একটি ব্রুচ। ঐ সব সাজ-গোজ করা সঙ্গিনীদের মধ্যে তাকেই যেন সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল। কি ভেবে বর্তনি এগিয়ে গেল ওদের কাছে।

ন্যাথানিয়াল সসব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বার বার হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বিনয়ের সঙ্গে জানাল সঙ্গিনী তার বাগ্‌দত্তা পত্নী। মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিল বর্তনি। মেয়েটি সুশ্রী, মুখের চেহারায় সারল্যের ভাব পরিস্ফুট। বাঁকা ভুরুর নীচে টানা টানা চোখে কেমন এক স্বপ্ন আবেশ।

বর্তনি বসে পড়ল ওদের পাশে। শুরু করল নানান আজেবাজে গল্প। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিজেকে সে বেশ অন্তরঙ্গ করে তুলল হাসিকৌতুকের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য করল, মেয়েটির চোখ মুখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। আবার বেহালায় সুর বেজে উঠল হলঘরে। সবাই তৈরী হল নাচবার জন্যে। বর্তনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল সে নাচতে রাজী কিনা তার সঙ্গে। সম্মতি জানাল মেয়েটি। ন্যাথানিয়াল খুশীই হল এতে, কারণ সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানে কাজ করে পা দুটো তার ক্লান্ত, নাচবার সামর্থ্য নেই। একটা নাচ শেষ হবার পর আরেকটা নাচ, তারপর আবার আরেকটা। তৃতীয়বার ন্যাথানিয়েলের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না ওরা। ন্যাথানিয়াল বসে রইল বিমর্ষমুখে, হয়তো মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল কী সে মেয়েটিকে বলবে তিরস্কারের ছলে বর্তনি বিদায় নেবার পর।

কিন্তু ন্যাথানিয়াল কোনো সুযোগই পেল না মেয়েটিকে কিছু বলবার। বল নাচের শেষের দিকে নৃত্যরত পুরুষ ও মহিলারা যখন নাচতে হলের চারদিকে ঘুরতে লাগল বিদ্যুৎ বেগে এবং সেই হট্টগোলের মধ্যে বর্তনি আর ন্যাথানিয়েলের বাগ্‌দত্তা ঐ মেয়েটি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ টের পেল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ন্যাথানিয়াল যাকে সামনে দেখতে পায় তাকেই প্রশ্ন করে বর্তনি আর তার বাগ্‌দত্তা পত্নী সম্বন্ধে। সবাই তখন ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত, কেউই তার কথায় কর্ণপাত করে না। রাগে দুঃখে ন্যাথানিয়াল মনে মনে অভিসম্পাত করে বর্তনিকে।

পরের দিন সকালেই সবাই শুনল, বর্তনি বিয়ে করেছে। রাত তিনটের সময় সে নাকি যাজকের বাড়ি গিয়ে দরজায় করাঘাত করতে থাকে ভীষণভাবে। ঘুম থেকে উঠে দারোয়ান দরজা খুলে দেয়। দারোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে সোজা চলে যায় যাজকের শোবার ঘরে এবং পিস্তল উঁচিয়ে তাঁকে বাধ্য করে শয্যা থেকে উঠে এসে নাইটক্যাপ-পরা অবস্থায় বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে। অনুষ্ঠানের একমাত্র সাক্ষী ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত ঐ নিদ্রালু দারোয়ান এবং বিবাহবন্ধনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় একটা পিতলের আংটি যা বর্তনি ছিনিয়ে নিয়েছিল যাজকের মশারির হাতার থেকে।

বর্তনির স্বভাবটা যারা জানত তারা ওর ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটা শুনে একটুও আশ্চর্য হল না, এ নিয়ে আলোচনাও করল না নিজেদের মধ্যে। কিন্তু শহরের শ্বেতাঙ্গ সমাজের বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুরুষের কাছে এটা রসদ জোগাল খোশগল্পের। আলোচনা করবার এধরনের রসালো ব্যাপার অনেকদিন পায়নি তারা। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বর্তনির নবপরিণীতা বধূর এমন কোনো গুণপনার কথা তারা শোনেনি এ পর্যন্ত যা কোনো বুদ্ধিমান পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে। মাস কয়েক আগে মা-বাবার সঙ্গে মেয়েটি এদেশে আসে ন্যাথানিয়েলকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে। কিশোরীসুলভ তার সরল সলজ্জ আচরণ এদেশের কোনো উচ্চ বংশের যুবককে আকৃষ্ট করে নি। শোনা যায়, ন্যাথানিয়েলকে বিয়ে করে দেশে ফিরে গিয়ে ওরা ওখানে ঘোড়ার সাজের কারবার খুলে বসবে এই নাকি ছিল ওর ইচ্ছা। এর বেশী আর কিছু ও চায় না। ওর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ওর বাবার মতন। বাবা ছিলেন সৎ, নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান খৃষ্টান। কলকাতায় সুতীবস্ত্রের ব্যবসা ছিল তাঁর। প্রবাসী ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা আদৌ পছন্দ করতেন না তিনি। আর সেই কারণেই ব্যবসায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

সপ্তাহ দুই পরে বর্তনিকে আবার দেখা গেল কলকাতা শহরে। একদিন সন্ধ্যায় কিন্তু সে হাজির হল বাকস ক্লাবে। অত্যধিক মদ্যপান করার ফলে তার পা দুটো তখন টলছে। টেবিলের ওপর গোটা কয়েক ব্র্যান্ডির বোতল পর পর সাজিয়ে রেখে কাউকে কিছু না বলে সে বোতল এক চুমুকে শেষ এবং বাইরে এসে ঘোড়ার পিঠে চাপল কোনরকমে।

ন্যাথানিয়েলের দোকানের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল বর্তনি। তার চুল এলোমেলো, মুখচোখের চেহারা কেমন যেন অস্বাভাবিক। দোকানের ভিতর ঢুকে ন্যাথানিয়েলকে সে বলল, ইউরোপ থেকে আমদানি করা হল ক্যাম্বেলের এক জোড়া স্পার তার চাই। কয়েক জোড়া স্পার ছিল দেওয়ালের গায়ে উঁচু তাকের ওপর। মই বেয়ে উঠে উপর থেকে এক জোড়া স্পার নামিয়ে আনল ন্যাথানিয়েল। কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে স্পার জোড়া ভাল করে পরীক্ষা করল বর্তনি। তারপর মুখ না তুলে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি, ন্যাথানিয়েল। অবশ্য আমি যদি দেখতাম, আমি যেমন আশা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে চলবে সব কিছু, তা হলে ক্ষমা চাইতাম না আমি। মেয়েটির কথা চিন্তা করে বা তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি বলে অনুতাপ জাগে না আমার মনে।

দ্বিতীয় বছরে পড়লো
সবচেয়ে সেরা সবচেয়ে সস্তা
ছোটদের জন্য ছোটদের সম্পাদিত ছোট্ট পত্রিকা
দেয়ালা
প্রতি সংখ্যাই
গল্প, কবিতা, ছড়া, উপন্যাস, ধাঁধা, প্রতিযোগিতা
ও
জানবিজ্ঞানের কথায় ঠাসা
দাম : প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা : বার্ষিক সডাক ৩.৫০
দেয়ালা কার্যালয় : ১১/৭, উপেন্দ্র গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-২৬

CENTRAL LIBRARY

ওকে আমি বিয়ে করেছিলাম কেন তা তুমি জানো না। আমার মনে হয়েছিল ও শান্ত সরল ও বোকা এবং আমি চেয়েছিলাম ও এইরকমই থাকুক চিরদিন। একটা ক্ষীণ আশা আমার ছিল, একদিন হয়তো ওর ঐ সরলতা ও সহজ মাধুর্য আমার এই উদ্দাম জীবনকে সংযত করতে পারবে। কিন্তু দেখলাম, আমার ধারণা ভুল। মেয়েটির বুদ্ধি প্রখর আর নীতিজ্ঞান কঠোর। ও যেটাকে সত্য বলে জানে তা থেকে এক চুলও ওকে নড়ানো যায় না। এই অনমনীয়তা ও পেয়েছে ওর বংশের কাছ থেকে। ও যে এই প্রকৃতির মেয়ে তা কে জানত? আমি ভেবেছিলাম ও সেই [illegible] সিন্‌ডারেলা—যে শুধু তার স্নিগ্ধ মাধুর্য দিয়ে জড়িয়ে রাখবে আমার মন, নিজের আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাবে না কোনদিন।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলে তাকাল ন্যাথানিয়েলের মুখের পানে। "এর জন্যে অবশ্য অন্য কাউকে দায়ী করা যায় না—দোষটা আমারই। যেমন যে ক্ষতিটুকু করেছি—সেটা ঠিকমতো পূরণ করবার চেষ্টা করবো আমি।"

এক মুহূর্ত থেমে সে ক্লান্তভাবে বললে, "চট করে এসো বোঁথ একবার, ঘোড়ার পিঠে চড়তে আমায় একটু সাহায্য করো প্রসন্ন-মনে। দেখছ তো আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, পা দুটো কাঁপছে।"

ন্যাথানিয়েল দাঁড়িয়ে থাকতে শিখেছিল। জর্ডানকে সে পছন্দ করত বরাবরই, কারণ সে জানত জর্ডানের আচরণ একটু উগ্র হলেও ছোট বড় সকলকেই সে সমান চোখে দেখে। জর্ডান তার বাগদত্তাকে ছিনিয়ে নেওয়ায় তার মনে দুঃখ আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু জর্ডানের ওপর রাগটা সে মনের মধ্যে পোষণ করেনি বেশীদিন। জর্ডানের এই অদ্ভুত আচরণ আর এলোমেলো কথাবার্তা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ওর যা অবস্থা তাতে পথে বিপদ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। এক মিনিট সে ভাবল, তারপর আর দ্বিধা না করে ওকে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগল তার। চুপ করে বসে থাকতে পারল না। যে পথে জর্ডান গিয়েছে সেই পথ ধরে চলল ঘোড়ায় চেপে।

শহরের পাকা সড়ক ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলল সে। দুপাশে ঝোপ-ঝাড় খানা-ডোবা। চাঁদের আলোয় পথ ধরে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর, দূর থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে জর্ডানের ঘোড়াটাকে সে দেখতে পেল পথের পাশেই একটা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে মনের সুখে, কিন্তু পিঠে তার আরোহী নেই। ন্যাথানিয়েলের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। জর্ডান গেল কোথায়?

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই সে দেখতে পেল জর্ডান মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের ধারে খানার মধ্যে। চুলগুলো কাদায় জড়িয়ে গেছে, পোশাক রক্তে লাল। ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলে সে ওর বুকের ওপর হাত রেখে দেখল, তখনও হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করছে। আস্তে আস্তে জর্ডানকে তুলে নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চাপালে, তার পর লাগামটা এক হাতে ধরে হাঁটিতে হাঁটিতে চলল জর্ডানের বাড়ির দিকে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে স্বামীর জন্য হলঘরে অপেক্ষা করছিল জর্ডানের স্ত্রী। পায়ের শব্দ শুনে দুহাতে দুটো জ্বলন্ত মোমবাতি তুলে ধরে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল সে। জর্ডানকে ঐ অবস্থায় দেখে মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না সে। জর্ডানকে একটা কৌচের ওপর শুইয়ে দিল ন্যাথানিয়েল। এক গামলা জল আর একটা তোয়ালে নিয়ে এল জর্ডানের স্ত্রী। জর্ডানের মুখের কাদা আর রক্ত ধুয়ে দিল পরিষ্কার করে। তারপর জর্ডানের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল স্থিরভাবে। যখন বোঝা গেল জর্ডানের জীবন-দীপ নিভে এসেছে তখন সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ভেঙে পড়ল কান্নায়।

"জর্ডান, আমায় কিছু বলবার আছে তোমার?" আকুলভাবে প্রশ্ন করে সে।

"না, বলবার কিছু নেই। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" অস্পষ্ট ভারী গলায় জবাব দিল জর্ডান।"

"যদি তোমার মৃত্যু হয়, জেনে যাও অন্য কাউকে বিবাহ করব না আমি। আজীবন তোমার চিন্তায় কাটবো।"

জর্ডান কোন জবাব দিল না।

"তুমি কি চাও অন্য কাউকে বিবাহ করি আমি?"

"তোমার যা খুশী করতে পারো—তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" ক্লান্তভাবে জর্ডান মুখ ফেরালো দেওয়ালের দিকে এবং তার পরই তার কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল চির-দিনের মত।

ন্যাথানিয়েল একটু ইতস্ততঃ করল, জর্ডানের স্ত্রীর বেদনাবিহ্বল মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল বাইরে।

জর্ডানের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কিছুদিন চুপ করে বসে রইল। তার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোনো চেষ্টাই করল না। আশা করল, নিশ্চয়ই ও কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং ফিরে আসবার জন্য আবেদন জানাবে ওরা তাদের কাছে। তারা অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, আবেদন এলেই সভা ডেকে এবং দু-চারটে তিরস্কারের বাণী শুনিয়ে দেবার পর ওকে আবার গ্রহণ করবে পরিবারের মধ্যে। কিন্তু এক মাস কেটে যাবার পরও যখন মেয়েটির দিক থেকে কোন আবেদন এসে পৌঁছল না, তখন তারা ইউনিটেরিয়ান চার্চের যাজকের শরণাপন্ন হল। যাজক রাজী হলেন সাহায্য করতে। ভদ্রলোক তর্কে সুপটু, মনটাও উদার। [illegible] গিয়ে একদিন তিনি দেখা করলেন মেয়েটির সঙ্গে। তিনি যে তার আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে এ কাজে ব্রতী হয়েছেন এটা অবশ্য গোপন করলেন তার কাছে। ভাগ্যচক্রে যে হতভাগা যুবকের সঙ্গে কিছু-দিনের জন্য তার ভাগ্য জড়িত হয়েছিল তার নৈতিক দুর্বলতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তিনি তাকে বললেন বাইবেলে বর্ণিত সৎ মেষপালকের মত তিনি এসেছেন পথভ্রষ্ট মেষকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। মেয়েটি সব কথাই শুনল তাঁর। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলল, জর্ডান যখন চার্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি কোনদিন, তখন চার্চের আশ্রয় গ্রহণ করে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না সে। তার স্বামী যা ভালো বলে মনে করে-ছিল সেটা যে তার পক্ষেও ভালো এ বিশ্বাস সে ত্যাগ করতে চায় না। যাজক ভেবেছিলেন, মেয়েটি কুকর্মের জন্য অনু-তাপ করবে। কিন্তু অনুতাপের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। যাজকের যুক্তি খণ্ডন করবার জন্য কোনো চেষ্টাও সে করল না। দৌত্য নিষ্ফল হল দেখে বিমর্ষ-মুখে ফিরে গেলেন যাজক।

এর পর এলেন তার বাবা। সে যাতে পরিবারের কাছে ফিরে যায় তার জন্য অনেক বোঝালেন তিনি, কিন্তু মেয়ে কোনো কথাই কানে নিল না। তার সেই এক কথা—স্বামীর ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। বিফল হয়ে ফিরে গেলেন বাবা।

বাড়ি এসে দুঃখমুখে বললেন মেয়েটা ভারী একগুঁয়ে। যা ঝোঁক ধরবে তা থেকে এক চুলও ওকে নড়াতে পারবে না কেউ। আমার মেয়েকে আমি চিনি তো!

অল্পবয়সী মেয়ে, একা রয়েছে বাইরে। কীভাবে সে দিন কাটাচ্ছে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে বাড়ির সকলেই। গোড়ায় বাবা কিছু জানাতে চান না। পরে তিনি সব বললেন সবিস্তারে। ওখানে সে রয়েছে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণীদের মত। জর্ডান ছিল অভিজাত বংশের সন্তান। কাজেই তার বংশমর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে মেয়েটির সতর্ক দৃষ্টি। অভিজাত-

বাড়ির গৃহিণীদের চালচলন, আদব-কায়দা সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে বইপত্র পড়ে। ওদেশে জমিদার বাড়িতে যেমন কুকুর আর ঘোড়া থাকে বিস্তর, সেও তেমনি এক পাল কুকুর আর ঘোড়া রেখেছে বাড়িতে। চাকর-বাকরদের যে উর্দি দিয়েছে তাতে রুডলির সুরুচির। বিকেলের দিকে খোলা গাড়িতে চড়ে সে প্রায়ই বেড়াতে বেরোয় গ্রামের পথে আর মাঝে মাঝে স্থানীয় কয়েকজন বন্ধু ভদ্রলোক অফিসারকে আমন্ত্রণ করে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করার জন্য। এই পল্লীজীবন যেন তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে—এ তার স্বামীর ঘর, এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না তার।

বন্ধুবান্ধবেরা যখন এই সব কথা শুনল তখন রীতিমত অবাক হয়ে গেল তারা। তাদের অনেকে তাকে দেখতে এল চুঁচুড়ায়, কিন্তু ক্রমশঃ তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এল। নিয়মিত আসা-যাওয়া করত শুধু ন্যাথানিল। ন্যাথানিল এলে রুডলির স্ত্রী খুব খুশী হত বটে, কিন্তু পুনরায় বিয়ে করার চিন্তা কোনো-দিনই উদয় হত না তার মনে। ন্যাথানিলের অনুরাগ যেন বাড়ছিল দিনে দিনে। কত না রঙীন ছবি সে আঁকত মেয়েটির মন ভোলাবার জন্যে। ইংলন্ডের নরম সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, সেই মিষ্টি বাতাস, ওদের সেই ছোট্ট শহর মার্কেট হারবরো, ওখানে আবার ফিরে যাবে ওরা, ঘোড়ার সাজের ব্যবসা করবে, সুন্দর এক-খানি বাড়ি তৈরী করবে প্রান্তর পারে, নীচের তলায় থাকবে দোকান, উপরতলায় বাস করবে ওরা, অভাব-অভিযোগ থাকবে না, দিনগুলো কাটবে অনাবিল আনন্দে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই হত নিষ্ফল, মেয়েটির মন গলাতে পারত না কিছুতেই। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলত, না, তা হয় না—সে আবার বিয়ে করে এ ইচ্ছা ছিল না রুডলির। তার এই যে জীবন এটাই ছিল রুডলির কাম্য এবং সে-ও তাই এটা গ্রহণ করেছে প্রসন্নচিত্তে। সে যদি স্বামীর ইচ্ছাটাকে মর্যাদা না দেয়, তবে তার স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে না পরলোকে। রুডলির চিন্তা শুধু যে তার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা নয়, রুডলি এখন যেন সর্বগুণসম্পন্ন এক আদর্শমানবের মূর্তি নিয়ে তার সামনে উদ্ভাসিত।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। কলকাতায় রুডলির স্ত্রীর পরিচিত ছিল যারা, তাদের অনেকেই মোটা টাকা সঞ্চয় করে ফিরে গেল ইংলন্ডে। বাকী যারা রইল এখানে, তারা একে একে চির-বিশ্রাম নিল সেটেলমেন্ট চার্চের প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসের নীচে। চুঁচুড়ায় রুডলির স্ত্রীকে দেখতে আসত যারা, তাদের সংখ্যা কমে এল ক্রমশঃ। শেষ পর্যন্ত ন্যাথানিল ছাড়া অন্য কেউ আর আসত না ওর খোঁজখবর করতে। ন্যাথানিল অবশ্য ঠিক করেছিল, বিদেশে ওকে একা ফেলে রেখে স্বদেশে ফিরবে না কোনো কারণেই। ইতিমধ্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিল ন্যাথানিল। ইচ্ছা করলে একখানা কেন, দশ বিশখানা বাড়ি সে কিনতে পারত মার্কেট হারবরোতে। কিন্তু এ টাকা তার কাছে এখন নিরর্থক। রুডলির স্ত্রীও ইতিমধ্যে বদলে গেছে অনেক—চেহারায় ও মনে। এখন তার মুখে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা আর নেই। যৌবনে যেটা ছিল মনের বিলাস বার্ধক্যে সেটা পরিণত হয়েছে এক উৎকট মানসিক ব্যাধিতে। দিনের বেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন-মনে সে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা, সন্ধ্যায় সাজগোজ করে হল-ঘরে টেবিলের ধারে বসে কল্পিত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে গভীর রাত পর্যন্ত।

প্রিয়তমার এই মানসিক বিপর্যয় ন্যাথানিলকে প্রভাবিত করল কিছুটা। সে-ও ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলল তার মানসিক ভারসাম্য। শেষের দিকে ওল্ডটাকলারের বন্ধুর কাছে সে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিল সেগুলোর বেশীর ভাগই দুর্বোধ্য। তার প্রত্যেক চিঠিতেই বল নাচ আর পার্টির উল্লেখ দেখা যায় বার বার, তবে সেই সব আসরে উপস্থিত ছিল যারা তারা হয় মৃত, নয় কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। শেষের এই চিঠিগুলি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায়, রুডলির বিধবা স্ত্রীর মতোই ন্যাথানিলও তখন অপ্রকৃতিস্থ।

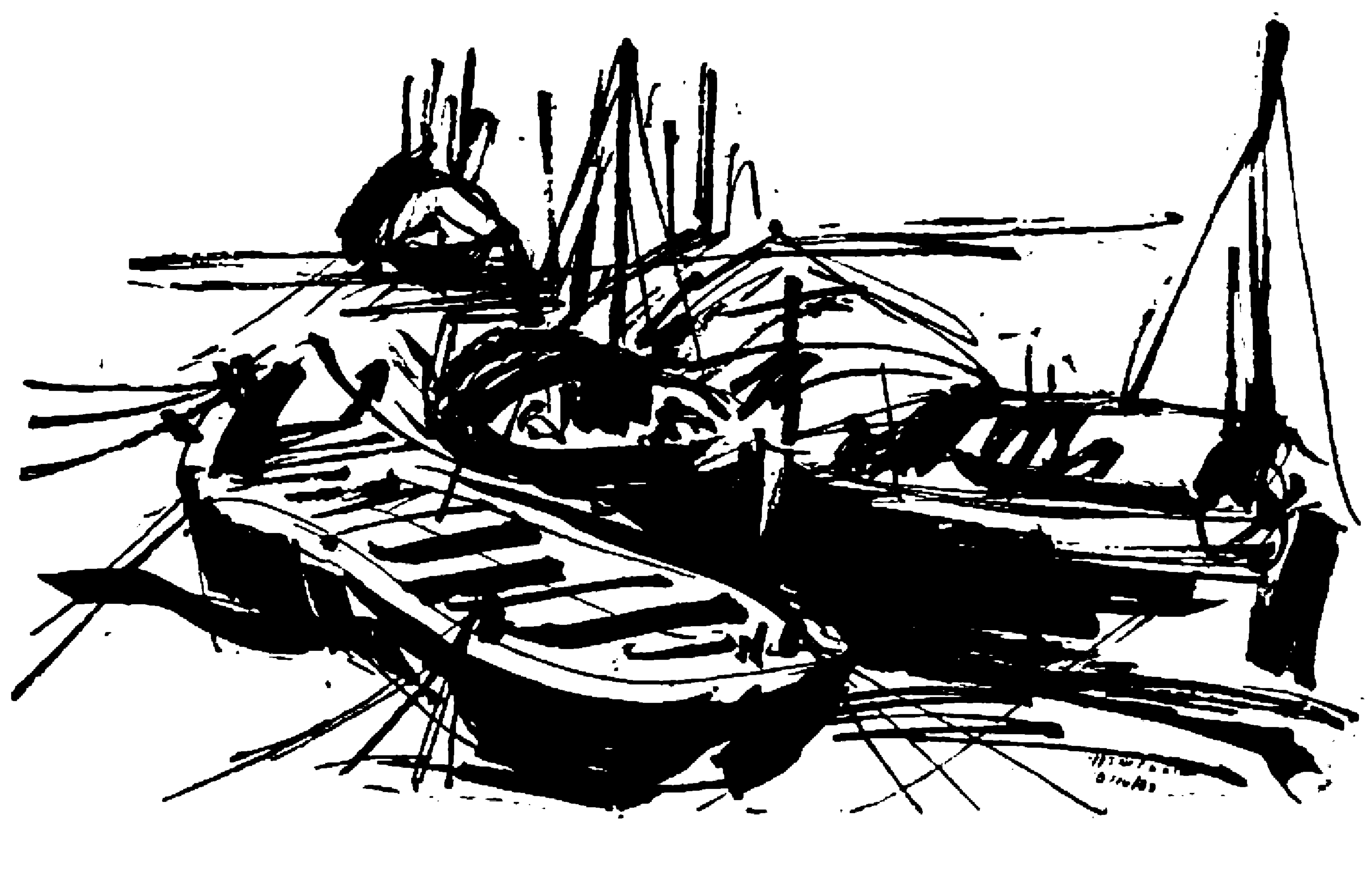

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শনী

শরণার্থী

ফটো ঃ প্রণব মুখার্জি

প্রবীণ শিল্পী জে এস বোথরা সম্প্রতি বিড়লা একাডেমীতে তাঁর একটি ছবির প্রদর্শনী করলেন। ৬ থেকে ১১ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে মাঝারি মাপের প্রায় সত্তরখানির মত ক্যানভাস রাখা হয়েছিল।

শ্রীবোথরার কাজে স্টাইলের বৈচিত্র্য এবং রঙের পরিণতি এই দুটি জিনিষই বিশেষ করে চোখে পড়ে। প্রদর্শনীর মধ্যে সর্বত্র আকর্ষনীয়তা আছে বলা যায় না, কিন্তু স্থিটীরিলি বিষয়ে মুন্সীয়ানা আনার জন্যে অনেক ত্রুটিই চাপা পড়ে গিয়েছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিগারেটিভ ও আধা-ফিগারেটিভ সবরকম রীতির ছবিই এখানে দেখা গেল। কয়েকটি ছবির বর্ণকে সাজানোর কাজ চমৎকার। 'অনস্ক্রাসিং' ছবির চাপা নীল সবুজ ও বাদামীর সমারোহ আবছা দেখতে পাওয়া রুদ্ধ উন্মোচন-কারিণীর আভাস বা প্রায় কুয়াশাচ্ছন্ন আব-হাওয়ার মধ্যে দেখা ধ্যানী মহাপুরুষের অন্তর-দৃষ্টি ([illegible]) কিম্বা গোমতে-শ্বরের মূর্তির আদলে জোয়ারে ঘূর্ণি চালনায় কৃত্রা ফিগারের আমেজ বা প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট 'ন্যুড'-এর মধ্যে পরিণত দৃষ্টি-ভঙ্গীর ছাপ দেখা যায়। নানা টোনের স্পেস সৃষ্টি করে "প্যাসেজ" ছবিটির বর্ণাঢ্য রূপ বেশ দৃষ্টিকর। 'জেলপট্টি' ছবিটিতে নিম্ন-গ্রামের রঙের ব্যবহারে ভেক্সচটিভ ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহিষমর্দিনী মূর্তিটি অ্যাবস্ট্রাক্ট অনুপ্রেরণায় আঁকা। 'সিক', 'আজার্স' ইত্যাদি সিরিজের ছবি-গুলির মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রঙের ওপর ছোট ছোট শাদা রং-এর ডেক-রেটিভ প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এক্স টেকচার তৈরীর সুযোগ পাওয়া গেলেও দেখানোর দিক থেকে একটু একঘেয়ে ভাব এসে গিয়েছে।

●

দিলীপ মুখার্জি ৭ থেকে ১০ জুলাই একাডেমি অব ফাইন আর্টসে কনকর্ডের ড্রাফ্টি-এর প্রদর্শনী করলেন। বর্তমান পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকাংশ ড্রইং তৈরী হয়েছে। প্রধানত সরু কালির রেখার মাঝে মাঝে মোটা রেখা টেনে একটা ক্যালিগ্রাফিক মেজাজ ও চেষ্টাকৃত বলিষ্ঠতা দেখানো হয়েছে। দু-একটি ঘোড়াও এঁকে-ছেন তিনি, ধূসর কাগজে বাদামী কালি ও শাদা চক দিয়ে। যীশুখৃষ্টের মত মূর্তিও এঁকেছেন, হয়ত নিখিল বিশ্বাসকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে। 'আদিম' ছবিতে দণ্ডায়মান নগ্ন পুরুষ মূর্তি এঁকে একটু শক দেবার চেষ্টা করেছেন। শকুনে মৃত নরদেহ ভক্ষণ করছে তার ছবিও এঁকেছেন। প্রতিরোধকারী জনগণ বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে তা আঁকা হয়েছে। পি সি সরকারের ম্যাজিকের মত মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত করা নর-মূর্তি আঁকা হয়েছে। খুব ছোট মাপের চেয়ারের দু-পাশে দুটি দণ্ডায়মান নগ্নিকা মূর্তি আঁকা ছিল। কিন্তু কোন ছবিতেই পুরো ফিগার আঁকার চেষ্টা করেন নি। পদ্মার বিবর্তনে কেমন যেন তেজের অভাব।

●

১০ থেকে ১৭ জুলাই আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে মিউজিয়াম ভবনে বিভিন্ন মিউ-জিয়ামের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়। পৃথিবীর নানা দেশের নানা মিউ-জিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত মনোগ্রাফ, স্লাইড, ছবির পোস্টকার্ড, বই পোস্টার ইত্যাদির প্রচুর নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়। আশুতোষ মিউজিয়াম প্রকাশিত পুস্তক, পোস্টকার্ড ইত্যাদিও প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

●

বাংলা দেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে নানারকম আয়োজনের মধ্যে ফটোগ্রাফির একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ফটো-গ্রাফার প্রণব মুখার্জি এবিষয়ে সচেতন তাই অল্পদিনে হল বারানসী ও দিল্লীতে দুটি বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ফটোগ্রাফের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনী দুটিই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ছাপ অনেকগুলি মুখের মধ্যেই পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত। তাছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে প্রতি-রোধ গড়ে উঠছে তার ছবি তুলতেও তিনি অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তরুণ-তরুণীদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণ-কৌশল শিক্ষার কয়েকটি ছবি ও পাকি-স্থানী মীরজাফরদের গ্রেপ্তারের ছবির মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

—চিত্ররসিক

শ্রাবস্তী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শ্রাবস্তী নগরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিষ্ণু-পুরাণের মতে সূর্যবংশীয় রাজা শ্রাবস্তের নামে এই নগরীর নামকরণ হয়েছে। রামচন্দ্রের পুত্র লব পিতার কাছ থেকে শ্রাবস্তীর অধিকার লাভ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্তীকালে অযোধ্যা শ্রীহীন হয়ে পড়ায় শ্রাবস্তীই হয় কোশলের রাজধানী। ভগবান বুদ্ধের কালে কোশল ছিল ভারতের ষোলটি মহাজনপদের (প্রদেশ) অন্যতম, আর শ্রাবস্তী ছিল এর রাজধানী। বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বকালে এখানে জৈন ধর্মের প্রভাব খুবই গভীর ছিল. রাজা প্রসেনজিত নিজেও জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জৈন ধর্মের তৃতীয় ও অষ্টম তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথ ও চন্দ্রপ্রভ এই শ্রাবস্তীতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে বুদ্ধের সমকালে এখানে তীর্থঙ্কর মহাবীরেরও পদার্পণ ঘটেছিল।

শ্রাবস্তী নগরী ছিল ভারতের একটি প্রাচীন ও প্রশস্ত বাণিজ্যপথের ধারে, এই পথটি রাজগৃহ, বারানসী পরিক্রম করে শ্রাবস্তী থেকে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত পৈথান (প্রতিষ্ঠান) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথটির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশেরও যোগাযোগ ছিল। শ্রাবস্তীর নাগরিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে প্রচুর ধন উপার্জন করত এবং এই কারণে শ্রাবস্তীর শিল্প-কলাও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল।

শ্রাবস্তীর অন্যতম ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন সুদত্ত। ইনি দরিদ্র-দুঃখীদের অন্নদান করে অনাথ-পিণ্ডিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন (বাংলাতে ইনিই অনাথপিণ্ডদ নামে প্রসিদ্ধ)। ব্যবসায় সূত্রে এঁর রাজগৃহে যাতায়াত ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহের অধিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ভগবান বুদ্ধের অন্যতম প্রচারকেন্দ্রও ছিল তদানীন্তন মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহে পুনঃপুনঃ যাতায়াতের ফলে বুদ্ধ প্রভাবিত অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রাবস্তী আসার জন্য অনাথপিণ্ডিক পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করায় বুদ্ধ তাঁর নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, শ্রাবস্তীতে একটি উপযুক্ত বিহার নির্মিত হওয়ার পরই তিনি শ্রাবস্তী যেতে পারেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে বাস করতে পারেন। বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে বুদ্ধ-বিহার নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেন সেটি ছিল শ্রাবস্তীর অধীশ্বর প্রসেনজিতের পুত্র কুমার জেতের একটি উদ্যান, এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এর নাম ছিল জেত-বন। উদ্যানের ভূমিটুকু আচ্ছাদন করতে যত স্বর্ণমুদ্রা লাগবে তার বিনিময়ে অনাথপিণ্ডিককে এই উদ্যান বিক্রয় করবেন কুমার জেতের এই শর্তে অনাথপিণ্ডিক সম্মত হয়েছিলেন, কারণ ভারতের অন্যতম ধনী শ্রেষ্ঠী হিসাবে তাঁর ভাণ্ডারে স্বর্ণমুদ্রার অপ্রতুলতা ছিল না। ভগবান বুদ্ধের প্রীতিসাধন, তাঁর সান্নিধ্য-লাভ ও সেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অনাথপিণ্ডিক জেতবনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করে এখানে বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যগণের বাসের জন্য মন্দির, সঙ্ঘারাম, বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করান। এই কাজে তাঁর আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মৌদ্গল্যায়ন এই বিহার নির্মাণ কার্য পরিচালন করেন। অনাথপিণ্ডিক বলীবর্দবাহিত শকটের সাহায্যে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এনে যখন জেতবনের ভূমির উপর বিছিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন কুমার জেত অনাথ-পিণ্ডিকের বুদ্ধভক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং তাঁর মনেও বুদ্ধভক্তির সঞ্চার হয়। অনাথপিণ্ডিককে তিনি কিছু ভূমি-খণ্ড অনাবৃত রাখার অনুরোধ করেন এবং এই ভূমির উপর তিনি স্বয়ং নিজ ব্যয়ে একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দেন। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারহুতে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর ফলকে অনাথ পিণ্ডিক কর্তৃক স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জেতবনের ভূমি ক্রয় ঘটনাটি চিত্রিত আছে। বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে জেতবন নির্মাণের কাহিনীতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে রাজকুমার জেত শেষ পর্যন্ত সুদত্ত প্রদত্ত ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেন নি এবং নিজ ব্যয়ে জেতবনে একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। যাই হোক, জেতবন বিহার নির্মাণে সুদত্ত বা অনাথপিণ্ডিক যে বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কুমার জেতের ভক্তিতে প্রসন্ন ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছানুসারে কুমার জেতের নামে এই বিহারের নামকরণ করা হয় জেতবন বিহার। জেতবনে বুদ্ধের বাসের জন্য অনাথপিণ্ডিক যে দুইটি মনোরম সৌধ নির্মাণ করান—তার নাম ছিল গন্ধ কুটি ও কোসাম্ব কুটি। বুদ্ধত্ব লাভের পর তৃতীয় বর্ষে ভগবান বুদ্ধ প্রথম

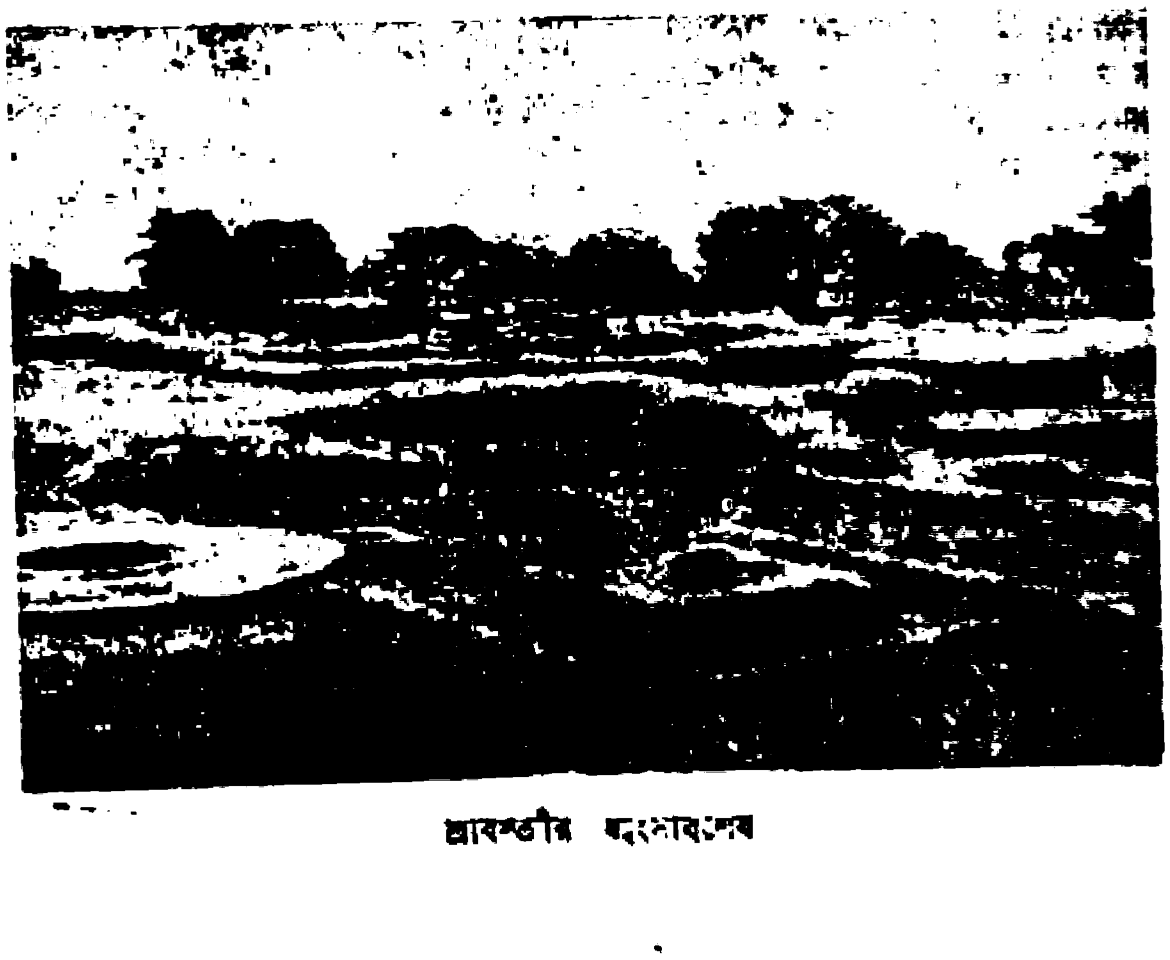

শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ

শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করেন। অচিরকালের মধ্যে শ্রাবস্তীর অগণিত নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধের মহিমামুগ্ধ রাজা প্রসেনজিতও জৈনধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জেতবনের অদূরে শ্রাবস্তীর নগরাভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদের নিকটেই বুদ্ধের উপদেশ দানের জন্য একটি বিস্তৃত ও মনোরম ধর্মমণ্ডপ এবং জেতবনে থাকাকালীন বুদ্ধের বাসের জন্য সললাগার নামে একটি বাসগৃহও রাজা প্রসেনজিত কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। প্রসেনজিতের ভগ্নী সুমনা বুদ্ধের প্রভাবে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন এবং কালে ইনিই শ্রাবস্তীর ভিক্ষুণী সঙ্ঘের নেত্রী হন। রাজা প্রসেনজিত জেতবনের অদূরে ভিক্ষুণীদের বাসের জন্যও একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন, এর নাম ছিল রাজকারাম। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠা ধনী বিশাখা ছিলেন বুদ্ধের একজন একনিষ্ঠা শিষ্যা. জেতবনের পূর্বপ্রান্তে পুর্বারাম নামে অপর একটি বিহার বিশাখার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে জেতবনে বহুসংখ্যক ভিক্ষুর বাস হেতু স্থানাভাব ঘটায় জেতবনের সীমানার বাইরে এই সব বিহার স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধ জেতবন বিহারে ২৪টি বর্ষা ঋতু যাপন করেন। বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ এই জেতবন বিহারেই প্রদত্ত হয়, ভগবান বুদ্ধের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনাও এই শ্রাবস্তী বাসের কালে ঘটেছিল—বৌদ্ধ-সাহিত্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

বুদ্ধের তিরোধানের পর আনন্দ, কুমার কাশ্যপ প্রভৃতি তাঁর শিষ্যগণ এখানে থেকে বৌদ্ধধর্মকে সঞ্জীবিত করে রাখেন। বুদ্ধের তিরোধানের পরেও বহু শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষে শ্রাবস্তীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক তীর্থদর্শনার্থীরূপে শ্রাবস্তী আগমন করেন এবং জেতবন বিহারে দুটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করান। বৌদ্ধ-সাহিত্যের বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি এখানে এসে সারিপুত্র, মোদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপ ও আনন্দের সমাধিস্তূপের পূজো সম্পন্ন করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, ভগবান বুদ্ধের চারিটি প্রধান শিষ্য শ্রাবস্তীতেই দেহরক্ষা করেছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন শ্রাবস্তী পরিদর্শনে আসেন তখন শ্রাবস্তীর গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত। শ্রাবস্তী নগরীতে তিনি মাত্র দুইশতটি পরিবারের বাস দেখতে পান, এই সময়ে শ্রাবস্তীর বিহারগুলির উপর হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেতবন বিহারের উদ্যান লোতা এবং কূপ-তড়াগাদি পূর্ববৎ থাকা সত্ত্বেও এখানে জনসমাগম ছিল না, জেতবনের আশেপাশে পূর্বারাম প্রভৃতি বিহার সম্পূর্ণ ভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এর প্রায় দু'শ বছর পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং শ্রাবস্তী এসে কয়েকটি সঙ্ঘারাম দেখতে পেয়েছিলেন. রাজা প্রসেনজিতের প্রাসাদটি তখন ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় ছিল। জেতবন বিহারের পূর্বভাগে ৭০' উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি অশোকস্তম্ভ ও একটি বিশাল বুদ্ধ মূর্তির উল্লেখও তাঁর ভ্রমণ বিবরণী থেকে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত শ্রাবস্তী কোনরকমে তার খ্যাতি বজায় রেখেছিল, এই সময় পর্যন্ত যে এখানে কিছু কিছু ভিক্ষু বাস করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর শেষ হিন্দু নরপতি সুহেল দেও ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী, তিনি একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুহেলদেও-এর মৃত্যুর পর শ্রাবস্তীর নাম আর ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণে অথবা পার্শ্ববাহিনী অচিরবতী নদীর বন্যার প্রকোপে শ্রাবস্তী নগরী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত বা পরিত্যক্ত হয়েছিল। অতঃপর এই স্থান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকের দ্বারা সাহেত-মাহেত নামে অভিহিত হত। স্থানীয় কথাভাষানুযায়ী ওলট-পালট, সর্বনাশ, বিপর্যয় ইত্যাদি সাহেত-মাহেত শব্দের সমার্থক। সুদূর অতীতে রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্মৃতিই সাহেত-মাহেত এই দুর্গম অভিধার মাঝখানে লুকিয়ে আছে বলেই মনে হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যে বহু উল্লিখিত ও আলোচিত শ্রাবস্তীর অস্তিত্ব কোথায় ছিল তা গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও অজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধিকর্তা আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা ও বাহারাইচ্ যথাক্রমে এই দুটি জেলার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাহেত-মাহেত নামে পরস্পর সংলগ্ন দুটি জনবিরল স্থান খনন করে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন—যে এই ভূখণ্ডটুকুই ছিল প্রাচীন শ্রাবস্তী। সাহেত নামক স্থানের মাটি খুঁড়ে তিনি একটি বিরাট বোধিসত্ত্ব মূর্তি উদ্ধার করেন। মূর্তির পীঠিকার ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, এটি মথুরাবাসী বাল নামক ভিক্ষু কর্তৃক জেতবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূর্তিটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ যুগে নির্মিত হয়েছিল। সাহেতের যে ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধস্তূপের মধ্য থেকে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল কানিংহাম সেটি বৌদ্ধ-সাহিত্য ও চৈনিক পরিব্রাজকের দ্বারা বর্ণিত জেতবনস্থ কোসাম্বকুটি বলে সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৭০ খৃঃ পুনরায় এখানে উৎখনন চালিয়ে কানিংহাম আরও অনেকগুলি মন্দির, স্তূপ ও সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে এইগুলি জেতবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই বিহার থেকে প্রায় অর্ধমাইল পূর্বে অবস্থিত মাহেত নামক স্থানটি তিনি অতঃপর শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে উৎখননের ফলে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু এই দুই স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়, তা' থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সাহেত ও মাহেত যথাক্রমে জেতবন ও শ্রাবস্তী নগরী. কানিংহামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ রূপে অভ্রান্তই ছিল।

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ হোই মাহেতে উৎখনন পরিচালনা করে বহু প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছিলেন। দশ বৎসর পরে ডাঃ হোই আর একবার এখানে উৎখনন করেন. এইবারও অনেক প্রত্নদ্রব্য ও সৌধাদির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার পেয়েছিল। ১৯০৭-৮ ও ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে সাহেত-মাহেতে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে আরও দুবার উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল। এই দুইবারই বহুসংখ্যক খোদিত লিপি, ছাপ মুদ্রা, ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রভৃতি প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। শ্রাবস্তী থেকে সংগৃহীত বেশীর ভাগ প্রত্নদ্রব্য লক্ষ্ণৌ-এর সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে। সামান্য কিছু কিছু অংশ কলিকাতার সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে।

পূর্বোত্তর রেলপথের গোণ্ডা-গোরক্ষপুর শাখা পথের বলরামপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাহেত-মাহেতের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। বলরামপুর স্টেশন থেকে বাহারাইচ্‌গামী সরকারী বাসে সাহেত-মাহেত পৌছান যায়। মূল সড়ক থেকে সাহেত বা জেতবনের দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। বলরামপুর স্টেশন থেকে সাহেত-মাহেত যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ও রিক্সা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বলরামপুর থেকে বাহারাইচ্‌গামী সড়ক থেকে সাহেত-মাহেতে আসার পথে প্রথমে সাহেত বা জেতবন হয়ে পরে মাহেতে পৌছান যায়। কিছুকাল পূর্বে জেতবন বিহারে দুটি বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে. এর একটি ব্রহ্মদেশীয় ও অপরটি চীন দেশীয় বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত। সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের দ্বারা এখানে একটি বুদ্ধমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ চলছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে প্রতি বৎসর বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রাবস্তী আসেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রাবস্তীর মাহাত্ম্যই তাঁদের এই নিভৃত স্থানে টেনে নিয়ে আসে।

জেতবন বা সাহেতের বিস্তৃতি প্রায় ৭৫,০০০ বর্গফুট। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে কয়েকটি মন্দির, স্তূপ ও সঙ্ঘারাম। অধিকাংশেরই বর্তমানে শুধু ভিত্তি ও পীঠিকা সম্বল। যে চারটি সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে, সেগুলি বহু কক্ষযুক্ত ছিল তা বেশ বোঝা যায়, এর আশেপাশে প্রাচীনকালের কূপও দেখা যায়। এগুলি বিহারবাসীদের পানীয় জোগাত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষগুলিকে এক একটি

সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে দেওয়া আছে। পাঁচ সংখ্যা চিহ্নিত স্তূপটির নিকটে যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি রয়েছে এটি সুপ্রাচীন আনন্দ-বোধি বৃক্ষ। জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠাকালে বুদ্ধের আদেশে মহামৌদ-গল্যায়ন গয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখা নিয়ে আসেন এবং অনাথপিণ্ডিক এটি স্বয়ং রোপণ করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। বর্তমান বৃক্ষটি মূল মহাবৃক্ষের কোন শাখা-প্রশাখার বংশধর হওয়াই সম্ভব। আনন্দ-বোধিবৃক্ষের প্রায় ২৫০ ফিট উত্তর দিকে রয়েছে কোসাম্বকুটির ধ্বংসস্তূপ, এই গৃহেই বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী অবস্থান কালে অধিক সময় বাস করেছিলেন, এর সামনে দুটি প্রশস্ত চত্বর রয়েছে, এই চত্বর দুটি ছিল বুদ্ধের পদচারণ স্থান। কানিংহাম এই স্থানের ভূমিগর্ভ থেকেই বিশাল বোধিসত্ত্ব মূর্তিটি উদ্ধার করেছিলেন। এই মূর্তি প্রাপ্তির জন্যই এই বিশেষ ধ্বংস-স্তূপটিকে কোসাম্বকুটি বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। ধ্বংসস্তূপটি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মূল কোসাম্বকুটির ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধটি সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক সৌধটি ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার পর সেই স্থানে পরবর্তীকালে নূতন সৌধ স্থাপিত হয়েছিল অথবা সেটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল, আর সেটি ধ্বংস হওয়ার পর আবার সেখানে নূতন সৌধ নির্মিত হয়েছিল—এই সত্যটি শুধু কোসাম্বকুটির ক্ষেত্রে নয় সাহেত-মাহেতের প্রায় সকল ইষ্টক নির্মিত পুরাকীর্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কোসাম্বকুটির ২০০ গজ উত্তরে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আর একটি বুদ্ধাবাস 'গন্ধকুটির' ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গন্ধকুটি বুদ্ধের কালে ছিল সপ্ততল প্রাসাদ। ফা হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে যখন শ্রাবস্তী পরিদর্শন করেন তখন এটি ছিল দ্বিতল। এর দুইশত বৎসর পর অপর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ যখন এখানে আসেন তখন দ্বিতল গন্ধকুটিও পতনোন্মুখ ছিল। গন্ধ-কুটির সম্মুখে সোপানযুক্ত একটি বিরাট মণ্ডপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে গন্ধকুটির সম্মুখস্থ ধর্মমণ্ডপের বিবরণ আছে, এখানে ভগবান বুদ্ধ সমবেত নরনারীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। গন্ধকুটির উত্তরে জেতবনের সীমানার মধ্যে আরও তিনটি সঙ্ঘারাম ও স্তূপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। জেতবনের প্রায় এক মাইল পূর্ব-দক্ষিণে একটি সুউচ্চ টিলা আছে, এটিকে বুদ্ধশিষ্যা বিশাখা প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত পূর্বারাম বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। হিউ-এন-সাঙ বর্ণিত সুউচ্চ অশোকস্তম্ভ দুটির কোন চিহ্নই বর্তমানে পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ দীর্ঘ-কালের ব্যবধানে এদুটি ভগ্নাবস্থায় গভীর মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে।

ধ্বংসস্তূপ-আকীর্ণ জেতবনের উদ্যান-শোভা এখনও দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে।

উপবিষ্ট বুদ্ধের মূর্তি

জেতবন বিহারের সীমানার বাইরে উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় আধ-মাইলের মধ্যে মাহেত বা প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন বিবরণানুযায়ী শ্রাবস্তীর তিনদিক যে অর্ধচন্দ্রাকারে উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত ছিল তার চিহ্ন বর্তমান রয়েছে, এর উত্তর সীমানায় প্রবাহিতা রয়েছে অতীতের অচিরবতী নদী যেকে বর্তমান নাম রাপ্তী। জেতবনের দিক থেকে মাহেতে প্রবেশ করতে হলে দুদিকের প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে যে পথে প্রবেশ করতে হয় তার নাম সোমনাথ দ্বার। এই প্রবেশপথের অদূরে সোমনাথ নামে একটি মন্দির আছে। এই সোমনাথ মন্দিরটি তৃতীয় জৈনতীর্থঙ্কর সম্ভবনাথের জন্মস্থানের উপর নির্মিত হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের কিছুদূরে পূর্বদিকে একটি বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, এটি পক্কীকুটি নামে পরিচিত। ডঃ হোইর মতানুসারে এটিই রাজা প্রসেনজিত কর্তৃক নির্মিত সর্বধর্ম সভাশালার ধ্বংসাবশেষ, ভগবান বুদ্ধ এখানে শ্রাবস্তীর নরনারীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও এই ধর্মমণ্ডপের উল্লেখ আছে। কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষটিকে অঙ্গুলিমাল কর্তৃক বুদ্ধের জন্য উৎসর্গীকৃত স্তূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমাল নরহত্যা করে নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গুলি কর্তন করে সেগুলি মালাকারে গলায় প্রলম্বিত রেখে আনন্দলাভ করত, এই জন্যই সে অঙ্গুলিমাল আখ্যা পায়।

বুদ্ধের উপদেশে অঙ্গুলিমালের মতি পরিবর্তিত হয় এবং সে অহিংসা ব্রত গ্রহণ করে। অতীতের কুকীর্তির জন্য অহিংসাব্রতী হলেও অঙ্গুলিমালকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, এর জন্য সে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেনি বা পূর্বজীবনে ফিরে যায়নি। অবশিষ্ট জীবন সে প্রকৃত বুদ্ধশিষ্যরূপেই অতিবাহিত করেছিল। পক্কীকুটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আর একটি সুউচ্চ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে; এটি কচ্চীকুটি নামে খ্যাত। এর পীঠিকাটি ১০৩'×৩২' ফুট, এটি বহুতলবিশিষ্ট ছিল, উচ্চতলে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত সোপানপথেরও চিহ্ন আছে। সৌধের ইষ্টকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত ঘটনাবলী চিত্রিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এটি বুদ্ধের উত্তরকালে নির্মিত একটি বিশাল দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ। এখানে যে মূল মন্দির বা স্তূপ ছিল সেটি অনাথপিণ্ডিক বা সুদত্ত কর্তৃক ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে শ্রাবস্তী নগরীর অভ্যন্তরে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত একটি বিশাল স্তূপের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত মূল সৌধটি বিনষ্ট হওয়ার পর একাধিকবার সেটি পুনর্নির্মিত হয়।

[illegible] / রেখা

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্র আমদানী-রপ্তানী

ভারতে বৃটিশ শাসনকালে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে যদিও বেশীর ভাগ ছবিই আসত আমেরিকা এবং ইংলণ্ড থেকে, তবু মাঝে-মাঝে আমরা সাধারণ ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর (কমার্শিয়াল স্ক্রীনিং) মাধ্যমে রাশিয়া (ব্যাটলশিপ পোটেমকিন, কমরেড শ্যাফট), জার্মানী (ভ্যারাইটি, ফাউস্ট, লাস্ট লাফ, প্যান্থার অব প্যারিস), ইটালী (কুও ভেডিস, মাস্ত্রে নোস্ট্রাম), ফ্রান্স (লে মিজারেবল) প্রভৃতি দেশের ছবি দেখতে পেতুম। কিন্তু চলচ্চিত্রে সবাক যুগ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার হলিউড এবং বৃটেনের ছবি ছাড়া অন্য দেশের ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায় সম্ভবত এই কারণেই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণভাবে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে আমদানী-করা ছবির মধ্যে আবার দ্বিতীয়োক্ত দেশের ছবিই ছিল বেশী। কলকাতার বিদেশী চিত্রগৃহগুলির মধ্যে (যার সংখ্যা ছিল আটটি) একমাত্র নিউ এম্পায়ার ছাড়া অন্য কোথাও বৃটিশ ছবি দেখান হত না। বর্তমানে 'রিগ্যাল' ভারতীয় চিত্রগৃহে পরিণত হয়েছে এবং নিউ এম্পায়ার আমেরিকান — বিশেষ করে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স নির্মিত ছবি দেখাচ্ছে। অর্থাৎ বৃটিশ ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেছে।

পাঠকরা চিন্তা করে দেখেছেন কিনা জানি না যে, এই যে হলিউডী ছবির ঢালোয়া আমদানী হয় আমাদের ভারতে— স্বাধীন ভারতে (প্রতি বছর গড়পড়তা ৩০০ থেকে ৩৫০), এর পরিবর্তে ভারতবর্ষ থেকে কিন্তু একখানিও ছবি ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর জন্য আমেরিকায় রপ্তানী করা হয় না। স্বাধীন ভারত সরকার তার দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীবনে এ ব্যাপারে বিগত বৃটিশ সরকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। আমাদের স্বাধীন সরকার একবারও চিন্তা করে দেখেন নি, এই যে তাঁরা প্রতি বছর ৩০০।৩৫০ হলিউডী ছবি আমদানী হতে দিচ্ছেন, এর পরিবর্তে সমপরিমাণ ভারতীয় ছবি আমেরিকায় রপ্তানী করা সম্ভবপর কিনা। ভারতীয় ছবি রপ্তানী করার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অজুহাত হচ্ছে, আমেরিকায় ভারতীয় ছবির কোন বাজার নেই। কিন্তু বাজার নেই অর্থাৎ চাহিদা নেই, একথাটা তাঁদের জানিয়েছে কে? আমেরিকার চিত্র-ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ নয় নিশ্চয়? আমেরিকার সাধারণ দর্শকরা ভারতীয় ছবি দেখতে আদৌ চায় কিনা, তা কি করে জানা যাবে, যদি না তাদের সামনে নানা ধরনের ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়? ভারতীয় ছবির বাজার যে সম্প্রসারণ করার আশু প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই যে-আমেরিকায় তার বাজার নেই, সেখানে তার বাজার খুলতে হবে এবং এর একটি মাত্র রাস্তাই আমাদের সামনে খোলা আছে। মোশান পিকচার একসপোর্ট এসোসিয়েশান অব আমেরিকার সঙ্গে নতুন করে চুক্তি সম্পাদনের সময়ে তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে হবে, ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর জন্যে তোমরা যতগুলি ভারতীয় ছবি আমদানী করতে রাজী হবে, আমরা মাত্র ততগুলিই— এবং তার একখানিও বেশী নয়—আমেরিকান তথা হলিউডী ছবি ভারতে রপ্তানী করতে দেব। তাদের আরও বলতে হবে, যদি তোমরা ভারতীয় ছবি নিতে অসম্মত হও, আমরাও আমেরিকান ছবি নেব না। আজকাল হলিউডে নির্মিত বেশীর ভাগ ছবিই এমনই নিম্ন মানের যে, সেগুলি মাত্র যে না দেখলেও চলে, তাই নয়, সেগুলি সাধারণে প্রদর্শিত হবার জন্যে আমদানী হওয়াই উচিত নয়। এখানে বিশেষ জোর দিয়েই বলব, হলিউডী ছবির অবাধ আমদানী যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ হওয়া দরকার এবং এর জন্যে আমেরিকাতেই ভারতীয় দূতাবাসের অধীনে বা উদ্যোগে একটি সুযোগ্য স্ক্রীনিং কমিটি (কোন্ ছবি যাওয়া উচিত এবং কোন্ ছবি যাওয়া উচিত নয়, তাই নির্ধারণ করার সমিতি) গঠিত হওয়া উচিত। হলিউডী ছবির আমদানীকে সীমিত করতে পারলে ভারতে অবস্থিত বিদেশী চিত্রগৃহগুলিতে যে-প্রদর্শনী সময়টা (স্ক্রীনিং টাইম) উদ্বৃত্ত হবে, তাতে ফ্রান্স, জার্মানী (পূর্ব ও পশ্চিম), পোলাণ্ড, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের ভাল-ভাল ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর সুযোগ হওয়া সম্ভব হবে। এমন কি, কিছু ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ক্ষেত্র এর ফলে বর্ধিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আই এস জোহর সম্প্রতি যে-প্রস্তাব করেছেন, সেটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল বিদেশী ছবির

আমদানী ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। গেল মঙ্গলবার, ১৩ জুলাই মোশান পিকচার এক্সপোর্ট এসোসিয়েশান অব আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তিকে নতুন করে বলবৎ করার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, হলিউডী ছবিকে ভারতে আমদানী করার অনুমতি দেওয়ার সময়ে অপরাপর দেশের ছবি যেন ভারতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-পথ অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

গেল বছরে ভারতীয় ছবি রপ্তানী করে ৬ কোটি টাকা পরিমাণ আয় হলেও ভারত যে জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে বিশেষ কিছু মাথা গলাতে পারে নি, শ্রীজোহর সেকথার উল্লেখ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জানান, ইউ. কে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছবির রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীজোহর মনে করেন, ইউরোপ ও জাপান থেকে ছবি আমদানী করতে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আমদানীর বিনিময়ে রপ্তানীর প্রথা—যাকে ইংরেজীতে বলে টু-ওয়ে ট্রাফিক—চালু করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে ইমপেকাকে (ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনকে) আমদানী লাইসেন্স দেওয়া উচিত এবং যে-সব দেশে ভারতীয় ছবির কোন বাজার চালু নেই, সেই সব দেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। শ্রীজোহরের মতে বিদেশের সমস্ত চলচ্চিত্রকেই ই-ম-পে-কা-এর মাধ্যমে আমদানী করাই হবে এ ব্যাপারে প্রকৃত পন্থা।

কোন রকম দুর্নীতি প্রবেশ না করে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার ইম্পোর্ট অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশানের (না থাকলে নতুন করে গড়ে তুলে) মাধ্যমে ভারতীয় ছবির বিভিন্ন দেশে রপ্তানী ও তার পরিবর্তে সেই সব দেশ থেকে সমসংখ্যক ছবি ভারতে আমদানী করার রীতি গ্রহণ করা ভারত সরকারের পক্ষে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা এবং সেই পন্থা অবিলম্বে চালু করবার জন্যে যা-কিছু আইন-কানুন প্রণয়ন বা রদ-বদল করা প্রয়োজন, তা যতশীঘ্র সম্ভব করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কারণ এই ব্যবস্থায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। প্রত্যক্ষ উপকার হচ্ছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহির্বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং পরোক্ষ লাভ হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে অধিকতর যোগ স্থাপনের ফলে নতুন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে নব-নব দিগন্তের আবিষ্কার ও সামগ্রিক উন্নতি সাধন।

আশা করব, ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্য বিষয়ক কর্তারা চলচ্চিত্রের আমদানী-রপ্তানী ব্যাপারটিতে সনাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে একটু খোলা মন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন।

এই পর্যন্ত লেখবার পরেই সংবাদ পেলুম, ১৪ই জুলাই লোকসভার অধিবেশনে

বনপলাশীর পদাবলী/মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং শিপ্রা মিত্র। পরিচালনা : উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

[illegible] মন্ত্রী এল এন মিশ্র ঘোষণা করেছেন গেল ৩০ জুন তারিখে মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (আগে লেখা মোশান পিকচার এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কথাটা ভুল) সঙ্গে ভারত সরকারের আমেরিকার চলচ্চিত্র আমদানী করা সম্পর্কে যে-চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেই চুক্তিকে নতুন করে চালু করবার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই। বিগত চুক্তিতে অন্যতম শর্ত ছিল যে, মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকা মার্কিন মুলুকে ভারতীয় ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে এবং ভারতীয় ছবির রপ্তানীর বাজারকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবার জন্যে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শ্রীমিশ্র বলেন, 'আমাদের আশা ফলবতী হয় নি।' শ্রীমিশ্র আরও বলেছেন, 'ভারত সরকার প্রদত্ত শর্তাবলী মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকা না মেনে নিলে বিগত চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না।

এই শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে, আমেরিকাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক (সমান সংখ্যক নয় কেন?) ভারতীয় ছবি আবশ্যিকভাবে আমদানী করতে হবে।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আই এস জোহর বিদেশী ছবির আমদানী ও ভারতীয় ছবির রপ্তানী—দুই-ই ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত করবার যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে শ্রীমিশ্র বলেন, প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে বর্তমানে যে-হেতু শতকরা ৯০ ভাগ ছবিই বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিদের দ্বারা

[illegible] সেই পথে ই-ম-পে-কা-এর মাধ্যমে সমস্ত বিদেশী ছবি আমদানী করার পথে কিছু আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই বাধা এড়াবার জন্যেই মাত্র স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ সকল বিদেশী ছবি আমদানী করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমিশ্র বলেন বিদেশী ছবির আমদানী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা মনে রেখে যে-সব দেশ ভারতীয় ছবি আমদানী করে থাকে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শ্রীমিশ্র একথাও প্রকাশ করে বলেন যে, ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট

ষ্টার থিয়েটার

(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)

স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯

— নতুন নাটক

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬৷৷টায় • শনিবার ৬টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২৷৷ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, জ্যোৎস্না দাস, কুমারী বিন্দু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

কর্পোরেশনের পরিচালক সমিতিটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মত লোক থাকবেন। শ্রীমিত্রের মতে ভারতীয় ছবি যখন বিদেশে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করছে, তখন প্রধান-প্রধান আন্তর্জাতিক চৌলচিত্র প্রদর্শন গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমাদের ভারতীয় ছবি দেখানোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

বিদেশী ছবির আমদানী সম্পর্কে আমরা এই নিবন্ধে আগেও যে-কথা বলেছি, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলব, যে-সংস্থার ওপর ভারতীয় ছবির রপ্তানী করবার ভার ন্যস্ত আছে বা থাকবে, সেই সংস্থাকেই বিদেশ থেকে ছবি আমদানী করবারও দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তাহলেই লেন-দেনের মধ্যে একটি সমতা-রক্ষাকারী বিধিনিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতবাসীর দেখার উপযোগী ছবির আমদানীর সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবির বাজারের সম্যক সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও পাকা হতে পারে।

চিত্র-সমালোচনা

নিশাচর

হাঁফিয়ে উঠেছিলেন বাঙলা ছবির দর্শকেরা। পর পর কয়েক সপ্তাহ কোন নতুন ছবির মুখ না দেখে বেশ খানিকটা অস্বস্তির মধ্যেই কাটছিল সময়। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘকাল ধরেই। চোখের সামনেই একের পর এক বাঙলা ছবি নির্মাণের সংখ্যা কমে আসছে। নানান ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে প[illegible] চলচ্চিত্র শিল্পেরই আজ সর্বনাশা সংকট। নিজ বাসভূমে এ ধরনের দুঃখের, ক্ষোভের, লজ্জাজনক অবস্থা আর কতদিন চলবে কে জানে? তাই, যখন 'নিশাচর' মুক্তি পেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই খুশি। যাঁরা জানেন এ ছবি নির্মাণের ইতিহাস, তাঁদের কাছে এর মুক্তিলাভ নিঃসন্দেহেই যেমন বিস্ময়ের তেমনি গভীর আনন্দের। অনেক কড়-কাঠই সইতে হয়েছিল এই চিত্রটিকে। পেরোতে হয়েছে অনেক চড়াই-উৎরাই। তৈরিও হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। তাই, এ ছবির মুক্তির উল্লাস একটু বেশি বৈকি! বলাবাহুল্য, আমাদের সঙ্গে দর্শকেরা 'নিশাচর' দেখে হবেন শিহরিত, রোমাঞ্চিত। রহস্যঘন বাঙলা চিত্রের জগতে 'নিশাচর' উজ্জ্বল নির্মাণ।

সাংবাদিকেরাই দিয়েছিলেন এই নাম। দিনের আলোয় যিনি আলাদা মানুষ, রাতের বেলায় তাঁরই চেহারা যায় বদলে। অন্ধকারের গভীরে চলে তার অভিযান। হত্যার অভিযান। ব্যক্তি-জীবনের দুঃসহ স্মৃতিটা তাঁকে খেত কুরে কুরে। ভুলতে পারতেন না সেই স্নেহ-প্রতিমার আর্ত। আত্ম-অবমাননার ধ্বংসাবশেষ। ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল কয়েকটি বছর। দেখতে দেখতে বদলে গেলেন শিবপদ। তৈরি করলেন নিজেকে। চোখের সামনে দেখলেন অফুরন্ত রহস্যের কুয়াশা। ঘৃণিত জগত। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন। আত্ম-অভিমানে দীর্ণ ক্রূরতার প্রতীক হলেন শিবপদ। চলল অভিযান। রাতের বেলায় প্রতিশোধ নেবার পালা। আশ্চর্য রোমহর্ষক অভিযান। সারা শহর আতঙ্কিত। লোকের মুখে মুখে নিশাচরের নাম। সংবাদপত্রের শিরোনামে নিশাচরের অভিযান। বিভ্রান্ত পুলিশ মহলও। কেন এই হত্যা? কোন্ দুঃসহ স্মৃতির প্রতিশোধে এই প্রাণের মাশুল?

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই বলতে হয় শম্ভু মিত্রের কথা। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় এ-ছবির সম্পদ। তবে মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আসলে মঞ্চ জগতের অভিনেতা, খ্যাতকীর্তি নট শ্রীশম্ভু মিত্র। বিকাশ রায় তাঁর স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা নিয়েই উপস্থিত। মঞ্জু দে নায়লীল। সুস্মিতা সান্যাল, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র-ব্রতীর অভিনয় চরিত্রানুগ। ছবির কলা-কৌশল, সঙ্গীত সাধারণ মানের। পরিচালক হিসেবে তপন রায় প্রথানুগ।

সম্পাদনে স্বল্প শিথিলতা সত্ত্বেও মন্দিরা ফিল্মস পরিবেশিত, গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্স-এর 'নিশাচর' বাঙালী দর্শককে আনন্দ দেবে। দেবে বৈচিত্র্যের আস্বাদ।

খুঁজে বেড়াই/পরিচালনা : সলিল দত্ত। অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দুড্ডা মিল গয়া

কাহিনী সব সময়েই একটা-না-একটা থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দি ছবিতেই কাহিনী প্রধান না হয়ে তার উপভোগ্যতার দিকটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। হাসি-ঠাট্টায়, খুন-খারাবি আর নাচে-গানে ভরা অজস্র প্রমোদ-উপকরণে তৈরি এসব ফিল্ম দেখে এক ধরনের দর্শক মজা নিয়েই পান স্বস্তি। চারদিকের নানান জটিলতা আর অশান্তির মাঝখানে পান আরামের একটু ফুরসৎ। এদিক থেকে এল-বি-ফিল্মস'এর রঙীন চিত্র 'দুড্ডা মিল গয়া' সার্থক।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ নিয়ে তোলা এ ছবিটিকে যেমন ক্রাইম পিকচারের মর্যাদা দেওয়া যায় তেমনি কৌতুক রসের ছবি হিসেবে দেওয়া যায় বিশেষ মূল্য। তা বলে, দুড্ডা মিল গয়া কোনো নতুন জাতের চিত্র নয়। বরং গতানুগতিকতা এখানে পুরো মাত্রায় রক্ষিত। ঠাস-বুনোট এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-সমৃদ্ধ ছবিটি শুরু থেকে শেষ অব্দি বজায় রেখেছে দর্শকের কৌতূহল। এদিক থেকে পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর কৃতিত্বের অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন।

এ ছবির সবচেয়ে বড়ো কথা হল অভিনয়ের দিকটি। বৃদ্ধের ভূমিকায় অভি-

রবিবার ২০শে জুলাই, ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
শতাব্দীর শ্রমিক নাটক
ইন্দ্রপুরের রূপকথা
রচনা ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট : অভিনয়ের দিন ১টা থেকে হলে
আগামী মাসে নতুন নাটক

অমল দত্ত পরিচালিত 'আবার বছর কুড়ি পরে'? চিত্রে অনিল ও সুচন্দ্রা

নয় করেছেন ওমপ্রকাশ। তিনি যে কতো বড়ো অভিনেতা তার নজির চিত্রের সর্বত্র। এ'র এমন প্রাণবন্ত হৃদয়গ্রাহী, অভিনয় বিশেষ দেখা যায় না। নবীন নিশ্চল, দেবেন বর্মা, অর্চনা, ললিতা পাওয়ার, সোনিয়া সাহানীর অভিনয় ছিল একই ছন্দে গাঁথা। এর মধ্যে বিশেষ করে নবীন নিশ্চল তাঁর সাফল্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন অনায়াস-ভঙ্গিতেই। ললিতা পাওয়ারেরও এমনতর চোখ-জুড়োনো অভিনয় ভোলা যায় না।

ছবির কলাকৌশলের দিকটি উন্নত-মানের। রঙের প্রয়োগও মনোরঞ্জক। সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেববর্মন রেখেছেন অসামান্য কৃতিত্বের নজির। প্রত্যেকটি গানই প্রাণ-মাতানো।

হাসি-গানে, রহস্যের মায়াজালে এল, বি, ফিল্মস-এর বুড্‌ঢা মিল গয়া উপভোগ্য ছবি।

•

এপার ওপারের সঙ্গীত গ্রহণ : গত সপ্তাহে অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত সমরেশ বসুর 'এপার ওপার' ছবির দুখানি গান টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সত্যেন চ্যাটার্জি রেকর্ডিং করেন। গান দুখানির একখানিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মান্না দে ও অন্যখানিতে বনশ্রী সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন সুধীন দাশ-গুপ্ত। এপার ওপার ছবিখানি পরিচালনা করছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। টেকনি-সিয়ান স্টুডিওতে ছবিখানির একটানা সার্টিং চিত্রগ্রহণে ছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায়, অপর্ণা সেন ও দিলীপ রায়। আশুবাবু ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও নিয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। এন-এ ফিল্মস ছবি-খানির পরিবেশক।

মানসী : সুনীল চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে অরোরা ফিল্মসের পরবর্তী প্রয়াস মানসীর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে আশু বসু, বিশ্বনাথ ও প্রফুল্ল মল্লিক। সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, ভাস্কর চৌধুরী, তরুণকুমার, জহর রায়, শিশির মিত্র, জীবেন বসু, কমলনাথ মুখোপাধ্যায়, অনন্ত মুখো-পাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নমিতা বিশ্বাস, সীতা মুখোপাধ্যায় এবং নায়িকা চরিত্রে রূপদান করছেন নবাগতা বৈশাখী চট্টোপাধ্যায়, যাঁর অভিনয় প্রতিভা এই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কাররূপে চিহ্নিত হবে বলে আশা করা যায়।

মঞ্চাভিনয়

লিটল থিয়েটার গ্রুপ : 'বর্গী এলো দেশে' এবং 'সূর্যশিকার' নাটকের অভূত-পূর্ব সাফল্যের পর পিপলস লিটল থিয়েটার এর নবতম নাট্যপ্রযোজনা বাংলা-দেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় 'ঠিকানা' নাটক উপস্থাপন করছেন ২ আগস্ট একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি' ঘোষণা করছেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে আগামী ১১ আগস্ট। আর প্রস্তুতির পথে রয়েছে ১৮৭১ সালের প্যারিসের রাজপথে ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে শ্রমিক সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায় 'প্যারী কমিউন' নাটক। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশটের 'ডী টাগে ডের কমুনে' বাংলা অনুবাদ। রচনা ও পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীউৎপল দত্ত, আলোকসম্পাতে শ্রীতাপস সেন, মঞ্চে শ্রীসুরেশ দত্ত, সঙ্গীতে প্রশান্ত ভট্টাচার্য, আর চরিত্র রূপায়ণে রয়েছেন শ্রীউৎপল দত্তের নেতৃত্বে পিপলস লিটল থিয়েটারের শক্তিশালী শিল্পীবৃন্দ। এই নাট্যগোষ্ঠী একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে আগামী ১০ আগস্ট জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় করবেন, 'ঠিকানা', 'সূর্যশিকার' এবং 'টিনের তলোয়ার' নাটক।

অসম্পূর্ণ রেখা : শ্রীমোহিত চট্টো-পাধ্যায় রচিত উপরোক্ত নাটকটি কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী নক্ষত্রের প্রযোজনায় আগামী ২৬ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে অভিনীত হবে। প্রয়োগপ্রধান শ্রীশ্যামল ঘোষ।

রঙ্গনা বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৫৫)
নান্দীকার
শনি ৬ রবি ২।। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউনিটি থিয়েটারের 'মধ্যমপুরুষ' : অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা, হতাশা, অসাড়তার নিঃসীম অন্ধকারের আবর্তে ঘুরে মরছে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলো। পরিশ্রান্ত সৈনিকের গ্লানি এদের সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন, কল্পনা, প্রতিশ্রুতি, শপথ সব কিছুই হয়তো ধূসরতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট আচমকা অচেনা আলোয় যা এবং যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে শুধু লেখা বেদনার এক করুণ কাহিনী। তবু এরা ছুটে চলেছে মানুষের চিরন্তন সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে; প্রসন্ন হাসির কল্লোলে কান্না মুছে দিতে। বহু ঝড়ের আঘাতে পর্যুদস্ত হোলেও উদাত্ত কণ্ঠ মেলে ধরে সোচ্চারে বলতে চাইছে, আমরা নতুনতর এক দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে বাঁচবো, আমরা সমাজকে গড়ে তুলবো নিজেদের পরিশ্রমে আর আন্তরিকতায়। মধ্যবিত্ত সমাজের এই পরিশ্রান্ত স্বাপ্নিক মানুষগুলোর অন্তরে জীবনসংগ্রামকেই হয়তো ভাষা দিয়েছে গোর্কির 'পেটি বুর্জোয়া' অনুপ্রাণিত 'মধ্যমপুরুষ' নাটকটি। গোর্কির তীব্র সমাজচেতনা ও গভীরতর জীবনবোধ যা 'পেটি বুর্জোয়া' নাটকটির প্রতিটি মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠেছে 'মধ্যমপুরুষে'ও সেই রেশ থেকেছে অব্যাহত। এর জন্য প্রশংসার দাবী প্রথমেই করতে পারেন শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁতা তাঁর ভাবানুবাদে কৃত্রিমতা কোথাও চোখে পড়েনি। সম্প্রতি 'রঙ্গনা'য় এই নাটকটি অভিনয় করে ইউনিটি থিয়েটারের শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে 'মধ্যমপুরুষ' নাটকটির বক্তব্যকন্দ্র সংঘাত গড়ে উঠেছে। এতে আছে অবসরপ্রাপ্ত লোকের যন্ত্রণা; প্রেম আর অনুরাগের জন্য দীর্ঘশ্বাস; তরুণের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ, আবার সঙ্গে সঙ্গে আছে এই মানিকের মধ্যেই, এই যন্ত্রণার মধ্যেই দিন আর জীবনের চরমতম অর্থ খুঁজে নেওয়ার কিছু চেষ্টা। ভবতারণ, দীনতারণ, পার্থ, নিখিল, তাপস, কাদম্বিনী, তপতী, প্রীতি, ইলা এরা সবাই এই দুই অনুভূতির দোলায় আবর্তিত হয়েছে। এই আবর্তনে কোথাও ঝরেছে কান্না, কোথাও বেশ মুখর হয়ে উঠেছে সমন্বয়সাধনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা। 'এরই মাঝে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি', এইটেই বোধ হয় 'মধ্যমপুরুষ' নাটকের চিরন্তন সত্য।

এই নাটকের শৈল্পিক প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে যে নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের নিবিড় সহযোগিতা ছিল, তা প্রথম থেকেই বোঝা গেছে। প্রয়োগ-পরিকল্পনার ব্যাপারে কয়েকটি মুহূর্তে অজয় চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দর শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে একটি কথা। নাটকটির দু' একটি জায়গায় জোনাল অ্যাকটিং-এর এফেক্ট কিন্তু ভালো করে স্পষ্ট হোতে পারেনি।

আলোয় আঁধারে ছবিতে অপর্ণা সেন। পরিচালনা: অগ্রদূত। ফটো: অমৃত

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর কৃতিত্বের কথা প্রথমেই মনে আসে তিনি হোলেন 'নিখিল'-রূপী বরুণ দাস। মঞ্চে শিল্পীর স্বচ্ছন্দ চলা ও সংলাপ বলার প্রাণোজ্জ্বল ভঙ্গিমা সত্যি অপূর্ব। শৈবাল বসুও 'পার্থ' চরিত্রের যন্ত্রণা আর ক্রুদ্ধ হতাশাকে বেশ সবেগভাবেই পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। অজিত শাসমলের 'তাপস'ও অনেক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হোতে পেরেছে। ভবতারণের ভূমিকায় অরুণ চৌধুরী নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। তবে তাঁর বাজারে যাবার পোশাক খোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী না হোলেই ভালো হোত। রাণু রায়ের 'কাদম্বিনী', ও সুকন্যা রায়ের 'তপতী' হয়েছে মর্মস্পর্শী। 'প্রীতি' ও 'ইলা'র ভূমিকায় ছায়া এডওয়ার্ড ও কবিতা গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ে প্রাণের অভাব ছিল। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন সুজিত পাল, রোহিনী সরকার, নির্মল গুহসরকার।

বালিগঞ্জ নাট্যসমাজের 'একটি পয়সা' : বালিগঞ্জ নাট্যসমাজের যাত্রা বিভাগের শিল্পীরা কিছুদিন আগে বালিগঞ্জ শিক্ষা-সদনে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সামাজিক নাটক 'একটি পয়সা' পরিবেশন করেছেন। সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ পরিকল্পনা ও অভিনয়ে সেদিনকার প্রযোজনা সার্থকতায় হয়ে উঠেছিল। এর জন্য প্রথমেই যিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবী করতে পারেন, তিনি হোলেন নাট্যনির্দেশক শ্রীধীরাজ দাস।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। তবুও এর মধ্যে জিতেন দাসের 'ভুজঙ্গ-নারায়ণ', গৌর শ্রীমানির 'দিবাকর', শম্ভু লাহার 'শুভঙ্কর', বুলবুল চ্যাটার্জির 'মৌসুমী' ও রাণু রায়ের 'রাঙাবৌ' বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন কৃষ্ণ ঘোষ, শান্তি চক্রবর্তী, মণি চক্রবর্তী, সত্য ঘোষ, আদা বোস, রথীন হালদার, রবি গুপ্ত, মণি মাম্না ও অর্পিতা ঘোষ।

এই সুষ্ঠু প্রযোজনার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রাণময় সুরসৃষ্টি। অপূর্ব সুরের ছন্দে নাটকের গতিবেগ অসাধারণ গভীরতা লাভ করেছিল। এর জন্য প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী সঙ্গীতনির্দেশক শ্রীনটবর দাস।

সেন্ট্রাল একসাইজ এন্ড কাস্টমস ক্লাবের 'ফাঁস' : শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর অফুরন্ত হাসির নাটক 'ফাঁসে'র মঞ্চসফলতা আর একবার কিছুদিন আগে নতুন এক আলোয় পরিস্ফুট হয়ে উঠলো 'স্টার' থিয়েটারে। এই অসাধারণ উজ্জ্বল প্রাণবন্ত নাটকটি সেদিন সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন সেন্ট্রাল একসাইজ এন্ড কাস্টমস ক্লাবের শিল্পীরা।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনায় অনেক নতুনতর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত ছিল। এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রশংসার দাবী রাখেন নির্দেশক ধীরেশ ভট্টাচার্য। সুষ্ঠু চরিত্র-চিত্রণের জন্য যাঁদের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য তাঁরা হোলেন শিশির বসু (সোমনাথ), অচিন গুহ (ডেপুটি), প্রদ্যোৎ বসাক (বিমান), সত্যেন মিত্র (তপন)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নিমাই দাস, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সরোজ দে, কাজল ব্যানার্জি, বীণা রায়, অমলেশ সরকার, শঙ্কর গাঙ্গুলী, নিমাই দাস, মুকুল রায়, সত্যেন মিত্র।

প্রজন্ম মহিমা : পি এন্ড টি (ক্যালকাটা টেলিফোনস — বাগবাজার) রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি বনফুলের 'প্রজন্ম মহিমা'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হোল বিশ্বরূপায়। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরতন-কুমার ঘোষ। বিশু চ্যাটার্জি নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন অজিত চ্যাটার্জি, অরুণাভ চক্রবর্তী, মদনমোহন চক্রবর্তী, রঞ্জন ঘোষ, অনন্ত মিত্র, প্রবীর মল্লিক, রানু রায়, শিবানী ভট্টাচার্য, অজিত রাজচন্দ্র, প্রভাস চক্রবর্তী, মুকুল দত্ত তারক দে, শচীকান্ত মুখার্জি, লালবিহারী ঘোষ, শম্ভু নন্দী, বিশ্বনাথ রায়, গোপীনাথ ঘোষ, কানাই মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী ও দীপা হালদার।

দুই মহল : জ্যোতিন্দ্র দস্তিদারের বলিষ্ঠ নাটক 'দুই মহল' সম্প্রতি অভিনয় করলেন [illegible]

জয়শ্রী ব্যানার্জি

রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। স্টার থিয়েটারে পরিবেশিত এই নাটকের নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেন শংকর রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন শৈলেন মিত্র, ভোলা সেন, মাধব বোস, নির্মল চক্রবর্তী, প্রতিমা পাল, অসিত চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্তা, রাধিকা মুখার্জি, লক্ষ্মী দাস, শম্ভু রায়, সুনীল দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সোম, পঞ্চানন দে, সুব্রত চৌধুরী।

বিবিধ সংবাদ

সেতার শিল্পী জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ১২ই জুলাই থিয়েটার সেন্টারে আয়োজিত একটি ঘরোয়া আসরে প্রতিভাময়ী সেতার শিল্পী জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহা) সেতারে প্রথমে মালকোষ ও পরে বাগেশ্রী শোনালেন। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করলেন শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়। জয়শ্রীর হাতের কাজ অতি সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গী সরল। সুর পরিবেশনে এই কৃতিত্বের জন্য সেদিনের আসরে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বাজনা শুনেছেন।

এই মাসের শেষের দিকে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একক সেতার বাজনা শোনাবার ব্যবস্থা করছেন। এই দিনকার আসরে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, বিমান ঘোষ, তরুণ রায়, শম্ভু মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রবীন সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভাষণে জয়শ্রীর পরিচয় প্রদান করেন।

জয়শ্রীর পিতৃদেব পণ্ডিত শচীন সাহা ওস্তাদ দবীর খানের শিষ্য এবং বর্তমানে মেদিনীপুর মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পিতার সঙ্গীত বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান কন্যা জয়শ্রীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। জয়শ্রী এলাহাবাদ ... ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম-এ এবং হিন্দুস্থানী গানে প্রথম শ্রেণীতে সঙ্গীত সরস্বতী উপাধি পেয়েছেন। এম-এ পরীক্ষার পর তিনি বৃটেনে যান। সেখানে বি বি সি এবং টেলিভিসনে তাঁর সেতার পরিবেশিত হয়। ১৯৬৭-তে লণ্ডনে সাফজোর (গ্রামাফোন) জয়শ্রীর যে বিলম্বিত লংপ্লেয়িং ডিস্ক প্রকাশ করেন, তা অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রচুর বিক্রী হয়।

জয়শ্রীর সেতার পরিবেশনায় বৈচিত্র্য আছে, তিনি একটা নতুন ধারার প্রবর্তনে প্রয়াসী। নতুনের সন্ধানে তাঁর অন্তর আকুল হয়ে আছে। তাঁর সেতার বাদনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষ্য করা গেল, তাতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, জয়শ্রীর শিল্পনৈপুণ্য আসরেই অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

দিশারী পুরস্কার অনুষ্ঠান

নাট্য-সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ যাত্রা, নাটক ও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও শিল্পীদের 'দিশারী পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করা হয় গত ১৬ জুলাই রামমোহন লাইব্রেরী হলে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক শ্রীনিকুঞ্জরঞ্জন বসু। সভাপতির ভাষণে শ্রীবসু বলেন— তরুণ প্রতিভাধর স্রষ্টা ও শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর একটা সুফল আছে। পুরস্কৃত স্রষ্টা ও শিল্পীরা এর ফলে পরবর্তীকালে আরও মহৎ সৃষ্টিতে উৎসাহ লাভ করেন। সুতরাং দিশারীর এই পুরস্কার প্রদান সর্বদিক থেকে প্রশংসনীয়।

ডঃ রমা চৌধুরী মহৎ আদর্শ ও সৎ প্রচেষ্টার জন্য দিশারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধারণ সম্পাদক ... ঘোষ আগামী কার্যসূচী বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাঁরা পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয় চক্রবর্তী, সুব্রত রায়চৌধুরী, গোবিন্দ বসু, মায়া চ্যাটার্জি, লিপিকা গুপ্ত, সমর মুখার্জি, বাউল ঠাকুর, হীরক মুখার্জি, দেবকুমার ভট্টাচার্য, ছন্দা চ্যাটার্জি, রমেন লাহিড়ী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অজাতশত্রু, সুজিত পাঠক, ভক্ত মল্লিক ও রবি চ্যাটার্জি। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্পনা সাহা রায়।

নিউ প্রভাস অপেরা

গেল বছরের বিপ্লবী তিতুমীর পালা অভিনয়ে নাট্য সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থা প্রভাস অপেরার এ বছরে প্রধান পালা রমেন লাহিড়ী রচিত ও পরিচালিত 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'। এছাড়াও আছে 'অগ্নিদূত'-এর 'বর্বর সভ্যতা', কমলেশ ব্যানার্জির 'বাঘিনী' এবং কানাই নাথের 'অপরাধী কারা'। সুরারোপে আছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অজিত বসু ও মৃগেন্দ্র দত্ত। অংশগ্রহণ করছেন : ননী ভট্ট, অভয় হালদার, রাধারমণ পাল, অনাদি চক্রবর্তী, জয়ন্তকুমার, অমূল্য ভট্টাচার্য, রাজকুমার, মুকুল মালি, শচীন দাস, কল্যাণী ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, প্রতিমা ভট্টাচার্য, গীতা সেন প্রমুখ।

সঙ্গীতচক্রের রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব

সম্প্রতি এক মনোরম সন্ধ্যায় সঙ্গীত চক্রের শিল্পীবৃন্দ বিদ্যালয় ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষক রামকমল চট্টোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত প্রমুখ প্রতিভাবান ও বহু উদীয়মান শিল্পীদের কণ্ঠসঙ্গীত রসিক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য লীলা দেবী, মণ্টু মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী দত্ত, জয়ন্তী মুস্তাফী, কমলাকান্তি দাস, অসীমা পাল, দেববাণী চক্রবর্তী, অর্পিত মুখার্জি, সীমা ঘোষ, মোহন মুখার্জি, বলদেব চট্টোপাধ্যায়, আমলনী সিংহ, বাণী চক্রবর্তী প্রমুখ। শিশুশিল্পীদের উদ্দীপনী সঙ্গীত প্রশংসা করবার মতো। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন হরেন দে এবং দেবব্রত দত্ত।

চিত্তরঞ্জনে সান্ধ্য সম্মিলনী

চিত্তরঞ্জনে বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি 'রঞ্জন' প্রেক্ষাগৃহে এক মনোরম সান্ধ্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নাচ-গান-বাজনায় ও মূকাভিনয়ে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আরো যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বে), কার্তিক-বসন্ত (বাংলার আশা ও লতা), কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, বলরাম দাস ও খ্যাতিমান মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ। ইঁহাদের 'জয়বাংলা' ক্যারিকেচার দর্শকদের মনে আনন্দ দান করে।

CENTRAL LIBRARY

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরের ৬ষ্ঠ খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৫ রানে ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি দলকে পরাজিত করেছে।

তিনদিনব্যাপী খেলার প্রথম দিনে ওয়ারউইকশায়ার দল প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটে ৩৭৭ রান সংগ্রহ করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারতীয় দল খেলার বাকি সময়ে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়ারউইকশায়ার দলের জন জেমসন এবং হোয়াইটহাউস ভারতীয় বোলিংকে তছনছ করে খেলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। জেমসন ডাবল সেঞ্চুরী (২০১ রান) করেন। তিনি ২৬৫ মিনিট খেলে তাঁর ২০১ রানে ৪টে ওভার-বাউন্ডারী এবং ৩৩টা বাউন্ডারী করেছিলেন। ৩য় উইকেটের জুটিতে জেমসন এবং মাইক স্মিথ ঝড়ের গতিতে ১৪১ মিনিটের খেলায় ২৫২ রান সংগ্রহ করেন। মাইক স্মিথ ৭২ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ৫১০ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। সরদেশাই ১২০ রান করেন—এবারের সফরে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। ৩য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার ও সরদেশাই ১৫৬ রান এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সরদেশাই ও বিশ্বনাথ ১১৮ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৫৬২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ড সফরে এই ৫৬২ রানই ভারতীয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়ারউইকশায়ার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮২ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৩ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়ারউইকশায়ার : ৩৭৭ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জন জেমসন ২০১, হোয়াইটহাউস ৩২ এবং মাইক স্মিথ নট আউট ৭২ রান। বেদী ১০৬ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮২ রান (রোহন কানহাই ৫১ রান। বেদী ৬৪ রানে ৫ এবং প্রসন্ন ৫৭ রানে ৪ উইকেট)

ভারতীয় দল : ৫৬২ রান (ওয়াদেকার ৭৭, সরদেশাই ১২০, বিশ্বনাথ ৯০ এবং আবিদ আলী ৯০ রান। ব্রাউনকম ১০০ রানে ৫ উইকেট)

সফরের সপ্তম খেলায় ভারতীয় দল ১০২ রানে ১৯৬৯ সালের কাউন্টি লীগ চ্যাম্পিয়ান গ্ল্যামর্গান কাউন্টি দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে। সাতটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ভারতীয় দলের জয় ৪, হার ১ এবং খেলা ড্র ১।

প্রথম দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৮৪ রানের মাথায় শেষ হলে গ্ল্যামর্গান ১০টা উইকেট হাতে জমা নিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল। ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি দল থেকে ছুটি পেয়ে উইকেট-কিপার ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এই প্রথম ভারতীয় দলে খেলতে নামেন এবং দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে গ্ল্যামর্গান দলের প্রথম ইনিংস ২০০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ৮১ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২৪৫ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। গ্ল্যামর্গান দলের প্রথম ইনিংসের শেষ ৪টা উইকেট মাত্র ১১ রানে পড়ে যায়। ভেঙ্কটরাঘবন এবং বেদীর বোলিংয়ের ভেল্কিতে এই বিপর্যয় ঘটে। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৬টা এবং বেদী ৬৬ রানে ৩টে উইকেট পান। ভেঙ্কটরাঘবন ২য় ইনিংসে ৫৭ রান করে ব্যাটিংয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যেখানে খেলায় জয়লাভের জন্যে গ্ল্যামর্গানের ৩২৭ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ১০টা উইকেট

বিষেণ সিং বেদী

হাতে নিয়ে ২য় দিনের খেলায় ১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে গ্ল্যামর্গান দলের ২য় ইনিংস ২২৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১০২ রানে হেরে যায়। খেলায় বেদী ১৪১ রানে ৯টা এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১৭৩ রানে ৯টা উইকেট পান।

ভেঙ্কটরাঘবন

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম সরকারী সফরে গ্ল্যামর্গান দলের বিপক্ষে ভারতীয় দল যে দুটি ম্যাচ খেলেছিল তার প্রথমটি ড্র ছিল এবং দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় দল ৫৪ রানে জয়ী হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ২৮৪ রান (বেগ ৪৭, বিশ্বনাথ ৫২, আবিদ আলী ৪৬ এবং ইঞ্জিনিয়ার নট আউট ৬২ রান। টনি কর্ডল ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৪৫ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ওয়াদেকার ৭৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫৭ রান)।

গ্ল্যামর্গান : ২০০ রান (এম খান ৭৮ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৬ এবং বেদী ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ২২৪ রান (ম্যালকম নাশ ৭৫ এবং জোন্স ৫৫ রান। বেদী ৯৫ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৯৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ইংল্যান্ড : ৩১৬ রান (জিওফ বয়কট ১১২ এবং বেসিল ডি ওলিভিয়েরা ৭৪ রান। আশিফ ইকবাল ৩৭ রানে ৩ এবং ইন্তিখাব আলম ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৬৪ রান (ডি ওলিভিয়েরা ৭২, এমিস ৫৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪৫ রান। সেলিম ৯১ রানে ৪, ইন্তিখাব ১৯ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩৫০ রান (জাহির আব্বাস ৭২, মুস্তাক মহম্মদ ৫৭ এবং ওয়াসিম বারি ৬৩ রান। রিচার্ড হাটন

৭২ রানে ৩, গিফোর্ড ৬৯ রানে ৩ এবং ওলিভিয়েরা ৪৬ রানে ৩ উইকেট)

● ২০৫ রান (সাদিক মহম্মদ ৯১ রান। পিটার লেভার ৩টি, ইলিংওয়ার্থ ৩টি, ওলিভিয়েরা ২টি এবং গিফোর্ড ২টি উইকেট পান)

লিডসের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানকে ২৫ রানে হারিয়ে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে পাকিস্তান কখনও 'রাবার' জয়ী হয়নি। এই দুই দেশের মধ্যে এপর্যন্ত যে ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ৪টি এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২টি। টেস্ট খেলার ফলাফল : মোট খেলা ২১টি ইংল্যান্ডের জয় ৯টি, পাকিস্তানের জয় ১টি এবং খেলা ড্র ১১টি।

চার বছর আগে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল—পাকিস্তান ১—২ খেলায় এবং ভারতবর্ষ ০—৩ খেলায়। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের চলতি ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফর ১৯৬৭ সালের পর প্রথম।

ক্রিকেট খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফলাফল সম্পর্কে দারুণ অনিশ্চয়তা। তার প্রমাণ ইংল্যান্ড-পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় হাতে-নাতে পাওয়া গেল। শেষ পঞ্চম দিনে পাকিস্তান ধাপে ধাপে জয়লাভের পথে এগিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে আর মাত্র ২৮ রান তুলতে পারলেই পাকিস্তানের জয়, হাতে তিনটে উইকেট জমা এবং সময়ও যথেষ্ট। খেলার ঠিক এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের পরাজয় যে অবধারিত তা তাদের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকরাও মেনে নিয়েছিলেন।

বেসিল ডি ওলিভিয়েরা এক ওভারে পাকিস্তানের দুটো উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যে দুজনকে আউট করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের নায়ক সাদিক মহম্মদ, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত ৯১ রানে আউট হন। এরপর ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি দলের পেস বোলার পিটার লেভার কোন রান না দিয়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ তিনটে উইকেট নিলেন মাত্র চারটে বল খেলে। আর মাত্র ২৬ রান সংগ্রহ না করতে পারায় পাকিস্তান ২৫ রানে হেরে গেল—খেলায় কি নাটকীয় পরিণতি!

আগের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়—টেস্ট সিরিজের এই অবস্থায় ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তান শেষ তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। ইংল্যান্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। খেলার সূচনা মোটেই শুভ হয়নি—৪ রানের মাথায় ১ম এবং ১০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। খেলার মোড় ঘুরিয়েছিলেন ৪র্থ উইকেট জুটি বয়কট এবং ওলিভিয়েরা। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৩৫ রান তুলেছিলেন। জিওফ বয়কট ১১২ রান করে আউট হন। তিনি ২৫৫ মিনিট খেলে তাঁর ১১২ রানে ১৩টা বাউন্ডারী করেন। দুটি টেস্ট খেলাতেই বয়কট সেঞ্চুরী করেছেন। তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়জীবনে সেঞ্চুরীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১১টি। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩০১ (৯ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হয়। পাকিস্তানের উইকেট-কিপার ওয়াসিম বারি ৫টা সর্বাধিক লুফে পাকিস্তানের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় উইকেট-কিপার হিসাবে সর্বাধিক 'ক্যাচ' নেওয়ার যে রেকর্ড ছিল তা স্পর্শ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করেছিল। এই ২০৮ রানের মধ্যে ১২৯ রান তুলেছিলেন ৩য় উইকেট জুটি জাহির আব্বাস (৭২ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (৫৭ রান)।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩৫০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩৪ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৭ রান সংগ্রহ করেছিল। পাকিস্তানের উইকেট-কিপার ওয়াসিম বারি ৬৩ রান করে শেষ আউট হন। তিনি উইকেটকিপিং এবং ব্যাটিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে বারি এবং সেলিম আলতাফ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থ দিনে চা-পানের পর ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ২৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের শেষ ৫টা উইকেট পড়েছিল মাত্র ১৬ রানে। সেলিম মাত্র ১১ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট পান। এক সময় তিনি ১৫টা বল খেলে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ১ রান দিয়ে। উইকেট-কিপার ওয়াসিম বারি ২য় ইনিংসে ৪টে 'ক্যাচ' লুফেছিলেন। প্রথম ইনিংসে লুফেছিলেন ৫টা।

খেলায় জয়লাভ করতে পাকিস্তানের ২৩১ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় তারা কোন উইকেট না খুইয়ে ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার সূচনায় পাকিস্তানকে মহাসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। কোন রান করার আগেই পূর্ব দিনের ২৫ রানের মাথায় তাদের দুটো উইকেট পড়ে যায়। ৬৫ রানের মাথায় পড়েছিল ৪র্থ উইকেট। এর পর দৃঢ়তার সঙ্গে তারা খেলতে থাকে। এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ১৬০ রান উঠেছে ৪টে উইকেট পড়ে। জয়লাভের জন্যে আর ৭১ রান তুলতে হবে, হাতে জমা আছে ৬টা উইকেট। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান শেষ রক্ষা করতে পারেনি, বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৭১ রানের পরিবর্তে তারা মাত্র ৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার মোড় নাটকীয়ভাবে ঘুরিয়েছিলেন ওলিভিয়েরা এবং লেভার।

ডেভিস কাপ

ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৩—০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দল কৃপাল সিংয়ের নেতৃত্বে তাদের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে অপরাজিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে এসেছে। সফরের মোট ৯টি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের জয় ৮ এবং খেলা ড্র ১। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল ৪৪টি গোল দিয়ে মাত্র ৭টি গোল খেয়েছে।

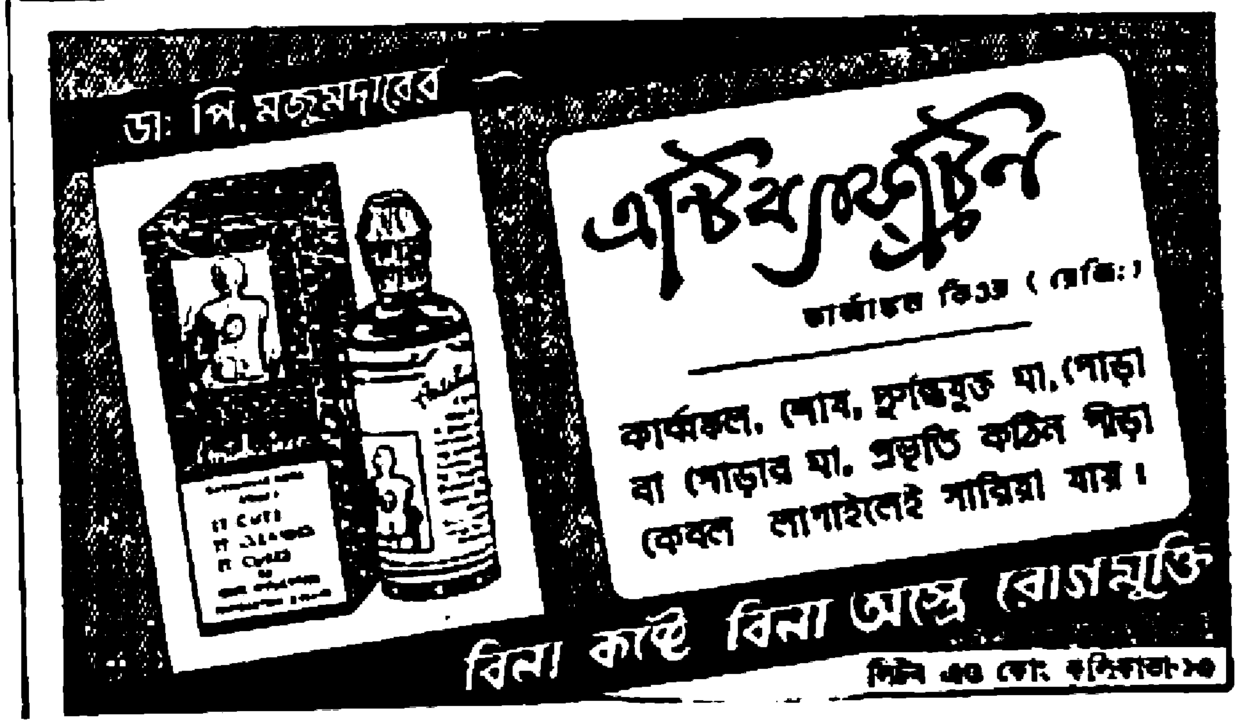

চিঠিপত্র

শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত

সম্পাদক মহাশয়, বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পর যত অশান্তিতেই থাকি না কেন—একটা সুযোগ ঘটেছে। সেটা হলো অমৃত পড়ার সুযোগ। ইতিমধ্যে আমি অমৃতের অনেকগুলো সংখ্যা পড়ে ফেলেছি—এবং অমৃতত্ব উপলব্ধি করার বিচক্ষণতা আমার না থাকলেও আমি এটাকে ভালো-বেসেছি। সেই দাবী নিয়েই চলতি সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবনাথ-এর 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলবো।

প্রবন্ধটিতে লেখক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং এটি তাঁর তাঁর মননশীলতার প্রমাণ দেয়। রাধারমণ দত্ত আর সৈয়দ শাহনূর সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা খুবই খাঁটি, এবং সত্যি কথা বলতে কি পূর্ব-বাংলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় গত দু'বছরে এই ধরনের আলোচনা চোখে পড়েনি। প্রবন্ধটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যদোষ বর্জিত। কিন্তু তাই বলে যে এটা সম্পূর্ণ—এটা আমরা বলতে পারিনে। কিছু কিছু উপেক্ষা-করার দোষে এটা জর্জরিত। যেমন ধরুন, হাছন রজার কথা। সিলেটের কবি হাছন রাজা বাংলার 'মরমী কবি' হিসেবে আখ্যাত হয়েছেন। প্রবন্ধকার এক জায়গাতে তাঁর নামটি শুধু বলেছেন আর একটি কথাও বলেননি। শ্যামল-স্নিগ্ধ কাজল-মাটির দেশ সিলেট সম্পর্কে কোন কথা বলতে বা লিখতে গেলে যাকে প্রথম স্মরণ করা কর্তব্য—তাঁকে বাদ দিয়ে অথবা তার সম্পর্কে এতটা উদাসীনভাব অবলম্বন করলে ভালো লাগে না। তাছাড়া এই উপেক্ষিতদের মধ্যে আছেন—বাউল শাহ্-এওলা ও শেখ আলী। লোকসঙ্গীতে কি এঁদের দান এতই কম যে প্রবন্ধকার বিনা-বিচারে এঁদের প্রবন্ধের চৌহদ্দি থেকে বের করে দিলেন? প্রবন্ধটি দীর্ঘায়িত করার আশঙ্কা না হয় লেখককে বাক্‌সংযত করে তুলেছে—এটা বুঝলাম, কিন্তু এই জন্য এঁদের মত দু'জন প্রতিভাবান লোকগীতিকার ও লোকসঙ্গীতজ্ঞকে উপেক্ষা করার যে কোনো কারণ নেই।

অবশ্য আমি বলছি না—প্রবন্ধটি আরো বড়ো হলে ভালো হতো। আমার কথা হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা কি কখনো পর্যাপ্ত হয় না? এই অপরিপূর্ণ প্রবন্ধটি আমাদের কয়েকটা কথা স্পর্শ করেছে যেগুলোকে আমরা নিঃসন্দেহে সত্য বলতে পারি না। যেমন ধরুন, এক জায়গায় তিনি হজরত শাহজালাল ও শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার উত্তরাধিকার পল্লীকবির সংখ্যা একান্ত মুষ্টিমেয় বলে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা হবে একরূপ [illegible]। লাউড়কে হিন্দু-রাজের আওতায় রেখে প্রবন্ধকার আরেকটি ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে ভ্রান্তিপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। কারণ আমরা জানি তখন হজরত শাহ-ই-আরেফীন (হজরত শাহজালালের অন্যতম শিষ্য) লাউড় অধিকার করেন এবং ইসলাম-ধর্ম প্রচার করেন। এটা একটা খুব সাঁচা কথা যে, অনেক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানী পাঠক ভ্রান্তিপাশে না পড়ার জন্যে সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাঠ করেন। এক্ষেত্রে অমৃতের মতো একটি বহুল-প্রচারিত পত্রিকা থেকে পাঠক-মহলের বিভ্রান্তির পরিসর না বাড়ানোটাই আমরা আশা করি।

বসুদ চক্রবর্তী,
গৌহাটি-১১

তিরুমালা প্রসঙ্গে

গত ১৭ই আষাঢ় 'অমৃতে' (১১শ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'তিরুমালা' ভ্রমণ-কথা আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। শ্রীসান্যালের লেখায় ইতিপূর্বে দক্ষিণ ভারতের কথা পড়েছি বলে মনে পড়ে না; তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর প্রতি বাঙালী পাঠকসমাজেরই কৌতূহল বেশী।

তিরুপতি শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলেছে।' যতদূর জানি তিরুপতি শহরে শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে। 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে লেখক কি শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিদ্যালয় বোঝাতে চেয়েছেন; এবং নির্মাণ কাজ কি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির? ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ থাকলে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলা সহজ। শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান বলেই এ কথা মনে এল। নমস্কারান্তে ইতি—

মোহন বসু,
কলকাতা-৩৩

(২)

মেদিনীপুর জেলার সুদূর পল্লীগ্রামের অমৃত পত্রিকার এক অনুরাগী পাঠকের নমস্কার গ্রহণ করুন। বহুদিন অমৃত পড়ছি নিত্যনূতনতর লেখার আস্বাদ পাওয়ায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পত্র লিখি যে—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের তিরুমালা ভ্রমণ কাহিনী এত সুন্দর হয়েছে—পড়তে পড়তে মন সুদূর সেই দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। সব চেয়ে লেখাটি এক জায়গায় এত ভালো লেগেছে, যেখানে উনি লিখেছেন—এত ধনবানদের গড়া মন্দিরের ঠাকুররা যদি জগৎ-গুরু হতেন বা ঐসব বিত্তশালীদের ঐ অর্থ যদি সর্বহারাদের হত কত সুন্দর না হত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট—এঁরা দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিয়েও আজ জগৎ-পূজ্য। কিন্তু ভারতের এইসব ঠাকুর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কত সুন্দরভাবে মানুষের আকুল আশাকে নূতনভাবে রূপায়িত করেছেন তা লিখে কি আর জানাব। এই অমৃতে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসের একটি নূতন সৃষ্টি। অমৃত সত্যি অমৃত। এটা কোন স্তাবকতা নয়, সাহিত্যের দিক দিয়ে এক অমূল্য সৃষ্টি। জানি না এই চিঠি অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হবে কিনা। তবু ভাল যেটা তাকে সাধুবাদ দিতেই হবে।

ডাঃ অনিলকুমার হাজরা,
মেদিনীপুর।

'স্ত্রী শিক্ষার ঊষালগ্নে' প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত ১০ই আষাঢ়ের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত আশা দেবীর 'স্ত্রী-শিক্ষার ঊষালগ্নে' প্রবন্ধটি পড়লাম।

প্রবন্ধটির কোথাও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ না দেখে মর্মাহত হলাম। আজ আমাদের দেশের যে হাল-চাল তাতে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' বলে কোনও ব্যক্তি আমাদের দেশে কোনদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। জানি না, এরই বশবর্তী হয়ে লেখিকার তাঁর সম্বন্ধে বিস্মরণ ঘটেছে কি না!

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কলকাতার ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্তৃক যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার জন্য বীটন সাহেব বিদ্যাসাগরকেই নিযুক্ত করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতই উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল যে তিনি আচারবদ্ধ দেশবাসীকে এ-বিষয়ে সচেতন করে তোলবার জন্য বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর দু'পাশে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই প্রচেষ্টায় উত্তরকালে অর্থাৎ নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮—এই ক'মাসের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি)। বিদ্যালয়গুলির ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০, মাসিক খরচ মোট ৮৪৫ টাকা।' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বারিদবরণ ঘোষ,
চুঁচুড়া
হুগলী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

আবার ৭জন বিশিষ্ট লেখকের ৭খানি বাংলা-পকেট বই আগামী ১৬ই আগস্ট প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের বইগুলি বিষয়ে আকারে—মনোরম প্রচ্ছদে আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। দাম প্রতিটি বই ২৲। ৭খানি বই-এর ভিঃ পিঃ ডাক ব্যয় মাত্র ২·২০ পয়সা। পুস্তক ব্যবসায়ী ও নিউজ-এজেন্টদের অপ্রত্যাশিত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এখনই যোগাযোগ করুন।

যে যে বইগুলি প্রকাশিত হচ্ছে তার বিবরণঃ—

(৮) অধরা মাধুরী
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ক্লান্ত প্রৌঢ় বিক্ষুব্ধ স্বামী-স্ত্রী জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য চাই একটি নবীন বসায়ন যার আর এক নাম অধরা মাধুরী।

(৯) গুপ্তেশ্বর
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
একটি মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী। দুর্গম অরণ্য-তীর্থপথে যার অবস্থান তারই মনোজ্ঞ বিবরণ আর তার সঙ্গে অসাধারণ বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

(১০) রূপ ও প্রসাধন
ডঃ এন এন গুপ্ত
[illegible]

(১১) সুরের বাঁধনে
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
[illegible]

(১২) অর্গানের দিন
বাণী রায়
[illegible]

(১৩) ফুল ফুটুক
বিমল মিত্র
[illegible]

(১৪) নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন
[illegible]

দ্বিতীয় দফার পকেট বই-এর গ্রাহক হবার তারিখ আগামী ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল।

মাত্র পাঁচ মাসে
শংকরের
সীমাবদ্ধ
সাতটি মুদ্রণ
মূল্য—৬৲

বিভূতি - রচনাবলী
৬ষ্ঠ খণ্ড—১৬৲
॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥
অন্যান্য খণ্ডগুলি এখনও
১৬৲ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
শতরূপে দেখা
আবদুল জব্বারের
মুখর মেলা
॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥

মিত্র ও ঘোষ ॥ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পরিবার-সুখ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে [illegible] সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

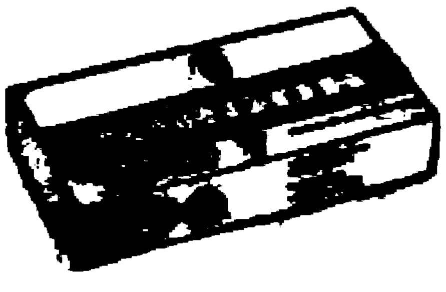

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
[illegible] দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

Friday 30th July, 1971 ১৫ই শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১০৫২	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
১০৫৩	সম্পাদকীয়		
১০৫৪	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
১০৫৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১০৫৮	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
১০৫৯	পত্রস্মৃতি		—শ্রীপরিমল গোস্বামী
১০৬৪	সমুদ্র	(কবিতা)	—শ্রীনিরোদ্র পালিত
১০৬৪	প্রতিশ্রুতি রাখো	(কবিতা)	—শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ
১০৬৪	কে রয়েছে মনে হয়	(কবিতা)	—শ্রীশুভ মুখোপাধ্যায়
১০৬৫	গোধূলি	(গল্প)	—শ্রীমিহির আচার্য
১০৭০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১০৭৩	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
১০৭৯	সম্বৎসর চোখে		—শ্রীসম্বৎসর
১০৮১	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১০৮৭	গির অরণ্যে পশুরাজ		—শ্রীসমীরকুমার মিত্র
১০৮৯	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১০৯৪	ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরতত্ত্ব : ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম		—শ্রীসুধীন মিত্র
১১০০	জবানবন্দী	(গল্প)	—শ্রীপ্রভাত রায়চৌধুরী
১১০৬	পাকিস্থান বনাম পাকিস্থান : ফলাফল বাঙলাদেশ		—শ্রীরতন নাগ
১১১১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১১১৪	কয়েকটি ঐতিহাসিক মরণজাতার কাহিনী		—শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত
১১১৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
১১১৯	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১১২৭	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

রাণী কাহিনী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·০০

নয়া বসত
শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ৬·০০

ত্রয়োদশী
রমাপদ চৌধুরী ॥ ৫·০০

চম্বলের আতঙ্ক
চিরঞ্জীব সেন ॥ ৫·০০

গল্প মণিঘর
সুবোধ ঘোষ ॥ ১৪·০০

আশাবরী
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৬·০০

নীলাঙ্গুরীয়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ১০·০০

তাজের স্বপ্ন
নারায়ণ সান্যাল ॥ ৮·০০

কুমারী কন্যা
দীপক চৌধুরী ॥ ৮·০০

উত্তরাংশ
রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ ॥ ১·০০

কামিনীকাঞ্চন
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·০০

নীলকণ্ঠী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

কালোঘোড়া
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ ৪·০০

উত্তরঙ্গ
সমরেশ বসু ॥ ৬·০০

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা
নীলকণ্ঠ ॥ ১০·০০

সুধাপারাবার
প্রবোধ রায় ॥ ৬·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তৃতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত হইয়াছে
মিহিজামের স্বর্গীয় ডাঃ পরেশনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে
ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লিখিত হোমিও চিকিৎসার বই

আধুনিক
চিকিৎসা

মূল্য ৮৲ গোল্ডেন ৬৲ সাধারণ ডাক
মাশুল আলাদা
৩৭বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৫। ফোন ৪৭-৫০৮১

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ও মনোজ্ঞ বই। লেখক নিজে একজন চিকিৎসক এবং একজন খ্যাতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুত্র। তাই রোগ ও রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং এই অভিজ্ঞতাই বইটির উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি বইটিতে তাঁর পিতার চিকিৎসক-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে। যে চিকিৎসার ধারা এখানে উল্লেখিত তার নাম মিহিজামের চিকিৎসা ধারা।

অসুখ ও ওষুধ—এই দুটি বিষয়ের ওপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি সহজবোধ্য। যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

—যুগান্তর, ২০শে জুন, ১৯৭১

এক নজরে

রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবন :

উত্তর আয়ারল্যান্ডের (আলস্টার) বিদ্রোহী তরুণী কুমারী বার্নাদেৎ দেভলিন দু বছর আগে রাজ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, মাত্র একুশ বছর বয়সে বৃটিশ কমন্সসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের নির্যাতিত সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের প্রতিনিধি তিনি, তাঁদের ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা বৃটিশ জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৬৯ সালে মধ্য আলস্টার কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হন ও বিপুল জনসমর্থনে জয়লাভ করেন। পরের বছর সাধারণ নির্বাচনেও তিনি ঐ কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণের হয়ে নানা বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের ঐ কুমারী সদস্যা ঐ দ্বীপরাজ্যের সমাজ ও রাজনীতিতে আবার দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন, আগামী শরতে তিনি সন্তানের জননী হবেন—এই অভাবনীয় চাঞ্চল্যকর সংবাদ ঘোষণা করে। সন্তানের পিতা কে তা তিনি জানান নি।

শ্রীমতী দেভলিনের ঘোষণা সবচেয়ে বিব্রত করে মধ্য-আলস্টারের জনগণকে যাঁরা দুবার তাঁকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন বৃটিশ কমন্স সভায়। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাঁরাও ব্যাপারটাকে সহজ করে নিচ্ছেন বলে মনে হয়। কদিন আগে শ্রীমতী দেভলিন ঘোষণা করেছেন, তিনি শীঘ্রই তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ঘরোয়া সভায় মিলিত হবেন। আর ঐ কেন্দ্রের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোস্যালিস্ট এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট নেতা হ্যারী মারুক্স বলেছেন : আমরা এখনও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি আমাদের দলের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচনে জয়ী হন, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের প্রতিনিধি থাকবেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, আমরা তার সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চাই না। আমরা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে আস্থা স্থাপন করেছিলাম, সে আস্থা আমাদের এখনও অটুট আছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের সব রাজনৈতিক মহল শ্রীমতী দেভলিনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্যে নারাজ, এবং ঐ এলাকা থেকে নির্বাচিত কমন্স সভার অন্যান্য বিরোধীপক্ষীয় সদস্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমতী দেভলিনের ব্যক্তিগত জীবনের কোন ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চান না।

পুলিশ জুলুম চলবে না :

এই সুপরিচিত ধ্বনিটি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মাঝে-মাঝেই শোনা যায়। সম্প্রতি বৃটেনের পাঁচ শতাধিক যুবক-যুবতী এক যুক্ত বিবৃতিতে দাবী জানিয়েছেন যে, রাঁচির পপ ফেস্টিভ্যালে পুলিশ তাদের সঙ্গে যে অপমানকর ব্যবহার করেছে তার পূর্ণ তদন্ত করতে হবে এবং এ ধরনের লাঞ্ছনা যাতে তাঁদের আবার সইতে না হয় তার জন্য দোষী পুলিশ অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। ঐ যুবক-যুবতীদের হয়ে এখন আন্দোলন চালাচ্ছে 'এ ডি ই' নামক এক নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনকারী দল।

যুবক-যুবতীদের অভিযোগ, নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের সন্ধানে পুলিশ তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং এ ব্যাপারে কোন বাদ-বিচার করা হয় না বা শালীনতাও রক্ষা করা হয় না, যদিও অনেকক্ষণ ধরে তল্লাসী চালিয়েও পুলিশ আপত্তিকর কিছুই প্রায় পায় নি। বহু পুরুষ পুলিশ অফিসারের সম্মুখে তল্লাসীর নামে মেয়েদের প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলা হয় এবং সেসময় বহু অশ্রাব্য মন্তব্য পুলিশ অফিসারদের মুখে শোনা যায়। অনেককে দু-তিনবার তল্লাসী করা হয়।

উনিশ বছরের অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া কেলী তাঁর অভিযোগলিপিতে বলেছেন, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঐ উৎসবে গিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক নারী পুলিশ তাঁকে দেহ-তল্লাসীর জন্য যেতে বলে এবং তিনিও যেতে বাধ্য হন। তারপর নিকটবর্তী একটি বাড়ীর দোতলায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরে তাঁর হ্যান্ডব্যাগটি টেবিলের উপর উল্টিয়ে ঝেড়ে দেখা হয়, তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা। কিন্তু নারী পুলিশ অফিসাররা তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে দরজা বন্ধের আদেশ দেন এবং তারপর 'আমার সর্বদেহে তল্লাসী শুরু হয়। প্রথমে জ্যাকেট খুলি, তারপর ব্লাউজ। তাতেও ওরা সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমার ব্রা'র মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেখতে লাগল, কিছু পায় কিনা সেখানে। তারপর ওরা আমার শরীরাবয়ব নিয়ে কিছু অশালীন মন্তব্য ও পরিহাস করে আমাকে ছেড়ে দিল।'

একুশ বছরের মেয়ে কুমারী ডায়েনা মিলস বলেছেন, তিনি মেলায় গিয়েছিলেন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে, শেষ পর্যন্ত হাজতবাস করে ঘরে ফিরেছেন, যদিও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি তাঁদের কাছে। আরও অনেকের মতো তাঁদেরও জোর করে ছবি ও আঙুলের ছাপ নিয়েছে পুলিশ।

এ ডি ই-সম্পাদক টনি স্মিথ বলেছেন, একমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরই ছবি বা আঙুলের ছাপ পুলিশ নিতে পারে এবং তাও পারে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে। এভাবে যাকে-তাকে ধরে এনে জোর করে ছবি নেওয়ার বা আঙুলের ছাপ দিতে বাধ্য করার কোন অধিকার পুলিশের নেই। পুলিশ যা করছে সেটা তার স্বভাবসুলভ হলেও সম্পূর্ণরূপে তার ক্ষমতা ও এক্তিয়ার-বহির্ভূত আচরণ। প্রায় হাজার খানেক ছেলে-মেয়ের উপর এই অন্যায় আচরণ ও জবরদস্তি কখনও মেনে নেওয়া যেতে পারে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

পাবলো পিকাসো :

বিশ্বখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকে তাঁর ৯০তম জন্ম দিনে ও ফ্রান্সে বসবাসের সত্তর বর্ষপূর্তির স্মারক হিসাবে 'সিটিজেন অফ প্যারিস' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। প্যারিস সিটি কাউন্সিল শুধুমাত্র বিশ্বের বিশিষ্ট নাগরিকদেরই এই সম্মান দিয়ে থাকেন। ইতিপূর্বে স্যার উইনস্টন চার্চিল ঐ সম্মান লাভ করেছিলেন।

২২।৭।৭১ —ব্রজবাসী

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

কুৎসিৎ নাটক

বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে রাজনৈতিক মহানাটকের পালাটা বেশ জমে উঠেছে। হাস্য, করুণ, বীর ও বীভৎস রসের সমাবেশে গঠিত এই নাটক কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী। ব্রেখটীয় রীতির জটিল নাটক নয় যে, সাধারণের পক্ষে মর্ম গ্রহণ করা কঠিন হবে, তাই পালাটা সহজেই আসর মাৎ করেছে। নিকসন সাহেব চীন দেশে যাবেন এবং তার পূর্বে নাকি রাশিয়াতে সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে দেখাও করবেন। শান্তির প্রয়োজনে মানুষ কি না করে। তিনিও তাই নানা রকম প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অভিযাত্রার পরিকল্পনা করেছেন। যে দূতী এই অভিসারের পিছনে গোপনে কাজ করেছেন তাকেও ইতিমধ্যে কয়েক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র উপঢৌকন পাঠান হয়েছে। অবশ্য এঁরা সবাই সজ্জন, তাই এই সব দ্রব্য দেওয়া হল পূর্ব প্রতিশ্রুতি মাফিক। কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে যেদিন থেকে সেই ২৫শে মার্চের পর, কোনো রকম অস্ত্র সাহায্য যাতে পাঠানো না হয় তার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের কোটি-কোটি মানুষ উৎপীড়িত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা আসছে ত' আসছেই, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাই আসছে, সীমান্ত পার হয়ে থালা-ঘটি, হাঁড়ি-কলসী যা-কিছু শেষ সম্বল তা মাথায় করে চলে আসছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তারা কিন্তু 'কটু কহিব না, কটু শুনিব না, কটু দেখিব না' এই নীতি অনুসারে চোখে মুখে কানে হাত চাপা দিয়ে গান্ধীজীর সংগ্রহে রক্ষিত সেই তিনটি দারুভূত বানরের মত এতকাল নীরবে বসে ছিলেন। শুধু সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট মহাশয় ব্যক্তিগত মত হিসাবে মানব ইতিহাসের এই জঘন্যতম ট্রাজেডির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশেষে এই সব উদ্বাস্তুদের জন্য কি আন্দাজ সাহায্য সরবরাহ করা দরকার তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য প্রিন্স সদরউদ্দীন আগা খাঁকে পাঠালেন। প্রিন্স সাহেব ইসলামাবাদ, ঢাকা, নয়াদিল্লী আর বনগাঁর সীমান্ত অঞ্চল দেখে-শুনে যেখানে যেমন মন্তব্য করা সমীচীন তা করলেন। আর ঠিক তারপরই নিকসনের চীন সফরে যাবার সংবাদে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠল। ইয়াহিয়া খুশী, তাঁর দূতীগিরি সার্থক। তিনি তাই সেই মওকায় লন্ডনের 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস'এর সংবাদদাতাকে (সেই 'ইনডিয়াস চায়না ওয়ার' নামক ভারতবিরোধী গ্রন্থের লেখক রেজিন্যালড্ ম্যাকসওয়েল) ডেকে বললেন—'ভারত যদি ইস্ট পাকিস্তানের কোনো অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করে, পৃথিবীর মানুষ জেনে রাখো আমি তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আর এই যুদ্ধে পাকিস্তান একা লড়বে না।' আর সেই সঙ্গে একথাও সংবাদদাতাকে জানালেন 'পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি রাজী, কিন্তু 'লেডী' রাজী নন।' অর্থাৎ তাঁর যা কিছু গন্ডগোল তা ভারতকে নিয়ে। বাংলাদেশের ব্যাপারটি কিছু নয়, ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া হলেই ত সব গোল চুকে যায়। ঠিক এই সঙ্গেই প্রস্তাব এলো ভারত-পাক সীমানা বরাবর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন করা হোক। তার ফলে উদ্বাস্তুরা অন্তরে নিরাপত্তা অনুভব করবে আর হাসিমুখে 'ফিরে চলো আপন ঘরে' গান করতে-করতে স্বদেশে ফিরবে। ভারত ও পাক দু পক্ষ যেন তুল্যমূল্য। ইসলামাবাদের শাসকচক্রের সুবিধার্থে তাঁরা যা খুসী ইয়াহিয়ার রাজত্বে করুন, কিন্তু ভারতের ভূমিতে তাঁরা দাঁড়াবেন কোন প্রয়োজনে? ভারত আশ্রয়দাতা আর ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকচক্রের পৈশাচিক বর্বরতায় উৎপীড়িত হয়ে শরণার্থীরা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ইয়াহিয়াকে ত্রাণ করার জন্য স্বার্থপরায়ণ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির এই চালাকী ভারত কোনোমতেই বরদাস্ত করবে না। এদিকে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ঘোষণা করেছে, আমরাও ওদের অস্ত্র সাহায্য করব। এই ঘোষণা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিবাহিনী জয়যুক্ত হলেই উদ্বাস্তুরা সোনার বাংলায় ফিরবেন, তার পূর্বে নয়। এদিনের এই নাটকীয় হুংকার ও তর্জন-গর্জনের অবসানে এই কুৎসিত নাটকের যবনিকা পতন তখনই সম্ভব হবে।

পটভূমি

জুনের শেষে যে নাটকীয়ভাবে পশ্চিম বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল তার অন্ততঃ একটা বাহ্যিক কারণ ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীর স্রোত। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার খাড়া করান হল, একেবারে শুরু থেকেই তার গোড়ায় জোর ধাক্কা দিতে শুরু করল এই স্রোত। ঈশ্বর জানেন, পশ্চিম বাংলার নিজস্ব সমস্যার অন্ত নেই। সেই সব সমস্যা সামলাতে যে-কোন ভদ্রস্থ সরকারেরই হিমসিম খেয়ে যাওয়ার কথা। তার ওপর এই শাকের আঁটি। নড়বড়ে কোয়ালিশন সরকার যে নাজেহাল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী?

গোড়া থেকেই ঘোষণা করা হল যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সামলানোর সব ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু দিল্লী তো হাজার মাইল দূর, প্রথম চোটটা সামলাতে হবে এই রাজ্যকেই। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পরই অজয়বাবু দিল্লীতে, এমন কি প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। পশ্চিম বাংলার একার পক্ষে যে এই বিরাট দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয় সে-কথাও তিনি স্পষ্ট করে দিলেন। সৈন্য বাহিনীর হাতে শরণার্থীদের দেখাশোনার ভার ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবও উঠল। অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থীদের সরিয়ে নেওয়ার কথাও তোলা হল। কিছু কিছু সরানোও হল। রাশিয়া থেকে কিছু বিমান এল। শরণার্থীদের অনেকে সেই বিমানে চেপে মানা গেলেন। সেই সঙ্গে কিছু ট্রেন বোঝাই করেও মানা পাঠান হল। কিন্তু তাতে মূল সমস্যার বিশেষ সুরাহা হল না।

এ পর্যন্ত ভারতে যত শরণার্থী এসেছেন তাঁদের মোট সংখ্যা সত্তর লাখ ছুঁই-ছুঁই করছে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই এসেছেন ৫২ লাখের বেশী। এর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র সোয়া লাখের মত শরণার্থীকে মানা, গয়া ও এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকী সকলেই আছেন এই রাজ্যেই—শিবিরে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে, সরকার ছাউনি দেওয়া 'ঘরে' বা কংক্রিটের পাইপে, রাস্তার ধারে অথবা গাছতলায়।

এখনও পর্যন্ত রোজ গড়ে বিশ হাজার করে শরণার্থী আসছেন। এই স্রোত কি কমবার কোন সম্ভাবনা আছে? সেই সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং খুব শীগগির এই স্রোত রীতিমত প্লাবনের আকার ধারণ করতে পারে।

শরণার্থীরা প্রথম আসতে শুরু করেন ২৫ মার্চের পরেই। সেই দলে হিন্দুরা ছিলেন, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। মাঝে কিছু দিন একটু ভাটা পড়ে। তারপর পাক ফৌজ যখন হিন্দুদের ওপর সুপরিকল্পিত অত্যাচার শুরু করে তখন আবার দলে-দলে শরণার্থীরা আসতে থাকেন। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু। তারপর আবার শরণার্থী আগমনের হার কিছু কমে যায়। আগে যেখানে দিনে ৫০ হাজার থেকে লাখ খানেক আসছিলেন, এখন সেখানে কুড়ি হাজার—কম মানে এই আর কী! কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা বোধহয় এখনও বাকী। তার কারণ, বাংলাদেশে গুরুতর খাদ্যসঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। পাক ফৌজী শাসকরা এখনও কোন অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা সেখানে চালু করতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণ জোরদার করে তুলেছেন। ফলে বাংলাদেশে প্রায় সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। খাদ্য বন্টন ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। ফলে অন্ততঃ তিন কোটি লোক খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে খবর এসেছে। বাংলাদেশের মধ্যে যদি তাঁদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে তবে অনেকেই ভারতে চলে আসবেন। ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসামেও তাঁরা অনেকে যাবেন, কিন্তু বেশীর ভাগই আসবেন পশ্চিম বাংলায়। তাঁদের অধিকাংশই হবেন মুসলমান। কেন্দ্রীয় সরকার আশঙ্কা করছেন, শরণার্থীর মোট সংখ্যা কোটিতে পৌঁছবে। আসলে হয়ত সেই সংখ্যাও ছাড়িয়ে যাবে। এই বছর আদমসুমারীতে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার কোটি। এই ঘনবসতি রাজ্যে তার ওপর আরো ৫০ লাখ থেকে কোটি খানেক লোক এসে পড়লে অবস্থা কি দাঁড়াবে?

• • •

সব দায়িত্বই কেন্দ্রীয় সরকারের, ঠিকই। পশ্চিম বাংলার বাজেটে এ-জন্যে আলাদা ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তাও ঠিক। কলকাতার থিয়েটার রোডে আগে যেখানে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় পূর্বপাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তর ছিল সেখানেই নতুন করে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ত্রাণ দপ্তর। সেই দপ্তরের কর্তা কর্ণেল লুথরা।

কিন্তু এই দপ্তরের কাজটা অনেকটাই কো-অর্ডিনেশনের। দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সব কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। আসল ধাক্কাটা আসছে পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু সেখানেও বিভ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। পুনর্বাসন ও ত্রাণের কাজের জন্যে সরকারের একটি দপ্তর আছেই। তার ভার কমিশনার পর্যায়ে একজন অফিসারের ওপর। তার ওপর একটা বিশেষ পদও তৈরী করা হয়েছে — ডিরেক্টর-জেনারেল অফ ইভাকুইজ। এঁদের কার কী এক্তিয়ার তা এখনও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু পুনর্বাসন দপ্তরই থাক আর নতুন পদ তৈরী করাই হোক, সেটা অনেকটাই রাইটার্স বিল্ডিংসের ব্যাপার। যে-সব জেলার সরকারী অফিসাররা শরণার্থীদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁদের এতে বিশেষ আসে-যায় না, কারণ সব ঝামেলা তাঁদের ওপরেই। নির্দেশ রিলিফ কমিশনারের কাছ থেকেই আসুক অথবা ডিরেক্টর-জেনারেল অফ ইভাকুইজের কাছ থেকেই আসুক, সেটা নিছক টেকনিক্যাল তফাৎ।

যে-আটটি জেলার ওপর প্রধানত চাপ এসে পড়েছে সেখানে অবস্থা কি রকম? এক কথায়, শোচনীয়। শরণার্থীদের দেখাশোনার দুটো দিক আছে—শিবির রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিবিরের বাইরে যে-সব শরণার্থী আছেন তাঁদের সমস্যা। শিবিরে যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। তাঁদের জীবনধারা মোটামুটি একটা ছকের মধ্যে এসে গেছে। তা ছাড়া শিবিরের কাজের জন্যে নতুন লোকও সরকার অনেক নিয়োগ করেছেন। কিন্তু যাঁদের শিবিরে স্থান হয় নি তাঁদের নিয়ে ভাবনা আরো বেশী। তাঁদের সংখ্যাও কম করে বিশ লাখের মত।

সরকারীভাবে হয়ত স্বীকার করা হবে না, কিন্তু ঐ আটটি জেলায় ত্রাণ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ-কর্মই প্রায় বন্ধ। সেটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। প্রথম কারণ লোকাভাব। যেমন ধরুন, ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা। সেখানে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা সোয়া শ' মতো। কিন্তু বসিরহাটে এ-পর্যন্ত শরণার্থী এসেছেন অন্তত পাঁচ লাখ, এসেছেন মাস তিনেকের মধ্যে। এই সংখ্যক শরণার্থী সামলে ঐ শ'খানেক কর্মচারী অন্যান্য কাজের দিকে মন দেওয়ার কতটা সময় ও সুযোগ পেতে পারেন? অন্যান্য জেলা বা মহকুমাতেও অবস্থা এই রকমই। বনগাঁ মহকুমায় শরণার্থীর সংখ্যা সাত লাখ হবে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অন্ততঃ পনের লাখ। এই

গুরুত্বের এইসব খবর কোন জেলা কর্তৃপক্ষেরই নেই।

ইতিমধ্যে বর্ষা নামায় বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষ পড়েছেন আরো কঠিন সমস্যায়। প্রথম দিকে যেখানেই খালি জমি পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার মধ্যে যেগুলো নীচু জমি সেখানে এখন অবস্থা কাহিল। ফলে অনেক জায়গা থেকেই শিবির সরিয়ে নিতে হয়েছে। তাছাড়া বর্ষায় জল জমে স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্যাকেও তীব্রতর করে তুলেছে। অনেক জায়গাতেই জল প্রায় টিউবওয়েলের মুখ পর্যন্ত চলে আসছে। খাবার জল যদি দূষিত হয় তবে আবার নতুন রকমের অসুখ-বিসুখের আশঙ্কা। এমনিতেই বর্ষায় ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। কয়েক জায়গায় ছোট আকারে কলেরার আক্রমণও ঘটেছে—যেমন পশ্চিম দিনাজপুরের কোন-কোন শিবিরে।

বর্ষায় শিবিরের শরণার্থীদের অবস্থাই যদি কাহিল হয়ে থাকে তবে শিবিরে যাঁদের ঠাঁই হয় নি তাঁদের অবস্থা কল্পনা করা চলে সহজেই। জোর বৃষ্টি এলে তাঁরা অনেকেই ছুটে এসে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেখানে জায়গা কোথায়? তাছাড়া, কাছাকাছি শিবিরও তো সব জায়গায় নেই। তাই কোন-কোন জায়গায় শরণার্থীরা বাঁচবার জন্য খালি বাড়ী দেখলেই ঢুকে পড়ছেন। এক বনগাঁ মহকুমা থেকেই এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ অবশ্য বাড়ীগুলি আবার খালি করে দিতে পেরেছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যদি অসন্তোষের সৃষ্টি করে তবে সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয় মোটেই।

উত্তেজনার আরো কারণ দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন শিবিরে শরণার্থীরা যে-পরিমাণ রেশন পাচ্ছেন তার পরিমাণ সন্তোষজনক। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অনেক মফঃস্বল এলাকাতেই আছে শুধু মডিফায়েড রেশনিং ব্যবস্থা, যার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অনেক জায়গাতেই আবার তা-ও নেই। এই রাজ্যেও দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত লোকের অভাব নেই। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ স্বাভাবিক। তাছাড়া, বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দামও বেড়ে গেছে।

সীমান্তবর্তী অনেক জেলাতেই ভেসে-বেড়ান শরণার্থীদের মধ্যে কেউ-কেউ ইতি-মধ্যেই চাষবাসের কাজে যোগ দিয়েছেন। যেহেতু তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং যে-কোন খড়কুটো পেলেই তা ধরতে সচেষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাই তাঁরা অনেক কম মজুরীতেই খাটতে রাজী হচ্ছেন। জমির মালিকেরাও এই সুযোগ নিতে কার্পণ্য করছেন না। শুধু ক্ষেতমজুর নয়, স্থানীয় লোকের অন্যান্য জীবিকাতেও হাত পড়েছে। যেমন, রিক্সাওয়ালাদের।

বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর এক চিন্তাতেও জেলা কর্তৃপক্ষের ঘুম হচ্ছে না। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলাতেই বর্ষায় নদী কূল ছাপালে প্রতি বছর বেশ কিছু লোক আশ্রয়হারা হন। অন্যান্যবার তাদের স্থানান্তরিত করে সাময়িক শিবিরে বা স্কুল-কলেজে বড় বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হয়। এবার অনেক জায়গাতেই স্কুল-কলেজে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে শরণার্থীদের। বন্যায় যাঁরা আশ্রয়হারা হবেন তাঁদের নিয়ে এবার কি করা হবে?

জেলা কর্তৃপক্ষের এই সমস্যার তালিকাই শেষ নয়। শিবিরের মধ্যে বা বাইরে যে-সব শরণার্থী আছেন তাঁদের কুপথে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব নেই। শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে সরকার গোড়া থেকেই কিছুটা সতর্ক। তাঁদের শিবিরের বাইরে বিশেষ আসতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যাঁরা শিবিরে ঠাঁই পান নি তাঁদের সম্পর্কে এই সতর্কতা সম্ভব নয়।

এত জটিল সমস্যা সম্বন্ধে জেলা কর্তৃপক্ষ যদি অন্যান্য কাজে হাত দিতে না-পারেন তবে তাঁদের হয়ত দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু অন্যান্য কাজও তো চলা দরকার। যেমন ধরুন, কোন কোন জায়গায় এর জন্যে বর্ষার মুখে চাষীদের বীজ বা সার সরবরাহের কাজও ব্যাহত হয়েছে। অথচ তা হতে দেওয়া মোটেই চলে না। অন্যান্য উন্নয়নের কাজ না-হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। জেলায়-জেলায় প্রতি ব্লকে একশ' লোককে চাকরী দেওয়ার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাজ শীঘ্রই শুরু হওয়ার কথা। সেই কাজ শুরু করার সময় পাওয়া যাবে তো? এমনিতেই পশ্চিম বাংলায় উন্নয়নের কাজের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে কম। তার ওপর প্রশাসনিক অসুবিধের যদি সেটুকুও ব্যবহৃত না-হয় তবে সেটা কত দুর্ভাগ্যের হবে ভেবে দেখুন।

*

এই সমস্যার সমাধানের কোনো পথ দেখা যাচ্ছে কি?

কেন্দ্রীয় সরকার, ফলে পশ্চিম বাংলা সরকারও এখনও এই ধারণা আঁকড়ে আছেন যে, সব শরণার্থীই বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। আগে একটা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, ছ মাসের মধ্যেই তাঁরা দেশে ফিরবেন। এখন আর তা বলা হচ্ছে না, কারণ সেই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। প্রথমত, বাংলাদেশে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও যে কতজন ফিরবেন সেটা খুব সন্দেহের ব্যাপার। অন্ততঃ হিন্দুরা প্রায় কেউই ফিরতে চাইবেন না সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরো একটা ব্যাপার আছে। এদেশে ছ' মাসের বেশী বসবাস করলেই পূর্ব বাংলার (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ ভারতের নাগরিক হওয়ার অধিকার পাবেন। তখন তাঁদের দেশে ফিরতে বাধ্য করা যাবে না।

প্রথমে বলা হয়েছিল, আট লাখ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। তাও যদি হয় তবু এই রাজ্যে প্রায় ৪৫ লাখ শরণার্থী থেকে যেতেন। আসলে কিন্তু সোয়া লাখের বেশী শরণার্থী এখনও যে সরানো হয় নি, সে-কথা আগেও বলেছি। অন্যান্য রাজ্য শরণার্থীদের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক, যদিও অনেক বিধান-সভাতেই বাংলাদেশের জন্যে দরদে গদগদ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এখন, বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে সব ভাবনা যেন পশ্চিম বাংলার বাঙালীর।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার বিপর্যস্ত বৈষয়িক ব্যবস্থা কি এই গুরুভার বহন করতে পারবে? নাকি এই ভারই শেষ পর্যন্ত হবে যাকে বলা হয় উটের পিঠে শেষ খড়কুটো?

শরণার্থীরা আবার দেশে ফিরে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করবেন, এমন একটা মনোহর পরিণতির স্বপ্ন কেন্দ্রীয় সরকার দেখতে চান দেখুন। কিন্তু সেই সঙ্গে এখনই যদি শরণার্থীদের দেশের মধ্যে নানা স্থানে সরিয়ে না-নেওয়া হয় এবং এখন থেকেই তাঁদের সম্ভাব্য পুনর্বাসনের আগাম পরিকল্পনা তৈরী করা না-থাক তবে পশ্চিম বাংলার বিপর্যয়ের যেটুকু বাকী আছে তাও সম্পূর্ণ হবে। দেশ ভাগের পর থেকে যে-সব উদ্বাস্তু এসেছিলেন তাঁদের পুনর্বাসনে দিল্লীর ব্যর্থতা পশ্চিম বাংলার বর্তমান দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। এখন যদি আরো পঞ্চাশ লাখ থেকে কোটি খানেক লোক পশ্চিম বাংলায় থেকে যান তবে এই রাজ্যের গোটা সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারাটাই পাল্টে যাবে। রাজনৈতিক দিক থেকে শেষ পর্যন্ত এর ফল কি দাঁড়াবে তা আপাতত বলা না গেলেও অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। যত দিন এই বিপুল ভার এই রাজ্যে থাকছে তত দিন অন্ততঃ নির্বাচন যে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না এটা এক রকম নিশ্চিত। কারণ, সব কিছুর ওপরে জেলা কর্তৃপক্ষকে এখন নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলা দুঃসাধ্য।

২৭।৭।৭১ —দেবব্রত

কবিতা, রূপকল্প ও অন্যান্য

ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃতি প্রকাশন, ১০নং হেস্টিংস স্ট্রীট; দে বুক স্টোর; কার্মা কে, এল, মুখার্জি; ভবানীপুর বুক ব্যুরো।

দেশে বিদেশে

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চমকপ্রদ ঘোষণার তিন দিনের মধ্যেই বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোন অংশ দখল করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এই রকম কোন চেষ্টা হলে তিনি সেটাকে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করবেন। অতএব? অতএব, সারা দুনিয়া শুনে রাখুক আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব।'

সারা দুনিয়াকে এই যুদ্ধের হুমকি দেওয়ার জন্য মাধ্যম হিসাবে ইয়াহিয়া খাঁ কোন্ বিশেষ সাংবাদিকটিকে বেছে নিয়েছেন সেটাও ভালভাবে লক্ষ্য করার মত। এই সাংবাদিকের নাম হচ্ছে নেভিল ম্যাক্সওয়েল। যারা খবর রাখেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, এই ম্যাক্সওয়েল সাহেবই ১৯৬৭ সালে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় বলেছিলেন, ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে আসছে, আর চতুর্থ নির্বাচনই হবে এদেশের শেষ নির্বাচন। আরও সম্প্রতি এই ম্যাক্সওয়েল সাহেবই বই লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৬২ সালে ভারত নিজের দোষেই চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল। এই বৃটিশ সাংবাদিক এক সময়ে ভারতে লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। সম্প্রতি তিনি লন্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এ যোগ দিয়েছেন এবং সেই পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এহেন ম্যাক্সওয়েলের মারফৎ পাকিস্তানের জঙ্গী ডিক্টেটর আরও কয়েকটি খবর দিয়েছেন। যেমন, (১) কয়েকটি বৈদেশিক সরকার মধ্যস্থতা করার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারই জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 'যে কোন সময়ে যে-কোন জায়গায়' প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, বাদশাটি না বলে দিয়েছেন। (২) ভারতবর্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের যেসব আশ্রয়প্রার্থী ফিরে আসবেন তাঁদের তদারক করার জন্য পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি আছে। এই পর্যবেক্ষকদের কাজ হবে, 'আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষে ফিরে আসা যে নিরাপদ সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থীদের এই আশ্বাস দেওয়া যে, তাঁরা ফিরে যেতে পারেন।' (৩) শেখ মুজিবুর রহমানকে শীঘ্রই বিচারের সম্মুখীন করা হবে। এই বিচার গোপনে এবং সামরিক আদালতে হবে। শেখের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য উকিল নিতে দেওয়া হবে; কিন্তু বিদেশী আইনজীবীর সাহায্য নিতে দেওয়া হবে না। শেখের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হবে তার দণ্ড হচ্ছে মৃত্যু। তবে দণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর থাকবে।

ইসলামাবাদের জঙ্গী নায়কের এইসব ঘোষণা সম্পর্কে নয়াদিল্লির সরকারী প্রতিক্রিয়া হল:—

(১) পাকিস্তান যদি কোন ছল-ছুতোয় ভারতকে আক্রমণ করে তাহলে 'আমরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তৈরি আছি।' আসলে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়-সঙ্কল্প দেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জয় হবেই।

একথা লোকসভায় বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং।

(২) বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কোন আলোচনা হতে পারে না। পাকিস্তানের যে বন্ধুরা মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী তাঁরা বরং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মুজিব ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করতে বলুন। জনসাধারণ এদের প্রতিই তাঁদের আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

লোকসভায় এই কথাগুলিও বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং।

(৩) ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ভারতবর্ষের মাটিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব 'উদ্দেশ্যপূর্ণ' এবং যারা এই প্রস্তাবের ওকালতি করবে ভারত সরকার তাদের কাজকে 'অমিত্রোচিত' বলে গণ্য করবে।

(শরণার্থীদের সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাই-কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন খাঁর কাছ থেকে সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব এসেছিল। পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধিও এই প্রস্তাব দেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন মহাসচিব উ থান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনিও শ্রীসেনের কাছে প্রস্তাবটি পেড়েছিলেন।)

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে ভারতের আপত্তির কারণগুলি হল:—প্রথমতঃ, এতে ভারতকে সত্তর লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে জায়গা দেওয়ার পর সদাচরণের জবাবদিহি করার দায়ে আবদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরে যেতে রাজী করাবার জন্য যে একমাত্র পথ খোলা আছে সেই পথে না যাওয়ার জন্যই পাকিস্তানকে একটা অজুহাত যুগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনরকম মীমাংসায় না আসার জন্য পাকিস্তানকে একটা ছুতো তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয়তঃ একমাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদেরই এই ধরনের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার অধিকার আছে এবং তাও শুধু দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধাবস্থা দেখা দিলে পর।

(ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ সম্মেলনের ও দুই সীমান্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব, দুটিই বাংলাদেশ প্রশ্নের সঙ্গে ভারতকে জড়াবার অপচেষ্টা। প্রথমে চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলাদেশের ঘটনার জন্য ভারতের উস্কানিকে দায়ী করার। দ্বিতীয় চেষ্টা হল ইয়াহিয়া-ইন্দিরা সাক্ষাৎকার ঘটাবার। ক্যানাডার পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতিনিধি দলের মারফৎ প্রথমে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারত এ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় এখন তিন নম্বর চেষ্টা চলছে—সীমান্তের দুই পাশে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার জন্য।)

(৪) শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং লোকসভায় পাকিস্তানকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান যদি শেখকে শাস্তি দেয় এবং 'পাগলামির রাজনীতি' চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই আরও দৃঢ়-সঙ্কল্প হবেন।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের মূল বিষয়টি থেকে যখন এভাবে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তখন সেই মূল বিষয়টিই কিন্তু আরও জটিল হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ গত ২৮ জুন তারিখে তাঁর বেতার ভাষণের 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে সপ্তাহ তিনেক একেবারে স্পীকটি-নট হয়ে থেকে সম্প্রতি পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো মুখ খুলেছেন। তাঁর দলের সভা হয়েছে এবং তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন। এই সাক্ষাৎকারের পরেই পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, ভুট্টো ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু ভুট্টো নিজে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, পাকিস্তান রেডিওর এই সংবাদ ঠিক নয়। তিনি শুধু আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণা মেনে নিয়েছেন। তিনি চান, ইয়াহিয়া খাঁ অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও যদি বৃটেন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে থাকতে পারে তাহলে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেটা সম্ভব না হওয়ার কারণ নেই। ভুট্টো মনে করেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও আমলাদের ভিতরকার চক্র সেখানে ক্ষমতার হস্তান্তরে বাধা দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ২৮ জুনের ভাষণে নতুন নির্বাচনের কথা বলেন নি, শুধু আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হবেন না তাদের আসনগুলিতে নতুন সদস্য নির্বাচন করা হবে, এতে ভুট্টো খুশী। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই সুযোগে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে পূর্ববঙ্গে জায়গা করে নেওয়ার মতলব করছেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার পরিকল্পনার অন্যান্য যেসব অংশ

CENTRAL LIBRARY

তাঁকে খুশী করতে পারে নি, সেগুলি হল —প্রথমতঃ, ইয়াহিয়া যে বলেছেন, নিছক আঞ্চলিক পার্টিগুলির কোন প্রয়োজন পাকিস্তানের আছে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে, এতে ভুট্টোর দলের উপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা আছে, কেননা সেটিও পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ইয়াহিয়া সংবিধান তৈরি করার ক্ষমতা জাতীয় পরিষদকে দেন নি, একদল বিশেষজ্ঞের হাতে সেই কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ, ইয়াহিয়া বলে দিয়েছেন, জাতীয় পরিষদের মাথার উপর আরও কিছুকালের জন্য সামরিক আইনের ছাতা ধরে রাখা হবে।

ভুট্টোর ভাবনার আরও একটি কারণ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের কিছু কিছু কিছু নেতা এখন ভাবতে শুরু করেছেন যে, পাকিস্তানে যে 'রাজনৈতিক শূন্যতা' ভরাট করার জন্য বামপন্থী ও "আঞ্চলিক" দলগুলি এগিয়ে এসেছিল সেই শূন্যতা পূরণ করার সবচেয়ে ভাল পথ হল মুসলিম লীগকে আবার জাগিয়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের তিনটি অংশকে এক করার একটা চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে।

এই চেষ্টায় ভুট্টোর খুশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনের অধিকারী যে পিপলস পার্টি তার নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো অসামরিক শাসন প্রবর্তনে যতটা আগ্রহী অন্যান্য দলের নেতারা ততটা নন। ভুট্টো এখন কি করবেন? আন্দোলনে নামবেন? যদি নামেন তাহলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের আশা আরও সুদূরপরাহত হয়ে যাবে।

*

ইতিমধ্যে, পূর্ববাংলা থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় আর একটি তরঙ্গ ভারতের দিকে আসছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম ধাক্কায় চলে এসেছিলেন খানসেনাদের দ্বারা নিগৃহীত পূর্ববঙ্গের মানুষ — হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। দ্বিতীয় ধাক্কায় বেছে বেছে হিন্দুদের তাড়ান হয়েছিল।

এবারকার এই ধাক্কার প্রধানত মুসলমানরা চলে আসছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। রয়টারের সংবাদদাতার খবর হচ্ছে ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ মানুষ চলে আসার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এঁরা আসছেন ক্ষুধার তাড়নায়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে এবং ঢাকা ও ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো মার্কিন প্রতিনিধিদের তারবার্তা উদ্ধৃত করে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ফাঁস করে দিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যেই দারুণ আকাল দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লোকসভায় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী আর কে খাদিলকারও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় পূর্ববঙ্গের মানুষদের সীমান্ত পার হয়ে চলে আসার সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই এক কোটিতে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এদিকে শাসক কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন বলেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের বাবদ বাজেটে যে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এই বাবদে ব্যয় যেভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্য সংসদের বর্তমান বাজেট অধিবেশনের মধ্যেই একটা অতিরিক্ত বাজেট পেশ করে অর্থের সংস্থান করতে হবে। এই সভায় শ্রীচ্যবন ও শ্রীমতী গান্ধী দুজনই পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আরও বেশী ট্যাক্সের বোঝা বইবার জন্য ও খরচ কমাবার জন্য জনসাধারণকে তৈরি হতে হবে।

*

মরক্কোর পর দ্বিতীয় আর একটি আফ্রিকান রাজ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হল। এবং এখন পর্যন্ত যতদূর বোঝা যাচ্ছে, মরক্কোর মতো সুদানেও এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ সুদানের আয়তন প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। জাফর আল-নিমেরি নামে সামরিক বাহিনীর এক মেজর জেনারেল ১৯৬৯ সালের ২৫শে তারিখে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেদেশে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর তিনি একটি বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকেন। বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কগুলি ও সংবাদপত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। বাবাকর আওয়াদাল্লা নামে একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত সমাজতন্ত্রী নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসান হয় এবং মন্ত্রিসভায় অন্ততঃ চারজন জানা কম্যুনিস্টকে স্থান দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের শেষ দিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল নিমেরির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক খারাপ দিকে যেতে থাকে। আওয়াদাল্লা ইউরোপে সমাজতন্ত্রীদের এক সভায় বলেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি সুদানের সরকারের একটি অপরিহার্য অংশ। দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৭০ সালের ১৬ নভেম্বর সামরিক বাহিনীর বিপ্লবী নেতৃ-পরিষদ থেকে তিনজন সদস্যকে সরিয়ে দেওয়া হল। এদিকে সুদানের সরকারী নীতিও ধীরে ধীরে বদলাতে আরম্ভ করল। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে ঘোষণা করা হল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনগুলি রাষ্ট্রের অধিকারে রাখা হবে আর কোনগুলি বাছাই করে মালিকানার অধিকার ছেড়ে দেওয়া হবে, সেটা একটি কমিশন বিবেচনা করে দেখবেন। শিল্প ও একমাত্র ব্যাঙ্কগুলির অন্য সব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে কোন বাধা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়।

এরপর জেনারেল নিমেরির প্রাণনাশ করার জন্য একটা ব্যর্থ চেষ্টা হল। গত ১৯ জুলাই সোমবার বিপ্লবী নেতৃ-পরিষদের ... ঘন্টাব্যাপী একটি বৈঠকের পর মেজর জেনারেল নিমেরি ওমদুরমান রেডিও থেকে

শারদীয় অমৃত ১৩৭৮

- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। স্বহস্তলিখিত অনুলিপিসহ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরির ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র।
- সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের একাধিক সম্পূর্ণ উপন্যাস
- একটি সুদীর্ঘ কাব্য-নাট্য
- সুনির্বাচিত গল্প-সংগ্রহ
- কবিতাগুচ্ছ
- চলচ্চিত্র, নাটক, খেলাধুলো।

দাম : সাড়ে চার টাকা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-তিন।

ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সরকার সুদানের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন ও ধ্বংস করবেন। সুদানের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এর আগে সরকার পার্টি তুলে দিয়ে অন্য সকলের সংগে দেশব্যাপী একটি পার্টির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছিলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। (আসলে, জেনারেল নিমেরি ও তাঁর সহযোগীরা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন অন্যান্য সব দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুদানের কম্যুনিষ্টরা প্রথম দিকে সরকারের অংশ হিসাবে এবং পরে গোপন সংস্থা হিসাবেও বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন। সুদানী কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধানত মস্কোমুখী, তবে ইদানীং তার মধ্যে চীনা প্রভাবও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে বলে সংবাদ আছে।)

১২ ফেব্রুয়ারির এই বেতার ঘোষণায় জেনারেল নিমেরি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, সুদানের বিপ্লবে তাঁদেরও একটা ভূমিকা আছে।

ঐ মাসের মধ্যে জেনারেল নিমেরির সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে ৬০ জন কম্যুনিষ্টকে সরিয়ে দেন বলে খবর পাওয়া যায়।

কম্যুনিষ্টদের সংগে জেনারেল নিমেরির এই সম্বর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই গত ১৯ জুলাই তাঁকে সরিয়ে সামরিক বাহিনীর একটি নূতন বিপ্লবী নেতৃপরিষদ গঠনের চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার নেতৃত্ব করেন মেজর হাশেম আট্টা। গত বছর নভেম্বর মাসে বিপ্লবী নেতৃপরিষদের যে চারজন সদস্যকে সরান হয়েছিল তাঁদের একজন হলেন এই মেজর আট্টা। তিনি প্রায় বিনা বাধাতেই তাঁর কাজ হাসিল করেছিলেন। ক্ষমতা দখল করার সংগে সংগেই তিনি কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও নারী সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। ১৯৬৯ সালের বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নূতন রাজত্বে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন কর্নেল বাবাকর এল-নুর। গত নভেম্বরে বিপ্লবী নেতৃপরিষদ থেকে অপসারিতদের মধ্যে তিনিও একজন।

কিন্তু ৭২ ঘন্টার মধ্যেই চাকা উল্টে গেল। লণ্ডন থেকে বি-ও-এ-সির বিমানে সুদানের রাজধানী খার্তুমে আসছিলেন কর্নেল নুর। বিমানটিকে লিবিয়ার কর্তৃপক্ষ বেনগাজী বিমানবন্দর থেকে নামতে বাধ্য করলেন এবং কর্নেল নুর ও তাঁর একজন সহযাত্রী যিনি হচ্ছেন সুদানের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ভাই—এই দুইজনকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রায় একই সময়ে সৌদী আরবের আকাশে ইরাকের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই বিমানে ইরাকের একদল প্রতিনিধি খার্তুমে যাচ্ছিলেন সেখানকার নূতন সরকারকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

এরপর ঠিক কি হল বোঝা গেল না। তবে, ওমডুরমান রেডিওর সংবাদ উদ্ধৃত করে মধ্য প্রাচ্য সংস্থা জানালেন যে, একজন সুদানী লেফটেনান্টের নেতৃত্বাধীন একদল সৈন্য রেডিও ষ্টেশন দখল করেছেন, মেজর আট্টা ও তাঁর সহযোগীদের আটক করেছেন এবং জেনারেল নিমেরিকে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এর পর মেজর আট্টা ও আরও কয়েকজনকে গুলী করে হত্যা করার খবর আসতেও দেরী হল না।

জেনারেল নিমেরিকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে লিবিয়া এবং মিশরের হাত থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, লিবিয়া, মিশর, সিরিয়া, ও সুদানকে নিয়ে একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব হয়েছে সুদানের কম্যুনিষ্ট পার্টি তার বিরোধিতা করেছে।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল নিমেরি যে কম্যুনিষ্ট-বিতাড়ন আরম্ভ করেন তার পিছনেও এই আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কটাই ছিল আসল কারণ।

২০-৭-৭১ —পুণ্ডরীক

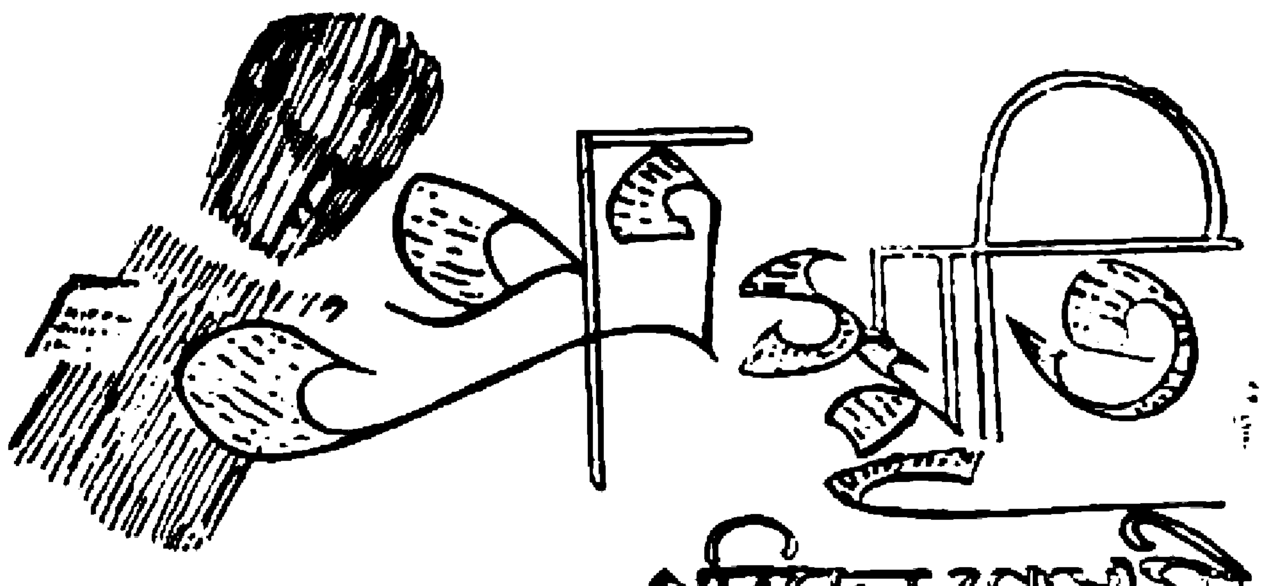

পরিমল গোস্বামী

(পেতস্মৃতি রচনা নানা সময়ে। কোনো কোনো রচনায় তারিখ দেওয়া আছে।)

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে, আমি শনিবারের চিঠিতে যোগ দেবার (১৯০২) আগে, খবরের কাগজে অনেক রসিকতা করা হয়েছিল, মনে পড়ে। বোমারু বারীন্দ্র, পরে বীমারু বারীন্দ্র, পরে বামারু বারীন্দ্র ইত্যাদি।

বোমার যুগ উদ্বোধন করার অনেক কাল পরে বারীন্দ্রকুমার অন্ন সংস্থানের আশায় নানা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চায়ের দোকান খুলেছিলেন, বীমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলেন, পরে স্টেটস-ম্যান কাগজের লেখক হয়েছিলেন, দৈনিক বসুমতীতেও সম্পাদনার কাজ করেছেন।। তারপর সংসার করবেন মানসে বিবাহ করেছিলেন।

এসব নিয়ে যাঁরা রসিকতা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কিন্তু আমি যোগ দিতে পারি নি। বারীন্দ্রকুমারের জীবনের এই পর্যায় রসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্রায় প্রকাশিত হারুর জীবনের সঙ্গে অনেকটা মেলে। হারু গরিব, কিছু উপার্জনের আশায় ফেরি-ওয়ালা হয়েছিল, কিন্তু লোকে টিটকারি দিতে লাগল। সে কাজ ছেড়ে সে চাষের কাজে লাগল। লোকে তবু টিটকারি দিতে লাগল। হারু এসব সহ্য করতে না পেরে সন্ন্যাসী হল। তখন, যারা ওকে টিটকারি দিয়েছিল তারাই এসে ওর পায়ে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ল। বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে হারুর কিছু মিল আছে। তিনি যখন তাঁর জীবনের বিপ্লবী যুগ শেষ করেছেন, তখন অন্য কাজ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না কিছুই। তিনি আমরণ বোমা তৈরি করে সাহেব মারবেন, এমন আশা করা অবশ্যই অন্যায়। তবে বোমার যুগের কার্যকলাপ জনসাধারণের মনে একটি পবিত্র যুগের ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। এঁদের সবার কাজ একটি সংকাজ রূপে স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তাই বোমার যুগের মানুষ সাধারণ চাকরি করছে, চায়ের স্টল খুলছে, এতে মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক, এবং এই আঘাত থেকেই পরে বিদ্রূপের উদ্ভব।

তাই যখন ১৯৩৩ সনে বারীন্দ্রকুমার বিবাহ করলেন, তখন তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজ খুব রঙ্গরহস্যে মেতে ওঠে। আমি কিন্তু এ ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আছে তখনকার লেখায়।

বারীন্দ্রকুমারের কিছু কিছু লেখা আমি যখন যুগান্তর 'সাময়িকী বিভাগে' প্রকাশ করি, তখন একটি লেখা উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান তারিখ ইত্যাদি চেয়ে পাঠাই। তিনি মূল 'বার্থ সার্টিফিকেট' ও তৎসহ জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু ঘটনার একটা তালিকা পাঠান। সে বোধ হয় ১৯৫৬ হবে। বছর দশেক ধরে তাঁর কিছু কিছু লেখা আমি ছেপেছি, খুব অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, আমাকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে তার প্রমাণ। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আমাকে 'পরিমলদা' সম্বোধন করতেন, চিঠিতে (ও মুখে) বারীন্দ্রকুমারও মাঝে-মাঝে তাই করতেন। তিনি আমার অনুরোধে যে সব জন্মকথা লিখেছিলেন তার ভিতর থেকে মূল বার্থ সার্টিফিকেটখানা আমি ফেরত দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে না দিলেই ভাল হত, তা এখন কোথায় কিভাবে আছে জানি না। হাতের লেখা যেখানা আছে তা এই—

আমার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১। জন্ম—লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে ১৮৮০, ৫ই জানুয়ারী।

২। এক বৎসরের শিশু ভারতে আগমন—রোহিণীতে রেল লাইনের ধারে গ্রান্ট সাহেবের বাড়ীতে খানসামা আয়া বাবুর্চি-সহ পাগল মায়ের সহিত বাস। (বারীন্দ্র-কুমারের মাতার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।)

৩। আমার ৬ হইতে ৯ বৎসর অবধি লালা তারিণীচরণের বাড়ীতে বাস। পাগল মায়ের হাতে দিদি ও আমার প্রহার নির্যাতন ও অর্ধাহারে জীবনের।

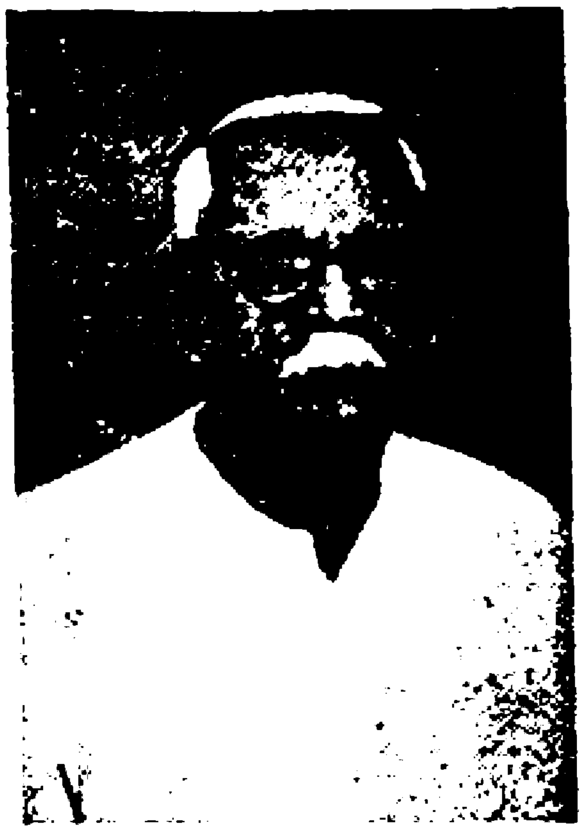

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

৪। ৯ বৎসর বয়সে বড়মামার ইঙ্গিতে ডাঃ কে ডি ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ, পিতা) তাঁহার বন্ধু জয় চৌধুরীর সাহায্যে গুণ্ডার দ্বারা আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

৫। সেই প্রথম গোরুস লেনের বাটীতে বড়মামার কাছে আনন্দের জীবন ও হাতে খড়ি।

৬। ১৮৯২ সনে পিতৃবিয়োগ, ঘোর রাত্রে স্বপ্নে রাঙাবাবার পিতার দর্শন দান।

৭। পরবর্তী বৎসরে ধর্মান্ধ গোঁড়া মাতুলদের দ্বারা আবার মাতৃকোল হইতে ছিন্ন। (প্রসঙ্গতঃ রাজনারায়ণ বসু এঁর মাতামহ ছিলেন।)

৮। দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণের সহিত বাস—১৯০১ এন্ট্রান্স পরীক্ষা অবধি আট-নয় বৎসর দেওঘরে বাস।

৯। মেজদা প্রফেসর মনোমোহন ঘোষের বিবাহ, ঢাকায়। কিছুদিন পাটনা কলেজে পাঠের পর মেজবৌদির সহিত ঢাকায় বাস। ঢাকায় বাবু জীবন।

১০। আবার পাটনা, রাস্তা বাজারে টাকায় B. Ghose's Tea stall খোলেন মহামারী। বরোদায় কবি, কৃষি ও বড়দার জীবন।

১১। বিপ্লবের পথে—১৯০৩ হইতে ১৯০৮। দুইবার বাংলায় প্রস্তুতের স্থাপন।

১২। সুরাট কংগ্রেস ভাঙা—লেলের কাছে আমার দীক্ষা, বরোদায় অরবিন্দের দীক্ষা।

১৩। ১৯০৮ ২রা মে গ্রেপ্তার, দ্বিতীয় দ্বীপান্তর দণ্ড। ১৯০৯ হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর অবধি।

১৪। কালাপানি হইতে প্রত্যাবর্তন ও কারামুক্তি। বিজলী, ফেরী প্রেস।

১৫। পণ্ডিচেরীতে ৭ দিন। তিন বৎসর ১০ মাস। ৬ই বছর।

১৬। পণ্ডিচেরী আগমন। দ্বিতীয় পর্যায় বিজলী।

১৭। বসুমতীতে ৭ বছর।

এর পরেও আছে, কিন্তু তা তাঁর সাধনা জীবনের ভবিষ্যতের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত, এখানে তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে গিয়ে ১০ই মার্চ (১৯৭০) পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত সরকারকে কয়েক প্রশ্ন করে একখানা চিঠি লিখি। নলিনীকান্ত ১২ই মার্চ তার উত্তরে যা জানিয়েছেন তার অংশবিশেষ এই—

লেলের পুরো নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। ইনি গুহযোগী ছিলেন। বারীনদা লেলের কাছে যোগসাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা নয়। যোগসাধনার নির্দেশ। মন্ত্রদীক্ষা নেন শাখারিয়া স্বামীর কাছ থেকে। এই শাখারিয়া স্বামীর আশ্রম ছিল নর্মদা অঞ্চলে। বারীনদার পর শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনার নির্দেশ নেন লেলের কাছ থেকে।

রাঙা-মা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। পঁচিশনীর গোড়ার দিকে এই রাঙা-মার সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। তখন তিনি বৃদ্ধা।

স্ত্রী স্বর্ণলতা পাগল হয়ে যাওয়ায় স্বামী কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে ডি ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত) বহুবিধ চিকিৎসায় বিফল হয়ে দেওঘরের কাছে রোহিনী গ্রামে একটি বাড়ি ভাড়া করে বালকপুত্র বারীন্দ্রকুমার ও নিতান্ত বালিকা কন্যা সরোজিনী সহ স্ত্রীকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করেন। অদূরেই দেওঘরে থাকতেন রাজনারায়ণ বসু। পাগল কন্যার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা তিনিই করে-ছিলেন।

ডাঃ কে ডি ঘোষ তখন খুলনার সিভিল সার্জন। (রাঙা-মাও আসল নাম আমি জানি না, বারীন দা তাঁকে রাঙা-মা বলেই ডাকতেন) খুলনার মেয়ে। তাঁর যৌবনকালেই ডাঃ কে ডি ঘোষ তাঁকে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার দপ্তরি-পাড়ায় একটি বাড়ি তাঁর নামে কিনে সেখানে তাঁকে রাখেন। পাগল মায়ের কাছ থেকে বারীনদাকে একরকম চুরি করেই আনা হয় কলকাতার এই বাড়িতে। বারীনদার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। অপূর্ব সুন্দরী দেখে তাঁকে বারীনদা রাঙা-মা বলতেন।

এই রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা পাটনায় চায়ের দোকান খোলেন। দোকানের সাইনবোর্ডে থাকত B Ghose's Tea Stall, Half anna cup rich in cream.

রাঙা-মা দপ্তরিপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে বর্ধমানে বাড়িভাড়া করে ছিলেন কিছুদিন। পাটনার ব্যবসায়ে বিফল হয়ে রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা বরোদায় যান শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

এ চিঠিতে বিস্তারিত খবর জানা গেল। আমার বাল্যকালে বারীন্দ্রকুমার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের কথা স্মরণমাত্র মনে এক অভূত-পূর্ব রোমাঞ্চ জাগত। সেই বোমার যুগ স্বদেশী যুগের আসল অর্থ কি তা বুঝি না বুঝি দূর পল্লীতেও যে একটা নব যুগের হাওয়া এসে লেগেছিল তাকে খুব পবিত্র মনে হত। বোমার যুগস্রষ্টা বারীন্দ্র-কুমারের প্রতি যে একটা রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধা বালকবয়সে আমার মনে জেগেছিল, তা শেষ পর্যন্ত আমার মন থেকে দূর হয়নি। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন, তার জন্য আমি বেদনা বোধ করেছি, এবং আমার যেটুকু সাধ্য ততটুকু সাহায্য তাঁকে করেছি—অবশ্য তাঁর লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপিয়ে। তাঁর যে কখানা চিঠি আমার কাছে আছে, তাতে তাঁর অভাবের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু হীনতার ভাব কোথাও নেই।

বাঁচতে হলে কিছু অর্থ চাই, মানুষের জীবনে বিধাতাবাবস্থিত এই প্রাথমিকতাকে মেনে চলতেই হয়। যিনি আত্মিক সাধনায় রত থাকবেন, তাঁরও এ থেকে নিস্তার নেই। একই সঙ্গে সাধনার পথে চলা এবং ব্যবসা করে কিছু উপার্জন এই দুয়ের শিক্ষা এদেশে কেউ পায়নি "moral businessman" সম্ভবত পরস্পরবিরোধী কথা। তাই অ্যামে-রিকানদের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করে এক রসিক লেখক বলেছেন, তিনি একটি পূর্ব বার্ষিক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি কি বিষয় নিয়েছ?' সে উত্তর দিল 'Salesmanhip and Religion'। লেখক মন্তব্য করছেন—

> Her, was a young man whose training wac destined to turn him unto a moral businessman.

তিনি একথা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন। আমাদের ছাত্রদের কাছেও বলতে পারতেন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গাত।

বারীন্দ্রকুমার বোমার যুগ শেষ করে প্রবীণ বয়সে ঘরের শান্তি কামনা করে-ছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করে-ছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজে খুব বিদ্রূপ করা হয়েছিল। যেন কতবড় অধঃপতন। আমরা শান্তিতে ঘরে থেকে বারীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যঙ্গরহস্য করেছি। এ জিনিস আমার পছন্দ ছিল না। আমি ১৯৩০ সনে—তার সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন আমি—শনিবারের চিঠিতে (তখন আমি সম্পাদক) এই প্যারা-গ্রাফগুলি লিখেছিলাম—

> বারীনদার বিবাহ হইয়াছে। মানুষেই বিবাহ করিয়া থাকে—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাহারো দৃষ্টির প্রসার হয় কাহারো সঙ্কোচন ঘটে—মোটকথা কেহ একই মত অথবা দৃষ্টি লইয়া বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দেয় না। শেষ সত্য পাইয়াছি ইহা এক হোমিওপ্যাথ ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। সুতরাং বারীনদা যদি এতকাল পরে বিবাহের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে বাঙালী-জাতির সর্বনাশ হইল বলিয়া মনে হয় না।
>
> বাঙালী হইয়া বিবাহ করিল না—এটা অসাধারণত্ব। এইজন্য কেবলমাত্র বিবাহ না করিলেই অনেকে অবিবাহিত লোকটিকে অসাধারণ লোক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। অনেক সময় পাঁচ-জনের মুখে এইরূপ আত্মানবতার স্তুতি শুনিয়া শ্রবণকারীর ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যায়। বোমার বারীনদা বীমায় ঢুকিবার পরেও কোনো কোনো কৌতূহলী লোকের মনে এরূপ ধারণা থাকা অসম্ভব ছিল না যে, তিনি হয়তো একদা কোনো বীমা কোম্পানির ডিরেক্টর বা অ্যাকচুয়ারিকে হত্যা করিয়া আবার আন্দামান যাইবেন। কিন্তু এই বিবাহ হইবার পর তাহাদের সে আশা চূর্ণ হইল।...
>
> লোককে যখন নির্দিষ্ট কোনো একটি আশা দ্বারা উস্কাইয়া তোলা হয়—তখন তাহারা ভাবে না যে, যিনি আশা দিলেন তিনি মানুষ। অদ্যকার যে লোকটি আশা দিলেন—আগামীকল্য তিনি আর সে লোকটি থাকিবেন না। এইটুকু ভুলিয়া যাওয়াতেই যত অনর্থ। বারীন্দ্র-কুমার সম্বন্ধে দেশ আর কি আশা করিতে-ছিল? ভদ্রলোক জীবনে একবার দেশের জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন—তাহার পর বুঝিয়াছেন তাহাদের সেই পথ ভারত উদ্ধারের পথ নহে। পথ হউক অপথ হউক যৌবনের প্রথম আগুন এই পথেই তিনি জ্বালাইয়া নিজেকে ভস্মে পরিণত করিয়াছেন। এখন যদি তিনি সাধারণ লোকের মতো বিবাহ ইত্যাদি করিয়া সংসার পাতিতে চাহেন তাহাতে নিন্দার কিছু নাই।...
>
> (অগ্রহায়ণ ১৩৪০)

বারীন্দ্রকুমার এ সময়ে আমার অপরিচিত আগেই বলেছি। তাই তাঁর বিষয়ে তখন যা বলেছি তা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য না হতেও পারে কিন্তু তাঁর বিবাহ করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা এ বিশ্বাস আমার তখনো ছিল—এখনো আছে, এবং

হিমালয়ের নানা তীর্থ

সচিত্র, ম্যাপসহ

১। ছয় কেদার, সাত বদ্রী — শ্রীমতী বিজলী গাঙ্গুলী — ৭৲

২। দুইবার শ্রীকৈলাশ দর্শন — যতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী — ৭৲

ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট পাবলিশার্স

১১, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা—২৬

তিনি যে লোকে কি বলবে' সে কথা না ভেবে নিজের বুদ্ধিমতে চলেছিলেন এজন্য তিনি আমার শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। উপরে যেটুকু উদ্ধৃত করেছি তা আংশিক, দুটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছি। মনে রাখতে হবে ঐ লিখনটি আজ (১৯৭০) থেকে ৩৭ বছর আগে লেখা। বারীন্দ্রকুমারের শেষ জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই আমার মনে একটা বেদনার ছবি এঁকে দিয়েছে। আত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েও শেষ পর্যন্ত অভাবই তাঁকে দীর্ঘজীবী হতে দেয়নি।

বারীন্দ্রকুমারের মৃত্যু ঘটল ১৯৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল। তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় ১৭ই মে ১৯৫৯। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ নিজে এসেছিলেন চিঠি দিতে। দেখা হয়নি। খামে লিখে গিয়েছিলেন

I missed you by some minutes
Lotika Ghose 11.5.59.

লতিকা ঘোষের অনেক অনুরোধ আমি পালন করেছি, এটি পারিনি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিমাতা হেমলতা দেবী। তাঁর দুখানা চিঠি রয়েছে আমার সংগ্রহে। অন্যত্র অন্য উপলক্ষে এ চিঠি দুখানা ছাপা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তার পিছনের স্মৃতি, এবং ব্যাখ্যা অন্য।

হেমলতা ঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩০-এর পর থেকেই। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিকে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি এর কাছাকাছি সময়। হেমলতা দেবী ছিলেন তার সম্পাদিকা। পরিচয় শুধু সেই সূত্রেই নয়। কিন্তু সে কথা অবান্তর। ১৯৩৯ সনে আমার ভগিনী মঞ্জুর বিবাহ (সরোজ আচার্যের সঙ্গে) উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে একবার এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম।।

১৯৩৮ সনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে কথাসাহিত্য বিভাগের সভানেত্রীরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর দুখানা চিঠি এই সম্পর্কেই। কিন্তু সে কথা বলার আগে ১৯৩৩ সনের একটি ঘটনায় ফিরে যাই। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন একটি পরামর্শের জন্য। তাঁর ইচ্ছা প্রতি বৎসর তিনি বাছাই করা একজন কথাশিল্পীকে একটি নগদ টাকার পুরস্কার দেবেন। কিন্তু কিভাবে একটি বিচারকমণ্ডলী গঠন করা যায় সেই বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি যেদিন তাঁর কাছে যাব সেদিন সজনীকান্ত দাসকেও আমার সঙ্গে যেতে বললাম। সজনীকান্তও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

১৯৩৩ সনের এক শীতের সকাল। তারিখটি মনে নেই। ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বিখ্যাত বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে আমার সামান্য কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯২৩ সনে একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি ফোটোগ্রাফ তুলতে গিয়েছিলাম ঐ বাড়ির দোতলার পশ্চিমের বারান্দায়। এই সময়ের কিছু আগে ঐ ৬ নম্বরের বাড়ির নিচের একটি ঘরে বাস করেছি। ১৯২৭ (?) ঐ বাড়িতে নটীর পূজা অভিনয় দেখেছি। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সনের মধ্যে চারবার ব্যক্তিগত কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছি। ১৯৩৬ সনে তাঁর গদ্যকাব্যের আবৃত্তি সভায় যোগ দিয়েছি ৬।১ নম্বর বাড়িতে। এবং এই সময় বাসব ঠাকুরের আহ্বানে তার ঘরে বসে তার কয়েকটি নতুন লেখা কবিতা শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য পাঠের দিন একটি অতি কৌতুককর ঘটনার কথা বলি। ৬।১ নম্বর বাড়ি—সেখানে পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা অফিস হয়েছে, সে বাড়ির দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি খুব প্রশস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন গদ্যকাব্য পাঠ করে শোনাবেন নিমন্ত্রিতদের কাছে। সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী ও আমি যথাসময়ে গিয়েছি সেখানে। সিঁড়িটি জুতোয় ভরতি। পাঠ শেষে যখন নিচে নামছি তখন সজনীকান্তের নজরে পড়ল প্রকাণ্ড একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটির উপর। তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল এ জুতো রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। সজনীকান্ত বললেন এ জুতো সরাতে হবে। তাঁর নিজ মুখে আগে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসও তিনি কিছু কিছু হস্তগত করেছেন। তার মধ্যে তাঁর নিজ-হাতে মার্জিনে মন্তব্য লেখা বইও আছে। বইখানা কার লেখা এখন আর আমার মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত যে-কোনো জিনিস ভবিষ্যতে বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠবে এ বোধ সজনীকান্তের একটু তীব্র রকমেরই ছিল। শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে দেওয়া কয়েকটি জিনিসও সজনীকান্ত তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, এবং পরে রবীন্দ্রনাথ তা জানতে পেয়ে হেমন্তবালা দেবীর উপরে কিছু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। সে সব কথা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র(৯)তে ছাপা আছে। (যে সব চিঠিতে এর উল্লেখ আছে ছাপার সময় তা থেকে সজনীকান্তের নাম অবশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে।)

সম্প্রতি প্রকাশিত

নূতন সংস্করণ

কালের যাত্রা

পরিবর্ধিত সংস্করণে 'রথের রশি'র প্রাক্-রূপ "রথযাত্রা" নাটিকা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাবিংশ খণ্ডের পরিশিষ্ট থেকে সংকলিত। 'রথের রশি' নাটিকাটি 'রথযাত্রা'রই পরিবর্তিত ও আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত রূপ। মূল্য ২·০০

মহুয়া ॥	৪·০০	পুনশ্চ ॥	৪·০০
শ্যামলী ॥	৩·০০	সেঁজুতি ॥	১·৫০
চৈতালি ॥	২·০০	উৎসর্গ ॥	২·৫০

কড়ি ও কোমল ॥ ৩·০০

উল্লিখিত সাতখানি কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থপরিচয় নূতন সংযোজিত।

গ্রন্থপরিচয়ে কবিতার পাঠান্তর, যে-সকল সাময়িকপত্রে কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশিত তার যথাসম্ভব সংগৃহীত পৃষ্ঠাঙ্ক-সহ তালিকা এবং কবিতাগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও প্রণিধানযোগ্য অন্যান্য তথ্য ও রচনা, রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের আগ্রহ তৃপ্ত করবার জন্য সংকলিত।

বিশ্বভারতী

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

অতএব রবীন্দ্রনাথের চটি সজনীকান্তের সংগ্রহকে আরো মূল্যবান করবে এই আশায় তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া সরাবার উপক্রম করতেই শিল্পী (শান্তিনিকেতনের) দীর্ঘকায় দীর্ঘপদী হরিপদ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার চটি কোথায়? সজনীকান্ত তাড়াতাড়ি কাগজের ভিতর থেকে চটিজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, এ চটি কার—হরিপদদার নাকি? পরে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল।

সজনীকান্ত ও আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। কে যে আমাদের পথ দেখিয়ে সেই লোলক ধাঁধার পথে হেমলতা দেবীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। তবে সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ হয়েছিল এবং কথাশিল্পীরা যে আমাদের দেশে অধিকাংশই গরিব সে সব কথা আলোচনার পরে পুরস্কারের কথা পাড়লেন। তিনি বললেন, তিনি শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্প বা উপন্যাস লেখককে বছরে যে পুরস্কার দিতে চান তার মূল্য একশত টাকা।

অঙ্কের পরিমাণ শুনে দমে গেলাম: অথচ সে যুগে একশত টাকা খুব কম ছিল না। টাকার দাম তখন কেমন ছিল অন্যভাবে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। ঐ টাকায় তখন খুব ভাল চাল পাওয়া যেত ৬০০ সের। অথবা মিলের ধুতি কেনা যেত মাঝারি ধরনের ৫০ জোড়া। রুই মাছ পাওয়া যেত ২০০ সের। এবং এই সময় সজনীকান্ত দাস মাসে ২০০ টাকা বেতনে বঙ্গশ্রী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়াতে বন্ধুমহলে উৎসব আরম্ভ হয়েছিল। এত বড় চাকরি সহজে কারো ভাগ্যে মেলে না! সেই বাজারে একশত টাকা পুরস্কারের কথা শুনে যে দমে গিয়েছিলাম (যাঁরা এই পুরস্কার পেতেন, তাঁদের মনোভাব যাচাই না করেই) সে অন্য কারণে। আমরা জানতাম হেমলতা দেবীর অনেক টাকা আছে। এবং পথে আমরা অনুমান করেছিলাম অন্তত পাঁচশত টাকা অবশ্যই তিনি দিতে চাইবেন। কিন্তু আমরা যেমন দমে গেলাম, তিনিও তেমনি। বাংলা সাহিত্যের জন্য প্রথম পুরস্কার ঘোষণার ঐতিহ্য গড়ে ওঠার নিজেদের অদিম্যবাকারিতার জন্যই বাধা দিলাম। পুরস্কার প্রথা সর্বপ্রথম প্রচলিত করেন হেমেন্দ্র বসু, কুন্তলীন পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তা ছিল অন্য জাতের। গল্পের জন্য পুরস্কার, এবং সে গল্পে কৌশলে কুন্তলীন তেলের নাম ব্যবহার করতে হবে। জগদীশচন্দ্র বসুও ২০ টাকার কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন, একটি গল্প লিখে। লম্বা বই, যতদূর মনে পড়ে খাড় গোলাপী কালীতে কুন্তলীন প্রেসে ভারী সুন্দর ছাপা, বাল্যকালে পড়েছি। হেমলতা দেবীর পুরস্কারই হত আসল সাহিত্য পুরস্কার।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনীর (১৯০৮) ভাষণ প্রস্তুতে সাহায্য করার জন্য হেমলতা দেবীর দুখানা চিঠির উল্লেখ করেছি, তার প্রথমখানি এই—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি,
৬০-বি মির্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪-১-০৮

কল্যাণীয় পরিমল,

"তোমাদের মুখে তুমি আমাকে কথা-সাহিত্যে অভিভাষণ সম্বন্ধে সাহায্য করবে জেনে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে যে তথ্য দেবে তা কত মূল্যবান ও সুচিন্তিত হবে। একেই তো এ রকম একটি অভিভাষণ লিখতে গেলে অনেক জানা থাকা দরকার, তা ছাড়া ভাবতেও হবে অনেকখানি। এ সব করতে আমার একেবারেই সময় অভাব। আপাতত তুমি বই ঘেঁটে কথা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটি আমাকে ধরিয়ে দেবে, শেষে নিজের ভাষায় সেটি গেঁথে নেব। নানা কাজে আমি এত ব্যস্ত যে বেশি সময় এর জন্য দিতে পারছি না, অতএব তুমি অভিভাষণটি এক রকম তৈরি করেই দেবে আমি নিজের ভাষায় গুছিয়ে নেব মাত্র। এ কাজে তোমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে, তোমার সময়ের ও পরিশ্রমের মূল্য আমি জানি। সামান্য কিছু সাহায্য সেজন্য আমি তোমাকে তারাদাস মারফৎ পাঠালাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে লেখাটুকু পেতে পারব তো? আমাকে আবার গুছিয়ে ভাষায় বসিয়ে নিতে সময় দিতে হবে। ইতি বড়মা

"পুঃ পাঁচটি টাকা পাঠালুম।—বড়মা"

এবারে আট-দশ দিনের পরিশ্রম সার্থক মনে হল। টাকা একেবারেই আশা করিনি। ঐ টাকায় এক মাসের চাল (চল্লিশ সের, চার টাকা) ও দুদিনের বাজার হল (আট আনা +আট আনা।) সাহিত্য কর্মের জন্য বার্ষিক একশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, তখন তা মনঃপুত না হওয়াতে যে ভুল করেছিলাম, এবারে আর সে ভুল করিনি।

পত্র ও টাকা বাহক তারাদাস—তারাদাস মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের মানুষ। তখন বয়স সম্ভবত ২৫ বছর—ছদ্মনাম ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়।

হেমলতা ঠাকুরের দ্বিতীয় চিঠি—

ওঁ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
জোড়াসাঁকো, ৩।২।১৯০৮

কল্যাণীয় পরিমল,

কাল তোমার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি এবং তোমার নির্দেশ মত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে দিলুম। কাকামহাশয় (রবীন্দ্রনাথ) পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন এই সব প্রবন্ধে ব্যক্তিগতভাবে নাম উল্লেখ করতে। তাই উল্লেখ করতে সাহস পাই নাই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান সম্মিলনীর জন্য যে অভিভাষণ লিখেছেন, তাতে একজনেরও নাম উল্লেখ করেন নাই বা বলবার সব সাধারণভাবে বলেছেন, আমার প্রবন্ধটা একবার কাকামহাশয়কে দেখিয়ে আনার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি যা বলেন তাই করি।

আমি যে এ সব বিষয়ে অনেকটা অনাড়ি সবাই তা জানে, তবে তাই বলে যা তা লিখতে হবে তা হতে পারে না। কেউ জানে না দিলেও মনে গ্রহণ না করলেও আমাকে অবশ্য সাবধান হতেই হবে।

তোমার Suggestions পেয়ে কাজ খানিক ২ বদলেছি এবং তাতে ভাল হয়েছে। কাকামহাশয় পছন্দ করেন না অনেক নাম উল্লেখ করা তাই করতে সাহস করলুম না তবে তাঁরা যে প্রতিভাশালী সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি।

তুমি যে আমার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। —বড়মা

এ চিঠি পাবার কিছু দিনের মধ্যে হেমলতা ঠাকুর আমাকে ঐ তারাদাস মুখোপাধ্যায়ের হাতে একটি ব্ল্যাক বার্ড ফাউন্টেন পেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নীল রঙের কলমটার কথা আজও ভুলিনি। কাজ করিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে কিছু দেওয়া কর্তব্য এ বোধ যাঁরই আছে, তাঁর প্রতিই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি। হেমলতা ঠাকুরের জন্য সামান্য কাজ করার বিনিময়ে আমি কিছু যে আশা করিনি, একথা আগে বলেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রায় অনুরূপ ঘটনার কথা মনে এলো। এ ক্ষেত্রেও এক মহিলা। এবং তিনিও ধনী। উপরন্তু তিনি ধনী পিতার সন্তান। পিতা, স্যার তারকনাথ পালিত, স্বামী ভাগলপুরের বিখ্যাত জমিদার দীপনারায়ণ সিং। এঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন লেখক এনজিনিয়ার কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দীপনারায়ণ সিং অল্প দিন হল মারা গিয়েছেন, লীলা সিং তখন শোকসন্তপ্ত বিধবা।

আলাপের পরে লীলা সিংএর ইচ্ছা হল আমি তাঁর স্বামীর বিষয়ে বাংলায় একটা প্রবন্ধ লিখি। লেখার জন্য প্রয়োজন খবরের কাগজের কিছু কিছু কাটিং পেলাম। এবং আমার অনুরোধে তিনি দীপনারায়ণের পড়বার ঘর, বিশ্রাম ঘর এবং তাঁদের প্রাসাদের পরিবেশটি ঘুরে ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে প্রায় সর্বদা বিশ্বভ্রমণরত দীপনারায়ণের মনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল—যতদূর মনে পড়ে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ছন্দদূত নামক সাপ্তাহিকে। তার কোনো কপি আমার নেই। আমার সেই লেখা পাঠের পর লীলা সিং আমাকে ভাগলপুর থেকে এই চিঠিখানা লেখেন।

much has been written about him since his death but nothing I have read has really moved me as greatly as your article.

এ রকম একখানা চিঠি পেয়ে মনটা স্বভাবতই স্ফীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই স্ফীতির কেন্দ্রে কি পাঁচ টাকার একখানা চেক পাব এমন দুরাশা লুকিয়ে ছিল? এখন আর তা স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে সত্যই যদি পেতাম, তা হলে অবশ্যই আশা করতে থাকতাম যে এবারে হায়দারাবাদের নিজামের বিষয়ে কিছু লেখার আদেশ পাব।

হেমলতা প্রসঙ্গ শেষ করতে শান্তিনিকেতনের কথায় ফিরে যাচ্ছি। ১৯২১ সনে সেখানে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়। অল্প দিনের পরিচয়ে

অথচ কি এক মধুর স্মৃতি অর্ধশতক কাল পার হয়ে আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কোনো উপকার পাওয়ার স্মৃতি নয়, স্বার্থের স্মৃতি নয়। সে যে কি তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে না, শুধু একটা চরিত্র মাধুর্যের স্মৃতি মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই দীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছর পরে যখন আমি মাসিক বসুমতীতে স্মৃতিচিত্রণ নামক স্মৃতির ছবি আঁকতে শুরু করি, তখন নিত্যানন্দবিনোদের কথা মনের মধ্যে একটা আনন্দের আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। একটি কথা লিখেছিলাম এই যে তাঁর স্বতন্ত্রশীর্ষ আমার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর নীডলের কাজ করছে। যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর ছাঁটা দাড়ি ঠিক একটা পিনের আগার মতো নিচের দিকে ঝুলে ছিল। এই স্মৃতিকথা নিত্যানন্দবিনোদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, এবং সেটি পড়ার পর তিনি ২১-৪-৫৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে যে চিঠিখানি লেখেন তা এই—

"সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন, এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই একটু চমকাবেন। মাসিক বসুমতী যখন মাঝে মাঝে হাতে এসে পড়তো তখন আপনার স্মৃতিচিত্রণ পড়বার সুযোগ হতো। সম্প্রতি আমাদের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে অখণ্ড স্মৃতিচিত্রণ [গ্রন্থ]খানি নিয়ে অখণ্ড আনন্দ করলাম। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। বইখানির বরুণরে ছাপাতে সমস্তটা সৌন্দর্য পরিমলেই মনোরম হয়েছে। ঘটনার বৈশিষ্ট্য, নানা মানুষের আনাগোনা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সবাই চিত্রের মতোই চোখে ভেসে ওঠে। অথচ যাঁর স্মৃতিচিত্র তিনি কিন্তু 'পার্মানেন্ট' হবার চেষ্টা করেননি এইটেই খুব ভাল লাগল। আমি এখনো ধরাধামে বিরাজমান আছি। শরীর খুবই ভেঙে পড়েছে। আমার যে 'স্বতন্ত্রশীর্ষ' আপনার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর (স্টীলের) নীডলের কাজ করেছে, আজ তা এলুমিনিয়ামের (শুভ্র) নীডলত্বপ্রাপ্ত। আপনার চিত্রণের একপাশে চিহ্নিত হয়ে গেছি, এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নিশ্চয়ই চেহারাতে বদল হয়েছে, পথেঘাটে ট্রামেবাসে পরস্পরকে আর চিনে উঠতে পারব না।—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।"

যে স্নিগ্ধ সহৃদয়তা নিত্যানন্দবিনোদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তার প্রমাণ এই চিঠিখানাও বহন করছে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন — 'দেশিকোত্তম'। এই সংবাদ পাবার পর আমি নিত্যানন্দবিনোদকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি লিখলেন—ঠিকানা হাসপাতালের।

P. M. Hospital
Santiniketan
30.12.65

...মস্তকেরের মাথার তাজ, সাজের দিক না লাজের বিষয়।...আজ চার বছরের অধিককাল স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে অচল অবস্থায় শেষ শয্যায় বিকল মতো শায়িত আছি, হাত-পা সব কাজে জবাব দিয়েছে। সুতরাং আমার অবস্থা অনুমানযোগ্য। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় হুইল চেয়ার বাহনে মঞ্চের কাছে যেতে হয়েছিল।...এইবার বাহাত্তরে ধরল। সুতরাং বয়েসের রস নেই যশও নেই, এখন এক পা ওপারের কাদাতে এক পা এপারের ঝুঁমতে আটকে দাঁড়িয়ে আছি। সময় একটা পা তুললেই হবে।... শুয়ে-শুয়ে লিখলাম পড়তে কষ্ট হলে ক্ষমা করবেন।—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

আজ তাঁর সম্পর্কে লিখছি, সে, ১৯৭০-এ। আজ আমিও শুয়ে-শুয়ে লিখছি। পায়ের কথা বলব না। হাত আমার অনেক, সেই সব হাত দিয়ে অনেক জিনিস আঁকড়ে ধরে আছি। কেউ যদি ছাড়িয়ে নেয়, নেবে, তা নিয়ে ভাবি না।

বাসব ঠাকুরের কথা বলেছি আগে। ১৯০৩ কিম্বা ০৪ সনে তার ঘরে বসে কবিতা শুনেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। তারপর সে ১৯০৬ সনে বিলেত যায়। ছিল কবি, হয়ে এলো রয়াল অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী। মাঝখানে যুদ্ধের কাজে সে লণ্ডনে এ-আর-পিতে যোগ দিয়ে ভ্যান ড্রাইভার হয়েছিল। তার বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে, এবং কৌতুক অনুভব করি ভাবতে গেলেই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়-তৃতীয় দুটি পুত্রই শিল্পীরূপে খ্যাতি লাভ করেছে সুভো ও বাসব। বাসব চমৎকার আলাপী, ইংরেজী বা বাংলায় মনোগ্রাহী কথা বলে যেতে পারে, কিন্তু কিছু লিখতে হলে বানান বিষয়ে ভয়ানক রকমের দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তবু তাকে দিয়ে নানা বিষয়ে লিখিয়েছি, এবং অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়েছে। তার বিবাহ হয় ১৯৫৮তে। শ্রীমতী স্মৃতি খুব সুন্দর ছোটো আলোচনা মেয়েদের বিভাগে অনেকগুলি লিখেছে। কিন্তু বাসব যেদিন স্মৃতির লেখা প্রথম আমাকে দেয়, সে-লেখার লেখিকার নাম ছিল না। আমি বললাম, নাম লিখে দাও তুমিই। কিন্তু এ অনুরোধ তার কাছে বিভীষিকাবৎ বোধ হতে লাগল। স্ত্রীর নাম স্মৃতি না সৃতি কিছুতে মনে পড়ে না। আমি বললাম দুটোতেই মানে হয়, অতএব তার কাছ থেকে শুনে আমাকে পরে দিন জানাবে। বিবাহের দু-এক বছরের মধ্যেই স্ত্রীর নাম বিস্মৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সহজে চোখে পড়ে না। আসলে বানানটাই ছিল তার কাছে সমস্যা।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্বন্ধে ওই জাতীয় একটি গল্প প্রচলিত আছে বটে। কাশীতে সীতা অভিনয় কালে হঠাৎ স্টেজে তাঁর ভুল হয়ে গেল, তিনি রাম না লক্ষ্মণ-শরীর। কৌশলে প্রম্পটারের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রম্পটার বিপদে পড়ে গেল। বলল, ভিতরে মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি।

সংস্কৃতি সিরিজ

রবীন্দ্র চিত্রকলা ॥
রবীন্দ্রনাথের বহু চিত্রের প্রতিলিপি সম্বলিত।
রবীন্দ্র চিত্রের মর্ম উপলব্ধি করার বই। [১৫.০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ॥
উক্ত বিষয়ে একটি সুলিখিত বই। [১০.০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা ॥
দ্বারকানাথ, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধকদের কথা। [১২.০০]

উপনিষদের দর্শন ॥
বিষয়টি সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত। [৭.০০]

রবীন্দ্র দর্শন ॥
রবীন্দ্র উপলব্ধির অনন্য বই। [২.৫০]

বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া ॥
উক্ত বিষয়ে একমাত্র বই। [১০.০০]

বৈষ্ণব পদাবলী ॥
বৈষ্ণব পদাবলীর প্রামাণ্য একমাত্র আকর গ্রন্থ। [২৫.০০]

বাঁকুড়ার মন্দির ॥
শুধু বাঙলার মন্দিরশিল্প পরিচয়।
বহু আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ। [৩৫.০০]

কালিকট থেকে পলাশী ॥
পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। [৬.৫০]

উদ্বাস্তু ॥
উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান-প্রচেষ্টার তথ্যাদি। [৩০.০০]

সা হি ত্য সং স দ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯

সমুদ্র ॥ দিব্যেন্দু পালিত

আমিও পেরিয়ে আসি স্মৃতিলগ্ন সেই বালিয়াড়ি;
দ্রুত দৌড়ের টানে পায়ের গভীর ক্ষত
রয়ে যাবে ভাবি না কখনো—
সমস্ত স্টেশনে আজও চলে ট্রেন, সবুজ পতাকা
আজন্ম বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে গেছে—বহুদূর—যায়নি কখনো
বালিতে ক্ষতের চিহ্ন, কুমারীর ভাঙা শাখা
পড়ে আছে অল্প ব্যবধানে,
প্রসব-যন্ত্রণা থেকে বের হয়ে জননীর নাভি
অনন্ত শূন্যের ভারে নুয়ে পড়ে আশ্রয় যেদিকে...!

একেকটি ঢেউ আসে, সমুদ্র সমূহ কেড়ে নেয়

প্রতিশ্রুতি রাখো ॥ কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রতিশ্রুতি রাখো ওই পাহাড়ের উপর, ওই রৌদ্রে,
ওই পাইনগাছগুলির পাশে দীর্ঘ ছায়ায়।

শৈশবের শুদ্ধতা রয়েছে এখানে, এখানে একটি শিশু
আকাশ দেখতে-দেখতে বড়ো হয়,
রৌদ্র নিয়ে খেলা করে সারাদিন।

এখানে কোনো নগ্নতা এনো না।
তার মধ্যজীবনে যখন তীব্র মাদার-ফুল
উড়ে পড়বে রৌদ্রে, অন্তলীন
শান্ত বিকেলবেলায়, তখন প্রতিশ্রুতি রেখো।

আমি ওই পাহাড়ের উপর আর কোনোদিন যাবো না,
সে শুধু থাকবে
একা, অন্তরাগে

পাইনগাছগুলি সারাদিন ছায়া ফেলে রেখে সন্ধ্যাবেলা
গুটিয়ে নেয়
পাইনগাছগুলি সূর্যের কাছ থেকে পরিণতি শিখে নিয়ে ছড়ায়
তুষার-দিন, হাওয়া, হিম-হাওয়া

তার পাশে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখো,
কোনো নগ্নতা এনো না।

॥ কে রয়েছে মনে হয় ॥

শুভ মুখোপাধ্যায়

এ ঘরে মানুষ জাগে
তিমির প্রহরে
শেষ রাখী হাতে
অবন ঠাকুরের বুকে রাখা
সেদিনের সুবর্ণিকায়
কারো ঘুম ভাঙে
একে একে জন্মদিনকে মনে পড়ে যায়
সে যে তোমার জন্যে
বার বার
ফিরে ফিরে দুঃখ জেলে রাখে

এ ঘরে মানুষ জাগে।

গোধূলি

মিহির আচার্য

সমস্ত সম্পর্কের দাগগুলো নির্দয় হাতে মুছে নিয়ে অনিলা চলে যাওয়ার পর পরমেশের দিনরাতগুলো শূন্য, বিবর্ণ হয়ে গেল। অনিলা ছিল, দীর্ঘদিনের পরিচয়ে অস্তিত্বের একটা বস্তুগত বোধ ছিল পরমেশের চেতনায়। নিজের বেঁচে-থাকাটাও অপরের স্বীকৃতির নাগালে না-থাকলে অর্থরিক্ত হয়ে পড়ে। হাতের থাবায় উদ্গত হাইটাকে বাধা দিয়ে পরমেশ পুনরপি ভাবল : আশ্চর্য, অনিলা নেই। এবং পরমেশের অস্তিত্বজ্ঞাপক সংজ্ঞাটুকুকেও মুছে নিয়ে গেছে। একুশ শীতগ্রীষ্ম-বসন্তের মেয়েটার তূণে এত শক্তি ছিল! ছিল। নাহলে চৌত্রিশ বছরের পোড়খাওয়া, কর্মক্ষিপ্তকালের এক বহুদর্শী যুবক পরমেশ, তার এই নিঃস্ব ফতুর অবস্থা কেন! পরমেশের পৃথিবী কিমাল, চাকরি, বন্ধুবান্ধব, খেলা-রাজনীতি এবং কেতাব-পঠন, আহ্, তাবৎ জগতটার ওপরই কালি ঢেলে অনিলা লেপেপুঁছে একাকার করে নিল। তার অর্থ কী এই : অনিলার বিদায়ের সঙ্গে অন্য জগতটাও অন্তর্হিত হয়েছে। কিংবা, উলটো করে ভাবলে, অনিলা স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বলেই বাইরের দুনিয়াটা অটুট ছিল! কেন এমন হল? অনিলা তাকে সর্বরিক্ত করে দেবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল। যেমন করে পথিক রাত্রির আস্তরটাকে লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়। অনিলা যতদিন ছিল পরমেশ কী তার দাম বোঝেনি? পরমেশ কী তাকে নিস্পৃহ উদাসীনতায় দিন দিন হতাশ করেছে? একুশ বছরের সমস্ত ওর রক্ত মাংস হিংসা লোভ-সমেত লোলুপ শরীরটা...। আহ্, পরমেশ কী বিশেষভাবে শুধু হৃত্ত চাইল এই আশ্লেষে? বৈদেশ? পরমেশ চোখ মিলল সেই শেষদিন অনিলা যেন অন্যমনস্ক ছিল, উন্মন কিছু চিন্তা করছিল। অনিলা চিন্তা করে? ওর চিন্তার চেহারাটা ভাববার চেষ্টা করল পরমেশ।

সেদিন আলো-মরা বিকেলে ঘর্মসিক্ত, ক্লান্ত, অনিলা এসে দাঁড়াল দরজায়, দরোজার ফ্রেমে ওর পরিপাটি শরীরটা কিছুক্ষণ মধ্যবর্তিতায় ঝাড়ের মতো দুলতে লাগল, চোখের তারা ঘূর্ণমান, ঠোঁট কাঁপছে :

'আমি চলে যাচ্ছি।' ধ্রুব মৃত্যুর মতো ঘোষণা করল অনিলা।

পরমেশ ব্যাপারটাকে বুঝতে না বলেই বুঝতে চাইল না। কিন্তু এইরকম : আজ সবাই সব কিছু বোঝে, তবু তাকে স্বীকার না-করাই ভালো। কারণ তাহলে অন্যের সঙ্গে বাঁচার সেতুটা ভেঙে যায়। মানুষ একা হয়ে পড়ে।

পরমেশ একটু থেমে বলল : 'এ কথাটা বলবার জন্যে কী এতদূর আসার দরকার ছিল?'

অনিলা বলল : 'আমি নাটক করতে চাইনে।'

'নাটক!'

'হ্যাঁ, সহজভাবে বিদায় নিয়ে যেতে চাই।'

পরমেশ বলল : 'তার কোনো দরকার ছিল না।'

অনিলা হাসল। 'মানুষের তো ঐ জিনিসটারই যা দরকার আছে। প্রয়োজনগুলো আমরা বানাই।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বাঁচতে গেলে বানাতে হয়।'

'এতদিনের এই সম্পর্কের কনসেপটাও তাহলে বানানো ছিল?'

'সেটা তোমার থেকে আর কে বেশি জানে।'

পরমেশ দৃঢ়স্বরে বলল : 'না, আমি জানিনে।'

অনিলা বলল : 'তোমার কাছ থেকে এম. এ-র নোটগুলো আদায় করার জন্যেই আমাদের আলাপ। তোমার ওগুলো না পেলে আমি হাই সেকেণ্ড ক্লাশ কিছুতেই পেতাম না।'

পরমেশ বাধা দিয়ে বলল : 'আমার নোটে তুমি পেলে সেকেণ্ড ক্লাশ। আর আমি থার্ড ক্লাশ।'

অনিলা বলল : 'সেটা তোমার অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার ফল।'

পরমেশ বলল : 'তবুও তোমার কৌমার্যের জন্যেই আমার প্রয়োজন ছিল। আর কিছু নয়? ময়দানের সন্ধ্যাগুলো, রেস্তোরাঁর পর্দাটানা কেবিনগুলো, এই ঘরের চারদেয়ালের সান্নিধ্যগুলো?'

'অন্যের কাছে সুবিধে নিতে গেলে কিছু প্রশ্রয় দিতেই হয়।'

'প্রশ্রয় ?'

'হ্যাঁ। নাহলে কারবারি চেহারাটা বড় স্পষ্ট হয়ে পড়ে।'

পরমেশ বলল : 'এই বয়সে তোমার এত হিসেবী বুদ্ধি, অবাক হতে হয়।'

অনিলা বলল : 'হিসেব না-করলে আমরা কবে ভেসে যেতাম।'

নিশ্বাস ফেলে পরমেশ বলল : 'আমি কোনো হিসেব করিনি।'

'কারণ তোমার হিসেব না-করলেও চলে। তোমরা জানো সংসারটা একান্ত তোমাদেরই। আর সবকিছু তোমাদের আবর্তে মুখ বুজে ঘুরবে। অনিলা বলে মেয়েটির আলাদা কোনো সংজ্ঞা নেই তোমার চেতনায়। কোনোদিন ছিল না। একজন যুবতী একজন পুরুষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, এটা কোনো ঘটনাই নয়।'

'তোমার গলায় অভিযোগের গন্ধ পাচ্ছি।'

'নাহ্, এমন বোকামি আমি দ্বিতীয়বার করব না।'

'দ্বিতীয়বার ?'

হ্যাঁ দুবারের বেশি কোনো মানুষেরই আর বোকামি করা উচিত নয়।'

পরমেশ ক্রুদ্ধ হল : 'প্রথম বোকামিটা কী আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কারণে ? আমাকে অবহেলা করতে পারো কিন্তু আহত করবার অধিকার তোমাকে দিইনি।'

অনিলা বলল : 'আমি দুঃখিত।'

পরমেশ বলল : 'আমাকে যদি বিশ্বাস করতে না পেরে থাকো তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

'তুমি নিজেকেই কী বিশ্বাস করো ?'

'মানে ?'

'না। এমনি বলছিলাম।'

'কাকে বিশ্বাস করো তুমি ?'

'কী জানি। মনে পড়ছে না।'

'চালাকি কোরো না। বলতেই হবে তোমাকে।'

'বলছি। আজ বলবার জন্যেই এসেছি।' অনিলা চেয়ার টেনে বসল : 'এই তিন বছর এই ঘরটা, এই তুমি-আমি, ঠিক এক জায়গায় আটকে আছি। তোমার ব্যবহার, তোমার চলাফেরা, কথাবার্তা মুখস্থের মতো হয়ে গেছে। আমি চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারি।'

'কী-রকম ?'

'এম. এ. পাশ করে আমি কলেজে কাজ পেলাম। আর তুমি থার্ড ক্লাশের অপবাদ ঘোচাবার জন্যে আরেকবার পরীক্ষা দিলে না।'

'আমি পারিনি।'

'পারোনি নয়, পারতে চাওনি। তুমি পুরুষ, তোমার একধরনের অহংকার...'

পরমেশ বলল : 'বেশ। অহংকারই হল। তোমার কী আসে-যায় ?'

অনিলা বলল : 'সেটা বুঝলে যে তোমার অহম্ খর্ব হয়।'

পরমেশ নির্বাক।

অনিলা বলল : 'তোমার নোট মুখস্থ করে আমি সেকেন্ড ক্লাশ আদায় করলাম। আর, তুমি রইলে থার্ড ক্লাশ। আমাকে আঙুল উঁচিয়ে সব সময় স্মরণ করিয়ে রাখা।'

পরমেশ আশ্চর্য হল।

অনিলা আবার বলল : 'আমাকে অধমর্ণ করে রেখে তুমি মহাজনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাও। তার মানে তুমি আমাকে কখনো তোমার সমান ভাবোনি, বন্ধু ভাবোনি। আর, দিনের পর দিন আমাকে এক হীনমন্যতার ন্যাজ করে রেখেছ। আমি আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করিনি, কুণ্ঠা-লজ্জা-সংকোচ-অপরাধের ভারে আমি ছোটো হয়ে গেছি। আমার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে দম-দেয়া পুতুলের মতো চলতে হয়েছে। যেন তোমার ইচ্ছাগুলোকে আমি বাধা না দিই। যেন তোমাকে বুঝতে না দিই 'আমি আছি—আমি আছি'...

পরমেশ বলল : 'হুম। এত জ্ঞানলাভের পরও তুমি সম্পর্ক রাখলে কী করে ?'

অনিলা টেবিলের বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল : 'কী জানি, বোধহয় পুরনো অভ্যেসের দাস হয়ে পড়েছিলাম।'

'অভ্যেস !'

'আমরা অজানতে কখন একটা অভ্যেসের পৌনঃপুনিকতায় লীন হয়ে পড়ি। এক সময় আমাদের জীবনবোধটাও অভ্যেসের সমষ্টি হয়ে পড়ে। এই অভ্যেসের পিছনে নিজস্ব কোনো চেষ্টা নেই, পুরনো জুতো পায়ে গলাবার মতো....'

'আহ্।'

'তারপর এই অভ্যেসের কারাগারে আমরা স্বেচ্ছায় বন্দী হই, বন্দিত্বের অপরাধবোধগুলো ভোলবার জন্যে অভ্যেসগুলোকে ভালোবেসে ফেলি।'

পরমেশ রুক্ষ গলায় বলল : 'অভ্যেসের দাসত্ব যখন কাটাতে পেরেছ তখন আর কী, এবার তুমি মুক্ত, স্বাধীন। আমাদের জন্যে আর নাইবা ভাবলে, আমরা এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।'

অনিলা কথা বলল না, চুপ করে রইল।

পরমেশ আবার বলল : 'আমি জানি আমার কোনো উচ্চাকাংক্ষা নেই, আমি বড় স্বপ্ন দেখিনে, আমার মনের আধারটা ভীষণ ছোটো।'

অনিলা বলল : 'একথা বলে তো পার পাওয়া যায় না পরমেশ। আমি উচ্চাকাংক্ষার কথা তুলিনি, বড় স্বপ্নের কথাও নয়। না

ভয়েস অব্ আমেরিকার

বিশেষ বিবরণী

চন্দ্রাভিযানে

অ্যাপোলো

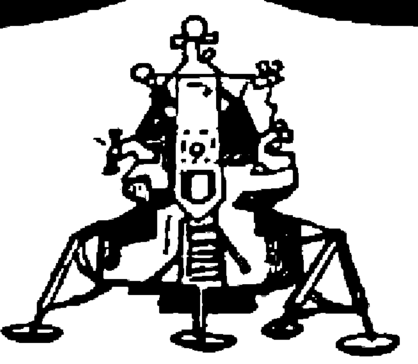

ইংরেজী ধারাবিবরণী

			মিটারব্যান্ড
জুলাই ৩১	চন্দ্রাবতরণ	৩:৩০- ৬:৩০ ভোর	১৯, ২৫,
"	চন্দ্র-ভ্রমণ	৬:৩০-১১:৪৫ রাত	৪১, ৪৯
আগস্ট ১	"	৬:৩০- ৯:০০ রাত	কিঃ হাঃ
আগস্ট ২	"	৬:৩০- ৭:০০ সন্ধ্যা	১৫২৮৫
	চন্দ্র থেকে যাত্রা	১০:৩০-১১:০০ রাত	১১৮৩৫
			৭১০৫
			৫৯৯৫

রাত ৯-৯:৩০ মিঃ নিয়মিত বাঙলা অনুষ্ঠানে বাঙলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

১৯, ২৫, ৩১ ও ১৯০ মিটারে।

নীল দিয়ে ওর জামাকাপড়ে ফুটে ওঠে সাদা সাদা ছোপ

এখন টিনোপাল® দিয়ে জামাকাপড় হয়ে উঠেছে— ধবধবে সাদা

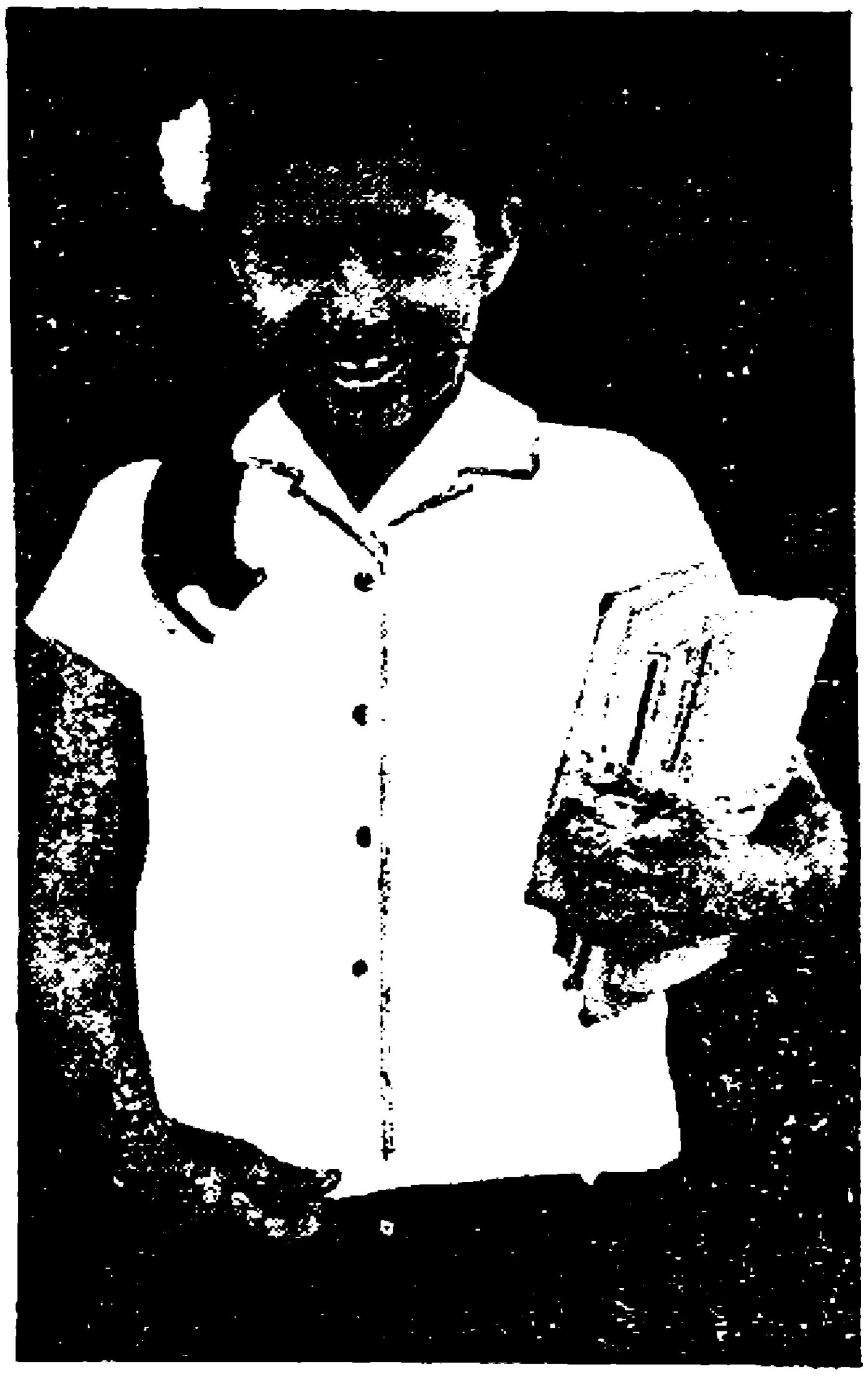

মেয়েটির মা—বুদ্ধিমতী নারী। তিনি বুঝতে পারলেন, নীল দেবাতে ওর মেয়ের জামাকাপড়ে দেখা যাচ্ছে শুধু সাদা সাদা ছোপ—আর সব জায়গায় লেগেছে নীলের দাগ। তাই তিনি নীল ছেড়ে টিনোপাল ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

এখন টিনোপাল তাঁর কাচা সাদা বাড়ীর সব জামাকাপড় ক'রে তোলে ধবধবে সাদা—নিখুঁত সাদা। শেষ ধোয়ার সময় মাত্র এক প্যাকেট ব্যবহার করলেই এক বালতি জামাকাপড় সাদা করা যায়।

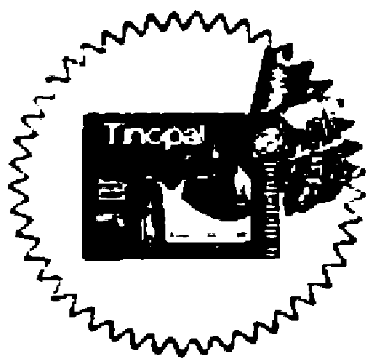

১৫ পয়সার এক প্যাকেটে—
বালতিভর্তি জামাকাপড় ধবধবে হয়ে ওঠে।

তাছাড়াও পাবেন :
রেগুলার প্যাক ও ইকনমি প্যাক

আজই টিনোপাল ব্যবহার করতে শুরু করুন।

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

® টিনোপাল—জে.আর. গাইগী এস.এ., বাস্‌ল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গাইগী লিঃ, পোঃ আঃ ১১০৫০, বোম্বাই-২০ বি.আর.

Shilpi HPMA 17A/71 ben

জন্য যৌবন আমি যৌবন, কোনোদিনই নয়।' একটু হেসে : 'কী জানো, আমরা কেউই রাজযোটক হয়ে জন্মাইনি। আমাদের যখন জ্ঞান বাড়ে, জন্ম পৃথিবীর সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন দ্বিতীয় একটি সত্তার [illegible] আদলটা তিল তিল করে নিজেই আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি। একে দ্বিতীয় জন্ম বলতে পারো। কাঁদা করে বলতে গেলে প্রত্যেকের [illegible] যেমন পদ্মের [illegible]। হ্যাঁ মানুষই এটা পারে, চেষ্টা করে। নিজের জন্যে নয়, আরেকজনের জন্যে। যাকে সে ভালোবাসবে, যাকে সে স্নেহ করবে, আদর করবে। তা নাহলে থাকে জীবনের সঙ্গে একটি জীবন যুক্ত হতে চাইবে কেন।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অনিলা মৃদু গলায় বলল : 'পারবে। স্যাঁৎসেঁতে দেয়ালটা ভেঙে ফেলো। পারবে। ভালোবাসা একটা অস্ফুট গানের মতো, পবিত্র মন্ত্রের মতো। ভালোবাসা মানেই আরেকজনের জন্য তৈরি হয়ে ওঠা। আমি-ও যদি বুঝতে পারি তাহলে অপরকে আমি কী দেবো।'

'কিন্তু...' ভাবনাটা গুছিয়ে উঠতে না-পেরে পরমেশ চুপ করে গেল।

অনিলা বলল : 'ভুল কোরো না। তোমার হাতের পুতুল আসবাবের মতো আমি নিত্য ব্যবহৃত হয়ে গেলাম। আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি। আর লক্ষ্য পেয়েছি নিজের অন্তরের, শাঁসহীনতার। আমি তোমার জীবনে অনিবার্য হতে পারিনি। অথচ— চেয়েছিলাম। দূর, থাকগে। এখন আর সেসব কথা ভেবে লাভ কী।'

পরমেশ অনেকক্ষণ পর বলল : 'তুমি তাহলে চলে যাবে?'

অনিলা বলল : 'একটা কথা-সম্পর্ককে জিইয়ে রেখে কী লাভ হবে। হয়তো এমনও হতে পারে, আমি ঠিক তোমার উপযোগী নই, হয়তো অন্য কেউ অপেক্ষা করে রয়েছে। তার জন্যেই আমাকে জায়গা করে দিতে হবে।'

'না, অনিলা, না। সব মিথ্যে। আমি তোমাকে ছাড়া...'

'হ্যাঁ কষ্ট হবে বইকি। এতদিনের একটা বন্ধন। কিন্তু পরে বুঝতে পারবে : ভালোই হয়েছে। জানো, ভালবাসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার আগেই আমরা ভালোবেসে ফেলি। সে-ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। প্রস্তুত-ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন আসে। তখন পরিপূর্ণ ভালোবাসার ফসল ফলে ওঠে।'

'না, অনিলা, না।'

'তোমার দোষ নেই। না, দোষ কারুরই নয়। জীবন এইরকমই। তোমার জড়তা থেকে যদি আমি তোমাকে জাগাতে না পেরে থাকি সে-অক্ষমতা সে-দুঃখ আমারই।'

'অনিলা, তুমি চলে যেও না। আমাকে নতুন করে চেষ্টা করতে দাও।'

'তা হয় না পরমেশ। দেরি হয়ে গেছে। ফিরে যাবার [illegible] পাওয়া যায় না। সেটা আমাদের সম্পর্ককে আরো ছোটো করে দেবে। আমাকে এখন উঠতে হবে। নাঃ বাধা দিও না। জোর করে সব সময় কাজ হয় না।'

অনিলা চলে গেল।

অনিলা চলে যেতে পারল! আর আশ্চর্য, সাতটা নির্দোষ দিন যাদুর হিসেব থেকে বাতিল হয়ে গেল। পরমেশ ঘুম থেকে উঠেছে, ব্রেকফাস্ট করেছে, নিপুণ হাতে কর্তব্যগুলো করেছে, অফিস গেছে, আড্ডা মেরেছে, খেলাধুলো-রাজনীতি-সিনেমা। একেকবার মনে হয়েছে হয়তো দরজায় তালা দিয়ে এসেছে কিনা। আর, একটা অনুভূতি, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার-বাড়ির সঙ্গে অনিলা একমাসের জন্যে পুরী গেলে যে-স্বাদটা তাকে সিক্ত করে রাখত। তারপর সাতটাই অনিলা একদিনও এল না। ক্লান্তি, অসহায়তা, দুঃখ, ক্ষোভ এবং ক্রোধ তাকে জটিল করে তুলল। মাঝে কঠিন অলৌকিক কোনো সম্ভাবনার সে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যেমন : আজ-একটা-কিছু-হবে। হল না।

সাতদিন পরে হঠাৎই বলল সে উঠে দাঁড়াল। গায়ে জামা গলিয়ে রাস্তায় নেমে এল। বড় রাস্তায় ট্রামে সওয়ার হল। ঠিক স্টপে নেমে গলিতে এসে পড়ল। এক-দুই-তিন, চার। পাঁচ নম্বরের বাড়িটার এ মুড়ো ও মুড়ো বার কয়েক চক্কর মারল। ইচ্ছে করলেই পরমেশ বাড়িতে সোজা ঢুকে পড়তে পারে। ওই তো রাস্তার দিকের দোতলার কোণের ঘরটা অনিলার। ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল, স্প্রিং-এর খাট, সোফায় অনিলার ছিপছিপে বেতস্বী দেহটা। কিন্তু কিছুতেই পা উঠল না পরমেশের। উত্তেজনা শুরু হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুলে এই মুহূর্তে কে বেরুল? সামনেরটোতাই সুনীল। ও কী দেখে ফেলেছে। না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পরমেশ। ট্রাম—রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যদি এসে পড়ে অনিলা। যদি...। বেলা বাড়ল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হতাশ হল পরমেশ। নিশ্বাস ফেলল আহ্। রাস্তার লোকগুলো কী তাকে লক্ষ্য করছে? পরমেশকে কী উদভ্রান্ত, বেদুইন কিশোরের মতো দেখাচ্ছে? অনবরত পিছলে যাচ্ছে পা রোদে। রোদে ঘামে জামায় সিক্ত হয়ে পরমেশ। চোখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। অন্ধকারের চেতনা। কখন ট্রামে উঠে পড়েছে পরমেশ। আবার নেমেছে। সম্মুখে মেয়েদের কলেজের সাদা পাঁচিলটা। আরে, রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে অনিলা না? অ-নিলা। একটা দুঃসহ আবেগকে পরাস্ত করতে পরমেশ ছুটে গেল।

দরদর ঘাম। হাঁপাচ্ছে।

'তুমি!' অনিলা বলল।

পরমেশ বলল : 'তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'আমার একটুও সময় নেই। ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাশ।'

'কখন? কোথায়?'

'বিকেলে আসতে পারো গড়িয়াহাটের মোড়ে। হ্যাঁ পাঁচটায়। চলি।' অনিলার পাতলা শরীরটা কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এখন কী করবে পরমেশ? সবে দশটা পনেরো বেজেছে। নাঃ অফিস যাওয়া হবে না। বাড়ি? ধ্যাৎ। পরমেশ না? কী করছ এখানে? রজত। মেডিক্যাল কোম্পানির দুর্ধর্ষ প্রতিনিধি। চলো, কাজ নেই তো? একটু কফি খাওয়া যাক। কী করছ কাজকর্ম কেরানীগিরি? পরীক্ষাটা আর দিলে না? অনার্সে না তুমি ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলে? তোমাদের মতো উজ্জ্বল ছেলে। দু কাপ কফি। স্ন্যাকস? নো। থ্যাংকস। বাড়ি যাওয়ার দরকার। বিকেলের জন্যে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়া দরকার। রজতকে কী বলবে, তার ভালো লাগছে না। সে খুব ক্লান্ত, অসুস্থ। হ্যাঁ পৃথিবীর গভীর অসুখ এখন। নাঃ রজত তোমার মিস মজুমদারের খবরের আমার কোনো দরকার নেই? কী, তোপচাঁচি বাংলোয় তোমরা তিনটে রাত মধু কাটিয়েছ? রজত তুমি সুখের কিছু জানো না। তুমিও একটা সিসটেমের দাস। আচ্ছা চলি। থ্যাংকস। সো লং।

'বাড়ি। তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। দরকার! শব্দটা ব্যবহার করবার আগের মুহূর্তেও পরমেশ বোঝেনি ওটা দরকার-ই হবে। অথচ, ভেবে দেখতে গেলে, কথাটার কোনো অর্থই নেই। আচ্ছা, কী বলবে অনিলাকে? বিকেলের ওই উচ্ছিত ভিড়ে গড়িয়াহাটে দাঁড়িয়ে? ক্ষমা? ক্ষমা! অনুতাপ? অনুতাপ! আহ্। অনুতপ্ত পরমেশকে না হয় ক্ষমা করল অনিলা। হ্যাঁ তোমাকে ক্ষমা করলাম পরমেশ। তারপর? চলো একটু চা খাই। খেলাম। তারপর ওর সম্ভ্রম আবরণগুলোকে না হয় প্রশ্রয়ই দিল অনিলা। তারপর? তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে। আহ্, দরকার।

পরমেশ ঘুমিয়ে পড়ল।

উৎকট গরমে ঘামে-ভেজা ওর নিদ্রিত শরীরটা এখন গলিত শবের মতো দেখাচ্ছিল। বিছানা থেকে গন্ধ উঠছিল। পচা মাংসের মতো। ওর ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক-করা। সম্ভবত ওর নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। ওর অন্তরটা ছটফট করছিল কিনা কে জানে। হাতের ঘড়িটা আর খোলেনি পরমেশ। পাছে সময় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল পরমেশ। হাতঘড়ি দেখল। পৌনে চারটে। নাঃ দেরি হয়নি। নিদ্রার ভেতরেও সে সতর্ক ছিল। চোখ খুলে কিছুক্ষণ শয্যা আঁকড়ে রইল পরমেশ। হাতে আধঘণ্টা সময় নিয়ে বেরুলেই চলবে। তাড়াতাড়ি নয়, আবার দেরিও নয়। বেশি গরজ দেখাবার কিছু নেই। যেন কিছু একটা বিশেষ নয় এমন-ভাবে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে শাসন করে রাখল পরমেশ। উত্তেজনাকে দমন করলে অধৈর্য হয়ে উঠতে হবে। না এখন উত্তেজনার সময় নেই।

কী যেন কথাটা? দরকার ছিল। দরকার! যেন অর্থ না-বুঝে একটা শক্ত প্রশ্ন করে ফেলেছে এমন বিহ্বলতা বোধ করল পরমেশ। দরকার আছে! গলার ভেতর গুমরিয়ে এল পরমেশের। এমনভাবে প্রশ্নটা রাখা উচিত ছিল না! বাস্তবে সত্যিই তো দরকার বলে কিছু মনে করতে পারছে না। নতুন করে আবার আরম্ভ করতে হবে। যৌবন থেকে পুনরায় হামা-গুড়ি-দেয়া শৈশবে? ইচ্ছে করলেই কী শৈশবে প্রত্যাবর্তন করা যায়! নাহ্, পরমেশ নিজেকেই ধমকাল : যথেষ্ট বয়স্ক হয়েছে সে। বয়স্কতা মানেই আত্মমর্যাদা-বোধ, আত্মগৌরববোধ। পরমেশের চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠল। আবার হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় পড়িয়ে রইল সে।

তারচেয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে কী হয়? হরিণঘাটায় বোনের বাড়ি। অনেকদিন সুকুমারীকে দেখেনি। গতবার ভাইফোঁটায় যেতে পারেনি। এখনি জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেলে কাছাকাছি সময়ের কোনো ট্রেন ধরতে পারবে নিশ্চিত।

সাড়ে চারটে।

পরমেশ জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিল। চিরুনিতে চুল আঁচড়াল। দিবানিদ্রার শরীর ভারি ঠেকছে। মনটাও বোকা-বোকা লাগছে। টেবিল থেকে মানিব্যাগটা পকেটস্থ করল।

দরজা বন্ধ করে ভারি পায়ে নেমে এল পরমেশ। সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরির লাল দেয়ালে বিকেলের ক্লান্ত রোদ। একটা ট্রাম আসছে। শেয়ালদায় বদল করতে হবে। পরমেশ ট্রামে উঠে পড়ল। এই সময়েও ভিড় কম নয়। আশ্চর্য, এই ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারছে না কেন পরমেশ। সে যেন আলাদা হয়ে ওপর-ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। পরমেশ কী আবার উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ছে। একটা বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ তাকে যেন রুদ্ধ করে রেখেছে। বিরক্তি, বেদনা, ক্লান্তি, এবং এবং একটা আকণ্ঠ ঘৃণা তাকে নিরত আবর্তিত করছে।

না না না। মুক কণ্ঠস্বর জান্তব গোঙানির মতো শোনাল। ট্রামটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অতিক্রম করে ধজ্ নিরতির মতো ধাবমান। মাথার ওপরে ফ্যানটা কী বন্ধ হয়ে গেছে! দম বন্ধ লাগছে কেন পরমেশের।

পিছনে কারা কথা বলছে। কী ভাষায় কথা বলছে ওরা। পরমেশ কিছুই বুঝতে পারছে না।

ট্রামটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।

গড়িয়াহাট।

পরমেশ উঠতে গিয়ে পারল না। জানালার বাইরে জন রিক্তের কন্ঠোপাল

অসহায় চোখ মেলে থাকল। রজনীগন্ধার পেছনে কে দাঁড়িয়ে। পরিচিত শাড়ি। অনিলা। হ্যাঁ অনিলাই। হাতঘড়ি দেখছে। রাস্তার এদিক ওদিক দেখছে। পাঁচটা পনেরো। এবার পরমেশকে নামতে হয়। অনিলা অপেক্ষা করছে। আবার অপেক্ষমান অনিলার দীর্ঘ দেহের দিকে তাকাল। অনিলা কী ভ্রূ তুলল, ওর গৌর মুখে উদ্বেগ, বিরক্তি, না কিসের ভাঁজ?

ট্রামটা তখন বাঁক ঘুরে স্টেশনের দিকে ছুটেছে।

ট্রামে বসে দরদর করে ঘামতে লাগল পরমেশ। কে জানে অনিলার চোখে সে ধরা পড়ে গেছে কিনা।

চলন্ত ট্রাম থেকে শেষবারের মতো নামবার চেষ্টা করে অক্ষম মানুষের মতো দীর্ঘ, পাংশু সীটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল পরমেশ।।

নিজের একখানি বাড়ী করুন

ইউকো ব্যাঙ্কের হাউসিং রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের সুযোগ নিন

এখন নিজের বাড়ী নিজেই করবার কথা ভাবতে পারেন। ইউকো ব্যাঙ্কের হাউসিং রেকারিং ডিপোজিট স্কীম সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। এর জন্য আপনাকে শুধু ইউকো ব্যাঙ্কে একটি হাউসিং রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে—যার নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে ৪৮, ৬০, ৭২ বা ৮৪ মাস। এই মেয়াদ পূর্ণ হলে আপনি বেশ মোটা টাকা লোন পাবেন যা দিয়ে নিজের একখানি বাড়ী করার সাধ মেটাতে পারবেন।

যাঁরা চাকুরীরত এবং/অথবা নিয়মিত আয়ের লাভজনক পেশায় নিযুক্ত, কেবলমাত্র তাঁরাই এই স্কীমে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

UCOAM

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মৌখিক ভাষার শব্দসম্ভার

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক পর্যায়ে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় অধিকতর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষক অসাধারণ নিষ্ঠায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতির বিবরণ সংগ্রহ করছেন। এই কাজে ব্রতী হতে আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিগত শতকের শেষ দিকে এই বিষয়ে আমরা সচেতন হয়েছি। রমেশচন্দ্র দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্য-সাধক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক গবেষণার কাজ শুরু হোল। চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ঢাকার সতীশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতি গবেষকের অক্লান্ত সাধনায় অনেক হারান সম্পদ সংগৃহীত হল এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি পেল।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগের পক্ষেই পরম কল্যাণকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতির উৎসাহ এবং উদ্যম বাঙালীকে এক স্বর্ণখনির সন্ধান দিয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রায় প্রথম দিক থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকদের নানাবিধ গবেষণাপূর্ণ রচনার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহের পরিচয় প্রকাশিত হত। ১৩০৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দসংগ্রহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব, 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এই ১৩০৮ সনেই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মৌখিক ভাষার শব্দগুলি এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার শব্দসংগ্রহ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হয়েছিল কিন্তু এই জাতীয় কাজে কোন গবেষক অগ্রণী হয়ে আসেন নি। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রবীন গবেষক শ্রীকামিনীকুমার রায় সুদীর্ঘকাল অসামান্য নিষ্ঠায় এই কাজে ব্রতী আছেন। ১৩০৯ সনে তাঁর শব্দসংগ্রহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই চল্লিশ বছর-কাল ধরে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করছেন।

শ্রীকামিনীকুমার রায় সম্প্রতি 'লৌকিক শব্দকোষ' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

'১৮৯৫ সালের জুন মাসের দাসী পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রাদেশিক কথিত বাংলা' প্রবন্ধে সাধারণের কথিত ভাষার কতকগুলি শব্দ বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করেন এবং বহু পূর্বে আগেই তিনি একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।'

অর্থাৎ আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে যা ছিল স্বপ্ন তা সত্যে পরিণত করলেন শ্রীকামিনীকুমার রায়। এই ধরনের কাজ করা অধ্যবসায় এবং প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ। শুধু তাই নয় সদ্গ্রন্থের প্রকাশনায় উৎসাহী প্রকাশকেরও বাংলা দেশে যথেষ্ট অভাব, তাই শ্রীকামিনীকুমার রায়ের সকল ক্লেশ ও পরিশ্রম সার্থক করে এই গ্রন্থটি যে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এ অতি-আনন্দ সংবাদ। বাংলা সাহিত্যের হাটে এই সংবাদ সগর্বে ঘোষণা করার মত সংবাদ। এই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ লৌকিক শব্দকোষ প্রকাশনায় সরকারী সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সম্ভব না হলেও শ্রীকামিনীকুমার রায় একক চেষ্টায় যে এই দুরূহ কর্ম সম্পাদনে সফল হয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীকামিনীকুমার রায় প্রথম খণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি মূল্যবান ভূমিকায় সংগ্রহ বৃত্তান্ত, শব্দ নির্বাচন, শব্দ বিন্যাস প্রণালী, শব্দের প্রচলন-স্থান ও বিষয় বিভাগ, শব্দ বৈচিত্র্য, আক্ষরিক অর্থের লোপ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাঙালী জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আম, কলা, মাছ, পান তামাক, হুঁকা, গায়ে-হলুদ, সিঁদুর-দান, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয়ে সকল সম্ভাব্য তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন।

এই সংগ্রহ কর্মে আসাম, গোয়ালপাড়া, পাবনা, পুরুলিয়া, বরিশাল, তরাই অঞ্চল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বা দক্ষিণবঙ্গ, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, রাঢ় অঞ্চল, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি বাংলাদেশের বৃহত্তর অঞ্চলের প্রায় সবগুলিই গ্রহণ করেছেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক বা লৌকিক ব্যবহারের ভাষার বিরাট সমুদ্র এভাবে মন্থন করে এমন মূল্যবান রত্নরাজি আহরণ করা যে সহজ-কর্ম নয় সেকথা বলাবাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বাংলাভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন-তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না।'

সেই তন্ন-তন্ন পরিচয়সাধনে ব্রতী হয়েছেন 'লৌকিক শব্দকোষে'র রচয়িতা শ্রীকামিনীকুমার রায়। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শব্দ সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন আর পরিণত বয়সে পৌঁছে লৌকিক শব্দকোষ সম্পূর্ণ করলেন। তাঁর এই কাজ বাংলা কোষ-গ্রন্থের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সমগ্র জীবন ধরে পরিশ্রম করে অভিধান সঙ্কলন করেছেন, এই শব্দকোষ প্রণেতা শ্রীকামিনীকুমার রায়ও তেমনই সারা জীবন ধরে কাজ করে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তিনি অখণ্ডভাবে শুধু এই কাজ করতে পারেন নি, জীবিকা আহরণের জন্য তাঁকে অন্য প্রকার কাজও করতে হয়েছে দীর্ঘকাল। এই কারণে তাঁর নিষ্ঠা এবং সাফল্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই শব্দকোষের প্রথম খণ্ডটিতে তিনি শব্দগুলিকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন, যথা, ঘর-বাড়ী, গৃহ-সামগ্রী, চাষ-আবাদ, উৎসব, জীব-জন্তু, আচার-অনুষ্ঠান ও নামাবলী। নামাবলী অংশটির দুটি ভাগ, সম্বন্ধসূচক ও ব্যক্তিবাচক।

যেভাবে তিনি শব্দ সংগ্রহ করেছেন এবং তার অর্থ এবং সেই সম্পর্কীয় নানা তথ্যাবলী পরিবেশন করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আচার-অনুষ্ঠান' নামক পরিচ্ছেদের দুটো উদ্ধৃত করছি—

'আচার-অনুষ্ঠান (১) বি বা হে লোকাচার : বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে যে সকল লোকাচার তথা স্ত্রী-আচার পালিত হয়, তাহার বিবরণ এবং তুলনামূলক আলোচনা। নানারূপ লোকমত ও লোকবিশ্বাস।'

(২) বিবিধ ব্রতাচার ও লোকবিশ্বাস—সাধারণ মানুষের কতকগুলি ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা ; বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানসম্পৃক্ত কতকগুলি শব্দের বিবৃতি।'

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলি মনুষ্যাসহ, খাদ্য-পানীয়, বসন-ভূষণ, ব্যবসা ও পেশা, যান-বাহন, বিশেষক পদ, নৈসর্গিক, বিবিধ শব্দ, দেব-দেবীর নাম প্রভৃতি বিষয়ক শব্দসম্ভার পাওয়া যাবে।

দেব-দেবীর নাম সংক্রান্ত অধ্যায়ে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার দেব-দেবীর বিশেষ করে লৌকিক দেবতার ও পীর-ফকিরের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ; তাঁদের পুজো-হাজোতের বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট লোকাচার ও লোকছড়া প্রভৃতি বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

'সারা বাংলার জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে, চিন্তা প্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপ-ন্যাসের মত সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য ত আছেই। সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।'

আমরা এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। শুধুমাত্র শব্দ এবং তার অর্থটুকু দিয়েই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নি তিনি সেই সব শব্দের সঙ্গে তার পরিবেশ, সমাজ সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, লোক-বিশ্বাস প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়েছেন ফলে একত্র বাংলা লোকসংস্কৃতির অজস্র পরিচয় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। গ্রন্থকারের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এই পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

—অতনুব্রত

লৌকিক শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—কামিনীকুমার রায়। লোকভারতী। ৫।১ হরিদেবপুর রোড, কলিকাতা—৪১। দাম প্রথম খণ্ড—১২·৫০ পঃ। দ্বিতীয় খণ্ড—পনেরো টাকা।

নতুন বই

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ—অশোক কুণ্ডু। টেগোর রিসার্চ ইনস্টি-টিউটের পক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বইটির উৎসর্গপত্র বাংলাদেশের সেই নাম-না-জানা বাঙালী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত, যাঁরা পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কুঠি-বাড়িকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্প্রতিক এই দুঃখিত ইতিহাসের বেদনাই আমাদের মনকে আরো অনেক বেশী মনো-যোগী করে তোলে এই বিশেষ বইটি পড়ে।

শিলাইদহ নামটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার শিলাইদহের কুঠিবাড়ির সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির জমিদারী কাজ দেখা, জমিদারীর ভারগ্রহণ, কুঠিবাড়ির অবস্থান ও পরিবেশ সকল কথাই উল্লেখিত। শিলাইদহে সংসার পাতার পরিকল্পনা সেই সঙ্গে কবি এবং কবি-পত্নীর মানসিক গঠনের বেদনাদায়ক পার্থক্য লেখক অত্যন্ত অল্প কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শিলাইদহে সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে গৃহবিদ্যালয় স্থাপন এবং এই গৃহবিদ্যালয় যে শান্তিনিকেতন শিক্ষায়তনের পূর্বাভাষ বহন করছে সে কথাও আমরা জানতে পারি। রেশম চাষ, কৃষি ব্যবসা ইত্যাদি সকল বিষয়েই কবির উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথের সহমর্মী জমিদারী ব্যক্তিত্বের ছবি লেখক পত্র উদ্ধৃতিসহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতি আমরা স্মরণ করতে পারি 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্যে আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেননা তাঁর সেরেস্তায় আমিও কিছু দিন আমলার কাজ করেছি।...রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন জমিদার হিসাবেও তেমনি Unique—' (রায়তের কথা—প্রমথ চৌধুরী)

এ ছাড়া শিলাইদহে কবির উপস্থিতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তারিখ এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট এবং সেই সঙ্গে শিলাইদহে রচিত কবিতাবলীর প্রথম লাইন ও কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখিত।

কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে হয়, লেখক যতটা যত্নসহকারে রবীন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনকে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিক সেই মত শিলাইদহের আকাশ মাটি এবং মানুষকে নিয়ে কবির হৃদয় অনুভূতির কথা পরিচ্ছন্ন-ভাবে উল্লেখিত নয়। ছোটগল্পের মানুষ এই শিলাইদহের মাটির থেকে পাওয়া, একান্ত কাঁচা মাটির গন্ধমাখা রক্ত-মাংসের চরিত্র। এ বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ ছিল। লেখক কেন জানি না ছোট-গল্প এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন মাত্র কিন্তু এর সম্পূর্ণ আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে এখানে রচিত কবিতা-বলীও ভাব, আবেগ ও অভিজ্ঞতার মিলিত ফসল, এসব বিষয়ও যথেষ্ট আলোচনার দাবী রাখে। বইটির এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য আলোচনাগুলির গুরুত্ব স্বীকার্য।

শিশু পালনের দুটি কথা—ডাঃ সরোজিৎ বাগচী। প্রকাশক : বীরেন্দ্রকিশোর বাগচী সঞ্জীব ভবন, ডি বি সি রোড জলপাইগুড়ি। ৭৫ পয়সা

নানা কথায় সহজ ভাষাতে সাধারণ শিক্ষিতা মায়েদের জন্য এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বইটিতে শিশু পালনের নানান

পড়েছেন কি ?

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা-কাহিনী—

— শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের —

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্ম্মিণী হয় ক'জন

৪·৯০

—তরুণ কবি শুভব্রতের —

আজ আমি বেকার

১·২০

পরিবেশক—
দে বুক স্টোর—১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি। পুস্তকম—শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ঊষা পাবলিশার্স—১০।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। ফেভার বুক ব্যাংক—৬৫ এম জি রোড, কলি। নবজীবন ব্যানার্জী—২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি।

কথা আলোচনা করা হয়েছে। মায়েরা এই বইটি পড়লে উপকৃত হবেন।

মিশরের কথা—অতীন মজুমদার। রূপ ও কথা: ৬৮বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড কলকাতা-১৪। দু টাকা।

কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা এই বইটি আধুনিক মিশর নয়—প্রাচীন মিশরের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। ইহুদি জাতির এক গোষ্ঠীপতির ছেলে যোসেফ। তাকে ঘিরেই এ কাহিনী জমে উঠেছে।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩·৭৫ টাকা।

ছুটিছাটায় বাঙালীবাবুদের 'পশ্চিম' বেড়ানোর একটা রেওয়াজ বহুদিন যাবৎ চলিত আছে। দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি ঘুরে না এলে অনেকে সমাজে মুখ দেখাতে পারেন না। কিন্তু ঘরের কাছেই যে সব ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পবস্তুর অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে সে সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন থেকে যান। আজকে দেশ বিভাগ হয়ে গেলেও পশ্চিম বাঙলার প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতার নিদর্শন অল্প নেই। সেগুলি সর্বভারতীয় স্থাপত্য নিদর্শনের মত বিপুলায়তন নয় ঠিকই। কিন্তু শিল্পরসের দিক থেকে এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের দিক থেকে তাদের গুরুত্ব অনেকখানি। তথাপি তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এসব প্রাচীন দ্রষ্টব্যবস্তুর পরিচয় দেবার মত সহজলভ্য গ্রন্থও এতদিন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ বর্তমানে পশ্চিম বাংলার সবকটি জেলা ও কলকাতার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির সচিত্র বিবরণসহ একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশনের পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি নিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে সরেজমিনে কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাঁকুড়ার মন্দিরের ওপর তাঁর বইটি সজ্জনের সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থের রচনার ভার তাই ন্যায়সঙ্গত কারণেই যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

বইটির ভূমিকায় বাঁকুড়ার জাতিবিন্যাস ও ধর্মীয় বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যমূলক বিবরণ দিয়ে পুরাতন মন্দিরগুলির স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক-মুসলিম যুগের উড়িষ্যার শিল্পরীতির প্রভাব ও মুসলিম অধিকার কালে ইসলামী শিল্পরীতির প্রভাব এই দুটি বিষয়ই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাঁকুড়ার মন্দির শিল্পরীতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিছু—কম নব্বইটি স্থানের মন্দিরের বিবরণ ও অবস্থান দেওয়া আছে। কোথা থেকে কিভাবে সেখানে যেতে হয় সেটিও উল্লেখ করতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ভোলেননি। যদিও তিনি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন যে বাঁকুড়ার সমস্ত দর্শনীয় স্থানের বিবরণ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি তবু একশ চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এই মুদ্রণপ্রমাদবিবর্জিত বইটিতে সাধারণ ভ্রমণকারীর দেখবার বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এবং একটু অসাধারণ ভ্রমণকারী বা শিল্প-ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

লেখক নিজে একজন উঁচুদরের আলোকচিত্রশিল্পী। তাঁর তোলা চৌষট্টিখানি ফটোগ্রাফ বইটিকে বিশেষ লোভনীয় করে তুলেছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অন্য মনে (ত্রৈমাসিক : তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ' ৭৮)—সম্পাদক : সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল। ১৭এম ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। এক টাকা।

'অন্য মনে' সাময়িক সাহিত্যের চলতি হাজারো পত্রিকা থেকে একেবারে অন্য ধরনের। সমাজ ও জনজীবনের বিবিধ সমস্যার ওপর দৃষ্টির সূক্ষ্ম বিচারের আলোকপাত সৃষ্টিশীল মনন ও পরিণত বোধের পরিচয় সত্যিই অভিনব এবং অভিনন্দনীয়। প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। এ ধরনের চেষ্টা এর আগে দেখা যায় নি। আলোচ্য সংখ্যায় 'বর্তমান পরিস্থিতি ও জনসংযোগ'-এর নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন নীহার দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, উইলিয়ম লীডগেট, প্রশান্ত সান্যাল, সনৎ লাহিড়ী, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, অমূল্যধন দাশশর্মা প্রমুখ।

পরিচয় (বাঙলাদেশ সংখ্যা ২)—সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৭। দাম এক টাকা।

ঐতিহ্যসমন্বিত 'পরিচয়' পত্রিকার এটি দ্বিতীয় বাঙলাদেশ সংখ্যা। শ্যামল চক্রবর্তীর 'জাতিতত্ত্বের বিচারে বাঙলাদেশের সংগ্রাম' এবং জাহির রায়হানের 'পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ' আলোচনা দুটি সব থেকে মূল্যবান। বাসব সরকার, গৌরী আইয়ুব, হিরণকুমার সান্যাল এবং সুব্রত বড়ুয়ার কয়েকটি আলোচনা আছে। গল্প কবিতা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সুতান সেন, অসীম রায়, বিতোষ আচার্য, শিবশম্ভু পাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, নক্ষত্র কুণ্ডু, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শিশির সামন্ত, অমিয় ধর, রবীন সুর, শুভ বসু, দুলাল ঘোষ।

ঘোড়সওয়ার (বৈশাখ ১৩৭৮)—সম্পাদক : আশিস সান্যাল। ৫০ বিধানপল্লী। কলকাতা—৩২। দাম : এক টাকা।

তরুণ লেখক সমাজের মুখপত্র ঘোড়-সওয়ারের প্রথম সংখ্যাতেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এই সংখ্যায় লিখেছেন আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, কালীকৃষ্ণ গুহ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, চন্দন সেন, শুভ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষাল, অজয় সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জিতা দাশ, উদয়ন ভট্টাচার্য, হিমাদ্রিশেখর বসু, অমল ভৌমিক, নিশিনাথ সেন, পঙ্কজ সাহা। নাইজেরিয়া, জাপান এবং অসমীয়া কবিতার অনুবাদ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ।

মুকুর (বাংলাদেশ সংখ্যা)—বাওয়ালী, রথতলা, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

ষাণ্মাসিক সাহিত্যপত্র। সাতজন সম্পাদক। 'বাংলাদেশ' বিষয় সংখ্যায় লিখেছেন : আবদুল জব্বার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শান্তনু দাস, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা কর, এবং আরো অনেকে।

সুরের খেয়া (কবিতা সংকলন) নির্মলেন্দু ঘোষ। প্রকাশক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়। নর্থ স্টেশন রোড, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

কাকলি (বৈশাখ '৭৮) সম্পাদিকা : পারুল দাশ। অভয়নগর আগরতলা, ত্রিপুরা। পঁচাত্তর পয়সা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা। নামেই এর পরিচয়। ছোটদের নিজস্ব লেখা আছে অনেকগুলি আর ছোটদের জন্যে বড়দের লেখাও। প্রশংসনীয় আয়োজন।

প্রাপ্তিস্বীকার

গৌজমারী (সুভাষবাদী বাংলা সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মহিমারঞ্জন শর্মা। ৬এ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১৩। পনেরো পয়সা।

তির্যক (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, '৭৮)—সম্পাদক : সেখ সদরউদ্দিন। ১৪বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। এক টাকা।

বরেন্দ্রভূমি (সংবাদ সাহিত্য সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলজানন্দ রায়। বরেন্দ্রভূমি কার্যালয়, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। পনেরো পয়সা।

কাল (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : বিমল দেব। খোয়াই, আগরতলা, ত্রিপুরা। 'সোনার বাংলা' বিশেষ সংখ্যা। পঁচিশ পয়সা।

অণিমা (জুলাই, ১৯৭১)—সম্পাদক: অনুপম মুখোপাধ্যায়। ওলাইচণ্ডীতলা ফার্স্ট বাই লেন, উদয়পুর, নিমতা, কলকাতা-৪৯। পঞ্চাশ পয়সা।

ছন্দ (জুলাই, ১৯৭১)—সম্পাদক : [illegible] মুখোপাধ্যায়। চৌপথি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি। ৩০ পয়সা।

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সাবর্ডি-নেটেড অ্যান্ড কেন্ট বি এনির্বাউজ এম্বিশান,' লিখেছিলেন ইশান চৌধুরী বেনারসের কুইন্স কলেজের ছাত্র কনিষ্ঠপুত্র বাইশ বছরের ভবনাথকে। কলকাতার ঘোড়ায় টানা ট্রাম থেকে পা হড়কে পড়ে যাওয়ায় কপাল সামান্য ছড়ে যায় ভবনাথের, পার্সিভেল সাহেবের ছাত্র ভবনাথের ক্ষেত্র হয় বেনারস যেখানে কাকা ডাক্তার অঘোর চৌধুরীর দু টাকা ভিজিটে একচ্ছত্র পসার। এই দু ভাইয়েরই খ্যাতি প্রধানত তাঁদের জেদ ও সততার দরুন। একবার গঙ্গার ওপারে রামনগরের রাজার চোখের চিকিৎসায় ডাক পড়ে অঘোর চৌধুরীর। ওপারে নামতে যাচ্ছেন এমন সময় রাজার পাইক নিষেধ করলে জুতো পরে নামতে; রাজার রাজত্বে জুতো পরে যাওয়া মানা। তৎক্ষণাৎ নৌকো ফিরিয়ে নিলেন অঘোর। পরে রাজার প্রধান অমাত্য এসে তাঁকে জুতো সমেত নিয়ে ওপারে যায় কারণ 'এ কানুন ডাক্তার অঘোর চৌধুরীকে লিয়ে নেহি।'

দু-ভাই ইংরেজের চাকরীকে গোলামী বলতেন। তাঁরা যে স্বদেশী আন্দোলনে খুব ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন নয়।

দু'ভাইয়েরই কাছে স্বাদেশিকতার একটা খুব ধরা-যায়-ছোঁয়া-যায় এমন ধরনের চেহারা ছিল। সেই উদ্দীপ্ত শীর্ণ তাপসী অবনী ঠাকুরের 'ভারতমাতা', তাঁদের স্বদেশের চিত্রকল্প মোটেই ছিল না। এটা প্রবল আঞ্চলিক স্বাদেশিকতা—পাবনার দুধ আর ইলিশ মাছ, সিরাজগঞ্জের রুই, গ্রামের গাঁট-ছড়ায় বাঁধা উঠতি শহুরে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মাঠের মধ্যখানে বাড়ি, বড়জামাই ভাগ্নে ভাইপো ভাইঝি, অন্ধ ভজন বিধবা পিসী মাসী মিলিয়ে কণ্ডাখাটি নির্ভরতার ভরা জমজমাট একান্নবর্তী পরিবার এই ছিল ইশান চৌধুরীর দেশের ছবি। এরই মাঝখানে উত্তর বাংলার জেলায় জেলায় সফর —পাল্কীতে ট্রেনে বোটে। এইসব নিরন্তর ভ্রমণে আদালতে আদালতে হাকিমদের জ্ঞানদান, তারপর টানা পাখার নীচে ইলেকট্রিক আলোবিহীন নিশ্ছিদ্র কালো রাত—এই দেশ। অঘোর চৌধুরীর কাশী এমন ভাল লেগেছিল, এমন রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল উত্তর ভারতের অসহ্য কোমর-পড়া গরম আর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা যে বিশাল জমিজমা কিনে গঙ্গার ওপর মস্ত বড় বাড়ি হাঁকালেন। চোখের চিকিৎসাও করতেন, সে ব্যাপারে আরও জ্ঞানলাভের জন্যে বিদেশে যাবার বাসনাও হয়েছিল কিন্তু যাননি। তার কারণ সেখানে গা ধুয়ে সরষের তেল ডলা যায় না। কলকাতায় আসার জন্যে কখনও বিশেষ মন কেমন করে নি তাঁদের। কারণ দেশটা তাঁদের কাছে কোন পতাকায় আঁকা ছিল না, দেশটা সারা দেশেই ছড়িয়ে ছিল। সেখানকার আচার-বিচার বসনভূষণে, সেখানকার খানো, সেখানকার জলে রোদে।

অবশ্য ঈশান চৌধুরীর কথা দাঁড়ায়নি। স্বর্ণসুন্দরীর বাবা বিহারের কলেক্টার অক্ষয়চন্দ্র বসু তাঁর জামাইকে টেনে নেন ইংরেজের গোলামীতে। তাঁর মুরুব্বী ডিইক সাহেবকে বলে কয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করেন। প্রথমদিকে আপত্তি থাকলেও দেশ-কালের অবস্থা চিন্তা করে সেই কথাবার্তায় অত্যন্ত কুশলী জবরদস্ত অফিসার অক্ষয় বসুর কন্যাকেই পুত্রবধূ করতে মনস্থ করলেন শেষপর্যন্ত।

মুঙ্গের থেকে অক্ষয় বসু পাবনায় এলে পূর্বদিকে লাইব্রেরী ঘরের পাশে সব-চেয়ে বড় দখিনা ঘর ছেড়ে দেওয়া হোল। ঈশান চৌধুরীর মেজাজের খ্যাতি অক্ষয় বসুর কানেও পৌঁছেছিল। কোন কথাটা কার ভাল লাগতে পারে এবং সে কথাটা চেষ্টা না করে যত স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় এ ব্যাপারে তারিফ করার মত ক্ষমতা তাঁর। স্বর্ণ বাপের সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন! তিনি শুধু কাজই করতেন না, সব ব্যাপারে তাঁর চোখকান ছিল আশ্চর্যরকম সজাগ। অক্ষয় বসু এসে কেবল তাঁদের পারিবারিক কাহিনী বললেন। তিনদিন পর ভাইকে ইংরাজীতে চিঠি লিখলেন ঈশান চৌধুরী। এসেনশিয়ালস অঘোর, এসেনশিয়ালস। আর কিছু মানুষের দরকার নেই। সে উকিল হতে পারে, ডাক্তার হতে পারে, ইংরেজ সরকারের গোলাম হতে পারে, কিন্তু তার যদি এসেনশিয়ালস ভাল হয় তাহলে আরগুলো সব ফেলো কড়ি। অক্ষয় বসুর কন্যাকেই পুত্রবধূ করব সিদ্ধান্ত করেছি। নদীয়ার মুড়াগাছার গ্রামের ইস্কুল মাস্টারের ছেলে অক্ষয়। জন্মানোর পরই পিতৃহীন। মা অসুস্থ হলে হাত পুড়িয়ে বেঁধে মাকে খাইয়েছে। আগাগোড়া জলপানি পেয়ে উঠেছে। এ সেলফমেড ম্যান।

কন্যার রাশিচক্রে খাঁচ ছিল কিন্তু ঠাকুর-মশাই বললেন সেটা বয়ঃকালে কেটে যাবে। বিবাহে আর কোন বাধা ছিল না।

আর ইংরেজের গোলামীতে ঈশান চৌধুরী বাধা দেননি তার কারণ ভবনাথের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমশই এ উপলব্ধি জন্মায় যে বেতো বাপের খোঁড়া ঘোড়া পেলেও সেই ঘোড়া যথেষ্ট নয়, বাপের প্রকৃতি যেমন ছেলেতে বর্তায় না তেমনি জাগতিক ব্যাপারে উৎসাহ ও অভিনিবেশ, মদ ও কালোর মাঝামাঝি এ ভুবনে মেজাজের ভারসাম্য অর্জনে বাপ ও ছেলের মেজাজের ফারাক শুধু অনিবার্য নয় স্বাভাবিক। বরং ভবনাথের সমাহিত পরিচ্ছন্ন মেজাজের সঙ্গে তাঁর বাবা রঘুনাথ চৌধুরীর প্রতিকৃতি তিনি খুঁজে পান। রঘু চৌধুরী চন্দন পড়তেন, সাধু সন্তদের মালপোয়া ক্ষীর খাইয়ে, গ্রামের বাড়িতে সাবেকী পোড়া ইঁটের তৈরী পুরনো গোপীনাথ মন্দিরের বিশাল চত্বর সম্বলিত নাটমন্দির প্রতিষ্ঠায়, প্রজাদের দারিদ্র্যে অভিভূত হয়ে ঘন ঘন খাজনা মকুবে জমিদারী লাটে তুলে বাইশ হাজার টাকা দেনা রেখে যান মৃত্যুর আগে।

এ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাবনা শহরের উঠতি মধ্যবিত্তদের মধ্যে, জোতদার-অফিসার বা জোতদার-উকিলদের ঘরে ঘরে একটা গল্প চালু ছিল রঘু চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েও তাঁর

কোথাই ছিল না, যারে যারে জ্ঞান ফিরে আসছে, আর বারে বারে ছটফট করছেন। এ দৃশ্যে কাতর হয়ে তৎকালীন হুগলী মহসীন কলেজের ছাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান বললেন, 'বাবা তোমার কেন এ কষ্ট? তুমি তো সাধু। তোমারও এমন কষ্ট?' রুদ্রনাথ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা আমার ঋণ-কষ্ট। একথা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি তো নিজেই বুঝিনি ঋণের কি গ্লানি, কি প্রবল প্রতাপ। ঋণ কষ্টে আমি যেতে পারছি না।' সঙ্গে সঙ্গে উনিশ বছরের ছেলে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, 'তোমার সমস্ত ঋণের দায় আমি মাথায় নিলাম।' বিশাল দাড়ি আর জটা রেখেছিলেন রুদ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে। সমস্ত মুখখানা ছেলের দিকে ফিরিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'যাঁহা দুঃশ্চিন্ত তাঁহা আসান।' তারপর চোখ বুজলেন।

তারপর প্রবল পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বিশাল পসার গড়ে তুললেন ঈশান। শহরের বুকে আট বিঘে জমির ওপর প্রকান্ড গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়ি তুললেন। গত শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ঈশান চৌধুরী ক্ষমতা ও পসারের পাহাড় ঠেলে তুললেন কাঁধ দিয়ে। এরই মধ্যে বড় ছেলে পরেশ ক্রমাগত বাপের টাকা চুরি, মায়ের গয়না বিক্রি এবং প্রচুর সন্তান সন্ততি ছাড়া আর কিছু না করে বাপের ভাবনার কারণ হলেন। দ্বিতীয় পুত্র ভবনাথের ওপর পিতৃস্নেহের কিঞ্চিৎ আধিক্য ছিল কারণ তিনিই বাপের আইন ব্যবসায় এলেন। তবে সিপাই এবং সিপাই-এর ঘোড়ার চাল কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল একেবারে আলাদা: বাপের মেজাজ তিনি পুরোপুরি নিলেন। সামান্য কারণেই বাপের মত 'শালা' এবং 'শুয়োর' এ দুটি কথার প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন। কিন্তু ঈশান যেমন লোককে চটাতেন তেমনি লোককে টানতেন প্রবলভাবে। বিশ্লেষণ প্রথমটার পারতেন। ক্রমে এমন ফৌজদারী ব্যাপার আরম্ভ হল যে শুধু শহরের আইন-জীবিই নন পাড়ার মুদি পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে পারলে বাঁচেন। এরই মাঝখানে মাঝখানে পারিবারিক চেঁচা-মেচি অন্দরমহল থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগল। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল দুই জামাই। নিকষ কৌলীন্য প্রীতির দরুণ দুটি নিরেট কাঠ কুলীনের হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন ঈশান। তাঁরাও বলতে নেই বছরে বছরে সংসার ভরাট করে চললেন আর কিছু না করে। ঈশান চৌধুরী তাঁর কাজের মাঝখানে ডুবে থেকেও টের পেতে লাগলেন তাঁর ভরাপালের সংসার-তরণী মুখ ফিরিয়েছে, শন শন করে ছুটে চলেছে যেন ধ্বংসের আবর্তের দিকে। মাঝে মাঝে সচেষ্ট হয়েছেন তরণীর মুখ ফেরাতে কিন্তু প্রতিকূল হাওয়ার বিরোধিতায় চেষ্টা সফল হয়নি।

অবশ্য পাবনা বাড়ির শেষ অবস্থায় পৌঁছবার অনেক আগেই অক্ষয় বসুর পদার্পণ এ বাড়িতে: তখন জমজমাট সংসার। তুঙ্গাবস্থাতে ঈশান চৌধুরীর অবস্থান। আগামী বেশ কয়েক বছরের সম্ভাবনা অক্ষয় বসু সহজেই টের পান। আর ঠোঁটের ওপর নবীন গোঁফের বাহার ও বড় বড় চোখের লাজুক দৃষ্টি নিয়ে যখন ভবনাথ সামনে কাছে এসে দাঁড়াল তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তাকে অন্য জগতের বাসিন্দে হতে অনুমতি দিলেন। ১৮৮৩ সালের গরমে ধুম ধাম। পেট্রোম্যাক্স কার্বাইড জ্বালানো কৃষ্ণপক্ষের রাতে বধূবরণ হল পাবনা বাড়িতে। পরের বছর কাশী থেকে যে ঘন ঘন ভবনাথের চিঠি আসত ভায়োলেট কিংবা লাইলাক রং-এর ছোট চৌকো পুরু ও মসৃণ বিলাতি কাগজে তার মধ্যে একটা এরকম:

রামাপুরা
বেনারস
৫।৮।৮৪

প্রাণের স্বর্ণ!

তুমি হয়ত আমার আগের চিঠিখানা পাইয়া কষ্ট পাইয়াছ। বোধ হয় রাগ করিয়াছ—মনে ভাবিয়াছ 'আমার চিঠির কি এই উত্তর?'

তোমার চিঠির উত্তর পাও নাই—উত্তর লিখিয়াছিলাম—অনেক যত্ন করিয়া লিখিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আবার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি—আর তেমন হইবে কি?

চিঠি কেন ছিঁড়িয়াছিলাম, বলিতেছি। কাল রাতে লিখিয়া আজ সকালে পোস্ট করিব বলিয়া টিকিট আনিতে অন্য ঘরে গিয়েছিলাম ইত্যবসরে কেউ একজন—তাহার নাম করিব না, চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে। তাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। রাগে আমার চোখের জল পড়িতে লাগিল। তারপর ভাব যায় দেখিয়া দু লাইন লিখিয়া দিলাম—তোমার চিঠির উত্তর দিই নাই। বুঝিতে পারিলে তো?

স্বর্ণ! জীবন ছেড়ে কি কেউ কখনও বাঁচে? আমি আমার পরাণ ছেড়ে কি করে থাকব? তাই প্রাণহীন দেহে একলা ঘরের কোণে বসে ভাবি, আর 'নীরব ক্রন্দন শুধু আমার সম্বল'।

সেই কয়দিন আগে—দুদিনের জন্য এক ফোঁটা দেখা হইয়াছিল। কত পুণ্য ফলে শুধু দুদিনের জন্য মর্তে স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম। সে মধুর হাসি আর অস্ফুট, অস্পষ্ট, সলজ্জ কথা-গুলি সুদূরস্থ স্বর্গীয় বীণাধ্বনির মত এখনও কর্ণকুহরে বাজে। আবার কদিন পরে শুনিব? যাক আর লিখিব না। যত বেশী লিখিব ততই কষ্ট বেশী হবে। আমারও বুক ফেটে যাবে, তোমারও পড়িতে কষ্ট হইবে।

কেমন আছ আমার জীবন? আর আর সকলে কেমন আছে? আমি আরও ৮।১০ দিন এখানে থাকিব। আসি তবে। আমার বুকভরা ভালবাসা ও শত সহস্র চুম্বন জানিবে। তৃষ্ণার্তের কি মরীচিকা দর্শনে পিপাসা নিবৃত্তি হয়? তবু জলাশয়-ভ্রমে একটু আনন্দ হয় বটে। তেমনি কল্পনার চুম্বনে কি প্রকৃত চুম্বনের মত সুখ হয়, তবু একটু আনন্দ হয়। আমার চিঠির উত্তর খুব শীঘ্র দিতে পারিবে কি? এখানে সকলে ভাল আছে।

তোমারই
হতভাগা
ভবনাথ

ডিভিশনাল কমিশনার জর্জ ফক্স এবং মার্কিন্সটি অর্থাৎ লাণ্ডি যখন পুব দিকের গেটের কাছে রাণাঘাট বাজারের সেরা চাল ব্যবসায়ী বিলাসী প্রসাদের কমলা রংয়ের ফোর্ড গাড়ি থেকে নামলেন তখন বিকেল পড়ন্ত হলেও জ্বলন্ত। গেটের পাশেই কাঁচা আমে ঝুমঝুমে ঝাঁকড়া লম্বা গাছটার মাথায় ভর্তি ঝকঝকে আলো, সামনের মাঠ থেকে তখনও গরম ভাপ উঠছে।

ঢ্যাঙা হালকা চেহারা, ছুঁচলো চিবুক, তীক্ষ্ণ ছোট চোখ, ব্রাউন বাজখাঁই গোঁফ, ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র জর্জের মিলিটারী অফিসারের কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা। 'দ-এ রংয়ের স্যুট আর চকোলেট টাই-পরা সাহেবটিকে কিছু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অপেক্ষাকৃত কম বয়সীই মনে হয়। ল্যাণ্ডির গড়ন অনেক মোটাসোটা। সাদা স্যুট কালো টাই-পরা তরুণ আই সি এস টি-র প্রায় মেয়েলী চেহারা, মোলায়েম মুখ, আয়ত চোখ বয়সের তুলনায় শরীর কিঞ্চিৎ ভারী।

স্টেশনে বিলাসী প্রসাদের গাড়ি নিয়ে ভবনাথ অপেক্ষা করছিলেন। শুদ্ধ ইংরেজ সৌজন্যে ভবনাথের করমর্দন করে সবার সংবাদ 'আমরা আজ গাড়িতে একসঙ্গে সীটে বসেই ভাল মেটাল আলাপ আবার ছাড়তে থাকেন।

'দেয়ার আর মোস্ট অফ ইওর ওয়েল এস্টাব্লিশড় ফ্যামিলি। সিটি ইজ দি সিটি। ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন ইট। সিটি ফানি।' অতঃপর তার আর্টিস্টি ঝামেলায় থাকলেই মুখে রুমাল চাপা দেন। চারদিকে ধুলো উড়ছে।'

'দা মিউনিসিপ্যালিটি ইজন্ট ফাংশানিং ভবনাথ,' ল্যাণ্ডি বললেন।

'ইয়েস স্যার, ইট'স ইন এন অফুল স্টেট।' অলওয়েজ গ্রাম্বলিং ফর ল্যাক অফ মানি।'

এবার দুধারে ঝাউয়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি যায় পাকা রাস্তা ধরে। ধুলোও কম।

'হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান সিন্স ইউ টুক ইট? ইউ হ্যাভ সিন দিস আর্থার, হ্যাভন্ট ইউ? ভেরী শর্ট, ভেরী ফ্যাট। ভেরী ডার্ক অ্যান্ড হি সেড—হোয়াই ডু ইউ বদার এবাউট বাইস প্রাইস জর্জ? আই নেভার টেক রাইস। ওনলি মাই সার্ভেন্টস ইট রাইস।'

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন সকলে।

'হোয়াট দিস নেটিভস আর এক্সাইটেড ইন কালচার্ড। দে স্পিক ইংলিশ অ্যাট হোম।'

CENTRAL LIBRARY

'আই নো, আই নো। আর সি সোজ গ্রীক্‌, যে স্পিক ইংলিশ অ্যাট হোম। আই হ্যাভ প্লেড টেনিস উইথ নলিনী। বাট আই মাস্ট সে, আর সিস রিমার্কস অ্যাট ক্যালকাটা ক্লাব লাস্ট নাইট ওয়াজ এক্সিডিংলি ফানি।'

'দে আর আওয়ার অ্যাসেটস জর্জ' গম্ভীরভাবে বললেন ব্র্যান্ডি। ভারতীয়দের ইংরেজীপনা নিয়ে ঠাট্টা ব্র্যান্ডির মনঃপূত নয়। ডিভিশনাল কমিশনার হলেও এবং উড়িষ্যার আদিবাসীদের জীবনযাত্রার যথেষ্ট সমাদৃত একখানা বই লিখলেও ব্র্যান্ডির মতে জর্জ ফকাস পুরনো জমানার লোক যে জমানায় সন্ত্রাসবাদীদের বোমা ছিল না, কংগ্রেসের বন্দেমাতরম্‌ ছিল না।

ইঞ্জিনের শব্দের নীচে ধীরে গলায় বললেন, 'উই আর পাসিং থ্রু ডিফিকাল্ট টাইমস জর্জ।'

জর্জের ফুর্তিতে টান পড়ে। তিনিও আস্তে আস্তে বলেন, 'ইয়েস দ্য টেররিস্টস আর এ নুইসেন্স।' তাঁর ফুর্তিতে জ্বলজ্বলে মুখখানাও হঠাৎ গম্ভীর দেখায়।

ব্র্যান্ডি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন মহকুমার অবস্থা কি রকম।

ভবনাথ বললেন গত রবিবার চোদ্দ পনেরো বছরের কয়েকটা ছেলে হঠাৎ আদালতে ঢুকে পড়ে, শার্টের নীচ থেকে ছোট ছোট তেরঙ্গা পতাকাগুলো বার করে বন্দেমাতরম শুরু করে। দু মাস করে জেল ঠুকে দিয়েছেন।

'ইয়েস, ডিল উইথ দেম ফার্মলি', ব্র্যান্ডি বললেন।

গাড়ি এস ডি ও বাংলোর কাছে আসবার আগেই আবার ধুলোর রাজত্ব।

ভবনাথ রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক দুর্দশার কথা জানালেন, শহরের মেয়েদের একটা ভাল হাই স্কুল হওয়ার কথাও বললেন।

ব্র্যান্ডি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'হোয়াট দোজ থিংস কেন ওয়েট ভবনাথ। লেট দ্য সিচুয়েশান সেটল দেয়ার ইজ নো হারি।'

ভবনাথ ভুরু কুঁচকালেন। ওপরওয়ালার আদেশে অভ্যস্ত হলেও ওপরওয়ালার অবজ্ঞা তিনি হাসিমুখে হজম করতে পারেন না। গোমড়া মুখে বসে থাকেন।

ফকাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লুক অ্যাট দোজ ট্রিজ, আর্থার। দে রিমাইন্ড মি অফ পপলার্স।' গেটের আগে রাস্তার দুধারে ঝাউয়ের সারি। গেটের পাশেই গাড়ি রাখতে বললেন ফকাস।

সামনেই অপেক্ষমান ভদ্রলোকের সারি, পেছনে একটু দূরে রোদ্দুরে তামাটে খালি গা এক সার ছেলেমেয়ে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, রাখাল সরকার এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা জানান, 'গুড আফটারনুন সার।'

পেছনে আর একজন পুলিশ অফিসার, সার্কেল অফিসার বেবির বাবা, হেডমাস্টার শ্যামবাবু নলিনী উকিল পেশকার সুরেন, ব্যবসায়ী বিলাসীপ্রসাদ। কেউ কেউ করমর্দন করেন, কেউ হাত জোড় করে নমস্কার করেন। বিলাসীপ্রসাদের বাগান থেকে কার্ণ দিয়ে জোড়া টকটকে লাল গোলাপের দুটো মালা একটা রুপোর থালায় নিয়ে বলাই আর্দালি দাঁড়িয়েছিল। পাশে নীল অর্গান্ডির ফ্রক পরা বুড়ী। উত্তেজনায় তার ছোট্ট বুকখানা উঠছে পড়ছে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ভবনাথ চারদিকে চেয়ে তাঁর ছোট ছেলেকে খোঁজেন। কিন্তু তার কোন পাত্তা পান না। ফকাস আর ব্র্যান্ডি এগিয়ে আসতেই পেছন থেকে বলাই আস্তে করে ঠেলে দেয় বুড়ীকে। রোদে পুড়ে তামাটে দেখায় বুড়ীর মুখ।

গলায় মালা দিতেই ফকাস বুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। হোয়াটস ইওর নেম, মাই গার্ল।'

'গায়ত্রী চৌধুরী' চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ী মরীয়াভাবে। এরপর যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বসে সাহেব, কথাটা মুহূর্তের জন্যে মনে থেকে যায় তার।

'ইওর ডটার' ভবনাথের দিকে চেয়ে ফকাস বলেন।

'ইয়েস স্যর।'

সাহেবদের গলাফেরত দুটো মালা বলাই হাতে ঝুলিয়ে পেছন পেছন আসে।

'হোয়াট আর দোজ ট্রিজ? বকুল আই সাপোজ। আই নো কোয়াইট এ লট অফ নেমস অফ ইণ্ডিয়ান ট্রিজ।'

'ইয়েস স্যর।'

মাঠের দক্ষিণে পুকুরের পাড়ে অনেকগুলো বকুল গাছ—টুটুল আর বুড়ীর দ্বিপ্রহর অভিযানের জায়গা। পুকুরের গায়ে সিমেন্ট বাঁধানো বেদী। এস ডি ও নবীন সেন এখানে পায়চারী করতে ভালবাসতেন। একবার কর্মবক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এনেছিলেন এ বাগানে। এখন পোড়ো জংলা জায়গাটা।

বাড়ির সামনের মাঠে ছায়া পড়েছে। ওখানে সাদা ধবধবে ঢাকা টেবিল পাতা হয়েছে জোড় দিয়ে। ফকির উর্দি পরে তদারক করছে।

ব্র্যান্ডি বললেন তাঁদের হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। পরের ট্রেনটাই ধরবেন ফিরতে।

এক ঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে টেবিলের একদিকে বসা জর্জ ফকাসের ফুর্তির মেজাজ আবার ফিরে আসে।

'আই সাম টাইমস ফিল, পিপল লাইক আর সি উইল গো অন ফর এভার ইন ইণ্ডিয়া, ইভন হোয়েন উই লীভ সাম ডে।'

শেষ কথাটা খুব মৃদু গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন।

'ডোন্ট সে দ্যাট জর্জ, ডোন্ট সে দ্যাট। ইফ উই লীভ দেয়ার উইল বি কেওস।'

'ডু ইউ থিঙ্ক সো?'

ব্র্যান্ডি চাপা অসহিষ্ণুতায় বললেন, 'আটার্লি। দে উইল বি লিভিং অ্যাজ দে ইউজড টু লিভ আন্ডার দ্য রাজা অফ আউধ। লুট, আর্সন অ্যান্ড ভায়লেন্স উইল বি অর্ডার অফ দ্য ডে।'

'টেক সাম সন্দেশ সার। দে আর ফ্রম ভীম নাগ, ক্যালকাটা,' ভবনাথ সন্দেশের প্লেট সামনে ধরে বললেন।

ফকাস একটা সন্দেশ তুলে নিলেন চামচে করে। ব্র্যান্ডি মাথা নাড়ালেন।

এস-পি রাখাল সরকার অনেকক্ষণ উসখুস করছিলেন ইংরেজী বলবার জন্যে। এবার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সন্দেশ ইজ গুড ফর হেলথ স্যর।'

ব্র্যান্ডি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে মাথা নাড়িয়ে হেসে অসম্মতি জানালেন।

'দা ডক্টর প্রেসক্রাইবড সন্দেশ টু মাই সান সাফারিং ফ্রম টাইফয়েড,' রাখাল সরকার আবার বললেন।

'ও রিয়্যালি?' ব্র্যান্ডির নীলচে চোখে চাপা বিদ্রূপ।

'হোয়াট এবাউট দা ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন, সারকার?'

'আন্ডার দা প্রেসেন্ট সারকামস্টেন্সেস কোয়াইট গুড সার। উই হ্যাভ রাউন্ডেড আপ দা সাসপেক্টস। দা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইজ ডুইং ফাইন।'

'সাম ট্রাবল অ্যাট শান্তিপুর?'

'ইয়েস সার। বাট আন্ডার দা প্রেসেন্ট সারকামস্টেন্সেস ইট ইজ অল রাইট।'

হান্টলী পামারের বিস্কুট দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে খেতে খেতে ফকাস মৃদু গলায় বললেন, 'আই নো হিম ফর দা লাস্ট টেন ইয়ার্স। বাট্‌ ফ্র্যাঙ্কলি......'

ফকাসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্র্যান্ডি চাপা গলায় বললেন, 'ফ্র্যাঙ্কলি হি ইজ এ গুড পোলিস অফিসার।' তারপর তেমনি চাপা গলায় বললেন কেমন ভাবে রাখাল সরকার অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইন্সপেকটরের পদ থেকে এখন জেলার পুলিস সুপার হয়েছেন।

চায়ের টেবিলে [illegible] অফিসের কথা ফকাসের পছন্দ নয়। তিনি জানেন ব্র্যান্ডি ইতিমধ্যেই খুব জবরদস্ত অফিসার নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর আর বছর তিনেক চাকরী। ডিভিশনাল কমিশনারের পর কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং। চীফ সেক্রেটারী বোধহয় হবেন না, তবে নির্ঘাত হোম সেক্রেটারী, তখন ব্র্যান্ডির মত দুঁদে জেলা শাসকদের সংস্পর্শ আরও বাড়বে। ফকাসের মনে হল এই যে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের চাকরীর একটা বাঁধা গত আ থেকে চাকরীর প্রথমদিকে উড়িষ্যার ছত্রিশগড় আর তার আশেপাশে কয়েক বছরের চাকরীটা ছিল একটু আলাদা। তখন বন্দেমাতরম আর বোমার হিড়িক এত ছিল না। সেই রোদে ঝোমরানো লাল পাথুরে রাস্তার ধারে ধারে নির্জন বিষণ্ণ ডাকবাংলো,

ঝাড়িয়ে শালবনে জালিকাটা জ্যোৎস্নায় ও'রাও যুবক যুবতীর নাচের তালে তালে বিলাপের সুর। স্মৃতি হুইস্কি পাশে প্রথম স্ত্রী রোজালিও।

পড়ন্ত রোদে ঘন বকুল বনের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ফকাস বলে উঠলেন, 'বাই দা ওয়ে, হোয়ারস ইওর ডটার ভবনাথ? শি রিমাইন্ডস সি অফ্ সাম ওয়ান।'

বুড়ী দূরেই দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে সাহেবদের চোখ দেখে, মাঝে মাঝে তাদের হাসি আর আলাপ শুনে শুনে সে অনেকটা ধাতস্থ। বাপের ডাকে সে এগিয়ে আসে।

'টেক এ বিস্‌কিট,' সাহেব বিস্কুটের প্লেট-টা এগিয়ে দেয়।

'কেন ইউ সিং?'

বুড়ী অন্দাজে মাথা নাড়ায়। 'নো? শিওরলি ইউ নো সাম্।'

বুড়ী বিহ্বলভাবে তাকায়। সাহেবটার বাদামী গোঁফ হাসিতে ভরা ছোট চোখ তার মোটের ওপর অপছন্দ নয়। কিন্তু সাহেব তো একটাও ঠিকমত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে না। নাম জিজ্ঞেস করার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হওয়া উচিত সে কোন ক্লাসে পড়ে। তার উত্তর সে ঠিক বলে দিতে পারে। বুড়ী তাই করল। তার ফ্রকের কোনটা এক হাতে সপ্শে ধরে স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'আই রিড ইন্ ক্লাস টু।'

ফকাস হো হো করে হেসে বললেন, 'ইউ রিড ইন ক্লাস টু? হাউ ওয়াণ্ডারফুল।'

'ওয়াণ্ডারফুলের' মানে বুড়ী জানত। এ হর্ষধ্বনি তার বাবা প্রায়ই উচ্চারণ করেন। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটাও ফস করে বলে উঠল, 'মাই ব্রাদার্স নেম ইজ্ অনিন্দ্য চৌধুরী।'

'ও দিস ইজ গ্রেট!' ফকাস বুড়ীকে কোলে টেনে তার কাটি নেড়ে দেন। ভবনাথের দিকে চেয়ে বলেন, 'হোয়ারস ইওর সান?'

'হি ওয়াজ হিয়ার সাম হোয়ার, হি ইজ ব্রাদার লাইক।'

'পুট হিম্ টু এ গুড স্কুল,' ব্রাণ্ডি বললেন।

'মাই এলডেস্ট সান ইজ ডিফারেন্ট, হি ইজ ভেরী সোশ্যাল,' ভবনাথ বললেন।

'হোয়ার ইজ হি নাউ?' ফকাস প্রশ্ন করেন।

'হি ইজ ইন প্রেসিডেন্সী কলেজ। হি ইজ এ ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। আই হোপ টু সেণ্ড হিম টু ইংল্যাণ্ড নেকস্টে ইয়ার ফর সিভিল সার্ভিস।'

'দ্যাটস্ ফাইন, দ্যাটস্ ফাইন।' ব্রাণ্ডি উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে ফকাসের উৎসাহ তাঁর না থাকলেও ভারতীয় রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে তাঁর আশা প্রবল। রাজকর্মচারীরা এই বোমা আর বন্দেমাতরমের অস্থির জলরাশির মধ্যে এক-একটি সুরক্ষিত পরিচ্ছন্ন দ্বীপ। ভারতবর্ষের আয়তনটা এত বড় যে, এই দ্বীপগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে একটা গোটা দেশে পরিণত করা যাবে না নিশ্চয় কিন্তু এগুলোর পরিধি বাড়ালে ব্রাণ্ডি মনে করেন ইংরেজ সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে।

'মাই সান ইজ গোইং টু কলেজ নেকস্‌ট ইয়ার। আই প্ল্যান অলসো সেণ্ড হিম টু ইংল্যাণ্ড।' এস-পি রাখাল সরকার কাটলেট খেতে খেতে চেঁচিয়ে উঠলেন টেবিলের এক কোণ থেকে।

ব্রাণ্ডি আবার মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ ফাইন, দ্যাটস্ ফাইন।'

ফকাস মিটমিট করে হাসলে।

মর্মাহত হল বাবুর্চি ফকির। কাটলেটের প্লেট বারে বারে সাহেবদের সামনে ধরেও কিছু হল না। বারে বারেই তারা ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। সাটিফেন এস-পি সাহেব, আর হেডমাস্টার শ্যামবাবু, পেস্কার সুরেন। সেদিকে চেয়ে ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চোখের ইসারায় ভবনাথ প্লেট সরিয়ে নিতে বললেন ফকিরকে।

বোধহয় তার বড় ছেলের সম্ভাব্য বিলেত যাত্রার জন্যেই ব্রাণ্ডি ভবনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ বোধ করেন। ভবনাথের টেনিস খেলার খ্যাতি ছিল, নেটে হাতের কাজ ভাল ছিল, একবার বোধহয় ব্রাণ্ডি খুব বিশ্রীভাবে হেরেও ছিলেন। ভবনাথের টেনিস খেলা কেমন চলছে জিজ্ঞেস করলেন। ভবনাথ জানালেন, রাণাঘাট ক্লাবের দুরবস্থার কথা। আর তাছাড়া ভাল পার্টনারের বড় অভাব। যাঁরা খেলেন, তাঁরা এত এলেবেলে যে, তাঁদের সঙ্গে খেলে খেলার মান নেমে যায়!

ফকাস ঘড়ি দেখলেন।। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় একঘণ্টা হয়ে গেছে। সমস্ত মাঠটা এখন ছায়ায় ঢাকা, বকুল বন আরও ঘন আরও কালো লাগে। এক ঝাঁক পানকৌড়ি আবার আকাশের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত উড়ে যায়।

ভবনাথ আঁচ করেন, এইটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়টাকেই ঠিকমত কাজে লাগানোকেই না স্বর্ণ ঝোপ বুঝে কোপ মারা বলে? এই সময়টার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের ওপরেই না মানুষের ব্যক্তিত্ব দাঁড়ায় যেমন তাঁর শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়েছেন। আর ভবনাথ টের পান ব্রাণ্ডিও তাঁর নীল চোখদুটো কেমন কোমলভাবে মেলে আছেন, যেন অপেক্ষা করছেন।

'উই মাস্ট রেজ আওয়ার গ্রান্টস টু দা মিউনিসিপ্যালিটি। দ্য রোডস আর ইন প্রিটি ব্যাড শেপ।' ভবনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন।

ব্রাণ্ডি ভুরু কুঁচকালেন। 'আই টোল্ড ইউ দিজ থিংস ক্যান ওয়েট। ইউ মাস্ট লুক টু দা আদার সাইড। দ্য চিটাগাং আরমারী রেড। দ্য নন-কোঅপারেশান মুভমেন্ট।'

'আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট ইজ ফোরচুনেট, কমপ্যারেটিভলি।'

'আই নো, আই নো। বাট হিউ কান্ট হি টু শিওর। দি টেররিস্টস মে কাম টুমরো হিয়ার।'

ভবনাথ আবার স্বর্ণ-র কথা স্মরণ করে। স্ক্রিনের বাইরে যেমন প্রম্পটার বারে বারে অভিনেতাদের মুখস্ত পার্ট স্মরণ করায়, তেমনি অদৃশ্যভাবে স্ত্রী স্বর্ণ ভবনাথের মুখে কথা জুগিয়ে দেয়। 'আই এম সরি স্যার, আই পোজড দ্যাট মিউনিসিপ্যাল প্রবলেম। বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার মাই কেস।'

এমন আচম্বিতে ভবনাথ কথাটা তোলেন যে, ব্রাণ্ডি হতবাক হয়ে পড়েন। বলেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

ভবনাথকে কিঞ্চিৎ বিহ্বল দেখায়। পর্দার অন্তরালে তিনি যেন প্রম্পটার স্ত্রীর দিকে কান পেতে আছেন। কিন্তু সেদিক থেকে কোন শব্দ আসে না। প্রম্পটার ঘুমিয়ে পড়েছে। ভবনাথ নিজের টেনিস খেলা নিয়ে বলতে পারেন এবং বেশ ভালভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু নিজের চাকরীর ব্যাপারে ঠিক জোর করে কিছু বলতে পারেন না। অস্পষ্টভাবে প্রশ্ন বালকের মতো অসহিষ্ণুতায় বললেন, 'হোয়েন উইল আই গেট এ ডিস্ট্রিক্ট?'

ব্রাণ্ডি তাঁর নীল চোখে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে থাকেন ভবনাথের দিকে। দুরকম ভারতীয়দের উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সহচর ভাল লাগে। যেসব ভারতীয় তাদের কথাবার্তায় হাবভাবে ইংরেজ ওপরওয়ালাদের 'ইউ আর মাই ফাদার-মাদার' বলতে পারেন অথবা যারা সমানে সমান টক্কর দিতে পারেন, দুর্বিনয়ের সামনে রাখতে পারেন দুর্বিনয়, হাসির সঙ্গে চীৎকার করে হেসে পাল্লা দিতে পারেন। এর মাঝামাঝি ভারতীয়রা উদ্ভিদসদৃশ, তাদের সম্পর্কে কোন দায় নেই। ব্রাণ্ডিরও অনুভূতি এব্যাপারে সমান। তাছাড়া এই বালকোচিত প্রশ্নের পেছনে বোধহয় ভবনাথের আন্তরিক তাগিদ নেই, এ-কথাটা ব্রাণ্ডির মনে খেলে যায়: এ-প্রশ্নটা এই টি-পার্টির চা-বিস্কুটেরই অঙ্গ বলে সে ভাবছে। কিন্তু এই প্রশ্নটা পাড়তে অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক সময় বুঝে তুলতে হয়। ব্রাণ্ডির মনে মনে একটা গোটা ইংরেজী বাক্য চলিত প্রবাদের স্বতঃসিদ্ধতায় ঝলকে ওঠে—যার টাকট নেই তার কিছু নেই।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'জর্জ, ইটস হাই টাইম উই গো।' তারপর সবাই উঠে পড়লে আস্তে আস্তে বললেন, 'আই রিমেম্বার ইউর কেস, অলরাইট। বাট ইউ উইল, হ্যাভ টু ওয়েট ফর সাম ইয়ার্স। দা টাইমস আর সো আনসার্টেন।'

আর লোকে যেমন একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে আরাম পায়, তেমনি আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভবনাথ,

ফকাসের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন, 'হোপ ইউ উইল বি বুলার নাউ।'

'ইউ নেভার নো' ফকাস বললেন সাহেবের ছাগভাঁড়' মাঠের দিকে চেয়ে। এতক্ষণ ঘাম হচ্ছিল, এখন ফির ফিরে হাওয়া বইতে থাকে।

'উই হ্যাভ এ নাইস টাইম', ফকাস বললেন ভবনাথের দিকে চেয়ে।

অভ্যাগতরা যখন মাঠ পার হচ্ছেন, তখন দেখা গেল চাপরাশী বলাইয়ের হাত ধরে টুটুল আসছে। পরনে ধোপদুরস্ত সাদা হাফ প্যান্ট শার্ট ইতিমধ্যেই সে বেশ ঘামসেছে। নতুন পালিশকরা কালো চকচকে জুতোর মাথা ধুলোর পুরু আবরণ ভেদ করে ঝিকিয়ে উঠছে। রোদ্দুরে মুখ-চোখ লাল।

'তোমার আজ যাবদ্ধ বললেন টুটুল-বাবু', বলাই চাপাগলায় ভর্ৎসনা করল।

টুটুল কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'আমি ইংরিজী বলব না, আমি ইংরিজী বলব না।' তারপর বস্ত্রাতির আলো থেকে তার চোখে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আমাকে নিয়ে যেও না বলে দিচ্ছি। আমি বন্দেমাতরম বলে দেব।'

'তার থেকে তুমি তোমার ঠাকুরদার বুলির গল্পটা করে দিও না সাহেবদের। আমাকে যেমন পড়িয়ে শোনাও।'

'আমি পারব না। নীলকমলের ইংরেজী কি? বুড়ীও জানে না।'

অতিথিদের কাছে এসে ইশারায় ভবনাথ ছেলেকে ডাকেন। তারপর ফকাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'হিয়ারজ মাই নটি বয়।'

ফকাস হাত বাড়িয়ে টুটুলের হাত ধরেন। তারপর ইংরেজী ছড়ার সুরে বলেন, নটি বয়, নটি বয়, হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন?'

টুটুল বললে, 'মাই নেম ইজ অনিন্দ্য চৌধুরী।'

বুড়ীর স্বতঃপ্রণোদিত দ্বিতীয় উত্তর ফকাসের মনে পড়ে যায়। বলেন, 'হোয়াট ক্লাশ ডু ইউ রীড ইন?

আই রীড ইন আই রীড ইন, টুটুলের আটকে যায়।

'নেভার মাইণ্ড, ইউ আর এ ফাইন ল্যাড।' তারপর মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করেন, 'টুমি কোঠায় ছিলে?'

টুটুলের মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাষার যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালে সে এতক্ষণ ধাক্কা খাচ্ছিল, আর যে প্রবল অসোয়াস্তির ভয়ে এতক্ষণ পালিয়ে বেড়িয়েছে, তা মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায়। মাঠের কোণটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ঐ যে বকুলবাগান দেখছো, ঐখানে ছিলাম। ওখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরটা একদম শুকনো। খালি কাদা। ওখানে চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়।'

ফকাস সব কথাগুলো বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। কিন্তু তার হাতের মধ্যে হাত রাখা কোঁকড়া চুলওয়ালা স্বাস্থ্যবান শিশুটির উৎসাহ তাকে স্পর্শ করে। চিংড়ি মাছটা বুঝতে পেরে বললেন, 'ভালো মাছ?'

'আমি কবিতা বলতে জানি। আমার ঠাকুরদার বুলি আছে জানো? দাদাবাবু এসেছিল না? দাদাবাবু দিয়েছে। শুনবে শুনবে?' হাত ছাড়িয়ে টুটুল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে, 'নীল কমলের আগে লাল কমল জাগে, আর জাগে তলোয়ার; দপ্ দপ্ করে ঘিয়ের বাতি জ্বলে, কার এসেছে কাল?'

কমাস হল বইখানা উপহার পাওয়ার পর এ ছড়া দুটো প্রায়ই সে আবৃত্তি করে। বকুলবাগানে গাছে কঞ্চি নিয়ে, কিংবা সন্ধ্যের পর রান্নাঘরে অন্ধকার উঠোন পার হতে হতে চীৎকার করে সে নিজেরই মনে সাহস সঞ্চার করে। এতক্ষণ বকুলবনের এই কর্মই চলছিল। ফকাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে টুটুলের দিকে চেয়ে থাকেন। ভবনাথ হেডমাস্টার শ্যামবাবু, সেক্রেটারি সুরেন অপ্রস্তুতভাবে সাহেবের দিকে তাকায়। বলাই কিন্তু মুগ্ধ। রোজ কাছারী যাবার আগে বাবু যখন খেতে বসেন সেই অবসরে তাকে ঠাকুমার বুলি শোনায় টুটুল। সে মুগ্ধভাবে তার গুরুর দিকে চেয়ে থাকে।

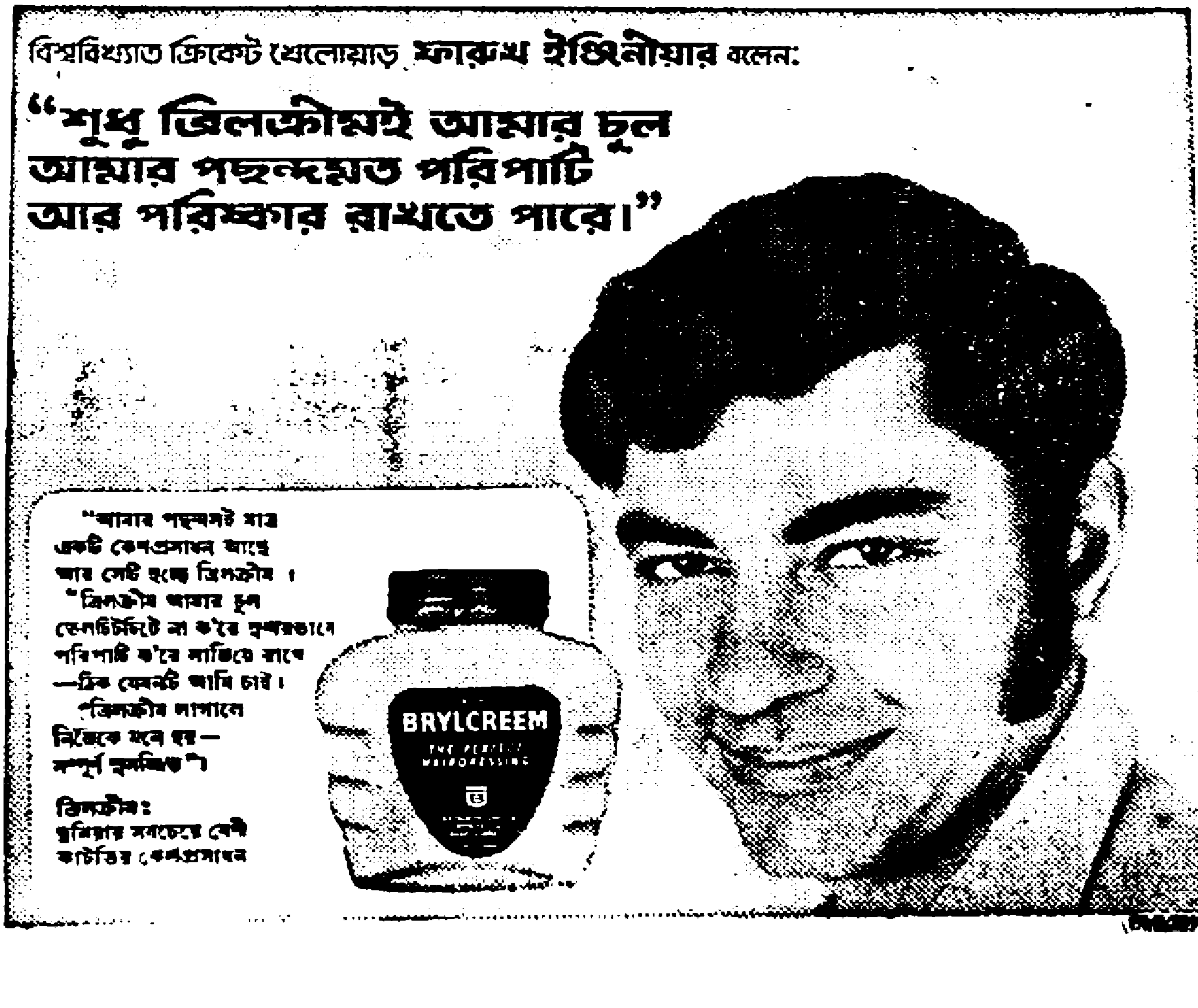

CENTRAL LIBRARY

'ইউ আর ভেরী জেন্টাল উইথ চিল-ড্রেন, ইউ মিসেস,' ব্রাণ্ডি বলেন।

'ইয়েস, দে আর দা সেম্ এভরি হোয়ার।'

(৫)

মাঠভর্তি শিশির ছিল ঘণ্টা দুয়েক আগে। এখন নটা বেজেছে। মাঠ এখনও ভিজে, খালি পায়ে ভেজা মাঠ পার হতে হতে বলাই দুবার হাঁচে। ঢাকের বাজনা আসছে চূর্ণী নদীর ধারে গ্রাম থেকে। বলাইয়ের শক্ত সোমত্ত সবল হাতের ডানা বাজারের থলির ভারে টনটন করে। মুখ উৎফুল্ল। ধুতির ওপরে পরা খাটো কুর্তা ঘামে ভিজে গেলেও হাসিতে উজ্জ্বল।

সামনের বারান্দায় এক কোণে ছায়ায় ঢাকা সিঁড়িতে বসে টুটুল গুহ ঠাকুরমার ঝুলি পড়ছে। আর দূরে কাঁচা বেল ভর্তি উঁচু গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিড় বিড় করে কি বলছে। ভেতরের উঠোনে এসে বলাই হাঁক দেয়, 'মা!'

সচরাচর যা করেন না স্বর্ণসুন্দরী আজ সকালে তাই করেছেন, পাটভাঙা মোটা লালপেড়ে শাড়ি পরেছেন। চুলে আঁচড়ও দিয়েছেন। বড়ছেলে আর মেজোমেয়ের কলকাতা থেকে আসার কথা।

অন্দরবাড়িতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে একটা টুলের ওপর বসেন স্বর্ণসুন্দরী। ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে বলাই জিনিস বার করে। সম্পূর্ণ উদাসীন গলায় স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মাছ?'

'সে তোমায় বলতে হবে না মা,' বলাই এক থালাই ভর্তি টকটকে লাল তাজা পাবতা ঢেলে দেয় দাওয়ায়।

'দাম কত?' নিস্পৃহ বিরক্ত গলা স্বর্ণসুন্দরীর।

'ছ আনা।'

'ছ আনা? সে কি রে?'

'কি বলছো মা, দেকসের মতো মাছ আছে। আর চেহারা দেখেছো?' বলাই কোমল রক্তাক্ত কটা মাছ চোখের ওপর তুলে নাচায়।

'থাক থাক, খুব করেছো। যত দিন যাচ্ছে তত অগ্নিমূল্যের বাজার। মানুষ খেয়ে পরে থাকবে কি করে?'

'যা বলেছেন মাগো! দশ আনা বারো আনায় ফুলকাটা শাড়ি কিনেছি, এই দু-তিন বছর আগে। আজ তুমি যে বলেছিলে শাড়ি আনতে, এনেছি দেখো, এমন কিছু আহামরি নয় মা। নিলে কত জানো? চোদ্দ আনা!'

বগল থেকে ফুলপাড় লাল শাড়িখানা বার করে বলাই। শাড়িটার দিকে একবার দীর্ঘ অপ্রসন্ন দৃষ্টি দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেন স্বর্ণসুন্দরী। তিনিও অবিকল এই শাড়ি ব্যবহার করেন। শাড়ির খোল হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বললেন। 'ভালই হয়েছে।' বলাইয়ের নতুন বউয়ের শাড়ির জন্যে যে পয়সা খর্চ করেছিলেন তা থেকে আনা-চারেক পয়সা বেশী খরচ করেছে বলাই। উড়িয়ে ভাবলেন, গোপীনাথ, মাছগুলো নিয়ে যাও। এখন কুটে ফেল। বুড়ো আসেনি—না? দেরী করবে না একদম। বাবুর আজও অফিস।'

ষষ্ঠীর দিনও ভবনাথকে কোর্টে যেতে হবে। দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিবাদে খুনের মামলা। আজও সাক্ষী আছে। ভবনাথ তাড়াতাড়ি কেসটা সারতে চান। ওদিকে জমি কেনার পর দক্ষিণ কলকাতায় তাঁদের বাড়ির ভিত খোঁড়া হচ্ছে। তদারক করতে পুজোর মধ্যেই একবার কলকাতা যাবেন। যাবার আগে হাতের কাজগুলো হাল্কা করতে চান।

ফাট ফাট থলি থেকে বলাই বার করতে থাকে এক আনায় একসের বেগুন, দু আনায় একসের আলু, দু পয়সায় গোটা মিট কুমড়ো চার আনায় সেরখানেক পাটালি, পাহাড় প্রমাণ শাক, কয়েক পয়সার মশলা লংকা—সর্বসাকুল্যে এক টাকায় বাজার। এছাড়া বলাইয়ের নতুন বউয়ের জন্যে স্বর্ণসুন্দরীর উপহার চোদ্দ আনায় লাল ফুলপাড় মিলের শাড়ি।

'দেখো, বউয়ের পছন্দ হয়।'

'না, মা, বউ আমার খুব পছন্দ,' বলাই নিজের মনেই বলে উঠল, 'আর রং যা ফেটে পড়ছে। ঠিক তোমার মত।'

'মরণ', স্বর্ণসুন্দরী হেসে ফেললেন। তরকারি কুটতে বসে বললেন, 'তোমার বউয়ের রং কেমন জিজ্ঞেস করিনি বলাই। আমি বলছি তোমার বউ-এর এ শাড়ি পছন্দ হবে তো?'

'হবে না? আমার মা যে শাড়ি গায়ে দেয় সে শাড়ি বেটির পছন্দ হবে না?'

চাপা উল্লাস আত্মপ্রসাদে ডগমগ করে বলাই। ষোল বছরের একহারা ফর্সা বউকে কাল নিয়ে এসেছিল। তার নিজের বয়স তিরিশ-বত্রিশ। খাকি উর্দি পরা বিশাল শাট জোয়ান বলাইয়ের পাশে যখন এক-হারা ছোটখাটো বউটা এসে দাঁড়াল তখন স্বর্ণসুন্দরীর বিসদৃশ লাগেনি। কারণ, বলাই তার প্রগলভতায় বয়সের পার্থক্য ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। হাওড়ার হাঁড়িমুখ আধবুড়ো নির্মল আর্দালী যখন বিয়ে করে নতুন একরত্তি বউ নিয়ে এসেছিল তখন স্বর্ণসুন্দরী অপ্রসন্ন না হয়ে পারেননি।

'এবারে পুজো কেমন হচ্ছে?'

'খুব ধুমধাড়াক্কা লেগেছে। পাল-চৌধুরীদের বাড়ি তিন দিন যাত্রা, কৃষ্ণ-সুদামা, সিরাজদ্দৌলা আর নদের নিমাই। আর রাত্তিরে সং আসবে শান্তিপুর থেকে। যাবে মা? এই একেবারে জেলখানা পর্যন্ত নিয়ে আসবে। আমি টুটুলবাবুকে নিয়ে যাব।'

'না না ওসব জায়গায় গেলে বাবু রাগ করবে। কিসব বিচ্ছিরি কুচ্ছিরি গান হয়।'

'ওদের ঘাড়ে মাথা আছে? সাহেব কুঠির কাছে হুল্লোড়? তিন মাস জেল ঠুকে দেব না?'

কাছারীতে উপস্থিত থেকে থেকে বলাইয়ের এ ধারণা জন্মেছে যে, সে এবং তার সাহেব অভিন্ন, সুতরাং সাহেবের জেল ঠুকে দেওয়া এবং তার জেল ঠুকে দেওয়া একই ব্যাপার। অন্তত এভাবেই সে জ্ঞাতি বন্ধুদের কাছে বলে থাকে। এবং সম্প্রতি রাণাঘাটের পরের স্টেশন পায়রা-ডাঙ্গায় জ্ঞাতিদের সংগে সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ হয় তারও সাম্প্রতিক নিষ্পত্তির অন্যতম কারণ বলাইয়ের এই রকম হাঁকিমী উক্তি। সে সাহেবকে বলে কিভাবে আইনের কত ধারায় ক' মাসের জেল ঠুকে দেবে সে আস্ফালন ব্যর্থ হয়নি।

'পুরাণ কাহিনী থাকবে, মহাভারত থাকবে। রাসের মেলার সময় যেমন হয় তেমনি হবে। কতগুলো মূর্তিতে রং চাপানো হয়েছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেও।'

বলাই স্বর্ণসুন্দরীকে যেমন জমিয়ে নিয়েছে অন্য কোন এস-ডি-ও গিন্নীকে পারেনি। ভবনাথের আগে কালিপদ মুখার্জী সাহেব ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে বলাই বলত মেমসাহেব, মা বলতে পারত না। আর কালো পেড়ে রুচ আঁটা ফরাস-ডাঙ্গা শাড়ি পরনে দিয়ে পাশ মিসেস মুখার্জী তার রিমলেস চশমার ভেতর থেকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন, তখন হড়বড় বলাইয়ের বাকশক্তি লোপ পেত। বর্তমান সাহেব আসার পর থেকেই গত দু বছরে তার ভাগ্য ফিরছে। বহুদিনের জমির বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছে। মুখার্জী সাহেবের আগে সদ্যোবিবাহিত নাগসাহেব এলেন এস-ডি-ও হয়ে তখন তার প্রথম পক্ষের ছেলে কলেরায় মরল, স্ত্রী মরল দু মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবকালে আকাশ ভেঙে পড়েছিল বলাইয়ের মাথায়। গত বছর থেকেই তার স্বাভাবিক স্ফূর্তি আবার ফিরে এসেছে। এ সাহেব যদি আরও দু-তিন বছর থাকতেন, বলাই আজ-কাল মাঝে মাঝে কল্পনা করে আনন্দ পায়, তার ভাগ্য তাহলে হয়ত আরও নতুন নতুন দিকে খুলে যেত।

'মায়েদের এখন কলকাতায় বাড়ি হচ্ছে। কলকাতায় গেলে মা তো চিনতেই পারবে না বলাইকে।'

'দূর। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। জমি কিনতেই এত টাকা পড়ে গেল। কবে বাড়ি হবে!'

'বড়দার বিলেত যাওয়া সব ঠিক?'

'দূর! কোথায়?'

'বড়দার বিয়ে দেবে না? এখনই তো বিয়ের যুগ্যি বয়েস।'

'আর বকিও না বলাই। গোপীনাথ, ভাপারে পাবতা মাছ করবে। প্রতাপ ভাল-বাসে। আর বড়ি দিয়ে ডগা দিয়ে একটা মাখামাখা তরকারী, টালটলে করবে না। বাবু একদম খেতে পারেন না। অড়হর ডালে হিংয়ের ফোড়ন। আর গাছে যদি চালতে থাকে, না থাক। আজ আর হবে না, দেরী হয়ে যাবে।' স্বর্ণসুন্দরী উঠে পড়েন।

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

শিল্পীর চোখে

উপেক্ষায় পড়ে আছি —রঘুনাথ সিংহ

কিছুদিন আগে রবীন্দ্র সদনে একটা নাটক দেখে বাড়ী ফিরছিলাম। সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে, হৈ হৈ করে কলকাতার রাত তখন উদ্দাম হয়ে উঠছে। রাস্তা জুড়ে ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কারের মিছিল। একটা বড় সাহেবী ক্লাবে বোধ হয় সেদিন কোন বড় উৎসব ছিল। মাইকে অ্যানাউনসারের গলা ভেসে আসছে : অমুক নম্বর গাড়ী জলদি। একদল দিশী বিলিতী সাহেব মেম বেরোচ্ছেন তো আর এক ঝাঁক ঢুকছেন। সন্তর্পণে ঐ গাড়ী আর অজানা মানুষের স্রোত ঠেলে এগুতে এগুতে হঠাৎ চোখে পড়ল উল্টোদিকে নিয়নের আলোয় ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারের এক কোণে এগজিবিশন হলটা। একটা হাসপাতালের করিডোরের মত পড়ে রয়েছে—কি সব ছড়ানো ছিটোনো সারা ঘরে। কৌতূহল হল তাই রাস্তা পেরিয়ে এসে উঁকি দিলাম। ঘরে ঢুকবার মুখে বাঁদিকে টেবিলে মাথা রেখে অল্প বয়সী (কারণ ঘাড়ের চামড়া সতেজ টান টান) একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে দেখে ফিরে আসছিলাম, কানে এল : আসুন। এখানে আমাদের স্কালপচার এগজিবিশন চলছে।

আধঘন্টা ধরে ঘুরে ঘুরে ওঁরা আমায় সেদিন ওঁদের কাজের নমুনা দেখিয়েছিলেন। আর ফেরার সময় বলেছিলেন, এখনো মনে পড়ে, আজ সন্ধ্যায় আপনি একাই শুধু দর্শক।

এই তো অবস্থা। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে কলকাতাকে নিয়ে যত গর্বই আমরা করি না কেন, মুষ্টিমেয় একদল রসিক ছাড়া গোটা সমাজটাই এসব ব্যাপারে উদাসীন। একটা ঘুড়ির লড়াই দেখতে রাস্তায় যে ভিড় জমে তার সিকির সিকিও দেখা যায় না ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে। কেন?—এই প্রশ্নই সেদিন করেছিলাম এ যুগের অন্যতম প্রধান ভাস্কর—রঘুনাথ সিংহকে।

মানুষটা ভেতরে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, খুব সুন্দর। প্রশ্নটি শুনলেন। মনে মনে ভাবলেন। তারপর ধীরে সুস্থে গুছিয়ে উত্তর দিলেন—শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার একটা প্রচণ্ড যোগ আছে একথা নিশ্চয়ই মানেন। ইউরোপে দেখেছি কলকারখানায় খেটে খাওয়া মানুষও ছুটির দিনে স্ত্রী কাচ্চা বাচ্চাকে নিয়ে ছোটে মিউজিয়ামে বা কোন পরিচিত শিল্পীর স্টুডিওতে। সামর্থ্য নেই যে অরিজিনাল কিছু কিনবে, তাতে কি, রেপ্লিকা কিনে এনে ঘরের ও মনের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে। এ কেমন করে সম্ভব হোল? এর কারণ খুঁজতে গেলে একটা উত্তরই পাব বলে আশা করি, তা হল ওদের শিক্ষা ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা মানুষকে প্রয়োজনের দাস করে তোলে না, তার মননের বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। আর সমস্ত শিল্পেরই তো মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুস্থ, সচেতন ও পুরোপুরি মানবিক করে তোলা। পড়াশোনা মানে তো কতগুলো বই গেলা। তার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কোথায়? জীবনকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা তা তো কোথাও পৌঁছে দেয় না। তাই দেখবেন হাল্কা, মোটা মোটা ব্যাপারে আমরা সবাই খুশী। সূক্ষ্ম কলাশিল্প আমাদের টানে না।

আর টানে না বলেই, আমরা যখন কাগজের পাতায় বিদেশী শিল্পীদের অরিজিনালগুলির নীলাম-দাম শুনে চমকে উঠি, মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই ওদের শিল্পপ্রীতিকে তখন আমাদের ঘরের যোগীন্দ্র শুধু দু মুঠি অন্নের সংস্থানে যেখানে সেখানে যা তা একটা কাজ জুটিয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখবার তাগিদে পাগল হয়ে ফেরেন। এই ধরুন না রঘুনাথ বাবুর কথা।

দু-পুরুষ আগে রঘুনাথরা ছিলেন হাওড়া জেলার [illegible] বাসিন্দা। ক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জী লেন ছিল ওঁদের আদি বাস। ঠাকুর্দা সদানন্দ সিংহ ডাক মাল সাপ্লাই-এর ব্যবসা করতেন। অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে ব্যবসা টেঁকাতে না পেরে সদানন্দ উত্তরপাড়ায় জাকপুরে ছোট ভাই-এর কাছে চলে যান। জাকপুরেই রঘুনাথের জন্ম। বাবা জগন্নাথ সিংহ ছিলেন ওভারসীয়ার। রঘুনাথেরা তিন ভাই ও এক বোন। ভাইবোনদের মধ্যে রঘুনাথ মেজ। ছেলেবেলা থেকেই রঘুনাথ পুরীতে মামাবাড়ীতে মানুষ। মামা ছিলেন স্কুল শিক্ষক।

—বাবার মাকে দেখেছি কি সুন্দর ছবি আঁকতেন, সেলাইয়ের কাজ করতেন। ঠিক তাঁকে দেখেই কি না মনে নেই আমিও ছেলেবেলা থেকেই কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে ছবি আঁকতাম। জাকপুরে বাড়ীর পাশেই ছিল কুমোর পাড়া। কুমোরদের চাক বন বন করে ঘুরত, আর দুটো সমান্তরাল হাতের তালে তালে পাক খেয়ে নানা রকম ঘর-গেরস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হয়ে উঠত। দেখতে দেখতে কেমন নেশা ধরে যেত। তখন আমিও ওদের পাশাপাশি মাটির তালে আঙুল বুলোতে শুরু করি।

পুরীতে যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আর একটি মানুষকে দেখলাম যাঁর এ ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। আমাদের আর্ট টীচার পূর্ণ সিংহ। মাস্টার মশাই চিরদিন আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। বাবা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না। যতদিন ছেলেমানুষী বলে ব্যাপারটা চলেছে, কেউ তেমন বাধা দেন নি, কিন্তু যখনই স্কুলের পড়া ফেলে মাটি ছেনে মূর্তি গড়ায় সকাল দুপুর সন্ধ্যা করে ফেলেছি তখনই উঠেছে যত আপত্তি। বাবা বলতেন, এসব করে কিসু হবে না। মামাও খুব সুনজরে দেখেন নি।

নাইনটিন ফর্টি সেভেনে চোদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। স্বাধীনতার বছর। দেশ স্বাধীন হোল। আমিও ঠিক করলাম এবার জীবন আমি স্বাধীনভাবে

পড়ে তুলব। বাড়ীতে সবাই আপত্তি করল। বাবা তো রেগে কাঁই। শুধু মা কিছু বলেন নি। কারণ তার দু বছর আগেই আমি মাকে হারিয়েছি। সবার সব আপত্তি অস্বীকার করে চলে গেলাম কটকে।

বিখ্যাত ওড়িয়া শিল্পী শ্রীমুরলীধর তালি তখন কটকে 'কলিঙ্গ স্কুল অব আর্ট' গড়ে তুলতে ব্যস্ত। পূর্ণবাবুর সাথে শ্রীতালির খুব জানাশোনা ছিল। সেই সুবাদেই মুরলীধরবাবু আমাকে তাঁর স্কুলে টেনে নিলেন।

স্কুলে তো ভর্তি হলাম, কিন্তু থাকা, খাওয়া, জামা-কাপড়, আঁকার সরঞ্জামের খরচ আসবে কোথা থেকে? বাড়ীর রাস্তা তো বন্ধ। মুরলীধরবাবু স্কুলেরই এক কোণে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আর পেট চালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বিভূতিভূষণ কানুনগো। বিভূতিবাবুর ওখানে বইএর ব্লক, সাইন-বোর্ড পেন্টিং, ইন্টিরিয়র ডেকরেশনের কাজ করে মাস গেলে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা আয় হোত। তাতেই আমার চলে যেত।

কিন্তু মন ভরল না। মুরলীধর বাবুর ইচ্ছে ছিল আমি হই পেন্টার। অথচ আমার বাসনা স্কালপটর হওয়ার। এদিকে কলিঙ্গ স্কুলের তখন টালমাটাল অবস্থা। সব দিক বিবেচনা করে দু বছর বাদে দুম করে একদিন কটকের পাট চুকিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। আমারই পরিচিত জনৈক ব্যবসায়ীর কলকাতার বৌবাজারে একটা আস্তানা ছিল। প্রথমে এসে উঠলাম ওখানেই। ভর্তি হলাম ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে।

ছ মাস বাদে অ্যাডমিশন টেস্ট উৎরে ভর্তি হলাম চৌরঙ্গীর গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে। কলেজেরই এক বন্ধু কার্তিক পাইন আমার থাকা খাওয়ার অসুবিধে দেখে নিজেই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের বাড়ীতে, গ্রে স্ট্রীটে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন, পাঁচ বছর কার্তিকদের বাড়ীতে থেকেই কলেজের পড়াশোনা চালিয়েছি।

বাড়ী বিমুখ। ফলে কলেজের মাইনে ও অন্যান্য খরচ অনেক কষ্টে তুলতে হোত। গ্রে স্ট্রীটে কার্তিকদের বাড়ীর কাছেই ছিল এক সাইন বোর্ড পেন্টারের দোকান। চিরকালই আমি আর্লি-রাইজার। ভোরে ঘুম থেকে উঠে লেগে পড়তাম কাজে। কলেজে যাওয়ার আগে ঘন্টা দু-তিনেক যা সময় পেতাম তাতে সাইন বোর্ড পেন্টিং ছাড়াও, বিভিন্ন কনফিউমার গুডসের শো-কেস, বুক কভার ইত্যাদি করে দুটো পয়সা রোজগার করতাম। আর ফার্স্ট ইয়ার থেকে কখনো কলেজের মাইনে লাগে নি। স্কলার-সিপ পেয়েছি—নইলে আর উপায় কি ছিল বলুন?

ঝকঝকে হাসিতে সারাটা মুখ ভরে উঠল। ও-মুখে কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের ছাপ নেই। এ যেন একটা খেলা। যোগদানের আনন্দেই শিল্পী বিভোর। একটু থেমেছিলেন রঘুনাথবাবু, আমি আবার উস্কে দিলাম, তারপর?

তারপর এইভাবে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। পঞ্চান্ন সালে পাশ করে বেরোলাম। হাতে কোন কাজ নেই। কি করি? শুরু করলাম ফ্রি-ল্যান্সিং, যা ছেলেবেলা থেকেই করে আসছি। বিভিন্ন কমার্শিয়াল ফার্মের ইন্টিরিয়র ডেকরেশন থেকে শুরু করে অর্ডারী মূর্তি গড়ার কাজ—সব করেছি।

কাজের সুবিধা হবে বলে পাইনদের সুখচরের (সোদপুর) ঠাকুরবাড়ীতে তখন থাকতাম। কোম্পানীর কাজ করতে করতে বাড়তি পড়তি যা মালমশলা পেতাম তাই দিয়েই চালাতাম নিজের স্বপ্নগড়ার কাজ। প্লাসটার, রি-ইনফোর্সড কনক্রিট, সিমেন্ট যখন যা পেয়েছি তাই দিয়েই কাজ করেছি, থেমে থাকি নি কখনো। এরই মধ্যে আটান্ন সালে ভারত সরকারের একটা স্কলারসিপ পেয়ে চলে গেলাম বরোদায়।

মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীশঙ্কর চৌধুরীর কাছে শুরু করলাম কাজ। দু বছর ছিলাম বরোদায়। বরোদার স্মৃতি কিছুতেই মোছে না—এমন সুন্দর পরিবেশ, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটা কাজের গন্ধ ম ম করত।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটি বছর। বরোদার পড়াশোনা শেষ হতে, আর কল-কাতায় ফিরলাম না, স্ট্রেট চলে গেলাম দিল্লী। তিন বছর ফ্রি-ল্যান্সার হিসাবে কাজ করেছি ওখানে। তেষট্টিতে ইতালী সর-কারের একটা স্কলারসিপ পেলাম। এক বছরের। আবার আমার আস্তানা পাল্টাল।

এবার আর দেশে নয়, বিদেশে। নেপলসে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে শুরু হোল আমার জীবনের আর এক অধ্যায়। এমিলিও গ্রেকো ছিলেন আমার মাস্টার মশাই। এ এক অদ্ভুত লোক। জগৎ জোড়া নাম। অথচ কোনদিন কারুর ওপর নিজের ইচ্ছের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিতেন যার যেমন ক্ষমতা সেইটুকু যাতে নিজের মত করে ডেভলপ করতে পারে। ঠিক এই জায়গাতেই দেখেছি আমার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের মাস্টার মশাই প্রদোষবাবুর সঙ্গে ও'র আশ্চর্য মিল। প্রদোষ দাশগুপ্ত কোনদিন আমার ওপর কিছু ইমপোজ করেন নি।

অনেক অনেক ঘুরেছি আমি ঐ এক বছরে। দেখে বেড়িয়েছি প্রাচীন রোমক ও মধ্যযুগীয় পুরাকীর্তির স্বাক্ষর। রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, কারারা, পিয়েত্রা সান্তা, অরভিয়েতো, সিসিলি। ইতালীর বাইরে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইডেন। ঘুরে ফিরে দেখে শুনে একটি ধারণাই হয়েছে, পুরোনোকে নকল করে মডার্ন হওয়া যায় না। শিল্পী নিজেকে এক্সপ্রেস করার জন্য যে কোন মেটিরিয়াল দিয়েই মনের ব্যাপার স্যাপারগুলোকে ফুটিয়ে তুলবে। পাথর, সিমেন্ট, কংক্রিট, ব্রোনজ জোটে তো ভাল, না জোটে তো তুলে নাও অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, যে কোন সস্তা সস্তি মেটাল। পার্মানেন্ট মেটি-রিয়ালের দাম বেশী। কিন্তু শিল্প যে কোন মেটিরিয়ালেই তো মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। রসিক মানুষ শিল্পেরই কদর করে, মেটি-রিয়াল সেখানে বাহ্য।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। চৌষট্টিতে স্কলার-সিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। ফিরে এলাম আবার এই কলকাতায়। আমার বয়স তখন একত্রিশ। একটা কোন পাকাপাকি অবলম্বন দরকার যাকে আশ্রয় করে পেট ও শিল্প দুই-ই চলতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই চাকরী নিলাম হ্যান্ডিক্রাফট বোর্ডের আঞ্চলিক অফিস ডিজাইন সেন্টারে। কাজটা হোল কাঁচ বা সেরামিকের ওপর নানা রকম ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা যা নিয়ে হস্ত-শিল্পীরা তাদের কাজগুলোকে নিখুঁত ও সুন্দর করে তুলবেন। গত সাত বছর আমি তাই ক'র যাচ্ছি। অথচ সকলেই জানে রঘুনাথ সিংহ ভারত বিখ্যাত ভাস্কর।

—সাধনেন্দু

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫·৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০	দি হাউস অফ্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫·০০	পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
সোমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫·০০	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·০০	টেগোর অন্ লিটারেচার অ্যান্ড এস্থেটিক্স
রবীন্দ্র রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার	১২·০০	রবীন্দ্র-সুভাষিত
ডক্টর ননীলাল সেন	১৫·০০	এ ক্রিটিক্ অফ্ দি থিওরিজ অফ্ বিপর্যয়
শ্রীকানকুক মেনন	২৫·০০	ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডানসেস
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬·০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর মানস রায়চৌধুরী	১৫·০০	স্টাডিজ ইন্ আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬·৫০	রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন্ বেঙ্গল

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—১

হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের পতন

১৯৪০ সালের মে মাসে কেবল নরওয়ে ও ডেনমার্ক অতিক্রান্ত এবং অতর্কিত দখলের দ্বারাই জার্মানী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল না, তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, দূরপ্রসারী এবং চরম যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যাহা আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসে Western Front নামে বিখ্যাত। কিন্তু এই যুদ্ধের আগে ইউরোপের আকাশ যদিও সর্বত্র রক্তমেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তথাপি এর আকস্মিক ভয়াবহ বিস্ফোরণ সম্পর্কে পশ্চিম জগতের রাজধানীগুলিতে তেমন কোন গভীর উৎকণ্ঠা ছিল না, কিম্বা তা প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক আয়োজন ছিল না। অথচ এই বছরের গোড়ার দিকেই ইউরোপের অন্তত ২ কোটি লোককে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান জানান হইল এবং অস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিতে নূতন করিয়া ধূম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। মার্কিন ঐতিহাসিক লুইস স্নাইডার তাঁর গ্রন্থে (দি ওয়ার ১৯৩৯—১৯৪৫) বলিয়াছেন যে, মিউনিক চুক্তির বছরে বা ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর সৈন্যবাহিনীগুলিতে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি সৈন্য বৃদ্ধি পাইল, নৌবহরগুলির বৃদ্ধি পাইল মোট ৮০ লক্ষ টনেজ, মিলিটারী প্লেন প্রায় ৫০ হাজার এবং পৃথিবীব্যাপী মোট সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ১৭০০ কোটি ডলারে। এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার নয়। আর ১৯৩৯ সালে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন শক্তিগুলির — যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড একত্রে ছিল ১৮২ ডিভিসন সৈন্য, অপর পক্ষে জার্মানী ইতালী হাঙ্গেরী ও স্পেন বা অক্ষশক্তিবর্গের এই কোয়ালিশনের ছিল ১০৯ ডিভিসন সৈন্য। তার যে কোন দুইটি ইউরোপীয় নৌবাহিনী অপেক্ষা একা বৃটিশ নৌবহরই অনেক বেশী শক্তিধর ছিল। সৈন্য শক্তির মত উভয় কোয়ালিশনের রণ-বিমানের শক্তিও (৮৫০০) বোধহয় সমান ছিল। কিন্তু পোল্যান্ড ও নরওয়ের যুদ্ধের সঙ্কটে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অপদার্থ ও উদাসীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং চারদিকের তুমুল রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে লণ্ডন ও প্যারিসে তোষণবাদী পুরাতন নেতৃত্ব যখন বিদায় নিল, তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কারণ, হিটলারী জার্মানীর আধুনিকতম যান্ত্রিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর যেমন কোন সর্বাত্মক যুদ্ধের আয়োজন ছিল না, তেমনি নেতৃত্বের মধ্যেও কোন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং ১০ই মে উইনস্টোন চার্চিল যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর এবং পল রেণো ফরাসী মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন উহার আগেই মিত্রপক্ষ জার্মানীর অভাবনীয় সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক অভিযানের সম্মুখীন হইলেন। আর একটি মহাবিপর্যয়ের এবং সর্বনাশের যবনিকা পৃথিবীর সামনে উদ্ঘাটিত হইল।......

হল্যান্ড

......৯ই মে, ১৯৪০ — হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লাক্সেমবার্গ ও ফ্রান্সের উপর নিশীথ রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকার নামিল। নাগরিকেরা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ইহার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা, বিশেষভাবে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী কিভাবে সময় কাটানো যায় তাহা লইয়া ব্যস্ত ছিল। তাদের অবসর-প্রমোদ একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং জার্মান বেতারে প্রচার করিতেছিল যে বেলজিয়াম ও ফরাসী ফ্রন্টে সাবধান! 'জল সামলাও'— এই ছিল তাদের দৈনিক বাণী। বৃটিশ সৈন্যরা চাঁদা-চসবাজি করিয়া সময় কাটাইল।

এই মানাবস্থির ৮ মাস কাটিবার পর ৯ই মে গভীর রাত্রি আসিল। এই রাত্রির কথা বিস্তৃত করিয়া কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিতেছেন :—

জার্মান দূতাবাসে (রোমের) পরীক্ষা-মূলক ডিনার খাইলাম। [illegible] পর দীর্ঘকাল অতিবাহনে এবং একাধিক্রমে আলাপ—হরেক রকম কথাবার্তা যাহা জার্মানদের সঙ্গে সম্ভব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি কথাও হইল না। রাত্রি ১২টা ২৫ মিনিটের সময় যখন আমরা দূতাবাস হইতে চলিয়া আসি তখন ভন ম্যাকেনসন (জার্মান রাজদূত) বলিলেন, সম্ভবত রাত্রে তিনি আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন। কারণ বার্লিন হইতে একটা বার্তা আসিবার কথা আছে। সুতরাং তিনি আমার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর টুকিয়া লইলেন।

'রাত্রি ৪টার সময় তিনি আমাকে টেলিফোন করিয়া বলিলেন যে, মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন এবং আমরা দুইজনে মিলিয়া 'ডুচের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। শেষ রাত্রি ঠিক ৫টার সময় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে (বার্লিন হইতে)। অকস্মাৎ কেন এই সাক্ষাৎ? — এই সম্পর্কে তিনি টেলিফোনে কিছু বলিতে অক্ষম। যখন তিনি (ম্যাকেনসন) আমার গৃহে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে এক গাদা কাগজপত্র দেখিলাম। নিশ্চয়ই টেলিফোনে এইগুলি কাগজপত্র আসে নাই।......

দুইজনে মিলিয়া আমরা 'ডুচের' কাছে গেলাম। তাঁকে আমি পূর্বেই সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিলাম। সুতরাং তিনি আগেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁর মুখ হাসি-হাসি এবং তাঁকে স্থির দেখিলাম। তিনি হিটলারের নোটগুলি পড়িলেন। কেন হল্যান্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণ করা হইয়াছে, সেই কারণগুলির একটি তালিকা এই সমস্ত নোটে ছিল। উপসংহারে হিটলার সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন মুসোলিনীকে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। তারপর 'ডুচে' দীর্ঘকাল ধরিয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করিলেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পর ভন ম্যাকেনসনকে বলিলেন যে, তিনি নিশ্চিত উপলব্ধি করিতেছেন যে, ফ্রান্স ও বৃটেন বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের মধ্য দিয়া জার্মানীকে আক্রমণের আয়োজন করিতে-ছিল। সুতরাং তিনি সর্বান্তঃকরণে হিটলারের কার্য অনুমোদন করিতেছেন।'*

৯ই মে শেষ রাত্রে কোন নগরীর এই ক্ষুদ্র নাটিকা, যখন নিদ্রামগ্ন ডাচ ও বেল-জিয়ম নাগরিকদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল আকস্মিক বোমা ও গোলাবর্ষণের শব্দে। যুদ্ধের গুজব তারা দীর্ঘকাল যাবৎ শুনিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু উহার বাস্তবতার দিকে তাদের বিশ্বাস ছিল না। বিশেষত তারা ছিল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে হিটলার ইতিপূর্বেই গ্যারান্টি দিয়াছিলেন একাধিকবার।

---

*Ciano's Diary'—page 245-46

কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মারফৎ এই সাঙ্কেতিক বার্তা পাইলেন—"Tomorrow at dawn, hold tight". তৎক্ষণাৎ হল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এইচ জি উইঙ্কেলম্যান আত্মরক্ষার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ ও সমুদ্রপথ সক্রিয় হইয়া উঠিল—সমুদ্রে বিস্ফোরণ ঘটিতে লাগিল চুম্বক মাইনের জন্য। রাত্রি ৩টার সময় জর্মান বিমান দেখা দিল হল্যাণ্ডের আকাশে এবং বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষিত হইল। ইহার পরেই জানা গেল যে, জার্মান সৈন্যেরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহার তিন ঘণ্টা পর জার্মান দূত কাউণ্ট ভন জেখ ওলন্দাজ গভর্নমেন্টকে জানাইলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের ভিতর দিয়া এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল আক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছে বলিয়া রাইখ গভর্নমেন্ট বাধ্য হইয়াই হল্যাণ্ড দখল করিতেছেন।......

কেবল ওলন্দাজদের দেশই নহে, বেলজিয়ম, লাকসেমবুর্গ ও ফরাসী সীমান্ত একযোগে আক্রান্ত ও অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং ১০ই মে ভোর বেলা শুরু হইল ইতিহাস প্রসিদ্ধ পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ, যাহা ১৯১৪—১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল এবং এবারও সেই ভয়াবহ পরিণতির সূত্রপাত করিল।

পাঁচ দিনের মধ্যে হল্যাণ্ড খতম হইয়া গেল, যার আয়তন মাত্র ১২৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮৭ লক্ষ। কিন্তু দেশটা কৃষিকার্য এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশে ঐশ্বর্যশালী, লোভনীয় এবং সমুদ্রতীরবর্তী ও জলপ্রধান বলিয়া যার নৌবহরও উল্লেখযোগ্য ছিল। আর উত্তর সমুদ্রের উপকূলবর্তী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম ইংলণ্ড আক্রমণের পক্ষে অনুকূল, অবরোধ কার্য করিবার পক্ষে উপযোগী এবং ফ্রান্সের পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিবার পক্ষে চমৎকার। আর জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন বলিয়া দ্রুত আক্রমণের পক্ষেও আদর্শস্থানীয়। সুতরাং হিটলারী বিবেচনায় এই সমস্ত ক্ষুদ্র দেশের নিরপেক্ষতা টিকিতে পারে না, জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হওয়াই ইহাদের একমাত্র অদৃষ্ট।

কাগজ-পত্রে হল্যাণ্ডের ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। কিন্তু তাদের না ছিল অস্ত্রসজ্জা, কিম্বা আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কোন সমরোপকরণ। সুতরাং ঝড়ের বেগে জীর্ণপত্রের মত ওলন্দাজেরা উড়িয়া গেল নাৎসী বোমারু মুখে। ১০ই মে ভোরবেলা হইতেই অজস্র বোমারু, প্যারাস্যুট সৈন্য, বিমানবাহিত সৈন্য এমন কি বিভিন্ন জলপথে স্টীমারের নৌকাযোগে আনীত সৈন্য হল্যাণ্ড যেন ছাইয়া গেল।

কাগজে-পত্রে সৈন্য সংখ্যার মত হল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার একটা প্ল্যানও জেনারেল উইঙ্কেলম্যান ঠিক করিয়াছিলেন। বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডকে একত্রে 'নীচু জমির দেশ' বলা হয় এবং সমুদ্র তীরবর্তী এই দেশগুলি প্রভৃতি নদী, খাল জলাভূমি ও জলপথের দ্বারা আকীর্ণ। ফলে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই দেশগুলি বরাবরই জলপথের এই প্রতিবন্ধকগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং উত্তর হল্যাণ্ডের জুইডার জী জলপথ, যাহা ভিতরের দিকে প্রশস্ত খাড়ির মত অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছে, সেই অংশে, ইজেল নদীপথ ধরিয়া (জার্মান সীমান্ত) এবং তারপর হল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানায় গ্রীব্ লাইন এবং দক্ষিণে পীল-র‍্যাস জলাভূমি ধরিয়া আত্মরক্ষার লাইন তৈয়ারীর চেষ্টা হইল। পূর্ব দিকের এই লাইনগুলিকে আত্মরক্ষার প্রথম সীমান্তবর্তী সারি বলা যাইতে পারে। এগুলি ডাঙ্গিয়া গেলে ভিতরের দিকে খাস 'হল্যাণ্ড দুর্গের' লাইন ধরিয়া বাধা দেওয়া হইবে—আমস্টারডাম এলাকার জুইডার জী জলপথ, মোয়েরডিক জলপথ ও সেতু পর্যন্ত আত্মরক্ষার এই ব্যূহ প্রসারিত ছিল।

কিন্তু জার্মানদের কাছে এই সমস্ত অতিপরিচিত এবং অতিতুচ্ছ ছিল। তারাও তিন অংশ ধরিয়া আক্রমণ চালাইল, যথা—(১) উত্তর হল্যাণ্ড পূর্ব ও পশ্চিমে জুইডার জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু জুইডার জী বাঁধের দ্বারা এই দুই অংশকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্বাংশে গ্রোনিনজেন ও ফ্রিসল্যাণ্ড প্রদেশ ধরিয়া জার্মানীরা জুইডার জী বাঁধ অভিমুখে উত্তর হল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। (২) হল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশে গ্রীব্ লাইন ধরিয়া এবং তারপর আরও ভিতরের দিকে 'হল্যাণ্ড দুর্গ' অভিমুখে, যাহাকে 'নিউ ডাচ ওয়াটার লাইন'ও বলা হইয়া থাকে, সেখান দিয়া দ্বিতীয় আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। (৩) তৃতীয় আক্রমণ ঘটিল নিউজ বা মাস নদী এলাকা বা দক্ষিণ হল্যাণ্ডের পীল-র‍্যাস অঞ্চল দিয়া মোয়েরডিক সেতু, জীল্যাণ্ড (সমুদ্রোপকূলবর্তী) এবং বেলজিয়ম অভিমুখে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লাকসেমবুর্গ ও ফ্রান্স—এই দেশগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত বলিয়া একই রণনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ একটা শিকলের মত ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত ছিল। আবার হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের উত্তর পার্শ্বদেশ ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ডেনমার্ক ও নরওয়ে আগেই দখল হইয়া যাওয়ায় হল্যাণ্ডের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল, আবার হল্যাণ্ডের দ্বারা বেলজিয়ম এবং বেলজিয়মের দ্বারা লাকসেমবুর্গ ও ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল। এজন্যই জার্মান অভিযানও একই সঙ্গে এই সমস্ত দেশগুলিকে আক্রম এবং বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

জল, স্থল ও আকাশ, তিন পথেই জার্মান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই প্রবল আক্রমণের মুখে ওলন্দাজেরা কোথাও দাঁড়াইতে পারিল না। ম্যাস নদী মোহনায় মোয়েরডিক সেতু ছিল খাস হল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে আক্রমণের পক্ষে প্রধান যোগসূত্রের মত। এখানকার দুইটি বৃহৎ সেতুই অক্ষত ছিল। জার্মানরা প্রথম দিনেই সেতুগুলি দখল করিয়া লইল এবং উহার আগেই বহু প্যারাস্যুট সৈন্য ও বিমানবাহী সৈন্য ওয়ালহ্যাভেন, রোজেন, সিফোল, হেগ, রটারডাম, আমস্টারডাম ইত্যাদি বিমানঘাঁটি ও শহর ছাইয়া ফেলিল। নিদারুণ বোমাবর্ষণে ঘাঁটিগুলি ও এরোপ্লেন বিধ্বস্ত বা বেদখল হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে জনসাধারণ ও ওলন্দাজ হাইকম্যাণ্ড বিহ্বল, বিমূঢ় এবং তাঁদের আত্মরক্ষার নক্সা একবারে বানচাল হইয়া গেল। এর সঙ্গে আবার পঞ্চম বাহিনী সক্রিয় হইয়া উঠিল। হল্যাণ্ডে বহু জার্মান বাসিন্দা ছিল এবং তারা জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যের পক্ষপাতী ছিল। এ ছাড়া হিটলার ও নাৎসীভক্ত লোকও অনেক ছিল। তারা ডাকহরকরা, পুলিশ, ট্রাম কণ্ডাক্টার, এমন কি পাদ্রী ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেও জার্মান বিমান ও সৈন্যদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। জার্মান পরিচারিকারা কয়েকটি ক্ষেত্রে 'গাইড' হিসাবেও কাজ করিয়াছিল এবং রাত্রিবেলা ছাদ বা বাতায়ন হইতে আলো জ্বালাইয়া বিমান বহরকে 'সিগন্যাল' করিয়াছিল। জেনারেল ভন স্পোনেক নামে একজন নিহত জার্মান সেনাপতির মৃতদেহে এই সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছিল। *(২)

১০ই মে তারিখ জার্মান বিমান ও ছত্রী সৈন্যেরা হেগের রাজপ্রাসাদে বোমাবর্ষণ করিয়া রাণী উইলহেলমিনা, প্রিন্সেস জুলিয়ানা এবং রাজপরিবারের অন্যান্যকে ধরিবার চেষ্টা করে। ছত্রী সৈন্যেরা এই উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদ ঘেরাও করিয়াছিল। কিন্তু রাণী উইলহেলমিনা ও অন্যান্য সকলে কোনমতে ত্রাণ লাভ করেন এবং ১৩ই তারিখ একটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে হল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লাভ করেন।

এদিকে সর্বত্র আগুনে বোমা, অতিবিস্ফোরক বোমা ও মেসিনগানের গুলী বিমান হইতে বর্ষিত হইতে থাকে এবং যান্ত্রিক সৈন্য দল ওলন্দাজদের প্রতিরোধ ব্যূহ চূর্ণ করিয়া দ্রুত ধাবমান হইতে থাকে। ১৪ই মে বেলা ১টার সময় জার্মান বোমারু রটারডাম শহরে বোমা মারিয়া শহরটির কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করিয়া ফেলে। কয়েক হাজার লোক রটারডামের বোমাবর্ষণে হতাহত হইয়াছিল।

উত্তর হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ সৈন্যেরা ১০ই তারিখ রাত্রে জুইডার জী বাঁধ ধরিয়া একবারে উত্তর-পশ্চিম তীরের ডেন হেলডারে পশ্চাদপসরণ করে এবং জার্মানরা তাহাদের পিছু ধাওয়া করে। দক্ষিণ দিকে তাহারা

The Second Great War — Hammerton & Gwynn, Vol page 15-17

মাস বা মিউজ নদী এবং ইজেল নদী পার হইয়া যায়। ১৩ই তারিখ তাহারা গ্রীব লাইন দখল করিয়া লইল এবং ১৪ই তারিখ জার্মানরা খাস 'হল্যান্ড দুর্গে' প্রবেশ করিল।

১৩ই তারিখই দক্ষিণ হল্যান্ডের পীল-র‍্যাস ব্যূহ পরিত্যক্ত হইল এবং ১৪ই তারিখ ওলন্দাজেরা এই অংশেও একেবারে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিল। এদিকে ১৩ই তারিখ জার্মান মোটোরাইজ্ড সৈন্য দল মোয়েরডিক সেতুপথ দিয়া রটারডাম ও হল্যান্ডের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিল। ওদিকে বেলজিয়মের উত্তর পার্শ্বদেশও তখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আর প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ১৪ই তারিখ সন্ধ্যা ৮টার সময় ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল উইন্কলম্যান যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন এবং ১৫ই মে, বেলা ১১টার সময় হল্যান্ড জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল।

এভাবে মাত্র ৫ দিনের মধ্যে হল্যান্ড বিধ্বস্ত, পরাজিত ও পদানত হইল এবং এই যুদ্ধ নিতান্তই ছিল এক তরফা। কারণ ওলন্দাজদের পক্ষে সংগ্রাম করার কোন সুযোগ ছিল না।

বেলজিয়াম

হল্যান্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষা প্রায় একই সূত্রে বাঁধা ছিল। কিন্তু হল্যান্ড ও বেলজিয়াম নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় ইঙ্গ-ফরাসীর সঙ্গে ইহাদের সামরিক মৈত্রী এবং আত্মরক্ষা ও রণক্রিয়ার বিস্তৃত কোন পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে স্থির করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জার্মানী ইহাদিগকে পরস্পরের কাছ হইতে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিবার অভূতপূর্ব সুযোগ পাইল। নিরপেক্ষতা বা দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার কোন প্রয়োজন নাৎসী জার্মানী অনুভব করিল না। সুতরাং হল্যান্ডের মত বেলজিয়ামের অদৃষ্টেও একই দুর্বিপাক ঘনাইয়া আসিল।

বেলজিয়াম ও ফরাসী সীমান্তের লাক্সেমবুর্গ ১০ই মে তারিখ রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই আক্রান্ত হইল।* আক্রমণের পর সকাল সাড়ে ৮টার সময় জার্মান রাজদূত বেলজিয়ান পররাষ্ট্রসচিব মঃ

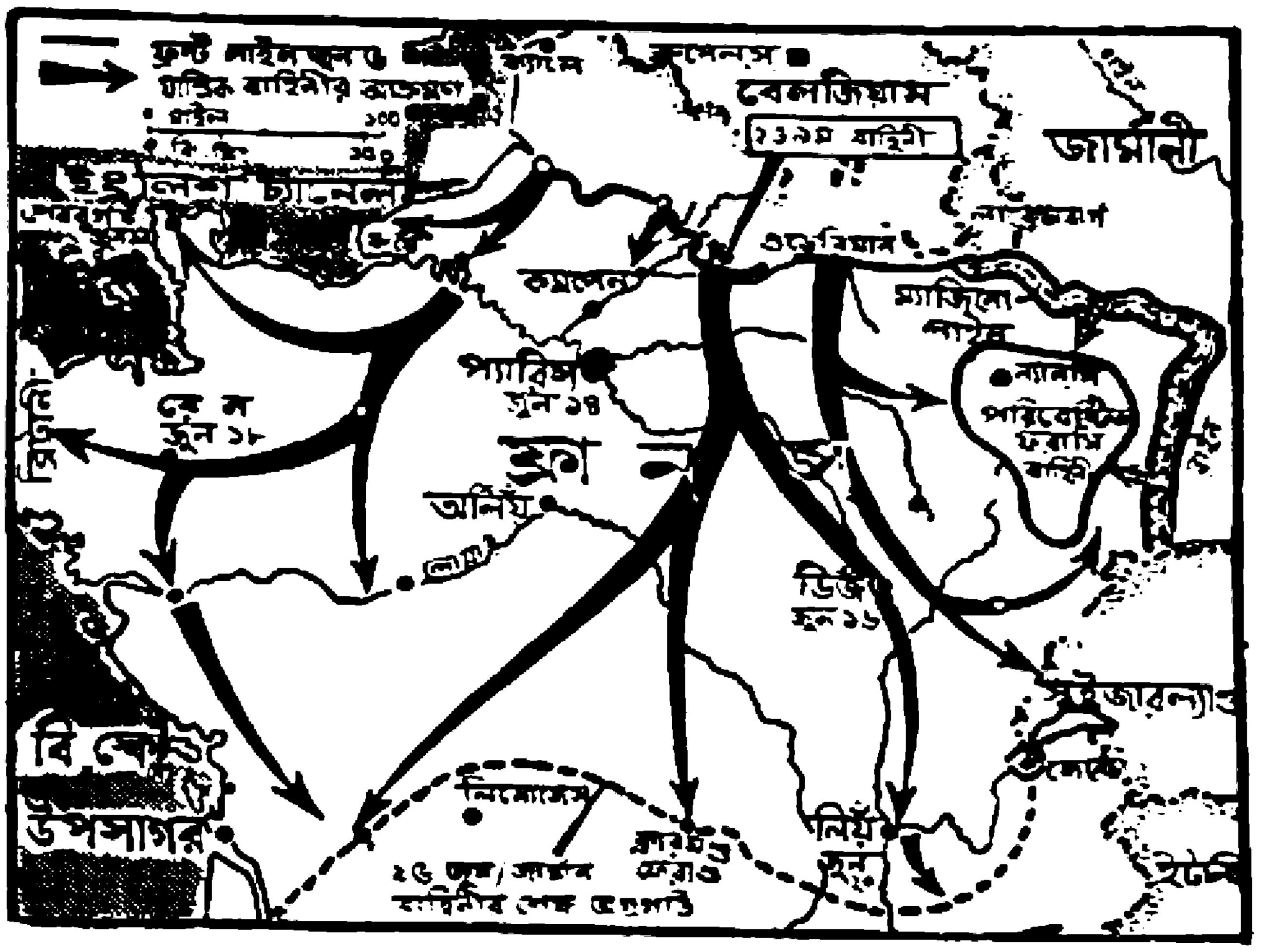

স্পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জার্মান গভর্নমেন্টের 'ঘোষণাপত্র' পেশ করিতে উদ্যত হইলে মঃ স্পাক প্রথমেই বাধা দিয়া জার্মানীর এই ন্যায় ও নীতিবিরোধী আক্রমণের প্রতিবাদ করেন এবং পূর্বাহ্নে কোন প্রকার দাবী-দাওয়া বা চরমপত্র পেশ না করিয়া এভাবে বেলজিয়ান রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার জন্য জার্মানীকে দায়ী করেন।

অতঃপর জার্মান দূত হল্যান্ডের অনুরূপ একটি নাৎসী সরকারী ঘোষণা পাঠ করেন এবং মঃ স্পাক আবার মধ্যপথে বাধা দিয়া বলেন, 'দলিলটা আমার হাতে দিন। এত কষ্ট করিয়া ওটা আর পড়িবার দরকার নাই।' *(৩)

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে বেলজিয়ামের রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষা করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পত্র যখন পঠিত হইতেছিল, তখন জার্মান বোমারু বিমান বেলজিয়ামের আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল এবং দলে দলে নাৎসী সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিল। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষার সংকল্প ঘোষণা করেন এবং মিত্রশক্তির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হন। একটা নক্সাও একদা কিছুকাল আগে স্থির হইয়াছিল।

১,১৭,৭৫ বর্গমাইল পরিমিত ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ এবং ইহা ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধেও বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল প্যারিস অভিযানের পথে। এবারও সেই একই ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি হইল। শান্তির সময়ে বেলজিয়ামের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮৬ হাজার এবং যুদ্ধের সময় ইহা ৬ লক্ষ হইতে সাড়ে ৬ লক্ষে দাঁড়াইল এবং কাগজেপত্রে মোট সমাবেশের সংখ্যা দাঁড়াইল ৯ লক্ষে। নিঃসন্দেহে বেলজিয়ামের পক্ষে সংখ্যাটি সর্ববৃহত্তর। এই সৈন্যবাহিনী নানা শ্রেণীর ২১টি ডিভিসনে বিভক্ত ছিল, এবং উহার মধ্যে ১২ ডিভিসন ছিল এলবার্ট ক্যানেল এলাকায়। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধযাত্রায় ও যান্ত্রিকতায় ইহারা বহু দূর পিছনে ছিল। সুতরাং কার্যকরীভাবে যে ১২ ডিভিসন সৈন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানীকে বাধা দিল, তাদের দশাও ওলন্দাজদের মতই ঘটিল।

আক্রান্ত হওয়ার কিছুকাল আগে বেলজিয়ান সেনানীমণ্ডলী বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই মর্মে একটি আত্মরক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণের তৃতীয় দিবসে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী বেলজিয়ামে রণক্রিয়ায় লিপ্ত হইবে। এন্টোয়ার্প হইতে লীজ পর্যন্ত এলবার্ট ক্যানেল (খাল) ধরিয়া এবং লীজ হইতে নামুর পর্যন্ত মিউজ নদী ধরিয়া বেলজিয়ান বাহিনী বিলম্বিত রণক্রিয়া অনুসরণ করিবে এবং এভাবে যে সময় পাওয়া যাইবে, উহার মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা এন্টোয়ার্প—নামুর-গিভেট (ফরাসী সীমান্তের) লাইনে দণ্ডায়মান হইবে। তৃতীয় দিবসে ইহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান ছিল এবং এই লাইনের এন্টোয়ার্প হইতে লুভেন পর্যন্ত খণ্ডাংশে বেলজিয়ানদের রক্ষা করার কথা ছিল। ইহা ছাড়া হল্যান্ড ও বেলজিয়াম সীমান্তের আত্মরক্ষার বহির্ঘাঁটি তো ছিলই।

ভোর রাত্রি ৪টার সময় জার্মান বোমারুর দল ঝাঁক বাঁধিয়া বেলজিয়ামের বিমানঘাঁটি রেল স্টেশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ও মেশিনগানের গুলী চালাইতে লাগিল। বেলজিয়াম বিমানবহরের অর্ধেকের বেশী ভূমিতেই নষ্ট হইয়া গেল এবং সীমান্তের আত্মরক্ষা

* ১১১ বর্গমাইল ভূমি ও ৩ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ লাক্সেমবুর্গ একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স—এই তিনটি রাজ্যের সীমানায় ইহা অবস্থিত এবং ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে জার্মান যৌথরাষ্ট্র হইতে ইহার উদ্ভব হয়। শক্তিবর্গ ইহার নিরপেক্ষতারও প্রতিশ্রুতি দেন। রণনৈতিক কারণে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন লৌহ ধাতু এবং ২০ লক্ষ টন ইস্পাতের উৎপাদনের জন্যও ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা কতকটা জমিদারী রাষ্ট্রের মত—বোধহয় আমাদের দেশের 'দেশীয় রাজ্যের' (প্রাক্তন) সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়।
—লেখক

*(৩) বেলজিয়াম পররাষ্ট্র দপ্তরের সরকারী বিবৃতি—১৯৩৯-৪০ সালে উদ্ধৃত 'The Second Great War' — vol 4.

ব্যূহ জার্মান পদাতিক, ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের প্রবল আক্রমণে ভাঙিয়া গেল।

কিন্তু বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার সর্বাপেক্ষা সংকটজনক বিন্দু ছিল মাসট্রিকটের দক্ষিণে, যেখানে বিখ্যাত লীজ দুর্গশ্রেণী মিউজ নদীর পথে সতর্ক প্রহরীর মত দণ্ডায়মান ছিল। ১৯১৪ সালে কাইজারের বাহিনীও এই পথ দিয়াই অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই দিন দীর্ঘ আত্মরক্ষায় যে যুদ্ধ তীব্র ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, আজ হিটলার তাহা অতি সহজে বিদ্যুৎগতিতে কাড়িয়া লইলেন। এই দুর্গশ্রেণীর উত্তরবর্তী ইবেন-ইমেল নামক আধুনিক কেল্লা দুর্ভেদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। কিন্তু জার্মানরা অভিনব দুঃসাহসিকতার ইহাকে চক্ষের নিমেষে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। গ্লাইডার বাহিত জার্মান সৈন্যেরা শেষ রাত্রির অন্ধকারে এই দুর্গের ছাদের উপর নামিল এবং বিস্ফোরক ও বোমা মারিয়া কামানগুলি অকেজো করিয়া ফেলিল, দুর্গ দেওয়াল বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর একই সময়ে জার্মান গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক ও প্যারাসুট সৈন্যেরা ইহার উপর আক্রমণ (রবারের তৈরী ডামি প্যারাসুট সৈন্য চারদিকে প্রচুর সংখ্যায় ছড়াইয়া দিয়া প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছিল।) চালাইল এবং পরদিন ১২ই মে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ধরাশায়ী হইল। এলবার্ট ক্যানেল বরাবর যে ৭নং বেলজিয়ান ডিভিসন আত্মরক্ষা করিতেছিল, জার্মানরা মাসট্রিকটের পথে সেখান দিয়া

অগ্রসর হইল এবং তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। এই ক্যানেলের দুইটি সেতু জার্মানরা অক্ষত অবস্থায় হস্তগত করিল, আর এগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান মোটরারূঢ় ও যান্ত্রিক সৈন্য যেন বন্যাপ্রবাহের মত বেলজিয়ামের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। জার্মানরা দ্রুত টংগ্রেস ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল এবং ১১ই তারিখ রাত্রে বেলজিয়ানরা এলবার্ট ক্যানেল লাইনের এলাকা (যেখানে জার্মানদিগকে বিলম্বিত রণক্রিয়ায় আটকাইবার কথা ছিল) ত্যাগ করিয়া পিছু হটিল এবং মিত্রবাহিনীর সহিত একত্র প্রধান আত্মরক্ষার লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১ নং ও ৯ নং ফরাসী বাহিনী এবং লর্ড গোর্টের অধীন বৃটিশ অভিযাত্রী দল এই লাইন রক্ষার জন্য সন্নিবিষ্ট হইল। ১০ই মে তারিখ এন্টোয়ার্প ও লুভেনের মধ্যে দাঁড়াইল বেলজিয়াম সৈন্যরা আর তাদের বামপার্শ্ব রক্ষা করিল আর এক দল ফরাসী বাহিনী—জেনারেল জিরোর অধীন ৭ নং ফরাসী আর্মি শেল্ড নদী মোহনা অঞ্চলে। ৩টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল লুভেইন ও ওয়েভারের মধ্যে, আরও ৬টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল ইহাদের পিছনের দিকে ডাইল ও শেল্ড নদীর মধ্যে। লর্ড গোর্টের দক্ষিণে ওয়েভার ও নামুরের মধ্যে ছিল জেনারেল ব্লানচার্ডের অধীন ১ নং ফরাসী আর্মি। খাস নামুর দুর্গ এলাকায় ছিল ৭নং বেলজিয়াম আর্মি কোর এবং আর্দেনেস এলাকা হইতে পশ্চাদপসরণকারী বেলজিয়ান সৈন্যেরা। নামুর হইতে মিউজ নদী ধরিয়া মেজিয়ার্স পর্যন্ত ছিল জেনারেল কোরাপের অধীন ৯ নং ফরাসী বাহিনী আবার ইহাদের দক্ষিণে ছিল ২নং ফরাসী বাহিনী।

বেলজিয়ামের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ভ্যান ওভারস্ট্রেটেনের অধীন সৈন্যেরা এবং বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি এভাবে দণ্ডায়মান হইলেও তাদের ব্যূহ অতি দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশ পথে জার্মান বিমান একাধিপত্য বিস্তার করিল এবং ভয়াবহ বোমাবর্ষণে শত-সহস্র ভীত আতঙ্কিত ও বিমূঢ় বেলজিয়ান সৈন্যেরা পলাতক অবস্থায় আসিয়া শহরে ভীড় করিল এবং আতঙ্কিত নাগরিকদের ত্রাস আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক-একবারে হাজার হইতে দুই হাজার পর্যন্ত বিমান হানা দিতে লাগিল। মিত্র সৈন্যদের পক্ষে ইহা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিভ্রাটে বিলম্ব হইল না।

এই বিভ্রাট প্রকটতর আকারে দেখা দিল লাক্সেমবুর্গ ও নামুরের মধ্যবর্তী আর্দেনেস পার্বত্য এলাকা হইতে। গভীর বন জঙ্গল, কুটিল ও বক্রগতি নদী এবং বন্ধুর পাহাড়িয়া ভূমির দ্বারা আচ্ছন্ন এই এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা দ্রুত অগ্রসর হইবে এই বিশ্বাস নিশেষেও ছিল না। কিন্তু দুর্দমনীয় গতিশীল যান্ত্রিক জার্মান সৈন্যেরা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই পার্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন ৯ নং ফরাসী বাহিনী নামুরের দক্ষিণে মিউজ নদীর ধারে ছিল। ১২ই মে তারিখ জার্মানরা অগ্রসর হইল এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে, মিউজ নদীর ৬টি সেতু অক্ষত রহিয়াছে। এখানে যে ৫০ মাইল চওড়া ও ৫০ মাইল দীর্ঘ বৃহৎ ছিদ্র তারা সৃষ্টি করিল, সেই ছিদ্র পথে মিউজ নদীর অক্ষত সেতুগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান যান্ত্রিক সৈন্য প্রবেশ করিল—ঠিক এলবার্ট খালের সেতুর মত। নিঃসন্দেহ মিউজ নদীর এই ৬টি সেতু অক্ষত রাখা অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। কেন না শত্রুর আক্রমণ মুখে সেতু উড়াইয়া দেওয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য মাত্র। (এই সমস্ত সেতুর কাহিনী লইয়া সেই সময় মিত্রপক্ষীয় মহলে তুমুল তোলপাড় হইয়াছে এবং কোন কোন ফরাসী অফিসারের বিরুদ্ধে ইহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হইয়াছিল।) কিন্তু এই মারাত্মক ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল। যদিও ইহার জন্য ১৫ই মে তারিখ নামুর-মেজিয়ার্স লাইনের ৯ নং ফরাসী বাহিনীর নায়ক জেনারেল আন্দ্রে কোরাপ পদচ্যুত এবং তাঁর স্থলে জেনারেল জিরো নিযুক্ত হইলেন, তথাপি শেষ রক্ষা হইল না। ইতিহাস বিখ্যাত সেডান (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স-প্রুশিয়ান যুদ্ধে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়) এলাকায় ২ নং ফরাসী বাহিনীর উপর জার্মানরা যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল, ইহার ফলে ১৩ই মে অপরাহ্ণ ৫টায় সেডানের ব্যূহ অর্থাৎ ম্যাজিনো লাইন ভাঙিয়া গেল। (প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান আক্রমণ। পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিনো লাইনের কেমা স্রুণী সিংগাপুরের নৌ-দুর্গের মতই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল এবং ফরাসীদের আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা ছিল এই ম্যাজিনো লাইন, যাহা সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা হইতে লাক্সেমবুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। সেডানে আসিয়া ইহার 'পাকা গাথুনি' শেষ হইয়াছিল এবং সেডানের পর বেলজিয়ামের সীমানা ধরিয়া ইহা ছিল 'কাঁচা গাথুনির' লাইন। সেডান ও মন্টমিডির মধ্যস্থলে ম্যাজিনো লাইনের এই দুর্বল গ্রন্থিতে আঘাত করিয়া জার্মানী ইহাকে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কার্যতঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের চূড়ান্ত সংগ্রামের ক্রিয়াকাণ্ড পর্ব এখান হইতেই সুরু হইল।

সেডানের ব্যূহ ভেদের পর ৯ নং ফরাসী বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়া গেল এবং ১৬ই মে তারিখ উহার প্রধান সেনাপতি জেনারেল জিরো জার্মানদের হাতে বন্দী হইলেন। উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রে মধ্যে বিচ্ছেদ সুরু হইল এবং বেলজিয়ামের মিত্রবাহিনীও বেষ্টিত হইবার জো হইল। ১৫ই মে সন্ধ্যায় জেনারেল জর্জেস এন্টোয়ার্প-নামুর লাইন ত্যাগ করিয়া শেল্ড বা এস্কাউট নদীর পিছনে আশ্রয় লইবার হুকুম দিলেন। ৭ নং বেলজিয়ান আর্মি কোরও প্রভূত সৈন্য বলির পর নামুর শহর ছাড়িয়া আসিল, যদিও নামুর ও লীজ দুর্গগুলি আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু বেলজিয়ামের প্রধান আত্মরক্ষার লাইনই এভাবে চূর্ণ হইয়া গেল।

১৬ই মে তারিখের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সর্বত্র পশ্চাদপসরণ ঘটিল। এন্টোয়ার্পের পশ্চিমে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের সীমান্ত অঞ্চলে যে ৭ নং ফরাসী বাহিনী ছিল, তারা ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের আত্মসমর্পণের পর অতি বিশৃংখলভাবে এন্টোয়ার্প পিছু হটিয়া আসিল। আর বেলজিয়ান সৈন্যরাও পর পর তিনটি পর্যায়ে শেল্ড নদীর পিছনে গিয়া আশ্রয় লইল।

এদিকে জার্মানরা সেডানে ব্যূহ ভেদের পর উত্তর ফ্রান্সের (বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী অঞ্চল) অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানে ছিল ফরাসী বাহিনীগুলির মূল আত্মরক্ষার ব্যূহ, আর বেলজিয়ামে ছিল তাদের দূরবর্তী আত্মরক্ষার ঘাঁটিস্বরূপ। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্য দল দুর্বার গতিতে সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া ১৮ই মে সন্ধ্যাবেলা পেরোন, ২০শে মে ক্যাম্ব্রাই দখল করিয়া একেবারে উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী সুপরিচিত অ্যাবেভিল বন্দর বিপন্ন করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের রণাঙ্গনের মধ্যে জার্মানী এক বৃহৎ কীলক প্রবেশ করাইয়া দিল এবং এই দুই রণাঙ্গন পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার জো হইল, যার ফলে উভয় রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনী জার্মান বেষ্টনীর মধ্যে পড়িবার আশঙ্কা জাগাইল।

এই সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনো তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের ভার্দুন বিজয়ী বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিলেন—১৮ই মে, ১৯৪০। পরদিন ১৯শে মে বিগত মহাযুদ্ধের অন্যতম ফরাসী নায়ক 'ওয়াগর ভ্যাঁ' জেনারেল ওয়েগা পশ্চিম রণাঙ্গনের সমগ্র মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। জেনারেল গ্যামেলা ছিলেন এতদিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক, ব্যর্থতার অভিযোগে তিনি এই পদ হইতে অপসারিত হইলেন।

২০শে মে তারিখ জার্মানরা সোমি ও অয়েস-আইনে খাল ধরিয়া অগ্রসর হইল, আমিয়েন্স ও আরাস দখল হইল এবং ক্রমে ক্রমে বলোন, ক্যালে ইত্যাদি বিখ্যাত ফরাসী বন্দরগুলি বিপন্ন হইল। ২১শে মে তারিখ ইপ্রেতে মিত্রপক্ষীয় রণনেতাদের এক

বৈঠক বসিল। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীগুলি পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই বিচ্ছেদ নিবারণের জন্য জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উভয় দিক হইতে যুগপৎ পাল্টা-আক্রমণের এক পরিকল্পনা করিলেন এবং ইপ্রে বৈঠকে ইহা লইয়া আলোচনা হইল। ইহার ফলে মিত্রবাহিনী-গুলির নূতন করিয়া সৈন্য সমাবেশ ও পশ্চাদপসরণ ঘটিল বটে, কিন্তু সেই পরিকল্পিত পাল্টা-আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হইল না। বৃটিশ ও বেলজিয়ান সৈন্যেরা শেল্ড নদীর এলাকা হইতে লাইস নদীর আড়ালে অপসারিত হইল। ইহার আগেই হল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী ওয়ালচেরেন দ্বীপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল (১৯শে মে)। সেখান হইতে জার্মানী কর্তৃক পশ্চাৎ আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ২৪শে তারিখ জার্মানরা লাইস নদী অতিক্রম করিল কোর্টরাই এলাকায় এবং এক বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড জার্মান বোমারুবহর সমগ্র বেলজিয়ান খণ্ডাংশে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল এবং নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া তারা মেনিন হইতে ইপ্রে পর্যন্ত আক্রমণ চালাইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। বৃটিশ ও বেলজিয়ান, উভয় সৈন্যদলই ঘেরাও হইবার জো হইল এবং পরিত্রাণের বন্দরগুলির একে একে পতন ঘটিতে লাগিল—২৪শে বোলোন এবং ২৭শে ক্যালের পতন হইল।

পরিত্রাণের পথ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকায় ইংরাজ সৈন্যদল বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নির্দেশে চাচা আপন বাঁচা নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। এই সময় ২৫শে মে তারিখ জার্মানরা ঘেন্ট ও কোর্টরাই দখল করিয়া লইল। আর ইঙ্গ-ফরাসী সঙ্কটের জন্য সামরিক নেতৃত্বের বহু পরিবর্তন ঘটিল। ১৫ জন ফরাসী জেনারেল বা সেনাপতি পদচ্যুত হইলেন এবং ইংলণ্ডে ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্তার পদে জেনারেল স্যার আইরণ সাইডের বদলে জেনারেল স্যার জন ডিল নিযুক্ত হইলেন—২৬শে মে।

২৫শে মে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক হইতে তাদের ইতিহাস বিখ্যাত পলায়ন-পর্ব সুরু করিল, আর হতভাগ্য বেলজিয়াম সৈন্যেরা পরিত্রাণের পথ হারাইয়া নিরুপায় হইয়া পড়িল। তথাপি এই অবস্থায়ও রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ২৫শে মে রাত্রিবেলা ও পরদিন দুর্ধর্ষ জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধের জন্য রুলার্স হইতে ইপ্রে পর্যন্ত ২০০০ রেল ওয়াগন প্যাসেনডেলের সম্মুখে (যে স্থান বিগত মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত বিভীষিকার স্মরণীয়) সাজাইয়া বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এই সময় জেনারেল বিলোট, যিনি বেলজিয়ান রণাঙ্গনের মিত্রবাহিনীগুলির মধ্যে প্রধান সংযোগরক্ষাকারী সেনাপতি ছিলেন, তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইলেন। ফলে রাজা লিওপোল্ডের জরুরী বার্তা লণ্ডনে পৌঁছিল না এবং ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগও নষ্ট হইয়া গেল। ২৬শে মে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ বৃটিশ হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাইলেন যে, অধিকতর আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তখন রাজা লিওপোল্ড তাঁর সদর দপ্তর ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ওস্টেণ্ড বন্দরের নিকট অপসারিত করিলেন। তাঁরা শেল্ড ও লাইস নদীর মধ্যে জার্মানীর পার্শ্ব ও পশ্চাৎ আক্রমণের জন্য বৃটিশ বাহিনীকে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ উত্তর দিলেন, তাহা সম্ভব নহে এবং ফরাসীরাও কোন সাহায্য দিতে পারিলেন না।

২৭শে মে জার্মানীর প্রবল আক্রমণের মুখে বেলজিয়ানদের শেষ মজুত সৈন্যদল নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু ইহা ছিল অনল শিখায় শেষ আহুতি দানের মত। বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় রাজা লিওপোল্ড বৃটিশ সেনাপতি লর্ড গোর্টকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে, অবস্থা সাংঘাতিক, আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নাই। ফরাসীদের তিনি জানাইলেন যে, বেলজিয়ান রণাঙ্গন ধনুকের জীর্ণ ছিলার মত ভাঙিয়া পড়িতেছে!

বেলজিয়ামের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। রণক্ষেত্র ভগ্ন, সৈন্যদল পরাজিত, বিহ্বল ও ছত্রভঙ্গ, আর জনপদ, পল্লী ও নগরে জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক। হতাহতে রণক্ষেত্র পরিকীর্ণ, হাসপাতালে আহতের স্থান নাই, কামানের গোলাগুলী পর্যন্ত নিঃশেষিত। রণক্ষেত্র হইতে সমুদ্রতীরবর্তী যেটুকু ফাঁক ছিল সেই সংকীর্ণ অংশে পলায়মান উন্মাদ জনতার ভীড়—জার্মানদের হাত হইতে পুরুষের প্রাণ ও মেয়েদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য সর্বত্র ধাবমান নরনারী ও শিশু। খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই—৩০ লক্ষ নরনারী ৬৫০ বর্গমাইল ভূমিতে মাথা গুঁজিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে ২৭শে মে, অপরাহ্ন ৫টায় রাজা লিওপোল্ড জার্মানীর ১৮ নং বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাত্রি ১০টায় হিটলার বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। রাত্রি ১১টায় সেনানীমণ্ডলীর সহিত পরামর্শক্রমে রাজা লিওপোল্ড সেই দাবী মানিয়া লইলেন এবং ভোর ৪টায় (২৮শে মে) সমগ্র বেলজিয়ান রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতির ভেরী বাজিয়া উঠিল। ২৮শে মে সকালবেলা আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

রাজা লিওপোল্ড বন্দী হইলেন, কিন্তু জার্মানরা তাঁর প্রতি 'রাজোচিত' সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁকে পরিবার, ভৃত্যমণ্ডলী ও সামরিক কর্মচারীসহ একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকিবার অনুমতি দিলেন। 'সম্মানজনক আত্মসমর্পণের চিহ্ন' স্বরূপ বেলজিয়াম অফিসারদিগকেও অস্ত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ এবং ৩ লক্ষ সৈন্য কর্তৃক অস্ত্র ত্যাগ ১৯৪০ এবং উহার পরেও মিত্রপক্ষীয় মহলে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। বিশেষতঃ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেণো এক বেতার বক্তৃতায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজা লিওপোল্ডের কার্য সম্পর্কে রায় দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তিনি বেলজিয়ান বাহিনীর বীরত্বেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কিন্তু রাজার পক্ষপাতী লোকেরা বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে লিওপোল্ডকে দায়ী বা দোষী করা চলে না, বরং ১৮ দিন পর্যন্ত বেলজিয়ান বাহিনী যে অসম্ভব রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাতে সৈন্যগণের প্রশংসাই প্রাপ্য। তবে, সমগ্র মিত্রপক্ষের রণনীতি এবং ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতির জন্য যে দুর্বিপাক ঘটিয়াছে, উহার জন্য নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র বেলজিয়াম কিংবা একা লিওপোল্ডই দায়ী নহেন। যে অবস্থায় তিনি পড়িয়াছিলেন, তাতে আত্মসমর্পণ, কিংবা মৃত্যুবরণ ছাড়া উপায় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

★ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য
★ নিখুঁত শিল্প সৌন্দর্য্য

রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স • ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

গির অরণ্যে পশুরাজ

সমীরকুমার মিত্র

একটি মহিমান্বিত প্রদীপ্ত নাম—রাজা। হ্যাঁ রাজাই বটে। তবে রাজা ফারুক বা ইংলণ্ডের রাজার (বর্তমান রাণী) কথা বলছি না। বলছি গুজরাটের গির অরণ্যে পশুরাজ সিংহের কথা।

অরণ্যের অতলে পশুরাজের স্বকীয় দীপ্তি নিবিড় চোখ মেলে দেখেছিলাম, আর প্রাণভরে নিয়েছিলাম স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উজ্জ্বল্যকে। এই ধরনের নিরাভরণ প্রাণময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসে নিজের অনুভূতিকে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করতে পেরেছিলাম, তার নেপথ্যে ছিল গুজরাটের নতুন রাজধানী গান্ধীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান। সম্মেলনের সুষ্ঠু আয়োজন করেছিলেন ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট; গুজরাট সরকারের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলন যে অভাবনীয় তাৎপর্য লাভ করেছিল, তার মজার হল সম্মেলনে আগত প্রায় দেড়শ সাংবাদিকের জন্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শনের সুব্যবস্থা। সোমনাথ, দ্বারকা প্রভৃতি স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক জায়গার মত গির অরণ্যও এক নতুন উপলব্ধির তোরণদ্বারে উন্নীত করেছিল আমাকে। জানার আকাশে সে এক অবিস্মরণীয় সূর্যোদয়।

রাজকোটের বিখ্যাত স্থান 'বালভবন' থেকে বেরিয়ে, ঐতিহাসিক শহর জুনাগড়কে পেছনে ফেলে মেনদারদার মধ্য দিয়ে আমরা সরকারী বাসে করে গির অরণ্যের গহীনতাকে স্পর্শ করলাম। প্রথম ভোরের বিহঙ্গ আবেশকে মধুময় করে তুলল প্যাখম-তোলা ময়ূরের অনুরাগে ভরা সন্তরণ। যেন, সে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যই অপেক্ষা করছিল। পথে নানা জাতের পাখি ও সম্বর চোখে পড়ল। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে সিংহ দেখবার জন্য মন ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আমরা সাসানে এসে পৌঁছেছি। কারণ এখানেই 'স্যাংকচুয়ারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট' আমাদের সিংহ ও অরণ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণগুলো জানিয়ে দিলেন। এখান থেকে আরও ৬ মাইল ভিতরে যেতে হবে 'লায়ন শো' বা সিংহ প্রদর্শনী দেখবার জন্য।

জানতে পারলাম গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৭টিতে এবং এদের রক্ষা করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। গিরের সিংহ আফ্রিকার সিংহের থেকে একটু ছোট হলেও, বড় লেজের জন্য গির সিংহ বিখ্যাত। ভারতীয় সিংহের আয়তন ২০০ থেকে ২৮৭-৫ সেঃ মিঃ, যেখানে আফ্রিকার সিংহের আয়তন আরও ৩০ সেঃ মিঃ বেশী। ১,৩১৫ স্কোয়ার কিলো মিটার বিস্তৃত শুষ্ক গির অরণ্য তাই ভ্রমণকারী ও জন্তু-জীবন সম্বন্ধে জানতে উৎসুক সুদূরের পিয়াসী মানুষকে বার-বার কাছে ডেকে নিতে চায়।

'লায়ন শো' দেখবার জন্য মন আমার চঞ্চল শিশুর মত উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। তাই বাসটি যখন সেই অরণ্যকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগল তখন আমার মন নৃত্যপাগল ছন্দে উন্মনা হয়ে উঠল। ভীতির সম্ভ্রমও যে মনে দোলা খাচ্ছিল না, তা নয়। তবে এই ভয়ের মধ্যে ছিল একটা রোমাঞ্চের অদ্ভুত এক শিহরণ। দিগন্তের বুকে সূর্যাস্তের বিষণ্ণতা নেমে আসছে, ঠিক এমনি সময় অরণ্যের পূর্ব প্রান্তের

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

এর স্থানে আমাদের বাস থেকে নামতে বলা হল। বাস থেকে নেমে পাঁচ-সাত গজ এগোতেই অরণ্যরক্ষীদের একজন আমাদের আর এগোতে বারণ করল। কারণ, আমরা

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1676 R-BEN

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার থেকে ২০।২৫ গজ দূরে ৬টি সিংহ দেখা গেল। এরা কেউ-বা বসে আছে, কেউ আবার প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ করছে। কিন্তু অদূরেই যে এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ফেরার পথে জঙ্গলের আর এক স্থানে আমাদের বাস থমকে দাঁড়াল। তখন ক্লান্তির ভারে ভারাক্রান্ত পৃথিবীর বুকের জলসায় অন্ধকার নেমে এসেছে। হয়ত বা বিস্মৃতির অন্ধকার। আমাদের 'পাইলট কার' থেকে 'সার্চলাইট' ফেলার সঙ্গেই দেখতে পেলাম ৬।৭টি সিংহ—কেউ কিছুটা দূরে, আবার কেউ আমাদের থেকে ১০।১২ গজ দূরত্বের ব্যবধানে বসে আছে। দুইজন অরণ্যরক্ষী একটা মহিষ শাবককে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা সিংহ মহিষ শাবকটার দিকে একান্ত চিত্তে তাকিয়ে বসে আছে। কিন্তু আক্রমণ করছে না। এমন কি এতগুলো মানুষকে দেখেও এতটুকু বিচলিতবোধ করছে না। রূপকথার গল্পের মত মনে হচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, অরণ্যরক্ষীদের সঙ্গে গির সিংহদের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। এবং গিরের সিংহ খাদ্যের প্রয়োজনে ছাড়া কখনও জীব হত্যা করে না। সিংহের ২৬টি দাঁত আছে। এর মধ্যে আটটি দাঁত ও তার বিশাল থাবা দিয়ে সে তার কবলিত যে কোনও জীব-জন্তুকে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারে।

চার বৎসর বয়সে একটি সিংহকে প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয়। কিন্তু সিংহী দুই থেকে আড়াই বৎসর বয়সেই মাতৃত্ব লাভ করে থাকে। একটা সিংহী প্রতিবারে দুই থেকে তিনটি শাবক প্রসব করে, আবার কখনও-কখনও পাঁচটিও প্রসব করতে দেখা গেছে। একটি সিংহের গড় আয়ু হচ্ছে ১৫ বৎসর। সব চাইতে মজার ব্যাপার এই যে, খাদ্যের ব্যাপারে প্রথমে সিংহ তার ভাগ গ্রহণ করবে। এই কারণেই বোধহয় 'লায়ন্স সেয়ার' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। এবং সিংহী তার ভাগ গ্রহণ করবার পর শাবকেরা তাদের খাদ্য গ্রহণ করবে।

গির অরণ্য থেকে কল্লোলমুখর কলকাতা ফিরে এসে বুঝতে পেরেছি যে, সিংহের বসে থাকা, চলা-ফেরা এবং প্রতিটি নিখুঁত অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে যে একটা 'ম্যাজেস্টিক' ভাব আছে, তাই তাকে পশুরাজের অতুলনীয় সম্মান দিয়েছে। আর এই প্রাণময় উপলব্ধি এই পরিশ্রান্ত শহর-জীবনে দিয়েছে কিছুটা অন্য জীবনের স্বাদ। চলতি মুহূর্তগুলোতে তাই হয়ত নতুন করে দেখতে পাব স্মৃতি আর বিস্মৃতির দোদুল দোলন।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(তৃতীয় খণ্ড)

(১১)

নরেন্দ্রনগররাজ ভোরবেলাতে জরাকে সঙ্গে নিয়ে নির্মীয়মান মন্দিরটি দেখছিলেন। জরার বেশ-ভূষায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। মাথায় তার শাদা হালকা কাপড়ের উষ্ণীষ, গায়ে বুটিদার আঙরাখা, পরণে রেশম বস্ত্র, পায়ে শুঁড়তোলা পাটকিলে রঙের পাদুকা, আর কণ্ঠে ও বাহুতে স্থানোচিত অলংকার। ক'দিন আগে যার পায়ে ছিল বেড়ি, কটিতে সামান্য জীর্ণ আচ্ছাদন আর গায়ে চাবুকের দাগে—এই কি সেই জরা। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল জরা নিজে। কি জন্যে, কেন, এই পরিবর্তন হল বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে— অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অপ্রত্যাশিত রাজপ্রসাদলাভ।

পাথরভাঙা গ্রামে সংবাদার কুটিরের কাছে হঠাৎ রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে সে আতঙ্কে চমকে উঠেছিল নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আসবার ফলে না জানি কি দণ্ড পেতে হবে। রাজা তো চলে গেলেন, ভয়ে ভয়ে সে আবাসে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরেই রাজার প্রেরিত লোক এসে বলল চলো।

শঙ্কিতভাবে শুধালো কোথায়?

মহারাজার কাছে।

কেন?

কেন আমরা কি করে জানবো, তবে মনে হচ্ছে মহারাজা তোমার উপরে খুশী হয়েছেন।

খুশী হয়েছেন। অস্ফুট অনুবৃত্তি করে জরা।

রাজভৃত্য বিনীতভাবে অভিবাদন করে একটি অশ্ব দেখিয়ে দেয়।

নীরবে জরা দেখিয়ে দেয় পায়ের বেড়ি।

রাজভৃত্যের ইঙ্গিতে কামার এসে খুলে দিয়ে দেয় সে বেড়ি। তখন জরা ঘোড়ায় চেপে বসে; রাজভৃত্য সসম্ভ্রমে রাজপুরীর পথটা দেখায়। অবশেষে জরা রাজপুরীতে পৌঁছে মহারাজার সমীপে উপনীত হয়, ঘোড়া থেকে নামে, রাজাকে নত হয়ে অভিবাদন করে।

রাজা বলেন, এসো রাজা, তোমার উপরে অনুচরগণ অন্যায় আচরণ করেছিল, তারা তিরস্কৃত হয়েছে।

জরা কিছুই বুঝতে না পেরে আর একবার অভিবাদন করে।

ব্যাপারটা এই।

নরেন্দ্রনগররাজ অনুচরদের আদেশ করেছিলেন রাজাকে (জরা নাম তাঁর অজ্ঞাত) যেন আরামে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও বলেছিলেন লোকটা গুণী, ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে কাজ হবে। আগেই বলা হয়েছে যে এই সামান্য রাজানুগ্রহই জরার কাল হল, তার পায়ে বেড়ি এবং পিঠে চাবুক পড়লো। হঠাৎ রাজার চোখে না পড়ে গেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে খাটতে এবং চাবুক খেতে খেতেই ওর জীবনাবসান হতো। ওকে পাথরভাঙা গ্রামে দেখবামাত্র রাজা এক লহমায় প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন। রাজানুচরদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রাজার পরিচয় অপ্রত্যাশিত নয়।

একজন অমাত্যকে ডেকে বললেন, ওহে রাজার এ দশা কেন।

সে বলল, মহারাজ কি বলবো, ওকে তো আরামেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু ওর ভাগ্যে আরাম নেই। লোকটা কাজের নয়। পালিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে ধরে নিয়ে এসে বললাম, বাবা, তুমি পালালে যে আমাদের কি হবে। তুমি দয়া করে রাজসম্মানে বাস করো।

রাজা শুধালেন তারপর?

মহারাজ, বললে কি লোকটা তো বুঝলো, আসলে ভণ্ড, শয়তান, মিষ্টান্ন সন্দেশ বাদ করে, শুধু আটার রুটি ছাড়া আর কিছু রোচেনা তার মুখে। তাও না হয় সহ্য করেছিলাম। যার যা খাদ্য তাই খাক; কিন্তু আবার পলায়ন। তখন বাধ্য হয়ে ওর পায়ে বেড়ি পরালাম, অবশ্য কাজকর্ম ওকে কিছু দেওয়া হয়নি, আর সেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতেও বাধা ছিল না। তাই তো পাথরভাঙা গ্রামে মহারাজের চোখে পড়লো লোকটা।

রাজকর্মচারীদের স্বভাব রাজাকে নির্বোধ ভাবা, তা নইলে তাদের জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে রাজাদের স্বভাব রাজকর্মচারীদের বিশ্বস্ত ভাবা নইলে রাজকর্ম চলে না। দুজনেই জানে প্রকৃত ব্যাপার। ঠিক বিপরীত। এই ভাবে আপোষে চোখ-ঠারাঠারি করে চলে রাজসংসারের কাজ। মানব-সংসারের বেলাতেও বোধ করি ভুল হয় না, এখানেও একের সম্বন্ধে অপরের এই রকম ধারণা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে সংসারের মধ্যে এমন বিচিত্র প্রহসন আর কোথায়।

রাজা জানতেন লোকটা গুণী, কিন্তু তারপরে তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যা জানতে পেলেন তাতে তাঁর চোখে জরার নতুনতরো তাৎপর্য প্রকাশ পেলো।

রাজা শুধালেন, তোমার দেশ কোথায় হে রাজা।

জরা বলল, ভারতবর্ষে মহারাজ।

আমরা ভারতবর্ষে তো আমরাও বাস করি, এ অঞ্চল তো ভারতের বাইরে নয়, এ অঞ্চলের আমরা সবাই মহারাজা যুধি-

ঠাঁইয়ের সামন্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ভারতের কোথায়? মৎস্য, পাঞ্চাল, মদ্র, কোশী, কোশল নানা প্রদেশ আছে—কোথায়?

জরা বলল, তা তো জানিনে মহারাজ, আমি থাকতাম দ্বারকায়!

দ্বারকায়! চমকে উঠলেন রাজা। কানকে বিশ্বাস হল না, পুনরপি শুধোলেন—কি বললে?

দ্বারকায়।

দ্বারকায়। বাসুদেবের দেশে।

না জেনে জরা কি পিছল পথে পদক্ষেপ করলো নাকি, কিন্তু আর তো ফিরবার উপায় নাই—বলল, হাঁ মহারাজ।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক। কি আশ্চর্য, এতদিন বলোনি কেন?

মহারাজা না শুধোলে বলি কি উপায়ে।

এতে আর শুধানো অশুধোনো কি! এত বড় সৌভাগ্য কি লুকিয়ে রাখতে হয়। এই যে মন্দিরটা তৈরি করছি, চলো দেখে আসি, এখানে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জরার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাবে এই এত দূর দেশে, কত রাজা, পাহাড়-পর্বত, নদী মরুভূমি পার হয়ে এখানেও পৌঁছেছে বাসুদেবের নাম। তখন মনে পড়ে জরতীর কথা। তবে হয়তো লোকটা সত্যি কেউকেটা ছিল। তবে জরতী যে বলেছিল ভগবান তা হতেই পারে না। ভগবানের যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কি ত্রিভুবনে এখন ভগবান নাই। এ হতেই পারে না। ভগবান যদি না থাকে তবে চন্দ্র সূর্য উঠছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে কি করে? মায়ের কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিল যে এই যে চন্দ্র-সূর্য উঠছে বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে, সবই ভগবান আছেন বলে। এখনও তো এসমস্ত ঠিক আগের মতই হচ্ছে। কাজেই ভগবান আগের মতই আছেন। আর তা যদি থাকেন, তবে বাসুদেব কখনই ভগবান হতে পারেন না।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

এত কথা এত চিন্তা আর এমন যুক্তির সঙ্গে জরার পক্ষে নূতন। ক'মাস আগে, যখন সে বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াত, তখন এমন চিন্তাধারা ও যুক্তি তার ধারণার অতীত ছিল। এই ক'মাসে ভিতরে ভিতরে তার যে পরিণতি ঘটেছে তারই চিহ্ন এই চিন্তাধারায়। বাসুদেবকে হত্যা করবার মুহূর্তে জরার অজ্ঞাতসারে জীবন-পণ্ডিত তাকে ভর্তি করে নিয়েছিল নিজের পাঠশালায়। এ পাঠশালা বড় আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। এখানে কে পড়ায়, কারা পড়ে, পড়বার রীতি যে কি রকম কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। পড়ুয়াদের প্রশ্ন করলে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে, তারা আবার পাঠশালার ছাত্র। আর এই পাঠশালায় যে বিচিত্র ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তার কিছু কিছু বিবরণ আগে দিয়েছি। এখানে দুঃখ দিয়ে শেখানো হয়, সুখ দিয়ে শেখানো হয়, আর সবচেয়ে বেশী শেখানো হয় সুখের ছদ্মবেশে যখন দণ্ড আসে।

বাসুদেবকে হত্যার পরেই জরার আরম্ভ হল দুঃখের শিক্ষা। সেই পাঠ চলল সমুদ্রপুরে পৌঁছানো অবধি। সমুদ্রপুরে যে মাসাধিককাল সে ছিল, তখন সুখের পাঠ চলেছিল। নরেন্দ্রনগরে পৌঁছানোর পর ক'দিন আবার দুঃখের পাঠ। তারপরে এখন আরম্ভ হল সব দণ্ডের সেরা সুখের ছদ্মবেশে দুঃখের দণ্ড।

জরা এখন রাজার প্রিয়পাত্র, সারাদিন তিনি জরাকে সঙ্গে রাখেন, কারিগররা মন্দির তৈরী করছে, জরাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন, কোথায় কোন্ বেদীর উপরে বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে বুঝিয়ে দেন। রাজা বলেন, আমার ইচ্ছা বাসুদেব দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন, কারণ ওই দিকেই দ্বারকা। আর রাজপুরোহিত বলেন, না মহারাজ, সর্বদিকের শ্রেষ্ঠ পূর্বদিক, যেদিকে সূর্য ওঠে, বাসুদেব পূর্বাস্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেন। তুমি কি বল রাজা?

জরা অবাক হয়ে বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি বলব?

রাজা বলেন, সে কি কথা, তুমি বাসুদেবের দেশের লোক, তোমার উপরে কার কথা?

তারপরে রাজা বলেন, দেখ, বাসুদেবের মূর্তি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সঙ্কটে পড়েছি। এদেশের কেউ তাকে চোখে দেখে নি। এমন কি যে শিল্পী মূর্তি গড়বে সেও দেখেনি, সকলেরই শোনা কথার উপরে নির্ভর।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেন, তুমি কি কখনও তাঁকে চোখে দেখেছ?

এই নিদারুণ প্রশ্নে জরার সমস্ত অস্তিত্ব মোচড় খেয়ে ওঠে, একি নিদারুণ সঙ্কটের মুখে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে চলেছে, এর চেয়ে যে মাথায় করে পাথর বওয়া সহজ ছিল। সে কেবল কায়িক কষ্ট। নিতান্ত অসহ হলে, মাথা থেকে নামিয়ে জিরিয়ে নেওয়া চলে, আর, এ বোঝা যে মানসিক, এ তো নামাবার উপায় নেই। জরা হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারে না।

রাজা শুধান, কি হে, তাঁকে কখনও চোখে দেখনি একি হতে পারে?

জরা বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, ভগবানের কাছে কি মূর্খ-পণ্ডিত ভেদ আছে। তিনি যে স্বয়ং ভগবান।

জরা কোন উত্তর দেয় না।

এবারে রাজা অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, কিভাবে তাঁর লীলাবসান ঘটল জান? নানা লোকে নানা কথা বলে।

জরার সেই এক উত্তর, মহারাজ, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, আমরা এতদূরে থেকে শুনলাম, আর তুমি সে রাজ্যে থেকেও শুনতে পেলে না, একি হয়।

তারপরে কিছুক্ষণ দুজনে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখে। রাজা বলেন, মন্দিরটি উচ্চতায় একশ বিশ হাত হবে। কেন না, ওই বয়সেই বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন। তারপরে অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে যান, কতজনে কত পরামর্শ দিল। কেউ বলে মহারাজ শ্বেতপাথর দিয়ে মন্দির তৈরী করান, কেউ বলে লালচে পাথর দিয়ে গড়ুন, দেখতে খুব সুন্দর হবে। কিন্তু কালো পাথরের কাছে কেউ নয়। মুকুলে রাজা, লাল বল, সাদা বল, সমস্ত কালক্রমে ম্লান হয়ে আসে। কেবল কালোর মহিমাই দিনে দিনে গভীর হতে থাকে। তাছাড়া বাসুদেবের রং কালো ছিল। ইচ্ছা করেই কালোর মহিমা বোঝাবার জন্য ওই বর্ণ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মন্দিরটা ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে বসেন, শুনেছি একটা ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর লীলাবসান ঘটেছিল।

জরা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার মত হয়।

সাবধানে পা ফেলো, পাথরের টুকরো ছড়ান রয়েছে।

রাতে সুখশয্যায় শয়ান জরার ঘুম আসে না। এর চেয়ে যে মজুরদেরে কয়েদখানা অনেক ভাল ছিল। গবাক্ষপথে আকাশের দিকে তাকায়, তারাগুলো তার অচেনা নয়, বনে-জঙ্গলে মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যার অভ্যাস, তারা না চিনে তার উপায় কি? দেশ ছাড়বার পরে এমন করে তারাগুলোর দিকে তাকাবার অবকাশ পায় নি সে। দেখতে পায় কালপুরুষের তলোয়ারখানা ঝুঁকে পড়েছে। তার দিকেই নাকি? আর আকাশের ওই যে কোণে একটা তারা রাজার হাতের আঙটির লাল পাথরটার মত চোখ পাকিয়ে রয়েছে সেকি তার দিকে তাকিয়ে? এই তারাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে দ্বারকার বন-বাদাড়ের কথা মনে পড়ে যায়, সমুদ্রের শব্দ রাতের বেলায় যেন দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে, গরমের দিনে রাতের বেলা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হাজার জোনাক জ্বলতে থাকে। সেই

সুরে মনে পড়ে যায় জয়ন্তীকে। জয়ন্তী শুধাতো, ওগুলো কি রে জরা? ও সম্বন্ধে জ্ঞান দুজনেরই সমান। জরা বলে :

সাপের মাথায় মণি থাকে শুনেছিস তো? সেই মণি।

এত সাপ এলো কোথা থেকে?

কোথা থেকে কি রে? সমস্ত সাপেরই তো বাস সমুদ্রে।

তবে দিনের বেলায় দেখতে পাই নে কেন রে?

এর সদুত্তর জানে না জরা। তাই সে চুপ করে থাকে। কতক্ষণ দেশের কথা জয়ন্তীর কথা চিন্তা করেছে তার হুঁস ছিল না। যখন আবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল, দেখতে পেলো কালপুরুষের তলোয়ারখানা আরও অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। জরার ভয় হল এমনিভাবে ঝুঁকে পড়তে থাকলে কখন এক সময় তার বুকে এসে বিঁধবে। মনে হল, তাহলে বড় অন্যায় হয় না। এমনি ভাবেই তো তার শর গিয়ে বিঁধেছিল বাসুদেবের পায়ে। বাসুদেবের কথা মনে হতেই ভাবল তাঁকে হত্যা করে যদি পাপ করেই থাকি, তবে রাজার কাছে এত সমাদর পাচ্ছি কেন? তখনই মনে হল, রাজা তো জানেন না। ভগবান জানেন। তবে তিনি কেন এত সমাদর দিচ্ছেন রাজার হাত দিয়ে। বিশেষ যে সমাদর তার প্রাপ্য নয়, সেই সমাদর যখন সে পাচ্ছে, বুঝতে হবে বাসুদেবকে হত্যা করায় পাপ হয় নি। তবে কালপুরুষের তলোয়ারখানা আরও ঝুঁকে পড়েছে কেন তার দিকে? পাপ, পুণ্য, ভগবান, বাসুদেব সবশুদ্ধ মিলিয়ে তখন তালগোল পাকিয়ে যায় তার মনের মধ্যে। সে না পারে ঘুমোতে, না পারে জেগে থাকতে। তাকালে কালপুরুষের তলোয়ার, চোখ বুজলে জটিল চিন্তার গোলকধাঁধা। সুখশয্যা তার পক্ষে অসহ্য হয়। সে উঠে বসে সজোরে কপাল চাপড়াতে থাকে।

দিনের বেলায় রাজবাড়ীর সমাদর রাতের বেলায় সুখ শয্যায় যন্ত্রণা জরার আর সহ্য হয় না। সেই যে সেদিন বাসুদেবের মৃতদেহ দেখে জয়ন্তী বলে উঠেছিল ওরে জরা তোর নরকেও স্থান হবে না। সেই কথার অর্থ এত দিনে বুঝি বুঝতে পারছে। তবে নরক বুঝি সমাদর ও যন্ত্রণায় সমভাগে মিশিয়ে তৈরি তাই এমন দুঃসহ। কিম্বা বে-সমাদর প্রাপ্য নয়, সেই সমাদরের সুযোগ পরে যন্ত্রণা আসে বলেই বুঝি তাকে নরকযন্ত্রণা বলে।

রাতের বেলায় সুখশয্যায় শুয়ে বালু খোলায় বসে সংকল্প করে কালকেই সব কথা রাজসমীপে নিবেদন করে এই দ্বৈতাবস্থার অবসান ঘটাবে—একদিন যে শূলদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সেই দণ্ড আবার মাথে নিয়ে সব যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যকালে দিনের বেলায় সাহসে কুলোয় না।

এক-একদিন যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হয় পাথরডাঙ্গায় সুবালার বাড়ীতে যায়, এখন আর কোথাও যাওয়ায় বাধা ছিল না। সেদিন সুবালার বাড়ীতে গিয়ে দেখে শুকনো কুসুম ফুলের গুঁড়ো জলে গুলে কাপড় রাঙাচ্ছে।

এ কি হচ্ছে সুবালা?

শাড়ী রাঙাচ্ছি, কাপড় রাঙাচ্ছি, ছেলেটার আবোথা রাঙাচ্ছি।

সবই তো দেখছি রাঙিয়ে ফেললে, তবে আর বাড়ীঘরগুলো বাদ থাকে কেন?

সুবালা হঠবার পাত্র নয়—বলল, তাও রাঙাবো।

কি এই রং দিয়ে নাকি?

সে হেসে উঠে। হাসবার সময়ে অনেকগুলো দাঁত দেখা যায়, স্ফটিকের মতো শাদা আর ঝকঝকে। হেসে উঠে বলে তুমি কেমন লোক গা! কুসুম ফুল দিয়ে কি বাড়ীঘর রাঙায়!

তবে কি দিয়ে?

কেন গেরি মাটি আর গোবরে মিশিয়ে। তোমাদের দেশে কি করে?

সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ছেলেটা এসে জরার হাঁটু ধরে দাঁড়ায়। এই কদিনের যাতায়াতে জরাকে চিনেছে। ছেলেটা কোলে উঠে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করে।

সুবালা বলে নামিয়ে দাও, খুলে ফেলবে।

ফেলুক না বলে জরা। তার মনে পড়ে তার একটি ছেলে হয়েছিল, বেশি দিন ছিল না, বছর দুই হতেই মারা গিয়েছিল। সে-ও এমনি ভাবে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করতো। গলার পুঁতির মালা কতবার ছিঁড়ে ফেলেছে। জরা পাগড়ি খুলে তার মাথায় জড়িয়ে দেয়। তার মুখ অবধি ডুবে যায় পাগড়িতে, টান দিয়ে খুলে ফেলে দেয়। হো-হো করে হেসে ওঠে জরা। তারপরে সুবালার উদ্দেশ্যে বলে, তা হঠাৎ এত কাপড়-চোপড় বাড়ীঘর রাঙাবার ধুম পড়ে গেল কেন?

সুবালা বলে, পরব আসছে যে।

কি পরব আবার।

বাঃ তুমি রাজবাড়ীতে থাক আর জানো না।

বাস্তবিক কিছুই জানে না জরা।

সুবালা বুঝতে পারে, বলে বাসুদেবের মূর্তি বসবে যে মন্দিরে!

এখানেও বাসুদেব। জরা চমকে ওঠে এখানেও লোকটা পিছু পিছু এসেছে দেখছি। কোথায় সেই সমুদ্রতীরের দ্বারকা আর কোথায় এই পাঁচ-সাতশো ক্রোশ দূরের পার্বত্য অঞ্চল, তার কিনা আবার পাহাড়ীদের জীর্ণ কুটীর। এমন শত্রুও তো দেখিনি, যে ভাবে সুযোগ পেলে আবার তাকে তীর মারে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে বাসুদেব কে?

শাড়ীখানা নিংড়াতে নিংড়াতে সুবালা বলে, বাসুদেব যে ভগবান।

তারপরে আবার আর একখানা শাড়ী নিয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস চূড়ান্ত উত্তর দিয়েছে, অধিক বিস্তার সাধন অনাবশ্যক। কিন্তু জরাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে শুধায়, বাসুদেব তোমাদের কি করেছে?

কি আবার করবে। ভগবান ভগবান। তিনি কি বোঝা বইবেন, না ঝরণা থেকে জল এনে দেবেন।

ভগবান কি মানুষের হাতে মরে।

ভগবানের ইচ্ছা কেমন করে জানবো! ও জানবার চেষ্টা করতে নেই। তবে সেই মানুষটাকে পেলে একবার দেখে নি।

কি করতে তাকে নিয়ে।

ঐ পাথরখানা দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম। মনে করো যদি আমিই সেই হাকি।

সুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে, এমন অসম্ভব কথার হাসি ছাড়া আর কী উত্তর হতে পারে।

সেদিন রাতে তার সুখ হরণ করে সুবালার সরল বিশ্বাস। তখনি মনে পড়ে জয়ন্তীকে, তারও এমনি সরল বিশ্বাস ছিল। মূর্খ জরা জানে না যে মেয়েরা সরল বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে নিশ্চিন্তে পথ

প্রকাশিত হয়েছে—রজতজয়ন্তী সংখ্যা
বর্ষপঞ্জী ১৩৭৮
দেশবিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ বাংলাভাষায় একমাত্র 'ইয়ার-বুক'
গত ২৫ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু আজ বলেই বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল সকলের সমাদর লাভ করছে। চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ৫ রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচন, সি, এম, ডি, এ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।
বড় বোর্ড বাঁধাই, ৭৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭·৫০ পয়সা
প্রকাশক : এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং
৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬। ফোন : [illegible]

চলে; পুরুষে জ্ঞানের উপরে নির্ভর করবার ফলে পথ হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস পাহাড়ী ঝরণা, জ্ঞান কাটা খাল। তার মনে পড়ে একদিন এই রকম সরল বিশ্বাস তো তারও ছিল, জীবনের পথ ছিল মসৃণ সমতল, তারপরে কি কুক্ষণেই ঐ শর নিক্ষেপ করলো। সব কেমন উল্টে-পাল্টে গেল।

হঠাৎ দারুণ ক্রোধ হয় জটাসের উপরে. কেন বাঁচাতে গেল তাকে। মৃত্যুদণ্ডই তো তার প্রাপ্য ছিল। আর বাঁচালোই যদি বা এমন নির্মোচ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেললো কেন? সেই শরাঘাতের মুহূর্ত থেকে তার সরল জীবনে গ্রন্থির পর গ্রন্থি পড়ে চলেছে। কোথায় কিভাবে এর বিরাম কে জানে। যেভাবেই হোক যত শীঘ্র হয় সে বেঁচে যায়—এভাবে আর চলে না।

রাজা বলছিলেন, ওহে শিল্পী রাজা, ভাস্কর কাকে বলে জানো তো, যারা মূর্তি গড়ে এই আর কি, কাল রাজ্যে এসে পড়েছে। কালো পাথরে বাসুদেব মূর্তি গড়বে। চলো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি তাহলে বাসুদেবের মূর্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা তাকে দিতে পারবে।

রাজার জেরার মুখে ঠেকে একদিন জরা স্বীকার করে ফেলেছিল যে দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখেছে।

রাজা বলেছিলেন তা হলেই হল, যে লোক একবারও দেখেনি সে যখন মূর্তি গড়তে সাহস করছে, তোমার পক্ষে তাকে সাহায্য করা অসম্ভব নয়।

অগত্যা রাজি হতে হয় জরাকে। জরা শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছে এমন সময়ে একজন অমাত্য এসে নিবেদন করলো, মহারাজ সেই যে দুজন বন্দী পালিয়েছিল তারা ধরা পড়েছে।

কোথায় ধরা পড়লো।

মহারাজ, ওরা বিদেশী লোক, এদেশের পথঘাট জানে না; এ পাহাড় সে পাহাড় করে ঘুরে ঘুরে অনাহারে শুকিয়ে গিয়ে সেইদিন গাঁয়ে ভিক্ষার সন্ধানে গিয়েছিল। সে গাঁয়ে মহারাজার অনুচরদের অনেকের বাস তাদের একজন চিনতে পেরে রাজবাড়ীতে সংবাদ দেয়। তখন রাজবাড়ী থেকে সৈন্য গিয়ে বন্দী করে আনে।

তাদের বোধকরি পালাবার সামর্থ্য ছিল না।

মহারাজার অনুমান যথার্থ। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ধরা পড়ে তারা যেন কৃতার্থ হল।

যাক যখন ধরা পড়েছে খুব জলদি কেন না চড় ওদের উপরে। আগে খাইয়ে-দাইয়ে চাঙ্গা করে তোল তারপরে অন্য কথা। হাঁ শোনো লোক দুটো যুদ্ধের কথা না জানতে পারে দেখো।

এদের [illegible] থেকে ভিন্ন অন্য হয়েছিল।

ওখানে তো চড়া দাম নেয়।

হাঁ মহারাজ, আর লোক দুটোরও প্রকৃতি নামের অনুরূপ।

কৌতুহলী রাজা শুধান, নামের অনুরূপ! তার মানে?

একজনের নাম নরক একজনের নাম অসুর।

নাম দুটো তপ্ত লৌহ শলাকার মতো জরার কানে প্রবেশ করে—এতক্ষণ শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রাজা ও অমাত্য ওদের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত থাকায় জরার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলো না।

নরক ও অসুর। জরার সেই মহা অপরাধের সাক্ষী, তার সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী। তারা মুখ খুললে মাত্র তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাদের অপরাধের তুলনায় জরার অপরাধ পর্বত-প্রমাণ। সে কিনা আজ রাজপ্রসাদভোগী আর ওরা দুজনে কড়া চাবুকের আসামী। জরা আর মনঃস্থির করতে পারছিল না, কোনরকমে দায় সারা করে আপসে ফিরে এলো। সে বুঝলো তার জীবনের আর একটা সঙ্কট ঘনীভূত। সে এসব নিরিবিলিতে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করতে চায়। হয় নিষ্কৃতি নয় নিয়তি। নিয়তির স্রোত দুর্নিবার।

(১২)

দুদিন পরে।

এই দুদিন ভয়ে ভয়ে কেটেছে জরার, ভয় এবং দুশ্চিন্তায়। সে ভেবেছে দুর্ভাগ্য তার পিছু নিয়েছে নতুবা কে জানতো নরক আর অসুর এখানে। তারা তার সব কীর্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সহকর্মী। সমুদ্রপুরে ও নরেন্দ্রনগরে রাজসমাদর পাওয়ায় তার ধারণা হয়েছিল পশ্চাৎধাবমান দুর্ভাগ্যকে এড়াতে পেরেছে। এখন দেখল সে ধারণা ভ্রান্ত। পাকা শিকারী জরার এমন ঘটনা অজ্ঞাত নয়। পোষা কুকুর নিয়েছে হরিণের পিছু, দুজনে আগু পিছু বেশ ছুটেছে, হঠাৎ কুকুর থমকে দাঁড়ায়, হরিণের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলে হরিণ যে রক্ষা পায় তা নয়, আবার গন্ধের নিশানা পেয়ে হরিণের পিছু নেয়। এক্ষেত্রেও সেই রকম। মানুষ দুর্ভাগ্যের শিকার।

দুদিনেও যখন অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটল না জরার বিশ্বাস হল ওরা জানে না যে জরা এখানে আছে। জানবেই বা কি প্রকারে, জানবার কারণ নেই। এক নিতান্ত কাকতালীয়বৎ যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আপাততঃ তাদের উপরে না বসাই [illegible]।

জরা কেমন করে জানবে যে তারাই প্রথম অনুমান করেছিল ঐ পাকা [illegible] জরার কীর্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তারপর যখন যুদ্ধ বেঁধে উঠল তারা পালালো, তাই যুদ্ধের পরিণাম ও জরার বন্দীরূপে আগমন তাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল তবে দীর্ঘকালের জন্য নয়।

সেদিন জরা গিয়েছিল পাথরডাঙা গ্রামে সুবালাদের বাড়ীতে। হঠাৎ সুবালা প্রশ্ন করে বসলো, আগে যখন আসতে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কথা তুলতে দামী কাপড় পরবার ফলে ওসব বুঝি ভুলে গিয়েছ।

এমন প্রশ্ন আশা করেনি জরা তাই উত্তর জোগালো না মুখে। তাকে নীরব দেখে সুবালা বলল, তবেই বুঝতে পারছ পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, মানুষের যখন অবস্থা কিম্বা মন খারাপ হয় তখনই ওসব আগাছা গজায় মাথায়।

এবারে কথা জোগালো জরার মুখে, বলল, তাহলে রাজাদের বেলায় বুঝি পাপ-পুণ্য নেই।

কেন, রাজবাড়ীর ছাদে কি কখনো অশথ গাছ গজায় না। বিশেষ মন খারাপ তো রাজা-গজাদেরও হতে পারে।

তা তোমার মতটা কি শুনি না।

কতবার তো বলেছি। সোজা পথে যারা চলে না তাদেরই মাথায় ওসব আগাছা দেখা দেয়।

কিন্তু সুবালা পথ দীর্ঘ হলে তো সবটা সোজা না হওয়াই স্বাভাবিক।

কি জানি বাপু। আমাদের এগাঁয়ে যে কয় ঘর লোক বাস করি কারো মাথায় ওসব বালাই নেই।

তোমরা তা হলে সুখী।

দুঃখ হতে যাবে কেন?

না, সুবালা, দুঃখ আছে, পাপ আছে, নেই বললে এ সাপের বিষ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তুমি যদি পাপ করে থাকো তবে এমন সুখে আছ কি করে?

আজ আছি কাল না থাকতেও পারি। বলে জরা বিদায় নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। পাশের শুঁড়ি পথ বেয়ে পাথরের চাপড়া মাথায় বন্দী মজুররা উঠছে। জরা নিতান্ত আপন মনে না চললে দেখলে দেখতে পেত তো সেই দলের দুজন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং জরাকে ইসারায় দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো। শিকারীর নাকে আবার এসেছে শিকারের হারানো গন্ধ।

চিন্তার সমুদ্রে চেতনার ভেলা এই কিছুক্ষণ মাত্র ডুবেছে, জরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে দুজন মানুষ এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে, আলো আঁধারিতে তাদের চেহারার খসড়ার বেশি দেখা যাচ্ছিল না। গবাক্ষপথে আকাশের যে আলোটুকু আসছিল হাতে এবারে চকচক করে উঠল একখানা অস্ত্র। কিরীচ হতে পারে। তারা

ইসারায় পরস্পরে কী বলাবলি করলো, হয়তো বা মারতেই চায়। এমন সময়ে ঘুম ভেঙে গিয়ে জরা উঠে বসলো।

কে তোমরা কি চাও, এত রাত্রে কেন?

অতগুলো প্রশ্নর উত্তর কি একসঙ্গে দেওয়া যায়।

এ যে চেনা গলা।

গলাটা যখন চিনেছ তখন মানুষ দুটো ও অচেনা থাকবে না।

কে, নরক আর অসুর নাকি?

হাঁ রাজা, একসঙ্গে নরকাসুর, অজ্ঞ সমাস বলে নরেন্দ্রনগররাজ।

অপরজন বলল, এখন আমাদের দুজন রাজা, নরেন্দ্রনগররাজ, আর আমাদের দলের রাজা। কাকে মেনে চলবো তাই জানতে এসেছি। এবারে জানলে কি চাই?

নরক বলল, রাতে কেন এসেছি বুঝতে কষ্ট হবে না। দিনের বেলায় দশজনের সম্মুখে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেলে কি তোমার পক্ষে গৌরবের হতো।

অগৌরব কেন?

তুমি এখন রাজামাত্য আর আমরা দাগী আসামী।

অসুর বল, যাই বলো, রাজা আমরাই বেশি গৌরব দিয়েছিলাম। ছিলে রাজা হলে রাজামাত্য।

এত রাতে এখন ঠাট্টা রাখো, কি চাও বলো।

কয়েদী কী চায়, মুক্তি।

আমি তার কি করবো।

বলো কি রাজা, এখন তুমি নরেন্দ্রনগররাজের নয়নের মণি, রাজার রাণী নেই নইলেত তারও ঐ রকম কিছু হতে। তুমি একটু ইঙ্গিত করলেই রাজা খুশি হয়ে আমাদের ছুটি দেবেন।

একবার তো ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে ফিরলে কেন?

ভাগ্যে রাজদর্শন লেখা ছিল তাই।

কিন্তু আমি কেন তোমাদের মুক্তির জন্যে ইঙ্গিত করতে যাবো।

নিজের মঙ্গলের জন্যে।

নইলে অমঙ্গল।

অমঙ্গল কি?

মৃত্যু হতে পারে।

রাজার আদেশে?

আমাদের হাতে হতেই বা বাধা কি? এই বলে দেখালো কিরীচখানা।

জরা বলল, মরলে তোমাদের মুক্তির জন্যে ইঙ্গিত করবো কি ভাবে।

এই তো পথে এসো রাজা। আমাদের ছুটি করে দাও, আমরা দেশে চলে যাই, কেউ জানতে পারবে না যে বাসুদেবের হত্যাকারী।

এখানে বসে বসে বাসুদেবের মূর্তি গড়তে সাহায্য করো, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো, চাই কি তার পাশে নিজেরও একটি মূর্তি দাঁড় করিয়ে দাও।

এই বলে নরক হেসে উঠল।

জরা ভাবে উঃ কি নারকীর হাসি, এ যেন ঘটোৎকচেও হার মানায়।

আর , যদি রাজার কাছে বলবার না করি।

তবে বাধ্য হয়ে আমাদের বলতে হবে। বাসুদেব ভক্ত রাজা নিশ্চয় বাসুদেব হত্যাকারীকে ক্ষমা করবেন না।

দাগী আসামীর কথা রাজা বিশ্বাস করবেন কেন?

সেই কৌস্তুভমণির হারটা কোথায় রাখলে।

জরার মনে পড়লো সীমন্তিনীর স্মৃতি, বলল সেটা আর যেখানেই থাকুক আমার কাছে নেই।

বাসুদেব হত্যার ওটাই প্রধান চিহ্ন, সেটা না থাকায় ওরা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হন।

এবারে জরা বলল, আমি যদি ঐ অপরাধে তোমাদের অভিযুক্ত করি।

তবু রাজা আমাদের বিশ্বাস করবেন।

কেন?

একজন সাক্ষীর চেয়ে দুইজন সাক্ষীর গুরুত্ব বেশি।

এবারে অসুর বলল, রাত শেষ হয় রাজা, আর দেরি চাইও না, রাজাকে বলে আমাদের মুক্তি দাও, নইলে চলো তিনজনেই পালিয়ে চলে যাই।

আমি এ দুয়ের একটাতেও রাজি নই, দৃঢ়ভাবে বলল জরা।

তবে এই নাও বলে হঠাৎ আক্রমণ করলো নরক। কিরীচখানা তার হাতেই ছিল। জরা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারখানা টেনে নিল। নরকাসুরের ধারণা ছিল শয়নগৃহে রাত্রেবেলায় জরাকে নিরস্ত্র পাওয়া যাবে। এরকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জরা কখনো নিরস্ত্র থাকতো না। তার প্রতি রাজপুরীর লোকদের মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনগররাজ। তাঁর পরামর্শেই জরা সর্বদা সশস্ত্র থাকতো।

জরা যে অসি চালনায় এমন নিপুণ নরক বা অসুর জানতো না। তাদের ধারণা ছিল ব্যাধের ছেলে শুধু তীর ধনুক চালাতেই জানে। এখন তার অসিতে পটুতা দেখে ভড়কে গেল,—কিন্তু আর পিছোবার উপায় নেই।

সেই গভীর রাতের আলো-আঁধারির মধ্যে নরক ও জরা মৃত্যু পণ করে লড়তে লাগলো। অসুর দেখলো নরক এক পা এক পা করে পিছু হটছে, গতিক ভালো নয়। তার উপরে আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে এ ঘরটা তাদের পরিচিত নয়—প্রস্থ দৈর্ঘ্য উচ্চতা কিছুই তাদের জ্ঞাত নয়। সেদিন জরাকে দেখবার পরে নিভৃতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার ইচ্ছা তাদের হয়েছিল; সুযোগের সন্ধানে ছিল: আজ বিকালে মাত্র জরার শয়ন ঘরটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। গভীর রাতে রাজপুরী নিস্তব্ধ হলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

জরা বুঝে নিয়েছিল যে অস্ত্রধারী মাত্র একজন—তাই নির্ভয়ে লড়ছিল। নরক নিতান্ত অনিপুণ নয় তবে জরার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দ্বৈরথ শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল, নরকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার বুকে অসিখানা আমূল বিদ্ধ করে দিল জরা। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে বার দুইচার আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো, তার পরে স্থির হয়ে গেল।

অসুর তার হস্তচ্যুত তলোয়ারখানা কুড়িয়ে নিতেই জরা তাকে আঘাত করলো। দক্ষিণ হাত শুদ্ধ তলোয়ারখানা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। সে চীৎকার করতে করতে পলায়ন করলো। জরা কি করবে ভাবছে এমন সময়ে তার কানে গেল অসুরের চীৎকার। সে তারস্বরে ঘোষণা করছে ওগো তোমরা সবাই এসো, ভগবান বাসুদেবের হত্যাকারীকে ধরো—শীগগীর এসো, আর এক লহমা বিলম্ব হলেই সে পালাবে।

এই ঘোষণার জন্যে জরা প্রস্তুত ছিল না; সে বুঝলো এই মুহূর্তেই তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে: লোকজন এসে পড়লে আর রক্ষা নাই। কর্মপন্থা একটিই ছিল—পলায়ন। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুরীর দেয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো, তার পরে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল সে। এসব এক নিমেষে ঘটে গেল, তখনো অসুরের নিদারুণ ঘোষণার ক্ষীণ রেশ তার কানে আসছিল।

পাহাড়ের পথঘাট জরার জানা হয়ে গিয়েছিল, পাহাড় থেকে নেমে খরস্রোত পেরিয়ে, পাথরভাঙা গ্রামের কোণ ঘেঁষে সে ছুটছে। একবার যেন সুবালাদের কুটীরখানার অস্পষ্ট খসড়া তার চোখে পড়লো। সে অবিরাম ছুটছে, অন্ধকারে দিক্‌জ্ঞান সম্ভব নয়, সে সব দিনের বেলায় স্থির করলেই চলবে। এখন নরেন্দ্রনগর ও তার মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে তত বেশি তার নিরাপত্তা। মন্ত্রতাড়িত প্রেতাত্মার মতো ছুটে চলেছে সে।

জীবন-পণ্ডিতের পাঠশালায় পণ্ডিত-মশাই হঠাৎ জেগে উঠে বেতগাছা টেনে নিয়ে পড়োদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

(ক্রমশঃ)

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরতত্ত্ব: ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম

স্যার ফ্রান্সিস গাল্টন একদা এক ধরণের মজার বাঁশী তৈরী করেছিলেন। মানুষ এর শব্দ শুনতে পেত না, কিন্তু কুকুর পেত এবং শব্দের মানে বুঝতে পেরে আদেশ পালন করত ঠিক ঠিক। এর কারণ কি? একই শব্দ অথচ দুজনের ক্ষেত্রে দুরকমের প্রতিক্রিয়া কেন?

আমরা জানি শব্দের উৎপত্তি কম্পন তরঙ্গ থেকে। আমরা যখন কথা বলি, আমাদের কণ্ঠ থেকে একটা কম্পন তরঙ্গ বের হয়ে চারপাশের বাতাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে চলে এবং তা শ্রোতার কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে তার স্নায়ু উত্তেজিত করে। শ্রোতার মস্তিষ্ক সেই কম্পনতরঙ্গকে বুদ্ধির কাছে পাঠিয়ে দেয়। বুদ্ধি তাকে অর্থ এবং ভাবে রূপান্তর করে তা অনুভব করে। অর্থাৎ তখনই শ্রোতা শব্দকে গ্রহণ করতে ও একই সঙ্গে মানে বুঝতে পারেন। কথা বলবার সময় বক্তার গলায় জোর যত বাড়ে, কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা তত বেশী হয়। অপরদিকে আস্তে গলায় কথা বললে কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা হয় কম।

সাধারণ হিসেব অনুযায়ী ধরে বলা হয়ে থাকে, বাতাসকে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচিশ বারেও কম কাঁপিয়ে যে শব্দ আমাদের কানে আসতে চায় তা যেমন সাধারণ কান শুনতে পায় না, তেমনি প্রতি সেকেন্ডে বাতাসকে চল্লিশ হাজারেরও বেশী বার কাঁপিয়ে যে শব্দ ওঠে তাও আমরা শুনতে পাই না। অবশ্য এ হিসেবটা অনুমান-ভিত্তিক। কারণ শোনবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। আমার কানের যন্ত্র খুবই শক্তিশালী, সামান্য শব্দ হলেও তা আমি শুনতে পাই। একজন বধিরের কানের কাছে চেঁচিয়ে কথা বললেও সে শুনতে পায় না। ঠিক একই কারণে গাল্টন সাহেবের বাঁশী কুকুর শুনতে পেত কিন্তু মানুষের কানে তার রেশ একেবারেই পৌঁছত না।

কিন্তু কার কানে পৌঁছল আর কার কানে পৌঁছল না, কে শুনতে পেল বা কে পেল না তা নিয়ে শব্দের অত মাথাব্যথা নেই। কেউ শুনলেও শব্দ আছে, কেউ না শুনলেও তাই। চরাচর ব্যাপ্ত করে শব্দ শ্রবণ-নিরপেক্ষ হয়ে বিরাজ করছে বলে ইংরাজী প্রতিশব্দ সাউন্ড-এর সঙ্গে তাকে এক পংক্তিতে বসানো চলে না। শব্দ যখন তার কম্পন তরঙ্গ সংখ্যাকে সীমার মধ্যে বেঁধে শ্রবণযোগ্য করে তখনই তা সাউন্ড হয়। শব্দ আরও ব্যাপক।

শব্দের এই ব্যাপকতাকে ভারতবর্ষের ঋষিরা মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা শব্দকে বলেছেন 'স্পন্দন'। শব্দ তার স্পন্দন নিয়ে সমস্ত ব্রহ্মান্ডকে বশ করে ফেলেছে। শ্রোতার কানে যে শব্দ ধরা পড়ল তার তুলনায় যা পড়ল না তার জগতটাই আকারে বৃহৎ।

শিক্ষাকার পানিনী শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন

সুধীন মিত্র

দার্শনিক, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর মতে, 'আত্মা বুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনো যুঙক্তে বিবক্ষয়া। মনোঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম। মারুতস্তুরসি চরণ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্।'

অর্থাৎ আত্মা চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মনকে প্রেরণ করে, মন দেহের অগ্নিকে জ্বালিয়ে দেয়, সেই অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণ করে, প্রাণবায়ু উরুদেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নাদ বা শব্দের সৃষ্টি করে। স্বরের উৎপত্তি সেই নাদ থেকেই। চৈতন্যযুক্ত আত্মার সঙ্গে মন এসে যোগ দিলে অগ্নি অর্থাৎ শক্তির উদ্বোধন হয়। এই শক্তি থেকেই প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। শব্দের নিগূঢ় রহস্য প্রাণবায়ুর এই সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব শব্দ ও স্বরের জন্মকথা আরও বিশদভাবে বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে, আত্মা চেতনার আলোয় দীপ্ত হয়ে মনকে প্রেরণ করে। মন দেহের অভ্যন্তরে যে আগুন রয়েছে তাকে জ্বালিয়ে প্রাণবায়ুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। প্রাণবায়ু দেহের ঊর্ধ্বমুলে চলতে চলতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধ্বনির সৃষ্টি করে। এই ধ্বনিই নাদ বা শব্দের জন্মদাতা। নাদ অব্যক্ত হলে তাকে সূক্ষ্মশব্দ বলে, ব্যক্ত হলেই তাকে বলে স্বর।

তন্ত্রশাস্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় আরও এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তন্ত্রমতে শব্দ শক্তির আধার। শক্তি তিনরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। একদিকে সৃষ্টিকে পূর্ণ করে তোলা তার কাজ, অপরদিকে শূন্য করা। মাঝখানে থাকে স্থিতিশক্তি। তার সমতা রক্ষা করে সে। শব্দ এই শক্তির বিকাশকে পূর্ণতম করে। পৃথিবীর আদি শব্দ ওঁকার তাই এই তিনরূপেরই সমাহার।

শব্দকে বলা হয় আকাশের গুণ (Quality of Ether)। বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক—এই দুটি ভাগে তাকে বিভক্ত করা যায়। অনাহত শব্দ ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপাদান। একেই বলা হয়েছে শব্দব্রহ্ম। দেহস্থ কোনও অংশে আহত না হয়ে বা ধাক্কা না খেয়ে যে শব্দের জন্ম, তা-ই অনাহত শব্দ। অন্যদিকে বাক্য, পদ বা বর্ণ নিয়ে বর্ণাত্মক শব্দ গঠিত। বর্ণাত্মক শব্দ সেই কারণে অর্থের দ্বারা সীমিত।

আমাদের দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম, কারণ ও স্থূল শরীর রয়েছে, শব্দেরও তেমনি রয়েছে চারটি অবস্থা। এগুলির নাম যথাক্রমে পরা, পশ্যান্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। পরা শব্দের উৎপত্তি মহাবিন্দু থেকে। কুন্ডলিনী শক্তির মধ্যে এর অবস্থান। স্থির এবং অচঞ্চল পরাশব্দ হল শব্দের সমাধিস্থ রূপ। এই শব্দ অনন্ত ও অবিনাশী। পশ্যান্তী বা সামান্য স্পন্দ শব্দ এসেছে পরাশব্দ থেকে। পশ্যান্তী শব্দ বাস করে মূলাধার চক্র থেকে মণিপুর চক্রের মধ্যে। মনের সঙ্গে পশ্যন্তী সংশ্লিষ্ট। শব্দের ঈশ্বররূপ বলে একে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যমা শব্দ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত।

CENTRAL LIBRARY

মণিপুর চক্র থেকে হৃদয় পর্যন্ত এর এলাকা। এরই এক নাম হিরণ্যগর্ভ শব্দ। মধ্যমা শব্দ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্থূল বাক্যের সাহায্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে তখন তাকে বৈখরী শব্দ বলে। বৈখরীকে কেউ কেউ বিরাট শব্দও বলে। বিরাট শব্দ মধ্যমা শব্দেরই স্থূল অভিব্যক্তি। ইচ্ছাশক্তি থেকে জন্ম নিয়ে বৈখরী শব্দ স্পন্দনের আকারে কণ্ঠে স্পষ্ট হয় এবং বর্ণ ও বাক্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দেখা যাচ্ছে, চেতনা থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কম্পন, কম্পন থেকে নাদ বা শব্দ এবং সবশেষে শব্দ থেকে এল স্বর।

সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বরের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ সলিলে সৃষ্টি তখন রহস্যাবৃত। জীবনের অস্তিত্ব তখনও অনুপস্থিত। সূর্যের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্ব তখন গলিত ও উত্তপ্ত।

যুগের পর যুগ পার হয়ে গেল। শান্ত ও শীতল হল পৃথিবী। জলে সাঁতার কাটল মাছ, আকাশে উড়ল পাখী, বনে বনে অতিকায় বন্যপ্রাণীদের পদক্ষেপে পায়ের তলায় মাটি উঠল কেঁপে। সমস্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ করে শব্দে শব্দে ভরে উঠল ভুবন। পাখীদের কণ্ঠে, জলের মাছের পাখনার শব্দে, বন্যপ্রাণীদের চলার ছন্দে, যে বৈচিত্র্য এল তার মধ্য দিয়েই সুরের প্রথম অভ্যুদয় প্রাণের সমাজে ঘটল। আবিষ্কারের চিন্তা তখনও অনেক দূরের ব্যাপার ছিল। সুরকে স্বর দিয়ে বেঁধে রাখবার কথা ভাববার কোনও অবসর তখনও ছিল না। মানুষ তখনও তার অনুসন্ধানী প্রজ্ঞা নিয়ে হাজির হয় নি।

সৃষ্টির শেষ ধাপে এল মানুষ। জয় করে নিল সমস্ত প্রকৃতি। প্রাণের বিকাশ শ্রেষ্ঠার আসনে প্রতিষ্ঠা পেল। প্রাণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল সভ্যতা। আপনার স্বরূপকে জানবার আগ্রহ মানুষের মনে জেগে উঠল। মানুষ দেখল বিশ্বপ্রকৃতির মহলে মহলে তার চিত্তপ্রকৃতি আপনাকে সঞ্চার করে দিয়েছে। মানুষ আরও দেখল, বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণের কেন্দ্রে তার চিত্তপ্রকৃতিকে স্থায়ী করে রাখতে হলে তাকে সুরের বিন্দুতে স্থাপন করা দরকার। মানুষের এই উপলব্ধি থেকে সুরের অন্বেষণ আরম্ভ হল।

অন্বেষণের প্রথম স্তরেই একথা বোঝা গেল, হৃদয়ের আদান-প্রদানই হচ্ছে আত্মীয়তাকে নিবিড় করবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। আবার সুরের আদান-প্রদান হৃদয়ের আদান-প্রদানের সবচেয়ে নিকট মাধ্যম। কারণ সুরের আবেদন সরাসরি হৃদয়ের কাছে। মস্তিষ্কের কাছে তাকে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয় না। প্রকৃতির সুরকে আপন করে নেবার তাই চেষ্টা চলল নিরন্তর। দেখা গেল, প্রকৃতির সুরকে গ্রহণ করতে হলে, তার যে যে জায়গায় সুর লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রবেশ করতে হবে আহরণের মনোভাব নিয়ে। কার্যতঃ প্রকৃতির এই সুর আছে ময়ূরের ডাকে, কোকিলের কুহু-শব্দে, অশ্বের হ্রেষায়, আছে নদীর ছলোছলে আর মেঘের গর্জনে। এদের কাছে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হল না মানুষ। কণ্ঠে এদের ধ্বনি ধারণ করল। এই ধ্বনিকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থায়ী করতেই স্বরের আবিষ্কার হল।

সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর-আবিষ্কারের অধ্যায় মোটামুটি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমরা সাত স্বরের যে মার্জিত রূপ পাই, তখন কিন্তু তেমন ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। আজকের সাতস্বর শ্রুতি, মূর্ছনা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হয়েছে।

সঙ্গীতের প্রথম যুগের নাম আর্চিক যুগ। একটিমাত্র স্বর দিয়েই মনের ভাব-প্রকাশের কাজ এ যুগে মানুষকে চালিয়ে নিতে হত। আর্চিকের পর গাথিক যুগ এল দুই স্বর নিয়ে। আবার চলল গবেষণা। সামিক যুগে তিন স্বরের আবিষ্কার হল। ক্রমশ এল স্বরান্তরের যুগ অর্থাৎ চার স্বরের যুগ, ঔড়ব বা পাঁচ স্বরের যুগ। ষাড়ব যুগের শুরু হল ছয় স্বরকে সঙ্গে নিয়ে। সবশেষে সম্পূর্ণ যুগে এসে পড়ল। সাতটি স্বর আপন সুরের সাতটি পাঁপড়ি মেলে দিয়ে বিশ্বসঙ্গীতের আত্মাকে নন্দন সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুললে।

স্বরের জন্মকথা প্রসঙ্গে একটি বিতর্ক আজও চলে আসছে। আমরা শুনেছি আর্চিক যুগ এক স্বরের যুগ। কিন্তু এটি কোন্ স্বর এ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মতবাদ পোষণ করে থাকেন। অন্যান্য যুগের স্বর সম্বন্ধেও একই ধরনের বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে নির্ভরযোগ্য মনে করলে বলতেই হয়, আর্চিক যুগে আবিষ্কৃত স্বরটি মধ্যম। গাথিক যুগে মধ্যমের সঙ্গে পঞ্চম এসে মিলল। সামিক যুগ মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জের যুগ। তারপর এল স্বরান্তরের যুগ। মধ্যম, পঞ্চম, ষড়জ এবং গান্ধার—এই চারিটি স্বর এ যুগের স্বর। অতঃপর ঔড়ব যুগে চারিটি স্বরের সঙ্গে ঋষভ এসে যুক্ত হল। ষাড়ব যুগে এদের সঙ্গে সংযোজিত হল নিষাদ স্বরটি। সম্পূর্ণ যুগে ধৈবত স্বরটিকে নিয়ে সাতটি স্বর সঙ্গীতের সাধনাকে গভীর করে তুলল।

সঙ্গীতের জগতে সাতটি স্বরের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক স্বরই আত্মাকে জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে আপন আপন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। তবুও এরই মধ্যে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে যেটা চোখে না পড়ে পারে না, তা হল, ভারতীয় সঙ্গীতসাধকেরা সাতটি স্বরের মধ্যে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমাদের সঙ্গীতে এই স্বর তিনটি কেন অধিকতর সম্মানের স্থান অধিকার করে বসে আছে। কিন্তু কেন? এ সম্মান কি ভিত্তিহীন?

কোনও বিশেষ স্বরকে যথার্থ মূল্য দিতে হলে সেই বিশেষ স্বরটির আবেদনকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। দেখতে হবে, স্বরটির প্রয়োগমূল্য কতখানি। বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে মানব-চৈতন্যের যোগসূত্র রচনায় সে কতটা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় জীবনধারায় স্বাভাবিক-ভাবেই নিখিল প্রকৃতিকে মানবপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা আনন্দের দিনে আকাশকে সঙ্গী করেছি, আনন্দের ভাগ দিয়েছি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুপরমাণুকে। দুঃখের মুহূর্তে বাতাস সমবেদনা জানিয়েছে, সমস্ত সৌর-মণ্ডল কান্নায় সুরে সুর মিলিয়েছে। সঙ্গীতের স্বরগুলিও তাই তত বেশী শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে যত সে আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, এককথায় বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব, অন্তরাত্মার কাছে ঋণ স্বীকার করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জকেই অপর চারিটি স্বরের তুলনায় সর্বব্যাপী বলে মনে হয়।

প্রথমেই ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর-গুলির উপর যে তান্ত্রিক বর্ণবীজ আরোপ করা হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। বিশ্লেষণের পূর্বে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য হিসেবে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেহভাণ্ডকে ঘিরে যে সমস্ত নাড়ী শাখা-প্রশাখার মতো পল্লবিত হয়ে দেহের অন্তর্নিহিত সজীবতাকে বহন করে রয়েছে—আমাদের তন্ত্রসাধনায় তাদের চালনা করবার প্রণালী তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে এদের সংযত নিয়ন্ত্রণের ফলে কেমন করে অসাধ্যসাধন করা যায়। এদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ইড়ার ডানদিকে ও পিঙ্গলার বাঁদিকে অবস্থিত হয়ে মস্তক পর্যন্ত প্রসারিত। তান্ত্রিক বীজ হিসেবে 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত যে বর্ণগুলি ব্যবহার করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি অর্থহীন বলে মনে হলেও আসলে এদের ধ্বনি ও ভাব দেহের অভ্যন্তরের নাড়ীগুলিকে কঠোর ছন্দে বেঁধে দেহ-যন্ত্রকে সংযত রাখে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমাদের দেহে ছটি চক্র আছে। এগুলি যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। নিজ নিজ চক্রে মধ্যে অবস্থিত হয়ে এরা ধ্বনির মাধ্যমে কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ প্রভাব রেখে যাচ্ছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম থেকে। উপরোক্ত ছটি চক্রের উৎস আবার পঞ্চ-ভূতেই নিহিত। 'বিশুদ্ধ' চক্র কণ্ঠমূলে, 'অনাহত' হৃদয়ে, 'আজ্ঞা' ভ্রূ-র মাঝখানে, মণিপুর চক্র নাভিমূলে, স্বাধিষ্ঠান

লিঙ্গমূলে, এবং 'আধার' বা 'মূলাধার' চক্র পায়ুদেশের কিছুটা ঊর্ধ্বে অবস্থিত। 'অ' থেকে 'অঃ' পর্যন্ত ষোলটি বর্ণ স্থান পেয়েছে 'বিশুদ্ধ' চক্রে, 'অনাহত' চক্রে পেয়েছে 'ক' থেকে 'ঠ' পর্যন্ত বারোটি বর্ণ, 'মণিপুর' চক্রে 'ড' থেকে 'ফ' দশটি বর্ণ, 'স্বাধিষ্ঠান' চক্রে এসেছে 'ব' থেকে 'ল'—এই ছয়টি বর্ণ এবং 'মূলাধার' চক্র গ্রহণ করেছে 'ব' থেকে 'স' পর্যন্ত চারিটি বর্ণ। 'আজ্ঞা' চক্রে আছে 'হ' এবং 'ক্ষ' বর্ণ দুটি। প্রতিটি চক্রের সঙ্গে তাদের যথাস্থিত বর্ণগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। চক্রগুলির কর্মশক্তি বর্ণগুলির ধ্বনি ও উচ্চারণের সঙ্গে জড়িত। বর্ণগুলি চক্রগুলিকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে বর্ণগুলি উচ্চারণ করলেই তাদের ধ্বনিসাহায্যে চক্রগুলির কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে এদের ক্রিয়া অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ, তালব্য, মূর্ধা, দন্ত, ও ওষ্ঠ্য এই বিভাগের অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলির মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ বর্ণগুলিকে বসানো হয়েছে, তাদের সঠিক উচ্চারণে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত বিশেষ বিশেষ চক্রগুলির উপর ছাপ পড়ে যায়। যেমন 'হ' উচ্চারণ করলে তা 'আজ্ঞা' (মস্তিষ্ক)কে স্পর্শ করে, 'ভ' উচ্চারণ করলে মূলাধারকে স্পর্শ করে।

আমাদের সঙ্গীত প্রত্যেক স্বরের পেছনে একটি করে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্র রয়েছে, তারও মূলে উদ্দেশ্য হল ধ্বনির প্রভাব প্রয়োগের দ্বারা সঙ্গীতসাধকদের দেহের বিভিন্ন অংশগুলিকে শক্তির ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত করে স্বরের মাধুর্যকে পবিত্র রাখা। তা রাখতে পারলে স্বরগুলি সর্বাধিক শ্রুতিমধুর হবে।

ষড়জের তান্ত্রিকবীজ 'ল', মধ্যমের 'ম' এবং পঞ্চমের 'প'। ষড়জ স্বরের উৎস স্বাধিষ্ঠান চক্রে, মধ্যমের মূলাধার চক্রে এবং পঞ্চমের মণিপুর চক্রে। শক্তির অফুরন্ত যোগান দেয় মধ্যম এবং তার মাঝখানে কুণ্ডলিনী শক্তির বাস। পঞ্চমের উৎস নাভিমূলে, সৃষ্টির সমস্ত রহস্য যেখানে আত্মগোপন করে আছে। ষড়জ এদিক থেকে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যোগ রেখেছে। যেখানে স্বর্গ ও পাতাল এক হয়েছে, পঞ্চভূতেরা যেখানে কোনও না কোনওভাবে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে, ষড়জ সেই জগতের। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমকে যদি পুষ্ট করা যায় অর্থাৎ নাভি, মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠান চক্রের শক্তির কর্মতৎপরতাকে যদি অধিকতম ত্বরান্বিত করা যায়, তবে অন্যান্য স্বরগুলিকে আয়ত্তে আনবার শক্তি সঞ্চয় অনায়াসসাধ্য হয়। প্রাণের যা কিছু শক্তি প্রাণের ভেতরেই আছে, তার বাইরে নয়, আর শব্দ তার ধ্বনির মাধ্যমে সেই শক্তিকে মন্দ্রিত করে স্বরের কেন্দ্রে তাকে স্থাপন করেছে। তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের বর্ণগুলির দ্বারা স্বরগুলি এইভাবে উপকৃত হচ্ছে।

তান্ত্রিক বর্ণবীজ ভেতরের দিক দিয়ে স্বরগুলিকে ধ্বনিমান করে দেহের বিভিন্ন অংশকে জাগ্রত করছে। সঙ্গীতের স্বরের পেছনে যে বর্ণ বা রঙের কল্পনা করা হয়েছে সেগুলিও সঙ্গীত-সাধকের মনস্তত্ত্বের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাকে সারিয়ে তুলছে। এবং এখানেও মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জের স্থান অন্যান্য চারিটি স্বরের অনেক উপরে।

বিজ্ঞান বলে, সূর্যের আলো সাতরঙের সমষ্টি। সাতটি রঙকে সমান অনুপাতে মিশিয়ে ফেললে সাদা রঙকে পাওয়া যায়। কালো রঙ পাওয়া যাবে যদি কোনও অদৃশ্য ব্লটিং পেপার দিয়ে সূর্যের আলো থেকে সাতটি রঙকেই শুষে নেওয়া সম্ভব হয়। সাত রঙের মধ্যে লাল, নীল ও হলদে হল মৌলিক। সাদা রঙকে যদি পূর্ণতার প্রতীক বলে ধরে নিই, কালো তাহলে শূন্যতার স্থান নিতে পারে নিশ্চয়ই। অবশ্য, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে শূন্যতাকে কোনও অংশেই খাটো দেখানো হয়নি। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রলয় ত শূন্যতাকেই মর্যাদা দিয়েছে। সৃষ্টি এবং প্রলয়—পূর্ণতা ও শূন্যতার ভারসাম্য রক্ষা করছে স্থিতিশক্তি। সে দেখছে, কেউ যেন অপরকে ছাড়িয়ে না যায়। শূন্যতা এবং পূর্ণতা একই পরিপূর্ণতার দুই সমান ভগ্নাংশ। বর্ণের দিক দিয়ে বিচার করলে তাই সাদা ও কালো এই দুটি রঙই বর্ণজগতে মহামান্য অতিথির আসন গ্রহণ করতে পারে, যা মৌলিক বলে স্বীকৃত হলেও হলুদ বা নীল রঙ পারে না। পারে না সবুজ, বেগুনী বা ঐ ধরনের রঙগুলিও।

লাল রঙ-এর ব্যাপারটা এক্ষেত্রে কিছু পৃথক। ভিড়ের মাঝে সে হারিয়ে যায় না। সমতারক্ষক বর্ণ হিসেবে তার খ্যাতিও আছে। বর্ণের রূপময়তা যখন রূপহীনতার অথৈ সমুদ্রে ভাবের নৌকো ভাসিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করে, লাল রঙ তাকে আলোকস্তম্ভের মতো পথ দেখিয়ে বলে, 'এইবার তোমাদের রূপহীনতার রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হল।' কথাটাকে ব্যাখ্যা করা যাক।

পরমাণুর কেন্দ্রে বাস করে নিউক্লিয়াস। এ বুঝি একই সংসারে মিলে মিশে বাস করা। সংসারের অন্যান্য সভ্য হল নিউট্রন আর প্রোটনের দল। নিউক্লিয়াসের চারপাশ দিয়ে উপবৃত্তের মতো প্রচণ্ডবেগে ঘুরছে ইলেকট্রন। নিউট্রন 'হ্যাঁ'-তেও নেই, 'না'-তেও নয়। কিন্তু ইলেকট্রনের প্রকৃতি প্রোটনের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্মক। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক তড়িৎকে প্রোটনের ধনাত্মক তড়িৎ নাকচ করে। সেটা আবার কেমন? মনে করা যাক, আমি বেচারা বড়ই দুর্বল। প্রোটন আমাকে কিছু শক্তি দিল। আমি নিজেকে শক্তিশালী ভেবে আনন্দে গদগদ, ঠিক সেই সময় ইলেকট্রন সেই শক্তিটুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল। আমি আবার দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা—'যথা পূর্বং তথা পরং'। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, যে বিদ্যুৎ শক্তি যোগ করে চলে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'ধনাত্মক তড়িৎ' বলা হয়েছে, অপরদিকে শক্তিকে ক্ষয় করে যে বিদ্যুৎ তা-ই ঋণাত্মক তড়িৎ। এই যোগ-বিয়োগের দরুন পদার্থমাত্রেই তড়িৎসম্পন্ন হয় না। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ইলেকট্রন মাঝে মাঝে কেন্দ্রশক্তির (কেন্দ্রাতিগ বলের) কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তখন তার শক্তি খানিকটা বেরিয়ে যায়। একেই ইলেকট্রন বিকীরণ বলে। এই বিকীরণের ফলে ইথারের উপর যে কম্পনতরঙ্গের সূচনা করে, সেই তরঙ্গ সংখ্যার উপরই নির্ভর করে রঙের নাম। এই তরঙ্গ সংখ্যাগুলিকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন—এই উভয়-সীমার মধ্যবর্তী কম্পনতরঙ্গগুলিকেই আমরা রঙ বলে মেনে নিই। সাদা সমস্ত রঙের কম্পনতরঙ্গের মিলিত রূপ। লাল ন্যূনতম কম্পন সংখ্যাবিশিষ্ট বর্ণ। রঙ বলে মেনে নিতে পারি এমন কম্পন তরঙ্গের ন্যূনতম সংখ্যাও যেখানে গরহাজির তাকেই কালো বলে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই রঙের জগতে কালো, লাল ও সাদা বিশেষ খাতির দাবী করতে পারে।

সূর্যের আলো থেকে যে সাতটা রঙ বিশ্লেষণ করা হয়, তার মধ্যে সাদা ও কালোকে ধরা হয় না। এর কারণ কী? সাদা ও কালো তবে কি রূপের অতীত? কোনও কম্পনতরঙ্গের সীমারেখায় এ দুটি রঙকে কি বেঁধে রাখা যায় না? না কি বৈজ্ঞানিকের দল সীমাতীতকে সীমার মধ্যে বন্দী করে তাদের উপর অবিচার করতে চান নি? ঘটনা যা-ই হোক, ব্যাখ্যাটা এভাবে করতে সত্যিই ভাল লাগে।

আলোর মধ্যে ধরা পড়ে যে সাতরঙ, পুরাণে যাকে বলেছে সপ্তাশ্ব, তাদের চুলচেরা হিসেব নিলে দেখা যাবে; স্থিতিস্থাপক লাল রঙ অন্য ছয় রঙের চাইতে অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। লাল রঙের জীবনীশক্তি অন্য সব রঙকে ছাপিয়ে উঠেছে। অনেক বেশী গতিসম্পন্ন সে। সচল মনকে একাগ্র করতে তার জুড়ি নেই। মানুষের মনে যতখানি তার তুলনাহীন প্রভাব, জীবজগত ও জড়জগতেও ঠিক ততখানি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, লাল রঙের পরিবেশে অঙ্কুরিত শস্য অন্যান্য রঙের পরিবেশে রাখা শস্য অপেক্ষা দীর্ঘতর ও সজীবতর হয়।

প্রভাবের কথাই যদি উঠল তবে বলতেই হবে লাল আমাদের মনোস্তত্ত্বে যে কী বিচিত্র ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে, আমাদের সমাজে বিবাহ অন্নপ্রাশন বা ঐ ধরনের শুভ ও পবিত্র উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে আজও লাল কালির ব্যবহার তার সাক্ষ্য দেবে। এ ছাড়া লাল রঙ হৃদযন্ত্রকে সবল করে। হৃদযন্ত্র বিকল হলে বর্ণ-চিকিৎসকেরা রোগীকে লাল রঙ-এর পরিবেশে রাখবার পরামর্শ দেন।

বর্ণতত্ত্বে সাদা, কালো ও লাল অন্যান্য রঙের চাইতে স্বতন্ত্রতর, সঙ্গীতের স্বর-

তত্ত্বেও মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জ—এই তিনটি শ্রেষ্ঠ স্বরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সাদা, কালো ও লাল, এই তিনটি শ্রেষ্ঠ বর্ণের কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে—'ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্।' তিনটি বর্ণই সত্য, বাকী সব বিকৃত।

শিক্ষাকার নারদ মধ্যমকে আদিস্বর বলেছেন। মধ্যমের বর্ণ সাদা তাই অত্যন্ত ব্যাপক। এত ব্যাপক যে আকাশ ছাড়া আর কারও এত ক্ষমতা নেই তাকে ধারণ করে। আকাশই মধ্যমের দেবতা। শার্ঙ্গদেবের মতে, আত্মা আকাশকে জন্ম দিয়েছে, আকাশ জন্ম দিয়েছে অগ্নি ও তেজকে, অগ্নি ও তেজের মধ্যে পৃথিবীর জন্মরহস্য লিখিত। সাংখ্যদর্শন ও তৈত্তিরীয় উপনিষদেরও সেই কথা। অতএব আত্মাকে যদি বলি কারণ নাদ, তবে আত্মার সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে আকাশ, তেজ ও পৃথিবী। তেজ বা শক্তির প্রকাশক হল সূর্য। মধ্যমের দেবতা আকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। পঞ্চমের দেবতা সূর্য এবং ষড়জের পৃথিবী। সঙ্গীতের আত্মার নিকটতম আত্মীয় হল এরা। ষড়জ ও পঞ্চমের অন্য গুরুত্বও আছে। এরা অবিকৃত। স্থিতিস্থাপক স্বর হিসেবে ষড়জ আকাশ ও সূর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রত্যেক স্বরের সঙ্গেই তার বন্ধুদের গাঁটছড়া বাঁধা। রাগবিবোধকার সোমনাথ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমকে স্বয়ং সম্রাট বলে সম্মানিত করেছেন। সিংহভূপালের মতে, মধ্যম স্বর দেবকুলে উৎপন্ন। সুতরাং উত্তরাংশ ও পূর্বাংশের যে সমস্ত রাগ-রাগিনী আছে, তাতে ষড়জ, মধ্যম এবং পঞ্চমই (স-ম-প) আসর জাঁকিয়ে বসে আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতকারদের এই স্বীকৃতি-দান কোনও অলীক উচ্ছ্বাস নয়। আমাদের অধ্যাত্মবাদ আমাদের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আমাদের সঙ্গীতও আমাদের জীবনকে বাদ দিয়ে চলে না। ভারতীয় সঙ্গীত তাই এত নিটোল, এত অর্থবহ। জীবন, আধ্যাত্মিকতা ও সঙ্গীত পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ। যখনই বন্ধন শিথিল হবে বলে আশঙ্কা হয়েছে, তখনই চলেছে পুনরায় ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা। সঙ্গীতের স্বরগুলিকে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত করবার জন্য গবেষণা চলেছে অবিরাম। ফলে, আমাদের সঙ্গীতে যা কিছু বিবর্তন, সবই বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে আপন সত্তাকে মুক্ত করার প্রয়াস।

এই প্রচেষ্টা যে কত আন্তরিক, তার প্রমাণ হল চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থের পেছনে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাদের তিন রূপের কল্পনা। এই তিন রূপ যেন সমগ্রতার ধারক। দুইদিকে দুই চরম প্রান্তসীমা, মাঝখানে সংহত কেন্দ্রবিন্দু। একদিকে স্থিতি, অপরদিকে গতি, মাঝখানে স্থিতিস্থাপক সংযমবন্ধন।

বিজ্ঞানের দোহাই না দিলে আমরা হাল আমলের আধুনিকেরা কোনও কথাই সহজে মেনে নিতে পারি না। এখানে তাই বলে রাখা ভাল বিজ্ঞানও পদার্থের তিন অবস্থার কথা স্বীকার করে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন অবস্থাতেই সৃষ্টির যাবতীয় রূপান্তর ঘটছে। আত্মার কম্পন থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। কম্পন নির্ভর করে গতির বেগের উপর। গতির ধ্বংস অসম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে তার পরিবর্তন অবশ্যই আছে। সেই পরিবর্তন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন অবস্থার মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তন করে।

বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের বহিরঙ্গ রূপকে বিজ্ঞান কঠিন তরল ও গ্যাসীয় বলে বর্ণনা করেছে। সেটা ঠিক। তবুও বৃহত্তর জীবনের পটে বহিরঙ্গ রূপের ভূমিকা ত তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। স্থূল বহিরঙ্গ রূপের পেছনে বিরাজ করছে সূক্ষ্মতম অন্তরঙ্গ রূপ। এই রূপকেও যদি তিন অবস্থায় বেঁধে ফেলা যায় তবে কবিতার ছন্দে চলবে বিশ্ব। ত্রিগুণবাদ সাংখ্যকারদেরই আকৃতিকেই নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, প্রকৃতিকেও সে যথেষ্ট মূল্য দেয়। সঙ্গীতের তিনটি স্বর ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম, এদের বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। মানবিক তিনটি ভাব সত্ত্ব, রজ ও তমোর সঙ্গে এদের প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। অন্তরপ্রকৃতির এক-দিকে ভাল, অন্যদিকে মন্দ, মধ্যবিন্দু রজঃ ভালো-মন্দের মিশ্রিত ঐক্য রূপ। এই তিনের মিলিত মাধুরীতে স্নিগ্ধ হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীত। চিত্তের অনুভূতিকে প্রকাশময় করে জীবন ও দর্শনের মতো আমাদের সঙ্গীতও বিশ্বরসিকের রসের আকর হয়েছে।

ভরত বলেছেন, অনুভূতির বস্তু রস। বিশ্বপ্রকৃতি ও চিত্তপ্রকৃতি পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্ব ও চিত্তের অন্তর্লোকে যে আত্মা নিত্য অধিষ্ঠিত, রস হল তারই নির্যাস। আত্মার নির্যাস বলে নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র করে রসের যে রূপায়ণ ঘটে, আপাত অর্থে স্থূল বলে মনে হলেও তা কিন্তু [illegible] তা নয়। নায়ক ও নায়িকা এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি অর্থেও বাচ্য। যথার্থ রসের অধিকারী নায়ক মাত্রেই শিব এবং অধিকারিণী নায়িকা মাত্রেই শক্তির ঐশ্বর্যে ভূষিত হন। আসলে সূক্ষ্ম কথাকে গম্ভীরভাবে বলা হয়েছে বেদ-উপনিষদের দোহাতে দোহাতে, সূক্ষ্ম কথাকে রমণীয় করে বলা হয়েছে রসশাস্ত্রে নায়ক ও নায়িকার প্রতীক গ্রহণ করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও তাকে কেন্দ্র করে যে সচিত্র ও অপূর্ব সুষমামণ্ডিত মানসিক বিবর্তন ও স্বপ্নের ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে তাতে যেমন সাধনার সত্তা রূপটি রয়েছে তেমনি রয়েছে শিল্পী ও প্রেমিকের মনের কথা।

আমাদের সঙ্গীতেও রসের এই গূঢ় কথাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। একেই মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীত ঋষিরা স্বরের গুরুত্ব অনুযায়ী তাতে রসের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। শুক্লবর্ণ মধ্যম ও কৃষ্ণবর্ণ পঞ্চম—রাধা ও কৃষ্ণ, পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তির দ্যোতক। উভয়ের রসই হল শৃঙ্গার। শুক্ল ও কৃষ্ণ—বর্ণের দুই বিপরীত মেরু। শুভ্রবর্ণ মিলন ও কৃষ্ণবর্ণ বিরহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শৃঙ্গার রসে প্রেমের পূর্ণতা ও বিরহের শূন্যতা দুই-ই এসে মিলে গিয়েছে মোহানায় যাচ্ছে এসে শাখা নদীর মতো। এককথায় শৃঙ্গার আদি ও শ্রেষ্ঠ রস। ভরত শৃঙ্গারকে নির্বেদ উদ্দীপক মনে করেন।

অনেকের মতে শৃঙ্গার রসে কাম ভাবের আতিশয্য রয়েছে। তাই যদি হয় তাতেই বা দোষ কি? কাম কি সর্বস্থলেই অপাঙক্তেয়? সুস্থ কাম প্রবৃত্তি কি উজ্জ্বল ও পবিত্র নয়? সৃষ্টি যে এত মহীয়ান, তা তো এই কামকে অবলম্বন করেই। 'স অকাময়ত, এ কোহম বহুস্যাম প্রজায়েয়।'

বস্তুতঃ শান্ত, মধুর, দাস্য ও বাৎসল্য সব রসকেই শৃঙ্গার আশ্রয় করে বসে আছে। সারথি অশ্ব ও রথকে চালনা করেন, মন পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, শৃঙ্গার অন্য সব রসকে নিয়ন্ত্রণ করে। শৃঙ্গার শুদ্ধাচারী হলে বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুত রস তাদের অধিকারের অপ-প্রয়োগ করতে পারে না। লবণ ও মশলার সমানুপাত মিশ্রণ ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত করে, বীভৎস, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের যথাযথ ব্যবহার রসাশ্রিত ভাবকে মহিমামণ্ডিত করে। শৃঙ্গার বাস্তবিকই সুগৃহিণী। বিপ্রলম্ভ হয়ে শৃঙ্গার বিরহের জয়গানে মূর্ছিত হয়, সম্ভোগ হয়ে মিলনকে সে নিবিড় করে। সমস্ত রসের অন্তরে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ায় সে ব্যাপক।

মধ্যম ও পঞ্চমের রস শৃঙ্গার হওয়ায় একথা বেশী করে মনে হয় যে আমাদের দেশের সঙ্গীতঋষিরা স্বরের কেন্দ্রবিন্দুতে রস ও ভাবকে স্থাপন করবার সময় কত রকম দৃষ্টিকোণ থেকেই না তাদের বিচার-বিবেচনা করতেন। মধ্যম মিলনের ব্যাপকতার প্রকাশক পঞ্চম বিরহের ব্যাপকতার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, আমাদের সঙ্গীতের স্বর-গুলি পশু-পক্ষীদের কণ্ঠস্বরকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। মাণ্ডুকীতে একথার সমর্থন আছে। পশু-পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিকে অনুসরণ করে এই যে স্বরসৃষ্টি এর হিসেব নিলেও কিন্তু মিলনের ও বিরহের তাৎপর্য আমাদের বিস্মিত করে। মধ্যম স্বর আবিষ্কারের সময় ক্রৌঞ্চের কণ্ঠস্বরকে কাজে লাগানো হয়েছে, পঞ্চম আবিষ্কারের সময় কোকিলের। ক্রৌঞ্চ মিলনের ছবি আনে। বাল্মীকি উদ্ভাবিত অনুষ্টুপ ছন্দে জগতের প্রথম যে কবিতা মানুষের মনে ঝংকার তুলেছে, তাও ক্রৌঞ্চ দম্পতির যুগল মিলনকে কেন্দ্র করে। অবশ্য সেখানে করুণতা আছে। বোধহয় আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলায় যেখানেই মিলনকে দেখানো হয়েছে, সেখানেই বিরহ ও করুণাকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে মিলন আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পঞ্চমের ক্ষেত্রেও তাই। কোকিলের

কণ্ঠের অনুসরণে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। কোকিল বিরহের বাহক। অথচ বসন্তের দূত সে। বসন্ত ঋতু ও প্রকৃতিকে যৌবনবতী করে পূর্ণতাকেই প্রকাশ করে। তবে সেখানে বিরহ কেন? এখানেও সেই এক উত্তর। মিলন ও বিরহ হাত ধরাধরি করে চলে। চলে বলেই মধ্যম ও পঞ্চমের রস শৃঙ্গার সম্পূর্ণ দ্বিবিভাজক।

ষড়জ একতাবস্থায় মধ্যম ও পঞ্চমের ছায়াতলে আশ্রিত। তার রস বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত হলেও তাই তার প্রয়োগ সুসমঞ্জস। ষড়জ স্থিতিস্থাপক স্বর। তার একদিকে মধ্যম, অন্যদিকে পঞ্চম। কাজেই একই রসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ককভের মতো সে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়নি। ময়ূরের ডাকের অনুসরণে সে সৃষ্ট। ময়ূর কলাপ বিস্তার করে বুঝি বিশ্বের মিলনকে স্বাগতম জানায়।

ব্যষ্টির অনুভূতিকে বিশ্বের অনুভূতির সঙ্গে এক করে দেওয়াই রসের প্রধান ধর্ম। আমাদের সঙ্গীতে একেই বলা হয়েছে 'সাধারণীকরণ।' প্রিয়জনবিরহে আমাদের অন্তর কেঁদে ওঠে। সেই কান্নাকে যখন আমরা রোদনের মাধ্যমে ব্যক্ত করি, তখন তা হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু সেই রোদনকে ঘিরে করুণ রসের ছোঁয়া লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কান্না বিশ্বমানব মনের চিরন্তন কান্নায় পরিণত হয়। রস-স্নিগ্ধ কান্নাও আনন্দের বস্তু। জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় যদিও দেখি, আনন্দের উৎপত্তি আনন্দ থেকে, দুঃখের থেকে দুঃখ, যেই রসের হাওয়া লাগল, অমনি বিশ্বসত্তায় লীন হয়ে গেল। তখন সুখেও আনন্দ, দুঃখেও তাই।

রসের এই আনন্দ তত ঘনীভূত হয়ে উঠবে, শ্রুতির সংখ্যা সেখানে যত বেশী হবে। শ্রুতি রসকে স্বর্গীয় পর্যায়ে উন্নীত করে। আমাদের সঙ্গীতে প্রতিটি সপ্তকে শ্রুতির সংখ্যা বাইশ। একটি স্বর থেকে পরবর্তী স্বরে আরোহণের সময় কয়েকটি কম্পনকে অতিক্রম করে যেতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই কম্পনের সংখ্যা ষোল পর্যন্ত হতে পারে। এই কম্পনের শ্রুতি-যোগ্য স্তরগুলিকে ভারতীয় সংগীতজ্ঞেরা আলাদা করে ভাগ করেছেন। মনে করা যাক, কোনও স্বরের কম্পনসংখ্যা ষোল। দেখা গেল, চারিটি কম্পনের পর তাদের সুরের তারতম্যকে পরিষ্কার ধরা গেল। সমান অনুপাতে এই তারতম্য ঘটলে তবেই বলা যাবে ষোলটি কম্পনের ক্ষেত্রে শ্রুতির সংখ্যা ১৬÷৪=৪। এই হিসেব, বলা বাহুল্য, কল্পিত। কেন না, সব সময়েই যে সমানানুপাতে তারতম্যে এই কম্পন শ্রুতি-যোগ্য হবে তার কোনও স্থিরতা নেই।

এই হিসেবের দ্বারা এটা বোধহয় স্পষ্ট হয়েছে যে একস্বর থেকে অন্য স্বরে সুর ক্ষেপণের সময় শ্রুতি যত অধিক সংখ্যক হবে, স্বরটি ব্যাপকতায় তত বিপুল হয়ে উঠবে।

স্বরের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথা যত্নসহকারে অনুধাবন করে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী নারদ শ্রুতির নামকরণ করেছেন—

দীপ্তায়তা—করুণানাং মৃদু মধ্যময়োস্তথা।
শ্রুতিনাং যোংবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য' উচাতে।।

নারদের বর্ণনা অনুসারে শ্রুতি পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তী, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। ভরতমুনি এগুলিকে জাতিশ্রুতি বলে আখ্যা দিয়ে আরও বিশদভাবে এর বিবরণ রেখেছেন। শ্রুতির সার্থকতাকে চূড়ান্তভাবে রূপ দেবার জন্য তিনি দীপ্তা ও মৃদুকে চারভাগে, আয়তাকে পাঁচভাগে, করুণাকে তিনভাগে এবং মধ্যাকে ছয়ভাগে ভাগ করলেন। বিভাগগুলির মধ্যে জাতি-শ্রুতির গূঢ় ভাব ও বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা হল।

দীপ্তার অর্থ প্রদীপ্ত। এর রস মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনাকে আহ্বান জানায়। এর উপশ্রুতি তীব্রা, রৌদ্রী বজ্রিকা ও উগ্রার কাজ হল উদ্দীপনার এই রসকে চিরস্থায়ী করা। আয়তা শব্দের অর্থ বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা, এর রসও শ্রোতার চেতনাকে উদারতায় মহৎ করে। কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারণী, সন্দীপনী ও রোহিনী—আয়তার এই পঞ্চ-উপশ্রুতি আপন সুরের বীণায় প্রসারতায় রাগিণীর কেন্দ্রস্থলে উদাস বৈরাগ্যের বীজ বপন করে। করুণা শব্দের মানেটা বুঝতে চেষ্টা করলেই দেখব আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় এবং মন কোমলতায় হয়েছে স্নিগ্ধ। আনন্দের অমৃতে দাক্ষিণ্যের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। করুণার উপশ্রুতি দয়াবতী, আলাপিনী ও

মধ্যতীর ভাবের বক্তব্যও তাই। মৃদু পছন্দ করে প্রসন্নতা ও প্রীতিকে। মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষিতি, যারা নাকি মৃদুর উপশ্রুতি, তাদেরও পছন্দ একই ধরণের। অবশেষে জাতিশ্রুতি মধ্যার কথা বলতে হয়। নাম থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায় এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। কোনও রকম বাড়াবাড়ি মধ্যা বরদাস্ত করে না। তার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যার দর্পণে সমতার লাবণ্যময় ছবি ভেসে ওঠে। আর আছে রঞ্জনীশক্তি, অনুরাগের আকর্ষণকে নিবিড় করে রাখবার ক্ষমতা। এই আকর্ষণীর শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে তার উপশ্রুতি ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তা, রম্যা ও ক্ষোভিণী।

মূলতঃ সঙ্গীতের শ্রুতিগুলি শুধু সাহিত্যবোধ-দীপ্ত নয়, ভাবরসসমৃদ্ধও বটে। কোনও স্বরের শ্রুতিসংখ্যা স্বরটির সার্বিকতার পরিমাপক হিসেবে চিহ্নিত করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। শ্রুতি যত বেশী হবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বরটিকে প্রয়োগ করা তত সহজ হবে। স্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় তার মন জয় করবার ক্ষমতার দ্বারা। মন জয় করার বিদ্যার যাদু আবার লুকিয়ে আছে, স্বরটির অনুরণনের মধ্যে। এই অনুরণনই শ্রুতি। কোন স্বরের শ্রুতিসংখ্যা কত—সে সম্বন্ধে ভরত বলেছেন,

'ষড়জশ্চতুশ্রুতিজ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃ শ্রুতিঃ স্মৃতঃ।
দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতি।।
চতুশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিঃশ্রুতি ধৈবতস্তথা।
দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়জগ্রামে স্বরান্তরে।।'

ষড়জগ্রামে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমের শ্রুতিসংখ্যা চার, ঋষভ ও ধৈবতের তিন, গান্ধার ও নিষাদ স্বরের দুই। শ্রুতি-সংখ্যাকে বিচারের মাপকাঠি মনে করলে বলতেই হয়, ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটিই শীর্ষস্থানীয়। তিনটি স্বরের প্রত্যেকটিরই চারটি করে শ্রুতি। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা এই তিনটিকে নিয়েই তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। দর্শন, সাহিত্য, মনোস্তত্ব, গণিত ও বিজ্ঞান—সব দিক নিয়েই এদের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চেয়েছিলেন সযত্নে। আর কোনও স্বর সম্বন্ধে তারা এতটা উৎসাহী ছিলেন না।

ষড়জ ও মধ্যমের কারণশ্রুতি একই—দীপ্তা, আয়তা, মৃদু ও মধ্যা। করুণা এখানে সশরীরে উপস্থিত নয়। স্বর বেদনার রসে সিঞ্চিত হলে তবেই করুণার আত্মপ্রকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোমলতা ও বেদনা—করুণার কাছে উভয় রসের সন্ধানই পাওয়া যায়। ষড়জ ও মধ্যম স্বর করুণাকে প্রত্যক্ষভাবে টেনে আনে না সত্য, কিন্তু অন্যভাবে এর অভাবকে পূরণ করা হয় প্রাজ্ঞ শ্রুতি নির্বাচনের দ্বারা। কারণশ্রুতি এক হলেও ষড়জের উপশ্রুতি মধ্যমের থেকে পৃথক হয়ে ষড়জকে স্বাতন্ত্র্যের আলোয় আলোকিত করেছে। একের পর এক আলোচনা করা যাক। ষড়জের কারণশ্রুতি দীপ্তা, আয়তা, মৃদু ও মধ্যা। দীপ্তার উপশ্রুতি এখানে ধরা হয়েছে তীব্রা (উগ্রা নয়), আয়তার কুমুদ্বতী (ক্রোধা নয়), মৃদুর মন্দা এবং মধ্যার ছন্দোবতী। ষড়জের অন্তর্লোকে তীব্র, বিস্তৃত, প্রসন্ন, কোমল ও মধুর—এক কথায় সব রসেরই কম-বেশী মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যমের কারণশ্রুতি ষড়জের অনুরূপ হলেও দীপ্তার সঙ্গে এসেছে বজ্রিকা, আয়তার সঙ্গে এসেছে প্রসারিণী, মৃদুর সঙ্গে প্রীতি ও মধ্যার সঙ্গে মার্জনী। অর্থাৎ এখানে আরোপিত উপশ্রুতিগুলি উদাত্তগুণযুক্ত। একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব স্বীয় শক্তিতে মধ্যমকে গম্ভীর মর্যাদা দিয়েছে। পঞ্চমের কারণশ্রুতি মৃদু, মধ্যা, আয়তা ও করুণা। এদের মধ্যে মৃদুর উপশ্রুতি ক্ষিতি, মধ্যার রক্তা, আয়তার সন্দীপনী এবং করুণার আলাপিনী। পঞ্চম স্বরের কারণ-শ্রুতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে করুণা, অনুপস্থিত হয়েছে দীপ্তা। করুণা পঞ্চমে সুস্পষ্ট, তাই বিন্দুমাত্র উগ্র রস সেখানে আসেনি, পরিবর্তে মূর্ত হয়েছে প্রেম, প্রীতি, প্রসন্নতা ও বেদনার মেজাজ।

আমাদের সঙ্গীতের মূল লক্ষ্যটিও সেই রকম। বেদনাই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ। শব্দের উৎপত্তি এবং সেই কারণে স্বরেরও, ভাবপ্রকাশের আকুল বেদনা থেকেই। বেদনাকেই সুরে সুরে রাঙিয়ে আমরা তার মধ্যে রসের আস্বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। এই চাওয়ার পেছনে নিষ্ঠার অভাব ছিল না বলেই নির্জনতাকে আমরা সাধনার সহায় হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি, কোলাহলকে নয়। প্রজ্ঞার ভাণ্ডার মন্থন করে সঙ্গীতের সমৃদ্ধিকল্পে আমরা সেই সেই উপাদানগুলোকে বারবার আহরণ করেছি যেখানে দেখেছি নির্জনতা সম্মান পেয়েছে। স্বরের ক্ষেত্রেও দেখেছি, নির্জনতাকে সর্বাধিক স্বীকৃতি দিয়েছে যে যে স্বর তাদের আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটি, সুতরাং, ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। বেদনা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হিসেবে এই তিনটি স্বর ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম-লোকে অনন্তপ্রসারী প্রতিষ্ঠা রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসব কথা মনে রেখে নির্দ্বিধায় ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমকে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহাসিক ইতিহাসে সর্বোত্তম ও অভিনব সংযোজন বলে মেনে নেওয়া যায়।

'গুপ্তের কথাই যদি বলেন,'—বিরুবাবু বললেন, 'তাহলে আমি বলবো এ অতি বিচিত্র বস্তু। যাঁরা যে বলেছেন, 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'—এ হল অতি সাঁচা কথা। আর এর স্বাদ হচ্ছে অম্ল-মধুর। যদি কেউ বলেন এর অর্ধেকটা মিষ্টি এবং অর্ধেক মধুর, আমি অন্ততঃ একমত হতে পারবো না তাঁর সঙ্গে।'

আমরা কোন মন্তব্য করলাম না। বোঝা যাচ্ছিল বিরুবাবু বাধা না পেলে গল্পটা শুরু করতে পারেন। গল্পের লোভে আমরা চুপ করে রইলাম। বাইরে সন্ধ্যা ক্রমেই ঘন হয়ে আসছিল। ঘরে আমরা পাঁচজন। ঘড়িতে সাতটা।

'অবশ্য আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল নিতান্তই যাকে বলে বিয়োগান্ত। আর এ-ব্যাপারে আমার একটা অপরাধবোধও রয়েছে এখনো।' তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। 'তাকালে খুব মনোজ্ঞ কিছু একটা আশা করবেন না যেন। আমার কেসটা আদালতের বিচারের মত কিছু হয়নি। অপরাধটা আমার নিজের কাছেই। আর তার দণ্ডও আমার ভেতরের বিচারক আমাকে দিয়েছে।'

গল্পের আভাস পাচ্ছি অথচ তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি না দেখে সকলেই আমরা খুব অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। বোঝা যাচ্ছিল না তিনি আর কতক্ষণ সুতো ছাড়বেন। তারপর অকস্মাৎই বিরুবাবু আমাদের একেবারে কাহিনীর মাঝখানে এনে ফেললেন।

'সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হিসেবে আমার ঘরটা ছিল হোস্টেলের তিনতলায়। একটাই ঘর তিনতলায়। বাকি দোতলায় সবটা ছেলেদের থাকবার ঘর। আর একতলায় একদিকে রান্নাঘর-খাবার ঘর, বাকী একটা দিকে আমাদের বামুনঠাকুর বিপিনের থাকার ঘর-কাম-ভাঁড়ার ঘর। হোস্টেল কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা টিউবওয়েল।

'এই টিউবওয়েল নিয়েই শুরু। হোস্টেলের চার্জ নেওয়ার দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের পাচকঠাকুরটি বিদেশে একা-একা থাকতে না পেরে কিছু একটা সাময়িক বন্দোবস্ত করেছে। আর ঐ কলতলাই হচ্ছে তার হৃদয় নিয়ে চোরাকারবারের ঘাঁটি।

'আমি কিন্তু কলতলায় পাহারা দেওয়ার জন্যেই ঘরে বসেছিলাম না। সারাদিন ক্লাস করে শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল, বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলাম। ছেলেরা হোস্টেলে ছিল না কেউ, খেলতে গিয়েছিল সব। আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলাম। তিনতলার জানালা থেকে আকাশ দেখতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ মাটিতে নেমে এলাম। মেয়েলি গলার হাসি ছেলেদের হস্টেলে অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই আবার যখন হাসি শুনলাম জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

'আমাদের বামুনঠাকুর, বিপিন, তখন সেই মেয়েটার হাত চেপে ধরে রেখেছিল। মেয়েটির কাঁখে মাটির কলসী একটা এক হাত দিয়ে বেড় দেওয়া, অপর হাতটি

বিপিনের মুঠোয়। বিপিনের ছাড়ার ইচ্ছে ছিল বলে মনে হল না। কিন্তু মেয়েটির হাসি যখন প্রায় কেঁপে পরিণত হওয়ার যোগাড় তখন বিপিন হাত ছেড়ে দিয়ে কি যেন বলল। সে তখন রাগ করে চলে যাচ্ছিল প্রায় কিন্তু বিপিনের কথায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আমি ওপর থেকে দেখলাম, বিপিন রান্নাঘরের ভেতর থেকে ছোট একটা বালতি করে এক বালতি চাল এনে রাখলো তার সামনে। ও প্রশ্রয় হল বোধহয়। আবার একবার হাসল তারপর বালতিটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমার কর্তৃত্ব সজাগ হয়ে উঠলো। তাহলে এইভাবে চালের খরচ বেশী হয়! আচ্ছা, আমি যদি থাকি,—মনে মনে বিপিনের উদ্দেশ্যে বললাম, তাহলে তোমার কেরামতি বন্ধ করছি আমি। অনেক সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ফাঁকি দিয়েছ তুমি বিপিন, কিন্তু আমি তোমাকে ফাঁকি দেখিয়ে ছাড়ব—মনে মনে বললাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, ছেলেরা যে যার ঘরে চলে গেলে আবার নীচে নামলাম আমি। বিপিন খাচ্ছিলো। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। যেন কিছুই জানি না এমনিভাবে ধূর্ত গোয়েন্দার মত আমি প্রশ্ন করলাম—কত চাল নিয়েছিলে বিপিন? এক মুহূর্ত ও চেয়ে রইল আমার দিকে—"কেন স্যার, আপনার সামনেই তো নিলাম; পাঁচ সের।" "চাল বোধহয় বেশী নিচ্ছ তুমি"—

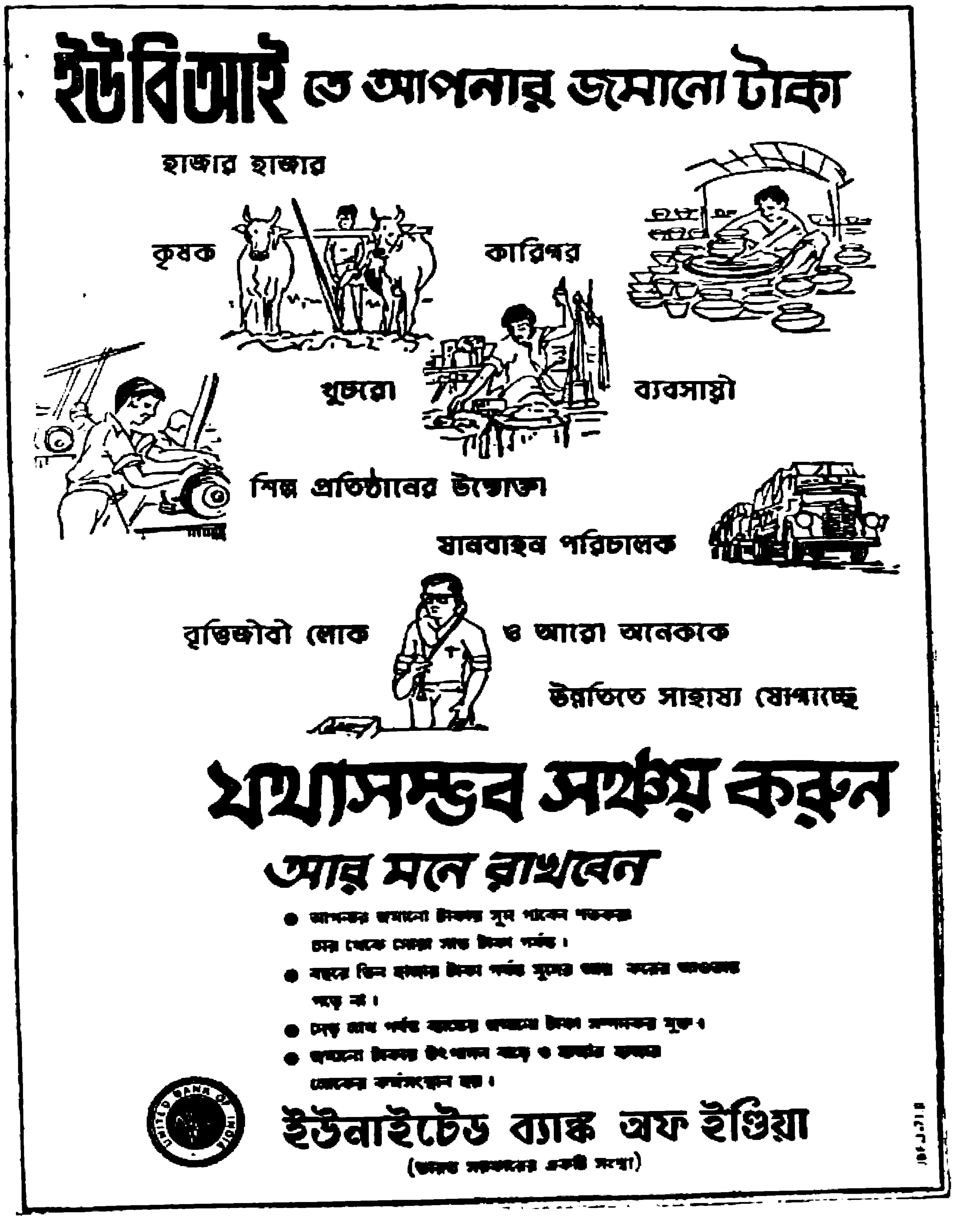

আমি বললাম। —"পাঁচ সের লাগতেই পারে না এই কটা লোকের।" "বহুদিন থেকেই তো স্যার পাঁচ সের লাগছে—" "তখন অন্য স্যার ছিলেন—" তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আমি বললাম প্রায় ধমক দিয়ে। "আগের মত কিছুই চলবে না আর মনে রেখো"—বলে আমি বেরিয়ে এলাম। মনে হল বিপিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

সে রাতটা গুমোট ছিল একটু। তার ওপরে এই ভাতচুরির ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল। কাজেই ঘুম আসছিল না মোটেই। মাঝে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে। তারপর একসময় পিপাসা পেতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে জল খেলাম, ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে এগারো জল পেটে পড়তেই একবার নীচে নামবার প্রয়োজন হল। কারণ কলতলাতেই বাথরুম ইত্যাদি সব।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারপর বাইরে যাওয়ার দরজা। বাইরের দরজা খোলার আগেই নজরে পড়ল এক চিলতে আলো আসছে বিপিনের ঘর থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে। বিপিনের ওপর রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। ব্যাটা শুধু দুষ্কর্মই করছে তাই নয়, আবার রাত জেগে কেরোসিনও পোড়াচ্ছে! প্রথমে ভাবলাম দরজায় ধাক্কা দিই। তারপর কৌতূহল হল। কি করছে? কি করছে এত রাত পর্যন্ত বিপিন? চুপ চুপি দরজার ফাঁকে গিয়ে চোখ রাখলাম। এই সময় একটা হেঁচে বাড়ির ছেলেদের জাগিয়ে তোলাটা ভাল মনে করলাম না।

এখন মনে হয়, দরজায় চোখ না দিলেই ভাল হত। কারণ সেই আমার মরণের শুরু। কি দেখলাম—সে আমি বর্ণনা করতে পারব না, সে সাহস আমার নেই, স্বীকার করছি। তবে বিপিনের ভাতচুরির আরও একটা জলজ্যান্ত সাক্ষ্য পেয়ে গেলাম। দেখলাম, বিপিন তার ভাতের দাম উশুল করছে।

মাথাটা আমার ঝিমঝিম করতে লাগলো। এক মিনিট বোধহয় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। তারপর পা টিপে টিপে চলে এলাম নিজের ঘরে। প্রাকৃতিক কর্তব্য ছাদেই সারলাম। আর তারপর নিশি-পাওয়ার মত এসে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়।

সেইরাতে বিপিনকে হাতে-নাতে ধরতে আমি পারতাম। কিন্তু তাতে ছেলেদের পক্ষে সেই নোংরা ব্যাপারের সাক্ষী হওয়াটা বাধা দেওয়া যেত না। আর তাছাড়া আমি নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, বিপিন তো আমার হাতের মুঠোয় রইলই। এ-ব্যাপার নিশ্চয়ই একদিনেই শেষ হচ্ছে না।

সে-রাতে আমার আর ঘুম আসছিল না। আর ঘুম না আসার ফলস্বরূপ আমার মনের একটা রূপান্তর ঘটছিল। জীবনের যে অংশটার সামান্য থেকে সামান্যতম খাতাপত্রই আমি জানতাম, তার পাতাগুলো যেন পট্‌পট্‌ করে খুলে যেতে লাগলো আমার চোখের সামনে অন্ধকারে। আর কি আশ্চর্য, প্রত্যেক পাতায় একই ছবি। আমার মন যেন একলাফে তার যৌবনে পৌঁছে গেল। আর, একসময়ে শেষ পর্যন্ত মনে হল বিপিনের থেকে আমার আর কোন তফাৎ নেই।

সেই রাতের কথা আজও ভুলতে পারিনি। বোধহয় কখনও পারবোও না। উত্তেজনায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। একসময় মাথায় যেন খুন চেপে গেল। মনে হল যাই, নিচে নেমে যাই। বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম। তারপর অনেকক্ষণ—কতক্ষণ জানি না—ছটফট করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙলো কিন্তু অনেক সকালে। এই পনেরো দিন এখানে আসার পর এত সকালে আমার ঘুম ভাঙেনি কখনো। আজ কি জানি কি হল। ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়লাম। সকালে এক গ্লাস জল খাওয়ার অভ্যাস আমার বরাবর—পেট পরিষ্কার রাখার জন্যে। বিছানা ছেড়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে গ্লাস হাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

হোস্টেলের বাঁদিকে যে পুকুরটা ছিল সেখানে আমার চোখ আটকে গেল। চারপাশে অশ্বত্থের ঝোপঝাড়, তারপর পুকুর,—তারপর খান-দুই খোড়ো ঘর। পুকুরের নারকেল গুঁড়ি দেওয়া সিঁড়িতে মেয়েটি তখন স্নান সেরে চুল ঝাড়ছে। একনিমেষে তাকে চিনে নিতে দেরী হল না। কিন্তু আমি সরে যেতে পারলাম না সেখান থেকে। চোখ ফেরাতে পারলাম না। ভিজে গামছায় তার শরীরকে ঢাকার পরিবর্তে আরও উগ্র করেছে যেন। প্রতিবার সে পেছন দিকে হেলে দুহাতে গামছা দিয়ে চুল ঝাপটা দিচ্ছে আর তার সারা শরীরে শিহরণ কাঁপন-লাগা কলাগাছের মত থরথরিয়ে উঠছে। মিনিটখানেক ছিলাম দাঁড়িয়ে কি মিনিট দুই। তারপরেই আমার ওপর চোখ পড়ে গিয়েছিল তার। এক-মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল চোখ বড়বড় করে। তারপর হাতের গামছাখানা গায়ে জড়িয়ে দৌড় দিল। গাছ-গাছালির আড়ালে আর দেখা গেল না তাকে।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় মোহগ্রস্তের মত। তারপরেই কলতলায় ছেলেদের গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো। ওরা উঠে পড়েছে। এখানে দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। তাই সরে এলাম।

চাল দেওয়ার সময় বিপিন আমায় জিজ্ঞেস করলে,—চাল কত দেবো স্যার? মুহূর্ত থমকে আমি বললাম,—যা দিচ্ছ তাই দাও। দু-একদিন আমি দেখি আরও, তারপর হিসেব করে দেবো। বিপিন যেন নিশ্চিন্ত হল। বললে,—আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন আজ্ঞে: আমার ঘরে এসে দেখুন, চাল কোথাও আমি লুকিয়ে রাখি কিনা। আমি ধমকে বললাম,—সে-কথা আমি বলিনি। কেন বাজে তর্ক কর। নিজের কাজ করগে যাও। আমার হিসেব পড়ে আছে।

বিপিন চলে গেল। আমার হিসেবের খাতা যেমন পড়েছিল, তেমনি পড়ে রইল। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, চাল আগের মতই নিতে বললাম কেন। মনের একটা দিক জবাব দিল, ঠিকই হয়েছে; হয়তো ভাত একটা দিন বেশী হয়েছিল, তাই বিপিন তার ভালবাসার লোককে দিয়েছে। তাতে হয়েছে কি? ফেলা তো যেতই নাহলে। ঠাকুর চাকর কে কি করছে, তা আমার দেখার দরকারটাই বা কি।

কিন্তু মনের আর একটা দিক এত সহজে আমায় ছেড়ে দিলে না। সে বলতে লাগল—তোমার এসব যুক্তি নেহাৎই নিজেকে চোখ ঠারা। মেয়েটার ওপর নিজের দুর্বলতা জন্মাচ্ছে তোমার, তাই তুমি কিছু বললে না বিপিনকে। বিপিনের কাছে ওর আসা-যাওয়া বন্ধ করতে চাও না তুমি, তাই—। আমি প্রাণপণে বোঝালাম তাকে না, না—কখনই তা নয়। কিন্তু আমার মন জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ—তাই, তাই।

এইরকম আচ্ছন্নের মত অবস্থায় সেদিনের ক্লাসগুলো সারলাম। কোন কাজেই মন দেওয়া গেল না। বিকেলবেলায় ঘরেই রইলাম। এবং ওপর থেকে বিপিনের ভাত দেওয়া লক্ষ্য করলাম আজও।

সেই রাতে জেগে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপরে নীচে নামলাম পা টিপে টিপে। কিছু না; হতাশ হলাম। বিপিন ঘুমোচ্ছে একাই। সে আসেনি।

পরদিন ভোরে নেশাগ্রস্তের মত জ্বালাধরা চোখে দাঁড়ালাম এসে জানালার ধারে। যেমন আশা করেছিলাম, তাকে দেখতে পেলাম আজও। আজ কিন্তু সে হুড়মুড়িয়ে পালিয়ে গেল না আগের দিনের মত। বরং আমার দিকে চেয়ে থাকল। আরও আশ্চর্য, যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে গেল একবার।

এইভাবে দিনকয় কেটে গেল। এই কদিন যে কিভাবে কাটালো তা বলা শক্ত আমার পক্ষে। নেশাগ্রস্তের মত, জরাগ্রস্তের মত দিনগুলো যাচ্ছিল। আমার পড়া ঘুচোয় গেল, পড়ানোও। দিনে সারাদিন এক ভাবনা ভাবি আর রাতে বিনিদ্র হয়ে বিছানায় গড়াই। দু-একদিন নীচে নেমে বিপিনের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছি, উন্মত্তের মত ওর দরজায় ধাক্কা দিতে গেছি, কিন্তু পারিনি।—শেষপর্যন্ত বিপিনের সমপর্যায়ে নিজেকে নামিয়ে আনতে পারিনি।

ব্যাপারটা চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। বিপিন দিন-সাতেকের ছুটিতে গেছে সেই সময়ে, ছেলেরা পালা করে রান্না চালাচ্ছে। বিকেলে সেদিন ছেলেরা খেলতে বেরিয়ে যেতে আমিও নেমে এলাম। কেউ নেই সারা হোস্টেল বাড়ীতে। আমার মন খালি বলতে লাগলো, এইবার,—এইবার! কিন্তু আমি জানতাম না যে, সে আমার চেয়েও বেশী সাহসী, অনেক বেশী। দেখি, ঠিক সেই সময়টাতেই সে জল নিতে এলো তার পুরোনো মাটির কলসীটা নিয়ে!

'যতক্ষণ সে জল ভরতে লাগল কল পাম্প করে, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম দরজার কাছে। প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করতে লাগলাম এগিয়ে যাওয়ার; কিন্তু পা উঠছিল না। অবশেষে কলসীটা কাঁখে নিয়ে যখন সে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে, প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দু'পা পেছিয়ে এলাম আমি ভয়ে। এই বুঝি ও গাল দিয়ে উঠবে চীৎকার করে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে এল; ভাবলাম ছুটে দিই বাড়ীর মধ্যে। কিন্তু না, সে চেঁচিয়ে উঠল না, গালও দিল না। খালি বললে, নীচে থেকো, রাতে আসবো। বলেই হেসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি।

'সেই রাতে খেতে বসে ছেলেদের গম্ভীরভাবে হোস্টেলের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিলাম। ইদানীং কেউ কেউ বেশী রাত করে পড়াশুনো করছিল, তা করতে নিষেধ করে দিলাম। কারণ হোস্টেলের নিয়ম, দশটার মধ্যে সকলে শুয়ে পড়বে। সকাল-সকাল শুলে সকাল-সকাল ওঠা যায়, আমি ছেলেদের বললাম, আর তাহলেই পড়াশুনো এবং স্বাস্থ্য দুই-ই ভাল থাকে।

'জানি এই উপদেশের মধ্যের প্রকাণ্ড ভণ্ডামীতে আপনাদের হাসি আসছে, কিন্তু আমার তখন নিমেষের জন্যে নিজের ওপর করুণাও হয়েছিল। তবে মুহূর্তের জন্য। আমার তখনকার অবস্থা বলে বোঝাতে পারবো, এমন আশা আমি করছিনে। আমি শুধু চাইছিলাম, ছেলেরা শুয়ে পড়ুক তাড়াতাড়ি। সব অন্ধকার হয়ে যাক, সব আলো নিভে গিয়ে একটা অসীম গোপনতার অভেদ্য অবগুণ্ঠন এনে দিক।

'ছেলেরা শুয়ে পড়লে দু'বার ওপর-নীচ করে দেখে নিলাম ভাল করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করলাম প্রায় আধঘণ্টা। তারপরেই নেমে এলাম নীচে। আবার কি ভেবে উঠে গেলাম তিনতলায়। নিজের ঘরের তালাটা খুলে এনে বন্ধ করলাম দোতলার সিঁড়ির দরজাটা, যাতে ছেলেরা না হঠাৎ নীচে নামতে পারে।

'সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকার সদর দরজা খুলে। ধীরে ধীরে অনেকটা সময় কেটে গেল। প্রথমটা মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা একটা হতাশার রূপ নিল। এলো না, সে এলো না বোধহয়। হয়তো আমাকে মিথ্যেই বলেছে তখন, অথবা বুঝি সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তার ওপরে রাগ হতে লাগল, নিজের ওপরেও,—কেন তার কথা বিশ্বাস করলাম।

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছি এমন সময় সে যেন অন্ধকার ফুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্যমনস্ক ছিলাম কিছুটা, তাই তাকে দেখতে পাইনি বোধহয়। তাই প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। মুহূর্ত পরেই আমি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমার বুকে তখন হাতুড়ি পড়ছে। পেছন-পেছন এলো ও। সে ঘরে ঢুকলে পলকের জন্য যেন আমি পাগল হয়ে গেলাম। দরজা বন্ধ করার কথাও মনে পড়লো না, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

'এই সময়টা ঠিক কি ঘটেছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না ঠিক ঠিক। তবে তখুনি ওর গায়ে কি-একটা কাঠিন্য অনুভব করে ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। নাহলে বোধহয় ও-ই ছাড়িয়ে দিত।

'দাঁড়াও,—ও ফিসফিস করে বললে। তারপর বুকের মধ্যে থেকে গোটা-তিনেক বোতল বের করে আমার সামনে ধরলে। এগুলো রাখতে হবে আগে,—ও বললে।

'কি এগুলো,—আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'মদ গো বাবু, মদ'—অন্ধকারে চাপা হাসি হাসলে ও, আমরা চোলাই করি তো তাই। কাল পুলিশ আসবে—ও বললে,—তাই তোমার কাছে রাখতে এসেছি গো।'

'আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ধরনের কিছু শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি।

'—কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো বাবু? নাও, এগুলো তোমার ওপরের ঘরে নিয়ে রেখে দিও। পরে সুবিধে মত গেলে আমি নিয়ে যাবো।—বলে সে বোতলগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখতে গেলো।

'আমি বাধা দিলাম তাকে। বললাম—আমার এখানে কেন? জানো, চোলাই করা, মদ লুকিয়ে রাখা, বেআইনী—অন্যায়?'

'—অন্যায়? সে আবার হেসে উঠলে। —কোনটা অন্যায় গো বাবু?—আর কোনটা নয়? দুপুর রাতে ঘরে মেয়েছেলে ঢোকানো অন্যায় নয়? নাও গো বাবু, ধর। রাত পুইয়ে এলো।'

'আমি কিন্তু হাত বাড়াতে পারলাম না। আমার ভেতরের ভদ্রলোকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মেয়েটি অপেক্ষা করলে বোধহয় মিনিটখানেক। তারপরে ফিরলো দরজার দিকে।

'সে বেরিয়ে যায়-যায় এমন সময়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলাম আমি। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল সে। ফুঁসে উঠলো ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত।—ছাড় গো ভদ্দরলোক,—সে তীব্র চাপা স্বরে বলে উঠলো,—অত ফালতু ফুর্তি হয় না। তারপর বেরিয়ে গেল সোজা অন্ধকারের মধ্যে।

'সম্বিত ফিরে পেতে আমার সময় লাগলো কিছুটা। তারপর বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিছু দেখা গেল না নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকার পর। অবশেষে তালা খুলে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো অবশেষে এক সময়ে। তারপর ঘুমিয়েও পড়লাম কখন।

'সকালে স্বাভাবিকভাবেই ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গিয়েছিল সামান্য। ব্রাশটা নিয়ে নীচে কলতলায় নামতেই ছেলেরা ভিড় করে এলো।

'—স্যার, ওদের বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল ভোরবেলায়।

'—পুলিশ? কাদের বাড়ীতে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'—ঐ যে স্যার, ঐ পুকুরধারে চাষীদের বাড়ীটা আছে—কয়েকজনে মিলে হৈ-চৈ করে উঠলো একসঙ্গে।

'একজন বলো। সকলে একসঙ্গে চীৎকার কোরো না।—তাদের আমি ধমকে থামিয়ে দিলাম। তারপর যা শুনলাম তা বুঝি গত রাত্রের নাটকের শেষ অঙ্ক। ভোরবেলা আবগারী পুলিশ এসেছিল ওদের বাড়ীতে এবং বেশ কয়েক বোতল চোলাই মদের সঙ্গে ওদের মেয়েটাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

'কোনরকমে মুখ ধুয়ে তিনতলায় উঠে গেলাম নিজের ঘরে। সেখান থেকে জানলা দিয়ে দেখলাম, বাড়ীটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। কাছাকাছি জঙ্গল পিটিয়ে পুলিশ মদের সন্ধান করেছে। উঠোনে টেনে বের করেছে একখানা ভাঙা তক্তপোষ। এদিক-ওদিক খানকয়েক ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা লুটোচ্ছে, আর গড়াচ্ছে কয়েকটা মাটির হাঁড়ি-কলসী।—একেবারে তছনছ করে দিয়েছে ওদের ঘরকন্না।

'সেদিন ক্লাসে যেতে পারলাম না আর। সর্বদাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ খচ্‌খচ্ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমিই দায়ী এই ঘটনার জন্য। বারবার ভাবছিলাম, যদি আমি লুকিয়ে রাখতাম বোতলকটা, তাহলে হয়তো এই দশা হতো না ওদের। মেয়েটি যা দিতে এসেছিল তার বিনিময়ে তো সামান্যই দাম চেয়েছিল সে। অন্যায় হতো? বে-আইনী হতো? তার জবাব তো ও নিজেই দিয়ে গেছে আমাকে। নীচে তো নেমেছিলাম আমি, অনেক নীচেই,—তার চেয়ে আর কত নীচে নামা হতো চোলাই লুকিয়ে রাখলে।'

বিকুবাবু একটানা অনেকক্ষণ বকে স্তব্ধ হলেন। আমরাও সকলে চুপ। প্রভাস নীরবতা ভাঙলে প্রথম। 'আপনার ভালই তো হয়েছিল সবদিক থেকে। কোনো অন্যায়টাই আপনাকে করতে হয়নি। সুতরাং আপনি যে অপরাধবোধের কথা বলেছিলেন গোড়ায় তার কোনো যুক্তিই নেই।'

'যুক্তি আছে।'—আমি বললাম। 'বিকুবাবু যা বলতে চেয়েছিলেন তা বোধহয় এই—তাঁর অদম্য বাসনাটা না মেটানোটাও সম্ভবত এক ধরনের অপরাধ ছিল সেই সময় তাঁর কাছে। ঘটনার কালটা কত বছর আগে, সেটাও আমাদের খেয়াল করতে হবে। আশা করি আমাদের এই কাহিনীর নায়কও সে-কথা স্বীকার করবেন।' এই বলে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

বিকুবাবু নিঃশব্দে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—'কি জানি।'

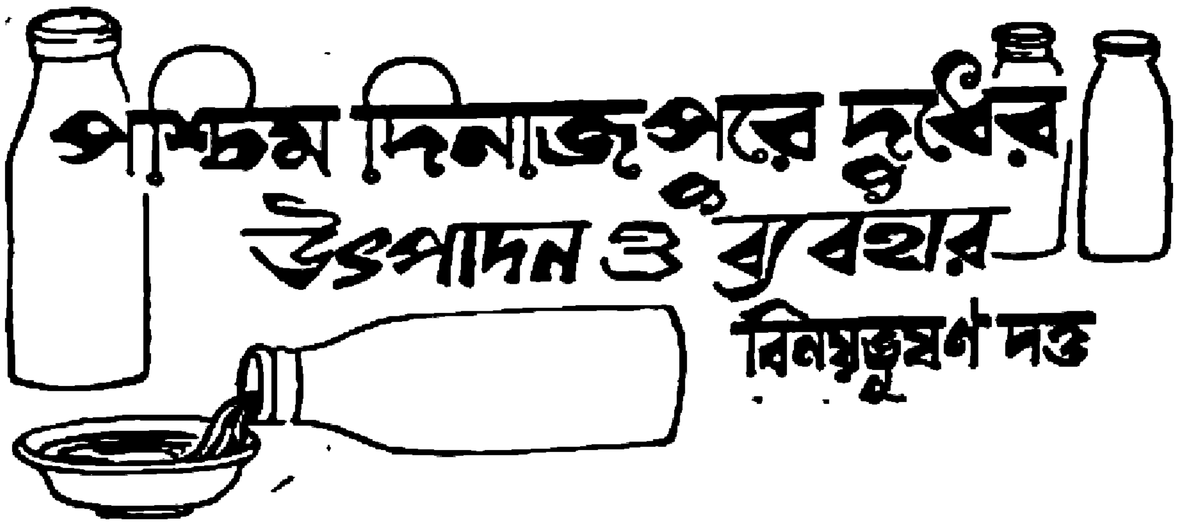

পশ্চিম দিনাজপুরে দুধের উৎপাদন ও ব্যবহার

বিনয়ভূষণ দত্ত

খাদ্য সমস্যা বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি খাদ্যশস্য ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি এবং অত্যধিক মূল্য। কিন্তু সুষম খাদ্যে দুধ যে অপরিহার্য একথা আমরা আজকাল ভুলতে বসেছি। সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় দুধ তাই আজকাল দেখা যায় না। ফলস্বরূপ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ। খাদ্য সমস্যা আলোচনায় যদি আমরা পুষ্টিকর খাদ্যের উপযুক্ত গুরুত্ব দিই তাহলে দেখা যাবে খাদ্য সমস্যার তীব্রতা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাবে। অপুষ্টিকর খাদ্যের মূল সমস্যা দুধের অভাব। এই সমস্যা কত তীব্র বুঝা যাবে যদি আমরা কোন একটা অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করি। সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৫৬ সালের হিসেব অনুযায়ী এ জেলার গরু ও মোষের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ৪০২০০ লিটার। ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এ জেলার লোকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

মোট লোকসংখ্যা	১০,২০,৭৯৭
১৪ বৎসরের অনূর্ধ্ব লোকসংখ্যা	৫,৭৭,১১০
১৫ থেকে ৩৪ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা	৩,১৯,৮০৪
৩৫ থেকে ৫৯ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা	১,৭০,৮০২
৬০ বৎসরের ঊর্ধ্বে লোকসংখ্যা	৩৫,১৮৯

এই লোকসংখ্যার বয়সগত ব্যবধানের ভিত্তিতে জেলায় দৈনিক কি পরিমাণ দুধের প্রয়োজন তার একটা আভাষ দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিশে দেখা যায় একজন সুস্থ ব্যক্তির সুষম খাদ্য তালিকায় দৈনিক ৫ ছটাক দুধ থাকা প্রয়োজন। আমাদের হিসেবে এর চাইতে আরো কম ধরা হল। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধের খাদ্যে দুধের প্রয়োজন সর্বাধিক। তাছাড়া আছেন প্রসূতি ও সন্তানসম্ভবা নারী। সাধারণভাবে বলা চলে যদি ১৪ বৎসরের অনধিক প্রত্যেকের এবং ৬০ বৎসর ও তদূর্ধ্বে ব্যক্তিদের দৈনিক ½ লিটার দুধের প্রয়োজন মনে করা হয়—তবে কেবলমাত্র এদের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৫ লিটার দুধের। যদি লোকসংখ্যার বাকী অংশের জন্য দৈনিক গড়ে ¼ লিটার দুধের প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া যায় যা স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিশের অনেক নীচে তাহলে এ জেলায় প্রত্যহ ২,৪৪,৪৬৪ লিটার দুধের প্রয়োজন। এ হিসেবের মধ্যে প্রসূতি নারী, অসুস্থ ব্যক্তি ও হোটেল-রেস্টুরেন্টে চা ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য দুধের চাহিদার উল্লেখ করা হল না। তথাপি দেখা যাচ্ছে আমাদের হিসেব অনুযায়ী চাহিদার মাত্র ১৬ শতাংশ দুধ এ জেলায় উৎপন্ন হয়।

এখন দেখা যাক দুধের চাহিদা ও যোগানের এই বিরাট ব্যবধান কিভাবে পূরণ করা হয়। প্রথমত পার্শ্ববর্তী বিহারের কাটিহার, মনিহারী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কিছু পরিমাণে মোষের দুধ এ জেলায় আসে। তাছাড়া, আমরা দুধের চাহিদার পরিমাণ হিসেব করেছি একটি ন্যূনতম জীবন ধারণের মানের ভিত্তিতে। দুধের সরবরাহ খুব কম থাকায় এবং মোটেই সহজলভ্য না হওয়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের কাছে দুধের ব্যবহার খুব সীমিত। অধিকাংশ লোকই অসুখ-বিসুখ ছাড়া দুধ ব্যবহারের কথা ভাবেন না। যদি নিয়মিত দুধের সরবরাহ থাকত এবং দাম কিছুটা কম হত তাহলে অনেকেই প্রত্যহ দুধ ব্যবহারের কথা ভাবতেন যার ফলে তাদের নিষ্ক্রিয় চাহিদা সক্রিয় হতে পারত।

দুধ উৎপাদনের দিকটা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারী তথ্যে দেখা যায় ১৯৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিল এই জেলায় গরুর হিসেব ছিল :

বাচ্চা হয়নি এমন গরুর সংখ্যা... ৩৩,৫৫৬
দুধ দেয় এমন গরুর সংখ্যা...৪৪,৫০৭
দুধ দেয় না এমন গরুর সংখ্যা...১২,৯৫৬

একই তারিখের মোষের হিসেবে দেখা যায় :

বাচ্চা হয় নি মোষের সংখ্যা ... ৪৫৯
দুধ দেয় মোষের সংখ্যা ... ২৮৮৯
দুধ দেয় না মোষের সংখ্যা ... ২০৫০

অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল, ১৯৫৬তে দুধ দেওয়া গরু ও মোষের সংখ্যা—৪৭৩৯৬। কিন্তু এ সময়ে দুধের উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,২০০ লিটার অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এ জেলার গরুর দুধ উৎপাদনের গড় দৈনিক এক লিটারের কম। দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় এ জেলায় গরুর সংখ্যাও বেশ কম। এর কারণ দুটো। আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় গো-মহিষ পালনের কোন ব্যবস্থা এ জেলায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা কিম্বা মহারাষ্ট্রের আনন্দ প্রকল্পে দেখা গেছে আধুনিক পদ্ধতিতে মিশ্র প্রজনন জাত (cross breeding) গরু সাধারণ গরু অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী দুধ দেয়। ২৪ পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বেশ কিছু সম্পন্ন চাষী মিশ্র প্রজনন জাত গরু পালন করে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। এ জেলায় সরকারী বেসরকারী কোন তরফ থেকেই সে রকম কোন চেষ্টা নেওয়া হয় নি। দ্বিতীয়তঃ এ জেলায় গরু-মোষ ইত্যাদির মোট সংখ্যা (১৯৬১ সালের গণনায়) ৮,৭২,০০৬। এ ছাড়া অন্যান্য তৃণভোজী পশুও যথেষ্ট রয়েছে। অথচ ঐ সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে এ জেলার আয়তন ১৩,১০,২৮০ একর এবং তার মধ্যে ১১,০২,৮০০ একর অর্থাৎ মোট আয়তনের ৮৬ শতাংশ জমি চাষ-আবাদভুক্ত। বাকী ১৪ শতাংশ জমিতে শহর গ্রামের লোকেরা বসবাস করে এবং বিবিধ কাজে ব্যবহার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পতিত জমি না থাকায় এ জেলায় কোন গোচারণ ভূমি নেই। শীত থেকে বর্ষার শুরু অবধি পাঁচ মাস মাঠ ফাঁকা থাকে। কিন্তু এ সময়ে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য জমিতে ঘাসও থাকে না। তাই পশু খাদ্যের অভাব অনেকটা নিয়মিত। খড়ের দ্বারা এ অভাব কিছুটা পূরণ করা হয়ে থাকে। খাদ্যের অভাবে এ জেলার গবাদি পশুর দুধের পরিমাণ কম হওয়ার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য কয়েকটি জেলার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। এই রাজ্যে দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে ২৪-পরগণা—মোট উৎপাদনের ১৭ শতাংশ। অবশ্য এ জেলার লোকসংখ্যা রাজ্যের লোকসংখ্যার ১৮ শতাংশ। তাই অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সেদিক থেকে বর্ধমান রয়েছে শীর্ষে—লোকসংখ্যা ৯

শতাংশ এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ শতাংশ। মেদিনীপুর সবার নীচে—লোকসংখ্যা ১০ শতাংশ এবং দুধ উৎপাদন ৮ শতাংশ। উত্তর বাংলার মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের আনুপাতিক অবস্থা পশ্চিম দিনাজপুরের অনুরূপ। দার্জিলিং-এর অবস্থা কিছুটা ভাল—লোকসংখ্যা ২ শতাংশ এবং দুধের পরিমাণ ৩ শতাংশ।

সারা ভারতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার আরো কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গো-মোষ-ছাগ দুধের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ৫·১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। সারা ভারতে তার পরিমাণ হল ২০৩·০৫ লক্ষ মেট্রিকটন। অর্থাৎ দৈনিক মাথাপিছু দুধ উৎপাদনের পশ্চিমবঙ্গীয় গড় হল ৪১ গ্রাম এবং ভারতীয় গড় ১২৭ গ্রাম—তিন গুণেরও বেশী। ১৯৫১—৬১তে এ রাজ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩ এবং ১৯৫১—৫৬তে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ০·৬। সুতরাং বর্তমান বৎসরের গণনায় যে আরো শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অপর দিকে পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবের অভাবনীয় সাফল্যের পরবর্তী কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্বেত বিপ্লব' (white revolution) —দুধ উৎপাদনে পাঞ্জাব অপ্রতিহত গতিতে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিভাবে এ জেলার দুধের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ান যায় আলোচনা করা যাক। প্রথমত জেলার শহরগুলোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি ছোট ডেয়ারী প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় উৎসাহী কিছু সংখ্যক লোক যদি এ ব্যবসায়ে অগ্রণী হন তারা সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। মনে হয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India) থেকে তারা ঋণ পাবেন। কয়েক বিঘা জমি নিয়ে এভাবে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ডেয়ারী গড়ে উঠতে পারে যেখানে সরকারী আনুকূল্যে উন্নত ধরনের গো-মহিষ রাখা সম্ভব হবে এবং পশু চিকিৎসার সব সুযোগ থাকবে। প্রসঙ্গত, এ জেলায় প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি করে এবং আরো দশটি ব্লক-সংলগ্ন পশু হাসপাতাল রয়েছে—এই হাসপাতালগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশুর মালিকরা উন্নত প্রথায় গোপালন করে উপকৃত হতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এ জেলায় যদি গবাদি পশুর একটি মিশ্র প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তাহলে অধিবাসীরা কোন ডেয়ারী প্রকল্প না থেকেও উন্নত গবাদি পশু পালনে সমর্থ হবেন এবং ফলস্বরূপ দুধ উৎপাদনের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তৃতীয়ত, পশুখাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ কিভাবে সারা বছর রাখা যায় ভাবা দরকার। সব পতিত জমি চাষের আওতায় না নিয়ে কিছু জমি সরকারী আনুকূল্যে গোচারণ ভূমি হিসেবে রাখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় সরকার এই জেলায় পতিত জমি (vested land) যা উদ্ধার করেছেন তার সবটাই ভূমিহীনদের বিতরণ না করে ধান চাষের পুরো উপযোগী নয় এরকম কিছু পরিমাণ জমি গোচারণ ক্ষেত্র হিসেবে রাখতে পারেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কল্যাণীতে একটি পশু খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন। দ্বিতীয় কারখানাটি খোলার কথা শিলিগুড়িতে। এই কারখানা দুইটি তাড়াতাড়ি চালু করে এবং আরো অধিক সংখ্যায় কারখানা খুলে গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পশুখাদ্য বিতরণ করাই হবে এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রামাঞ্চলে যে প্রচুর সংখ্যক বেকার এবং বাড়তি কৃষি শ্রমিক রয়েছেন, তাঁদের কর্মসংস্থান গ্রামাঞ্চলেই করতে হবে —শহরের শিল্প-কারখানায় তা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই যথেষ্ট সংখ্যায় ডেয়ারী, পোল্ট্রি ইত্যাদি ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্প (যার সাথে কৃষির যথেষ্ট সংযোগ রয়েছে) স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা ভাবতে হবে। এতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে এভাবে প্রচুর দুধ উৎপাদন করলে দুধ অবিক্রিত থেকে দুধের দাম খুব কমিয়ে লোকসান ঘটতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এ অঞ্চলে এ ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত। তাদের অভিযোগ হলো এ অঞ্চলের লোকেদের ক্রয়-ক্ষমতা খুবই সীমিত। এর জবাব হলো আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন করলে লোকের একাংশের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তাছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এমন কি কলকাতায় (ফারাক্কার সড়ক সেতু এ বছরেই চালু হবে) চালান দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে দুধের সরবরাহ কম থাকায় তার চাহিদা কিছুটা অস্থিতিস্থাপক। সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়লে এবং নিয়মিত হলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে — অর্থাৎ সরবরাহ বাড়িয়ে দাম সামান্য কমালেই দুধের বিক্রয় প্রচুর বেড়ে যাবে। সব চাইতে বড় কথা, সুস্থ সবল জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে হলে দুধের ব্যবহার সকল স্তরের লোকের মধ্যে চালু করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপাদন ও সহজে স্বল্পমূল্যে বণ্টন। *

---

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত পরিসংখ্যান নিম্নলিখিত বইগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(1) Statistical Abstract of the Indian Union-1967.
(২) পরিসংখ্যান, জুলাই, ১৯৬৯
(3) Census of India 1961, volume XVI.
(4) Census 1961, W. Bengal — West Dinajpur
(5) W. Bengal District Gazetteers, West Dinajpur.

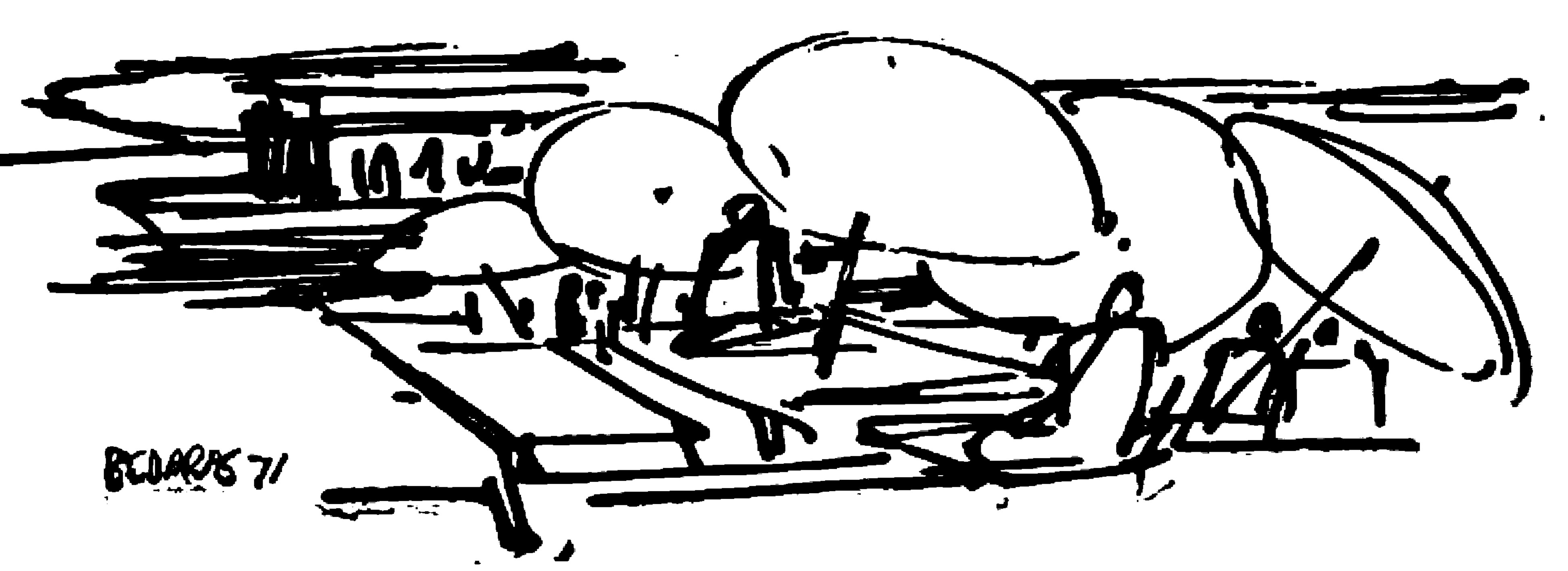

পাকিস্তান বনাম পাকিস্তান : ফলাফল — বাংলাদেশ

মঞ্জু নাগ

(১)

পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। কিন্তু এই কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি যাতে উন্নত না হয়, তার দিকে পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত দৃষ্টি ছিল। সরকারীভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ এমনভাবে নেওয়া হত, যার ফলে পূর্ব পাকিস্থানের কৃষি বরাবরই স্কুইজড হয়ে আসছিল। পশ্চিম পাকিস্থানের কৃষিপণ্যের বিনিময়মূল্য—আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া—দুদিক থেকেই পূর্ব পাকিস্থানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। অন্যদিকে শিল্পদ্রব্যের বিনিময়মূল্য ছিল পূর্ব পাকিস্থানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্থানে অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানের কৃষক একদিকে যেমন তাঁর কৃষি উৎপাদনের জন্য কম মূল্য পেতেন; অন্যদিকে তেমনি তাকে পশ্চিম পাকিস্থানের শিল্পদ্রব্যের জন্য বেশী মূল্য দিতে হত। পূর্ব পাকিস্থানে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী ছিল; যেহেতু সেখানে শিল্পোৎপাদন পশ্চিম পাকিস্থানের তুলনায় ছিল খুবই কম। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্থানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ যতটা কঠোর ছিল, পশ্চিম পাকিস্থানের বেলায় তা ছিল না। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্থানে আমদানী যতটা সুলভ এবং স্বচ্ছন্দ ছিল, পূর্ব পাকিস্থানে ছিল ঠিক তার বিপরীত। সরকারী নীতির পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও আর একটি কারণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তা হল পূর্ব পাকিস্থানের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা। ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে, পূর্ব পাকিস্থানে শিল্পোদ্যোগ তেমন গড়ে ওঠে নি। ফলে শিল্পোৎপাদনও থেকে গেছে খুবই নীচু স্তরে। উপরন্তু ছিল পূর্ব পাকিস্থানের আমদানীর ক্ষেত্রে সরকারী কঠোরতা। অথচ পূর্ব পাকিস্থানে আমদানীর জন্য লাইসেন্স যদি আরও বেশী বরাদ্দ করা হত, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশী হতে পারত। কিন্তু সেই উন্নয়নই বোধহয় পাক সরকারের বাঞ্ছিত ছিল না। এইজন্যই আমদানী নীতির এই দুরভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্ব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, আমদানী লাইসেন্স কাকে দেওয়া হবে বা হবে না—তা ঠিক করেন পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার।

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে এই আমদানী লাইসেন্স বিতরণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ছিল, তা নীচের তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হল। এই তথ্যচিত্রে কয়েক বছরের আমদানী লাইসেন্সের মূল্যের শতকরা হিসাব দেওয়া হল :

	করাচী*	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৩ জানুয়ারী-জুন	৮৯·৮		১০·২
১৯৫৩।৫৪ জুলাই-ডিসেম্বর	৭৪·০		২৫·৭
জানুয়ারী-জুন	৫৮·৮	১০·২	২৮·০
১৯৫৪।৫৫ জুলাই-ডিসেম্বর	৬০·৪	১০·৫	২৯·২
জানুয়ারী-জুন	৬৬·২	৯·১	২৪·৭
১৯৫৫।৫৬ জুলাই-ডিসেম্বর	৫৭·১	১১·৬	৩১·০
জানুয়ারী-জুন	৫৯·৬	১১·৬	২৮·৮

বাঙলাদেশে নির্যাতনের প্রতিবাদে হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ

দেখা যাচ্ছে : পূর্ব এবং পশ্চিম—দুই পাকিস্থানের তুলনায় করাচীই সবচেয়ে বেশী লাইসেন্স পেয়েছে। করাচীস্থ লাইসেন্সীরা আমদানীকৃত জিনিসপত্র আবার বেশিরভাগটাই বিক্রী করতেন সেই সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে, যারা করাচীরই লোক বা প্রতিষ্ঠান। করাচীস্থ এই সব লাইসেন্সীরা করাচী ছাড়া পাকিস্থানের অন্যান্য অংশেও আমদানীকৃত জিনিসপত্রাদি বিক্রী করতেন। অর্থাৎ কৃষিজীবীদের কাছ থেকে আয়ের পুনর্বণ্টনে লাভবান হলেন করাচীর লাইসেন্সীরাই। পূর্ব পাকিস্থানে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে আমদানীকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ কৃষিকে নিষ্পেষণ করে যে অল্পুলীদের লাইসেন্সীরা লাভবান হলেন, তাঁরা করাচীর লোক, যে করাচীতে তখন পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান এবং সেই সরকার, যার হাতে রয়েছে আমদানী লাইসেন্স বরাদ্দ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা।

করাচীর প্রাধান্য কয়েকদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ লাইসেন্সী করাচীর হওয়ায়, শিল্পায়নের জন্য দরকার যেসব যন্ত্রপাতি, তা তারা আমদানী করতে পেরেছে। ফলে ওখানে এবং পশ্চিম পাকিস্থানে শিল্পায়ন ঘটেছে দ্রুত হারে। শিল্পসংস্থাগুলি এখানে একবার গড়ে ওঠার ফলে, তারাই উত্তরকালে বৈদেশিক মুদ্রার বৈধ দাবীদার হিসেবে গৃহীত হল। আবার কমার্সিয়াল লাইসেন্সিং প্রথা চালু হলে করাচীর শিল্পপতিরাই তার সুযোগ নিয়েছেন বেশী। কারণ, এই প্রথা চালু করার সময় যে শ্রেণী (Category) নির্ণয় করা হয়, তা করা হয়েছিল ১৯৫০-৫২ সনের আমদানীর ভিত্তিতে। আর সেই সময় করাচীর শিল্পপতিরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশী আমদানীকারক।

---

* ১৯৫৪ সনের জানুয়ারীর আগে করাচীর জন্য তথ্য আলাদাভাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী-জুন এবং ১৯৫৩।৫৪ সনের জুলাই-ডিসেম্বরের তথ্য মোট পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য ধরতে হবে।

এরা এসেছে বাঙলাদেশ থেকে।

ফটো : প্রণব মুখার্জি

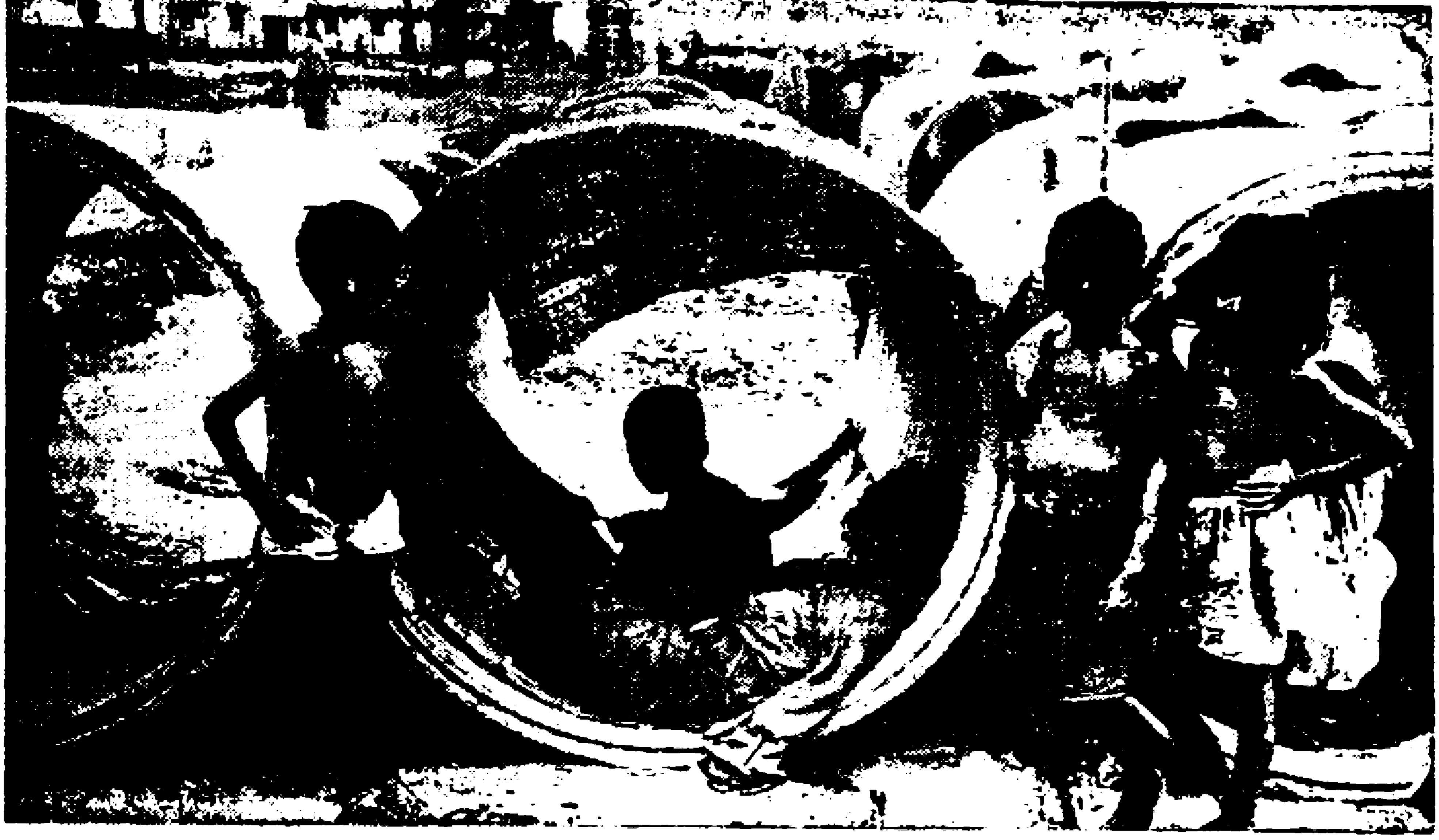

কমার্সিয়াল লাইসেন্স ছাড়াও আর একরকম লাইসেন্স পাকিস্থান সরকার ইস্যু করতেন। তা হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স। এখানে, সংক্ষেপে এই দুইরকম লাইসেন্সের প্রকৃতি সম্পর্কে দুচার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাকিস্থানে আমদানী লাইসেন্স আসলে হল একটি পারমিট। এই পারমিট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইস্যু করা হত। এই পারমিটের দৌলতেই সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারত। এই পারমিটেই কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। যেমন, কোন কোন জিনিস আমদানী করা যাবে; কত মূল্যের জিনিস আমদানী করা যাবে; পাকিস্থানের কোন অঞ্চলে সেইসব জিনিস ব্যবহার করা যাবে। কমার্সিয়াল লাইসেন্স হল সেই পারমিট, যার কৃপায় আমদানীকারক আমদানীকৃত জিনিসপত্রাদি বিক্রয় করতে পারেন। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স হল সেই পারমিট, যার দৌলতে প্রস্তুতকারকেরা শুধু নিজেদের ব্যবহারের জনাই যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানী করতে পারতেন। উভয় ক্ষেত্রে পাক সরকারের আমদানী এবং রপ্তানীর মুখ্য নিয়ামকই হলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকর্তা। এই সরকারী সিদ্ধান্ত কত ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্থানের অনুকূলে যেত এবং পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিকূলে যেত, পরিসংখ্যানই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত যত কমার্সিয়াল লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, তার মোট মূল্যের শতকরা ভাগ কোন পাকিস্থানের ভাগ্যে কতটুকু জুটেছে, তার হিসেব নীচের তথ্যচিত্রে দেওয়া হল :

এই তথ্যচিত্রে স্পষ্ট হচ্ছে পূর্ব পাকিস্থানের ভাগ্যে মোট কমার্সিয়াল লাইসেন্সের অর্ধেকও জোটেনি কোন বছর। মোট: পশ্চিম পাকিস্থানেই বরাবর বেশী লাইসেন্স পেয়েছে; তার মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে করাচীর প্রাধান্য। ১৯৬০

	করাচী	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৭			
জানুয়ারী-জুন	৪৪·৮	১০·২	৪২·০
১৯৫৭-৫৮			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪১·২	১৭·৮	৩৩·৩
জানুয়ারী-জুন	৪৮·৮	১৮·৩	৩২·১
১৯৫৮-৫৯			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৯·৯	১৮·২	৩১·৯
জানুয়ারী-জুন	৪৮·৯	১৫·৩	৩৫·৮
১৯৫৯-৬০			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·১	১৭·৮	৪০·১
জানুয়ারী-জুন	৪৭·৬	২০·৩	৩২·১
১৯৬০-৬১			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪১·৮	১৪·৬	৪০·৬
জানুয়ারী-জুন	৪০·৯	১২·৮	৪৬·৩
১৯৬১-৬২			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·১	১৭·৮	৪৬·০
জানুয়ারী-জুন	৩৬·৯	১৭·৫	৪৫·৬
১৯৬২-৬৩			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·৯	১৮·৮	৩৮·৪
জানুয়ারী-জুন	৪১·৩	২১·৭	৩৭·০
১৯৬৩-৬৪			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·০	২৪·৪	৩৯·৬
জানুয়ারী-জুন	৩০·২	৩২·৫	৪৬·৩

CENTRAL LIBRARY

সালের আগে করাচী মোট কমার্সিয়াল লাইসেন্সের অর্ধেক পেয়েছে; আর তার পরে পেয়েছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। করাচী বাদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানের অংশ এক-পঞ্চমাংশের কম থেকে বেড়ে উঠেছে প্রায় চার ভাগের এক ভাগে। যদিও পূর্ব পাকিস্থানের ভাগ এক-তৃতীয়াংশের থেকে দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশী হয়েছে ১৯৬২ থেকে আবার তা কমতির দিকে যায়। ১৯৬০ সনের আগেপরে যে হেরফের দেখা যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এই : ঐ সনেই পাক সরকার আমদানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কিছু শিথিল করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণমুক্তি পূর্ব পাকিস্থানকে যে খুব একটা সাহায্য করেছে তা নয়।

এবারে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য ঘটানো হয়েছে তার হিসেব নেওয়া যাক। নীচের তথ্যচিত্রে এই লাইসেন্সের মোট মূল্যের শতকরা ভাগ দেখানো হচ্ছে :

	করাচী	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৭			
জানুয়ারী-জুন	৪০·৬	৩০·৫	২৮·৯
১৯৫৭-৫৮			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৭·৪	২৫·৫	৩৭·১
জানুয়ারী-জুন	৩৯·৬	৩০·৮	২৯·৬
১৯৫৮-৫৯			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·৮	৩১·৮	২৫·৪
জানুয়ারী-জুন	৪৬·১	৩০·৫	২৩·৪
১৯৫৯-৬০			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৮·০	২২·৫	৩৯·৫
জানুয়ারী-জুন	৩৬·০	৩২·১	৩১·৯
১৯৬০-৬১			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৩·৩	৩০·৩	২৬·৪
জানুয়ারী-জুন	৩৭·৫	২৪·৪	৩৮·২
১৯৬১-৬২			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·৪	২৭·০	৩৬·৭
জানুয়ারী-জুন	৩৬·৫	৩২·৬	৩০·৯
১৯৬২-৬৩			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৬·৬	২৭·৪	২৬·০
জানুয়ারী-জুন	৪৫·০	৩০·৩	২৪·৭
১৯৬৩-৬৪			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৭·০	৩৬·৫	২৬·৫
জানুয়ারী-জুন	৩৭·৭	২৯·৪	৩২·৯

এখানেও সামগ্রিকভাবে করাচীর প্রাধান্য। অথচ করাচীতে পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগের বাস। এবং গ্রামীণ জনপদগুলি থেকে করাচীর অবস্থান বেশ দূরে। অথচ করাচীই যেখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বরাবরই পেয়ে এসেছে; পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে জুটেছে এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এই পক্ষপাতিত্বের ফলে করাচীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতি, যাঁরা আসলে ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সরকারী অর্থনীতির পক্ষপাতিত্বের সুযোগেই হয়ে উঠলেন শিল্পপতি, লাভবান হয়েছেন। আমদানীর এই অসমবণ্টনের [illegible] যা ঘটেছে, তা হল : [illegible] থেকে শিল্পক্ষেত্রে সম্পদের এমন স্থানান্তরণ। এই স্থানান্তরণ পশ্চিম পাকিস্তানে যতটা ঘটেছে, পূর্ব পাকিস্থানে তেমন কিছুই হয়নি।

এমনকি সরাসরি সরকারী উদ্যোগে যে আমদানী হত, সেক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বজায় রাখা হয়েছে। পাঁচ বছরের তিনটি পর্বে সরকারী আমদানীর শতকরা ভাগ নীচের তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হল :

	প্রাক পরিকল্পনাকাল ১৯৫০-৫১—১৯৫৪-৫৫		প্রথম পরিকল্পনাকাল ১৯৫৫-৫৬—১৯৫৯-৬০		দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল ১৯৬০-৬১—১৯৬৪-৬৫	
	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য
পূর্ব পাকিস্তানা	৩০·৩	৫১·৩	৩৫·৫	৩১·৯	৩৬·০	৪১·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৯·৭	৪৮·৭	৬৪·৫	৬৮·১	৬৪·০	৫৮·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

দেখা যাচ্ছে : পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে সরকারী আমদানীর অংশ এই তিনটি পর্বেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এমন কিছু বাড়ে নি, যে পশ্চিম পাকিস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই সরকারী আমদানীর সিংহভাগ ভোগ করেছে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল : খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানী। এবং মোট আমদানী থেকে এর পার্থক্য। প্রাক পরিকল্পনাকালে যখন মোট আমদানীর থেকে সরকারী আমদানী এক-পঞ্চমাংশের কম ছিল, তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানীর অর্ধেকের বেশী পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। প্রথম পরিকল্পনাকালে যখন সরকারী আমদানী মোট আমদানীর প্রায় অর্ধেক হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত সরকারী আমদানীর এক-তৃতীয়াংশের কম পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, যখন মোট আমদানীর মধ্যে সরকারী আমদানীর অংশ খুবই কমতির দিকে গেছে, পূর্ব পাকিস্তান তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানীর অংশ ছিল পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, মোট আমদানীর মধ্যে সরকারী আমদানীর ভাগ এবং সরকারী আমদানীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান আমদানীর যে ভাগ পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে — তার মধ্যে সম্পর্কটা বৈপরীত্যমূলক। সোজা কথা হল : পূর্ব পাকিস্থান শুধু যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে যে লাইসেন্স দেওয়া হত, তাই কম পেয়েছে তা নয়; সরকারী উদ্যোগে যে বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টন করা হত, তাও পেয়েছে খুব কম।

প্রসঙ্গসূত্রে একজন পাকিস্তানী অর্থ-নীতিবিদের এই মন্তব্যগুলি তুলে দেওয়া হল : 'যেহেতু রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা যতটা পরিমাণে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাধ্যমে পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তা পান নি। এক-জন পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি যৎসামান্য ব্যয় করেই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে তদ্বির-তদারক করে কাজ গুছিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু একটা সামান্যতম বিষয় জানতে হলে একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে দীর্ঘ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়। সরকারী প্রশাসকেরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন, তার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অবহেলা।' এই [illegible] পূর্ব পাকিস্তানের [illegible]

CENTRAL LIBRARY

বাঙলা দেশের এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে চলেছেন একজন বালক ফটো : প্রণব মুখার্জি

ব্যবসায়ীদের ভাগ্যেই জুটেছে। অবাঙালীদের ভাগ্যে নয়।

(২)

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জেহাদের একটি অন্যতম কারণ হল রপ্তানী থেকে যে বিদেশী মুদ্রা আয় হয়, দুই অংশের মধ্যে তার অসম বন্টন। পাঁচ বছরের তিনটি কালপর্বে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী এবং রপ্তানীর শতকরা মূল্য পরিমাণ তুলে ধরা হল নীচের তথ্যচিত্রে। এই আমদানী বিশ্ব থেকে দুই পাকিস্তানে এবং রপ্তানী দুই পাকিস্তান থেকে বিশ্বে। দেখা যাচ্ছে রপ্তানী বাণিজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রার অর্ধেকেরও বেশী আয় করেছে। কিন্তু আমদানীকৃত জিনিসপত্রের এক-তৃতীয়াংশেরও কম তার ভাগ্যে জুটেছে। এই তথ্যচিত্র থেকে আরও একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল : পাকিস্তান সৃষ্টির ঠিক পরে পূর্ব পাকিস্তান যা রপ্তানী করত, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে তার চেয়ে বেশী করেছে।

যখন পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তেমন কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এই দুই অংশের মধ্যে এই সম্পর্ক তৈরী হয়। ১৯১৪ সন পর্যন্ত দেখা গেছে : বৃটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে ঘাটতি থেকে যাচ্ছিল, কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত ঘটাচ্ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ বাদ দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে বৃটেনের মন্দাবস্থা যাচ্ছিল। এই মন্দাবস্থা সে কাটাতো ব্রিটেন বাদ দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতবর্ষের যে উদ্বৃত্ত ঘটত, সেই উদ্বৃত্ত লুট করে নিয়ে। এই লুট সে চালাত হোম চার্জের মাধ্যমে এবং ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে।

১৯৫০।১ থেকে ১৯৫৪।৫ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ২১২০·০ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে তার উদ্বৃত্ত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের বাণিজ্যে যে উদ্বৃত্ত ঘটেছিল, তার পরিমাণ ছিল ১৩০৯·৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৫৪।৫ থেকে ১৯৫৯।৬০ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ১৪১৮·৫ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে তার উদ্বৃত্ত ছিল ১৭৭৫·০ মিলিয়ন টাকা। সামগ্রিকভাবে তার উদ্বৃত্ত তাহলে দাঁড়িয়েছিল ৩৫৬·৫ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু ১৯৬০।১ থেকে ১৯৬৪।৫ সনে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যে সামগ্রিকভাবে ঘাটতি হল। এই ঘাটতির কারণ হিসেবে বলা যায় : পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে বাধ্য করেছিল উচ্চমূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জিনিসপত্রাদি কিনতে। শুধু তাই নয়, উন্নয়নমূলক সম্পদসমূহকে পূর্ব পাকিস্তানে না খাটিয়েও এই ঘাটতি ঘটান হয়েছে। এই ঘাটতির পরিমাণের হিসেবটা এই রকম : পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২১২২·৫ মিলিয়ন টাকা; কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমে নেমে আসে ২০৫·৫ মিলিয়ন টাকায়। অতএব সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি হয়েছিল ১৯১৭·০ মিলিয়ন টাকা।

পরপৃষ্ঠার তথ্যচিত্র দুই পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্য এবং বহি-

আমদানী : শতকরা মূল্য

	১৯৫০।১—১৯৫৪।৫	১৯৫৫।৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।১—১৯৬৪।৫
পূর্ব পাকিস্তান	২৯·৪	২৯·১	৩০·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৭০·৬	৭০·৯	৬৯·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০

রপ্তানী : শতকরা মূল্য

	১৯৫০।১—১৯৫৪।৫	১৯৫৫।৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।১—১৯৬৪।৫
পূর্ব পাকিস্তান	৫০·৩	৬১·৪	৫৯·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৪৯·৭	৩৮·৬	৪০·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০

CENTRAL LIBRARY

বিশ্বের সঙ্গে দুই পাকিস্তানের বাণিজ্যের বার্ষিক গড়ের পরিসংখ্যান মিলিয়ন টাকার অঙ্কে দেওয়া হল :

	১৯৫০।৫১—১৯৫৪।৫৫	১৯৫৫।৫৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।৬১—১৯৬৪।৬৫
পূর্ব পাকিস্তান			
বিদেশ থেকে আমদানী	৪৩৯·৪	৬২৪·৮	১২১৯·২
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী	২৮৭·৮	৫৬৪·৩	৮৮১·৫
মোট আমদানী	৭২৭·২	১১৮৯·১	২১০০·৭
বিদেশে রপ্তানী	৮৬৩·৪	৯৭৯·৮	১২৬০·৩
পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানী	১২৫·৭	২৮০·৬	৪৫৭·০
মোট রপ্তানী	৯৮৯·১	১২৬০·৪	১৭১৭·৩
পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	—১৬২·১	—২৮৩·৭	—৪২৪·৫
বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	৪২৪·০	৩৫৫·০	৪১·১
সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যের ব্যালান্স	২৬১·৯	৭১·৩	—৩৮৩·৪
পশ্চিম পাকিস্তান			
বিদেশ থেকে আমদানী	১০৫৩·১	১৫২৫·০	২৭৭২·৭
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমদানী	১২৫·৭	২৮০·৬	৪৫৭·০
মোট আমদানী	১১৭৮·৮	১৮০৫·৬	৩২২৯·৭
বিদেশে রপ্তানী	৮৫২·৮	৬১৬·৩	৮৫৭·২
পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানী	২৮৭·৮	৫৬৪·৩	৮৮১·৫
মোট রপ্তানী	১১৪০·৬	১১৮০·৬	১৭৩৮·৭
পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	১৬২·১	২৮৩·৭	৪২৪·৫
বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	—২০০·৩	—৯০৮·৭	—১৯১৫·৫
সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যের ব্যালান্স	— ৩৮·২	—৬২৫·০	—১৪৯১·০

এই হিসেব থেকেও দেখা যাচ্ছে : বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঘাটতি। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য হয়েছে আভ্যন্তরীণ মূল্যমান অনুসারে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য হয়েছে আন্তর্জাতিক মূল্যমান অনুসারে।) এমনকি, সামগ্রিকভাবেও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালান্স অব ট্রেড আর উদ্বৃত্ত থাকল না; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই তাতে ঘাটতি দেখা দিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রেখেছে; কিন্তু তার ঘাটতি ঘটেছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে তার ব্যালান্স অব ট্রেড ঘাটতি থেকেই যায়।

এই সব তথ্য থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বেরিয়ে আসে। তা হল এই : প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে জিনিসপত্র রপ্তানী

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে আয় খুবই বেড়ে যায়, তার অংশ পূর্ব এবং পশ্চিম পাকি-

পাকিস্তানে। এই স্থানান্তরণ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তা ঘটেছে স্বল্পআয়বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে অধিক

করছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে স্তানের মধ্যে সমানুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়নি। উপরন্তু আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্যমানের যে তারতম্য ছিল, তার যদি একটা সমন্বয় সাধিত হয়, তাহলে দেখা যাবে : আন্তঃ প্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদই চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

দুই পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তার একটি প্রধান কারণই হল পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের এই স্থানান্তরণ। বলাই বাহুল্য যে, আন্তপ্রাদেশিক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় থেকেই স্থানান্তরণ ঘটেছে। প্রাকপরিকল্পনাকালে প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ৩১০ মিলিয়ন টাকার প্রকৃত সম্পদের স্থানান্তরণ হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে হয়েছে ১০০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের একটা মোটা অংশই চলে গেছে পশ্চিম উচ্চআয়বিশিষ্ট অঞ্চলে। আর তা সম্ভব হয়েছে exchange control এর মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণানুসারে রপ্তানীকারককে তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সমর্পণ করতে হয়। সরকারী বিনিময়হারে দেশীয় মুদ্রা লাভের জন্য। এইভাবে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তাই আবার আমদানীকারকদের দেওয়া হয়। তা দেওয়া হয় সরকারী নীতি অনুসারে। তাই কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী হবে, তা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আমদানীকারকেরা কতদূর কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন, তার ওপর। পশ্চিম পাকিস্তান এ ব্যাপারে খুবই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে; যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার ঘাটতি ছিল বরাবরই; অথচ প্রায় সবসময়ই এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল।

নতুন বাসস্থানের পথে এগিয়ে চলেছে বাঙলাদেশের মেয়েরা। বর্তমানের দুর্দশায় এরা মূহ্যমান—কারণ এরা ফিরে যাবে একদিন স্বাধীন বাঙলাদেশে।

ভিন্ন দৃষ্টিতে

অঙ্গনা

মানুষ একা একা থাকলে নিজের খুশিমতো চলতে পারে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে এই খুশি অন্য খাতে বাঁক নেয়। দুটি মনের খুশি তখন কাছাকাছি এসে এক চিরন্তন পথ বেয়ে চলে। সে পথে আসে সন্তানসন্ততি। ঘর ভরে ওঠে। আদিম পৃথিবী থেকে শুরু করে এই রেওয়াজই চলে আসছিল। তারপর অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে পৃথিবীর উপর দিয়ে। হালফিল দুনিয়া আরো বদলাচ্ছে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মানুষের অভ্যাস। দুনিয়া যেমন যেমন বদলাচ্ছে মানুষও তেমনি চালচলনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এখন আর কেউ ঘরভরতি সন্তানসন্ততি চায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানটি প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। এতেও অনেকের কত না গড়িমসি। কেউ কেউ সন্তান চায় একটু দেরিতে। তবু প্রথম সন্তান নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। কারণ, বিবাহিত জীবনে কেউই প্রায় সন্তানবিহীন থাকতে চায় না।

এখান থেকেই প্রশ্নটা উঠেছে, প্রথম সন্তানের পর আর কটি? এই প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে, বিবাহিত জীবনে কটি সন্তান কাম্য?

এই একটি প্রশ্নকে নিয়ে আজকের দুনিয়া হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নানাদিক থেকে নানাভাবে প্রশ্নটিকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ও এ সম্পর্কে একাধিক সমীক্ষা চালিয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, যেসব অঞ্চলে এমনিতেই জন্মের হার কম তাদের সন্তান-আকাঙ্ক্ষাও কম। আবার যে অঞ্চলে জন্মের হার বেশি সেই অঞ্চলের মহিলারা চান তিন বা ততোধিক সন্তান।

জন্ম-হার সাধারণত নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের উপর। পারিবারিক প্রস্তুতি, নারীর সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক মান, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ-সুবিধা, বাসস্থান প্রভৃতির উপরই সন্তানের আগমন নির্ভর করে। এরই মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব হলো পারিবারিক প্রস্তুতির। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির উচ্চনিনাদ যেন চকিতে উধাও না হয়ে যায়, তবু সন্তান আকাঙ্ক্ষা খুব-একটা বাড়ে না। এ সম্বন্ধে গোড়ায় সবাই সতর্ক হয়ে যায়। স্বাভাবিকতাকে মেনে নেবার পর সব ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

দুনিয়াদেশে নানাদিক থেকেই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্ভব হয়েছে। কাজকর্মের

সুব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, বাসস্থান এবং বলতে গেলে কোন কিছুরই অভাব নেই। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মানুষের গড় আয়ুও বেড়েছে। মৃত্যুর হার কমেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। সাংস্কৃতিক মান ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী।

ভাবতে বেশ মজা লাগে যে, পৃথিবীর অনেক দেশ যখন জন্মহার কমানোর জন্য মাথা ঘামিয়ে মরছে, তখন রুশদেশে জন্মহার বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এবং কম জন্মহার নিয়ে তাঁরা রীতিমতো বিব্রত। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গত দশকে সেদেশে মৃত্যুর হার বেশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই সময়ে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি হাজারে জন্মহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। যদিও নবজাতকের সংখ্যা হাজার পিছু দশজন। এই সংখ্যা খুব-একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক নয়। যেকোন সমৃদ্ধ দেশের পক্ষে এই জন্মহারও কিছুটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু জন্মহারের এই মাপকাঠি সমগ্র রুশদেশের পক্ষে কিছুটা আশার সঞ্চার করা উচিত ছিল। এদেশের

ক্ষুধা আর রোগ বাঙলাদেশের এইসব অসহায় শিশুদের জীবনে ডেকে এনেছে এক মর্মান্তিক পরিণতি—মৃত্যুর হাত থেকে এদের বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছেন মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশ্ববাসী।

সর্বত্র জন্মহার এক নিয়মে চলে না। কোথাও জন্মহার কম আবার কোথাও বেশি। এক জায়গায় যদি হাজার প্রতি ৩০ থেকে ৩৬ হয় তবে অন্য এক প্রান্তে তা হলো ১৪ থেকে ১৭।

কিন্তু সমস্যা হলো যে, দীর্ঘদিন যাবত এই জন্মহার কমতে গেলে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আবার যেখানে জন্মহার কম সেখানে তা কোনক্রমেই বাড়তির মুখে নয় বা স্থিরও থাকছে না। জন্মহার ক্রমেই চলেছে। একথা কারো পক্ষে জোর করে বলা সম্ভব নয় যে, এসব অঞ্চলে জন্মহার আরো কমবে না বা যে ধারা চলছে তাই অক্ষুন্ন থাকবে। কাজেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বাড়ছে। জন্মহার কমানো নিয়ে সারা পৃথিবী মাতামাতি করলেও তাঁদের ভিন্ন দিকে নজর দিতে হবে। জন্মহার সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে হবে এবং তা কেন হ্রাস পাচ্ছে তাও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কারণ, এখানে এমনও একটা আশংকা আছে যে, জন্মহারের এই নিম্নমান যদি অব্যাহত থাকে তবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে অদূর ভবিষ্যতে। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এথেকে অনেকের মনে একটা ধারণা হতে পারে যে, জন্মহারের খুব বৃদ্ধি বুঝি এদেশের আকাঙ্ক্ষিত। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়। এর পেছনে যে যুক্তিটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর তা হলো, জন্মহার হ্রাস পেতে পেতে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে যে বয়স্ক মানুষদের (বাপ-ঠাকুর্দার) চেয়ে সন্তানসন্ততির সংখ্যা হবে কম। জন্মহারের খুব বৃদ্ধি যেমন কাম্য নয়, তেমনি এরকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থাকেও কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া চলে না। সেজন্যই এসব অঞ্চলে জন্মহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এটা যদি সম্ভব না হয় তবে এখানকার জনসংখ্যা এমন হ্রাস পাবে যে, সেই আশংকা সেদিন বাস্তবে রূপ নিয়ে সারা মানব-জাতিকে উপহাস করবে। সেজন্য বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জন্মহার এখন যেমন আছে তা থেকে কিছুটা বাড়াতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে, দুটি বা তিনটি সন্তান হবে পরিবারপিছু হিসাব।

এপর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় যে, অনেক অঞ্চলে পরিবার-পিছু একটি সন্তানই কাম্য। খুব বেশি হলে দুটি। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে যদি এই ধারার কোন পরিবর্তন না হয়, তবে দেশের আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার আশংকা সত্যি হবে। দেশের সম্পদে শিশু-দের অধিকারও সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। সে জায়গায় আসবে বৃদ্ধের দল। সবল এবং সক্ষম লোকের জায়গা এরা দখল করবে। এমনিভাবে দেশে গুরুতর সংকট দেখা দেবে, ম্যান পাওয়ারের। এর ফল ভোগ করবে সমগ্র দেশ ও জাতি। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে যাবে। কারণ নতুন বংশধররা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও হবে যুগোপযোগী। সেই সঙ্গে থাকবে তাদের বলিষ্ঠ দেহ। বয়স্কদের কাছে এগুলো প্রত্যাশা করা যায় না।

এই জাতিগত দুর্দৈবের হাত থেকে বাঁচতে হলে এবং আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সকল দিকে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে জন্মহার বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, দেশের ভার নেবে নতুন বংশধররা; পুরাতনের হাতে চিরকাল নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। পুরাতনের দায়িত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুনকে এসে সব বুঝে নিতে হবে। তাই জন্মহার বৃদ্ধির পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। জন্মহার সেটুকুই দরকার যতটুকু হলে কোন অনাসৃষ্টি সম্ভব নয়। এবং এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য যেখানে জন্মহার স্বল্প।

যাঁরা একটি সন্তান চান তাঁদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি সন্তান বড় হয়ে ওঠে পুরোপুরি স্বাধীনতার ভিত্তিতে। পরিবারে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। তার অধিকারে হাত দেবার কেউ নেই। সে যখন যা আবদার করে মা-বাবা তাই সাধ্যমতো পূরণ করেন। মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সে যা পায় তা ফিরিয়ে দেওয়ার অভ্যাস তার গড়ে ওঠে না। এর চেয়েও বড়ো কথা যে, নিঃসঙ্গ বেড়ে ওঠার ফলে সে হয়ে পড়ে কিছুটা স্পর্শকাতর। এরকম সন্তানের পক্ষে একা একা পৃথিবীতে চলা-ফেরা খুবই দুঃসাধ্য। নিজের সম্বন্ধে এদের কোন সঠিক ধারণা থাকে না এবং সব সময় সব ব্যাপারেই কিরকম অসন্তোষে ভোগে। কোন কিছুতেই সে তৃপ্তি পায় না। অন্য সন্তান না চেয়ে এমনিভাবে তাদের একটি মাত্র সন্তানকে সবকিছু উজাড় করে দেন।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে এর বিষময় ফল ফলে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম সন্তান দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের তুলনায় হীনস্বাস্থ্য এবং দুর্বল হয়। অথচ মা-বাবা নিজেদের অজ্ঞাতে এই দুর্বল শিশুকে আরো দুর্বল করে গড়ে তোলেন।

এদিক থেকে বিচার করে দুটি বা তিনটি সন্তান পরিবারের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সমাজের পক্ষে তো বটেই। সন্তান শুধু যে মা-বাবার ভবিষ্যতের ভরসা তাই নয়, দেশেরও ভবিষ্যৎ। তাই সন্তানের যত্ন নেওয়া, তাকে বড় করা মা-বাবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, দেশেরও একই সমান দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মহার বাড়ানোর ব্যাপারে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন। বিশেষত যেখানে জন্মহার খুবই কম। এজন্য প্রয়োজন সেখান-কার সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে দেখা। তারপর রাষ্ট্রগত সমস্যার সঙ্গে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তবে হয়তো সুফল পাওয়া যেতে পারে।

আসলে প্রেরণা জাগাতে হবে নারীদের মধ্যে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সন্তান পালন বা মানুষ করা খুব একটা সমস্যা নয় এবং এ দায়িত্ব পুরোপুরি তাদের একা বহন করতে হবে না। সমগ্র দেশ এজন্য তার পেছনে রয়েছে। বাচ্চা হওয়ার পরও যদি পরিবারের আর্থিক এবং অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হয় তবে বিবাহিতের দল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের ব্যাপারে উৎসাহ অনুভব করবে। আর এভাবেই জন্মহারও বৃদ্ধি পাবে। দেশ এক ভবিষ্যতের প্রচণ্ড সংকট থেকে ত্রাণ পাবে।

জন্মহার বৃদ্ধির মাধ্যমে রুমানিয়া জাতীয় সংকট থেকে ত্রাণের পথ খুঁজছে, আর আমরা জন্মহার কমানোর মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রতীক্ষা করছি। পৃথিবীর দেশে দেশে কি বিপুল বৈচিত্র্য!

—প্রবীণা

পরলোকে নির্মলা মা

নির্মলা মা দেহত্যাগ করেছেন ২০শে জুলাই মঙ্গলবার বিকেল ৬টায়। তিনি একজন সাধিকা ছিলেন এবং অমৃতপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদা ঠাকুরের স্ত্রী মা মণি-কুন্তলা দেবীর শিষ্যাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত। ঢাকার সিংহ-পাড়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সংঘের অধিকর্তা এবং ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীহেমচন্দ্রের সহধর্মিণী ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের পাদপদ্মে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেন এবং অবশেষে তাঁর স্ত্রী মণিকুন্তলা দেবীর শিষ্যা হন। তিনি কিছুদিনের জন্য আড়িয়া-দহ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ঠাকুর এবং গুরুমাতার দেহত্যাগের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে ধ্যান এবং পূজাকার্যে

নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি সংঘের প্রচারকার্যের জন্য পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে পরিভ্রমণ করেন।

কয়েকটি ঐতিহাসিক দরওয়াজার কাহিনী

নারায়ণ সেনগুপ্ত

দরওয়াজা বলতে সত্যিকার বসবাসকারী গৃহে আমরা যা ব্যবহার করে থাকি—এগুলির দেখি তার ব্যতিক্রম। এই দরওয়াজাগুলি নির্মাণের পিছনে কোথাও ঐতিহাসিক তাৎপর্য, আবার কোথাও নির্মিত হয়েছে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের হিসাব নিকাশের পরোয়া করা হয়নি এইসব দরওয়াজাগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে। তাই ইতিহাসের পাতায় অন্যান্য তথ্যনির্ভরশীল সাক্ষীর মত আজো এদের প্রাধান্য সমানভাবে বিরাজ করছে। ভ্রমণ-পাগোল লোকদের কাছে সমান আদরনীয়, দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বাহবা লুটেছে।

আগ্রা যাঁরা গেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ফতেপুর সিক্রী না দেখে ফিরে আসেননি। আর ধুলো উড়িয়ে বাসটা যখন সিক্রীর দিকে ছুঁই ছুঁই করে, তখন যেটি প্রথমে নজরে পড়ে সেটি হলো বুলন্দ দরওয়াজা। ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ ও পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবেশদ্বারের অন্যতম। এটি তৈরী হয়েছিল ১৬০২ খৃঃ বিজয় তোরণ হিসেবে। সম্রাট আকবর যখন দাক্ষিণাত্য জয় করে আগ্রায় ফিরে আসেন তখন তাঁর সম্মানার্থে এই ১৭৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট তোরণটি নির্মিত হয়।

এই ফতেপুর সিক্রী প্রাসাদের অপরদিকে আরেকটি দরওয়াজা আপনার নজরে পড়বে—যার নাম বাদশাহী ফটক। একমাত্র বাদশাদের ব্যবহারের জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল। যোধাবাঈ প্যালেসের সঙ্গে এই প্রাসাদের যাতায়াতের নিভৃততম সংযোগকারী হিসেবে বাদশাহী ফটকের গুরুত্ব কম ছিল না।

আগ্রার তাজমহল দেখবার সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটেছে। আনমনা হয়ে সবাই যখন ফুলবাগিচে ঝাউবীথি আর ফোয়ারার মাঝখান দিয়ে সোজা চলে যেতে চান তাজের প্রধান চত্বরের দিকে, তখন কজনই বা ফেলে যাওয়া প্রধান তোরণটি খুঁটিয়ে দেখবার কথা ভাবেন? আছেন অবশ্য অনেকে। যাঁরা সত্যিই দেখেন, আর ইতিহাসের পাতা উল্টে যাচাই করে নেন। এই তোরণের দৈর্ঘ্য ১৭১ ফুট, প্রস্থ ১১৭ ও উচ্চতা ১০০ ফুট এবং গোটা তোরণটি ২১১ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি খাস বেলেপাথরের মঞ্চের উপর অবস্থিত। এটি একটি দ্বিতল প্রবেশদ্বার।

আগ্রা দুর্গের প্রবেশপথে যে তোরণটি

চারমিনার। হায়দ্রাবাদ

লালকেল্লা । দিল্লী

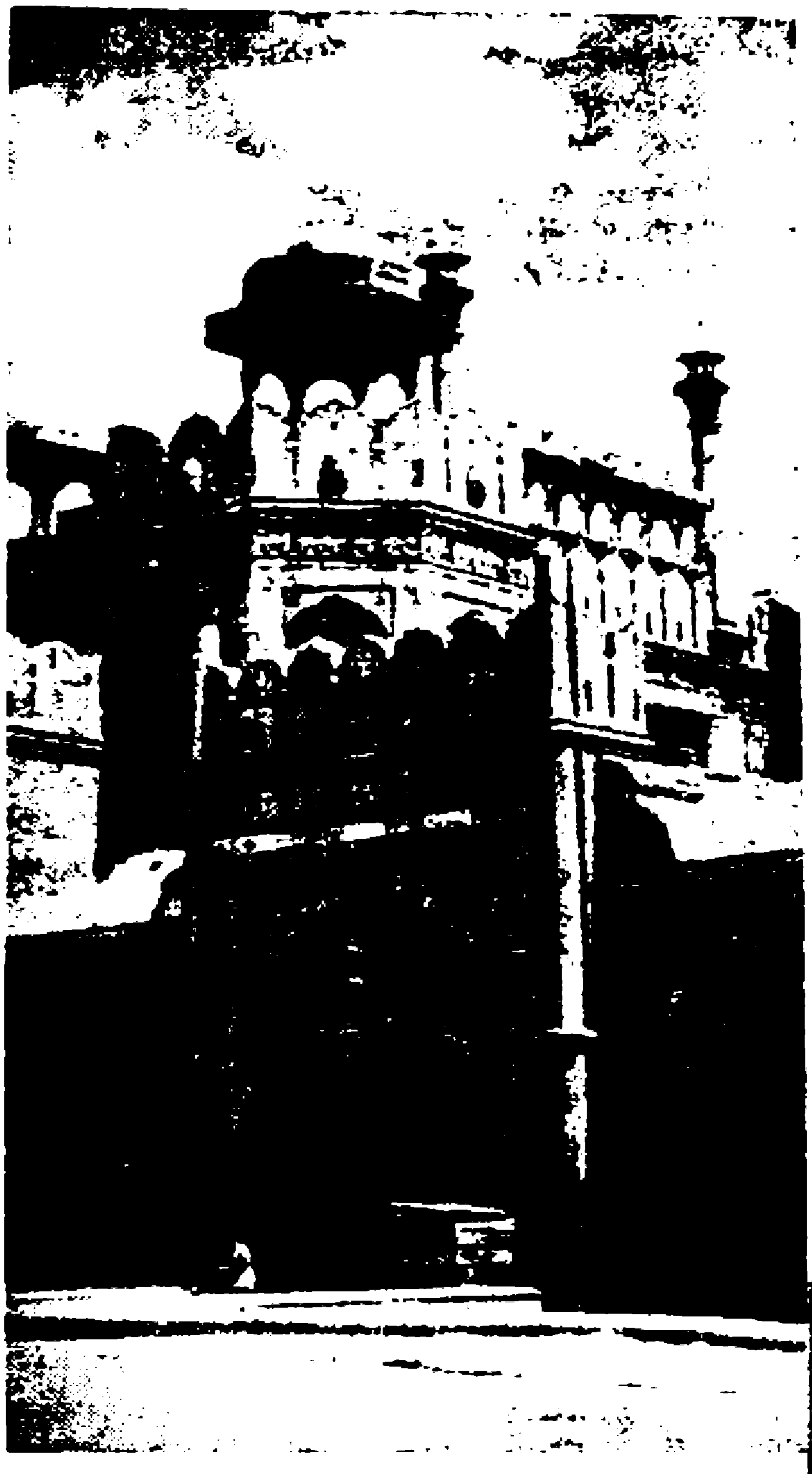

লালগড় প্রাসাদ । বিকানির

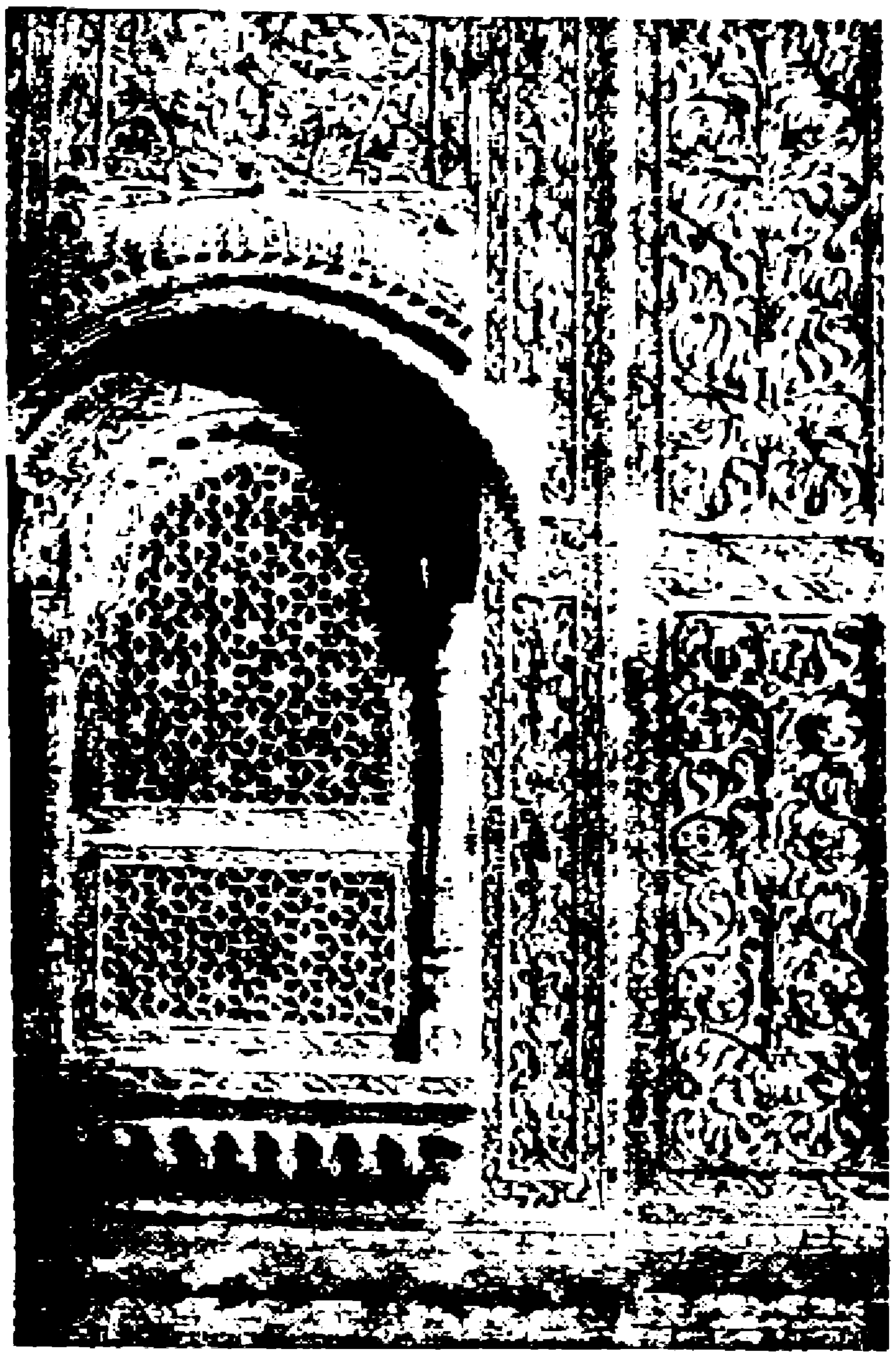

নজরে পড়ে তার নাম অমর সিং ফটক। এই দরওয়াজা অতিক্রম করেই তবে প্রাসাদে প্রবেশ করা সম্ভব। সম্রাট শাজাহান রাজপুত বীর অমর সিং-এর স্মৃতিকল্পে এই ফটকের নামকরণ করেন। ফটকের পাশেই অশ্বারূঢ় অবস্থায় অমর সিং-এর মর্মর মূর্তি বিরাজ করছে।

আলাউদ্দিন খিলজীর নাম শোনেননি, এমন লোকের সংখ্যা বোধকরি খুব বেশী নেই ভারতে। দিল্লীর উত্থান-পতনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দিন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই দিল্লীর বুকে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কীর্তিকলাপের উৎসাহদাতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্মাণকার্যে লিপ্ত ছিলেন। আলাই দরওয়াজা তাঁরই কীর্তি। অপূর্ব কারুকার্য খচিত এই আলাই দরওয়াজা শিল্পপ্রেমিকদের এক ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার। এই আলাই দরওয়াজার আশেপাশে

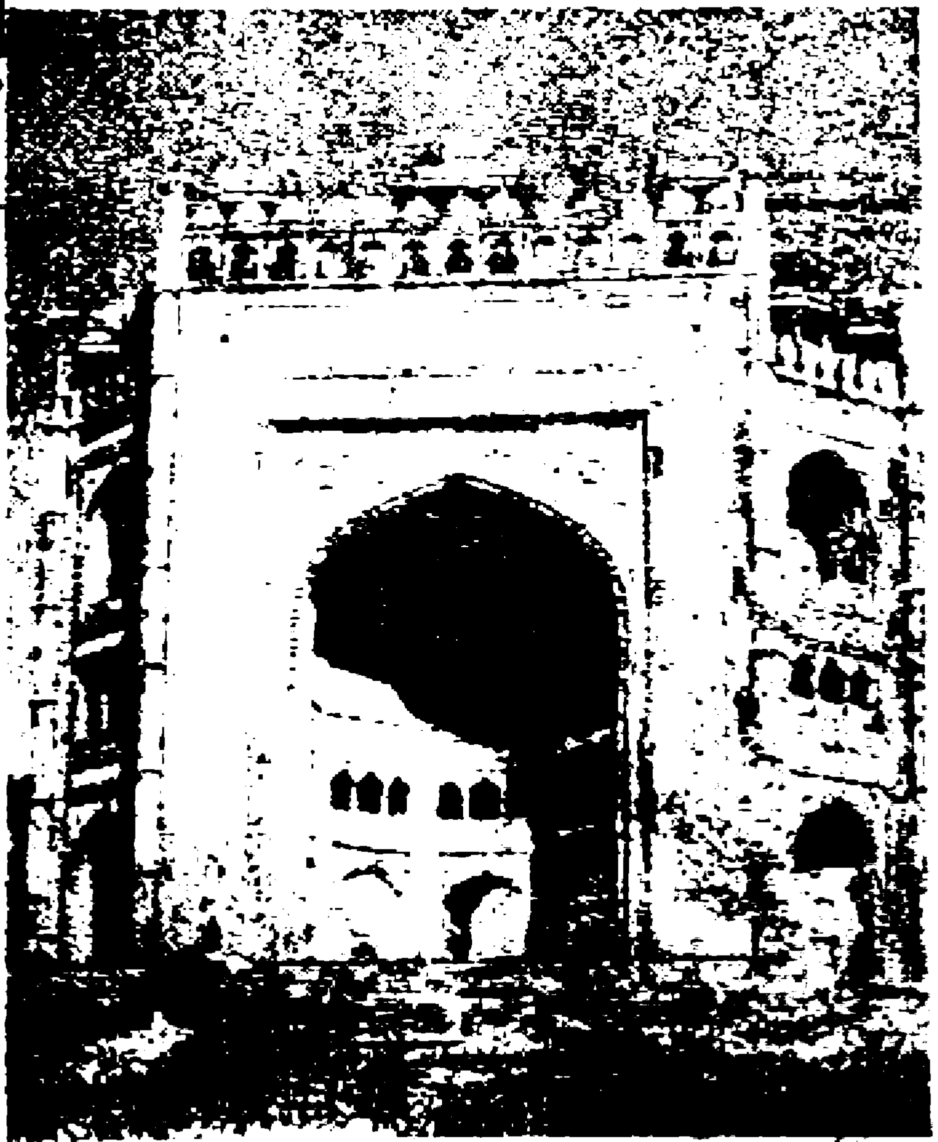

বুলন্দ দরওয়াজা । ফতেপুর সিক্রি

CENTRAL LIBRARY

আরো বহু ঐতিহাসিক দর্শনীয় জিনিষ রয়েছে—যা সত্যই একান্তভাবে দেখবার অবকাশ রাখে।

এই দিল্লীতে একাধিক ফটক রয়েছে। প্রাধান্যের দিক দিয়েও বেশ মধুর কোনটি। খুনী দরওয়াজার কথা কে কবে ভুলতে পেরেছে? দিল্লী গেট, কাশ্মীরী গেট, আজমীর গেট—এই তিনটি দরওয়াজা শহরের বিভিন্নপ্রান্তে বিরাজ করছে নিজস্ব মহিমায়।

ফিরোজশাহ কোটলা শহর নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিল্লীতে। নাম দিয়েছিলেন 'ফিরোজাবাদ'। এই প্রাসাদে দুটি বিখ্যাত জিনিষ আছে দেখবার। প্রথমটি মসজিদ—যার গঠন প্রণালী ও সৌন্দর্য সত্যিই গর্বের বস্তু। দ্বিতীয়টি—বিখ্যাত অশোক স্তম্ভ। সম্রাট অশোক আম্বালা থেকে এটিকে এনেছিলেন। এই দুটি জিনিস দেখে বেড়িয়ে এসে সামনেই যেটি নজরে পড়বে সেটি হলো 'খুনী দরওয়াজা'। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।' তাদের অনেকেরই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছিল এই খুনী দরওয়াজায়।

এবার মুখ ফেরানো যাক বোম্বের দিকে। সমুদ্রের বুক থেকে উঠে মাটিতে পা ফেলতেই যে দরজাটি আপনাকে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাবে তার নাম 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া' —ভারতের প্রবেশদ্বার। আধুনিক প্যাটার্নের তৈরী বিরাটাকৃতি ফটক। শিল্প মাধুর্যে তেমন প্রাধান্য না পেলেও, গঠন প্রণালীতে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

সম্ভবতঃ এটি তৈরী হয়েছিল প্রথম পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের স্মরণে।

এবার আসা যাক রাজস্থানের দিকে। শিল্পগরীয়সী রাজস্থান। চিতোর একটি ঐতিহাসিক স্থান। দেশী-বিদেশী টুরিস্ট-দের লীলাভূমি। এই চিতোর দুর্গে প্রবেশের পথে পর পর কতকগুলি তোরণ অতিক্রম করতে হয়। যথা ভৈরব পোল, রাম পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, লক্ষ্মণ পোল ইত্যাদি। এগুলি ছোট ছোট আড়ম্বরহীন এক একটি তোরণ। এর মধ্যে পাডোন পোলের গুরুত্ব অধিক। ঐতিহাসিকদের মতে

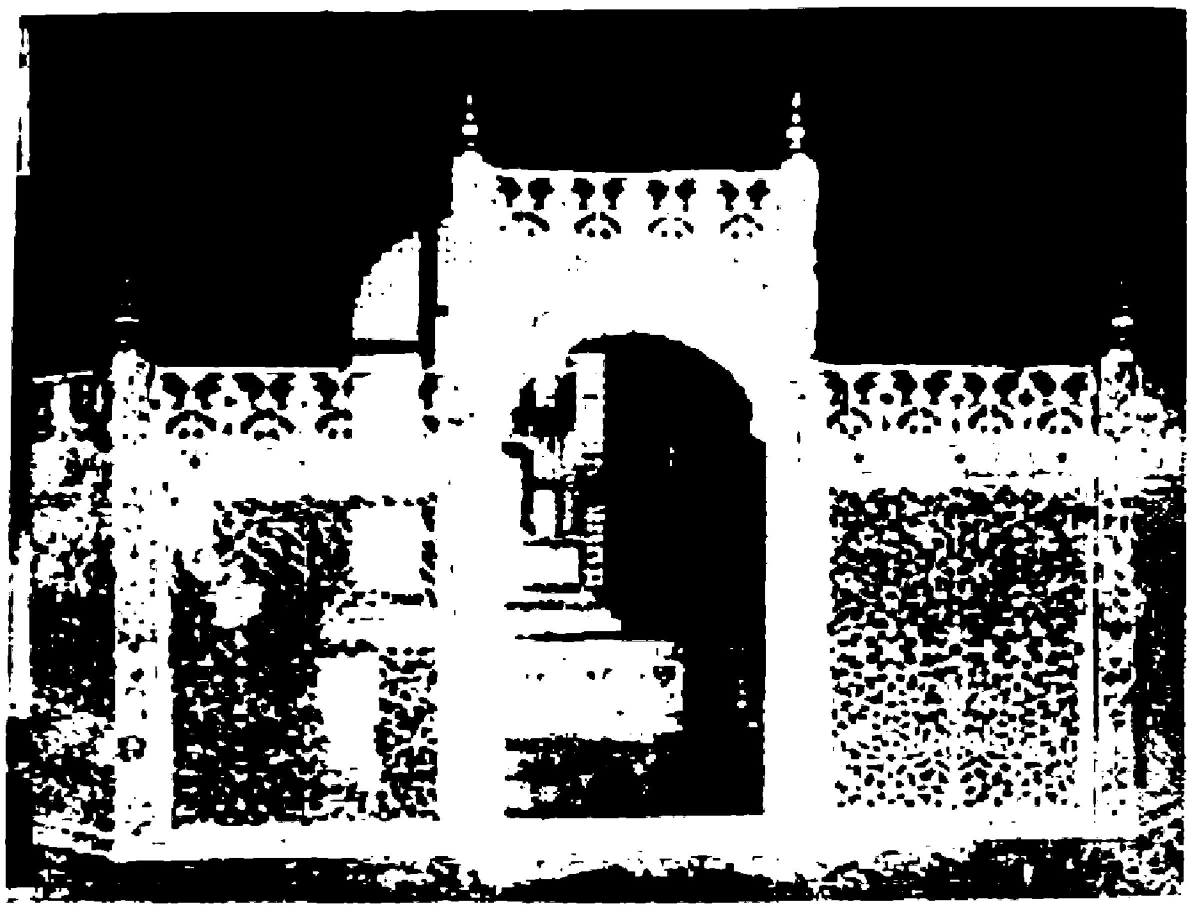

রাজমহলের ভিতরে। আগ্রা

এই পাডোন পোলের ফাঁকে ফাঁকে আলা-উদ্দিন খিলজীর সৈন্য লুকিয়ে ছিল এবং অতর্কিতে রাণা কুম্ভকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার চরম স্বাক্ষর বহন করছে এই পাডোন পোল।

সূর্যতোরণ, আরেকটি সুদৃঢ় গর্বিত ফটক। দিল্লীশ্বর আকবর আক্রমণ করেছেন চিতোর। রাণা উদয় সিংহ গেছেন পালিয়ে কিন্তু বীর রাজপুতেরা মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে ফেলে দিতে পারেননি। তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দুর্দিনে সূর্যতোরণ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলেন সাহিদাস। আর পত্ত? মাত্র ১৬ বছর বয়সের কিশোর পত্ত? ছুটে গেছিলেন রাজপুরীতে মা বোন আর স্ত্রীকে রক্ষা করতে। কিন্তু একি? দেখলেন বোন মারা গেছেন, স্ত্রীও গত। কিন্তু মা? মৃতপ্রায়। গেলেন মার কাছে। মা আশীর্বাদ করলেন আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন বীরের কর্তব্য। পত্ত আবার ছুটে গেলেন সূর্যতোরণ রক্ষা করতে। কিন্তু পারেননি। শত্রু পক্ষের গুলিতে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়েছিল এই দরওয়াজার প্রান্তে।

আজমীরের বহু দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকায় একটি ফটকের নাম পাওয়া যায়—নিজামী ফটক। মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় প্রবেশের মুখেই পড়বে নিজামী ফটক। হায়দ্রাবাদের নিজাম এটি নির্মাণ করেছিলেন। শিল্পকার্য অপূর্ব। জৈনশিল্প। চিস্তি সাহেবের প্রতি নিজাম বাহাদুরের অসীম শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করছে নিজামী দরওয়াজা।

এই জাতীয় দরওয়াজার শেষ নেই ভারতে। কিন্তু এ নিবন্ধে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মাত্র আর একটি ঐতিহাসিক দরওয়াজার কথা উল্লেখ করেই আমরা এ নিবন্ধের শেষ করবো।

এই তোরণটির নাম দখল দরওয়াজা। কেউ কেউ আবার বলেন দাখিল দরওয়াজা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় অবস্থিত। হিন্দু স্থাপত্যের শেষ কীর্তি, রাজধানী গৌড়-এ প্রবেশের পথে দেখা যায়। একদা গৌড়কে সৌন্দর্য নগরী বলেছিলেন হুমায়ুন। বলেছিলেন—জান্নাতাবাদ। যার ইংরেজী তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'রেসিডেন্স অফ প্যারাডাইস' এই গৌড়-এর ইতিহাসের শশাঙ্ক একটি পরিচিত নাম। তারপর এলো পাল যুগ, সেন যুগ। হিন্দুরাজাদের শেষ আর মুসলমান রাজত্বের সুরু। তাই অনুমান করা হয়—প্রথম মুসলমান শাসক হুমায়ুন ১৫৩৮ খৃঃ যে দরওয়াজা দিয়ে প্রথমে রাজ-ধানী গৌড়-এ প্রবেশ করেন—সেটিই দখল দরওয়াজা নামে খ্যাত। অথ দরওয়াজা কাহিনী সমাপ্ত।

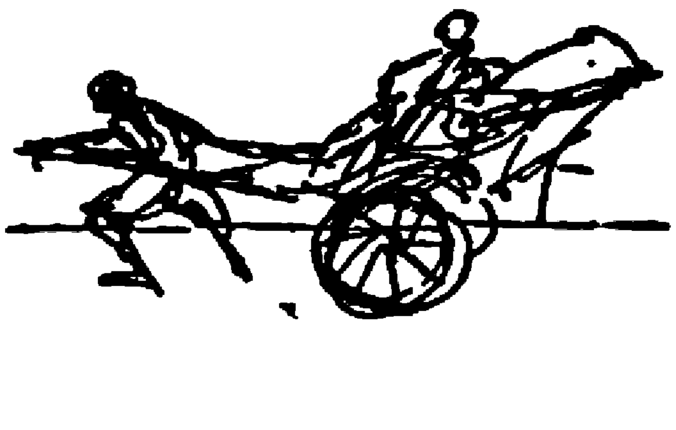

CENTRAL LIBRARY

জলসা

নবনালন্দা প্রযোজিত "ঋতুরঙ্গ"

রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ নবনালন্দার নবতম প্রযোজনা 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্যনাট্য সম্প্রতিকালের এক অনিন্দনীয় রূপকল্পনা।

ঋতুচক্রের অবিরাম আবর্তনের অন্তহীন বৈচিত্র্য যে বিস্ময়, আনন্দ, রং ও মাধুর্যরূপ প্রতিমুহূর্তে কবিকে উদ্বেলিত করে তারই রসঘন রূপ—এই ঋতু উৎসবের গীতিকাব্যের বিরাট ভাণ্ডার—এখানে কবির অন্তরমহলের খাসদরবারী এলোমেলো আবেগ যেন আপনাকে প্রকাশের আনন্দেই গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হয়ে ফুটেছে, আর সেই আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত বলেই আপন সুষমা শ্রোতাদের অন্তরকেও সবলে আকর্ষণ করে। শিল্পী ও দর্শকচিত্তের এই পারস্পরিক মিলন-সূত্র রচনাই সেদিনের ঋতু উৎসবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঋতুরাজের এক চরণের আঘাতে সর্বধ্বংসী নির্দয় লীলা অন্য চরণের আঘাতে ফুটে ওঠে সৃষ্টির শতদল। প্রথমেই বৈশাখের তাপস নিঃশ্বাসে দাবদগ্ধ দিগন্তের উদ্ভ্রান্ত হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠল—'এসো হে বৈশাখের' সম্মিলিত নৃত্য ও গান দিয়ে। এরপর বর্ষার আগমন কখনও দুরন্ত আবেগে (হৃদয় আমার নাচে রে) কখনও সজল রসাবেশে (সুচিত্রা মিত্র গীত 'ঝরে ঝরঝর') কখনও কৌতুকরঙিন সুরের অন্তর গহনস্থিত আবেগ রূপে প্রার্থনার শ্রাবণ পূর্ণিমার আলোছায়ার অপরূপ ভাষায় বিনতি—(কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে') — আবার নীপবনে আনন্দ স্পন্দনের মধ্যে পুব হাওয়ার স্পর্শে আনমনা হয়ে ওঠা (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—পুব হাওয়াতে দেয় দোলা)—এরই মধ্যে কখন বারিপাতের পথে ধরণী ও গগনের মিলনের ছন্দের মধ্যেই বিচ্ছেদের আশঙ্কা গভীর হয়ে উঠল যখন সুচিত্রার কণ্ঠে শোনা গেল—'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে'—

বর্ষার পরই শরৎ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বিপরীতের একটি তারার মতই সমুজ্জ্বল। কারণ রসের আবেদন ওজনে নয়—আয়োজনের মধুরতায়। এমনি করে হেমন্ত ও শীতের দুয়ার পেরিয়ে নৃত্য ও সংগীতের ধারা বসন্তের অন্তহীন উচ্ছ্বাসের সমুদ্রে মেশে যেখানে চির নতুন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছে। গৌরবের ভারে নড়া যায় না। তাই ঋতুরাজ জরদ্‌কুট নামিয়ে বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করে অগৌরবের উৎসবে মেতে উঠেছেন।

গানের নির্বাচন ও পরিচালনায় শিল্পকৃতির পরিচয় দিয়েছেন ভারতী মিত্র। আর শিল্পীরা সবাই পরিবেশিত গানের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন বলেই প্রতিটি গান যেন ঝর্ণার মত স্বচ্ছপ্রবাহী।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনাবৃত কণ্ঠে ভাবনিবিড় স্বপ্নছায়ায় 'কার বাঁশী নিশিভোরে বাজিল' তে কোনদূরের দূরাগত আভাস মনকে উদাস না করে পারে? ঠিক তেমনই মধুর 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো' (কোরাসের) উল্লাসের মাঝখানে তাঁর 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়ার—মিনতি। তারপর যখন 'আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলার তারার সাথে'—এখানে মনে হয়েছে ভোরের বেলার তারার সাথে কথা বলা এহেন স্বপ্নময়ীর পক্ষেই সম্ভব। সুচিত্রার কণ্ঠে 'শুকনো পাতা কে যে ঝরে' যেমন প্রাণল তেমনই অনবদ্য 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে'—যেখানে গভীর অভিমানে শিল্পী বিদায়োদ্যতকে থাকবার মিনতি জানাতে নারাজ। তেমনই উপভোগ্য কোরাসের মধ্যে বৃন্দকণ্ঠে—'ঐ আসে ঐ অতি'র অংশ বিশেষ। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'এখন আমার সময় হোলো' ও 'এবার অবগুণ্ঠন' সু-পরিবেশিত। বনানী ঘোষের 'সে কি ভাবে' সুন্দর।

একটি প্রতিশ্রুতিদীপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল প্রণতি লাহিড়ীর। তারা সর্বাধিকারী শ্রাবণের গানে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সমবেত সঙ্গীত অত্যন্ত সুন্দর এবং অনুষ্ঠানের সার্থকতার অন্যতম অঙ্গ। এর জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য—যাঁদের তাঁরা হলেন প্রণতি লাহিড়ী, চিত্রিতা দাশগুপ্ত, উমা বসু, মজুমদার, প্রতিমা রায়, মিতা হালদার, সুস্মিতা দাশগুপ্ত, রত্না দাশ, সুব্রতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সেন, অর্পিতা সেন, শিশিরকিরণ চট্টোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায়, প্রবীর লাহিড়ী, মৃণাল বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রণেশ সেন, শংকর বসু, সমীর সিংহ, সতীন সিংহ, সুব্রতা গাঙ্গুলী, গৌরাঙ্গ রায়। আবৃত্তি ও সংলাপে ছিলেন কাজী সব্যসাচী, প্রশান্ত ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র। নৃত্য পরিচালনায় আপন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত অনাদিপ্রসাদ। আপনাপন মান অনুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়কে সার্থক করেছেন শিবশংকর, শম্ভু ভট্টাচার্য, সুস্মিতা মিত্র, পারমিতা চৌধুরী, মহেশকুমার, জয়শ্রী লাহিড়ী, অলকানন্দা চাকলাদার, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দাশ, সুতপা দাশগুপ্ত, শুভ্রা দাশগুপ্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়, চান্দু দে। কিন্তু কণিকার 'যদি তারে নাই চিনি গো'—গানটির উপস্থাপন রূপ দিয়েছে বন্দনামূলক বিচার নৃত্য। ধীরেশ চন্দ্রের যন্ত্রসঙ্গীত সৌন্দর্য সৃষ্টির একটা বড় অংশ।

ওস্তাদ মসীত খাঁর সম্বর্ধনা

বাংলা তথা ভারতের শীর্ষস্থানীয় তবলিয়া ওস্তাদ মসীত খাঁ সাহেবের এ বছর একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্তির গৌরবময় উপলক্ষ উদযাপনার্থে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ গ্যালিফ স্ট্রীটের মুখার্জি হাউসে সম্প্রতি এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। ওস্তাদ মসীত খাঁ একাধারে সার্থক শিল্পী, সার্থক সাধক এবং সার্থক গুরু।

সার্ধ শতাব্দীকাল ধরে ভারতের বহু আসরে তাঁর তবলা বাদন গুণীসমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়েছে। একক—বাদনে তাল লয় বোলের চক্রধারায় তাঁর সম্মোহিনী শক্তির অনিবার্য আকর্ষণের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতা মাত্রই পরিচিত। বিশেষ করে বাঁয়ার কাজে তিনি এক নতুন ঢং-এর প্রবর্তক যার স্বাক্ষর বংশধর ওস্তাদ কেরামতুল্লার বাজনায় সোচ্চার। সমান নৈপুণ্যে সিদ্ধ ছিল তাঁর সংগত। গান বা যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর সংগত যেন জুড়ি হয়ে যেত।

সভাপতি ডাঃ বিমলচন্দ্র রায় ওস্তাদের সার্থক সঙ্গীত জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতজগতে তাঁর দুই বিরাট অবদান ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও সঙ্গীতনায়ক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের উল্লেখ করেন। একজন শিল্পী অপরজনের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার অপূর্ব মিলনসংগম শুধুমাত্র ভারতে নয় দুনিয়ার সঙ্গীত জগতে সমাদৃত।

সম্বর্ধনার উত্তরে গুণীর স্বাভাবিক বিনয়নম্রতায় ওস্তাদ মসীত খাঁ সাহেব বলেন যে, শিষ্য-প্রশিষ্যদের চার পুরুষের বাজনা শুনে তিনি আপন শ্রম ও সাধনার সার্থকতা উপলব্ধি করছেন। তবলাবাদন ও সংগত নীতির ওপরও ইনি মূল্যবান অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন।

সভান্তে তবলা বাদনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আরম্ভ হোলো ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর আমেরিকান বালক শিষ্য মাস্টার পটলপের লহরা বাদন দিয়ে। মাত্র ১০ মাসের শিক্ষায় তার পরিচ্ছন্ন বাদনে নিষ্ঠার

পরিচয় আনন্দদায়ক এক। তবলা বাদনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীরা হলেন নন্দন ঘোষের (জ্ঞানবাবুর ছাত্র) দুই ছাত্র বিমল রায় ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানবাবুর দুই শিষ্য—মাস্টার অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর পুত্র সাবীর খাঁন।

এছাড়া ওস্তাদ মুনোব্বর খাঁর কণ্ঠসঙ্গীত ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর তবলা সঙ্গতে রবিশংকর নামের সেতার বাদন জমে উঠেছিল শিল্পীদের নৈপুণ্য এবং গুণী শ্রোতার সমাবেশের কারণে।

১১ই জুলাই রবীন্দ্রসদনে দক্ষিণায়ন পরিবেশিত ঋতুরঙ্গ নৃত্যনাট্যে যাদের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর লাহিড়ী, প্রণতি লাহিড়ী, মিতা হালদার, শমিতা দাশগুপ্ত, বনানী ঘোষ এবং আরো অনেকে।

ঝরঝর বাদল দিনে

রবীন্দ্রসদনে কিশলয় নিবেদিত ঝরঝর বাদল দিনে আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

নিজস্ব ছন্দে, মাধুর্যে, ব্যাকুলতায়, সৌন্দর্যবৈচিত্র্যে রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীতে বর্ষার ঋতু একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কবিকণ্ঠের নানান মেজাজ ও নানান আবেগসমৃদ্ধ বর্ষার আবাহনের যেন সীমা নেই।

মন্থর বনপ্রকৃতি তার অনবদ্য মায়া মেলে ধরেছে। আষাঢ়ের নীলঘনের ওপর ঘনিয়ে এসেছে স্নেহনীল ছায়া—তারই মধ্যে এক-একজন শিল্পী বর্ষামুখর সন্ধ্যা-প্রদোষের এক-একটি ভাবের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে সহজ করিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্র-মানসের অফুরন্ত ঐশ্বর্যলোকের খবরটি—শুধু কি তাই? সেদিন বারবার মনে একটি প্রশ্নই জেগেছে পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো কবি কোনো কালে ঋতু গানে-গানে তাঁর চির-চাওয়াকে পূজা করে সেই পূজার প্রসাদ কি সর্বজনচিত্তেও এমনই করে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন?

দেবব্রত বিশ্বাস 'দুরন্ত মেঘ এ কোন খেলা', 'ক দিক অবার আঘাত' ও 'আবার কেন দিলে নাড়া'—এই তিনটি গানের নির্বাচন অন্তর্লীন ভাবধারার রূপ-পরিণতি—রবীন্দ্র-দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পীমনের একাত্মীকরণ ও সংযত আবেগের মধুর ছোঁয়ায়—সেদিনের রসোন্মুখ প্রতিটি চিত্তকে পরিপ্লাবিত করেছেন। বিশেষ অনুরোধে গাওয়া 'শ্রাবণ ঘন গহন' গানটির বারবার প্রশংসা করতে হয়। শ্রীবিশ্বাসের বিশিষ্ট গাওয়ার ভঙ্গিতে তা হয়ে উঠেছিল অনির্বচনীয়। রীতিপ্রকরণ কেতাবী নয় বলেই সহজ প্রকাশে এ-গান মনে দাগ কাটতে পেরেছে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্বর-নিষিক্ত কণ্ঠে বর্ষার উদাসী ভাবাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলক্ষ্যে বর্ষণছন্দের মৃত্যু-ভাবী সঙ্গীত-গুঞ্জন শোনা গেল। 'সখী আঁধারে একলা ঘরে'-র বিরহ-উতল চিত্ত গোধূলি-লগ্নের নৈসর্গিক আভাবে করুণ-মধুর হয়ে উঠল। সুর ও রূপের মাঝে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করতে পারেন বলেই শ্রোতৃচিত্তকেও তিনি সীমার বন্ধনমুক্ত করে অসীমের পথে উধাও করে দেবার শক্তি রাখেন।

আপন দৃপ্ত অন্তরের উজ্জ্বল দীপ্তিতে যেন সুচিত্রা মিত্র প্রশ্ন জানান 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো'। তারপরই 'কৃষ্ণকলি' কালোহরিণ চোখের একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে, 'ঝরঝর বরিষে'—ধারা করে পড়েই যেন নিস্পৃহতার 'বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা' এঁকে চলেন বাউলের সেই সবহারানো অথচ সব-পাওয়া রূপ যার কাছে 'বজ্র' হোলো 'মাণিক'—আর স্বর্গার্জিত আষাঢ় হোলো মহামূল্য মণিহার।

মায়া সেনের 'তিমির নিবিড় মেঘ' 'চলে ছলছল' ও 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা'-র ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের দোলায় মন দুলিয়ে দিয়েছে। এছাড়া চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'ছায়া ঘনাইছে', 'আমার যেদিন' 'ওগো মিতা', সুমিত্রা সেনের 'আজ শ্রাবণের', 'সতিমির রজনী' ও অশোকতরুর প্রাণোচ্ছল গায়কীতে 'যেতে যেতে একলা পথে', 'কড়ে যায় উড়ে' উপভোগ্য।

সাগর সেনের দুটি গান সু-পরিবেশিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী না হয়েও ৩ খানি রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিষ্ঠার ছাপ রেখেছেন দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। আপন ভাবগাম্ভীর্যে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—'অনেক কথা বলেছিলেম', 'তিমির অবগুণ্ঠনে' ও 'শ্রাবণের পবনে' তিনটি গানে। এরই মাঝে প্রদীপ বসু ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে রসনিবিড় করে।

—চিত্রাঙ্গদা

সুরঙ্গমা

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন

৩৩, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিকাতা—২৬

নূতন শিক্ষাবর্ষ জুলাই থেকে : ভর্তি চলছে

কার্যালয় শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৮টা, রবিবার সকাল ৭টা থেকে ১টা এবং সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সুপরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম অনুযায়ী প্রণালীবদ্ধভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাগসংগীত ও প্রাচীন বাংলা গান ডিপ্লোমা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত। অগ্রসর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা দেন। ভরত-নাট্যম, মণিপুরী ও কথাকলি পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার পাঠক্রম সুপরিকল্পিত। শিশুদের উভয় বিভাগেই চার বছরের পাঠক্রম। বয়স্কদের উভয় বিভাগেই পাঁচ বছরের সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম। এস্রাজ ও গীটার প্রত্যেক বিভাগে পাঠক্রম পাঁচ বছরের।

প্রেক্ষাগৃহ

মলাট/নন্দিনী মালিয়া

আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে

মেট্রো-গোল্ডুইন-মেয়ার, প্যারামাউন্ট, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, ইউনাইটেড আর্টিস্টস, কলাম্বিয়া, ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং অ্যালায়েড আর্টিস্টস—এই আটটি আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ আটটি ভারতীয় অফিস (যাদের ঐ ঐ কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত আছে বোম্বাই শহরে। এই সংস্থাগুলি আবার একযোগে 'কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটি প্রাইভেট লিমিটেড (কে আর এস পি এল) নাম দিয়ে তাঁদের ব্যবসায় চালিয়ে থাকেন। এর সভাপতি হচ্ছেন মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডবল্যু. টি উইলসন। সম্প্রতি লোকসভায় বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী যে বলেছেন, অতঃপর স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন বিদেশী ছবির আমদানী করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এই উক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করে মিঃ উইলসন বলেছেন, সত্যিই এ-ব্যাপার ঘটলে আমাদের আটটি অফিসকে দরজা গুটোতে হবে। কারণ, এতদিন এঁরা ব্যবসা চালিয়ে আসছেন রয়্যালটি প্রথায়—সম্পূর্ণ বিক্রয়ের ব্যাপার এর মধ্যে নেই। এবং এই প্রথায় তাঁরা বছরে গড়ে ১২০ খানি ছবি আমদানী করেন মাত্র ২৫ লাখ টাকা খরচ করে। তাঁর মতে, এই সমসংখ্যক ছবি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফত আমদানী করতে হ'লে পড়বে প্রায় ২ কোটি টাকা। কাজেই অবস্থা যে কি দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়।

মিঃ উইলসন বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী এল এন মিশ্রের উক্তির প্রতিবাদ করে বলেন, আমেরিকাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার তৈরী করবার জন্যে কিছুই করা হয়নি বললে ভুল করা হবে। মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা এর জন্যে তাদের সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোনো ভারতীয় প্রযোজক তাঁদের সাহায্য নেবার জন্যে এগিয়ে যাননি। প্রায় বছর দেড়েক আগে তাঁদের ভারতীয় সংস্থা কে-আর-এস-পি-এল এই ধরনের সাহায্যের কথা জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে একটি সাহায্য স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল; কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এমন কি এখনও যদি ভারতীয় প্রযোজকেরা আমেরিকায় ভারতীয় ছবির বাজার খোলবার জন্যে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁরা তা করবেন বলে জানিয়েছেন মিঃ উইলসন।

কিন্তু মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার জনৈক মুখপাত্র ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যদিও আমরা কথা দিয়েছিলাম যে, ভারতীয় ছবিকে আমেরিকার ছবিঘরগুলির মালিকদের নজরে আনবার জন্যে আমরা একজন সৎ দালালের মতো যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু তাই বলে আমরা তো 'ভারতীয় ছবি দেখাতেই হবে', এইভাবে তাঁদের ওপর জোর খাটাতে পারিনা। তিনি আরও বলেছেন, ভারতীয় ছবি যদি ভালো হয়, তাহলে তা আমেরিকার বাজারে বিক্রী না হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্পই ভারতীয় ছবিকে ভালো বলা যেতে পারে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, বছরের বাহান্ন হপ্তা ধরে কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার ছবিঘরগুলিতে যে-সব মার্কিনী ছবি দেখানো হয়ে থাকে, তার প্রত্যেকটিই কি নির্ভেজাল ভালো? ওয়েস্টার্ন আর ক্রাইম স্টোরি ধরনের অর্থহীন ছবি মানুষের যৌন ও হিংসা প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগানো ছাড়া আর কি করে জানাতে পারি কি? চিত্রসমালোচক হিসাবে আমরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচখানা আমেরিকান বা ইংরেজী-আমেরিকার যুগ্ম প্রযোজনার ছবি দেখে থাকি। কিন্তু তার মধ্যে ভালো ছবিতো 'কোটিকে গোটিক'। এবং একথা অন্যায় হবে না হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে যে, আজকাল হলিউড বছরে যতগুলি ভালো ছবি তৈরী করে, ভারত তার থেকে অনেক, অনেক বেশী সংখ্যক ভালো ছবির স্রষ্টারূপে গর্ববোধ করতে পারে। এ অবস্থায় আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী বন্ধ করে যে ভালোই করেছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা অপরাধমূলক ও যৌনসর্বস্ব আমেরিকান চিত্রের কু-প্রভাব থেকে আমাদের তরুণরা তো রক্ষা পাবেই; তা ছাড়া পরোক্ষভাবে সাধারণ হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা ঐসব ছবি অনুকরণ করার সুযোগও কম পাবেন।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ. এম. তারিক সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছেন এবং তথায় কয়েকটি স্থানে ভারতীয় ছবি আমেরিকান

আন্দাজ/রাজেশ খান্না ও হেমা মালিনী

ছবিকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ফ্রান্স ইতালী জাপান প্রভৃতি দেশ সমসংখ্যক ছবির আদান-প্রদানের দ্বারা ভারতীয় ছবি কিনতে ইচ্ছুক, এমন কি, ওরা আমাদের দেশে ছবির নির্মাণ করতেও প্রস্তুত। ইরাণ, তুরস্ক, সিংহল, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক প্রভৃতি দেশ প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে, ওরা ভারতীয় ছবির নিয়মিত খরিদ্দার হওয়া সত্ত্বেও ভারত ও-সব দেশের চিত্রপ্রযোজনা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহশীল নয়। ভারতীয় ছবি কেনবার ব্যাপারে আমেরিকা থেকে কিছুদিন আগে যে একজন বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয়েছিল, তার উত্তরে কারে মিঃ তারিখ বলেন যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের পক্ষে অপমানজনক। প্রায় বছর দুই আগে যখন আমেরিকার চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান, এরিক জনস্টন-এর স্থলে বোম্বাই শহরে পদার্পণ করেছিলেন তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে মিঃ তারিক মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা যে আমেরিকাতে ভারতীয় ছবির বাজার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন না, এ-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন এবং এই অবহেলার ভবিষ্যৎ ফল কি হতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এখন কে-আর-এস-পি-এল-এর সভাপতি মিঃ উইলসনের বিস্ময় প্রকাশ তাই তাঁর কাছে বিস্ময়কর লেগেছে।

আমেরিকার বাজে ছবির অনুকরণে নির্মিত বাজে হিন্দী ছবি আমেরিকায় দেখানো হোক, এ আমরা কখনই চাই না। কিন্তু ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপানের মতো দেশ প্রচুর ভারতীয় ছবিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে এবং কিনছে একথা আমেরিকার চলচ্চিত্র আমদানীকারকদের মনে রাখা উচিত।

অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রামোদীর অন্যতম রূপে বলতে পারি, কোনো দেশেরই ভারতে ছবি দেখানোর একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে, তা দেখার সুযোগ প্রতিটি ভারতীয় চিত্রদর্শকেরই থাকা উচিত। এবং এরই ওপর অনেক নির্ভর করবে ছবির ভালোমন্দ সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ,

এপার ওপার/অপর্ণা সেন

তেমনিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজনাক্ষেত্রে মানোন্নয়নে এই ব্যবস্থা হবে রীতিমত সহায়ক।

চিত্র-সমালোচনা

আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছিলেন বড় হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়া আরও ভালো। **নবকেতন এন্টারপ্রাইজ-এর নিবেদন বিজয় আনন্দ প্রোডাকশান-এর ইস্টম্যানকালার চিত্র 'তেরে মেরে সপনে'র** নায়ক ডাক্তার আনন্দ-এর চরিত্র আমাদের সেই কথা মনে পড়িয়ে দিল। [illegible] যে-আদর্শ নিয়ে সে তার চিকিৎসক জীবনের সূচনা করেছিল, সত্যপথে চলবার যে-আদর্শ তাকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল ন্যায়পথে থেকে মাথা উঁচু করে চলবার যে-আদর্শ তাকে ধনী মালিকের হাসপাতালের চাকরী ত্যাগ করে অসহ দারিদ্র্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছিল, সহসা ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদ লাভ করে সে তার সেই আদর্শকে ভুলতে বসেছিল, স্ত্রী নিশার ব্যাকুল আবেদন সত্ত্বেও সে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে অস্বীকার করেছিল, বন্ধু ডাঃ জগনের যে-মদ্যপানকে সে একদিন কর্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী কু-অভ্যাস বলে ধিক্কার দিয়েছিল, নিজে সেই মদ্যপানকে অবসাদ নিবারণকারী বলে সমর্থন ও গ্রহণ করেছিল। সামান্য গ্রাম্য চিকিৎসকরূপে কাজ করতে এসে তার পরিচয় হয় স্কুল শিক্ষয়িত্রী নিশার সঙ্গে। পরে বিবাহিত না হলে চাকরী পাবে না এই পরিস্থিতিতে আনন্দ যখন নিশাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে, তখন নিশা আনন্দের মন বোঝবার জন্যে প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে ওর মনের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে বিবাহে সম্মতি দেয়। নিশা যখন মা হতে চলেছে, তখন ধনী দেওয়ান মুলচাঁদের অসতর্ক গাড়ী চালানোর ফলে সে আহত হয় এবং গর্ভপাত ঘটিয়ে জীবন রক্ষা হলেও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ আশঙ্কা প্রকাশ করেন, সে মা হওয়া হতে হয়ত চিরতরে বঞ্চিত হল। ধনীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে হাসপাতালের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ডাঃ আনন্দ যখন বোম্বাই শহরে এসে রীতিমত হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন [illegible] চিকিৎসা সূত্রে তার পরিচয় হয় চলচ্চিত্রের নায়িকা মালতী-মালার সঙ্গে এবং তারপর থেকে ওর ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়। সন্তান সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি দ্বারা ভূষিত হয় এবং রুগী তার কাছে এত বেশী আসতে থাকে যে, তার স্নানাহারের সময় পর্যন্ত থাকে না। ফলে সে তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। গ্রামে থাকতে যে-শিশুটিকে সুস্থ করে সে উপহাস-স্বরূপ একজন শিশুর একটা চোখ নষ্ট করেছিল সেই শিশুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে ওর বাড়ীতে চিকিৎসিত হতে এসেছে ওরই কাছে। কিন্তু নিশার শত অনুরোধকে উপেক্ষা করে সে তাকে হাসপাতালে পাঠাল এবং নিজে চিকিৎসা না করে অপরের অনভিজ্ঞতার উপর ঠেলে দিল। একে নিশা মালতীমালার সঙ্গে তার স্বামীর ঘনিষ্ঠতাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল, তার ওপর এই মর্মান্তিক ঘটনা তাকে তার স্বামী সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। তাই সে একদিন স্বামীর অজ্ঞাতে গৃহ ত্যাগ করে গ্রামে তার মাসীর বাড়ীতে চলে এল। এখানে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাঃ জগন এসে ওকে পরীক্ষা করতে এবং যখন সে বুঝল, সে আবার মা হতে চলেছে এবং এই মা হওয়া তার পক্ষে কি বিপজ্জনক, তখন সে ডাঃ আনন্দকে খবর দিল। আনন্দ তৎক্ষণাৎ গাড়ী নিয়ে হাজির হল এবং হাসপাতালে নিশাকে পৌঁছে দিল। এর পর নিশার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ও স্বামীর সঙ্গে তার মিলিত হওয়ার মধ্যে ছবির সমাপ্তি।

'তেরে মেরে সপনে' ছবিতে আজকের সাধারণ হিন্দী ছবির মতো নায়িকার পিছনে নায়কের ধাওয়া করা নেই, খল নায়ক নেই, নায়িকাকে উপলক্ষ্য করে নায়ক ও খল নায়কের মধ্যে ছুটোছুটি মারামারি, গালাগালি প্রভৃতির বালাই নেই। পরিবর্তে আছে আদর্শ ও অনুভূতির আবেগপূর্ণ ঘটনা, প্রেমের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও চিত্তগ্রাহী দৃশ্যাবলী। যেখানে নিশার কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আনন্দ চলে গেল এবং পর মুহূর্তে রাস্তা থেকে শুনল নিশা গাইছে 'রাধিকে মালা জপে শ্যামকী', সেখান থেকে আনন্দের উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসা, বিবাহ

অপর্ণা/চন্দ্রা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

এপার-ওপার/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আগামী সপ্তাহ থেকে
ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে
নতুন স্বাদের
গোয়েন্দা কাহিনী
হরপ্পার ফুল
লিখেছেন
নির্মল সরকার

হওয়া এবং দু'জনে মিলে ছোট্ট সংসার পেতে আনন্দে দিন যাপন করা প্রভৃতি দৃশ্য ঐ এক গানের মাধ্যমে দেখানো অভিনব এবং চিত্তাকর্ষকভাবে কাব্যধর্মী। তেমনি অন্য একটি গানের প্রয়োগ—হায়, হায়রে কসম সি'—ওদের প্রথম দাম্পত্য জীবনের সুখের দিনে এবং যেখানে দু'জনের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর উঠেছে, সেই দুঃখেরও দিনে দর্শকচিত্তকে আশ্চর্য-ভাবে স্পর্শ করে। শুধু মনে হয়, যে-প্রচুর অর্থ ডাঃ আনন্দের মনে মাদকতা এনে দিয়েছিল, তা যদি নিশার আগেকার মতো সাদাসিধেভাবে জীবন-যাপনকে উপলক্ষ করেই ওদের মধ্যে তুমুল কলহ মাঝে মাঝে উত্তাল হয়ে উঠত, তাহলে আমরা যেন অধিকতর বাস্তবতার ছোঁয়াচ পেতুম।

'তেরে মেরে স্বপ্নে' ছবিতে যদিও প্রায় প্রতিটি শিল্পীই সু-অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন, তবু নায়িকা নিশারূপে মমতাজ যে আশ্চর্য সংযত অথচ সংবেদনশীল অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। সংলাপ ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা পরিচালক বিজয় আনন্দ ডঃ জগন বেশে মদাসক্ত ও পরবর্তী সুস্থ জীবনে আনন্দ-নিশার সহৃদয় বন্ধু হিসেবে সার্থক অভিনয় করেছেন। ডাঃ আনন্দের ভূমিকায় দেবআনন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করলেও মনে হয়, একটু তীর্যক ভঙ্গীতে চলাফেরা করা ও দ্রু কুঞ্চিত করে সময় সময় সংলাপ বলা ও'র যেন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। হেম মালিনী এ ছবিতে যথার্থই গ্ল্যামার গার্ল বা চাকচিক্যময়ী তারকা। তিনি ফিল্ম স্টুডিওর ফ্লোরে শ্যুটিং করার ভঙ্গীতে নেচেছেন ও প্লে-ব্যাকে ঠোঁট মিলিয়েছেন। আর একটি নাচ-গান স্টেজে এবং বাকীটা তাঁর হাসি-হাসি মুখে কথা বলা। এ-ছাড়া মহেশ কাউল (ডাঃ প্রসাদ), আগা (ডাঃ কোঠারী), প্রেমচাঁদ (দেওয়ান মূলচাঁদ) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ষ্টার থিয়েটার

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯

— নতুন নাটক ·

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেনুকা দাস, কুমারী মিনু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে ক্যামেরাম্যান রাত্রা গৃহীত মমতাজ ও দেবআনন্দের দু'শ ক্লোজআপগুলি তুলনাহীনভাবে সুন্দর। টি. কে. দেশাইয়ের শিল্প নির্দেশনাধীনে গঠিত সেট বিষয়োপযোগী ও ঘটনা উপযোগীও বটে। শচীন দেববর্মণকৃত সুরারোপে ছবির প্রায় প্রতিটি গানই সুখশ্রাব্য। বিশেষ করে আগে যে গান দুটির কথা বলা হয়েছে, সে-দুটি তো জনপ্রিয়তার শীর্ষে ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে।

নবকেতনের নিবেদন বিজয়আনন্দ প্রযোজিত ও পরিচালিত 'তেরে মেরে স্বপ্নে' একটি আদর্শপ্রচারী চিত্তাকর্ষক চিত্ররূপে সমাদৃত হবে।

মঞ্চাভিনয়

'নিবাস' ও 'ভূশণ্ডির মাঠে' : আজকের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অসংখ্য লোভ ও লালসার আবর্তে বিকৃত, ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত সত্তাও সংগ্রামশেষে মাঝে মাঝে নিজের প্রত্যাশিত রূপ খুঁজে পায়। প্রাপ্তির পরন লগ্নে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে না থাকা গেলেও আগামী বংশধরদের সামনে সোচ্চারে ঘোষণা করা যায় মহত্তর কোন সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবের বাণীকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত নাটকে হয়তো এই সত্যকেই সংঘাতের মুখরতায় ভাষা দেওয়া হয়েছে। বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের শিল্পীরা কিছুদিন আগে এই নাটকের একটি প্রাণবন্ত প্রযোজনা পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি 'দিবাকরের' ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন সংগ্রাম চ্যাটার্জী। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্খা, কল্পনার নিঃসীমতা তাঁর চরিত্র-চিত্রণে আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। মায়া ঘোষ আর একটি মর্মস্পর্শী চরিত্র রূপায়ণের নজীর রেখেছেন দিবাকরের স্ত্রী লতার ভূমিকায়। অন্য কয়েকটি চরিত্রে সুষ্ঠু রূপদান করেন অমিত রায় (প্রথম সাংবাদিক), দিলীপ চন্দ (দ্বিতীয় সাংবাদিক), কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, (বাদুকর), সুপ্রিয়া ঘোষ, সুবীর গুহ, স্বপন দাস, চিত্তরঞ্জন মাইতি, মোহনলাল দত্ত।

আর একটি অফুরন্ত হাসির নাটক শিল্পীরা এরপরে অভিনয় করেন। নাটকটির নাম ;ভূশণ্ডির মাঠে।' পরশুরামের একটি ছোট গল্প অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেছেন অমল মজুমদার। উচ্ছ্বসিত হাসির এই নাটকটির বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন অমল মজুমদার, অমিত রায়, মোহনলাল দত্ত, বিকাশ বোস, অজিতবরণ সিনহা, অশোক দাশগুপ্ত।

নাটক দুটির নির্দেশনায় সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন অমল মজুমদার। মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতে ছিলেন দীপক পাল ও অশোক দাস।

'সর্জনে'র 'সাহিত্যিক' ও 'কথায় কথায় রূপকথা' : কিছুদিন আগে বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে দুটি নাটকের প্রাণবন্ত প্রযোজনা পরিবেশিত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'সর্জন' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা। নাটক দুটি হোল বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কথায় কথায় রূপকথা।'

হতাশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সাহিত্যিকের জীবনকে ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'সাহিত্যিক' নাটকের মর্মস্তুদ কাহিনী। হতাশা আর যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে দু-একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আশার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিকের ভবিষ্যতের জীবন কোন প্রদীপ্ত সূর্যালোকে আলোকিত হবে কিনা সে সম্পর্কে বোধহয় কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাটকে নেই।

নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিকের কয়েকটি মানসিক অস্থিরতার দৃশ্য অতিরিক্ত সংযোজিত হোলেও, তাতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প চেতনার গভীরতাই ক্ষীণতর হয়েছে। যে কজন সাবলীল অভিনয় করে প্রযোজনাটিকে সুন্দর করে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত চট্টোপাধ্যায় নির্মল দে সরকার। আলোকসম্পাতে শ্রীকনিষ্ক সেন তাঁর পূর্বসুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন।

উদ্ভট ঘটনা এবং ততোধিক উদ্ভট সংলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'কথায় কথায় রূপকথা' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে সেদিনকার দর্শকেরা অফুরন্ত ধারায় শুধু হেসেছেন। সহ-নায়ক 'গঞ্জালেস' হঠাৎ যখন আচমকা নায়িকা (মণিকা)-কে 'তোমার বাসর গোরে বাজাইবে—জামাই-ভাডা সানাই' বলে গীটারটা নায়িকার হাতে তুলে দিয়ে 'গুডবাই' বলে চলে গেল এবং ভৃত্য নীলমাধব 'হে-হে-হে' করে হেসে উঠলো, সেই সময়টি হয়েছে নাটকটির অগ্রগতির পক্ষে অপূর্ব। প্রচণ্ড এক উৎকণ্ঠায় নিয়ে গিয়ে দর্শকদের এমন অনাবিল হাসির তুফানে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন। দর্শকদের একেবারে অভিভূত করে রাখেন 'গঞ্জালেস' বেশী নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন রজত রায়চৌধুরী, শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, গোপা ভট্টাচার্য, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীর গঙ্গোপাধ্যায়। এই নাটকটির মঞ্চসজ্জা ও নির্দেশনার দায়িত্ব নেন সুনীথ মজুমদার।।

শুভম নাট্যগোষ্ঠীর 'স্ট্রীট বেগার' : সম্প্রতি শুভম নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'স্ট্রীট বেগার' নাটকটি পরিবেশন করেন।

সুঅভিনীত এই নাটকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন সুমিত দেব, তপন ধর, অমর দাস, অমিত দেব, সুনীল দত্ত, শুক্লা দাঁ, শিবানী ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন কমলেশ ভট্টাচার্য।

'অনুকৃতি'র 'নবজাতক সূর্য': আদর্শ, প্রেম, আনন্দ, বিশ্বাস, মানুষের চিত্তের এই চিরন্তন বৃত্তি ও বোধগুলো বারবার সামাজিক নিষ্ঠুরতার চাপে বিপর্যস্ত হোলেও, অস্তিত্বের ইতিহাসে এরা অম্লান থাকে। বোধ হয় এই সত্যই বিঘোষিত হয়েছে 'অনুকৃতি' প্রযোজিত 'নবজাতক সূর্য' নাটকে। সম্প্রতি এ নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে।

প্রয়োগপরিকল্পনার ব্যাপারে আরো একটু গভীরতর চিন্তা প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এদিক দিয়ে নির্দেশক অমল ঘোষের একটু শৈথিল্যই চোখে পড়েছে। তবে গৌতম দত্তের উদাত্ত কণ্ঠে বাউল গান দর্শকদের মনে এনেছে নতুনত্বের দোলা। এ ব্যাপারে সঙ্গীতপরিচালক রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াসও নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন রাগ পরিবেশন করে নাটকের আন্তর গতিবেগকে গভীরতর করে তুলতে পেরেছেন। পিন্টু বসুর আলোকসম্পাত নাটকের কয়েকটি মুহূর্তকে সজীব করে তুলেছে। তবে দৃশ্যসজ্জার আরো একটু শৈল্পিক কল্পনার প্রয়োজন ছিল।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন স্বরাজ চাটার্জী, শশাঙ্ক ঘোষ, স্নেহাংশু চক্রবর্তী, মনীষ রায়, অমল ঘোষ, অসিত নাগ, গৌতম দত্ত, রণজিৎ রায়, ধরণী মুখার্জী, মধুছন্দা দাস ও শাশ্বতী মুখার্জী।

মুভিং থিয়েটারের 'ইয়াহিয়া ও গণ-আদালত': মুক্ত আকাশের নিচে প্রায় দু হাজারের ওপর নানান বয়সী মানুষের মেলা। সোদপুর গোশালার বিশাল চত্বরের কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত দৃষ্টি সংহত হয়ে রয়েছে সামনের জোড়াতালি দিয়ে তৈরি মঞ্চের দিকে। দর্শকরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন 'বাংলাদেশে' যে নারকীয় কাণ্ড ঘটে চলেছে তারই জান্তব রূপ—'ইয়াহিয়া ও গণ-আদালত' মঞ্চাভিনয়। বাঙালী জাতীয়তাবোধের নব উন্মেষের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শক্তির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের বাস্তব রূপ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সোদপুরের মুভিং থিয়েটার তাঁদের সাম্প্রতিক মুক্তাঙ্গন অভিনয়ে। অভিনয়ের আগে সভাপতি বিমল বসু জনমত জাগরণে এই ধরনের অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 'ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ' তরফ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। অভিনয়ের প্রারম্ভে 'সোনার বাংলা' গানটি নিবেদন [illegible] ও [illegible]

অভিনয়ে মুভিং থিয়েটার তাঁদের পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয় দর্শক চিত্তকে অভিভূত করে রাখে। অংশ গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ বসু, সুকুমার বসু, প্রতাপ রায়চৌধুরী, বাচ্চু দত্ত, কুমার চক্রবর্তী, কালিপদ দাস, চন্দ্রমৌলি ব্যানার্জি, বাদল সমাদ্দার, রবি ভট্টাচার্য, রমানাথ চক্রবর্তী, প্রদীপ সিংহ, দিলীপ চক্রবর্তী, তপন উপাধ্যায়, শঙ্কর দে ও পারুল দাস। সংগীত পরিচালনা করেন লাল্টু সোম। নাট্যকার সুকুমার বসু নাটক পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন।

দুটি একাংকের যৌথ প্রযোজনা

আগামী ২১ জুলাই মুক্ত অংগন রঙ্গমঞ্চে প্রাচীতীর্থ প্রযোজিত ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' ও সম্প্রীক্ষণ নাট্যগোষ্ঠীর 'বক্তব্যের অপেক্ষায়' (ক্লিফোর্ড ওডেটের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' অনুপ্রাণিত)—এই দুটি একাংক নাটক অনুষ্ঠিত হবে। নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে শ্রীঅমল কর ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয় আরম্ভ সন্ধে সাতটায়।

'নতুন দিনের আলোয়' কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার বাংলা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী। বিগত একুশ বছর ধরে এই নাট্যগোষ্ঠীটি নাট্যরসিকদের উপহার দিয়েছেন বহু নাটক। সম্প্রতি এই দল স্টারমার্স রঙ্গালয়ে অভিনয় করলেন নতুন নাটক 'নতুন দিনের আলোয়'। নাট্যকার ইন্দুনীল চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পটভূমিতে বিধৃত এই নাটক মূলতঃ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কয়েকটি উপভোগ্য নাট্য মুহূর্ত রচনা ও সংলাপে নাট্যকার ও নির্দেশকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। অভিনয়ে বিশেষ করে উল্লেখ্য হলেন অনিল মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র দোঁর, কালিপদ ভৌমিক, বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, মঞ্জন রায় ও শ্যামলী মজুমদার।

৩০শে জুলাই, শুক্রবার শুভমুক্তি
স্মরণীয় মুহূর্তের এক অনন্যসাধারণ ছবি !
সিপ্পী ফিল্মস নিবেদিত জি.পি.সিপ্পীর

সোসাইটি : হিন্দ : দর্পণা : মেনকা
গ্রেস : গণেশ : ছায়া : ইন্টালি
শ্যামবিরমহল (রাজাবাজার) : মৃণালিনী (দমদম) : বঙ্গবাসী (হাওড়া)
কমল (মেটিয়াবুরুজ) : নিশাত (সালকিয়া) : দীপক (মাখলা) : মানসী (শ্রীরামপুর) : জ্যোতি (চন্দননগর) : রূপালী (চুঁচুড়া) : লক্ষ্মী (টিটাগড়)
শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) : শ্রীলক্ষ্মী (কাচরাপাড়া) : অরোরা (বর্ধমান)
চিত্রা (আসানসোল) : চিত্রালয় (দুর্গাপুর)
—রাজশ্রী রিলিজ—

স্টুডিও থেকে

'আন্দাজ'-এর শুভমুক্তি

শিল্পী ফিল্মস্ নিবেদিত জি. পি. সিপ্পী প্রযোজিত এবং রমেশ সিপ্পী পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে তোলা 'আন্দাজ' ছবিটি এই শুক্রবার, ৩০ জুলাই সোসাইটি, হিন্দ, দর্পণা, মেনকা, প্রেম, গণেশ, ছায়া, ইন্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন শাম্মী-কাপুর, হেমা মালিনী, রাজেশ খান্না, সিমি প্রভৃতি শিল্পী। শংকর-জয়কিষণের সুর-সংযোজিত এই ছবিটির পূর্ব-ভারতীয় পরিবেশক হচ্ছে রাজশ্রী পিকচার্স।

শপথ নিলাম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁদের আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় কীর্তি চিরভাস্বর, সেই মুক্তিবাধ্য বীরসন্তানদের কর্মসাধনার ছবি 'শপথ নিলাম' মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

দিব্যেশ দের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কৃষ্ণা নায়ক। শচীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ছবির গীতিরচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করেছেন সমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, শর্বরী বসু, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, শেখর চ্যাটার্জি, মলিনা দেবী, ভাস্কর চৌধুরী, মন্মথ, দুলাল, বলাই মুখার্জি ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা আরও অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক : ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার
একাডেমী অব ফাইন আর্টস
নান্দীকার
৩রা অগাস্ট সাড়ে ছ-টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাকাডেমীতে টিকিট বেলা ১টা—৭টা
রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড় (৫৫-৬৮৪৮)
নান্দীকার
শনি ও রবি ২।। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
২রা আগস্ট সোমবার মুক্ত অঙ্গনে ৭টায়
শের আফগান

স্ত্রী/আরতি ভট্টাচার্য এবং উত্তমকুমার। পরিচালনা : সলিল দত্ত। ফটো : অমৃত

স্বীকৃতির আউটডোর : এলিট মুভিজ নিবেদিত ও আশিস রায় প্রযোজিত স্বীকৃতি ছবির বহির্দৃশ্যের জন্যে শিল্পী ও কলাকুশলীসহ এই মাসের শেষে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, টোকিও ও হংকং-এ যাচ্ছেন পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্যও স্বয়ং পরিচালকের। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ছবির কাজ সমাপ্ত হবে। সঙ্গীতপরিচালনা অমল মুখোপাধ্যায়ের। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। ছবির নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান তিন শিল্পী অপর্ণা সেন, সমিত ভঞ্জ ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, কল্যাণী মণ্ডল এবং বিকাশ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

ভিন্ন স্বাদ অন্যরসের ছবি : কুহেলির চিত্র মুক্তি

চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার এবার ভিন্ন স্বাদ এবং অন্যরসের ছবি দর্শক সাধারণকে উপহার দিচ্ছেন। এ ছবির ভিন্ন প্রকৃতির কাব্যরসাসিক্ত 'নিমন্ত্রণ' থেকে একেবারে 'দুটি'—এর স্বাদ এবং স্বত একেবারে আলাদা। 'কুহেলি' এই নতুন ছবির নাম। নামেই পরিচয় মেলে। ক্রাইম থ্রিলার। রহস্য ভয়াল ভয়ংকর রসের পটভূমিতে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন স্বনামধন্যরা—যেমন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সুমিত্রা সান্যাল, সুখেন্দু, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত এবং আরো অনেকে। সংগীত রূপায়ণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে সৌমেন্দু রায় আর সুনীতি মিত্র আছেন দৃশ্যপরিকল্পনায়।

আগামী ৩০ জুলাই রাধা, পূর্ণ সহ সতেরোটি চিত্রগৃহ এই ছবিটি দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

বিরাজ বৌ: সমাপ্তি পথে

সুনীল রায় প্রযোজিত কে সি দাস প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'এর চিত্রগ্রহণের কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে প্রায় অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে। চিত্রনাট্য রচনা—সলিল সেনের। পরিচালনায় আছেন—মানু সেন। সুর দিচ্ছেন: কালীপদ সেন। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন: সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র ও অনুপ ঘোষাল। ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন—উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, নীলিমা দাস, বিকাশ রায় শিবানী বসু, শর্মিলা, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জীবেন বসু, জহর রায়, বেচু

সিংহ, ধীরাজ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল, গৌর সী, বীরেন চ্যাটার্জী, আনন্দ মুখার্জী, রাজলক্ষ্মী (ছোট) প্রমুখ।

অপর্ণা : মুক্তির পথে

সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত ও শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত করাসন্ধের—'অপর্ণা'-র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ছবিটি এখন মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল সেনের। সুর দিয়েছেন—রবীন চট্টোপাধ্যায়। গান লিখেছেন—প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণঃ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনায়—সুবোধ রায়। নেপথ্য কণ্ঠে—আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সিপ্রা বসু। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেনঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, তপতী ঘোষ, রেবা দেবী, অজন্তা চৌধুরী, দিজেন ভট্টাচার্য, তরুণকুমার ও জহর রায়।

স্ত্রীর চিত্রগ্রহণ চলছে : বেবী জুন প্রোডাকসনের 'স্ত্রী' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন বিজয় ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী। ছবিটির ভূমিকালিপি আকর্ষণীয়। সলিল দত্তের সফল ছবি 'অপরিচিত'র পর আবার উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। নায়িকা চরিত্রে আছেন আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সাধন সেনগুপ্ত, পারিজাত বসু। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস-বি-ফিল্মস।

বিবিধ সংবাদ

অস্করস্কোপে নতুন যোজনা 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন'

পাকিস্তানী জঙ্গীবাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে আশ্রয়প্রার্থীর দল পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে সীমান্ত অতিক্রম করে। গ্রাম-বাংলার তাদের শান্তির নীড় আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এই আশ্রয়প্রার্থী দলের মর্মকথাকে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন সার্বজয়ন্তী উদয়শঙ্কর একটি নাতিদীর্ঘ ব্যালের মাধ্যমে, যাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন জনৈক একক নর্তক এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বহু নর্তক-নর্তকী। এই ব্যালে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সুনিপুণ আবহ-সঙ্গীতের সহায়তায়। মঞ্চ এবং পর্দার কৌশলী সমন্বয়ে গঠিত, উপভোগ্য দুটি ভিন্নকারী 'অস্করস্কোপ'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেও 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' একটি বিশুদ্ধ ব্যালে।

টিটি/ললিতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনায় : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারত

মস্কো শহরে গেল হপ্তা থেকে যে সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হয়েছে, তাতে যোগদানের জন্য পাঠানো হয়েছে বাংলা কাহিনী-চিত্র 'সাগিনা মাহাতো' এবং ফিল্মস্ ডিভিশনকৃত কয়েকখানি তথ্যচিত্র। খবরে প্রকাশ, গেল ২০ জুলাই তারিখে 'সাগিনা মাহাতো' দেখানো হয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ধর্মবীর সিং-এর নেতৃত্বে আন্ডার সেক্রেটারী কে কে খান এবং প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী গেল রবিবার, ১৪ জুলাই মস্কো যাত্রা করেছেন। বোম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো'র শুটিং চলতে থাকায় ছবির পরিচালক তপন সিংহ কথা থাকা সত্ত্বেও এই দলের চতুর্থ সভ্যরূপে যোগ দিতে পারেন নি।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক চলচ্চিত্র পুরস্কৃত

হোমি, জে, এইচ, তালিয়ারখান-এর নেতৃত্বে ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পুরস্কার-সমিতির সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক দপ্তর ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে নির্মিত পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে-চলচ্চিত্রগুলিকে পুরস্কৃত করেছেন, তাদের সংস্থা ও পরিচালকসমূহ নাম ও পুরস্কারের পরিমাণ ঘোষণা করেছেন :

শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার : ৭৫,০০০ টাকা—প্রযোজক ৬০,০০০ ও পরিচালক—১৫,০০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার : ২৫,০০০ টাকা—প্রযোজক— ২০,০০০ ও পরিচালক— ৫,০০০ টাকা।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার : ১০,০০০ টাকা—প্রযোজক— ৭,৫০০ ও পরিচালক—২,৫০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫,০০০ টাকা—প্রযোজক— ৪,০০০ ও পরিচালক— ১,০০০ টাকা; তৃতীয় পুরস্কার : ২,০০০ টাকা—প্রযোজক—১,৫০০ ও পরিচালক— ৫০০ টাকা।

শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্রের প্রথম পুরস্কারটি তিনটি ছবির মধ্যে সমভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে : (১) পরিবার (হিন্দী) : প্রযোজনা ও পরিচালনা : কেশব, পি. কাশ্যপ; (২) ধর্মকন্যা (মারাঠি) : প্রযোজনা শ্রীমতী স্মরুন্তী শিন্দে; পরিচালনা—মাধব শিন্দে; (৩) কাড়ি দুপ কড়েহান (পাঞ্জাবী): প্রযোজনা : পুরেন্দ্র শর্মা; পরিচালনা : কানওয়ার শোরে। দ্বিতীয় পুরস্কার : ওমাৎমেন্তী (মালয়লম)। : প্রযোজনা : এম. পি. চন্দ্রশেখরন পিল্লাই; পরিচালনা : কে. এস. সেথুমাধবন।

স্বল্পদৈর্ঘ চিত্র : প্রথম পুরস্কার—বাপ রে বাপ; বোম্বাইয়ের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার পক্ষে প্রযোজনা : প্রমোদ পতি; পরিচালনা : রামমোহন; দ্বিতীয় পুরস্কার—ডেঞ্জার সিগন্যাল; ফিল্মস্ ডিভিশনের পক্ষে প্রযোজনা ও পরিচালনা : পি. কে. রাজহংস এবং তৃতীয় পুরস্কার—দে ইয়া তিন কাছে : প্রযোজনা : ক্লিমেন্ট পিপাস ও পরিচালনা : রাম পাইওয়া।

এ-ছাড়া প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে ফিল্মস্ ডিভিশন প্রযোজিত 'শাড়ি অ্যান্ড সাকুটাম্স অ্যান্ড রামায়ণা এবং কেমার্স দ্বারা প্রযোজিত এবং এস. শুক পরিচালিত 'পিংলোনে' ছবি দুটিকে।

আলজিরিয়ার ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্রয়

আলজিরিয়ার সরকারী চলচ্চিত্র পরিবেশনা সংস্থার মুখ্য ব্যক্তি, মিঃ মোহাম্মেদ আউলেদ মুসা ভারতে এসে ১৬ খানি ভারতীয় চিত্র ক্রয় করেছেন ৪৫,৫০০ ডলার মূল্য দিয়ে। ছবিগুলির মধ্যে বাদ পাঁচখানি সাদা-কালো, বাকীগুলি রঙীন। পাঁচখানি সাদা-কালো ছবির মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন পরিচালিত আধুনিক শিল্পধর্মী ছবি আছে।

চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত তৃতীয়

ইউনাইটেড নেশন বার্ষিক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা হিসেবে ভারত ১৯৬৯ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শকসংখ্যা যেখানে ৪৬৫ কোটি ৫৯ লক্ষ, ভারতের দর্শকসংখ্যা সেখানে ২১১ কোটি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চীন।

৪ঠা আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে
অভিনেতৃসংঘ প্রযোজিত
নতুন নাটক
অন্ধযুগ
অভিনয়ে : অশোক মিত্র, সোমনাথ চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, রমেন মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, জগৎ মিত্র, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস, নরেন্দ্র আচার্য।
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
হলে টিকিট আজ থেকে রোজ ২—৭টা
টিকিট—[illegible]

২১ জুলাইয়ের 'প্রাভদা' পত্রিকা ঠিক আগের দিনে মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হিসেবে ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেস-এ প্রদর্শিত 'সাগিনা মাহাতো' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বলেছে, ছবিটি আকারে বাস্তবধর্মী, বিষয়বস্তুতে সামাজিক এবং সাধারণ রঙীন গীতিবহুল মেলোড্রামাগুলি (ভারতীয় হিন্দী ছবিগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।...'সাগিনা মাহাতো' চলচ্চিত্রে কলিকাতা রীতির (কোলকাটা স্কুল অব সিনেমার) একটি সুযোগ্য নিদর্শন—এই কলিকাতা রীতির নেতা হচ্ছেন প্রখ্যাত শিল্পী সত্যজিৎ রায়।' প্রাভদাতে বলা হয়েছে, ছবির পরিচালক তপন সিংহ এবং নায়ক-নায়িকা দিলীপকুমার ও সায়রাবানু সম্ভবত আসছে হপ্তায় মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে যোগ দিতে আসছেন।

'সাগিনা মাহাতো' ছাড়া ভারত দুটি তথ্যচিত্র ও দুটি শিশুচিত্রও পাঠিয়েছে মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্য।

ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এবং অসীম দত্ত ও নেপাল দত্ত প্রযোজিত পূর্ণিমা পিকচার্সের নিবেদন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে পাঠাচ্ছেন ভারত সরকার। উৎসবটি ১৯৭১-এর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হচ্ছে। স্মরণ থাকতে পারে, শ্রীরায়ের 'অপরাজিত' এই ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসব থেকেই স্বর্ণ-সিংহ (গোল্ডেন লায়ন) পুরস্কার লাভ করেছিল।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র বিশেষ আমন্ত্রণ

আগামী ৫ থেকে ২০ নভেম্বর শিকাগোর সপ্তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসর বসছে। এই উৎসবে অংশ গ্রহণ-এর জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ এসেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রিয়া ফিল্মস-এর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র। উৎসব পরিচালকরা চিকাগোতেই বিশ্বের রসিক-সমাজের সামনে এই অবিস্মরণীয় ছবির নিয়মিত শোতে উৎসাহী হয়ে প্রযোজক নেপাল দত্ত অসীম দত্ত এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে এই উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গীতালি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

—৩বি, ললিত মিত্র লেনস্থিত শ্যামবাজার কলি-৪ গীতালি সঙ্গীত শিক্ষায়তন আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সকল বিভাগের ও বিষয়ের কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারীগণ:—ধ্রুপদ, [illegible] আদো [illegible] [illegible] কর, স্বপ্না চক্রবর্তী, মধুমিতা দাস। ঠুংরি : কাবেরী কর, আশিস ঘোষরায়। রাগপ্রধান : কাবেরী কর, গৌরী সরকার, সুচেতা ভট্টাচার্য, মহুয়া ঘোষ। ভজন : অরুণা বসু, ভাস্বতী বিশ্বাস, সুস্মিতা গোস্বামী। শ্যামাসঙ্গীত : প্রশান্তকুমার রায়, কাজলরেখা ব্যানার্জী, গৌরী সরকার, ইন্দ্রাণী দাস, মধুমিতা দাস। লোকসঙ্গীত : পলি ভট্টাচার্য, মালা চক্রবর্তী, রাধারাণী কর্মকার, তন্ময় কর, শিপ্রা চক্রবর্তী, স্বপ্না চৌধুরী। প্রাচীন বাংলা গান : পলি ভট্টাচার্য, শুক্লা পাল। রবীন্দ্রসঙ্গীতে : মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী, কাজলরেখা ব্যানার্জী, সুস্মিতা সাহা, ইন্দ্রাণী দাস, সুস্মিতা গোস্বামী, শাস্তা বসু, কল্পনা মজুমদার, মিনাক্ষী মুখার্জী, দেববাণী চৌধুরী, আশিস ঘোষরায়, দীপালি সাধুখাঁ, বুলবুল মণ্ডল। অতুলপ্রসাদ : বাদল চ্যাটার্জী, কাবেরী কর, বনানী মিত্র, চৈতালী সোম, মধুমিতা দাস, দীপালি সাধুখাঁ, শিবানী গাঙ্গুলী, স্বপ্না সাহা। নজরুল : প্রশান্তকুমার রায়, কাবেরী কর, গৌরী সরকার, তনুশ্রী বসু, রিংকু চক্রবর্তী, আশিস ঘোষরায়, দীপালি সাধুখাঁ, শিবানী গাঙ্গুলী। আধুনিক : বাদল চ্যাটার্জী, মালা চক্রবর্তী, মধুমিতা দাস, তন্ময় কর, মুক্তা ঘোষ, স্বপ্না চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র সরকার, জলি পোদ্দার, শিবানী গাঙ্গুলী, স্বপ্না সাহা। পাশ্চাত্য : প্রভাসচন্দ্র সরকার, জলি পোদ্দার, শিবানী গাঙ্গুলী। ভারতনাট্যম : কৃষ্ণকলি বাগচী, সুতপা বসু, পাপিয়া বিশ্বাস, মণিকা বসু। কথক : তন্ময় কর, কাজল রায়, মৃদুলা ভট্টাচার্য। কথাকলি : কৃষ্ণকলি বাগচী, মুক্তা ঘোষ, দেববাণী চৌধুরী। সমবেত লোকনৃত্য : বাণীপীঠ নৃত্য-গীতাঙ্গন। তবলা : নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি : সৌরেন অধিকারী, অরুন্ধতী চক্রবর্তী, মিতা দত্ত, অভিজিৎলাল রায়, শমোল ঘোষ।

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের একক আসর

গেল ১৮ই জুলাই দক্ষিণ কলিকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যের তালে তালে'-র এক ঘরোয়া আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেতকণ্ঠে সংস্থার ছাত্রছাত্রীর গীত তিনখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রশংসনীয়। তারপর শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের পনেরোখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রত্যেকটিই উপভোগ্য রস-সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ। সর্বশেষে এবং সকলের অনুরোধে ইনি 'সার্থক জনম আমার' ও 'আমার সোনার বাংলা' গানদুটি দিয়ে আসর সমাপ্ত করেন। তাঁর সঙ্গে সুনিপুণ তবলাসঙ্গতে ছিলেন শ্রীগোপালদুলাল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য ধন্যবাদার্হ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসনৎকুমার দাশগুপ্ত, অলোকা মুখার্জী মীরা [illegible] ও অমিতাভ [illegible]।

CENTRAL LIBRARY

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড
প্রথম টেস্ট খেলা

লর্ডসে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট বৃষ্টির জন্যে ড্র হয়েছে।

১৯৭১ সালের আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতবর্ষ যে ৬টা টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলেছিল তার কোন খেলাতেই জিততে পারেনি। টেস্ট খেলার ফলাফল ছিল—ভারতবর্ষের হার ১৫ এবং খেলা ড্র ৪। এই অবস্থায় গত ২২শে জুলাই লর্ডস মাঠেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। টসে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকারকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড খেলার প্রথমদিকে খুব বেশী সুবিধা করতে পারেনি। মাত্র ৬১ রানের মধ্যে তাদের চারজন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান। এরপর ৭১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের এই দারুন সঙ্কটকালে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে উইকেটকিপার এ্যালেন নট (৬৭ রান) এবং অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ (৩৩ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁদের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৯৮ মিনিটের খেলায় ৯০ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৫২ রানের (৮ উইকেটে)

একনাথ সোলকার
১ম ইনিংসে ৬৭ রান

অজিত ওয়াদেকার
অধিনায়ক—ভারতবর্ষ

মাথায় প্রথমদিনের খেলা শেষ হয়। বোলার জন স্নো ৫১ রান করে নটআউট থাকেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা পালা করে যদি ক্যাচ না ফস্কাতেন তাহলে ইংল্যান্ডের অবস্থা খুবই শোচনীয় হত।

দ্বিতীয় দিন ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩০৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ৯ম উইকেট জুটিতে স্নো এবং গিফোর্ড ৯১ মিনিটে ৭১ রান তুলে দলের মুখ রেখেছিলেন। স্নো তাঁর ৭৩ রানে আউট হন—টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে তাঁর এই সর্বোচ্চ রান।

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করেছিল। উইকেটে

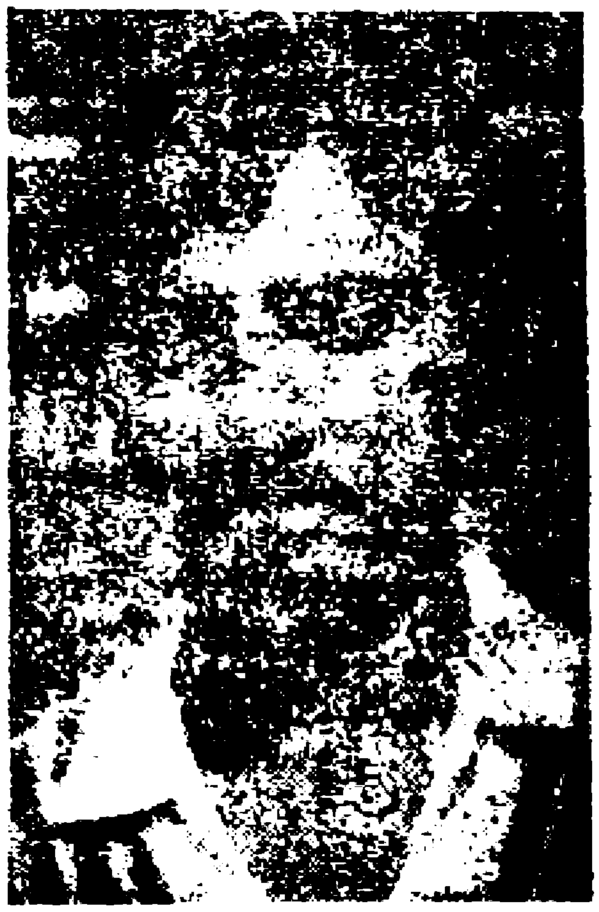

জি বিশ্বনাথ
১ম ইনিংসে ৬৮ রান

রে ইলিংওয়ার্থ
অধিনায়ক—ইংল্যান্ড

অপরাজিত ছিলেন বিশ্বনাথ (২৪ রান) এবং সোলকার (০)। ভারতবর্ষেরও প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—১ রানের মাথায় ১ম এবং ২১ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। অধিনায়ক ওয়াদেকার ব্যক্তিগত ৮৫ রান তুলে অবস্থা ফিরিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩১৩ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৯ রান এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের মাটিতে এই নিয়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডের থেকে যে-কোন পুরো ইনিংসের খেলায় বেশী রান অগ্রগামী হন। ১৯৩৬ সালে এই লর্ডস মাঠেই প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ১৩৪ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১৩ রানে এগিয়েছিল। এইদিন বিশ্বনাথ ৬৮ রান এবং সোলকার ৬৭ রান করে আউট হন। বিশ্বনাথ এবং সোলকারের ৫ম উইকেটের জুটিতে ৯২ রান উঠেছিল। তাঁরা মাত্র ১৪ রানের জন্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড ১০৫ রান (হাজারে এবং ফাদকার, লিডস, ১৯৫২)।

বিশ্বনাথ এবং সোলকার কি দক্ষতা এবং ধৈর্য নিয়েই না খেলেছিলেন। দলের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের মন্থর গতিতে এই খেলা পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। মাত্র ৪ রানের মাথায়

জন স্নো (ইংল্যান্ড)
প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান

নরম্যান গিফোর্ড (ইংল্যান্ড)
১ম ইনিংসে ৪ উইকেট

ইংল্যান্ডের ১ম উইকেট পড়ে যায়। বরকট (৩৩ রান) এবং এড্রীচ (৬২ রান) ২য় উইকেটের জুটিতে ৬১ রান তুলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ড ১২৬ রান এগিয়ে, হাতে জমা ৫টা উইকেট।

শেষদিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ১১১ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৮ উইকেটে ১৪৫ রান তুলেছিল। জয়লাভের জন্যে আর ২৮ রানের দরকার ছিল; হাতে জমা ছিল ২টো উইকেট। কিন্তু বৃষ্টির ফলে চা-বিরতির পর খেলা হয় না।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড: ৩০৪ রান (নট ৬৭ এবং স্নো ৭৩ রান। বেদী ৭০ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ১১০ রানে ৩ উইকেট)।
ও ১৯১ রান (এড্রীচ ৬২ রান। ভেঙ্কট-রাঘবন ৫২ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতবর্ষ: ৩১৩ রান (ওয়াদেকার ৮৫, বিশ্বনাথ ৬৮ এবং সোলকার ৬৭ রান। গিফোর্ড ৮৪ রানে ৪ উইকেট)।
ও ১৪৫ রান (৮ উইকেট। গাভাস্কার ৫৩ রান। গিফোর্ড ৪৩ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরের অষ্টম খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল ৫ উইকেটে হ্যামশায়ার কাউন্টি দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি চারটি খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে। লর্ডসের প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হবার আগে ভারতীয় দলের এইভাবে পরপর চারটি খেলায় জয়লাভ দলের সংহতি এবং মনোবল বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী।

প্রথম দিন হ্যামশায়ার দলের প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল না উইকেট খুইয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। হ্যামশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় গাভাস্কার ৮ রানের বিনিময়ে শেষ দুটো উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে তারা ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। ভারতীয় দলের এই দুজন সেঞ্চুরী করেন—বিশ্বনাথ (১২২ রান) এবং অশোক মানকাদ (১০৯ রান)। চলতি ইংল্যান্ড সফরে মানকাদের এই প্রথম সেঞ্চুরী। অপরদিকে বিশ্বনাথের তৃতীয় সেঞ্চুরী। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রান সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতীয় দলের শেষ ৬টা উইকেটে মাত্র ৫৭ রান উঠেছিল। খেলার শেষে হ্যামশায়ার দলের রান দাঁড়ায় ২৫, কোন উইকেট না পড়ে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে হ্যামশায়ার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭১ রানের মাথায় শেষ হয়। ভেঙ্কটরাঘবন একাই ৯৩ রানে ৯টা উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের জয়লাভের পথ সহজ করে দেন। ভারতীয় দল ৫ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০৬ রান তুলে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

এই খেলার শেষে ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়: জয় ৫, হার ১ এবং ড্র ২।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

হ্যামশায়ার: ১৯৮ রান (রিচার্ড গিলিয়াট ৫০ রান। প্রসন্ন ৩, গোবিন্দরাজ ২ এবং গাভাস্কার ২ উইকেট পান)।
ও ২৭১ রান (গিলিয়াট ৭১ এবং লিউস ৭১ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৯৩ রানে ৯ উইকেট)।

ভারতীয় দল: ৩৬৪ রান (বিশ্বনাথ ১২২, মানকাদ ১০৯ এবং গাভাস্কার ৫৩ রান। ওসালিভান ১১৬ রানে ৫ এবং ওয়ালে ১০২ রানে ৪ উইকেট)।
ও ১০৬ রান (৫ উইকেটে। গাভাস্কার ২৫ ও ওয়াদেকার ২৭ রান। ওসালিভান ২৭ রানে ৩ উইকেট)।

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

১৯৭১ সালের ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালের একদিকে ভারতবর্ষ খেলবে রুমানিয়ার সঙ্গে এবং অপরদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া খেলবে ব্রাজিলের সঙ্গে।

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-২ খেলায় স্পেনকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৫-০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ বনাম রুমানিয়ার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলাটি আগামী ৩০শে জুলাই নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে আরম্ভ হবে।

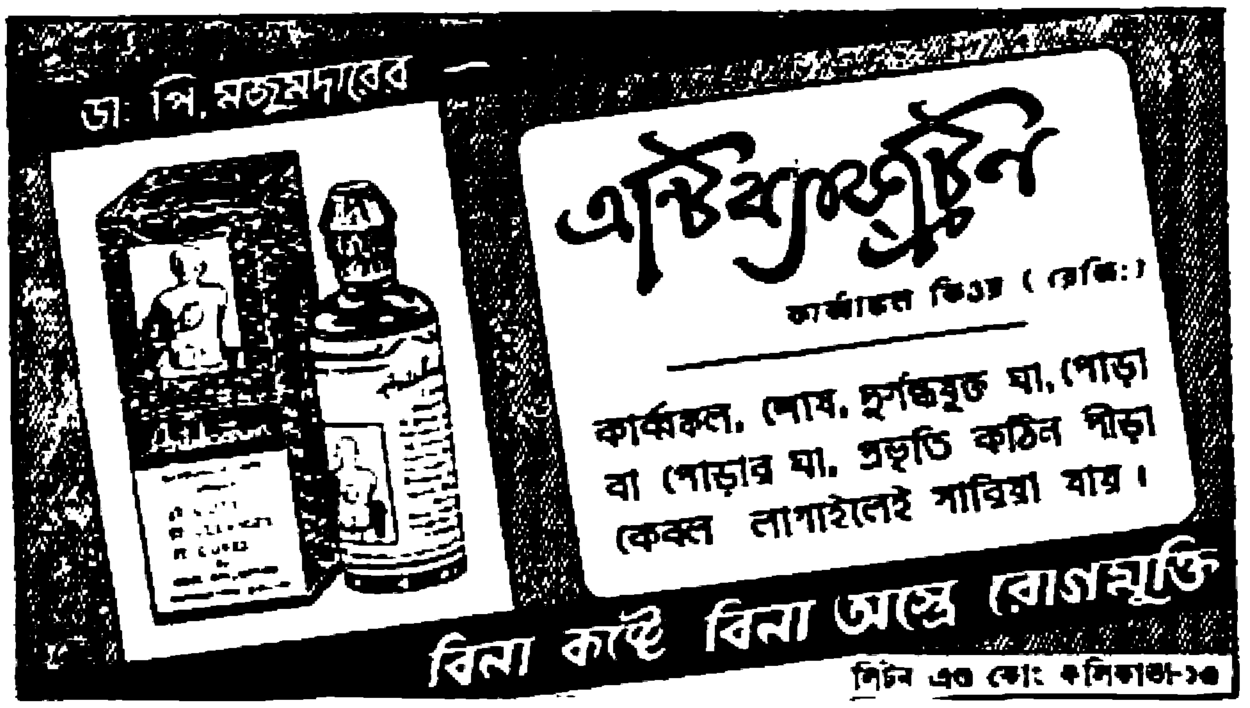

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৭, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

শিঙ্গার কুমকুম ঐ ললাটে অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে !

তুলে নিন, লাগিয়ে দিন শিঙ্গার কুমকুম। আপনার সুন্দর ললাট এর রঙের ছটায় হয়ে উঠবে অপরূপ। আপনার মুখকান্তিতে ফুটে উঠবে এক অপূর্ব শোভা— মনের মাতা— করবে জাগাবে পুলক। ১২টি অনন্য রামধনু রঙের কুমকুম থেকে আপনার মনের ভাব বুঝে পছন্দমত মানানসই বেছে নিন আপনার রুচি মাফিক কুমকুম। আপনার প্রিয় শাড়ী, কুর্তা আর সবচেয়ে সেরা লুঙ্গী আর বেলবটমের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে লাগান শিঙ্গার কুমকুম— টিপ। তাকান আয়নাতে।

চলুন—ফ্যাশন জগতে ভ্রমণ করুন।
শিঙ্গার—ফ্যাশনদুরস্ত আধুনিকা মহিলাদের জন্যে কুমকুম বিন্দি

বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম

শিঙ্গার

ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি
ভেলভেট ফিনিশ

পারামাউন্ট উৎপাদন ... বোম্বাই-৩১ ডি/ডি

PRATIBHA 2416-11-BEN.

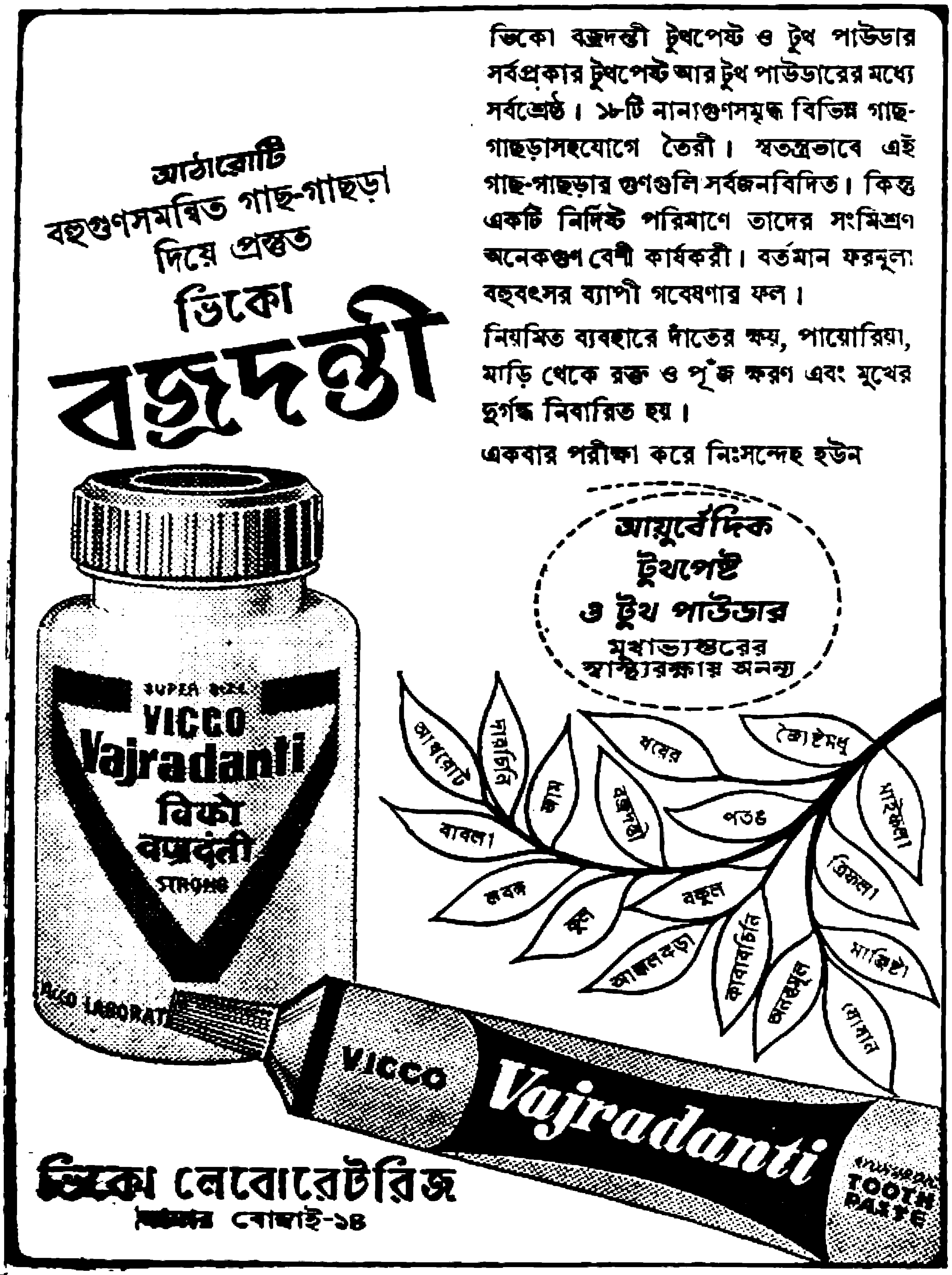

২০, লিন্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

পড়েছেন কি?

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা-কাহিনী—

— শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের —

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্ম্মিণী হয় ক'জন

৪·৯০

—তরুণ কবি চন্দ্রশেখরের —

আজ আমি বেকার

১·২০

পরিবেশক—
দে বুক স্টোর্স—১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি। পুস্তকম—শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। উষা পাবলিশিং—১০।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। বেঙ্গল বুক সপ—৬৫ এম জি রোড, কলি। সত্যজিত মুখার্জী—২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায়
একটি দুঃসাহসিক নাটক

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবর থেকে বলছি

মূল্য ৩·০০

রাজা বদল—৩·০০ পর্দাবিহীন—৩·০০

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের
চরৈবেতি ... ৩·৫০

সমর মুখোপাধ্যায়ের
মৃতদেহ ৩·২৫
হে মোর পৃথিবী—২·৫০

সলিল সেনের উৎসর্গ ২·৫০
শক্তিপদ রাজগুরুর মশাল ২·৫০
উমানাথ ভট্টাচার্যের জন্ম-মৃত্যু ৩·০০
ভোলা দত্তের স্বপ্ন নয় ৩·০০
শচীন ভট্টাচার্যের অবতার ৩·০০
রতন ঘোষের সমুদ্রমন্থ ২·০০
প্রতিবাদ ২·০০
দিলীপ মৌলিকের
ছায়া কায়া আলো ২·০০
মণীন্দ্র রায়ের কাব্য নাটক
নাটকের নাম ভীষ্ম ৩·৫০

দিলীপ মৌলিক ও শান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত

আজকের একাঙ্ক

: দাম — ৪·০০ :

এতে আছে ৮টি বিভিন্ন স্বাদের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক : অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পৃথিবী। উমানাথ ভট্টাচার্যের দিবারাত্র। কিরণ মৈত্রের আপোষ। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমল-কমল। ভোলা দত্তের খেলা। মনোজ মিত্রের তক্ষক। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠনালী। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের বাসভূম।

মিত্রালয়—৩০/৬ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

Friday, 6th August, 1971. ২০শে শ্রাবণ ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪	চিঠিপত্র		
৫	সম্পাদকীয়		
৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
১১	বাইশে শ্রাবণের ডায়েরী		—শ্রীপ্রশান্তকুমার মণ্ডল
১৯	দুই সৈনিক	(গল্প)	—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৫	আলব্রেখ্‌ট ডুরার		—শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন
৩২	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৩৫	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৩৯	৭১'এর লোকগণনায় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৪০	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৪৯	সাংবাদিকের চোখে		—শ্রীসাংবৎস
৫১	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৫৪	মধ্যাহ্নের বাঘ	(কবিতা)	—শ্রীশান্তনু দাস
৫৪	হিসেবের অঙ্ক	(কবিতা)	—শ্রীগোলাম কুদ্দুস
৫৪	অমলাপারের গান	(কবিতা)	—শ্রীকার্তিকচন্দ্র মিত্র
৫৫	সামুরাই প্রেত		—শ্রীঅমল চৌধুরী
৬২	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৯	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৭১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম রায়

জ্ঞানী, গুণী ও সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত!

মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরীর

নৃত্যে-ভারত

ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিক তথ্যপূর্ণ সচিত্র ইতিহাস
— দাম : দশ টাকা —
প্রাপ্তিস্থান : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলি-৬

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে

আমাদের বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী জাতীয় একটি গ্রন্থের অভাব অনুভব করে এবছর "রূপকল্প ১৩৭৮" নামে একটি সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করেছি। এতে আছে—বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকানা, ছদ্মনামের তালিকা, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের পুরস্কারের তালিকা, সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যুর তাং, ১৩৭৭ সালে পরলোকগত এবং শত ও অর্ধশত-বার্ষিকী উত্তীর্ণ সাহিত্যিকদের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁদের সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, ১৩৭৭ সালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসংবাদ, গ্রন্থপরিচিতি ইত্যাদি। যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি, তবুও আগামী বছর ২৫শে বৈশাখ যথানিয়মে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীর ২য় সংখ্যাটি প্রকাশ করব বলে আশা করছি। কিন্তু আমার পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা: অথচ বর্তমান জীবিত লেখকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা না তৈরি করতে পারলে আমার গ্রন্থের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত আর্থিক ক্ষমতাও আমার নেই। তাই আপনাদের এই 'চিঠিপত্র' কলমের শরণাপন্ন হলাম। যদি চিঠিটি প্রকাশ করেন তাহলে অনুগৃহীত হবো।

যে-সমস্ত সাহিত্যিকদের অন্ততঃ একটিও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ঠিকানা যাঁরা জানেন এবং সাহিত্যিকরা নিজেও যদি ঠিকানাটি জানান তাহলে আমরা চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেব। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা—গ্রাম—বোড়হল, পোঃ—জাঙ্গিপাড়া, জেলা—হুগলী। বাংলা-সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

অশোক কুণ্ডু, হুগলী।

কালাপানির দেশে

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কালাপানির দেশে' প্রবন্ধটি পড়ার পর ১৬ জুলাই সংখ্যায় অমৃতে শ্রীসত্যভূষণ সেন—গৌহাটি ১১ থেকে লেখা চিঠিটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীসেনের তিনটি তথ্যের শেষ দুটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

(১) 'লোকাল' নামে চিহ্নিত মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধে শ্রীসেনের বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবতার ছবির চেয়ে কিছুটা যেন সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। 'লোকাল' নামে যে জাতি (?)-র কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, আমার মনে হয় তা' দাঁড়িয়ে নয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাড়াও বহু কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে রয়ে গিয়েছেন; তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁরাও সাধারণের কাছে 'লোকাল' নামে অভিহিত হয়েছেন। শ্রীসেনের 'জাতিধর্মের পুরাতন পরিচয়'—এর যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করছি না, এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু তাবলে 'ইতিহাস বিহীন, ঐতিহ্য-বিহীন একটি জাতিতে পরিণত'—এ উক্তিটি যেন শ্রীসেন নিতান্তই আবেগ বশতঃ করেছেন বলে মনে হয়। শ্রীসেনের 'লোকাল' কথাটিকে পোর্টব্লেয়ার অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দাদের বলা হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে পুরাতন বাসিন্দারা 'লোকাল' কথাটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না। কথাপ্রসঙ্গে বলা যায় যে এই পুরাতন বাসিন্দাদের বংশধরেরা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং পুরাতন বাসিন্দারাও, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, আদালতে সর্বস্তরের সরকারী চাকুরীর বিভিন্ন কাঠামোতে নিযুক্ত আছেন এবং অনেকেই আজ মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষায়তনে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। আজ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সর্বস্তরের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং এদের কি 'অতীত ইতিহাসবিহীন ঐতিহ্য-বিহীন একটি জাতি' (?) বলে ভাবা যায়?

(২) শেষ পর্যায়ে শ্রীসেন আন্দামানে বাঙালীদের একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আন্দামানে বহু অভাব অভিযোগের কথা আমিও নিজে স্বীকার করি। তবে শ্রীসেন আন্দামানকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন তাতে সায় দিতে পারছি না। কারণ আন্দামানে হতাশার ফাঁকে ফাঁকে আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সকলের মনকে জয় করবেই। পোর্টব্লেয়ার শহরটি এমনই সুন্দর যে এখানে কেউ কিছুদিন থাকলে জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলি অনায়াসে অনুভব করতে পারবেন। আন্দামান দেখবার জন্য প্রায় কেউ সেখানে বেড়াতে যান না—এ অভিযোগ আমার মতে কিছুটা অমূলক। ১৯৬৩ সন থেকে কলকাতার একটি বিশেষ পর্যটন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বছর আন্দামান ভ্রমণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দুটি জাহাজ এবং সপ্তাহে দুবার ভাই-কাউন্ট প্লেন সারা বছর চলার ফলে আন্দা-মানের অপূর্ব সৌন্দর্য টুরিস্টদের কাছে ক্রমশঃ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। শ্রীসেন আর একটি মন্তব্যে লিখেছেন 'আন্দামানের বাঙালীদের পক্ষে ভারতবর্ষের লোকদের সহিত সংযোগ সম্পর্ক রক্ষা করা সহজ নয় সেজন্য লোকেরা তাদের প্রতি উদাসীন—এটা তাদের কাছে মর্মান্তিক।' শ্রীসেনের এই মন্তব্যের পক্ষে কতটা যুক্তি আছে তা অবশ্য চিন্তাসাপেক্ষ। আন্দামানের বাঙালীদের ভাগ্য যে ভারতবর্ষের লোকদের কাছে এতটা মর্মান্তিক রূপ ধারণ করেছে, তা আমি সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের মধ্য দিয়েও বুঝতে পারিনি। আন্দামানের বাঙালী সমাজ সেখানে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে: (ক) পূর্ববঙ্গ হতে আগত এবং (খ) সরকারী ও বেসরকারী কাজে নিযুক্ত বাঙালী। আমার মনে হয় পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাঙালীরা আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে পুনর্বাসিত হয়ে অন্তত মানুষের মত বাঁচার অধিকার লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভাবকে কিছুটা পূরণ করতে পেরেছেন। অপরদিকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত বাঙালীরা এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আছেন—তা আমার মনে হয় না। শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের লেখনীর বন্ধনে আন্দামানের বাঙালীদের করুণ আবেদন 'আমাদের কথা তাদের বলবেন—আমাদের কথা বলবেন'—এবং শ্রীসেনের এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আমার মনে হয় না যে বাঙালীরা অনেকেই আজ সেখানে এক সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন। কারণ এ ধরনের উক্তি তথাকথিত 'কালা-পানির দেশ'-এর প্রতি আকৃষ্ট বাঙালী সমাজের কাছে স্বভাবতই ভীতি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কথা প্রসঙ্গে বলতে চাই, আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে সরকারী দপ্তর এবং ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে বাঙালীদের তুলনায় অবাঙালীদের বিশেষ করে, দক্ষিণ ভারতীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করে আসছে। প্রতি ক্ষেত্রে বাঙালীরা আজ সেখানে অবাঙালী বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে ঘরমুখো এবং অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন। আমার বক্তব্য 'আমাদের কথা তাদের বলবেন, আমাদের কথা বলবেন'—এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে বাঙালীরা অবাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্দামানে নিজেদের কুশলতাকে প্রমাণ করুন; কেন আজ বাঙালীরা ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন?

প্রণবজ্যোতি দে
কলকাতা-৫০।

একটি তথ্য সম্পর্কে

অমৃত-র ১১শ সংখ্যায় "মঞ্চাভিনয়" স্তম্ভে (৯৬২ পৃঃ) লেখা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের "সে" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩৭-এর এপ্রিল)। তথ্যটি ঠিক নয়। অধুনালুপ্ত ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রিকা প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "রংমশাল"-এর প্রথম সংখ্যায় (১৩৪০ কার্তিক, ১৯৩৩ অক্টোবর) "সে" প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি চিত্রিত করেছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল লাহিড়ী, যিনি পরে "পিসিয়েল" ছদ্মনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দুর্গাবতী দেবী,
[illegible], কলকাতা।

CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদকীয়

সংবিধান সংস্কার

সুপ্রীম কোর্টের রায়, মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা নতুন যুগ রচনা করেছে। এইবার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এক হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জনগণ এভাবে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে অনেকদিন ভোটদান করেন নি। শাসক কংগ্রেস নির্বাচনের পূর্বে যে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন তা সফল করতে হলে এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। যে প্রস্তাব আনা হয়েছে নতুন দুটি বিলে তার দ্বারা সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশগুলি সংশোধনের অধিকার সরকারের হাতে দেওয়া হবে। এখন থেকে সরকার যে সব সম্পদ, গৃহ বা ভূমি সম্পত্তি গ্রহণ করবেন তার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের মোট পরিমাণ স্থির করবেন সংসদ। আর রাজন্য ভাতা বিলোপ, আই. সি. এসদের সুযোগ সুবিধা হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁদের ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ। এমন কি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও সংসদই ভাগ্যনিয়ন্তা। এই সূত্রে গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় স্মরণযোগ্য। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে অভিমত দিয়েছেন যে মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো আইন প্রণয়নের অধিকার সংসদের নেই।

বর্তমান সরকার শক্তিমান, কিন্তু অতিরিক্ত উৎসাহে সেই শক্তির অপব্যবহার অনুচিত। ইতিপূর্বে তেইশবার সংবিধান সংশোধিত হয়েছে, সুতরাং তেইশবার যখন হয়েছে আরো তেইশবার তা সংশোধন করা সম্ভব। বিরোধী দল বিল দুটি উত্থাপনের দিনেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় মনে হলে নিশ্চয়ই এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করা যায়, কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সুবিবেচনার দাবী রাখে। চতুর্বিংশতিতম সংশোধনী বিলটির দ্বারা সংসদকে সংবিধানের সকল পরিচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষমতা দান করা হবে, তার মধ্যে আছে মৌলিক অধিকার।

সংবিধান যখন রচিত হয় তখন কল্পনা করা সম্ভব ছিল না যে একদা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী প্রবর্তনের প্রয়োজনে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বিধিনিষেধ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে উঠবে। সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন জনপ্রতিনিধি, আজ যাঁরা সেই সংবিধানের সংস্কারক তাঁরাও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বর্তমান সংসদ তাঁদের সহযোগিতায় সুপ্রতিষ্ঠ। এই কারণে, সংসদ যদি আজ সংবিধানের কালোপযোগী পরিবর্তনে ব্রতী হন তাহলে সেই কাজকে অসংগত বলা যায় না।

বিরোধী দলের একজন সম্মানিত নেতা পরলোকগত নাথ পাই, বিগত সংসদে এই জাতীয় একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত স্বার্থসংরক্ষক কিছুসংখ্যক সদস্য এই বিল দুটির বিরোধিতা করলেও তাঁদের যুক্তি এবং বক্তব্য হয়ত তেমন তীক্ষ্ণ হবে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সীমা নির্ধারণে আদালতের এক্তিয়ার থাকবে না। এই ব্যবস্থানুসারে একত্রিশতম অনুচ্ছেদে "ক্ষতিপূরণ" কথাটির পরিবর্তে 'দেয় অর্থের পরিমাণ" বা অ্যামাউন্ট কথাটি বসানো হয়েছে। এর অর্থ কোনো সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারি অধিকারে নেওয়া হলে তার জন্য যে মূল্য দেওয়া হবে তাকে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না, এর ফলে হয়ত খেয়ালখুশি মাফিক যা হয় একটা অর্থ আমলাতন্ত্রের করুণায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাবেন।

এই ধারার অপব্যবহার হতে পারে এমন আশঙ্কা সরকারেরও আছে—তাই বিলে বলা হয়েছে সংশোধিত আইন রাজ্যগুলিতে প্রচলিত আইনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে না, সেটা অবশ্য রাষ্ট্রপতির বিবেচনাসাপেক্ষ। এই বিলে এমন কোনো রক্ষাকবচ নেই যা ভবিষ্যতের কোনো ক্ষীণ গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সংসদকে ত্রাণ করতে পারে। যে সংসদ আজ সংবিধান সংস্কারে ব্রতী ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পটভূমি

ঠিক সময় ঠিক কথা বলার জন্যে প্রমোদ দাশগুপ্তের খ্যাতি আছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন পশ্চিম বাংলার জন্যে বিশেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, তখন প্রমোদবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বৃটিশ রাজ যেমন ভাইসরয় থাকা সত্ত্বেও ভারতের জন্যে একজন সেক্রেটারী অফ স্টেট নিয়োগ করত, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি রাজ্যপাল থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার জন্যে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। পশ্চিম বাংলা দিল্লীর কলোনি—মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এই শ্লোগান অনুসারে প্রমোদবাবুর তুলনাটা বেশ লাগসই নিশ্চয়ই। আবার গত বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের গোড়ার দিকে পুলিশ খুব গুলি চালাচ্ছিল, কিন্তু বিশেষ কেউ মরছিল না। এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে প্রমোদবাবু চট্ করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তবে কি পুলিশের বুলেটে "নিরোধ" লাগানো আছে?

কিন্তু সেই প্রমোদবাবুও একটি বিষয়ে চট্ করে মুখ খুলতে চাইলেন না সেদিন। বিষয়টি হল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পিকিং সফরের প্রস্তাবের পর চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা। এ-কথা ঠিকই যে এই খবরের আকস্মিকতায় পৃথিবী জুড়ে অনেকে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেরই মুখ খুলতেও দেরি হয় নি। যেমন, আমাদেরই দেশের সি পি আই। নিক্সনের পিকিং সফরের খবর আসার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই দল চীনকে গালমন্দ করে বিবৃতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রমোদবাবু তথা মার্কসবাদীরা যে অ—বাক হয়ে রইলেন তার কারণ শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় নয়।

সকলেই জানে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সি পি এম কোনো বিশেষ শিবিরে নেই। অতীতে রাশিয়াকেও এই দল যেমন গাল পেড়েছে, চীনকেও একেবারে ছেড়ে কথা বলে নি। তবু পলিটব্যুরোর বৈঠকের আগে কোনো মার্কসবাদী নেতা চীন-মার্কিন সমঝোতা সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলেন না কেন? তার কারণ চীন সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলার আগে তাঁরা একটু ভেবে-চিন্তে এগোতে চান। মার্কসবাদীরা এখনই এমন কিছু বলতে চান না যাতে চীনের চটবার আশঙ্কা আছে। আবার আগের সমালোচনার পর এখন রাতারাতি চীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে, ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে চীনের বর্তমান মনোভাব সি পি এমের কাছে যদি কিছুটা রহস্যাবৃত মনে হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চীন সম্পর্কে পার্টির সতর্কতার কারণও এখানেই।

সি পি এম যে চীনা বা সোভিয়েট, কোনো শিবিরেই নেই সেটা হয়ত তাদের পক্ষে এক দিক দিয়ে ভালোই—কারণ কম্যুনিস্ট পার্টি মাত্রেই যে বিদেশের দালাল তাদের এই অপবাদ দেওয়ার অন্ততঃ কোনো উপায় নেই। তবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন যখন আন্তর্জাতিক আন্দোলন, তখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগেরও প্রয়োজন আছে বৈকি? সি পি এম সেই দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রায় নির্বান্ধব। মস্কোর কম্যুনিস্ট সম্মেলন হলে সি পি আই নেতাদের ডাক পড়েছে, চীনের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে সি পি আই (এম - এল), কিন্তু সি পি এম নেতাদের একমাত্র যোগসূত্র ইউরোপের ছোট্ট কম্যুনিস্ট দেশ রুমানিয়া। রুমানিয়া ওয়ার্কার্স পার্টির বৈঠকে যোগ দিতে জ্যোতি বসু কিছু দিন আগে সেখানে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের আরো কিছু কিছু চেষ্টা এর আগে সি পি এম করেছে—যেমন কোরিয়া মারফৎ চীনের সঙ্গে। কিন্তু সে-চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় অনেক অন্তর্বিরোধ কাটিয়ে উঠে সি পি আই শেষ পর্যন্ত চীনের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকেই এই পার্টি চীনের বিষদৃষ্টিতে পড়ে। ১৯৬৪ সালে যখন সি পি আই সরকারীভাবে দুভাগ হল তখনও তার অন্যতম কারণ ছিল চীন সম্পর্কে পার্টির মনোভাব কী হবে সেই প্রশ্ন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি হওয়ার পর চীন এই নতুন দলকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু দুই পার্টির মধ্যে মার্কসবাদীদের প্রতিই যে চীনের পক্ষপাতিত্ব ছিল, এ-কথা সকলেই জানেন। অবিভক্ত পার্টির মধ্যে যাঁরা চীনাপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সকলেই নতুন পার্টিতে যোগ দেন—যেমন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রভৃতি।

চীনের আক্রমণের পর বাম কম্যুনিস্টদের ধরপাকড় উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা যে "হোয়াইট পেপার" প্রকাশ করেছিলেন তাতে তো অভিযোগ করা হয়েছিল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে চীনা লাইন আমদানির প্রধান ভার ছিল হরেকৃষ্ণবাবুর ওপর। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে হানয়ে ভিয়েৎনাম পার্টির কংগ্রেসে যোগদানের পর তিনি নাকি গোপনে চীনেও গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, নতুন পার্টি তৈরি হওয়ার পর সি পি এম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যে-মনোভাব গ্রহণ করে তাতে চীনের লাইনের প্রতিই পার্টির সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ক্রুশ্চেভ যে লাইন আমদানি করেন তার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে সি পি এম। শান্তির পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার যে-নীতি ক্রুশ্চেভ চালু করেন, সি পি এম তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধতা করায় এই সব প্রশ্নে চীনের বক্তব্যের সঙ্গে পার্টির বক্তব্য বেশ মিলে যায়। শুধু তাই নয়, চীন-সোভিয়েট বিরোধের ফলে কম্যুনিস্ট শিবির যে আজ দুটুকরো হয়ে গেছে তার জন্যেও সি পি এম দায়ী করে সোভিয়েট রাশিয়াকেই।

কিন্তু চীনের প্রতি এই সহানুভূতি সত্ত্বেও ১৯৬৭ সালের পর থেকে সি পি এম ক্রমশঃ চীনের কাছ থেকে সরে আসে। এর সূত্রপাত অবশ্যই নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সি পি আই (এম-এল) গঠন থেকে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি এমেরই একাংশ যখন দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলেন তখনই চীন প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াল নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের সমর্থনে। ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন পিকিং বেতার থেকে এই আন্দোলনকে "মাও সে তুঙের শিক্ষার আলোকে ভারতীয় জনগণের সশস্ত্র

বিপ্লবের সামনের থাবা" বলে অভিহিত করা হল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের যন্ত্র' বলেও গাল দেওয়া হল। ঐ সময় পিপলস্ ডেইলির কয়েকটি মন্তব্যেও ফুটে উঠল একই সুর। যেহেতু সি পি এম ছিল ফ্রন্টের প্রধান শরিক তাই এই দলও প্রতিক্রিয়াশীলদের দালালের মার্কা পেয়ে গেল। তারপর তো ১৯৬৮ সালের ৭ অকটোবর পিকিং বেতার চারু মজুমদারের দলকেই ভারতের আসল কম্যুনিস্ট পার্টি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিলে।

এদিকে সি পি এমের নানা প্রস্তাবেও চীনের নীতির সমালোচনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালেরই আগস্টে মাদুরাইয়ে সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবেই প্রথম চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির বিভ্রম নীতির নিন্দা করা হল। ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুই পার্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা গেল। সি পি এম এ-কথা কিছুতেই মানতে রাজী হল না যে, ভারতের বর্তমান অবস্থা চীনের প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার অনুরূপ। ভারত সরকার যে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং ভারতে বিপ্লবের রূপ হবে মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, এ-তত্ত্বও সি পি এম অগ্রাহ্য করল। সবচেয়ে বড় কথা, পার্লামেন্টারি পথে কোনো অগ্রগতিই সম্ভব নয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ, সি পি এমের দৃষ্টিতে চীনের এই বক্তব্যও অসার মনে হল। ভারতের বিপ্লব হুবহু চীনের পথেই হবে, সি পি এম এই কথা মানতে পারল না। অর্থাৎ সংক্ষেপে, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই পার্টি ও চীনের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমশঃ দুস্তর হয়ে দাঁড়াল।

*

তাই যদি হয় তবে চীন সম্পর্কে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান সতর্কতার কারণ কী? ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে চীন এখন কি কোনো নতুন চিন্তা দেখা দিচ্ছে? নকশালপন্থী তথা সি পি আই (এম-এল) সম্পর্কে চীনের মোহভঙ্গের কোনো ইঙ্গিত কি পাওয়া যাচ্ছে? আর সেই ধরনের ইঙ্গিত কি সি পি এমের মনে চীন সম্পর্কে কোনো নতুন আশার সৃষ্টি করছে?

সত্যি কথা বলতে কি, চীনের কাছ থেকে এ-পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ চীন এখনও চারু মজুমদারের দলের কোনো প্রকাশ্য সমালোচনা করে নি। তবে কয়েকটি নেতিবাচক লক্ষণ থেকে অনেকে মনে করছেন যে, সি পি আই (এম-এল)-এর বর্তমান ক্রিয়াকলাপে হয়ত চীনের সমর্থন নেই। আর এ-কথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের মধ্যে ঐ দলেরই অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাও আছেন। আর ঐ দলের মধ্যে বর্তমানে যে অন্তর্বিরোধ চলছে তার মূলেও রয়েছে এই বিভ্রান্তিই।

গত বেশ কয়েক মাসের মধ্যে পিকিং বেতার থেকে প্রচারিত কোনো অনুষ্ঠানে সি পি আই (এম-এল)-এর কোনো কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয় নি। অথচ তার আগে পিকিং বেতারের বিভিন্ন কথিকাতেই ভারতে বিপ্লবের অগ্রগতির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ দলের কার্যাবলীর প্রশংসাসূচক উল্লেখ করা হত। নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন সুরু হয় তখন তো পিকিং বেতার ও চীনের নানা পত্র-পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু এই যে বীরভূমে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, যেখানে নকশালপন্থীরা মুক্তাঞ্চল কায়েম করেছে বলেও দাবি করা হল, সেই বীরভূম সম্পর্কে চীনের কোনো প্রচার-মাধ্যমেই কোনো উল্লেখ পাওয়া গেল না। তার চেয়েও বড় কথা, সম্প্রতি পিকিং রিভিউর একটি সংখ্যায় বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের অগ্রগতির যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভারতের বা সি পি আই (এম-এল) দলের সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হয় নি। অথচ এর আগে, এই ধরনের যে-কোনো পর্যালোচনাতেই সি পি আই (এম-এল) সম্পর্কে উল্লেখ করা হত।

এই সব লক্ষণ দেখেই অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, চারু মজুমদারের দলের ক্রিয়াকলাপকে চীন হয়ত ভালো চোখে দেখছে না। বেশ কিছুদিন ধরেই এই দলের সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজিতে যে-পরিবর্তন দেখা গেছে সেটা ঠিক মাওবাদী পথ বলা চলে না। মাওবাদের প্রধান কথা গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের সূত্রপাত। কিন্তু ইদানিং সি পি আই (এম-এল) দলের আক্রমণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শহর অঞ্চল। সেই দিক থেকে তাদের কাজকর্মে মাওবাদের চেয়ে লাতিন আমেরিকার "শহুরে গেরিলাদের" পথের পরিচয়ই বেশি করে পাওয়া গেছে। অন্যান্য দেশে শহুরে গেরিলাদের কার্য-কলাপের নিন্দা করেছে চীন, কিন্তু এ-পর্যন্ত চারু মজুমদারের দল সম্পর্কে সরাসরি কোনো নিন্দাবাদ করে নি।

তবে ইদানিং পিকিং বেতারের নীরবতা থেকে দলের একাংশ, যাঁদের নেতা হলেন অসীম চ্যাটার্জি, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দলের বর্তমান নীতিতে চীনের কোনো আস্থা নেই। যেহেতু চারুবাবু এই নীতির জনক তাই তাঁরা চারুবাবুর বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলকে সঠিক মাওবাদের পথে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বীরভূমে অসীম চ্যাটার্জির নেতৃত্বে আন্দোলন সেই উদ্যোগেরই প্রকাশ। কিন্তু এই সঠিক মাওবাদী পথে প্রত্যাবর্তনও পিকিংয়ের আশীর্বাদ পেয়েছে, এমন প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

• • •

চীনের এই অস্পষ্ট মনোভাবই চীন সম্পর্কে সি পি এমের সতর্কতার কারণ। তাই নিকসনের পিকিং সফর সম্পর্কে পলিটব্যুরো যে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তাতেও তাই সতর্কতার চিহ্ন ফুটে উঠল।

চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার ফলে সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কিন্তু পলিটব্যুরো চীনের নিন্দা করলেন না। বরং এ-কথাই বললেন যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই সফরের প্রস্তাব চীনের কাছে আমেরিকার পরাজয় স্বীকার ছাড়া কিছুই নয় এবং চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিরই প্রমাণ। এর সঙ্গে তুলনা করুন রুশ-মার্কিন বোঝাপড়া সম্পর্কে সি পি এমের কঠোর সমালোচনার। রাশিয়া সম্পর্কে কটূক্তি করে সি পি এম বলেছিল, আধুনিক সংশোধনবাদীরা মুখে আমেরিকাকে "সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক শোষণকারী" "পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি" এবং "পৃথিবীর মানুষের প্রধান শত্রু" বলে গাল দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব (মাদুরাই, ১৯৬৭, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব)। চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত এবারের প্রস্তাবে কিন্তু চীন সম্পর্কে এই ধরনের বক্রোক্তি নেই।

তা ছাড়া সি পি এম চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার চেষ্টা থেকে ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের আহ্বানও জানিয়েছে। চীনের কাছে মার্কিন পরাজয়ের পর ভারতের কী করা উচিত? উচিত চীনের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করা। এখন ভারত সরকারের ঘুম থেকে ওঠা দরকার, বোঝা দরকার এতদিন চীন সম্পর্কে যে-নীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে তা চূড়ান্ত ভুল নীতি। এখনও ভারত সরকারের সুযোগ আছে এই নীতি পরিবর্তন করে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার।

অর্থাৎ সি পি এমের বিচারে চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান অচলা-বস্থার জন্যে সব দায়িত্ব ভারত সরকারের এবং এ-বিষয়ে চীন সরকারের কিছু করার নেই। দু' হাত না-হলে যেমন তালি বাজে না, তেমনই দু' হাত না-হলে মিলনের সম্ভাবনাও থাকে না। সুতরাং চীনেরও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে এগিয়ে আসা দরকার নয় কি? সি পি এম অবশ্য তেমন কোনো আহ্বান জানায় নি। সেই জন্যেই অনেকে মনে করছেন, এই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের সঙ্গে ভাবগত যোগাযোগের একটা পথ খুলে রাখছে।

৩০।৭।৭১ —[illegible]

দেশে বিদেশে

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন ও পাকিস্থানী প্রতিনিধি আগা শাহীকে ডেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কি আলোচনা করেছিলেন, সেকথা সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়নি। স্বস্তি পরিষদের সভাপতিকে পত্র লিখে কি জানিয়েছেন তাও জানান হয়নি।

খবর ছিল যে, মহাসচিব মহাশয় নাকি রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সদস্যদের প্রথমে একটি ঘরোয়া বৈঠকে এবং পরে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাছে লড়াই বেধে যায় সেজন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং এই খবর অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বস্তি পরিষদের ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক কোন সভা ডাকারই প্রস্তাব উ থান্টের কাছ থেকে আসেনি।

কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘের এই বিদায়ী মহাসচিব যে বাংলা দেশের সীমান্তের দুই পারে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের মতলব হাসিল করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রসংঘের এই পর্যবেক্ষকদলের নেতৃত্ব নিয়ে জন কেলি নামে রাষ্ট্রসংঘের একজন অফিসার আসছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ভারত সরকার আগেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন।

•

ক্রমেই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, জুলফিকার আলি ভুট্টো নন, তাঁর পিপলস্ পার্টিও নয়, খাঁ আবদুল কায়ুম খাঁ ও তাঁর অল পাকিস্তান মুসলিম লীগই এখন ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকদের নয়নের মণি। ইয়াহিয়া খাঁ যদি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও হস্তান্তর করার কথা ভাবেন তাহলে এই কায়ুম খাঁর কথাই তাঁর আগে মনে হবে।

পাকিস্তানের শাসকরা বিচ্ছিন্নতাবাদের দাওয়াই হিসাবে প্রথমে তিনটি মুসলিম লীগকে এক করে কায়েদে আজম জিন্নার পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার মতলব করেন। "পাকিস্তান টাইমস্"-এর সম্পাদক জেড এ সুলেরিকে দিয়ে এই নীতির স্বপক্ষে জোর প্রচার চালান হয়। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ক্রমাগত এই পার্টির গৌরবময় অতীত ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেন।

অবশেষে, গত ১৪ জুলাই তারিখে কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিঞা মমতাজ দৌলতানা ও কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, তাঁরা দুই লীগকে এক করার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং খাঁ আবদুল কায়ুম খাঁ অল-পাকিস্তান মুসলিম লীগকে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই ঘোষণার পরই পাকিস্তান টাইমস্ তিন লীগকে এক করার ওকালতি ছেড়ে কায়ুম খাঁর গুণকীর্তন আরম্ভ করে দেয়। কায়ুম খাঁ না এলে তো রাম ছাড়া রামায়ণ লেখার সামিল হবে, এই হল পাকিস্তান টাইমস্-এর মন্তব্য। পত্রিকাটি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "সব নেতার মধ্যে তিনিই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফল দেখাবার মতো লড়াকু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং কোনরকম আপোষ রফা না করে পাকিস্তানের মতাদর্শ আঁকড়ে ধরে রাখার সৎ সাহস দেখিয়েছেন।" মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ আলোচনা করে সুলেরি সাহেব সম্প্রতি বলেছেন, "(লীগের) উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ সম্ভবত কায়ুম খাঁর উপরই নির্ভর করে।"

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কায়ুমের চেয়ে যোগ্যতর সাক্ষাৎ সে দেশের শাসকদের পক্ষে খুঁজে বার করা কঠিন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধার তিনি ধারেন না, কট্টর ইসলামপসন্দ দল তাঁর, ভুট্টোর গান্ধা সমাজতন্ত্রের বুলিও তিনি কপচান না।

•

আগামী ২২ আগস্ট তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি নির্বাচনকেন্দ্রে একটি উপনির্বাচন হওয়ার কথা আছে। এই উপনির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। যদিও তিনি শাসক কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা হলেও তাঁকে নির্ভর করতে হবে ডি এম কে দলের সমর্থনের উপর। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, ডি এম কে এই উপনির্বাচনে কোন প্রার্থী দেবে না, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম যাতে জয়ী হন সেজন্যই তারা চেষ্টা করবে।

কিন্তু এই সমর্থনের জন্য ডি এম কে দল শাসক কংগ্রেসের কাছ থেকে একটা মূল্য আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই মূল্যটা হচ্ছে এই যে, কাবেরী নদীর জল ভাগ করার প্রশ্ন নিয়ে তামিলনাড়ুর সঙ্গে (এবং কেরলের সঙ্গে) মহীশূরের যে বিরোধ আছে সেই বিরোধ ফয়সালার জন্য ট্রাইবুন্যাল বসাতে হবে।

এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ডি এম কে-র এই দাবী মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। কেননা, কাবেরীর জলের উপর দাবীতে যেমন তামিলনাড়ুর সব দলই ডি এম কে-র পিছনে সামিল হয়েছে তেমনি মহীশূরের মানুষও তাদের দাবীতে অটল। তামিলনাড়ুর দাবী মিটিয়ে দিলে শাসক কংগ্রেসের পক্ষে কৃষ্ণাগিরিতে সুবিধা হতে পারে এবং বেচারা শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের জন্য দিল্লিতে একটা আসন লুটিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মহীশূরে এর ধাক্কা শাসক কংগ্রেস কি করে সামলাবে? সেখানেও তো নির্বাচন আসছে।

কাবেরীর জল সত্যিই শাসক কংগ্রেসকে উভয় সঙ্কটে ফেলেছে।

এই জল নিয়ে দক্ষিণের তিনটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। পৃথিবীর যেসব নদীর জল মানুষের প্রয়োজনে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগান হয়েছে কাবেরী তাদের মধ্যে অন্যতম। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ জলই ব্যবহার করা হয় প্রায় দশ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে সেচ দিতে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই দাক্ষিণাত্যের রাজা-রাজড়ারা কাবেরী নদীর জল আটকে খালের সাহায্যে মাঠে-মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। পাথরে তৈরি একটি বাঁধ ১৬০০ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ এই অঞ্চলে সেচের জল যুগিয়ে এসেছে ও বন্যা প্রতিরোধ করেছে। ইদানীংকালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলা যে প্রচুর ধানের ফলনের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে সেই ফলন কাবেরীর জল ছাড়া সম্ভব হত না।

ভারতবর্ষের পূর্ববাহিনী নদীগুলির মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম এই নদী আজ আন্তরাজ্য বিরোধের বিষয়ে পরিণত হলেও ভারতের ঐক্য কল্পনায় কাবেরীর একটা বৃহৎ স্থান রয়েছে। ভারতীয় হিন্দুর প্রার্থনা-বাক্যে আছে :

"গঙ্গে চৈব যমুনে চৈব গোদে চৈব
সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে
অস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"

অর্থাৎ যে সাতটি নদীকে ভারতের পবিত্রতম নদীরূপে গণ্য করা হয় সেগুলির মধ্যে একটি হল কাবেরী। এক অর্থে কাবেরী গঙ্গার চেয়েও পবিত্র নদীরূপে গণ্য হয়। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় অবগাহন করে শুদ্ধ হয় পাপী মানুষ আর গংগা নাকি শুদ্ধ হয় বৎসরান্তে একবার পাতালপথে কাবেরীর সংগে মিলিত হয়ে। এই হচ্ছে প্রচলিত বিশ্বাস। কাবেরীর আর এক নাম দক্ষিণ গঙ্গা।

কাবেরীর জলরাশিকে মানুষের কাজে লাগাবার বিপুল সম্ভাবনার কথা আধুনিক কালে যাঁদের মাথায় এসেছিল, তাঁদের একজন হলেন এম বিশ্বেশ্বরায়া। তিনি তখন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান। তিনি কাবেরীর উপর বাঁধ পরিকল্পনা করলেন। এই নিয়ে মহীশূরের সংগে বিরোধ বাধল পার্শ্ববর্তী বৃটিশ প্রদেশ মাদ্রাজের। মাদ্রাজের আশংকা, নদীর উজান থেকে মহীশূর যদি জল টেনে নিয়ে যায়, তাহলে ভাটিতে মাদ্রাজের কপাল পুড়বে। ১৯২৪ সালে মাদ্রাজ ও মহীশূরের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তাতে স্থির হল যে, মাদ্রাজ মহীশূরকে বাঁধ বাঁধতে দেবে (পরবর্তীকালে যার নাম হল কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ), মাদ্রাজও মেট্টুরে বাঁধ তৈরি করতে পারবে। আরও স্থির হল যে, কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধটি পরিচালনা করা হবে কতকগুলি বাঁধাধরা নির্দেশ-নির্দেশ অনুসারে। মাদ্রাজে কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ছেড়ে দিতে মহীশূর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকল।

তামিলনাড়ু ও কেরলের অভিযোগ, মহীশূর কাবেরী অববাহিকার জন্য নতুন কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯২৪ সালের সেই চুক্তির শর্ত খেলাপ করেছে। মহীশূরেরও পাল্টা অভিযোগ আছে।

কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধের উজানে কাবেরীর অন্যতম উপনদী হেমবতীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য মহীশূর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা নিয়ে তামিলনাড়ুর সংগে তার বিরোধ চলছে ১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে। মহীশূর সরকার বলছেন, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃরাজ্য বৈঠকেই এই বিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার একথা স্বীকার করেন না।

হরঙ্গী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের জন্য মহীশূর সরকার যে পরিকল্পনা করেছে সেটি নিয়েও মহীশূরের সংগে তামিলনাড়ুর বিরোধ আছে। বিরোধটি আরও জটিল। কেননা, এই বাঁধটি যেখানে তৈরি হওয়ার কথা আছে সে জায়গাটা আগেকার কুর্গ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। কুর্গ রাজ্য মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এখন সেই জায়গাটা মহীশূরের। কিন্তু যেহেতু ১৯২৪ সালের চুক্তি যখন হয়েছিল তখন কুর্গ মহীশূরে ছিল না সেহেতু সঠিক ভাবে বলতে গেলে হরঙ্গী বাঁধের পরিকল্পনা এ চুক্তির আওতায় আসে না।

কেরলের সংগে মহীশূরের বিরোধ কাবেরীর আর একটি উপনদী কাবিনি নিয়ে। এই কাবিনি নদীর উপর জলাধার তৈরির একটা পরিকল্পনা মহীশূর হাতে নিয়েছে। এই জলাধার তৈরি হলে কেরলের প্রায় ২৫০ একর জমি ডুবে যাবে। রাজ্য-গুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস এক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কেননা, ১৯২৪ সালের চুক্তি যখন হয় তখন ঐ এলাকা মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আজ সেটা কেরলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কেরল ১৯২৪ সালের চুক্তির শরিক নেই। মহীশূরের আর একটি যুক্তি এই যে, তামিলনাড়ু যে ভবানী জলাধার পরিকল্পনা করেছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবেই মহীশূর চুক্তি অনুযায়ী কাবিনি পরিকল্পনা করার অধিকারী।

মহীশূরের সুবর্ণবতী পরিকল্পনা সম্পর্কেও তামিলনাড়ুর আপত্তি আছে। মহীশূরের বক্তব্য, এটা হচ্ছে তামিলনাড়ুর অমরাবতী পরিকল্পনার ক্ষতিপূরণ।

তামিলনাড়ুর কয়েকটি সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কেও মহীশূরের পাল্টা অভিযোগ আছে।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমে সরকারী অফিসার স্তরে এবং পরে মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হয়। এইসব আলোচনার শেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দেন যে, ১৯৫৬ সালের আন্তঃরাজ্য জলবিরোধ আইন অনুযায়ী এই বিরোধ ফয়সালার জন্য একটি ট্রাইব্যুনালে পাঠান হোক। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, পরিকল্পনা কমিশন যেসব প্রকল্প মঞ্জুর করেন নি সেগুলির কাজ যেন তাঁরা বিরোধ নিষ্পত্তির আলোচনাসাপেক্ষে স্থগিত রাখেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে মহীশূরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাটিল বলেন যে, তাঁদের কোন প্রকল্প তাঁরা স্থগিত রাখার কথা চিন্তা করছেন না। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়া গেলেও তাঁরা প্রকল্পগুলির কাজ চালিয়ে যাবেন। মহীশূর সরকার ঐসব প্রকল্প বাবদ দশ কোটি টাকার বেশী ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছেন।

ভারত সরকার কাবেরী বিরোধ ট্রাইব্যুনালে দিতে চান না, তাঁরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধের মীমাংসা করতে চান। মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেছেন,

শারদীয়

অমৃত

১৩৭৮

- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। স্বহস্তলিখিত অনুলিপিসহ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরির ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র।
- সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের একাধিক সম্পূর্ণ উপন্যাস
- একটি সুদীর্ঘ কাব্য-নাট্য
- সুনির্বাচিত গল্প-সংগ্রহ
- কবিতাগুচ্ছ
- চলচ্চিত্র, নাটক, খেলাধুলা।

দাম : সাড়ে চার টাকা

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বিকল্পটি ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নির্বাচিত সরকার। রাষ্ট্রপতির শাসনের পরিচালক হিসাবে তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। এদিকে, তামিলনাড়ু বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ট্রাইব্যুনালের দাবী জানান হয়েছে এবং এই দাবী মেনে নেওয়া না হলে কুম্বাকোণমে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের দুর্ভিক্ষ হবে বলেও আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় এইটুকু বলেছেন করেছেন যে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিরোধের ফয়সালা করা না গেলে ট্রাইব্যুনালই বসবে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তির আশায় কতদিন অপেক্ষা করা হবে সেটা অবশ্য তিনি খুলে বলেন নি।

●

সুদানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল নিমিরি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ দমন করার পর ঐ বিদ্রোহের যেসব নেতাকে ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে গুলি করে অথবা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন তাঁদের একজন হলেন আব্দুল খালেক মাহ্জুব। তিনি ছিলেন সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। গত ২৬ জুলাই রাত্রিতে ওমডুরমান শহরের একটি ছুতারের বাড়ী থেকে জেনারেল নিমিরির অনুগত সৈনিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। খার্তুম শহরের উপকণ্ঠে একটি মিলিটারি ব্যারাকে সংক্ষিপ্ত "বিচারের" পর ঐ শহরেরই কোবার জেলে ৪৮ বছর বয়স্ক এই কম্যুনিস্ট নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই বিচারের সময় কিছু সাংবাদিককে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এই বেঁটেখাট কম্যুনিস্ট নেতাকে সামরিক আদালতে জবানবন্দী দেওয়ার সময় টেলিভিশনের কড়া আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতে দেখেছিলেন।

সুদানই আফ্রিকার একমাত্র দেশ যেখানে একটি সুসংগঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে। আর সেখানে যাঁরা ঐ পার্টি গড়ে তোলেন তাঁদেরই একজন ছিলেন এই আব্দুল খালেক মাহ্জুব।

মাহ্জুব কায়রোতে পড়াশুনা করতে গিয়ে কম্যুনিস্ট হয়ে দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৪ সালে। সেই সময়েই স্থাপিত হয় সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টি। কয়েক বছরের মধ্যে এই পার্টির জোরায় শ্রমিক, ছাত্র, যুব ও নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও এই পার্টি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা গ্র্যাজুয়েটদের ১৫টি আসনের মধ্যে ১১টিতে জিতে যান। ১৯৬৬ সালে পার্টি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে জেনারেল নিমিরির অধীনে একদল সামরিক অফিসার সুদানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর কিছুদিন সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টি খুবই আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক নীতি ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জেনারেল নিমিরির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকে। মাহ্জুবকে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কারারক্ষকও উধাও হয়ে যান।

গত ১৯ জুলাই জেনারেল নিমিরির বিরুদ্ধে যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে মাহ্জুবও নেতৃত্ব করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

৩০-৭-৭১ —পৃথ্বীজ

CENTRAL LIBRARY

শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় কলকাতার পথে। ২৫শে জুলাই ১৯৪১ খৃঃ

স্বর্গত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একদা সাহস ক'রে একখানি চিঠি লিখেছিলুম, তার বক্তব্য ছিল মোটামুটি এই: দেশের সবাই বলে কবিগুরু, বিশ্বকবি, কবীন্দ্র, কবিকুলচূড়ামণি, কবিসম্রাট ইত্যাদি। কিন্তু বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, সেক্সপীয়র—এ'রা যদি 'মহাকবি' বলে বর্ণিত হন, রবীন্দ্রনাথ কেন হবেন না।

'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দবাবু ছিলেন অতিশয় রাশভারী ব্যক্তি, তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতে তৎকালে চট করে কেউ সাহস পেত না। সমগ্র সাংবাদিক জগৎ তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, এবং সম্পাদক মহলে তাঁর মতো মনীষী সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন।

চিঠিখানা পাঠিয়ে একান্ত উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিলুম—যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে! যদি এক লাইন জবাব আসে।

এর মধ্যে সামান্য একটু কথা আছে। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে অত্যন্ত তরুণ বয়সে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' বার করেছিলুম। সেই একই সময়ে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন বিভাগে অন্য একজন ব্যক্তির সাহায্যে কিছু কাজ করে দিতুম। রামানন্দবাবুর তৎকালীন সহ-সম্পাদক যিনি, তাঁর নাম ছিল এডভোকেট অশ্বিনীকুমার ঘোষ। আবার এই অশ্বিনীবাবুই ছিলেন আমার 'বিচিত্রা'র সম্পাদক। আমাদের পীড়াপীড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা'র জন্য একটি কবিতা (না, গান নয়) দিলেন। সেটি হল, 'আনমনা গো আনমনা, তোমার কাছে আমার বাণীর গাঁথনখানি আনব না—' ইত্যাদি।

রামানন্দবাবু পরের মাসের 'প্রবাসী'তে এই কবিতাটি 'সঙ্কলন' অংশে ছেপে দিলেন। 'বিচিত্রা' প্রবাসী প্রেসেই ছাপা হত। এই 'বিচিত্রা'রই কয়েক মাস আগে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযোগানন্দ দাশ ও রামানন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়—এ'রা দুজন বার করেন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'—যেটি ছোট একখানা খামে মুড়ে তখন বিক্রি হত চার পয়সায়!

যাই হোক, আমার পয়েন্ট আমি কিন্তু ভুলি নি!

'প্রবাসী'র প্রায়-নিয়মিত লেখক হিসেবে রামানন্দবাবু আমাকে জানলেও চিঠির জবাব কিন্তু এল না! ঠিক মনে নেই,

বাইশে শ্রাবণের ডায়েরী

প্রবোধকুমার সান্যাল

এর মাস দুই কালের মধ্যে যখন দেখলুম, সম্পাদকীয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মহাকবি শব্দটি রবীন্দ্রনাথের নামের আগে ছাপা হয়েছে, সেদিন বড়ই আনন্দ পেয়েছিলুম।

সেই মহাকবির মৃত্যু আসন্ন।

২০ শ্রাবণ থেকেই কলকাতায় গুমোট চলছে। হাওয়া নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই। সমস্ত আকাশে নিশ্চল মেঘরাশি—যেন সমস্ত বিশ্বের মহাশ্মশানের ভস্মরাশির মতো। ওরে কবি, এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস, আপন বাণীতে তারি গমন তারে বাঁচাইতে চাস?' জীবনের শ্রেষ্ঠ গান,—গীতবিতান,—এবার বুঝি চিরকালের মতো স্তব্ধ হতে চলল। গত তিন-চার দিন ধরে ডাক্তারদের বুলেটিন একটির-পর-একটি প্রকাশ করা হচ্ছিল। কবির অবস্থা উদ্বেগজনক। ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শল্যচিকিৎসক ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সর্বদাই কবির প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

তিরিশ বছর আগেকার ইতিবৃত্ত আজ তুলে ধরছি। অনেক ছোট-ছোট ঘটনা ও তার টুকিটাকি মন থেকে হারিয়ে গেছে। তবু বলছি এই কারণে যে, সর্বাধুনিক কালের ছেলে-মেয়েরা সেদিনের ছবিটি একবারটি দেখেই নিক না কেন?

তখন আমি 'যুগান্তরের' অন্যতম সহযোগী সম্পাদক, এবং বাংলা দৈনিকের পক্ষে সেই প্রথম রবিবারের 'সাময়িকীর' বিভাগ আমার হাতে। এই সূত্রে তখন মহাকবির কাছ থেকে ছিটে-ফোঁটা একটু-আধটু লেখাও আদায় করে নিতুম। 'যুগান্তরের' জন্মকাল থেকেই আমি তার সঙ্গে যুক্ত।

সে যাই হোক, দৈনিক কাগজ মানেই রাজনীতিক কাগজ। সুতরাং তখনকার রাজনীতিক ভারতের চেহারাও এই সূত্রে একটু বলা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন প্রায় দু বছর। হিটলারের রকেট-বোমায় লণ্ডন তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। চরম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ফ্যাসিস্তরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে মাত্র দেড় মাস আগে। ইউরোপের এক-একটি রাজ্য হিটলারের আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। জাপান প্রায়ই আমেরিকাকে হুমকী দিচ্ছে। চারিদিকে একটা অনিশ্চয়তা। এদিকে প্রায় সাত মাস আগে সুভাষচন্দ্র সংগোপনে ভারত ত্যাগ করে গেছেন, এবং তিনি এখন কোথায় কেউ জানে না! গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর বাক-বিতণ্ডা ঘটেছে। তখন চলছে গান্ধীজীর পরিচালিত ব্যক্তিগত 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। সেই প্রথম দেশের লোক শুনলো একটি নাম, বিনোবা ভাবে। ওটা ছিল এখনকার মতো অনেকটা 'পিংপং' রাজনীতি এবং 'ডিক্কুর' যুদ্ধের মতো। গান্ধীজীর ও-ব্যাপারটায় কারও বিশেষ সমর্থন নেই। নেহরু-প্যাটেলাদি তখন কারাগারে বন্দী। কংগ্রেস তখন মূঢ়, তার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ নামেই আছেন শুধু। জিন্না তখনও পাকিস্তান সৃষ্টির হুজুগ নিয়ে হৈ-চৈ সৃষ্টি করেন নি। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের ঘোরতর বিপদের কালেও ভারতে জাঁতা হয়ে বসে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। সুতরাং তখনকার ভারতের আকাশ অমানিশায় ঘনঘোর। এই সময় মহাকবির জীবন-কালের সর্বশেষ বৈশাখের প্রথম দিনে বৃটিশরাজ তথা ইংরেজের বিরুদ্ধে এই অশীতিপর বৃদ্ধের সর্বশেষ ধিক্কার তাঁর কম্বুকণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষে উচ্চারিত হল একটি প্রবন্ধে। সেটির নাম 'সভ্যতার সঙ্কট'। এই প্রবন্ধে মহাকবির একটি অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণীর সংকেত প্রকাশ পেয়েছিল, ইংরেজ ভারতকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে! আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ, তাঁর কথাটা শুনতে ভাল লেগেছিল, কিন্তু কথাটার তেমন আমল দিই নি। তাঁর মৃত্যুর ৬ বছর ১ সপ্তাহকাল পরে উপমহাদেশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল!

[illegible] খবর পাওয়া গেল, মহাকবিকে ৯ শ্রাবণ, [illegible] তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এনে তাঁর কিডনিতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। সেটি বোধহয় ১৩ শ্রাবণ। যিনি এই কাজ করেছেন তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ নীলরতন ও ডাঃ বিধান-চন্দ্র সর্বদা কবির প্রতি যত্নবান ছিলেন। এই অস্ত্রোপচারের পর মহাকবি কতকটা সুস্থ হয়ে শুয়ে-শুয়ে কবিতা লিখিয়েছেন, (১৪ শ্রাবণ) গান গাইবার চেষ্টা করেছেন, ডাঃ রায়ের সঙ্গে ব্যঙ্গ-কৌতুক করেছেন, সুভাষচন্দ্রের খবর কিছু পাওয়া গেল কিনা শুনতে চেয়েছেন, এবং তাঁর শেষ কবিতার বইটির কি নাম হবে তাও আলোচনা করেছেন। এর কিছুদিন আগে তিনি 'সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার—' কবিতাটিও লিখিয়েছেন,—যার একটি ছত্রের সর্বশেষ অসম্পূর্ণ অক্ষরটি তাঁর মৃত্যুর পরে বসিয়ে দিয়েছিলেন অধুনা পণ্ডিচেরীবাসী শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত সরকার মহাশয়। মহাকবি তাঁর সর্বশেষ ছোট কবিতাটির নাম 'মৃত্যু'—এই শিরোনামা নিজে দিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কেন তাঁকে বেশ কিছুদিন আগে আনা হয় নি, তাঁর রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল কিনা, তাঁকে কলকাতায় আনার প্রাক্কালে নানা জটলা ও জটিলতার দরুণ অশান্তি দেখা দিয়েছিল কিনা,—এ নিয়ে কিছু কিছু গুজব শোনা যাচ্ছিল। অবশ্য জগৎসভার সর্বত্র তখন এটি প্রচারিত যে, রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় পীড়িত। কিন্তু অন্দর মহলের একটিই ত সংবাদ—'বুড়োকর্তা ভুগছে খুব!'

যাই হোক, ১৬ শ্রাবণ থেকে মহাকবির অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটতে থাকে এবং তখন থেকে কবির অবস্থা রেডিও কর্তৃপক্ষ যখন-তখন ঘোষণা করছেন, এবং ডাঃ রায় ও ললিত ব্যানার্জি স্বাক্ষরিত বুলেটিনও বের হচ্ছে। কিন্তু ২০ শ্রাবণ তারিখে ভারতবাসীর মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, এবং পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও মনীষীরা কবির খবর নিতে লাগলেন। আমেরিকা তখন অনেক দূর, বিশ্বযুদ্ধেও সে তখন জড়িত নয়, এবং আমাদের পৃথিবীর বাইরে। সুতরাং সে-দেশের উদ্বেগ আমাদের কাছে ছিল একটা থ্রিল। বাংলাদেশে সেদিন উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক নেতা কেউ নেই, ফলে রাজনীতিক বাংলা তখন ধুঁকছে। বাংলার কংগ্রেস মূঢ় ও নির্জীব এবং এক মহিলার আঁচল-ধরা। একমাত্র শ্যাম এন রায় মহাশয় তখন অনেকটা মিত্রশক্তির পক্ষে বাগ্মিতার আসরে নেমেছেন।

২১ শ্রাবণ মহাকবির অন্তিম অবস্থা দেখা দিল। রাত্রের দিকে তাঁর দেহের আভ্যন্তরীণ কলকব্জা সব আলগা হয়ে এল, এবং মধ্যরাত্রে ঝুলন পূর্ণিমার কালে অনেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে জড়ো হলেন। সেদিন দুবার বুলেটিন বেরিয়ে ছিল, এবং সংবাদপত্রগুলির অপিসে 'অবিচুয়ারী' রচনাগুলি চুপি-চুপি সাজানো হচ্ছিল। না, আর কিছু করার নেই। সমগ্র বাঙালী জাতি আর যেন আজকের দিনটিতে কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছে না! অনেকের বাড়ীতে রান্নাবান্না বন্ধ,—ওই ছ' আনা সেরের গঙ্গার ইলিশ আর এক পয়সার খিচুড়ি! তখন ঘরে-ঘরে রেডিয়ো হয়নি। ট্রানজিস্টার তখন স্বপ্নবৎ। সংবাদপত্রের বিক্রি শুধু কিছু বেড়েছে যুদ্ধের খবরের জন্য। কলকাতার ট্রাম-বাসে তখন ভিড় বলতে কিছু নেই। অনেক ডেলি-প্যাসেঞ্জার সেদিন মহাকবির শেষ সংবাদ শোনার জন্য বাড়ী ফেরে নি।

আজ ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮। ইং ৭ আগস্ট ১৯৪১। ঝুলন পূর্ণিমা থাকবে সকাল ১১-০৮ মিঃ পর্যন্ত। অন্তিমকালের রোগীদের পক্ষে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নাকি ভাল নয়! কেননা প্রতিপদে ওলটালেই টান আসে। ঠিক এক বছর আগে এই ৭ আগস্ট তারিখে ভারতের চীফ জাস্টিস স্যর মরিস গয়ার দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে মহাকবিকে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে যান। এ সম্মান সেদিন অন্য কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার ঘুম ভেঙেছিল তখন রাত চারটে। আর-জি-কর হাসপাতালের পাশের গলিতে থাকি। দিন-তিনেক থেকে আমি অসুস্থ ছিলুম। কিন্তু সেই ঊষাকালে কোনও দিকে না তাকিয়ে শ্যামবাজার হাতীবাগান শোভাবাজার মানিকতলা জেলে-টোলা সিংহীবাগান ও কাঁসারীপাড়া ছাড়িয়ে চাষাধোপাপাড়ার পাশ কাটিয়ে নতুনবাজার ও কোম্পানীবাগান একে-একে পেরিয়ে যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে পৌঁছলুম, তখন ভোর পাঁচটা। তখনও লোক চলাচল হয়নি, জনসাধারণকে দেখা যাচ্ছে না, ট্রাম চলছে না তখনও চিৎপুর রোডে। তেমনি গুমোট, আকাশ তেমনি ধূসর, হাওয়া নেই কলকাতায়। মহাকাল যেন রুদ্ধশ্বাসে চরম লগ্নের বীজমন্ত্র জপ করছেন। সোজা ভিতরে ঢুকে কোল্যাপ-সিবল্ গেট ছেড়ে বাঁহাতি সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলুম। ছোট সাঁকো পেরিয়ে এলুম এ-বাড়ীর বারান্দায়—চিৎপুর রোডে দাঁড়ালে সোজা পুব দিকে যে-বারান্দা দেখা যায় সেইটি। পাশে দু-একখানা ঘরে দুই-একজন-তিনজন অপরিচিত লোক। হলঘরখানায় বিশেষ কারোকে দেখছিনে। চাকর-বাকর ঘুরছে এক-আধজন আশে-পাশে। কেউ চেনে না আমাকে, আমি চিনিনে কারোকে। বোধহয় সেই প্রভাতে প্রথম বাইরের লোক। বারান্দা ধরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলুম সেই দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটির সামনে,—পাশেই নীচে নামবার পুরনো কাঠের সিঁড়ি, রেলিংও কাঠের। প্রশস্ত সেই সিঁড়ির মাথার উপরে নক্সাকাটা সিলিংয়ের উপর দোতলার বারান্দা। আগাগোড়া সবটাই বোধ করি মহর্ষির আমলের।

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। মহাকবি শায়িত রয়েছেন একখানা খাটে। তাঁর মাথা পূর্বদিকে, পা দুখানি পশ্চিমে,—যেদিকে গঙ্গা। কবি বলতেন, তিনি গাঙ্গেয়! তিনি তখনও জীবিত নিদ্রায় নিলীন। নিদ্রা ঠিক নয়, যোগতন্দ্রায় নিমীলিত নেত্র। শায়িত অবস্থায় আগে তাঁকে দেখিনি, এই প্রথম দেখছি। তিনি একালে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটতেন, সেজন্য তাঁর ঋজু দেহের সঠিক পরিমাপ করা যেত না আজ শায়িত অবস্থায় এ যেন দেখছি বিরাট এক পুরুষ, যেন সেই গোদাবরী তীরের বিশাল শাল-প্রাংশু, যেন ভারতের মহাপ্রাচীন সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ আর্যঋষি!

মহাকবি তখনও জীবিত। ঘরের মধ্যে প্রথম জন দুই মহিলা ছিলেন, এখন হলেন চারজন। কিন্তু আমি তখনও কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে। আমি দেখছিলুম তাঁর সাংঘাতিক চওড়া হাতের কব্জা, আর পায়ের গোছের গড়ন,—ধব-ধব করছে এখনও গৌরবর্ণ। বুকের ছাতি এপার থেকে ওপার পর্যন্ত অনেক দূর। মাথাভরা শাদা চুল, একটু-একটু টাক পড়েছে মাঝে-মাঝে। ললাট যেন কৈলাসের চূড়া! দু হাতের বড়-বড় আঙুলগুলোকে দেখলে পুরাণের মহানায়ককে মনে পড়ে। কিন্তু সেই আঙুলগুলির বর্ণ যেন কনকচাঁপার। এই আঙুলের সৃষ্টি শান্তিনিকেতন।

একদা মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি বৃটিশ রাজের স্বৈতশাসন-প্রণালীর যখন সমালোচনা করছিলেন, চারদিকে দাঁড়িয়েছিল দু লক্ষ লোক। ওই দু লক্ষর জনসমুদ্রের মধ্যে শুধু তাঁরই উন্নত শির দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। সাধারণ মানুষ যে কত কুদ্রকায়, তাঁকে না দেখলে ঠিক বোঝা যেত না। তিনি স্থূলাঙ্গ ছিলেন না ছিলেন বিশালাকার। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অতি মধুর এবং পরিহাসপ্রিয়। কিন্তু তবু কাছাকাছি যেতে গা ছমছম করতো, দু-একটি কথা বলার পর যেন গলা শুকিয়ে যেতো। প্রথম দু-একবার আমার খুবই বিপদ গেছে। 'কল্লোল যুগ' একবার অচিন্ত্য গিয়েছিল মহাকবির সঙ্গে দেখা করতে। মহাকবি সামনে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন। অচিন্ত্য ফিরে এসে লিখেছিল, "এ ত' আগমন নয়, আবির্ভাব!"

সকাল আটটায় এসে গেল অনেক লোকজন। মহাকবির ঘরের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। ঘরে ধূপ জ্বলছে, ফুলের গন্ধ ঢালা। কবি তখনও জীবিত রয়েছেন, সামান্য একটু দাঁত নাড়ছেন।

অনেকে বিরক্ত হচ্ছেন ওদিক থেকে একটা অসামাজিক ও অভদ্র আওয়াজ শুনে। সমস্ত বারান্দা ও বাড়ী সেই

অধ্যাপক বীরেন্দ্রমোহন আচার্য

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি

পরিবর্ধিত সংস্করণ ১২.০০

আধুনিক শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান ১১·০০

মাতৃভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি ৫·০০

অধ্যক্ষ নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের

ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা দাম ১৪·০০

বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা ৪·৫০

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত দুই বাংলার মানুষ হৃদয়গতভাবে এতখানি নৈকট্য আর কখনও বোধ করেনি। সাহিত্যই মানুষকে মানুষের নিকটতর করে: দুই বাংলার মানুষের আজকের বাসনারও পূর্ণতা এনে দেবে সাহিত্য। সংকলনটি সেই উদ্দেশ্যেই। দুই বাংলার সেরা গল্প নিয়ে এই গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হল। দাম ৮·০০

দুই বাংলার সেরা গল্প

সম্পাদনা : শ্যামল চক্রবর্তী

শংকর-এর

এপার বাংলা ওপার বাংলা ১০-০০

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৫·৫০ মানচিত্র ৬·৫০ চৌরঙ্গী ১২·৫০

সার্থক জনম ৫·৫০ পাত্রপাত্রী ২·৫০ রূপতাপস ৪·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের — বিমল মিত্রের

নতুন তুলির টান (৩য় মুদ্রণ ৭·০০) — এর নাম সংসার (৫ম মুদ্রণ ৮·৫০) — গল্পসম্ভার (দাম : ১৬·০০)

ডঃ নবগোপাল দাস-এর — ননীমাধব চৌধুরীর — আশীষ বসুর

দুই নারী ৬·০০ আবির্ভাব ১০·০০ মনে রেখো ৩·৫০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। দেখতে-দেখতে একে-একে এসে পড়ছেন গণ্যমান্যরা। সবাই নিঃশব্দ সন্তর্পণে কয়েক পা এগিয়ে দর্শন করে যাচ্ছেন মহাকবিকে। চারিদিকে একটা স্তব্ধ বেদনা ও বিচ্ছেদের ছায়া। কিন্তু ওই আকাট বিশ্রী আওয়াজটা যেন হাতুড়ীর ঘায়ে সেটাকে দীর্ণ করে দিচ্ছিল। না, এ সহ্য করা যায় না। আমি ছুটে গেলুম চারু ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে। বললুম, এ বড় অশোভন, এ অন্যায় চারুবাবু! কোথা থেকে কারা কি কারণে এ রকম আওয়াজ করছে? একে থামানো যায় না?

চারুবাবু অত্যাধিক শান্ত প্রকৃতির লোক। বললেন, শব্দটা একটু বেশী হচ্ছে, কিন্তু ও ছাড়া ত উপায় নেই! ওদিকে মিস্ত্রিদের কাজ হচ্ছে! দেখুন ত একবার?

বারান্দার ছোট সেতুটি পার হয়ে দক্ষিণমুখী হল-এ এলুম এ-বাড়ীতে। এ সেই হল যেখানে এই কিছুকাল আগেই আমাদের সকলের উপস্থিতিতে মহাকবি তৎকালীন 'আধুনিক সাহিত্যের' বিচারসভা ডেকেছিলেন। এসে দেখি সেই হলেরই মাঝখানে জন-তিনেক ছুতোর মিস্ত্রি দুম-দাম হাতুড়ী পিটিয়ে একখানা বড় ইজি-চেয়ারের তলায় বাঁশের মতো লম্বা-লম্বা দুখানা কাঠ জোড়া দিচ্ছে বড়-বড় পেরেক ঠুকে। কবিকে নাকি এই চেয়ারে বসিয়েই শান্তিনিকেতন থেকে আনা হয়েছে। এই পুরনো রচটা চেয়ারেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে নিমতলায়। এ তারই আয়োজন। পরম্পরায় শুনলুম এটি নাকি নন্দলাল বসু মহাশয়ের নির্দেশক্রমে নির্মাণ করা হচ্ছে।

বেলা নটা। কবি তখনও জীবিত। ইদানীং তিনি কানে একটু কম শুনতেন। সেটি বোধহয় ছুতোর মিস্ত্রিরা জানতো! মৃত্যু যাঁর তখনও হয় নি, তাঁর কাছাকাছি বসে সৎকারের আয়োজন করাটা যে কত দৃষ্টিকটু, এটি বিবেচনা করার মতো মানুষ আশে-পাশে কেউ ছিল না। আমি লক্ষ্য করলুম, এই স্ট্রেচার-চেয়ারখানা আন্দাজ আড়াই ফুট চওড়া এবং লম্বায় মোট ছয় ফুট নাও হতে পারে। যাঁর সোনার দেহকে নিয়ে যাবার জন্য সোনার পালঙ্ক দরকার ছিল, তার বদলে এই খেলো সঙ্কীর্ণ সস্তা চেয়ার? অপরাহ্নকালে লক্ষ্য করেছিলুম কবির শবদেহের পক্ষে এটি খুবই অপ্রশস্ত। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিল্পী-জীবনে এইটি একমাত্র অপসৃষ্টি।

সাড়ে নটার পর এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র ও ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁদের পিছু-পিছু গিয়ে মহাকবির ঘরের কাছে দাঁড়ালুম। অমল হোম মহাশয় তখন উপস্থিত হয়েছেন। বোধহয় মিনিট পাঁচেক, তারপরই ডাঃ রায়ের সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন ললিতবাবু। দু-চারজন ঘিরে ধরেছিলেন দুই স্বনামপ্রসিদ্ধ চিকিৎসককে। ডাঃ রায় দ্রুতপদে যাবার সময় বলে গেলেন, না, আর কিছু করার নেই। ওঁর আশা নেই আর। পাল্স আর পাওয়া যাচ্ছে না। জীবন নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। অক্সিজেন, [illegible]।

বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল ডাঃ রায়ের মন্তব্য।—

নীচের উঠোনে উৎসুক জনতার ভিড় জমেছিল। দৈনিক কাগজগুলির রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করছেন। তখন মুভি-ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ড—এসব হয় নি। শুধু স্টিল-ক্যামেরা ফিরছে হাতে-হাতে। দেখতে-দেখতে এসে পড়লেন দেশের বহু গণ্যমান্যরা। রাজা, মহারাজা, শিল্পপতি, নাইট-উপাধিধারীরা, রায়বাহাদুর ও রায়সাহেবরা, শান্তিনিকেতন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে, অধ্যাপক ও ব্যারিস্টারের দল, হাইকোর্টের বাঙালী জজেরা, মাগামী হাকিমেরা। রামানন্দবাবু সকালে এসেছিলেন সপরিবারে। আমার সমকালীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। মাঝখানে এলেন সঙ্গীতশাস্ত্রী ও গেরুয়াপরিহিত দিলীপকুমার রায়। এছাড়া অগোচরে কোথাও বসেছিলেন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাখন সেন, নরেন্দ্র দেব, গিরিজা বসু ও সজনী দাস। মহাকবির জ্যেষ্ঠা ভগ্নি স্বর্ণকুমারী দেবীও এক সময় এসে পৌঁছলেন। এলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সমাজ।

কবির ঘরে মেয়েরা ললিত কোমল কণ্ঠে কবিরই গান গাচ্ছিলেন। সেই গান মর্মভেদী আতুরতায় যেমন নিবিড়, তেমনি যাতনা-বেদনায়-কারুণ্যে এবং ব্রহ্মাস্বাদস্পর্শে যেন অতুল। সে-গান কান্নারই মতো। আন্দাজ ১১টার পরে জনতাকে আর আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না। এবার চড়া রোদ দেখা যাচ্ছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে এবার দুর্বারগতিতে। সে যেন আসছে এক প্রচণ্ড উন্মত্ত অশ্বপৃষ্ঠে বর্শা হাতে,—তাকে দেখছিনে, সে যেন বহু দূর থেকে আসছে ধুলো উড়িয়ে। যেন বহুকাল থেকে আসছে সে,—১২৬৮ সনের ২৫ বৈশাখে সে যাত্রা করেছে, যেদিন এই একই বাড়ীতে মহাকবির জন্ম হয়। ওই অশ্বারোহীর হাতে ২০ বছর ৩ মাস আগে সেই জন্মদিনেই মৃত্যুর পরোয়ানা দেওয়া ছিল! সে ছুটে আসছে উন্মাদ ঝড়ের গতিতে।

আমরা ভয় পাচ্ছিলুম। মৃত্যু অনিবার্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পায়ের তলাটা কাঁপছে,—যেমন থরথর করছে আমাদের হৃৎপিণ্ড! ওই মহাকাশ, ওই তার করাল কুটিল আলো, মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ-জ্যোতিষ্ক-তারকা — যেখানে যেটিতে কবির বিবাগী মনের ভাবনা বাসা বাঁধতে যেতো—তারাও যেন এই আসন্ন বিচ্ছেদের আতঙ্কে কাঁপছে।

নীচের দিকে বিশাল জনতা ক্ষণে-ক্ষণে অধীর চঞ্চল হচ্ছে। তারা প্রতি মুহূর্তে কবির সর্বশেষ সংবাদ শুনতে চাইছে। জীবন্ত কবিকে শেষবারের মতো দেখতে চাইছে। আপাতত এ বাড়ীর কর্তৃপক্ষ কারা জানতে পাচ্ছিনে, কিন্তু এ-বাড়ীর প্রশাসন ব্যবস্থা এখন আলগা। নীচের তলার সব জানলা দরজা এবং প্রত্যেকটি প্রবেশপথ বন্ধ। কিন্তু আবেগ-ব্যাকুল সেই জনস্রোত যেন পাগল-বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মতো সর্বত্র আঘাত করছে। তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিড় ঠেলে প্রাণপণে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় শ্যামাপ্রসাদকে অবশেষে পাঁচিল টপকিয়ে আসতে হল। নীচে অত বড় ময়দানের মতো উঠোন, সমস্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, দূরে চিৎপুর রোডের যতটা অংশ চোখে পড়ে,—শুধু নিরেট নরমুণ্ডের একটা বিশাল পিণ্ড! পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই।' সে কি, এ যে মিছে কথা! সমস্ত পৃথিবী ছুটি নিচ্ছে আজ তোমাকে প্রণাম জানাবার জন্য! তুমি ভাবছ তোমার যোগতন্দ্রার মধ্যে সম্মুখে শান্তি পারাবার, আর আমরা দেখছি তুমি এই শতাব্দীর বাঙালীকে পথে বসিয়ে চলে যাচ্ছ! এই ঘোরতর দুর্দিনে, বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে, নরপিশাচদলের কলাকানির চক্রান্তে, হিংসা বিদ্বেষ হানাহানির বিষবাষ্পের মধ্যে,—তুমি রেখে যাচ্ছ এই নিরুপায় নেতৃত্বহীন মৃত বাংলাকে? তুমি কি জানো না এর ভয়াবহ পরিণাম? তুমি জানো না কি তোমার এই ছিন্নমস্তার পূজারী বাঙালী জাতিকে যারা চিরকাল নিজেদের টুঁটি কেটে নিজেরাই সেই রক্ত পান করে? এই হতভাগ্য, দরিদ্র, আত্মনাশা, কর্মবিমুখ, আত্মকলহশীল জাতিকে কোন্ নরককুণ্ডে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছ? এই কি তোমার ছুটি নেবার কাল?

হঠাৎ কে যেন ডাকল পাশ থেকে। ফিরে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র। এরা সবাই 'শ্রীহর্ষ' সাময়িক পত্রিকার গোষ্ঠী—আমার একান্ত আপনজন। বিজয় চট্টোপাধ্যায়, বিজন মিত্র, প্রবোধ ঘোষ, ভাঁড়, — আরও কেউ-কেউ। আমি ওদের কাগজে প্রায়ই লিখি। ওরা এক দল বলিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক। ওরা বলল, আপনাকেই খুঁজছি এতক্ষণ। আমরা এলুম পূর্ব-দক্ষিণের পাঁচিল টপকিয়ে। আমি বললুম, তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি! এবার কোমর বাঁধো,—এদের দেখে ভরসা হচ্ছে না।

এ 'গাঁয়ে' আমাদের কেউ মানে না, কিন্তু আমরাই 'মোড়ল' সাজলুম। উপরতলায় রাশি-রাশি লোক এলোমেলো ভিড় পাকাচ্ছিল — সব মিলিয়ে যেন অনাবশ্যক একটা জনতা। ওদেরকে সরিয়ে চারজন যুবক দাঁড়িয়ে গেল পশ্চিমের বারান্দায়। সিঁড়িতে পাহারা দুজন, পূর্বদিকে,—যেদিকে থিয়েটার হয়,—সেখানে মেয়েদের আনাগোনার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল জন-দুই। আমাকে বলল, আপনি কবির ঘরের দরজায় থাকুন।

এতক্ষণ পরে আমার সাহস ফিরে পেল।—

প্রায় বেলা ১২টা। কবির নাভিশ্বাস চলছিল। তাঁর মুখের উপরে ঈষৎ কুঞ্চনের ছায়া দেখে ডাক্তার অক্সিজেনের নলটা সরিয়ে নিলেন। সমস্ত ঘরখানা মহিলায় ভরা। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন। বহু মহিলা, যাঁদের অনেককেই চিনি তাঁরা কাঁদছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ [illegible]! রথীন্দ্র, সুধীন্দ্র। কিন্তু সৌমেন্দ্রকে

দেখছিলেম। একবারও দেখি নি রবীন্দ্রনাথকে। প্রতিমা দেবী কোথায় রয়েছেন লক্ষ্য করি নি। নন্দিতার দিকে চোখ পড়ে নি। রাণী মহলানবিশকে দেখছিলুম। উপনিষদের মন্ত্র পাঠ শুনছিলুম। বেদমন্ত্রোচ্চ-সঙ্গীত চলছিল মহাপরিনির্বাণের আগে।

ঝুলন-পূর্ণিমা বোধ হয় প্রতিপদে উত্তীর্ণ হল। কৃষ্ণপক্ষের স্পর্শ লাগল জ্যোতিষ্কলোকে।

হঠাৎ নিমেষ নিহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার মহাকবিকে একবার স্পর্শ করেই বললেন, না, আর নেই। ১২টা বেজে ১০। নেই? কি বলছেন, নেই? নেই মানে? বেঁচে নেই? চলে গেছেন মহাকবি?

উত্তাল জনসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত বাইরে তখন আছাড়ি-পিছাড়ি গর্জন করছিল। বারান্দা দিয়ে ছিটকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অমল হোম। ছুটে গিয়ে ধরলুম, কোথা যাচ্ছেন? ওদের বলে দিন? এনাউন্স করুন?

না, না, আমি পারব না। বলতে হয় তুমি বলো! — চোখে রুমাল চেপে অমল হোম চলে গেলেন।

মুহূর্তে-মুহূর্তে দোতলায় জানছে সবাই। ঘরে-বারান্দায় মহিলারা কাঁদছেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। কিন্তু খবরটি ঘোষণা করবার জন্য কোনদিক থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। ছুটে এল শ্রীহর্ষের বিজয় আর বিজন। ওরা কান্না চাপছিল আমাকে ধরে। তারই মধ্যে আবেগে উত্তেজিত হয়ে বিজয় বলল, আপনি বলুন, শিগগির এনাউন্স করুন, — ওরা ক্ষেপে যাচ্ছে,— লোহার গেট ভেঙে পড়ছে—শিগগির সামনে যান—

আমি গিয়ে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ালুম। তখন প্রায় ৩ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে এবার আমাকে দেখে সেই বিরাট জনতা ক্ষিপ্তোন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, বলুন—খবর বলুন—

দু হাত বাড়িয়ে আমারই প্রেতাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠল, না, মহাকবি আর নেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ১২টা বেজে ১০ মিনিটে!!

সেই জনসমুদ্র যেন কম্পমান হয়ে উঠল। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অভিশপ্ত দিনটিতে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘোষণা যে-ব্যক্তি করল সে ত বাইবেলের সেই বারাব্বাস অপেক্ষাও নরাধম! সুতরাং তার ছবিও তুলে রাখো! চক্ষের পলকে নীচের উঠানে অনেকগুলি ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

শুধু মনে আছে, ছুটে এসে মহাকবির পা দুখানি ধরে আরেকবার মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলুম। সম্ভবত বিজন আমাকে সরিয়ে এনেছিল।

সেই বৃহৎ জনতা—অবাধ্য ও দুঃশীল —শুধু চেঁচামেচি করেই ক্ষান্ত রইল না। এবার তারা সেই মস্ত লোহার কোলাপ-সিবল গেটটি দুড়দাড় দুড়দাড় ফাঁক করে জলস্রোতের মত ঢুকে পড়ল। এ যেন সেই মহাপ্রাচীন বিশাল-কালের রাজকীয় দুর্গের পতন ঘটল! বহুলোক দেয়াল ধরে কার্নিশে পা রেখে দোতলায় উঠতে লাগল। পিছনের বাগানের দিককার পাঁচিল টপকিয়ে হাজার-হাজার লোক ভিতরের দিকে আক্রমণ করল। শ্রীহর্ষের ছেলেরা এবং আরও অনেক লোক শুধু আমাদের এই বারান্দাটা ওদের হাত থেকে রক্ষা করছিল। ওরা নীচের তলাকার ঘরের জানলা, দরজা, সিঁড়ির প্রবেশ পথ—সমস্ত ভাঙছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ নীচের থেকে উপরে এসেছিলেন কিনা আমার মনে নেই, কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা অবাধে চলতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক সমাজ রাজনীতিক সমাজ ছিল না। তাঁকে ঘিরে থাকত উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান একটা অভিজাত সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে জনজীবনের যোগ ছিল কম। তিনি নিজে থাকতেন শান্তিনিকেতনে, এবং মধ্যে মাঝে কলকাতায় আসতেন হয় জাতির একান্ত প্রয়োজনে, নয়ত তাঁর বাইরে চলে যাবার আয়োজনে। তিনি ছিলেন আজীবন ভ্রমণ-পিপাসু এবং ভ্রাম্যমান। এর ফলে হয়েছিল এই, সাধারণ মানুষ কোনদিনই তাঁর নাগাল পায় নি, এবং কাছে থেকে দেখে নি। তাঁর চারদিকে ছিল একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান,—যেটাকে এড়িয়ে তাঁর কাছে পৌঁছানো যেতো না। কলকাতায় এলে তিনি থাকতেন একটা পাহারার মধ্যে, এবং তাঁদের সম্মতি ছাড়া তাঁর দিকে এগোনো যেত না। ১৯৩৪-এ একখানা চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'কোনও দ্বাররোধের বাধা স্বীকার করো না, সোজা চলে এসো।'

'রক্তকরবীর' সেই অন্তরালবর্তী 'রাজাকে' কাছে দাঁড়িয়ে দেখার জন্য জনসাধারণের মনে একটা ক্ষুধা পুঞ্জীভূত হয়েছিল বহুকাল থেকে। আজ সেই দ্বাররোধকরা সরে দাঁড়িয়েছে—জনতার উপরে যাদের তিলমাত্র দখল নেই। এই বারান্দায় এবং অন্যান্য কক্ষে ও হলঘরগুলোয় যে বৃহৎ করুণ সমাজ আজ মহাকবির অন্তিম-শয্যার চারদিকে সমবেত হয়েছেন তাঁরাও সমগ্র দেশের শ্রদ্ধার পাত্র, প্রত্যেকে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বাংলা ও ভারতের সর্বত্র পরিচয় তাঁদের, তাঁরা আপন-আপন জগতে স্ব-স্ব প্রধান, অনেকে বিশ্ববাসীর নিকটেও সুপরিচিত, এবং প্রবল-প্রতাপ বৃটিশ রাজের দরবারে অনেকে অতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীও বটে। কিন্তু আজকের এই সঙ্কটকালে যখন হাজারে-হাজারে স্বেচ্ছা-

সংগ্রামী বাংলাদেশের উদাত্ত বজ্রনির্ঘোষে
আরও একটি সংযোজিত কণ্ঠ

এপার বাংলা ওপার বাংলা ও ভারতীয় অন্যভাষার কবিদের রচনা নিয়ে
একটি প্রামাণ্য কাব্যসংকলন

• শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত •

গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা

॥ দামী কাগজে ঝকঝকে ছাপাই ও রঙিন জ্যাকেটে বাঁধাই হয়ে বেরুলো ॥

লিখেছেন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে দিনেশ দাস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমিতাভ চৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সতীকান্ত গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সন্তোষকুমার অধিকারী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, নচিকেতা ভরদ্বাজ সুশীলকুমার গুপ্ত, সুনীলকুমার নন্দী শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, পরাগ মিত্র, শিপ্রা ঘোষ, গোরাচাঁদ ভৌমিক সামসুল হক, অমিত বসু, সুচেতা মিত্র অমৃতাভ দাশগুপ্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুকোমল রায়চৌধুরী, মৃগেন্দ্র সরকার মৃণাল চট্টোপাধ্যায় জীবন সরকার, অজয় দাশগুপ্ত, বীরেন মিত্র অরুণ ভৌমিক, কমল সাহা, সৈয়দ কওসর জামাল, বনজিৎ দেব, স্বাতী চক্রবর্তী শিবাজী গুপ্ত, সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা দেব, মৃণাল বসুচৌধুরী, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য ॥

বাংলাদেশ থেকে : আলাউদ্দিন আল আজাদ সৈয়দ আলী আহসান, নির্মলেন্দু গুণ, আল মাহমুদ, শাউল হাওলাদার, আনওয়ার পাশা ॥

হিন্দী : প্রভাকর মাচওয়ে ॥ পাঞ্জাবী : অমৃতা প্রীতম ॥ উর্দু : ক্যায়ফি আজমি ॥ ইংরেজী : প্রীতীশ নন্দী ॥

দাম : সাধারণ সংস্করণ—তিন টাকা। শোভন সংস্করণ—পাঁচ টাকা।

অন্তরিক্ষ ॥ ৮৮।১১৮ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫ ॥ ফোন ৪৬-৩৭১৪

চারী জনতা প্রচণ্ড উদ্দীপনায় অবাধে এই অট্টালিকায় সর্বত্র ভাঙনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন তাদের সংযত করার জন্য কারোকে পাওয়া যাচ্ছে না। ও'রা—যাঁরা বরেণ্যসমাজ, যাঁদের পরিচয় ও আভিজাত্য গগনস্পর্শী—তাঁরা তখন কক্ষে-কক্ষে আতঙ্কিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আত্মগোপন করে রইলেন। অবস্থা যখন চরমে উঠছে, তখন কিছু লোক ছুটোছুটি করতে লাগলেন মহাকবির পুত্র রথীন্দ্রনাথের কাছে নির্দেশ নেবার জন্য। কিন্তু কোথায় রথীবাবু? কোথাও তিনি নেই বহু চেষ্টা করেও কেউ তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! ঘরে-বাইরে, কবির কক্ষ—কোথাও তাঁকে দেখা যায় নি এখন পর্যন্ত। অনেকে অসন্তুষ্ট, অনেকেই দুঃখিত। পরম্পরায় শোনা গেল, তাঁর মাথা ধরেছে এবং তিনি এই অট্টালিকার কোনও এক নিভৃতলোকে বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রতিমা দেবীও নাকি সেইখানে। তা হবে। কিন্তু সমস্ত দেশবাসী ও এই বরেণ্যসমাজ যখন উদ্বিগ্ন হয়ে মহাকবির একমাত্র পুত্রের আবির্ভাবের অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত গুনছে, সেই সময় সামান্য একটু ওষুধ খেলেই হয়ত মাথা ধরাটা কমে যেতে পারতো। তাঁর এই অনুপস্থিতির মূল কারণ আর কোথাও কিছু ছিল কিনা,—সেটি হয়ত বলতে পারেন রথীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীযুক্ত অমল হোম,—যিনি আজও রোগশয্যায় শায়িত রয়েছেন। কিন্তু কবির মৃত্যুর পরের দিন সংবাদপত্রগুলিতে এমন কিছু-কিছু সংবাদ বেরিয়েছিল যার অনেকগুলি সত্য নয়। আশী বছরের পিতার মৃত্যুতে পঞ্চাশ বছরের প্রবীণ পুত্রের পক্ষে শোকে মুহ্যমান হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে শয্যাশ্রয়ী থাকাটা অনেকের কাছে একটু বেমানান ঠেকেছিল।

সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে যেতে বসেছে তখন তদানীন্তন নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী চেঁচামেচি করে উঠলেন। এমন যে নিরীহ অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু—সেও এক সময়ে দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করল, স্যাক্রিলেজ!

সেদিন সেই জনসঙ্কটকালে সকলের চেয়ে বেশী করে যাঁর আলোচনা উঠেছিল, তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র। অনেক ব্যক্তিরা বলাবলি করছিলেন, আজ সুভাষ এখানে উপস্থিত থাকলে এমন দুরবস্থা হত না। লাখো-লাখো লোকের সামনে সে দাঁড়াতে জানতো। আর তাকে এক ঘণ্টার মধ্যে হাজার-হাজার স্বেচ্ছাসেবক শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেতো! আজ সকলের বড় দুর্ভাগ্য, সুভাষ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

এমন সময় এগিয়ে এলেন উত্তর কলকাতার সৌম্যদর্শন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ শোভান। তিনি বললেন, আপনারা অনুমতি করুন, আমি আজকের সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আমার অফিসাররা সবাই প্রস্তুত আছেন। বিলেত থেকে সেক্রেটারী অফ স্টেট, দিল্লী থেকে ভাইসরয়, কমাণ্ডার-ইন-চীফ, বাংলার গভর্নর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার—এঁদের সকলের ইচ্ছা, কবির জন্য আমরা স্টেট প্রসেসন করি, ও'কে ইউনিভার্সিটিতে 'লাইং-ইন-স্টেট' করে দিন-দুই রাখা হোক, — গভর্নমেন্ট এজন্য সমস্ত দায়িত্ব বহন করবেন। উনি পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতির, সব সম্প্রদায়ের কবি। আপনারা অনুমতি করুন আমরা এই জনতাকে কন্ট্রোল করে নিচ্ছি।

সম্মতি লাভের অপেক্ষায় মিঃ শোভান উৎসুক হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন।

আগের বছরে বাঙলার গভর্নর মিঃ ব্রাবোর্ণের মৃত্যু ঘটে এই কলকাতায়। তাঁর শবযাত্রার সেই 'স্টেট প্রসেসন' কলকাতার পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মিঃ ব্রাবোর্ণ ছিলেন খাঁটি, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান একজন অভিজাত ইংরেজ। তিনি বাঙলার প্রথম জনপ্রিয় গভর্নর, এবং সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর সুখ্যাতি করতেন। আমি এই 'স্টেট প্রসেসনের' বিশালতা এবং বর্ণচ্ছটার অনন্যসাধারণ চেহারা স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম।

যাঁরা আজ একে-একে লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য করা অশালীন ও রুচিবিগর্হিত। কিন্তু সেদিনকার সেই সমবেত সমাজপতি-গণের মাঝখানে রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি খুবই দুঃখজনক ছিল। তাঁর অভাবে কেউ কিছু বলতে সাহস পেলেন না। মোটামুটি কথাটা এই দাঁড়াল, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ হলেন জাতিয়তাবাদী কবি, এবং তাঁর সর্ব-শেষ রচনা 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটি বৃটিশরাজ বিরোধী,—সেই হেতু মিঃ শোভানের প্রস্তাব সেইখানেই প্রত্যাখ্যান করা হল! মহাকবির দেশবাসীই মহাকবির শবদেহের দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু দেশবাসী কারা? ওই যাদের দেখছি আজ এই মহার্ঘ নামাঙ্কিত অট্টালিকার উপর আক্রমণকালে? ওই উচ্ছৃঙ্খল জনগণ, — যারা সভ্যতা, সৌজন্য ও সংযমের তোয়াক্কা রাখছে না? সেদিন এই কক্ষের মধ্যেই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক, ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যর আজিজুল হক, জাস্টিস হাসান সুরাবর্দী, মেয়র ফণীন্দ্র ব্রহ্ম, নাটোরের মহারাজা, ছিলেন স্যর মন্মথনাথ, ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, ছিলেন অগ্রজ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর স্যর যদুনাথ সরকার প্রভৃতি। ও'দের সকলের সিদ্ধান্তে কেন জানি না—সেদিন যথেষ্ট উৎসাহবোধ করি নি!

কবির ঘরের দরজা ও জানলা দুদিক থেকে বন্ধ। ভিতরে তাঁর শবদেহকে শ্মশান যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

এই যুগল পূর্ণিমায় মহাকবি একদা রচনা করেছিলেন তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা—।' এই যুগল পূর্ণিমা তিথিতেই মহাকবির নেতৃত্বে বাঙালী জাতি একদিন [illegible] ... দিয়েছিল। একদা বাঙলার ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে রাখী-বন্ধনের যে উৎসব মহাকবির নেতৃত্বে পরি-চালিত হয়েছিল,—তারও প্রথম সূচনা এই যুগল পূর্ণিমায়।

আগেই বলেছি আমার উপর ভার ছিল কবির ঘরের দরজা পাহারা দেবার। সেই দরজা খোলা হল বেলা আড়াইটের পর। ইতিমধ্যে মহাকবির দেহকে ঘৃত ও চন্দন মিশ্রিত এবং গোলাপ-যুঁই-রজনীগন্ধা ও পদ্মদলমথিত সুগন্ধী জলে স্নান করিয়ে কোঁচানো গরদের ধুতি, রেশমের পাঞ্জাবি এবং গরদের উত্তরীয় পরিধান করানো হয়। মাথায় চুলগুলি সুন্দরভাবে আঁচড়ানো, এবং ললাটে বরচন্দন অলঙ্কৃত করা। কবির দক্ষিণ হাতের মুঠিতে দেওয়া হয়েছে একটি নীলাভ শ্বেতপদ্ম। ঠিক যেন রাজ-বেশ ধারণ করেছেন মহাকবি। ভিতরে ধূপ, ধুনো, পুষ্প চন্দন সৌরভ, আর্ত সঙ্গীতসহ বেদমন্ত্র ধ্বনি—এ যেন মৃত্যুপুরী নয়,—এ অমৃতলোক, এ যেন বৈকুণ্ঠের অমরাবতী।

কতক্ষণ মুগ্ধ চক্ষে চেয়েছিলুম সেই রাজবেশধারী 'ভাগবতী তনুর' প্রতি!

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, জন সাধারণ সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে ও শান্ত-ভাবে মহাকবিকে দর্শন করে যাবে। উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবে, এবং দক্ষিণের ঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকবে। তাই হল। কিন্তু প্রথম যিনি এলেন তিনি সামরিক পোষাকে এক ইংরেজ,—হাতে তাঁর সুন্দর একটি বড় শ্বেতপদ্মের মালা। তিনি গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী। মহাকবির মৃতদেহের সামনে নম্রশিরে তিনি নতজানু হয়ে অভিবাদন করে মালাটি রাখলেন পায়ের দিকে। পরে উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক স্যালিউট করলেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন। ইংরেজ জাতি শেষবারের মতো মহাকবিকে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

এরপর সারিবদ্ধভাবে আরম্ভ হল জনস্রোত। নির্দেশ ছিল এই, কেউ থামবে না, মুখের আওয়াজ করবে না, পরস্পর কথা বলবে না, কবির পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করবে না, চলতে-চলতেই বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু দর্শন করে যাবে। তাই সই। জনতা এবার কতকটা শান্ত, কিছুটা সংযত। শ্রীহর্ষের বিজয় আর আমি—দুজন কঠিন ও নির্বিকার মুখে সেই দরজার দুদিকে কালপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কয়েকটি বলিষ্ঠ, নির্ভীক এবং শৃঙ্খলানিষ্ঠ যুবক সেদিন বহু লোকের প্রীতি ও প্রশস্তি অর্জন করেছিল। রবীন্দ্র-পার্শ্বচর যাঁরা সেদিন ভয় পেয়ে নিজ-নিজ গর্তে লুকিয়েছিলেন—তাঁদের হাততালিতে কিছু বেশী শব্দ শুনেছিলুম সেদিন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রথম সিঁড়ির প্রবেশপথ বন্ধ করা হল। এর মধ্যে আন্দাজ হাজার তিরিশেক লোক রাজবেশধারী মহা-কবিকে দর্শন করে গেল। ভিতরে তখনও মহিলা কণ্ঠে করুণ ব্রহ্মসঙ্গীতের মূর্ছনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল। আমাদের পাশে একে-একে তখন এসে দাঁড়িয়েছেন ইম্প্রেসারিও চারেন্দ্র আর শান্তিনিকেতনের জন-দুই ছাত্র, বিজন মিত্র এবং বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও

থাকেনই। এবার কবির শবদেহকে তুলে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হল। আর দেরী করা চলে না। অফিস, আদালত, হাইকোর্ট, এসেম্বলি, কাউন্সিল, কর্পোরেশন, ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, দোকানপাট এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান মায় ডালহাউসি স্কোয়ার ও লালবাজার, এমন কি রেল-অফিস ও ট্রেন চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে! বাঙলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে। লক্ষ-লক্ষ নাগরিক বেরিয়ে পড়েছে পথে। নারী-সমাজ তাদের সকল শাসন-বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক-ওদিক দিশাহারার মতো। টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে নিউজ-বয়রা নগরের পথে-পথে চিৎকার করছে। আর দেরী নয়। বৃহত্তর জনতা ঝাঁকে-ঝাঁকে এগিয়ে আসছে চিৎপুর রোড ধরে। এবার তোলা যাক।

কবির মাথার নীচে ফুলকাটা ওয়াড়-মুড় নরম বালিশ, পিঠের তলায় নতুন টিকিনের তোষকের উপরে ধবধবে সাদা নতুন চাদর। বাকী সমস্তই পুষ্পশয্যা।

'আবার সময় হল বিহঙ্গের,
এখনই কুলায় রিক্ত হবে—'

সেদিন বৃহস্পতিবার। মহাগুরু বৃহস্পতি বিদায় নিলেন। কিন্তু সেদিন আমারও তুঙ্গে ছিল বৃহস্পতি। মহাকবির মাথাটা নিয়েছিলুম আমার বুকের মধ্যে, একখানা হাত রেখেছিলুম তাঁর পিঠের তলায়। পিঠ আর কোমর নিল বিজয়, কিরণ, হরেন ঘোষ, শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র, এবং সঠিক মনে নেই—বোধ হয় হিরণ সান্যাল এবং আরও দু-একজন চেনা মুখ—তাঁরা নিলেন কোমর থেকে পা পর্যন্ত। কিন্তু এখানে স্বীকার করে নিচ্ছি সেই নাটকীয় কালে আমার স্মৃতির তালিকায় কিছু ভুল থাকতে পারে।

শম্বুকের গতিতে আমরা এগোচ্ছিলুম সিঁড়ির দিকে। কবিগুরুর দেহ ছিল অতিশয় গুরুভার। কিন্তু আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম, কয়েকক্ষণের জন্য। আমার বুকের মধ্যে মহাকবির চন্দন-পুষ্প সুবাসিত দেহ, তাঁর ডান হাতখানা আমার হাতে নির্ভর করেছে। আমি চেয়ে রয়েছি তাঁর মুখের উপরে। না, ভুল হচ্ছে না। মৃত্যুর তিনঘন্টা পরে তাঁর মুখের উপর থেকে মৃত্যুর ছায়া সরে গেছে। যেন সেই মুখে এবং নিমীলিত চক্ষে নেমে এসেছে একপ্রকার দিব্য দীপ্তিমান প্রসন্নতা। আমার বুকের মধ্যে চিরজীবনের মতো রয়ে গেল তাঁর পুষ্প-সুবাসিত দেহসৌরভ!

সবেমাত্র আমরা এক-এক-পা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলুম। কিন্তু সেই সময়ে জনতার প্রচণ্ড চাপে হঠাৎ আমার ডান হাতের সামনে কাঠের পুরনো রেলিংটা হুড়মুড়িয়ে ভাঙল; সমস্ত ভেঙে পড়ল নিচের দিকে, এবং আমাদের মাথার উপরে জনতার ভয়ানক চাপে দোতলার বারান্দা মড়মড় করে শব্দ করে উঠল। আজ আমার আর মনে পড়ে না সেদিন অবধারিত অপমৃত্যুর হাত থেকে কেমন করে বাঁচলুম! শুধু আমার একার মৃত্যু ঘটত না, অনেকেই যেত আমার সঙ্গে। তার চেয়েও বড় কথা। মহাকবির শবদেহের অবস্থা কি ঘটত তা ভাবলেও ভয় করে।

শুধু মনে আছে সেদিন সেই মুহূর্তে আমি একপ্রকার কিম্ভূত কঠিন কায়িক শক্তি প্রয়োগ করে ইঞ্চি ছয়েক দেওয়ালের দিকে ঘেঁষেছিলুম! পরবর্তী কয়েকদিন অবধি আমার মন থেকে এদিনের আতঙ্কের ছায়া সরেনি!

নিচের তলায় পূর্বদিকের চকমিলানো উঠোনে কবিকে নামিয়ে সেই কাঠঢাকা স্ট্রেচার-চেয়ারখানায় যখন তাঁকে শোয়ানো হচ্ছে তখন সেই জনতার প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে বি-এম-সেনের সঙ্গে আমার বাকযুদ্ধ বেধে গেল। আমি নতুন বিছানাটা দিতে চেয়েছিলুম, তিনি রাজি হননি। সেটি আমার পক্ষে দুঃখজনক ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বি-এম-সেন চেয়েছিলেন ওই অবস্থাতে হস্তপ্রস্থ স্ট্রেচার-চেয়ারের মাপে সবকিছু হতে হবে। যাই হোক, কবিকে আমরা কাঁধে তুললুম দশ-বারো জন, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল অসহ্য। যাঁরা কাঁধে তুললেন তাঁদের মধ্যে আমরা ছাড়া ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র এবং দল-নেতা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র কুমার সুহৃৎ সিংহ, ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর, বীরেন সেন, মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ—যারা প্রবল শারীরিক শক্তির অধিকারী। ভিড় ঠেলেঠেলে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরোতেই গর্জমান জন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সেই বড় উঠোনের চারিদিক থেকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ছিলুম খাটের মাথার দিকে, এবং নিজের দৈহিক শক্তির সম্বন্ধে আমার কতকটা আস্থাভাবও ছিল। কিন্তু জনতার সেই তরঙ্গাঘাতে আমি যখন ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলুম, সেই সময় পাশ থেকে প্রচণ্ড বলশালী এক ডাকাত-সর্দারের মতো যিনি আমার কাতর মুখের দিকে চেয়ে চক্ষের পলকে শবাধারের মাথার দিকটা কাঁধে তুলে নিলেন, তিনি ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়। তাঁর অমিতশক্তি ও বিক্রমকে সেদিন তারিফ করেছিলুম।

শবাধারটা যখন জনতার উপর দিয়ে একপ্রকার ভেসে চলে গেল, আমি তখন কোথায়? শুধু মনে পড়ে কিছু লোক আমাকে মাড়িয়ে ফুটবলের মতো ছিটকিয়ে দিয়ে গেছে লোহার গেটের রেলিংয়ের ধারে। আমি ওখানেই পড়েছিলুম। না, বেহুঁশ হইনি। শুধু মার খেয়ে চোখ বুজে পড়েছিলুম। ভাবখানা ছিল এই, কারা যেন আমার বুকের ধন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

পড়েছিলুম অনেকক্ষণ, কিন্তু আমার নাম ধরে যে ব্যক্তি ডাকল এবং আমাকে হিঁচড়িয়ে মেঝে থেকে টেনে তুলল, সে অনেক লেখকেরই বন্ধু এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, 'ডাক চার্চের' যতীন চৌধুরী। দুঃখে দুর্দশায় সে, খেলায়, মন্ত্রণারও সে। আমার পা কেটেছিল, জামাটা ছিন্নভিন্ন, কপালে কালশিরা, পায়ে জুতো নেই, সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা। ছেঁড়া ধুতিখানা কি ভাগ্যি কোমরে তখনও রয়েছে,—ওখানা আগেভাগে গেরো দিয়ে বেঁধেছিলুম!

খোঁড়াচ্ছিলুম।—যতীনদা হাত ধরল। বলল, চল্ আমার ওখানে। আগে এক পেয়ালা চা খাবি। ওসব সেরে যাবে। চল্ আমি মালিশ করে দেবো। বাড়ির ভেতরটা দেখে এলুম রে। হাজার দুই জুতোর পাটি, আর চারদিকে ফুল ছড়ানো। বাড়ি ঘর দোর ভেঙেচুরে একসা। চল্—

শেষের অংশটুকু না বললেই ভাল হত।—

কিন্তু থাক্ না কেন আমার নামের সঙ্গে সেদিনের সত্য কাহিনীটুকু জড়িয়ে? যতীন চৌধুরীর সঙ্গে ঘন্টা-দুই কাটিয়ে আমি সুস্থ হয়েছিলুম। পথে-পথেই আমি ছিলুম, এমন সময় 'যুগান্তরের' জনৈক রিপোর্টার ছুটে এসে আমাকে ধরল,—একি, এখানে আপনি? ওরা সবাই খুঁজছে যে? শিগগির চলুন শ্মশানের দিকে। ওঁরা ডেডবডি ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

অনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবিহীন একটা জনতার ভিতর দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে শবাধারটি গিয়ে পৌঁছয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল-এর সামনে। সেটা শবযাত্রা নয়, শুধু মানুষের ভিড়। তারপরে আর কোনও প্রোগ্রাম নেই। শবাধার সেখান থেকে ফিরল। না, আর কিছু করবার নেই। এবার সোজা নিমতলায়! কিন্তু সেই কদাকার শবাধারটি কাঁধে নিয়ে বাহকরা যেন ঠিক ছুটতে লাগল। ওদের পিছু পিছু ছুটেছে কলকাতার হাজার-হাজার নাগরিক। শববাহকরা যেন পালাচ্ছে ওদের ভয়ে নিমতলার দিকে! আমি নিজে অনেকগুলি ঐতিহাসিক শবযাত্রার সঙ্গে ছিলুম। স্যার আশুতোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, স্যার জগদীশ বসু, বিপিন পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ বসু—এঁদের শবযাত্রা মনে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শবযাত্রার মতো এমন অনাহূত, উপেক্ষামিশ্রিত এবং শৃঙ্খলাবুদ্ধিহীন ওদের মধ্যে একটিও ছিল না। এ-নিয়ে পরে অনেকে অনেকরকম নালিশ জানিয়েছিল। পরম্পরায় রটনা করা হয়েছিল এই, কবির ইচ্ছা ছিল তাঁকে যেন নিমতলার শ্মশানেই দাহ করা হয়, কারণ তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষকৃত্য ওখানেই সম্পন্ন করা হয়েছিল।

এই রটনায় সেন্টিমেন্টের একটি চটক ছিল। কিন্তু মূলত রটনাটি সত্য নয়। প্রাচ্যের সর্বপ্রধান নগর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হওয়া নানা কারণে ভালই হয়েছে, কিন্তু অশীতিপর অসুস্থ বৃদ্ধের অন্তিম-কামনাটি ছিল এর বিপরীত। তিনি কবি,

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাস্থল হল শান্তিনিকেতন। ওই আম্রকুঞ্জ, যেখানে আশ্রমিক বালকেরা একদা ‘গুরু গৌতমের’ কাছে প্রথম পাঠ নিয়েছিল, যেখানে জাম-বনের আশেপাশে পুষ্পবীথিকার প্রভাতী পাখির কূজন গুঞ্জনে মহাকবির মন কবিতায় উচ্ছ্বসিত হত,—কবির একান্ত কামনা ছিল সেই প্রকৃতির ক্রোড়ভূমিতে তিনি চোখ বুজবেন। তিনি আসতে চাননি, তাঁকে আনা হয়েছিল। তিনি নিরুপায়, অসমর্থ, জরা-ব্যাধিগ্রস্ত,—তাঁর অন্তিম অভিমতের দাম ছিল না কিছু। এ-ছাড়া তাঁর পারিবারিক জীবন সেইকালে যথেষ্ট শান্তিদায়ক ছিল কিনা, এ প্রশ্নও থেকে গেছে।

নিমতলার শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে দেখি এই খোলা জায়গায় জনতার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। রেল লাইন ভরে গেছে, মালগাড়িগুলো নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ, মানুষের গাঁদিতে পথ-ঘাট ভরা। সেই কাশী মিত্তির, শ্মশানেশ্বর, শোভাবাজার, আহিরীটোলা মানিক বোস, আনন্দময়ীতলা, জগন্নাথের ঘাট—মানুষে-মানুষে-মানুষে ছয়লাপ। শ্রাবণের উদ্বেলিত গঙ্গায় শত-শত নৌকা হাজারে হাজারে যাত্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই গঙ্গা-পথে শত-শত ছেলে দূরের থেকে সাঁতরিয়ে আসছে নিমতলার শ্মশানঘাটের দিকে। সেদিন অপরাহ্নে ও গোধূলির কালে কলকাতাবাসীর একটা বড় অংশ হায়-হায় ক'রে চারদিকে ছুটোছুটি করছিল,—কবির শবযাত্রা তারা দেখতে পেলো না। চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, রাসেল স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, হ্যারিংটন স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, হেস্টিংস, রডন, লাউডন, খিদিরপুর, আলিপুর—এসব অঞ্চল তখন সাহেব-সুবো ভরা। তারা কোনওদিন ‘নেটিভ-কোয়ার্টারে’ আসতো না। কিন্তু মহাকবির মৃত্যু সেদিন তাদের উদভ্রান্ত করেছিল। তারা কলেজ স্ট্রীট, ঠনঠনে, শিয়ালদা, চোরবাগান, পটলডাঙ্গা—সমস্ত ঘুরেছে, কিন্তু শবযাত্রার চিহ্নও দেখতে পায়নি।

আমরা কয়েকজন শ্মশানের মধ্যে কবির দেহ পাহারা দিচ্ছিলুম। কিন্তু কতটুকু আমরা? শবদেহ যাঁরা আনল তাঁরা কোথায়? শ্মশানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব কারা নিচ্ছে? রবীন্দ্রনাথের নিজ পরিবারের লোকেরা কই? কোথায় রবীন্দ্রনাথ? কোথায় বিশ্বভারতীর কর্তারা, কোথায়ই বা ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও কর্মীরা? না, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই, কেউ নিচ্ছে না শবদেহের দায়িত্ব! হাজারে-হাজারে জনতা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে কবির শব-দেহের চারপাশে,—তখন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু, পারিষদ পার্শ্বচর অনুগ্রহপুষ্ট সুবিধালোভী চাটুকার স্তাবক,—এবং যাঁরা মহাকবিকে ধরে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন—তাঁদের কেউ নেই আজ ধারে-কাছে!! চারিদিকের সেই প্রবল উত্তেজনায় এবং সেই উন্মত্ত জনতার ছোড়াছুড়ির মধ্যে কবির মৃতদেহটার শেষ দশা কি প্রকার ঘটেছিল, সে-দশা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু সেই উন্মত্ততা চারিদিকের সেই প্রবল উত্তেজনা, উন্মত্ততা ও কদাচারের মাঝখানে আমার দুই চোখ দিয়ে ঠিকরিয়ে বেরোচ্ছিল রোষবহ্নি! রুদ্ধ ভাবে দাঁতের ওপর দাঁত ঘষে নিজেই বিড়-বিড় করছিলুম, এ বিশ্বাসঘাতকতা, এ চরম কলঙ্ক এদের ধিক্কার দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাও!

ওইটুকুর মধ্যেই একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। শ্মশানের সেই চাতালে জল থৈ-থৈ করছিল। পা পিছলিয়ে যাচ্ছিল কথায়-কথায়। ওরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পা ফাঁক করে দুদিকে দু'হাত বাড়িয়ে অনেকের সঙ্গে আমিও শবদেহ পাহারা দিচ্ছিলুম। এমন সময় একটি প্যান্ট ও হাফশার্ট পরা ছোকরা সাঁতরিয়ে গঙ্গা থেকে উঠে এসে কবির শবদেহের কাছে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিল। আমি তাকে বার-বার ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলুম, আর সে বার-বার পিছলিয়ে ছিটকিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে ছেলেটা মরীয়া হয়ে উঠল। আমার মতন বাধাকে অতিক্রম করার জন্য সে ওই চাতালের ওপর উপুড় হয়ে সরীসৃপের মতো আমার দুই পায়ের ভিতর দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করল। সেই অবকাশটুকুর মধ্যেই লক্ষ্য করলুম ছেলেটা হাউ-হাউ করে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি যেন প্রলাপের মতো বকছে। এবার ছেলেটার সেই স্বগতোক্তি কান পেতে শুনলুম,—দাদা, আমি দাদা কুঠিঘাট থেকে সাঁতরে এলুম দাদা...দাদা...তুমি রবিঠাকুর...তুমি এরই মধ্যে বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে চলে যাবে? —দাদা...আমি এখানে জান দিয়ে চলে যাব, দাদা—!

ছেলেটা সবেগে আমার পায়ের তলা দিয়ে উপুড় হয়ে তীরের মতো আরেকবার গলে যাবার চেষ্টা করতেই আমিও আরেক-বার তাকে মেনি-বেড়ালের মতো ঘাড়ের কলাসি ধ'রে তুলে সরিয়ে দিলুম।

বাইরে যাবার সময় দেখে গেলুম আমারই মতো দুই অপরিণত-বুদ্ধি ও নিঃস্বার্থবাদী রবীন্দ্র-অনুরাগী বন্ধুকে,—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। ও'দের সেদিনকার শ্মশান-জাগরণ ও সংগীত বাঙালীর কতক লজ্জা নিবারণ করেছিল।

সন্ধ্যারাত্রির পর সেই প্রথম দিনতিনেক বাদে নামল শ্রাবণ-বর্ষণ। সেই ধারা-বর্ষণে মহাকবির চিতা শীতল হয়েছিল। পরদিন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, ঠাকুর পরিবারেরই একজন সুবীরেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-নীতি অনুসারে মহাকবির মুখাগ্নি করেছিলেন।

*

সেই বছরেই কার্তিকের শেষে বিন্ধ্যা-চলের ছোট্ট জনপদের একটি বাড়ির ছাদের ঘরে নিভৃতবাস করছিলুম। একদিন মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান সেরে উঠছি,—হঠাৎ একজন বয়স্ক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি আমার পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন:

ও মশাই, কলঙ্কের কাহিনী কি ভুলেছেন এরই মধ্যে? বলি ও মশাই—

পিছন ফিরলুম। ভদ্রলোকের এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। কিন্তু কিছু বলবার আগেই তিনি আবার চেঁচিয়ে বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের মারা যাবার দিনের কথা বলছি। আপনি ছিলেন আগাগোড়া, সব দেখেছি,—স্বচক্ষে সব দেখেছি শ্মশানে।

দেখেছেন নাকি?

কিছু মনে করবেন না, আপনারা দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক। কবি আপনাদের একা নন, আমাদের সকলের। অপমানে সেদিন বাঙালীর মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছেন আপনারা।

সবিনয়ে বললুম, কি ব্যাপার, বলুন না খুলে?

ভদ্রলোক তবু উত্তেজিত। আবার তিনি ঝাঁকিয়ে উঠলেন,—খুলে বলব? ঢাকা আছে কিছু? আপনি বোধহয় একটু ন্যাকাই সাজছেন মনে হচ্ছে! আমি নিজে সবজান্তা লেখক হলে আপনাদের মুখোশ খুলে ধরতুম। মনে নেই কবির সেই সোনার দেহ শেয়াল-কুকুরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনারা সব পালিয়ে ছিলেন দু' ঘণ্টার জন্যে? জানেন না কি ঘটেছিল?

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক আবার বললেন, কবি বোধহয় মরবার আগে জেনে যাননি যে, আপনাদের মতন অপদার্থ, মেনিমুখো আর কাপুরুষের দল তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। আর ওই শান্তি-নিকেতন? আপনাদের মতন ছুঁচো-ইঁদুররা ওর মধ্যে ঘুরবে, আর বাস্তুঘুঘুর দল বাইরে-বাইরে চরে বেড়াবে! দেখে নেবেন আমার কথা সত্যি কিনা। ধিক আপনাদের জীবনে, ধিক বাঙালীকে। কবি যদি আরও আশী বছর বাঁচতেন তাহলেও, আমাদের মতন বনমানুষকে তিনি মানুষ করতে পারতেন না।—নমস্কার।

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বাজারের দিকে চলে গেলেন। লোকটার কিছু মাথার দোষ ছিল, এই আমার বিশ্বাস।

দুই সৈনিক

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তার মুখ এত পারে স্পষ্ট করে দেখতে পেল সমীরণ। দেখল, চোখদুটো বড় বড়। চুল ঈষৎ কোঁকড়া এবং ঘন কালো। নীলাভ আলোয় সমীরণের মনে হল তার গায়ের রঙ খুব ফর্সা। চওড়া কপাল, বলিষ্ঠ পেশী। সে শুয়ে থাকলেও সমীরণ কল্পনা করে নিতে পারল তার দেহ বেশ দীর্ঘ।

এতক্ষণ অনেক মানুষ তার চারপাশ ঘিরে ছিল। ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছিল। আগন্তুকদের মধ্যে কিছু মেয়েও ছিল। সম্ভবত কলেজের ছাত্রী। কেউ কেউ অনেক ফুল এনেছিল। সেইসব ফুল এখন স্তূপের মত জমে আছে তার মাথার কাছে, এপাশে-ওপাশে। সমীরণ ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে।

তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। এক-একবার সে তার হাত চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছিল। আর তখন নার্স তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ডাক্তাররা প্রায়ই তার খবর নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে দেখতে ভিতরে ভিতরে বড় অবসন্ন হয়ে পড়ছিল সমীরণ। চৈত্রের বিকেল অল্প অল্প করে সরে নিভে গেছে। আজ সারাদিন বড় গরম ছিল। একটু আগে ঝড়ের মত দমকা হাওয়া উঠেছিল। সেটাও থেমে গেছে। এখনো ভাল করে অন্ধকার হয়নি তবুও আলো জ্বলে উঠেছে। শুয়ে শুয়ে সমীরণ দেখতে পাচ্ছিল হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ছোট একটা গাছের মাথায় নিওনের রেখা ছিটকে পড়েছে। শুয়ে থাকতে সমীরণের আর ভাল লাগছিল না কিন্তু উঠে বসবারও ক্ষমতা ছিল না তার। সমীরণের মনে হচ্ছিল একখন্ড জ্বলন্ত অঙ্গার তার পেটের ভেতরে দপদপ করছে। বারবার তার জল খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। নার্স অনেকক্ষণ তার কাছে আসেনি বলে সে আকণ্ঠ তৃষ্ণা চেপে রেখে চুপচাপ শুয়েছিল। আর এক-একবার কাতর চোখ মেলে দেখছিল তার পাশের বেডের মানুষটিকে। সে সমীরণের সমবয়সীই হবে বোধহয়। জ্বলন্ত অঙ্গার-খন্ডের মত একটা অনুভূতি পেটের ভেতরে ধকধক করে উঠলেও যন্ত্রণার কোনরকম স্বর এখনো বেরিয়ে আসেনি সমীরণের মুখ থেকে। সে তার জ্বালাকে এক অমিত বিক্রমশালী যুবকের মত অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করছিল মনে মনে। এবং তা করতে করতে তার মনে হচ্ছিল সে একটা শত্রুশিবিরে সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে।

সমীরণ জানত বাইরে দুজন পুলিশ বসে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাড়ি যেতে পারবে না, তাকে যেতে হবে থানায়। এবং পরে আদালতে তার বিচার হবে। [illegible]

হবেই এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সমীরণের। আর জেল হলে মার বুকের ব্যথাটা বেড়ে অনেক বেড়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দেবে মা—শুধু কান্নাকাটি করে দিন কাটাবে।

মা-র ভাবনা মনে উঠতেই একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল সমীরণ। তার পেটের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারখন্ডটা আবার যেন নতুন করে দপদপ করে উঠল। মা-র করুণ মুখটা বার-বার মনে পড়তে লাগল তার। সমীরণ যে পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে, মা এখনো সে খবর পেয়েছে কি-না তা সে জানে না।

সমীরণ ভাবল, সম্ভবত মা-কে খবর দেয়া হয়নি। খবর পেলে মা একবার না একবার আসত তাকে দেখতে—তার খবর নিতে। আর এখানে এই অবস্থায় তাকে দেখতে দেখতে মা-র চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তই। কেন পড়ত তা যেন এখন একটা অসহ্য যন্ত্রণা পেটের মধ্যে বহন করতে করতে এখানে একা শুয়ে-শুয়ে সমীরণ বড় স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। সে ছাড়া আর কেউ নেই তার। রোগে ভুগে ভুগে একরকম বিনা চিকিৎসায় বাবা মরেছে বছর কয়েক আগে। সে-বছরই উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল সমীরণের। এবং সে পাশও করেছিল। কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। পয়সাকড়ি আর কিছুই তো ছিল না। তখন সবচেয়ে বেশী করে দরকার ছিল একটা চাকরির। সমীরণ বহু মানুষের কাছে গেছে, পাগলের মত ছুটোছুটি করেছে। কিন্তু তার জন্যে কোন চাকরি কোথাও খালি ছিল না। মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বটাই বড় লজ্জাকর মনে হত সমীরণের। এবং সে তার বুকের ভিতরে একটা প্রবল চাপ অনুভব করত।

যে মানুষটি শুয়েছিল সমীরণের পাশের বেডে তার মুখ থেকে কাতর একটা ক্ষীণ শব্দ উঠতেই একটি অল্পবয়েসী নার্স দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল প্রায় মুখের ওপর। এবং খুব মিষ্টি করে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কী কষ্ট হচ্ছে?'

হাসবার চেষ্টা করে সে বলল, 'না-না, ব্যস্ত হবেন না। হঠাৎ হাঁটুটার ভিতরে কষ্ট করে উঠল।'

'অপারেশনের পর একটু ব্যথা-টাথা থাকে দু-চারদিন। খুব গরম পড়েছে তো। কাল সকালে ব্যান্ডেজ বদলে দিলে অনেক আরাম পাবেন।'

'খুব আরামেই তো আছি। আপনারা যা করছেন!' সে একটু থেমে নার্সের মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপা একটা উত্তেজনায় তার মুখ ঈষৎ বিকৃত হয়ে এল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, যে গুলীটা বার করেছে ডাক্তার আমার হাঁটু চিরে ফেলে—আপনি সেটা দেখেছেন নাকি?'

[illegible]

'কোন দেশের ছাপ ছিল গুলীটার জানবার ইচ্ছা হয়।'

নার্স হেসে বলল, 'বেশ তো, কাল ডাক্তার দেবকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলব।'

'না-না, থাক—' সে শুকনো হাসল, 'ওসব জেনে লাভ কী! আচ্ছা দিদি, কবে ছাড়তে পারবেন আমাকে?'

'বেশীদিন আটকে রাখব না—' নার্স তার মাথার বালিশটা ঠিক করে দিতে দিতে বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাকবার চেষ্টা করুন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

সে নার্সের কথা মেনে চলবার চেষ্টা করলেও একটু ছটফট করল। একবার তাকিয়ে দেখল সমীরণের দিকে। একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল যেন। নার্স ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে শুধু বলল, 'ঘুমোন।'

'ঘুমোতে পারি না দিদি। ঘুম আসবে কেমন করে বলেন? দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে জানোয়ারেরা। মা-বোনকে দিনে-দুপুরে বে-ইজ্জত করছে—'

নার্স তার এইরকম উত্তেজনা দেখে বিব্রত হয়ে বলে উঠল, 'আপনারা তো উচিত শিক্ষাই দিচ্ছেন ওদের। কিন্তু দয়া করে এখন ওসব ভাববেন না, আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বড় করুণ হয়ে এল তার। মৃদু এক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। এক-একবার এখনো সে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাঁটুতে হাত বুলোবার চেষ্টা করছিল।

নার্স কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল তার খাটের কাছে। কপালে হাত ছুঁইয়ে সে তার দেহের তাপ পরীক্ষা করল। এবং দেখল তার গোটা ডান পা-টাই ফুলে উঠেছে। দেখতে দেখতে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল নার্স। হয়তো ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যেই আস্তে আস্তে সরে গেল তার কাছ থেকে।

এত সময় পাশের খাট থেকে সমীরণও তাকিয়েছিল তার দিকে। সে খুব মন দিয়ে নার্সের মিষ্টি-মিষ্টি কথাও শুনেছিল। দুজনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সমীরণ। তার দৃষ্টিও একটা উৎসাহে ভরে যাচ্ছিল।

এখন বাইরে বেশ অন্ধকার। হাওয়ায় নানারকম কড়া ওষুধের গন্ধ সমীরণের নাকে এসে লাগছে। এই ওয়ার্ডেই অনেক রুগী কাতরে উঠছে থেকে থেকে। সমীরণও চিৎকার করে উঠতে চাচ্ছিল কিন্তু এখানকার কাউকে যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখাতে তার আত্মসম্মানে বাধল। প্রাণহীন একটা পদার্থের মত স্থির হয়ে থাকল সমীরণ।

নার্স তার খুব কাছেই ছিল এতক্ষণ। সে পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা শেষ করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন সমীরণ তাকে তার [illegible]

কিন্তু তা বলবার ইচ্ছে হল না সমীরণের। তার এত কাছে এইরকম একটা মানুষকে পেয়ে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল—এত বিমূঢ় যে ক্ষুধা কিম্বা তৃষ্ণার কথা তার আর মনেই ছিল না। এখনো সমীরণের দৃষ্টি ছিল তারই দিকে।

এই মানুষটির পরিচয় এখন মনে মনে পেয়ে গিয়েছিল সমীরণ। যদি গুলী খাওয়ার যন্ত্রণায় সে দিশাহারা না হয়ে পড়ত এবং সারাদিন একটা ঝিম-ঝিম ভাব তাকে অস্বস্তি না দিত তাহলে তাকে যখন অনেক সম্ভ্রান্ত মানুষ বহন করে নিয়ে এল তখনই সমীরণ বুঝে নিতে পারত সে কে।

ওপারের আহত অনেক সৈনিক নিরুপায় হয়ে ছিটকে এসেছে এপারে। সরকারী হাসপাতালগুলো ভরে উঠেছে। একটা মানবিকবোধেই এপারের মানুষও তৎপর হয়ে উঠেছে এদের সেবায়। সমর্থন করছে এদের মহৎ উদ্যম। সমবেদনা জানাচ্ছে। সমীরণ এসব জানে।

এবং জানে বলে যন্ত্রণার সঙ্গে সাংঘা একটা বেদনাও হঠাৎ আস্তে আস্তে তার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। মরবার ভয় তারও নেই। সে-ও দুঃসাহসী। রাজনীতির জন্যে সে জীবনকে তুচ্ছ করেছে অনেকবার। সমীরণ পাশের বেডের মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, এসব কথা কি সে জানে? তার মনে ঈর্ষার একটা অনুভূতিও হচ্ছিল।

সমীরণের ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে তার পাশের বেডের লোকটাকে বলে, আমিও গুলী খেয়েছি। জানের পরোয়া না করে আমিও রাজনীতি করতে নেমেছি—যুদ্ধ করে এসেছি যারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে।

এসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে একটু বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সমীরণ এবং সেই কারণেই পরে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার গলা ঠেলে বমি উঠে আসছে, বুকটা খালি-খালি লাগছে। শীর্ণ চোখে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখল সমীরণ—তার চেনাশোনা কেউ নেই।

মা খবর পেলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নিশ্চয় একবার তার কাছে আসত। কিন্তু আর কেউ যে তাকে দেখতে আসবে না সেকথা সমীরণ বেশ ভাল করেই জানে। কারুর আসবার উপায়ও নেই। তার কাছে কেউ এলে পুলিশ তার পিছনে লাগবে—গ্রেপ্তার করেও রাখতে পারে।

এসব জানলেও সমীরণের মনটা বড় কোমল হয়ে এল। তার চেনাশোনা কেউ কাছে এলে বড় ভালো লাগত এখন। সে তো না-ও বাঁচতে পারে আর। কে জানে, দু-একদিনের মধ্যে এই হাসপাতালেই সে শেষ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতেও একটা নিষ্ঠুর উল্লাস অনুভব করল সমীরণ। সে মরলে খুব জব্দ হয়ে যাবে পুলিশ।

মনগড়া [illegible] স্বাদ বেশীক্ষণ [illegible]

আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। বাইরে হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। বড় চুপচাপ হয়ে গেছে চারপাশ। শুধু রাস্তার একটা কুকুর অনেক দূরে একসুরে ডেকে যাচ্ছে।

'মা—' অস্ফুট উচ্চারণে সমীরণের একবার ডাকবার ইচ্ছে হল। শেষের দিকে যদিও মা-র ওপর তার বেশী টান ছিল না। রাজুদা তাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে মায়ের সুবোধ সন্তান হয়ে থাকলে এ যুগে রাজনীতি করা চলে না। সব ঠেলে ফেলে জীবনপণ করে কাজে নামতে হবে—তবেই সার্থক হবে শ্রম।

চাকরি পাওয়ার আশা যখন একরকম ছেড়ে দিয়েছিল সমীরণ—একটা অবসাদ তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল হতাশার গহন অন্ধকারে ঠিক সেই সময় রাজুদা তাকে বেঁচে থাকবার নতুন রাস্তাটা চিনিয়ে দেয়। এবং বেশ ভাল করেই বেঁচে ওঠে সমীরণ।

'কে এখন চাকরি দেবে তোকে?' একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় রাজুদার ঠোঁটে, 'কুত্তার বাচ্চারা নিজেদের পকেট ভরতেই ব্যস্ত। পলিটিক্স করে বোঝবার চেষ্টা কর গলদটা কোথায়। বাস, তারপর তোর হাতেই সব। সময় হলে দেখবি শালারা বাপ-বাপ বলে চাকরি দেবে।'

সমীরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রশ্ন করে, 'দেবে?'

'না দিয়ে যাবে কোথায়! আরে, দুর্নীতি দমন করার জন্যেই তো আমাদের সংগ্রাম। সুদিন আনতেই হবে—বুঝলি?'

সমীরণ স্পষ্ট করে কিছু না বুঝলেও রাজুদার চোখে-মুখে দৃঢ়-সঙ্কল্পের ছাপ দেখে সে ভিতরে ভিতরে একটা জ্বলন্ত আশা পোষণ করে এবং বেশ জোরে বলে ওঠে, 'আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব।'

'আমি কে রে!' অমায়িক হাসি হেসে রাজুদা বলে, 'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিস না কী অবস্থা হয়েছে দেশটার? শালারা যার যা খুশী করে যাচ্ছে—' কথা বলতে বলতে বড় কঠিন হয়ে ওঠে রাজুদার মুখ, 'মরে তো আছিই আমরা, কাজেই মরার ভয় আর আমাদের নেই। লড়ে যা!'

টুকরো-টুকরো স্মৃতির আমেজে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল সমীরণের। একটু-একটু ঘুমও বোধহয় আসছিল। শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। ঘুমের মত মনে হলেও সমীরণ জানত এত সহজে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না। পেটের ভেতর আবার ধক-ধক করে উঠবে—দম ছুটে যাবে।

ব্যথার কথা মনে হতেই চোখ খুলল সমীরণ। খুলেই দেখল তার বিছানার পাশে একটা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। যে-দুজন বাইরে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে বোধহয় তাদেরই একজন। তাকে দেখে ব্যথা-টেথার কথা ভুলে গেল সমীরণ। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

সমীরণ ভাবল, একটু বেশী করে কর্তব্য করবার চেষ্টা করছে পুলিশটা। বোধহয় এই ভেবে ভয়ে-ভয়ে আছে যে [illegible]

এখান থেকে জানলা টপকে সে পালিয়ে যেতে পারে।

এইরকম ভাবনার ভিতর একটা তৃপ্তিও অনুভব করল সমীরণ। তার ভাবনায় পুলিশের ঘুম ছুটে যায়। সমীরণ একটু চেষ্টা করে পাশের বেডের মানুষটিকে দেখল। জেগেই আছে সে। সমীরণের মাথার কাছে একটা জলজ্যান্ত পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্ভবত খুব অবাক হয়ে গেছে। সে এদিকেই তাকিয়েছিল।

তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রুক্ষস্বরে সমীরণ পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

তার প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে পুলিশ বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাক।'

সমীরণ জোরে বলে উঠল, "শুয়ে থাকব না তো কি আপনার গলা বাড়িয়ে ধরে নাচব?"

পুলিশ হাসল, "নাচতে ইচ্ছে করছে নাকি?"

"এখান থেকে যান। আমি ঘুমব। কেন এসেছেন ভেতরে?"

"চটো কেন? কেমন আছ জানতে এসেছিলাম—"

সমীরণ বলল "খুব ভাল আছি। আজ রাতে আপনার যখন একটু ঢুলুনি আসবে তখনই কাট লাগাব এখান থেকে—বুঝেছেন?"

"হুঁ," পুলিশের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে এল। সে আর কথা না বাড়িয়ে আবার বাইরে এসে বসল।

সমীরণ দেখল পাশের বেডের মানুষটি তখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। আলাপ করবার ছলে অল্প অল্প হাসছে। সমীরণও হাসল। এদিকে নার্স-টার্স কেউ নেই। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। একটু শীত শীত লাগছিল সমীরণের।

সেই প্রথম কথা বলল, "কেমন আছেন?"

"ভালই তো—" ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাঁটুর দিকে আর একবার তাকিয়ে সমীরণের পাশের বেডের মানুষটি সাবধানে তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনার কোথায় চোট লেগেছে?"

"আমিও গুলির খদ্দের। শালাকে গালি পেটে লেগেছিল—"

"কারা গুলি করল?"

CENTRAL LIBRARY

সমীরণ লক্ষ করল পাশের বেডের মানুষটি তার উত্তর শোনবার জন্যে বড় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। তার এই রকম উৎকণ্ঠা খুব ভাল লাগল সমীরণের। এতক্ষণে সে নিজের বীরত্ব জাহির করতে পারবে—তাকে বুঝিয়ে দেবে যে সেও গুলি-টুলি গ্রাহ্য করে না।

সমীরণ অল্প হেসে বলল, "পুলিশ ছাড়া আবার কে গুলি করবে আমাকে। দেখলেন না এক বেটা ঘুরে গেল একটু আগে? শালা আমাকে পাহারা দিচ্ছে বাইরে বসে।"

সমীরণের কথা তার কাছে বোধহয় খুব দুর্বোধ্য মনে হল। কেননা সে বেশ কিছু সময় চুপচাপ তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। সব জানবার একটা অদম্য কৌতূহলে তার চেহারা বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ঘরের শেষ প্রান্তে এক রুগী হঠাৎ খুব জোরে আর্তনাদ করে উঠল। ওদিকটা অন্ধকার। কিছু দেখা গেল না।

কিছু পরে সমীরণই আবার বলল, "আমি রাজনীতি করি কি-না তাই হঠাৎ একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম।"

রাজনীতির কথা শুনে অন্য আর একজনের মুখ থেকে বিস্ময়ের রেখাটা মুছে গেল। সে বেশ অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, "আপনাদের খবরের কাগজ আমাদের হাতে পড়ত না। আমার বাড়ি যশোহর। আমি কলেজের ছাত্র। খবর রাখতাম যে আপনাদের এখানে রাজনীতির চর্চা খুব জোর চলছে—"

"চলবেই। দেশের যা অবস্থা! আমরাও আপনাদের মত জান কবুল করে উঠে পড়ে লেগেছি—" একটা উত্তেজনার ঘোরে গলার স্বর অনেকটা তুলেছিল সমীরণ, হঠাৎ সতর্ক হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। এসব কথা এত জোরে বলবার জায়গা এটা নয়। কেউ শুনে ফেললে সে-ই মুশকিলে পড়বে।

পরে সমীরণ নিচু গলায় পাশের বেডের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী নাম?"

"মীরণ—" সে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলল, "মীরণ মফজ্জার রহমান।"

"কী পড়তেন?" নিজের নামের সঙ্গে তার নামের মিল আছে দেখে খুশী হয়ে সমীরণ জিজ্ঞেস করল।

"বি-এ—আমি আর্টসের ছাত্র—" একটু থেমে মীরণ পাল্টা প্রশ্ন করল সমীরণকে, "আপনিও ছাত্র বোধহয়, না?"

"না-না, সেসব চুকে গেছে। আমি এখন রাজনীতি নিয়েই আছি"—হাসবার চেষ্টা করল সমীরণ।

"ভালই তো"—মীরণ একটু উঠে হাতের ওপর মাথা রাখল, "একবার মন দিয়ে রাজনীতির চর্চা শুরু করলে আর কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। বহুদিন আমরা শান্তিতে পড়াশুনো করতে পারি নি। বুকের জ্বালা, ঠকতে ঠকতে ভিতরে-ভিতরে সকলেই ক্ষেপে উঠেছিল। তাই যুদ্ধে নামতে দেরী হয় নি আমাদের।"

"তাই তো দেখছি—" এবার সমীরণও একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল, "আপনারা কি আগে থেকেই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন?"

ইতস্তত করল না মীরণ। সমীরণের কথা শেষ হতেই বলল, "মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওদের বাধা দেব—আমাদের শ্রমের ফসল ওদের আর লুঠ করে নিয়ে যেতে দেব না। জানতাম ওরাও জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইবে—"

"তাই তো হল।"

"হ্যাঁ, তাই যুদ্ধও হল—" মীরণ তার আঘাতের কথা ভুলে একটা তেজী যুবকের মত মাথা তুলে বলল, "যুদ্ধ-টুদ্ধ আমরা চাইনি, তবে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুধু আমাদের মত ছেলেরা নয়, গোটা বাংলাদেশের সব মানুষ মনে মনে ওদের বাধা দেবার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে নিয়েছিল।"

"বেশ করেছিল—" সমীরণ যেন নিজে মীরণেরই মত আর একজন যোদ্ধা এমন ভাব করে বলল, "অত্যাচার সহ্য করতে-করতে মানুষ এক সময় মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন তার আর ভয়-ডর থাকে না, সে হাতির বল পায়।"

"ঠিক ঠিক—" কাতর একটা শব্দ করে কিছু সময় চুপ করে থাকল মীরণ, পরে আবার বলল, "আমরা হাতীর বলই পেয়েছি। অস্ত্রশস্ত্র বেশী কিছু নাই আমাদের, শুধু মনের বলই ভরসা।"

বিজ্ঞ একটা মানুষের মত সমীরণ বলল, "অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে তার দাম অনেক বেশী।"

"খুব ঠিক কথা।"

ওরা আস্তে আস্তে কথা বললেও চারপাশ একেবারে নীরব হয়ে গেছে বলে ওদের স্বর আছড়ে পড়ছিল এদিকে-ওদিকে। আশেপাশের কোন-কোন রুগীর বোধহয় ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল, চোখ পিট পিট করে ওরা দেখছিল এদের দিকে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুদূর থেকে একজন নার্সও ওদের দেখল। বোধহয় সমীরণ বলেই কাছে এসে ধমকাতে সাহস পেল না। একটু পরেই দপ করে সব আলো নিভে গেল।

রোজ ঠিক এই সময় হাসপাতালের এই ওয়ার্ডের সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়। সমীরণ বুঝল এখন রাত আটটা হয়েছে। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠল। খুব কাছাকাছি থাকলেও মীরণের মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেল না সমীরণ।

এখন ঘুমের সময় হলেও চোখ বন্ধ করে সমীরণ চুপচাপ পড়ে থাকতে পারবে না। মীরণের সঙ্গে আরো কথা বলার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল তার। এবং এতক্ষণ বকেছে বলে ওর গলাও শুকিয়ে এসেছিল, আবার জল খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু এবারেও তৃষ্ণা দমন করে মীরণের অন্ধকার বিছানার দিকে তাকিয়ে সমীরণ আস্তে জিজ্ঞেস করল, "ঘুম পাচ্ছে নাকি আপনার?"

"না-না, ঘুম-টুম সবে ছুটে গেছে। এখান থেকে ছাড়া পেয়ে ঠিক জায়গায় আবার ফিরে যেতে পারলে বাঁচি!"

"আবার যুদ্ধ করবেন?"

"করব না?" অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল মীরণ, "আমার এই পা-টা কেটে বাদ দিলেও আমি আবার বন্দুক ধরব। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে অন্তত একটা হানাদারকে—পাকিস্তান সরকারের একটা দালালকে খতম করব। আমাকে যেতেই হবে"।

অন্ধকার চোখে সয়ে গিয়েছিল সমীরণের। সে এখন মীরণের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। তার দৃঢ় স্বর শুনে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকল সমীরণ। সে ভাবল, সেরে ওঠার জন্যে অধীর মীরণ—যুদ্ধ করবার জন্যে ব্যাকুল। সমীরণ আপন মনে তারও একটা রণক্ষেত্র খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখের সামনে এবং মনের ভিতরে সব কিছু যেন ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে গেছে।

সমীরণের আরও মনে হল, মীরণের মত তার জন্যে বিশেষ কোন রণক্ষেত্র নেই। তাকে সাহায্য করবার জন্যে লক্ষ মানুষের গড়া মুক্তিফৌজ নেই। এবং তার অগ্রগমনের জন্যে আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও আত্মত্যাগ তো নেই-ই।

সমীরণ খুব নরম স্বরে মীরণকে জিজ্ঞেস করল, "জখম হলেন কেমন করে?"

মীরণ হাসল, "হঠাৎ একটু বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম—" কথা বলতে বলতে স্বর দৃঢ় হয়ে এল তার, চোখে তেজ ঝলসাতে লাগল, "আমাদের যশোহর আমাদেরই দখলে ছিল—জন্মভূমিকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা জান দিয়ে লড়ছিলাম—"

"তারপর?"

"শয়তান দালালরা পিছন থেকে ছুরি চালাল"—একটু দম নিয়ে বলতে লাগল মীরণ, "এক রাতে ঐ দালাল গুণ্ডারা গেরস্থ বাঙালীদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল—পথ চিনিয়ে নিয়ে এল হানাদারদের। ব্যস, শুরু হল খুন, জখম, মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার। আমরা বাধা দিলাম। একটা রেজিমেন্ট ঘিরে ফেলল ওদের।"

সমীরণ আবার বলল, "তারপর?"

"আগেই বলেছি আমরা জান দিয়ে লড়ছিলাম। অত গোলাগুলি বারুদ থাকলেও ওরা পিছু হঠছিল আমাদের বেপরোয়া আক্রমণে—" এতটা বলে মীরণ লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বড় আস্তে বলল, "ওদের গুলি লাগল আমার পায়ে। অন্ধকারে পড়ে গেলাম। গলগল করে খুন ঝরতে লাগল। প্যান্ট-মোজা সব ভিজে গেল। মাথার ভিতর সোঁ সোঁ করছিল, চোখ বুজে এল—"

বালিশটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একদিকে হেলে পড়ল মীরণ। একটু বিশ্রাম নিয়ে থেমে থেমে পরে বলল, "একটা পরিবার বুঝি ভয়ের চোটে তল্পীতল্পা নিয়ে ভাগছিল আপনাদের এপারে—মনে হয়, তারাই আশ্রয় করে নিয়ে আমাকে—"

CENTRAL LIBRARY

মীরণ ম্লান হাসল, "আমার জান আপনারাই তো বাঁচালেন।"

সমীরণ প্রশংসা করার মত বলল, "আপনার প্রাণের দাম কত!"

"আর আপনার জানের বুঝি দাম নাই?" হাল্কা হাসল মীরণ, পরেই ঈষৎ ভারী স্বরে প্রশ্ন করল, "পুলিশের গুলি কেমন করে লাগল আপনার গায়ে? এবার আপনার খবর বলেন।"

অন্ধকারে হয়তো দেখতে পেল না মীরণ, করুণ একটা আভা সমীরণের মুখে থম থম করে উঠল। সে স্থির করতে পারল না মীরণের প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে। সমীরণ চুপ করে থাকল। মীরণ যেমন করে বলে গেল তার কাহিনী তেমন কোন মহান দুঃখের কথা সে-ও যদি বলতে পারত তাহলে তার পেটের ভিতরে যে ব্যথা ধকধক করে উঠছে তা বোধহয় অনেকটা কমে যেত। কিন্তু সেইরকম কিছু ঘটে নি তার জীবনে।

সমীরণ জানে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেয়ার জন্যে হয়ত তার মত ছেলের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হবে। এখন যদিও কেউ কোনরকম অত্যাচার করছিল না তবুও সমীরণের মনে হচ্ছিল মীরণের ছোট একটা প্রশ্ন তার দেহ ও মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দীর্ঘ কাহিনী শোনাবার আন্তরিক ইচ্ছায় তার মন উন্মুখ হয়ে উঠলেও গভীর হতাশায় সে অনুভব করল তার ঝুলি একেবারে শূন্য—মীরণকে বলবার মত তার কিছু নেই।

এই ওয়ার্ডের কাছাকাছি হাসপাতালের কোন অন্ধকার গাছে একটা পেঁচা দু-একবার কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। চোখ দুটো আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে সমীরণের, কড়া ওষুধের গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছে। সে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিল। থুতু জমে উঠছিল তার জিবে। যেন অনেক কষ্ট করে তা গিলে ফেলে সে তার শুকনো গলা ভিজিয়ে নিল।

আবছা অন্ধকারে মুক্তিফৌজের এক আহত সৈনিকের খুব কাছে শুয়ে সমীরণ ম্লান মুখে ভাবছিল তার রণাঙ্গন যশোহর নয়, মাত্র কয়েকদিন আগে সে গুলি খেয়েছে এখানে—এই কলকাতায়। রাতে নয়, সকাল এগারোটার আগে-আগে। রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। বাস ট্রাম ট্যাক্সি গাড়ি হু-হু করে ছুটে যাচ্ছিল।

একটা ছেলেকে ধরবার চেষ্টা করছিল সমীরণ। সে নাকি লুকিয়ে-লুকিয়ে রাজুদার নামে পুলিশের কাছে লাগিয়েছে। ছেলেটার নাম নন্দ, একটু দূরে ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি সে থাকে। তবে টিকটিকির কাজ করবার পর থেকেই বেশ সাবধান হয়ে গেছে নন্দ, ট্রামে আর কলেজে যায় না। গলি-ঘুঁচি দিয়ে কিছু দূরে পালিয়ে গিয়ে বাস ধরে। দু-চারদিন চেষ্টা করেও নন্দকে ধরতে পারে নি সমীরণ।

ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি বাঁকা আর তিনুর সঙ্গে বাস স্টপেজে সমীরণ দাঁড়িয়েছিল। পাশেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আজ ধরতেই হবে নন্দকে—রাজুদার ডেরায় নিয়ে যেতেই হবে তাকে।

নন্দর বাস এ রাস্তা দিয়েই যাবে। আজ সমীরণের দলও পুরোপুরি তৈরি। নন্দ যাতে দেখতে না পায় এমনভাবে তাকে অনুসরণ করেছে লালু। সে-ও ওই এক বাসে উঠবে। তারপর বাসটা এখানে দাঁড়ালেই চিৎকার করে খবর দেবে সমীরণকে।

এই জায়গাটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে সমীরণ। এখানে অনেক লোক ওঠে, নামে। সব বাস এখানে থামবেই। রোদ বড় কড়া। একটা ছায়া-ছায়া জায়গায় দাঁড়িয়েছিল বাঁকা তিনু আর সমীরণ। এক-একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছিল আর ওরা তিনজনেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল, চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

"এই যে, শালাকে পেয়েছি—" বাসের ঘণ্টার দড়ি শক্ত হাতে টেনে রেখে সমীরণ বাঁকা আর তিনুকে বলল লালু।

"এই নাম—" ওরা তিনজন উঠে পড়ল ভিড়ের বাসে লাফ দিয়ে, নন্দকে সীট থেকে গায়ের জোরে টেনে তুলে বলল, "একটা কথা বলবি কি ফিনিশ করে দেব'—

কান্না-কান্না গলায় নন্দ মিনতি করার মত বলল, "আমাকে মাপ করুন, কালীর দিব্যি আমি কিছু করি নি—"

'নাম শালা, নাম।"

'আপনাদের পায়ে ধরছি আমাকে ছেড়ে দিন—'

'চোপ!' নন্দকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এই চারজন বেপরোয়া ছোকরা।

বাসসুদ্ধ লোক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বাধা দেয়ার কিম্বা একটা কথা বলার সাহস কারুর ছিল না। ওরা নির্বাক দর্শকের মত শুধু দেখছিল দিনের প্রখর আলোয় ওদেরই চোখের সামনে একজন যাত্রীকে গায়ের জোরে বাস থেকে নামান হচ্ছে।

এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত হয়েই কন্ডাক্টারকে বলল, 'বেলটা দিন না মশাই, অফিসের সময়—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে তাড়া দিয়ে সমীরণ বলে উঠল, 'থামুন, — এক চুল নড়লে জ্বালিয়ে দেব বাস—'

নন্দকে ঠেলে একটা ট্যাক্সিতে তুলল ওরা। আর কোন প্রতিবাদ জানাল না নন্দ। ভয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ওদের হুকুম মত স্টার্ট দিয়েছিল ড্রাইভার। আর একটু হলেই নন্দকে রাজুদার ডেরায় এনে তুলতে পারত সমীরণের দল।

কিন্তু যা কখনো হয় না, হঠাৎ তাই হল। হুড়মুড় করে একসঙ্গে নেমে এল বাসসুদ্ধ লোক। সেই ট্যাক্সিকে ঘিরে ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'দিনের আলোয় এত বাড়াবাড়ি! ধর শালাদের, এই নেমে আয়! পিটিয়ে পাছার ছাল তুলে দেব।'

একজন সমীরণের কলার চেপে ধরতেই সে ধাঁ করে তার মুখে মারল এক ঘুষি, তারপর মুহূর্তে পিছিয়ে এসে পকেট থেকে হাত-বোমা বের করে পর পর দুটো ছুঁড়ে মারল বাসটার গায়ে। বোমার আওয়াজ হতেই লোকগুলোর মেজাজ হিম হয়ে গেল, যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

সমীরণও ছুটছিল। এখনো সে শুনছিল দূর থেকে কিছু লোক চিৎকার করছে, 'ধর ধর, মেরে ফেল শালাকে—'

এই সময় ঝোঁকের মাথায় একটু ভুল করেছিল সমীরণ। ইচ্ছে করলে একটা পাঁচিল টপকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। কিন্তু নন্দ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। যে লোকগুলো তাকে গালাগাল করে চিৎকার করছিল তাদের থামিয়ে দেয়ার জন্যে আর একটা বোমা ফাটাতে যাচ্ছিল সমীরণ, ফাটাতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত সে বিমূঢ় হয়ে থাকল। উল্টোদিক থেকে

CENTRAL LIBRARY

একটা পুলিশ ভ্যান তার খুব কাছে এসে গেছে। যে বোমা বের করেছিল সমীরণ নিরুপায় হয়ে তা ছুঁড়ে মারল পুলিশের কালো গাড়ির গায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। তার পেটে গুলি লেগেছে।

এসব ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় মড়ার মত এখন পড়েছিল সমীরণ। তার এই কাহিনী বাংলাদেশের এক মুক্তিযোদ্ধাকে শোনাতে তার দ্বিধা হচ্ছিল। এবং কিছু বলতে পারছিল না বলে তার পেটের ভিতরে সে দ্বিগুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিল।

সমীরণকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে বড় ক্লান্ত স্বরে মীরণ জিজ্ঞেস করল, ঘুমোলেন?'

ইচ্ছে করেই একটা হাই তুলল সমীরণ, পরে বলল, 'একটু একটু ঘুম পাচ্ছে এখন—'

'তবে ঘুমান।'

'শুনুন—' খুব সতর্ক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল সমীরণ এবং ফিসফিস করে উঠল, 'রাজনীতির ব্যাপার কি-না। আমার জখমের কথা এখানে কিছু বলা ঠিক হবে না। বলব আপনাকে পরে সব।'

'বেশ, তাই বলবেন।'

সমীরণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের খাটের দিকেই টর্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে ডাক্তার—সঙ্গে সেই অল্প-বয়েসী নার্স।

ওদের দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সমীরণ। তার শরীর একটা আশঙ্কায় সিরসির করে উঠল। মনে হল, ভিন্ন লোকের দুটি ছায়ামূর্তি রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে তাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র করছে।

ডাক্তার মীরণের কপালে হাত রাখল। টর্চ জেলে তার পা দেখল। পরে বিব্রত হয়ে নার্সকে বলল, 'আর একবার টেম্পারেচার নিন। শুনুন, আপনি একেই অ্যাটেন্ড করুন সারারাত। আমি এখুনি ডাঃ মৈত্রকে ফোন করছি।'

মীরণ বলল, 'ব্যস্ত হবেন না। আমি ভালই আছি ডাক্তারবাবু।'

'হ্যাঁ, ভালই তো আছেন।'

'শুধু পা-টা জ্বলে যাচ্ছে।'

'আমি ওষুধ দিচ্ছি।'

নার্স থার্মোমিটারটা ভাল করে ঝেড়ে মীরণের মুখের কাছে ধরতেই সে তা জিবের তলায় ঠেলে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল। ডাক্তার তখন নাড়ী পরীক্ষা করছিল তার। সমীরণ চুপচাপ সবই দেখছিল।

কিছু পরে মীরণের মুখ থেকে থার্মোমিটার টেনে নিয়ে নার্স দেখল প্রথম, পরে ডাক্তারকে তার জ্বরের কথা খুব নিচু গলায় জানাতেই বিস্ময়ের অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হল ডাক্তারের মুখ থেকে।

সে পরে নার্সকে বলল, 'আপনি এখানেই থাকুন, আমি আসছি।'

এত রাতেও নার্স ও ডাক্তারের তৎপরতা এবং সেবাযত্নের এইরকম বহর দেখে সমীরণের মন কুঁকড়ে-কুঁকড়ে তার দেহটাকে এতটুকু করে তুলেছিল। বালিশে ঘাড় গুঁজে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল সে। ঈর্ষার জ্বালায় নয়, অবহেলার বেদনায় সে চোখ বন্ধ করে ছিল। কেননা তার মনে হচ্ছিল, চোখ বন্ধ করে আছে বলে সে যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি কেউ তাকেও দেখতে পাবে না।

অন্য প্রান্তের কোন রুগী এখন আর্তনাদ করে উঠছিল না।

মীরণের খাটের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়েছিল সমীরণ। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে, সজল একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তবুও ভয়ংকর একটা তাপ যেন সমীরণের দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে আসছে।

মীরণের খাট একঘন্টাও বোধহয় খালি ছিল না। মৃত্যুর বেশ কিছু পরে খুব ঘটা করে তার দেহ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। গণ্যমান্য বহু লোক এসেছিল, খবরের কাগজের লোকেরাও ছিল। মুহুর্মুহু ক্যামেরা ঝলসে উঠেছিল। সমীরণ জানত তার কথা সব কাগজেই খুব ফলাও করে বেরুবে। কাগজগুলো দেখবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সমীরণের।

ডাক্তারগুলোর ওপর সে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এত চেষ্টা করেও মীরণকে বাঁচাতে পারল না তারা। ক্রমশ তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, পা-টা বীভৎস হয়ে ওঠে। শেষের দিকে অচৈতন্যের মত হয়ে গিয়েছিল মীরণ—কথা-টথা আর বলত না।

তার সঙ্গে সমীরণের মাত্র কয়েকদিনের আলাপ, তবু এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ব্যথা তাকে বড় কাতর করে তুলেছিল। সে-ই তো এখানে একমাত্র সঙ্গী ছিল সমীরণের।

এখন মীরণের খাটে শুয়ে আছে থুরথুরে এক বুড়ো। কথা একেবারেই বলে না, চুপচাপ ওপরে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখতেও লোক আসে, তার মাথার কাছে বসে থাকে পুরো দুঘণ্টা।

এ বুড়োটাও হয়তো মরবে। কাতর একটা নিশ্বাস ফেলে সমীরণ ভাবল, খাটটাই অপয়া। এবং এইরকম ভাবনা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল সে যে-খাটে শুয়ে আছে সেখানে তার আগে যে রুগী ছিল সে সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে না মরেছে।

চোখ দুটো করুণ হয়ে এল সমীরণের—ভয়-ভয় লাগল। আজকের বিকেল হয়তো তার জীবনের শেষ বিকেল। সমীরণ তাকিয়ে দেখল সাইডটেবিলে ঠান্ডা একটা আতা তার চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে।

এখন আত্মীয় বন্ধুদের আসবার সময়। অনেক রুগীর খাটের কাছে কেউ না কেউ এসে বসেছে। যারা ভেতরে ঢুকছে তাদের কারুর হাতে বড় ঠোঙা কিম্বা আপেল আঙুর বেদানা—এইরকম সব ফল। এসব দেখতে দেখতে বড় ঝিমিয়ে পড়েছিল সমীরণ।

বৃষ্টিটা বোধহয় একটু থেমেছে। কিন্তু ঠান্ডা নেই, বড় গরম। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না সমীরণের। কবে এরা ছাড়বে কে জানে। তারপর সে যাবেই বা কোথায়! আবার সেই মারধোর, অত্যাচার—কথা আদায় করবার জন্যে কতরকম নির্যাতন।

তার চেয়ে মরে যাওয়াই যেন ভাল। সমীরণের মনে পড়ল বিনয়, বাদল দীনেশের কথা। ওদের মধ্যে একজন গুলির ক্ষত ইচ্ছে করে আঁচড়ে সেপটিক হয়ে মরে গিয়েছিল। সমীরণও সেইরকম করবে নাকি! মীরণও মরল সেপটিক হয়েই।

চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখছিল না সমীরণ, একটা বিপুল ক্লান্তিকর শূন্যতার মাঝে সে আপন মনেই ঘুরে ফিরছিল। তার কানে আসছিল অস্ফুট গুঞ্জন—আশেপাশের রুগীরা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মনের কথা বলে যাচ্ছে।

'সীরু!'

খুব চেনা গলার স্বর শুনে সমীরণ চমকে উঠে দেখল এতদিন পর মা এসে তার খাটের কাছে দাঁড়িয়েছে। ভাবনায় ভাবনায় মার চেহারা ভেঙে পড়েছে। পরনের থানটাও আধময়লা, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া।

'মা!' একটা উৎসাহের ঝোঁকে উঠে বসবার চেষ্টা করল সমীরণ, 'পুলিশ গিয়েছিল? সার্চ-টার্চ করেছে? বল না—'

মা বলল না। তার দু চোখে জল টলমলো করছিল, ঠোঁট কাঁপছিল।

সমীরণের মা তার কথার উত্তর না দিয়ে ধরা গলায় শুধু বলল, 'সীরু, তুই আমাকে আর কত দুঃখ দিবি!'

কিছু বলবার ছিল না সমীরণের। তার শীর্ণ মাকে আশ্বাসের একটি কথাও সে এখন বলতে পারল না। মা দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। সমীরণের মনে পড়ল এই রকম করে আর একবার মা কেঁদেছিল—তার বাবা যখন মারা যায় তখন।

মীরণের খাটের দিকে দেখল সমীরণ, অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মাকে বলতে চাইল, মা আমি মরিনি—আমি বেঁচে আছি! কিন্তু অনেক চেষ্টা করে সে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

মার চোখ থেকে দুদ্দু করে জল পড়ে যাচ্ছিল।

আলব্রেখট ড্যুরার

ধ্রুবজ্যোতি সেন

আত্মপ্রতিকৃতি (১৫০০)

১৯৭১ সাল জার্মানীতে ড্যুরার বৎসর হিসেবে পালিত হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ড্যুরারের স্মৃতির সম্মানে নানা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সমালোচকদের সেমিনার ও বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পীর জন্ম ও কর্মস্থান নুরেমবার্গ শহরে ড্যুরারের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী বিশেষ সমারোহে উদ্যাপিত হচ্ছে, কারণ জীবিতকালে শিল্পী এখানকার বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। আধুনিক শিল্পীদের কাছে ড্যুরারের শিল্পদর্শনের আজও কোন অর্থ আছে কিনা সেই উদ্দেশ্যে তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে আধুনিক শিল্প-কলারও কয়েকটি প্রদর্শনী করা হবে।

যাঁকে নিয়ে ফেডারেল রিপাব্লিকে এত কিছু তাঁর পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল হাঙ্গেরীর এইটাস গ্রামে, যেখান থেকে তাঁর পারিবারিক নামের উৎপত্তি। এইটাস অর্থে দরজা—জার্মান 'টুরে': ড্যুরারের বাবা নাম সই করতেন 'টুরার' বলে। তবে মাগিয়ারদের মত লম্বা চুল রাখলেও ড্যুরারের পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ জাতে জার্মানই ছিলেন। বাবা আলব্রেখট স্বর্ণকার হিসেবে নুরেমবার্গের অভিজাত ও শিক্ষিত পির্খাইমার-পরিবারের বাড়ির খুব কাছেই বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর নিয়োগকর্তার কন্যা বারবারা হোলপারকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের আঠারোটি সন্তানের তৃতীয় সন্তান হলেন শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার—জন্ম ২১ মে, ১৪৭১।

ছেলেবেলায় কয়েক বছর স্কুলে লেখাপড়া শেখার পর ড্যুরার বাবার দোকানে সোনারূপোর কাজ, ডিজাইন ও এনগ্রেভিং শেখেন। এই শিক্ষা তাঁর অনেক কাজে লেগেছিল। তাঁর পরবর্তী কালের উডকাট, এচিং এনগ্রেভিংগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্মতার পরিচয় আছে তা এই ছেলেবেলার হাতেখড়ির ফল। আজকেও তাঁর পেন্টিং-এর চাইতে এই সব কাঠ-খোদাই ও এনগ্রেভিংগুলিই সকলের কাছে সমাদর পেয়ে আসছে।

ছেলেবেলা থেকেই ক্রাফটসম্যানশিপে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। মাত্র তের বছর বয়সে সিলভার পয়েন্টের মত কষ্টসাধ্য মাধ্যমে আঁকা তাঁর নিজের প্রতিকৃতিই তার প্রমাণ। ১৪৮৬ সালে ড্যুরারের বিশেষ ইচ্ছায় এবং তাঁর বাবার কিছুটা অনিচ্ছায় তাঁদের প্রতিবেশী শিল্পী মিখায়েল ভোল্‌গেমুট-এর স্টুডিওতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের স্টুডিওর মত এটিও ছিল ছবি তৈরীর কারখানা বিশেষ। অনেকের সঙ্গে ড্যুরার এখানে কাজ করতে করতে শিক্ষালাভ করেন। তবে সহকর্মীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে পড়ায়, ভদ্র, শান্ত ও সংযত চরিত্রের শিল্পীর শিক্ষানবীশি কাল অবিমিশ্র সুখে অতিবাহিত হয়নি। ছবি আঁকার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া কাঠখোদাই কাজের হাতেখড়িও এখানেই হয়। তাঁর জন্মের প্রায় বিশ বছর আগে ছাপাখানা আবিষ্কার হয়। নুরেমবার্গের বিখ্যাত প্রকাশক ছিলেন আন্টন কোবার্গার—ড্যুরারের ধর্মপিতা। তাঁর অনেক বইয়ের কাঠখোদাই ছবি ভোলগেমুটের স্টুডিওতে তৈরী হত।

স্টুডিওর শিক্ষা সমাপন হলে ১৪৯০ নাগাদ অন্যান্য কারিগরদের মত তিনিও ভ্রমণে বার হন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, সে যুগের বিখ্যাত এনগ্রেভার মার্টিন শোনগাউয়ারের কাছে কাজ শিখতে তিনি কোলমার যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর উপস্থিতির পূর্বেই শোনগাউয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাইয়েরা অবশ্য শিল্পীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং বাসেলে মৃত শিল্পীর এক ভাইয়ের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। বাসেল এবং স্ট্রাসবুর্গের প্রকাশকদের জন্য কিছু কাঠখোদাই ডিজাইন করে ১৪৯৪এ ড্যুরার নুরেমবার্গে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্বশুর হান্স ফ্রে ছিলেন নানারকম যন্ত্রপাতির নির্মাতা, উচ্চস্তরের অবস্থাপন্ন লোক। দেশে ফিরতেই তাঁর কন্যা অ্যাগনেসের সঙ্গে ড্যুরারের বিয়ে হয়ে গেল। যৌতুক মিলল দুশ ফ্লোরিন—নেহাৎ অল্প নয়।

এঁদের বিবাহিত জীবন সর্বৈব সুখের হয়নি। তা সেটা আর কজনারই বা হয়ে থাকে। অসুখের কারণ সম্পর্কে নানা জনের বিভিন্ন মত আছে। অল্পবয়সে অ্যাগনেস মোটামুটি সুশ্রীই ছিলেন। তবে বয়সের সঙ্গে চেহারায় একটা দজ্জাল ভাব এসে গিয়েছিল। কেউ বলেন বিখ্যাত স্বামীর অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও পারিবারিক মোটামুটি শান্তশিষ্ট ভালমানুষ গোছের গৃহিণী ছিলেন। অপরের মতে গিন্নীটি ছিলেন একটি খান্ডার। তাঁর দাপটে কর্তাটি শেষের দিকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতেও সাহস পেতেন না। পয়সা পয়সা করে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। এবং কতকটা সেই জন্যেই নাকি স্বামীটি বেশী দিন বাঁচেন নি। তবে সকলেই স্বীকার করেন যে, নিঃসন্তান বিবাহিত জীবন এঁদের কারো পক্ষেই সুখের হয়নি। ড্যুরারের ডায়েরি বা চিঠিপত্রে কি আত্মজীবনীতে কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ উক্তি নেই; পরিহাসোক্তি যেটুকু আছে তার মধ্যেও কেমন একটা সহানুভূতিহীনতা চোখে পড়ে। ১৫২০–২১ সালে যখন তিনি সপরিবারে (জীবনে একবারই সপরিবারে ভ্রমণ করেন) নেদারল্যান্ড যাত্রা করেন

তখনকার ভ্রমণ কাহিনীতে কোথায়, কবে, কার সংগে কতবার ডিনার খেয়েছেন তার হিসেব লেখা আছে। তার মধ্যে স্ত্রীর সংগে একত্রে আহারের সংখ্যা খুবই কম। অথচ নিজে নিমন্ত্রণ করে তাঁর সংগে বসে ভোজ খাচ্ছেন আর ফিরের সংগে অ্যাগনেস ওপরে রান্নাঘরে বসে আহার করছেন এমন ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। পতি-দেবতাটি যে একজন প্রতিভাবান পুরুষ সেটা সম্ভবতঃ অ্যাগনেস বুঝতে পারেননি। তিনি যদি মধ্যযুগের অর্থে স্বামীকে একজন ছবিবিক্রেওয়ালা বলে মনে করে থাকেন ত তার জন্যে অপরাধ দেওয়া যায় না। লোকে যেমন চেয়ার-টেবিল বা কোট-প্যান্ট বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এরও তেমনি বেশী করে ছবি বানিয়ে দুটো পয়সা যাতে আসে সেদিকেই মন দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করে থাকতে পারেন। তা না করে দিনরাত লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরাতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা কি রসতত্ত্ব এসব নিয়ে দিনরাত বক বক করলে কোন প্রেমিক বৌয়েরই বা সহ্য হয়। আসলে দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করতেন বলেই কাছাকাছি আসতে পারেননি। তাই অ্যাগনেস তাঁর স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না।

আর বিশেষভাবে ঘৃণা করতেন তাঁর স্বামীর আশৈশব অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বিখ্যাত 'হিউম্যানিস্ট', রাজনীতিবিদ এবং নিকটতম

ইন্সব্রুকের দৃশ্য জল রং

প্রতিবেশী উইলিবাল্ড পির্খাইমারকে। পির্খাইমারও তাঁকে তেমন সুনজরে দেখেননি; কারণ ড্যুরারের মৃত্যুর পর শোকে অভিভূত অবস্থায় তাঁদের আরেক বন্ধুকে তিনি যে-চিঠিটি লেখেন তাতেই তিনি শিল্পীর মৃত্যুর জন্যে সোজাসুজি অ্যাগনেসকে দায়ী করেন। চিঠিটা অবশ্য রাগ ও দুঃখের মাথায় লেখা, আদৌ সুস্থ মস্তিষ্কের নয়। কারণ, শিল্পীর সংগে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অসাধারণ রকমের গভীর, যদিও আকৃতি ও প্রকৃতিতে এত প্রভেদ দেখা যায় না। ড্যুরারের চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিলেন তিনি। ধনী, উচ্চবংশের সন্তান —পাদুয়া ও পাভিয়াতে আইন, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি পাঠ করেছেন। নুরেমবার্গের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি এবং সম্মান ছিল। বিরাট চেহারা, সুপুরুষ বলা চলে না, প্রচণ্ড জীবনীশক্তি, ভীষণ মেজাজ, রসিক, উদ্ধত এবং কিছুটা উচ্ছৃংখল চরিত্রের লোক ছিলেন তিনি। স্ত্রী মারা গেলে আর বিয়ে করতে রাজী হননি, কারণ অবিবাহিত থাকার সুবিধে অনেক। তিনিই ড্যুরারকে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, সমকালীন জীবনদর্শন ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আকৃষ্ট করেন। শিল্পীর অনেক ছবির বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। শিল্পীর সমাধি-ফলকে লিখে দেন 'আলব্রেখট ড্যুরারের মরদেহের যা-কিছু তাই এখানে সমাধিস্থ রয়েছে।' বন্ধুর মৃত্যুর বছর-দুয়েক বাদেই তিনিও তাঁর অনুসরণ করেন। এত ভালবাসায় অ্যাগনেসের যে রাগ হবে তাতে আর বিচিত্র কি?

বিয়ের পরেই ড্যুরার ভেনিস যাত্রা করেন। ইটালী তখন রেনেসাঁস শিল্প-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের চাবি সেখানেই। তাছাড়া বন্ধু পির্খাইমার তখন পাভিয়াতে পড়াশোনা করছেন। এ-সময় উত্তর ইউরোপের গথিক-রীতির অনুসরণকারীদের মক্কা ছিল ব্রুজ এবং গাঁ। ইটালীর প্রভাব ততটা ছড়ায়নি। ড্যুরারই সেই যুগে জার্মান শিল্পীদের ইটালীর পথ দেখালেন। একবারের ভ্রমণ যদিও মাত্র এক বছর

ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপ্স (১৪৯৮)

স্থায়ী হয়েছিল, তবু এরই ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আসতে শুরু করে।

১৪৯৫-এ দেশে ফিরে তিনি একটানা দশ বছর ধরে অনেকগুলি ছবি ও প্রায় ষাটখানির মত উডকাট ও এনগ্রেভিং তৈরী করেন। এসব প্রিন্ট তাঁর মা এবং স্ত্রী বাজারে বা মেলায় বেচতেন। বিখ্যাত ইটালীয়ান শিল্পী মান্তেনা এবং পোলাই-উওলোর কিছু কাজ তিনি কপি করেন। মান্তেনার প্রভাব তাঁর ওপর অনেকখানি পড়েছিল। তাঁর দ্বিতীয়বার ভেনিস যাত্রার সময় মান্তেনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ড্যুরারও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর পৌঁছবার পূর্বেই মান্তেনার মৃত্যু হয়। এটি ড্যুরারের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হয়েছিল। জ্যাকোপো ডি বারবারি নামে নুরেমবার্গ প্রবাসী এক ভেনেশিয়ান শিল্পী তাঁকে একদা একটি পুরুষ ও রমণীর নগ্ন মূর্তির ড্রয়িং দেখিয়ে বলেন, যে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এরকম মূর্তি গঠন সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটি গোপন করেন। বিষয়টি তখন থেকেই ড্যুরারের মাথায় ঘুরতে থাকে। সারাজীবন ধরেই তিনি নিখুঁত নরদেহ আঁকবার ফরমুলা খুঁজে বেড়িয়েছেন। ভেনিসে বেলিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এঁদের বর্ণ-চাতুর্যের প্রভাবও তাঁর পক্ষে মূল্যবান হয়েছিল। তবে তাঁর আসল সাফল্যের কারণ হল সর্ব বিষয়ে অপরিসীম কৌতূহল ও কাজে নিষ্ঠা। যখনই যেখানে কোন বিচিত্র মানুষ, দৃশ্য বা জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন, তখনই নোটবইয়ে তা টুকে রাখতেন। ভেনিসে থাকতে একটি সামুদ্রিক কাঁকড়া ও চিংড়ির চমৎকার জলরঙের ছবি আছে। অন্যত্র এক সিন্ধুঘোটকের ড্রয়িং করা আছে। পোর্তুগাল থেকে একজন গণ্ডারের বর্ণনা ও একটি স্কেচ পাঠিয়েছিলেন, তাই দেখে গণ্ডারের একটি উডকাট প্রকাশ করে ফেলেন—খুব তথ্যমূলক না হলেও সুন্দর কাজ। এমনকি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেও তার নিখুঁত বর্ণনা লিখে এবং ছবি এঁকে রেখে গিয়েছেন। নানারকম জন্তু-জানোয়ার; পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি সাজিয়ে একটি বিরাট নিসর্গদৃশ্যের মধ্যে পেন অ্যান্ড ইঙ্ক জল-রং-এর ওয়াশে যে ম্যাডোনা মূর্তি তিনি তৈরী করেন, সেরকম বিষয় নিয়ে আর কোন শিল্পী কোন মাতৃমূর্তি আঁকেননি।

সে-যুগে দেশভ্রমণ কষ্টসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল হলেও ড্যুরার একাধিকবার বিদেশ যাত্রা করেন। সবগুলিই যে নিছক বেড়ানোর খাতিরে করা হয়েছিল তা নয়। প্লেগের আক্রমণ এড়াবার জন্যেও তিনি শহর ছেড়ে বাইরে গিয়েছেন। এইসব ভ্রমণের ফলে তাঁর নিসর্গদৃশ্যের ছবিগুলির বিশেষ উন্নতি হয়। ফোলগেমুটের স্টুডিওতে কাজ শেখার সময় তিনি জল রঙে কিছু নিসর্গদৃশ্য এঁকেছিলেন বটে কিন্তু তখনো পারস্পেকটিভ ভালো করে রপ্ত হয়নি। আলো-বাতাসের ছাপও ছবিতে অনুপস্থিত। নিছক তথ্যপূর্ণ এবং কিছুটা নক্সা চেহারার ছবি হত। কিন্তু প্রথম ইটালী যাত্রার সময় আল্পস অঞ্চলের যেসব ছবি তিনি ভ্রমণের দলিল হিসেবে নিয়ে আসেন, তখন থেকেই তাঁর কাজের পরিণতি দেখা যায়। ভেনেশিয়ান রঙের ছটায় এগুলি আর নিছক দলিলে পরিণত হয়নি, ছবি হয়ে ওঠে। ছবির ক্ষুদ্র অংশগুলির সঙ্গে গোটা ছবির সুসম্বন্ধ ভাব, আলো, আবহাওয়া, মেজাজ সবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

এখানে ড্যুরারের জল রঙের ছবি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর জীবদ্দশায় এগুলি সম্পর্কে খুব অল্প কয়েকজনই খবর রাখতেন। কিন্তু নিসর্গ-দৃশ্য রচনায় তিনি যে একজন পথিকৃৎ, তা আজকে এগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তাঁর পেন্টিং বা গ্রাফিকে ব্যবহারের জন্য রেফারেন্স হিসেবেই এগুলি আঁকা হয়েছিল। কিন্তু আজ এগুলি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী করতে পারে। তাঁর পরিণত ছবিতে যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্ষণস্থায়ী আভা এবং তুলি চালনার দক্ষতা, আবহাওয়া সৃষ্টি এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা আবার দেখা গিয়েছিল দীর্ঘকাল পরে। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে নিসর্গদৃশ্য রচনার জন্যে কেউ কেউ তাঁকে ইম্প্রেশনিজমের পুরোধা বলেও চালাতে চান, যদিও সেরকম কোন শিল্প-তত্ত্ব আবিষ্কারের বাসনা তাঁর ছিল না। তেমনি কিউব এবং কোনের সাহায্যে গঠনকে বোঝাবার জন্যে কতকগুলি ড্রয়িং থাকলেও তাঁকে কিউবিজমের স্রষ্টা বলা চলে না বা স্বপ্নের ছবি আঁকলেও সুর-রিয়্যালিজমের পুরোধা বলা উচিত নয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ। আঙ্গিকের দিক দিয়েও তাঁর কাজে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কালি-কলমের ওপর জল রং, জল রঙে এঁকে কলম চালিয়ে ফিনিশ করা, কলমের কালি শুকোবার আগেই রং চাপানো, স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ জল রঙের ব্যবহার ইত্যাদি নানা রীতিতে করা ছবির নিদর্শন রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত খরগোশের ছবিটিতে সূক্ষ্ম তুলি চালনার আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। অতি-সূক্ষ্মভাবে ড্রাই ব্রাশ চালাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। একটি গিরিস্থানের তিনটি স্টাডি, ভোরবেলা বনের ধারে ছোট্ট একটি পুকুর, নদীর ধারের মিল বা একেবারে মাটির কাছ থেকে দেখা ঘাস-ঝাঁট একটুকরো জমির ছবিতে নিখুঁত রিয়ালিজম ও গীতিকাব্য-ধর্মিতার মিলন খুব আধুনিক লাগে। এই আঙ্গিকের চর্চা আজকের আমেরিকান শিল্পী অ্যান্ড্রু ওয়াইয়েথের কাজেও দেখা যায়। ড্যুরারের প্রিয় নুরেমবার্গের শহরতলীর নিখুঁত বর্ণনার সঙ্গে শেষ বয়সের আঁকা কাল-ক্রয়েথ গ্রামের দৃশ্যের তুলনা করলে তাঁর স্টাইলের আরেক পরিবর্তন দেখা যায়। শেষোক্ত ছবিতে অনেক খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে দৃশ্যের সামগ্রিক রূপ ও মেজাজটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের জোরালো তুলি চালনা এবং সামগ্রিক মেজাজ বাহুল্য বর্জন করে তুলে ধরার চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি আরো প্রায় একশ বছর বাদে হার্কিউলিস সেগার্স ও রেমব্রান্ট প্রমুখ শিল্পীদের কাজের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

১৪৯৬-এ স্যাক্সনির শাসক ও পরবর্তীকালে লুথারের আশ্রয়দাতা ফ্রেডারিক দি ওয়াইজ ড্যুরারকে দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি ও গীর্জার জন্যে দুটি ধর্মীয় ছবি আঁকান। ফলে এঁর সঙ্গে শিল্পীর আজীবন সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। এই সময়েই তিনি বড় একটি জায়গায় নিজের কর্মস্থল সরিয়ে নিয়ে যান, সহকারী নিযুক্ত করেন, একটি প্রেস কেনেন এবং পির্খাইমারের দর্জিকে দিয়ে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করিয়ে একজন উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকের মত সাজ-সজ্জা করে নিজের একটি ছবি আঁকেন। জানলার ভেতর দিয়ে দূরে ইটালীর পার্বত্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে শিল্পী দুটি হাত একত্র করে সংযতভাবে

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বাণী রমাকান্ত দাস কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত

শ্রীরামদাস প্রতিভা

শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাঁর 'বহুমুখী প্রতিভা' ও 'গানের' এক অপূর্ব সম্পুট। মূল্য—৫.০০

সংকীর্তন রণবীর

শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের 'আবির্ভাব' হইতে 'তিরোভাব' পর্যন্ত সুমধুর চরিত-কথা। মূল্য ১.০০। বোর্ড বাঁধাই ২.০০।

দাস গোস্বামী

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুপম জীবনালেখ্য। মূল্য—১২.৫০

এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন—"গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস ও দর্শন এবং সাধনা ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে নানা অজ্ঞাত ও অপূর্ব সংবাদ পাইয়াছি।"

প্রাপ্তিস্থান
(১) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২;
(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬;
(৩) 'সাধকের' বুক স্টল, কালীবাড়ী, কলিকাতা—৩৫।

ফোর অ্যাপস্‌লস (১৫২৬)

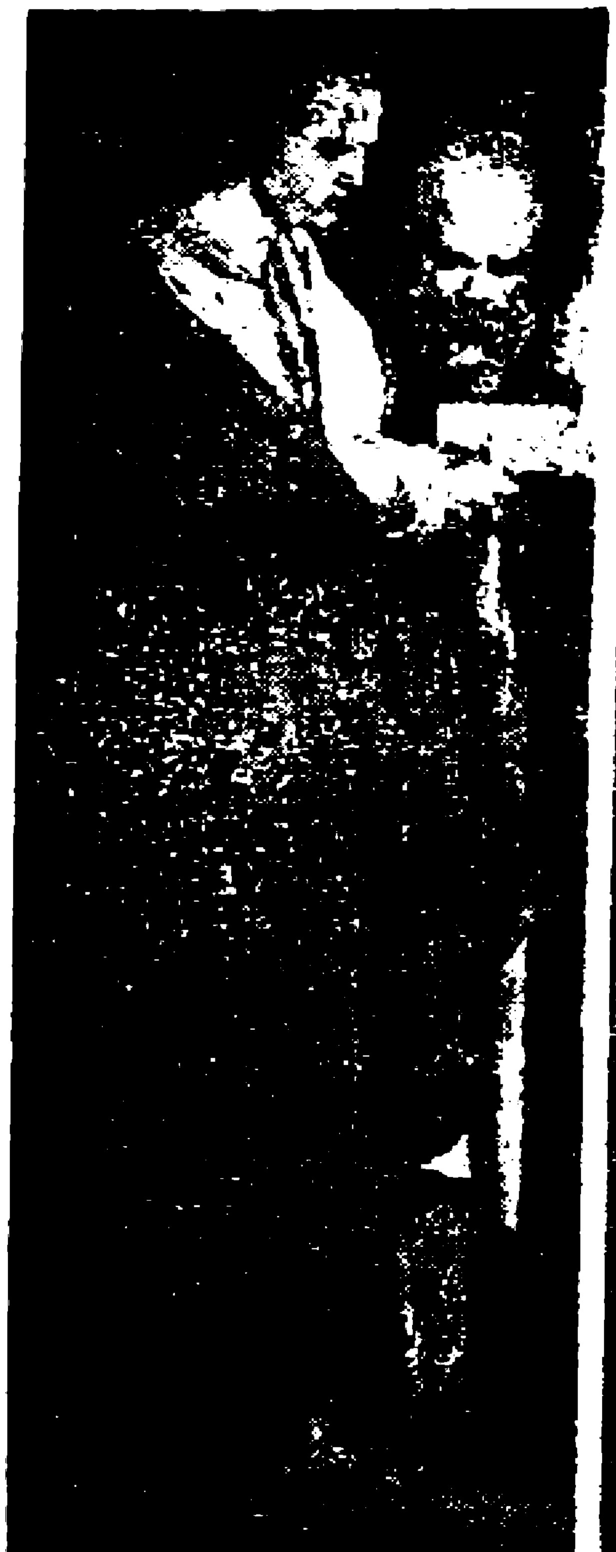

কতকটা আভিজাত্যের সঙ্গে দর্শকের দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে ফ্লেমিশ ও ইটালিয়ান রীতির সুন্দর মিলন ঘটেছে। দক্ষিণ ইউরোপে শিল্পী তখন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, আর সে-সম্মান আদায় করেছিলেন লিওনার্দো। উত্তরে এই প্রথম শিল্পীকে 'ভদ্রলোক' হিসেবে আঁকা হল আর এই সামাজিক সম্মানও সেখানে আদায় করেন জার্মানীর লিওনার্দো, আলব্রেখট ড্যুরার। বয়স তখন তাঁর ছাব্বিশ—সারা ইউরোপে তাঁর খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়ার মুখে।

কোন বিরাট পেন্টিং বা রাজা-মহারাজার বিরাট পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে এই খ্যাতি আসেনি। তাঁর নিজের ছাপিয়ে বার করা কতগুলি কাঠখোদাই ইলাস্ট্রেশন থেকেই তাঁর এই খ্যাতির সূত্রপাত। যুগের পটভূমিকায় ঘটনাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইটালীর রেনেসাঁসের ধারা যদি প্রাচীন গ্রীস রোমের সৌন্দর্য ও দর্শনের পুনরুজ্জীবনের খাত বেয়ে এসে থাকে ত জার্মান রেনেসাঁসের লক্ষণ হিসেবে ধর্মের পুনরুজ্জীবন বা রিফর্মেশনকে ধরা যেতে পারে, যার প্রধান নায়ক হচ্ছেন মার্টিন লুথার। চার্চের নানারকম দুর্নীতি থেকে তাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে তা প্রোটেস্টান্ট মতবাদ হিসেবে আলাদা একটি মতবাদ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের অনেক আগেই আকাশে বাতাসে এই সংস্কারের রব ও দুর্নীতির প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, এই পাপের রাজত্ব বেশী দিন চলবে না, শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতেই তা আসবে। নানারকম অনৈসর্গিক দুর্লক্ষণ দেখা যেতে থাকে এবং সেসব শেষ বিচারের পূর্বাভাস বলে ধরা হয়। গীর্জায়-গীর্জায় ধর্মভীরুদের ধর্ণা পড়ে যায়। এই সময় ১৪৯৮-৯৯ নাগাদ ড্যুরার 'সেন্ট জনের রিভিলেশন'-এর একটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাদেশরূপে প্রাপ্ত বিশ্বের পাপ ও ধ্বংসের বর্ণনা করা হয়েছিল

১৫টি পুরোপাতা কাঠখোদাই ছবিতে সাজিয়ে এই অ্যাপোক্যালিপ্সের রূপ প্রকাশিত হয় এবং সারা ইউরোপ অস্য তৎকালীন ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখে একে সাদরে গ্রহণ করে। এই বইয়ের 'দি ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপ্স' ছবিটি হয়ত অনেকেরই পরিচিত। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে, পায়ের তলায় রাজা-মহারাজা পোপ কার্ডিনাল সব নরকের ড্রাগনের উদরস্থ হচ্ছেন। লুথারের আন্দোলন শুরু হবার ১৭।১৮ বছর আগেই শিল্পী চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এইভাবে প্রচার চালান। তাছাড়া উডকাট-শিল্পে ছবিগুলি যুগান্তর এনেছিল। এই প্রথম সরু মোটা রেখায় ছাপা ছবিতে এমন সুন্দর আলো, মডেলিং এবং টোনের প্রতিফলনে এক নাটকীয়তার সৃষ্টি হল। নিছক কারুশিল্প থেকে কাঠ খোদাই চারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হল। মান্টেনার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। ড্যুরারের গ্রাফিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তখনকার বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট রটারডামের এরাসমুস বলেছিলেন যে, অ্যাপেলেসকে রঙের সাহায্য নিতে হয়েছিল কিন্তু ড্যুরার শুধু কালো রেখাতেই রঙের কাজ শেষ করেছেন। এসব ছবিতে রঙ দিতে গেলে ছবির ক্ষতি হবে। ১৫১৭-তে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু হলে ড্যুরার লুথারকে কিছু প্রিন্ট পাঠান। লুথারও তার যথাযোগ্য সমাদর করে একটি চিঠি লেখেন তাঁর এক বন্ধুকে। ড্যুরারের বাসনা ছিল লুথারের একটি প্রতিকৃতি আঁকার, কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ না হওয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। লুথার যখন জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর ছবিগুলির জন্যে ড্যুরারের এই ছবিগুলিকেই আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। ড্যুরারের এই ছবি যখন প্রকাশিত হয় তার অল্পকাল পূর্বে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন এবং ভাস্কো-ডা-গামা সদ্য কালিকটে উপস্থিত হয়েছেন। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার চিত্র উল্লিখিত অশ্বারোহীদের তাণ্ডব শুরু হতে অল্প কয়েক বছর বাকি আছে।

শিল্পীর অন্তর্জীবনেও বোধহয় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৫০০ সালের আত্মপ্রতিকৃতিতে দু বছর আগেকার সেই সৌখীন ভদ্রলোকের কোন চিহ্ন নেই। খৃষ্টের মত সন্ন্যাসীর রূপ, রং বা সাজপোশাকের কোন বাহুল্য নেই। ঘোর রঙের মধ্যে সামনে ফেরা মুখ ও ডান হাতটুকু আলোকিত; কতকটা ধর্মীয় আইকনের মত। খৃষ্ট প্রতিমার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য দেখাবার কারণ হয়তো এই যে 'খৃষ্টের অনুসরণে' নিজেকে পরিপূর্ণ করবার বাসনা তাঁর মনে এসেছিল। যে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে শিল্পী সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই ঈশ্বরকেই বোধহয় তিনি এই বিচিত্রভাবে আরাধনা করেছেন।

১৫০২-এতে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দোকানটি বিক্রী করে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ড্যুরার অনেকগুলি উডকাট-এ

এনগ্রেভিং করেন। এ সময়কার ছবির মধ্যে 'মেরীর জীবনী' কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও কিছু ধর্মীয় চিত্র এবং 'রিটার্ণ অব প্রডিগাল সান', 'সেন্ট ইউস্টাস', 'গ্রেট ফরচুন (বা নেমেসিস)' এবং 'ফল অব ম্যান' নামে কয়েকটি এনগ্রেভিং বিখ্যাত। নেমেসিস ছবিটি নানা প্রতীকে ভরা এবং মনুষ্যদেহ রচনার এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ভিট্রুভিয়াসের পরিমাপে তৈরী হলেও ইটালীয়ান আদর্শের চাইতে অধিক রিয়্যালিজমই বেশী প্রকট। শূন্যে ভাসমান নেমেসিসের পায়ের তলায় টিরোলিয়ান আল্পসের নিসর্গ দৃশ্যটি চমৎকার। 'ফল অব ম্যান' ছবির আডাম, ইভ, সাপ, জীবজন্তু ও গাছপালার বিভিন্ন টেক্সচার ও এনগ্রেভিং-এর সূক্ষ্মতা আর পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্য করার মত। এ যুগের পেন্টিং-এর মধ্যে, ফ্রেডারিক দি ওয়াইজের জন্যে আঁকা (বর্তমানে উফিৎসিতে) 'অ্যাডোরেশন অব দি মেজাই' বিখ্যাত। নিখুঁত স্পেসের মধ্যে নিখুঁত কয়েকটি মূর্তি বসানো। ভাঙা প্রাচীন বাড়িঘরের পটভূমিকায় শিশুযীশুকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপহার দিতে এসেছেন। মধ্যের ফিগারটি লিওনার্দোর মত। রং কম্পোজিশন সবই জমাট তবে পটভূমি ও ফিগার আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজমান।

ভেনিসের জার্মান ব্যবসাদারদের অনুরোধে তাদের গির্জার একটি বৃহৎ বেদীচিত্র আঁকবার জন্যে তিনি দ্বিতীয়বার ইটালী যাত্রা করেন। ১৫০৫-৭ পর্যন্ত এই ইটালী প্রবাসকালে তিনি বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে অনেকের সম্মান ভালবাসা ও ঈর্ষা কুড়িয়েছেন। পির্খাইমার তাঁর খরচ হিসেবে কিছু আগাম টাকা দেন ও নিজের জন্যে নানান জিনিস কিনে আনতে বলেন। ড্যুরারের চিঠিতে জানা যায় ভেনিসের জার্মান সুযোগ পেলেই যানুষ জন্তু সবাইকে ঠকায়।

এখানে তিনি বেশ সৌখীন জীবনযাপন করতেন। এমন কি নাচের ইস্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাল-জ্ঞানের অভাবে বার দুয়েক চেষ্টার পর ও পথে আর পা দেন নি। অনেক শিল্পী তাঁকে ঈর্ষা করত বলে তাঁর বন্ধুরা যত্রতত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বারণ করেন কারণ এদের বিষ খাওয়াবার বদনাম ছিল। ড্যুরার লিখেছেন, 'সুযোগ পেলেই এরা আমার ছবির নকল করে, আর বলে বেড়ায় যে আমার কাজে কোন ধ্রুপদী গুণ নেই।' বৃদ্ধ জোভান্নি বেলিনি তখনো জীবিত এবং ড্যুরার তাঁকে ভেনিসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সম্মান করতেন। বেলিনি তাঁর স্টুডিওতে এসে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও তাঁর একটি ছবি কিনতে চান। একবার তিনি ড্যুরারের কাছে, যে সব তুলিটি দিয়ে তিনি অত সূক্ষ্ম চুল আঁকেন, সেই রকম একটি তুলি প্রার্থনা করেন। ড্যুরার একটি সাধারণ তুলি বেছে নিয়ে ক্যানভাসে দীর্ঘ কয়েক গোছা চুল এঁকে দেখিয়ে দেন যে, তুলির গুণে নয়, তুলি চালানোর গুণেই সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়।

'ফীস্ট অব দি রোজ গারল্যান্ডস' ছবিটি তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের দুর্নামের মত জবাব হয়েছিল। উত্তর ইউরোপের রেখা ও বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে ভেনেশিয়ান রঙের সুন্দর সমন্বয়ে এই ছবিটি সৃষ্টি হয়। ছবির বিভিন্ন প্রতীক আজকে সকলের কাছে পরিস্ফুট না হতে পারে, কারণ এখানে রোজারী বা জপমালার প্রবর্তন সম্পর্কে অনেক নিহিত ইঙ্গিত রয়েছে। মাতৃমূর্তি ছাড়া ছবির বিভিন্ন পাত্রপাত্রী সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিদের আদর্শে গড়া হয়। বহু মেরামতির পর আজকে অবশ্য মূল শিল্পীর হাতের কাজের অল্পই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ছবি যেদিন শেষ হয়, সেদিন ভেনিসের সমস্ত অভিজাতবর্গ ও শাসককুল ছবি দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের তরফ থেকে মোটা মাসোহারা দিয়ে শিল্পীকে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু নুরেমবার্গ ছাড়া ড্যুরার কোথাও বাস করতে চাননি।

এই সময়কার অন্যান্য ছবির মধ্যে 'ক্রাইস্ট অ্যান্ড দি ডক্টরস' একটু অসাধারণ। অভ্যাসসিদ্ধ খুঁটিয়ে কাজ করার পরিবর্তে কতকগুলি রঙের পোঁচে শেষ করা। যেন কায়দায় ফ্লুয়াশ্চর্য বৃদ্ধ মোটা বই হাতে কিশোর যীশুকে ঘিরে আছে আর তিনি শান্তচিত্তে তাদের কূটিল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ছবির কেন্দ্রাংশে নানা রকমের হাতের ভঙ্গী। বৃদ্ধদের চেহারা কতকটা লিওনার্দোর কতকটা বা বশ্-এর ক্যারিকেচারের মত তবে অধিক প্রভাবই প্রকট। এ সময় যে দু-একটি রমণীর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, সেখানে ভেনেশিয়ান রীতির প্রভাবই ছড়িয়ে আছে এবং দেখা যায়, যে সুন্দরীদের রূপের প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতাও তাঁর কম ছিল না।

ইটালী প্রবাসকালে স্থাপত্য, জ্যামিতি, দেহসংস্থান বিদ্যা ও পারস্পেকটিভের সমস্যা নিয়েও অনেক সময় দেন। আলবের্টি ও পার্শিওর চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পারস্পেকটিভের গোপন পদ্ধতি জানবার জন্য তিনি বোলোনা যাত্রা করেছিলেন। এ সময়কার ড্রয়িং থেকে স্বদেশে ফেরার পর আডাম ও ইভের যে দুটি প্রমাণ মাপের ছবি করেন অতেও অঙ্কের চেয়ে অধিক রীতিই প্রকাশ পায়।

নাইট, ডেথ অ্যান্ড দি ডেভিল (১৫১৩)

দেশে ফিরে একটি বাড়ি কিনে শহরের সম্মানিত নাগরিক রূপে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে থাকেন। ১৫০৭ ও ১৫১১-র মধ্যে যে গোটা তিনেক বেদীর চিত্র আঁকেন তার মধ্যে হেলার ও ল্যান্ডাউয়ার নামে দুই ব্যক্তির জন্য আঁকা দুটি ছবি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি পুড়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়টি আঁকতে হয়েছিল শহরের বৃদ্ধদের এক আশ্রমের জন্য। পবিত্র ট্রিনিটির চার দিক ঘিরে নানা সাধুসন্তদের মধ্যে ছবির দাতা উপস্থিত। ছবির প্রধান নাটকীয় অংশটি স্বর্গে স্থাপিত। নীচে মর্ত্যে শুধু একটু জায়গায় বিস্তৃত বিস্তৃত এক নির্জন দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিল্পী ঘটনাটি অবলোকন করছেন। দুরকম পারস্পেকটিভের ব্যবহারে স্বর্গকে নিকটে এবং মর্তকে দূরে স্থাপন করা হয়েছে। তুলি চলেছে এনগ্রেভিং-এর সূক্ষ্ম রেখায় যত।

এই সময়ে খৃস্ট-জীবনীর ওপর ১৪টি এনগ্রেভিং ও কাঠখোদাইয়ের একটি সিরিজ প্রকাশিত হয়। তাঁর এনগ্রেভিংগুলি পরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপ ছাড়া তুরস্ক, পারস্য এমন কি ভারতেও এগুলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

হোলি রোমান এম্পায়ার ম্যাক্সিমিলিয়ন ছিলেন একাধারে মধ্যযুগের শেষ নাইট ও রেণেসাঁসের একজন ইউনিভার্সাল ম্যান—সর্ববিষয়ে আগ্রহান্বিত সমাদর ব্যক্তি। ১৫১২তে নুরেমবার্গে এসে ড্যুরারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ড্যুরার সম্রাটের একটি কাঠকয়লায় স্কেচ করেন যার থেকে সম্রাটের মৃত্যুর পর একটি বৃহৎ উডকাট সৃষ্টি হয়। নিজের রাজত্বকাল স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি বিরাট পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে সেসব সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মহিমার প্রতীক হিসেবে সূক্ষ্ম কাঠখোদাইয়ের নানা প্রতীক চিহ্ন ভূষিত বিরাট এক বিজয় তোরণ ছাপা হয়। অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ড্যুরারের তত্ত্বাবধানে ও পির্খাইমারের দেওয়া বিভিন্ন আইডিয়ায় ১১-৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৯-৭৫ ফুট প্রস্থ তোরণটি ১৯২টি কাঠের ব্লক থেকে ছাপা হয়। একটি বৃহৎ জয়যাত্রার কাজও অনেকদূর এগোয় তবে সম্রাটের মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়নি। শুধু এর ব্লকগুলি পাশাপাশি সাজালে প্রায় বাট গজ লম্বা হয়। সম্রাটের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হয়েছিল শিল্পীর নিজের হাতে করা সম্রাটের প্রার্থনা পুস্তকের অলঙ্করণ। বিশেষ টাইপে ছাপানো এই বইয়ের পাতার মার্জিনে লাল, সবুজ ও বেগুনী রঙে কালিতে বাইবেলের চরিত্রের সঙ্গে নানা রকম জন্তু জানোয়ার, প্রতীক ও নিসর্গ দৃশ্য মিশিয়ে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক মেজাজের সমন্বয়ে বিচিত্র এক অলঙ্করণ সৃষ্টি করেন তিনি।

১৫১৪তে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর বাবার মত মায়ের কোন পেন্টিং নেই। কিন্তু মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে করা কাঠকয়লার ড্রয়িংটি অনেক পেন্টিং-এর চেয়ে মূল্যবান। শীর্ণ কায়া মৃত্যুর মূর্তি, দুটি বিস্ফারিত চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ও দুঃসহ ওষ্ঠাধরে ৬০ বছরের নিরন্তর বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। ছবির কোণে শিল্পী লিখে রাখেন তাঁর মা অনেক রোগ ভোগ করেছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু কখনো অভিযোগ করেন নি। মাস দুয়েক বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। ড্যুরার লেখেন মৃত্যুতে জীবিতাবস্থার চাইতেও তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমার সাধ্যমত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাধিস্থ করলাম।' এর কিছুকাল পরেই তাঁর বিখ্যাত এনগ্রেভিং 'মেলাঙ্কলিয়া' প্রকাশিত হয়।

১৫১৩ থেকে ১৪র মধ্যে যে তিনখানি 'মাস্টার এনগ্রেভিং' ড্যুরারকে গ্রাফিক শিল্পীদের অগ্রগণ্য করে রেখেছে সেগুলি হল 'নাইট, ডেথ অ্যান্ড ডেভিল', 'সেন্ট জেরোম' এবং 'মেলাঙ্কলিয়া-১'। এগুলি প্রায় একই মাপের এবং সম্ভবতঃ একটি সিরিজের কাজ। প্রথমটিতে সামনে মৃত্যু এবং পিছনে শয়তানকে উপেক্ষা করে সুদূরস্থ ধর্মের দুর্গকে লক্ষ্য করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্বত্য পথে নিঃশঙ্কচিত্তে এক অশ্বারোহী চলেছে; সঙ্গে বিশ্বস্ত কুকুর। এরাজমুসের খৃস্টীয় সৈনিকের বর্ণনার প্রভাবে আঁকা অপার্থিব ছবি। খৃস্টীয় পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিফলন হয়েছে দ্বিতীয় চিত্রে। ঘরের অজস্র খুঁটিনাটির বর্ণনার মধ্যেও দূরে লিখনরত বৃদ্ধের মূর্তি হারিয়ে যায় নি। সামনে অর্ধনিদ্রিত পোষা সিংহ, জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়া দুপোলী আলোয় একটা শান্ত ও ঘরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে। তৃতীয় ছবির বক্তব্য ও প্রতীক অনেক আলোচনার পরেও পরিষ্কার হয়নি। অনৈসর্গিক আলো-আঁধারের মধ্যে ছবির দক্ষিণে ডানাওয়ালা এক রমণী মূর্তি নানা যন্ত্রপাতি পরিবৃত হয়ে একটি ম্যাজিক স্কোয়ার ও সময়-নির্দেশক কাচের আধারের তলায় বসে কি যে চিন্তা করছে তার হদিশ মেলা ভার। পাশে এক শান-পাথরের ওপর কিউপিড বসে কি যেন লিখছে, পায়ের কাছে এক নিদ্রিত কুকুর। দূরে দিগন্তে এক উড্ডীয়মান বাদুড়ের কোলে লেখা 'মেলাঙ্কলিয়া-১'। আরো সিরিজ করবার ইচ্ছে ছিল কি না কে জানে। এ সময় শিল্পী নিখুঁত সৌন্দর্যের ফর্মুলা আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি একবার লেখেন, 'নিখুঁত সৌন্দর্য যে কি তা আমি জানি না।' তাই মনে করা হয় যে এখানে সৃষ্টির নানান যন্ত্রপাতি পরিবৃত হয়েও শিল্পী যে নিখুঁত সুন্দরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম তাই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিভার অশান্ত বেদনার এ এক রূপ। একে ড্যুরারের মোনালিসা বলা চলে।

সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান ড্যুরারের জন্যে একটি পেনসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মৃত্যুতে সেটি বন্ধ হয়ে গেলে নতুন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অনুমোদনের জন্যে আবেদন করতে ১৫২০তে ড্যুরার সস্ত্রীক নেদারল্যান্ডস যাত্রা করলেন।

নেদারল্যান্ডস ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর ডায়েরীতে পাওয়া যায়। নানা শহরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও শিল্পীদের কাছ থেকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান ও ভোজসভায় আমন্ত্রিত হন। তাঁর অনেক প্রিন্ট এ সময়ে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকে বিশেষ লাভ হয়নি, কারণ সামান্য উপকারের বিনিময়ে অনেক ছবি বিলিয়ে দেন বা অনেকের ছবি এঁকে দেন। অনেক অসাধারণ জিনিসের বর্ণনা বা ছবি আঁকা আছে এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনেছেন বলেও জানা যায়। জীল্যান্ডে এসে শোনেন সমুদ্রের ধারে এক বিরাট প্রাণী এসেছে। নৌকা নিয়ে তখনি দেখতে ছোটেন। কিন্তু ততক্ষণে সেটি (তিমি) ভেসে গিয়েছে। কিন্তু ফেরার মুখে কড়জলে ভিজে তাঁর যে ব্যাধি হয়, সেটি তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়েছিল। এরাজমুসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁর একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চিয়ান তখন পঞ্চম চার্লসের অভিষেকে যোগ দিতে আসেন। ড্যুরার তাঁর একটি ড্রয়িং ও পেন্টিং করে দেন এবং তাঁর সঙ্গে রাজা চার্লসের অভিষেকে উপস্থিত হন। এই দুই রাজাই শিল্পীকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়, কারণ বছরে ১০০ ফ্লোরিন পেনসন মঞ্জুর হয়েছিল। অ্যান্টওয়ার্পে তাঁকে স্থায়ী বসবাসের অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধের ব্রাশ ড্রয়িং তাঁর শেষের দিকের সেন্ট জেরোম নামে একটি পেন্টিং-এর মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ড্রয়িং-এর ওপরকার লেখা থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধের বয়স তখন ৯৩ এবং তাঁর শক্তি ও বুদ্ধি নষ্ট হয়নি। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ড্রয়িংগুলির একটি।

১৫২১এ দেশে ফেরার পর খৃস্টজীবনী নিয়ে একটি উডকাটের সিরিজ এবং পির্খাইমার, এরাজমুস, মেলাঙ্কথন (প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনে লুথারের অন্যতম সহকারী ও বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট) প্রমুখ করকে জনের এনগ্রেভিং প্রকাশ করেন। নুরেমবার্গের মেয়র যাকব মুফেল ও সেনেটর হিয়েরোনিমাস হলসুহের-এর দুটি প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য পেন্টিং। এই সময়ে নিপীড়িত খৃস্টের রূপে নিজের একটি ড্রয়িং করেন। উপবিষ্ট নগ্ন বেদনার্ত মূর্তি, হাতে নিপীড়নের যন্ত্র একটি চাবুক। ২২ বছর আগেকার সুন্দর মূর্তি নয়। এ যেন জীবনের সমাপ্তি সূচনা।

তাঁর শেষ মহৎ চিত্র হল 'ফোর অ্যাপসল্‌স' বা খৃস্টের চার শিষ্য পল, পিটার, জন ও মার্ক, যাঁরা খৃস্টের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে দেন। এ ছবিও কারো আদেশে আঁকা নয়। নিজের তাগিদেই এঁকেছিলেন এবং নুরেমবার্গের কাউন্সিলকে উপহার দিয়েছিলেন, কোন চার্চকে নয়।

তাগিদের কারণ ছিল। ড্যুরার যদিও ক্যাথলিক চার্চ পরিত্যাগ করেন নি, তবু

লুথারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডে থাকতে যখন গুজব ওঠে যে লুথার গ্রেপ্তার হয়েছেন তখনকার দীর্ঘ আক্ষেপ থেকে বোঝা যায় শিল্পী লুথারকে কি চোখে দেখতেন। তাছাড়া নুরেমবার্গ শহরই প্রথম লুথারের স্বপক্ষে যায়। কিন্তু লুথারের মতবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে তার যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তা লুথার ও সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। চরমপন্থীরা লুথারের শিক্ষাকে মূর্তি ধ্বংসে, সাম্যবাদ ও বহু বিবাহ ইত্যাদির সমর্থনে লাগাতে চায় এবং নানারকম অনাচার চালাতে থাকে। জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। লুথার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এদের উচ্ছেদ কামনা করেন। অনেকেরই মনে হল রোমের চাইতে ভেতরের শত্রুই বেশী মারাত্মক। তাই শহরের শাসকবর্গের প্রতি সতর্কবাণী হিসেবেই এই ছবির সৃষ্টি। খৃষ্টের প্রকৃত বাণীর কেউ যেন ইচ্ছামত বিকৃতি সাধন করে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে তারই সাবধান বাণী—প্রোটেস্টান্ট শিল্পের একটি দলিল।

দীর্ঘকার দুটি প্যানেলে দুজন করে পূর্ণাঙ্গ দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁদের হাতে বাইবেল ও বিভিন্ন প্রতীক। ছবির নীচে তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি লিপিবদ্ধ করা। ছবির সামনের দিকে জন ও পল এবং পেছন দিকে পিটার ও মার্ক যেন চারদিক রক্ষা করছেন। সে যুগের ধারণা অনুযায়ী চারজনকে চার রকমের চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চেহারাগুলি সমকালীন অনেক বিখ্যাত চরিত্রের থেকে আহরণ করা হয়। এর রং রূপ মডেলিং কাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই রেনেসাঁস আদর্শের ছাপই বেশী। ১৫২৬এ নুরেমবার্গ কাউন্সিলকে ড্যুরার একটি চিঠিতে লেখেন, 'এইমাত্র যে ছবিটি আঁকা হয়েছে তাতে যে কোন ছবির চাইতে বেশী পরিশ্রম করেছি। একমাত্র আপনাদেরই আমি এই স্মৃতিচিহ্নটি রক্ষা করবার উপযুক্ত বলে মনে করি।' কোন অতিশয়োক্তি করেন নি। কাউন্সিল সাদরে এই উপহার গ্রহণ করেন ও শিল্পীকে উপহারস্বরূপ ১০০ ফ্লোরিন দেন।

১৫২৮-এর ৬ই এপ্রিল ড্যুরার মারা যান প্রায় হঠাৎই। বন্ধু পির্কাইমারও তাঁর আকস্মিক অসুস্থতার খবর পাননি। লুথার থেকে শুরু করে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করেন। সামান্য স্বর্ণকার গৃহে জন্মে রাজা-মহারাজা, জ্ঞানী-গুণীদের সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন তিনি এবং প্রায় একাই জার্মানীকে রেনেসাঁস শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যান।

শিল্পী-জননী (১৫১৪)

শিল্পচিন্তায় রেনেসাঁস থেকে পথের সন্ধান নিলেও নিজের অভিজ্ঞতা এবং গথিক আদর্শ থেকে গ্রহণীয় কিছু তিনি পরিত্যাগ করেন নি। শিল্প শিক্ষার জন্যে যে বৃহৎ বইয়ের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তাতে নিজের অর্জিত জ্ঞান সকলকে দিতে চেয়েছিলেন। অনেকের মত আর্টিস্টের কলাকৌশল গোপন করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। পারস্পেকটিভ, শরীর সংস্থান বিদ্যা, স্থাপত্য, অঙ্কন বিদ্যা এবং আশ্চর্যের বিষয় প্রতিরক্ষার ওপরেও মূল্যবান রচনা রেখে যান। কামানের প্রচলনের ফলে তখন যুদ্ধব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তাঁর অল্প কয়েকটি এচিং-এর মধ্যে বিস্তৃত নিসর্গ দৃশ্যের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বৃহৎ একটি কামান একটি অনবদ্য ছবি। তাঁর প্রতিরক্ষার ওপর বইটি গত শতাব্দী পর্যন্ত সমরবিদরা আলোচনা করেছেন।

লুথারের বাইবেল প্রকাশিত হলে জার্মান গদ্যের রূপ পরিবর্তন হয়। ড্যুরারের দানও উপেক্ষণীয় নয়। তিনিই প্রথম জার্মান গদ্যে বৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক রচনার সূত্রপাত করেন। এর পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর অনেক কিছুই তাঁকে হাৎড়ে বার করতে হয়েছিল: কারণ ল্যাটিনেই এসব বিষয় নিয়ে লেখা হত।

সারা জীবন তিনি আদর্শ সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন। কিন্তু শেষে বোঝেন যে, অনেকের মত গ্রহণ করলেই যে কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলতেন যে যতই প্রকৃতির অনুকরণ করা যায়, ততই ছবির শিল্পগুণ বাড়ে, তবে অন্ধের মত অবৈজ্ঞানিক প্রথায় করলে চলবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই আদর্শ সৌন্দর্যের ধারণা করতে পারেন, মানুষ কেবল আপেক্ষিক সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করতে সক্ষম। তাই যা কিছু তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তার মধ্যেই সৌন্দর্যকে দেখতে চেয়েছেন। নেদারল্যান্ডে থাকার সময় মেক্সিকো থেকে সদ্য লুণ্ঠিত সোনারূপোর কাজ ও ওয়েস্টইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। তখন এসব জিনিসের মধ্যে নিছক কৌতূহলের খোরাক ও এর আর্থিক মূল্যটাই সকলের কাছে প্রধান ছিল।

তিনি মনে করতেন শিল্পী চয়ন করবে বাইরে থেকে আর তার সমন্বয় হবে মনের মধ্যে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে চক্ষুষ্মান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে বাইরের সাহায্য বিনাই রূপ সৃষ্টি সম্ভব। শিল্প এবং জ্ঞান তাঁর কাছে সমার্থক ছিল, এবং যেহেতু এ জিনিস প্রকৃতিতে নিহিত তাই তার ভেতর থেকে একে নিংড়ে বার করতে হবে। তবে ঈশ্বরের চেয়ে ভাল কিছু সৃষ্টি করার দাবি মানুষের নেই। ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাঁর শিল্পচর্চায় ধর্মবিষয়ক ছবি ও যুগের প্রধান ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি এই দুটি বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

প্রতিভার মৌলিকত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন যে, প্রতিভাবান শিল্পীর এক বেলায় আঁকা কালি-কলমের একটি স্কেচ অপরের এক বছরের পরিশ্রমে আঁকা বৃহৎ ছবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আজ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে হতে পারে; কিন্তু যে যুগে রং-তুলি-ক্যানভাসের দাম আর পরিশ্রমের ঘণ্টা হিসেবে ছবির মূল্য ধার্য হত বা কটা মূর্তি আঁকা হয়েছে গুণে দেখা হত, সে যুগে এই উক্তির মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। শিল্পীর নিজের আঁকা ছবি এবং ড্রইংগুলির মধ্যেও এই উক্তির সত্যতা দেখা যাবে। নিজেও এই অন্যায় সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর সমস্ত ছবি ও ড্রয়িং তাঁর বিখ্যাত মনোগ্রাম দিয়ে সই করতেন ও তারিখ দিয়েছেন, প্রিন্ট জাল হলে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা নিয়েছেন এবং প্রায় নার্সিসিস্ট-এর মত নিজের প্রতিকৃতি এঁকে গিয়েছেন ও তাঁর পারিবারিক ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। সে যুগে তিনিই উত্তর ইউরোপের একমাত্র শিল্পী যাঁর লেখা থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে এত তথ্য জানা যায়।

তবু এত বিদ্যা ও নিজের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে বিনয় থেকে বঞ্চিত করেনি। শেষ বয়সে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার নিজের শিল্পকে আমি সামান্যই জ্ঞান করি। সকলে যেন তাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আমার ভুলভ্রান্তিগুলির সংশোধনের চেষ্টা করে। যদি ঈশ্বর করতেন তবে ভবিষ্যতে যেসব মহাশিল্পীরা আসবেন তাঁদের কাজ আমি দেখে যেতে পারতাম।'

সাহিত্য সংস্কৃতি

বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙালীর সমাজ ও জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক স্থায়ী আসন বিস্তার করেছেন। বাঙালী এমনভাবে আর কোন মনীষীকে গ্রহণ করেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ধর্মগুরু ছিলেন না, রাজনৈতিক নায়কও ছিলেন না যে, তাঁকে ঘিরে বাস্তুপূজার প্রবণতা গড়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক আর সর্বোপরি তাঁর জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাঙালীর হৃদয় মন জয় করেছেন। তাঁরই ভাষায়—'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি' ... 'আমায় ঘিরে আমার বৃত্তি, কেবল তুমি, কেবল তুমি।' — তিনি আমাদের ঘিরে আছেন। তাঁর তিরোভাবের পর এতগুলি বছর কেটে গেছে, আজ যাঁরা যুবক তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের পর জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা প্রবীণ তাঁরা সেদিন নবীন ছিলেন। ইতিমধ্যে দেশ বিভাগ ঘটে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর তার পর স্বাধীনতা-উত্তর-অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব হ্রাস পায় নি, হ্রাস করার প্রয়াস সফল হয় নি। তিনি আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের পৈশাচিক তাণ্ডবের বীভৎস আবহাওয়ায় আমার ভেসে উঠল রবীন্দ্রনাথের সেই আনন্দময়ের মূর্তি। ধ্বনিত হল তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।' রবীন্দ্রনাথ বাঙালী, কারণ তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাংলা ভাষায় লিখেছেন, বাঙালী জাতিকে একটা নতুন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলাদেশে খান সেনাদের উৎপাতের পর অনেক বিদেশী সাংবাদিক ইয়াহিয়ার বর্বরতার একটা সুস্পষ্ট চিত্র বিশ্বের দরবারে পেশ করেছেন। একমাত্র এই সব নির্ভীক সাংবাদিকের নিরপেক্ষ ডেসপ্যাচ আর বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের সমস্যাকে কিছু পরিমাণে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিকপত্র 'নিউইয়র্ক টাইমসের' সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম জেমস পি ব্রাউন লিখিত 'বাংলাদেশ—রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার, অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিহাস' — নিবন্ধটি নিউইয়র্ক টাইমসের ৩রা মে ১৯৭১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো একটি প্রভাবশালী দৈনিকপত্রে বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ। এই ধরণের একটি আলোচনা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। মিঃ জেমস পি ব্রাউনের রচনাটির অংশ বিশেষ যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল তা অতিশয় বিভ্রান্তিকর এবং রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ হীনভাবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা হয়েছে এমন ধারণা পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক।

মিঃ ব্রাউন পূর্বে দু বছর কলিকাতায় বাস করেছেন এবং বাঙালীর জীবন ও সমাজ তাঁর কাছে বিশেষ পরিচিত। আমাদের জনৈক লেখকবন্ধু শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহ মিঃ ব্রাউনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁর কলিকাতায় অবস্থানের কালে। শ্রীযুক্ত সিংহ 'নিউইয়র্ক টাইমসের' সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি কোথাও সন্ধান করতে না পেরে মিঃ ব্রাউনের কাছে সেটি চেয়ে পাঠান, এবং সেই সূত্রে তাঁকে জানান যে, এই প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ এখানে মুদ্রিত হওয়ায় রবীন্দ্রানুরাগী সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পত্র পাঠমাত্র মিঃ ব্রাউন প্রবন্ধের একটি অনুলিপি পাঠিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একদা বাঙালী মহলে তিনি যেভাবে সমাদৃত হয়েছেন সেকথাও জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সিংহের কাছে প্রেরিত এই প্রবন্ধটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় মিঃ ব্রাউন বাঙালীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা সুনিপুণ ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন।

তিনি বলেছেন—"গঙ্গার উপত্যকায় ১১০ মিলিয়ন বাঙালীর বাস, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের এটি পূর্বাঞ্চল। পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন ৭৫ মিলিয়ন মুসলমান এবং ভারতের পশ্চিম বাংলায় বাস করেন ৩৫ মিলিয়ন হিন্দু, ভারতীয় উপ-মহাদেশে এরা আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের সমগোত্রীয়।"

মিঃ ব্রাউন অবশ্য একটি বিরাট ভুল করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ৭৫ মিলিয়নের মধ্যে হিন্দুও কিছু ছিলেন এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ৩৫ মিলিয়নের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন মুসলমানও আছেন।

মিঃ ব্রাউন বলেছেন, চরিত্রে বাঙালীরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাহসী হয়ে ওঠে আবার কখনও তারা অতি সুশ্রী, ভদ্র এবং তীব্রভাবে কবিতা এবং রাজনীতিতে আসক্ত। তারপর বলেছেন—

> "It is no exaggeration that where there is one Bengali there is a poet; where two, a little magazine, where three a political party".

সাহিত্য ও রাজনীতির সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ মিঃ ব্রাউন তা দেখে গেছেন। তিনি কলিকাতা ও ঢাকাস্থ কফি হাউসে বিরামবিহীন আড্ডার আলাপচারও দেখেছেন। বলেছেন গ্রামের অশ্বত্থের তলায় এই সব সামাজিক আলোচনা কেন্দ্র বসে। আর এই সব কারণে পশ্চিম পাকিস্তানীবৃন্দ এবং ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসীরা বাঙালীদের 'অলস এবং গল্পে' বলে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে দেখে থাকেন। আর অপর পক্ষে—

> "The Bengalis, in turn, assert there considerable intellectual and cultural achievements with disdain for outsiders that often borders on insufferable arrogance".

বাঙালীর চরিত্রে এই ঔদ্ধত্যের মধ্যে অন্য কারণও যে আছে মিঃ ব্রাউন সেদিকটা বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়ত পান নি। তিনি বলেছেন—বাঙালীরা বিদেশীদের প্রতি অতিশয় মধুর ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার উৎসাহবর্ধক। বাঙালীদের বাসভূমি সবুজ শ্যামল, প্রায় আয়ারল্যাণ্ডের মতই। তবে আয়ারল্যাণ্ডের চেয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মাটি অতিশয় উর্বর। এখানে ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি বীজ পড়লেই জন্মায়। অনেক মাছ নদীর জলে সন্তরণশীল। কিন্তু মধ্যযুগীয় দুর্ভিক্ষগ্রহের অভাবে এবং আধুনিক ওষুধপত্রের দয়ায় এই আবহাওয়ায় প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে এই দুটি অঞ্চলের জনসংখ্যা এদেশের মধ্যে সর্বাধিক। একদা দেশের কাজ বলে বিহার

কথা সম্ভব ছিল সেদেশ আজ নিদারুণ দারিদ্র্যের কবলে।

কিন্তু এই অত্যধিক জনবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের পরিবেশ অতি-মনোরম। দৃশ্যপট কাব্য সুষমায় মণ্ডিত। সবুজ বাঁশের ঝাড়, নারকেল গাছের সার আর গ্রীষ্ম অঞ্চলের উষ্ণ আবহাওয়া সব জড়িয়ে এ এক বিচিত্র দেশ। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ অনেক গ্রাম দ্বীপের আকৃতি নেয়। আর বাংলার পল্লী অঞ্চলের সৌন্দর্য এবং বাঙালীর বিত্তবৃত্তি—

"The beauty of the Bengal country side and the spirit of the Bengalis is encapsulated in the works of the Nobel Prize-winning poet-philosopher Rabindranath Tagore. Every Bengali, Hindu or Mosle . reveres Tagore and can recite from his works by heart".

এর পর তিনি লিখেছেন—অনেক বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগীয় জনৈক পদস্থ ব্যুরোক্র্যাটের সঙ্গে একদা তিনি জীপে চড়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন। সেদিনকার সন্ধ্যাটি চমৎকার। সহসা তিনি রবীন্দ্রনাথের ছন্দোময় কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পৈশাচিক অত্যাচারের কালের একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন—

"Several weeks ago, during the brutal suppression of the Bengali autonomy movement in Dacca, West-Pakistani troops broke into a school master's home and angrily pointed to a picture of a bearded and on the wall.

"Bhasani?" they demanded accusingly, referring to the East Pakistani Communist leader.

"No" he replied scornfully "Tagore".

সৈন্যদল সন্তুষ্ট। লোকটা তাহলে বিদ্রোহী নয়। স্কুল মাস্টারকে ছেড়ে দিয়ে সৈন্যরা বিদায় হল।

মিঃ ব্রাউন বলেছেন, কিন্তু ওরা ভুল করেছে। যে কোন উগ্র রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে ছন্দের কবির ভয়ংকরত্ব অপেক্ষাকৃত কম মনে করে ওরা ভুল করেছে।

এর পরই তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—

"Tagore, through his enormous contributions to enriching the Bengali language, has been a major force fostering Bengali nationalism which has precipitated violent division in Pakistan and chronically threatens the unity of India. This is an ironic legacy for a poet who preached the brotherhood of all men".

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জীবনে ও সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন একথা মিঃ ব্রাউন স্বীকার করেছেন, তবে সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমস্যার এই চমৎকার বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। তথাপি তাঁর এই সহানুভূতিশীল নিবন্ধটির জন্য বাঙালী হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞ। —[illegible]

BANGLADESH—TAGORE'S IRONIC LEGACY (An article) By JAMES P. BROWN, a member of the Editorial Board—of the New York Times — (N. Y. TIMES : May 3, 1971)

সাহিত্যের খবর

রাখালদাস নাহার শোকসভা : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাখালদাস নাহার কয়দিন আগে গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। পরিচিত-অপরিচিত সকলেই এই মানুষটির মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। গত শুক্রবার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সকল দল এবং জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, আপনারা এমন এক পরিবেশ রচনা করুন যার মধ্যে সাংবাদিকরা নির্বিঘ্নে ভয়হীন চিত্তে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন। সাংবাদিকরা কারো শত্রু নন, তাঁরা জনগণের দাস। তাঁরা নিজস্ব বিবেক অনুসারে সৎ মনোভঙ্গীতে সংবাদ রচনা করেন। কোনো রিপোর্টার রচিত রিপোর্ট একদিন হয়ত প্রীতিকর মনে হল না, কিন্তু সেই বিশেষ রিপোর্টার রচিত অন্য রিপোর্ট পরদিন হয়ত প্রীতিকর হল। প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে আমি জানি সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে কি পরিমাণ বিপদের ঝুঁকি সাংবাদিককে নিতে হয়। আমার মতে সাংবাদিকরা মহৎ দেশপ্রেমিক, কারণ সংবাদপত্রে কাজ করে তাঁরা জাতির সেবা করে থাকেন। নাহার মৃত্যুতে আমি ব্যথিত, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন. এই কঠিন পরিশ্রমী মানুষটি সর্বদাই সকলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতেন। তাঁকে হত্যা করে কার উপকার হল জানি না—সাংবাদিকের এই জাতীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আর কোনো রেকর্ড নেই। সভায় প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত একটি বাণী পঠিত হয়।

মানব মস্তিষ্ক বিষয়ে বক্তৃতা : সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে মানব-মস্তিষ্ক প্রসঙ্গে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন ডাঃ বি মুখোপাধ্যায়। মস্তিষ্ক সম্পর্কে সহজ এবং সরল ভঙ্গীতে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন—আমাদের মস্তিষ্কের ওজন মাত্র তিন পাউণ্ড, তার ভিতরে যে পদার্থ থাকে তা সামান্য অথচ তার ভিতর প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ নার্ভ-সেলের অবস্থান। এদের কার কি ভূমিকা তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কি কি কাজ করে তা নির্ধারণ করেছেন, যথা মস্তিষ্কের সামনের

প্রকাশিত হল তরুণ প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক
বীরেন্দ্র দত্তের তৃতীয় গল্প সংকলন
জলবিন্দু ২-৭৫
এই লেখকের পূর্বপ্রকাশিত গল্প-সংকলন
অমিল পয়ার ৩·০০ পুরনো পট ধূসর ছায়া ৫·০০
লেখনী সাহিত্য মন্দির * ৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২

বল বৰ্দ্ধিত ও সৃজনশীলতার কাজে সহায়ক। মানব-মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থাই চরম অবস্থা নয়, ভবিষ্যতে এই মস্তিষ্কের বিকাশ আরো উন্নত এবং প্রখর হবে।

সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ আয়োজিত মস্তিষ্ক-বিষয়ক দেওয়াল-চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য এ-বছর বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন 'মহাজাতি সদনে' আগামী ২১শে আগস্ট ১৯৭১ থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ আগামী সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনের বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানসূচীর জন্য উত্তর বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সদস্যপদ গ্রহণের শেষ তারিখ—৮ই আগস্ট, '৭১ ধার্য করা হয়েছে। এসম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মেলন কার্যালয় ১১বি, বাদামতলী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৭ এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব : ইন্দোনেশিয়া ও রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের যুক্ত প্রচেষ্টায় আগামী আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ভারত সরকার কর্তৃক এই অনুষ্ঠানে প্রতি-নিধিত্ব করার জন্য মনোনীত হয়েছেন। তিনি ভারতে রামায়ণের শিল্পরূপায়ণ বিষয়ে ভাষণ দান করবেন।

নতুন বই

ও আমার সোনার বাংলা (সংকলন)—সোমেন পাল সম্পাদিত। বিজেন্দ্র পাবলিকেশন : ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাংলা দেশ খণ্ডিত। রাজনৈতিক বেড়াজালে দু-পারের মানুষের মুখ দেখাদেখি যেখানে ছিল বন্ধ, সাংস্কৃতিক সংযোগের সম্ভাবনাও সেখানে ছিল অবান্তর। অথচ ওপার বাংলার ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রসারিত হয়েছে ; সমৃদ্ধ হয়েছে। যবনিকার অন্তরালে বর্তমান, সেই সংস্কৃতির স্বাদ আমরা পাইনি। ওপার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ঘোষণা করায়, সীমান্তের আবরণ শিথিল হয়েছে। অসংখ্য মানুষ এপারে আশ্রয় নিয়েছেন নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে এপারে এসে পৌঁছেছে ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদ, যা আমাদেরও একান্ত নিজস্ব।

ওপার বাংলার রচনাবলীর কিছু কিছু সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হোচ্ছে এপারে। ওপারের কবি, কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার, বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় আলেখ্য এইসব সংকলন। 'ও আমার সোনার বাংলা'র সম্পাদক সোমেন পাল বাংলাদেশের লেখক-দের রচনা নির্বাচন করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ এই সংকলনটিতে যাঁদের লেখা আছে শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মফরুদ্দিন উমর, আহমদ ছফা, জসীমুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান, কায়সুল হক, শাহেদা খানম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নিয়ামত হোসেন, দিলওয়ার, রাবেয়া খাতুন সিকদার আমিনুল হক, আবদুর সিদ্দিকী ওমরআলি, মুনীর চৌধুরী, জাহাঙ্গীর খালেদ, সাহেদ আলী, আনোয়ার আহমদ, আনসার আলী, শাতিল হায়দার, আব্দুল-কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ সামসুল হক, মাহবুল হক, মাহমুদ আলি জামাল, এবং আবুল হাসান। সংকলনটি সমাদৃত হবে।

আরব্য রজনী (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)—তারাপদ রাহা। বুকো অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম পাঁচ টাকা।

'আরাবিয়ান নাইট' এক অফুরন্ত গল্পের খনি। বাংলা ভাষায় এর কিছু কিছু অনুবাদ হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। শ্রীতারাপদ রাহা সেই দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। আরব্য রজনীর চারটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বেরিয়েছে ৫ম ও ষষ্ঠ খণ্ড। আগেকার খণ্ডগুলির আলোচনাকালে আমরা লেখকের উদ্যম এবং প্রকাশকের দায়িত্ববোধকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। শাহারাজাদীর যাদুকরী গল্পের ইন্দ্রজাল বাংলাভাষী পাঠককে যে মুগ্ধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শ্রীরাহা অপূর্ব মুন্সিয়ানায় গল্পের সম্পূর্ণ অবয়বকে দেশীয় পরিমণ্ডলে নিয়ে এসেছেন। বর্তমান খণ্ডদুটিতে আছে অপূর্ব আতিথেয়তা, তিনবোনের কাহিনী, নকল-খলিফা, চোর চোর নয়, জেলে খলিফার কাহিনী, কামার-অল-জমান ও বুদুরের কাহিনী, ছদ্মবেশে খলিফা এবং আবু হাসানের কাহিনী। রসগ্রহণ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কণ্ঠস্বর (নজরুল জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা)—সম্পাদক : সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪১।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা—১১। দাম : তিরিশ পয়সা।

কণ্ঠস্বর আধুনিক কবিতার মুখপত্রী মাসিক মুখপত্র। গত পাঁচ বছর ধরে এই পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গে তরুণদের কবিতা আন্দোলনে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কবিতার ছন্দ, গতি ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন এঁরা। আলোচ্য সংখ্যাটি অভিনব এজন্য যে, কবি নজরুলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উভয় বাংলার প্রায় বাটজন কবি-সাহিত্যিক কবিতা ও আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত অনেক সাহিত্যিকেরও পাশে অতি তরুণরাও লিখেছেন। নজরুলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি, নজরুল রচনা থেকে উদ্ধৃতি ও নজরুল গ্রন্থাবলী থাকায় পত্রিকাটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা পাবে। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সৌমেন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতিরা কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে রচনা লিখেছেন তাও সংক্ষেপে আছে। পত্রিকাটি পরিকল্পনা করেছেন অমিতাভ চৌধুরী।

উষালোক (আষাঢ়, ১৩৭৮) সম্পাদক : পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য। ১২৩।এ, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। পঞ্চাশ পয়সা।

সাময়িক পত্রিকার অভাবে নবজাতকের নতুন দৃষ্টিকোণ গল্প-কবিতার সংকলন হিসেবে। সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্য আন্দোলনের ওপর লেখা তরুণ সন্যালের প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রকাশিত হয়েছে—রজতজয়ন্তী সংখ্যা

বর্ষপঞ্জী ১৩৭৮

দেশবিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ বাংলাভাষায় একমাত্র 'ইয়ার-বুক'

গত ২৫ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু আজ বলেই বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল সকলের সমাদর লাভ করছে। জেতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচন, সি, এম, ডি, এ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

পুরু বোর্ড বাঁধাই, ৭৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭·৫০ পয়সা

প্রকাশক : এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোং

৩৫/এ, [illegible] লেন, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭১৭

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

সন্দৃষ্টিতে সীমা তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, না, আপনি ভুল করছেন, আমার নাম অমিতা রায় নয়।

—কিন্তু আপনাকে আমাদের অফিসে কাজ করতে দেখেছি আমি,—বলল অরূপ বসু। সচরাচর এমন ভুল তার হয় না।

—কোন্ অফিস? সীমা তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

—কোলরিজ অ্যান্ড সন্স।

—কখনও নাম শুনিনি। হয়ত আমার চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে আপনার পরিচিতার। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সীমা, একটা বাসে উঠে পড়ল। অরূপ বসু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে তাকিয়ে।

বাসে উঠে সীমা লেডিজ সীটে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু ভীড়ের জন্য অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সাধারণতঃ সে অফিসের সময় বাসে বা ট্রামে যায় না। কিন্তু লোকটাকে এড়াবার জন্য এছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। টিকিট কেটে কয়েক স্টপেজ পরেই নেমে গেল সে। এতক্ষণে যেন সে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে—একথাটা চিন্তা করলেই সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার দেহের স্নায়ু কঠিন হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। এটা কেন হয় সে বুঝতে চেষ্টা করেছে। এটার পেছনে কোন যুক্তি আছে কিনা, তা সে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সৌন্দর্যের তারিফে বা মুগ্ধদৃষ্টির আকর্ষণে মেয়েরা স্বভাবতই প্রীতি অনুভব করে থাকে। কিন্তু তার বেলায় মানসিক প্রতিক্রিয়া বিপরীত রূপ নেয় কেন এটা তার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবে একটা জিনিস তার মাঝে মাঝে মনে হয়। তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বর লুকিয়ে আছে। একটা অলঙ্ঘনীয় বিরাট বাধা আত্মগোপন করে আছে তার অগোচরে। রাস্তাটা পার হয়ে সীমা অপর দিকের স্বল্প পরিসর ছোট রাস্তাটা ধরল, তারপর কিছুদূর যাবার পর একটা ম্যানসন হাউসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দক্ষিণ কলকাতার এ অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত জনহীন। নতুন বাড়ী এবং রাস্তা, তার সঙ্গে অচেনা মুখের সারি। জায়গাটা সীমা পছন্দ করে। আর কিছু না হোক, রোয়াকে বসা চ্যাংড়া প্যান্টপরা ছেলেদের চোখা মন্তব্য শুনতে হয় না কিংবা আশেপাশের প্রতিবেশীও থেকে [illegible]

তার ফ্ল্যাটে সে থাকতে পায় ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত। অন্ততঃ বিশ্রামের সুযোগটা মেলে। আজকাল বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা যেন তার বেড়ে গিয়েছে। অল্পতে এখন সে অসীম ক্লান্তি অনুভব করে। অসহায় বোধ করে সামান্য মানসিক চাঞ্চল্যে। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে কিনা, সীমা তাই ভাবছে এখন। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে, মানসিক বৃত্তিগুলো অন্যরকম হওয়া উচিত বলেই সীমার বিশ্বাস। মেয়ে বলেই যে সে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে এমন কিছু কথা নেই। তার মনে হয় অর্থনৈতিক বা দৈহিক কারণটা মেয়েদের পঙ্গু করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অকর্মণ্যতা আর দাসত্ব-বন্ধন আনে মানসিক দুর্বলতা আর অলীক ভাবালুতা।

ব্যাগের মধ্য থেকে ইয়েল চাবিটা বের করে দরজা খুলে ফেলল সীমা। ঘরে ঢুকতেই পোড়া গন্ধ তার নাকে ঢুকল। নাকটা কুঞ্চিত করে সীমা ভাবতে চেষ্টা করল গন্ধের কারণ। মনে পড়ে গেল সকালের ওমলেট তৈরীর দুর্ঘটনার কথা। একটু অন্যমনস্ক হওয়ার ফলে পুড়ে গিয়েছিল সেটা। কিছু না খেয়েই তাকে বেরোতে হয়েছিল সেই কারণে। নিজের ওপর বিরক্ত হোল সীমা। অন্যমনস্ক হওয়া তার পক্ষে শুধু অশোভন নয়, রীতিমত অপরাধ। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে অনেক বিপর্যয়ের কথাই জানে সে। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সাইড-টেবিলে রেখে কিচেনে গেল সে। জানালা বন্ধ রাখার জন্য অপ্রিয় গন্ধটা সবটা বেরিয়ে যেতে পারে নি। এটা তার আর একটা শৈথিল্য। বোকার মত জানালাটা বন্ধ করে যদি না দিত তাহলে এই অসহনীয় দুর্গন্ধটা তাকে বিফল সকালের কথা মনে করিয়ে দিত না। জানালাটা খুলে দিল সে। এবার নজর পড়ল ফ্রাইং-প্যানে রাখা পোড়া সামগ্রীটির ওপর। তাড়াতাড়িতে সেটা ফেলে দিতেও ভুলে গিয়েছে। এবার গৃহ-স্থালির দিকে নজর দিল সীমা। প্রথমে কিচেনের আসবাবপত্রের নিখুঁতভাবে সংস্কার করল তারপর বেডরুমে ফিরে এসে তার পোশাকটা পাল্টে নিল। হঠাৎ সীমা অনুভব করল, তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এবার ডিমের দিকে আর গেল না সীমা। কয়েকটা টোস্ট আর এক পেয়ালা চা নিয়ে সে খেতে বসল ধীরেসুস্থে। অনেক খুঁজে এই ফ্ল্যাটটা সে যোগাড় করেছে। সুন্দরী নিঃসঙ্গ যুবতীকে ভাড়া দিতে বাড়ীওয়ালা প্রথমে নারাজ হয়েছিল। কিন্তু অনেক বোঝা-বার পর তিনি সম্মত হয়েছিলেন শেষ-পর্যন্ত। একলা বাড়ীতে থাকতে সীমার ভাল লাগে। এটা তার অভ্যাস আছে। অন্য লোকের সংস্পর্শে সে শুধু স্বস্তিবোধ করে না, কুণ্ঠিত হয় রীতিমত। তার কাছে একাকীত্বের মূল্য অনেক। চা আর টোস্ট শেষ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সীমা। বিছানার নরম স্পর্শে তার দেহের সজীবতা আর মনের বিশ্রান্তি ফিরে এল। এতক্ষণে পরম নিশ্চিন্ত হোল সে। বিছানার ওপর একটা টিকিট পড়েছিল। অলস কৌতূহলে সেটা তুলে নিয়ে দেখল, বাসের টিকিট। বাসস্টপের অরুণ বসুর কথা মনে পড়ল। কোলরিজ অ্যান্ড সন্সের অরুণ বসু। চার বছর পরেও লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু চিনতে পারার কথা নয়। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তার। অনেক পার্থক্য হয়েছে তার সাজসজ্জায়, বেশভূষায় আর চেহারায়। সীমার মনে পড়ল, সে সময় তার চুলটা ববড্ করা ছিল। শুধু তাই নয়, তার রঙটা তখন ট্যানড্ ছিল। দুষ্প্রাপ্য আমেরিকান প্রসাধন সংগ্রহ করে তার গৌর-বর্ণকে ঢাকা দিতে পেরেছিল অনেক কষ্টে। ভ্রূটা তখন সরু আর তির্যক ছিল। এখন ত সবই পালটে গিয়েছে। চুলে এখন সে বেণীর ভাগ সময় বেণী বাঁধে। দেহের শুভ্র রঙটা অমলিন রয়েছে। ভ্রূটা ঈষৎ মোটা আর ধনুকের অনুকরণে সে এখন এঁকে থাকে। তবু অরুণ বোস তাকে চিনেছে। কথাটা মনে হতেই সীমা উত্তেজনায় উঠে বসল বিছানার ওপর। সেই অরুণ বসু—কোলরিজ অ্যান্ড সন্সের জুনিয়র পার্টনার। অবশ্য অন্যের মত গায়ে পড়া ভাব ছিল না লোকটার, কিন্তু একটা অভিভাবকসুলভ আধিপত্যের ভাব ছিল তার ব্যবহারে। তা না হলে কাজে অকাজে সদাসর্বদা তাকে শুধু উপদেশ দেবার ছলে এগিয়ে আসত না। তার ভালমন্দর ওপর এত নেকনজর দেবার কোন প্রয়োজনই ছিল না বলে মনে হোল সীমার। কেতাদুরস্ত আর শান্ত-প্রকৃতির লোক অরুণ বসু—একথা অস্বীকার করতে পারে না সে। লোকটার চালচলন, কথাবার্তায় একটা অদ্ভুত জোর ছিল সেটা তার বেশ মনে আছে। অরুণ বসুকে মনে মনে ভয় করেছে সীমা। কেন ভয় করেছে, তা হয়ত বলতে পারবে না সে। তবে তার উপস্থিতিতেই সীমার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ লোপ পেত, অস্বস্তি বোধ হোত প্রচুর। ঠিক এই কারণে সে পারতপক্ষে অরুণ বসুর সামনে আসতে রাজী হোত না। অরুণ বসুকে বাসস্টপে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলে আতঙ্কে হয়ত আর্তনাদ করে ফেলত। গাড়ীছাড়া অরুণ বসুকে সে দেখেনি। সুতরাং বাসস্টপে অরুণ বসুর উপস্থিতিটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত কাজ করেছিল তার পক্ষে। কোলরিজ অ্যান্ড সন্সে সে কাজ করেছিল প্রায় এক বছর। তারপরেই সে সরে গিয়েছিল অন্য জায়গায়। তার অন্তর্ধানটা কোম্পানী এবং অরুণ বসু কিভাবে নিয়েছিল সেটা মাঝে মাঝে কল্পনা করে আনন্দ পেয়েছে সীমা।

ভয়েস অব আমেরিকার
বিশেষ বিবরণী
চন্দ্রাভিযানে
অ্যাপোলো

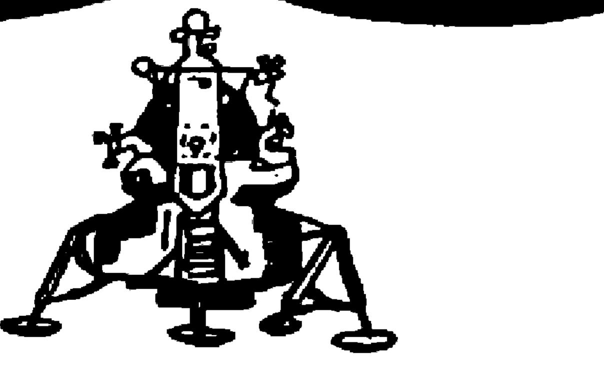

ইংরেজী ধারাবিবরণী

'অ্যাপোলো ৮ প্রত্যাবর্তন ও উদ্ধার [illegible] ভোর

মিটারব্যান্ড
১৯, ২৫,
৩১, ৪৯
কিঃ হাঃ
১৫২৯৫
১১৮৩৫
৭১০৫
৫৯১৫

রাত [illegible] মিঃ নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠানে বাংলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—
১৯, ২৫, ৩১ ও ৪৯ মিটারে।

CENTRAL LIBRARY

বিছানা থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়াতে তার বক্সারের কথা মনে পড়ল। বক্সার সীমার কুকুর। সাত বাধাবী বয়ওএর এই জীবন-বন্দন জীবটাই সীমার একমাত্র বন্ধু। এটা বুলডগ জাতীয় কুকুর—অ্যালসেশিয়ানের থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু শক্তিতে কিছুমাত্র কম নয়। বুলডগের চেয়ে বেশী একগুঁয়ে, তবে রাগ কম। তার আকৃতি এবং গর্জনই যথেষ্ট। তবে প্রয়োজনে দু-একটা লোককে সাংঘাতিকভাবে আহত করতে কয়েক সেকেণ্ডই লাগে তার। অরুণ বসুর পরই বক্সারের কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। ছোট ঘরটা সীমা বক্সারের জন্যই ব্যবহার করে থাকে। সে শুধু সীমার বন্ধুই নয়—অন্দ, প্রহরী। রাতে শোবার সময় সীমা ঘরের দরজাটা খুলে রাখে। মানুষের চেয়ে কুকুরকে সে বিশ্বাস করে বেশী। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বক্সার এক লাফে তার কাছে এগিয়ে এল। তার আনন্দের আতিশয্য সীমার পক্ষে ভয়ের কথা, কারণ সীমার চেয়ে তার দেহের ওজন হয়ত বেশী।

সিট ডাউন বক্সার—চেঁচিয়ে বলল সীমা।

বক্সারের কথাটা মনঃপূত হোল না। কিন্তু অমান্য করতে পারল না সে। তার ইচ্ছে ছিল সারাদিন অদর্শনের পর সীমা তার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা তারিফ করে। পাশে রাখা বেতটার দিকে লক্ষ্য পড়ল বক্সারের। এটা দিয়ে আঘাত করলে তার দেহের কোন ক্ষতি হয় না, তবে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। সেটা তার পক্ষে আরও অসহনীয়। বক্সারের তত্ত্বাবধান করার জন্য সীমা বাড়ীর ঝাড়ুদারকে নিয়োজিত করেছে। দুবেলা তার খাবার এবং প্রসাধনের ব্যবস্থা সে করে দিয়ে যায়। দিনে একবার বেড়াতে যায় বক্সার। এই নিয়মটা তার সবচেয়ে লোভনীয়। অপরপক্ষে সীমার এটাকে দুঃসময় বলা চলে। রাস্তায় বার হলে তাকে সামলান শক্ত হয়ে পড়ে। সীমা সঙ্গে থাকলে তার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা যেন বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

বক্সারকে আজ একটু সকালেই নিয়ে বাড়ী ফিরল সীমা। তার অবচেতন মনের মধ্যে অরুণ বসু উপদ্রব শুরু করেছে, সেই কারণে তার মনটা তেমন ভাল নেই।

ইন্টারভিউ হবার একটু আগেই সীমা এসে উপস্থিত হয়েছে। অফিসটা নতুন খুলেছে। ক্যাশ-ডিপার্টমেন্টে একজন অ্যাসিসটেন্ট পদপ্রার্থী সে। ছোট ঘরটার মধ্যে বেশ কয়েকজন বসে রয়েছে উন্মুখ হয়ে। বেশীর ভাগই পুরুষ। শুধু সীমা আর একজন মেয়ে এসেছে চাকরীর অন্বেষণে।

আপনি সর্টহ্যাণ্ড জানেন? জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার যোশী—কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর তিনি।

হ্যাঁ জানি, উত্তর দিল সীমা।

অনেক বিখ্যাত কোম্পানীর লেটার অফ রেকমেনডেশন রয়েছে।। এতে আপনার সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা আছে। তাছাড়া আপনার অভিজ্ঞতা দেখছি প্রচুর।

মৃদুভাবে একটু হাসল সীমা। এ ধরনের হাসি এ সময়ে খুব কার্যকরী হয় বলে জানে সীমা।

অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে, খুব রিস্কি,—মন্তব্য করলেন মিস্টার যোশী।

এর আগেও করেছি, সোজাভাবে তাকাল সীমা।

সাধারণতঃ আমরা সিকিউরিটি চেয়ে থাকি, বললেন মিঃ যোশী।

দরকার হোলে তাও দিতে পারি। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

তাহলে পঞ্চাশ হাজার—হাসিমুখে তাকালেন মিঃ যোশী।

আমার নামে বাবা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন।

বলেন কি? তাহলে চাকরী করতে এসেছেন কেন? কটাক্ষ করলেন মিঃ যোশী।

টাকার জন্য নয়, সময়টা কাজে কাটাতে পারলে শরীরমন ভাল থাকেই বলে জানি।

ঠিকই জানেন। যাই হি ওয়ে, কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন।

যখন বলবেন।

তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়েই যাবেন আর যদি অসুবিধে না হয় তাহলে কালই জয়েন করবেন। আমাদের এখন লোকের অভাব।

মিস্টার যোশীর বয়স প্রায় ষাট বছর। মাথাভরা চকচকে টাক, গোঁফদাড়ি মসৃণভাবে কামানো। পরনে নিখুঁতভাবে তৈরী স্যুট তার সঙ্গে ম্যাচ করা টাই এবং জুতো। মুখের মধ্যে মিস্টার যোশীর নাকটা অসংগতভাবে উন্নত। মুখে তার সদালাপী যেন একটা তৈলাক্তভাব ফুটে রয়েছে বলে মনে হয়। কথাগুলো তোষামোদভাবে বেরিয়ে আসছে মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সীমার কিন্তু মনে হোল মিস্টার যোশীর দৃষ্টিটা সুবিধের নয়। কথা বলার সঙ্গে যেভাবে সীমার সর্বাঙ্গে চোখ ফেলছেন, সেটার অর্থ কোন মেয়ের পক্ষেই বোঝা কষ্টকর নয়। এতে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না সীমার। কারণ ইতিমধ্যে চাকরীর খাতিরে এইটুকু সহ্য সে করতে পারে কিন্তু উদ্বেগ নয়। হঠাৎ অরুণ বসুর কথা মনে পড়ে গেল সীমার। তার দৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের অশালীনতা ছিল না। কিন্তু এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে বিব্রত করত। অরুণ বসুর দৃষ্টিটা অন্তর্ভেদী বলা যায়। তার চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারত না সীমা। অকারণে ভয় পেত যেন। অবশ্য মিস্টার যোশীর মত আদেখলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক মেয়ে আছে যারা নাকি এটা পছন্দ করে। তাদের সৌন্দর্য অপরকে আকৃষ্ট করে এতে তারা আনন্দ পায়, গৌরব অনুভব করে। সীমা সমস্ত জিনিসটাকে ঘৃণা করে। বয়স্ক লোকদের প্রতি তার তবুও কিছুটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কিন্তু মিঃ যোশীর আপত্তিকর দৃষ্টিপাতের পর সে ধারণা তার পালটাতে শুরু করেছে।

সীমা সান্যাল কথা কম বলে কাজ করে বেশী। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু বলাই দত্ত শুধু নয়, সকলেই সীমার কর্মদক্ষতা, কর্তব্যবোধ আর নিষ্ঠার প্রশংসা করে। অফিসের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। শুধু ইয়ারলী ক্লোজিং-এর জন্য নয়। মাইনের সময় এটা। বলাইবাবুর সম্প্রতি ব্লাডপ্রেসার হয়েছে। তার ওপর কাজের চাপ পড়াতে তিনি একটু অস্থির হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য অ্যাসিসটেন্টের ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। শুধু তত টাকাকড়ির ব্যাপার বলে নয়, সবাই যেন ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছুই চায় না। সকলেই চেষ্টা করে কত সকাল সকাল চেয়ার ছেড়ে বাড়ীমুখো হবে। চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে একটা উসখুস ভাব লক্ষ্য করেছেন তিনি। একমাত্র সীমা সান্যাল ছাড়া। মেয়েটি যেন কাজ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। সকাল থেকে একনাগাড়ে একটার পর একটা কাজ করে চলেছে—ক্লান্তি নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই। সীমা সান্যাল নিজের কাজ করেই ক্লান্ত নয়, অন্য লোকের কাজ করতেও তার আপত্তি নেই।

মিস সান্যাল,—ডিপার্টমেন্টের ছোটবাবু সলিল চৌধুরী সেদিন সীমার শরণাপন্ন হলেন।

বলুন,—সীমা তাকাল তার দিকে।

আমায় একটু সাহায্য করতে হবে; লেজারের অর্ধেক আইটেম লেখাই হয়নি। করুণভাবে তাকান সলিল চৌধুরী।

দিয়ে যান করে দিচ্ছি।

এ ধরনের সাহায্য সীমাকে প্রায়ই করতে হয়। এতে তার আপত্তি নেই। সেই কারণে সীমা আর বলাইবাবু সব শেষে অফিস থেকে ছুটি পায়। তাদের পর ঝাড়ুদার আর দারোয়ান নিষ্কৃতি পেয়ে থাকে। দুজনে অপেক্ষা করে থাকে কখন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের আলো বন্ধ হবে। বড়বাবু বেশী মাইনে পান, তাছাড়া পুরনো লোক। তার কাজে চাড় থাকতে পারে, কিন্তু সান্যাল মেমসাব নতুন ঢুকে এত কাজ করেন কেন, তা তাদের কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হয়। এদিক দিয়ে অন্যান্য বাবুরা অনেক ভাল, সাড়ে চারটের পর থেকেই সরে পড়েন, তাদের অযথা ঝামেলায় ফেলেন না। সান্যাল মেমসাব না থাকলে একলা বড়বাবু দিনভর থাকতে পারতেন না। যোশী সাহেবের কথা অবশ্য আলাদা। তিনি অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। সুতরাং

CENTRAL LIBRARY

তিন চৌপর রাত থাকলেও ক্ষতি কিছু নেই।

মিস সান্যাল আজ সেবার পেমেন্টের দিন মনে আছে। বলাইবাবু মনে করিয়ে দেন।

সে সব ঠিক আছে উত্তর দেয় সীমা।

আপনার কাজে কোন ত্রুটি নেই সে আমি জানি, কিন্তু তার একটা ব্যাপার আছে, মানে পার্সোনাল বলেই আপনাকে বলছি।

সীমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বলাইবাবুর দিকে।

আমায় আজ একটু সকাল সকাল ফিরতে হবে, পেমেন্টটা যদি আপনি করে দেন—

আমি? কিন্তু অত টাকা—বিস্মিত হয়ে তাকাল সীমা।

কেন, এর আগের বারেও আপনিই দিয়েছিলেন।

তা দিয়েছি, কিন্তু আপনার উপস্থিতিতে। না মিস্টার বসু, ও আমি পারব না, আমার ভয় করে।

কি মুশকিল, ভয় কিসের? মাত্র ত সাতাশ হাজার টাকা।

তাহলে আর একজন লোক দিন।

আর লোক কোথায়? সাড়ে চারটের পর কাউকে পাবেন না। আপনি আপত্তি করবেন না মিস সান্যাল, তাহলে আমি ভীষণ বিপদে পড়ব। চেকে যাদের পেমেন্ট হবে, তাদের বন্দোবস্তটা আমি আর সজলবাবু ম্যানেজ করে দিচ্ছি, ক্যাশটা আপনি করে দিন।

আজও আবার মিসেস মোদী আসবেন।

হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে, তিনি সাহেবের ঘরে থাকবেন। ওতে আপনার কাজ আটকাবে না।

বলাইবাবু সাড়ে চারটের সময় সীমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে চলে গেলেন। পাঁচটা বাজার একটু পরেই মিসেস মোদী এলেন। মঙ্গলবার আর শুক্রবার তিনি মিস্টার মোদীর সঙ্গে বাড়ী ফেরেন। মিসেস মোদীর বয়স কম। প্রায় সীমারই মত। তার চুলগুলো বব করা, চোখে হালকা রঙের চশমা, আর পরনে পিঙ্ক-রঙের শাড়ী এবং চোলী। মিসেস মোদী যে দুটি রং পছন্দ করে থাকেন, হয় পিঙ্ক, না হয় বেগুনে। সীমা এক মাস ধরে লক্ষ্য করেছে মিসেস মোদী এ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করেন না। মিসেস মোদী হাতে সাদা ব্যাগটা ঝুলিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে দরজা পার হলেন। দারোয়ান তাকে প্রকাণ্ড সেলাম করল একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন মিস্টার মোদীর এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে। মিস্টার মোদীর ঘরের দরজা বন্ধ হতেই সীমা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার ব্যাগটা নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকল সন্তর্পণে। প্রথমেই তার লম্বা বেণীটা খুলে খোঁপা করে নিল বরফ-করা চুলের মত। তার পর ব্যাগ থেকে পিঙ্ক সিল্কের শাড়ী আর চোলীটা পরল নিখুঁতভাবে। এবার ঠোঁটে গাঢ়রঙের লিপস্টিক আর মুখে কমপ্যাক্টের গুঁড়ি বুলিয়ে প্রসাধন শেষ করল সে। হাতের ঘড়িতে লক্ষ্য করে দেখল সাজসজ্জায় ঠিক দশ মিনিট লেগেছে। এখনও হাতে তার কয়েক মিনিট সময় রয়েছে। ছাড়া কাপড়-জামা পরিপাটী করে ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে শান্তভাবে সে আবার ফিরে গেল নিজের চেয়ারে। লোহার আলমারীর চাবিটা বলাইবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা দিয়ে আলমারির দরজা খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো বার করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল সীমা। সব কাজগুলোই সে ঠাণ্ডা মাথায় করেছে। প্রত্যেকটি ভঙ্গীই তার সামঞ্জস্যপূর্ণ আর নিখুঁত। ব্যাগ থেকে আগের শাড়ী বার করে তা থেকে দুটো টুকরো ছিঁড়ে নিল এলোমেলোভাবে। এবার আর একটি জিনিস বার করল সে। সচরাচর ছেলেরা যে ধরনের রুমাল ব্যবহার করে সেই রকম একটি রুমাল পাকিয়ে লম্বা করে মেঝের ওপর শাড়ীর টুকরোগুলো ফেলে দিল। বসার চেয়ারটা ধীরে ধীরে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে টেবিলে রাখা খাতার কাগজপত্র ছড়িয়ে দিল চতুর্দিকে। একবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখে নিল তার কাজের কোন খুঁত আছে কিনা। পর্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট হোল সে। ক্ষিপ্র সতর্কতার সঙ্গে নোটের বাণ্ডিলগুলো ব্যাগে ভরে নিল। শুধু তার থেকে দু-তিনটি বাণ্ডিল মেঝের ওপর ফেলে দিল ইতস্তত ভাবে। তারপর ব্যাগ থেকে গগলস নিয়ে সেটা পরে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে বাইরের দিকে। দারোয়ান তাকে মিসেস মোদী ভেবে লম্বা সেলাম জানাল।

অফিসের বাইরে বেরিয়ে সীমার অসম্ভব ক্ষিদে পেল। এরকম ঘটনার পরে সে লক্ষ্য করেছে তার ক্ষিদে পেয়ে থাকে। তার সঙ্গে পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। এটা কেন হয় তা সে বুঝতে পারে না। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল ভয় থেকে হয়ত এই ব্যথা জাগে, কিন্তু ইদানীং একাজে সে ভয় পায় না, উলটে কেন একটা তৃপ্তি জাগে, সাফল্যের স্বাদ পায়।

অরুণ বসু অমিতাকে বাস স্টপে দেখবে এটা ভাবেনি, এমনকি কলকাতায় তার দেখা পাবে এটা আশা রাখেনি। কোলরিজ কোম্পানীর টাকা চুরি যাবার পর যখন অমিতা রায়কে সন্দেহ করা হয়েছিল তখন সে-ই প্রথম আপত্তি জানিয়েছিল। একটা কোম্পানীকে দেওয়ার জন্য চেকটা রেডি করে রাখা হয়েছিল। কোম্পানীর স্ট্যাম্প সমেত রসিদ পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু টাকাটা তারা পায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় জিনিসটা ধরা পড়েছিল ছয় মাস আগে। অমিতা রায় তার আগেই রিজাইন দিয়ে চলে গেছে। পদ্ধতি সহজ, সরল, আর কার্যকরী। চিন্তে সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যে কোম্পানীর নামে চেক ছিল, সেই নামে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল মারওয়াড়ী একটা ব্যাঙ্কে। এতে আপত্তি করার কিছু ছিল না। কোলরিজ কোম্পানীর চেকটা তাতে জমা দিয়ে যথাসময়ে সেটা নকল সই দিয়ে ক্যাশ করতে কোন অসুবিধে হয়নি অমিতার। কিন্তু অরুণের আপত্তি সত্ত্বেও এ-বিষয়ে যথারীতি তদন্তের ফলে এটা স্পষ্টই জানা গিয়েছিল অমিতা রায়ই টাকাটা আত্মসাৎ করেছে। জাল রসিদ আর নকল সই দুটোই ধরা পড়েছিল তারপর। অরুণ বসু নিযুক্ত হয়েছিল অমিতা রায়ের হয়ে ওকালতি করার জন্য। অমিতাকে একটু অন্য ধরনের বলে মনে হয়েছিল তার। শান্ত, স্বল্পবাক মেয়েটি শুধু পরিশ্রমী আর ভদ্র নয়, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত দীপ্তি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিল অরুণ। সাধারণত যেসব মেয়েরা অফিসে কাজ করে তা থেকে অমিতা রায়কে ভিন্ন বলে মনে হয়েছিল। মেয়েরা কাজ করে সংসার চালাবার জন্যে, না হয় সময় কাটাবার জন্যে। অমিতা কিন্তু কোন দলের মধ্যেই পড়ে না। তার কাজ করার ভঙ্গী আর নিষ্ঠা দেখে অরুণ প্রথম একজন মেয়ের মধ্যে অফিসের কাজকে পেশা বলে মেনে নিতে দেখল। এটা কম কথা নয়। এই ধরনের মেয়ে প্রতারণা করে টাকা আত্মসাৎ করবে এটা ভাবতেও পারেনি অরুণ। অনেকদিন পর অমিতাকে দেখল সে। অরুণের মনে পড়ল তার নাম যে অমিতা নয়, এটা বেশ সহজভাবেই অস্বীকার করল সে। চোখে তার ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না, জড়তাও ছিল না তার ব্যবহারে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সময় অরুণ অমিতার কথাই ভাবছিল। নামটা যখন অস্বীকার করেছে তখন নতুন আর একটা পরিচয় নিশ্চয় নিয়েছে সে। অরুণের ভাবতেও আশ্চর্য লাগে অমিতার মত মেয়ে কেন এমন অস্বাভাবিক হোল। চেহারায় তার দারিদ্র্য বা অশিক্ষার চিহ্ন সে খুঁজে পায়নি। অরুণ বসুর এটা নিছক কৌতূহল নয়। ভদ্রঘরের মেয়ের অস্বাভাবিক অপরাধ-প্রবণ প্রবৃত্তির কারণটা খোঁজার জন্যে সে উৎসুক। সমাজ বা সংসারের চাপে পড়ে অনেকের মন অস্বাভাবিক রূপ নেয়, এটা তার অজানা নয়, কিন্তু অমিতাকে সেই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়নি তার।

(ক্রমশঃ)

৭১'এর লোকগণনায় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৭১ সালের লোকগণনার যে প্রাথমিক হিসাব সেন্সাস কমিশনার প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, দশ বছরের ব্যবধানে ভারতের লোকসংখ্যা ২৪-৫৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সিকিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটি হিসাবে, '৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ, '৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ।

ইতিপূর্বে কোন দশকের ব্যবধানে ভারতের লোকসংখ্যা এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় নি। পূর্বের লোকগণনার হিসাব-গুলিতে দেখা যায়, ১৯২১—৩১, ১৯৩১—৪১ ও ১৯৪১—৫১ দশকে ভারতের লোক বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১০-৬, ১৩-৫ ও ১২-৫ শতাংশ হারে। তারপর ১৯৫১—৬১ সালে লোক বৃদ্ধির হার হঠাৎ বেশ খানিকটা বেড়ে হয় ২১-৫ শতাংশ। আর এবার বাড়ল ২৪-৫৭ শতাংশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে তবে এই শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা হবে ৮৫ কোটি, যা '৬১ সালের লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

অথচ এইবারের লোকগণনার হিসাবেই প্রকাশ, এদেশের শতকরা সত্তরজন, অর্থাৎ ৩৮ কোটি ২১ লক্ষ লোক এখনও নিরক্ষর এবং প্রায় আট কোটি লোক নিরাশ্রয়। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা ও আশ্রয় সমস্যা সমাধানে সরকারী উদ্যোগ সমতা রক্ষা করে চলতে পারছে না বলে নিরক্ষর ও নিরাশ্রয়ের সংখ্যাও প্রতি দশকের ব্যবধানে কয়েক কোটি করে বেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কর্মহীন মানুষের সংখ্যাও দুর্নিবার গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ত্রিশ বছরের মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা যখন ৮৫ কোটি হবে, তখন প্রকৃত পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তার আভাস এবারের লোক-গণনার হিসাব থেকেই যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর অবশ্য এই বছরে এক কোটি দশ লক্ষ হারে লোক বৃদ্ধিতে খুব বিচলিত হন নি। বরং এর মধ্যে তাঁরা পরিবার পরিকল্পনা অভিযানে সাফল্যের সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে বেশ খানিকটা আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁরা বলছেন, তাঁদের অনুমোদন ছিল (আশঙ্কাও বলা যায়) '৭১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হবে ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ। কিন্তু সে বৃদ্ধি যে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষে এসে থেমেছে, পরিবার পরিকল্পনার দাবী, সেটা তাঁদেরই নিরলস ও সফল অভিযানের সুফল।

কিন্তু এ দাবী যে অর্থহীন তা কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। বছরে ২-৫ শতাংশ হারে লোকবৃদ্ধি, যার ফলে একটি দেশের লোকসংখ্যা আটাশ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তা জনগণনার হিসাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধির হার বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া, আফ্রিকার দু-চারটি দেশ বাদে এত দ্রুত হারে পৃথিবীর কোথাও লোক বৃদ্ধি হয় না। ভারতেও ইতিপূর্বে কোন দশকে এত দ্রুত হারে লোকবৃদ্ধি ঘটে নি। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের দাবী নিতান্তই অর্থহীন বলে মনে হয়। আসলে মৃত্যুহার এদেশে যতটা হ্রাস পেয়েছে বলে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর মনে করেছিলেন ততটা হ্রাস না পাওয়ার জন্যই এদেশের লোকসংখ্যা ঐ দপ্তরের অনুমিত হিসাবে পৌঁছাতে পারে নি। ১৯২১—৩১ সালে ভারতের মৃত্যুহার ছিল হাজার-করা ৩৬-৩, চল্লিশ বছর পরে ১৯৬১—৭১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে হাজার-করা ১৫-৬। মৃত্যুহারের এই হ্রাস নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিবার পরি-কল্পনা দপ্তরের আশা ছিল, ১৯৬১—৭১ সালে মৃত্যুহার আরও কমে হাজারে ১২-৫ দাঁড়াবে। সেটা না হওয়ার জন্যই ভারতের লোকসংখ্যা তাঁদের হিসাব মত ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ হতে পারে নি। অর্থাৎ, ভারতের লোকসংখ্যা যে এক দশকের ব্যবধানে আরও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বাড়তে পারে নি তার জন্য পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের চেয়ে চিকিৎসকের কৃতিত্বের দাবীই বেশী।

পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এদেশের মৃত্যু-হার যেখানে হাজার-করা ৩৬-৩ থেকে কমে ১৬-৬ হয়েছে, সেখানে ঐ সময়ের ব্যবধানে জন্মহার কমেছে হাজার-করা ৪৬-৪ থেকে মাত্র ৩৯-৮-এ। আসলে আগে যে লোক-বৃদ্ধির হার কম ছিল তার প্রধান কারণ ছিল মৃত্যুহারের আধিক্য। সুতরাং জন্ম-হার প্রায় অপরিবর্তিত থেকে মৃত্যুহার যত দ্রুতগতিতে হ্রাস পাবে লোকবৃদ্ধির হারও তত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। এই জন্যই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুহার যেমন হ্রাস পাবে জন্মহারও সেই মত এবং প্রয়োজন হলে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে হ্রাস পাওয়া দরকার, আর তারই জন্য প্রয়োজন পরিবার পরিকল্পনার। আলডুস হাক্সলির ভাষায়—

> A society that practises death control, must at the same time practise birth control

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ভারত পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী দেশ। প্রতি পঞ্চ-বার্ষিক যোজনাতেই পরিবার পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে এবং প্রতিবারেই বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় পরিবার পরি-কল্পনার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২৭ কোটি টাকা; আর চতুর্থ যোজনায় সে অঙ্ক প্রায় দশ গুণ বাড়িয়ে ৩১৫ কোটি টাকা করা হয়, জন্মহার হাজার-করা ২৫-এ নামানোর লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জন্মহার ৪০-এর নীচে নামানো সম্ভব হয়নি, যদিও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। চতুর্থ যোজনার মেয়াদ অবশ্য এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে বড় একটা সাফল্যের আশা নিশ্চয়ই কেউ করেন না।

বহুপ্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে—

"দুর্গামা"

শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা,
তপস্বিনী গৌরীমাতার উত্তরসাধিকা,
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা,
দুর্গামাতার মধুর জীবনচরিত।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

(৪৮৮ পৃষ্ঠা, ২১খানি ছবি—একখানি রঙীন)
মূল্য—আট টাকা।

॥ ডাকযোগে লইলে মনিঅর্ডারে দশ টাকা পাঠাইবেন — আশ্রম-সম্পাদিকার নিকট। 'রেজিস্টার্ড' বুকপোস্টে গ্রন্থখানি যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

আসলে জন-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য যে জাতীয় চেতনা দরকার, তা আমাদের নেই। তার জন্য প্রধানত দায়ী অশিক্ষা, তারপরে দায়ী কুশিক্ষা ও কুসংস্কার। '৭১-এর লোকগণনার হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দশ বছরে এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৪-০৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৯-৩৫ শতাংশ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং যে-দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি লোক এখনও নিরক্ষর, এবং নানা ধর্মীয় ভীতি ও লৌকিক কুসংস্কারে যে-দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সকলেই আচ্ছন্ন সে-দেশের সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হবে এমন আশা দুরাশারই নামান্তর। অথচ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতির সার্বিক উদ্যোগ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে কি বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারে তা জাপানের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। ১৯৪৭ সালে জাপানে জন্মহার ছিল হাজারে ৩৪-৩, মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে, ১৯৫৭ সালে সে-হার নেমে হয় ১৭-২। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে জাপান, গর্ভপাত থেকে শুরু করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় পদ্ধতি ও প্রয়োগকে আইনানুমোদিত ও সরকারি প্রচেষ্টায় সহজলভ্য করে। জাপানের সব লোক শিক্ষিত ও জাতীয় চেতনাসম্পন্ন। তারা জানে যে, জাপানের লোকবৃদ্ধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে সে-দেশের জীবনযাত্রার বর্তমান উন্নত মান বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে সে-জাতীয় সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য কতটুকু চেষ্টা হচ্ছে?

বিশ্বের প্রতি সপ্তজন ভারতীয়

সর্বশেষ হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ৩৭১ কোটি। তার মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। তার মানে হল পৃথিবীর প্রতি সাত-জনের একজন ভারতীয়। পৃথিবীর ভূ-খণ্ডের মাত্র দুই-শতাংশ স্থান নিয়ে ভারত, অথচ পৃথিবীর চোদ্দ শতাংশ লোক বাস করে এখানে।

১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লোকগণনার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। তাতে দেখা যাবে, সত্তর বছরে এ-দেশের লোকসংখ্যা ১২৯-৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯০১	—	২৩,৮৩,৩৭,০০০
১৯১১	—	২৫,২০,০৫,০০০
১৯২১	—	২৫,১২,৩৯,০০০
১৯৩১	—	২৭,৮৮,৮৮,০০০
১৯৪১	—	৩১,৮৫,৩৯,০০০
১৯৫১	—	৩৬,০১,৫০,০০০
১৯৬১	—	৪৩,৯০,৭৩,০০০
১৯৭১	—	৫৪,৭০,০০,০০০

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা গেছে, ভারতে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা দু'কোটি বেশি।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা জনবহুল, সেখানে বাস করে ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ লোক, যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার ১৬-১৪ শতাংশ। তবে উত্তরপ্রদেশ গঠিত ভারতের ৯-৬৫ শতাংশ স্থান নিয়ে, এবং আয়তনের দিক থেকে সে চতুর্থ রাজ্য, লোকসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী রাজ্য যথাক্রমে বিহার ও মহারাষ্ট্র। ভারতের ৫-৭১ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত বিহার আয়তনের দিক থেকে ভারতের অষ্টম রাজ্য কিন্তু মহারাষ্ট্র আয়তন ও লোক-সংখ্যা উভয় দিক থেকেই ভারতের তৃতীয় রাজ্য। ভারতের ১০-০৮ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত ঐ রাজ্যটিতে এখন ভারতের ৯-২০ শতাংশ লোক বাস করে।

এদিক থেকে সবচেয়ে ভাল অবস্থা হল মধ্যপ্রদেশের। ভারতের ১৪-৫৪ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত ঐ বৃহত্তম রাজ্যটিতে বাস করে ভারতের ৭-৫৮ শতাংশ লোক এবং লোকসংখ্যার হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ভারতের ষষ্ঠ রাজ্য।

এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ত্রয়োদশ রাজ্য হলেও লোকসংখ্যার দিক থেকে তার স্থান চতুর্থ। ভারতের ২-৮৭ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে বাস করে ভারতের ৮-১২ শতাংশ লোক। '৬১ সালের লোকগণনায় চতুর্থ স্থানে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ। এবার পশ্চিমবঙ্গ তাকে পঞ্চম স্থানে নামিয়ে দিয়ে তার স্থানটি দখল করেছে। পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার, দশ বছর আগে ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৬ হাজার। সুতরাং দশ বছরের ব্যবধানে এই রাজ্যে লোক বেড়েছে ২৭-২ শতাংশ, [illegible] বৃদ্ধির হারের চেয়ে কেবল কিছুটা বেশি। পশ্চিম-বঙ্গে এখন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জন-বসতির ঘনত্ব ৫০৭। এ-ব্যাপারে তার স্থান কেরলের পরেই। আয়তনের দিক থেকে ভারতের পঞ্চদশ রাজ্য কেরলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৫৪৮।

শিক্ষার অবস্থা

দশ বছরের ব্যবধানে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫-৩২ শতাংশ। কিন্তু জনবৃদ্ধির হার সে-তুলনায় বেশি ছিল বলে নিরক্ষরের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। '৬১ সালে এদেশে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪-০৩ শতাংশ; '৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯-৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের ৭১-৬৫ শতাংশ লোক এখনও নিরক্ষর। ১৯৬১ সালে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৪-০৩ শতাংশ শিক্ষিত থাকায় তখন এদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক। আর ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭০-৬৫ শতাংশ নিরক্ষর হওয়ায় নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৮ কোটি ৬২ লক্ষ।

শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ব ভারতের অগ্রগতি বিশেষ লক্ষণীয়। দশ বছরের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ২৯-২৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩-০৫ শতাংশ হলেও অন্যান্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এগিয়ে যাওয়ায় শিক্ষায় অগ্রগতির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ একাদশ স্থান থেকে দ্বাদশ স্থানে নেমে গেছে। শিক্ষার তালিকায় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন স্থান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ১৮-৩০ শতাংশ শিক্ষিত; '৬১ সালে ঐ রাজ্যে শিক্ষিতের হার ছিল ১১-০৩ শতাংশ।

তবে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরেই অবস্থান করছে ভারতের চারটি হিন্দী-রাজ্য — মধ্যপ্রদেশ (শিক্ষিত ২২-০৩ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (শিক্ষিত ২১-৬৪ শতাংশ), বিহার (১৯-৯৭ শতাংশ), ও রাজস্থান (শিক্ষিত ১৮-৭৯ শতাংশ)। হিন্দী রাজ্যগুলির উপরে অবস্থান করছে ওড়িশা (শিক্ষিত ২৬-১২ শতাংশ), তার উপরে আসাম (শিক্ষিত ২৮-৭৩ শতাংশ)। তবে আসামই ভারতের একমাত্র রাজ্য যার গত দশ বছরে শিক্ষিতের হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালে আসামে শিক্ষিতের হার ছিল ২৯-১১ শতাংশ।

শিক্ষার তালিকায় প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য কেরল, সেখানকার ৬০-১৬ শতাংশ লোক সাক্ষর। ১৯৬১ সালে কেরলে সাক্ষর ছিলেন ৪১-০৬ জন। শিক্ষার [illegible]

নীল দিয়ে ওর জামাকাপড়ে ফুটে ওঠে সাদা সাদা ছোপ

এখন টিনোপাল দিয়ে জামাকাপড় হয়ে উঠেছে—ধবধবে সাদা

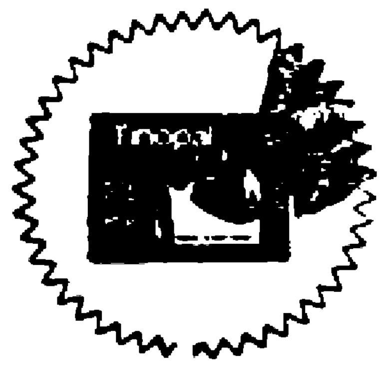

১৫ পয়সার এক প্যাকেটে—
বালতিভর্তি জামাকাপড়
ধবধবে হয়ে ওঠে।

তাছাড়াও পাবেন :
রেগুলার প্যাক ও
ইকনমি প্যাক

মেয়েটির মা—বুদ্ধিমতী নারী। তিনি বুঝতে পারলেন, নীল দেবাতে ওর মেয়ের জামাকাপড়ে দেখা যাচ্ছে শুধু সাদা সাদা ছোপ—আর সব জায়গায় লেগেছে নীলের দাগ। তাই তিনি নীল ছেড়ে টিনোপাল ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

এখন টিনোপাল তাঁর কাচা সারা বাড়ীর সব জামাকাপড় ক'রে তোলে ধবধবে সাদা—নিখুঁত সাদা। শেষ ধোবার সময় মাত্র এক প্যাকেট ব্যবহার করলেই এক বালতি জামাকাপড় সাদা করা যায়।

আজই টিনোপাল ব্যবহার করতে শুরু করুন।

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

® টিনোপাল—জে. আর. গায়গী এস.এ., বাল, সুইৎজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ বাঃ ১১০৫০, বোম্বাই-২০ বি.আর.

এখন কেরলের পরে স্থান তামিলনাড়ু রাজ্যের, সেখানে শিক্ষিতের হার ৩৯-৪৪ শতাংশ। তারপর মহারাষ্ট্র (৩৯-০৬), গুজরাট (৩৫-৭০) ও পাঞ্জাব (৩৩-৩৯)। পাঞ্জাবের পরে স্থান পশ্চিমবঙ্গের। এখানে বলা দরকার, ভারতের সব রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলকে নিয়ে যে শিক্ষিতের হারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দশম। কিন্তু শুধু রাজ্যগুলির মধ্যে এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ। ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মোট সংখ্যা ২৮।

এবারের লোকগণনার হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় ভারতের নারীকুল সাক্ষর অভিযানে অধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। ভারতের পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৯-৪৯ জন এবং নারীদের মধ্যে শতকরা ১৮-৪৭ জন এখন সাক্ষর; ১৯৬১ সালে এই হিসাব ছিল যথাক্রমে ৩৪-৪৫ শতাংশ ও ১২-৯০ শতাংশ।

নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যও লক্ষণীয়। এ-রাজ্যের ৩০-১৯ শতাংশ নারী এখন সাক্ষর। নারী-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে এ-রাজ্যের চব্বিশ পরগণা ও হুগলী জেলায়। দার্জিলিং, পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ও মেদিনীপুর জেলায়ও নারী-শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষণীয়।

পশ্চিমবঙ্গে নারী-পুরুষের হারে যে ব্যবধান ছিল, তাও এবার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৬১ সালের লোকগণনায় দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষ-পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৮৭৮, এবারে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৯২। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বর্ধমান, হাওড়া ও কলকাতার নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতার ১৯৬১ সালে প্রতি হাজার পুরুষ-পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৬১৪, এবার ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৯৬।

শ্রমিক শক্তি হ্রাস

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা দশ বছরে ২৭-২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও এ-রাজ্যের শ্রমিক-সংখ্যার আনুপাতিক হার কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালে এ-রাজ্যের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৩-২ ভাগ, এবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ২৮-৩৭ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলাতেই এই শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা হ্রাস লক্ষ করা যায়। এ-ব্যাপারে কলকাতার অবনতিও লক্ষণীয়। ১৯৬১ সালে কলকাতার লোকসংখ্যার ৪০-৪ শতাংশ ছিলেন শ্রমজীবী, এবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৭-০৫ শতাংশ। কলকাতার অগণিত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াই এর কারণ বলে মনে হয়। এমনকি দুর্গাপুর, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন, সেন-র‍্যালে, রূপনারায়ণপুর, কে কে নগরসমৃদ্ধ বর্ধমান জেলাতেও শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক হার এক দশকের ব্যবধানে ৪৬-২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪২-৫ শতাংশে হয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ জেলায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই শ্রমজীবীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায়নি। প্রকৃতপক্ষে এ-রাজ্য যে একটা বড় রকমের শিল্প-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস তারই ইঙ্গিত বহন করে।

কলকাতা পৌর এলাকায় এখন ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার লোকের বাস। দশ বছরে কলকাতার লোকবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭-৩ শতাংশ, যদিও রাজ্যে লোক বেড়েছে ২৭-২ শতাংশ। শিল্প-সঙ্কট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় জীবিকার অভাব ঘটছে বলেই এই মহানগরীর লোকবৃদ্ধির এই মন্দগতি। অবশ্য কলকাতার চারপাশে উপনগরীগুলি গড়ে ওঠাও কলকাতার পৌর এলাকার লোকবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাওয়ার আর একটি কারণ। আর ঐ উপনগরীগুলি নিয়ে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা গঠিত হয়েছে। লোকসংখ্যার দিক থেকে তা ভারতের বৃহত্তম জনাকীর্ণ এলাকা।

ভারতের সর্বশেষ জনগণনার যেটুকু হিসাব এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রাথমিক হিসাব মাত্র। কিন্তু তাতেই এদেশের সর্বক্ষেত্রে একটা হতাশাজনক অবস্থার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। পরন্তু রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলি বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রসারিত হতে পারছে না বলে দেশে নিরন্ন, নিরাশ্রয়ের সংখ্যা সমানেই বেড়ে যাচ্ছে। শিল্পায়নের অগ্রগতিও আশানুরূপ নয় বলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যানুপাতিক হার দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। আর এই সবের ফলে সারা দেশের জীবনযাত্রার মানের যে অবনতি ঘটেছে, তাতেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মানুষ যখন শিক্ষিত হয় ও তার জীবনযাত্রার মান একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, তখনই সে তা রক্ষার জন্য পরিবার ছোট রাখার কথা চিন্তা করে। আর যে-দেশের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য ছাড়া হারানোর কিছু নেই, তার কাছে পরিবার-পরিকল্পনার আবেদন কতটুকু? যতদিন না অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে, ততদিন এদেশে জন-সমস্যার প্রকৃত সমাধানের অতি সামান্যই সম্ভাবনা। জন-সমস্যা যে আসলে অর্থনৈতিক সমস্যারই বাইপ্রোডাক্ট, রাষ্ট্রকে সবার আগে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

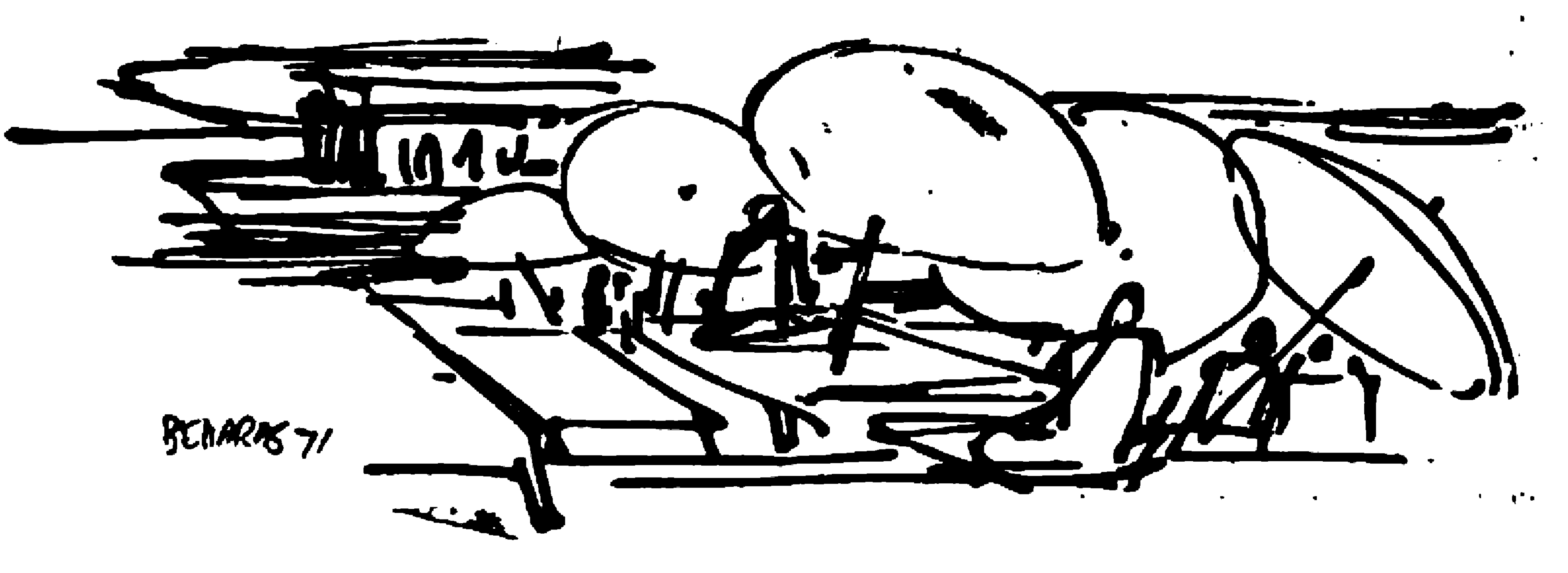

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

চতুর্থ খণ্ড

(১)

ছুটে ছুটে ছুটে, খরস্রোতের উপত্যকা পার হয়ে সুবলাদের পাথরভাঙ্গা গ্রামখানি ডাইনে রেখে পাহাড়টার উপরে উঠে সে ছুটে ছুটে ছুটে। পথেরও শেষ নেই আর মানুষের হৃদপিণ্ড ও মাংসপেশী কে জানতো তার শক্তি এমন অমিত।

আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর প্রকাণ্ড এক-খানা চাঁদ পণ করে বসেছে আকাশ ও পৃথিবীর কোন স্থান কোন রন্ধ্র কোন গুহা গহ্বর আজ অনালোকিত রাখবে না, সমস্ত দিবাভাগের মতো স্পষ্ট আর উজ্জ্বল। সম্মুখে পথটা মৃত অজগরের মতো নিশ্চল ভাবে শায়িত। সেই পথ ধরে আতঙ্কতাড়িত জরা ছুটেছে। পা মচকে গিয়েছে, কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, মাথার পাগড়িটা কখন কোন গাছের ডালে আটকে গিয়েছে কে জানে। বুকের পাঁজরের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা, দমাদম হাতুড়ি পিটছে যে কোন মুহূর্তে হাড় পাঁজরা ভেঙ্গে যাবে। আর চলে না, একবার দম নেবার জন্যে থামলো, ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, বসতে সাহস হয় না আর যদি উঠতে না পারে। আর কিছু নয়, নরেন্দ্রনগরের সঙ্গে ব্যবধানটা দীর্ঘতর করতে এই তার প্রতিজ্ঞা।

কত দূরে এলো দেখবার জন্যে পিছনে ফিরে তাকালো এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম। তাকিয়েই শিউরে উঠল আতঙ্কে, একি ঐ তো নরেন্দ্রনগর—হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ করতে পারা যাবে। তবে সে কি এতক্ষণ এক স্থানেই ছুটে মরেছে, না নরেন্দ্রনগর রাজপুরীটা তার পিছু পিছু ছুটেছে। পাহাড় অচল, নগর অচল তারা আজ সচল হল যেন মন্ত্রে। জরার সন্দিগ্ধ থাকলে বুঝতে পারতো যেখানকার পাহাড়, যেখানকার রাজপুরী সেখানেই আছে। একে পার্বত্য প্রদেশের আবহাওয়া স্বচ্ছ তার উপরে পরিপূর্ণ চাঁদের আলো তাই দূরকে এমন নিকট মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল কিসের যেন কোলাহল, কারা যেন তার পিছু নিয়েছে, না, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, আবার সে আরম্ভ করলো ছুটতে।

কোলাহল বটে তবে তা মনুষ্যকৃত নয়। পাহাড়টার বাঁদিকে গভীর খাদ সেই খাদের মধ্যে প্রবাহিত ঝরণা—এই ঝরণাটাই উপত্যকায় নেমে খরস্রোত নাম ধারণ করেছে। রাতের নিস্তব্ধতায় সেই ঝরণার স্পষ্টতর শব্দ জরার আতঙ্কিত কানে তার পশ্চাদ্ধাবমান রাজপুরীর লোকজনের কোলাহল। আবার ও কারা চাপাগলায় কথা বলে। গাছের পাতায় পল্লবে ফিসফাস শব্দ। কিন্তু কে বুঝবে, কার বুঝবার মতো এখন মনোভাব।

হঠাৎ তার কানে এলো নিহত নরকের আর্তনাদ, অসুর ভাই রাজবাড়ীতে খবর দাও গে। আর সঙ্গে সঙ্গে অসুরের তার-স্বরে ঘোষণা: ওগো তোমরা জাগো—শীগগির ওঠো, বাসুদেব হত্যাকারী পালালো। এ মনের বিকার নয়, কানের ভুল নয়, স্পষ্ট সজীব সত্য। হায় জরা কান আর মন কি আলাদা। মন যা শোনায় কান তাই শোনে। কিন্তু মনের মধ্যে এলো কি ভাবে। আরে, মনের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড। প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও এ বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না জরার এখন সে তো পরি-পূর্ণ বিকারগ্রস্ত।

জরা জানতো [illegible] তার পিছু পিছু [illegible] রাজ-বাড়ীর লোকজনের তার পিছু নেওয়া অসম্ভব নয়। না, তাই ঘটেছে। তার মনে পড়লো আগামীকাল পূর্ণিমায় নতুন মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ঠিক তার আগের দিনটিতে যদি জানতে পাওয়া যায় বাসুদেব হত্যাকারী রাজপুরীর মধ্যে আছে, আর শুধু তাই নয় সে রাজার প্রিয়পাত্র, বাসুদেবের দেশের লোক বলে, বাসুদেবকে স্বচক্ষে দেখেছে বলে বিশেষ অনুগ্রহ করে—

এখন সেই যদি নরাধম প্রতিপন্ন হয় তবে রাজার মনে দেখা দেবে উৎকট প্রতিক্রিয়া। পলাতক অপরাধীকে পাকড়াও করতে কোন চেষ্টার ত্রুটি হবে না তার দিক থেকে। এই সব যুক্তি জরাকে বোঝালো দারুন কোলাহল করতে করতে ছুটে আসে রাজবাড়ীর লোকজন। সে আবার ছুটলো।

কতক্ষণ ছুটেছে, কত দূরে এসেছে ছুটে, দেশকালের জ্ঞান নেই তার, এমন অবস্থাতে কারোই থাকে না। তাড়া-খাওয়া শিকার যেমন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে শিকারীর সান্নিধ্য অনুমান করতে চেষ্টা করে, তেমনিভাবে পিছন ফিরে তাকালো জরা। কি আশ্চর্য! কোথায় নরেন্দ্রনগর, কোথায় কোলাহল, নিশুতি রাত নির্জন নিঃশব্দ নিষুপ্ত। এ কি হল কোথায় গেল রাজবাড়ীর লোকজন, কোথায় গেল তাদের কোলাহল। সমস্তই মায়া নাকি। আসল কথা ছুটতে ছুটতে জরা অজ্ঞাতে মোড় ঘুরেছে, আর ঝরণাটাও খাদ বদলে অন্য খাদে গিয়েছে— তা ছাড়া এদিককার পাহাড়ে গাছপালাও বিরল। কাজেই নরেন্দ্র-নগর, লোকজনের কোলাহল, চাপা কণ্ঠের ফিসফাস সমস্তই লোপ পেয়েছে। এতক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা পাথরের উপরে বসলো, আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কিছুই টের পেলো না।

CENTRAL LIBRARY

জরার যখন ঘুম ভাঙলো অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গিয়েছে, সূর্য প্রথম প্রহরের আকাশে আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জনদুই লোক যাদের মুখটা চেনা-চেনা, তাদের চোখেও বিস্ময়ের আভা। উভয়পক্ষ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে লোক দুটোই প্রথমে কথা বলল, তা আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন?

জরা দিনের আলোয় এই প্রথম নিজের অবস্থা দেখল, পায়ে পাদুকা নেই, গায়ে আঙরাখা নেই, মাথায় উষ্ণীষ নেই দেহে এখানে ওখানে ছড়ে গিয়েছে—সবশুদ্ধ মিলে বস্তুত লক্ষ্মীছাড়া বেশভূষা হতে হয় তাই। জরা বলল, তোমাদের তো চিনলাম না।

আমরা আপনাকে খুব চিনি, আপনি মহারাজার পার্ষদ, তা এখানে কেন?

জরার চোখ প্রশ্ন করলো তোমাদের তো চিনলাম না।

চোখের প্রশ্নের উত্তর মুখ দিল, বলল, আমরা রাজবাড়ীতে কাজ করি, কাছেই আমাদের গাঁ ভিখনটুনি সেখান থেকে রাজবাড়ীতে যাতায়াত করি।

যতক্ষণ ওরা কথা বলছিল সময়োচিত উত্তর ভেবে নিচ্ছিল জরা। এবারে সে বলল, আর বলো না বাপু, কালকে চমৎকার জোৎস্না রাত দেখে মনে ইচ্ছা হল শিকারে বের হলে মন্দ হয় না। বের তো হলাম তারপরেই গোলযোগের সূত্রপাত হল। একে রাত্রিবেলা তাতে এদিকটায় আগে আসিনি—পথ ভুল হল। কোনদিকে চলেছি বুঝতে না পারায় ঘোড়াটাকে বেঁধে যেমনি কতকটা অগ্রসর হয়েছি একসঙ্গে তিনজন দস্যুতে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। অনেকক্ষণ লড়লাম, তারা তিনজন আমি একা। এই দেখো না কি অবস্থা হয়েছে—

বলে গায়ের কাটাচিহ্নগুলো দেখিয়ে দিল, তারপরে বলল, উষ্ণীষ আঙরাখা অস্ত্রশস্ত্র তো গেলই বেটারা ঘোড়াটা শুদ্ধ দক্ষিণাস্বরূপ নিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বসেছি কি ঘুমিয়ে পড়েছি।

লোক দুটো সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল, তা আর কি করবেন, আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন।

ওদের একজন বলল, এই পাহাড়গুলোর চোর-ডাকাতের আস্তানা, কত নিরীহ লোক যে রাহাজানিতে প্রাণে মারা পড়েছে তার স্থির নেই। যাই হোক বাসুদেবের কৃপায় আপনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন—এই ঢের।

জরা সংক্ষেপে বলল—হাঁ বাপু তাই।

তারা বলল, আর বসে থেকে লাভ নেই, চলুন আমাদের সঙ্গে।

জরা বলল, তোমরা এগোও, আর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমি আসছি।

ওরা যেতে যেতে বলল, তবে আমরা রাজবাড়ীতে খবর দিই গে—একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে।

শঙ্কিত জরা নিষেধ করতে যাবে দেখল তারা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। জরা বুঝলো আর একমুহূর্ত এখানে নয় তা ছাড়া এ পথেও অগ্রসর হওয়া চলবে না। সে নিশ্চয় জানতো বাসুদেব হত্যাকারীকে পাকড়াও করতে রাজা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

যে পাহাড়টার কোণে বসেছিল জরা তার মাথায় উঠে দাঁড়াতেই এমন দৃশ্য তার চোখে উদ্‌ঘাটিত হল যার অনুরূপ দেখা দূরে থাক কল্পনাও করেনি। উত্তরে-দক্ষিণে দূরে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে বলে দেখা যায় অনেক দূর কেবল পাহাড়, পাহাড়ের পরে পাহাড়, ছোট বড় মাঝারি ঢেউ খেলে চলে গিয়েছে। ঢেউগুলোর মাঝখানে চাষের জমি, ক্ষীণ সোতা এক-আধখানা গ্রাম। বামদিকে পাহাড়ের গায়ে তির্যকভাবে ঐ যে গ্রামখানা ঝুলে আছে খুব সম্ভব ঐ হচ্ছে ভিখনটুনি।

জরা পাহাড়ের দেশের লোক না হলেও ইতিমধ্যে পাহাড়ের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হয়েছে বুঝেছে পলাতকের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে তবে এই পাহাড়ের অরণ্যের মধ্যে তাকে পাকড়াও করা অসম্ভব না হলেও নিতান্ত কঠিন। পাহাড়ী পথে সর্বত্র ঘোড়া চলে না কাজেই অনুসরণকারীকে পায়ের উপরে ভরসা করতে হবে। তাতে দুজনেই সমান-সমান। আর বেশীক্ষণ দেখলে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে কতক্ষণ আর লুকোবার জন্য গুহা-গহ্বরের তো আদৌ অভাব নেই। সে ভাবলো আসুক রাজবাড়ীর লোক, আসবে যে নিশ্চয়ে তার সন্দেহ ছিল না।

প্রাণের আশঙ্কায় [illegible] আতঙ্কিত ছিল জরা তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাদের দাবী ছাড়বে কেন। অদূরে একটা ঝরণা দেখতে পেয়ে পেট ভরে জলপান করলো সেই সঙ্গে শীতল নির্মল জলে স্নান। সুযোগ পেয়ে ক্ষুধা নিজ মূর্তি ধারণ করলো। কিন্তু কী খাবে।

অনেকের ধারণা প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ অরণ্যে বন্য ফল-মূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। এরচেয়ে ভুল আর কিছুই হতে পারে না। বনে হরতকি আমলকি বহেড়া, বুনো কুল খেজুর প্রভৃতি কয়েকটা ফল জন্মায় বটে তবে সেসব খেয়ে কারো পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। পশুমাংসে সুলভ আর এক বনের পশু তাড়িয়ে গেলে বনান্তরে পৌঁছায় চলে। যত কিছু সুস্বাদু ও সুখাদ্য ফল-মূল এবং শস্য সমস্তই মনুষ্যের দীর্ঘকালের কৃষিচর্চার ফলে লব্ধ। তপোবনের একমাত্র শস্য নীবার ধান্যজাত তণ্ডুল অভিলাষী মুনিঋষিদের যোগ্য খাদ্য হলেও গৃহীর পাতে চলবে না, এমন কি রেশনের দোকানেও নয়। মোট কথা এই সেকালের তপোবনের জীবন বড় সুখের ছিল না অন্ততঃ খাদ্যের বিচারে একথা বনচারী জরার চেয়ে কেউ বেশি জানতো না তাই সে অসম্ভবের আশা না করে হাতের কাছে দু-চারটে কটু কষায় ফল যা পেলো তাই কোনমতে গলাধঃকরণ করে একটা ঝোপের ছায়ায় উপবেশন করলো। আবার সর্বদুঃখহরা নিদ্রা।

পূর্ণ চেতনা ও গভীর সুষুপ্তির মাঝখানে এক ফালি চওড়া জমি আছে তাকে স্বপ্নলোক বলা যেতে পারে। জরার মন তখন সেখানে বিচরণ করছিল। সে শপথ করে বলতে পারবে না স্বপ্ন দেখছিল না বাস্তব ঘটনা দেখছিল—তবে অভিজ্ঞতা মিথ্যা নয়। একদল সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার সবেগে ছুটে আসছে সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। একবার মনে হয় সত্য একবার মনে হয় স্বপ্ন; শোনা যায় তাদের হলাহল ধ্বনি, শোনা যায় ঘোড়ার খুরের দড়বড়ি, অতি স্পষ্ট, স্বপ্ন কি এমন প্রত্যক্ষ হয়। ক্রমে তারা কাছে এসে পড়ে জরা যেখানে শায়িত তার সিকি ক্রোশের মধ্যে। এবারে হঠাৎ তার তন্দ্রা ছুটে যায়—ঐ তো তারা, তবে তো স্বপ্ন নয়। জরা দেখতে পায় আট-দশজন অশ্বারোহী, কাঁধে তাদের তূণীর ও ধনুক, হাতে কারো বল্লম কারো অসি। বিদ্যুৎবৎ তার মাথায় খেলে যায় এ ঐ রাজবাড়ীর লোক দুটোর কীর্তি। তারা গিয়ে সংবাদ দিয়েছে পাকড়াও করতে ছুটে আসছে রাজপুরীর সৈনিকেরা। ওকে ভুল না। ঐ যে সবার আগে। তবে আর সন্দেহের কী আছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে ছোটে জরা।

পাহাড়ে দেশের লোক না হলেও এ কয়মাসে পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে, পাহাড়ের প্রকৃতি বুঝতে শিখেছে সে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠা সহজসাধ্য নয়, তার চেয়ে দ্রুত ছুটবে সে। পাহাড়ের

উপরে উঠতেই রাজানুচরদের চোখে পড়ে যায় জরা, ঐ যে ঐযে, ঐ যে পালায়। একসঙ্গে কয়েকটা তীর এসে পড়ে আশেপাশে। সাবধান মেরো না, মহারাজা ওকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন। এ কার গলা! কার আবার অনুচরের, এ গলা বেশ পরিচিত তার। জরা স্থির করে জীবিত তাকে কেউ ধরতে পারবে না। আক্ষেপ করে যে তীর-ধনুক হাতে নেই, থাকলে একলাই এ কটাকে নিকেশ করে দিতে পারতো।

ছুট ছুট ছুট, এবারে আর সহজ পথে নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে, বড় বড় পাথরের খণ্ডগুলোর পাশ কাটিয়ে, কখনো লাফিয়ে কখনো মাথা নীচু করে। কখনো হঠাৎ মোড় ঘুরে; পাহাড়ী ছাগলের চেয়েও দ্রুততর, নিশ্চিততর, অধিকতর অশিক্ষিত পদক্ষেপে জরা ছুটেছে। এক-একবার পিছন ফিরে দেখে লোকগুলো কতদূরে। না দূরত্ব ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে. এমনভাবে চললে ঘাড়ের উপরে এসে পড়তে আর বিলম্ব নেই। আবার ঐ যে কুকুরগুলো কানখাড়া করে জিব বার করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ছুটে আসছে। ওদের থেকে এবারে আর রক্ষা নেই। তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কোন দেব-দেবীকে বা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে না—আজ পর্যন্ত যার নাম করে ডাকেনি সেই জরতীকে। জরতীর এবার যে বাঁধ। একখানি উঁচু পাথরের

CENTRAL LIBRARY

উপরে থেকে তাকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে অসুর অবাক হয়ে যায়—একি কোথায় গেল লোকটা! দশ হাতের মধ্যে ছিল, আর একেবারে অদৃশ্য। একি ভোজবাজি না ইন্দ্রজাল। মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল না বাতাসে গেল মিশিয়ে। না কোথায় জরার চিহ্ন মাত্র নাই।

অন্য সকলে অসুরের পাশে এসে দাঁড়ায়, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে একি হল, কোথায় গেল। বাতাসে মিশে গেল না মাটিতে তলিয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি অসুর, কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে শুধু বলে, তাই তো।

কালকে রাত্রে ভয়ার্তস্বরে রাজপুরীর লোকজনকে জাগিয়ে তুলিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিয়েছিল, বলেছিল না—বাসুদেবের ভক্ত রাজা ও রাজপুরী ঐ লোকটা তাঁকে হত্যা করেছে। এই হত্যার গুরুত্বে নরকের মৃত্যু এতই তুচ্ছ ব্যাপার যে সেটা কেউ দেখেও দেখল না।

ভোরবেলা নরেন্দ্রনগররাজ সমস্ত শুনলেন, বললেন, যেমন করে পারো তাকে ধরে নিয়ে এসো পালাতে দিলে চলবে না।

কিন্তু কোথায় সে? কোন দিকে গিয়েছে? এমন সময়ে তিনকড়িদের সেই রাজভৃত্যরা এসে সংবাদ দিলে তাদের খাঁচার কাছে দেখেছে জরাকে।

রাজা আদেশ করলেন শীগগির যাও, ধরে আনা চাই। অসুর, সেই লোক দুটো আরও জনসাতেক ছুটলো জরার সন্ধানে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকটা সময় গিয়েছে, জরা আরও দূরে এসে পড়েছে। জরার আকস্মিক অন্তর্ধানে ওরা যখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তখন বেলা অপরাহ্ন। পাহাড়ে রোদের আলো এবং সন্ধ্যার অন্ধকার দুই ত্বরান্বিত আসে। ওরা যখন কিংকর্তব্য চিন্তা করছে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ওদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

(২)

জরা ওদের চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়ে ভাবে ব্যাপারটা কি হল? হঠাৎ কি মাটির তলায় তলিয়ে গেল না কোন গুহার মধ্যে এসে পড়লো। মাটির তলায় যদি, তবে নিশ্বাস নিচ্ছে কিভাবে? গুহার মধ্যে যদি তবে ঢুকলো কি ভাবে? মাটির তলা হোক কিম্বা গুহার মধ্যে হোক দুয়ে একটা মিল আছে—ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এলো কি-ভাবে। অবশ্য তখন তার এসব খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো মনের অবস্থা নয়। পড়ি কি মরি করে প্রাণের দায়ে ছুটেছে। শুধু মনে পড়লো, এই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে বসে মনে পড়লো আততায়ীদের হাত এড়াবার আশায় যখন হঠাৎ মোড় ফিরতে যাচ্ছে তখন পিছন থেকে একটা হেঁচকা টান যেন অনুভব করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেবেছিল গাছের ডালপালা হবে—তারপর কিছুক্ষণ সম্বিৎ ছিল না, তারপরে ঘোরান্ধকার। মাটির তলায় না গুহার মধ্যে।

মাটিতে বসে যখন সে জিরোচ্ছে আর [illegible] সমস্ত বিষয়টাকে পরিপাক করবার চেষ্টা করছে, অমনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার কানে এলো একটা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ। হুঁ-হু, হুঁ-হু, হুঁ-হু! এ আবার কি? মানুষ নয় নিশ্চয়, মানুষে এমন শব্দ করে না। জন্তু-জানোয়ার হবে খুব সম্ভব বুড়ো বুনো ছাগল কাছেই কোথাও পড়ে ধুঁকছে। বনের মধ্যেই এমন দেখেছে। ক্রমে ঐ শব্দটা কাছে আসতে আসতে একেবারে হাতখানেকের ব্যবধানে এসে পড়লো।

হুঁ-হু হুঁ-হু হুহু বলি কি ভাবছ?

এ-যে মানুষের কণ্ঠস্বর! সাহস পেয়ে জরা শুধায়, প্রভু আপনি কে?

তুমি কি ভেবেছিলে বলো তো।

জরা উত্তর দেয় না।

বলই না লজ্জা কিসের? বুড়ো ছাগল ভেবেছিলে নিশ্চয়।

জরা সত্যি তাই ভেবেছিল, তবে মুখের উপরে তা তো আর বলা যায় না। চুপ করে থাকে।

আরে বলোই না, ক্ষতি কি?

জরা বলে, কি করে জানলেন প্রভু?

পাঁচজনে বলে তাই জানলাম।

এবারে সাহস পেয়ে জরা শুধালো, প্রভু এখন তো মানুষের মতো কথা বলছেন, তবে আবার ও-রকম অদ্ভুত শব্দ আবার করেন কেন?

কেন? আমার চেহারাখানির সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে। একবার আমার চেহারাখানি দেখলে বুঝতে পারবে ঐ রকম অদ্ভুত শব্দটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তবে যে মানুষের মতো কথা বলি সেটা পূর্ব সংস্কারবশতঃ।

কিছুই বুঝতে পারে না জরা। তবে এটুকু বোঝে, কিছু বলা আবশ্যক। বলে প্রভু কখন আপনার দেখা পাবো?

বুঝেছি, আমার মুখখানি দেখে সন্দেহ-ভঞ্জন করতে চাও। তা এখনি পাবে, একটু অপেক্ষা করো, আরো ওরা দূরে যাক, এখনো কাছাকাছি আছে। ভাবছে তুমি নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছ। আর তাদের রাজার বাবার সাধ্য নেই তোমাকে খুঁজে বের করে—একেবারে গর্ভগৃহে লুকিয়ে রেখেছি না।

কি করে জানলেন প্রভু?

প্রভু কোন উত্তর দেয় না, তার বদলে সেই রহস্যময় শব্দ করে হুহু, হুহু, হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে সেই রহস্যময় লোকটি বলল, নাও, এবারে চন্দ্রালোকে আমার মুখ-চন্দ্র দর্শন করো, বলে পাথরের দেয়ালে ঠেলা দেয়—একখানি পাথর সরে যায়। পাথরখানা স'রে যেতেই অনেকখানি চাঁদের আলো এক ঝলকে ঢুকে পড়ে লোকটির মুখের উপরে পড়ে। সে মুখ দেখে অবাক হয়ে যায় জরা।

ভীষণ মুখ বটে খট্টাসের। সে মুখ দেখলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁদে—কতকণে ছুটে পালাবে তাবে দর্শক। এ মুখের ছাঁদ স্বতন্ত্র। রহস্যময়-বলয়ে-[illegible] হয়। মুখখানি যেন দর্শকের দিকে তাকিয়ে রহস্য করছে; দেখলে হাসিও পায়, আবার করুণাও হয়। মুখমণ্ডল শুকিয়ে একটি শুষ্ক হরিতকীর মতো শীর্ণ, জীর্ণ, চিবুকে একগোছা কাঁচা-পাকা দাড়ি। আর চোখ দুটি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। জরার মনে হ'ল মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন বুনো ছাগলের সঙ্গে মিল আছে সে মুখে।

কি দেখলে সো?

জরা শুধালো, প্রভু আপনাকে কি বলে ডাকবো?

সবাই যা বলে ডাকে, ছাগর্ষি।

বুঝতে পারে না জরা। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলে পেটে বুঝি চু-চু, টোল চতুষ্পাঠীর সঙ্গে বুঝি জন্ম থেকেই আড়ি।

অপ্রস্তুত জরা বলে, প্রভু, মুখখু সুখখু মানুষ লেখাপড়া শিখবো কি করে।

তা বেশ করেছে। লেখাপড়া শিখে যারা মূর্খ হয় তাদের তুলনা নেই। তা বাড়ী কোথায়? এ-দেশী লোক যে নও চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

জরা বলে দক্ষিণ দেশে।

ব্যবসা কি?

জরা আবার বলে ব্যাধ।

চমকে উঠে লোকটি বলে দক্ষিণ দেশে বাড়ী, ব্যবসা ব্যাধগিরি। বাহা বাহা শুনেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

জরা তো অবাক, মূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

আরে এটা বুঝলে না, তোমাদের জাত-গোত্রের কারো শরাঘাতে সেই কালান্তক বেটা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছে।

জরা ভাবে এ-কি, এই সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গুহার মধ্যেও সে সংবাদ প্রবেশ করেছে।

বুঝতে পারছ না। আমি বসুদেবের বেটা বাসুদেবের মৃত্যুর কথা বলছি। দেখলে না কেমন ঘোঁট পাকিয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিলে আর আঠারো অক্ষৌহিণী নিরীহ প্রাণী মারা পড়লো। এ নাটের গুরু তো সেই বেটা। তেমনি আক্কেলও হয়েছে বেঘোরে মারা পড়লো এক ব্যাটা ব্যাধের তীরের আঘাতে।

প্রভু এ-কি বলছেন, তিনি যে ভগবান। আজ নরেন্দ্রনগরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

খুবই স্বাভাবিক। রাজা বেটাদের কাজই হচ্ছে মানুষ মারা। সেই মানুষ মারার সর্দারের প্রতি তাদের ভক্তি হবে না-তো কার উপরে হবে। থাক এসব কথা বুঝবে না, তোমার বিদ্যার দৌড় বুঝে নিয়েছি কি না।

প্রসঙ্গান্তরে খুশী হ'য়ে জরা শুধালো কি বলে ডাকবো প্রভু আপনাকে।

কেন, ঐ যে বললাম ছাগর্ষি। ছাগ আর ঋষি সন্ধি করলে দাঁড়ায় ছাগর্ষি। আর সমাস করলে—আচ্ছা ওটা না হয় থাক, সমাস বোঝাতে সময় লাগবে।...হুহু হুহু, হুহু।

CENTRAL LIBRARY

জরা সঙ্কোচে নিবেদন করে, ও নামে কি ডাকা যায় আপনাকে।

আরে এ-তো শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা। দেব ভাষার মাহাত্ম্যে কত কদম পার হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের লোক আমাকে সোজা-সুজি ছাগলা, ছাগলা ঋষি, বুনো ছাগল, পাহাড়ী ছাগল কত নামেই না ডাকে।

আপনি অপ্রসন্ন হন না।

অপ্রসন্ন হ'লে চলবে কেন? ওরা যে আমার অন্ন জোগায়, তা একটু রহস্য করবে বই কি।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে কখন খেয়েছিসে?

এতক্ষণ উত্তেজনাবশে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল জরা, এবারে খাদ্যের নামে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, বলল কালকে রাত্রে।

তবে তো খিদে না পেয়ে যায় না। দেখি কিছু আছে কিনা। এসো আমার সঙ্গে।

দু'চার পা চলতেই মোড় ঘুরতে হ'ল সেখানে ঘোর অন্ধকার।

প্রভু কিছু যে দেখতে পাই না।

আমার হাত ধরো। আমার আবার কি জানো অন্ধকারে যেমন দেখতে পাই, আলোতে তেমন নয়। বুঝলে না, আঠারো বছর এই গুহার মধ্যে আছি। বের হইনি, অন্ধকার বেশ সড়গড় হ'য়ে গিয়েছে।

বের না হ'লে আমাকে রক্ষা করলেন কি ক'রে?

তাতে বের হওয়ার প্রয়োজন হবে কেন? ঐ যে পাথরখানা ঠেলে সরাতে চন্দ্রালোক এসে ঢুকলো, মাঝে মাঝে ঐ পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে মানুষের রঙ্গ-রহস্য দেখি। তখন ঘোড়ার ক্ষুরের ধড়বড়ি শুনে পাথর ঠেলে দেখি যে, তোমাকে ধরলো বলে— তখন এক টানে তোমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে আবার পাথরখানা ঠেলে দিলাম। বেটারা খানিকটা এদিক-ওদিক করে ফিরে গেল। নিশ্চয় নরেন্দ্রনগরের লোক কি বলো?

হ্যাঁ প্রভু।

তা তোমার উপরে এমন সদয় কেন? তাও খেতে খেতে বলো শুনি।

এই বলে খানকতক বাজরার রুটি আর একটু শাক ও চাটনি দিল, সেই সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে জল।

জরা গো-গ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলো। তার মুখে সেই শুকনো রুটি অমৃতের স্বাদ দেয়। ক্ষুধার অন্ন অমৃত, বিলাসের অন্ন গরল।

জরা বলল, প্রভু, আমি রাজরোষে পড়েছি।

সে তো বাপু বুঝতেই পারছি। ঘোড়-সোয়ার দিয়ে তাড়া করে যে শিকের বর সন্ধান করে না, এ-তো সকলেই জানে। হঠাৎ রাজার রোষটা হ'ল কেন তাই শুধোচ্ছি।

হঠাৎ রাজার প্রসাদ লাভ করেছিলাম, তারই পাল্টা হ'ল হঠাৎ রাজার রোষ।

বেশ এ-ও সহজবোধ্য। এবারে হঠাৎ প্রসাদ ও হঠাৎ রোষের কারণটা বলো দেখি।

জরা বলে, রাজা বাসুদেবের জন্য।

তা' শুনেছি।

আমি বাসুদেবের দেশের লোক শুনে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক! চমকে ওঠে ছাগর্ষি, কই একথা তো বলোনি।

ঐ যে বললাম দক্ষিণ দেশের লোক।

হাঁ এখান থেকে দ্বারকা দক্ষিণে বটে, তবে আরও অনেক দেশ তো দক্ষিণে, কেমন ক'রে বুঝবো যে তুমি দ্বারকার লোক।

আপনি বাসুদেবের প্রতি অপ্রসন্ন তাই বলিনি।

এখন তর্কের মুখে বলতে বাধ্য হ'লে কি বলো?

জরা চুপ ক'রে থাকে।

তারপরে রোষের কারণ?

রাজার একজন প্রিয় পাত্রকে হত্যা করে ফেলেছি।

কেন বলো তো।

সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

আততায়ীকে হত্যা তো অপরাধ নয়।

সে-কথা বলবার অবকাশ পেলাম কই?

প্রকৃত ঘটনা বলতে ভরসা পায় না জরা।

ছাগর্ষি বলে, ওসব কথা থাক, এখন খেয়ে নাও।

জরার আহার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল।

ছাগর্ষি বলল, এই গুহার শেষের দিকে একটা ঝরণা আছে সেখান থেকে আমি জল সংগ্রহ করি।

আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আপনি দেখছেন কি ক'রে?

আমি যে আজ চল্লিশ বছর এই গুহার মধ্যে বাস করছি। অন্ধকারে চোখ এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে যে অনায়াসে দেখতে পাই, বরঞ্চ আলোতেই এখন কষ্ট হয়। তাই সারাদিন পাথরখানা দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ ক'রে রাখি, কেবল রাত্রের বেলায় খুলে রাখি, বাতাস আসে আবার চাঁদের আলোও আসে। তবে আজ বেশিক্ষণ আলো পাওয়া যাবে না। আজ চন্দ্রগ্রহণ একেবারে পূর্ণ গ্রাস।

গ্রহণ শব্দটি শুনেমাত্র জরার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে। শীতান্তে সর্পের মতো জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। সে মন্ত্রের মতো আবৃত্তি ক'রে চলে গ্রহণ, গ্রহণ, তাই তো।

গ্রহণ শুনে অবাক হ'লে কেন, কখনো কি গ্রহণ দেখনি।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জরা শুধোয়, ভূমিকম্পও হয় নাকি?

প্রায়ই পাহাড়ে দেশের রীতিই এই।

আচ্ছা সঙ্গে সমুদ্র ফেঁপে আসে না?

সমুদ্র এখানে কোথায়? পাগল হয়ে গেলে নাকি? হাঁ বাপু, কৌশলে আমার নামটি তো জেনে নিলে, এবারে তোমার নামটি বলো তো শুনি। কতক্ষণ আর সর্বনাম দিয়ে চালানো যায়।

প্রভু আমার নাম জরা ব্যাধ।

বেশ নামটি তো!। জরা ব্যাধ। কে দিয়েছিল এ নামটা। তোমার বাপ-মা দেখছি তত্ত্বদর্শী ছিলেন। জরা ব্যাধ। জরা তো ব্যাধই বটে, তার বাণে সকলকেই নিহত হ'তে হবে।

ছাগর্ষির এসব কথা জরার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা নিজের উদ্দেশ্যে। জীবন-রহস্যকে সে যেন লাভ করলো একটা সূত্রা-কারে। জরা ব্যাধ কিনা জরাব্যাধি।

জরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কি জানি কোন্ স্মৃতির টানে কোন গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তাই সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার আশায় শুধোয় প্রভু, আপনি এই গুহায় একাকী চল্লিশ বৎসর বাস করছেন কেন?

হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ। সে অনেক কথা তুমি বুঝবে না। পেটে বিদ্যা না থাকলে সে কথা বোঝা যায় না।

বুঝিয়ে দিলে অবশ্যই বুঝবো।

না তাও বুঝবে না। বাতিতে তেল থাকলে তবে আলো জ্বালানো যায়। সে তেলটুকুই যে নাই তোমার ঘটে।

ছাগর্ষি বুঝতে পারে না, জরা বুঝতে পারলো না।

তবে শোনো বলি অনেক বিষয় আছে যা বোঝবার জন্যে গোড়ায় একটু জ্ঞান থাকা দরকার। তোমার সেই গোড়ার জ্ঞান-টুকুর অভাব। তবে এই পর্যন্ত শুনে রাখো যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না।

কেন প্রভু?

ঘটনাটা শুনে নাও, তত্ত্বটা বুঝতে চেষ্টা করো না। আমি অমরাবতী রাজ্যের রাজা ছিলাম। ধন, জন, স্ত্রী পুত্র সৈন্য সামন্ত রূপ, যৌবন, কিছুরই অভাব ছিল না আমার। সকলেই আমার জয়ধ্বনি করতো, ভাবতাম তারা আমাকেই চায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম যে, তারা আমার ধন, রূপ, যৌবন, শক্তির জয়ধ্বনি করছে, সে জয়ধ্বনি আমার উদ্দেশ্যে নয়। আমার ধারণা যে অমূলক নয় প্রমাণ হ'তেও দেরী হ'ল না। শত্রুপক্ষের রাজা আমার রাজ্য জয় ক'রে নিয়ে আমাকে বিতাড়িত ক'রে দিল। রাজ্য ছেড়ে পালাবার সময়েও শুনতে পেলাম তেমনি জয়ধ্বনি উঠছে, তবে এবারে তা বিজয়ীর উদ্দেশ্যে। ভাবলাম তাহলে বিত্ত রাজ্য, রূপ, যৌবন শক্তির এই মূল্য, এই প্রকৃতি, এই পরিণাম। তখন হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ। কি করলাম বলতে পারো।

জরার নিরুত্তরতা প্রমাণ করে সে বুঝতে পারেনি।

রাজ্য ছেড়ে [illegible] দেশান্তরী হ'লাম। স্ত্রী-পুত্র কেউ এলো না সঙ্গে কাজেই নিঃসঙ্গ। সে ভালোই হ'ল, কারো কাছে দায়িত্ব নেই। আমারও কোন দায় নেই। লোকে দরিদ্রকে ভিক্ষা দেয়, সন্ন্যাসীকে

ভিক্ষা দেয়। রাজচ্যুত রাজাকে ভিক্ষা দেবে কে? বরঞ্চ সকলেই যেন খুশী. ভাবটা এই যে, কেমন এখন হয়েছে তো! খুব যে রাজা সেজে সকলের মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাতে। এখন নাও পথে পথে হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরে মরো! দুঃসময় দিনে মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরে জনপদ ছেড়ে দিয়ে বনে চলে এলাম। তখন খাদ্য পানীয় গাছের ফল আর নদীর জল। ক্রমে এসে উপস্থিত হ'লাম এই পাহাড়ী দেশে। এখানে দূরে দূরে পাহাড়ীদের ছোট ছোট গ্রাম। নীচু জমিতে চাষ, আর পাহাড়ময় ছাগলের পাল। ছাগল হচ্ছে পাহাড়ীদের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। ওরা দুধ জোগায়, মাংস জোগায়, মাল বহন করে, ওদের চামড়া দিয়ে পাদুকা তৈরি করে যা নইলে পাহাড়ে চলাফেরা করা দায়। কি শুনছ না ঘুমিয়ে পড়লে?

না বাবা শুনছি।

বেশ মন দিয়ে শোনো। একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে এই পাহাড়ের কাছে একটা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম শেষ হ'য়ে আসতেই অনুভব করলাম, পেটের মধ্যে ক্ষুধায় করাত চালাচ্ছে। ভাবছি কোথায় যাই, কী খাই, না হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেই সব জ্বালা জুড়াই। চোখ খোলবার বড় ইচ্ছা আর ছিল না, কিন্তু চোখ বুজেই বা কতক্ষণ পড়ে থাকা যায়। তাকিয়ে দেখি আমার কাছে একটি ছাগী দাঁড়িয়ে আছে, দুধের ভারে তার বাঁট দুলে পড়ে টন-টন করছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে এগিয়ে এল, তার বাঁটদুটো আমার মুখের কাছে। মনে হল সে আমার কোন জন্মের মা, সন্তানের ক্ষুধা টের পেয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি সেখানে শুয়ে শুয়ে পেটভ'রে তার দুধ পান করলাম। আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লে ছাগলটা গাঁয়ের দিকে চলে গেল। সেই মাতৃদুগ্ধ পান ক'রে নূতন জীবন লাভ করলাম। শুনছ তো?

আজ্ঞে হাঁ।

দেখো কেমন গল্প ফেঁদেছি। ইচ্ছা আছে, কোনদিন যদি লোকালয়ে যাই তবে এই কাহিনী নিয়ে ছাগ-পুরাণ রচনা ক'রে অষ্টাদশ পুরাণের সঙ্গে যোগ ক'রে দেবো। তবে তা আর হ'য়ে উঠবে না।

কেন প্রভু?

খামোকা প্রশ্ন ক'রো না। মন দিয়ে শুনে যাও। আমার মনে হ'ল ছাগলটা আবার আসবে আমাকে স্তন্য পান করাতে। তাই সেখানেই রয়ে গেলাম। দেখি হাঁ সকালবেলাতে সে এসে উপস্থিত হয়েছে। মাতৃক্রোড়ে শুয়ে পেটভরে দুধ পান করলাম মায়ের দুধের স্বাদ তো বড় হ'লে মনে থাকে না, ভাবলাম এইরকমই অমৃতময় ভাবে। তারপর থেকে রোজ দুবেলা আমার ছাগমাতা এসে মানবসন্তানকে দুধ পান করিয়ে যায়। ভাবতাম আমি কেন ওর ছোট্ট বাচ্চাটি হ'লাম না, মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম, উপত্যকার সবুজ ঘাস খেতাম, ক্ষিদে পেলে পেটভরে দুধ খেতাম! তা, না হয়ে হায় আমি মরতে কেন মানুষ হ'তে গেলাম, তায় আবার রাজা। পূর্বজন্মে অনেক ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা করলে তবে রাজা হয়ে জন্মায়! যাক গে ওসব বাজে কথা, এবারে কাজের কথা শোনো। ক্রমাগত ছাগলের দুধ পান করবার ফলে দেখি আমার কণ্ঠস্বরে বেশ ছাগলের ডাকের গিটকিরি খেলতে শুরু করেছে। হুহু, হুহু হুহু। কেমন না। আর একদিন পল্বলে জলপান করতে গিয়ে দেখি বা-বা-বা চেহারাটি বেশ ছাগভাব-যুক্ত হয়ে উঠেছে। ছাগলা, দাড়ি, ছাগলা মুখ, ছাগলা চোখ—কণ্ঠটি তো অবিকল ইতিমধ্যে হয়েছে কি জানো পাহাড়ীরা লক্ষ্য করেছে যে রোজ ছাগলে এসে আমাকে দুধ খাইয়ে যায়, তার উপরে আমার মুখের চেহারা আর কণ্ঠস্বর। সরল পাহাড়ীদের ধারণা হল আমি ছাগ জাতির দেবতা, দয়া করে দেখা দিয়েছি। তারা ভাবলো এখানে যতদিন থাকবো তাদের ছাগপালের মঙ্গল হবে, তারা মড়কে মরবে না, শ্বাপদের হাতে মরবে না। আমাকে এখানে স্থায়ী করবার আশায় নিত্য বজরার রুটি, শাক চাটনি লাড্ডু প্রভৃতির ভোগ জোগাতে লাগলো, অন্না-ভাব, আমার ঘুচে গেল।

এতক্ষণ জরা নীরবে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনছিল এবারে বলল, প্রভু তবেই তো দেখলেন মানুষের মনে দয়ামায়া আছে।

রামচন্দ্র! আমাকে মানুষ করলে কি ভোগ জোগাতো। তাছাড়া স্বার্থ যে স্বার্থের দান তো বেতন, তাকে দয়ামায়া বলছ কেন? ওরাই আমাকে এই গুহাটা দেখিয়ে দিল। এখন এখানে বেশ স্থায়ী হয়ে বসেছি, দুবেলা ভোগ খাই, মাঝে মাঝে মুখখানা বের করে দর্শন দি, আর হুঁ-হু হুঁ-হু হুঁ-হু করে ছাগলাদ্য তান ছাড়ি। এখানেই আছি, এখানেই থাকবো, এখানেই মরবো। আর পরজন্মে ছাগশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফালাফি করে বেড়াবো।

প্রভু মার্জনা করবেন কথকতার আসরে শুনেছি যে যিনি ছাগ সৃষ্টি করেছেন মানবও তাঁর সৃষ্টি।

ঐ সব ছেঁদো কথা রাখো তো। বিধাতারও ভুল হয়ে থাকে। ঐ ছাগ পর্যন্ত এসে থামলেই যথার্থ হতো। আবার মানুষ কেন?

শুনেছি মানুষ সব সৃষ্টির সার।

বটে বটে। সার তবে সমস্ত দোষের সার। ছাগলের রিরংসা, কুকুরের স্বজাতি বিদ্বেষ, ছাগলের শঠতা, মেষের ভীরুতা, বানরের অনুসরণ প্রিয়তা, সর্পের প্রতি-হিংসা স্পৃহার ঘনীভূত মূর্তি মানুষ। আর কোন প্রাণী কি উপকারীর অপকার করে? আর কোন প্রাণী কি খাদ্যদাতার হস্ত দংশন করে? আর কোন প্রাণী কি নখদন্তকে যথেষ্ট না মনে করে নরমেধী অস্ত্র উদ্ভাবন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে? তবে কি জানো আর বেশি দিন নয়, বিধাতার ভ্রম সংশোধন করবার ভার মানুষ নিজেই গ্রহণ করেছে। ঐ যদুবংশের ইতিহাসটাই সমগ্র মনুষ্যজাতির অনতি-দূরবর্তী ইতিহাস। বিধাতা যখন মারতে চান নিজে কষ্ট স্বীকার করেন না মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র জুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপরে আমার রাগের কারণ মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র জুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপরে আমার রাগের কারণ কৌরব পাণ্ডব কুরুবংশ যদি নাশ করলেন বাকি কটাকে রাখতে গেলেন কেন। মোট কথা এই যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না তাই মানুষকে একঘরে করেছি। বুঝলে কিছু হুঁ-হু হুঁ-হু হুঁ-হু।

জরা বলে, প্রভু মানুষের উপরে আপনার যদি এতই রাগ তবে আমার উপরে এই অনুগ্রহ কেন?

তাই তো ভাবছি ভিতরে মন তো কোথাও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। তবে আর বেশিক্ষণ নয় কাল সকালেই তুমি বিদায় নাও। নাও এখন ঘুমোও রাত অনেক হয়েছে।

তারপরে বলে, ঐ পাথরখানা খোলা রয়েছে, রাতের বেলা খোলাই থাকে, ঐ ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঐ কোণায় ঘুমোচ্ছি, আমার আবার আলো সহ্য হয় না।

এই বলে ছাগর্ষি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

জরা ঐ ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে, তার বদলে নানারকম চিন্তা মাকড়সার মতো জটিল জাল বুনতে লাগলো সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে। চরাচর নিঃশব্দ, কেবল গুহার কোন্-অন্ধকার কোণ থেকে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগলো হুঁ-হু হুঁ-হু হুঁ-হু শব্দ।

(ক্রমশঃ)

সন্ধিৎসু চোখে

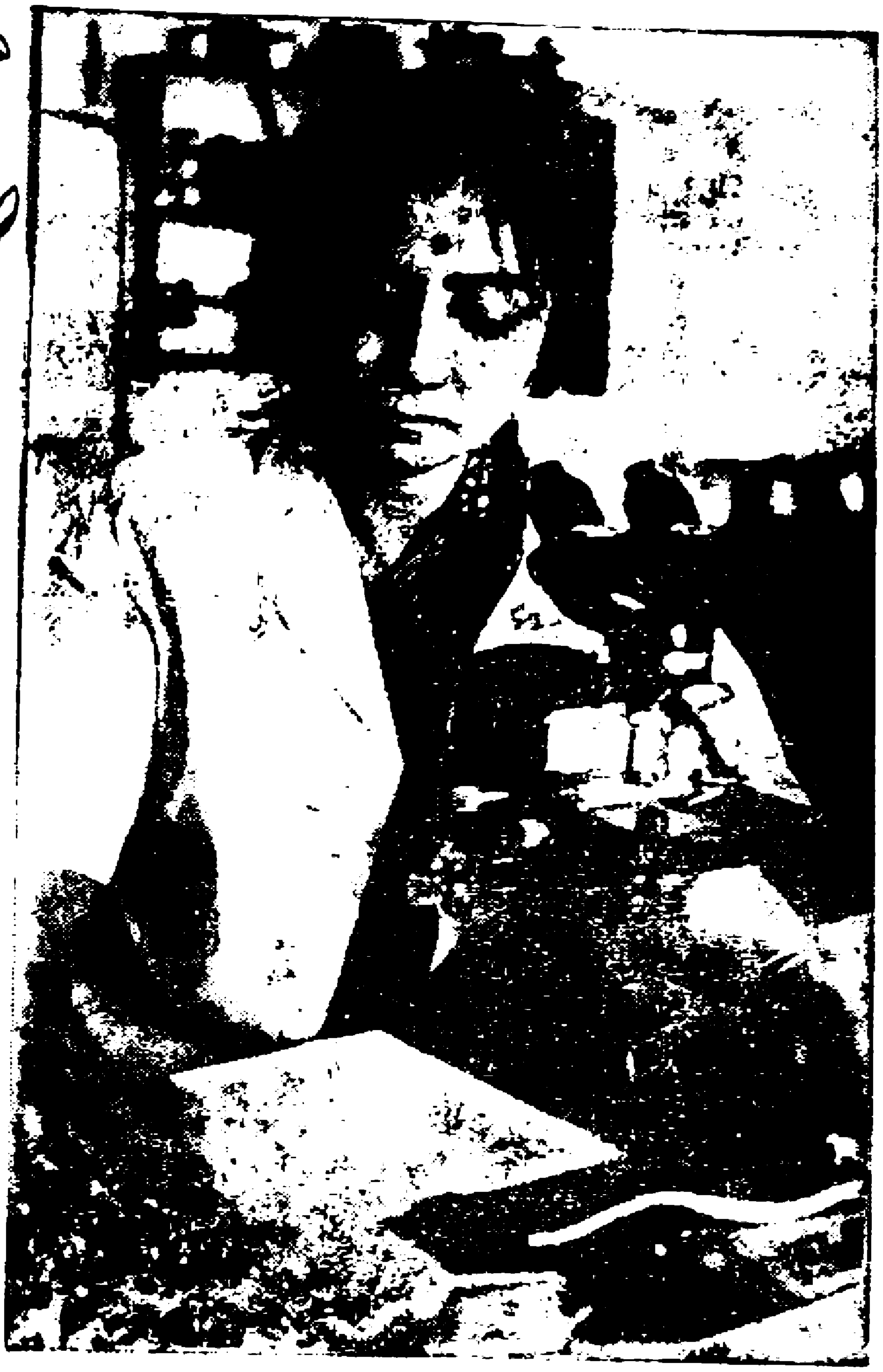

আপাত সুখের আড়ালে জয়শ্রী রায়চৌধুরী

'শিয়রে কেউটে সর্পাঘাত, কোথায় বাঁধবি তাগা?'—আধুনিক বিজ্ঞান তবু এই প্রশ্নটির মোটামুটি উত্তর দিতে পেরেছে: পারেনি আজো কর্কট দংশনের দাওয়াই বাৎলাতে। ক্যানসার মানেই অবধারিত মৃত্যু। এখন পর্যন্ত যা চিকিৎসা হয় তা সবই রুগীকে সাময়িক রিলিফ দিতে বা বড়জোর আর কিছুদিন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম। আসল চিকিৎসা কিছুই নেই। সম্ভব নয়। আদতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র দশ বছর পরিশ্রম করেও রোগটির মূলে এযাবৎ পৌঁছোতে পারে নি; পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগারে শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

ক্যানসার কি?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা বলেন, টিস্যু এবং কোষের অস্বাভাবিক নতুন বৃদ্ধি যাকে আকটানো যায় না, যা ক্রমাগত বেড়েই চলে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই হচ্ছে ক্যানসার। গাছপালা, জীবজন্তু থেকে মানুষ কেউই এর হাত থেকে রক্ষা পায় না।

সাধারণত খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে ক্যানসার দু ধরনের—উৎপত্তির কারণ অনুসারে কার্সিনোমা ও সার্কোমা। এ ছাড়া রোগের বিস্তার পর্যায় লক্ষ্য করে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাথমিক বা লোকালাইজড্ (২) মেটাস্টেটিক (৩) সারা দেহে ব্যাপ্ত। যদিও ক্যানসার মাঝবয়েসী বা বৃদ্ধদের রোগ বলেই পরিচিত, তবুও যে কোন বয়সেই এই রোগ দেখা দিতে পারে। আর সে জন্যই গোড়া থেকে সাবধান হওয়া দরকার। মাথা থেকে পায়ের পাতা দেহের কোন অংশই বাদ যায় না এর আক্রমণ থেকে—ত্বক, মুখ-গহ্বর, জিহ্বা, ল্যারিংস, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, গলা, ফুসফুস, খাদ্যনালী, স্টমাক, প্যাংক্রিয়াস, মলদ্বার, স্তন, ইউটেরাস, মূত্রাশয়, প্রোস্টেট ও হাড়।

বাদ যায় না কেউ অথচ রোগ জাঁকিয়ে বসলে প্রচলিত চিকিৎসায় দেহের অংশবিশেষ কেটে বাদ দেওয়াই নিষ্কৃতির প্রাথমিক উপায়। কোন কোন বিশেষ ধরনের ক্যানসারে রন্টজেন রশ্মি বা গামা রশ্মি দিয়ে অস্বাভাবিক ক্রমবর্ধমান কোষ বা টিস্যুগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আবার কিছু কিছু ক্যানসারে হরমোন ট্রিটমেন্ট করেও সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ ধরনের ক্যানসারে ডাক্তাররা রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করেও সুফল পেয়েছেন। আবার লিমফয়েড টিউমারে রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে ফল পাওয়া গেছে।

এত করেও কিছু হচ্ছে না, তার কারণ একটাই—কেন ক্যানসার হয় সেই কারণটাই আজো আমরা বার করতে পারিনি। 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল ব্যাপার স্যাপার আমার মত একজন নভিসকে বোঝাতে গিয়ে রীতিমত ঝামেলায় পড়েছিলেন ডক্টর রায়চৌধুরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুবোধ মিত্রের মেয়ে জয়শ্রী রায়চৌধুরী জন্ম ইস্তক এই বিশেষ রোগটির সাথে পরিচিত। একমাত্র মেয়ে ডক্টর মিত্রের। ছোটবেলা থেকে ছায়ার মত ঘুরেছেন বাবার সঙ্গে। কানে শুনে নয়, নিজের চোখেই দেখেছেন সেই জাত-চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর কাজকর্ম'। ক্যানসার হসপিটালের গোড়াপত্তন থেকে ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট সবই ওঁর জানা। তাই ভেম্পায় সালে লরেটো হাউস থেকে আই-এস-সি পাশ করে মেয়ে যখন জিদ ধরল: আমি ডাক্তারী পড়ব, বাবা মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেও মনে মনে নিশ্চয় খুশী হয়েছিলেন! ঘরাণার ঐতিহ্য এভাবেই তো বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

বাবা যখন 'মিত্র অপারেশন অব ক্যানসার সেরভিক্সের' মত জটিল কাটাছেঁড়ার তত্ত্ব উদ্ভাবনে ব্যস্ত তারই মধ্যে মেয়ে ধাপে ধাপে বছর পেরিয়ে আটান্ন সালে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এলেন মেডিক্যাল কলেজ থেকে। সেই বছরই বিয়ে আর সেই বছরই মা হলেন মেয়ে। তবু নেশা ছাড়ে

না। পুরোপুরি বাঙালী গৃহিনী হলে হবে কি, জয়শ্রীর বোধ সাংঘাতিক। সারা জীবন যে রোগের বিরুদ্ধে বাবা লড়াই করেছেন, তার শেষ না দেখে ছাড়ব না, কিছুতেই না। জানতেই হবে এ রোগের কারণ কি?

আর সে জন্যই বিয়ের বছরেই পাড়ি জমালেন সুদূর আমেরিকায়। নিউইয়র্কে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে 'স্লোয়ান-কেটারিং ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চে' দু'বছর ডক্টর অ্যালিস মুর-এর তত্ত্বাবধানে থেকে শিখলেন ক্যানসার গবেষণার প্রাথমিক কাজ—টিস্যু কালচার, ভাইরোলজি ও অ্যাপ্লায়েড বায়োলজি।

জয়শ্রী যখন বিদেশে, ঠিক সেই সময়েই চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে একটি ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র খুলেছেন প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ডক্টর সুবোধ মিত্র। শুধু রোগ নির্ণয় করে আর প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে যে এই দুর্নিবার রোগকে ঠেকানো যাবে না, মনস্বী-চিকিৎসক তাঁর সারাজীবনের সাধনায় তা উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই উপলব্ধিরই ফসল হোল 'চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার'। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় দিন দিন সেন্টারটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। ষাট সালে আমেরিকা থেকে ফিরেই জয়শ্রী এই সেন্টারে জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন।

কেন ক্যানসার হয়? এর উৎপত্তি কোথায়? প্রশ্ন দুটির উত্তর জগতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা আজকাল খুঁজছেন তিন ধরনের গবেষণায়—কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন, ফিজিক্যাল রি-অ্যাকশন ও ভাইরাস ইনফেকশন। জয়শ্রী শেষোক্ত বিষয় নিয়েই আমেরিকায় দু বছর বিশদভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। রিসার্চ সেন্টারে যোগ দিয়ে ঐ বিষয় নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন।

লাখ লাখ কেস স্টাডি করে বিজ্ঞানীরা আজকাল নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া জীবদেহে ক্যানসার টিস্যু বা সেলের জন্ম দিয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয়ের প্রতিক্রিয়া যে ক্যানসারের কারণ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে। ক্যানসারের কেমিক্যাল ও ফিজিক্যাল উৎপত্তি তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা এরই মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের দরজা পেরিয়ে বার্ধক্যে পা বাড়িয়েছে। এদের তুলনায় ভাইরাস সম্পর্কিত গবেষণা নেহাতই শিশু। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনকোজেনিক ভাইরাসই ক্যানসারের কারণ বলে দাবী করলেন তখন গোটা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। অনেকেরই চোখ পড়ল এদিকে—তাই তো ক্যানসার ভাইরাস থেকেও তো হতে পারে। ধেড়ে ইঁদুরের গা থেকে লিউকেমিয়া আক্রান্ত টিস্যু নিয়ে সম্পূর্ণ নীরোগ একদিনের বাচ্চা ইঁদুরের দেহে চালান দিয়ে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক এল. গ্রস সফল হলেন সুস্থদেহে লিউকেমিয়ার জন্ম সাধনে। এই গবেষণাই দরজা খুলে দিল ভাইরোলজির।

রিসার্চ সেন্টারে জয়শ্রী এই টিউমার ভাইরোলজির ওপরেই কাজ করতে শুরু করলেন। জয়শ্রী যেদিন এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন, সেদিন অন্তত কলকাতায় দ্বিতীয় কোন ভাইরোলজিস্ট ছিলেন না। একজন মাত্র হেলপার (চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) সম্বল করেই অতবড় কাজে হাত দিয়েছিলেন—গবেষণার পাশাপাশি ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টটিও গড়ে তুলতে লাগলেন জয়শ্রী।

তিন বছর দিন রাতের কোন পার্থক্য অনুভব করেন নি জয়শ্রী। চৌরঙ্গী টেরেসের বাসা আর হাজরার মোড়ে গবেষণাগার এরই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। হাজার দিনের পরিশ্রমের পুরস্কার চৌষট্টি সালে পেলেন—ডাক্তার জয়শ্রী রায়চৌধুরী হলেন ডক্টর। এম-বি-বি-এস ডিগ্রীটির পাশেই জমা হোল আর একটি ডিগ্রী পি-এইচ-ডি।

ডিগ্রী বেড়েছে তবু কারণ জানা যায় নি—তাই ক্ষান্ত হলেন না জয়শ্রী। শুরু হোল আর এক পর্যায়ের গবেষণা। গবেষণা-পর্বটির টেকনিক্যাল নাম : বাইয়োক্রোম ইন ক্যানসার। সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই গবেষণার উদ্দেশ্য একটি স্বাভাবিক কোষ ও একটি অস্বাভাবিক কোষের কাজকর্মের পদ্ধতি ও ঢং খুঁটিয়ে দেখা। স্বাভাবিক কোষে রাসায়নিক দ্রব্য বা ক্যানসার ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে, তার চালচলন ভালভাবে নজর করলে ধরা পড়বে—(১) কেন ক্যানসার হয় (২) ঠিক কখন থেকে স্বাভাবিক কোষ ক্যানসার কোষে পরিণত হয়। চার বছর একটানা এই বিষয়ে গবেষণা করে গত আটষট্টি সালে জয়শ্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একটি সম্মানপত্র আদায় করেছেন—ডি-এস-সি।

নতুন সম্মানপত্রের আমদানী চাকুরী-জীবনেও ঘটিয়েছে পরিবর্তন। জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার থেকে প্রমোশন পেয়ে ঐ বছরই ডক্টর রায়চৌধুরী হলেন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সেই সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান।

দায়িত্বভার বাড়লেও কাজের বিষয় দীর্ঘদিনই তাঁকে পালটাতে হোল। এতদিন ভাইরোলজি নিয়েই গবেষণা চালাচ্ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে নানা ঝামেলা। প্রথমত ভাইরাস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বাইরে থেকে আনলেই তো চলবে না, সেগুলো জিইয়ে রাখতে হবে। তার জন্য চাই ডীপ ফ্রিজ, চাই ইনকিউবেটর, চাই ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ-প্রবাহ। এত সব চাওয়া মেটানোর গ্যারান্টি কে দেবে? তাই বছর কয়েক ধরে ভাইরোলজি সংক্রান্ত গবেষণা বন্ধ রেখে টিউমার-বায়োলজি সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছেন ডক্টর রায়চৌধুরী।

ইতিমধ্যে ডিপার্টমেন্ট বেড়েছে অনেক। একদিন মাত্র একজন হেলপার নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন, আজ সেখানে তাঁকে সাহায্য করছেন একজন জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট, দুজন ল্যাবরেটরী অ্যাসিসট্যান্ট ও পাঁচজন রিসার্চ ফেলো। এরই মধ্যে ও'র তত্ত্বাবধানে কাজ করে একজন পি-এইচ-ডি পেয়েছেন। এখন কাজ চলছে ক্রোমোজোম, ক্যানসার সার্ভিক্স ও টিউমার সেলের জৈবিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে।

খ্যাতি প্রতিপত্তি অনেক পেয়েছেন জয়শ্রী। তাঁর কাজ দেশে-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে অনেক। ঘরে ফুটফুটে দুটি বাচ্চা—দেবশ্রী ও দেবযানী। ওরা দেবতারই আশীর্বাদ। স্বামী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে চিকিৎসক মহলে খ্যাত। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যা চায়—বিদ্যা, অর্থ, নাম, সুখী সংসার—সবই পেয়েছেন জয়শ্রী, তবু সুখী নন! কেন?—এই প্রশ্নই সেদিন ও'র কাছে রেখেছিলাম।

সদ্যফোটা গোলাপের মত পবিত্র দুটি চোখে দেখেছি কষ্টের আভাস। আজো তো কারণ বার করতে পারি নি—পাতলা ফুরফুরে ছোট্ট ঠোঁট বেয়ে একটু একটু করে বেদনার ধারা নির্গলিত হয়েছে—বাবা সারা জীবন এই দারুণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। উনিই আমার জীবনের একমাত্র ইনস্পিরেশন। বলতে বলতে পাশের দেওয়ালের দিকে তাকালেন জয়শ্রী—চিত্রশিল্পের জন্য ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছেন ডক্টর সুবোধ মিত্র। যেখানে যেটুকু চিকিৎসা সবই তো অনুমান ভিত্তিক। মূল কারণটা না জানলে কি করে এ রোগকে ঠেকানো যাবে?

—সন্দিপন

* সূক্ষ্ম কারুকার্য্য
* নিখুঁত শিল্প সৌন্দর্য্য
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স • ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

অবিস্মরণী কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলাইও ওঠে। আজ ষষ্ঠীতে সদরাসর অফিস বন্ধ। সাহেব জোর করে অফিস করছেন এ জন্যে তার একটা দিনের ছুটি মারা গেল। টুটুল বুড়ীদের ছুটি চলেছে। গোয়ালের পাশে কুয়োর পাড়ে যমুনো ঝি যেখানে চায়ের বাসন ধুতে বসেছে সেখানে স্কিপিং করছে বুড়ী। মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে বলাই যখন সামনের বারান্দায় আসছে তখন অসম্ভব হেঁড়ে গলায় ডাক এল, 'বলাই, বলাই শোন।'

বলাইয়ের পিত্তি জ্বলে যায়। এ নিশ্চয় ভুঁড়িবাবু। একবার অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে, ঠিক তাই। তাকধিক্কিপে হাড়গিলে বাইশ-তেইশ বছরের লোকটা টান হয়ে শুয়ে আছে বাড়ির সবচেয়ে লম্বা তক্তাপোষটায়। খালি গা, পরনে লাল লুঙ্গি। অমৃত বাজার পত্রিকা কাগজখানা পেটের ওপর নিয়ে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে আছে।

জগন্নাথের বোনপো রাধাগোবিন্দ দত্ত বা ভুঁড়িবাবু তিন মাস আগে যখন মামার বাড়ি এলেন তখন বলাই থ মেরে গিয়েছিল তার পেটের দিকে এক নজর চেয়ে। এক তিল ভুঁড়ির চিহ্ন নেই, বরং পা দুমড়ে বসলে পেট বিসদৃশভাবে তুবড়ে যায়। সাহেবদের দুঃস্থ জ্ঞাতি সম্পর্কে বলাইয়ের এক নির্দিষ্ট লাইন আছে,—তারা অবজ্ঞার পাত্র। বলাই তাই রাধাগোবিন্দের কথায় জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

'মরবে, এ বউটাও মরবে! যা লাশ!' ভুঁড়িবাবু পা নাচাতে নাচাতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বললে।

বলাই ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে বললে, 'তোমার লাশটাও বড় কম যায় না।'

'কি মাছ এনেছিস?'

তুই সম্বোধনে এবং তার সর্পিল ম্লান দুগালের দিকে চেয়ে বলাই ফেটে পড়ল, 'বেলা সাড়ে নটায় টান হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোনা কদ্দিন চলবে?'

'কাল রাত কটা পর্যন্ত জেগেছিস রে? চোখের নীচে যে কালি পড়ে গেছে।' নির্বিকার উদাসীন গলায় ভুঁড়ি বললে।

লোকটার প্রতি আপাদমস্তক ঘৃণায় বলাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাহেবের আত্মীয় না হলে বোধহয় মেরেই বসত। 'কি মাছ এনেছিস রে?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে ভুঁড়িবাবু।

'তাতে তোমার কি?' বলাইয়ের জিভের ডগায় শালা কথাটা এসে গিয়েছিল। অপরিসীম সংযমে সামলে নেয়।

'তুই আবার বিয়ে করলি কেন রে? একবার বিয়ে করে জুড়ে হল না?'

'তোমার মতো তো ঢামনা সাপ নই আমরা।'

'আই! গাল দিস না বেটা। জানিস মামাকে বলে তোর চাকরি খতম করে দিতে পারি!'

'বলো না, বলো না, বলবার মাথা আছে?'

'যা-যা, বাবুদের তেল দে।' এককোণে বলাইয়ের দিকে চেয়ে ঝাঁকের সঙ্গে ছোকরা বললে।

'যাই বলো বাবু, তোমায় তেল দেব না।'

'আমায় দিবি কেন? তেলা মাথায় তেল দে, গিভ অয়েল টু অয়েলড হেড।'

'অত ফড় ফড় করে ইংরেজী বোল না। গালাগাল আমরাও বুঝি।'

'গালাগাল না, মাইরি গালাগাল না।' ভুঁড়ি উঠে বসে, তারপর গলায় যতখানি সম্ভব বন্ধুত্ব ঢেলে বললে, 'এদিকে আয় এদিকে আয়।'

আর বলাইও আড়ি রাখতে পারে না। সে দু চার পা সামনে এগিয়ে আসে।

'হাঁড়ি বসিয়েছিস?'

দালানের খোলা দরজার দিকে চেয়ে বলাই বললে, 'আটো খাটো করতে পার না? বসিয়েছি। সন্ধ্যের পর এসো। শান্তিপুর থেকে সং আসছে সন্ধ্যের পর। একেবারে জেলখানার গোড়া পর্যন্ত আসবে।'

'তাই নাকি? বা বা!' ভুঁড়িবাবু উঠে বসে। মাস তিনেক চাকরীর অপেক্ষায় মামার বাড়ি হাপিত্যেশ করে বসে বসে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। অবশ্য নিষ্কাট ঘুম আর খাওয়া-দাওয়ায় শরীর যে ফিরছে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়। এরই মধ্যে কণ্ঠার হাড় প্রায় ভরে এসেছে। তবে সন্ধ্যের পর বেশ একঘেয়ে লাগে। তারপর মামার বড় ছেলে আসছে। সে যাচ্ছে বিলেতে আই-সি-এস পড়তে আর সে আছে অপেক্ষা করে কোন গতিকে আশেপাশের কোর্ট-কাছারীতে পেস্কার করে ঢুকিয়ে দেবে মেজো মামা। বিধির এই বিধানে সে কিঞ্চিৎ মুহ্যমান। বলাইয়ের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা তাড়িপার্টি অবশ্য এই জীবনযাত্রায় ব্যতিক্রম। বলাইয়ের টিনের বাড়ি আর সবজি ক্ষেতের গায়েই পোড়ো মাঠে। তার গায় খেজুর গাছগুলো বলাই দখল করে নিয়েছে। দু হপ্তা হোল হাঁড়ি বসানো শুরু হয়েছে। চাঁদনি রাতে তাড়ির দাওয়ায় বলাইয়ের পাশে উবু হয়ে তাড়ি পান ভুঁড়িবাবুর বাইশ বছরের জীবনে একটি সুখকর স্মৃতি। বলাই অবশ্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান, যদি ধরা পড়ে তাহলে তার চাকরী যাবে। কারণ এ সাহেব একেবারে গোঁড়া, সার্কিট হাউসে বোতল চলেছে, কিন্তু সাহেব ছোঁননি। বলাই নিজের চক্ষে দেখেছে। জানতে পারলে নির্ঘাত চাকরি যাবে, আর তাছাড়া ভুঁড়িবাবুর মতো দুঃস্থ অথচ দুর্বিনীত আত্মীয় বলাইয়ের অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু এই তালেবর লাইন সত্ত্বেও তার দু-দুবার পদস্খলন হয়েছে। তাছাড়া এই রোগা ভুঁড়ির রসের আকর্ষণ সেও যেমন বোধ করে তেমনি সাহেবের বাড়ির লোকও

করে প্রবলভাবে এই বোধে আর অন্ত-প্রসাদও জন্মায়। প্রায় সমবয়েসীর লোকের চালে কলাই বললে 'তুমি তাহলে আসছো সন্ধ্যের পর। একটু সকাল সকালই এসো, টুটুলবাবুকে নিয়ে সং-এ যাব।'

আবার নড়াম করে শুয়ে পড়ে ভূঁড়ি। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে পা নাচাতে থাকে।' দিত অরেল টু অর্গান বেড', পা নাচানোর তালে তালে আপনমনে বলতে থাকে।

বাইরে সিঁড়িতে ছায়ার তন্ময় হয়ে টুটুল তার ঠাকুরমার কাঁথির ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে, হাতের ভেতর গালে। এক-দৃষ্টিতে সে দেখছে। অরুণ-বরুণ-কিরণমালা উপাখ্যানের রাজপুত্রবেশী কিরণমালার ছবিখানার দিকে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল জেলখানার পেটা ঘড়িতে। আরও আধ ঘণ্টা বাকী। কলাই সিঁড়িতে সবচেয়ে নীচু ধাপে বসে পড়ে বললে, 'পড় না মোটাবাবু শুনি।'

ঘুমের ঘোর থেকে যেন টুটুল জেগে উঠল। এক রাশ কোঁকড়া চুল হাওয়ায় অবাধ মুখে এসে পড়ছে, সেগুলো সরাতে সরাতে বললে, 'কোনটা পড়ব ?'

শুনে শুনে কলাইয়েরও গল্পগুলো প্রায় মুখস্থ। এক নজর ছবিখানার দিকে চেয়ে বললে। ঐ যে কিরণমালা দেখল তার ভাইরা মরা গেছে ঐখান থেকে বল।'

বইখানা হাঁটুর ওপর ঠিকমত রেখে টুটুল পড়ে চলে, 'ভোরে উঠিয়া কিরণমালা দেখেন, ভাইয়ের কলা খসিয়া গিয়াছে, বন্দুক ছিলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—অরুণবাবা গিয়াছে, বরুণবাবাও গেল, কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজলতাকে বড় ধৈর্য দিল, গাছ-পালাদির গোড়ায় জল দিল, দিয়া, রাজপুত্রের পোষাক পরিয়া মাথে মুকুট হাতে তরোয়াল,— কাজললতার বন্দুককে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া, চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণমালা রাজা পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইল।'

উত্তেজনায় টুটুলের চোখ জলজল করে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে কলাই শুনে যায়, 'যায়—যায়,—কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে;—কে দেখে, কে না-দেখে; দিবারাত্র পাহাড় জঙ্গল, জোনাল সকল দুটোপাটি গেল; কড় কড়কাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তেজ বাতি জ্বালিয়া দিয়ে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন।'

বয়সের তুলনায় আশ্চর্য পরিষ্কার উচ্চারণ টুটুলের। তাছাড়া এসব উপাখ্যানের মধ্যে সে এমন ডুবে আছে যে সে নিজেতেই বুঝবে না সাম্না পাখিরী অন্য লোক কেন কান পেতে থাকবে না এই গল্প শুনবার জন্যে। আর সত্যিই গল্প শুনতে শুনতে আর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। অথচ এখন থেকে দেরে টাই বাঁধতে টুটুল কলাই বাঁশিওলা আর কাঁজরওলা ডাকছে।

খোকাবাবুদের মাস্টার মুখ অবিকল নকল করে টুটুল চেঁচাচ্ছে, 'বাঁ বাঁ রে?' বাঁর বাঁশের ভাঁটা এখন, মা জানি সে কি রে?' এমন সময় অন্দরের গলা এল, 'কলাই'।

কলাই উঠে পড়ে বললে, 'দুপুরে ঘুমিয়ে নিও দাদাবাবু। সন্ধ্যের পর সং দেখতে বেরোব।'

দুপুরে ঘুমোয় নি টুটুল। স্বর্ণ-সুন্দরীর ঘুম যখন জমে ওঠে ঠিক সে সময় তাইদেখ পা টিপে টিপে বের হয়। আজ সকালবেলা পুকুরপাড়ের চালে জামিয়ে খেজুর ঝোপের ঘন ছায়ায় যে কয়েকটা কোকর দেখিয়েছে গত বর্ষার পর সেখানে পাখির ছানা সন্ধান। শীতের রোদ্দুর এখন খুব মিঠে, মাঝে মাঝে শুকনো কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। এ সময় মনে হচ্ছে শীতটা বেশী পড়বে। পাখির ছানা সন্ধান একটু বিপজ্জনক, যে এই ব্যাপারে তাদের দীক্ষা দিয়েছে সুরেন পোস্টারের ছেলে তাদের সাবধান করেছে, আগে সাবধানে একটা লম্বা বাঁশ খানিকটা ঢুকিয়ে দেখতে, ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসছে কিনা তা কান পেতে শুনতে। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে কয়েকটা কোকর পরপর পরীক্ষা করেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। টুটুলের উৎসাহই বেশী। সে গর্তে কাঁধ পর্যন্ত হাত ভরে কয়েক খাবলা মাটি বার করলে। শীতের রোদ্দুরও অনেকক্ষণ মাথায় লাগাতে অস্বোয়াস্তি লাগে। বকুল বনের ছায়ায় বাঁধানো বেদীতে বসতেই টুটুল বললে, 'আচ্ছা বুড়ী, মানুষ কি করে জন্মায় ?'

'আমায় দিদি না বললে বলব না।'
'তুই জানিস না, আমি জানি।'

'কি জানিস ? বল বল'।

'আমি দেখেছি, বুড়ীর বাছুর হতে
আমি দেখেছি।'

'কি অসভ্য ? আমি মাকে বলে দেব। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে টুটুল জিজ্ঞেস করে, 'আমরা কি সব মরে যাব ?'

বুড়ী বোধহয় এ ব্যাপারে বিশেষ ওয়াকিব নয়। বললে, 'বুড়ো হলে' পেলে মরে যায়।'

'বাবা মরে যাবে ? মা মরে যাবে ?'
'দূর! বাবা কি বুড়ো!'

'আমাদের ক্লাসে বিশ্বনাথের বাবা মরে গেছে, জানো ?'

বুড়ী প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। বলে, 'আজ কত লোক' কত রকম সেজে আসবে। কলাইদা বলছিল, কেউ রাজা হবে, কেউ ডিগে করবে লাঠি নিয়ে।'

'আমাদের মতো একটা দুবন্দুকি আছে। এখানে...; ঠিক এইখানটায়। এখানে কানটা পাত।' টুটুল বুড়ীর মাথাটা টেনে তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বলে, 'বিশ্বনাথের বাবার ধুকধুকানি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আমি জানি, আমি জানি। আমারও আছে দুকধুকি সকলেরই আছে।' বুড়ী বললে।

তারপর হঠাৎ চেঁচাতে থাকে, 'ধুকধুকি আছে, ধুকধুকি আছে! তুই একটা বোকা আস্ত বোকা!' দু হাতের আঙুলগুলো কুকড়ে সে টুটুলের চোখের সামনে খোলে আর বন্ধ করে।

টুটুল লাফিয়ে ধরে পড়ল বুড়ীর বেণী ধরে। এর পর আঁচড়া-আঁচড়ি। গায়ের জোরে ভাইয়ের সঙ্গে না পেরে বুড়ী কষ্ট করে কামড় বসিয়ে দেয় টুটুলের গালে। সঙ্গে সঙ্গে টুটুলের বকুল-বন কাঁপানো কান্নামিশ্রিত চীৎকার। কান্না আর চীৎকারের একটা ডেলা গোল খেতে খেতে মাঠ পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে আসে। পেছনে কাঁদো কাঁদো বুড়ী, বারান্দায় স্বর্ণসুন্দরী দাঁড়িয়ে। টুটুল এসে হাউ-হাউ করে মাকে জড়িয়ে ধরে। যে হাতখানা খালি ছিল সেই হাতখানা দিয়ে তিনি ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন বুড়ীকে। বুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় বাড়িল, টান হয়ে পড়ল বিছানায়। কর্তা গলায় স্বর্ণ-সুন্দরী হুকুম দিলেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা কোথাও যাওয়া বন্ধ।'

বললেন বটে, কিন্তু বিকেল পড়ে এলে যখন জেলখানার সামনে বাদামতলায় লোক জমায়েত শুরু হল তখন বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, কলাইটা কখন আসবে। সম্প্রতি শহরে থিয়েটার হলে সিনেমা দেখানো আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বই চণ্ডীদাস দেখতে ছেলেমেয়ে স্বামী-শুদ্ধ বক্সে গিয়ে বসেছিলেন। জমেও উঠেছিল। কিন্তু এক নাটকীয় মুহূর্তে উমাশশী রামী যখন তার ঢল ঢল চোখ তুলে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে দুর্গাদাস অভিনীত চণ্ডীদাসকে—'চণ্ডী ঠাকুর এ কি সাজা ?' তখনই ঘরর-ঘরর শব্দে ফিল্ম কাটল। তারপর অবশ্য 'কপালকুণ্ডলা' দেখে ছেলেমেয়েরা দু-তিনটে রাত ঘুমোয় নি। কিন্তু সং তাদের ভালই লাগবে। তাঁর নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু স্বামী বোধহয় পছন্দ করবেন না ভেবে ছেলেমেয়েদের জামা পরাতে গেলেন।

সন্ধ্যে সাতটা না বাজতেই কারবাইড আর হ্যাজাকের আলোয় বাদামতলা জমজম করে। নদীর ওপার থেকে আসে সবুজ লুঙ্গি আর দাড়ি নিয়ে মুসলমান চাষী, শহরের দোকানদার—বাড়ি ফিরবার মুখে কারো হাতে কেরোসিনের বোতল, জেল-খানার ওয়ার্ডার কেউ নিশ্চিন্তভাবে ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে খৈনি ফেলে হাতে তালি মারছে। নতুন জামাপরা বাবুদের ছেলে-মেয়ে, সাদা থানপরা বিধবা দল, অতগুলো লোকের কলরবে উঁচু বাদাম গাছের মাথা থেকে পাখা ঝাপটে বাদুড় উড়ে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুটুলের পা ব্যথা হল। কলাইয়ের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে সে আবার প্রশ্ন করে, 'কখন আসবে?' আর

বলাই প্রত্যেকবারই জবাব দেয়, 'এখনই এসে যাবে। একটু সবুর করু না।'

বুড়ীর কিন্তু ভালই লাগছে। পেটখারাপের দুঃখে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও এসে গিয়েছিল। সন্ধ্যে গড়িয়ে জেগে উঠেছে। এখন তাই বিস্ফারিত চোখে কালো দাড়ির ওপরে কার্বাইডের আলো, শ্যামবাবুর বড় মেয়ের মাথায় গোলাপী রিবনের ফুল, ঘন সবুজ আর টকটকে লাল এক পয়সার ঘোলের সরবতের জন্যে ছেলে-মেয়েদের ভিড়, উড়ন্ত বেলুন—সবটাই খুব ভাল লাগছে।

রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেখানকার অপেক্ষমান জনতা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর কোথা থেকে কয়েকজন ফচকে ভলান্টিয়ার 'আপনারা হটে যান, হটে যান' করতে করতে ছুটে আসে। আলোয় ঝলমল প্রথম গোরুর গাড়িটা দেখা যায়। বুড়ী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে—রামচন্দ্রের সভা, ঝকমকে জরিপাড় পোশাকে, কুচো মুক্তো গলায় আশ্চর্য সুন্দর লাগে রাম-সীতাকে। একজন চামর ঢুলোচ্ছে, নীচে হাত জোড় করে হনুমান—অবিকল হনুমানের মতো। আর হাত জোড় করে বসে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন আর অমাত্যরা। বুড়ী লক্ষ্য করলে অমাত্যদের সঙ্গে শ্যামবাবুর ছোট ছেলে বসে গেছে। পরের গরুর গাড়িতে ফেস্টুন আঁটা, 'মেরেছিস কলসী কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?'—হাত তুলে নিমাই দাঁড়িয়ে, গরুটা হোঁচট খাওয়ায় তাল সামলাবার জন্যে একবার নেচে উঠল, মাথায় পরচুলায় এক খাবলা আলতা, নীচে হাঁটু গেড়ে জগাই-মাধাই। গাড়িগুলো থামতেই সবাই এগিয়ে আসে, তারিফ করে। আবার উদগ্রীব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এর পর যে সং আসে তা দেখে অনেকে হৈ-হৈ করে, তরুণরা কেউ-কেউ সিটি দেন, কিন্তু বুড়ী টুটুলের কাছে ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না। গরুর গাড়িটার মাঝখানে দুটো বাঁশ আঁটা। মাথায় ঘোমটা দেওয়া বউকে বর কাঁধে নিয়েছে, আর দুদিকে দু হাতে দিয়ে বুদ্ধ বাবা-মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে আছে। বউয়ের আলতা-পরা পায়ের দিকে নজর দিয়ে বুড়ী বুঝতে পারে মেয়েটি তারই সমবয়সী। এর পর আরও সং আসে, কিন্তু বড্ড সেন্টিমেন্টালিটে, বেশীর ভাগই রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, মাঝে-মাঝে সামাজিক প্রহসন। ঘুমে জড়িয়ে আসে টুটুলের চোখ, বলাই তাকে কোলে তুলে নেয়।

শেষের দিকে একটা ব্যাপার ঘটে যায় যা ছিল বলাইয়ের কল্পনাতীত। অবশ্য আড়ুয়ের গান সে আগেও শুনেছে কৃষ্ণনগরে। কিন্তু এখানে এস-ডি-ও সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে এমন নির্লজ্জভাবে গান গেয়ে লোকগুলো হাসির হররা তুলবে সে ভাবে নি।

গানের পার্টি এল খোল, হারমোনিয়াম, খঞ্জনী। একজন মাথা ঝাঁকিয়ে জমাগত হারমোনিয়ামে বাঁকিয়ে রঙিন জল হাতে তুলে গান ধরলে :

ওগো ননদিনী রাই!
তোমার ছোট ভাই, তোমার ছোট ভাই
কলকাতাতে নিয়ে গিয়ে টিপে দিল তাই!

সামনের দিকে দুবকদের হাসি আর হাততালিতে ফেটে পড়ল। বলাই শিহরিত হয়ে শুনতে থাকে জনতায় আর কি-কি হল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা। আবার হাসি আর হাততালি। সাদা খানের দল 'ওমা, ওমা, একি!' বলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। দাড়িওয়ালা লোকগুলো কিন্তু গম্ভীরভাবে চেয়ে থাকে। খোল করতালের শব্দে আর হাসির হররার জমজম করে চার পাশ। পেছন থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে গলার আওয়াজ আসে, 'বাবা-বাবা-বাবা-বাবা!' বলাই চমকে পেছন ফিরে দেখলে কুঞ্জবাবু। মুখে মৃদু হাসি, চোখ প্রায় বোজা।

বলাই এবার বুড়ীর হাত ধরে টানতে থাকে, চলো দিদি, এবার ফিরি।' বুড়ীর ব্যাপারটা বোধগম্য নয়। সবাই হাসছে দেখে সেও হাসছে। যখন তারা ফিরব-ফিরব করছে তখন চার পাশের চিৎকারে টুটুলের ঘুম ভাঙে। শেষ গাড়িটা আসছে। কোঁচানো ধুতি আর মিহি কলা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা লম্বা এক ছোকরা গান ধরে, 'বাগবাজার সোনার দুধের, ও বাবু মহাশয়!' আর তার সঙ্গে মোয়ারকি দেয় বেঁটে দাড়িওয়ালা লোকটা। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে নেচে-নেচে হাততালি দিয়ে হাঁকে, 'তাই তো তাই রে তাই তো।'

একবার বলাই আর টুটুলের সামনেও নাচে, 'তাইতো তাইতো তাইতো!'

(৩)

'ওমা, মাগীর, মাগীর!' ধাঁড় খোঁজে আসে দুদোর পাড়ে জোয়ারবেলায়। জোরের টানে ভবনাথের বড় ছেলে প্রতাপ, মেজছেলে চোখা এবং সেজ মেয়ে গৌরী এসেছে কলকাতা থেকে। স্বর্ণময়ীর চেঁচানিতে বাড়ি গরম। টুটুলেরও ঘুম ভেঙেছে। সেও জোরের ঠেলায় হাঁটতে হাঁটতে উঠে এসেছে দিদির পেছনে।

দিদির মত টুটুলও হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে গৌরীর শাঁখ ফুল করা দেখে। বিশেষ করে তার ফর্সা মুখে কলমকে বিমলেন্দু চন্দ্রের দিকে। এক বছর আগে গৌরী রাণাঘাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছে। সে আর সার্কেল অফিসারের মেয়ে বেবি মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে ক্লাসে গুট-গুট করে ঢুকত এবং মাস্টারমশাইরা তাঁদের বগলদাবা করে ক্লাসে বসে ফিরতেন। এরই কোন ফাঁকে লালমোহন বলে কারিকরা ছেলেটি তাকে প্রেম নিবেদন করে বসল চিঠির মারফত। তা নিয়ে হুলুস্থুল। হেডমাস্টার শ্যামবাবু পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়। লালমোহনকে মেড দেবার পর ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়। দু-তিন দিন পর কাগজের ছোট-ছোট প্যাকেট বল কোন অনির্দিষ্ট দিক থেকে ক্রমাগত গৌরীর নাকে-মুখে পড়তে থাকে। তারপর সার্কেল অফিসারের মেয়ে বেবী এ আন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল তার শাঁড় দাঁত চাপা কুত্তো খা, জুতো খা' চিৎকারে। শেষ পর্যন্ত ফয়সালা করলেন স্বর্ণময়ী। লালমোহনের মা ছিলেন নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁকে বাড়িতে ডেকে চা খাইয়ে ব্যাপারটা মামলেজ দিলেন।

গৌরীর টুথপেস্টের বাক্সটা নাড়াচাড়া করে সসম্ভ্রমে বুড়ী। ভবনাথের বাড়িতে টুথপেস্ট ব্রাশের চল এখনও হয় নি। নিজে নিজের দাঁতনে অভ্যস্ত এবং বাড়ির আর সবাই খড়ির গুঁড়োর সঙ্গে কর্পূর কিম্বা সুপারী পোড়ান ছাই দিয়ে দাঁত মাজে।

পেছন থেকে অচিন্ত্য ডাকনাম চোখা বলে 'আমারও আছে জানিস?' তারও হাতে ব্রাশ।

(ক্রমশঃ)

'মানুষের জীবনাচরণের নানা ক্ষেত্রে মানব সংস্কৃতির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। সেই পরিচয়ের মধ্যেই সত্য, শিব ও সুন্দর নিত্য প্রকাশমান। তাই মানুষের জগতে যা-কিছু সত্য, যা-কিছু শিব ও সুন্দর তার সব কিছুরই প্রকাশ-আধার সংস্কৃতি। আর সেজন্যই মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য এবং সে কারণেই সংস্কৃতি একটি চিরন্তন বিষয় এবং তা চিরকালই সমস্যামুখী।'

কিন্তু সেই সংস্কৃতি সম্বন্ধেই আমাদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর ভুল ধারণা এবং সেই সব ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য প্রকাশিত হলো :

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
কালজয়ী সাহিত্যকর্ম
সংস্কৃতির ধর্ম
মূল্য আট টাকা মাত্র
ভারতী বুক স্টল, ৬নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯

CENTRAL LIBRARY

হিসেবের অংক ॥ গোলাম-কুদ্দুস

মৃত্যুমন্ত্র সুকঠিন
আরো কঠিন মুক্তির সংগ্রাম,
কঠিনতম আত্ম-বলিদান।
যখন তা হ'য়ে ওঠে সহজতম
রক্তগঙ্গা বয়ে আনে প্রাণগঙ্গার ধারা
রক্ত থেকে জন্ম নেয় রক্তবীজের চারা
তখনই ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে যায় রোশেনারা।

আমি শুনলাম সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মেয়ের নাম
মানুষের মুখে মুখে,
আমি দেখলাম রোশেনারা হ'য়ে উঠেছে
মানুষের মিছিলের পতাকা,
আমার কানে বাজল : জয় রোশেনারার জয়।

সে-মেয়ে এই জয়ধ্বনি শুনতে পাবে না কোনোদিন,
চিরকালের মত মাটি হ'য়ে মিলিয়ে গেছে মাটিতে,
ক্ষমতা থাকলে হয়ত ব'লে উঠত :
আমায় জাগিয়ো না, ঘুমাতে দাও,
যারা জেগে আছ এগিয়ে যাও, প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

যারা জেগে জেগে ঘুমায় তাদের তুমি কি বলবে রোশেনারা?
যারা তোমাদের নামে মাতোয়ারা
তারা তোমাদের স্বীকার করে না কেন রোশেনারা?
কেন এত লাভ-লোকসানের কড়ি মেলায়?
আমি জানি, রোশেনারা, তোমাদের বেহিসেবী প্রাণ-বলিদান
ওদের হিসেবের অঙ্ক একদিন গরমিল ক'রে দেবেই দেবে।

তমসা পারের গান ॥ কার্তিকচন্দ্র মিত্র

তমসার পার থেকে ভেসে আসে গান।
বিক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলায় সরোবরে
নিজস্ব মুখের প্রতিবিম্ব আপাতত ম্লান।
বারুদের গন্ধ শুঁকে আমার মধ্যাহ্ন কাটে—
কার্পাসের বন লুঠ হ'য়ে গেছে কবে!
শূন্য মাঠ—আলালের ঘরে ধান।

বারুদ স্তূপের মাঝে আমার মধ্যাহ্ন বয়ে যায়।
আলালের ঘর উড়ে গেছে বোমার আঘাতে।
ভস্মীভূত তুলোর গুদাম আর ধান।

তমসা পারের মহান চরিত্র পুরুষের ছায়া
গলিত মনের সরোবরে এখন অপরিচিত।
তবু তমসার পার থেকে ঠিকমত
নন্দিত বীণার ঝংকারে ঝংকারে
ভেসে আসে বাঁচা ও মুক্তির গান।

মধ্যাহ্নের ব্যাধ ॥ শান্তনু দাস

: আমি আছি
পিঠে তূণ, ছিলায় আঁঠালো রক্ত
অনন্ত অনাদিকালে পাশুটে রক্তিম,
দয়াময়ী জননী সুন্দর : তুমি কোন্ তাম্বুল আলোর কোলে
ফেলে দিয়ে সোনার বাছাকে চলে গেছ,
যে আলোতে ফোটে ফুল, ভোরের শিশিরে ঝরে স্মৃতি,
যে আলোতে রাতের অতিথি হাটু গেড়ে নতজানু,
নির্মম শিবিরে এসে মহাকাল, দাঁতে কাটে আলোর করাত।

ভয়? কাকে ভয়? ভয় আমি কাউকে করিনা,
আমার শরীর দ্যাখো তামাটে ইস্পাত, হাতে জ্বালা,
বনের গন্ধে যদি কখনো আচম্বে ঘুম নেমে আসে, তবু জেনো—
ছিলায় সতর্ক হাত; পিঠে তূণ, পাশুটে রক্তিম।

পিতামহ : সার্থকপূর্বক—
তুমিও কি ভয়ঙ্কর শাখা-প্রশাখায় ঝাড়ে তুলেছো তুফান?
তুমিও কি মধ্যাহ্নের স্বর্ণছায়া দু' পায়ে মাড়িয়ে
মিশে আছো, গভীর নৈঋতে?
কিংবা কোনো লক্ষ্যভেদে দুরন্ত শার্দুল পিঠে আদিম উল্লাসে
রক্তঝরা ললাটে আঁকড়ে নিয়ে স্মৃতি।
আমি জানি : আমার ধমনী জুড়ে সেই শব্দ পিতৃপুরুষের
গরম লাভার স্রোতে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে বলে—
আগে চল।

কেউ কারে স্মরণে রাখে না :
শুধু মাত্র দুপাশে উড়ন্ত পায়রা ওঠে নামে,
নম্রতায় ঝরে পড়ে হলুদ পাতারা
কিংবা কোনো তারা ঘর বদলে নেয় অন্ধকারে।
শিয়রে দুঃখ নিয়ে জেগলে রাখি চোখ,
যেমন বাঘিনী ঘোরে হেতাল বনের ধারে
ফেলে রেখে ঘুমন্ত শাবক
সে আগুন আমার শরীরে
নিমেষেই দাবানল, নিমেষেই অনন্ত দহন।

হে পিতৃপুরুষ : তোমরা শোনো—
নিজের শোণিতে আমি খেলা করি মাছের মতন,
হে উত্তরসাধক : আমি নতজানু তোমাদের কাছে,
দয়াময়ী জননী সুন্দর :
জানিনা কখন তুমি তাম্বুল আলোর নীচে
ফেলে গেছো সোনার বাছাকে,
শুনে যাও আমি আছি,
যৌবনের লাভাস্রোতে নির্মম আগুন নিয়ে
বনজ মাটির কাছাকাছি,
পায়ে কাঁপে গর্জিনী মেদিনী,
পিঠে তূণ, আমি এক মধ্যাহ্নের ব্যাধ,
আদিম প্রহরে স্বতঃ ঋজু
ঋজুতম সাহসে সামিল।।

সামুরাই প্রেত

কমল চৌধুরী

উইলিয়ম কুপার অঙ্কিত এই কার্টুন ১৯৪১ খৃঃ ৯ ডিসেম্বর ডেইলি ওয়ার্কার-এ প্রকাশিত হয়।

জাপান শুধু একটি রহস্যময় দেশই নয়, সক্রিয় বিকাশশীল দেশও বটে। জাপানীদের চরিত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ওরা পুরোনকে ছাড়তে দ্বিধাগ্রস্ত, নতুনকেও দেখে সংশয়ের চোখে। চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য রাজনৈতিক অন্তর্নিহিত অথচ মধুরভাবের সঙ্গে ধর্মীয় এবং দার্শনিক ভাবধারা আছে জট পাকিয়ে। মধ্য ও বর্তমান যুগে জটিল রূপ পেয়েছে ওদের মানসিকতায়। অন্য দেশের তুলনায় এখানকার সব-কিছুই কেমন বিস্ময়সূচক। দেশটি এমন যা যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। জাপানী জনগণের শ্রমশীলতা প্রশংসাজনক। একজন সাধারণ জাপানীর অপরের প্রতি ব্যবহারের সৌজন্য ও সংযম এবং সহনশীলতা অতুলনীয়। তাছাড়া তারা বিখ্যাত অধ্যবসায়, শৃংখলাবোধ, জীবন ও শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির প্রতি আনুগত্যের জন্য। জাপানীদের দীর্ঘকাল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বারবার ডেকে এনেছে অন্তহীন দুর্দশা। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই অর্জিত হয়েছে দুর্লভ চারিত্রিক গুণাবলী।

দীর্ঘকাল সামন্ততান্ত্রিক শাসনে নিষ্পেষিত জাপানী-জনগণ। এই দীর্ঘকালীন শাসন নেতিবাচক প্রভাব জাপানীদের চারিত্রিক গঠনকে এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে। তৎকালীন বুশিদো আচরণবিধি অর্থাৎ যোদ্ধার আচরণবিধি ছিল সমাজের উচ্চস্থান অধিকারী সামুরাই বা সামন্ত প্রভুদের জন্য। কিন্তু অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বুশিদো আচরণবিধির বহু ধারাই সামরিক নিয়মাবলীতে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও বিশেষত সরকারী আমলাতন্ত্রের আচরণবিধিতেও দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। জাপানে মধ্যযুগীয় ভাবধারার অবসান ঘটে ১৮৬৮ খৃঃ। বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। সামন্ত প্রভুদের ওপর নবীন বুর্জোয়া সমাজ আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর শুরু হয় সোগানদের কাল। সোগান উপাধিধারীরা ছিল শক্তিশালী শাসনকর্তা। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলত অবিরত। অনেকটা ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মতো। দীর্ঘকাল পরে হাতে ক্ষমতা পান সম্রাট মাৎসুহিটো। শুরু হয় তথাকথিত মেইজি যুগ। জাপানী ঐতিহাসিকদের মতে এটা হচ্ছে মেইজি বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লব মধ্যযুগীয় দর্শন এবং নীতিকে বাঁচিয়ে রাখল মাত্র। তারপর অনেক ঝড় উঠেছে জাপানে।

এক-একজন নেতা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের পথ নির্দেশ করেছেন। কখনো পাশ্চাত্য ভাবধারা, কখনো সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে চলেছে জাপান। প্রাচীন সামুরাই মনোভাব কাটিয়ে এক নতুন জাতীয় সত্তার বিকাশ ঘটছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে জাপানের দ্রুত সামরিকীকরণ ঘটতে থাকে। এশিয়ায় প্রভুত্ব কামনায় জাপানী শাসকবর্গ উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের ওপর এল কালো মেঘ নিয়ে।

ফ্যাসিস্ট লেখক মিশিমা আত্মহত্যা করেছেন কিছুকাল আগে। যে রকম অমানুষিকভাবে হারাকিরি করে আত্মহত্যা করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর আত্মহত্যার উদ্দেশ্য হোল সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে 'সামুরাই' মনোভাব জাগিয়ে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তাদের সংগ্রামে নামানো। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই সংবিধানে বলা হয়েছে যুদ্ধ পরিহারের কথা এবং সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রতি অসমর্থন। একখানি তরবারি দিয়ে উদর বিচ্ছিন্ন করে মিশিমা দেখালেন যে, সামুরাই মনোভাব এখনো জীবন্ত। এই সামুরাই মনোভাব যদি একটা জীবন্ত চিন্তা হিসাবে এখনও থেকে থাকে, তাহলে সিন্তোধর্মও কম জীবন্ত নয়। এই ধর্মমতে সম্রাট ঈশ্বরের হিসাবে চিহ্নিত। নাগরিকদের তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানান হয়েছে।

একশ বছর আগে সামুরাইদের স্মৃতিরক্ষার জন্যে টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গত একশ বছর ধরে যত সৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর অফিসার বিভিন্ন যুদ্ধে জাপানে মারা গেছে তাদের চিতাভস্ম অথবা পারিবারিক স্মৃতিফলক এখানে আনা হয়েছে। এসব যুদ্ধই হোল আগ্রাসী যুদ্ধ, তার একটিও ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ লক্ষ পারিবারিক স্মৃতিফলক নাকি এখন এই মন্দিরে আছে।

আই টিকইয়োসির নমুনা থেকে টোকিও-র একটি পার্কে সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করা হয় ১৯৬৮ খৃঃ। এখানে

আছে মনোরম একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। অন্যান্য সিন্টো তীর্থস্থানের মতো বিস্তীর্ণ এবং শান্ত। পরিবেশটা মনোরম কবিত্বময়। একে বলা হয় জাপানমাতার প্রতীক। জাপানমাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানী বীরদের আত্মার তৃপ্তি দিয়েছেন। এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে মহাসমরের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তরখণ্ড। ম্যানিলা থেকে করেগিডর থেকে গুয়াম দ্বীপ থেকে বোগেইন দ্বীপ থেকে এবং অন্যান্য জায়গার পাথর নিপুণভাবে দেওয়ালে লাগান হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের বিরাম নেই। অবিশ্রাম গতি, সপরিবারে আসে সকলে। মনে হবে প্রাচীন কোন নিদর্শন দেখার কৌতূহলে এসেছে তারা। কিন্তু মন্দিরের দরজায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী, তারা অমুখ তাকিয়ে থার্মবন অধিকারের জন্য যেসব যোদ্ধা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিন। বার্মার যুদ্ধে নিহতদের স্মৃতি-তর্পণের জন্যও রয়েছে অনুরূপ অনুরোধ। ধীরে ধীরে সমগ্র পরিবেশের রূপ যায় পাল্টে। মনে হয় টোকিও শহরের মাঝখানে প্রতিহিংসাপরায়ণতার একটি প্রতীক জীবন্ত।

ধর্মীয় আবরণের মোড়কে সামরিকীকরণের যে প্রয়াস চলেছে, জাপান জুড়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে বারবার। জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ বিনষ্ট করতে নয়া উপনিবেশবাদীরা বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করেছে। জাপানে এরাই আওয়াজ তুলেছে: আমরা কি চাই—কম্যুনিজম না স্বাধীনতা?— সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। জাপানের ধর্মীয় সমাজও এই অসম্ভব চিন্তাধারার আত্ম-প্রকাশে বিপন্ন বোধ করছে। কাউন্সিল অফ রিলিজিয়াস্ট ফর পিসের সেক্রেটারি জেনারেল রেভারেন্ড সুজুকি বলেছেন:

"Neocolonialist policies have already been brought to Japan. Because of the Japan-US Security Treaty, many national traditions, many cultural achievements have been destroyed. And grave criminal acts are increasing in this country just as in the United States itself : the use of narcotics, heroin, and other drugs, and so on. The very fact to being a human is threatened. The struggle against this — against the very simple things of life that are being destroyed by the Japan-US Security Treaty — must also grow into a struggle against imperialism, against the Treaty Japan has become a semicolony. its politics and the Japanese people themselves as human beings, are being contaminated and destroyed. We have to struggle against that.

কিছুদিন যাবৎ টোকিওতে একটি ছবি দেখান হচ্ছিল পর্দায়। ছবিটির নাম টোরা, টোরা, টোরা। ছবিতে আছে কি করে জাপানীরা পার্ল হারবার বিধ্বস্ত করেছিল। এই ঘটনায় প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূত্রপাত। মার্কিন-জাপান যৌথ উদ্যোগে ছবিটি তৈরি। বিখ্যাত জাপানী পরিচালক কুরোসাওয়াকে এই ছবিটি করতে অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু কুরোসাওয়া অসম্মতি জানান। তারা আর একজন পরিচালকের শরণাপন্ন হলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ছবিটি প্রস্তুত হোল। এই ছবির দুটো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা তাদের প্রাক্তন শত্রুদের উচ্চাশার খুব তারিফ করছে। কিন্তু এখন সেই শত্রুরাই হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে জাপানীরা বিধ্বস্ত করেছিল সেই জাপানীদের তারা তারিফ না করে পারে না। আর দর্শকরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে হতবাক। তাদের কাছে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যদিও জাপানীরা সত্যি-সত্যি বিধ্বস্ত করার মত শক্তিমান ছিল, তবু আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে জাপানীরা ঠিক করে নি, তাদের উচিত ছিল এই অভিযানকে অন্য দিকে পরিচালিত করা। আর কোন দিকে সেই অভিযানকে পরিচালনার কথা হচ্ছে তা স্পষ্ট করে না বললেও সবাই বুঝতে পারে। ফিল্ম, টেলিভিশন, নাটক সর্বত্রই 'সামুরাই' মনোভাব। এক তীব্র অনাসক্তি মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। কিন্তু আপাত দৃশ্যমান বেশ কিছু সংগঠন ব্যাপকভাবে যুবকদের মধ্যে সামুরাই মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানী জনসাধারণের জন্য ডেকে এনেছিল এক দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। বলা যায়, যুদ্ধ পরবর্তী কয়েক বছর জাপানের এক অন্ধকার যুগ। যে বিদ্যুৎ এক সময় রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী আলোকিত করে রাখত, তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, শিল্প সংগঠন কলকারখানা অতি পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারত। ট্রাম চলাচল হয়ে যায় অনিয়মিত। মোটর চলাচলও কঠোর পেট্রোল রেশনিং-এ বিপর্যস্ত। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। কাঠকয়লার অভাবে স্টোভ জ্বলে না। জামাকাপড়ও রেশনিং-এর আওতা থেকে বাদ পড়ে না। নতুন নতুন ফ্যাশান নিষিদ্ধ। জাপানের ঐতিহ্যময় জাতীয় পোশাক কিমোনোও বাদ পড়ে না --এর আওতা থেকে। কুটিরশিল্প বিধ্বস্ত। ট্রেন চলাচল অনিয়মিত। শহরের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি মিলিটারির হাতে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দিয়ে নানা ধরনের কাজ করান হোতে থাকে। কাফে, রেস্টুরেন্টগুলি বন্ধ। একমাত্র নিয়মিত চলছিল সিনেমাহলগুলি। সেখানে কেবল প্রোপাগান্ডা সামুরাই ছবি দেখান হতে থাকে। আর দেখান হয়েছিল জাপানের নতুন সামরিক গৌরব কাহিনী। জাপানের প্রাণবন্ত ছুটির দিনগুলি যেন হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপানের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমর বিভাগ আমেরিকার অধীনে চলে যায়। যুদ্ধের পরেকার প্রথম বছরেই আমেরিকা জাপানীদের নানাবিধ সংস্কার প্রচেষ্টায় সমর্থন জানায়। বিশেষ করে জাপানের অর্থনীতি বিকাশে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে গভীর মনোযোগ দেওয়া হয়। মৎস্য চাষের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সব কিছুই ছিল একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেন্দ্রিক।

"The outlook for the develpoment of individual parts of the country, especially in the north (Hokkaido, Tohoku) was considered earlier either in the light of the interests of the big monopolies or with an eye to framing administrative measures. For this reason such problems were dealt with for the most part by officials of central and local bodies. Japan, K.Popov Moscow 1969).

পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতে থাকে। জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠী এবং মার্কিনী 'গণতন্ত্রের' পক্ষে এই উন্নয়ন প্রয়াস ছিল তখন অত্যাবশ্যকীয়: জাপানী জনগণ এই পরিকল্পিত অর্থনীতিকে স্বাগত জানায়। তাদের ধারণা ছিল 'মার্কিনী সৈন্যদল' মুক্তিসেনা।

ক্রমশঃ মার্কিনী কৃষি ও ভোগ্যপণ্যাদি জাপানে রপ্তানি হতে থাকে। গম, দুধ, মাংস, ফল, ডিম এসব আসত আমেরিকা থেকে। ফলে জাপানী কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। এর আগে জাপানের কৃষি ব্যবস্থা ছিল মূলত চাল, গম, সিল্ক দ্রব্যের কাঁচামাল এবং ডেয়ারি ভিত্তিক। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তন এল এত দ্রুত এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে যে গরীব কৃষকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে এসে ভীড় জমাতে থাকে শহরে। ১৯৬০ খৃঃ—১৯৬৮ খৃঃ মধ্যে ৭৬০,০০০ কৃষি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারা শহরে এসে কাজ নেয় নানান কলকারখানায়। শহর অঞ্চলে বর্তমানে এক মিলিয়নেরও বেশী অস্থায়ী কারখানাকর্মী রয়েছে। শতকরা কুড়ি ভাগেরও নীচে নেমে গেছে কৃষিপরিবারের হার। কৃষি অঞ্চল হয়ে পড়ছে জনহীন এবং দরিদ্র। এমন কি দৈনন্দিন খাদ্য দ্রব্যেরও চেহারা বদল ঘটেছে। চালের ব্যবহার কমে গেছে। রুটির অভ্যাস বেড়েছে জাপানীদের। আর এইসব রুটি তৈরি হয় মার্কিনী গমে।

বর্তমানে জাপানী শিল্প দ্রব্যের বাজার বিশ্বব্যাপী। অবশ্য এর প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়া অঞ্চল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপানের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, কিন্তু এক অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাপানীরা বিধ্বস্ত। জীবনধারণের মান অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপানের স্থান ২০তম। একজন জাপানী কর্মীর মাসিক আয় ১১০—১২০ মার্কিন ডলার। যেখানে একজন নতুন কর্মীর আয় ৩০ ডলার, সেখানে জাপানী ব্যবসায়ী বছরে আয় করে এক হাজার মিলিয়ন ইয়েন (৩৬০ ইয়েন এক মার্কিন ডলারের সমান)।

জাপানে শতকরা ৯৩ জনের ঘরে টি ভি আছে। প্রভাতী এবং সান্ধ্য দৈনিকের প্রচার সংখ্যা ৫ মিলিয়নেরও বেশী। সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন। একমাত্র টোকিওতে আছে সাতটি টি ভি কেন্দ্র। পরিচালনা করে মার্কিনী এবং জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলরা। যুদ্ধ বিষয়ের ছবি এবং যৌনতার ছড়াছড়ি। আমেরিকান কার্টুন এবং নাটক টিভিতে পরিবেশিত হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত। এ সময়ই অধিকাংশ মানুষ টি ভি দেখতে অভ্যস্ত। যাবতীয় প্রগতিশীল সংবাদ কৌশলে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বিকৃত প্রচার চলে অবিরত। অবশ্য কখনও কখনও বামপন্থী নেতাদের গোল টেবিল বৈঠকে ডাকা হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুলিশ প্রবেশ করতে পারে বিনা অনুমতিতে। যুদ্ধ, সামরিক চিন্তা এবং উপনিবেশবাদে দীক্ষিত করে তোলার নয়া পাঠক্রম চালু হয়েছে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সংবিধানকে ভেঙে ইচ্ছামত দেশ শাসন করছেন।

পঁচিশ বছর আগে পরাজয় স্বীকার করার পর জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিক থেকে রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিযোগীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত জাপানেও আজকাল মোটরগাড়ি, বড় বড় জাহাজ, বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশলগত দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধপত্রের মতো শিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন এবং রপ্তানি হচ্ছে। বহু উৎপাদনসূচকেই জাপান দুনিয়ার দ্বিতীয় স্থান অধিকারী।

জাপানী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস শুরু হয় ১৯৫০ খৃঃ, কোরিয়ার যুদ্ধের সময়। তখনই আমেরিকা জাপান সম্পর্কে তার নীতি বদলায়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে জাপানকে তুলে দিতে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। জাপান সরকার এবং পুঁজিপতিদের এটাই ছিল কাম্য। জাপানী দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে। বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নিয়ে জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি দ্রুত তাদের পূর্বতন অবস্থান অনুসরণের ফলে যুদ্ধপূর্ব জাপানী

বিক্ষুব্ধ জাপানী ছাত্র

অর্থনীতির প্রকৃত প্রভু তিনটি প্রাক্তন সংস্থা জাইবাৎসু পুনর্গঠিত হয়। পুঁজিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫৫ খৃঃ থেকে ১৯৬৫ খৃঃ পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায় তিনগুণ এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে আড়াই গুণ।

জাপানী ভারী শিল্প দ্রুত ফেঁপে উঠতে থাকে। আমেরিকা জাপানের শিল্পবিকাশে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখে এশিয় দেশগুলিকে শোষণ করবার জন্য। কোরিয়া-জাপান, তাইওয়ান-জাপান চুক্তিগুলি তার প্রমাণ। জাপানী শিল্পকে ঋণ দান ও আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকানরা বদান্যতা দেখিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্বার্থেই এটা দরকার ছিল। ১৯৫০ খৃঃ থেকে ১৯৬৯ খৃঃ মধ্যে জাপান বিদেশ থেকে, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছে ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের যাদুটি এভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে জাপান তার বিদেশের বাজারকে সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হয়েছে। জাপানী একচেটিয়াপতিরা আবার এশিয়ায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারের আশা পোষণ করছেন। সেই সঙ্গে জাপানী সমরবাদীদের আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে সংশোধন করা। এই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠছে দেশের সামরিক উদ্যোগ এবং প্রতিহিংসাকামী মনোভাব। সে কারণে জাপানী একচেটিয়া পুঁজি শোষণের এক ভয়াবহ ব্যবস্থার সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট কৃতিত্বগুলিকে এবং শ্রমিকদের মহান শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে।

জাপানী একচেটিয়াপতিরা যেকোন নতুন জিনিসকে পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের চেয়েও অধিকতর দ্রুততায় গ্রহণ করেন। জাপানী ব্যবসায়ী রাজারা একথা ভালোভাবেই জানেন যে, যারা পিছনে পড়ে থাকে, নির্মম প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম তাদের বাতিল করে দেয়। আর যারা দুর্বল অংকুরগুলি পরবর্তীকালে অতি-মুনাফার জন্ম দেবে সেগুলিকে তারা যথাসময়ে দেখতে পায় এবং লালনপালন করে।

সমগ্র জাপান জুড়ে চলেছে যেন এক কর্মযজ্ঞ। সে সব কিছু সত্যে উপলব্ধি করবার। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরি এবং অগুন্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

।। দুই ।।

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫১ খৃঃ। জাপানে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিকে আইনসিদ্ধ করা হয় এই চুক্তিতে। জাপানী ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপান তথাকথিত মার্কিন পারমাণবিক-ছত্রের রক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেবার অঙ্গীকার করে। সেই সঙ্গে 'আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে' শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বর্তমানে অবশ্য দুটি দেশের তথাকথিত বাধ্যতামূলক 'পারস্পরিক প্রতিরক্ষার' আওতায় শুধু জাপানই পড়ে নি, এশিয়ার সমগ্র অঞ্চলটিই তার মধ্যে পড়েছে। ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই চুক্তি। অবশ্য জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি মনে করে, এর ফলে এশিয়ার বাজ-

CENTRAL LIBRARY

সমৃদ্ধির কেন্দ্রটি পুনরুজ্জীবিত করার আর একটি সুযোগ উপস্থিত। জাইবাতস্ (প্রধান একচেটিয়া গোষ্ঠী) একে তাদের স্থিতিশীলতার চিহ্ন মনে করে। বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই চুক্তিকে দেখে তাদের শিল্পক্ষমতা পুনরুদ্ধারের অন্যতম শর্ত হিসাবে। জাপানী সমরবাদীরাও যথেষ্ট আগ্রহী। এক্ষেত্রে একমাত্র অসুবিধার কথাটা জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি ও সমরবাদীরা হিসেবে ধরেন নি। সেই অসুবিধাটি হোল যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আগাগোড়া বদলে গেছে। অর্থনৈতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে। আমেরিকানরা পর্যন্ত আস্তে-আস্তে একথা বুঝতে শুরু করেছে। ফলে জাপান ভুগছে অন্তহীন অশান্তি। জাপান সরকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই চুক্তির মেয়াদ আরো দশ বছর বাড়ায় ১৯৬০ খৃঃ জুন-এ। প্রবল জনবিক্ষোভের সম্মুখীন হয় জাপান সরকার। নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদনের সময় অবশ্য সরকার যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করেন। গণবিক্ষোভ এড়ানোর জন্য মেয়াদ বৃদ্ধিকে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা হয় নি। নতুন ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, কোন পক্ষ কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

কিন্তু এই বিপজ্জনক মৈত্রীর বিরুদ্ধে জাপান সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে পর্যন্ত জনগণ নামতে বাধ্য হয়েছে। বিক্ষোভের অন্ত নেই। এই মৈত্রী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে যুব সংগঠন রেড আর্মি বলেছেন:

> Fascism is not limited to the Nazis of another epoch but is a necessary development within the US-Japanese alliance. The Security Treaty is a treaty between two fascist states, two fascists Capitalist governments.
>
> Our struggle against the Treaty is a struggle against war and invasion and against fascism. It is the struggle of anti-imperialist forces of reaction —US imperialism and Japanese Capitalism—militarism—whose joint and continuing objective is the oppression of the people of Asia.

জাপানী পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী এই চুক্তির জন্য দেশের মানুষের ওপর দিনের পর দিন বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে সাটো সরকার। সরকার প্রবল বিক্ষোভে আতঙ্কগ্রস্ত। দশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী কিসি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই গণবিক্ষোভ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ আন্দোলন ছাত্র এতে অংশ নিচ্ছে। তাদের দাবী নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল এবং ওকিনাওয়া ফেরৎ দেওয়া। এক সময় জনতার রোষ প্রশমনের জন্য মার্কিনী ঘাঁটি শহরাঞ্চল থেকে দূরে সরাতে হয়েছিল। এমন কি উত্তাল জনসমুদ্র মার্কিন দূতাবাস কর্মীদের বিব্রত করে তোলে। জাপানের সাধারণ মানুষ আজ এই চুক্তির স্বার্থগত দিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অধিকাংশ বামপন্থী দলগুলির মতে নিরাপত্তা চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে তাঁর চীন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আতঙ্কে ভুগছে বর্তমান জাপানের শাসকবর্গ এবং আমেরিকা। তাছাড়া এশিয়ার মানুষকে দাবিয়ে রাখা এবং চীনকে প্রহরা দেওয়া একটা বড় উদ্দেশ্য। তাই যুদ্ধে পরাস্ত নিরস্ত্র জাপান আজ পরিণত হয়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (কোরিয়া ও ইন্দোচীন) যুদ্ধে লিপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদবর্তী সামরিক ঘাঁটি, মেরামত কেন্দ্র ও অস্ত্র ভাণ্ডারে। শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যে জাপানকে হাতে রাখা আমেরিকার দরকার। জাপানকে তাই সাধারণ উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে কেবলমাত্র নয়, আণবিক অস্ত্রেও সজ্জিত করা হয়েছে। এর ফলে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও বেশ অসহায় বোধ করছে।

সামরিক ক্ষমতার দিক থেকে এশিয়ায় জাপানের শক্তির তুলনা হয় না। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তার স্থান দ্বিতীয়। ক্ষুদ্র এই দেশটিতে অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি এখন নিজস্ব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা এক নতুন মেজাজ ও আক্রমণমুখীনতা নিয়ে এসেছে। অবশ্য এই পুনরুজ্জীবন দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে বিকশিত করে নি। কারণ এই প্রবাহে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে মাত্র জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ডলারের দাম বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের খেলা চলতে থাকে। অর্থনীতির বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ভিত্তিতে পরিণত হয় ডলার। আবার ১৯৬০ খৃঃ-এর প্রথমেই ডলার সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। সেই দুরবস্থা এখনও বর্তমান। ১৯৬৭ খৃঃ শরৎকাল থেকে তীব্র আকার নেয়। মার্কিন সাহায্য কর্মসূচী পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে থাকে। আমেরিকা কর্তৃক তার মিত্রদের প্রদত্ত সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য রাজনৈতিক রণনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় দরকার হয়েছে এই রণনীতির। বিশ্ব কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখাও একটা লক্ষ্য। এশিয়ায় কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশকে বাধা দিতে মার্কিন সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞার পিছনে এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের গোপন বাসনাও যে প্রবল, তা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাই বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ও পরিধি না বাড়িয়েও উপায় নেই। কিন্তু তার নিজের আন্তর্জাতিক লেনদেনের অবস্থা শোচনীয়। মার্কিন ডলার সঙ্কট জটিল চেহারা নিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধগুলি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়েছে এই সঙ্কটে। অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করছে অন্যান্য দেশকে প্রদেয় সামরিক সাহায্যের বোঝার একটা অংশ তার মিত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। এশিয়ায় বিশেষ আশা রাখা হয়েছে জাপানের ওপর। শক্তিশালী মিত্রের ওপরই কেবল ভরসা রাখা সম্ভব। জাপানকে তাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দীক্ষা দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু ওপরে রয়েছে সদাসতর্ক দৃষ্টি।

মনে রাখা দরকার, বর্তমান জাপানী সরকার ও জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। ফলে 'ডলার রক্ষা করার' জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই তারা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ডলার সঙ্কট মোকাবিলার জন্য তারা মার্কিন মুদ্রা সঞ্চয় করে। জাপানে তার যে সঞ্চয় ভাণ্ডার দুশো কোটি ডলারে ওঠানামা করছিল ১৯৬৮-র শেষ দিকে তা তিনশো কোটি ডলারে পৌঁছায়। একই উদ্দেশ্যে জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি তাদের পণ্যের রপ্তানীকে দ্রুত বাড়াতে থাকে। ১৯৬৮ খৃঃ জাপানী রপ্তানীর মোট মূল্য হয় তেরশ কোটি মার্কিন ডলারের সমান অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেড়ে যায়। অপর দিকে এ সবই এক উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে; জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি এখন সেই উভয় সঙ্কটে পড়েছে। আগে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করত প্রধানত ছোটখাট শিল্পদ্রব্য। এখন ভারী শিল্প, বিশেষ করে লৌহজাত দ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম রপ্তানী করছে। অবশ্য বর্তমান হারে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়তে থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক লেনদেনের অবনতি ঘটবে এবং ডলার সঙ্কটকে আরো গুরুতর করে তুলবে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পথ আমদানীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণভাবে 'ডলার রক্ষা' ব্যবস্থায় তৎপর হওয়া। জাপানী রপ্তানী সম্প্রসারণে হবে প্রতি-

CENTRAL LIBRARY

কঠিনতার সৃষ্টি। তাই আজকের মার্কিন ডলার সংকট জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলিকে ফেলেছে উভয় সংকটে।

অনুকূল পথের সন্ধান করতে হচ্ছে জাপানকে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য জাপান এশীয় দেশগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ জাপানী দ্রব্যাদির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাজার ছিল এশীয় দেশগুলিই। কিন্তু এশীয় দেশগুলির অধিকাংশই রয়েছে অর্থনীতির বিকাশের নিচুস্তরে। এশিয়ার বাজারও নিম্ন জীবন-মানসম্পন্ন। জাপানী একচেটিয়াপতিদের ক্ষুধা এই বাজার তৃপ্ত করতে পারে না। সেই জনাই প্রয়োজনমাফিক তার পণ্য বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাপানকে বাঞ্ছিত রপ্তানি হ্রাস করে, নিজেকেই এই দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো নতুনভাবে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। অবশ্য আমেরিকার বিকাশশীল মিত্রদের প্রশ্নে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের বোঝা অন্যান্য সমুন্নত পুঁজিবাদী দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মার্কিন বাসনার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ মেলে না।

॥ তিন ॥

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাটো ওয়াশিংটন সফর করেন '৬৯ সালে। বাইশ নভেম্বর ১৯৬৯ খৃঃ জাপান-আমেরিকান যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পর দু-দেশের মৈত্রীস্বরূপ স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে অতীতের নিরাপত্তা চুক্তিকে নতুনরূপে নিক্সনের গুয়াম নীতি (এশীয়দের দিয়ে এশীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করানো) নামে খ্যাত আমেরিকার নতুন এশীয় নীতি রূপায়ণের জন্যেই জাপান-মার্কিন সামরিক মৈত্রীজোট। ইন্দোচীনে মার্কিন আগ্রাসনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রীড়নক সরকারগুলির জাকার্তা সম্মেলনে (মে, ১৯৭০) জাপানের সক্রিয় অংশ গ্রহণও এর একটা প্রমাণ। জাপানসহ সমগ্র দূর প্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলা হয় যুক্ত বিবৃতিতে। জাপান শুধু তার নিজের ভূখণ্ডেই নয়, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও অন্যান্য যেসব অঞ্চল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে, সেখানকার 'প্রতিরক্ষা' সংক্রান্ত সামরিক দায়-দায়িত্ব সে গ্রহণ করে। জাপানী পত্রপত্রিকা-গুলি প্রকাশ্যেই এইসব বিষয়ে লিখছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লেকচারে এবং ব্যবসা-জগতের বিশিষ্টদের বক্তৃতায় তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

জাপানী সংবাদপত্রগুলিতে শিরোনামা বৈচিত্র্য শুরু হয়েছে। শিরোনামগুলির মধ্যে কয়েকটি : 'জাপানের কূটনীতিতে নতুন বাঁক', 'জাপানের প্রথম পদক্ষেপ', 'জাপানকে একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' প্রভৃতি। সংবাদপত্র আসাহী লিখেছে : 'মার্কিন-জাপানী শীর্ষ আলোচনায় জাপান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সম্মেলনে (জাকার্তা) জাপানের অংশ গ্রহণ সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার প্রথম সুনির্দিষ্ট কাজ।'

এশীয় রাজনীতি থেকে আমেরিকার সরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার একার পক্ষে এই বিস্তৃত অঞ্চলে চৌকিদারীও অসম্ভব। এই কাজটা সে ভাগ করে নিতে চায় জাপানের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর-কালে রচিত জাপানী সংবিধানে দেশে সৈন্য বাহিনী প্রতিষ্ঠা বা জাপানী সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। কিন্তু সংবিধান-বিরোধী কাজে কেন এগিয়ে যাচ্ছে জাপানী শাসকবর্গ?

এশিয়ায় জাপান হোল আমেরিকার ছোট শরিক ও সঙ্গী তাই আমেরিকা পৃথিবীর এই অংশে জাপানের অর্থনৈতিক আক্রমণের অধিকারকেও স্বীকার করে নিতে রাজী আছে। এখনই অ-কমিউনিস্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায় এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে জাপানীরা ব্যাপকভাবে তাদের কার্যকলাপ বাড়ায় নি এবং অচিরেই সমগ্র এশিয়া হয়ে উঠবে জাপানের পক্ষে একটা কারখানার মতো—বিশেষত সেই সমস্ত অঞ্চলে, যেখানে চীনা কর্মীবাহিনী ও চীনা সংস্কৃতি আছে। মন্তব্যটি করেছেন মার্কিন প্রশাসনের বিতর্কমূলক তত্ত্ববাগিশ হেরমান কান। তিনি আরো বলেন : 'এই সম্প্রসারণের ফলে উক্ত অঞ্চলে প্রচুর শত্রুতা জাগানো হচ্ছে, এবং জাপান ও মুক্তি-সংগ্রামী এশিয়ার জনগণের মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী মোকাবিলার পূর্বাভাস তিনি করেছেন।

জাপানের বিশাল ধাতুবিদ্যাগত প্রতিষ্ঠান ফুজি সেইতেৎসু-এর প্রেসিডেন্ট সিগি ও নাগানো বলেছেন : 'পারস্পরিক সমৃদ্ধির ভিত্তিতে এশীয় দেশগুলিতে বাজারের বিকাশ জাপানের অর্থনীতির ভবিষ্যতের দিক থেকে পরম বাঞ্ছনীয়।' মাইনিচি পত্রিকার বক্তব্য : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। এবং এই অঞ্চলে জাপানের যে ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করার কথা তা থেকে আর সে দূরে সরে যেতে পারে না।' শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রমে দলিলে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত এই দৃষ্টিভঙ্গী। ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খৃঃ অনুষ্ঠিত লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস জাপানের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছে 'সঠিক (!) পথটি ধরে, এশীয় দেশগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে তার যথাসাধ্য সাহায্য করতে।' গৃহীত একটি দলিলে সরাসরি বলা হয়েছে যে, 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুগে সত্তরের দশকে, জাপান এশিয়ার নেতৃভূমিকা লাভ করবে।' জাপানের দ্রুত সামরিকীকরণ এই মতবাদটির সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলে যায়।

দূরপ্রাচ্যের সমসাময়িক একজন বিশেষজ্ঞ রবার্ট গিলেইন। প্যারিসের লে ম'দ পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। গিলেইন স্পষ্ট বলেছেন যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধে নিযুক্ত মার্কিন ফৌজের 'আংশিক অপসারণ' ঘটাবার জন্য মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত এবং 'এশিয়ায় মার্কিন ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য তার দৃঢ়পণ' আদৌ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং তা জুলাই ১৯৬৯ খৃঃ ঘোষিত নিক্সন নীতির দুটি দিককেই প্রতিফলিত করে। এর যাথার্থ প্রমাণের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাপানকে ওকিনাওয়া দ্বীপ ফেরৎ দেওয়ার বাসনার প্রকৃত কারণ দেখিয়ে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি জাপানকে ফিরিয়ে দিতে চায়—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা অনির্দিষ্টকাল নিজেদের দখলেই রাখবে। কারণ ওকিনাওয়া সমরনীতিগতভাবে সবচেয়ে ভালো জায়গায় অবস্থিত এবং সবচেয়ে ভালোভাবে অস্ত্র-সজ্জিত। জাপানে আমেরিকার ১৭০টি সামরিক ঘাঁটির মধ্যে ওকিনাওয়াতেই আছে ১১৭টি। ওকিনাওয়াতে যে আণবিক অস্ত্র-ঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে, তাও প্রমাণিত। বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে। এশিয়ায় আমেরিকার সামরিক কার্যকলাপ চলে এখান থেকেই। ওকিনাওয়ার কাদেনা ঘাঁটি থেকে গিয়ে বি-২৫ এবং বি-৫২ বোম্বার উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করে থাকে। ওকিনাওয়ার লোকসংখ্যা ৯৭৮,০০০ (১৯৭০ খৃঃ)। এদের আয়ের প্রধান উৎস হোল মার্কিন সমরঘাঁটিতে সরবরাহ ও যোগাযোগ, চিনি, চাল এবং আনারস উৎপাদন। ১৯৭০ খৃঃ রপ্তানি পরিমাণ ছিল ১০৬,০০০,০০০ মার্কিন ডলার এবং আমদানি পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৯৮১,০০০,০০০।

আগামী বছরের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ওকিনাওয়ার লোক দেখানো হস্তান্তর ঘটবে। এ ব্যাপারে জুনে যে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর হয়েছে, তার অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ওকিনাওয়ার প্রধান কর্মাধ্যক্ষের অনুপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গিলেইন সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, 'জাপানকে (ওকিনাওয়ার) উপর সার্বভৌমত্ব আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু সামরিক ঘাঁটিগুলি নয়।' সুতরাং দ্বীপটির ওপর জাপান সরকারের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এর ফলে সাটো সরকার অবশ্য আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক প্রচারের বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ ১৯৭২ সালেই নির্বাচন।

গিলেইন এই রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যে, আমেরিকানরা

ওকিনাওয়ায় মার্কিন ঘাঁটি অপসারণের দাবীতে বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

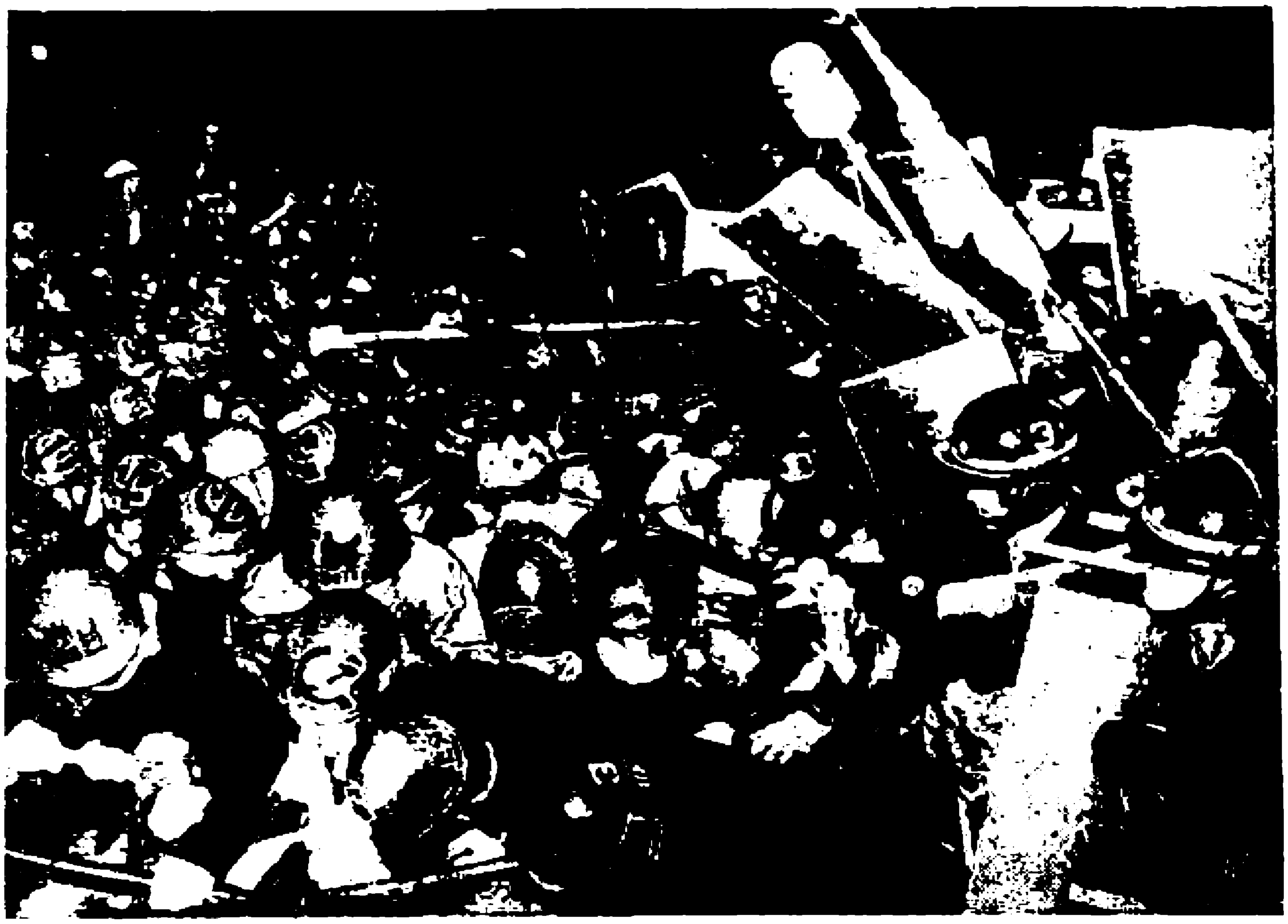

জাপানীদের সাথে একটা সূক্ষ্ম খেলা খেলতে বাধ্য। তার মানে : একদিকে তারা চায় যে জাপান এখন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবং তাদের শক্তি এশীয়দের অনুভব করাক। অন্যদিকে তারা চায় যে, এই শক্তি যেন সীমাবদ্ধ থাকে এবং আংশিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।"

"নিক্সন নীতি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জাকে উৎসাহিত করে। তাতে জাপান সরকারকে তার সশস্ত্র-বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার আহ্বান জানানো হয়। দাবি করা হয় যে, আজ পঁচিশ বছর ধরে ওয়াশিংটন যে এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, জাপান তার একজন সক্রিয় সদস্য হোক। জাপান যেভাবে (এই ব্যবস্থায়) একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে, অন্য কোনো এশীয় দেশই তেমনটি পারবে না। কিন্তু অন্যদিকে, নিক্সন-নীতির কিছু পাল্টা প্রতিশ্রুতিও দরকার, যাতে নিশ্চিত দেওয়া হবে যে, জাপান সামরিক ক্ষেত্রে 'অতিরিক্ত' (!) বলশালী এবং 'অতিরিক্ত' (!) স্বাধীন হবে না।" —গিলেইন এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওকিনাওয়াতে তার সামরিক ঘাঁটিগুলি বজায় রাখতে চায় এবং সেগুলিকে ব্যবহার করতে চায় এশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য—শুধু সেখানকার ঘাঁটিগুলিই নয়, মূল জাপানের দ্বীপ-গুলির ঘাঁটিকেও।

ওকিনাওয়াতে আমেরিকানদের থেকে [illegible]

পরিপূর্ণ সম্মতি দিয়েছেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যতদিন সম্ভব মৈত্রী চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত নীতির সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ এই মৈত্রীর ফলে, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ছাতার তলায় থাকতে পারে, এবং অস্ত্রসজ্জা বাবদ তাকে অত্যধিক ব্যয় না করলেও চলে। ঠিক এই কারণেই জাপানকে ওকিনাওয়া দ্বীপ ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক চুক্তিতে জাপানের এই বিশ্বাসের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে যে দূরপ্রাচ্যে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি, সেই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার এক অপরিহার্য উপাদান।"

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রথমত, এশিয়া থেকে তার সশস্ত্রবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার কোনো মতলব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই; এবং দ্বিতীয়ত, এশিয়ায় তার আগ্রাসী ষড়যন্ত্র রূপায়ণের কাজে সে জাপানকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছে। গিলেইনের প্রবন্ধ অনুযায়ী বলা যায়, জাপানী শাসক-চক্র এই ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করতেই ইচ্ছুক। এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিকের ভূমিকা তাদের স্বার্থানুগ, কারণ এর ফলে তাদের নিজেদের মতলব হাসিল করাটা সহজতর হবে।

॥ চার ॥

জাপানী আত্মরক্ষা বাহিনীতে বর্তমানে আছে ১০ ডিভিসন সৈন্য (৫০০,০০০), ১০০০[illegible]

আনবিক অস্ত্র, রকেট ঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। স্থলবাহিনীতে ১০০,০০০ জন। বাকি নৌ এবং বিমানবহরে। অবশ্য এই আত্মরক্ষাবাহিনী মার্কিন দূর প্রাচ্য-বাহিনীর অধীনে। সম্প্রতি এফ—ফ্যানটম ছক, এফ—৮৬ ফাইটার বম্বার যুক্ত হয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান ইয়াসুহিরো নাকাসোন ১ ডিসেম্বর (৭০) বিদেশী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান : "টোকিওর অনেক পর্যবেক্ষকই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় এবং কখন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজ শেষ হবে। তবু সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সংখ্যা বলা অসম্ভব। কারণ অজ্ঞাত ও পরিবর্তনশীল অনেক ঘটনা ঘটেছে।" গতবছর ডিসেম্বরে ৭ তারিখ 'আসাহী' সংবাদপত্র একটি বিশদ বিবরণ বেরোয়। ঐ বিবরণে ছিল : ১৯৭২ খৃঃ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের জন্য প্রতিবছর ১০০০,০০০,০০০,০০০ ইয়েন জনসাধারণের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করা হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে। প্রায় ২,৫০০,০০০০ লক্ষ ইয়েন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হবে এবং এই অর্থ তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের তিনগুণ। সুতরাং প্রতিটি জাপানীকে কোলের শিশুকেও বছরে ৫০০০ ইয়েন সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দিতে হবে।

জাপান ১৯৬৭ খৃঃ থেকে ১৯৭০ খৃঃ [illegible]

জন্য ব্যয় করেছে ২০৪০,০০০০ ইয়েন। ১৯৭২ খৃঃ—১৯৭৬ খৃঃ মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশী অর্থাৎ ৫৮০০,০০০০ ইয়েন (১৬০০ কোটি ডলার) পরিমাণ দাঁড়াবে। একটি নতুন নৌবাহিনী গড়ে তুলতে ব্যয় বেড়ে যাবে ১৩০ শতাংশে। বিমানবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যয় বাড়বে ১০০ শতাংশে। দেশের সমস্ত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য এটি হল চতুর্থ পরিকল্পনা। পরিকল্পনার রচয়িতারা জাপানের সমরশিল্পের ত্বরান্বিত বিকাশের এক নীতি উপহার দিয়েছেন। আধুনিকতম উপকরণের বিকাশের অনুকূলে কথা বলেছেন। শুকান আসাহি পত্রিকা লিখেছে যে চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের সময়ে অস্ত্রনির্মাণকারকদের তরফ থেকে চাপ বেড়ে যাবে, তারা সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করবে। পত্রিকাটি আরো বলেছে যে 'এক সামরিক শিল্প সমাহারের আবির্ভাব এবং তার হাতে প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ জাপানে সব সময়েই আছে।'

এমন কি জাপানের যে সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা করে, তারাও পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটির প্রকাশ উপলক্ষে বিপদ সংকেত জানাতে বাধ্য হয়েছে। শুকান আসাহির অভিমত: 'এই পরিকল্পনা রূপায়ন করার পর শুধু বিদেশেই নয়, আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বেশ বড় অংশের মধ্যেও আশংকা দেখা দেবে...... অতীতে যে-পথ সে একবার অনুসরণ করেছে জাপান কি আরেকবার সেই পথই গ্রহণ করছে না?' ইয়োমিউরি পত্রিকা বলেছে যে 'জাপানের সেনস্থানীর মহল-গুলি সামরিকীকরণের যে নীতি চালাচ্ছে তা শুধু দূরপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়াতেই সক্ষম হবে।'

॥ পাঁচ ॥

নতুন সামরিক কর্মসূচীর আত্মপ্রকাশকে জাপানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্বর্ধনা জানিয়েছে দৃঢ় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সঙ্গে। তারা দেশের সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে বার বার আন্দোলনের পথে নেমেছে। দেশের নীতিকে তারা শান্তি ও নিরপেক্ষতার পথে পরিবর্তিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বাসনা ঘোষণা করেছে। নতুন এক সামুরাই সভ্যতার যুগে তারা প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। অথচ দেশের পরিবেশ এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, প্রগতিশীল সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে একত্রিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জাপানের বামপন্থী শক্তিগুলি নানা ধারায় বিভক্ত। তাদের একত্রিত করার মত অনুকূল পরিবেশ নেই। তবুও চেষ্টা চলেছে যৌথ [illegible] একত্রিত করার, কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে মিলিত করার এবং পার্লামেন্টে অধিক সংখ্যায় সদস্য প্রেরণ করবার। যে সব প্রগতিশীল শক্তি মুনাফাবৃদ্ধি অবসান, শ্রমিকবিরোধী আইন বাতিল এবং গণতন্ত্র রক্ষায় অভিলাষী তারা অনেক কাছাকাছি এসেছেন অসাম্প্রদায়িক কিছু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিল অফ রিলিজিয়নিস্ট ফর পিসের জেনারেল সেক্রেটারি রেভারেন্ড সুজুকির মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠী তাদের মতানুযায়ী এগিয়ে চলেছে আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবপন্থী। যার যে পথই হোক না কেন, বৃহত্তর জাপানী জনগণের স্বার্থে তাদের পাশে আমরা সব সময়েই থাকব। কোন আন্দোলনে জনসমর্থন সব থেকে বড় পাথেয়। আমরা সে কাজে কখনও বিরত থাকব না। শত্রুদের যত তাড়াতাড়ি কোণঠাসা করা যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

সাতো সরকার যে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এপ্রিল মাসের নির্বাচন থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ১৯৬২ খৃঃ নির্বাচনে ওকিনাওয়া প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র করে সাতোর লিবারেল ডেমোক্রাট পার্টি বিপুল সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু এদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জনগণ ধরে ফেলেছে। উপরন্তু জাপানী জনগণের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমেরিকান ঘাঁটি ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। ওটমা নৌঘাঁটিকে পোলারিস ও পোসেডন আণবিক সাবমেরিন ব্যবহারোপযোগী করা হচ্ছে। কাদেনা বিমানঘাঁটিতে রয়েছে তিনখানি এস আর-৭১ গোয়েন্দা বিমান। এরা সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর গোয়েন্দা কাজ চালায়। জাপানে এমন একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, যেখানে কোন জাপানী বা আমেরিকানের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তৃতীয় কোন দেশের মানুষকে বিশেষ ধরনের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এ নিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ চলেছে অন্তহীন। কিছুদিন আগে ওকিনাওয়ায় ৭০,০০০ মানুষের এক ধর্মঘট হয়। সর্বত্র বিরাট বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল টোকিও আর কিয়োটোতে। জাপানী শাসকগণ উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। কিন্তু এপ্রিলের নির্বাচনী ফলাফল এই উদ্বেগকে আরো বাড়িয়েছে। এই প্রিফেকচার নির্বাচনে বামপন্থীরাই লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই নির্বাচনের ফলাফলে কমিউনিস্ট পার্টি প্রিফেকচার, শহর ও জেলা অ্যাসেম্বলিগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যার দিক থেকে উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। লিবারেল ডেমোক্রাট ও সোশ্যালিস্ট পার্টির পরে।

এবারকার নির্বাচনী অভিযান পঁচিশ-দিনব্যাপী তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কাটে। লিবারেল ডেমোক্রাটরা এবং তাদের সমর্থক দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি নির্বাচনী অভিযানে ছলাকলা ও [illegible] আশ্রয় নিতেও পরাঙ্মুখ হয়নি। বামপন্থীরা আগে থেকেই ভোট বণ্টনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। বহু শহর ও প্রিফেকচারে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলি এক যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। শাসক লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তফ্রন্ট সাফল্য অর্জন করেছে। বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যে প্রচার চালান হয়, কার্যত তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

টোকিও ও ওসাকার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিরাটভাবে জয়লাভ করেছে। মোট ২১০ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট জাপানের দুটি বৃহত্তম প্রিফেকচারের গভর্নর পদগুলিতে এখন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের প্রতিনিধিরা অধিষ্ঠিত। টোকিওর ২৩টি জেলা অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে ১২৮ জন কমিউনিস্ট প্রার্থীর মধ্যে সকলেই নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ইয়োকোহামার মেয়র পদ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির হাতে। টোকিওর পর জাপানের পাঁচটি বৃহত্তম পৌর অ্যাসেম্বলিতেও শাসক পার্টির শক্তি হ্রাস পেয়েছে। আগে ছিল ১৪৮টি আসন। এখন ১২১টি। অধিকন্তু, প্রিফেকচার অ্যাসেম্বলিগুলিতে তারা হারিয়েছে প্রায় ১৫০টি আসন। টোকিওর ২৩টি জেলা অ্যাসেম্বলিতে হারিয়েছে কয়েক ডজন আসন।

সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি টোকিও ও ওসাকা প্রিফেকচার অ্যাসেম্বলিগুলিতে তাদের আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে ৩৫ থেকে ১০৫ অর্থাৎ তিন গুণ। ইয়োকোহামা, নাগোয়া, ওসাকা, কিয়োটো ও কোবেতে পৌর কাউন্সিলরদের সংখ্যা বেড়েছে ২৪ থেকে ৫২ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। প্রতিটি শহরেই লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা পরিষদের কিছু আসন হারিয়েছে আর কমিউনিস্টরা আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে।

একদিকে সামুরাই মনোভাব জাগানো হচ্ছে। অপরদিকে জনগণের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারা প্রবল প্রভাব বিস্তার করছে। এই দুই মতাদর্শের সহাবস্থান অসম্ভব। নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি প্রবল হয়ে উঠলেও সামরিক চক্র কি তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে ভরসা পাবেন। অনেকেই আশঙ্কা করছেন অদূর ভবিষ্যতে জাপানের শাসন-ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পড়তে পারে। বিশ্ব রাজনীতির চেহারা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। আমেরিকাও নিজেকে নানাভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। [illegible]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—২

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ সামরিক ইতিহাসে সুপার ব্যাটল বা চরম যুদ্ধ নামে পরিচিত। কেননা, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এই যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং প্রায় চক্ষুর নিমেষে তারা ধরাশায়ী হইল। ইদানীংকার দিনের সামরিক ইতিহাসে এমন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন নিখুঁত যান্ত্রিক যুদ্ধ আর হয় নাই। চার্চিল বলিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন কোন যুদ্ধ ছিল না সেই ৮ মাস কাল হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীগুলি ১৫৫ ডিভিশনে দাঁড় করাইলেন এবং যান্ত্রিক-সজ্জা ও ট্রেনিংয়ের দ্বারা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট থাকায় দুই রণাঙ্গনের কোন বিপদও তাঁর ছিল না। সুতরাং ১০ই মে পশ্চিম রণাঙ্গনে উত্তর সাগরের তীর থেকে সুইস সীমানা পর্যন্ত বিশাল সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করিয়া হিটলার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানিলেন। এই আক্রমণে ১২৬ ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করা হইল। সেই সঙ্গে পুরা ১০ ডিভিশন প্যাঞ্জার বা যান্ত্রিক সৈন্যদলের সাঁজোয়া-অস্ত্রশক্তির প্রচণ্ডতা। তিন হাজার আর্মার্ড কার, যার মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার ছিল হেভী বা ভারী ট্যাঙ্ক—যান্ত্রিক শক্তির এই বিপুল অস্ত্রসম্ভারসহ হিটলারী সৈন্য দল ৩টি আর্মি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে নিম্নলিখিত আক্রমণের অংশগুলিতে দাঁড়াইল :

১। আর্মি গ্রুপ-বি—২৮ ডিভিশন সৈন্য, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন বোক, অবস্থান — উত্তর সমুদ্র তীর থেকে Aix-la-Chapelle পর্যন্ত। এদের দায়িত্ব ছিল হল্যান্ড ও বেলজিয়ামকে পর্যুদস্ত করা এবং তারপর জার্মান দক্ষিণ (ডান) পার্শ্বরূপে ফ্রান্সের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হওয়া।

২। আর্মি গ্রুপ—এ—৪৪ ডিভিশন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন রুণ্ডস্টেড—এই বাহিনীর আক্রমণই প্রধান। অবস্থান—মধ্যবর্তী রণাঙ্গনের (Aix-la-Chapelle) আচিলেস অঞ্চল থেকে মোজেল নদী পর্যন্ত।

৩। আর্মি গ্রুপ—সি—১৭ ডিভিশন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন লীব, অবস্থান—মোজেল নদী থেকে সুইস সীমানা পর্যন্ত রাইন নদীর সম্মুখ ভাগ।

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ছাড়াও সুপ্রীম আর্মি কমান্ড বা ও কে এইচ প্রায় ৪৭ ডিভিশন সৈন্য মজুত বা রিজার্ভ রাখিল। এর মধ্যে ২০ ডিভিশন ছিল বিভিন্ন আর্মি গ্রুপের পিছনে চাপের কাজেই প্রস্তুত; আর ২৭ ডিভিশন ছিল সাধারণভাবে মজুত সৈন্য দল।

আক্রমণের যে প্রচণ্ডতা এবং নূতন অস্ত্র ও অস্ত্রসজ্জার যে অভিনবত্ব গোড়াতেই পরিস্ফুট হইল, ইতিহাসে তার কোন তুলনা নাই। চার্চিল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সেই ভয়াবহ আক্রমণের স্মৃতি হিসাবে লিখিয়াছেন :

> "... after eight months of inactivity on both sides * the Hitler thrust of a vast offensive, led by spear-print masses of Cannon-proof or heavily armoured vehicles, breaking up all defensive oppsition and for the first time for centuries, and even perhaps since the invention of gunpowder, making artillery for a while almost impotent on the battle field".

চার্চিলের মত বহুদর্শী সমরবিশেষজ্ঞের বর্ণনার মধ্যেও বর্ণিত ও আক্রমণের যে পরম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তা লক্ষ্য করার মত। সোজা বাংলায় তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই—জনস্রোতের মত এই প্রচণ্ড হিটলারী আক্রমণের পুরোভাগে ছিল এমন সমস্ত বর্মাবৃত এবং লক্ষ্যভেদকারী অস্ত্র যান ও যন্ত্র যেগুলি প্রতিরক্ষার সমস্ত বাধাদানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম বহু শতাব্দীর মধ্যে—এমন কি, বোধ হয় সেই বহু দূরে আগেকার গান্ পাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর কামানের গোলা-গুলী বা গোলন্দাজী শক্তিকে একেবারে অকেজো করিয়া ফেলিল।

ফন বোক ও ফন রুণ্ডস্টেডের এই আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইল? আবার চার্চিলের কথাই উদ্ধৃত করা যাক :

> Complete tactical surprise was achieved in really every case. Out of the darkness came suddenly innumerable parties of well-armed ardent storm troops, often with light artillery and long before the daybreak a hundred and fifty miles of front were aflame.

সোজা কথায় আক্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রণকৌশলের দারুণ বিস্ময় অর্জিত হইল। হঠাৎ অন্ধকার থেকে প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত, এবং অনেক সময় হালকা গোলন্দাজী অস্ত্রসমন্বিত যেন অদম্য উৎসাহী অজস্র ঝটিকা সৈন্যদল বাহির হইয়া আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবার অনেক আগেই দেড়শ মাইল রণাঙ্গন অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

• •

এভাবে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের রাজ্য সীমানায় ১০ই মে তারিখ হইতে জার্মানী যে আক্রমণ আরম্ভ করিল, তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। উত্তর-পূর্ব হল্যান্ডের জুইডার জী হইতে ফরাসী সীমান্তের লাক্সেমবুর্গ, মোজেল ও ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ২৫০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইল। এন্টোয়ার্প দুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাসট্রিক্ট পর্যন্ত একটা খাল প্রবাহিত—বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার জন্যই ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল। ম্যাসট্রিক্টের অদূরবর্তী লিয়েজ দুর্গ এবং তারও দক্ষিণে নামুর দুর্গ। ম্যাসট্রিক্টের সোজা পশ্চিমে বেলজিয়াম রাজধানী ব্রুসেলস। মিউজ নদী (ওলন্দাজ ভাষায় ম্যাস) এই স্নায়ুকেন্দ্র ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে ফ্রান্সের দিকে আর্দেনেস পর্বতের পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে—৫৭৫ মাইল দীর্ঘ এই নদী হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মধ্য প্রবাহিত। জার্মানরা ইহার স্নায়ুকেন্দ্র ম্যাসট্রিক্ট দখল করিল, একটা খাল পার হইল এবং লীজ দুর্গ ভেদ করিয়া নামুর দুর্গের প্রান্তে পৌঁছিল ও মিউজ নদী অতিক্রান্ত হইল। আর ১৭ই তারিখ বেলজিয়ামের ব্রুসেলস, লুভে ও ম্যাসট্রিক্ট এবং ১৮ই তারিখ এন্টোয়ার্পের পতন হইল। সেই সঙ্গে ১৭ই তারিখ সেডানের দক্ষিণে

---

* চার্চিল এখানে পশ্চিম রণাঙ্গনে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল ৮ মাসের উভয় পক্ষের নিষ্ক্রিয়তার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। জার্মানী নিষ্ক্রিয় ছিল না, পোল্যান্ড দখলের পর সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন ও প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত ছিল। —লেখক

ফরাসী ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইল। আর মিত্রপক্ষের সর্বপ্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলা তাঁর নির্দেশনামায় হুকুম দিলেন—মিত্রপক্ষ ও আমাদের স্বদেশ এবং পৃথিবীর ভাগ্য এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে।... সুতরাং মারো, না হয় মরো — conquer or die" কিন্তু এই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণাতেও কুলাইল না। ফরাসী বাহিনী আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মঃ রেনো এক বক্তৃতায় আর্তনাদ করিয়া বলিলেন যে অবিশ্বাস্য রকমের ভুলের জন্যই মিউজ নদীর সেতুগুলি ভাঙা হয় নাই। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যেরা জেনারেল গুডেরিয়ানের নেতৃত্বে এই সমস্ত সেতু দিয়া দলে দলে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

জার্মান পক্ষ দাবী করিলেন যে, ১০০ কিলোমিটার বা ৬০ মাইল চওড়া স্থানে ম্যাজিনো লাইন বিদীর্ণ করা হইয়াছে। এখান হইতেই পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিপর্যয় শুরু হইল। হল্যান্ড দখলের দ্বারা জার্মানী ইংলণ্ডের মুখোমুখি সমুদ্রতীর কাড়িয়া লইল, আর উত্তর ও পূর্ব বেলজিয়াম (এন্টোয়ার্পের পতনের পর) দখলের দ্বারা মিত্র সৈন্যদিগকে যেমন শেল্ড নদীর দিকে ঠেলিয়া দিল (ফ্লাণ্ডার্সের এলাকা) এবং তাদের দক্ষিণ পার্শ্ব বেষ্টন করিল, তেমনই সেডান ও গিভেটের পথে ম্যাজিনো লাইন ও আর্দেনেসের পার্বত্য এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলের দিকে ধাবিত হইল।

ইহার পরেই উত্তর ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ শুরু হইল, যার পরিণতিতে ঘটিল এক দিকে ডানকার্ক এবং অন্য দিকে প্যারিস অভিযান। কিন্তু জার্মান বাহিনী ১৯১৪ সালের মত আগে প্যারিসের দিকে লক্ষ্য করিল না—তার চেয়েও ভয়াবহ ফাঁদ সৃষ্টি হইল। হিটলার সমগ্র মিত্র বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনকে চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং ফরাসী সীমান্তের সেডান ও বেলজিয়ামের নামুর-এন্টোয়ার্প ব্যূহ ভেদের পর জার্মান বাহিনী এক মারাত্মক সাঁড়াশীর চাপে নিদারুণ বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিল। জীব্রাগ, অস্টেণ্ড, নিউপোর্ট, ডানকার্ক, ক্যালে ও বোলোন—ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী এই সমস্ত ফরাসী ও বেলজিয়াম বন্দর প্রত্যক্ষ বিপদে পড়িল। ১৯শে তারিখ সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে ঘোষিত হইল যে, জেনারেল গ্যামেলা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের খ্যাতিমান জেনারেল ওয়েগাঁকে সর্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত যুদ্ধের এই বৃদ্ধ সেনাপতিকে নিয়োগ করিয়াও কোন লাভ হইল না। কারণ, পেতাঁ বা ওয়েগাঁ দুইজনের চিন্তাধারাই গ্যামলার চেয়েও সেকেলে ছিল। মিত্রসৈন্যেরা উত্তর ফ্রান্সের সোম ও আইনে নদী ধরিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল এবং আইনে নদীতীরস্থ রেথেল দখল হইয়া গেল। জার্মান ট্যাঙ্কবহর আরাস ও পেরোনের মধ্যে দেখা দিল এবং ২১শে মে তারিখ হিটলারের শিবির হইতে

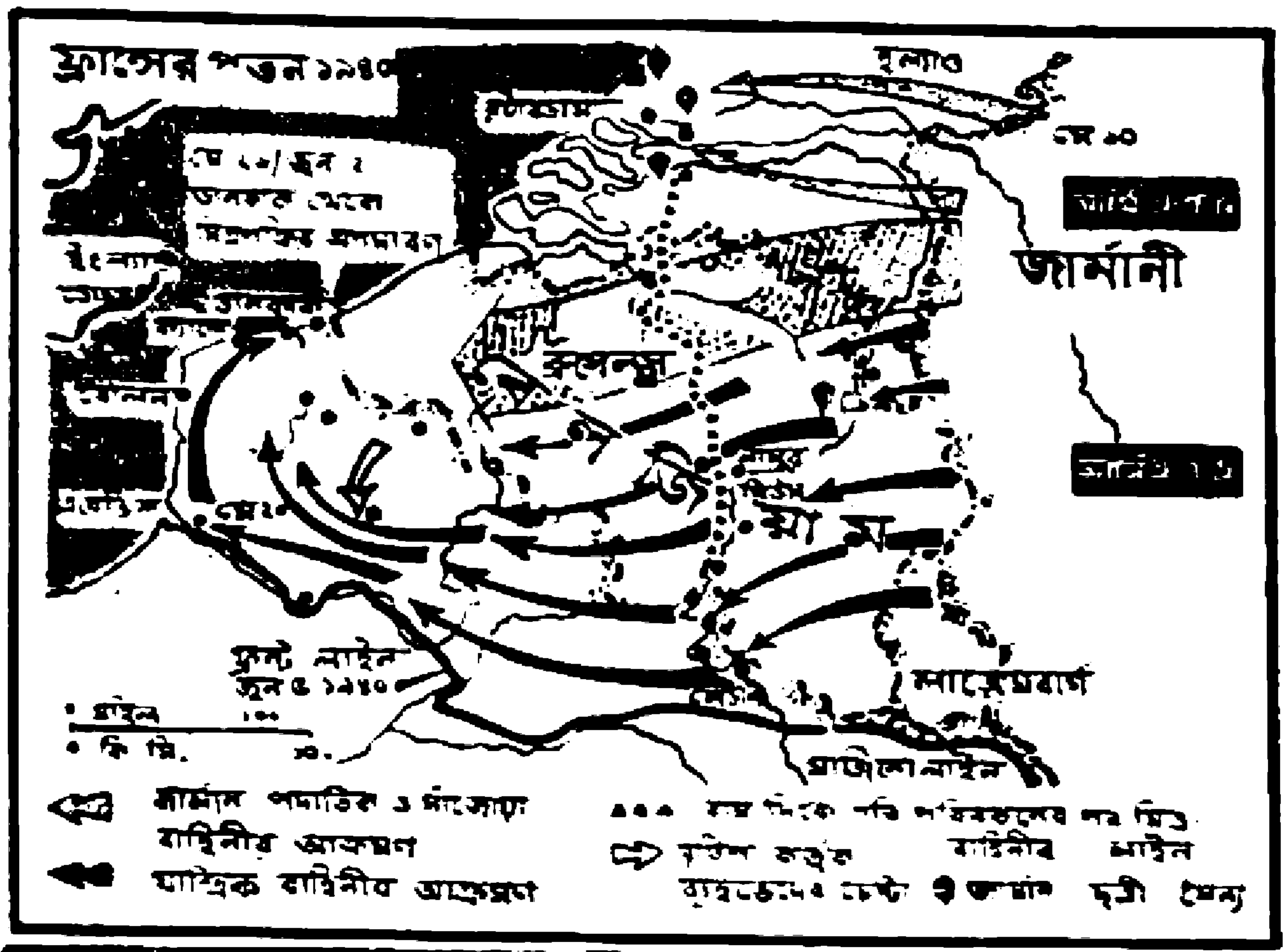

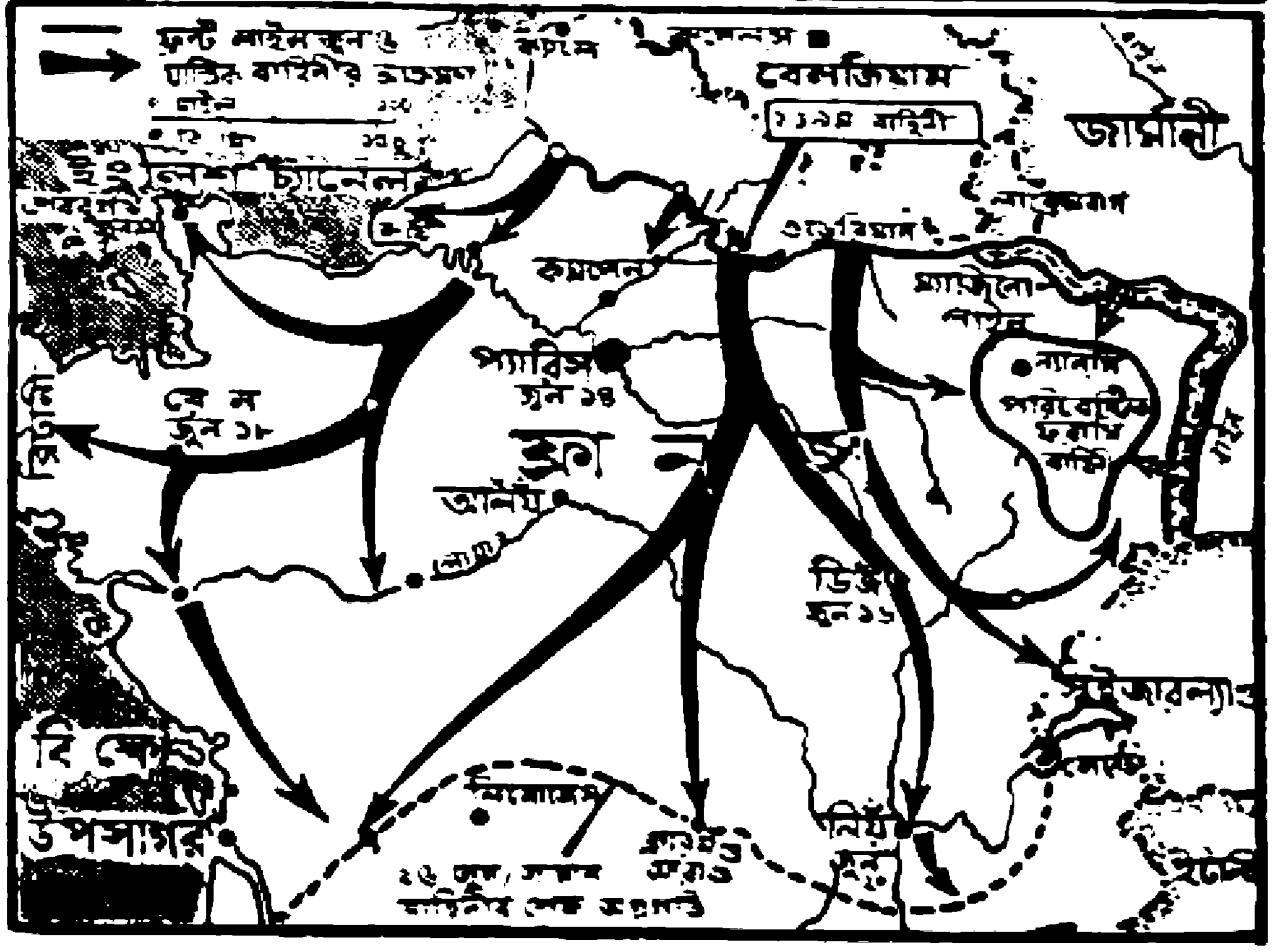

দাবী করা হইল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আক্রমণের অভিযানে জার্মান সেনোরা জয়ী হইতেছে। বেলজিয়াম হইতে সেডান পর্যন্ত মিউজ নদীর তীর ধরিয়া যে ৯নং ফরাসী বাহিনী জার্মানদিগকে বাধা দিতেছিল, তাঁরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। ইহার অধিনায়ক জেনারেল জিরো তাঁর স্টাফসহ বন্দী হইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ফরাসী ব্যূহের নানা অংশ ধরিয়া জার্মান ডিভিসনগুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং তাদের পুরোগামী ট্যাঙ্ক ও মোটরযুক্ত সৈন্যদল আরাস, আমিয়েন্স এবং আবেভিল (সোম নদীর মোহনাস্থিত) বন্দর দখল করিয়াছে। সোম্ নদীর উত্তরদিকস্থ সমস্ত মিত্রসৈন্য—ফরাসী, বৃটিশ ও বেলজিয়ানদিগকে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিটলারের এই দাবী আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না, বরং মিত্রপক্ষের নিদারুণ বিপর্যয়ের বিবেচনায় এই ইস্তাহার ইতিহাসের দিক হইতে স্মরণীয় ছিল। ২১শে মে তারিখের এই জার্মান কর্পোরেট দ্বারা মিত্রবাহিনী উত্তর ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত হইয়া গেল। এই দুই অংশের মধ্যে ৩০ মাইল ব্যবধান রচিত হইল—যাকে ইংরাজিতে বলা হইয়াছে দুই অংশের মধ্যবর্তী অন্তঃপথ। উত্তর দিকে ইহা ফ্লাণ্ডার্স এবং দক্ষিণদিকে ইহা সোম নদী রেখায় বিচ্ছিন্ন। ফ্রান্সের ক্যালে বন্দর হইতে বেলজিয়ামের শেল্ড নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম ফ্লাণ্ডার্স, যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য পরিচিত ছিল। কেবল ফ্লাণ্ডার্স নহে, উত্তর ফ্রান্সের এই সমস্ত অঞ্চলেও প্রথম মহা-

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধে কিম্বা আগেকার ইতিহাসের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ২১শে মে তারিখ আবেভিল বন্দরের পতনের এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইল, তাহা ৩০ মাইল চওড়া হইয়া জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর যেন প্লাবন ডাকিয়া আনিল। উত্তর দিকে ঘেন্ট-ভ্যালেন্সিনেস-আরাস এবং দক্ষিণ দিকে সোম ও আইনে নদী—মোটামুটি এই দুই রেখায় মিত্রবাহিনীর মধ্যে যে বিরাট বিচ্ছেদ ঘটিল, উহা পূর্ণ করিবার জন্য ২৩শে মে তারিখ মিত্র সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল ওয়েগাঁর পরামর্শ অনুসারে যুগপৎ উত্তর দিকে পাল্টা আক্রমণের প্ল্যান করিলেন এবং ২৬শে মে তারিখ এই পাল্টা-আক্রমণের দিন ধার্য হইল। কিন্তু এই পাল্টা-আক্রমণের কোন সুযোগ জার্মানীরা রাখিল না। বিদ্যুৎবেগে তারা সেল্ড পার হইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিয়া তাদের ডানকার্কে পিছু হটিবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। ২৫শে মে তারিখ অপরাহ্নে জার্মানীরা দাবী করিল যে, বেলজিয়ান বাহিনী ১নং, ৭নং ও ৯নং ফরাসী বাহিনীর কতগুলি অংশ এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ বেষ্টিত হইয়াছে। ঘেন্ট ও কোর্টরাই দখল হইয়াছে, লাইস নদী অতিক্রান্ত এবং বোলোন বন্দরের পতন হইয়াছে। ইহার পর অবরুদ্ধ ক্যালে বন্দরেরও অনুরূপ দশা ঘটিল। ১নং ফরাসী বাহিনীর জেনারেল প্রিয়ো সদলবলে বন্দী হইলেন। এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে মে তারিখ বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করিলেন।

ডানকার্ক

তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী ও মিত্রসৈন্যদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তারা কেবল সমুদ্রতীরের সঙ্কীর্ণ বালুকাভূমিতেই তাড়িত হইল না, অধিকন্তু তিন দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। অস্টেণ্ড, নিপে, ডানকার্ক (প্রকৃতপক্ষে ডানকার্ক ও ক্যালের মধ্যবর্তী স্থান)—এই ত্রিভুজাকৃতি অতি অল্প পরিসর ভূমিখণ্ডে সমুদ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া মিত্র সৈন্যদিগকে সরিয়া আসিতে হইল। যে অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যেরা পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গোর্ট তাঁর সৈন্যদলসহ পলায়নেও বিস্ময়কর শক্তি দেখাইলেন এবং ইতিহাসের এক বৃহত্তম পৃষ্ঠরক্ষার লড়াইয়ের দ্বারা ত্রাণলাভের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিলেন।

লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে' (যাহা ১৯৪১ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছিল), দেখা যায় যে, মোট ১০ ডিভিসন সৈন্য লইয়া বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী গঠিত ছিল, তবে ইহার মধ্যে তিন ডিভিসন পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এই সমস্ত সৈন্য রাখা এবং ৪৫ হাজার যানবাহন আনিতে ও নামাইতে ১৪টি বন্দর ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ গোলাগুলী ও যান্ত্রিক সজ্জা ছিল না। লর্ড গোর্ট বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইলেও কার্যত তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের জেনারেল জর্জেসের অধীনে এবং জেনারেল জর্জেস ছিলেন মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁর অধীনে। অর্থাৎ বৃটিশ বাহিনী ফরাসী সৈন্যদলেরই একটা শাখা ছিল মাত্র। ১৯৩৯ সালের শরৎকালে মিত্রপক্ষের রণনৈতিক নক্সা স্থির হয় এবং কয়েকবার অদল-বদলের পর 'প্ল্যান ডি' অনুসারে ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান সীমানা হইতে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাইল নদী ব্রাসেলস পর্যন্ত লাইন ধরিয়া জার্মান আক্রমণ বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু জার্মানীর দুর্ধর্ষ আক্রমণ ও বিদ্যুৎগতি অভিযানে এই সমস্ত নক্সা চুরমার হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চলের বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ডানকার্কের ফাঁদে বা পকেটের মধ্যে গিয়া পড়িল। ২৩শে মে তারিখ পর্যন্তও লণ্ডনের সমর দপ্তরের আশা ছিল যে, লর্ড গোর্ট জেনারেল ওয়েগাঁর পাল্টা-আক্রমণের পরিকল্পনায় যোগ দিতে পারিবেন। কিন্তু এই আশা ছিল ভ্রান্ত ধারণার উপর। ২৬শে মে সকালে লর্ড গোর্ট জেনারেল ব্লাঁশার্ডের সঙ্গে একযোগে ফরাসী সৈন্যদের সহিত লাইস নদীর পশ্চাতে তাদের সৈন্যদের ঘুরাইয়া সমুদ্রের অভিমুখে নিতে চাহিলেন এবং সেদিনই নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া লণ্ডনের সমর-দপ্তর হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে, বোধ হয় বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীকে সরাইয়া আনা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ইহার পরেই আর একখানা টেলিগ্রাম আসিল—

> 'Sole task now is to evacuate to England maximum of your force possible'. —

—'আপনার একমাত্র কার্য হইতেছে সৈন্যদের যত বেশী সম্ভব ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা।'*

তারপর শুরু হইল ডানকার্কের তীর হইতে উদ্ধার লাভের আন্তরিক চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বৃটিশ সৈন্যেরা পৃষ্ঠরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবাহিনী (R.A.F.) তাদের যথাসাধ্য সমগ্র শক্তি এই উদ্ধার কার্যে নিয়োগ করিল। আর জার্মান বোমারুর দল তাদের ডানকার্কের বালুকাতটে ধাওয়া করিল। কিন্তু পলায়নের দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে, তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। বৃটিশ নৌবহরের দুই শতাধিক হাল্কা রণপোত এবং ৬৫০ খানার বেশী বিভিন্ন ধরনের পোত—মোট প্রায় হাজারখানেক জলযান অসংখ্য লস্কর ও স্বেচ্ছাসেবক এই উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হইল। বহু বৃটিশ সৈন্য তীর হইতে জল সাঁতরাইয়া এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া গিয়া জাহাজে উঠিল। (এই অবস্থায় লজ্জা-সরম না থাকিবারই কথা!) সমস্ত গোলা-বারুদ, কামান, অস্ত্র, দ্রব্য ইত্যাদি ফেলিয়া তারা ছুটিতে লাগিল এবং জার্মানরা এই পলায়ন প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না। সত্য-সত্যই ডানকার্ক হইতে এই ত্রাণলাভ সকলকে চমকাইয়া দিল, আর মিত্রপক্ষের নেতা, সংবাদপত্র ও প্রচার বিভাগ মিলিয়া বৃটিশ বাহিনীকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় (৪ঠা জুন, ১৯৪০) ডানকার্ক থেকে এই পরিত্রাণ লাভকে miracle of deliverance বলিয়া ইংরেজের কীর্তি গানে মুখরিত হইয়াছিলেন। (কিন্তু পাঠকদের জানা উচিত যে, এর মধ্যে মিরাক্যাল বা অঘটন কিছু ছিল না, ছিল জার্মান হাইকমাণ্ডের ভ্রান্তি, সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।)

২৯শে মে তারিখের রাত্রি হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিতে আরম্ভ করে এবং ৪ঠা জুনের মধ্যে ডানকার্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। চার্চিল কমন্সসভায় এক জোরালো বক্তৃতায় প্রকাশ করিলেন যে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেডান ও মিউজ নদীতটে ফরাসী ব্যূহ ভাঙিয়া পড়ায় এবং বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করাতেই বৃটিশ সৈন্যেরা বেলজিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি ডানকার্ক হইতে বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধার লাভের ভূয়সী প্রশংসা করেন—নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সাহস, নৈপুণ্য এবং নিষ্ঠার দ্বারাই পরিত্রাণের এই বিস্ময় সম্ভব হইয়াছে। এই ত্রাণকার্যে ৩০ হাজার সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছে। তবে বৃটেনের ৭ হাজার টন গোলা-বারুদ, ৩০০ কামান, ১ লক্ষ ২০ হাজার যানবাহন এবং সমস্ত সাঁজোয়া গাড়ী, ৯০ হাজার রাইফেল, ৮ হাজার ব্রেনগান, ৪ শত ট্যাঙ্ক মারা রাইফেল—যেগুলি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিল, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খোয়া গিয়াছে। ফলে, বৃটেনের যুদ্ধ সজ্জায় আরও বিলম্ব ঘটিবে। কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বীকার করেন যে, ডানকার্ক হইতে ত্রাণলাভেই যুদ্ধ জয় নহে,—
'wars are not won by evacuations'
এবং ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে যাহা ঘটিয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহা এক নিদারুণ সামরিক বিপর্যয়—'Colossal military disaster' মিঃ চার্চিলের এই মন্তব্য অক্ষরে-অক্ষরে সত্য ছিল এবং ইহার পরেই শুরু হইল খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ ও ফরাসী জাতির পতন।

ডানকার্ক হইতে মোট ২,২৪,৫৮৫ জন ইংরাজ এবং ১,১২,৫৪৬ জন মিত্রসৈন্য (অধিকাংশই ফরাসী) উদ্ধার পাইয়াছিল। আর ডানকার্কের দক্ষিণে ক্যালে বন্দরের অবরোধ যুদ্ধে ৩ হাজার বৃটিশ সৈন্যের প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল।

* 'This Expanding War' — by Liddel Hart page 199.

CENTRAL LIBRARY

প্যারিসের পতন

ডানকার্ক হইতে যখন বৃটিশ সৈন্যদের প্রস্থানের নাটক জমিয়া উঠিতেছিল, তখন জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যরা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করিতেছিল। সোম নদী যেখানে ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছে, সেই মোহনা হইতে ম্যাজিনো লাইনের আসল দুর্গমালার মন্টমিডি পর্যন্ত এই আত্মরক্ষার ব্যূহ তাড়াতাড়ি রচিত হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানরা ফ্রান্সকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিতেছিল না এবং সোম নদী ধরিয়া পাকাপোক্ত কোন ব্যূহও গড়িয়া উঠিল না। কেবল স্থানে স্থানে কতগুলি ট্যাঙ্ক-মারা ফাঁদ তৈয়ারী হইল। তবে, আত্মরক্ষার এই লাইন ছিল প্রায় একটানা নদী ও জলপথের দ্বারা বিধ্বস্ত, যে-বিষয় যান্ত্রিক যুদ্ধের মুখে বিশেষ কোন কাজে আসিল না।

ফ্লান্ডার্সের যুদ্ধেই ফরাসী বাহিনী-গুলি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং লড়াই করিবার ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া ফরাসী বাহিনীগুলির একাংশ ছিল ম্যাজিনো লাইনের দুর্গশ্রেণী আশ্রয় করিয়া এবং অপরাংশ ছিল ইতালী-সুইজারল্যাণ্ডের সীমানায় পাহারারত। সোম নদী মোহনার আবেভিল বন্দর হইতে আমিয়েন্স, সেন্ট কুইন্টিন, ল্যায়ন, রেথেল ইত্যাদি হইয়া মন্টমিডি পর্যন্ত ফরাসীদের ছিল ৪০টি পদাতিক ডিভিসন (অধিকাংশই দুর্বল) ৩টি সাঁজোয়া ডিভিসন (যাহাদের ট্যাঙ্ক ছিল অতি সামান্য) এবং ৩টি দুর্বল অশ্বারোহী ডিভিসন। আরও ১৭ ডিভিসন ছিল দুর্গশ্রেণীর আড়ালে মন্টমিডি ও সুইস সীমান্তের মধ্যে। (২)

৫ই জুন হিটলার সৈন্যবাহিনীর নিকট এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আর একটি বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা জার্মান জাতির মুক্তি এবং লন্ডন ও প্যারিসের শত্রু-শাসকের দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। আর একটি ঘোষণাপত্র তিনি প্রচার করিলেন জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে এবং বলিলেন যে, পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধে জার্মান সৈন্যেরা জয়ী হইয়াছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১২ লক্ষ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, বৃটিশ বাহিনীর অধি-কাংশ হয় ধ্বংস, না হয় পলায়িত হইয়াছে। শত্রুরা এখনও শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সংহারের সার্বাত্মক যুদ্ধ।

হিটলার অবশ্য বৃথা গর্ব করেন নাই। ৫ই জুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম শুরু হইল এবং যাহা 'বাটল অব ফ্রান্স' নামে পরিচিত, তাহা অতি দ্রুত সারা ফ্রান্সের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল হইতে ল্যায়ন-সয়সন্ সড়ক পর্যন্ত ১২০ মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে সোম-নদীর তীর ধরিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যার মত ট্যাঙ্ক, গোলাগুলী ও বোমাবর্ষণের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের উদ্বোধন হইল—এই আক্রমণের জার্মান নেতা ছিলেন ভন বোক্। ফরাসী সৈন্যদল যথাসম্ভব বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ঐদিন রাত্রেই সোম নদীর মোহনা হইতে আমিয়েন্স পর্যন্ত ফরাসী ব্যূহ ভাঙিয়া পড়িল। ৬ই জুন আবেভিল হইতে আইনে নদী পর্যন্ত জার্মানদের প্রায় দুই হাজার ট্যাঙ্ক দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইল—এক এক দলে ২।৩ শত করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল। সোম নদীর নিম্নভাগে যে ৫১নং হাইল্যান্ড ডিভিসন (বৃটিশ) ছিল, তারাও এই আহবে পিছু হটিয়া গেল। কিন্তু তখনও মঃ রেণো আশাবাদী ছিলেন এবং এক বেতার বক্তৃতায় বলিলেন যে, ওয়েগাঁ যুদ্ধের গতিতে সন্তুষ্ট আছেন! কিন্তু পরদিন ৭ই জুন, অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিবসেই সমগ্র সোম নদী রণাঙ্গন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। আক্রমণের প্রথম হইতেই ফরাসীদের আত্মরক্ষার কিল্লা-গুলিতে খাদ্য ও গোলা-বারুদ সরবরাহে বিঘ্ন হইতেছিল। সুতরাং ফরাসীদের অবস্থা ভাবিবার মত ছিল। ১০নং ফরাসী বাহিনী সোম নদীর এলাকা ছাড়িয়া পশ্চিম অভিমুখে সরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এক ডিভিসন জার্মান সাঁজোয়া সৈন্য সোম অতিক্রম করিয়া ফরাসীদিগকে ঘিরিবার জন্য অতি দ্রুত সেই দিকে আক্রমণ চালাইল। প্যারিসের উত্তরে ৭নং ফরাসী বাহিনী আরস নদীর দক্ষিণ-পূর্বে পিছু হটিতে বাধ্য হইল এবং ইহার ফলে তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে ৬নং ফরাসী বাহিনীও পশ্চাদপসরণ করিল। ৯ই জুন রবিবার জার্মানদের ভাষায় আবার 'ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ' আরম্ভ হইল। ইহাই ছিল জার্মান বাহিনীর অন্যতম প্রধান আক্রমণ। প্যারিসের পূর্ব দিকে আইন নদী পার হইয়া এই আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং পদাতিকেরা যে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিল, জার্মান ট্যাঙ্কবহর অতি দ্রুত সেখান দিয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং ফরাসী সৈন্যদিগকে বিখ্যাত মার্ণ নদী পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেল। সমুদ্রতীর হইতে প্যারিসের উত্তরে এবং সেখান হইতে পূর্ব দিকের আইনে নদী পর্যন্ত সমগ্র রণক্ষেত্রে প্রবল আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং এই বিদ্যুদ্গতি অভিযান ও ভয়াবহ যান্ত্রিক আক্রমণের দ্বারা ফরাসী বাহিনীগুলি অতি দ্রুত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা পর্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

এই অবস্থায় পাল্টা আক্রমণের কোন প্রশ্নই ছিল না। সামরিক দিক দিয়া যখন এই বিপর্যয়, তখন শত শত বোমারু বিমানের আক্রমণে বে-সামরিক জনগণের মধ্যে ত্রাস, ভীতি ও হতাশা গোটা ফরাসী জাতির মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া দিল।

একজন মার্কিন লেখক বলিয়াছেন :

All France degenerated into panic, terror, hysteria, confusion. There was chaos on the roads. The onrushing Germans, aiming to immobilise the retreating enemy, deliberately induced a mass exodus of the civilian population. Hundreds of thousands of refugees, desperately anxious to escape from Paris. *

Jammed the roads south to Bordeaux for a distance of 400 miles. They used everything they could move — carts, bicycles taxi cabs, trucks, bakery vans, roadsters, even hearses. All these were loaded with human being, shouting, wailing, cursing.

সংক্ষেপে প্যারিস থেকে দক্ষিণ দিকে বর্দো পর্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তার সর্বত্র হাজার হাজার আর্ত, আতঙ্কিত পলায়মান নর-নারীর ভিড় এবং তারা হাতের কাছে যে-কোন যানবাহন পাইল তাতেই চড়িয়া বসিল, আর চলিতে চলিতে তারা চীৎকার ও আর্তনাদ এবং অভিশাপ দিতে লাগিল...

কিন্তু এই হতভাগ্য পলায়মান শরণার্থীরা কেবল তাতেই ত্রাণ পাইল না। দ্রুতবেগসম্পন্ন জার্মান বোমারুগুলি গাছের মাথার নীচু পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে বন্দীর মত অসহায় নর-নারীর উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। আর রাস্তার উপর রাশি-রাশি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে বা ঝুলিয়া থাকিতে দেখা গেল :

'It seemed to be a field day for Hitler's young Supermen. German pilots in speedy Heinkels roared up and down at tree level over the roads where civilian refugees were trapped and helpless in traffic jams. Bombs and bullets burst among the automobiles, carts, farm wagons and bicycles, catching humans and horses in a deadly melange of flame and smoke. Lining the roads leading south from Paris were hundreds of bodies spread-eagled in grotesque attitudes of death".

যুদ্ধের নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সাধারণ ফরাসী নর-নারীর কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু এবং কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা! একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, যারা ফরাসী বিপ্লবের জন্ম দিয়াছিল, যারা বাঘের মত লড়াই করিয়াছিল স্বাধীনতার জন্য, যারা খালি হাতে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও তার পতন ঘটাইয়াছিল, সেই বীর ফরাসী

• 'The Second Great War' — vol 3 page 923

* ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের অগণিত ত্রাস-গ্রস্ত নর-নারীর এভাবে পলায়ন প্রসঙ্গে হয়তো অনেক পাঠকের মনে পড়িবে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে ইয়াহিয়া খানের আক্রমণের জন্য বিপন্ন ৬০ লক্ষ মানুষের ভারতে পলায়নের কথা।—লেখক

সন্তানদের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাস করাও কঠিন।

•

১০ই জুন মধ্যরাত্রে যখন ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা আল্পস পর্বতের এলাকায় নূতন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ আসন্ন ছিল, তখন ওয়েগাঁ লাইনের আত্মরক্ষার সমগ্র অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ফরাসী জাতির নাভিশ্বাসের তাহা ছিল পূর্ব লক্ষণ। জার্মান সৈন্যেরা জলপূর্ণ দ্রুত প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সোম, আইনে, মার্ণ এবং সীন নদী জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যের বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল। সম্মন হাভরাড়া, ম্যুরে এবং রেইমস প্রায় তাহাই। জার্মানেরা প্যারিসের শহরতলী হইতে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিল।

প্যারিসের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল এবং ১০ই জুন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট রাজধানী ত্যাগ করিয়া ট্যুর্ণে চলিয়া গেলেন। ১১ই তারিখ সমস্ত রণাঙ্গনের অবস্থা আরও খারাপ হইল এবং ৪ঠা জুন যে ৪০ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য ছিল, উহার মধ্যে অন্ততঃ ৯ ডিভিসন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ১২ ডিভিসনের সংখ্যাগুলি দাঁড়াইল এক চতুর্থাংশে, অর্থাৎ ইহারাও কার্যতঃ অকেজো হইয়া পড়িল এবং ১১ ডিভিসন অর্ধেকে দাঁড়াইল। সুতরাং ফরাসী সৈন্যদলের আর বাকি রহিল কি? ১২ই জুন জার্মানেরা প্যারিসের উত্তরে অয়েজ নদী উপত্যকা দিয়া সেনলিফকে পৌঁছিল। পশ্চিম দিকে সীন নদী বরাবর তারা লে হাভার বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল এবং ওয়া অঞ্চলে সীন নদী দক্ষিণে অতিক্রান্ত হইল। পূর্ব দিকে তাহারা মার্ণ নদী অতিক্রম করিল এবং আরও পূর্বে মণ্টমিডি অঞ্চলে তারা ফরাসী রণাঙ্গনকে ম্যাজিনো লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল। এই অবস্থায় আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা সম্ভব? ১২ই তারিখেই জেনারেল ওয়েগাঁ ফরাসী মন্ত্রিসভাকে জানাইলেন যে যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা না জানাইয়া আর উপায় নাই। কিন্তু ইহার এক অক্ষরও এমনকি কাণাঘুষাও তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল না।* ১৩ই জুন সকালবেলা প্যারিস খোলা বা অরক্ষিত শহর বলিয়া ঘোষিত হইল এবং দলে দলে নরনারী প্যারিস ছাড়িয়া আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিতে লাগিল। রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিরাট অট্টালিকাসমূহ নিস্তব্ধ, সমগ্র শহর শ্মশানের মত, দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ—কেবল অদূরবর্তী বন্দরের ধুম ও অগ্নিশিখা রাত্রির আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল...

১৩ই জুন সন্ধ্যাবেলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট ট্যুর্ণে অবস্থিত তাঁর সহকর্মীকে প্যারিস হইতে টেলিফোনযোগে জানাইলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা প্যারিসের নগরীদ্বারে প্রবেশ করিয়াছে। কার্যতঃ প্যারিস প্রায় চারিদিকেই বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ১৪ই তারিখ জার্মান হাইকম্যাণ্ড এক ইস্তাহারে পূর্ণ জয়ের দাবী করিলেন এবং ঐদিন সকাল ৭টার জার্মান সৈন্যেরা দলে দলে প্যারিস নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজধানী এবং একটি শ্রেষ্ঠ জাতির মর্মকেন্দ্রের পতন হইল।

ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

১০ই জুন ইতালী সরকারীভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনী গোড়া হইতেই সাম্রাজ্যবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন এবং দীর্ঘ অতীতের গর্ভে লুপ্ত রোমক সাম্রাজ্যের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া ইতালীকে এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করিবার দিবাস্বপ্ন রচনা করিতেছিলেন। জার্মানীতে নাৎসী দল-নায়ক হিটলারের অভ্যুদয়ে এই দিকে তিনি আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং হিটলারের সঙ্গে দল পাকাইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ডিকটেটারি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরকে তিনি তাঁর কল্পিত রোমক সাম্রাজ্যের এলাকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপে হিটলারের অগ্রগতিতে তিনি একবার ক্রুদ্ধ, একবার লুব্ধ এবং অন্যবার ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িতেছিলেন। শক্তি হিসাবে ইতালী কোন দিক দিয়াই জার্মানীর সমকক্ষ ছিল না। মনে মনে তিনি এ-কথা জানিতেন, কিন্তু নিজকে হিটলারের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর পুরুষ বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ তিনিই ছিলেন ইউরোপে ফ্যাসিজমের পথ-প্রদর্শক। সুতরাং হিটলারের শক্তি ও প্রতিপত্তি তাঁকে অস্থির এবং বিকারগ্রস্ত করিয়া তুলিল। রণসজ্জায় ও যুদ্ধযাত্রায় ইতালী বহু পশ্চাতে ছিল একথা অনুভব করিয়া তিনি সময় সময় আরও বেসামাল হইয়া পড়িতেন। কাউণ্ট সিয়ানোর ডায়েরীতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, তখন মুসোলিনী যুদ্ধ ও শান্তি—এই দুই প্রশ্নের মধ্যে গভীর সংশয়ের দ্বারা আন্দোলিত হইলেন। কিন্তু সামরিক প্রস্তুতির অভাবে তিনি জার্মানীর সহিত গোপন চুক্তির দ্বারা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া ভাবিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নায়ুর লড়াইয়ের দ্বারা [illegible] পার্শ্ববর্তী বলকান [illegible] [illegible] এবং বিশেষভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টিউনিস, কর্সিকা, নিস ও স্যাভয় লইয়া দলাবাজীর দ্বারা বাজীমাৎ করিতে চাহিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধিবার পর তিনি 'নিরপেক্ষতার' বদলে অযুধ্যমান সাজিয়া হিটলারকে খুসী রাখিলেন এবং ইতালীর বন্দরগুলিকে মিত্রশক্তির অবরোধের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিলেন। কিন্তু এতেও সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের দিগ্বিজয় যাত্রা ও জার্মান সাম্রাজ্যের জয়ডঙ্কায় তাঁর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইতালীর জনসাধারণ এই যুদ্ধে উৎসুক নহে, একথা জানিয়াও তিনি ১৯৪০ সালের ১০ই জুন মুমূর্ষু ফ্রান্সকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইলেন।

কাউণ্ট সিয়ানোর ডায়েরীতে দেখা যায় যে, ৩০শে মে তারিখেই মুসোলিনী যুদ্ধযাত্রায় সংকল্প স্থির করেন এবং ৫ই জুন যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু হিটলার আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ, ফরাসী বিমানবহর ধ্বংসের যে প্ল্যান হিটলারের ছিল, তাহা ইতালী কর্তৃক পূর্বাহ্নে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তারিখটা পিছাইয়া গেল।

৪ঠা জুন ইতালীর মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলেই যখন মুসোলিনীর এত বড় সংকল্প লইয়া প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও বাহবাস্ফোটের প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে শুধু মাত্র বলিলেন— 'This is the last council of Ministers during peace-time." —এবং একথা বলিয়াই নাটকীয় কায়দায় কর্ম-তালিকায় হাত দিলেন। গত ১৮ বৎসরের মধ্যে এমন শাসনতান্ত্রিক কায়দা নাকি আর হয় নাই!

১০ই জুন অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানো ফরাসী এবং বৃটিশ রাজদূতকে যুদ্ধ ঘোষণার দলিল পড়িয়া শুনাইলেন। ফরাসী দূত মঃ পসেঁট বিচলিত এবং কাতর হইয়া বলিলেন, "যে লোক পড়িয়া গেছে, ইহা দ্বারা তার উপরেই ছোরা মারা হইল! তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ যে, আপনার হাতে ভেলভেটের দস্তানা।" কিন্তু বৃটিশ রাজদূত স্যার পার্সি লোরেনের মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, চক্ষুর পলকও পড়িল না, শুধু যুদ্ধ ঘোষণার দলিলটা তিনি টুকিয়া লইলেন এবং যথোচিত মর্যাদা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে বিদায় লইলেন। এমনকি, কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে আন্তরিকভাবে দীর্ঘ করমর্দনও ভুলিলেন না।*

The War—Louis S. Snyder 1960 P. 163

*The Second Great War—vol 3 P. 967

*সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ইংরাজ জাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একাধিকবার প্রশংসা করিয়াছেন। বার্লিনে বৃটিশ দূতের ভাবভঙ্গীও অনুরূপ মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল।

—লেখক

CENTRAL LIBRARY

মুসোলিনী মাইক্রোফোনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করিয়া ১০ই জুন ইতালীর জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। "পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রীরা, যারা ইতালীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে", তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা। ইতালীর স্থলভাগের সীমানা নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমুদ্রপথের সীমানার মীমাংসা হওয়া দরকার। যদি সমুদ্র পথে অবাধ স্বাধীনতা না থাকে তবে, সাড়ে ৪ কোটি ইতালীর জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা নিতান্তই অর্থহীন। সুতরাং যে ভৌগোলিক ও সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা আমরা আমাদের সমুদ্রে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, তাহা আমরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাই।'...যে সমস্ত লোভক জাতি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও স্বর্ণভাণ্ডার কুবেরের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, তাদেরই বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এবং 'এই সংগ্রাম দুই শতাব্দী ও দুইটি মতবাদের মধ্যে।'

হিটলারেরই অনুরূপ ভাষায় মুসোলিনীর এই বক্তৃতা এবং পৃথিবীর এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য স্বয়ং হিটলার ঐ দিনই তারযোগে মুসোলিনীকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন এবং এই সংগ্রামে তাঁরা দুইজন এবং দুই জাতিই যে একাত্ম, তাহাও প্রকাশ করিলেন। ইহাই তাঁদের 'কমরেডশিপ'।

অতএব প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষের সঙ্গী ইতালী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। চার্চিল, রেনো, রুজভেল্ট প্রভৃতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতা ও ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহও মুসোলিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ফ্রান্সের প্রতি কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিলেন। চার্চিল তাঁকে শৃগালের মত হীন বলিয়া গালি দিলেন এবং মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রতিবেশীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের জন্য ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

"…. the hand that holds the dagger has struck it into the back of its neighbour'. *

মুসোলিনীর যুদ্ধ ঘোষণা যেমন অদ্ভুত, ইতালীর সৈন্যদের লড়াইও ছিল তেমন হাস্যকর। তিনি নিজে ইতালীর সর্বাধিনায়কের পদ (যদিও শাসনতন্ত্র অনুসারে রাজা এই পদ চাহিয়াছিলেন) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আসলে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব লইলেন মার্শাল বাদোগলিও। ফ্রান্স তখন জার্মানীর হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত এবং হিটলারের নিকট সন্ধিপ্রার্থী। কিন্তু সেই অবস্থায়ও ২১শে জুন হইতে ২৪শে জুনের মধ্যে মুসোলিনীর সেনাপতিরা ইতালী-ফরাসী সীমান্তে আক্রমণ চালাইয়া কোন সফলতা লাভ করিতে পারিল না। বোধ হয় অতি কষ্টে ইতালীর সৈন্যরা ফরাসী রাজ্যের দুই তিন মাইল অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, '২১শে জুন তারিখ মুসোলিনীকে অত্যন্ত অপদস্থ বলিয়া মনে হইল। কারণ, আমাদের সৈন্যরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। এমন কি, আজও তারা অগ্রসর হইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, প্রথম ফরাসী দুর্গের মুখে কিছু বাধা পাওয়ায়, তাদের গতি রুদ্ধ হইয়াছে।' ৯ মাস অপেক্ষা করিবার পর যুদ্ধে, ফরাসীদের সঙ্গে লড়িতে গিয়াও ইতালীর এই অবস্থা। তথাপি মুসোলিনী চাহিয়াছিলেন সমগ্র ফরাসী দেশ দখল করিতে ও সমস্ত ফরাসী নৌ-বহরের আত্মসমর্পণ দাবী করিতে। কিন্তু বখরাটা নেহাৎ হিটলার ভাঙিয়া দিলেন। সুতরাং সন্ধিপত্রও হিটলারই আরোপ করিলেন। মুসোলিনী ইহাতে মর্মাহত। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষা অর্জনের প্রার্থনা যে স্বপ্ন তাঁর ছিল, তা এভাবে মিলাইয়া গেল। সুতরাং হিটলার, জার্মানী, ইতালীর সৈন্য ও জনগণ সকলের উপরই তিনি বিরক্ত হইলেন।* ইহাই ইতালীর যুদ্ধ এবং মুসোলিনীর বাগাড়ম্বর জিগীষার রূপ।(৬)

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

১৪ই জুন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্সের প্রতিরোধ কার্যতঃ শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী তারপর পরাজিত, হতবল ও বিশৃঙ্খল ফরাসী সৈন্যদিগকে কেবল তাড়া করিতে লাগিল। পশ্চিম মধ্য ও পূর্ব ফ্রান্স—মোট ফরাসী রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ লোকালয়ের অনুরূপে তারা ছাইয়া ফেলিল। উত্তরে সমগ্র ইংলিশ চ্যানেল উপকূল, পশ্চিমে লোরিয়ঁ, ব্রেস্ট বন্দর ও নান্টেস্ (আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তীরে) এবং প্যারিস ছাড়াইয়া দক্ষিণবর্তী মধ্য ফ্রান্সের লয়ের নদী ও সেভার্ণ (২৫শে জুন) পূর্বদিকে ডিজোন, লিয়ন্স ও সুইস সীমান্ত, আর ম্যাজিনো লাইন বিধ্বস্ত ও দখল হইল মেৎস্ ও বেলফোর্টের পতন (১৮ই জুন)। যে ভার্দুন দুর্গ বিগত মহাযুদ্ধের ১৯১৬ সালে ফরাসী বীরত্ব প্রতিরোধের বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা প্যারিসের পতনের পরদিন ১৫ই জুন প্রায় বিনা বাধায় দখল হইয়া গেল। বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত ফ্রান্স আত্মসমর্পণের বার্তা লইয়া হিটলারের দ্বারস্থ হইল। সমগ্র ফরাসী জাতি এবং সারা পৃথিবী স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া গেল। ...

সামরিক বিপর্যয়ের আগেই ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় সুরু হইয়াছিল এবং একদল রণক্ষেত্রের পরাজয় ফরাসী জাতির সর্বনাশ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। ১০ই জুন ম: রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট সাহায্যের জন্য করুণ আবেদন জানাইলেন। ১১ই জুন তিনি চার্চিলের নিকট প্রস্তাব করিলেন যাতে প্রতিশ্রুতি হইতে ফ্রান্সকে মুক্তি দিতে, যে প্রতিশ্রুতিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরস্পরের সম্মতি ছাড়া জার্মানীর সঙ্গে পৃথক কোন সন্ধি করা হইবে না এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে এবং যথাসম্ভব সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইয়া সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৩ই জুন ম: রেনো পুনরায় রুজভেল্টের নিকট আবেদন করিলেন, অন্তত যুদ্ধবিমান পাঠাইয়া ইউরোপের দানবীয় শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য সাহায্য করিতে। ১৩ই জুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ফ্রান্সের এই ঘোরতর দুর্দিনের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইয়া এবং মিত্র গভর্ণমেন্টসমূহ প্রতিরোধ করিলে, বর্ধিত সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, সামরিক সাহায্য মঞ্জুরির অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

১৬ই জুন ফরাসী সৈন্যদলের আর আশা রহিল না এবং মন্ত্রিসভার কর্তৃপক্ষীয় মহলও এই অবস্থা অনুভব করিলেন। তথাপি মিঃ চার্চিল যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফরাসী গভর্ণমেন্টের নিকট আফ্রিকা ও সমুদ্র পারবর্তী ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়িবার পরামর্শ দিলেন। তিনি সরকারীভাবে এক চাঞ্চল্যকর নাটকীয় প্রস্তাব পেশ করিলেন, কিন্তু সামরিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়াতে উহার দুই দিন আগে ১৬ই তারিখ টুর্স হইতে ফরাসী গভর্ণমেন্ট বর্দোতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। চার্চিলের এই চাঞ্চল্যকর প্রস্তাবের মর্ম ছিল এই যে, ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেন অতঃপর ইহাতে একটি মাত্র ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং ফরাসী ও ইংরাজ আর পৃথক দুইটি জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে না। তাঁরা একত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক বিনিময়ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত করিবেন। অতঃপর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী জনগণ পরস্পরের প্রজা ও নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পাইবেন। দুইটি পার্লামেন্টও একটি মাত্র আইনসভায় রূপান্তরিত হইবে এবং একটি মাত্র সমর মন্ত্রিসভা সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন।

---

* 'The Second Great War' —vol 3 page [illegible]

(6. Ciano, Diary' P at 160-66

জার্মানীর বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধ পরিচালনায় চার্চিলের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব (যাহা আইনের ভাষায় 'অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন' নামে পরিচিত) একটা যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনার মত। ফরাসী মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা প্রত্যাখ্যাত হইল* ফরাসী মন্ত্রিসভা ১৩-১১ ভোটে (বিরুদ্ধদলের ভোটসংখ্যা লক্ষ্য করিবার মত) অর্থাৎ দুইটি মাত্র ভোটাধিক্যে যুদ্ধবিরতির ধারাবাহক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী মঃ রেনো এবং তাঁর সমর্থক অন্যান্য মন্ত্রীরা ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলনের প্রস্তাব সমর্থন এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিরোধীরা এই প্রস্তাবের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। মার্শাল পেতা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁরা এর মধ্যে বৃটেনের অভিসন্ধি—অর্থাৎ বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হাত করার কূমতলব পর্যন্ত আবিষ্কার করিলেন এবং অভিযোগ করিলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ফ্রান্স বৃটেনের আশ্রিত ও অধীন রাজ্যে পরিণত হইবে। জেনারেল ওয়াগাঁ মার্শাল পেতাঁকে বুঝাইলেন যে, হিটলার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ডকে মুর্গীর ছানার (চিকেন) মত ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া ফেলিবে!' আর পেতাঁ স্বয়ং মন্তব্য করিলেন, বৃটেনের সহিত মিলনের অর্থ মৃত দেহের সঙ্গে মিলন! আর একজন ফরাসী কূটনীতিবিদ বলিলেন, আমরা বরং নাৎসী প্রদেশে পরিণত হইব, তবু ইংলণ্ডের সঙ্গে যাইব না।

এভাবে ফরাসী মন্ত্রিসভা তোষণকামী এবং প্রচ্ছন্ন নাৎসী পক্ষপাতী সদস্যরাই জয়ী হইলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী পল রেনোর শরীর ও মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—ক্রমাগত আঘাতে ও ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন। ঐ দিন রাত্রি ৮টার তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন। প্রেসিডেন্ট লেব্রাঁ মার্শাল পেতাঁকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করিলেন। ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই সরকারীভাবে হিটলারের নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাইলেন স্পেনীয় রাজদূতের মারফৎ। হিটলার সম্মত হইলেন এবং ২২শে জুন ৬-৫০ মিনিটের সময় যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। আর ইতালীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ২৪শে জুন সন্ধ্যাবেলা। মাত্র দেড় মাসের যুদ্ধে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গন ও তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র চুরমার হইয়া গেল, যেগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির অন্যতম।

কিন্তু এই চুক্তিপত্র যেখানে এবং যেভাবে স্বাক্ষরিত হইল তাহাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ২২ বৎসর আগে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মানীকে মিত্রপক্ষের ফরাসী সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফস্ যে কাম্পইন অরণ্যের যে রেলওয়ে কামরায় নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন, হিটলার সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সেই অরণ্য এবং সেই রেলওয়ে কামরায় একই চেয়ার ও টেবিল (যাহা স্মৃতিচিহ্নরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল) ব্যবহার করিলেন। ২১শে জুন অপরাহ্ণ ৩টায় হিটলার সগৌরবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ফিল্ডমার্শাল গোয়েরিং, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ব্রাউখিৎস, গ্রাণ্ড এডমিরাল র‍্যেডার, ভন রিবেনট্রপ ও ডেপুটি ফুয়েরার রুডলফ্ হেস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জার্মান সেনামণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে কাইটেল যুদ্ধবিরতির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন যে, বীরদের সহিত সংগ্রাম করিয়া ফ্রান্স একটি মাত্র শোণিতপ্রাবী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে তাঁরা কোন লজ্জাকর রূপ দিতে ইচ্ছুক নহেন। (কিন্তু স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এই ঔদার্যের কোন প্রমাণ নাই।) পরদিন ২২শে জুন ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারেল হান্টজিগার এবং জার্মানীর পক্ষ হইতে জেনারেল কাইটেল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিলেন।

আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুসারে জার্মানী সমগ্র ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের স্পেনীয় সীমান্ত হইতে তুর্স পর্যন্ত এবং তুর্স হইতে পূর্ব দিকে জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড) পর্যন্ত রেখা টানিলে উপরের দিকে যে সমগ্র অংশ পাওয়া যায়, তাহাই জার্মানীর দখলে গেল। অর্থাৎ জার্মানী ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত শ্রমশিল্প ও কৃষিতে উর্বর এলাকা, ইংলিশ চ্যানেল ও অতলান্তিক মহাসমুদ্রের সমগ্র উপকূল ও বন্দর এবং ১৭টি প্রধান নগরীর ১৩টি দখল করিল। ৪ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ফরাসী জার্মান শাসনের অধীনে গেল। প্রাকযুদ্ধকালীন ফ্রান্সের লৌহের শতকরা ৯০ ভাগ, বক্সাইটের ৯০ ভাগ, কয়লার ৬৬ ভাগ এবং গমের ৫০ ভাগ জার্মানীর অধিকারে গেল। ফ্রান্স দখলের ব্যয়স্বরূপ জার্মানীকে দৈনিক ৮০ লক্ষ ডলার (অঙ্কটা লক্ষ্য করিবার মত) করিয়া দিতে হইবে এবং সমস্ত জার্মান যুদ্ধবন্দী এবং নাৎসী-বিরোধী যে সমস্ত জার্মান ফ্রান্সে বা তাঁর সাম্রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীরূপে অবস্থান করিতেছে, তাদের সকলকে জার্মানীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। নিঃসন্দেহে এমন সর্ত রাষ্ট্রিক মর্যাদার ও অধিকারের বিরোধী। সুতরাং জেনারেল ওয়েগাঁর মত পরাজয়বাদী নেতাও আপত্তি করিলেন, কিন্তু আলোচনার সময় জেনারেল কাইটেল চীৎকার করিয়া বলিলেন—'ওরাই জার্মান জনগণের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ওদের ফেরৎ দিতেই হইবে।'

এই সমস্ত সর্তের জামীনস্বরূপ হিটলার সমস্ত ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে (যাঁদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে) নিজের হাতে রাখিয়া দিলেন। অধিকৃত ফ্রান্সের সমগ্র সামরিক সম্ভার ও দুর্গ ইত্যাদিও জার্মানীর হাতে গেল। স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নৌবহর পৃথিবীর অন্যতম সেরা বা চতুর্থ শীর্ষস্থানীয় নৌবহর ছিল। চার্চিল এই নৌবহরের পরিণাম নিয়া অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা, এই নৌবহরের সঙ্গে যদি ইতালী ও জাপান বা অক্ষশক্তিবর্গের নৌশক্তি একত্রিত হয়, তবে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ ঘটিবে। সুতরাং চার্চিল ফরাসী নৌবহরের প্রধান কর্তা এডমিরাল দারলা এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকটা প্যাঁচ কষিয়াছিলেন এই নৌবহর বৃটেনের দখলে বা নিরপেক্ষ আনিবার জন্য। কিন্তু হিটলারও কম দূরদর্শী ছিলেন না, তিনি কিছুতেই এটা ঘটিতে দিলেন না এবং ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে এই চুক্তি হইল যে, ফরাসী বন্দরে এগুলিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। তবে, জার্মানী বা ইতালী কেহই এগুলিকে ব্যবহার করিতে পারিবে না—অবশ্য নৌবহরগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত এই চুক্তি নাৎসী জার্মানী ভঙ্গ করে নাই। একথা চার্চিলও স্বীকার করিয়াছেন।)

ইতালীর ডুচে মুসোলিনীর খুব সখ ছিল যে, তিনিও হিটলারের সঙ্গে একত্রে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলীলে যৌথ স্বাক্ষরের 'গৌরব' অর্জন করিবেন। কিন্তু মুসোলিনীর কপাল মন্দ, হিটলার রাজী হইলেন না এবং ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ছিল না।

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ফ্রান্সের এই আত্মসমর্পণের দলীল অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বীর মার্শাল পেতাঁ এই হীন আত্মসমর্পণ স্বীকার করিয়া নিয়া ঘোষণা করিলেন: 'Honour has been saved' অর্থাৎ সম্মান বাঁচিয়াছে।'

(ক্রমশ)

* বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ছিল না। ১৬ই মে চার্চিল অতিরিক্ত ৬ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ফ্রান্স তাহা পৌঁছে নাই। —লেখক

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো—১৫

তিন বারের পর চার বার। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির পরেই আবার জুলাই-এ। তিনজন নভশ্চরকে নিয়ে আপোলো ব্যোমযান আবার যাত্রা করেছে চাঁদের দিকে। সব যদি ঠিক থাকে তাহলে এই লেখা যেদিন প্রকাশিত হবে, তার আগেই নভশ্চর জেমস আর-উইন ও নভশ্চর ডেভিড চন্দ্রযানে চড়ে চাঁদের মাটিতে নামবেন আর অপর নভশ্চর আলফ্রেড ওয়ার্ডেন মূল ব্যোমযানে থেকে যাবেন এবং চাঁদের কক্ষে পরিক্রমা করে চলবেন। রওনা হওয়া ও চাঁদের মাটিতে অবতরণ করার ব্যাপারগুলো অ্যাপোলো-১১, অ্যাপোলো-১২ ও অ্যাপোলো-১৪ অভিযানগুলোতে যেমন যেমন ঘটেছিল, এবারকার অ্যাপোলো-১৫ অভিযানেও তার চেয়ে অন্যরকম কিছু নয়। তবে একটি ব্যাপারে আপোলো-১৪ অভিযানের চেয়ে অ্যাপোলো-১৫ অভিযান নির্বিঘ্নে হয়েছে। তা হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু করে চাঁদের দিকে রওনা হবার পরে মূলযানের সঙ্গে চন্দ্রযানের জোড়া লাগাবার ব্যাপারটি। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে ছ-বারের চেষ্টায় জোড়া লাগানো গিয়েছিল (প্রথম পাঁচবারের চেষ্টা কেন সফল হয়নি তার কারণ কিন্তু জানা যায়নি), অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে একবারের বেশি চেষ্টা করতে হয়নি।

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে চাঁদের নতুন একটি এলাকাকে লক্ষ্যস্থল করা হয়েছে। অ্যাপোলো-১১, ১২ ও ১৪ অভিযানে নভশ্চররা নেমেছিলেন চাঁদের বিষুবরেখার কাছাকাছি এলাকায় (শেকশো মাইলের মধ্যে)। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের নভশ্চরদের নামার কথা বিষুবরেখা থেকে আরো অনেক উত্তরে (প্রায় পাঁচশো মাইল)। জায়গাটি আপেনাইন ও হ্যাডলি রিল-এর মাঝখানে, আপেনাইন হচ্ছে একটি পর্বতমালা আর হ্যাডলি রিল হচ্ছে চাঁদের মাটিতে শুকনো নদীর মতো গভীর একটি খাদ।

এবারকার অভিযানের আরো বৈশিষ্ট্য আছে। চাঁদের মাটিতে নভশ্চরদের পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হবে না। তাঁদের সঙ্গে থাকছে জীপের মতো দেখতে একটি স্বয়ংচলমান যান, নাম 'রোভার'। এই যানটির বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১০ কিলোমিটার। এই যানে চেপে নভশ্চররা হ্যাডলি রিল পার্বত্য এলাকায় তিনটি চক্কর দেবেন। চাঁদের পার্বত্য এলাকায় পাড়ি দেবার উপযোগী করে তৈরী এই যানটি ৭৫

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের নভশ্চররা এবারে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন একটি স্বয়ংচলমান যান 'রোভার'। চাঁদের মাটিতে এই যানটির তিনটি চক্কর দেবার কথা আছে। ছবিতে এই তিনটি চক্কর দেখানো হয়েছে। চক্করের পথে যে সংখ্যাচিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো রোভারের থামবার জায়গা। নভশ্চররা এই জায়গাগুলো থেকে নমুনা সংগ্রহ করবেন ও পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবেন।

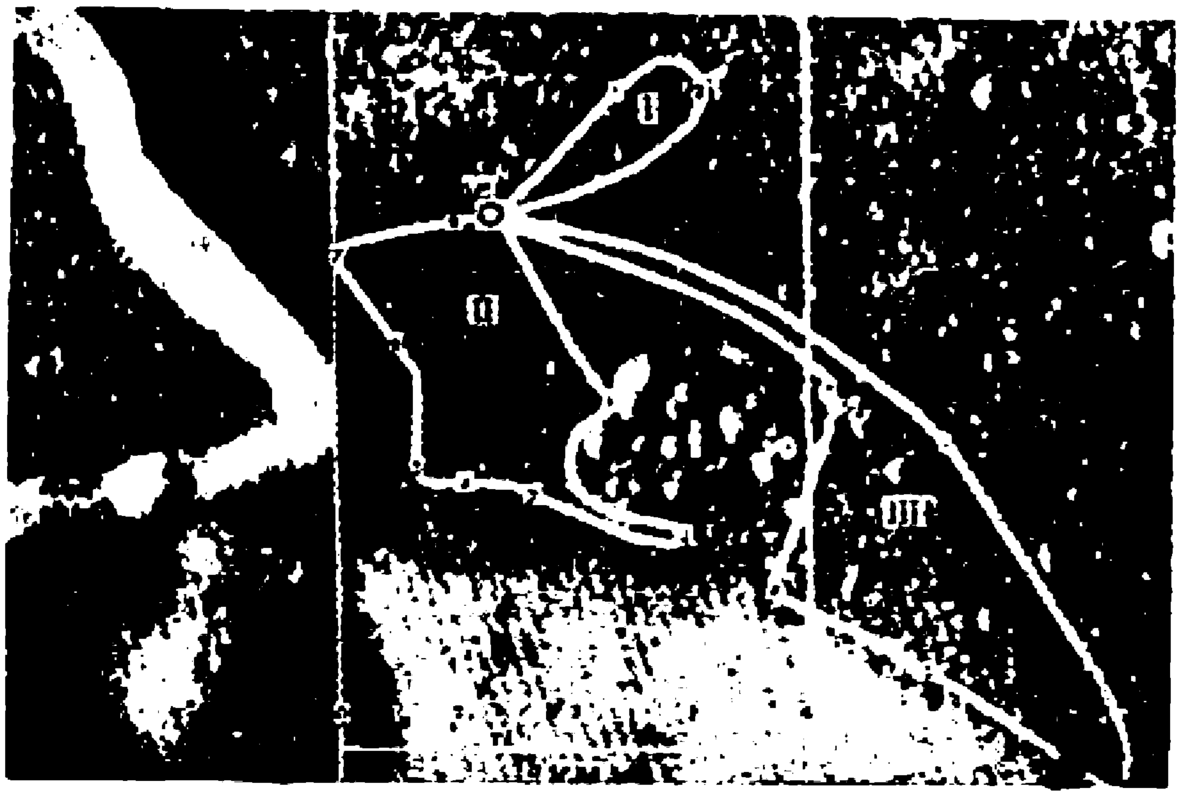

কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে, ব্যাটারি চালিত, প্রায় তিন মিটার লম্বা। সঙ্গের একটি ছবিতে নভশ্চরদের তিনটি চক্কর দেখানো হয়েছে। ইংরেজি অক্ষরে এল-এম লেখা জায়গায় চন্দ্রযান অবতরণ করেছে। সেখান থেকে প্রথম চক্করটি খুবই ছোট এলাকায়, দ্বিতীয়টি আরো বড়ো, তৃতীয়টি আরো আরো বড়ো। প্রতি চক্করে রোভারের থামার জায়গাগুলো সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রথম চক্করে থামছে দু-বার, দ্বিতীয় চক্করে আট-বার, তৃতীয় চক্করে পাঁচবার। যতোবার থামছে, নভশ্চররা পাথরের নমুনা সংগ্রহ করছেন ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

এবারের অভিযানে নভশ্চরদের চাঁদের মাটিতে সময় কাটাবার কথা ৬৭ ঘণ্টা—অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের চেয়ে দ্বিগুণ। এটি অবশ্যই একটি রেকর্ড হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, এবারের অভিযানে চাঁদের এমন এক এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনা হচ্ছে যার ফলে হয়তো চাঁদের জন্ম সম্পর্কে অনেক জরুরি সূত্র জানা যাবে।

ভবিষ্যতের মহাকাশ-অভিযান

অ্যাপোলো পর্যায়ের অভিযান আগামী দু-বছর ধরে চলবে। চাঁদের উপরিতলের অন্যান্য এলাকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা হবে এবং আরও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকবে।

ন্যাসা (ন্যাশনাল এরোনটিক্স এণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা এই সংস্থাটির পরিচালনায় হয়ে থাকে) থেকে ভবিষ্যতের যে-সব পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, শুধু চাঁদ নয় সৌর-মণ্ডলের অন্যান্য গ্রহেও পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান অদূর ভবিষ্যতেই শুরু হতে চলেছে। আগামী দু-বছরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান রওনা হবে মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে পাক খাবার জন্যে এবং এই গ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য। স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান রওনা হবে বুধ ও শুক্রগ্রহের উদ্দেশে এবং এই দুটি গ্রহের খুব কাছাকাছি এলাকা দিয়ে পার হবে। একটি মনুষ্যহীন ব্যোমযান মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করতে চলেছে ১৯৭৫ সালে। পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যোমযান রওনা হবে বাইরের দিকের গ্রহগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে, এক-এক বারে একটি করে নয়, এক অভিযানে সবকটিকে। অর্থাৎ বাইরের দিকের সবকটি গ্রহের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে একটি ব্যোমযানই পার হয়ে যাবে ও তথ্যসংগ্রহ করবে। ১৯৭৬ সালের কথা ধরা যাক। এ-বছরে একটি মহাকাশ-অভিযান শুরু হবার কথা বৃহস্পতিগ্রহের দিকে এবং সম্ভবত বৃহস্পতি ছাড়িয়ে শনি ও প্লুটোর দিকে। ১৯৭৯ সালে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান পর্যটন করবে বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনের এলাকা। বলা বাহুল্য, অনেক বছর ধরে চলবে এই অভিযানগুলো। ১৯৭৯ সালে যে ব্যোমযানটির রওনা হবার কথা সেটির নেপচুনে পৌঁছতে সময় লাগবে দশ বছর। অর্থাৎ সেই ১৯৮৯ সালে। তারপরে আর ফিরে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। নেপচুনের পাশ কাটিয়ে ব্যোমযানটি চলে যাবে মহাশূন্যে।

মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে আরো একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হতে চলেছে। সকলেই জানেন, কৃত্রিম উপগ্রহই হোক বা ব্যোম-যানই হোক, তাকে পৃথিবীর মাটি থেকে উৎক্ষেপণের জন্যে রকেট ব্যবহার করতে

হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রকেট। এই রকেটটি আর ফিরে আসে না। আজ পর্যন্ত যে অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহ ও ব্যোমযান পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে উঠেছে, প্রত্যেকটির জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছে নিজস্ব এক-একটি রকেটের। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের জন্যে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্যাটার্ন-৫ রকেটটি ব্যবহার করা হয়েছে, তৃতীয় পর্যায়ের জ্বালানী শেষ হবার পরে তার কাজও শেষ। সেটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে একটি মোটরগাড়ি বা একটি এরোপ্লেন প্রথমবারের যাত্রাশেষে বাতিল করার মতো। মহাকাশ-অভিযানের বিপুল খরচের মূলে এটি একটি কারণ—প্রত্যেক বারে পৃথক পৃথক রকেট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। খরচের বিপুলতা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যদি বলি ১৯৬৬ সালে ন্যাসার বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল ৫৯০ কোটি ডলার (৪৪২৫ কোটি টাকা)। পরবর্তী বছরগুলোতে খরচ অবশ্য কিছুটা কমানো হয়েছে। যাই হোক, মার্কিন বিজ্ঞানীরা গত বছরের গোড়া থেকেই বারবার ব্যবহার করা যায় এমন এক ধরনের ফেরী-রকেট তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ফেরী-রকেট বলতে এমন একটি ব্যবস্থা যার সাহায্যে পৃথিবীর মাটি থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশনে বারবার যাতায়াত করা চলবে। ফেরী-রকেটটি পৃথিবীর মাটি থেকে খাড়া আকাশে উঠবে, পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হবে, আবার ফিরতি রকেট চালু করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে, তারপরে অনেকটা এরোপ্লেনের মতো মাটিতে নেমে আসবে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা যে ফেরি-রকেট নিয়ে কাজ করছেন তা অন্তত একশোবার এমনি যাতায়াত করতে পারবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

অনুমান করা চলে, ফেরি-রকেট চালু হবার পরে মহাকাশ-অভিযানের ব্যাপারটি যেমন হবে অনেক কম খরচের, তেমনি অনেক সুবিধেরও। তখন আর চাঁদে অভিযান করতে হলে পৃথিবীর মাটি থেকে সরাসরি যাত্রা করার প্রয়োজন থাকবে না। যাত্রা শুরু হবে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশন থেকে। অ্যাপোলো-১৫ ব্যোমযানটিও প্রথমে উঠে এসেছিল পৃথিবীর একটি কক্ষপথে এবং প্রায় তিন ঘণ্টা সময় সেই কক্ষপথে অবস্থান করার পরে পুনরায় রকেট চালু করে চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। ফেরি-রকেটের ব্যবস্থা চালু হবার পরে ব্যোমযানটি যাত্রা শুরু করবে এই কক্ষপথ থেকেই, তার আগে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে এই কক্ষপথেই অপেক্ষা করবে। আবার চাঁদের দেশে পৌঁছে ব্যোমযানটি থেকে যাবে চাঁদের কক্ষে, চাঁদের মাটিতে নামবে চন্দ্রযান। তেমনি চাঁদের মাটি থেকে উঠে এসে চন্দ্রযান থেকে যাবে চাঁদের কক্ষে, পৃথিবীর দিকে রওনা হবে ব্যোমযান। পৃথিবীতে পৌঁছে ব্যোমযানটি থেকে যাবে পৃথিবীর কক্ষে, প্রয়োজনীয় মালপত্র সমেত নভশ্চররা পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসবেন ফেরি-রকেটে। এই ব্যবস্থায় কোনো পর্যায়েই কোনো কিছু বাতিল করতে হচ্ছে না। একই ফেরি-রকেট, একই ব্যোমযান, একই চন্দ্রযান (এটিও চাঁদে নামা ও চাঁদ থেকে ওঠার জন্যে এক জাতীয় ফেরি-রকেট) বারবার ব্যবহার করা যাচ্ছে। ব্যবস্থাটা পুরোপুরি চালু হবার পরে (আশা করা যাচ্ছে এই দশকের মধ্যেই) চাঁদে একবার ঘুরে আসা, নিদেনপক্ষে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশনে কয়েকদিন কাটিয়ে আসা খুব একটা শক্ত ব্যাপার হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই, চাই কি, চাঁদে পুরোদস্তুর একটি উপনিবেশেরও পত্তন হয়ে যেতে পারে। মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে নভশ্চারণবিদ্যায় যে আশ্চর্য অগ্রগতি হয়েছে তা মনে রাখলে স্বীকার করতে হয়, আগামী পনেরো বছরের মধ্যেই (শতক শেষ হতে এখনো উনত্রিশ বছর বাকি) যা ঘটতে চলেছে তা হয়তো এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

তবে একটা কথা আছে। ধরে নেওয়া গেল মহাকাশে যাতায়াত করার যান্ত্রিক আয়োজনটি সুসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণে বন্দী মানুষের পক্ষে কতদিন মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় কাটানো সম্ভব? আবার ব্যাপারটা তো শুধু ভরের নয় (মহাশূন্যেও কৃত্রিম উপায়ে ভর সৃষ্টি করা চলে), পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডল মহাশূন্যের বহু প্রাণঘাতী বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে (বায়ুমণ্ডলকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা আছি এই সমুদ্রের একেবারে তলদেশে—ছুটন্ত উল্কা, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি ইত্যাদি অনেক কিছুর নাগালের বাইরে), বাইরের অবাধ এলাকায় আমাদের প্রাণ বাঁচবে তো? মার্কিন বিজ্ঞানীদের ১৯৭৩ সালের 'স্কাইল্যাব' এই বিশেষ দিকেই বিশেষ গবেষণা।

সোভিয়েত 'স্যালিয়ুৎ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিনী স্কাইল্যাবের কথা বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে আগের একটি সংখ্যায় বলেছি। স্যালিয়ুৎ-এর গবেষণাও ছিল একই উদ্দেশ্যে—মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটালে মানুষের শরীরের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, কিংবা আদৌ ক্ষতিকর কিনা (স্যালিয়ুৎ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী তিনজন সোভিয়েত নভশ্চরের মৃত্যু, যতোদূর জানা গিয়েছে, টেকনিক্যাল কারণে)।

পরিকল্পনা অনুসারে, স্কাইল্যাবে নভশ্চররা ২৮ দিন থেকে ৫৬ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে আসবেন। এই নভশ্চরদের পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া শরীরের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে কী প্রকার। স্কাইল্যাবে থাকার সময়ে নভশ্চররা অবশ্যই নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও চালাবেন এবং উন্নত ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবেন।

মহাকাশগবেষণার আরো একটি বিরাট দিকে রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে নানা-রকমের কাজ সম্পাদন। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার খবরাখবর অনেক আগে থেকে ও অনেক সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্ত আগেই পাওয়া গিয়েছে। তবে ১৯৭২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরেকটি নতুন ধরনের উপগ্রহ স্থাপন করবেন যার উদ্দেশ্য হবে এই পৃথিবীকেই পর্যবেক্ষণ করা ও পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়েও এই অনুসন্ধান চলতে পারে, বা এমনকি বিমান থেকেও। ১৯৭২ সালে একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর সম্পদের অনুসন্ধানে ফললাভ কতখানি।

তবে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার ও টেলিভিশন প্রচার যে কতখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত তো ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যখন চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তখন সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ টেলিভিশনে তা দেখার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরে আরো দু-বার চাঁদের মাটিতে পৃথিবীর মানুষের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ছবি টেলিভিশন মারফৎ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এবারও পৌঁছবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি হয়েছে যে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ (অ্যাডভান্সড্ টেক্‌নোলজি স্যাটেলাইট বা এ টি এস) ভারতের ৫,০০০ গ্রামে ভারত গভর্ণমেন্ট রচিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করা হবে।

সব মিলিয়ে বর্তমান দশকটি মহাকাশ-গবেষণা ও নভশ্চারণার ক্ষেত্রে বিরাট এক সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে, বলা চলে। ১৯৮০ সালটি এখন কল্পনা করাও শক্ত।

নিউটন সম্পর্কে কীন্‌স

জন মেনার্ড কীন্‌স-কে বলা হয় বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে তিনি মারা গিয়েছেন, তার পঁচিশ বছর পরে লণ্ডনের রয়েল ইকনমিক সোসাইটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে 'জন মেনার্ড কীন্‌স-এর রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এ-পর্যন্ত চারটি খণ্ড (১, ২, ১৫, ১৬) প্রকাশিত হয়েছে। টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট-এর (২রা জুলাই, ১৯৭১) সমালোচনা থেকে জানা যায় যে অর্থনীতি ছাড়াও অন্য বহু বিষয়ে কীন্‌স লিখে গিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সমালোচনায় নিউটন সম্পর্কে কীন্‌স-

এর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

এই চমৎকার লেখাটির নাম 'মানুষ নিউটন'। নিউটনকে কীন্‌স বলছেন "কেমব্রিজের শ্রেষ্ঠ সন্তান"। কীন্‌স-এর এই উক্তি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মতে, নিউটন আধুনিক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানীদের প্রথমতম নন, বরং মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্ট ও 'যাদুকরদের শেষতম'। নিউটন হচ্ছেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমন এক শিশু যার ওপরে আন্তরিক ও যথাযোগ্যভাবেই ঐন্দ্রজালিকের কৃপাবর্ষণ হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ে তিনি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হন নি, যড়ুদ্ধাপড়ায় বিপন্ন নন, লক্ষ্মীর বরপুত্র থেকেই মারা গিয়েছেন। "বুদ্ধিবৃত্তির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অর্জন ছিল অসাধারণ মাত্রায়—তিনি বড়ো বড়ো গণিতবিদ পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন তার চেয়ে কম বড়ো আইনবিদ ইতিহাসবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন না।"

কীন্‌স বলছেন, "আমার বিশ্বাস, নিউটন কোনো একটি সমস্যাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁর মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারতেন, যতোক্ষণ না সেই সমস্যার রহস্য তাঁর কাছে ধরা পড়ত। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় গাণিতিক কারিগর—জনসমক্ষে উপস্থিত করার জন্যে তারপরে সেটির গায়ে, যেমনটি দরকার তেমনটি, পোশাক চড়াতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইনটিউইশন বা স্বজ্ঞা ছিল মাত্রাতিরিক্ত রকমের অসাধারণ—দা মর্গান বলছেন, 'নিজের অনুমান নিয়েই এমন তৎপর থাকতেন যে মনে হত প্রমাণ করার উপায় যতোখানি তাঁর আয়ত্তে আসার সম্ভাবনা তার চেয়েও বেশি জানেন।' যে কথা আমি বলেছি, হিসেবমতো ও দরকারমতো প্রমাণগুলো তিনি সাজিয়ে তুলতেন পরে—আবিষ্কারের হাতিয়ার সেগুলো হত না। গ্রহের গতি সম্পর্কে তাঁর একটি সবচেয়ে মূলগত আবিষ্কার সম্পর্কে হ্যালি-কে তিনি কিভাবে জানিয়েছিলেন সে-সম্পর্কে একটি গল্প আছে। হ্যালি জবাব দিয়েছিলেন, 'তা বেশ, কিন্তু আপনি কি করে এটা জানলেন? আপনি কি এটা প্রমাণ করতে পেরেছেন?' নিউটন থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, 'তা কেন, আমি এটা কতক বছর ধরেই জেনে এসেছি। আপনি আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন, এটার প্রমাণ আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে হাজির করব।' এবং হাজির তিনি করেছিলেন যথাসময়েই।"

—অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

অন্য জগৎ

মিসিসিপি ও লুইসিয়ানার সীমানা-নির্ধারণের সময় প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট একদিন ভালুক শিকারে বেরোলেন। সঙ্গী একদল সাংবাদিক। শিকার মিলতে দেরি হলো না। একেবারে নাগালের মধ্যে। সবাই ভাবছেন যে এক্ষুনি প্রেসিডেন্ট ট্রিগার টিপবেন আর ভালুকটা লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু সকলকে চমকে দিয়ে তিনি বন্দুক নামিয়ে নিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত ভালুক পালিয়ে বাঁচলো।

সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন ওয়াশিংটন পোস্টের কার্টুনিস্ট। তিনি রুজভেল্টের এই মহানুভবতার মুহূর্তটি অমর করে রাখতে চাইলেন। এই কার্টুনিস্টের তুলিতে ধরা পড়লো সেই বিখ্যাত 'টেডি ভালুক'—ভীত শাবকের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই কার্টুনটির ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। খেলনাপ্রস্তুতকারকরা এর দ্বারা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের কল্পনায় নতুন দিগন্ত প্রসারে কার্টুনটির অবদান অসামান্য। একজন এই কার্টুনটি নিয়ে গেলেন মার্গারেট স্টেইফের কাছে। তিনি ছিলেন জার্মানীর এক নামকরা খেলনাপ্রস্তুতকারক। ইউরোপ-আমেরিকার খেলনাপ্রস্তুতকারকদের মধ্যে তখন তাঁর বেশ নামডাক। সেসব দেশে তাঁর খেলনার যথেষ্ট সমাদর।

এই প্রতিষ্ঠান শুরু করেন ফ্রাউ স্টেইফে। বছর-আড়াই বয়সের সময় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শারীরিক দিক থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। আঘাত প্রচণ্ড হলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। অকস্মাৎকে স্বীকৃতি না দিয়ে তিনি হুইল-চেয়ারে বসে কাজ শিখতে থাকেন। অবসর সময়ে রং-বেরং-এর কাপড় দিয়ে মজার মজার খেলনা তৈরি করা ছিল তাঁর একটা নেশা। তাঁর প্রত্যেকটি খেলনাই উৎসাহীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তিনি ক্রমেই বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ফলে অচিরেই ব্যবসাটি চালু হয়ে গেল। এমনিভাবে শারীরিক ক্ষেত্রে মার খেয়েও স্বক্ষেত্রে প্রতিভায় হয়ে রইলেন প্রায় রূপকথার নায়িকা।

তিনি মারা গেলে শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন মার্গারেট। খেলনার জগতে মার্গারেট এক বিরাট খ্যাতির অধিকারী। সেই বিখ্যাত কার্টুনটি পেতেই নতুন নতুন খেলনার হাজার ভাবনা তাঁর মাথায় ভিড় করে এলো। সব ভাবনা আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসতে যে-ভাবনাটি মনে এলো, তা থেকে রূপ নিল 'টেডি ভালুক'। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে টেডি ভালুক অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বেশী খেলার লিস্টে তখন টেডির আধিপত্য স্বীকৃতির্বোধহয়। খেলনাটির এই জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। পাশাপাশি মার্গারেটের আর যে খেলনাগুলি শিশুচিত্ত জুড়ে রয়েছে, তা হলো জাম্বো দি এলিফ্যান্ট, পনি দি পোডল, পেদ্রো দি টুবল এবং লোভি দি রিনোসারোজ। এছাড়াও রয়েছে ডজনখানেক অন্যান্য খেলনা পুতুল। বিশ্বজোড়া যাদের বিরাট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

পুতুলের ব্যাপারে জার্মানীর নুরেমবার্গ শহরের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। চতুর্দশ লুই তাঁর চার বছরের ছেলেকে পুতুলের সেনাবাহিনী দিয়ে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর দূতমন্ত্রীকে প্রথমেই নুরেমবার্গে পাঠান।

লেখক অবনীন্দ্রনাথ
কথক অবনীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যের মহত্তম ফ্যানটাসি লেখক অবনীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যে বিচিত্র বিস্ময়কর কারুকর্মের এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করেছেন ডক্টর অমলেন্দু বসু মহাশয় উপরিউক্ত দুটি অনবদ্য রচনায়—তাঁর 'সাহিত্যলোক' গ্রন্থে।

দাম : দশ টাকা

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

যুদ্ধমন্ত্রী যে-পুতুলের সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন তারা সকলেই ছিল অটোমেটিক কায়দায় সুসজ্জিত। শতাব্দী পরেও নুরেমবার্গের এই খ্যাতি অক্ষুন্ন আছে। এবং বর্তমানে সেখানকার 'টিন সোলজার্স' ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছে। বিশ শতকে খেলনা সম্পর্কে জটিলতর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বড়দের কাছে পুতুলের অর্থই গেছে পাল্টে। তবে পুতুলের সঙ্গী অর্থাৎ শিশুরা এসম্পর্কে মাথা ঘামায় না বলেই বাঁচোয়া। এজন্যই আজকাল জার্মান পুতুলশিল্পে অনেক সাইকোলজিস্টের সমাবেশ ঘটেছে। নির্মাতারা এসব সাইকোলজিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। এরই মধ্যে এক ধরনের লুডোর জনপ্রিয়তা কিন্তু আজো অক্ষুন্ন আছে। তবু লুডো-নির্মাতাদের ভাবনা যে এই খেলনারও পরিবর্তন হতে পারে। তাই তাঁরা আগে থেকেই এসম্বন্ধে সতর্ক হয়েছেন। পুরনো জার্মান দুর্গগুলি ঘুরে নতুন খেলা চালু করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি ঘুরতে বেরোন। ঘুরতে ঘুরতে নাভিরিবার্গ এক দুর্গে একটি চিত্র দেখে তিনি থমকে দাঁড়ান। একটা টেবিলে কয়েকজন লোক বসে খেলছে। এটা হচ্ছে সেকালের যৌবন গেম। ভদ্রলোক হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন। তারপর 'কনফারেন্স' নাম দিয়ে খেলনাটি বাজারে ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজার মাৎ। দোকানে ভিড় আর ধরে না। অবশেষে খেলনাটির রেশন করতে হয়।

পুরনো মডেলের গাড়ি যেমন অচল তেমনি হাল সেকেলে খেলনা-পুতুলেব। একটি খেলনাগাড়ি বিক্রি করতে হলে তার লাইট, হর্ণ এবং মেকানিজমের দিক থেকে আধুনিক হতে হবে। আমেরিকা অনু-প্রাণিত এবং জাপানে প্রস্তুত বার্বী ডল এখন বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। আবার রুচির পরিবর্তনের ফলে কিছু পুতুল আবার জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে। কাঠের পুতুল সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ বেড়েছে। আবার শিক্ষাগত খেলনা, যেমন 'কেমিস্ট্রি সেট' শিশুদের বেশ প্রিয়। ইদানীং টয়-সোলজার অপেক্ষা কাউবয় এবং ভারতীয় পুতুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ভারতীয় পুতুলের কথা উঠলেই মনে পড়ে শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়ের কথা। পুতুল তৈরির ব্যাপারে তিনি যে অভি-নবত্বের সূচনা করেছেন, সে-ধারা অব্যাহত থাকলে অতীতের ভারতীয় মসলিনের মতো ভারতীয় পুতুলও কাঞ্চনমূল্যে বিদেশে বিক্রি হবে। বিদেশে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের তৈরি পুতুলের চাহিদা খুবই। আমেরিকা, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি সব দেশ থেকেই প্রতি বছর অনেক অর্ডার আসে। কিন্তু তিনি ঠিকমতো সাপ্লাই দিতে পারেন না।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের পুতুলের বৈশিষ্ট্য তা পুরোপুরি ভারতীয়। দেশীয় ভাবধারাকে তিনি কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। বহুবিচিত্র আমাদের দেশকে তিনি

পুরস্কৃতা শ্রীমতী সুমিতা সিনহা

পুতুলের মাধ্যমে একত্রে উপস্থিত হন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের বর-কনে আর বিভিন্ন জীবিকার মানুষজন তাঁর পুতুলে মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় শাশ্বত ভারত। কালিদাসের শকুন্তলা অপরূপ সৌন্দর্যে শিল্পীর সৃষ্টিতে শ্রীমণ্ডিত।

সাধারণ গেরস্থঘরের বউ শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়। ঘরকন্নার অবসরে নিজের খেয়ালে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে পুতুল গড়তেন। অভ্যাসটা এমনি থেকে যেতো যদি না পেতেন স্বামীর উৎসাহ। পুতুল গড়ায় স্ত্রীর অনুরাগ দেখে তিনি সবসময় উৎসাহ দিতেন। স্বামীর উৎসাহ ও প্রেরণায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প প্রতি-যোগিতায় যোগদান করেন এবং স্বীয় বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেন। এবার আসে আরো বড়ো সাফল্য। ১৯৬৯ সালে বার্লিনের মেলার জন্য তাঁর পুতুল মনো-নীত হয়।

এমনিভাবে আসে একের পর এক সাফল্য। ১৯৬৯ সালে একটা ছোটখাটো প্রদর্শনীও করেন। কিন্তু এই-ই তাঁর জন-সমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর প্রথম আত্মপ্রকাশেই রসিকজনেদের বিস্মিত অভিনন্দন প্রশংসা কুড়োলেন অপর্যাপ্ত-ভাবে। পুতুলে আমাদের দেশ দেখে ঠিক ভারত ভ্রমণের আনন্দ পাওয়া গেল।

সাইকোলজিস্টদের মতে, কথাবলা পুতুল মেয়েদের তুলনায় মায়েদেরই আকর্ষণ করে বেশি। শিশুরা অল্প সময়েই পুতুল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। সাত বছর পর্যন্ত মেয়েরা এটা পছন্দ করে। কারণ, পুতুলের জবাব দেওয়ার রহস্যটা তারা তখনো ভাল বুঝে উঠতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কুড়িটি ভালো পুতুল তেরো বছর পর্যন্ত মেয়েদের সন্তুষ্টিবিধানে সমর্থ। পুতুলের প্রাচুর্য তাদের ক্লান্ত করে ফেলে।

শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়ের পুতুল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবাণী নিরর্থক। তাঁর পুতুল কথাও বলে না এবং কুড়িটির জায়গায় অনেক বেশীতেও ক্লান্তি আসে না। আর তা একই সঙ্গে বয়সের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে সকলের মনো-রঞ্জনের অফুরন্ত শক্তি ধরে।

দুই গ্রামসেবিকা

বিহারের ডিগা ব্লকের গ্রামসেবিকা শ্রীমতী সুমিতা সিনহা। নিজের ব্লকের উন্নতি কিভাবে হবে সেই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এজন্য তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি। আর করেনও তাই।

মেয়ে হিসেবে গৃহ-উন্নয়ন এবং নারী প্রগতির দিকটাই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এর ফলে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার সুবিধাগুলি তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন আর বাস-স্থানকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার প্রচেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছেন। প্রত্যেক বাড়িতে হাওয়া চলাচলের জন্য অন্তত একটি জানালা বা দেওয়ালে একটি বড় গর্ত রাখার জন্য প্রতিটি গৃহস্থকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। ব্লকের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের চেষ্টায় তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ডিগা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৪১০টি পয়ঃপ্রণালী এবং ১৫০টি ধূম্রহীন চুল্লী-তৈরি করা। এই কৃতিত্বটুকু শ্রীমতী সিনহার একক প্রচেষ্টার ফল। ব্লকের স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল। মহিলাদের হাতের কাজ শেখানোর জন্য ৫টি সেলাই-স্কুল আর ২০টি মহিলামণ্ডল গড়ে তুলেছেন। আর শতাধিক মহিলা ও পুরুষকে কৃষি-কর্মে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

গ্রামসেবিকা হিসেবে নিজের দায়িত্ব যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

এমনি আর একজন সফল গ্রামসেবিকা হলেন মণিপুরের শ্রীমতী লাইসারাম

আনন্দি দেবী। তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় ফলে ধাউবাল ব্লকের প্রতি গৃহাঙ্গন আজ শাকসব্জীতে ভরে উঠেছে। গৃহস্থদের বিশেষত মহিলাদের তিনি বুঝিয়েছেন যে বাড়ির ফাঁকা জায়গাটুকু কাজে লাগানো দরকার। এই দায়িত্বটুকু বাড়ির বউ-ঝিদেরই নিতে হবে। পুরুষেরা ফাঁক-ফোকরে তাদের সাহায্য করবে। তাঁর এই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়েছে। চাষের সঙ্গে সঙ্গে সার তৈরিও বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৬টি গ্রাম নিয়ে শ্রীমতী লাইসারাম অত্যন্ত একটি সুখী এবং সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তুলেছেন।

সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এই দুই সফল গ্রামসেবিকাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে গ্রামোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শ্রীমতী সুস্মিতা সিনহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। এর সঙ্গে নগদ দেড় হাজার টাকা এবং একটি সাইকেল দেওয়া হয় তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ। আর শ্রীমতী লাইসারাম এ-বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রাম-সেবিকার সম্মান লাভ করেন।

—প্রমীলা

দুই শিল্পী
মা ও মেয়ে

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের তাজ আর্ট গ্যালারিতে শ্রীমতী অঞ্জলি দাশগুপ্ত ও তাঁর নয় বছরের কন্যা নন্দিনীর যৌথ চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমতী দাশগুপ্তের বেশীর ভাগ ছবির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। তাঁর গার্হস্থ্য চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'ড্যান্সিং কর্নার' 'আফটার আওয়ার মিলস' ইত্যাদি ছবিগুলি ইতিপূর্বে পুরস্কার লাভও করেছে।

কন্যা নন্দিনীর হাতও কম পাকা নয়। চার বছর বয়স থেকেই সে ছবি আঁকে। বর্তমানে মায়ের যোগ্য কন্যা হয়ে উঠেছে সে। বেশীর ভাগ ছবিই জলরঙে করা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রীমতী দাশগুপ্ত পরে বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্স থেকে সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিক্ষালাভ করেন ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের স্পেশাল অফিসার হিসেবে কাজ করেন।

কিন্তু একমাত্র কন্যার দীর্ঘ অসুস্থতার দরুন তাঁকে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়। সেই সময় থেকেই তিনি রং তুলি ধরেন এবং পরে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীর প্রদর্শনীতে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ইভন গুলাগঙ উপন্যাসের নায়িকা

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বংশোদ্ভূতা ইভন গুলাগঙের সঙ্গে মাই ফেয়ার লেডী উপন্যাসের নায়িকা এলাইজা ডু লিটলের অনেকখানি মিল আছে। এলাইজাকে সমাজের উচুতলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন প্রফেসার হিগিনস। ইভনকে গড়ে তুলেছেন ভিক এডওয়ার্ডস। উইম্বলডন টেনিসে মহিলা বিভাগে বিজয়িনী অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসী তরুণীর জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় বর্ধিত ও পুষ্ট হলেও তার শুরু হয়েছিল সিডনী থেকে চারশো মাইল দূরে এক আদিবাসী বসতিতে। ইভন গুলাগঙের বাবার শরীরে মিশ্র রক্ত, মা পুরোপুরি আদিবাসী। শ্রীযুত গুলাগঙ স্বল্পশিক্ষিত, স্থানীয় পশুপালক। মা নিরক্ষর। তাদের আটটি ছেলেমেয়ে। ইভন এগারো বছর বয়স থেকেই বাড়ীছাড়া। ঐ বয়সেই তিনি প্রখ্যাত টেনিস কোচ ভিক এডওয়ার্ডসের চোখে পড়ে যান।

ভিক এডওয়ার্ডসের টেনিস স্কুল শাখা করে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলতো। এইরকম একটি শিক্ষণ-কেন্দ্রে ইভনের ক্রীড়া-প্রতিভা তাঁর শিক্ষকের চোখে পড়ে যায় এবং তিনি ভিক এডওয়ার্ডকে সেকথা জানান। ভিক এডওয়ার্ডসের জহুরীর চোখ, এই অসাধারণ ক্রীড়া-প্রতিভাকে চিনতে দেরী করলো না। তিনি এও বুঝলেন যে, ইভনের প্রতিভার যথাযথ স্ফুরণ হতে গেলে তাকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে সরিয়ে আনা দরকার।

ভিক ও ইভা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সাথে ইভনকে মানুষ করেছেন সিডনীর অভিজাত পল্লীতে। অভিজাত স্কুলে ইভনের শিক্ষা-দীক্ষা। ভিক এডওয়ার্ডস অবশ্য বলেন যে, ইভনের জন্য আলাদা করে তিনি কিছুই করেননি, কিন্তু একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁদের সস্নেহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ইভনের পক্ষে নতুন পারিপার্শ্বিকের সাথে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এডওয়ার্ডসরা শুধু তাকে টেনিস খেলাই শেখাননি, টেনিস খেলোয়াড়ের যে জগৎ, যেখানে অর্থ-কৌলীন্য ও কাঞ্চন কোনটারই অভাব নেই সেখানে মেশবার মত সহজ আত্মবিশ্বাসও তার মধ্যে এনে দিয়েছেন। এই সহজ আত্মপ্রত্যয়ের জন্যই ইভন নিজের ভুলে ঘাবড়ে না গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আজ হাসতে পারেন। কিছুদিন আগেও তাঁকে নিয়ে ভিক ও তাঁর স্ত্রীর চিন্তার অবধি ছিল না। ভিক এডওয়ার্ডসের সবচাইতে দুর্ভাবনা ছিল উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলে ইভন খেলায় তেমন মন দেন না। এ বছরও ইভা এডওয়ার্ডস ইভনের সাথে উইম্বলডনে এসেছেন। যদিও এডওয়ার্ডসদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতিমধুর এবং শুধু [illegible] কিন্তু ইভন ক্রমশ স্বনির্ভর হচ্ছেন।

ইভনের রং বাদামী। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল। বন্ধুবান্ধবরা বলেন ইভন নিজের রং সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নন। তবে পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোন কৌতূহল তাঁকে বিরক্ত করে। ইভন গুলাগঙ টেনিস খেলোয়াড়। টেনিসেই তাঁর উৎসাহ। কিন্তু টেনিসের বাইরে যে জগৎ তাকে কি তিনি বেশীদিন এড়িয়ে চলতে পারবেন?

একথা সত্যি যে বর্ণবৈষম্য ইভনের জীবনে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। বরং অস্ট্রেলিয়ানরা তাঁকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু যে আদিবাসী সমাজে ইভন জন্মেছেন তার প্রতি তাঁর দায়িত্বকে তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন? অন্য বহুজন টীন এজারের মত ফ্যাশানের স্রোতে গা ভাসিয়ে এবং পপ মিউজিক শুনে ইভন কি অত্যাচারিত বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ থেকে দূরে থাকতে পারবেন?

গত মার্চ মাসে দাসত্ব প্রথা নিবারণী সমিতির সম্পাদক কর্নেল মন্টগোমারী উত্তর অস্ট্রেলিয়া সফর করে সেখানকার আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে এক তীব্র বিবৃতি দেন। তিনি এদের নিরুপায় অবস্থাকে অস্ট্রেলিয়ার কলঙ্ক বলে ঘোষণা করেন। তিনি দেখেন হতাশায় কর্মহীন আলস্যে আদিবাসী জীবন ভেঙে পড়ছে। মদ্যপান জুয়া খেলা ইত্যাদি উপসর্গ এসে জুটেছে। পারিবারিক জীবন ধ্বংস হচ্ছে; বেকারত্ব আদিবাসী জীবনে সবচাইতে বড় অভিশাপ।

সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বংশানুক্রমে যে জমিতে তারা বসবাস করে এসেছে তাতে তাদের কোন অধিকার বা স্বত্ব নেই। কর্নেল মন্টগোমারী মনে করেন এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে যদি বিশ্ব জনমত এ সম্পর্কে জাগ্রত হয়।

ইভন গুলাগঙ হয়তো নিজের অজান্তেই বিশ্বসমাজে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। হয়তো শ্বেত অস্ট্রেলিয়ানরাও অনুভব করছে যে ইভনের মত আরও অনেক আদিবাসী প্রতিভা শুধু সুযোগের অভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। স্বীকৃতি পেলে অস্ট্রেলিয়ার জন্য তারাও জয়মাল্য এনে দিতে পারে।

আদিবাসীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন ইভন তাঁদের কথা বলেন কিনা দেখতে। ইভন কি তাদের নিরাশ করবেন?

—বাণী বোস।

আমরা কি বোকা হ্যায়/নিকিতা। পরিচালনা : কামরান। ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) একদা নির্বন্ধ প্রেম

একদিন ছিল, যখন বিধবা বিবাহকে হিন্দুসমাজ সমর্থন করত না। বিশেষ করে বিধবা বয়সে যতই নবীনা হোক না কেন, যদি সে পুত্রবতী হ'ত, তাহলে তার দ্বিতীয়বার স্বামীগ্রহণের কথা চিন্তা করাও নাকি পাপ ছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নানা কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী বিধবা তো দূরের কথা, সধবা আলোকপ্রাপ্তা (শিক্ষিতা?) তরুণীরা স্বামী কর্তৃক মানসিক উৎপীড়নের অভিযোগে বিবাহবন্ধন ছিন্ন ক'রে নতুন ক'রে সংসার পাতছেন। কাজেই শিল্পি ফিল্মস্ নিবেদিত, জি-পি সিপ্পি প্রযোজিত এবং রমেশ সিপ্পি পরিচালিত 'আন্দাজ' ছবিতে সুন্দরী তরুণী বিধবা শীতল ও বিপত্নীক যুবক রবি যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন দর্শক তার মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পায় না। রবির পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে মুন্নি ও শীতলের চার বছর বয়স্ক ছেলে দীপু যখন ঘনিষ্ঠ খেলার সাথী হয়ে উঠে দু'জনেই শীতল ও রবিকে মাম্মি-ড্যাডি বলে সম্বোধন করতে থাকে এবং মজা করে গান গেয়ে ওঠে—'পাপাকো মম্মিসে, মম্মিকো পাপাসে প্যার হায়, প্যার হায়' তখন দর্শক ওদের গানের কথাকে সমর্থন করে এই কামনাই করে যে, রবি ও শীতল যত শীঘ্র সম্ভব পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। সম্পর্কিত ভাই বাদল যখন রবির মার কাছে জানায়, রবি সন্তানবতী এক বিধবাকে বিবাহ করতে উদ্যত ও বিধবাটির সেই সন্তান অবৈধ, তখন রবির মায়ের সনাতনী সংস্কারাচ্ছন্ন মন রবির বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠলেও দর্শক কিন্তু রবির মার আচরণকে সমর্থন না করে রবির পক্ষেই রায় দিয়েছে; কারণ তারা দেখেছে, শীতলের প্রথম স্বামী রাজ তাকে দেবতার সমক্ষে ধর্মপত্নী বলে স্বীকার করেছে এবং তাদের পরস্পরের মিলনের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

বিধবা শীতল ও বিপত্নীক রবির মধ্যে প্রেম 'আন্দাজ' ছবির কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য হলেও, ওদের দুজনেরই অতীত প্রেম ও দাম্পত্য-জীবনকে দুটি ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। শীতলের রাজের সঙ্গে প্রেম ও গোপন পরিণয় একটি আনন্দের দিনে দুর্ঘটনার ফলে রাজের মৃত্যুতে কেমন করে গভীর বিষাদময়তার মধ্যে শেষ হয়েছিল এবং অপরদিকে রবির বিবাহিত সুখী জীবনে সন্তানজন্মের ফলে তার স্ত্রী মোনার অপমৃত্যুর মাধ্যমে কি আকস্মিকভাবে ছেদ পড়ে, দুই-ই দর্শক দেখছেন তাদের বর্তমান জীবনের অন্তর্নিহিত শূন্যতাকে উপলব্ধি করবার জন্যে।—এই সরল কাহিনীটিকে কিছুটা পল্লবিত করবার জন্য রবির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এক গ্রাম্য তরুণীর চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, যার প্রতি রবিরই এক বোবা চাকর তার নিরুচ্চার প্রেমনিবেদন করে একটি ক'রে ফুল উপহার দিয়ে এবং যে শেষ পর্যন্ত রবির সম্পর্কিত ভাই বাদল দ্বারা ধর্ষিত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এমন কি, এই তরুণীটির আত্মহত্যার জন্যে রবিকেই দায়ী করা হয় প্রথমে। অবশ্য রবি নিজেই রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে নিজেকে দোষমুক্ত করে।

শ্রেফ প্রেমের চিত্র হিসাবে 'আন্দাজ' সার্থকতা লাভ করেছে। চার-পাঁচ বছরের দুটি বালক-বালিকার উপস্থিতি এই প্রেমকে দিয়েছে পবিত্রতা ও মাধুর্য। গুলজারের সংলাপ ও হসরৎ জয়পুরীর রচিত গীত ছবিটির মাধুর্যকে করেছে বর্ধিত।

অভিনয়ে রবি, রাজ, শীতল ও মোনার ভূমিকায় যথাক্রমে শাম্মী কাপুর, রাজেশ খান্না, হেমা মালিনী ও সিম্মী অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে দরদী চরিত্র চিত্রণের সাহায্যে কাহিনীটিকে মনোহর করে তুলেছেন। গ্রাম্য তরুণী বেশে অরুণা ইরাণী কাহিনীর লঘু অংশটিকে উপভোগ্য করতে সহায়তা করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অজিত (রাজের বাবা), অচলা সচদেব (রবির মা), অভি ভট্টাচার্য (গির্জার পাদরী), বেবী গৌরী (মুন্নি), মাস্টার অলঙ্কার (দীপু), বাদল (রূপেশকুমার), মলধাওয়া (বোবা চাকর) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনয় করেছেন।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। শঙ্কর-জয়কিষণ-কৃত সুরে গাওয়া 'জিন্দগী এক সফর হায় সুহানা', 'দিলে প্যাস ওইসী প্যাস দুল্ড়ী-

হে' এবং 'হায় ন বোলো বোলো' গানগুলি অনায়াসেই কানকে তৃপ্ত করে অপরিসীম মাধুর্যে ভ'রে।

সিপ্পি ফিল্মসকৃত 'আন্দাজ' দর্শকদের প্রচুরভাবে খুশী করবে।

(২) বিপর্যয়ের মুখে অসহায়া বালিকা

মাতৃহারা ছোট্ট মেয়ে কমলের একমাত্র আশ্রয় তার বাবা—ঠাকুর সামন্তের সিং। বাবাকে সে বারবার জিজ্ঞেস করে; মার মতো তুমিও আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে যাবে না তো? আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সামন্তের বলে, না বেটি, তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না।—কিন্তু নির্মম নিয়তি! বেচারা কমলের জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠানের আসর থেকে পুলিশ সামন্তেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল জাদুঘর থেকে মণিকাখচিত বিক্রমূর্তি চুরি করার অপরাধে। যাবার সময়ে বন্ধু রণজিতের ওপর মেয়ে ও সম্পত্তির ভার দিয়ে গেল সামন্তের। কিন্তু হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গেল। 'বাবাকে ফিরিয়ে আন', বাচ্চা কমলের এই কাতরোক্তিতে বিগলিত হয়ে তার পিতৃবাতুল্য গুলর্থা বন্দুক হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং মুহূর্তে গুলির আঘাতে পুলিশের গাড়ীকে স্তব্ধ করে সামন্তেরের মোটরকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল তীব্রবেগে। অনুসরণকারী পুলিশ বহু দূর পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করবার পরে সবিস্ময়ে দেখল গাড়ীটি হাজার ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রবক্ষে। পুলিশ জানল, ওদের মৃত্যু ঘটেছে।

রণজিৎ তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার স্ত্রী ও পুত্র রঘুবীরের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। রণজিতের স্ত্রী চেয়েছিল, কোনোক্রমে তার ছেলের সঙ্গে কমলের বিয়ে হয়ে গেলে সামন্তেরের অগাধ সম্পত্তি তারই ভোগ-দখলে থাকবে। তাই কমল যখন বড়ো হল, তখন ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্যে সে রঘুবীরকে উপদেশ দিত। রঘুবীরের উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকমের। সে চাইত কমলের সঙ্গে মজা লুটতে—বিবাহের প্রতি তার কোনো রকম আগ্রহ ছিল না। একদিন যখন কমলাকে কলেজে পৌঁছবার অছিলায় সে তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর বল-প্রয়োগ করতে চেয়েছিল, তখন কমলকে রঘুবীরের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল ডাক্তার সন্দেব নামে একটি সুদর্শন যুবক। সন্দেবের সঙ্গে পরিচয়কে ক্রমে ভালোবাসায় পরিণত হতে দেখে রঘুবীর ক্ষেপে গেল এবং জ্ঞানদর্শন মুখোশধারীর সাহায্যে কমলকে ভয়ঙ্কর করে তুলল। পিতা রণজিতের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে সে কমলাকে অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণ ক'রে তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করে দিল। সেখানে বহু নির্যাতন ভোগ করবার পরে কমল সুযোগ বুঝে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ডাঃ সন্দেবের আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছল দৈবক্রমে এক দুর্ঘটনায় আহত হবার পরে। [illegible] [illegible] ও [illegible] বহু [illegible] ছদ্মবেশে সমুদ্রোপকূলে মাছের ব্যবসা করবার পরে প্রচুর অর্থোপার্জন করে কেদার নামে এক গুণ্ডার সহায়তায় সেই বিক্রমূর্তি এবং মণিকাখচিত একটি ছোরা পুলিশের হেপাজত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সফলভাবে কেদার ওগুলিকে হস্তগত করে সামন্তের ও গুলর্থার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পরে ওরা দুজনে এসে পড়ে ডাঃ সন্দেবের বাড়ীতে। কেদার ঐ বাড়ীতেই জিনিসদুটিকে লুকিয়ে রেখেছে, এই সন্দেহে ওরা সন্দেব ও কমলের ওপর পীড়ন করতে থাকে। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে যাবার পর ওরা যখন প্রকৃত সত্য জানতে পারে, যখন শোনে মেয়েটি ওদেরই সেই ছোট্ট আদরের কমল, তখন ওদের অনুতাপের শেষ থাকে না এবং সেই অভিশপ্ত বিক্রমূর্তি ও ছোরাকে হাতে পেয়ে সামন্তের জলে ফেলে দেয়। কিন্তু তখনও সামন্তেরের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরবার মুহূর্তটিতেই পুলিশের গুলি ওর বক্ষ ভেদ করে।

—প্রচুর উত্তেজনাময় ঘটনাপ্রধান এই কাহিনীটিকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে রামজে প্রোডাকসন্স (ইণ্ডিয়া)-র ইস্টম্যান কলার ছবি 'এক নান্হী মুন্নী লেড়কী থী'। বিশ্রাম বেদেকার পরিচালিত এই ছবিটিতে সাসপেন্স ভীতিরসের সঙ্গে সন্তানবাৎসল্য ও প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে ঝগড়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন রসাত্মক ঘটনাবলীকে একসঙ্গে চালাতে গিয়ে ছবির ভারসাম্য বিচ্যুত হয়েছে প্রায়ই। ফলে ছবিটি একটি অনিবার্য পরিণতির পথে সুষ্ঠুভাবে এগোতে পারে নি।

তবু প্রাচীন শিল্পী পৃথ্বিরাজ-এর অনবদ্য অভিনয় ছবিটিতে দিয়েছে প্রাণের স্পন্দন। তাঁর ঠাকুর সামন্তের হচ্ছে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ। বিভিন্ন রসের

শুক্রবার, ৬ই আগষ্ট!

অশোককুমার আবার আরেকটি মহৎ চিত্র — একটি সমস্যাসঙ্কুল সামাজিক চিত্র উপহার দিচ্ছেন।

অধিকার ...... অধিকার ...... অধিকার

একে নিয়ন্ত্রণ করে কে? মানুষের তৈরি সমাজ, না, মানবিকতার আহ্বান? কেন তাহলে একজন নারী তার পবিত্র সম্পর্ককে বিসর্জন দেয়?

প্রত্যেক পরিবারের অবশ্যই একটি দর্শনীয় চিত্র !

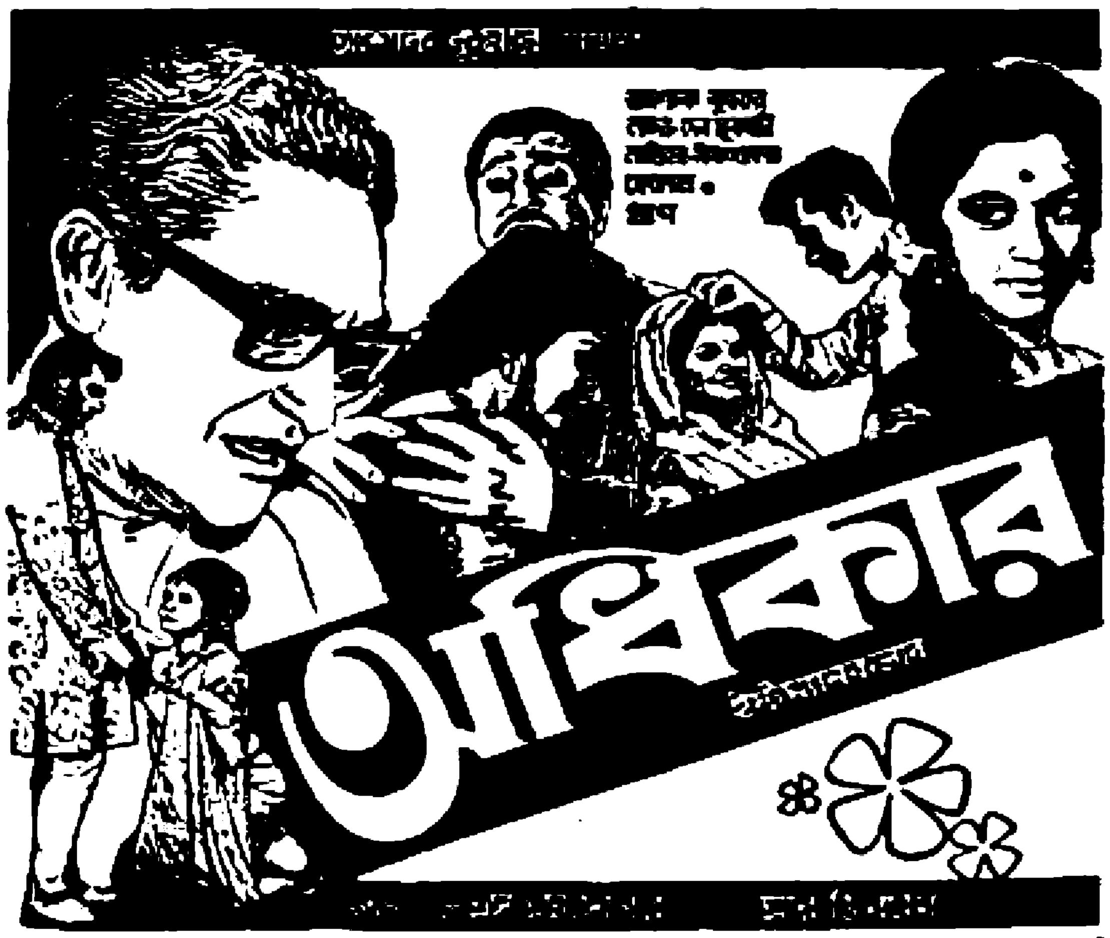

জ্যোতি - জেম - প্রভাত - লিবার্টি
খান্না - রূপালী - পার্কশো - ভবানী

প্রিয়া ও শ্রী-তে মধ্যাহ্নিক প্রদর্শনী

ন্যাশনাল — মৈত্রী — নবভারত — নবরূপম — অশোক — লিলুয়া
চন্দ্রলোক — তটিনী — অন্নপূর্ণা — মায়াপুরী — মুক্তি — সংঘম — মীনা
বিহার (ঝরিয়া) — প্রভাত (কটক)

এবছর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হবে আগামী সংখ্যায়। ছয়টি সুনির্বাচিত আলোচনা এবং শিল্পগুরুর অসংখ্য শিল্প-নিদর্শনের প্রতিলিপিসহ প্রকাশিত হবে সংখ্যাটি

অভিব্যক্তি কি নিপুণভাবেই না প্রকাশ করেছেন এই সিদ্ধ শিল্পী। তাঁর সহচর-রূপে গুনখানের ভূমিকায় জহরও সার্থক অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে হেলেনের নাচের সঙ্গে তাঁর গান আশ্চর্য মাদকতার সৃষ্টি করে। খলনায়ক রঘুবীরের ভূমিকায় শত্রুঘ্ন সিংহের অনবদ্য অভিনয় তাঁকে বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের উঠতি ভীলেন রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। শিশু কমল রূপে ববী বহুটুকু সুন্দর কাজ করেছে, বড়ো কমল-বেশে মমতাজকে তার হাঁজারগুণ বেশী কাজ করতে হয়েছে। মমতাজ যে একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই ছবিতে কি প্রেমের দৃশ্যে, কি নিপীড়িত হওয়ার দৃশ্যে—তিনি সু-অভিনয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি বহু ছবিতেই তাঁকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে। মনে হয়, তিনিও যেন স্থির পদক্ষেপে নায়িকার মুকুট ধারণ করবার যোগ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। নায়ক ডাঃ সন্দেশরূপে সুরেন্দ্র-কুমারকে মানিয়েছে ভালো, তবে তাঁর অভি-নয়ের আরও উন্নতির অবকাশ আছে। ভীলেন কেদারবেশে শ্যামকুমারও সার্থক। এছাড়া সজ্জন (রণজিৎ), নাদিরা (রণজিতের স্ত্রী), হীরালাল (ফেল্স), ধুমল (রামু), লক্ষ্মীছায়া (পুলিশ-প্রেরিত নারীচর) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। হেলেনের নৃত্য ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারে। বিশেষ করে ছবির শিল্পনির্দেশনা দৃষ্টি আকর্ষক। গণেশের সুরযোজনা অভিনবত্ব-পূর্ণ।

রামজে প্রোডকসন্স (ইণ্ডিয়া) নিবেদিত 'এক নান্হী মুন্নী লেড়কী থী' একটি বহু ঘটনাপূর্ণ রহস্যচিত্র।

রবিবার ৮ই আগস্ট ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
শতাব্দীর নতুন নাটক
সাগিনা মাহাতো
গল্প : গৌরকিশোর ঘোষ
নাটক ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট : দেবী পুস্তকালয় (হেদুয়া মোড়)
ও অভিনয়ের দিন সকাল ১১টা থেকে হলে।

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে
নান্দীকার
১০ই আগস্ট মঙ্গলবার ৬৷৷টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাকাডেমীতে টিকিট বেলা ১টা—৩টা

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
শনি ও রবি ২৷৷ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
১২ই আগস্ট বৃহস্পতিবার ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টুডিও থেকে

'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' শীঘ্রই আসছে

জয়দীপ পিকচার্সের নিবেদন 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' অবশেষে দর্শকদের আনন্দে মাতাতে আসছে। ছবিটি মিত্রা, বীণা ও বসুশ্রী-তে মুক্তির অপেক্ষায়। মুখ্য দুটি চরিত্রে আছেন দুই হাস্যকৌতুক—সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। ছবির রোমান্টিক জুটি হচ্ছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী এবং তাঁদের সঙ্গে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী, কল্যাণী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রূপক মজুমদার।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত-রচনা প্রণব রায়ের। শ্যামল মিত্রের সুর-সংযোজনা এ-ছবির অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। হাস্য-মুখর ছবিটির প্রযোজনা করেছেন বাদলরাজ সিন্‌হা।

পুজোয় আসছে 'খুঁজে বেড়াই'

গীতাঞ্জলি পিকচার্স নিবেদিত ও এস বি ফিল্মস পরিবেশিত 'খুঁজে বেড়াই' রূপবাণী, ভারতী ও অরুণাতে পুজোর অন্যতম আকর্ষণরূপে চিহ্নিত।

আজকের সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় মানুষের চাওয়া-পাওয়ার চলচ্চিত্র-রূপ হচ্ছে 'খুঁজে বেড়াই'। পরিচালনা করেছেন বহু সফল ছবির পরিচালক সলিল দত্ত। এই ভিন্ন স্বাদের কাহিনীর চিত্রনাট্য ও সংলাপও তিনিই রচনা করেছেন।

সংগীত-পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়।

ছবিটির ভূমিকালিপিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শোভা সেন, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস শেফালি ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাপুজোর আকর্ষণ 'শচীমার সংসার'

মহাপুজোর প্রাক-লগ্নে মালবিকা চিত্রের নিবেদন ভক্তিরস-প্রধান চিত্র 'শচীমার সংসার' মুক্তিলাভ করছে।

ভূপেন রায় পরিচালিত ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে আছেন ননী দাস। সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন অমিয় মুখোপাধ্যায়।

শচীমা এবং নিমাই-এর চরিত্রে রূপ-দান করেছেন সন্ধ্যারাণী এবং অসীমকুমার। অন্যান্য চরিত্রচিত্রণে : দিলীপ রায়, তরুণ-কুমার, জহর রায়, অসিতবরণ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, শমিতা বিশ্বাস, নবাগতা সংহিতা রায় ও জুঁই বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা মিত্র, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস বি ফিল্মস্।

মঞ্চাভিনয়

আগন্তুকের 'আবর্ত' : কৃষক-জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, যন্ত্রণা ও সবশেষে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার দৃপ্ত শপথকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনী 'আবর্ত'। আর এরই মুখরতাতেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে নাটকের দুর্বার এক সংঘাত। কাহিনীটির প্রবহমানতাকে যিনি সংলাপের কল্লোলে ভাষা দিয়ে মঞ্চের আলোয় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন, তিনি হোলেন বরুণ দাশগুপ্ত। উত্তর কলকাতার একটি নতুন দল 'আগন্তুক গোষ্ঠী' সম্প্রতি এই নাটকের একটি মোটামুটি সপ্রতিভ প্রযোজনা উপস্থিত করে নাট্যানুরাগীদের মনে কিছুটা স্থান করে নিতে পেরেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

চষার ছেলে 'সনাতন' আর 'রাজা'কে নিয়েই গড়ে উঠেছে নাটকটির মূল ঘটনা। শহরের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করলে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, অন্তত দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে যান্ত্রিক শহরের মাঝখানে এলো 'সনাতন'। আর তারই ছোটভাই 'রাজা' জোতদার মহিম ঠাকুরের পরামর্শে আর উৎসাহে তারই অনুর্বর জমিতে ও ধারের টাকায় লেগে গেলো ভাগচাষে। দিন-রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই অনুর্বর জমিতে সোনার ফসল তুলে দিল রাজা, কিন্তু জোতদার মহিম ঠাকুরের প্ররোচনায় ও ছলচাতুরিতে সে ফসল তার গোলায় সে তুলতে পারলো না। এমন কি ভাগ্যের দুঃসহ নিষ্ঠুর চক্রান্তে তার বাড়ী ঘরও বাঁধা পড়লো। কি করবে রাজা। সামনে কোন উপায় না দেখে দাদা সনাতনের কাছে শহরেই যাবে ঠিক করলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে শহর থেকে বেকার হয়ে ফিরে এলো সনাতন। যন্ত্রণার অতলে তলিয়ে না গিয়ে সে অন্য আর সব কৃষকদের আহ্বান জানালো বাঁচার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য।

মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশিত এই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গোকুল সেন। নাটকটির মূল সুর সম্পর্কে তিনি যে বেশ সচেতন ছিলেন, বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত থেকেই তা প্রতিভাত হয়। শিল্পীদের স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণের জন্য সামগ্রিক প্রযোজনাটি মোটামুটিভাবে শৈথিল্যমুক্তই ছিল বলতে হবে।

'সনাতন' চরিত্রটিকে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় মঞ্চে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন কার্তিক ভট্টাচার্য। কিন্তু কানু ব্যানার্জীর 'রাজা' বোধ হয় সব সময়ে সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। আর দুটি সুষ্ঠু অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন প্রশান্ত ব্যানার্জী (বঙ্কু) ও পরেশ মুখার্জী (সুবল)। অন্য কয়েকটি চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় চিহ্নিত করেন উমাপ্রসাদ ব্যানার্জী (ইনসপেক্টর), অপেন্দু দেব (মহিম ঠাকুর), সবিতা মুখার্জী ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

ইসকাবনের গোলাম : বেথলীগঞ্জের অন্যতম নাট্যগোষ্ঠী 'উদয়ন সংঘের' শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'ইসকাবনের গোলাম' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন। সমর সেনের নির্দেশনায় নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনায় অনেক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ ছিল। কয়েকটি ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করেন শিখা মুখার্জী, শম্ভু কৌশিক, আশোক নাহা, প্রবীর গোস্বামী, বঙ্কিম ঘোষ, নীলমণি গোস্বামী, দ্বিজেন চক্রবর্তী, সমর সেন।

তিনটি একাঙ্কিকা : সম্প্রতি নাট্য সম্প্রদায়ের শিল্পীরা মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে তিনটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করলেন। নাটক তিনটি হোল শিবপ্রসাদ জাহ্নবীর 'বলি', সলিল চৌধুরীর 'সবুজ নেই' ও [illegible] 'প্রজাপতির পাপ'। [illegible] পরিচয় মেলে এই তিনটি একাঙ্কিকাতেই। তা ছাড়া 'প্রজাপতির পাপ' নাটকটিতে পাত্রী নির্বাচনের মতো একটি পুরো [illegible] ও সামাজিক ব্যাপারকে [illegible] এক করুণ নাটকীয় বিন্যাসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কৌশিক সান্যাল নির্দেশিত নাটক তিনটির কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন সন্তোষ ভট্টাচার্য, অরুণ বসু, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, মুকুল দাস, মল্লিকা দাস, অঞ্জলি সেন, পবিত্র ভৌমিক, প্রণব বসু, কল্যাণ সর্বাধিকারী, নবীন দাস ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

মূকাভিনেতা যোগেশ চক্রবর্তী : বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা ও বহির্বাংলায় মূকাভিনয় পরিবেশন করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শিল্পী পরিবেশিত প্রত্যেকটি বিচার পরিণত শিল্প চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে।

বিবিধ সংবাদ

ভারত ভ্রমণে শঙ্করস্কোপ

মঞ্চ ও পর্দার সাহায্যে বিভিন্ন 'সিঙ্ক্রোনাইজড' নৃত্যগীতসংবলিত ও কৌতুক প্রদর্শনীপূর্ণ 'শঙ্করস্কোপ' যে কলিকাতাবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। যাতে এই অভিনব অনুষ্ঠানটি ভারতের বিভিন্ন শহরের অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ করতে পারে, এবার তারই আয়োজন চলেছে।—শনিবার, ৩১ আগস্টে ময়দান প্রেস ক্লাব টেন্টে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীউদয়শঙ্কর এই কথাই জানালেন। অক্টোবর মাসে এই 'শঙ্করস্কোপ' অনুষ্ঠিত হবে দিল্লীর 'মভলঙ্কর' হলে। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শহরে প্রদর্শনী হবার পরে বোম্বাই শহরের বিরাট 'ষন্মুখানন্দ হলে' অনুষ্ঠানটির আসর বসবে জানুয়ারীর মাঝামাঝি এবং একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ ধরে চলবে। এর পরে এটি মাদ্রাজেও

ষ্টার থিয়েটার

(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)

স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯

— নতুন নাটক —

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, মেনকা দাস, কুমারী বিষ্ণু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

সুরঙ্গমা

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন

৩৩, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিকাতা—২৬

নূতন শিক্ষাবর্ষ জুলাই থেকে ॥ ভর্তি চলছে

কার্যালয় শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৮টা, রবিবার সকাল ৭টা থেকে ১টা এবং সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮॥টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সুপরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম অনুযায়ী প্রণালীবিদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাগসংগীত ও প্রাচীন বাংলা গান ডিপ্লোমা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অগ্রসর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা দেন। ভরত-নাট্যম, মণিপুরী ও কথাকলি পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার পাঠক্রম সুপরিকল্পিত। শিশুদের উভয় বিষয়েই চার বছরের পাঠক্রম। বয়স্কদের উভয় বিষয়েই পাঁচ বছরের সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম। এস্রাজ ও গীটার প্রত্যেক বিষয়ের পাঠক্রম পাঁচ বছরের।

প্রদর্শিত হবে। শ্রীশঙ্কর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি অল্পকালের মধ্যেই একটি স্মরণীয় ব্যালে এই 'শঙ্কর-স্কোপ'-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত করবেন। তিনি আরও জানান, 'উদয়শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ' নামে একটি সংস্থা তৈরী হচ্ছে চলচ্চিত্র নৃত্যগীতের সর্বাঙ্গীণ চর্চার জন্যে।

অ্যাপোলো ১৫'র প্রস্তুতিচিত্র

মানুষের সভ্যতার বিকাশকে পরম্পরা ধারাবাহিকভাবে প্রতীকের সাহায্যে দেখাবার পর মানুষের মহাকাশ অভিযান ও সাম্প্রতিক অ্যাপোলো ১৫'র চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতিপর্ব অতি সুন্দরভাবে নির্মিত একটি স্মরণীয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল সেদিন আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটিতে অ্যাপোলো ১৫'র অভিযাত্রী তিনজন—আলফ্রেড ওয়ার্ডেন, জেমস আরউইন এবং ডেভিড স্কটের অভিযানসম্পর্কীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়চিত্ততাও তাঁদের সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্পী সংসদ-এর নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি : উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতিগণ : বিকাশ রায়, পঙ্কজ সেন, শচীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অরুন্ধতী ও শ্রীমতী মলিনা দেবী। সম্পাদক : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক : শ্যামল মিত্র ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ : জহর রায়। কার্যকরী সমিতি : হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার চক্রবর্তী, শিশির মিত্র, অজিত মিত্র, প্রভাত ঘোষ, মৃদুলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তী ও শ্রীমতী জয়শ্রী সেন।

এই বৎসর শিল্পী সংসদের নিজস্ব চিত্র 'বনপলাশীর পদাবলী' উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়ার ইয়োরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ

কোলকাতার প্রখ্যাত পাপেট গোষ্ঠী ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া গেল ৫ আগস্ট ১৯৭১-এ আমেরিকার নাসভিল-এ যাত্রা করেছে আমেরিকার বিখ্যাত পাপেট গোষ্ঠী 'পাপেটিয়ার্স অফ আমেরিকা'র দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে শিক্ষা ও পাপেট্রী সম্মেলন ও জাতীয় উৎসব (১৯৭১)-এ যোগদান করতে। ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া উক্ত জাতীয় উৎসবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাপেট গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেরাও অংশ গ্রহণ করবে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার গোষ্ঠীর সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাপেট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সংস্থাটি আপন খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে ও বিগত ১৯৭০ সনে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় উৎসবে 'অল রাউণ্ড বেস্ট পারফর্ম্যান্স টিম' লাভ করেছে।

রাজেন্দ্রভপাড়া ব্যায়াম সমিতির ৬৪তম বার্ষিক উৎসব

গত ২৮শে জুন সোমবার সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে রাজেন্দ্রভপাড়া ব্যায়াম সমিতি উদ্‌যাপন করল তাদের শুভ ৬৪তম বার্ষিক উৎসব। ধূপ, দীপ ও সুগন্ধিতে আমোদিত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শঙ্খধ্বনি ও পণ্ডিত কিরণশঙ্কর সম্প্রদায়ের সানাই বাদ্যে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। শান্তিবচন ও বেদ পাঠ করেন পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ। কুমারী শর্মিষ্ঠা ঘোষের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বরণ করেন উদ্বোধক প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়, প্রধান অতিথি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং বিশিষ্ট অতিথি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে সভাপতিরূপে। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস স্বাগত ভাষণ জানান।

উদ্বোধক শ্রীরায় বলেন—৬৪ বছরের প্রতিষ্ঠান আজও যে নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত কিছু বজায় রেখে চলেছে এটা বাস্তবিকই গৌরবের। সমিতির ব্যায়াম শিক্ষক [illegible] সমিতির সভ্যগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে মাধুরী বসু, সোনালী দাস, রিন্টু মিত্র। সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ দেন শ্রীসুরবোধ মল্লিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগীয় সম্পাদক দুলাল ঘোষ। প্রধান অতিথি ডঃ চৌধুরী বলেন—দীর্ঘ দিনের এ সমিতির কার্যাবলী সত্যই প্রশংসার্হ। এই সমিতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। সভাপতির ভাষণে শ্রীভট্টাচার্য বলেন—সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রমথ হেমন্তদার সঙ্গে বহু সেবামূলক কাজ করেছি। তাঁর কার্য পদ্ধতিকে সমিতি আদর্শ কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে শুনে আনন্দিত হলাম। প্রত্যেক সংগঠনই দু-একজন কর্মীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় চলে কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ কর্মীর উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যায় তখনই দেখা দেয় সমিতির অচলাবস্থা ও নিষ্প্রাণতা। এ সমিতি সে অভাববোধ করে না বলে আজ ৬৪ বছরে পদার্পণ করল পূর্বসূরীদের গৌরবকে বজায় রেখে। প্রার্থনা করি এদের কার্য পদ্ধতি আরও প্রসার লাভ করুক। পরিশেষে সমিতির প্রধান সংগঠক শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাময়িক বিরতির পর সাংস্কৃতিক শাখার সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক 'অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ও শ্রীঅমর বসু পরিচালিত ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটক 'ফুল্লরা' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

বিপ্লবী নায়ক : তারকনাথ অপেরা এবারের নতুন মরশুমে দীপ্তিকুমার শীল রচিত নতুন পালা বিপ্লবী নায়ক বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করবেন। এছাড়া চারণ-কবি মুকুন্দ দাস (ভূপেন চক্রবর্তী), মধুমালতী (বলরাম সাঁতরা) ও রক্তের বাঁধন (নন্দগোপাল রায় চৌধুরী) পালা-গুলিও পরিবেশন করবেন। দলে আছেন প্রখ্যাত নট তারা ভট্টাচার্য, রেখা ভট্টাচার্য, সুখেনকুমার ও [illegible]

এয়ারপোর্টে / বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, জর্জ কেনেডি

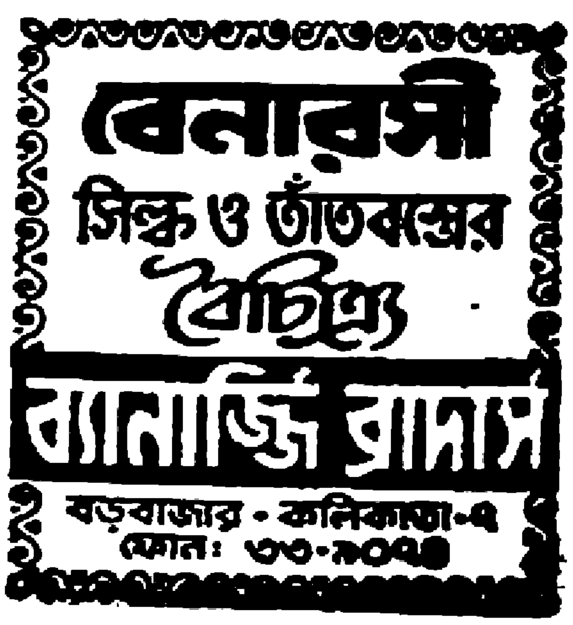

লর্ডস মাঠে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ১ম টেস্ট খেলার শেষ দিনে ভেঙ্কটরাঘবনের বলে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ 'ক্যাচ' তুললে সোলকার তা ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে

লর্ডস মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলার বিবরণ এবং ফলাফল অমৃতের গত সংখ্যাতেই আপনারা পেয়ে গেছেন। এই সংখ্যায় প্রথম টেস্ট খেলার বিভিন্ন দিকের আলোচনা এবং সেই সঙ্গে বিদেশী ক্রিকেট সমালোচকদের মন্তব্য দেওয়া হল।

লর্ডসের প্রথম টেস্টের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা রীতিমত জমেছিল। বৃষ্টির ফলে চা-বিরতির পর খেলা বাতিল হওয়াতে দু' পক্ষেরই মুখরক্ষা হয়েছে। চা-বিরতির পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৪৫ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলাটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে খেলার ফলাফল ড্র দাঁড়ায়। যে অবস্থায় খেলাটি বাতিল হয়েছে তাতে বলা যায় সেই সময় খেলার গতি খানিকটা ইংল্যান্ডের অনুকূলে ছিল। তবে ইংল্যান্ডের এই অনুকূল অবস্থার পরিবর্তন করা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল এমন কথা ক্রিকেট খেলায় জোর দিয়ে বলা চলে না। জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের আর ৩৮ রানের দরকার ছিল, হাতে ছিল দুটো উইকেট। শেষ দিনের খেলায় ১১১ রানে ১৩টা উইকেট পড়ে—ইংল্যান্ডের ৪৬ রানে ৫টা এবং ভারতবর্ষের ১৪৫ রানে ৮টা। এই ৮টা উইকেট পাওয়ার মধ্যে ইংল্যান্ডের বোলারদের বিশেষ কোন বাহাদুরী ছিল না। কারণ দ্রুত গতিতে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে গিয়েই ভারতীয় খেলোয়াড়রা আউট হয়েছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কটরাঘবন অল্প রানে ইংল্যান্ডের শেষ পাঁচটি উইকেট নিয়ে শুধু তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয়ই দেননি, দলের হাতে জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ তুলে দিয়েছিলেন।

শেষ দিনে যখন ইংল্যান্ড খেলতে নামে তখন তাদের রান ছিল ১৪৫ (৫ উইকেটে) এবং হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের আরও ৫টা উইকেট। সুতরাং ইংল্যান্ডের অনুকূলেই খেলার গতি ছিল। কিন্তু দেড় ঘন্টার মধ্যেই ১৯১ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হলে খেলার গতি ভারতবর্ষের অনুকূলে ঘুরে যায়। ইংল্যান্ড ৯০ মিনিটের খেলায় তাদের শেষ পাঁচটা উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১৪৫ রানের সঙ্গে মাত্র ৫৬ রান যোগ করেছিল। ইংল্যান্ডের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কট-রাঘবন। এই দিনের খেলায় চন্দ্রশেখর ২৫ রানে ২টো এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১০ রানে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন।

খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ১৮৩ রানের দরকার ছিল। হাতে ছিল ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট সময়। উইকেটের অবস্থা কিন্তু অনুকূল ছিল না। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলায়

শিবরামকুমার সম্পাদিত

গ্যালারী-র

(ক্রীড়া সাপ্তাহিক)

পেলে সংখ্যা

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের লেখা
ও চিত্রিত সমৃদ্ধ হয়ে এই
সপ্তাহেই বেরুচ্ছে।

দাম : ৩৫ পয়সা

গ্যালারী

১৪১।৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৪

প্রথম জয়লাভের এমন সুবর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষের হাতে আগে কখনও আসেনি। সুতরাং ভারতীয় খেলোয়াড়রা দ্রুত গতিতে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৩ রাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে খেলেছিলেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিয়ে রাণ তুলেছিলেন। প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলায় ৪৭ রাণ উঠেছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৪৭ রাণ, দুটো উইকেট পড়ে। ১৩ মিনিটের খেলায় দলের ১০০ রাণ উঠেছিল। তৃতীয় উইকেট জুটি ইঞ্জিনিয়ার এবং গাভাসকার ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে ৫৩ মিনিটে ৬৬ রাণ তুলেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ৪৩টি বল খেলে তাঁর ব্যক্তিগত ৩৫ রাণ সংগ্রহ করেন। ইঞ্জিনিয়ারের বিদায়ের পরই রাণের গতি কমে যায় এবং তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে থাকে। এই পতনের মুখে একমাত্র গাভাস্কারই যা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজস্ব ৫৩ রাণ করেছিলেন।

বৃটিশ ক্রিকেট সমালোচকদের সমালোচনায় ভারতীয় স্পিন বোলিং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁরা চন্দ্রশেখর, বেদী এবং ভেঙ্কটরাঘবনের স্পিন বোলিংয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, ইংল্যাণ্ডের কোন খেলোয়াড়ই এঁদের বোলিংয়ে স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারেননি। ব্যাটিংয়ে প্রশংসা পেয়েছেন ওয়াদেকার, ইঞ্জিনিয়ার এবং গাভাস্কার। তবে তাঁরা পঞ্চমুখে ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা অতুলনীয়।

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

নয়াদিল্লীতে ভারত বনাম রুমানিয়ার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় রুমানিয়া ৩-১ খেলায় জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনে যে দুটি সিঙ্গলস খেলা হয় তার প্রথমটিতে রুমানিয়ার নাস্তাসে ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ভারতের জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় প্রেমজিৎলাল ১৪-১২, ৬-৩ ও ১-৭ গেমে রুমানিয়ার টিরিয়াককে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান (১—১) করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলাটি আলোর অভাবে অসমাপ্ত থেকে যায়। খেলা বন্ধের সময় ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৩-৬, ৮-৬ ও ৬-২ গেমে এগিয়ে ছিলেন। রুমানিয়ার পক্ষে ডাবলসের খেলায় নেমেছিলেন নাস্তাসে এবং টিরিয়াক।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ দ্বিতীয় দিনের অসমাপ্ত ডাবলসের খেলাটি আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ দিনে রুমানিয়ান জুটি নাস্তাসে এবং টিরিয়াক ৪-৬, ৬-৮, ৮-৬ ও ৬-১ গেমে ভারতীয় জুটিকে পরাজিত করে স্বদেশকে ২—১ খেলায় এগিয়ে দেন।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার বিপক্ষে এর আগে ভারতবর্ষ মাত্র একবার খেলেছে,—বুখারেস্টে ১৯৬৯ সালের ইন্টারজোন সেমি-ফাইনালে। এই খেলায় রুমানিয়া ৪—০ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ০-৫ খেলায় আমেরিকার কাছে হেরেছিল।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের জুন-জুলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীর ৯টি স্থানে দশম বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে। সম্প্রতি ১৯৭৪ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৯৮। এত বেশী দেশ ইতিপূর্বে যোগদান করেনি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে ১৯৭৪ সালের ১৩ই জুন। এই উদ্বোধনী খেলায় ১৯৭০ সালের চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের সঙ্গে কোন্ দেশ খেলবে, তা পরে ঠিক হবে। ফাইনাল খেলা হবে ৭ই জুলাই, মিউনিখের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে।

যোগদানকারী ৯৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৬টি দেশ পশ্চিম জার্মানীতে শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে গতবারের (১৯৭০) চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিল এবং ১৯৭৪ সালের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ পশ্চিম জার্মানী সরাসরি শেষ লীগ পর্যায়ে খেলতে নামবে। কিন্তু বাকি ১৬টি দেশকে প্রতিযোগিতার নিয়মমাফিক বাছাই পর্বের খেলায় অংশগ্রহণ করে শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ব্রেজিল এবং পশ্চিম জার্মানীকে বাদ দিয়ে ৯৬টি দেশকে নিয়ে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বের খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। যোগদানকারী দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করে এই ৬টি জোনে তাদের খেলা দেওয়া হয়েছে—(১) ইউরোপ, (২) আফ্রিকা, (৩) এশিয়া, (৪) দক্ষিণ আমেরিকা, (৫) উত্তর-মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান, (৬) ওসেনিয়া। প্রতি জোনের অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা এই রকম : ইউরোপীয় জোনে ৩৩টি, আফ্রিকান জোনে ২৪টি, এশিয়ান জোনে ১৫টি, দক্ষিণ আমেরিকান জোনে ১০টি, উত্তর-মধ্য আমেরিকান জোনে ১৪টি এবং ওসেনিয়ান জোনে ২টি।

অন্যান্য জোনের তুলনায় ইউরোপীয়ান জোনেই যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বেশী—৩৩টি। পশ্চিম জার্মানীতে শেষ পর্যায়ের খেলায় যে ১৬টি দেশ খেলবে তার মধ্যে ইউরোপের ৯টি দেশ তো খেলবেই, এমন কি ১০টি দেশও হতে পারে। কারণ ইউরোপীয়ান জোনের ৯নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ৩নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশের যে খেলা হবে তার বিজয়ী দেশই পশ্চিম জার্মানীর শেষ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে।

এশিয়ান জোনের দুটি গ্রুপে ১৫টি দেশ খেলবে—'এ' গ্রুপে ৮টি এবং 'বি' গ্রুপে ৮টি। ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'বি' গ্রুপে।

পশ্চিম জার্মানীতে ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশকে নিয়ে নক আউট প্রথায় খেলা হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ।। শ্রেষ্ঠ রচনা

দ্বিতীয় দফার বাংলা পকেট বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে

গ্রাহকগণ কুপন পাঠিয়ে সাতখানি বই সংগ্রহ করুন

যে সমস্ত এজেন্টগণ ও পুস্তক বিক্রেতা অগ্রিম মূল্য জমা দিয়েছেন দ্বিতীয় দফার পুস্তকগুলির জন্য তাঁদের চাহিদামত পাঠানো হচ্ছে।

।। প্রতিটি বই দু' টাকা ।।   ।। ভি-পি ডাকব্যয় ২·২০ পয়সা ।।

সাতটি বই-এর প্রচ্ছদ নমুনা নীচে লক্ষ্য করুন

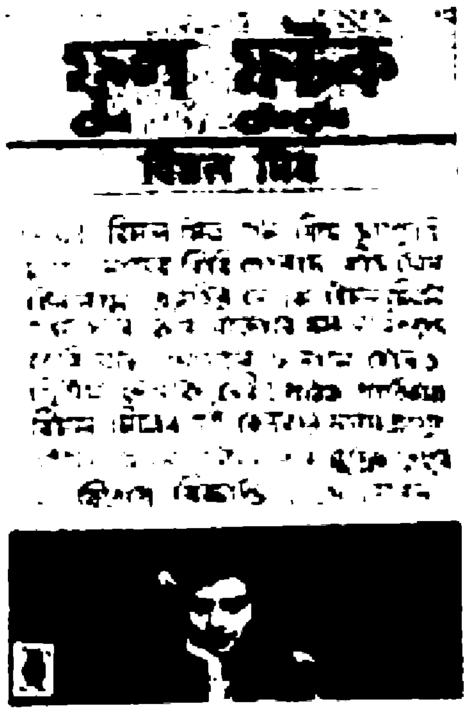

কেবলমাত্র গ্রাহকগণকেই সাতখানি বই একসংগে ২০% কমিশনে নিতে হবে।

এ-ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই সব সময় যে কোন বই পছন্দমত কিনতে পারেন। প্রতিটি বই ২,

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ লেখনীর নবীন স্বাক্ষর।

শতরূপে দেখা ১৪,

।। প্রকাশিত হচ্ছে ।।

নবীন লেখকের জীবন সাধনা সৃষ্টির উজ্জ্বল প্রকাশ আবদুল জব্বারের

মুখের মেলা ৮,

।। প্রকাশিত হচ্ছে ।।

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২। ফোন : ৩৪৩৪৯২ ও ৩৪৮৭৯১

টাকা গাছে ফলে না

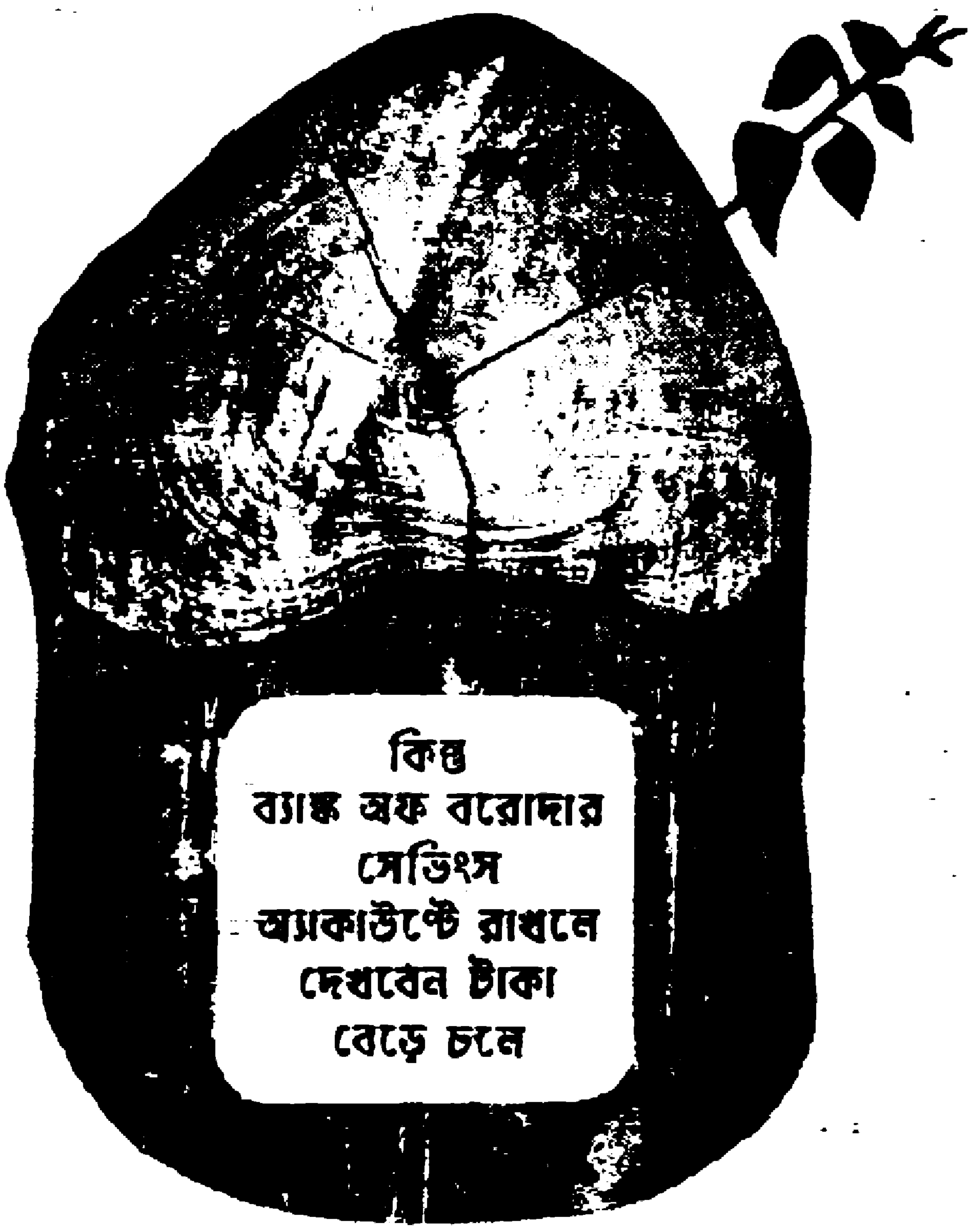

টাকা রোজগার করতে কি পরিশ্রম করতে হয় তা শুধু আপনিই জানেন। সে টাকা নিরাপদে রাখার দায়িত্বও আপনার নিজের, আর এটাও দেখতে হবে যে সে টাকা থেকে আপনি কিছু পাচ্ছেন। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

সেভিংস অ্যাকাউণ্ট। মাত্র ১ টাকা জমা রেখেই শুরু করতে পারেন। তারপর যত ইচ্ছে টাকা জমা দিন আর মোট টাকার পরিমাণের ওপর সুদ নিন। যে-কোন সময় ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন—আগে থেকে জানাবার কোন দরকার নেই।

নাবালকদের জন্যে সেভিংস অ্যাকাউণ্ট। ১০ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা সরাসরি টাকা জমা দিতে বা তুলতে পারে। আমানতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা। ১০ কিম্বা তার চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে কোন সর্বোচ্চ সীমা নেই। ব্যাঙ্কে জমা টাকার ওপর ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের জন্যে আয়কর দিতে হয় না, আর ১,৫০,০০০ টাকার সম্পত্তিকর রেহাই। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সেভিংস অ্যাকাউণ্টে টাকা জমা রাখুন—দেখবেন টাকায় টাকা ফলবে।

নির্ভরযোগ্য সোপান.

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

হেড অফিস: মান্ডভি, বরোদা
ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যের ৫০০ টিরও বেশী শাখা।
ইউ. কে., পূর্ব আফ্রিকা, মরিশাস, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও গিয়ানাতেও শাখা আছে।

Shilpi-BOB 1A/71 beng

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 13th August, 1971. ২৭শে শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৮৫	সম্পাদকীয়		—
৮৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৯২	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৯৩	অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার রঙ		—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৯৭	শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব		—শ্রীভূদেব চৌধুরী
১০৪	কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১০৯	শতবর্ষের আলোয় অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধা বসু
১১৩	কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
১১৭	গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
১২০	বাংলা গদ্যছন্দে অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
১২১	জনক রাজার ধানক্ষেত	(গল্প)	—শ্রীমহাশ্বেতা দেবী
১২৫	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১২৮	দুটি কবিতা	(কবিতা)	—শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
১২৮	অন্ধকারে নীল স্নিগ্ধ এক	(কবিতা)	—শ্রীজ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
১২৯	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১৩৫	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৩৭	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
১৪০	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
১৪৪	হলদিয়ার প্রতিশ্রুতি		—শ্রীসুধীরকুমার সেন
১৪৭	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
১৫১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
১৫২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১৫৪	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
১৬০	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : মুকুল দে

রাণী কাহিনী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·০০

নয়া বসত
শান্তিপদ রাজগুরু ॥ ৬·০০

অন্বেষণ
রমাপদ চৌধুরী ॥ ৫·০০

চম্বলের আতঙ্ক
চিরঞ্জীব সেন ॥ ৫·০০

গল্প মণিঘর
সুবোধ ঘোষ ॥ ১৪·০০

নিঃসঙ্গ পদাতিক
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮·০০

নীলাঙ্গুরীয়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ১০·০০

পাষণ্ড পণ্ডিত
নারায়ণ সান্যাল ॥ ৬·০০

কুমারী কন্যা
দীপক চৌধুরী ॥ ৮·০০

পঞ্চকন্যা
ফণিভূষণ আচার্য ॥ ১২·০০

কামিনীকাঞ্চন
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪·০০

নীলকণ্ঠী
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

নাগরী
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ ৪·০০

উত্তরঙ্গ
সমরেশ বসু ॥ ৬·০০

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা
নীলকণ্ঠ ॥ ১০·০০

সোনালী রেখা
প্রফুল্ল রায় ॥ ৪·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তৃতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত হইয়াছে
মিহিজামের স্বর্গীয় ডাঃ পরেশনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ
ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লিখিত হোমিও চিকিৎসার বই

আধুনিক
চিকিৎসা

মূল্য ৮৲, শোভন ৯৲, সাধারণ ডাক
মাশুল আলাদা
৫০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
ফোন ৫৫-৪২২৯

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান বই। লেখক নিজে একজন চিকিৎসক এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুত্র। তাই রোগ ও রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং এই অভিজ্ঞতাই বইটির উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি বইটিতে তাঁর পিতার চিকিৎসক-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যে চিকিৎসার দ্বারা এখানে উল্লেখিত তার নাম মিহিজামের চিকিৎসা ধারা।

অসুখ ও ওষুধ—এই দুটি বিষয়ের ওপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি সহজবোধ্য। যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

—যুগান্তর, ২০শে জুন, ১৯৭১

এক নজরে

বিজ্ঞান ও পৃথিবী :

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বিরাট বিরাট পরিবর্তনের কর্তৃক মানুষ নিচ্ছে তাতে আগামী পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর আবহাওয়া এমনভাবে পাল্টে যাবে যা মানুষের বর্তমান স্বাভাবিক জীবনকে অসম্ভব করে তুলবে। বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এখনও বছর দশেক সময় আছে। কিন্তু প্রকৃতি জয়ের নেশায় উন্মত্ত মানুষ এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করবে বলে মনে হয় না। —এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় স্টকহোমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিন সপ্তাহব্যাপী নিখিল বিশ্ব বিজ্ঞানী সম্মেলনে।

বিশ্ব বিজ্ঞানী সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল—পৃথিবীর আবহাওয়া ও পৃথিবীর বুকে বড় বড় ওলটপালটের বিপজ্জনক পরিণতি। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কলকারখানার ময়লা আর পোড়া কয়লা পেট্রোলের ধোঁয়ায় কিভাবে বাতাস দূষিত হচ্ছে, নদীর জল কলুষিত হচ্ছে তা উদ্বেগের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তার চেয়েও তাঁরা বেশি চিন্তিত হন পৃথিবীর বুকে যেসব বড় বড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তার পরিণতির কথা চিন্তা করে। যেমন পেট্রোলিয়মের সন্ধানে ও মানুষের খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে যদি সাহারা মরুকে শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত করা হয় তবে আইসল্যাণ্ডের মতো বরফচাপা হয়ে যাবে বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপ। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি সাইবেরিয়ার নদীগুলির গতিপথ ঘুরিয়ে দেয় ও সেগুলিকে নাব্য রাখার জন্য উত্তর মেরুর বরফ গলানোর ব্যবস্থা করে তবে তা পৃথিবীর সমগ্র উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়া পরিবর্তিত করে দিতে পারে। সমগ্র উত্তর আমেরিকা তখন আলাস্কার মতো হিমশীতল হয়ে পড়বে। আর পশ্চিম ইউরোপ হয়ে যাবে শুষ্ক। কৃষিকার্যে সেচের প্রয়োজনে যেভাবে নদীর জল ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে তাতে অনেক বেশি জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, যার ফলে বৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। বাতাসে যেভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে তাতে বৈজ্ঞানিকদের আশঙ্কা, এই শতাব্দীতেই সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার তাপ তিন সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে।

সব পর্যালোচনার শেষে বৈজ্ঞানিকরা মন্তব্য করেছেন, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই মানুষ এইসব সর্বনাশের খেলায় মেতেছে।

বালিকারা নতুন সমস্যা :

বৃটেনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর শ্রীক্যাসপার ব্রুক সেদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বারো থেকে ষোল বছরের মেয়েদের ভিড় দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হতে চায়, এবং কেন্দ্রগুলির পরিচালকরাও তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। কারণ তাঁরা দেখতে পান যে, ঐ বালিকারা প্রকৃত অর্থে কেউই কুমারী নয় এবং যে কোন মুহূর্তে ওদের যে কোনজন বিপন্ন হতে পারে।

শ্রীব্রুক আরও বলেন, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান সমস্যা হল আইনের প্রতিবন্ধকতা। কারণ আইনানুসারে যারা এখনও সম্মতির বয়সে (এজ অব কনসেন্ট) পৌঁছায়নি তাদের তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেন বা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করান কেমন করে? অথচ তারা যে অবস্থায় আসে শুধুমাত্র মানবিক কারণেই, সে অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীব্রুক ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের যে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতে তিনি দেখান যে, এ-বছরের প্রথম তিন মাসে, গত বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের গর্ভপাতের ঘটনা অত্যধিক বেড়ে গেছে। ১৯৭০ সালের প্রথম তিন মাসে ৩,৫১১ জন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার গর্ভপাত ঘটানো হয়; এ বছরের প্রথম তিন মাসে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪,৫৫৬। তাদের মধ্যে ষোল বছরের কম বয়সের বালিকার সংখ্যা ছিল ১,৭১১। এ অবস্থায় যদি বিপন্ন মেয়েদের আইনগত কারণে ক্লিনিক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গর্ভপাতের সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। এক বছরের ব্যবধানে ২৮ শতাংশ বৃদ্ধিও সামান্য কথা নয়।

এ ব্যাপারে নতুন আইনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে মেডিক্যাল ডিফেন্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। ঐ সংস্থার সহকারী সেক্রেটারি ডঃ জন ওয়াল সেদিন সাংবাদিকদের বলেন, কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা যদি অন্তঃস্বত্বা হয় তাহলে তার গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে আইনত অভিভাবকদের মতামতই চূড়ান্ত হবে এমন কোন কথা ফ্যামিলি ল রিফর্মস এক্ট-এ বলা হয়নি। ওসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেয়েটির মত অবশ্যই নিতে হবে এবং ও ব্যাপারে তার মতই হবে শেষ কথা। ডঃ ওয়াল বলেন : এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হল, একটি মেয়ে যদি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বয়স অর্জন করে থাকে তবে সে সন্তান তার কাম্য কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়সও তার হয়েছে। সুতরাং তার ওপর অন্যের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

বলা বাহুল্য, ঐ মেডিক্যাল ডিফেন্স ইউনিয়নের আন্দোলনের জন্যই আজ বৃটেনে বিভিন্ন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার গর্ভপাতকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। কদিন আগে হাউস অব কমন্সে শ্রমিক সদস্যা শ্রীমতী রেনো শর্ট অভিযোগ করেন যে, বিভিন্ন হাসপাতালের বহু চিকিৎসক এখন তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বা অন্য কোন কারণের জন্য গর্ভপাত ঘটাতে চাইছেন না, এবং তার ফলে গর্ভপাত আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে চলেছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার কিথ যোসেফ তখন শ্রীমতী শর্টকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, দেশের প্রয়োজনে গর্ভপাত আইন কতটা সহায়ক হচ্ছে সেটা পর্যালোচনার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, তাঁরা এ সম্পর্কেও তদন্ত করে দেখবেন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

ছায়া কালো-কালো

ইয়াহিয়া খানের রণহুঙ্কার ভারতবর্ষের পক্ষে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। এই দেশের সামরিক শক্তি পাকিস্তানের চেয়ে বেশী হলেও, সেই দেশের সামরিক শাসকচক্র একটা সংঘর্ষের জন্য একেবারে মুখিয়ে আছেন। মুক্তিফৌজের আক্রমণ যত তীব্রতর হয়ে উঠছে পূর্ব বাংলায় কর্মরত কম্যান্ডারবৃন্দ ততই পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাদের চাপ দিচ্ছেন কিছু একটা করে মুখরক্ষা করার জন্য। এই সূত্রে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভিয়েতনামের মার্কিন কম্যান্ডারবৃন্দ শুধু কম্বোডিয়ায় এবং হো-চি-মিন ট্রেইলের ঘাঁটিতে আক্রমণ করার চাপ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিদ্রোহ রুখবার জন্য উত্তর ভিয়েতনামেও হামলা চালিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণের লোভটা সংবরণ করেছিলেন। তবে তার পিছনে অন্য কারণও ছিল।

ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্র পূর্ব বাংলায় যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে মুক্তিফৌজের হাতে পরাজয় স্বীকার না করে বরং ভারতের হাতে চড় খাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাহলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে, স্বদেশে দেশাত্মবোধ জাগানো যাবে—বলা যাবে ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে মৃত্যু হলে একেবারে সশরীরে বেহেস্তে যাওয়া সুনিশ্চিত। পাকিস্তানী সেনাদল জেহাদের মানসিকতায় গড়ে উঠেছে। তার ওপর পাকিস্তানের মুরুব্বির জোর আছে। কোনো কোনো জীববিশেষ খোঁটার জোরে লড়াই করে। পাকিস্তানও কম কি, নিকসন চাচার ছত্র-ছায়ায় সে যা অস্ত্রসম্ভার পাচ্ছে তা একটা ছোট্ট দেশের পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর এই সব অস্ত্র আসছে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে। ওদিকে সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান তার দুই প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা ও চীনের কাছ থেকে অনেককিছু পেয়েছে এবং পাবে কিন্তু তার চেয়ে বেশী পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে। ভারী কামানশস্ত্র, স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং তিন স্কোয়াড্রোন জঙ্গী বিমান পেয়েছে। এই সব দ্রব্যগুলি আসলে পশ্চিমা মাল, শুধু হাত-ফেরতা হয়ে আসছে মাত্র। আরও জানা যায় ত্রিশ হাজার নতুন সেনা তৈরী হয়েছে, এই সেনা দিয়ে বোধ হয় পূর্ব-বাংলার গৃহযুদ্ধে নিহতদের কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করবে। পাকিস্তান শুধু ভাবছে এখনই তারা ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু করবে না বর্ষার পর—এই নিয়ে তাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে মতভেদ আছে। মুক্তিবাহিনীর অবস্থা বর্ষার শেষে কি রকম দাঁড়ায় অনেকে সেটা দেখতে চান; অপর পক্ষ বলছেন না, এখনই, দিই লাফ—

এই সব কারণে ভারতকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে তার সব কটি সীমান্তে। পাকিস্তান যে কোনো ঘাঁটিতে হঠাৎ একটা খেল শুরু করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু সুশিক্ষিত গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করছে। আরো কিছু আসতে পারে।

ইয়াহিয়ার ভারতবিদ্বেষ, উৎকট সমরস্পৃহা এবং হঠকারিতা সত্ত্বেও একথা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা সুচিন্তিত এবং তার পিছনে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী মস্তিষ্ক কার্যরত তা নয়, দু-একটি বিদেশী রাষ্ট্রের ঝানু-সমরকুশলী ধুরন্ধর এই সব প্ল্যান প্রস্তুত করছেন। ইয়াহিয়া জানেন যে, বিশ্বের দরবারে আজও তাঁর রাষ্ট্র অসহায় নাচার শিশুরাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত, সবাই তাঁদের নানা কারণে নেকনজরে দেখে থাকেন। সেই আন্তর্জাতিক মুরুব্বিরাই তাদের প্রধান আশ্রয়। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মিত্রভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির সহযোগে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির করছে একথা জানার জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্র ত এখনই ইউ-এনের মারফৎ ভারত ও পাকিস্তানে ইউ-এন পর্যবেক্ষক বসানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। নিকসনচক্রের যুক্তি যে, ইউ-এন-এর এই পর্যবেক্ষক দল সীমান্তে এসে দাঁড়ালেই বাস্তুত্যাগীরা একেবারে দ্বিধাহীনচিত্তে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই ছলনার অর্থ অনাবিধ। ভারতের সীমান্তে লোক রেখে দেখা মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত যেন কোনো রকম সাহায্য দিতে না পারে।

পাকিস্তানের প্ল্যানের প্রথমাংশ বেশ কার্যকরী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবাই প্রায় মেনে নিয়েছেন ঘরোয়া কোঁদলে কারো গায়ে-পড়ে যাওয়া অকর্তব্য। যাঁরা গোড়ার-গোড়ায় বলতেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হলে বাস্তুত্যাগীরা দেশে ফিরতে পারেন না, তাঁরাও এখন ইয়াহিয়ার দিকে ঢলে পড়েছেন। ভারত তাঁর ভাষায় বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানে কোনো কলহ নেই, কলহ তার নিজের ঘরে সুতরাং আমরা পর্যবেক্ষক চাই না। ইয়াহিয়া এখন সেই কলহটাই সৃষ্টি করতে চায়। জগৎকে দেখাতে চায়—দেখো ভারত কি কাণ্ডটা করছে—আর সেই অবস্থা যদি ঘটে তাহলে ভারতের অবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটু কাহিল হবে।

আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বার বার বলেছেন—আক্রান্ত হলে আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারব। তার জন্য আমরা প্রস্তুত। এই আশ্বাস মূল্যবান। কিন্তু শুধু অস্ত্রের ঝনঝনা নয়, কূটনীতির দাবা-খেলায় মোক্ষম চাল দিতে যেন ভুল না হয়। আমাদের সেই দিকে চোখ খুলে থাকতে হবে।

CENTRAL LIBRARY

পটভূমি

সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আগামী ২৫ আগস্ট যে বাংলা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে সেটা কি মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একটা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ? নাকি এই ঐক্যবোধের জন্যে পার্টিকে বেশ চড়া মাশুল দিতে হল? আর এই সর্বাত্মক আহ্বানকে পশ্চিমবাংলা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তথা শিল্পপতিসমাজ বা কী চোখে দেখছেন?

এর অন্ততঃ প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকাতে হবে। অবশ্য খুব বেশি পিছনে নয়, গত জুনের শেষের দিক থেকেই শুরু করা যায়। ঐ সময়েই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটু প্রথম আহ্বান জানায় মিলিত আন্দোলনের। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কাছে লেখা একটি চিঠিতে এই ডাক দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, শ্রম-বিরোধী নীতি, এই সবই এই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে স্থির ছিল। এর কিছুদিন আগে দিল্লিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি হয়েছিল শ্রী এস এ ডাঙ্গের উদ্যোগে। সিটু ঐ কমিটি তৈরিতে সহযোগ করেছিল। তাই সিটুর ধারণা ছিল, তার সহযোগের উত্তরে এ আই টি ইউ সি পশ্চিমবাংলায় তার আহ্বানে সাড়া দেবে।

কিন্তু সিটুর সেই আশা ফলবতী হল না। যে-কারণে ঐ সময়েই কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চা গঠনের জন্যে সি পি এম-এর ডাক অন্যান্য বামপন্থী দল প্রত্যাখ্যান করল, ঠিক সেই কারণেই যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের প্রস্তাবও ভেস্তে গেল। সেই কারণটা হল, পশ্চিম বাংলায় ক্রমাগত খুনোখুনি। সিটুর আহ্বানের উত্তরে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বললেন, দলীয় সংঘর্ষ ও হত্যার রাজনীতি বন্ধ না হলে সংযুক্ত আন্দোলন করাই যাবে না। তাই আগে চাই, এই বিষয়ে বোঝাপড়া। সিটুর ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন—প্রথমতঃ, খুনোখুনি বন্ধের প্রশ্ন প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সেই রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার আশায় বসে থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলবে না। দ্বিতীয়তঃ, সংযুক্ত আন্দোলনই খুনোখুনি বন্ধের পথ।

জুলাইয়ের গোড়ায় সি পি এম রাজ্য কমিটি যে-প্রস্তাব নিল, তাতেও একই ধরনের কথাই বলা হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত জানালেন, 'জরুরী দাবি নিয়ে, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু না করলে সমাজ-বিরোধীদের রোধ করা যাবে না।' কিন্তু মার্কস্‌বাদীদের এই ব্যাখ্যা অন্যান্যরা মেনে নিতে পারলেন না। তাই পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র—এই ধরনের তর্কের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে দিশাহারা হয়ে গেল সিটুর প্রস্তাব।

মার্কস্‌বাদীরা অবশ্য হাল ছাড়লেন না। তাঁরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই ডাক দিলেন বাংলা বন্‌ধের। তারিখ ঠিক হল ১১ আগস্ট। তবে সেটা সাময়িক-ভাবে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে এই বন্‌ধে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সিটুর পক্ষ থেকে বলা হল, সকলে যদি চান তারিখ পাল্টাতে কোনো অসুবিধে হবে না। অর্থাৎ দর-কষাকষি ও আপসের একটা ছোট দরজা খুলেই রাখা হল।

তবু কিন্তু প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল, সি পি এম-কে বুঝি একলাই নামতে হবে শক্তিপরীক্ষায়। আর এবারও জাহাজ আটকে থাকছিল একই চড়ায়। অর্থাৎ খুনোখুনি বন্ধ সম্পর্কে একটা আচরণবিধি তৈরির প্রশ্নে।

অ-মার্কস্‌বাদী কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা নিয়ে পশ্চিম বাংলায় একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি আছে। সি পি আই, এস ইউ সি, পি এস পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতারা এই কমিটিতে আছেন। সিটুর চিঠিটি তাঁরা বিবেচনা করতে বসলেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। আই এন টি ইউ সি নেতা শ্রীকালী মুখার্জিকেও ডাকা হল বিশেষভাবে এই আলোচনায় যোগ দিতে।

সিটুর চিঠির উত্তরে তাঁরা বেশ কড়া ভাষায় জানালেন যে, প্রস্তাবিত বন্‌ধে তাঁদের সমর্থন নেই। কারণ? কারণ এই যে, যে-সব দাবির ভিত্তিতে বন্‌ধ ডাকা হচ্ছে তাতে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে তোলার কাজে কোনো সাহায্য হবে না, শ্রমিক-শ্রেণীর দাবি পূরণের কোনো কর্মসূচীও গড়ে তোলা যাবে না। সিটুর আহ্বানের মধ্যে তাঁরা পেলেন রাজনীতির গন্ধ—একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন। এই ধরনের সংকীর্ণ দলগত দৃষ্টি-ভঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তাঁরা রায় দিলেন।

দলীয় সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের প্রশ্নও তাঁরা তুললেন। দলে-দলে যখন সংঘর্ষ ঘটে, তখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও যে তা ঘটবে তা আর বিচিত্র কী? অনেক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীই হয়েছেন এই সংঘর্ষের বলি। এই আত্মঘাতী পথ এড়িয়ে সমবেত-ভাবে শ্রমিক আন্দোলন চালাতে হলে প্রথমেই দরকার একটা আচরণ-বিধি তৈরি করা। সেই আচরণ-বিধির মূল কথা হবে, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় সন্ত্রাসের কোনো স্থান থাকবে না। এইসব কথা বলার পর কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা সিটুর প্রতি কিছুটা বক্রোক্তি করতেও ছাড়লেন না। 'কোনো দুর্বোধ্য কারণে' সিটু এই ধরনের প্রস্তাবকে তেমন আমল দিচ্ছে না। আর তার ফলেই যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশও তৈরি হতে পারছে না।

তবে যেটা লক্ষ্য করা দরকার, কমিটি কিন্তু সিটুর সঙ্গে সমঝোতার সব পথ বন্ধ করে দিলেন না। কী জানি, ভবিষ্যতে যদি কোনো দরকার হয়! তাই কমিটির নেতারা বললেন, বন্‌ধের তারিখ বা যে-সব দাবির ভিত্তিতে বন্‌ধ হবে, সে-সব বিষয়ে অবশ্যই আরো আলোচনা করা যেতে পারে। আর সেই আলোচনার জন্যে সিটুকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোও হল।

চেষ্টাও চলতে লাগল একটা মিলিত বৈঠকের। একদিন (২৮ জুলাই) বৈঠক বসতে পারল না, কারণ কে বৈঠক ডেকেছেন, সে-বিষয়ে নাকি কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পরদিন আবার চেষ্টা হল বৈঠকের। সি পি আই, এস ইউ সি, পি এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের ট্রেড ইউনিয়ন শাখার নেতারা বৈঠকের জন্যে তৈরিই ছিলেন। কিন্তু তবু বৈঠক হল না। কারণ, কালী মুখার্জি এবং আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী তখন দিল্লীতে। তাঁরা না হাজির থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশেষ লাভ নেই, এই কথা জানানো হল সিটুর পক্ষ থেকে।

বৈঠক অবশ্য বসল শেষপর্যন্ত—৩১ জুলাই। সব ট্রেড ইউনিয়নের নেতারাই হাজির রইলেন। শুনতে একটু অদ্ভুত হলেও বৈঠক যে শেষপর্যন্ত হল তার জন্যে অনেকটা কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন কালী মুখার্জি। তবে প্রথম দিনেই সব প্রশ্নের ফয়সালা হল না। আবার বৈঠক বসল ২ আগস্ট। সভাপতিত্ব করলেন কালী মুখার্জি।

• • •

যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ২৫ আগস্ট হরতালের ডাক দেওয়া হল তা বিশ্লেষণ

করলে কী দেখা যায়? দেখা যায়, দু পক্ষই কিছু কিছু ছেড়েছেন। বন্ধের তারিখ পালটানোটা খুবই গৌণ ব্যাপার, ওটা তো সিটু আগে থেকেই বলে রেখেছিল। এটাকে সিটুর বিপক্ষ গোষ্ঠীর জয় বলা তাই অর্থহীন। সিটু তাহলে বড় রকমের কোনো প্রশ্নে কি এক-পা পিছিয়ে এসেছে? আচরণ-বিধির প্রশ্নে তারা কিছুটা নরম হয়েছে বৈকি! বৈঠকের প্রথম দিকে সিটুর কমল সরকার ও আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী অবশ্য কোনোরকম আচরণ-বিধি তৈরির প্রবল বিরোধিতাই করেন। যতীনবাবু নাকি বৈঠক ছেড়ে চলে যাবেন বলেও হুমকি দেন বলে শোনা যায়। তবে শেষপর্যন্ত দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা প্রস্তাব তৈরি হল। না, ঐ বৈঠকেই আচরণ-বিধি তৈরি করা হল, তা নয়। তবে সব দল একবাক্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে শরিকী সংঘর্ষের নিন্দা করলেন।

বৈঠকের পর যে-বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে তাতে কিন্তু এই প্রসঙ্গটি অনেকটা জায়গাই জুড়ে আছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উদ্যোগে সর্বদলীয় বৈঠকে হত্যার রাজনীতি সম্পর্কে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তার প্রতি সমর্থন জানালেন। শরিকী সংঘর্ষের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাও স্বীকার করা হল। আর বড় কথা, তারা একটা আচরণ-বিধি তৈরির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা যাতে এই কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে চলেন তার জন্যেও আবেদন জানানো হল।

অবশ্যই এ-কথা ঠিক যে, সিটু তথা মার্কস্‌বাদীরা এই প্রথম একটা আচরণ-বিধির প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর উদ্যোগে এ-পর্যন্ত যে-সব সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে সেখানেও মার্কস্‌-বাদী নেতারা এই ধরনের আচরণ-বিধির জন্যে এস ইউ সি ও অন্যান্য দলের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার কারণ, সি পি এম-এর মতে এই রাজ্যের খুনো-খুনির মূলে কারণ শরিকী সংঘর্ষ নয়, কংগ্রেস ও নকশালপন্থীরা একযোগে গণ-তান্ত্রিক দলের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে বলেই চলছে সংঘর্ষ। কিন্তু এখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের (অর্থাৎ বিভিন্ন দলের) মধ্যে একটা আচরণ-বিধি পালনে রাজী হওয়া মানেই পরোক্ষভাবে এই কথা স্বীকার করে নেওয়া যে, শরিকী সংঘর্ষ অশান্তির একটা বড় কারণ।

অ-মার্কসবাদীরা এই বিশ্লেষণে হয়ত উল্লসিত হবেন, কিন্তু খুনোখুনি সম্পর্কে সি পি এমের মনোভাবে এর আগেই কি একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে নি? অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় যে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব করেন, সি পি এম যে তাতে যোগ দিতে চায় নি, তার অন্যতম কারণ ছিল, এই দল 'খুনী' কংগ্রেসের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে চায় না। কিন্তু সেই 'খুনী' কংগ্রেসেরই নেতা এবং পশ্চিম বাংলায় দিল্লীর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতীক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন অনুরূপ বৈঠক ডাকলেন তখন সি পি এম তাতে যোগ দিলো। শেষ পর্যন্ত ঐ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতেও সি পি এমের সম্মতি পাওয়া গেল। দিল্লীতে জ্যোতি বসু স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার কারণ হিসেবে সি পি এমের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সি পি এম স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কতোটা আগ্রহী এই বৈঠক তারই প্রমাণ।

অর্থাৎ, গত মাস খানেকের মধ্যে এই ব্যাপারে সি পি এমের সুর যে ক্রমশ নরম হয়ে আসছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি
আমরা আমাদের সকল পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে সমস্ত চেক ও ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে "অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড" লিখতে অনুরোধ করছি।
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

নেই। এখন ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকে বাংলা বন্‌ধের প্রস্তাব গ্রহণের সময় পার্টির গলা আর এক পর্দা নেমেছে। এটাকে যদি পার্টির পশ্চাদপসরণ বলতে চান, বলুন। তবে তার আগে ভেবে দেখা দরকার, এর বিনিময়ে মার্কসবাদীরা কী লাভ করলেন? অর্থাৎ এই পশ্চাদপসরণ স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট কিনা?

বাংলা বন্‌ধের সর্বসম্মত ডাকের মধ্যে দিয়ে সি পি এম তিনটি ক্ষেত্রে লাভবান হল:

এক—ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের দাবিতে সব ট্রেড ইউনিয়নকে (অর্থাৎ দলকে) সামিল করা গেল। আশু নির্বাচনের দাবি প্রথম সি পি এমই তুলেছিল। সিদ্ধার্থবাবুর সর্বদলীয় বৈঠকেও সি পি এমের অনুগামীরা বলেছেন, নির্বাচন হলেই খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন করতে হবে। সি পি-এম পোলিট-ব্যুরো নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের ডাক দেয়। ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকের আশু নির্বাচনের ডাক দেওয়া হল, তবে তার সময়-সীমাটা কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হল, এই যা।

দুই—সর্বসম্মত হরতালের ডাকের মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের নিঃসঙ্গতা ঘুচে গেল। এই সিদ্ধান্তের আগে সিটু ছিল এক দিকে, আর বাকি সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল বিপরীত দিকে। এখন যে সব মতভেদ ঘুচে গেল তা নয়। ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকের পর প্রচারিত বিবৃতিতেও অনেক বিষয়ে মত-পার্থক্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবু এখন অন্য সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন সিটুর সঙ্গে একত্রে আন্দোলন চালাতে রাজী হয়েছে। এটাও সি পি এম লাইনের জয়, কারণ কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করাই মার্কসবাদীদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া সি পি এম এখন একটা কাউও পেয়ে গেল—সেটা হল আই এন টি ইউ সি।

তিন—সি পি এম প্রথমে ১১ আগস্ট যে বন্‌ধের ডাক দেয় তাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাষ্ট্র-বিরোধী। লোকসভায় স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের মন্ত্রী কে সি পন্থও অনুরূপ মন্তব্য করেন। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, এই বন্‌ধের ডাক পরিতাপজনক। এই সব মন্তব্যেরই লক্ষ্য ছিল সি পি এম। কোনো কোনো মহলে এই দাবিও উঠল যে, সি পি এম যদি রাষ্ট্র-বিরোধী কাজই করছে, তবে তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? তাদের সঙ্গে শান্তি বৈঠকেরই বা দরকার কী? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সি পি এম তো বটেই, পশ্চিম বাংলার অন্যান্য বামপন্থী দলও এই রাষ্ট্র-বিরোধী বন্‌ধের ডাকে গলা মিলিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে-আটটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে এই ডাক দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আই এন টি ইউ সি। অর্থাৎ এখন রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শুধু মার্কসবাদীদের দায়ী করা যাবে না, অন্যান্য দলকেও করতে হবে এবং সেই সব দলের মধ্যে কংগ্রেসও এসে পড়বে, কারণ আই এন টি ইউ সি কংগ্রেসেরই শাখা। এটা কি সি পি এমের কম লাভ?

এই ধরনের যুক্ত আন্দোলনে হাত মিলিয়ে হরতাল ডাকা আই এন টি ইউ সির পক্ষে এই প্রথম। এই সংস্থা যে নিতান্তই কংগ্রেসের লেজুড় নয়, এ-কথা প্রমাণ করাই কি কালী মুখার্জির উদ্দেশ্য? তা হোক আর না-ই হোক, কংগ্রেসের একাংশ কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কল-কারখানায় আই এন টি ইউ সির পাল্টা ইউনিয়ন চালু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সেটা নিশ্চয়ই তাৎপর্য-পূর্ণ। [illegible]

৬-৮-১৯৭১ দেব দত্ত

দেশ বিদেশ

এই সাপ্তাহিক সংবাদ পর্যালোচনা লেখার সময় পত্রিকার সামনে যেটা সব চেয়ে বড় খবর সেটা হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো ভারত সফর করতে আসছেন বলে অকস্মাৎ ঘোষণা করা হয়েছে।

এর ঠিক আগে নয়াদিল্লির বিশেষ দূত হিসাবে মস্কোতে পাঠান হয়েছিল প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী ডি পি ধরকে।

বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকার সংবাদ যদি সত্য নয়, তাহলে ধরতে হবে, নয়াদিল্লি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি আসন্ন এবং ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ হচ্ছে এই সম্ভাবনারই পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠছে, পূর্ব বাংলার বেশ কিছু অংশ তাঁরা নিজেদের দখলে এনেছেন। এদিকে পাকিস্তানের জঙ্গী ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে 'টোটাল ওয়ার'-এর হুমকি দিচ্ছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে চড়াবেন বলেও দম্ভ প্রকাশ করেছেন। জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। আমেরিকা পাকিস্তানকে পথে আনতে সাহায্য করবে বলে ভারত যে আশা করেছিল সেই আশা মিলিয়ে গেছে। সেদেশের ডেমোক্র্যাটিক প্রাধান্যযুক্ত প্রতিনিধিসভা ২০০-১৯২ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্তানকে একমাত্র ত্রাণ বাদে অন্যান্য বাবদ যাবতীয় ডলার সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখতে বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন, 'আমেরিকা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখুক, এই মত আমরা সমর্থন করি না।' তিনি বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে যেতে থাকলেই আমরা এবিষয়ে সবচেয়ে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারব বলে আমরা মনে করি।'

অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের ভারতে আসার বিরাম নেই। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে ৮০ লক্ষে পৌঁছে গেছে।

এই অবস্থায় ভারত সরকার কি একটা নূতন, নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন? বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকার যে 'উপযুক্ত সময়ের' কথা বলে আসছেন সেই 'উপযুক্ত সময়' কি এসে গেছে? এই পর্যালোচনা পাঠকদের হাতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই সম্ভবত এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

•

হেনরি গোলকনাথ নামে পাঞ্জাবের একজন অধিবাসী ১৯৫০ সালে মারা যান। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে জলন্ধর বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার ঐ হেনরি গোলকনাথের পুত্র, কন্যা ও নাতিনাতনিদের জানান যে, ১৯৫৩ সালের একটি আইন অনুযায়ী তাঁদের হাতে ৪১৮ স্ট্যান্ডার্ড একরের কিছু বেশী জমি উদ্বৃত্ত রয়েছে। ১৯৬৫ সালে গোলকনাথের এই ওয়ারিশরা সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে এই আপত্তি তোলেন যে, পাঞ্জাবের উপরোক্ত আইনের ধারাগুলি সম্পত্তির উপর মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের নির্দেশের বিরোধী।

এই ঐতিহাসিক মামলার রায় দিতে গিয়েই ১৯৬৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকোকা সুব্বা রাও বললেন যে, সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা আছে সেটা মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় অথবা, অন্য কথায়, মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

১১ জন বিচারপতির বেঞ্চের তরফ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দিয়ে শ্রীসুব্বা রাও বলেন, 'মৌলিক অধিকারগুলি হচ্ছে সেইসব আদিম অধিকার যা মানুষের ব্যক্তিত্বের

প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও সি গাঙ্গুলিকে তাঁর বাসভবনে ৯০তম জন্মদিনে সম্বর্ধনা জানান হচ্ছে।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিবস অনুষ্ঠান

গত ১লা আগস্ট বিখ্যাত শিল্প সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নব্বই বছর পূর্ণ হল। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর গৃহে একটি সুন্দর ঘরোয়া সভার আয়োজন হয়। কলকাতার অনেক প্রবীণ ও নবীন ব্যক্তি তাঁকে সম্বর্ধিত করতে আসেন। সর্বশ্রী রমেশ মজুমদার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপতি মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন ভদ্র ও মনোজ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মবহুল জীবনের আলোচনা ও তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

CENTRAL LIBRARY

বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সব অধিকারই মানুষকে তার অভিরুচি অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলতে দেয়। ...

"আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে উচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে পার্লামেন্টের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। ... রাষ্ট্রীয় নীতির যেসব নির্দেশ সংবিধানে রয়েছে, সেগুলি মৌলিক অধিকার হরণ বা খর্ব না করেই কার্যে পরিণত করা যাবে বলা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যেতে পারে।...

"মৌলিক স্বাধীনতাগুলির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সংসদের উভয় কক্ষের সকল সদস্যের সর্বসম্মত ভোটে গৃহীত আইনও এই সব মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে না।

"সংবিধানের নীতিনির্দেশক ধারাগুলি কার্যকর করা যেমন পার্লামেন্টের কর্তব্য, ঠিক তেমনি মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ না করে এই সব নীতিনির্দেশ কার্যকর করাও পার্লামেন্টের দায়িত্ব। মৌলিক অধিকারগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আইন সম্পর্কে পার্লামেন্টের রায় চূড়ান্ত নয়, এই রায় আদালতের বিচারসাপেক্ষ। যদি তা না হত তাহলে সংবিধানের কাঠামোই ভেঙে পড়ত।

"মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অধিকার থেকে পার্লামেন্টকে বঞ্চিত করলে বিদ্রোহই একমাত্র অনিবার্য পরিণাম হবে না।"

সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের আগে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলি বার তিনেক সংশোধন করা হয়েছে (সংবিধানের প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তদশ সংশোধন)। এই সব সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত করা। সংবিধানের এই সব সংশোধনই জমিদারি দখলের এবং জনস্বার্থে অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে 'শংকরীপ্রসাদ সিং দেও বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং ১৯৬৫ সালে 'সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান সরকার' মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি পি বি গজেন্দ্রগড়কর সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলার রায় সব কিছু উল্টেপাল্টে দিল। ঐ মামলায় বিচারপতিরা অবশ্য বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য ইতিপূর্বে মৌলিক অধিকারের যেসব সংশোধন হয়েছে সেগুলি বহাল রাখলেন; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পার্লামেন্টের হাত বেঁধে দিলেন।

১৯৬৭ সালের ঐ রায় কিন্তু সর্বসম্মত ছিল না। বেঞ্চের ১১ জন বিচারপতির মধ্যে প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও সহ ছজন এক দিকে ছিলেন। এই ছয় জনের মধ্যে আবার বিচারপতি হেদায়েতুল্লা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়ে তাঁর নিজের এই মত জুড়ে দিয়েছিলেন:—

"সম্পত্তির অধিকার একটা মৌলিক অধিকার, এই তত্ত্ব আমাদের সংবিধানে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রই যদি কাম্য মনে হয়ে থাকে তাহলে এটা করা সম্ভবতঃ ভুল হয়েছিল। সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে তখনই যখন জনস্বার্থে সেটা করা প্রয়োজন মনে হবে। কিন্তু যেখানে এই ব্যতিক্রম করা হবে সেখানেও সেটা করতে হবে আইনের পদ্ধতিতে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে। কয়েকটি সংশোধনের পর অবশ্য অবস্থাটার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই সব সংশোধনের ফলে এখন যা দাঁড়িয়েছে সেটা হল:—একমাত্র নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্ভুক্ত জোতজমি বাদে অন্য সমস্ত জমি দখল করে নেওয়া যেতে পারে এবং ঐসব জমির উপর অধিকার বিনা খেসারতে হরণ অথবা খর্ব করা যেতে পারে। সেই ব্যাপারে সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন আইনের বিরুদ্ধে আদালতে আপত্তি তোলা যাবে না।

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

মিত্র-ঘোষ বাংলা পকেট বইয়ের মোট চৌদ্দ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা পছন্দমতো নীচের বইগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচখানি একসঙ্গে কিনবেন তাঁরা ২৩শে আগষ্ট থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট সাড়ে আট টাকায় পাবেন। অবশ্য ডাকে নিলে ডাক খরচ আলাদা লাগবে।

উপন্যাস

১) দূরের জানলা—আশাপূর্ণা দেবী
২) সাচ্চা দরবার—অবধূত
৩) [illegible]—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৪) তবু মনে রেখো—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৫) নিরালা প্রহর—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৬) [illegible] যাবে না—[illegible] ঘোষ
৭) স্বর্ণচাঁপার দিন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৮) [illegible]—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৯) সুখের বাঁধনে—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১০) [illegible] দিন—[illegible] রায়
১১) [illegible]—বিমল মিত্র

ভ্রমণ কাহিনী

১২) [illegible]—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রূপচর্চা

১৩) রূপ ও প্রসাধন—ডাঃ এন. আর. গুপ্ত

সহজ ভাগ্যগণনা

১৪) নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন—[illegible]

প্রতি গ্রন্থ দুই টাকা : [illegible] প্রচ্ছদপট : সুন্দর ছাপা

মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ : ফোন : ৩৪০৪৯২ ॥ ৩৪৮৭৯৯

মুর্শিদাবাদে রাস্তার ধারের একটি ক্যাম্পে শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াচ্ছেন বাংলা দেশের একজন মা।

"যেহেতু সম্পত্তির উপর অধিকার খর্ব করার এই প্রবণতা অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, সেহেতু প্রস্তাবটি খারিজ করে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে।"

১৯৬৭ সালের সেই ঐতিহাসিক মামলার রায় ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের উপর যে নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকসভা সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন বিলটি গ্রহণ করেছেন। এই সাড়ে চার বছরে গোলকনাথ মামলার রায় নিয়ে দেশব্যাপী তুমুল বিতর্ক হয়েছে। ঐ রায় বেরোবার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের রাজাপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, সি-এস-পি সদস্য নাথ পাই সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী বিল আনেন। ঐ বিলে মৌলিক অধিকার সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দিতে চাওয়া হয়। এই একটি বেসরকারী বিল নিয়ে লোকসভা ও তার কমিটি যত সময় ব্যয় করেছেন তার অন্য নজির নেই। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে একমাত্র ১৯৬৯ সালের শেষ অধিবেশন ছাড়া লোকসভার অন্য সমস্ত অধিবেশনে এই বিল নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা হয়েছে। বিলটি বিবেচনার জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার যে যুক্ত সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার ১৫টি বৈঠক হয়েছিল। সংসদের ভিতরে, তার কমিটিতে ও সংসদের বাইরে এই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয়েছে।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে একটি আলোচনাচক্রে শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, সম্পত্তির অধিকার হচ্ছে 'প্রগতির পথে একটি প্রতিবন্ধক'। বিচার বিভাগে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বিত্তবান মানুষ এবং সামাজিক প্রগতির বিলম্ব নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হয় না, এই মন্তব্য করে শ্রীমেনন বলেন, "কোন বিচারপতি যদি পার্লামেন্টে গৃহীত কোন আইন মেনে নিতে ক্লেশ বোধ করেন তাহলে তাঁর উচিত পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে এসে ভিতর থেকে সেই আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা।" ঐ আলোচনাসভায় কম্যুনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে বলেন যে, "গোলকনাথ মামলার রায়ের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের যে

CENTRAL LIBRARY

মর্জিমাফিক সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া গেছে" সেটা বদলাবার অন্য সব চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে "রাষ্ট্রকে সেটা বদলাতে হবে।" মোহন কুমারমঙ্গলম ঐ সভায় বলেন যে, সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে সম্পত্তি দখল করা হবে তার খেসারতের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা একান্তভাবে পার্লামেন্টেরই হাতে থাকা উচিত। সিলেক্ট কমিটিতে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল এম সি শীতলবাদ বলেন, "গোলকনাথ মামলায় অধিকাংশ বিচারপতি যে রায় দিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়।" তিনি বলেন, "পার্লামেন্ট যেভাবে মৌলিক অধিকারগুলি রদবদল করেছেন" তাতেই এই ধরনের রায় দিতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা প্ররোচিত হয়েছেন। যদিও এইসব সংশোধনে প্রধানত সম্পত্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারেই হাত দেওয়া হয়েছে তাহলেও অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলির দিকে পার্লামেন্ট হাত বাড়াতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সুপ্রীম কোর্ট ঐ রকম রায় দিয়েছিলেন বলে শ্রীশীতলবাদ মনে করেন।

নাথ পাইয়ের বিল লোকসভায় সরকারের সমর্থন লাভ করেছিল, যদিও তাঁরা সেটিকে সরকারী বিল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হন নি।

অন্যদিকে, স্বতন্ত্র পার্টির নেতা জে এম লোবো প্রভু, নির্দলীয় সদস্য ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি পার্লামেন্টের ভোটের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নাকচ করে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, নাথ পাইয়ের বিল গৃহীত হলে 'হিটলারবাদের অনুরূপ বিপদ' দেখা দেবে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান বিচারপতি এম হিদায়েতুল্লা মন্তব্য করেন যে, বাইরে যখন 'মানবাধিকার দিবস' পালিত হচ্ছে পার্লামেন্ট তখন মৌলিক অধিকারগুলি কি করে কেটে দেওয়া যায়, তাই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, এটা 'অদ্ভুত ব্যাপার।' তিনি বলেন যে, "সম্পত্তির অধিকারকে সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকাররূপে অন্তর্ভুক্ত করাতেই যত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা থেকে এই অধিকারকে বাদ দেওয়া যায়।" পার্লামেন্ট সম্পর্কে এই মন্তব্য করার জন্য প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লাকে লোকসভায় সদস্যদের কটু কথা শুনতে হয়েছিল।

দেশব্যাপী এই সব বিতর্কের শেষে এল লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন। গোলকনাথ মামলার রায় বনাম পার্লামেন্টের অধিকারের প্রশ্নটি ঐ মধ্যবর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ও অন্যান্য কয়েকটি দল কর্তৃক একটি বড় নির্বাচনী ইস্যুরূপে উত্থাপিত হয়েছিল।

মধ্যবর্তী নির্বাচন শাসক কংগ্রেস দলকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তারই বলে বলীয়ান হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবার লোকসভায় সংবিধানের ২৪তম সংশোধনের বিলটি পাশ করিয়ে নিলেন।

এই বিল এক অর্থে নাথ পাইয়ের উদ্দেশে লোকসভার শ্রদ্ধার্পণ। তিনি যা চেয়েছিলেন, তার জন্যই এই বিল যখন এল তখন তিনি লোকান্তরিত। স্বতন্ত্র পার্টি জনসংঘ, মুসলিম লীগ ও ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনির মতো কয়েকজন নির্দলীয় সদস্য ছাড়া আর সকলেই বিলটি সমর্থন করেছেন। বিরোধী কংগ্রেস দল এই বিল সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে গোড়ার দিকে দলের ভিতরেই কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দলের সদস্যরা বিলের সমর্থনেই ভোট দিয়েছেন। বিলের পক্ষে ৩৮৪ ও বিপক্ষে ২৩ ভোট পড়ে। এইভাবে লোকসভার সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের শর্তটি পূরণ হওয়ায় লোকসভায় বিলটি গৃহীত হয়েছে। এর পর বিলটি রাজ্যসভায় যাবে। তার পর রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের দ্বারা এটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে।

এই বিলের পশ্চাদনুসরণ করে আরও দুটো গুরুতর সংবিধান সংশোধন বিল আসছে। এই দুটির মধ্যে একটির অর্থাৎ ২৫তম সংবিধান সংশোধন বিলের উদ্দেশ্য হল, সরকার কর্তৃক অধিকৃত সম্পত্তির বদলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আইনসভার বিচারবিবেচনা অনুযায়ী একটি অঙ্ক স্থির করে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সম্পত্তি অধিকারের আইনগুলিকে আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা। সংবিধানের ২৪ ও ২৫ নম্বর সংশোধনের বিল আইনে পরিণত হয়ে গেলে পরবর্তী বিল আনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ঐ শেষ বিলটি আনা হবে প্রাক্তন দেশীয় রাজা ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি বাতিল করার জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২৫তম সংশোধন করা হয়েছিল ঐ সংবিধান চালু হওয়ার ১২৮ বছর পরে। আর ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৫তম সংশোধন ঐ সংবিধান

মাথা ধরেছে?
অ্যানাসিন
ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়
কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

চিত্র প্রযোজক শ্রী জি. মুখার্জি বলেন, "অ্যানাসিন মাথার যন্ত্রণা থেকে চট করে আরাম দেয়। আমি সবসময় সঙ্গে অ্যানাসিন রাখি।"

জোরালো, কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য, কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

ফলদায়ক,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

৪ ভাবে কাজ করে
Regd. User of T.M. Geoffrey Manners & Co., Ltd.

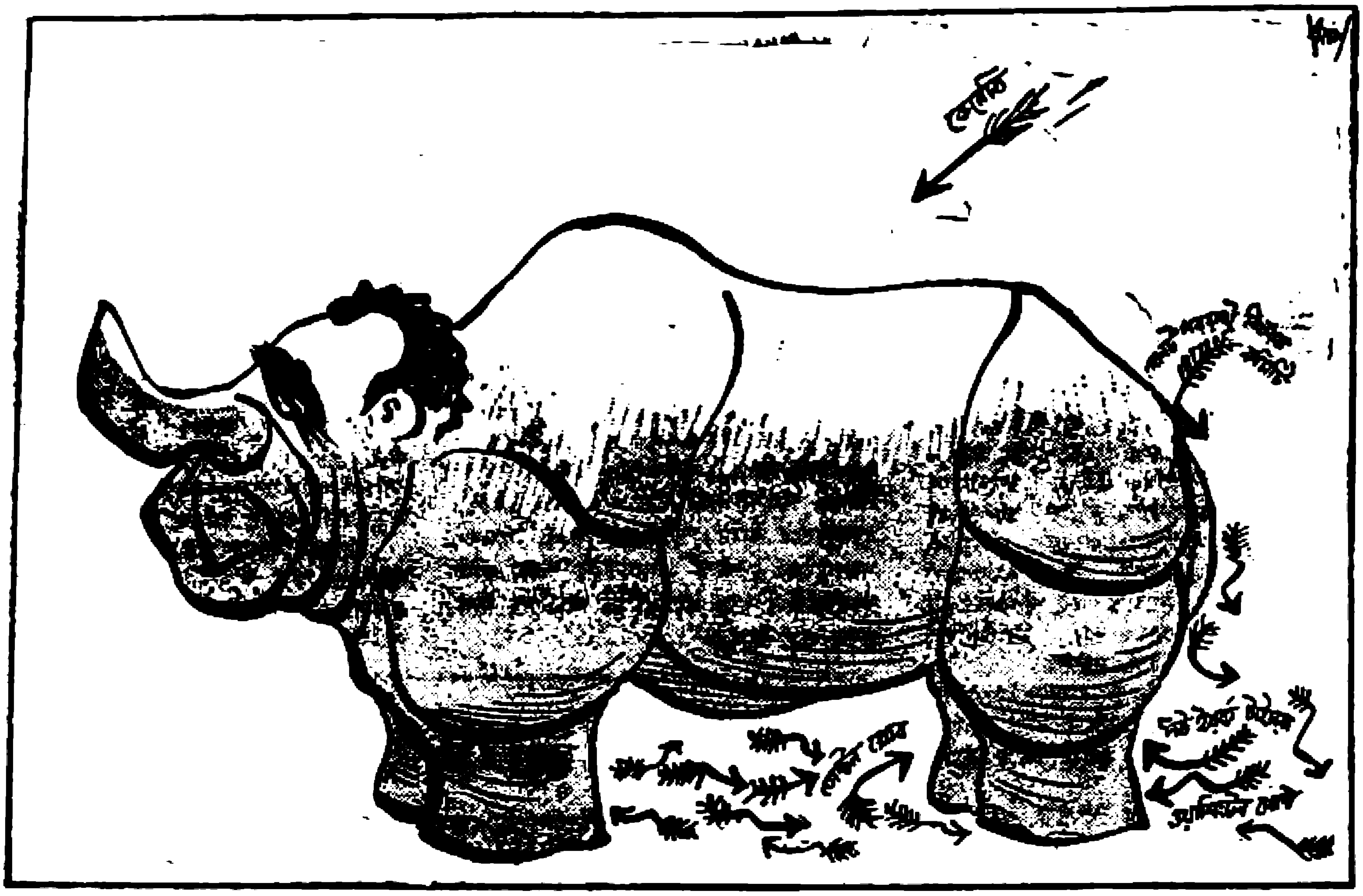

চালু হওয়ার ২২ বছরের মধ্যেই গৃহীত হবে বলে মনে হচ্ছে।

•

লোকসভায় এবারকার বাজেট অধিবেশন সমাপ্তির প্রাক্কালে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল হল 'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সিস বিল'। এটিও আর একটি বিল যার বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ দেশব্যাপী বিতর্ক হয়েছে এবং যা নিয়ে বহু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে।

বিলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, গর্ভপাত ঘটান সম্পর্কে এখন আইনের যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটি বাতিল করে দিয়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত ঘটাবার আইনগত অধিকার দেওয়া।

লোকসভায় গৃহীত এই বিলের প্রধান ধারাগুলিতে বলা হয়েছে, অনধিক ১২ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক এবং ১২ থেকে ২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় দুজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কয়েকটি সর্তাধীনে গর্ভপাত ঘটাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, গর্ভের দরুণ গর্ভবতীর জীবন বিপন্ন হতে পারে অথবা তাঁর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর হানি হতে পারে কিম্বা এই গর্ভের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান শারীরিক অথবা মানসিক অস্বাভাবিকতার দরুণ গুরুতরভাবে পঙ্গু হয়ে থাকতে পারে কেবল তাহলেই ঐ চিকিৎসক গর্ভপাত ঘটাতে পারবেন। ধর্ষণের ফলে অথবা জন্মনিরোধের ব্যর্থতার দরুণ গর্ভসঞ্চার হলে আইনের সর্ত পূরণ হল বলে ধরে নেওয়া যাবে।

গোপনে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গর্ভপাত করাতে গিয়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোকরা যে বিপদ ডেকে আনেন সেদিক নজর যাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হচ্ছে। একটি অনুমান এই যে, আমাদের দেশে প্রতি বৎসর যেখানে দু কোটি দশ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে সেখানে আইনবিরুদ্ধ গর্ভনাশের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ এবং গর্ভপাত করাতে গিয়ে হাতুড়েদের হাতে যেসব নারী প্রতি বছর মারা যায় তাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় পরিবার কল্পনা বোর্ড বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, মহারাষ্ট্রের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শাহের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। এই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, 'গর্ভপাত ঘটান সম্পর্কে সমাজের যে নীতিবোধের কথাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, এই সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, বহু সংখ্যক জননী পূর্ণ সময় পর্যন্ত গর্ভ বহন করার চেয়ে বরং বেআইনী গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত আছেন। এটাও সত্য কথা যে, এই জননীদের অধিকাংশই বিবাহিতা এবং তাঁদের গর্ভ গোপন করার বিশেষ কোন কারণ নেই।'

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা তুলে দিয়ে শান্তিলাল শাহ কমিটি এই বিষয়ে কড়াকড়ি অনেক শিথিল করার প্রস্তাব দেন।

কমিটির প্রস্তাব নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ডাঃ ভি কে আর ভি রাও ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলেন যে, ভারত সরকার একমাত্র জননীর স্বাস্থ্যের কারণে ছাড়া অন্য কারণে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী শারদা ভার্গব বলেন, 'গর্ভপাতের কড়াকড়ি শিথিল করলে যদি অনাচার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে পরিবার পরিকল্পনার অন্য সব উপায়ও অনাচারে উৎসাহ যোগাতে পারে।'

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা পরিষদের সভায় কেরলের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বি উইলিংডন বলেন যে, গর্ভপাত হল মানুষের প্রাণ নষ্ট করা, যদিও সেই মানব গর্ভস্থিত ভ্রূণমাত্র।'

এই সব বিতর্ক লক্ষ্য করে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে, গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা হবে না, তবে নিষেধাজ্ঞার কড়াকড়ি শিথিল করা হবে। লোকসভায় যে বিলটি গৃহীত হয়েছে সেটি ঐ সিদ্ধান্তের ফল। রাজ্যসভায় বিলটি এর আগেই গৃহীত হয়েছে।

৬-৮-৭১ —পুণ্ডরীক

অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার ব্রত

আশুতোষ ভট্টাচার্য

একটি মাত্র যে ক্ষুদ্র রচনার মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার নাম 'বাংলার ব্রত।' বাংলা দেশের মেয়েলী ব্রতের দুইটি দিক আছে, একটি শিল্পের দিক আর একটি সাহিত্যের দিক। অবশ্য ইহার শিল্প যেমন লোক-শিল্প তেমনই ইহার সাহিত্যও লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুইটি বিষয়েই সমান অনুরাগ অভিজ্ঞতা এবং অধিকার না থাকিলে অন্ততঃ বাংলার ব্রত সম্পর্কে কোন আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। বাংলা দেশে বোধহয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, সেই জন্য এই বিষয়টির আলোচনায় তিনি যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী কালেও আর কেহ এই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

বাংলা দেশের মেয়েলী ব্রত সম্পর্কিত কোন আলোচনাকেই পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য আরও একটি বিষয়ের আবশ্যক, তাহা হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান। শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতিভা ব্যক্তিবিশেষের সহজাত গুণ হইতে পারে, কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করিবার প্রয়োজন হয়। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে তিনি কেবলমাত্র সহজাত শিল্পী এবং সাহিত্যিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বও যে গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাংলার ব্রত বইখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং পরে যাঁহারাই বাংলার ব্রতকথা সংগ্রহ এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ইহাদের সুগভীর উৎসের সন্ধান দিতে পারেন নাই; এমন কি তাহার কোন প্রয়াসই পান নাই। কিন্তু প্রথমতঃ ব্রতের মধ্যে যে লোক-শিল্পের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনুরাগ বশতঃই হোক কিংবা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের উৎস সন্ধান করিবার আগ্রহেই হউক, যে কারণেই বাংলার ব্রত বিষয়টির প্রতি অবনীন্দ্রনাথ আকর্ষণ অনুভব করুন না কেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বিষয়টি আলোচনার পরিধি অপরিসীম এবং তাহা কেবলমাত্র শিল্প এবং সাহিত্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহা জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত। সুতরাং তিনি সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং যদিও এই বিষয়ক শিক্ষার যে একটি গতানুগতিক ধারা আছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না, তথাপি সহজেই তিনি এই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া তাঁহার বাংলার ব্রত বিষয়ক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ এই আলোচনা কেবলমাত্র নীরস তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবার পরিবর্তে যাহাতে সরস পাঠযোগ্য হয়, সেইজন্য তাঁহার শিল্পী এবং সাহিত্যিকসুলভ মনও সজাগ এবং সক্রিয় হইয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহার 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থখানি যেমন একদিকে সরস তথ্য দ্বারা পরিপূর্ণ

অবনীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

হইয়া আলপনার চিত্র এবং কাব্য রসসিক্ত প্রকাশভঙ্গিতে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুক এবং তত্ত্বজ্ঞানী। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বস্তুর কাব্যরস আস্বাদনে যতখানি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, (তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাহার প্রমাণ) অবনীন্দ্রনাথ তথ্যের বাস্তবমূল্যকে স্বীকার করিবার ফলে কদাচ তেমন হইতে পারিতেন না। বাংলার ব্রতের কেবলমাত্র যে শিল্পগত সাহিত্যগত মূল্যই নাই, তাহার যে একটি গভীরতর তথ্যগত মূল্যও আছে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ক আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া তাঁহার কাজকে লঘু করিয়া লইবার জন্য ইহার তথ্যগত আলোচনা পরিহার করিতে যান নাই; রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় যেখানে কেবল ধূম্র এবং বাষ্প, অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় সেখানে মধ্যে মধ্যে গৌরীশৃঙ্গের কঠিন তুষার প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

'বাংলার ব্রত' বইখানির ভিতর অবনীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের একটি মৌলিক বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং বইখানি আকারে যত ক্ষুদ্রই হোক, ইহার মধ্যে যে সকল তথ্য এবং তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহাদের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।

অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিল্পী নহেন, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস এবং তত্ত্বকথা সুগভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, বাংলার ব্রতের আলপনাকেও তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন একটি লোকশিল্প হিসাবেই দেখেন নাই, ভারতীয় বৃহত্তর শিল্পচেতনার সঙ্গে তাহার যোগ লক্ষ্য করিয়া সেই অনুযোগী তাহার আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

একথা সত্য বাংলা দেশের আলপনাই হোক, কিংবা মেয়েলী ব্রতই হউক, তাহা কখনও বাংলা দেশ এবং বাঙালীর সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। প্রায় সারা ভারতবর্ষেই একভাবে না হোক অন্যভাবে ইহাদের প্রচলন আছে। অবনীন্দ্রনাথও সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, ইহার কারণ, শিল্পসাধনায় অবনীন্দ্রনাথের একটি ভারতীয় অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, সেই দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বাংলার ব্রতের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা ব্যতীত ভারতীয় ধর্ম কিংবা আচারবিষয়ক কোনও আলোচনাই সার্থক হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে ব্রত কিংবা তাহার কথা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা গুজরাটের মত সুদূর অঞ্চলেও প্রচলিত। যে আলপনার অভিপ্রায় (মোটিভ) বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা অন্যদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। যে লোকাচার আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারও একটি সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে। সুতরাং জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক কোন উপাদানই বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারিবার প্রধান কারণ এই যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্প এবং দর্শনের উপরই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেবলমাত্র বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতির মধ্যে তাহা তিনি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি সর্বত্রই লোকশিল্পই হোক কিংবা উচ্চতর শিল্পই হউক, তাহাদের মৌলিক উৎসের সর্বদা সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার 'আর্য ও অনার্য শিল্প' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

'ভারতশিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি মূর্তি মন্দির মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হলো। চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে করতে একটা কথা বারবার আমার মনে জাগে—কই, এতো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একখানা পুঁথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে।...ভারতশিল্পীদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিকভাবে যেমন তেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ, এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,—এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব।...চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অনাব্রত— তাঁরা কাজ করেছেন।'

এই ইতিহাসের অখ্যাতযুগের ভারতবাসীর আচার-আচরণের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রতগুলির অনুশীলন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাধারণ লোক-শিল্প কিংবা লোক-সাহিত্য রসিকগণ যেমন এই বিষয়গুলির কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কিংবা বস্তুগত বিশ্লেষণ কিংবা সংগ্রহের মধ্যেই তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় যাহা করিয়াছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তাহা হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ যাহাদিগকে 'অনাব্রত'ধারী, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত, অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন যে, 'এঁরা ভারত শিল্প চর্চার বেলায় কোন্ স্থান অধিকার করেন সেটা দেখার বিষয়।' কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, তাহার উপরই ভারতশিল্পের মূল ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। বাংলার ব্রতের আলপনার মধ্যেও তিনি তাহাই সন্ধান করিয়াছেন।

বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রতকে অবনীন্দ্রনাথ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন— শাস্ত্রীয়ব্রত ও নারীব্রত; নারীব্রত তাঁহার মতে আবার দুই ভাগে বিভক্ত—কুমারীব্রত ও নারীব্রত।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা যে ব্রতের পৌরোহিত্য করা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার মতে শাস্ত্রীয়ব্রত এবং যাহাতে নারীরাই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, তাহাই তাঁহার মতে নারীব্রত। কিন্তু শাস্ত্রীয়ব্রত বলিয়া একশ্রেণীর ব্রতের তিনি উল্লেখ করিলেও তাঁহার 'বাংলার ব্রত' বইখানির মধ্যে তাহার বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ইহার কারণ, শাস্ত্রীয়ব্রত বলিয়া মূলতঃ কিছু নাই। কোন কোন মেয়েলী ব্রত উচ্চতর সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া বাহ্যতঃ শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র, অর্থাৎ তাহাতে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় আচার যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সঙ্কল্প ইত্যাদি

গতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা শাস্ত্রীয়ব্রত নহে, শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'মেয়েলি ব্রত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কোন কোন সময় তাহার উদ্দিষ্ট দেবতাকে 'স্ত্রীয়মতাং ইষ্টদেবতা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ইহাদিগকে কেবলমাত্র পুরোহিতের সম্পর্কের জন্যই শাস্ত্রীয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

যখনই পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে কোন লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান কিংবা 'মেয়েলি' প্রচলিত ব্রতের ভার পড়ে, তখন যে পুরোহিত যে পূজানুষ্ঠানে অভ্যস্ত তিনি সেই অনুযায়ী তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কারণ, ইহাদের সুনির্দিষ্ট কোন বিধি নাই। বৈষ্ণব পুরোহিত বৈষ্ণব আচারে, শাক্ত পুরোহিত শাক্ত আচারে এবং তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত পুরোহিত তান্ত্রিক আচারে এই সকল লৌকিকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্রতের কথাও পাঠ করেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোহিত পূজা সম্পন্ন করিয়া যাইবার পরও পরিবারের নারীরাই ব্রতের কথা নিজস্ব ভাষায় বলিয়া থাকেন। ইহাতেই পুরোহিতের অনুপ্রবেশ যে পরবর্তীকালে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শাস্ত্রীয়ব্রত বলিতে অবনীন্দ্রনাথ ইহাই মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারাও মেয়েলী ব্রতেরই অন্তর্ভুক্ত, কেবল শাস্ত্রীয় আচার দ্বারা প্রভাবিত মাত্র, ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

বাংলার ব্রতগুলির উৎপত্তির ইতিহাস যে কুয়াসাচ্ছন্ন তাহা অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এই কুয়াসার জাল ছিন্ন করিয়া সত্য নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যুক্তি এবং বিচার দিয়া সেখানে সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, এখানে তাঁহার যুক্তিবাদী মন, তাঁহার স্বাভাবিক ভাববিলাসিতার নিকট নতিস্বীকার করে নাই।

বাংলার ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ বেদের সূক্তের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহাদের ভাব এবং ভাষাগত সরলতা বৈদিক সূক্তগুলিরই অনুরূপ বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'খাঁটি মেয়েলী ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, উদ্দেশ্য চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও, সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্দাম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ দুয়েরই মধ্যে লোকের আশাআকাঙ্ক্ষা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে।' তারপর তিনি বৈদিক সূক্ত হইতে নদী এবং সূর্যের স্তব উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতে যে নদী এবং সূর্যের সম্পর্কে ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাদের তুলনা করিয়াছেন।

সামাজিক জীবনের যে স্তর হইতে একদিন বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল,

বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলির রচনার মধ্যেও তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করিবার মধ্যে যে কত সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাবের পরিচয় দেখা যায়, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন সংস্কারমুক্ত না হইলে সত্যের সন্ধান কদাচ সার্থক হইতে পারে না। বেদ অপৌরুষেয় ইহাই ভারতীয় হিন্দুর চিরন্তন সংস্কার, অথচ ইহা প্রকৃত সত্যোপলব্ধির যে অন্তরায় তাহা সে যুগে অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহার আরও একটি দিক এই যে বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলি অভিজাত সমাজের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ এবং অবহেলিত হইয়া ছিল, ইহাদের সম্পর্কে এই প্রকার বিশ্বাস ইহাদের মর্যাদাই যে কেবল বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা নহে নিতান্ত সাধারণ জিনিসের মধ্যেও যে অসাধারণ বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস, তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যেই ক্ষুদ্রের মধ্যেই মহতের সন্ধান করিয়াছেন। লোক-শিল্প হইতেই তাঁহার উচ্চতর শিল্পসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে, লোক-সাহিত্য অবলম্বনে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনাকেও রূপায়িত করিয়াছেন, তাহারই স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলার মেয়েলী ব্রতের ছড়ার মধ্যে বৈদিক সূক্তের প্রেরণার সন্ধান করিয়াছেন।

যখন পর্যন্তও ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতিই বুঝিতেন অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীণতম উপকরণটির জন্যও একমাত্র বেদকেই এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিতেন তখন অবনীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের এই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া এই বিষয়ে অনার্য সংস্কৃতির দাবীকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে

সেদিন কম দুঃসাহসের কথা ছিল না। বাংলার ব্রতের প্রতি অনুরাগের কারণ তাঁহার মূলতঃ ইহাই। কারণ, ইহার মধ্যে ভারতীয় সনাতন আচার-জীবনের অনুশাসনমুক্ত বিচিত্র উপকরণের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ কুমারী ব্রতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; ইহার তত্ত্ব, শিল্প এবং সাহিত্য কোন দিকের আলোচনাই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার ফলে ইহা যেমন তথ্যনিষ্ঠ হইয়াছে, তেমনই সরস সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। কুমারী ব্রতের আলোচনার মধ্যে পূর্ব বাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনাটি দীর্ঘতম স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়া সংগ্রহে দুই একটি ব্যতীত পূর্ব বাংলার ছড়া সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার ছড়াই সর্বাধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। হয় ত এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

দেশ দেশান্তরের লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতের তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত বিষয়ক আলোচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে সুগভীর অধ্যয়নের ভিতর দিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সে যুগের পক্ষে প্রকৃতই বিস্ময়কর। তিনি এক ক্ষেত্রে বাংলার নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত বৃষ্টি আহ্বান করিয়া একটি ব্রতের সঙ্গে আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ একটি ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা তিনি যে ভাবে দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁহার কি সুগভীর লক্ষ্য ছিল। যেমন তিনি লিখিতেছেন, 'একটি মাটির চাকতি বা সরা; তার এক পিঠে আলপনা দিয়ে সূর্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ক্রশের মত একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্য দিনের সূর্যকে বুঝিবে; একটি

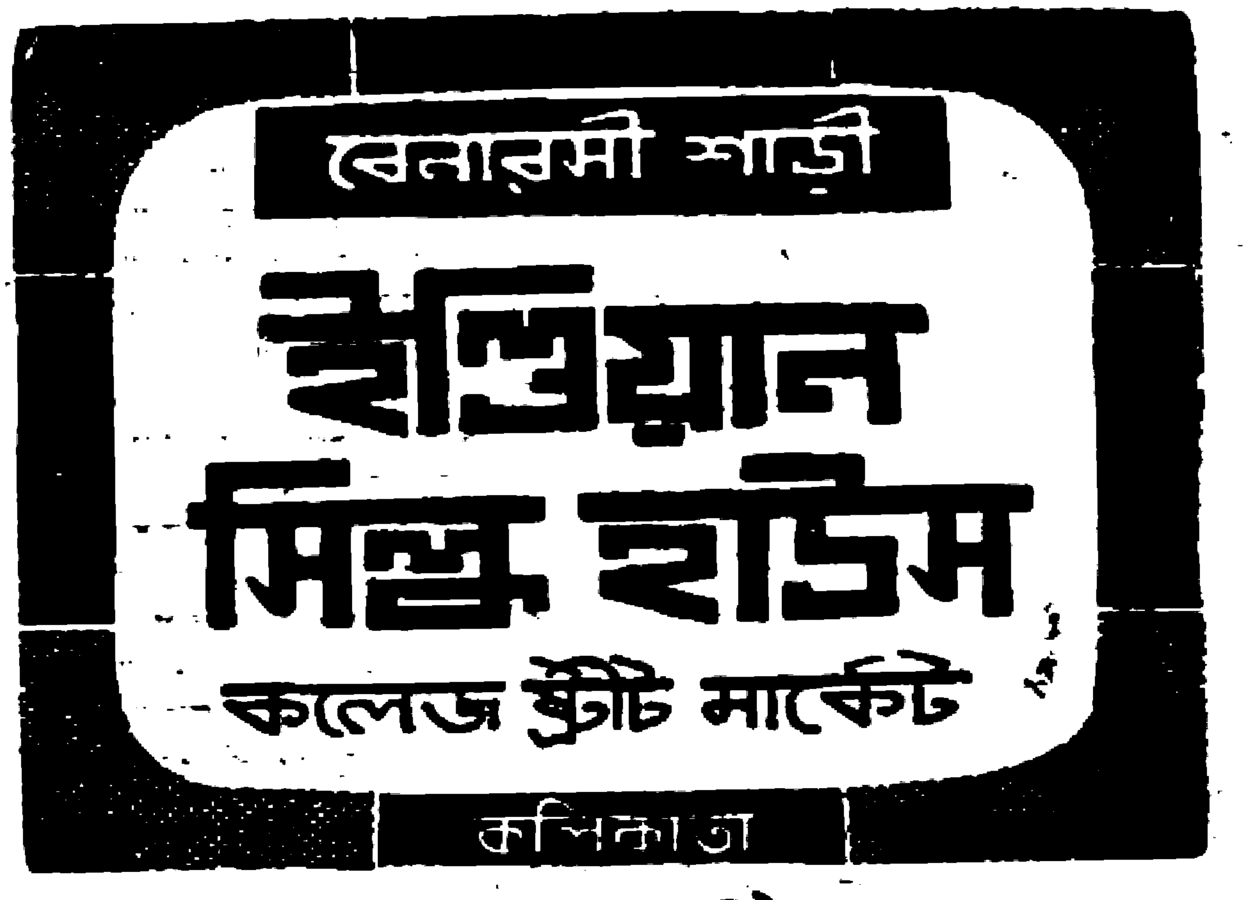

আমাদের কোন শাখা নাই

চারিদিকে সবার বিপদার সব পর্বতের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধানক্ষেত কোথাও কলা গাছ ও হলুদের সব বিন্দু, তারই ধারে বসিয়ে দিতে হবে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা তাল। সবার অন্য পিঠে লাল নীল হলদে রঙের বাদ দেওয়া চক্রাকার সূর্য ছাতার আলপনা দিয়ে পূজো বাড়ীতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আলপনা দিয়েই ব্রত শেষ, ব্রত কো ব্রত ছড়াও কিছু বলা হয়।'

এই ব্রতটির বর্ণনায় দুইটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে:—প্রথমতঃ একটি শিল্পীর রস দৃষ্টি, দ্বিতীয়টি একটি তত্ত্বানুসন্ধানীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এই দুইয়ের সম্মেলনেই এই বর্ণনাটি অদ্ভুত সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনার ভিতর দিয়া লেখক এই চিত্রটিকে যেন বাঙলা দেশের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বাংলা দেশেরই মাঘমণ্ডল ব্রতের একটি আলপনার ছবি ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনাটি অবনীন্দ্রনাথ কোন চিত্র হইতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইবে নতুবা কেবল মাত্র লিখিত বর্ণনার ভিতর হইতে এত খুঁটিনাটি করিয়া ইহার বিবরণ উল্লেখ করিতে পারিতেন না। বাংলার আলপনা কিংবা ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে কত দূর পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, এই বর্ণনাটি তাহার প্রমাণ।

অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলী ব্রতের যে বিস্তর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যে কত বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার আরও একটু নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

'ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্য জাতি এই সব অন্য জাতির চেয়েও বেশি দূর অগ্রসর হন নি। জগৎ-সংসারের এক নিয়ন্তাকে স্বীকার করেও আর্যদেরও মধ্যে অনেক দেবতাতে ঘটেছে। তার পূর্বে জলের এক দেবতা, আগুনের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, এমন কি জন্তুর পর্যন্ত। অন্য জাতের মধ্যেও এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে কেবল। যেমন বেদের সূর্য ইজিপ্তের রা অথবা রা আ, মেক্সিকোতে রায়মী, বাংলায় রার বা রাই।'

এই সকল তুলনামূলক আলোচনাকে কোন মতেই কষ্টকল্পনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, ইহাদের মধ্য দিয়া অবনীন্দ্রনাথ যে সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা সুগভীর অনুশীলন সাপেক্ষ এবং এই ধারায় অগ্রসর হইতে পারিলে ইতিহাসের বহু ছিন্ন উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে।

'বাংলার ব্রত' ভাষার দিক দিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত—প্রথমতঃ সহজ গদ্য, দ্বিতীয়তঃ কাব্যধর্মী গদ্য। বইখানির যে অংশে তথ্য এবং তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ সহজ গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য কিংবা গীতিরসের স্পর্শ মাত্র নাই, কিন্তু যেখানে তিনি ব্রতের কথা বিশেষতঃ মাঘমণ্ডল ব্রতের নাট্যধর্মী

অবনীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি স্বভাবতই কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রতের কথাটিকে যথাযথ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলিবার নিজস্ব ভঙ্গিই প্রকাশ পাইয়াছে, মেয়েলী ব্রতকথা স্বভাবতঃই যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

কোন কোন ব্রতের ছড়া উদ্ধৃত করিয়া অবনীন্দ্রনাথ তাহা এমন খুঁটিনাটিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে একটি ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুলাই ঠাকুরের ব্রতটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'এই ছড়া ত শুধু আওড়ে যাবার নয়; এতে যাত্রা হতে হবে, জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাং ঝপাং পড়া, সকাল হবে এ দিক ও দিক দেখা এবং হাসুর হাসুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস পর্যন্ত।' এর সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জেলে রাখাল ছেলেরা এবং মেয়েরা ঘুরছে নানা দর্শকের নানা ভাবভঙ্গি, ঘরের ঘর প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে এক পল্লীব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই গ্রামের আসরে বসে নিজের চোখে এই অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, আমরা পাব। ইহা হইতে মনে হইবে যেন অবনীন্দ্র-নাথ স্বয়ং পল্লী বাংলার মেয়েলী ব্রতগুলির যে তথ্য, তত্ত্ব, শিল্প এবং সাহিত্যগত এত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে কিংবা পরে কেহই এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেন নাই। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা শিল্প এবং সাহিত্যের যুগপৎপ্রেরণায় যুগপৎ জাগিয়াছে, ইহার মধ্যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্যানুসন্ধানের প্রেরণাও আসিয়া সার্থকভাবে যুক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার বাংলার ব্রত এক অভাবনীয় রচনা।

• অ্যালকালেকা টনিক • কিংস হোমোটোন
• কিংকোর আর্নিকা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিয়া সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণার এবং উদ্ভাবনী
একক আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
১০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী :
৮৬, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২
GRACE/K/20/70
কিং এণ্ড কোম্পানীর [সকল শাখার] ঔষধ বিভাগ প্রতিদিন সকাল
৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

ভূদেব চৌধুরী

(১)

"কেবল শিল্পীদের কাছে নয়, সাধারণ জনতার পক্ষেও চিত্রশিল্পীর ভাবনা ও রচনা চিরকাল লোভনীয় হয়। লেখার মধ্যে আমরা তাঁর কৃতির গোপন রহস্যটি খুঁজে পাবার ভরসা করি, অথবা তাঁর মানস ব্যাকুলতার প্রতিফলন! আকাঙ্ক্ষা করি তাঁর জীবনের নিভৃতে অনুপ্রবেশ করতে পারার।" অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন আন্দ্রে কার্পেলেস, (১) ঠাকুরশিল্পের বড়ুয়া প্রবন্ধ-বলীর আলোচনায় শ্রীমতী আন্দ্রে নিজেও ছিলেন চিত্রাঙ্কন বলয়ের শিল্পী!

বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় অবনীন্দ্রনাথের সকল লেখারই শ্রেষ্ঠ মূল্য ঐ 'ভরসা' পূরণের সম্ভাবনায়; এইটুকুই তাঁর সাহিত্য-কীর্তির একমাত্র রস-উৎস। লিপিশিল্পে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকর্মা; শেষ জীবনে ছবি এঁকেও নিঃশব্দে করে গেছেন; তবু নিজেই বলেছেন, (২) তাঁর একমাত্র পরিচয়, তিনি 'কবি-মাত্র'। অবনীন্দ্রনাথের লিপি-কৃতির মূল্য বাংলাসাহিত্যে অনন্য, কেবল গুণে ও স্বাদে নয়, বৈচিত্র্য এবং বিস্তারেও; একখানি ছবি না আঁকলেও কেবল লেখার জন্যেই বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয়তা তিনি দাবি করতে পারতেন, এমন যুক্তিও (৩) প্রমাণ-সাপেক্ষ নয় মোটেই। আর ইতিহাসের বিচারে কলম আর তুলি তাঁর হাতে চলেছে যুগপৎ। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ পদের জন্য যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে তখন পর্যন্ত পাওয়া মোটা তিন চিত্রাঙ্কনী স্বীকৃতির পাশে স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন, (৪) "এবং আমি বাংলাসাহিত্যের কিঞ্চিৎ খ্যাতিসম্পন্ন লেখকও।" তা হলেও অবনীন্দ্র-নাথ অন্তঃপ্রকৃতি-বশে আদি-অন্ত সম্পূর্ণ নিভেজাল এক চিত্রশিল্পী ছাড়া আর কিছুই নন। রবীন্দ্রনাথের লেখা যেমন গল্প-উপন্যাস-নাটক থেকে চিত্রাঙ্কন পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভার সহযোগী কিংবা সম্পূরক, অবনীন্দ্রনাথের সকল লেখাই তেমনি তাঁর চিত্রশিল্পী মনের রূপবাহী! আর এই বিচারে সর্বশিল্পীর কাছে ছবির মত, চিত্রশিল্পীর-ব্যক্তিত্বের পক্ষে লেখার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক একান্ত।

সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর আত্ম-রচনা; রবীন্দ্রনাথের কথাই চূড়ান্ত ও "আপনারে তুমি দেখিছ মধুরে রসে। আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।" সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী আত্মসমর্পণ করেন আসলে আত্ম-আস্বাদনের লোভেই। আর তাইতেই সৃষ্টির জন্ম। অবনীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন; (৬) "রচনা যেখানে রচয়িতার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেইখানেই সে আর্ট।" কিংবা (৭) সৃষ্টির প্রকাশ হল স্রষ্টার অভিমতে, শিল্পের প্রকাশ হল শিল্পীর অভিব্যক্তিতে হবে, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা সম্পূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম।" শিল্পীর স্মৃতিভাণ্ডার, কল্পনাজগৎ ও তারই পরিপোষণে গঠিত তাঁর 'ব্যক্তিত্ব' তথা বিশিষ্ট মনোভঙ্গির প্রভাবেই শিল্প তার অনন্যপর স্বাতন্ত্র্য লাভ করে থাকে। তাকে আস্বাদন করতে হলে মনে পৌঁছানো চাই; শিল্পকে ধরে শিল্পীর

অন্বেষণ / অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

অনন্দচেতনায়, বাইরে থেকে একেবারে ভেতরে।

কিন্তু বাইরের চাকচিক্য কিছু কম নয়, তাই রসের সন্ধানে আমাদের দিন কাটে অন্দরমহলের পথে—দেউড়ির কাছে। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট কথন আজ আমাদের মুখে মুখে—ভারতবর্ষকে তিনি "বিশ্বজনের আত্মউপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্মউপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে।" কিন্তু এটুকু তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন—তাঁর রচিত সৌন্দর্যের আস্বাদন নয়। অথবা 'পাশ্চাত্য বস্তুজ্ঞান তিনি সংগ্রহ করেছেন সন্দেহ নেই, প্রাচ্যের ধ্যানমগ্নতাও কিছুমাত্র বর্জন করেন নি, উভয়কেই যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্ররীতির সংগত একটি সমন্বয় ঘটিয়ে তোলার আশ্চর্য সিদ্ধি।—' বিশেষজ্ঞ কণ্ঠের এ সব উক্তিও (৮) শিল্পের মূল চরিত্র লক্ষণেরই নির্দেশক—অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের চাবিকাঠিটি এখানেও উপস্থিত নেই।

সে লুকোনো আছে স্রষ্টার অন্তর্লোকের স্ফটিক স্তম্ভে। অবনীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আর উক্তিতেই তার সন্ধান ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র—একটির কথাই বলি (৯) ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডির বাড়ি গিয়ে তখন (১৮৯০) (১০) রোজ সকালে অয়েল পেন্টিং শেখেন। নিচের তলায় থাকেন বুড়ো এক ইটালিয়ান মিউজিক মাস্টার আর তাঁর মেয়ে, দুজনে মিলে রোজই তখন বাজান,—"মেয়ে পিয়ানো বাজায় বাপ বাজায় বেহালা।...... একদিন সকালে রোজকার মত ছবি আঁকছি, নিচে থেকে বেহালার সুর এল কানে, উদাস করে দিলে।......সুর তো নয় যেন বেহালাটা কাঁদছে। সেদিন সে সুর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বেহালার ছড়ি বেহালার তার আর যে বাজাচ্ছে তার মনসতন্ত্রী এক হয়ে গেছে। আজ আর পিয়ানো নেই সঙ্গে। গিলার্ডিকে বললুম, 'সাহেব, আজ বেহালা কেন কাঁদছে মনে হচ্ছে, কেন বলো তো? এমন তো শুনিনি কখনো?' সাহেব বললেন, 'চুপ চুপ, জানো না, বুড়োটির মেয়ে কাল চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে!' সেদিন আর ছবি আঁকা হল না আমার। খানিক বাদে আস্তে আস্তে নেমে এলুম। সিঁড়ির কাছের দরজাটিতে দেখি, বুড়োটি বসে আছে চেয়ারে কাঁধে বেহালাটি রেখে মাথা হেঁট করে, একমাথা সাদা চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে। সেদিন বুঝেছিলুম মনে ধরল আজ সুরের আগুন। অন্তর বাজে তো যন্ত্র বাজে।'

শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর অন্তরের নিভৃত মিলন-বিন্দুটিই রসের উৎস। রাণী চন্দকে গল্পটি বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের সেই উৎসের সন্ধান দিতে (১১)—'দীপ জ্বলল মন। দেখে নিলেম।' কিন্তু এখানেও মনের গভীরে 'চোরাটি' রয়েই—এত বিশেষ মুহূর্তের মানসিকতা অব্যবহিত বাধার বৃন্তে সুরের কুঁড়ি হয়ে ফুটেছিল বেহালা বাদকের হাতে। আরো গভীরে মনের যে চরিত্র চিরন্তন, সেদিনের ঐ এক বাজনার মতো সকল বাজনাতেই যার সমান প্রসারের আকাঙ্ক্ষা—তার প্রকাশের পূর্ণতাতেই শিল্পের নিরপেক্ষতা, তার উপভোগেই শিল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের [illegible] ছবি দেখে [illegible] অভিভূত ভাস্কর-[illegible] লিখেছেন (১২)—'আর্টিস্ট [illegible] কাগজে relief তুলেছেন। অক্ষরের রঙের বাজনা শুনেছি, আর আমি তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টকে।'

এই দেখতে পারার ক্ষমতাতেই শিল্পরসের উপভোগ সার্থক, কারণ শিল্পীর নিজেকে দেখাতে পারার আগ্রহ থেকেই তো শিল্পের জন্ম। প্রকাশই শিল্পের প্রেরণা, কারণ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর মজ্জায় স্পন্দিত। কিন্তু প্রকাশের মাধ্যম যেমন বিচিত্র, তার মাত্রাও সেই অনুপাতে বিভিন্ন। লিপির ভাষা শব্দার্থে মুখর, কিন্তু রেখার ভাষা নির্বাক মনোহারিতায় মর্মস্পর্শী। বাণীর তুলনায় তার অর্থের চেয়ে ব্যঞ্জনা, বক্তব্যের অপেক্ষা সংকেত রেখার পরতে পরতে সাজিয়ে দিয়ে চিত্রশিল্পী নিজেকে নিবেদন করেন আপন সৃষ্টির পায়ে। সে প্রকাশের সংবেদনা গভীর যত, তত অস্ফুটও—আবেদনও তাই সীমিত, কেবল আলংকারিক তাৎপর্যে নয়, আক্ষরিক অর্থেই চিত্রশিল্প একান্তভাবে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'। সেই মৌন ভাষা রসিকের মনকে যত আবিষ্ট করে, ততই আরো অনেক না-জানার আক্ষেপ করে রাখে অতৃপ্ত। সেই স্নিগ্ধ অনির্বাণ মোহময় অতৃপ্তিই রসিক-মনে চিত্রশিল্প-রসের করুণ-বিন্দু, এ আস্বাদনে আবেশ আছে, তেমনি উৎকণ্ঠাও। যে ছবিকে ভালোবেসে মুগ্ধ হই, অথচ তার মানে বুঝি না—বুঝি না শিল্পের ভাষা অনুভববেদ্য, বোধগম্য নয় বলেই! শিল্পীর কোন নিভৃত আক্ষেপ অথবা রহস্যময় কোন আভাসে সেই ছবি রেখার বাঁধনে মর্মরিত হতে চাইছে, তাকে খুঁজে পাবার—নিঃশেষে নির্ণয় করতে পারার অধীর ব্যাকুলতাই সাধারণ মানুষের মনেও শিল্পীর লেখার প্রতি আগ্রহ জাগায়—তাই বলতে চেয়েছেন আঁদ্রে কার্পেলেসও।

আর এ আগ্রহ শিল্পরসিকের চেয়ে শিল্পীরও কম নয়, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে ফেলাই তো তাঁর একাগ্র বৃত্তি। তবুও! অন্যে যে যাই বলুন, অবনীন্দ্রনাথ রেখার মাত্রায় যে-আপনাকে নিবেদন করেছেন আপনারই অন্তরের আত্মসমর্পিপাসু সৌন্দর্য চেতনার কাছে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাকেই মাত্রাহীন অজস্র কথায় মাত্রা দিয়ে আর এক ভাবে মেলে ধরতে চেয়েছেন আপন লেখালুব্ধ মনের সামনে! রেখার আর লেখার মিলে শিল্পীর পূর্ণ প্রকাশ। লেখার মূল্য এইখানেই, এবং আরো বেশি এই জন্য যে লেখায় সে প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে হয়েছে 'সর্বসাধারণীকৃত!' অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠ আসলে শিল্পীর সেই ব্যক্তিমূর্তির মূল সন্ধানের 'করণ-কৌশল',—চিত্রের আধারে যার প্রকাশ শিল্প-রসের অমূর্ত ভাষায়! লেখাপাঠ যেন রেখা-পাঠের ভূমিকা! রেখা পড়বার বিদ্যে জানা নেই, তাই মূল পড়ার আগের মুখবন্ধটুকুই বর্তমান আলোচনায় একমাত্র [illegible]!

কিন্তু সে চেষ্টাও হঠাৎ সুরু করবার উপায় নেই। অবনীন্দ্রনাথের লেখার ভাষাও নিছক বাণী-শিল্প নয়—'বাগর্থের' হর-গৌরীই যার ভিত্তি। আসলে এ লেখাও রেখাশিল্পের রূপান্তর, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত বা তার পরিশীলিত মানোন্নতির চেষ্টা। মাঝে প্রায় বছর আট-নয় (১৮৩০—১৮৩৮।৩৯) (১২ক) ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে প্রধানতঃ যাত্রা লিখতে বসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তখন একবার মনে হয়েছিল, (১৩) "দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানারকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।" —অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর ভাষা আসলে 'বাগর্থের' দর্পণে চিত্রশিল্পীর আত্মানুসন্ধানের পরিভাষা। এ ভাষায় বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশি—বহুভাষী বিবৃতির ছদ্মবেশে ঘটেছে নিগূঢ় আত্মারোপণ! ছবির ভাষার মত তাঁর লিপিকর্মও তাই রহস্য আবরণে মোড়া। পড়লে মনে হয়, শিশুশিল্প হয়েও কেবল শৈশবসীমায় আবদ্ধ করে রাখবার মত নয়,—বড়োদের রসানুভবকে চরিতার্থ করেও শিশুর জগতে তার চিরন্তন আবাস। ফলকথা, অবনীন্দ্রনাথের ছবির চেয়ে লেখার ভাষায় তাঁর আত্মউন্মোচন মুখরতর হলেও কম রহস্যাবিষ্ট নয়! তাই লেখার মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ এক সঙ্গে মুঠো করে ধরবার উপায় নেই। ব্যক্তিকে জানার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বকে ক্রমশ আবিষ্কার করতে হয়।

আর ব্যক্তি অর্থে, অন্তত শিল্পীর পক্ষে, কেবল জন্মমৃত্যু আর নূতনতর প্রজন্মবহী সত্তার আধারটি মাত্র নয়! এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বের ওতঃপ্রোত স্বভাবটিকে খবরের অঙ্কের চেয়ে অনুভবের তুলাদণ্ডে যাচাই করাই সহজ। আসলে এ-দুয়ের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল—একে অন্যের পরিপূরক। ব্যক্তিবিশেষের সহজাত মনঃপ্রকৃতি তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি,—সারা জীবনব্যাপী তার ক্রম-উন্মোচন। অন্য পক্ষে ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের গঠন ও ঘনীভবনে প্রভাব বিস্তার করে। অবনীন্দ্রের লেখা আর রেখায় তাঁর সেই রহস্য-সত্তারই বিচিত্র প্রকাশ। বর্ণনার চেয়ে তুলনার মাধ্যমেই হয়ত এসব দুরূহ কথা স্বচ্ছ হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ—মাত্র দশ বছরের বড়-ছোট খুড়ো-ভাইপো। রবীন্দ্রনাথের জন্মের তারিখ ৬ই মে, ১৮৬১, অবনীন্দ্রনাথের—৭ই আগস্ট ১৮৭১।— পরস্পরের মধ্যে [illegible]

নিবিড়, শৈশব-অভিজ্ঞতায় সাদৃশ্যও কম নয়। তবু ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে দুজনে ছিলেন পরস্পর বিপরীত। একজন আজন্ম-পরিণত ঋষি হন—আর একজন চিরশিশু। অবনীন্দ্রনাথ গল্প বলেছেন (১৪) তাঁদের ছোটোবেলায় 'ইস্কুল-ইস্কুল' খেলার। 'দীপুদা ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে গম্ভীর স্বরে বলেন, 'পড় সবাই।' পড়া আর কি, কোলের উপর ঠোঙা রেখে তার থেকে চিনাবাদাম বের করে ভাঙছি আর খাচ্ছি, দীপুদার হাতেও এক ঠোঙা, তিনিও খাচ্ছেন।......একদিন আবার প্রাইজ 'ডিস্ট্রিবিউশন' হল। কে প্রাইজ দেবে। উপরের বারান্দায় পায়চারি করছেন রবি-কা। তিনি আসতেন না বড়ো আমাদের খেলায় যোগ দিতে। সমান বয়সের ছেলেও তো থাকত ঐ খেলায়। কিন্তু তিনি ওই তখন থেকেই কেমন একলা একলা থাকতেন, একলা পায়চারি করতেন। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে দেখতেন দাঁড়িয়ে, নীচে আমরা খেলা করছি। গিয়ে বললুম তাঁকে, 'আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, তোমায় আসতে হবে।' রবিকা একটু হেসে নেমে এলেন, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। ...প্রাইজের পরে আবার তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিলেন একটি খাঁটি শুদ্ধ ভাষায়।'

—রবীন্দ্রনাথের একাকিত্বের নয় কেবল, স্বভাব 'বড়োত্বের'—অর্থাৎ নিজেকে বড়ো বলে ভাববার আন্তরিক আগ্রহের এক কৌতুক-কর ছবি এটি। আসলে তিনিও তো তখন ঐসব খেলুড়িদের দলে! অন্যদের কথা ছেড়ে দিলেও 'দীপুদা' অর্থাৎ দীপেন্দ্রনাথ (১৮৬২-১৯২২) রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো! খেলায় যোগ দিলে অন্ততঃ মাস্টারমশায়ের পদবীটি তাঁর পক্ষে অবশ্যই মানানসই হত। তা নয়, ওপরের বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের চালে ছোটদের খেলা দেখতেন নেকনজরে, 'একটু হেসে' নেমে আসেন তাঁদের আবদারে সাড়া দিতে, কিংবা সেই বড়োত্বের চালটুকু ধরে রাখতে 'খাঁটি শুদ্ধ ভাষায়' বক্তৃতাও করেন। [illegible] রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'চিরকাল [illegible]'!

আর অবনীন্দ্রনাথ? তিনি নিজেই বলছেন (১৫)—"চিরকালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার গেল না কোনো কালেই। আমার নামই ছিল বোম্বেটে। দুরন্তও ছিলুম, আর যখন যেটা জেদ ধরতুম, তখন সেটা করা চাই-ই। তাই সবাই আমার ওই নাম দিয়েছিলেন। রবিকারাও চিরকাল ওই 'খ্যাপা' 'পাগলা' বলে আমায় ডাকতেন। আমিও যেন তাঁদের কাছে গেলে ছোট্ট ছেলেটি হয়ে যেতুম। এই সেদিনও রবিকাদের কাছে গেলেই আমার বয়স ভুলে আমি যেন সেই পাগলা খ্যাপা হয়ে যেতুম। তাঁরাও আমায় সেইভাবে দেখতেন।

"জ্যোতিকাকার কাছে রাঁচিতে গেলুম, এখন তো আমি কত বড়, ছেলেপুলে নাতি-নাতনি আমার চারদিকে। জ্যোতিকাকামশায় রোজ সকালে টুং টুং করে রিক্‌সা বাজাতে বাজাতে ফিরতেন। কোলের উপর একটি কেকের বাক্‌স। রিক্‌স থেকে নেমে কেকের বাক্‌সটি আমার হাতে দিয়ে বলতেন। 'অবন, তোমার জন্য এনেছি, তুমি খেয়ো।' ঘর ভরতি নাতি-নাতনি, সে সব ফেলে আমার জন্য নিজের হাতে বাজার থেকে কেক কিনে আনতেন। এনে আমার হাতে দিয়ে বারে বারে বলতেন, 'তুমি খেয়ো কিন্তু, তোমার জন্যেই এনেছি।' আমি মহা অপ্রস্তুতে পড়তুম। ...কিন্তু তা হবে না। ছোট ছেলেকে লজেন্‌স খেতে যেমন দেয়, অবন কেক খেতে ভালোবাসে, নিজের হাতে এনে দিতে হবে। এমনিই ছোট্টটি করে দেখতেন ওঁরা আমাকে চিরকাল। এখনো এক-একদিন আমি স্বপ্ন দেখি যেন বাবামশায় ফিরে এসেছেন, আর আমি ছোট্ট বালকটি হয়ে গেছি। একেবারে নিশ্চিন্ত। আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই স্বপনেতে। এ স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। মা-পিসিমারা সব বাড়িতে আছেন, আমিও বড় এই রকমই আছি, ছেলেপুলে সব ঘর ভরতি।"

উদ্ধৃতি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অন্তরের [illegible] চেনা গেল তাতে। বড় থেকেও, ঘর ভরতি ছেলেপুলে, নাতি-নাতনির মাঝখানে বড় থেকেও, ছোট্ট বালকটি হবার বাসনায় স্বপ্ন দেখা—এই অবচেতন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে মোড়া তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর লেখা ছোটোদের জন্য হলেও বড়োদের লোভের সামগ্রী, কিংবা বড়োদের জন্যে লেখাও ছোটটি হয়ে পড়তে চাওয়ায় মোহাবেশ। তাছাড়া তাঁর বাক্‌রীতিতে নাট্যসুলভ ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্যটুকুও লক্ষ্য করবার মত। অবশ্য সে সবই বিশেষার্থে। চিত্রেও ঐ নিভৃত ব্যক্তি-লক্ষণ কি বিভায় [illegible] করেছে সে সব কথা অধিকারী জনের আলোচ্য। কিন্তু তার আগে ঐ অম্লান শৈশব আর অকলুষিত রমণীয়তার রহস্য-মর্মোদ্ঘাটনটুকুর সন্ধান করতে হয় ব্যক্তির বিকাশের ইতিহাসে।

বিশ্রাম / অবনীন্দ্রনাথ

(২)

বাল্যকাল জীবনের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্র- [illegible] অবনীন্দ্রনাথের শৈশব পরিবেশ [illegible]

সাদৃশ্য বড়, বৈসাদৃশ্যও তার চেয়ে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ জীবিত সন্তান—কালের হিসেবে ছিলেন পরাগত। (১৬) অবনীন্দ্রনাথ তা নন, তাছাড়া ছোট বোনও ছিলেন তাঁর দুজন, তাদেরও তিন ভায়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ মা-বাবার জীবিত ছোট ছেলে। রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথেরও শৈশবের একটা অংশ কেটেছে স্বজন-বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হয়ে, চাকরদের মহলে। উপেক্ষিতমনা সে বেদনার গ্লানিটুকু বেশি বয়সেও স্মৃতি থেকেও মুছে ফেলতে পারেন নি শিল্পী! চাকরদের মহলে দুটি আশ্চর্য নস্য কুকুর ছিল, (১৭) "কুকুর দুটো পাঁউরুটি বিস্কুট আর দুধসাবু ভিন্ন খায় না। আমার ভালো লাগে থাকে কোঠের নীচে খালি ডিমের খোলা।" একদিন নাকি তাই তুলে মুখে দিতে ধরা পড়েছিলেন, বাবার কাছে শাস্তিও জুটেছিল। ক্ষোভের বশে সেদিন কুকুর দুটিকে খুন করার ফিকির চিন্তা করতে পেরেছিলেন শিল্পী-শিশু, এই স্বীকৃতি-টুকু উপেক্ষাযোগ্য নয়।

বাবাদের প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে ছিল এক অবহেলা-অনুকম্পা। অল্প বয়সে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন (১৮৭৬?) (১৮) বোনদাদা তখন সে স্কুলে সাফল্যের সঙ্গে পড়ছেন, দাদা গগনেন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স-এর ভালো ছাত্র। (১৯) আর অবনীন্দ্রনাথ স্কুলে বাবার নামে কাঁদেন, স্কুলে গিয়েও 'বোম্বেটেপনা' করেন, শেষ পর্যন্ত তো অস্বাভাবিক শাস্তি ভোগের সূত্রে স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল (১৮৮০) (১৮)। বাবা ভাবতেন বড়ো দুই ছেলে বিলেত যাবে, য়ুরোপে। আর অবনীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন (২০), আমাকে দেখিয়ে বড় পিসিমাকে বলতেন, 'ও থাকুক এখানেই। আমার সঙ্গে ঘুরবে, ইন্ডিয়া দেখবে জানবে।' তখন থেকেই সকলে আমার বিদ্যেবুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। "এই অন্তরে গোপন যে বেদনাবোধ রয়েছে—তার সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের হীনমন্যতার সাদৃশ্য স্পষ্ট। ...তা হলেও সে দুর্বলতাবোধ রবিকার মত নিরবলম্ব ছিল না। তিনটি পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, ছোট ছেলেটিকে বাবা কাছ ছাড়া করতে চান না, এই অবস্থায় মধ্যে আপাত অক্ষম শিশু মন একটি মধুর আশ্রয় খুঁজে পেত নিশ্চয়, বাংলোর সেই কাচলো পালিত ছায়ায়,—যার অজস্র প্রকাশ শিশু-শিল্পীর মনকে স্পর্শ করেছিল অকাল-মৃত ছোট ভাইটির প্রসঙ্গে (২১), "একটি ভাই ছিল আমার, সকলের ছোট, দেখতে রোগা চিটচিটে, বড় মায়াবী মুখখানি। আমরা ছিলুম তার কাছে পালোয়ান। একটু ধমক দিলেই ভয়ে কেঁদে ফেলত। বাবামশায় খুব ভালবাসতেন তাকে আদর করে ডাকতেন 'র‍্যাট', বাবামশায়ের র‍্যাট ছিল তাঁর সোনালি বরিতেরই আদিম এবং আদর-যত্ন। ইঁদুরেরই মতো দুষ্টু চোখ দুটো ছিল তার।"

ঠাকুরের মতো সৌন্দর্যের দাবি কোনো দিক থেকেই ছিল না অবনীন্দ্রনাথের—মুখশ্রী [illegible] কালো [illegible]

বসন্তঠাকুরকে নিয়ে তাঁর কৌতুক-আক্ষেপ ছিল অবিরাম। (২২) তবু দাদাদের চেয়ে কেবল কথায় দুর্বল বলেই, সারাজীবন বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার পাসপোর্ট জুটে গেল, বঞ্চিতমনা শিশুর কাছে করুণা-মিশ্র এই বাংলোর লোভ মোহে-মাধুর্যে নিশ্চয়ই অনির্বচনীয় হয়েছিল। কিন্তু দুর্দৈবেই বজ্রপাত, অকস্মাৎ বাবার অকাল-মৃত্যু হল। মধুর প্রত্যাশার এই নিষ্ঠুর অবসান কিশোর মনে শৈশব-তৃষ্ণাকে অবচেতনে বসিয়ে করেছিল। সেই আক্ষেপের তাড়নে বাবার জায়গায় ভুলিয়ে দিয়ে শৈশব-স্বপ্ন বাগানের স্বপ্ন-রেখা মুছল না কখনো শিল্পীর জীবনে—কাটলো না কোনোদিন বড়দের কাছে নীরবে নিভৃতে শিশু হয়ে পড়তে পারার অদম্য লোভ!

ঠাকুর্দা শিশুর প্রত্যাশার বাংলোর দুটি মুখ একান্ত প্রার্থিত। বাবার স্নেহে শাসন আছে, মায়ের স্নেহে কেবলই অন্তঃকরণ লালন। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের কবি দৃঢ়-পৌরুষ অনাসক্ত পিতার স্নেহে বঞ্চিত হয়েছিলেন একবার কৈশোর আরম্ভে। শান্তিনিকেতনের প্রান্তর থেকে ডালহৌসি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত সেই অন্তরঙ্গতার স্মৃতি। চিরকালের জন্য রবীন্দ্র-বাণীর বক্তাদের ধ্রুব পদটি সে বেঁধে দিয়েছিল। তার মূলে প্রেম ছিল অনিবার, কিন্তু আসক্তি ছিল না কিছু-মাত্র,—জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল উৎকণ্ঠিত, কিন্তু আপেক্ষণের লোভ ছিল না একেবারেই। এই অনাবিষ্ট মমতা রবীন্দ্র-রচনার আবেগময় মুহূর্তেও তাঁর প্রকাশরীতিকে দিয়েছে নৈর্ব্যক্তিক ঋজুতা, বাক্যে এবং প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই এলিগ্যান্ট।

৫নং বাড়ির ধারা ছিল তার বিপরীত: প্রথমাবধি সে বাড়িতে গার্হস্থ্য জীবনের সূত্রপাত মহিলা-অভিভাবকত্বে। গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪) স্বল্পজীবী ছিলেন, তাঁর পরে, দুজনও তাই। গণেন্দ্রনাথ (১৮৪১-৬৯) নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাত্র আটাশ বছর বয়সে; আর গুণেন্দ্রনাথের (১৮৪৭-৮১) মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল বাবার মতই চৌত্রিশ। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে তাঁর দুই পুত্রের বয়স যথাক্রমে ১৩ এবং ৬। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হিমালয় থেকে মহর্ষি যেদিন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন বাড়িতে দ্বারকানাথের কালের জাঁকজমক পুজোর অনুষ্ঠান চলেছে। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব তখন সবিচল। তাই পুজোর কদিন ব্রাহ্মসমাজের কর্মচারী বাড়ি ফেরেন। অচিরেই কুলদেবতার পরিত্যাগ সম্পর্কেও তিনি দৃঢ়সংকল্প হন। ঐ বছরেই মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা-নগেন্দ্রনাথ অবিবাহিত থেকে লোকান্তরিত হন; তার বছর দশ আগেই তিনি পৈতৃক-বাস্তু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তিন ভাই যখন একত্র ছিলেন, তখন অনুজের ও পরিবারবর্গের আপত্তি হেতু মহর্ষি পৈতৃক অনুষ্ঠান বর্জন করতে পারেন নি। পুজোর সময়ে নিজে বরং গৃহত্যাগ করে চলে যেতেন। এসময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল পাকা অতএব গিরীন্দ্রনাথের বিধবা যোগমায়াদেবী দুই শিশুপুত্র, দুই কন্যা ও দুই জামাতাকে নিয়ে ৫নং বাড়িতে দ্বারকানাথের বৈঠকখানায় উঠে আসেন, কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণকে নিয়ে স্থায়ী বসবাস করতে। তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রর বয়স তখন যথাক্রমে সতেরো আর দশ। অতএব মায়ের অভিভাবকত্বে সূচিত হয়েছিল ৫নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনের জীবনযাত্রা: বলা ভালো, মায়ের আনুগত্যে সেই ধারাই প্রবাহিত হয়ে এল পরবর্তী প্রজন্মে। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন অপুত্রক; গুণেন্দ্রনাথ গেলেন চৌদ্দ, এগারো এবং দশ বছরের তিন পুত্র রেখে, মেয়ে দুটি আরো ছোট। অতএব আবার মা অভিভাবক; বৈষয়িক দায়িত্বের অধিকারে আসেন। সঙ্গেই রইলেন গিরীন্দ্রনাথের জামাতা—যদুনাথ; অবনীন্দ্রনাথের পিসেমশায় তাঁরা। মেয়েদের স্নেহে আসক্তই মূল প্রবণতা—জড়িয়ে ধরবার, ভালো বসে অধিকার করতে পারার ব্যাকুল আগ্রহ! আর মার কাছে কোনো আগল নেই তো!—না লজ্জার, না সম্ভ্রমের! অতএব তাঁকে ছেড়ে শিখবেন কিনা, তার নির্দেশ যেমন, তেমনি 'আর্ট' স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল পদের জন্য হ্যাভেল সাহেবের আহ্বানে সাড়া দেবেন কিনা,—সব কিছুতেই মায়ের অধিকার ছিল চূড়ান্ত। অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে ঐ 'ফেমিনিন' কোয়ালিটি ছিল এক মুগ্ধ সমর্পণ,—মেয়েদের মত সমর্পণ, তীব্র তাঁর অনুরাগ,—জীবনকে জড়িয়ে ধরে পাবার আকুলতা তাঁর ভালোবাসায় এবং সৃষ্টিতেও।

এসব প্রবণতা দোষগুণের নয়,—ব্যক্তিগত অন্তর্লক্ষণের, সংস্কৃত বা ব্যক্তিত্বের দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছে। রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্রের ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে—রবীন্দ্রনাথের দুরেখারাজে দুটি চরিত্রে মনে পড়ে, —একজন যুবরাজ আর এক রাজপুত্র,—ব্যক্তিত্বে আর সত্তায়—একজন দৃপ্ত, উদার, অনাসক্ত; অন্য একজন নিপুণ, মধুর এবং আবিষ্ট,—হয়ত তাই [illegible]। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, (২৩)—'আমি কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলিনি সংসারে। যেমনো কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়।... সবই করেছি কিন্তু ভালো করেই নি... ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সে করেছি, কিন্তু সে যেন একটা intellectual task, সেটা বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত করেই।"

অন্যপক্ষে, ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়াই ছিল অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব। কন্যা উমাদেবী লিখেছেন (২৪) 'বড়ো স্নেহপ্রবণ ছিল তাঁর মনটি। সকলকে সকলকে কাছে কাছে নিয়ে থাকবেন এই ছিল সব সময়ের ইচ্ছে।' কিংবা, (২৫) 'নানান জায়গায় বেড়াতে যাবার সুখ ছিল বাবার খুবই। এতে তাঁর হাওয়াবদলও হতো, ছবি আঁকার খোরাক সবারও হতো। আর কোথাও গেলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাইই।" অন্যপক্ষে শোভনবাবুরা মেয়েরা বলছেন—শিল্পী বলেছিলেন, (২৬) [illegible]

CENTRAL LIBRARY

না আমন্ত্রণ পেয়েছি। দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, চীন সব জায়গা থেকে আমায় ডেকেছে। কেন যাইনি জানিস? তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বল।

বড্ড ভীতু ছিল সে।"

কেবল 'অলকের মার (২৭) জন্যেই নয়, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি ভরা গোটা সংসারটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে, অধিকার করে রেখেই চলত তাঁর ব্যক্তিজীবনের চাকা,—তাই তিনি চিরকাল ঘরবন্দী,—ঘরোয়া কথার অফুরন্ত ভান্ডার। পুরী, রাঁচি, এলাহাবাদ, মুসৌরী, দার্জিলিং—যেখানে গেছেন, সেখানেই তিনি ঘরবন্দী; একাকী কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারেন নি,—পুত্র অলকেন্দ্রনাথ বলেছেন, (২৮) তাজমহলের অমর ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাজমহল দেখা হয়নি তাঁর জীবনে কোনোদিন।

এমনিতে ছিলেন শিশুর মত আত্মভোলা বোহিমোব;—অথচ বলতেন, 'যাকে রাখ সেই রাখে।' কাজের অকাজের অজস্র সঞ্চয় থাকত তাঁর ডেস্কে পোরা। মেয়েদের মত রক্ষণশীল ছিলেন,—ইংরেজি অর্থে নয়, বস্তুপরিগত অর্থে। তাঁর শিল্পী মনেও সব কিছুকে ধরে রাখবার,—সঞ্চয়ের আগ্রহ, শিল্পরচনাতেও: অন্তত লিপিশিল্পে। কিন্তু রক্ষণশীলতা ছিল অন্যতর অর্থেও এবং বাড়ির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য; অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁর সৃষ্টিতে যা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, (২৯)—"লেখক হিসাবে আমার একটা অভাব আছে। আমি আমাদের দেশের সমাজকে ভাল জানিনে। তাই গল্প যখন লিখি, মাঝে ফাঁক থাকে পাশ-কাটিয়ে চলতে হয়।" অন্যত্র লিখেছিলেন, (৩০) "ছেলেবেলা থেকে সমাজ থেকে দূরস্থ গাড়িতে বাস করে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আমার পক্ষে যথেষ্ট সহজ হয়নি। লোকে মনে করে সে আমার অহংকার, কিন্তু আমার উপায় নেই।"—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লেখায় সব ফাঁক ভরাট হয়ে আছে;—আগাগোড়া মানুষটি যেমন, তেমনি তুলি-কলমের আঁচড়ও তাঁর নিতান্ত সহজ। অথচ একই বাড়িরই তো দুই ছেলে,—কিংবা এ-বাড়ি ও-বাড়ির। এ পার্থক্য আসলে মানসিকতার, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সতত দূরসঞ্চারী নিঃসঙ্গতা,—সব কিছুর মাঝখানে থেকেও কোনো কিছুতেই জড়িয়ে না পড়তে পারার ঐতিহ্য তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকার।—মহর্ষি ছিলেন মনের দিক থেকে সর্বদাই হিমালয়-চর,—সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব নির্বাহের সময়েও মন থাকত ঈশ্বর-চিন্তায় তুঙ্গ-চূড়ায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক সমাজের মাঝখানে থেকেও তিনি ছিলেন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। সমাজ অর্থে কলকাতার স্বদেশী ধনী সমাজ,—যাদের মহা-পরগাছার মত আশ্রয় করে গড়ে উঠত মধ্য ও নিম্নবিত্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনতার সমাগম। সেই 'বাবু'-কেন্দ্রিক বোধ জীবনযাত্রার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছিল নগর কলকাতার আমোদ-আহ্লাদ, উৎসব-সংস্কৃতির কাঠামো! কবি-গান, টপ্পা-তর্জা-খেউড় যেমন,—তেমনি যাত্রা-থিয়েটার, ঘুড়ি ওড়ানো, পাখি ওড়ানো প্রভৃতিরও নবজন্ম কলকাতার উদীয়মান জনসমাজে। তার অনেক কৌতুকচিত্র আছে 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়'। কিন্তু সেগুলি অনেকখানি ব্যঙ্গচিত্রও,—আর সবটুকুই তার লঘু কৌতুকের বিষয়ও নয়। দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজে জাত ও বর্ধিত হয়েও তার সামাজিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বর-মনস্ক প্রগতিপন্থী এক নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী 'আত্মীয়' সমাজ গড়ে তোলার উপাসনায় আত্মমগ্ন। দেশের সম্পর্কে অবিচল মর্যাদাবোধ ছিল মহর্ষির,—কিন্তু সে দেশ নির্বিশেষ শাশ্বতকালীন ভারতবর্ষ।—অর্থাৎ বৃহৎ ভারতবর্ষের যতটুকু অমর মহিমাদীপ্ত বলে নিজের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তাকেই তিনি স্বীকার করেছেন। তাতে একদিকে ছিল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী বিচার প্রক্রিয়া,—আর একদিকে যা কিছু বিশেষ, যা কিছু অব্যবহিত, একান্ত কাছের বলেই পরম আপন,—যাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার নয়, মন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয় মহর্ষির তুঙ্গস্থ দৃষ্টির কাছে তা ধরা পড়ে নি। শুধু তাই নয়, বহমান অকিঞ্চিৎকর পরিত্যাজ্য হয়েছে বলেই, তাঁর চারপাশে অসাধারণের ভিড় জমেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবাল্য অভিজ্ঞতায় উচ্চ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং অনাবিল পরিমণ্ডলের সঙ্গ পেয়েছেন।—কিন্তু যা কেবল কলকাতার, নিছক তাৎকালিক,—বাংলা ও বাঙালীর সাধারণ সম্পদ ও অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে নিবিড় নৈকট্যবোধ ঘটেনি তাঁর। তাই তাঁর ভাবনা ও রচনায়—প্রকৃতি, মানুষ, প্রেম সকলেরই এক উত্তুঙ্গ নির্বিশেষ স্বভাব,—চেতনাকে তা উদ্বোধিত করে—কখনোই মনকে আবিষ্ট করে না। অন্যপক্ষে অবনীন্দ্র-শিল্প মন-জড়ানো আবেশেই আদি-অন্ত আপ্লাবিত।

তার উৎস এ-বাড়ির রক্তে রয়েছে গিরীন্দ্রনাথের কাল থেকেই। মহর্ষি যখন উচ্চ চিন্তা, সমুচ্চ ধ্যান নিয়ে মগ্ন,—বৈষয়িক জীবনের দায়িত্ব তখন গিরীন্দ্রনাথের ওপরে ন্যস্ত। তিনি ছিলেন সার্থক জমিদার,—কেবল ভূসম্পত্তির চালনায় নয়,—জীবনযাত্রার চলনেও। কলকাতার ধনাঢ্য সমাজের সহজ জীবন-ধারার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত-জড়িত ছিলেন।—নিজে যাত্রা লিখতেন,—কথকতা, কীর্তন, গান, পার্বণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে যোগ ছিল কেবল জমিদারের নয়—বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিশিষ্ট রুচির। অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের ভাবরূপ দেখে মনে হয় 'হুতোম প্যাঁচা'র মেজাজ আর জীবনপ্রকৃতি যেন ঠাকুরবাড়ির মার্জিত রুচির মোড়ক পরে অপরূপ প্রাণশক্তিতে ভূষিত হয়ে এসেছে। আবহমান, শতাব্দ-প্রতিষ্ঠ, কখনো বা আদিম ঐতিহ্যকে পরিশীলিত আভিজাত্যের সূক্ষ্ম পরিমার্জনায় নবজন্ম দানের প্রেরণা ৫ নম্বর বাড়িতে সঞ্চিত হয়েছিল গিরীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বলে। সব কিছুর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে জড়িয়ে দেবার কৌশল ছিল অবনীন্দ্রনাথের,—আর সব কিছুর মাঝখানে থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে। গিরীন্দ্র-দেবেন্দ্রের স্বভাব প্রেরণা এইভাবে বাংলার তথা ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের চরিত্র নির্দেশ করেছে!

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় দেশ-কাল-সমাজ সব কিছুই তাঁর কল্পনায়,—সৃজনকর্মের প্রচ্ছন্ন! অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তা আরো বেশি—সে বাস্তব ঐতিহ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে কথকতা, কীর্তন ইত্যাদির কথাই মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সব-কিছু দেশীয় শিল্পের [illegible] উপাদান,—অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তা আরো বেশি,—মর্মকথা! তাই দুজনের কাছে এর আবেদন যেমন পৃথক,—তাঁদের শিল্পের রূপেও সেই পার্থক্যের চিহ্ন আছে,—আকারে নয় কেবল, নিভৃত স্বাদেও। অবনীন্দ্রনাথ যখন দেশীয় শিল্পের রহস্য-দরজাটি আবিষ্কার করলেন, রবীন্দ্রনাথই তাঁকে তখন বলেছিলেন (৩১) "বৈষ্ণবপদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে বাতলে দিলেন যে চণ্ডী-দাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণবপদাবলী দেশীয় মানসিকতা চর্চার যথার্থ একটি 'পারস্পেকটিভ' তাঁর চোখে, (৩২) "বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া এই ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

'আইডিয়া' হিসেবে এ পরিকল্পনার মহিমা বিশ্বজনীন; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য ছিল আরো সজীব, প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ 'প্রতিদিন'। ছোট পিসীমার ঘরে 'কৃষ্ণের পায়েস ভক্ষণের ছবি দেখেছিলেন শিশু অবনীন্দ্র-নাথ—সে ছিল তাঁর জীবনে ছবির স্বাদ গ্রহণের একেবারে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, (৩৩)—"দেশী ধরনের অয়েল পেন্টিং......সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছেন, চুপি চুপি কৃষ্ণ হাত ঢুকিয়ে পায়েসটুকু তুলে মুখে দিচ্ছেন, এই কথক ঠাকুরের গল্পের ছবি।" পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠান, কথকতা, ছবি,—সবকিছু মিলে এ অভিজ্ঞতা কেবল সজীব এবং প্রত্যক্ষ নয়—

আদি-অন্তে সম্পূর্ণ নিটোল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণবপদাবলীর চিত্রধারায় এই জীবন্ত ইন্দ্রিয়বেদ্য ঐতিহ্যবোধকে যুক্ত করেছিলেন, বিশেষজ্ঞের চোখেও তাতে স্বাদের অভিনবতা সঞ্চারিত হয়েছিল। তরুণযৌবনে 'অভিসার' ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ,—বৈষ্ণব কবিতার "আমা কিন বিকাইনু বলে" ইত্যাদি বিখ্যাত ভাবের অনুসরণে। শিল্পীর যৌবনরক্তের উত্তাপ নিশ্চয় জড়িয়েছিল সে ছবির পরিকল্পনায়; কিন্তু পরিণামী মূল্যে মূল্যবেত্তার গৃহে আসন পেয়েছিল ছবিটি। অনেকদিন পরে দেখেও প্রবোধেন্দু ঠাকুরের নিশ্চিত মনে হয়েছিল, (৩৪)—"পদাবলীর দেহাতীত ভাবের শৃঙ্গার-সাত্ত্বিক রসরূপটি যেমন ফুটে উঠেছে অবনীন্দ্রনাথের 'অভিসারে' তেমনটি কোন কোর্টেন বৈষ্ণব-কবির গীতিচিত্রলোক ভাবার প্রাকৃত সরলতাতেও।'

মূল কবিতার সঙ্গে ছবির এই প্রতিতুলনার মূল্য নিয়ে বিতর্ক যদি বা হয়, তবু স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রকাব্যে পদাবলীর যে মূল্য—তার সৌন্দর্য অপেক্ষাকৃত 'ইনটেলেকচুয়াল', অবনীন্দ্রনাথের রচনারসের উৎস 'ট্র্যাডিশন্যাল।' এ আলোচনা প্রতীক প্রসঙ্গের নয়,—সামাজিক আন্তরিকতা এবং আত্মস্বভাব। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রেখারূপের স্বতন্ত্র কোনো স্বাদুতা আহরণ করা সম্ভব কিনা জানা নেই,—কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের গাড়তাই রবীন্দ্রপ্রভাবে সর্বাপেক্ষা লালিত-চেতন অবনীন্দ্রনাথের লিপিকলাকে রবীন্দ্র-শৈলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে। নিজের লেখা সম্পর্কে শিল্পী বলেছিলেন, (৩৫)—"আমি গান বাঁধি, ছড়ার গান, যাত্রার,—আর রবিকা গান বাঁধেন, পড়ার গান।"—নির্বাচনীর আভিজাত্য, আর প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য-চেতনা-বাহিত লোকায়ত শৈলীর পার্থক্য এখানেই,—একটি লেখা শোনার, দেখার,—আর একটি পড়ে উপভোগ করার। একজন জীবনকে উপলব্ধি করেছেন নিঃসঙ্গ দূরত্বের গহনে বসে,—আর একজন জীবনের একেবারে মাঝখানে বসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে কথা বলে উঠেছেন। পারিপার্শ্বিক জীবনের কাছে এই একান্ত বাঁধা পড়ে-যাওয়া অবনীন্দ্রনাথের প্রকাশরূপের একটি ছবি তাঁর প্রথম গান শেখার কাহিনীতে। কোন্নগরে তখন রয়েছেন বাবার সঙ্গে,—পুরস্কার পেয়েছেন অর্গ্যান একটি। বুড়ো চাটুজ্জে মশায়ের কাছে তখন এই গান শিখেছিলেন, ...(৩৬)—হায়রে সাহেব বেলাকর / আমি গাই সোনাকে দুই বাছুর ধর। / ওটি লিস্ট বাছুর, পাঁচুড়োর মাকো / কাম দুটো ওর দুচক্কে ধর / হায়রে সাহেব বেলাকর।।" / "ঘ্যাকওয়াব সাহেব রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফেরবার সময় গয়লাবাড়ি গিয়ে গয়লানির কাছে একপো করে দুধ খেতেন। পাড়ার লোকে এই দেখে তাঁর নামে গান বেঁধেছিল।"

তারপর আর 'সেমেটি' গঙ্গার এপার-ওপার। ওপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে যুবক রবীন্দ্রনাথও তখন সেখানে। কিন্তু এপার ওপার দিয়ে এপারে লেখার উপায় কবির ছিল না। এ কেবল অভিজ্ঞতার দূরত্ব নয়,—দৃষ্টিভঙ্গী তথা 'অ্যাটিচুড'-এর পার্থক্যের কথা। আরো একদিক থেকে 'অ্যাটিচুড'-এর বিশিষ্টতা ছিল অবনীন্দ্রব্যক্তিত্বে। ঐশ্বর্যমগ্ন,—তথা ঐশ্বর্যব্যাকুল এক আশ্চর্য উৎকণ্ঠা ছিল তাঁর চোখেমুখে; পথে-ঘাটে, বাগানে, জনসমাগমের সর্বত্র হীরে খুঁজে খুঁজে বেড়াবার শিশুসুলভ উৎকট বাতিক ছিল সারাজীবন।" কিন্তু রূপশিল্পীর অদ্ভুত 'খ্যাপামিও' তাঁর শিল্পি-চরিত্রের ব্যঞ্জনাবহ। লোভী নয়, ঐশ্বর্যমগ্ন এক অপরূপ রূপ-দৃষ্টি রয়েছে তার মূলে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি,—তার অতীত স্মৃতি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের চোখে ছিল ঋদ্ধৈশ্বর্যের যেন পীঠভূমি;—সেই ঐশ্বর্যমোহিত মন তাঁর শিল্পের রেখায় রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে,—তুলি ও কলম দুয়েরই মুখে;—লেখার বেলায় সে ঐশ্বর্য বিচ্ছুরিত হয়েছে কথা নিয়ে অনায়াস-বিচিত্র খেলার ছন্দে। অত্যন্ত সাধারণ আটপৌরে শব্দ ও প্রকৃতি যেন নানা রঙের ফুলঝুরি ছিটিয়ে বেড়িয়েছে তাঁর ভাষায়। ছবির কথা কিছু বলেছেন শিল্পী নিজেই।

অনায়াস ঐশ্বর্যের সে অবিরাম বিস্তার আসলে আন্তরিক ঐশ্বর্য-সম্ভোগেরই সহজ প্রকাশ। রানী চন্দকে বলেছিলেন, (৩৭)—"কি সুখের স্বপ্নই ছিল কি সুখের হাওয়াই বইত ওইটুকখানি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ......পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সেসব সুখের দিন গেল। তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার। প্রসাধনের বেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে সুন্দর মুখ সব, যে ছবি সব সংগ্রহ করলে মন, আমার 'কনে সাজানো' ছবিখানিতে তার অনেকখানি পাবে।" ঐ মেয়েলি প্রসাধনের মত ঘষামাজা, কিন্তু তারই মত অকৃত্রিম পরিমার্জনা আছে অবনীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলীতে,—সে তাঁর ঐশ্বর্যমগ্ন অতলস্পর্শ মানসিকতারই সহজ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, (৩৮) "আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।" আর অবনীন্দ্রনাথদের প্রসঙ্গে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, (৩৯)—"দাদামশায়দের তিন ভাই নিয়ে শুরু হয়েছিল এই জোড়াসাঁকো। তিন দাদামশায় আর তিন দিদিমা। তখন কেউ দাদামশায় আর দিদিমা হননি। সবে বাপ-মা হতে শুরু করেছেন হয়তো। ছ' জনের সংসার আর প্রকাণ্ড জমিদারী। মাথার উপরে মা। বিলাসী ছিলেন না কেউ। অমিতব্যয় কাকে তিন ভাই-এর এক ভাইও জানতেন না।.... দান-ধ্যান ছিল। আশ্রিত ছিল অনেক।..... কর্তার ধারার মতো জমিদারী থেকে যে টাকা এসে পৌঁছত, তাই দিয়েই খরচ মিটে যেত সমস্ত সংসারের এবং সমস্ত কর্মের।"—লক্ষ্য করতে হয় ৫নং জোড়াসাঁকোর বাড়ির জীবনযাত্রার আশ্রয়ও ছিল ঐ একই জমিদারি। রবীন্দ্র-জন্মের সাত বছর আগে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মহর্ষি ভায়েদের অংশ সম্পত্তির ভাগ করে দিয়েছিলেন, যদিও মোটা জমিদারির পরিচালনা তখনো চলেছিল একযোগিতে। তখনো পৈতৃক ঋণের অনেক অংশ অপরিশোধিত ছিল; ভায়েদের ব্যক্তিগত ঋণও যুক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে। তাহলেও গিরীন্দ্রনাথের দুই নাবালক পুত্র গোটা জমিদারির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়েছিলেন; চার বছর পরে অবিবাহিত নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর এক তৃতীয়াংশও দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল ৬ এবং ৫নং বাড়িতে। মহর্ষির সংসারে তখন জনতার হাট,—ছেলে, মেয়ে, বধূ, জামাতা,—তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রত্যেক দম্পতির পৃথক মহল। এই বিরাট সংসারের অপরিমাণ ব্যয় নির্বাহের একমাত্র ভরসা ছিল একযোগিতে পরিচালিত ঠাকুর-জমিদারির অর্ধাংশ। বাকি অর্ধাংশের আয় থেকে ৫নং বাড়িতে পরিচালিত হত অপেক্ষাকৃত ছোট সংযত গিরীন্দ্র-পরিবার। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গুণেন্দ্রনাথের তিনপুত্র গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র সাবালক হয়ে ওঠার পর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বও মহর্ষি পৃথক করে দিয়েছিলেন। মোহনলালের বিবৃতিতে হয়ত তারই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের উদ্ভাবন তো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর শৈশবস্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মূলে প্রোথিত।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার পরিবেশগত পার্থক্য ছিল না খুব। বিখ্যাত সংসারচক্রের যথাযথার প্রাচুর্যপূর্ণ বিবৃতি, এমন কি মেয়ে মহলে নূপুরবেণী চুড়িওয়ালির আবির্ভাব কিংবা ছাতের মহলে মার মেয়েলি আসর আর আচার রোদে দেবার কাহিনী কিছুই বাদ পড়ে নি কবির 'ছেলেবেলা'র স্মৃতি থেকে। কিন্তু মনে এর কিছুই দাগ কেটে বসে নি; যা বসেছিল অক্ষয় অক্ষরে লেখা হয়ে, সে হল,—(৪০) দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান।

'বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্যডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হুহু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।'

—এ অনুভব কেবল অনির্বচনীয় নয়, বস্তুতীর্ণ! অবনীন্দ্রনাথ বস্তুর ঐশ্বর্য-মূর্তির মধ্যে সুন্দরকে অধিকার করতে চেয়েছেন মুঠো ভরে। তাঁর সৃষ্টিতেও তাই শিল্পের বিস্ময় আর রমণীয় ঐশ্বর্যাবেশ। কিন্তু সে শিল্পধর্ম ছিল প্রৌঢ় প্রজ্ঞার-গুহা-নিঃসারিত, রমণীয়তার উৎসে ছিল অধ্যবসায় পরিশীলিত বলিষ্ঠ দীপ্তি। এর সবটুকুই কিন্তু অলৌকিক প্রতিভার দান নয়,—বহুলাংশে শিল্পীর আয়াস-সাধ্য প্রস্তুতির ফলও। অবনীন্দ্রনাথের বাণী ও ব্যক্তিত্ব এমন আপন-

তোলা, এবং নৈনিক, হয়ত প্রাকৃত, যে তাঁর প্রতিভাকে অশিক্ষিতপটু বলে ভ্রম করার আশংকা কিছু কম নেই! কিন্তু অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ এবং প্রয়াস ছিল নিরবধি; রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি ছিলেন বহুলাংশে অস্বশিক্ষিত। নর্মাল স্কুলের বিদ্যাভ্যাস অল্পেই শেষ হয়েছিল,—কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে অভিভাবকেরা আবার তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন, সেখানে একটানা দশ বছর পড়াশোনা করেন (১৮৮১—৯০)। তার-ও পরে ইংরেজি পড়তে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অন্য পক্ষে সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়ে সরস্বতী সম্পর্কে একটি চিত্রও এঁকেছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষা না দিলেও এন্ট্রান্স মান পর্যন্ত অধ্যয়ন তিনি সাঙ্গ করেছিলেন; তাছাড়া সংস্কৃতে তাঁর অধিকারও জন্মেছিল প্রচুর। পরবর্তী জীবনে সে অভ্যাস তো ছিলই, তাছাড়া নানা বিষয়ে অধ্যয়নে মগ্নতা দেখা যেত,— বলা বাহুল্য পাঠ্য গ্রন্থাদির মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, সবই ছিল। শেষ বয়সে তাঁর অধ্যয়নের একটা বর্ণনা ধরে দিয়েছেন ছেলে-মেয়ে দুজনে—অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অধ্যয়ন মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পরিণতির আভাস তার থেকে অনুমান করাই চলে কেবল। উমা দেবী জানিয়েছেন, (৪১)—'বাবার নিজের ছিল সংগৃহীত বহু প্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কৃত পুঁথি, ইংরেজি সাহিত্য প্রভৃতি।' অলোকেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য (৪২) 'ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র, শিল্প, ইতিহাস আর শিশুসাহিত্য পড়তেন, তাছাড়া হুগো, বালজাক, স্কট, ডিকেন্সের উপন্যাসগুলিও পড়তেন। মার্ক টোয়েন-এর বই তাঁর বড় প্রিয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বই, পুরাতন পুঁথি আর সংস্কৃত কাব্যও পড়তেন। বই পড়া ছিল তাঁর একটা বিলাস।' কেবল 'বিলাস' মাত্র অধ্যয়ন অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তপস্যাও ছিল বহুলাংশে,—এ দাবি করা যেতে পারে উদ্ধৃত তথ্যের নজির থেকেই। কেবল পুরাতন গ্রন্থরাজিই নয় সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কেও তাঁর সক্রিয় আগ্রহ ছিল;—এসব নৈষ্ঠিক বিদ্যানুরাগের নিশ্চিত স্বাক্ষর। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন, যাতে কঠোর তপস্যার কাঠিন্যও বিলাসের ঐশ্বর্যদীপ্ত উপভোগে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

অলোকেন্দ্রনাথই বলেছেন,— (৪২)—'বই পড়ে তার মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন।' সেই ডুবে যাবার একটা উদাহরণ, (৪৩) রবীন্দ্রনাথ একবার য়ুরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে 'অবনকে অনুযোগের সুরেই বললেন, সারা য়ুরোপ জুড়ে ওঁর কত ভক্ত: নিজের শিল্প-রচনার নিমিত্ত অন্তত তাঁর ঐসব দেশ ঘুরে আসা উচিত। বিশেষ করে প্যারিসের ল্যাটিনকোয়ার্টার প্রভৃতি দেখে আসা নিতান্তই প্রয়োজন। তখন নাকি 'অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গড়গড়ার নলে খুব খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আমি শিল্পী, মানসচক্ষে সব দেখতে পাই ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো আর বালজাক যখন পড়েছি নিয়েছি, তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবে না। তুমি আমাকে বল, আমি হুবহু ল্যাটিন কোয়ার্টারের ছবি এঁকে দিচ্ছি।'—

—এমনই ছিল শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতা। অধীত বিষয়কেও তিনি মনের মধ্যে ভরে আত্মগত করে নিতেন,—তখন সে তাঁর নিজস্ব সম্পদ। যেমন তাজমহল না দেখে তাজমহল আঁকবার রসদ মনে জোগাড় করেছিলেন বই পড়ে এবং ছবি দেখে নিশ্চয়। কিন্তু সে দেখা এবং পড়াকে এমন করে হাত করে নিলেন,—অনায়াসে দেখা দিল তাজমহলের শিল্পরূপ;—সন্দেহ করবার অবকাশ রইল না যে, এ শিল্পী মনের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল নয়। এখানেই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য-স্বর্ণবিলাসী মনের যথার্থ সম্পদ; জ্ঞানকে মনোলীন করে আপন করে নিয়েছেন,—সেই জ্ঞান অধীত বিদ্যা কিংবা অভিজ্ঞতা যা-কিছুরই ফল হোক! তারপর তাকে নিয়ে দুই হাতে রূপের ফুলঝুরি খেলেছেন রেখায়, লেখায়,—মনে হয়, সবকিছু যেন তাঁর অশিক্ষিত-পটু মনের একান্ত স্বয়ম্ভূ ফসল।

সবকিছু মিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল এক অতলস্পর্শ গভীরতা,—যার উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ। গভীর জ্ঞানের বোঝা তলানি হয়ে পড়ে থাকে মনের গহনে,—বাইরে বিচ্ছুরিত হয় ভারহীন নৈমিত্তিকতার নিরাবরণ স্বচ্ছ-প্রকাশ উপলব্ধির অতলস্পর্শতা রূপ ধরে শিশুর বিস্ময় আর বিশ্বাসপ্রবণতায়; বিস্ময়-রূপরস-জিজ্ঞাসু পরিশীলিত মনের মাটি ভ্রমণীয় মমতা ও চঞ্চলধর্মী অপরিমার্জিত সহজ। 'প্রাকৃত' অলংকারের ছন্দবেশে কাণ্ডজ্ঞান সহসাদ্যুতি বিস্তারিত করতে থাকে। আপাত-বিপরীতের বাজনা-বাদী সেই গহনার্জিত অবনীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মূল থেকে তাঁর অজস্র লিপি কর্মে ছড়িয়ে পড়ে রূপকথার মোহ-মাধুরী রচনা করেছে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল পাঠকের মনে। সেই খানেই তার সৌন্দর্যলোকের গোপন উৎস;—সাহিত্য অথবা সেই রস-উৎসার ধীর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

নির্দেশপঞ্জী

1. "What a painter thinks and what he writes has at all times been of interest not only to artists but to the public at large We hope to find in his writings the secret of his endeavours or the rejections of his restlessness; we wish to penetrate into his life". — Andreu Karpels — An Introduction to Abanindranath Tagore's Sadanga. Viswa Bharati Quarterly, May 1942. P. 43

২ দ্রষ্টব্য :— রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী ২৭ পৃঃ ২৩৯।

3. O. C Ganguly—Abanindranath Tagore : An Impromptu Portrait—V. B. Qly. May 1942. P:102.

৪। দ্রষ্টব্য :— ওসি গাঙ্গুলি 'ভারত শিল্প ও আমার কথা'—পৃঃ ১৪৫। ৫। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'—রবীন্দ্র রচনাবলী ১১—পৃঃ ৭৮। ৬। অবনীন্দ্রনাথ—বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—পৃঃ ১১২। ৭। তদেব—পৃঃ ১১৩। ৮। দ্রষ্টব্য : অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'ঘরোয়া'—পৃঃ ৩। ৯। অসিত হালদার —'অবনীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ)—দ্রষ্টব্য কানাই সামন্ত সম্পাদিত 'চিত্রদর্শন'—পৃঃ ১০২। ১০। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

A Chronology of Abanindranath's Paintings, V. B Qly May 1942 P123,

১১। দ্রষ্টব্য : অবনীন্দ্রনাথ ও রানীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৭১। ১২। দ্রষ্টব্য : প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্র-চরিতম' পৃঃ ৭৫। ১২(ক)। দ্রষ্টব্য : মুকুল দে :

Abanindranath Tagore : A Survey of the Master's Life & Works; V. B Qly. May 1942 P32

১৩। দ্রষ্টব্য :— মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়—'দক্ষিণের বারান্দা'—পৃঃ ১৩৪। ১৪। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৪৬। ১৫। তদেব—পৃঃ ৮০-৮১। ১৬। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ১ম পর্ব, প্রথম অধ্যায়। পৃঃ—৫—২২। ১৭। অবনীন্দ্রনাথ—'আপন কথা'—পৃঃ ৫৭। ১৮। দ্রষ্টব্য :—

Mukul Dey — Abanindranath Tagore : A Survey of the Master's Life & Works. Visva Bharati Quarterly—P29-30.

১৯। দ্রষ্টব্য :—অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' :—পৃঃ ১২। ২০। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৫২। ২১। তদেব—পৃঃ ৪৯। ২২। দ্রষ্টব্য :— প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্রচরিতম'— পৃঃ ৪৬। ২৩। দ্রষ্টব্য :— মৈত্রেয়ী দেবী—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ১৮। ২৪—২৬। উমা দেবী 'বাবার কথা'—পৃঃ ৪৯, ৩৫—৩৫,। ২৭। স্ত্রী সৌদামিনী দেবীকে অবনীন্দ্রনাথ ঐ নামে উল্লেখ করতেন। ২৮। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'—পৃঃ ৩৫। ২৯। রবীন্দ্রনাথ—'চিঠিপত্র', ১ম—পৃঃ ৩৬। ৩০। তদেব—পৃঃ ৩৭৭। ৩১। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১২৮। ৩২। রবীন্দ্রনাথ—'পঞ্চভূত'—পৃঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ২য়— পৃঃ ৫৭৭। ৩৩। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১৮—১৯। ৩৪। প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্র-চরিতম্' পৃঃ ৭০। ৩৫। দ্রষ্টব্য :— তদেব—পৃঃ ৫৯। ৩৬। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১৯—২০। ৩৭। তদেব—পৃঃ ৪৭, ৫৪। ৩৮। রবীন্দ্রনাথ—'অবতরণিকা'— রবীন্দ্র রচনাবলী, ১। পৃঃ ৵ ৩৯। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় — 'দক্ষিণের বারান্দা'— পৃঃ ১৮০—১৮২। ৪০। রবীন্দ্রনাথ—'ছেলেবেলা' রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬—পৃঃ ৬১। ৪১। উমা দেবী—'বাবার কথা'—পৃঃ ৪২। ৪২। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'—পৃঃ ৩৪—৩৫। ৪৩। দ্রষ্টব্য :— তদেব—পৃঃ ৩৯।

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

তখন দ্বিতীয় মহাসমর সারা ইউরোপ খণ্ডে প্রবলবেগে চলছে, যার ফলে সারা দুনিয়ায় একটা বিরাট ঝড় উঠেছে। সে-ঝড় একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক। প্রাচীন চিন্তাধারায় ধ্বংসের গড়ে উঠেছে। সে ঝড় ভারতবর্ষের মাটিতেও বইছে। সারা বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়েছে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ঘুণধরা কাঠামো ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। দ্রব্যমূল্য মহার্ঘ হওয়ায় পুরুষের রোজগারে সংসার চলা হয়েছে দুষ্কর; তাই বহুদিনের প্রাচীন সংস্কার কাটিয়ে মেয়েরাও চলেছে চাকরী করতে; ছেলেরা চলেছে যুদ্ধে যোগ দিতে,—নতুন নতুন কলকারখানায় যোগ দিতে। তার জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন নতুন বিমানবন্দর, অজস্র ঘরবাড়ি। তৈরি হচ্ছে নড়বড়ে আস্তানা। ঠিকেদারেরা নানা ফন্দিতে অজস্র টাকা লুটছে। প্রচুর টাকা জমা হচ্ছে কালোবাজারী পথে। সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নেমে গেছে অনেক নীচে। প্রজারা জমিদারের খাজনা দেয় না, কিন্তু সরকার তার প্রাপ্য কর তো জমিদারের কাছে ছাড়ে না। দায়দায়িত্ব সব রয়েছে, তবে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করার রসদ ক্ষীণ হয়ে আসায় কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। জমিদার-বাড়ির চিরাচরিত প্রথা তো হঠাৎ একদিনে বন্ধ হবার নয়। তাই বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতে বনেদী অচলায়তন একেবারে অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁপা হয়ে গেছে। প্রাচীনকাল হতে রক্তশোষক বেতালের মত যাঁরা জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তাঁদের কেমন করে আজ ধার্য নমস্কারে আত্মনির্ভর হওয়ার উপদেশ দিয়ে বিদায় দেওয়া যায়? দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ির মানুষ যাঁরা, যে-বাড়ির পুরুষদের দীর্ঘ সময় কেটেছে দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় বসে শিল্প, নাট্য ও সাহিত্যের সাধনায়, তাঁদের কিনা ডাক এল শতাধিক বর্ষের স্মৃতিবিজড়িত এই পিতৃপুরুষের প্রাচীন বাড়ি ছাড়ার। কালের দায়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বাড়িটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। একদিকে বাড়ির প্রতিটি ইঁটের সঙ্গে তাঁরা মায়ার বন্ধনে জড়িত; এই পিতৃপুরুষের প্রশস্ত স্মৃতি-বিজড়িত অট্টালিকা ছেড়ে যেতে হবে। তাঁরা জানতেন 'যেতে নাহি দিব' বললেও একে আটকানো যাবে না। তাঁরা আরও জানতেন আপন গরজে বিক্রী করলে তার যথার্থ মূল্যও পাওয়া যাবে না। তাই তাঁরা কালাতিপাত করে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। এই বাড়িটার উপর অবনীন্দ্রনাথের কত যে মায়া, কত যে মমতা ছিল, তা তাঁর শৈশব স্মৃতির রোমন্থনে কিছুটা জানা যায়। বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়াঘেরা সবুজ চত্বর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যসুষমা ও

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল শিল্পগুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিবেশী হিসাবে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে অবনীন্দ্রনাথের শেষজীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী। প্রতিদিনের যে আলাপাচার দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন লেখক—তা 'অমৃতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুরের জলে পড়ে দিনরাত আলোছায়ার মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠঠোকরা থেকে থেকে। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহাঁস দেয় সাঁতার, ফোয়ারাতে জল ছোটে সকাল-বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড়-বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়। গরমের দিনে দুপুরে চিল স্থির ডানা মেলিয়ে ভেসে ক্ষীণ সুরে ডাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই ওঠে ওপরে। পায়রা থেকে থেকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ির ছাদে উড়ে উড়ে বেড়ায়। কাক উঁকিয়ে দেয় লুকনো ডাল মাটি থেকে গাছের আগায়। সন্ধ্যায় ওঠে নীল আকাশের তারা। রাতে ডাকে পাপিয়া, কত দূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয় পিউ পিউ, কিউ কিউ। আবার শেয়ালও ডাকে রাতে, বাদুড়ও বসে বর্ষায়। ব্যাঙও বেড়ায়, বেড়ালও বেরোয় থেকে থেকে শিকার সন্ধানে। একটা একটা নেড়ি-কুত্তা, সেও ফাঁক বুঝে হঠাৎ ঢোকে বাগানে চারদিক দেখে নিয়ে ছুট করে সরেও পড়ে রবাহূত গোছের ভাব দেখিয়ে। বেশী রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল-দেওয়া জানলাগুলো পুরোপুরি খোলা ছিল তখন বেকসুর। ঐ দিকটা বন্ধ রাখা প্রথা হয়ে গিয়েছিলো কতটা দায়ে পড়েও। এ-বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে তৈরী করা—এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসাবে করে নিতে এখানে ওখানে নানা পর্দা দিতে হয়েছে, না হ'লে ঘরের আব্রু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে সেটাও একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিলো নিশ্চয়ই; তাই কতকগুলো পর্দা ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরোনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিলো আব্রুর জন্যও বটে, বাসঘরের অকুলানের জন্যও বটে। এবং সেই পর্দা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো আপনা হতেই। বহির্জগতের খিড়কি দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার মত ছবিগুলো। মানুষ, মুরগী, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাস, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমোস্তা, মুহুরী, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা—সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলছে এই উত্তরের আপিসঘরটায়।' এ এক মহা আড়ম্বর পর্বের অন্তিমযাত্রা শুরু হয়েছিলো কবে তা বলা সুকঠিন। কিন্তু শেষ আঘাত হানলো যে দ্বিতীয় মহাসমর অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বহুদিন থেকে এই বাড়ি বিক্রীর নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। হিতৈষীদের উপদেশে ও চাপে আসন্ন শুভদিন এবং স্থাবর সম্পত্তির উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির

সি এফ এণ্ডরুজ । অবনীন্দ্রনাথ অংকিত

আমার বাড়ি বিক্রীর বিবরটি বিলম্বিত হচ্ছিল। অবনীন্দ্র-ভ্রাতারা মনে মনে আশা ও বৃহদাকার পরিকল্পনা রাখতেন যে, এই বড় বাড়ি বিক্রীর এমন দাম পাওয়া যাবে যে সেই দামে অতীতের সকল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে যুক্ত পারিবারিক দেনা শোধ হয়ে তিন ভায়ের তিনখানা মনোমত পৃথক বাড়িও হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তিন ভায়ের তিনখানা নতুন বাড়ির জন্য প্রস্তুতি ও নকশা রচনার ভার নিয়েছিলেন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ নিজে। একরকম নকসা আঁকা হোল, যেখানে বসার ঘর, শোবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর প্রভৃতি সব দেখানো। তার নিত্য রদবদলও কাগজের ওপর নিরন্তর চলতে লাগলো নব-নব লীলায়। আখেরে সব রয়ে গেল সেই পরিকল্পনার স্তরে। ১৯৩৮ সালে গগনেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে নতুন বাড়ির স্বপ্ন কোন্ দিক দিয়ে ভেঙে ভেসে গেল কেউ জানলো না। সারা সংসারে এসে নামল বিষাদের এক করাল ছায়া। অন্য ভায়েরা মৃত্যু-পথিকের পদধ্বনি শুনতে পেলেন আর সেই সঙ্গে হল নব-নব নকসার পরিকল্পনার নিত্যনতুন অনুশীলনের ইতি। নকসা অংকের উপর পড়লো কালো যবনিকা। ভবিষ্যৎ বাড়ে অবনীন্দ্রনাথ বাড়ির বিষয়ে আমার সঙ্গে কিছু কল্পনা-জল্পনা করেছিলেন তা পরে যথাস্থানে বলা হবে। বিশ্ব-মহাযুদ্ধ মাথায় নিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটে সাধের জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে উঠে এলেন ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণের থাম ও রেলিং দেওয়া পৈতৃক বাসভবনের অনুরূপ 'গুপ্তনিবাসের' বাগানবাড়িতে। ফেলে-আসা স্মৃতির অচলায়তনের অনুরূপ বাড়িতে এসে অতীত স্মৃতির রোমন্থনের এক উপযুক্ত পরিবেশ পেলেন বাংলার প্রখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও বর্তমানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিষ্যরা হলেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীরা। পলাশীর যুদ্ধের সাতাশ বছর বাদে কুশারী বংশের নীলমণি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পাশের খালি জমিতে তাঁর পৌত্র প্রিন্স দোয়ারকানাথ টেগোর (দ্বারকানাথ ঠাকুর) বিরাট বৈঠকখানা বাড়ি তুলেছিলেন। এটিই হল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ি। দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী যোগমায়া দেবী বৈঠকখানা বাড়িতে উঠে যান। গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের ভাগে এ-বাড়ি পড়ায় তাঁর তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাগে এ-বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে আসে। গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গগনেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব বাড়ির মালিকানা অবনীন্দ্রনাথের তিন ভ্রাতার।

সেই বাড়ি বর্তমানে বিক্রী হওয়ায় মাড়োয়ারী ক্রেতা বিরাট বাড়ির ইট, কাঠ, পাথর, রাবিশ, জানলা, দরজা, পাইপ, টালি, কড়ি, বরগা ভেঙে নিয়ে যায়। এমনি করেই অতীতও মাটিতে-পড়ে-থাকা প্রাচীন অশোকস্তম্ভ ভেঙে বাড়ি তৈরীর মাল-মসলারূপে ব্যবহার করতে নিয়ে গিয়েছিল স্বার্থপর মানুষ। সেই শিল্পকলায় স্মৃতি-বিজড়িত বহু দেশী-বিদেশী গুণিজ্ঞ শিল্পীর পদস্পর্শপূত প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দা কলকাতার মাটি থেকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফ্রেঞ্চ নাভেলো শ্রীমতী নিলাক্ষা গাঙ্গুলী প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরাট বিকাশ ক্ষেত্রকে কিছুটা আলোকচিত্রে আবদ্ধ করে রেখেছেন অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'আপন কথা' গ্রন্থখানির চিত্রাবলীতে। যাঁরা এই প্রাচীন দক্ষিণের বারান্দাকে শিল্পে সাহিত্যে ও রূপে [illegible]

বোধহয় কেউই আজ আর ইহলোকে নেই। গগনেন্দ্রনাথ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এই বাড়িতে। সমরেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন গুহহারা হয়ে। অমরধামে চলে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত নিবাসের ভাড়া বাড়িতে। নেই সুহাসিনী দেবী, নেই জামাতা মণিলাল, এমনকি দৌহিত্র মোহনলালও নেই। আছেন অবনীন্দ্রনাথের তিন পুত্র অলোকেন্দ্র, তরুণেন্দ্র, মনীন্দ্রনাথেরা তিনজনে। ঠাকুর বংশের প্রাচীন ইতিহাস-বিমণ্ডিত কুলাচারপূত দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ি আর নেই। জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ঠাকুর বংশের মূল বাড়িটি যেখানে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বসবাস করে গেছেন, সেটি মাড়োয়ারী ক্রেতাদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে সংস্কৃতিবান মানুষ ও সরকারের চেষ্টায় রক্ষা পেয়েছে। এখন সেখানে রবীন্দ্র-

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এটি জাতির পরম গৌরবের বস্তু। স্ট্র্যাটফোর্ডে মহাকবি শেক্সপীয়রের বাড়ি শেক্সপীয়রের জীবিতকালে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি করে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল প্রচেষ্টা আজও বিপুল উৎসাহে চলছে। জার্মানীতে মহাকবি 'গেটের' যে-বাড়ি বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটিও আবার ঠিক তেমনটি করে গড়ে তোলা হয়েছে। যে-রকম কাঠ দিয়ে মেঝে তৈরী হয়েছিল সেই রকমের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। মানুষ চলার সময় কাঠের পাটাতনের উপর জুতোশুদ্ধ পা পড়লে যে-রকম মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ হোত, সে-রকম আওয়াজ যাতে হয়, তারও পুনরাবৃত্তি করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে ও তাতে তারা সমর্থও হয়েছে। পুরোন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আকৃতির যথার্থ পুনর্বিন্যাস সফলতা লাভ করেছে। আমাদের স্বাধীন দেশে বিশ্বকবির বাসস্থান ধ্বংসের মুখ থেকে টেনে রক্ষা পেয়েছে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রচুর প্রচেষ্টায় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ চাটার্জি লেনের বাসা-বাড়িটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এসেছে সত্য, কিন্তু সেই ভগ্ন অট্টালিকা আজও ভগ্নাবস্থায়। তার কোন বিহিত আজও হয়নি, জাতীয় সরকারের সহানুভূতি ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়তো শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র এমনিভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো না, স্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকতো। [illegible] যা চলে গেছে তাকে আর তো ফিরে পাওয়া যাবে না।

[illegible]স্থানের বহু শত স্মৃতি-বিজড়িত আকর্ষণ কাটিয়ে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সপরিবারে দৈহিক বাসস্থানের অনুরূপ দক্ষিণের বারান্দা দেওয়া বরানগরে গুপ্ত নিবাসে উঠে এলেন। 'গুপ্ত নিবাস' কামারহাটী পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত এক বিরাট বাগানবাড়ি। এটি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও ম্যাগাজিন রোডের সংযোগস্থলে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই ম্যাগাজিন রোড বর্তমানে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড বা আর এন টেগোর রোড নামে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে বেরিয়ে পশ্চিম মুখে গঙ্গার ধারে পর্যন্ত চলে গেছে। গঙ্গার ধারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক প্রাচীন বাড়িতে ইংরেজের গোলাবারুদ রাখা হত। সেই গোলাবারুদের ম্যাগাজিনের বাড়িগুলো ও সংলগ্ন ভূখণ্ড নিয়ে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানীর' বিরাট দেশলাই প্রস্তুতের বৃহত্তম কারখানা গড়ে উঠেছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড যেখানে ক্যালকাটা কর্ড রেলের 'বরাহনগর রোড' স্টেশনের গা দিয়ে উত্তর মুখে 'ডানলপ টায়ার্স' লেখা রেলের সেতুর তলা দিয়ে পার হলেই পশ্চিমমুখো রাস্তা ছিল ম্যাগাজিন রোড। একদিন এই রাস্তা ছিল বরাহনগর ও কামারহাটি পৌর এলাকার সীমারেখা। [illegible] আর গঙ্গার ধারের ম্যাগাজিন রোড লোপ করে গড়ে উঠলো '[illegible]' মেরামতি কারখানা। এবং কতকগুলি বিমান প্রতীক্ষার স্থান। বর্তমানে তা সামরিক ঘাঁটি। অনেকটা জায়গায় তিন স্তর ইঁট বিছিয়ে তার উপর পিচ ঢেলে চওড়া 'রানওয়ে' করা হয়। এই ম্যাগাজিন রোডের পাশে নদীর ধারে বরাহনগর কামারহাটীর যৌথ জল কলের গঙ্গা জল পাম্প করার মূল পাইপের উপর মোটর ও পাম্প বসান আছে। বিরাট 'গুপ্ত নিবাসের' (বিখ্যাত ম্যালেরিয়ার ডি, গুপ্তর টনিক বিক্রেতা ডি. গুপ্তদের বাগানবাড়ি) ঠিক পশ্চিমে রায়বাহাদুর প্রমথ বাড়ুজ্যের বাগান। কলকাতার ইডেন গার্ডেনের অনুকরণে এক বিরাট ফল-ফুলে ভরা বাগান অতি যত্নে ও নিরলস চেষ্টায় তিনি গড়ে তোলেন। সেখানে ঝিল কেটে নানা পাহাড়বাহারের গাছ সাজিয়ে ওখানে নানা রকমের গাছে ভর্তি করা হয়। যুদ্ধের হিড়িকে সেই বাগান ভেঙ্গে চুরে তৈরী হয়েছিল এ. কে. সরকারের পেট্রোল ড্রাম মেরামতের কারখানা ও পটারী। তারই ঠিক পশ্চিম গায়ে বিরাট জমি নিয়ে বরাহনগর কামারহাটী পৌর প্রতিষ্ঠানের যৌথ জল কল। ক্যালকাটা কর্ড রেলের বাঁধ তৈরী করতে যে বিরাট মাটি লেগেছিল সেই মাটি যে দুটি বিস্তৃত জায়গা থেকে গভীর করে কেটে বিরাট দুটি হ্রদের মত করা হয়। সেই বিরাট দুটি হ্রদে বর্ষার জল নদী থেকে ধরে রেখে গরমের সময় গঙ্গার নোনা জল পাম্প করে না তুলে মিষ্টি জল জমিয়ে রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ম্যাগাজিন রোডে পৌর প্রতিষ্ঠানের বহুদিন বিজলীর আলো আসেনি। রাতের বেলা এখানে লোক চলাচলের ব্যাপারই ছিল না। ওয়াগন-ভাঙ্গা ও খুনে ডাকাতের আড্ডা ও যাতায়াত ছিল এই সব জায়গায়। কত মানুষ মেরে রেখে দিত এর জলে, এর মাঠে, রেল লাইনের উপরে, রেলের সেতুর তলায়। জল কলের এই বৃহৎ হ্রদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন আগরপাড়া স্টেশন থেকে বরাহনগর চটকলে।

এই বাগানবাড়ির দুটি গেট ছিল। একটি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ঢোকার অপরটি ম্যাগাজিন রোড দিয়ে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ঢুকলেই বাঁদিকে পড়বে দারোয়ানের ছোট্ট একটি ঘর। পশ্চিম মুখে একটু খানি ঢুকলেই রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, পুকুরের দু পাড় দিয়ে এসে মিশেছে দোতলা বাড়ির সামনে। নীচু ধাপের সিঁড়ি বেয়ে কোলাপসিবল্‌ গেট দিয়ে বিরাট চওড়া বারান্দায় আসা যায়। বারান্দার ডানদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। উত্তর দিকে রাস্তা দিয়ে পৃথক রান্না বাড়িতে ঢোকা যায়। পুকুরের পশ্চিম পারে সান বাঁধানো ঘাট ও ঘাটের পাশে হেলান দিয়ে বসার চাতাল। ঘাটের উত্তর দিকে মাজা-ভাঙা প্রাচীন চাঁপা গাছ। মূল বাড়ির দক্ষিণে বিরাট খোলা জায়গা। আগে সেখানে গোলাপ, বেল, ও নানা মৌসুমী ফুলগাছ ছিল। দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকলেই গেটের পাশে আর একখানা ছোট ঘর। সেটি 'শিল্পাচার্যের' স্টুডিও হিসাবে ব্যবহৃত হত। মূল বাড়িটার পশ্চিমে বিরাট ফলের বাগান সেটি পৃথক করে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে যাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে সেই অংশটি এ বাড়ির ভাড়ার আওতার মধ্যে নয়। সেটি ডি. গুপ্তদের নিজস্ব অধিকারে। দক্ষিণের বারান্দার সামনে পাঁচিল দেওয়া বাগান। তার পাশ দিয়ে প্রাচীন ম্যাগাজিন রোডের খোয়ার রাস্তা যা সংস্কারের অভাবে কদর্য সেই রাস্তা পার হলে উঁচু রেলের মাটির বাঁধ 'বরাহনগর রোড স্টেশন' থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলে গেছে। এই বাগানবাড়িতেই অবনীন্দ্রনাথ আসার আগে ভাড়া ছিলেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ অর্থাৎ রাণী মহলানবীশের স্বামী অর্থাৎ প্রখ্যাত অধ্যক্ষ ব্রজচূড়ামণি নীতিবাগীশ হেরম্ব মৈত্রের জামাতা। এই হেরম্ব মৈত্র ছিলেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরাজী সাহিত্যের এক প্রখ্যাত লেখক। তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক যুবক রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে স্টার থিয়েটার যাবার পথ কোন দিকে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—জানি, কিন্তু বলব না। যেহেতু কলকাতার লোক তাঁরা, হাতী-বাগানের মোড়ে স্টার থিয়েটারের অবস্থিতি তাঁর জানা আছে অতএব এ সত্য তিনি গোপন করতে পারবেন না। আবার সেখানে যাবার পথের নিশানা জানিয়ে দিলে সেখানে থিয়েটার দেখে যদি ঐ যুবক গিয়ে নীতিভ্রষ্ট হয় তার নৈতিক দায়িত্বও তিনি নিতে পারেন না। তাই তিনি তাকে পথের নির্দেশ বলে দেবেন না। এ হেন নীতি-বাগীশ হেরম্বর মৈত্রের পুত্র অশোক মৈত্রর একসময় রোমাঞ্চ করা বিবাহিত সহ-ধর্মিনী রূপে অভিনেত্রী শ্রীমতী কাননবালা মাঝে মাঝে শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের অতিথি হয়ে আসতেন এই বাগান-বাড়িতে। এমনতর উদার হৃদয় ছিল মহলানবীশ পরিবারের। আবার এই বাড়িতে মাঝে মাঝে অতিথি হয়ে আসতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এখানের ফাঁকা জায়গায় স্নান ও বায়ু পরিবর্তনে বিশ্বকবির স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হোত। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রের বর্ণনা যে এই বাগানবাড়িরই তা অতি সুস্পষ্ট।

ইঁট কাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশ বিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে
তুমি ডেকে শ্যামল শুশ্রূষায়
নারিকেল বন পবন বীজিত নিকুঞ্জ
আঙিনায়।
শরৎ লক্ষ্মী কনকআলোর ডালায়
মেঘের বেণী
নীলাম্বরের পটে আঁকা ছবি সুপারী
গাছের শ্রেণী
দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাটে বাঁধা যে
কোমর-ভাঙা

ঝিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার চার ডাঙ্গা।
জামরুল গাছে ঝরে অজস্র ফুল
রচনা করেছে নব বালিকার হাতার
কানের দুল।
লতানে মাধবীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরাফিরা
পুকুরের তটে—তটে।
মধুছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগনোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে
পড়ে যায়
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের
খবর আসে।
একসার মোটা পাখাভারী পাম
উদ্ধত মাথা তোলা
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলাতি
পাহারা ওলা।

বাঁশ বনে বাতাসে—
কলাম গাছের পার দেখা যায়
পুকুরের এক কোণে।
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্ন রূপে
জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে—
আমের শাখায় আঁটি বেয়ে যায়
সোনার রসের আগে
লিচু ভরে যায় ফলে
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে
অতিথির ভাগ চলে
বেড়ার ওপারে মৌসুমি ফলে
রঙের স্বপন বোনা
চেয়ে দেখে দেখে জানলার নাম
রেখেছি 'নেত্রকোনা'।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার এসেছেন এই বাগানে। বরাহনগর পৌর এলাকায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের নতুন বাড়ি হওয়ায় 'গুপ্ত নিবাস' ছেড়ে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন। সেই সময় খালি বাগানবাড়ির খোঁজে 'গুপ্ত নিবাস' পছন্দ হওয়ায় কিনে নিয়ে এলেন আপন নীতুকাকা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে। বাগানবাড়িগুলি আগেকার দিনে ধনী সুবর্ণ বণিক ও অন্যান্য ধনী পরিবারের অধিকারে ছিল। তারা সেওয়ায় তখন কামনা ছিল না। কলকাতার ধনী সম্প্রদায় বিলাসব্যসনে ও সপ্তাহান্তে দিন রাত্রি স্ফূর্তিতে কাটাবার জন্য স্ব স্ব কুলাচার পুষ্ট বেষ্টনী ছেড়ে মুক্ত বিহঙ্গমের মত এখানে রাত কাটিয়ে যেতেন। তখনকার দিনে বাগানবাড়িতে আসতো বাজিয়ে, বাইজী, মদ ও মেয়েরা। নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিয়ে নানা প্রকারের জনসমাগম হোত। এই সব বাগানবাড়ি দ্বিতীয় মহাসমরে সামরিক ও অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে, কখনও উপপত্নীর হিসাবে, কখনও বিকল্প হাসপাতালরূপে কাজে লাগানো হোত। যুদ্ধোত্তর মহার্ঘতার ও বাণবৃদ্ধির চাপে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমন হওয়ায় বিরাট বাগানবাড়ির ধনী মালিকরা বাগানবাড়িগুলির উদ্যানের ... ছেড়ে

ভাড়া দিতে শুরু করলেন। যেখানে লোকেরা বসবাস করছিল সেখান থেকে সরানো তাঁদের শক্ত, যদিও তখন বৃটিশ শাসন প্রচণ্ড প্রতাপে চলছে। সবার মনে এই বাড়িটি ধরে গেল কেননা এখানেও সেই খোলামেলা জায়গা, পুকুর, বাগান ও আবার দক্ষিণের বারান্দা। খোলা বাগান, বাগান পার হয়ে রাস্তা ও রেলের বাঁধ। গেটের পাশে গোয়ালারা বিকল্প দোকান খুলেছে। সেখানে গরু-মোষের দুধ সামনে দুইয়ে দেওয়া হয়।

দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় পুরাতন পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের দক্ষিণের বারান্দার গোড়া বিনর্ধক বিশেষ আকৃতির ইজিচেয়ার সারি সারি এখানেও পাতা হল। চওড়া বারান্দায় এধারে ওধারে শান্তিনিকেতনী মোড়া। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই ডান দিকের ঘরটি সপত্নীক অবনীন্দ্রনাথ থাকতেন। ছেলেরা অন্যান্য ঘর দখল করলেন। যুদ্ধের সময় ঠিকমত নাপিত পাওয়া না যাওয়ায় তিনি দাড়ি রাখলেন। অসুখ-বিসুখ হলে আসতো আলমবাজারের কানাই ডাক্তার (ডাক্তার কানাইলাল পাল)। কতদিন কত অপরাহ্নে এসে বসেছি পুকুরের ধারে কোমর ভাঙ্গা বৃদ্ধ চাঁপা গাছটার তলায়, সান বাঁধানো ঘাটে, নয় দোতলার ডেক্ চেয়ার পাতা দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। কত রকম যে কথাবার্তা চলতো তার শেষ নেই। কত স্নেহ যে করতেন আমাদের পরিবারের সবাইকে তা আজ পঁচিশ বছর বাদেও অম্লান হয়ে আছে। অতীত স্মৃতির রোমন্থনে পুরোনো পরিবেশ স্মরণে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রথম পরিচয়

১৯০০ সালের স্কটিশ চার্চেস কলেজের অর্থনীতির ছাত্রদের বার্ষিক সম্মিলনীর উৎসব উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে আসেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বেথুনের বাড়ীর সুন্দরী ও বিনীতা ছাত্রীদের ও কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বিশেষ উদ্যমে এ অভিলাষ চরিতার্থ হয়। তাঁর সঙ্গে এলেন অন্যান্য মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ। ডক্টর আর্কার্ট সাহেব তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ও অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মী ছাত্রছাত্রীরা প্রধান অতিথি ও অন্যান্য আমন্ত্রিতদের আহ্বান জানাবার জন্য কলেজের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। বিশ্বকবি সপারিষদ তাঁর স্বভাবের চিরন্তনী আলখাল্লার মত পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে উপস্থিত হলেন কলেজের সম্মুখে। তাঁকে সমাদরে নিয়ে যাওয়া হল প্রধান অতিথির আসনে। অনুগামী বরেণ্যরাও এসে সম্মুখের আসনে উপবেশন করলেন। তার মধ্যে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও। 'প্রার্থনা হলে' তিলধারণের স্থান ছিল না। অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী বসার আসন পূর্ণ ও দুধারে বারান্দায় ঠেসাঠেসি করে ছাত্রছাত্রীরা সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে দেখতে দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথকে ... তাঁর ... রক্ত

গোলাপের রক্ত মালা পরিয়ে দিল তরুণী এক ছাত্রী। রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে উদ্বোধন গান গাওয়া হল। পরে রিপোর্ট পাঠ, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুমধুর আবৃত্তি প্রভৃতি চললো কিছু সময়। একজন ছাত্রী বিনা যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে খালি গলায় অপূর্ব গান শোনালেন। আজ আমার আর তাঁদের নাম মনে নেই। কিন্তু কানে সে সুরের রেশ আজও বাজে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

বিশ্বকবি তাঁর ছোট বক্তৃতায় প্রথমেই রক্ত গোলাপের মালার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—এই যে রক্ত গোলাপের কঠিন মালা এ পরতে গেলেও বাজে আর খুলতে গেলেও লাগে। এ মালা কলেজের উপর রেখে দিয়ে আসার মালা। এ জীবন্ত মানুষের গলার ভূষণ নয়। <u>শান্তিনিকেতনের মিলন মেলা হওয়া উচিত সাদা ফুলের মালা বা বেল, চামেলি, কুন্দ, যুঁই ও রজনীগন্ধার ফুল মালা।</u> তা গলায় নিশ্চিন্তভাবে জড়িয়ে থাকে। আর যন্ত্রসঙ্গীত বিহীন গায়িকার শুধু গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আজকাল গায়ক-গায়িকার কণ্ঠ ছাপিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের আবহ সুরারোপ করা এক রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। এ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অমার্জনীয় প্রবৃত্তি।

অবনীন্দ্রনাথকেও বক্তৃতা দিতে বলা হল। ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন—আমি সামান্য শিল্পী আমার আবার অর্থনীতির উপর ভাষণ দিতে বলা লম্বা দেওয়ারই নামান্তর। যাই হোক তাঁর অতি ঘরোয়া চলতি ভাষায় অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলি সরসভাবে বলে গেলেন। তিনি বললেন 'নেড়া-মাথায় সবাই তেল দেয়।' অর্থাৎ যেখানে অর্থ আছে সেখানেই বেশী অর্থ জমা হয়। এই রকম রসাল কথাবার্তা বক্তৃতায় সেদিন সকলেই আনন্দিত হয়েছিল।

এবার সভার আনুষ্ঠানিক পর্বের শেষে ছেলে-মেয়েদের অটোগ্রাফের খাতায় মাননীয় অতিথিদের নাম সই করানোর পালা। সেখানে তরুণী তরুণদের বেজায় ভিড়। অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিলেই তিনি নামটি সই দিচ্ছেন। তাছাড়া উপায়ও ছিল না। অনেকে সই পেয়েই খুশী। এক-একজন নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়বে না, কিছু না কিছু বাণী লিখে দিতেই হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাণী লেখার লোক ঐখানে।' তবু তারা ছাড়বে না। অগত্যা তাঁর সইয়ের উপরে লিখে দিলেন 'তোমারই'। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' লিখে সই করা আগে থেকেই আছে। কেউ বললে আর একটু লিখে দিন।

অবনীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে বললেন "আমি যখন তোমারই হয়ে গেলাম, তখন এর চাইতে আর বড় বাণী কিছু আছে?"

সেদিনের সেই বরেণ্য অতিথিবৃন্দের সান্নিধ্য ও স্মৃতি আজও মনপটে জাজ্বল্য আছে। জীবনে ...

গেছে। কত মননশীল মানুষের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভের সুযোগ পেয়েছি কিন্তু সেই কলেজের দিনের এ মধুর স্মৃতি আজও আমার মনের পটে চির উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিক্ষা পর্বের অবসানে কর্মব্যপদেশে আমায় কলকাতার উপকণ্ঠে এক নতুন শিল্পাঞ্চলে কাজ নিতে হয়। তখন বরানগর পৌরপ্রধান ছিলেন পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শশাঙ্ক চক্রবর্তী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্রের সহপাঠী ছিলেন। শশাঙ্কবাবু আমাদের বিশেষ বন্ধু স্থানীয়।

একদিন সকালে শশাঙ্কবাবু আমায় টেলিফোনে বললেন,—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আপনার প্রতিবেশী।

ঠিক বুঝতে পারলাম না. এখানে কাছে পিঠে তো কোন বাড়ী নেই, যাই হক তাকে আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম—

—কোন বাড়ীতে এসেছেন তিনি?

—ঐ ডি গুপ্তদের বাগানে, যেখানে আগে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ থাকতেন। তাঁরা নিজেদের বাড়ী করে উঠে গেছেন। ওঁরা সেই খালি বাড়ীতে এলেন।

—তাই নাকি? যাব একদিন দেখা করতে।

—নিশ্চয় যাবেন। দেখা করে খুসীই হবেন।

—আমার যেতে হ'ল না দেখা করতে। তিনিই পরের দিন সকালে দুই নাতির হাত ধরে জলকলের ঝিলের ধারে বেড়াতে এলেন। হেঁটে হেঁটে চলে এলেন আমার কোয়ার্টারের সামনে।

তাঁর দীর্ঘ চেহারা, পায়ে কটকী চটি, পরণে লুঙ্গি, হাতে লাঠি, গায়ে আলখাল্লা দেখে বুঝতে কোনই অসুবিধে হল না ইনিই সেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি পিঠে হাত দিয়ে বললেন, আপনার কথাই তো শশাঙ্ক বলছিল।

—ঠিক কথা। শশাঙ্ক চক্রবর্তী ও আমার টেলিফোনে আপনি যে আমাদের পাড়ায় এসেছেন, সেকথা বললো।

রোদ উঠে যাওয়ায় তিনি আর সেদিন আমাদের বাসায় এলেন না, পরে একদিন আসবেন বলে গেলেন. কথায় কথায় চলতে চলতে পায়ে পায়ে পুবের দিকে তাঁর বাসার দিকে খানিকদূর গিয়ে বিদায় নিয়ে বললাম—

—একদিন আমাদের বাসায় আসতে হবে।

—নিশ্চয়ই যাব।

বংশ পরিচয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বংশের সেই শাখার যাঁরা বাবু [illegible] এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের [illegible] বর্জন। সেদিন চিৎপুর রোডের (বর্তমানে যার নাম রবীন্দ্রসরণি, উপর আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দিরটির দৈন্যদশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখে মর্মাহত হলাম। বর্তমানে সেখানে বেলেপাথর ও মার্বেল ব্যবসায়ীর গুদোম ঘর। ভেতরে অন্ধকার, ধুলো ও স্যাঁতসেঁতে, বাইরেও জীর্ণ বৃদ্ধ জরদ্গবের মত। তবে বংশ-তালিকা থেকে দেখা যায় যে ঠাকুর বংশের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সন্তান-সন্ততিদের বিবাহাদি স্মরণ-কারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত। ধর্মান্তরিত না হয়ে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরেরা অত্যন্ত প্রগতিশীল ও প্রাচীন সংস্কারমুক্ত ছিলেন। ওরা ব্রাহ্ম না হলে কি হব, ব্রাহ্ম পরিবারের তো ওরাও একজন। পাড়াগাঁয়ের মত ওদের বাড়ী খাবো না, ওদের ছায়া মাড়াবো না, ইত্যাদি পুরাতন ছুৎমার্গের কবল মুক্ত ছিলেন। শহরে নিজেদের মধ্যে এসব অধিক ক্ষেত্রে অচল। ক্রিয়াকর্মে নিমন্ত্রণে যাতায়াত সবকিছু করণ-কারণে দুই বাড়ীর যাতায়াত ছিল, কোনখানে কোন ত্রুটি ছিল না। বাইরের লোকেরা সহজে বুঝতে পারবে না কোন অংশ ব্রাহ্ম ও কোন অংশ অব্রাহ্ম। এখানে নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকে অবনীন্দ্রনাথের সন্তান সন্ততির বংশতালিকা সংযুক্ত করা হল।

রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথও পরিচিত জনের নানা রকম নাম দিতেন। তিনি নিজের ছেলের মজার মজার নাম দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের তিন পুত্র—অলোকেন্দ্র, তরুণেন্দ্র ও মানীন্দ্রনাথ। তরুণেন্দ্রের ডাক-নাম 'কোকো' মানীন্দ্রের 'টোটো'। একজন হয়তো কোকো খেতে ভালবাসত, অন্যজন টোটো করে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতো। আমারও তিনি একটি নাম দিয়েছিলেন—'জীবনদাতা'। যেহেতু আমি জলকলের কর্মী তাই 'জল অপর জীবন'। যে জল দেয় সে হল—জীবনদাতা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অলোকেন্দ্র বিবাহ করেন নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী পারুল দেবীকে। পারুল যৌবনে যে সুন্দরী ছিলেন, তা তাঁর প্রৌঢ়ত্বেও প্রকাশ পায়। তিনি সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিতা, সুগৃহিনী, মার্জিতরুচি ও প্রিয়ভাষিণী ছিলেন তা তাঁর আপন করা আন্তরিক টানে আজও আমরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হই।

অলোকেন্দ্রনাথের দুই পুত্র —অমিতেন্দ্র ও সুমিতেন্দ্র অর্থাৎ বীরু ও বাদশা। বীরু ১৯০৪ সালে শান্তিনিকেতনের চীনা ভবনে চীনা ভাষা শিক্ষা করেন ও ১৯৪৭ সাল থেকে সেখানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ভারত সরকারের সামরিক শিক্ষার-দলে দেরাদুন ও পুণায় শিক্ষকতা করেন ও পরে কিছুকাল শিকিমেও বসবাস করেন। সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি পেন-সিলভেনিয়া বিদ্যালয়ে ও পরে ওকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তারও একটি মাত্র পুত্র। বীরুর সহধর্মিনী অধুনালুপ্ত প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা '[illegible]'র সুযোগ্যা সম্পাদিকা বীণা চক্রবর্তীর কন্যা। বাদশার বিবাহ হয় মোহনলাল ঘোষালের কন্যার সঙ্গে। এরও একমাত্র পুত্র। বাদশা এখন মার্কারি শিল্প-ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। অলোকেন্দ্রনাথের মধ্যে যে শিল্পীমন ছিল তার কিছু প্রয়োগ করেন নানারকম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে—যেমন নল কূপের স্ট্রেনার, পেতলের কলকা প্রভৃতি। অলোকেন্দ্রনাথের শিল্প-খ্যাতির সঙ্গে সাহিত্য খ্যাতিও বর্তমান। তাঁর বাটিকের কাজ দুই দশক আগে গুণীমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চিত্রকলার এক সাধারণ প্রদর্শনীও হয়।

মধ্যম পুত্র তরুণেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় বিলেতে থাকাকালে এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথের সহধর্মিনীর মৃত্যুর পর ইংরেজ পুত্রবধূ এবাড়ীতে প্রবেশের অধিকার পান। তাঁর অন্তরে অপত্য স্নেহের ফল্গুধারা ছিল নিত্য-প্রবাহিত। সংসারে অশান্তি আনার ভয়ে তিনি মনোবেদনা দমন করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম কন্যা করুণা দেবীর সঙ্গে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। অল্প বয়সে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিলালের মৃত্যু হওয়ায় বিধবা করুণাদেবী দুই শিশু পুত্র নিয়ে পিতৃ-গৃহে আসেন। এই দুই দৌহিত্রের নাম হল খ্যাতনামা সাহিত্যিক মোহনলাল ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোভনলাল। মোহনলাল বিলেতে থাকার সময় লন্ডনে এক চেক মহিলার সঙ্গে পরিচয় ও পরে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এঁর নাম মিলাডা গাঙ্গুলি। এদেরও একটি পুত্র ও একটি কন্যা, মিতু ও মাম—অমিতেন্দু ও ঊর্মিলা।

এই গুপ্ত-নিবাসে অবনীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী দেহ রক্ষা করেন। এখানে বীরুর বিবাহ হয়। অবনীন্দ্রনাথও দেহত্যাগ করেন এই বাগানবাড়ীতে। মরদেহ ভস্মীভূত করা হয় আলমবাজারের শ্মশানঘাটে। বরাহনগর পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে শেষকৃত্যের স্থানে মর্মর ফলক স্থাপন করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিন পুত্র পৃথকভাবে বসবাস সুরু করেন। অলোকেন্দ্রনাথ যখন একলাই এই বাগানে থাকতেন সেই সময় একটা ডাকাতির চেষ্টা হয়। তারপর তিনি ঐ বাড়ী ছেড়ে মানিক-তলার কাছে তাঁর এক বন্ধুর ভাড়াবাড়ীতে উঠে যান। সেখান থেকে কয়েক বছর পরে ভি, আই পি রাস্তার প্রায় ওপরে মানিক-তলা মেন রাস্তার কাছে নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ করান।

বর্তমানে সেই 'গুপ্তনিবাস' ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ভাড়া নিয়েছেন নীচের তলায় পুবের অংশে মোহনলাল ইনস্টিটিউটের কর্মী হিসেবে ভাড়া থাকতেন। দোতলায় ডক্টর দাস তাঁর বিদেশী পত্নী ও শিশু সন্তান নিয়ে বসবাস করেন।

(ক্রমশঃ)

শতবর্ষের আলোয় অবনীন্দ্রনাথ

সুধা বসু

রাধার চিত্র দর্পণ-বিলাস [illegible] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। নবজাগৃতির বাঙালীর ভাবনার তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। সেই তরঙ্গায়িত ভাবপ্রবাহে বাঙালীর জীবনক্ষেত্র উর্বরা ও পরিপুষ্ট হয়েছিল নানাদিকে। অতঃপর বাংলাদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের স্ফূর্তি যখন সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নবচেতনা সঞ্চার করে চলেছিল তখন চিত্রকলার রাজ্যেও একটি নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস লক্ষিত হোল। বাংলাদেশে জাতীয় চেতনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পাঁচ নম্বর আবাসে চিত্রকলার মুক্তিযজ্ঞের হোতা অবনীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আজ থেকে শত বর্ষ আগে একটি শুভ দিনে।

দিনটি বাংলা ১২৭৮ সাল, ২৩শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথি (ইং ৭ই আগস্ট, ১৮৭১)। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ। তাঁর পৌত্র অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছিলেন চিত্রশিল্পী। নানা কারুকলা ও সংগীতে ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। বাড়ীর সমস্ত পরিবেশেই ছিল সৌন্দর্য সাধনার বিশেষ অনুকূল। শিশু অবনীন্দ্রনাথ সেই সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঘুরে ফিরে, দেখেশুনে তাঁর সহজাত কৌতূহল ও সৌন্দর্যবোধকে পরিপুষ্ট করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীর সাধারণ নিয়মে তিনিও দাস দাসীর আওতায় মানুষ হন। তাদের সংগে সান্নিধ্যও অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ মনের যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছিল। বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক শিক্ষানীতির বাঁধা নিয়মে তিনি বেশীদিন আবদ্ধ থাকতে পারেননি। একদিন ইংরেজী শিক্ষকের বেত্রাঘাতের চরম চিহ্ন পিঠে ধারণ করে বালক অবনীন্দ্রনাথ চিরদিনের মত চলে এলেন নর্মাল স্কুল ত্যাগ করে। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতির যে চমৎকার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তা জীবনের শেষ বেলাতেও বিস্মৃত হননি। তার পরে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে পড়ার সময়ও তিনি চিত্রাঙ্কন শেখার কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। তবে সেখানেও তিনি সাধারণ শিক্ষার শেষ সীমানা অতিক্রম করতে পারেননি।

অতঃপর গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠ কিছুদিন চলেছিল। আর সেই সংগে চলতো ছবি আঁকা ও স্কেচ করার পালা। বাড়ীর আসবাব, পোষা পশুপাখী, উৎসব আনন্দ ও সৌখীন ক্রিয়াকলাপ, বাগানের গাছপালা ও রোদ্র ছায়ার খেলা—সব কিছুর মধ্যেই তিনি শিল্পানুভূতিকে পুষ্ট করার অপূর্ব সুযোগ পেতেন। বালক অবনীন্দ্রনাথের জ্ঞানকৌতূহল মেটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হয়েছিল তাঁর ছোট পিসিমার ঘরটি। সেখানে ছিল নানা পৌরাণিক আখ্যানের চিত্রাবলি ও কৃষ্ণনগরের অদ্ভুত সুন্দর সব পুতুল ও প্রতিমা। আর একটু বড় হয়ে অবনীন্দ্রনাথ পিতার কোন্নগরের বাগান বাড়ীতে গিয়ে আপনমনে ছবি ও স্কেচ করে যেতেন ফুলফলের, গাছপালা ও পশুপাখীর; আর গঙ্গানদীর বুকে ভাসমান নৌকার। [illegible] সেই বাগান বাড়ীতে অংকিত ছবি ও স্কেচ এবং সেখানকার বিচিত্র সব [illegible] তাঁর ভাবী শিল্পী জীবনকে নানাভাবে [illegible] অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট [illegible]

আপনমনে ও নিজের খেয়ালে ছবি এঁকে এঁকে সতের বছর উত্তীর্ণ হলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই সময় তাঁর পিতার অকাল বিয়োগের ফলে বাড়ীতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাও তাঁর ভাবুক মনকে আলোড়িত করেছিল প্রবলভাবে। তখন তাঁর মা তাঁকে বিয়ে দিলেন। আর তিনিও পড়াশুনোর সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে ছবি আঁকা ও গানবাজনার বিভোর হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু রীতিমত চিত্রবিদ্যা শিক্ষার তখনও কোন সুব্যবস্থা হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর পিতা-মাতার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না যে তাঁদের কনিষ্ঠপুত্র আর্টিস্ট হন।

এমতাবস্থায় কিছুদিন যেতে অবনীন্দ্রনাথের মেজ জেঠাইমা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) তাঁর চিত্রাঙ্কন শেখার রীতিমত ব্যবস্থা করে দিলেন পরপর দুজন ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। তাঁরা হলেন মিঃ গিলার্ডি ও মিঃ পামার। এতদিনের ভাবানুভূত জীবন থেকে অবনীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন অতি বাস্তব এক জীবন সাধনার পথে। বিদেশী শিক্ষকের কাছে পাশ্চাত্যের

পাশ্চাত্য প্রথাতে চিত্রাঙ্কনের শিক্ষায় তিনি অতি দ্রুত সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেবোঁত শিক্ষকের হাতপাত পেয়ে তিনি পরোক্ষভাবে একজন নিপুণ চিত্রের শিল্পী ও পোর্ট্রেট পেইন্টার রূপে হলেন আত্মপ্রতিষ্ঠ। আত্মীয় বন্ধু সকলের প্রতিকৃতি অঙ্কন করলেন প্যাস্টেলে। মুসৌরিতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কত বিচিত্র দৃশ্যপট করলেন রচনা। তবু তৃপ্তির না চিত্ত। কি যেন এক অপ্রাপ্তি ও অজানার বেদনা-ব্যথায় মন তাঁর পীড়িত হয়ে চললো।

এমন সময়ে হঠাৎ এল পরিবর্তনের পালা। প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লাইব্রেরীতে পেয়ে গেলেন মুঘল যুগের স্বর্ণচিত্রে একটি পাণ্ডুলিপি পুঁথি। সেই চিত্রাঙ্কনের কারুকলা ও বর্ণ বাহার দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন; আর কিভাবে তাকে আয়ত্ত করা যায় সেই চিন্তায় হলেন বিভোর। তার পরে হাতে এল একখানি পার্শিয়ান ছবির বই। এর আগে বিলেতেও তিনি শিল্পীর কিছু মিনিয়েচার ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও তাঁর মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। এবার পাশ্চাত্য প্রথার রঙ-তুলি সরিয়ে রেখে ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলীর রস-রহস্য উদ্ধার করবার চেষ্টায় হলেন রত। কিন্তু সমস্যা হোল আঁকবেন কি?

সে সমস্যার সমাধান করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে ছবি হোক্। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই অবনীন্দ্রনাথ কবির চিত্রাঙ্গদা কাব্য এবং বহু ও বিম্ববতীর চিত্র এঁকেছিলেন রেখার রূপে-ছন্দে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন প্রয়াণেরও কয়েকটি ছবি করেছিলেন অতি চমৎকার। কিন্তু এসবই ছিল সেই বিদেশী প্রথার শিক্ষার অন্তর্গত।

রবি-কার নির্দেশে ভাইপো অবন রূপ দিলেন বৈষ্ণবকবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিকে।। দেশী ঢঙে ছবি হোল। নতুন পথ ও পন্থা হোল নির্দিষ্ট। কিন্তু শিল্পীর মন তৃপ্ত হোল না একেবারেই। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যেন শীতের রাত্তিরে যেন সাহেবকে শাড়ী পরিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বিদেশী রীতির শিক্ষার প্রভাব তখনও চলছিল পুরোদমে। তাহলেও অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু হাল ছাড়েননি।

আবার শুরু করলেন কৃষ্ণলীলার নতুন চিত্ররচনার কাজ। এবারে পথ খুঁজে পেলেন। তার মধ্যে ছবিতে সোনা লাগানোর পদ্ধতি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কুড়ি খানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যে। এই চিত্রগুচ্ছে তাঁর নতুন আঙ্গিক রীতি ও রূপ রচনায় কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তা আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল নিঃসন্দেহে।

এই ঘটনা ১৮৯৫ সালের। কৃষ্ণলীলার ছবি এঁকে এবারেও তাঁর মন পুরো পরিতৃপ্ত হয়নি। ভক্তিভাবের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারেননি এবং রসিকের বিচারে তা রসোত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং আবার পথ খোঁজার পালা চললো অবিরত। অবনীন্দ্রনাথ সংকল্প গ্রহণ করলেন 'দেশীমতে ছবি আঁকতে হবে'। তিনি তাঁর আদি শিক্ষা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে দেশীয় প্রথা-পদ্ধতির মিলন ঘটিয়ে, গ্রহণ বর্জনের ভিতের নিজের মতে ও স্বকীয় পন্থায় নতুন সৃষ্টির সাধনায় হলেন নিমগ্ন। কোন একটি নির্দিষ্ট ভাব-ভাবনা ও করণ কৌশলে আবদ্ধ না থেকে তিনি নানা নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাতে লাগলেন চিত্র পটে। ক্রমশঃ যেমন প্রকরণ পদ্ধতির বৈচিত্র্য দেখা গেল, তেমনি এল কত শত ভাব-ভাবনা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা, রঙ্গ প্রত্যেক রঙের শেড পর্যন্ত......।"

বিদেশী ধারায় শিক্ষার ভিত্তি ও দেশের মধ্যযুগীয় চিত্রের প্রেরণা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রেখার সৌকুমার্যে, রঙের মনোহারিত্বে ও রূপের অভিনবত্বে গড়ে তুললেন এক অভূতপূর্ব ও একান্ত স্বকীয় শিল্পরাজ্য। একটির পর একটি ছবি তৈরী হোল সেই নবকল্পের রঙ-এ ও রেখায়। বিষয়বস্তু সংগৃহীত হোল পৌরাণিক আখ্যান, বুদ্ধজীবন কথা ও কালিদাসের কাব্যসমূহ থেকে। সেই প্রথম প্রচেষ্টা ও পরীক্ষাকালের সৃষ্টি গুলির মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ রচনার পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে। তাঁর সেই প্রথম পর্বের অভিসারিকা, দীপাবলী ও সিদ্ধার্থ-যশোধরা? কালের সীমানা ডিঙিয়ে চিরায়ত রূপকল্পনার নতুন প্রতীক হয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে এল আর একটি যুগ পরিবর্তনের পালা। তিনি পরিচিত হলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের তৎকালীন ইংরেজ অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সঙ্গে। তিনি এদেশে কর্মভার নিয়ে এসে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যমহিমা দেখে তাকে নতুন যুগের উপযোগী করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নতুন ধারার চিত্রচর্চার মধ্যে তিনি তাঁর সেই সংকল্পকে সার্থক রূপায়ণের সংকেত-সহায়তার স্পর্শ অনুভব করলেন। নানা চেষ্টা-ব্যবস্থা করে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করালেন ১৯০৫ সালে। অবনীন্দ্রনাথের পরিচালনায় আর্ট স্কুলে একটি ভারতীয় বিভাগ হোল উন্মুক্ত। ক্রমান্বয়ে একটি দুটি করে ছাত্র এসে সেই বিভাগে যোগ দিলেন নতুন চিত্রপদ্ধতি শিক্ষার জন্য। অবনীন্দ্রনাথ গুরুর আসনে হলেন অধিষ্ঠিত। আর তাঁর প্রবর্তিত নব্য চিত্ররীতিকে প্রসার ও পুষ্ট করার নানা সুযোগ সৃষ্টি করে চললেন ভারত-শিল্পপ্রেমী হ্যাভেল সাহেব।

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে যোগদানের পূর্বে হ্যাভেল সাহেবের প্রেরণাতেই দিল্লীর দরবার প্রদর্শনীতে (১৯০২) ছবি পাঠিয়ে সম্মানপদক লাভ করেন। তিনি তখন জলরঙ-এ তাঁর নবীন সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন বটে, কিন্তু সেই প্রথম সম্মান স্বীকৃতি লাভ হয়েছিল তেল-রঙ-এ অঙ্কন করে। বিষয়: শাজাহানের অন্তিম অবস্থা। বিষয়বস্তুও যেমন দেশীয়, টেকনিকও তেমনি দেশজ অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয় পন্থা।

অবনীন্দ্র চিত্রের বিদেশে প্রথম প্রচারও হয়েছিল ১৯০২ সালে। হ্যাভেল সাহেব বিলাতের স্টুডিয়ো পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখে ইউরোপের শিল্প রসিকমহলে ভারতের নতুন চিত্ররীতিকে প্রচার করেন তাঁর প্রভাবশালী লেখনী মাধ্যমে। ক্রমান্বয়ে আরও অনেক ভারত কলাপ্রেমী বিদেশী ব্যক্তিরা অবনীন্দ্রচিত্রশৈলীর প্রচারে সহায়তা করেন নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে দিয়ে।

১৯০২ সালেই জাপানের শিল্পবেত্তা মনীষী কাকুজো ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে এসে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর নবীন চিত্র সাধনার সঙ্গে পরিচিত হন। দেশে ফিরে যাবার সময় তিনি প্রস্তাব দিলেন ও ব্যবস্থা করলেন যে কতিপয় জাপানী চিত্রশিল্পীকে কলকাতায় পাঠাবেন দুই দেশের চিত্রভাবনা ও আদর্শ বিনিময়ের জন্য। অনতিবিলম্বে জাপান থেকে কলকাতায় এলেন হিশিদা ও টাইকান নামে দুই তরুণ শিল্পী। তাঁদের চিত্র রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী, বিশেষ করে জাপানী প্রথায় ছবির পটকে জলে ধুয়ে অঙ্কনের রীতি দেখে তিনি তাকে নিজের মত করে, আপনভাবে ও নতুনভাবে উপায়ে প্রয়োগ করার চেষ্টায় হলেন রত। কিন্তু তিনি জাপানী ওয়াশ পদ্ধতিকে হুবহু গ্রহণ করেননি কখনও।

এই নতুন ভাবধারা গ্রহণের ফলে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনায় আর একটি নব পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। গোড়াতে তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ভারতের

শাড়ীর মেলা
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট [illegible] নং ([illegible]) কলিকাতা-৭

মধ্যযুগীয় চিত্রে তাঁর অনুপ্রেরণা ও নতুনভাবে দেশী মতে ছবি আঁকার মৌল আদর্শ হয়েছিল। অতঃপর জাপানী জলধোয়া রীতির ভাবধারা গ্রহণের ফলে তাঁর চিত্রশৈলী অতি অভিনব ও অভূতপূর্ব এক রূপশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠলো। সেই নব প্রবর্তিত চিত্ররীতির সঙ্গে দেশী-বিদেশী কোন প্রথার সমরূপতা দেখা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রেখার সাধনার সঙ্গে জলধোয়া রীতিতে রং প্রয়োগের ফলে ছবিতে একটা কুহেলিকাময় স্বপ্নানুভাবের আবেশ এসে গেল। ক্রমশঃ তাঁর প্রতিটি রচনা অভিনব রূপ, অদ্ভুত কল্পনার অত্যাশ্চর্য প্রবাহ ও উচ্ছ্বাসের কমল-কোমলের সার্থক নিদর্শন হয়ে উঠেছিল।

অবনীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে বিশিষ্টতা হোল তাঁর উদার মনোভঙ্গী, সঙ্কীর্ণতাবর্জিত স্বাজাত্যাভিমান ও চূড়ান্ত কৌশলের রূপ সৃষ্টির অসীম ক্ষমতা। দেশ-বিদেশ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—এই বিভেদ তিনি কখনও করেননি। তিনি এযুগের উপযোগী আধুনিক চিত্রশৈলীর পত্তন করলেও প্রাচীনকে কখনও অস্বীকার করেননি। তাঁর আধুনিকতা কোন সমকালীন প্রেরণাসঞ্জাত ও নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের মধ্যে মূল আবদ্ধ রেখে তাঁর চিত্রভুবনকে তিনি শাখা পল্লবিত করেছিলেন নানা রূপে-রঙে ও রসের আবেশে। আর তা শুরু থেকেই বিভিন্ন ভাব প্রবাহের স্তর বেয়ে ক্রমঃপরিণতির দিকে চলেছিল এগিয়ে।

নিজের উদ্ভাবিত রীতিতে গোড়ার দিকে যে অনিশ্চয়তা ও অপরিপক্কতার ছাপ ছিল, ভাব প্রকাশের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখা যেত তা ক্রমশঃ এগিয়ে চললো তুলনাহীন উৎকর্ষের অভিমুখে। পথ খোঁজার পালায় প্রথম সব চিত্রের ঈপ্সিত দেখা গেল ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছে (১৯০৭-৮)। এক মানস জাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণ। এই চিত্র মধ্যে দেখা যায় তাঁর জলে ধোয়া রীতিতে বর্ণযোজনার অপূর্ব কৌশল লাভ করেছে চূড়ান্ত পরিণতি। জীবনজিজ্ঞাসার ছাপও ক্রমস্ফুট: ভাবের আলোড়ন দোলানো মন ক্রমশঃ ভাব-সংহতির দিকে চলেছিল এগিয়ে। এই ছবি কখানি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার ক্ষেত্রে এক একটি landmark। ওখান পর্যন্ত তাঁর প্রথম সার্থক সৃষ্টি এযুগের নতুন কল্পনার ভারতমাতার চিত্র। এটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯০০ সাল।

১৯১১ সালে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আবার দেখা গেল নবতর আর একটি পর্যায়ের শুভসূচনা। ইংলণ্ডের রাজারাণী এলেন ভারত ভ্রমণে। কলকাতায় এসে রাণী অবনীন্দ্রনাথের 'তিষ্যরক্ষিতা'র চিত্র দেখে মুগ্ধ হলেন। শিল্পী ছবিটি রাণীকে উপহার দিলেন। তার কিছুকাল পরেই তিনি সি আই ই উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রেও অবদানবিতরণ করেছেন অনেকখানি। শিশুসাহিত্যের রাজ্যে তাঁর আসন তখন সুনির্দিষ্ট।

দীপাবলী—অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

এমন সময়ে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করলেন চারুকলার তত্ত্বাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য (১৯২১-২৯)। তাঁর সেই বক্তৃতা প্রায় ত্রিশটি নিবন্ধে হয়েছিল বিধৃত। সময়টি তাঁর চিত্র নির্মিতির মধ্যাহ্ন লগ্ন: কিন্তু তিনি তখন ভূমিকা গ্রহণ করলেন সব্যসাচীর। এক হাতে চলছিল তুলি: এবারে কেন আর এক হাতে ধরলেন লেখনী। এত দিন ছিলেন রঙ-রেখার যাদুকরের ভূমিকায়—এবারে হলেন সৌন্দর্যসাধনার গূঢ়-মন্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা। তাঁর আরাধনা সাধনার রূপ প্রতীক, তাঁর অনুভাব-অনুভূতি ও নন্দনরুচিকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এই বক্তৃতামালায় অনবদ্য ভঙ্গীতে ও ভাষায়। বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি অবিসংবাদী পথিকৃৎ। এই অপূর্ব সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ ডিগ্রী।

এইজাতীয় প্রচুর সাহিত্য সাধনায় তাঁর চিত্রচর্চা কখনও ব্যাহত, বিঘ্নিত হয়নি। এই বয়সেও অবনীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ও অনন্য। ওমর খৈয়ামের চিত্রকল্পনায় তাঁর সৃজনী প্রতিভার যে দ্যুতি বিকীর্ণ হয়েছিল, তাঁর তুলি ও রঙ-রেখার মায়াজালের যে সর্বব্যাপী বিস্তার শুরু হয়েছিল তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল চল্লিশ বছরেরও অধিককাল। আর তা যে কত বিচিত্রভাবে ও ভঙ্গীতে হয়েছিল তার শেষ নেই। হাজার পটে হাজার বিষয়বৈভব। যত পট, যত ছবি: তত রীতি-পদ্ধতি ও রূপবৈচিত্র্য। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যুগপৎ কোন ছবিতে দেখা যায় গীতিময়তা ও স্বপ্নালুভাব, আবার তারই পাশে আর কোনও চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ওজস্বিতা ও প্রাণোচ্ছলতার সঙ্গে স্থিরগম্ভীর ভাব ও ঐতিহ্য কীর্তিত অনুরাগ। অনেক চিত্রে লঘুচপল পরিহাস প্রিয়তার ছাপও সুস্পষ্ট। বর্ণবয়নে ছিলেন ঐন্দ্রজালিকতুল্য। সূক্ষ্ম আলোকের রেখা রচনার মৌল প্রেরণা মুঘল শিল্পীদের 'একবাল' স্তরের থেকে হলেও অবনীন্দ্রনাথ নিজের রুচি ও প্রজ্ঞানানুসারে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেকখানি।

[illegible]—অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত (রবীন্দ্র ভারতী) সংগ্রহ

তাঁর স্বকীয় শিল্পীজীবনের সৃষ্টি-সম্ভারে বিষয় বৈচিত্র্যও সুপ্রচুর। মানুষের প্রতিকৃতি, নিসর্গ শোভা, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, পশুপাখীর বিচিত্র রূপাকৃতি, রবীন্দ্র কাব্য ও নাটকের চিত্ররূপ, প্রতীক ধর্মী ও আখ্যানমূলক চিত্র এবং বিচিত্র রকমের সব মুখোশ রচনার সমারোহ দেখা যায় সেখানে। নিমীল নেত্র হাসি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আভাসও এনেছেন অনেক চিত্র-পটে। হাস্যরসাত্মক চিত্র শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি, মননের পরিমিতিবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি গুণে রসোজ্জ্বলতায় স্নিগ্ধ। মুখোশ-চিত্রও তাঁর শিল্পের ও নাটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত আলেখ্য। তিনি নিজেকেও মুখোশের-আড়ালে অসীম রহস্যরূপে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। নিসর্গ চিত্র এনে দিয়েছে প্রাকৃতিক রূপের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় অ-ধরা মাধুরীর প্রবাহ। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের চিত্রণেও তিনি স্বকীয় ভাবানুভূতির প্রাধান্য ও গতিকে এনে স্তরে পরতে পরতে তাকে সর্বাবিষ্ট করেছেন। সেই স্বপ্নের মায়াজাল রচনা ও রোমান্টিকতার আবেশ-অনুভব যেন আরব্য-রজনীর চিত্রাবলী রচনার পরে তাঁর মনে একটা ক্লান্তির স্পর্শ এনে দিয়েছিল।

আর তাই তিনি— ফিরে গেলেন সরলতা, গ্রাম্যতা ও সহজবোধ্যতার অভিমুখে। নতুন ভাব ভাবনা ও আঙ্গিকের পরিবর্তন দেখা গেল শেষ বয়সের চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের চিত্র এবং আরও নানা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য চিত্রপটে। মনে হয় তিনি আর একবার শৈশব কল্পনায় বাঁধন-ছেঁড়া ও রীতিনীতির তোয়াক্কাহীন স্বচ্ছন্দ-চারী এক শিল্পচেতনায় হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ। বিগত কালের সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন ও জলে ধোয়া রঙের খেলাতে তাঁর প্রবীণ মনের দুঃখ ভুলে আর একবার মনোভিরাম করিয়ে দিলেন। অন্যান্যদের মূলক এই চিত্রাবলি মুক্তধারার শক্তিতে ও মোটা তুলির টানে যে অভিনব লাভ করেছে তার তুলনা কেবল উৎকর্ষতার।

আরব্য রজনীর চিত্রাবলীতে তাঁর শিল্প প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির শেষ বিচ্ছুরণ-বিকীর্ণ হয়ে যে মাধুর্য, শিল্পরসের আঙ্গিক-কৌশল ও অভিনব কল্পনার অসীম বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে তা তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিত্রের পাশে স্থান পাবার যোগ্য। তাঁর এসব পর্যায়ের চিত্র-বিচিত্র—শেষ বোঝা, শাহজাদা, আলমগীর, নবাব মন্ত্রী, ফকিরী, কাপোথোপের, উমা, [illegible] ..যোগ..., বাহিকা, জোয়ারে বাঁশী, শাহজাদী-আত্ম, অসংখ্য অতুলিক এবং আরও অনেক ছবির গুণগরিমা অবর্ণনীয়।

তা দেখে দেখে মনে-প্রাণে রসাবিষ্ট হয়ে প্রকৃত আনন্দ লাভের জন্য।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার দ্বিতীয় স্বরূপ বিকশিত হয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে রচিত কুটুম-কাটামে। প্রকৃতির বুকে কুড়িয়ে পাওয়া এবং জীবনে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত জিনিস ছিল তাঁর এই রূপায়ণ কর্মের মূল্য উপাদান। তুচ্ছকে উর্দ্ধের সীমানায় তুলে দেবার ইহা এক অদ্ভুত নিদর্শন। এই অভিনব শিল্পায়নে হয়েছে শৈশব-বার্ধক্যের ও রূপ-বিরূপের সুখ-সম্মেলন। সৃজনীশক্তির অসীম প্রাণ-রসে তা পরিপূর্ণ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আজ দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-চিত্রের অপব্যাখ্যান শোনা যায় অহরহ। অথচ যখন ১৯০৮ সাল থেকে কলকাতা শহরে এবং ১৯১৪ সাল থেকে ইউরোপ, আমেরিকা, যাভা, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের নানা অঞ্চলে অবনীন্দ্র-নাথ ও তাঁর শিষ্যদের প্রদর্শনী হয়েছে— তখন প্রতিবারই দেশ-বিদেশের সমালোচক ও পত্র-পত্রিকাকে দেখা গিয়েছে অতি-মাত্রায় প্রশংসামুখর। কিন্তু আধুনিক কোন কোন সমালোচক এখন বলতে চান যে অবনীন্দ্রনাথের কিছু মৌলিক প্রতিভা ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-রীতির পুনরুজ্জীবন করেছেন মাত্র। একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

অবনীন্দ্রনাথের জাতীয় ঐতিহ্যে আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল অবিচল। তিনি দেশের চিরাগত প্রথার মূল আদর্শ রেখেই নতুন নতুন সৃষ্টিতে হয়েছিলেন নিমগ্ন। তিনি পুরাতনের দাবি মানেননি কখনও। দেশ-বিদেশ, একাল-সেকাল, সকলের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, আবার বর্জনীয়কে করেছেন বর্জন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিসম্ভার স্বকীয়তার পূর্ণ রূপ-প্রতীক। তাঁর প্রবর্তিত চিত্রশৈলী অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রখর দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। তাকে যদি বিশেষ কোন আখ্যা দিতে হয়, তবে তা হচ্ছে 'অবনীন্দ্র-রীতি।'

এই রীতির প্রবর্তন করে তিনি আধুনিক ভারত-কলাকে বিশ্বের শিল্প-দরবারে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি কিছু চাননি। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখনীয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন,—

"আমি কিছু চাই না, জীবনে চাইনি কিছু। কিন্তু এই একটা জোর যে শিল্প-জগতে যুগ পরিবর্তন করেছি, দেশের সব দৃষ্টি বদলে দিয়েছি। সমস্ত দেশ যখন নিরুপায় ছিল, এই অবস্থায় তার হাওয়া বদলে দিয়েছি।"

সেই দৃষ্টি ও হাওয়া বদলের কথা স্মরণ করে আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভ দিনে তাঁকে প্রণাম করে জানাতে ও বুঝতে হবে। আর তাতেই এই পুণ্যলগ্নে তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন আন্তরিক-রূপে সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

CENTRAL LIBRARY

কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ বাংলার এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। বাংলার সাংস্কৃতিক নবজন্মে এই মহান পুরুষের দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন; তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কথাই যেন এই কথাগুলির মধ্যে বলা হয়েছে। শিল্প-গুরুর সাহিত্যসাধনার ইতিহাসও সুদীর্ঘ। শিল্পচর্চার সংগে সংগে চলেছে সাহিত্য-রচনা। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্র-নাথের অত কাছে থেকেও সাহিত্য-রচনায় কি করে পিতৃব্যের প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিয়ে শূন্য গগনে সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমকে তিনি অবাধ বিহারের সুযোগ দিয়েছেন। তারপর যে কল্পলোকে বিচরণ করেছেন, তার জন্য স্বহস্তে রচনা করেছেন স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে তারপর—

'বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন বিছিয়ে চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে।'

এই সদাজাগ্রত দৃষ্টি শিল্পগুরুকে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে এক অনন্যসাধারণ শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বপ্ন ধরার জালটি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করতে পেরেছিলেন বলেই রং ও রেখায় অবলীলাক্রমে যা ফুটিয়ে তুলতে পেরে-ছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই অনায়াস-ভঙ্গীই তাঁকে সিদ্ধিদান করেছে।

কি সূত্রে কথাটা উঠেছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন—

'তুমি লেখোনা, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।'

পিতৃব্যের এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্যের কাছে উৎসাহ পেয়ে এক ঝোঁকেই তিনি লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। তারপর রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে তিনি ভালো করেই পড়লেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের ওপর মস্ত বিশ্বাস হল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজ-কাহিনী ইত্যাদি—'

ছোটবেলায় শোনা কাহিনী 'ক্ষীরের পুতুল' অবনীন্দ্রনাথের কলমে যে আকার লাভ করল তার তুলনা নেই। এ এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই কাহিনীর ইংরাজী অনুবাদও উচ্চ প্রশংসিত। দুয়োরানীর দুঃখে কাতর বানরের রাজাকে ধোঁকা দেওয়া। দুয়োরানীর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে শোভাযাত্রা করে বর নিয়ে যাওয়া। বরের পরিবর্তে ক্ষীরের পুতুলকে বর সাজানো, এবং খিদের জ্বালায় ষষ্ঠীঠাকুরানীর সেই ক্ষীরের পুতুল ভক্ষণ এবং ধরা পড়া আর তারপর বানরকে দিলেন দিব্য চক্ষু আর সেই চোখে বানর ষষ্ঠীতলায় ছেলের রাজ্য দেখতে পেল—

'সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য—সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলা-ধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালার গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে শরবন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান; গাছে গাছে ঝোলঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, বনে বনে মশার ঝাঁক; আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসী-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন—'

মাসী-পিসি বনগাঁবাসী, বনের ধারে ঘর—এই প্রচলিত ছড়াটিকে তিনি এইভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রূপকথা এবং ছড়ার রাজ্যেই যেন তিনি বিচরণ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'র অন্তর্গত 'শিল্প ও ভাষা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

'ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং চোখের তারা ফিরিয়েছে বা হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।'

অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাই ছবির ভাষা আর লেখার ভাষা এক। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন অবনীন্দ্র-নাথ, তাই সে-ভাষা এত রূপময়, এত জীবন্ত।

ক্ষীরের পুতুলের পর 'রাজকাহিনী' প্রকাশিত হয় আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে। ১৩১১ সালের ভারতীতে রাজকাহিনীর চারটি গল্প প্রকাশিত হয়—শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য। এই কাহিনী-গুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারায় গদ্য-রীতি ও সেই সঙ্গে পরিবেশন-ভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এখানেও সেই কাব্য সুষমামণ্ডিত বর্ণনা ভাষার ঝঙ্কার আর সেই সঙ্গে চিত্রের প্রকাশ। শিলাদিত্যের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল দৃষ্টান্ত হিসাবে—

'সুভগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল, সুভগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরে দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রেখা কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলো-ময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে-আলো সে-জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য করা যায় না।'

যদি চোখ বুজিয়ে উপরোক্ত বর্ণনাটুকু কল্পনা করা যায়, তাহলে কি একটি সুন্দর ছবি মনের ভিতর ফুটে ওঠে না। মহা-মুনিবর কাশ্যপের যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির ভাষার সঙ্গে লেখার কাজ এইভাবে এগিয়ে চলল। এই 'রাজকাহিনী' লেখার প্রায় পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হল 'ভূতপতরীর দেশ'। 'ভূত-পতরীর দেশ' অবনীন্দ্রনাথের আর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের অতি-পরিচিত পটভূমিতে রচিত এই অতি-প্রাকৃত কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র পর বাংলা-সাহিত্যে আবার নতুনরূপে আবির্ভূত হল। 'কঙ্কাবতী' অনেক সময় কিঞ্চিৎ 'ভূত' মনে হতে পারে, কিন্তু 'ভূতপতরীর দেশ' কাব্যকল্পনা ও চিত্রময়তার এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম।

'দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।...'

তারপর সেই গোলাটার ভিতরে পাল্কি-শুদ্ধ ঢুকে পড়ার পর আর পালাবার পথ নেই

'একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্ বন্ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে. পেটের ভিতর আমার হাসির ঘোরাগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে।'

ফ্যান্টাসি রচনায় অবনীন্দ্রনাথ একটা নতুন পথের যেমন সন্ধান দিয়েছেন, তেমনই ফ্যানটাসির ভাষাও যে কেমন হওয়া প্রয়োজন তার পথ প্রদর্শন করেছেন।

১৯১৬-তে 'নালক' লিখেছিলেন গৌতম বুদ্ধের জীবনের কাহিনী নিয়ে। এই কাহিনীর মধ্যেও মুখে মুখে গল্প বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গী তিনি প্রকাশ করেছেন। জাতকের কাহিনীও যে এইভাবে পরিবেশন করা সম্ভব তা হয়ত সেদিন কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। 'পথে বিপথে' ভ্রমণকাহিনী-জাতীয় রচনা। পথে বিপথের বর্ণনাভঙ্গীও কাব্যধর্মী এবং চিত্রময়। তিনি প্রত্যুষের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন কয়েকটি মাত্র কথায়—

'একটুখানি আলোর আভাস, নিশীথ বীণার সোনার তারের একটুখানি তীব্র-কম্পন। ঊষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নতুন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো স্তম্ভিত দেখা যাচ্ছে।'

সমস্ত বর্ণনাটি যেন এক অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপের বিবরণ। ১৯১১ খৃঃ 'ভারতী'তে অবনীন্দ্রনাথ ফরাসী ঔপন্যাসিক রোস্তাঁ-র একটি সুপরিচিত কাহিনী অনুসরণে লিখলেন 'আলোর ফুলকি'।

অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সেই সময় অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, এবং 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথও একজন হলেন। শুনেছি তিনিও ছবি, রচনা এবং উপদেশ দিয়ে 'ভারতী'কে সাহায্য করতেন। যতদূর মনে পড়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত বারোয়ারী উপন্যাসের একটি অংশ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা সে-যুগে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মনে হয়, জামাতা মণিলালের তাগিদে অবনীন্দ্রনাথ 'আলোর ফুলকি' রচনায় হাত দেন। 'আলোর ফুলকি'র মূল কাঠামো ফরাসী হলেও এডাপটেশনে অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে তা যেন এক মৌলিক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমনটি ঘটেছে 'খাতাঞ্চির খাতা' (পিটার প্যানের অনুসরণে) বা বুড়ো-আংলার বেলায়। বুড়ো আংলা সেলমা ল্যাগারলফের একটি কাহিনীর ছায়া।

বাংলা সাহিত্যের অনেক সমালোচক এই গ্রন্থগুলিকে মৌলিক ধরে নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ যে-আশ্চর্য ভাষা ও কল্পনার প্রকাশ করেছেন, তা তুলনা-রহিত। এখানেও সেই কাব্যসুষমামণ্ডিত চিত্রময় বর্ণনাবৈচিত্র্য। 'পথে বিপথে' যে প্রত্যুষের বর্ণনা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সঙ্গে 'আলোর ফুলকি'র এই অংশটুকু তুলনীয়—

'দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের ওপর কলগাছের মাথার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের সূর্যের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুঁকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালের সোনালিতার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল। তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন।'

রোস্তাঁর মূল রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, কিন্তু রোস্তাঁ পড়া না থাকলেও অবলীলাক্রমে বলা যায়, এই চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব, তিনি প্লটটুকু নিয়ে আপন মনের মাধুরী বিস্তার করে এমন এক শিল্পকর্ম রচনা করেছেন যা হয়ত মূল রচনাকেও অতিক্রম করে গেছে।

'বুড়ো আংলা'র গল্পটি আমাদের ছোট বয়সে 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানেও বলা কর্তব্য যে 'মৌচাক' 'ভারতী' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদেরই আর এক বিচরণ ক্ষেত্র। সেলমা ল্যাগেরলফের গল্প থেকে বেরিয়ে এল ছেলে ওরফে রিদয়, গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন নিয়ে চলেছে—কৈলাস যাত্রায় পথে বুড়ো আংলার 'চৈৎ-সোনাতা ঘুম' ইত্যাদির ব্যবহার—অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারা। এছাড়া ভাষাকে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে একতাল কাদামাটির মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করে তার থেকে এক প্রতিমা বানিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'বুড়ো আংলা' যদি অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হত, তাহলে লুই ক্যারলের 'এলিস ইন দি ওয়ান্ডারল্যান্ডে'র সমগোত্রীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হত। পিটার প্যানের অনুসরণে রচিত 'খাতাঞ্চির খাতা' অবনীন্দ্রনাথের আর এক অপূর্ব সৃষ্টি। গল্প-কথকের ভঙ্গীতে কাহিনীটি বিবৃত।

'বুড়ো আংলা' নামকরণেও বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পের নায়ক রিদয় অতি দুষ্টু ছেলে, গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে খর্ব হয়ে গেল, তারপর গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন জানানোর জন্য তার কৈলাস যাত্রা এবং পরিশেষে পিতার প্রশ্ন—ফিরে কিছু ভাঙিসনি ত?—তার চৈতন্য আনে। যতক্ষণ শেষ অংশটুকুতে না পৌঁছানো যায় ততক্ষণ ঔৎসুক্যের আর সীমা থাকে না। 'বুড়ো আংলা'র একটি আশ্চর্য অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল—

'গ্রামে গ্রামে মটকায় মুশকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। বাঁটিতে-বাঁটিতে চলন্ত পাখিরা ডাকাত পড়ার খবর পাচ্ছে। কোন গ্রাম?' 'তেঁতুলিয়া. সাবেক তেঁতুলিয়া—হাল তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি—খটখটে।' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুনির মাঠ—জলে থৈ থৈ।' 'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট—পুণ্যি ভরা।' 'কোন হাট?' 'উজোর হাট—খড়ের ধুম।' 'কোন নদী?' 'বিষ নদী—ঘোলা জল।' 'কোন নগর?' 'গোপালনগর—গরলা ভরা।' 'কোন আবাদ?' 'নাসীরাবাদ—তামুক ভালো।' 'কোন গঞ্জ?' 'মাধুনগঞ্জ—মাছ মেলা যায়।' 'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার—পলতা মেলে।' 'কোন বন্দর?' 'বাগাবন্দর—হুঁকো কাছুরা।' 'কোন জেলা?' 'হুগলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।' 'কোন বিল?' 'চলন বিল—জল নেই।' 'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।' 'কোন দীঘি?' 'রায় দীঘি—শ্যাওলা ঢাকা।' 'কোন খাল?' 'খালির খাল—কেবল চড়া।' 'কোন ঝিল?' 'হীরাঝিল—তীরে জেলে।' 'কোন পরগনা?' 'পাতলে দ—পাতলা দ।' 'কোন ডিহি?' 'বাজসাই—খাসা ভাই।' 'কোন পুর?' 'পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।' 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।' 'কার কাছারি?' 'নাম বল না, কাটবে দাড়ি।'

পালকী-বেহারার বোলের ছন্দে রচিত এই জাতীয় গ্রন্থেরজমালা একটা অপরূপ ছবি মনে জাগায়। খেয়ালী শিল্পী ওবিন ঠাকুর—ছবি আঁকেন ত' বটেই, তিনি ছবি লেখেন।

'খাতাঞ্চির খাতার' শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থ পিটার প্যানের কথা দিয়ে প্রস্তাবনা করলেও এই কথা তাঁর নিজস্ব—

'সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি খেলেরা হারিয়ে ফেললে মুশকিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজে চাবি নেই; একটা করে পিন আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো একটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায় এমনকি রাতের স্বপ্নের ছবিও এই ছোট্ট খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে—'

ছোটদের মনের গহনে অবনীন্দ্রনাথ ডুব দিয়েছিলেন, তাই শিশুমনের অরূপ রতনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। যে স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহশলা স্বর্ণখণ্ডে রূপান্তরিত হয়, অবনীন্দ্রনাথ সেই স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তিনি রূপকথার যাদুকর।

কথক অবনীন্দ্রনাথ কথকতার এই বিশিষ্ট ধারার অধিকারী ছিলেন বলেই 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' আজ বাংলা-সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। অবশ্য এর জন্য রানী চন্দের কাছেও বাঙালী পাঠকের ঋণের পরিমাণ কম নয়।

খাতাঞ্চির খাতায় অবনীন্দ্রনাথ এই-ভাবে যাদুকরের ভঙ্গীতেই গল্প বলেছেন। —দিনের বেলায় দাদা যেই কাজ নটার ডোপ পড়ে, অমনি ছিলিয়ে দিয়ে বাগান, বাজার,

মাঠ আর পুকুর হয়ে যায়। আকাশের মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রাজ-মহারাজাদের বৈঠকখানা আর জোড়াসাঁকো আর এই তেতলা বাড়ি।' এখন শ্রোতার যদি এইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস না হয়, তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হচ্ছে—

'—বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি। আচ্ছা সন্ধ্যেবেলা পুব দিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও—সাদা ফানুস থাকে না তো? ঠাহরে দেখো ঠিক সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে—আবার সেটা কখনো দেখবে রুপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে।'

এর পর আরো নানা রকম কথা বলা হয়েছে শ্রোতার মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য এবং এমনভাবে বলা হয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাস করতেই হয়।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ভঙ্গীটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনি কথাও বলতেন এই ভঙ্গীতে, এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও এমনই ভাষা ও ভাব প্রকাশ করে লিখতেন। পরিণত বয়সে মুখে মুখে বলে গেছেন, 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তার মধ্যেও এই বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

অবনীন্দ্রনাথ কেন 'শকুন্তলা' লিখলেন এ-কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। তখন তার মাত্র একুশ বছর বয়স। 'ক্ষীরের পুতুল' যখন লিখলেন তখন বাইশ বছর বয়স। শকুন্তলার কাহিনী নির্বাচনে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুখ্যতঃ চিত্রশিল্পী। শিল্পবোধ নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে 'শকুন্তলা' দিয়ে হাতেখড়ি। শিল্পবোধের কাছ থেকে সবুজ নিশানের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি উৎসাহিত হলেন। বলেছেন, 'পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম।' সত্যি 'পটাপট' করে লেখারই বয়স সেটা, নবযৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কোনো কিছু খাপ খায় না। কিন্তু একুশ বছরের লেখকের ভাষার মধ্যে একটা উজ্জ্বল ভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া গেল। অথচ অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। '[illegible]' লিখেছিলেন বলে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ তা কাটতে দিয়েও কাটেননি, তার একমাত্র কারণ যা অনুমান করা যায় তা হল কবি শকুন্তলার সামগ্রিক রচনাভঙ্গীর সঙ্গে '[illegible]' কথাটি [illegible] খাপ খেয়ে গেছে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। তাই বলেছিলেন না থাক।

অবনীন্দ্র ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অনায়াসে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ করতেন আর তা চমৎকার মিল খেয়ে যেত।

'শকুন্তলা' রচনার তিন বছর পরে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথ 'দেবী প্রতিমা' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন ১৩০৫ সালের 'ভারতী'তে তখন ভারতীর সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথের ওপর। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষায় এই কাহিনী লিখিত হয়—যথা :

"পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরী মন্দিরের মহাবিস্তীর্ণ স্তম্ভ শ্রেণী বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে তাঁর উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটি তারকায় উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণ সন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাষাণ-মন্দিরের গভীর অন্ধকারে। পাষাণময়ী লোকেশ্বরী প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণ বিজড়িত রত্নখচিত আরতি প্রদীপের সহস্র শিখা, সহস্র ভক্তের একাগ্র চিত্তের ন্যায় নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিস্পন্দ জ্বলিতেছিল।'

এই ভঙ্গীতে তিনি আর না লিখলেও এই রচনা প্রকাশের দু' বছর পর যখন রাজস্থানের ইতিহাসের কাহিনী লিখলেন, প্রথমে লিখলেন শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, এবং পরে আরো পাঁচটি গল্প লিখলেন হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রানাকুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ। রাজকাহিনীর এই ন'টি গল্প অবনীন্দ্রনাথের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুধু গল্প নির্বাচনে নয়, গল্পের কথন ভঙ্গী এবং বর্ণনা চাতুর্যের মধ্যে কল্পনাকুশলী লেখকের শিল্পীমানসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এছাড়া ১৩০৫ সালে লিখিত 'দেবী প্রতিমা'র ভাষা তার বক্তব্যকে ওপরকার আবরণ ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এই কাহিনী-গুলিতে।

অবনীন্দ্রনাথের 'একে তিন তিনে এক', অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়, তার দু বছর পরে মারুতির পুঁথি, তারও দু বছর পরে চাই বুড়োর পুঁথি এবং '[illegible]' এবং ১৯৬০-তে প্রকাশিত হয় 'হানাবাড়ির কারখানা'। বলা বাহুল্য যে এই সব অপ্রকাশিত রচনাবলী যে কোনো কারণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশে উদ্যোগী হননি বা উদ্যোগী প্রকাশক পাওয়া যায়নি। অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক অপ্রকাশিত যাত্রা পালা প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে সবগুলি হয়ত আজো প্রকাশিত হয়নি।

মারুতির পুঁথি এবং চাইবুড়োর পুঁথি সমগোত্রীয় রচনা। চাইবুড়ো পুঁথি পাঠক। তিনি পুঁথি পাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করে মন্ত্র পড়লেন—

"হুম, গণেশ চিং পটাং
ভজঃ মারুতি চিংপটাং
আকাশে চিংপটাং বাতাসে চিংপটাং
জলে স্থলে কাদা মাটিতে চিংপটাং—।"

তারপর মারুতি বসতি বলে মন্ত্র ও পুরাণ থেকে দুরা-কর্নটি আওড়ালেন—

"যেখানে রাম সেখানে বনবাস—
পাষাণ ধরো তার ছোটো-বড়াই আর ।।
কোথায় সে আমের বিচি—
ডাক নাম অনাহিণ্ডি,

দধীচি বললেন—নামেতে কাজ কি, রাম বোল চাখো না আর।

ক্যাঙারুটির বললেন—"বুঝলে সোঁয়া মা?"

সে ভাষা চোখ আকাশে তুলে গল্প—বলবার কিছু কিছু—হনুমানের আসল নাম মারুতি।

ব্যোচির বাবা কট কট করে বললেন—যদি মারুতিই হবে আসল নাম—তবে কোথা থেকে এলো ল্যাজ-পাটি-সাটি হনুমান?"

চাই বুড়ো বললেন—"কথাটা উঠবে বলেই অতঃ মারুতি পুঁথির গোড়াতে ঐ কথাটি দিলেন। নামের পাঁক দিয়ে তর্ক না করে, রাবণ, মাঠাকরুণ সকল, নাম রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের—সঙ্গে সঙ্গে। শুনু—"বলে চাই বুড়ো বাজখাঁই সুরে গলা ছাড়লেন—"

এমনই অপরূপ লিখন ভঙ্গী যে সমগ্র রচনাটি উদ্ধৃত করার লোভ হয়। রচনার অদ্ভুত কার্য এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন কথকতার ভঙ্গীতে বর্ণিত কাহিনী ফেলে আসা এক স্মরণীয় অতীতকে মনে আনে।

চাই বুড়োর পুঁথির সুরু এইভাবে—

"আষাঢ়স্যে বেলায়, শাম্বর তেল কালি আর লঙ্কার ধুনো দিয়ে দোয়াত শোধন করে, তবে চাইবুড়ো গোড়ালঙ্কার পুঁথি পাঠ সুরু করলেন, হনুমানের বক্তব্য দিয়ে।"

তারপর সেই বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, সবাই লঙ্কা ভিতেতে মাথা করলেন হেঁট—। ইত্যাদি। এই কাহিনীর মধ্যে বিচরণ করছেন রাক্ষস-রাক্ষসীরা, কারণ এটা গোড়ালঙ্কার পুঁথি।

অবনীন্দ্রনাথের 'হানাবাড়ির কারখানা' অন্য জাতের রচনা। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন— অবাক্ত বেলায় রোদ পড়ো-পড়ো। বেড়াল-বৌ হুঁকোয় মনের কথা আমড়ার পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সোনাতন চিক সরাচ্ছে, এমন সময় "ওরে সনাতন শীমনাথ খাঁ [illegible]!" বলে হাঁক দিতেই সোনাতন খাতাটি বগলে করে ঢুকে বললে 'কর্তা ডাকছেন?'

"আরে তোরে ডাকবো কেন? হঠাৎ স্বপ্নে বাড়ির স্বপন দেখে জেগে উঠেছি।

সোনাতন একথা শুনে বসে ভাবে যে কর্তা ঘুমোতে পাই লোকে বলে থাকে—অথচ [illegible] শব্দে বাঁশির। তার মনে কর্তা কেন ঘুমিয়ে?

তখন কর্তা ফ্যানাক্লেন—সে তুমি বুঝবে না, সেটা শ্বশুর বাড়ি নয়, আমার শ্বশুর বা তাতো নয়—একটা হানাবাড়ি।"

তারপর রামপাখির মালসাভোগ চড়িয়ে দেন। জীবন গোসাই, জগদ্রাম মুন্সী, টোলারাম চন্দ্র আর যাগণি সবাই মিলে এক একটা কারখানা বানালেন—আর ইস্তার নষ্টো করে মালসা পোড়াতে-পোড়াতে দিন ছোট, রাত বড় হতে উঠল। তখন মালসা এবং রামপাখীরও দর এত চড়ে গেল যে, তখন তার বৈঠক বসানো অসম্ভব হয়ে পড়ল তখনই খতম হল হানাবাড়ির কারখানা।

হানাবাড়ির কারখানার মধ্যে যে ছড়াগুলি আছে সেগুলিও অপূর্ব।

'বং বেরং' ও 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থ দুটি দুরবো রচনার সংকলন। তার মধ্যে আছে ছড়া আর মজাদার গল্প। উদ্ভট মিশ্রিত এক অদ্ভুত রস সৃষ্টি। এই ধরনের রচনাও অবনীন্দ্রনাথ ১৯২০-২১-এ লিখতে সুরু করেন।

অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা আজো যেমন প্রকাশিত হয়নি, তেমনই কথা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে আজো আমরা আবিষ্কার করিনি। তাঁর রচনাবলী শুধু শিশু পাঠ্য নয়, সকল বয়সের সর্বজন পাঠ্য।

আমরা কালজয়ী কথাটি ইদানীং সব ব্যাপারেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকৃতই কালজয়ী। তিনি যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন, সে পথে নতুন পথিকের আজো যাত্রা সুরু হয়নি।

গদ্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) চিত্রশিল্পে উজ্জ্বল তারা। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছায়ায় গদ্যলেখক অবনীন্দ্রনাথের কীর্তি কিছুটা আবৃত।

একথা অনস্বীকার্য, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য সাধনায় অবনীন্দ্রনাথ যে কীর্তি রেখে গেছেন, গদ্যরীতি ও বাক্-রীতি নিয়ে যে বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন, এবং চিত্রশিল্পীর স্বভাব নিয়ে গদ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য, কবিত্বগুণ ও চিত্রধর্মিতা আরোপ করে যে অপূর্ব ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন, তা আপন মহিমায় বর্তমান। ভারতী-কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠীর লেখকদের উপর অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ন্যারেশনের আদর্শ ভাষা (রাজকাহিনীর ভাষা) সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে স্বীকার্য, অবনীন্দ্রনাথ এমন একজন গদ্যশিল্পী যিনি নিজের সৃষ্ট ভাষারীতিও বারবার অতিক্রম করে গেছেন।

১৮৯৫ থেকে ১৯৫১—অবনীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ২৭টি বই, মৃত্যুর পর আরো ৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শকুন্তলা (১৮৯৫) ও ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (১৯০৯।১৯৩১), ভূতপতরীর দেশ (১৯১৫) ও খাজাঞ্চির খাতা (১৯২১), আলোর ফুলকি (১৯১৯) ও বুড়ো আংলা (১৯৪১); নালক (১৯১৬) ও পথে-বিপথে (১৯১৯); বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯২১-২৯); ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪); ও আপন কথা (১৯৪৬); মারুতির পুঁথি (১৯৫৬) ও চাঁই বুড়োর পুঁথি (১৯৫৮); একে তিন তিনে এক (১৯৫৪) ও রং-বেরং (১৯৫৮); লম্বকর্ণ পালা (১৯৬৯): অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার বিচিত্র উদাহরণ।

অবনীন্দ্র-গদ্যের দুটি প্রধান গুণ—চিত্রধর্মিতা ও আলাপচারিতা। এ দুটি গুণ তিনি প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেছিলেন, এ কথা আমাদের মেনে নিতে হয়। অথচ, গোড়া থেকেই তিনি পরিণত শিল্পী।

ধীরা দেবী। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় শকুন্তলায় (১৮৯৫), যা বালা-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত। সে কাহিনী তিনি নিজেই লিখেছেন :

'একদিন আমায় উনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম—বাপ্‌রে, লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পুষ্করের জল', ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে।'

(জোড়াসাঁকোর ধারে)

এই বিবরণের মধ্যেই অবনীন্দ্র-গদ্যের শিল্পরহস্য নিহিত। যখন 'শকুন্তলা' লেখেন তখন আঁকছেন রাধা-কৃষ্ণ চিত্রাবলী। ভারতীয় চিত্রকলার রীতি-পদ্ধতি তখন তাঁর আয়ত্তে। ছাদ বেঁধার—শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি অবনীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল। অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হোলো রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্র-ভাষা বিচারে আমাদের মুখ্য অবলম্বন এই সংজ্ঞার্থ—শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে রচিত বাক্য হল 'উচ্চারিত ছবি'। মুখের ভাষা ও ছবির ভাষার অদ্বৈতবোধের কথা অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে। যাও শব্দবোধা বক্তে আলোর ছবি আবর্ণিকাকে উক্তি : 'ওকিন ঠাকুর, ছবি লেখ।' আমাদের মনে রাখতে হয়, অবনীন্দ্রনাথ আগে চিত্ররচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, তারপরে ভাষারচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। চিত্রের পথ ধরেই তিনি ভাষারাজ্যে এসেছেন। এই ঘটনার প্রভাব অবনীন্দ্র-গদ্যে প্রকট। অবনীন্দ্রগদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা—রেখার সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র বাহার, রং ও রেখার নিখুঁত আলিম্পন এখানে স্পষ্ট। আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের দেওয়া আতসী কাচ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বকের পালকে কত সূক্ষ্ম কারুকার্য, তাঁর গদ্যভাষায় আমরা দেখি কত সূক্ষ্ম কাজ, কত রঙের সমাবেশ। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। তার আগেই বেরিয়েছে 'শকুন্তলা' আর 'ক্ষীরের পুতুল'। এ দুটিতে ভাষাচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋজুতা ও সরলতা। তখন তিনি রাধাকৃষ্ণ চিত্রাবলী আঁকছেন। তখনকার ভাষাচিত্রের বন্দনা সরলের ও সরল সুষ্ঠুতার বন্দনা।

'ঘোর গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া খেয়ে শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল দুলিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁক্‌কার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সমস্ত বন কেঁপে উঠল।' (শকুন্তলা)

ছোট ছোট সরল বাক্য একটি দীর্ঘ বাক্যের বিধৃত। বিশেষণের অনুপস্থিতি, ক্রিয়াপদের সরলতা, বর্ণনার ঋজুতা এখানে লক্ষণীয়। মনে হয় তুলির টানে আঁকা, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট, প্রতিটি টান অব্যর্থ আর সমস্ত ছবিটা জীবন্ত।

এরপরই তিনি মুঘল চিত্রকলার ডীটেল ও ফিনিশের কাজ সম্পর্কে অবহিত হলেন (১৮৯৭)। তখন ভাষা হয়ে উঠল চিত্রধর্মী ন্যারেশনে এলো ছবির গতি ও ভঙ্গি। বের হল 'রাজকাহিনী'। ভাষায় এলো লাবণ্য, সৌকুমার্য; ইতিহাসের বস্তুতে সঞ্চারিত হল রূপকথার মায়া।

'বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার শিকলি খুলে নিলেন তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে দুখানা কালো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শিকারীর মাঝে এসে পড়ল।' (পদ্মিনী। রাজকাহিনী)

আজ থেকে সাতষট্টি বছর আগে ভারতী পত্রিকায় ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় এই কাহিনী প্রকাশিত হয়। আজও তা আধুনিক। কী ভাবে নিরাভরণ ঋজু বর্ণনা ও বিবরণের মধ্য দিয়ে চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, তা এখানে লক্ষণীয়। ধ্বনি ও ছন্দ অবলম্বন করে অবনীন্দ্রনাথ এখানে চিত্রময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

অবনীন্দ্র-গদ্যের দ্বিতীয় প্রধান গুণ—আলাপধর্মিতা। এই গুণ গোড়া থেকে অবনীন্দ্র-রচনায় অনুস্যূত। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দুজনের প্রভাব অস্বীকার করে অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে, কথ্যশব্দ সম্ভারকে শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। সাধু ও চলতি ভাষার কৃত্রিম বাধা উত্তরণে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃতিত্বের অংশীদার। সে-গুণ শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী বা বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে নয়, নালকে ও পথে-বিপথে গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত। পথে-বিপথের ভাষায় ভিত রাজকাহিনীর ভাষা আর পথে-বিপথের ভাষা পরবর্তী স্মৃতিচারণ গ্রন্থের (ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা) ভাষার ভিত্তি। ন্যারেশনের ভাষাকে অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণার ভাষারূপে ব্যবহার করলেন। এখানে আলাপধর্মিতাগুণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রাজকাহিনীর ন্যারেশনের ভাষায় যেসব শিল্পসম্ভাবনা নোতুন করে পরীক্ষিত ও শিল্পসাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হল পথে-বিপথে, যা আসলে স্মৃতিচিত্র ভ্রমণগ্রন্থ নয়। অন্তরঙ্গ মাধুর্যময় হার্দ্য ভাষারূপে পথে-বিপথে-র ভাষার প্রতিষ্ঠা।

তথাকথিত সাধু গদ্য ও চলতি গদ্যের বিরোধ বা সমস্যাকে গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কীভাবে নিষ্পন্ন করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাই পথে-বিপথে গ্রন্থে। একথা সত্য, অবনীন্দ্রনাথ সাধুক্রিয়াপদিক ভাষা মাত্র দুবার—'দেবীপ্রতিমা' গল্পে, ভারতী শ্রাবণ, ১৩০৫, আর পথে-বিপথে-র 'সিন্ধুতীরে' অধ্যায়ে কোনার্ক-মন্দির-বর্ণনায়—ব্যবহার করেছেন। আসলে সাধুক্রিয়াপদিক গদ্যে অবনীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। এবং ক্রিয়াপদের তথাকথিত সাধুরূপের মোহে অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি।

পথে-বিপথে গ্রন্থের ভাষাচিত্রে—রাত্রিশেষে পূর্ব আকাশে আলোর প্রথম কাঁপনের চিত্রে—অবনীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদের সমস্যাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন :

'একটুখানি আলোর আভাস, নিশীথবীণার সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।' (গিরিশিখরে, 'পথে-বিপথে')

ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব বিলুপ্তি, তৎসম শব্দ নির্ভরশীলতা, তদ্ভব শব্দ ও ইডিয়মের নিপুণ ব্যবহার এখানে পাই। সেই সঙ্গে পাই চিত্রভাষা ও ধ্বনিভাষার সমীকরণ।

পথে বিপথের আগেই প্রকাশিত হয় নালক। গোড়াকার সহজ সরল গদ্য, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রধর্মিতা ও আলাপধর্মিতা। নেই দীর্ঘায়িত বাক্যের জটিলতা ও ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্যের পল্লবিত বিস্তার, যা আছে ভূতপত্রীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতায়। আছে ছবির মতো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষাচিত্র।—

'সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। কেবল দূর গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দিমার'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দিমার'। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন

নেবো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বললেন—'ওরে নোয়া কয়, নোয়া কয়।'

সমস্ত দিবসটি শিল্পিত গদ্যে পবিত্র ঘন্টাধ্বনির মতো বেজে উঠেছে।

ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার রাজ্য দুখানি বই 'ভূতপত্রীর দেশ' ও 'খাতাঞ্চির খাতা'। এ দুয়ের গদ্যও ফ্যান্টাসির গদ্য—যার সৃষ্টি অতি দুরূহ কর্ম। অবনীন্দ্র-গদ্যের সারল্য ও চিত্রধর্মিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বপ্নের মতো আজগুবি ছবি-আঁকার ভাষা। চেনাশোনার বাইরে তার বিচরণ বাধা, অসংলগ্নতা আর অসম্ভবের রাজ্যে তার অভিযান। এই ফ্যান্টাসি-ভাষার মূল উপাদান দীর্ঘায়িত বাক্য—প্রসারিত অন্তর্বাক্য (প্যারেনথিসিস)। এর সাহায্যে তিনি গড়ে তুলেছেন অসংলগ্ন ছায়াছবির মতো দ্রুতচলমান ভাবচিত্রের মিছিল। ছবি ও সংকেতের আলো-আঁধারিত ভাষা হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়।

'দেখছি আলোটা দুলে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।......

গেছি, পাকিসমেত গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে পাখির মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্‌বন্‌ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়া-গুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে। কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে।' (ভূতপত্রীর দেশ)

অতিকল্পনার উপযোগী বাহন এই গদ্যভাষা—তার গতি দীর্ঘায়িত বাক্যের পথে, অন্তর্বাক্যের অসংলগ্ন ছায়াছবির পথে।

অবনীন্দ্র-গদ্যের আরেক নিদর্শন 'আলোর ফুলকি'। এতে পাই শকুন্তলা-ক্ষীরের পুতুলের সহজ কবিত্ব, রাজকাহিনীর ন্যারেশনের শব্দচিত্রময় ঋজুতা, পথে-বিপথে ও নালকের রূপ-চিত্রময় বর্ণনামাধুর্য। এর ভিত্তি ছড়ার সরল সৌন্দর্য কিন্তু তা নিরাভরণ নয়, পরন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্যসমন্বিত, নিরুদ্ধ-আবেগ ও লাবণ্যমণ্ডিত, কখনো বা নির্ভার লালিত্য। আলোর ফুলকিতে ধ্বনি হল বাহন, শব্দের ভূমিকা ধ্বনির অনুগত হয়ে, তাকে ছাড়িয়ে নয়।

'পায়রা' বেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'থেকো না, থেকো না, থেকো না, থেকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ্‌ করে এসে ঝুঁকড়ো নামলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে-পলকে রামধনুকের রং ধরে ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অ-লু-প ফু-উ-ল। আলোর ফুল'। আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় পাতায় ফলে ঝিক্‌মিক্‌। আকাশে ঝিক্‌মিক্‌—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে থাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো দিয়ে থাক্‌ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক রঙের এক রং। ......ফুলের জবার সোনার শিখা, সবুজ ঘাসে সোনার ঝুমকি, আলোর ফুলকি, অ-লু-উ-ল অমূল আলো।' (আলোর ফুলকি)

শব্দচিত্র ও ধ্বনিচিত্রের সমীকরণে, শব্দ-ভাষা ও ধ্বনিভাষার সমীকৃত শিল্পসৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথের সামর্থ্য এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

চিত্রময় ধ্বনিময় স্পন্দময় ভাষা অবনীন্দ্র-গদ্যের ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ন্যারেশনের আদর্শ রাজকাহিনীর ভাষা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রগুণ। নালক আর পথে-বিপথে এই ভাষারই সহজ অন্তরঙ্গ রূপ। এই পথ ধরেই এসেছে বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা—ঘরোয়া জোড়াসাঁকোর ধারে-আপন কথা। এর ভাষা অন্তরঙ্গ, মাধুর্যময়, আলাপচারী। সদ্য অতীত কালের বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ সঞ্চার করে দিয়েছেন স্বপ্নের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য, আর রূপকথার বস্তুভারহীন লাবণ্য। ঘরোয়া-তে রাজেন মল্লিকের প্রাসাদের বর্ণনা আর জোড়াসাঁকোর ধারেতে সুরধুনী গঙ্গার বর্ণনা এর পরিচায়ক। যা ভোলা যায় না, ভোলবার নয়।

অবনীন্দ্র-গদ্যের শেষ অধ্যায় কথকতা-ভঙ্গির গদ্য। এখানে তিনি গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে প্রয়াসী। একে তিন তিনে এক, মারুতির পুঁথি, চাঁইবুড়োর পুঁথি, বং-বেরং, লম্বকর্ণ পালা—প্রভৃতি যাত্রাপালা এর অন্তর্ভুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় মিশেছিলেন সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে—দাস-দাসী, দারোয়ান কোচোয়ান, হরিয়াল বেহারা, খানসামা বাবুর্চি, খাজাঞ্চী মামা, খাতাঞ্চি সাহেব, বহুরূপী কথকঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির উচ্চ কোটির জীবনযাত্রা থেকে যাত্রাপালার প্রেরণা আসে নি, এসেছিল লোকজীবন থেকে। এইসব যাত্রাপালার শৈলী কথকতাশৈলী। এই কথকতায় অবনীন্দ্রনাথ সহজাত আবেগ কল্পনাশক্তি [illegible] [illegible] [illegible] পরবার, [illegible] সুরে সুরে অবনীন্দ্রনাথের কথকতার শৈলী আয়ত্ত করেছিলেন। গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্র-নাথের সকল কৌশল যেন হল কথকতাতে, সৃষ্টি হল যাত্রাপালা। ভঙ্গিমা ও বাচিক অভিনয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্য, চিত্রশিল্প-নৈপুণ্য, ছবিতে ভাব দেখাবার সামর্থ্য—সব মিলিয়ে এই চারণরীতি।

কথকঠাকুরের পাঠে কলারসলক্ষণটির যে তাতে পাঠের সঙ্গে থাকে ছড়া, আবৃত্তি, কথোপকথন, নাচাড়ি বা পয়ার ছন্দের গান। সেই সঙ্গে যুক্ত আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়—অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠমুদ্রা, ধ্বনিক নকল ও মুখ-মণ্ডল-পেশীর চালনা, কণ্ঠস্বরমণ্ডিত ধ্বনি ও স্বরক্ষেপ। তার ফলে গড়ে ওঠে কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতা। অবনীন্দ্রনাথের কথ-কতাশিল্প যাত্রাপালায় কথকতার এইসব গুণ বর্তমান।

এর উপাদান প্রাকৃত ভাষা উপভাষা, দেশী বিদেশী শব্দ, কৌতুক ও ব্যঙ্গ।

'তার কোপে চাঁইবুড়ো যেন শুঁড়ির বে, এখন চাক লেপিয়ে আকাশে চক্ষু বুজে বসলেন—ঐ তিনি এসে গেলেন—

মারুতির পুঁথির পাঠ হইবে যে স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে।'

সবাই আকাশের পানে চায়—মাথার পরে চাঁদোয়া আপ দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—নড়ে না দোলে না। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন—যদি বা তিনি এসে থাকেন তো সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রশংসা শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাশ্য হতে পারেন না। অতএব বিলম্বনালম—'

(মারুতির পুঁথি)

গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে অবনীন্দ্র-নাথের প্রয়াস গোড়া থেকেই আছে। শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, ভূতপত্রীর দেশ, নালক, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, জোড়াসাঁকোর ধারে, খাতা, চাঁইবুড়োর পুঁথি, মারুতির পুঁথি, একে তিন তিনে এক—সর্বত্রই তার নিদর্শন মিলে। শেষ পর্যায়ে তা প্রকট। রূপকথা, উপকথা, খোশগল্প, ছড়া, কথকতা, যাত্রাপালা—সর্বত্রই অবনীন্দ্র-নাথ এই পরীক্ষা করেছেন। তার সামান্য নিদর্শন উদ্ধার করে গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্র-নাথের বিচিত্র গদ্য সাধনার সংক্ষিপ্ত আলো-চনার ছেদ টানি—

এস কাঁড় বিড়িবাড়ি।
হাঁড়ি পেটে নাও চাঁড়ি!—হরি বাক!।
সেই পথে প্রাণপাখি। ব'য়ারে যাক।
—তিড়িবিড়ি।
কটু তুষ্টক তাক সাক।।
ঢুকে যাক-নাকলাক।।—আঁকি ছাব।
মস্ত কিড়িমিড়ি।
আমরা একান্ত পড়ে থাকি।
উড়ে উঠে যাক প্রাণপাখি।
—বেঙ্গল আর ইন্ডিয়া।
মনে চিবোচ্ছ কাঁচাপাকা তিন্তিড়ী।।

(মারুতির পুঁথি)

বাংলা গদ্যছন্দে অবনীন্দ্রনাথ

সনৎকুমার গুপ্ত

বাংলা গদ্যছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় স্বয়ং যা বলেছেন ঃ

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকার' অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।'

রঙ-তুলিকে বিশ্রাম দিয়ে, শুধু কালির আঁচড়ে অবনীন্দ্রনাথ যে লেখাগুলি প্রকাশ করেছিলেন, এই রচনাসম্ভারের মধ্যে গদ্যছন্দের কারুকীর্তি রচনা সাদরে আলোচনার অবকাশ দিয়েছে।

বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতবাদ কি ছিল, তা কবি সাহিত্যী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভ্যুদয়' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান রচনাটি এযাবৎ কোনো গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত হয় নি। এমন কি তাঁর কোনো গ্রন্থ সংগ্রহেও প্রকাশিত হয় নি। এটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়। লেখা হয় দৌহিত্রদ্বয় মোহনলাল ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। ভবিষ্যতে অবনীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে স্থান পেতে পারে, এ জন্য রচনাটি যথাযথ মুদ্রিত হলো ঃ

ভাই—মো—শো—

তোমরা বাংলাতে ছেলেদের গল্পলেখায় এ আমলে নাম কিনেছ। সেই জন্যেই তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে ঃ বলি—বিদ্যাসাগর তাঁর 'কথামালা' গদ্যতে লিখেছিলেন না পদ্যতে না গদ্যছন্দতে—এটি তো তোমাদের ঠিক করে দিতে হয়। আমি তো দেখছি ছেলেবেলায় কথামালাকে গদ্য বলেই পড়ে গেছি কিন্তু এখন দেখি ওটা পুরো গদ্যছন্দে লেখা কিন্তু গল্পের আর্ট প্রয়োগ করে গেলেন ওটার ওপরে কথামালা-রচয়িতা। দু-একটা গল্প সামান্য কলম চালিয়ে প্রায় কথামালার মূলটা ছন্দে বজায় রেখে গদ্য-ছন্দের স্বরূপটা প্রকাশ করে দিলেম, এখন তোমরা কি বল এ সম্বন্ধে।

(এক)
"মধুর কলসী"

এক দোকানে মধুর কলসী
উলটিয়া পড়িয়া
চারিদিকে মধু ছড়াইয়া দিল।
মধুর গন্ধ পাইয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া
সেই মধু খাইতে লাগিল
নড়িল না!—
যতক্ষণ পড়িয়া রহিল
এক ফোঁটা মধু।...

আবার বলি আর একটা গল্প, সেটাও গদ্য-ছন্দে লেখা।

(দুই)
"কুকুর ও প্রতিবিম্ব"

মাংসের এক খণ্ড মুখে এক কুকুর
নদী পার হইতেছিল।
নির্মল জলে প্রতিবিম্ব তাহার পড়িয়াছিল,
অন্য কুকুর।

মনে মনে লোভে পড়িয়া
প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর

স্থির করিয়া
ধরিতে গেল কুকুর মুখ বিস্তৃত করিয়া
অলীক মাংসখণ্ড

তখনি আপনার মুখের আহার সত্যকার
জলে পড়িয়া স্রোতে পড়িয়া
পর পার চলিয়া গেল বহুদূরে।

(তিন)
"সর্প ও কৃষক"

শীতকালে, অতি প্রত্যুষে, কৃষক সে
ক্ষেত্র যাইতে, দেখিতে পাইল—
পথের ধারে হিমে মৃতপ্রায় একটি সর্প।
তখন সে ঐ সর্পকে উঠাইয়া
বাটিতে আনিয়া
আগুনে সেঁকিয়া
সজীব করিল।

•

এইরূপে সর্প
সজীব হইয়া
উঠিয়া কৃষকের সন্তানকে
সম্মুখে পাইয়া
দংশন করিতে উদ্যত হইল।

*

কুপিত কৃষকের
হস্তস্থিত কুঠারের
প্রহারের আঘাতে
সর্পের মস্তক—
দ্বিখণ্ডিত হইল।

এখন কথা হচ্ছে, 'শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুরকে বঙ্গভাষার আদি কবি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' একটা হয় ঠিক গদ্য, এর মধ্যে ছন্দ ধরানো শক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মালা এ জিনিস নয়। এই ভাবের গদ্যের দিক দিয়েও যায় নি কেন না বিদ্যাসাগর শিশুদের জন্য লিখতে চেয়েছিলেন কাজেই ছন্দের সাহায্য নিতেই হয়েছিল তাঁকে। না হলে কথামালা মালা না হয়ে হত শিশু-পাঠ্য একখানা শক্ত বই কি না সেইটে তোমরা বিচার করে বল। সাহিত্যিকদের কাছে গদ্য-ছন্দ লিখে প্রথম তাড়া খেয়েছি আমি, কাজেই আমার ঢের পূর্বে যে পথ মহাজন দেখিয়ে গেলেন এটা জানতে পেরে আমার সাহস বাড়লো এবং দুঃখ কমলো। কেননা তোমরা দুজন অন্তত খুশি হবে আর কেউ হোক বা নাই হোক কিছু আসে যায় না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনক রাজার ধানক্ষেত

মহাশ্বেতা দেবী

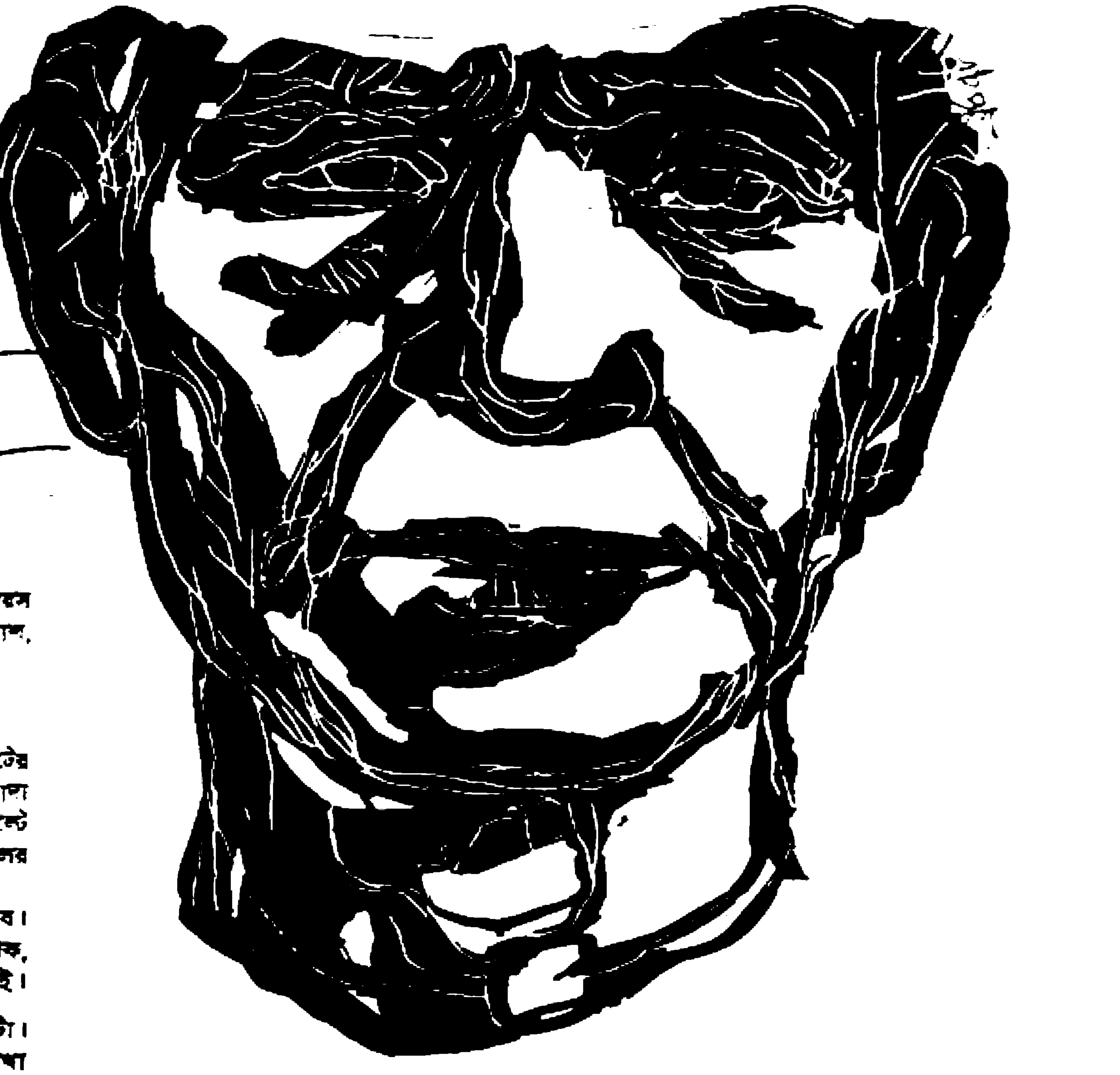

লোকটাকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশ হবে কিন্তু ও বললে নয় জনক দাস, বয়স তিন কুড়ি দশ।

সত্যি?

আজ্ঞা।

লোকটার বুক সিন্দুকের কপাটের মত, কালো, চওড়া, তাতে সাদা সাদা লোম। কপালের চুল পেছন পানে উল্টে ফেলা। কাঁচা পাকা। গলায় একটা পেতলের তক্তি। কোমরে ধুতি, কাঁধে গামছা।

চারদিকে মানুষ, অগণিত মানুষ। ছেলে মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি, জোয়ান, বালক, কাছারির মাঠে পা ফেলবার জায়গা নেই।

মাঠের ওপাশে চালা কয়েকটা। কলেরা রোগীদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স কদিন ধরে চালা থেকে মানুষ তোলে আর হাসপাতালে, হেলথ সেন্টারে নেয়।

কান্না, হট্টগোল, বাসের হর্ন। মানুষ বাসে উঠছে, ক্যাম্পে যাচ্ছে, বাসে উঠছে, ক্যাম্পে যাচ্ছে।

বাবা তখন ওরা পোয়ালে আগুন দিল, নিরাপদদের ঘরে এনে শুওর খোঁচা করে মারল। তখন পাইলে বাঁচতি আর হেথা এসে ওলায় মরলি বাবা!

মায়ের কান্না। এখন কাছারির মাঠে মা রা অমন কাঁদে। বলে আর এট্টু মুখখানা দেখাও বাবা, দে কেওনা।

তাঁবুর সামনে লাইন, টিকে দেওয়া হচ্ছে। তাঁবুর সামনে লাইন, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

জনক এই সব কিছুর দিকে আশ্চর্য নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়েছিল। যেন এই জনস্রোত জলস্রোত। মধুমতীর স্রোত। এ পারে এসে সমুদ্রে পড়েছে। জনক যেন জাহাজের মালিম। বসে বসে দূরে আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করছে। যেন ও জাহাজের পাহেরী। সমুদ্রের সবচেয়ে দূরের দিক সীমারেখার দিকে চেয়ে থাকাই ওর কাজ যেন।

জনক কাঠের কাঁকই দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের আকাশে বর্ষার মেঘ কালো, বাতাসে ঠান্ডা। এই মেঘগুলোকে জনক ওর যৌবনকালে বড় চিনত। তখন ওর জমি ছিল না, হাল লাঙল ছিল না। জনক তখন লখীন্দরের নৌকোয় জলে জলে বনে যেত। সুন্দরী গাছ কাটত, গোলপাতা আনত।

জনকের যৌবনে নদীতে জল ছিল, সমুদ্রে মাছ। খেতে ধান হত, সব সময়ে সে ধানে জনক পালা দিতে পারে নি। জনক জানতনা তাতে কোন দুঃখ আছে। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, বিধির নিয়ম। জনক জানত ওরা বিছন তোলে, ধান রোয়, ধান কাটে, ওকরা লাগলে তামাকপাতার জল ছেটায়, হেমন্তে-আঘাণে ধান কাটে আর সে ধানে পালা দেয় বুকের মালিকের উঠোনে। বিধির নিয়ম।

কিন্তু জনকের যৌবনকালে জনক সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আষাঢ়ের আকাশে মেঘ উঠে আসতে দেখেছে। সমুদ্রের জলের চেয়েও গাঢ় কালো মেঘ।

হাতীর মত পালে পালে উঠে ওরা আকাশ ঢেকে ফেলত।

আরো কত দেখেছে জনক। সমুদ্রের তলার কামান গর্জাতে শুনেছে গুম গুম গুম। যশোরের প্রতাপরাজার মাটির রাজ্য কায়া যেন ছেড়ে দিয়েছিল। তাই প্রতাপ-রাজা দিয়ে জলের দেবতার সঙ্গে সমুদ্রের দখল নিয়ে যুদ্ধ করত।

কিন্তু যুদ্ধ বললেই শুধু পবনের কথা মনে পড়ে।

যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ বোঝেন? আজ্ঞা, যুদ্ধ বোঝেন?

তুই বোকা গা বা। যুদ্ধ করত দিল্লী সাহেব গোরা, তখন তোর বাপ সা জোয়ান। এটা বোয়াল মাছের দরাকস যেমন একা খায়। তোরা যুদ্ধ করবি? তোদের কি আছে, বন্দুক আছে? বন্দুক বিনে যুদ্ধ হয়?

আজ্ঞা, যুদ্ধ না করলে ওরা মোদের বাঁচতে দেবে না।

কোথা থেকে যুদ্ধের হাওয়া এসেছিল? নৈঋত থেকে? দক্ষিণ থেকে? ঈশান থেকে? জীবনভরে জনক আর কিছু জানে নি শুধু চাষ জেনেছে। কত কষ্টে জমি নেওয়া, সে জমি হাসিল করা। বৈশাখে মাটি ফাটা ফাটা, জ্যৈষ্ঠের মাটি তেষ্টায় হাঁ করা। বৃষ্টি এসে সেই মাটিতে ঝাঁপ দিত। জনক তখন ওর সযত্নে আগলানো চারাগুলো নিয়ে সেই মাটিতে নেমে পড়ে নি?

আজ্ঞে, আপনি কিছু বোঝেন না, শুধু চাষ বোঝেন।

তুই বোঝ যা যা। কেন, চরণদাসের মেয়েতে মন ওঠে না? বিয়ে করালাম, সোমসার করবো যা পবন! ঐ কতায় কতায় আজ দেখছাটা। কাল মানুষরা, মানুষে গায়ে মেরে মেরে তুই মরতেছিস। যুদ্ধ করহ। যুদ্ধ করে লড়াই গোরা। তুই ভেমো মাধা, তুই যুদ্ধের কি জানিস রে?

আপনিও জান।

কিছু জানি না।

না তে ভোট দেওনি আপনি?

তা হলে যুদ্ধ কবে বলছি?

আপনি জান না।

তুই জান্ বেরে।

অসীম, অশেষ প্রশ্রয়ে জনক হাসত। জনকের মনে হত এসব ছেলেখেলা পবনের। ওর জমি আছে, হাল-লাঙল-বলদ সব আছে। মা বসুন্ধরা নাড়ির বাঁধন কেটে সন্তানকে মাটি ধরায়। তখন ধর মেয়ে সোমসারটা সে মনের জেলাটাকে হাত পেতে ধরে। তখন সোমসারটা মানুষের মা হয়ে যায়। বাঁধনটা বাঁধনে বাঁধে। এই খেত-বিছন - ধান - হাল - লাঙল - বউটা-ছেলেটা সন্ধের উঠোনে ভাতের ম ম গন্ধটা সেইসব বাঁধন। জনক ভাবত চরণদাসের মেয়েটার কোলে কাঁখে ছেলে এলে পবনের মন ধুরে যাবে।

পবনের মন ঘোরে নি। পবন যুদ্ধে গিয়েছিল। গাছ কেটে কেটে পথে ফেলে বাঁশগাড়ি দিয়েছিল। পথে খানাখন্দ কেটে গাছপাতা দিয়ে ঢেকেছিল।

বন্দুক বিনে যুদ্ধ হয় না? আজ্ঞা, আপনি কিছু বোঝ না।

পবনাটা যুদ্ধে গিয়েছিল। জনকের ছেলের ছেলে, বংশের রক্ত পবন। ইস্কুলে অল্প সল্প কি পড়ল না পড়ল, ঠাকুরদা-র ডান হাত হয়েছিল।

ওরা পবনদের গুলি করে নি। গুলিতে খরচ আছে। চাষাভুষো গ্রামের মানুষের হাতে বন্দুক থাকে না, তার পেছনে কেশগুলি খরচ করে?

ওরা পবনদের বুকে পেটে সঙীন ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মানুষের শরীর বড় নরম, স্নেহে আদরে গড়া। সঙীন ঢুকে যেতে পলকের বেশি সময় লাগে না।

সঙীন ঢোকাবার আগে ওরা পবনদের ধরে এনে গাছ তুলিয়েছিল। খানাখন্দ ওদের দিয়ে বুজিয়েছিল।

পবনের কথাগুলো জনকের মনে পড়ে।

আজ্ঞা, আপনি কিছু বোঝ না। মানুষ না মরলি যুদ্ধ হয়?

পবনের বউটা সেই থেকে পাগল পাগল। এখন ও গাছের নিচে বসে ভিজতে ভিজতে বলল,

কোন্ থে এত মানুষ এয়েল গো?

নানা দেশ থনে আসতেছে।

এত মানুষ ওপারে ছিল?

ছিল না?

কি জানি? এখন কি হবে?

জানি না।

জনকের বউ জবাব দিল। ওর বয়স অনেক। পুত্র শোকে, পৌত্র শোকে ও এখন রাক্ষসের মা নিকম্মা হয়ে বসে আছে। দিনেরাতে ওর এখন একটিই কাজ, জনককে গালি দেওয়া। এখন ও জনককে গালি দিতে শুরু করল।

বলি বেবস্থা করলে? যে যেমন পারতেছে, বেবস্থা করতেছে, দেখ না? শুধু হুড়ে নিলে আর খিচুড়ি খেলে হয়ে যাবে?

জনক বলল,

যেখানে সে যাবে, যাব।

তা আর যাবে না! আমার জনমজনমে সোমসার জলে দিয়ে তুমি ভালমানুষ সাজবে না? কিছু নিতে দিল না গো! কুকুর তাড়া করে বললে এখনি চল। গাই গরু দড়ি কেটে ছেড়ে দিয়েছ গো।

ওরা আজ বললে হাটবাজারে যেতে পাবি না, কাল এসে বলবে পুকুরে মড়া ফেলে গেল, বলল না এ আমাদের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরোতে পাবা না?

নয় ঘরে পড়ে রইতাম।

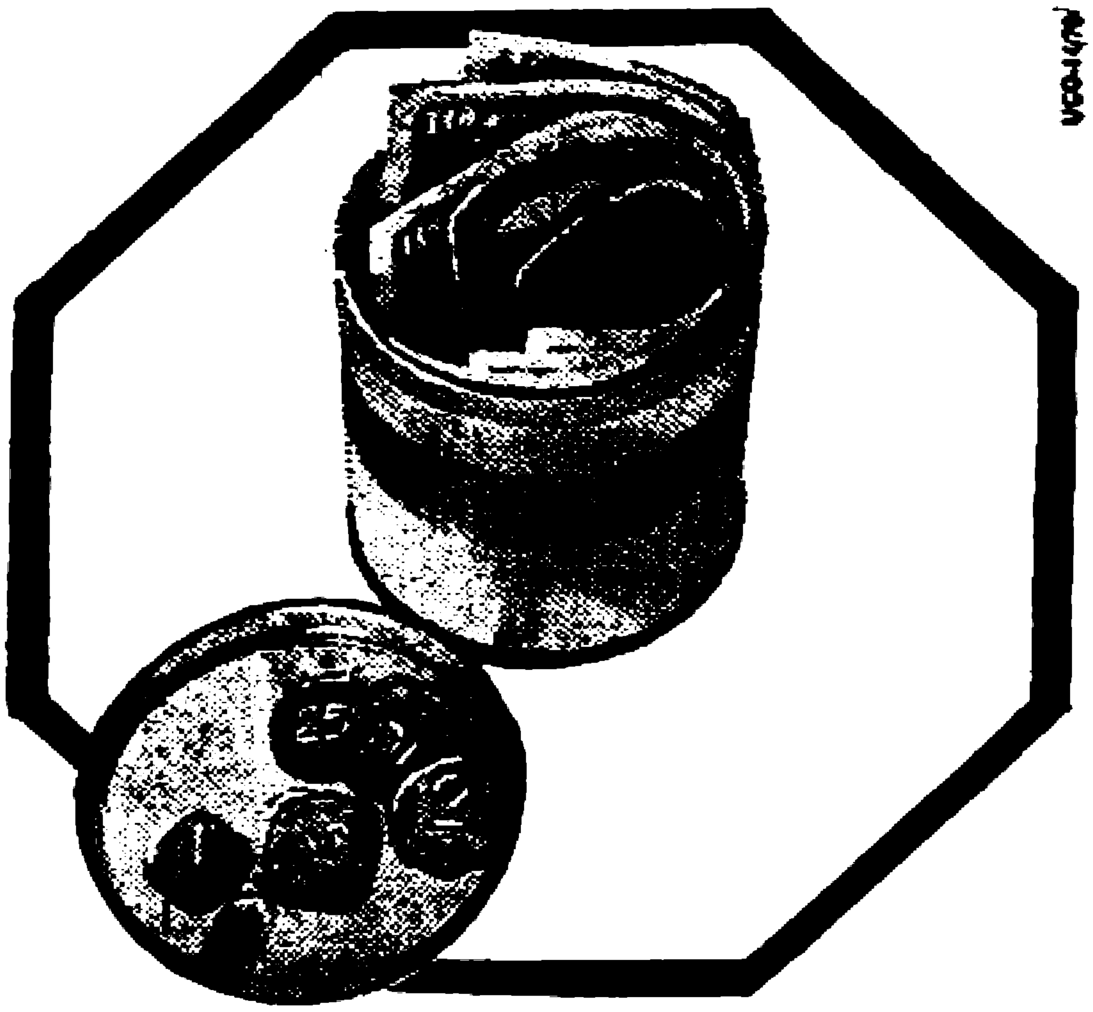

বাড়িতেই টাকা জমিয়ে রাখবেন কেন? তার চাইতে ইউকোব্যাঙ্কে আপনার টাকাকড়ি জমা রাখা ঢের বেশী নিরাপদ ও লাভজনক

ইউকোব্যাঙ্কে একটি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে আপনার টাকা জমা রাখলে তা যেমন সুদে বাড়বে তেমনি দেশের কৃষিকার্য, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ী বাণিজ্যের উন্নয়নেও তাতে সাহায্য হবে, কেননা ভারতের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানে প্রত্যেকটিরই আবশ্যকতা অপরিসীম।

দেশে সমৃদ্ধি আনতে, দেশকে প্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলতে, আপনার টাকাকড়ি দেশের ইউকোব্যাঙ্কের মাধ্যমেই রাখুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস: কলিকাতা

নাত বউ, দুলি, আমরা সবাইরে কি করতিস?

যামিন বনেজপারে লুকে থাকিছল, তাই থাকত।

ওরা মোদের ঘরে আগে আগুন দিত।

কেন? পবনের আকা আজির ঘর বলে?

মোদের ওরা আগে মারত।

মারলে মরতে।

জনকের বউ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর জনককে বলল

এখানে বাবুরা পবনরে ডাকো বলতেছে জানি? বলতেছে পবনরা তিনোজনা যুদ্ধ করে মরেছে?

যুদ্ধ করে মরেছে? এ কথা এখানেও বাবুরা বলতেছে?

বলতেছে না?

জনক মাথা নাড়তে লাগল। বোঝেন না, জনক কিছুই বোঝে না। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অবধিও ত' দেশে থাকা গিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে ওরা কেমন করে জানতে পারল জনকদের গ্রামের তিনজনকেই হাটে বেয়নেট করা হয়েছিল।

আজ বলল হাটে-বাজারে-দোকানে যাবেনা।

কাল বলল গ্রামের বাইরে যাবে না। গরু-ছাগল কার ঘরে এখনও কি আছে সব জমা দিয়ে দিতে হবে।

তথাপি জনকরা রাতের অন্ধকারে বেরোল। এই এতদিন বাদে। হালের বলদ, গোয়ালের গরুর দড়ি কেটে দিয়ে বেরোল। রাতে হেঁটে, দিনে লুকিয়ে থেকে তবে এখানকার মাটিতে পা দিল। কিন্তু পবন ত মরল ওদের সঙীনে। বন্দুক হাতে না থাকলে লড়ুয়ে গোয়া হয়? এখানে বাবুরা কেন বলছে পবন যুদ্ধ করে মরেছে?

কি ভাবতেছ?

কিছু না।

তুমি তোমার ধানের কথা ভাবতেছ।

ধুস্। ফেলে থুয়ে এসেছি, আমনের চারা কেমন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে তেমন চলে এসেছি। আর ভাব!

তবে?

জনক অন্যমনস্কভাবে বলল,

কুবের মাঝিক বলত এখানে আমনের চাষ জবর। তা এখানে চাষ কোথা করে যে বউ? আমি ত কিছু ঠাওর পেলাম না।

ত্যাত মাটি, ত্যাত খেত কোতা?

অন্যত্তর আছে।

এই এত এত মানুষ! এই এত মানুষ এরা কোতা থেকে বল দিখি।

আমি মেয়েমানুষ, আমি জানি? ঐ শোন কি বলতেছে ওনারা।

জনক ঘাড় কাত করে শুনল। মাইকে ওরা হেঁকে বলল আজ যারা ক্যাম্প যাননি তারা দু একদিনের মধ্যেই যাবে।

এখন জনকের বউ, জনক, পবনের বউ আস্তে আস্তে গাছের কোল ঘেঁষে বসল। জায়গাটা এর মধ্যে খানিকটা ভালো। দুটো খুঁটির ওপর দুটো মাদুর। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দেওয়া যায়। ওরা পাত করে খাবার আনতে গেল। জনক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে চেয়ে রইল। পবনা সব কথা বুঝত না। সেবারকার সমুদ্দুরে বানের পর বলেছিল,

আজ্ঞা গো, দেশে আর মানুষ নি। সব ভেসে গেল।

মানুষ, মানুষ, অনন্ত অর্বুদ মানুষ। আকাশের তারার চেয়েও অগুণতি। আহা, পবন ত সব জানত না। সমুদ্র যাদের টেনে নিয়েছিল তাদের সব উগরে দিয়ে গেল বুঝি। নইলে এত মানুষ আছে বলে ত কই জনক জানে নি? এত মানুষ থাকবে কোথা, খাবে কি? কদিন থাকবে?

হা দেখ, ফিরে গেলে কেমন হয়?

একথা বলতে গেলেই সবাই ওকে মারতে ওঠে। জনক বোঝে না কেন ওরা রেগে যায়। দেশ-ঘর ছেড়ে মানুষ কতদিন এমন করে থাকবে? জনকের দলে জোড়ার মধ্যে রাঙাটা সেয়ানা আছে। দুটো বলদ যাকে বলে। কদিন খেতে জঙ্গলে ঘুরে ধুরে খাবে। তারপর?

জনকের ডাকনা বউ আর নাতবউকে নিয়ে। চরণদাসের মেয়েটার বয়স বেশি নয়। এখনও ও মাঝে মাঝে ওকেই জিগেস করে।

বাঁশগাড়ি দিলে যুদ্ধ হয়? বাঁশগাড়ি দিয়ে মানুষকে অমন কুঁড়ে মারে?

কে বলে যুদ্ধ?

জনক উত্তর দেয় আর মাথা নাড়ে। বলে

যুদ্ধ যুদ্ধ বলে মাথা খারাপ করিস না দিদি। যুদ্ধ হত আগে। বাপ যে লড়াইয়ে গোরা দেখিছি। যা দেখ, যুদ্ধে গেয়ে মরেছিল কাদের লোকের ছেলে। এই ডাক জোয়ান, বুকে চাপড় মেরে হা হা করে হাসত। যুদ্ধে মরেছিল বলে কাদের টাকা পেত।

তোমার নাতি বলে, দেছে মোরা সব পাব গো!

ছুলো!

জনক চেঁচিয়ে উঠেছে। পবনের কথা পবনের বউয়ের মুখে ও শুনতে পারে না। যুদ্ধ যুদ্ধ বল কেন সবাই? বন্দুক সঙীন হাতে সেপাই পবনদের খুঁজিয়ে

নাটক — নাটক — নাটক

স্বপন সেনগুপ্ত রচিত বহুল অভিনীত শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামী নাটক

কবে বসন্ত আসবে

[১টি সেট্, ২টি মেয়ে, ১৩টি পুরুষ]

দাম—তিন টাকা

বর্তমান রাজনৈতিক পট-ভূমিকায়
স্বপন সেনগুপ্তের নতুন আঙ্গিকে

অশুভ অাঁতাত

[১টি মেয়ে, ১০টি পুরুষ, ১টি সেট্]

দাম—সাড়ে তিন টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

নদী বয়ে যায়

দাম—দুই টাকা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

মন্দাক্রান্তা

দাম—আড়াই টাকা

বিজন রায়ের তিনটি একাংক একত্র

গ্রহ সম্মেলন, ব্রীজ, অন্তরালে

দাম—দুই টাকা

—প্রকাশিত হইতেছে—

বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা
স্বপন সেনগুপ্তের বলিষ্ঠ নাটক

হিরো

— : প্রকাশক : —

চক্রবর্তী এণ্ড কোং

৮সি, টেমার লেন কলকাতা-৯

মাজন এর নাম যুদ্ধ? ঘরে ঘরে আগুন, হাট পুড়ে, বাজার পুড়ে, এর নাম যুদ্ধ? ভাত খাবার মাটি খুঁড়ে যেমন পিঁপড়ে বেরোতে থাকে তেমনি [illegible] বেরোচ্ছে আর [illegible]।

জনক মাথা নাড়তে লাগল। জনক কিছুতে মানবে না এরা নাকি যুদ্ধ।

এর নাম কি?

জনক জানে না। জনক জানে অম্বুবাচীর পড়নায় জানে, ওষুধের চিকিৎসা জানে, ধানসা, পোকা ধান গাছ থেকে নির্মূল করতে জানে। আর জানে বিছন-বোনা-নিড়েন, বিছন-তোলা-নিড়েন। আর হেমন্তে ধানকাটা। আবার শ্রাবণে আল কেটে জল বওয়ানো।

জনক রাজা চাষ করে যাবেন।

জনকের যৌবনে জনকের বউ বলত। বউএর কোলজুড়ে যখন টুকটুকে মেয়েটা এল, জনক বলত,

সীতা খুঁড়ে এনেছি, জানিস?

জনক এই সব জানত, এখনো জানে। এই যে হিন্দুস্থানে মানুষ আসতে থাকে শুধু মনে হচ্ছে না সমুদ্রের ওপর মেঘের মত বিশাল বড়ো জাহাজ নিয়ে আমাদের সব জমি চাষ করে ফেলে?

শুধু সেই সব জানে জনক। কিন্তু আজ গো! আজকালই গো! বলে বলে, পবন যে মারে তার নাম যে কি তা জনক জানে না। এখনো বাবুরা কি বুঝাচ্ছে তা শুনে জনকের হাসি পায়। কত ছেলে-মানুষ ওরা! কত কম জানে! আর জনকরা যখন থেকে আসতে শুরু করেছে, তখন থেকে ওদের বিশ্রাম নেই।

জানে না গো! পবনটার বড় হাবাটা। তাই মরল যুদ্ধে। যুদ্ধ কারে বলে তা জানে না।

কিন্তু ওরা বলল পবন যুদ্ধ করে করে মরেছে।

তুমি, তুমি, জনক দাস?

আজ্ঞা।

নিবাস

সেখানটা কোথা? হাঁটুরে চলে যাও। বড়কেটার গাছ বরাবর দখিন পানে নামতে যেতে যেতে তবে মোদের গ্রাম গো।

তোমার নাতি পবন দাস?

আজ্ঞা।

ওঁদের চেন?

না বাবুরা।

এঁরা পবনদের জানতেন। পবনের কথা ওরা জানতেন।

জানতে তোমরা?

জানতাম।

জনক অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল। যেন জাহাজের পাহারা জনক, জাহাজের মালিক। ঢেউ দেখা আর তারা দেখা আর দিক দিগন্তে চেয়ে থাকাই ওর [illegible]।

জনকের চোখ নিষ্পাপ, একাগ্র, স্বচ্ছ। তবে পবনা মরল কেন?

মরল কেন?

সবাই যদি সব জানত তবে মোর পবন মরল কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না। পবন যুদ্ধে মরেছে।

ওর নাম যুদ্ধ?

যুদ্ধ নয়?

এমন যুদ্ধ হয়? বাবুরা, আমি কিছু জানি না, তাই শুধাই, বন্দুক নেই, কিছু নেই, ওর নাম যুদ্ধ?

হ্যাঁ।

ওরা আস্তে আস্তে বলতে লাগল। যে যা জানে, তাই নিয়ে লড়াই করার নামই যুদ্ধ। যে যা জানে তাই করে চলার নামও যুদ্ধ করা। শুনতে শুনতে জনকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এত ভালো ভালো কথা জনক কখনও শোনে নি।

তোমরা এখানে আছ?

আজ্ঞে।

কাল পরশু ক্যাম্পে চলে যাবে।

আজ্ঞা। সে কি দূরে?

তেমন দূরে নয়।

জনক গাছতলার আশ্রয়ে ফিরে এল। যে যা জানে তাই করে চলার নামই যুদ্ধ করা।

তোমরাও ত যুদ্ধ করতেছ বাবুরা?

আমরা?

এই যে এত এত জীবকে দেখতেছ, সাধামত খাওয়াতেছ, আশ্রয় দিতেছ, এর নাম যুদ্ধ নয়?

তা বলতে পার, বলতে পার বটে।

জনক গাছতলায় ফিরে এসে হেলান দিয়ে বসে রইল।

—এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবে। সে কতদূরে? জনকের ঘর-খেত-পাল গাদা থেকে কতদূরে? সবাই চলে যাবে, ওরা সেখানে থাকতে দেবে না? কেমন করে জনক যাবে?

চোখ-বুজে থাকতে থাকতে জনক ছবির পর ছবি দেখতে পেল। সেই সমুদ্রের ওপর মেঘ। সেই প্রথম জমি নিয়ে হাসিল করার আনন্দ। পবনার বাপটার মুখপ্রসাদ হয়েছিল তার নাকনার শব্দ কানে শুনতে পেল জনক। তখন জনকের বাপ বেঁচে আছে। মেয়ে বউটা নতুন কাপড় পরে বাবের বাড়াগাছটার তলায় পুজো দিয়ে এসেছিল।

সেই থেকে যত হল। জনক বাঁধনটা বাঁধনে সোমসারের তোলা থেকে কত সুখ পেয়েছে। ছেলে মরেছে, নাতি মরেছে। জনকের বিষয়সংসার ত অধিকার হয়ে যাবার কথা। তা ত হয়নি।

তখনও যে জনক সুখ পেয়েছে কত? বিছানে-নিড়ানে-রোয়াতে সুখ ছিল। ধান কাটে, আঁটি বাঁধ, ঝাড়, সারি দাও পালা বাঁধ। কত সুখ, কত আনন্দ। শুধু সে আনন্দে পূর্বলোক ভুলতে পার, পৌত্রলোক ভুলতে পার। সব সুখ থেকে কারা তাকে খুঁজে আরো দূরে নিয়ে যাবে? যুদ্ধ? জনক যুদ্ধ করবে না।

আজ্ঞা, আপনি কিছুই বোঝ না।

তুই বোঝ খা-খা।

আজ্ঞা, এর নাম যুদ্ধ।

আমি তোদের যুদ্ধ জানি না।

জনক মনে মনে পাখের কথা ভাবতে লাগল। ওরা বলে ফিরে যেও না। জনক ফিরে যাবে। জনক ত আর জনক রাজা নয়। জনক আর কোথায় তার? তার ত [illegible] মানুষের পরমায়ু। যে জমি [illegible] তার পৃথিবীতে আলো সে আর জনক যেমন সুখে কেমন করে? জনক যদি ফিরে যায় তার ফেরার পথে বাঁশঝাড় কে [illegible]? কার এত ক্ষমতা?

কুম্ভকর্ণ, পরিত্যক্ত গ্রাম। শ্মশান, যেখানে যেন আকাশের বড়বেড়ীর গর্জন [illegible] ঘটায় [illegible]। নতুন সকাল, মেঘে মেঘে [illegible]। আকাশ জনকের চাল ছুঁয়ে আছে।

জনক ওর খেতে গিয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তোদের যুদ্ধ একরকম পবন, তোর আজা সে যুদ্ধ বোঝে না। তোর আজার বয়স অনেক। এক সময়ে তোর আজা মাটি খুঁড়ে সীতা তুলে তোর আজিমার কোলে ফেলে দিয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠে বোনা ধান খেতের চারা এখন সতেজ, সবুজ। নিড়েন পড়ে নি তাই চারার মাঝে মাঝে আগাছা। আগাছা ঘন হলে জল বাধবে, জল জমবে, বাইন লাগবে, আমনের মরণ।

জনক নিচু হয়ে পাগলের মত আগাছা উপড়াতে লাগল। ছেঁড়! ছোঁড়! ছেঁড়! আগাছা-গুলোকে গাল দিতে লাগল জনক। যেন ও যুদ্ধ করছে, তাই ওর হাতের মুঠো এত শক্ত, এত কঠিন। মাটির গন্ধ কি আশ্চর্য, কি উত্তেজনা তাতে। যার যা কাজ তা না করলে দিলে শান্তি পায় না। বাবুরা কি সেই কথাই ওকে বলেছিল?

মাটির [illegible], —[illegible]—[illegible] জনক অন্ধ হয়ে গেল। কালা হয়ে গেল তাই দেখল না। [illegible] চীৎকার, জনক শুনতে পেল না, দেখতে পেল না সামনে থেকে [illegible] ওর দিকে বন্দুক তুলেছে।

জাতীয় মানসমঞ্চ থিয়েটারের (বার্লিন) শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের একটি দৃশ্য

সাহিত্য সংস্কৃতি

বার্লিনের নাট্যোৎসবে ব্রেখট ও রবীন্দ্রনাথ

আগামী অক্টোবর মাসে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী বার্লিনে যে নাট্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রধান অংশ জুড়ে থাকছে বের্টোল্ট ব্রেখটের নাটক। দর্শকেরা এ-উপলক্ষে ব্রেখটের অনেকগুলি নাটক একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাবেন। ব্রেখট প্রতিষ্ঠিত বের্লিনার আনসাম্বল এবারে এই প্রথম ট্যুরানডট নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন। অন্যান্য নাটকের মধ্যে থাকবে 'আর্তুরো উই..মা', 'গ্যালিলিওর জীবন', 'সেনোরা কারারের রাইফেল', 'থ্রী পেনি অপেরা' ইত্যাদি।

ব্রেখটের এই নাট্যসম্ভার আমাদের দেশেও মঞ্চস্থ হওয়ায় সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রেখটের নাটকের জনপ্রিয়তা এবং ব্রেখট সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। আমাদের দেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যশিল্পীদের একটি প্রতিনিধি দল বার্লিনের এই উৎসবে যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে আমাদের সঙ্গে ব্রেখটের উপযুক্তভাবে পরিচিত হবার অধিকতর সুযোগ পাওয়া যাবে।

আসন্ন এই নাট্য উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ—ভাইমারের (গ্যেটে ও শিলারের নগর) জাতীয় থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকটির পুনরাভিনয়। ভারতীয় শ্রীমতী আনন্দা এই নাটকটির পরিচালিকা।

বিদেশের অনেক বিখ্যাত নাট্যকারেরাও এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন আশা করা যায়।

নতুন বই

পিঞ্জর (উপন্যাস)—সুভাষ সিংহ। বিচিত্র প্রকাশনী, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা : ৯। বারো টাকা।

তরুণ পরিবারের লেখক শ্রীসুভাষ সিংহের দ্বিতীয় উপন্যাস 'পিঞ্জর' আজকের যুগ-মানসের অন্তরঙ্গ বাস্তব রূপায়ণ। চলমান চঞ্চল জীবনের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু রঞ্জত ও মীরা। তাদের ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে অসংখ্য ঘটনার ঘূর্ণি, এসেছে ছোট-বড় বিস্তর চরিত্র। সাড়ে তিনশো পাতারও বেশি বিস্তীর্ণ পরিধিতে কাহিনীর স্বাভাবিক চলমানতার মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং যে সব চরিত্র এসেছে তারা সবাই উঠে এসেছে জীবন থেকে—কেউই আরোপিত, প্রোথিত, প্রক্ষিপ্ত বা অপরিচিত নয়। সবাই, সবকিছুই আমাদের চেনাজানার পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে। এই স্বাভাবিকতাই কাহিনীকে করেছে জীবন্ত ও বেগবান। যারা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য জটিলতা, যন্ত্রণা, উদ্দেশ্যহীনতা, অনিশ্চয়তা ও প্রাত্যহিকতার শিকার—যারা কাছে টানতে গেলে দূরে ঠেলে, ভালোবাসতে গিয়ে ঘৃণা করে, ঘর বাঁধতে গেলে ঘর ভাঙে—জীবন-ধারণে ক্লান্ত তারা সবাই। অস্থির উচ্ছৃঙ্খল রঞ্জত, ঘর বাঁধার স্বপ্নে আতুর জীবন থেকে জীবনে ছুটে বেড়ানো বিবাহিতা মীরা, সাধারণ মেয়ে শেফালি, প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত জীবনভীরু বিনয়, পলা মেয়ে লতা, চাকুরিজীবিনী চন্দ্রাণী—আমাদের রোজকার জীবনে একান্ত পরিচিত ও নিত্যসঙ্গী। লেখক জীবনের গল্প বলেছেন, তাই এ কাহিনী পাঠকমনকে এত নাড়া দেয়। কাহিনীর বিন্যাসে, নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুভাষ সিংহের সবচেয়ে বড় গুণ তিনি গল্প বলতে জানেন এবং সার্থকভাবে তা পেরে-ছেনও। কাহিনীর সূত্রপাত থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমানভাবে তিনি পাঠকমন ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। শুরু করলে সমাপ্তি না করা পর্যন্ত পাঠকের মন স্বস্তি পায় না। অসতর্ক শব্দের কিছু প্রয়োগ এবং কাহিনীতে গতি টানবার জন্য শেষদিকে দ্রুত লিখন এর একমাত্র ত্রুটি। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রচনার গুণাবগুণে, চরিত্র-চিত্রণে ও জীবনের বাস্তব প্রতিফলনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'পিঞ্জর'। যুগজীবনের বাস্তব চিত্র হিসেবে সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন বলে এ উপন্যাসটি গণ্য হবে।

তুফান যখন আসবে (উপন্যাস)—শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক : সুশীলকুমার সরকার, ১৬২।৯১, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা : ৪৫। পাঁচ টাকা।

ভারতের বিশেষ করে আজকের পশ্চিম-বাংলার পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটির মধ্যে যে ভাবতরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে তা হল সমাজ সংস্কার ও দেশপ্রেম। সর্বহারা মানুষের বঞ্চনমুক্তির এবং নষ্ট সমাজের পতনের মধ্যেই রয়েছে দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। এই বক্তব্যের বিস্তারে কাহিনী বহু ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কাহিনী গঠনে ও ঘটনার সমাবেশে ত্রুটি এড়াতে পারলে উপন্যাসটি উপভোগ্য হোত। ত্রুটি বানানে এবং মুদ্রণেও। অথচ প্রচ্ছদ শোভনসুন্দর।

অতীতের কান্না (ঐতিহাসিক নাটক)—তিলক দাস। ভৈরব লাইব্রেরী, ১০।১ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৩·৫০ টাকা।

কালের হাওয়া বদলেছে। তাই হালে রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের আর তেমন কদর নেই। মঞ্চপ্রেমীরা এই কাল এই যুগ-এর প্রতিফলক নাটকে আর মঞ্চে রূপায়ণে ব্যস্ত। পুরনো ঐতিহাসিক নাটক কখনো কখনো দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সহযোগিতায় পুনরভিনয়ের বিরল সৌভাগ্য লাভ করে। ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন অবশ্য এখনও আছে। 'যাত্রা'র অধিকারীরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছেন সগৌরবে, সেই সঙ্গে অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের প্রেরণা ও আনন্দ যুগিয়ে আসছেন নিরলসভাবে। 'অতীতের কান্না' রাজস্থানের এক অতীত কাহিনীর নবরূপায়ণ। কোঠা রাজের হাড়া-বংশীয় রাজপরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এর পটভূমি। নাটক রচনায় দক্ষতার পরিচয় মেলে। নানান ঘটনার টানাপোড়েনে, নাটকীয় সংঘাতের আবর্তে নাটকটি দর্শকচিত্তে দোলা দেবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সমকালপত্র। সম্পাদক : অরুণ বসু ও কল্যাণ সেনগুপ্ত। ১৬ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের গল্প-কবিতা প্রবন্ধ-নাটিকার সংকলনে যুবমানসের প্রতি-ছবি ফুটে উঠেছে। সম্পাদকদ্বয় ভূমিকায় বলেছেন : '...সমাজের মুখে বালি গুঁজে যারা চুপ করাবার চেষ্টা করছেন, সমকাল-পত্র হল সেই হিতৈষীজনের (?) প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো।...' দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে হিপি দর্শন সেই নিক্ষিপ্ত পাথরগুলোর একটি 'সেল'। সুবিমল মিত্রের গল্প 'বাকসারীগণ'। সত্য বক্সীর 'জন্ম দিন' ও অমু বোসের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বাস্তবতাবোধ' উল্লেখ্য। এছাড়া লিখেছেন : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রগতি ('বাংলা দেশ' বিশেষ সংখ্যা)। সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩১বি, ডেন্টমিশন রোড, কলকাতা—২০। ১·২৫ পয়সা।

এই বিশেষ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ'-এর নানান বিষয়ের ওপর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য হল সুদর্শন চৌধুরীর 'সমর-সমীক্ষা', ইন্দ্রনীলের 'শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশে মুক্ত অঞ্চল চাই', সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী বর্ণমালা'। এছাড়া লিখেছেন : ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, সুকুমার সেনগুপ্ত, বিমান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

লোক-সংস্কৃতি (প্রথম সংকলন)—সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি : দুলাল চৌধুরী। অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর। ২৫৫ যোধপুর পার্ক। কলকাতা—৩১।

বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, আলোচনা, সংগ্রহ, সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই এদের ত্রিমাসিক সংকলন 'লোক-সংস্কৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত ছড়া, গান, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ নানা রকমের শিল্প কাজ ও পুরাবস্তুর বিবরণ,

আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ পরিচয়, নাচ ও বাজনার তথ্যাবলী, আঞ্চলিক শব্দ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এই পত্রিকায় থাকবে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন : অজিতকুমার দাস (চারুশিল্পে আদিবাসী সংস্কৃতির রূপায়ণ), চিন্ময় ঘোষ (পূর্ব ভারতের চা-শিল্পে আদিবাসী শ্রমিক), সাধনা চৌধুরী (বঙ্গে বিবাহ রীতি : মালদহ), জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী (বেনাকি—চব্বিশ পরগণার একটি লৌকিক দেবতা), মুহম্মদ আয়ুব হোসেন (আঞ্চলিক শব্দ : বর্ধমান), ফুল্লিকা মজুমদার (দার্জিলিং জেলা)। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে পত্রিকাটি প্রচারের জন্য চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের মনে যে ঔৎসুক্য আছে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এই সব পত্র-পত্রিকা।

মীরাজনা (সপ্তদশ সংকলন) সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫।সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা : ২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি নতুন ভাবনার খোরাক যুগিয়ে ইতিমধ্যে সাহিত্য-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি নানাদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'বাংলাদেশ'-এ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং ব্যাপ্তির বিস্তৃত পরিচয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন মোহাম্মদ সুলতান। জাতীয়তাবোধের জাগরণ ও ভাষা-আন্দোলনের ক্রমপরিণতি কেমন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঢেউ তুলেছে তাই বাঙ্ময় হয়েছে শ্রীসুলতানের 'আন্তর্জাতিক বাংলা প্রসঙ্গে' নিবন্ধটির মধ্যে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার নায়কীয় গণহত্যা-কাণ্ডের বীভৎস কাহিনীর বিবরণ। প্রণবকৃষ্ণ গোস্বামীর 'অবর্ণনীয় ওরা' রচনা উল্লেখ করবার মতো। এছাড়া লিখেছেন : জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, রণেন মিত্র প্রমুখ।

বাঙলাদেশ (স্মারকপত্র) সম্পাদক : কৃষ্ণজীবন মজুমদার। ৩।১, লকগেট রোড, কলকাতা : ২। এক টাকা।

'বাঙলাদেশ' ওপর লেখা গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা ও মহৎ মানুষদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে 'বাঙলাদেশ' স্মারক গ্রন্থে সত্যকার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লিখেছেন : রবি সেন, দিলীপ ঘোষাল, অতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়, শামসুল আলম সাঈদ, মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল, প্রণবেন্দু রায়, দিলীপ দত্ত, সুকুমার বিশ্বাস, নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু মুসলমান' ও লেনিনের 'জাতীয়তাবাদ' নিবন্ধ দিয়েই স্মারকপত্রের পরিক্রমা শুরু। প্রচ্ছদ প্রখ্যাত শিল্পী অমর্ত্য মুন্সীর। সম্পাদকের কৃতিত্ব এবং দুঃসাহস তারিফ করার মতো।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (আষাঢ় '৭৮)—সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যাটি 'কবি শান্তশীল দাস সম্বর্ধনা সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাব্রতী কবি শান্তশীলের কাব্য-ভাবনার নানাদিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন দিজেন্দ্রলাল নাথ, বিমল দত্ত, কালিদাস রায়, দিলীপকুমার রায়, বিজয়লাল চট্টো-পাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিহারী সেন, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্য-সেবীরা। এছাড়া রত্নেশ্বর হাজরা, কমল গুপ্ত, গদাধরচন্দ্র নিয়োগী, প্রদীপকুমার দত্ত, দীপককুমার মজুমদার প্রমুখের রচনা-গুলি উল্লেখ করার মতো।

জাগরী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮)—সম্পাদক : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগ-বাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ ভাবে ভাবিত 'দিব্য-জীবন'-অভিসারী মাসিক পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই সাহিত্যরসিক পাঠকদের অভিনন্দন-ধন্য হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, শক্তি চট্টো-পাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, অপূর্বকুমার সাহা এবং আরো অনেকে। 'ওপার বাংলার রবীন্দ্রনাথ' 'তারা তিনজন' রচনাগুলি পড়ে দেখবার মতো। সবচেয়ে উল্লেখ্য হল নজরুল-লিখিত (রচনাকাল ১৩৩১) 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যপথ-যাত্রীরা এই প্রবন্ধে অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন।

দক্ষিণীপা (এপ্রিল-জুন ১৯৭১) সম্পাদক—প্রবীর দত্ত ও জীবনময় দত্ত। ৭।১২৪, কিদ্‌ওয়াইবাগ কলোনী পাটনা—১। পঞ্চাশ পয়সা।

বিহারে একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে প্রবাসী বাঙালীদের বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রীতির প্রশংসনীয় পরিচয় মেলে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়া হিন্দী কবিতার অনুবাদও আছে। অধিকাংশ লেখাই বাংলা-দেশকে নিয়ে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূর্ব বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ' ও সুভাষচন্দ্র সরকারের 'বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত।'

চারুবাক (তৃতীয় বর্ষ, মার্চ ১৯৭১) সম্পাদক : অরুণ মুখোপাধ্যায়। ৪৩, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

চারুবাক অঙ্কন পাড়ার ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। পত্রিকাটির সব অবয়ব জুড়ে আন্তরিকতার ছাপ। লেখা ও ছাপার কাজ এবং কারুকৃতি লক্ষণীয়। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন : অমরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, চিত্ত তরফদার, সুধা মুখোপাধ্যায়, কে নজরুল ইসলাম, শংকরানন্দ মুখো-পাধ্যায়, দেবেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন ঘোষ, অমর ভট্টাচার্য, অরুণজ্যোতি বসু, আনন্দ চৌধুরী, কান্তিলাল সুহরায় প্রমুখ। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা : রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা, জনসাহিত্য এবং নির্বাচনী ইশতেহার, বাঁকসপাড়ার ক্ষেত্র ইতিহাসের আন্দোলনের পর্যালোচনা। 'অন্যনা' বিভাগটির জন্যে সম্পাদক অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন।

ষষ্ঠি-মধু (বৈশাখ '৭৮) সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ২৮।৩।আর রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা—৫৪। পঁচাত্তর পয়সা।

'সরস বাংলার সরস পত্রিকা' ষষ্ঠি-মধু এবার কিন্তু সত্যিই 'সিরিয়াস'—বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা তার জীবন্ত সাক্ষী। যা কী ছিলেন, যা কী হইয়াছেন, যা কী হইতে চলিয়াছেন— তারই আলোছায়া বিস্তৃত পরিচয়ে বাংলা সাহিত্য মন্থন করে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে হালের কথাকারদের রচনা উদ্ধৃতির সার্থক সংযোজনায় বাংলাপ্রেমীদের অবশ্য দ্রষ্টব্য এই বিশেষ সংখ্যাটি।

সিন্ধু সারস (প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ১৩৭৮) সম্পাদক : জ্যোতির্ময় দাশ, সহিং শর্মা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। ৫৩, কাটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া-১। পঞ্চাশ পয়সা।

'সিন্ধুসারস' তার অকপট অশিক্ষিত ডানা দুটি মেলে 'মানুষের সভ্যতার শেষ জাগ্রত জ্যোতির্লোক পর্যন্ত' কল্পনার অসীম সমুদ্রের আকাশে উড়তে অভিলাষী—এই ঘোষণা দিয়ে সাময়িক সাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করল। তরুণ মনের ভাবনার ভাস্বর গল্প কবিতা দিলন সম্পর্কীয় পত্রিকাটি লেখা রেখা এবং ছাপার দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং পরিচ্ছন্ন।

ফালগুনী (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ। কবি মুকুন্দ ধর রোড, নতুনবাজার, বসিরহাট। ষাট পয়সা।

সন্দেশ (ছোটদের পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ '৭৮)—সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১১।৫, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬। পঁচিশ পয়সা।

একেবারে খুদে শিশুদের পত্রিকা। লেখক-লেখিকা ছোটরা। সম্পাদকও তাই। চমৎকার ছাপা। গল্প-কবিতাগুলো মন টানে। কার্টুন পর্যন্ত বাদ যায়নি। ছোটরা এমন বই পেলে খুশী হবে নিশ্চয়ই। ছোট বন্ধুদের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই।

নক্ষত্রের রাত : (জুন ১৯৭১) সম্পাদক : সব্যসাচী দেব ও সুব্রত ভট্টাচার্য। ১১৩।১, অশোকগড় পূর্ব কলকাতা—৩৫। ষাট পয়সা।

দুটি কবিতা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

এংলিন।।

এক।

কন্টক দিয়েছি সব-ই, বলো আর কার কাছে যাবো?
সূর্য তুমি পারো নাকি দিতে অন্তত একবার সোনা?
কুঞ্চিত সত্তার কান্না যদি হয় অসহ্য কখনও
হৃদয়কে হত্যা করতে তবে কিন্তু কুণ্ঠিত হবো না।।

দুই।

এখনও হইনি বৃদ্ধ, এখনও বিশ্বাসে মুগ্ধ চোখে
প্রেমের তুলনা খুঁজি আশ্বিনের পাহাড়ে নীলায়,
জটিল তর্কের মতো দেখিনি অনেক পথ, তাই
দেখি না পুরনো প্রেম পুরনো চাঁদের উপমায়।।

---

*এংলিন এক ধরনের ওয়েলশ কবিতা

স্বগত।।

কিছুই প্রার্থিত নেই, কি দেবে? নিজস্ব বেদনার
সাম্রাজ্যের আমি অধীশ্বর,
নীলিমায় অহংকৃত স্থির আত্মবিশ্বাসী আকাশ
নয় কারো করুণা-নির্ভর।

বরং তোমাকে আমি তোমার-ই অজান্তে প্রতিদিন
আমার সর্বস্ব দিয়ে ঋণী করে যাই,
ফুল-ফোটানোর ব্রতে কৃতার্থ মৃত্তিকা গন্ধে রঙে
রাখে তার স্বপ্নের দোহাই।।

অন্ধকারে নীল নিম এক ॥

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

আমাদের বংশতালিকায় এক অন্ধকারে নীল নিম আছে ;
রাত্রির স্তব্ধতা বেয়ে একটি নক্ষত্র
রোজ ওঠে তার শিয়রের কাছে,
বিস্মৃত অনেক স্মৃতি চুপিসারে পায় প্রাণ
অন্ধকারে লীন সেই নীল নিম গাছে।

পূর্ব-পুরুষের কত শেওলায় ঢাকা মুখ
নম্র চোখে ওর কাছে আসে,—
পূর্ব জীবনের কত বিস্মৃত স্মৃতির তীর
বিঁধে আছে ওরই চারিপাশে।
ঘর-বাড়ী কবে গেছে, শুধু এক কোণে
সেই নম্র তরু পুরাণো আকাশে।
অনির্বচনীয় কোনো লোকের সম্মুখে
সমাহিত ধ্যানরত।—যাতে আরো গাঢ় হয় ধ্যান,—
কথা নাই মুখে,
শরীরে লতানো সব বুনো ফুল
জোছনার হিম মাখে বুকে,—সুখের অসুখে।

সে-পেঁচারা বেঁচে নেই তাহাদের ফেলে-যাওয়া স্বপ্নাতুর স্বর,—
যে-পাখিরা মরে গেছে তাহাদের মোহ-মাখা নিদাঘ কুহর
সযত্নে সজ্জিত আছে ওর শাখা প্রশাখার ভাঁজে,—
আমাদের বংশতালিকায় আজো নম্র এক নীল নিম আছে।
প্রাচীন পোকারা কবে ডিম পেড়ে নতুন পোকার জন্ম দিয়ে
আদিম সৃষ্টিতে মিশে গেছে;
শৈশবের ছায়া-ভাসা উঠোনেতে চাঁদের তবক
সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
তারা সব—
আরো যেন কারা সব
অনেক সমৃদ্ধি আর সৃষ্টিশীল মন নিয়ে
সময়ের বুকে সরে গেছে,—
শুধু ঐ নিমগাছ সব কিছু একাকী দেখেছে।

হেঁটেছি যৌবনে আমি একদা যেসব নদী-কূলে
তাহাদের অস্তশোভা তরঙ্গিত যে মেয়ের চুলে,
তারা সব ঐ স্নিগ্ধ ছায়াতুর নিমতলা দিয়ে হেঁটে গেছে,—
বংশের মর্যাদা-লিপ্ত ঐ নীল নিম গাছে
তাহাদের অশ্রু-তিক্ত নির্যাস লেগেছে।

একটি তারার আলো জ্বেলে নিয়ে শিয়রের কাছে
প্রাচীন বৃদ্ধের মত সে সব প্রত্যক্ষ করিয়াছে—
অন্ধকারে লীন নীল নিম ছাড়া এক ভিটের আকাশে।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাথরখানার ফাঁক দিয়ে চন্দ্রলোকের কতকটা দেখতে পাওয়া যায় সেইদিকে তাকিয়ে থাকে জরা। মাঝে মাঝে কানে আসে নিশাচর পাখীর কলরব, নিদ্রিত পাখীর পাখা ঝটপটানি আর শ্বাপদের গর্জন। এই বনের সবটার সঙ্গে সে খুব পরিচিত, এক সময় ওদের সন্ধানেই ফিরতো, হরিণের আর্তনাদ, বাঘের হুঙ্কার, ভালুকের হাসির ন্যায় চীৎকার, বুনো কুকুরের তারস্বর সমস্তই তার চেনা। এত প্রাণীও আছে পাহাড়টায়—অথচ দিনের বেলায় কিছুই বুঝতে পারেনি—কোথায় থাকে তারা সারা দিনমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা আবার ফিরে আসে কোটরে। ও যেন একটা পাখী, কিন্তু কোটরে তো শান্তি নেই, মনটা থেকে থেকে পাখা ঝটপটিয়ে ওঠে। আর চোখ দুটো আকাশের দিকে, মনটা কোটরবদ্ধ।

দুঃখের লোষ্ট্রখানা পড়েছে মনের মধ্যে, চিন্তার তরঙ্গবলয় ক্রমবর্ধিত পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে তার গতির আর সীমা নেই। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা সেই তরঙ্গতাড়নে পাতার ভেলার মতো কাঁপতে থাকে। সেই নিদারুণ শরাঘাত, জরতীর মৃত্যু, বালিকার কুটীরে আগমন, বনের দিকে প্রস্থান, খটাসের হাতে আত্মসমর্পণ, ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার প্রয়াস, রাজ্যাভিষেক, যদুবংশীয়দের অনুসরণ, আক্রমণ ও বন্দীদশা, দ্বারকাপুরীর বাজার, সুমন্তপুর, নরেন্দ্রনগর, নরককে হত্যা ও পলায়ন, অবশেষে হার্গার্ভির গুহায়। এদের যে কোন একটি ঘটনা নৌকা বানচাল করবার পক্ষে যথেষ্ট, আর এতগুলো তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করেও সে যে এখনো জীবিত, তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সুমন্তপুর ও নরেন্দ্রনগরের রাজপ্রসাদ মনে ধারণা জন্মে দিয়েছিল যে পাপটা অলীক, কেননা, পাপের পরিণাম তো সুখ হতে পারে না। তবে সে এত সুখী কেন, এত সুখ কেন তার ভাগ্যে। তবে তো খটাস মিথ্যা বোঝায় নি যে হত্যা করে পাপ করে নি, হত্যায় পাপ নেই। আর হত্যাও তো সে অল্প করেনি—বাসুদেব, জরতী, নরেন্দ্ররাজ ও মন্ত্রিণী, তারপরে নরক। এ যে অনেকগুলি। তখনি মনে পড়ে জরার কথা এ যদি সত্য তবে আবার দুঃখের মধ্যে পড়লো কেন। কিছুই বুঝতে পারে না। তখন মনে পড়ে যায় পাথরভাঙা গ্রামের সুবালার সরল প্রশ্ন। পাপ কাকে বলে? পাপ বলে কিছু তো জানে না তারা। বেশ সুখে আছে তারা। তবে সেই বা দুঃখে পড়বে কেন? এ কেনর সদুত্তর নেই। আসল কথা এই যে এর সদুত্তর দেওয়ার সাধ্য নেই জরার, ঘটনাক্রমের ক্রীড়নক সে, ঘটনাক্রমের বিচারক নয়।

জরা তাত্ত্বিক নয় যে জীবনের সমস্ত ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যেমন পৌঁছেছে হার্গার্ভ তা যতই ভ্রান্ত হোক না কেন। সে হালভাঙা পালছেঁড়া কর্ণধারহীন জল হাওয়ার খেয়ালের অধীন অসহায় নৌকামাত্র। যখন দুঃখের মধ্যে পড়ে পড়ে ভাবে দুঃখটাই জীবনের নিয়ম, আবার যখন সুখের তরঙ্গশীর্ষে ওঠে ভাবে দুঃখটা অলীক জীবন সুখময়। তৎসত্ত্বেও একটা স্থূল বিচার বোঝে সেই অসতর্ক শরাঘাতে বাসুদেবকে হত্যার পর থেকেই এই দুর্গতির, সুখদুঃখের ওঠাপড়ার সূত্রপাত হয়েছে তার জীবনে। না জানি আরও কী আছে ভবিষ্যতের জন্যে। এখন কোথায় যাবে কী করবে জানে না। এইটুকু মাত্র জানে সে এই বর্তমান মুহূর্তটি মাত্র তার হাতে আছে। এইটুকু মাত্র যার সম্বল তার মতো হতভাগা আর কে আছে।

কতবার সে স্থির করেছে সেই দুষ্ট ঘটনাটিকে সে বিস্মৃত হবে, কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না মনের মধ্যে। কিন্তু যখনি ধীরভাবে মনের মধ্যে তাকায় চোখে পড়ে যায় চরণ ভেদ করে একটি পদ্মরাগ বর্ণ রক্তরেখা নির্গত হচ্ছে, কাঁচ দুর্বাদলের মতো কান্তিধর দিব্যদেহ নিশ্চল হয়ে রয়েছে, একবার বঙ্কিম গ্রীবা উত্তোলন করে কী জানালো অভয় না সান্ত্বনা না কী। সেই মৃদু ওষ্ঠাধর পুট, সেই নিমীল নেত্র, সেই প্রশস্ত ললাট। না, এসব কিছুতেই মনে মানবে না। কিন্তু সাধ্য কি? মনের মধ্যে পাথরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে—যে ঐ চন্দ্রলোকের মধ্যে শান্ত স্নিগ্ধ শোভা। কিন্তু এ কি চাঁদটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কেন? আলো এখন ক্ষীণ হয়ে এলো কেন? ও কিসের ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চন্দ্রলোকের গায়ে। আবার ও কী অনুভব করছে সে, পিঠের তলাকার পাথরখানা নড়ছে কেন? আর ঐ চাপা গুড়্ গুড়্ শব্দ কিসের? সে চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্রের কোলাহল। ক্রমাগত এই তিনটি শব্দ আর্তনাদ করে বলতে থাকে। গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র।

হুহু, হুহু, হুহু! কি হল এবার এত রাতে।

প্রভু গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র। সেই সেদিনকার মতো।

কোন দিনকার মতো আবার।

সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বলে প্রভু, ঐ দেখুন, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবী আড়মোড়া ভাঙছে, সমুদ্র হাঁ করে ছুটে আসছে। ঠিক সেইদিনকার মতো।

কোনদিনকার মতো হর্গার্ভ জানে না, তবে তিথি অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ যথা সময়ে হয়েই থাকে, আর পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমিকম্প প্রায় নিত্যকার ব্যাপার, কিন্তু সমুদ্র কোথায়? সে তো বহুদূরে ঐ দক্ষিণ দেশে, এখান থেকে পাঁচশো যোজন দূরে।

জরার মনে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে। সেদিন আতঙ্কিত কল্পনায় যা দেখেছিল, যা অনুভব করেছিল আজ বাস্তবে তার পুনরাবৃত্তি দেখছে, অনুভব করছে। হঠাৎ এই ঘটনায় অবসাদে

মাঝখানকার কয়েক মাস, মাঝখানকার সমস্ত ঘটনা লোপ পেয়ে গিয়েছে। সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে বাসুদেব-হত্যার মুহূর্তে। তার ইচ্ছা হল এখান থেকে ছুটে পালাবে সেদিন যেমন পালিয়েছিল, কিন্তু পালাবে কোথা দিয়ে, গুহা থেকে বের হওয়ার পথ তার অজ্ঞাত। তাই সে ক্রমাগত আর্ত চীৎকার করতে লাগলো, প্রভু ঐ যে আবার ফিরে এসেছে আমাকে গ্রাস করবে।

হার্গার্বি বললে, সবাই আমাকে দেখে অবাক হয়, তুমি যে আমাকেও অবাক করলে হে। কি হয়েছিল শুনি বলো তো। সেদিন, সেদিন কবে, কোনদিন, কি করেছিল?

প্রভু, আমি মহাপাপী।

আরে বাপু মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ পাপী হতেই হবে, জন্মগ্রহণটাই তো পাপ। খুলে বলো।

বাবা আমি মহা দুঃখী।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সুখী হলে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে কেন? এই দেখনা কেন আমার দশা।

বাবা, আপনি তো পাপী নন।

কে বললে পাপী নই। মানুষের সঙ্গে যার বনলো না, মানুষ যার দুচক্ষের বিষ সে যদি পাপী না হয় তবে পাপী আর কে?

কিন্তু বাবা আমি যে মহাপাতক করেছি।

বড্ড বিরক্ত করলে তো। পাপও যাকে বলে পাতকও তাকেই বলে। কিন্তু পাতকটা কি? ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা না কি খুলে বলো।

সেদিনও সেখানে আকাশ এমনি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, সমুদ্র ছুটে চলে এসেছিল।

সবই তো বুঝলাম। সেদিন কি হয়েছিল?

কিছুতেই কুকর্মটা জরার মুখ দিয়ে বের হতে চায় না। পাপ যে ঘৃণ্য তার প্রধান প্রমাণ মহাপাপীও কুকর্মকে আভাসে ইঙ্গিতে বলে। চোর চুরিকে বলে সৎকর্ম, খুনী হত্যাকে বলে কণ্টকচ্ছেদন। নামান্তরে কেন রূপান্তর হয়ে যায়।

জরা কিছু বলে না শরাহত মৃগের ন্যায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে থাকে—কেবল বলে হত্যা করেছি তাকে আমি হত্যা করেছি।

আরে বাপু ভূ-ভারতে আজ এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে হত্যা করলে এমন আত্মগ্লানি হয় বুঝতে পারি না। অনেকে যাকে ভগবান মনে করে আমি যদি সেই বাসুদেবকে হত্যা করতাম তবু এমন আত্মগ্লানিতে ভুগতাম মনে হয় না।

হার্গার্বির কথা শুনে ফুকরে কেঁদে উঠলো জরা, বললো, প্রভু, আমি তাকেই হত্যা করেছি—প্রভাসে শরাঘাতে তাকে হত্যা করেছি। এই বলে সে পাথরের উপর মাথা কুটতে লাগলো।

তার স্বীকারোক্তি শুনে হার্গার্বি স্তম্ভিত হয়ে গেল, বাসুদেব হত্যাকারী এই লোকটা। বলে কি? কারো প্রতি তার যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তা নয়, সাধারণভাবে সে মানববিদ্বেষী, তবে বাসুদেব সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারে নি সে। কখনো মনে করে যে কালান্তক, কুরু পাণ্ডব যদুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই জন্ম। আবার কখনো বা ভাবে এতই যদি করলো তবে বাকি কটাকে রেখে গেল কেন? পরশুরাম করেছিল নিঃক্ষত্রিয়, এ না হয় করতো নির্যাদব। কখনো ভাবে অবতার, কখনো ভাবে মহা ধড়িবাজ; কখনো ভাবে মূর্তিমন্ত ভগবান কখনো ভাবে শঠ কপট লম্পট। যাই ভাবুক লোকটা যে অসামান্য তাতে সন্দেহ ছিল না হার্গার্বির। জনশ্রুতিতে তার কানে এসে পৌঁছেছিল বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু সে যে এই লোকটার শরাঘাতে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। চেয়ে দেখল পায়ের কাছে তখনো মুমূর্ষু পশুর মতো আকুলি বিকুলি করছে। হার্গার্বির বিস্ময় এতই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে ক্ষণকালের জন্য ছাগডাকার মন্ত্র বোধ হুহু শব্দ করতেও ভুলে গেল।

হার্গার্বির মুখে হুহু শব্দ না শুনে জরা শঙ্কিত হয়ে উঠল, না জানি তার প্রতি কি আদেশ হয়। তার মনে হল মানুষ মাত্রেই এখন তার বিচারক। তার পা জড়িয়ে ধরে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা এখন আমার কি গতি হবে।

কি জানি বাপু বুঝতে পারছি না, তুমি মহাপাপী না মহাপুণ্যবান, নরকের কীট না স্বর্গের দেবতা, ভারতের কলঙ্ক না উদ্ধারকর্তা, তোমাকে অভিসম্পাত দেবো না মাথায় করে নাচবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জরার মুখে ঐ এক কথা, কি আমার গতি হবে বাবা, কি আমার গতি হবে।

হার্গার্বি বললে, এগিয়ে দেখো হাত জোড়া।

কিছু বুঝতে না পেরে অবোধ পশু যেমন প্রভুর দিকে মুখ তুলে তাকায় তেমনি ভাবে তাকালো তার মুখের দিকে, গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তবে তা চোখে পড়লো না হার্গার্বির, আর চোখে পড়লেও অর্থ বুঝতে পারতো কি? আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে চোখের জল চোখে পড়ে নি নিঃসঙ্গ গুহাবাসীর।

কোথাও এগোবো বাবা, কার হাত জোড়া।

আরে কথাটার অর্থ বুঝলে না। ভিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা বা সামর্থ্য না থাকলে গেরস্ত ভিখারীকে বলে এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। আমারও সেই ভাব। তোমার সমস্যা মীমাংসা করবার সামর্থ্য আমার নেই—তাই বলছি এগিয়ে দেখো।

কোন দিকে এগোবো, শুধায় জরা।

সে কি দিকের অভাব কি? এই পাহাড়টা ঠিক হিমালয় নয় তবে হিমালয়ের শাখাপ্রশাখা বলতে পারো, উত্তর মুখে যতদূর খুশি চলে যাও সেই লৌহিত্য অবধি সমস্ত যোজনা পথ হিমালয়পর্বত। আর যদি পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামো তবে হাজার হাজার যোজন-ব্যাপী পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ। দেখো বিধাতা যত ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন তার ঔষধ। কেবল খুঁজে বের করবার অপেক্ষা। পাপ সম্বন্ধেও সেই কথা। পাপ থেকে মুক্তির রহস্যও নিহিত আছে এই মহাদেশে এই মহাপর্বতমালায়। কত মুনি-ঋষি জ্ঞানী গুণী যোগী তপস্বী আছেন কেউ তাঁদের সংখ্যা জানে না। যাও এগিয়ে যাও, সকলেরই যে হাত জোড়া থাকবে এমন নয়, কেউ না কেউ জানবেন তোমার মুক্তির পথ।

জরা বলে, পথ যে অন্তহীন।

আরে সেই তো সুবিধা, অন্তহীন বলেই কখনো অন্ত হবে না, কোথাও না কোথাও সন্ধান মিলে যাবে।

জরা প্রবোধ মানে না মাথা কুটতেই থাকে। ও কি করছ?

মরতে চেষ্টা করছি।

মূঢ়, মরে কেউ কখনো মুক্তি পায় না, বৃথা মাথা কুটলেও মুক্তির সন্ধান মিলবে না।

প্রভু, এত বড় পাপ কেউ কখনো করেছে?

ঐ তো আগে বলেছি তুমি পাপী কি পুণ্যবান সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।

আমাকেও পুণ্যবান বলবে এমন কি সম্ভব।

জরা এ বড় আশ্চর্য জগৎ, এখানে বোধ করি তাও সম্ভব। এই দেখো না কেন আমারই তো সন্দেহ ঘুচছে না।

এমন সময়ে বাইরে হুহু হুহু হুহু শব্দ শোনা গেল। হার্গার্বি বলে উঠল, ঐ আমার ছাগমাতা এসেছে দুধ পান করাতে, তুমি থাকলে ভয় পাবে, তুমি এবারে পালাও।

তারপরে কিঞ্চিৎ মৃদুভাবে বললে, চল্লিশ বছর পরে মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ বাস করলাম, কেন করলাম জানি না; ভিতরে এখনো কোথাও কাঁচা আছে। যাও যাও তুমি এখনি যাও।

আবার বাইরে শব্দ উঠল হুহু, হুহু, হুহু। হার্গার্বি ভিতর থেকে শব্দ করলো হুহু হুহু হুহু। অমনি পাথরের ফাঁক দিয়ে একটি বুনো ছাগল তুড়ুপ করে লাফিয়ে প্রবেশ করলো; শুয়ে পড়লো হার্গার্বি, আর ছাগলটা তার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো, বাঁটে মুখ লাগিয়ে সে দুধ পান করতে করতে হাত দিয়ে বার বার ইসারা করতে লাগলো জরাকে চলে যেতে। অগত্যা জরা গুহা থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

৪

জরা চলতে শুরু করলো। পথ, পথ, পথ। এ সংসারে আর সকলেরই অন্ত আছে, কেবল পথ অন্তহীন, অনাদিও বটে। পথ ধরে ধরে পৌঁছে দেয়, নিজে কোথাও পৌঁছয় না। অরণ্য পর্বত প্রান্তর কান্তার, নগর, জনপদ কিছুই বাধা দিতে পারে না, নদ নদী ঝরনা

ধূম ফিরেই তার পথে বাধা নয়। কোথাও সবুজ ক্ষেতের মধ্যে, কোথাও সূক্ষ্ম সূতোর মতো, কোথাও কেবল ছোট বড় উপলখণ্ডের দ্বারা চিহ্নিত দীর্ঘ দীর্ঘ অন্তহীন। পৌরাণিকগণ যে অনন্ত সর্পের কল্পনা করেছে এ বুঝি তারই কেউ হবে। আর সব-চেয়ে রহস্যময় পাহাড়ী পথ। দূর থেকে মনে হয় ঐখানে শেষ হ'য়ে গিয়ে শূন্যে মিশে গিয়েছে, কাছে যেতেই দেখা যায় পাহাড়টাকে বেষ্টন করে আবার সেই পথ। উপত্যকার যে নিম্নতম অংশে ঝরণা প্রবাহিত তারই ধার ঘেঁষে চলেছে, পথে আর ঝরণায় অন্তহীন প্রতিযোগিতা। অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় ঝরণাও শেষ হয়েছে আর একটা ঝরণায় মিশে, পথ চলতেই থাকে। নদী? তার উপ-রেও পথের জিত। নদীর শিখর আছে সঙ্গম আছে কিন্তু পথের? নদীতে নৌ-চলাচলের চিহ্ন থাকে না, পথেও কি থাকে? দিনের বেলায় হাজার পথিকের পদাবলী ধূলোয় উড়ে কোথায় বিলীন হয়ে যায়, ভোরবেলা আবার সদ্যজাত অকলঙ্ক অচিহ্নিত। তোমার শোক-তাপ থাকে পথে এসে দাঁড়াও, সমস্ত ভুলিয়ে দেবে, সুখে আনন্দে তুমি অধীর, পথে এসে দাঁড়াও দেখবে তাদের আর সে মূল্য নেই। তুমি যদি নিঃসঙ্গ হও পথ তোমাকে সঙ্গদান করবে, তুমি যদি সসঙ্গ হও পথ তোমাকে নির্জনতা দেবে। তুমি যদি পুণ্যবান হও পথের কাছে সেই শান্তি পাবে যা সমস্ত পুণ্যের লক্ষ্য। আর তুমি যদি পাপী হও, নদীস্রোত যেমন সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে নিষ্কলুষ করে দেয়, পথচলা তেমনি তোমার পাপের ভার নষ্ট ক'রে দিয়ে মুক্তির দিকে তোমাকে চালনা করবে। পায়ে পায়ে পথের জপমালা আবর্তিত করতে করতে চলো। জরা চলেছে।

এতদিন পর্যন্ত জরা মনুষ্যসমাজের অন্তর্গত ছিল, এবারে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার নিদারুণ মূর্তি দেখেছে নির্বাসিত অন্ধকার গুহাবাসী ছাগর্ষির মধ্যে। নিঃসঙ্গতাকে আর তার ভয় নাই। দিনে পথে চলে, রাতে পথে ঘুমোয়, কোনদিন একটা গুহা পেলে ধন্য মনে করে। খাদ্যও? মাঝে মাঝে পাহাড়ী-দের গ্রাম, যাত্রী আদমিকে দু'খানা রুটি একটু শাক দেওয়াকে তারা পুণ্য মনে করে। যেদিন পথে গ্রাম না পড়ে গাছে ফল তো আছেই। তাও যেদিন জোটে না, সেদিন অনাহারে। আর সমস্ত অভাব পূর্ণ করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝরণার ধারা। সেই অমৃত বারি থেকে তাকে বঞ্চিত করবে কে।

ছাগর্ষির পরামর্শ নিরন্তর বাজছে তার মনের মধ্যে—এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। কিন্তু কি ক'রে সে বুঝবে কার হাত পূর্ণ, কে দান করতে পারে তার কাম্য বস্তু। নিরন্তর মনে মনে জপতে থাকে আমি পাপী, কি গতি হবে আমার। কই এমন তো কাউকে চোখে পড়ে না যার কাছে হাত পাতা যায়, সকলকেই তার মতো প্রার্থী মনে হয়। একদিন সে দেখতে পেলো পথের পাশে বিশ্রাম করছে একজন প্রবীণ ব্যক্তি, ভাবলো সাধু-সন্ন্যাসী হবে। তার কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে বলল, বাবা, আমি মহাপাপী, আমার কি গতি হবে?

লোকটি হেসে বল্‌ল, আমার চেহারা দেখে বুঝি সাধু-সন্ন্যাসী মনে হ'চ্ছে। না বাপু, আমি ব্যবসায়ী, কালকে রাতে লুঠেরা আমার সমস্ত মালপত্তর লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে। এখানে বসে বিশ্রাম করছি। আমি কি উত্তর দেবো তোমার জিজ্ঞাসার।

জরা অবাক হয়ে ভাবে এই পাহাড়ের মধ্যেও ব্যবসায়ী আছে, লুঠেরা আছে। অবাক হ'য়ে আবার চলতে থাকে।

আর একদিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়লে তার হাসি পায় যদিচ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হ'তে পারতো। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় চোখে পড়লো পথের পাশে গাছের ছায়ায় একদল লোক কালো কম্বল গায়ে চক্রাকারে বসে আছে। তার ধারণা হ'ল তীর্থ-যাত্রী সাধুর দল হবে, রাতের মতো আড্ডা গেড়েছে। ভাবলো ভালোই হ'ল, এদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে, আর সাধু সঙ্গে একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে তার জিজ্ঞাসার। পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে সেই দিকে চলল, যখন খুব কাছে এসে পড়েছে, পায়ের হয়তো শব্দ হ'য়ে থাকবে, তখন সেই সাধুদের একজন মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখ্‌লে, সে-ও দেখ্‌লে আর তখনি এক দৌড়ে পথের উপরে এসে বসে প'ড়ে হাঁফাতে লাগলো। সাধু নয় এক পাল ভালুক। ভাবলো আর একটু হ'লেই চরম গতি হ'য়ে যেতো। পরে এ কথা মনে করে হেসেছে কিন্তু তখন কাঁপুনি থামতে চায় নি।

জরার পথ চলার আর বিরাম নাই। সকালবেলা সূর্য্য দেখে দিক স্থির ক'রে নেয়, পূব দিকে হিমবন্ত, দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এই দুই দিক তার গন্তব্য, আপাততঃ হবে। শাখা-প্রশাখা ছেড়ে নিজ হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। ছাগর্ষির কাছে শুনেছিল সেখানেই নাকি জীবনের সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা সঞ্চিত। সেই খনি থেকে রত্ন উদ্ধারের আশাতেই আবহমান কাল মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের সেখানে ভিড়। মনে পড়লো সংসারে থাকতে কার কাছে যেন শুনেছিল পাঁচভাই পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করলো—সেও তো এই হিমালয়ের দিকে। সকলের সব প্রশ্নের উত্তর জানে এই আদি বৃদ্ধ, তার প্রশ্নের উত্তরটাই কি তার অজানা? আমি পাপী, কি গতি হবে আমার।

কালের মাত্রা ভুল হয়ে গিয়েছে জরার। সূর্য্যোদয়ে দিন, সূর্য্যাস্তে রাত্রি—এইটুকু মাত্র জানে। সপ্তাহ মাস বৎসর আর সব মাত্রা হারিয়ে গিয়েছে তার মন থেকে। একদিন পল্বলে স্নান করতে নেমে ছায়া দেখে চমকে উঠ্‌ল, এত লম্বা চুল দাড়ি কার? তবে তো অনেক বছর পার হ'য়ে গিয়েছে। হয়তো চার পাঁচ বছর হবে, এতদিন গেল তবু মিললো না তার প্রশ্নের উত্তর। এতদিনেও এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না যার হাত পূর্ণ। সংসারে কি তবে সকলেরই হাতজোড়া। হতাশ হ'য়ে মাটিতে বসে পড়ে।

ভারতের সাধক

শঙ্করনাথ রায়ের

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত জীবনী-গ্রন্থমালা

প্রথম হইতে দশম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

একাদশ খণ্ড যন্ত্রস্থ

প্রকাশিত হলো

ভারতের সাধিকা ॥ শঙ্করনাথ রায়

স্বামী নির্লেপানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন ৫৲ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে ৭৲

স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন ৫৲ [illegible] ৭৲

CENTRAL LIBRARY

জগা পথে পথে চলছেই, কখনো উপত্যকা কখনো অধিত্যকা, কখনো প্রান্তর, কখনো কান্তার। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই, কখনো জনপদ, কখনো নির্জন, এমন করে কি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। বেহুঁস ভাবে আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। তবে দৃশ্যপট যেমনি হোক মুখে তার এক বুলি, আমি পাপী, আমার কি গতি হবে, পাপীর কি মুক্তি নাই। পথে যার সঙ্গে দেখা হোক রাজা কি রাখাল, মানুষের তো দু-ই ছিল, শুধায় আমার কি গতি হবে। তারা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে দেখে চলে যায়। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় সাধু কি ভণ্ড, শুধায় পাপীর কি মুক্তি নাই। কেউ স্নেহের চোখে দেখে, কেউ সন্দেহের চোখে দেখে চলে যায়। কেউ বলে বাউরা, কেউ বলে পাগলা, কেউ বলে লোন্ডা, কেউ বলে মহাত্মা আদমি কিন্তু আসল কথার উত্তর দেয় না।

একদিন জগা গিয়ে উপস্থিত হল এক পাহাড়ী গাঁয়ে, সেখানে কি একটা পরব চলছিল। জটাজুট শ্মশ্রুসমন্বিত জগাকে তারা সমাদর করে বসালো। খেতে দিল, এমন খাদ্য অনেককাল সে পায়নি, তারপরে বিদায়ের সময়ে একখানি ধুতি আর পশমী গায়ের কাপড় দিল। এ দুটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার পরিধেয় ও গায়ের কাপড় লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। তবে এ তিনের কোনটারই বোধ ছিল না তার। বিদায়ের সময় একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে শুধালো, বাবা, আমি পাপী আমার কি গতি হবে।

সে ব্যক্তি বলল, সাধুজি, আপনার মতো সাধু যদি পাপী হন, তবে আমাদের গৃহীদের কি আর পাপের অন্ত আছে। আপনার নৌকোর ফুটো হয়ে গিয়েছে আর আমাদের নৌকা তো অনেকদিন বানচাল।

তবে চলছে কি করে?

একে কি আর চলা বলে। এ-যে তলিয়ে যাওয়া।

তবে এত হাসি গান পরব কিসের।

সাধুজি, কি আর বলবো, এসব মুমূর্ষুর বিকার।

জগা ব্যাকুল ভাবে শুধায়, তবে আমার প্রশ্নের মীমাংসা কার কাছে পাবো?

কেমন করে বলবো বাবা, তবে কি জানেন, পরমাত্মা কৃপা করলে নিশ্চয় মীমাংসা হবে আপনি এগিয়ে দেখুন।

জগা শোনে সেই পুরাতন উত্তর এগিয়ে দেখা হাত জোড়া। ভাবে হাত জোড়া হবে না কেন? হাত যে সুখের উপাদানে পূর্ণ। সে আবার এগিয়ে চলে।

সেদিন ভোরে যখন পথ চলতে সুরু করেছে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি। এসব স্থানে ভোরের কুয়াশা একটা নিত্যকার ব্যাপার। সেই প্রায়ান্ধকারে কার সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। জগা বলে উঠল, বাবা আমি পাপী আমার কি গতি হবে। অন্য সময় দেখেছে প্রশ্ন শুনে লোকে পাশ কাটিয়ে যায়। এবারে পাশ কাটালো না। জগা ও সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। বাবা পাপীর কি মুক্তি নেই? কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে এলে দেখতে পেলো একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। ভাবলো ক্ষতি কি? একদা পাথর ভেদ করেই তো নৃসিংহ-মূর্তিতে নারায়ণ প্রকাশ পেয়েছিলেন। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে না। আমি কি হিরণ্যকশিপুর চেয়েও নরাধম। জগার আবার সুরু হল চলা।

একদিন দেখতে পেলো নদীর তীরে, যেখানে সেখানে হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে গিয়ে নদীর বিস্তার লাভ করেছে, এক সাধু উপবিষ্ট। তাকে প্রণাম করে সেই চিরন্তন প্রশ্ন শুধোলো, বাবা, পাপীর কি মুক্তি নেই? সাধু তাকে নিরীক্ষণ করে বলল, বসো। জগার আশা হল। এপর্যন্ত কেউ তো বসতে বলেনি। দেখল সাধুজি একটা ছোট কল্কে যথারীতি সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বেটা পিও তেরা মুক্তি মিল যায়গা।

জগা বলে, আগে বাবা প্রসাদ করে দিন।

সাধু একটান দিয়ে তার হাতে কল্কে দিল।

জগা বাল্যকাল থেকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি যাবতীয় নেশা পারঙ্গত, কিন্তু একি পাহাড়ী গাঁজা বাপ, একটান দিয়েই তিনদিন অচেতন। তিনদিন তিন রাত পরে যখন সে প্রথম চোখ মেলল সাধু শুধালো কি বেটা শান্তি মিলল?

জগা বলল, অচৈতন্য অবস্থায় শান্তি পেয়েছিলাম, এখন আবার অশান্তি।

সাধু বলল, বেটা সংসারে শান্তি কোথায়? সংসার পাপের আগার। মুক্তি বলো শান্তি বলো সমস্তই এই এর মধ্যে—এই বলে গাঁজার কল্কেটি দেখালো।

জগা শুধায়, তবে হিমালয়ে হাজার হাজার যোগী মুনি ঋষির ভিড় কেন? গাঁজা তো সংসারেও মেলে।

মেলে বইকি, তবে তা পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আর হিমালয়ে তা পথেঘাটে জন্মে রয়েছে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র; তাছাড়া এ দেবলোকের গাঁজায় দৈবগুণ প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলি বেটা।

তা পেলাম বাবা, কিন্তু আমার মীমাংসা তো পেলাম না। এ মুক্তি ক্ষণিক, আমি চাই স্থায়ী মুক্তি।

তখন সাধু বলল, এগিয়ে যা, আর কিছুদূর গেলেই হিমালয়ের আরম্ভ, সেখানে প্রথমেই মিলবে কিন্নর রাজ্য। সেখানে তোর স্থায়ী মুক্তি মিলবে—এই বলে সাধু অস্থায়ী মুক্তির আয়স্বরূপ কল্কেটিতে মনোনিবেশ করলো। আশান্বিত জগা ত্বরান্বিত পদে কিন্নর রাজ্যের দিকে যাত্রা করে।

কয়েকদিন পথ চলবার পরে জগা বুঝতে পারলো, জগার মতো উন্মত্ত লোকের পক্ষেও সহজবোধ্য হল যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে সুরু করেছে। চড়াইগুলো এখন বেশি খাড়া, উৎরাইগুলো বেশি ঢালু, উপত্যকাগুলো গভীরতর, শিখরগুলো উচ্চতর, দিনমান তেমন আর গরম নয় রাত্রি শীতলতর, যখন-তখন কুয়াশা এসে সমস্ত অবলুপ্ত করে দেয়, মেঘের দল নীচের দিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে, আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তারাগুলোর কি স্বচ্ছতা, আর পাহাড়ের গায়ে ঋজু সুঠাম সরল গাছগুলো থাকে থাকে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে একেবারে শিখরের চূড়ান্ত অবধি। দেওদার, ধূপ, কিত্ প্রভৃতি কয়েকটা গাছ বাদ দিলে অধিকাংশ গাছপালা তার অপরিচিত। আর উপত্যকায় যে ঘন সবুজ তৃণ তাদের রঙটি এমন গাঢ় এমন নবীন মনে হয় বসলে কাপড়ে ছোপ লেগে যাবে। জগার চোখ কিছুদিন থেকে পাহাড়ে অভ্যস্ত হলেও এ দৃশ্য তার চোখে নূতন। এ পাহাড় নয়, পর্বত।

এতকাল যে-সব পাহাড়ে পাহাড়ে জগা ঘুরেছে, সে-সব হিমালয়ের শাখাপ্রশাখা হলেও তার গৃহীরূপ। এবারে যেখানে এসে পৌঁছল জগা সেখানে হিমালয় গৃহত্যাগী মহাযোগী। হিমালয়ের দুর্ধর্ষ, দুর্বার, দুর্ভেদ্য, দুরারোহ তুষারশুভ্র শৃঙ্গ দেখেই কি প্রাচীনেরা ধূর্জটির কল্পনা করেছেন! আর উমা? সে তো নবীন কোমল তটিনী-তরঙ্গ শ্যামলঘন শস্যসুন্দর উপত্যকাগুলি। উপত্যকা, অধিত্যকা বিবিক্ত শিখর এবং নিবিড় অরণ্য গায়ে গায়ে সংযুক্ত থেকে যে বিস্ময় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে কে নিশ্চয় করে বলতে পারে তা-ই হর-গৌরী পরিকল্পনার মূলে নয়? হিমালয়ের প্রতিটি শৃঙ্গ স্বর্গারোহণের এক-একটি সোপান, এখানকার বায়ুতে, জলে, ফুলে, ফলে আয়ু এবং অমৃত। অমৃত মুক্তির সোপান। সেখানে আজ প্রবিষ্ট জগা।

এতদিন একটা ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই করে যেন চলছিল জগা, পাদুখানা তাকে বহন করতো না, তাকেই টেনে নিয়ে যেতে হতো পাদুখানাকে। এখন যেন তার অদৃশ্য পাখা গজিয়েছে, উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে; এখানকার বায়ুতে এমন একটা আশ্বাস অনুভব করলো মনে হল যোড়টা ঘুরলেই দুর্লভ মুক্তি। কিন্তু মূর্খ জগা জানতো না যে, ধূর্জটির তপোবনে নন্দী ভৃঙ্গী দ্বাররক্ষী। নন্দীর দাবির শাসন, ভৃঙ্গীর ত্রাসন। একজন স্বর্ণবেত্র উঁচিয়ে করে, অপরজন নানা উপায়ে ভয় দেখিয়ে আগন্তুককে নিবারিত করে। এদের হাত থেকে ছাড়পত্র পেলে তবেই প্রবেশের অধিকার, তবেই শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি; ও দুটী দুষ্টা দিক; মাহেশ্বরের বিভূতি।

খাড়া চড়াই উঠতে উঠতে আরও উঠতে হবে যখন প্রত্যাশা করছে, হঠাৎ দেখল হঠাৎ চড়াই-এর উচ্চতম স্থানটা একেবারে সমতল হয়ে গিরিশিখরগুলোর দিগন্ত অবধি প্রসারিত। জগা এসে উপস্থিত হয়েছে একটি অধিত্যকায়—যেখানে নাকি সেই সাধু-কথিত কিন্নর রাজ্য।

উচ্চাবচ পাহাড়ের মধ্যে সমতল অধিত্যকা দেখে জগা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, তারপরে যখন তার চোখে পড়লো সেই সমতলে সুন্দর একটি নগর, সুরম্য অট্টা-

লিকা, উদ্যান, বিপণি, ফোয়ারা, শ্বেত-পাথরে ঘাট বাঁধানো সরোবর, সরোবরে নীল রক্ত উৎপল, পথের দুদিকে বকুল, শিরিষ, চম্পক, কামিনী প্রভৃতি সপুষ্পক ফুলের গাছ, তখন তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময় একেবারে চরমে উঠল নগরের অধিবাসীদের দেখে। সকলেই তরুণ-তরুণী, শিশু, বালক-বালিকা কিশোরীও আছে, তবে তারা তো তারুণ্যের কুঁড়ি, ফুটে উঠলেই তরুণ-তরুণী। একটিও বৃদ্ধ চোখে পড়লো না তার, আর একটিও কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ, রূপ ও যৌবন যেন এ-রাজ্যের নির্যাস। তখনি সাধুর আশ্বাসে মনে পড়লো, হাঁ এখানে পাপের মুক্তি, পাপীর শান্তি মিললে মিলতেও পারে।

সে এগিয়ে গিয়ে সরোবরের ঘাটে উপস্থিত হল, দেখলো, কয়েকজন তরুণী সম্পূর্ণ বিবসন অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, পাছে তরঙ্গ জলে এতটুকু আবরণের কাজ করেনি। আর কয়েকজন স্খলিত-বস্ত্র তরুণী ঘাটে বসে সোনার লোষ্ট্র-খন্ড দিয়ে পা ঘসছে, কেউ বা সোনার দর্পণে মুখ দেখছে, আর কেউ বা মেঘমুক্ত কেশগুচ্ছে তেল মাখছে যার সুগন্ধ, কেশের গন্ধে আর তেলের গন্ধে মিলে অধিকতর মনোজ্ঞ, এতদূরে এসে নাসায় প্রবেশ করছে জরার। তাকে কেউ দেখল কিনা বুঝতে পারলো না, আর দেখে থাকলেও জিজ্ঞাসা বা বিকার জাগলো না তরুণীদের ব্যবহারে। ঘাট থেকে দূরে এক জায়গায় জলে নেমে আকণ্ঠ জল পান করে যখন সে উঠল, মনে হল জল নয় অমৃত। অমৃত কখনো পান করেনি বটে, তবে এই-রকম হওয়াই সম্ভব।

তারপরে সে একটি বীথিকা-পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। সে দেখতে পেলো পথটির একদিকে বকুল, শিরিষ চাঁপা, অন্য দিকে কদম, শিউলি, লোধ্র, আরও দেখতে পেলো উদ্যানে মল্লিকা যূথী, চামেলি, কুন্দ বিভিন্ন ঋতুর ফুল প্রস্ফুটিত। এমন তো কোথাও দেখেনি, তবে আগে তো বিস্ময়-রাজ্যেও আসেনি। এমন সময়ে দেখতে পেলো তিনটি তরুণী, তিনটি স্বর্ণ-প্রতিমা নিষ্কলঙ্ক তুষারের উপরে প্রথম সূর্যরশ্মির আভা তাদের রঙে, তার দিকে আসছে।

সাহসে ভর করে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি বিস্ময় রাজ্য?

তরুণীদের একজন বলল, হাঁ।

তার ব্যবহারে লজ্জা ও সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না, খুব সম্ভব ও দুটি শব্দ নয় ঐ ভাবনাটির সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই।

আর একজন বলল, তোমাকে তো বিদেশী মনে হচ্ছে, কোথা থেকে আসছ?

জরা বলল, সে অনেক দূর, অনেক সময় লেগেছে এখানে পৌঁছতে।

দেশ ছেড়ে কেন এখানে এলে?

সে অনেক কথা শুনে লাভ নাই। আমি দেশে দেশে, এখন পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি মুক্তির আশায়। আমি পাপী, মহাপাপী, আমার কি গতি হবে তোমরা বলতে পারো।

তৃতীয়া বলল, এ-রাজ্যে এরকম কথা এই প্রথম শোনা গেল।

বিস্মিত জরা বলে, সে-কি, পাপ-পুণ্য এসব কথা কি তোমরা শোনোনি?—তার মনে পড়ে যায় সুবালাকে, সে-ও তো এই রকম চমকে উঠেছিল।

তরুণীদের একজন বললে, ওসব শব্দ আমাদের দেশে অজ্ঞাত, পাপ পুণ্য কাকে বলে?

আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো একজন মানুষকে খুন করলাম, নরহত্যা মহাপাপ।

কিন্তু হঠাৎ হত্যা করতে যাবে কেন?

মনে করো লোভে।

ওদের একজন বলে, লোভ হবে কেন?

জরা বলে, মনে করো তার ধনরত্নে আমার লোভ।

ওরা বলে, আমাদের দেশে ধনরত্ন যথেষ্ট আছে কিন্তু সেসব কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

তবে! বিস্ময় প্রকাশ করে জরা।

তবে আর কি যার যা প্রয়োজন নেয়।

কেউ বাধা দেয় না?

কে বাধা দেবে? আমাদের দেশে রাজা নেই, রাজশাসন নেই—ওসব ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

আচ্ছা ধনরত্ন থাক। মনে করো কারো সুরম্য একটা অট্টালিকা বাড়ী আছে, তার লোভে হত্যা করলাম।

দেখো বিদেশী, এদেশে সকল হর্ম্যই সুরম্য কিন্তু তাও কারো ব্যক্তিগত নয়, যার যেখানে খুশী বাস করছে।

জরা বলল, আচ্ছা বাড়ীও থাক। কারো সুন্দরী নারী আছে তার লোভে স্বামীকে হত্যা করলাম।

এবারে সুন্দরীরা হেসে উঠল, বলল, দেখতেই পাচ্ছ এদেশে নরনারী সকলেই সুন্দর। কিন্তু তাদের মধ্যেও সম্বন্ধ ব্যক্তি-গত নয়।

কেন বিবাহপ্রথা কি তোমাদের নাই?

না, যে যার সঙ্গে খুশী বাস করছে তাকে ভালো না লাগলে আবার আর এক-জনের সঙ্গে গিয়ে বাস করছে।

জরা শুধায়, তাদের সন্তান হলে?

সন্তান হয় বইকি? তবে তারাও কারো ব্যক্তিগত নয়?

তবে কার?

সকলেই এই বিস্ময় রাজ্যের নাগরিক। একটু বয়স হলেই তারা যথেচ্ছ বিচরণ করে।

বিস্ময়ের ধমকে জরা নির্বাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে তরুণীদের একজন উচ্চ-স্বরে ডাকে, তুহিন, এদিকে এসো।

জরা দেখে তার ডাক শুনে একজন সুন্দর যুবক এগিয়ে আসে। সে লোকটি কাছে এলে সেই তরুণীটি বলে, তুমি আজ রাতে আমার কাছে থাকবে।

তুহিন নামে সেই যুবকটি বলে, নবীনা, তোমার কাছে থাকতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আগেই যে আরতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তুমি কেন আজকার মতো আর কাউকে বলো না।

প্রিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার জয়-জয়কার! আপনার সান্নিধ্য মধুর হবে সবার কাছে।

কসমেটিক ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর দিল্লী মাদ্রাজ পাটনা

তাই হবে গন্ধর্বকে না হয় বলবো।

জরা তাদের কথোপকথন শুনে ভাবে এরা কি বাতুল নাকি?

এবারে তুহিন লক্ষ্য করে জরাকে, শুধায় একে তো আগে দেখিনি।

নবীনা বলে, বিদেশী লোক।

এখানে কেন?

পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় লোকটা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তুহিন বলে, তার মানে মাথা খারাপ।

জরা আর নীরবে থাকতে পারে না, বলে, মাথা খারাপ কার? আমার না তোমাদের?

কেন বলো তো, শুধায় তুহিন।

কেন আবার কি! তোমাদের এখানে দেখছি নীতি বিবেক ধর্ম রাজশাসন কিছুই নেই।

তুহিন বলে, সত্যই ওসব কিছু নেই, তবু তো দেখো আমাদের আনন্দে চলে যাচ্ছে।

জরা বলে, এখন যাচ্ছে বটে, যৌবনে ওরকম মনে হয় কিন্তু বয়স হলে দেখতে পাবে যে......

বাধা দিয়ে তুহিন বলে, বয়স তো কম হয়নি আমাদের। আমার বয়স দেড়শ বছর, আর এই সুন্দরীদের বয়স একশ পঁচিশ তিশ হবে।

কি যতসব বাজে কথা বলছ। তোমার বয়স খুব বেশি হবে তো পঁচিশ তিশ, আর এই তরুণীদের কিছুতেই পঁচিশের বেশি নয়।

তুহিন বলে, তোমার কাছে মিথ্যে বলার কি লাভ?

জরা বলে, তবে দেখছি তোমাদের চির-যৌবন।

এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ, কিন্নররাজ্যে চিরযৌবন।

এ কেমন করে সম্ভব হল।

খুব সহজে। এই তো একটু আগে বিস্মিত হয়েছিলে আমাদের এখানে কারো শাসন নেই, না রাজার না সমাজের। ওসব নেই সত্য, তবে এক শাসন আছে, সে শাসন স্বভাবের।

সে আবার কি?

স্বভাব যদি তার বিধিনির্দিষ্ট পথটি পায়, কোন বাধা না আসে, কেউ বাধা না দেয় তবে মানুষ চিরানন্দময় হয়। চিরানন্দময়ের আবার জরা মরণ কি? সে তো চির-যৌবন চিরজীবী।

চমকে উঠে জরা শুধায়, বলো কি! তোমাদের কি মৃত্যু নেই?

না। মরবে কেন? কেন জীর্ণ হবে মানুষ!

জীর্ণ হবে কারণ আধিব্যাধি জরা নিরন্তর তার জীবনরস শুষছে। সাধ্য কি মানুষ চিরযৌবন চিরজীবী হয়।

সে তোমাদের দেশের নিয়ম হতে পারে। তোমরা স্বভাবের পথে ধ্যানধারণা পাপ-পুণ্য নীতি বিবেক ঈশ্বর পরকাল স্বর্গ নরক প্রভৃতি এনে ফেলেছ, তাই স্বভাব বিধিনির্দিষ্ট পথটি না পেয়ে কখনো শুকিয়ে মরে কখনো রুগ্ন ক্ষীণ। তোমরা নানুষ কুব্জ মুন্ড জীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে পড়ো। মরণ তো ভালো, এইসব থেকে মুক্তি দেয়।

স্বভাবের নিয়ম বলতে কি বোঝায়?

এতো সহজ। মন যা চাইবে প্রাণ যা চাইবে ইন্দ্রিয় যে পথে যেতে চাইবে বাধা দিয়ো না। মন নারী চায় ভোগ করো, সুখাদ্য চায় ভোগ করো, ধনরত্ন চায় ভোগ করো, নৃত্যগীত বিলাস চায় ভোগ করো, দেখবে জরা মৃত্যু দুঃখ পাপ ঘেঁষতে পারবে না।

জরা হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে এক-খানা শিলাসনে বসে পড়ে, আপন মনে বলতে থাকে, তবে তো দেখছি এদের কাছে মুক্তির উপায় মিলবে না। এরা স্বভাবত মুক্তজীব, বন্ধন না মানলে মুক্তির উপায় জানবে কি করে? তবে তো সাধুজী ভুল সংবাদ দিয়েছেন।

তুহিন বলল, কোন সাধু তোমাকে কি সংবাদ দিয়েছে জানি না, কোন সাধু সন্ন্যাসী আমাদের দেশের রীতিনীতি জানে না, সত্য কথা বলতে কি এখানে তাঁদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ। তুমি যে কিভাবে প্রবেশ করলে বুঝতে পারছি না।

জরা বলল, তোমাদের রীতিনীতি তোমাদের থাক। আমার কি গতি হবে তাই ভাবছি।

দেখো বিদেশী, তোমার গতি তারাই বলতে পারবে যারা ঐ পথের পথিক। কিন্নর রাজ্য আধিব্যাধি জরামরণহীন আনন্দময় চিরযৌবনের দেশ—বলল তুহিন।

জরা স্বগতভাবে বলে, এমন রাজ্য যে পৃথিবীতে আছে জানতাম না।

তোমার কথা এক হিসাবে সত্য। এ রাজ্য পৃথিবীর অন্তর্গত নয়। এ রাজ্যের অবস্থিতি পৃথিবী ও স্বর্গের ঠিক সীমান্তে। আর এক ধাপ অগ্রসর হলেই নন্দনলোক।

তবে তোমরা আর এক ধাপ এগিয়ে সেখানে যাওনা কেন? শুধায় জরা।

মনুষ্যদেহধারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ, শুনেছি মহারাজ যুধিষ্ঠির সেখানে সশরীরে যাবেন।

তোমরা দেখছি যুধিষ্ঠিরকে জানো। তাহলে নিশ্চয় বাসুদেবের নাম শুনেছ।

তুহিন বলে, কি বলছ তাঁর নাম কে না শুনেছে? তবে কি জানো আমরা বাসু-দেবের ভক্ত নই, আমাদের আরাধ্য ব্রজের কৃষ্ণ, সেই চিরানন্দময় চিরকিশোর।

তবে যে বললে তোমরা ঈশ্বর মানো না।

কে বলল মানি না! আমরা মানি ভগবান আছেন। আছেন তো আছেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরি না।

তবে কেন কৃষ্ণকে স্বীকার করো।

স্বীকার করি সখা বলে, বন্ধু বলে, আমাদের আনন্দের সঙ্গী বলে, ভগবান বলে নয়।

আমি তো তোমাদের ভাবগতিক কিছুই বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণকে মানো বাসু-দেবকে মানো না। এ দুই কি আলাদা!

সহজ কথাটা সহজে বুঝতে না পারা তোমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বিদেশী। যে রূপে তিনি গোপিনীদের সখাদের ব্রজ-বাসীদের আনন্দ দিতেন আমরা তাঁর সেই চিরকিশোর রূপটি মানি। বাসুদেব রূপে তো তিনি আনন্দময় নন। তখন তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ধনুকখানায় জ্যা আরোপণ করেছেন, তখন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রদ্রষ্টা, চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রপতি, তখন তিনি বিশ্বমূর্তি। ঐ মূর্তি দেখে মহাবীর অর্জুন অবধি ভীত হয়েছিলেন। বিশ্বরূপের বদলে বন্ধুরূপে দেখা দিতে মিনতি করেছিলেন কৃষ্ণকে। তবু যদি ও রূপ মর্ত্যের মানুষের যাদের সমস্যা অসংখ্য, আর সেই অসংখ্যের নাগপাশ থেকে যারা মুক্তি-প্রয়াসী।

তুহিনকে বাধা দিয়ে নবীনা বলল, বিদেশীর স্নানাহার হয়নি দেখছি, তার ব্যবস্থা করে দাও।

জরা বলল, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি ঐ সরোবরের জলপান করেছি, জল তো নয় অমৃত, ওতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই মিটেছে। এখন আমাকে বিদায় দাও।

কোথায় যাবে?

পথ যেখানে নিয়ে যায়।

পথ কি তোমার মুক্তির খবর রাখে?

হয়তো রাখে না, তবু পথ ছাড়া আমার আর গতি কি? পথে পথে ঘুরে ঘুরেই জীবন কাটাবো যদি কখনো তেমন লোকের সাক্ষাৎ পাই। তেমন কাউকে তোমরা জানো?

তুহিন বলল, শুনেছি হিমালয়ের কোনখানে আশ্রম স্থাপন করে বিরাজ করছেন চারুবাক নামে ঋষি। যদি ভাগ্যে থাকে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিলেও দিতে পারেন।

কি নামটি বললে, আর একবার বলো।

ঋষি চারুবাক।*

চারুবাক—না আর ভুল হবে না, চললাম। এই বলে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে জরা আবার পথ চলতে শুরু করলো।

জরার বিদায়ে চিরানন্দ লোক থেকে রাহুর উপচ্ছায়া অপসারিত হল। (ক্রমশঃ)

---

*মহাভারতে পাওয়া যায় যে দুর্যো-ধনের চার্বাক নামে এক বন্ধু ছিলেন। এই 'বাক্যবিশারদ' দার্শনিককে বোধকরি Sophist বললে অন্যায় হয় না। তিনি বেদবিরোধী ছিলেন বলে বেদবাদী ঋষিগণ তাঁকে বলেছেন চার্বাক রাক্ষস। খুব সম্ভব চার্বাক শব্দটি চারু-বাক্ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে অনেকের কাছে তার বাক্য সুন্দর মনে হতো। সম্ভবতঃ চারুবাক, চার্বাক শব্দের মধ্যে এই ইতিহাস লুপ্তাকারে থেকে গিয়েছে। মহাভারতের সমাজ, পৃঃ ৬৫৭, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

(ক্রমশ)

অঙ্গনা

পরিস্থিতি : মানসিকতা

বিয়ে করাটা সামাজিক কর্তব্য। একদিন এটাই ছিল সমাজ-জীবনের ন্যূনতম বিধান। সেদিন ছেলে বা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজন এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত বসে থাকতেন না। উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করে বিয়ের পাটটা চুকিয়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত। এজন্য তোড়জোড় সব শুরু হয়ে যেতো সেই কবে থেকে, বলতে গেলে প্রায় মেয়ের জন্মের পর থেকেই। ছেলের জন্য অতটা ভাবনা ছিল না। দায় হলো মেয়ের বাপের। মেয়ে বড়ো হলে তিনি যেচে আসবেন ছেলের কাছে। ছেলের বাপ পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি আরামে বসে থাকতেন। মেয়ের বাপ খোঁজ-খবর নিয়ে ছেলের বাপের কাছে হাজির হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের আবেদন পেশ করতেন। সহজে সেই আবেদন মঞ্জুর হতো না। হাজার কথার আদানপ্রদান যার মোদ্দা কথা কি না দেনাপাওনা নিয়ে চুলচেরা বিচার হতো। দরাদরিটা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় কসাইয়ের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতো। যার সঙ্গে দুদিন পরে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হবে তার সঙ্গে এমনিভাবে চলতো প্রাথমিক পরিচয়ের পালা।

সেদিন 'উপযুক্ত' ছেলে বলতে বাপের আর্থিক অবস্থার দিকেই নজর রাখা হতো বেশি। লেখাপড়া বা ছেলের রোজগারের উপর খুবএকটা ভরসা করা হতো না। আর এরকম সম্পর্ক স্থাপনে ছেলে বা মেয়ের মত ও কোনো প্রাধান্য পেতো না। দুপক্ষে লেন-দেন পাকাপাকি হয়ে গেলে নির্দিষ্ট দিনে ছেলেকে হাজির থাকতে হতো। মেয়ের তো কোন কথাই নেই। তাকে হাজির রাখার দায় বাপ-মা আর আত্মীয়স্বজনের। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের আগে একজন আর একজনকে দেখতেও পেতো না। এমনিভাবে সেদিন স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্কটি স্থাপিত হতো।

সেদিনের রেওয়াজ ছিল মেয়ে মানেই দায়। তাই মেয়ের বাপ-মায়ের চোখে ঘুম থাকতো না মেয়ে বিয়ের যোগ্য হলে। ছেলের বাপের কাছে তাঁদের কম হেনস্থা হতে হতো না। এরকম অনেক কাহিনীই আমাদের জানা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা যে, চেষ্টাচরিত্র করলে সেদিন বিয়ের ব্যাপারটা মিটতে খুব একটা অসুবিধা হতো না। মেয়ের কথা ছেড়ে দিলেও ছেলে জানতো যে বিয়ের ব্যাপারে তার কোন ওজর-আপত্তি খাটবে না। কারণ তার দায়িত্ব যেমন মা-বাবার তেমনি বউয়ের দায়িত্বও প্রথমদিকে তাঁরাই বহন করবেন। ভবিষ্যতে অবশ্য সব দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। আর সেও অনেক পরের কথা। সুতরাং প্রচলিত সংস্কারকে সে গ্রাহ্য করেই চলতো। এবং চলা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। না হলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কানাঘুষো চলবে। নানা কথা রটবে। বাপ-মায়ের অসম্মান হবে।

সে ছবি আজ পুরোপুরি বদলে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে এবং ছেলে দুজনেরই মত এখন সমান প্রাধান্য পায়। তাই বিয়ের ব্যাপারটাও এখন জটিল হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই মেয়ে বা ছেলের বিয়ে চুকিয়ে ফেলা যায় না। আজকাল বিয়ের পরই স্ত্রীর সব দায়িত্ব স্বামীকে গ্রহণ করতে হয়। তাই রোজগারের দিকটা আগে ভেবে নিতে হয়। এই রোজগারের কথা ভেবে অনেকেই বিয়ে থেকে পিছিয়ে আসছে। চট করে বিয়ের আসনে বসতে চাইছে না। আবার মেয়ের দিক থেকেও বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত মেয়ের বাপ। এখন মেয়ে মানেই আর দায় নয়। মেয়েও লেখাপড়া শিখছে। ছেলের মতোই রোজগার করছে। মা-বাবার সুখ-সুবিধার দিকে পুরো নজর রাখছে। পুরাতন কালের গৌরী-দানের প্রথা আর নেই। তাই ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই বয়স বাড়ছে। এর ফলে বিয়ের পর আগেকার সেই সুখ এবং সাবলীল জীবনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সে জীবন যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এ জন্য ছেলেরা দায়ী। বিয়ের কথা শুনলেই যেন তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোন মতেই সময় থাকতে তারা বিয়ে করতে রাজি হয় না। সেই বিয়ে করে সময় পেরিয়ে গেলে। মেয়েদের দোষ এদিক থেকে ততটা নয়। লেখাপড়ার প্রসার ঘটলেও মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে সংসারের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু অপর পক্ষ সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। তাই তাদেরও অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অথচ মেয়েদের অনেকেই আজকাল রোজগার করছে। তারা যে সেই আদিকালের মতো ছেলেদের চিরস্থায়ী বোঝা তাও নয়। বরং অনেক পরিবার এখন স্বামী এবং স্ত্রীর রোজগারেই চলছে। একার আয়ে সংসার চালানো যায় না। তাই দুজনকেই রোজগার করতে হচ্ছে।

এই সুযোগ এখন অনেকে নিচ্ছে। বিয়ের কথা উঠলেই ছেলেরা খোঁজ করে

বাংলা ভাষায় এই প্রথম !!

গোবিন্দ বিশ্বাসের

সিফিলিস

১৫·০০

লেখককে ধন্যবাদ তাঁর এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য।

—ডাঃ এইচ এন ঘোষ, এম-বি-বি-এস, ডি-ফিল, পি এইচ ডি (বেলফাস্ট), শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ।

ডাক্তারী শাস্ত্রের এমন বিশদ সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা বাংলা ভাষায় লেখা আমার চোখে পড়ে নি।

—ডাঃ পি কে মুখার্জী, এম-বি-বি-এস, ডি পি এইচ, সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিস, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া।

বিজ্ঞানভিত্তিক এরকম বই সচরাচর চোখে পড়ে না।

—ডাঃ কে পি চ্যাটার্জী, এম-বি-বি-এস, টি ডি ডি ডিপ কার্ড, রিসার্চ স্কলার, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন।

বইখানিতে সিফিলিস রোগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

—ডাঃ বি এন বিশ্বাস, এম-বি-বিএস, ডি পি এম, মেডিক্যাল অফিসার, ই এস আই হসপিটাল।

প্রাপ্তি : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মেয়ে চাকরি করবে কি না। চাকরি করা মেয়ে হলে তারা বেশ সহজেই রাজি হয়ে যায়। কিন্তু যদি চাকরি করা না হয় তবে সহজে রাজিই হতে চায় না। এর বিপরীতে আবার দেখা যায় যে, কেউ কেউ স্ত্রীর চাকরি করাটা সুনজরে দেখে না। মেয়ে যদি অফিসে কাজ করে তবে ছেলে আর সেখানে মাথা গলাতে রাজি হয় না। এর অর্থ স্ত্রী যদি চাকরি করে তবে, ক্রমশঃ স্বাভাবিক হবে না। সেখানে সবটাই হবে গোলমাল।

ছেলেদের এই দুই মনোভাবেরই বলি হচ্ছে মেয়েরা। এ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ মিলতে এখনো অনেক দেরি। এই সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে নিতে সচেষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেম করে বিয়ে আর সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের হচ্ছে যে, প্রেম বিয়েকে আমরা এখনও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি নি। এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে। তবু মনের দিক থেকে তাকে সায় দিতে পারি না। এর পেছনে যে আশংকা খুব বেশি সক্রিয় তা হলো যে ওরা দুজনে একসঙ্গে মিলেমিশে সারা জীবন কাটাতে পারবে তো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুরকম ছবি আমাদের অভিজ্ঞতার ক্যানভাসে ধরা পড়ে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কেউ কেউ সুখী জীবন যাপন করছে আবার কেউ কেউ বিয়ের পর থেকেই ভয়ংকর অশান্তিতে ভুগছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ধারণা দুটো ভেবেই আমরা শঙ্কিত হই। তবে একথাও খুবই সত্য যে বাবা-মায়ের মনোমত বিয়েতেও যে অশান্তি না হয় এমন নয়। তবে সে ক্ষেত্রে অতীতে এক রকম প্রতিষেধক ছিল। কিন্তু আজ সে ব্যবস্থা প্রায় অচল বললেই চলে।

সেদিক থেকে নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর এখনো কিছু দ্বিধা থাকলেও তা টিকবে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া ছেলে বা মেয়ে বিয়ের নামে যে কোন পছন্দসই নয় সেটা এতে প্রমাণ হয়ে যাবে। ছেলে এবং মেয়ে নিজেদের পছন্দে ভাল-মন্দের সংসার পেয়েছে। কোন মা-বাবাকেই মাথা নত করতে হবে না। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো যে ওদের ভবিষ্যৎ ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে। যে টানা পোড়েন ছেলে বা মেয়ের বিয়ে নিয়ে এখন মা-বাবাকে ভুগতে হয় তা থেকে তারা মুক্তি পাবেন।

দিনে দিনে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার ঘটছে। কেউ চায় মেয়েরা চাকরি করুক। আবার কেউ চায় মেয়েরা চাকরি করবে না। কিন্তু মেয়েরা যখন সমান সুযোগের অধিকারী তখন সুযোগ তাদের দিতেই হবে। তবে কোন মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় সে সুযোগ না নেয় তবে সে কথা আলাদা। আসল কথা সবকিছু নির্ভর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। দুজন যদি দুজনের সাহায্যে সমান উদার হয় তবে তো আর কিছু ভাববার থাকে না। কোন কোন মেয়ে এমনিতেই বিয়ের পর বাইরের জগতকে ভুলে সংসারে মেতে ওঠে। আবার কেউ কেউ বাইরের জগতের সঙ্গে সব সময় যোগসূত্র বজায় রেখে চলতে চায়। ভালবাসা দুটি মন পরস্পরকে বোঝার গভীর সাহায্য করে। আর এই সমস্যার সমাধান হবে সেখান থেকেই।

পশ্চিমের দেশগুলিতে মেয়েরা যে-কোন বয়সে চাকরি পাবার অধিকারী। সাধারণত এসব দেশে মেয়েরা বিয়ের পরই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সংসার করে। তখন সংসারই তার ধ্যান-জ্ঞান। তারপর বাচ্চা হলে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তখন তো আর চাকরি করার চিন্তাও মাথায় আসে না। বাচ্চা স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত মা নিশ্চিন্ত নয়। বাচ্চা যখন একা চলে ফিরতে পারে তখন মা আবার চাকরিতে ফিরে যায় সংসারকে আর একটু স্বচ্ছল করতে। নবাগত আসায় খরচ বেড়েছে। তাছাড়া এখন দায়িত্ব একটু হাল্কা হয়েছে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আর সেদেশে স্ত্রীকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার কোন ক্ষমতাই স্বামীর নেই। স্ত্রী নিজের খুশি মতো চাকরি-বাকরি করতে পারে। স্বামীকে সেদেশে স্ত্রীর এই অধিকারটুকু মেনে নিতে হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে চাকরির অতো স্বাচ্ছন্দ্য নেই। এদেশে একটা চাকরি পাওয়া ভগবান পাওয়ার সামিল। তাই বিয়ের পর মেয়েদের পক্ষে চাকরি ছেড়ে আবার কয়েক বছর পরে নতুন চাকরি নেওয়া খুব সহজ নয়। এ-ক্ষেত্রে একটা সুরাহা আছে। বিয়ের বয়সটা এখন যেমন চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে তা না করে মেয়েদের কুড়ি থেকে একুশের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিলে কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর বয়স থাকতে থাকতে একটা চাকরি জোগাড় করে নেওয়া চলতে পারে। তাহলে বোধহয় সবদিক বেশ রক্ষা পায়। কিন্তু সেখানেও তো একই প্রশ্ন, ছেলে যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়। তবে এক্ষেত্রে একটা পথ আছে। তা হলো যে, যদি [illegible] ব্যাপার হয় তবে মা-বাবাকে একটু উদ্যোগ নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থাটা সেরে ফেলতে হবে। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা সম্ভব।

মা-বাবাকে গোঁ ছাড়তে হবে। সেই দিন যে আর নেই এবং তা ইতিহাসের পাতায় জমা হয়ে গেছে এই সত্যটুকু তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে। যে দিন আর কখনো ফিরে আসবে না তার জন্য মাথা খুঁড়ে কোন লাভ নেই। তাঁদের দিনে যা সম্ভব হতো এখন আর তা সম্ভব নয়। বরং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পাঠ তাঁদের নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে স্বামী-পুরুষদের একচেটিয়া প্রভুত্বের দিনও অবসান। স্ত্রীর দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর। কিন্তু আজকের স্ত্রী আর অসহায়া নয়। নিজের পায়ে চলার ক্ষমতা সব সময়ই তার রয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে দেরি করে ছেলেরা শুধু দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করছে না সেই সঙ্গে সামাজিক অশান্তিরও কারণ ঘটাচ্ছে। (অবশ্য আর্থিক দিক থেকে অর্থাৎ রোজগার শুরু করার পরই একথা প্রযোজ্য)। একথা তাদের মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যৎ তাদের এই ইন্ধন জোগানোর মূল্য পুরোপুরি আদায় করে নেবে।

বিশ্বপর্যটন শেষে

মিস শীলা স্কট আবার বিশ্ব পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। এবারও তাঁর সঙ্গী ছিল সেই হাল্কা বিমানখানি। এই সেদিন তিনি ঘুরে গেলেন মাদ্রাজ বিমানবন্দর। তখনো তাঁর ঘরে ফেরার অনেকটা বাকি। কিন্তু তিনি ঘরের ডাকে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই পাঁচ দিনের পথ পেরোলেন মাত্র তিন দিনে। তারপর স্বদেশ অস্ট্রেলিয়া হয়ে লন্ডনে পৌঁছলেন তিনি। বিমানবন্দরে সমবেত কয়েক হাজার উৎসাহী দর্শক তাঁকে স্বাগত জানান। এবারের বিশ্বপর্যটনকালে তিনি অতিক্রম করলেন ৩৪ হাজার মাইল পথ। আর সেই সঙ্গে তিনি পূর্ণ করলেন তাঁর সপ্তম আকাশ-ভ্রমণের রেকর্ড।

প্রাক্তন অভিনেত্রী মিস শীলা স্কট বার বৎসর আগে বিমান চালানো শুরু করেন এবং সাতটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। বিমান চালকদের মধ্যে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব হলো, একক চালনায় একটি হালকা বিমান নিয়ে তিনি উত্তর মেরুর উপর দিয়ে উড়ে এসেছেন।

এবারকার মিস স্কটের বিশ্বপর্যটনের বৈশিষ্ট্য হলো যে বিশ্বভ্রমণে তাঁর মানসিক এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সব রেকর্ড করা হয়েছে। এসব খবর পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে যখন তিনি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে বিজ্ঞানীদের গবেষণা নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
স্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরী তার ছোট ভাই-বোনদের চুমু খায়। তার গা থেকে সেন্টের গন্ধ পায় টুটুল। এক বছরে কলকাতা বাসে ছোড়দা আর রাঙাদিকে তার অনেকখানি অপরিচিত লাগে।

'বায়োস্কোপ দেখেছিস?' ঢোঙা তার কালো লম্বা শরীরখানা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমরা কাল সং দেখেছি', টুটুল বললে।

'ধেৎ আমরা দেখেছি চণ্ডীদাস, ভাগ্যচক্র, কোহিনুর, প্রিজনার অফ জেন্দা, যমুনা পুলিনে, চার্লি চ্যাপলিন।' এক-একটা সিনেমা যেন এক-একটি অধিকৃত সাম্রাজ্য, আর সে বিজয়ী সেনাপতি।

বুড়ী বললে, হকি খেলবে না রাঙাদি? তুমি থাকতে কি হকি খেলা হত। গরমের ছুটিতে এলেই না।'

'গরমের ছুটিতে যে দার্জিলিং গেলাম তাই কলেজের মেয়েদের সঙ্গে। ঢোঙাকেও নিয়ে গেলাম অনেক বলে-কয়ে।'

'দার্জিলিং কি ফাইন জায়গা বুড়ী। কি ঠাণ্ডা! ম্যালে সাহেব-মেমরা নাচছে। চারদিকে ফগ, ঘরের মধ্যে ফগ আসছে। আমরা কি রকম ফগ খেতাম রাঙাদি?' ঢোঙা বললে।

টুটুল আর বুড়ী অবাক হয়ে শোনে। বুড়ীর ঠিক নীচেই ঢোঙা। এক বছরের মধ্যে তার এই অভাবিত সৌভাগ্যে বুড়ীর ঈর্ষা হয়। ঢোঙার বদলে সে কি কলকাতায় পড়তে পারত না? তাহলে সেও দিদির সঙ্গে দার্জিলিং যেত।

ঢোঙার পা দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, বয়সের তুলনায় দৈর্ঘ্যে প্রায় দু ইঞ্চি বেশী। টুটুলের মাথা ভর্তি অগোছাল কোঁকড়া চুলের পাশে তার টান-টান, পেছনের দিকে ব্রাশ করে তোলা চুল, ট্রেনের হাওয়ায় তা একটু এলোমেলো।

প্রতাপ এল হাল্কা পায়ে জুতোর পাড়ে। তিন ভাইয়ের মধ্যে তার চেহারাই সবচেয়ে সুন্দর। শুধু ফর্সা রঙের জন্যে নয় এক ধরনের বাঙালী কমনীয়তা তার মুখের আদলে খুব স্পষ্ট। পরনে পাজামা সাদা পাঞ্জাবী। এসেই টুটুলকে কোলে তুলে গাল টিপে আদর করে বললে, 'দেখি কত বড় হয়েছিস!' সে যে ভবনাথের জবাব 'ব্রিলিয়ান্ট' সেটা তার প্রেসিডেন্সী কলেজের মাস্টারমশাই, তাদের বাড়ি, তার বন্ধুবান্ধব সবাই মেনে নিয়েছে যেমন লোকে ভাল জিনিস মেনে নেয় তর্ক না করে। ইকনমিক্সে তার ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড হওয়ার খবর যখন কয়েক দিন আগে পৌঁছল তখন ভবনাথ তো ক্ষেপে উঠেছিলেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে ভেতরের বারান্দায় এলেন, 'মার দিয়া, মার দিয়া!'

গোপীনাথ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জড়িয়ে ধরলে প্রতাপকে, 'তুমি খুব ভাল করিয়াছো, আরও ভাল করিবে। বিলাত যাইবে। কিন্তু দেখিও বাবা, তোমার মামার মতো...

মামা মানে অক্ষয় বসুর একমাত্র ছেলে অজয় গত আট বছর ধরে বিলেতে চার্টার্ড একাউন্টেন্সী পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। অক্ষয় বসু রিটায়ার করার পর ক্রমান্বয়ে চিঠি লিখছেন ছেলেকে দেশে ফিরবার জন্যে কিন্তু অজয় সে ব্যাপারে উদাসীন। বেশী চিঠিপত্র চললে তার শরীর খারাপ হয়ে যায়, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়, বাঁ পায়ে 'নিউর‍্যালজিক পেন' জন্মায়। তিন মাস ছুটি নিয়ে একবার দেশে মুখ দেখিয়ে যাবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে। এই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটেছে অক্ষয় বসু মাসে-মাসে যে চারশো টাকা করে দিয়ে আসছেন তার পরিসমাপ্তি ঘটার ইঙ্গিত কোন চিঠিতে থাকায়। গোপীনাথ এই পারিবারিক ইতিহাসের আদ্যোপান্ত জানে।

প্রতাপ বললে, 'না না কি বলছো? আমি দেখো ঠিক দু-তিন বছরের মধ্যেই চলে আসব। ওদেশে কি আছে? আমাদের মতো গাছপালা আছে? রবীন্দ্রনাথের গান আছে?'

'নানা নানা, তুমি বলতো রবি ঠাকুর কেমন দেখতে?' টুটুল বায়না ধরে।

'দূর আমি কি জানি!'

'ও রবিবাবু, চূর্ণী নদী দিয়ে গিয়েছিলেন? বাবা দেখিয়েছিলেন কয়েক মাস আগে।' গৌরী বললে।

'সে আর কি বলিব। নদীর ধারে গাছের ওপর থেকে লোক ঝুলিতেছে। আর রবিবাবু নৌকায় একটা চেয়ারে একেবারে চোখবন্ধ, হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছে।'

'ঠিক যেমন ছবিতে দেখায় সেইরকম দেখাচ্ছিল?'

'সেইরকম পারা! বড়ো ভারী ঠাকুর [illegible] সেই মত পারা!'

'তুমি বেশ বললে নানা', প্রতাপ বললে।

'আমি কি মিথ্যা বলছি? বলাইকে বলো। বলাইও বলিবে। ঠিক ঠাকুরের মত দেখিতে। খালি একটু ফর্সা।'

বিকেল না হতেই পথে পথে লালমোহনের দল এসে গেল। এবার টাউনস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে গৌরী কম্পানীর ম্যাচ। সামনের বিস্তৃত মাঠে হকি খেলা শুরু হয়। হকি স্টিক তিনখানা—প্রতাপ, গৌরী আর লালমোহনের। আর সবাই বাঁশের বাখারি নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। গৌরী তার দাদার বুট পরে দুম দুম করে ছোটে। তার চেহারায় বেশ খেলোয়াড়ী ভাব আছে ব্রিমলেস চশমা সত্ত্বেও, মোটেই শান্ত আত্মসচেতন কিশোরী নয় সে। তার উৎসাহে লালমোহন কম্পানীও দুর্দান্ত খেলে। বিপক্ষ দল প্রতাপদের গোলে পর পর দুখানা গোল দিয়ে দিল। হঠাৎ রোদ পড়ে গেছে। অদূরে কাছারীর কাছ থেকে একটা আওয়াজ আসে। তারপর গাছ আর ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে আওয়াজটা মাঠের গা দিয়েই জেলখানার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম।' এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি গলার জোর আরও বেড়ে যায়। কয়েকটি তরুণের সঙ্গে সঙ্গে হেড-কনস্টেবল আর জেলখানার দুজন ওয়ার্ডার। মুহূর্তের জন্যে খেলা থেমে যায়। কেউ কোন প্রশ্ন করে না। সবাই জানে বন্দেমাতরম বলে আর একটা জগত আছে যেটা সমান্তরাল, যার সঙ্গে এই চারপাশের সকাল দুপুর সন্ধ্যের কোন যোগ নেই, যা দূরে কাছারীর কাছে, থানা কিংবা জেলে

বাবার কথাবার্তায় অথবা সকালে অমৃতবাজার কাগজে মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়েই মিলিয়ে যায় কিন্তু এই দুর্গার ধারে শিশুকের জীবনযাত্রায় কিংবা কলকাতায় মেয়াদ-দার দিকে মাসিক পনেরো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের বাসিন্দে প্রতাপ আর তার ভাইবোনের চিন্তায় বিশেষ রেখাপাত করেনি। বাড়ি জেলে যায়, চরকা কাটে, বন্দেমাতরম বলে চীৎকার করে তারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করছে বটে কিন্তু তারা প্র্যাকটিক্যাল নয়, তারা এক বায়বীয় অস্পষ্ট জগতের বাসিন্দে—এইরকমভাবে চিন্তা করে প্রতাপ। এদের সম্পর্কে তার উৎসাহ নেই, অবজ্ঞা নেই। আরও অনেকের মত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনেছে, আরও অনেকের মত হাততালি দিয়েছে, ভিড়ের মধ্যে দু-একবার বন্দেমাতরমের সঙ্গে গলাও মিলিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে সত্যাগ্রহ করার প্রস্তাব তার কাছে সম্পূর্ণ অলৌকিক লেগেছে।

খেলোয়াড়দের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রতাপ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও আর কি দেখবার আছে। লালমোহন সেন্টার করো।'

লালমোহন সেন্টার করলে, গৌরী তার হাফপ্যান্টের কষি করে বেমানান বটে সত্বেও শন্ শন্ করে দৌড় দিল, তার বাদামী কোঁকড়া চুল হাওয়ায় ওড়ে, হাওয়ায় এলোমেলো ফ্রকের ভেতর থেকে তার নীচের পেশীস্ফীত পা দুটো ঝলকায়। পেছনে পেছনে বাখারী নিয়ে টুটুল আর দুটো ডিঙিং ডিঙিং করে ছোটে। গৌরী পাস দিলে, লালমোহন তৃতীয় গোল করল। প্রতাপ এবার চোট্টামি করল। লালমোহনের এক সাকরেদ যে লালমোহনের চেয়েও ভাল খেলে তাকে নিলে নিজের দলের ফরোয়ার্ডে গৌরীর প্রতিবাদ সত্বেও। এবার দুর্দান্ত জমে ওঠে খেলা। প্রতাপ একটা গোল দিল, লালমোহনের সাকরেদও দিলে আর একটা। গোল শোধ হয় হয় এমন সময় নিষ্করুণ স্পষ্ট মুহূর্তে মুহূর্তে ঘামে ভেজা মুখ-লাল গৌরী প্রায় হুকুম দিল খেলা বন্ধের জন্যে, কারণ আলো পড়ে আসছে।

সন্ধেবেলা আরও উত্তেজনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' শেষ হবে। এ বিষয়ে সাংবাদিক খাতা থেকে প্রত্যহ। তাদের বার পুজোর 'প্রতাপাদিত্য' হয়েছিল, স্টেজ ভাড়া করা হয়েছিল দু দিনের জন্যে। এবার দশ-বারো দিন ধরে রিহার্সেল চলে। প্রতাপ জয়সিংহ আর গৌরী অপর্ণা। লালমোহন চেষ্টা করেছিল জয়সিংহের ভূমিকা দখল করতে, কিন্তু হয় নি। আর্ট ডাইরেক্টার প্রতাপ এ ব্যাপারে জটিলতার সমস্যা কাটাতে পেরেছিল। তাছাড়া স্বর্ণসুন্দরীর ভাষায় মারোয়াড়ী উকিলের ছেলে না হয়ে লালমোহন যদি কলকাতার প্রত্যন্তের কোন মধ্য হোত, বাপের বিষয়-সম্পত্তি থাকত তাহলে তাকে জয়সিংহের ভূমিকা দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তার বাবাকে প্রতাপ দেখেছে, হাতের অসংখ্য কণ্ঠী। বড়বাজারের কাছে টিনের চালওয়ালা বাড়িতে কারবার দিয়ে তাদের চেনা নিজেই লজ্জা পেয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেয়ালে দেয়ালে রংজ্বলা ভেলভেটের ওপর মাছের আঁশের টিয়াপাখী কিংবা গোলাপ ফুল সাজিয়েও যা প্রতাপ আসবে বলে মায়ের ঝিয়ের বড়া ভেজেও সে দৈন্য লালমোহনের মা ঢাকতে পারেন নি। আর স্বল্পভাষী, কালো, লাজুক লালমোহন, গৌরীকে একদা প্রেমনিবেদনকারী, ম্যাট্রিকে জলপানি পেলেও আর বেশীদূর পড়তে পারবে না, কোর্টের কেরাণী কিংবা পেশকারীর জন্যে তার বাবা ইতিমধ্যেই ভবনাথের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে জয়সিংহের ভূমিকা অসম্ভব। অপর্ণার ভূমিকায় গৌরী তাকে বলবে, 'জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! বার বার ফিরায়ো না! কী সয়েছি অন্তর্যামী জানে।' অসম্ভব। তাই প্রতাপ জয়সিংহ, লালমোহন গোবিন্দমাণিক্য, লালমোহনের সেই সাকরেদ যে মাঠে নেমেই বাখারির স্টিক দিয়ে পর পর দুটো গোল করেছিল, সে রঘুপতি আর গৌরী অপর্ণা। চমৎকার ছাঁটকাট করে প্রতাপ কালীপুজোর দুরাত্রির আগে 'বিসর্জন' নাটক নিবেদন করলে। মাঠের মধ্যে চেয়ার-টেবিল-আলমারী সাজিয়ে ভাড়া করা স্টেজ, উইংসে খাটানো হল। টুটুল আর বুড়ীর এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসাহ। তারা কারিগর আর ছুতোরের অনবরত ফরমাইস খাটছে। তাদের ডেকে ডেকে চা খাওয়াচ্ছে। যখন শো শুরু হল তখন শহরের গণ্যমান্য লোকে ঘর ভর্তি, লালমোহনদের একটা বিশাল দল বাইরের গোটা বারান্দা ছেয়ে গেলেন। দুর্গাবাবুর জন্য এস-ডি-ও সাহেবের নিরাপত্তা মঞ্জুরী হল। সন্ধ্যার পরেই সমস্ত কেষ্টও হাঁক দিল, 'হু কামস দেয়ার?' আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'ফ্রেন্ডস, ফেন্ডস, আমি শ্যামবাবু, পেস্কার, পেস্কার'—এসবের বালাই নেই। যদিও টাউনস্কুলের ছেলেরা দুর্দান্ত সাদা পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে বলাবলি করেছিল নিজেদের মধ্যে তবু সেটা খুব একটা গুরুত্ব কিছু ছিল না। আর্ট ডাইরেক্টারের সাফল্যে দর্শকদের অনুরোধে দ্বিতীয় রাত্রিতেও শো হল। লালমোহন বোকা যেন লম্বা, গালে দাড়ি দিয়ে টানা-টানা চোখে, গলায় বড়ো মুক্তোর মালা দুলিয়ে ঝলমলে জরির পোশাকে অস্তর্ধ অভিনয় করলে। আর স্বর্ণসুন্দরীর ছেঁড়া লাল বেনারসী মালকোঁচা মেরে পরে মাথায় হলুদ পাগড়ি এঁটে প্রতাপের জয়সিংহ অভিনয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। তারপর বুকে মারকোলেন্স মালা আঁটা পরমেশের ফিমেল পার্ট দেখতে অভ্যস্ত টাউনস্কুলের বয়স্ক ছাত্রদের কাছে চুল এলোকেশা গৌরীর প্রেমনিবেদনের কোন জবাব নেই। রক্তচন্দনের ফোঁটাকাটা রঘুপতিও খারাপ হয়নি, যদিও মাঝে মাঝে ছোকরার শ্লেষ্মা জমে যাওয়ায় গলা খাঁকারি কিঞ্চিৎ বেশী হচ্ছিল। দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে দু রাত্রিই স্বর্ণসুন্দরী বিধাতার পরিহাসের কথা ভাবছিলেন। সম্ভব ছিল না লালমোহনের বাবার অবস্থান্তর? দুটো হাতা, বাদামী কেডসের জুতো আর ছেঁড়া কাপড়ের বদলে সম্ভব ছিল না সিল্কের পাঞ্জাবী আর চকচকে কালো পাম্পসু পরা ভদ্রলোক, হাতে ছড়ি কিংবা সিগারেটের টিন, তাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির পাশেই যিনি জমি নিয়েছেন, বাড়ি তুলছেন এবং তাঁদের মতোই কোন ছেলেকে বিলেত পাঠানোর চিন্তা করছেন? গোবিন্দমাণিক্যকে দেখতে দেখতে স্বর্ণসুন্দরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বুড়ী রাণীর সহচরী আর টোটাকে প্রহরীর পার্ট দেওয়া হয়েছিল, টোটার ছটফটানিতে তার মাথার মুকুট খসে পড়ে দর্শকদের হাসির কারণ ঘটায়। তবে ধ্রুবর পার্টে টুটুলের বিশেষ করার ছিল না। তার ঘুমন্ত অবস্থায় পার্ট সে সময় রঘুপতির বক্তব্য 'এসো এসো পান করি কারণ-সলিল' অংশটা তার মুখস্ত। কিন্তু [illegible] দিনের উত্তেজনায় ঘুমন্ত ধ্রুবর পার্টে টুটুল সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। ঢিলে [illegible] পাঞ্জাবী পরে একরাশ চুল মাথায় কড়া স্টেজের আলো মুখে টুটুল নির্বিবাদে ঘুমোয়। দর্শকদের কৌতূহল তাকে স্পর্শ করে না।

(৭)

মেজো বৌদি ছড়া কাটতে ভালবাসতেন। যদিও তাঁর ঠেসমারা কথায় তরুণ ভবনাথের প্রাণ মাঝে মাঝে ওষ্ঠাগত হয়েছে এবং অত্যধিক বিচলিত বোধ করেছেন নববধূ স্বর্ণসুন্দরী তবু সেই ফর্সা ড্যাবরা-নয়নী মেজো বৌদির সঙ্গ না হলে ভবনাথের চলত না। তিনি যে বাড়িতে স্বর্ণসুন্দরীর চেয়েও ঝিরি ঝিরি সুন্দরী কাটতে পারেন সে বিদ্যা মেজো বৌদির জন্যে। আর পার্সিভেল সাহেবের ছাত্র ইংরেজী সাহিত্যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত তরুণ ভবনাথ মেজো বৌদির মুখে বাংলা বাগ-কালের ভাষায় তাঁর কাছে মুগ্ধ হতেন। 'দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না' মেজো বৌদি বলেছিলেন যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেছেন ভবনাথ নতুন চাকরী পেয়ে। লোকজনের ওপর রাগ হলে বলতেন, 'বাঁদির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না।' একদিন মেজাজ খুব ভাল ছিল। বললেন, 'আচ্ছা ভব, তুই তো সব মেডেল ফেডেল পেয়েছিস। বল তো এটার কি মানে—'কালের কোমল চরণপাত, লোহার মতো শক্ত হাত।'

কথাটা কুড়ি বছর পর বৈঠকখানায় বসে শীতের সকালে বাইরে নেড়া বেল গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়ল ভবনাথের। ভবনাথ ঠিক মত উত্তর দিতে পারেননি, কি বলেছিলেন তা এখন স্মৃতির পাথরে চাপা পড়ে গেছে। তবে মেজো বৌদির কথাগুলো মনে আছে। 'বুঝতে পারলি না? এই তো যখন প্রথম এলাম তখন তোর গোঁফ গজায়নি। গাল টিপে আদর করতে কি ভাল লাগত। আর এখন দেখো, কোট প্যান্ট পরা সাহেব।'

'কিন্তু কালের হাত আর পা-টা কি?'

'কালের পা বললি না তব? আর ও কথার বাক বুঝলি? কাল তো নাচতে নাচতে চলেছে, 'আমার কচি মেজো বৌদি

মরল, তোর চকরী থাকলনা তোকে কান ধরে বার করে দিল সাহেবরা কিছু পরোয়া করে না। নাচতে নাচতে চলে গেল।'

'আর হাত?'

'হাতের ছাপ রেখে গেল। আমার এমন চেহারা ছিল? এমন টিপ ছিলাম? এখন তো স্বর্ণকে দেখে চোখ জুড়োচ্ছি! আমার বয়সে আমার পাশে দাঁড়াত?

ভবনাথের আজও স্পষ্ট মনে আছে। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে মেজো বৌদি চেয়ে আছেন তার দিকে। আর কালের এই ভ্রূক্ষেপহীন, নৈর্ব্যক্তিক চেহারা যা একই সঙ্গে স্থাবর ও জঙ্গম সেই দ্বৈত সত্তার কথা ভবনাথের মনে আসে। টাকে হাত বুলোতে বুলোতে। চুলটা আর রাখা গেল না। তাঁর যৌবনের মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুলে কালের হাত পড়েছে। সমস্ত চাঁদি আর তার চারপাশে গড়ের মাঠ। ভবনাথ হাত নামিয়ে তাঁর কাঁচা-পাকায় মেশা তোড়-পুরী গোঁফে তা দিতে থাকেন।

'মে আই কাম ইন সার?' ছুটির দিনে সকালে কোন আগন্তুক চান না ভবনাথ। ভুরু কুঁচকে তাকান।

ঢ্যাঙা ফর্সা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা এক তরুণ পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে। ভবনাথ চমকে ওঠেন। টেররিস্ট যুগে এই ধরণের আগন্তুকের আবির্ভাবে ভয়াবহ পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে পাশেই বলাইকে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

'সার্কাস পার্টি থেকে এসেছি সার। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। আমি তার ম্যানেজার।' ফ্রাকিরা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা কার্ড টেবিলে রাখে।

'কদিন চাই?'

'সাত দিনের জন্যে সার। সিদ্ধেশ্বরী তলায়। আমরা আগেও এসেছি সার, তিন বছর আগে। তখন ছিলেন......'

'কি খেলা দেখান?'

'বাঘ সিংহ ঘোড়া ট্রাপিজ। বুকে হাতি......'

'আপনি কি দেখান?'

'আমি সার বুকে হাতি নিই। দেখবেন সার দেখবেন।' লোকটি বাঁ করে তোলা পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে হাতের গুলি ফোলায়। ফর্সা পায়রাজাল বার স্ফীত পাহাড়ে বাইসেপ। তরুণটি নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

ভবনাথ একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে তারপর দু লাইন লিখে সই করে দেন। বলাই স্ট্যাম্প মারে। দ্রুত কার্যোদ্ধারে প্রফুল্ল তরুণটি হাত তুলে নমস্কার করে।

ভবনাথ সেই পেছন ফেরা তরুণটির দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বললেন, 'শুনুন।'

তরুণটি ঘুরে দাঁড়াতেই ভবনাথ বললেন, 'আমার বাইসেপটা দেখবেন নাকি?'

ভবনাথ বসে বসেই পাশ ফিরে হাতের পেশী তাঁর করলেন। বুকে হাতি-তোলার মতো ফুলে ফেঁপে উঠল না, তবে দাঁড়-দাঁড়ায় সেই স্নিগ্ধ উদ্বোলিত বাদামী বাইসেপ জলে ধোয়া পাথরের মতো ঝলসে। অবাক হয়ে তরুণটি বলে, 'বাঃ, আমার চেয়েও ভাল।'

'না-না, একটু ডাম্বেল করার অভ্যাস আছে।' আত্মসচেতনভাবে বললেন ভবনাথ।

তরুণটি চলে যাবার পর অমৃতবাজার পত্রিকার পাতা ওল্টান।

প্রথম পাতাতেই একটা খবর বুঝতে পড়েন ভবনাথ। ত্রিপুরার খবর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও বিঠলভাই প্যাটেল রয়টারের কাছে এক বিবৃতিতে গান্ধীজীকে নিন্দা করে বলেছেন সঙ্কটকালে তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। ভবনাথ তাঁর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবেন, 'বন্দেমাতরম' চীৎকার মিছিল হয়তো ভয়ের নয়, তবে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় এই বোমা পিস্তলের হিড়িকটা বন্ধ হলে প্রাণ বাঁচে।

এই সব আন্দোলনের খবর, সরকারী অর্ডিন্যান্স জারী হবার পর ওপরওয়ালাদের নতুন নতুন হুকুম এসব ছাপিয়ে একটা চিন্তা বা দুশ্চিন্তাই ভবনাথকে আবৃত করে রেখেছে। বাড়ির ভিত হয়েছে, দেয়াল গাঁথা হয়েছে। বেশ জরা তালে কাজ চলেছিল। কিন্তু ছাতে এসে ভবনাথের তরী আটকে গেছে। দিন দশেক হল প্রায় কাজ বন্ধ। মিস্ত্রিদের মজুরী বাবদ সাত আটশো টাকা অবিলম্বে না চালতে পারলে কাজ মার খাবে। ভবনাথের স্বপ্নের ইমারত চোট খাবে।

ঠিক সত্তর বছর আগে ভবনাথের বাবাও ঠিক এমনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাজারের সেরা মাল দিয়ে বাড়ি বানাবেন। বর্ষার দিনে টিনের চালে বৃষ্টির চড়বড় আর শুনতে হবে না। এমনভাবে গাঁথনি তৈরী হল পাবনার বাড়ি যে দু-তিনশো বছর চলে যাবে সামান্য যত্নে। তখন ঈশান চৌধুরী জানতেন না, বড় ছেলেটা মরে যাবে, মেজো ছেলে টিম টিম করে চালাবে তাঁর আইন ব্যবসা, ছোট ছেলে দেশের বাড়ি ভোগ করবে, জামাইগুলো হবে অপগণ্ড। শুধু ইঁট গাঁথনির প্রতাপে বাড়ি টিঁকে থাকবে না।

ভবনাথ এসব কথা ভোলেননি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই ভাবে সে নিজে ব্যতায়, জীবনের ভঙ্গুরতার ঊর্ধ্বে। কালের অবাধ গতি হার পালের লোকটাকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে ফেলে দেবে কিন্তু সে রক্ষা পাবে। আর তাছাড়া কালের এই অনিবর্তনীয় গতির কথা চিন্তা করে কি কিছু করার আছে। তার বড়দা যে কম বয়স থেকেই বৈঠকখানায় মক্কেলদের টাকায় ঘোড়ার মাট-পাড়ি করেছে, মায়ের সাতনরী সোনার হার, বেশ গাছা চুড়ি, দুজোড়া বালা লোপাট করেছে সিন্দুকের চাবি হাতসাফাই করে সে এখন দীক্ষা নিয়েছে কোন এক গুরুর কাছে। প্রায়ই বলেন, সবই তো তিন মুঠো ছাই।' কাজেই কালের অনিবর্তনীয় গতির কথা চিন্তা করে আলাদা বিক্রম স্বার্থপর মানুষে পরিবর্তিত হতে চায় না ভবনাথ। কালের হাতের শক্ত পাঞ্জা আর নখ, পদক্ষেপ মেনে নিতে হবে প্রসন্নচিত্তে। পোতাজিয়া থেকে পাবনা আবার পাবনা থেকে কলকাতা। আর কলকাতার বাস যদি যায় তো যাবে।

কিন্তু এ তত্ত্ব ছাপিয়ে ভবনাথ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন রসা রোডে জজন বসুর বাড়ির মতো মার্বেলের সাদা সিঁড়ি, উঠেই ছোট বসবার ঘর। পাশে দক্ষিণে শাসিকরা ঘন সবুজ সিমেন্ট মেজের লম্বা ঘর, ব্যালকনি। কালো-সাদা মোজেইকের করিডর পার হয়েই বড় ছেলের ঘর। পাশে একটা ছোট ঘর মাস্টারমশাই এসেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ছে। তাঁদের ঘরের গায়ে আরও একখানা বড় শোবার ঘর। সবার শেষে কালো মার্বেলের ঠাণ্ডা ছোট ঠাকুরঘর।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫·৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮·০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৩·০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০	দি হাউস অফ্ দি টেগোরস
ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫·০০	পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫·০০	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী	৮·০০	টেগোর অন্ লিটারেচার অ্যান্ড এস্থেটিক্স
রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার	১২·০০	রবীন্দ্র-সুভাষিত
ডক্টর ননীলাল সেন	১৫·০০	এ ক্রিটিক্ অফ্ দি থিওরিজ অফ্ বিপর্যয়
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন	২৫·০০	ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস্
ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	২৫·০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু
ডক্টর মানস রায়চৌধুরী	১৫·০০	স্টাডিজ ইন্ আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬·৫০	রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন্ বেঙ্গল

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১০০এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—৩

একটি বিমান দুর্ঘটনা ও ম্যানস্টাইন প্ল্যান

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিটলার সেই আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বার বার ইতস্ততঃ করিয়াছেন। একথা আগেই (পঞ্চম অধ্যায়ের শেষের দিক দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ১০ জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃঃ তারিখের একটি অদ্ভুত বিমান দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা জানি বিজ্ঞানের অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার আকস্মিক কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনাও কোন দুর্ঘটনার জন্য পাল্টাইয়া যাইতে পারে এবং তার ফলাফল অভূতপূর্ব সাফল্যের আশা সুদূরপ্রসারী বা যুগান্তকারী হইতে পারে, এমন ঘটনার কথা কদাচিৎ শুনা যায়। পাঠকগণের বোধ হয় মনে আছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীর একজন মেজর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাসহ যখন মুনস্টের থেকে কোলোন (মতান্তরে বন্) অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ কড়া আবহাওয়ার জন্য তাঁর বিমান বেলজিয়ামে অবতরণে বাধ্য হয় এবং আক্রমণের দলিলপত্রগুলি মেজর কর্তৃক পোড়াইয়া ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঐগুলির অন্ততঃ কিছু অংশ বেলজিয়ান সেনাদের হাতে পড়ে এবং বেলজিয়ান ও ডাচ্ কর্তৃপক্ষ সেগুলির মর্ম জানিতে পারেন। এভাবে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের সেগুলি জানার কথা। কিন্তু সেই সময় জার্মান কর্তৃপক্ষ ঐ দলিলগুলির ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের গভীর সন্দেহ জাগিয়াছিল। মার্শাল গোয়েরিং তো এই ঘটনায় রাগিয়া টঙ্ হইলেন, কিন্তু হিটলার মাথা ঠাণ্ডা রাখিলেন, তবে, প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন অবিলম্বেই আক্রমণ শুরু করিবেন, কিন্তু পরে (১৬ই জানুয়ারী) আক্রমণের মূল পরিকল্পনাই বাতিল করিয়া দিলেন এবং তার পরিবর্তে ম্যানস্টাইন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এর ফল একেবারে যুগান্তকারী হইল। (১)

কিন্তু কিভাবে এই ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার উদ্ভব হইল?—সেই কাহিনীও কম ঐতিহাসিক ও কম রোমাঞ্চকর নয়। কারণ, সমস্ত প্ল্যানটাই সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল রুন্ডস্টেডের একজন তরুণ স্টাফ অফিসার এরিক ফন্ ম্যানস্টাইনের 'উর্বর মস্তিষ্ক সম্ভূত' ও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। পশ্চিম রণাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ ট্যাঙ্কযোদ্ধা ও যান্ত্রিক সংগ্রামের কুশলতম সেনাপতি কর্নেল জেনারেল হেইন্জ গুডেরিয়ান যিনি এই পরিকল্পনা হাতে-কলমে প্রয়োগ করিয়া সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন, ১৯৫২ সালে তাঁর লিখিত 'প্যাঞ্জার লীডার' নামক বইতে তিনি এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেখান থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হইতেছে :

'হিটলারের নির্দেশে আর্মি হাইকমাণ্ড সেই ১৯১৪ সালের বিখ্যাত শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। পরিকল্পনাটি সারল্যই এটির বড় গুণ ছিল। যদিও তেমন আড়ম্বর ছিল না। এমন সময় একদিন নভেম্বর মাসে (১৯৩৯) ম্যানস্টাইন আমার কাছে এসে হাজির। তিনি আমাকে এই বিষয়ে তাঁর নূতন চিন্তার কথা বলিলেন এবং মোটামুটি তাঁর পরিকল্পনার একটা নক্সা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এই পরিকল্পনায় তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের দক্ষিণ দিক দিয়া এক প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক আঘাত হানিতে হইবে এবং এই অঞ্চলে ম্যাজিনো লাইনের বর্ধিত অংশটি ভেদ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং এখানকার সমগ্র ফরাসী রণাঙ্গনকে এভাবে বিদীর্ণ করিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিতে হইবে।

একজন ট্যাঙ্ক-বিশারদ হিসাবে তিনি আমাকে পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি তখন সেই অঞ্চলের মানচিত্র গভীরভাবে অনুধাবন করিলাম এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তা মিলাইয়া দেখিয়া আমি ম্যানস্টাইনকে এই নিশ্চিত ভরসা দিলাম যে, তাঁর এই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে, উহার একমাত্র শর্ত এই যে, যথেষ্ট পরিমাণ সাঁজোয়া এবং মোটরযুক্ত ডিভিসনগুলিকে এবং সম্ভব হইলে সমস্ত গুলিকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

'আমার এই মতামত শুনিবার পর ম্যানস্টাইন এই বিষয়ে একটা মেমোরেন্ডাম লিখিয়া ফেলিলেন এবং কর্নেল জেনারেল ফন্ রুন্ডস্টেডের স্বাক্ষর ও সম্মতিসহ তিনি এটা আর্মি হাইকমাণ্ডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৯। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা এই পরিকল্পনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন না। তাঁরা রণক্ষেত্রের প্রস্তাবিত অংশে মাত্র এক বা দুইটি যান্ত্রিক ডিভিসন প্রয়োগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি প্রবল আপত্তি তুলিলাম। কারণ, এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বল ট্যাঙ্ক শক্তিকে আরও টুকরা করিয়া ফেলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। কিন্তু হাইকমাণ্ড কিছুতেই রাজী নন। এদিকে ম্যানস্টাইন জেদ করিতে লাগিলেন। ফলে, হাইকমাণ্ড তাঁর উপর এমন চটিয়া গেলেন যে, তাঁকে স্টাফ বাহিনী থেকে নামাইয়া একটি পদাতিক বাহিনীর (ইনফ্যান্ট্রি কোর) কমান্ডিং জেনারেল করিয়া দেওয়া হইল। এর ফলে আমাদের রণক্ষেত্রের সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ককে ('ফাইনেস্ট অপারেশনাল ব্রেন') আক্রমণের তৃতীয় তরঙ্গে অংশ গ্রহণ করিতে হইল, যদিও অনেকাংশে তাঁরই অপূর্ব উদ্যমের (ব্রিলিয়ান্ট ইনিশিয়েটিভ্) জন্যই এই প্রস্তাবিত আক্রমণ এক অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

'কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্য আমাদের প্রভুরা শ্লিফেন প্ল্যান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে ম্যানস্টাইন নূতন কোর্ কমান্ডাররূপে হিটলারের নিকট যখন হাজিরা দিলেন, তখন তিনি সেই সুযোগে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলিলেন। এভাবে ম্যানস্টাইন প্ল্যান গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার সিদ্ধান্ত হইল। ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, কোব্লেঞ্জে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী মায়ানে—পর পর দুইবার এই পরিকল্পনার মহড়া দেওয়া হইল। কিন্তু আর্মি জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল হালডার সেডানের নিকট মিউজ নদী জোরপূর্বক পার হওয়া এবং যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাহায্যে ফরাসী ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া আমিয়েন্সের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকে 'নির্বোধ' চিন্তা বলিয়া আপত্তি করিলেন।......

'এভাবে হাইকমাণ্ডের নেতাদের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রকৃত আলোচনা হইল। একমাত্র হিটলার, ম্যানস্টাইন ও আমি নিজে ছাড়া এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে আর কাহারও বিশ্বাস ছিল না। সমস্ত পরিকল্পনা হিটলারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, আক্রমণের পঞ্চম দিনে আমি

(১) লিডেলহার্ট প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, লন্ডন, ১৯৭০, ৩৭ পৃঃ

মিউজ নদী পার হইবে এবং ঐ দিন সন্ধ্যাতেই নদীর ওপারে সেতুমুখ স্থাপন করিবে। তখন হিটলার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু নদী পার হয়ে তুমি কি করবে? তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর মাথায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসিয়াছিল—

"He was the first person to ask me this vital question!

আমি জবাব দিলাম যে, আমি আমার অগ্রগতি বজায় রাখিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইব। তবে, সর্বপ্রধান কমান্ড অবশ্যই স্থির করিবেন আমার লক্ষ্য আমিয়েন্স হওয়া উচিত কিম্বা প্যারিস? তবে, আমার মতে যথার্থ পথ হওয়া উচিত আমিয়েন্স পার হয়ে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে চলে যাওয়া।

হিটলার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানালেন এবং আর কোন মন্তব্য করিলেন না।" (২)

যে কোন দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া পরিকল্পনাই হিটলারকে আকর্ষণ করিত। সুতরাং ম্যানস্টাইনের এই পরিকল্পনায়ও তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অনুমোদন করিলেন—যদিও জডল, ব্রাউকিৎস প্রমুখ অনেক জেনারেল এর গুরুত্বের বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে আশঙ্কা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনে হিটলার নিজেকে একজন সামরিক প্রতিভা (মিলিটারি জিনিয়াস) বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইল যে, এই ম্যানস্টাইন পরিকল্পনাকে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন! সোজা কথায় পরের পরিকল্পনা আত্মসাৎ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। (লীডেল হার্ট, উইলিয়াম শিরার ও অ্যালান বুলক প্রমুখ বিখ্যাত সামরিক ইতিহাস লেখকেরাও একথার উল্লেখ করিয়াছেন।) বলাই বাহুল্য যে, হিটলারের অনুমোদনের পর জেনারেল হালডার, যিনি এটাকে গোড়ার দিকে উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া প্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনিও এই পরিকল্পনাকে এখন লুফিয়া নিলেন এবং জেনারেল স্টাফের অফিসারেরা এর প্রভূত পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার পর এটি সরকারীভাবে গৃহীত এবং নির্দেশ হিসাবে প্রচারিত হইল—২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০। এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে ৭ মার্চের মধ্যে সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার হুকুম জারী হইল।

অবশ্য বিমান দুর্ঘটনার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের এই নকসার সাঙ্কেতিক নাম ছিল "কেস ইয়েলো" এবং বিমান দুর্ঘটনার পর পরিবর্তিত এই পরিকল্পনা লইয়া জার্মান জেনারেলদের মধ্যে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিতর্কের মূল কথা ছিল—এটা কি সেই প্রথম মহাযুদ্ধের বিখ্যাত জার্মান পরিকল্পনা শ্লিফেন প্ল্যানেরই পরিবর্তিত সংস্করণ? হালডার এবং রুন্ডস্টেড প্রমুখ সেনাপতিরা সেকথাই বলেন। শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেও জার্মান বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আগাইয়া গিয়া ইংলিশ চ্যানেলের বন্দর-শহরগুলি দখলের কথা ছিল। কিন্তু তারপর চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়া সীন নদী পার হইয়া পূর্বদিকে প্যারিসের নীচ দিয়া বাকী ফরাসী বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করার কথা ছিল। কিন্তু সেবার অর্থের জন্য শ্লিফেন প্ল্যান সফল হইতে পারে নাই। এবার ম্যানস্টাইন প্ল্যান অনুসারে জার্মানীর প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আর্দেনিস পার্বত্য এলাকার মধ্যবর্তী অংশে এবং তার পর সেডানের উত্তরে মিউজ নদী পার হইয়া ফ্রান্সের খোলা প্রান্তরে প্রচণ্ড সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীসহ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এবং ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীকে বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের দিকে ধাবমান হওয়া, সে কথা আগেই উল্লেখ হইয়াছে। হিটলারের জেনারেলদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগত ঈর্ষা ছিল, ম্যানস্টাইন অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসার। অভিনব পরিকল্পনায় বিরুদ্ধাচরণের অন্যতম কারণও তাই ছিল। কিন্তু জেনারেল রুন্ডস্টেড এই পরিকল্পনার উপর খুব ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি এটা খুব পছন্দ করিয়াছেন বলিয়াই নয়, বিশেষভাবে এজন্য যে, এই আক্রমণাত্মক অভিযানে তাঁর আর্মি গ্রুপ-এ (যার তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন) মুখ্য এবং চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্মি একটা বড় কীর্তি অর্জনের সুযোগ পাইবে।

এই নূতন পরিকল্পনা হাইকমান্ডের আশীর্বাদ লাভ করা সত্ত্বেও, শেষ মুহূর্তে কিন্তু স্বয়ং সুপ্রীম কমান্ডার হিটলারেরও আতঙ্ক হইয়াছিল। গোড়ায় পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, ৯ মে তারিখ তিনি চূড়ান্ত নির্দেশ দেন ৩ মে অভিযানের জন্য, কিন্তু আবহাওয়ার দোহাই দিয়া ৩ মে তারিখ উহা স্থগিত রাখিলেন ৬ মে পর্যন্ত এবং তার পর ৭ মে, গোয়েরিং চাহিলেন অন্ততঃ ১০ মে পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে এবং শেষে ৮ মে উত্তেজিত হইয়া স্থির করিলেন ১০ মে আক্রমণ চালাইতেই হইবে, আর একদিনও বিলম্ব না। (৩)

ফিলসেনেস্ট থেকে হিটলার হাই-কমান্ডের কাইটেল, জডল প্রমুখ দুই সামরিক নেতাদের সঙ্গে ৯ মে বিকেলে পাঁচটায় রেলযোগে রওনা হইলেন সীমান্তের সদর দপ্তরের দিকে—এই দপ্তরের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'Felsennest' এটি মুয়েনস্টেরইফেল শহরের নিকট। ১০ মে

---

(2) Decisive Battles of the Second World War — edited by Peter Young, London, 1967, p 16-21

(3) The Rise & Fall of the Third Reich — Williams L. Shirer p 860-63.

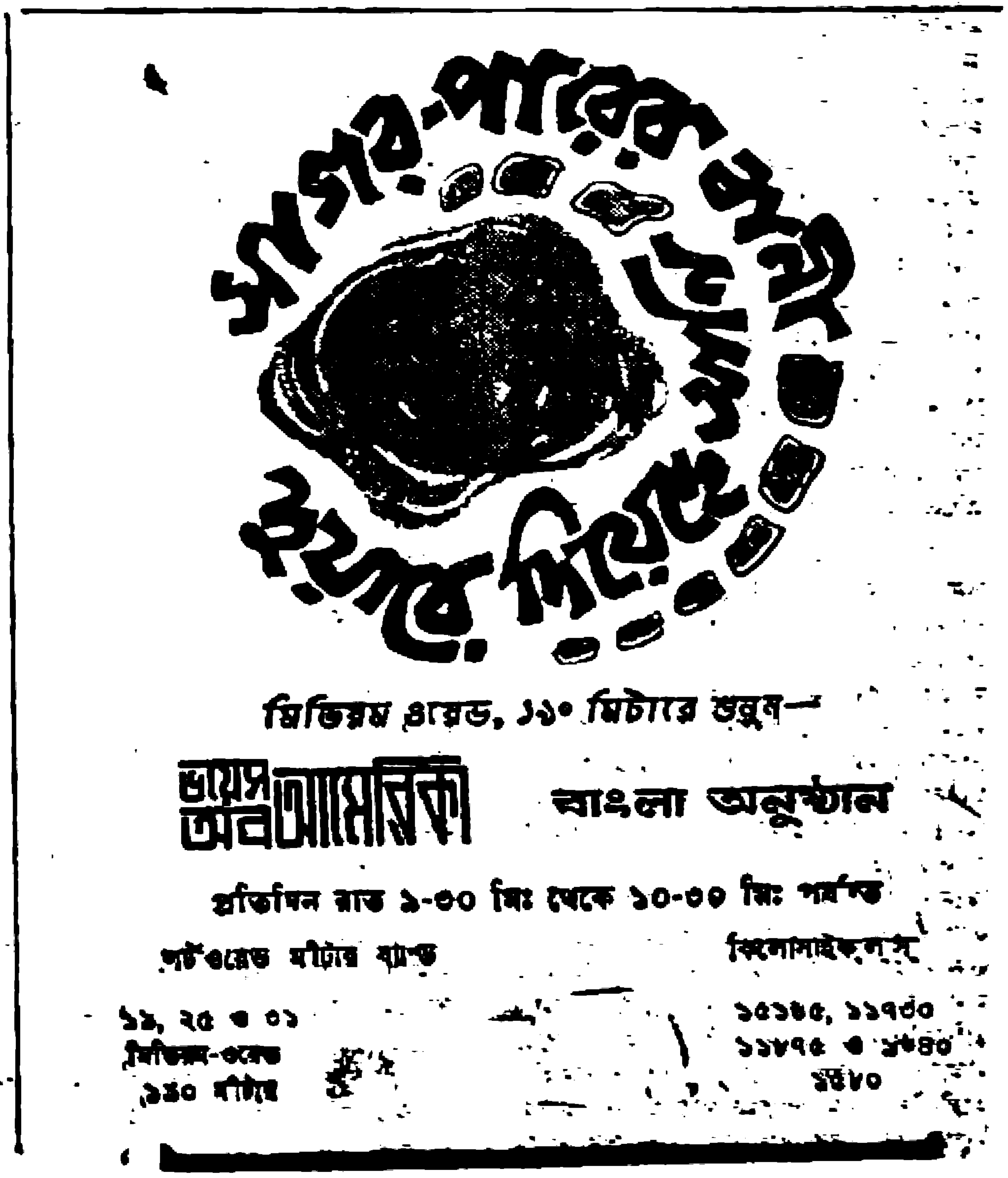

তের হওয়ার ঠিক আগে উত্তর সমুদ্র থেকে ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ১৭৫ মাইল রণাঙ্গনে নাৎসী সৈন্যেরা হল্যান্ড, বেলজিয়ম, লাক্সেমবুর্গ তিনটি দেশের বারম্বার ঘোষিত ও স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তিকে চূর্ণ করিয়া আক্রমণের তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল।......

কিন্তু হিট্লারের বিরুদ্ধেও গোয়েন্দাগিরি ছিল, বৈরিতা ছিল। (এমন কি ১০ জানুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক বিমান দুর্ঘটনার মূলেও খোদ গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা—এডমিরাল ক্যানারিসের কোন কারসাজি ছিল কিনা, অন্ততঃ রণপণ্ডিত লিডেলহার্ট সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন।—তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) কর্ণেল ওস্টার ছিলেন নাৎসী বিরোধী ষড়যন্ত্রের একজন পাণ্ডা। তাঁর সঙ্গে বার্লিনের ওলন্দাজ দূতাবাসের মিলিটারি এটাচি কর্ণেল জি জে সাস্ নামে একজন অফিসারের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তিনিই ৯ মে তারিখ কর্ণেল সাস্কে বলিয়া দিলেন—'শুকরের বাচ্চাটা পশ্চিম রণাঙ্গনে গিয়াছে।' 'শুকরের বাচ্চা' অর্থে এখানে হিট্লার। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গোপন সংবাদ সাসের চেষ্টায় বেলজিয়াম ও ডাচ কর্তাদের কানে পৌঁছিল। অবশ্য এর দ্বারা যুদ্ধের ফলাফলের কোন তারতম্য হইল না।

•

১০ মে যে আক্রমণ সুরু হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে এত বড় বিদ্যুৎগতি ব্যাপক আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। একেবারে পরিকল্পনা মাফিক, এমন কি তার চেয়েও নিখুঁত এবং দ্রুতগতিতে জার্মান বাহিনীগুলি আগাইয়া যাইতে লাগিল, আর পাঁচ দিনের মধ্যেই ইঙ্গ-ফরাসী বা মিত্র বাহিনীর সঙ্কট চরম আকারে দেখা দিল: ১৫ মে সকালে সাড়ে সাতটায় তখনও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘুম থেকে ওঠেন নাই: তাঁর শোবার ঘরে বিছানার পাশে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। প্যারিস থেকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পল্ রেনোর আর্ত কণ্ঠস্বর শুনা গেল:

'আমরা পরাজিত হয়েছি, আমরা হেরে গেছি!'—এই কথাগুলি পশ্চিম রণাঙ্গনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু চার্চিল যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে ফরাসী বাহিনী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির ঐতিহ্যবাহী সেই বাহিনী এত দ্রুত হারিয়া গেল? ১৬ মে চার্চিল প্লেন-যোগে উড়িয়া গেলেন প্যারিসে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী রেনো এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল গামেলার সঙ্গে দেখা হইল। জেনারেল মহাশয় চার্চিলকে সেডান রণক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর অবস্থা, যার ফলে ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত—এই অবস্থায় জার্মান বাহিনী চ্যানেলের দিকে কিম্বা প্যারিসের দিকে ছুটিতে পারে—এই গুরুতর কথাগুলি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন।

খানিক নিস্তব্ধতার পর চার্চিল ফরাসী ভাষায় জেনারেল গামেলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ বা রণনৈতিক মজুত বাহিনী কোথায়?'

(চার্চিল লিখিয়াছেন যে, এই আলোচনার সময়েই তিনি জানালা দিয়া দেখিলেন যে, মন্ত্রিভবনের বাগান থেকে ধোঁয়া উঠিতেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিলপত্র পোড়ানো হইতেছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই প্যারিস পরিত্যাগের পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে।)

গ্যামেলা চার্চিলের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'রিজার্ভ কিছু নাই!'

এই উত্তর শুনিয়া চার্চিল 'স্তম্ভিত' হইয়া গেলেন এবং লিখিয়াছেন—

—'আমার জীবনে পরমতম বিস্ময় বোধের এটি ছিল অন্যতম, একথা আমি সরলভাবেই স্বীকার করিব।'......

এই 'পরম বিস্ময়' একটির পর একটি করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘটিয়া যাইতে লাগিল এবং ১৯ মে [illegible] বেলা চ্যানেলের দিকে ধাবমান ৭টি 'প্যান্জার' ডিভিশন প্রথম মহাযুদ্ধের সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রগুলি (ফ্ল্যান্ডার্সের) অতিক্রম করিয়া গেল এবং ২০ মে সন্ধ্যাবেলা জেনারেল গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক বাহিনীর হাতে আবেভিল বন্দর দখল হইয়া গেল। আর বেলজিয়াম, বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি সেই ফাঁকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল।

বিস্মিত হিট্লার আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

•

কিন্তু গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক অভিযানের আতঙ্কের মধ্যে পড়িয়া যখন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা চূর্ণ হইতে লাগিল এবং ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরগুলি একে একে পাকা ফলের মত হাতের মুঠোয় আসিতে লাগিল, তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর ডানকার্ক থেকে পলায়নের সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল কিরূপে? যুদ্ধের সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে আসল কারণটা জানা যায় নাই। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ১৭ মে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জেনারেল গুডেরিয়ানের নিকট নির্দেশ আসে আর চ্যানেলের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। কিন্তু গুডেরিয়ান এতে একেবারে অবাক হইয়া যান (তাঁর পুস্তকে লিখিত বক্তব্য অনুসারে)। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, ম্যানস্টাইন প্ল্যান যখন গৃহীত হইয়াছিল, তখন হিট্লারের সঙ্গে তাঁর কথা অনুসারে তিনি চ্যানেলের দিকে অব্যাহত গতিতে আগাইয়া যাওয়ার অধিকারী। সুতরাং প্যাঞ্জার গ্রুপের অধিনায়ক জেনারেল ভন্ ক্লাইস্টের সঙ্গে এই নিয়া তাঁর বিরোধ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য আর্মি গ্রুপের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি পুনরায় তাঁর সেনাপত্য (কমান্ড) গ্রহণ করেন। কিন্তু আবার বিভ্রাট দেখা দিল। এবার ২৪ মে একেবারে খোদ সুপ্রীম কমান্ড থেকে হুকুম আসিল আর ডানকার্কের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। স্বয়ং হিট্লার এই হুকুম জারি করিয়াছেন। অতএব ডানকার্কের দিকে অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া দিতে হইল।

এই আদেশ পাইয়া গুডেরিয়ান স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। কারণ, এমন আদেশের কোন মাথামুণ্ডু বুঝা গেল না। হিট্লার অবশ্য পরে বলিয়াছিলেন যে, ফ্ল্যান্ডার্স অঞ্চলের অসংখ্য ক্যানেল ও ভিজে (খাদ) জমির জন্য ট্যাঙ্কের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। কিন্তু এটা বাজে ওজর বলিয়া প্রতিভাত হইল।

২৬ মে অপরাহ্নে হিট্লার অবশ্য আবার অনুমতি দিলেন ডানকার্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। কিন্তু তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই সুযোগে বৃটিশ সৈন্যেরা চ্যানেল পার হইয়া গেল। জার্মান বাহিনী দূর থেকে সেটা দেখিলেন। অর্থাৎ ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যদের এভাবে পরিত্রাণ মোটেই সম্ভব হইত না, যদি না সুপ্রীম হেডকোয়ার্টার্স ১৯নং আর্মি কোরকে তাদের গতিপথে থামাইয়া না দিতেন। কিন্তু হিট্লারের নার্ভাসনেসের জন্যই মূল্যবান সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল। (৪)

কিন্তু গুডেরিয়ানের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ, আর্মি গ্রুপের প্রধান অধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডও এর জন্য সমভাবে দায়ী ছিলেন। তিনিই অগ্রসরমান ট্যাঙ্ক বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকাইয়া কিছুটা দম লইবার জন্য এই পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং হিট্লার তাতে রাজী হইয়াছিলেন। অবশ্য বিমান বাহিনীর অধিনায়ক গোয়েরিংয়ের আস্ফালনও হিট্লারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ, গোয়েরিং চাহিয়াছিলেন উপকূল ভাগের দিকে কোণে পড়া শত্রু সৈন্যদিগকে তাঁর বিমান বাহিনীর দ্বারা সাবাড় করিতে।

কিন্তু রণপণ্ডিত লিডেলহার্ট বলিয়াছেন যে, এই ঐতিহাসিক ও বিতর্কমূলক নির্দেশের পিছনে একমাত্র সামরিক কারণ ছিল না, আসলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। ২৪ মে তারিখ হিট্লার ও রুন্ডস্টেডের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যাপার সম্পর্কে রুন্ডস্টেডের

(4) Decisive Battles of the Second World War — Peter Young, p 42-43।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৫৮

মুর্শালিয়ার প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল গুদেরিয়ান ব্রুমেন্ট্রিট্ লীডেলহার্টের নিকট (যুদ্ধের পর) যা' বলিয়াছিলেন, তার মর্ম এই :

'হিট্লার খুব উল্লসিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এই অভিযানে একটা মিরাক্যাল্ ঘটিয়া ঘটিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। তারপর ফ্রান্সের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তি-সন্ধি করার পর বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি করারও অবাধ সুযোগ পাওয়া যাইবে।

অতঃপর হিট্লার বৃটিশ সাম্রাজ্যের এমন গুণগান করিলেন যে, আমরা অবাক হইলাম। তাঁর মতে বৃটেন পৃথিবীতে একটা নূতন সভ্যতা আনিয়াছে।......

উপসংহারে তিনি বলিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য হইতেছে, বৃটেনের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করা।' (৫)

সুতরাং ইতিহাসের বিচারে ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যের পরিত্রাণ কোন 'মিরাক্যাল্' ছিল না, জার্মাণ হাইকমান্ডের ভুলের জন্যই এটা ঘটিয়াছে এবং যে ভুল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক হিট্লারী যুদ্ধের একটা 'মেজর মিস্টেক্' বা বড় রকমের ভুল বলিয়া স্বীকৃত।

●

ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বিপর্যয় ও প্যারিস নগরীর আত্মসমর্পণের সময় (১৮নং জার্মাণ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ফন্ কুয়েকলার ১৪ জুন এই মহানগরী দখল করিয়া বিখ্যাত ইফেল টাওয়ারের উপর স্বস্তিক পতাকা উড়াইয়াছেন) অনেক নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল, যেগুলির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে, একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে ঐতিহাসিক কারণে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মাণ সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্ম নির্বাসিতরূপে হল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর কথা বাইরের জগতে কাহারও স্মরণে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ হিট্লারী দিগ্বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়া হল্যান্ডের ডুর্ণ শহর থেকে নির্বাসিত কাইজার ১৯৪০, ১৭ জুন তারিখে হিট্লারের উদ্দেশ্যে এক উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন—যে হিট্লারকে তিনি এত দিন 'একটা তুইফোড় চাষাড়ে লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধের পর এই অভিনন্দন ধৃত নাৎসী কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। অভিনন্দনের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

"Under the deeply moving impression of the capitulation of France I congralutate you and the German wehrmacht on the mighty victory granted by God, in the words of the Emperor willhelm the Great in 1870 : 'what a turn of events brought about by divine dispensation'... ......".

প্রাক্তন জার্মাণ সম্রাট এই তারবার্তায় সম্ভবতঃ একটু ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, জার্মাণীর এত বড় জয়ের জন্য তিনি হিট্লারী প্রতিভার কোন উল্লেখই করিলেন না, একমাত্র ভগবানের কৃপার উপর দোহাই দিলেন। সুতরাং হিট্লার নম্রো নম্রো করিয়া যে জবাবের খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন, তা আদৌ পাঠানো হইয়াছিল কিনা, সন্দেহজনক। কারণ, নথিপত্রে তার কোন প্রমাণ নাই।

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম ডুর্ণ শহরে মারা যান পরের বছর ৪ জুন, ১৯৪১। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু জার্মাণীতে কেউ খেয়াল করেন নাই। (৬)

হিট্লারের প্রতিশোধ

পশ্চিম রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব জয় লাভের পর হিটলার প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণীর পরাজয়ের প্রতিশোধ কিভাবে নিয়াছিলেন, আগের অধ্যায়ে তা' খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাটা এত ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় যে, এখানে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে......

হিট্লার আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, সেই কম্পেন অরণ্যের ঠিক সেই স্থানেই ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, যেখানে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। স্থানটি হইতেছে প্যারিসের ৪৫ মাইল উত্তরে এবং কম্পেন শহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মার্শাল ফশ্ ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র যে রেলওয়ে কামরায় (ওয়াগন লীট্) বসিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কম্পেন অরণ্যের একটি জায়গায় সযত্নে নির্মিত মিউজিয়মের মধ্যে সেটি রক্ষিত ছিল। ১৯ জুন অপরাহ্ণে জার্মাণ মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারগণ সেই মিউজিয়ামের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রেলওয়ে কামরাটি বাহির করিলেন এবং ঠিক ১৯১৮ সালের যথাস্থানে ওটি পুনরায় স্থাপন করিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী (বিখ্যাত মার্কিণ সাংবাদিক উইলিয়াম শিরার) লিখিয়াছেন যে, তখন জুন মাসের চমৎকার গ্রীষ্ম, স্থানটি বড় বড় ওক, সাইপ্রাস, পাইন ইত্যাদি গাছের নিবিড় ছায়ায় বড় রমণীয়। এখানে একটি প্রকান্ড রাস্তার শেষে ছিল আলসাস-লোরেনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি মনুমেন্ট—জার্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতীকস্বরূপ দেখানো হইয়াছে একটি খোঁড়া ঈগল পাখী, যাকে বিদ্ধ করিতেছে বিশালকায় প্রতীক-তরবারি একটি বৃহৎ তরোয়াল এবং তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল :

"To the heroic soldiers of France, defenders of our country and of right, glorious liberators of Alsace Lorraine".

১০ জুন অপরাহ্ণ ঠিক ৩-১৫ মিনিটে হিট্লার, গোয়েরিং, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ-নেতাদের সঙ্গে একটি প্রকান্ড মার্সেডিজ বেন্ গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর পরনে ইউনিফর্ম ও বুকে আইরন ক্রশ ঝুলানো ছিল এবং তিনি ওই মনুমেন্টের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল গম্ভীর এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় যেন রক্তিম হইয়া উঠিল, বিজয়ীর ঔদ্ধত্য এবং দম্ভও তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন তিনি আগাইয়া গিয়া আর একটি প্রস্তর ফলকে ফরাসী ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি নিঃশব্দে পড়িলেন......

"Here on the eleventh day of November, 1918, succumbed the criminal pride of the German Expire, vanquished by the free peoples which it tried to enslave" ......

তখন তাঁর (হিট্লারের) মুখে যে ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখা গেল, তার কোন তুলনা নাই। তাঁর চোখের দৃষ্টিপাতেও যেন 'masterpiece of contempt'!....

(হিট্লারের আদেশে তিন দিন পর সেই প্রস্তর ফলকটি চূর্ণ করিয়া ফেলা হইল।)

তারপর হিট্লার সেই রেলওয়ে কামরায় ১৯১৮ সালের মার্শাল ফশের ব্যবহৃত সেই আসনে গিয়াই বসিলেন। জার্মাণ ও ফরাসী প্রতিনিধি দলের মধ্যে নিয়মমাফিক কায়দা-কানুন অনুষ্ঠিত হইল। তখন হিট্লারের নির্দেশে জেনারেল কাইটেল যুদ্ধবিরতি চুক্তির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ঠিক ২৭ মিনিট সময় লাগিল—যদিও এর পরেও উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় ২৭ ঘন্টা লাগিয়াছিল।

হিট্লার তাঁর মূল্যবান সময় আর নষ্ট করিলেন না। বিজয়ীর দর্পে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আর বিমর্ষ ও বিপর্যস্ত ফরাসী প্রতিনিধি দল কাছেই একটি তাঁবু থেকে বিশেষভাবে নির্মিত টেলিফোনের সাহায্যে ফরাসী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির কঠোর সর্তগুলি নিয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন।......

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির উপর আর একটি কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল। সামরিক দিক থেকে এর মূলে ছিল ম্যানস্টাইন প্ল্যানের সার্থক প্রয়োগ।

(ক্রমশঃ)

(৫) লীডেলহার্ট প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস, লন্ডন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৮০

(৬) উইলিয়াম এল শিরার প্রণীত—দি রাইজ্ এন্ড ফল্ অব্ দি থার্ড রাইখ্, পৃঃ ৮৮৬

হলদিয়ার প্রতিশ্রুতি

সুধীর কুমার সেন

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকারীর পরিপ্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে কয়েকলক্ষ লাখখানেক মানুষের কর্মসংস্থানের যে আশ্বাস হলদিয়া দিচ্ছে, সে দিক থেকে এই নির্মীয়মান শিল্পনগরীর আকর্ষণ কম নয়। পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটা রাজ্য যেখানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতাই ছিল একমাত্র নগরী, যদিও মানুষের নতুন জীবিকার পথ সৃষ্টির সামর্থ্য তার অনেকদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। অথচ এখানে কর্মপ্রার্থী শুধু এ রাজ্যের লোক নয়, অন্যান্য রাজ্য থেকেও অসংখ্য মানুষ অন্নের সন্ধানে এখানে এসে বেকারের তালিকা স্ফীত করেছে। ফলে নগরীর দারিদ্র্য বেড়েছে অশান্তি অরাজকতা জনজীবনকে গ্রাস করেছে এবং কলকাতা লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটির জন্য দৈনন্দিন রূঢ় সংগ্রামের এক জীবন্ত চিত্রের রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে দুর্গাপুর যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর চিন্তায় ও কাজে রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থবোধের অভাব তার পূরণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দুর্গাপুর আজ কর্মপ্রার্থীদের সামনে নতুন আকর্ষণ হওয়ার পরিবর্তে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের শিল্পশান্তির কারণে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাই হলদিয়ার প্রতিশ্রুতির পিছনে দুর্গাপুরের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে ছায়া বিস্তার করেনি তা নয়। তবুও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে পশ্চিমবঙ্গের এই দ্রুত অধোগতি যদি রোধ করতে হয় তাহলে বর্তমান অরাজকতা কঠোর হস্তে দমনের সঙ্গে সঙ্গে বেকারী নিরসনের জন্যও প্রাণপণ সংগ্রামে নামতে হবে এবং সেক্ষেত্রে হলদিয়ার গুরুত্ব কম নয়।

গুরুত্ব কম নয় এই জন্য বলছি, কারণ হলদিয়ার পরিকল্পনার শুরুতে তাকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কলকাতার এক পাল্টা শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল, যার আসল লক্ষ্য হবে কলকাতা থেকে কর্মপ্রার্থীদের ভিড় কমানো। আকর্ষণ হিসেবে এখানে যে শিল্প-[illegible] তোলা হবে তাও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব হয়েছে, তার অনেকগুলোরই পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হুগলী নদী ক্রমাগত মজে যেতে থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা বন্দরে কোন বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। ফলে বন্দর পরিচালনার ব্যয় যেমন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল, তেমনি যেসব জাহাজ এখানে এসে ভেড়ে তাদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

কলকাতা বন্দরের এই সমস্যা অবশ্য নতুন নয়, শ'খানেক বছর আগে এর সূচনা হয়। হুগলী নদীতে এত পলি পড়ে যে বন্দরের একটা অংশে এর নাব্যতা দ্রুতভাবে হ্রাস পায় এবং বন্দরে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে নিয়মিতভাবে ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা কোনভাবে বজায় রাখা হলেও বর্তমানে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে বছরে মাস দুয়েক ছাড়া বন্দরে বড় জাহাজ ভেড়ার মত জল থাকে না। বিশেষজ্ঞরা আশা করেন যে ফরাক্কা বাঁধ শেষ হলে গঙ্গার নাব্যতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে, কারণ তখন প্রচুর জল পাওয়া যাবে। তবু বেশী বড় ড্রাফটের জাহাজ এখানে ভবিষ্যতে ঢুকতে পারবে এরকম আশা নেই।

কলকাতা বন্দরের এই বর্তমান সমস্যার সমাধানের চিন্তাই হলদিয়ার নতুন বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনার জন্ম দেয়। তমলুক মহকুমার নয় বর্গমাইলের কিছু বেশী এলাকা হুকুম দখল করে যে বন্দরনগরী নির্মাণের কাজ চলছে তাতে ৪০ ফুট ড্রাফটের জাহাজ এখনই ভিড়তে পারবে যেখানে কলকাতা বন্দরে ২৬ ফুটের বেশী ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে না। বর্তমানে হলদিয়া ডকে তিন হাজার পর্যন্ত টনের জাহাজ আসতে পারে। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের মতে, বারাকার কাজ শেষ হলে এক লক্ষ টন পর্যন্ত জাহাজও হলদিয়া বন্দরে ভিড়তে পারবে।

হলদিয়া বন্দরে যে ডক তৈরী হচ্ছে তাতে থাকবে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত চারটি বার্থ ও দুটি জেটি। এগুলি প্রধানত কয়লা, লোহ, পেট্রল ও ফার্টিলাইজার বোঝাই-খালাসের কাজে লাগবে। অয়েল জেটির কাজ শেষ হয়েছে ১৯৬৮ সালেই। এখন এখানে বিদেশ থেকে আমদানী তেল পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাইপ লাইন বরাবর বিহারে বারৌনি তৈল শোধনাগারে। ডকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশের কাজকর্ম শেষ হয়েছে। ১৯৭১ সালের মধ্যেই ডক নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কাঁচামালের অভাবে কাজ কিছুটা হয়ত বিলম্বিত হবে।

শিল্প-প্রত্যাশা

আধুনিক বন্দর ও জেটি এতবেশী যান্ত্রিক যে সেখানে শিল্প-পরিধির তুলনায় মানুষের কর্মসংস্থান খুব কম। বন্দরের কাজ একেবারে শেষ হলে তাতে পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ বোঝাই খালাস, মাল পরিবহন, বন্দরে আশ্রিত জাহাজগুলোর রসদ প্রভৃতি যোগানের জন্য আরো যে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাতে কর্মসংস্থান হবে আরো অনেক বেশী মানুষের। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এখানে যে তৈল শোধনাগার নির্মিত হচ্ছে তার ফলে সৃষ্টি হবে অসংখ্য উপজাত দ্রব্যের যাতে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তৈল আমদানী-রপ্তানীর বন্দরের কাছে ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন তার কারখানা গড়ে তুলছে। এর কাজ সম্পূর্ণ হতে আরো কমবেশী দু বছর লাগবে। রিফাইনারির উপজাত কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য বসবে আর দুটি শিল্প—পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও সার কারখানা। পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্সকে শিল্প না বলে শিল্পসমবায় বলাই যুক্তিযুক্ত হবে, যা থেকে রং, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি বহু শিল্প জন্ম নেবে। এছাড়া এখানে মেথানল ও সোডা অ্যাশ কারখানা, জাহাজ তৈরীর কারখানা, ইলেকট্রনিক শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে। এই রাজ্যে জাহাজ কারখানা স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিনের দাবী আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে তথ্য-

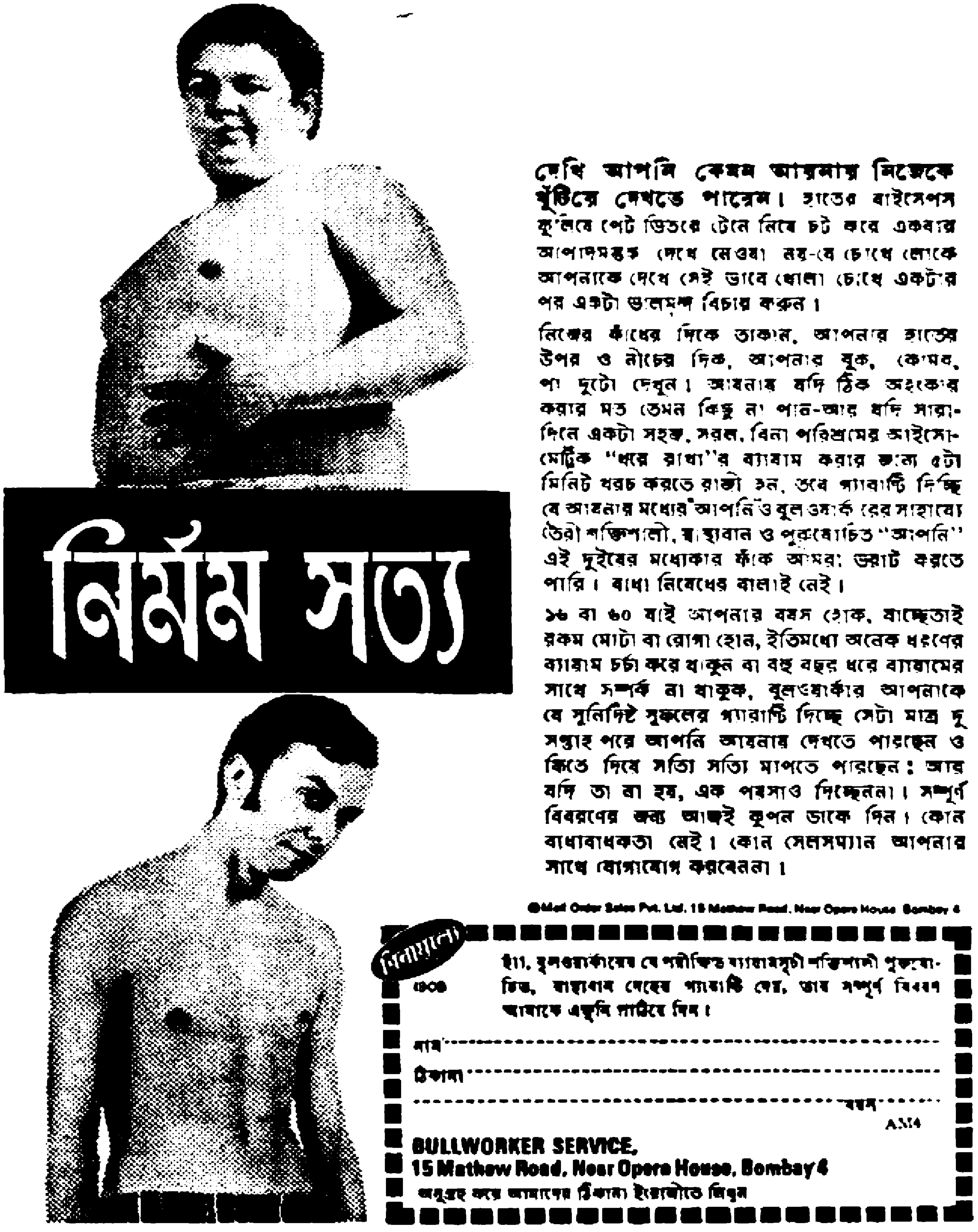
নির্মম সত্য
দেখি আপনি কেমন আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। হাতের বাইসেপস ফুলিয়ে পেট ভিতরে টেনে নিয়ে চট করে একবার আপাদমস্তক দেখে নেওয়া নয়-যে চোখে লোকে আপনাকে দেখে সেই ভাবে খোলা চোখে একটার পর একটা ভালমন্দ বিচার করুন।
নিজের কাঁধের দিকে তাকান, আপনার হাতের উপর ও নীচের দিক, আপনার বুক, কোমর, পা দুটো দেখুন। আয়নায় যদি ঠিক অহংকার করার মত তেমন কিছু না পান-আর যদি সারাদিনে একটা সহজ, সরল, বিনা পরিশ্রমের আইসোমেট্রিক "ধরে রাখা"র ব্যায়াম করার জন্য ৫টা মিনিট খরচ করতে রাজী হন, তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়নার মধ্যের আপনি ও বুলওয়ার্কারের সাহায্যে তৈরী শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও পুরুষোচিত "আপনি" এই দুইয়ের মধ্যেকার ফাঁক আমরা ভরাট করতে পারি। বাধা নিষেধের বালাই নেই।
১৬ বা ৬০ যাই আপনার বয়স হোক, যাচ্ছেতাই রকম মোটা বা রোগা হোন, ইতিমধ্যে অনেক ধরণের ব্যায়াম চর্চা করে থাকুন বা বহু বছর ধরে ব্যায়ামের সাথে সম্পর্ক না থাকুক, বুলওয়ার্কার আপনাকে যে সুনির্দিষ্ট সুফলের গ্যারান্টি দিচ্ছে সেটা মাত্র দু সপ্তাহ পরে আপনি আয়নায় দেখতে পারছেন ও ফিতে দিয়ে সত্যি সত্যি মাপতে পারছেন: আর যদি তা না হয়, এক পয়সাও দিচ্ছেননা। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আজই কুপন ডাকে দিন। কোন বাধাবাধকতা নেই। কোন সেলসম্যান আপনার সাথে যোগাযোগ করবেননা।
©Mail Order Sales Pvt. Ltd. 15 Mathew Road, Near Opera House Bombay 4
বিনামূল্যে
হাঁ, বুলওয়ার্কারের যে পরীক্ষিত ব্যায়ামসূচী শক্তিশালী পুরুষোচিত, স্বাস্থ্যবান দেহের গ্যারান্টি দেয়, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।
নাম
ঠিকানা
বয়স
AM4
BULLWORKER SERVICE,
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4
অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন

নসংস্থানের জন্য ক'জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছেন। দিন কয়েক আগে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি শিপিং মিশনও হলদিয়া পরিদর্শন করেছেন। ভারতীয় কয়েকটি জাহাজী কোম্পানী তৈলবাহী ট্যাঙ্কার ক্রয়ের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ঋণ প্রার্থনা করায় তাঁরা কলকাতায় পোর্ট কমিশনার্সের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে হুগলী নদীর বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নাব্যতা (ফারাক্কার কাজ শেষ হওয়ার পূর্বে) সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। হলদিয়া পরিদর্শনকালে তাঁরা সেখানকার প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

জাহাজ কারখানা

হলদিয়ায় জাহাজ তৈরীর কারখানা যদি কেন্দ্রীয় অনুমোদন পায় তাহলে এর প্রথম পর্যায়ের কাজেই পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কারখানা স্থাপনের যে পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে তা যদি দ্রুত প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে সূচনার ধাপে পা দিতে পারে এবং অবিলম্বে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় তাহলে এই রাজ্যের বহু বেকারের এখনই কর্মসংস্থান সম্ভব হতে পারে।

হলদিয়ায় জমি সংগ্রহ করার ব্যাপারে কিছু বেহিসেবী কাজ আছে যার ফলে বর্তমান সংগৃহীত নয় বর্গমাইল এলাকায় ডক, রিফাইনারি, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও সার কারখানা ছাড়া বেসরকারী মালিকানায় কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপযোগী জায়গা নেই। এই হুকুম দখল করা জায়গায় ডক, কারখানা ছাড়া যেসব বসতবাড়ী গড়ে উঠবে সেগুলোও শুধু সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বন্দর ও কারখানার কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য। যেখানে সরকারী মালিকানায় এতগুলো শিল্প গড়ে উঠবে, সেখানে বেসরকারী উদ্যোগেও বহু আনুষঙ্গিক ও সহায়ক শিল্প গজিয়ে উঠবে। এবং উপনগরীর চাহিদা মেটাতে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, হোটেল, রেস্তরাঁ, বাজার, দোকানের জায়গা দরকার হবে। বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ী করার জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হবে। এই স্থান সংগ্রহের জন্য অবশ্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু যদি এতে প্রশাসনিক শৈথিল্যের দরুণ বিলম্ব ঘটে তাহলে উপনগরী গড়ে ওঠার কাজও বিলম্বিত হবে। দ্বিতীয়ত মানুষের আপাতঃ প্রয়োজন মেটাতে এই শিল্পনগরীকে ঘিরে নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে কতকগুলো ঘিঞ্জি শহরতলী গড়ে উঠবে। কলকাতা এবং শহরতলীগুলোর অব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের তিক্ত স্মরণ রেখেও কর্তৃপক্ষের পূর্বেই এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত ছিল।

সড়ক, পরিবহন

পরিবহন ও সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে। মহিষাদল থেকে হলদিয়া পর্যন্ত যে রাস্তা আছে তাই-ই এখন পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের একমাত্র পথ। মেচেদা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত যে রেললাইন আছে তাতে বর্তমানে মালগাড়ী চলে কিন্তু যাত্রী পরিবহনের ট্রেন এখনও চালু হয়নি। যাতে দূর অঞ্চলের মানুষরাও এসে হলদিয়ায় কাজ করে সন্ধ্যা বেলা আবার ঘরে ফিরে যেতে পারেন তজ্জন্য ট্রেন বাস ও লঞ্চ সার্ভিসের সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের সঙ্গেও হলদিয়াকে যুক্ত করা হবে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলোর রূপায়নে যদি অহেতুক বিলম্ব হয় তাহলে হলদিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্মে যুক্ত মানুষের অসুবিধার অন্ত থাকবে না।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং শিল্পক্ষেত্রে অসুস্থ পরিবেশের জন্য বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি বরং ঘেরাও, ধর্মঘট, লোকআউট প্রভৃতির ফলে চালু বহু কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে নবাগতরাই শুধু বেকারের তালিকায় স্থান পাননি, পূর্বে কর্মরত বহু ব্যক্তিও তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এই অবস্থার জন্যে শ্রমিক-মালিক উভয়কেই অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতারাও এর জন্য কম দায়ী নয়। এই অশান্ত ও অনিশ্চিত পরিবেশের জন্য গত কয়েক বছরের মধ্যে চালু শিল্পগুলোর স্বাভাবিক প্রসারও ঘটেনি। বহু শিল্প ও মূলধনের রাজ্যান্তরে প্রস্থানের ঘটনাও বিরল নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসেবমতোই বেকারের সংখ্যা তিন লক্ষে পৌঁছেছে, বেসরকারী হিসেবে যা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশী হবে। এছাড়া, অর্ধবেকার ও সাময়িক বেকাররাও আছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, পঙ্গুতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তার অস্বাভাবিক দৈন্য এই রাজ্যকে এক নিদারুণ ব্যাধির কবলিত করেছে। এই ব্যাধি যদি হলদিয়াকেও যথারীতি সংক্রামিত হয় তাহলে এই রাজ্যের অধোগতি রোধের আর কোনো অবকাশ থাকবে না। এই রাজ্যের যাঁরা প্রকৃতই মঙ্গলকামনা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই হলদিয়াকে দুর্গাপুরের পথে ঠেলে দেবেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল
বিপ্লবী
জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর
নমামি
পরিবর্ধিত সংস্করণ। দশ টাকা
ভূমিকা—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী
"...জিতেশচন্দ্রের নমামি বাংলা ভাষায় রসসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। বাস্তব চরিত্রের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ ও এমন নিখুঁত রূপদান ইতিপূর্বে দেখি নাই।"
—বিপ্লবী নেতা শ্রীনলিনীকিশোর গুহ
"...নমামি বইখানি চমৎকার—অবিস্মরণীয়।...এই অপূর্ব রচনার যথাযথ সমাদর দেশ দিল না বলে আমার দুঃখ সহজে ঘুচবে না।..."
অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এম-পি)
"...এই ধরণের ইতিহাসধর্মী গল্প ইতি-পূর্বে দেখি নাই।..." —আনন্দবাজার
পূঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন অর্থ ও কারামন্ত্রী
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর
পাক-ভারতের রূপরেখা ১০·০০
দে বুক স্টোর। কথা ও কাহিনী। ডি এম। খান্না প্রকাশনী। পোঃ চাপড়া। নদীয়া।

নির্মল আচার্য, সম্পাদিত
রক্ত স্বাক্ষর
সর্বসাধারণের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা—নতুন লেখক, লেখিকার বলিষ্ঠ লিখনীর সমন্বয়ে "শারদীয় রক্ত স্বাক্ষর" মহালয়ার আগে বের হচ্ছে। বার্ষিক পূজা সংখ্যা, সাহিত্য সংখ্যাসহ সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—নয় টাকা। পত্র উত্তরে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।
কার্যালয় : ১৬নং বীরেন রায় সরণী, কলিকাতা-১২

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল সীমা। সাধারণতঃ সে স্বল্পাহারী কিন্তু এ সময়ে তার খাওয়ার পরিমাণ দেখে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু তাই নয় তার খাদ্যতালিকা মাত্র দুটো জিনিসেই সীমাবদ্ধ থাকে—চিংড়ি মাছ এবং ডিম। এছাড়া অন্য খাবার সে স্পর্শ করে না এসময়। রেস্তোরায় এদুটির অভাব থাকলে সে অন্য আর একটা খুঁজে নেয়। চিংড়ি মাছ এবং ডিম তার চাই। এ সময়ে এ দুটো জিনিস তার ভাল লাগে কেন তা সে বুঝতে পারে না। রেস্তোরার বিলটা চুকিয়ে সে একটা বাসে উঠল। প্রায় আধঘন্টা চলার পর ট্রামে চড়ে উলটো রাস্তা ধরল আবার। এটা সতর্কতার লক্ষণ। তাকে যদি কেউ অনুসরণ করে তাহ এভাবে তাকে এড়ানো সম্ভব বলেই তার বিশ্বাস। অবশেষে ট্রাম থেকে নেমে সীমা একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে বক্সারের জন্য তার মন কেমন করছিল। কতক্ষণে সে তার গাঢ় বাদামী রঙের মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে আদর করবে সেই কথাই সে ভেবেছে সারা সময়। ব্যাগটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সীমার পায়ের আওয়াজ বক্সার পেয়েছে তাই সে প্রস্তুত হয়েই ছিল তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য। অনেকক্ষণ ধরে তাকে আদর করল সীমা। বক্সারের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, বিস্কুট খাইয়ে, আদরের নাম ধরে ডেকে সে তৃপ্তি পেল। এই জন্তুটা তার কাছে বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আর নির্ভরতার প্রতীক। বক্সারের কাছ থেকে এসে সীমা বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সমস্ত জিনিসটা মনে মনে

ভেবে দেখবার সময় পেল সীমা। না, কোথাও খুঁত নেই তার কাজে। জায়গাটা দেখলেই মনে হবে যে, গুন্ডার দল এসে তাকে কাবু করে টাকাটা কব্জা করেছে। পুলিশ এসে অনুসন্ধান করবে নিশ্চয় কিন্তু কি প্রমাণ তারা পাবে? দারোয়ান হলফ করে বলবে মিসেস মোদীকে সে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিন্তু তাকে দেখেনি। তার অন্তর্ধান দুটো জিনিসই অবশ্য মনে হবে পুলিশের। হয় সে গুন্ডাদের কবলে রয়েছে কিংবা সে নিজেই টাকাটা সরিয়েছে। চুরি কথাটা কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয় সীমার কাছে। দুনিয়ার লোকে সকলেই রোজগার করে তবে এটাকে লোকে চুরি বলবে কেন? প্রথম সীমা কবে চুরি করেছিল সেটা তার স্পষ্ট মনে আছে। তখন সে স্কুলে পড়ে। স্কুলের একজন মেয়ের ব্যাগ থেকে মাইনের টাকাটা সে কৌশলে সরিয়ে নিয়েছিল। মেয়েটা আকুল হয়ে কেঁদেছিল টাকার শোকে। অস্থির হয়ে খুঁজেছিল চতুর্দিকে যদি টাকাটা পাওয়া যায়। সীমার বেশ মজা লেগেছিল সে সময়, খুব আনন্দ পেয়েছিল সে। মাইনের টাকাটা নিয়ে কি করেছিল এখন তা আর মনে নেই তবে মনে যেন জোর এসেছিল টাকাটা পাওয়াতে, বিপদগুলো ছিটিয়ে যাওয়া মনে সাড়া জেগেছিল এটা সে এখনও ভুলে যায়নি।

প্রথমবার একটু ভয় হয়েছিল, বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক কাঁপুনি জেগেছিল বলে মনে পড়ল সীমার। তারপরে আর কোন ঘটনাই তাকে এধরনের বিপদে ফেলতে পারে নি। উপরন্তু এতে একটা উত্তেজনা সে উপভোগ করে, কাজটা গৌরব অনুভব করে কাজের সাফল্যে। ধরা পড়লে কি হতে পারে সে বিষয়ে সীমা চিন্তা করে না। সাধারণতঃ চুরি করে ধরা পড়লে যেভাবে জনসাধারণ তার শাস্তি দেয় সেটা তার পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না কারণ সে বাসে-ট্রামে পকেট মারে না কিংবা লোকের বাড়ী সিঁধও দেয় না আর সবচেয়ে বড় কথা সে মেয়ে। অবশ্য স্ত্রীলোক হিসেবে সে পুরুষের কাছে বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করে না। আদালতে বিচারের প্রহসন তার কাছে হাস্যকর বলে ঠেকে। সাক্ষী-সাবুদ ওলটপালট করে নরকে হয় করা ত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অবশ্য প্রহারের স্বাদ সে পেয়েছে, বেশ ভালভাবেই পেয়েছে। ......উত্তর কলকাতার অন্ধকার ঘুপসী একতলা বাড়ীটার কথা মনে পড়ে গেল সীমার। নোনা ওঠা, চওড়া আর বালি ওঠা দেওয়ালগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে তার। কেমন একটা অদ্ভুত ঠান্ডা আর ভ্যাপসা গন্ধ বার হত সেগুলো থেকে। মা, নান্দু কাকা, বাবা, সবাইকেই মনে আছে তার। দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি, চটা ওঠা মেঝে, শোবার ঘরে কবজা ভাঙ্গা জানলাটা সবই মনে পড়ছে সীমার। কবজা ভাঙ্গা জানালা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হত। সেই শব্দে বড় ভয় পেত সীমা। তখন তার বয়স আর কত হবে যোল-ছয় বছর হবে। নান্দু কাকা বাবারই বন্ধু, বেশীর ভাগ সময় তাদের বাড়ীতেই থাকত। বাবা কাজ করতেন কাগজের অফিসে। এক সপ্তাহ দিনে আর এক সপ্তাহ রাতে তাঁকে অফিসে যেতে হত। বাবাকে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে তার। রোগা ছিপছিপে চেহারা ছিল তার বাবার। মাথায় লম্বা চুলগুলো এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সে। কাশির শব্দটাও ছিল বাবার অদ্ভুত ধরনের। জোর করে যেন সেটা চাপতে চেষ্টা করতেন তিনি। আর অবাক আর্তনাদের মত বেরিয়ে আসত শত চেষ্টা সত্ত্বেও। বাবার হাঁপানি ছিল। রাতে মাঝে মাঝে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেত। কবজা ভাঙ্গা জানলার শব্দ আর বাবার কাশির আওয়াজ, দুটো প্রায় একসঙ্গে হত। এর সঙ্গে অবশ্য মায়ের বকুনিও ছিল। কাশির শব্দে মার ঘুম ভেঙ্গে যেত; ঘুম ভেঙ্গে গেলে বাবাকে অনেক কথা শুনতে হত এমন কি গালাগাল পর্যন্ত। বড় মায়া লাগত সীমার। ছোট হাত দুটো সে বাবার বুকে বুলিয়ে দিত যাতে বাবার কাশি থেমে যায়, মার কাছ থেকে আর বকুনি শুনতে না হয় বাবার। কিন্তু তাতে কিছু হত না, বাবার কাশি থামতে বেশ সময় লাগত। বাবার কাছে কিছু চাইত না সীমা। কারণ বাবার পয়সা তার জন্য খরচ হলে মায়ের গঞ্জনা বেড়ে পড়বে। টাকাপয়সার জন্য বাবাকে মা কষ্ট দিত আর অপমান করত নানাভাবে। হাঁপানি আর অর্ধকাষ্ঠে বাবার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। চা খেতে বাবা ভালবাসতেন কিন্তু সেদিক দিয়েও তাঁর নিস্তার ছিল না। সে সময়ে সীমার মনে হত, যদি সে নিজে রোজগার করে চা আনত তবে নিশ্চয়ই বাবা মায়ের কাছে চা চাইত না। বাবার মাথার কাছে রামকৃষ্ণদেবের একটা ছবি ছিল। সীমার মনে আছে সেদিকে তাকিয়ে বাবা অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। আর বাইরে যাবার সময় ছবিতে প্রণাম করে বার হতেন। সীমা ঠাকুরকে অনেকবার বাবার হাঁপানি সারিয়ে দিতে আর কলের জলের বদলে চা দিতে বলেছিল। কিন্তু তা হয় নি। রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা হাসি হাসি মুখ নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকত তার দিকে।

মাথাটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠল সীমার। ছোটবেলার কথা ভাবলেই তার এরকম হয়। তাই সে পারতপক্ষে সব ভাবনা মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, বাধা দেয় প্রাণপণে। আবার সে স্নান করবে। স্নান করা তার পক্ষে একটা অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। খুব মন দিয়ে সে এই কাজটি করে থাকে। বাথরুমে যাবার আগে ব্যাগ খুলে সীমা নোটের বান্ডিলগুলো সাজিয়ে রাখল বিছানার ওপর একের পর এক। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে সেই দিকে। আশ্চর্য হল সীমা এই কাগজের টুকরোগুলোর ক্ষমতা দেখে। মানুষের কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে একে কেন্দ্র করে। সুখদুঃখের অনুভূতি যেন এর মুঠোয় দিকে মাথানত রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বান্ডিলগুলো তুলে ফেলল তার আলমারীর মধ্যে। কালই ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, বিভিন্ন নামে সে টাকা জমা রাখে, এতে তার সুবিধে হয়। এতক্ষণে সে বাথরুমে যাবার সময় পেল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সীমা। এধরনের কাজের পর সে কাপড়জামা পরা অবস্থায় জল ঢালে। তার মনে হয় পরা কাপড়জামাগুলো ধুয়ে যেন শুচি হয়। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সে শাড়ীটা খুলে ফেলল ধীরে ধীরে। তারপর এক এক করে চোলি, ভিতরের ব্রা, পেটিকোট ফেলে দিয়ে স্থিরনিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জলের ধারার তলায়। ফিনকি দিয়ে শাওয়ারের জল যখন তার মাথায় পড়ে তখন সে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পায়, সেটা যেন তার সর্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে যায় ধীরে ধীরে। জলের ধারা তার শরীরের ওপর দিকে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, সীমা তাকিয়ে দেখছে সেদিকে তন্ময় হয়ে। স্নানে তার শুধু শরীর আর স্নায়ু স্নিগ্ধ হয় না, এটা তাকে যেন ক্লেশমুক্ত করে, নবজীবন দেয়। পিঙ্ক রঙের ভিজে শাড়ী আর চোলিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, মিসেস মোদীর এইখানেই ইতি। বিসর্জনের পর প্রতিমার মত এখন ওটা শুধু মাটি, খড় আর আবর্জনার স্তূপ মাত্র। মিসেস মোদী এখন অপ্রয়োজনীয়, নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত। এবার আর ও বিষয়ে কিছু ভাববে না। ওটা একটা উল্টে যাওয়া বইয়ের পাতার মত, আর পড়বার বা দেখবার প্রয়োজন হবে না তার। কোলাবিক্স কোম্পানীর কথাও সে আর ভাববে না, পিছনে ফেলে আসা দিনগুলি সম্বন্ধে তার কোন মমতা নেই, সম্পূর্ণ উদাসীন সে। মন থেকে জোর করে সরিয়ে দেবে সে, না হলে তার কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। অকারণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সীমা।

বড় বাথ টাওয়েল দিয়ে সে সর্বাঙ্গ মুছে দিল সযত্নে। তারপর টাওয়েল জড়িয়ে ঘরে গিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে নিল। পিঙ্ক রঙের শাড়ী আর চোলি এখন ঝাড়ুদারের প্রাপ্য। ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্রসাধন করতে করতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল সীমা, অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাকে এখন সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। চোখ, মুখ, তার দেহের গঠন একেবারে নিখুঁত। চোখের ভাষা এবং মুখের ভাব—সে পলকে পলকে পাল্টাতে পারে। শান্ত ভালমানুষের মত কিংবা নিরীহ অবোধের ভঙ্গীটা সে সহজে নকল করতে পারে। দেখলে মনে হবে সহজ, সরল, নিষ্পাপ মেয়েটি। কথাটা ভাবতেই হেসে ফেলল সীমা। তার পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে একটু ভেবে নিল সে। প্রথমেই টাকা জমা দেবে অন্য একটা ব্যাঙ্কে। কলকাতার অলিগলিতে এখন ব্যাঙ্ক, নগদ টাকা নিতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এবার কি নাম নেবে? তার আসল নামটা বেশীর ভাগ সময়ই মনে পড়ে না। এখন একমাত্র তার মেজো পিসিমা ছাড়া আর কেউ সে নামটা জানে কিনা সন্দেহ। এই নিয়ে সে দুবার নাম পাল্টাল। কোন ক্ষতি হয় না তাতে। প্রথমতঃ সে কারও সঙ্গে মেশে না। দ্বিতীয়তঃ তার বন্ধু বলতে কেউ নেই, স্কুলজীবনেই তার শেষ হয়েছে। তাই বা কেন, তার স্কুলেই বা বন্ধু কে ছিল? কেউ নয়। না, ছোটবেলার কথা আর সে ভাববে না। এবার তার নাম হবে শ্যামলী সেন। নিজে আর একবার

CENTRAL LIBRARY

সমর্পণ করল সীমা। এরপর শ্যামলী সেনের একটা ভাল চাকরীর দরকার। কাজের বিজ্ঞাপনগুলো কাল থেকেই পড়তে হবে। নামটাও পালটাতে হবে সেই সঙ্গে। আরশিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে একবার মিষ্টি হাসল সীমা।

পরের দিন টাকাটা নতুন অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে নতুন এক প্রস্থ পোষাক কিনে নিল সীমা। তারপর চৌরঙ্গীর একটা বিউটি সেলুনে গিয়ে তার চুলটা ছোট করে নিল। এবার আর বব্‌ড্ নয়, ঘাড়ের চুলগুলো ছোট করে ছেটে ফেলা হল। মুখের চেহারা তার সম্পূর্ণ পালটে গেল এই প্রসাধনের ফলে। এবার তার বিশ্রাম চাই সর্বতোভাবে—মানসিক এবং শারীরিক। পুরী হোটেলে এয়ার কন্ডিশনড করা একটা ঘর বুক করল শ্যামলী সেনের নামে। সমুদ্র তার ভাল লাগে। নিষ্ফলে ভেঙে পড়া ঢেউগুলো আবার মিশে যায় সমুদ্রের বুকে। এর শেষ নেই, ক্ষয় নেই। সমুদ্রকে কেউ জয় করতে পারে না, সকলেই পরাজিত তার কাছে। তুচ্ছ মানুষ আর তার তৈরী জলযান সমুদ্রের কাছে তুচ্ছ, কত নগণ্য! সমুদ্রের বলিষ্ঠতাকে ভালবাসে সীমা, তার মনে হয় সে যেন সমুদ্রেরই একটা ন্যূনতম অংশ। তাকে আছড়ে ভাঙলেও সে ভাঙবে না, তার সত্তা হারিয়ে যাবে না, বারবার ফিরে আসবে তার প্রচণ্ড মূর্তি নিয়ে। নিষ্ফলতায় চূর্ণ হয়ে যাবে হয়ত কিন্তু তার গতি রুদ্ধ হবে না কোনমতে।

প্রায় দশদিন সে পুরীতে এসেছে। খাওয়া আর বেড়ান ছাড়া অন্য কোন কাজই নেই তার। সেই কারণে এবার যেন একটু একঘেয়ে লাগছে। মনে পড়ে যাচ্ছে কলকাতার ঘটনাগুলো। কি নিয়ে দিনগুলো কাটাবে তাই চিন্তা হচ্ছে সীমার। পারতপক্ষে সে আলাপ করতে কারও সঙ্গে চায় না। ডাইনিং হলে সীমা খেতে যায় না। যতখানি সম্ভব সে নির্জনেই থাকে, হয় নিজের রুমে নয় নির্জন সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের শব্দ তার স্নায়ু আর মনকে শান্ত করে। একমনে সীমা এই গর্জনটা শোনে সর্বদা।

মাফ করবেন। অপরিচিত এক যুবক।

আমায় বলছেন? তাকাল সীমা। বুকের মধ্যে তার একটা অজানা আতঙ্কের সাড়া জাগল।

হ্যাঁ, আপনাকে প্রায়ই একলা বেড়াতে দেখি, আপনি কি একলা এসেছেন?

হ্যাঁ, একলাই এসেছি।

কিছু মনে করবেন না অহেতুক কৌতূহলের জন্যে। একজন আত্মীয়া আছে আমার অবিকল আপনার মত দেখতে। তাই যেচে আলাপ করার অসৌজন্যতা ক্ষমা করবেন।

আপনি এখানে কতদিন আছেন, জিজ্ঞাসা করল সীমা।

আমি দিন তিনেক এসেছি ব্যবসার খাতিরে।

ব্যবসা?

হ্যাঁ, এখানের তৈরী রূপোর জিনিস কিনে আমি অন্যান্য শহরে বিক্রী করি। তাছাড়া আমার অন্যান্য ব্যবসাও আছে। আমি জুয়েলার, কলকাতায় আমার জুয়েলারীর ব্যবসাও আছে।

সীমা একবার তাকাল তার দিকে। পুলিশের লোক বলেই সন্দেহ হল তার। কিন্তু সে প্রস্তুত রয়েছেই। তার সন্ধান যে পুলিশ করবে এটা আশ্চর্যের কথা নয়। যেচে আলাপ করার কারণটাও তার মতকে দৃঢ়তর করল। পুলিশের লোক হলেও সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। তাহলে তার মারাত্মক ভুল হবে। সাবধান হল সীমা। অন্য কিছু নয়, এত লোকের সামনে অপদস্থ হতে সে নারাজ। সমুদ্রের ধার ছেড়ে শহরের মধ্যে যেতে লাগল এবার। পুরী ছোট শহর। শুধু তাই নয় ধোঁয়া-ধুলো আর চিৎকারের জন্যে সীমা প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার সে ফিরে যাওয়ার আয়োজন শুরু করে দিল। সেদিন সকালে একটা সংবাদের ওপর নজর পড়ল তার। লেখাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল সে: "মোদী এ্যান্ড সন্সের অফিসে একজন লেডী অ্যাসিস্টেন্ট সমেত সাতাশ হাজার টাকা অদৃশ্য হয়েছে। বেলা পাঁচটা আন্দাজ মিসেস মোদী অফিসে আসেন। তার মিনিট পনের পরে দরোয়ান তাঁকে চলে যেতে দেখে। অবশ্য মিসেস মোদী একথা অস্বীকার করেন। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তার স্বামীর সঙ্গেই গিয়েছিলেন বলে জানান। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে ধস্তাধস্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ লেডী অ্যাসিস্টান্ট মিস সীমা সান্যালের খোঁজ করছে। এ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়ে নি।"

যা আন্দাজ করেছিল সীমা তাই হয়েছে। অবশ্য পুলিশ তাকে ধরলেও তার লড়বার রাস্তা সে রেখে এসেছে। সে জন্যে কোন চিন্তা নেই তার। তার অদৃশ্য হওয়ার জোরাল কৈফিয়ৎ তৈরীই আছে। পুরীতে সে গা ঢাকা দিতে আসে নি। সে এসেছে একটু বিশ্রাম নিতে। অশান্ত মন আর দুর্বল স্নায়ুকে সে পুনরায় উজ্জীবিত করে কাজে লাগাবে। কিসের পর কি হতে পারে সেটা তার জানা আছে। বিভিন্ন অবস্থায় তার কাজের ধারাটা কি হবে সেটা সে আগেই ঠিক করে রাখে।

শ্যামলী সেন নাম দিয়ে সীমা রস্ অ্যান্ড কেরাওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত পেশ করেছিল। সীমা লক্ষ্য করেছে তার আবেদন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়। কয়েক জায়গায় অবশ্য তাকে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে, কিন্তু চাকরীর ব্যাপারে তার ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলা চলে। রস্ অ্যান্ড ক্যারাওয়ে কোম্পানির ইন্টারভিউ-এর আহ্বানপত্র পেয়ে তাই সে বিস্মিত হয় নি। এটা সে একরকম আশাই করেছিল। শনিবার বেলা দুটোর সময় তার ইন্টারভিউ।

কিছুক্ষণ বসার পর তার ডাক এল। টেবিলের একধারে তিনজন বসে আছেন। সীমা তাদের নমস্কার করে অপর দিকের চেয়ারে বসল।

আপনার নাম?

শ্যামলী সেন। স্পষ্ট দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিল সীমা।

কোন স্কুল থেকে টাইপ শিখেছেন?

সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল।

কত স্পীড?

সত্তর; কোনকালেই তার স্পিড সত্তর নয়।

এর আগে কোথায় কাজ করেছেন?

একটা কোম্পানির নাম করল সীমা।

কখনও নাম শুনি নি। মন্তব্য করলেন একজন।

আপনি কেরাওয়ে কোম্পানির নাম শুনেছেন? পরিচিত স্বর। সীমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। অরুণ বসুই প্রশ্ন করেছে তাকে। সীমা এটা আশা করে নি। তার শরীর যেন অবশ হয়ে এল। তার মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড ভারী বোঝা কে যেন চাপিয়ে দিয়েছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা হচ্ছে তার। অনেক বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে সে পড়েছে। কিন্তু আর যাই হোক জ্ঞান সে কোনদিনই হারায় নি। মনকে শক্ত করল সে। অরুণ বসু তার কি করতে পারে? ধরিয়ে দেবে পুলিশে; এছাড়া তার করার কিছুই

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিকায়
একটি দুঃসাহসিক নাটক
জোছন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবর থেকে বলছি
মূল্য ৩·০০
রাজা বদল—৩·০০ সর্বাধিক—৩·০০
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের
চরৈবেতি ... ৩·৫০
সমর মুখোপাধ্যায়ের
মৃতদেহ ৩·২৫
হে মোর পৃথিবী—২·৫০
সলিল সেনের উৎসর্গ ২·৫০
শৈলেশ রাজগুরুর জনপদ ২·৫০
উমানাথ ভট্টাচার্যের জন্ম-মৃত্যু ৩·০০
ভোলা দত্তের স্বপ্ন নয় ৩·০০
শচীন ভট্টাচার্যের অবতার ৩·০০
রতন ঘোষের মনুষ্যত্ব ২·০০
প্রতিবাদ ২·০০
দিলীপ মৌলিকের
ছায়া ছায়া আলো ২·০০
মণীন্দ্র রায়ের কাব্য নাটক
নাটকের নাম জীবন ৩·৫০
দিলীপ মৌলিক ও শান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত
আজকের একাঙ্ক
: দাম — ৪·০০ :
এতে আছে ৮টি বিভিন্ন স্বাদের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক: অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পৃথিবী। উমানাথ ভট্টাচার্যের দিবারাত্র। কিরণ মৈত্রের অভাব। জোছন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাধি-সম্বাদে। ভোলা দত্তের খেলা। মনোজ মিত্রের তক্ষক। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাজপাখি। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের মাশুল।
লিপিকা—৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা-১

নেই। কর্তাদের সকলের সামনে তাকে তার বলে অতিহিত করতে পারে। তাতেই বা কি এসে যায়। জবাব তার তৈরী আছে। সুতরাং আর ভয় পাবার কি থাকতে পারে? মুখোস ঝুলিয়ে মুখটা মুছে সীমা জবাব দিল।

হ্যাঁ কোলাবিক্স কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি।

ক'বছর আগে। অন্যালোকের প্রশ্ন।

চার বছর। সীমা এবার লোকগুলোর দিকে তাকাল। অরুণ বসু তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার কোন ভাবের প্রকাশ নেই; ডাক্তার তার রোগীকে লক্ষ্য করছে রোগ নির্ণয়ের আশায়। সেই অরুণ বসু। কোলাবিক্স কোম্পানির অরুণ বসু—যে তাকে অনুবীক্ষণের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিব্রত করত দিনের পর দিন। কিন্তু এখানে কেমন করে এল সে। এ কোম্পানির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? সীমাকে আর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, সেটা সে ঠিক শুনতে পায়নি। অরুণ বসু তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। বেগ ইওর পার্ডন, বলল সীমা।

আমাদের এখানে কাজ নিলে বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে, বললেন একজন প্রশ্নকর্তা।

তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

সীমা আশা করে নি এত তাড়াতাড়ি সে নিষ্কৃতি পাবে। প্রশ্নের ধারা পালটে যাবে। বাইরে বেরিয়ে সে হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু এখনও তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে সীমার। সাতাশ হাজার টাকা ব্যাগে ভরে নেবার সময়ও তার এতখানি দুর্বলতা আসে নি। নিজের অক্ষমতায় বিরক্ত হল সে। সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে সে একতলায় গিয়ে পৌঁছল। গেটের বাইরে যাবার মুখে অরুণ বসুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিস সেন—অরুণ বসু এগিয়ে এল তার দিকে।

আমায় বলছেন? সীমা পাশ কাটাতে পারল না।

হ্যাঁ, এবার আমার ভুল হয় নি, আপনিই মিস শাশ্বতী সেন ত?

সীমা তার মুখের দিকে তাকাল, সেখানে ব্যাঙ্গের কোন চিহ্ন নেই। সীমা কোন উত্তর দিল না, শুধু মাথাটা সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে নাড়ল একবার।

গাড়ীতে উঠুন। অরুণ বসুর স্বরটা গম্ভীর।

আমি একটা ট্যাক্সি নেব। অস্পষ্ট স্বরে বলল সীমা।

দরকার নেই, আমার গাড়ীতে উঠুন—দরজাটা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণ বসু। আশে-পাশে মানুষের ভিড়। অনেকেই দাঁড়াল নাটকীয় পরিস্থিতির আশায়। গাড়ীতে উঠে পড়ল সীমা। অরুণ বসু তার পাশে বসে গাড়ীটা চালিয়ে দিল।

চাকরীটা আপনার হয়েছে, বলল অরুণ বসু, কিন্তু কতদিন করবেন এটা।

কোন উত্তর দিতে পারছে না সীমা। ঠিক এ অবস্থায় যে তাকে পড়তে হবে এটা তার কল্পনাতীত।

আমায় এখানে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন বোধহয়? আমাদের গ্রুপের আর একটা ফার্ম এটা। সীমা এবার তাকাল অরুণের দিকে। পাশ থেকে শক্ত চোয়ালের সঙ্গে ভাবলেশহীন মুখটা দেখতে পেল এতক্ষণে।

আপনাকে কোথায় পৌঁছাব?

এবার তার মনের মত প্রশ্ন করেছে অরুণ, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

এখানেই ছেড়ে দিন—। নিষ্কৃতি পেলে বাঁচে সীমা।

আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন আমাকে। ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে বলল অরুণ বসু।

কেন, ভয় কিসের? অরুণের দিকে তাকাল সীমা। তার কথায় একটা তাচ্ছিল্যের সুর রয়েছে।

সেটা আপনিই জানেন, তবে একটা কথা আপনাকে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই—।

বলুন—সীমা সোজাসুজি তার দিকে তাকাল।

আমায় বন্ধু বলে মেনে নিতে পারেন। আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল অরুণ। তারপর গিয়ারটা চেঞ্জ করে বলল—আমি আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছি না, এটা বিশ্বাস করা কি আপনার পক্ষে কঠিন।

কিন্তু আমাকে সাহায্যই বা আপনি করবেন কেন? সীমার প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ কিন্তু সোজা।

আমি সাহায্যের কথা বলিনি, আমি বলছি আমাকে শত্রু বলে ভাবার কোন কারণ নেই। গাড়ীটা ময়দানের পাশ দিয়ে বেগে চালিয়ে দিল অরুণ।

কোথায় যাচ্ছেন? হঠাৎ ভয় পেল সীমা।

সাউথ ক্যালকাটায়—আপনি ত ঐদিকেই থাকেন?

হ্যাঁ, কিন্তু আমায় এখানে ছেড়ে দিলেই চলবে।

আপনার চলবে, কিন্তু আমার চলবে না।

তার মানে? সোজা হয়ে বসল সীমা।

তার মানে, এখানে নো পার্কিং জোন, থামলে আমি বিপদে পড়ব।

অরুণের মুখে হাসি দেখতে পেল সীমা।

কিন্তু আমায় এভাবে গাড়ীতে তুললেন কেন বুঝতে পারছি না।

না তুললে বিপদে পড়তেন।

কি বিপদ? বুকটা ধড়াস করে উঠল সীমার।

ট্রাম বাস বা ট্যাক্সি কিছুই পেতেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীমার।

আপনি কবে জয়েন করছেন? না, ভয়ে এড়িয়ে যাবেন না, চাকরীটা ভাল, ছাড়বেন না, ছাড়লে আপনারই ক্ষতি হবে।

কেন, ক্ষতি কিসের?

সে কথাটা এখন স্পষ্টভাবে বলতে পারব না, তবে আপনাকে অনুরোধ করব চাকরীটা নিতে।

একটু চুপ করে অরুণ আবার বলল, আমার ব্যবহারে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে চাকরীতে জয়েন না করলে আপনি বিপদে পড়বেন।

আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

বাই নো মিনস; আপনাকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি? গাড়ীটা ফুটের বাঁদিক ঘেঁসে থামাল অরুণ, তারপর বলল—এবার নামুন।

কাঠের পুতুলের মত সীমা নেমে এল।

আমার কথাটা মনে রাখবেন। কথাটা বলে অরুণ এগিয়ে গেল তার গাড়ী নিয়ে।

কয়েক পা এগিয়ে সীমা দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। এতক্ষণ যেন সে স্বপ্ন দেখছিল। কোলাবিক্স কোম্পানির অরুণ বসু তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে এতদূর পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ না করে। এটা তার বোধগম্য হচ্ছে না কোনমতেই। অবিশ্বাস্য লাগছে এই ঘটনাকে। সীমা ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল স্বপ্নাবিষ্টের মত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে ভাবতে বসল তার ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্বন্ধে।

প্রথম কথা হল সে নতুন অফিসে জয়েন করবে কিনা? যদি সেখানে কাজটা সে নেয় তাহলে দিবারাত্র তাকে অরুণ বসুর আওতার থেকে তার স্থির দৃষ্টির তলায় নির্জীবের মত দিন কাটাতে হবে। কিন্তু তাকে এড়ানোই বা যাবে কিভাবে? লোকটা গোয়েন্দার মত সন্ধানী। ইতিমধ্যে তার বাসস্থান যে দক্ষিণ কলকাতা, তাও জেনে ফেলেছে। অবশ্য ফ্ল্যাট পালটাতে তার বেশী সময় লাগবে না। সেটা বড় সমস্যা নয়। অরুণ বসু তাকে সাবধান করেছে কেন এটা বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছে। তার কাছে সব থেকে বড় হেঁয়ালী হল অরুণ বসুর, এই চাকরী করার জন্যে অনুরোধ। এতে অরুণ বসুর কি স্বার্থ থাকতে পারে তা ভেবে কোন কিনারা করতে পারল না সীমা।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

জলসা

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্ধিত

গত ১লা আগস্ট রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধিকা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গান্ধর্বী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সম্বর্ধনা জানানো হোলো। গুণী সম্বর্ধনা এই সংস্থার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের অনুষ্ঠান তালিকার প্রধান অঙ্গ। এবারের সম্বর্ধিতা শিল্পী হলেন শ্রীমতী কণিকা।

শিল্পীকে আশীর্বাদ জানিয়ে সে দিনের সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী বলেন আনন্দ থেকেই জগতের প্রকাশ আর এই আনন্দেরই এক চাবঘন মধুর রূপ হোলো সঙ্গীত। কবিগুরু তাঁর ধ্যানে কল্পনার মুহূর্তের জন্যও এই আনন্দের স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হন নি। বিভিন্ন ভাববাহী তাঁর অন্তহীন সঙ্গীতগুচ্ছ এই গগনচারী কল্পনারই এক আশ্চর্য প্রকাশ। আমাদের একান্ত স্নেহের পাত্রী কণিকা জীবনব্রতের মত এই সঙ্গীতকে গ্রহণ করে তাঁর কণ্ঠ ও হৃদয়মাধুর্যে এর গহন-গভীর বাণীকে শ্রোতৃচিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোটা আমাদের পক্ষে একটা পরম আনন্দের কাজ ও দায়িত্ব। পরমা জননীর কাছে প্রার্থনা করি কণিকা দীর্ঘজীবী হয়ে কবির গানে গানে সারা দেশ তাঁদের রসিকসমাজের অনাবিল আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক।—এরপর ডঃ রমা চৌধুরী এই সংস্থাপ্রদত্ত পুষ্পস্তবক, শাড়ী, সংগীতগ্রন্থ ও মানপত্র শিল্পীর হস্তে অর্পণ করেন। মানপত্র পাঠ করলেন সভাপতি সুরজিৎ সেন। শিল্পীকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানান জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও অখিল নিয়োগী। শিল্পী অসুস্থ ছিলেন বলে স্ব-কণ্ঠে পরিবেশিত গানের ডালি ভরে দিতে পারেন নি। স্ব-লিখিত একটি ভাষণও অ-পঠিত থেকে গেল তাঁর বিনম্র-স্বভাবের স্বাভাবিক কুণ্ঠার কারণে।

অ-পঠিত সেই ভাষণ তাঁর গানের চেয়ে কিছু কম মধুর নয় বলেই তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হোলো—'আজকের এই মুহূর্তে একটি মহীরুহের মত প্রতিভা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের স্মৃতি মন উচ্চারণ করছে। জীবনের পরম সত্যের মত সেই মানুষের সান্নিধ্য নিবিড় স্নেহদৃষ্টির আশীর্বাদের ছায়ায় ধন্য হয়ে আছে।...গুরুদেব বলতেন 'গানের একটা কথা থাকা চাই বইকি। এমনই একটা কথা যা সুরে লীলায়িত হয়ে প্রাণের মর্মে এসে লাগে।'

কি কথায়, কি কবিতায়, কি গানে, কি জীবনের প্রতিদিনের স্তরে প্রাণের ভিতর এই প্রাণকেই তিনি মূল্য দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাণীর কত বিচিত্র সুর কত রকম ভাব যে প্রাণে বেজেছে তার ত অন্ত নেই। সমুদ্রের সব তরঙ্গেই স্নান করব এমন সাধ্য কোথায়? তাই একটি তরঙ্গকেই বেছে নিয়েছি শুধু—সে তাঁর গান। তাই নিয়েই আজীবনের পূজা সাঙ্গ করব।'

সর্বশেষে সংস্থার পক্ষ হতে শ্রীসন্তোষ ঠাকুর পরিচালিত 'নিবিড় মেঘের ছায়ায়' নৃত্য ও সঙ্গীতালেখ্য মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে সংস্থার শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের নৃত্য ও গানের মধ্য দিয়ে।

রবিতীর্থের আষাঢ় সন্ধ্যা

গত ৭ই আগস্ট সু-খ্যাত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান রবিতীর্থের পঞ্চবিংশতিতম জন্মদিবস পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে একক সঙ্গীতের অকৃপণ ধারায় আষাঢ় সন্ধ্যার পুঞ্জীভূত বেদনাকে মুক্তি দিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

পৌঁছলাম যখন, গানের পালা তখন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। কিন্তু জমে-ওঠা আসরের রসমাধুর্য অপূর্ব নিবিড়তায় যেন সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল স্তব্ধ শ্রোতার মুগ্ধ হৃদয়ের আনাচে কানাচে। কখনও অশ্রু ভরা বেদনা'র বিধুর আভাসে, কখনও বা আষাঢ় পূর্ণিমা আমা'র মধুর দ্বিধায় প্রশ্ন 'এ কি ভুলে যাওয়া? একি মনে রাখা?'— তারপরই স্মৃতিচারণের আলোয় 'অনেক কথা বলেছিলেম'? এরা অন্তরচারী ভাবপরিক্রমার পর হঠাৎ অনুভব করা গেল আষাঢ় সন্ধ্যার শুধু মানুষ চিত্ত-ই একা নয়। একাকিনী প্রকৃতির মুখেও রহস্যের ঘোমটা টানা। তাই কবির প্রশ্ন 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী?'— মানুষ ও প্রকৃতির মিলনে নীরবতাও যেন মুখর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে।

গানের পর গান যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলে· কখনও 'বিলম্বিত লয়ে কোথা যে উধাও'-এর উদাত্ত দিগ-দিগন্ত—তারপরই নৃত্যছন্দে মত্ত মত্ত উপবনে'র উল্লাস। এমনই নানানচারী আবেগের পথ বেয়ে 'কবে বরষায়' —যখন থামল তখন সত্যিই ধরিত্রী বর্ষাপ্লাবিতা, বর্ষণ ও সঙ্গীতের যুগপৎ দোলায় শ্রোতৃচিত্ত আন্দোলিত। সুচিত্রার গায়কী ও অন্তর্গাহী পরিবেশনায় সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। সেদিনও আপন স্বকীয়তায়, বলিষ্ঠতায় তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য আর একটি অনুষ্ঠান ছিল শ্রীমতী মিত্রের পরিচালনায় 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' ও 'হে নিরুপমা'র সমবেত সঙ্গীত। এ অনুষ্ঠান সুসংবদ্ধ এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী। উদ্বোধনী ভাষণে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত দর্শনের ওপর আলোকপাত করেছেন।

দীনেশ চন্দ্র'র সেতার সঙ্গতে প্রতিটি গানের রাগের অনুরণন কাব্যমধুর সঙ্গীত পটভূমিকা রচনা করে।

আশ্রমিক-সঙ্ঘ পরিচালিত নৃত্যনাট্যোৎসব

প্রতিবারের মত এবারেও শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে দীর্ঘ আট দিন-ব্যাপী রবীন্দ্রনৃত্য নাট্যোৎসবের আসর বসে। অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল একাধিক নৃত্যনাট্য—'মায়ার খেলা', 'ভানু সিংহের পদাবলী', 'তাসের দেশ', 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'।

রবীন্দ্রমানসের বিচিত্র গতির বিভিন্ন অধ্যায় নতুন করে আস্বাদ করা ও অতুলনীয়

সুরঙ্গমা

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন

৩৩, রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলিকাতা—২৬

নতুন শিক্ষাবর্ষ জুলাই থেকে ঃ ভর্তি চলছে

কার্যালয় শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৮টা, রবিবার সকাল ৭টা থেকে ১টা এবং সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮॥টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সুপরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম অনুযায়ী প্রণালীবদ্ধভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাগসংগীত ও প্রাচীন বাংলা গান ডিপ্লোমা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অগ্রসর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রতি শনি ও রবিবার বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা দেন। ভরত-নাট্যম, মণিপুরী ও কথাকলি পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার পাঠক্রম সুপরিকল্পিত। শিশুদের উভয় বিভাগেই চার বছরের পাঠক্রম। বয়স্কদের উভয় বিভাগেই পাঁচ বছরের সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম। এস্রাজ ও গীটার প্রত্যেক বিভাগের পাঠক্রম পাঁচ বছরের।

সংলাপ ও গানের মননশীলতা ও রসানুভূতির মিলন ও তার অপরূপ প্রকাশভংগীতে নতুন করে আস্বাদনের ভূমিকায় এ উৎসবের সার্থকতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরিবেশনা ও প্রযোজনার ত্রুটি আমাদের প্রত্যাশী চিত্তকে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'মায়ার খেলা' অবশ্য কিছুটা উত্তীর্ণ শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও বনানী ঘোষের গীতাভিনয়, কিন্তু সজ্জা পরিকল্পনার ত্রুটি অকল্পনীয় —বিশেষ করে মায়াকুমারীদের অদ্ভুত রজনীর নর্তকীদের মত সাজ।

অন্য নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্য প্রশংসনীয়। সামগ্রিক বিচারে, নৃত্য, অভিনয়, রূপসজ্জা সব মিলিয়ে একটি অনুষ্ঠানও দর্শকদের খুশী করতে পারে নি। বিশেষ করে পুরুষ চরিত্রের শিল্পীদের নিম্নমানের রূপাভিনয় রসিকচিত্তকে পীড়িত করেছে। তবে সব ত্রুটির অনেকখানিই ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত 'শ্যামা' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র গান। নীলিমা সেন, মায়া সেন ও কমলা বসুও প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবী রাখেন গোরা সর্বাধিকারী। উভয়ের গানগুলি আশাতীত লক্ষ্যের পরে হীন শুধু, অপ্রণীতের পরিচয়ই দেন নি দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করেছেন।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর রবীন্দ্রার্ঘ্য

ভারতী রেকর্ড কোম্পানী নিবেদিত রেকর্ডগুচ্ছে স্বল্প-পরিসরের মধ্যেও এক পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় চিহ্নিত। কবিগুরুর সু-নির্বাচিত সঙ্গীতগুচ্ছ রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতাদের অবশ্যই আনন্দ দেবে।

প্রতিষ্ঠান-পরিচালক ও সুগায়ক সমর গুপ্তের কণ্ঠে 'কেন বাজাও কাঁকন' ও 'সারাজীবন দিল আলো' পরিবেশনার আন্তরিকতায় মুগ্ধকারী। শ্রীগুপ্তেরই পরিচালনায় গীত অন্যান্য শিল্পীদের গাওয়া গানগুলি সুশ্রাব্য। শিল্পী এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলি যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হোলো।

দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তোমারি গেহে' এবং 'ওরে আমার', তারক চন্দ্রর 'আজি নির্ভর নিদ্রিত' ও 'এই ত তোমার আলোকধেনু', সত্যেন কুণ্ডুর 'পাগল যে তুই' ও 'যে ছিল আমার' এবং ভূপেন মুখোপাধ্যায়ের 'এরা সুখের লাগি' এবং 'কার আমি'। এছাড়া দীপক রায়ের ইলেকট্রিক গীটারে বাজানো 'তুমি রবে নীরবে' ও 'আমার কণ্ঠ হতে' বৈচিত্র্যবর্ধক। বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' এবং 'আমার বনি বেলা' সুশীল মল্লিকের পরিচালনায় সঙ্গীত।

উদ্বোধন-উৎসব

মঞ্জুর নিউক্লিক সারগোলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান কাশিমবাজার হাউসে গত ২৪শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী সান্যাল। সভাপতির ভাষণে শ্রীসান্যাল এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে উদ্যোক্তাদের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরু উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল গানে। তাঁর 'পুরিয়া কল্যাণ' রাগের খেয়াল উপভোগ্য। তবলায় ছিলেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ছিলেন বলরাম পাঠক। তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রের 'পূর্বশ্রী' রাগের সেতার শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করে। সঙ্গে তবলায় ছিলেন শ্রীচন্দ্রভানু।

বি-বি-সি, লন্ডনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এইচ-এম-ভি দীপিকানা রেডিও পুরস্কার

গত অক্টোবর মাসে লন্ডনের বি বি সি বাংলা প্রোগ্রামে আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রদত্ত তিনটি এইচ-এম-ভি 'দীপিকানা' ট্রানজিস্টর রেডিও পুরস্কার হিসাবে ঘোষিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'বি-বি-সির বাংলা প্রোগ্রামের ভার পেলে আপনি এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম কেমন করতেন?'

শত শত শ্রোতা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে নদীয়ার হামিদুল হক, কলকাতার সুশান্ত দত্ত এবং চুঁচুড়ার সমীর দত্ত নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বি বি সি লন্ডনের বাংলা প্রোগ্রামের প্রতিনিধি শ্রীকমল বসুর উপস্থিতিতে গ্রামোফোন কোম্পানীর বিপণন বিভাগীয় কর্তা মিঃ জে পি ভাটনগর বিজয়ীদের পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। কমল বসু সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

চিত্রে মিঃ ভাটনগরকে পুরস্কার দিতে দেখা যাচ্ছে।

'বাণীবিতান'-এর উৎসব অনুষ্ঠান : সম্প্রতি চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)-এর সভাপতিত্বে এক ভাবগম্ভীর ও মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বাণীবিতান'-এর প্রতিষ্ঠা স্মরকোৎসব এবং ১১০তম রবীন্দ্রজয়ন্তী একযোগে প্রতিপালিত হয়ে গেল। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্বাগত জ্ঞাপনের পর নতুন প্রদীপ প্রজ্জ্বালন নববর্ষকে আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে দুর্লভ মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্র দাসের আবৃত্তি দিয়ে এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত দে ও রেণু ভৌমিক।

কর্মাধ্যক্ষের প্রতিবেদনে নির্মলেন্দু বসু বাঙলা তথা ভারতের অতীত গৌরব এবং তার ত্যাগ-তপস্যা ও মৌলিক চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্বন্ধে এক বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এর পরে দেশ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ সুধাময় আচার্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ উমা রায়। আলোচনান্তে সৌরেন্দ্রনাথ দে ও কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম-পরিচালনায় 'আলোকের বাণী' শীর্ষক একটি দেশাত্মবোধক গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

—চিত্রাঙ্গদা

পরলোকে মঞ্চবিদ সতু সেন

শনিবার, ৭ আগস্ট অকস্মাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, সতু সেন ঐদিন সকালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্যে বহু মঞ্চশিল্পী, নাট্যশালাধ্যক্ষ ও নাট্যানুরাগী উত্তর কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সমবেত হন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নিমতলা মহাশ্মশানে। মৃত্যুকালে শ্রীসেন তাঁর স্ত্রী, তিনটি কন্যা এবং একমাত্র পুত্র পার্থ সেনকে রেখে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাই।

বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ে সতু সেন একটি ঐতিহাসিক নাম। ঊনিশ শো তিরিশ সালের শেষাশেষি কিংবা একত্রিশের গোড়ার দিকে কলকাতার নাট্যমোদীরা এই নামটি প্রথম শুনতে পান আমেরিকায় বিপদগ্রস্ত শিশির-সম্প্রদায়ের পরিত্রাতা হিসেবে। 'সীতা' নাটকের সজ্জাসমহলায় (ড্রেস-রিহার্সালে) অসন্তুষ্ট হয়ে আমেরিকায় শিশির-সম্প্রদায়ের উপস্থাপয়িত্রী এলিজাবেথ মারবারী যখন চুক্তি নাকচ করে ঐ অভিনয় ব্যাপার থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং ফলে নিউইয়র্কের বিলাসবহুল ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটারে নির্ধারিত অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিউইয়র্ক ল্যাবরেটারী থিয়েটারের তদানীন্তন টেকনিক্যাল ডিরেক্টার সতু সেন নামে বাঙালী ভদ্রলোকটি বিপন্ন শিশিরকুমারের দিকে তাঁর সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করেন এবং তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় অভিনয় না করতে পাওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে শিশির-সম্প্রদায় তাঁদের 'সীতা'কে মঞ্চস্থ করবার সুযোগ লাভ করেন 'ভ্যান্ডারবিল্ট থিয়েটার'-এ ১৯৩১-এর জানুয়ারীতে। আমেরিকা ত্যাগ করবার সময়ে এঁরা যে আর্থিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা থেকেও উদ্ধার করেন এই সতু সেনই।

সতু সেন আমেরিকায় আসলে গিয়েছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্যে। যতদূর জানি, তিনি ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশনের শিক্ষানবিশ-কর্মী হিসাবে যোগদানও করেছিলেন। এ হচ্ছে ১৯২৫ সালের কথা। এর আগে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি, এসসি পাশ করবার পরে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু মঞ্চনাট্যপ্রয়োগশিল্পের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ থাকায় তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়েন এবং এ সম্পর্কে ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত বিদ্যা আহরণ করেন। পিট্সবার্গ কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে এবং নিউইয়র্কের ল্যাবরেটারী থিয়েটারে স্ট্যানিস্‌ল্যাভস্কির প্রয়োগবিদ্যায় বুৎপন্ন রিচার্ড বোলেস্লাভস্কির কাছে তিনি এই বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। পরে এই ল্যাবরেটারী থিয়েটারেই তিনি টেকনিক্যাল ডিরেক্টার হিসেবে নিযুক্ত হন এবং এখানে 'ডন কুইকসোট' প্রভৃতি কয়েকটি নাটক তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এই সময়েই তিনি শিশিরকুমারের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে শিশির-সম্প্রদায় কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েক মাস পরেই সতু সেনও কলকাতায় এসে হাজির হন। নবনির্মিত রঙমহলের উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ৮ আগস্ট তারিখে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটককে অবলম্বন করে শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে। এতে মঞ্চাধ্যক্ষ (স্টেজ ম্যানেজার) নিযুক্ত হন শ্রীসেন। কলকাতার নাট্যজগতে তিনি তখন সেন সাহেব নামে পরিচিত।

প্রবোধচন্দ্র গুহের আহ্বানে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার আশায় শ্রীসেন কিছুদিনের মধ্যেই রঙমহল ত্যাগ করে নাট্যনিকেতনে যোগদান করেন এবং ১৯৩১-এর ১৪ নভেম্বরে প্রথম অভিনীত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'ঝড়ের রাতে' নাটকে তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়ে তাঁর মহলা দেবার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। দেখেছি, তিনি মঞ্চের ওপর খড়ি দিয়ে দাগ কেটে শিল্পীদের গতিপথ এবং অবস্থানের নির্দেশ দিতেন। এ-ছাড়া সংলাপের কোন্ স্থানে কতটুকু সময় থামতে হবে, কোন্ দিকে মুখ রাখতে হবে ইত্যাদি সমস্তই এমন ধাঁচ ধরে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন যে, এই 'ঝড়ের রাতে'র অভিনয় প্রতিদিনই ঠিক একই সময় নিত (ধরুন, ৩ ঘণ্টা ১২ মিনিট); কোনোদিনই এক মিনিট বেশী বা কম হত না। ঠিক এই ব্যাপার নাট্যনিকেতনের পরবর্তী নাটক 'জড়ভরতে'ও দেখা গিয়েছিল শ্রীসেনের প্রযোজনাগুণে।

এর পরে সতু সেন আবার চলে আসেন রঙমহলে। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'অসবর্ণা' নাটকে কালিকাতাণ্ডবের সঙ্গে ; তাঁর

প্রেম ও অপ্রেম / সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : বিমল ভৌমিক। ফটো : অমৃত

আলোর খেলা যে অভাবনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তার তুলনা আজও কোনো নাট্যাভিনয়ে মেলে না। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত 'নেচেছে প্রলয় নাচে, হে নটরাজ, তাথৈ তাথৈ' গানটি গাইতেন কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং তাঁর সঙ্গে খাঁড়া হাতে কালিকাতাণ্ডব নাচতেন (কালো) আঙুরবালা এবং এই নৃত্য-গানকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপনাময় করে তুলতেন শ্রীসেন মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশের আলোকে পর্যায়ক্রমে নিভিয়ে ও জ্বালিয়ে। দর্শকমনে এতে যে কি অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হত, তা আজ আর বলে বোঝানো যাবে না।

১৯৩৩-এর গোড়ার দিকে রঙমহল পরিচালনার ভার নেন মিলিতভাবে শিশির মল্লিক, সতু সেন ও যামিনী মিত্র। এই ত্রয়ীর পরিচালনা বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে অমর বললেও অত্যুক্তি হয় না। পর পর রঙমহলে 'মহানিশা', 'পতিব্রতা', 'চাকরী', 'বাঙলার মেয়ে', 'পথের সাথী' প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনায় এঁরা মিলিতভাবে উচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়ে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।

প্রথম নাটক মহানিশাতেই সতু সেন প্রবর্তিত ঘূর্ণন মঞ্চ (রিভলভিং স্টেজ) প্রথম ব্যবহৃত হয়। এর আগে কতার-ভিক্ষতার পর্দাটাতে দৃশ্যপরিবর্তনে যে-অসুবিধা ও কালক্ষেপ হত, এই রিভলভিং মঞ্চ তা দূর করে নাটকের গতিকে ক্ষিপ্রতর করে তুলল। অবশ্য এই ঘূর্ণন-মঞ্চ দৃশ্যের আয়তনকে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে বেশ ছোট করে ফেলেছে এবং এই কারণে এতে সামাজিক নাটকের অভিনয় সম্ভব হলেও পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের উপস্থাপনা রীতিমত দুঃসাধ্য।

এই সময়ে শ্রীসেন চলচ্চিত্র পরিচালনার দিকেও মনোনিবেশ করেন শিশির মল্লিক দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এবং তারই ফলে পপুলার পিকচার্স প্রযোজিত এবং শ্রীসেন পরিচালিত 'মন্ত্রশক্তি' ছবিটি উত্তরা সিনেমায় মুক্তি পায় ১৯৩৫-এর ২১ আগস্ট তারিখে। এর পরে তাঁর পরিচালিত ছবি হচ্ছে : আবর্তন (১৯৩৬), পণ্ডিত মশাই (১৯৩৬), সার্বজনীন বিবাহোৎসব (১৯৩৮), চোখের বালি (১৯৩৮), স্বামী-স্ত্রী (১৯৪০)।

শিশির মল্লিকের সঙ্গে শ্রীসেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে চিত্রপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন মঞ্চে তাঁর প্রয়োগরীতিও চালিয়ে গেছেন। আলফ্রেড মঞ্চে স্থাপিত নাট্যভারতীতে তিনি একাধিক নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে তিনি রঙমহলে এককভাবে 'রামের সুমতি' পরিচালনা করে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৪৮-এ মিনার্ভাতে প্রবোধ সান্যাল রচিত 'প্রিয়বান্ধবী'র নাট্যরূপ 'স্ত্রী'ও শ্রীসেনের প্রযোজনায় উপস্থাপিত হয়েছিল। তাঁর সর্বশেষ প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করেছিল সলিল মিত্র পরিচালিত স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকটি (নিরুপমা দেবীর উপন্যাস থেকে)।

শ্রীসেন ১৯৫৫-তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ও ১৯৫৮-তে দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এবং এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রিত হন

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সামনে রাজেন্দ্র রোড (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার
শনি ও রবি ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
১৯শে অগাস্ট বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র

১৭ই অগাস্ট মঙ্গলবার সাড়ে ছ-টায়
অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ অ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ॥

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, মেনকা দাস, কুমারী মিঠু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

এবং উভয় স্থানেই তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যে প্রচুর সম্মান অর্জন করেন।

শেষ জীবনে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি অবসর যাপন করছিলেন গোবরা মানসিক হাসপাতালের প্রাঙ্গনস্থ তাঁর পুত্র পার্থ সেনের বাসভবনে।

বাংলার নাট্যমঞ্চ প্রযোজনা, আলোক-সম্পাত, ঘূর্ণমঞ্চ প্রভৃতি বহুবিধ দিক দিয়ে শ্রীসেনের কাছে ঋণী। আর মাত্র কিছুদিন পরে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় যখন তার জীবনের শতবর্ষপূর্তি উৎসবে মেতে উঠবে, তার আগেই তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটায় উৎসব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই একটি গভীর শূন্যতা অনুভব করবেন।

কয়েকটি তথ্যমূলক চিত্র

(১) সুন্দরবনে তুলার চাষ

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবনে বন্য জন্তুদের পাশাপাশি মনুষ্য-বসতি শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। এবং বাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সেখানে শুরু করেছিল ধানের চাষ। কিন্তু ধান তো মাত্র তিন-চার মাসের ব্যাপার। এরপরে জমি থাকে পতিত। ফলে ওখানকার বাসিন্দাদের দুরবস্থার সীমা থাকত না। অবস্থা দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ গবেষণা আরম্ভ করলেন সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলবর্তী নোনা জমির ওপর কি ফসল ফলানো যায়, যা বাসিন্দাদের দুঃখ দূর করতে সাহায্য করবে। দেখা গেল, তুলার চাষ করতে পারলে ফল ভালো হবে। চাষীদের মধ্যে বিলি করা হোল তুলোর বীজ, সার, কীট-পতঙ্গনাশক ওষুধ। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল কিভাবে তুলোর চাষ করতে হয়। শুরু হোল চাষ। ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তুলো গাছে দেখা গেল শাদা শাদা ফুল এবং ৩-৪ মাসের মধ্যেই ফল ফেটে বেরুল কম-বেশী এক ইঞ্চি আঁশওলা তুলো। চাষীদের মুখে হাসি ধরে না। কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা গেলেন এই আশ্চর্য পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করতে তাঁরাও খুশী। তুলোর চাষের সাফল্য সুন্দরবনের তথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুনিয়াদকে নিশ্চয়ই দৃঢ়তর করতে সাহায্য করবে।

—এই পরীক্ষামূলক তুলার চাষের তথ্যচিত্র তুলেছেন 'শুক পাবলিসিটি'; পরিচালনা করেছেন সুধীশ মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও সুরযোজনায় আছেন যথাক্রমে কানাই দে, গোবর্ধন অধিকারী ও শুভ গুহঠাকুরতা। প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বন করে তোলা ছবিটি সুন্দরবনের পরিবেশ, তাতে ধানের চাষ, বছরের অন্য সময়ে জমির অবস্থা, তুলা চাষের উপযোগিতা, তুলা চাষে সাফল্য প্রভৃতি অত্যন্ত আকর্ষকভাবে তুলে ধরেছে। শ্রীগুহ-ঠাকুরতার সুর সৃষ্টি ছবিটির আকর্ষণকে বর্ধিত করেছে।

(২) হুইলস অ্যান্ড দি হরাইজন

শিক্ষিত ছেলেদের স্বাবলম্বী করবার জন্যে আসাম রাজ্য সরকার গৌহাটিতে তাদের মধ্যে কিছু অটো-রিক্সা শর্তাধীন বিলি করেছেন। বেশ কিছু যুবকের এ থেকে জীবিকার্জন হচ্ছে। এই ঘটনাকে একটি বলিষ্ঠ তথ্যচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (১৯৬৪) ভূতপূর্ব ছাত্র দুলাল সাইকিয়া। তিনিই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন। নতুন প্রবর্তনের সময়ে গৌহাটির বহু লোকের, বিশেষ করে মেয়েদের তাতে চাপতে সংকোচবোধ থেকে শুরু করে স্বাধীন চালক হিসেবে যুবকদের উৎসাহ এবং ক্রমে অটো-রিক্সার বহুল প্রসার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ছবিটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। জয়ন্ত হাজারিকার মৌলিক সুর-সংযোজনা ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। সুজিত সিংহের ক্যামেরার কাজ ভালো।

(৩) আরোহণ

একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে এক সুখী দম্পতির পাশাপাশি আর একটি

প্রিয়তমা রেখা,

তুমি জানতে চেয়েছ নতুন সংসারে আমার কেমন লাগছে।
সু-র ভাল। দিলীপকে আমি ভালবাসি, দিলীপও আমায় প্রাণাধিক ভালবাসে। কিন্তু এই ভালবাসায় বাধ সাধলো [illegible] শাশুড়ী।
সবাই জানে শাশুড়ী আর বউ- বউ আর শাশুড়ী এদের নিয়েই অনেক কান্ড সংসারে। সব শাশুড়ীই একদিন বউ ছিলো- সব বউই একদিন শাশুড়ী হবে, কিন্তু তবুও কেন জানিনা প্রায় সব ঘরেই দেখা যায় [illegible] শাশুড়ীরা [illegible] দুঃখ পাচ্ছেন। আমার [illegible] ব্যতিক্রম হয়নি। [illegible] শাশুড়ীরা যা করতেন- আধুনিকারাও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম যান না, রেখা, [illegible] - [illegible] শাশুড়ীর [illegible] (নতুন-নতুন) [illegible] শাশুড়ীরা [illegible] [illegible] ।

"[illegible]" অর্থাৎ —

— শাশুড়ীও একদিন বউ ছিলো —

[illegible] মধুসূদন দত্ত। [illegible]
ও অন্যান্যদের নাম উল্লেখ যোগ্য।

এই [illegible] ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন [illegible] ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

ইতি
তোমার বান্ধবী
[illegible]

পুনঃ তুমি আমার
সঙ্গে নিম্নোলিখিত
প্রেক্ষাগৃহে দেখা করতে পার।

— শুক্রবার ১৩ই আগষ্ট থেকে —

জনতা : বসুশ্রী : বীণা : মুনলাইট
ম্যাজেষ্টিক : জেম : পূর্ণশ্রী : নবীনা : লিবার্টি
এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে

আজকের নায়ক/শমিত ভঞ্জ ও জয়শ্রী রায়। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

বহু ছেলেমেয়েওলো স্বামী-স্ত্রীর পথ পরিক্রমা শেষে অনুশোচনায় ধাপসহ একটি পাথরে সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠবার মুখোমুখি নিয়ে আলো হয়েছে পরিচয় পরিকল্পনামূলক তথ্যচিত্র 'আরোহণ'-এ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দুই জোড়া মা-বাপের মানসিকতার বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করবার মতো করে দেখিয়েছেন সম্পাদক পরিচালক দয়াল সাইকিয়া।

*

রূপচক্রের 'কোথায় যাবো?'

আগামী ১৮ই আগস্ট '৭১ সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে রূপচক্র সংস্থা শ্রীমনোজ মিত্রের হাসির নাটক 'কোথায় যাবো?' পুনরাভিনয় করবে।

চারণদলের
যে দিবস
হিমালয় থেকেও ভারী
১৬ তারিখে, সাতটায়
মুক্তাঙ্গনে

প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৬॥টায়
অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে
অভিনেতৃ সংঘ প্রযোজিত

অগ্রযুগ

অভিনয়ে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শোভন লাহিড়ী, নির্মল ঘোষ, অশোক মিত্র, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দত্ত, জয়ং মিত্র ও নীলিমা দাস।
নির্দেশনা—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
টিকিট—রোজ ১—৭টা

মঞ্চাভিনয়

পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের নাট্যাভিনয় : আগামী ১৫ই আগস্ট সকাল ৯টায় অমৃতবাজার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবেন নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটক। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন সমীর মিত্র, প্রবীর সেন, অর্ণব ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ, নিশীথ বড়াল, অচ্যুত সিনহা, সন্তোষ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, অবিনাশ দে, সত্যনারায়ণ নন্দ, দিলীপ দত্ত, জগবন্ধু ভাণ্ডারী, সরোজ মল্লিক, শ্যামল দে, বাপ্পু রায়, ইরা মিত্র, মিস্ পলিন, শিপ্রা চক্রবর্তী ও দিলীপ মৌলিক। নাট্যনির্দেশনায় আছেন দিলীপ মৌলিক। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন বসন্ত চট্টোপাধ্যায় ও শচীন বসু। নাট্যানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

'প্রবাসীর নাটক : 'প্রবাসী' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা আগামী ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যায় মুক্তঅংগনে 'বাঁচা একটি প্রশ্ন' নাটকটির অভিনয় করবেন। নাটকটি লিখেছেন তপনকুমার ঘোষাল।

'সমকাল'-এর দুটি একাঙ্ক : দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী 'সমকাল'-এর শিল্পীরা কিছুদিন আগে 'মুক্তঅংগনে' দুটি একাংক নাটকের অভিনয় করে নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন। নাটক দুটির নাম 'চাঁদনী রাত', 'আমেন'।

'চাঁদনীরাত' নাটকটি লেডী গ্রেগরীর 'রাইজিং অব দি মুন' অবলম্বনে রচিত হয়েছে এবং নাট্যরূপ দিয়েছেন বারীন রায়। প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে অমরনাথ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বধু বসুর 'বাউল' চরিত্রচিত্রণও হয়েছে মর্মস্পর্শী। তাঁর কণ্ঠের গান দর্শকদের মনকে আপ্লুত করেছে। হিন্দুস্থানী কনেস্টবলের ভূমিকায় অনন্ত ঘোষ আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন।

দ্বিতীয় নাটক 'আমেন'-র রচয়িতা হোলেন রমেন লাহিড়ী। প্রথমটির মতো এ নাটকের প্রযোজনা অতোটা আকর্ষণীয় না হোলেও দু'একটি অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। এ নাটকের সার্থক দুটি চরিত্রচিত্রণে যাঁদের নাম মনে আসে তাঁরা হোলেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (এগবার্ট) ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (ডেভিড)। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন চিন্ময়শংকর, রূপক সেনগুপ্ত এবং পার্বতী মুখোপাধ্যায়।

দুটি নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনায় বলিষ্ঠ শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। পিন্টু বসুর আলোকসম্পাত দুটি নাটকের মেজাজকে পরিস্ফুট করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

চারণ দলের নাটকাভিনয়

চারণদলের প্রযোজনায় আসছে ১৬ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তঅঙ্গন রঙ্গালয়ে 'যে দিবস' ও 'হিমালয়ের থেকেও ভারী' নাটক দুটির পুনরাভিনয় হচ্ছে।

'বৈকালিকে'র আগামী নাট্যপ্রযোজনা :

দক্ষিণ কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী এবারে দিলীপ মৌলিক রচিত 'আলোর প্রহরে' ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটক দুটোর মহড়া চালাচ্ছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই একাঙ্ক নাটক দুটি অভিনীত হবে। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন দিলীপ মৌলিক।

: যাত্রা সংবাদ :

* **'নিউ প্রভাস অপেরা'** এবারের মরশুমে যে কটি পালা নিয়ে যাত্রার আসরে উপস্থিত হবেন তা হোল রমেন লাহিড়ীর 'রাহুমুক্ত রাশিয়া', কমলেশ ব্যানার্জির 'নীচের পৃথিবী' অগ্নিদূতের 'বর্বর সভ্যতা'। শিল্পী-তালিকায় রয়েছেন অভয় হালদার, নন্দী ভট্ট, রাধারমণ পাল, অনাদি চক্রবর্তী, জয়ন্ত-কুমার, রাজকুমার, অমূল্য ভট্টাচার্য, মুকুল ঘোষ, সাধন দাশগুপ্ত, কল্যাণী ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, গীতা সেন, পুতুল দাস। আলোকসম্পাতে রয়েছেন অজাতশত্রু।

* **'তরুণ অপেরা'র** শিল্পীরা এবার শম্ভু বাগের 'মহেঞ্জোদারো', অমর ঘোষের 'আমি সুভাষ' ও দিগিন ব্যানার্জির 'দুরন্ত পদ্মা' পালা তিনটি উপহার দেবেন। পালা পরিচালনা করবেন অমর ঘোষ। শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন শান্তিগোপাল, স্বর্ণালী মজুমদার ও শিব ভট্টাচার্য।

* **নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা'র** নতুন পালা হোল ভৈরব গাঙ্গুলীর 'আগুনে শিকল ভাঙবে'। শিল্পীগোষ্ঠীতে রয়েছেন মিহির ভাওয়াল, বটুবাবু, অজিত সাহা, অঞ্জনকুমার, তারা ভট্টাচার্য, বিভূতি পাণ্ডে, পাঁচু মুখার্জি, ছায়া পাল, রূপশ্রী মিত্র, তনুশ্রী ঘোষ, মালতী মণ্ডল, হরিরাণী।

* **লোকনাট্যের** শিল্পীরা আগামী ২১শে আগস্ট 'মহাজাতি সদনে' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'র পালারূপ পরিবেশন করবেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দেবেন ভোলা পাল, শিবদাস ভট্টাচার্য, রাখাল, সুবিমল, গীতা দত্ত, সোনালী গোস্বামী, পূর্ণিমা ও বিজয় মুখার্জি। পালা পরিচালনা করবেন বিজন মুখার্জি।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সমবেত বিদেশী প্রতিনিধি

বিবিধ সংবাদ

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব : ৭ম মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উপমন্ত্রী শ্রীধরমবীর সিংহ বলেন যে, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের বিশ্ব-জোড়া মর্যাদা রয়েছে এবং সেজন্যই এবার মস্কো উৎসবে 'একটি নতুন ধরনের ভারতীয় ছবি' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হয়। মস্কো থেকে এ পি এন এ খবর দিয়েছে।

মস্কো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম পুরস্কারবিজয়ী 'সাগিনা মাহাতো' (শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত) ছবিটির প্রদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা একথা বলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন সোভিয়েত ছবির শিল্পীগণের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'সোভিয়েত চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগের উদ্যোগ আমরা চালিয়ে যাব।' উল্লেখযোগ্য, ইতিমধ্যেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-পরিচালকরা যুক্তভাবে কয়েকটি ছবি করেছেন।

'সাগিনা মাহাতো' ছবিটির প্রযোজক ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের সাফল্য সম্পর্কে 'মস্কো নিউজ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন, মস্কো উৎসব, অন্যান্য উৎসব থেকে স্বতন্ত্র। কারণ ছবির বিচারে শুধু ছবির আঙ্গিক নয়, বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।' প্রথাগত 'বাজার-চলতি ছায়াছবির' থেকে পৃথক, ভারতীয় চিত্রজগতে 'নতুন ধারার ছবি' সম্পর্কে সোভিয়েত দর্শক ও চিত্র-সমালোচকদের যে আগ্রহ তিনি দেখেছেন, সে সম্পর্কে তিনি আনন্দিত। 'সাগিনা মাহাতো' ছবিটিতে শ্রমিক-আন্দোলনের কথা আছে। 'প্রাভদা' পত্রিকাতে এই ছবিটি সম্পর্কে যে পর্যালোচনা বের হয়, তা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের 'বিরাট সাফল্য' সম্পর্কে এ-পি-এন-এর সংবাদদাতার কাছে শ্রীগাঙ্গুলি বলেন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার বিরাটত্বের দিক থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের দিক থেকে মস্কো উৎসবটি অসাধারণ।'

মস্কোয় ৭ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯ জুলাই-এ শুরু হয়ে ২ আগস্ট শেষ হয়।

২ আগস্ট ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি উৎসবে সপ্তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের জুরীর চেয়ারম্যান 'গ্রেগরী কুজিন্টসেভ ঘোষণা করেন উৎসবের নিম্নলিখিত ফলাফল:

(১) কানেটো শিন্দো পরিচালিত 'লিভ টু ডে, ডাই টু মরো' (জাপানী চিত্র)—শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত।

(২) দেমিয়ানো দামিয়ানি পরিচালিত 'কনফেশন অব এ পুলিশ কমিশনার টু এ পাবলিক প্রসিকিউটার' (ইতালীয় চিত্র) ও (৩) যুরী ইলিয়েঙ্কো পরিচালিত 'এ হোয়াইট বার্ড উইথ এ হোয়াইট মার্কিং' (সোভিয়েত চিত্র)।

সোভিয়েট-আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটি সম্পূর্ণ পুরস্কারটি পেয়েছে ভারতীয় চিত্র 'সাগিনা মাহাতো।'

পোলিশ পরিচালক আন্দ্রে ওয়াইদা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক বিবেচিত হয়েছেন।

অহীন্দ্র চৌধুরীর ৭৬তম জন্মদিবস

"অভিনয়"-পত্রিকার পরিচালক গোষ্ঠী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর ৭৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করলেন তাঁদের দপ্তরে গেল শনিবার, ৭ আগস্ট সন্ধ্যায়। নাট্যকার মন্মথ রায়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল পত্রিকার তরফ থেকে মাল্যচন্দন বিভূষিত করে এবং একটি কবিতাবদ্ধ মানপত্র দিয়ে। উপস্থিত বহু সুধীজনই এতে সামিল হয়েছিলেন। শ্রীচৌধুরীর দীর্ঘ সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে বক্তৃতা দেন সভাপতি শ্রীরায়, নাট্যকার বরীন্দ্র ভট্টাচার্য, নন্দী প্রধান ডঃ অজিত ঘোষ পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার বসু প্রভৃতি। সভায় টেপ রেকর্ডে শ্রীচৌধুরীর 'বিশ্বমঙ্গল' থেকে আবৃত্তি এবং তিরিশ বছর আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে 'আলমগীর' থেকে রাজসিংহের ভূমিকাভিনয়ের অংশ বাজিয়ে শোনানো হয়। পরিশেষে সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী হেনরী আর্ভিং-এর আমেরিকা যাত্রার সময়ে জাহাজে এলেন টেরীর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গ এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের দৃশ্য বর্ণনা করে সকল ব্যাপারেই ঈশ্বরের অমোঘ শক্তির কথা ব্যক্ত করেন।

তরুণ মার্কিনীদের তৈরী ক্ষুদ্র ছবির উৎসব

গেল ৬ থেকে ১৭ আগস্ট (১৫ আগস্ট বাদে)— এগারো দিন ধরে কেন্দ্র সেন স্ট্রীটস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে আমেরিকার কলেজ ছাত্র, স্কুল ছাত্র এবং কিছু শিক্ষক-ছাত্র অন্যান্য ব্যক্তির মিলিতভাবে তৈরী ছোট ছোট চলচ্চিত্রের একটি উৎসব চালু হয়েছে। এই কদিনে অনধিক প্রায় ১০০ খানি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন কর্তৃপক্ষ। ছবিগুলি সবচেয়ে কম এক মিনিট থেকে শুরু করে নব্বই মিনিট কাল স্থায়ী। এদের মধ্যে আছে কার্টুন, তথ্যমূলক, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ও নাটকধর্মী ছবি। বেশীর ভাগই রঙীন।

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় যুগ্ম-বিজয়ীর পুরস্কার হাতে ভারতীয় স্কুল ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

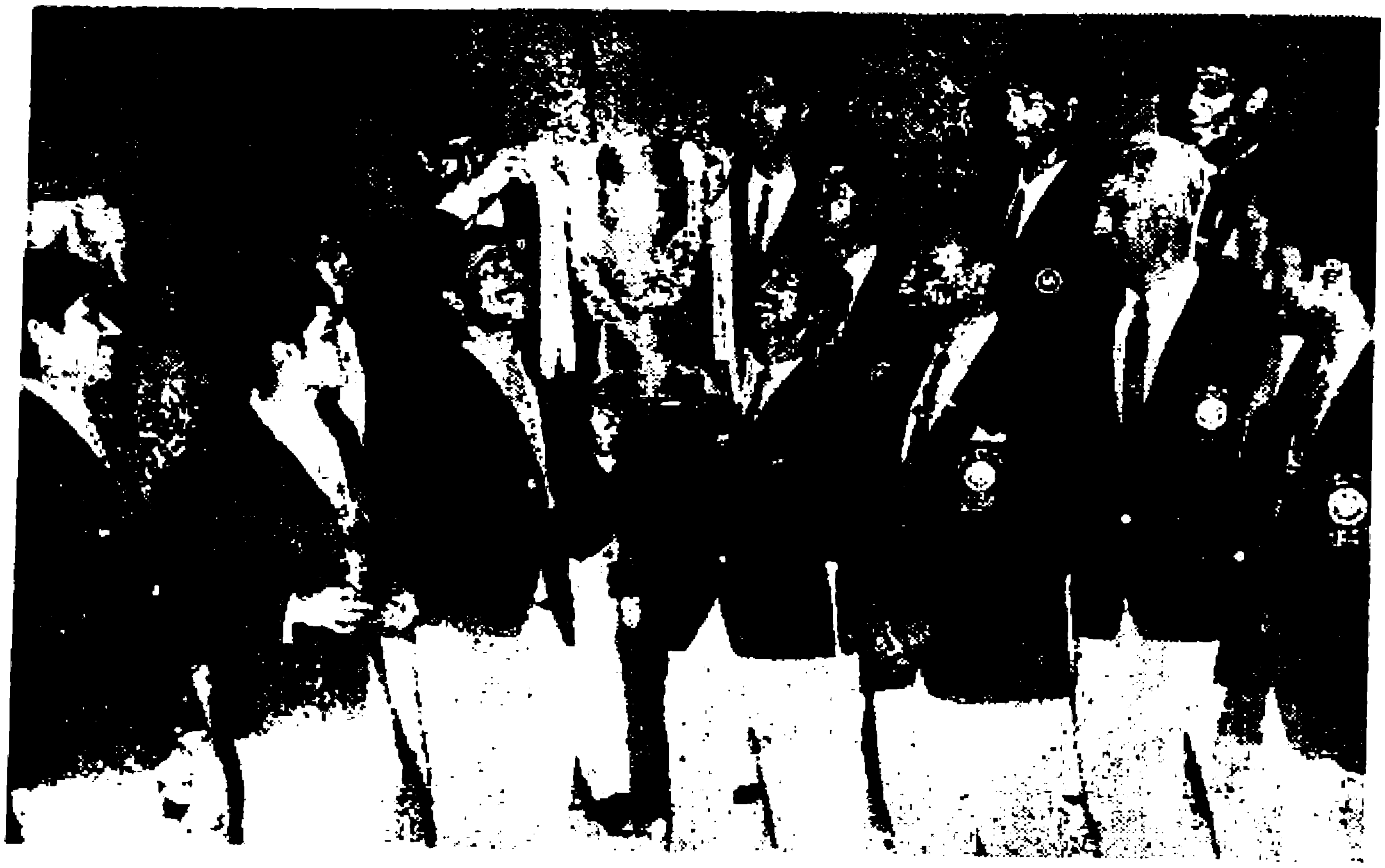

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় বনাম মাইনর কাউন্টি দলের তিনদিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্যে প্রথমদিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দিনে মাইনর কাউন্টি দল ৫ উইকেটে ২০০ রান সংগ্রহ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি সময়ে ভারতীয় দল ১ উইকেট খুইয়ে ১০৪ রান তুলেছিল মানকাদ ৫৮ রানে এবং বেগ ৩২ রান করে নট আউট ছিলেন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ২৫২ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ৪১ রানে এগিয়ে যায়। ভারতীয় দল এইদিন ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে ৮০ মিনিটে ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। অন্যদিকে মাইনর কাউন্টি দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে যখন খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন মাত্র ২০ ওভার বল খেলার মত সময় ছিল। এই সময়ে ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় ১৫১ রান সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং ভারতীয় দল তার চেষ্টা করেনি। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ২৬ রান করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মাইনর কাউন্টি: ২০০ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এম ফসলিন ৬১ রান। চন্দ্রশেখর ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

● ১১১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মিলেট ৫০ নট আউট এবং হান্টার ৪১ রান। চন্দ্রশেখর ৩০ রানে ২ উইকেট)

ভারতীয় দল: ২৫২ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাসকার ৫৪, মানকাদ ৬০ এবং বেগ ৬৪ রান। মানকাদ এবং গাভাসকার রান আউট)

● ২৬ রান (বিনা উইকেটে)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের তিনদিনব্যাপী খেলাটিও ড্র যায়।

প্রথম দিনে সারে দলের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ২৮ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয়দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫৭ (৫ উইকেটে)। প্রথম উইকেটের জুটিতে মানকাদ এবং জয়ন্তীলাল ১২৯ রান তুলেছিলেন। মানকাদ ১৭৫ মিনিট খেলে তাঁর ৭৭ রানে আউট হন। জয়ন্তীলাল ৮৪ রান করেন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৩২৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে খেলার বাকি সময়ে সারে দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৭ রান তুলেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সারে: ২৬৯ রান (ইউনিস আমেদ ৫৩ গ্রাহাম রোপ ৬০ এবং ইন্তিখাব আলম ৫৫ রান। বেদী ১১১ রানে ৭ উইকেট)

ও ২৫৭ রান (৪ উইকেটে। রোপ ৫৬ নট-আউট এবং স্টোরে ৭০ নটআউট প্রসন্ন ৬৯ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় দল: ৩২৬ রান (৮ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। মানকাদ ৭৭ এবং জয়ন্তীলাল ৮৪ রান। বব উইলিস ৭৫ রানে ৩ উইকেট)।

শেষ সংবাদ

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট বৃষ্টির ফলে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

আগামী সংখ্যায় এই খেলার বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ এবং পর্যালোচনা থাকবে।

অ্যাথলেটিক্স

তেহেরান, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল প্রেরণের উদ্দেশ্যে তরুণ অ্যাথলীটদের নিয়ে তিনটি পৃথক দল গঠন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি দলই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় দল। তরুণদের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এইভাবে দল

তৈরী করা হয়। পশ্চিম বাংলার মাত্র একজন অ্যাথলীট—এম পাওয়েল ভারতীয় দলের সংগে তেহেরাণের ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ব্রোঞ্জ পদক পান। তাছাড়া তিনি ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে স্বর্ণ পদক এবং ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে রৌপ্য পদক পান।

তেহেরাণে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ মোট ১০টি পদক জয়ী হয়েছে—স্বর্ণ ৪টি, রৌপ্য ৪টি এবং ব্রোঞ্জ ৩টি। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের পক্ষে ২টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন একমাত্র হরভজন সিং (হ্যামার ও ডিসকাস)।।

পদক বিজয়ী ভারতীয় অ্যাথলীট

স্বর্ণ (৪): ১০০ মিটার—কে নটরাজন, হ্যামার ও ডিসকাস—হরভজন সিং, ৪×১০০ মিটার রিলে—বচান সিং, এম পাওয়েল, কে নটরাজন।

রৌপ্য (৪): সটপাট—গুরদীপ সিং, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়—ভি সিং, ৪×৪০০ মিটার রিলে—বচান সিং, এম পাওয়েল ও নির্মল সিং।

ব্রোঞ্জ (৩): ডিসকাস থ্রো—লোকনাথ বোলার, ১১০ ও ৪০০ মিটার হার্ডলস—নির্মল সিং, ১০০ মিটার দৌড়—এম পাওয়েল, ৪০০ মিটার দৌড়—বচান সিং।

মালয়েশিয়ার ৪১তম অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ মোট ৯টি পদক (স্বর্ণ ৫ এবং রৌপ্য ৪) জয়ের সূত্রে আগন্তুক দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। প্রথম স্থান পায় ফিলিপাইন—মোট ১৬টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে মালয়েশিয়ার পক্ষে সর্বাধিক ২৯টি পদক (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ১২) জয় সম্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষের পক্ষে দুটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন—পুরুষ বিভাগে রঘুনাথন এবং মহিলা বিভাগে সীতা কাউর। রঘুনাথন স্বর্ণ পদক পান ট্রিপল ও লং জাম্পে। অপরদিকে সীতা কাউর পান সটপাট ও ডিসকাস থ্রোতে।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের বিশ্ব ফুটবল

যোগিতায় যে ১৬টি দেশ বাছাই পর্বের লীগ প্রতিযোগিতায় খেলবে তাদের খেলার তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই বাছাই পর্বের লীগ খেলায় মাত্র ১৪টি দেশ ১৯৭৪ সালের জুন-জুলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীর শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে। গত বারের (১৯৭০) কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং উদ্যোক্তা দেশ পশ্চিম জার্মানী বাছাই পর্বের খেলায় অংশ গ্রহণ না করেই সরাসরি শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবে।

ইউরোপ

১নং গ্রুপ : সুইডেন, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, মালটা।
২নং গ্রুপ : ইতালী, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, লুক্সেমবার্গ।
৩নং গ্রুপ : বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড।
৪নং গ্রুপ : রুমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, আলবানিয়া, ফিনল্যান্ড।
৫নং গ্রুপ : ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড, ওয়েলস।
৬নং গ্রুপ : বুলগারিয়া, পর্তুগাল, উত্তর আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস।
৭নং গ্রুপ : যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, গ্রীস।
৮নং গ্রুপ : চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, স্কটল্যান্ড।
৯নং গ্রুপ : রাশিয়া, ফ্রান্স, রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড।

দক্ষিণ আমেরিকা

১নং গ্রুপ : উরুগুয়ে, কলোম্বিয়া, ইকুয়েডর।
২নং গ্রুপ : আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, বোলিভিয়া।
৩নং গ্রুপ : পেরু, চিলি, ভেনেজুয়েলা।

এশিয়া

১নং গ্রুপ : ইস্রাইল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, হংকং, রিপাবলিক অব কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।
২নং গ্রুপ : ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, কুয়েত, সিংহল, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ডের বিজয়ী দেশ।

আফ্রিকা

১নং গ্রুপ : মরোক্কো, সেনেগাল, গায়না, আ ল জে রি য়া, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, টিউনিশিয়া, আইভরী কোস্ট, সিয়েরা লিওন।
২নং গ্রুপ : সুদান, কেনিয়া, মরিশাস, মাদাগাস্কার, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, লেসোথো।
৩নং গ্রুপ : নাইজেরিয়া, কঙ্গো-ব্রাজাভিলে, ঘানা, ডাহোমি, টোগো, কঙ্গো-কিনসাসা, ক্যামেরুন, গাবন।

মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান

১নং গ্রুপ : কানাডা, আমেরিকা, মেক্সিকো।
২নং গ্রুপ : গুয়াতেমালা, এল সালভাডর
৩নং গ্রুপ : হণ্ডুরাস, কোস্টারিকা
৪নং গ্রুপ : জামাইকা, নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলেস
৫নং গ্রুপ : হাইতি, পুয়েরতো রিকো
৬নং গ্রুপ : সুরিনাম ত্রিনিদাদ, অ্যান্টিগুয়া

এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে ৮টি দেশ নিয়ে এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগ ছিল। একটি বিভাগে ১৫ বছরের কমবয়সী এবং অপর বিভাগে ১৮ বছরের কমবয়সী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল। যে-বিভাগে ১৫ বছরের কমবয়সী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল তার ফাইনালে গত-বারের বিজয়ী থাইল্যান্ড ৪—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে। অপর বিভাগের ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং মালয়েশিয়া যুগ্মবিজয়ী হয়েছে। এই বিভাগের 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ ভারতবর্ষ সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের বিজয়ী থাইল্যান্ডকে ২—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৯৭১ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে নিয়ে ১২টি দেশ যোগদান করেছে। যোগদানকারী দেশগুলি সমান দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। 'এ' গ্রুপে খেলছে—দক্ষিণ কোরিয়া (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান), মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, জাপান, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে খেলছে বুহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুর।

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ১০ জন খেলোয়াড় দলে স্থান পেয়েছেন এবং বাংলার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

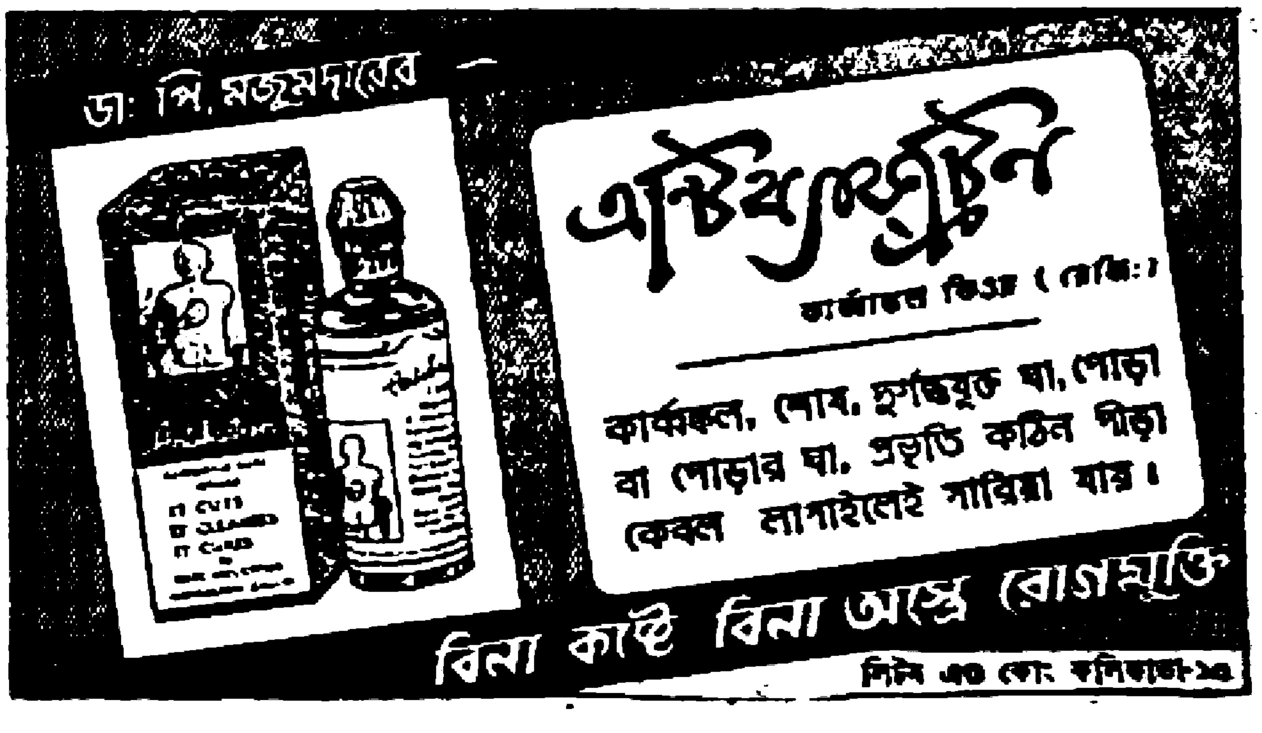

চিঠিপত্র

'বাংলাদেশ' সংখ্যা ও "গোরনিদ্রা"

বলে রাখা ভালো, আমি সাপ্তাহিক অমৃত এবং সাপ্তাহিক দেশ দুটোরই নিয়মিত পাঠক।

কি আশ্চর্য! এ রকমও হয় নাকি? অমৃতর বাংলাদেশ সংখ্যা নববর্ষ ১৩৭৮-এ প্রকাশিত শওকত ওসমানের ছোট-গল্প 'গোরনিদ্রা', তেসরা জুলাই প্রকাশিত ৩৫ সংখ্যা দেশ-এ 'গোরস্থানে নয়' নামে প্রকাশ! এ ব্যাপারে কোন স্বীকৃতি কোথাও চোখে পড়ল না। অবাক লাগছে। দুটি ঐতিহ্যপূর্ণ সাপ্তাহিকে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে একই গল্পের হুবহু মুদ্রণ কেমন করে সম্ভব? একটু ভুল হোল, হুবহু ঠিক নয়। কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আছে। প্রথমতঃ নামে। একটিতে 'গোরস্থানে নয়'। অন্যটিতে 'গোরনিদ্রা'। তাছাড়া মাঝে মধ্যে দু-একটি শব্দের এদিক সেদিক। যেমন, গল্পের শেষ দিকে (অমৃতর)—...আমার দিকে এগোতে এগোতে হেঁকে উঠলো, স্লামালেকুম! স্লামালেকুম!'

আমি ভূতের সংগে কথা বলব?... কোন রকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, আলায়কুম আস্‌সালাম:

(দেশএ)... আমার দিকে এগোতে এগোতে হেঁকে উঠলো, 'আদাব, আদাব, সালামালেকুম...।'

আমি কি ভূতের আদাবের জবাব কোনরকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, আদাব, আদাব।

পরিবর্তন আরো আছে, যেমন অমৃতর প্রকাশিত গল্পের শেষ লাইনটি 'বিপদেরও শঙ্কায় চোখ বন্ধ করে নিলাম'—দেশ-এ নেই।

এ চিঠিটি অমৃতে প্রকাশ করে আমাদের মত মফস্বলী লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কৌতূহল মেটাবেন।

বিনায়ক দেব
কালাকাটা, জলপাইগুড়ি

(২)

নিবেদন এই যে, 'বাংলাদেশ' সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে, যদ্দুর জানি, সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে অমৃত পথিকৃৎ। সেদিক থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশবাসী আপনাদের নিকট চিরঋণী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত শওকত ওসমানের একটি গল্প নিয়ে পাঠক সমাজ থেকে অভিযোগ উঠেছে। কারণ, একই গল্প আবার অন্য নামে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। এমন হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু লেখকের এদেশে অনুপস্থিতি—এবং তার সংগে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে, আপনাদের পক্ষেও অনুমতি নেওয়ার সুযোগ ঘটে নি। যোগাযোগ হলে না পারিশ্রমিকের প্রশ্ন ওঠে।

শওকত ওসমান আমার বহু দিনের পরিচিত বন্ধু। তাই জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনারা যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন এবং যে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন তার জন্যে, অনুমতি-পারিশ্রমিক ইত্যাদির প্রশ্ন তোলা তো দূরের কথা, শুধু একবার নয়, শওকত ওসমান বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তা লিখিতভাবে সর্বজনসমক্ষে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাই।

নানা কারণে নাম উহ্য রাখতে বাধ্য থাকলাম। জয়বাংলা।

ওয়াকিবহাল
কলকাতা-১৭

"বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর"

বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের ঘটনাটি কোথায় যে ঘটেছিল, তা এখনও নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারেন নি। এটা অবশ্য পৌরাণিক যুগের (খৃষ্ট-জন্মের পূর্বে এবং মহাভারতীয় যুগের পরে) উল্লেখযোগ্য ও মহিমাময় ঘটনা। এ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দাবী-দাওয়ারও অন্ত নেই। আসামের ঐতিহাসিকরা দাবী করেন, এটা ঘটেছিল আসামের ধুবড়ীতেই। তাই নেতা ধোপানীর নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয়েছে ধুবড়ী। কারণ ধুবড়িতে এখনও 'নেতা ধোপানীর ঘাট' নামে একটি স্থান রয়েছে। এই ঘাটেই 'শুভ্র বৈদ্য-ফুল-তিলক' নেতা কাপড় কাচতেন।

আবার শ্রীহট্টের পণ্ডিতেরা মনে করেন, 'চাঁদ সওদাগরের বাড়ি' বলে বর্ণিত ও চিহ্নিত তথায় একটি জঙ্গলময় জায়গা আছে। লাউড়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-সদৃশ শনির হাওরেই নাকি চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে নিমজ্জিত হয়েছিল।

'এই বাঁক ছাড়াইয়া কন্যা বিজয়াগমন।
ধনা-মনার বাঁকে গিয়া দিলা দরশন।।'
—ষষ্ঠীবর দত্ত।

পদ্মপুরাণে ধনা ও মনা নামে দুজন স্রোত-পতির নাম উল্লিখিত আছে। ওদেরে নিয়ে দুটি পালাগানও শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত আছে। লাউড় রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান শাখা-সুরমা নদীর তীরে এদের বসতি ছিল। বেহুলার কলার ভেলা এই নদী দিয়েই গমন করেছিল এবং পরে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে আসাম উপত্যকা অতিক্রম করে ভেলা দেবপুরে (বর্তমান মানস-সরোবরে) পৌঁছেছিল। কথিত আছে শ্রাবণ সংক্রান্তির শুভ দিবসেই নাকি মনসাদেবী লক্ষ্মীন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সেই হেতু শ্রীহট্ট জেলায় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিবসে প্রতি ঘরে ঘরে মনসাদেবীর যথারীতি অর্চনা হয়। মনসাপূজা শ্রীহট্টে জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হয়েছে।

আবার বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিতরাও সমস্বরে দাবী করেন যে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ঘটনাটি নাকি বর্ধমান জেলার কোনও এক স্থানে ঘটেছিল। আর চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদহে (বঙ্গোপসাগর) নিমজ্জিত হয়েছিল। সে যাই হোক, সকলের দাবীকেই সামনে রেখে এই ঘটনাটি কবে এবং কোথায় ঘটেছিল, তাহা নির্ণয় করতে ঐতিহাসিকদের একান্ত অনুরোধ করি।

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ
এলাহাবাদ

'নূর-নামা' প্রসঙ্গে

অমৃত নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৭৮) একটি ত্রুটী লক্ষ্য করা গেল—অষ্টাদশ শতাব্দীর (?) 'নূর-নামার' কবি আবদুল হাকিমের কবিতার উদ্ধৃতিতে। ১৯৫০ ইং সনের ২৩শে এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডঃ শহীদুল্লাহ যে উদ্ধৃতি দেন তাহল—

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।
মাতা পিতা যয় ক্রমে বংগেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে না যায়।।'

(দ্রষ্টব্য শিক্ষা-ব্রতী রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৬১ পৃঃ ১৫)

অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে এই রূপে—
'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগ কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতা পিতা মহক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।'

কোনটি সঠিক?

সুনীল পাল
কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়···তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

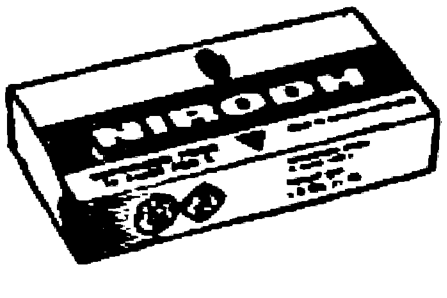

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লাখ লাখ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকানে [illegible] পাওয়া যায়।

davp 70/580

প্রথম স্তবক

৪৫ আর-পি-এম সিঙ্গলস্
উষা মঙ্গেশকর
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
গীতা দত্ত
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
নির্মলা মিশ্র
নির্মলেন্দু চৌধুরী
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বজিৎ
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূপেন হাজরিকা
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মান্না দে
মিন্টু দাশগুপ্ত
রাজকুমার বিশ্বাস (রাজু)
রাণু মুখোপাধ্যায়
ললিতা ধর চৌধুরী
সুমন কল্যাণপুর

৩৩⅓ আর-পি-এম
লং প্লে রেকর্ড
হিটস্ ফ্রম বেঙ্গলী
হিম্নস্, ৪র্থ খণ্ড

বিশদ বিবরণের জন্য এইচ-এম-ভি ডীলারের কাছে আসুন।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও জনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
অগ্রণী ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • কানপুর

GC 66308

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৬শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 20th August, 1971 — শুক্রবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৭৮ — 50 Paise

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৬৪	একনজরে		—শ্রীপ্রভাকর
১৬৫	সম্পাদকীয়		
১৬৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
১৬৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১৭০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
১৭১	মমতা	(গল্প)	—শ্রীসুশীল রায়
১৭৫	সুন্দরী 'মানা' ভয়ঙ্করী		—শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস
১৮১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১৮৪	আগডুম-বাগডুম	(কবিতা)	—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
১৮৫	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
১৯০	কলকাতা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে		—শ্রীপ্রিয় গুহ
১৯৭	বয় চিরকাল বয়ই রয়		—শ্রীমণি দাস
১৯৮	বৃহৎ কর্মে		—শ্রীশিশির নিয়োগী
২০১	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
২০৫	কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২০৯	গীতিকার বঙ্গনারী		—শ্রীগুরুপ্রসাদ রায়
২১০	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
২১৮	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
২২১	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
২২·	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅরুষ্কান্ত
২৩০	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি বসু
২৩১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
২৩৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক
২৪০	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন দাস

হানিম্যানের উত্তরসূরীর ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরেকটি মূল্যবান বই

গাইড বুক

হোমিও চিকিৎসার বহুল প্রচারিত "পাকেট বই" হিসাবে সুপরিচিত। বাংলা/ইংরাজী এক সঙ্গে।

মূল্য ২ টাকা [ডাক খরচা আলাদা]

পি ব্যানার্জি

৫০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
ফোন ৫৫-৪২২৯

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ বই। লেখক নিজে একজন চিকিৎসক এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুত্র। তাই রোগ ও রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং এই অভিজ্ঞতাই বইটির উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি বইটিতে তাঁর পিতার চিকিৎসক-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যে চিকিৎসার ধারা এখানে উল্লেখিত তার নাম 'হানিম্যানের চিকিৎসা ধারা'।

অসুখ ও ওষুধ—এই দুটি বিষয়ের ওপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি সহজবোধ্য। যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

—যুগান্তর, ২০শে জুন, ১৯৭১

এক নজরে

মূলোচ্ছেদের প্রয়াস :

দশ বছর ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আমেরিকা। কত লোকের যে জেল, জরিমানা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু তার নিরলস, সর্বাত্মক ও অতন্দ্র প্রহরা ভেদ করে অগণিত ছিদ্রপথ দিয়ে তাল তাল আফিং ঢুকেছে দেশে, আর গোটা আমেরিকা, বিশেষ করে তরুণ আমেরিকা যেন নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো ঝিমিয়ে পড়ছে দিন দিন। একদা অর্থলোলুপ শ্বেতাঙ্গ বণিকরা যেমন করে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল গোটা চীনকে, তেমনি এক কালঘুম গ্রাস করছে সমস্ত আমেরিকা।

তাই নিক্সন প্রশাসন এবার মূলোচ্ছেদে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি তুরস্কের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমেরিকার মতে স্থির হয়েছে, শুধু ওষুধের প্রয়োজনে যেটুকু আফিং চাষ প্রয়োজন সেটা মাত্র চারটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আর সব জেলায় আফিং চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবে তুরস্ক সরকার। আর তার জন্য তুরস্কের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা আমেরিকা পুষিয়ে দেবে আর্থিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে। প্রধানত তুরস্ক থেকেই চোরাপথ দিয়ে মার্সাই বন্দর হয়ে নানা হাত ও নানাপথ ঘুরে পাউন্ড পাউন্ড আফিং প্রবেশ করে আমেরিকায়। সুতরাং তুরস্কে যদি আফিং চাষ বন্ধ হয় তাহলে পণ্যের অভাবে ঐ আন্তর্জাতিক চোরাচালানের কারবারটি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপাতত দেখা গেছে, এতে দু' পক্ষেরই লাভ হবে যথেষ্ট। কারণ আমেরিকাকে স্বদেশে এবং বিদেশে ফরাসি পুলিশ, ইন্টারপোল প্রভৃতির পেছনে চোরাচালান বন্ধের ব্যর্থ প্রয়াসে যে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, তার একটা অংশ পেলেই তুরস্ক খুশিমনে আফিং চাষ বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া তুরস্ককেও ত চোরাচালান বন্ধের জন্য কম অর্থ ব্যয় করতে হয় না। গত বছর শুধু তুরস্কের পুলিশের হাতেই ধরা পড়েছে ১,১৮৮ পাউন্ড আফিং ও প্রায় নয় পাউন্ড মরফিন। এর জন্য জেলে পাঠাতে হয়েছে প্রায় ছয়শ' চোরাকারবারীকে। তুরস্ক গত বছর আমেরিকার কাছে যে আর্থিক সাহায্য পায় তার অর্ধেক ব্যয় হয়ে যায় আফিং-এর চোরা কারবার বন্ধ করতে।

তুরস্কের চারশটি জেলায় আফিং চাষ হয় এবং প্রায় আশি হাজার কৃষকের প্রধান জীবিকা হল আফিং উৎপাদন। আফিং বেচে তুরস্ক প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সারা দেশে বছরে প্রায় ১৫০ টন আফিং উৎপাদন হয়। কিন্তু সরকারের হাতে জমা পড়ে মাত্র ৬০ টন, বাকি মানে হল ৯০ টন চলে যায় চোরাপথে। প্রতি কিলোগ্রাম আফিং-এর সরকারি দাম হল ৩-৩ ডলার, কিন্তু চোরাকারবারীরা দাম দেয় কিলোপিছু ৭ থেকে ১১ ডলার। গত বছর চাষ ভাল হয়নি বলে চোরাবাজারে দর উঠেছিল কিলোপিছু ৪৪ ডলার। সদ্যসমাপ্ত তুরস্ক-মার্কিন চুক্তি অনুসারে ১৯৭২ সালের শরৎকাল থেকে তুরস্কের মাত্র চারটি জেলায় পপির চাষ হবে এবং তা থেকে যে আফিং উৎপন্ন হবে তা শুধু ওষুধ প্রস্তুতের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। এবং আমেরিকা যে ক্ষতিপূরণ দেবে তা দিয়ে বৃত্তিচ্যুত কৃষকদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।

পাঁচ মিনিটের ব্যাপার :

দুগ্ধ শুভ্র বর্ণকান্তি, নীলনয়না স্বর্ণকেশী সুন্দরী শ্রীমতী রোজমারী হেস [illegible] রাজ্যের বিশ্ব নগ্ন-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। ওন্টারিও রাজ্যের কোন এক স্থানে অনুষ্ঠিত ঐ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিনীর সংখ্যা ছিল ১৭। সাংবাদিক, বেতার ও টি-ভির ভাষ্যকার নিয়ে বিচারক ছিলেন ১৪ জন এবং দর্শক সংখ্যা তিন হাজার। সকলের বিচারে পঞ্চবিংশতি উর্দ্ধা শ্রীমতী হেসই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বিবেচিত হন। একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মী শ্রীমতী হেসের দেহের মাপ ৩৫-২৪-৩৫।

বছর পাঁচেক আগে ইউরোপে থাকাকালে হেস-দম্পতি নগ্নবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ ব্যাপারে শ্রীমতী হেসের সুস্পষ্ট অভিমত—সমস্যাটা মাত্র মিনিট পাঁচেকের। চার মিনিট পরে আর কিছুই দেখার থাকে না।

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার :

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যে বিশ্বজনীন এবং তাকে যে কোন দেশ, কাল বা ধর্মের গণ্ডিতে সীমিত করা যায় না, তা বোধহয় ইন্দোনেশিয়াই সর্বাধিক আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব এশিয়ার নবজাগরণের কালে ভারতবাসী প্রথম বিস্মিত হয় ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দের সুকর্ণ, সুবন্দ্র, সুশাস্ত্র প্রভৃতি নাম শুনে। তারপর সে বিস্ময় আরও গভীর হয় যখন জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই ইসলামধর্মী। ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলিদ্বীপ বাদে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, কিন্তু দূর অতীতকাল থেকে যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর সুচিস্নিগ্ধ প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল ঐ দ্বীপময় রাজ্যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তারা বর্জন করেনি। রামায়ণ মহাভারতের যুগের মতো ইন্দোনেশিয়ার মানুষ আজও শুধু একটি নামেই পরিচিত, পদবী বা উপাধি সে-দেশে বাহুল্যজ্ঞানে বর্জিত। রাজা দশরথ, ধৃতরাষ্ট্র, শল্য, কর্ণের মতোই একনামে পরিচিত প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, সুহার্তো এবং ইসলামধর্মী প্রধান সেনাপতির নাম কর্নেল অভিমন্যু।

আগামী ২১শে আগস্ট থেকে ইন্দোনেশিয়ার যোগকর্তা শহরে যে আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব শুরু হচ্ছে তাতে যোগদানের জন্য ইন্দোনেশিয়া ছয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে দেশগুলি হল ভারত, নেপাল, বর্মা, খেমর সাধারণতন্ত্র (কম্বোডিয়া), সিংহল ও মালয়েশিয়া। ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে উৎসবে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে সাত। তিনদিনব্যাপী উৎসবে ইন্দোনেশিয়া তার সুরকর্তা, যোগকর্তা ও বলিদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণ নৃত্যনাট্যগুলি উপস্থাপিত করবে। ভারত, বর্মা, খেমর সাধারণতন্ত্র ও নেপালের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে যে, উৎসবে যোগদানের জন্য তারা নৃত্যনাট্যদল পাঠাবে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধন দুটি দেশের সম্পর্ককে যত নিবিড় করে, কোন কূটনৈতিক মারপ্যাঁচেই সেটা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকলি কালো নয় :

আফ্রিকা, এশিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অশ্বেতকায়দের আগমনে সম্প্রসারিত ও সুপরিচিত হয়েছে ইংল্যান্ডের স্লাউ শহরটি। সম্প্রতি সেখানে যে 'মিস ব্ল্যাক এন্ড বিউটিফুল' প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন হয়েছিল তা পরাজিতা প্রতিদ্বন্দ্বিনীদেরই ক্ষোভের প্রতিবাদ ও হৈহট্টগোলে শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ, যাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করা হয়েছে (কেনিয়ায় জন্ম, ভারতীয় বংশোদ্ভূতা শ্রীমতী অমৃত চাওলা) তিনি অশ্বেতকায় হলেও প্রকৃত অর্থে কৃষ্ণাঙ্গিনী নন।

অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী, ওয়েস্ট ইন্ডিজের শ্রীমতী গ্লোরিয়া টমসন এ সম্বন্ধে বলেন : তিনি সুন্দরী হতে পারেন, কিন্তু কালো একেবারেই নন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

মহাপঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ

যে কোন কারণেই হোক ভারত সরকারের শাসনযন্ত্রের চাকা অতি মন্থরগতিতে চলে। কলিকাতার জন্য আজ শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর উদ্বেগের আর অন্ত নেই। দুঃস্বপ্ন নগরী, মিছিল নগরী ইত্যাদি বিশেষণগুলি অতি পুরাতন হয়ে গেছে; এখন যতক্ষণ না যুৎসই কিছু একটা বিশেষণ কোনো উচ্চপদস্থ মনীষী কলিকাতাকে চিহ্নিত করছেন অন্ততঃ সেই ফাঁকে বলা যাক বিভীষিকা-নগরী। এই সব নানা হাঙ্গামা এবং অস্থিরতার কথা কিন্তু কেন্দ্রও চিন্তা করছেন। কিন্তু যে করছেন তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গীয় প্রশাসনে নজর রাখার জন্য একজন ফুলটাইম মন্ত্রীর ওপর ভার দেওয়া হয়েছে। কলিকাতার যা কিছু প্রয়োজন তা জোগানোর জন্য দিল্লী এখন বিশেষ ঝোঁক দিয়েছেন। তা যদি না হত তাহলে মেট্রোপোলিটান ডেভেলপমেন্ট সংস্থার সবরকম স্কীমের বাবদ মোট টাকাটা দিয়ে দিতে তাঁরা সহজে রাজী হতেন না। অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, এখন কাজটুকু সুসম্পন্ন হলেই সব দিক থেকে মঙ্গল।

অর্থের অভাবে যে কাজ আটকেছে তা বলা যায় না, কাজটা তাড়াতাড়ি করিয়ে নেওয়ার জন্য জরুরী তাগিদ বোধ করেননি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পাঁচ বছর আগে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। টাকার অঙ্কটা বেশ মোটা। কাজে হাত না দিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নেওয়ার জন্য কসরৎ শুরু করলেন। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার চেষ্টা হলে কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং বৈদেশিক সহায়তার অভাব হত না। তিন কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে এই জাতীয় টানা-হেঁচড়ার ফলে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা গত বছর ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং এই ধারণা করা হয়ত অন্যায় হবে না যে চতুর্থ পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫০ কোটি বরাদ্দ টাকা থেকে হয়ত সামান্য একটা অংশ খরচ হবে। নানা মুনির নানা মত। অজস্র ডিপার্টমেন্ট আর অজস্র কর্তা। সকলকার মনঃপুত না হলে এবং অনুমোদন না পেলে ত' বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা যাবে না।

রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেশনের এই টাল-বাহানার মধ্যে শিব সদাগরের মত দাঁড়িয়ে আছেন সি এম ডি এ সংস্থা। কিন্তু স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উপযুক্ত কাজ চালানোর মত দায়িত্বভার তাঁদের হাতে আছে কি? যথেষ্ট দায়িত্ব যদি এই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় এবং প্রতি পদে পারিপার্শ্বিক বাধা এবং বিধি-নিষেধের আওতা থেকে তাঁরা যদি মুক্ত থাকেন তবেই তাঁদের পক্ষে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সি এম ডি এ-র সংগঠন পার্লামেন্টারী সাব-কমিটির ব্যবস্থানুসারে কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকারের সমসংখ্যক প্রতিনিধি আছেন। সমগ্র বিষয়টি ভালোভাবে বিচার করলে সাধারণের কাছে মনে হবে যে, এই ব্যবস্থাটি ত্রুটিমুক্ত নয়। যেখানে দ্রুত ফললাভের আশা করা যায় সেইখানে সিদ্ধান্তও দ্রুত লয়ে গ্রহণ করতে হয়, বিলম্বিত লয়ে উন্নয়নমূলক কার্য করা সম্ভব নয়। উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অর্থ ব্যয়ও কম হয়, বিলম্বে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তার পরিমাণও অনেক বেশী হয়ে পড়ে। বরাদ্দ অর্থ যাতে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগান হয় সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ৩৮ কোটি টাকার ওপর অর্থ বস্তী উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ খাতে ধরা আছে। যদি ঠিকমত এই অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে সাধারণের কল্যাণ হবে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ-বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় সম্প্রতি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। তাঁর এই আগ্রহের কারণও সুস্পষ্ট। হাহাকার যত বৃদ্ধি পাবে, অশান্তি ও অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পাবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন করে দরিদ্র জনগণের রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত করার যে চেষ্টা তাও তেমন সফল হয়নি। বর্তমান কালে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক ও বৈষয়িক দিক থেকে এক মহাসংকটের মুখে, তার উপর বাংলাদেশ থেকে আগত কোটি কোটি শরণার্থীর দায়-দায়িত্বও এই পশ্চিমবঙ্গের ওপর অনেকখানি পড়েছে। অভাব, অনটন, আশ্রয়হীনতা, কর্মহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক অভিশাপে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জর্জরিত, প্রধানমন্ত্রী হয়ত এই দুর্দশার সংবাদ কিছু পেয়েছেন, তাই তাঁর এই আগ্রহ। কিন্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনো পরিকল্পনাই যদি অচিরাৎ দ্রুত তালে সম্পন্ন না করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অসহায় মানুষ দুর্দশার মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হয়ত ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক নিরাময় সাধনে উপযুক্ত বৈদ্যের প্রয়োজন। পরিকল্পনা পরিপূরণে উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজনই আজ সর্বাধিক।

পটভূমি

অনেকেই আক্ষেপ করেন যে, এদেশে ছোট ছোট দলের সংখ্যা এত বাড়ছে যে, তার ফলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ব্যবস্থাটাই প্রায় বিপন্ন হতে পড়েছে। কারণ গোটা দুই-তিন বড় দল থাকলেই নাকি পার্লামেন্টারি খেলাটা জমে ভালো। তবু যে এই সেদিন, অর্থাৎ ৯ আগস্ট, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, ইন্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি সবাই মিলে নতুন একটা সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তুলল সেটা কিন্তু দেশে তেমন সাড়া জাগালো না। কেরলে, বিহারে তবু একটু হৈ চৈ হল, কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় তো এই নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই হল না, উত্তেজনা তো দূরের কথা। অথচ হওয়া উচিত ছিল, কারণ সমাজতন্ত্র কথাটা এখন বেশ একটা ধরতাই বুলি। তা ছাড়া, কংগ্রেসও চান না, কমিউনিস্টদেরও ভালো চোখে দেখেন না, মাঝামাঝি একটা প্রগতিশীল বিকল্প চান—এমন লোকের সংখ্যা কি নিতান্তই কম?

তবু কেন এই আগ্রহের অভাব? একটা কারণ, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের ঐক্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই গত কয়েক বছরে এক ধরনের সিনিসিজম দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রীরা এর আগেও যুক্ত হয়েছেন, আবার বিযুক্ত হয়েছেন, আবার যুক্ত হয়েছেন এবং আবার বিযুক্ত। ১৯৫১ সালে আচার্য কৃপালনি যে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গড়লেন পরের বছর সাধারণ নির্বাচনের পর সেই দল সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় গড়ে উঠল প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি। ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যই সমাজতন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছে, ১৯৫২ সালের ঐক্যের পিছনেও ছিল ঐ একই কারণ। কিন্তু ফাটল দেখা দিতেও দেরি হল না। পি এস পি ছেড়ে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া গড়লেন সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (১৯৫৫)। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে দু' দলের কোনোটিই বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। আবার উঠল ঐক্যের কথা। '৬৪তে গড়ে উঠল সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি। কিন্তু এবারের ঐক্য টিকলো আরো কম দিন। বছর না-ঘুরতেই পি এস পি নেতারা প্রায় সদলেই এস এস পি ছেড়ে গেলেন। তার পর থেকেই দু' দলের মধ্যে মাঝে মাঝেই মিলনের কথা উঠেছে, কিন্তু ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনের ধাক্কা না এলে সে প্রয়াস এখনও হয়ত সফল হত না। ঐ ঐক্যও কদিন টিকবে তা নিয়ে যদি অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয় তবে অবাক হওয়ারও তেমন কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্য নিয়ে পশ্চিম বাংলায় যে তেমন আগ্রহ দেখা দিল না, তার কারণ অবশ্য শুধু এই সন্দেহ নয়। এই রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি হীনবল বলেই এ নিয়ে কোনো উত্তেজনা দেখা দিল না। ধরুন আজ যদি সি পি এম ও সি পি আই-এর মিলন প্রস্তাব উঠত, এমন কি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের হাত মেলাবার কথা হত তবে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আকাশে বিদ্যুৎ চমকে যেত। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও এই রাজ্যের রাজনীতিতে তার উল্লেখযোগ্য জের পড়ত। কিন্তু পি এস পি-এস এস পি মিলনে সে-ধরনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

ইদানীং পি এস পি ও এস এস পি, দুটি দলই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সরকারী পি এস পি ভেঙে গড়ে উঠেছিল বিমল বসু, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যের বিক্ষুব্ধ পি এস পি। সুধীর দাস শেষের দিকে সরকারী পি এস পি-তেও ছিলেন না, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতেও ছিলেন না, তবু তিনিও ছিলেন পি এস পি নামের দাবিদার। এস এস পিও ভাঙন এড়াতে পারে নি। একটা অংশ ভেঙে তৈরি হল সোস্যালিস্ট পার্টি। আবার কাশীকান্ত মৈত্র হলেন আর এক দলছুট অংশের নেতা।

কিন্তু ছিন্ন-দীর্ণ হওয়ার আগেও যে সমাজতন্ত্রীরা পশ্চিম বাংলার মনে তেমন-ভাবে নাড়া দিতে পেরেছিলেন তা নয়। যদিও স্বাধীনতার ঠিক আগে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নামের থেকে 'কংগ্রেস' শব্দটা কাটা পড়েছিল, তবু এই রাজ্যে সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের 'বি-টিম' বলেই পরিচিত হয়ে রইলেন অনেকের কাছে। পি এস পি-কে 'পরম সুবিধাবাদী পার্টি' বলতেও অনেকের আটকালো না।

এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, বাঙালির মন-কাড়বার মতো তেমন জবরদস্ত নেতা সোস্যালিস্টদের মধ্যে দেখা যায় নি। গোড়ায় যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যেই সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয় বাঙালি নেতা বিশেষ কেউ ছিলেন না। পরে যখন সোস্যালিস্টরা কংগ্রেস-বিরোধিতার পথ ধরলেন তখনও কিন্তু তা বাঙালির কাছে তেমন আবেদন জানাতে পারল না। তার কারণ কংগ্রেস-বিরোধী পথ হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলন এখানে রীতিমতো শক্তিশালী। দ্বিতীয়তঃ, বিরোধী অথচ অ-কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী একটি দলও পশ্চিম বাংলায় বেশ প্রভাবশালী—তার নাম ফরওয়ার্ড ব্লক। এই দলের সঙ্গে যেহেতু জড়িত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম, তাই এর আকর্ষণের কারণ বুঝতেও অসুবিধে হয় না।

১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে যখন আসন ভাগাভাগি নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে কোন্দল চলছিল তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পি এস পিকে একটিও আসন দিতে চায় নি। পি এস পি সম্বন্ধে বামপন্থীদের একাংশের মনোভাব এর মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। কিন্তু মার্কসবাদীরা এস এস পিকে ২৪টি আসন দিতে চেয়েছিলেন। কারণ আর এস পি এবং এস ইউ সি-র মতো এস এস পিও তখন মার্কসবাদীদের নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিল। আসন-রফার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর যখন দুটো বামপন্থী ফ্রন্ট তৈরি হল তখন এস এস পি রয়ে গেল মার্কসবাদীদের সঙ্গেই। কিন্তু পি এস পি সরকারীভাবে কোনো ফ্রন্টেই রইল না।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল তাতে পি এস পির বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কারণ এস এস পি'র মতো এই দলও সাতটি আসনে জিতে গেল। স্পষ্টতঃই দেখা গেল, পি এস পির শক্তি সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ধারণায় গলদ ছিল। পি এস পি এবং এস এস পি, দু' দলই মোট কম-বেশি আড়াই লাখ ভোট পেয়েছে দেখা গেল।

কিন্তু যে এস এস পিকে বেশি আসন দেওয়ার জন্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের আগে জোর লড়াই করেছিল, প্রথম যুক্তফ্রন্ট তৈরি হওয়ার পর সেই দলের সঙ্গেই লেগে গেল জোর বিবাদ। এস এস পির অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বি পি ঝা ঐ সময়েই নিহত হন। এস এস পি অভিযোগ করে যে, মার্কসবাদীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। দলের নেতা ডঃ ভূপাল বসু দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট অনিবার্যভাবে ভাঙনের দিকে যখন এগোতে লাগল তখন মার্কসবাদীরাও অবশ্য ছেড়ে কথা কইলেন না। ফ্রন্টকে যারা দুর্বল করছে, তাদের তালিকায় বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে পি এস পি এবং এস এস পির নামও জুড়ে দিলেন মার্কসবাদীরা। পি এস পির সঙ্গে মার্কসবাদীদের কোনো সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে নি, কিন্তু সি পি এমের সঙ্গে অজয় মুখার্জির বিরোধে পি এস পি নেতারা অজয়বাবুর পক্ষেই ছিলেন। পি এস পির জাতীয় পরিষদ যে-বৈঠকে ঘেরাওয়ের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন ফ্রন্ট সরকারের পি এস পি মন্ত্রী নিশীথনাথ কুণ্ডু। সরকারী কর্মচারীদের জন্যে বেতন

কমিশন গঠন নিয়ে যখন ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় তখনও নিশীথবাবু অজয়বাবুকে নতুন সমর্থন জানান। '৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে অজয়বাবু যখন কংগ্রেসের সহযোগে সি পি এম-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় করছিলেন, তখনও তিনি যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন নিশীথবাবু ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রথম যুক্তফ্রণ্ট ভাঙলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ফ্রণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলা কংগ্রেসের একাংশ ছাড়াও ছিলেন পি এস পি'র কয়েকজন সদস্য।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টে পি এস পি সরকারীভাবে যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু আঞ্চলিক বোঝাপড়ার ফলে চারটি আসনে ফ্রণ্ট এই দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী দেয়নি। ঐ চারটি আসনে পি এস পি তো জিতলই, তার সঙ্গে আর একটি-তেও। ফ্রণ্টের সঙ্গে সহযোগে যাঁরা জিতে-ছিলেন, তাঁরা হাওয়া বুঝে ফ্রণ্টে যোগ দিতে বিশেষ দেরি করলেন না। কিন্তু গোড়া থেকেই ফ্রণ্টে থাকায় এস এস পি লাভবান হল আরো বেশি। এই দলের আসন সংখ্যা সাত থেকে বেড়ে হল নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে সি পি এমের সঙ্গে এস এস পি'র সম্পর্ক বেশ খারাপ হয়ে গিয়ে-ছিল। আসন বণ্টনের সময় সি পি এম এবার এস এস পি'র পক্ষে কোনো কথাই বলে নি। এস এস পি এক সময় তো হুমকি দেয় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন না পেলে তারা ফ্রণ্টেই থাকবে না। আবার নির্বাচনের পরে এস এস পি থেকে কজনকে মন্ত্রী করা হবে তা নিয়েও সঙ্কট দেখা দেয়: এস এস পি চাইছিল অন্ততঃ দুজনকে পুরো মন্ত্রী করা হোক। কিন্তু ফ্রণ্ট ঠিক করে একজনকে পুরো মন্ত্রী ও একজনকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হবে। প্রতিবাদে এস এস পি মন্ত্রিসভাতেই যোগ দিল না, যদিও ফ্রণ্টে থেকে গেল।

তবে সি পি এমের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। আসানসোল-রানীগঞ্জের খনি অঞ্চলে দু দলের মধ্যে কর্মিরা সংঘর্ষ আরম্ভ হল পুরো দমে। এত দিন পর্যন্ত ঐ এলাকায় সি পি এমের কোনো প্রভাব ছিল না বললেই চলে। সি পি এম দ্রুত সেই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করতে লাগল। তার ওপর ঐ সময়েই বামানন্দ তেওয়ারি আর লালিত আইচ, এই দুই এস এস পি নেতা আসানসোলে গ্রেপ্তার হলেন। দ্বিতীয় যুক্ত-ফ্রণ্টের আমলে এই দুজন ছাড়া আর কোনো দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেপ্তার হন নি। ফলে এস এস পি গেল ক্ষেপে। দলের সাধা-রণ সম্পাদক জর্জ ফারনাণ্ডেজ জ্যোতি বসুকে কড়া চিঠি দিয়ে বললেন, ফ্রণ্ট যদি ভাঙে তবে সি পি এমের সন্ত্রাসের জন্যেই ভাঙবে।

পি এস পিও ছিল কেরল ও পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্টের তীব্র সমালোচক। তাই ফ্রণ্টের শেষের দিকে যখন ফ্রণ্টের মধ্যেই সি পি এম বিরোধী জোট গড়ে উঠল তখন দুটি সমাজতন্ত্রী দলকেই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল।

কিন্তু ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বা-চনে সি পি এম-বিরোধী ফ্রণ্টে সরকারী পি এস পি বা এস এস পি কেউই রইল না। যদিও বিক্ষুব্ধ পি এস পি দল সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের মধ্যেই রইল।

বিশেষতঃ সরকারী এস এস পি'র পক্ষে এই নির্বাচনের ফল হল মারাত্মক। লোক-সভার চারটি আসনে লড়াই করে চারটিতেই জামানত হারাতে হল, আর যাঁরা হারলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেরেন সেনের মতো নেতা। বিধানসভায় একটিও আসন পেল না এস এস পি। কাশীকান্ত মৈত্র কৃষ্ণনগর থেকে অবশ্য জিতলেন, কিন্তু আগেই বলেছি তিনি একটি উপদলের নেতা।

পি এস পি অবশ্য সামান্য ভালো ফল দেখাল। কারণ মেদিনীপুর থেকে এই দলের তিনজন বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন— প্রবোধ সিংহ, অনিল মান্না ও সুধীর দাস। এঁদের মধ্যে প্রথম ও শেষের জন কোয়া-লিশন মন্ত্রিসভার মন্ত্রীও হলেন। লোক-সভার একটি আসনেও পি এস পি প্রার্থী সমর গুহ কাঁথি থেকে জিতলেন।

•

ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী দল গঠনের ফলে আসছে নির্বাচনে কি সমাজতন্ত্রীরা ভালো ফল দেখাতে পারবেন? গোটা দেশেই গত নির্বাচনে পি এস পি এবং এস এস পি'র বিপর্যয় ঘটেছে। লোকসভায় পি এস পি সাকুল্যে পেয়েছে দুটি আসন এবং এস এস পি তিনটি। তাঁদের মিলিত সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ। লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা যে ৫২০ তা সকলেই জানেন। নির্বাচনের পর এমন আশঙ্কাও দেখা দেয় যে, দুটি দলই হয়ত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সর্ব-ভারতীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি হারাবে।

গোটা দেশে এবং পশ্চিম বাংলায় সমাজ-তন্ত্রীদের এই বিপর্যয়ের পরও কিন্তু নতুন দলের নীতি নির্ধারিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনে এই দল অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত করবে না।

নীতিহীন আঁতাত যে অনেক রাজনৈতিক অসাধুতারই উৎস তা ঠিক, কিন্তু রাজনীতি তো বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়। ইংরিজিতে তো পলিটিক্সের অন্য নাম 'আর্ট অব দি পসিবল'। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের আরো বছর পাঁচেক দেরি। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আবার নির্বাচনের খুব দেরি নেই। তার জন্যে জোট বাঁধার তোড়জোড় গত বিধানসভা ভাঙার পরই শুরু হয়ে গেছে। নতুন সমাজতন্ত্রী দল যদি কোনো জোটেই না থাকে তবে তার ভবিষ্যৎ কী? পশ্চিম বাংলায় এখন কোয়ালিশনের যুগ। এখানে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বা কংগ্রেসও একা লড়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সাহস করতে পারছে না। সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই বলবেন, তাঁরা নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্যে লড়বেন না, সুতরাং তাঁদের ভয় কী? কিন্তু নির্বাচনের আগে যদি দুটি প্রধান পাল্টা জোট গড়ে ওঠে তবে তার মাঝে পড়ে তাঁদের হাল কী হবে? গত নির্বাচনেই দেখা গেল কংগ্রেস এবং সি পি এমের মাঝখানে পড়ে সংযুক্ত বাম-পন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টই কাহিল হয়ে পড়েছিল।

অন্য সব দলকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রীরা একলা চলার যে নীতি ঘোষণা করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্রী দলের একটা স্বতন্ত্র চেহারা জনসাধারণের সামনে হাজির করা। কিন্তু কংগ্রেস ভাগ, শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিশীল নীতি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ থেকে সংবিধান সংশোধন, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি—এই সব কি সেই উদ্দেশ্য পূরণের পথে বিরাট বাধা নয়? কারণ, শাসক কংগ্রেস পার্লা-মেন্টারি পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যতোই ব্যবস্থা নেবে, সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের পার্থক্য ততই কমে আসবে নাকি? চরিত্রের এই সংকট সমাজতন্ত্রীরা কাটিয়ে উঠবেন কী করে?

—দেবদত্ত

CENTRAL LIBRARY

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভাষণ দানের পর সেনেটর কেনেডি দিল্লীর লালকেল্লায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দেশে বিদেশে

সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সঙ্গে ডঃ হেনরি কিসিঙ্গারের সাম্প্রতিক পিকিং সফরের তুলনা করেছেন কোন কোন পর্যবেক্ষক। ডঃ কিসিঙ্গারের দৌত্যের পরই যেমন নিক্সনের পিকিং যাত্রার নাটকীয় ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে তেমনি গ্রোমিকোর সফরের মধ্যেই নাটকীয় আকস্মিকতার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে কুড়ি বছরের "শান্তি, বন্ধু ও সহযোগিতার চুক্তি।" কেউ কেউ অনুমান করেছেন, ভারত-রুশ চুক্তিটা অংশত ওয়াশিংটন-পিকিং সম্ভাব্য বোঝাপড়ার প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু উভয় ঘটনার মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্যও লক্ষ্য করার আছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রস্তাবিত পিকিং সফরের সংবাদ যদিও আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হলেও এই ধরনের একটা পরিণামের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরে প্রকাশ্য প্রস্তুতি চলছিল। কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার, এই নিয়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, ব্যবসায়ী মহলে ও সরকারী মহলে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা চলছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল। অর্থাৎ পিকিংয়ের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যে সেখানে যাচ্ছেন তার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের চাপ ছিল। কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে সে রকম কোন কথা বলা যায় না। দুই দেশের মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যে একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তির দ্বারা নথিভুক্ত করা দরকার এবং বিশেষ করে তার মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা প্রতিশ্রুতি রাখা দরকার, এমন কোন দাবী ভারতবর্ষের জনমতের তরফ থেকে ওঠে নি। এমন কি, যে সব দল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তারাও কখনও সুনির্দিষ্টভাবে এই ধরনের প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত চুক্তির প্রস্তাব দেয় নি। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শ্রীব্রজমোহন কল তার সদ্য-প্রকাশিত বইয়ে যা বলেছেন সেটা বাদ দিলে, আর কারও কথা মনে করা যাচ্ছে না যিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই ধরনের একটা চুক্তি করার জন্য প্রকাশ্যে দাবী তুলেছিলেন। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, এই চুক্তি জনমতের চাহিদার সৃষ্টি নয়, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি যাঁরা তৈরি করেন নয়াদিল্লীর সেই উপর মহলের বিবেচনার ফল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং লোকসভায় বলেছেন, গত বছর দুয়েক যাবৎ বিষয়টি নিয়ে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হলেও ব্যাপারটা খুব ভালভাবে গোপন করে রাখা গেছে। এ-রকম একটা কিছু যে হতে যাচ্ছে তার বিন্দুমাত্র আভাষ কখনও পার্লামেন্টে দেওয়া হয়নি, এমন কি, শাসক দলের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে কখনও আলোচনা হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

তার মানে অবশ্য এমন নয় যে, এই চুক্তি আমাদের দেশে জনমতের সমর্থন লাভ করে নি। বরং তার উল্টো। পার্লামেন্টে এই চুক্তি বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেদিনই বিকালে শাসক কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত দিল্লীর বিশাল এক জনসভায় যোগ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সমর্থনের প্রমাণ রেখেছেন।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি থেকে আরম্ভ করে এ কে গোপালন পর্যন্ত বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতের মানুষ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। আসলে, এমন এক সময়ে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যখন বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। এই চুক্তি সেই নিঃসঙ্গতা বোধ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে জেনেই বিভিন্ন দল এই চুক্তি সমর্থন করেছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিন লোকসভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং বলেছেন, এমন সময়ে এই চুক্তি হয়েছে যখন এমনকি যারা এর বিরোধিতা করতে চান তাঁরাও জানেন যে, মানুষ এর পিছনে আছে এবং তাঁদের নিজেদের চামড়া বাঁচান দরকার।"

পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে খুব ভুল কথা বলেন নি সেটা চুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। যাঁরা এই চুক্তি সমর্থন করেছেন তাঁদেরও অনেকে হাতে রেখে কথা বলেছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা এ কে গোপালন বলেছেন যে, একটা সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপিত হল বলে তাঁরা খুশী; কিন্তু চীনের সঙ্গে মিটমাটের কথাটা যেন ভুলে যাওয়া না হয়। এই চুক্তি বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চান জনসংঘ নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী. নির্দলীয় নেতা ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনির মতে এই চুক্তির দ্বারা ভারতের জোটনিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দেওয়া হল এবং সেই কারণে তিনি দুঃখী; কিন্তু তাঁর আশা এর ফলে ভারত সোভিয়েট কলোনীতে পরিণত হবে না।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে স্বভাবত ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের যুদ্ধের হুমকি ও সম্ভাব্য চীন-মার্কিন সমঝোতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে কোন একটি আক্রান্ত হলে অথবা আক্রমণের সম্ভাবনায় বিপন্ন হলে উভয় পক্ষ তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সঙ্গে

পূর্ব জার্মানীর পার্লামেন্টারী ... লোকে ...

আলোচনা করবেন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হবে ঐ আশঙ্কা দূর করা এবং নিজের এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ও ফলপ্রদ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।' ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে যে 'টোটাল ওয়ার'-এর হুমকি দিয়েছেন তার কথা মনে রেখেই কি এই পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা রাশিয়াকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই কি রাশিয়া ভারতের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করতে উৎসাহিত হয়েছে? এই-সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মনে রাখতে হবেঃ—(১) বছর দুয়েক ধরে এই ধরনের একটা চুক্তির বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল; অতএব আজকের পরিস্থিতিই এই চুক্তির একমাত্র হেতু হতে পারে না। (২) তা হলেও, এই পরিস্থিতির কথাটা যে অন্তত ভারতের দিক থেকে মনে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিংয়ের মন্তব্যে। চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানের সময় তিনি রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'আপনি এমন এক সময়ে সফর করতে এসেছেন যখন পৃথিবীর এই অঞ্চলে আমাদের উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ঘটনাসমূহ ঘটছে। এই সব ঘটনা শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করতে পারে।' (৩) চুক্তিটি পার্লামেন্টে পেশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন 'আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে কোন কোন শক্তির আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেই সব শক্তি এই চুক্তির পর তাদের সেই উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত হবে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, সোভিয়েট তরফ থেকে এই চুক্তি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলিতে শুধু ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার চিরাচরিত বন্ধুত্বেরই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত যে পাকিস্থান ও চীন কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথাটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিন গ্রোমিকো যখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সওয়া দুই ঘণ্টা ধরে কথা বলে বেরিয়ে এলেন তখন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের যুদ্ধের হুমকি এবং বাংলাদেশ প্রশ্নের উপর এই চুক্তির প্রভাব কি হবে বলে তিনি মনে করেন। গ্রোমিকো এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেন, পরিস্থিতি এমনিতে জটিল, সেই জটিলতা তিনি আর বাড়াতে চান না।

রাশিয়ার এই সাবধানতার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে গ্রোমিকোর সফর শেষে যে ভারত-পাকিস্থান যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে। বাংলাদেশ প্রশ্নে এই ইস্তাহারের ভাষা অত্যন্ত সংযত ও কেতাদুরস্ত। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ শব্দ ব্যবহার না করে ইস্তাহারটিতে পূর্ব পাকিস্থান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইস্তাহারে যদিও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা হলেও সেই সমাধান যে, পূর্ববাংলার মানুষের ইচ্ছানুগ হতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই, বরং ঐ সমাধান 'পাকিস্থানের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল হতে হবে' বলে একটা শর্ত দেওয়া হয়েছে—যাতে এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টির অবকাশ রাখা হয়েছে যে, পাকিস্থান ভাগ না করেও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। এই ধারণা নয়াদিল্লীর ইতিপূর্বে ঘোষিত অভিমতের বিরোধী।

পাকিস্থানের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকর আলি ভুট্টো অবশ্য প্রত্যাশিতভাবেই বলেছেন 'এটা আক্রমণের চুক্তি। এই চুক্তি পাকিস্থান ও চীনকে আক্রমণ করার জন্য ভারতকে সাহস যোগাবে।' কিন্তু ৯ আগস্টের চুক্তি ও ১১ আগস্টের যুক্ত ইস্তাহার মিলিয়ে দেখে এখনই একথা মনে করা যাচ্ছে না যে, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দ্রুততর করার ক্ষমতা ভারতের হাতে এসেছে।

এটা খুবই সম্ভব যে, ২০ বছরের মেয়াদে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা চুক্তি শুধু আজকের প্রয়োজন বিবেচনা করে সম্পাদন করা হয়নি, অধিকতর দূরবর্তী কোন লক্ষ্য সামনে রেখে এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। যদি তাই করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্যটা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এটা হতে পারে যে, ভারত জেনে বুঝেই ক্ষমতার বিশ্ব-রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করছে—এবং তা করতে গিয়ে তার জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি একেবারে বাতিল না করলেও তার অনেকখানি সংশোধন করছে। নেহরু আমলে যে জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির উদ্ভাবন করা হয়েছিল সেটা ছিল শান্তির অবসরের উপযোগী এবং তখন বিশ্ব রাজনীতি মূলত দুই মেরুতে বিভক্ত ছিল। আজ একটা সংঘর্ষের পরিস্থিতির উপযোগী পররাষ্ট্র-নীতির জন্য ভারতকে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। যে পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতকে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে সেই পাকিস্থান এবং

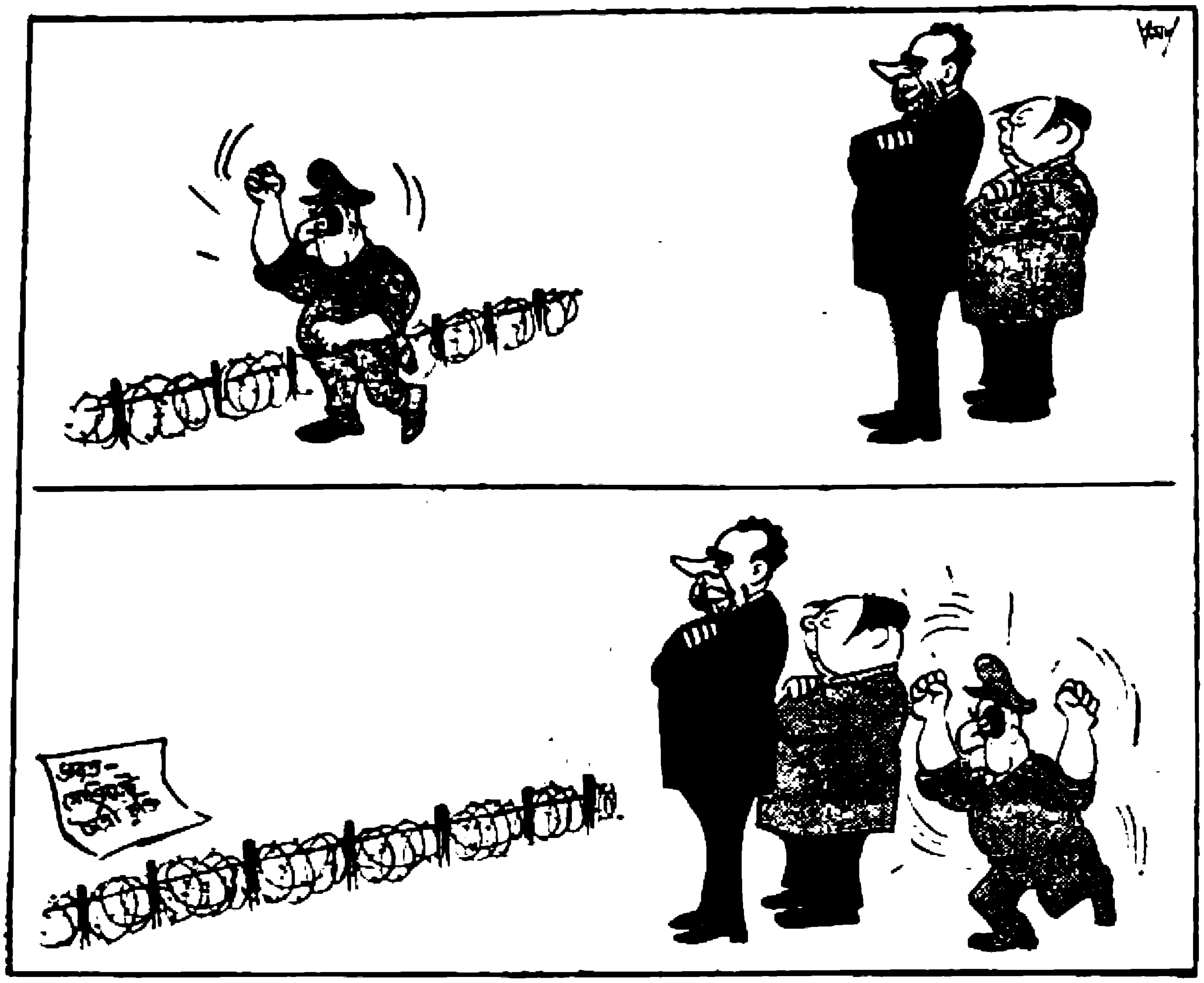

দিকে চীন ও অন্যদিকে আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছে, আবার চীন একই সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে ও আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করছে—এই সব কারণেই পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে জটিল হয়ে পড়ছে। এর মধ্যেও ভারত কি তার পুরোনো জোটনিরপেক্ষতার নীতি আঁকড়ে হয়ে থাকতে পারে? ৯ আগস্টের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জোর দিয়ে বলেছেন যে, সমালোচকরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, (এই চুক্তির ফলে) ভারত তার জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। তিনি বলেন, 'সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, ভারত জোটের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায়। সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে।' পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'এই চুক্তি আমাদের জোটনিরপেক্ষতার শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। চুক্তিতে এই নীতির প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (চুক্তির একটি অনুচ্ছেদে ভারতের জোটনিরপেক্ষতার নীতির সপ্রশংস উল্লেখ আছে।)......জোটনিরপেক্ষতা একটি গতিশীল নীতি। এই নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারে।'

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারত এর আগে একমাত্র নেপাল ছাড়া অন্য কোন দেশের সঙ্গেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি করে নি। নেপালে ভারত ছিল আশ্বাসদাতা, আর ভারত-সোভিয়েট চুক্তির ক্ষেত্রে ভারত হচ্ছে আশ্বাসগ্রহীতা। অতীতে ভারত এই ধরনের সামরিক সহায়তার আশ্বাস নিতে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলির কাছ থেকে নিতে, ভারত অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। আজ তার ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও ভারত জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের যুক্তি হল:—(১) এক দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দেশ আপনা-আপনিই সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি চুক্তির মধ্যে নেই, শুধু উভয়পক্ষের আলোচনার কথা বলা হয়েছে। (২) চুক্তির ভাষায় এমন কিছু নেই যাতে বোঝাতে পারে যে, এক পক্ষ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হলে অন্য পক্ষ আপনা আপনি তাতে জড়িত হয়ে পড়বে। (৩) ভারত 'এই অঞ্চলের' অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই চুক্তি করতে রাজী আছে। (৪) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করে মিশর যদি গোষ্ঠীনিরপেক্ষ থাকতে পারে এবং ফিনল্যান্ড যদি 'ইউরোপীয়ান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশনে' যোগ দিতে পারে তাহলে ভারতই বা এই চুক্তির পর তার স্বাধীন ইচ্ছামতো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে না কেন?

সঠিকভাবে দেখতে গেলে, ভারত তার চিরাচরিত নীতি বিসর্জন দিয়ে কোন জোটের মধ্যে প্রবেশ করল কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত চুক্তির ভাষার মধ্যে পাওয়া যাবে না, চুক্তিটিকে কিভাবে কার্যকর করা হয় তার মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

চুক্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আর দুটি প্রশ্ন হল:-অতঃপর ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ও ভারত-চীন সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়াবে?

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তর নয়াদিল্লীস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে ডেকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভারত-মার্কিন সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে, ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মীকান্ত ঝা একজন সাংবাদিককে বলেছেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকার ভূমিকায় ভারত হতাশ হয়েছে। তিনি এই ইংগিত দিয়েছেন যে, যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় এই চুক্তির তাৎপর্য অনেক বেশি, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স সংক্ষেপে শুধু এইটুকু মন্তব্য করেছেন যে, এই চুক্তি শান্তির সহায়ক হবে বলে তাঁরা আশা করেন। ওয়াশিংটন থেকে যতটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, এই চুক্তির জন্য সেখানকার সরকার প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে সময় নেবেন। তবে, আপাতত এটাকে তাঁদের পরাভব হিসেবেই গ্রহণ করছেন।

নয়াদিল্লীর সরকারী মহল ভারত-চীন সম্পর্কের দিক থেকে এই চুক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, 'ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এই চুক্তি কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।'

এসব ব্যাপারে চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আপাতত শুধু বলা চলে—ক্রমশ প্রকাশ্য।

১০-৮-৭১ —পুণ্ডরীক

সমতা

সুশীল রায়

আমার আনন্দের আর সীমা নেই। অনেক উপরে উঠে এসেছি আমি। মনে হচ্ছে আকাশের যেন প্রায় কাছাকাছি।

জানালায় বসে তাই শিস দিই, আর গান করি। গান করি, আর শিস দিই।

যারা বলে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, আমি তাদের দলে না। আমি শেষ পেয়ে গিয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষার। এর চেয়ে বেশী উন্নতি জীবনে আর চাইনে।

আনন্দ ধরে না।

অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়েছে আমার। পূর্ণ হয়েছে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। দোতলায় ঘর পেয়ে গিয়েছি একটা। জীবনে এই আমার প্রথম দোতলার জীবন। এতে আনন্দ কার না হয়?

মেটে কুঠরি আর কোঠাঘড়ী অনেক দেখা গেছে। সেসব কিছু নতুন না। তারা সকলেই সমতলের সঙ্গে সমতালে বাঁধা। এই সমতলের জীবন ছিল আমার একটানা। তখন সেই নীচু থেকে আকাশের দিকে চেয়ে যে-স্বপ্ন দেখতাম সে-স্বপ্ন আকাশ-স্পর্শনই। স্বপ্ন দেখতাম দোতলায় বাস করার একটা রোমাঞ্চকর জীবনের। নিজেকে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে টেনে তুলতে না পারলে চারদিক ঠিকমত দেখাই হয় না।

ঠিক কি-কি জিনিস যে দেখা বাদ পড়ে যায় তা অবশ্য জানিনে, তা অবশ্য বলতে পারিনে। তবে এটুকু বুঝি যে সমতলের [illegible] না।

তাই উঁচুতে উঠে এসেছি আমি। বেশি উঁচু না হলেও এই সামান্য উঁচুটুকুই আমার কাছে অসামান্য। যাঁরা আরও উঁচুতে—তিনতলায় বা চারতলায়—বাস করে, আশ্চর্যই লাগে আমার, তাদের দেখে হিংসে হয় না একটুকু। কিন্তু আমার আগে যারা দোতলায় বাস করত তাদের আমি মনে করতাম সম্রাট।

আমি এখন হয়েছি সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর কোন আক্ষেপ আমার নেই। আমার জীবনের একটা ভীষণ স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে।

তাই আমি দোতলার এই জানালায় বসে মনের আনন্দে শিস দিই, আর গান করি।

আমি নিজেই নিজের এই আনন্দের রকম দেখে হেসে মরি আর-কি। এমন আনন্দও আমার ছিল, মনের মধ্যে এমনভাবে চাপা ছিল—এইটেই আমার বিস্ময়।

আকাশের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি এখন। এখন আমি মাটির দিকে চেয়ে দেখি সকলকে। দূরের ঐ মাঠ পার হয়ে হেঁটে গেছি কতদিন কতবার। সে-মাঠ যে অমন আড়াআড়িভাবে পায়ে-হাঁটা-পথ দিয়ে দু ভাগে ভাগ করা, তা চোখে পড়ে নি। এখন দেখি, আমারই ভূতপূর্ব জীবনের কোন সহচরই হয়তো ওই হাঁটাপথে ওই হেঁটে চলেছে একা-একা। করুণা হয় ওর কথা ভেবে। ও জানে না, ও বুঝতেই পারছে না—সাদা সিঁথির মত কি রকম একটা পরিচ্ছন্ন পথ ধরে ও চলেছে।

এখান থেকে যা দেখি তাই কেমন ভাল লাগে। ওই পানা-পুকুরটাও। ফ্রক-পরা তিনটি মেয়ে কলার ভেলা বুকে নিয়ে ওই সাঁতার কাটছে জলে। এমন কী মধু আছে ওই সাঁতারে? তবু কেমন ভাল লাগে সব। এক-একবার কেমন ইচ্ছে করে—ঝাঁপ দিয়ে পড়ি গিয়ে ওদের মধ্যে। সারা গায়ে পানা মেখে সং সেজে কি আরামই যেন পাব বলে মনে হয়। বসন্তের সবুজ গুটিকার মত সর্বাঙ্গে পানার দাগ এঁকে জীবনে নতুন বসন্ত আনতে যেন ইচ্ছে জাগে।

একদিন সত্যিই জাগল এই বসন্ত। জানালায় বসে শিস দিচ্ছি আর গান করছি, অমনি কোন্ গাছের পাতার আড়াল থেকে কে যেন শব্দ করে উঠল—কুউ।

তিনবার শুনলাম ঐ শব্দ। আমি তাকাতে লাগলাম এদিকে আর ওদিকে।

কিছু দেখতে পেলাম না। আমার ঠোঁটের শিস আর গলার গান বন্ধ হয়ে গেল। কেবল দুটো চোখ ছটফট করে বেড়াতে লাগল চার ধারে।

দোতলার জীবনে উঠে এসে জীবনের যে চরম শান্তি লাভ করেছিলাম, সামান্য ওই একটা শব্দে সেই শান্তি গেল উধাও হয়ে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কত ঘর-বাড়ী। কোনোটা একতলা, কোনোটা দোতলা, কোনোটা-বা তিন-চারতলা। কোনো বাড়ির কোনো জানালায় কাউকে দেখতে পাইনে। উঁচু-জীবনের সঙ্গে তারা নিশ্চয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তাই তারা আমার মত এমন উৎকট আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানালায়-জানালায় এসে বসে নি।

আমার গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এবার প্রাণ হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত ও উদাস।

ওই শব্দটার কথা ভাবি। আরও কয়েকবার শুনেছি ওই শব্দ। আশ্চর্য হয়েছি—যখনই আমি জানালায় গিয়ে বসি ঐ শব্দটা কেন-যেন তখনই বেজে ওঠে। অন্য সময় ঐ শব্দটা তো শুনিনে।

কোকিলের ডাকের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। প্রথমে ঐ শব্দটাকে কোকিলের গলা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বার-কয়েক ওই শব্দ শুনে কেন-যেন মনে হল—এ শব্দ কোকিলের কণ্ঠের নয়, এ শব্দটা নিশ্চয় অন্য কোন জীবের গলার।

মনের কথা অকপটে খুলেই বলি—আমার মনে হল, এ শব্দ নিশ্চয় কোন কোকিলকণ্ঠীর।

কিন্তু কে সে? কেন সে অমন শব্দ করে ডেকে ওঠে? ইচ্ছে করে জানালায় গিয়ে বসি, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয়ের শিহরণও অনুভব করি—আমি জানালার কাছে যাওয়া মাত্র যদি আবার কানে আসে ওই শব্দ!

জানালার ঠিক কাছে না গিয়ে একটু তফাতে থেকে চুরি করে-করে দেখি চার ধার। দুটো বাড়ি পরে একটা ছাতে রোজ ঠিক এই সময়ে বাচ্চাদের জামা আর ফ্রক মেলে দিতে আসে মাঝবয়সী একটা বউ। দুটো বাঁশের সঙ্গে তার বাঁধা—জামা-ফ্রকে ভরে যায় সেই তার। কতগুলো বাচ্চা যে আছে ওই বউটির, জামা গুনে-গুনে তাই হিসেব করার চেষ্টা করি। আর দেখি, আরো দূরে চিলেকোঠা ডিঙিয়ে মাথা তুলে আছে নারকেল-গাছের কতকগুলো ঝালর-দার পাতা। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে তেতলার ছাতে পায়চারী করেন এক বৃদ্ধ। আর-এক পা এগিয়ে আলগোছে উঁকি দিয়ে দেখি আমার এই দোতলা-বাড়িটার দেয়াল-ঘেঁষা পেয়ারা-গাছটা। দুটো শালিক তার ডালে বসে ঝগড়া করছে। আমার দিকে একবার তাকিয়েই পাখি-দুটো পালিয়ে গেল। আর একটু এগোলাম, পেয়ারাগাছের গা থেকে যেন মরা চামড়া উঠছে, তার ডালে কচি-কচি কয়েকটা ফল ধরেছে। কিছুক্ষণ দেখার পর অতিসন্তর্পণে আর-এক পা এগোলাম।

একটু দম নিয়ে আবার আর-এক পা যেই এগিয়েছি অমনি আচমকা বেজে উঠল সেই শব্দ।

খেয়াল ছিল না — আমি আমার অজানিতে একেবারে পৌঁছে গিয়েছিলাম জানালার গায়ে। শব্দটা শোনা মাত্র বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল, আমি এক লাফে পিছনে সরে এলাম।

কিসের ঐ শব্দ? আমার এত সাধের দোতলার জীবন এমনভাবে বিপন্ন করে তুলেছে যে-শব্দ, সে-শব্দ কার? — কার গলার?

ঘরের মেঝেতে চুপ করে মাথা নীচু করে বসে পায়ের নখ খুঁটতে-খুঁটতে কতক্ষণ যে ঐ গবেষণা করেছি জানিনে। যখন মাথা তুলে তাকালাম, তখন দেখি পেয়ারাগাছের মগডালে পড়ন্ত দিনের নিভন্ত রোদে বসে চারটে কাক থেকে-থেকে ডেকে উঠছে। তাদের ঐ কর্কশ গলার আওয়াজে কোন আতঙ্ক বোধ করলাম না। কিন্তু মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। যে সুদূর নেপথ্যদেশ থেকে সাতাশ্রের কোকিল পঞ্চমে কূজন করে ওঠে, সেই সুদূর অজানা দেশের উদ্দেশ্যে উড্ডীন হল সারা মন।

আমার এই দোতলার জীবন বাসী হতে চলেছে। তার সমস্ত সুগন্ধ উধাও হয়ে গেছে, তার সমস্ত রোমাঞ্চ নিঃশেষ হয়েছে। এখন কেমন-যেন বিস্বাদ ঠেকছে এই জীবনটা। এক-এক সময় মনে হয়, আগেই ভালো ছিলাম ওই সমতলের দেশে। সেখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া গিয়েছিল। এখন, সেখান থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে আসায় জীবনের তাল যেন কেটে গিয়েছে একেবারে।

তাই, ইচ্ছে করে চলে যাই। এই সাধে আর এই স্বপ্নে কাজ নেই আর। কিন্তু সাধ নয়, স্বপ্ন নয়, আমি বাঁধা পড়ে গেছি কি-এক মায়ায়।

আপনারা বলতে পারেন এটা মাথা-খারাপের লক্ষণ ছাড়া কিছু না। আপনাদের এ অনুমান ভুল না হতে পারে। আমার নিজেরই এক-এক সময় এমন সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু নিজেকে পাগল বলে ঘোষণা করতে পারি নি। নিজের পাগলামি নিজেই যদি ভালো-মত ধরতে পারতাম তাহলে সে পাগলামি কবে ভাল হয়ে যেত।

কয়েক দিন জানালার ধারে যাই নি। সেদিন জানালার কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু আমি বুকের মধ্যে একটা ভীষণ মায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। অনেক দিনই হয়ে গেল—ওই শব্দটা শোনা হয় নি আমার। জীবনটা তাই কখনো-কখনো লোনা-লোনা ঠেকে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে অনেক রাতে একদিন মরীয়া হয়ে গিয়ে বসলাম জানালায়। পেয়ারাগাছের পাতায় হাওয়া লেগেছে—পাতাগুলো একটু-একটু কাঁপছে। গাছটার ওপারে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অন্ধকার। দূরের সেই চিলেকোঠার মিট-

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : ২৩-[illegible]
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স

মিট করে জ্বলছে একটা আলো, চৌকো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই আলোর রেশ মাত্র।

অনেকক্ষণ বসে আছি এইভাবে। ভয়ের ভাবটা যেন কেটেছে। আমি আমার অজান্তেই গুন-গুন করতে আরম্ভ করলাম। ভয় আরো কেটে গেল। গলা আর একটু ছেড়ে অনেকদিন বাদে এই জানালায় বসে ধরলাম একটা গান।

দু চরণও গাওয়া শেষ হয় নি, অমনি আবার কানের যেন একেবারে পাশেই হঠাৎ বেজে উঠল সেই কুহু-ধ্বনি।

চমকে উঠলাম। ছিটকে সরে এলাম জানালার কাছ থেকে। অমনি শুনলাম একটা হাসির শব্দ। কে-যেন ব্যঙ্গ করল আমাকে।

চাপা গলায় ফিসফিস শব্দে জিজ্ঞাসা করলাম—'কে তুমি, কে তুমি?'

জবাব না পেয়ে আবার জানালার কাছে গেলাম, বললাম, 'কে তুমি?'

জবাব না পেয়ে আবার বললাম, 'এ কী মায়া।'

পেয়ারা-গাছের গোড়ার দিক থেকে যেন সাড়া এল, কে যেন বলল, 'মায়া না। আমি মমতা।'

ঐ গলার স্বর অনুসরণ করে আমি শব্দের উৎসটা খুঁজতে লাগলাম। অনেকক্ষণ খোঁজার পরে নীচে ওই প্রাচীর-ঘেরা বাড়িটার জানালায় দেখতে পেলাম একটা ছায়া। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াটা।

রোমাঞ্চে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

সাধের দোতলার জীবন সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠল এক নিমেষে।

উঁচু প্রাচীরের নেপথ্যে এমন যে একটা মমতার জগৎ ছিল, যদি সমতলের জীবনেই নিজেকে বেঁধে রাখতাম, তাহলে সেই জগতের সাক্ষাৎ পেতাম না কখনোই। এই জন্যে দোতলাকে নূতন ক'রে ভালো লাগল এখন। কত প্রাচীরের কত নেপথ্যে যে এমনি এক-একটা মমতাময়ী লুক্কায়িত আছে—বসে-বসে তাই ভাবি।

এখন আমার জীবন নতুন স্বাদে সুস্বাদু হয়ে উঠেছে। এখন প্রকাশ্য দিবালোকে আমি জানালায় গিয়ে আর বসি নে। আমাদের দু-জনের মধ্যে কেমন-যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন রাতের ঘন অন্ধকারের আড়ালে বসে আলাপ করি।

আমি বলি, 'তোমার নাম মমতা। আমার নাম নিশ্চয় তুমি জানতে চাও। কিন্তু এতদূর থেকে বলব না। কাছে গিয়ে বলে আসব একদিন।'

উত্তর দেয় না। ভীষণ আনন্দ হয় নিশ্চয় ওর। কেমন অস্বাভাবিক শব্দ করে হাসে।

যেদিন প্রথম আমি ওকে স্পষ্ট দেখলাম, সেদিন ছিল পূর্ণিমা। উদার জ্যোৎস্নার স্পষ্ট আলো গিয়ে পড়েছে ঐ জানালায়, আমি দোতলা থেকে চেয়ে দেখলাম ওকে ঐ আলোয়। শুকনো গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল ফুরফুর করে উড়ছে হালকা বাতাসে। উপরের দিকে চেয়ে ও হাসল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ঐ মুখ, ঐ চোখ আর ঐ হাসি দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। নিজেকে অসীম সৌভাগ্য সৌভাগ্যবান বলে স্বীকার করলাম।

প্রাচীরের অন্তরালবর্তিনী ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার করার জন্যে বীরত্ব জেগে উঠতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একদিন বললাম, 'আমি গান গাইলে তুমি অমন ব্যঙ্গ কর কেন।'

উত্তর পেলাম না। হাসির শব্দ পেলাম।

বললাম, 'তোমার গলা এমন মিষ্টি, তোমাকে আমি কী বলি জান?—কোকিলকণ্ঠী। তুমি গান গাও না কেন।'

উত্তর দিল না। আবার হাসল।

বুঝতে পারলাম—কথা বলার অসুবিধে ওর আছে। কেউ শুনে ফেলতে পারে।

ও না হলে আমার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, ক্রমশ আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে অনুমান করতে পারলাম, আমার সম্বন্ধেও ওই ধারণা ও-ও লালন করে।

আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা অল্পদিনের মধ্যেই নিবিড় হয়ে এল। গভীর রাতে প্রত্যহ আমাদের এইভাবে দেখা সাক্ষাৎ চলেছে।

একদিন বললাম, 'চারদিক তো নিঝুম। আমি আসব তোমার কাছে? প্রাচীর আর কতটুকু, ডিঙিয়ে ঠিক যেতে পারব। বলো, আসব?'

কোনো উত্তর দিল না। হাসল।

'আসছি কিন্তু।'

আবার হাসল। এর চেয়ে ভালোভাবে আর কী করে ডাকা যায়?

তার এই অনুমোদন পেয়ে আমি নীচে নামলাম।

ধীরে ধীরে পেয়ারা গাছের ডালে পা দিয়ে উঠলাম প্রাচীরে। দেখলাম, জানালায় ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম ওপারে। এই শব্দে কেউ জেগে উঠল না তো? একটু দাঁড়ালাম। শব্দ করে হেসে উঠল মমতা।

আমি ধীরে ধীরে তার কাছে গেলাম। জানালার গরাদে ধরে দাঁড়ালাম, বললাম, 'মমতা!'

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

ও

আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে আনন্দ পাবেন

আমি এ কী! বিকট চীৎকার করে উঠল সে, বীভৎস অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল সে। সেই ভয়ংকর শব্দের সঙ্গে বেজে উঠল যেন লোহার শেকলের শব্দও।

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। আমি জড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল মূর্তির মত!

ওদের বাড়ির সকলে জেগে গেল, ঘরে-ঘরে চটপট জ্বলে উঠল আলো। সেই আলোয় আজ প্রথম তাকে এত স্পষ্টভাবে দেখলাম। দেখলাম, লোহার শেকল ওর দুই পায়ে পরানো। এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এর পরের কথা আমার মনে নেই। সাত বছর বাদে কাল আমি ছাড়া পেয়েছি। আমার মাথা নাকি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একেবারে বদ্ধপাগল হয়ে গিয়েছিলাম নাকি। এতদিন একটানা চিকিৎসার পর এবার নাকি সুস্থ হয়েছি। এখন আমার আচরণ নাকি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তাই মুক্তি পেয়েছি আমি।

ভাবছি, চিকিৎসা করলে যদি এ রোগ সারে, তাহলে আর একজনের ব্যাপারে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না কেন। এখনো কি তার জন্যে কিছু করা যায় না? তার পায়ের শেকল কেটে মুক্তি দেওয়া যায় না তাকে?

সবই নিছক ভাবনা। সে এখন কোথায় বা কেমন আছে, তা অবশ্য জানিনে।

সুন্দরী 'মানা' ভয়ঙ্করী

বিশ্বদেব বিশ্বাস

"সাব্ ডায়রী লিখো,—ডায়রী লিখো। —হাম্ লোক্ সব কই খতম্ হো গিয়া।" —ঝড়ের বেগে তাঁবু ঠেলে ঢুকে পড়ল শেরপা নরবু। উত্তরপ্রায় প্রবীণ শেরপা কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে, আর বলছে, —'হাম্ লোক্ খতম্ হো গিয়া।' তার দৃঢ় ধারণা আমরা আর বাঁচব না।

তাই এই ডায়েরি লেখা।

এই ডায়েরি মানা অভিযানের দলপতির দিনলিপি নয়। কোন সেনানায়কের সমর-সজ্জার সচিত্র পরিকল্পনাও নয়। এক পর্বতারোহী লিখছে তাদের দলের অন্তিম-ক্ষণের এক করুণ কাহিনী। প্রকৃতির রুদ্র রোষের ক্রমাগত নির্যাতনের এক নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি। ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে মৃত্যুর কোলে শুয়ে শেষ সময়ের অপেক্ষায় থেকে দলের দলপতি লিখছে তার পার্থিব জীবনের শেষ লিপি। তাদের অভিযানের সাল-তামামী। এই লিপি কোন দিন মর্তলোকে পৌঁছবে কিনা তা আমি নিজেই জানি না। যদি পৌঁছায়,—যখন পৌঁছাবে, তখন আমরা হয়ত ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছি।

কাহিনীর শুরু কলকাতাতেই। একের পর এক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনী চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়েছে।

শুরু থেকেই প্রকৃতির বহুবিধ প্রতিরোধ। একের পর এক আক্রমণ আর আঘাত দিয়েই প্রকৃতি বুঝি অভিযানের সংগঠনের শুরুতেই আমাদের শেষ করে দিতে চেয়েছে। দলের সবাই দুর্ধর্ষ, মরিয়া। তাজা প্রাণের উপঢৌকন নিয়ে দুর্দমনীয় তেজে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রবল পরাক্রমে সকল প্রতিরোধ একের পর এক অতিক্রম করেছে। সকলের দুর্নিবার আকাঙ্খা,—শেষ অবধি লড়ব, জিতব,—মানায় সফল হব,—শীর্ষে উঠব,—প্রাণের বিনিময়েও।

'মানা' শেষ পর্যন্ত এই দামাল মরিয়াগুলোকে নিরস্ত করতে তার তূণের মারাত্মক অস্ত্র ছেড়েছে। জানি না,—পরিণতি কি? ঐ অস্ত্রের আঘাতে আমাদের অবলুপ্তি না মোহমুক্তি? সবাই এখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। শক্তি সামর্থ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছে।

উত্তর-গাড়োয়াল হিমালয়ে উন্নত শীর্ষ 'মানা' (২৩,৮৬০ ফুট) আপন সৌন্দর্যের আড়ম্বরে মহীয়ান। সুন্দরী গরবিনী। যেন 'দুয়োরানীর' নিষেধ ঘেরা আলেয়া। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ নামে এক বৃটিশ, আজন্ম হিমালয় অনুসন্ধানী পরিব্রাজক, দক্ষ পর্বতারোহীও। তিনি ১৯৩১ খৃঃ 'কামেট' (২৫,৪৪৭ ফুট) অভিযানে এসে 'মানা'-র নিরাবরণ উত্তর-গাত্রের দিকে নজর দিয়ে চমকে উঠেছিলেন। চোখধাঁধানো রূপ। জীবন্ত আকর্ষণ। স্থির থাকতে পারেন নি। কাছে যাওয়ার উদগ্র বাসনায় পথের অনুসন্ধানে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ শেষে ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে, 'অসম্ভব', 'অজেয়',—এই আখ্যা দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মানার উগ্র রূপের মোহিনীমায়া কাটাতে পারেন নি। সুস্থির থাকতে না পেরে আবার ফিরে এলেন ১৯৩৭ খৃঃ। —এবার ভিন্ন পথে। দক্ষিণ-গাত্র-পথে। সফলও হলেন শেষ অবধি একা। তারপর এই সুদীর্ঘ ২৪ বছরে অন্য কেউ মানায় কোন পথে আসে নি। উত্তর-পথে ত সাহসই করে নি।

ছেলেবেলা থেকেই মা বলতেন, আমার যেন সৃষ্টিছাড়া স্বভাব। সকল স্বাভাবিক কাজেই আমার কি রকম অনীহা। যে কাজে লড়াই আছে সে কাজেই নাকি আমার উৎসাহ দ্বিগুণ, ছেলেবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন স্কুল পালিয়ে আম পাড়তে গিয়েছিলাম বিরাট এক গাছে উঠে। হঠাৎ ডাল ভেঙে পড়ে গেলাম। ভীষণ আঘাত লাগল। সর্বাঙ্গ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে থাকল। গায়ের জামা-প্যাণ্ট রক্তে লাল হয়ে গেল। বাড়ীতে বকবে এই ভয়ে পাশে এক পুকুরে ডুব দিলাম,—মতলব, রাতের অন্ধকারের আড়ালে বাড়ী ঢুকে পড়ব। কেউ কিছু দেখতে পাবে না। দাদু খবর পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু বকেন নি। ডাক্তার ডেকে পাঠিয়ে শুধু বলেছিলেন,—'অসাবধানতার ফল।'

আর একদিনের অনুরূপ ঘটনা। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে ভূত দেখতে গিয়েছিলাম। পাড়ায় একজনকে ভূতে ধরেছিল। রোজা এসে বলল, অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে ভূত ভোজন না করালে ভূত ছাড়বে না। বিশ্বাস করি নি। তখনকারের শিশুমনেও কেমন যেন ঘটনাটাকে নিছক মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। রোজা বলল, বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখতে পার। তার ধারণা, ভয়ে কেউ যাবে না। আমি চুপ চুপি লুকিয়ে গিয়েছিলাম। যাবার আগে আমার তখনকারের খেলার বান্ধবী জানতে পেরে গিয়েছিল। সে অনেক কান্নাকাটি, কাকুতি-মিনতি করেও যখন আটকাতে পারল না তখন আমার পায়ে ভীষণ জোরে কামড়ে দিয়েছিল। বাবা পা নিয়ে যাতে শ্মশানে যেতে না পারি। মা শুনে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন; দাদুও টের পেয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এলে,—এতটুকু বকেন নি,—শুধু বলেছিলেন, —'সাহস ভাল,—তবে এরকম মিথ্যা বাজে কাজে নয়।' —আমার মার ধারণা ছিল,—কোনদিন জঙ্গলে, পুকুরে, কি আগুনে আমার কপালে নাকি অপঘাতেই মৃত্যু আছে'—কিন্তু আমার দাদু ও আমার বাবা কোন সময়ের জন্য নিরুৎসাহ করেন নি।

আমার ছেলেবেলার বেপরোয়া স্বভাব বড় বয়সেও থেকে গেছে। আজ এই পর্বত অভিযানের স্পৃহার পেছনে ছোট বয়সের সেই দস্যিপনাই প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই-ত

সিফিলিস রোগতত্ত্বের ওপর পূর্ণাঙ্গ বই !

গোবিন্দ বিশ্বাস রচিত

সিফিলিস

১৫·০০

......ডাক্তারী শাস্ত্রের এমন বিশদ সর্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা বাংলো ভাষায় লেখা আমার চোখে পড়েনি।......

Dr. P. K. Mukherjee, M.B.B.S., D.P.H. (Cal), C.H.S.

ত্রয়ী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বরফ প্রাচীর আরোহণ

মানা শীর্ষের উদ্দেশে

মানা'-র উত্তর-পথ 'ভয়ঙ্কর', 'অসম্ভব'—এই বলে লব্ধ পর্বতারোহী স্মাইথ যখন ছেড়ে দিয়েছে তখন সেই ভয়ঙ্করকে প্রত্যক্ষ করতে হবে এই দুর্দম্য দুর্বুদ্ধি মাথায় চেপেছে। অসম্ভবকে দেখব, ভয়ঙ্করের সঙ্গে লড়াই করব এই উৎসাহ। জগতে দামাল ছেলের অভাব কোন সময়েই নেই। কলকাতা শহরে এসে দেখলাম আমার মত কতশত দামাল ছেলে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। বেপরোয়া। তাদেরই কয়েকজনা আমাদের মানা অভিযানের সঙ্গী।

১৫,৭০০ ফুট থেকে ২১,০০০ ফুট। মূল শিবির থেকে চতুর্থ শিবির। ভাল-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছি। পথ এক-রকম ছিল। সহজ স্বাভাবিক না হলেও দুরূহ দুর্গম নয়। এ পথে চরম কষ্ট ছিল কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি ছিল না। চতুর্থ শিবিরের পর প্রকৃত ভয়ঙ্করের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। চমকে উঠলাম। স্মাইথের আখ্যা দেওয়া জীবন্ত অসম্ভব। মানার উত্তর প্রাচীর। যেন বিরাট এক দৈত্য উদ্ধত মাথায় দাঁড়িয়ে আছে,—এক দুর্লঙ্ঘ্য কঠিন শ্বেত স্তম্ভ।

ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পারব কি? চতুর্থ শিবির পর্যন্ত পৌঁছতেই আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, সম্পদের সবটুকুই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুরু থেকেই প্রকৃতির এত বাধা, এমন সব অকল্পনীয় আক্রমণ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমরা সর্বস্বান্ত। সাধারণ একটা বড় অভিযান শেষেও এত বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। হলে,—অনেক আগেই অভিযান গুটিয়ে ফেরৎ আসে এমন নজির যথেষ্ট আছে।

হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ। এই সুদীর্ঘ ১৭০ মাইল পথে বাস চলে। ভাগ্যের পরিহাসে অকাল বর্ষণে এই বাস চলা পথ যত্রতত্র ভেঙেছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অসহায় হয়ে কখনও পথে বসেছি দিনের পর দিন। কখনও অভিযানের রসদ পিঠে ফেলে সমানে হেঁটেছি। বহু দিন আহার জোটে নি, অনাহারে দিন কাটিয়েছি। শোয়ার আস্তানা জোটে নি, বসে থেকেছি সারা রাত্রি। সমানে বৃষ্টিতে ভিজেছি। গায়ের জল, ভেজা পোষাক গায়েই শুকিয়ে গেছে। তথাপি নিরুপায় নিরুৎসাহ হয়ে ক্ষান্ত দেই নি।

আমাদের এই ১৯৬১ খৃঃ মানা অভিযানের শেরপা সর্দার আংশেরিং,—সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়। অত্যন্ত ধীর, স্থির, প্রাজ্ঞ এক পর্বত শার্দুল। ১৯৩৪ খৃঃ এক জার্মান দলের নাঙ্গাপর্বত অভিযানে আংশেরিং ছিল অন্যতম মূল শেরপা। সেই দল যখন নাঙ্গা শীর্ষের প্রায় শেষ বরাবর এসে গেছে তখন হঠাৎ এক বিপর্যয় দেখা দিল। আংশেরিং সহ দশজন তখন পাহাড়ের উচ্চ স্থানে। বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সেই দশজনের নজন মারা গেল। আর মৃত্যুকল্প আংশেরিং একা জীবন্ত ফিরে এল,—সাত-দিন বিনা আহারে বিনা পানীয়ে কাটিয়ে। সেই আংশেরিংও আমাদের এই মানা অভিযানে এসে আহত হয়েছে। বুকের হাড় ভেঙে গেছে। তাকে দ্রুত নিচে বেসক্যাম্পে ডাক্তারের কাছে পাঠান হয়েছে। নচেৎ বুকে জল জমে মারা যাবে।

আর এক বলিষ্ঠ বিচক্ষণ শেরপা আজীবা। সম্পর্কে আংশেরিং-এর ভাই। ১৯৫১ খৃঃ ফরাসী অভিযাত্রী দলের ঐতিহাসিক অন্নপূর্ণা অভিযানে যশস্বী। সেই আজীবাও শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত হয়ে নিচে নেমে চলে গেছে ডাক্তারের কাছে।

দিলীপ দলের শ্রেষ্ঠ আরোহী। অত্যন্ত কর্মক্ষম দুঃসাহসী। ১৯৬০ খৃঃ ভারতের প্রথম বেসামরিক অভিযান নন্দাঘুন্টির শীর্ষে উঠে বাংলার পর্বত অভিযান ইতিহাসের সূচনা করেছিল। দিলীপ আমাদের দলের এক বড় সম্পদ। সে যেন দিলীপকে 'মানা' তার সমস্ত জীবনীশক্তি নিঙড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তাকেও বেসক্যাম্পে ডাক্তারের কাছে ফেরৎ পাঠান হয়েছে।

দলের সহ-নেতা, আমার অন্যতম প্রধান সহকারী নিমাই অভিযানের উচ্চ পর্যায়ের এক মূল্যবান মস্তিষ্ক। সেও অসুস্থ।

বৈজ্ঞানিক শরদিন্দু বসু, তাঁর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণের কাজে সহসা ঠাণ্ডায় জমে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। তাকেও কোনক্রমে বাঁচিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাক্তারের কাছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে রীতিমত চিন্তিত হয়েছিলাম,—পারব কি? স্মাইথের আখ্যা দেওয়া সেই,—"অসম্ভব,—ভয়ঙ্কর!" পরক্ষণেই আবার উদ্দীপ্ত হয়েছি। 'গগন-চুম্বি 'মানার' উদ্ধত চ্যালেঞ্জ শ্বেত স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে উঠেছি,—

(Just wait the old thing, ye'll get you yet")

কোন কিছুই আমাদের পথরোধ করতে পারে নি। যেমন আমার শিশু বয়সের স্কুলের সহপাঠী পায়ে কামড়ে দিয়েও শ্মশানে ভূত দেখতে যাওয়া আটকাতে পারে নি!

সব বাধা উপেক্ষা করে মদন ও গৌরাঙ্গকে দিয়ে একটা দল পাঠিয়েছিলাম,

—শীর্ষে উঠবে। ওরা বিফল হয়ে ফিরেছে আর বিহ্বল হয়ে স্মাইথের মতেই সমর্থন জানিয়েছে,—উত্তরের পথে নানা শীর্ষ প্রকৃতই অলঙ্ঘ্য, অনাবৃত অসম্ভব,—ভয়ঙ্কর। জটিল, কুটিল হিমবাহের মাথায় ঝুলন্ত কার্নিশগুলো যেন মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে, টন টন ওজনের বরফের চাঁই। যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। —জীবন্ত চ্যালেঞ্জ, সাক্ষাৎ মজুদ।

আমার ছেলেবেলার সেই দুঃস্বভাব আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেই আমার বিশেষ সত্তা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তখন মৃত্যুভয়কে আমার কি রকম যেন এক নিছক সেকেলে সংস্কার বলে মনে হয়। আমাদের স্কুলের স্পোর্টস মাস্টার মহাশয় একটা কথা বারে বারে বলতেন,—কাপুরুষেরা দু'বার মরে,—একবার ভয়ে মরে আর একবার মৃত্যুকালে মরে। ঘরে বসে থাকলেই কি মৃত্যুকে এড়ান যায়? পাহাড়ে এসে আর একটা কথা জেনেছি,—পর্বতারোহীরা পাহাড়ে মরতে পারলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে,—কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু বীরের,—অনেক গৌরবের,—তাই পাহাড়ে মৃত্যুভয় আমাদের প্রেরণার ইন্ধন।

মদন গোরাঙ্গের প্রথম শীর্ষারোহীদল বিফল হয়ে ফেরার পর আমরা দ্বিতীয় দল। জলোৎ ও আমি, সঙ্গে দুই শেরপা, নরবু ও ভাংদাওয়া। চতুর্থ শিবির থেকে রওনা হলাম। পঞ্চম শিবিরে রাত কাটিয়ে পরের দিন প্রত্যুষে শীর্ষে পাড়ি দেব। এবারের দুর্ভাগ্য ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মত সবসময় যেন ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে আমাদের পেছনে লেগে আছে।

আমরা যখন রওনা হলাম আকাশ পরিষ্কার ছিল বাতাস ছিল স্তব্ধ। উজ্জ্বল সূর্যালোক দেখে মনে হয়েছিল নানা দেবীর তার মহামূল্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে পুণ্যপিয়াসী এই পূজারীদের। পূর্ণ হবে আমাদের এই পর্বতারোহী জীবন, ধন্য হবে আমাদের অভিযান, সফল হব নানা শীর্ষে।

প্রায় দু'শ ফুট আন্দাজ উঠেছি। হঠাৎ নজর পড়ল দূরে আকাশে পাহাড়ের মাথা থেকে এক ফালি কালো মেঘ উঁকি মেরে দেখছে। কি যে হল, ভাবলে শিউরে উঠি। সহসা সে মেঘ হু হু করে ছেয়ে এসে সারা আকাশ যেন কালো কালিমাখা হয়ে উঠল। ঐ উজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ সহসা রুদ্র মূর্তিতে রূপ বদলালো। পাহাড়ের সর্বনাশা ঝড় হা হা করে উড়ে এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। —ঘূর্ণিঝড়, যার নাম ব্লিজার্ড। কি প্রচণ্ড তার বেগ, কি মারাত্মক তার দাপট, যেন পাহাড় থেকে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। ঘণ্টায় সে ঝড়ের গতি কত ছিল তা পরিমাপ করার মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। দেখছিলাম এই ঘূর্ণিঝড় পাহাড় থেকে বরফ তুলে আবার পাহাড়ের গায়েই আছড়ে মারছিল। এরই মধ্যে একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, ঝড় নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মধ্যে গাঁইতি গুঁজে কোমরের দড়ি জড়িয়ে দিলাম যেমন করে মাঠে খোঁটা পুঁতে গরু বাঁধে। অনেকক্ষণ পাহাড়ের বুকে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলাম যেন মরুভূমির বুকে উট।

পাহাড়ের এই প্রাণঘাতী ব্লিজার্ড যে কি রকম ভয়ংকর তার নজির পর্বত অভিযান ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টালে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি ছত্রে। কি নির্মম নিষ্ঠুরভাবে দিনের পর দিন এই ব্লিজার্ড এসেছে,—কত মূল্যবান প্রাণ ধ্বংস করেছে; কখনও [illegible] কখনও এক কোপে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সকল কাহিনী ও ধ্বংসের কাহিনীগুলো মনে পড়লে আজও যেন [illegible] প্রাণগুলোর কথা আমার মনে ভেসে আসে তখন [illegible] আপনা হতেই কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠি।

আমি কখনও [illegible] এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। [illegible] পর্বতের উপর এসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি কখনও হইনি। পাহাড়ে পড়া অভিযাত্রীদের যে ঘটনাগুলো এতদিন পুস্তকের পাতায় রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীরূপে পড়েছি তার এমন নির্মম প্রত্যক্ষ [illegible] কল্পনাও করতে পারিনি। ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ভাবনা শুধু আমার একটি প্রাণের জন্য নয় আরও তিনটি প্রাণ রয়েছে। আমার সহ-অভিযাত্রীটি—সে বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান।

ক্ষণমাত্র এই বিভ্রান্তি। পরক্ষণেই মরিয়া হয়েছি। বাঁচতে হবে,—সকলকে বাঁচাতে হবে। শুরু হল সংগ্রাম,—বাঁচার সংগ্রাম, প্রকৃতির সংগ্রাম, ঝড়ের সঙ্গে লুকোচুরির খেলা। ঝড়ের দমকা হাওয়া আসে মুখ গুঁজরে বরফের মধ্যে পড়ে থাকছি। দমক কমে, অমনি গাঁইতি নিয়ে উঠতে থাকি। আবার ঝড়ের দমক আসে, আবার মুখ

গুঁজে বসে পড়ি। ঝড়ে উড়ে আসা বরফের কণাগুলো দেহের একমাত্র অনাবৃত অংশ মুখে লাগছে,—মনে হচ্ছে ধারাল ছুরি দিয়ে মুখটাকে ফালাফালা করে চিরে দিচ্ছে। নিজের পোষাকের ভার—সে অনেক; পিঠে খাবারের বোঝা তারও ওজন ৩৫ পাউণ্ড। এর উপর কোমরের দড়ি, জুতোর কাঁটা। ভীষণ শ্বাসকষ্ট। আরোহণের পথ—সামনে ৬০ ডিগ্রী খাড়া বরফ প্রাচীর। সব মিলিয়ে অবস্থা এমনই অসহনীয় আবহ যে তা সমতলে বসে কল্পনা করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে পড়ার আগে আমরাও এতবার পাহাড়ে এসেও কল্পনা করতে পারিনি। মনে হচ্ছে আর এক পাও বুঝি উঠতে পারব না। এই বসে থাকাই বোধহয় চিরস্থায়ী হবে অনড় অচলরূপে থেকে যাব,—ঠাণ্ডা হয়ে। সে যে কি অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। জীবনে প্রাণের মায়া করে কোনদিন মৃত্যুভয় করিনি। বহু ক্ষেত্রে বিপদের মুখোমুখি হয়ে বেপরোয়া হয়েছি। বর্তমানের তুলনায় সে সকলই দেখছি কত ছেলেখেলা! এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি প্রাণ বস্তুটা আমাদের কত প্রিয়। ওর মায়া অমোঘ,—তুচ্ছ করা যায় না।

লড়াই করে বেঁচে আছি। ঐ ঝড় ঠেলে শেষ অবধি পঞ্চম শিবিরে উঠে পৌঁছেছি। চার ঘণ্টার আরোহণ পথ উঠতে লেগেছে নঘণ্টা। তখনও বুঝিনি এই ডিফাড আমাদের হত্যার আয়োজন আরও সাড়ম্বরে করে রেখেছিল। যখন পৌঁছেছি আমাদের অবস্থা মৃতপ্রায়। তাপন একার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে তাতে শোবে সে অবস্থাও নেই। সহযাত্রীর মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, নিজেরও অনুরূপ অবস্থা ভুলে গিয়ে তাকে সমানে চাপড়াচ্ছি তার শরীর গরম করতে।

পঞ্চম শিবিরে এসে আটকে পড়েছি। সেদিন, সেই রাত্রি। তারপরেও একদিন—এক রাত্রি; আরও একদিন—একরাত্রি। সেই ঝড় থামেনি। সামনে বইছে ব্লিজার্ড। তাঁবু ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা। অদৃষ্টের এই পরিহাসের মধ্যে তাঁবু যদি কোথাও একটুও ফাটে তাহলে একটা মাত্রই পরিণতি,—মৃত্যু। আবহাওয়ার তাপমাত্রা ভীষণ কমে গেছে। ০ ডিগ্রীরও বহু নীচে। ভীষণ শীত করছে। পরনে ও গায়ে চারপ্রস্থ করে পশম পোষাক, গলায় পশমের মাফলার, জোড়া পাখীর পালকের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে পশমের টুপি। শুয়ে আছি এর ভেতর। তাঁবুর কাপড়ও দু পর্দা মোটা। একদম হাওয়া ঢোকে না। এরপরেও শীতে এমন কাঁপছি ছেলেবেলার ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনিকে হার মানিয়ে দেয়।

অস্বাভাবিক রকমের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমরা রুগীর মত। বাতাসে শ্বাস-বায়ুর অভাব,—অক্সিজেন কম। হাঁপানী ছাড়াও আরও নানা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শরীরের অবস্থা শুয়ে থেকেও ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে আসছে। মাথা তুলতে পারছি না, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝে বমি হচ্ছে। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, যেমন আমাদের দেশে শীতকালে হয়। সেই জল মুছে দেখছি লালচে—রক্ত। চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে আপনা হতেই। ঠাণ্ডায় হাতে-পায়ে শিরটান ধরছে। হাত পায়ের আঙুলগুলো কি রকম বেঁকে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠছি। রক্ত চলাচল চালু রাখতে হাতে হাতে তালি লাগাচ্ছি। পায়ে পায়ে ঠুকছি।

ঝড়ের বেগে তাঁবুর বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে আজ আমরা বড় অসহায়,—মনে হচ্ছে শুধু অন্তিমের অপেক্ষায়। আমাদের এই অবস্থার কথা মা, মাসীমা যদি জানতে পারেন তাহলে আকোরে চীৎকার করে কাঁদবেন আর প্রকৃতিকে অভিসম্পাত দিতে দিতে মায়ার বাঁধন দিয়ে নিষেধের খাঁচায় আবদ্ধ রাখবে, কোনদিন আর হয়ত পাহাড়ে আসতে দেবে না। কিন্তু না,—পাহাড়ের টান বড় দুর্নিবার। যেন নিয়তির অমোঘ আকর্ষণ। এই আকর্ষণেই যুগ-যুগ ধরে দেশ-দেশান্তর থেকে পর্বতপ্রেমী পাগলগুলো ছুটে এসেছে। বহু অমূল্য প্রাণ এই পাহাড়ের বুকে মিলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তবুও আবার অনেকে এসেছে,—যেমন আগুনের লোভে পোকাগুলো উড়ে এসে আগুনেই পুড়ে মরে। পাহাড়ের রূপ বড় উগ্র—আকর্ষণ বড় তীব্র। কোন পার্থিব প্রাণীর আকুল ক্রন্দনেও কারও চিত্ত বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হয় না।

•

আপন মৃত্যু কেউ কখনও প্রত্যক্ষ করেছে? আমরা এখন করছি। প্রায় ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে পঞ্চম শিবিরে বসে থেকে দেখছি আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন এক পার্থিব বস্তুর রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বাদেই সে আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর?—আমাদের চোখ থেকে পৃথিবী দেখার আলো নিভিয়ে দেবে। তখন সব শেষ। অনন্ত অন্ধকার। এ এক অলৌকিক আস্বাদন।

পাহাড়ের শুষ্ক আবহাওয়ায় শরীরের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সমানে জল জল করছি। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। বারে বারে বমি করে শরীরের জল আরও কমে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। চতুর্দিকে বরফরূপে অনন্ত জলরাশি। এমনই পরিহাস, এক ফোঁটা পান করার উপায় নেই। আজ দুদিন থেকে গলায় এক ফোঁটা জল পড়েনি। স্টোভে বরফ গলাতে হবে তবে জল পাওয়া যাবে।

ঠাণ্ডায় সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে। কোল্ড স্ট্রোক হতে পারে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে গরম পানীয় এখনই দরকার। এখানে গরমের একমাত্র উৎস স্টোভ। সেটা জ্বলছে না। বরফ গলান যাচ্ছে না। জল নেই। পানীয় কিছু নেই, গরমও কিছু না। সুতরাং? অবশ্যম্ভাবী পরিণতি? যদিও বা এই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাই তাহলেও পিপাসাকাতর হয়ে এই ৩০ ডিগ্রী 'বিলো ফ্রিজিং' ঠাণ্ডায় কোল্ড স্ট্রোক হয়ে জমে মরা বোধহয় ঠেকান যাবে না। 'জলের অপর নাম জীবন'—ছেলেবেলায় পাঠ্য-পুস্তকে পড়েছি তখন একথার অর্থ এক বর্ণও বুঝিনি। আজ জীবন দিয়ে বুঝতে বসেছি জলের অপর নাম কেন জীবন! জল বিনা জীবন যায়।

আমাদের কাছে এই মুহূর্তে এক ফোঁটা তরল পানীয় কিছু নেই। তবে তরল তেজ আছে,—বর্তমানের তরল প্রাণ। দু-পাইন্টের বড় দু ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা ছিল। নীচে থেকে নিয়ে এসেছিলাম। দুর্গম ঝড়ের দাপটে পথিমধ্যে এক ফোঁটাও খেতে দেয়নি। এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উষ্ণতা হারিয়ে গেলেও চা এখনও তরল আছে। ফ্লাস্কের গুণ নিঃসন্দেহ।

আমাদের তাঁবুতে আরও একটা তরল বস্তু ছিল,—৮ আউন্স পরিমাণ 'রম্‌'—তেজস্কর পানীয়। সমতলে এটার নাম—'মদ',—পাহাড়ে, বরফে,—এই ৩০ ডিগ্রী বিলো ফ্রিজিং ঠাণ্ডায় আমরা ঐ বস্তুকে বলি,—'আগুন।' আগের দল, মদন ও গোরাশপরা সঙ্গে করে এনেছিল। ওদের প্রয়োজন হয়নি, রেখে গেছে। রমটুকু সমস্ত তরল চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। দু' ফ্লাস্ক তরল তেজস্কর পানীয়ই আমাদের তরল প্রাণ। প্রাণ রাখতে ঐ পানীয় পান করছি, শরীর গরম হচ্ছে। ধীরে ধীরে চুমুক চুমুক খাচ্ছি,—যেন মৃত্যুর পেছনে ছুটে ধরে রাখতে চাইছি আমাদের প্রাণ। যত পান করছি ঐ প্রাণরস তত কমছে, ফ্লাস্কের তলার দিকে তত নামছে আর আমাদের প্রাণের পরিমাণ তত কমছে। ফুরিয়ে আসছে। একদম তলদেশে শূন্য প্রান্তে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় বইছে, তাঁবুর কাপড়ে আঘাত করে [illegible]

ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও পুরুষত্ব হীনতার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

Vacuum massage যন্ত্র ১০্ টাকা, Trial ৫্ টাকা, ভাইটোবাম সেবন ৩ কৌটা ৯্ টাকা, মোট ১৮্ টাকা ১ মাসে সুফল নিশ্চিত। সময়—দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ২॥টা। ২৪্ টাকা M. O. পাঠালে এক মাসের ঔষধ ১২টা হইতে বিকাল ২॥টা। ২৪্ টাকা

ক্যাপ্টেন—জে, এন, বসাক, M. B. I. M. S. A. M. C. (EX)
৫বি, জগদীশনাথ রায় লেন, দর্জিপাড়া (বেথুন কলেজের উত্তর), কলিকাতা-৬

শিঙ্গার কুমকুম ঐ ললাটে অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে !

চুনে নিন, লাগিয়ে দিন শিঙ্গার কুমকুম। আপনার সুন্দর ললাটে এর রঙের ছটায় হয়ে উঠবে অপরূপ। আপনার মুখকান্তিতে ফুটে উঠবে এক অপূর্ব শোভা—অনবদ্য আভা··· হৃদয়ে জাগাবে পুলক। ১২টি অনন্য রামধনু রঙের কুমকুম থেকে আপনার মনের ভাব বুঝে পছন্দমত মানানসই বেছে নিন আপনার রুচি মাফিক কুমকুম। আপনার প্রিয় শাড়ী, কুর্তা আর সবচেয়ে সেরা লুঙ্গী আর বেলবটমের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে লাগান শিঙ্গার কুমকুম—টিপ। দারুণ মানাবে।

চলুন—ফ্যাশন জগতে ভ্রমণ করুন।
শিঙ্গার—ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিকা মহিলাদের জন্যে কুমকুম বিন্দি

বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম

শিঙ্গার

ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি
ভেলভেট ফিনিশ

প্যারামাউন্ট উৎপাদন প্রসাধনী, বোম্বাই-৩১ ডিডি

PRATIBHA 2416-11-BEN.

আওয়াজ হচ্ছে, যেন মর্সিনগান চলছে। মনে হচ্ছে তাঁবু উপড়ে যাবে, ফেটে যাবে। এই ঝড় না থামলে, এই স্টোভ না জ্বললে, যতক্ষণ প্রাণটুকু আছে শরীর গরম থাকবে। তারপর? সব ঠাণ্ডা। সব অন্ধকার। এই শরীর তুষারীভূত হয়ে অনন্ত হিমরাজ্যে বিলীন হয়ে যাবে। হিমশীলা হয়ে পড়ে থাকবে।

এই অবস্থায় পড়ে নিদ্রা গেছে, শক্তি গেছে, শারীরিক সুস্থতা গেছে। মানসিক স্বাভাবিকতাটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি অন্তিম কালের অপেক্ষা করে। এমন আসন্ন মৃত্যু কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তি সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেছে কিনা জানি না। কিন্তু এই আসন্ন মৃত্যু দেখেও আমাদের কোন বিকার নেই, কোন উত্তেজনা নেই, শুধু নির্লিপ্ত প্রশান্ত উদাসীনতা। অফুরন্ত সময়, অবাঞ্ছিত বিরাম। যেন দৈনন্দিন কর্মচক্রের নিয়মমাফিক ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত এই মৃত্যু আগমন। বাঁচার জন্য কোন ব্যাকুলতা নেই।

এই ডায়েরি লিখতে লিখতে সহসা ইচ্ছে হোল মরার আগে বাইরের তাণ্ডব প্রকৃতি একবার একটু প্রত্যক্ষ করি। দেখি কি তার রূপ। তাঁবুর পর্দা একটু ফাঁক করেই চমকে উঠলাম প্রলয়ের প্রত্যক্ষ রূপ দেখে। কি ভয়ংকর, কি সুন্দর! মনে হোল চিরনিস্তব্ধ অচল হিমাদ্রি সহসা যেন সচল হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের সেই চিরন্তন নীরবতা ভঙ্গ করে ঝড়ের সোঁ-সোঁ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন রণশিঙা বাজছে। মহারুদ্র ধ্বংসেশ্বর বুঝি সংহার মূর্তিতে জেগে উঠেছে। জগতের আদি অন্ত পঞ্চভূত থর-থর করে কাঁপছে। পাথরে-বরফে, আকাশে বাতাসে, অন্তরীক্ষে সমস্ত মহাশূন্য জুড়ে মহাপ্রলয়।

কবি ও সাহিত্যিকদের ভাষায় কথায় ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের কথা পড়েছি। সেই প্রাণঘাতী চণ্ডলীলা কোনদিন প্রত্যক্ষ করার উপলব্ধি ঘটেনি। আজ তা সামনে দেখছি। সুদূর প্রসারিত তুষার মহাসমুদ্র। সে সমুদ্র সাইক্লোনের ঘূর্ণাবর্তে বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। উড়ন্ত তুষার রাশিতে সারা পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আকাশ কালো মেঘাচ্ছন্ন। মহারুদ্রের এই করাল রূপও মনোহর। বসন্তের উল্লাসই শুধু সুন্দর নয়, নটরাজ রুদ্রের প্রলয় তাণ্ডব নৃত্যেও তা বিকশিত।

এই আকাশই পাহাড়ের সারি টপকে বহু দূরে নীচে নেমে গেছে। দিগন্তের দেশে বিলীন হয়ে গেছে সমতলের হরিত শ্যামলিমায়। সমতলে মাথার উপরেও এখন এই আকাশই। সেই আকাশে হয়ত এখন শরৎকালের সূর্যকিরণ নীলোজ্জ্বল। স্নিগ্ধ মাধুর্যতায় রোমাঞ্চ হবে। সে রোমাঞ্চকর পৃথিবীকে ফেলে ছেড়ে এসেছি। ফেলে এসেছি অনেক দূরে নীচে। পেছনে চাওয়ার চোখ বুজেছি। সামনে এগিয়ে এসেছি পাহাড়ের অমোঘ টানে। বন্ধুর পথের বন্ধুর টান। স্বজন পরিজন, প্রিয়জন সকলের বাঁধন ছিঁড়ে এসেছি পাহাড়ের এই নিবারণ নিষ্কলঙ্ক উগ্ররূপের তীব্র আকর্ষণে।

জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এসে মার কথাটা বড় বেশী করে মনে পড়ছে,—'আমার কপালে নাকি আঘাতেই মৃত্যু আছে।' না, এখন যদি মৃত্যু আসে সে মৃত্যু অপঘাতে মৃত্যু নয়,—পুণ্যবানের সঞ্চয় করা কর্মজীবনের গৌরবময় পরিসমাপ্তি। এখন বড় আফশোষ হচ্ছে:—এই কথাটা মাকে গিয়ে আর বোঝাবার সময় পাব না! আজ যখন সাক্ষাৎ-মৃত্যু সামনে এসে ডাক দিচ্ছে তখন আমি মার কাছ থেকে অনেক দূরে। পবিত্র হিমালয়ের অনেক উঁচুতে এক পুণ্যলোকে। আমার সহপাঠী আমার পায়ে কামড়ে দিয়ে ছুরের ছোবল থেকে আমায় বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু নিয়তি বোধহয় আরও ধারালো দাঁতের ছোবল মেরে নিয়ে যাচ্ছে এই মায়াময় মর্ত্যজগত থেকে দেবলোকে।

সব চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে ঝড়ো সঙ্গে বেগে তাঁবু ঠেলে ঢুকে পড়ল শেরপা নরবু। শঙ্কমাথা মুখখানা দেখেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ওর লাল মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন বার করে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কালো কালিমাখা হয়ে গেছে ওর মুখখানা। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে,—কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে,—উন্মত্তপ্রায়। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হচ্ছে না, হাত-পা নাড়ছে, অথচ কি বলতে চায়, বলতে পারছে না।

অনেক কষ্টে বলল,—'সাব ডায়ারী লিখো,—হাম লোক খতম হো গিয়া।'

নরবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। নিশ্চেষ্ট হয়ে অসহায়ভাবে ভাগ্যের হাতে প্রাণ দেব না এই সঙ্কল্পে আমাদের স্টোভ দুটো জ্বালাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ধরে। অবশেষে পরাস্ত হয়ে নিশ্চিত হয়েছে এই স্টোভ আর জ্বলবে না। —আমরাও আর বাঁচব না। এই ভেবেই হঠাৎ নরবু কি রকম যেন অস্থির হয়ে উঠেছে,—উন্মত্তপ্রায়। তাই আমায় বলতে চাইছে, ডায়েরিতে সব ঘটনা লিখে রাখ, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটনা। এই ডায়েরি কোনদিন উদ্ধার পেলে জানা যাবে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে আমরা শেষ অবধি কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছি।

হায় রে,—এই মুহূর্তে একটিবার যদি মার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম!

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড	কিলোসাইক্‌ল্‌স্
৪১, ২৫ ও ৩১	১৫১৬৫, ১১৭০০
মিডিয়াম-ওয়েভ	১১৮৭৫ ও ১৬৪০
১৯০ মীটার	১৫৮০

মনোবিজ্ঞানীর মনের কথা

কেউ যদি সহসা এসে বলে 'আমি অনন্তের একটি অণুকণা' তাহলে চোখ কপালে তুলে তার মুখের পানে সবিস্ময়ে তাকাতে হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তিটির নাম যদি কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং হয় তাহলে আর কোনো কথা বলা যায় না। ইয়ুং যেন প্রাচীন যুগের একটা অংশবিশেষ আর তিনি লিখেছেনও সেই ভঙ্গীতে। তাঁর জীবদ্দশায় অজস্র মানুষের ব্যাধি নিরাময়ে তিনি সহায়ক হয়েছেন, তিনি রোগ-উপশমের বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর কথা তাই মানতে হয়, শুনতে হয়। অনন্তের গায়ে ধাক্কা লাগেনি কখনো আমাদের মতো মর্ত্যের মানুষের কিংবা অচেতনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইনি। কিন্তু ইয়ুং-এর সঙ্গে অনন্ত বা ইনফিনিট্-এর সঙ্গে মোলাকাৎ প্রতিদিনই ঘটেছে। অচেতনের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত বার্তা পেয়েছেন এবং সেই বার্তার মর্মোদ্ধার করেছেন। ইয়ুং তাঁর জীবনের কথা 'মেমারিস, ড্রীমস, রিফ্লেক্সানস্' নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর দু' বছর পরে এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি মুখ্যতঃ অচেতনদের সঙ্গে দেখাশোনার কথাবার্তাই লেখা হয়েছে, অচেতন এবং অনন্ত ইয়ুং-এর অতি-পরিচিত জগৎ।

এমন আশ্চর্য জীবনকথা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয়, শুনতে কোনো অসুবিধা নেই, অসুবিধা অন্যত্র। কোনোরকম প্রশ্ন মনে জাগলেই সব আনন্দ মাটি। অচেতন জগতের গভীরে কার্ল গুস্তাভ্ ইয়ুং-এর হাত ধরে নামার সময় হাতে কোনো মশাল না থাকাই বাঞ্ছনীয়। অন্ধকারে বিচরণ করার যোগ্যতা চাই। দান্তে যখন নরকের অতল তলে নেমেছিলেন তখন তাঁর হাতে লণ্ঠন ছিল না। সঙ্গে ভার্জিল ছিল এই পর্যন্ত। অন্ধকারে অবতরণে চাই একজন পথনির্দেশক গুরু, যিনি সকল অন্ধকারের মধ্যেও আলো দেখাতে পারেন। ইয়ুং স্বয়ং সেই গুরু। গুরুর পদে তাঁকে বরণ করা যায়। ইয়ুং-এর সমস্ত বক্তব্য এমন ধাঁধায় বিধৃত যে তিনি যে গভীরের গোপনতম সংবাদে ওয়াকিবহাল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গোপন কথা ধাঁধার মত, তাই ইয়ুংও তাঁর কথা বলেছেন হেঁয়ালির ভঙ্গীতে।

অতিসাধারণ বস্তুও তাঁর চোখে প্রহেলিকা-প্রায়। আমরা যখন দুধ পান করি তখন প্রশ্ন করি না আমরা দুধ পান করছি না দুধ আমাদের পান করছে। আমরা সমুদ্রতীরে কিংবা শৈলশিখরে যখন বসি তখন আমরা ঠিক ঠিক জানি কোথায় আছি।

কিন্তু ইয়ুং-এর অবস্থা স্বতন্ত্র। যখন মাত্র ন' বছর বয়স তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীটা ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো, আমরা যেটুকু সমতল দেখি তাও চোখধাঁধানো ব্যাপার। নিজেদের বাড়ির বাগানে একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে তিনি অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করছেন—

> "Am I the one who is sitting on the stone, or am I the stone on which he is sitting?"

এই ধরনের প্রশ্ন আমরা কেউ করলে আমাদের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু যে মহামনীষী হাজার হাজার মনোবিকারের রোগীকে নিরাময় করেছেন তাঁর মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার সাহস আছে কার?

হেঁয়ালি কাকে বলে সে বিষয়ে আমাদের সকলের একটা যা হয় ধারণা আছে। তথাকথিত স্বাভাবিক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান মানুষ ইয়ুং-এর চোখে কিন্তু—

> "Optimistic tadpoles who bask a puddle in the sun, in the shallowest of waters, crowding together and amiably wriggling their tails, totally unware that the next morning the puddle will have dried up and left them stranded"

ডোবার জল শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ইয়ুং সেই আশ্রয় ত্যাগ করতে পেরেছেন, কারণ তাঁকে 'অচেতন' ঈশ্বর সময়ে সতর্ক করে দিয়েছে। যখন তিনি শিশুমাত্র তখনও 'অচেতন' তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। বুড়ো-বয়সেও সেই সতর্কবাণী তিনি অতীতের মধুর স্মৃতির মত মনে করেছেন।

> "Who spoke to me then? Who talked of problems far beyond my knowledge? Who brought the above and below together and laid the foundation for every thing that was to fill the second half of my life with stormiest passions? Who but the alien guest who came both from above and from below?"

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। এখানে ডোবার 'বেঙাচি'র মুখপাত্রটির অর্থভেদ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদি ওপর এবং নীচে থেকে অতিথি এসে হাজির হয় তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি?

এই রহস্যময় অতিথির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হলে মনের দিক থেকে অতিশয় সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ইয়ুং এই অত্যাশ্চর্য মন-এর অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু 'অপর'-এর বাণী শুনেছেন তা নয়, নিজের অর্থাৎ 'অহং'-এর বাণীও তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছে।

উপনিষদে আছে আত্মা দুটি পাখির মত, একটি পাখি কূজন করে অপরটি নীরবে তা শুনে যায়, একটি অহং আর অপরটি আত্মা। আমরাও জানি আমরা মাঝে মাঝে দুটি বিভিন্ন প্রাণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ি—কিন্তু আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় তাই কোনটি যে কোনজন তা বিচার করা সম্ভব হয় না। ইয়ুং তৃতীয় নয়নের অধিকারী তাই তিনি শুধু যে দুজনকেই দেখতে পান তা নয়, উভয়ের পরিচ্ছদের পার্থক্যও তাঁর নজরে পড়ে। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখনও তাঁর এই শক্তি ছিল। তিনি সেই সময়েই একাধারে যে দুই তা বুঝতে পেরেছেন—

> "Then, to my intense confusion, it occured to me that I was actually two different persons."

এদের মধ্যে একজন স্কুলের ছাত্র, অঙ্ক মাথায় একেবারে ঢোকে প্রবেশ করে না। আত্মবিশ্বাসেরও অভাব আছে, অন্যদিকে অপর টির একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী—

> "—was important, a high authority, a man not to be trifled with—"

ইয়ুং বুঝতে পেরেছিলেন এই অপর সত্তাটি একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃদ্ধ মানুষ—তাঁর পরিধানের বৈশিষ্ট্যও ইয়ুং-এর নজরে পড়েছে—

> —"Wore buckled shoes and a white wig and went driving in a fly with high, concave rear wheels, between which the box was suspended on springs and leather straps".

এই অপর প্রাণীটি সর্বদাই যে বকলস আঁটা জুতো পরে তা নয়—তার পোষাক অন্যরকমেরও হতে পারে। তাছাড়া তিনি যে চিরতরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আবদ্ধ তা নয় স্ব সময় কিমিয়া বিদ্যা বা 'এলকেমি' অস্তিত্ব জনপ্রিয় ছিল সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেও তিনি ছিলেন এমনকি খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীও এই অপর সত্তার বিচরণ ক্ষেত্র হতে পারে।

কিন্তু এই দুটি সত্তা যে যুগেরই মানুষ হোন না কেন তাদের দুজনকে এক-সঙ্গে বেঁধে রাখা ইয়ুং-এর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

তিনি বলছেন—

"The play and counter-play between personalities No. 1 and No 2 which has run through my life has nothing to do with a split or dissociation in the ordinary medical sense"

কিন্তু তিনি আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে এই দ্বিতীয় সত্তা যদিও এক বিশেষ চরিত্র তবু তার যথার্থ রূপ সকলের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ অধিকাংশ মানুষের সচেতন মনের বোধশক্তি তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তারা স্ব কি তা উপলব্ধি করা সহজ নয় সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়—

"Most people's conscious understanding is not sufficient to realise that he is also what they are."

বলা বাহুল্য পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই জনই এই তীক্ষ্ণ বোধশক্তির অধিকারী নন।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি বিষয়ে আলোচনার শেষ অংশটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —অন্তরঙ্গ

MEMORIES, DREAMS, REFLECTIONS : By Carl Gustav Jung: Recorded and edited by Aniela Jaffe. Translated by Richard and Clara Winston—(Collins with Routledge & Kegan Paul) Price-45 shillings. only.

নতুন বই

ছায়াঙ্গিনী (উপন্যাস)—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি প্রকাশনী, ৫৪।১, কালীঘাট রোড, কলকাতা : ৩৬। ৫-৫০ টাকা।

জাহানারা বেগম আর প্রদীপ রায়। একজন মুসলমান, অন্যজন হিন্দু। প্রথমা হলেন ওপার বাংলার, অপরজন এপারের। ঘটনার আবর্তে ও ঘাত-প্রতিঘাতে পারাপারের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে জাতি-পাঁতি-ধর্মের ভেদ-প্রাচীর মুছে গিয়ে জাতীয়তা-বোধের প্রাণ-গঙ্গায় অবগাহন করে জাহানারা আর প্রদীপ হল নতুন মানুষ—বাঙালী। আদর্শবাদে আপ্লুত এই উপন্যাসটিতে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে এপার বাংলার করণীয় কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করবার মতো। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্ত এ লেখায় অনুপস্থিত এবং ক্লান্তিকর বক্তৃতাধর্মী সংলাপের দরুণ কাহিনী রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মনে রেখো (উপন্যাস)—আশীষ বসু। বাকসাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা : ৯। ৩-৫০ টাকা।

তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়াই কি জীবন? বেঁচে থাকাই কি জীবনের পরমায়ু। সারা জীবনটা মস্ত জুয়াখেলা—ভাগ্যের সঙ্গে রঙ মেলানো? জীবনটা কি একটা কম্প্রোমাইজ, একটা মেনে নেওয়া। আজকের জীবনের এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে লেখক অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে একটি নিটোল প্রেমের ট্র্যাজিক কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছেন কলকাতায় বৈঠকখানা সেকেন্ড বাই লেনে এবং যতি টেনেছেন দার্জিলিঙে। কাহিনীর প্রাণবিন্দু মৃন্ময়কে ঘিরে এবং তার জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই নানান ঘটনার আবর্তে স্বাভাবিক ধারায় এসেছে নানান চরিত্র—নরনারীর বিচিত্র মিছিল। এরা সবাই—কলকাতার মেঘমালা, শুভময় দত্ত, চন্দ্রকান্তবাবু, মা চারুলতা, চামেলী, শ্যামলী, হিরণ্ময়বাবু এবং কেষ্ণনগরের কল্যাণী, কামিনী, পীতাম্বরবাবু, আবদুল হোসেন, গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচন দত্ত—এমনকি দার্জিলিঙের ভায়োলেট আমাদের একান্ত চেনা মানুষ। এই চেনা ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া জীবনযন্ত্রণায় কাতর মানুষদের ও নিচুতলার মানুষদের বঞ্চিত জীবনের ছবি বড় নির্মম বড় করুণ করে এঁকেছেন লেখক। কাহিনী শেষে মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কাহিনী বুননে এবং বিস্তারে লেখক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। পরিমিতিবোধ এবং স্বল্প-কথায় বৃহত্তের আভাস আনার বিরল বৈশিষ্ট্য এবং গল্পবলার গুণে কাহিনী নদীর মতো স্বাভাবিক ধারায় বয়ে চলেছে। গ্রাম-বাংলার প্রতি মমতা গ্রাম-শিল্প সম্পর্কে লেখকের বিশেষ জ্ঞান এবং নিঃস্ব গ্রাম্য শিল্পীদের (পসোলাশিল্প) কথা কাহিনী উপন্যাসটিকে অধিকতর হার্দ্য মানবিক এবং মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। আলোচ্য উপন্যাসটি যদি এই শক্তিমান লেখকের প্রথম লেখা হয় তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। সুন্দর প্রচ্ছদে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে এই জীবনধর্মী কাহিনীতে প্রাণময় 'মনে রেখো' বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক প্রকাশনীতে মনে রাখবার মতো উপন্যাস বলে চিহ্নিত হবে।

টইটম্বুর (ছড়া-ছবির বই)—ধীরেন বল। সাম্প্রতা প্রকাশনী, ২১।২ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা ৩৭। ২-৫০ টাকা।

কবি কবিতা লেখে আর ছড়া লেখে। ছবি-আঁকিয়ে তাকে ছবিতে রূপ দেয়। দুটি মানুষ কিন্তু আলাদা। আলাদা কাজ দুজনের। এই দুজনের কাজ একজনে পারে? পারে কখনো কখনো। তা যখন হয় ছড়া তখন গান গেয়ে ওঠে, ছবি কথা কয়। শ্রীবল 'টইটম্বুরে' সে কাজ করেছেন আশ্চর্য সুন্দরভাবে। দুটি বিষয়েই—কবিতা লেখার এবং ছবি আঁকায়—তাঁর খ্যাতি সুদীর্ঘ-কালের। সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে ভালো লাগল। কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা মজাদার কবিতা ও ছবিতে ভরা টইটম্বুর শিশু-কিশোরমহলে হাসির হিল্লোল তুলবে সেকথা বলাই বাহুল্য। বুড়ো বয়স্কদের মনেও তার রেশ এসে লেগে হারানো কিশোর-বয়সকে মনে পড়িয়ে দেবে। ঝকঝকে প্রচ্ছদে মজাদার ছবিতে এবং হাসির কবিতায় ভরা চমৎকার ছাপা এ বইটি খুশী হওয়ার মতো।

CENTRAL LIBRARY

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থজগৎ (এপ্রিল-মে ১৯৭১)—সম্পাদক : বিনোদলাল চক্রবর্তী। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৭। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র হলেও 'গ্রন্থজগৎ' কেবল বইয়ের খবরে বোঝাই নয়, উন্নত মানের প্রবন্ধে নিবন্ধে আকর্ষণীয় একটি সাহিত্য-পত্রিকাও। এ সংখ্যায় লিখেছেন নারায়ণ চৌধুরী (পূর্ব বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য), সুনীল মুখোপাধ্যায় (ওপার বাংলার সাহিত্যাকাশ), রাণা বসু (বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কবিতা), আনোয়ার পাশা (পূর্ব বাংলার রসসাহিত্য), প্রকাশ ভাণ্ডারী ও অনিলকুমার ভৌমিক। 'ভাষার ঐক্য' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহের একটি প্রবন্ধের (বাংলাভাষার রীতিনীতি ও সম্ভাবনা) পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পত্রিকাটি সকলের কাছেই সমানভাবে আদৃত হবে।

গ্রন্থ পরিক্রমা (বাংলাদেশ সংখ্যা)—সম্পাদক অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ১৫, মৈত্রী নিবাস রোড, দমদম, কলকাতা ২৮। ষাট পয়সা।

কয়েকটি অসাধারণ প্রবন্ধ নিয়ে বেরিয়েছে 'গ্রন্থ পরিক্রমার' এ সংখ্যাটি। 'বাংলাদেশের যুদ্ধ ও আমরা' 'উদ্বাস্তু সমস্যা : তখন ও এখন' 'পাক পররাষ্ট্র-নীতির তিনযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। লেখকদের মধ্যে আছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল চন্দ, দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক ও দিলীপ সেন। পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যের খবর

পরলোকে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় : কল্লোল কালিকলম যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় রবিবার ২৭শে আষাঢ় (১১ জুলাই) তারিখে লোকান্তরিত হয়েছেন। এই সংবাদ কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ মাসের 'কথা সাহিত্য' নামক সাহিত্যপত্রে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

'সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজিকার পাঠক মহলে তেমন পরিচিত নয়—লেখকরাও অনেকে হয়ত তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবেন না। এই শক্তিমান ব্যক্তিটি অকালে—নিজে সাধ করিয়াই মোটা মাহিনার চাকুরী ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির সম্ভাবনা ঘুচাইয়া একদিন কলিকাতার বিদ্বজ্জন সমাজ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। কিছুদিন এখানে প্রায় অজ্ঞাতবাস করার পর কাশীতে গিয়া নিভৃতে নির্জনবাস করিতেছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অর্থোপার্জন বা যশোপার্জনের কোন চেষ্টা করেন নাই। একরূপ অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।'

এই মন্তব্যটির সঙ্গে আমরা একমত। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দ সুন্দর ঠাকুর' এই ছদ্মনামে 'কালিকলমে' যে ধরনের সাহিত্য আলোচনা করতেন এ যুগে তা বিরল। তাঁর 'মেজদার ডায়েরী' নামক গ্রন্থটি একদা পণ্ডিত মহলে সমাদর লাভ করেছিল। তিনি আমেরিকা প্রবাসী বাঙালী লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কিছু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন। সেই কালে সাহিত্য সমাজে এই প্রিয়দর্শী মানুষটির যথেষ্ট সমাদর ছিল। তিনি 'রয়টার' নামক বিখ্যাত সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা ও দিল্লী শাখার বার্তা সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন সেযুগের সাংবাদিকরা। ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত কোনো আঘাত পেয়েছিলেন তাই এই ধরনের সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের কালে প্রবোধকুমার সান্যাল যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মত মানুষ বর্তমানকালে বিশেষ চোখে পড়ে না তাই তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে নিদারুণ দুঃখের সংবাদ হয়ে এসেছে। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সরোজকুমার সম্বর্ধনা : প্রবীণ উপন্যাসকার ও সাংবাদিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে আছেন। তাঁর 'ময়ূরাক্ষী' 'সোমলতা' 'শৃঙ্খল' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। লেখকের আগামী জন্মদিনে তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক ও বন্ধুগণ তাঁকে একখানি 'স্মারক গ্রন্থ' উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। এই গ্রন্থটিতে সরোজকুমারের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন বাংলার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী : ১৫ই আগস্ট তারিখ থেকে শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত রচনাবলী ত্রিশটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মহামনীষীর দর্শন, যোগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থাবলী ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস্ লিমিটেড—পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ থেকে পাওয়া যাবে। সমগ্র সংস্করণটির মূল্য ৭৫০৲ টাকা এখন যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা ৫০০ টাকায় পাবেন আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসের সম্মেলন। সম্প্রতি ক্রেমলিনে পশ্চিম সোভিয়েট লেখক সম্মেলন কবি কোইকেন ফালিয়েভের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যকারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

মূর্তির কর্তিত মুণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-দিবসে একটি মহৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। পথে যেতে আসতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মুণ্ডহীন মূর্তি বড়ই পীড়াদায়ক মনে হ'ত। বিদ্যাসাগর ও প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির মুণ্ড দুটি দুষ্কৃতকারীরা কর্তন করে। পাথরের মূর্তির এই লাঞ্ছনায় সকলেই বাথিত হলেও সংস্কার সাধনে সময় লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে বাঙালী জাতির এই কলঙ্ক মোচন সম্ভব হল। এই দিনকার সভায় ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—প্রবল হিংসা ও অনাহার রাতের অন্ধকারে অস্ত্রাঘাত করে, তাঁর অঙ্গহানি করে তাঁকে অসম্মান করেছিলাম, আজ এই অনুষ্ঠান সেই দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত। সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অনিলা দেবী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বিদ্যার্থীরঞ্জন সংস্থা এই উপলক্ষ্যে কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতামালায় এ-বছরে বক্তা ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন—দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান সার্থক রচনা। অন্য নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ ও মুখ্য চরিত্র সৃষ্টিতে অসঙ্গতি থাকলেও দেশাত্মবোধ ও কাব্যধর্মীতা এবং জীবনের রাজপথ থেকে বিচ্যুত কয়েকটি গৌণ চরিত্রের মহিমা তিনি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়েছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই সুদীর্ঘ ভাষণে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এমন তথ্য সমাবেশ ও তুলনামূলক আলোচনা কদাচিৎ শোনা যায়।

আগডুম বাগডুম

অন্নদাশঙ্কর রায়

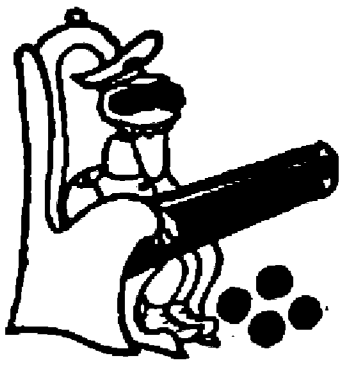

আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
রাজ্য চালাতে গিয়ে দেখান আজব খেল।
এক একটি সুলতান ঢাকা থেকে মুলতান
গোলা আর গুলী দিয়ে করে বান গুলতান।
চেঙ্গিজ তৈমুর নাদিরশা হুলাকু
মেরেছেন এক লাখ মেরেছেন দু' লাখু।
তাঁদের উপরে নাকি দিয়েছেন টেক্কা
সার্থকনামা বীর জাঁদরেল টিক্কা।

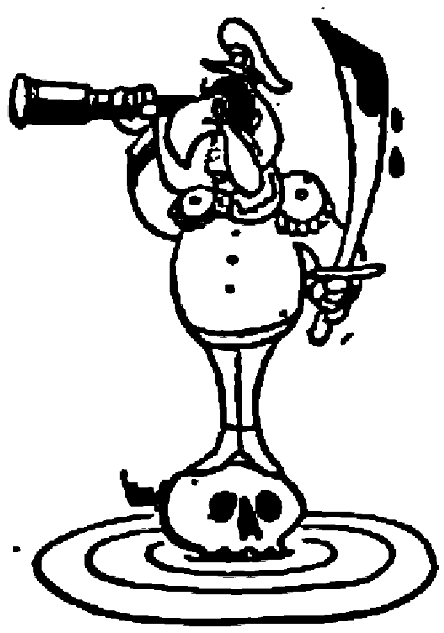

শুনে কাঁদে এ পরাণ শুনে কাঁপে এ হিয়া
নাদিরের ঘরানা শাহান শা এহিয়া
অর্ধেক লোক মেরে রাখবেন একতা
ছয় কোটি মরবে সত্য কি একথা?
ছয় কোটি অক্কা! একদম ছক্কা!
লাশ হয়ে দেশ হবে মার্শালিক মক্কা।
হাঁক শুনি দৈনিক সাথে আছে চৈনিক
আরো কত জাঁদরেল আরো কত সৈনিক।

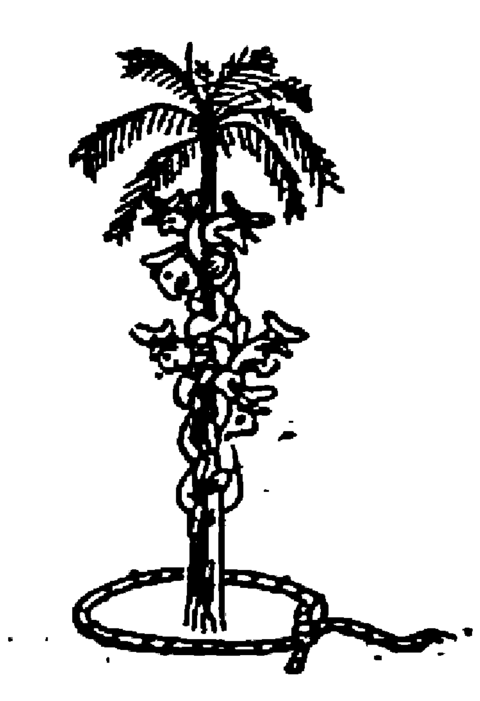

আসবেন চেঙ্গিজ আসবেন তৈমুর
দেখবেন দু' ইয়ার দিল্লী অনেক দূর।
কপালে কি আছে লেখা জানে সবজান্তা
বাংলায় হারবেই মিলিটারি জান্টা।
আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
বাংলা বিষম ফাঁদ সেখানে ফুরাবে খেল।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

৫

আবার পথে। একে পথ বলা ভাষার অপব্যবহার। খাড়া পাহাড়ের কাঁধ-বরাবর পথিকের পায়ে পায়ে একটা নিরিখ পড়ে গিয়েছে, কোন মতে একজন লোক চলতে পারে, উল্টোদিক থেকে আর একজন এসে পড়লে বিপদ, একজনকে পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আঁকড়ে ধরে পাশ দিতে হয়। ডান দিকে পাহাড় সোজা উঠে গিয়েছে একেবারে আকাশের সীমানা অবধি; গায়ে বনস্পতির অক্ষৌহিণী; তার পায়ে পায়ে জড়ানো মোটা মোটা লতা; অজানা ফুলে অজানা পতঙ্গের চঞ্চলতা; সেই অরণ্যের মাঝে নিশ্চয় আছে অজানা শ্বাপদের দল: সমস্ত নিস্তব্ধ কিন্তু নীরব নয়, কেমন একটা গম্ গম্ গম্ভীর ধ্বনি, একেই বোধকরি প্রাচীনেরা ওঙ্কার শব্দ বলেছেন। আর বাঁ দিকে ঐ খাড়া নিম্নে পাহাড়-বরাবর একটি ক্ষীণ সাদা সুতো, তার দুপাশের সাজ দেওয়ার বনস্পতির [illegible] স্মরণ করিয়ে দেয় উপত্যকার গভীরতা।

সর্বত্র পথ পায়ে চলার মতো হলেও যা হতো, অনেকগুলিই পথের নিরিখ নয়, পাথরের খণ্ড পড়ে আছে—ওটাই নাকি পথ। পায়ের চাপে একখানা পাথর খসে পড়লেই নির্ঘাৎ পতন, হাড় মাংসের আর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না, ঐ যে নীচে রাংগা পাখীগুলো উড়ছে তারা বঞ্চিত হবে না। উপত্যকার ওপারে আবার পাহাড়ের ঐ একই দৃশ্য। আজ সারাদিনের মধ্যে একখানি পাহাড়ী গ্রাম চোখে পড়েনি ভবার। গতকাল এক পাহাড়ী গ্রামে আশ্রয় জুটেছিল, গাঁয়ের লোকে সাধু মনে করে তাকে খাদ্য ও ঘরের দাওয়ায় রাত্রি যাপন করতে দিয়েছিল। আজ সারাদিন অনাহার, তাতে ভবা অনভ্যস্ত নয়, রাতে যে কোথাও আশ্রয় মিলবে তারও আশা নাই—তাতেও সে অভ্যস্ত। তবে একটা বসবার স্থান তো আবশ্যক—এই পাথর শুধু সুকঠিন বলা দূরে থাক এক পা ফেলবার স্থানও যে খুঁজে নাই।

সারা দিনের মধ্যে চোখে পড়েনি একটা পথিক। কাউকে শুধাতে পারেনি তার গতি কি হবে, শুধু মনের মধ্যে জপে চলেছে মনি পাপী, আমার কি গতি হবে। এমন সময়ে মোড় ঘুরতেই ভবার চোখে পড়লো অনেকটা সমতল স্থান, সেখানে গাছপালাও কম। এখন এই হঠাৎ দৃশ্যান্তরে আর সে বিস্ময় বোধ করে না। পাহাড়ে সবই অভাবিত আচমকা। তার পা আর চলছিল না, একটা গাছের গুঁড়ির কাছে বসলো, বসলো কি ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো সামনে আলোয় ভরে গিয়েছে আর সম্মুখে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ, বাবাজী গোড় লাগে।

ভবা তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বলল, আমি সাধু সন্ন্যাসী নই, নিতান্ত পাপী মহাপাপী।

তাতে ঠিক উল্টো ফল হল। এই সকল পাহাড়ীরা জানে প্রকৃত সাধুরা সহজে ধরা দেন না, নানা ছলনায় মুক্তি পেয়ে প্রস্থান করেন।

তারা বলল, বাবাজী, সংসারী বলেই পাপী তাপী হয়, আপনার মতো পুণ্যভাগী পাপী হতে যাবে কোন দুঃখে।

ভবার এরকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে, জানে যে দোষ স্বীকার করে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রণাম প্রত্যাশীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই সে নীরবতা অবলম্বন করলো। তাতে পুণ্যার্থীদের ভক্তি গেল আরও বেড়ে। এমন সময়ে একজন পুরুষ এক লোটা দুধ আর কতকগুলো আখরোট নিয়ে এসে উপস্থিত হল, সাধুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো। ভবা বুঝলো এগুলো প্রত্যাখ্যান করলে তাদের ভক্তিতে এমন আতিশয্য হবে যে সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। আর তা ছাড়া কালকার অনাহারে সে এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল খাদ্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দুধটা পান করে কয়েকটা আখরোট ভেঙে খেল, বাকিগুলো বিতরণ করে দিল, তারা প্রসাদ মনে করে মাথায় ঠেকিয়ে গাঁয়ের দিকে প্রস্থান করলো। ভবা এই সুযোগে করলো স্থান ত্যাগ।

ভবার দেশ কাল সম্বন্ধে বিভ্রম জন্মে গিয়েছে। কতকাল হল নরেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করেছিল খেয়াল নাই—সে যেন গতজন্মের স্মৃতি। কিম্বর রাজ্য ছেড়েছে কবে? কখনো মনে হয় দুচার দিন আগে, কখনো মনে হয় অনেক অনেক কাল। আর স্থান? এ কোন্ স্থান জানে না, কোথায় চলেছে জানে না। দেশভ্রমে দিক্‌ভ্রম। তবু সেটা হতে দেয়নি। প্রতিদিন প্রাতে সূর্যোদয় দেখে দিক্ মিলিয়ে নেবার মতো দিক্‌নির্ণয় করে নেয়। মার্গদর্শীর উপদেশ পূবে যাবে দক্ষিণে যাবে, পূবে হিমালয়, দক্ষিণে আর্যাবর্ত উত্তরে বা পশ্চিমে নয়। ভবা পূর্বদিকের যাত্রী। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীতে স্নান করতে নেমে নিজের দাড়ি আর চুলের দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে পারে অনেক কাল গিয়েছে তার মাথার উপর দিয়ে। কত কাল? তা জানে না। নরেন্দ্রনগরে তার দাড়ি ছিল না, চুল সামান্য। এখন দাড়ি বুকের উপরে এসে পৌঁছেছে, চুল পিঠের উপরে। সেই গোঁফ দাড়ির আগাছা ভেদ করে চোখে পড়লো নিজের মুখখানি। এ মুখে কত প্রভেদ! হাঁ কপালে ও গালে দুঃখ কষ্ট ছাপ বসিয়ে দিয়েছে বটে তবু তারুণ্য ঘোচাতে পারেনি। তার বয়স কতই বা হবে, খুব বেশি হবে তো দুই কুড়ি। তার কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অবশ্য দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেললে তারুণ্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। তখনি মনে পড়ে যায় কিম্বর রাজের অদল-বদলীদের।

ভবা ভাবে বোকা পেয়ে ওকে ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে দিল না তো। বলে কিনা যোকয়ার বয়স দেড়শ, আর বুড়ি তিনশোর গোলাম। ওদেশে যে বয়স নেই, অর্থাৎ চুল দাড়ি পাকা নয়, অবশেষে খাদ্য নেই সে তো চোখেই দেখলাম। আর এই চিরযৌবন নাকি প্রকৃতিকে বাধা না দেওয়ার ফল। সে হলে দেখ না... কিছু [illegible]

দেখল আর শুনলো তাকে মিথ্যা বলে কি করে? ছোকরা এসে ছুঁড়ি তিনটেকে পথের মাঝে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল আর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কেমন সহজভাবে হয়ে গেল। ওরা তো স্পষ্টই বলল, প্রবৃত্তির পথে ধর্মনীতি বিবেক আচার প্রভৃতির শিলাখণ্ড ফেলবার ফলেই বন্যা ঘটে তাতেই অকালে ধ্বসে পড়ে তারুণ্য যৌবন আনন্দ সুখ-স্পৃহা। নাঃ ওরা বেশ সুখে আছে। অজ্ঞাত-সারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর সে কিনা পথে পথে ঘুরে মরছে মুক্তির সন্ধানে। নাঃ এরা বেশ সুখে আছে।

তখনি মনে পড়ে যায় ঘটোৎকচ আর দলবলকে। তারাও তো বেশ সুখী ছিল। ধর্মনীতি বিবেক বলে হায় হায় করে বুক চাপড়ে মরতো না। মাঝখান থেকে তার এ-দশা কেন? দুই দিকে সুখের সমান্তরাল তীরভূমি, মাঝখানকার দুঃখের আবর্তে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন মনে পড়ে যায় কিন্নর রাজ্যের তরুণটি কি একজন ঋষির যেন নাম করেছিল—চারুবাক না কি। পাছে নামটা ভুলে যায় তাই বারবার মনে মনে উচ্চারণ করে, এক-আধবার হয়তো জোরে বলে ফেলেছিল।

কি বাবাজী সকাল-বেলাতেই ঐ ভণ্ড-তপের নামটা করছো কেন?

জরা চমকে চেয়ে দেখে পাশে এসে বসেছে আর একজন সন্ন্যাসী। হিমালয় সন্ন্যাসীর বাচ্চা।

জরা শুধালো আপনি কখন এলেন? কোথায় থাকেন?

নবাগত একটু রুক্ষভাবেই বলল, এখনি এসেছি। আর নিজে সন্ন্যাসী হয়ে জানেন না কোথায় থাকি! সন্ন্যাসীর যেখানে রাত সেখানে কাত। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো, এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর শুনি—সকালবেলাতেই ঐ পাষণ্ডটার নাম করছিলেন কেন?

কেন তাতে দোষ কি?

সকালবেলায় পাষণ্ডের নাম করলে দোষ কি?

পাষণ্ড বলেই দোষ।

নবাগত বললো, আর এযে মহাষণ্ড।

পাষণ্ড, মহাষণ্ড! সে কি আমি শুনেছি তিনি ঋষি।

ও বেটা যদি ঋষি হয় তবে বনের তালুকগুলোও ঋষি। তা নামটি কোথায় পাওয়া হল?

জরা জানায় কিন্নর রাজ্যে।

ও, ইতিমধ্যে সেখানেও যাওয়া হয়েছে। তবে তো নরকের দরজাটা দেখেছ, এবারে খাস নরকটা দেখতে বুঝি ইচ্ছা।

জরা বলল, সাধুজী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন তাকে পাষণ্ড বলছেন।

আগে কি প্রয়োজন সে বেটার কাছে শুনি।

জরা বলে, আমি ঘোরতর পাপী, মুক্তির সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্নর রাজ্যের লোকেরা বলল, ঋষি চারুবাক জানেন মুক্তির সন্ধান।

ঋষি চারুবাক! বেটা রাক্ষস চার্বাক।

রাক্ষস কেন? মানুষ খায় নাকি—শুধায় জরা।

মানুষ খায় না, খায় তার মুণ্ডুটি আর তার ইহকাল পরকাল।

জরা বলে আমার তো ঐ দুয়ের একটাও নেই।

মুণ্ডুটি আছে তো, এবারে সেটাও থাকবে না।

সাধুজী, আমার মাথা মুণ্ডুতে কি প্রয়োজন? মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

তা দেবে মুক্তি। গোটাকতক যুবতী জুটিয়ে দেবে, আর সেই সঙ্গে পায়স পিষ্টক পুরোডাশ আর ভাঁড় ভাঁড় মাধ্বী। মুক্তি না পেয়ে আর উপায় কি?

কি বলছেন! তিনি একজন ঋষি।

আরে ঋষি বলেই তো বলছি। এক ঋষি বিশ্বামিত্র, আর এক ঋষি পরাশর, আবার এক ঋষি বেদব্যাস। এদের কলঙ্কে কান পাতবার উপায় নেই।

তার সন্তোষ বিধানার্থে বলল, সাধুজী আপনিও তো একজন ঋষি।

তবে রে বেটা! আমি হলাম কিনা ঋষি—এই বলে হাতের দণ্ডখানা উত্তোলন করলো জরার মাথা লক্ষ্য করে।

জরা সরে এসে বলল, মাপ করবেন, আমি জানতাম না আপনি কী?

নবাগত সদম্ভে বলল, আমি মুনি, মৌন থাকাই আমাদের ধর্ম আর সেই সঙ্গে অক্রোধ ক্ষমা তিতিক্ষা।

মুনি-ধর্মের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর মুনিত্বে আর সন্দেহ রইল না। এখন সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু এতক্ষণ চিনতে পারি নি, দোষ হয়ে গিয়েছে। এবারে চারুবাক ঋষির আশ্রমের সন্ধান যদি জানেন তবে দয়া করে বলে দিন।

মুনি প্রস্থান করতে করতে বলল, জানি না।

তারপরে ফিরে এসে বলল, জানি কিন্তু বলবো না।

এই বলে সবেগে প্রস্থান করলো, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জরা।

৬

জরা যখন চার্বাক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হ'ল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়।

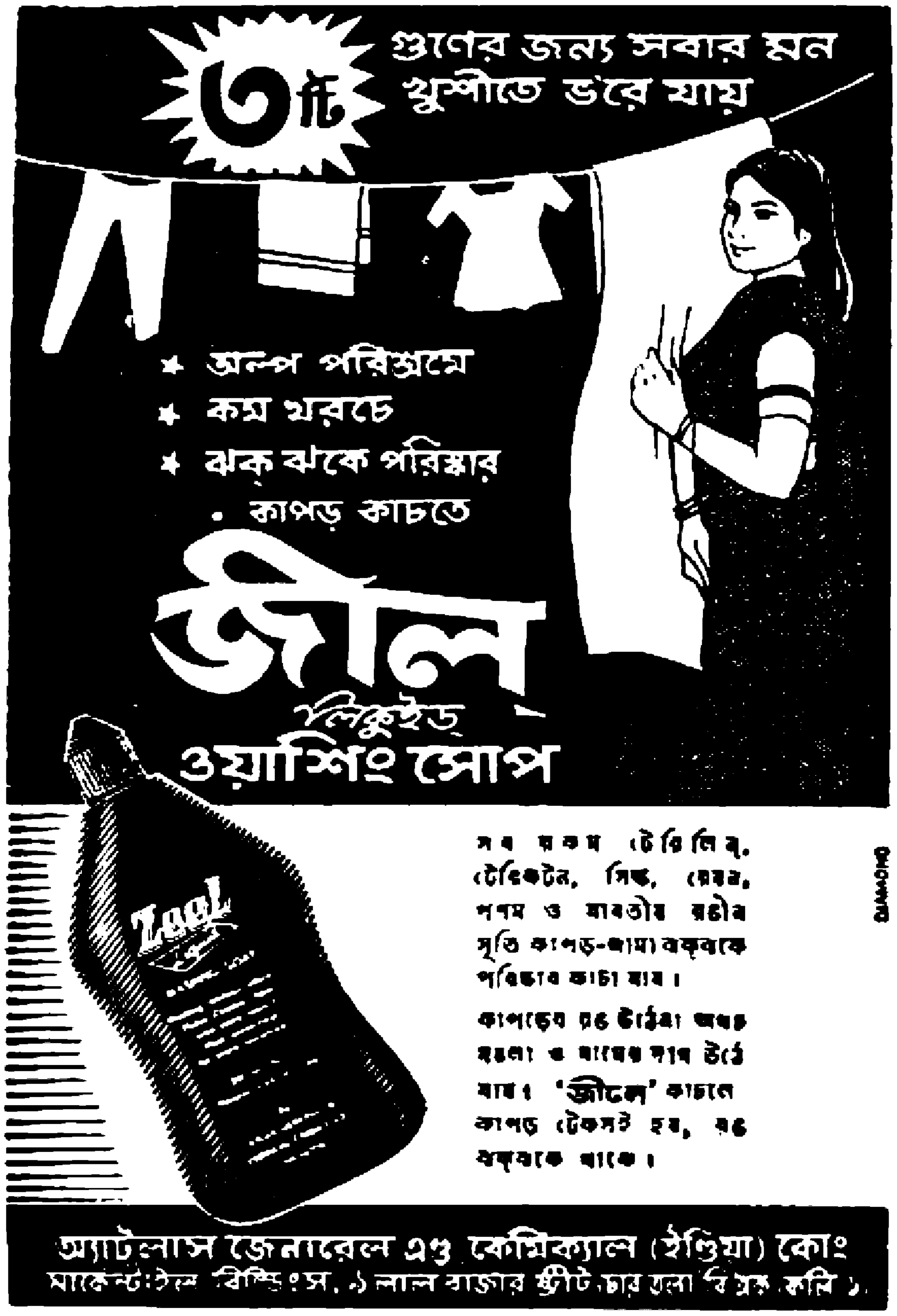

আশ্রমে প্রবেশ করতেই একজন তরুণ শিষ্য তাকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দিল, তারপরে বলল, আর্য, এখন আপনি বিশ্রাম করুন, কালকে প্রাতঃকালে আশ্রমগুরুর কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো।

জরা বলল, বৎস সত্যই পথশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

শিষ্যটি বলল, সে তো খুবই স্বাভাবিক। হিমালয়ের এই দুর্গম অধিত্যকা আসতে হলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে জরা দেখতে পেলো সরল দেওদার প্রভৃতি বনস্পতির ছায়ায় ছোট ছোট পর্ণকুটীর, কুটীরে কুটীরে দীপ প্রজ্বলিত, আশ্রমের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত তকতক ঝকঝক করছে। আর সেই স্নিগ্ধশীতল আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত করে একটি নিবিড় শান্তি। ভারি আরাম বোধ করলো সে।

শিষ্য তাকে নিয়ে একটি পর্ণকুটীরে প্রবেশ করে পাথরের মেঝের উপরে খানদুই কম্বল বিছিয়ে দিল, বলল, আপনি উপবেশন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহারের সময় হবে তখন আপনাকে মহানসের সমীপে ভোজনশালায় নিয়ে যাবো।

জরা বললো, বৎস, তোমাদের অভ্যর্থনা ও সমাদরে আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম। তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

জরা উপবেশন করলে অদূরে মেঝের উপরে বসলো। জরা বলল, বৎস তুমি শীতল মেঝেতে বসলে কেন? এই কম্বলের উপরে এসে বসো।

শিষ্যটি বলল, আর্য, অতিথির সঙ্গে সমাসনে বসা বিধেয় নয়, আমি এখানে বেশ আছি।

জরা শুধালো, তোমার নাম কি বৎস?

আমার নাম অর্বাণ।

অর্বাণ, বেশ সুন্দর নামটি।

অর্বাণ শুনে হেসে উত্তর দিল, আর্য, শুধু আমার নামটি নয়, আমাদের এখানে সমস্তই সুন্দর, কালকে ভোরের আলোয় দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

জরা প্রশ্ন করলো, বৎস, তোমরা এখানে কোন্ দেবতার উপাসক?

উত্তর শুনতে পেলো, আর্য, আমরা কোনো দেবতার উপাসক নই, আমরা ব্রাত্য।

ব্রাত্য শব্দটি কখনো শোনেনি জরা, তাই শুধালো, ব্রাত্য বলতে কি বোঝায়?

আমরা দেবোপাসক নই বলে বেদবাদী মুনি-ঋষিগণ আমাদের বলে ব্রাত্য অর্থাৎ ভ্রষ্ট বা পতিত। তারা আমাদের একঘরে করে রেখেছে।

জরা শুধায়, তাই বুঝি এই দুর্গম স্থানে তোমাদের আশ্রম।

না আর্য ঠিক সে জন্য নয়। এ স্থান সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ, নগর কোলাহল হতে দূরে অবস্থিত বলে সাধনার প্রশস্তক্ষেত্র।

জরা বলে, এই মাত্র বললে, তোমরা কোন দেবতার উপাসনা করো না তবে আবার সাধনা কিসের? কার সাধনা করো?

অর্বাণ বললো, কারো সাধনা নয়,

একটি ভিন্নধর্মী অভিনব শারদ সংকলন

পদক্ষেপ

সম্পাদনা : সতীকান্ত গুহ

বাঙালী ও অবাঙালী সৃজনশীল লেখকদের রচনায়
সমৃদ্ধ হয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বের হবে

লিখছেন

গল্প : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, প্রতিমা সেনগুপ্ত, সুভাষ সিংহ ও আশিস সান্যাল।

প্রবন্ধ ও আলোচনা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, শচীকান্ত গুহ, বিশু মুখোপাধ্যায়, ইন্দুনাথ গুহ, সাবিত্রী সেনগুপ্ত, কমল চৌধুরী, কমলকুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ বসু।

চলচ্চিত্র ও খেলাধুলো : সেবাব্রত গুপ্ত, মতি নন্দী, ক্ষেত্রনাথ রায়,

উপন্যাস : সতীকান্ত গুহ।

কবিতা : বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আতাউর রহমান, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার, বাণী বসু, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, হিমাদ্রি বসু, সুনীল বসু, শিশির ভট্টাচার্য, শুভ মুখোপাধ্যায়, অমল ভৌমিক, চন্দন সেন, সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, স্বপ্নেন্দু ভৌমিক, রুদ্রেন্দু সরকার, নিশিনাথ সেন প্রভৃতি।

এ ছাড়া থাকছে ভারতীয় ভাষায় রচিত
কয়েকটি অসাধারণ গল্প-কবিতার অনুবাদ

যাঁদের লেখা অনূদিত হয়েছে : কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শচীরাউত রায় (ওড়িশা), ধর্মবীর ভারতী, শ্যাম পারমার, রঙ্গনাথ রাকেশ, প্রভাকর মাচওয়ে (হিন্দী), উমাশংকর যোশী (গুজরাটি), নবকান্ত বড়ুয়া, পরেশমল্ল বড়ুয়া (অসমীয়া)

অসংখ্য ছবি ও স্কেচ ॥ দাম চার টাকা ॥ এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ॥
অলংকরণে : শ্যামল নন্দী

পদক্ষেপ ১০ হিন্দুস্থান রোড, কলকাতা : ২৯

আমরা জীবনের সাধনা করি, আমরা জীবনসাধক।

বিষয়টা তো বুঝতে পারলাম না বংস, বুঝিয়ে দাও।

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন করেছেন, বোঝাবো, এমন সাধ্য আমার নেই। কালকে আশ্রমগুরুকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন।

এমন সময় শঙ্খধ্বনি হল।

জরা শুধোলে, কোন্ মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনিত হল?

শিষ্যটি বলল, কোন মন্দিরে নয়, তবে মন্দিরশব্দ প্রয়োগ করতে হলে বলা যায়, ভোজনমন্দিরে—এই বলে সে মৃদু হাস্য করলো।

তারপরে বললো, গাত্রোত্থান করুন, ভোজনশালার দিকে যাওয়া যাক।

অতিথিকে অনুসরণ করে জরা ভোজনশালায় এসে পৌঁছল। দেখতে পেল দীর্ঘ দুই সারিতে কুশাসনে ভোক্তাগণ উপবিষ্ট, প্রত্যেকের পাশে এক লোটা জল, সম্মুখে কালো পাথরের থালাতে এক গুচ্ছ পুরোডাশ, শাক, পাথরের বাটীতে মাংস ও পায়সান্ন। এই দীর্ঘ সারির একান্তে একজন বিভূতিসম্পন্ন কান্তিপুরুষ উপবিষ্ট। তিনি বললেন, আর্যগণ, এবারে অনুগ্রহ করে ভোজন আরম্ভ করুন। অতিথি নবাগত অতিথিকে পাশে নিয়ে বসেছিল। জরা বুঝলো, এদের মতবাদ যাই হোক, এরা খায়দায় ভালো, তখন মনে পড়লো - এরা জীবনসাধক। হাঁ জীবনসাধনার উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী বটে। নরেন্দ্রনগর ছাড়বার পরে এমন সুখাদ্য জোটে নি জরার ভাগ্যে, অধিকাংশ সময়েই জুটেছে অখাদ্য ও নিখাদ্য। কাজেই সে যে আগ্রহের সঙ্গে খাবে এ আর বেশি কি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, খাদ্য গ্রহণে সকলেরই সমান আগ্রহ। জরা ভাবে তবে কি এরা সকলেও তারই মতো পেটুক আর্য নাকি। না, তাতো নয়, অতিথির কাছে শুনেছিল যে, সেদিন অতিথির সংখ্যা বেশি। দুপুরবেলাতেও এই সংখ্যা ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুধার এই সজীব রূপ দেখে বুঝলো, এদের জঠরাগ্নি কিছু প্রবল, আর তা হবেই বা না কেন? হিমালয়ের জল ও হাওয়া দুই স্বাস্থ্যের অনুকূল।

কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে জরা লক্ষ্য করলো, এতক্ষণ একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুরোডাশ ও মাংসের প্রতি। এক সারিতে, যে সারিতে সে নিজে উপবিষ্ট ভোক্তাগণ যুবক ও মধ্যবয়স্ক, অনেকে শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য জন্যে দাড়িকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্য সারিতে-যুবকদের মধ্যে শ্মশ্রু ক্ষৌরিত কিন্তু কান্তিমৎ মুখমণ্ডল। অতিথি কানে কানে বলল, এ সারিতে, সমাগত অতিথিগণ, সম্মুখের সারিতে আশ্রমিকগণ, আর ঐ যিনি আহার করতে অনুরোধ করলেন তিনি আশ্রমগুরু চার্বাক। জরা সাগ্রহ বিস্ময়ে তাঁকে দেখল তবে ইনিই বহুজনকে বহুনিন্দিত বহুনিন্দিত ঋষি চার্বাক। কই অভিযোগ্য তো কিছুই নাই তাঁর মধ্যে, শ্মশ্রু দাড়ি ঘটাপটা। এ-কেমন ঋষি!

জরা শুধালো, এত অতিথি সমাগম কি নিত্য হয়ে থাকে।

অতিথি জানালো, তার প্রত্যহ কিছু অতিথি সমাগম হয় তবে আজ কিছু সংখ্যা বেশি।

কোন পর্ব আছে কি?

না আর্য, আগামীকাল এক বিতর্ক হবে।

কি নিয়ে?

অতিথি জানায় এইসব অতিথি বেদবাদী অর্থাৎ আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি মানেন। আমরা মানি না। তর্ক এই দুই পক্ষে হবে।

জরা শুধায়, তোমরা কি পাপপুণ্য মানো না? পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে এক অবস্থা আছে, আমরা তাই মানি।

কি সেটা?

আনন্দ। আমাদের জীবনসাধনা এই আনন্দ উপলব্ধির জন্যে।

শুনেছি বেদবাদীগণও আনন্দ স্বীকার করেন।

করেন কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের পথের ব্যবধান অনেক। আর্য এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে আমি অনধিকারী। আজ রাত্রের মতো ধৈর্য ধরুন কালকে বিচারসভায় সমস্ত অবগত হবেন।

ইতিমধ্যে ভোজন ও আচমন শেষ করে যে-যার কুটীরে প্রস্থান করলো। জরা শয্যায় শয়ন করামাত্র নিদ্রামগ্ন হল।

যে জরা তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে শিকার করে বেড়াতো, বাসুদেবকে হত্যা করেছিল, মদিরার ঘরে ঢুকে মদ খেয়ে মাতলামো করতো সে-জরা আর আজকের জরায় অনেক প্রভেদ। সুমন্তপুরের জরা আর নরেন্দ্রনগরের জরা অনেক তফাৎ, রাজকীয় আচারব্যবহার শিখেছিল বটে সে জরা আজকার জরা নয়: তারপরে দুঃখের অনুশোচনায়, কষ্টের তাড়নায় সংকটে বিপদে পথে-পথে অনেক বছর কেটে গিয়েছে তার। সাধুসঙ্গ করেছে, অসাধুসঙ্গ করেছে, বাঘের মুখে পড়েছে, ডাকাতের তাড়া খেয়েছে, কিন্নর রাজ্য দেখেছে। এইভাবে দুঃখের কটাহে উত্তপ্ত হতে হতে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পেকে উঠেছে; কেতাবীজ্ঞান না পেলেও জ্ঞানের যা সার ভালোমন্দ বিচার করবার কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে। বেদ পুরাণ লোকায়ত মত সম্বন্ধে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকলেও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়েছে। জ্ঞানীদের কথা বুঝতে পারে যদিচ নিজে জ্ঞানী বা পণ্ডিত নয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, চুম্বকশলাকা যেমন নিরন্তর উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনটি একাগ্র হয়ে আছে অভীষ্ট লাভের দিকে, কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই অভিলাষ নিয়ে সে যখন পরদিন প্রাতে বিচারসভায় এসে বসলো দেখলো পাণ্ডিত্যের ধুলো ধূলে চতুর্দিক অন্ধকার করে ফেলেছে উভয় পক্ষের পাণ্ডিতে। কেবল আশ্রমগুরু চার্বাক প্রসন্নমুখে নীরব:

উভয় পক্ষে বিতর্কটা কি রকম হচ্ছে বোঝাতে হলে আধুনিক রণকৌশলের সঙ্গে তুলনা দিতে হয়, অন্য কিছু তুলনীয় তো দেখি না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষ কামানের গোলা চালাতে শুরু করে, গোলাবর্ষণ করে প্রতিপক্ষকে খেঁতলে ঘায়েল করে দেওয়া উদ্দেশ্য, তারপরে প্রয়োজন হলে পদাতিক বা অশ্বারোহী। এ-ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, কামানের গোলার বদলে দুর্বোধ্য দুর্বহ সংস্কৃত শ্লোক। জরার এমন বিদ্যা নেই সংস্কৃত বোঝে, তাই গম্ভীরভাবে নীরব হয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে উভয় পক্ষ যখন রণক্লান্ত তখন শ্মশ্রুমান একজন বেদবাদী বলে উঠল, হে চার্বাক রাক্ষস, সাধ্য থাকে তো প্রমাণ করো যে আত্মা, ঈশ্বর ও পরকাল নাই।

তার অনার্য সম্ভাষণে চার্বাকপন্থীদের একজন বলে উঠল, আশ্রমগুরুর অপমান অসহ্য, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

সেই শ্মশ্রুমান ব্যক্তিটি বলল, অনার্যের সঙ্গে ভদ্রতা অনাবশ্যক:

শিষ্যটি বলল, উনি যে অনার্য সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণ ও ভদ্রতা অবান্তর। যুদ্ধ বিজয়ের পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে, অনাহূতভাবে এই অশিষ্ট ব্যক্তি সভায় প্রবেশ করে সমবেত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাণী উপেক্ষা করে তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল বলল বেদবাদী ব্রাহ্মণটি।

শিষ্য উত্তর দিল, অসংখ্য আত্মীয় ও নিরীহ প্রজার প্রাণের বিনিময়ে লব্ধ সিংহাসন সজ্জনের ধিক্কারের যোগ্য।*

তার উত্তর শুনে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চহাস্য করে উঠল, বলল, স্বধর্মে শত্রু নিধন পাপ নয়, বরং শত্রুনিধন না করাই পাপ: স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাদের বাক্যে লোকায়তগণ বলল, আপনারা অপোগণ্ডের মতো কথা বলছেন, কৃষ্ণ পর্যন্ত মানতে রাজি আছি কিন্তু তিনি যে ভগবান তার প্রমাণাভাব।

বেদবাদীদের একজন বলল, অন্ধের কাছে জগৎটাই প্রমাণের অতীত।

অন্ধ জগৎ দেখতে না পেলেও তাকে স্পর্শ করতে পারে, তাকে আস্বাদ করতে পারে, কিন্তু আপনাদের কে ভগবান প্রত্যক্ষ করেছেন বলুন।

তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হলেও মানস প্রত্যক্ষ।

সে প্রত্যক্ষতা আপনাদের কাছে সত্য হতে পারে অন্যে তা মানবে কেন?

বেদবাদীগণ বলল, তবে তোমরা কি মানো বলো দেখি।

লোকায়তগণ অভিমত প্রকাশ করলো, যা প্রত্যক্ষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যসম্মত তাই মানি, প্রমাণাভাবে অতীন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নাই।

---

* মহাভারতের সমাজ পৃঃ ৬০২, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

নির্মম সত্য

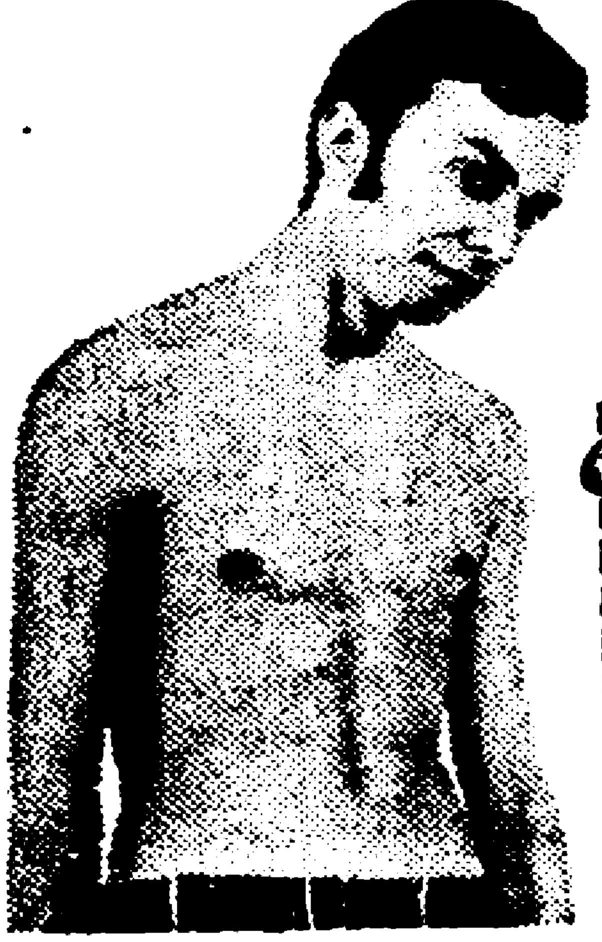

দেখি আপনি কেমন আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। হাতের বাইসেপস ফুলিয়ে পেট ভিতরে টেনে নিয়ে চট করে একবার আপাদমস্তক দেখে নেওয়া নয়-যে চোখে লোকে আপনাকে দেখে সেই ভাবে খোলা চোখে একটার পর একটা ভাবমন্দ বিচার করুন।

নিজের কাঁধের দিকে তাকান, আপনার হাতের উপর ও নীচের দিক, আপনার বুক, কোমর, পা দুটো দেখুন। আয়নায় যদি ঠিক অহংকার করার মত তেমন কিছু না পান-আর যদি সারা-দিনে একটা সহজ, সরল, বিনা পরিশ্রমের আইসো-মেট্রিক "ধরে রাখা"র ব্যায়াম করার জন্যে ৫টা মিনিট খরচ করতে রাজী হন, তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়নার মধ্যের আপনি ও বুলওয়ার্কারের সাহায্যে তৈরী শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও পুরুষোচিত "আপনি" এই দুইয়ের মধ্যেকার ফাঁক আমরা ভরাট করতে পারি। বাধা নিষেধের বালাই নেই।

১৬ বা ৬০ যাই আপনার বয়স হোক, যাচ্ছেতাই রকম মোটা বা রোগা হোন, ইতিমধ্যে অনেক ধরণের ব্যায়াম চর্চা করে থাকুন বা বহু বছর ধরে ব্যায়ামের সাথে সম্পর্ক না থাকুক, বুলওয়ার্কার আপনাকে যে সুনির্দিষ্ট সুফলের গ্যারান্টি দিচ্ছে সেটা মাত্র দু সপ্তাহ পরে আপনি আয়নায় দেখতে পারছেন ও ফিতে দিয়ে সত্যি সত্যি মাপতে পারছেন: আর যদি তা না হয়, এক পয়সাও দিচ্ছেন না। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আজই কুপন ডাকে দিন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন সেলসম্যান আপনার সাথে যোগাযোগ করবেনা।

© Mail Order Sales Pvt. Ltd., 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

হাঁ, বুলওয়ার্কারের যে পরীক্ষিত ব্যায়ামসূচী শক্তিশালী পুরুষোচিত, স্বাস্থ্যবান দেহের গ্যারান্টি দেয়, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।

নাম ....

ঠিকানা ....

.... রাজ্য ....

A. M. — 3

BULLWORKER SERVICE,
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন

তবে তোমরা আত্মা মানো না, কেন না তা প্রত্যক্ষ নয়।

নিশ্চয়ই মানি না।

তবে তো দেখছি তোমরা ঈশ্বর, পরকাল, ধর্মনীতি বিবেক কিছুই মান না।

একথা সত্য স্বীকার করলো লোকায়তগণ। তারা আরও বলল, ঈশ্বর, পরকাল ধর্ম প্রভৃতি অলীক কল্পনা। রাজন্যগণের প্রেরণায় অতিমাংসপরায়ণ পরপিণ্ডভোজী ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি। ও এক প্রকার মানসিক মদ।—ঐ মদ পান করিয়ে জনসাধারণকে বিকল করে রাখা হচ্ছে।

কেন বলো তো বাপু, শুধলো একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

এই জন্যে যাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে থাকে রাজাদের হাত থেকে নিজেদের প্রাপ্য ছিনিয়ে না নিতে পারে।

ধরো তোমার কথা যদি সত্যই হয় তাতে ব্রাহ্মণগণের লাভ কি?

লাভ রাজপ্রসাদ।

ব্রাহ্মণগণ দীন জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, সামান্য আতপ চাল ও ঘৃতের বেশি তাদের প্রয়োজন হয় না তবে কেন অন্যায়ভাবে রাজপ্রসাদ বাঞ্ছা করতে যাবে।

তা নইলে যে ঐটুকু মেলে না। পরজীবী পরাশ্রয়ী পরান্নভোজীদের জীবন ধারণের আর কি উপায়।

এসব দুর্মতি অর্বাচীনের মতো, অর্বাচীনরাই এতে মুগ্ধ হবে। আচ্ছা বাপু, তোমরা তো আত্মা ঈশ্বর পরকাল কিছুই মানো না, তবে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

লোকায়তদের একজন বলল, সুখ লাভ!

সুখ লাভ তো পরকালবাদীদেরও কাম্য, তবে তফাৎটা কোথায়?

তফাৎটা পন্থায় ও সাধনরীতিতে।

সকলে চেয়ে দেখল আত্মগুরু এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিলেন এবার বলে উঠলেন, বেদবাদীদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ লোকায়তগণের লক্ষ্যে প্রভেদ নাই—প্রভেদ সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ে।

সমস্ত বেদবাদীগণ দীর্ঘ চমরের মতো দাড়ি সঞ্চালিত করে বলল, আর একটু খুলে বলুন।

প্রত্যুত্তরে চার্বাক শুরু করলেন—আপনারা তপস্যা তিতিক্ষা কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে অহরহ কণ্টকিত করে রেখেছেন। অনাহারে অনিদ্রায় জোমর্যাহতো নিজেকে ক্লিষ্ট করেন, কেমনা, আপনাদের ধারণা ঐ সব প্রক্রিয়ার পরিণামে সুখ লাভ করবেন। কিন্তু শতকরা নিরানব্বইজন ঐসব অযোগ্য প্রক্রিয়ার পরিণামে দেহরক্ষা করেন, সুখলাভ আর ঘটে না।

ব্রাহ্মণগণ বলল, ইহলোকে না হোক পরলোকে হয়।

চার্বাক বলেন, পরলোক যে আছে তা তো প্রমাণ হয় নি। আর তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাই যায় যে পরলোক আছে তবু আমাদের জিৎ।

কেমন করে দাবী করে বেদজ্ঞগণ।

আমরা ইহলোকে হাতে হাতে সুখলাভ করি, কোন অনির্দিষ্ট পরলোকের জন্য তা মুলতুবি রাখি না।

ব্রাহ্মণগণ বলে, আমাদের সাধনপন্থা তো বিবৃত করলে এবারে তোমাদের সাধনপন্থা কি শুনি।

বিলক্ষণ বলে পুনরায় শুরু করেন চার্বাক। জীবনকে বঞ্চিত করো না, পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাদের ভোগ্য জোগাও। হাতে হাতে সুখ পাবে। রসনা সুখাদ্য চায় তাকে বঞ্চিত করো না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধ চায় গন্ধ পুষ্প ও সুরভিতে গৃহ পূর্ণ রাখো, শ্রবণেন্দ্রিয় মধুরধ্বনি প্রত্যাশা করে সুরম্য সঙ্গীত শ্রবণ করো, ত্বক ও উপস্থ নারীর স্পর্শ কামনা করে সুন্দরী যুবতী নারী উপভোগ করো—এই আমাদের সাধনরীতি। এভাবে যদি চলো তবে জরামরণরহিত হয়ে চিরপুণ্যলোকে মানুষ বিরাজ করতে পারবে। পারবে নয় পারে, হিমালয়ে অনেকগুলি কিন্নর রাজ আছে সেগুলি দেখে আসুন।

তারপরে তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শুধোলেন, মহাশয়, আমার বয়স কতো অনুমান করেন?

একজন তাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে বলল, যে রকম নাদুসনুদুস দেখছি চল্লিশের ঊর্দ্ধে নয়।

চার্বাক বলল, আমার বয়স দুই হাজার বছর, আরও অন্তত দুই হাজার বছর বাঁচবো, হয়তো বা চিরজীবীও হতে পারি। এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আপনাদের বৃদ্ধতমের বয়স কত?

এই অভাবিত প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল ব্রাহ্মণগণ। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানালো এই যে উন্মাদক যাঁর ইনিই আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এঁর বয়স চুরাশি।

তবেই দেখুন বেদজ্ঞমহাশয়গণ এই সামান্য বয়সে ভ্রান্ত সাধনপন্থা অবলম্বনের ফলে আপনারা শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গিয়েছেন। আমার এই সৌম্য শিষ্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠতমের বয়স চুরাশির অনেক বেশি। এরা সকলেই ভোগী, সুখী ও দীর্ঘকায়।

একজন বেদজ্ঞ বলল, মহাশয়, ক্রমাগত ভোগে যে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে, ক্রমে উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, ধবজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়, রোগ ও জরা মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে এসে আক্রমণ করে তখন সুখ যে মাথায় ওঠে।

চার্বাক বলল মহাশয়গণ ভুল করবেন অতিরিক্ত ভোগেই ঐসব পরিণাম ঘটে, অতিরিক্ত ভোগে অগ্নিবর্ণ নষ্ট হয়েছিল, অতিরিক্ত ভোগে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত। ভোগ ও অতিরিক্ত ভোগে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই দেখুন না কেন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনে অকালে আপনারা শুষ্ক শরিতকিতে পরিণত হয়েছেন। সর্বমধ্যমং গার্হস্থ্য। আরও যদি অনুস্বর-বিসর্গযুক্ত বাক্য শুনতে চান তবে বলি—সাত্ত্বিকভাবে নিয়মিত সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। বিচার করে নিয়মিত ভোগ করলে ইহজীবনেই পরম সুখ লাভ করবেন তখন নিজেকে ভোগ্য দেবার জন্যে ঈশ্বর-ঈশ্বর পরকাল-ফরকাল কল্পনা করবার প্রয়োজন হবে না।

চার্বাকের যুক্তির মধ্যে যতই ফাঁক থাকুক সে ফাঁক ধরবার মতো বিদ্যা উপস্থিত বেদবাদীদের ছিল না তবু তারা তাকে তর্কাপি মচকায় না।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, বেশ ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি যেন নাই—কিন্তু জড়জগতে চৈতন্য এলো কি ভাবে?

চার্বাক বলল, চৈতন্যরূপে স্বতন্ত্র কিছু কল্পনা করবার প্রয়োজন নাই, চৈতন্য জড়েরই বিকার। এই ধরুন না কেন তণ্ডুল, গুড় প্রভৃতি নানা দ্রব্যের কল্ক মিলিত হলে দুইটিতেমিলনের মধ্যে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয় সেই যথাযথ সমাবিষ্ট পঞ্চভূত থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়—অগ্নি তো কাষ্ঠেরই অবস্থান্তর। অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চালিত করে সেই সমুৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে চালিত করে। অতএব কাজ কি, ভোগবস্তুর ভোক্তৃত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত শরীরাতিরিক্ত জীব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কাজেই চৈতন্য জড়ের মধ্যেই বর্তমান।

চার্বাকের ব্যাখ্যা শুনে বেদবাদী কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে সমস্বরে বলে উঠল, ধিক্ পাপ আলোচনা। এ নরককুণ্ডস্থানে আর তিলার্ধকাল অবস্থান করা উচিত নয়।

এই বলে তারা গাত্রোত্থান করে চার্বাকের শিষ্যগণ করতে করতে সদলে প্রস্থান করলো, চার্বাকের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপরোধে বিচলিত হল না।

এতক্ষণ একান্তে বসে জরা সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল এবং শুনছিল, কতক বুঝতে পারছিল, কতক পারছিল না। সবাই চলে যাওয়ার পরে একমাত্র দণ্ডায়মান ব্যক্তি হওয়ায় সহজেই চার্বাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চার্বাক বলল, মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি বেদবাদীগণের সঙ্গে প্রস্থান করেন নি। আপনি দয়া করে আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

জরা উত্তর দেওয়ার আগেই অর্জান তার বিবরণ নিবেদন করলো, বললো গত রাত্রে তিনি এসেছেন, আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে।

তখন চার্বাক বলল, বড়ই আনন্দিত হলাম, তা কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি।

জরা করজোড়ে নিবেদন করলো, প্রভু, আমি মূর্খ, দেশান্তে ব্যাধ। শাস্ত্র জানিনা, এই যে আলোচনা হচ্ছিল তার সামান্যই বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আমি জড়বাদী বা চৈতন্যবাদী কিছুই নই। আপনারা সুখসাধক, আর আমি ঘোরতর দুঃখী।

চার্বাক স্নিগ্ধভাবে শুধালো, কিসের দুঃখ আপনার।

প্রভু, আমি মহাপাপী। সেই পাপ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করে আমি দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুনেছি হিমালয় তাবতের সকল সমস্যার সমাধান, সকল তর্কের মীমাংসা, সকল সন্ধানের শেষ লক্ষ্য।

তাই এখানে এসেছি যদি আমার কোন একটা গতি হয়।

জরার বাক্য শ্রবণ করে চার্বাক অধোবদনে নীরবতা অবলম্বন করলো, উত্তরপ্রত্যাশী জরা করজোড়ে উন্মুখ হয়ে বসে রইলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষে বাক্‌স্ফূর্তি হল না। অবশেষে চার্বাক মুখ তুলে বলল, আর্য, আপনি লোকায়ত তত্ত্বের মর্মে আঘাত করেছেন।

জরা সকাতরে শুধালো কেন প্রভু?

চার্বাক বলল, সংসারে সকলেই সুখের প্রত্যাশী, সকলেই সুখের সন্ধানে আমার কাছে আসে, এ পর্যন্ত কেউ পাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় আমার কাছে আসেনি, কাজেই ও সমস্যার সম্মুখে আমাকে কখনো পড়তে হয়নি। এই প্রথম। আজ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পারলাম আমার তত্ত্বে এমন কোন উপায় নাই যাতে দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পারে, পাপীর পাপমুক্ত করতে পারে।

তার কথায় জরার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, সেটুকু এড়ালো না চার্বাকের চোখ। তিনি বললেন, পাপ তাপ দুঃখের ঊর্ধ্বে সুখলোক, লোকায়ত তত্ত্ব সেই সুখের সন্ধান জানে। এ তত্ত্ব স্বাস্থ্য সঞ্চার করতে সমর্থ, রোগমুক্ত করতে পারে না। স্বভাবতই সুখলাভের উপায় আবিষ্কার করেছি, ভেবেছি সংসারকে সুখময় করে তুলবো কিন্তু পাপীকে দুঃখীকে কিভাবে সুখলোকে উদ্বর্তন করানো যায় কখনো চিন্তা করিনি। কাজেই, আর্য, আপনার প্রার্থনার কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে লোকায়ত তত্ত্বের ক্ষমতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী নয়—এর সীমা আছে। কাজেই স্বীকার করতে বাধা হচ্ছি আপনার গতি নির্দেশ করবার শক্তি আমার নাই।

চার্বাকের সরল স্বীকারোক্তি শুনে জরা নীরবে অধোবদনে অশ্রুমোচন করতে লাগলো। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো, তাকে দেখে আহ্লাদিত হয়ে চার্বাক বলল, সখা আনন্দ, অনেককাল পরে তোমার দর্শন পেয়ে মন খুশী হল, এসো আমার কাছে উপবেশন করো।

জরা দেখল নবাগত আশ্রমিকগণের ন্যায় চিরতরুণ নয়, তার দেহে বয়সের লক্ষণ বিদ্যমান, বয়স পঞ্চাশের কাছে হবে।

চার্বাক শুধালো, তোমার তো ঘুরে বেড়ানো চিরকালের অভ্যাস, বলো, এবার কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, তোমার কথা সত্য, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেই আমার আনন্দ, আমি দীর্ঘকাল একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না।

সে তো জানি কিন্তু এবারে এখানে কিছুকাল স্থায়ী হও।

আনন্দ স্বীকার করে যে তার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, বলে কিছুকাল থাকবো তবে কতকাল বলতে পারি না নিয়তি ইঙ্গিত করলেই আবার পথে বের হয়ে পড়তে হবে।

সে দেখা যাবে, এখন বলো কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, এখন সোজা আসছি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে! আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করে চার্বাক। বলো সেখানকার সংবাদ কি?

অনেক সংবাদ। দ্বারকার যদুবংশ আত্মনাশ করে লোপ পেয়েছে। বলভদ্র ও বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন আর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছেন।

চার্বাক শুধায়, এসব কতদিনের কথা?

তা অনেকদিন হল বইকি। সাত আট বছর হতে পারে।

বলো কি। এতদিন হয়েছে, আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।

জানতে পারবে কি করে? তোমার আশ্রম হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকায় সুখলোকে, পৃথিবীর দুঃখের এখানে প্রবেশ অনধিকার। ভ্রাতঃ চার্বাক, দুঃখের মহাসমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র এই সুখের দ্বীপ রচনা করায় লাভ কি লাভ? এ দ্বীপে কজনের স্থান হবে?

নৌকা বানচাল হলে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে যে কয়জনের স্থান হয় তাই লাভ। সকলে মিলে ডুবে মরার চেয়ে যে কজন বাঁচে।

ভ্রাতঃ আনন্দ, তোমার কথার মূল্য এইমাত্র বুঝতে পেরেছি। তোমার আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই আর্য—এই বলে দেখালেন অধোবদনা জরাকে, পাপ থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তুমি কি উত্তর দিলে?

জানালাম যে এ সমস্যার উত্তর দান আমার ক্ষমতার অতীত। অন্ততঃ লোকায়ত তত্ত্বের সীমানা বুঝতে পেরেছি। এ বিষয়ে তোমার সাথে পরে আলোচনা করবো, এই আর্যের সঙ্গেও পরে আলোচনা হবে। এখন বলো দেবাদ বকপাতে বিজিত পাণ্ডব সন্তানদের কি সংবাদ।

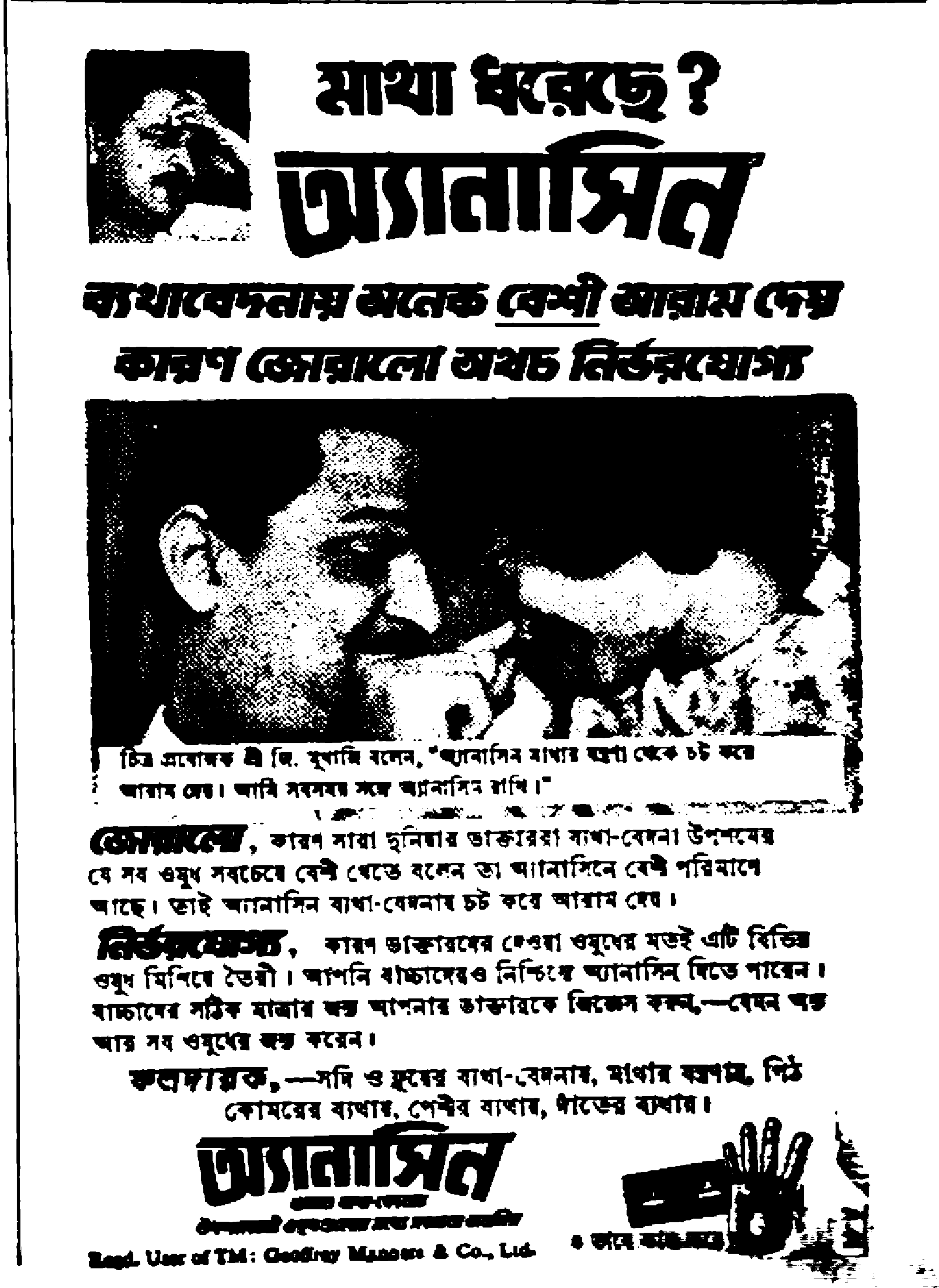

সে সংবাদ না শোনাই ভালো।

কেন এমন কথা আনন্দ।

নামে সাম্রাজ্য কাকে বলে অরাজকতা, তারপরে এখন যাঁটি ভেবে না।

এই দুঃসংবাদে চার্বাক ও জরা দুজনেই উৎসুক হয়ে উঠল, চার্বাক প্রকাশ্যে, জরা মনে মনে।

খুলে বলো আনন্দ।

আনন্দ আরম্ভ করলো, দুর্যোধনের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে রক্ত পৌঁছয় না দেহের সীমান্তে, দেহে দেখা দেয় জরা ও মৃত্যুর আভাস। পাণ্ডব সাম্রাজ্যেও আজ সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ। একদিকে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ, আর সেই সঙ্গে তাল রক্ষা করে অন্তর্গত প্রজাবিদ্রোহ। একটাকে সামলাতে পারে এমন শক্তি কোন্ রাজার। রাজা দুর্বল, ঘটনাচক্রের দাস। আদেশ প্রচারিত হয়, পৌঁছয় না তা সীমান্তপ্রদেশসমূহে, আর যদিবা পৌঁছয় সামন্ত ও রাজকর্মচারীগণ তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে যায়।

কী তাদের ইচ্ছা?

সকলেরই ইচ্ছা ছিন্নভিন্ন সাম্রাজ্যখণ্ড নিয়ে রাজ্যস্থাপন করে। তখন একজনের ইচ্ছার সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছার সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রজাসাধারণ সুযোগ বুঝে একদিকে যোগ দেয়—দুর্বল পিষ্ট হয়ে মরে। অনেকেই লোকে কাজটা অন্যায়, কিন্তু দুপক্ষে কি হবে নিছক প্রাণরক্ষার তাগিদে যে কোন দিকে যোগ দিতে বাধ্য হয়। প্রভু চার্বাক পাণ্ডব সাম্রাজ্যে আজ কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয়, যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন উপলক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তির প্রাণ যেতে পারে। এই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার্বাক সমস্ত নীরবে শুনে বললেন, দেশের সবগুলি আলো একে একে নিভে গেল।

আনন্দ বলল, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে গেল অধিকাংশ, তার পরে বাসুদেবের তিরোধানে আর সর্বশেষ পাণ্ডবগণের মহা-প্রস্থানে বাকি কটা গেল।

উজ্জ্বলতম আলোটা গেল বাসুদেবের সঙ্গে।

নীরবে সমর্থন করলো আনন্দ। তখন চার্বাক বললে, শুনেছি এক ব্যাধের শরা-ঘাতে বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন।

আমিও সেইরকম শুনেছি চার্বাক। ভেবে পাইনে ব্যাধটা কেন মহাপুরুষকে মারতে গেল।

চার্বাক বলে হয়তো না জেনে মেরেছে।

তা-ও কি সম্ভব সংক্ষেপে মন্তব্য করে চার্বাক। তারপরে বলল, না জানি সেই হতভাগ্যের মনে কী আত্মগ্লানি অনুভূত হচ্ছে, না জানি কী হল তার পরিণাম।

কে রাখে তার সন্ধান, মন্তব্য করলো আনন্দ।

চার্বাক কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বলল, আনন্দ এই যে মহাপাপ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত পাপের গ্লানিতে সংসার পরিত্যাগ করে ইনি পথে পথে মুক্তির উপায় সন্ধান করে ফিরছেন। কি পাপ ইনি করেছেন জানি না, তবে এমন আর কি গুরুতর হবে। একটা সাধারণ পাপে যদি এত গ্লানি হয় তবে বাসুদেবকে হত্যার পাপে না জানি কি দাবানল জ্বলছে সেই অভাগা ব্যাধটার মনে।

এতদিনে বোধকরি আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়িয়েছে লোকটা।

সে পাপের গ্লানি কি এক জীবনে দূর হওয়ার।

একি কথা তোমার মুখে চার্বাক। তুমি তো পরকাল মানো না।

আমি মানি না সত্য কিন্তু সে লোকটা তো মানে। তাহলে হল। অনেক বিষয় আছে যার অস্তিত্ব নির্ভর করে মানা না-মানার উপরে।

তারপরে চার্বাক জরাকে সম্বোধন করে বললে আর্য এখন চলুন স্নানাহারের উদ্যোগ করা যাক। সন্ধ্যাবেলায় আপনার সঙ্গে আবার আলোচনা করবো।

৭

সন্ধ্যাবেলায় চার্বাক ও জরার মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল. আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

চার্বাক বলছিলেন আর্য, আমার দ্বারা আপনার অভীষ্ট লাভ হল না, পাপ থেকে মুক্তির সন্ধান দান আমার ক্ষমতার অতীত। কিন্তু আপনার দ্বারা আমি লাভবান হয়েছি।

চার্বাকের স্বীকারোক্তিতে জরা লজ্জিত হয়ে বলল, এমন করে বলবেন না, ওতে আমার পাপের ভার আরও বাড়ে যে।

সত্যভাষণে পাপ বাড়বে কেন? আর আমার এই উক্তি অত্যন্ত নির্মম সত্য।

কেমন প্রভু, শুধোয় জরা।

আপনার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পেরেছি লোকায়ত তত্ত্ব নীরন্ধ্র নয়। বেদবাদীরা যদি ভ্রান্ত হয় তবে লোকায়ত তত্ত্বও অভ্রান্ত নয়। বেদ নির্দিষ্ট পন্থা যদি সুখ দিতে না পারে তবে লোকায়ত পন্থাও দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। লোকে কখনো না কখনো কোন না কোন অবস্থায় পাপ করবেই। সেই পাপ থেকে মুক্তির পন্থা যদি না থাকে তবে তো জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে।

সত্যিই কি মুক্তির পন্থা নেই প্রভু?

অবশ্যই আছে তবে তা লোকায়তগণ ও বেদজ্ঞগণ কেউ জানে না।

তবে পাপীর কি গতি হবে প্রভু!

সেই প্রশ্নই তো আজ সারাদিন নিজেকে করেছি।

উত্তর?

পাইনি বললেন চার্বাক।

তবে?

হতাশ হওয়ার কারণ নেই আর্য, আমি না জানলেও কেউ না কেউ অবশ্যই জানবে।

আপনার মতো জ্ঞানী যদি না জানেন—

তাকে বাক্যটি সম্পূর্ণ করবার অবসর দিলেন না চার্বাক, বললেন, আমি জ্ঞানের সাধনা করিনে, কেবল আনন্দকে পাবো বলে মগ্ন হয়ে ছিলাম। আজ আপনার প্রশ্নে বুঝতে পারলাম জীবনে একটা অন্ধকার দিক আছে। এতদিন তার সন্ধান জানতাম না, এবারে সেই চেষ্টা করবো। জানি না তার পরিণাম কি? আমি যে কৃত্রিম সুখলোক নির্মাণ করেছি তাতে ফাটল প্রবেশ করবে।

তার ফলে?

তার ফলে দুদিকে উঠবে পাতা, ঝরে পড়বে ফুল, ফল ফলবে বিষময়।

দুঃখের সঙ্গে জরা বললে, আমি এসে দুর্বিপাকটি ঘটালাম।

মোটেই নয়, আপনি এসে আমার মুখ ফেরাতে বাধ্য করলেন সেই দিকে যে দিকটা আমি এতকাল অস্বীকার করেছি। বেদ-বাদীরা আমাদের পরিহাস করে বলে যে, আমাদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, ঋণ করেও খাবে, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে আর ফেরে না। ভস্মীভূত দেহ আর ফেরে কি না ফেরে জানি না, তবে আপনাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগেও মানুষ পলে পলে দগ্ধ হতে পারে। আপনাকে নমস্কার। রাত অনেক হয়েছে এখন বিশ্রাম করুন।

জরা বললে, প্রভু, আমি বিদায় নিয়ে রাখছি ভোররাতে আবার পথে নামবো।

কে বলতে পারে হয়তো পথেই আপনার অভীষ্টলাভ হবে, বলে বিদায় দিলেন চার্বাক ঋষি।

এর পরে কি আর জরার ঘুম হওয়া সম্ভব! তার মনে পড়লো সন্ধ্যাবেলায় আনন্দর মুখে শুনেছিল দেশ এখন সম্পূর্ণ অরাজক, সাধু নির্জিত অসাধু প্রবল; রাজা অবজ্ঞাত রাজকর্মচারী আত্মাভিমুখী; বহিঃশত্রু সমাগত অন্তঃশত্রু সমুদ্যত। অরাজকতা আর কাকে বলে। এখন তার মনে হ'ল তার হৃদয়টারও সেই অবস্থা। অরাজক অরাজক ঘোর অরাজক তার উপরে অন্ধকার। আলোগুলো একে একে নিভেছিল, এক সর্বনাশা দমকায় উজ্জ্বলতম আলোটা নিভে গিয়েছে।

আর অদৃষ্টের নিদারুণ বিদ্রূপ। সাধারণ পাপীর যদি এত আত্মগ্লানি হয় তবে না জানি বাসুদেব হত্যাকারীর গ্লানি কি ভয়ানক মন্তব্য করেছিলেন চার্বাক। যদি তিনি জানতেন সেই নরাধম সেই মুহূর্তে তার সম্মুখে উপস্থিত। তা হলে না জানি কি কাণ্ডই ঘটতো। হঠাৎ তার কি কারণে জানি না হাসি পেলো—হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলো। তারপরেই সেই হাঃ হাঃ শব্দ হায় হায় শব্দে পরিণত হ'ল আর হাসির বাষ্প গলে গিয়ে দুই চোখ জলে ভেসে গেল। জরা কি পাগল হয়ে যাবে নাকি। তখন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি বলে হাসি-কান্নাকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল—বাসুদেব বাসুদেব, রক্ষা করো। তোমার হত্যাকারীকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো। বাসুদেব, বাসুদেব, বাসুদেব।

(ক্রমশঃ)

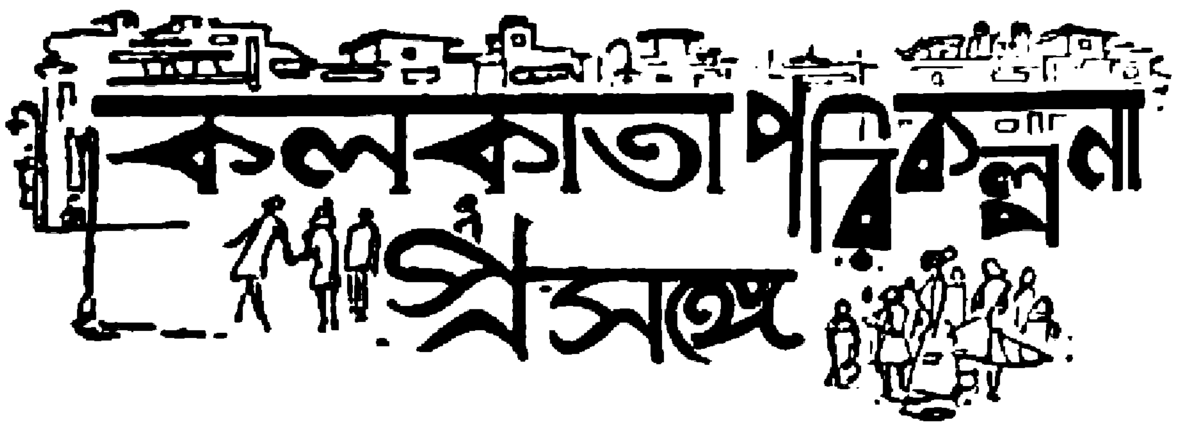

প্রিয় গুহ

অনেক কাল ধরে অনাদৃত ও অবহেলিত এই কলকাতার তথা বৃহত্তর কলকাতার ওপর নজর পড়েছে। ঠিক হয়েছে এবার তার সংস্কার করা দরকার। এ দরকার অনেকদিন আগেই হয়েছে, কিন্তু বহু কারণে তার রূপায়ণ হয়নি। কোনো বিসম্বাদ বা বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে,—যা করার প্রচেষ্টা আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ও পরিকল্পনার সমবেত চেষ্টা এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সাহচর্যই কাম্য। দেশের ও দশের উপকার হওয়া দরকার, অন্যায়ে বা ন্যায়ে দলীয় মতের স্বপক্ষে যদি তা না হয় তাহলে হওয়ার দরকার নেই এই রকম একটি মনোভাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছা তার ঊর্ধ্বে উঠবে এইটাই আশা করা যায়। এই সম্পর্কে পরিকল্পনাকারী সংস্থার নিজ দায়িত্ব-সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে চললেই অসঙ্গতি ও বাদানুবাদের উপর সঙ্কুলতায় পরিকল্পনার ধারা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। কয়েকটি মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক কথা এই প্রসঙ্গে এই জন্যই বলা প্রয়োজন। এইগুলি কারিগরি বা কুশলীদের বুদ্ধি বা কৌশল প্রয়োগের সহায়ক হবে বলেই এবং সেগুলি প্রকৃত বাস্তব ব্যবহারে কার্যকরী করার জন্য প্রথমেই বিচার করে দেওয়া দরকার।

প্রথমতঃ যারা এই পরিকল্পনার ধারক-বাহক সংস্থা তাদের দায়িত্ব এবং নির্দেশনা কী? এদের নাম কলকাতা-নগর-উন্নয়ন প্রাধিকার। (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি (সি এম ডি এ)।

১৯৭০ খৃঃ ১৬ জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর সতেরো নম্বর হুকুমনামা বা অ্যাক্টের মাধ্যমে এই সংস্থার গোড়া-পত্তন করেন এবং তাতে এই আইন প্রণয়নের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমেরিকার ফোর্ড সংস্থার সহযোগিতায় একটি উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং তারা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন কার্যে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ১০৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং বিভিন্ন কারণে তার রূপায়ণ বিঘ্নিত হওয়ায় এবং রাজ্যের রাজস্ব বা আয় কিম্বা জাতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় রাজ্যের জন্য বিভাজিত অংশ থেকে একে সম্পূর্ণ রূপায়িত করার অসুবিধা থাকায় দ্রুত কর প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—যার দ্বারা এই উন্নয়নের সূচনা করা সম্ভব। ইতিমধ্যে অবশ্য এই পরিকল্পনা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে এবং কলকাতার চারদিকের ছোট ছোট পৌর সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন বিবেচনায় একটি মুখ্য সংস্থার গোড়া-পত্তন করা জনহিতার্থে দরকার হয়ে পড়ে।

বৃহত্তর কলকাতার পরিধি ও পরিমাপ কী তা ১৯৬৫ খৃঃ ১৪ নম্বর বিধিবদ্ধ আইনের স্থিরীকৃত হয়েছে এবং তার বিস্তৃতি ভাগীরথীর দুই পারের বিভিন্ন পৌর অঞ্চল এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এমন একটি বিরাট অঞ্চল যে তার উন্নয়ন কার্যে বহু শত কোটি টাকার প্রয়োজন।* —উন্নয়ন তো শুধু ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, জল নিষ্কাশন, পানীয় জল ইত্যাদি নিয়েই নয়, এর সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্যান্য আপাত অপরিস্ফুটমান বহুবিধ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নও সংযুক্ত।

সি এম ডি এ তো তৈরি হোল। কে তার ধারক, বাহক এবং সংযোজক? এঁরা কে এবং এঁদের দায়িত্ব এবং অন্যান্য অধিকার কী কী?

এতে আছেন—

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—সভাপতি। অভাবে রাজ্য সরকারের মনোনীত ব্যক্তি।

২। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের কমিশনার।

৩। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অন্তর্গত নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা বিভাগের কমিশনার।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক-সঙ্গতি সম্বন্ধীয় কমিশনার।

৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচিত অনূর্ধ্ব তিনজন ব্যক্তি যার মধ্যে—(ক) একজন কলকাতা পৌরসভা সদস্য বা কাউন্সিলার। (খ) দুইজন বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত কোন পৌরসভার সদস্য যারা সি এম ডি এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই পদাধিকার বলে মনোনীত এবং সেইজন্য ধারাবাহিক-

*Calcutta Metropolitan Planning Area (use and Development of Land) Control Act 1965 West Bengal Act XIV of 1965.

দুটি নতুন ধরনের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের

নেতার হাটের রহস্য ৩·৫০

তীর্যক রেখা ৩·৫০

আমাদের অন্যান্য বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অহিংসা ৭·৫০ **দিবারাত্রির কাব্য** ৫·০০

মাঝির ছেলে ৩·৫০ **অতসীমামী** (যন্ত্রস্থ)

নরেন্দ্র ঘোষের — **যেন এক নদী** ৩·০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর — **যৌবনকাল** ৫·০০

লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

তার অভাব সম্ভাব্য—এবং এর মধ্যে কেউ পরিকল্পনা কুশলী নন। সাধারণ বুদ্ধির প্রাধান্য হয়ত সম্ভব কিন্তু পরিকল্পনাগত বিশেষ বুদ্ধি বা বিদ্যার সম্পূর্ণ অভাব। এর সহায়ক কার্যনির্বাহক সমিতিতে তাঁরা আছেন. (পরে দ্রষ্টব্য) এখানে না থাকার যৌক্তিকতা কিংবা রাজনীতি বা আমলা তান্ত্রিকতা দুষ্ট বলে মনে হতে পারে।

কতকগুলি আইনগত বাধ্যবাধকতা যাতে টাকা নেবার এবং দেবার, সভা আহ্বান এবং তাতে সিদ্ধান্ত নেবার, সহ-সভাপতি নির্বাচন করবার, সভার কার্য এবং যাহা খরচ ইত্যাদি মঞ্জুর করার অধিকার এবং কাজ করার ও করাবার সমস্ত আইনগত অধিকার এই আইনে অন্তর্ভূত করা আছে। এই সংস্থার উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পৌরসভার সদস্যরা তিন বছরের জন্য স্থায়ী যদিনা তার ভেতর পদাধিকার পরিবর্তিত হয় এবং সেক্ষেত্রে সরকারের পুনর্নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে।

শুধু সংস্থা গড়লেই তো হোল না, তাকে চালাবার এবং তার নির্দিষ্ট কাজ করার অর্থ কোথা থেকে আসবে? তিনটে উপায় নির্ধারিত হয়েছে:—

প্রথম দুগ্ধ কর—কলকাতায় যাবার সিকি বা পরোক্ষভাবে কোন মালের প্রবেশের উপর যে কর বা শুল্ক আদায় হবে সেই অর্থ. *

দ্বিতীয় ভূমি উন্নয়ন কর—এবং

তৃতীয়, রাজ্য সরকার বা অন্যান্য অধিকার বা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ। এখানে অবশ্য পরিষ্কারই বলে দেওয়া হোল যে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনকে দাতা হিসাবে অন্তর্গত করা হোল। —এটা অবশ্য বোঝা গেল না যে কোন বিদেশী বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য ইত্যাদি এর মধ্যে পড়বে কী না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমেই এককালীন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অবশ্য এগিয়ে এসেছেন।

মোটামুটি ভাবে এই হোল সংস্থার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপর যে প্রাসাদ গড়তে হবে তাতে অনেকের সাহায্য, অনেকের সহযোগিতা দরকার। এই সংস্থার কার্যকলাপ বিধিবদ্ধ করা সংস্থার স্থাপনা করা এবং সুষ্ঠু সন্নিবেশনার জন্য একটি উপদেষ্টা দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তার

*Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Act 1970

দিক বুদ্ধির অবতারণা করার কোন অবকাশ নাই। এই উপদেষ্টা দল স্বভাবতই কলকাতার এবং রাজ্য সরকারের এই জাতীয় কাজে রত যে সমস্ত বিভাগ এবং আধি-কারিক সংস্থা নিযুক্ত আছে তাদের নিয়ে গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়,—কারণ, তারা জানে এবং বোঝে কোথায় কতটা এবং কী প্রকারে উন্নয়নের কাজ সহজে রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে এই দলটি এমন একটি বিরাট ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে যে শেষে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের পর্বে পৌছান অসম্ভব নয়। তবে সবই নির্ভর করে উপরের লোকের পরিচালন ক্ষমতা এবং সরকার ও এই সংস্থার সদিচ্ছা এবং প্রচেষ্টার উপর। এই উপদেষ্টা দলটি হোল :—

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—সভা-পতি।

২। সি এম ডি এর সহকারী সভা-পতি—যাকে প্রাথমিক সংস্থায় নির্বাচন করা হবে এবং প্রাথমিক সংস্থার যিনি একজন সদস্য।

৩। কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি।

৪। কলকাতা পৌর সংস্থার কমিশনার।

৫। নগর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য কলায় পারদর্শী দুজন—যাদের পশ্চিম-বঙ্গ সরকার মনোনীত করবেন।

৬। সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মনোনীত একজন।

৭। কলকাতা পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা বা পৌরসংস্থা থেকে সরকার দ্বারা মনোনীত তিনজন।

৮। কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর পক্ষে সরকার মনোনীত একজন।

৯। কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে সরকার মনোনীত একজন।

১০। বৃহত্তর কলকাতা জল এবং স্বাস্থ্য-উৎকর্ষ সাধন পর্যদের একজন। *

১১। বৃহত্তর-কলকাতা - পরিকল্পনা সংস্থা পক্ষে সরকার মনোনীত একজন। *

১২। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা পক্ষে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন।

১৩। বৃহত্তর কলকাতা রেল পরি-বহনের মুখ্য আধিকারিক।

১৪। সরকার মনোনীত চারজন।

*Calcutta Metropolitan Water-Supply and Sanitation Authority

*Calcutta Metropolitan Planning Organisation

এছাড়া অবশ্য প্রয়োজনমত কার্য-নির্বাহক সমিতি নিয়োগ করার অধিকার সি এম ডি এর থাকবে। অবস্থানুযায়ী এই সব সভা সমিতি আসন পরিগ্রহ করবেন এবং তাদের কার্যপদ্ধতি, পারি-শ্রমিক এবং অন্যান্য কার্যকরী বিষয় সম্বন্ধে বিধি রচনা করা হবে।

এই বৃহত্তর উন্নয়ন সংস্থা এবং তার আইনগত অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত কিছু ঠিক হবার পর তার দায়িত্বের বিশ্লেষণে অনেক খুঁটিনাটি কথাই আইন-গতভাবে বলা হয়েছে কিন্তু আসল বক্তব্য হোল যে সে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং তাকে কার্যে পর্যবসিত করবার একমাত্র সার্বিক সংস্থা। এর থেকে বেশী জানবার প্রয়োজন সাধারণ লোকের দিক থেকে আর কিছু নেই, তবে একটা ভুল ধারণা লোকের মনে হতে পারে যে কাজের সমস্ত দায়িত্বই বুঝি তাদের। এটা ঠিক নয়. এই জন্য যে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট দায়িত্ব বৃহত্তর কলকাতা পরিকল্পনা সংস্থার সাহায্যে তৈরী হোলেও উপরে উল্লিখিত সকারি অধিকারই এর সঙ্গে জড়িত এবং কাজ করার দায়িত্ব যে যে সংস্থার উপর অর্পিত হবে সেটুকু বিশেষভাবে তারই। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তর যেই যে কাজ করুক না কেন সেই কাজের তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে এবং মুখ্যত তাদেরই। গাফিলতি বা পরিদর্শনের বিশেষ ভুল-ত্রুটি ব্যতিরেকে উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ করা কাজের গতি বা সৌষ্ঠবের পক্ষে হানিকর হওয়া স্বাভাবিক।

সংস্থার গঠন তার দায়িত্ব এবং কর্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিধানের কাঠামো হোল আবরণিক। এই অবয়বের অন্তর্গত যে প্রাণ বা পরিকল্পনার পিছনে মানবিক প্রয়োজনের এবং সামাজিক উন্নতির স্পন্দন সচঞ্চল হবে তার আকার, রূপ ও বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ কী করে পাওয়া যাবে বা কোথা থেকে আসবে? এ সম্বন্ধে যে দু-চারটি কথা উপস্থাপিত হবে সেইটি এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়।

যাঁরা প্রয়োগকুশলী এবং যাঁদের মধ্যে আছেন স্থপতি, নগর পরিকল্পক, পূর্ত-বিদ, প্রশাসক, অর্থনীতি বিশারদ, স্বাস্থ্য-বিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞান বিশারদ ইত্যাদি সকলেই, তাঁরা নিজ নিজ গণ্ডীর বাইরে মানুষের জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নিজের বিশেষ এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিকে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করবেন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োগকুশলীদের মধ্যে স্থপতি নগর পরিকল্পক এবং পূর্তবিদদের কাজ অনেকখানি প্রত্যক্ষ। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অনেক নিশ্চিত এবং ধ্রুব। এঁদের চিন্তাধারায় কোথাও যদি ত্রুটি থাকে কোথাও যদি পরিসমাধানের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে [illegible] নির্দেশনায় হয়, তা সমস্তই নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাপারটা

এতই সাংঘাতিক যে আরও একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার।

বক্তব্য এই যে, এই বিশিষ্ট প্রয়োগ-কুশলীরা যাদের পেশা বা বৃত্তি উন্নয়ন পরিকল্পনার জৈবিক এবং দার্শনিক রূপ পরিস্ফুট করা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু তাদের নকশা, ছবি বা প্রতিরূপের উৎকর্ষই নয়, উপরন্তু মানবিকতা, সামাজিক মঙ্গল, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমাজ এবং মনুষ্য কল্যাণের প্রতিরূপ তাঁদের নকশা বা ছবিতে প্রতিফলিত করা। এইটি করতে গেলে পরিকল্পনার গোড়ার কথায় যেতে হয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা পরিকল্পনা ব্যাপারটা কী? সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করলে পরিকল্পনা মুখ্যত শ্রেষ্ঠতর জীবনযাত্রা এবং জীবনের সুষ্ঠু অগ্রগতির মানবিক সমন্বয় সাধন। স্থান বা বস্তুর বিন্যাসেই তার সমাধা হয় না বরং মানুষের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার একত্রীভূত হওয়ায় যে ভূমার চেতনা থাকে তাকে স্পর্শ করবার দায়িত্বেই তার প্রাণশক্তির প্রকাশ। এই দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী হয়ত সচরাচর লক্ষ্যের মধ্যে থাকে না কারণ বেশীর ভাগ পরিকল্পকই তাঁর পুঁথিগত প্রয়োজনের মাপকাঠিতে পরি-সংখ্যানের হিসাব মেলাতে এতই পর্যুদস্ত হন যে তাঁরা মানবিক কল্যাণ, সমৃদ্ধি, জীবন উপভোগের ক্ষেত্রে সামাজিক মান উন্নয়ন কিম্বা আধুনিক জীবনযাত্রার চাপ হ্রাস করার কথা ভাববার সুযোগ বা অবকাশই পান না। অধিকন্তু, স্থপতি-পরিকল্পকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার কান্তি-বিদ্যা, সৌন্দর্য বিজ্ঞান, স্থাপত্য রচনার সাম্য ইত্যাদি, পূর্ত বিশারদের কাছে তার মজবুতা, সমতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য পরিকল্পক গোষ্ঠীভুক্তদের কাছে তাদের নিজের নিজের বিদ্যার বিশিষ্ট প্রয়োগ মানুষের প্রয়োজনের থেকে বড় হয়ে দাঁড়ায়। পরিকল্পকের কাছে সমস্ত পরি-কল্পনার ধারা ভূ-ব্যবহার বা উন্নয়নবিধি এত বেশী বড় হয়ে ওঠে যে সমস্ত চিন্তার স্রোত একমুখী হয়ে মানুষের জন্য পরিকল্পনার ব্যবহার না হয়ে পরিকল্পনার ব্যবহারে মানুষকে প্রয়োগের প্রশ্ন সঞ্জাত হয়।

সাধারণ লোকের কাছে পরিকল্পনার প্রয়োজন ভূ-ব্যবহার ও ভূ-বন্টনেই * শেষ হয় এবং তাতেই আনুমানিক হিসাবে জীবন ও তার নির্বাহের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে গেল বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তাই কি ঠিক? পরিকল্পক তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদির হদিশ পেয়ে তাই নিয়ে বসে যায় নকশার গায়ে ছক মেলাতে আর এই ছক মেলাতে তার কাছে থাকে কতগুলি পরিকল্পনার রীতি, ধারা ও বিধি—যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পরি-কল্পনা শিক্ষা সংস্থাগুলিতে উদ্ভূত হয়েছে। এই নিয়ে সে প্রবৃত্ত করে মানুষের জীবন-শক্তিকে সীমায়িত করে তার পরি-কল্পনার ভেতর বেঁধে রাখতে। কিন্তু তাই কি সম্ভব।

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

—এটা সত্যি যে এই জীবন দর্শনের গুরুত্বের সঙ্গে, ভূ-ব্যবহার, পৌর প্রয়োজন বা ইঁট কাঠ পাথরের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ, কিন্তু এটাও দরকার যে পরিকল্পকের মানসিক-সজ্জা, এই আদর্শের বিশ্বাসটুকু ধারণ করবে।

বিদেশের একটি বড় শহরের মুখ্য সচিবের কথা উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী কোন দিক থেকে দেখা দরকার—

'আমরা তো পরিকল্পনার ছকের ভেতর আমাদের জীবনযাপন করি না—এমন কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতার ভেতরেও নয়। গতি পৌর-বিন্যাস আগম-নিগম, যানবাহন, এগুলো জীবনের মৌলিক প্রয়োজন নয়। জীবনে যা চাই তা একটি গৃহ—কয়েকখানা ঘর নয়; একটি পরিবার—তাতে কজন প্রাণী তা অবান্তর; জীবনকে উপভোগ করা আর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি—কটাকা খরচ করা যায় তার হিসেব নয়; ভালবাসা, সাহচর্য স্নেহ, বন্ধুত্ব—পরিসংখ্যান স্বীকৃত সাম্য জীবন নয়; উদ্দেশ্য, আগ্রহ আশা, আকাঙ্খা, বিশ্রাম ও পরিতৃপ্তি—সক্রিয়তার সংখ্যা-পরিমাপ নয়। এটাকে কখনই ভাল পরিকল্পনা বলা চলবে না যদি কোন যতি লক্ষ যান-বাহন-চালন পরি-কল্পনার সঙ্গে কোলাহলময় কেন্দ্রে বা দৃশ্যমান অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এটাকে কখনই ভাল পরিকল্পনা বলা চলবে না যদি কোন সুপরিকল্পিত গৃহ-সন্নিবেশের মধ্যে তাদের অন্তরেই লক্ষ্যহীনতা অসন্তোষ নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ থাকে। মাটির ওপর কী হচ্ছে সেটাই পরিকল্পনা নয়, মানুষের জীবনের গোড়ার জিনিসগুলির চাহিদা মেটানই প্রথম। কোন পরিকল্পকের অধিকার নেই, জীবনের কঠিন প্রশ্ন-গুলির সমাধান না করে খালি সেই-গুলির ওপরেই মনোযোগ দেওয়া, যেগুলি সহজে কাগজের ওপরে প্রকাশ করা যায় কিম্বা হিসেবে ধরা পড়ে বা কঠিন স্থাপত্যের কক্ষাভ্যন্তরে—

* ভূ-ব্যবহার— Land use
ভূ-বন্টন— Distribution.

প্রকাশিত হ'ল

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক

শঙ্করনাথ রায়ের

ভারতের সাধিকা

দক্ষিণ আড়বার সাধিকা অণ্ডাল মঙ্গলায়কী থেকে এ যুগের তপস্বিনীদের রহস্য বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য। শুধু তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর নয়—হৃদ্য স্বাদু পদে পদে।

মনীষী, সাধক ও কুশলী লেখক শঙ্করনাথের "ভারতের সাধক" গ্রন্থমালা তাঁর অসামান্য সাহিত্য-কীর্তি। 'ভারতের সাধিকা' সেই গ্রন্থমালারই চমকপ্রদ পরিপূরক।

লেখকের এই নূতনতর ও মহত্তর নিজে পড়ুন ও প্রিয়জনকে পড়ান।

এই লেখকের

ভারতের সাধক

[১—১০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে]

একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

করুণা প্রকাশনী : ১৮এ টেমার লেন : কলকাতা-৯

যেমন বস্তুরূপ, কান্তিবিদ্যা, সাম্য বা সংগীত ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন করা যায়।*

সামাজিক চিন্তাধারায় এইটে বিচার করে নিতে হবে যে পরিকল্পনা ও সমাজ উভয়ে উভয়কে কী করে এবং কীভাবে প্রভাবিত করবে।

সমাজ একটা গতিশীল সম্বন্ধতা যার অস্থিরতাময় চৈতন্য তার উপাদান ও গঠনের প্রকাশ। সুতরাং প্রাথমিকভাবে এটা পরিকল্পককে বুঝে নিতে হবে এবং এই প্রতিপাদ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে নির্ভর করতে হবে ও এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থান কালের সামঞ্জস্য তাকে চিন্তা গঠন করতে হবে। শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের সমাজ এবং যাদের ওপর এই পরিকল্পনার লাভা-লাভ বা দোষ-গুণ বর্তাবে এবং যাদের জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হবে তাদের সঙ্গে এই পরিকল্পনার সংযোগ, নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা কোথায়! এই পরিকল্পনার ফলাফল যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার্য। ভেবে নিতে হবে, ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার প্রণালী, ভবিষ্যৎ মানুষের প্রয়োজন, আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা, বেশভূষা, খাদ্য পানীয়, রীতিনীতি অথবা এক কথায় সমাজ এবং ব্যক্তিচেতনার সমস্ত আঙ্গিক ও ভাবনার সর্বাঙ্গীন প্রয়োজন ও তার সমন্বয়। ভবিষ্যৎ শুধু কল্পনা বা চিন্তার বিলাস হয়েই থাকবে না, তাকে রূপ পরিগ্রহণযোগ্য আকার ও পরিমাণ সম্বলিত বাস্তবিকতায় পর্যবসিত করতে হবে। সদা পরিবর্তনশীল সমাজের এই জৈবিক এবং দার্শনিক প্রয়োজনের স্রোতের মাঝখানে আজকের এবং ভবিষ্যতের সমাজের যে পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে তাতে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এবং আজকের বিশ্লেষণে সমন্বয় ঘটাতে হবে ও বহুবিধ বিপরীত বিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারার দায়িত্ব সমাজ প্রত্যাশা করে। পরিকল্পকের দায়িত্ব কত কঠিন, গুরু এবং দুঃসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। এর জন্য যে প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, বিদ্যা এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হোলে যে শিক্ষা এবং বিচার-শীলতা চাই তার জন্য বহু বর্ষব্যাপী সাধনা এবং সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করা দরকার।

সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে আজকের দিনের সমাজের উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গীতে কতখানি অপরাধ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে এখনও করতে হবে তার চিন্তাও বেদনাময়। যে অশান্ত সামাজিক আবেষ্টনীর সূচনা দেখা দিয়েছে, যেখানে অপরাধ প্রবণতা, ধ্বংসকারী মনোবৃত্তি এবং বিরাট অসন্তোষ সমাজের সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করছে তিলে তিলে, এর নিরোধ হয়ত সম্ভব ছিল যদি অতীতের পরিকল্পনায় যথেষ্ট মন এবং দেহের প্রসারের সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে যৌবনের অমিত শক্তিকে বিশ্লেষণ করা স্রোত এবং তার প্রকাশের বেদনাকে প্রকাশের আনন্দে রূপান্তরিত করে, তাকে দুঃখহীন কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেওয়া যেত। আজ একথা অনস্বীকার্য যে সুযোগের অভাব অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ এবং এর প্রতিকার সম্ভব। আমরা এবং আমাদের পূর্বসূরীরা এই পরিকল্পনা বা এর চিন্তা করিনি। এ ভুল যেন আর না হয়।

স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের পক্ষে সব সময়ে যথার্থ বা নিভুলভাবে ভবিষ্যতকে স্পষ্ট করে ভাবা বা দেখা হয়ত যায় না, কিন্তু সাধারণ সত্যের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানে অপারগ হওয়া পাপ, এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে করতেই হবে—তার দুঃখ ভোগে, তার দৈন্যে এবং তার হতাশায়। কোন পরিকল্পক যেন জীবনের সাধারণ সত্যকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করেন, কারণ মহাকালের উদ্যত দণ্ড ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সদাজাগ্রত প্রহরায় অতন্দ্র দণ্ডায়মান। যদিও ভবিষ্যতের প্রয়োজন যথার্থ নিরূপণ সম্ভব নয়, তবে এটাও ঠিক যে মোটা-মুটি বৃহত্তর সাধারণ প্রয়োজনের আভাস সর্বকালেই পাওয়া যায় এবং তার জন্য ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত করা ও পরিকল্পনায় যথেষ্ট নমনীয়তার স্থান নির্ধারণ করা থাকলে এই দায় উদ্ধার করা সম্ভব। সময়ের পরিক্রমায় মানুষের প্রয়োজনের যে পরিবর্তন ঘটে তার জন্য স্থানের এবং উপায়ের যেন অভাব না হয়। এটা মানুষের চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা আজ যে পর্যায়ে উন্নীত তাতে ভবিষ্যতের মানুষের প্রয়োজনের খসড়া অনেক-খানি এগিয়ে গিয়েও বলা অসম্ভব নয়। অন্য-দিকে কোন পরিকল্পনাই শাশ্বত নয় এবং তারও পরিধি ও প্রয়োজন সীমিত—সেটা হয়ত পঞ্চাশ, কি একশো, কি দুশো বছরের জন্য কল্পিত হতে পারে এবং সেই সময়ের জন্য পরিকল্পনায় এমন নমনীয়তার স্থান করে দেওয়া যায় যাতে ওই সময়ের ব্যবধানের ভেতরের পরিবর্তন সে গ্রহণ করতে পারে। তার পরেও যদি সে চলে বা চলা সম্ভব হয় তবে তার অবস্থান বা বর্ধমানতা কল্পিত চিন্তার নমনীয়তার পর্যায়ে ধারণযোগ্য করে রাখা সম্ভব।

মনুষ্য চরিত্রের বিভিন্নতা তার সহজাত। কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে তার বোধ ধর্ম বা গুণ কিন্তু কতগুলি বিধি মেনে চলে, যেজন্য সমাজ বিজ্ঞান আজ তাকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে। পরি-কল্পনার দিক থেকে এই পাঁচটি অংশে বিচার করে নিলে একটি সুনির্দিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায় এবং সমস্ত ব্যক্তিক বিভিন্নতা ধরে নিয়েও সমষ্টিগতভাবে পরিকল্পনাগত

*W. Frank Harris, Principal City officer and Town clerk: New-castle upon Tyne.

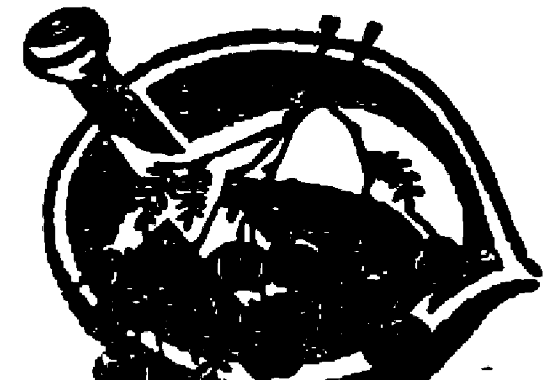
ভারতের
আদিতম
রসায়ন
চ্যবনপ্রাশ
আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি,
যকৃত ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা – বোম্বাই – কানপুর

নিষ্পত্তিতে ভাগ করা সম্ভব। এই পাঁচটি ভাগ হোল :—

১। লোকসংখ্যা ভিত্তিক তত্ত্ব এবং তথ্য,

(ক) লোকসংখ্যা, তার ক্রমবিবর্তন এবং তাদের বিভিন্ন বয়সকালীন ভাগ সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ,

(খ) গোষ্ঠীর * গঠন ও প্রকৃতি, তাদের পরিবারের সংখ্যা, বয়স, স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, উপজাতি, পেশা, বৃত্তি, শিক্ষার মান, আয় এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় স্থিতাবস্থার বিচার এবং বিশ্লেষণ,

(গ) লোকসংখ্যার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন,—তার বিশ্লেষণ,—কারণ এবং রীতি।

২। অর্থনৈতিক কাঠামো :

পরিকল্পিত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের বিচার এবং বিশ্লেষণ,—বৈভব, বিস্তৃতি এবং প্রয়োজন। সম্ভাব্য শ্রম-পরিমাণ** বৃত্তি, শিল্প ইত্যাদির পরিমাপ। এই অর্থ নৈতিক জিজ্ঞাসা সমাজের বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ বা নিরূপণ করে এবং কোন পরিকল্পনার সার্থকতা বা যোগ্যতা নির্ভর করে এই নিষ্পত্তির সত্যতার উপর।—এর একটি উদাহরণ কলকাতার কাছে কল্যাণীতে। এই পরিকল্পনাটি কলকাতা শহরের বিপরীত চুম্বক† হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল, কিন্তু এই চুম্বকটির আকর্ষণী শক্তির অভাবে এটি একটি শুধু রাত্রি-শোবার-শহর ‡ তৈরি হয়েছে বোধ হয়। এটা ঘটেছে এর অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণে ভুল হিসাবের আওতায় পড়ে। কাজ না দিয়ে শুধু মানুষকে রেখে দিলেই শহর বা সমাজ গড়ে না,—একটা আস্তানা হয় মাত্র।

৩। সামাজিক সংগঠন :

মানুষের সমাজগত মনোবৃত্তি তাদের বৈশিষ্ট্য, রীতি, নীতি, অভ্যাস, ব্যবহার, সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ এবং সামাজিক মূল্যবোধ। পরিকল্পনাভুক্ত মানুষের সমাজ জীবনের সঙ্গে পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ মিলনের বিচার।

৪। সামাজিক বিশৃঙ্খলা :

এই ব্যাপারটি সামাজিক সংগঠনের ঠিক বিপরীত দিক, এবং ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর প্রশ্নমূলক ব্যবহার, তার কারণ ও ব্যাধি নিরূপণ পদ্ধতি। এই সামাজিক এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মানসিক ব্যবহার শুধু শিক্ষা ও গবেষণার প্রশ্নই নয়—পরিকল্পনা ক্ষেত্রে এর ব্যবহারিক প্রয়োজন অসীম। পরিকল্পনার মধ্যে শোধনমূলক উপচার আগে থেকে তৈরি থাকলে অনেক সময় সেগুলি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্ষতগুলি উপশম করা কিম্বা নিরাময় করতে যথেষ্ট সাহায্য করে* সমাজ নিশ্চয়ই আশা করে যে সামাজিক দুষ্ট-ক্ষতগুলি শোধরাবার মত উপায় পূর্ব-চিহ্নিত করা থাকবে এবং সমাজ বিজ্ঞান মতে তার সুরাহা পরিকল্পনায় গ্রথিত এবং সন্নিবিষ্ট করা থাকবে।

৫। সামাজিক মনস্তত্ত্ব ;—

মানুষের সংস্কারগত পক্ষপাত, বিশ্বাস এবং রুচি ইত্যাদির মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একক বা দলের মধ্যে সঞ্চারণ করে তার কারণ এবং প্রয়োজনীয়তার মান নির্ধারণ, সামাজিক ব্যবহারের গোড়া পত্তনে এর প্রয়োজন এবং যে কোন পরিকল্পনায় এর দরকার।

পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক। কিন্তু তার রূপায়ণের মূলাধার হিসেবেই সাধারণের কাছে প্রকট এবং জড়াকৃতি রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর এবং পৌর প্রয়োজনের জড় বস্তুগুলিই প্রাধান্য নজরে পড়ে। অন্যান্য দিকের মধ্যে তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য যে নিত্য সঞ্জাত কর্ম তার সম্ভোগ ও বিতরণ কিন্তু সমানভাবে মুখ্য, পরিদৃশ্যমান না হোলেও অনুভূত।

পরিশেষে, যার উপর একাগ্র হওয়া প্রয়োজন, সেটা হোল, যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়বার ভার পরিকল্পকদের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত এবং যোতে বাধ্য, সেই তুলনায় এই জাতের মানুষ তৈরির দায়িত্বও সমাজ এড়িয়ে যেতে পারবে না। তার জন্য তাদের যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতের পরিকল্পক গোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু সাময়িক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, তাকে সমাজ বিজ্ঞানের সহ-শিক্ষার সঙ্গে মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ মানবের চেতনা জাগ্রত করা অবশ্য দরকার।

এটা বুঝতে হবে যে আজকের পরি-কল্পকরাই সমাজকে তার পারিপার্শ্বিকের অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে অধঃপতন থেকে বাঁচাবে।

* Professor Donald Bogue. Professor of Sociology: University of Chicago.

* Community
** Labour Potential
† Counter-magnet
‡ Dormitory town.

বয় চিরকাল বয়ই রহে

মণি দাস

কবিতাটি অনেক দিনের পুরোনো. বোধহয় বুদ্ধদেব বসুর লেখা। সাহেবদের হোটেলে ঢুকে "বয়" বলে সাহেবদের অনু-করণে চিৎকার করলে যে ব্যক্তিটি সামনে এসে দাঁড়াবে তার নাম নেই, জাত-কুল নেই, এমনকি বয়সেরও কোন মাপকাঠি নেই, তার একমাত্র পরিচয় "বয়" এবং বালককে দিয়ে যে কাজ সম্ভবপর, যুবককে দিয়েও তা সম্ভবপর এমন কি বৃদ্ধকে দিয়েও যা করান যায় "বয়" নামধারী ব্যক্তিকে দিয়ে তাই সম্ভবপর।

সাহেবদের হোটেলে যদি এই প্রথায় কোন কাজের অসুবিধা না হয়, তবে যত দোষ কি শুধু নন্দঘোষ "কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের' বেলায়? সেখানে "গালি বয়" বলে এক সম্প্রদায় আছে। বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে, তাদের মাহিনার বিল মাসে মাসে তৈরী হয় এবং সেই টাকাও তারা নিয়মিতভাবে পেয়ে থাকে। তাদের বয়সের দরুণ মেরুদণ্ড কে রোধ করতে পারে; তাদের বয়সের দরুণ দৈহিক স্থূলতার জন্য যদি তারা অপরিসর "গালি পিট"গুলিতে ঢুকতে না পারে এবং পরিষ্কার না করতে পারে তার জন্য কি তারা দায়ী; নিশ্চয়ই না, তবে উপায়: উপায় খুব সহজ, বৃষ্টির জলে রাস্তা-ঘাট ডুবে যখন মোটরগাড়ী অচল হয়ে যায় তখন সামান্য একটু কাজ করলেই দাঁড়ানো জল তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। রাস্তার উপরে "ম্যানহোলের" ঢাকনাগুলি খুলে দিন। হু-হু করে জল গর্তে ঢুকবে এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই অচল মোটরগুলি সচল হয়ে উঠবে। অনেকে বলে থাকেন পয়ঃপ্রণালীর পরিবহন ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম, এইসব জল ম্যানহোল দিয়ে তবে যাবে কোথায়? আবার মন্তব্য জুড়ে দেন পলি-মাটিতে সব বুজে গেছে তাই "ম্যানহোল" প্রয়োজন। উত্তর কিন্তু সেই একই—"বয় চিরকাল বয়ই রহে।" রাস্তার কাঁকা ধারায় দিয়ে যে সব "গালি পিট" বিদ্যমান সেইসব পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয় সংখ্যায় উপ-যুক্ত "গালি বয়" মাইনে টানলেও, এখন আর "বয়" নেই, কারণ অনেকেই এখন যুবক কিম্বা প্রৌঢ়। পথের ধারের দুপাশের গালিপিটের বাক্সের নীচে ইটের গাঁথনি করা চৌবাচ্চা, পয়ঃপ্রণালির সাথে পাইপের সংযোগ থাকে। এই গালিপিট-এর চৌবাচ্চা বারো বছর ও তার নিম্নবয়স্ক বালকের দ্বারা পরিষ্কার রাখা সম্ভবপর, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ইহার ভিতরে ঢুকে পরিষ্কার করা সম্ভব নহে। তবে কি করা উচিৎ, সে দায়িত্ব পৌরপিতাদের এবং পৌর কর্তৃ-পক্ষের।

বৃহৎ কর্মে

শিশির নিয়োগী

বৃহত্তর কলকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের যে কর্মসূচী ইনঞ্জিনিয়াররা হাতে নিয়েছেন সেটা কারিগরী জগতের একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বৃহত্তর কলকাতা শহর যদি কোনো দিন আবার তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পায় বিজ্ঞানের দৌলতে, সেটা হবে আধুনিক যুগের সপ্ত আশ্চর্য নৈপুণ্যের একটি। কলকাতা শহর মৃত না জীবন্তদের নগরী কিনা সেটা বিচার করবে 'কাল' তার নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে।

কলকাতা শহরটাকে যে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, আবার ওকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে এসব চিন্তা-ভাবনা ইংরেজদের কোন দিনও ছিল না। যেদিন কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিন থেকেই কলকাতা সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার প্রথম থেকে দ্বিতীয় এবং ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বলা হল কলকাতা একটা 'বর্ডার সিটি' Border City —চীন-জাপান অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিকটে একটুখানি গোলাবর্ষণ হওয়ায় কলকাতা শহর বৈদেশিক আক্রমণের শিকার। ফলে কলকাতাকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কলকাতা বেড়েছে, সে বেড়েছে নিজের প্রাণশক্তিতে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের তাপ তার গায়ে লেগেছে। বিশ্বযুদ্ধের তাড়নেই কলকাতার বুকে কিছু ইমারতী কাজ সুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ভেবেই অসমাপ্ত হাওড়া ব্রিজের কাজ সুরু হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে শহরকে বাঁচানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল গঙ্গা, আদি গঙ্গা আর ক্যানালের পাড়ে বেশ কয়েকটি ফায়ার ব্রিগেডের প্ল্যাটফর্ম, যেগুলোর চিহ্ন এখন বড় একটা দেখতে পাওয়া যাবে না।

বৃটিশরা কোনওদিন কলকাতাকে উপভোগ্য শহরে পরিণত করে তুলবে এ ভাবে নি। সে ভাবনা জব চার্ণক সাহেবের ছিল কিনা জানি না তবে নির্দয় ভাইসরয়দের যে ছিল না এটির প্রমাণ তাঁরা বারবার দিয়েছেন।

কলকাতার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসে জড়ো হল কলকাতার আশে-পাশে। বৃহত্তর কলকাতা ছাড়া এত বড়ো চাপ সহ্য করবার মতো শহর আর ছিল না বাংলাদেশ কেন গোটা পূর্বভারতে। তাই অনিবার্য কারণেই কলকাতা মিছিল বা দুঃস্বপ্নের নগরী হয়েও বেঁচে রইলো মৃত সঞ্জীবনী হিসেবে। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের আশার জোগালো বৃহত্তর কলকাতা—হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার মানুষ বৃহত্তর কলকাতার অপরিসর জায়গায় মাথা গুঁজে পড়ে রইলো ভবিষ্যৎ সুদিনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু মানুষ যা আশা করে তা বোধহয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। বাঙালীদের হতভাগ্য জীবনেও এলো না শান্তি ও সমৃদ্ধি। এর জন্যে কে বা কারা দায়ী জানি না। কেউই জানেন না হয়তো। কিন্তু এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে বৃহত্তর কলকাতা জনভারে নুইয়ে পড়েছে। যে ভার সে সহ্য করতে পারে না সেই ভার চাপানো হয়েছে কলকাতার ওপর। আমরা কলকাতাকে যতোই ভালোবাসি না কেন এটা আমরা স্থির বুঝতে পেরেছিলাম কলকাতা শহরের নাগরিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। সহ্য সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। কি করা যায়?

কলকাতার সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। কোটি কোটি টাকার অংকটা দেখেই কিন্তু কলকাতার সমস্যার প্রকৃত আয়তন ও গুরুত্ব বোঝা যাবে না। ডি-ভি-সি হিন্দুস্থান স্টীল, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি প্রকল্পে বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রকল্পগুলির রূপায়ণ আর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ঐসব প্রকল্পে মেন, মানি ও মেটিরিয়ালস যোগাড় হলেই হু-হু করে কাজ এগোয়। দেখতে দেখতে নতুন শহর জনপদ গড়ে ওঠে, কলকারখানা স্থাপনের ব্যাপারে তখন বহু বিদেশী কনসর্টিয়াম এসে হাজির হয়েছে, ভারী ভারী মেশিন প্রদীপের আলাদিনের প্রদীপের মতো [illegible] বুকে [illegible] সমস্যাটা [illegible] বলা যাচ্ছে তর্ক আর প্রাণচঞ্চলতার ভরিয়ে তোলাই হল ওসব প্রকল্পের রূপায়ণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু কলকাতা সম্পূর্ণ আলাদা। কলকাতার সমস্যাই কেবল নয়, সেই সমস্যার সমাধানের উপায়গুলোও আলাদা। দুর্গাপুরের মত বিশাল ইস্পাত কারখানা আর নগরী গড়ে তুলবার জন্যে পৃথিবীর নানা দেশের নানা কোম্পানী হু-হু করে ছুটে আসবে কর্মদক্ষতা দেখাবার জন্যে। কিন্তু যদি বলি আমরা টাকা দেবো, কে আছো কোথায় এসো কলকাতা শহরের বস্তীগুলোকে বাস করবার মতো করে দাও, কলকাতার রাস্তাঘাটগুলোকে চওড়া করে দাও যাতে গাড়ী-ঘোড়া চলতে অসুবিধে না হয় আর—কলকাতার জন্যে প্রচুর পানীয় জলের ব্যবস্থা করো যাতে গরমের দিনে স্নান না করে অফিসে না যেতে হয়, আর পয়ঃপ্রণালীগুলো এমন করো যাতে ঘোর বর্ষায় রাস্তা জলমগ্ন না হয়—আর দিনের পর দিন রাস্তা জলে ডুবে না থাকে, আপনারা স্থির জানুন একটা কনসার্ন বা দেশও এগিয়ে আসবে না এ কাজ করবার জন্যে। এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। এই জটিল সমস্যাপূর্ণ মানসিক দায়-দায়িত্ব নিতে বিদেশীদের বয়ে গেছে। তারা বড়জোর—কলকাতার জন্যে একটা পরিকল্পনা ছকে দিয়ে যেতে পারে যেমন দিয়ে গেছে বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ ও জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে। বাকীটুকু অর্থাৎ কিভাবে সেই কাজগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে তার ব্যাপারে বিশেষ সংস্থাগুলো উপদেশই দিয়েছে, নিজেরা কাঁধই লাগাতে চায়নি মোটেই। তাদেরই উপদেশে প্রথমে, জল সরবরাহ ও জলনিকাশী প্রকল্পগুলোর কাজ আরম্ভ করবার জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি গঠিত হয়েছিল। তাদেরই উপদেশে পরে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা সি এম ডি এ গঠিত হয়েছে।

সি এম ডি এ বর্তমানে কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে অভিভাবকের মত। কলকাতা উন্নয়নের বেশীর ভাগ টাকাটাই এই সংস্থার তহবিলে প্রথমে জমা পড়বে, পরে এই সংস্থাই সবাইকে টাকা দেবেন সবার চাহিদা অনুযায়ী। 'সবাই' বলতে উন্নয়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যেমন সি এম পি ও, পাবলিক হেলথ, পি ডবলিউ ডি, সি আই টি, কর্পোরেশন এসবগুলিকে মনে করছি।

কোন বৃহৎ কর্ম করতে গেলে ভ্রান্ত ভুলচুক আসতেই পারে। কলকাতা উন্নয়নের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ভুলভ্রান্তি কিছু কিছু যে এসে যাবেনি একথা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারেন না কিন্তু ভুলগুলি যদি মারাত্মক হয় এবং তার চেয়ে বড়ো কথা সেগুলি যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে সে ভুলের তদন্ত করতেই হবে। অপরাধী বা অপদার্থ লোককে শাস্তি দিতেই হবে।

কলকাতার মতো বড় ও জটিল জনপদের সর্বাধিক সমস্যাগুলিকে আলাদা আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়। যে রাস্তায় ঘণ্টায় কয়েক হাজার গাড়ী চলছে, তার তলা দিয়েই চলেছে ইলেকট্রিকের তার, জলের লাইন, গ্যাস আর স্যুয়ারের পাইপ, টেলিফোনের কেবলও। সেই রাস্তার উন্নয়নের কর্মসূচীতে আছে জলের লাইনটাকে বড়ো করা, স্যুয়ার লাইনের আয়তন বৃদ্ধি, নতুন গ্যাসগ্রিড বসানো, রাস্তা চওড়া করা, মাটির নিচের টিউব রেলের জন্যে বৃহৎ আকারের টানেল তৈরী করা আর প্রয়োজন মত রাস্তা পারাপার হবার জন্য ওভার ব্রীজ তৈরী করে দেয়া। এই সব কাজের মধ্যে কোন কাজটা জরুরী আর কোন কাজটা কম জরুরী সেটা যাঁরা বিচার করতে পারেন তাঁদের পক্ষে হয়তো এটা বিচার করা সম্ভব নয় যে বাস্তবক্ষেত্রেও কোন কাজটার পর কোন কাজটা করলে সুবিধা হবে। এর জন্যে প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দূরদর্শিতা এবং তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার মতো সৎসাহস ও কর্মক্ষমতা। সরকারী কাজ-কর্মে যাঁরা ওপরে বসে আছেন তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের সাধারণ জ্ঞান খাটিয়ে যে নীতিটা সঠিক বলে মনে করেন সেটাকে চালু করবার জন্য দাঁড়িয়ে যান। এই ব্যাপারে কোনও টেকনিক্যাল লোক যদি তাঁদের এই খুসিতে ইন্ধন যোগান তবে তো আর দেখতে হবে না! অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চিন্তাধারাকেই কাজে রূপায়িত করবার জন্যে তখন কী জোর লবিইং চলবে! কাজটা সুষ্ঠুভাবে হবে কি না হবে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তখন চলবে শক্তির লড়াই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও ছাড়বে না আবার ওদিকে ইঞ্জিনীয়ারও ছাড়বে না। বর্তমান কালক্ষয়, ধনক্ষয় তো আছেই। কলকাতার উন্নয়নের মতো বিরাট সংস্থার সংগে যারা জড়িত তাদেরকে নির্লোভ-প্রায় হতে হবে। পলিটিক্স-এর দিকে মন গেলেই দেশের ক্ষতি হবে। স্বজন-পোষণ তবুও ভালো, কিন্তু তাঁবেদার পোষণ নৈব নৈব চ।

বৃহৎ কর্মে নতুন নতুন সব সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ গজিয়ে ওঠে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে এবং সংস্থা থেকে অভিজ্ঞ লোক এনে, কারও বা জন্ম-ঠিকুজী বিচার করে নতুন কাজে লাগানো হয়। এক কথায় দুষ্কণ্ট। তবে আশ্বাসের কথা এখানে যাঁরা কাজ করতে আসেন তাঁদের কোনও পার্টি নেই। সুতরাং পার্টির স্বার্থে নতুন সংস্থার স্বার্থ বিঘ্নিত করবার প্রয়াস কারও থাকবে না। তবে গা বাঁচানোর ব্যাপারটা তো থেকে যেতে পারে। আমি ধরুন খাল-নির্মাণ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে জুটেছি। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার পিতৃ-ডিপার্টমেন্টের ওপর দরদ একটু বেশী থাকবে। নতুন সংস্থায় আমার 'পিতৃ' বংশের কেউ আসুক—এই ঝোঁক আমার পেয়ে বসতে পারে। বিশেষ করে এই নতুন জায়গায় কাজ শেষ হলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যে সেই পেরেন্ট ডিপার্টমেন্টেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সেখানকার দু-চারজনকে নতুন সংস্থায় ভালো পোস্টে ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটা গুড উইল তৈরী করবার লোভ তো আমার হতেই পারে। এখানেও সেই তাঁবেদারের ভয়। আর আমি যদি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আমার যদি লোক ঢোকাবার ক্ষমতা থাকে তবে যে পোস্টে রাস্তা তৈরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের দরকার সেই পদে আমার ইচ্ছে হবে খাল কাটার লোক নিই। তা না হলে আমার তাঁবেদারদের ঢোকাই কি ভাবে?

আমাদের জীবনে সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যদি বলতে হয় তবে সেটা হল বিজ্ঞাপনের মোহ। আমাদের ইচ্ছে হয় আমাদের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক—লোকে জানুক 'অমুকের হাতে অমুক একটা দুরূহ কার্যভার রয়েছে। অতএব অনন্তই অর নাই।' কিন্তু বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য যে জনসাধারণ হবে ভোগী—কেবল খোলা বাজানো নয় এটা বুঝে যাই আমরা সবাই। বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। 'কলকাতার জন্যে কিছু করা হচ্ছে না' এই নৈরাশ্যের যাঁরা ভুগছেন তাঁদের প্রাণে আশার সঞ্চার করা, আর যাদের দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে হবে তাদেরকে কর্মচঞ্চল করে তোলা। কোনও বড়ো কাজের কর্মচাঞ্চল্য এ তোমার আমার সবার প্রাণে আনবে। এটা আর আর্টিস্টের চিত্রাংকন নয় যে এঁকে বসালেই কাজ সারা। বড়ো বড়ো অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কিন্তু কোটি টাকার চেক সই করেই পরদিন খোঁজ নেন কাজের কতদূর হোল। তাঁরা জানেন না বৃহৎ কর্মের প্রস্তুতিটা করতেও সময় লাগে। আপনি সাঁওতালি নাচ দেখেছেন, সাঁওতাল পরগণার শালবনে ছাওয়া গ্রামে গিয়ে? কোনও পূর্ণিমা তিথিতে যদি আপনি এমনি কোন সাঁওতালি নাচের আসরে যান তবে বেলা থাকতে থাকতেই আপনাকে নিয়ে যাবে নাচের আসরে। আপনি নিশ্চয়ই নাচবেন না।

সুধীন্দ্রকুমার দেবের উপন্যাস

নদী মরুপথে হারালো

সত্য ঘটনা
সাধারণ ভাষা
কামনার বিকার
মনুষ্যত্বের অবমাননা

ভি, পি-তে পেতে চিঠি দিন—
কাকলী : ৮৪।১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা—১০

● হাতে বই নিতে আসুন—
বুক সেন্টার্স অ্যান্ড নিউজ এজেন্ট : ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আপনি দেখুন। দেখবেন মেয়েরা মেয়েদের কেমন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি ধরনের হাল্কা নাচছে। নাচছে? হাঁ, লক্ষ্য করে দেখুন পায়ের পাতাগুলো স্থানচ্যুত হচ্ছে না কেবল ঝিলিক কাটছে কোনও একটা বিশেষ ছন্দ মাফিক হবে। লক্ষ্য করুন ঘণ্টা কেটে যেতে আবার লক্ষ্য করে দেখবেন পায়ের পাতা স্থানচ্যুত হতে সুরু করেছে, কিন্তু শরীর ও মাথা নড়ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে, পা নিতম্ব আর কোমর পর্যন্ত দুলবে কেবল। রাত আরো গভীর হবে গোটা দেহবল্লরী ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হবে, চোখে মুখেও খেলবে খুশির আর যৌবন উচ্ছ্বাসের জোয়ার ভাটা। রাত যখন আরও গভীর হবে নৃত্য-পরা সাঁওতালী মেয়েরা পাগল হয়ে উঠবে, পূর্ণিমা রাতের চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে তাদের যৌবনবতী দেহ আন্দোলিত হবে মহুয়ার মাতাল গন্ধে।......তাই বলছিলাম চরমক্ষণ আসতে সময় লাগে এবং তার জন্য প্রস্তুতি চাই।

প্রস্তুতি প্রয়োজন সব কিছুর। বৃহত্তর কলকাতার আশে-পাশের যেসব কলকারখানা গত কয়েক বছর নিষ্কাম আবহাওয়ায় ছিলো সেগুলোর হাঁটুতে মরচে ধরেছে।

'ওই ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বললেই তারা উঠতে পারছে না। প্রশ্ন করবে নানারকম। 'কারখানা খুলবো অনেক গুনোগার দিয়ে, সাপ্লাই চলবে তো বেশ কিছুদিন?' কেউ বলবে 'কিছু ক্যাপিটাল লোন দিন, কারখানা খুলি।' কেউ চাইবে, ফরেন এক্সচেঞ্জের গ্যারান্টি, কেউ চাইবে এ্যাডভান্স পেমেন্ট। এসব সমস্যা ও আবদার মিটিয়ে মাল-মশলা সরবরাহের একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা আগে থাকতে পাকা করে নিতে হবে। তা না হলে আসরে নাচতে নেমে কোনও ফয়দা নেই।

মাল-মশলা যোগাড় হলেও, সেগুলোকে ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত লোকও তো চাই। একসঙ্গে এতো কাজ চালু হয়ে গেলে ভালো ঠিকাদারের অভাব হতে বাধ্য। খুব সুখের কথা যে বেকার ইঞ্জিনীয়ারেরা আজকাল বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য ব্যবসা-মুখী হচ্ছেন। এঁরা একবার ভালোভাবে ব্যবসার সুতো ধরে ফেলতে পারলে আর চিন্তার কিছু নেই। আমরা কোয়াক Quack —ডাক্তারদের অবজ্ঞা করি, কিন্তু আমাদের দেশে যে হাজার হাজার কোয়াক ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম আছে যাদের মালিকেরা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ই জানেন না, তাদের ব্যাপারে আমরা উদার। বেকার ইঞ্জিনীয়ারেরা ব্যবসায় ভালোভাবে ঢুকে যেতে পারলে আমাদের দেশেও ঠিকাদারদের বদনাম ঘুচবে। তবে প্রথমদিকে ইঞ্জিনীয়ার ঠিকাদারদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেমন 'রক্ষা কবচ' দিতে হবে সরকারকে সেগুলি 'একস্ট্রা স্ট্রং' হওয়া দরকার। তা না হলে কোয়াক ঠিকাদারদের সম্মিলিত প্যাঁচে পড়ে নয়ারা নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

এর পরের সমস্যা হোল জনগণকে নিয়ে। বৃহত্তর কলকাতায় এমন সব অঞ্চল আছে সেগুলি এতোই উপদ্রুত যে সেসব জায়গায় গিয়ে ঠিকাদাররা নাকি কাজ করতে রাজি হবে না। জানি না এসব কথার মধ্যে কতোখানি সত্যি মিথ্যে মেশানো আছে। গত নির্বাচনের আগে তো শোনা গিয়েছিল ভোট দিতে গেলেই গলা কাটা যাবে ভোটারের। কিন্তু পরে দেখা গেল এসব দুশ্চিন্তা অমূলক। সত্তর উন্নয়ন কাজের মধ্যে এমন কোনও উগ্র রাজনীতি থাকা সম্ভব নয় যার উপরে স্থানীয় জনসাধারণ ঠিকাদারদের গলা নেবে। সবাই যেটা আশংকা করছেন যে স্থানীয় ছোকরারা জুলুম করবে। হয় চাকরী দিতে হবে, না হলে মোটা টাকার চাঁদা দিতে হবে আর তা না হলে কিছু ফ্যাগ খেটে দিতে হবে ক্লাব ঘরটার মেঝেটা পাকা করে দেবার ব্যাপারে। কোনও সমস্যা এতো দুরূহ হতে পারে না যার সমাধান নেই। কলকাতার উন্নয়ন সংস্থা কোনও রাজনৈতিক দলপুষ্ট নয়। এই সংস্থা প্রকল্প রূপায়ণের সময়ে রাজনৈতিক দল বেছে বেছে প্রকল্পে হাত দিচ্ছে এমনও নয়। আর এই উন্নয়ন কাজ হয়ে গেলে সেখানকার অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হবেন এটা সবাই বুঝবেন। আর কোনও অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা বিঘ্ন ঘটালে গৌরী সেনের টাকা অন্য অঞ্চলের জন্য ব্যয়িত হয়ে যাবে সংগে সংগে। সুতরাং কোনও অঞ্চলের অধিবাসী এমন খোদকারী করবেন না।

তবে এই ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কাজ যে কোন সংস্থাই করুক না কেন এটা সরকারের টাকায় ব্যয়িত কাজ আর হচ্ছেও সরকারের নির্দেশে। কিছু টাকা হয়তো কলকাতা কর্পোরেশন বা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি খরচ করছেন কিন্তু সেটাও সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুসারে। কোন্ পদ্ধতিতে কাজ হবে সেটা সরকারই ঠিক করে দিচ্ছেন। সুতরাং কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের যে রাজনৈতিক রঙই থাকুক না কেন সেটা কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারবে না। এই সব ব্যাপারে সরকার আর জনসাধারণের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় এবং যাঁদের জন্যে কাজ করা হচ্ছে তাঁরা সহজ-ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তার জন্যে ব্যাপক পাবলিসিটি দরকার। দামী কাগজে সুন্দরভাবে বুকলেট ছেপে টেলিফোন ডাইরেক্টরীর ঠিকানা দেখে দেখে সেগুলো পোস্ট করে দিলেই কর্তব্য সমাধা হবে না। আরও নিষ্ঠা নিয়ে আরও আন্তরিকভাবে সমস্যাটাকে দেখতে হবে। যে হ্যান্ড বিল তৈরী করছি বিলোবার জন্যে সেটা কোনও এক বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে কতোটা আকর্ষণীয় হবে সেটা বুঝে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে বহু সমস্যা জর্জরিত কলকাতা শহর একটি রূঢ় বাস্তব-ময়ী নগরী—এখানে সফিসটিকেশনের স্থান নেই—এখানে কাজ করবার জন্য চাই একজন মাটির মানুষ, কলকাতার বহু বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য যাঁদের মন সত্যিকার কাঁদবে।

রঙীন মাছ, মাছের খাবার, মাছের সরঞ্জাম ও এ্যাকোরিয়াম বিক্রেতা

মান্না এ্যাকোরিয়াম

প্রোঃ—শ্রীসুজন মান্না

১৬, নারান সরকার স্ট্রীট, কলি—৪

[হাতিবাগান বাজারের পিছনে]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বক্সারের কথা মনে পড়ল সীমার। আজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকাতে তার অভিমানমিশ্রিত প্রতিবাদের শব্দটাও শুনতে পায়নি সীমা। তাড়াতাড়ি উঠে বক্সারের ঘরে গেল সে। বক্সার অন্যদিনের মত তাকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করল না। তার গলার স্বরটাও যেন পাল্টে গিয়েছে বলে মনে হল সীমার। বক্সারের শিকলটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এল সে। বক্সার আজ ধীরে ধীরে চলছে। অন্যদিনের মত আজ তার স্ফূর্তি নেই। গলির মোড় পার হবার একটু পরেই বক্সার অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগল। এটা অস্বাভাবিক ঠেকল সীমার কাছে। তার ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে সীমা পরিচিত। সুতরাং আরও কিছুদূর যাবার পর বক্সার রাস্তার ওপর যখন বসে পড়ল অসহায়ভাবে, তখন সে বিপদে পড়ল। তাকে ওঠাতে চেষ্টা করল, কিন্তু নানাভাবে প্রতিবাদ জানাল বক্সার। ছোট কুকুর হলে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু বক্সারের বেলায় একথা খাটে না, তাকে তুলতে অন্ততঃ দুজন লোকের দরকার। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সীমা। ধারেকাছে কাউকে দেখা গেল না। একটা রিক্সা হলেও তার কাজ চলে যায়। কিন্তু তারও অভাব। এবার নিজেকে অসহায় বোধ করল সীমা। সামনে বড় বাগানওয়ালা একটা বাড়ী। গেট পেরিয়ে সাহায্যের সন্ধানে সে যাবে তারও সম্ভব না কারণ গেট থেকে বাড়ীটা বেশ কিছুটা দূরে। দূরে একজন লোক এদিকে আসছে দেখতে পেল সীমা। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। রাস্তার আলো নিষ্প্রভ।

শুনছেন? ডাকল সীমা লোকটির উদ্দেশে।

কি হয়েছে?

কুকুরটা চলতে চাইছে না।

চলতে পারছে না কারণ ও অসুস্থ। আপনি দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করছি।

সামনের বাড়ীটির ভেতরে ঢুকে গেল সে। সীমার মনে হল কোথায় যেন তাকে দেখেছে। চিন্তা করার আগেই স্ট্রেচার নিয়ে এসে উপস্থিত হল দুজন লোক। বক্সারকে তুলে তারা সেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। এবার ওকে চিনতে পারল সীমা। পার্টির সেই ভদ্রলোক, পুলিন। মুখটা লালিমায় বিবর্ণ হয়ে গেল।

পার্টিতে আপনাকে দেখেছি, মনে পড়ছে আপনার?

হ্যাঁ মাথা নাড়ল সীমা।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। কি খাবেন বলুন—চা, না কফি?

কিন্তু—

ব্যস্ত হবেন না। আমি ওকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি। উনিই আমার কুকুরের চিকিৎসা করেন। বেশ ভাল ডাক্তার। আমারও গোটাতিনেক আছে।

সীমা এবার তাকাল তার দিকে। সুবেশ, সুন্দর চেহারা লোকটির।

আপনি এখানেই থাকেন? জিজ্ঞাসা করল সীমা।

হ্যাঁ, এটা আমারই বাড়ী।

পুলিশের লোক বলে একে সন্দেহ করা সীমার ভুল হয়েছে। বাড়ী, সাজ-পোশাক, আসবাবপত্রের মধ্যে মধ্যবৃত্তীয় ছোঁয়াচ রয়েছে যথেষ্ট।

পুরীতে আপনাকে আমি পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করেছিলাম।

সীমার কথা শুনে হেসে উঠল সে। তারপর বলল—পুলিশই আমার পিছু নেয় অনেক সময়।

কেন? অবাক হয়ে তাকাল সীমা।

আমার জুয়েলারীর ব্যবসা আছে। ওরা অনেক সময় আমাদের ব্যবসাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে পুলিশ বলে মনে হওয়ার কারণটা ঠিক বুঝলাম না। আমার নাম সোমা দত্ত। সোমা দত্তের দিকে আর একবার ভাল করে দেখল সীমা। পরণে সূক্ষ্ম কাপড়ের পাঞ্জাবি তার সঙ্গে কোঁচান ধুতি। সোমা দত্তর চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু মিস্টার মোটেই নয়ই আপত্তিকর।

আপনি এই মানসনে থাকেন? জিজ্ঞাসা করল সোমা।

হ্যাঁ, দেখুন, এবারে আমায় যেতে হবে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সীমা।

কিন্তু এখনও ডাঃ জৈন আসেনি। আর ঐ বিরাট কুকুরটাই বা নিয়ে যাবেন কি করে? একটু ব্যস্ত এগিয়ে এল সোমা দত্ত, তারপর বলল—তার চেয়ে আসুন, ড্রইংরুমে একটু বসবেন।

না থাক, এখানেই ভাল আছি।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিন, একটু চা খান—। সোমা দত্ত সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল।

বাড়ীতে কোন মেয়েছেলে নেই যে, এসে আপনাকে খেতে অনুরোধ করবে। আমি নিতান্তই একলা। সোমা দত্ত দেখা করেছে বলে এতক্ষণে বুঝতে পারল সীমা। চোখ-দুটো তার স্বর্ণ। আরও এগিয়ে এল সে।

আপনার নামটা কিন্তু এখনও বলেন নি।

আমার নাম শ্যামলী সেন। আড়ষ্ট হয়ে বলল সীমা।

রাইট—পুরী হোটেলের রেজিস্টারে তাই দেখেছি বটে। কিন্তু আপনি চা খাচ্ছেন না।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিল সীমা। আপত্তি জানালে অহেতুক দেরী হবে। ডাক্তারসাহেব এসেছে বলে একজন বেয়ারা সংবাদ দিয়ে গেল। ক্যাসারকে পরীক্ষা করে ডাঃ জৈন বলল—মিঃ দত্ত, কুকুরটা কি আপনার?

না, মিস্ সেনের। ইনি আমারই প্রতি-বেশী।

ওর ডিসটেম্পার হয়েছে। একটা পা প্রায় প্যারালাইজড্। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সীমা।

তাহলে কি হবে? ব্যাকুল হয়ে পড়ল সে।

ওকে হাসপাতালে দিলেই ভাল হয়। বলল ডাঃ জৈন। সীমার চোখদুটো জলে ভরে এল। এই এক জায়গায় সে দুর্বল। ক্যাসার তার কাছে থাকবে না এটা ভাবা তার পক্ষে শক্ত। ক্যাসার তার সহায়, বন্ধু, রক্ষক। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সীমা পরম স্নেহে।

ভয় পাবেন না মিস সেন, সোমা দত্ত বলল, ওর ভালোর জন্যই কয়েকদিন ওকে ছেড়ে থাকতে হবে।

ওকে আপনি রোজ দেখতে যেতে পারেন, সেই সঙ্গে বলল ডাঃ জৈন, আর বলেন ত আমিই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

খুব ভাল হল ডাঃ জৈন। সীমার হয়ে উত্তর দিল সোমা।

ক্যাসারকে নিয়ে ডাঃ জৈন চলে যাবার পর সীমার শরীর আর মন যেন অবশ হয়ে গেল। নির্জীবের মত সে বসে রইল চুপ করে। হঠাৎ একটা অজানা স্পর্শ সে অনুভব করল তার উন্মুক্ত গলার ওপর। চমকে উঠে সীমা তাকিয়ে দেখল সোমা দত্তের একটা হাত তার নগ্ন কাঁধের ওপর রয়েছে। চকিতে দূরে সরে গেল সীমা।

কুকুরটাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?

সোমার কথার উত্তর না দিয়ে সীমা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সীমা জানে মেয়েদের দুর্বল মুহূর্তগুলো কাজে লাগায় এরা।

মিস সেন—ডাকল সোমা। থমকে দাঁড়াল সীমা দরজার কাছে।

কুকুরের খবর আমি কালই জানিয়ে দেব আপনাকে।

সীমা আর দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল বাড়ীর বাইরে।

ফ্ল্যাটে ফিরে সে ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে বিছানায় বসে ভাবতে লাগল।

সমস্ত জিনিসটা তার কাছে অবাস্তব বলে মনে হল। অরুণ বসুর সামনে ইন্টারভিউ, গাড়ীতে তার সঙ্গে ফিরে আসা, ক্যাসারের অসুস্থতা, সোমা দত্তের গায়ে পড়া আলাপ করা, সবগুলোই যেন আকস্মিক দুর্ঘটনার মতই একটা থেকে আর একটা ঘটনার পার্থক্য লক্ষ্য করে সে অবাক হয়ে গেল। একটু পরে ক্যাসারের জন্য জানালার কাছে দাঁড়াল সে। ক্যাসারের জায়গা, কোণে রাখা বেতটা, গায়ে ঢাকা দেবার কম্বল, শোবার বিছানা—সব তাকে ক্যাসারের অনুপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিল। ক্যাসারের গায়ের গন্ধটা এখনও সীমা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। সীমা আজ নিঃস্ব, রিক্ত, নিঃসহায়। তার সামনে বন্ধুহীন রাত্রি আর অজানা বিপদের নিঃশব্দ পদসঞ্চার। পাশের দেওয়ালটা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

ধীরে ধীরে বিছানায় এসে সে শুয়ে পড়ল। আজ তার খাওয়ার স্পৃহাও নেই। সীমা নিজেকে এত অসহায় কেন ভাবছে তা সে বুঝতে পারে না। ছোটবেলায় তার মনে এই ভাবটা বেশী আসত সে কথা তার মনে আছে। ক্যাসার তখন কোথায় ছিল? সে থাকলে নানুকাকা তাকে অত বকত না, যন্ত্রণা দিতে পারত না। নানুকাকার চেহারা বেঁটে মোটা ধরনের ছিল। গোল মুখের ওপর সরু গোঁফ আর চোখে চশমা। নানুকাকা তাদের বাড়ীতে অত থাকত কেন তা সে বুঝতে পারত না। বাবাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন। বাবা কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকতেন সব সময়। এক কথা পাঁচবার বলে তবে উত্তর পাওয়া যেত। তবে সীমা এটা জানত যে নানুকাকা বাবার বন্ধু। বাড়ীটাও তার। পঁচিশ টাকা ভাড়া। মাস গেলে বাবা মাইনের টাকাটা মার হাতে দিয়ে দিত। বাড়ীভাড়ার টাকা কিন্তু সীমা কোনদিনই নানুকাকাকে নিতে দেখেনি। বাবা অফিস চলে গেলে নানুকাকা একটা বাজারের থলে নিয়ে বাড়ী ঢুকত। তাতে মাছ কিংবা মাংস থাকত। মায়ের রান্না কখন শেষ হত সে হিসেব সে রাখত না। কারণ তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ত বাবার খালি বিছানায় হাত রেখে। নানুকাকার সামনে সে পারতপক্ষে যেত না। যদি গিয়ে পড়ত তাহলে—

খুকু তোমার পড়া হয়েছে? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করত নানুকাকা।

তুমি এখানে কেন? মা-ও সায় দিত নানুকাকার সঙ্গে। সে বুঝতে পারত না মা আর নানুকাকা তাকে দেখলে অত রাগ করত কেন। বাবা কিন্তু তাকে দেখতে না পেলে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নানুকাকা তাকে সঙ্গে করে সিনেমায় নিয়ে যেত। মা, নানুকাকা আর সে। ছবি দেখাতে তার ভাল লাগত না, উসখুস করত। তাছাড়া নানুকাকা আর মা কি যেন ফিসফিস করে বলত আর হাসত। সে আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। সোজাসুজি তাকালে মা তাকে চিমটি কাটত। তখন তার বয়স কত হবে, পাঁচ ছয় বছর। তারপরেই বাবা তাকে একটা মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। নানুকাকা যেদিন খেয়াল হত সেদিন তাকে নিয়ে পড়াতে বসত। স্কুলের মাদার না সিস্টার কি সুন্দর করে [illegible] বলত, নানুকাকা কিন্তু সেরকম পারত না। একদিন [illegible] নানুকাকা তাকে [illegible] টেনে দিয়ে তার [illegible] সারাদিন সে [illegible] আর কেঁদেছিল [illegible]

সে সব বলে দিয়েছিল বাবাকে। এ নিয়ে মায়ের সংগে দারুণ ঝগড়া হয়েছিল বাবার। কথাগুলো সব বুঝতে পারে নি। তবে সে রাতে বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল সেটা এখনও তার মনে আছে। সেই প্রথম বাবাকে রাগ আর ঝগড়া করতে দেখল সীমা। নান্কাকার কাছে এরপর সে অকারণে অনেকবারই মার খেয়েছে। এক এক সময় সে নান্কাকাকে কিভাবে জব্দ করবে, ভাবত: বাবা নান্কাকাকে মারে না কেন? একথা মনে হত তার মাঝে মাঝে। বাবা যে নান্কাকার চেয়ে সর্বদিকেই দুর্বল একথা বুঝতে দেরী হয়নি সীমার। একবার নান্কাকার চশমাটা সে লুকিয়ে রেখেছিল চালের ড্রামের মধ্যে। অনেক খোঁজা হল কিন্তু পাওয়া গেল না। তার পরের দিন সীমাই সেটা বার করে মিথ্যে বলেছিল যে খাটের পিছনে সে পেয়েছে। ব্যাপারটায় ভারী খুশী হয়েছিল সে। নান্কাকার ব্যস্ততা, মায়ের হতাশার ভাব, সবই সে উপভোগ করেছিল। রাত্রে তার কষ্ট হত। দিনের বেলায় তবু স্কুলে তার সময়টা কাটত ভাল। পড়াশুনো আর খেলা নিয়ে আনন্দে থাকত। বাড়ী ফেরার মুখে আবার সেই অন্ধকার গলির ভ্যাপসা বাড়ীটা, নান্কাকা আর মায়ের কথা মনে পড়ে মনটা তার খারাপ হয়ে যেত প্রায়ই। বাবার দিনের বেলায় ছুটি থাকলে তার ভাল লাগত। আর কিছু না হোক বাড়ী গিয়ে সেদিন খেতে পেত। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলেই মনটা আবার তার ভার হয়ে যেত কারণ রাত্রে বাবা কাজে গেলে তাকে খালি বিছানায় শুতে হবে, সেই চিন্তাটাই পেয়ে বসত। একটানা তার কোনদিনই ভাল যায়নি। এই দুঃখের মধ্যে বাবাই অবশ্য একমাত্র তার শক্তি ও সহায় ছিল। সেই বাবাকে সে চোখের সামনে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখল একটু একটু করে। রাত্রে বাবা ঘুমের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ করত। সেটা শুনে সীমার মনে হত বাবা বোধ হয় মরে যাচ্ছে। অনেক রাতে সে উঠে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছে বাবা বেঁচে আছে কিনা। সংগে সংগে ভাঙা জানলাটার আওয়াজও শুনতে পেত। সীমার কাছে রাতটা দুর্বিষহ যন্ত্রণা ছিল যেন। বিভীষিকাময় স্বপ্ন আর ভয়াবহ অস্বাভাবিক শব্দগুলো তাকে পীড়ন করত অসহনীয়ভাবে।

চিন্তাস্রোতে তলিয়ে গেল সীমা। বক্সারের অভাবে সে যে ভয় পাচ্ছে এটা অনুভব করতে পারল সংগে সংগে। ঘুমের কোন আশা নেই তা সে বুঝেছে। এখন সে উন্মুখ হয়ে থাকবে অচেনা অস্বাভাবিক কোন আওয়াজের জন্য। সেইদিকেই তার মন পড়ে থাকবে সারারাত। বিছানায় উঠে বসল সীমা।

ক্রুস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে কোম্পানীতে যোগ দিল সে। এইটেই অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যবস্থা বলে মনে হল তার কাছে। সৌম্য দত্ত বক্সারের অসুখের অজুহাতে যেভাবে তাকে সাহায্য করতে ব্যগ্র হচ্ছে সেটা তার পক্ষে প্রায় অসহনীয় বলা চলে। সবচেয়ে ভয়ে বিপদ হয়েছে, সৌম্য তার ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়াতে। লোকটার হাতে প্রচুর পয়সা আছে, এটা বেশ বোঝা যায়। অবশ্য সেটাই বড় কথা নয় সীমার কাছে। সম্পদ তাকে প্রলুব্ধ করে না। কারণ এতে দায়িত্ব বেশী, বিপদও প্রচুর। সেই কারণে সৌম্য দত্তকে অরুণ বসুর মতই সে এড়িয়ে যেতে চায়। সৌম্য দত্তের সংগে অরুণ বসুর তুলনা করে সীমা দেখেছে, সৌম্য দত্তের অ্যাপ্রোচটা শুধু আপত্তিকরই নয়, তার সবটাই প্রকটভাবে স্থূল। অরুণ বসুর ভাবভঙ্গী বা কথায় সৌম্য দত্তের প্রলুব্ধতা নেই। জোর করে ভদ্রতা প্রকাশের অশোভন চেষ্টা নেই। অরুণ বসুর ব্যবহারে তার প্রতি একটা সূক্ষ্ম অভিভাবকসুলভ ইংগিত সে লক্ষ্য করেছে। তার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় অরুণ বসুর কি স্বার্থ থাকতে পারে সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি সীমা। সুন্দরী যুবতীর প্রতি আকর্ষণের কথা যদি ধরা যায়, তাহলেও অরুণ বসুকে সেদিক দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায়ের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। কোলারিজ কোম্পানীর টাকা চুরির ব্যাপারে পুলিশ এখনও তাকে অভিযুক্ত করছে না কেন এবং এর পিছনে অরুণ বসুর কোন ইংগিত আছে কিনা সেটাও সীমার পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে উঠছে। অরুণ বসুর ব্যবহার তাকে শুধু ভয় পাইয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তার মন আর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে এটা সে অনুভব করছে এবার। আপত্তিকর কিছুই নেই অরুণের ব্যবহারে। তাই সে সীমার কাছে দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত। সৌম্য দত্তকে সব মেয়েই চিনতে পারে। তার উদ্দেশ্যটা যেমনি প্রাচীন তেমনি প্রকট। সৌম্য দত্তকে চেনা যায়—তাকে ঘৃণা করতে বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত বহু উপলক্ষ্য পেতে পারে। মোট কথা তাকে একটা বিশেষ রূপ দিয়ে যাচাই করতে অসুবিধে নেই। অপরপক্ষে অরুণ বসুর বেলায় সে কথা খাটে না। সীমা তার সামনে এবং পিছনে অবাঞ্ছিত বিপদ দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ক্রুস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে

COLLEGE BOOKS

Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani, Visva Bharati and Jadavpur University.

BOOKS ON B.T., B.Ed. and P.G. Basic Course

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

1. শিক্ষণ-প্রসংগে পদ্ধতি ও পরিবেশ 12.00
2. শিক্ষণ-প্রসংগে সমাজবিদ্যা (Social Studies) 8.00
3. শিক্ষণ-প্রসংগে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Economics & Civics) 10.00
4. শিক্ষণ-প্রসংগে ইতিহাস (History) 12.00
5. ভারতের শিক্ষা-সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 2.00

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

6. শিক্ষা-তত্ত্ব (Principles and Practice of Education) —দ্বিতীয় সংস্করণ 9.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

7. শিক্ষণ-প্রসংগে মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology with Statistics) যন্ত্রস্থ

BP **BANERJEE PUBLISHERS**

CALCUTTA 9 : Phone : 34-7234

কোম্পানীতে যোগ দেবার পরই সে বুঝতে পারছে সে যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তার অজান্তে কে যেন তাকে এগিয়ে দিচ্ছে বিপদের সীমানার মধ্যে। গণ্ডীটা যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে তার অজান্তে। সেটা যে একদিন ফাঁসের বেড়িতে পরিণত হতে পারে, সেই দুশ্চিন্তা আজকাল যেন তাকে পেয়ে বসেছে। অফিসে অরুণ বসু, আর বাইরে সৌম্য দত্ত। এই দুজনকে কিভাবে এড়ান যেতে পারে, কি উপায়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি সে পাবে, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে সীমা তাই ভাবছিল মনে মনে। তার জীবনে যেন সে শুধু পাপ কাটিয়েই এসেছে বার বার। দুঃখ, ভয়, দুশ্চিন্তা, অশান্তি সবই সে এড়িয়ে এসেছে কোন না কোন কৌশলে। কোন সমস্যার সংগেই সে সামনাসামনি মোকাবিলা করে নি বা করতে চায় নি। এটা তার কাছে বোকামি বলে মনে হয় না। বুদ্ধি না খোয়ালে যদি সমস্যার আবর্ত থেকে মুক্তি সম্ভব হয় তাহলে বাহাদুরী করে তার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি সীমা।

ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

কে? জিজ্ঞাসা করল সীমা। তাকে কেউ ডাকে না এইভাবে।

আমি সৌম্য দত্ত।

কি ব্যাপার? দরজার খিল দিয়ে সৌম্যকে দেখতে পেল সীমা। সেই পরিচিত সজ্জ—ধুতি আর পাঞ্জাবি। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

দরজাটা একটু খুলবেন—সৌম্য স্বরের কণ্ঠে অনুনয়ের আগ্রহ।

আমি এখন ব্যস্ত আছি—স্পষ্ট উত্তর দিল সীমা।

তাহলে অপেক্ষা করছি।

না, তার প্রয়োজন নেই, বক্সারের কুশল সংবাদ আমি পেয়েছি। আপনি আর অনর্থক কষ্ট করবেন না।

বক্সারের জন্য আমি আসিনি। আমি কয়েকটা জুয়েলারী আপনাকে দেখাতে এসেছি।

আমার জুয়েলারীর কোন দরকার নেই। মিঃ দত্ত, আপনি অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

পায়ের শব্দ শোনা গেল সৌম্য দত্ত চলে যাচ্ছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। এত তাড়াতাড়ি সৌম্য দত্ত তাকে নিষ্কৃতি দেবে এটা আশা করেনি সে।

অরুণ বসুর চেম্বারটা অফিসের এক-ধারে ঠিক সীমার রুমের। সেদিন কাজের মধ্যে বেয়ারা চিরকুট দিয়ে জানালো যে বোস-সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছেন। এটা সে আশা করেছিল, সুতরাং দেরী না করে সে সোজা গিয়ে ঢুকল পার্টিশান দেওয়া ঘরের মধ্যে।

আমায় ডেকেছেন?

হাঁ বসুন। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল অরুণ। বসল সীমা।

গত সপ্তাহে কয়েকটা স্টেটমেন্ট টাইপ করেছিলেন মনে আছে?

আছে। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

তাহলে কাইন্ডলি ওর কপিগুলো যদি পাঠিয়ে দেন।

আচ্ছা। এগিয়ে গেল সীমা দরজার দিকে।

আর মিস সেন—ফিরে তাকাল সীমা অরুণের দিকে।

আমি সাড়ে চারটের সময় বার হব, আপনাকে সংগে যেতে হবে।

কেন? যেন রুখে দাঁড়াল সীমা।

বোর্ডের মিটিং-এ স্টেনোর অভাব। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণ বসু।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল সীমা। আবার অরুণ বসুর সংগে তাকে যেতে হবে। তার এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সেটার জন্য চিন্তিত নয় সে।

গাড়ীতে উঠে বসল সীমা অরুণের পাশে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ী চালাবার পর অরুণ তার দিকে তাকিয়ে বলল—আজ একটু দেরী হতে পারে মিস সেন?

দেরী হবে কেন? সবকিছুতেই তার সন্দেহ হয়।

প্রথমে মিটিং সেরে তারপর আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব—

আমি আর কোথাও যাব না। শক্ত হয়ে বসল সীমা।

কথাটা শুনেই ভয় পেলেন? ডগ শো-এ আজ প্রাইজ দেওয়া হবে।

আপনার কুকুর আছে? কৌতূহল হল সীমার।

হাঁ, আমার স্প্যানিয়েলটা প্রাইজ পেয়েছে এবার।

বোর্ডের মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সংগে সীমা একবার চেষ্টা করল অরুণের নাগালের বাইরে যেতে। কিন্তু পারল না।

একসংগে অত কুকুর সীমা কোনদিন দেখে নি। ছোটবেলা থেকেই সীমা কুকুর ভালবাসে। মনে আছে ছুটির দিনে, বাড়ীর সামনে যে কুকুর দুটো থাকত তাদের নিয়ে তার সময় কাটত। নিজের খাবার থেকে লুকিয়ে রুটি বা ভাত তাদের জন্য রেখে দিত। তাদের পেট ভরাবার মত জিনিস অবশ্য তার ছিল না কিন্তু ভারী ভাল লাগত সীমার এই কুকুর দুটোকে। এই দুটো জীবকেই শুধু সে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে দেখেছে। তার জন্য অপেক্ষা করেছে খাবার মত অধীর আগ্রহে। সীমার ধারণা ছিল তার দুঃখের কথা বাবা ছাড়া ঐ দুটো কুকুরই বুঝতে পারত। নীরব সান্ত্বনা দিত ওরা তার দুর্দশার মধ্যে।

ভাল লাগছে? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হাঁ, বেশ লাগছে—। ঐ কুকুরটা কি?

পিকিনীজ।

কি সুন্দর! আনন্দে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সীমার।

কুকুর ভালবাসেন বুঝি? অরুণ ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে।

হাঁ, আমার আছে বক্সার—তার ডিস-টেম্পার হয়েছে বলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ওটা কি?

পুড্ল।

কত ছোট, চোখদুটো সুদ্ধ লোমে ঢেকে গেছে।

চলুন ঐ ক্যান্টিনে একটু চা খাই, বলল অরুণ। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে চা খেল ওরা। বেশ ভাল লাগছে সীমার। এত ভাল অনেকদিন তার লাগে নি। তার ইচ্ছে হচ্ছে এইখানেই থেকে যেতে। এক-সংগে কুকুরগুলো ডাকছে নানা সুরে। ছটফট করছে সবাই প্রাণচাঞ্চল্যে। শুধু বুলডগ আর গ্রেটডেন দাঁড়িয়ে আছে তাদের বিরাট দেহ নিয়ে। তাদের গাম্ভীর্য কিন্তু অপরকে লজ্জা দিতে পারছে না। সীমার দিকে তাকিয়ে দেখল অরুণ। তার সব ব্যক্তিত্বটাই পালটে গিয়েছে। মুখের রুক্ষভাবটা অদৃশ্যপ্রায়। সে জায়গায় স্নিগ্ধ কোমলতার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করল সে। সীমাকে আর চেনা যাচ্ছে না এখন। (ক্রমশঃ)

সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(২)

অবনীন্দ্রনাথের বরানগরের গুপ্ত-নিবাসে বসবাসকালে তাঁর বাসায় বহুবার গিয়েছি; কখন একাকী, কখন সস্ত্রীক আবার কখন বা পুত্রসহ। আমার পিতৃদেব নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভগ্নীপতি ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আমার কাছে এলে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে আসতেন। সব স্তরের লোকেদের সংগে তিনি নানা রকমের কথাবার্তা কইতেন সমানভাবে। নাতিদের সঙ্গে, পুত্র ও পুত্রস্থানীয়দের সঙ্গে প্রায় সব সমবয়স্কদের সংগে সমান ঘরোয়াভাবে আলাপ-সালাপ করতে দেখেছি। ও'দের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমা-দের বাসায় যাতায়াত করতেন এবং আমরাও তেমনি আপনজন ও অভিভাবক ভেবে তাঁর কাছে যেতাম।

আমার নতুন বিয়ের পর যখন কোন তত্ত্বতাবাস আসতো তখনই অবনীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ীতে লোক মারফৎ সাইকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনিও বিশেষ করে জন্মাষ্টমী ও তার পরের দিন প্রচুর মিষ্টান্ন ও সন্দেশ আমাদের বাড়ীতে পাঠাতেন। আমাদের এখানে জলকলের পুকুরে মাছ ধরা হলে তাঁর ওখানে পাঠানো হতো। তাঁর পরিবারের আমরাও এক আপনজন হয়ে গিয়েছিলাম। উনি সকালে নেমে আসতেন চটিটি পায়ে দিয়ে বাগানে ঘুরতেন। ছোট ছোট পরিত্যক্ত কাঠ পাথর নিয়ে কিছু শিল্পকলার 'কাটুম-কুটুম' খেলা চলতো। সামান্য জিনিসকে শিল্পীর দৃষ্টি-প্রলেপ দিয়ে এক অপরূপতার রূপ দেখতে পেতেন। সন্ধ্যার আলো নেভার আগে ওপরের দক্ষিণের বারান্দায় বসতেন তাঁর বিশেষ ইজিচেয়ারে। সারি সারি অনেক চেয়ার শান্তিনিকেতনী মোড়া প্রভৃতি পাতা থাকতো। আমি গিয়ে পাশের চেয়ারে বসতাম। আর শুনতাম তাঁর দীর্ঘ জীবনের অনন্ত কাহিনীর কথা। অধিকাংশ সময় আমি শুধু নীরব শ্রোতা।

অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্র-নাথ (আমাদের অলোকদা) আমায় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী পারুল দেবীর যেন স্নেহের অবধি ছিল না। অতি ধীরে ধীরে ও সুনম্র তাঁর কথা। প্রকৃত সুগৃহিণীর মত সংসারের নানান কথা জানতে চাইতেন। পৃথক পৃথক-ভাবে প্রত্যেক মানুষটির কুশল সমাচার গ্রহণ করতেন। তার মধ্যে থেকে দাসদাসীও বাদ যেতো না। বেদনায় সহানুভূতি জানাতেন। মাঝেমাঝে আমাদের বাসায় আসতেন। তাঁর চাল-চলনে তাঁর সহৃদয় আচরণে সকলেই মুগ্ধ ছিল। ঘরে বাইরে সবাই তাঁর মমতাময়ী স্নেহশীলা মূর্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতো ও আজও করে।

অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের পর ফিরে এসে কোন কোন দিন কিছু কিছু আমাদের আলাপ-আলোচনার কথা লিখে রেখে দিতুম। তারই কিছু কিছু অতীত দিনের স্মরণিকা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অবনীন্দ্র সান্নিধ্যে

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিপুল বেগে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথ সেই দিন সকালে জলকলের কাছ দিয়ে বেড়িয়ে গেছেন। জল-কলের ভিতরে উচ্চস্থিত জলাধারটি এলুমিনিয়াম রং করা। অত উঁচুতে বলে গায়ে ধুলো জমে এটার রং কিছু মলিন করেনি।

১৮।১।৪২ তারিখে তাঁর বাসায় যেতে তাঁরই পাশে রাখা চেয়ারে বসতেই তিনিই কথা শুরু করলেন।

দক্ষিণেশ্বর: ১৮।১।৪২

অবনীন্দ্রনাথ—আসতে আসতে ভাবছিলাম, তোমাদের চাঁদির মতো ট্যাঙ্কটা কি করবে?

আমি—ওতে একটা ক্যামোফ্লেজ রং দেবো। নীচে সবুজ ঘাসের রং ও ঠাট মিশিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার করা হবে।

অ—মানে, গাছপালা করে দেওয়া, আমি ভাবছিলাম যদি ওর কমকান্তিটা গঙ্গা-মাটি লেপে নষ্ট করে দাও তো কেমন হয়? কারণ এরকম রংটা ডিসকলার করলে তা আর পরে ফিরে পাওয়া যাবে সেই গঙ্গামাটি হলে পরে ধবলে গঙ্গামাটি উঠে যাবে। সেই গঙ্গামাটি লেপার উপর থেকে তাল খেজুরের পাতা ঝুলিয়ে দাও। তা করলে কি হয়? নকল একটা জিনিস আমাদের চোখে দূর থেকেই ধরা পড়বে কিন্তু ওপর থেকে জলের ধারে গাছপালাই মনে হবে।

আ—যারা এরোপ্লেন করে জিনিস নষ্ট করে, তাদের আর্টের সমঝদারী চোখ নেই। তাহলে জিনিস নষ্ট করতো না। তা যাই হোক, আপনাকে উক্ত দেখছি, ধারের বিরাট জলাশয়ের মাঝখানে এটা একটা বিন্দুর মতন। এই ডামাডোলে আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

অ—কোথায় আর যাব! এই রকম জঙ্গলের মতো জায়গা ছেড়ে, পয়সা খরচ করে যাব কোথায়? তারা এই জলা ও জঙ্গলে বোমা ফেলতে আসবে না।

আ—তা যা বলেছেন—বোমারও তো দাম আছে। বোমা বয়ে আনবারও আবার খরচ আছে। তার উপর শত্রু শিবিরে প্রবেশ। ধনে-প্রাণে বিনাশিত হবারও ভয় আছে।

অ—আমার মেয়েকে বলেছিলাম, এখানে থাকবার জন্যে মরি তো একসঙ্গেই মরব।' সে বললে, বাবা আমার এই ছোট্ট মেয়ের জন্য আমাকে চলে যেতে হল। আমি বললাম ভালো। ইচ্ছে ছিল এক-সঙ্গে থাকা, বুঝলাম হল না। —বলে অবনীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেমন যেন হঠাৎ উদাস ভাব।

আ—বাড়ীতে 'এয়ার রেড সেলটার' তৈরী করছেন নাকি? না নীচে একখানা ঘর সেলটারের মতো ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন?

অ—নীচের ঘরে গিয়ে কি বাড়ী চাপা পড়ে মরব? সাইরেন বাজলে বুড়োবুড়িতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকবো, মরতে হয় দুজনে একসঙ্গে মরব।

কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে শিল্পাচার্যকে জিজ্ঞেস করলাম, সামনে ঐ নেপালীটি যে ঘুরছে, আপনারা কি নতুন নেপালী দরোয়ান রেখেছেন?

অ—ওরে বাবা: নেপালী! কখন কেটে রেখে রেখে চলে যাবে। মিলিটারী মেজাজ কিনা? তবে সেকালের এক কলকাতার বড়লোকের এক গল্প বলি শোন। —বাবু এক মস্ত জমিদার। বিরাট দালান-বাগান, গাড়ী জুড়ি দাস-দাসী কত কি। তার মধ্যে একটা বিরাট কোচিং গাড়ী ছিল। [illegible] দারোয়ান রেখেছেন—[illegible] পাল মুসলমান [illegible] বড়ই মাথায় [illegible] কথ

কোচোয়ানের বাক্সে গিয়ে বসলেন। দুধারে দুই সহিস—ফেটিং-এর দরজা খুলে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। কর্তা ও গিন্নী এসে উঠলেন। সহিস দরজা বন্ধ করে দিল। কর্তা গাড়ীতে উঠেই কোচম্যানকে বলে দিয়েছেন, কোন জায়গায় যেতে হবে। তবুও কোনো রাস্তার মোড় এলেই জমিদারবাবু— কোচম্যানকে নির্দেশ দিচ্ছেন রাইট স্যার, লেফট স্যার।

দু-তিনবার এইরকম করবার পরে ঘাড় ফিরিয়ে সাহেব কোচম্যান জমিদারবাবুকে বলল, আই নো মাই বিজনেস, বাবু।

২০।৮।৪২

অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তাই আজ বিকেলে তাঁর বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফটক পার হলেই মালীর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম কর্তাবাবু আছেন? 'আছেন্ত।'

পুকুরের পাড় দিয়ে সুপুরি গাছের সারি দেওয়া রাস্তা পার হয়ে পুব পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে দেখি শিল্পাচার্য আসীন। আমায় দেখতে পেয়ে 'আসুন, আসুন। এতদিন কোথায় ছিলেন? দেখিনি অনেকদিন। তাঁর প্রশ্নের অবকাশে তাঁকে প্রণাম করে বসলাম তাঁর পাশে। সেখা চাঁপাগাছটা সান বাঁধানো ঘাটের উপর ছায়া ফেলেছে। আর দীর্ঘ গুবাকতরুরাজি বিলম্বিত ছায়া পুকুরের কালো জলে সরল কাল রেখাপাত করে দাঁড়িয়ে আছে। সমীরণের স্পর্শে ঈষৎ চঞ্চল জলে সরল ছায়া রেখাগুলি তরঙ্গায়িত রূপে ধারণ করছে। পাতাল-বাগানে মাটি নিড়ানো ... ... পুকুর জলে টইটুম্বুর। ভিতরে বাঁধ দেখা যাচ্ছে। চির অভ্যস্ত সিগারে টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ীর সব ভালো তো।'

—'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে মোটামুটি ভালো।'

—'কি রকম বুঝছেন? কাল সাইরেনের সময় কোথায় ছিলেন?'

—'গতকাল আমি এখানে ছিলাম না—হাওড়ার বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং সাইরেনের সময় হাওড়ার বাড়ীতেই ছিলাম। গত ছ' মাসে দেখা যাচ্ছে মানুষের মনে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। কেননা আমার নব্বুই বছরের বুড়ী ঠাকুরমাকে যখন বললাম, 'ঠাকুমা নীচে চলো, সাইরেন বাজছে!' ঠাকুমা বললেন, তোরা রয়েছিস ওপরে, আমি নীচে গিয়ে করব কি? বাইরে রাস্তায় কুল্পিবরফওলা সদাগরী মনোবৃত্তি নিয়ে আসন্ন খদ্দের না ছেড়ে কুল্পি বরফ বেচতে মসগুল। পাঁপড়ভাজাওলা লোহার তোলা উনুনে পাঁপড় ভেজেই চলেছে। লোহার বাটির টোপর মাথায় দিয়ে এ-আর-পির লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—বোমা ফেলার ভয় নেই এই আশ্বাস দিয়ে।'

অবনীন্দ্রনাথ তখন বললেন—'বৌমা তো উঠতে পারেন না। টাইফয়েডের জন্য শয্যাশায়িনী। আমি বুঝতেই পারিনি যে সাইরেন বেজেছিল। বারান্দায় বসে একখানা বই পড়ছিলাম। অলকও তখন বাড়ী ছিল না।'

—'জার্মান রেডিওর খবর কি শুনেছেন? আমরা এখান থেকে যা জানি না তা যুদ্ধের সময় জার্মান রেডিও থেকে বলছে যে ভারতবর্ষের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর ইস্পাতের কারখানায় ধর্মঘট চলছে। অস্ট্রেলিয়ার উইমেন ফেডারেশন থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে, যে সকল মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান মহিলাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হচ্ছে, তাদের বিবাহ করার ও মার্কিন স্ত্রী হবার রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হোক। উদ্দেশ্য যাতে স্ত্রী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্র বজায় থাকে।'

অ—'এখানের খবর ওরা রাখে?'

আ—'দেখছি তো তাই। শরীরটা এখন কিরকম বুঝছেন?'

অ—'আমাশার ভাবটা এখনও যায়নি; তবে গরম লুচি ও মাংস খেলেই ভাল হয়ে যাবে, একটু রোদের ঝাঁজটা কমলেই একদিন সকালের দিকে আপনাদের ওখানে যাব। এরা সব 'সিঁথিতে' মাছ ধরতে গেছে। আজ সকালে 'বেলঘরিয়া' থেকে একদল ছেলেমেয়ে দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। আমি বললাম, 'আমায় দেখবে, দেখো।' একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কতদিন থাকবেন আপনি এখানে?' বললাম, 'তিন বছরের তো লীজ নিয়েছি। তারপর যেখানে যাব সেখানে তোমরা দেখা করতে যেতে পারবে না। করবার বহু কাজ ছিল যখন, তখন খুবই কাজ করতাম, তখনই বেঁচে থাকার সার্থকতা ছিল। এখন কাজ শেষ হয়েছে। তাই এদের বলি, 'আমায় কোন এক জায়গায় পাঠিয়ে দে। যখন শক্তি ছিল তখন কত কঠিন রোগের সেবা, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ আনানো, ঐ ঢাকুরে থেকে ডাবশাঁস, পাতিপুকুর থেকে জামরুল আনানো—সবই আমি করতাম। ছেলেদের অসুখ করেছে; রাত জাগা আমিই করতাম। আমার স্ত্রী একটু দুর্বলা, অনেক বাচ্চাকাচ্চা। আমিই সব করতাম। এখন কিছুই পারিনে। ছোট বৌমা বলেন, 'আপনি গল্প লিখুন।' তাও কি এখন পারি? গল্পও মনে আসে না। খুব ভোরে উঠি। চটিটি পায়ে দিয়ে ঠুক্‌ঠুক্ করে ওপর থেকে নেমে আসি। আর স্টুডিয়োয় গিয়ে একটু-আধটু আঁকি। তারই জন্যে বেঁচে আছি। সেগুলোকে ছবি বলা চলে না, ছবি নিয়ে খেলা।'

আ—'নতুন কি আঁকলেন?'

ছোট বউমাকে ডাকলেন। ছোট বউমা এলেন। ছোট বউমাকে বললেন, তাঁর আঁকা কয়েকটা ছবি আনতে।

ছবি এসে গেল।

অ—'নতুন আঁকার কথা বলছিলেন? এই ছবিখানা এখানেই বসে বসে এঁকেছিলাম। সামনে বাঁধ। সেই বাঁধের উপর দিয়ে রেলগাড়ী যাচ্ছে রাত্তির বেলা। তিনটি কামরার জানালা দিয়ে তীব্র আলো দেখা যাচ্ছে। সামনেই ঝাউগাছের শ্রেণী। দূরে কয়েকটা নারিকেল গাছ হাওয়ায় পাতা দোলাচ্ছে। ঝাউগাছের তলায় অন্ধকারের কালো রংয়ের বদলে একটু সাদা ফাঁকা—মনে হয় কে যেন সাদা থান পরে বসে। আসলে ছবিটা হল আমাদের বাড়ীর সামনে দোতলা থেকে দেখতে পাওয়া এমন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু বউমারা বলেন, এটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি বর্ণনার দৃশ্য।'

তখন আমি বললাম 'আপ কোন প্রাচীনকালে 'বিষবৃক্ষ' পড়েছেন তার মধ্যে আবার

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা। কত উপন্যাসে কত বর্ণনাই না আছে। এক বিশেষ বর্ণনা মনে রাখা কি সম্ভব?' সকল সংশয় ও সকল তর্কের অবসানের জন্য আনা হল 'বিষবৃক্ষ'। পড়া হল।

বিশেষ করে সেই অংশটি রাত্রে যখন সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে বলল, তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নাহলে হাঁরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনায় বঙ্কিমবাবু লিখেছেন, 'গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকল নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। দত্ত বাড়ীর বাহিরের পথ সে জানে।......

'অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে আলো দেখিয়া যায়।......

'বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কপাট খোলা, সার্সী বন্ধ, অন্ধকারের মধ্যে তিনটি জানালা জ্বলিতেছে। ......কুন্দনন্দিনী মুগ্ধ লোচনে গবাক্ষ-পথ প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতগুলি ঝাউগাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব ও ফল খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ মন্দ মন্দ হেলিতেছে, দূর হইতে তাল বৃক্ষের তর তর মর্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে। সর্বোপরি বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে।"

ছবি হাতে উৎকর্ণ শ্রোতার মত শুনে গেলাম সেই বর্ণনা ও উল্লাসিত কণ্ঠে বললাম, 'আশ্চর্য' অদ্ভুতভাবে মিলে গেল বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে ছবির দৃশ্যপট। শুধু শোনা যাচ্ছে না তাল বৃক্ষের তরতর মর্মর শব্দ, আর নেই সঞ্চরণশীল কুন্দনন্দিনী। এটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন। সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট ডাকা দরকার। এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বিশ্লেষণে। এটা সংখ্যাগণিতের খাতে এক দৈব-ঘটনা।"

শিল্পাচার্য উল্লসিত হয়ে মৃদু হেসে বললেন—'বিবরণের সঙ্গে অদ্ভুত মিলে যাবে, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এঁকেছি নিজের খেয়ালে। বৌমারা মাথা ঘামিয়ে মিল বের করেছেন। তারিফ ওঁদের করতে হয় বৈকি? এইরকম খেয়ালমাফিক ছবি এঁকে যাই, নানা চিত্র গড়ে যাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নয়।' আরও কয়েকটি ছবি দেখালেন। ছোট সাইজের কাগজে জল রঙে আঁকা। ফুলস্কেপ ও ফুলস্ক্যাপের চাইতে কম-বেশী মাপের মোটা কাগজে সাধারণতঃ এগুলি আঁকা।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অমর চিত্রাবলী যেন এক অপূর্ব তুলিওয়ালার বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই সময় খেয়ালী ছবিগুলির মধ্যে তা আমার চোখে পড়লো না। আমি শিল্পী নই, নই শিল্পসমালোচক। শুধু সাধারণ চোখ দিয়ে সাধারণ ভালো-লাগা-না-লাগার মাপ কাঠিতে ছবি দেখি। এক সময় ছিল যখন শুনতাম, অবনীন্দ্রনাথের নর-নারীর চিত্রের অতি দীর্ঘায়িত অঙ্গুলি আর গাছপালার পাতা সব সময় নিম্নমুখী যেন এক ঘুমন্তভাব উদ্যত হত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছের মতো ঊর্ধ্বমুখ নয়। ছবিগুলির মধ্যে চাকচিক্য বা পারিপাট্য ও শিল্পকৌশল অথবা শিল্পনিপুণতার ত্রুটির সমালোচনা কেউ কেউ করলেও তাতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকরের নিপুণ হাতের স্পর্শ আছে, তা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। কিন্তু দেখলাম, ছবিগুলি আমার মতে যত যত্ন নেওয়া দরকার সেরকম যত্নে রক্ষিত বা সঞ্চিত হচ্ছে না। হয়তো এ বাড়ীর চিত্রসম্ভারের মধ্যে এই ছবিগুলির মূল্যায়ন অল্প কিন্তু শিল্পরসিকদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

নানারকম আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বলতে কিছু হয় না। একটু ধরিয়ে দিতে পারলেই হল। তিনিই বলে যান, অতীত দিনের কত পুঞ্জীভূত স্মৃতিকথা—যা মনের পটে অমলিনভাবে ভেসে ওঠে।

মাছ ধরার প্রসঙ্গ উঠাতে বললাম—আজ আমাদের পুকুরে একটা প্রায় দশ-বারো সেরের বোয়াল মাছ ধরা পড়েছিল। তার হাঁ-টা বেজায় বড়—আর অসংখ্য মিহি করাতের মত দাঁত। যে-জেলে তার জালে জল থেকে তাকে তুলেছিল, তার গাল খাবলিয়ে দিয়েছে। জেলেরা বলছে যে, ওর পেট চিরলে কম করে দু' সের ছোট গোটা মাছ পাওয়া যেতে পারে। এই বোয়াল মাছগুলো ঠিক শার্কের ছোট ভাই। পুরীতে এইরকম বোয়াল জাতীয় সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায়। অনেকে খায়, অনেকে খায় না। আপনি দেখেছেন ওগুলো?

অ—সমুদ্রের ধারে ঐ মাছ পাওয়া যায়। তবে আস্বাদন তেমন সুবিধের নয়।

এমন সময় কলহুগলী থেকে জিতুবাবু (জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ও শশাঙ্কবাবু (শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী) এলেন। আমায় দেখে 'আরে আপনি এখানে? আপনার বাড়ীতে টেলিফোন করে পেলাম না। ভাবলাম নিশ্চয়ই এখানে।'

—আপনারা দুজনেই তাহলে ভবিষ্যাণীর দোকান খুলুন। কারবার ভালই চলবে। মূলধন লাগবে না। উপরে বাড়ীতে যেখানে দোকান ভাড়াও লাগবে না।

এই কথা বলতে বলতে দুজনে অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে পাশের দুটি চেয়ারে বসলেন।

আবার গল্প শুরু হল।

১৩।১১।৪২

এর আগে [illegible] অবনীন্দ্রনাথের কাছে গেছি ও তিনিও আমাদের জলকলে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সামনের রেলের বাঁধের ধার ঘেঁষে একপাল মোষ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি বললাম—এ মোষগুলো তেমন রাগী নয়, আওয়াজে ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করে না। তবে একটা মজা এই যে ঘোড়া দেখলে পাড়াগাঁয়ের আবাদুলো মোষগুলো তেড়ে আসতো।

এই কথা শুনে অবনীন্দ্রনাথের অতীত দিনের এক কাহিনী বললেন—আপনি কি জানেন, ঐ মোষেরা ঘোর লাল কি ঘোর কালো রং দেখলে তেড়ে আসে। আমি তখন জোয়ান। রাঁচিতে বেড়াতে গেছি। আমার স্ত্রীও সঙ্গে গেছেন। মেয়েরা সাধারণতঃ একটু ধীরে হাঁটে। তিনি আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটু পিছিয়ে পড়েছেন। লাল চেলী তখনকার দিনে নতুন বৌয়ের জন্য ভাল কাপড়। তাই পরে তিনি বেড়াতে এসেছেন। আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে দেখি একটা মোষ আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে। তাই না দেখে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমি পাহাড়ের কিছুদূর উঠেছি, তিনিও খানিকদূর উঠেছেন। আমি নেমে তাঁর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে উপরে উঠিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে সাদা চাদর জড়িয়ে দিলাম। আমাদের দেখতে না পেয়ে মোষটা পালিয়ে গেল। বাড়ী ফিরে মাকে পথের বিপদের কথা বলাতে তিনি বললেন, 'বৌমাকে কেন আর কখনও লাল কাপড় কি জামা পরিয়ে নিয়ে যাস না। সেই থেকে আমি জানি লাল রংটার উপর মোষদের বেশী রাগ।

১১।১১।৪২

বৈকালে যেতেই দেখি তিনি একটা কাঠের টুকরো নিয়ে ছুরি দিয়ে কী কাটুমকুটুম করছিলেন। তাই তাকে প্রশ্ন করলাম —"কী করছেন?"

—এই একটা ব্যাঙের মত করছি। বলে পুকুরপাড়ের বাঁধানো রোয়াকে সেটাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর প্রসন্ন বদনে শিল্পীবর বললেন—

মিলিটারি থেকে বাড়ী দেখতে এসেছিল। তাদের সব দেখিয়ে দিলাম। মস্তবড় পচা পুকুর, নীচু জমি ও মশার আড্ডা। কলের মুখ দেখে জিগেস করে যে এখানে পৌর প্রতিষ্ঠানের জলের কনেকশন আছে কিনা? তাকে বললাম, নেই, নলকূপ থেকে জল তুলে এইসব কলে আসে। আজকাল আর নলকূপ থেকে প্রায়ই জল ওঠে না। এ জল স্নানঘর ও বাসন মাজার জন্য ব্যবহার হয়। আমার ঐ জল থেকে আমাশয় হয়েছে। আজও ভুগছি। সেরে উঠতে পারিনি। চারিদিকে জঙ্গল ও পচা পুকুরের জন্য বাড়ীতে টাইফয়েড রুগী। বড় বৌমা এখনও সেরে উঠতে পারেন নি। এখন এমন দেখলে তোমাদের কি রকম মনে হয়? [illegible] হবে কিনা আগে থেকে বল। আমাদেরও

বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক খরচা করে শাকসব্জি লাগিয়েছি, তা এখন বন্ধ করেছি। নিসর্গে থাকার জন্য শহর ছেড়ে এই জঙ্গলে এসেছি। নিসর্গে থাকতে চাই। বলে যাও তোমাদের এ বাড়ী পছন্দ হল কিনা? বা নেবে কিনা?

—আমরা নেবার মালিক নই। তবু বলছি

We are not going to dislodge you from your residence. Go and smoke your cigar peacefully.

তারপর গেটের ধারে টিনের চালা দেখিয়ে বলে 'ওটা কি?'

বললাম, 'ওটা আমার স্টুডিও, চল দেখবে। সেখানে রয়েছে কাটুম-কুটুমের কাঠের টুকরো, মোটা বাঁশের গাঁট, নানা পুতুল, ছবি, রং তুলি। ওরা দেখে আর হাসে।

সব শুনে বললাম—আপনি যখন ওদের কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড রোগের কথা, মশার ভয় দেখিয়েছেন ও তার উপরে ঐ বড় পুকুর। ওরা নেবে না, দেখে নেবেন।

—শহরের মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছি। শান্তিতে আছি। আর ওঠাউঠির পর্ব ভাল লাগে না। তবুও 'অলকা'কে বলেছি একটা বাড়ী দেখার জন্য, গংগার ধারে হলেই ভাল হয়। সেখানেও তো সেই অবস্থা। আমার জন্য আমার কিছুই ভাবনা নেই। আমাকে সবাই ঠাঁই দেবে।

—চলুন আমাদের সংগে থাকবেন।

—তাই তো বলছি। আমায় সবাই ঠাঁই দেবে। রবিকাকা মাঝে মাঝে বলতেন, 'চলে এস শান্তিনিকেতনে। ছেলেদের উপর সব ছেড়ে দাও, ওরা বড় হয়েছে। কিন্তু পারি না ওরা আমাকে চায়। আমি বলি যে আমায় ছেড়ে দে। বৌমাদের বলি তোমরা তোমাদের বাপের বাড়ী চলে যাও। তাঁরা বলেন, আপনাকে একলা ফেলে আমরা কোথায় যাব? এ হতে পারে না। দেবীপ্রসাদ বলেছিল তার মাদ্রাজের বাসায় গিয়ে থাকতে। বোলপুরে গেলে যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারি। কিন্তু এদের মায়ায় এমন জড়িয়ে, যে ছেড়ে যেতে পারি না।

—এ বাড়ী যতক্ষণ না ছাড়ছেন তখন আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আসুন। আর যদি ছাড়তে হয় পাকাপাকি চলে আসুন, কোন অসুবিধে হবে না।

—হাঁ, আপনাতে আমাতে দুজনে থাকবো।

—যাবার জায়গা অনেক আপনার আছে সত্য, কিন্তু সেখানে গেলে কি সুবিধে হবে? সামঞ্জস্য থাকবে না, মনে শান্তি থাকবে না। যেমন অলকদাকে তাঁর ব্যবসার জন্য এখানে থাকতে হবে। বাঁরুর পড়ার জন্য থাকতে হবে। বাদশার কথা এখন সে ছোট বাদই দিলাম। কিন্তু জানবেন এ বাড়ী অন্ততঃ মিলিটারী থেকে নেবে না। অতএব মনের অকারণ ভাবনা দূর করাই ভাল।

—আমি হয়েছি কি জানেন—ওই লাঠি। যার মনে ভাবনা আছে অথচ নিজের কোন ক্ষমতা নেই।

—আমি বলব এটি একটি প্রাণবন্ত লাঠি বা তরুবর, যাকে জড়িয়ে নানা লতা উঠেছে। আপনি হলেন এই বৃহৎ সংসারের সিমেন্টিং মেটিরিয়াল।

—তাই ভাবি, আর ভাবনা করব না। একলা যখন ভাবি তখন মনে হয় আমি শান্তিতেই আছি। যশ, অর্থ সবই পেয়েছিলাম কিন্তু এখন বেশ শান্তিতেই আছি।

লক্ষ্য করলাম অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস সমস্ত আবহাওয়াকে উদাস করে দিল। সত্যই কি শান্তির কথা বলছেন? মনে কোন ভাবনা নেই?

প্রসঙ্গ বদলে বললেন—কাল সকালে শশাঙ্কদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। মনটা খুবই তৃপ্ত হল। বাড়ীর মেয়েরাও সন্ধ্যার সময় আরতি দেখতে গিয়েছিল।

বাড়ীর প্রসংগে এসে আবার বললাম—বাড়ী নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকেরাই দায়ী। তারা দালালী করে দেখাতে নিয়ে আসছে। সাহেবদের সুরো হবে।

—বেশী ভাড়া পাবার লোভে বাড়ীওলাদেরও কারসাজি হতে পারে। আবার জমি ও বাড়ীর দালালরাই এসে বলছে এখানে জমি আছে, ওখানে বাগানবাড়ী আছে।

আমার মনে হয় ওসব দালালীতে মিলিটারীরা ভোলে না। ওরা খুব স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। যা বলবে তাতে কোন লজ্জা নেই বা গোপনীয়তা নেই। খাড়া জবাব। ওদের একটা গল্প বলি শুনুন। সেবার কলকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ধর্মীয় মহাসম্মিলন। সেই পার্লিয়ামেন্ট অফ রিলিজিয়নে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের ব্যক্তিরা সভাপতিত্ব করবেন। বহু বক্তা থাকে। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় লাগায় তাতে সভাপতির বেজায় অসুবিধে হয়। শেষ বক্তৃতা পেশ করারও সময় কমে যায়। সেদিন প্রাক্তন বিখ্যাত সেনাপতি ও পরম ধার্মিক স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেন্ড সভাপতিত্ব করার দিন। তিনি সভারম্ভে বলে দিলেন—আমি মিলিটারী লোক, নিয়মানুবর্তিতা এখানে মূল কথা। বিশেষ বক্তার বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। তাঁর বক্তব্য সেই সময়ের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। আমি একবার লাল আলো জ্বালাবো, থামবার নির্দেশ দিতে। তারপর আমি কাউকে বলতে দেবো না। অতএব আপনারা দয়া করে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় নেবেন না এই আমার ঐকান্তিক অনুরোধ। অনেকে হয়তো ক্ষুন্ন হয়েছিল কিন্তু শ্রোতারা খুশী। অধিকাংশ বক্তা অন্য সভাপতির বেলায় ঘন্টা দেওয়া ও আলো জ্বালাবার পরও পাঁচ দশ আরও বেশী সময় বক্তৃতা করে যান। সেদিন কিন্তু বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। কেউ দু-এক মিনিট বেশী নিয়েছিলেন মাত্র। সব সুশৃংখলায় পরিচালিত হয়েছিল।

—সেই সময় আমরাও একদিন স্যার ফ্রান্সিসকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মেয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁর একটি পোট্রেটের স্কেচ এঁকে তাঁকে দিলাম। তিনি তো বেজায় খুশী। কথাবার্তা, হাসি-তামাসা অতি স্পষ্ট। ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। আমাদের সেই সন্ধ্যা ভালই কেটেছিল।

—আপনি নিজে না নড়লে কেউ এখান থেকে আপনাকে নড়াতে পারবে না।

—জায়গাটি আমার ভারী ভাল লেগেছে। মেয়েরাও খোলামেলা জায়গায় বেড়াতে পারে। আমি যদি দু-এক চক্কর এ বাগানে দি তো বেশ খানিকটা পরিশ্রম হয়ে গেল। কেমন খোলা হাওয়া। কলকাতার শুধু ধুলো, ধুঁয়ো, গরম ও আওয়াজ। আমি এখানে কেমন বসলাম সন্ধ্যাবেলা। স্ত্রী যে ঘরে মারা গেছেন সেই ঘরেই আমি শুই। রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুম হয় না। তাঁর কথা মনে পড়ে। ভাবি কত কী পুরোনো কথা। ভোর না হ'তেই বারান্দায় চলে আসি। নীচে নামি টুকটুক করে। বেশ আছি।

—আমাদের বাসায় কবে যাবেন?

—শীগগির যাব; দু' একদিনের মধ্যেই। বৌমাদের বলি বাপ-মা নাম রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা অথচ আমার নিজস্ব থাকবার ঠাঁই নেই। পাখীদের নীড় আছে, পশুদের গুহা আছে।

—অবনীন্দ্র যাঁর নাম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই যাঁর আপনার, তিনি কি গন্ডী দিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারেন? সবাই যদি আমার বলে ধরে নেন তাহ'লে ল্যাঠা চুকে গেল। গন্ডি দিলেই মুক্তি নেই। বাঁধন আরও শক্ত হ'য়ে বসবে।

—ঠিক তাই। রাজা ভর্তৃহরি বলেছিলেন

গাছে ফল, নদীতে জল
থাকার ঠাঁই বৃক্ষতল

তার আবার দুঃখ কী? এর বেশী মানুষে কী চায়।

এমনি কথাবার্তা চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে আসায় বললাম—ঠান্ডা পড়ছে, ভেতরে চলুন।

ও'কে ভেতরে এগিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্র দ্বারা ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

CENTRAL LIBRARY

গীতিকায় বঙ্গনারী

গুরুপ্রসাদ রায়

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতককে পালাগানের আদি যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এগুলির অর্বাচীনতা নির্ণীত হয়েছে। বস্তুত ষোড়শ/সপ্তদশ শতকে পালাগানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। গীতিকার ত্রিধারার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কিছু পালাগান বিদগ্ধ চিত্তে অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গেছে। ধর্ম-কেন্দ্রিক নাথ গীতিকার চরিত্র-চিত্র সামাজিক অবস্থা একটা বিশেষ যুগের স্বাক্ষর বহন করে চললেও পূর্বোক্ত দুই গীতিকার মতো একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য নাথ গীতিকার ধর্মীয় আবরণটি মুক্ত করলে যে সমস্ত চরিত্রগুলি সাধারণ মনে দোলা দেয় তাহল, রাণী, রাজপুত্র; কিছুটা অদুনা পদুনা। আর চরিত্রের বিশ্লেষণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গীতিকায় স্ত্রী চরিত্রেরই একাধিপত্য।

বস্তুতঃ গীতিকায় নারী সমাজ বা নারীর যত চিত্র, বিচিত্র রূপে রসে প্রকাশ ঘটেছে এমনটি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। শাক্ত-বৈষ্ণব, নাথ, যুগী, আউল-বাউল গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত সেই বাংলা দেশ—অজস্র আচার বিচার সংস্কার পরিকীর্ণ বাংলা দেশ আজকের বিক্ষুব্ধ জটিলতার স্পর্শ মুক্ত ছিল। সহজ সরল জীবনের স্বাদে গন্ধে ভরপুর সাংস্কৃতিক বাতাবরণ আজকের মতো এমন বিষাক্ত ছিল না। এই সমস্ত গীতিকার মধ্যেই পুরোন বাংলাদেশ তার জীবন-বোধ, জিজ্ঞাসা, সংস্কার আচার-আচরণ আশা-নিরাশা, প্রতিবেশ ও রসবোধকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছে। তাই এই গীতিকাগুলোকে বলতে পারি সামাজিক দলিল।

আজকের ব্যবসা বিমুখ বাঙালীর সান্ত্বনার কথা হল যে একসময় বাঙালী বণিকবৃত্তিতে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছিল। সেদিনের চট্টগ্রাম, হালিশহর, জয়নাবাদ, পতেঙ্গা, তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বহু সংখ্যক 'মধুপ', 'সাম্বেলা', 'জোলা', 'সুলুপ' বাণিজ্য উদ্দেশ্যে দেশান্তরে গমনাগমন করতো। ব্যবসায়িক নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হত। সাধু বা বণিক সম্প্রদায়ের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। লোক-কবিরা মন সেই সব বণিকদের বৈভবের প্রশস্তি পঞ্চমুখে গেয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের দুবেলা দুমুঠো অন্নের অভাব ছিল না। সেই বাংলাদেশ কোথায়? যেখানে—

হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া
নাই সে যায়।
ফকির বৈষ্ণব যদি হাঁক ছাড়ে দুয়ারে
কাটায় মাইপ্যা চাউল দেয় হরির
অন্তরে

সেই পুরানো বাংলায় সামাজিক স্বভাবের নমুনা এই রকম—

টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে
আকাল
কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাওয়াল।

পুরুষের বহিরঙ্গ জীবন—ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ উপায়ের মধ্যে, আর নারীর জন্য ছিল গার্হস্থ্য জীবন। গীতিকার ছত্রে ছত্রে তারই হাজার ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। বিবাহের নিয়ম বেশ শিথিল ছিল। অভিজাত কন্যাদের ওপর লোককবিদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হতে পারেনি, অতি সাধারণ ঘরের মেয়েরাই নায়িকার মর্যাদা পেয়েছে। ধোপার পাটের নায়িকা-কাঞ্চন ধোপানি, বিদেশ প্রত্যাগত সাধুদের জন্য হত নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূলে ছিল নারী সমাজ। আবার বিদেশ গমনোদ্যত স্বামীর জন্য স্ত্রীর ভাবনা অন্তহীন। [illegible] অঞ্চলের পূর্বোক্তায় অনেক স্থলেই সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

স্বামী আমার বাণিজ্যে যাবার পূর্বে যা ঘটেছিল
উড়িয়া যাইতে তার ঠেকে হানিল মাছি
ঘরের দুয়ার বাহির হইতে মুখে
দিল হাঁচি—
আমের ধুম আমি সর্প বাড়ে লোক ধাই
পন্থের মাঝে দেখে আমিষ কুম্ভ
একটা পাট
তিন বিধি দাসী যে শাখাত উবুম চাহ
খাইলা কলসী লৈয়া নারী জল
আনিতে যায়।

বর্তমানে সর্বত্র বর-বেদী এ সংস্কার দেখা যায়। বিবাহে স্ত্রী-আচার একটা বিশেষ অঙ্গ। ফুলশয্যার রাতে আড়ি-পাতার রেওয়াজ আজ আর তেমন দেখা যায় না, কিন্তু একসময়ে এটি একটি অবশ্য পালনীয় প্রথা হিসাবে গণ্য করা হত। 'মলুয়ায়' দেখা যায়—

পঞ্চ ভাইয়ের বৌ নিদ্রা নাহি গেছে
বেড়ার ফাঁক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে।
কুবলের বনে বনে শব্দ শুনি কানে
পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে।

গৃহজীবনে সতীন ও ননদের জ্বালায় যে কি নিদারুণ ছিল তার পরিচয় মঙ্গলকাব্যের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী অভিজাত সাহিত্যে তার আভাস পাওয়া যায়, বর্তমানের আর্থিক সংকট ও আইনের দৌলতে বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্তির পথে। গীতিকার লোক-কবিরা সেই লোকায়ত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে গেছেন—

সতীনের বাক্যায় বধে বুকে
সতাইর দুখ
আখেরে আমার কপালে আছে
বড় দুখ।

আর ননদিনী? ননদিনীর দৌরাত্ম্যে বধূ-জীবন অতিষ্ঠ—সুখের আলো সরে যায়।

অবিহতা ননদিনী আছে যার ঘরে
সে বধূর সুখ কখন না হয় সংসারে।

মাতৃহৃদয়ের রূপটিও সযত্ন তুলিকায় আঁকা। শুধু স্নেহই নয় তিরস্কারও প্রয়োজন। লোকায়ত অভিজ্ঞতার পথ ধরে তাই মায়ের গলায় শুনি—

বাপধন ধন কুড়াই যায় বাঁশী বাজাইলে
সংসার নষ্ট হয়রে আইস্য বৌ-এর
কথা হেলে।
ইজ্জত আবরু খাইলা, খাইলা
মনাইর্গ
ঘরে মাঝে বসি রৈল যৌবন
আচল ধরি।

বাংলাদেশে 'বৌকাটকি' বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। সন্তান-স্নেহের একাধিপত্য অধিকার যে নারী দীর্ঘকাল ভোগ করে আসছে, সেই ছেলেই বিবাহের পর পর হয়ে যায়। নতুন অর্ধাঙ্গিনী বৌটিকে সে কিছুতেই মনের সঙ্গে মেনে

CENTRAL LIBRARY

নিতে পারে না। কারণ অকারণে তিরস্কার গঞ্জনা জোটে বৌ-এর কপালে। কিন্তু আয়না বিবির ভাগ্য বোধহয় একটু আলাদা ছিল। বাংলার 'বৌকাটকি' শাশুড়ির উক্তি হিসাবে বেশ অদ্ভুত বলেই মনে হয়—

আয়না যদি অইয়া থাকছেলো কন্যা
আরে ভালা ঘরে ফিইরা যায়
পান পন্থাইত ছারবাম তোর না
লাগিয়া রে...।

আয়না যদি অইয়া থাকছলো কন্যা
গিরে না সে যায়
তোরে লইয়া করবাম কন্যা গো
জগন্নাথ বসাত রে।

গার্হস্থ্য জীবনের অজস্র ছবি এঁকেছেন গ্রাম্য কবিরা। নারীর রূপসজ্জ, রান্নাঘরের ছবি, গর্ভবতী নারীর বর্ণনা, রঙ্গ রসিকতা এমনি আরো কত ছবি। সমাজে তখনো বারবণিতার অভাব ছিল না। গাঁয়ে কুট্নী নারীর দেখা পাওয়া যেত। ছিল অজস্র যাদুমন্ত্র, বশীকরণ, উচাটন, পানপড়া, তেলপড়া এমনি অজস্র মন্ত্রসিদ্ধ আচারের পরিচয় যা গীতিকার মধ্যে বিধৃত রয়েছে।

গর্ভিণী নারীর রূপ ও বৈশিষ্ট :

সুগোল সুন্দর তনুখে লাবনি জড়িত
সর্বঅঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত।

সঙ্কীর্ণ অঙ্গুরি আর মাথা খোরা আদি
আলস্য জরতা হৈল আছে যত ব্যাধি।

সর্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে
না পারে
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে।

রুচি হইল চুকা আর চিকর মাটিতে
বিছনা ছাড়িয়া শুয়ে কোল ভূমিতে।

সমগ্র পালাগানের মধ্যে 'কমলা' পালায় চিকন গোয়ালিনীর চরিত্রটি আন্তরিক রসে সিক্ত। গীতিকায় নারী চরিত্রেরই প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু চিকন সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার বাচনভঙ্গী, রঙ্গ রসিকতা, উপমা ইত্যাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। চিকনের চরিত্র আঁকতে লোককবির এতটুকু আড়ষ্টতা চোখে পড়ে না।

চলিতে চলিয়া পড়ে রসে ঢলঢল
শুকাইয়া গেছে তার যৌবন কমল।
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী
বৃদ্ধা বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী।'

যাক পাটিরসী এই বৃদ্ধার অভিজ্ঞতার চাপ—

শুন কথার লাল (মর্ম)
মরিচ যতই পাকে তত হয় লাল।
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস
মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ।

বিগত যৌবনের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধা সরস রসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে—

মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আমি
দিন রাইত কানের কাছে মাছির
ভনভনি।

অখন বয়স গেছে নদী ভাটিয়াল
পাকা দই চোকা হয় এমন কপাল।

নারীরূপ বর্ণনায় এবং নারী সজ্জার বিবরণে গ্রাম্য কবিদের অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। চারপাশের উপকরণ থেকে সংগ্রহ করেছেন কবিতার মূল্যবান হীরাপান্না, আর তাই দিয়ে গেঁথেছেন কাব্যমালা।

উম্মত্ত যৈবন হৈয়ে ভালা লাগের অতি
উলাই উলাই (গলিয়া গলিয়া) পড়ি
যায় গৈ শরীলের জ্যোতি।।

জেলের মেয়ে মহুয়ার রূপের কথায় কবির দৃষ্টি কোন অপার্থিব স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি......সত্যকার বাস্তব রসবোধ ব্যক্ত হয়েছে—

বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা
কেমন জনা
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে
কাঞ্চা সোনা।

হাঁটিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে
পড়ে চুল
মুখেতে ফুটা উঠে কনক চাঁপার ফুল।

আগল ডাগল আঁখিতে আসমানের
তারা
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায়
পাসরা।

আরো আছে—

ঠুট ভেলা কুচ ফল।

....

আষাঢ় মসায় বাঁশের কেরুল মাটি
ফাটা উঠে
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দসে
হাটে।

কেলোইনে বেকিয়া তুলছে দুই
বাহুলতা।

উপকরণ সামান্য কিন্তু ব্যঞ্জনা অসাধারণ রূপে ধরা দিয়েছে। সুন্দরীর পায়ের উপমার জন্যে অভিজাত কাব্যের কদলী এখানে আসেনি। এসেছে বর্ষার সমাগমে গজিয়ে ওঠা বাঁশের তেউড় (চারা)। সুন্দর উপমা। বাহু সুডৌলতা জানাবার জন্যে যে জিনিসটির আবির্ভাব ঘটেছে তা হ'ল গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় রুটি সুঁচ বেলবার বেলুন চাকি। বেলন দিয়ে 'বেলিয়া তুলছে' সেই বাহু যুগল। উভয় ক্ষেত্রেই কস্তুরস নিষ্কাষণে বাস্তববাদী কবির জীবনাভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বর্তমান।

বর্তমান সমাজে নিরাভরণ থাকাই শিক্ষিত শহুরে সভ্যতার অঙ্গ। শহুরে ভাবধারার প্রভাব গ্রামাঞ্চলেও সঞ্চারিত হয়েছে। অলংকার প্রসাধন প্রিয় নারী সমাজে সাজ-সজ্জা অলংকরণের রীতি-নীতি আজ পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। পুরানো কালের অজস্র ধরনের অলংকার আজ বিস্মৃত প্রায়—যদিও অলংকার-প্রিয়তা নারী মনের স্বাভাবিক ধর্ম তবু শৃঙ্খলের চাপে সেগুলোকে আমরা ভুলতে বসেছি।

সেই হারানো যুগের সাজসজ্জা কেমন ছিল? স্বামীর আগমন সংবাদ শুনে ভিলাধরের স্ত্রী অভ্যর্থনার জন্যে সেজে-ছিল এই বিচিত্র সাজ—

এই কথা শুনিয়া তবে ভিলাধরের
নারী
কোমরে বান্ধিয়া পড়ে ময়ূর পাখা
শাড়ী।

হাতেত পরে তার বাজু কাঁকিয়া যতন
চাম্পা ফুল দিয়া কন্যা বান্ধিল লুটেন।

লুটেনে তুলিয়া দিল সোনার ভমরা
কপালে কাটিয়া দিল সুবর্ণের তারা।
নাকেত বেশর দিল কানে ঝুমকা ফুল
কপালে সিন্দুর দিল পাকমী সমতুল
পায়ে দিল গোল খাড়ু পঞ্চম গুজরী
এই মতে সাজান করে ভিলাধরের নারী।

সাজের বহরটা পেলাম, এবার কল্পনা করে নিতে পারি সেই সজ্জিতা নায়িকার রূপটি। সুন্দরী ভেলুয়ার সাজটাও ছিল অপরূপ, দাঁত মিসি (মিশি) নাকে নথ, মাথায় মণিমুক্তার ছড়া, হার হাঁসুলি, নাকে কয়ম ফুল, কানে বালি তার ওপর—

তোরল ডাড়ুল পিন্ধে দোছরা বাজুবন
দোন হাতে পরাই দিল সোনার কাঙ্কন।
মাথার উপরে দিল সীঁতির ঢাকনি

উদ্ধৃতি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। উপায় নেই, গ্রাম্য কবির দৃষ্টিকে সংক্ষিপ্ত ও মার্জিত করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাতে রসাভাব ঘটতে পারে, নারীমন জয় করার জন্যে সেদিনও প্রেমিককে অনেক তোষামোদ, অনুনয় অঙ্গীকার করতে হত। মহুয়ার মন জয় করার জন্যে সাধুর নিবেদন ছিল—বসনভূষণ, নীলাম্বরী শাড়ী, নাকে কানে সোনার ফুল, লক্ষ টাকার সোনার হার, সোনা বাঁধান কামরাঙা শাঁখা, লক্ষ টাকার উদয়তারা শাড়ী, হীরা মণি, চন্দ্র-হার, নাকে নথ আর পায়ে নূপুর।

কঙ্করাণীর গানে—হস্তেত ছিঁড়িয়া রইল রাজার অগ্নিপাটের শাড়ী। নীলাম্বরী উদয়তারা' ইত্যাদির মতোই কি, অগ্নিপাটের শাড়ী একটা নামকরণ মাত্র?

আধুনিকাদের দরবারে এবার আমরা একটা গহনার তালিকা পেশ করতে চাই! রুচিসম্মত হলে প্রচলন করতে দোষ কি—

বেশর আছে ঝুমকা আছে
আর আছে মাইকল ফুল
চিক রইয়াছে সিঁথি আছে আর কানফুল
সোনার মালা বাজু আছে
আর আছে বুকের পাটা

সোনার হাসা গাথা আছে
কান খোচানি কাটা
সঙ্গে আছে চুনি মণি আর মুক্তা ঝলেমলে
গোল্ডা বাইসেক তাবিজ অনন্ত
আর যে ঝকঝকে
চন্দ্রহার, মকরমুখা রূপার বাক খাড়ু
চাবন্দের বাজু-পইছে ঝলমলী
দুই পায় মল

আর তো কিনিয়া আনছে কমলার গুণ্ডারী
আর বেশী পেস্তাছে (বাকা মন)
মাছের কলাক

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতার পথ ধরে উপরের অলংকারগুলি এখনো নাম ও রূপ পরিবর্তন করে সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

বঙ্গনারীর বিশেষ পরিচয় তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে বিধৃত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে বিশ শতকের কয়েক দশক পর্যন্ত বঙ্গনারীর বাহির্বিশ্বের সম্পূর্ণ পুরুষোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে স্নেহ-মমতা-কল্যাণময়ী সহনশীলা নারীকেই আমরা একান্তভাবে পেয়ে এসেছি। গার্হস্থ্য জীবনের অনাড়ম্বর আয়োজন ও প্রয়োজনের মধ্যে নারীসত্তার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে দুঃখ আছে, অভাব আছে, হাজার গন্ডা নিয়ম-বিধি-আচার আছে, কিন্তু সবার ওপর আছে স্নেহাসিক্ত, আবেগ-মথিত ত্যাগমধু হৃদয়। সেই হৃদয়ের অমৃতধারার আকর্ষণেই পারিবারিক জীবন-বোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখে এসেছে।

পারিবারিক জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রান্নাশালা। এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গীয়রাই বিশেষ স্বকীয়তা দাবী করতে পারে। সেখানে রান্না করা শুধু মাত্র উদরপূর্তির আয়োজন নয়, রান্না একটা বিশিষ্ট শিল্পকলা। গীতিকার পাতায়-পাতায় এর্থনিধারা তালিকার ছড়াছড়ি, মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও আমরা অনেক রকমের খাদ্যের তালিকা পাই। কিন্তু মঙ্গল গান তথাকথিত ধর্মীয় সাহিত্য এবং শিক্ষিত কবির মার্জিত হাতের সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এই লোকগাথাগুলি বিদগ্ধ মনের স্পর্শ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত। অনেকখানি বলছি এই কারণে যে, পালা-গানগুলির আঙ্গিক প্রকরণ, চরিত্রচিত্রণ, অলংকরণ ছন্দ-লালিত্যের মধ্যে বেশ গতানুগতিকতা এবং একটা আলগা ভাব দেখতে পাওয়া যায়। যা, প্রকৃত লোক-সাহিত্যরূপে গণ্য হবার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

এবার আমরা কিছুক্ষণের জন্যে হেঁসেলশালা ঘুরে আসতে চাই। যেখানে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কোনটারই অভাব নেই। আজকের অর্ধাহারী বাঙালীর রসনা যদি নীচের তালিকার দিকে তাকিয়ে রসসিক্ত হয়ে ওঠে—করার কিছু নেই, দিন পালটেছে।

মান কচু ভাজা আর অম্বল চালিতার
মাছের মুড়ো রান্ধে ভিতর সম্বার।
কাইট্টা লইছে কই মাছ চেতার পাখা
শুকত খাইল ঝোল খাইল আর ভাজা বরা
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ
দুধের পিঠার করা।
পাত পিঠা মরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি
পোরা চই (সেন্দুই জাতীয়) খাইল
কত রসে টল টল।

আরো আছে—
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত
চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত
চই চর্পাড় পোরা সুরস রসাল
তা দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল

পিঠের তালিকা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এবার একটু ব্যঞ্জনের সংবাদ নেওয়া যাক। রন্ধনপটিয়সী বঙ্গনারীর প্রস্তুত খাদ্য তালিকা থেকে প্রায় কিছুই বাদ যায় নি। লোক-কবিদের ভোজন রসিকতার স্বাক্ষর বহুতর উক্তি মেরেছে।

আলু, মানকচু, বেগুন, তিলের বড়া, বেসম দিয়ে টাটকি ভাজা এ সমস্ত পরিচিত কিন্তু টেক মাছের মুড়ি ঘন্ট কলাই শাক দিয়া' কড়াটি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হবে। তারপর—

শুক্তানী মুক্তানী দিল নাইরের বিন্দুরী
তারপরে আইনা দিল
খইলসা পুঁটির চর্চরী।।
মুগের ডাইলে বোয়াল মাছের
মুড়া কাটা পাইয়া
ভরা বাটী চাইলা লইল
ভাত গেল ওয়াইয়া।।
কোল দিল বাটী ভইরা
বোয়াল মাছের পেটী
বিরম ঝাল টকটক ঝাল খাইতে কিটিমিটি।
কত মাছের মুড়ি ঘন্ট বাদ হাইলা খায়
তারপরে আনিয়া দিল
কাগা আম্রের অম্বল
এক বাটি ঘন দুধ আর একবাটি দই
সাপুর সুপুর খাইল বাদু
মাখাইয়া লইয়া খই।

রন্ধনশালার চার দেওয়ালের মধ্যে নারীর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। নারীর অন্তরঙ্গ পরিচয় তার সর্বগ্রাসী প্রেমসাধনার মধ্যে যতখানি প্রস্ফুটিত হয়েছে, ঠিক ততখানি দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে খুঁজে পাই না। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের শতধারা বাংলা লোকগীতিকার সর্বাঙ্গ রসসিক্ত করে রেখেছে। প্রেমের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, আইন বা সমাজের কাঁটের বাঁধন তাকে আটকাতে পারে না। সে আপনার বেগে, তেজে পথ করে নেয়, সে আগে জাহিরনী মৃত্যুতেও গরিয়সী। গীতিকার চরিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাবো—তারা মুসল-মান বা হিন্দু, জৈন কিম্বা বৌদ্ধ, সহজিয়া কিম্বা শাক্ত কোনটাই পরিপূর্ণভাবে নয়। এককথায় বলা যায় কোন ধর্মীয় বাতাবরণ সেখানে নেই, পরিচয় শুধু মানুষ—আশা-নিরাশা, ন্যায়-অন্যায়, হিংসা-ভালো পূর্ণ সাধারণ নরনারী। দীনেশচন্দ্র বলেছেন—'এই গীতি সাহিত্যের উদার মুক্ত ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শতধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবণের মতো অবাধ, নির্ঝরের মতো নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষ, বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অসহ্য।' এই আবেগ-কম্পিত বাক্যের মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি থাকতে পারে সত্য, তবু এই লোকগীতিকার পাতায় পাতায় যে প্রেমের

বি. টি. ও বি. এড. পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি অপরিহার্য পুস্তক

পশ্চিম বাংলার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক

এ. এ. ডি'সুজা

ও

কল্যাণী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ

কে. পি. চৌধুরী প্রণীত

THE SCHOOL GUIDANCE SERVICE

॥ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

মূল্য : পেপার ব্যাক ৮·০০ :: ডি-লাক্স ১৫·০০

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ : এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা প্রত্যহ স্মরণীয় এবং বিস্ময়কর সম্পদ। জীবন-বিবিক্ত কোন ঊর্ধ্বচারী কল্পনার পাখা বিস্তার কোথাও ঘটেনি। জীবনের সঙ্গে হাত ধরে অর্থাৎ 'সংহত' রীতিতে সাহিত্যের সকল সংস্কার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অভিজাত কাব্যের বর্ণনা, উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষার আধিক্য ঘটেনি। এতে আছে জীবনের পরিচিত, সামান্য এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ আর আছে হৃদয়ের চিরন্তন অভাববোধ, হতাশা প্রেম ও নারীর শাশ্বত সম্পদ সতীত্ব। যে সতীত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্ম আইন কানুন বা আচার্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুর্বলতার ছদ্মবেশমাত্র কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষি-বচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দু-সমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন, সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।'

(মহুয়া, মলুয়া, কঙ্কলীলা, দেওয়ান ভাবনা, মহীশাল বন্ধু, আরো অনেক পালা-গানে এমনিভাবে ঋষি-বচনোদ্ধৃত সতীত্বের সংজ্ঞাকে ধূলিসাৎ করে প্রেম-সাধনা আপনাই অমর হয়ে গেছে। 'মাচুর মা' পালাগানের নায়িকা একজন বারবণিতা, কিন্তু কবির আন্তরিকতায় তা আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছে। প্রচলিত সতীত্বের সংজ্ঞা এসব গীতিকায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর)

'সেইজন্য গীতিকার নায়িকাগণ দীর্ঘদিন পরপুরুষের গৃহে বন্দী থাকিয়াও একমাত্র প্রেমের শক্তিতে নিজেদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।...সতীত্ব-বোধ নারীর একটি নিজস্ব ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ। সমাজ বাহির হইতে ইহার বিধি রচনা করিয়া নারীকে ইহা দ্বারা শাসন করিলেও তাহার মনে যদি ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, তবে বাহিরের শাসন ফলপ্রসূ হইতে পারে না।...প্রেমের জন্য দুঃখ তিতিক্ষা-আত্মত্যাগ, সর্বস্বার্পণ করিয়া নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করিতে পারে গীতিকাগুলি তারই পরিচায়ক।' (আশুতোষ ভট্টাচার্য)

প্রায় সমস্ত গীতিকাই নারী-প্রধান। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যে নারী-প্রাধান্যের ঐতিহ্য সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্গসাহিত্য অঙ্গনে এখনো পর্যন্ত যে-চরিত্র-কুসুম-গুলি সুপ্রস্ফুটিত হয়েছে, তার বেশীটাই নারী। তবে অভিজাত সাহিত্যের পাতায় পাতায় যে-নারীকে দেখতে পাই, সেই নারীর পরিচয় গীতিকায় নেই। অভিজাত সাহিত্যে নারীর যে জননী-সত্তার রূপ আঁকা হয়েছে, তার বিশেষ কোন ইঙ্গিত গীতিকায় পাই কি? এখানে নারীর প্রেমিকা-সত্তার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের জয়গান শোনা যায়, সে-প্রেম অলংকৃত মহিমা-দীপ্ত; কিন্তু এমন বাস্তব সচেতন জীবন-রসপূর্ণ দুর্বার প্রেমের কথা গীতিকা ছাড়া আর কোথাও নেই।

উচ্চতর সমাজ-জীবনের আবহাওয়ায় যে মার্জিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার নির্যাস এই সমস্ত নিরক্ষর সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। চণ্ডী-মণ্ডপের সেউতে যখন মুষ্টিমেয় রুচিশীল নাগরিক মঙ্গল-গান, বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা সংস্কৃত-সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে মগ্ন ছিল, তখন এই বৃহত্তর জনসাধারণের সমাজ চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তারাও আপন রুচি বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাকৃত-জনের সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টি করে চলেছিল। অজস্র গীতিকা, লোকশ্রুতি—সেই সমস্ত নিরক্ষর সমাজের মানস-ফসল। গীতিকায় নারী-সত্তার স্বাভাবিক বলিষ্ঠ প্রকাশের কারণ অনুসন্ধানে বলা যায়—এক বিলুপ্ত সামাজিক ব্যবস্থা। মাতৃপ্রধান সমাজের নারী-স্বাধীনতার অজস্র ছবিতে ভরা পূর্ববঙ্গ গীতিকার অনেকগুলি আখ্যান সেই বিলুপ্ত সমাজের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই স্বাভাবিক, তাই স্বাধীন প্রেম-চেতনায় ধারাটি আমাদের বিস্মিত করে তুললেও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত 'কঙ্কলীলার' পরিণতিটি আমাদের তেমনি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বৃহত্তর বাংলার মাতৃ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার উপাদানের আকর এই গীতিকাগুলি হয়ে রয়েছে। সবশেষে দীনেশচন্দ্রের এই উক্তিটিকে আবেগপ্রবণ মনের স্বতোচ্ছ্বাস বলে মনে হলেও এখানে পরিবেশন করার ইচ্ছাকে দমন করা গেল না।

'বাংলাদেশের ইতিহাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে সীতা-সাবিত্রী। কেহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন, কেহ বা তদপেক্ষাও কঠিনতর ত্যাগ দ্বারা স্বীয় মূর্তি মহিয়সী করিয়া দেখাইয়াছেন। সুদূরে তমসা নদীর তীরে যে বীণা সুর অতীতকালে বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঝঙ্কার যুগে যুগে কবিরা সুর-তান-লয়-যোগে প্রতিধ্বনি করিয়া এদেশের প্রেম মহাত্ত্বের পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ সকল নারী-চরিত্রের কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা শক্ত-এ বাগানের গোলাপ ও স্থলপদ্ম সন্ধ্যামালতী ও মল্লিকা সকলটিই নিখুঁত সুন্দর।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

নবম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের রণকৌশল

রণক্রিয়ার যুগান্তকারী পরিবর্তন

১৯৪০ খৃঃ মে ও জুন মাসে ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী বিদ্যুৎগতিতে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিল এবং যার ফলে ইতিহাসের মোড় ফিরিয়া গেল, উহার পিছনে রণনীতি ও রণকৌশলের কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। যদিও পোল্যাণ্ডে এবং নরওয়েতে জার্মানীর আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশল ইতিপূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই দেশগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল ছিল বলিয়া জার্মান রণক্রিয়ার অভিনবত্ব পৃথিবীব্যাপী সামরিক মহলকে ততখানি ব্যস্ত, উৎসুক ও বিস্মিত করিয়া তোলে নাই। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের এতগুলি বিখ্যাত শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধের চাপে জার্মানীর এই অভূতপূর্ব জয়লাভ দুনিয়ার লোককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। এখানে স্মরণীয় যে, হিটলার মাত্র ২৬ দিনে পোল্যাণ্ড, ২৮ দিনে নরওয়ে, ২৪ ঘণ্টায় ডেনমার্ক, ৫ দিনে হল্যাণ্ড, ১৮ দিনে বেলজিয়াম এবং ৩৫ দিনে ফ্রান্স সম্পূর্ণ জয় ও দখল করিয়া নিয়াছিলেন: কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের দল প্রতিরোধ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের কথা আজ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের পৃথিবী ইহার বিজ্ঞাপনে ও প্রচারকার্যে অস্থির ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই উত্তর সমুদ্রের তীর হইতে সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গন নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের পূর্ব সীমানায় সুইস সীমান্ত হইতে লুক্সেমবুর্গের মন্টমিডি পর্যন্ত ছিল আসল ম্যাজিনো লাইন, তারপর সেখান হইতে ফরাসী-বেলজিয়াম সীমানা ধরিয়া এই লাইন বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা আসল লাইনের মত ততটা পাকা পোক্ত ও দুর্গায়িত ছিল না। লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে'ও দেখা যায় যে, উহা ছিল কার্যতঃ একপ্রকারের ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ মাত্র, এবং গভীর কতগুলি খাদ যেগুলি 'ব্লক হাউস'এর দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল—

> —"an almost continuous anti-tank obstacle in the form of a ditch covered by concrete block houses." (১)

কিন্তু আসল ম্যাজিনো লাইন তৈয়ার হইয়াছিল ১৯২৭-৩৫ সালে, তদানীন্তন ফরাসী সমরসচিব মঃ ম্যাজিনোর নির্দেশে। তারপরেও ক্রমাগত ইহার শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে (মার্কিন সামরিক মহলের মতে প্রতি মাইলে ২০ লক্ষ ডলার!) সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার চরম বিস্ময়রূপে ইহা মানুষের ইতিহাসের '[illegible]' দুর্গমালারূপে প্রচারিত হইল। প্রায় ২০০ মাইল লম্বা, স্থানে স্থানে ইহা ১০ হইতে ৪০ মাইল পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রায় হাজার খানেক কেল্লা লইয়া এই লাইন ভূগর্ভ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বলা যাইতে পারে যে, পাতালপুরীতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল শহর। রেলপথ, বৈদ্যুতিক শক্তির আধার এবং সমস্ত প্রকার অস্ত্রসজ্জা দ্বারা এর পত্তন বিধান করা হইয়াছিল। বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ মাটিতে পুঁতিলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, এর কেল্লা, পিলবক্স, ট্যাঙ্কফাঁদ ও কামান সংস্থাপনের বিন্দুগুলিকে সেই অসম্ভব অবস্থার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়। এই লাইন সম্পর্কে বহু গল্প ও কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল এবং ফরাসী রাজনীতিবিদ ও রণনীতিবিদগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই দুর্গমালার ভিতর দিয়া তাঁদের চিরশত্রু জার্মানীর পক্ষে আর পিন্‌ ফুটাইবারও সম্ভাবনা নাই! সুতরাং এই মহাদুর্গের আড়ালে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিলেই যথেষ্ট। ফ্রান্সের এই মনোভাবকেই ম্যাজিনো মনোবৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ম্যাজিনো লাইনের জবাবে রাইন নদীর ওপারে জার্মানীও তাদের পশ্চিম প্রাচীর বা সিগফ্রিড লাইন তৈয়ার করিয়াছিল। ফ্রান্সের অনুকরণে ১৯৩৮ সালে উহা তাড়াতাড়ি নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিনো লাইনের মত উহা যেমন জাঁকালো বা দুর্ভেদ্য ছিল না কিংবা জার্মানীর রণচিন্তাও এই সমস্ত কেল্লার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

বর্তমান আঘাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য জার্মানী পূর্বাহ্নেই সমস্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের ত্রুটিগুলি এবং শ্লিফেন প্ল্যানের ভুলচুক সম্পর্কে জার্মান হাইকম্যাণ্ড যেমন সতর্ক হইয়াছিলেন, তেমনই পোল্যাণ্ড ও নরওয়ের যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাঁরা কাজে লাগাইলেন। ১৯১৪-১৮ সালের চার বৎসরের সংগ্রামে জার্মানী যাহা করিতে পারে নাই, এবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তাহা সম্ভব হইল।

সুতরাং পশ্চিম রণাঙ্গনে এই আক্রমণের সন্ধিক্ষণে হিটলার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, এই অভিযানের দ্বারা 'আগামী হাজার বৎসরের জন্য জার্মানীর ভাগ্য নির্ণীত হইবে।'—

> —'to decide the fate of the German nation for the next thousand years.'

বিগত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া এবং 'চিরশত্রু ফ্রান্সকে' সংহার করার জন্য হিটলার তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধজয়ের চেয়েও এক মহাবিজয়ের পরিকল্পনা হইল এবং ১৯৪০ সালে জার্মানী গোটা ইউরোপের মালিক হইয়া 'নিউ অর্ডার' বা 'নূতন রাষ্ট্রনীতি'—অর্থাৎ নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল।

ভিসি গভর্নমেন্টের (ফ্রান্সের পরাজয়ের পর মার্শাল পেতাঁর অধীনে গঠিত অনধিকৃত ফ্রান্সের গভর্নমেন্ট) সমর দপ্তর হইতে প্রচারিত ১০ই মে হইতে ২৫শে জুন পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনের রণক্রিয়া সংক্রান্ত

(1) This Expanding War — by Liddel Hart Page 190.

রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া ম্যাক্সভার্নার ব্যাটেল ফর দি ওয়ার্ল্ড পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মিত্রবাহিনীগুলির মোট সংখ্যা ছিল ১০০ ডিভিসন। ইহার মধ্যে ১০ ডিভিসন বেলজিয়ান, ২০ ডিভিসন ম্যাজিনো লাইনের রক্ষী এবং ১২ ডিভিসন ছিল বৃটেনের ফরাসী সৈন্য। আবার ইহাদের একাংশ ছিল ইটালীর সীমান্তে। ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষের হাতে কোন মজুত সৈন্য বা রিজার্ভ বাহিনী ছিল না। ভিসি গভর্নমেন্টের রিপোর্ট অনুসারে তাঁহারা ১২৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যে কোন মুহূর্তে রণাঙ্গনে যোগ দেওয়ার জন্য আরও ৫০ হইতে ৭৫ ডিভিসন সৈন্য জার্মান লাইনের পিছনে মজুত বাহিনীরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্যদলের মোট ২০০০ ট্যাঙ্ক ছিল এবং ৪২০টি জঙ্গী বিমান ও ১০০ বোমারু বা মোট ৫২০ রণবিমান এবং জার্মানীর ছিল ৭০০০ ট্যাঙ্ক, ১৫০০ জঙ্গীবিমান ও ২৫০০ বোমারু বা মোট ৪০০০ রণবিমান। কিন্তু সোভিয়েট সামরিক মহলের মতে জার্মান বিমান বহরের সংখ্যা আরও বেশী ছিল—৩৫০০ বোমারু, ১৫০০ ছোঁমারা বিমান এবং ৪০০০ জঙ্গীবিমান। অর্থাৎ মোট ৯০০০ রণবিমান।

ম্যাক্সভার্নারের মতে জার্মান বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, সংগঠন ও আঘাত হানিবার শক্তি বিবেচনা করিলে মিত্রবাহিনীর সহিত কোন তুলনা দেওয়াই যায় না। কেবল তাহাই নহে, রণনীতি, সংগঠনশক্তি, রণচাতুর্য এবং সমরের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতির দিক দিয়াও জার্মান বাহিনী মিত্রপক্ষের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষ যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

এই মহাযুদ্ধে প্রথমেই জার্মানীর রণনীতি বা স্ট্র্যাটেজির বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, সমস্ত রণক্রিয়া এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জার্মান রণগুরু ক্লাউসেভিৎসের (১৭৮০ খৃঃ—১৮৩১ খৃঃ) শিক্ষানুসারে আক্রমণাত্মক অভিযান ও শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করাই ছিল ইহার লক্ষ্য। কেবল তাহাই নহে, যে ইতিহাস বিখ্যাত শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে ১৯১৪ সালে জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাও এই অভিযানের নক্সায় গৃহীত হইল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইহা সংশোধিত আকারে অনুসৃত হইল এবং সেখানেই ছিল বর্তমান জার্মান রণনীতির বৈশিষ্ট্য। *১৯১৪ সালে শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই জার্মানী বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের আক্রমণ ও সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল। এবারও সেদিক দিয়া চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল জেনারেল লুডেনডর্ফের ১৯১৮ সালের আক্রমণাত্মক প্ল্যান। এই নক্সা অনুসারে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে লুডেনডর্ফ চাহিয়াছিলেন বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর সংযোগস্থলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের তীর পর্যন্ত পৌঁছিতে এবং এভাবে বৃটিশ বাহিনীকে ফরাসীদের কাছ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে। কিন্তু সেবার লুডেনডর্ফের অভিযান আমিয়েন্স হইতে ১৫ মাইল দূরে গোলাবিধ্বস্ত রণক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল। এবার জার্মানী শ্লিফেন ও লুডেনডর্ফ, উভয়ের নক্সা একত্রে মিলাইয়া এক অভিনব পরিকল্পনা অনুসরণ করিল। অর্থাৎ একদিকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ম্যাজিনো লাইনের উত্তরবর্তী ফরাসী-বৃটিশ-বেলজিয়ান বাহিনীকে বেষ্টন এবং অন্যদিক দিয়া সেডান ও আর্দেনিস এলাকায় মিত্রব্যূহ বিদারণ, ইংলিশ চ্যানেলের দিকে অভিযান ও খাস ফ্রান্সের বুকে মূল ফরাসী বাহিনীকে বেষ্টন এবং সংহার।* শুধু তাহাই নহে, শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীর প্রধান ও মূল আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা ছিল দক্ষিণ পার্শ্ব এবং বাম পার্শ্বের আক্রমণ ছিল গৌণ। কিন্তু ১৯৪০ সালে দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণই ছিল গৌণ—যাহার ফলে ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ এবং সেডানের ব্যূহভেদের দ্বারা বাম পার্শ্বের আক্রমণ দাঁড়াইল প্রধান বা মুখ্য—যাহার ফল খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ। ইহার সঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের ব্যূহভেদের দ্বারা মিত্রবাহিনী যেমন ফ্লাণ্ডার্স ও বেলজিয়ামে বেষ্টিত হইল, উত্তর ফ্রান্সের মূল ফরাসী বাহিনী হইতেও (সেডান হইতে আবেভিল বন্দর পর্যন্ত অগ্রগতির দ্বারা) তারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরস্পরের কাছ হইতে এই বিচ্ছেদের বিস্তৃতি দাঁড়াইল ৩০ মাইল, যাহা সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সামরিক ভাষায় জার্মানীর এই চাল ও চাতুরীকে বলা যাইতে পারে ধাপ্পা আক্রমণ। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁর সেনাপতিবৃন্দের অনুসৃত রণনীতির সাফল্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,

> "I feinted to the north and moved my main mass against the left wing in contrast to the Schlieffen Plan (which moved by the right wing in 1914). There feint succeded." *1

অর্থাৎ হিটলার উত্তর দিকে বা দক্ষিণ-পার্শ্বে দিলেন আক্রমণের ধাপ্পা, যাহা শ্লিফেনের প্ল্যানের বিপরীত, আর বামপার্শ্বে চালাইলেন প্রধান আক্রমণ এবং এই ধাপ্পা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

এই ধাপ্পার পাল্লায় পড়িয়া মিত্রবাহিনী দস্তুরমত 'বেকুফ' বনিয়া গেল। তারা ভাবিয়াছিল যে, দক্ষিণ পার্শ্বে কিংবা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া জার্মান অভিযানই প্রধান আক্রমণ। সুতরাং মিত্রবাহিনী যতই সেদিকে অগ্রসর হইয়া জার্মানীকে বাধা দিতে চাহিল, ততই তাহারা বড়শির টোপ গিলিবার মত এক কৌশলপূর্ণ ফাঁদে পড়িল। কারণ, বামদিকে তখন সেডান ও আর্দেনিস এলাকা দিয়া প্রধান জার্মান বাহিনী ম্যাজিনো লাইন যেখানে নূতন কাঁচা অংশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে) ভেদপূর্বক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। উত্তর দিকের বা বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের এই ধাপ্পা এত সাফল্যমণ্ডিত হইল যে, সেডানের ব্যূহভেদের পর মিত্রবাহিনীর হাইকম্যাণ্ড বুঝিয়া উঠিতেই পারিলেন না যে, অতঃপর জার্মানী কোন্ দিকে ধাবিত হইবে—ইংলিশ চ্যানেলের দিকে কিংবা প্যারিস অভিমুখে?

> 'It masked its decisive break-through at Sedan by the preceding offensive against the Netherlands and Belgium, and after this successful break-through it kept the Allied Supreme Command in suspense for several days, as to where the next decisive blow would be struck—whether against the channel cost or Pais' (2)

জার্মানীর এই অদ্ভুত রণনৈতিক চালের মধ্যে পড়িয়া মিত্রবাহিনী গোড়ার দিকেই পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহাদের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। সুতরাং এই যুদ্ধ ছিল কার্যতঃ প্রায় এক তরফা। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর 'একটানা আক্রমণ, অগ্রগতি এবং মিত্রশক্তিপুঞ্জকে বেষ্টন ও সংহার। যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শক্তি, কৌশল ও মহড়ার এত বৈষম্য সেখানে পরস্পরের সংঘর্ষের কোন বিস্তৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। সাধারণ চলিত বাংলায় তুলনা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধারালো বঁটি দিয়া

---

* ১৯৪০ সালের ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তখন এটা জানা ছিল না। —লেখক

* ১৯৪০ সালের ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তখন এটা জানা ছিল না। —লেখক

*1 'The World At War'—Published by Infantry Journal 1945, P. 45.

*(2) 'Battle For the World'—by Max Werner.

মেয়েরা যেমন কুমড়ার ফালি কাটিয়া ফেলে, জার্মানীও তেমনই মিত্র বাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পশ্চিম রণাঙ্গনের এই জার্মান রণনীতি মূলতঃ ছিল তিন পর্যায়ের (১) মিত্রপক্ষের প্রথম সারির আত্মরক্ষার ব্যূহভেদ (২) গতিশীল যুদ্ধ ও বিদ্যুৎগতি এবং (৩) শত্রুর দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের পূর্বে সোম ও আইনে নদীর ব্যূহভেদ।*(৩)

প্রথম পর্যায়ে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত দুর্গায়িত এলাকাগুলি জার্মানরা বোমারু, ছোঁমারা বিমান, প্যারাসুট সৈন্য ও 'পাইওনীয়ার'দের সহায্যে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বোমারুগুলি 'উড়ন্ত গোলন্দাজের' কাজ করিল এবং এভাবে যান্ত্রিক ও মোটর সাইকেলবাহিত পদাতিকদের জন্য পথ খুলিয়া দিল। মিউজ নদীর সেতু, এলবার্ট ক্যানেল এবং লীজের বিখ্যাত দুর্গগুলির দখলে প্যারাসুট বা ছত্রীসৈন্যেরা প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। সেডান ও মন্টমিডি এলাকায় ম্যাজিনো লাইনও যুগপৎ আকাশ ও স্থলপথের প্রচণ্ড 'বিস্ফোরক আক্রমণে' ভাঙিয়া ফেলা হইল এবং এই সমস্ত দুর্গায়িত এলাকা চূর্ণ করিতে জার্মান বাহিনীর দুই দিনের বেশী সময় লাগিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাইন নদী অন্তবর্তী ম্যাজিনো লাইন এবং খাস রাইন নদী বিচ্ছিন্ন ও অতিক্রান্ত হইল। বেলজিয়ান ও ফরাসী দুর্গগুলি ভাঙিবার পর জার্মানী ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক সৈন্যের সাহায্যে গতিশীল যুদ্ধের বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিয়া স্থিতিশীল যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল মিত্রপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিল না। ১০ই মে হইতে ১৪ই মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে ১২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল। ১০ই মে হইতে ১৬ই মে-র মধ্যে ভন রাইকনাউয়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যান্ত্রিক সৈন্যেরা লুক্সেমবুর্গ ও ফরাসী সীমানা ভেদ করিল এবং ২০শে মে-র মধ্যে পিরোন-ক্যাম্বাই লাইনে পৌঁছিয়া অবিশ্বাস্য গতিবেগের দ্বারা মাত্র তিন দিনের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী আবেভিল বন্দরে পৌঁছিল এবং সেখান হইতে উত্তর দিকে ক্যালে বন্দর অভিমুখে ঘুরিয়া ফ্লাণ্ডার্সের মিত্রবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টন করিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ সীমান্ত হইতে ক্যালে বন্দর পর্যন্ত দখলের যে দুই সপ্তাহ সময় লাগিল, উহার মধ্যে জার্মান বাহিনী গড়পড়তা দৈনিক ২০ মাইল হিসেবে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিল। এবং ২১শে হইতে ২৩শে মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনীর গতিবেগ ছিল দৈনিক ৪০।৫০ মাইল।

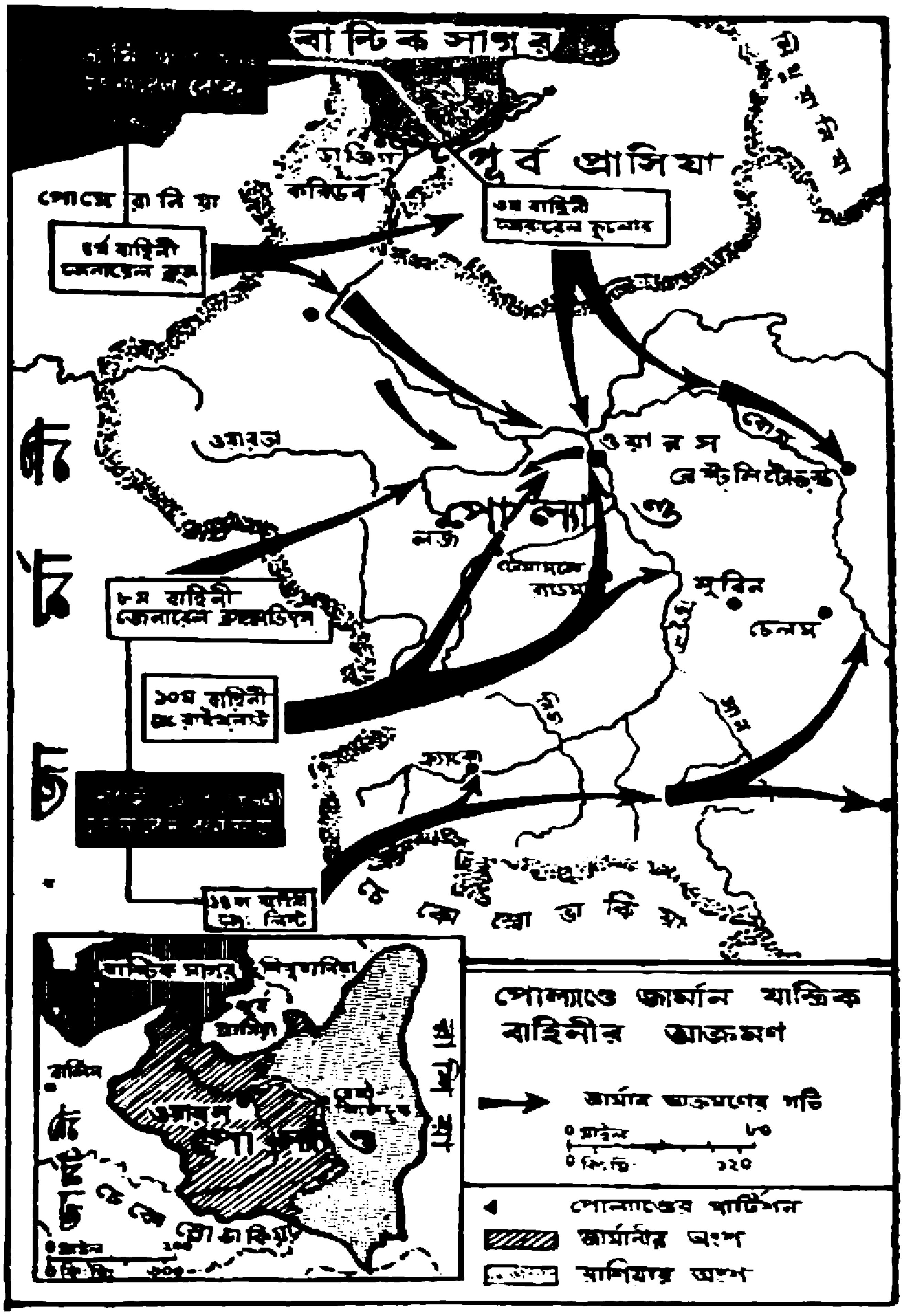

জার্মানীর বিদ্যুৎগতি আক্রমণের প্রথম বলি পোল্যান্ড

ফ্লাণ্ডার্সের এই যুদ্ধের পর (যাহার পরিণতি ডানকার্ক) সুরু হইল জার্মানীর তৃতীয় পর্যায়ের অভিযান, কিংবা প্রধান ফরাসী বাহিনীগুলির সংহার। সোম ও আইনে নদীর তীরে ইহাই খাস 'ফ্রান্সের যুদ্ধ' নামে অভিহিত। এখানে সোম নদীর নিম্নভাগে (আমিয়েন্সের দক্ষিণে ও পূর্বে) ফরাসী সৈন্যেরা প্রাণপণে লড়াই করিয়া প্রচণ্ডতম বাধা দিয়াছিল। তথাপি বাস্তব অবস্থার বিচারে ফ্রান্সের এই যুদ্ধ হাতেকলমে মাত্র পাঁচদিন টিকিয়া ছিল—৫ই জুন হইতে ১০ই জুন। তারপর পূর্বে ও পশ্চিমে প্যারিস বেষ্টন এবং ছত্রভঙ্গ ফরাসী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন। সোমনদীর যুদ্ধ বা ওয়েগাঁ লাইন ভাঙিবার ফলে ফরাসী সৈন্যেরা ৩০০ মাইল পিছু হটিয়া গেল।

বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও মোটরযানে জার্মান বাহিনীর এই অভাবনীয় যান্ত্রিক যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স ও তাঁর মিত্রবর্গ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। আজ অবশ্য পাঠকবর্গের নিকট এই কৌশল অত্যন্ত পরিচিত, এমন কি পুরাতন। কিন্তু সেদিনের পৃথিবী বর্ণনাতীত কৌতূহল ও বিস্ময়ের সহিত পশ্চিম রণাঙ্গনের এই মহানাটকের অভিনয় লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং সেদিনের অবস্থা বুঝিবার জন্য 'রয়টারের' টেলিগ্রাম ও সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯৪০ সালের ১৭ই মে, 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'যুদ্ধের ধারা পরিবর্তন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম :—

"রয়টার জানাইতেছেন যে, বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে কামান ও গোলাগুলীর

---

*৩ পূর্বোল্লিখিত পুস্তক

CENTRAL LIBRARY

প্রচণ্ডতায় ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবর্তী সহরের ঘরবাড়ীগুলি ভূমিকম্পের আলোড়নের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেলজিয়মের রণক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর কমপক্ষে দেড় শত মাইল দূরে হইবে। কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার দ্বারা কি ভাবে দেড় শত মাইল দূরে ভূমিকম্পের অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া জনসাধারণ নিশ্চয়ই ভীতি ও বিস্ময় অনুভব করিবেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর অনেক রণপণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক-যুদ্ধ অপরিমেয় ধ্বংস বিস্তার করিবে। সেই ধ্বংসের বার্তাই আজ রণক্ষেত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সমর-বিজ্ঞানের দিক দিয়া এই যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, যান্ত্রিক-বাহিনী ও বোমারু বিমানের দ্বারা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইবার ফলে এই যুদ্ধের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইবে। 'রয়টারের' নূতনতম তারবার্তায় এই পরিবর্তনের কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

> The enemy is hurling formidable forces into the battle and is attacking the whole front more on the lines of the Polish campaign than on those of 1914. The German attack has changed the war of position behind fortified lines into a war of movement. Enemy attacks now take the form of a spearhead drive of tank corps which try to penetrate the lines with the infantry following. This change in the character of the war, it is announced in Paris to-night, has involved reorganisation of French dispositions which the French High Command has now carried out.'

ইহার সহজ মর্ম এই যে, বর্তমান যুদ্ধ ১৯১৪ সালের অনুরূপ ধারায় চলিতেছে না। পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী যে ধারায় ও পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল, নামুর সেডান যুদ্ধেও তাহাই অনুসৃত হইতেছে— war of position একণে war of movement-এ পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ফরাসী সৈন্যেরা দুর্গের আড়ালে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবে বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিল সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে সচল যুদ্ধের গতিবেগ অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে; ফলে ফরাসী সৈন্যদিগকে নূতন করিয়া সন্নিবেশ ও সংস্থাপন করিতে হইয়াছে! এই কারণে সমগ্র যুদ্ধের ধারা বা character-এর পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন যে, ম্যাজিনো লাইন ও কেল্লার দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অবস্থান করিবেন এবং এই অচলায়তন গম্ভীর নিরাপদ কেন্দ্রে বসিয়া আক্রমণকারীকে কামান ও মেসিনগান ইত্যাদির দ্বারা ঘায়েল করিবেন। কিন্তু জার্মান যান্ত্রিক ও বোমারু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা তাহারা দুর্গের "নিরাপদ গর্ত" হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—

> French troops have had to adopt themselves suddenly from a war of position to one of rapid action on land and in the air". (Reuter)

—ফরাসী বাহিনীকে অকস্মাৎ অচলায়তন গম্ভীর যুদ্ধ হইতে স্থলপথে ও আকাশে সচল ও সক্রিয় যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য নূতনভাবে সেনা সাজাইতে হইয়াছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার মত।

"যুদ্ধ যদিও আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি যুদ্ধের ধারা ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন খুব ঘন-ঘন দেখা যায় নাই। এমন কি কাহারও কাহারও মতে জিনপত বা পণ্ডিত বলেরেও যুদ্ধনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে রণবিজ্ঞানেরও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯১৪—১৮ সালের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সাধারণতঃ নেপোলিয়ানের এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান (ফরাসী ও জার্মানী) যুদ্ধের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, এই প্রকার যুদ্ধনীতি ক্রমশঃ অচল অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতেছে ১৯১৫-১৭ সালের পরিখা শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ মাটির নীচের অচল গণ্ডীতে পরিণত হইতেছে। একমাত্র কোণাকুই রাইফেল ও মেসিনগানকে ব্যর্থ করিয়া দিল। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ সাল, এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ও রণসজ্জার সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ধূম্রহীন বারুদ, দূরপাল্লার রাইফেল, মেসিনগান এবং অতি দ্রুত গোলাগুলী বর্ষণকারী বহুপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু অস্ত্রের গতি ও প্রকৃতি যদিও আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, সমরনীতি ও পদ্ধতি পড়িয়া রহিল পশ্চাদবর্তী যুগে—নেপোলিয়ান ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের আমলে। সুতরাং আধুনিক অস্ত্র ও পুরাতন মনের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিল না—দুই পক্ষই অবশেষে ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় লইয়া দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস অচল গণ্ডীতে কাটাইতে লাগিল। অবশেষে বৃটেনের আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ক আসিয়া দুর্বার গতিতে পরিখাশ্রেণী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যুদ্ধের অচলাবস্থা ঘটাইল। এইভাবে tactics ও strategy উভয় দিক হইতে নূতন পরিবর্তন দেখা দিল।

খুব সংক্ষেপে ইতিহাসের কথা বলা যাইতে পারে যে, সেকালে গ্রীক ও রোমান বাহিনী ঢাল, তলোয়ার ও বর্শা ইত্যাদি লইয়া প্রতিপক্ষের খুব কাছাকাছি যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত, ইহাকে আধুনিক ভাষায় আক্রমণ না বলিয়া সংঘর্ষ বা assault বলা যাইতে পারে। এই সংঘর্ষ ঘটিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে; যাহাদের সাহস শারীরিক শক্তি ও দুঃখদারিদ্র্যে যত বেশী তাহাদের জয়লাভেরও বেশী সম্ভাবনা ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমল পর্যন্তও এই মূল নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল, তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, গুলীর দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হইত। কিন্তু ক্রমে সমরনেতাগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, পরস্পরের মুখোমুখি দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়াছে এবং যাহাকে সামরিক ভূগোলের ভাষায় no-mans-land বলা যাইতে পারে, সেই দূরত্বের হ্রাস কিভাবে সম্ভব? রাইফেল, মেসিনগান ও উন্নত শ্রেণীর কামান এই দিক দিয়া সাহায্য করিল। কিন্তু শত্রু বা মিত্র, উভয়পক্ষই যেমন নূতন আগ্নেয়াস্ত্রের সুবিধা ও কৌশল গ্রহণ করিল তেমনই আত্মরক্ষার প্রশ্নও নূতন করিয়া দেখা দিল। এই আত্মরক্ষার প্রশ্নই ক্রমশঃ ১৯১৫—১৭ খৃষ্টাব্দের অচল ট্রেঞ্চ যুদ্ধের একঘেয়েমিতে পরিণত হইল। তখনকার দিনে সাধারণতঃ আক্রমণ চলিত under cover of artillery অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনী প্রচুর গোলাগুলী বর্ষণ করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিত এবং তাহার পিছনে অনুসরণ করিত রাইফেল ও সঙ্গীনধারী পদাতিক। কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে ইহারও পরিবর্তন ঘটিল। তখন সদ্য আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ককে সম্মুখভাগে রাখিয়া ক্রমে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আক্রমণে অগ্রসর হইত। ইহার সঙ্গে অবশ্য এরোপ্লেনও পর্যবেক্ষণের কার্য করিত। এই নূতন অবস্থার চাপে পড়িয়া ১৯১৮ সালের নবেম্বরে মহাযুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু উহার আগে ১৯১৯ সালের জন্য বৃটিশ সমর-নেতাগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্বারা শত্রুর সম্মুখভাগ ও দ্রুতগামী এরোপ্লেন দিয়া পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবেন। ১৯৩৯-৪০ সালে ইহারই উন্নততর সংস্করণ জার্মান-যুদ্ধে দেখা দিয়াছে। এক্ষণে বোমারু বিমান ঝাঁক বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে এবং প্রচুর বোমাবর্ষণের মধ্যে যান্ত্রিক-বাহিনী বড় বড় ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যানসহ আক্রমণ চালাইতেছে এবং মোটর সাইকেল বাহিনী উহাদিগকে পদাতিকের মত অনুসরণ করিতেছে। সহজ কথায় গোলন্দাজ বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বোমারু বিমান এবং ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী। এই আক্রমণ কোথাও চলিতেছে বৃত্তাকারে এবং কোথাও বা বর্শা ফলকের মত অর্থাৎ একের উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুকে পরিবেষ্টন এবং আর একটির উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুবাহিনীকে তীরের মত ভেদ করিয়া যাওয়া!"

১১ই মে তারিখ আমি লিখিয়াছিলাম :—"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এবারের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য অতর্কিতে আক্রমণ ও বিস্ময়কর গতিবেগ—এমন দ্রুত গতিবেগ খুব কম দেখা গিয়াছে। এই দ্রুত জয়লাভের মূলে রহিয়াছে ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান। এই দুই অস্ত্রের জন্য বর্তমান যুদ্ধের ধারা

পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। একণে 'রয়টার' বলিতেছেন—

> 'The German success is mainly due to a new technique of clearing the ground by heavy tank attacks supported by lowflying bombers'.

জার্মানীর সাফল্যের প্রধান কারণ হইতেছে এই যে তাহারা ভারী ট্যাঙ্কের সাহায্যে অভিযান পথের বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে বোমারু বিমান খুব নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া বোমা বর্ষণ করিতেছে। ফরাসী-ইংরাজ সৈন্যদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, জার্মানদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান উভয়ই অপেক্ষাকৃত বেশী। যদি এইদিক দিয়া তাহাদের সংখ্যা সমান হইত তাহা হইলে জার্মান অগ্রগতি এত দ্রুত হইতে পারিত না।......বৃটেনের বর্তমান চীফ অব দি ইম্পিরীয়েল জেনারেল ষ্টাফ জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রন-সাইড ১৫ বৎসর আগেকার এক বক্তৃতায় *বলিয়াছিলেন যে,

> One of the first principles of war is the maintenance of mobility. An army which can move about quickly always has the advantage over one which is slow and immobile.

যুদ্ধের একটি মূল নীতি হইতেছে ক্ষিপ্রতা, এই ক্ষিপ্রতা রক্ষা করিয়া যাহারা চলিবে তাহারা যে কোন অল্পসমর্থ সেনাদলের উপর জয়লাভের বেশী সুযোগ পাইবে। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এই দিক দিয়া সর্বাগ্রগণ্য ছিল। এই কারণেই দুর্গশ্রেণীর আড়াল হইতে ফরাসী সৈন্যেরা বর্তমানে বাহির হইয়া আসিয়াছে।"

•

কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকাইয়া শিয়াল যেমন কাঁকড়াকে বাহিরে টানিয়া হত্যা করে, জার্মান যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশলও ফরাসী বাহিনীকে সেভাবে দুর্গের গহ্বর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং স্থিতি-শীল 'নিরাপদ' আশ্রয়কে গতিশীল যুদ্ধের বজ্র হানিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। পূর্বেও জার্মান বাহিনীর গতি-বেগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং এখানে আর একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া জার্মানী ৫ দিনের মধ্যে সমুদ্রতীরে পৌঁছিল, কিন্তু ১৯১৪ সালে এই উপকূলে পৌঁছিতে জার্মানীর আড়াই মাস সময় লাগিয়াছিল। রণ-

কৌশলের দিক থেকে ট্যাঙ্ক ও বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতাই ছিল এই অভূতপূর্ব জয়ের মূল কারণ।

এই সংগ্রামের বহু অভিনব ঘটনার মত আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা এই যে উভয় পক্ষেই হতাহতের পরিমাণ হইয়াছিল অবিশ্বাস্য রকমের সামান্য। (ইহা দ্বারাও অসমযুদ্ধের আর একটি প্রমাণ মিলিতেছে।) জার্মান সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১০ই মে হইতে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত জার্মান পক্ষে নিহতের সংখ্যা ২৭,০৭৪, নিখোঁজ ১৮০৪, আহত ১,১১,০০৪—মোট হতাহত ও নিখোঁজ ১,৫৬,৪৯২ জন। পশ্চিম রণাঙ্গনের মহা-সংগ্রামের তুলনায় বিজয়ী পক্ষেরও এই হতাহতের সংখ্যা এত সামান্য যে, ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব। জার্মানীর বেলা যেমন, ফ্রান্সের পক্ষে ইহা তেমনই অত্যন্ত অভি-নব। কেননা ফ্রান্স ছিল পরাজিত পক্ষ। ফ্রান্সের আধা-সরকারী মতে নিহত ফরাসীর সংখ্যা ৭০,০০০ এবং জার্মানদের হাতে বন্দীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ (জার্মান সরকারী ইস্তাহারেও এই সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ৫ জন বাহিনী অধিনায়ক এবং প্রায় ২৯ হাজার অফিসার ধরা পড়িয়াছেন)। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে অনধিকৃত ফ্রান্সের এক রিপোর্টে (ম্যাকস ভাণ্ডারের মতে) দেখা যায় যে নিহত ফরাসীদের সংখ্যা ৮০ হাজার এবং আহত ১ লক্ষ ২০ হাজার। বিশেষজ্ঞ মতে এই সংখ্যাগুলি মোটামুটি ঠিক বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, ফরাসী আত্মরক্ষার দ্রুত অবনতি এবং জার্মানীর বেষ্টন কৌশলের জনাই হতাহতের সংখ্যা সংগ্রামের বিশালতার তুলনায় এত সামান্য হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এই পর্যন্ত কোন বড় যুদ্ধের ইতিহাসেই বিজেতা ও বিজিতের এত কম হতাহতের সংখ্যা দেখা যায় নাই। ইহার আর একটা বড় কারণ এই যে, কতকগুলি ডিভিসন (যেমন, ম্যাজিনো লাইনের ও পূর্ব ফ্রান্সের) বিনাযুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে এবং বহু ডিভিসন ঘেরাও হইয়া বন্দী হইয়াছে।

চার্চিল তাঁর ইতিহাসে মন্তব্য করিয়া-ছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে এত কম সৈন্য হতাহত হওয়ার মূল কারণ যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এবং প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতি-হাসিক এ্যালান বুলক্ বলিয়াছেন যে, জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী সংগঠনের কৃতিত্ব হিটলারের। তিনিই এর উপযোগিতা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদিও আর্মির মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ছিল। *5

(ক্রমশঃ)

*(4) 'The study of War'—edited by Major-General Sir George Aston.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা—১৯২৫-২৬ সাল—পৃষ্ঠা ১০০

(5) Hitler—Allan Bullock Pelican, 1962, P. 588

অবনীন্দ্রনাথ

'প্রদর্শনী

অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী

মহর্ষি ভবনে রবীন্দ্রভারতী ও রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির উদ্যোগে ৯ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। ২০ আগস্ট অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে উনসত্তর খানি ছবি ও অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ফটোগ্রাফ, ব্রোঞ্জ মূর্তি, তাঁর ব্যবহৃত রং-তুলি, ইজেল, চিঠি ও অভিনন্দনপত্র সমেত সযত্নে একটি এক্জিবিশনটি দ্রষ্টব্য বস্তু প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা অবনীন্দ্রনাথের সচিত্র পোস্টকার্ডগুলি এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখা যাত্রা পালাগানের সচিত্র পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। ফাল্গুনী নাটকে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত অষ্টাবক্র লাঠিটিও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন।

মাত্র উনসত্তর খানি ছবিতে যদিও তাঁর সমগ্র শিল্পরীতি ধরা পড়ে না, তবু তাঁর স্টাইল পরিবর্তনের অনেকগুলি নমুনাই এখানে পাওয়া যাবে। গোড়ার দিকের আঁকা সোনা বসানো মিনিয়েচার ধর্মী কৃষ্ণলীলা থেকে সুরু করে তাঁর যাত্রা সিরিজ, ফাল্গুনী তাজ নির্মাণের পরিকল্পনা, নিসর্গ দৃশ্য, তোতা-কাহিনী, মোহরদণ্ড, আরব্যোপন্যাস, কৃষ্ণমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল পর্যন্ত অনেকগুলি স্টাইলের নমুনাই এখানে দেখা গেল। তাঁর অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত ছবিগুলির মধ্যে তেলরং-এ আঁকা "শাজাহানের মৃত্যু, 'তাজ নির্মাণ', 'ভারতমাতা', 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম' 'কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি', ফাল্গুনীর বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথ, 'জাহাঙ্গীর' 'বেস উড্রসা' ইত্যাদি অনেকগুলি ছবিই সংগ্রহ করা হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত ছবির মধ্যে জাপানী রীতি প্রভাবিত বুদ্ধদেব 'সারস', 'প্রভাত' নামে একটি চমৎকার বাছুরের ছবি ও মোমবাতির সিরিজের সঙ্গে। [illegible] ছবি ও [illegible] রাখা আছে। [illegible] একটু বড়ো মাপের 'শাজাদপুরে' ও 'করতোয়ার দৃশ্যে' এই স্পেস আরো সুন্দরভাবে অনুভব করা যায়, অথচ ছবিটির অঙ্কিত অংশ অতি সামান্য। বাস্তবিক অবনীন্দ্রনাথের নিসর্গদৃশ্য নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। আরব্য-রজনী সিরিজে 'আলাদিন' 'নুরুদ্দিনের বিবাহ', 'ফকির শিরচ্ছেদ' ইত্যাদি ছবির রং ও কম্পোজিশনের বৈচিত্র্য অনেকখানি আধুনিক জ্যামিতিক রীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার শেষ বয়সের মঙ্গলকাব্যের ছবিগুলির ওপর লোকশিল্পের অনুপ্রেরণা তাঁর সরলীকরণ পদ্ধতির আরেক নিদর্শন। আশ্চর্য লাগে এই যে, অবনীন্দ্রনাথ কোথাও নিজের পুনরাবৃত্তি করেন নি। অবশ্য এটা তাঁর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমানভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস সারা প্রদর্শনী দেখেই বোঝা যায় যে, নানা রকম বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পীর বিশিষ্ট একটি রসিক ও খেয়ালী মেজাজের পরিচয় তাঁর সমগ্র কাজের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে এবং এই বিশিষ্ট মেজাজটিই তাঁর ছবিগুলির বিশেষ আকর্ষণ। তবে আজকের শিল্পীর কাছে অবনীন্দ্রনাথের কোন বিশেষ মূল্য রয়েছে কিনা তার কোন পরিষ্কার আলোচনা তেমন হয়নি। কিন্তু তাঁর ছবিগুলি যতদিন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকবে ততদিন তা হওয়া সম্ভবও নয়। প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখেই বোঝা যাবে যে কি অযত্নে এই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষিত হচ্ছে। ছবির মাউন্টিং ও ফ্রেম কতকাল যে বদলানো হয়নি, জানা যায় না। কোন কোন ছবিতে নানা রকম দাগ ধরেছে। ঢিলে হয়ে যাওয়া ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে আরশোলা ঢোকার রাস্তা ও বটেই পোকামাকড় ঢোকার রাস্তাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা গোড়ার দিকে দেখেছেন তাঁদের মতে শাজাহানের মৃত্যু ছবিটির রং অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছে। এসব জিনিসও সংরক্ষিত দরকার। সমস্ত ছবি [illegible] প্রদর্শনীকালে [illegible] বয়সে ছবির যাঁরা জিম্মাদারী করতে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যতবংশীয়দের কাছে চূড়ান্ত অপরাধে অপরাধী হবেন, কারণ বোধ হয় এঁদের কাছেই কলকাতার অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র শিল্পকলার বৃহত্তম সংগ্রহ রয়েছে। শিল্পকলা সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের দেশে সর্বত্রই একটা ঔদাসীন্য দেখা যায়। এই শতবার্ষিকী উৎসবের সময় কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রথমতঃ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পশৈলীর অনুসরণকারীদের ছবি নষ্ট হতে বসেছে। দ্বিতীয়তঃ কলকাতার ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফটসম্যানশিপ উঠে যেতে বসেছে। ছাত্রদের অপরাধে নয়, তাঁরা এটি সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এমন কি প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন তাঁরা তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের রচনাকাল অবধি তার কোন ফয়সালা হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিতে যাঁদের কণ্ঠ গদগদ হয়ে এসেছিল সেদিন, তাঁরা চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, কোন শিল্পবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি আনন্দিত হতেন কি না। তৃতীয়তঃ আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে ভারতের

শিল্পী : সঞ্জয় সেনগুপ্ত

শিল্পকলা একদল হীন স্বার্থান্বেষী লোক অবাধে অর্থোপার্জনের জন্য নানা পথে বিদেশে চালান করছে। দেবমন্দিরের বিগ্রহও তারা বিদেশে বিধর্মীদের কাছে অর্থ-বিনিময়ে বিক্রয় করতে কুণ্ঠিত নয়। যে ভারত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে অবনীন্দ্রনাথ সারা জীবন কাজ করে গিয়েছেন, তার মূল্য আজ কেবল অর্থমূল্যে নিরূপিত হচ্ছে। দেশের শিল্পসংস্কৃতি রক্ষার যে একটা জাতীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকেদের পর্যন্ত চৈতন্য নেই। অবনীন্দ্র-শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মন্তব্য করলেন যে, বর্তমানে আমাদের সমাজ চেতনা শিল্প-চেতনা ইত্যাদি নেই সুতরাং তাঁর শিল্প-নিদর্শন যদি বর্তমানে সংরক্ষিত না হয়, তাতে দুঃখ নেই। যেদিন চেতনা হবে সে দিনই তার যথার্থ মূল্যায়ণ হবে। অর্থাৎ বাইশ মণ তেলও পুড়বে, রাধাও নাচবে।

*

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শিল্পায়ন আর্টিস্টস সোসাইটির উদ্যোগে সঞ্জয় সেনগুপ্তের ২৫।২৬ খানি লিনোকাট প্রদর্শনী হয়ে গেল। ২১ থেকে ২৭ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল কবি সুকান্ত ও আজকের জগৎ। সুকান্তের কয়েকটি কবিতাকে রূপায়িত করবার যে চেষ্টা করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অধিকাংশ লিনোকাটই সাদা-কালোয় ছাপা। কয়েকটিতে রঙের আমদানী করা হয়েছে। তবে সাদা-কালো কাজগুলিই বেশী আকর্ষণীয়। অনেকখানি কালোর মধ্যে সাদা রেখার ব্যবহার বা অনেকটা সাদার মধ্যে জোরালো কালোর ছাপ বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিল। সুকান্তের চমৎকার প্রতিকৃতিটি ছাড়া 'একটি মোরগের প্রতি' 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' 'চিল' 'হে মহাজীবন' 'বোধন' ইত্যাদি কবিতা অবলম্বনে ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*

২৪ থেকে ৩০ জুলাই ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর কর্মীদের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী ফিলিপসের হাউস জার্নাল 'পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোগে অ্যাকাডেমির মধ্যের ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি 'পরিচয়ের' অষ্টম সর্বভারতীয় প্রদর্শনী। ৯ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা সাড়ে তিনশোর অধিক ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সাধারণ জলরং, প্যাস্টেল, ক্রেয়ন, পেন্সিল ও কালি-কলমে আঁকা ছবি ছাড়াও মোজাইক ও কালো জমির ওপর রূপোলী তার দিয়েও ছবি তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রচুর ছিল। চারপাশের দেখা এবং শোনার জগৎ কোনোটাকেই ছেলেমেয়েরা বাদ দেয়নি। রূপকথার রাজা থেকে রকেট সবই এখানে দেখা গেল। প্রতি বিভাগেই কয়েকটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু পুরস্কার বিচারের কাজটি এতই দুরূহ যে, সকলের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভব নয়। তবে বিলিতী বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের অনুসরণে আঁকা ছবির প্রথম পুরস্কার লাভটা কেমন যেন লাগে।

৩১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট অবধি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জাপানী ক্যালেণ্ডার ও পোস্টারের একটি প্রদর্শনী জাপান কনসুলেটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দেড়শতাধিক ক্যালেণ্ডার ও পোস্টারের এই প্রদর্শনীতে জাপানের আধুনিক মুদ্রণ শিল্প ও ফটোগ্রাফির অনেকগুলি সুন্দর নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। সেখানকার বিভিন্ন বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রচারের জন্য কি ধরনের ক্যালেণ্ডার প্রস্তুত করে থাকেন তা দেখা গেল। প্রদর্শনীতে জাপানী উৎসব, জাপানের মন্দির, জাপানের নৃত্য, জাপানের শিল্পকলা ও আধুনিক জাপানের জীবনযাত্রার ওপর অনেকগুলি ক্যালেণ্ডার ও পোস্টার ছিল। ছবিগুলি অনেক সময়েই জাপানের প্রথাগত চিত্ররচনারীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তোলা হয়েছে। ফলে যদিও ইউরোপ আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার ছাপ এ সবে সুস্পষ্ট, তবু সেটুকু সম্ভব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ এতে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, নিপ্পন কোকান, মিৎসুই, ব্যাঙ্ক অব টোকিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্যালেণ্ডারগুলি চমৎকার যদিও কোথাও কোথাও চকোলেটের বাক্সের ডিজাইনের মিষ্টত্ব এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রদর্শনীটির নাম জাপানী গ্রাফিক শিল্পের নিদর্শন দেওয়ায় একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

*

১ থেকে ৫ আগস্ট কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সোসাইটি ফর আর্টস অ্যাণ্ড আর্টিস্টসের দ্বিতীয় যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সাতজন শিল্পীর চব্বিশখানি তেল-রং জল-রং ও ড্রয়িং-এর চব্বিশখানি নিদর্শনের মধ্যে ফিগারেটিভ, আধা ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট, এই সব রকমের কাজেই পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাপ দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অনুপ্রেরণায় আঁকা ছবি প্রদর্শনীর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। এসব ছবি এবং বিশেষ করে ড্রয়িংগুলি বেশীর ভাগই উৎক্ষিপ্ত হস্ত, কঙ্কাল, ভূপাতিত নগ্নমূর্তি, মাটি ফুঁড়ে ওঠা ফুল, চোখ, কান্না, ভয় ইত্যাদি প্রতীকের সাহায্যে আঁকা—খুব একটা জোরালো নয়। জহর সাহা পোদ্দারের পেন্সিল ও তুলিতে করা সোজাসুজি ফিগারেটিভ কয়েকটি ড্রয়িং তবু মন্দ নয়। গোবিন্দ রায়ের 'নিউ কামার' ও 'আপীল' ছবির রংয়ের গুণ এবং ফিগারের ট্রীটমেন্ট সংযত ও পরিচ্ছন্ন। কেবল হার্বি জেনারেশন ছবিটি অমৃতবাজারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একদা প্রকাশিত কমিক স্ট্রিপের অপার্থিব প্রাণীদের মতন লাগে।

*

৪ তারিখ থেকে সপ্তাহকাল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে স্বর্গত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের ছিয়াত্তরটি জলরং, লিথোগ্রাফ

এলোরা চিত্রগৃহের ম্যুরাল
শিল্পী : ধীনজবরণ সাহা

এবং এনগ্রেভিং ও আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ছাত্র হিসেবে শিল্পজীবন তিনি শুরু করেন এবং পরে শান্তিনিকেতনের গৃহনির্মাণের নকসা তৈরী করে খ্যাতি লাভ করেন। ওয়াশ এবং টেম্পারার মাধ্যমে করা অনেকগুলি ছোট ছোট ছবির মধ্যে বিগত-যুগের একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া গেল। কোন কোন কাজে সগ্গত্তোর রেখার পটভূমিকায় ফিগারের পোষাক আসাবের রেখার সামঞ্জস্য সাধন এবং প্রায় সাদার ওপর সাদা রংয়ের প্রয়োগ চমৎকার লাগে। 'মার্বল প্রিজন' 'দি প্রিন্সেস' 'কল অব দি ওয়ার্লড' ইত্যাদি ছবির এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। বংশীবাদনরত পাহাড়ী বালক ছবির রংয়ের ব্যবহার সুন্দর। বিলেতে থাকার সময় ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে নকল করা অনেকগুলি প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের ছোট ছোট কপি উল্লেখযোগ্য। এখানে থাকার সময়েই তিনি কিছুকাল এচিং ও লিথোগ্রাফি শেখেন ও শান্তিনিকেতনে তার প্রবর্তন করেন। এসব কাজের মধ্যে হাঁসদের পাল, গ্রামের কুকুর, পুতুল, মোরগ, দাঁড়ের পুল ইত্যাদি ছবির একটা সুন্দর আক্রেষ সৃষ্টির চেষ্টা ভাল লাগে। তাঁর বিখ্যাত সাথী ছবিটির ড্রয়িং ও লিথোগ্রাফ উভয়ই প্রদর্শনীতে রাখা ছিল।

স্থাপত্যের ড্রয়িংগুলির মধ্যে কল্যাণী কংগ্রেস, বোকারোর অতিথিশালা, ভারতী বেন সারাভাই-এর বাংলো প্রভৃতি কয়েকটি বাড়ির নকশা ছাড়াও অনেকগুলি প্রস্তাবিত বাড়ির নকশাও ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারতীয় ছাপ এই ড্রয়িংগুলিতে সুস্পষ্ট।

•

শিল্পী অনিলবরণ সাহা কিছুকাল হল বেহালার এলোয়া সিনেমার গায়ে একটি বৃহৎ ম্যুরাল তৈরী করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের প্রগতি হল ম্যুরালটির বিষয়বস্তু। দেওয়ালের গায়ে সামান্য উঁচু করে সিমেন্ট জমিয়ে ম্যুরালটি তৈরী হয়েছে। ঘোর এবং হাল্কা ধূসর বর্ণের দুটি টোনের সাহায্যে ষোল ফুট চওড়া ও পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা এই ম্যুরালখানি নিঃসন্দেহে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কাজ। ফর্ম এবং ডিজাইনের সরলতা ও ছন্দজ্ঞান লক্ষ্য করার মত। দেওয়ালের অন্য দিকে প্রায় এগার ফুটের মত লম্বা একটি রমণীমূর্তিও চমৎকার কাজ। সমগ্র হলটির আভ্যন্তরীণ ডিজাইনও তিনি সুষ্ঠুভাবে সমাপন করেছেন। কলকাতায় অনেক বড় বড় ধরনের শিল্পীদের যদি এসব বাড়ির সৌষ্ঠব বর্ধনের ভার দেওয়া হয়, তাহলে শিল্পীদের কর্মসংস্থান ও শহরের শোভা বর্ধন এই দুটো কাজই সুন্দরভাবে করা যায়।

—চিত্ররসিক

একই ধোপে ৩ সুরে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে— অন্য যে-কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১। ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।

২। ডেট কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।

৩। ডেট কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়, জামাকাপড় উজ্জ্বল করে—সাদা কাপড় আরো বেশী সাদা করে আর রঙীন কাপড় ক'রে তোলে আরো বেশী ঝলমলে। (এতে নীল বা সাদা করবার অন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

আজই কিনুন—ডেট! একমাত্র ডেট-এই পাবেন দুরকমের প্যাকেট—লাল ও নীল।

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

আবহমান কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্ণসুন্দরী এলেন। অন্যদিন কখনও বৈঠকখানায় আসেন না। ছুটির দিনে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

আর স্ত্রীকে দেখে কয়েকদিন থেকেই যে কথাটা ঠোঁটের কাছে উঠে আসছে অথচ বলতে পারছেন না সেই প্রস্তাবটা আবার পাড়বেন কিনা ভাবেন।

'কিছু বলছো?' স্বর্ণসুন্দরী বেতের চেয়ারে বসে বললেন।

ভাসাভাসা চোখে চেয়ে থাকেন ভবনাথ স্ত্রীর দিকে।

'বাড়ির কাজ আটকে গেছে না?'

ভবনাথ চুপ করে থাকেন।

'অজিতনন্দনকে বলি আসতে। কয়েক গাছা চুড়ি বেচে দি। অতোগুলো কে পরবে? তারপর তুমি করে দিও, কেমন?'

ভবনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পরদিনই স্যাকরা অজিতনন্দনের ডাক পড়ল। একমাত্র বলাই জানল ব্যাপারটা। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরীকে বলল, 'কথায় বলে, মেয়েদের যা যায় তা ফেরে না।'

স্বর্ণসুন্দরীও জানতেন। কিন্তু ধমকে উঠলেন, 'তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করো।'

পরদিন বাইশ টাকা ভরি দামে পঁয়ত্রিশ ভরি সোনা, মাপলেন, দশগাছা চুড়ি বেচে দিলেন স্বর্ণসুন্দরী। শহরের সেরা স্যাকরা অজিতনন্দন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে গুণে গুণে ময়লা নোট আর সপ্তম এডওয়ার্ড পঞ্চম জর্জের রূপোর টাকায় সাতশো সত্তর টাকা স্বর্ণসুন্দরীর হাতে দিয়ে ক্যালকোর নেকড়ায় গয়নাগুলো বেঁধে থলিতে পুরে বিদায় হলেন।

(৮)

ছুটির বিকেলে রোদ পড়তেই ভবনাথ বাগানে যান। উঁচু করে সার সার চূড়ো বেঁধে পাশে জল যাবার নালা খুঁড়ে আলুর জমি তৈরী করাচ্ছে জগা। জগা অনেককালের দাগী আসামী। সবসুদ্ধ দশ বছর জেল খেটেছে বৌকে দা দিয়ে কুপিয়ে মারার অভিযোগে। তবে গত তিন-চার বছরে তার এমন পরিবর্তন এসেছে, জেলখানার নরক তাকে এমন ভদ্র আর আত্মানন্দে দেখিয়েছে যে তার জেলবাস মকুব করেছেন ভবনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গে। কুচকুচে কালো বেঁটে শক্ত চেহারা, শরীরের তুলনায় বেমানান ছোট মাথায় কদমছাঁট চুল, ঠোঁট বন্ধ হয় না, দুটো গজাল দাঁত বেরিয়েই থাকে।

'অটলা কোন দাম দেয় না,' জগা বিড়বিড় করে আর মাটি কোপায়। জগার এই বিড়বিড়ানি রোগ ভবনাথ আগেও লক্ষ্য করেছেন। বললেন, 'তোর দেশ কোথায়?'

'আমার দেশ সাহেব ওদা।'

'ওদা কোথায়?'

'কমলাপুর, ওপী, হাতেবাহার'...জগা কোদাল থেকে তার ঘামে ভেজা খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখখানা তোলে।

'কার গরুতে হাল দিয়েছে? কোন কাম করেনি দেখছি।'

আবার জগা তার ঘামে ভেজা মুখ তোলে। জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে, 'গরু-বাছুর অনবোলা জীব।'

অনবোলা মানে বোধহয় যার ভাষা নেই। ভবনাথ একটু অবাক হয়ে জগার দিকে চেয়ে থাকেন। দশ বছর আগে যে কুপিয়ে মেরেছে তার স্ত্রীকে তার গরু-বাছুর সম্পর্কে করুণা তাঁকে স্পর্শ করে। আদালতে এ ব্যাপারটা বহুবার লক্ষ্য করেছেন ভবনাথ, খুন একটা উত্তেজনার দ্বীপ, কিভাবে লোকে হঠাৎ করে সেখানে এসে পড়ে তার পেছনে কোন চিন্তা নেই, যুক্তি নেই। কিন্তু এই দ্বীপের আশেপাশেই খেলা করছে মমতার যে বিশাল সমুদ্র তার পরিচয় খুনীদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ঝলক ওঠে।

'আর কদিন লাগবে? এখন যা হয়েছে তাড়ান দে। দ্যাখ যা ভাবছি, প্রদীপে তেল ফুরোচ্ছে।'

ধুলো আর চোখের পাতা পর্যন্ত ঘামে ভেজা লোকটা কোদালের বাঁট দিয়ে মাটির ঢেলাগুলো পিটিয়ে পিটিয়ে সমান করতে থাকে। এক পশলা বৃষ্টির দরকার, আলুর চারা বসাতে সুবিধে হবে।

মাচায় কচি নধর একটা লাউ ঝুলছিল। ভবনাথ বললেন, 'ওটা কেটে নিয়ে যা।'

আলুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে সূর্যমুখী ফুল গাছ অসংখ্য ফুলের কুঁড়ি গিলোগালি হলুদ ফুলের মধ্যে মাথা তুলে আছে। পাবনা বাড়ির পেছনে যে ক্ষেতের সেই অঞ্চলের পুব দিকে জলের পাশেই একটা ঝাঁকড়া টোপা কুলের গাছ ছিল। পেল্লাই সাইজের কুল হতো। একবার পায়ে কুলের কাঁটা ফুটে কি তুমুল কাণ্ড হয়েছিল ভবনাথের অস্পষ্ট মনে পড়ে। ভবনাথ আপন মনে তাঁর কালো চটি থেকে বাঁ পা-খানা মাটির ওপর রাখেন। চল্লিশ বছর আগের সেই ক্ষতের দাগ এখনও মেলায়নি।

না: [illegible] থেকে কিছু খারাপ হয়নি, ভবনাথ বাগান থেকে ফেরার পথে ভাবেন। [illegible] না থাকলে তাঁর বাবা যাবার পর থেকেই পাবনা বাড়িতে যে পচন ধরেছে সেই পচা পাঁকে তাঁর পাও গেড়ে যেত। বড়দার অশিক্ষিত গোঁয়ার আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোদের পরস্পর কলহ, শেষ পর্যন্ত লাঠালাঠি, পুলিশ কেস এগুলোর মাঝখানে তাঁকে আর স্বর্ণসুন্দরীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কোথায় না থাকত দারুণ কলকাতায় বাড়ি অথবা বড়ছেলেকে আই-সি-এস বানাবার স্বপ্ন।

তাছাড়া তাঁর বাপের যে বিশাল পারিবারিক বোধ তা তাঁর নিজের কখনই ছিল না একথা স্ত্রী স্বর্ণসুন্দরীর আপত্তি সত্ত্বেও সত্য। স্বর্ণসুন্দরী মাঝে মাঝে এই রকম একটা আঁচ দেন যে তাঁর স্বামী পাবনা বাড়ির যূপকাষ্ঠে বলি। সামান্য কয়েকজন ভাগ্নে ভাইপোকে ছোটখাটো চাকরী করে দেওয়া ছাড়া ভবনাথ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করেননি, একথা তিনি বিলক্ষণ জানেন। বরং পাবনা বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মগ্লানিও এসেছিল। তাঁর বাল্যকাল, এক বাড়ি লোকের একান্নবর্তী বয়সের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গা মিলিয়ে যে বড় হওয়া তার পাশে ছোট টুটুল বুড়ির বড় হওয়ার যে প্রবল ফারাক তা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বাবার সম্পর্কে একটা গল্প কিছুতেই ভুলতে পারেন না ভবনাথ। [illegible]

CENTRAL LIBRARY

ভাই অঘোর তখন ছোট, আর ঈশান চৌধুরীর প্রথম ছেলে ছ মাসের। ঈশান গিয়েছেন ঠাকুর স্টেটের মোকদ্দমায়। সেখানে টেলিগ্রাম গেল 'চাইল্ড পাস্ড অ্যাওয়ে, কলেরা স্ট্রোক, কাম শার্প।' পাবনা বাড়ির গাড়িওয়ালা গেটে গাড়ি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে তিনি ছুটতে ছুটতে বারান্দা দিয়ে আসেন। ঘরের সামনেই দেখলেন অঘোর গুলি খেলছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে কোলে তুলে নিলেন। আনন্দে দু চোখে জল। পরম নিশ্চিন্তে বলে ওঠেন, অঘোর আঃ! তুই আছিস। তাহলেই হল আমার সব আছে।' পর্দার ওপাশে রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না, এক ছেলে গেছে, আর এক ছেলে হবে। কিন্তু ভাইকে তো আর পেতাম না।'

বাড়ির কাছে আসতেই একটা চেঁচামেচি শুনে ভবনাথ মাঠের দিকে তাকান। চোঙা চীৎকার করত করতে ছুটে আসছে, টুটুল কাঁদছে আর চোখ মুছছে, বুড়ী ঘাড় নেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা বডি গার্ডকে কি বোঝাচ্ছে। স্বর্ণসুন্দরীও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন।

'বাবা, টুটুল পটকা চুরি করেছে। চুরি করে ধরা পড়েছে।' চোঙা চীৎকার করে বললে।

টুটুল সামনে এসে ফুকরে ফুকরে কাঁদতে থাকে। 'আমি আর করব না।' হেড কনস্টেবল খালি বলে যাচ্ছে 'কুছ হয়নি, কুছ হয়নি।'

'কি হয়েছে, কি হয়েছে?' স্বর্ণসুন্দরী ঝাঁঝিয়ে বললেন।

বুড়ীই পরিষ্কার করে বলতে পারে ব্যাপারটা। হেডমাস্টার বাবুদের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে ভাই-বোনেরা বাড়ি ফেরবার পথে কনস্টেবল দুটিকে বড় রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে পটকার দোকানে গিয়েছিল। বুড়ী তার ভাইদের অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে প্রচুর বাজি বলাইদা কিনে এনেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা গিয়েছে। বুড়ী বলে চোঙাই প্রথমে সামনের ডালাতে সাজানো ছোড়া পটকার স্তূপ থেকে দুটো সরিয়ে নিতে বলে টুটুলকে। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো টুটুল ধীরে-সুস্থে তার মোটা মোটা আঙুল পটকার স্তূপে রেখে একমুঠো পটকা তেমনি ধীরে সুস্থে যেই বুকপকেটে রাখতে গেছে অমনি দোকানদারের এক ছোকরা সপাং করে তার হাত চেপে ধরে পটকাগুলো বার করে ফটাফট করে কান মলে দিয়েছে।

এইটুকুন বলেই ভাইয়ের অপমানে অপমানিতা বুড়ী প্রায় কেঁদে ফেলে। কিন্তু পরের ঘটনাটা সে আর বলেনি। চোঙার চীৎকারে বড় রাস্তা থেকে কনস্টেবল দুটি ছুটে আসে। এস-ডি-ও সাহেবের ছেলে শোনার পর আর তৎক্ষণাৎ দুটি কনস্টেবলের আবির্ভাবে দোকানদার আতঙ্কে বড় বড় দু ঠোঙা পটকা চোঙার হাতে তুলে দিয়েছে।

ব্যাপারটা মিটে গেছে এবং স্বর্ণসুন্দরীও অদৃশ্য দোকানদারের উদ্দেশে কয়েকটি কঠিন বাক্য বলে টুটুলের চোখ মুছিয়ে দিলেন। কিন্তু টুটুলের আফসোস গেল না। তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। দুমাস আগে ভবনাথের কোর্টে ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল বোধহয় সে স্মৃতি এখনও টুটুলের মনে প্রবল। সে রাত্তিরে অন্ধকার মাঠে প্রদীপে ঝলমল বাড়িখানা দেখতে দেখতেও সেই ফাঁসির সম্ভাবনা তার মন থেকে মুছে যায় নি। ফাঁসি কোথায় হবে সে সম্পর্কেও কল্পনা করে নিয়েছিল সে। শোবার ঘরে উঁচু কড়ি-কাঠ থেকে টানা পাখা নামিয়ে তার ফাঁসির ব্যবস্থা হয়েছে, তার আগে সে যেমন যেমন দেখেছে তেমনি একটা ছবি ভেসে ওঠে তার মনে—কাছারীতে ভবনাথ হাকিমের চেয়ারে, সে কাঠগড়ায় আর বলাই খাঁকি উর্দি আর জরির টুপি পরে বিকট হাঁক দিচ্ছে—'আসামী হাজির?'

সেদিন সন্ধ্যায় চোঙা মনের আনন্দে পটকা ফাটিয়ে সকলের কানে তালা লাগাবার উপক্রম করল। কিন্তু টুটুল জানালায় শুধু ম্রিয়মাণ।

পরদিন আর একটা পারিবারিক দুর্যোগ আসে। দুর্যোগই বটে! সারা বিকেল স্বর্ণ চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুললেন। এমনকি গোপীনাথের ওপর ঝাঁঝালেন, বলাইয়ের নতুন বউয়ের গল্প একেবারে আমল দিলেন না। জগাকে বললেন, 'তোর ফাঁসি হলেই ঠিক হত।' কমলির মা, ধোপা কেউ এই তোলপাড় থেকে রেহাই পেল না। আদালত থেকে ফিরে ভবনাথ ঘিয়ে ভাজা লুচি আর বেগুন শুকনো লঙ্কা ভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর কাছে কি শুনলেন, তারপর তাঁরও স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কোমল মুখখানা ভারী থমথম করে।

এই তুলকালামের কেন্দ্রস্থল বুড়ীর রিপোর্ট। বুড়ী তার কাছে এসে জানায় চোঙা জঘন্য কথা তাকে বলেছে।

চোঙা প্রতিবাদ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় পড়ে তার গালে। টুটুল লক্ষ করলে এরকম একটা খানদানি চড় খেয়েও চোঙা কাঁদে না। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরীর জেরায় ফুঁপিয়ে ওঠে, 'রতন শিখিয়েছে, একদিন টিফিনে রতন শিখিয়েছে।'

'রতন কে?'

জানা গেল, রতন চোঙার সহপাঠী। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ হুকুম দিলেন কলকাতায় পড়া চোঙার বন্ধ। বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই সে টুটুলদের স্কুলে পড়বে।

ভবনাথকে খাবার টেবিলে স্বর্ণ বললেন 'কলকাতায় বড় স্কুলে পড়ে যদি এইসব শেখে তারচেয়ে পাঠশালাতে পড়াই ভাল।' ভবনাথ সায় দিলেন।

প্রতাপ এবং গৌরী কিন্তু এসব পারিবারিক দুর্যোগে ছিল না। তারা পরিপূর্ণভাবে ছুটি কাটাতে এসেছে। তাছাড়া এমনিতেই সামনের বছরের মাঝামাঝি প্রতাপের বিলেত যাবার পর কলকাতার ডেরা তুলতে হবে। গৌরী কলেজের হস্টেলে যাবে। কাজেই ছুটিটার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে দুই ভাই-বোন। স্বর্ণসুন্দরী ভিড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাদের ছোট ভাই-বোনদের। কিন্তু প্রতাপ এলেবেলে-দের নিয়ে যেতে চায়নি। গত দু-তিনবার চূর্ণী নদীতে নৌকোয় পিকনিক, পাখি শিকার—এর কোনটার মধ্যেই তারা ছোটদের ফেলে নি।

সন্ধেবেলায় প্রতাপরা ফেরে। পাশে গৌরী, বাদামী চুল হাওয়ায় এলোমেলো। খাটো ফ্রকের নীচে থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে তার হাঁটা স্বর্ণসুন্দরী মনে মনে তারিফ করেন। বড় মেয়ের মতো এ-মেয়ের জন্যে বোধহয় খুব পণ দিতে হবে না এরকম একটা আশা তাঁর মনের মধ্যে নড়ে-চড়ে। পেছনে লালমোহন সঙ্গে সেই শাখারীর বাতায় সুদক্ষ হকি খেলোয়াড়। লালমোহনের লম্বা লম্বা গোঁফদুটোর দিকে তাকান আর তার পিছনে আর একবার ধিক্কার জাগে স্বর্ণসুন্দরীর। কত সহজ ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যেত, যদি কলকাতায় বাড়ি থাকত কিংবা..

কালকে প্রতাপ তোমাদের দলে ছোটদের নিও। ওরাও একটু আমোদ আহ্লাদ করুক না।'

কাগজের থলি থেকে তিনটে রক্তমাখা তিতির নামায়, বাবার পায়ের কাছে প্রতাপ। চোঙা তার দুঃখ এক মুহূর্তে ভুলে যায়। তিতিরের ঠ্যাং নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দেয়।

দোনলা বন্দুকটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে প্রতাপ বললে, 'কাল আমরা যাব গোসাপ মারতে। এই জেলখানার গায়েই। বেটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ওরাও যাবে আমাদের সঙ্গে।'

টুটুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে বড়দা-কে দেখতে থাকে। ফর্সা রং আরও লালচে দেখায়। পাশে দাঁড় করানো বন্দুক, পায়ের নীচে রক্তমাখা পাখি, তার ঠাকুরমার ঝুলির ডালিমকুমারের মতো লাগে বড়দাকে। কাছে পিঠেই নিশ্চয় দুধের মতো সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রতাপ আগামীকালের অভিযানের প্ল্যান বলতে থাকে তার ছোট ভাই-বোনদের কাছে।

পরেরদিন সারা বিকেল জেলখানার উপুড় হয়ে অপেক্ষা, চোঙার উৎসাহই বেশী। সে সর্বত্র গোসাপের ল্যাজ, গোসাপের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে, গোসাপের গন্ধ পায়। দোনলা বন্দুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রতাপ মাঝে মাঝে ফোঁসে, 'চোঙা চুপ কর।' চোঙা সাময়িক চুপ করে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐয়ে ঐযে।'

নালা দিয়ে দিয়ে তারা মরাকাটার মাঠের দিকে অগ্রসর হয়। কাল তিতির অভিযানে গৌরীর পা ছড়ে পেকে উঠেছে, সে তাই আসেনি। টুটুল আর বুড়ী শুকনো নালার ভেতর শুয়ে পড়ে, ঘাসের বেগুনি নীল সাদা শুকনো ফুলগুলো জোগাড় করে। যেদিকটায় ছায়া স্যাঁতসেঁতে সেদিকের ফুলগুলো এখনও অক্ষত।

'মা বলেছে কি জানিস, ছুটকিদাকে জেলে দেবে।'

টুটুল অবাক হয়ে তাকায়। মা বললে, অ্যাদ্দিন থাকলি, খেললি-দেললি, যাবার সময় একবার জানিয়ে গেলি না?'

'আমি জানি, আমাকে বলেছে। কলকাতায় যাবে ছুটকিদা বলেছে চুপি চুপি। রাণাঘাট ভাল লাগে না, পাবনা ভাল লাগে না। কলকাতা সবচেয়ে ভাল। সেখানে সবসময় আলো, ট্রাম-বাস। আমিও কলকাতায় যাব বুড়ী।'

'তুই বিয়ে করবি টুটুল? আমি করব না।'

'আমিও না।'

'থাক, তুই কি জানিস? বড়দি বিয়ে করে এল, চিনতেই পারছি না। একগুচ্ছের গয়না, শাড়ি, বাসন। আবার মেজদির বিয়ে হবে।'

'বিলেত কেমন রে? বিলেতে কেন লোকে যায়?'

'বিলেতে যায়? বিলেতে সব বড় হবে বলে, আরও টাকা পাবে বলে?

'বাবারও তো টাকা আছে।'

'বাঃ বাড়ি বানাতে হবে না।'

'বাবাও তো বাড়ি বানাচ্ছে।'

'বাঃ আরও বড় বাড়ি। তুই কিছু বুঝিস না টুটুল।'

ঠিক এই সময় দুম্ দুম্ করে পর-পর দুটো গুলির আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে মড়াকাটা ঘরের ড্রেনের পাশে কোপের মাঝখানে ঝটাপট আওয়াজ। 'তুই বটে পামর' বলে ছোড়া তার ছাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেদিক দৌড় দেয়। টুটুল আর বুড়ীও নালা থেকে উঠে সামনে দৌড় দেয়।

সামনেই প্রায় তিন ফুট লম্বা ধূসর গোসাপ। লেজটা নড়ছে।

উত্তেজিত ছোড়া তিড়িং তিড়িং করে নাচে আর চেঁচায়, 'সাবধান, সাবধান, এখনই ধুব্দ ছিটোবে। ধুব্দ লাগলেই অবধারিত মৃত্যু।' ছোড়া তার বাংলা গল্পের বইয়ের মতো কথা বলে।

প্রতাপকে লাগে সত্যিই স্বপ্নের রাজকুমারের মতো। তার কপালের ওপর কোঁচকানো চুল ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে। মুখখানা রোদে রাঙা। আলগোছে ধরে থাকা দোনলা বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পায়ের নীচে সাপ ভূপতিত। পাশেই সেনাপতি হেড কনস্টেবল রামসুজন সিং।

বুড়ী টুটুলও মুগ্ধ দৃষ্টিতে বড়দা-কে দেখে। আর ছোড়া পাগলের মতো চীৎকার করে যায়। 'পামর, তুই বন্দী।' বলে ছাড় দিয়ে শিবরু জীবটার পেটে দুবার খোঁচা দেয়। সরীসৃপটার ঘাড়ে ছ্যাঁদা, সেখান থেকে টপ্-টপ্ করে রক্ত পড়ে শুকনো ঘাসে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে দেখা নাটকের একটা লাইন মনে পড়ে যায় ছোড়ার। আবেগ উদ্বেল কণ্ঠে ছোড়া চেঁচায়, 'জাঁহাপনা, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

আর বন্দী শব্দ ছোড়ার প্রাণেশ্বরকে [illegible]

ছুটি বেশ জম-জমাট কাটছিল। হঠাৎ কি হ'ল ভবনাথের পরিবার দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। বড়দের ও ছোটদের এই শিবির থেকে ভবনাথ অবশ্য বাদ। তিনি কাঁপর ক্ষেত আর বন্দেমাতরম সামলাতে ব্যস্ত। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরীও প্রতাপ গৌরীর দলে ভিড়ে গেলেন। রোজ দুপুরবেলা দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় খবরের কাগজ পড়ার রেওয়াজ শুরু হ'ল। ছোড়া কিভাবে হাত গলিয়ে দরজার হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পরই প্রতাপ তাকে হাত ধরে পাশের ঘরে বার করে দিয়ে কট্-কট্ করে কান মলে দিল। বড়দার এই আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় অবাক টুটুল আর বুড়ীকে ছোড়াই আশ্বস্ত করলে, 'আমি সব শুনেছি। সব শুনেছি। দারুণ সব অসভ্য কথা লেখা আছে কাগজে।'

বুড়ী আন্দাজে একটা ভয়াবহ ব্যাপার আঁচ করতে পারে। ছোড়া তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে তার সামনে আঙুল নেড়ে বলে, 'তুই তো নালিশ করে বালিশ পেয়েছিস। তুই জানিস?

সুজাতা সরকারের চাঞ্চল্যকর মৃত্যুর শুনানী কয়েকদিন থেকে খবরের কাগজের পাতায় ফলাও করে ছাপা হচ্ছে তাই শোনবার জন্যে বড়দের এই রুদ্ধদ্বার ষড়যন্ত্র। ছোড়া অলক্ষিতে ঢুকে পড়ে দরজার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। কাগজের পাতা মুড়তে গিয়ে প্রতাপের চোখ পড়ে সেদিকে।

'আমরা একটু বললেই খারাপ, না? আর, বড়রা যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে সে বেলায় কিছু হবে না,' ছোড়া চীৎকার করে বলে।

'চল, আমরা চূর্ণী নদীতে যাই,' টুটুল বললে।

'চূর্ণী নদী! চূর্ণী নদী! কি আছে সেখানে। ঘোলা জলের ওপর দিয়ে একটা-দুটো নৌকো যাচ্ছে। এই দেখতে এই দুপুরে যাই আর কি। এখানে চিড়িয়াখানা আছে? গণ্ডার দেখেছিস, জলহস্তী দেখেছিস?'

টুটুল দমে যায়। সে গণ্ডার কিংবা জলহস্তী স্বচক্ষে দেখেনি। কিন্তু বাবার বৈঠকখানায় 'বুক অব নলেজের' পাতায় ও দুটো জন্তু সে দেখেছে। জলহস্তী বলতেই তো সেই বইয়ের পাতা থেকে বড় বড় দুটো হাঁ মনের মধ্যে ভেসে উঠল। কিন্তু তার সংগে চূর্ণী নদীর কি সম্পর্ক সে বোঝে না। তার স্বপ্নের রাজত্বে এরকম হামলায় মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করুণ। 'চিড়িয়াখানা দেখতে আমার বয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাইয়ের ওপর কিন্তু টুটুলের গায়ে জোর বেশী। মার খেয়ে সে এমনভাবে জাপটে ধরে দাদাকে যে প্রায় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। 'মা, টুটুল মেরে ফেলল ছোড়াকে,' বুড়ী চেঁচাতে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে হাত-পাখার বাঁট দিয়ে দুই ছেলেকে বেশ জোরে [illegible] ঘা বুলিয়ে দেন। টুটুল মায়ের আক্রমণে হাঁউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ছোড়ার চোখেও জল। সে অবস্থাতেই ছোড়া তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে টুটুলের কড়ে আঙুলের সঙ্গে ঠেকিয়ে আড়ি করে দিলে।

বুড়ীর এই ধরনের মারামারি মোটেই পছন্দ নয়। আর ছোড়ার সব সময় কলকাতা টেনে কথা বলা তার অসহ্য। চিড়িয়াখানায় সেও একবার গিয়েছে, জলহস্তীও দেখেছে। তাতে হয়েছে কী? দুজনের সঙ্গই ছেড়ে দিয়ে সে ভেতরের বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দালানে ওঠে।

নানা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ছে। সেদিকে একনজর চেয়ে কিন্তু গতিতে রোদে দেওয়া স্বর্ণসুন্দরীর কুলের আচারের মস্ত বয়ামে হাত চালিয়ে এক খাবলা আচার তুলে নেয় বুড়ী এবং নিঃশব্দে পাঁচিলের বাঁকে ছায়ায় এসে আঙুল চাটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরই দুই ভাইকে সেদিকে আসতে দেখা যায়। 'আমাকে একটু দে-না।' ছোড়া প্রায় হুকুম করে। টুটুল কিছু বলে না। দুজনেই আচার পায় কিন্তু ছোড়া চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইস্ কি মার্কিক-চোখ, এইটুকুন দিয়েছে।'

'কেন, তোর কলকাতায় যা-না,' বুড়ী বললে।

'যাব তো।'

'হবে না, হবে না, আর যাওয়া হবে না, আমি সব জানি।'

ছোড়া দাঁত টিপে ছুঁচলো মুখে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার চোখের পাতা পিট-পিট করে। বুড়ী দুর্যোগের আভাস লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করে ফেলে। 'এই নে, এই নে।'

আচারের [illegible] ভাগটাই ছোড়াকে দিয়ে দেয়।

ছোড়ার সব সময় কি করি, কি করি ভাব। কোন একটা কাজ কিংবা খেলা সে বেশীক্ষণ করতে পারে না। ভাই-বোনদের মধ্যে তার ঘুম সবচেয়ে পাতলা। রাত্তিরে খুট্ করে কোথাও শব্দ হলে সে জেগে যায়। টুটুল এদিকে তার দাদা থেকে অন্য রকম। সে কোন জিনিস ধরলে তা থেকে উঠতে চায় না। তার বাড়াবাড়ি লাগিয়ে দেয়। এটা আবার বুড়ীর ভাল লাগে না। টুটুলকে বলে, 'আমার নাম বুড়ী না হয়ে তোর নামই বুড়ো হওয়া উচিত ছিল।'

টুটুল আচারের হাতটা ভাল করে চেটে গেঞ্জির ওপিঠে মুছে নেয়। নানার ভীষণ ছুঁচিবাই সেজন্যে এ ব্যবস্থা সেরে রান্নাঘরের দালানে উঠে নানার পিঠ ঘেঁষে বসে। নানা নিজেই চেঁচিয়ে পড়ে কারণ, চেঁচিয়ে না পড়লে বাংলাটা সম্যক বুঝতে পারে না। কানের সঙ্গে কালো কর্ডের সুতো দিয়ে আঁটা চশমার ভেতর থেকে একবার টুটুলের দিকে ফিরে, পড়ে চলে :

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভের উপরে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার॥
নানা রত্নে নির্মাইল টঙ্গ শতে শতে।
নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতি পথে॥

CENTRAL LIBRARY

প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রত্নে করে লক্ষ লক্ষ চন্দ্রতারা।।
নানা রত্নে নির্মিত আগার সারি সারি।।
জিনিয়া অমরাবতী রম্য বেশধারী।।
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্য বেশ।
তেমনি মণ্ডপসুর অযোধ্যার দেশ।।

'গোপীনাথ!' স্বর্ণসুন্দরীর ডাক পড়ে।

গোপীনাথ একটু অবাক হয়। অন্যদিনের চেয়ে অন্তত আধঘণ্টা আগে তার ডাক পড়েছে। জামগাছের গায়ের আধেকটা এখনও ছায়ায় ঢাকেনি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চশমা খুলতে খুলতে টুটিলকে বলে, 'আজ আর তোমার শোনা হইল না। বাবু আসিয়া গিয়াছেন। লুচি ভাজিতে হইবে।'

ভবনাথের থমথমে মুখখানা দেখে স্বর্ণসুন্দরীর মনে প্রশ্ন করবার ইচ্ছে জেগেছিল, কিন্তু গোপীনাথকে তাড়া লাগাতে লাগাতে ভুলে গিয়েছেন। ভবনাথ চায়ের কাপ খালি করতে করতে বললেন, 'আজ সন্ধ্যের ট্রেনে তোমাকে নিয়ে যেতে আসছি। টেলিগ্রাম এসেছে। স্বর্ণ, কমলাইর শরীর খুব খারাপ।'

এক মুহূর্তে স্বর্ণসুন্দরী অন্ধকার দেখেন। পকেট থেকে ভাঁজ খুলে টেলিগ্রামখানা টেবিলে রাখেন। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে তাকান না।

রাত নটায় যখন ভবনাথ স্বর্ণসুন্দরী কলকাতায় অক্ষয় বসুর আগাগোড়া মার্বেল মোজাইক করা রসা রোডের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন তখন ডক্টর নামজাদা সাহেব ডাক্তার ডেনাম হোয়াইট এসেছেন। অক্ষয় বসু অচেতন। ডাক্তার রক্তের চাপ, বুক পরীক্ষা ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে যা যা করণীয় সব করলেন। অক্ষয় বসুর ছোট জামাই গগন মিত্তির যাকে বিলেত থেকে একাউন্টেন্সী পাশ করিয়ে ঘরজামাই করে রেখেছেন, তিনি ডাক্তারের আশেপাশে গম্ভীর মুখে ঘোরাফেরা করছেন। ডাক্তার চলে গেলেই দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল।'

ভবনাথ অবাক হয়ে চাইতেই বললেন, 'নবা স্কাউন্ড্রেলটার কথা বলছি। আটটা বছর তো বাপের হোটেলে কাটিয়ে দিল বিলেতে। এখন বাপ মর-মর। টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কি জবাব দিয়েছে জানেন? বলেছে একটা পার্ট টু পরীক্ষা বাকী আছে। সেটা হলেই নভেম্বর পর দেশে ফিরবে।'

'কবে থেকে স্ট্রোক হয়েছে?'

'এটা তো ঠিক স্ট্রোক না, মানসিক ডিপ্রেশান।'

ভবনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ডাক্তার কি বললেন?'

'ব্যাটার ভাট কি! চৌষট্টি টাকা ফি নিল। বললে তো রিকভারির চান্স আছে।'

পরদিন সকালে আটটায় প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এলেন স্বর্ণসুন্দরীর বাবার ইচ্ছায়। বাড়িতে আরও আত্মীয়-স্বজনের আগমন শুরু হয়েছে। তাঁদের চা-পান জলখাবার জোগাড় দিতে দিতেই স্বর্ণসুন্দরীর সময় কেটে যাচ্ছে। একবার বাপের কাছে বসবার ফুরসতই পাচ্ছেন না। তাছাড়া তাঁর সচেতন মন অস্বীকার করলেও অক্ষয় বসু যে তখন প্রায় আর এক লোকের বাসিন্দা তা তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। দোতলায় ইটালিয়ান মার্বেলে মোড়া মস্ত শোবার ঘরখানার সংলগ্ন ব্যালকনি ছুঁয়ে আছে রাস্তার ঝাড়ালো তরুণ সবুজ দেবদারু। দোতলা পাঞ্জাবী বাসগুলো গুম গুম শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণসুন্দরীর ছোট বোন তারা বা তারাসুন্দরী ছুটে ছুটে ধরমর কাজ করে বেড়াচ্ছে, তার বিশাল গতরখানা নিয়ে। কখনও অচেতন বাপের মাথা টিপতে বসছে, কখনও দিদির সঙ্গে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে তার শ্বশুড়ের সাম্প্রতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণনা করছে, কখনও ভবনাথকে ঠাট্টা করছে, 'আপনি যে দাদাবাবু সেইরকম ছোকরাই থেকে গেলেন। এখনও যে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়।' মস্ত কড়াইতে পাঁচটাকা সেরের বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে। সারা বাড়িটা ওষুধ, ফিনাইল আর গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে ম-ম করছে। এর মাঝখান দিয়ে মৃত্যু আসছে ভবনাথ নিশ্চিতভাবে টের পান।

গগন মিত্তির প্রচণ্ড আশাবাদী। 'আমি বলছি বাবা সেরে উঠবেন।' ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন। 'আমি ডেনহাম হোয়াইটকে বলেছি......আমি দেখেছি এইসব ব্লাডপ্রেসার কেসে......আসলে নার্ভাস টেনশান ঐ স্কাউন্ড্রেলটার জন্যে......এরকম কথা উঠতে বসতে বলে যেতে থাকেন।

স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করেন, 'নব হয়ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি।'

'তোমরা বড়দি আদর দিয়ে দিয়ে ভাইটার মাথা তো খেয়েছো।' গগন মিত্তির বললেন।

সারা বাড়ি অনেক লোকজন, কিন্তু একজনাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্যাকফেকে ফর্সা ছোট্ট শরীর হেমাঙ্গিনী স্বামী অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিয়েছেন, প্রায় তিনদিন অনাহারে। প্রাণপণে বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ মা কালী ইত্যাদি যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ে সবাইকে ডেকে যাচ্ছেন অহোরাত্র। কিন্তু কিছু হবার নয়। ডেনাম হোয়াইট প্রতাপ মজুমদার বাবা বিশ্বনাথ মা কালী কেউ অক্ষয়কুমার বসুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন না। তিনদিন আগে যেমন চিত হয়ে শুয়েছিলেন দুটো বালিশের ওপর তাঁর মাথা আর বিশাল শরীর নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে শুয়ে থাকলেন অক্ষয় বসু।

আর যত দিন যায় ততই মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে সকলের দ্বিধা কেটে যেতে থাকে। ডেনাম হোয়াইটের পতন হয়েছে, তাঁর ওষুধে কিছুই হয় নি। প্রতাপ মজুমদারও তথৈবচ। কাজেই তাঁদের সমর্থকদের আর কিছু করণীয় নেই। আর আলোচনা করে জলখাবারের ওপর সন্ধ্যে গুলজার করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। খালি হেমাঙ্গিনী তাঁর ভগবানকে ছাড়লেন না। তিনি তাঁর শীর্ণ দেহে কতগুলো নাম বারংবার আবৃত্তি করে মৃত্যুর দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। এভাবে চার পাঁচদিন যাবার পর ভবনাথ বুঝতে পারলেন না তাঁর কী করণীয়। আর ছুটি নেই, ফিরতেই হবে। তাঁকে অবশ্য বেশী ভাবতে হয় নি। সেদিন ভোরবেলাতেই স্বর্ণসুন্দরী স্বামীকে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন।

নব-র বিলেতে অবস্থান নিয়ে সারা বাড়ি আলোচনায় সরগরম। গগন মিত্তির তো 'স্কাউন্ড্রেল' বা 'রাসকেল' ছাড়া তার উল্লেখ করে না। সে যে ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে এরকম কথাবার্তাও শোনা যায়। আসলে নব একটু আরাম চায়। এক ছেলে হওয়ার ফলে তাকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা অনেক স্বপ্ন। সেসব দায় দিয়ে নিরুপদ্রবে সাত আট বছর বিলেতে কাটিয়ে দিয়েছে, একরকম আরও কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলে মন্দ কি? আর মহিলাদের ব্যাপারেও সে কোনরকম ঝামেলা চায় না। মহিলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে গেলেই তাদের বেল দিতে হবে, এরকম অভিজ্ঞতা নব সঞ্চয় করেছে। আর কোনরকম বেল দেওয়া নব-র পোষাবে না। সম্প্রতি এখানে তার টেনিস খেলার খুব তারিফ হয়েছে। একটা কাউন্টি প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে ওঠার পর তার 'ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকের' তারিফ কাগজে বেরিয়েছে। সেটা টুকরো করে কেটে সব তার ফাইলে রেখেছে। আসলে বাবার অসুখের চিঠি পেয়ে দেশে ফেরার মনস্থির করতে না পারার প্রধান কারণ টেনিস ফাইনাল। তারপর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আল্পস পাহাড়ে ঘোরার একটা প্ল্যান আছে। ইউরোপে এতদিন থেকেও এ ব্যাপারটা সে করে উঠতে পারে নি। নব-র স্থির বিশ্বাস তার বাবা মাস দুই অন্তত টিঁকে থাকবেন।

মাঝখানে একদিন জ্ঞান হয়। অক্ষয় বসু কয়েকবার মাথা নাড়ালেন, চোখ খুললেন, জল চাইলেন। সন্ধ্যেবেলার দিকে উঠেও বসলেন। পায়ের কাছে স্বর্ণসুন্দরী বসেছিলেন, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবনাথ ফিরে গেছে তো?'

পরের দুদিন স্বর্ণসুন্দরী সর্বক্ষণ বাপের সঙ্গে থাকেন। অক্ষয়বাবু মাঝে মাঝে বলেন, 'তোদের মা-কে একটু খেতে বল।' কয়েকদিন প্রায় অনাহারে থাকার পর হেমাঙ্গিনী ভাত নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেন। স্বর্ণসুন্দরী বাপকে উষ্ণ জলে স্নান করিয়ে সারা গায়ে পাউডার মাখিয়ে একটা হাতকাটা জেমানার গরদের পাঞ্জাবি পরিয়ে উঁচু বালিশের ওপর মাথাটা তুলে যখন বসিয়ে দিলেন তখন কিন্তু মনে হচ্ছিল এযাত্রা কাটিয়ে উঠলেন।

এমনকি মেয়ের সঙ্গে তাদের নতুন বাড়ির কথাও তুললেন। বাড়ির একতলার ছাত হয়ে গেছে শুনে আনন্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। 'প্রত্যাশা যাওয়া ঠিক?' জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ বাবা, জাহাজে টিকিট কাটা হয়েছে।' একটু থেমে বললেন স্বর্ণসুন্দরী। 'আমরা তো ছেলেদের ভালর জন্যেই করি। ছেলেরা তার কতখানি বোঝে ভগবান জানেন [illegible]

অক্ষয় বসু চুপ করে রইলেন। [illegible] প্রসঙ্গ তিনি তুলতে চান না। [illegible] এই মুহূর্তে তার দেশে না ফেরার [illegible] সংকট কারণ থাকতেও পারে। [illegible] বললেন, 'ও নিয়ে ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অক্ষয় বসুর মৃত্যু এল সহসা, যখন সবাই ভাবছেন তিনি আরোগ্যের পথে, যখন গগন মিত্তির আবার এই রোগ ও রোগমুক্তির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করছেন [illegible] রহস্যময়ী মত করছেন [illegible] ও [illegible] এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার [illegible] সেইরকম পারিবারিক মানসিকতার মধ্যে আবার স্থান পাওয়া গেল। সেদিনও [illegible] করলেন অন্যতম অক্ষয় বসু, অন্য লোকে।

পাশের ঘরে [illegible] থাকতে আত্মীয়স্বজন [illegible] অবস্থায় পৌঁছলেন স্বর্ণসুন্দরী। মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি [illegible] ছিলেন। [illegible] কাছে থাকতে তিনি তার জীবনের [illegible] নিয়ে। [illegible] স্বর্ণসুন্দরী [illegible] ফিরলেন।

(ক্রমশঃ)

সানসিল্ক

তার ৩টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্যেঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার ঝরঝরে, মেঘের মত উদার, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

ঝলমলে চুলের জন্যেঃ- এতে আছে অ্যালান্টয়েন যা আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

স্বাভাবিক চুলের জন্যেঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় সুন্দর পরিপাটি থাকে, প্রতিটি চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক – শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

CENTRAL LIBRARY

নভশ্চর স্কট (বামে) চন্দ্রে রোভারের গাড়ীতে বসে আছেন, তার এসময় আরউইন প্রস্তুত হচ্ছেন স্কটের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য (৩১শে জুলাইয়ের ঘটনা)। ডানে অ্যাপেনাইনস পর্বতশ্রেণীর দেখা যাচ্ছে।

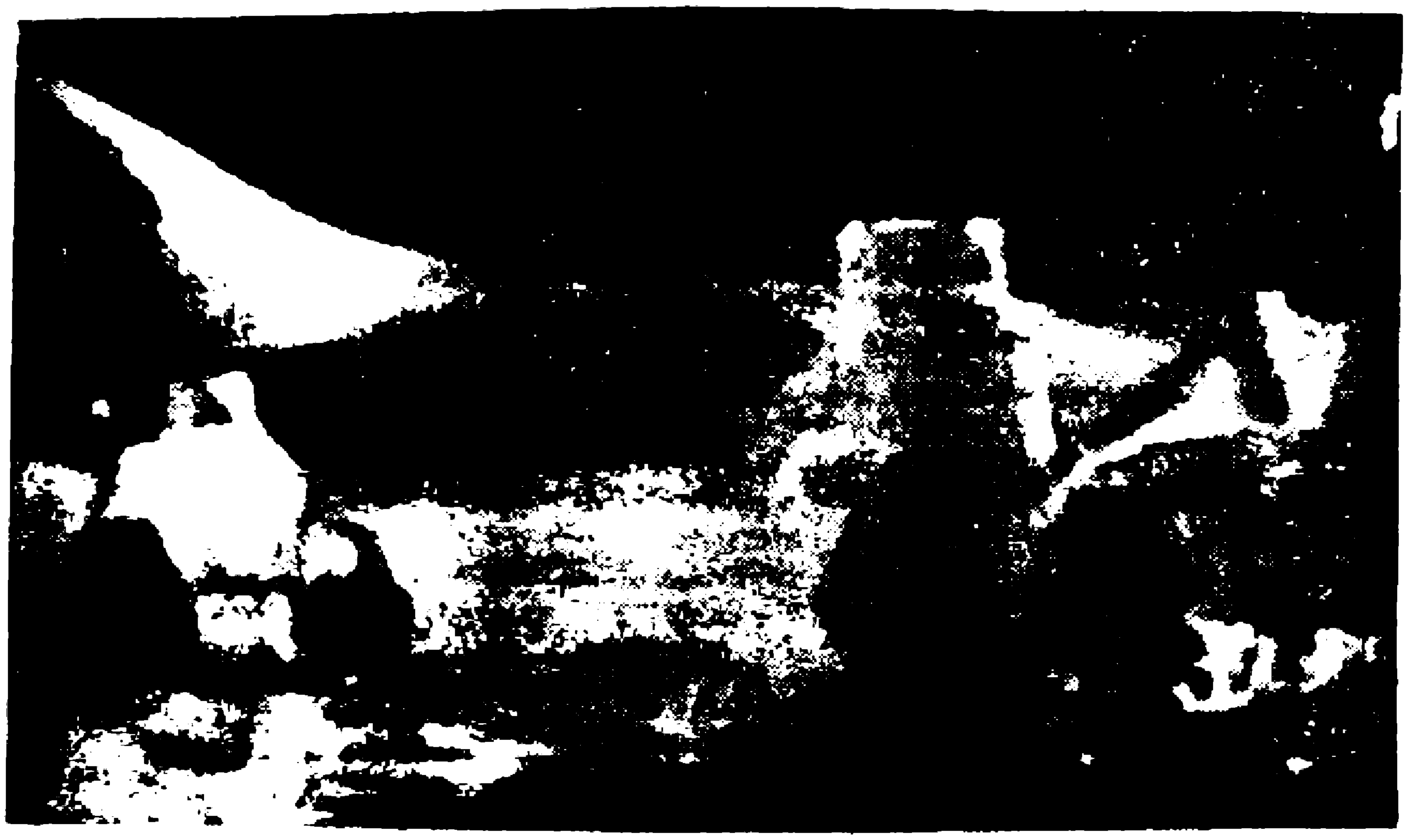

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো—১৫ কেন ? মহাকাশ-অভিযান ও ভরহীনতার সমস্যা

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের বিবরণ পড়ে সবাই জেনে গিয়েছেন যে, অ্যাপোলো-১৫ অভিযান সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এবারের অভিযান মোটামুটি নির্বিঘ্ন ছিল। সামান্য কিছু যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক গোলযোগ ছাড়া এবারের অভিযানের কোনো পর্যায়েই উৎকণ্ঠিত হবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি। তবে এই যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক গোলযোগগুলোকে সামান্য বলা হল পৃথিবীর মাটিতে অবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। পৃথিবীর মাটিতে চলমান কোনো যানে যে-সব গোলযোগকে সামান্য মনে করা হত, মহাশূন্যের এলাকায় তা থেকেও বৃহৎ বিপদ ঘটে যেতে পারে এবং কোনো ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। সুখের বিষয়, এবারকার অভিযানে বৃহৎ কোনো বিপদ ঘটে নি, এমন কি তার কোনো সম্ভাবনাও কখনো উপস্থিত হয়নি। নাসা-র (ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা ও মহাকাশ-অভিযান যে সংস্থাটির দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত। বিজ্ঞানীরা এবারের অভিযানে পরিপূর্ণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই কৃতিত্বের জন্যে নাসার বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অথচ এবারকার অভিযানই ছিল সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চাঁদের কক্ষ পর্যন্ত পথটি এবারেও আগের তিনটি অভিযানেরই অনুরূপ। এই পথের বিপদ আগের তিনটি অভিযানে যতোখানি ছিল এবারেও তার চেয়ে বেশি নয়। আসলে বিপদ ছিল তার পরের পর্যায়ে, চাঁদের কক্ষ থেকে চাঁদের মাটিতে অবতরণে। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানে চাঁদের মাটিতে নামা হয়েছিল সমতল এলাকায়—এই অবতরণে যে-অর্থে এবারের অবতরণে বিপদ দেখা দিতে পারত সেই অর্থে, বিপদ ছিল না। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে অবতরণ করা হয়েছিল ফ্রা মরো এলাকায়। এই এলাকাটি মোটেই সমতল ছিল না এবং অবতরণে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা ছিল। মনে রাখা দরকার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে হয় অবতরণের বিপরীত দিকে রকেট চালু করে ব্রেক হিসেবে কাজ করিয়ে। চন্দ্রযানটি নেমে আসে হেলিকপ্টারের মতো সিধেভাবে। চাঁদের মাটির কাছাকাছি এসে যদি দেখা যায় যে চন্দ্রযানটি যেখানে নামছে সেখানে প্রকাণ্ড একটি পাথরের চাঁই পড়ে আছে, তখন আর একটু সরে গিয়ে নামবার উপায় নেই। চন্দ্রযানটিতে ফিরে আসার মতো জ্বালানী মজুত থাকে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে এত বেশি নয় যে চন্দ্রযান চাঁদের মাটি স্পর্শ করার আগেই তাকে আবার আকাশে উঠিয়ে এনে, ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পরে আবার নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। মহাশূন্যে বাড়তি বোঝা বর্জন করা হয়, কারণ সামান্য একফোঁটা জলও যদি পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে তুলতে হয় তার খরচ মোটেই সামান্য নয়। যাই হোক, ধরেই নিতে হয় যে, চন্দ্রযান প্রথম বারেই চাঁদের মাটি স্পর্শ

সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"সাহিত্যে অনধিকারীর দলে মিশিয়াছিলাম অল্প বয়সেই। তখন তত গুরুদের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতে ও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না, কিন্তু সে মহল হইতে পিঠের ওপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ আধুনিককালে সে মহলটার দেউড়িতে তেমন লোকবল নাই। কিন্তু কবুল করিতে হইবে আমি আইন মানি নাই।" সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্বহস্তলিখিত অনুলিপিসহ।

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী

চৈতন্য লাইব্রেরী আয়োজিত বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। চৈতন্য লাইব্রেরীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রকাশিত সংবাদ।

১৩৭৮ শারদীয়া অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

তিনটি সুবৃহৎ উপন্যাস

প্রবোধকুমার সান্যালের
কমরেড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
খনির নতুন মণি

বুদ্ধদেব গুহের
পারিধী

•

চলচ্চিত্র ও খেলাধুলো বিষয়ে বিশেষ রচনা

দাম সাড়ে চার টাকা

সমকালীন জীবনের পটভূমিতে রচিত

বুদ্ধদেব বসুর
কাব্য নাটক
বিরাগমন

•

খ্যাতনামা লেখকদের অজস্র
ছোট গল্প
কবিতা

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—তিন

CENTRAL LIBRARY

করবে। অতএব অবতরণের স্থানটি এমনভাবে নির্বাচিত করতে হয় যে, তার চারদিকে যতোই পাহাড় থাকুক আর খাদ থাকুক অবতরণের নির্দিষ্ট এলাকাটি হবে সমতল। এজন্যে আগে থেকেই অবতরণের এলাকার আলোকচিত্র নেওয়া হয়। কিন্তু এখানেই হয় মুশকিল। অনেক উঁচু থেকে নেওয়া আলোকচিত্র যতোই স্পষ্ট হোক,তাতে মিটার পাঁচেক উঁচু একটা পাথরের হদিশ পাওয়া শক্ত। তাই ফ্রা মরোর মতো এলাকায় বা এবারের অভিযানের হ্যাডলে রিলের মতো এলাকায় অনেকখানি ঝুঁকি নিয়েই নামতে হয়। ফ্রা মরোর চেয়েও এবারের ঝুঁকি ছিল অনেক অনেক বেশি। তাই এবারের অভিযানই ছিল চারটি অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে বিপদসংকুল।

এতই যেখানে বিপদ, এমন এলাকায় নামার দরকারটা কী? দরকারটা হচ্ছে, লণ্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা প্রমাণ করা। খোদ আমেরিকার এবং আমেরিকার বাইরে সারা বিশ্বে বহু বিজ্ঞানী অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। চাঁদের মাটিতে তিন-তিনবার মানুষ নামাবার পরেও চাঁদের ব্যাপারটা কী বা আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আরো বেশি জানতে পেরেছেন তা বলা চলে না। দু-বছর আগে 'ন্যাসা' যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তদনুসারে হ্যাডলে রিল ছিল শেষতম অভিযানের (অ্যাপোলো-২০) অবতরণ-স্থল। পর পর কয়েকটি সফল অভিযানে পর্যায়ক্রমে চাঁদের বিভিন্ন এলাকায় অবতরণের পরে হ্যাডলে রিল হবে রোমহর্ষক উপসংহার। কিন্তু সেই হ্যাডলে রিলকেই কুড়ি থেকে পনেরোয় এগিয়ে আনতে হয়েছে, নতুবা অ্যাপোলো অভিযানের মাধ্যমে চাঁদ সম্পর্কে যা জানার ছিল তা জানা যাচ্ছে না—অর্থাৎ, অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা প্রমাণ করাই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতঃপর আর দুটি মাত্র অভিযান বাকি রয়েছে—অ্যাপোলো-১৬ ও অ্যাপোলো-১৭। অবতরণ-স্থলের দিক থেকে এই দুটি অভিযানের তেমন আকর্ষণ নেই। অ্যাপোলো-১৬ অভিযানের অবতরণ-স্থল নির্ধারিত হয়েছে চাঁদের দেকার্ত এলাকা। এটি অপেক্ষাকৃত নবীন, অ্যাপোলো-১১ অভিযানে প্রশান্ত সাগরে নামার পরে এই এলাকা থেকে নতুন কোনো নমুনা সংগৃহীত হবার আশা কম।

হ্যাডলে রিলকে এত আগেই অবতরণ-স্থল হিসেবে নির্বাচিত করার তাগিদটা কিসের? আগে বলেছি, আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী ও চাঁদ কঠিন অবস্থা ধারণ করেছিল। কিন্তু তারপর থেকে চাঁদে যেন অনেক অনেক বেশি ওলোট-পালোট ঘটে গিয়েছে। সে-তুলনায় পৃথিবীর ইতিহাস অনেক বেশি শান্ত, অনেক বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত। পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র, নদী, গাছ, মাছ, পশুপাখি ও শেষ-পর্যন্ত মানুষ। দিনে দিনে অপরূপ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। কিন্তু চাঁদ? অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানের নভশ্চররা চাঁদের যে-এলাকায় নেমেছিলেন সেখানে ছিল বিরাট এলাকা জুড়ে জমে যাওয়া লাভা প্রবাহের সমতল। মনে হয় জন্মের পরে অর্ধেকটা সময়ই চাঁদের কেটেছে প্রচণ্ড একটা লণ্ডভণ্ডের মধ্যে। কঠিন পাথর পরিণত হয়েছে তরল লাভাস্রোতে এবং চাঁদের বিরাট সমতল এলাকা জুড়ে জমে কঠিন হয়ে আছে।

এ-অবস্থায় প্রথম দুটি অভিযান থেকে যেসব পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল সেগুলো ছিল অধিকাংশই এই লণ্ডভণ্ড শান্ত হয়ে যাবার পরে। বয়স আড়াইশো কোটি থেকে সাড়ে তিনশো কোটি বছরের বেশি নয়। কিন্তু তারই মধ্যে ছিটেফোঁটা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেল যার বয়স পাঁচশো কোটি বছর। অর্থাৎ এই হচ্ছে আদি পাথর, জন্মের সমকালের পাথর।' বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, চাঁদের এমন কোনো এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হোক যেখানে আদি পাথর পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা ধরে নিলেন চাঁদের পর্বতগুলোতে নিশ্চয়ই লণ্ডভণ্ডের ছাপ পড়ে নি, চাঁদের পর্বত থেকেই পাওয়া যাবে আদি পাথর। ফ্রা মরো এলাকায় অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এই আদি পাথর সংগ্রহ করা।

ফ্রা মরো এলাকা থেকে নমুনা এসেছে যতোখানি আশা করা গিয়েছিল তার চেয়েও কম। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসংবাদ, পাথরগুলো ছিল সবই 'নবীন'। কোনোটাই আদি পাথর নয়। ৪০০ কোটি বছর বয়সের পাথরও পাওয়া যায় নি।

এ থেকে যে ছবিটি বেরিয়ে আসে তা বিজ্ঞানীদের কাছে অন্তত গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে জন্মের পরে প্রায় ৮০ কোটি বছর চাঁদে কোনো উৎপাত ছিল না, শান্তশিষ্ট এই উপগ্রহটি নির্বিবাদে পাক খেয়ে গিয়েছে। তারপরেই আচমকা কোনো কারণ ছাড়াই শুরু হয়েছে তোলপাড় ও লণ্ডভণ্ড ঘটার একটা ব্যাপার। তৈরি হয়েছে চাঁদের উপরিতলে খাদ ও গহ্বর। অতএব আদি পাথরের নমুনা বিজ্ঞানীদের চাই-ই চাই। কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? পরবর্তী অভিযানগুলোতে যেসব অবতরণ-স্থল নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র হ্যাডলে রিল-ই একমাত্র সম্ভাব্য স্থান। অতএব যেখানে যাবার কথা ছিল একেবারে শেষতম অভিযানে, তাকেই অনেকখানি এগিয়ে আনা হল।

হ্যাডলে রিল থেকেও যদি আদি পাথরের সন্ধান না পাওয়া যায়? তাহলে অন্তত বর্তমান অ্যাপোলো পর্যায়ে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান নেই।

টেলিভিশনে চাঁদ থেকে আসার দৃশ্য

এবারের অ্যাপোলো অভিযানে একটি নতুন ব্যাপার ঘটেছে। চন্দ্রযানটি যখন চাঁদের মাটি ছেড়ে চাঁদের আকাশে উঠছিল তার পুরো দৃশ্যটি পৃথিবীর মানুষে টেলিভিশনে দেখেছে। নভশ্চররা যে গাড়িতে চেপে চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সামনের দিকে ছিল টেলিভিশন ক্যামেরা। গাড়িটি চাঁদের মাটিতেই রেখে আসা হয়েছে, সেই সঙ্গে ক্যামেরাটিও। এই ক্যামেরাতেই চন্দ্রযানের চাঁদের মাটি ছেড়ে আসার দৃশ্য ধরা পড়ে। শোনা যাচ্ছে এ-ঘটনার দিন তিনেক পরে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল তার দৃশ্যও এই টেলিভিশন ক্যামেরার মারফৎ দেখা গিয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে। খোদ চাঁদের মাটিতে চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য পৃথিবীতে বসে দেখা।

চাঁদের গাড়ি

মানুষ যেদিন প্রথম চাঁদের মাটিতে নেমেছিল সেদিন চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াবার জন্যে ও যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল নিজের পায়ের ওপরে। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে ছোট একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু ঘুরে বেড়ানো সেই পায়ে হেঁটেই। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে মানুষ চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে মোটরগাড়িতে, নাম 'লুনার রোভার ভেহিক্‌ল' (এল আর ভি) বা চাঁদে ঘুরে বেড়াবার যান।

এই যানটি লম্বায় সাড়ে তিন মিটারের সামান্য বেশি, চওড়ায় দুই মিটারের সামান্য কম, চাকা থেকে চাকার দূরত্ব (একই সারির) সোয়া দুই মিটারের সামান্য বেশি। এই যানে ওজন বহন করা যেতে পারে ৪৫৪ কিলোগ্রাম, যানের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ। সাজসরঞ্জাম সমেত এক-একজন নভশ্চরের ওজন প্রায় ১৮২ কেজি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজনের ওজন ৫৯ কেজি। বাকি থাকে প্রায় ৩১ কেজি। গাড়িতে এই ওজনের পাথর বয়ে আনা যেতে পারে। যানটি চালিত হয় প্রত্যেকটি চাকার সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে। সিকি অশ্বশক্তির মোটরগুলির শক্তি সরবরাহ হয় দুটি ৩৬ ভোল্টের ব্যাটারি থেকে। প্রত্যেকটি ব্যাটারি ১২১ অ্যাম্পিয়ার ঘণ্টার ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট। ব্যাটারি থেকে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে তা জানবার একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

এই দুটি ব্যাটারির সাহায্যে যানটি মোট ৯১ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে।

যানটিকে চন্দ্রযানের মাল মজুদ করার জায়গায় ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল। যানটি মাঝ-বরাবর ভাঁজ হয়ে যায় আর চারটি চাকাও ভাঁজ হয়ে পড়ে। স্প্রিং-এর সাহায্যে যানটির ভাঁজ খোলা হয়।

যানটিকে স্টীয়ার করা হয় সামনের ও পিছনের উভয় সারির চাকা দিয়েই। মোটর-গাড়ির মতো স্টীয়ারিং হুইল এই যানে নেই, আছে এরোপ্লেনের মতো একটি দণ্ড। যদি কোনো এক সারির স্টীয়ারিং ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে অকেজো ব্যবস্থাটিকে বিচ্ছিন্ন করা চলে এবং বাকি অন্য সারির স্টীয়ারিং ব্যবস্থা দিয়েই কাজ হতে পারে।

যানের চাকাগুলো তারের জাল দিয়ে তৈরী। প্রত্যেকটি চাকা ওডোমিটারের সঙ্গে যুক্ত। এ থেকে প্রত্যেকটি চাকার বেগ এবং প্রত্যেকটি চাকার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্বের মাপ পাওয়া যায়।

এ-ধরনের তিনটি যান তৈরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার বা ৩০ কোটি টাকা। একটি যান চাঁদের মাটিতেই রেখে আসা হয়েছে। বাকি দুটি যান পরবর্তী দুটি অ্যাপোলো অভিযানের জন্যে।

মহাকাশ-অভিযান ও ভরহীনতার সমস্যা

ভোস্তোক-১ ব্যোমযানে গাগারিন আকাশে উঠেছিলেন ও কক্ষপথে পৃথিবীকে একটি পাক দিয়েছিলেন মাত্র দশ বছর আগে। এই দশ বছরে স-মনুষ্য মহাকাশ-অভিযান বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। তবে মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থার সঙ্গে মানুষের কতখানি খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আছে সেটাই এখনো প্রধান গবেষণার বিষয়। বিশেষ করে সয়ুজ ব্যোমযানের তিন-জন সোভিয়েত নভশ্চর মারা যাবার পরে এই বিষয়টিই মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে। অ্যাপোলো-১৫ অভিযান শুরু হবার ঠিক আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত অ্যাপোলো-১৫ অভিযান স্থগিত রাখার কথাও উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যখন মত প্রকাশ করেন যে, অ্যাপোলো-১৫ অভিযান স্থগিত রাখার কোনো কারণ ঘটেনি তখন অভিযানের সময়-তালিকা ঠিক ঠিক মেনে চলা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাইরের বিশ্বকে পুরোপুরি জানানো হয়নি এই দুর্ঘটনার মূলে কারণগুলো কী? বলা হয়েছে ছিদ্র-পথে কক্ষের অক্সিজেন বেরিয়ে যাবার ফলে কক্ষের চাপ কমে গিয়েছিল আর তারই ফলে এই মৃত্যু। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, ছিদ্র-পথ হল কী করে? এটা কি কোনো টেক্‌নিক্যাল ত্রুটি? জবাব যদি হয়, হ্যাঁ—তাহলে অবশ্য মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন। কেননা টেকনিক্যাল ত্রুটি সারিয়ে নেওয়া মানুষের সাধ্যের মধ্যে। আর যদি বলা হয় যে নভশ্চরদের অসতর্কতা বা শৈথিল্যের জন্যেই কক্ষের অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে পেরেছিল তাহলে গুরুত্বের প্রশ্ন ওঠে। যে নভশ্চররা মহাশূন্যের স্পেস-স্টেশন স্যালিয়ুতে প্রায় চব্বিশটি দিন ভরশূন্য অবস্থায় এমন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে এলেন এবং এতসব কাণ্ড-কারখানা করলেন তাঁদের এমন অসতর্কতা বা শৈথিল্য কেন হবে? দীর্ঘকাল ভরশূন্য অবস্থায় থাকার জন্যেই কি? তাই যদি হয় তাহলে বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে।

তাছাড়াও কথা আছে। মহাশূন্যের মানুষকে কখনো কখনো আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। যেমন বেরিয়ে আসতে হয়েছে অ্যাপোলো-অভিযানের দুজন নভশ্চরকে। তবে এক্ষেত্রে অবস্থাটা কিন্তু পুরোপুরি ভরহীনতার নয়, অনেক কম মাত্রার ভরের। আবার পৃথিবীর কক্ষপথে থাকার সময়েও নভশ্চর অনেক সময়ে ব্যোমযানের আশ্রয় থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, যদিও এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যোমযান থেকে বাইরে কাটানোর মোট সময় চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযানের কক্ষ থেকে বাইরে কাটানোর মোট সময়ের চেয়ে কম। অর্থাৎ, মহাশূন্যে মানুষের একক অবস্থান (পুরোপুরি বা আংশিক ভরশূন্য অবস্থায়) নিয়েও অনেক কিছু গবেষণা করার আছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহুদূর আভাস পাওয়া যাচ্ছে. সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন তৈরি করার দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের স্যালিয়ুৎ আগেই আকাশে উঠেছে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের স্কাইল্যাব শীঘ্রই (১৯৭২ সালে) উঠছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, এই দুটি দেশের মহাকাশ-গবেষণা পরস্পরের পরিপূরক হতে চলেছে। দুই দেশ দুই দিকে—অ্যাপোলো অভিযান চলা পর্যন্ত তা বলা গেলেও—আর দুটি অভিযানের পরে অ্যাপোলো পর্ব শেষ হলে একথা বলা চলবে না।

গোটা ষাটের দশক ধরে আমেরিকার মহাকাশ-অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল চাঁদে মানুষ নামানো। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই জেমিনি পর্ব শুরু। জেমিনি-৪, জেমিনি-৫ ও জেমিনি-৭ আকাশে থেকেছিল যথাক্রমে চার, আট ও চোদ্দ দিন। ভরশূন্য অবস্থার সঙ্গে মানুষ কতখানি মানিয়ে চলতে পারবে তাই নিয়ে গবেষণা এই চারটি পরিক্রমায় অনেকখানি এগিয়েছিল। জেমিনি-৮ অভিযানে সাফল্যের সঙ্গে জোড়-বাঁধা ও মিলন ঘটানোর পর্বটি সমাধা হয়। জেমিনি-৯, জেমিনি-১০, জেমিনি-১১ ও জেমিনি-১২ অভিযানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ব্যোমযানের বাইরে এসেও নানা ধরনের কর্মতৎপরতার সামর্থ্য মানুষের আছে।

জেমিনী-৭ অভিযানের স্থায়িত্ব ছিল চোদ্দ দিন। এই অভিযান থেকেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল মানুষের পক্ষে চাঁদে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে যতোদিন সময় লাগার কথা ততোদিন মহাশূন্যে কাটানো মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে তারপরে আর অগ্রসর হন নি। তারপরে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন জোড়-বাঁধা ও ব্যোমযানের বাইরে এসে মহাশূন্যের অবাধ পরিবেশে একক নিরবলম্বতার মধ্যে বস্তুর কার্যকলাপের ওপরে।

রুশ বিজ্ঞানীরা কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথে স-মনুষ্য মহাকাশ অবস্থানের দিকেই সবিশেষ মনোযোগ দিলেন। সয়ুজ-৪ ও সয়ুজ-৫ অভিযানে পরখ করা হল মহাশূন্যে মানুষ কতখানি কী করতে পারে। সয়ুজ-৬, সয়ুজ-৭ ও সয়ুজ-৮ সেই একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে, অক্টোবর মাসে একসঙ্গে পাঁচদিন ধরে পৃথিবীকে চক্কর দিয়েছিল। এই অভিযানগুলোর পরেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় মানুষের থাকার সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছিলেন। সয়ুজ-৯ আকাশে উঠেছিল ১৯৭০ সালের জুন মাসে এবং আঠারো দিন স্থায়ী ছিল। জেমিনি-৭ অভিযানের চেয়ে চারদিন বেশি স্থায়ী এই অভিযানের পরে দেখা গেল ফিরে আসা নভশ্চররা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, মারাত্মক ধরনের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন-এ ভুগছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন অভিযান চলাকালে নভশ্চরদের যথোচিত ব্যায়াম করাতে পারলে হয়তো অন্যরকম ফল পাওয়া যেত। তারপরে স্বল্পস্থায়ী সয়ুজ-১০, অবশেষে সয়ুজ-১১। শেষের অভিযানে এই বিশেষ গবেষণার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বগুলো যেমনটি ভাবা হয়েছিল তেমনিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। নভশ্চররা নিয়মিত ব্যায়ামও করেছিলেন। তবে সম্ভবত নভশ্চরদের মৃত্যুর ফলে পুরো অভিযানটি থেকে যতোখানি ফললাভের আশা করা গিয়েছিল তা অপূর্ণ থেকে গেল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরবর্তী তৎপরতা অবশ্যই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করবার বিষয়।

পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস-স্টেশন স্থাপন করা ছাড়াও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই চাঁদের দেশে একাধিক মনুষ্যহীন অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, চাঁদের মাটিতে তাঁরাও লুনোখোদ নামে একটি স্বয়ংচালিত যান নামিয়েছেন, শুক্রগ্রহে ব্যোমযান নামিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে ব্যোমযান (মার্স-২ ও মার্স-৩) পাঠিয়েছেন। তবে সম্ভবত মহাশূন্যের ভারহীনতার অবস্থা মানুষের পক্ষে কতখানি সহনীয় সে-সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য না জানা পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীর আকাশের বাইরে নভশ্চর পাঠাতে যাবেন না। আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও অ্যাপোলো পর্ব শেষ হবার পরে সেই একই দিকে যাচ্ছেন। সম্ভবত সত্তরের দশকটি মহাশূন্যের ভারহীনতার অবস্থা সম্পর্কে জানাতেই কাটবে। মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে

এখন এইটিই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্পর্কে পুরোপুরি জানা হলে এবং এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলোর পুরোপুরি সমাধান হলে তবে সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহের দিকে সমন্বয় অভিযানের কথা ভাবা হবে।

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের পরে আরো একটি কথা উঠছে। তা হচ্ছে সমন্বয় অভিযানের সার্থকতা। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে নভশ্চররা চাঁদের যে স্থানটিতে নেমেছেন তার চারদিকের কয়েক বর্গমাইল এলাকার চক্কর দিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। একটি রোবটের সাহায্যে এত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যেত কিনা সন্দেহ. একটি অভিযানে তো নয়-ই। লন্ডনের টাইম পত্রিকাও মন্তব্য করেছেন (৫ই আগস্ট তারিখে) অ্যাপোলো-১৫ অভিযান সমন্বয় অভিযানের সার্থকতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে।

তবে কেউ যদি ভাবেন যে অ্যাপোলো পর্বে যে-ধরনের অভিযান চলছে তার সাহায্যে আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল দূরের একমাত্র উপগ্রহটি জেনে নিতে পারা যাবে তাহলে বড়ো বেশি ভাবা হয়ে যাবে। অ্যাপোলো ধরনের ব্যোমযানের সাহায্যে চাঁদের বহু এলাকাতেই অবতরণ অসম্ভব। সম্ভাব্য অবতরণের এলাকাগুলোই অ্যাপোলো অভিযানের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের আগে আরো তিনবার চাঁদে অবতরণ করা হয়েছিল—তিনটি পৃথক এলাকায়। প্রচুর তথ্যও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে চাঁদ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি? লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, তিন-তিনটি সফল অ্যাপোলো অভিযানের পরেও চাঁদ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে, যা ছিল তাই রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, চাঁদের তিন-তিনটি পৃথক এলাকার মাটি-পাথর হাতে পেয়েও (অ্যাপোলো-১৪ অভিযান থেকে যে পরিমাণ মাটি পাথর পাওয়ার কথা ছিল, পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। একটি থলে নাকি বোঝাই হবার আগেই ভুলে বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল।) আমরা চাঁদের জন্মরহস্য সম্পর্কে যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকুই জানা গিয়েছে যে পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম একই সময়ে—আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। এমনকি সর্বশেষ মরোর মাটি-পাথরও নতুন আলোকপাত করে নি।

—অমলকান্ত

অঙ্গনা

চেক নারী সমাজ

বিরাট উপ-মহাদেশ ভারতের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক তুলনা করা চলে না কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক অভিজ্ঞানের সময় ভারত এদের দিকে চেয়ে দেখলে আনন্দ পাবে বলেই বিশ্বাস। কারণ এইসব রাষ্ট্রগুলির অনেকেই ভারতেরই মত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ মায়েদের মেয়েদের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন, সম্মান রাখতে তৎপর। চেকোস্লোভাকিয়ার কুড়ি বছরের সমাজতান্ত্রিক জীবন যেন্না জাতীয় জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে মেয়েদের অনুপ্রবেশের ইতিহাস। মেয়েরা সহায় হয়েছেন চেক গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনে, মায়ের ভূমিকায় আগামী দিনের নাগরিকদের প্রতিপালনে।

পূর্ণ আইন ব্যবস্থা আছে গর্ভবতী বা শিশু পালনে রত কর্মী মায়েদের রক্ষা করার জন্য। মেয়েদের কতখানি মূল্য আছে আইনের চোখে বোঝা যায় এ থেকেই যে গর্ভাবস্থায় মায়েদের অপেক্ষাকৃত হাল্কা কাজ করতে দেওয়া হয় কিন্তু বেতন দেওয়া হয় পুরো। ছুটির পরে পূর্ণ সুযোগ সুবিধা নিয়ে মায়েরা বার বার কাজে ফিরে আসেন। মায়েদের এবং শিশুদের যত্ন নেবার জন্য উত্তরোত্তর উন্নততর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উৎপাদক এবং অনুৎপাদক কর্মক্ষেত্রে চেক মহিলাদের অবদান আজ শুধু অনস্বীকার্য নয়, অপরিহার্য। সেখানের কোনো সাংগঠনিক প্রচেষ্টাই কি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কি সমাজকল্যাণ বা সংস্কৃতি, কি ক্রয়বিক্রয় বা পরিবহনে কি চাকরীর ক্ষেত্রে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে, মেয়েদের ছাড়া চলার কথা ভাবাই যায় না।

মেয়েরা বাইরের কাজে নামবেন কি নামবেন না সেটা আর আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়ার কোনো প্রশ্ন নয়। সমাজতন্ত্রের এটা মৌলিক অধিকার এবং সমস্ত সমাজই এ থেকে উপকৃত। এখনকার চিন্তনীয় বিষয় হোলো কর্মী মায়েরা তাদের পরিবার এবং ছেলেমেয়েদের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন কি না সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য, আমোদ প্রমোদ এবং বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় পেতে পারেন কি না।

মেয়েরা প্রচুর সংখ্যায় কাজে নামতে আরম্ভ করায় কতগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান যথাকালে করার জন্য চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে অন্যতম হোলো মেয়েদের শিক্ষার মান বাড়ানো। বছর পাঁচেক আগের হিসাবেই পাওয়া যায়, চেকোস্লোভাকিয়ার মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৬৪·৫ কারিগরী স্কুলগুলিতে ৫৮·৭ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭। গড় হিসাবে অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষার পরিমাণ ছেলেদের চেয়ে বেশী। বিগত ক' বছরে মেয়েরা সব রকম শিক্ষা ক্ষেত্রেই আরও এগিয়ে গেছে এ কথা মেনে নিতে বাধা নেই। এসঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য রাখা হয় যে, স্কুলের পড়া শেষ করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যেন কোনো না কোনো রকম কাজের সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৫৫-তে প্রতি তিনটিতে একটি মেয়ে কোনো রকম কারিগরী প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্কুল থেকে বেরিয়ে কাজে ঢুকত। ১৯৬৬-তে এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি দশজনে একজন।

কৃষিবিষয়ে নানা রকম যান্ত্রিক প্রয়োগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ এসে উপস্থিত হচ্ছে সেদেশের মেয়েপুরুষদের সামনে। সে জন্যই চিন্তা করা হচ্ছে কৃষি শিক্ষার সঙ্গেই বিভিন্নধরনের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের আয়োজন চলবে কি না যাতে বিভিন্ন ধরনের কৃষি কার্যে একই সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে শিক্ষিত কৃষিজীবিরা।

শিশু এবং তরুণ সমাজের সর্বাঙ্গক শিক্ষা লাভের, নৈতিক রাজনৈতিক এবং আদর্শগত জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে উন্নতির প্রথম সোপান বলে গণ্য হয়। চেক জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের এই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানেন শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তরুণ সমাজতান্ত্রিক নাগরিকের জীবন প্রস্তুতির রসদ যোগাতে পারে না। প্রথম যে পরিবেশে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে ওঠে তা হোলো তার পরিবার।

আধুনিক মনঃসমীক্ষা, প্রজননতত্ত্ব এমন কি চিকিৎসা শাস্ত্রও জোরের সঙ্গে বলে থাকে যে, শিশুর জীবনের প্রথম কটি বছরেই তার ভবিষ্যত চরিত্র, চিন্তাধারা ও মানসিক গঠনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তরুণ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে সুসংহত করার জন্য, জনজীবনের শিক্ষারতনের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের এবং যুব সংস্থার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে পারিবারিক পরিবেশের কতখানি মূল্য রয়েছে বিজ্ঞান সে কথা জানাতে সোচ্চার।

মাতা এবং পিতাই আধুনিক পরিবারের কেন্দ্রস্থল। শিশুসন্তানের পারিবারিক শিক্ষা কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে তা মুখ্যতঃ নির্ভর করে পিতামাতার ঐহিক সামর্থ্য এবং ব্যক্তিত্বের উপর। তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনীতিক মান, তাঁদের বিশ্বগত দৃষ্টিভঙ্গীই স্থিরীকৃত করে তরুণ প্রাণকটি কিভাবে পরিবারে সমাদৃত হবে কি মনোভাব নিয়ে তারা জীবনে প্রবেশ করবে, মূল্যবোধ কিভাবে তাদের অন্তরে জাগ্রত হবে, আগামী দিনের কি ছবি তাদের সামনে ফুটে উঠবে, সমাজের বুকে নিজেদের জন্য কি আসন তারা লাভ করতে চাইবে।

কুয়াবতন বলে চেকোস্লোভাকিয়ার অগ্রগতির প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র নয়। আবার, হয়তো জনসংখ্যা কম বলে সেখানে অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়েছে। তবু এ আশা কি করা যায় না যে, সমাজতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র, তা সে যত ছোটই হোক যেখানে নিজের রাষ্ট্রীয় জীবনের বাঁধন দৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর এবং সে কাজে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে সেখানে ভারতের মত অতি-বৃহৎ রাষ্ট্রের উন্নতির পথে সকল বাধা অপসারণ করা অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে?

অজিত বসু

CENTRAL LIBRARY

প্রেক্ষাগৃহ

শাশ্বতী কান্ত বসু খী / লীনা

ঝড় উঠেছে

'অতঃপর ভারতে আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না' ১৪ জুলাই ভারত সরকারের বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী এল এন মিশ্রের এই ঘোষণা তুমুল ঝড় তুলেছে। মার্কিনী ছবি প্রদর্শনীর সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেই সিনেমাটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটির সভাপতি ডবল্যু টি উইলসন সমেত ঐ সংস্থার সদস্যবৃন্দ থেকে শুরু ক'রে পরোক্ষ ভাবে এর দ্বারা আর্থিক এবং অন্যান্যভাবে উপকৃতদের কথা ছেড়েই দিলুম, এমন কি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কোনো কোনো চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জনমত সংগ্রহ করে তাও ফলাও ক'রে ছাপিয়েছেন। আবার অপরদিকে ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ বেশ কিছু চলচ্চিত্র রসিক ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন।

আমরা ইতিমধ্যেই অমৃত-এর ১২ ও ১৩ সংখ্যায় (২৩ ও ৩০ জুলাই) আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করেছি এবং অকুণ্ঠচিত্তে মন্তব্য করেছি, 'অগণিত ভারতীয় চিত্রামোদীর মনোভাবরূপে বলতে পারি, কোনো দেশেরই ভারতে ছবি দেখানোর একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে, তা' দেখার সুযোগ প্রতিটি ভারতীয় চিত্রদর্শকেরই থাকা উচিত। এবং এরই ওপর যেমন নির্ভর করবে ছবির আলোচনা সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ, তেমনই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজনাক্ষেত্রে মানোন্নয়নে এই ব্যবস্থা হবে রীতিমত সহায়ক।'

আমরা মনে করি না, আমাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে কারুর দ্বিমত থাকতে পারে বা থাকা উচিত। তবুও যে আবার কলম ধরতে হ'ল, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের যে-চুক্তিটির মেয়াদ গেল ৩০শে জুন তারিখে শেষ হয়ে গেছে, তার অন্যতম শর্ত ছিল :

'(আমেরিকাতে) ভারতীয় ছবির ক্রয় এবং বা ভাড়াকে ক্রমবর্ধমান হারে প্রণোদিত করবার জন্যে এম-পি-ই-এ-এ (মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যান্ড প্রোডিউসার্স'কে যথাসম্ভব সাহায্য করে যাবে, যাতে এই সংস্থার (এম-পি-ই-এ-এর) সভ্য কোম্পানীগুলির সঙ্গে তাঁরা সরাসরি আলোচনা ক'রে (বিক্রী বা ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে) দরদস্তুর ঠিক করতে পারেন।'

ভারত সরকারের অভিযোগ এই শর্ত পালন করবার জন্যে এম-পি-ই-এ-এ কিছুই করেননি। এই অভিযোগ কি মিথ্যা? কারণ সিনেমাটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটির সভাপতি মিঃ উইলসন সাফাই গাইছেন, যে-হেতু এমন কোনো আইনসঙ্গত উপায় নেই, যার বলে মার্কিন সরকার বা মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা কিংবা অপর কেউ ইউ-এস-এর কোনো চিত্রগৃহের মালিককে কোনো ছবি ভাড়া নেবার বা দেখাবার জন্যে জোর করতে অর্থাৎ বাধ্য করতে পারেন, সেই কারণে স্বভাবতই মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বিদেশী ছবির প্রদর্শনী বা মুক্তি সম্বন্ধে জামিন (গ্যারাণ্টি) দিতে পারেন না।—আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করবার সময়ে উপরোক্ত যে-শর্ত করা হয়েছিল, সেটি কি একেবারেই অর্থহীন? এম-পি-ই-এ-এ তার বিভিন্ন সভ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশক ও প্রযোজক সংস্থাগুলি যাতে সরাসরি আলোচনা চালাতে পারে, তার জন্যে কুটোটিও নেড়েছিলেন কি?

মিঃ উইলসন জানাচ্ছেন যে, এম-পি-এ-এর বৈদেশিক চলচ্চিত্র পরামর্শ কর্মসূচী অনুসারে আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বৈদেশিক চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকদের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ও কাজ। এম-পি-এ-এর এই বিশেষ বিভাগের সহায়তা অন্যান্য বিদেশী সংস্থাগুলির মতো ভারতীয় প্রযোজকেরা এবং আই-এম-পি-ই-সি (ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন)ও নিতে পারেন তাঁদের ছবিকে আমেরিকার বাজারে চালু করবার জন্য।

এর পরে মিঃ উইলসন বলেছেন, এম-পি-এ-একে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে খোঁজ নেওয়া উচিত, কোনো ভারতীয় প্রযোজক, পরিবেশক বা আই-এম-পি-ই-সি এম-পি-এ-এর এই সহায়তা নেবার কোনো চেষ্টা করেছেন কিনা। তাঁর প্রশ্ন, ভারতীয় সংস্থাগুলিই যখন উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেনি, তখন এম-পি-এ-এ অভিযুক্ত হবে কেন?

কিন্তু এম-পি-এ-এ যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিল, তখন ঐ বিশেষ শর্তটি

পালন করা বিষয়ে ভারতীয় প্রযোজক, পরিবেশক কিংবা ইম্পক (আই-এম-পি-ই-এস)-এর করণীয় কিছু আছে যা তারা নিজের থেকে অগ্রণী হয়ে না এলে এই শর্ত পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, এমন কথা জানিয়েছিল কি? এবং যখন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় হয় অর্থাৎ ৩০ জুন নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল, তখনও ভারত সরকারকে জানানো হয়েছিল কি, ঐ বিশেষ শর্তটি পালন করা সম্ভব হচ্ছে না ভারতীয় প্রযোজক প্রভৃতির গাফিলতির জন্যে? কিংবা এম-পি-এ-এ ভেবে নিয়েছিল, শর্ত তো কতই লেখা থাকে, তার সবই যে মানতে হবে এমন কি কথা আছে? শর্ত পালন নিয়ে ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর যে অমন কঠিন হয়ে উঠবে, এইটিই তাদের মনে হয়নি—এই কথাটিই হচ্ছে আসল কথা। এখন যা কিছু লেখা বা বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে ধরবার চেষ্টারই সামিল।

কিন্তু আমাদের মাথা ব্যথা অন্যত্র। আমেরিকান ছবি আর দেখতে পাওয়া যাবে না, এই দুঃখে নাকি আমাদের দর্শকসমাজের বেশকিছুটা অংশ কেঁদে সারা হচ্ছেন। বোম্বের একজন উৎসাহী চলচ্চিত্র দর্শক নাকি বলেছেন, হলিউডের ছবি দেখতে না পেলে তিনি শেষ পর্যন্ত মারা পড়বেন। [illegible] তরুণ বলেছেন, অন্যান্য দেশের বাজে ছবি দেখার থেকে আমেরিকার ছবি দেখা ঢের ভালো। এঁরা কোন্ কোন্ দেশের বাজে ছবি দেখেছেন, তা বোধ করি, জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কোনো নামকরা চলচ্চিত্র সাংবাদিক লিখেছেন, পঞ্চাশ বছর ধরে একটানা প্রদর্শিত হবার পরে এদেশে আমেরিকান ছবির আমদানী যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, যা হল তা ব্যবসায়িক এবং আর্থিক—উভয় দিক থেকেই সাংঘাতিক ও দুঃখজনক। কিন্তু আমেরিকান ছবির আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ-কথা এখনই ভাবি কেন? ভারত সরকার বিদেশ থেকে ছবি আমদানী করা বিষয়ে একটি নীতি গ্রহণ করতে উদ্যত। সর্বোচ্চ যতগুলি বিদেশী ছবি প্রতি বছর এদেশে আমদানী করা হবে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, জার্মান, সুইডিস, রাশিয়ান, জাপানী প্রভৃতি সব রকম ছবিরই আসবার ব্যবস্থা থাকবে। এ-কথা তো সত্য যে, এতদিন অবাধ ভাবে আমেরিকান ছবির আমদানী হওয়ার ফলে অপরাপর দেশ থেকে খুব বেশী সংখ্যায় ছবি আমদানী করা সম্ভব হয়নি এবং এ-ও সত্য যে, আমেরিকার মতো অন্যান্য বহু দেশেই বহু দর্শনযোগ্য ছবি তৈরী হয়ে থাকে। কাজেই সব দেশ থেকেই যাতে উপভোগ্য ও দর্শনীয় ছবি আমাদের দেশে এসে পৌঁছোতে পারে, তারই রাস্তা প্রশস্ত করা উচিত। অবশ্য প্রতিটি বিদেশী ছবিই যাতে নিখুঁতভাবে ইংরেজী ভাষায় ডাব্‌ড্ (মূল ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে ইংরেজী সংলাপ বসানো) হয়ে আসে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তা না হয়ে ইংরাজী সাব-টাইটেল সংবলিত হয়ে এলে ছবি দেখবার অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।

অপর্ণা / তনুজা এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : সলিল সেন। ফটো : অমৃত

স্টার থিয়েটার

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯

— নতুন নাটক

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, রেণুকা দাস, কুমারী মিঠু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

চিত্র-সমালোচনা

শাশুড়ী এবং বৌ

কোনো সময়ে শাশুড়ী হয় বৌ-কাঁটকী, আবার কখনও বা সে হয় বৌয়ের চক্ষুশূল—এ ঘটনা সংসারে প্রায়ই দেখা যায়। অথচ শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক চলতে থাকলে সংসার সুখের হয় না। এই কথাই বলতে চেয়েছে মাদ্রাজের বাসু ফিল্মস্ নিবেদিত, বাসু মেনন প্রযোজিত এবং মধুসূদন রাও পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা হিন্দী ছবি 'শাশজী কভি বহু থী'।

মোতিলাল চৌধুরীর ছেলে দিলীপের সঙ্গে ধনী বিধবা ভাগমতীর মেয়ে সাধনার বিয়ে হতে সাধনা দিলীপ দুজনেই খুশীতে উপচে পড়ল; কারণ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসত। কিন্তু সাধনা যেদিন আবিষ্কার করল তার শ্বশুর তাঁর স্ত্রীর (অর্থাৎ সাধনার শাশুড়ীর) সঙ্গে কেন ভালোভাবে কথাবার্তা বলেন না, সেদিন থেকে সে ধীরে ধীরে নিজের শাশুড়ীর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়তে লাগল; এমন হল, শাশুড়ী তার ভালোর জন্যেই কোনো কিছু করলে সে তার মধ্যেও মন্দ অভিপ্রায় দেখতে পেত। তাই সে সন্তানসম্ভবা হতে ওরই নিরাপত্তার জন্যে ওর শাশুড়ী যখন বাড়ীর নীচের তলার একটি ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত করল, তখন সাধনা এই ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। কিন্তু প্রতিফল পেল সে হাতে হাতে। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে সে পড়ে যাওয়ায় তার পেটের সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। মা ও স্ত্রীর মধ্যে এই রকম বিরূপতায় দিলীপ প্রচুর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল অন্য শহর অভিমুখে।

মোতিলালের বৈবাহিকা ভাগমতীর বাড়ীতেও দারুণ অশান্তি। এবং এই অশান্তির কারণ তিনি নিজেই: তাঁর একমাত্র ছেলে কানহাইয়ার তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন চমনলালের মেয়ে লাজবন্তীর সঙ্গে। কিন্তু চমনলাল প্রতিশ্রুত পণ দিতে পারেননি বলে তিনি পুত্রবধূকে গৃহে ঠাঁই না দিয়ে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। পরে যখন তিনি কন্যার বিবাহ দেন, তখনও তিনি পুত্রবধূকে ঐ বিবাহোৎসবে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত করেন না। কিন্তু মোতিলাল কৌশলে পিতা-পুত্রীকে শুধু বৈবাহিকার বাড়ীতে আনেনই না, ভাগমতীকে বাধ্য করেন পুত্রবধূকে গৃহে স্থান দিতে। স্থান দিলেন বটে, কিন্তু লাজবন্তীর সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলেন গৃহ-পরিচারিকার মতো, শুধু নয়, তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে লাগলেন, যাতে সে কোনো সুযোগ না পায়

স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। অশিক্ষিত কানহাইয়া ছিল মায়ের ওপর একান্ত নির্ভরশীল; তাই সে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করলেও মায়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে পারত না। কিন্তু ভাগমতীর অনুপস্থিতির সুযোগে কানহাইয়া ও লাজবন্তী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং ওদের লাজবন্তীর কোলে এসেছিল শিশু। এই সময়ে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করে সাধনা এসেছিল মায়ের কাছে; কিন্তু বধূর প্রতি মায়ের অন্যায় আচরণ দেখে সে তাঁর প্রতিবাদ করে মাতৃগৃহ ত্যাগ করে ও বিদেশে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে স্ত্রীর প্রতি আপন কর্তব্য পালনে অসমর্থ হওয়ার লজ্জায় কানহাইয়াও যে কোনো উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের আশায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং মাল বওয়ার কাজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে ভগিনীপতি দিলীপের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপরে কি অধ্যবসায় ও কি কৌশলে মোতিলাল দিলীপ ও কানহাইয়ার সহায়তায় মায়া দেবী (দিলীপের মা) ও ভাগমতীর সঙ্গে ওদের পুত্রবধূর মানসিক মিলন সম্ভব করে এবং নিজের মাকেও বহুদিনের পরে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত করে উভয় সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনে, তারই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী দ্বারা ছবির শেষাংশ রচিত।

—এই কাহিনীটিকে বিস্তারিতভাবে চিত্রূপ দিতে গিয়ে বহু সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে। ফলে একদিকে মোতিলালের মানসিকতার মধ্যে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই অপরদিকে অস্বাভাবিকভাবে রূঢ় ও রুক্ষ চরিত্রের ভাগমতীকেও দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তব এবং অবাস্তবের এমন উদ্ভট সহাবস্থান যে কি করে সম্ভব হয়, তা আমরা ভেবেই পাই না।

চরিত্রচিত্রণে উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন মোতিলাল বেশে ওমপ্রকাশ। তিনি আজকে দক্ষতার এমন একটি স্তরে পৌঁছেছেন যে, অতি অনায়াসে তিনি যে কোনও রসকে প্রকাশিত করতে সমর্থ। কানহাইয়ার ভূমিকায় জগদীপও অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন প্রশংসনীয়ভাবে। ললিতাকে যেমন আজকাল আর রূঢ় ভূমিকায় দেখতে মন চায় না, তেমনই অবিশ্বাস্য রকম নির্দয়তার প্রতিমূর্তি রূপে ললিতা পাওয়ারও কেমন কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছেন। তিনি চেষ্টা করলে ঐ একই ভূমিকাকে বিশ্বাস্য রূপ দিতে পারতেন। নায়ক দিলীপ বেশে সঞ্জয় মোটামুটিভাবে সার্থক। নবাগতা অনুপমা চিত্রিত লাজবন্তী সংযত অথচ সুন্দর। নায়িকা সাধনা বেশে লীনা চন্দ্রভারকর উপভোগ্যতার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুন্দর (গোবিন্দ), প্রতিমা দেবী (মোতিলালের মা), মনোমোহন কৃষ্ণ (চমনলাল) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির সাতখানি গানে সুরের কোনো নূতনত্ব প্রত্যক্ষ করা না গেলেও গানগুলি উপভোগ্য। বিশেষ করে 'খোলকে আঁখে চলো সেঠজী' গানটিকে কিশোরকুমার যে-ভাবে গলায় গেয়েছেন, তা গানটিকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করবে।

বাসু ফিল্মস নিবেদিত 'লালচী কভি বহু-ধী' গৃহধর্ম সম্পর্কিত উপদেশাত্মক ছবি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ্যও হয়ে উঠেছে।

স্টুডিও থেকে

দৈনন্দিন

ফিল্ম আর্ট-এর প্রযোজনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দৈনন্দিন' ছবির চিত্রগ্রহণ কাজ নির্মল মিত্রের পরিচালনাধীনে শীঘ্রই শুরু হবে। প্রখ্যাত পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে আছেন যথাক্রমে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। মানুষের সুখ দুঃখে ভরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে অম্লমধুর, কৌতুক ও কষাঘাতের কাহিনী 'এই দৈনন্দিন'।

সংসার মুক্তিপথে

নর্দা পিকচার্সের সলিল সেন পরিচালিত 'সংসার' সম্প্রতি ছাড়পত্র নিয়ে মুক্তির দিন গুণছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন স্বয়ং। সুর দিয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অরিজিত মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, নির্মল কুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন, মাঃ অরিন্দম, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও নন্দিনী মালিয়া। নর্দা চিত্র ছবিটির পরিবেশক।

সোনার খাঁচা-র সংগীতগ্রহণ

সরকার ফিল্মস নিবেদিত এবং অগ্রদূত পরিচালিত 'সোনার খাঁচা'-র সংগীতগ্রহণ হয়েছে বম্বেতে। কাহিনীকার ও সঙ্গীত পরিচালক বীরেশ্বর সরকারের তত্ত্বাবধানে নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন—লতা মঙ্গেশকর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে ছবিটির চিত্রগ্রহণ এক চতুর্থাংশ

আমরা সানন্দে এমন একটি চিত্রের উদ্বোধন-সন্দেশ ঘোষণা করছি যেটি বসন্তের বিচিত্র আবাহন গীতি, রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধভরা অনুপম জীবনলীলা আর নিজেকে হারিয়ে ফেলার আনন্দ-শিথিল স্পৃহায় থরকম্পিত !

শুক্রবার ২০শে আগষ্ট !

অপেরা : ম্যাজেষ্টিক : জেম : প্রভাত

গণেশ : লিবার্টি : খান্না : রূপালী

নবীনা : (উজ্জ্বলায় প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী)

বঙ্গবাসী - অশোক - পি-সম - মুক্তাঙ্গনী - সন্ধ্যা
অতীন (ব্যারাকপুরে) - রজনী - চলচ্ছায়া - অন্নপূর্ণা - গোহাটি (আসানসোল) - চিত্রালয় (দুর্গাপুরে) - সুসজ্জিত জি. টি. সিনেমা (জামসেদপুরে)

শেষ হয়ে গেছে—স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে এবং তৃতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হচ্ছে এ মাসের ২৪।২৫ তারিখ থেকে একটানা দশদিনের জন্য।

মিহির সেন চিত্রনাট্যায়িত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কণিকা মজুমদার, অপর্ণা দেবী, সুলতা চৌধুরী, রবীন মজুমদার প্রভৃতি।

ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

নিশিকন্যা

শতরূপা পিকচার্সের প্রথম ছবি অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণ কাহিনী অবলম্বনে 'নিশিকন্যা'র চিত্রগ্রহণ কাজ এই মাসের শেষেরদিকে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুরু হবে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সুর দেবেন—সুধীন দাশগুপ্ত। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রামানন্দ সেনগুপ্ত। শতরূপা ফিল্মস্ ছবিটির একমাত্র পরিবেশক।

ফেরার

সিনে ক্রাফটের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়াস 'ফেরার' এ ছবির মূল ইংস প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়া নূরজন কয়েদীর (একজন বাস্তহারা অপরজন পাঞ্জাবী) চোখে বর্তমান পশ্চিম বাংলার সামাজিক সমস্যার এক জটিল ঘটনা—এরই এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে—নব্য বাস্তবতার নিদর্শন স্বরূপ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১

অগ্নিস্নান

রচনা ও পরিচালনা—[illegible] ঘোষ

শ্রেঃ—শান্তিগোপাল ও বর্ণালী

২৪শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৬টা বিশ্বরূপা

হলে টিকিট ।। ৫৫-০২৬২ ।।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার

শনি ৬, রবি ২॥ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

২৬শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার ৬টায়

শের আফগান

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪শে আগষ্ট মঙ্গলবার সাড়ে ছ-টায়

এ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে

নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

! [illegible] টিকিট ১টা—৭টা !

বিজয় বসু পরিচালিত

ভাগিনার / পার্থ মুখার্জী

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ('কোন একদিন' এবং 'হারানো প্রেম খাত')। সঙ্গীত: সরোজ কুমারী। চিত্রগ্রাহক : বিজয় দে। ভূমিকায়—সম্পূর্ণ নবাগত শিল্পী অবশ্য পার্শ্ব চরিত্রে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। সম্প্রতি এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। অবশ্য স্টুডিওর বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শহরের আশে-পাশে এ ছবির কাজ চলবে (সিনেমা ভারতির) মতো। বিশ্ব পরিবেশনায়—৩৫ এম এম ডিস্ট্রিবিউসান।

আগামী ছবি 'শেষ কিনার' সমাপ্ত

কে বি ভি প্রোডাকসন্সের আগামী ছবি 'শেষ কিনার' সমাপ্ত হয়ে আসছে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। রাজকুমার মৈত্র লিখিত একটি মধুর আবেগপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে ছবিটিকে গড়ে তুলেছেন পরিচালক দেবকুমার বসু। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বিনয় রাও, নিপন গোস্বামী, আনন্দ কার্জি, চন্দ্রা, পার্থ এবং আরও অনেকে।

মঞ্চাভিনয়

মূকাভিনয়—গত ১৪ আগষ্ট ভারতে মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে পরিবেশন করেন। ঐদিনের অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত মূকাভিনয়ের জগতে আরও একটি নূতন ফীচার উপহার দেন। সম্ভবত এর আগে কোনও বিদেশী অভিনেতাও এই ধরণের কোনও মূকাভিনয় পরিবেশন করেন নি। কোনরূপ আঙ্গিকের কথা, আলো ইত্যাদি কোনও কিছুর সাহায্য না নিয়ে প্রাণবন্ত প্রথম যে ফীচারটি পরিবেশন করেন তার নাম ছিল একটি অধ্যায়। একটি খোঁড়া লোক ক্রাচ-এ ভর দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ভিক্ষা চায়। তারপর নিরাশ হয়ে এক জায়গায় বসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—স্বপ্নে দেখে তার বিগত জীবনকে—একদিন সে সাইকেল চালিয়ে কাগজ বিলি করে বেড়াত, তারপর সাইকেল চুরি যাওয়ার পর কাঁধে বাঁক নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী জল দিত, রাস্তার দোকানের ছাতুই ছিল তার একমাত্র খাদ্য, তবু কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না তার। হঠাৎ একদিন কোনও একটি গাড়ীর ধাক্কায় তার একটি পা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়, এর পরই তার ঘুম ভেঙে যায়, আবার সে ফিরে আসে তার বাস্তব জগতে যেখানে তার একমাত্র বন্ধু সেই ক্রাচটিকে নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষার চেষ্টায়। প্রতিটি অভিব্যক্তি দর্শকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত পরিবেশন করেন তার অন্যান্য ফীচার,—চন্দা, বাস ম্যানেজার, চোর, ফটোগ্রাফার, সোসাইটি লেডী এবং জন্ম থেকে মৃত্যু। প্রতিটি মূকাভিনয়ই দর্শকদের অভিভূত করে রাখে, দীর্ঘ দুঘণ্টা দর্শকরা তন্ময় হয়ে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। দেশী ও বিদেশী দর্শকে পরিপূর্ণ সেদিনকার রবীন্দ্র সদন দেখে মনে হল যে মূকাভিনয় আমাদের দেশে একটি পৃথক শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর জন্য শ্রীদত্তর এই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করেছে।

শ্রীদত্তর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন আবহ সঙ্গীতে শ্রীহিমাংশু বিশ্বাস, আলোকসম্পাতে শ্রীতাপস সেন এবং রূপসজ্জায় শ্রীঅনন্ত দাস। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন 'পদাবলী'।

"সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর "ফেরারী ফৌজ"

গেল ২১ জুলাই ১৯৭১ সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাঁদের একাদশতম বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে পরিচালক শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটক 'ফেরারী ফৌজ'এর সার্থক রূপায়ণ অপেশাদার নাট্যসংস্থার পক্ষে সত্যিই দুর্লভ। পুলিশ ইন্সপেক্টর হীরেন দাসগুপ্তের ভূমিকায় শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে। নীলমণির চরিত্রে অভিনয় করে চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অশোক, কুমুদ, জ্যোতির্ময়, বিপিন ও সিরাজুলের অনবদ্য অভিনয় করে দর্শকসমাজের মনে রেখাপাত করেছেন যথাক্রমে সুশান্ত সান্যাল, মৃণাল চৌধুরী, মনোরঞ্জন সিনহা, প্রণব মুখোপাধ্যায়, জয়দেব চক্রবর্তী ও দিলীপ। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখেন তাঁদের মধ্যে অসীম যোগেশ, প্রকাশ মুখার্জি, দাদার জ্ঞানাগান, ডাক্তার, মাতাল, হরিশ, রাজেন ও যুবকের ভূমিকায় যথাক্রমে দিবেন গাঙ্গুলী, অনন্ত

ভট্টাচার্য, বিরূপাক্ষ দত্ত, অজিত সরকার, সুনীল সরকার, গোপাল মন্ডল, জ্যোতি-গোপাল রায় ও অসীম বিশ্বাস।

শচীচরিত্রে বন্ধ্যার ভূমিকায় শ্রীমতী সৌরভিনী সান্যাল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রাধা, বঙ্গবাসী ও শচীর ভূমিকায় যথাক্রমে দীপিকা দাস, অজন্তা চৌধুরী ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

সঙ্গীত পরিচালনায় জয়ন্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় নাটকটির আবেদন মুহূর্ত সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেন।

।। তুঘলক ।।

'জন্মভূমি'র পর থিয়েটার ইউনিট সংস্থার নতুন নাটক 'তুঘলক'। রচনা গিরিশ কারনাড। মূল নাটক কান্নাড়াতে —বাংলা অনুবাদ করেছেন শেখর চট্টো-পাধ্যায়। ইতিহাসবিখ্যাত মহম্মদ বিন তুঘলকের জীবনী অবলম্বনে রচিত ঐ নাটক ইতিমধ্যেই সারা ভারতে সুপরিচিত। এ নাটকের ইংরাজি অভিনয় হয়েছে বোম্বাইতে। দিল্লীতে হিন্দী এবং উর্দু— কলকাতায় হচ্ছে বাংলায়। প্রসঙ্গত নাট্যকার গিরিশ কারনাড নাটক লেখার জন্য 'ভাবা ফেলোশিপ' পেয়েছেন। নাটক পরিচালনা ও নামভূমিকায় থাকছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। আলো এবং মঞ্চ পরিকল্পনার দায়িত্ব তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত নিয়েছেন। রবীন্দ্রসদনে তুঘলকের প্রথম অভিনয় ১০ই আগস্ট মঙ্গলবার: পরবর্তী অভিনয় ১৭ই আগস্ট।

অভিনয়ে থাকছেন থিয়েটার ইউনিটের বাটজন শিল্পী।

পথিকৃতের দুটি একাঙ্কিকা : দুটি বাস্তব জীবননিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক সম্প্রতি 'পথিকৃতে'র শিল্পীরা পরিবেশন করলেন মুক্ত অঙ্গনে। দুটি নাটকেরই পটভূমিকায় আছে একালের যন্ত্রণা ও একালের অনুভূতি। নাটক দুটি হোল সোমেন সেন-গুপ্তের তৌলিগ্রাম ও তপন মিত্রের বাঁচাও সন্ধ্যা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকার নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মানুষের বিভ্রান্তি আর নৈতিক অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে তৌলিগ্রাম নাটকটি। আর বাঁচাও সন্ধ্যাতে আছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে রাজনীতির প্রভাব এবং তারই আবর্তে বিভিন্ন চরিত্রের নানা রকম ঘাতপ্রতিঘাত। নাটকটির আর একটি উজ্জ্বলতম দিক হোল দর্শকদের সামনে একটি বলিষ্ঠ ও সুস্থ জীবনবোধের সংকেত ছড়িয়ে দেওয়া।

দুটি একাঙ্কিকার বক্তব্যের সঙ্গে অভিনয় মিলেছে একই তালে, একই ছন্দে। স্বভাবতঃই প্রযোজনায় থেকেছে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। নাটক দুটির গতিবেগে যাঁরা স্বচ্ছন্দভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হোলেন অজয় ভট্টাচার্য, তপন মিত্র, সোমেন সেন-গুপ্ত, তপন ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ মুখার্জী, বাণী মিত্র, অমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রণব ব্যানার্জী,

এরাও মানুষ নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে শ্রীমতী পাইন।

ভোলা দত্ত, প্রদীপ পাল, গৌতম মুখার্জী ও মিহির সরকার।

দুটি নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনায় প্রণব চক্রবর্তী তাঁর মোটামুটি স্পষ্ট শৈল্পিক বোধের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন বলেই মনে হয়।

সব্যসাচীর 'গোলাপ কাঁটার মৃত্যু' : ওপার বাংলার সামগ্রিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ-মূলক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক কিছুদিন আগে মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন 'সব্যসাচী' নাট্যগোষ্ঠী। দিলীপ মজুমদার রচিত এই নাটকটি বাংলাদেশের রক্তঝরা কাহিনীকে নিয়ে গড়ে উঠলেও, ওপারের সংগ্রামের নিখুঁত বাস্তব ছবি বোধ হয় নাটকটির মুখর সংঘাতের মধ্যে স্পষ্টতা পেতে পারেনি। এই শৈথিল্যকে স্মরণে রেখেও সব্যসাচীর এই নাট্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় ছিল পরিণত মননের ছাপ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সাবলীল রূপ দেন অরুণ ভট্টাচার্য, অশোক চক্রবর্তী, সমবোধ সাহা, শিবপতি চক্রবর্তী, শংকর বসাক ও দীপিকা ভট্টাচার্য।

'আলোকের স্রোত ধরে' : সম্প্রতি হাওড়ার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'ইউনাইট থিয়েটার ক্লাব' হাওড়ার গোলমোহর রেলওয়ে মঞ্চে অভিনয় করলেন রাধারমণ ঘোষের 'আলোকের স্রোত ধরে' নাটকটি। স্বয়ং নাট্যকার নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন অনিল ভট্টাচার্য, বিশু গোস্বামী, সুনীল ভট্টাচার্য, কার্তিক শী, গৌর দাস, শশাঙ্ক বসু, নবকুমার ঘোষ, তাপস গুহ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন বৈদ্যনাথ নন্দী ও বর্ধমান সিংহ।

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা : 'যুগান্তরে'র পরিচালনায় আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৮ই আগস্ট। যোগদানের ঠিকানা : সম্পাদক, 'যুগান্তর', ১৪ রজনীকান্ত চ্যাটার্জী রোড, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি।

অভিনেতৃ সংঘের অন্ধযুগ নাটকের একটি দৃশ্যে নির্মল ঘোষ, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং জগৎ মিত্র

রূপরসের 'রোশেনারা' : রূপরস নাট্য-গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে নাটকটির মহড়ায় এখন ব্যস্ত আছেন তার নাম হোল 'রোশেনারা'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীনির্মল রায়। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অরুণ সেনগুপ্ত।

সংগীত কলাকেন্দ্র

গেল ৪ আগস্ট কাচরাপাড়া স্পার্টিং মঞ্চে সংগীত কলাকেন্দ্রের চতুর্থ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুরভারতীর (নৈহাটী) শিল্পীরা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন প্রেম-প্রসাদ বসু। এতে অংশগ্রহণ যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন—দ্বিজেন ভট্টাচার্য, ছবি মুন্সী, প্রণব চক্রবর্তী, অপর্ণা পাল, কালী ভৌমিক, গৌরী মুখোপাধ্যায়, স্বপ্ন দত্ত এবং কৃষ্ণ সরকার।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'

গেল ৭ আগস্ট শনিবার, কোর্টক্লাব সাহিত্য সভার সভা-সভ্যারা রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকটির সার্থক মঞ্চাভিনয় করেন।

নাটকের একটি প্রধান চরিত্র চন্দ্রকান্ত। এই চরিত্রে নীরজ বিশ্বাস এক অনবদ্য স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন তাঁর স্পষ্ট সংলাপ, রসবোধের অভিব্যক্তির সুন্দর ব্যঞ্জনায়। গদাই ও বিনোদ-এর ভূমিকায় নিখিল ভট্টাচার্য ও তরুণ ভট্টাচার্য প্রাণোচ্ছলতা ও আবেগপূর্ণ অভিনয়ে তাঁদের চরিত্র দুটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ক্ষান্তমণির ভূমিকায় মনীষা বিশ্বাস তেজ, তিতীক্ষা ও আবেগের সঞ্চার করেছেন। কমলের ভূমিকায় শিখা রায় ও ইন্দুর ভূমিকায় অনীতা ভট্টাচার্য সপ্রাণ ও রোমান্টিক দৃশ্যগুলোকে সজীব করে তুলেছিলেন।

অন্যান্য ভূমিকায় চারু রায়, ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্য, কণ্ঠী ভৌমিক, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, শিবশংকর মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে ও অলকা দাস প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

নাটকে রাবীন্দ্রিক মেজাজ, অভিনয়ে রাবীন্দ্রিক ঢঙ এবং মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্য রচনায় নাটকটি ভালবাসার চৌকাঠ ডিঙিয়ে এক শাশ্বত রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে। এ কৃতিত্ব নাট্য-নির্দেশক চারু রায় ও শিল্পীদের সমান প্রাপ্য। সংগীতের ব্যবহার সংহত ও সুপ্রযুক্ত হলেও আর একটু উদাত্ত হলে ভাল হত। সংগীতের নেপথ্যে ছিলেন, ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়, নন্দিনী রায় ও তপন চৌধুরী। নাটকটি প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেন কোচবিহার সাহিত্যসভা।

মূকাভিনয়ে 'জয় বাংলা'

প্রতিভাবান তরুণ মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ সম্প্রতি তাঁর জনপ্রিয় 'জয় বাংলা' ফিচারটি শহরে ও শহর থেকে দূরে নানান জায়গায় দেখিয়ে দর্শক-সাধারণের অশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের ওপর বর্বর পাক-বাহিনীর নির্মম অত্যাচার শ্রীঘোষের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রীঘোষ সম্প্রতি দুর্গাপুরে, চিত্তরঞ্জন ও পাটনায় অনুষ্ঠান সেরে কলকাতায় ফিরেছেন।

কিশলয় নাট্যদলের দুটি নাটক : মজঃফর-পুরের কিশলয় নাট্যদলের শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি নাটকের অভিনয় করে স্থানীয় নাট্যানু-রাগীদের যথেষ্ট আনন্দ দেন। নাটক দুটি হোল রামমোহন দত্তর 'অতীতের দিনগুলি' এবং নারায়ণ দত্তর 'সূর্যের মৃত্যু'। নাটক দুটির নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন রামমোহন দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন শ্রীধর মুখার্জি, বিধান বসু, সুজিত সাহা, অভিজিৎ বসু, অজিত সাহা, দীপক ঘোষ, সজীব রায়চৌধুরী, তাপস দত্তরায়, সীমা নাগ ও রামমোহন দত্ত।

নাট্যরূপার 'সমাজদর্পণ' : নতুন নাট্য-সংস্থা 'নাট্যরূপা'র শিল্পীরা কিছুদিন আগে তরুণ-নাট্যকার দিলীপ দে'র 'সমাজদর্পণ' নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই নাটকটির বিভিন্ন সংঘাত মুখর হয়ে উঠেছে। নাট্যকার স্বয়ং এই নাটকের নির্দেশক ও প্রধান ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন। তাঁর 'নির্মল' ও রীতা মুখার্জি'র 'কল্যা' চরিত্র-চিত্রণ সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনার দুটি উল্লেখ-যোগ্য সম্পদ। অন্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন প্রশান্ত চক্রবর্তী, রথীন মুখার্জি, চঞ্চল শেঠ, অনিমেষ নাহা, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, নমিতা পাল, মেনকা দেবী, রতন পাল।

'সাহেব বিবি গোলাম' : শ্রীবিমল মিত্রের জনপ্রিয় উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলামে'র একটি সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত নাট্যরূপ সম্প্রতি পরিবেশিত হোল স্টার থিয়েটারে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (হাওড়া) স্টাফ এসোসিয়েশনের শিল্পীরা। নাটকটির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যবিন্যাসে গতি-বেগের স্পর্শ অনুভূত হয়েছে এবং তাতে বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে করুণ রস। বিশেষ করে সংগীতের সুপরিকল্পিত ব্যবহার নাট্যমুহূর্তগুলোকে সজীব করে তুলেছে। এ ব্যাপারে নির্দেশক কালী দে'র প্রয়োগ পরি-কল্পনাই প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন বাসন্তী চ্যাটার্জি। তাঁর 'পটেশ্বরী' হয়েছে অনবদ্য ও মর্মস্পর্শী, তিনটি গানেই তাঁর কণ্ঠের দরদ যেন ঝরে পড়েছে। বিভাস রায়চৌধুরীও 'ভূতনাথ' চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে বেশ নিবিড় করে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। আর কটি উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণে যাঁদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে মঞ্চের আলোয় তাঁরা হোলেন কল্পনা মুখোপাধ্যায় (জবা), রেণু বসু-মল্লিক (মেজ বৌ) অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (চুনী), অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ, রঞ্জিত কোলে, কমলেশ মুখোপাধ্যায়, গোপাল কাঁড়ার।

"সামানা : অসামান্য" : আসানসোলের ঘরোয়া নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি গোর্কির কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক "সামানা : অসামান্য"র অভিনয় করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন শশাঙ্ক গাঙ্গুলী। বাসুদেব সেনগুপ্ত নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন তপন দাস, উমা প্রামাণিক, বাসুদেব সেনগুপ্ত, সন্তোষ বসু, প্রদীপ সরকার, স্বপন গাঙ্গুলী, দেবাশিষ চ্যাটার্জি, রমা-পতি চ্যাটার্জি, বাবলু বোস, হীরেন ঘোষ।

লখনউয়ে বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা : লখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ং মেনস এসো-সিয়েশন পরিচালিত বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতা এবারও অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। ভারতবর্ষের যে কোন নাট্যগোষ্ঠীই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : ২০ শিবাজী মার্গ, লখনউ-১।

বিবিধ সংবাদ

প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের যে অংশের (প্লট নং ১—১৮) নাম পরিবর্তন করে 'প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি' রাখা হয়েছে, সেই অংশে গেল ১ আগস্ট নতুন ফলক লাগানো

হয়ে গেছে। প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটির এই প্রস্তাবটি বিগত ৮ জানুয়ারী পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতদিনে এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হল। এই বিস্মৃতপ্রায় চিত্রস্রষ্টার নামে রাস্তার নামকরণ করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ একটি প্রশংসনীয় কাজ করলেন।

আনন্দ মন্দির-এর গুণিজন সংবর্ধনা

আসছে ২২ আগস্ট, সোমবার, সকাল নটার সময়ে প্রাচী সিনেমা-গৃহে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আনন্দমন্দির তাঁদের গুণিজন সংবর্ধনা কর্মসূচী অনুযায়ী প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে সংবর্ধিত করবার আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবেন যথাক্রমে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়, প্রথিতযশা সুরশিল্পী তিমিরবরণ ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

বিশ্বরূপায় সতু সেনের স্মৃতিতে স্মরণসভা

গেল বুধবার ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে পরলোকগত সতু সেনের স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্মৃতিচারণ করেন মন্মথ রায়, মনোজ বসু, কালীশ মুখোপাধ্যায়, তাপস সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুণ্ডু, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং পার্থ সেন (সতু সেনের যথাক্রমে জামাতা ও পুত্র)। রাসবিহারী সরকারের অনুরোধে সকলে নীরবে এক মিনিট দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভায় সতু সেনের আলোকসম্পাত সম্বন্ধে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করার জন্য ও তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সংস্কৃতি কর্তৃক সতু সেনের শোকসভা উদ্যাপন

চাকপোড়ার (হাওড়া) প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গেল ১১ আগস্ট সংস্থা-গৃহে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের আধুনিক প্রয়োগকলার পথপ্রদর্শক, নির্দেশক ও প্রযোজক সতু সেনের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করেন। এই ভাবগম্ভীর সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি ও নাট্য নির্দেশক নিমাই মান্না। সভাপতি ও বিভিন্ন বক্তা সতু সেনের জীবনী ও বিরাট কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের কর্মী সম্মেলন

২৫শে জুলাই '৭১ রবিবার ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের কর্মী সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় একশোজন প্রতিনিধি ও কর্মী এই সভায় যোগদান করেন।

সকালে স্বল্প সঞ্চয় প্রদর্শনী ও কর্মী সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পোদ্দার, যুগ্ম অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শ্রীপোদ্দার ও শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী স্বল্প সঞ্চয় সম্বন্ধে ও জেলার কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেন। কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস। সভায় সংগঠন সম্পাদক গুরুদাস আঢ্য জেলার ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচীর প্রস্তাব রাখেন। কার্যকরী সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সিনহা সকল কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়ার বিদেশ ভ্রমণ

ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়া গত ২ আগস্ট আমেরিকার ন্যাসভাইলে এডুকেশন এণ্ড পাপেট কনফারেন্স ও আন্তর্জাতিক উৎসব-এ 'পাপেটিয়ার্স অব আমেরিকার আমন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করতে এয়ার ইণ্ডিয়া বিমানযোগে যাত্রা করেছেন। কনফারেন্স ও উৎসব শেষে ২১ আগস্ট দুটি ইউরোপীয় দেশগুলি ভ্রমণ করবেন ও অনুক্রম ক্রমে লণ্ডন, রোম, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে ফিরবেন।

তুলসী কাব্য সমারোহ

সম্প্রতি কলামন্দিরে ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ নিবেদন করলেন 'তুলসী কাব্য সমারোহ।' এই উপলক্ষে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় শ্রীতুলসীদাসজীর ভজন সহযোগে—'রামচরিত মানস' ও ভজনমালা পরিবেশিত হোল। সমবেত কণ্ঠে, যন্ত্রবাদন সহযোগে বিভিন্ন কণ্ঠে এক সাঙ্গীতিক নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিল। একক সংগীতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তা ঘোষ, রবিকুমার কিচলু, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার অংশ নেন। শ্রীঘোষের অনুপম সুরসৃষ্টিতে তুলসীদাসজীর ভজনের অর্থমালা এক ভাব-গম্ভীর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রবিবার ২২ শ্রাবণ, ১৩৭৮ (৮ আগস্ট, ১৯৭১) সকাল আটটার সময় নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়েছে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির পক্ষ থেকে।

এই উপলক্ষে ঐদিন ৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ মহর্ষি ভবনে কবির কক্ষ ও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা ছিল।

চিত্র / সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মস্কো এবং কিয়েভে অনুষ্ঠিত ৫ম গ্রীষ্মকালীন স্পার্তাকিয়াদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ম্যারাথন দৌড় বিজয়ী বেলোকারোভানক। সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াবিদরা, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আভেরি ব্রান্ডেজ সহ প্রায় ১৭০জন বিদেশী অতিথি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন। ফাইনালে ৭০৮২জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

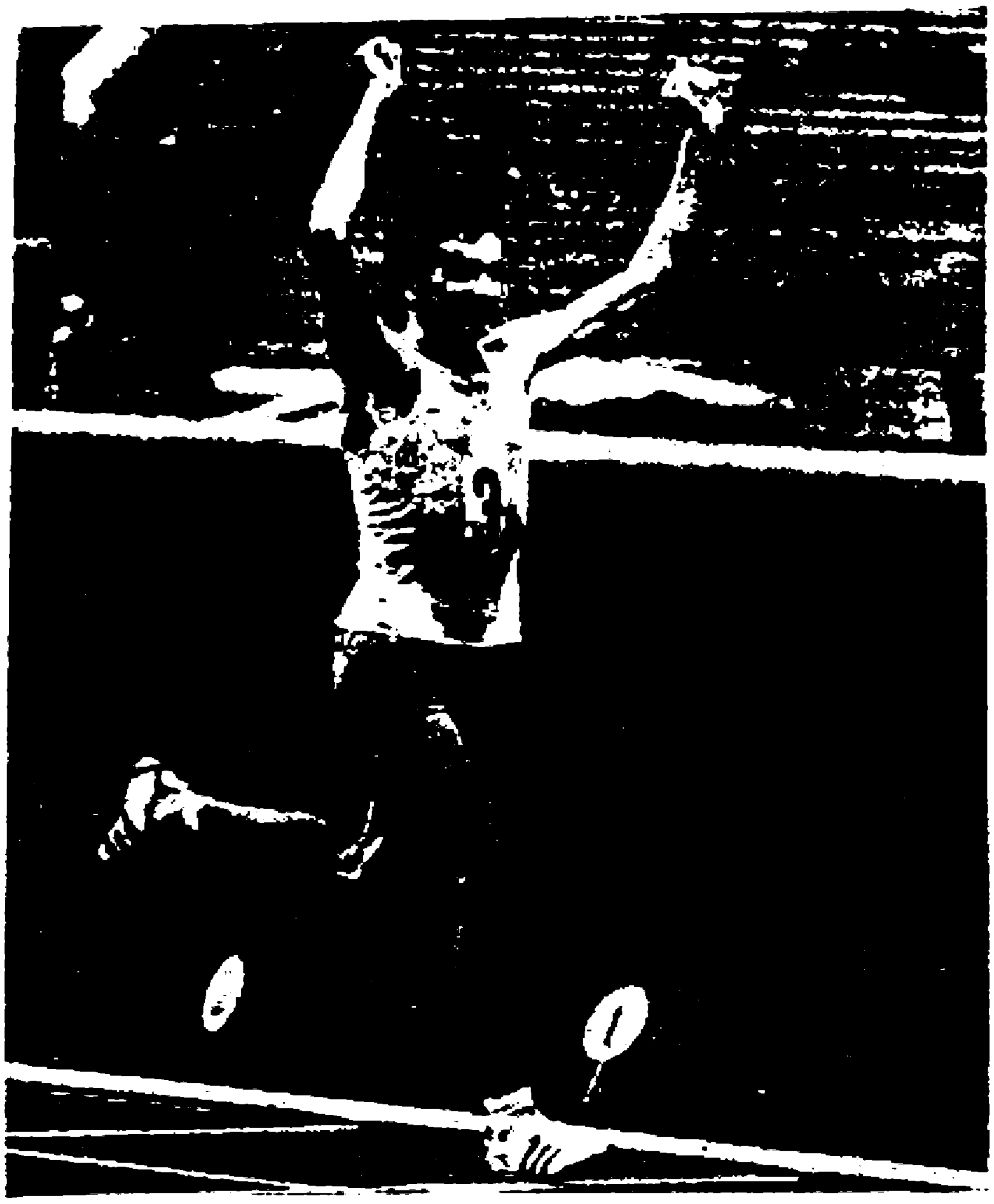

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ইংল্যান্ড : ৩৮৬ রান (লাকহার্স্ট ৭৮, নট ৪১, ইলিংওয়ার্থ ১০৭ এবং লেভার নট আউট ৮৮ রান। আবিদ আলি ৬৪ রানে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৮৯ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৪৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লাকহার্স্ট ১০১ এবং এডরিচ ৫৯ রান)।

ভারতবর্ষ : ২১২ রান (গাভাস্কার ৫৭ এবং সোলকার ৫০ রান। লেভার ৭০ রানে ৫ এবং প্রাইস ৪৪ রানে ২ উইকেট)।

ও ৬৫ রান (৩ উইকেটে। গাভাস্কার ২৪। প্রাইস ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্য বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে খেলা ড্র যায়। মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে শেষ পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনের শেষে খেলার এইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ৬৫ রান। তখনও ভারতবর্ষের পক্ষে খেলায় জয়লাভের জন্য আরও ৩৫৫ করার প্রয়োজন ছিল। তাদের হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট এবং একদিনের খেলা। সুতরাং বৃষ্টি ভারতবর্ষকে এ যাত্রা পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছে তা কেউ বললে জোর গলায় তার প্রতিবাদ চলে না।

বৃষ্টির জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের বদনাম চিরকালের। এখানে অনেক টেস্ট খেলাই বৃষ্টির জন্যে ভন্ডুল হয়েছে। এমন কি পাঁচদিনের বরাদ্দ টেস্ট খেলার একটা বলও খেলা হয়নি এমন নজির দুটি আছে—১৮৯০ এবং ১৯৩৮ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা।

১৯৭১ সালের টেস্ট খেলা নিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে যে পাঁচটি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ২ এবং খেলা ড্র ৩। ১৯৩৬, ১৯৪৬ এবং ১৯৭১ সালের টেস্ট খেলা ড্র যায়। অপরদিকে ইংল্যান্ডের জয়—১৯৫২ সালে এক ইনিংস ও ২০৭ রানে এবং ১৯৫৯ সালে ১৭১ রানে। ১৯৫২ সালের টেস্টে ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের মূলে ছিল ওল্ড ট্রাফোর্ডের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ভিজে উইকেট পেয়ে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৫৮ রানে এবং ২য় ইনিংস ৮২ রানের মাথায় শেষ করে এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই জয়ই বৃহত্তম। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় ইনিংস জয়ের প্রথম গৌরব লাভ করে ভারতবর্ষ—১৯৫১-৫২ সালের মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে ভারতবর্ষের এক ইনিংস ও ৮ রানে জয়।

ইংল্যান্ড টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু খেলার সূচনায় তাদের মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ১০ মিনিটের খেলায় মাত্র ৪১ রান তুলতে তাদের চারটে উইকেট পড়ে যায়। এই চারটে উইকেটই পান আবিদ আলি। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৫০ (৪ উইকেটে)। লাকহার্স্ট ১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৬১ (৫ উইঃ)। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন লাকহার্স্ট (৭১ রান) এবং ইলিংওয়ার্থ (১০ রান)। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে লাকহার্স্ট এবং নট দলের অতি মূল্যবান ৭৫ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে লাকহার্স্ট খুবই ভাগ্যবান। ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের দোষে তিনি ১৬ এবং ২৭ রানের মাথায় আউট হওয়া থেকে খুব জোর 'বেঁচে' যান। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ৭৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। চা-পানের দশ মিনিট পর লাকহার্স্ট খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি সাড়ে চার ঘণ্টা খেলে তাঁর ৭৮ রানে ১১টা বাউন্ডারী করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সাতটা উইকেট পড়ে ২১৯ রান দাঁড়ায়।

খেলার এক সময় আবিদ আলির বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ১১-১ ওভার বল ১৫ রান দিয়ে ৪টে উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের চা-পানের কিছু পরে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৮৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে ইংল্যান্ডের শেষ তিন উইকেটে ১৯৯ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের ৮ম উইকেটের জুটিতে রে ইলিংওয়ার্থ (১০৭ রান) এবং পিটার লেভার (৮৮ নট আউট) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের যে ১৬৮ রান সংগ্রহ করেন তা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের অষ্টম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্বের ৮ম উইকেটে জুটির রেকর্ড রান ছিল ১০৪ (রবিন্স এবং ভেরিটি, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬)।

এই নিয়ে ইলিংওয়ার্থ টেস্ট খেলায় দুটো সেঞ্চুরী করলেন। তিনি ২৫৯ মিনিট খেলে তাঁর ১০৭ রানে ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের পিটার লেভারের বলে দিলীপ সরদেশাইয়ের বোল্ড-আউট হওয়ার দৃশ্য।

ওভার-বাউন্ডারী করেন। অপরদিকে লেভার তাঁর ৮৮ রানে ৭টা বাউন্ডারী করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় এই তাঁর সর্বোচ্চ রান।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে এবং আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭০ মিনিট আগে খেলা ভেঙ্গে যায়। এই সময় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-পড়ে ৮ রান ছিল। এইদিন দু'ঘন্টারও বেশী খেলার সময় বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের এগার মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২১২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ১৭৪ রানে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের একমাত্র গাভাস্কার (৫৭ রান) এবং সোলকার (৫০ রান) বা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে সাময়িকভাবে দলের পতন রোধ করেছিলেন। লেভার ৭০ রানে ৫টা উইকেট পান। প্রথম টেস্টে যে নরম্যান গিফোর্ড ১২৭ রানে ৮টা উইকেট (১ম ইনিংসে ৮৪ রানে ৪ ও ২য় ইনিংসে ৪৩ রানে ৪) পেয়েছিলেন তিনি গাভাস্কারের মার খাওয়া বল ধরতে গিয়ে আঙ্গুলে চোট পেয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি একটা বলও করেননি।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে যেখানে ৪২০ রানের দরকার ছিল সেখানে এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় তাদের তিনটে উইকেট পড়ে মাত্র ৬৫ রান উঠেছিল।

পঞ্চম দিনে বৃষ্টির ফলে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, লর্ডসের প্রথম টেস্ট খেলাও বৃষ্টির জন্যে ভণ্ডুল হয়েছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৫শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। সেমি-ফাইনালে উঠেছে 'এ' গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) এবং তাইওয়ান। অপরদিকে 'বি' গ্রুপ থেকে ব্রহ্মদেশ (গত বছরের রানার্স-আপ) এবং ইন্দোনেশিয়া।

ভারতবর্ষ 'বি' গ্রুপের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষের মোট পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়ায় জয়—১, হার—৩ এবং ড্র ১। ভারতবর্ষ ২—১ গোলে ফিলিপাইনের বিপক্ষে জয়ী হয়। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা ২-২ গোলে ড্র যায়। ভারতবর্ষের হার এই তিনটি খেলায়—ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১—৩ গোলে, হংকংয়ের কাছে ১-২ গোলে এবং ব্রহ্মদেশের কাছে ১—৯ গোলে।

১৯৫২ সালের অলিম্পিক ফুটবল খেলায় যুগোস্লাভিয়ার কাছে ভারতের শোচনীয় ১-১০ গোলে হার স্বীকারের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের নজির ব্রহ্মদেশের কাছে এই ১—৯ গোলে।

এশিয়ান আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত পেপ্সী সুকান আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড রানার্স-আপ সম্মান লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করে লীগ প্রথায় খেলেছিল। ভারতবর্ষ ৫টি খেলায় মোট ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করে—জয় ৪, ড্র ১ (নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে), গোল স্বপক্ষে ২০ এবং বিপক্ষে ১। ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় নিউজিল্যান্ড ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল।

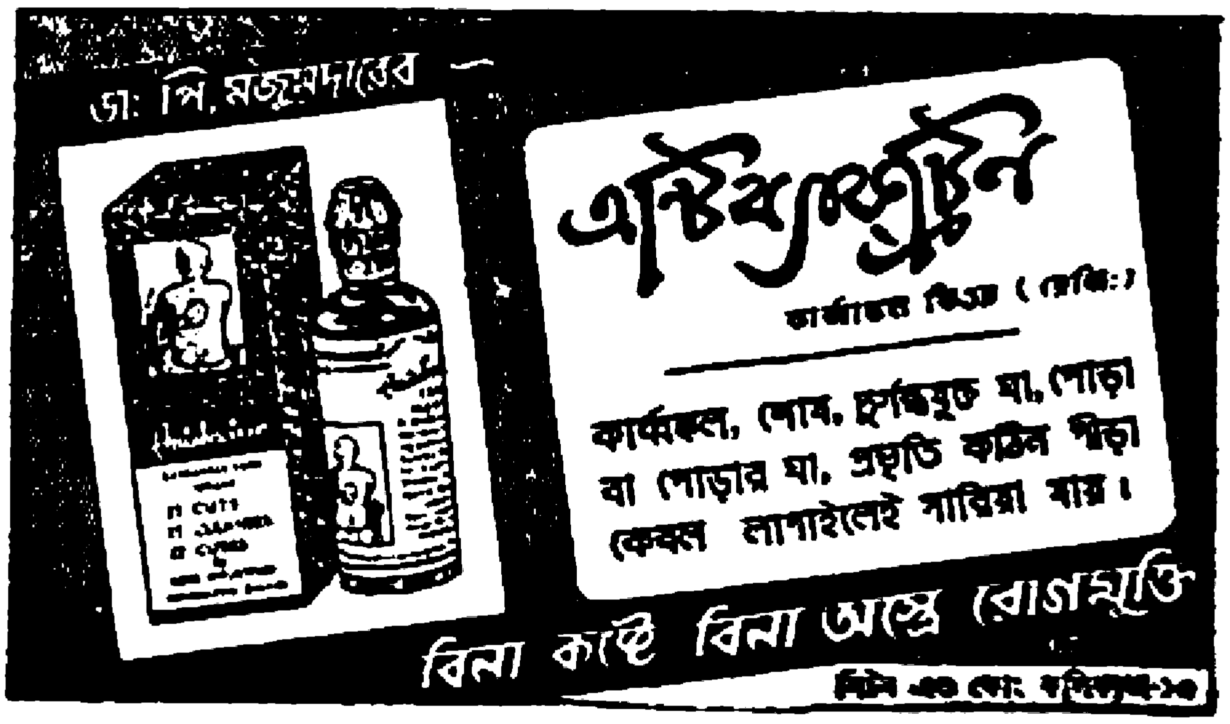

CENTRAL LIBRARY

চিঠিপত্র

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

২৭এ শ্রাবণের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ' লেখাটির মধ্যে একটি গুরুত্বের ভুল চোখে পড়ল। লেখকের মতে সাহিত্যরথী স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা, করুণা দেবী অকালে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই—আনুমানিক ১৯১৬-১৭ সালে করুণা দেবীর অকাল মৃত্যুর পর প্রায় বারো-তের বৎসর পর ১৯২৯ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। সুতরাং করুণা দেবী বিধবা হননি। বিপত্নীক হওয়ার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মণিলাল জোড়াসাঁকোতেই অবস্থান করেছেন। দুই পুত্র ছাড়া ওঁদের একটি কন্যাও আছেন। নাম—রেখা দেবী। অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীযুক্তা সুরূপা দেবীর দেবর শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনি সহধর্মিণী। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম 'অমিতেন্দু' বলে লেখা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম মিতেন্দ্র। তিনি একটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। বাঙলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম লেখক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রকাশকালে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছিল।

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরতত্ত্ব

অমৃতে (১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা) শ্রীযুক্ত সুধীন মিত্র মহাশয়ের 'ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরতত্ত্ব : ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে ভাল লাগলো। এ প্রবন্ধে প্রচুর ভাববার রয়েছে। লেখক প্রশংসনীয়ভাবে দুর্গম পথ-পরিক্রমা করে বহু তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসতর্কতা বশতঃ তিনি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। প্রবন্ধটির গোড়ার দিকেই তিনি এক স্থানে লিখেছেন, 'কথা বলবার সময় বক্তার গলার জোর যত বাড়ে, কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা তত বাড়ে।' ঐ উক্তি শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত, সন্দেহ নেই। আলোর তরঙ্গের বেলায় কম্পাঙ্ক কমলে বাড়লে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ইথার তরঙ্গের কম্পনের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হলে আলোর বর্ণের পরিবর্তন হয়। তেমনি শব্দের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সুরের তীক্ষ্ণতার তারতম্য হয়। যদি লেখকের দাবি অনুযায়ী 'গলার জোরে'-ই সুরের তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতো, তবে গান হতো শুধু গলার জোরে। গায়ক সচেষ্টভাবে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির চেষ্টা না করে যদি শুধুমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করেন তবে তা সম্ভব হবে না। লেখকের কথাই যদি ঠিক হবে, তবে কোন গান একই স্কেলে আস্তে বা জোরে গাওয়া কি সম্ভব হতো? শব্দের তীব্রতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতার অনুভূতির কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে, কিন্তু শব্দের তীব্রতাই সুরের তীক্ষ্ণতার নিয়ন্ত্রক নয়। লক্ষণীয় যে, বাঁশিতে 'সা' যেখানে বাজে, তার অষ্টক সুর 'সা-'ও সেখানে বাজে। কিন্তু প্রথমবার সুর সৃষ্টিতে বাঁশিতে যতটা জোরে ফুঁ দিতে হবে, পরের বার তার চেয়ে বেশি জোরে ফুঁ দিতে হবে। এখানে শুধু গলার জোরে কার্যসিদ্ধির হলো সন্দেহ নেই। কিন্তু সুরের অনুভূতির এ তারতম্যকে তরঙ্গ সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করলে ভুল করা হবে।

বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে কোন সুর যখন সৃষ্টি করা হয় তখন মূল সৃষ্টির সঙ্গে অন্যান্য অনেক উপসুরও থাকে। বাঁশিতে যখন 'সা' বাজে, তখন তার অষ্টক সুর 'সা'ও ঐ সুরে বর্তমান। কিন্তু তার তীব্রতা কম হলে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঐ সুর ধরা পড়ে না, বা মূল-সুরকে ছাপিয়ে তার অষ্টক আমাদের অনুভূতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এটাকে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু জোরে ফুঁ দিলে মূল সুরের তীব্রতা যেমন বাড়বে, অষ্টকের তীব্রতাও তেমন বাড়বে। এ ক্ষেত্রে কম্পন তরঙ্গের কোন প্রকৃতিগত তফাৎ হবে না, শুধু পরিমাণগত তফাৎ হবে। কিন্তু সুরের অনুভূতি ব্যক্তিনির্ভর। তরঙ্গ-চরিত্রের পরিমাণগত তফাতের ফলেই শব্দানুভূতির তফাতের সৃষ্টি হবে এবং মূল সুরের চেয়ে তার উপসুর 'সা'-কেই প্রাধান্য দেবে আমাদের অনুভূতি।

শিশুকালে মানুষের গলার স্বর তীক্ষ্ণ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর মোটা হতে থাকে অর্থাৎ গলার শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কমে যাচ্ছে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গলার জোর কমে যায়, এরূপ মনে করার কোন ভিত্তি নেই।

অজয়কুমার চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্রুপদ সঙ্গীত প্রসঙ্গে

২৪ আষাঢ়, ১৩৭৮ সালের সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ধ্রুপদ সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। সত্যিই যাঁরা এ বিষয়ে প্রকৃত রসগ্রাহী তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক গবেষণাও কম আদরের নয়, বিশেষ করে যখন অনেক ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্র-ভারতীর মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে সঙ্গীতে উচ্চতর শিক্ষা পাবার ও গবেষণা করবার সুযোগ পাচ্ছেন তখন তাঁদের কাছে এ জাতীয় প্রবন্ধ অনেক বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করবে।

লেখক ঐ প্রবন্ধে চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা মহানগরীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, চন্দননগর বাগবাজার নিবাসী স্বর্গত বসন্তলাল মিত্র মহাশয় গোয়ালিয়রের ওস্তাদ দিওয়ান সিংকে চন্দননগরে এনে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন। চুঁচুড়া ও চন্দননগরে ঐ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজও ধ্রুপদের চর্চা বজায় রয়েছে।

ওস্তাদ দিওয়ান সিং কেবল গায়ক ছিলেন না। চিত্র অঙ্কনেও তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। এখনও হয়তো ঐ মিত্র পরিবারে খোঁজ করলে তাঁর অঙ্কিত তৈল-চিত্রের নমুনা এক-আধটি পাওয়া যেতে পারে। বসন্তবাবুর পুত্র মণিবাবু ধ্রুপদে সুগায়ক ছিলেন। মণিবাবুর কণ্ঠ অতিশয় সুমধুর ছিল এবং তিনি ধ্রুপদ গানে পিতার যোগ্যপুত্র হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে যদি কারও আরও বিশদ কিছু জানার আগ্রহ থাকে চন্দননগর, পালপাড়ার শ্রীজীবন নন্দী মহাশয়ের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনি মণিবাবুর কাছে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন। লেখক কলকাতার অনেক প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়কের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কয়েকটি দিকপালের নাম, যেমন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ তাঁর প্রবন্ধে কেন নেই বুঝলাম না। হয়তো প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চান নি। পঞ্চাশ বছর আগে মুরারি সম্মেলনে এই দুই-জনের যুগলবন্দে সুরের আলাপ, গান ও হাতের কাজ আজও আমার প্রাণে শিহরণ জাগায়। সখারাম গণেশ ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করতেন। দুই সহোদর শিবা পশুপতির (নেপাল রাজের সভাগায়ক) দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলাপ আজও ভুলিতে পারিনি। তিনি স্বর্গত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটিও বাদ দিয়েছেন। বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক দুর্লভ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সন্তোষবাবু খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
চুঁচুড়া

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লি-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

॥ আসন্ন শারদীয়ার নবীন সাহিত্যোপহার ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

শাড রূপে দেখা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি অনেক উপন্যাস লিখেছেন, আগেও লিখেছেন, কালকে চিহ্নিত করে রাখার মতোও তাঁর অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে—যেমন 'কাল, তুমি আলেয়া', 'পঞ্চতপা', 'সাত পাকে বাঁধা', 'চলাচল', 'নগর পারে রূপনগর' প্রভৃতি—কিন্তু আমরা সগর্বে ও নিঃসংশয়ে প্রচার করছি, এমন বই এর আগে একখানিও লেখেননি। এর আঙ্গিক আলাদা, কাহিনী ভিন্ন স্বাদের, এর চরিত্র সৃষ্টি অভিনব। এই উপন্যাসের 'চন্ডী বৌ' চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি যে কোন নারী-চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। এই বইটি দীপ্যমান বাংলা কথাসাহিত্য জগতেও নূতন দীপ্তি এনে দিল।

॥ দাম চৌদ্দ টাকা ॥

আবদুল জব্বারের

নবতম গ্রন্থ

সুখের মেলা

এই লেখকের 'বাংলার চালচিত্র' যখন প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় তখনই পাঠক সমাজ চমকে উঠেছিলেন—নবীন এক প্রতিভার আবির্ভাব হল বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের সে আশা যে ব্যর্থ হয়নি—এই বইটিই তার প্রমাণ। সুখের মেলায় যে সব দুখের মেলা তা আপনি আমি দেখেছি বৈকি কিন্তু এমনভাবে চিরদিনের মতো ধরে রাখতে কেউ পারেনি। সুখের মেলা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করল তাঁর শক্তির অসাধারণত্ব।

॥ দাম সাড়ে সাত টাকা ॥

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গীতার এই ব্যাখ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই মহাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট অভাব দূর করল।

॥ দাম দশ টাকা ॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অবধূত ও যোগীসঙ্গ

যাঁরা এই লেখকের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' পড়েছেন ও তৃপ্তি লাভ করেছেন—তাঁদের কাছে এটি অবশ্য-পাঠ্য।

॥ ন টাকা ॥

শংকরের

সীমাবদ্ধ

॥ সপ্তম মুদ্রণ নিঃশেষিত প্রায় ॥

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের

জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲

জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরী ও রবিজিৎ চৌধুরীর

সুবর্নসিরির উপজাতি ৫৲

বিভূতি রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রতি খণ্ড—চৌদ্দ টাকা।

প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ড—আঠারো টাকা।

বাংলা পকেট বই

দ্বিতীয় দফায় সাতখানি বইও প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি ২৲। গ্রাহকরা ১১·২০ পঃ সাতখানি বই পাবেন। এই বই পৃথক ভাবেও বিক্রী হচ্ছে। সাতখানি বইয়ের ডাকব্যয় ২·২০ পঃ, পাঁচখানি বইয়ের ডাকব্যয় ১·১০ পঃ।

মিত্র ও ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৮২ / ৩৪-৮৭১১

বসন্ত মালতী তেল
আমায় সারা দিন পরিপাটি রাখে
অবিন্যস্ত চুল সকলেরই অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। বসন্ত মালতী ব্যবহারে চুল সর্বদা পরিপাটী থাকে। এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পিছনে আছে বিখ্যাত জবাকুসুম তেলের প্রস্তুতকারক সি কে সেনের প্রায় একশো বছরের অভিজ্ঞতা। চুলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যে সব দেশীয় উপাদানের প্রয়োজন তার সবগুলিই এতে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এর মনমাতানো গন্ধ সারাদিন আপনাকে খুসীর আনন্দে ভরিয়ে রাখবে।
Basant malati
সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ও দিল্লী

পড়েছেন কি ?

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা-কাহিনী—

— পেসদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের —

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্ম্মিণী হয় ক'জন

৪.৯০

—তরুণ কবি "অক্ষয়লোক"র—

আজ আমি বেকার

১.২০

পরিবেশক—

দে বুক স্টোর্স—১৩ বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি। পুস্তকম—শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। উষা পাবলিশিং—১০।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। বেঙ্গল বুক সপ—৬৩ এম জি রোড, কলি। সত্যজিত মুখার্জি—২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি।

বাংলা তথা ভারতের গৌরব—আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রাণপুরুষ **স্বামী সত্যানন্দদেবের** অমর রচনাবলী। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সুরশিল্পী ও মর্মতত্ত্বান্বেষী সকলেই নিজ নিজ পথের অভিলষিত বস্তুর সন্ধান পাইবেন।

* **যুগে যুগে যার আসা** (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাশ্রিত)
* **যুগাচার্য্য** (স্বামী অভেদানন্দের জীবনাশ্রিত)
* **বটের বাঁশী** (সংগীত পুস্তক)
* **বাঁশী ও অশ্রু** (সংগীত পুস্তক)
* **বটের বীণা** (সংগীত পুস্তক)
* **বটের বাউল** (বাউল সংগীত)
* **কালীকীর্তন** (১৩শ খণ্ডে)
* **স্বরলিপি** (বিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের সুর ও স্বরলিপি সম্বলিত, তিন খণ্ডে)

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬
(২) নমনলাল পাবলিশিং হাউস
৫১-সি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 27th August, 1971. শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৪৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
২৪৫	সম্পাদকীয়		—
২৪৬	পটভূমি		—শ্রীবসন্ত
২৪৯	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
২৫১	মর্জালশী মানুষ অতুলপ্রসাদ		—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২৫৫	ফস্কুল		—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২৫৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
২৬১	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
২৬৫	সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তি		—শ্রীনিরঞ্জনলাল নাথ
২৬৭	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
২৭১	কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
২৭৫	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
২৮০	কাশ্মীর : শ্যামাপ্রসাদ : আবদুল্লা		—শ্রীপুলকেশ দে সরকার
২৮০	পাওয়া	(গল্প)	—শ্রীদুর্গাদাস ভট্ট
২৮৫	স্কেল্ট্ ক্যানসারের কথা		—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
২৮৭	অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলা দেশ	(কবিতা)	—শ্রীবিষ্ণু দে
২৮৮	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
২৯৫	খাঁচা	(গল্প)	—শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম
২৯৮	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩০০	বাঘ		—মহম্মদ আবদুল হকমিঞা
৩০৩	বাইবেল ও একটি দুঃসাহসিক অভিযান		—শ্রীঅতীন মজুমদার
৩০৫	নিজের মৃতদেহের পাশে	(গল্প)	—শ্রীমায়া বসু
৩১২	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৩১৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩২০	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

শিক্ষা বিভাগ ও মনীষিবৃন্দ প্রশংসিত

COMMON WORDS

• পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪ • ছবির সংখ্যা ৩৪০ • দাম আড়াই টাকা

জেনারেল বুকস্

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

এক নজরে

হৃৎপিণ্ড ছিনতাই :

বছর চারেক আগে দুর্ঘটনায় নিহত এক শ্বেতাঙ্গিনী বালিকার হৃৎপিণ্ড দিয়ে অপর এক হৃদরোগাক্রান্ত দন্তবৈদ্য ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নবঅধ্যায় সংযোজিত করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শল্য চিকিৎসক ডঃ ক্রিস বার্নার্ড। একের হৃৎপিণ্ড অন্যের বক্ষে স্থাপন করে নবজীবন দান করায় অবিস্মরণীয় ও কল্পনাতীত কীর্তিকে সেদিন সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ সেদিন একে অপরকে প্রশ্ন করেছিল এরপর মানুষ আর ভগবানে তফাৎ রইল কোথায়?

ডঃ বার্নার্ডের সাফল্য যে যুগান্তকারী এবং তা যে বিশ্বমানবের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে সাফল্য স্বীকার করে নিয়েও কোন-কোন মহলে সেদিন এ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, ডঃ বার্নার্ডের সাফল্য অনতিবিলম্বে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর মানুষের জীবনে দারুণ অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভাগ্যবান ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের মহামূল্য জীবন রক্ষা করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের হৃৎপিণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু হবে এবং তার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হবে তা প্রায় নরহত্যার সামিল।

সেদিনের সেই আশঙ্কা, যা তখন নৈরাশ্যবাদীদের অহেতুক উদ্বেগ বলে উপেক্ষিত হয়েছিল তাই আজ ভয়ংকর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে হাসপাতাল এখন যমপুরীর মতোই আতঙ্কের বস্তু। কেপটাউনের যে গ্রেটশ্যুর হসপিটাল একদিন বিশ্বকে নবজীবনের বার্তা শুনিয়েছিল, কেপটাউনের কৃষ্ণাঙ্গ-পল্লী গুগুলেটুর মানুষ এখন তার ধারে-কাছেও যেতে ভয় পায়।

কদিন আগে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জ্যাকসন গুনিয়া নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ। ভর্তি হওয়ার পরে তাঁর স্ত্রী রোজালিন প্রতিদিনই হাসপাতালে যেতেন খোঁজ-খবর নিতে। সেকারণে হাসপাতালের বহু নার্স ও চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। তাছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় যথারীতি জ্যাকসনের ঠিকানা ও নিকটতম আত্মীয়ের নামও খাতায় লিখে নেওয়া হয়েছিল। শেষ যেদিন হাসপাতালে যান রোজালিন, সেদিন শুনে আসেন স্বামীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু পরদিন এক সাংবাদিকের মুখে রোজালিন শুনে হতবাক হয়ে যান যে, তাঁর স্বামীর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দিয়ে এড্রিয়ান হার্বার্ট নামক এক শ্বেতাঙ্গ রোগীর প্রাণরক্ষা করা হয়েছে। সাংবাদিকটি তখন আবার হাসপাতালে ছুটে গিয়ে জানতে চান, মৃতের আত্মীয়দের অনুমতি ছাড়াই কেন তার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বার করে নেওয়া হল? এর কোন সন্তোষজনক উত্তর হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডঃ বার্জার বা অস্ত্রোপচারকারী ডঃ বার্নার্ড দিতে পারেন নি। তাঁরা শুধু বলেন, মৃতের কোন আত্মীয়কে খবর দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় তাঁদের হাতে ছিল না। কিন্তু একই ধরনের ঘটনা ঐ হাসপাতালে অল্প কদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ঘটলো বলে কেউই ঐ কৈফিয়তকে গ্রহণযোগ্য মনে করে নি।

রোজালিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনেছেন—হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এ অভিযোগের জবাব দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই দেবে না। কিন্তু সারা বিশ্বের মানবতাবাদী মহলে আজ প্রশ্ন উঠেছে—একের প্রয়োজনে অন্যের জীবনহানির এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা কবে শেষ হবে?

জাতির কলঙ্ক :

বৃটেনের শিক্ষক পিটার উইলি ১৯৬৯ সালে চার্চিল বৃত্তি লাভ করে এক বছরের জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সম্প্রতি তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, বৃটেনের অগুন্তি হিপি ছেলে-মেয়েরা কাবুলের পথে পথে কুকুরের মত রুটির টুকরো আর নেশা-ভাঙ ভিখ মেগে দিন কাটাচ্ছে। আজ আফগানদের চোখে তারা চরম ধিকৃত ঘৃণ্য জীব।

তিনি আরও বলেছেন, তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, মনের জোর সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, আত্মচেতনা বলতেও কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাঁচার প্রয়োজনে তারা নিজেদের বিকিয়েছে, নিজেদের সঙ্গিনীদের বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রত্যাশায় তারা ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল তা তারাই জানে। কিন্তু আজ যখন তারা ছিন্ন মলিন পোশাকে জীর্ণ দেহ আবৃত করে সমতল বা চিরসবুজ সড়কের ধারে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে বা সাঁকোর ওপরে দল বেঁধে বসে থাকে তখন তাদের রাস্তার ধারে আবর্জনার মধ্যে পড়ে-থাকা কতগুলো খালি টিনের কৌটো বলে মনে হয়। শিক্ষাব্রতী পিটার উইলি তাই বৃটেনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে ঐ 'প্রতিভাগুলি মনগুলিকে দেশে ফিরিয়ে এনে একটি জাতীয় কলঙ্ক দূর করা হক।

সমাজতত্ত্ব :

বৃটেনের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তর আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে ইংলন্ডের সমাজজীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, শুধু ইংলন্ডে ১৯৭০ সালে ১৯৬৯ সালের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী গর্ভপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে সেখানকার বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে ৫২,০১৮টি গর্ভপাত করা হয়। পরের বছর ১৯৭০ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮০,৭২৩। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে গর্ভপাতের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোন কারণ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় নি।

অত্যধিক মাদকদ্রব্য সেবনজনিত রোগ সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৬৫ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাসপাতালে আসার সংখ্যা অতিদ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে মোট ২,০৭২ জন নেশাগ্রস্ত ইংলন্ডের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে আসে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ঐ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১,৯৪৮। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঐ সংখ্যা থেকে এ অনুমান যেন না করা হয় যে, অতজন নেশাগ্রস্ত রোগী এসেছিল চিকিৎসার জন্য। কারণ একই রোগী কয়েকবার এসে থাকতে পারে। পরিশেষে রিপোর্টে এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে যে, অন্তত একটা সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পাওয়ার সুনিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজধানীর জনতত্ত্ব :

দিল্লী এখন লোকসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ২১তম শহর। তার লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৪২। তার মধ্যে পুরুষ ২০ লক্ষ ১৮ হাজার ৮২৫ আর নারী ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯১০। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৭৯৮। এসব তথ্য সদ্য-প্রকাশিত ১৯৭১ সালের জনগণনার রিপোর্টে পাওয়া গেছে। দিল্লীর পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিত শতকরা প্রায় ৬৬ জন এবং নারীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫১ জন।

রাজধানী দিল্লীর চারিদিকের কিছু পল্লী এলাকা নিয়ে যে কেন্দ্রশাসিত দিল্লী অঞ্চল তার মোট লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৮। অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত দিল্লীর মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ শহরবাসী।

—প্রত্যক্ষদর্শী

CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

কেনেডি ও কিসিংগার

আগে এসেছিলেন কিসিংগার। কিসিংগার জাতে ইহুদী, জন্ম জার্মানীতে। জেনোসাইড বা গণহত্যার ব্যাপারটার সম্যক অর্থ তাঁর অজ্ঞাত একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। ১৯৬২-তে এই হেনরী কিসিংগার বলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সঙ্গে মিতালী করা 'নির্বোধ'-এর কর্ম। করাচীর 'ডন' পত্রিকা সেদিন কিসিংগারকে "হার্ভাড গুরু" এই বিশেষণে সম্মানিত করেছিল। তারপর অনেক জল অতলান্তিকে--প্রশান্তমহাসাগরে বয়ে গেছে। আজ কিন্তু কিসিংগার পরম প্রাজ্ঞ। বাংলাদেশ আর বেলসেনের ক্যাম্প যে একই বস্তু তিনি হয়ত তা মনে করেন না। দিল্লীতে বসে তিনি নাকি লক্ষ্মীকান্ত ঝাকে বলেছিলেন পাকিস্তানের ব্যাপার নিয়ে চীন যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কাছে কোনো সাহায্য আশা করবেন না। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন—একবার শরণার্থী শিবির দেখবেন? জবাবে বলেছিলেন—না, না, সেসব সময় নেই। তারপরই তিনি গেলেন সোজা ইসলামাবাদে, সেখান থেকে গোপন দৌত্যে পিকিং-এ। জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"For all his professorial background he looks and acts more like a spy than a learned emissary".

তাঁরই উপদেশে নিকসন মহোদয় ইয়াহিয়াকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন। চীন এবং আমেরিকা আজ ভাই-ভাই হতে চলেছে। কিসিংগারের রচনাদি থেকে বোঝা যায় তিনি একজন বুদ্ধিবাদী মানুষ, মানবিক সহৃদয়তার এতটুকু ধার ধারেন না। কঠোর বাস্তববাদী।

যাই হোক, কিসিংগার যা করেছেন তাতে ভারতবর্ষের পক্ষে ভালোই হয়েছে। মার্কিন শাসকচক্র যে কোনোকালেই ভারতবর্ষকে সুনজরে দেখেন নি, বরং মুখে হাসি অন্তরে গরল নীতি পালন করেছেন আজ সে অবস্থা অতি বড় জড়বুদ্ধির কাছেও সুস্পষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষে একশ্রেণীর মানুষ আমেরিকার অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে বলে এসেছেন—ওরা আমাদের বন্ধু, আমাদের আপৎকালের বন্ধু। আজ তাই কিসিংগারকে ধন্যবাদ—এইসব মানুষের জ্ঞানচক্ষু হয়ত এতদিনে একটু উন্মীলিত হবে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মার্কিন শাসকচক্রকে এক বীভৎস আকৃতিতে কিসিংগার প্রকাশিত করেছেন তার জন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এই-ই সব নয়। স্বদেশে ফিরে কিসিংগার যখন পরবর্তী প্যাঁচের পরিকল্পনা করছেন তখন এলেন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। আইরিশ-ক্যাথলিক বংশোদ্ভূত এই ভদ্র মানুষটি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পেরেছিল মার্কিন শাসকচক্র আর জনসাধারণ এক বস্তু নয়। সরকারী নীতির তীব্র সমালোচক একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী আজও মার্কিন মুলুকে আছেন। সেখানকার সংবাদপত্র প্রকৃতই স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তিতে শক্তিমান। কেনেডি এলেন ভারতীয় সরকারী ও বে-সরকারী মহলের সঙ্গে পরামর্শ করতে কিভাবে ত্রাণসামগ্রী বণ্টন এবং আহরণ করা যায়, স্বচক্ষে কোটি কোটি দুর্গত মানুষের দুর্দশা দেখতে, তারপর পিণ্ডি এবং ঢাকায় গিয়ে কথাবার্তা চালাতে। পিণ্ডি শেষ পর্যন্ত রাজী হল না তাদের বাঁশের পরদাঘেরা মুলুকে কেনেডি সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের প্রবেশের অনুমতি দিতে। এই সিদ্ধান্ত কেন যে পিণ্ডি নিয়েছেন সে বিষয়ে অনেক কানাঘুষা সংবাদও রটেছে। কেনেডি এবং তাঁর সমর্থক মার্কিন জনগণ পিণ্ডিকে যথেচ্ছভাবে সামরিক অস্ত্রসম্ভার এবং সাহায্যদানের বিরোধিতা করছেন। কেনেডির ভারত আগমনে ভারতবাসীর নজরে মার্কিন জনগণের চিত্রকল্প বা ইমেজ সুস্পষ্ট হয়েছে। মার্কিন মুলুকে কিসিংগারও আছেন আবার কেনেডিও আছেন। কেনেডি আমেরিকার বেসরকারি রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দুটি মহান দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের যে মনোভঙ্গী প্রকট হয়ে উঠেছিল, কেনেডির এই আগমনে তাও অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। "হাউজ অব রিপ্রেসেনটেটিভস" ইতিমধ্যেই পূর্ববাংলায় যতদিন না ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটছে ততদিন পাকিস্তানকে কোনরকম সাহায্যদান নিষিদ্ধ করেছেন। মার্কিন সেনেটও হয়ত অনুরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্রও ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য না করাটাই শ্রেয় মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন নিঃসঙ্গতার হতাশায় ভারত পিকিং ও পিণ্ডির সঙ্গে এখন আর সহসা কোনোরকম হাঙ্গামায় বিজড়িত হয়ে পড়বে না। সোভিয়েট-ভারত চুক্তি এইসব দেশের মধ্যে যে 'মনকষাকষি' বা 'টেনসান' চলছে তা তরল করে দেবে।

বাস্তুহারা সহায়ক সেনেট-সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কেনেডির প্রাথমিক কর্তব্য ত্রাণব্যবস্থা। কিন্তু স্বচক্ষে দেখে তিনি বুঝেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সমাধানে পূর্ববাংলাকে স্বাতন্ত্র্যদান করতে হবে। ঠিক স্পষ্ট করে সব কথা না বললেও অনেক কথাই তিনি বলেছেন। আর বলেছেন—শেখ মুজিবরের একমাত্র অপরাধ তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। আশা করা যায় কেনেডি এবং তাঁর সহধর্মী স্বদেশবাসীরা মার্কিন মুলুকের মনোভাবকে যথার্থভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন।

ভারতের পক্ষে কিসিংগার ও কেনেডি উভয় ব্যক্তির আগমনই ফলপ্রসূ হয়েছে একথা এখন বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

পটভূমি

জাতীয় পরিষদের আলোচনা থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির বিচার মনন স্পষ্ট। কারণ, কংগ্রেসের সংগে সহযোগিতার কথা বলা হলেও, কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সংগে সংগ্রামের আহ্বানও জানানো হয়েছে। আবার মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সংগে গণ আন্দোলনে সি পি এমের সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির এই নীতির কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পশ্চিম বাংলায়?

কংগ্রেসের, অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের, মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের আবিষ্কারে কি কেউ ভুল করেছেন? ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেস ভাগের সময়েই কি তাদের কবরস্থ করা হয়নি? তা হলে কি নতুন করে আবার তাদের অভ্যুদয় ঘটল? কংগ্রেস ভাগের সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ তা হলে কতোটা ঠিক?

অবিভক্ত কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীলের দল একই সংগে জোট বেঁধে ছিলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির এই থিওরি অনেক পুরোনো। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, মোরারজী দেসাইয়ের পদচ্যুতি, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—এই সবকে কেন্দ্র করে যখন কংগ্রেস ভাগ হল তখন সেই থিওরি প্রমাণিত হওয়ায় পার্টি স্বভাবতই উল্লসিত হল। অন্যান্য নেতাদের সংগে পশ্চিম বাংলার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও রণেন সেনও বললেন, ব্যক্তিগত বিবাদের ফলে কংগ্রেস ভাগ হচ্ছে না, হচ্ছে গণ-আন্দোলনের আঘাতে। গণ-আন্দোলনের ফলে দক্ষিণপন্থীরা এতই ভীত যে, তারা আর কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। সেই সংগে মার্কসবাদীদের সম্পর্কে একটু খোঁচাও মেরে দেওয়া হল: "আমরা যখন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের অস্তিত্বের কথা বলতাম তখন আমাদের অনেক কমরেড হেসেছিলেন, আর পার্টি ছেড়ে গিয়েছিলেন, সি পি আই (এম)। আজ সেই সব বিপ্লবীরাও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের জন্যে শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।"

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন তুংগে, ১৯৬৯ সালের সেই সেপ্টেম্বরে কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবেও স্বীকার করা হল যে, কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ মূলতঃ রাজনৈতিক—এক দিকে রয়েছে দক্ষিণপন্থীরা আর অপর দিকে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিরা। সুতরাং এখন কর্তব্য কী? কর্তব্য হল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা। সেই ফ্রন্ট পরে কেন্দ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গড়বে। সেই সরকারে বামপন্থীরা তো থাকবেনই, সেই সংগে থাকবে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ।

কংগ্রেস ভাগের পর পার্লামেন্টে যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে মনে হচ্ছিল ভারতের রাজনীতির গতি যেন কম্যুনিস্ট পার্টির ছকের সংগে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। না, জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হল না ঠিকই, কিন্তু টিঁকে থাকার জন্যে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে তো বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর বেশ কিছুটা নির্ভর করতে হল! তার ফলে চাপ দিয়ে সরকারকে বাম পথে নিয়ে যাওয়ারও বেশ সুবিধে হল। বামপন্থীদের বিরোধিতার জন্যেই তো কুখ্যাত আটক আইন নতুন করে পাস করানো গেল না।

কিন্তু এ বছর মার্চ মাসে সব যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দিবাস্বপ্ন গেল মিলিয়ে, বামপন্থীদের সমর্থনেরও দরকার রইল না শ্রীমতী গান্ধীর, তাঁর দল স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল দিল্লীতে। অন্য কেউ চাপ দিয়ে সেই সরকারকে কোনো বিশেষ পথে নিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনাও তিরোহিত হল। শ্রীমতী গান্ধী যা চান তিনি এখন তা-ই করতে পারেন। সংবিধান সংশোধনও এখন যেমন সহজ, তেমনই সহজ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিল পাস করানো।

এই পরিবর্তিত অবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির নতুন মূল্যায়ন তো অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবেই। এই সপ্তাহে দিল্লীতে পার্টির জাতীয় পরিষদ সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কংগ্রেস-ভাগের সময় পার্টি যে বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন সেই অনুযায়ী শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের মধ্যে শুধু গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিদের থাকার কথা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পার্টির বিশ্লেষণ

জন্য পথ নিচ্ছে। কারণ পার্টি এখন নতুন কংগ্রেসের মধ্যেও দক্ষিণপন্থীদের সন্ধান পাচ্ছেন। পুরোনো কংগ্রেসের মতো এই কংগ্রেসের মধ্যেও চলছে দক্ষিণপন্থীদের সংগে বামপন্থীদের লড়াই। সেই লড়াইকে পার্টি জোরদার করে তুলতে চায় সম্মিলিত গণআন্দোলনের দ্বারা। সেই লড়াইয়ের পরিণতিতে আবার কংগ্রেস ভাগ হবে। আর সেই কংগ্রেস ভাগের পর কেন্দ্রে বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গঠনের সত্যিকার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

তা হলে কি এর আগে নতুন কংগ্রেস সম্পর্কে পার্টির বিশ্লেষণে কোনো ভুল ছিল? মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণই কি ছিল তবে সত্যের কাছাকাছি? কারণ, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রগতিশীলদের সংগে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বন্দ্ব, এ-কথা মার্কসবাদীরা মানতে চাননি। অবশ্য তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভি ভি গিরিকে সমর্থন করেছিলেন, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণেও শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্তের ভাষায়, জল্লাদের দড়ি যেমন ফাঁসির আসামীকে 'সাপোর্ট' দেয় এই 'সাপোর্ট'ও ছিল তেমনই!

এবারের জাতীয় পরিষদের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, কম্যুনিস্ট পার্টি যেন আবার ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই যাত্রা সুরু করছে। প্রগতিশীল পথে সরকারকে চালিত করার জন্যে তখনও পার্টি প্রস্তাব নিয়েছিল গণ-আন্দোলন সুরু করার। এবারের প্রস্তাবেও রয়েছে সেই ধরনের আন্দোলনেরই ডাক। মধ্যে ১৯৭০ সালের কোনো প্রস্তাবে কিন্তু এই ধরনের ডাকের বিশেষ আভাস ছিল না। তবে দু বছর আগে কম্যুনিস্ট পার্টির আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অনেক স্পষ্ট—সিণ্ডিকেট। এখন সেটা ততটা স্পষ্ট নয়। কারণ, এখন কংগ্রেসের মধ্যে কারা দক্ষিণপন্থী, পার্টি সে-কথা স্পষ্ট করে বলছে না।

এই গণ-আন্দোলন কেন চাই? বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাতেই শুনুন: 'সি পি এম সব উদ্যোগটা ছেড়ে দিতে চায় শ্রীমতী গান্ধীর ওপর। আমরা চাই, প্রগতিশীল নীতির সমর্থনে ও চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা নিজেরাই সেই সুযোগ হাতে তুলে নিক। আমরা মনে করি এই ধরনের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঝোঁককে শক্তিশালী করে তুলবে এবং সব চরমপন্থী চক্রান্তকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।' বিশ্বনাথবাবুর মুখে কথাগুলো শোনা গিয়েছিল ঠিক দু বছর আগে, কিন্তু এখনও শোনা যেতে পারত। কারণ জাতীয় পরিষদের এবারের বৈঠকেও তো এই সুরই শোনা গেল।

•

গণআন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টি যাদের সাহায্য চেয়েছে তাদের মধ্যে মার্কসবাদী

কম্যুনিস্ট পার্টিও আছে। সি পি আই সোস্যালিস্টদেরও সমর্থন চায়, কিন্তু সোস্যালিস্টরা যে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নয় তাতে পার্টি মোটেই খুশি নয়। দু' বছর আগেও সি পি আই সমালোচনা করেছিল এস এস পি'র, তখন তার কারণ ছিল এস এস পি'র অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতা। এস এস পি যে তখন যেন-তেন-প্রকারেণ শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের পতনে ঘটাতে সচেষ্ট ছিল, সেটা কম্যুনিস্ট পার্টি ভালো চোখে দেখে নি। এখন নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরাগের কারণ, ঐ দল কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলাবে না, কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও হাত মেলাবে না।

কিন্তু সি পি এমের সঙ্গে একত্র গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা কতোটুকু? পশ্চিম বাংলায় বন্ধ ডাকার ব্যাপারে এ আই টি ইউ সি ও সিটু গলা মিলিয়েছে। কিন্তু এটা কি দেশব্যাপী মিলিত আন্দোলনের সূচক?

একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা শুনুন। সি পি এমের পোলিটব্যুরোর সদস্য এ কে গোপালন গত ১ জুলাই সি পি আই সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকে একটি চিঠি দেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে সঙ্গে সি পি আইয়ের কাছ থেকেও এ-ব্যাপারে সহযোগ প্রার্থনা করেন শ্রীগোপালন। সি পি এমের মতো সি পি আই-ও পার্লামেন্টে এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাই শ্রীগোপালন চেয়েছিলেন সি পি আইও গণ-আন্দোলনে সামিল হোক।

শ্রীরাও এই চিঠির জবাবে কী বললেন? তিনি স্বীকার করলেন যে, তাঁদের পার্টি পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে এই আইনের বিরোধিতা করছে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে যদি যৌথ আন্দোলন চালাতে হয় তবে তার আগে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা তো রাজনৈতিক হত্যা ও সন্ত্রাসের ফলেও গুরুতরভাবে লংঘিত হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। এই হত্যা ও সন্ত্রাস আমদানি করেছে সি পি এম এবং আরো কয়েকটি দল। যদিও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কর্তৃক আহূত বৈঠকে সি পি এম যোগ দিয়েছে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে সি পি এম এখনও সংকীর্ণ মনোভাব গ্রহণ করে চলেছে। তা ছাড়া অনেক এলাকাতেই সি পি এম এখনও শ্রীরাওয়ের পার্টির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

শ্রীরাও আরো জানতে চাইলেন: বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের এবং ঐ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেই বা আপনাদের মনোভাবটা কী? পশ্চিম বাংলায় আপনাদের দলের পক্ষ থেকে যে-সব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় আপনাদের দল শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর বিরোধী। আমরা তো এর কারণ বুঝতে পারি না। তা ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যাকে আমরা একটা জাতীয় সমস্যা বলে মনে করি। কিন্তু আপনাদের দল এই ব্যাপারেও ভারত সরকার ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে সহযোগ করতে চায় না। কংগ্রেস দল ও ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগ না করে কি আমরা বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করতে পারব? তাই এই প্রশ্নেও আমরা আপনাদের মনোভাব ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোপালন অবশ্যই এই চিঠির জবাব দিলেন—দুটো অভিযোগই অস্বীকার করলেন এবং সেই সঙ্গে সি পি আইয়ের প্রতি কটূক্তি করতেও ছাড়লেন না। কেরল, বিহার, পশ্চিম বাংলায় সি পি আই কংগ্রেসের মিত্র, সুতরাং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যিকার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সি পি আই একটু অস্বস্তি বোধ করবে বৈকি!

গোপালন তাঁর চিঠিতে পশ্চিম বাংলার শরণার্থী ও বাংলাদেশ সম্পর্কে সি পি এমের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। তার উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই পত্রালাপ থেকে এটুকু অন্ততঃ

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

মিত্র-ঘোষ বাংলা পকেট বইয়ের মোট চোদ্দ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা পছন্দমতো নীচের বইগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচখানি একসঙ্গে কিনবেন তাঁরা ২৩শে আগষ্ট থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট সাড়ে আট টাকায় পাবেন। অবশ্য ডাকে নিলে ডাক খরচ আলাদা লাগবে।

উপন্যাস

১) দূরের জানলা—আশাপূর্ণা দেবী
২) সাদা ঘরবার—অবধূত
৩) অলৌকী জলপ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৪) শুধু মনে রেখো—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৫) নিরালা প্রহর—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৬) আগুন কখনো নেভে না—মন্মথনাথ ঘোষ
৭) স্বর্ণচাঁপার দিন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৮) অথবা মাধুরী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৯) দূরের নীড়—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১০) অর্ণানের দিন—বাণী রায়
১১) ফুল কাঁটা—বিমল মিত্র

ভ্রমণ কাহিনী

১২) দুন্দেশ্বর—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রূপচর্চা

১৩) রূপ ও প্রসাধন—ডাঃ এন, আর, গুপ্ত

সহজ ভাগ্যগণনা

১৪) নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন—জ্যোতিষ

প্রতি গ্রন্থ দুই টাকা : শোভন স্বতন্ত্র প্রচ্ছদপট : সুন্দর ছাপা

মিত্র ও ঘোষ   ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২ : ফোন : ৩৪৩৪৯২ ॥ ৩৪৮৭৯১

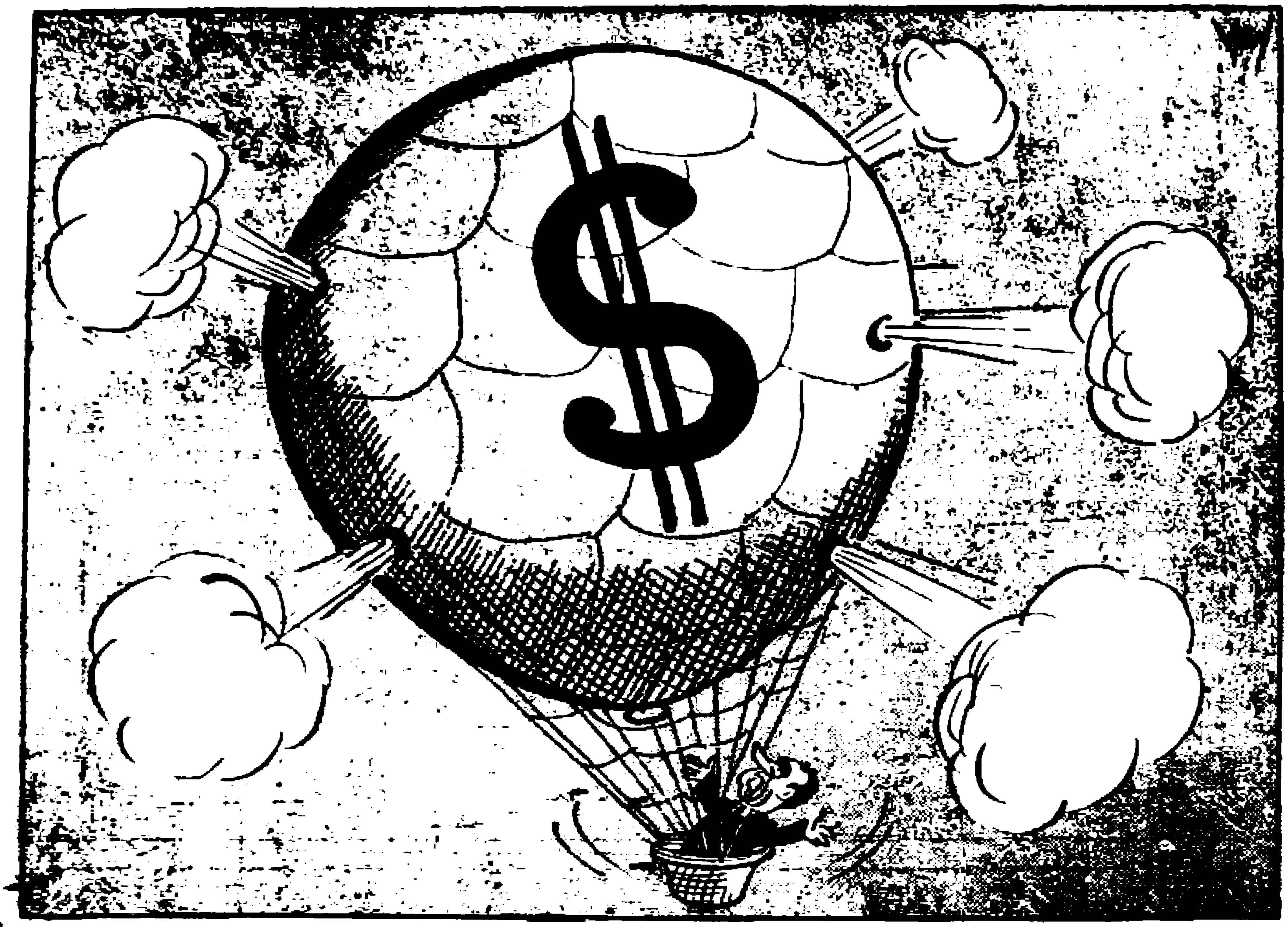

স্পষ্ট যে, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মিলিত আন্দোলনের পথে বাধা বড়ো কম নয়।

•

পশ্চিম বাংলায় এখন কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি কী হবে? এখানেও কি পার্টি প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে সহযোগ করবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে চালাবে লড়াই?

গত বছর এই সময় নাগাদ পার্টির জাতীয় পরিষদ পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলেছিলেন: প্রথমে আট পার্টি জোট বাংলা কংগ্রেসকে টেনে আনবে না পার্টি হবে, তারপর সেই জোট একটা নির্বাচনী সমঝোতায় আসবে কংগ্রেসের সঙ্গে। কিন্তু সে-স্ট্র্যাটেজি যে শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত করা যায়নি তার কারণ, পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখার নেতাদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় মোটেই রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা যথেষ্ট প্রগতিশীল নন, সুতরাং ওঁদের সঙ্গে সমঝোতা বাঞ্ছনীয় নয়। আট-পার্টির অন্যান্য শরিকেরাও ছিলেন এই ধরনের সমঝোতার বিরোধী। পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে জাতীয় পরিষদের নির্দেশ এইভাবে বানচাল হয়ে যায় দেখে ভবানী সেন প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতারা কলকাতায় ছুটে এলেন, সহকর্মীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন, তবু কিছুতেই কিছু হল না। জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব শিকেয় উঠল।

•

এই বছর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি তথা আট-পার্টি জোট যখন মোটেই সুবিধে করতে পারল না তখন কিন্তু পার্টির মধ্যে এই সমালোচনা দেখা দিল যে, জাতীয় পরিষদের নির্দেশ অমান্য করার জন্যেই নির্বাচনী ফল এমন হল। পার্টির তরুণতর সদস্যরা তো প্রায় বিদ্রোহই করে বসলেন। প্রধানতঃ তাঁদের চাপেই সাধারণ সম্পাদক ডঃ রণেন সেনকে বিদায় নিতে হল এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার জন্যে এখন যে চেষ্টা চলছে তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আসবে কিনা তা নির্ভর করছে এর ওপর। অনেকে তো এমন কথাও বলছেন, কংগ্রেসকে প্রগতিশীল চেহারা দেওয়ার জন্যে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ যে চেষ্টা করছে তার পেছনে কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের মদৎ রয়েছে। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাঁদের সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির আপত্তি ছিল তাঁদের মধ্যে বিজয় সিং নাহার বিদায় নিয়েছেন। বিজয়বাবুর জায়গায় নতুন সভাপতি এখনও নির্বাচিত হন নি, আবদুস সত্তার কাজ চালাচ্ছেন। তবে শীঘ্রই নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। এই পদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আছেন তরুণকান্তি ঘোষ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাব কী হবে? পার্টি কি কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ায় উদ্যোগী হবে? যদি উদ্যোগী হয়, তবে কি কম্যুনিস্ট পার্টি আট-পার্টির অন্যান্য শরিক যা ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট ইউনিট সেন্টার প্রভৃতির সহযোগিতা এ-ব্যাপারে আশা করতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তরের ওপর পশ্চিম বাংলায় রাজনীতির গতি অনেকটাই নির্ভর করছে।

২০।৮।১৯৭১ লেখক

দেশে বিদেশে

ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজের ডিরেক্টর কে সুব্রহ্মণ্যম সম্প্রতি বাংলা দেশের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মতো একটি হিসাব দিয়েছেন। বাংলা দেশে এখন মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে মাসে আন্দাজ এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য খতম হচ্ছে আর বাংলা দেশ থেকে আশ্রয়প্রার্থী আসছেন দিনে প্রায় ৫০ হাজার হারে। মাসে নূতন করে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য তৈরি করার খরচ এবং মাসে প্রায় বারো লাখ লোককে আশ্রয় দেওয়ার খরচ, এই দুটি অঙ্কের তুলনা করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলা দেশের উপর দখল বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে পাকিস্তানকে যে খরচের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে হচ্ছে তার বহুগুণ বেশী বোঝা সে ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম এটাকে পাকিস্তানের 'লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি' অর্থাৎ কম খরচে কাজ উদ্ধারের কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

এই কৌশলের একটি অংশ হল, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া। পাকিস্তানের ধারণা, মুক্তি বাহিনীর আসল জোর ও আসল ঘাঁটি হল ভারতে। এই বাহিনীর লোকেরা অবাধে সীমান্ত পার হয়ে যাতায়াত করতে পারছে বলেই তারা পাকিস্তানী বাহিনীকে এতটা বেগ দিতে সমর্থ হচ্ছে। পাকিস্তান এই অবাধ যাতায়াতের সুযোগ বন্ধ করতে চাইছে, আর সেই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীদের ভারত-অভিমুখী স্রোত বজায় রাখতে চাইছে। এইভাবে সীমান্তের লোক চলাচলকে একমুখী করতে পারলে পাকিস্তানের লাভ আর ভারতের লোকসান।

অথচ, পাকিস্তান জানে যে, সীমান্তে এই খবরদারি করা তার একার শক্তিতে কুলোবে না। সেই কারণেই সে এর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘকে জড়াবার জন্য জোর কোশিস চালিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘের লোকেরা এই খবরদারির কাজটা যদি ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীবাহিনীর সঙ্গে ভাগ করে নেন তাহলে পাকিস্তানের সুবিধা হতে পারে, এটাই সেদেশের জঙ্গীশাহীর হিসাব। আমেরিকার আশীর্বাদ, প্রশ্রয় ও সহযোগিতা নিয়ে ইসলামাবাদ প্রথমে চেষ্টা করেছিল সীমান্তের এপারে-ওপারে রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাই-কমিশনারের প্রতিনিধিদের নিয়োগ করতে। ভারত সরকার তীব্র আপত্তি করায় সেই চেষ্টা ফেঁসে গেছে। এরপর পাকিস্তান সামরিক নিরাপত্তা পরিষদকে জড়াবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের প্রস্তাব হল, নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি পাঠান। এই প্রস্তাবের পরিণাম কি হল তার পাকাপাকি খবর-একদম পাওয়া যায় নি, তবে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা গেছে যে, প্রধানত সোভিয়েট রাশিয়ার মনোভাব দেখেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা এই প্রস্তাব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাইছেন না।

কিন্তু পাকিস্তান তার চেষ্টা ছাড়ছে না, ছাড়বে বলে মনেও হয় না। বাংলা দেশের সমস্যাটিকে আসলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যারূপে উপস্থিত করে রাষ্ট্রসংঘকে ডেকে আনার জন্য ইসলামাবাদের পাণ্ডারা যে কোন ছলছুতোকে কাজে লাগাতে ছাড়বেন না। এই কারণেই মধ্যে মধ্যে সংবাদ রটনা করা হচ্ছে, 'আশ্রয়প্রার্থী' সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চায়, ইয়াহিয়া খাঁ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চান ইত্যাদি।

পাকিস্তানের এই কৌশলেরই আর একটি দিক হচ্ছে সীমান্তে ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করা। কাছাড় ও ত্রিপুরার মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য পাকিস্তান যেসব নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যেই তার প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৪ আগস্ট তারিখে উত্তর সীমান্ত রেলওয়ের চারগোলা রেল স্টেশনের কাছে একটি কালভার্টের ধারে পাতে রাখা পাকিস্তানী মাইনের আঘাতে একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। একটি রিলিফ ট্রেন যখন ঘটনাস্থলে আসছিল তখন সেটিও অনুরূপভাবে বিপন্ন হয়। পরে রেললাইন ও সড়ক থেকে আরও দুটি মাইন পাওয়া যায়। পাঁচদিন বাদে ঐ ঘটনাস্থলের কাছেই রেলওয়ের একজন টহলদার আরও দুটি পাকিস্তানী মাইন আবিষ্কার করে অল্পের জন্য আর একটি ট্রেন দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। সীমান্তে পাকিস্তানী উত্তেজনা সৃষ্টির আর একটি ঘটনা হল সম্প্রতি ত্রিপুরার কমলপুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে পাক ফৌজের হানাদারি। এই হানাদারিতে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

●

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন সেগুলির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য : এক, দেশের ভিতরকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলা এবং দুই, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলারের উপর চাপ কমানো। দেশের ভিতর মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার জন্য, দর্শনীয় ক্ষেত্রে যে মন্দা দেখা দিয়েছে, বেকারী বেড়ায়ে যাওয়া সেসবের মোকাবিলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন তিন মাসের জন্য মজুরী ও দর বন্দি বন্ধ রাখার, সরকারী খরচ কমাবার, কোন কোন ক্ষেত্রে ট্যাক্স কমাবার ও দর্শনীতে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিপুল ঘাটতি ডলারের উপর যে চাপ সৃষ্টি করছে তার সামাল দেওয়ার জন্য আমদানী শুল্ক দশ শতাংশ বাড়াবার, ৩৫ ডলারের বিনিময়ে এক আউন্স সোনা কেনা-

সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থমালা

বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া
ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন। [১০·০০]

উদ্বাস্তু
স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধানের ইতিহাস। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। [১০·০০]

রবীন্দ্র চিত্রকলা
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
গুরুদেবের ছবি উপলব্ধি করার বই। ২১ মুদ্রে ছবি। [১৫·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি
ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। সার্থক বই। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী
শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। ১০ বিরল মানচিত্র। [৬·৫০]

বাঁকুড়ার মন্দির
শ্রী———— বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ আর্ট প্লেট। [১৬·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা
———। তিন পুরুষের কথা। [১২·০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

ক্রোড় এবং ডলারের সঙ্গে অন্য বৈদেশিক মুদ্রার অবাধ বিনিময়ের ব্যবস্থা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে আমেরিকা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ১৯৪৬ সালের ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডলার হচ্ছে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা যেটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে প্রতি আউন্স সোনা ৩৫ ডলার দরে কেনাবেচা করার জন্য মার্কিন সরকারের বাধ্যবাধকতা। সোনার সঙ্গে ডলারের বাঁধা দাম আর ডলারের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অকম্যুনিস্ট দেশের মুদ্রার বাঁধা দাম —এই পটভূমির ভিত্তিতেই এতদিন ধরে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাট্টাহার নির্দিষ্ট হয়ে আসছিল আর সেই হারে আমদানী-রপ্তানীর বাণিজ্য চলছিল। এখন আমেরিকা তার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করায় গোটা ব্যবস্থার উপর টান পড়েছে। সবচেয়ে বেশী টান পড়েছে জাপানের ইয়েন, জার্মানীর ডয়েটস্‌মার্ক প্রভৃতি মুদ্রার উপর। ডলারের হিসাবে এদের বাট্টাহার বাড়ানই আমেরিকার উদ্দেশ্য।

২০-৮-৭১ —পদাতিক

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

শুধু সংখ্যায় নয়, সম্পদে। সংকলনের আসল পরিচয় তার রচনার সৌন্দর্যে আর শিল্পকলার ঐশ্বর্যে। 'অমৃত' তার শারদীয় নিবেদনে তাই এনেছে এবার সযত্নে সংগৃহীত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার। সঙ্গে থাকছে অসংখ্য ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরী

বঙ্কিমচন্দ্রের সোনালতায় রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্য লাইব্রেরীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। এবং রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র।

সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে মিশিয়াছিলাম অল্পবয়সেই। তখন ভদ্রগৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতে ও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না, কিন্তু সে মহল হইতে পিঠের ওপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ আধুনিক কালে সেই মহলটার দেউড়িতে তেমন লোকবল নাই, কিন্তু কবুল করিতে হইবে আমি আইন মানি নাই।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ।
স্বহস্তলিখিত স্বরলিপিসহ।

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রবোধকুমার সান্যালের **কমরেড**

বুদ্ধদেব গুহর **পারিধী**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **খনির নতুন মণি**

বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-নাটক

দ্বিরাগমন

প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ আর তরুণ লেখকদের সুনির্বাচিত গল্প-সংকলন।
এবং একাধিক রস-রচনা, শিকার কাহিনী, ভ্রমণ-কথা।

আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ কবি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত তরুণতম কবিদের কবিতা-সংকলন।

আজকের চলচ্চিত্র, তার মঞ্চের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন বর্তমান সময়ের অগ্রণী চিত্র-পরিচালক, চিত্র ও নাট্য সমালোচক।

খেলাধুলো নিয়ে লিখেছেন খ্যাতনামা ক্রীড়া সমালোচক।

দাম : সাড়ে চার টাকা * ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা তিন

মজলিশী মানুষ অতুলপ্রসাদ

সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উনিশ শতকের শেষে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় 'খামখেয়ালী সভে'র আসর বসিয়েছিলেন। কবিগুরুর ডাকে সে আসর জমাবার জন্য যোগ দিয়েছিলেন সে যুগের দিকপালেরা। সঙ্গীত সাহিত্য নাটক ও বঙ্গ সংস্কৃতির বিদগ্ধ মানুষেরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সেদিন ভীড় জমিয়েছিলেন' অতুলপ্রসাদ তখন সবেমাত্র প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরেছেন ব্যারিস্টার হয়ে। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহেবীয়ানায় পাকা হলেও অতুলপ্রসাদ চিরদিন বঙ্গ সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক ও পূজারী। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গান অতুলপ্রসাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। আইনের আঙিনা কোনদিনই অতুলপ্রসাদকে ততটা প্রলুব্ধ করতে পারে নি, যতটা সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের মজলিশ তাঁর রসিক মনকে আকর্ষণ করেছে' রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অতুলপ্রসাদ 'খাম-খেয়ালীর' আসরে কনিষ্ঠতম সভ্য হিসাবে যোগ দিলেন। নতুন ব্যারিস্টার হিসাবে তখন কোলকাতার হাইকোর্টে পসার জমাবার জন্য অতুলপ্রসাদ যাওয়া-আসা করছেন। তখনকার দিনে বাঘা বাঘা পুরোন ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার শক্তি অতুলপ্রসাদের কোথায়? শুকনো আইনের খুঁটিনাটি তাঁর রসিক মনের সঙ্গে কিছুতেই যেন আর খাপ খায় না। তাই তিনি সুযোগ পেলেই, হাইকোর্ট ছেড়ে ছুটে চলে যেতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অথবা শান্তিনিকেতনে - সাহিত্য-সঙ্গীত মধু আহরণের চেষ্টায়। মজলিশী মানুষ অতুলপ্রসাদ 'খামখেয়ালী' আসরে দেখা পেতেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুর বাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির। এ আসরে আরও যাঁরা জমায়েত হতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লোকেন পালিত, নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। ঘুরে ঘুরে এক এক সভ্যের বাড়ীতে 'খামখেয়ালী'র আসর বসত। শেষে অতুলপ্রসাদেরও ডাক পড়ল তাঁর বাড়ীতে খাম-খেয়ালীর আসর বসাতে। সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা, গানের আসর এবং অন্নের সমাপনে হিসাবে প্রচুর খানাপিনা। অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে যেদিন এই আসর বসে, সেদিন রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ফিরতে রাত বারোটা বেজে গেল।

অতুলপ্রসাদের আর কোলকাতায় থাকা হল না। রোজগারের তাগিদে একদিন তাঁকে 'খামখেয়ালী' আসর থেকে বিদায় নিয়ে কোলকাতা ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ের দিকে রওনা হতে হ'ল। সাহিত্য সঙ্গীতের এইসব মহারথীদের সম্পসংস্রাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অতুলপ্রসাদের রসগ্রাহী ও মজলিশী মন স্বভাবতই ব্যথা পেল। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে এসে তাঁর নিজের রসিক গোষ্ঠী তৈরী করতে বেশী দেরি হল না। তিনি নিজে বহু গান রচনা করেছেন, লক্ষ্ণৌ বসে এবং তাতে সুর দিয়েছেন নিজে। আর সেইসব গান তিনি নিজে গেয়ে শোনাতেন লক্ষ্ণৌর বিদগ্ধ মানুষদের কাছে। তাঁর গান শুনে বহুলোক তাঁর সঙ্গলাভের আশায় অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া আসা শুরু করলেন। বাড়ীর আড্ডায় যাঁরা প্রায়ই আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দল। যথা রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও অতুলপ্রসাদের বাড়ীর গানের আসরে যোগ দিতেন অম্বিকা মজুমদার, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। এর ওপর রবীন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌ যেতেন অতুলপ্রসাদের আহ্বানে তাঁর অতিথি হয়ে তখন তো আসর আরও সরগরম হত। অতুলপ্রসাদের কবি মন যে শুধু বাংলা সাহিত্য ও গানে নিবদ্ধ ছিল তাই নয়, তিনি হিন্দুস্থানী ও উর্দু গানের জলসা ও মুশায়রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। অবাঙালী এবং হিন্দী, উর্দু ভাষাভাষীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের অদ্ভুত মিল ঘটেছিল। ফলে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতীয়দের প্রাণের ও মনের মানুষ হয়ে ছিলেন।

আইনের আঙিনায় যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে অতুলপ্রসাদ সেদিন সমগ্র উত্তর ভারতের আইনজীবীদের সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁর ব্যবহারিক জীবন শুধু আইন আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর মজলিশী মন সব বাধা বিপত্তি, অবসাদ অতিক্রম ছাপিয়ে সঙ্গীতের মজলিশে আত্মনিবেদন করেছিল। রোগনিন্দা, সমাজ নিন্দা এমন কি পারিবারিক অশান্তিকেও তুচ্ছ করে তিনি অবাধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লক্ষ্ণৌর তৎকালীন প্রখ্যাত বাইজীদের বাড়ীতে বসে গান শুনেছেন, তারিফ করেছেন এবং লক্ষ্ণৌর ঠুংরী থেকে রসাস্বাদন করে তাঁর নিজের রচিত বাংলা গানে সেই আহরিত সুরকে সংহতভাবে ব্যবহার করেছেন এবং এইসব গান বাংলা গানের সামগ্রিক মহলাই শুধু বাড়ায় নি উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাইজীরা অতুলপ্রসাদকে অত্যন্ত সমীহ ও সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তাঁর অনুরোধে একের পর একটা গান শোনাতে তাদের আনন্দ ও আগ্রহের শেষ ছিল না। বাইজীদের এইসব গানের জলসায় অতুলপ্রসাদের প্রধান সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গানের মহল থেকে খবরাখবর এলে অতুলপ্রসাদকে দিতেন যে আজ অমুক নায়করা এক বাইজী গান করবেন তখনই অতুলপ্রসাদের সুরসিক মজলিশী মন সেই আসরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। বাইজীরা অতুলপ্রসাদের কাছে আলাদাভাবে ইনাম পেতেন বলেই যে অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে ব্যস্ত হতেন তা নয়, শ্রোতা যদি সঙ্গীতাদের সমঝদার শ্রোতা হন তবে শিল্পীদের গান শোনানও

মাণ্ডে বা মণ্ডা ক্লাবের মজলিশ

লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে একটি পারিবারিক মজলিশে

সার্থক হয় এবং এই কারণেই অতুলপ্রসাদকে শিল্পী বাঈজীর দল গান শোনাতে এত ভালোবাসতেন। শুধু মজলিশী গানই নয়, অর্থাৎ উর্দু গজল বা হিন্দী ঠুংরী নয়, তাঁরা কেউ কেউ অতুলপ্রসাদ রচিত ঠুংরী বা টপ্পা ঢং-এর বাংলা গানও গাইতেন। ক্ষেনাক্সের মোতিবাঈ, সিদ্ধেশ্বরী-বাঈ প্রমুখ গায়িকারা অতুলপ্রসাদ রচিত বাংলা গান বিশেষ করে 'শ্রাবণ ঝুলাতে' 'বাদল ঝুমঝুমে বোলে' গানগুলি অনবদ্য কণ্ঠে গাইতেন।

অতুলপ্রসাদের এই রসিক মজলিশী চরিত্রের জন্য একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে বড় ছোট নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ হত। তাঁর দীর্ঘ দেহ উদাত্ত কণ্ঠে গান, প্রাণ-খোলা হাসি, শান্ত-সৌম্য প্রেমিক চেহারা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে শুধু সাহিত্য সঙ্গীতের আসরে অথবা সামাজিক ব্যাপারে নয় উচ্চ রাজনৈতিক মহলেও তাঁর পাকা আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যর র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড থেকে শুরু করে ভারতের মহাত্মা গান্ধী, মহামতি গোখলে, পন্ডিত মতিলাল ও তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু, স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা তাঁর সহজ সরল ও উদার চিত্তের পরিচয় পেয়ে, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙালী, হিন্দুস্থানী উর্দুভাষী মুসলমান উত্তর ভারতের খৃষ্টান, পারসী, জৈন এবং জোরাষ্ট্রিয়ান প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর গভীর শোক এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁরাই তাঁর মৃতদেহ বহন করে গোমতী নদীর তীরে চৌপ কুন্ড শ্মশানে দাহ করেছিলেন। এইস-

ধর্মাচারী মানুষদের অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে কী শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল তার পরিচয় তাঁর জীবিতকালেই বাড়ীর সামনের রাস্তার নাম পরিবর্তন করে এ পি সেন রোড নামাঙ্কিত করা ও মৃত্যুর পর লক্ষ্ণৌর পৌর প্রতিষ্ঠানের বাগানে একটি আবক্ষ মর্মর প্রতিমূর্তি স্থাপনের মধ্যে প্রমাণিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে তিনি কবির অতিথি হয়ে রামগড় পাহাড়ে গিয়ে দশ দিন বাস করেছিলেন। এই দশটা দিন প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কবিতা গান বাজনা এবং হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে কেটেছিলো। সেবার রামগড়ে গাইয়েদের এাহস্পর্শ লেগেছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ—এই তিনজনের গানে রামগড় সেদিন মুখরিত হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের সুর রসিক ও মজলিশী মনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ আগেই পেয়ে-ছিলেন তাই অতুলপ্রসাদকে তাঁদের কবিতা গানের আসরে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদগ্রীব হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে অতুল-প্রসাদের বাড়ীতে তাঁকে ঘিরে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে গানের মজলিশ বসত। এই মজলিশে অতুলপ্রসাদ বেশীর ভাগ সময় নিজের লেখা গীতি কবিতা পড়ে শোনাতেন, উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতেন এবং হাসি রসিকতায় পরিহাসে তাদের মুগ্ধ করতেন। অতুলপ্রসাদ ছাড়াও যাঁরা গাইয়ে, শ্রোতারা থাকতেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের গান অথবা অতুলপ্রসাদের কাছে শেখা তাঁরই রচিত গান গাইতেন। আর অতুল-প্রসাদ তন্ময় হয়ে শুনতেন এবং বাহবা দিতেন। গান ছাড়া সাহিত্যের আসরও বসতো এই মজলিশে। এইসব গুণী-মনীষীরা তাদের নিজেদের লেখা প্রবন্ধ কবিতা গল্প ইত্যাদি পাঠও করতেন। তখন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বিখ্যাত ব্যারিস্টার সাহেবকে বঙ্গ ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক-রূপেই দেখা যেত। উপস্থিত সকলে এই সাপ্তাহিক মজলিশগুলি খুবই উপভোগ করতেন এবং তাঁদের প্রিয় অতুলদা মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসাবে চা জলখাবার ও মিষ্টি ফল খাইয়ে সকলকে বিদায় দিতেন। এদের মধ্যে মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের বন্ধু পুত্র দিলীপকুমার রায়ও থাকতেন। আরেকটি লক্ষ্ণৌবাসী কমবয়েসী ছেলের গান শুনে অতুলপ্রসাদ তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেই ছেলেটির নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। পরে যিনি পাহাড়ী সান্যাল নামে বাংলা-দেশের ছায়াছবির রাজ্যে খ্যাত হয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের খুব ভাব জমেছিল আর এই ভাব জমাবার ইন্ধন জুগিয়েছিল দুজনের সঙ্গীত পিপাসু প্রাণ।

লক্ষ্ণৌর বিদগ্ধ মানুষদের মজলিশে

এই সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন—'আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সঙ্গীতের সূত্রে, সঙ্গীতের আসরে। আমার প্রিয় গানের রচয়িতা হিসাবে যুবা বয়স থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। সবুজপত্রের বৈঠকে তাঁর মুখে তাঁর গান শুনি। কৈশরবাগে (লক্ষ্ণৌ) তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গান বাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গান বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভালো গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন। অস্ফুট চীৎকার করতেন, মুখ থেকে উর্দু জবান বেরুতো। এক স্থানে বসে থাকতে পারতেন না আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন 'দেখ একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনো। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই।' শারীরিক উত্তেজনা অল্পক্ষণের জনাই তাঁকে অভিভূত করতো। তারপর ধীরে ধীরে নামতো তাঁর মুখে সর্বাঙ্গে এক সুস্মিত কমনীয়তা। যার স্মৃতি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ধূর্জটিপ্রসাদ আর এক জায়গায় লিখেছেন—তিনি নিজের গান আসরে ভালো গাইতে পারতেন না সভায় অতি সহজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারাতেন সুর সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরে তাঁর গলা খুলতো। সবচেয়ে ভালো শোনাতো গুন গুন করে গাইবার সময়। তাঁর গাওয়ার মধ্যে একটি কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে, সেটা হল অবসর। আরম্ভ করবার পূর্বেই গানকে অবসর দিতেন, চোখ বুজে জমি তৈরী করতেন। কালো ভেলভেটের ওপর জামদানির কাজ আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে থাকতুম। গান গাইবার সময় প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন। বাক্যের সঙ্গে অর সম্বন্ধটি উপলব্ধি করবার জন্য উদগ্রীব হতাম। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতের কম্পিত মুখচ্ছটা, রাগ হতো সম্ভ্রমের সংবৃত কুশলতা। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। কবির কবিতা শুনতে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বলতেন 'লিখতে লজ্জা হয় ইচ্ছে হয় কেবল পড়ি। কিন্তু হঠাৎ যেন হাত কি রকম করে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য কবির রচনা পড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তুলসীদাস ও কবীরের দোঁহা, মীরাবাঈর ভজন তাঁর প্রিয় ছিলো। কিন্তু সাত রাজার ধন মানিক তাঁর নিজের ভাষা বাংলা ভাষা। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহিত্য সভায় যোগ দেওয়া ছিলো তাঁর নেশা। তাঁর সঙ্গে একাধিক সভায় যোগ দিয়েছি। তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা খুলে যেত। গল্প আর গান, গান আর গান। কানপুরে রাত দুটো পর্যন্ত গাইলেন। দিল্লীতে জয়ন্তী উৎসবে রাত বারোটা পর্যন্ত—শেষকালে জোর করে বাড়ী পাঠালাম। গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্র তিনি গিয়েছেন। সকলকে মুগ্ধ করেছেন কেবল সৌজন্যে নয়। সাহিত্য-প্রীতি সংক্রমণে অমন রসিক সুজন দুর্লভ। রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। পর্ণকুটিরে ভৈরবীর ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির সেন সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙ্গা খাটিয়ার ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গান শুনলেন। বেলা বারোটা হ'ল। ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানি নোট গুঁজে দিলেন—'ওর কিমী-রোজ তর্জমা' নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। লক্ষ্ণৌয়ে একজন পাগলী আছে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখনও অদ্ভুত টোড়ি আর ভৈরবী গায়। অতুলদা শুনেই সংবাদ দাতাকে পাঁচ টাকা দিলেন। তাকে নিয়ে এস, নিয়ে এস, নিয়ে এস। সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেওয়ার সময় তিনি বললেন 'ওটা তোমার কাছেই থাক। যখন খুঁজে পাবে ধরে নিয়ে এস।' বুঝলাম এটা সুখবরের পুরস্কার। রাজকুমারের গজমোতির মালা দান, না হয় সংবাদদাতাকে সাহায্য। যে খবর এনেছিল সে ছিল বিদেশী সঙ্গীত শিক্ষার্থী। ছোট মুস্রে ওয়াজিদ আলি শা-এর দরবারে শেষ গায়ক। এসে জুটেছিল অতুল সেনের বৈঠকখানায়। আলিম হোসেন লক্ষ্ণৌর শেষ বিখ্যাত সানাইয়া কৈশরবাগে থাকতে ভোরবেলা ভৈরো ও টোড়ি বাজায়। দূরে থেকে অতুল সেন ঘুম থেকে সুর শুনতে শুনতে উঠতেন। ইমামুকের সেতারের হাত মিঠে, রাখলে হয় না? তাঁকেই রাখলেন। বরকতের ছড়ির টান ভাল—নিয়ে এস তাকে' 'কদরদান' বলতে লক্ষ্ণৌর লোক ঠিক কি বোঝে জানি না—তবে আমি অতুলপ্রসাদ সেনকে বুঝতাম। বাংলাদেশ নবাব ওয়াজিদ আলি শার মারফৎ লক্ষ্ণৌর কাছে চিরঋণী, কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী করে লক্ষ্ণৌ সে ঋণের প্রতিশোধ করেছে। অমন দরদী না হলে কেউ অমন কদর দিতে পারে?

পারিবারিক কারণে অতুলপ্রসাদকে ১৯১৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌর কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। কলকাতায় তিনি হাইকোর্টে নতুন করে আইন ব্যবসার শুরু করেন এবং ওয়েলেসলী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে 'ওয়েলেসলী ম্যানসান'-এ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তাঁর বার্দ্ধক্য সহ দুজনের সংসার পেতে বসেন। অতুলপ্রসাদ কোলকাতায় এসেছেন এ খবরটা কোলকাতায় ছড়াতে বেশী দেরি হল না। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন অতুলপ্রসাদের গানের খুব ভক্ত। তিনি অমল হোম মারফৎ অতুলপ্রসাদকে নতুন গান রচনা করে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু 'ছন্দের রাজার' কাছে অতুলপ্রসাদ সুর বিহীন শুধু কথার মালা পাঠাতে চান নি। এবার কলকাতায় আসাতে তাঁকে প্রিয় কবি সত্যেন দত্তকে গান শোনাতে হল এবং সত্যেন দত্তর 'ভারতীর আড্ডার' অতএব সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হ'ল। তাঁরা সবাই অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হয়ে পড়লেন।

কোলকাতায় তখন আর একটি সংস্থা জমজমাট। ননসেন্স ক্লাবের নাম রূপান্তরিত হয়ে মান্ডে ক্লাবে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়ালে অবশ্য 'মন্ডা ক্লাব'ও বলে।

অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভগ্নীপতি বাংলা ভাষায় ননসেন্স রাইমস্-এর জন্মদাতা ও খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় (সত্যজিত রায়ের পিতা) ও তাঁর দুই ভাই সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় এবং তাঁদের মাতুল প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পিসতুতো ভাই নিত্যরঞ্জন বসু ('কুন্তলীন' তেলের আবিষ্কারক হেমেন্দ্র বসুর পুত্র) এবং অতুলপ্রসাদের

পূজায় নূতন শাড়ী
বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

একটি পিকনিকে

মাসতুতো ও মামাতো ভাইরা শিশিরকুমার দত্ত, হিমাংশু গুপ্ত ও ধীরেন্দ্র গুপ্ত, ভগ্নিপতি ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র (বেঙ্গল স্পেশাল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠাতা), সুকুমার রায়ের সম্পর্কে দাদা অমল হোম এবং তাঁদের বন্ধুবর্গ যথাক্রমে প্রশান্ত মহলানবীশ, কালিদাস নাগ, জীবনময় রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা মিলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির একটি আসর কোলকাতায় স্থাপন করেন। এই আসরের বৈঠক প্রতি সোমবারে বসত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল মানডে ক্লাব। আসরের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ভুরিভোজ' সে জন্য মানডে ক্লাবকে 'মন্ডা ক্লাব' বলে সম্বোধন করে হাস্যরসের খোরাক যোগাতেন আসরের প্রধান পান্ডা সুকুমার রায়।

এই 'মানডে ক্লাবে' অমল হোম একদিন অতুলপ্রসাদকে ধরে নিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদেরই মাসতুতো ভাই শিশির দত্ত (খোকনবাবু) তখন 'মানডে ক্লাবের' এক বিশিষ্ট সভ্য। তিনি 'ভাইদাকে' (অতুলপ্রসাদ) তখনি সভাভুক্ত করলেন। হাসি গানে রসিকতায় অতুলপ্রসাদ সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে সকল সভ্যেরই অতি প্রিয়জন হয়ে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর বৈঠক প্রায়ই তাঁর ফ্ল্যাটে বসতো, কারণ সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার পর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি এতো বিরাট আকার ধারণ করতো যে ক্লাবের বৈঠক অন্য কোথাও বসা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতুলপ্রসাদের বাড়ী ছাড়াও মানডে ক্লাবের বৈঠক বসেছে—ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্রের গঙ্গার ধারে মেয়ো হাসপাতালের কোয়ার্টারের ছাদে, সুকুমার রায়ের গড়পার রোডের বাড়ীর চিলেকোঠায়, অমল হোমের পিতা গগন হোমের ২০।১ সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানায়, সুনীতি চাটুর্জীর পৈতৃক বাসভবনে অথবা আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডাক্তার কালিদাস নাগের মামা বিজয় বসুর বাড়ীতে।

চিড়িয়াখানায় বিজয় বসুর বাড়ীর আড্ডায় একদিন অমল হোম অস্কার ওয়াইল্ড-এর লেখা 'ম্যান এ্যান্ড হিস ওয়ার্ক' প্রবন্ধটি পড়লেন। অতুলপ্রসাদ খুব মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং জানালেন পরের বৈঠকে তিনি অস্কার ওয়াইল্ডের বিচার বৃত্তান্ত শোনাবেন। অস্কার ওয়াইল্ডের ওল্ড বেইলিতে যখন বিচার হয় তখন অতুলপ্রসাদ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দুজনেই বিলাতে আইনের ছাত্র। তাঁরা এই বিচার দেখতে কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। স্যর এডওয়ার্ড কার্সনের জেরার জবাবে সেদিন অস্কার ওয়াইল্ডের মুখে যে ফুলকি ছুটেছিল সে গল্প সেদিন তিনি সবাইকে শোনান। মান্ডে ক্লাবের বৈঠকে অতুলপ্রসাদ একবার নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আরেক বার তিনি চেস্টারটনের 'ওআরশিপ অফ দি ওয়েল্‌থি' পাঠ করে শোনান। মান্ডে ক্লাবের সভ্যরা নানা মনোজ্ঞ বিষয়ের আলোচনা করতেন। যেখানে এতগুলি সাহিত্যিক শিল্পী ও বিশিষ্ট মানুষের সমাবেশ সেখানে শুধু কৌতুক ও ভোজন রসের মধ্যেই বৈঠক শেষ হত না। মান্ডে ক্লাব অতুলপ্রসাদকে নিয়ে বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্ণৌর দুই পুরোন বন্ধু পণ্ডিত গোকর্ণনাথ মিশ্র ও মির্জা সামিউল্লা বেগের তাগিদে ও ডাকে কোলকাতা ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌর দিকে পা বাড়াতে হল। তাঁর এই কলকাতা ত্যাগ উপলক্ষ্যে মান্ডে ক্লাবের সদস্যরা ১৯১৭ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এর কদিন বাদেই অতুলপ্রসাদ ট্রেনে করে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করেন।

পারিবারিক জীবনে অতুলপ্রসাদ সুখ পান নি। তাই বোধহয় তাঁর চিত্ত স্নেহ ভালবাসার কাঙাল ছিল। মানুষের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব পেলে তিনি সব থেকে বেশী খুশী হতেন। দুঃসহ বেদনায় দাম্পত্য জীবন যেমন তাঁর চিরসাথী ছিল, সামাজিক জীবন তেমনি তাঁর সাহিত্য সঙ্গীতের মজলিশের রসে আনন্দ-ভরপুর ছিল। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ১৯৩৪ খৃঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর বেশ কবছর আগে থেকেই রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেসার) বেড়ে যাওয়াতে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মজলিশী মন তাঁর কখনও ক্লান্ত হয় নি। ১৯২৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাড়ীতে শেষ বারের মত অতিথি হবার সময় গান বাজনা, সাহিত্য মজলিশ বসাতে তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। ১৯৩০ খৃঃ শেষবারের মত বিলাত গিয়েছিলেন—সেখানেও ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্রদের নিয়ে গান বাজনার আসরে মেতেছিলেন। ১৯৩২ খৃঃ কোলকাতায় এসেছিলেন তাঁর দাদা সত্যপ্রসাদের ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর শরীর খুব ভাল ছিল না, তাই সবাইকে একদিন সত্যপ্রসাদের বাড়ীতেই ডাকলেন। সেদিন সেখানে আসর জমজমাট। তিনি এত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও, বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনকে এতদিন পর এক সঙ্গে এক স্থানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেই নিজের গান—'ওগো সাথী মম সাথী' গেয়ে উপস্থিত সবাইকে অপূর্ব আনন্দ দান করেন। ১৯৩৩ খৃঃ মে মাসে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের আহ্বানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কিছুদিনের জন্য কার্শিয়াং সহরের 'গোলকুঠি' ভবনে এসে বাস করেছিলেন। তিনি সেই ছোট সহরে এসেছেন—এ খবর স্থানীয় বাঙালী বাসিন্দাদের জানতে দেরী হল না। সবাই মিলে এসে তাঁকে ধরলো গান শোনাতে। অসুস্থ অতুলপ্রসাদ রাজী হলেন। একদিন স্থানীয় টাউন হলে গানের জলসা বসল। অতুলপ্রসাদ একাই সেদিন দেড় ঘন্টা ধরে স্বরচিত গান গেয়ে বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সেবারেই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয়শংকর তাঁর দলবল সহ দার্জিলিং থেকে ফিরছিলেন। তাঁর দলের প্রধান পান্ডা হরেন ঘোষ মশাই অতুলপ্রসাদ কার্শিয়াং-এ আছেন জেনে সদলবলে একদিন গোলকুঠিতে এসে হাজির। যে কয়েক ঘন্টা তাঁরা সেখানে ছিলেন পেটভরা খাবার খাইয়ে ও গানে গল্পে, হাসিতে, রসিকতায় ভরিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ তাঁদের বিদায় দিলেন। মারা যাবার দু' মাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃঃ মে-জুন মাসে তিনি পুরী গিয়েছিলেন ডাক্তারদের নির্দেশে। সঙ্গে প্রায় ডজনখানেক সঙ্গী ছিলেন—সবাই তাঁরই অতিথি—অসুস্থ অবস্থায় পথশ্রম ও অচেনা জায়গায় থাকার একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যেই অতুলপ্রসাদের এই প্রয়াস শুধু নয়—তাঁর মজলিশী মনকে সতেজ ও সুস্থ রাখার এবং আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্যেও বটে।

বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভণ্ডুল

যে কথাটা বলতে চাই, সেটা বোঝাতে হলে বাংলা ভাষায় 'ভণ্ডুল' ছাড়া দ্বিতীয় শব্দ নেই। কাছাকাছি মানে হয়, এমন শব্দ দু-চারটে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভণ্ডুল কথাটা যে পরিমাণে অর্থবহ, ততটা নয়। ভণ্ডুল শব্দটির এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা রয়েছে, একটা পরিপূর্ণতার চিহ্ন। অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি, যেখান থেকে উদ্ধার বা নিস্ক্রমণের পথ নেই। একটা উদ্দেশ্য বা প্রত্যাশা নিয়ে হয়তো কোনও কাজ শুরু হয়েছে এবং কিছুটা এগিয়েওছে। একটা বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে চার-দিকে আটঘাট বেঁধে। কিন্তু কি যে হল—মাঝখান থেকে এমন এক অভাবিত বাধা এসে হাজির হল, যে সব তালগোল পাকিয়ে এমন বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হল যে আর কিছু করা বা নতুন কোনও উপায়ে সেটাকে আবার চালু করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, 'দূর হোক গে ছাই' বলে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

একেই বলে ভণ্ডুল। ইংরেজিতে আমরা বলি 'হোপলেস মাড্‌ল', অর্থাৎ এমন এক অচল অবস্থা যাকে কোনো মতেই সচল করা যায় না। এর চাইতে হাওড়া ব্রিজ-এর ওপর ট্রাফিক জ্যাম সিধে করা আরও সহজ। কারণ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে কসরত করলে প্রাইভেট মোটর গাড়ীর গোঁয়ার্তুমি, লরী-চালকের নাছোড়বান্দা জেদ, ঠেলা আর রিকশার নি-খাদ নির্বুদ্ধিতার জটিল মিশ্রণে যে চমৎকার 'জিগ্-স-পাজল' তৈরী হয়, তারও একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু যেটা ভণ্ডুল হয়ে যায়, সেটা আর মেরামত করা চলে না। যাকে বলা যায়, একদম বাতিল। শুধু তাই নয়, একটা ব্যাপার যেই ভেস্তে গেল, তারই যেন ছোঁয়াচ লেগে বাকিগুলোও একটার পর একটা খারিজ হতে থাকে।

দেখেন নি, এক একদিন এমন হয় যে, কিছুতেই কিছু হয় না। যা ধরতে যান, তাই ফসকে যায়। নয়তো লোকসান শুরু হয়। সকালে উঠে পরিপাটি চা খেলেন, তারপর খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে বাজারে বেরুলেন। বাড়ী এসে দেখলেন, হিসেব গরমিল হচ্ছে। গোটা টাকার ফারাক। তখন মনে পড়ল, দু টাকার নতুন নোটখানা এক টাকার ভেবে দোকানীকে দিয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে আপনি খুচরোই ফেরৎ পেয়েছিলেন, টাকাটা নয়। এখন আবার এতটা পথ ভেঙে বাজারে ফিরে যাওয়া চলবে না। আর কাল সেই দোকানীকে গিয়ে বললে সে কি আর মানবে? গেল একটা টাকা জলে! তারপর অফিস যাবার মুখে দর্জির দোকানে তাগাদা দিতে গিয়ে দেখলেন, ঝাঁপ বন্ধ। কখন খুলবে এবং খুললে যারা মুন্তাফার সঙ্গে আজ সারা দিনের মধ্যে আদৌ মোলাকাৎ হবে কিনা, সে কথা কেউ বলতে পারল না। কাল শনিবার, হাফ-ডে। অথচ জামাটা পাওয়া আজকে খুবই দরকার ছিল। এই নিয়ে প্রায় দু হপ্তা হয়ে গেল, ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। কিন্তু বললেই সেই এক জবাব, 'কাল সকালে নিয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই রেডি থাকবে।'

অফিসে [illegible], কিন্তু প্রাণ হাতে করে। বাস-এ উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় আপনার ও বাসখানার মাঝখানে অর্থাৎ ফুটপাথের কোণ ঘেঁষে ডবল ডেকার এসে গেল এবং কোনো মতে পিছু লাফ দিয়ে আপনি সে যাত্রা রেহাই পেলেন। ওদিকে বাসটা আপনার হাত উঁচু অগ্রাহ্য করে স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল, হলো সোঁ করে। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, পাশেই কলাওয়ালা—টিফিনের জন্য দুটো নেবেন কিনা। কিন্তু দাম যা' জোড়া তিরিশ নয়া। কাজেই নেওয়া গেল না। সান্ত্বনার মধ্যে আপ্তবাক্য—কলা অখাদ্য, সঙ্গে নিতে নেই। পৈতৃক প্রাণটা তো আর একটু হলেই যাচ্ছিল, বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। ধড়ফড়ানি যদি বা কমল, অফিসে এসে নিজের আসনে বসে একটি পুরো গ্লাস জল খেয়ে যদি বা ধাতস্থ হলেন, বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন যে কাল সন্ধ্যায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের জরুরী মিটিং হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই মাইনে বৃদ্ধি অথবা বোনাস প্রাপ্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।

সারাটা দিন দারুণ অস্বস্তি আর জল্পনা-কল্পনায় কাটল। কাজে মন বসানো গেল না, এ-কাগজ সে-ফাইল নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে মাঝখান থেকে হাতের জরুরী কাজে ভুল হতে লাগল। কারণ মনে মনে আপনি তখন চিন্তা করছেন, নগদ অর্থপ্রাপ্তি বরাতে জুটবে কিনা—যার ওপর আগামী কয়েক মাসের সাংসারিক বাজেট নির্ভর করছে। আরও ভাবছেন, যদি ইনক্রিমেন্ট বা বোনাস কিছুই না মেলে, তা-হলে অফিস থেকে 'লোন'-এর জন্য যে দরখাস্ত করেছেন, সেটা 'স্যাংশন' হলে তবু রক্ষে। আপাততঃ তাই দিয়েই সামনের অর্থসঙ্কট সামলাতে হবে, যদিও

সে ধার শোধ করতে হবে প্রতিমাসের বেতন থেকে কাটান দিয়ে।

বেলা চারটের সময়, অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখন ঘরে ঢুকে চারদিকের প্রত্যাশী দৃষ্টি ফেলে বেশ থমকে দাঁড়ালেন, তখন নাড়ীর স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে সকলের। আপনার হয়তো দম বন্ধ হবার জোগাড়, কারণ আপনারই 'স্টেক' বা চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তারপর যা আঁচ করা গিয়েছিল, তাই ঘোষণা করা হল। বর্তমান বাজারের যা হাল-চাল তাতে কোন রকম খরচ বৃদ্ধি করা চলবে না। আপনার হার্ট-এর বীট তখনো গণনার মধ্যে। কিন্তু কাগজপত্র গুটিয়ে চেয়ারটা হটিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছেন, তখন বড় সাহেবের পিওন এসে আপনাকে আবেদনপত্রখানা ফেরৎ দিল। ওপরে লাল কালিতে স্পষ্ট নোট—লোন স্যাংশন করা গেল না বর্তমান পরিস্থিতিতে। সরকারীভাবে কারণ দেখানোর পর মন্তব্য আছে, চার-পাঁচ মাস পরে আবার দরখাস্ত করলে সহানুভূতির সহিত তা বিবেচনা করা হবে। এখন এর পরে সাময়িক হার্ট-ফেল অনিবার্য নয় কি? রাস্তায় বেরিয়ে দুনিয়াটা কি রকম লাগছে? একটা ছাই রঙের ঘেরাটোপ, যার মধ্যে থেকে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে নাকি? হয়তো সেই শ্রীবৎস রাজার কাহিনীটা মনে পড়বে—যাতে হাত দেওয়া যায়, সেটাই ফসকায়—যা আশা করা যায়, সেটাই নির্মূল, যেটা নিশ্চিত ভাবা যায় তা কেমন করে অনিশ্চয়তার গহ্বরে ডুবে যায়। এক-কথায়—ভণ্ডুল!

এ অবস্থার প্রতিকার নেই। শহরের ফুটপাথে ঘেরা জায়গায় যতই শনি-পুজোর থালাও আয়োজন হোক এবং আসতে-যেতে পুজোর থালায় যতই প্রণামী চড়ান, কিছুতেই কিছু হবে না। নীচু মুখে জল-স্রোতের গতি ফেরানো যায় না, ধস নামতে থাকলে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই ধুলোয় গুঁড়িয়ে যায়। যাকে বলে, লণ্ডভণ্ড। আমার মনে হয়, ঐ 'লণ্ডভণ্ড' থেকেই ভণ্ডুল কথাটার জন্ম। লণ্ডভণ্ড শব্দটার মধ্যে একটা আকস্মিকতার ব্যঞ্জনা আছে, আর আছে একটা খণ্ড প্রলয়ের মতো বিপর্যয়ের আবির্ভাব। ভণ্ডুল হল তারই কিছু মোলায়েম সংস্করণ, আর একটু মন্থর। এর মধ্যে 'ভ' 'ণ্ড' এবং 'ল' তিনটে ব্যঞ্জন বর্ণই রয়েছে—কেবল 'ল'এর আগে একটি হ্রস্ব উ বসিয়ে বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র করে তোলা হল। এ যেন একটা প্রসেস'এর পরিণতি। বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রকাশ হতে হতে শেষকালে সবটাই বরবাদ। আফশোসটা তাই বেশি। এ যেন তিন খুঁটির গাঁথ—একটার পর একটা। অতঃপর ভূমিকম্প্য। মানে, কর্মকাণ্ড মক-আউট।

কোনও কোনও মানুষ আছেন যাঁরা সহজ সমাধানের পথ পছন্দ করেন না। ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তোলাই শুধু তাঁদের অভ্যাস নয়, উল্লাসের কারণ। ফলে, কোনো কাজ স্বাভাবিক ও সহজভাবে চুকে যাক—এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। সব বিষয়েই অযথা হস্তক্ষেপ করতে আসেন, অনেক সময়ই অযাচিত পরামর্শ দেন এবং সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ না করলে রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অতঃপর বাধ্য হয়েই তাঁর ওপর কাজের ভারটা ছেড়ে দিতে হয়। তখন গোড়া থেকে উল্টো পথ ধরে তিনি এমন নৈপুণ্যের নমুনা দিতে থাকেন যে এক-একটি গ্রন্থি-জাল এমনই নাগপাশ সৃষ্টি করে যে সমস্যাটার কোনও সুরাহা তো হয়ই না, আরও নতুন সমস্যা বা সঙ্কটের উদ্ভব হয়। সব কিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাধানের যথারীতি আশ্বাস দিয়ে, তিনি সরে পড়েন। এই প্রসঙ্গে জেরোম. কে. জেরোম সাইকেল মেরামতের কেরামতি নিয়ে যে সার্থক রসচিত্র এঁকেছেন, তা স্মরণযোগ্য। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন যে,

সর্ববিদ্যাবিশারদ উৎসাহী সাহায্যকারী বা পরামর্শদাতাদের মুখ্য দান হচ্ছে অপরের কাজ ভণ্ডুল করে দেওয়া।

অবশ্য অবস্থা-বৈগুণ্যে বা দৈব দুর্বিপাকে ভণ্ডুল সৃষ্টি হয় বেশি। কিন্তু সেখানে মানুষের হাত নেই, কেবল প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্ত করার বিফল চেষ্টাটুকুই সার। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেটা অনেকেরই হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজের বাড়ীতে সব-জান্তা করিতকর্মা লোকের অভাব হয় না। সবাই সমান কর্মিষ্ঠ না হলেও দু-একজন মানুষ পওয়া যায় যাদের উপর নির্ভর করা যায়। আবার এমন ব্যক্তিও থাকেন যাঁর দায়িত্ব-জ্ঞান প্রচুর কিন্তু দায়িত্বের আনুষঙ্গিক হাঙ্গামা পোহাতে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা. হুকুম করা ও নির্দেশ দেওয়াতেই যাঁর অভিরুচি। ফলে সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও এসব লোক ঝামেলা সৃষ্টি করেন এবং সহকারীদের মাথা ঘুলিয়ে দেন। তাই শেষোবশেষে ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং শেষ অবধি কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। মাঝখান থেকে পরস্পর দোষারোপ আর আত্মস্কালনের পালা চলতে থাকে। অর্থাৎ সর্বদা ব্যগ্র হয়ে সব দিক সামলাবার চেষ্টায় থেকে, এঁদের প্রবণতা দেখা যায় বিঘ্ন সৃষ্টির দিকে। এর উপর দৈব যদি বাদ সাধে. তাহলে একেবারে লণ্ডভণ্ড। যেমন কখনো-সখনো ঘটে বিয়ে-বাড়ীতে কিংবা কোনো উৎসব পার্টি বা সভাসমিতির আয়োজনে। লোকবল যথেষ্ট, আয়োজনেরও ত্রুটি নেই। বিভিন্ন বিভাগে কাজের লোক মোতায়েন করা হয়েছে, ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁত বললেই হয়। তারপর বর আসার প্রতীক্ষায় স্ত্রী-পুরুষ সবাই অধীর, লগ্ন বয়ে যায়, এমন সময় খবর এল রাস্তায় দুর্ঘটনা। কিংবা বর সভাস্থ হয়েছেন, পুরোহিতকে তাঁর বাসা থেকে কালেক্ট করা হয়নি। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটো-ছুটির পর ভগ্নদূতের মুখে শোনা গেল, হঠাৎ তাঁর 'করোনারি'! আবার কোথাও বা যাবতীয় খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত, কেবল দই-সন্দেশ আর পৌঁছুল না। কিংবা সারাদিন খটখটে রোদ, বিকেলবেলা থেকে এমন দুর্যোগ সুরু হয়ে গেল যে, তিনশো জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট জন প্রায় সাঁতার কেটে হাজির হলেন। এত আয়োজন পণ্ড হল, আহার্যবস্তুর শোচনীয় অপচয় হল এই দুর্দিনে। উপরন্তু ছাদের তেরপল ফুটো হয়ে গেল কিংবা মেরাপ ভেঙে পড়ল প্রবল বাতাসে ও অঝোর বর্ষণে। কিংবা কোথাও বা যেটা আরও সাংঘাতিক, ইলেকট্রিক ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে 'শর্ট সার্কিট' হয়ে অগ্নিকাণ্ড! প্রাণরক্ষার তাগিদে সবাই একসঙ্গে ছুটে বেরুতে গিয়ে কয়েকজন জখম হলেন, পাত্রের খুড়ো-মশায়ের বুড়ো হাড় তো কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার! আর এদিকে আগুন নেভাতে এবং নতুন করে তোড়জোড় করতেই রাত কাবার। সব ভণ্ডুল!

সভা-সমিতির আয়োজন ও উদ্দেশ্য কিভাবে ভণ্ডুল হয়ে যায়, তা অনেকে শোনেন বা দেখেছেন। গোড়ায় একটা মারাত্মক গলদ থাকেই যার পরিণতি নিদারুণ হয়ে দাঁড়ায়। হয় ভুল ঠিকানা, নয় তো কাগজে ভুল বিজ্ঞপ্তি কিংবা ভুল নাম ঘোষণা। এর ফলে যা সংকট সৃষ্টি হয়, তা কখনো মুখ-হেঁট, কখনো বা দারুণ রকমের হাস্যকর। এক জায়গায় পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা হবার কথা। বক্তা উঠে সুরু করলেন—ইহলোকের 'খাদ্যসমস্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়'। আর একবার কোনো গবেষণা-পরিষদ থেকে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং

অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। দিনক্ষণের ভুল হোক কিংবা স্থান নির্দেশে কোনো রকম ভুল বোঝার জন্যই হোক, ফল যা দাঁড়াল, তা এই রকম। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বক্তা উঠে দেখলেন— সামনে প্রায় ফাঁকা মাঠ। ফসলের আভাস নেই, কয়েকটি আগাছা মাত্র বিরাজ করছে! অর্থাৎ জন পাঁচ-ছয় স্থানীয় বৃদ্ধ, কিছু নাবালিকা ও আপোগণ্ড সমেত মহিলা-সংখ্যা আর হলঘরের শেষপ্রান্তে কয়েকটি সন্তানের জটলা।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। বহুকাল আগে ছাত্রাবস্থায় এক দেশপ্রসিদ্ধ মনীষীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভায় গিয়েছি। প্রথমে ভাষণ দিতে উঠলেন তখনকার দিনে নাম-করা এক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। বলা বাহুল্য, প্রথামত ইংরেজিতেই বক্তৃতা হচ্ছিল। সুরু হল ঠিক এই ভাষায় : 'অন দিস মোস্ট স্যাড অকেশন, আওয়ার ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু অফার ইন রেসপেকটফুল সাইলেন্স আওয়ার সিনসিয়ার থ্যাঙ্কস টু দ্য গ্রেট ডিপার্টমেন্ট…' ক্ষণকাল বিরতির পর যেন শ্রোতাদের চমক ভাঙল। তারপর ধীর লয়ে হাততালি ও হাসির গুঞ্জন। একটি নিরীহ স্লিপ, কিন্তু ঐ মুখ-ফসকানো একটি বাক্যের প্রয়োগের কি দারুণ অস্বস্তি! সমস্ত প্রত্যাশা ভণ্ডুল হয়ে গেল এবং প্রতিক্রিয়া দাঁড়াল একেবারে বিপরীত।

'বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভণ্ডুলমামার বাড়ী' গল্পটি এই সূত্রে বিশেষ করে মনে পড়ছে। এর আবেদন শুধু 'প্যাথেটিক' বা করুণ জীবনচিত্র বলে নয়, পুরোপুরি 'রিয়্যালিস্টিক'। এর ভিত্তিটি বাস্তব, আক্ষরিক অর্থেই। অর্থাৎ বাস্তুর ভিত থেকে সুরু করে দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে দেয়াল পর্যন্ত গাঁথুনি। এই উৎসাহ আর হতাশার মিশ্রণেই গল্পটি এত জীবন্ত ও সত্য। এ বাড়ীর নির্মাণ কাজ আর শেষ হয় না, হতেও পারে না। কারণ, জীবনে ও আর্টে কয়েকটা জিনিস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অপূর্ণতার প্রতীক বলেই এ গল্পটি রসজ্ঞ পাঠকের কাছে বিশেষ অর্থবহ। মামা কিন্তু আশা ছাড়তে চান না, তাঁর মন মানে না যে সব পণ্ডশ্রম। গল্পের নামকরণটি খুব লাগসই। এখানে দেখি সর্বাধিক ভণ্ডুল—জীবনব্যাপী জের টানা এবং সব কিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে দেখেও পরাজয়কে অস্বীকার করার করুণ প্রয়াস। 'ভণ্ডুল' শুধু মামার নামেই নয়, তাঁর বাসে, তাঁর মগজে ও হিসাবের কাগজে। তাঁর বাস্তিতে, আশাবাদ আর সম্পত্তির পরম অসামঞ্জস্যে।

ভণ্ডুল হচ্ছে আরমানি'র ক্রমিক নম্বর; জীবনদেবতার এক-একটি [illegible]।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মনোবিজ্ঞানীর মনের কথা (২)

আমাদের বিশ্বাস আর অবিশ্বাস একটি বিশেষ সীমারেখায় পৌঁছে স্থান্তিত হয়ে পড়ে। ইয়ুং যখন তাঁর প্রেতসত্তার কথা বলেন, যখন বলেন যে তিনি একাধারে শিশু এবং বৃদ্ধ তখন তা বিশ্বাস করে নেওয়া যায়।

ইয়ুং-এর এক রোগী রাতে নিজের মাথায় একটি বুলেট দিয়ে আঘাত করল, প্রভাতে ঘুম ভেঙে সে ভাবছে তার মাথায় কেউ যেন একটা বুলেট বিঁধে দিয়েছে—তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ইয়ুং-এর বাড়ির কাছে কোনো এক জায়গায় একটি বালক জলে ডুবেছে, সেই সময় তিনি ট্রেন-এ ভ্রমণ করছিলেন, সহসা এক নিমজ্জমান মানুষের আকৃতি তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল। রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখছেন যে এক অতিকায় নেকড়ে বাঘ মৃত্যুর মূর্তিতে এসে হাজির হয়েছে, তারপর দিন প্রভাতে ঘুম ভেঙে সংবাদ পেলেন তাঁর মার মৃত্যু হয়েছে।

এরই নাম কি এক্সট্রা সেনসরী পারসেপসান? আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরাও অনেক আসন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার পূর্বাভাষ তৃতীয় নয়নের আলোতে দেখতে পেতেন এমন উল্লেখ পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থে আছে।

ইয়ুং বলছেন—ভূত-প্রেত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছে। স্বপ্নে তিনি মহাশূন্যে বিচরণ করছেন—হাজার মাইল ওপর থেকে তিনি পৃথিবী অবলোকন করছেন।

অতীতের অনেক বিশিষ্ট মানুষকে তিনি দেখতে পেলেন, তাদের সঙ্গে কথা বললেন। নিজের প্রয়োজনে একটি নিরালা তোরণ তৈরী করেছিলেন ইয়ুং। সেইখানে বসে পুরো একটি ঘণ্টা ধরে দুটি অর্কেস্ট্রা শুনলেন,—অদৃশ্য সূত্র থেকে। জানালা খুলে ইয়ুং চারদিকে তাকালেন কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না।

আর—একবার বাড়িতে বসে আছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন বিরাট জন কোলাহল। একটা বিশাল জনস্রোত ঘরে এসে ঢুকছে—কিন্তু চোখে কাউকেই দেখতে পেলেন না। পরদিন প্রাতে কথাপ্রসঙ্গে আরেকজন বললেন, এঁরা হয়ত মৃত আত্মা। ইয়ুং এই আত্মা দেখেছিলেন। তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন—

"But why, after all, should there not be ghosts? How do we know something is impossible?".

কিন্তু অসম্ভব বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে। সমুদ্রের সমস্ত জল সহসা দুধে রূপান্তরিত হয়ে গেল—এমন ঘটনা ঘটে না। ইয়ুং নিজেই তাঁর স্মৃতিচারণ সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করে বলছেন—

"The real sin of faith is that it forestalls experience".

এই কারণেই ইয়ুং-এর স্বপ্ন ফ্যানটাসির অতি-প্রকৃত পরিবেশ সাধারণের মনে বিশ্বাস জাগায় না। ঠিক যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে না।

ইয়ুং অনেক নিউরোটিক অর্থাৎ স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত রোগীকে নিরাময় করেছেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এইভাবে ফ্রয়েডও সাফল্যলাভ করেছেন এবং আরো অনেকে হয়ত সফল হয়েছেন। তবে মনে হয় যে ইয়ুং-এর সমস্ত ধারণা বা বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব রোগনিরাময় পদ্ধতির পক্ষে অপরিহার্য নয়। ইয়ুং বলেছেন যে মানুষ তখনই নিউরোটিক হয়—

"When they content themselves with wrong or inadequate answers to the questions of life—"

কিন্তু এই যদি কারণ বলে গৃহীত হয় তাহলে কি সাধারণ সমাজে সহজ ভঙ্গীতে বিচরণশীল অনেককেই পাগলা গারদে আশ্রয় নিতে হবে না? রাজনৈতিকরা কি বলতে পারেন—জীবনের সকল প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর তাঁরা পেয়েছেন! তাঁরা যে যথাযথ উত্তর পাননি তা আমরা জানি, তবু ও তাঁরা সবাই আজো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে বাসা নেননি, নিউরোসিস তাঁদের কাবু করতে পারেনি।

ইয়ুং বলছেন—

"It is our loss of connection with the past, our uprootedness, which has given rise to the discontents of civilisation and to such a flurry and haste that we live more in the future chimerical promises of a golden age than in the present, with which our whole evolutionary movement has not yet caught up".

এই কঠোর বাস্তবের মধ্যে সুবর্ণ যুগের স্বপ্ন দেখার অবকাশ কোথায়? সুবর্ণ যুগ বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও আশা নেই। অতীতের সঙ্গে সংযোগের ফলে স্পিরিট বা আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি যোগাযোগ ঘটবে এমন আশা কোথায়।

ইয়ুং বিজ্ঞানী হলেও মনে মনে তিনি জন্ম-রোমান্টিক। তা যদি না হত তাহলে এত আবেগভরে রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনন্ত প্রশান্তির কথা বলতেন না। আকাশে প্রতিদিন সূর্য যেন না ওঠেন রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেই নাকি সূর্যদেব প্রতিদিন আকাশে ওঠেন না। ইয়ুং তাই মনে করেন যে রেড-ইণ্ডিয়ানদের জীবন—

"Cosmologically meaningful, because he helps the father and preserver of all life in his daily rise and descent".

এর আর এক অর্থ—আমাদের সকলের জীবন মহাজাগতিক অর্থে অর্থময় নয়।

যিনি জীবনের কথা বলতে বসে যিনি সর্বাগ্রে বলেছেন—

—"Myth is more individual and expresses life more precisely than does science".

তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ফ্যানটাসি তিনি উল্লেখ করেছেন তা কিন্তু বিজ্ঞান নয়। কিন্তু তাঁর অন্তর-আত্মা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়—বিজ্ঞান নয় বটে, এটা আর্ট। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলছেন—

"No, it is not art. On the contrary, it is nature".

এই কথার পর মনে যদি কোন সংশয় জাগে, যদি অবিশ্বাস উঁকি দেয় তখন ইয়ুং-এর বাণী কানে এসে ধ্বনিত হবে—

"It is presumptuous for any one to imagine that he produces his own thought".

একটি আত্মা একদিন ইয়ুং-এর ঘরে এসে বলে গিয়েছিল—'অরণ্যে বিচরণশীল পশুর মত, বাতাসে উড়ন্ত পাখির মত, ঘরের ভিতরের মানুষের মতই চিন্তাও একটা বিচরণশীল প্রাণী।'

ইংলণ্ডের মানুষ ইয়ুংকে বিদগ্ধ মানুষের মত শ্রদ্ধা করতে পারেনি। ইয়ুং তাদের কাছে এক পেডেন্ট আত্মরতিমগ্ন মানুষ। ফ্রয়েডের তত্ত্বকে প্রেততাত্ত্বিক পোষাক পরিয়ে তিনি নিজের সুবিধামত তা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড এবং ইয়ুং দুজনেই কি নিজেদের ধ্যানধারণা উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন? তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ প্রায় সর্বদাই একতরফা, গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া।

এই গ্রন্থের মাঝামাঝি ইয়ুং ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনী বলেছেন। তাঁদের বিতর্কের কারণ পাঠকের কাছে নেহাৎ তুচ্ছ মনে হতে পারে। যেমন পরীদের গাত্রবর্ণ কি হতে পারে এই নিয়ে মতবিরোধ ঘটা।

অ্যানিলা জাফে ছিলেন ইয়ুং-এর বন্ধু এবং সহকারী। এই গ্রন্থের কিছু অংশ তিনি তৈরী করেছেন, বাকী অংশ জীবনের শেষের দিকে ইয়ুং নিজেই লিখে রেখে গেছেন। ইয়ুং গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে বহির্জাগতিক জীবন বা বহিরঙ্গ জীবন সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলবেন না—কারণ সে জীবন ঘটনাবিবর্জিত নিস্তরঙ্গ নদীর মত। তাই তিনি অন্তরঙ্গ জীবনের কথা লিখেছেন—ইনার লাইফ ইয়ুং-এর নিজস্ব ধারায় বর্ণিত। স্বপ্ন, স্বপ্নাভাষ, ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদির মধ্য থেকে ইয়ুং-এর নিজস্ব তত্ত্ব কিভাবে গড়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত। মানব মনে ঠিক কি কি ঘটে, কিভাবে ঘটে যায় তারই যথাযথ বিবরণ।

ইয়ুং-এর রচনার এমনই আকর্ষণ যে প্রথম পরিচয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে উপায় নেই। তাঁর মতবাদে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। বিচারশীল মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ফ্রয়েড আর ইয়ুং বর্তমান যুগের 'থিওলজি'র স্রষ্টা। এই তত্ত্বের মধ্যে পতন, পুনর্জন্ম, অবতারবাদ সবই মিলিয়ে-মিশিয়ে আছে। প্রতিটি ধারা রোমান্টিক, কাব্যময় এবং প্রতীকী ভঙ্গীতে আলোচিত।

এই সব কারণে ইয়ুং-এর আত্মস্মৃতি পড়তে বসে একাধারে যেমন আনন্দ এবং আগ্রহ জাগবে তেমনই আবার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাও সঞ্চারিত হবে মনে। স্বপ্নবিলাসী যে কোনও মানুষের মতই ইয়ুংকে তাঁর স্বপ্নের বাস্তব নৈর্ব্যক্তিকতাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে। বিশ্বাসের একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। যুক্তিমন না হলে ইয়ুং পড়ে আনন্দ নেই।

—অভয়ঙ্কর

MEMORIES, DREAMS, REFLECTIONS: By C. G. Jung. Recorded and edited by ANIELA JAFFE. Translated by Richard and Clara Winston : : (Collins and Routledge Kegan Paul Price 45 shillings only.

সাহিত্যের খবর

এমিলি ডিকিন্সনের সম্মান : উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত নিউ ইংলন্ডীয় কবি শ্রীমতী এমিলি ডিকিন্সনের সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন। ২৮শে আগস্ট তারিখে আট সেন্ট মূল্যের স্মারক টিকিট বিক্রয় সুরু হবে। এর পূর্বে গত বছর কবি এডগার লী মাসটার্সের সম্মানে স্মারক টিকিট প্রকাশিত হয়। ম্যাসাচুসেটস শহরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এমিলির জন্ম হয়—তার পরবর্তী জীবন ঘটনাহীন। প্রতিদানহীন প্রেমের বেদনায় তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে সুরু করেন। মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই তিনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ পরিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় সামান্য কিছুসংখ্যক কবিতা মাত্র প্রকাশিত হয়। সেই কবিতাগুলির প্রকাশকালে লেখিকার নাম অপ্রকাশিত থাকে। ৫৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হল তাঁর কবি-প্রতিভা। গীতিকবিতা রচনায় এমিলির অসামান্য দক্ষতা ছিল।

এমিলি শ্বেতবসনা সুন্দরীর মত সর্বদাই শুভ্র পোষাক পরতেন এবং তাঁর কবিতার মত আপনাকেও তিনি অপ্রকাশ রাখতেই সদাসচেষ্ট ছিলেন।

নিখিলবিশ্ব সেকসপীয়র কংগ্রেস : এই এই বছর ক্যানাডার ভ্যানকুভারে সর্বপ্রথম নিখিল বিশ্ব সেকসপীয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্বের পণ্ডিতজন এবং সেকসপীয়র-বিশেষজ্ঞ দল এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী এই সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রতিষ্ঠ কবি।

ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি : পশ্চিমবঙ্গের ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে বিগত ২০শে আগস্ট তারিখে ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত-সোভিয়েট ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় শ্রীসত্যেন সেন, বিষ্ণু দে, ডাঃ মুরারি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

স্বামী ...কৃষ্ণানন্দের জন্ম-জয়ন্তী : সাংবাদিক ও পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীশিবপ্রসাদ সেনশাস্ত্রী বলেন—স্বামী কৃষ্ণানন্দ ছিলেন দয়ালদাস স্বামীর শিষ্য। তিনি প্রায় পাঁচশটি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধান অতিথি হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, তিনি স্বামী কৃষ্ণানন্দের 'গীতার্থ সন্দীপনা' পাঠ করে উপকার পেয়েছেন। এই সভায় সভাপতি শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী বলেন যে, ১১০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে সর্বপ্রথম স্বামী কৃষ্ণানন্দের নাম শোনেন। 'আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতো মানুষ ভারতে বিশেষ দেখা যায় না। হরিমন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে কৃষ্ণানন্দ বাংলা বক্তা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হন। কৃষ্ণানন্দ সামান্য রেলের কেরাণী হিসাবে অতি অল্পবয়সে জীবনযাত্রা সুরু করেন, পরে তিনি সব ত্যাগ করে পরিব্রাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'সনাতন' ও 'দি মাদারল্যান্ড' ছিল তাঁর মুখপত্র। এই সভায় ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, পণ্ডিত কালিদাস মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন বই

দীনবন্ধু এন্ড্রুজ (জীবনী)—সাহিত্য সদন, ৫৫।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। তিন টাকা।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা—এই-ই ছিল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন-বাণী এবং প্রতিজ্ঞা। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ যেন সেই বিবেক-বাণীর মূর্ত বিগ্রহ। অবমানিত আর্ত মানুষের সেবায় এবং নবজীবন উজ্জীবনের আন্তরিক আয়োজনে তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। মুক্তিসন্ধিৎসুদের সঙ্কট মুহূর্তে ভারতে তাঁর পদার্পণ যেন বিধাতার অভিপ্রেত ছিল। সংগঠন এবং সেবাকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছিলেন। এমন মহৎ মানুষ তাঁর আগে দেখা যায়নি, পরেও না। দুই যুগন্ধর পুরুষের—মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ—জীবনস্বপ্নকে সার্থক করতে তিনি তাঁর দুটি হাত দুদিকে মেলে ধরেছিলেন—একটি হাত সেবার এবং অপরটি সংগঠনের।

সি এফ এণ্ড্রুজ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটি ভারত-প্রেমিক পরহিতব্রতী দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের

CENTRAL LIBRARY

বিচিত্র জীবনকাহিনী এবং লেখকদের বিশদ আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর জীবন প্রবাহের বিবিধ ধারার ওপর আলোকপাত করেছেন ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, চিন্ময়ী বসু ও দীপালি রায়। আলোচনাগুলি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে অত্যন্ত সততার সঙ্গে লেখা। অনেকগুলি ছবি— বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য ছবি : দীনবন্ধু এন্ডরুজের সঙ্গে হাসপাতালে গান্ধীজীর শেষ সাক্ষাৎকারের ছবিটি গ্রন্থটির আকর্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই সঙ্গে পরিশিষ্টে দীনবন্ধুর জীবন পঞ্জী এবং এন্ডরুজ প্রণীত গ্রন্থসূচীর বিস্তৃত পরিচয় স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর আকর-গ্রন্থ হতে বিশেষ সহায়তা দিয়েছে।

অন্তিম মুখর (কাব্যগ্রন্থ)—সমীর দে।। আনফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম : দু টাকা।

বইটি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেহারা-স্বাতন্ত্র্যের জন্য। কবিতাগুলিও অতি সাম্প্রতিকতার স্বাক্ষরবাহী। তারুণ্যের আবেগ, বিষাদ ও উচ্ছলতায় কবি অনুভব করেন 'অনিবার্য পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে' ভেতরে ভেতরে, কিন্তু সেই প্রস্তুতির পুরো ছবিটা এখনো অস্পষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে সমীর দে রোমান্টিক কবি। এক ধরণের দুঃখবোধ তাঁকে বিচলিত করেছে কখনো কখনো। এবং সেই মুহূর্তেই তিনি লিখেছেন : 'কাছাকাছি কেউ নেই/ একমাত্র অক্ষমতার আততায়ী/ একমাত্র সর্বার্থের মৃতদেহ ছাড়া।'

তাঁর কণ্ঠ খুবই আন্তরিক, দৃষ্টি প্রখর। আরেকটু সংযত-বাক হলে কয়েকটি কবিতা অনেকদিন মনে থাকতো। এ কাব্যগ্রন্থের ছোট কবিতাগুলিই সবচেয়ে ভালো। প্রচ্ছদ রুচিসম্মত।

হর কেদার সাত বদ্রী (ভ্রমণ-কাহিনী)— বিজলী গাঙ্গুলী। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পাবলিশার্স, ১৯ পার্ক সাইড রোড, কলকাতা-২৬। সাত টাকা।

তীর্থময় ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেদার-বদ্রী। তুষাররাজ্যের এই তীর্থ এককালে ছিল দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। ধর্মপ্রাণ নর-নারী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষেরা প্রাণ তুচ্ছ করে কেদার-বদ্রী পরিক্রমা করেছেন। আজকে পথঘাটের উন্নতি এবং যানবাহনের অনেক সুবিধা সত্ত্বেও কেদার-বদ্রীর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং বেড়েছে। লেখিকা এই তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী লিখেছেন সহজ সরল ভাষায়। এই যাত্রাপথে যা তিনি দেখেছেন, যাঁদের তিনি দেখেছেন— পার্বত্য প্রদেশের সরল বিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষজন এবং সাধু-সন্তদের—তাঁদের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তীর্থ পরিক্রমার পথরেখাচিত্র এবং তুষার ধবল কেদার ও বদ্রীর স্থান বিশেষের অনেকগুলি ফটো ভ্রমণকাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিকল্পনা সুখ্যাতি করার মতো, কিন্তু মুদ্রণ-প্রমাদ অস্বস্তিকর।

ভারতের চীনযুদ্ধ (আলোচনা)—অমিয় রায়। নবজাতক প্রকাশক। ৬ এন্টনী বাগান লেন। কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা।

ভারত চীন যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত একখানি বিতর্কমূলক গ্রন্থ 'ভারতের চীন যুদ্ধ'। বহু সরকারী ও বেসরকারী তথ্যসহ নিজস্ব বক্তব্যকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। এজন্য তাঁকে ভারতীয় সেনানায়ক, দেশী বিদেশী সাংবাদিক এবং দুই দেশের রাষ্ট্র নায়কদের বক্তব্য ও পত্রালাপের সাহায্য নিতে হয়েছে। কে প্রথম আক্রমণকারী তা প্রমাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে, সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের ও সমস্যার মূলকারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও, এই ধরনের বই-এর গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

ষোড়শী (কাব্যগ্রন্থ)—সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থটির গৈরিক প্রচ্ছদের অঙ্কন ও তার ভিতরের কবিতার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় গ্রন্থকার সরলচিত্ত এবং ভক্তিপ্রবণ। আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন গ্রন্থটির কোথাও নেই। কবিতাগুলিতে যে বিষয় বা আঙ্গিকের ব্যবহার রয়েছে তা আর সাম্প্রতিক কবিতায় চোখে পড়েনা। প্রায় প্রতিটি কবিতায় একটি গল্প আছে। ছন্দের ব্যবহার অবশ্য ভ্রান্তিমুক্ত নয়।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

শারীরবৃত্ত (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৭১) সম্পাদক : দেবজ্যোতি দাশ, উমাশংকর সরকার। ভারতীয় শারীর বিদ্যা পরিষৎ, ৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯।

মাতৃভাষাই সকল স্তরে শিক্ষার বাহন হোক—'বাংলার বাঘ' আশুতোষের সময় থেকে এই চেষ্টা শুরু। স্তরে স্তরে একটু একটু করে তাই ঘটছে। কিন্তু তার অগ্রগতির সঙ্গেই দেখা দিয়েছে ভিন্নতর সমস্যা—ইংরেজি শব্দের বিকল্পে দেশীয় শব্দের অপ্রতুলতা। বিশ্বের সবদেশে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা—বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাতেও তাই—সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম এই দেশ, ভারতবর্ষ। মাতৃভাষাতেই নিজের চিন্তাভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষায় মাতৃভাষাকে সত্যকার বাহন করে তোলবার জন্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ চিন্তাশীল বিজ্ঞান সাধকেরা দীর্ঘকাল ধরে নানানভাবে চেষ্টা করে আসছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিজ্ঞান-সাহিত্য বিকাশের সদিচ্ছা নিয়ে 'ভারতীয় শারীরবিদ্যা পরিষৎ' বিরাট পরিকল্পনায় 'শারীরবৃত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বার করেছেন। সাধারণ পাঠকের মনে মানবদেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত ধারণার সৃষ্টি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা পাঠ্যক্রমের নানা অধ্যায় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের সাহায্য করা, শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনায় উৎসাহিত করা, শারীরবিদ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বকে লোকগোচরে আনাই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। পরিমল সেন, দেবজ্যোতি দাশ, পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আশিস সিংহ, অজিতকুমার মাইতি, বাসুদেব দত্তচৌধুরী, অজিতকুমার দেব, সুশীলরঞ্জন মৈত্র, উমাশংকর সরকার প্রমুখের রচনায় পত্রিকা প্রকাশের এই লক্ষ্য সাফল্যলাভ করে। দেবজ্যোতি দাশের 'শারীর বিজ্ঞানী সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ' জীবন-চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিজ্ঞান তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা এই সংকলনটি পেলে অবশ্যই খুশী হবেন তা বলাই বাহুল্য।

সোনার বাংলা (সাপ্তাহিক, সম্পাদক : প্রবীর সেন। ২০১।এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা-৭। কুড়ি পয়সা।

'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি গত ১৫ জুন আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের এপারে ওপারে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল প্রেরণাকে সদাজাগ্রত রাখতে যথাসাধ্য সাহায্য করা; এবং 'বাংলাদেশ'-এর সঠিক খবর এপার বাংলা-ওপার বাংলার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই ধরনের পত্রিকার অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। ব্যবসায়িক লাভক্ষতির দিকে দৃকপাত না করে জাতীয়তাবোধে আপ্লুত জাগ্রত মনের পরিচয় রেখে 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক সে অভাব মোচনে সার্থকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্যে পত্রিকার পরিচালকবর্গ ধন্যবাদার্হ। 'সোনার বাংলা' এপার-ওপারের শুধু স্বর্ণসূত্র নয়—সেতুসূত্র। এ পত্রিকা বাংলাপ্রেমীদের সাদর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে এটা আশা করা যায়।

অয়ন (আষাঢ়, '৭৮)—সম্পাদক : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। ১০।১৫, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা : ৯। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রথম নজরে আহামরি কিছু একটা মনে হয় না। কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং সুখ্যাত লেখকদের বিদগ্ধরচনার গুণাগুণে সাধুবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। লিখেছেন : বনফুল, গোপাল ভৌমিক, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ, কানাই সামন্ত, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিমল গোস্বামীর 'পত্রস্মৃতি'তে পুরানো দিনের সুখ্যাত লেখক জলধরদা প্রকৃতিবাদী চিকিৎসক জীবনময় রায়কে নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল। সম্পাদকের দিক্-দর্শনীতে ধার কমেছে, ভারও।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

চতুর্থ খণ্ড

(৮)

পরদিন ভোরবেলা চার্বাক আশ্রম থেকে বের হয়ে জরা উপত্যকায় বনে নামতে লাগলো। উপত্যকার অপর দিকে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে সেটা পার হলেই দক্ষিণ দিকের পথ পাওয়া যাবে। অরণিকে জিজ্ঞাসা করে পথের বিবরণ জেনে নিয়েছিল জরা। অরণি বলে দিয়েছিল যে ঐ পাহাড়টার নাম পাঁচচুড়ি. তারপরে দুটো পথ দেখতে পাওয়া যাবে, একটা শাখা গিয়েছে সোজা উত্তরে অপরটা কিছু দূরে ঘুরে গিয়ে তারপরে সোজা গিয়েছে দক্ষিণে। উত্তরের পথটা গিয়েছে উত্তর কুরুতে দক্ষিণেরটা ভারতবর্ষে। সেই পথটা আপনাকে ধরতে হবে, আর মনে রাখবেন যে আপনি যাচ্ছেন পশ্চিম থেকে। জরা তাকে জানিয়েছিল যে সে ভারতবর্ষে যেতে চায়।

উপত্যকায় নেমে একটি স্রোতস্বিনী দেখতে পেলো। এতদিনে জরা বুঝে নিয়েছে যে উপত্যকা মানেই নদী। প্রবল আর ক্ষীণ এই প্রভেদ। এই নদীটি ক্ষীণ। সে আরও বুঝেছিল নদীতে আর পাহাড়ে বেশ লুকোচুরি খেলা চলছে। পাহাড়গুলো চায় নদীগুলোকে বন্দী করতে, নদীগুলো কিছুতেই ধরা দেবে না। নদীর ধারে বসে এক পেট জল খেয়ে নিল জরা। এই কমাসের পাহাড়ী অভিজ্ঞতায় বুঝেছে এসব পথে জলটাকেই খাদ্য বলে গ্রহণ করতে হবে, খাদ্য কখনো কদাচিৎ মিলে গেলেও যেতে পারে। নদীর অপর পারে গিয়ে পাঁচচুড়ি পাহাড়ে উঠবার আগে একবার ফিরে তাকালো চার্বাক আশ্রমের গিরিচূড়ার দিকে। মনে পড়লো গত রাত্রে চার্বাকের স্বীকারোক্তি।

চার্বাক বলেছিল সে সুখ দিতে পারে, কিন্তু দুঃখ দূর করবার উপায় তার অজানা। অথচ ছাগর্ষি বলেছিল সংসারে সুখ বলে কিছু নেই, দুঃখের অভাবকেই কখনো কখনো সুখ বলে মনে হয়, যেমন নাকি এই পাহাড়ে সমতল ভূমি। পাহাড়ে কোন ভূখণ্ড সমতল নয়, পাহাড়ের অভাবকেই কোথাও কোথাও সমতল মনে হয়, লোকে তার নাম দিয়েছে উপত্যকা। জরা সুখের প্রার্থী নয়, চায় পাপ থেকে মুক্তি, পাপের পরিণাম তো দুঃখ। চার্বাক ও ছাগর্ষি দুজনেই অক্ষম তার পথনির্দেশ করতে। বুঝতে পারে না এখন তার কি কর্তব্য। পা দুখানার পথ চলে চলে পথচলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেই অভ্যাসের বশে সে পথ চলে। সে ধরে নিয়েছে এইভাবে পথ চলতে চলতেই একদিন কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে জীবনের অবসান ঘটবে। তাবে ভালোই হবে এই পাপ-পুণ্যের সুখ-দুঃখের দোটানা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

জরা ভেবেছিল দুপুরবেলার মধ্যেই পাহাড়টা পার হতে পারবে, কিন্তু দুপুরে পার হয়ে গেলেও দেখল এখনো অনেক পথ বাকি। পাহাড় ও নারী নিতান্ত আয়ত্তের মধ্যে মনে হলেও আসলে তারা অনেক দূরবর্তী। এতখানি পথ এসেও একটিও পথিক তার চোখ পড়েনি। এমন নেড়া ও নির্জন পাহাড় আগে দেখেনি। সন্ধ্যাবেলায় পা দুটো যখন অত্যন্ত ভারি মনে হল, একটা গুহা দেখতে পেয়ে তার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে একটা ছোট গিরিচূড়া পার হতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো [illegible] অনুরূপ আগে কখনো দেখেনি।

সমস্ত উত্তর আকাশটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, দেখা যায় পশ্চিমতম থেকে পূর্বতম সীমান্ত অবধি, সে দেখতে পেলো শাদা তরঙ্গের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া। যেন শাদা শিবিরের সারি। লোকমুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনেছিল, সে বিবরণ কে না শুনেছে সারা ভারতবর্ষে. শুনেছিল যে কুরু পাণ্ডবের উঁচু-নীচু শাদা শিবিরের সারিতে সমস্ত কুরুক্ষেত্র ভরে গিয়েছিল। সে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো, তবে তখনো জানতো না যে এ বিস্ময়ের [illegible] মাত্র। হঠাৎ একটা রক্তের বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হয়ে গেল ঐ শাদার পটে, গাঢ়তম লাল থেকে ফিকেতম বেগুনি পর্যন্ত। এর রঙ যে এমন চঞ্চল হয় কে জানতো। এই যেখানে লাল ছিল সেখানে হলদে, এই যেখানে বেগুনি ছিল সেখানে কমলা। এ কি মুহুর্মুহু রঙের পালাবদল। একবার রাজবাড়ীতে কোন একটা পরব উপলক্ষে নাচ দেখতে গিয়েছিল। আসরে বিশ পঁচিশ-জন সুন্দরী নারী নাচছে, তাদের ঘাগরাতে, কাঁচুলিতে, ওড়নিতে নাচের তালে তালে আর ঝাড় বাতির আলোয় আলোয় দেখেছিল এমনি রঙের পালাবদল, চোখে ধরবার আগেই বদলে যায়। হরিণের রক্তের লাল, চোখের শাদা, লোমের ধূসরতা, শিরদাঁড়ার পাটল আভা,—এটাই যা রঙ তার জানা। এ যে সংখ্যাতীত। কতক্ষণ মুগ্ধভাবে তাকিয়েছিল জ্ঞান ছিল না হঠাৎ সম্বিৎ হতেই দেখলো নাচ শেষ করে নটীরা অন্তর্ধান করেছে প্রকাণ্ড আসর শাদা ও শূন্য। দেখলো যে সে উপবিষ্ট, গোড়াতে দাঁড়িয়ে ছিল, কখন বসে পড়েছে জানে না। বুঝলো এ হচ্ছে চিত্রকূটের দেশ যার উত্তরে নাকি উত্তর কুরু।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো দক্ষিণ দিক থেকে আসছে পাহাড়ী ছাগলের লম্বা এক সারি, তাদের পিঠে মোট বোঝাই, সেই সারির সঙ্গে মাঝে মাঝে মালিক বা প্রহরী। পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালো জরা। কিন্তু তারা আর এগোল না। জরা একটা সমতল স্থানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে ছাগলের পিঠ থেকে বোঝা নামালো সেই বিদেশী ব্যাপারীর দল। ছাড়া পেয়ে ছাগলগুলো পাহাড়ের গা খুঁটে খুঁটে উদ্ভিদকণা খেতে আরম্ভ করলো, এসব উদ্ভিদ যে আছে আগে জরার চোখে পড়েনি।

ব্যাপারীরা মোট খুলে বের করলো মোটা মোটা রুটি আর চাটনি আর তার-

CENTRAL LIBRARY

পরে সকলে গল্প করতে করতে খেতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় একজনের চোখে পড়লো জরাকে, ইসারা করলো কাছে আসতে। জরা কাছে এলে শুধালো, রাহী আদমি?

জরা বলল, হাঁ জী।

আর একজন তার লম্বা দাড়ি চুল ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখে শুধালো, সন্ন্যাসী?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে জরা, শুধু কপালে হাত ঠেকালো।

ব্যাপারীরা তাকে বসতে বলে খান কতক রুটি ও খানিকটা চাটনি দিল, বলল, সাধুজী, খেয়ে নাও, এ পথে পরে কোথাও কিছু পাবে না।

জরা জানালো সে দক্ষিণ দিকে যাবে।

কোথায়?

ভারতবর্ষে। তোমরা কোথায় যাবে?

তারা জানাল—ঐ পাহাড় পেরিয়ে তাদের দেশ।

বিস্মিত জরা বলল, ও পাহাড় পার হবে কি করে? ওতো কেবল বরফ।

একজন বলল, বটে, তবে ওর মধ্যেই পথ আছে, নামান জমি আছে, ঝরণা আছে, গ্রামও আছে।

এতক্ষণে জরা লক্ষ্য করলো যে তাদের নাক চোখ কপাল একটু ভিন্নরকমের। বিদেশী সন্দেহ নাই। জরা শুধালো, তোমরা আমাদের দেশের ভাষা জানলে কি করে?

অনেক কাল থেকে আমরা ব্যবসা করতে আসা-যাওয়া করি তাই শিখে নিয়েছি। দেশের ভাষা না জানলে কি ব্যবসা করা যায়।

কিসের ব্যবসা তোমাদের, শুধোয় জরা।

একজন বলে, দেশ থেকে আনি পশমী কাপড় বিক্রি করে নিয়ে যাই সুতি কাপড়।

সুতি কাপড়ে শীত যানে?

এই তো আমাদের গায়ে সুতি কাপড়। তবে এখনি তা বদলে পশমি কাপড় গায়ে দেবো।

আর একজন বলল, আমাদের দেশ থেকে সুতি কাপড় চালান হয়ে যায় কম্বোজে গান্ধারে আরও কত দেশে।

আবার কবে ফিরবে তোমরা?

আর বোধহয় শীঘ্র ফিরবো না।

কেন?

কেন কি সাধুজী, দেশে রাজা না থাকলে ব্যবসা করে সুখ নাই।

রাজা নাই কি বলো?

নামে আছে কাজে নাই।

আর একজন ব্যাপারী বলল, একেবারে না থাকলে একরকম। এ যে সকলেই রাজা।

আনন্দর মুখে জরা কিছু কিছু শুনেছে তবু আরও জানবার আশায় শুধালো, সকলে রাজা সে আবার কি?

এই দেখো না সাধুজী, আমাদের মাল-পত্তর তিনবার লুট হয়ে গেল।

লুটে নিল। বিস্মিত হয় জরা।

লোকটি বলে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ এখানে তো লুট করে নেয় না, দান বলে নেয়।

দেশের নিন্দায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে জরা বলে, যদি দান করে থাকো তবে আর দুঃখ কি?

সাধুজী, দান কি ইচ্ছায় করেছি? দান বলে যারা হাত বাড়ায় তাদের হাতে যখন তীর-ধনুক বল্লম রামদা দেখি তখন কাজে কাজেই দান করতে হয়।

আর একজন জের টেনে বলে, তারা যেতেই আর একজন এসে বলে ওদের অত দান করলেন আমাদের পাঁচটা ছাগল দান করুন। তাদের হাতেও অস্ত্র কাজেই দান করতে হয়।

তৃতীয়জন বলে, সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা দল এসে বলে মাল ও ছাগল দান করলেন আপনার আঙরাখার জেবে যা আছে আমাদের দান করুন। দাবী সঙ্গত কাজেই বাধ্য হয়ে ঝোলা সাফ। আর সাধুজী, ওরা এত সংবাদ রাখে কি করে। কেমন করে জানলো পাঁচটা মোহর ছিল আমার জেবে।

জরা বলল, গরীব খেতে পায় না তাই এমন করে।

বাধা দিয়ে একজন ব্যাপারী বলল, না, সাধুজী, আমি তিরিশ বছর যাতায়াত করছি এদেশে গরীবকে কখনো লুটপাট চুরি-ডাকাতি করতে দেখিনি। অন্য দেশে গরীব লোক লুটেরা হয়, ডাকু হয়। এদেশে ধনীরা আরও ধনী হওয়ার আশায়, ভদ্র-লোকেরা ভদ্রতার সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করবার আশায়, শিক্ষিতরা নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপনের আশায় চুরি করে, ডাকাতি করে, যদিচ নাম দেয় দান আর যৌতুক। সাধুজী, যদি দেশকে ভালবাসতো তাহলে নিজেদের চুরি-ডাকাতির বোঝা গরীব দুঃখীর নামে চালাতো না। না সাধুজী, এদেশে আর ফিরবো না।

জরা যা সংক্ষেপে শুনেছিল আনন্দর মুখে এবারে তার বিস্তারিত পরিচয় পেলো।

ব্যাপারীর দল সারাদিন বিশ্রাম করে পরদিন প্রাতে সুতি কাপড়ের উপরে পশমী কাপড় গায়ে দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলো, যাওয়ার সময়ে তারা খানকতক চাপাটি আর কতকটা চাটনি দিল জরার হাতে, বলল, সাধুজী, পথে খেয়ো, বদরিনাথ পৌঁছবার আগে আর কিছু মিলবে না। অপসৃয়মান সেই দলটির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলো জরা।

(৯)

অনাবিল তুষাররাজ্যে দিনের পর দিন চলতে চলতে জরার মনে হয়েছিল বুঝি এ পথের শেষ নেই. কখনো কখনো ধারণা হয়েছে বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছি, অসম্ভব নয় চিহ্নহীন একটানা তুষারপথ ডাকিনীর দেশে এ আর আশ্চর্য কি। ভোরবেলায় যেদিন সূর্য দেখা যায় দিক নির্ণয় করে নেয়. সূর্য সর্বদিন যে দেখা যায় এমন নয়। কখনো দেখা যায় সমস্ত সাদা এমন কি আকাশটাও সাদাটে। মাঝে মাঝে ঝড়ঝাপটা আসে তখন পথে দাঁড়ানো দায়, কিন্তু যার অশেষ দুঃখভোগ শেষ হয়নি তাকে মারে কার সাধ্য।

সেদিন সকালবেলায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি কালো বিন্দু। ওটা কি? চোখের ভুল নয়তো। না, চোখের ভুল এতক্ষণ থাকে না, তাছাড়া কালোটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। সেই কালো বিন্দুটা লক্ষ্য করে পথ চলে জরা। এবারে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে; হাঁ, এতক্ষণে কালো বিন্দুটা একটা মন্দিরের আকার লাভ করেছে। তবে ওটাই বদরিনাথের মন্দির। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে দেখতে পায় মন্দিরের কাছে অনেকগুলি ছোট ছোট কালো বিন্দু, নড়ছে যেন। ওগুলো কি তবে মানুষ। দণ্ড দুয়েকের মধ্যে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায় জরা।

অবশেষে কালো একটা মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ায়, দেখতে পায় যাত্রীদের কতক ভিতরে ঢুকছে, কতক বের হয়ে আসছে, ঘণ্টা বাজছে, ধূপধুনার গন্ধ আর ধোঁয়া। কাছে কয়েকজন পসারি ফুল বেলপাতা চন্দন প্রভৃতি বিক্রি করছে। তাকে সাধু মনে করে একজন পাণ্ডা বলল, যাও সাধুজী দর্শন করো। সে কম্পিত বক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলো রত্নবেদী, আর সে বেদী শূন্য; দেবতা কোথায়? অথচ একি, যাত্রীরা কাকে প্রণাম করছে, কাকে প্রদক্ষিণ করছে, কার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করে দেবতা কোথায়?

দেবতা কোথায়? সবাই একসঙ্গে বিস্মিত হয়ে তাকায়। লোকটা বলে কি? একজন পাণ্ডা তখনি তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে বের করে দেয়। একজন বলে লোকটা ভণ্ড, কেউ বলে ম্লেচ্ছ, কেউ বলে পাপী। সে-সব কথা তার কানে যায় না. পাণ্ডার প্রবল ধাক্কায় একটা পাথরের উপরে পড়ে তার কপাল ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। সে ব্যথা অনুভব করে না, অন্তরে কেবলি কানে বাজতে থাকে পাপী ঘোর পাপী, মহাপাতকী।

নিরিবিলিতে গিয়ে বসে ভাবে পাপী তার আর সন্দেহ কি। পাপী বলেই দেবতা দর্শন দিলেন না. ভাবে দেবতা কি তবে কেবল পুণ্যবানের জন্যই. তবে পাপীকে উদ্ধার করবে কে? মানুষেও পারলো না, দেবতাও দেখা দিলেন না, তবে তার আর মুক্তি নাই গতি নাই। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে. রক্তের ধারায় আর চোখের ধারায় মিশে যায়। এক-আধটা ফোঁটা মুখের মধ্যে ঢোকে—দুয়েরই স্বাদ লবণাক্ত।

হঠাৎ জরা পিঠের উপরে স্পর্শ অনুভব করে. ফিরে তাকিয়ে দেখে একখানি শীর্ণ হাত আর তার পিছনে. সেই শীর্ণ হাতের মালিক তিনকাল-গত এক শীর্ণ বুড়ি যার দেহটা পাতাঢাকা এক কৌপিনের মধ্যে—কেবল মুখখানা উঁকি দিচ্ছে আর ঐ হাতখানা বাইরে। বিস্ময়ে সন্ত্রাসে জরা নড়ে না সরে না। [illegible] কথা [illegible] সরবে সে। তার [illegible] কাটিয়ে [illegible] বুড়িটি [illegible] বলে—সাধু, মনের পাপ আগে [illegible] দেবতা দেখা দিলেন না. দুঃখ করো না সময় হলেই দেখা পাবে।

CENTRAL LIBRARY

এত কথা তুমি কি করে জানলে বুড়ি-মা।

শোনো কথা আমার ছেলের। আমি যে এখানে বসে বসে সব দেখছি, সব শুনতে পাই।

জয়া খেদের সঙ্গে বলল, আর সকলেই দেখতে পেলো কেবল আমাকেই বঞ্চনা।

সে বলল, দেখতে পেলো।

কই কেউ তো বলছে না যে দেখতে পেলো না।

বাবা, ওরা সব মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তুমি নিশ্চয় জেনো অনেকেই দেখা পায়নি দেবতার। তবে কি জানো জানালেই বলবে পাপী তাই চুপ করে থাকে। আবার কেউ কেউ বা শোনা কথা বলছে, আহা কি দেখলাম। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি।

জয়া শুধায়, বুড়িমা, তুমি কি দর্শন পেয়েছ?

নিজ মুখে বলতে নেই বাবা, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি যে প্রথমটায় দেখা দেননি।

কেন?

কেন কি, নিশ্চয় পাপ ছিল।

তুমি আবার কি পাপ করবে বুড়িমা।

শোন কথা। পাপ করা কি কারো এক-চেটিয়া। জেনে হোক না জেনে হোক সকলকেই পাপ করতে হবে।

না জেনে করলেও পাপ।

পাপ বইকি! এই দেখোনা কেন একটা দিনের মধ্যে আমার স্বামী পুত্র গেল, রাতের বেলায় ঘরখানা পুড়ে গেল। এসব যদি আমার পাপে না হয় তবে কার পাপে!

তখন তুমি কি করলে?

আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন এক সাধু বললেন, কাঁদলে কি হবে মা, চোখের জলে পাপ ধুয়ে যায় না।

তবে কি করলে যায় বাবা, আমি শুধাই।

পাপ পুণ্যের মালিককে গিয়ে ধরো।

তিনি থাকেন কোথায়, আবার শুধাই।

সাধু বললেন, বদরীনাথে যাও, সেখানে তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে বিরাজ করছেন।

আমি বলি, কার সঙ্গে যাবো বাবা, অতদূরের পথ।

জয়া বাধা দিয়ে শুধায়, কোথায় তোমার বাড়ী ছিল, বুড়িমা?

সেই কাবেরী নদীর তীরে, চোলদের দেশে।

সে যে অনেক দূর।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুড়ি বলে, সাধু বললেন, কার সঙ্গে আবার যাবে। নিজের মনের সঙ্গে যাবে। মনটি এখানে ফেলে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে যাবে সে হবে না।

আমি বললাম, বাবা গরীব মানুষ গাড়ী-ঘোড়া তো নাই।

থাকলেই বা কি। গাড়ী চড়ে যাবে রাজার কাছে, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

তবে?

দণ্ডী টানতে টানতে যাও।

সে যে অনেক বছর লাগবে।

লাগলেই বা। তীর্থের পথে মৃত্যু হলেও তীর্থদর্শনের ফল হয়।

দণ্ডী টানতে টানতে এলে, শুধায় জয়া।

হাঁ বাব।

কত বছর লাগলো।

তা তো জানি না, তবে এই জানি যাত্রা করেছিলাম যুবতী বয়সে, এসে পৌঁছলাম যখন বুড়ি হয়েছি।

দেখা পেলে?

না, বাবা।

বলো কি বুড়িমা। এত কষ্ট স্বীকার করলে তবু দেখা দিলেন না।

দেখা দেবেন কেন? তখনো যে মনটা এসে পৌঁছয় নি, সেটা পিছনে পড়ে ছিল।

ঠাকুর তো বড় কঠিন।

হবেই হবে, পাথরে গড়া যে, বলে বুড়ি।

কবে দেখা পেলে।

সহজে আর মন্দিরে যাই না, এখানে বসে থাকি।

কেন?

দেখা পাই কি না পাই এই ভয়ে।

তার পরে কিভাবে দর্শন মিলল?

একদিন স্বপ্নে এসে বলে গেলেন, ও বুড়ি তোর জন্যে আর কত দিন বসে থাকবো, এসে আমাকে দর্শন দিয়ে যা।

তুমি দেবে দর্শন! চমকে ওঠে জয়া।

সেই কথাই তো শুধিয়েছিলাম, তা তিনি কি বললেন জানো, মা কি চিরকাল ছেলেকে দেখবে, ছেলের কি কখনো ইচ্ছা হয় না মাকে দেখতে। পাগলীর আর বুড়ি।

বুড়িমা, মি বড় ভাগ্যবতী। এই বলে হাত বাড়িয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তবে হয়তো আমিও দেখা পাবো।

পাবে বইকি বাবা, কেবল শক্ত হয়ে থাকা চাই। পাথরের দেবতা পাথরকে বড় খাতির করে।

কিন্তু বুড়িমা, আমি যে ঘোর পাপী।

পাপের আবার বেশি কম কি বাবা, ছোট সাপের বিষ কি কিছু কম।

বুড়িমা, আমি যে বাসুদেবের কাছে অপরাধ করেছি।

তবে তো বাবা তোমার ওষুধ এ বদ্যিখানায় নেই।

সে আবার কি রকম বুড়িমা, শুনেছি যিনি বাসুদেব তিনিই বিষ্ণু।

তা বটে, তবে কি জানো সব জল সমান হলেও কুয়োর জলের গুণ নদীর জলে নাই। আমাদের গাঁয়ে একটা কুয়ো ছিল তার জল নয় তো ওষুধ, কত দূরদূরান্ত থেকে লোকে এসে জল পান করে যেতো।

হতাশভাবে জয়া বলে, আজ আট-দশ বছর ধরে কত দেশ কত পাহাড় কত গুণী-জ্ঞানীর কাছে ঘুরলাম। শেষে অনেক আশা নিয়ে এলাম এখন বলছ এখানে হবে না।

তা কি করবে বাবা, যে বদ্যিখানায় তোমার ওষুধ আছে সেখানে যেতে হবে তো।

সে কোথায়?

বাসুদেবের কাছে যদি অপরাধ করে থাকো তবে তোমাকে যেতে হবে শ্রীবৃন্দাবনে, সেখানে তিনি লীলাখেলা করে গিয়েছেন কিনা।

সারা রাত বুড়িমার কথা ভাবে জয়া। একি আশ্চর্য। এই আট-দশ বছর পাহাড়-পর্বতে কত জ্ঞানী-গুণী যোগী-তপস্বীর দেখা পেয়েছে কেউ সন্ধান দিতে পারে নি পাপীর মুক্তি কি উপায়ে হতে পারে। কেউ সরলভাবে বলেছে জানি না, কেউ বা দুর্বোধ্য শাস্ত্র আউড়েছে, কেবল চার্বাক সরলভাবে জানিয়েছিল সুখের সন্ধান জানে, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তার অজ্ঞাত। তাদের তুলনায় এই বুড়ি নিরক্ষর নিতান্ত অজ্ঞ। আর শেষে কিনা তার কাছে একটা পথের ইসারা পাওয়া গেল। বুড়ির কত কথাই না তার মনে পড়ে। বলেছিল, বাবা পূর্ণাবতার ছাড়া কে দূর করবে তোমার দুঃখ। বলেছিল, বাবা, তুমি যদি পূর্ণা-বতারের কাছে অপরাধ করে থাকো তবে এক-মাত্র তিনিই মোচন করতে পারেন তোমার পাপ, যে-সাপে কেটেছে সেই সাপে ওঠাবে তোমার বিষ।

পূর্ণাবতার শব্দটা ইতিপূর্বে শোনে নি জয়া। অবতার শব্দটা বাসুদেব প্রসঙ্গে শুনেছে। অর্থ ধরে নিয়েছে দেবতা বা ভগবান, কিন্তু পূর্ণাবতার কি, পূর্ণাবতার আবার কে? বুড়িকে শুধিয়েছিল, সে বলল, পূর্ণাবতার হচ্ছে পূর্ণাবতার, যেমন চাঁদের পূর্ণাবতার পূর্ণিমার চাঁদ। জয়া ভাবে ও তো উপমা হল, অর্থ হল না। বুড়ি বলে-ছিল বৃন্দাবনে যেতে সেখানে পূর্ণাবতার লীলা করে গিয়েছেন। বেশ সেখানেই যাবে, দেখা যাক, সেখানকার লোকে বলতে পারে কিনা। আরও ভাবলো পথে যেতে যেতে সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করবে পূর্ণাবতার কাকে বলে, একমাত্র তিনিই তো পাপ থেকে মুক্ত করবেন তাকে, কিন্তু তার আগে জানা দরকার পূর্ণাবতার কে?

ভোরবেলা বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, পাহাড় থেকে সমতলে নামলে তবে তো বৃন্দাবনের পথ। চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁকা পথ ধরে চলছে তো চলছেই, এবারে তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। পথে দেখতে পায় শুধু রাহী লোক, তীর্থযাত্রী আর কাঠুরে। না, এরা পূর্ণাবতারের সন্ধান জানবে কি করে? কয়েক দিন পথ চলবার পরে ভাগীরথীর ধারাকে অনুসরণ করে, দু-দিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে সংকীর্ণ খাদের ভিতর দিয়ে ঘোর নাদে ছুটেছে ভাগীরথী।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পায় নিঃসঙ্গ এক পথিক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তার মনে হল আর দশজন লোক থেকে তিনি যেন স্বতন্ত্র। দীর্ঘাকৃতি প্রবীণ পুরুষ, পরণের ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো, হাতে দেহপরিমিত যষ্ঠি, চোখ পথের দিকে নিবদ্ধ, চিবুকে দৃঢ় সঙ্কল্পের ঘোষণা। পথিক আরও কাছে পড়তেই দেখতে পেলো তার পিছনে কালো রঙের একটি শীর্ণ কুকুর। সে কি ঐ সাধুর না পথের কুকুর তাঁর সঙ্গ নিয়েছে। জয়ার মনে হল এই সাধু কোথায় চলেছেন জানি না, তবে তিনি পূর্ণাবতারের সন্ধান যেন দিলেও দিতে পারেন। সাধু আর একটু কাছে এসে পড়তেই পথরোধ করে জোড়হাতে দাঁড়ালো। সাধু থামলো না, তবে তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা।

জয়া করুণভাবে শুধালো, বাবা, পূর্ণাবতারের সন্ধান কোথায় পাবো?

সেই সন্ধানেই তো চলেছি বলতে বলতে সাধু এগিয়ে গেল, এক পা-ও থামলো না। জয়া পিছন ফিরে দেখল মুহূর্তের মধ্যে তিনি পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কুকুরটাও। জয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, এই অসামান্য সাধুও যদি পূর্ণাবতারের সন্ধানে বহির্গত তবে তার মতো পাপীর কি আশা থাকতে পারে। তার ইচ্ছা ছিল অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে সাধুটিকে, কিন্তু সাধু না থামলো এক মুহূর্ত, না তাকালো তার দিকে। এহেন সাধুও যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে কে। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না, বৃন্দাবনে তাকে পৌঁছতেই হবে--কেন ভরসা সেখানে বুড়ি বলেছিল।

(১০)

অবশেষে বৃন্দাবনে। সমতল ভূমিতে পদার্পণ করে অবধি জয়া একটি স্বস্তির ভাব অনুভব করছিল যেমনটি গত আট-দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে পায় নি। তার যদি বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝতো যে সমতলবাসীর স্বস্তি সমতলে। সমতলের প্রভাবেই হো আর নাই হোক ব্রজমন্ডলে প্রবেশ করবামাত্র তার সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল। যমুনার শীতল জলে স্নান করে একটি গাছের ছায়ায় উপবেশন করলো। এমন সময় দেখল একজন ব্রজাঙ্গনা কিছু খাদ্য নিয়ে এসে তার হাতে দিল।

আমাকে কেন বহিন?

মেয়েটি বলল, ব্রজমন্ডলে স্নানান্তে কেউ অভুক্ত থাকে না।

কিন্তু আমাকে তো তুমি চেনো না।

ব্রজমন্ডলে কেউ কারো অচেনা নয়, সকলেই তাঁর সখা, নয় সখী।

কার, শুধায় জয়া।

পূর্ণাবতারের।

কার বললে, চমকে শুধায় জয়া।

পূর্ণাবতারের।

আশামিশ্রিত আর্তস্বরে জয়া চীৎকার করে ওঠে, আমি যে তাঁরই সন্ধানে এসেছি।

ব্রজাঙ্গনা পাশে বসে স্নেহের সঙ্গে বলল, এখানে তাঁর সন্ধান করতে হয় না, তিনিই সকলকে সন্ধান করে ফিরছেন।

সন্ধান করে ফিরছেন। কেন?

লীলা করবেন বলে।

জয়ার মনে পড়ে বুড়িমার কথা, সে তবে তো সত্যই বলেছিল যে বৃন্দাবনে তিনি লীলা করে গিয়েছেন।

জয়া বলল, কিন্তু বহিন আমি যে পাপী।

তবে তো তোমাকে আগে খুঁজে বের করবেন।

জয়া আবার বলে, আমি যে ঘোর পাপী।

তবে তো তোমার আর বিলম্ব নেই, তাঁর সাক্ষাৎ পেলে বলে।

কোথায় তিনি?

সর্বত্র। এখানকার আকাশে বাতাসে তরুলতায় কান্তারে প্রান্তরে কোথায় নয়?

মন্দিরে?

কেন, যেখানে দেখতে চাও সেখানেও দেখা দেবেন।

কাকে শুধাবো?

যাকে খুশী, এখানকার পাখীটা অবধি তাঁর নাম উচ্চারণ না করে খাদ্য গ্রহণ করে না।

কি নাম তাঁর?

হাজার নাম, যার যেমন অভিরুচি বলে, আমরা বলি কৃষ্ণ-বাসুদেব।

জয়ার হাত থেকে খাদ্য স্খলিত হয়ে পড়ে যায়।

ব্রজাঙ্গনা খাদ্য তুলে তার মুখে দেয়। কিন্তু কে তখন খাবে। জয়া মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছে।

মূর্ছা ভাঙলে দেখল তার মাথা মেয়েটির কোলের উপরে আর সে পল্লব দিয়ে বীজন করছে। শুধালো, আমি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি সস্নেহে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছিল, বলল, এখানে এসেছ এখন জ্ঞান হবে।

কি করে জ্ঞান হবে? আমি যে মূর্খ।

মেয়েটি বলল, তা হলে তো জ্ঞান হতে বাধা নেই।

সে আবার কি রকম?

সাদা পটের উপরেই তো ছবি ফোটে ভালো। যারা জ্ঞানী তাদের মনে যে অনেক আঁক জোক, সেখানে ছবি আঁকতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

জয়া বিস্মিত হয়, শুধায় এসব কথা কে শেখালো তোমাকে?

কেউ নয়, মন সাদা রাখলে কথা আপনি এসে জোটে। ভরা কলসী তো ভরা যায় না, কলসী খালি রাখলেই যেমন ভরে ওঠে।

এসব তো জ্ঞানীর মতো কথা।

মেয়েটি হেসে বলে, তবে তাই।

ঐ হাসি দেখে জয়ার মন অতীতের মধ্যে ডুব দেয়—মনে পড়ে এ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করে।

কি ভাবছ, শুধায় ব্রজাঙ্গনা।

ভাবছি ঐ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছি।

আবার হেসে মেয়েটি বলে, হাসির কি আবার স্থানকাল আছে?

পাত্রপাত্রী তো থাকতে পারে।

তুমিও তো বেশ কথা বলতে শিখেছ। শেখালো কে?

জয়া একটি মাত্র শব্দে উত্তর দেয়—দুঃখ।

দুঃখ হাসির কি জানে?

বলো কি বহিন, দুঃখের শক্তির মধ্যেই তো হাসির মুক্তা জন্মায়।

এত দুঃখ কিসের?

পাপীর আবার দুঃখের অভাব কি? পাপটাই তো দুঃখ।

তবে মনে করো না কেন আমিও পাপী।

তবু তো কৃষ্ণ-বাসুদেব তোমাকে দয়া করেছেন।

পাপমুখে কেমন করে বলি। আবার গম্ভীর হলে কেন?

ঐ হাসিটার ইতিহাস ভাববার চেষ্টা করছি।

সে চেষ্টা না হয় পরে করো। এখন উঠবে কি?

কোথায় যাবো?

তবে কি এই নদীর ধারেই পড়ে থাকবে?

সে কথার উত্তর দেয় না, আনমনা হয়ে বসে থাকে জয়া। হঠাৎ তার মনে হয় তা কি সম্ভব! এ হাসি যার মুখে দেখত তাকে তো অনেককাল আগে নিজে সে হত্যা করেছে। তবে? তবে একরকম হাসি কি দুজনে হাসে না? তবু যেন এ হাসিতে সে হাসিতে তফাৎ আছে। সে হাসি ছিল খাদের মেশানো সোনা, আর এ হচ্ছে নিকষিত হেম। দু-ই সোনা। তখনি মনে পড়ে সংসারে সোনা কি একাধিক খন্ডে থাকতে নেই। চিন্তার সুত্রে কেমন জট পাকিয়ে যায়।

তাকে তদবস্থ দেখে ব্রজাঙ্গনা শুধোয়, আমাকে কি চিনতে পারলে না জয়া?

চমকে উঠে জয়া বলে, জয়া! জয়া! কে বলল ঐ নাম।

আমি?

তুমি! তুমি কে?

এক সময়ে যার নাম ছিল মদিরা আমি সেই অভাগিনী।

তুমি মদিরা?

এখন আর মদিরা নই, এখন ব্রজাঙ্গনা।

কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

তোমার তো চিরকাল ঐ রকম, কিছুতেই কিছু বুঝতে পারো না, অন্ততঃ প্রথমটায়।

স্তম্ভিত জয়া বলে, কিন্তু তোমাকে যে আমি স্বহস্তে বধ করেছি।

তাই তো জন্মান্তরে ব্রজাঙ্গনা নাম হয়েছে।

এখন পরিহাস রাখো, সমস্ত খুলে বলো, আমার মাথা কেমন ঘুরছে।

বুঝেছি আমার কোলের উপরে মূর্ছা যাওয়ার সাধ হয়েছে। তা মূর্ছা যাওয়ার দরকার কি, এমনি আমার কোলে মাথা দিয়ে শোও না, আবার বীজন করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মঠে।

কার মঠ?

ব্রজাঙ্গনাদের।

সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

সেখানে ঢুকবে কেন, পাশে আছে ব্রজবালকদের মঠ।

সেখানেই বা আমার স্থান হবে কেন?

কেন হবে না? এখানে সবাই হয় ব্রজাঙ্গনা, নয় ব্রজবালক, সকলেই হয় তার সখা, নয় সখী।

কার?

পূর্ণাবতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের।

মদিরা, আমার সমস্ত ইতিহাস তো জালো তবু বলছ সেখানে আমার স্থান হবে।

হাঁ তবু বলছি। নাও এখন ওঠো—বলে তার হাত ধরে টানে।

জয়া উঠে দাঁড়ায়, শুধায়, তোমার ইতিহাস কখন বলবে?

সময় হলেই বলবো।

সময় কখন হবে?

যখন অসময় নয়— ঐ যে আমাদের মঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এসো আমার পিছু পিছু।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তি

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ব্যক্তিমনের শিল্প সমন্বিত প্রকাশে হয় সাহিত্যের সৃষ্টি। আবার ব্যক্তিমন সমাজমনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং সাহিত্যের একটা সামাজিক ভিত্তি আছে—এটা অস্বীকার করা যাবে না।

সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম ভাষা। ভাষা শুধু কথা বলার বাহন নয়, একে বলা যেতে পারে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ভাষা যদি না থাকতো মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত কী?

এ সরল সত্য থেকে ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতি সঞ্চারিত করে দেবার জন্য শব্দ প্রয়োগের শিল্প ছাড়া কিছু নয়। এই যে একের চিন্তা-অনুভূতি অপরের মনে সঞ্চারিত করা একে সামাজিক কর্ম ছাড়া কী বলা যেতে পারে? ভাষা যদি সংগঠন কর্মের মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় তাহলে সাহিত্যকে মানবমনের একটা উঁচু স্তরের অবস্থা বলা যেতে পারে। লেখক নিজেই একটি সামাজিক সত্তা। যতক্ষণ না তিনি সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না নেন ততক্ষণ তিনি তাঁর সামাজিক স্থিতি বা সম্পর্ককে উপেক্ষা করতে পারেন না। কিংবা যে পর্যন্ত তিনি সে সম্পর্ককে অস্বীকার না করেন সে যাবৎ তিনি সামাজিক জীব। লিখিত শব্দের মর্মবস্তুকে কিংবা তার কার্যকারিতার তিনি যা গ্রহণ করেন তা সামাজিক সত্য এবং সামাজিক কোন উদ্দেশ্য।

এখানে আমাদের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—সাহিত্য হলো সামাজিক মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সমাজ সরল রেখায় পরিব্যাপ্ত কোন সত্তা নয়, তার গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। সমাজের রয়েছে বহুমুখী দিক এবং তার ছাঁচও জটিলতায় ভরা। সে সমাজরূপের সকল দিক ফুটিয়ে তোলা অন্তত আজকের দিনে সম্ভব নয়। শুধু আজকে কেন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও সম্ভব হয়নি। একটা প্রচলিত কথা আছে, 'যাহা নাই ভারতে (মহাভারতে) তাহা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)'। কথাটি অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই, যেহেতু এ মহাকাব্যে সমকালীন ভারতবর্ষের নীচু তলার জীবনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাকাব্যে আদি সমাজের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের সাহিত্যে সমাজরূপের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া যাবে—এটা আশা করা অবাস্তব, যেহেতু এ কালের সমাজ আরো জটিল হয়েছে। সুতরাং সাহিত্যের অস্তিত্ব সমাজনির্ভর হলেও সাহিত্যকর্মে সমাজের সীমিত রূপই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যে সমাজ লেখকের সামনে প্রত্যক্ষ—সাহিত্যে সাধারণত সে রূপই অঙ্কিত হয়—যদিও সমাজের অজ্ঞাত রূপ থেকে অন্তহীন সমস্যা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে।

এমন কতগুলি সামাজিক উপাদান আছে লেখক যা উপেক্ষা করতে পারেন না। সে সমস্ত উপাদান থেকে লেখক তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। সে সমস্ত উপাদান লেখকের কল্পনাকে আকর্ষণ করে এবং আত্মপ্রকাশে বাধ্য করে। প্রথমত, লেখকের নিজের সামাজিক স্থিতি। যে সমাজ পরিবেশে তাঁকে বাস করতে হয় সে সমাজের সমস্যাগুলি অনিবার্যভাবে তাঁর মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ্যত তাঁর জন্ম, পরিবেশ, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সংস্থানের দ্বারা। অবশ্য তাঁর মনের সক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল স্পর্শচেতনার ওপর, অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম সচেতনতার দ্বারা তিনি পরিবেশ প্রভাবে সাড়া দিতে পারেন তার ওপর নির্ভর করে তাঁর সমাজচেতনা। সুতরাং কোন গোষ্ঠীতে যে সমাজপ্রতিক্রিয়া করে তার যথাযথ এবং স্পষ্টতর সমন্বয়েই হয় সাহিত্যের সৃষ্টি। এ দিক সার্থকতা অর্জনের ওপরেই বহুলাংশে নির্ভর করে সাহিত্যের মূল্য এবং উৎকর্ষ।

এখানে এসে শিল্পীর সত্তা সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমরা। বুর্জোয়া সমাজে লেখককে অন্যান্য শিল্পীর মত নির্ভর করতে হয় সমাজের একাংশের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর—যে সমাজের সঙ্গে তিনি নিজেও সম্পর্কিত। স্বভাবতই সে সমাজ তাঁর ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা তাঁর স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তাঁকে মতামত সংযত, সংশোধিত বা প্রচ্ছন্ন রাখতে হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন রকমের প্রতীকের। নানা উপায়ের মধ্যে এই একটি উপায়ে সমাজ নতুন সাহিত্যিক রূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। শিল্পী যদি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে কোন গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেন তাতে শুধু যে তাঁর দৃষ্টিসীমা সংকুচিত, কিংবা সাড়া দেবার সততা বিনষ্ট হয় তা নয়, তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সরলতাও ব্যাহত হতে পারে। উপরিতল বিহারী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সাধারণতঃ স্থিতাবস্থার সমর্থক। সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতি স্পর্শকাতর লেখকের কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না। যে জীবনচর্যার প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল নন তাকে ধিক্কৃত করতে লেখক ব্যঙ্গ বক্রোক্তি প্রভৃতি তির্যক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ধরনের সাহিত্যে তীক্ষ্ণতা হয় বেশী। লেখকের বক্তব্যটাই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। অপরপক্ষে অবসরবিলাসী পাঠক শ্রেণীর উদ্দেশে লিখিত সাহিত্যে ভাষা এবং আঙ্গিক—প্রসাধনের প্রয়াস বেশী। এ ধরনের লেখকদের প্রয়াস দেখে মনে হয় বহিরঙ্গচর্চাতেই বুঝি সাহিত্যের চরম এবং পরম সার্থকতা।

অবশ্য সৎলেখকের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। কোন প্রলোভন বা ক্ষতির সম্ভাবনা সামাজিক সত্য উদ্ঘাটনে তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন, অসম্মানিত হতে পারেন, দারিদ্র্যের মুখে তাঁকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে, কিন্তু সত্যজিজ্ঞাসা থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে না। মহাকবি দান্তের মতই তিনি আপোসহীন, উন্নতশির। প্রয়োজন হলে সৎসাহিত্যিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে কোন পরিণতির সম্মুখীন হতে দ্বিধা করেন না। শিল্পী—জীবনেও বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সে বিদ্রোহ এত চড়া নয়। পরোক্ষ উপায়ে শিল্পী সে বিদ্রোহচেতনাকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শিল্পকর্মে—যেমন, সেক্সপীয়র করেছেন তাঁর Richard II-এ, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এ শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে। এর কারণ, যে সমাজে শিল্পী বাস করেন সে সমাজের অনিবার্য প্রভাবে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু এবং রূপাঙ্গিক।

অনেক দেশের সরকারকে সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, নিয়ন্ত্রণ এবং দেখাশোনা করতে দেখা যায়। একে সাহিত্যের সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি ছাড়া আর কী বলা যায়? বিদ্রোহসচেতন সাহিত্যের প্রতি সরকার সব সময় সহিষ্ণু! সাধারণত স্থিতাবস্থার

সমর্থকদের প্রতি সরকারের যেমন সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বর্ষিত হয়, তেমনি সাহিত্যে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত শিল্প-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রবণতার প্রতি সরকারের অসন্তুষ্টি সুবিদিত। লিখিত শব্দের শক্তির ভয় এভাবে সেন্সারশিপ বা সরকারী পরীক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতে এরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতি সমাজ প্রগতির ক্ষতিকারক হতে পারে। এ পরীক্ষা-পদ্ধতি যদি খুব কড়া এবং কল্পনাহীন হয় তা মহৎ শিল্পের সর্বনাশের কারণ হতে পারে।

এর থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সাহিত্য কী হবে সামাজিক দলিলের শ্রেণীভুক্ত?

এমন কোন লেখকের অস্তিত্ব দেখা যাবে না যিনি সমাজতত্ত্ববিদদের সমীক্ষার উপকরণ যোগাবার জন্য শব্দজাল সৃষ্টি করেন। এটা যদি সত্য হয় তবে এটাও সমানভাবে সত্য যে, সমাজের মোক্তার মুখপাত্র হিসেবে সাহিত্য সামাজিক দলিলে পরিণত হয়। পাঠকমনের ওপর এ ধরনের সমাজ সচেতন সাহিত্যের প্রভাব অপরিমেয়।

এ পর্যায়ের লেখকের সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণনা, তার অঙ্কিত নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার চিত্র, তার যুগ এবং পরিবেশের বিশ্লেষণ মুখ্য বা গৌণভাবে সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত। তার মনোভঙ্গী যাই হোক না কেন এ সত্য অপরিবর্তিত থেকে যায়। ব্যক্তিচরিত্রের বিচ্যুতি এবং অস্বাভাবিকতার অনুসন্ধানে সাহিত্য সব সময় মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়ে আসছে। এছাড়া সামাজিক আচরণে দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতি অথবা যে সমস্ত ভাবরূপ সমাজ জীবনকে সুনির্দিষ্ট কোন প্রগতির দিকে চালিত করে—তার পরিচয়ও সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গী বা ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে চমৎকার ফুটিয়ে তোলেন। এলিজাবেথীয় যুগে নাটকের বিকাশ, রোমান্টিক যুগের কবিচেতনার উন্মেষ, ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাসের সম্প্রসারণ শুধুমাত্র স্ব-যুগে শিকড় বিস্তার করেনি—তাদের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে সামাজিক প্রবণতার মূল্যবান ইঙ্গিত এবং যে সামাজিক পরিবেশে তাদের সৃষ্টি হয়েছে তারও আভাস।

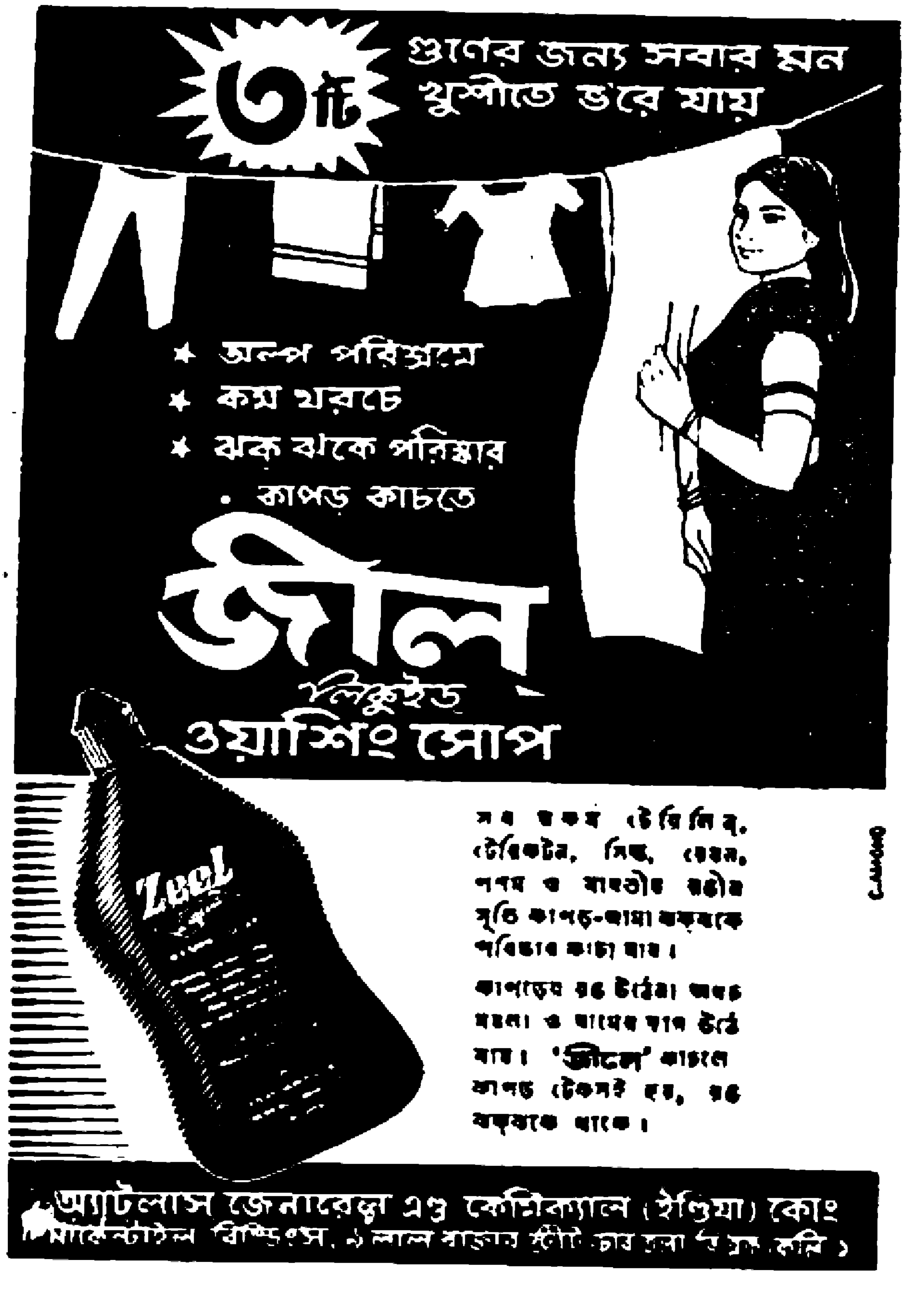

মোটের ওপর এ মন্তব্য বোধহয় সঙ্গত যে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড় এবং সমাজ-বাস্তবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য-সৃষ্টি অকল্পনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ফরাসী কবিদের কাব্য মতবাদে ছিল আবেগহীন নিরপেক্ষতা। তথাপি সে মতবাদ যে যুগের সৃষ্টি সে যুগকে বাদ দিলে তার মর্মলোকে প্রবেশ করা যায় না; সে মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক পরিবেশের দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। তাঁদের ধারণা হয়েছিল এ রকম দায়িত্ব নেবার তাঁরা উপযুক্ত নন কিংবা শুধুমাত্র মানুষের জন্য ছাড়া তাঁদের দায়িত্ব অন্যত্রও আছে। সমাজ-চেতনাহীন তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গী যে লৌকিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি তার প্রমাণ নন্দনতত্ত্ববিদ এবং উনবিংশ শতকের শেষার্ধের ফরাসী কবিগোষ্ঠী নিষ্ঠাবান শৈলীসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার অধিকারী হলেও আজ শুধুমাত্র কৌতূহলের সামগ্রী বলে বিবেচিত। অপরপক্ষে, আমরা বারে বারে সর্ব যুগের মহৎ শিল্পীদের শরণাপন্ন হই, কেননা তাঁদের সৃষ্টি জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, সামাজিক সত্যকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। বরং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিক প্রত্যয়ের সাহায্যে তাঁরা সে সামাজিক সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যেও এ সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। উদ্ভবের আটশো বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্য সর্বপ্রথম মূল্যসমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, যেহেতু এ শতাব্দীতেই লেখকের সচেতন সমাজ-জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তথাপি এ শতাব্দীর লেখক মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব এবং রোমান্টিক সৌন্দর্যস্বপ্ন মুক্ত হতে পারেন নি বলে সমাজের অতি-বাস্তব রূপ এ যুগের সাহিত্যে আশানুরূপ প্রতিফলিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বন্দ্ব শিল্পীর চেতনাকে সমাজজীবনের নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখী করায় সাহিত্যের রূপই পালটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-রুচিও। এযুগের পাঠক প্রথমেই খোঁজেন সাহিত্যে সমাজজীবনের বাস্তব সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে কী পরিমাণে, তারপর সে সমস্যানির্ভর সৃষ্টি রসসংবেদনা লাভ করেছে কিনা। এদুটি সর্ত পূর্ণ না হলে তাঁরা রচনাকে সৃষ্টির মর্যাদা দিতে চান না। লেখকের এ চাহিদা মেটাতে গিয়ে আধুনিক লেখকের দায়িত্ব এবং প্রয়াসও অনেক বেড়ে গেছে। ইদানীংকালে সৃষ্টি মানে নিছক কল্পনার বিদ্যুৎদীপ্তি নয়, ঠিক। সমাজ-সচেতন মনের মননশীল শিল্পরূপ। শিল্প-চেতনার সঙ্গে গভীর সমাজচিন্তা যুক্ত না হলে সাম্প্রতিক কালে কোন সৃষ্টিই আর বিচারশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না। বাংলা সাহিত্যে মন ভোলাবার পালা শেষ হয়ে সমাজ জিজ্ঞাসার যুগ শুরু হয়েছে—এটা শুভ লক্ষণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরুণ তাকে লিফট্ দিতে চাইল কিন্তু সীমা একটা ট্যাক্সি নিয়ে তার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির পাশে হঠাৎ সোমা দত্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠবার মুখে সোমা দত্ত একেবারে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

শ্যামলী, তোমার জন্যে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। সোমা দত্তর পা টলছে।

আপনি এখানে কেন?

স্রেফ তোমার জন্যে, বিশ্বাস কর।

বেরিয়ে যান, তা না হলে দারোয়ান ডাকব আমি।

হেসে উঠল সোমা সীমার কথা শুনে।

দারোয়ানকে আমি একটু কাজে পাঠিয়েছি—আসতে অনেক দেরী হবে তার—। সোমার মুখে কুটিল হাসি। অনেক ভদ্রলোক এ বাড়ীতে আছেন, আমি চীৎকার করে ডাকব তাঁদের।

তাতে আমার অসুবিধে নেই। অনেক সামনে আমি সব বলতে পারব। সাক্ষী থাকবে তারা। কোমরে হাত দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল সোমা।

কি বলবেন? রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে সীমার।

বলব, তুমিও যা আমিও তাই; বুঝলে না? এত বড় সহরে আমরা; পৃথিবীর নরকের উপরেই সবার। ওরা তাই ভালবাসে আমাদের। সত্যি বলতে কি তুমি আর আমি একই পথের পথিক।

বেরিয়ে যান—গলাগলায় আবার বলে উঠল সীমা। উত্তেজনায় স্বরটা কেঁপে উঠল তার।

যাব, তবে সবকথা বলে তারপর। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সোমা।

কি কথা? সীমার মুখটা তখন পাংশু হয়ে গিয়েছে।

আমিও যা তুমিও তাই—। একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করল সোমা। লোক দেখলেই চেনা যায়—এক লাইনের লোক—বুঝতে দেরী হয় না। আমি সোনা নিয়ে হাতে ধরা পড়েছি, তুমি ধরা পড়নি।

অন্য কিছু মানে?

সেইটাই ত বুঝতে পারছি না এখনও—, তবে ও ধরে ফেলব। কি কোম্পানীটা যেন—ক্রুস অ্যান্ড ক্যাভেণ্ডিস—যারা পাট বেচে যায় উপার্জন করছে। তাছাড়া এই বয়সে একলা ফ্ল্যাটে থাকার মানে আমরা বুঝি। সোমা দত্ত এগিয়ে এল তার কাছাকাছি। চকিতে পাশ কাটিয়ে সিঁড়িপথে ওপরে উঠে গেল সীমা। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা কোন রকমে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সীমা, তারপর দরজাটা বন্ধ করে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

তার চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত নেই বলে বুঝতে পারল সীমা। অসীম ক্লান্তি অথচ উত্তেজনায় তার দেহমনে পর্যন্ত জ্বালা ধরেছে বলে মনে হল। এই রকম অবস্থায় লোক অজ্ঞান হয়ে যায় নিশ্চয়। মনে জোর আনল সীমা, তার পক্ষে এ বিলাসিতা শোভা পায় না। কল থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। একটু আগে সে তার আকণ্ঠ পান করে ফিরেছিল। সেটা বোঝার মত অনুভূতিও ছিল না তার। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল সীমা। তার দেহের মধ্যে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বয়ে চলেছে। অনুভূতিটা স্পষ্ট কিন্তু বর্ণনাতীত। তার বুকের মধ্যে যেন ঝড় উঠেছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দটা বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। এ রকম অসহায় অবস্থায় সে এর আগে পড়েনি। অনেক রকম বিপদের মুখোমুখি সামনে সে এসেছে। কিন্তু সোমা দত্ত যে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সেটা তার কল্পনাতীত। দুঃখে ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

খাটের পাশের আলো জ্বেলে রেখেছে নান্কাকা। মা, নান্কাকা তার সামনে দাঁড়িয়ে। না, সে কাঁদবে না ওদের সামনে। বাবা তাকে বলে দিয়েছে কেউ পীড়ন করলে কাঁদতে নেই তাতে অপরাধী আরও মজা আর আনন্দ পায়।

কোথায় রেখেছিস্ আমার মনিব্যাগ? নান্কাকা তার কান ধরে টান দিল একটা।

কিরে, কথা বলছিস না যে? মা একটা চড় মারলো গালে সজোরে।

না, তবুও কাঁদবে না সীমা। ওরা মেরে ফেললেও কাঁদবে না। ব্যাগে সতের টাকা ছিল, সেটা কিছু নয় কিন্তু একটা জরুরী কাগজ ছিল আমার। শোকে অস্থির হল নানুকাকা।

ব্যাগটা সেই নিয়েছে। নানুকাকা স্নান করতে যাবার সময় বালিশের তলায় রেখেছিল, সেটা সীমা দেখেছে। ব্যাগটা নিয়ে সে স্কুলে চলে গিয়েছিল। ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে সতেরটা টাকা জমা রেখেছে রেখার কাছে। রেখা স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকে। সীমা টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছে তা জিজ্ঞেসও করেনি রেখা। রেখা বোর্ডারদের পেন, ঘড়ি সরিয়েছে কয়েকবার। ধরতে পারেনি কেউ। কিভাবে জিনিস সরাতে হয় আর ধরা পড়লে ভাল মানুষের মত কি রকম মুখ করতে হয় সেটা সে সীমাকে শিখিয়েছিল। এই গল্পগুলো শুনতে সীমার খুব ভাল লাগত। অতগুলো মেয়ে বা টিচার কিছুই করতে পারত না রেখার। আশ্চর্য লাগত সীমার। রেখার শক্তি আর সাহস দেখে মুগ্ধ হত সে।

কি হল, জবাব দিচ্ছিস না যে; ছিঃ ছিঃ চোর হলি তুই শেষে। নানুকাকা লজ্জা দিতে চায় তাকে।

হবে না, কেমন বাপের মেয়ে—। ফোড়ন দিল মা।

থাক তাহলে এইখানে। আজ তোর খাওয়া বন্ধ। দরজা বন্ধ করে নানুকাকা আর মা চলে গেল।

অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কে, নানুকাকা? না, এত সৌম্য দত্ত। আমায় খুলে দিন। অনুনয় করল সীমা। খুলে দেব? আরও জোরে বাঁধব যাতে গায়ের মাংস কেটে যায় তোমার। সৌম্য দত্ত হাসছে, ভারি আমোদ পেয়েছে সে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আরও একজনকে দেখতে পেল সীমা। মূর্তিটা এগিয়ে এল কাছে—অরুণ বসু কোথা থেকে এল! আমাকে বাঁচান, আমায় মেরে ফেলবে এরা, বলল সীমা। অরুণ বসুর হাতে একটা চেন বাঁধা কুকুর। সেটা এগিয়ে দিল অরুণ, বলল—এই তোমায় বাঁচাবে। বন্যায় এসেছে আর সীমার ভয় নেই। বন্যায়, বন্যায়, নিজের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সীমার।

বিছানায় উঠে বসল সে। অদ্ভুত স্বপ্ন। কোথায় নানুকাকা আর কোথায় অরুণ বসু, সৌম্য দত্ত। সৌম্য দত্তর কথা মনে পড়তে তার শরীরের মাংসপেশী আর স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠে সে সামনের জানলাটা খুলে দাঁড়াল তার সামনে। বুকের মধ্যে তার এখনও তাণ্ডব চলছে নানা ছন্দে। [illegible]

একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ল তার। একটা সুদৃশ্য লাল রংয়ের বাক্স। সেটা খুলে সীমা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে উজ্জ্বল চুনী পান্নার ব্রোচ রয়েছে একটা। তার অজান্তে এটা কিভাবে এসেছে তাই ভাবল সে। যখন সে ঘুমচ্ছে তখন ঝাড়ুদার মারফৎ সৌম্য দত্ত এটা পাঠিয়ে থাকবে। সৌম্য দত্ত সকলকেই হাত করেছে বলে বুঝল সীমা। দরোয়ান, ঝাড়ুদার, এমন কি অন্যান্য টেনেন্টরাও হয়ত তার করতলগত। সৌম্য দত্ত ধনী। পল্লীতে তার যে কারণেই হোক জনপ্রিয়তা আছে। তার বিরুদ্ধে একলা সীমা কি করতে পারে। অসহায়ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

সৌম্য দত্ত কি চায় তা সে জানে। কিন্তু জীবনে সে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে নারী-পুরুষের সম্পর্ক। সৌম্য দত্তর শিকার হতে সে রাজী নয়। তার চেয়ে পুলিশ অনেক ভাল। সেখানে আর যাই হোক এ ধরনের নোংরামি নেই। সেই নিয়ে আর একজনের কথাও মনে পড়ল সীমার। অরুণ বসুকে এ সমস্যার কথা বললে কেমন হয়। অরুণ বসু নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবে বলে তার ধারণা হল। আর কিছু না হোক অরুণ বসু ভদ্র। তাকে এভাবে অপমানিত হতে দেখে সে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। কিন্তু কি বলবে অরুণ বসুকে? একজন লোক তার পিছু নিয়েছে তাকে অপমান করছে তার জবাবে সে যদি বলে পুলিশের শরণাপন্ন হতে তাহলে? আর অরুণ বসুই বা তাকে সাহায্য করবে কেন? তাতে তার স্বার্থ কি? স্বার্থ ছাড়া মানুষ এক পাও চলে না বলে সে জানে। তাছাড়া কোলাকিয় বা যৌথ কোম্পানীর টাকা সরানোর ব্যাপারে অরুণের নজর তার ওপর আছে কিনা, তাই বা সে জানবে কি করে? এতখানি ঝুঁকি নিয়ে অফিসের টাকা পাচার করতে যে পারে তার আবার এ ধরনের সামান্য অপমানে কি ক্ষতি হয়। অরুণ বসু তাকে যদি সরাসরি এ প্রশ্ন করে তাহলে সে কি জবাব দেবে। স্বাধীন দেশে তার মত সাবালিকা আধুনিকার আমায় অপমান করেছে বলে কাঁদুনি গাওয়ার কি কোন যুক্তি আছে? রাত্রের অন্ধকারে নানা চিন্তা এসে ভিড় করল তার মাথায়। সাধারণতঃ সীমা চিন্তা করতে ভালবাসে না। যখন যেমন অবস্থায় পড়ে, নিজের বুদ্ধি আর কৌশল দিয়ে এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত সে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। সৌম্য দত্তর মত অনেক লোকই তার পিছু নিয়েছে, এটা তার নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু সৌম্য দত্তর সাহস আর ক্ষমতা অনেক বেশী বলেই মনে হচ্ছে তার। সব থেকে তার বিপদ সে প্রয়োজনে পুলিশের আশ্রয় চাইতে পারবে না। সভ্য জগতের একটা মূল্যবান রক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত।

সেদিন অফিসে অরুণ বসুকে কিছু বলার আগেই চিঠি ডিকটেট করতে করতে অরুণ বসু বলল,

আজ শনিবার, এক জায়গায় যাচ্ছি, যাবেন নাকি?

কোথায়? জিজ্ঞাসা করল সীমা।

শহর থেকে দূরে, একেবারে পল্লীগ্রামে। জায়গাটা ভাল লাগবে আপনার।

যাব। উত্তর দিল সীমা।

ছুটির পর সে কি করবে তাই ভাবছিল এতক্ষণ। সৌম্য দত্ত তার অফিসের ঠিকানা জানে। সুতরাং কোথায় যে সে তার জন্যে ওত পেতে থাকবে তা সে জানে না। অরুণ বসুর সঙ্গে গেলে এ দুর্ভাবনার হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাবে সে।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে অরুণ বসুর গাড়ী চলল শহরতলীর মধ্য দিয়ে। এতক্ষণে একটু সবুজের নিশানা দেখা গেল। গায়ে গায়ে বাড়ীগুলো এবার একটু জায়গা ছেড়ে দিল নিজেদের মধ্যে। রাস্তার ভিড়ও অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল চারিদিকে।

বাড়ীতে আপনার কে আছে? হঠাৎ প্রশ্ন করল অরুণ।

কেউ নেই—। অনেকক্ষণ বাদে উত্তর দিল সীমা।

আপনাকে কেমন যেন শুকনো লাগছে আজ।

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল নেই। রাত্রি জাগরণের কারণটা বলতে দ্বিধা হল সীমার।

জোরে গাড়ী চালালে অসুবিধে হবে আপনার? অরুণ চেয়ে দেখল সীমার দিকে।

না। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

আমরা কোথায় যাচ্ছি জানেন?

কোথায়? একটা অজানা ভয়ে সীমার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল।

আপনি খুব অল্পে ভয় পান, না? হাসিমুখে প্রশ্ন করল অরুণ।

কই না ত। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীমার।

আমরা যাচ্ছি একটা গ্রামে। গ্রামে কখনও গেছেন?

না।

আমি প্রত্যেক শনিবার চলে যাই বাবার কাছে।

বাবা।

হ্যাঁ। বাবা গ্রামেই থাকেন। ছোট তিনটে ঘর, দুটো গরু আর হারুকাকা এই নিয়েই আমাদের সংসার।

আপনি—?

আমি অবশ্য কলকাতায় থাকি। না থেকে উপায় নেই। বাবা কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই থাকবেন না।

কেন? [illegible]

হাঁপানির জন্যে।

কি বললেন, সীমার স্বরে উৎকণ্ঠা।

খুবই হাঁপানি অসুখ। [illegible]

ধুলোমহে—

খক-খক—কাশি কাশি। বাবা কি হয়েছে? ওরকম করছ কেন? বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এখুনি কমে যাবে। এটা কি বাবা, মাদুলি? হাঁপানি সেরে যায়? আমি চা করে আনছি মা। বকলেই বা? তুমি চুপ করে আনছি। মা বকলেই বা? তুমি চুপ করে শোও। মালিশ করে দেব সেই তেলটা দিয়ে—খক খক, খক খক কাশি, কাশি হাঁপ, হাঁপানি... .

কি বলছেন? অরুণের কথা শুনতে পারেনি সীমা।

পুকুর দেখছেন? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হ্যাঁ।

আমাদেরও একটা আছে। দাদুকাকা প্রায়ই মাছ ধরে। আমিও চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। হাসল অরুণ।

অন্ধকার হয়ে কালো মেঘ উঠল পশ্চিম দিকে। কালবৈশাখীর সময়। অরুণ আরও জোরে গাড়ী চালাল।

বা, কি সুন্দর দেখুন। মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল অরুণ, আরও পাঁচ মাইল। ঝড়ের আগে পৌঁছতে পারব কিনা জানি না।

পৌঁছন গেল না। তার আগেই কালো-মেঘটা জটা নেড়ে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎবেগে। সংগে সংগে ঝড় উঠল। মাঠের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল হু-হু করে। এপাশ ওপাশ, সামনে পিছনে, তারা অরুণের গাড়ীটা ঘিরে ধরল চতুর্দিক থেকে। গাড়ী দাঁড় করাল অরুণ। এ ধুলোতে আর অন্ধকারে এক পাও চলা সম্ভব নয়। এবার এল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা চড়্‌বড় করে গাড়ীর ওপর পড়তে লাগল মুষল ধারে।

মুস্কিল হল, আপনাকে অসুবিধেয় ফেললাম। বলল অরুণ।

না, আমার ভাল লাগছে, কেমন হাঁস-গুলো ছুটছে দেখুন। সীমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। ছোট ছোট ফুলগুলো এলো-মেলো হয়ে গিয়েছে।

এবার বেশ জোরে জল এল, তার সংগে মেঘের গর্জন। দুটো হাত কানে চাপা দিল সীমা। কড় কড়—কড়াৎ একটা বাজ পড়ল। হাতের রুমালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে সীমা। মুখটা তার পাংশু হয়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কি হল, ভয় পেয়েছেন? ফাঁকা জায়গায় আওয়াজ বেশী হয়। কোন ভয় নেই। আশ্বাস দিল অরুণ।

বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে। পাশের নালা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। মুখ থেকে রুমালটা নামাল সীমা। একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল জলের খেলা। মেঘের শব্দ হচ্ছে আবার। হঠাৎ একটা জোরাল আলো যেন গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। কড় কড়—কড়াৎ, এবার আরও কাছে। সিটের ওপর কুঁকড়ে গেল সীমা। হেলান দেবার ভঙ্গিমাটায় মুখ গুঁজে কাঁপছে সে। তার পিঠের ওপর হাত রাখল অরুণ।

...কাচ কাচ—, ওটা কি বাবা, জানলা জানালা? বন্ধ করে দাও, আমার ভয় করছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে থাক বাবা। কাচ কাচ, কড় কড়—কড়াৎ।

ভয় কি, আমি ত রয়েছি, কিছু হবে না, বলল অরুণ, চলুন এবার আস্তে আস্তে যাওয়া যাক।

কয়েকবার চেষ্টার পর গাড়ীটা স্টার্ট করল সে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। মাইল তিনেক যাবার পর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। পাশের কাঁচ নামিয়ে দেওয়াতে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া ঢুকল গাড়ীর মধ্যে।

মেঘটা পাতলা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের বাইরে। আলো ফুটেছে এবার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব চারিপাশে। স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। সীমা এতক্ষণে সামলে উঠেছে কিছুটা। মনটা তার অতীতের অতল গহ্বর থেকে বাস্তবে নেমেছে। আশপাশের মনোরম দৃশ্যের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছে সে আর্টিস্টের মত।

এবার বলুন মেঘের ডাকে অত ভয় কেন? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

ছোটবেলা থেকেই ভয় পাই, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল সীমা।

আপনার কিছুতে এত ভয় হবে আমার মনে হোত না।

ওখানে অত ভিড় কেন?

কথাটা পালটে দিল সীমা।

আজ হাট ছিল, উত্তর দিল অরুণ, এবার আমরা এসে পড়েছি, এখন হারু-কাকাকে পেলে হয়।

কেন?

মাথা ধরেছে?

অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়

কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

চিত্র প্রযোজক শ্রী বি. মুরারি বলেন, "অ্যানাসিন মাথার যন্ত্রণা থেকে চট করে আরাম দেয়। আমি সবসময় সঙ্গে অ্যানাসিন রাখি।"

জোরালো, কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য, কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

ফলপ্রদ,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

CENTRAL LIBRARY

হাটে এসে থাকলে ভিড়ের মধ্যে গাড়ীটা হয়ত দেখতেই পাবে না। ওই যে বড় অশত্থ গাছটা দেখছেন ওর পাশ দিয়ে আমাদের বাড়ী যেতে হয়।

এবার সীমা সতর্ক হল। এতক্ষণ নিজের মনের দিকে সে তাকাতে পারেনি। পল্লীর আবহাওয়া তাকে বন্ধনহীন স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিল। গাড়ী গিয়ে একটা খোলা জায়গা পার হতেই একটা ছোট বাড়ী নজরে পড়ল। হারুকাকা দাঁড়িয়েই ছিল তাদের অপেক্ষায়। বেঁটে ছোটখাটো মানুষটি।

হারুকাকা তুমি হাটে যাওনি? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

সকালেই সেরে রেখেছি, বলল হারুকাকা, গাড়ী কড়ে আটকে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, তাই ত দেরী হল। এঁরই অন্যায় কথা ছিল আজ।

আসুন দিদিমণি, বাবুর আবার আজ হাঁপটা বেড়েছে তাই শুয়ে আছেন।

চলুন ওঁর সঙ্গে দেখা করি আগে। সীমা অরুণের বাবাকে দেখতে ব্যস্ত হল। হারুকাকা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ততক্ষণ।

মিস সেন, যদি অনুমতি দেন তবে একটা অন্যায় অনুরোধ করি।

সীমা দাঁড়াল অরুণের দিকে তাকিয়ে।

বাবার সামনে আপনাকে আপনি বলে সম্বোধন করব না।

বেশ। অরুণের কথাটা বোধগম্য হল না তার।

একটা বিছানায় অসিতবাবু শুয়ে আছেন। ওদের দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসতে গেলেন তিনি। সীমা তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর বসল। সেই শীর্ণ চেহারা, গাল দুটো বসা! সেই অস্ফুট শব্দ যা চাপতে চেষ্টা করলেও অবাধ আর্তনাদের মত বেরিয়ে আসে বার বার। অসিতবাবুর বুকে হাত বোলাতে লাগল সীমা ধীরে ধীরে।

বাবা, এই শ্যামলী। বলল অরুণ।

তুমি না বললেও আমি বুঝেছি। বললেন অসিতবাবু। তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ধরে পড়েছিলে বোধহয়। যাও কাপড়-জামা বদলে নাও।

অরুণ দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

তোমার মুখটা একটু দেখি। অসিতবাবু দুহাতের তালু সীমার গালে দিয়ে কাছে টেনে আনলেন। একটু রুক্ষ, শুষ্ক অথচ উত্তাপ রয়েছে তাঁর স্পর্শে। এই স্পর্শ সীমার অপরিচিত নয়। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে মাদুলির খোঁজও পেল সে। মনের মধ্যে তার একটা ঝড় উঠতে হলে বুঝতে পারল সীমা। কালবৈশাখীর মত রুদ্ররূপ তাতে নেই বটে, তবে প্রচণ্ড বেগ রয়েছে তাতে। নতুন অনুভূতির আলোড়নে তার সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করল সে। না, তার সত্তাকে সে হারাবে না। জোর করে তার মনকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে সীমা। তাদের যেন [illegible]? মনে হয়েছে নিশ্চয়—

সোমা দত্ত তাকে অপমান করছে সকলের সামনে।—পুলিশ এসেছে তাকে ধরতে—তার জেল হবে—সে একটা জঘন্য চোর! রাস্তায় কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। রাস্তার লোকে তাকে নির্মম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। নানুকাকা অত মেরো না—কাচ, কাচ—ভাঙ্গা জানলাটার শব্দ হচ্ছে বার বার।

মা তুমি এতদিন আসনি কেন? জিজ্ঞাসা করলেন অসিতবাবু। না পারল না সীমা। অর্ডিকিছু মনে করেও অসিতবাবু, আর হাঁপানির শব্দ তাকে নিজের দিকে যেতে দিচ্ছে না।

সময় হয়নি এতদিন। আস্তে বলল সীমা।

অনেকদিন বাদে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলে তুমি।

এতদিন কেউ দেয়নি। অবশ্য আর কেউ নেই তো দেবে কে? নিজেই জবাব দিলেন অসিতবাবু।

চা খাবেন? জিজ্ঞাসা করল সীমা। তার বাবাও টানের সময় চা চাইতেন বলে মনে আছে তার।

ঠিক বলেছ মা, একটু চা পেলে ভাল হোত। হারু বাতে ভুগছে, ওরই বা দোষ কি?

আমি করে আনছি। সীমা উঠে পড়ল। তারপর দালান পেরিয়ে উঠানে হারুকাকাকে দেখে বলল— কাকা, রান্নাঘরটা কোথায়?

এই যে দিদিমণি, এইদিকে। কিন্তু তুমি ওখানে যাবে কেন? ব্যস্ত হয়ে পড়ল হারুকাকা।

আমি চা করব।

কেন দিদিমণি, আমি করে দিচ্ছি।

না, আমিই করি, রান্নাঘরে ঢুকল সীমা।

অরুণ দালানে উঠল। গায়ে তার একটা তোয়ালে জড়ানো, মাথাটা ভিজে। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে সে বলল—কি করছ?

চা, তুমি খাবে? সীমাও অভিনয় করতে পারে।

নিশ্চয়, তার সঙ্গে যদি সম্ভব হয়—আরও কিছু।

সে আছে, দিদিমণি তুমি শুধু চাটা করে নাও। মাঝ থেকে বলল হারুকাকা।

শ্যামলী, তোমার মাথায় ধুলো ভর্তি, চান করবে না? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

করব, আগে চা দিই তারপর। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল সীমা।

অসিতবাবুকে চা খাইয়ে ও নিজেরা খেয়ে সে বাথরুমে ঢুকল। টিউবওয়েল, বালতিভর্তি জল, সাবান, তোয়ালে, আর একটা অরুণের ধুতি। এবার বিপদে পড়ল সীমা। মরে গেলেও সে অরুণের জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। মুখ হাত পরিষ্কার করে নিয়ে অসিতবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সীমা। ঘরের জানালার কাছাকাছি যেতে তার নামটা শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

তুমি আর দেরী কোরো না অরুণ, [illegible] তোমার শরীর হয়েছে। অসিতবাবুর গলা।

আর কিছুদিন যাক বাবা, আপনি একটু সুস্থ হোন আগে—বলল অরুণ।

আমি যথেষ্ট সুস্থ আছি। বিয়ের যা কিছু ব্যবস্থা আমিই করব, তুমি ত নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে করবে না।

না তা করব না। তাহলে এবার—কলকাতায় আপনাকে থাকতে হবে কিছুদিন।

কথাগুলো শুনে সীমা যেন পাথর হয়ে গেল। অরুণবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে! না, এ হতে পারে না। বিয়ে সে করবেই না। যে কোন প্রকারে সে বাধা দেবে। অরুণ বসুই বা জেনেশুনে তাকে বিয়ে করতে চায় কেন?

সোমা দত্তর মত অরুণ বসু তাকে চেয়েছে, এটা বুঝতে তার দেরী হয়নি। পন্থা দুটো অবশ্য ওদের ভিন্ন ছিল। কিন্তু তার বিয়ের কথা যে উঠবে—এমন কি তার যে একদিন বিয়ে হতে পারে এটা ভাবাও তার পক্ষে যে ভয়ানক কষ্টকর। কেন যে কষ্টকর তার কারণ বিশ্লেষণ সে কোনদিনই করেনি বা করতে চায়নি। একটা পরিচিত চক্রের মধ্যেই তার জীবন সীমা বদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে বিয়ের মত একটা উৎকট জিনিসের স্থানই ছিল না। সীমার কাছে বিয়ে শুধু উৎকট নয়, নোংরা এবং অশালীন! সেটা তাকে এড়িয়ে যেতে হবে যে কোন প্রকারে। অরুণ বসু এবং সোমা দত্তের উদ্দেশ্য এক। ও ফাঁদে সে পা দেবে না।

বিয়ের পরও কি শ্যামলী কাজ করতে চায়? অসিতবাবুর গলা।

এখনও জিজ্ঞাসা করিনি, আপনি যা বলবেন তাই হবে। সুপুত্রের মত জবাব দিল অরুণ।

দূরে হারুকাকার গলা শোনা গেল। দেরী না করে সীমা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

একি, তুমি ভিজে কাপড় পরে আছ—অরুণের স্বর উদ্বেগপূর্ণ।

কে বললে ভিজে? অন্যদিকে তাকাল সীমা।

দেখি মা, এগিয়ে এস—ডাকলেন অসিতবাবু। তারপর সীমার শাড়ীটা স্পর্শ করে বললেন—হ্যাঁ একটু ভিজে মনে হচ্ছে; কিন্তু শাড়ী ত নেই এ বাড়ীতে।

কেন একটা শুকনো ধুতি পরলে ক্ষতি কি ছিল?

না, ধুতি আমি পরতে পারি না।

ঠিক বলেছ মা, মেয়েরা আবার ধুতি পরবে কি? সীমার কথায় সায় দিলেন তিনি। তারপর বললেন, তোমরা আর দেরী করো না অরুণ—এবার আস্তে আস্তে যাও—পথে অন্ধকার হয়ে যাবে। আর মা, তুমি কবে আসবে বল ত। এই দেখ তুমি আসতে আমি কত ভাল হয়ে গেছি।

অরুণ আর সীমা যখন অসিতবাবুর কাছে বিদায় নিল তখন বারবার তিনি সীমাকে তাঁর কাছে ফিরে আসতে অনুরোধ করলেন। তাদের বিদায় দিতে বাইরে পর্যন্ত এলেন [illegible] আপত্তি সত্ত্বেও।

(ক্রমশঃ)

সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(৩)

......আজ অনেকদিন পরে বিজয়ার পর দেখা করলাম। অলকদার স্ত্রী বাড়ীর খবরাখবর নিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বসলাম তাঁর পাশে রাখা এক চেয়ারে, তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে। বৌদি বলছিলেন—'বিজয়ার পর থেকে একটু জ্বর চলছে। রক্তের চাপ নাকি বেড়েছে!' অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ডাক্তারে বলেছে আমিষ ভোজন ছাড়তে। কাল ভেটকীমাছ গত পরশু মাংস বেশ লেগেছিল, সকালে একটু হাঁপানি বাড়ে, কাশি হয়। বৈকালে ছটার পর থেকে শরীরটা একটু ভাল থাকে।'

এইরকম সাংসারিক কথাবার্তা চলছে—এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'হাওড়ার শৈলেন দে-কে আপনি চেনেন?' আমি জবাব দিই, 'ঠিক চিনতে পারছি না। কোথায় তিনি থাকেন? তিনি এসেছিলেন নাকি?'

অবনীন্দ্রনাথ—তিনি লিখেছেন তিন পাতা চিঠি—'ঘরোয়া' তাঁর খুব ভাল লেগেছে। লিখেছেন আপনি নাকি বলেছেন যে গত দশ বৎসরে আপনি ছবি আঁকেন নি। তবে এ সময়টা কি করেছেন। আপনি একজন সাধক। রবীন্দ্রনাথও এ সময় বসে থাকেন নি? আপনি তবে এত সময় কি করলেন। সাধনার পথ তো হঠাৎ এমনি থেমে যাবে না, ইত্যাদি। শেষকালে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলে তিনি উপদেশ দিতেন,—আপনিও পত্রের উত্তর দেবেন। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সাধক নই—খুবই সাধারণ লোক। জীবনের একটা কাল আছে যেমন যৌবনকাল, প্রৌঢ়কাল ইত্যাদি। যৌবন ও প্রৌঢ়কালে যেমন ধর্ম ও বুদ্ধির সমাবেশে কাজ হয়, তা বুড়ো বয়সে কি সম্ভব?

আমি—একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী যখন একবার গোল্ টেবিল বৈঠকের জন্য বিলেত যান, সেই জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়—ছেলেমানুষের মন নিয়ে তিনি জাহাজের কলকব্জার খবরাখবর নিচ্ছিলেন ও নিজে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন—তাতে সেই কাপ্তেন সাহেব গান্ধী সম্বন্ধে বিবৃতি দিলেন যে গান্ধী খুব সরল প্রকৃতির ও খুব ভাল লোক। জিনিষটা দাঁড়াল এই যে, গান্ধীকে ভাল পরিচয় (recommendation) দিতে গিয়ে নিজেই পরিচিত হলেন বেশী, কেন না একটা জাহাজের কাপ্তেন; তাকে কেই বা চেনে। তখন হয়তো চিনেছিল বিবৃতি দেওয়ার সময়। এখন কেউ আর চেনে না নিশ্চয়—এও হয়তো সেইরকমের ব্যাপার। বড় সিনিক্-এর মত কথাগুলো হয়ে যাচ্ছে—হয়তো বা ক্ষুদে লেখক বা শিল্পী গজিয়ে উঠছেন।'

অঃ—'এই দশ বছর কি করেছি? অধকারের সে এক ইতিহাস। খেয়েছি ও ঘুমিয়েছি, জীবনের দুঃখ নিয়ে কেঁদেছি ও হেসেছি। আমি সাধকটা কিসের? আমি ছবি আঁকতে শিখেছিলাম—ভাল লাগতো বলে। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হবার জন্য তো ছবি আঁকিনি।' তবে মনের মাঝে যখন যে ভাবের উদয় হয়েছে, তখন তাই এঁকেছি। মাঝে মাঝে যখন ছবি নেশায় পায়, তখন আর ভাবনাচিন্তা নেই। একটানা নিরলস এঁকে চলেছি। যখন ধরলুম—আরব্য উপন্যাসের গল্পের ছবি, এঁকে চলেছি তো এঁকেই চলেছি। এক একটা ছবি পাঁচ ছ' দিনে শেষ। কিন্তু বেশ একটু বেশী সময় লেগেছিল প্রথম ছবিটি আঁকতে, যেখানে উজিরের মেয়ে শাহাজাদী বাদশাকে গল্প শোনাচ্ছেন। আর লেগেছিল আলিবাবার কাহিনীর দর্জির দোকানের দর্জিকে নিয়ে কাসেমের কাটা দেহ সেলাই করে জোড়া লাগাবার ছবিটা। সেই সময় শ্রীপ্রশান্ত রায় এসে নিবিষ্ট হয়ে বসে থেকে ছবি আঁকা শিখতো, সেই সময় কাসিমুদ্দিনও আসতো। কাসিমুদ্দিন সময়ের হিসেব খতিয়ে বলছিল, আপনার হাজার এক ছবি আঁকতে কম করে বিশ বছর লাগবে যদি ছবি আঁকবার মুডের ব্যতিক্রম না হয়।

—আপনি তখন কাসিমুদ্দিনকে কী বললেন? ওতো পাগ্রীকার, ছবি আঁকার কিছু জানে কি?

—আমি বললাম, তুমি বোধহয় জানো না শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসে, সে কি সময়ের হিসেব করে বসে। সে দেখে তার সামনে পড়ে আছে সীমাহীন সময় আর অনন্ত জীবন। এর অন্ত নেই কোথাও কোনদিন। এই রং আর এই তুলি অনন্ত হয়ে থাকবে। অজন্তার গুহার গায়ের ছবির কথা ভাবো। কত শিল্পী বংশানুক্রমে শিল্পের ধারা অব্যাহত রেখে গেছে। কেউ তো তারা ভাবেনি আমি নিজে সব আঁকা শেষ করে আপন সৃষ্টিতে নিজের নাম রেখে যাব। তাদের নাম কি আজ কেউ জানে? তবে তারা শিল্পের মধ্যে অমর হয়ে আছে। তুমি কবিতা লিখছ, কবিতা লিখে যাও। বড় বৌমা, আরব্য উপন্যাসের কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল?

বড় বৌমা—যতদূর মনে হয়, মোট পঁয়তাল্লিশ খানা ছবি আঁকা হয়েছিল, বাবামশাই। ঐ পঁয়তাল্লিশখানা ছবি একাধিক সহস্রকে ছাড়িয়ে গেছে।

অঃ—আমি তো আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হওয়ার মূল্য কামনা করিনি আর পাটোয়ারী বুদ্ধি ছিল না যাতে করে এই সৃষ্টি শিল্পের ভেতর থেকে নিংড়ে সোনা বের করতে হয়।

—ছবি আঁকেন নি বললে পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটিত হল না—কারণ আপনার মাস্টারপিস্ যেসব আঁকা হয়েছে এই দশ বছর আগে—তখন ছবি আঁকব বলে আঁকতেন। তাতে চিন্তা ছিল, ভাব ছিল, ইনটেলেক্ট্-এর প্রয়োগ ছিল—আমার বোধহয় সেই সময় ছবি নিয়ে সাধনা বললে অত্যুক্তি হবে না। এখন ছবি আঁকেন, তবে সে ছবি নয়, ছবি নিয়ে খেলা। যেমন নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলা করেন তাদের আসরের মেটোতে। সেই বাঁধের ছবি, বাঁধের উপর ট্রেন যাচ্ছে। তিনটে জানলা দিয়ে একটা কামরার আলো বেরোচ্ছে। সেটাকে যেমন ঘসে মেজে দেখা গেল 'বিষবৃক্ষের' একটা ছবি আঁকা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। কিন্তু 'বিষবৃক্ষের' ছবি নয়; আসলে সেটা রেল ও বাঁধের। সেইজন্য এখনকার ছবিগুলো ছবির পর্যায়ে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথেরও ঐ হয়েছিল। তাঁর শেষের দিকের কবিতা—'বলাকা', মহুয়ার কবিতার সঙ্গে তুলনাই হয় না।

অঃ—ঠিক তাই। জীবনের একটা উৎকৃষ্টের বয়স আছে। সেই সময়টা ভাল জিনিষ বেরোয়। তারপর বুড়ো হয়ে গেলে সে জিনিষ আর বেরোয় না। কেননা মনেও রাখা যায় না। বুদ্ধিও চালানো যায় না।

মোহনলাল, শোভনলাল এবং অমিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ

বয়সের একটা প্রভাব—উৎপত্তি পড়তি। তারপর দশ বছর যে ঘটনা ঘটেছে তা মনে নেই, আর যা আছে তা আমার ঘরের কথা, তাতে সাধারণের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। হাঁস ডিম পাড়ে, তার একটা সময় আছে। বুড়ো হ'য়ে গেলে যাকে আর কাটো ডিম দেবে না। এ ঠিক তাই।'

আমি—এ উপমাটি অতি সুন্দর। তাদের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় বলে দোষ, এহচ্ছে হাঁসের ডিম পাড়ার ব্যাপার। বুড়ো হাঁস ডিম পাড়ে না।

অ—আশু মুখুজ্যে— তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে সাধনা করেছেন। তাঁকে সাধক বলা যেতে পারে।

আমি — তাহলে সেদিক দিয়ে বিচার করলে আপনার সাধনা কম নয় বরং আরো বেশী। আর্ট-এর ক্ষেত্রে জগন্নাথ চালু করে দিয়েছেন। অনেক শিল্পী বেরিয়েছে তারা শেখাচ্ছে ও আঁকছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। যেমন মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, লক্ষ্ণৌয়ে অসিত হালদার, শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু প্রভৃতি।

অ—ঈশ্বর যে চালিয়ে দিয়েছে তাই চলছে। তাকে আবার টানাটানি কেন?

আমি—আপনার চিঠির জবাবে আজকেটি বাগেশ্বরী লেকচার দিতে দিতে তিনি একটা-[illegible] করেন, চোখ [illegible]।

অ:—ঠিক তাই। বাগেশ্বরী লেকচার তৈরী করতে বহু সময় লেগেছিল।

আমি—'লেকচার তৈরী করার সময় আপনাকে পড়াশুনা করতে হোতো না যা মনের মধ্যে ভাব আসতো তাই লিখতেন?

অ:—পড়তে হতো বৈকি।

এই সময় অলকদার স্ত্রী এলেন, চিঠির কথা উঠলো আবার। অলকদার স্ত্রী—ইনি (অলকবাবু) লিখে দিলেন তাঁর শরীর অসুস্থ, ডাক্তারে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। অতএব আপনার চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি—এই লেখা ছাড়া আর উপায় কি। নাহলে এক বিরাট এক্সপ্লানেশন লিখতে হবে। না হয় দশ বছরের ডায়েরী মেলে দিতে হবে। দেখ কি করেছি।

অ:—ডায়েরীর বালাই আমার নেই। তবে নানা বিষয়ে লেখার খাতা আছে। একসময়ে আমার যাত্রার পালা লেখার নেশায় পেয়ে বসেছিল। 'ভারতী'তে 'এস্পার ওস্পার' ছাপা হয়েছিল। সেই পালাটা নিয়ে একটা মহা-মজার যাত্রা ছেলেদের দিয়ে করিয়ে দিলাম।

—কাকে কি পার্ট দিলেন। আপনি নিজে কি কোন পার্ট নিয়েছিলেন?

যাত্রার ব্যাপারে [illegible] করা এক মহা সমস্যা। [illegible] নয় [illegible] থিয়েটারের মত নয়। [illegible] গলা ঠিক থাকলেই হল। ভীম রোগাপটকা হলেও চলবে। থিয়েটারের বেলাও দূরে থেকে যাত্রার বেলা সেটি হবার জো নেই। সহ-দেবের বা যুধিষ্ঠিরের পার্ট করার যে উপযোগী তাকে দিয়ে ভীমের পার্ট হবে না। কারণ চেহারা, বাচনভঙ্গী এক একটি চরিত্রের সঙ্গে এক রকম, প্রত্যেকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যে কেউ যে কোন পার্ট করতে পারেন না, ভালও হবে না। ভীমের মত চেহারা ও গোঁয়ার গোবিন্দ মন তৈরি করতে হবে, অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে, সেখানে নকুল সহদেবের অভিব্যক্তি অচল।

—কিন্তু বর্তমানে রূপামঞ্চে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো 'মেকাপে'র দৌলতে নবের পার্ট শুরু করল। বড় নট হলে হয়তো মানিয়ে যায় ও দর্শকবৃন্দ থেকে বড় একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না।

—সেটাই ঠিক। বড় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সাধারণতঃ প্রকাশ করে না। তবে এটাও সত্য যে সেই পার্টে বৃদ্ধ নট মানিয়ে গেছে।

—হয়তো তাই। জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। আমি শুনেছি নোংরা পাড়ার মেয়েদের দিয়ে সতী সাবিত্রীর পার্ট করাতে নাকি আগেকার দিনের প্রযোজক বা মোশন মাস্টাররা তাদের বেশ কিছুদিন হবিষ্যি করাতেন যাতে দেহের ও মনের শুদ্ধি আসে।

—নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। যে কেউ যে কোন চরিত্র রূপায়িত করতে পারে না। তার জন্য প্রস্তুতি দরকার, সাধনা দরকার, নিষ্ঠা দরকার আর কঠোর পরিশ্রম দরকার।

অবনীন্দ্র সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে

অবনীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভারতীর উপা-চার্য। থাকেন উত্তরায়ণে। ডাক এল শান্তি-নিকেতনে যাবার। কর্মব্যস্ততায় অবকাশ হয়ে উঠছিল না। হঠাৎ যাওয়া স্থির হল। ১৯৪০ সালের মহাষ্টমী, দামোদরের বন্যায় রেলের ও রাস্তার বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কলকাতা থেকে পশ্চিম ভারতের রেল-সংযোগ প্রায় বন্ধ। ব্যাণ্ডেল-বারহারা লাইনটি কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ঐ লাইন দিয়ে বোম্বাই মেল পাঞ্জাব মেল যাচ্ছে। এটি সিঙ্গেল লাইনের রেলপথ। দামোদর নদ এসে হুগলী নদীতে পড়ে। দামো-দরের বন্যায় ভেঙে গেছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা, হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন, ব্যাণ্ডেল-বর্ধমান লাইন, অনেকের বাঁধ—সমস্ত জলে জলময়। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে যত না ক্ষতি হয়েছিল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার বহুগুণ ক্ষতি হয়েছে। বাজারে চাল, চিনি, ময়দা পাওয়া যায় না এমনি দেশের অবস্থা। মহা-সপ্তমীর ছুটির দিনে ঠিক হল অবনীন্দ্র-নাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেমন হয়। সোদর-প্রতিম যতীন ভায়া (যতীন চক্রবর্তী) ও আমি চললাম অলকদার কাছে

তিনি আমাদের সহগামী হবেন কিনা? টানা মোটরে রাণাঘাট।

—আমার একটা বড় প্যাকিং বাক্স আছে সেটা নেবার ব্যবস্থা হলে আমি যেতে রাজী।

—এটা একটা সমস্যা। মোটরে করে নিয়ে যাব। কাল খুব সকালে বেরুচ্ছি।

ঠিক হল মহাষ্টমীর দিন সকালে বেরিয়ে রাণাঘাটে দুপুরে গাঙ্গুলি-বাড়ীতে মহাষ্টমীর প্রসাদ পেয়ে আবার চলে যাব নবদ্বীপের ঘাটে খেয়া পার হতে। তিন চাকার যাত্রা নাস্তি। আমার সিদ্ধানন্দও আমাদের সঙ্গী হল। তখন পেট্রোলের রেশন। সি পি উর্মিলউ তিন দোকানে গাড়ী ও পেট্রোল জোগাড় করতে কোনই অসুবিধে হল না। যাবার পথ হল দক্ষিণেশ্বর থেকে মোটরে রাণাঘাট, রাণাঘাট থেকে ট্রেনে কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর থেকে রেলে নবদ্বীপ ঘাট। নবদ্বীপ ঘাটে নৌকোয় পার, গাড়ী করে নবদ্বীপধাম ভ্রমণ ও পুনঃ রেলের নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে ভোরে ছোট রেলে বর্ধমান। বর্ধমান থেকে বড় রেলে বোলপুর। সেখান থেকে মোটরে কি রিক্সায় শান্তি-নিকেতন।

সকাল নটার সময় যতীন ভায়া মোটর নিয়ে হাজির। আমরা দুই ভাই গাড়ীতে উঠে আশে-পাশে দুপাশে বসলাম। তাঁর কাঁধের পোঁটলাটি পেছনে নিয়ে চারজনে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে রওনা দিলাম।

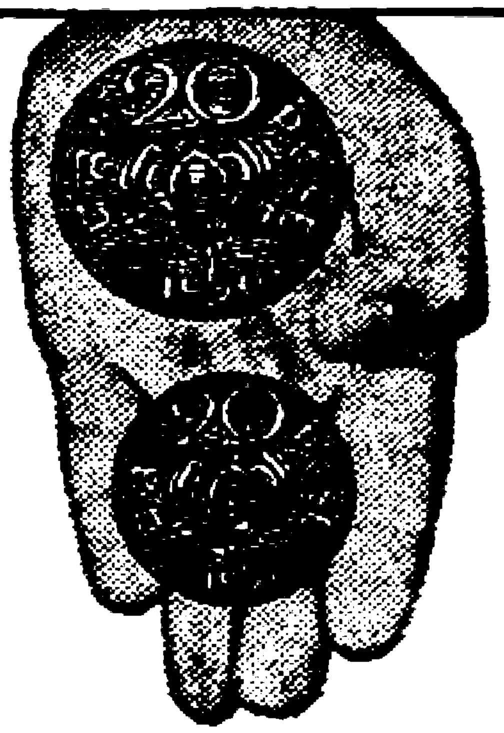

দিনে মাত্র কুড়ি পয়সা জমানো! কিছুই নয়, তাই না?

দিনে ২০ পয়সা, মানে মাসের শেষে হাতে ৬টা টাকা। কিন্তু তার কমেই, মাত্র ৫ টাকা দিয়ে পি. এন. বি-তে রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট (পৌনঃপুনিক জমার খাতা) খোলা যায়। ভেবে দেখুন, মাসে মাসে ৫ টাকা জমা দিলে ৬০ মাসে ৩৫৪. টাকা দাঁড়ায়। অবাক হয়ে যাচ্ছেন?

অবাক হবার কিছু নেই। ২০/২৫ পয়সা তো হরদমই এতে ওতে খরচ হচ্ছে। খরচ না করে ঐ ক'টা পয়সা জমিয়ে রাখতে আদৌ গায়ে লাগে না। অথচ এই সঞ্চিত অর্থই দরকারমত যেমন মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়ার খরচ অথবা অবসর জীবনে স্বস্তি আনতে অনেক কাজে লাগে।

বর্তমান আপনার আয়ত্বের মধ্যে—ভবিষ্যতকেও তাই আসুন না?

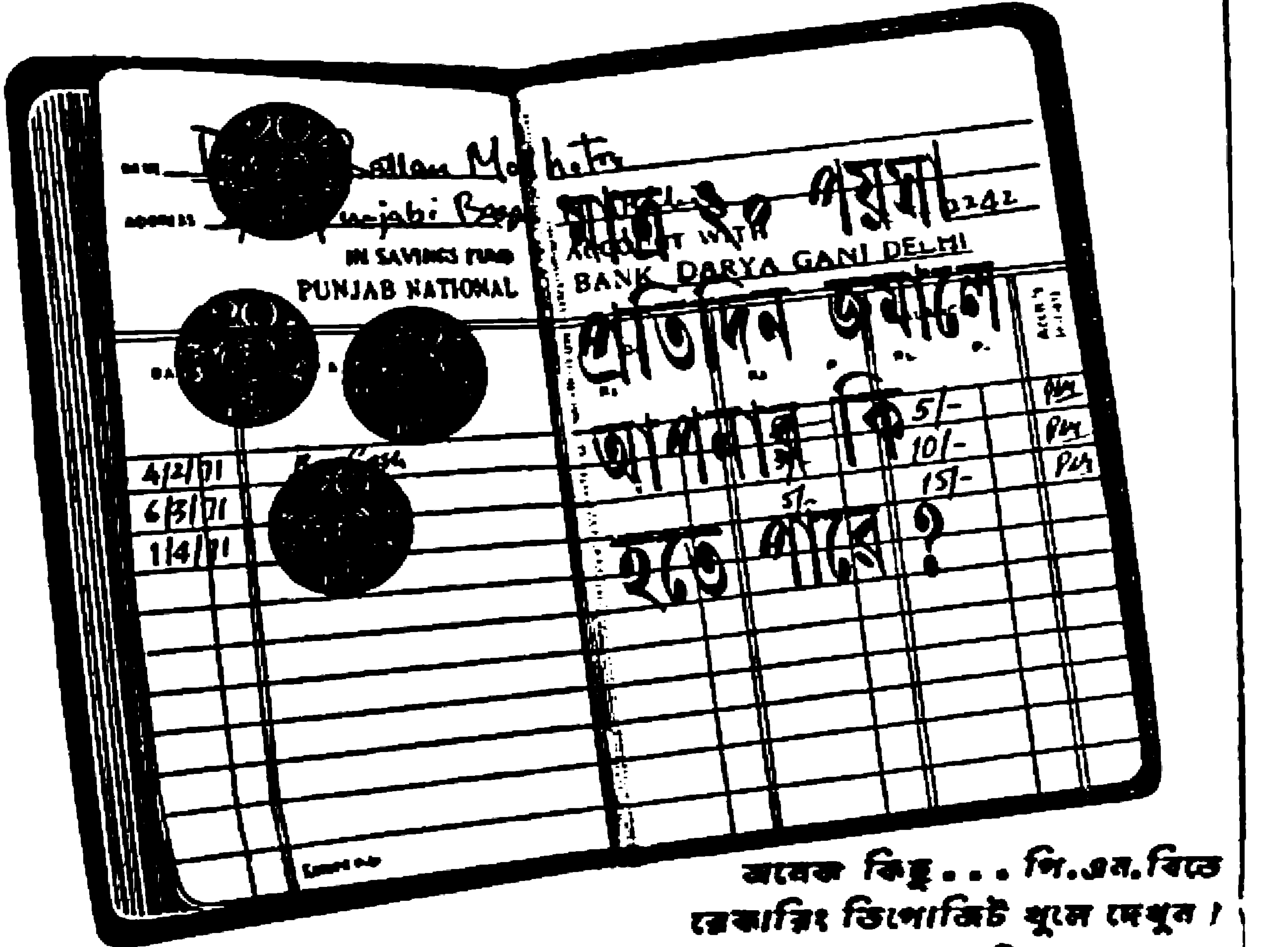

অনেক কিছু... পি.এন.বিতে রেকারিং ডিপোজিট খুলে দেখুন!

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

PNB/03/71/BEN

CENTRAL LIBRARY

কাঁচড়াপাড়া যেতে না যেতেই ক্লাচের দোষ দেখা দিতে শুরু করল। কাঁচড়াপাড়া বিমান বন্দরে আসার আগে এক ছড়া কলা কিনে নিলাম। কলা খেতে খেতে মাইল চারেক গিয়ে দেখি ক্লাচ আর ধরছে না। গাড়ী ফেরানো হল। গেলাম কাঁচড়াপাড়া বিমান ঘাঁটিতে। সেখান থেকে ঠিকাদারের দু'খানি লরি নেওয়া হল যখন ক্লাচ মেরামতের সকল প্রচেষ্টা বিফল হল। একটি লরি মোটরটিকে টেনে দক্ষিণেশ্বরের নৌ বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে ও অপরটি আমাদের রাণাঘাট নিয়ে গিয়ে আহারাদি পর্বের পর রাণাঘাট স্টেশনে পৌঁছে দেবে। লরিতে কাঠের পেটি ও আমরা চারজন চড়লাম ও চলতে লাগলাম রাণাঘাটের দিকে। স্টেশনে খবর নিলাম, আড়াইটের সময় কৃষ্ণনগর লোকাল আসবে। সেখানে রাণাঘাটের গাঙ্গুলি বাড়ীতে এসে আমাদের দুর্দৈবের কথা বললাম ও আগামী পরিকল্পনার বিষয়ও বললাম। আমাদের তাড়াতাড়ি আহারাদির ব্যবস্থা হল। আহারাদির পর সময় সংক্ষেপ থাকায় বেলা দুটো নাগাদ রাণাঘাট স্টেশনে লরি পৌঁছে দিয়ে কাঁচড়াপাড়া চলে গেল।

বেলা আড়াইটের ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে পৌঁছলাম। কৃষ্ণনগর ছোট রেলে চড়ে সন্ধ্যায় নবদ্বীপঘাটে পৌঁছে গেলাম। এবার নৌকোয় ভাগীরথী পার হলাম। নবদ্বীপধামে রাতের কাটোয়াগামী ট্রেন ধরব।। নবদ্বীপে কিছু সময় থাকার জন্য রাতের নবদ্বীপ দেখার সৌভাগ্য হল। পোড়ামাতলায় আমরা চা-পান, কিছু বৈকালিক আহারাদি সম্পন্ন করে নিলাম কেননা রাতের আহার অনিশ্চিত। প্রথমা ললিতা সখির সন্ধানে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণকে সখীভাবে সেবা করার জন্য পুরুষ পরেছে শাড়ী, বালা; মাথায় ঘোমটা, সলজ্জ সকুণ্ঠ ভাব। সন্ধ্যারতির সময় সেখানে হাজির। তিনি মধুর রসে সিক্ত হয়ে সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের আরতি ঘণ্টা ও দীপাবলী নিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আরতি করছেন। পথে অনেক ঠাকুরবাড়ী দেখে একটা ছেকরা ঘোড়ার গাড়ী করে 'নবদ্বীপধাম' স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর নিয়ে জানলাম ট্রেন আসতে অনেক দেরী। পথে বহু বিলম্ব হয়েছে। অলকদা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তাঁর প্যাকিং বাক্স নিয়ে ও সামান্য সেই পুঁটলি নিয়ে বসে পড়লেন। একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন। চারখানি টিকিট কেটে আনা হল কাটোয়া পর্যন্ত।

ট্রেন যখন এল, তখন ন স্থান তিল-ধারণের। কী করা যায়। একটা মিলিটারী কামরায় ঢুকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিকট এক দৈত্যের মত চেহারার এক শিখ মিলিটারী অফিসার কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। আমি গিয়ে এক ফাঁকে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট বদলে ফার্স্ট টিকিট করে আনলাম। কটাই বা স্টেশন। ঘণ্টাখানেকের পথ। স্টেশন মাস্টার এল, গার্ড এল, মহা হৈ-হুল্লোড়। যতীনভায়া ও অলকদা কোন-প্রকারে ফার্স্ট ক্লাসে দাঁড়িয়ে ও আমরা দুই ভাই সেকেন্ড ক্লাসে দাঁড়িয়ে।

কাটোয়া জংশনে নেমে যতীন ভায়া ও সিদ্ধানন্দ প্রায় দৌড়ে চলল ফার্স্ট ক্লাস কুপের দুটি বেঞ্চ দখল করতে। গিয়ে চাদর পেতে দেবে। আমরা পেটী ও মাল-পত্র নিয়ে চললাম ছোট রেলের স্টেশনে। আমরা নিজেদের কামরায় গিয়ে উঠলাম তখন রাত আড়াইটে। ভোর চারটে নাগাদ ট্রেন ছাড়বে। আমরা কখন শুয়ে কখন বসে রইলাম। আমাদের কামরায় মিলিটারী অফিসারদের ঢুকতে দিলাম না—ভেতর থেকে লক করা। ট্রেন ঠিক সময় ছেড়ে সকালে এল বর্ধমান স্টেশনে। মাল নিয়ে আসতে দেরী হওয়ায় বোলপুরের ট্রেন আমাদের সামনে দিয়ে ছেড়ে চলে গেল। বড়ই হতাশ হলাম। আবার স্টেশনে অপেক্ষা করা। সকালের প্রাতঃকৃত্য জলযোগ সারা চা খাওয়া শেষ করে পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বর্ধমানে অলকদার বাড়ীর জন্য কিছু মিহিদানা ও সীতাভোগ কিনে নিলাম।

বর্ধমান থেকে খানা জংশন পার হয়ে এলাম বোলপুর স্টেশনে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমরা চারজনে দু'খানা রিক্সায় শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা দিলাম। আমাদের স্থান হল 'টাটা হাউসে'। অলকদা চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে—বৌদি অপেক্ষা করছেন। এই ব্যবস্থা হল যে দুপুরে ও রাত্রে আহার হবে অলকদার বাড়ীতে। আর চা ও জল খাওয়া হবে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'উত্তরায়ণে'। বৈকালে চায়ের লৌকিক নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন অবনীন্দ্রনাথ। আমরা একে একে স্নানাদি সেরে দাড়ি কামিয়ে অপেক্ষা করছি মধ্যাহ্ন ভোজের ডাক আসবার। 'বাদশা' (অলকদার ছোটছেলে) এসে পথ দেখিয়ে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। যুদ্ধের জন্য এমন আকাল যে আহার্যবস্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাতে কি এসে যায়। বৌঠানের আমাদের জন্য যত্ন ও স্নেহের অন্ত নেই। আহারাদি সেরে কিছু গল্প-গুজব করে চললাম ফিরে 'টাটা হাউসে' গত রাত্রের অনিদ্রা পরিশোধ দিতে আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। যতীন-ভায়া যাবে পাটনায়। পূর্ণিমার দিন তার সেখানে থাকা চাই।

বিকাল বেলা লোক এল 'উত্তরায়ণ' থেকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। উত্তরায়ণে এসে দেখি তিনি সামনেই দাঁড়িয়ে। আমরা সবাই প্রণাম করলাম। আমাদের নিয়ে এক জায়গায় বসলেন। তার-পর চললো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর। স্ত্রীর খবর, ছেলের খবর, আমার বাবার খবর। শ্রীনিকেতনের প্রস্তুত বৃহদাকার কাপে এল চা, সঙ্গে চিড়েভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি জলখাবার। জলপানের সঙ্গে সঙ্গে বরানগরের খবর, কানাই ডাক্তারের খবর, শশাঙ্কদের খবর, মোহনলালদের খবর প্রভৃতি জেনে নিলেন।

এখানে কেমন লাগছে!

—খুব ভাল। এখন পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে কিছু দেখা হয়নি।

—কতদিন থাকবেন। পূর্ণিমা পর্যন্ত অন্ততঃ থেকে যান।

—থাকার বড়ই ইচ্ছা কিন্তু যতীন ভায়ার পূর্ণিমার দিন ওর শ্বশুরবাড়ী পাটনায় যেতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ দ্রব্যাদি উত্তরায়ণে দেখুন।

—নিশ্চয়ই দেখব। সেইজন্যই তো আসা। আর আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।

চা-পানের পর তিনি নিজে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। বাদশা এসে গেছে, সে আমাদের নিয়ে রথীবাবুর তৈরী নানা কায়দার বাগান ও জোর করে দাঁড়িয়ে দেওয়া আমগাছ প্রভৃতি দেখালো। অবনীন্দ্র-নাথ আজ রাতের সভায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তখন ইন্দিরাদেবী জীবিতা।

মুক্ত আকাশের তলায় চন্দ্রকিরণস্নাত রাতের সভায় বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হল। সকলেই আমাদের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থাকতে বললেন, বিশেষ করে ইন্দিরা দেবী। আমাদের বিশেষ কাজের জন্য পাটনা যাওয়ার কার্যসূচী থাকায় অনুরোধ রাখতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। ঐ খান থেকেই 'বাদশা'র সঙ্গে অলকদার বাড়ীতে রাতের আহার সারতে গেলাম।

পরের দিন সকালে 'টাটা হাউসে' চা খেয়ে (শিল্পগুরুর নির্দেশ মত) অলকদার সঙ্গে বেরুলাম। ওমর খৈয়ামের আর এক কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এখান থেকে খুব কাছেই থাকেন। তিনি কাছাকাছি দ্রষ্টব্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেন, আম্রকুঞ্জ, পুরাতন লর্ড সিংহদের বাড়ী প্রভৃতি দেখালেন। সেখান থেকে আমরা শ্রীনিকেতনের দিকে হেঁটে চললাম। আজ সব কথ তবু বহিরঙ্গ দেখে আসতে চললাম। ওখানে শিল্পী শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শিল্পীকে চিত্র-রচনায় নিমগ্ন দেখলাম। কুশলসমাচার বিনিময় হল ওখানে আর কালবিলম্ব না করে, বেলা বেজায় বেড়ে যাওয়ায় আমরা শান্তিনিকেতনের দিকে পদব্রজে রওনা দিলাম টাটা হাউসের দিকে।

পরের দিন অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে আমরা বাড়ীর দিকে আর যতীন ভায়া পাটনার দিকে রওনা হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(উপন্যাস)

॥১০॥

বল্যাইয়ের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে যখন স্বর্ণসুন্দরী বাড়ি ফিরলেন তখন বাড়ির সামনের মাঠ শীতের কুয়াশায় আর ম্লান চাঁদনিতে ঠাসা। মাঠের এককোণে দুটো তাঁবুতে চারজন বন্দুকধারী পুলিশের নতুন আস্তানা, সন্ত্রাসবাদীদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রাজকর্মচারীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেই স্বর্ণসুন্দরী একেবারে ভেঙে পড়েন শোবার ঘরের খাটের ওপর। গৌরী লেপের গাদা থেকে ভারী লেপ নিয়ে আগাগোড়া নিজেকে ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে দাদুর জন্যে। বুড়ী এতক্ষণ তার ভাইদের সঙ্গে লণ্ঠনের মাথায় ময়দার ছোট ছোট পুঁটলি ঠেসে লুচি বানাচ্ছিল। সেও মা আর দিদির কান্না শুনে মুখখানা অসম্ভব বিকৃত করে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, প্রতাপের চোখও লাল, ভবনাথ দুর্তিনবার বসা গলায় রুমালে নাক ঝাড়লেন, এমনকি টুটুল অসহায়ভাবে লক্ষ্য করল চোঙাও মার পাশে শুয়ে পড়ে এই শোকের সংসারে নিজের স্থান করে নিয়েছে। টুটুল দেখলে চোঙা মুখ তুলে ভেজা চোখে তার দিকে চেয়ে তার ভাবান্তর দেখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু টুটুলের মুখে ভাবান্তর আসে না।

আসলে গত কয়েকদিন মায়ের অবর্তমানে অনাবিল স্বাধীনতায় এমন এক খেলার মেজাজ পেয়ে বসেছে তাকে যে সহসা সেই খেলার জগত থেকে কান্নার জগতে প্রবেশ করতে সে মোটেই তৈরী ছিল না। কান্নার এই কলরোলের মাঝখানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে টুটুল। তারপর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাথায় ঝিলিক মারে। দেয়ালের দিকে মুখ করে সে গাড়াগাড়া চোখে তাকিয়ে থাকে সাদা দেয়ালের দিকে মরীয়ার মতো। চোখের পাতা না ফেলে কিছুক্ষণ তাকাবার পরই চোখ জ্বালা করে, চোখের পাতা জলে ভিজে আসে। তার পরের ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। টুটুলও চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে তার মাতামহের জন্যে। লণ্ঠনের ম্লান আলোর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা কতগুলো অস্পষ্ট মূর্তি আর কান্নার আওয়াজের মাঝখানে গোপীনাথের আবির্ভাব হয়। 'টুটুল বুড়ী, তোমরা সব খাইতে এস," গোপীনাথ বললে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'রাজা দশরথ মরিয়া গেল, স্বামী বিবেকানন্দ মরিয়া গেল, সংসারে কেউ থাকিবে না মা।' রোরুদ্যমানা স্বর্ণসুন্দরীর কানে সে সান্ত্বনা প্রবেশ করল না। তবে চোঙা তড়াক করে উঠে পড়ল। তার ভীষণ খিদে পেয়ে গিয়েছে।

শোকের খপ্পর যেমন জোরাল তেমনি এক একটা দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুঠো এত সহজে ঢিলে হয়ে যায় যে তৃতীয় ব্যক্তির চোখ দিয়ে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অশৌচের কয়েকদিন যেতে না যেতেই স্বর্ণসুন্দরীকে বাড়ির স্বপ্ন পেয়ে বসল। আর বাড়ির কাজও তাঁদের এই পারিবারিক শোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলে। এত তাড়াতাড়ি দোতলা দেয়াল ব্যালকনি মায় ছাত পর্যন্ত উঠে যাবে ভবনাথ ভাবতেও পারেন নি। বেশ কয়েকটা দিন কলকাতায় ছোটাছুটি হাঁকুপাঁকুর মধ্যে গেল। আরও কিছু ধারধোর হয়ে গেল। কিন্তু ভবনাথের বাড়ি এবার আর ঠেকানো যাবে না। ইলেকট্রিক, জলকলের কাজ, দরজা আর মার্বেল মোজেইকের মেঝে বাকী। এগুলো এখন টুকটাক করে করলেই হবে। ভবনাথের বাড়ি আর তাঁর শ্বশুরের মৃত্যু এ দুটো যেন একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা ভাবা যায় না।

অশৌচের কয়েকদিন পরই পিঁড়িতে বসে স্বর্ণসুন্দরী যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুরু করলেন তখন অস্পষ্টভাবে মৃত্যুর ভঙ্গুরতার কথাই মনে হচ্ছিল টুটুলের। তার মনও খুব খারাপ হয়েছিল মায়ের ক্রমাগত কান্না দেখে। ভাবছিল এবার হয়ত ব্রতকথার পাট উঠেই যাবে। কিন্তু প্রত্যেক বছরের মতো স্বর্ণসুন্দরী এবারও বসলেন।

চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, 'যা চুক তুই ছারেখারে যা, শুয়োরটার মতো মুখ হোক, সকল অঙ্গে লোহার গয়না হোক।'

বুড়ী তাঁর প্রতিবাদ করে, 'চোঙা, তুই চুপ কর তো।'

বারান্দার ধারে মার্কভর্তি কোজাগরী পূর্ণিমা। চারপাশে নানারকম কাটা ফল, নারকেলের চিড়ে, বরফি সন্দেশ, নাড়ু, একপাশে ফুলকো লুচি, বাঁধাকপির তরকারী, পেল্লাই সাইজের বেগুনভাজা। চোঙা আর থাকতে না পেরে টপ করে একটা নারকেলের নাড়ু তুলে নিলে সকলের অলক্ষ্যে।

স্বর্ণসুন্দরীর কিন্তু চোখ পড়েছিল। কিন্তু সেদিকে না চেয়ে হাতজোড় করে আবার বলতে থাকেন : 'চুক বললে, বারবার বলছি যাব না, তাও আসিস বিরক্ত করতে' বলে পানের বাটার খাপ ছুঁড়ে দিলেন। কপালে লেগে কপাল কেটে গেল। হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে কালীদহ সাগরে ধুতে গেলেন কুবের। ধুতে গিয়ে এত রক্ত পড়ল যে রক্তধাঁধা লেগে জলে পড়লেন। তারপর জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে ওপারে মালিনীর মালঞ্চে গিয়ে লাগলেন। এদিকে মালিনীকে সবাই বলছে, 'দ্যাখ মালিনী, তোর মালঞ্চ ধবলময় হয়ে ফুল ফুটেছে।' 'যাঃ, আমার মালঞ্চের খড়ি নিয়ে আমি বেঁধে খাই আবার আমার মালঞ্চে ফুল ফুটবে।' সত্যি কি মিথ্যে দ্যাখ।' বেরিয়ে এসে দেখলেন ধবলময় হয়ে ফুল ফুটেছে। হাতে ছিল ফুলের সাজি, তাতে ফুল তুলতে আরম্ভ করলেন। তাকিয়ে দেখলেন কালীদহ সাগরে মালঞ্চের ধারে লক্ষ্মীর পুত্র কুবের জলে ভাসছেন।

'মা, চোঙা সব নারকেলের নাড়ু খেয়ে ফেলছে।' বুড়ীর চীৎকারে স্বর্ণসুন্দরী চমকে ওঠেন। পেছন থেকে প্রতাপ ঠোনা মারে ভাইকে। বিলেত যাবার মুখে প্রতাপের সব কিছুই ভাল লাগছে, সব ব্যাপারে তার সমান উৎসাহ। নাটক, শিকার, ব্রতকথা, সবই তার তারুণ্যের উৎসাহে দীপ্ত হয়।

নতুন অর্থলাভ করে। সামনে জীবন বড়রকম মোড় খাওয়ার মুখে।

গল্প এগোতে থাকে। লক্ষ্মীর অভিশাপের পর রাজার রাজ্যে হ্যানম্যান্ লেগেছে।

প্রতাপ তারিফ করে 'হ্যানমান লেগেছে, গ্র্যান্ড এক্সপ্রেশান!'

স্বর্ণসুন্দরী বড় ছেলের দিকে চেয়ে স্বল্প হেসে বলতে শুরু করলেন, 'পায়েস বললেন, আমি আজ আর কিছু করব না। চান করে খেতে বসলেন। বনী তাতের গুলো দিয়ে টকের বাটি দিলেন। রাজা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, শুয়োরটার মতো মুখ, সারা গায়ে লোহার গয়না। রাজার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসলেন, তার মুখের আগুনে রাজার গোঁপদাড়ি পুড়ে গেল।'

ছেলেমেয়েরা চারদিক থেকে হেসে ওঠে। সারাদিন উপোসে এবং গত কয়েক দিনের খাওয়ার অনিয়মে স্বর্ণসুন্দরীর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। গল্পের খেই হারিয়ে যায়। বেশ খানিকটা বাদ দিয়ে তিনি চুককে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে ফেললেন নারায়ণ যখন খেতে বসেছেন কুবেরকে নিয়ে।

টুটুল বলে উঠল, 'তুমি সব বাদ দিয়ে দিলে মা, সেই সাপ উঠল ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী পাখির বাচ্চা খেতে। চুক হাই তুলল, সাপ ভস্ম হয়ে পড়ল। তুমি সব ভুলে গেছ মা।'

'হয়েছে হয়েছে। মা-র শরীর অসুস্থ।' প্রতাপ বললে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'না না, টুটুল ঠিকই বলেছে। আমি আবার বলছি।' এবার সবটাই ঠিক মতো বলে গেলেন। শেষের দিকে এসে বলতে থাকেন, 'পরের দিন তার শাশুড়ীর দিবসী। দিবসী মানে কি জানতো? মৃত্যুদিন। সব খাওয়াদাওয়া করিয়ে বেলা হয়ে গেছে। সেদিন লক্ষ্মী-পুজো। কাটনের সাজি আপনা থেকে উল্‌টে দিয়ে উঠল। চুক বললে, 'ওরে মা! আমি যে আজ লক্ষ্মী-নিন্দনীর হতাম। কে আছে উপোসী, কে আছে কাপাসী, নিয়ে আয় ধরে।'

'মা, কাপাসী মানে কি?'

'টুটুল তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কাপাসী মানে কি?' বুড়ী ভেঙায়।

'কাপাসী মানে ধনুক্স টুনক্স হবে,' গৌরী একটা মানে করবার চেষ্টা করে।

এরপর আর কিছুতে আটকায় না। 'মা লক্ষ্মী যেন সকলের গৃহে আসেন।' বলে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর পিতৃপুরুষদের আত্মীয়স্বজনদের নামে নামে লক্ষ্মীর আগমন কামনা করে ব্রতকথা শেষ করেন। আর বলতে গিয়ে গলা আটকে আসে! সম্প্রতি টেনিস ফাইনালে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত নয়কে মনে করে ধরা গলায় বলেন, 'লক্ষ্মী আসুক নব-র গৃহে।'

টুটুল যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল চোঁ। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এক থাবলা নারকেলের চিঁড়ে তুলে নেয়। কিন্তু সেদিকে টুটুলের মন ছিল না। তার মন তখনও পড়ে ছিল সেই মালিনীর ধবধবে মালঞ্চে, হেমথ-মন্মথ-পবন কাঠের নৌকায়, আকাশপথে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর নিধুবন থেকে নিকুঞ্জবনে যাত্রায়।

আসলে অনেক জীবনের মতই কাল এমন বন্ধু হয়ে এসেছে টুটুলের শৈশবে যে সে ও তার সময় আর আলাদা থাকে না, একেবারে গলাগলি হয়ে যায়। তাই চূর্ণী নদীর ঘোলা জলে ছোট ছোট ঢেউ, টাটা রোদ্দুরে ব্রহ্মদৈত্যের বাসস্থান বেলগাছ, সাদা মখমলের মতো গা মুংলীর বাছুরের নাচ, দপ্‌দপ্ করে ঘিয়ের বাতি জ্বলে এমন লালকমল নীলকমলের বন্ধ ঘর, মাঠের পাশে বকুল বনের আলো, অন্ধকারের গভীর রহস্য এ সমস্তই কালের যাত্রার সঙ্গে একাকার। যা সামনে আসছে তাকেই সে গ্রহণ করছে তর্ক না করে প্রশ্ন না করে। কালের সঙ্গে এরকম অখন্ড সত্তা টুটুল হয়েছিল অনেক পরে যখন সে আর টুটুল নয়, যখন সে অনিন্দ্য চৌধুরী। মাঝখানে বহু বছর জুড়ে তার যে জীবন সেখানে কাল সব সময় তার নাগাল এড়োবার উপক্রম করছে, কলকাতার লোকে টাপুর টুপুর দোতলা বাসের মতো ছাড়ো ছাড়ো, তখন সে প্রাণপণে ধাবমান সেই ফেরারী বাসের পেছনে। তার পরবর্তী জীবনের অনেকটাই এই কালের পেছনে দৌড়ানো হাঁপানো জীবন। তারপর অনেক পরে তার জীবনে আস্তে আস্তে আবার রাখাঘাট ফিরে আসে আর এক ভাবে। কাল বন্ধু হয়ে গলায় হাত রাখে।

॥১১॥

"গোপীনাথ, ও গোপীনাথ," বলাই হাঁক দেয় রান্নাঘরের দালানে উঠে। মাথায় কাঁকাভর্তি বাজার। খাকি হাফশার্ট ঘামে জবজবে। দেড় মাইল পথ হেঁটে মাঠ ভেঙে বাজার করে ফিরছে। গোপীনাথ ঝাঁকা নামাতে হাত লাগায়। বলাই তার ঘামে তেলতেলে তামাটে মুখখানা গামছা দিয়ে পুঁছে আর শব্দ করে দাওয়ায় বসে পড়ে। তারপর গোপীনাথের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলে, 'বলতো গোপীনাথ এর মানে কি—সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিষ?'

'তার মানে তোমার ভিমরতি ধরিয়াছে। বুড়া বয়সে দুবার বিয়া করিয়া তুমি ছাগল হইয়াছো।' মাছের চুবড়ি নামাতে নামাতে গোপীনাথ বললে।

বলাই সামনে দুপা ছড়িয়ে আরাম করে বসে। তার কুতো কুতো গালের মধ্যে থেকে চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল। 'মাছের ঝাল আর শুক্তো রাঁধিতে রাঁধিতে তুমি বুড়া হইয়া গেলে গোপীনাথ। দেশে কতদিন যাওনি?' তারপর নিজের মনেই বলাই বললে, 'তোমাদের দূরে প্রণাম। তোমরা ধার্মিক লোক। আমরা পাপীতাপী মানুষ।' আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরামে নিশ্বাস ফেলে। চাঁদ সওদাগরের পালা থেকে গুনগুন করে গান ধরে, 'ডুবরে ডুবিল ডিঙ্গা.....'

'আজ যে খুব খুশি বলাই,' স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন দাওয়ায়।

'মায়ের ইচ্ছে! আমার আর ভাবনা কি!' তারপর অন্যমনস্কভাবে দূরে বাঁকানো জামগাছটার দিকে চেয়ে বলে, 'কারুর সৌভাগ্য কেউ দেখতে পায় না মা। আমারই প্রতিবেশী, সাইকেলের দোকান দেয় মদন, উঠতে বসতে বলে, ঝড় গিয়ে ঝাঁপ, বয়স গিয়ে বিয়ে। আমার কি এমন বয়স মা? কাগজে কাল বেরিয়েছে পারস্যে একশো বছরের এক বুড়ো বিয়ে করেছে।'

'ওসব বাজে কথায় কেন কান দেও। বলাই, কি মাছ আনলে?'

সেরখানেক চিংড়ি আর একটা ধড়পড়ে রুই চুবড়ি উপুড় করে বলাই ফেলে দেয় স্বর্ণসুন্দরীর পায়ের কাছে।

মাছ তাঁর যতো ভালো লাগে ততো ঔদাসীন্য দেখাতে স্বর্ণসুন্দরী অভ্যস্ত। বলাইও তা জানে। স্বর্ণসুন্দরী মাছের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'নারকোল এনেছো?'

'তা আর বলতে মা! বলাইকে খালি একবার বলতে হয়।'

প্রতাপ বিলেত যাবার আগে রকমারি মাছ ও তরিতরকারি আসছে গত কদিন থেকে। স্বর্ণসুন্দরীর শোকের যেটুকু বাকী ছিল তা চিংড়ি মাছের মালাইকারীর গন্ধে ডুবে যায়। অবশ্য বাপের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে আজীবনই জ্বলন্ত ছিল ও থাকবে। সেই মজঃফরপুরের বাগানে গোলাপ, মুঙ্গেরে ডালিয়া আর সোনচাঁপার ঝাড়ে ঝাড়ে সাত বছর বয়সে প্রজাপতির সন্ধান এগুলো স্মৃতির পরতে পরতেই রয়েছে। কিন্তু শোক বলতে যেসব টাটকা অনুভূতি বোঝায় যেমন চোখ জ্বালা, মাথা ভার, আঁকদে, চোখের পাতায় বেদনা এগুলো এক একটা দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যেতে থাকে। তার ওপর দক্ষিণ কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলার চাপা উদ্দীপনা, সবটা মিলে মিশে থাকায় স্বর্ণসুন্দরী কোমর বেঁধে নবীন উৎসাহে সংসার করতে লেগে যান।

বিকেল বেলাতেও বলাই একবার আসে, বাড়ি ফেরার মুখে এক পাত্তর চা খেয়ে যায়।

'এবার মায়ের আর আমাদের মনে থাকবে না। বড়দা ম্যাজিস্টর, কলকাতায় নতুন ঝকমকে বাড়ি। মা-কি আর এই ভিখিরিদের মনে রাখবে?'

'এমন কথা কেন বলছো, বলাই। আবার আর এক মা আসবে তোমার,' স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

'সব জিনুকে মুক্তো নেই মা, সব ঝিনুকে মুক্তো নেই।'

গত কয়েক বছরের অভ্যাসবশে বলাই তার এক পারিবারিক সমস্যার কথা স্বর্ণসুন্দরীর কাছে তোলে। তার প্রতিবেশী সাইকেল মিস্ত্রি মদন লোকটা সুবিধের নয়। একটু বেশী উৎসাহ দেখিয়ে তার স্ত্রীর সম্পর্কে বলাই কথাবার্তা বলছিল তখন 'মদন কি বললে জানো মা, মদন বললে—যে

CENTRAL LIBRARY

সত্যি তার চোখও নেই, কানও নেই। বলো মা, এটা কোন্ কথা?'

সন্ধ্যে লেগেছে। বাইরে অন্ধকারের ওপর লণ্ঠনের চারদিক ঘিরে ছোটরা পড়তে বসেছে। টুটুলের একটানা গলায় আওয়াজ আসে, 'বি-এল-আই ব্লাই, বি-এল-ও ব্লো, বি-এল-আই ব্লাই, বি-এল-ও ব্লো...'। পাশের ঘর থেকে বেহালাচর্চার আভাসও পাওয়া যায়। অফিসার মহলে বেহালাবাদনের যে রেওয়াজ চালু হয়েছিল ভবনাথের বাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। পাশের ঘরে গোপাল মাস্টার গৌরীকে বাজনা শেখাচ্ছেন। মাদুরে বসে থুতনিতে বেহালা ঠেকিয়ে গোপালমাস্টার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজান, 'এসো নীপ বনে এসো ছায়া বীথিতলে', গীতের সপ্তসুরকলা বারেবারে সেই নীপবনে আহ্বান স্বর্ণসুন্দরীকে বিব্রত করে তোলে। আবার সেই ছেলেবেলার দিনগুলো এক এক করে মনে ভেসে ওঠে। গোপীনাথ যেবার প্রথম এলো সেবার তাকে নিয়ে বিহারে আরার কালেকটার সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলেন। সন্দর করে ছাঁটা মোটা খড়ের চাল, সাদা কাঠের দরজা, সিঁড়িতে কাঠের টবে টবে পাম গাছের সারি—এক এক করে বাড়ির সব কটা ঘর, বাগানে পেয়ারা গাছের নীচ দিয়ে রাস্তা, ফুলের গাছ সব মনে পড়ে। আস্তে আস্তে গোপীনাথকে ডাকেন। গোপীনাথ কাছে এলে প্রায় একটা স্বগতোক্তি করলেন, 'আরাতে কি প্রতাপ কৌর-গোতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল?

'মুঙ্গেরে পারা! মুঙ্গেরে প্রতাপ সেই ভেলভেটের স্যুট পরিয়া গিয়াছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মুঙ্গের মুঙ্গের। তোমার এত কথা মনেও থাকে গোপীনাথ!'

আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দা দিয়ে বৈঠকখানায় আসেন। ধবধবে সাদা ঢাকনি দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে ভবনাথ তাস খেলছেন। তাঁর চওড়া কপালের পাশে কোঁকড়া চুলগুলো স্বল্প আলোতেও দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে স্বর্ণসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এ লোকটা আর তাঁর বাবার মাঝখানে কি আকাশপাতাল ব্যবধান, দুজনের মেজাজে কি পার্থক্য। ভবনাথ বাড়িতে আছেন কি নেই স্বর্ণসুন্দরী মাঝে মাঝে ঠাওর করতে পারেন না। আর বাবার বসুর হাঁকডাকে সারাক্ষণ বাড়ি সরগরম থাকত। এই সময় তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প করতেন, নিজে ঠাট্টা-তামাশা করে চেঁচিয়ে হাসতেন, স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে ঠাট্টায় হেনাস্তা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। সেদিক থেকে ভবনাথ তাঁর স্ত্রীকে বরং সমীহ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বও অনুভব করেন স্বর্ণসুন্দরী। স্বর্ণসুন্দরী সেই আলোকিত স্নিগ্ধ কালো মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে গভীর মমতাও বোধ করেন আর টের পান তাঁদের জীবনের সবচেয়ে ভাল সময় এখন চলেছে, এই উন্নতির সময়, এই সম্ভাবনার সময়। অন্তত এই সময়টা তাঁর বাপের মুঙ্গের বড়সুখবুদ্ধের সময়। এরপর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে সব কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়। ছেলেরা ভাল চাকরী বাকরীও পায়, মেয়েরা ভালভাবে পাত্রস্থ হয় কিন্তু মানুষ একলা হয়ে পড়ে যেমনভাবে তাঁর বাবা শেষ জীবনে একলা হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জামাই ঘরে বসিয়ে এই একলাভাবখানা কাটাবার চেষ্টা হয়। আর তারপর জবার জন্মলো। হেমাঙ্গিনীর ছোট মেয়ে দলমলে চেহারাটা ঝলমল করে ওঠে মনের মধ্যে। নিজের ভরাট হাতখানা বারান্দার মৃদু আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন।

'মা, মরে গেলে কি ভূত হয়? দাদু এখন ভূত হয়ে গিয়েছে?' টুটুল তার প্রশ্ন নিয়ে মার কাছে উঠে আসে।

'এসব বাজে কথা কে শিখিয়েছে তোমায়?' স্বর্ণসুন্দরীর কঠিন স্বরে টুটুল সামান্য ঘাবড়ে যায়। তারপর বলে, 'ঐ যে বড়দা, দিদি, বড়ী, দরজা বন্ধ করে দাদুর ভূত আনছে। ছোড়দাকেও নিয়েছে শুধু আমাকে নেয় নি।'

স্বর্ণসুন্দরী ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'বয়ে, প্রতাপ ভূতের গল্প করছে।'

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে গৌরী দরজা খোলে। চাপা উত্তেজনা তার মুখেচোখে।

'কি করছো তোমরা? টুটুলকে বাইরে রেখেছো কেন? ওর পড়া হয়ে গেছে।'

গৌরী মার কথায় থতমত খেয়ে যায়। তার খেলোয়াড়ী হাতখানা বাড়িয়ে টুটুলকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিতে দিতে ঘাড় ঘুরিয়ে সুন্দর মিথ্যে কথা বলে, 'দাদা কি দারুণ ভূতের গল্প বলছে না, তুমি শুনবে? টুটুল ভয় পাবে বলে আমরা ওকে নিই নি।'

স্বর্ণসুন্দরী আঁচ করলেন, ভূতের গল্প ছাড়াও বোধ হয় আরও কিছু চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটছে আর অম্লানমুখে এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণভাবে মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতাটা তাঁর এ মেয়ে বেশ ভাল ভাবে রপ্ত করেছে। কিন্তু দারোগাগিরি করতে হয়ত তাঁর পা সরে গেছে। তাছাড় গৌরের ভাতটা শেষ হয় নি, ওটা আলাদা করে রাখতে হবে বলাইকে বলে ফেরত দেবার জন্যে। স্বর্ণসুন্দরী ভেতরের বারান্দার দিকে পা বাড়ান।

আর সেই ইন্দ্রজাল অন্ধকারে পা দিতেই টুটুল চেঁচাবার গলা শুনলো, 'অ-অ-ন-ন... নতুন ভূত এসেছে।' অন্ধকারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুটুল।

এবার গৌরীর গলার আওয়াজ আসে, 'দাদুমণি, তুমি কি এসেছো? যদি এসে থাকো তাহলে টেবিলের দু-পা ঠুকবে।'

টুটুল চোখ বড় বড় করে তাকায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এখন ঝাঁঝরাটা, উঁচু দেয়ালের মাথায় ফোকর দিয়ে এক বিঘৎ আলোর দ্বীপ তৈরী হয়েছে অনেক ওপরে, সেখান থেকে আলোর লক্ষ লক্ষ বিন্দু সারা

ভারতের সাধক
শঙ্করনাথ রায়

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত জীবনী-গ্রন্থমালা

প্রথম হইতে দশম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

একাদশ খণ্ড যন্ত্রস্থ

— প্রকাশিত হলো —

ভারতের সাধিকা ॥ শঙ্করনাথ রায় ॥ ১০৲

স্বামী নির্লেপানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন ৫৲ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে ৭৲

করুণা প্রকাশনী ॥ ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

ঘরে ছড়িয়ে পাতলা ফিকে করেছে ঘরের গাঢ় অন্ধকার। এখন দৃষ্টিতে আসে একটা গোল তেপায়া মেহগিনি টেবিলের চকচকে গা তার ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে গৌরী, প্রতাপ আর বুড়ী। টেবিলের কানা একটু একটু করে উঠল আবার নামল, এই অবস্থা অন্ধকারেও ঠাওর হয়।

'ওরা বুড়ীকেও নিয়েছে, আমাদের নেয় নি। আমার বয়ে গেছে। দাদুর ভূত আমাদের থোড়াই কেয়ার করবে।' চোঙা টুটুলের গা-ঘেঁষে যথেষ্ট জোরে ফিসফিস করে বললে। প্রতাপ অপ্রসন্নভাবে মুখ তুলে তাকায়।

প্রতাপ সম্প্রতি প্ল্যানচেটের ওপর খবরের কাগজের এক প্রবন্ধ গৌরীকে পড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যেরকমভাবে প্রশ্ন করা হয় সেই রকম একটা চালাও প্রশ্ন করে, 'তুমি কি এখন সুখে আছো, না দুঃখে আছো? সুখে থাকলে একবার আর দুঃখে থাকলে দুবার টেবিলের পা ঠোক।'

এবারে চোখ গাড়াগাড়া করে চেয়ে থাকে টুটুল। গৌরীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রেতলোক সম্পর্কে টুটুলের মনে অনেক রকম প্রশ্ন খেলে যায়। মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় থাকে কেমন ভাবে থাকে, তারা কি কলকাতায় থাকে না রাণাঘাটে থাকে, ইত্যাদি নানান নিরুত্তর প্রশ্নে সে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করে। টেবিলের কানা এবার নড়ে না চড়ে না। সেদিকে চেয়ে চেয়ে টুটুলের চাপা অস্থিরতা বেড়ে যায়, একটু ভয় ভয়ও যে করে না এমন নয়।

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললে, 'স্পিরিট আমাদের ওপর চটে গেছে। চোঙা, তোকে বারবার বললাম, কথা বলবি না। তোর জন্যেই এমন হল। আবার ধ্যান করো। কনসেনট্রেট'।

একটা চাপা হাসির রেখা গৌরীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঠোঁটের দু-পাশে ফুটে ওঠে। এইরকম মিথ্যে মিথ্যে করে সাজার স্বপ্ন দেখা তার ভাল লাগে। যেমন দাদার সঙ্গে শলা করে দাদুর ভূতকে টেনে এনেছে, এমনিভাবে যদি তার স্বপ্নের রাজপুত্তুরকে নিয়ে আসত। গৌরীর মনে স্বপ্নের রাজপুত্তুর বরাবরই ছিল। ইংরেজী অনার্সের সে ছাত্রী। শেলীর কবিতা অসম্ভব ভাল লাগে কারণ শেলী অসম্ভব রকম দেখতে সুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্চয়িতার বর্ষার কবিতাগুলো পড়তে তার সবচেয়ে ভাল লাগে। কিন্তু রবিঠাকুর মানেই তো একটা বুড়ো, সাদা দাড়ি। তাকে ঠিক মনের মধ্যে রাখা যায় না যেমন শেলীকে যায়। আর সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন, সে জজ হোক, ম্যাজিস্ট্রেট হোক, ব্যবসায়ী হোক, যা-ই হোক তাতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু সে সুন্দর হবে। ঐ রকম শেলীর মতো কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, লম্বা ছিপছিপে। সে রকম সুন্দর বরের জন্যে দরকার হলে বাসন মাজতেও—না, এই পর্যন্ত এসেই সচরাচর গৌরীর সৌন্দর্যপ্রীতি সহসা চোট খায়। মুক্তো ঝি-র মতো কুয়োর পাড়ে একগাদা ছাই তেঁতুল নিয়ে সে বসতে পারবে না। বরও মুক্তোর মতো উপুড় হয়ে হয়ে মুছতে পারবে না। আর সব পারবে, মুখোশে টেবিলের ঢাকনির ওপর সুন্দর এমব্রয়ডারী করে দেবে, সম্প্রতি সে বিশেষ ধরনের উনুনে প্লাম্‌কেক করতে শিখেছে তাও বানিয়ে খাওয়াতে পারে; কিন্তু আর এক ব্যাপারে গৌরী একটু ঘাবড়ে যায়। বিয়ে করতে পারল না বলে এন্তার আত্মহত্যার খবর কাগজে বেরোচ্ছে, প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে ডুব দিচ্ছে। অতখানি সে পারবে না। অন্ধকারে লম্বা ফর্সা আঙুলগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে গৌরী। নখের চারধারে নীচ থেকে রক্তাভা ফেটে বেরোচ্ছে। নাঃ, আত্মহত্যা করতে পারবে না, শেলীর জন্যও না। গৌরী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে।

প্রতাপের হাতের চাপে সে বুঝতে পারে প্রেতলোক থেকে আবার তাদের দাদুমণির নেমে আসার সময় হয়েছে। আবার সে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি সুখে আছো, না দুঃখে আছো? সুখে থাকলে একবার আর দুঃখে থাকলে দুবার পা ঠুকবে।'

টুটুল আর চোঙা অবাক হয়ে দেখে টেবিলের কানা দুবার উঠল, ঠুকঠুক করে দুবার শব্দও আসে।

'তুমি কেন কষ্টে আছো? দিদিমণির জন্যে? দিদিমণিকে আমরা সবাই দেখবো, তুমি কষ্ট পেও না, বুঝেছো? এবার বল তো, দাদা আই-সি-এস পাশ করবে কি করবে না?'

এ প্রশ্ন আচমকা, অভাবিত, তাদের প্ল্যানের বাইরে পা বাড়ানোয় প্রতাপ অপ্রসন্নভাবে তাকায় গৌরীর দিকে। আর যদিও এ প্রেতলোকের বাসিন্দাকে হঠাৎ টেনে আনার কারচুপি সম্পর্কে গৌরীর হঠাৎ লজ্জা জাগে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে ফেলেছে বলে নিজের আত্মবিশ্বাসেও আনন্দ পায়। আবার উত্তেজনায় বুক ধকধক করে। গলার স্বর প্রাণপণে না কাঁপিয়ে বলে, 'পাশ করলে একবার আর না পাশ করতে পারলে দুবার পা ঠুকবে।'

ঘরের মধ্যে হঠাৎ এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে যে টুটুল আর চোঙা দুজনেরই মনে হতে থাকে মাথারাত্তির। বুড়ীও অস্থির আগ্রহে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাতে জায়গাটার অভাব ঘটে। প্রতাপও এতক্ষণ পর টেবিলের দিকে দৃষ্টি দেয়। শক্ত হাতে বুড়ীকে সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজে বসে গৌরী। টেবিলের কানা উঠতে আরম্ভ করে। চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠছে, উঠছে।'

'শ-শ-শ...' গৌরী ফ'স করে ওঠে।

ঠক করে একবার আওয়াজ এল। ঘরের সকলের দৃষ্টি এবার তেপায়া টেবিলের মাথায় সঙ্গে যেন জুড়ে থাকে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটতে থাকে। পুরো এক মিনিট টেবিলটা স্থির। গৌরী হঠাৎ সবকিছু ভুলে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'দাদা আই-সি-এস, দাদা আই-সি-এস, বুড়ী চোঙা টুটুলও তার সঙ্গে চেঁচাতে থাকে।

গৌরী হঠাৎ চেঁচানো থামিয়ে প্রতাপকে বলে, 'তুমি দাদা কিন্তু মা-বাবাকে বলে যাবে, তোমার আই-সি-এস না হয়ে ফেরা পর্যন্ত আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে না যার তার সঙ্গে।'

'ফিরে এসে তোর সঙ্গে লালমোহনের বিয়ে দেব,' প্রতাপ বললে।

পরদিন দুপুরে হাল্কা শীতের রোদ্দুর পোয়াচ্ছে সারা মাঠখানা, ব্রহ্মদৈত্যের অধিষ্ঠান বেলগাছ যত নাড়া হচ্ছে ততই ডালে ডালে কুমকুমে ফল ভরে উঠছে। ভুবনাথের বাগান সাধনা সার্থক, ঠাসা প্রায় এক বিঘত সাদা ধবধবে কপি এসেছে বেশ কয়েকটা সারিতে, বেগুনের ফলনও খুব ভাল। বাইরের বারান্দায় দু-ভাই পর্দার লাঠি নিয়ে তরোয়াল খেলায় রত, গৌরী লাল ফুল তোলা গোলাপী কেম্ব্রিকের ফ্রক পরে বারান্দার এক কোণে এমব্রয়ডারিতে কথামালার 'আঙুর ফল টক' উপাখ্যানের ছবিখানা তুলতে ব্যস্ত। প্রতাপ ইজিচেয়ারে লম্বমান, রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছবি ভর্তি 'এক সপ্তাহে লন্ডন' বইখানার পাতায় মগ্ন। বুড়ী তার রোগা হাঁটুখানা দিয়ে মাকে জড়িয়ে অঘোরে ঘুমন্ত।

তরোয়ালে দুজন সৈনিকই আহত, চোঙা বললে, 'তুই যুদ্ধে মারা গেছিস, আমি তোকে টেনে নিয়ে যাব।'

বারান্দার ঠান্ডা মেঝের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে টুটুল বললে, 'তুই-ই আজকে মর। আমি তো কাল মরেছিলাম।'

চোঙা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। একবার আড়চোখে প্রতাপ ও গৌরীর দিকে চেয়ে আঙুল তুলে ইশারা করে। তারপর দু ভাই বারান্দা থেকে নেমে পড়ে। বাড়িটার চারদিকে পাকা চাতাল, একেবারে শেষ প্রান্তে রাজমিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। ছাতে ফাটাফুটো সারাচ্ছে।

'আর আমরা লাফ কাটি,' বলে চোঙা তড়বড় করে ছাতের সঙ্গে খাড়-করে-রাখা মইটার তিন ধাপ উঠে পড়ে লাফ কাটে নীচের সানবাঁধানো চাতালে। পাশেই খটখটে শুকনো পাকা ড্রেন। মইতে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে টুটুলের হঠাৎ পা ভারী লাগে। সকালবেলার জলের প্রথম ঘটি গায়ে ঢালতেই বুক পিঠ কেমন ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে উঠেছিল সে কথা তার স্মরণে আসে না। ভারী পা টানতে টানতে পঞ্চম ধাপে উঠে পড়ে নীচের দিকে তাকায়। চোঙার মুগ্ধ দৃষ্টির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বেশ নীচে শানবাঁধানো চাতালের দিকে চাইতেই তার মাথা ঘুরে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে টাল না সামলেই পড়ে। কেউ আচমকা ঠেলে দিলে যেমন হাত দুটো উঠে যায় ওপরে আকাশ খামচে ধরবার জন্যে তেমনিভাবে তার হাত

মুখখানা ওপরে উঠে গেল। আর নীচে পড়েই তার সমস্ত গা ভারী হয়ে ওঠে, যেন গায়ের একটা আলাদা ভার তাকে চেপে ধরে। দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়ে। ছোড়দা দৌড়ে এসে একবার তার হাঁটু মালিশ করে, আর একবার টানাটানি লাগিয়ে দেয় গোড়ালি ধরে। কিন্তু টুটুলের করুণ মুখখানা দেখে সে থমকে যায়। টুটুল সেই শুকনো খটখটে ড্রেনের মধ্যে পা ঝুলোতে ঝুলোতে আর কনুয়ে ভর দিয়ে হেঁচড়ে বারান্দায় উঠে। এবার উঠে দাঁড়াতে বিশেষ ব্যথা লাগে না। আস্তে আস্তে খাটের ওপরে উঠে যখন সে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে তখন তার কাছে হারিয়ে যায় সাম্প্রতিক ঘটনাটার গুরুত্ব। মই থেকে লাফানো বাবাকাকাদের অনেক ধরনের লাফানোর একই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাপারখানার গুরুত্ব ঘণ্টা দু-তিনেক যেতে না যেতেই বাড়ির সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বর্ণসুন্দরী সাত-সতেরো কাজ সেরে শোবার ঘরে এসে অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর অসময়ে টুটুলকে শুয়ে থাকতে দেখেই চমকে উঠলেন। ছেলেগুলোর দিকে বেশী নজর দিতে পারছেন না মনে করে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে এক ঘটি জলে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে ছেলের গা মুছাবার জন্যে টুটুলের গায়ে হাত দেন। জ্বর বেশী নয়, সামান্য গরম গা। স্বর্ণসুন্দরী দ্বিধা করেন। আস্তে আস্তে টুটুলকে উঠিয়ে মোছবার জন্যে তার ডান পাখানা কোলে তুলে নিতেই টুটুল হা-হা করে ওঠে যন্ত্রণায়।

তারপর যে-সব ঘটনা ঘটে তা টুটুলের কাছে স্বপ্নবৎ। একবার দেখল সে ইজি-চেয়ারে শুয়ে, পাশে ঝুঁকে পড়ে ভবনাথ, প্রতাপ, স্বর্ণসুন্দরী কাঁদছেন।

'কি করে হল, কি করে এমন হল? কোনখান থেকে পড়েছিস?' প্রতাপের তীক্ষ্ণ গলা টুটুলের কানে আসে। চোখ খুলে তাকাতেই ইজিচেয়ারের হাতলের সামনেই ছোড়দার করুণ মুখখানা ভেসে ওঠে। প্রকৃত-পক্ষে তার ভাইয়ের চেয়েও করুণ দেখায় ছোড়দার মুখ। 'ফাঁসীর অপেক্ষায়' বলে জনৈক বিপ্লবীর যে চেহারা এক ম্যাগাজিনের পাতায় দেখেছিল সেই রকম লাগে টুটুলের কাছে দাদার মুখ।

'এই ইজিচেয়ারের হাতল থেকে লাফাতে গিয়ে'...ব্যথায় ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে ক্ষীণ শোনায় টুটুলের গলা।

'অসম্ভব! এইটুকুন লাফানোয় এত ব্যথা হতে পারে না!'

টুটুলের কিন্তু মন্দ লাগে না তার ব্যথা সত্ত্বেও। তাকে নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে এমন কি তার মা যা-কে সে বাবার চেয়েও অনেক বেশী ভয় করে তিনিও কাঁদছেন। মা-কে কাঁদতে খুব কম দেখেছে টুটুল। দাদুর মৃত্যু বাদ দিলে রোদনভরা মায়ের মুখ অদ্যাবধি চোখে পড়ে না। তারপর এই সময় বৈঠকখানায় সাদা ধবধবে টেবিল ল্যাম্প আলোকিত ব্লটিং পেপারে মোড়া, কাচের পেপারওয়েটে সমাকীর্ণ, ফাইল-শোভিত ভীষণ রাশভারী টেবিলখানার মায়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর বিপদে-ভরা চোখ দুটি মেলে বাবা বসে আছেন তার পাশে। সারাদিন পর যে জাহাজে বিলেত পাড়ি দেবে, মরুভূমির পাশ দিয়ে যার জাহাজ যাবে, সেও তার শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট। গোরী বুড়ী কেউ বাদ নেই। সবচেয়ে তার তৃপ্তি ছোড়দাকে দেখে। তাকে শুধু ফাঁসী দিয়ে দিতে পারে এই রকম মেজাজে সে কয়েকবার তার দিকে তাকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসীর আসামীর মতো আরও করুণ লাগে ছোড়দাকে।

হরিচরণ ডাক্তার আসেন সে রাত্তিরেই। ভদ্রলোক খুব খেতে ভালবাসেন এবং নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় প্রায়ই পেট ছাড়েন। সেদিন তাঁর 'ওয়াইফ' লাউডগা দিয়ে এমন চমৎকার ইলিশ রেঁধেছিলেন যে নিতান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ স্মরণ করেও সেই গোটা ইলিশটার অর্ধেকের বেশী উড়িয়ে দিয়েছেন। দুপুর থেকে বেগ শুরু হয়েছে। মিকশ্চার বানিয়ে খেয়ে এখন অনেকটা প্রশমিত করেছেন সে বেগ। লণ্ঠনের আলো বলাইয়ের মুখে ফেলে বললেন, 'এত রাত্তিরে আবার কি হল!'

বলাই এ-সব ক্ষেত্রে ভীষণ রাশভারি। বললে, 'সাহেব, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

[illegible] স্থান নেই। সরকারী চাকরী, আর ভবনাথ ভাগ্যবিধাতা। ওষুধের বাক্স আর স্টেথিসকোপ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এলেন হরিচরণ ডাক্তার। দেখে অবশ্য কিছু বোঝা গেল না। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত থমথমে ফোলা, আঙুল লাগালেই চীৎকার, একটু জ্বর। হরিচরণ গুলার্ডস্ লোশানের ব্যবস্থা করলেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে টুটুলের ঘুম ভেঙে যায়। গোড়ালি থেকে ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কেউ যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল গড়ায় টুটুলের। ভারি নিঃসঙ্গ লাগে তার। বাইরে ফটফটে চাঁদনি। সে আলোতে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন বাবা-মার দিকে চেয়ে সে আরও হু-হু করে কাঁদতে থাকে। বাইরে চাঁদনিতে একটা প্যাঁচা উড়ে গিয়ে বাগানের গায়ে ঝাউ-গাছটায় বসে। এ দৃশ্য সে সন্ধ্যাবেলাতেও প্রত্যক্ষ করেছে এবং সেই চাঁদনিতে উড়ন্ত প্যাঁচা পরম নির্ভরতায় গাঢ় ঘুমে মগ্ন বাবা-মা এসব থেকে তার যন্ত্রণার জগতে সে এখন একক, একমাত্র টের পেতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। ভবনাথের ঘুম ভাঙে, উঠে টর্চ জ্বালালেন। টুটুল তার ডান-পা তুলে খাটের ছত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে। ভবনাথ পুরো বালিশ উঁচু করে ছেলের পায়ের নীচে দেন, তারপর তার ছেলের চুলে বিলি কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন সকালের [illegible] আর গুলার্ডস্ লোশানে ঘন ঘন পা-ডোবানি যত বাড়ে ততই নীলচে হলদে রং ধরে টুটুলের ডান পাখানার হাঁটু পর্যন্ত। কলকাতার বিখ্যাত সার্জন [illegible] বাঁড়ুজ্জেকে দেখানোর কথা উঠতেই স্বর্ণসুন্দরী কান্না শুরু করেন। প্রতাপ ঘন ঘন বলতে থাকে, 'ব্যাপারটা সীরিয়াস, হাতুড়ে ডাক্তারের কাজ না।' পরদিনও গড়িয়ে যায়। একখানা ছোট খাটে যন্ত্রণায় ছটফট করে টুটুল। খাটের বাজুতে কেউ হাত দিলে চেঁচাতে থাকে। মাঝে মাঝে তার যন্ত্রণাকাতর চোখ ঘুরে ফিরে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে যায় যেখানে স্বাস্থ্যবান সাদা মখমলে ঢাকা [illegible] বাচ্চাটা ঘাস খায় আর চমকে চমকে উঠে তাকায় মাথা তুলে। হঠাৎ স্বর্ণসুন্দরী ধবধবে বিছানার চাদরে কি একটা দেখে চমকে ওঠেন। একটা পোকা যাচ্ছে, মাথার মধ্যে তাঁর কিলবিল করতে থাকে। ভগবান ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না, কিম্বা বাঁচালেও পা-কাটা ল্যাংড়া ছেলের মা বলে তিনি পরিচিত হবেন। কান্না চাপতে চাপতে ভবনাথের বৈঠকখানায় গিয়ে আছড়ে পড়লেন, 'একবার দ্যাখো, ছেলেটা মরল কি বাঁচল, একবার দ্যাখো নিজের চোখে।'

ভবনাথ দেখলেন, মাথা নীচু করে বিছানার চাদরের ওপর চোখ বুলিয়ে। বোধহয় বুড়ী একটা গন্ধরাজের তোড়া টুটুলের মাথার বালিশের কাছে রেখেছিল। তা থেকে দু তিনটে পোকা বেরিয়ে নীচের দিকে নামছে। কিন্তু ছেলেটার জন্য উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেল তাঁর। সন্ধ্যার পর আবার হরিচরণ ডাক্তার এলেন। পায়ের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠলেন। অবিলম্বে অপারেশন না করলে পা পচে যেতে পারে, খাটের কাছে মাথা নীচু করলেই চাপা মৃদু দুর্গন্ধ আসে নাকে।

পরদিন সকালে [illegible] জাগা চোখ মেলতেই টুটুল অবাক হয়। ধুতি আর নীল টুইলের হাফ-শার্টের ওপর সাদা [illegible] আল-খাল্লা চাপিয়ে হরিচরণ ডাক্তার একজন জেনারেলের মতো তাদের শোবার বড় ঘর-খানায় ঢুকলেন। তাঁর পেছনে চকচকে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের সার্জারি বাক্স দু হাতে ধরে রোগেন কম্পাউণ্ডারবাবু, পেছনে আরও দুজন লোক, তাদের হাতে ট্রেতে বোঝাই টিঞ্চার আয়োডিনের শিশি-বোতল, তুলোর বাণ্ডিল, একজনের হাতে মস্তবড় টুল, স্টোভ, সাদা এনামেলের রকমারি পাত্র, অন্যদিন [illegible] বাড়ির ঘোড়া আর পেটরোগা অবস্থায় সবসময়ই বোকেরা অত্যন্ত কাঁচুমাচু, মুখখানায় মাঝে মাঝে রসিকতার ঝিলিক খেলে যায় চোখে। আজ চকচকে গাল, টাকের ওপর দু-পাশের চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটো আত্মবিশ্বাসে ভরা সমাহিত। হরিচরণ ডাক্তার যেন স্থানীয় যাত্রার দলের নিমাইয়ের নিমাই: যাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্যাচ-প্যাচ করে পানের পিক ফেলছে, ফোঁ ফোঁ করে বিড়ি টানছে, তারপর ঘণ্টা বাজতেই চেহারার অলৌকিক পরিবর্তন।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর : শ্যামাপ্রসাদ : আবদুল্লা

পুলকেশ দে সরকার

[যে-কাশ্মীর-সমস্যার প্রশ্নে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-দীপ অকস্মাৎ কাশ্মীরে বন্দীদশায় নির্বাপিত হয় তা আজ ২০ বছর পরও অমীমাংসিত। সংশ্লিষ্ট নায়কদের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন। শ্যামাপ্রসাদ নেই, পণ্ডিত নেহরু নেই, ডাঃ কাটজুও নেই। কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্নটি রাষ্ট্রপুঞ্জের ঠাণ্ডাঘরে যেমন ছিল তেমনি আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বা কোনকালে তার মীমাংসা হবে এমন কোন লক্ষণই লক্ষণীয় নয়।]

১৯৪৭-এর শেষদিনে খবর প্রচারিত হল : 'ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

১৯৪৮-এর ২রা ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত নেহরু অবোধ ভারতীয়দের আশ্বস্ত করে বললেন : এই কাশ্মীর-সংক্রান্ত সরল প্রশ্নটির যথাসম্ভব সত্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা নিষ্পত্তি করে দেবেন। (১)

আজ ১৯৭১-এর ২৩-এ জুন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩-এ জুন শ্যামাপ্রসাদ রহস্যাবৃত মৃত্যুতে বিলীন হন। ২০ বছরেও পণ্ডিত নেহরু-প্রতিশ্রুত 'যথাসম্ভব সত্বর' কাশ্মীর প্রশ্ন-মীমাংসা সত্য হয়ে ওঠে নি। পণ্ডিত নেহরু নেই; তাঁর বৃটিশ কূটনীতিক পৃষ্ঠপোষক লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেই। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু নেই। কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা আজ কাশ্মীরে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তি। তিনি আছেন। আর আছে অধিকৃত-অনধিকৃত কাশ্মীর। ভারতের দুর্ভাবনার উৎস।

কাশ্মীর-প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হলে অমৃতবাজার পত্রিকা ২৭-এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, তারিখে লিখেছিলেন : 'মনে হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর-প্রশ্ন উত্থাপন করে ভারত সরকার ফাঁদে পড়লেন। কি করে এ থেকে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন। ইতিমধ্যে পাকিস্থান কেকটাও রাখল, খেতেও থাকল।' (২)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর-প্রশ্ন ইচ্ছাকৃত নানা জটিল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ঢেউয়ে উথাল-পাথাল হতে লাগল।

১৯৪৯-এর ১লা জানুয়ারী থেকে কাশ্মীর তথা ভারতদেহে যুদ্ধবিরতি রেখা টেনে দেওয়া হল।

১৯৪৯, ১৯৫০ গড়িয়ে গেল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল স্বখাত সলিলে বিতৃষ্ণ প্রধানমন্ত্রী নেহরু অবোধ ভারতীয়দের উদ্দেশে আবার বলেন, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় নেই যে, যাই ঘটুক না কেন, কাশ্মীর নিয়ে কোন টালবাহানা আমরা সহ্য করব না। (৩)

কিন্তু এ না-হয় পাকিস্থানের যোগসাজসে বৃহৎ রাষ্ট্র গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র; নন্দ ঘোষের ওপর দোষ চাপিয়ে হয়তো নির্বিঘ্নে চিরটা কাল কাটানো যায়। পণ্ডিত নেহরুর জীবদ্দশায় যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরও তেমনি আমরা কাশ্মীর নিয়ে টালবাহানা সহ্য করে চলেছি; যারা করছে তাদেরই বন্ধুত্বলাভে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। সুতরাং, পররাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্র থাক; স্বরাষ্ট্র, জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা শ্যামাপ্রসাদের জীবৎকালে ও মরণোত্তরকালে কাশ্মীর নিয়ে কি করেছি? কারও ঘাড়ে দোষ চাপানোর আগে আমাদের সে সম্পর্কেও এক পরিচ্ছন্ন ঠিকুজি দেখা দরকার। ইতিহাসে তা ইতিমধ্যেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ভারতের সংবিধান পরিষদে 'অখণ্ড' ভারতের জন্য একটি সর্বব্যাপী সংবিধান গৃহীত ও বলবৎ হলেও (১৯৪৮-৫০) এবং তারপরও কাশ্মীরে কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠিত হল। অর্থাৎ, কাশ্মীরকে একই নিঃশ্বাসে ভারতের অঙ্গীভূত বলেও তার পৃথক রাষ্ট্রের পটভূমি রচনা করতে দেওয়া হ'ল। ৯ই সেপ্টেম্বর এই বিসংগতির সূচনা করল। জম্মু-কাশ্মীর-লাডাকের সংবিধান পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ঝিলম নদীতীরে ৩০০ বছরের প্রাচীন 'শেরগরহি প্যালেসে' ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১-এ অক্টোবর। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন গোলাম মহম্মদ সাদিক। তিনি ঘোষণা করলেন : পরিষদ সর্বতোভাবে সার্বভৌম এবং কাশ্মীরবাসীদের সৌভাগ্যের সূর্যোদয় অথবা দুর্ভাগ্যের ভরাডুবি ঘটাতে পারে; পারে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে। (৪)

পণ্ডিত নেহরু এই উক্তি সমর্থন করলেন। (৫)

(1) This simply Kashmir issue would be disposed of by UNO as quickly as possible (Amrita Bazar Patrika, 3rd Feb. 1948.

(2) It thus appears that the Government of India entered into a trap when they made a reference to the security council. It is difficult to see how they can get out of it. Meanwhile Pakistan is eating the cake and having it, too, as the saying goes. — A.B.P., Jan. 27.1948.

(3) "I am clear, I am dead clear, we will tolerate no nonsense about Kashmir, come what may". — ABP., April 3, 1951.

(4) The assembly was fully sovereign and could make or mar the fate of the people of Kashmir and fulfil the hopes pinned on it by the people (Amrita Bazar Patrika, Nov. 1, 1951.)

(5) Amrita Bazar Patrika, Nov. 4, 1951.

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীরিদের 'অখণ্ড' ভারতে দুই প্রধানমন্ত্রী বিরাজ করতে লাগলেন। এক—স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু; দুই—শেখ আবদুল্লা। ২৫-এ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করলেন : দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান পরিষদের অবিসম্বাদী অধিকার। ১০ই এপ্রিল স্পষ্টতর; কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তাকে 'অবাস্তব, শিশুসুলভ ও পাগলামির সামিল' বলে অভিহিত করলেন। এরপর পাক-সীমান্তের মাত্র চার মাইল ব্যবধানে রণবীরসিংপুরায় শেখ আবদুল্লা যে ভাষণ দেন তাকে উপলক্ষ করেই একদিকে শ্যামা-প্রসাদ, অপরদিকে দুই প্রধানমন্ত্রী নেহরু-আবদুল্লার বিরোধ সঞ্চারিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তাঁর দীর্ঘ-ভাষণের মধ্যে বলেছিলেন : 'আমরা যখন সুনিশ্চিত হব যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা চিরকালের জন্য সমাধিস্থ হয়েছে তখন আমরা কাশ্মীরে প্রয়োগের জন্য ভারতের সংবিধানকে স্বাগত জানাব। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত নই।।'

এবং বললেন, 'সেই জন্যই তো বলি যারা কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পরিচয় হারাতে চায় আমাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই।' (৬)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই ভাষণ শুনে বললেন, শেখ আবদুল্লার যে বক্তৃতা শনিবার সকালে (১২ই এপ্রিল) বেরিয়েছে তাতে তাঁর অন্তর্লোকের হৃদয়াংশের উদ্ঘাটন ঘটেছে। এই উদ্ভট ভাষণ পাকিস্তানের হাতকেই সবলতর করবে। (৭)

তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় স্বচ্ছন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। গত চার বছর ধরে যে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে তা যেন না ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭-এ আমাদের দেশমাতৃকার শোচনীয় বিভাজনের যে পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই সর্বনাশা পরিণাম থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।' (৮)

(6) "That is why I say those who want Kashmir to lose its separate identity are talking without any conception of practical realities that face us to-day". (Amrita Bazar Patrika, April 12, 1952)

(7) "Shik Abdullah's speech as reported on Saturday morning (April 12) is staggering disclosure of the inner working of his mind. This is strange statement calculated to strengthen the hands of Pakistan.

(৮) অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫২

পণ্ডিত নেহরু শেখ আবদুল্লাকেই সমর্থন করেন। এবং শেখ আবদুল্লাকে সমর্থন করবার জন্য জম্মু প্রজা পরিষদের ওপর সকল দোষ চাপালেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা এর প্রতিবাদে বললেন, শেখ আবদুল্লার দুর্ভাগ্যজনক বক্তৃতার সাফাইয়ে শ্রীনেহরুর সকল দোষ পরিষদের ওপর চাপানো সঙ্গত হয়নি। তাঁর পক্ষে একটা অসমর্থনযোগ্য নীতির পক্ষে খোঁড়া ওকালতি করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াও সঙ্গত হয়েছে বলে আমরা মনে করি নে। (৯)

তারপর একদিন সকল সংশয় নিরসন করে কাশ্মীরের সৌধশীর্ষে উঠল স্বতন্ত্র নিজস্ব রাষ্ট্রীয় পতাকা; চার কোণা লাল রঙের পতাকার সাদা লাঙল এবং সমবিস্তার ও সমদূরত্ব তিনটি দাগ —জম্মু, কাশ্মীর, লাডাক। প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করলেন, এই-ই কাশ্মীরের জাতীয় পতাকা। তিনি জম্মুবাসীকে এই বলে হুমকি দিলেন যে, তারা আন্দোলন চালিয়ে গেলে জম্মু-কাশ্মীরের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ দাবী করলেন, জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগ করুন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন, আসলে জম্মুর আন্দোলনটা ভারত সরকারকে বিব্রত করে

(9) "We do not think Shri Nehru is justified in laying all the blame on the Parishad for the unfortunate speech of Sheikh Abdullah. Nor do we think it was proper on his part to play the role of halting advocate in defence of an indefensible policy.

তোলার জন্য। কাশ্মীর-এর যে বাধা রয়েছে তা থাকবে।

১৯৫৩-এর ৯ই জানুয়ারী তাঁর এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ তা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিলেন এবং ঐ পত্রাবলী প্রকাশিত হলে দেখা গেল দুইপক্ষ দুই মেরুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টেও ধোঁয়াটে কাটল না। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের কি-একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তা কি প্রধানমন্ত্রী নেহরু জানতেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর রাজ্যকে কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু, লাডাক, গিলগিট এবং মীরপুর-পুঞ্চ-মুজফ্ফরাবাদ—এই পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ এবং তাদের নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। এই ফেডারেশন হবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসিত ফেডারেটেড ইউনিট।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখলেন: শ্যামাপ্রসাদ বললেন, এ নিছক গাঁজাখুরি ব্যাপার, উৎসাহ দিলে সারা ভারতবর্ষ একদিন এমনি হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বার বার উচ্চৈস্বরে তুলতে লাগলেন জম্মু হিন্দুদের কথা। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, বিতর্কের প্রয়োজন কি? তদন্ত হোক। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন, আমি বলছি, তার ওপর তদন্ত! শ্যামাপ্রসাদ বললেন, আচ্ছা, তবে আমিই যাচ্ছি 'সরেজমিনে' ব্যাপারটা বুঝতে।

কিন্তু কাশ্মীর যেতে পারমিট চাই। পার্লামেন্ট সদস্য শ্যামাপ্রসাদ বললেন, না, কাশ্মীরে যেতে পারমিটের আবেদন করব না

— কয়েকটি মঞ্চসফল নাটক —

নীহাররঞ্জন গুপ্তের		শম্ভু মিত্রের	
দুই রাত্রি	৩·০০	ঘূর্ণি	৩·০০

অন্ধকারের বৃত্ত	গঙ্গাপদ বসু	৩·৫০
অংশীদার	গঙ্গাপদ বসু	৪·০০
বাকি ইতিহাস	বাদল সরকার	৩·২৫
বাঁধ	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অগ্নিতারকা	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·৫০
আজকের নাটক	সুশীল মুখোপাধ্যায়	৩·০০
মেঘে ঢাকা তারা	শক্তিপদ রাজগুরু	৩·৫০
জীবন জিজ্ঞাসা	মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
কাঞ্চনরঙ্গ	শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র	৩·০০

— সকল প্রকাশকের নাটকের বই আমরা সরবরাহ করি —

গ্রন্থপীঠ
২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

বীরেন্দ্র পাল চৌধুরীর
আজ অতিবর্ষ বর্ষ ২·৫০

আছি। আমি তো জানি না কোন্ আইনবলে পারমিটের দরকার হয়।। (১০)

পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা গেলেন চটে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু সম্ভবতঃ ওটা কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চেপে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাকে এক খবর দিলেন। আবদুল্লা আসতে নিষেধ করে বললেন, 'অসম্ভব'। গ্রেপ্তারের হুকুমও দিলেন। সীমান্ত পার হয়ে স্বতন্ত্র কাশ্মীর রাজ্যের দু'মাইল ভেতরে যেতেই লক্ষীপুরে ১১ই মে'র সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ বন্দী হলেন। প্রথমে নিশাতবাগ বাংলোয়। তারপর গবর্ণমেন্ট হাসপাতালে। তারপর মৃত্যুকবলে। সিনেমার চাইতেও দ্রুতগতি ঘটনাক্রম।

অমৃতবাজার পত্রিকা গ্রেপ্তারের পর লিখলেন: 'জন-নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘন করে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করার অপরাধে কাশ্মীর সরকার যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করেন তা সম্ভবতঃ নয়াদিল্লীর পরামর্শক্রমেই। ......ডঃ মুখার্জি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, যাঁরাই নেহরুর কাশ্মীর-নীতি থেকে পৃথক মত পোষণ করেন, তাঁদের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের পারমিট চাইলেও দেওয়া হচ্ছে না—এ অভিযোগের কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্তব্য।' (১১)

বন্দী শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন, দিল্লী আদালতে হাজির হয়ে তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার অনুমতি কাশ্মীর সরকার দেবেন না। (৩০এ মে, ১৯৫৩)

২৩এ জুন পত্রিকার বিশেষ সংবাদ আট কলম জোড়া সংবাদ-শিরোনামা হল: 'ডঃ মুখার্জির দেহ আসছে কলকাতায়: অন্ত্যেষ্টি আগামীকাল।'

কাশ্মীরের এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিচারপতি মুখার্জিকে জানায়: আপনাকে একটা বার্তা দেবার আছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মারা গেছেন। (১২)

(10) I do not know under which law a permit is necessary to go to Jammu.

(১১) অমৃতবাজার পত্রিকা, মে ১০, ১৯৫৩

(12) "I have a message to convey to you from Sheikh Abdullah. Dr. Shyama Prasad is dead".

একটা আন্দোলনের কথা উঠেছিল, হয় নি। মনে হয়েছিল বঙ্গদেশ ১৯০৫-এর উদ্বেল তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে; ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল। একটা সভা হয়েছিল, তার সভাপতিরূপে রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর এবং বহুজনের বিচারে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন।

কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজু অল্পকালের জন্যও শ্যামাপ্রসাদের দেহকে দিল্লীতে নামাতে দেন নি।। পত্রিকা বলেছিলেন, এ আর যাই হোক অলৌকিক মনোভাব। পত্রিকা প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উক্তি ও বিবৃতিতে যে সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য দুঃখ করেন এবং পরিশেষে লেখেন, —'যদিও শেখ আবদুল্লার সরকার ডঃ মুখার্জির গ্রেপ্তার ও অন্তরীণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তবু নয়াদিল্লীর ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। একথা আর গোপন নেই এবং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন যে, ডঃ মুখার্জিকে হাজতে নিয়ে গিয়ে যে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে তা ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই করা হয়েছে।' (১৩)

পণ্ডিত নেহরু সব ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেবার উৎকণ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅতুল্য ঘোষকে এক পত্রযোগে লিখলেন, আসল ঘটনা সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকাতেই পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এমন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। (১৪) কিন্তু আসল ঘটনা কি তা বললেন না।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরে—আবদুল্লা কিছুদিন আগে জম্মুবাসীর উদ্দেশে যে-হুমকি দিয়েছিলেন যে কাশ্মীর জম্মু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেই—বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জম্মু-আন্দোলন দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন খোদ কাশ্মীরে তার কোন লক্ষণ দূরস্থান, প্রশ্রয়টাই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। ঘূর্ণায়মান যুগ বিদ্যুৎগতিতে ঘুরতে লাগল।

শেখ আবদুল্লা জেলমন্ত্রী পণ্ডিত শ্যামলাল সরফকে পদত্যাগ করতে আজ্ঞা দিলেন। হিন্দু! ন্যাশনাল কনফারেন্সে বললেন,

(১৩) অমৃতবাজার পত্রিকা, জুলাই ৪, ১৯৫৩

(14) "the feelings of the people of Bengalees in West Bengal were due to lack of knowledge of facts". (ABP, July 5, 1953).

কাশ্মীরীরা একটা স্বতন্ত্র জাতি; সুতরাং, জাতি হিসেবেই তাঁরা কাশ্মীরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। কি বিপদ? ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট পত্রিকার পাঠকদের চক্ষু বিস্ফারিত করে আট কলম-ব্যাপী সংবাদ শিরোনামা বেরোলো:

শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার—

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত বক্সী গোলাম মহম্মদ বিবৃতি দিয়ে বললেন: 'দেশের স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য বিকিয়ে দেবার মুখে পড়েছিল; পড়লে নিদারুণ পরিণাম অপরিহার্য হয়ে পড়ত।' ইত্যাদি।

নিঃসন্দেহে প্রভু-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে মীর্জা আফজল বেগ প্রমুখ আর ৩১ জন রাজবন্দী হন। সদর-ই-রিয়াসৎ করণ সিং ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। ৯ই আগষ্ট আবদুল্লা ও বেগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বক্সী গোলাম মহম্মদ আবদুল্লার স্থলাভিষিক্ত হন।

এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতায় কোন ত্রুটি নেই; কিন্তু আইনের জগতে 'এস্টোপ' বলে একটা কথা আছে। আইনের চোখে তারও রেহাই নেই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মরে প্রমাণ করলেন যে, তিনিই ঠিক; আবদুল্লাকে, রাষ্ট্রবিরোধী বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করার পর শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য আরও বেশী ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কালো ঘোড়ার যাঁরা জকি ছিলেন তাঁরা রেহাই পেয়ে গেলেন। অবোধ ভারত একটা প্রশ্নও তুলল না তাঁদের সম্বন্ধে। যত দিন যাচ্ছে, ২০ বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রলম্বিত কাশ্মীর প্রশ্ন পাকিস্থান এবং অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের দিকে তাকালে, শ্যামাপ্রসাদকে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের বলি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা আজ বহুজন। 'অবাঞ্ছিত' আবদুল্লা আর পাকিস্থান কাশ্মীরের ওপর প্রলুব্ধ বাজের দৃষ্টি রেখে চলেছে। শহীদ শ্যামাপ্রসাদ সত্যের মহিমায় মহাকালের কোলে মহত্তর—আরও মহত্তর হয়ে উঠছেন। কিন্তু কাশ্মীরের কি কোনদিন তিমির-বিদারণ হবে?

পাওয়া

দুর্গাদাস ভট্ট

দোতলার কোণায় ঘরের বারান্দা থেকে [illegible] নিচের দিকে ঝুঁকে দেখল বিমল। উঠোনের প্রায় অর্ধেকটা সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় যেখানে দুটো [illegible] ফুলের গাছ আর করবী গাছ ছিল, ইতিমধ্যেই কেটে ফেলে দুটো মস্ত মস্ত উনুন তৈরী করা হয়েছে। বামুন ঠাকুর একটায় বিরাট একটি [illegible] হাঁড়ি চড়িয়েছেন, অন্যটায় কড়াই। [illegible] আত্মীয়দের [illegible] আর বাড়ির [illegible] ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যাতায়াতে সমস্ত বাড়িটাই মুখর।

দিনকয়েক আগে বিয়ে হয়েছে বিমলের। [illegible] ফুলশয্যা সবই পার করে এসে আজ বৌভাতের দিন নিজেকে বড়ই নির্জন মনে হচ্ছে। চারিদিকে হাসি মুখ, প্রত্যেক মুহূর্তে একাকী ইন্দ্রজিতের সামনে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে। মনে পড়লো দিন তিনেক আগের সেই কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যাবেলার কথা। [illegible] মাইল কুড়ি বাসে করে ওরা গিয়েছিল। শীতের বিকেলে যে দিন আকাশের [illegible] আশ্চর্য এক ধরনের অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল। গাছ পাতায় ফসল কেটে নেওয়া ধু ধু প্রান্তরে শেষ রোদের সোনালী [illegible] যেন জীবনেরই এক নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরছে। তার পর লগ্ন আসন্ন হলে কপাল থেকে গাল পর্যন্ত চন্দন চর্চা [illegible] করে [illegible] ফুলের মালা পরে যখন বরাসন ত্যাগ করা [illegible] অভিযানে যাত্রা, [illegible] ছোট বেলার বন্ধু [illegible] এক [illegible] গাড়ী ধরে [illegible] দিতে [illegible] সোনালী ও রূপালী [illegible] মত [illegible] ইত্যাদি নানা শব্দ [illegible] করে উঠেছিল বিমলের। তার [illegible] হয়ে যাচ্ছে। একটা [illegible] এবং ছোট ছোট [illegible] মধ্যে [illegible] ইচ্ছে করে ডুবতে যাচ্ছে বিমল [illegible] এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই।

অল্প পরেই সমবেত উলুধ্বনি, শঙ্খ [illegible] আলোর [illegible] রেশমী শাড়ি [illegible] কৌতুক ভরা এক টুকরো বিস্ময়ের জগৎ। মুহূর্তকালের জন্য তার [illegible] থেকে যেন [illegible] নিয়েছিল বিমল। চোখের সামনে অপলক [illegible] দুটি চোখ [illegible] দুটি [illegible] আবার বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকের চিৎকার, কৌতুক [illegible] না হলে না আবার [illegible] একবার [illegible] হাত নাড়ছিল বিমল। [illegible] আঙুল নাড়া [illegible]

CENTRAL LIBRARY

এর পরে কত ধরনের আপ্যায়ন। শ্বশুর শাশুড়ী এবং অন্যান্যদের তাঁদের এই নতুন মানুষটিকে নিজেদেরই একজন করে পাওয়ার চেষ্টা। যা নিজের মুঠো থেকে যাবার প্রায় ফিকে হয়ে আসা স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনছিল। এত আদর এত আপ্যায়ন যে বিমলের জন্যে বসে ছিল, বিমল জানত না। জীবন যেন কুঁকড়ে মুচড়ে একটা কৃত্রিম খোলসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছিল। হঠাৎ আলো জ্বলল, হাওয়া বইল, জীবনের আদিঅন্ত তোলপাড় হয়ে কিছু পরম সুধা উঠে এল। তবু ঠিক নিশ্চিতভাবে সুধাময় করে তুলতে পারছে না বিমলকে। সব পাওয়ার মধ্যে পরম পাওয়াটিই যেন একটি কাঁটার মতো বিমলের মনে প্রতিক্ষণেই বিঁধছে।

প্রথমে বিস্ময়, তার পর তীব্র একটা আকর্ষণ, তার পর আত্মবিকাশের মধ্যে দিয়ে যেন একটি স্থির নিশ্চয়ে পৌঁছুনোর চেষ্টা। যা আদৌ সুখকর মনে হয় না। বরং একটা তীব্র বিস্ফোরণ তার সর্বাঙ্গ ধরে কাঁপাচ্ছে। এ কি করে হয়? কেমন করে হয়। যে মেয়ে তাকে কোন দিন দেখে নি, জানে নি, যার বয়স এখনো কুড়িতে পৌঁছয়নি যে আধা শহর আধা গ্রামের পরিবেশে এতকাল কাটিয়েছে, এমনি একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা তাকে এভাবে গ্রহণ করেছে কি করে। যে বিমলের চল্লিশ উত্তীর্ণ বয়েস। কথায়-বার্তায় চাল-চলনে কোন আবেগ নেই উচ্ছ্বাস নেই। সতর্ক চালে যে কথা বলে প্রতিটি ব্যাপারের তাৎপর্য যে মেপে মেপে বোঝে, ভাইবোন, আত্মীয় পরিজনরাও যার কাছ থেকে জ্ঞান নেয়। বিমলের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই অভিজ্ঞ হয়, এমন একটি খাঁটি দাদা মার্কা মানুষকে মণিকা এমন করে নায়কের আসনে বসাচ্ছে কি করে? না সবটাই তার ভান অন্য কোথাও মন ফেলে রেখে সুন্দর ভাবে প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে।

ফুলশয্যা পর্যন্ত তর সয়নি মণিকার। কাল রাত্রিতেই ছাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে তখন ভরা জ্যোৎস্না বরফের মতো চাঁদ উঠেছে। হিম পড়ছে, দোতলার ছাতের একটা কোণে দাঁড়িয়ে ছিল বিমল। ছাতের সংলগ্ন সজনে গাছটি অজস্র ফলে টইটুম্বুর দেখাচ্ছে। তরল জ্যোৎস্নায় যেন সব কিছুই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শাড়ির খস খস শব্দে চমকে ফিরে দেখে সামনেই মণিকা। প্রথমে বিমলের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এও কি সম্ভব। এ মেয়ে এত সহজে সমাজের সব বাধা নিষেধকে দুড়ো আঙুলে দেখিয়ে এভাবে আসে কি করে। বিমলই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙে—জানো না আজ কাল-রাত্রি। আজ পরস্পরের মুখ দেখতে নেই।

—জানি।

—তবে যে এলে।

—কি জানি না এসে থাকতে পারলাম না।

কথাটা এত সহজে এবং অকৃত্রিম ভাবে উচ্চারণ করল মণিকা যে, ভিতর পর্যন্ত শির শির করে উঠল বিমলের।

—কেন আর তো মোটে একটা দিন কাটলেই আমাকে তো তুমি একেবারেই একলা করে পেতে।

—ভয় পেতাম......

কেমন যেন থমকে গিয়েছিল মণিকা। নিজের হতচকিত ভাবটা ঢাকবার জন্যে মাথা নীচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে যেন ছাতের ওপর দাগ কাটে। একটু সরে গিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। একটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতেই বলে—কেন জানি মনে হচ্ছিল, সব সময়ই আপনি বড্ড চিন্তা করছেন। তাই আমার ভয় করছিল।

—কিসের ভয়। না অতো ভয়ের কারণ নেই। আমিতো তোমার সব দায়িত্বই নিয়েছি।

ফুল শয্যার মোহন পরিবেশেও সেই কৈফিয়তটাই নতুন করে মণিকার ঠোঁটে বাজল। ওরা কিছুতেই যেন সহজ হতে পারছে না। তাহলে বিমলের সুগম্ভীর হাবভাবটা থেকে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে কি ও পৌঁছুতে পেরেছে? বিমল নিতান্তই একজন তরুণ যুবক হতে চাইল। বাহুপাশে বাঁধল মণিকাকে। চুমু খেল। নিতান্তই সাধারণের মতই মণিকার কানের পাশে ঠোঁট নামিয়ে বলল, 'বলো আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে কি না।' উত্তরে আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই আকৃষ্ট হয়ে গেল মণিকা। টপ করে বিমলের কাঁধের ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল। ফোঁপাতে লাগল মণিকা। সবটাই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। কি থেকে যে কি হল বুঝতে পারা গেল না। দুজোড়া জাগ্রত চোখ জেগে জেগেই সারা রাত পার করে দিল।

আজ হচ্ছে বৌভাতের দিন। সব কাজের দায়িত্বই আজ ভাই, বোন, মেসো মাসী আর জামাইবাবুদের ওপর ন্যস্ত। তবু একটা কিছু করার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করছে বিমলের। কোনো ব্যাপারেই সে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। টাকা-পয়সার হিসাব তো বটেই, তদারকী থেকে শুরু করে, রান্না করা কুটনো কোটা সবেই সে পারদর্শী। তার ওপর রয়েছে তার সাম্প্রতিক ভাবনার চাপ যা থেকে রেহাই পাবার জন্যে একটা কিছু করা দরকার।

দোতলা থেকে নেমে যেখানে তরকারী কোটা চলছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় মাসীমা মনোরমা আর মেজদি ছন্দা ধারালো বঁটিতে তখন বাঁধাকপি কুটছিলেন। আশেপাশে দলের আল, ছাড়াচ্ছে বিমলের দুই ছোট বোন নন্দা আর তন্দ্রা। এদের দুজনকে বছর তিনেক আগে বিমলই যোগাড় যন্ত্র করে বিয়ে দিয়েছে। নতুন বৌ অন্য দুরে পান সাজছে এবং বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছে কারণ যে, কোন মুহূর্তে তার বাপের বাড়ির লোকজন এসে পড়তে পারে।

বিমল গিয়ে দাঁড়াতেই নন্দা আর তন্দ্রা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসল। পাশের ছোট প্যাসেজটায় চলে আসা মাত্রই শুনল বড় মাসীমা বলছেন—বিমলকে আজ বেজায় জব্দ মনে হচ্ছে?

পড়শী একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন—কেন।

—কেন আবার সব ব্যাপারেই বিমলই যে সব কিছু করে। আজ আর সে অভ্যাস মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ দেখছে তাকে বাদ দিয়েই সব কিছু হচ্ছে। ভাল ভাবেই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

—আহা বেচারী

মেজদি নন্দা এবার ফোড়ন কাটেন। তারপর আগের কথার জের টেনে বলেন—তা নতুন বৌ তুমিই বা কেমন লোক, একটু ওপরে গিয়ে ওর সঙ্গে গল্পসল্পও তো করতে পারো।

নতুন বৌ মণিকা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায়। একটা উদগত আবেগকে চাপতে চাপতে উঠোন পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলার পুবের ঘরে গদি মোড়া বিছানায় গিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক এবং অদ্ভুত যে সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত যখন বেশ একটু ঘন হয়েছে মেজদি ছন্দাই চেপে ধরেন বিমলকে। ইতিমধ্যে লোক খাওয়ানোর কাজ সাঙ্গ হয়েছে—ব্যাপার কিরে সুনু। নতুন বৌ এমন করে চলে এল কেন তখন?

—সে আমি কি করে বলব? স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা যা বলেছেন তা তো তোমার অজানা নয় মেজদি?

—রাজলক্ষ্মী রাখ। আমার মনে হয় একটা কোথাও অঘটন ঘটেছে। তোর ছোট শালীর মুখে শুনলাম এর আগে বার-তিনেক বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেস্তে গিয়েছিল মণিকার। শুধু টাকা পয়সার লেন-দেনের ব্যাপারেই। তাই ওর ধারণা হয়েছিল ওর কপাল খুবই খারাপ। বিয়ে ওর হবে না। তোর বেলায় প্রথমেই ম্যাঁকে দেখানোর আগেই তাই ওরা দাবী-দাওয়ার কথা জানতে চেয়েছিল। আমার মনে হয় এখনো ভয় কাটে নি মণিকার। অথচ আমাদের সব কিছুই ওর ভাল লাগছে।

বিমলের অন্তর থেকে একটু একটু করে মেঘ কেটে যাচ্ছে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে তার গম্ভীর মুখ দেখে প্রথম থেকেই ভয় পেয়েছিল মণিকা। সেই জন্যেই তর সয় নি, কাল রাত্রির অনুশাসন না মেনে বিমলের মনের কথা জানতে এসেছিল। ফুল শয্যাতেও সহজ হতে পারেনি। কিন্তু বিমল বুঝতে পারছে সবই একদিন সহজ হয়ে যাবে। বিমলের এই সহজাত গাম্ভীর্যই একদিন স্বাভাবিক মনে হবে মণিকার। তখন বিমলকে অতি মাত্রায় উৎফুল্ল কিম্বা চপল দেখলেই ঘাবড়ে যাবে। ভয়ের চোখে ফিরে ফিরে দেখবে মণিকা।

ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল হামেশাই লোকমুখে ক্যান্সার রোগের কথা শোনা যায়। এই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যেন একটা আতঙ্কও রয়েছে। কেননা সকলেরই ধারণা এ রোগ দুরারোগ্য। রোগটা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময়ে হয়ত দুরারোগ্য নয়। তাছাড়া, ক্যান্সার কী, কেন হয় এবং তার লক্ষণই বা কী ইত্যাদি অনেকেরই জানা নেই বলেই আতংক।

আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর নাম কর্কট রোগ। কাঁকড়া যেমন তার পা ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে গর্ত করে এই রোগও অল্পের থেকেই বড় আকার ধারণ করে কিনা, তাই।

ক্যান্সার রোগ শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। মস্তিষ্কে, মুখে, গলায়, স্তনে, পাকস্থলীতে, জরায়ুর মুখে এবং এমন কি রক্তের মধ্যেও। বর্তমান প্রবন্ধটি হল ব্রেস্ট বা স্তন-ক্যান্সার সম্বন্ধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান যে সকল তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেছে সেটা নারীদের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত কয়েক বছর যাবৎ নানান দেশেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের আক্রমণ বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার। দেখা গেছে এই রোগটা আবার মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকদেরই—যাদের বয়স চল্লিশের উপরে—বেশি হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইতালী, নরওয়ে, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে তো এই বিশেষ রোগে মৃত্যু সংখ্যা ইদানীং প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ইংলণ্ডে প্রতি বছর ৭ হাজার স্ত্রীলোক মারা যায় স্তন-ক্যান্সার রোগে। আমেরিকার সাম্প্রতিক কালের একটা বছরের হিসাব হল: ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২০৮০০০; তার মধ্যে স্তন-ক্যান্সারের রোগী ৫২০০০।

আমেরিকায় আবার এই রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি; মেয়েদের স্তন ক্যান্সার হওয়াটা একটা যেন অতি সাধারণ ব্যাপার ওদেশে। ইতিপূর্বে এক সময়ে ১৬ হাজার মার্কিন মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল; দেখা গেছে এদের অধিকাংশেরই স্তনে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। ১৯৬০ সালে সুইডেনে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগিণীদের একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল; তাতে প্রকাশ পায় প্রতি ৪ জনের মধ্যে এক জনের স্তন-ক্যান্সার।

একটা হিসাবে জানা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন হাসপাতালসমূহে ভর্তি ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৮০০। তার মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কেস ২১৫টি।

ইংলণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা আর্জেন্টিনা কানাডা প্রভৃতি দেশে স্তন-ক্যান্সার রোগের প্রকোপ যেমন অতিরিক্ত তেমনি আবার জাপান, রাশিয়া, চিলি, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে খুবই কম। প্রায় নেই বললেই চলে।

সোভিয়েট রাশিয়ার মেডিক্যাল অ্যাকাডেমীর ক্যান্সার ইনস্টিটিউট একবার একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল; দেখা গেল ঐ দেশের বেশিরভাগ মানুষই স্তন-ক্যান্সার রোগ থেকে প্রায় মুক্ত। তুর্কমানিয়া, কাজাকস্তান ও বুরিয়াৎ রিপাবলিকে তো একেবারেই তা নেই। ১৯৫৩—৫৬ সালে রাশিয়ার আসকা-বাদে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী ছিল ৮২ জন; তাদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিল রুশীয় স্ত্রীলোক; আর সবাই অন্য দেশীয়। আসকাবাদের অঞ্চলের বাইরে গ্রামের অধিবাসীদের সংখ্যা ১২০০০; ওখানে বছরে ১৬০টি শিশুর জন্ম হয়। একটা হিসাবে বলা হয়েছে পাঁচ বছরে মাত্র একটি ক্ষেত্রে এই রোগের আক্রমণ লক্ষ করা গেছে।

জাপানী স্ত্রীলোকদের তো বলতে গেলে স্তন-ক্যান্সার রোগটা হয়ই না। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই ওরা বাস করুক না কেন, এ রোগে তারা ভোগে না। হাওয়াই দ্বীপে জাপানী ছাড়া অন্য অনেক জাতীয় স্ত্রীলোকই বসবাস করে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ওখানে অন্যান্য জাতের যত স্ত্রীলোকের স্তন ক্যান্সার রোগ হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ জাপানীরও তা হয় না।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এই দুষ্ট ব্যাধির প্রকোপ কিছু বেশি, আবার কোথাও বা খুবই কম। কিন্তু কেন? আবহাওয়া জল-বায়ুর কারণে? নাকি জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের দরুন?

সম্ভবত শারীরগত অভ্যাস, স্থানীয় সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা

ইত্যাদি এর মূলে। তথাপি মোটামুটি কারণগুলি হল, সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান না করানো, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব এবং দাম্পত্য-জীবনের অনভিজ্ঞতা।

লক্ষ করে থাকবেন আজকাল মায়েরা সাধারণত তাদের শিশুসন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় না। পরিবর্তে ফিডিং বটল ব্যবহার করে থাকে। কোনো একটা বিশেষ দেশের কথা বলছিনে; ইদানীংকালে প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এটা খুব চলতি। যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। ওদের কথা হল বুকের দুধ দেওয়ার কাজটা সুরুচিসম্মত নয়, পরন্তু লজ্জাকর। দ্বিতীয়ত এতে করে তাদের যৌবন ও দেহের নিটোলতা নষ্ট হয়, বিকৃত হয় দেহের সৌষ্ঠব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য অসুস্থতাও একটা কারণ। আগেকার দিনে কিন্তু মায়েদের মনে ওরকম ধারণা ছিল না, সেকালে মায়ের বুকের দুধই শিশু-সন্তানের পক্ষে সর্বতোভাবে হিতকর বিবেচিত হত। অধুনা ও ব্যবস্থাটা বরবাদ করা হয়েছে, নারীরা বর্জন করেছে ওটা বিশেষ করে আমেরিকায় এবং দেখাদেখি প্রায় সব দেশেই। এই কারণেই আমেরিকার নারীদের মধ্যে এ রোগটার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার জাতীয় ক্যান্সার কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে এটা স্বীকৃত হয়েছিল।

সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সন্তানধারিণীরা যদি তাদের সন্তানকে স্তন্য পান না করায় তাহলে তাদের স্তনে ক্যান্সার রোগ হওয়ার বেশ কিছু সম্ভাবনা থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা শহুরে স্ত্রীলোকদের চেয়ে অধিককাল যাবৎ সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়; গর্ভনাশও করে না। সে কারণে ও দেশের গ্রামে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগটাও নেই। তুর্কমানিয়ায় স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করে, গর্ভপাত ঘটতে দেয় না এবং সন্তানকে স্তন্য পান করায় ২।৩ বছর বয়স পর্যন্ত। স্তন ক্যান্সার রোগ ওখানে তাই প্রায় অজ্ঞাত। দেখা গেছে উজবেকিস্তানের টুপিড়বোলক গ্রামে দশ বছরের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও এই রোগে ভোগে নি। ঐ অঞ্চলের মায়েরা সন্তানকে ২।৩ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ায়।

ইথিওপিয়ায় সাধারণত পরিবার বড়, সন্তানসংখ্যা বেশি। কিন্তু তথাপি সে দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রতিটি সন্তানকে বুকের দুধ দেয় দীর্ঘকাল। এই রোগও তাই সে দেশে একান্ত বিরল।

ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শিশু-সন্তানকে স্তন্য পান করানো হয় মাত্র ৮।৯ মাস বয়সকাল পর্যন্ত কিংবা তারও কম সময়। মুসলমান সমাজে সন্তানকে দু বছর বয়স পর্যন্ত স্তনদুগ্ধ পান করানোর রীতি আছে।

সন্তানসম্ভবা অবস্থায় নারীদেহের নানা অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির কম বেশি রূপান্তর ঘটে। তার ফলে দেখা দেয় নতুন হরমোন, দুগ্ধক্ষরণোপযোগী হয় তার স্তনগ্রন্থি। সুতরাং এই সময়ে যদি গর্ভপাত হয় তাহলে সমগ্র প্রোসেসটার একটা ওলটপালট ঘটে যায়। স্তনগ্রন্থির কোষগুলির বৃদ্ধি বাধা পায়; ফলে স্তনের ঐ স্থানটা ক্রমশ শক্ত কঠিন হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটা টিউমারে পর্যবসিত হতে পারে। আবার, সন্তানের জন্মের পরে মা যদি তাকে স্তন্য না দেয় তবে ঐ পদার্থটা লোপ পায়, যায় শুকিয়ে। তখন স্ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক কাজটা তো আর হতে পারল না? ফলে ঐ স্থানটা শক্ত কঠিন হতে থাকল। পরে সেটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে পরিণত হতে কতক্ষণ?

এই অবস্থায় দেহের সৌন্দর্য বা যৌবন-নিটোলতা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে সন্তান জন্মদানে বাধা প্রদান করা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি আবার অনেকগুলি সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করাও কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য এ দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নেবার কথা হচ্ছে না, আসলে কোনো দিকেই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়।

নানা রিপোর্ট খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, সন্তানকে স্তন্য পান করানো ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগের নিবারক। কিন্তু তা বলে ও-কাজটা দীর্ঘমেয়াদী না হওয়াই ভাল। সন্তান সংখ্যা বেশি হলে স্তন্যও দিতে হয় দীর্ঘকাল। কথা হল, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি গর্ভপাত ঘটিয়ে পরিবার সীমিত রাখাও অনুচিত। আর যদি মনে করে থাকেন গর্ভবতী হলেই নারীর সৌন্দর্য লোপ পায় কিংবা স্তনদুগ্ধ পান করানোর ফলে তার দেহসৌষ্ঠব নষ্ট হয়, তবে সেটা ভুল।

আর একটা কথা। খুব আঁটোসাঁটো কাঁচুলি ব্যবহার করা ক্ষতিকর। কেননা তাতে স্তনমণ্ডলের সূক্ষ্ম ফাইবার বা কোষগুলি ফুলে ফেঁপে দানা বাঁধতে পারে।

ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে নানান দেশের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটেই হরেক রকম গবেষণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি আমস্টারডাম ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় জানা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রোগ বংশগতও হতে পারে। কেবল ব্রেস্ট ক্যান্সারই নয়, সমগ্রভাবে এই ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কেই এত বেশি গবেষণা চালানো হচ্ছে দেশে দেশে যা আর অন্য কোনো রোগ সম্পর্কেই হচ্ছে না। আশা করা যায় অচিরে এই রোগের মূল কারণটি জানা যাবে।

কী জানেন, দেহের প্রতিটি অঙ্গের, ইন্দ্রিয়ের একটা বিশেষ ক্রিয়া আছে, একটা বিশেষ ধর্ম আছে। ওরা ঠিক ঠিক কাজ করলেই সম্ভবপর বাঁচিয়ে চলতে।

মাথার যন্ত্রণা ?
কাসপিন খেলে শীঘ্র আরাম পাবেন

কাসপিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা . বোম্বাই . কানপুর . দিল্লী

অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলাদেশ

বিষ্ণু দে

আবিশ্ব চৈতন্য আজ পঙ্গু, মূক—আকাশে সমুদ্রে আজ খরা,
যদিও সবাই জানে শতভঙ্গ এই বন্ধ্যা মনে-প্রাণে
মাঠে ঘাটে হাসি-গানে শতরঙ্গে ভরা।
অথচ সর্বত্র ঘোরে প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে নানান্ তস্কর,
এই মানুষেরই ত্রিভুবনে আজও ঘোরে জল্লাদ বর্বর,
এপাশে ওপাশে ঘোরে লুব্ধ সরীসৃপ, নানা জলুকা কণ্ডুক,
কোথাও বা টিরানোসোরাসদের সশস্ত্র প্রহরা, যেন ধরা তারই সরা!
কবিতা-বা অর্ধমৃত, নগ্ন-দেহে শতসজ্জা জরা।

অথচ হৃদয় জানে ধ্রুবতারা সত্য ঘটাকাশে,
অর্জুনেরা স্থির জানে উলূপীর অমৃত পাতালে।
জানে কর্মরচনাই মানবিক, কাব্য চিত্র, খোদাই, সঙ্গীত, ভালোবাসা
জীবনের ইতিনৃত্য মননে ভঙ্গীতে তালে তালে।
বহু হাজার বছর ব্যেপে পুস্তকে মানুষ গড়ে আশা
বিশ্বকে গড়েছে নিজ বরাভয় মহাপ্রতিভাসে।

তবু তো লোরকার অন্ত অপঘাতে, ঘরে চড়াও হত্যায়
যদিও সে দক্ষ শিল্পী অসামান্য সংবেদনে
চেয়েছিল ভাবী কথকের দুঃখে—নাকি মৃত্যুঞ্জয় উল্লাসেই?
যে অমৃত আজও কাঁপে প্রতিটি নিহত মুখে 'কবিতা নাটকে' সারাক্ষণ;
    কামারাদা! মৃত্যু হোক স্বাভাবিক, শয্যায়, সহজে,
    স্বাচ্ছন্দ্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন-কোমল
    শিরস্ত্রাণ শিরোধানে। যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
    অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক মরণের ছল
    যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে
    বাঘের বিকৃত বেগে, হাঙরের গুম্ফিত-দাঁতে, হানে
    কেউটের কৌটিল্যে, সেখানে যে মনুষ্যত্ব বিষে
    নীল হয় নিমেষে নিমেষে। নয় সেই অপঘাতে।—
    কারখানায়, গার্ডার-চূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, কানেলে,
    হাপরে, লাঙলে মৃত্যু জীবনের দাক্ষিণ্যের হাতে
    সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে
    স্রষ্টা মৃত্যু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
    সত্বরে সহজ মৃত্যু যে যায় আপন সুস্থ কাজে।
কিন্তু যদি সকলেই লোরকা না হই, বা সাকো ও ভ্যানৎসেত্তি
হাজার হাজার নিগ্রো? বা প্রাচ্য মানুষ? এদেশে ওদেশে
গঙ্গায় পদ্মায় হেসে লক্ষ লক্ষ চাষী বা মজুর?
যদি শুধু আউসভিৎজ্, বুখেনবাল্ড্, নানাবিধ ছদ্মবেশে
দেশে দেশে দেখা যায়, গরিব বা বহুবিত্ত বিস্ময়? নিকট সুদূরে
পাশ্চাত্যে, দুর্গত প্রাচ্যে, বিশেষত হতভাগ্য একালের প্রাচ্যে
বৈশাখের দাহে কিংবা শ্রাবণ বন্যায় মড়কে আকালে?

তাই বলে জিতে যাবে ওরা নাকি সর্বিত্তে সংক্রাম কিংবা
গোটা মানুষকে পৃথিবীকে পক্ষাঘাত হেনে?
আর এরা মেনে নেবে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাসংগ্রাম ছে…
মানবিক মর্ত্যলভ্য সভ্যতার অপঘাতী গ্লানি?
না না এরা জেনে শুনে বিশ্বে আজ গড়ে জীবন মরণপণ,
লক্ষ লক্ষ মানুষের সূচিকাভরণে দেহে মনে।।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব
দশম অধ্যায়
ফরাসী সংকটের মূল সূত্র

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও রণনীতির পরিণাম

১৯৪০ সালের ২২শে জুন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইল। সমগ্র সভ্যজগৎ এতবড় জাতির এত দ্রুত পতনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানীর দখলে গেল এবং অনধিকৃত দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিসি সহরে বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রধান নায়ক হইলেন। এক জো-হুকুম আইনসভা বা পার্লামেণ্ট তাঁর হস্তে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা অর্পণ করিলেন এবং ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী পেতাঁও ডিক্টেটর রূপে দেখা দিলেন। যে ফ্রান্সের রিপাব্লিক রাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস ছিল, তার অবলুপ্তি ঘটিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত এই তৃতীয় রিপাব্লিক রাষ্ট্রের সমস্ত বিধিবিধান লুপ্ত হইল এবং পেতাঁ ও তাঁর সহকর্মিগণ ফ্যাসিষ্ট অনুকরণে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন যে শাসনতন্ত্রের অধীনে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের সমাধি ঘটিল, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির অবসান হইল। ফরাসী বিপ্লবের যে মূল সূত্র ছিল Liberty, Equality and Fraternity কিম্বা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং যে মহান মন্ত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া ইউরোপ ও সারা পৃথিবীর মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছিল মার্শাল পেতাঁর নির্দেশে তাহা নিশ্চিহ্ন হইল এবং ফ্রান্সের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূলনীতি পাল্টাইয়া শ্রম, পরিবার ও পিতৃভূমি—এই তিনটি কথার উপর জোর দিলেন। কেননা, তাঁর মতে ফরাসী রাষ্ট্র ও সমাজ বিকৃত, নীতিভ্রষ্ট ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেতাঁর বর্ণিত ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার কারণ ও প্রতিকারের পথ ছিল অন্যরকম এবং উহার জন্য পেতাঁ ও তাঁর সহকর্মিগণই সর্বাধিক দায়ী ছিলেন। কিন্তু সেকথা পরে আলোচিত হইবে। সেপ্টেম্বর মাসে ভিসি গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া গঠিত হইল এবং ফ্রান্সের দুষ্টগ্রহরূপী মঃ লাভাল, মঃ রেনে বেলিন, এডমিরাল দারলাঁ প্রভৃতি কুখ্যাত নায়কেরা হিটলারের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। পেতাঁ যদিও বাহ্যতঃ এই গভর্ণমেণ্টের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি কার্যতঃ তাহা সম্ভব ছিল না। কারণ জার্মানীর নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণকারী ফ্রান্সের স্বাধীনতা বজায় রাখা স্বাভাবিক কারণেই অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ ভিসি গভর্ণমেণ্টের মতে হিটলারের হাতে ১৮ লক্ষ ফরাসী সৈন্য বন্দী ছিল, যারা জার্মাণীতে প্রেরিত হইল এবং অর্ধভুক্ত লাঞ্ছিত জীবনের বিড়ম্বনা বহন করিয়া অধিকাংশই শ্রমিকের কার্যের জন্য নিযুক্ত হইল। ৮ সেপ্টেম্বর জার্মানীর সঙ্গে ভিসি গভর্ণমেণ্ট জেনারেল গামেলাঁ, দালাদিয়ে এবং রেণোকে গ্রেপ্তার ও বন্দীনিবাসে আটক করিলেন। লিও ব্লুম এবং অন্যান্য বহু পূর্বতন নেতা, যাঁরা জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধাইবার জন্য দায়ী ছিলেন' তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার এবং আটক করা হইল। ফ্যাসিষ্ট অনুকরণে ইহুদী পীড়ন চলিতে লাগিল এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে সামান্য কারণের জন্যও মৃত্যুদণ্ডের বিধানগুলি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরিত হইলেন এবং ২৮শে অক্টোবর লাভাল পররাষ্ট্রসচিবের পদ পাইলেন। কিন্তু জার্মানীর সহিত চক্রান্তে অভ্যস্ত লাভাল মার্শাল পেতাঁরও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর তিনিও পদচ্যুত এবং ধৃত হইলেন। অবশ্য পরে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। এদিকে চার্লস দ্য গল ফ্রান্স হইতে পরিত্রাণ লাভ পূর্বক ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বরাবরই ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ ও হিটলারের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং লণ্ডনে গিয়া ফ্রান্সের প্রতিরোধের জন্য 'স্বাধীন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের' পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং ফ্রান্সের ভিতরে ও বাহিরে সমস্ত দেশপ্রেমিক ফরাসীকে তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ সংগঠনের জন্য আহ্বান জানাইতে লাগিলেন। জেনারেল দ্য গল নূতন ইতিহাসের নায়করূপে দেখা দিতে লাগিলেন।

●

উপরে ভিসি গভর্ণমেণ্টের যে সামান্য রেখাচিত্র দেওয়া হইল, তাহা ১৯৪০ সালের পরাজিত ফ্রান্সের কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের ইহাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। কেননা, ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যেমন প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হইয়াছিল, তেমনই উহার সমগ্র সামাজিক ও আর্থিক জীবনকেও নাড়া দিয়া গিয়াছিল।

ফ্রান্সের ভয়াবহ রক্তক্ষরণের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ ফরাসী সৈন্য স্বদেশ রক্ষার জন্য নিহত হইয়াছিল এবং ১০০ বছরের মধ্যে পাঁচবার—১৮১৪, ১৮১৫, ১৮৭০, ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালে বীর ফরাসীরা প্রুশিয়ান কামান ও গোলাগুলীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের ১০টি প্রদেশের উপর প্রুশিয়ান মিলিটারি শাসন চারটি ভয়ঙ্কর বছরের বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়াছিল এবং ভার্দুন থেকে টুলোঁ পর্যন্ত এমন একটি গৃহ বা কুটির ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নাই বা বিকলাঙ্গ হয় নাই। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া জার্মান সমরশক্তির ত্রাসের মধ্যে ফ্রান্সকে বাস করিতে হইয়াছিল ...কিন্তু মহাযুদ্ধরূপী ভূমিকম্পের আলোড়নের পর রাষ্ট্রজীবনের ফাটলগুলি পূর্ণ করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল, কিংবা পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে যে নূতন সমাজতান্ত্রিক সৌধ নির্মাণের ঐতিহাসিক দাবী ছিল, ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির নেতাগণ সেদিক দিয়া অগ্রসর হইলেন না। তখন পূর্বদিকে সোভিয়েট বিপ্লবের আতঙ্কে ইউরোপ ছিল শঙ্কান্বিত, সুতরাং ফ্রান্সের জনসাধারণ শাসক ও ধনতন্ত্রবাদী শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত এবং ১৯১৮ সালের পরবর্তী জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল—যদিও মাঝে মাঝে তথাকথিত বাহিক শান্তির যুগও ছিল। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে লাগিল, যখন ফ্রান্সের ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় এবং রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ ভিতরে ভিতরে ফ্যাসিজমের দিকে ঝুঁকিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রেণী স্বার্থের সংঘর্ষ আভ্যন্তরীণ সামাজিক দ্বন্দ্বও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে একদিকে শ্রমিক সাধারণের ক্রম-গভীর অসন্তোষ এবং অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় ঘটিতে লাগিল। আর আন্তর্জাতিক জগতে ইটালী, জাপান ও জার্মানীর ফ্যাসিষ্ট নীতি ও পদ্ধতির অগ্রগতিতে তখনই বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শান্তির সমর্থন ও যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিল। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী অধ্যুষিত ফ্রান্সের আসল মালিক ছিলেন ২০০ ধনী পরিবার, যাঁদের উদ্ভব হইয়াছিল নেপোলিয়নের আমলের ব্যাঙ্ক

বাটা গোগো।
নতুন যুগের নতুন জুতো।
নবীন......পরিকল্পিত......চৌকস।
নকশা ও নির্মাণে, গড়নে ও উপকরণে
এই জুতো একেবারে নতুন।
পোশাকী আর আটপৌরে, সকল সাজে
এবং সব মেজাজে মানানসই।
যাঁরা সব কিছুতেই নতুনের সন্ধানী,
সর্বাধুনিক ফ্যাশানই যাঁদের লক্ষ্য,
তাঁদের জন্যই বাটা গোগো।
আজই আসুন বাটার দোকানে,
দেখে যান বাটা গোগো-র
বিভিন্ন নকশা।
GoGo
নতুন যুগের নতুন জুতো।
গোগো
৩০.৯৫
গোগো
৩০.৯৫

CENTRAL LIBRARY

অব ফ্রান্সের বিধান হইতে। কার্যতঃ তাঁরাই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ফ্রান্সের সমস্ত শ্রমশিল্প অর্থ এবং খনিজা একচেটিয়া মালিকানার অধিকারী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির চাবিকাঠি। সুতরাং শ্রমজীবী সাধারণ ও দরিদ্র জনগণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যাঁরা অগ্রসর হইয়া আসিতে-ছিলেন, সেই বামপন্থী দলগুলির সহিত স্বভাবতঃই তাঁদের বিরোধ বাধিল। এই বিরোধিতা হইতে আত্মরক্ষার ও ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের সমস্ত বামপন্থী দল (র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, কমিউনিস্ট ইত্যাদি) একত্রিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাস্টিল দিবসে তাঁরা ৫ লক্ষ নরনারীর সমাবেশে ঘোষণা করিলেন:—

"We solemnly pledge ourselves to remain united for the defence of democracy, for the disarmament and dissolution of the Facist Leagues to put our liberties out of reach of Facism. We surer. on this day which brings to life again the first victory of the Republic, to defend the democratic liberties conquered by the people of France, to give bread to the workers, work to the young and peace to humanity as a whole".*

ইহাই তখনকার ফ্রান্সের বিখ্যাত 'পপুলার ফ্রন্টের' জন্মকথা ও মর্মবাণী। শ্রমিক সম্প্রদায় ও সংবাদপত্রের অধিকার হইতে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোচীন পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁরা এক গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম স্থির করিলেন এবং ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা ৬১৮টি সদস্য পদের মধ্যে ৩৭৮টি দখল করিলেন। * ফরাসী পার্লামেন্টী নির্বাচনে এই প্রথম সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির জয়জয়কার হইল। কিন্তু যে সমস্ত বামপন্থী দল লইয়া পপুলার ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল, তাঁদের সকলেই আসলে বামপন্থী মতবাদ কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুসরণে প্রস্তুত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সোসিয়েলিস্ট (১৪৬ জন সদস্য), র‍্যাডিক্যাল (১১৬) এবং কমিউনিস্ট (৭২)। ইঁহারা ছাড়া মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলে ছিলেন বাকি সদস্যগণ—যাঁদের আবার র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, ডেমোক্রাটিক ইত্যাদি দল ও উপদলীয় বহু নামের জন্য বাহির হইতে সত্যকার পরিচয় পাওয়া কঠিন ছিল।

* The Fall of The French Republic — by D. N. Pritt K.C.

* ফ্রান্সের আইনসভা বা ন্যাশনাল আসেমব্লি দুটি পরিষদে বিভক্ত ছিল—উচ্চতর পরিষদের নাম সিনেট এবং নিম্নতর পরিষদের নাম ছিল চেম্বার অব ডেপুটিস—৪ বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত।

সর্বাধিক সোসিয়েলিস্ট দলের নেতা হিসাবে মঃ লিও ব্লুম পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ হইতে ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। কিন্তু মঃ থোরেজের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন না, তবে, সমর্থন ও সহযোগিতা জানাইলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, দলগত বিরোধ গোড়া হইতে স্পষ্ট ছিল।

তথাপি ১৯৩৬ সালের বসন্তকাল হইতে ফরাসী রাজনীতি নূতন মোড় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং পপুলার ফ্রন্ট উহারই বাহক ছিল। কিন্তু কলকারখানার দুর্গত শ্রমিকসাধারণ ইতিমধ্যে অধৈর্য হইয়া পড়িয়া-ছিল। সুতরাং নূতন সোসিয়েলিস্ট গভর্ণ-মেণ্ট যথোচিত শক্তিলাভের পূর্বেই জুন মাস হইতে ফ্রান্সের সর্বত্র কলকারখানায় ব্যাপক ধর্মঘট সুরু হইল। মঃ ব্লুমের নেতৃত্বে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আপোষ করিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণী প্রভূত জয়লাভ করিল। তাঁদের খাটুনির সময় নির্দিষ্ট হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা, বৎসরে বেতনসহ ১৪ দিনের ছুটি এবং শতকরা ১০ হইতে ১৫, কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি। মন্ত্রি-সভায় ও পার্লামেন্টে সম্মিলিত বামপন্থী দলের আধিপত্য এবং বাহিরে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মালিক-শ্রেণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতিস্বীকারে বাধ্য হইলেন। সুতরাং নিজেদের আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া ফ্রান্সের পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণী এই সময় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন পপুলার ফ্রন্টকে ভাঙিবার জন্য। ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট ও ধনিকের দল চক্রান্ত করিলেন এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। তাঁরা আবার লণ্ডনের ব্যাঙ্কার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট পাকাইলেন। সুতরাং ফ্রান্সে মুদ্রানীতি ও বাজেটের বিভ্রাট ঘটিল এবং মঃ ব্লুম ধনপতিদের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। ফ্রান্সের উচ্চতর পরিষদ বা সিনেটের গঠন 'প্রতিনিধি পরি-ষদের' মত ছিল না। সেখানে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী এবং র‍্যাডিক্যালদেরই আধিক্য ছিল। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে সিনেটের ভোটাধিক্যে ব্লুম মন্ত্রিসভা পরাজিত হন, (যদিও নিম্ন পরিষদে তখনও তাঁদের বিপুল মেজরিটি) এবং মঃ ব্লুম প্রতিরোধের ফলে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে র‍্যাডিকেল দলভুক্ত মঃ শোটা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কারদের সমর্থন লাভের চেষ্টায় দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকিলেন। ফলে, তিনি সোসিয়েলিস্টদের সমর্থন হারাইলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হইল। দুই সপ্তাহ ধরিয়া এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সঙ্কট চলিল এবং এই সময় ফ্রান্সে কোন "গভর্ণ-মেণ্ট" না থাকিয়া হিটলার তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী (আগের পর্বে 'সামরিক চক্রান্তের' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। আর ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবাদী, ফ্যাসিস্টতন্ত্রবাদী ও অন্যান্য রক্ষণশীলেরা প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিল। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র 'Cagoulard' (Horded Men) দল সৈন্যবাহিনী ও ধনিকদের সহায়তায় মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল।

* এই সময় ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ নূতন সঙ্কট হইতে ত্রাণ-লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বাম ও মধ্যপন্থীদের সহযোগিতায় মঃ ব্লুম আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তখন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনেও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব চলিয়াছে এবং ইতালী, জার্মানী ও স্পেনের ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির প্রতি তোষণনীতির পালা পুরাদমে চলিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক তোষণনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফ্রান্সও গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িল এবং মঃ ব্লুম আবার পদ-ত্যাগে বাধ্য হইলেন। দালাদিয়ের-এর রাজত্ব সুরু হইল এবং চেম্বারলেনের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিক সঙ্কট ও মিউনিক চুক্তির পালা আরম্ভ হইল। এই সময় ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টেরও শেষ সমাধি রচিত হইল এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখনও আর একবার শ্রমিক সাধারণের 'জেনারেল স্ট্রাইক' বা সার্বজনীন ধর্মঘট (১৯৩৮, ৩০শে নভেম্বর) আহ্বান করিয়া ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী শাসন অচল করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এজন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তাঁরা এই 'জেনারেল স্ট্রাইক' ভাঙিয়া দিলেন। ইহার পর ফ্রান্স দালাদিয়েরের নেতৃত্বে চলিল যুদ্ধের দিকে, কতকটা ইচ্ছায় কতকটা বা নিজের অজ্ঞাত-সারে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ, বামপন্থী দল রুষ্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জয়গর্বে উৎফুল্ল—আর সশস্ত্র ও দুর্ধর্ষ হিটলারী বাহিনী ইউরোপ দখলে অগ্রসরমান। এই পটভূমিকার মধ্যে পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর ১৯৪০ সালের বসন্তকাল আসিল, যখন মঃ রেনো নূতন মন্ত্রিসভার ভার গ্রহণ করিলেন।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এই সংক্ষিপ্ত চিত্র স্মরণে রাখিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার পতনের কারণগুলি সহজে বুঝা যাইবে। এখানকার রাজনৈতিক দল-গুলিকে মোটামুটি দক্ষিণ, বাম ও মধ্য—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিলেও একটি সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী এবং দৃঢ় নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা কাহারও ইতিহাসকেই গৌরবান্বিত মনে করা চলে না। কারণ, মূলতঃ কোন দলের সঙ্গেই অপরের আন্তরিক মিল ও যোগ ছিল না—একমাত্র রক্ষণশীলগণের শ্রেণীস্বার্থের রক্ষা পূরণের চেষ্টা ছাড়া। সুতরাং বহু দলে ও উপদলে ছত্রভঙ্গ ফরাসী রাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রিপাব্লিক রাষ্ট্র পত্তনের পর হইতে কোন

* পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৯১—১০০।

ফরাসী মন্ত্রিসভার আয়ু গড়পড়তা ৮ মাসের বেশী ছিল না এবং এই সময়ের মধ্যে মোট ১০৬ বার গভর্ণমেন্ট বা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। * সুতরাং ফরাসী রাজনৈতিক বিরোধের চেহারা সহজেই অনুমেয়।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্সের এই সঙ্কট ১৯৪০ সালের রণক্ষেত্রে সর্বনাশা মূর্তি লইয়া দেখা দিল এবং ইহার মূল যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের গভীর আবর্তের মধ্যে, তথাপি বাহির হইতে বিশ্লেষণে ইহার আরম্ভ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—১৯৩৫ সাল হইতে যখন ইউরোপীয় পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। মঃ লাভালের আমল হইতেই ফ্রান্সের আত্মরক্ষার রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সমাধি ঘটে। ইহার পূর্বে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মঃ বার্থো বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত সখ্যতা ও চুক্তি সম্পাদন করিয়া হিটলারী অগ্রগতির বিরুদ্ধে বেষ্টনীজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ যেমন Declasse ক্লেমেন্স এবং পয়েঁকার যদিও 'সেকেলে নীতি' অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৃটেনের চার্চিলের মত গভীর স্বদেশানুরাগের এবং সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার দিকটা শক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুক্ষণে লাভাল এই সনাতন নীতি ত্যাগ করিয়া একদিকে যেমন ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই আভ্যন্তরীণ জাতীয় শক্তি ও উপাদানগুলিকে দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। ইতালীর পক্ষপাতী লাভাল ফরাসী রাজনীতিতে মুসোলিনীর বিষ প্রবেশ করাইলেন. আবার মুসোলিনীর মারফৎ হিটলারের সহিত সেতুবন্ধ রচনা করিলেন। ১৯৩৬ সালে অবশ্যই পপুলার ফ্রন্টের দ্বারা বামপন্থীরা কিছুটা প্রাধান্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সোসিয়েলিস্ট নেতা মঃ ব্লুমের ভ্রান্ত শান্তিবাদ, যাহা বাস্তবতঃ দক্ষিণপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিল, তাহাই আবার বামপন্থীদের সম্মিলিত অভিযানেরও মৃত্যু ঘটাইল। এদিকে বৃটেনে চেম্বারলেন ইতালী ও জার্মানীকে খুসী করিতে গিয়া মিঃ ইডেনের মত রক্ষণশীল নেতাকে পর্যন্ত পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে অপসারিত করিলেন এবং বন্ধু লর্ড হ্যালিফাক্সকে সেই গদীতে বসাইলেন। ফ্রান্স ও বৃটেন বেশ পাল্লা দিয়া তোষণ নীতির দিকে ঝুঁকিলেন এবং লাভাল, ফ্লাঁদিন, বনেট, দালাদিয়েরের প্রভৃতি একে একে সমস্ত ফরাসী রাজনীতিকেই আত্মহত্যার পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। শান্তিবাদ, তোষণ নীতি ও পরাজিতের মনোভাব ফ্রান্সকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, যুদ্ধায়োজনে ও আত্মরক্ষায় যেমন বিভ্রাট ঘটিল, তেমনই বাম ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যেও সীমারেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় ফরাসী রাজনীতিতে তিন প্রকার প্রধান দলের যে অবস্থা দাঁড়াইল, এককথায় তাদের সকলকেই 'পরাজয়বাদী' বলা যাইতে পারে। যথা—(১) প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী যাঁরা ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে মিত্রতার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। (২) যাঁরা পুঁজিপতি ও ধনিকদের পক্ষ হইতে তোষণনীতির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। (৩) বামপন্থী দলগুলির মধ্যে গোঁড়া শান্তিবাদীগণ, যাঁরা যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছিলেন। যদিও এই দলগুলির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আদৌ মিল ছিল না, তথাপি ইহাদের সমষ্টিগত ফল গিয়া দাঁড়াইল ফ্রান্সের বিপর্যয়। প্রথম দল চাহিলেন ফ্যাসিজমের সহযোগিতায় রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া রাখিতে, সুতরাং যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের জন্য তাঁরা আকাঙ্খা বোধ করিলেন। দ্বিতীয় দল ধনতন্ত্রের নির্বিঘ্নতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য মারফৎ অবাধ শোষণ সুরক্ষিত করার জন্য বৈদেশিক নীতিতে শান্তির দিকে ঝুঁকিলেন এবং তৃতীয় দল গণতন্ত্র ও যুদ্ধ-বিরোধিতার বামপন্থী বুলি আওড়াইয়া শান্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী হইতে বামপন্থী পর্যন্ত তোষণবাদী ও পরাজয়বাদীদের একটি 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গড়িয়া উঠিল।* ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভা মিউনিক সঙ্কটে গিয়া পৌঁছিলেন এবং তারপর এই শোচনীয় অঙ্কের যেটুকু বাকি ছিল, তার যবনিকাপাত হইল রেনোর মন্ত্রিসভায়।

ফরাসী রাষ্ট্রের আসল মেরুদণ্ড ছিল র‍্যাডিক্যাল পার্টি, যেমন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেস। এই র‍্যাডিক্যাল পার্টি ফ্রান্সের একদিকে বণিক, ব্যাঙ্কার ও ধনিকদের এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রবাদী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলিয়া স্বীকার করিলেও দেখা যাইবে যে দক্ষিণপন্থীদের পাল্লায় পড়িয়া ইঁহারা যে কোন মূল্যে শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে সংবাদপত্রের ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত (এবং যাঁহারা ছিল ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক) প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণও আসল বিপদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির পর প্যারিসে প্রত্যাগত দালাদিয়েরকে প্রতি জনসাধারণ আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত অভিবাদন জানাইল এবং...

'the crowds almost threw themselves under the wheels of the Premiers car' *

অবশ্য বৃটেনেও চেম্বারলেন করতালিধ্বনি পাইয়াছিল, কিন্তু সেখানকার অবস্থা ফ্রান্সের মত এত ভয়াবহ ছিল না। অত্যাসন্ন যুদ্ধের মুখে ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই অপরের বনিবনা ছিল না এবং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কেবল বিতর্কের ঢেউ চলিতে লাগিল। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতবাদ অনুসারে হিটলারের জয়যাত্রার মধ্যে কিছু কিছু সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। ফলে, সমস্ত ফ্রান্সের পক্ষ হইতে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী নীতির দ্বারা যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিচালনা এবং সৈন্য ও জনসাধারণকে উদ্দীপনা যোগাইবার কেহ রহিল না। অর্থাৎ ইংলণ্ডে রক্ষণশীল চার্চিলের মত যেমন একজন সিংহপুরুষ দেখা দিয়াছিলেন, ফ্রান্সে তেমন কেহ ছিলেন না।

মিউনিক চুক্তির পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে 'শান্তিরক্ষার' জন্য একটি চুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ উহা শান্তির নাম করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও হিটলারের চিরন্তন ধাপ্পা নীতির কৌশল যেমন উহাতে ছিল, তেমনই ফরাসী ধনিক গোষ্ঠীর অগ্রণী 'দুইশত পরিবার' পিছন হইতে সমস্ত কলকাঠি নাড়িতেছিলেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৩৯-৪০'এর শীতকালে। তখন ফরাসী গভর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ৫০ হাজার সৈন্য পাঠাইবেন ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যের জন্য। অবশ্য বৃটেন এবং আমেরিকাও এই মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময় ফ্রান্সে যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের নাম করিয়া আভ্যন্তরীণ শাসনে পীড়ন নীতির অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অথচ আসল যুদ্ধের প্রশ্নে শাসক গোষ্ঠী মনে করিতে লাগিলেন যে, সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে বরং হিটলারের জয়লাভ শ্রেয়তর। তাঁরা পার্লামেন্টের বদলে জরুরী আইনের (আমাদের দেশের অর্ডিনান্সের মত) দ্বারা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ সালের বসন্তকালে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের যে সাধারণ নির্বাচন হইবার কথা ছিল, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালেই তাহা স্থগিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত হইল এবং রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের পর পররাষ্ট্র সচিব জর্জ বোনেটের মত ধূর্ত ও কৌশলী লোক কমিউনিস্ট পার্টিকে দমনের ব্যবস্থা পাকা করিলেন। দুইটি কমিউনিস্ট পত্রিকা হিউম্যানিটি ও [illegible] বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং স্বাধীন মতাবলম্বী সাংবাদিকগণ বন্দিত হইলেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তখন ফরাসী সমাজবাদী দল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন.

---

* Penguin Political Dictionary [illegible]

ফ্রান্স রুটেঁক [illegible]

---

* 'Battle for the World' — by Max Werner [illegible] Page [illegible]

পূর্বোল্লিখিত পুস্তক

তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। সাম্যবাদীগণের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও মিউনিসিপালিটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রো-হিটলার ও অ্যান্টিওয়ার—হিটলারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও যুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল।

যে যুদ্ধের অজুহাতে এই প্রকার পীড়ন নীতি আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধের আয়োজন কি প্রকার ছিল? প্রকৃতপক্ষে সমর সম্ভার উৎপাদনের জন্য 'industrial mobilization' বা শ্রমশিল্প সমাবেশ ঘটিল না। বরং রাজনৈতিক আবর্ত ও পীড়ন নীতির ফলে জনসাধারণ ও শ্রমিকগণ হতাশ হইয়া পড়িল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 'Renault' কারখানাগুলিতে যেখানে শান্তির সময়ে ৩০ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করিত, যুদ্ধের সময় সেখানে সংখ্যা দাঁড়াইল ৬ হইতে ৮ হাজারে।

কারখানাগুলিতে কাজ একেবারে বন্ধীভূত বা অচল হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ মুনাফাবাজী ও ফ্যাসিস্ট সাহায্য দান চলিতেছিল পুরা চালে। এমন কি ফ্রান্স হইতে গাড়ী ভর্তি লৌহ ধাতু লাক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীতে পর্যন্ত যাইতেছিল।* এই প্রকার দেশদ্রোহিতা কল্পনাতীত ছিল বটে, কিন্তু সেদিনের ফরাসী রাজনীতিতে ইহাও সস্তা ছিল।

সমাজের কোন স্তরেই আত্মবিশ্বাস, বলিষ্ঠতা ও শত্রু প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প ছিল না। এমন কি বামপন্থী দলগুলিও এই দিক দিয়া নির্দোষ ছিলেন না এবং তাঁদের অচেতন সোভিয়েট-বিদ্বেষী ও সোভিয়েট পক্ষপাতী, উভয়েরই সমালোচনায় স্খলন হইয়াছিল। যে অদ্ভুত, জটিল ও শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার জন্য দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থী—প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই দায়ী ছিলেন। তবে, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাঁরা সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় ফ্রান্সের এই অধঃপতনে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু শান্তিরক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহ এবং সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার' সিদ্ধান্ত (বিশেষতঃ ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান চুক্তির প্রতিক্রিয়া) পৃথিবীর সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টি মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, বৃটেন এবং আমেরিকাও ইহা হইতে বাদ গেল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কূটচক্রটিকা আরও গভীর ছিল এই কারণে যে, ইহা বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল। তবে, ১৯৩৯-৪০ সালের আন্তর্জাতিক সঙ্কটে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব মোটামুটি এই প্রকার ছিল—

"This is not our war — this battle between two gangster groups — the British French and the Hitlerite. Let us keep out of it".

—১৯৪০ সালের ১২ই মে, মার্কিণ কমিউনিস্ট পত্রিকা 'ডেইলি ওয়ার্কারের' মন্তব্য।*

১৯৪২ সালের রিয়ম মামলার শুনানীর সময় মন্ত্রি দপ্তর, কারখানার মালিক এবং শ্রমিক ও কমিউনিস্টদের সহিত সম্বন্ধ ও বিরোধের বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তখন আদালতে দালালদিগের স্বীকার করিয়াছিলেন যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ফরাসী সেনাপতিরা স্থির করিয়াছিলেন যান্ত্রিক যুদ্ধ কোন কাজে আসিবে না। সুতরাং অর্থসচিবের দপ্তর এই সম্পর্কে ব্যয় মঞ্জুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিমান সচিবের দপ্তর অভিযোগ করেন যে কমিউনিস্টরা কারখানায় বিমান উৎপাদনে বাধা দিতেছিল, আর দালালদিগের বলেন যে, বিমান কারখানা 'জাতীয় সম্পত্তিতে' পরিণত করার দুর্বুদ্ধি প্রমাণের জন্য মালিকেরাই উৎপাদনে বিভ্রাট ঘটান এবং স্যাবোটাজের চক্রান্ত করেন। ফলে ট্যাঙ্ক বা বিমানবহর ফরাসী বাহিনীর কিছুই ছিল না।+

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সালে ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষের কথা উল্লেখ করিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে যখন জার্মানীর কারখানাগুলি দিনরাত সমর সম্ভার উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল, তখন ফ্রান্সে আরম্ভ হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা খাটুনি, আর বিমান কারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার মারাত্মক পরীক্ষা এবং ধর্মঘটের জন্য ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের সমস্ত কলকারখানাই এক সময় অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল।*

সোভিয়েট পক্ষপাতী ম্যাক্স ওয়ার্নার লিখিয়াছেন যে সোসিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্ট এবং র‍্যাডিক্যাল পার্টির বামপন্থিগণ গোড়াতে হিটলার-বিরোধী ও মিউনিক চুক্তির একান্ত বিরোধী ছিলেন। প্রতিরোধের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তির পর ইহার পরিবর্তন ঘটিল এবং সাম্যবাদী দলও কার্যতঃ পরাজয়বাদী ও তোষণবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। আর দক্ষিণপন্থীরা সেই সুযোগে সর্বহারা শ্রেণী ও বামপন্থী দলের উপর সর্বপ্রকার আক্রোশ মিটাইবার সুযোগ পাইলেন।+

আর ইংলণ্ডে তো ১৯৩৯ সালের অকটোবর হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্যবাদ অনুরাগীদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক আরম্ভ হইল। সাম্যবাদীগণ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন তফাৎ দেখিতে পাইলেন না। তাঁরা প্রতিদিন শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে এই যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর কোন স্বার্থ নাই। হিটলারের চেয়েও তাদের আসল শত্রু বলিয়া প্রচারিত হইল বৃটিশ ধনিকতন্ত্র এবং উহার সমগোত্রী ফরাসী পুঁজিবাদীগণ। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির উপর অত্যাচার ও পীড়ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিরোধিতার নীতি, আচরণ ও কার্যই সেই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ফরাসী শাসক গোষ্ঠীর অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।*

তথাপি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এই ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং রণক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি এক উদ্দীপনাময় ইস্তাহার ও বিবৃতি ফ্রান্সের সর্বত্র প্রচার করিলেন। এই ইস্তাহারে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের কারণগুলি এবং শাসক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

"The ruling class has brought our country to the brink of the precipice. To-day, when German imperialism is putting into practice its plan of enslaving France, all that the French rulers are concerned with is to save their privileges, their capital, their class domination. They are ready to sacrifice the independence of our country.... their regime is one of organized treachery towards our nation....As ever, under all conditions so in present days of severe trials, horror, and bound-

* The Fall of The French Republic — by D. N. Pritt page 125-31.

* The Great Challenge' by Louis Fischer, page 8

+ দুর্দশাগ্রস্ত পশ্চাদপসরণ—পৃঃ ১৪

* From Dunkirk to Benghazi — by Strategicus P. 12

* Battle For the World P. 138

* The Betrayal of the Left — edited by Victor Gallancy Page— 50—60.

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২০৭৪

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

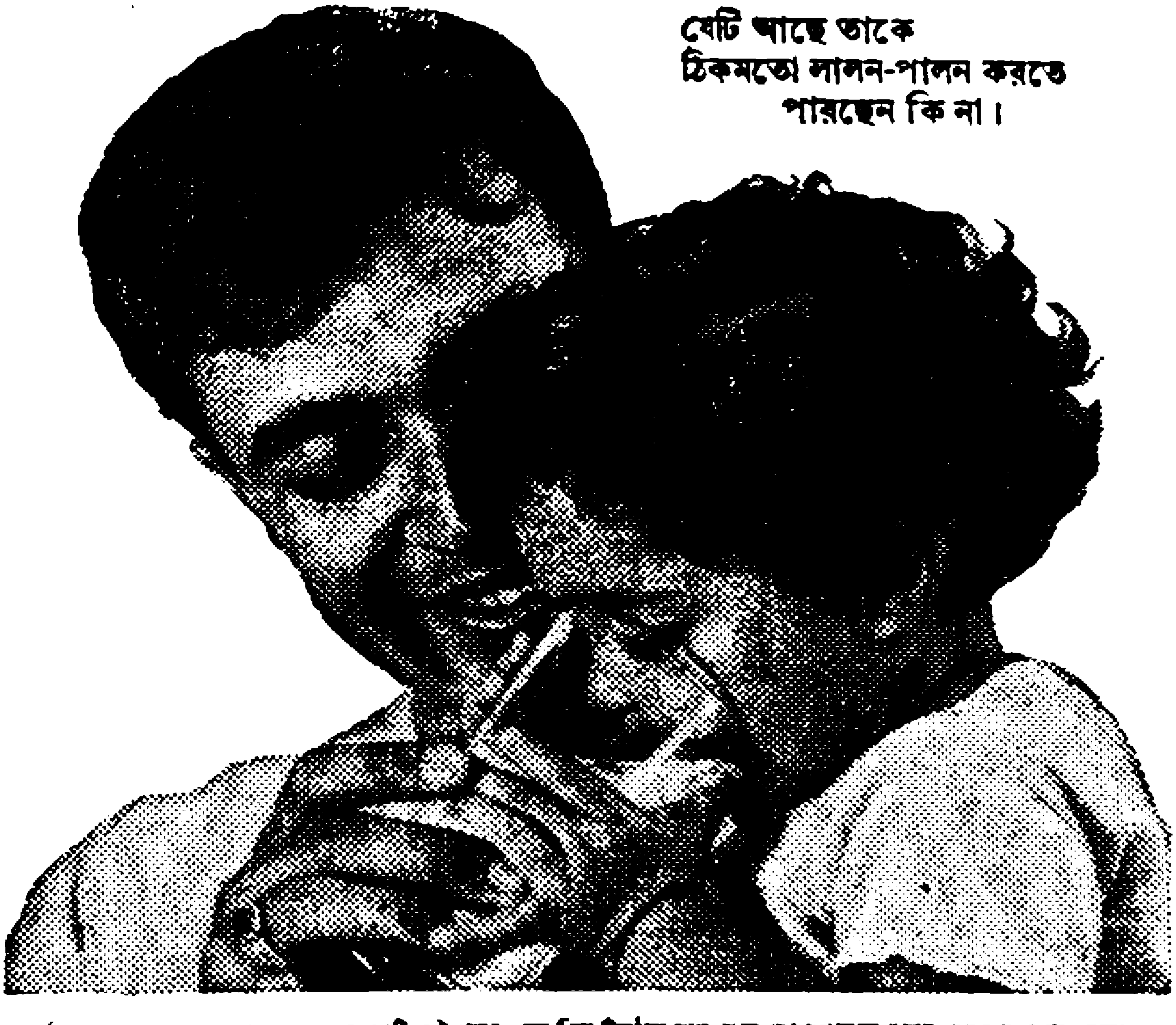

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রবারের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে মাত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

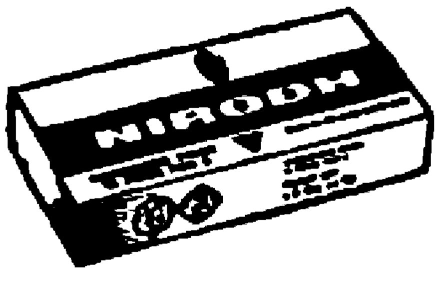

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,

davp 78/580

less calamities we Communists have been and remain with our people. Their fate is our fate. Our people will not perish".*

ইহার পর প্রধানত: ফরাসী সাম্যবাদীগণের চেষ্টাতেই পরবর্তী ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁদের আচরণ পূর্বাপর বুদ্ধিসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না; বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে ফরাসী সাম্যবাদীগণের নিন্দাবাদ আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না। দালাদিয়েরের পর ১৯৪০-এর বসন্তকালে রেনো মন্ত্রিসভাও অকর্মণ্যতার বহন হইয়া পড়িয়াছিল। আর নাৎসী পক্ষপাতী দল মার্শাল পেতাঁ ও জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে প্রাধান্য অর্জন করিয়া ফ্রান্সকে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। Helene de Portes নাম্নী একটি ব্যক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোক ছিল রেনোর রক্ষিতা। এই স্ত্রীলোকটি মার্সাই হইতে প্যারিসের অভিজাত মহলে আসিয়াছিল জার্মানীর গুপ্তচর বৃত্তি লইয়া এবং নাৎসী স্পাই জাবেৎসির আড়কাঠি স্বরূপ ছিল এই স্ত্রীলোকটি। মাদাম ডি পোর্ট প্রধানমন্ত্রী রেনোর উপর মারাত্মক বিস্তার করিল এবং হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিল। বহু দেশের ঐতিহাসিক দুর্দিনে কোন স্ত্রীলোকের অশুভ হস্তের প্রভাব দেখা যায় (যেই সময়কার ইংল্যাণ্ডে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার এবং রুমানিয়ার রাজা ক্যারলও দুর্দান্ত ষড়যন্ত্রকারিণী মহিলাদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তবে, হিটলারের উপর নারীর প্রভাব বিস্তারের কোন নজীর নাই) ফ্রান্সেও ইহার অভাব ছিল না। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে পল রেনো শনি ও রাহুর মিলনের মত ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে উদয় হয়।*

আর একটি বিস্ময়কর দেখা যায় যে, মাদাম দ্য পোর্ট প্রধানমন্ত্রী রেনোর শুধু একজন বান্ধবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সংগে রেনোর ঘনিষ্ঠতা এমন পর্যায়ে উঠিল এবং প্যারিসের মার্কিণ দূতাবাসের ডিনার টেবিলে রেনোর সঙ্গে এই দুই মহিলাকে নিয়া সময় সময় অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা দিত। মাদাম ডি পোর্ট হিটলার ও ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিলেন এবং রেনোর মন্ত্রিসভার পতনের পর তাঁরাই আগিয়ে রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

* The Fall of the French republic — Page 159-62.

* Truth on the Tregedy of France —by Elie J. Bois P. [illegible]

ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (রেনো মহিলাকে সঙ্গে নিয়া স্ত্রীকে নয়!) এবং একটি গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া ওয়াশিংটন যাত্রার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া স্পেনীয় সীমান্তে আসিয়া হাজির হইলেন। মোটর গাড়ী চালাইতে ছিলেন মাদাম নিজে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের আর ওয়াশিংটন যাওয়া হইল না, কারণ, হঠাৎ একটি গাছের সংগে ধাক্কা খাওয়ার পথে যে দুর্ঘটনা ঘটিল তার ফলে মাদাম মারা গেলেন এবং মিঃ রেনো গুরুতর আহত হইলেন।

সেই সময় ফ্রান্সের নৈতিক আবহাওয়া যে কলুষিত ছিল, তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে মার্শাল পেতাঁ মাদ্রিদে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে ছিলেন। তখন ফ্রান্সের পতনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইয়া পেতাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে প্যারিসে ফিরিয়া গিয়া এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রকাশ যে, মার্শাল পেতাঁ তখন জবাব দেন:

'What would I do in Paris? I have no mistress'!

আমি প্যারিসে গিয়ে কি করবো? আমার তো রক্ষিতা নেই!'

বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ রবার্ট মারফি তাঁর পুস্তকে ('Diplomat Among Warriors') এই সমস্ত ঘটনার কথা কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে ফরাসী গভর্ণমেন্টের নেতাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইতেন এবং জার্মান ও রুশ গুপ্তচরেরা তার সুযোগ নিতেন।...

বৃটেনের সংকটের কারণ

ফ্রান্সের যখন এই অবস্থা তখন বৃটেনের চিত্র খুব উজ্জ্বল ছিল না। তবে, চার্চিল ও চার্চিল এবং বিভারব্রুক (সেই বিলাতের অন্যতম) ইংলণ্ড দ্বীপকে রক্ষা করিল। কিন্তু চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনও দ্রুত চরম অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তবে লেবারদের সাহায্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চার্চিল ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (উপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড উপদেষ্টা নহে) মধ্যে প্রতিযোগিতা ঐক্য ছিল বলিয়া চেম্বারলেন যুদ্ধের পরাজয়ের পর বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও ইউরোপীয় তোষণ নীতির প্রধান নায়ক এবং উদ্যোক্তাই ছিলেন তিনি। ফ্যাসিস্ট ও বামপন্থী মতবাদের উন্মাদনায় বৃটেন ফ্রান্সের মত সর্বথা বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং ফ্যাসিস্ট মতবাদের উদ্যোক্তা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইল—২৩শে মে, ১৯৪০ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ অতান্ত্রিক শ্রেণী-আধিপত্যের চেষ্টা সেখানেও পুরোপুরি বজায় রহিল। অবশ্য প্রকাশ্যে রাজনীতিকে আমাদের দেওয়া হয়ন

নাৎ আর সামরিক সম্ভাবনে বৃটেন চিরন্তন রক্ষণশীলতা ও সাম্রাজ্যনীতির অনুসরণ করিল, যাহার ফলে ১৯৪০-এর পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা কোন মতে সমুদ্র সাঁতরাইয়া বাঁচিয়া আসিল।

বৃটেনের সনাতন রণচিন্তা ৩টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নৌবহর ও সমুদ্র পথ—কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সংগ্রাম, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও সাম্রাজ্য রক্ষা এবং ইউরোপীয় ভূভাগে সীমাবদ্ধ সংগ্রাম। সুতরাং বৃটেনের খাস স্থলসেনাকে অভিযাত্রী বাহিনী মাত্র বলা যায়। মূলতঃ বৃটেনের সামরিক মতবাদও আত্মরক্ষামূলক ছিল। কারণ, অর্ধ পৃথিবী ব্যাপ্ত এত বড় সাম্রাজ্যের পর তাহার আর নতুন রাজ্য ও কাঁচামাল দখলের প্রয়োজন ছিল না। বরং এগুলিকে রক্ষা করিয়া চলাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তাহার রণনীতিতে নৌবহর ও সমুদ্রপথের সংগ্রাম বড় হইয়া উঠিল।

ফ্রান্সের মত বৃটেনও ১৯১৪-১৮ সালের সামরিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিল। ফলে, ইউরোপীয় ভূভাগের যুদ্ধকে বাদ দিয়া দ্বীপ ও সাম্রাজ্য রক্ষার মনোবৃত্তি বৃটেনকেও রণক্ষেত্রের সংকটের দিকে লইয়া গেল। সাম্রাজ্যের এবং মিত্র সদস্যদের লোকবল ও সামরিক বলের উপর নির্ভরতাও তার রক্ষণশীল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিল। এখানেও তার তোষণনীতির সূক্ষ্ম কৌশল অনুসরণের চেষ্টা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। ফলে বৃটেনের দুর্বল স্থল সৈন্য এবং উপযুক্ত ট্যাঙ্ক ও গোলা-গুলীর অভাবকে ইউরোপ হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিল। আত্মরক্ষামূলক রণনীতির প্রধান সমর্থক ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের মতামতও বৃটিশ রণচিন্তার উপর প্রভূত প্রভাব খাটাইয়াছিল। কিন্তু লীডেল হার্ট আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং বৃটিশ আর্মিকে সেভাবে গড়িয়া তুলিবারও পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং 'কেবল আত্মরক্ষা বা dynamic defence' এর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—এই যুদ্ধের অনড় অচল যুদ্ধের নহে। বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মৈত্রী না করিয়া তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধযাত্রার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রণনীতি ও রাজনীতি, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতা বৃটেনকেও ভেতরের বিপাকে ফেলিল। ইউরোপীয় ভূমিখণ্ডের যুদ্ধের গুরুত্ব এবং রাইন নদীর তীর পর্যন্ত বৃটেনের আত্মরক্ষার সীমা—এই প্রচলিত তত্ত্বও উপেক্ষিত হইল। সুতরাং পরাজয় অনিবার্য ছিল।

[illegible] (ক্রমশঃ)

খাঁচা

নির্মলেন্দু গৌতম

অমলের মনের মধ্যে এতোদিন যে ভয়ের কথাটা ছিলো অনেক আগে সেই কথাটাই বললো, কৃষ্ণা। সেই মুহূর্তে তার ঘামে ভেজা মুখে অসম্ভব ভয়ের চিহ্ন দেখলো অমল।

কথাটা কৃষ্ণার মুখে শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অমলের সমস্ত শরীর এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলো ভয়ার্ত অনুভবে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠলো। শুকিয়ে উঠলো গলার ভেতরটা। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে বিস্ফারিত চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমিও এ কথাটা তোমাকে বলবো ভাবছিলুম।'...যদি সত্যিই তাই হয়।'

কৃষ্ণা বোধহয় ভেতরে ভেতরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। ভাঙা গলায় বললো, 'তাহলে কি করবো বলোতো!'

'কিছু করবার নেই।' বিষণ্ণ গলায় বললো অমল।

অমল এবার কিছুটা উঁচু হয়ে কৃষ্ণার শরীরের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুঁকে ওদিকে শুয়ে থাকা খোকাকে দেখলো। মুখের মধ্যে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ভ'রে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে খোকা। এতোক্ষণ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে ডুবে ছিলো। মনে হচ্ছে কৃষ্ণার শরীরের উত্তাপ এখনো খোকার শরীর ছুঁয়ে আছে। অসম্ভব কষ্টে বুকের ভেতরটা ব্যথা করতে থাকলো অমলের।

কৃষ্ণা ফের ভাঙা গলায় বললো, 'তোমার এক বন্ধু তো বিলেত থেকে ঘুরে এলো। চলো না একদিন তার কাছ থেকে ঘুরে আসি। ...ওর ঠিকানা নিশ্চয়ই তোমার নোটবুকে লেখা আছে।' একটুখানি আশ্রয় পেতে চাইলো কৃষ্ণা।

'তার ঠিকানা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি।'

'একবার খুঁজেই দেখো না নোটবুকটাতে।' কৃষ্ণা অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে অমলকে।

'ঠিক আছে, সকালবেলা খুঁজে দেখবো।'

অনেকটা সময় নিঃশব্দ থেকে কৃষ্ণা অসহায়ভাবে বললো, 'কিছু একটা করবার কি নেই, নিশ্চয়ই আছে।'

কিন্তু অমল জানে কিছু করবার নেই। খোকা কিছুতেই কথা বলতে পারবে না। অনেকদিন আগেই অমল খোকার ভাবভঙ্গি দেখে অনুভব করেছে ব্যাপারটা। কৃষ্ণাও নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছে। কারণ কৃষ্ণার কাছেই তো খোকা সবসময় থাকে। অমল অফিস, আড্ডা সব সেরে খুব কম সময়ই খোকাকে কাছে পায়।

খোকা বোবা হবে, কোনোদিন কথা বলতে পারবে না, কথাটা এমন ভয়াবহ একটা সত্যি কথা যে, এ কথাটা দু'জনের কেউ-ই পরস্পরকে বলবার মতো সাহস পায়নি। অমল জানে, সাহস পাওয়াও যায় না। যতো-ক্ষণ নিজেকে নিজের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখা সম্ভব ছিলো, ততোক্ষণ তা করেছে তারা। আজকে কৃষ্ণা নিশ্চয়ই নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারেনি নিজের কাছে।

খোকাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দীর্ঘসময় অস্বাভাবিকভাবে নিঃশব্দ ছিলো। অমলও ঘুমোতে পারেনি। কৃষ্ণা যে কিছু একটা গভীরভাবে ভাবছিলো তা বুঝতে পেরেছিলো অমল। বুঝতে পেরে-ছিলো বলেই অমল ঘুমোয়নি।

কৃষ্ণা বুকের ভেতর তার দীর্ঘ সময়ের কান্নাটাকে এবার আর ধরে রাখতে পারলো না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো দু'চোখ বাঁ হাতের পাতায় ঢেকে। তবু চোখের জলে কৃষ্ণার চিবুক ভেসে যেতে দেখলো অমল।

কি করবে অমল ভেবে পেলো না। কর-বার কি-ই বা আছে। কৃষ্ণার এই চোখের জল ক্রমশঃ সমুদ্র হয়ে যাবে। কৃষ্ণা সেই সমুদ্রে ভেসে যাবে অসহায়ভাবে। অমল বুকের ভেতরে এবার যেন তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলো।

তবু কৃষ্ণাকে অসম্ভব সাবধানে ছুঁয়ে অমল মৃদুস্বরে বললো, 'কাল সুজয়ের কাছে যাবো। আমরা যা ভাবছি তা নাও তো হতে পারে। সুজয় ডাক্তার হিসেবে খুব ভালো। ও নিশ্চয়ই কিছু একটা করে দিতে পারবে।'

কৃষ্ণা তবুও তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে পারলো না।

অমল ফের বললো, 'খোকা কোনোদিন কথা বলতে পারবে না ভাবলে তোমার মতো আমারও কাঁদতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণা। কিন্তু—'

কিন্তু কি বলবে অমল! নিঃশব্দে কেবল কৃষ্ণার চিবুক ছুঁয়ে জলের ধারার উষ্ণতাটুকু অনুভব করলো।

কৃষ্ণা পাশ ফিরে এবার ঘুমন্ত খোকাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

অমল আর কৃষ্ণাকে ছুঁলো না, কিছু বললোও না। মাথার সামনে ছোটো টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা নিয়ে একটা সিগা-রেট ধরালো। কম পাওয়ারের নীল আলোয় যন্ত্রণা উপচে উঠছে ঘরের মধ্যে। খোকা কোনদিন কথা বলতে পারবে না, কৃষ্ণার নিজের চোখের জলের সমুদ্রে নিজেই অসহায়ভাবে ভেসে চলে যাবে—এ ভাবনা অমলের বুকে যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে। অমল জানে, এ যন্ত্রণা থেকে আর মুক্তি নেই তার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে গেলো। খোকাকে বুকের মধ্যে নিয়েই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে কৃষ্ণা। মাঝে মাঝে কৃষ্ণা কান্নায় কেঁপে উঠছে। কী করুণ, কী অস-হায় দেখাচ্ছে কৃষ্ণাকে।

অমল এই প্রথম নির্ঘুম একটা রাত্রি ফুরিয়ে ফেললো। সাক্ষী হয়ে রইলো কেবল অ্যাসট্রের ভেতরে জমে থাকা একরাশ সিগারেটের টুকরো।

সকাল বেলা বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রথমেই পুরোনো ডায়েরীখানা খুঁজে বের করলো অমল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালো। সকালের আলোয়, বাতাসে রাত্রির ক্লান্তিটুকু অমলের শরীর থেকে মুছে গেল খানিকটা। এগিয়ে এসে খাঁচায় ঝোলানো কৃষ্ণার আদরের টিয়েটার কাছে দাঁড়ালো। সকালের আলোয় তার পালক-গুলো অসম্ভব সবুজ দেখাচ্ছে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না খাঁচার পাশে। একটা চেয়ার টেনে ব'সে পুরোনো ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টে দেখতে শুরু করলো অমল। তিনশো পঁয়ষট্টিটা পাতার কোথায় যে লেখা আছে ঠিকানাটা, তা এখন আর মনে নেই। কাজেই প্রথম থেকেই খুঁজে দেখতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতেই অনুভব করলো, কৃষ্ণা ঘুম থেকে উঠে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণার দিকে না তাকিয়েই অমল বললো, 'ঘুম ভাঙলো?'

'হুঁ।'

'খোকা জেগেছে?'

'না।'

'তুমি আরেকটু ঘুমোলে পারতে। রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি তেমন।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না। তুমি ঠিকানা পেলে?'

'খুঁজছি। পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই।'

ব'লে অমল কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালো। গতকালের কান্নার চিহ্ন কৃষ্ণার চোখে মুখে। অসম্ভব বিষণ্ণ চেহারায় একটি ছোট্ট মেয়ের মতো দেখাচ্ছে কৃষ্ণাকে। এখনি কৃষ্ণাকে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে আস্তে আস্তে তার বিষণ্ণতাকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে হলো অমলের। কিন্তু কিছুতেই তা যাবে না। অমল দুর্বলভাবে ফের মুখ ফিরিয়ে ডায়েরীর পাতা উল্টে সুজয়ের ঠিকানা খুঁজতে থাকলো।

কৃষ্ণা ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'তোমার বোধহয় চা দরকার এখন। একটু অপেক্ষা করো চা করছি।'

অমল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই বললো, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

নিঃশব্দে চলে গেল কৃষ্ণা।

ঠিকানা পেলে আজকেই সুজয়ের কাছে যাবে অমল। সব কাজ ফেলে আগে খোকাকে দেখবার কথা বলবে। সুজয় ভারি ভালো ডাক্তার। নিশ্চয়ই সে খোকার ভেতরের অসুবিধেটাকে ধরতে পারবে। একটা চেষ্টাও নিশ্চয়ই করতে পারবে সুজয়।

খুঁজতে খুঁজতে পাতা ফুরোলো কিন্তু সুজয়ের ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বোধহয় চোখ এড়িয়ে গেছে। ফের নতুন করে পাতা ওল্টাতে থাকলো অমল।

চা নিয়ে এলো কৃষ্ণা। বললো, 'খুঁজে পেলে?'

'পাইনি। দেখছি আবার।'

'ঠিকানাটা সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়নি তো?'

'কি জানি!'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালো অমল। আবার বোধহয় কান্না সুরু হবে কৃষ্ণার। কৃষ্ণার দীর্ঘ চোখের পাতায় গত রাত্রির ক্লান্তি জমে আছে। অমল অনুভব করতে পারছে, এই ক্লান্তি আর মুছে যাবার নয়! অমল দীর্ঘ করে একটা নিঃশ্বাস নিলো।

বারান্দায় একটুকরো রোদ্র এসে পড়েছে। সারারাত জাগবার জন্য কেমন কর্কশ মনে হচ্ছে সকালের রোদ্র। রোদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরালো অমল। আস্তে আস্তে শব্দ করছে টিয়েটা। বোধহয় রোদ্র দেখেই। অমল চোখ তুলে একবার টিয়েটাকে দেখলো।

কৃষ্ণা ডায়েরীর ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, 'এই ডায়েরীতেই তো ঠিকানা লিখেছিলে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে খুঁজে পাবেই।' কৃষ্ণা আশ্রয়টাকে হারাতে চায় না কিছুতেই।

ঘরে খোকা কেঁদে উঠেছে। ঘুম ভাঙলো খোকার। কৃষ্ণা দ্রুতপায়ে চলে গেল।

ফের ডায়েরীতে মন দিলো অমল।

কিন্তু কোথাও সুজয়ের ঠিকানা লেখা নেই। প্রত্যেকটি পাতায় প্রত্যেকটি লাইন পড়ে ফেললো অমল। শেষে মনে হলো, কার্ড ছিলো না বলে টুকরো একটা কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলো সুজয়। সে টুকরোটা ডায়েরীর মধ্যে রেখেছিলো। যথারীতি হারিয়ে গেছে একসময়।

খোকাকে ভুলে চোখ মুখ ধুইয়ে এসে ঠিকানা খুঁজে না পাবার কথা শুনে কৃষ্ণা ক্লান্ত গলায় বললো, 'তাহলে কি হবে?'

'প্রিয়ব্রত, আশিস ওরা জানতে পারে। ওদের কাছে আজ টেলিফোন করবো।'

'ওরাও তো তোমার মতোই সুজয়ের ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলতে পারে।'

এক মুহূর্ত ভাবলো অমল। তারপর খুব সহজ গলায় বললো, 'হারিয়ে ফেললেও যে করে হোক সুজয়ের ঠিকানা আমি খুঁজে বের করবো। তাছাড়া এখনে ভালো ডাক্তারের তো আর অভাব নেই।'

একটু যেন আশ্বস্ত হলো কৃষ্ণা। তারপর খোকাকে নিয়ে চলে গেলো ভেতরে।

অমল একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আশিস এবং অন্যান্য বন্ধুদের কেউই সুজয়ের ঠিকানা বলতে পারলো না। টেলি-ফোন গাইড খুলেও সুজয়ের নাম খুঁজে পেলো না অমল। আপিসে সারাক্ষণ যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে রইলো। কেবল কৃষ্ণার অসহায় মুখ মনে পড়লো অমলের। খোকার নিষ্পাপ সুন্দর মুখখানায় দারুণ একটা অভিশাপের ছায়া দেখলো। সমস্ত সুখের দিকে নিরেট একটা দেয়াল গড়ে উঠছে, অমল বুঝতে পারলো। সে দেয়াল কোনো-দিন ভাঙতে পারবে না অমল।

খোকা কোনোদিন কথা বলতে পারবে না। অমলের মনে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ কিছুদিন থেকেই অমল লক্ষ্য করছে, খোকার ভাবভঙ্গি। এ বয়সের ছেলে এখন অনেক শক্ত কথা পর্যন্ত বলতে পারে। হাসিতে, উচ্ছ্বাসে সমস্ত সংসারটাকে আলোর মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে।

কৃষ্ণা কেবল বলতো, 'অনেকেই তো দেরীতে কথা বলে, আমাদের খোকাও তাই বলবে।' অনেক উদাহরণও দিতো কৃষ্ণা। অমল জানতো সে সব কৃষ্ণার কেবল নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়া। যতোক্ষণ প্রত্যাশাটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, ততোক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অমলের মনে হলো, সুজয়কে না পেয়ে ভালোই হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই সুজয় কোনো উপায় খুঁজে পেতো না। কৃষ্ণার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু করবার নেই বলতে গিয়ে [illegible] মুসলেমানদের মতো অসহায় হয়ে যেতো। সুজয়ও কৃষ্ণার দুঃখের ভারে নুয়ে থাকতো সারাজীবন। অমল কিছুতেই যেন তা হতে দিতে চায় না।

আপিস ছুটি হতেই নিঃসঙ্গের মতো বাসস্টপে এসে দাঁড়ালো অমল, এবং প্রথমে যে বাস এলো, দারুণ ভীড় সত্ত্বেও সেই বাসে উঠেই ফিরলো বাড়িতে।

দরজা খুলে কৃষ্ণা সাগ্রহে শুধোলো, 'সুজয়বাবুর ঠিকানা পেয়েছো?'

'না।'

'তাহলে?' কৃষ্ণা যেন ভেঙে পড়লো।

'আমরা অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাবো।'

'তাহলে আজই চলো।'

এক মুহূর্ত কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে অমল বললো, 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

আপিসের জামা-কাপড় পালটে খোকাকে কাছে নিয়ে বসলো অমল। কৃষ্ণা স্টোভ জ্বালিয়ে তার জন্য চায়ের জল চাপিয়ে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বসলো।

খোকার মুখের দিকে তাকালো অমল। আস্তে আস্তে কথা বললো। খোকাও কিছু বলতে চাইলো। দুর্বোধ্য শব্দ করলো কেবল। হাতটা খোকার পিছনে নিয়ে দু' আঙুলে শব্দ করলো অমল। খোকা পেছন ফিরলো না। দু' আঙুলে বাজানো শব্দ সে শুনতেই পায়নি।

খোকার কানের কাছে চীৎকার করে 'খোকা' বলে ডাকতে ইচ্ছে হলো অমলের। প্রচণ্ড চীৎকারে বাড়ি-ঘর দুলে উঠবে, আকাশ পর্যন্ত পৌঁছুবে সেই চীৎকার। সে চীৎকারে নিশ্চয়ই কথা বলে উঠবে খোকা। কিন্তু ইচ্ছে হলেও ডাকতে পারলো না অমল। কেবল অসহায় অনুভবে খোকাকে শক্ত করে ধরে থাকলো।

ডাক্তার স্পষ্ট করে কিছু বললেন না। কিন্তু অমল বুঝতে পারলো তাদের ভয়ের কথাটাই প্রচ্ছন্নভাবে বললেন ডাক্তার। কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়েই স্পষ্ট কথাটাকে ডাক্তার এড়িয়ে গেলেন।'

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে উঠে কৃষ্ণা কান্নায় ডুবিয়ে যাওয়া গলায় বললো, 'আমি জানি সত্যিই খোকা কোনোদিন কথা বলতে পারবে না। ডাক্তার স্পষ্ট করে আমায় কথাটা বললেন না।'

মাথা নীচু করে নিস্তরঙ্গ গলায় অমল বললো, 'সত্যি আমরা ভারি অসহায় কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো।

সেই কান্নাই সারারাত ধরে তরঙ্গিত হলো কৃষ্ণার মধ্যে। নিঃশব্দে কৃষ্ণার পাশে শুয়ে [illegible] বিনিদ্র রাত্রি কাটালো অমল।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই অমল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তারপর কি ভেবে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো পাখির খাঁচার পাশে। কৃষ্ণার আদরের পাখি। পাখিটা খাঁচার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অমল তাকে দেখতে থাকলো।

হঠাৎ দাঁড়ালো পাখিটা। এবার দেখলো অমলকে। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললো, 'খোকা।'

হ্যাঁ, 'খোকা'ই বলেছে টিয়ে পাখিটা। চমকে উঠলো অমল। টিয়েটা বোধহয় এই প্রথম কথা বললো। অমল ঝুঁকে পড়লো খাঁচার ওপর। বিস্ফারিত চোখে তাকালো টিয়েটার দিকে।

খোকার কথা ভাবলো অমল। হঠাৎ কার ওপর যেন প্রবল ক্রোধে এবার উন্মত্ত হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। কি করবে ঠিক ভেবে পেলো না। খাঁচার দরজা খুলে হাত ঢুকিয়ে পাগলের মতো টিয়েটার গলা শক্ত মুঠোয় ধরতে চেষ্টা করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে খোকার নির্বোধ কণ্ঠস্বর শুনে ফিরেই দেখলো, অবাক হয়ে খোকাকে নিয়ে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে খাঁচাটা বন্ধ করে ফেললো অমল।

'কি করছো!' অবাক হয়ে কৃষ্ণা শুধালো।

'কিছু না।' সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল অমলের।

নির্নিমেষে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অমল।

'জানো কৃষ্ণা, ও কথা বলতে শিখেছে। এইমাত্র ও খোকার নাম বললো।'

ম্লানভাবে হাসলো কৃষ্ণা।

অমল খুব কাছে এলো কৃষ্ণার। প্রবল একটা কান্নাকে বুকে নিয়ে ফের সেই একটা কথাই বললো, 'সত্যি, আমরা ভারি অসহায় কৃষ্ণা।'

এইচ. এম. ভি

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রি করা হয়।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৮০

নতুন পথে

আমরা সাজি হুজুগে গা ভাসাই। প্রথা মতো আমরা সংস্কারকে মান্য করে চলি। চলতি নিয়মের বাঁধা পথ থেকে সামান্যতম একটু রাই করে নিতে চাইলেই চমকে ওঠা আমাদের অভ্যাস। চমকের প্রথম ঘোরটা কেটে গেলেই এবার আসে প্রতিরোধ-চিন্তা। প্রাণপণে তাকে সমূলে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে কেউ কেউ গোপনে তাকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে। অজানার প্রতি মোহগ্রস্ততা এবং আস্বাদন-পরিচয়ের গভীর আগ্রহ থেকেই এটা ঘটে। প্রথম পরিচয়েই তার সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। এইভাবে দুঃসাহসিক আস্বাদনকারীদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। প্রতিরোধের দুর্গও দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর একদিন দেখা যায় যে, সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে সে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে দিব্যি নিজের চলার সোজা সড়ক বানিয়ে নিয়েছে। তার আয়তনও ক্রমে বাড়তে থাকে। মানুষ সমাদর এবং স্বাগত জানায়।

এই পথেই অনেক বিদেশী প্রথা আমোদ-আহ্লাদ সাজ বদলিয়ে আমাদের মধ্যে স্থায়ী আসন নিয়েছে। এমনি একটি বস্তু হলো ফ্যামিলি পিকনিক। এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের খুব একটা পরিচয় ছিল না। আমরা যা জানতাম তা হলো চড়ুইভাতি বা বনভোজন। তার ভাতে ছেলেপুলেদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। শীতের দিনে ওরা যার যার বাড়ি থেকে সবকিছু জোগাড় করে কিছুটা জঙ্গলে এবং নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে এই ভোজনপর্ব সমাধা করতো। এর চেয়ে বড়ো আর কিছু নয়। ছোটদের এই ব্যাপারে বড়রা তেমন নাক গলাতো না। এমনকি এই ধারণাও বোধহয় সেদিন খুব একটা ব্যাপক ছিল না যে, এই আনন্দে বড় এবং বয়স্করাও অংশ নিতে পারে। ফ্যামিলি পিকনিকের ভাবনা তো ছিল দূরে অস্ত।

সেই চড়ুইভাতি বা বনভোজন আস্তে আস্তে নিজের মহিমা বিস্তার শুরু করলো। অনেকেই চাখতে শুরু করলো। এর রসাস্বাদ স্বাদ পেয়ে তারা মজলো। ক্রমে সকলেই জিনিসটা মনে ধরলো। কেউ আর এই রস থেকে বঞ্চিত থাকতে রাজি নয়। শীতের ঝকঝকে রোদ্দুরে একটু ফাঁকা কোথাও এমন একটু মিলিত ভোজনযজ্ঞে সামিল হতে পারলে একইসঙ্গে দুটো কাজ হয়ে যায়। খাওয়ার খাওয়া হলো আর সেইসঙ্গে বেড়ানো। বিশেষ ঋতুতে এই এখন পিকনিকের মধ্যে পড়ে যায়। শহরের ধোঁয়ায় ভরা ঘোলাটে আকাশের পরিবর্তে স্বচ্ছ নীল আকাশের সামিয়ানার নীচে সমবেত হওয়ার আনন্দটা নিঃসন্দেহে গ্র্যান্ড রিলিফ। এই রিলিফই হলো পিকনিকের আসল নির্যাস।

এই নির্যাসে আস্বাদিত হওয়ার অধিকার অনেকদিন পর্যন্ত পুরুষদেরই একচেটিয়া ছিল। মেয়েদের এতে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। সঙ্গিনী হলে মজাটা আরো বেশি জমে এই বোধ থেকেই সম্ভবত পিকনিকে মেয়েদের অংশ গ্রহণকে পুরুষেরা মেনে নেয়। এমনি-ভাবেই ফ্যামিলি পিকনিকেরও পথ তৈরি হয়। এজন্য মেয়েদের ঝান্ডা উঁচিয়ে রাজপথে নামতে হয় নি বা মিছিল-সমাবেশ করতে হয়নি। পিকনিকের আনন্দ আরো নিবিড় করে পাবার জন্য এবং পরিবারের সেই আনন্দযজ্ঞে অন্য আত্মীয় স্বজনদের সম্মিলিত করার একটা মস্ত সুযোগ ফ্যামিলি পিকনিক। উন্মুক্ত পরিবেশে সকলের সাহচর্য আনন্দলাভের এই সুযোগটুকু আমাদের দেশে এখনও তেমন প্রসারিত নয়। পশ্চিমে কিন্তু এই সুযোগটুকু সবাই গ্রহণ করে এবং আমাদের মতো বৎসরান্তিকভাবেও নয়। ওরা সুযোগ পেলেই ফ্যামিলি পিকনিকের আয়োজন করে। এর কারণ, এটিকে তারা ভোজন এবং আনন্দের হেতু বলেই শুধু মনে করে না। তারচেয়েও বড়ো কথা যে ফ্যামিলি পিকনিককে ওরা ফ্যামিলি স্পোর্টসের অঙ্গ হিসেবে মর্যাদা দেয়। এজন্যই তাদের কাছে এটির এতো কদর।

ফ্যামিলি স্পোর্টস কথাটা শুনে আবার আমাদের ভিরমি খেতে হয়। এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের এখনও পরিচয়ের সূত্র তেমন স্থাপিত হয়েছে বলা চলে না। বাড়িতে যে কিঞ্চিৎ খেলাধুলোর ব্যবস্থা রাখা উচিত সেকথা আমরা খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না। বাচ্চার জন্মের পর কোনক্রমে স্কুলে পাঠাতে পারলেই সন্তানের প্রতি আমাদের দায়িত্বের সিংহভাগ পালন করা হয়ে যায়। অধিকাংশ মা-বাবারই এই ধারণা। এর ব্যতিক্রম যাঁরা সংখ্যায় তাঁরা খুবই নগণ্য। এঁরা সন্তানের জন্য খেলাধুলোর ব্যবস্থা রাখেন কিন্তু বাদবাকি সবাই এর ধারকাছ দিয়েও হাঁটেন না।

খেলাধুলোর কথা বললেই এর প্রকার এবং প্রকরণ কি হবে সে আর এক সমস্যা। কারণ, বাড়িতে তো আর ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অথচ খেলাধুলো বলতে আমরা এসব মোটা দাগের খেলার কথা বুঝি। এসব তো আছেই। এছাড়া অনেক ছোট খাটো খেলা আছে যা বাড়িতে ব্যবস্থা করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। আমি পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে রোজ দেখি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে কিছুক্ষণ খেলেন। স্বল্প সময়ের খেলা। কিন্তু সকলেরই মন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে। বিশেষ, মা নিজে খেলায় অংশ নেয় বলে ছেলে মেয়েদের উৎসাহ আরো বেশি। এতে সন্তান এবং মা দুজনেরই উপকার হয়। সারাদিনের ক্লান্তির পর সবাই একটু ফ্রেশ হওয়া গেল। আর একটা ব্যাপার হলো যে খেলাধুলোর সুযোগ ক্রমেই আমাদের জীবন থেকে ছুটি নিচ্ছে এবং আমরাও এ-সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ছি। এর ফল শুভ হতে পারে না। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ফ্যামিলি স্পোর্টস কথাটা শুনে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে আঁৎকে উঠলে চলবে না। এর একটা বিহিত করতে হবে। সিনেমায় বিশেষ করে বিদেশী ছায়াছবিতে ইদানীং দেখা যায় যে, মা-বাবা আর ছেলে-মেয়েরা খেলছে। সে খেলা এমন কিছু নয়। কিন্তু শিশুমনে তার গুরুত্ব অসাধারণ। এই আনন্দময় পরিবেশটুকু তার ভবিষ্যৎ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই এই বস্তুকে শুধু সিনেমার পর্দায় না রেখে আমাদের পারিবারিক জীবনের সত্যে পরিণত করা একান্ত আবশ্যক।

খেলাধুলোর এটা হলো শারীরিক দিক। এতেই কিন্তু ফ্যামিলি স্পোর্টস সম্পূর্ণ হলো না। এখন তো প্রায় সব বাড়িতেই রেডিও আছে। এই বস্তুটি নিঃসন্দেহে ফ্যামিলি স্পোর্টসের অন্তর্ভুক্ত। একত্রে বসে রেডিও-অনুষ্ঠান শোনা এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা স্বল্পবয়সীদের মানসিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক। এর সবটাই হবে ক্রীড়াচ্ছলে। শিক্ষামূলক পুস্তকও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। বিদেশে টেলিভিশন থাকায় এই সুযোগটা আরো বেশি। যে সুবিধে আমাদের নেই সেজন্য

আফশোষ না করে যা আছে তারই সদ্ব্যবহারে একটু উৎসাহী হতে হবে। সিনেমা-থিয়েটার ও রিক্রিয়েশনেরই পর্যাপ্ত। এ সম্পর্কেও আমরা পুরো সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। ফ্যামিলি স্পোর্টসের দেবোত্তগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে আমরা উন্মুক্ত করে দিতে পারিনি। এই প্রগতির সোনা রোদে সারা গা মাখামাখি হওয়া এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশিত উদারতার এখনো নিদারুণ অভাব।

ছেলেমেয়েকে দিনরাত পড়তে দেখলেই মা-বাবা খুশি। তাদের জন্য মা-বাবার আর যে কোন দায়িত্ব থাকতে পারে সেকথা তারা আর মানতেই চান না। কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হলে তো চলবে না। কোন মানুষই অল্পে খুশি হতে চায় না। তাই ছেলেমেয়ের ব্যাপারেও অত কাটছাঁট করলে তো চলবে না। শুধু পড়াশোনা নয়, সেই সঙ্গে চাই ফ্যামিলি স্পোর্টসের আয়োজন। এজন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা হলো সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ওয়াকিবহাল রাখা এবং সে সম্বন্ধে ওদের নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করা। ভবিষ্যতে যাতে ওরা নিজেদের চারপাশের জগতটাকে অপরিচিত ভেবে ভয়ে হীনমন্যতায় আক্রান্ত না হয়।

এ ব্যাপারে আমাদের একটা মস্ত এলার্জি আছে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমরা সব কিছু সযত্নে গোপন করতেই জানি সেক্ষেত্রে যদি অনেককিছু তাদের জানাতে হয় তবে তো মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। এমন কি অনেক বাড়িতে নিয়ম আছে যে, ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ পড়বে না। আবার খবরের কাগজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করায় এক অভিভাবক তাঁর সন্তানকে বেশ শাসন করার পর উপদেশ দিলেন যে, খবরের কাগজ সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়ার সময় এখনও তার আসে নি। এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তবে রীতিমত শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। ছেলেমেয়েরা এই পৃথিবীরই মানুষ। সুতরাং পৃথিবীটাকে তাদের জানতে চিনতে দিতে হবে। না হলে পরবর্তীকালে চলতে গিয়ে পায়ে পায়ে ঠোকর খাওয়ার সম্ভাবনা। এই অশুভ সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচতে হলে ছেলেমেয়েদের ওয়াকিবহাল করতে হবে পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। আর যদি আমরা এই মনোভাব নিয়ে বসে থাকি যে সময় হলে ওরা নিজেরাই সব চিনে নেবে তবে সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব পালনে প্রচণ্ড শৈথিল্য প্রদর্শন করা হবে। কারণ, জন্মের পর থেকেই জানাচেনার অধিকার ওদের জন্মেই বাড়তে থাকে। ওদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

সন্তানকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। সেজন্য প্রথমেই দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যদি সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এগুতে পারে তবে সন্তানের উপর তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। সন্তান তখন সুষ্ঠুভাবে পৃথিবীর পথে পা বাড়াতে পারে। কিন্তু সর্বত্র এই সহযোগিতা থাকে না। একটি পরিবারের কথা আমার জানা আছে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখেই ছিল। স্ত্রী বেশ শিক্ষিত এবং তার বরাবরের ঝোঁক চাকরিবাকরি করা। কিন্তু সংসারে স্বচ্ছলতা থাকায় তাকে অবিবাহিত এবং বিবাহিত কোন অবস্থাতেই চাকরি করতে হয় নি। কিন্তু এবার চাকরির মোহ তাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসলো। ঠিক এমনি সময়ে বাধার সৃষ্টি করল মাতৃত্বের সম্ভাবনা; সুতরাং চাকরির পরিকল্পনা আপাতত ইতি। কয়েক মাস নবজাতক নিয়ে বেশ হাসিঠাট্টায় কাটালো স্বামী-স্ত্রী। সন্তান একটু সমর্থ হতেই চাকরির ইচ্ছা আবার স্ত্রীকে ভীষণভাবে পেয়ে বসলো। স্বামীর দিক থেকে এবার আপত্তি দেখা দিল। স্ত্রীকে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, বাচ্চা হবার পর সংসারে তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং এ অবস্থায় চাকরি করতে গেলে বাচ্চাকে ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব নয়। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর এসব যুক্তি শুনতে রাজি নয়। স্বামীকে বোঝাতে সেও পেছপা নয়। লেখাপড়া শিখে যদি কোন কাজেই না লাগালো তবে এ লেখাপড়া শেখার মূল্য কি? এর উত্তরে স্বামী বোঝালেন যে এবার তার সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হোক সন্তান মানুষ করায়। কিন্তু স্ত্রী রাজি নয়। অনেক কথার পর স্ত্রীর চাকরি করা স্থগিত রইলো বটে তবে পরিবেশ হয়ে উঠল অসুখকর। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হলো তাতে দেখা যায় যে সন্তানের জন্য সে বলিপ্রদত্ত হলো এবং সবকিছুর জন্য সে দায়ী করলো বিবাহকে। মনের এই ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি যত জ্বলবে, সংসারে অসুখী পরিবেশের বিস্তৃতিও তত ব্যাপক হবে। আর এর সবকিছু প্রভাবিত করবে সন্তানকে। সে গোড়ার গোড়ার গড়নটাই যেন কেমন হয়ে যাবে।

এভাবে না এগিয়ে ওরা দুজন যদি একজন আরেকজনকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতো, তাহলে হয়তো এরকম মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতো না। এর মধ্যে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবও আছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতার স্বাভাবিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে এবং অপরের প্রতি দৃষ্টিপাতের ফুরসত তার হয় নি। এ থেকেই সৃষ্টি হয় যত ঝঞ্ঝাট।

এর বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতার উভয়ের সুন্দর সহাবস্থানও দেখা যায়। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই। না হলে সংসার বাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো। এরই জন্য প্রয়োজন একত্রে বেড়াতে যাওয়া এবং খেলাধুলায় মেতে ওঠা। সন্তান যাতে মা-বাবাকে দেখে কোনরকমই অসন্তোষের কারণ খুঁজে না পায়। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। সামাজিক জীব আমরা। তাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করার কথা আমরা কেউ চিন্তাও করতে পারি না। তাই সমাজকে আমার সন্তানের সামনে তুলে ধরতে হবে। সমাজ সম্বন্ধে তার ধারণাকে পরিস্ফুট করতে হবে। সামাজিক ঘটনার সঙ্গে সে যাতে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সেজন্য সবসময় নজর রাখতে হবে। আর এমনিভাবেই এসে পড়বে পৃথিবীর কথা। সে কৌতূহলও তার চরিতার্থ করতে হবে। কিন্তু সবকিছুর মূলে হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আর এরই অপর নাম হলো যাকে পলিটিক্স অ্যাট হোম। এতে ঝান্ডা নেই, পোস্টার নেই, বিক্ষোভ নেই, স্লোগান নেই। আছে শুধু পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটি সহজ সুন্দর সম্পর্ক যার উপর ভিত্তি করে বাঁচবে সমাজ, দেশ এবং জাতি।

—প্রমীলা

বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক
ভিত্তিতে
'সত্যবান' রচিত

বেদ পরিচয় ৫·০০

তন্ত্র পরিচয় ৭·০০

দীপিকা : ৩০/১ কলেজ রো, কলি-১

॥ নিত্যপাঠ্য দুইখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

— সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত —

যুগান্তর বলেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

॥ বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—আট টাকা ॥

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা,—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রী গৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন।

॥ বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—পাঁচ টাকা ॥

ডাকযোগে লইলে—আশ্রম-সম্পাদিকার নামে মনিঅর্ডারে মূল্যসহ এবং ডাকমাশুল বাবদ আরও এক টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গ্রন্থ রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বাঘ

মুহম্মদ আবদুল হকিম

মির্জাজি,

হয়ত আমার গুরুদেব সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সেই চিঠিখানা পেয়েই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, সাক্ষাৎ নিয়তি-স্বরূপ সেই বাঘ আমি মেরেছিলাম, 'মরীচ' কিন্তু আসলে বাঘটা তিনি মারেননি। বাঘটা মেরেছিলাম আমি। তবে তার আত্মা ও আশীর্বাদ দুটোই আমার প্রতি ছিল বলে তিনি ঐ কথাটা লিখেছেন, বাঘটা আমি মারাও যা আর তিনি মারাও তাই। তিনে তিনে—ছন।

আপনি জানেন, চিঠির ভাষায় অন্ততঃ জানতে পেরেছেন যে ফরেস্ট বাংলোটার কাছাকাছি পাহাড়—এখানে সেখানে একড়া-দুকড়ো জঙ্গল, কাঁটা ঝোপ, নিবিড় বনানী, সবুজের সমারোহ, সেই যে দূরে মিলিয়ে গেছে, 'তমালতালি বনরাজিনীলা।'

বাংলোটার উত্তরে পাহাড়, পূবেও পাহাড়। জঙ্গল দুদিকেই আছে। দক্ষিণে পশ্চিমে তত বন জংগল না থাকলেও চাষীদের ক্ষেতের প্রায় চারপাশে অথবা কোন না কোন পাশে জঙ্গল আছে। বিশ-পঁচিশ ক্রোশ ধরে জঙ্গল কেটে শস্য ক্ষেত্র অথবা বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। বাঘের আশ্রয় স্থলে মানুষ ঢুকেছে, তাই বাঘের এত রাগ—উপদ্রব।

বাংলোর পূব দিকের যে পাহাড়টার উঠবার সময় জংগল কম বলে মনে হয়, তার ভেতরে যে কি গভীর জঙ্গল তা সে দিকে না উঠলে বলবার সাধ্য নেই। সেই পাহাড়েই একদিন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। ধান পরে ভানব, আগে সেই শিবের গীতটা গেয়ে নি। বাংলো থেকে নেমে আমরা তিনজন চলেছি শিকারে। তার মধ্যে একজন শোকাতুর যমুনাপ্রসাদ আরজন গুরুদেব আর তৃতীয়জন আমি। নামটা বলব না, তবে, আপনার মির্জাজির চেনা।

শুনলাম, হরিণ ডাকছে। সেদিন তাই সখ চেপেছিল হরিণ শিকারের। বাঘের পাছে ঘুরলে, বাঘ মারলে বা না মারলে, মানুষকে একটা নেশায় মাতিয়ে রাখে, একটা অনাবিল চাকাবিহীন দুরান্তের অদ্ভুত পূর্ব আনন্দ উজ্জল ঝিমুনি। নেশা, মাদকতা, কিন্তু তাতে পেট ভরে না। হরিণ মারতে পারলে খাওয়াটা ভাল হয়। শিকারের আনন্দও যে নেই তা নয়। বাঘ মারার মত উৎকট আনন্দ না হলেও একটা হাসি মিশ্রিত আনন্দ হরিণ শিকারেও মেলে, খাওয়ার আনন্দ ত আছেই।

আবার শুনলাম হরিণ ডাকছে, উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম একটা ঝোপের ওপাশে। সেখান থেকে একা হরিণের পেছনে লাগলাম। অদৃশ্য হয়ে গেলাম, হরিণ এই দেখা যায় আবার দেখা যায় না। যখন দেখি, তাক করবার জন্য রাইফেল উঠাবার আগে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। কটা হরিণ তা বলতে পারব না, হয়ত ৮।১০টা বা তার বেশীও হতে পারে। আমার চোখে একবার পড়েছিল ৩টা। পথের মোড়ে ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুলি করতে পারতাম কিন্তু হরিণ যারা মেরেছেন তারা জানেন যে হরিণের ভাইটাল পার্টস-এ গুলি না লাগলে হরিণ পালিয়ে যায়। তাকে আর পাওয়া যায় না। কদাচিৎ পাওয়া যায়—রক্ত দেখে দেখে—দোবারা গুলি করে পাওয়া যায়। কারণ হরিণই একমাত্র প্রাণী যার পিত্ত নেই।

চলেছি ত চলেছি। হরিণ এই দেখা যায় আবার মিলিয়ে যায়। কত মাইল চলে গেলাম বলতে পারব না। পরে জেনেছি ১২ মাইল।

CENTRAL LIBRARY

হরিণ মারা হলো না, কারণ পড়ে গেলাম কাঁটা ঘেরা বাঁশ বনের ভেতরে। পাহাড়ী বাঁশের গায় গজানো পাতা এক-একটি বৈঁচি কাটা, লাগলেই কাপড়-চোপড় গা ছিঁড়ে যাবে। চলেছি কোন পথ পাই কিনা. ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লাম। মাসটা গ্রীষ্মের জ্যৈষ্ঠ মাস। কিন্তু নামবার বা ফিরবার পথ কোথায়? সূর্য কদাচিৎ দেখা যায় বন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। তাতে বুঝলাম সূর্য কাত হয়ে দূরে পশ্চিমে চলে গেছে। কিন্তু আমি যে পথ পাচ্ছিনে—তবে দিক ভুল হয়নি, যেদিকে যাই দেখি খাড়া পাহাড়, খালি উত্তর থেকে দক্ষিণ চলে গেছে পাহাড়—অফুরন্ত অপরিসীম গাছ গুল্মে ঘেরা। বাঁশবনের কাঁটাখাড়া অতি কষ্টে পার হলাম, গা ছিঁড়ে রক্ত পড়েছিল। দেখলাম সামনে বিরাট গুহা। অসাবধানে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসলাম গাছের ছায়ায়। একটা প্রায় ১ হাত চেলা দুপাশ উঁচু করে আমাকে আক্রমণ করতে এলো—পাশে একটা গাছের ডাল দিয়ে সেটাকে মারলাম, পাহাড়ী চেলা। আবার চললাম, সামনে পাছে, ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে গাছের শাখা দেখতে দেখতে কারণ গাছে বা পাশে চিতাবাঘ থাকতে পারে। চললাম ক্লান্ত পদক্ষেপে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর হাঁটতে পারছিনে। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলাম, 'প্রভু, আমি নিজের ক্ষমতার আর একপাও যাব সে ক্ষমতা আর আমার নেই। এখন তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করো, আমাকে রক্ষা করো।'

হয়ত তিনি শুনলেন। কিছু দূরে যেয়ে দেখলাম একটা বাঁশ কারা কেটে নিয়ে গেছে। তা টেনে নেবার সময় গুল্ম-গুলি কাত হয়ে রয়েছে। বুঝলাম কোন দিকে নিয়ে গেছে, হাঁটলাম। দেখলাম পার্বত্য শীর্ণ নদীতে স্বচ্ছ স্ফটিক জল, দেখে নিলাম ধারে কাছে চিতাবাঘ আছে কিনা। পেট ভরে জল পান করলাম। মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে ফেললাম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম. হাঁটতে যেয়ে দেখলাম, গরু আছে কয়টা। মানুষ খেকো বাঘ গরু সহজে মারেও না, খায়ও না। একটা ডাল ভেঙ্গে গরুগুলোকে তাড়া করলাম। গরু ছুটলো। তার পেছনে পেছনে এসে উপত্য-কার মানুষের বাসস্থলে পৌঁছলাম। সেখানে খেতে পেলাম, দুধ মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে পরদিন সকালে ফিরে এলাম বাংলোয়।

গুরুদেব আর প্রসাদ জিজ্ঞেস করায় বললাম, 'গ্রামকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে আজও অনেক মারীচ জীবিত আছে।"

পরদিন সকালে গুরুদেব বললেন, 'আমরা চলে যাব,' যমুনাপ্রসাদ তার স্ত্রী সুভদ্রাকে বাঘের পেটে দিয়ে নির্ভিককে পরীক্ষা করে নিয়েছে। সে যেতে চায়। আমি বাধা দিলাম না। যমুনাপ্রসাদ আর গুরুদেব চলে গেলেন, থাকলাম আমি আর আশে-পাশের যারা বাসিন্দা, যারা বাঘ না মারলে ক্ষেত-খামার করতে পারবে না তারা। তাদের দলেও যারা সাহসী ছিল তারা ভড়কে গেছে, আমাকে শুনিয়েই বলল, 'হাতী ঘোড়া গেল তল—'। আমি চাইতেই তারা চুপ করে গেল। বুঝলাম, তারা বুঝে নিয়েছে যে আমি আনাড়ী বলেই, গুরুদেব, যে বাঘ মারা সম্ভব নয়, সেই বাঘ মারতে আমাকে রেখে চলে গেছেন, আমার সম্মানে আঘাত লাগলো। বিশটা বছর বাঘ, শুকর হরিণ, পাখী কত কি মেরেছি। নীলগিরিতে যেয়ে নীল গাইও মেরেছি। শিকারের নেশায় ভারতের কোন জায়গায় যাইনি? তবে গুরুদেব বলেছেন, 'বাঘটা ভারী চালাক, মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে সে কম যায় না। দশ-বারোজন লোক মেরেছে, তার মধ্যে দুজন শিকারী, তার মধ্যেও একজন খান্ সাহেব শিকারী। এই সেদিন যমুনাপ্রসাদের স্ত্রী সুভদ্রাকে নিয়ে গেছে, শিকারীর স্ত্রী। তাকে কোন জঙ্গলে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে, চেষ্টা করেও সুভদ্রার স্বামী যমুনাপ্রসাদ আর গুরু-দেব কোন হদিশ পাননি। দুটো শিকারীর মাঝখান থেকে নিয়ে গেছে একটা মেয়ে, যমুনাপ্রসাদের অপরূপ রূপসী লম্বা তন্বী স্ত্রী।'

আমি সেই দিগ্বিজয়ী বাঘ মারবার জন্য প্রস্তুত হলাম। গুরুদেব তার ৪৫০ আর ৭০৫ রাইফেল দিয়ে গিয়েছিলেন। যমুনা-প্রসাদের সেই ২৫০ রাইফেল সে নিয়ে গেলো। বলে গেলো, 'আমি আশীর্বাদ করছি, আমার সুভদ্রা খেকো বাঘটাকে মেরে তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে.' তারপর সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। গুরুদেব তাকে নিয়ে জীপে উঠে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'সাবধান সাবধান, ভারী চালাক বাঘ। না হয় আমি ফিরে এলে দুজনে চেষ্টা করে দেখবো।'

আমি গুরুদেবের কথা শুনলাম। কিন্তু ছাপিয়ে উঠলো যমুনাপ্রসাদের আশীর্বাদ. 'আমার সুভদ্রা খেকো বাঘটাকে মেরে তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে।' মনের মধ্যে রি-রি করে বাজতে থাকলো যমুনা প্রসাদের আশীর্বাদ আমার প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র লালসা। চোখ আমার ক্রোধে জ্বলে উঠলো। চোখে আগুন ধরে গেলো, দেখলাম, সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর সেই ছেঁড়া অংশটা যা সুভদ্রাকে বাঘে নেবার সময়ে কাঁটা গাছে বেধে ছিঁড়ে রয়েছিল সেই অংশটা কাঁটা আছে তখনো উড়ছে। রক্তের দাগ সেই কাঁটা গাছটায়, শাড়ীতে আর স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে শুকিয়ে রয়েছে। প্রসাদের সুখের ঘর উজাড় হয়ে গেছে, আগুনে রংয়ের শাড়ী পরা ছিল সুভদ্রার। স্নান করে পরেছিল।

গুরুদেব গেছিলেন বাঘ মারার জন্য মন্দির কাছে মাচানটা ঠিক করতে, বাংলো ছিল খালি। এই সুযোগে তাদের স্বপনের—মধুময় হয়ে পড়েছিল, সুভদ্রা যমুনা-প্রসাদের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। বছরের ছ মাস হলো বিয়ে হয়েছিল।

গুরুদেবকে আমি জানি। ইস্পাত কঠিন সংযমের অধিকারী। বদরাগী তবে ভীষণ বন্ধু বৎসল। সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ী, উঁচু করে বাঁধা চুল, দেহ-বল্লরী লাস্যময়, বেশ লম্বা। সেদিন সেই সান্ধ্য লগ্নে তার সে অপরূপ রূপ কি গুরুদেবকে আকৃষ্ট করেছিল? প্রসাদ কি তা বুঝতে পেরেছিল? অথবা সন্দেহ করেছিল? নচেৎ বাঘ মারতে যেয়ে সে রাত্রে যমুনাপ্রসাদ তার উঁচু ঢিপিতে সে যেখানে ছিল সেখান থেকে মানুষ খেকো বাঘের ভয় না করে গুরুদেব যে মাচানে একটু আগে ছিলেন, এবং যে মাচান ছেড়ে তিনি যমুনাপ্রসাদের কি হলো দেখতে তার উঁচু ঢিবির দিকে গিয়েছিলেন, সেই মাচানের নীচে এসে উপরে গুরুদেব আছেন কিনা দেখতে টর্চ ফেলেছিল কেন? আর গুরুদেব যদি তাই দেখে ঢিবির পাশ থেকে জ্ঞান হারিয়ে 'প্রসাদ, প্রসাদ' করে চীৎকার না করতেন তবে কি সুভদ্রা বের হয়ে আসত তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় বাংলো ছেড়ে? সুভদ্রা কি ভেবেছিল যে যমুনা-প্রসাদের কেন কি হয়েছে? বাঘ নেয়নি ত? গুরুদেব ও যমুনাপ্রসাদ উভয় শিকারীর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল কে? তাই কি সুভদ্রা এগিয়েছিলো স্বামীর অমঙ্গল হলো নাকি তাই ভেবে? নচেৎ একা বের হবার কি হেতু ছিল?

বাঘটা কেন গুরুদেব বসেছিলেন যে মাচানে আর যমুনাপ্রসাদ বসেছিল যে ঢিবিটার উপরে, তার অদূরে যদি বাচ্চা মোষটার সেদিকে না যেয়ে বাংলোর পাশে এসে থাপটি মেরে বসেছিল?

মনের ভিতরে ঠিক জিনিসটি ধরা পড়ে গেলো। স্নান করে সুভদ্রা শাড়ী শুকোতে দিয়েছিল বাইরে, তারের সাথে। সেই শাড়ী দেখে, ফিরেই, গুরুদেব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—শাড়ী কেন? শিকারে এসে শাড়ীপরিহিতাকে সাথে আনতে নেই। যমুনাপ্রসাদের সদ্য প্রেম তা বুঝতে পারেনি অথবা বুঝবার চেষ্টা করেনি। শাড়ী শুকোতে না দিলে বাঘের পেটে যেতো না সুভদ্রা। শাড়ীই দিনে মানুষ খেকো সুচতুর বাঘটা দেখেছিল এবং তারই লোভে মন্দির কাছে না যেয়ে বাংলোর আশে-পাশে অন্ধকারে সমানে টহল দিচ্ছিল।

মাচানে বসে গুরুদেব বাঘ আসে না দেখে বসে বসে অস্থির হয়ে—সংযম হারিয়ে খোঁজ নিতে প্রসাদের, মাচান ছেড়ে ঢিবিটার কাছে, যেয়ে। আর প্রসাদ ঢিবি ছেড়ে গুরুদেব মাচানে আছেন কিনা দেখতে এলো। টর্চ মারলো মাচানের উপর।

শুরুদেব তখন প্রসাদের ঢিবির কাছে। কেন তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'প্রসাদ, প্রসাদ' আর সেই ডাক শুনে বেরিয়ে এলো স্বামীর অমঙ্গল হয়েছে ভেবে সুভদ্রা। তারপরই শোনা গেল একটা হুংকার আর সুভদ্রার আর্তনাদ। সুভদ্রাকে নিয়ে গেলো বাঘ আর তার আগুনে রংয়ের শাড়ীটার একাংশ ছিঁড়ে বেধে থাকলো কাঁটা গাছে। সুভদ্রা গেলো বাঘের পেটে। বুঝলাম সুভদ্রার মৃত্যুর জন্য দায়ী তার স্বামী প্রসাদ আর গুরুদেব। বাঘ মারার জন্যে যে সংযম ও প্রতীক্ষা দরকার তা তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন—। সুভদ্রা কি গুরুদেবের প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল? রূপ লাগি আঁখি ঝুরে—।

বাঘ মারবার ফন্দী ঠিক করে ফেললাম। চোর বা বাঘ এদের কাজ-কর্মের ধরন একই রকম—যাকে ইংরেজীতে বলে 'মোডাস অপারেন্ডি'। দারোগাবাবু সিঁধ দেখে আর চুরির ধরণ দেখে বলে ফেলেন, 'চুরি করেছে শ্রীমন্ত।' বাঘ শিকারীও বলে দিতে পারে, 'এই মানুষের হন্তা বাঘ সেটি—বেটি—' শিকারী এও বলে দিতে পারে, হন্তা বাঘ না চিতাবাঘ।

সুভদ্রার যে শাড়ীখানা শুকোতে দেয়া হয়েছিল সেখানা প্রসাদ নিয়ে যাবেন। আমি শাড়ীখানা ভাল করে দেখলাম, লাল ফিনফিনে উৎকৃষ্ট ধরনের শাড়ী যার ভেতরে আটকে রাখতে পারেনি সুভদ্রা তার কুহিত যৌবন। স্নান করে সেই শাড়ীখানাই শুকোতে দিয়েছিল সুভদ্রা। স্নান করেছিল প্রসাদও। প্রেমাকাংখী একটি জীবন আর নেই।

শাড়ীখানা হাতে নিলাম, মোহন্তকে বললাম, 'শাড়ীখানা ধুয়ে আনতে।' সে বললো, 'ধোয়া শাড়ী আবার ধোবো কি?' আমি রাগ করে উঠলাম, বললাম 'আমার হুকুম।' শিকারীর চোখ আমার জ্বলে উঠলো আগুনের মতন, সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর ছেঁড়া অংশটা দেখলাম রক্তমাখা—কাঁটা গাছে তখনো উড়ছে।

মোহন্তদাস শাড়ীখানা ধুয়ে নিয়ে এলো। সে ভয় পেয়েছিল। আমি রাইফেল নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম বলে সে ধুয়ে আনলো। ঠিক যেদিন সুভদ্রাকে বাঘে নিয়ে যায় সেদিন যেখানে যেভাবে শাড়ীটা শুকোতে দেয়া হয়েছিল তেমনি করে নিজে শুকোতে দিলাম শাড়ীটা, মহানন্দে আমার মন নেচে উঠলো। মহানন্দে উড়তে লাগলো শাড়ীটা। লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েক মাইল উত্তর দিক থেকে পাহাড়ের উপর দাঁড়ালে শাড়ীটা দেখা যাবে। বাঘটা পূব দিকের পাহাড়ে নাই, আমি সে পাহাড়ে গিয়েছিলাম, উত্তর-দিকের পাহাড়েই আছে বাঘটা।

মাচান মরিটার কাছে পাতাই ছিল, উঁচু ঢিবিটা যার উপর সেই রাত্রে প্রসাদ ছিল তাও তেমনি কাঁটা দিয়ে ঘেরা তখনও ছিল, এইত কদিন আগে গুরুদেব আর প্রসাদ সবকথা বলে কয়ে চলে গেলেন। বাঘ মারার ভার আমার উপর—কারণ তারা ভেবেছিলেন যে এমন চালাক বাঘ আমি মারতে পারবই না। ভয়ও তারা করেছিলেন যে আমি হয়ত তৃতীয় শিকারী যে বাঘের পেটে যাবে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির কাছে সব জীব-জন্তু পরাস্ত।

দিন থাকতেই খুব সাবধান হয়ে গেলাম। বাংলোর খিলটিল ভালোভাবে আটকিয়ে জানালা আধ খোলা রেখে হাতল ছাড়া চেয়ারটা জানলার একপাশে এমনভাবে রাখলাম যেন খোলা পাশ থেকে চেয়ারটা দেখা না যায়। গায়ে দিলাম একটা কালো ফতুয়া। বাংলো থেকে দিনের বেলায় মানুষ খেকো বাঘটা মাইজিকেও নিয়ে গেছে একথা আমার জানা ছিল। তবে মানুষ খেকো বাঘ প্রায় মানুষের মত বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে, তবে যা পশু এই ব্যবধান।

মোহন্তকে বললাম 'শুয়ে পড়।' সে বলল, 'ভয় করে, মাইজি কখন যে বাইরে গেলো আর বাঘ ধরে নিয়ে গেলো। মাইজি যাবার সময় আমি টের পাইনি। আমার দরজা জানলা খোলা ছিল। কারণ, মাইজি ঘরের মেজেতে শুতে আসবে বলেছিলেন, তিনি যখন বাইরে যান তখন দরজা খুলে যান।' বাঘ মাইজিকে নিয়ে গেলো বলে মোহন্ত রক্ষা পেয়েছে, বুঝলাম। আমি তাকে ধমক দিলাম, নিশ্বাসও যেন না পড়ে। খুব সাবধান, মোহন্ত তার মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি গাঢ় অন্ধকারে বাইরের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলাম। রাইফেলটা দেখলাম, একেবারে ঠিক, প্রস্তুত ইংগিতের অপেক্ষা, ৯টা বেজে গেল, অনেকক্ষণ।

শাড়ীখানা সন্ধ্যার পর এনে খাটের উপর এমন করে বিছিয়ে রাখলাম যেন একপ্রান্ত বাইরে থেকে দেখা যায়। অন্ধকারে পৃথিবী আকাশ প্রান্তর বাংলোটা সব ডুবে গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আমি আর আমার প্রতীক্ষা।

উত্তর জংগলের দিক থেকে শব্দ পেলাম—ই-ই-ই-ই পাখীর পাখার ঝাপটা। কিচির মিচির শব্দ। বুঝলাম হয়ত বাঘ আসছে, সোজা শাড়ীর দিকে। বাংলোর উত্তর-পূব পাশটায় আবার শুনলাম, হরিণগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল, ভয়ার্ত চীৎকার। পাঁচ মিনিট গুনতে থাকলাম। একশিং-ওয়ালা একটা গনদার ফুকুরে হরিণ ডাকতে ডাকতে পালিয়ে গেল।

মনে হলো বাঘ এসেছে। যেখানে শাড়ীখানা শুকোতে দেয়া হয়েছিল সেখানে এলো। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘন অন্ধকারে বাঘ বাঘ বলে মনে হলো। কিন্তু যার শাড়ী সে যে শুয়ে আছে ভেতরে, আবছা দেখা যাচ্ছে। আশা-নিরাশায় বাঘ তার স্বভাবসুলভ হাই তুললো—আস্তে, আমি শুনলাম। টিপে দিলাম রাইফেলে ফিট করা টর্চ, মুহূর্তে বাঘের মাথা—সর্বাঙ্গ জুড়ে আলোর বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বাঘটা লাফ দিয়ে সরে যাবার আগে আমার রাইফেল গর্জে উঠলো। ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত আকাশ-বাতাস বন-জংগল ছিঁড়ে খুঁড়ে কামড়িয়ে একাকার করে ফেললো। জংগলের ভেতরে ও বাইরে ঘেরে গাছ বরজাম আন্দাজ, টর্চের আলোতে। তারপর সব নিস্তব্ধ।

বাংলোর দরজা জানলা এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্প ঘুম হলো। দেখলাম সুভদ্রা। রক্তে ভেজা আগুনে রংয়ের শাড়ীটা তখনও তার সর্বাংগ জড়িয়ে আছে। একটা জায়গায় অনেকখানি নাই। সেখান থেকে রক্ত—। সে হাসছে, অপরূপ রূপসী। সকালে ৮টায় উঠলাম।

লোকজন এলো—সাবধানে জংগল খুঁজে মরা বাঘটা নিয়ে আসা হলো। বিরাট বাঘ, লেজ শুদ্ধ ১০ হাত। রংটা প্রায় সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর মতই—তবে ডোরা-ডোরা।

আপনার
'নির্ভীক চেলা'
২০।৫

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

বাইবেল ও একটি দুঃসাহসিক অভিযান

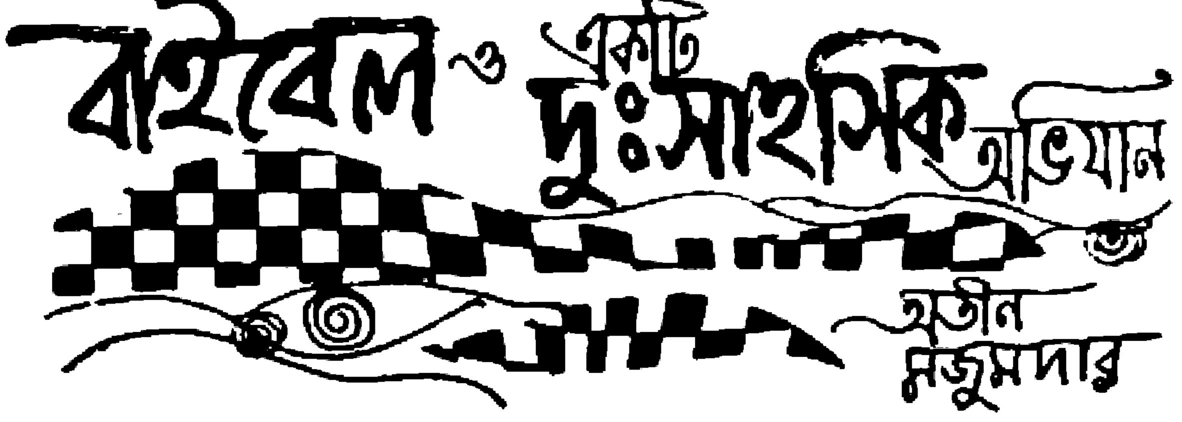

অতীন মজুমদার

বাইবেল ইংরাজী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ কিন্তু আজ থেকে হাজার বছর আগে ইংরাজীতে বাইবেল ছিল না। বাইবেলের দুটি ভাগ—ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনূদিত হয় হিব্রু ভাষা ও নিউ টেস্টামেন্ট গ্রীকভাষা থেকে। এই অনুবাদ সহজে হয়নি। এর পিছনে আছে সুদীর্ঘ এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী।

প্রাচীনকালে মিশরে প্যাপিরাস্ গাছের ছালের ওপর লেখার প্রচলন ছিল। ইহুদীরা ঐ গাছের ছালের ওপর তাদের ইতিহাস লিখে, তা মূল্যবান দলিলরূপে সযত্নে সংরক্ষণ করত। গ্রীকরা ঐ প্যাপিরাস্‌কে বলত 'বিবলস্'। এই 'বিবলস্' কথাটা ক্রমশঃ বইয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইহুদীজাতির এই ইতিহাসকে তারা বলত 'বিবলিয়া'। গ্রীকভাষা থেকেই 'বিবলিয়া' কথাটা ল্যাটিন ভাষায় আমদানী হয়। সেজন্য ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের প্রথম কপিটিকে বলা হয় 'বিবলিয়া স্যাক্রা' বা পবিত্রতম গ্রন্থ। ল্যাটিন ভাষার ঐ 'বিবলিয়া স্যাক্রা' ইংরাজীতে অনূদিত হয় এবং সংক্ষিপ্তভাবে 'বাইবেল' নামে অভিহিত হয়।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ইংলণ্ডে ইটালীর পোপ ও পুরোহিতদের অপ্রতিহত প্রভাব। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারের চেয়ে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতার দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল বেশি। মাসের পর মাস তাই গির্জাগুলো তালাবন্ধ হয়ে থাকত। যদিও বা কখনো সখনো তাদের মর্জি অনুযায়ী খোলা হত, ঐসব পুরোহিতরা ল্যাটিনভাষায় বাইবেল পাঠ করত। ফলে জনসাধারণ বাইবেল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যেত। আর তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পোপ ও পুরোহিত সম্প্রদায় বাইবেলের বিকৃত ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করত। এছাড়া তাদের উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, সেজন্য বাইবেল পাঠ জনসাধারণের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল, ছিল অনধিকারচর্চাস্বরূপ।

এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ইয়র্কশায়ার নিবাসী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—জন উইক্লিফ—ইংলণ্ডের ইতিহাসে যিনি 'মর্ণিং স্টার অফ দি ইংলিশ্ রিফর্মেশন' নামে অমর হয়ে আছেন। ইটালীর পোপ ও পুরোহিতদের স্বার্থলিপ্সা, স্বেচ্ছাচার, ক্ষমতার লোভ—এসবের বিরুদ্ধে ইংরাজীতে গোপন ইস্তাহার লিখে তিনি তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে শুরু করলেন। ঐ ইস্তাহারগুলোতে ইংরাজীতে বাইবেলের বাণী ও শিক্ষাও লিপিবদ্ধ থাকত। ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এর ফলে দেখা দিল এক নবীন উদ্দীপনা। ঐ ইস্তাহারগুলো যেন তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এল।

উইক্লিফ শুধু ঐ ইস্তাহার লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, আরও দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। পোপ ও পুরোহিতদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাইবেল ভুল ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যার এই হীন কৌশলের অপচেষ্টা জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, সেজন্য তিনি বাইবেল ইংরাজীতে অনুবাদ করতে শুরু করলেন। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে এই কাজে ছিল যে কোনো মুহূর্তে প্রাণহানির আশঙ্কা। কিন্তু অসমসাহসী উইক্লিফ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজে যুক্ত হয়ে এগিয়ে এলেন বহু বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীর দল। উইক্লিফ তাঁদের মধ্যে থেকে হেরেফোর্ড নিবাসী নিকোলাস নামে একজনকে তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য বেছে নিলেন।

উইক্লিফ নিজে আরম্ভ করলেন নিউ টেস্টামেন্টের অংশবিশেষ এবং নিকোলাস ওল্ড টেস্টামেন্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিকোলাস তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। পোপ, বিশপ প্রভৃতিদের চক্রান্তে প্রথমে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও পরে নির্বাসিত হতে হয়। শেষপর্যন্ত অন্যান্যরা তাঁর কাজ শেষ করেন।

উইক্লিফের বিরুদ্ধেও এই চক্রান্ত চলেছিল, কিন্তু সে সময়ে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিশেষতঃ রাজ্যের কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁর স্বপক্ষে। তাই তাদের এই চক্রান্ত নিষ্ফল হল। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি একাই নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ শেষ করলেন।

উইক্লিফ ছিলেন অক্সফোর্ডের শিক্ষক। কিছুদিন পরই অক্সফোর্ডের বহু ছাত্র তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। তখনও ছাপাখানার প্রচলন হয়নি। তাই তারা অতি গোপনে সতর্কভাবে সারাদিন সারারাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উইক্লিফ অনূদিত ঐ নিউ টেস্টামেন্ট নকল করতে শুরু করে। সুন্দর হস্তাক্ষরে তাদের লেখা ঐ নিউ টেস্টামেন্ট এবং তার অংশবিশেষ কেনার জন্য গোপনে জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। নিউ টেস্টামেন্টের কয়েক পাতা মাত্র প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হতে শুরু হল। ধনীলোকেরা ঐগুলো গোপনে গোপনে কিনতে লাগল পড়বার জন্যে। মধ্যবিত্তেরা অর্থ দিয়ে কিনতে না পারলেও তাদের এতদূর আগ্রহ ছিল যে, একগাদা খড়ের বিনিময়ে মাত্র এক ঘণ্টা ঐ হাতে লেখা বাইবেলের অংশবিশেষ পড়বার অনুমতি গ্রহণ করত। লোকালয়ের বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্জন বনে ঐ বাইবেল থেকে কিছু কিছু অংশের পাঠ শোনার জন্য দলে দলে লোকেরা শহর এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকেও ছুটে আসত।

ব্যাপারটা পোপ ও পুরোহিতদের কর্ণগোচর হতে বিশেষ দেরী হল না। আবার শুরু হল হীন চক্রান্ত হাতে লেখা ইংরাজী নিউ টেস্টামেন্ট বা তার অংশবিশেষ কার কার কাছে আছে তা খোঁজ করার জন্য তাদের গুপ্তচর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং যার যার কাছে তা পাওয়া যেতে লাগল, তাদের কঠোর সাজাও হল এবং ঐগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। তবু উইক্লিফ বা তাঁর দলের বিরামবিহীন উদ্যমে বাইবেল নকল করার কাজে একটুকুও ছেদ পড়ল না। বরং দেখা গেল, যত পুড়ছে, বাইবেল তার চেয়ে ঢের বেশি নকল হচ্ছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এরই মধ্যে নির্ভীক উইক্লিফের আরেক অভিযান শুরু হল। একমাত্র ধনীলোকেরাই হাতে লেখা ঐ বাইবেল কিনতে পারত, গরীবদের পক্ষে কেনা সম্ভব হত না। কিন্তু বাইবেল শুধুমাত্র ধনীদের জন্য নয়। সর্বসাধারণ যাতে তা পড়তে পারে, তার বাণী ও শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য তিনি তৎপর হলেন। তিনি তার অনুগত ছাত্রদের মধ্যে থেকে দুজন দুজন করে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। এই দল ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রকাশ্যে বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা প্রচার করতে শুরু করল। তারা কপর্দকহীন অবস্থায় পরিভ্রমণ করত এবং তাদের কাছে কোনো বাইবেল থাকত না। সর্বসাধারণ তাদের মুখ থেকে প্রচারিত বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা শোনার জন্যে দলে দলে এসে ভিড় করত। ফলে কপর্দকহীন অবস্থায় থাকলেও তাদের কোনো কিছুরই অভাব হত না। আগ্রহী শ্রোতারাই তাদের আহার, আশ্রয় ও সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটাত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে তারাই 'লোলার্ডস্' নামে পরিচিত। বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করেই তারা ক্ষান্ত হত না, কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনও গঠন করতে সচেষ্ট থাকত। পোপ পুরোহিতের দল ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে 'লোলার্ড'-দের এই অভিযান

বন্ধ করার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই তাদের নিবৃত্ত করতে সমর্থ হল না। উপরন্তু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণের কাছে তাদের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। ফলে তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল উইক্লিফের ওপর।"

উইক্লিফ তখন বার্ধক্যে উপনীত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও সে সময়ে তাঁর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাদের হীনকুটিল চক্রান্তে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হল।

বিচারের নামে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। শেষপর্যন্ত তাকে নির্বাসিত হতে হল।

বৃদ্ধ উইক্লিফ লুটারওয়ার্থে চলে গেলেন এবং নতুন উদ্যমে আবার বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু করলেন। আগে যা অনুবাদ করেছিলেন, তা সংশোধন করে বাইবেলের পরিমার্জিত রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিশ্চিন্তে কাজ করতে সক্ষম হন নি। তাঁকে বহুবিধ বাধা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তিনি ১৩৮৪ খৃঃ ডিসেম্বরের শেষ রবিবারে বাইবেলের শিক্ষা প্রচার করতে করতে হঠাৎ মারা যান।

ইংরাজী বাইবেলের জনক জন উইক্লিফ লোকান্তরিত হলেন। ইতিহাসে কিন্তু অমর হয়ে রইলেন। আর অমর হয়ে রইল সর্বসাধারণের জন্যে তাঁর বাইবেল অনুবাদের মহৎ প্রয়াস।

উইক্লিফের মৃত্যুর প্রায় একশ' বছর পর বাইবেল অনুবাদের এই দুঃসাহসিক কাজে নামলেন উইলিয়ম টিন্ডেল। এই কাজে নামার আগে তিনি কেম্ব্রিজের শিক্ষক সুপণ্ডিত এরাসমাসের দ্বারা—যিনি ঐ সময় গ্রীক ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন—যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এরাসমাসের মত ছিল, বাইবেল সর্বসাধারণে পড়ুক, তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করুক।

টিন্ডেল সতর্কতার থেকে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি সেই সময়ে লর্ড মানরের অধীনে পুরোহিতরূপে কাজ করছেন। তাই এই অনুবাদের কাজ তাঁকে যথেষ্ট গোপনেই করতে হচ্ছিল। কিন্তু একদিন কোনো একজন পুরোহিতের সংগে তর্ক করতে করতে তিনি প্রকাশ্যে বলে ফেললেন, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে একজন চাষার ছেলেও বাইবেল সম্বন্ধে পোপের চেয়েও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ফলে পোপ ও পুরোহিতদের কাছে তাঁর এই প্রয়াস আর গোপন রইল না। তখন সডবারী থেকে তাঁকে লণ্ডনে পালিয়ে যেতে হল। কিন্তু লণ্ডনে এসে বহুদিন তাঁকে আশ্রয়হীন হয়ে কাটাতে হয়। শেষে হামফ্রী মনমাউথ নামে এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁকে আশ্রয় এবং সর্বপ্রকারের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

টিন্ডেল এক বছর তাঁর আশ্রয়ে থেকে যখন বেশ কিছুটা অনুবাদের কাজে এগিয়ে গেছেন, এমন সময় আবার পোপ ও পুরোহিতদের অনুচরদের অত্যাচার শুরু হল। টিন্ডেল এবার পালিয়ে এলেন অ্যান্টোয়ার্প। সেখানে কোনোরকমে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে, অনিদ্রায়, অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদের কাজ শেষ করলেন।

অনুবাদ ত' শেষ হল। কিন্তু ছাপান হবে কোথায়? কে ছাপাবে? ছাপাখানাও সর্বত্র নেই। তাছাড়া পোপ ও পুরোহিতদের অনুচরেরা তখন সর্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এহেন অবস্থায় টিন্ডেল পাণ্ডুলিপিসহ অতি অন্তর্পণে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত কোলনে এসে সেখানকার এক ছাপাখানার মালিককে বাইবেল ছাপাতে রাজী করালেন।

গভীর রাত্রিতে টিন্ডেল অতি সন্তর্পণে ছাপাখানায় যেতেন। তাঁর সামনেই দরজা জানালা বন্ধ করে বাইবেল ছাপার কাজ শুরু হত। তিনি বসে বসে প্রুফ দেখতেন। বেশ কিছুটা ছাপার কাজ যখন এগিয়ে গেছে, সেই সময় আবার এক বাধা পড়ল। ঐ ছাপাখানার জনৈক কর্মচারী এক সরাইখানায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল। ফলে পোপ ও পুরোহিতদের অনুচরেরা কথাটা জানতে পারল। কিন্তু ছাপাখানায় গিয়ে তাদের হামলা করার আগেই টিন্ডেল খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাণ্ডুলিপিসহ যতগুলো ছাপান ফর্মা পেলেন নিয়ে সোজা ওয়ার্মস-এ গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

ওয়ার্মস-এ থাকাকালীন এক ছাপাখানার মালিক তাঁকে ছাপার কাজে সাহায্য করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাইবেল সম্পূর্ণ ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল।

বাইবেল ছাপা হওয়ার পরে দেখা দিল আর এক সমস্যা। পোপ, বিশপ, পুরোহিতবর্গ ও তাদের অনুচরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে তা' কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে? খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হল অ্যান্টোয়ার্পনিবাসী [illegible] উৎসাহী ইংরাজ ব্যবসায়ীর সক্রিয় সহযোগিতায়। তাঁদের সাহায্যে অতি গোপনে ময়দার বস্তায়, কাপড়ের থানের মধ্যে বাইবেল জাহাজে করে লণ্ডনে চালান হতে লাগল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ছ' হাজার বাইবেল লণ্ডনে পৌঁছে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা বেশিদিন চাপা থাকল না। জানাজানি হতেই বন্দরে বন্দরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হল এবং প্রতিটি জাহাজে খানাতল্লাসী শুরু হল। জনসাধারণের কাছ থেকেও বাইবেলগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। ফলে কিছু সংখ্যক বাইবেল সংগ্রহ হল এবং তা রীতিমত অনুষ্ঠান সহকারে পোড়ানও শুরু হয়। কিন্তু কত আর পোড়ান হবে? অ্যান্টোয়ার্পে রোজই অসংখ্য ছাপা হচ্ছে এবং তা' নানা উপায়ে লণ্ডনে এসে পৌঁছে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন পোপ-পুরোহিতদের অনুচরেরা আর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। চড়াদামে বাইবেল যাতে সরাসরি অ্যান্টোয়ার্প থেকে কেনা যায়—তা আর লণ্ডনে এসে না পৌঁছোয়, সেজন্য তারা লোক নিযুক্ত করল। সেই লোকদের মধ্যে ছিল টিন্ডেলেরই এক বন্ধু। সেই বন্ধুই একদিন টিন্ডেলের কাছে এসে গোপনে ব্যাপারটা জানাল এবং বলল, এমনিই ত তারা বাইবেল সংগ্রহ করে পোড়াচ্ছে এবং পোড়াবেও। তার চেয়ে যদি চড়া দামে তাদের কাছে কিছু বাইবেল বিক্রি করা যায়, মন্দ কি?

টিন্ডেলের সেই সময়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কারণ তিনি বাইবেলের নতুন সংস্করণের কাজ এর কিছুদিন আগেই শেষ করে, অর্থাভাবে তা ছাপাতে পারছিলেন না। তাই বন্ধুর এই যুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু বাইবেল তিনি চড়া দামে বিক্রি করে দিলেন। এইভাবে বাইবেল সংগ্রহ করে পোপ-পুরোহিতদের অনুচরেরা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রেলের সামনে অনুষ্ঠান সহকারে পোড়াতে লাগল। ফলে বাইবেল যত পুড়তে লাগল, জনসাধারণের কৌতূহলও ততই বাড়তে লাগল এবং তারা উৎসাহ সহকারে তা সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করে। অন্যদিকে পোড়াবার জন্য বাইবেল কেনার অর্থে টিন্ডেলের নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোতে লাগল।

এতদিন টিন্ডেল আত্মগোপন করেছিলেন। কিন্তু এবার তাকে ধরা পড়তে হল। ১৫৩৬ খৃঃ প্রথমে তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হলেন। তারপর শ্বাসরোধ করে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। লণ্ডনে যারা তাঁর কাজে সহায়তা করত, তাদেরও নির্বাসিত করা হল।

আজ জন উইক্লিফ নেই, উইলিয়ম টিন্ডেলও নেই। আছে তাঁদের আমরণ দুঃসাহসিক অভিযানের ফলশ্রুতি ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ : বাইবেল।

কুটিল চক্রান্তের দ্বারা মহৎ প্রয়াসকে অবদমিত করা যায় না—ইংরাজী বাইবেল [illegible] প্রমাণ হয়ে আছে।

টেলিগ্রাম : [illegible]
ফোন : [illegible]

জড়োয়া গহনা • ঘড়ি

গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত

রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স

৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

নিজের মৃতদেহের পাশে....

মায়া বসু

দরজার কাছে ডাক বিলি করে পিওনটা চলে যাওয়া মাত্র সুজয়া চিঠিখানা চোখের সামনে তুলে ধরল। পোস্টকার্ড নয়, বন্ধ খাম। বিশ্রী হাতের লেখায় নীরেনের নাম ঠিকানা লেখা।

সন্দেহের সেই কুটিল সাপটা সুজয়ার বুকের মধ্যে অনেকদিন পর আবার ফণা তুলে ধরল। উনুনে ডাল টগবগ করছিল, সুজয়া উঠোন থেকেই হাঁক পাড়ল, 'সুনু, ডালে একটু জল ঢেলে দে তো।' তারপরই খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে পড়তে সুরু করল।

যা ভেবেছিল তাই। লিখেছে সেই অতি ধুরন্ধর, চতুর লোকটা যার নাম ধীরেন। পরের ঘাড় ভাঙাই যার প্রবৃত্তি। পরগাছা-বৃত্তিই যার স্বভাব। ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা লিখেছে। '...নিরুপায় হইয়া আবার তোমাকে জ্বালাতন করিতেছি, ভাই নীরু, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহই নাই। তোমার বউদি মারা যাইবার পর হইতে ছেলেমেয়ে তিনটিকে লইয়া আমার কীভাবে দিন কাটিতেছে তাহা ঈশ্বর জানেন, তুমিও জান। ছোট মেয়েটা ভুগিয়া ভুগিয়া মারা গিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে। বাকী দুজনও সমানে ভুগিতেছে। আমার শরীরও শোকে তাপে অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। যেখানে আছি, সেখানে আর কোন মতেই থাকা চলিতেছে না। তাই মনস্থ করিয়াছি কিছু-দিনের জন্যে তোমার ওখানে কাটাইয়া আসিব। টুনুটা বড় হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ওর একটা পাত্র জোগাড় করিতে না পারিলে...'

এই পর্যন্ত পড়েই সুজয়ার চোয়াল শক্ত হল। কতকগুলো কঠিন রেখা ওর স্বাভাবিক লাবণ্যময় মুখের চেহারাটাকে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর করে তুলল।

দরজায় কড়ার শব্দ। নীরেন বাজারের থলেটা হাতে করে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই চিঠি হাতে সুজয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই শঙ্কিতভাবে থমকালো। 'কার চিঠি?'

'কার আবার? তোমার সাত সাতে উনপঞ্চাশ পুরুষের দাদার চিঠি!'

বাজারটা রান্নাঘরের বারান্দায় নামিয়ে রেখে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখেছেন ধীরেনদা? মানে বড়দা?'

'কি লিখেছেন, নিজেই পড়ে দেখ।' চিঠিখানা নীরেনের হাতের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুজয়া রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরেনের দু চোখে ভয় ঘনিয়ে এল। সে ভয় শুধু ধীরেনদার এখানে আসবার চিন্তাতেই নয়। আবার তার মাথার ওপর একটা বড় ঝড় ঘনিয়ে আসছে। পারিবারিক অশান্তি। সুজয়ার সঙ্গে কুৎসিত কলহ, মনোমালিন্য। ধার দেনা সংসার খরচ...যন্ত্রণা হতাশা...তাছাড়া টুনুর বিয়ে...কেমন করে...

সব মিলিয়ে...সব মিলিয়ে...একটা—একটা বীভৎস ব্যাপার।

রান্নাঘর থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত শব্দে বাজারের চুবড়িটা মুখ থুবড়ে নীরেনের পায়ের কাছে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বটি হাতে সুজয়াও রান্নাঘর থেকে ধমকের মত বেরিয়ে এসে শাক বাজারের থলেটা উপুড় করে কটু গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'তিন ঘণ্টা ধরে বাজার ঘুরে শেষে এই কিনে নিয়ে এলে? এই কটা আলু? কাঠকাঠির মত এই কাঁকড়া বরবটি- পোকাধরা বেগুন আর কুমড়োটা? আর এই কয়লা পাতের মত পাতলা পোনার টুকরো? দুবেলা আমি এতগুলো মানুষ এই নিয়ে কী পিণ্ডি চটকে দেব, তাই শুনি?'

জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল নীরেন।

প্রত্যেক দিনের মতন সুজয়াই ওকে বাজারের টাকা বার করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে কি আনতে হবে, কতটা আনতে হবে সবকিছুই বলে দিয়েছে। নীরেনও সুজয়ার কথমত প্রত্যেকটা জিনিস কিনে এনেছে। আলু বেগুন বরবটিই শুধু নয়। সেই সঙ্গে আগানের মত দামের রুইমাছও এনেছে বরাদ্দের চেয়েও বেশী। আর সেই মাছের টুকরোগুলো একেবারে পাতলা ফিনফিনে টুকরোও নয়। কিন্তু সেকথা এখন ওকে কোনমতেই মুখ ফুটে বলা যাবে না। চার টাকার বাজারের বদলে আজ যদি নীরেন ওকে দশ টাকার বাজার করেও এনে দিত, তাহলেও আজ ওর কাছ থেকে এই শক্ত শক্ত কথাগুলি শুনতে হত। আজ সুজয়ার কোন কথার প্রতিবাদ করা একেবারেই নিরর্থক।

CENTRAL LIBRARY

নিঃশব্দে চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজয়া থমথমে গলায় প্রশ্ন করল, 'এখনি চিঠিটার উত্তর দিতে যাচ্ছ বুঝি?'

এটাও সুজয়ার রাগের কথা। কেননা সুজয়া ভাল করেই জানে, কোন চিঠিপত্র আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দেওয়াটা নীরেনের ধাতে নেই। চিঠি লেখাতেই তার প্রচণ্ড কুঁড়েমি। কিন্তু এই তুচ্ছ কথাটাও আজ এই মুহূর্তে সুজয়াকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত সাহস অথবা শক্তি, কোনটাই নীরেনের নেই। তাই নীরেন সুজয়ার এই কথারও কোন জবাব দিল না।

জবাব দিলে, প্রতিবাদ জানালে, তর্ক করলে কী ফল হত বলা যায় না। কিন্তু স্বামীর এই নীরবতায় সুজয়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় একখানা কেন সাতখানা লেখগে যাও। কিন্তু দয়া করে গুষ্ঠিসুদ্ধ তোমার দাদাটিকে নেমন্তন্ন করে, আমার ঘাড়ে এনে ফেল না। একবার নয় দু-বার নয়, বার বার আমার এই হাঙ্গামা-ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না। এদিকে তোমাদের অফিসে গোলমাল লেগেই আছে। আর আমাদের অবস্থাও এমন নয় যে বারো মাস দাদাকে ঘরে রাখব। যেমন তোমার চোখের চামড়া না থাকা দাদা, তেমনি তার হ্যাংলা কাংলা অসভ্য ছেলেমেয়েরা। কবার এসে এসে আমাকে জ্বালিয়েপুড়িয়ে খেয়েছে। খরচের শেষ করিয়ে ফেলা ধার করিয়ে একেবারে ফোকলা করে দিয়ে গেছে। অদ্ভুত মানুষ বটে তোমার ওই দাদা! যার বাড়ি এখানে, এই টানাটানির সংসারে তিন-চারটে মানুষ এসে থাকবার কথা ভাবে কেমন করে? এতটুকু চক্ষুলজ্জাও কি নেই তাই? ঢের ঢের নির্লজ্জ বেহায়া মানুষ দেখেছি বাপু, কিন্তু তোমার ওই দুঃসম্পর্কের দাদার মত দু কানকাটা বেহায়া মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি। কোন কালে বাপ-মা-মরা তোমাকে কটা বছর একটু দেখাশোনা করেছিল বলে সারাজীবন ধরে সুদে-আসলে তার শোধ তুলে নিচ্ছে! মেয়ের বিয়ে দিতে হবে! মেয়ের বিয়ে দেয়া সুখের কথা কিনা? কী করে যে মানুষ একথা লেখে, ভেবে পাই না।'

বেশ কিছুদিন ফ্যাক্টরীতে গোলমাল চলছে। অফিস স্টাফের ভেতরেও সেই অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। কাজে কারুর মনই ভাল করে বসছে না।

কাজে মন লাগছিল না নীরেনেরও।

রোদে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে আসা জানলার ফ্রেমে আটকানো এক টুকরো ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে, ফাইলপত্তর ছাড়িয়ে বসে ভাঙা গলায় খাঁ-খাঁ ডাকা হাড়গিলে কাকটার দিকে তাকিয়ে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল একটা অজ্ঞাত অখ্যাত মফস্বল শহর। তবে শহর না বলে ওটাকে মফস্বল পাড়াগাঁ বলাই বোধহয় ভাল।

ঝোপঝাড় পুকুর-ডোবা ভাঙা পুরোনো শিবমন্দির, ছক কাটা-কাটা ধানক্ষেতের আল পেরিয়ে কলাগাছ বাঁশঝাড় পেরিয়ে প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে বসে যাওয়া ইটখসেপড়া একটা বিল্ডিং। সেখানকার হাইস্কুল। সেই স্কুল থেকেই একদিন সগৌরবে প্রথম বিভাগে পাস করে বেরিয়েছিল নীরেন। আজ যাকে অতি অভদ্রভাবে গালাগাল দিল সুজয়া, সেই ধীরেনদার বাবাই একদিন ওর হাতখানা ধরে হেড-মাস্টারমশায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, 'পোড়াকপাল ছেলেটার মাস্টারমশাই। না হলে জন্মাতে না জন্মাতে মা-টা মরে যায়? আর সেই শোকে এমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে ফেলে রেখে বাপ বিবাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে চলে যায়?'

আপন জ্যাঠা নয়। বাবার জ্যাঠতুতো দাদা। কিন্তু সে সম্পর্কটাও জানতে, বুঝতে পেরেছিল বহুকাল বাদে। বছর তিনেক বয়সে মা মারা গিয়েছিলেন। তারপরই বাবা একদিন সেই পাড়াগাঁয়ের বুড়ো মানুষটি আর তাঁর স্ত্রীটির হাতে ওকে তুলে দিয়ে সেই যে কোন তীর্থে না হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

সেই থেকে নীরেন জ্যাঠামশাই-জ্যাঠিমার কাছেই মানুষ। অনাদরে অবহেলায় নয়। সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসায় বাৎসল্যে। স্নেহে যত্নে মমতায়।

সেই দরিদ্র উদ্বাস্তু খেতখামার জমিজমা তদারক করে কোনমতে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখা স্নেহময় মানুষটির কথা বার বার মনে পড়ল নীরেনের।

ভাঙাচোরা ধসেপড়া জোড়াতালি দেয়া বাড়িটার মতই জীর্ণ প্রাচীন চেহারা ছিল বুড়োমানুষটির। জ্যাঠিমার রোগা ফ্যাকাসে চেহারা, শির বার-করা হাত দুখানায় দু গাছা মাত্র শাঁখা। বাসনমাজা, সাবান-কাচা রান্নাবান্না সবই নিজের হাতে করতেন। টাইম মত নীরেনকে ইস্কুলের ভাত রান্না করে দিতেন। টিফিন যেদিন যেমন সম্ভব হত, ঠিক সময়ে ধীরেনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। অভাবের সংসারে কোন-কিছু ভালমন্দ জিনিস এলে জ্যাঠামশাই নীরেনকেই বেশীর ভাগটা দিতেন। আহা, ওর বাপ-মা নেই! ইস্কুলে কত পড়ার চাপ, ও খাক। ও খাক।

জ্যাঠিমাও যেন জ্যাঠামশায়ের প্রতিচ্ছায়া ছিলেন। কত স্নেহ-ব্যাকুলতা, কত সতর্ক

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকলস
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫১৬৫, ১১৭৩০
মিডিয়াম-ওয়েভ	১১৮৭৫ ও ৯৬৪০
১৯০ মীটার	১৫৮০

দৃষ্টিই না ছিল তার ওপর! নীরেনের পড়াশোনার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে, তার ওপর।

সুজয়ার কটূক্তি মনে পড়ল। 'কেন, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হলেই তো পারতেন তোমার মতো? চাষা না হয়ে?'

নীরেনের মনে হয়, ধীরেনদার লেখাপড়া না হবার বেশ খানিকটা কারণ যেন সে নিজে। তারি জন্যে ওঁর লেখাপড়া হল না। মাথা মোটা ছিল। তেমন বুদ্ধি ছিল না। সকলের থাকেও না। নীরেনের মত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সব ছেলে হয় না। চেষ্টা করলেও হতে পারে না। কিন্তু ঘষেমেজে চেষ্টা চরিত্র করে মোটামুটি পাস করে যাওয়ার দলই তো বেশী।

নীরেনের চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড় ধীরেনের ঢিমেতেতালায় যেমন-তেমন করে যদিও বা পড়াশোনাটা যা হোক হচ্ছিল হঠাৎ জ্যাঠামশাই স্ট্রোকে মারা গেলেন। ওরা দুজনেই তখন প্রবেশিকার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার জন্যে ধীরেনকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার মাথায় নিতে হল। দুটো পয়সার জন্যে খেতখামারে ছুটোছুটি করা সুরু হল। তখন ধীরেনই নীরেনের পড়ার সব ভার হাসি মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল। সে সময় ধীরেন ওকে সমানে না পড়ালে, কলকাতার কলেজে পড়ার খরচ না জোগালে তার অবস্থা আজ বোধহয় ধীরেনের মতই হত। কিম্বা তার চেয়েও খারাপ।

স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করে নীরেন কলকাতার কলেজে ভর্তি হল। তারপরের কয়েকটা বছর ধীরেনের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। তাকে পড়ানোর খরচ পাঠাতে দাদাকে কী অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, সেকথা সুজয়া কল্পনাও করতে পারবে না।

তারপর ধীরেনদার বিয়ে হল। জ্যাঠিমা মারা গেলেন। টিউশনির টাকার সঙ্গে ধীরেনদার অনেক কষ্টে পাঠানো অর্থ-সাহায্যে নীরেনের কলেজের পড়াশোনা ভালভাবেই চলতে লাগল। ভালভাবে পাসও করল। আর কপাল জোরে মোটামুটি একটা চাকরিও তার জুটে গেল।

চাকরি পাবার পর বছরও ঘুরল না। ঠিক তারি মত বাপ-মা আত্মীয়স্বজনহীন সুজয়ার সঙ্গে কলেজে পড়ার সময়ই আলাপ হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা এবং ভালবাসাও হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। দাদা-বৌদির অনুমতি নিয়ে একদিন তাকেই বিয়ে করল নীরেন। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে কলকাতায় সংসার পেতে বসল, আর দশজন সাধারণ মানুষের মত। তারপর পৃথিবীর তথা সংসারের স্বাভাবিক, নির্ভুল নিয়মের মত, ধীরেনদার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো। আসা-যাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। নিজের চাকরি-বাকরি, বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে সেও ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়তে লাগল।

পাল্লার একদিক ভারী হলে অপর দিক হালকা হয়ে যায়। নীরেনের চাকরির কিছুটা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্যের যেন সীমাপরিসীমা রইল না। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাঙা বেড়ায় চাপা পড়ে ধীরেনের বৌয়ের কোমর ভাঙল। খবর পেয়ে নীরেন চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকাও পাঠাল। কিন্তু সে টাকায় কিছুই হল না। হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর জন্যে বাধ্য হয়ে কয়েক বিঘা ধানজমি বেচতে হল। বছরখানেক ভুগে ভুগে ধীরেনকে আরো খানিকটা দুঃখকষ্ট অভাব অনটনে ডুবিয়ে [illegible] চোখ বুজলেন। রেখে গেলেন দুটি মেয়ে একটি ছেলে।

ওদের নিয়ে ধীরেন দিশাহারা অবলম্বনহীন মানুষের মতই নীরেনের কাছে এসে আশ্রয় নিল সেই মহাবিপদে।

প্রথম প্রথম যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেও, কিছুদিন পর সুজয়ার চোখ

মুখের চেহারা কঠোর কর্কশ, কথা বলার ভঙ্গি বেসুরো হয়ে উঠল। দিনের বেলা অফিসের সময় বাদ দিয়ে যেটুকু সময় নীরেন বাড়ি থাকত, দাদার ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে থাকত। ধারেকাছে দাদাও থাকত। সুজয়ার অসুবিধে হত। কিন্তু রাত্রির নির্বিবাদিতে পরিশ্রান্ত, সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত সুজয়ার স্তব্ধতা, শালীনতার মুখোস নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেত। শোবার ঘরে খিল তুলে দিয়েই ও চাপা বিষাক্ত গলায় প্রশ্ন করত, 'ওরা কবে দেশে চলে যাবে?'

জেনেও না জানার ভান করতে হত নীরেনকে। 'ওরা কারা?'

'জান না কারা?' হিংস্র বিদ্বেষে দাঁতে দাঁত ঘষে সুজয়া জবাব দিত, 'ওই খুড়ুন্দের পাল আর তোমার আদিখ্যেতার বড়দা!'

'দোহাই সুজয়া, একটু আস্তে কথা বল। পাশের ঘরেই ওরা সবাই আছে। হয়তো এখনো ঘুমোয় নি...শুনতে পাবে।'

শুনতে পায় পাবে। একটু আক্কেল যদি তাতে হয় হোক, আমি বাঁচব। আমি আর এগুলোকে টানতে পারছি না। আমার শরীর আর বইছে না।'

সুজয়ার কণ্ঠস্বরে আগুন। দু' চোখে, কণ্ঠস্বরে মুখের বিদ্রূপ অভিব্যক্তিতে ঘৃণা বিতৃষ্ণা। র‍্যাশনের চালে তিনটে দিনও কুলোয় না। ব্ল্যাকে ডবল দামে চাল কিনে কিনে ফতুর হয়ে গেলাম। তোমার ভাইপো-ভাইঝিরা রাত দিন খাই খাই করছে। নিজের ছেলেমেয়ে দুটোকে পর্যন্ত পেট ভরে খেতে দিতে পারছি না ওদের জ্বালায়। আর বলিহারী তোমার দাদাকে। একাই তিনজনের ভাত খাচ্ছেন এক এক বেলায়। যেমন তিনি তেমনি তাঁর ছেলেমেয়ে তিনটে। আমার সমস্ত সংসারটাকে পেটের মধ্যে না পুরে ওরা এখান থেকে নড়বে না।'

'আঃ সুজয়া এত রাত্রে কী সুরু করলে? থাম এখন!'

'না থামব না!' সুজয়ার চোখের আগুন আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠল। 'কাঁচা চালগুলো পর্যন্ত ওরা তিনজনে মুঠো মুঠো চিবিয়ে খাচ্ছে, তা জানো তুমি?'

'কাঁচা চাল। ওরা কাঁচা চাল খায়!'

'শুধু কাঁচা চাল? দুবেলা থালা থালা ভাত গেলাচ্ছি, তাতেও তোমার ভাইপো-ভাইঝিদের পেট ভরে না!' নীরেনের স্তম্ভিত প্রশ্নের উত্তরে সুজয়ার চোখের তারায়, জিভের ডগায় আবার শাণিত ছুরির ফলা ঝলসে উঠল। 'যেখানে যা পাচ্ছে, গরু-ছাগলের মত পেটে পুরছে। ভাঁড়ারের কৌটো থেকে কাঁচা মুগের ডাল, র‍্যাশনের চাল-চিনি, আটা-ময়দা যখন যা পারছে চুরি করে মুঠো মুঠো মুখে পুরছে। এতটুকু শিক্ষা-সহবতও নেই। ছি ছি ছি! অমন হাড়হাবাতে হ্যাংলা ছেলেমেয়ে আমার নিজের হলে—'

অমন হাড়হাবাতে হ্যাংলা ছেলেমেয়ে তার নিজের হলে সুজয়া তাদের যে কী করত, কেটে কুচি কুচি করে জলে ভাসিয়ে দিত, না গলা টিপেই মেরে ফেলত—সে-কথা সে আর মুখে প্রকাশ করল না। কিন্তু মুখে না বললেও তার সমস্ত চোখ-মুখের হিংস্র অভিব্যক্তির মধ্যেই তার মনের কথা ফুটে উঠল।

টুনু মুনু শংকর।

মুহ্যমান নীরেনের চোখের সামনে বড়দার ছেলেমেয়েদের ফুলের মত নিষ্পাপ সরল মুখগুলি ভেসে উঠল।

সুজয়া মনের জ্বালায় যা ইচ্ছে বলুক না কেন, হতে পারে ওরা গেঁইয়া, অমার্জিত, কিন্তু অশিষ্ট অভদ্র অশান্ত প্রকৃতির নয়। অল্প বয়সেই নিজেদের দারিদ্র্য, দুঃস্থ অসহায় অবস্থা, পরাশ্রয়ের হীনমন্যতা মা-মরা ছেলেমেয়েকটি বুঝতে শিখেছে। বেশীর ভাগ সময়ই ওরা আস্তে কথা বলে, আস্তে হাঁটে, চুপচাপ বসেই থাকে। শৈশব-কৈশোরের স্বাভাবিক চাপল্য চাঞ্চল্য ওদের একেবারে নেই বললেই হয়। চেহারায় শিশু। কিন্তু মন বুড়োটে মেরে গেছে। ওরা যেন নির্জীব গৃহপালিত কয়েকটা পশুমাত্র। এক অদৃশ্য নিষ্ঠুর শাসকের শাস্তি অথবা চোখ-রাঙানির ভয়ে সদাসর্বদা সশঙ্কিত। ত্রাস-গ্রস্ত।

সেই টুনু মুনু শংকর চুরি করে খায়। কাঁচা চাল ডাল। আটা ময়দা চিনি।

কিন্তু কেন খায়? সুজয়া কি বুঝতে পারে না সে-কথা?

পেট ভরে না বলে খায়। ওরা পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়ে। যতই দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হোক না কেন, তবু দেশে থাকতে ওরা তিনবেলা পেটভরে লাল লাল মোটা চালের ভাত খেত। জলখাবারের বালাই ছিল না। ডাল-অম্বল মাছ-তরকারিরও প্রয়োজন ছিল না। এক কাঁসি মোটা চালের ভাতের সঙ্গে একটু ডালসেদ্ধ আলুসেদ্ধ আর দুটো কাঁচালঙ্কা। তাই ওদের কাছে অমৃত ছিল। নীরেনও তাই খেয়ে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু এখানে? এখানে ওরা কী খেতে পাচ্ছে?

দুবেলা মাপা চালের মাপা ভাত বেড়ে দেয় সুজয়া সবাইকে। ওদের ছেলে-মেয়েদুটোও একসঙ্গে খায়। তবে ওরা সাধারণতঃ খুব কম ভাত খায়। বাড়বার সময় সুজয়া নিজের ছেলেমেয়েদের যা ভাত বেড়ে দেয়, ওদেরও প্রায় সেইরকমই দেয়. বড়জোর মুখফুটে চাইলে আরো দু-একমুঠো বেশী দেয়, কিন্তু নীরেন জানে, তাতে ওদের কারুর পেটই ভাল করে ভরে না। আর জলখাবার? সে-কথা না বলাই ভাল। গিন্নির পাতলা পিস্‌ করে কাটা পাঁউরুটিগুলোর দু-একখানা

টুকরো খাওয়াও যা, না খাওয়াও তাই। অন্ততঃ ওদের পক্ষে।

'ওদের সঙ্গে মিশে মিশে আমার ছেলে-মেয়েদুটোও গোল্লায় যাচ্ছে। তুমি ওদের দেশে পাঠিয়ে দাও।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন বড়দা ওদের নিয়ে?' বিমূঢ়ের মত নীরেন উল্টে সুজয়াকেই প্রশ্ন করে বসল।

উত্তর রেডী করাই ছিল। জবাব দিতে তিলার্ধ দেরী হল না। 'কেন, এতকাল যেখানে ওরা ছিল, নিজেদের দেশঘরে। সেখানে কি মানুষ থাকে না, না নেই?'

'ঘর পড়ে গেছে, পাঁচিল ভেঙে গেছে। থাকবার উপায় থাকলে বড়দা এখানে আসতেন না। এতকাল থাকতে আসেননি।'

'বেশ তো, সেজন্য চিন্তা কেন? কে'টা টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে তুলে নিয়ে দেশের ঘরখানা সারিয়ে দাও। ওদের পুষতে কম খরচ তো আর হচ্ছে না। যা ছিল সব গেছে, যে ক'টা টাকা আছে, তাও যাবে। কিন্তু আপদেরা যদি ঘাড় থেকে ভালয় ভালয় নেমে যায় তাতেও শান্তি। আমি আর পারছি না।'

নীরেন তাই-ই করেছিল শেষপর্যন্ত। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে দেশের ঘর-বাড়ি মেরামত করে ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল।

কিন্তু কয়েক মাস পর আবার চিঠি এলো। দাদা নিজে নয়। তার বড় মেয়ে টুনু লিখেছে। কাকামণি বাবার বড় অসুখ। বড় ভয় করছে। তুমি একবার কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসো।

সুজয়ার ক্রোধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ টীকা-টিপ্পনি উপেক্ষা করে দেশে ছুটে গিয়েছিল নীরেন। সেখানে তাদের অবস্থা দেখে, ধীরেনের অসুখ দেখে ওদের সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল।

তারপরও মাঝে মাঝে এসেছে। আবার চলেও গেছে ধীরেন। যাবার আগে নীরেনকে সেই একই কথা বলে গেছে। 'তোদের এখানে এসে আমরা সবাই মিলে তোকে, বৌমাকে বড় জ্বালাতন করি নীরু, সবই বুঝি। কিন্তু না এসেও যে পারি না ভাই। তুই ছাড়া তিনসংসারে আমাদের আর কে আছে তাই বল?'

টুনুর পর মুনু। মুনুটা মারা গেছে। ভালই হয়েছে। মুনুর বয়সী ছিল ও। বেঁচে থাকলে ওরও বারো তেরো বছর বয়স হত। টুনু ওর চেয়ে তিন বছরের বড়। ষোলো বছর বয়স হল মেয়েটার। অযত্নে অবহেলায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে তাই, না হলে মেয়েটাকে দেখতে সত্যিই ভাল। পেটভরে খেতে পায় না। তবু ওর চেহারা দেখলে সেকথা মনে হয় না। গায়ের রং ফর্সা। মাথায় একরাশ চুল। টানা-টানা চোখ। টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট—

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HOL 2130

কিন্তু—কিন্তু তাতে কী হল ? শুধু সুশ্রী চেহারা দেখে তো বিয়ে হবে না। না জানে লেখাপড়া না জানে গানবাজনা। যা আছে অন্য কোন গুণ। নিঃশব্দে গাধার মত খাটতে পারে। রান্না থেকে বাসনমাজা জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। কিন্তু তাতে এই বাজারে মেয়ে পার করা যায় না। যদি টাকার জোর থাকত, অন্তত কিছুটাও, তাহলেও না হয় কথা ছিল। নীরেনেরই বা অত টাকা কোথায়? বার বার বললেই তো তাকে নিচ্ছে নিচ্ছে টাকাকড়ি বার করে দিচ্ছে। বড়দা কিভাবে নীরেন মস্ত একটা হোমরাচোমরা কিছু? হাজার দুহাজার মাইনে পায়? দাদাকে তো বহুবার আমার অবস্থার কথা খুলে বলেছি, লিখেছি, তবু দাদা কেন সেকথা বিশ্বাস করে না ?

অসহ্য বিরক্তিতে নিরুপায় তিক্ততায় হতাশায় নীরেন টেবিলে কনুই রেখে মাথার দুপাশে দুহাত টিপে ধরল।

'কী নীরেনদা ? শরীর খারাপ নাকি ?' জুনিয়ার সহকর্মী নিখিল সেন পাশে এসে দাঁড়াতেই সচেতন হল নীরেন। মুখের পাশ থেকে হাত নামিয়ে নিখিলের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল। 'শরীর মন দুই-ই খারাপ। কোনটাই ভাল নয়।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'দাদার চিঠি পেয়েছি। মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে আমার এখানে আসছেন। কিন্তু বিয়ে তো অমনি হয় না। জানই তো দাদার অবস্থা। আর আমিই বা কোথা থেকে অত টাকা পাব ? প্রভিডেন্ট ফণ্ডে কটা টাকাই বা পড়ে আছে ? লোন-টোন যদি—'

'লোন !' নীরেনের কথার মাঝখানে যেন হাতুড়ির ঘা মারল নিখিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করল 'ফণ্ডে একটা টাকাও জমা পড়ছে না। কোম্পানীর অবস্থা খুব খারাপ। হরিপদ ঘোষ তার বাবার শ্রাদ্ধে মাত্র দুশ টাকা চেয়েও পায়নি।'

'সে কী !' নীরেনের গলা শুকিয়ে গেল। বুক ধড়ফড় করে উঠল।

'তাই-ই। প্রোডাকশন বন্ধ। কেন ওয়ার্কাররা স্ট্রাইক করবে বলে শাসিয়েছে। আমাদের ব্যাপার নিয়ে যে গণ্ডগোল চলছে তারি রি-অ্যাকশন। ম্যানেজিং ডিরেক্টারও ওয়ার্কারদের কড়া গলায় জানিয়ে দিয়েছেন বার বার এই গণ্ডগোল তিনি কোনমতেই সহ্য করবেন না। ওরা স্ট্রাইক সুরু করলে তিনিও ফ্যাক্টরির গেটে লক-আউটের তালা ঝোলাবেন।'

'সেকথা তো সবাই জানে।'

'কেউ সবাই জানে না, এবার সেটা আপনি আমার কাছ থেকে ভাল করে শুনুন। খুব খারাপ খবর। গণ্ডগোলটা মালিকরাই বাধাচ্ছে ইচ্ছে করে। ওরা ফ্যাক্টরির এখান থেকে তুলে মাদ্রাজ কি বোম্বে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। নতুন স্টাফ দিয়ে কারখানা চালাবে। সে স্টাফের মধ্যে বাঙালী থাকবে না। বিশেষ করে আমরা কেউ-ই থাকব না।'

'কী সর্বনাশ! তাহলে কী হবে ?'

'কী আবার হবে ? চাকরি যাবে। না খেয়ে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে—'

পেছনে কার পায়ের শব্দ হতেই নিখিল তাড়াতাড়ি ওর টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

আর ঝিমঝিম মাথা নিয়ে ঠাণ্ডা কাঁপা আঙুলে কলমটা ধরে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীরেন মনে মনে জপ করতে লাগল। 'গুজবে কান দিতে নেই। গুজবে কান দিতে নেই। গুজবে কান দিতে......।'

সুজয়ার পরামর্শমতই চিঠিটা লিখল নীরেন। চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে। কমাস ধরে বাড়িটাও ছেড়ে দেবার কথা হচ্ছে। একটা বাড়ি পাওয়াও গেছে। সেখানে উঠে যাবার পর নীরেন দাদাকে জানাবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখন বড়দা এলেই ভাল হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পোস্টকার্ড খানার ওপিঠে দাদার নাম-ঠিকানা লিখতে লিখতে ধীরেনের নির্জীব রুগ্ন রক্তশূন্য চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল নীরেনের।

শিরবারকরা চামড়াকোঁচকানো হাত-পা। মুখে বয়সের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী আঁকিবুকি কাটা। দুঃখের রেখা ধৈর্যের রেখা সহ্যের রেখা। সামনের চুলগুলো পেকে ওঁর আরো বুড়োটে দেখায়। গায়ের পুরোনো সার্টটার ওপর টুনুর হাতের তালিমারা অনেক জায়গায়। ধুতিখানা বাড়িতে কেচে কেচে পরার দরুন লালচে, কোঁচকানো। হাঁটুর নীচে নামেও না। বারো-মাস সস্তার রবারের চটি পরার দরুন পায়ের আঙুলগুলো, গোড়ালি, ধুলোকাদা লেগে লেগে বিচ্ছিরি একটা কালচে ছোপ ধরে গেছে। মিলিয়ে বড়দা যেন জলহীন মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পাতাঝরা একটা শুকনো গাছ। যে গাছটাকে দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ওটা এখনো কেমন করে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ?

চিঠিখানা পোস্ট করে যেন একটা অবশ্যম্ভাবী আসন্ন ঝড়াট থেকে মুক্তি পেল নীরেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কষ্টকর অনুভূতি, এক বিষণ্ণ সুগভীর অপরাধবোধ ওর সমস্ত স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

দাদা চিঠি পেয়েই, পড়েই বুঝতে পারবে জলের মত স্বচ্ছ ওদের এই প্রতারণা। নীরেনরা ওদের এড়িয়ে চলতে চাইছে। ওরা চায় না, দাদা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এসে উঠুক।

জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দারিদ্র্য-জর্জরিত ওই মানুষটা অনেক মুড়্ক্ষাপটা অনাদর অবজ্ঞা, অনেক রূঢ়তা উপেক্ষা প্রতারণার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। বহু বিরুদ্ধ পরিবেশে অভ্যস্ত। নীরেন সুজয়ার মনের ভাব বুঝতে তার কিছুমাত্র দেরী হবে না।

কিন্তু তবু, কোনকিছুই আজ আর ধীরেনের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়।

বাড়ি বদলানো হল না।

ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের অসন্তোষ গণ্ডগোল অফিস স্টাফের মধ্যেও সংক্রামিত। সর্বদা কী হয় কী হয়। স্ট্রাইক হব হব। মালিকদের মনোভাবও অনমনীয়। কী হবে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দিন কাটছে রুদ্ধ আক্রোশে বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে। ধোঁয়ার আড়ালে আগুনের মত সবকিছুই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট।

এতদিনের চাকরি বুঝি যায় যায়। একবার লকআউট হলেই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মাইনে বন্ধ। শুধু তাই নয়। রিলায়েন্স ফ্যান ফ্যাক্টরির অবাঙালী ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখানকার কারখানা অফিস সমস্তই তুলে দেবেন। একথা নিশ্চিতভাবেই স্থির হয়ে গেছে।

কমাস ধীরেনদারও কোন খবর নেই। কোন চিঠিপত্র আসেনি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নীরেন পরে আবার চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তারও কোন জবাব আসেনি। অফিস নিয়ে সংসার নিয়ে বিব্রত নীরেনের দাদার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় উৎসাহ অথবা মনের অবস্থাও ছিল না।

মা-বাপ সুজয়ারও নেই। মাসীই মানুষ করে বিয়ে দিয়েছিল। তাকেই দেখতে গিয়েছিল ওরা দুজন বনহুগলীপুরে। সুনীতা আর সনৎ, ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়িতেই রেখে যেতে হয়েছিল। সেই ভোরে বেরিয়েছিল। এখন সন্ধ্যে নাগাত বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

স্টেশনের প্লাটফর্মে ভিড় আর ভিড়। মানুষ আর মানুষ। যাত্রী। উদ্বাস্তু। নোংরা জল কাদা শালপাতার ঠোঙা। গোয়ে-বসা অস্থায়ী সংসারপাতা মানুষ। ভিখিরি, কুকুর গরু কুলীর দল...... সব মিলিয়ে স্টেশনের চারপাশটাকে যেন নরক বানিয়ে রেখেছে। কী কদর্য পরিবেশ !

যাবার সময় ট্রেন ধরার ব্যস্ততায় এতটা কুৎসিত দৃশ্য নজরে পড়েনি। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম পার হবার সময় সবকিছুই চোখে পড়ল দুজনের। যেতে যেতেই দেখতে পেল কয়েকজন মানুষ ঘেরা প্লাটফর্মের এককোণে পড়েথাকা চাদর ঢাকা দেওয়া একটা মানুষের দেহ। সেদিকে না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল ওরা, কিন্তু তবু কানে গেল মিশ্রিত কথাবার্তার টুকরো।

'ও মশাই, বুড়োটা মরে গেল নাকি ?'

হ্যাঁ, তবে মরেনি, বলতে পারেন বেঁচে গেল।'

যা বলেছেন। কাঁদন যা কষ্ট পাচ্ছিল। চোখে দেখা যায় না। কে দেখে কে শোনে? কেউ যা একটু মুখে জল দেয়?'

'এতবার অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হল, হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে কিন্তু......'

'হাসপাতাল! অ্যাম্বুলেন্স! হাসালেন মশাই। ওসব আমাদের মত ইস্টিশানে পড়ে-থাকা ভিখিরি গরীব দুঃখীদের জন্যে নয়।'

আবার কে একজন যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আঃ! ধীরেনবাবু মারা গেলেন?'

'কপাল মশাই কপাল। কখন যে কে কীভাবে কোথায় মরবে, ভগবানই জানেন। ছেলেটা গাড়ি চাপা পড়ে মরল এই তো কদিন আগে......

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। শেষের কথাকটা কানে আসতেই এক ভয়ঙ্কর সন্দেহে, আশঙ্কায় পেছন ফিরে উল্টোমুখো হাঁটতে সুরু করল নীরেন।

সুজয়া ওর হাত চেপে ধরল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

কথা বলল না। শুধু দুর্বোধ্য আতঙ্কময় দৃষ্টিতে চাদর মুড়ি দেয়া শায়িত দেহটা দেখিয়ে দিল নীরেন সুজয়াকে।

ওদের দুজনকে দেখে লোকজনের ভিড় সরে গেল। নীরেন স্থির চোখে চাদর ঢাকা দেহটার দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখের চেহারা দেখে সুজয়াই প্রশ্ন করল, 'কে মারা গেছেন?'

পাশে বসে থাকা বয়স্ক লোকটি জবাব দিল, 'ধীরেনবাবু বলে একজন লোক। অনেকদিন স্টেশনে পড়ে ছিলেন, ভুগছিলেন...'

'কোথা থেকে এসেছিলেন?' সুজয়ার গলা কাঁপছিল। 'পাকিস্থান থেকে? উদ্বাস্তু?'

'না—না, পাকিস্তান থেকে আসবে কেন? হিন্দুস্থানেরই লোক। কমলপুরে বুঝি বান হয়েছিল কাগজে পড়েননি? বানের জলে ঘরদোর ভেসে যাওয়াতে...'

এসব দুজনেরই মনে পড়ল কমলপুরে ধীরেনের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে থাকবার মধ্যে বিশেষ কেউ নেইও। সাতকুলে কেউও না ওরা কেউ ওখানে। তবে কি শেষ পর্যন্ত ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল ওরা?

সুজয়ার পা-দুটো অসাড় বরফ-ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। পাথর-চোখে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীর দিক ও শুকনো গলায় কোনমতে প্রশ্ন করল, 'ওঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না?'

'ছিল বইকি মা। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। খিদের জ্বালায়, দুজনেই ভিক্ষে করতে বেরোতো। ধরা পড়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে বাস চাপা পড়ে মারা গেছে এই কদিন আগে। বেশ দেখতে ছিল ছেলেটা—বছর-বারো বয়স হবে, শংকর নাম—ধীরেনবাবুর ওই একটাই ছেলে।'

নীরেনের পাথর হয়ে যাওয়া শরীরটার আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে উঠল। কিসের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কে চুরি করতে গিয়েছিল? ধরা পড়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে কে বাস চাপা পড়েছে? ধীরেনের ছেলে শংকর? না নীরেনের ছেলে সনৎ?

আর একজন বলে উঠল, 'শুধু ছেলে কেন? একটা মেয়েও ছিল তো ধীরেনবাবুর। বছর সতেরো-আঠারো বয়সের। মেয়েটা দেখতেও বেশ ভালই ছিল। সন্ধ্যার পর তাকেও বেরুতে দেখতাম কতকগুলো বখা ছোকরার সঙ্গে। তাকেও তো বেশ কিছুদিন হল দেখতে পাই না। বোধহয় উধাও হয়ে গেছে কারু সঙ্গে। তা বাপু, তার আর দোষ কি? সোমত্ত মেয়ে, অল্পবয়স, এই ইস্টিশানের খোলামেলা জায়গায় এভাবে একটা মড়ো অথর্ব বাপের সঙ্গে...'

নীরেনের পায়ের তলায় মাটি কাঁপছিল।

নীরেনের চোখের সামনে সব তাসের নিয়ে যাবার, সর্বকিছু তলিয়ে নেবার উদ্বেলিত সমুদ্র উত্তাল হয়ে এগিয়ে আসছিল বুঝি তাকে গ্রাস করবার জন্যেই...নীরেনের সমস্ত পৃথিবীটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওলোট-পালট খাচ্ছিল। দুলছিল—কাঁপছিল।

'...মেয়েটার নাম ছিল টুনু...'

হঠাৎ কে যেন একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি নীরেনের বুকের মধ্যে বিঁধিয়ে দিল।

না-না-না—টুনু নয়, টুনু নয় মনু। শুনতে হয়তো ভুল করেছে লোকটা। নীরেনের বড় আদরের দুলালী মনীতা। সুজয়ার নয়নের মণি সুনীতা। ওদের একমাত্র মেয়ে সুনীতা।

অন্ধকার ভবিষ্যতের একখানা কালো চাপা ছবি নীরেনের চোখদুটো অন্ধ করে দিল।

লক-আউট। এ শহর থেকে কারখানা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উত্ত লোক থাকিল। চাকরি নেই...না খেতে পেয়ে সনৎ চুরি করতে বেরিয়েছে—আর মনু? মনু টুনু হয়ে যাচ্ছে। নীরেন আর সুজয়ার অক্ষম বোবা দু-জোড়া চোখের সামনে—

'দেখবেন না, যদি চিনতে পারেন—'

নীরেন আর সুজয়াকে কিছুমাত্র প্রশ্নোত্তর সুযোগ না দিয়ে একটা লোক মৃতদেহের মুখের ঢাকা চাদরখানা এক টানে সরিয়ে দিল।

পাথরের চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে নীরেন মৃতের মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কী আশ্চর্য।

এতক্ষণ ধরে লোকগুলো ওকে এত ভুল বোঝাচ্ছিল কেন? এতো তার বড়দা নয়। এ তো তার সেই ধীরেনদা নয়! এ তো সে নিজেই। যার নাম নীরেন।

কাঠকয়লার স্পষ্ট উজ্জ্বল আলোয় নীরেন তার নিজের বীভৎস মৃতদেহের, তার নিজের মৃত্যুর যন্ত্রণায় কুঞ্চিত বিবর্ণ মুখের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে বজ্রাহতের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

AIYARS-M. 173 BN

CENTRAL LIBRARY

জলসা

সঙ্গীত সম্মেলনী প্রযোজিত 'শাপমোচন'

আঁখিরে তুমি ভাঙবে যখন
অন্তরে তুমি ভাঙবে কি'?—

'রাজার মনে সন্দেহ ছিল, তাই উষার প্রথম কোকিলের ডাক, সূর্যোদয় মুহূর্তে রাণীকে দেখা দিতে, ছিল তাঁর দ্বিধা? কারণ, অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান'—এ অনুভবের জাগরণ অন্তরে না ঘটলে ও সুন্দরের যথার্থ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—।

কবিগুরুর 'শাপমোচন'-র এই স্বরূপকে নৃত্যে ও গানের লীলায়িত মাধুর্যে দর্শকচিত্তে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব নৃত্যুক্তভাবেই পালন করেছেন—সঙ্গীত সম্মেলনের সভাবৃন্দ রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ—তাঁদের 'শাপমোচন'—নৃত্যনাট্য।

গানে গানে সব বন্ধন টুটিয়ে দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুদিন বাদে হেমন্তকে শুনলাম রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে। মন্দ্রকণ্ঠে এবং দ্রুত মনে বলব—মনে রাখবার মতন গানই তিনি গেয়েছেন, একটি নয় একাধিক।

প্রথম দিকে 'জাগরণে যায় বিভাবরী'-র ঘুমহারা একাকীত্বের পর 'কখন দিলে পরায়ে'-তে আত্মবিস্মৃত বিরহীচিত্তের সুপ্ত চাওয়াই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল—উদার ছন্দের সীমাহীন ব্যঞ্জনায়—স্বপ্নে পাওয়া সুখস্মৃতির অশ্রু-উজ্জ্বল বেদনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল হেমন্তবাবুর অনাড়ম্বর গায়কীর অবগুণ্ঠিত নিবেদনে। 'সেদিন দুজনে', 'কোথা বাইরে দূরে'—'আনমনে' প্রভৃতি গানেই কবির অন্তরের আর্তি শুনেছি আর শুনেছি হেমন্তের নিষ্ঠাভরা মিনতি, যা রবীন্দ্রসংগীতের সুরশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখেও আপন বক্তব্যকে পেশ করতে জানে।

আর কণিকা?—রবীন্দ্রকাব্য, সঙ্গীত-নাটকের মধ্যে বিরহের যে অকূল পাথার উচ্ছলিত 'সেই ছোঁয়া অহরহ তোমার বিরহের নিবিড় আকুতিরই নানারঙ রূপ তাঁর এক একটি গান 'অন্ধকারের বুকে মেঘে যাওয়া বিদ্যুতা' 'আমি এলেম তোমার দ্বারে—আবার চাঁদের আলোয় সরণী আঁকিত রাতের বিরহ-স্তব্ধতায় চমকে উঠে দেখা পথের কাছে তারই মালা পড়ে চাঁদ না-ওঠা রাতে যে অজানার অনুভব প্রাণের তারে বেজে উঠেছিল—গানেরই সুরে। সবই যেন সুন্দরের অশ্রু-ভরা বেদনার রূপকে শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্য মধুর করে তুলেছে। আর এই মধুরতার অন্তহীন রূপরেখা সাতরঙা ইন্দ্রধনুর মতই বিচ্ছুরিত আলোয় ছড়িয়ে ছিল 'বড় বিস্ময় লাগে'-র বিস্ময়-দোলে। করুণ আবেগ, হৃদয়ভরা অনুরাগ, ছিল রবীন্দ্র-গীতিতে—তাতে লাগল শিল্পীর বিহ্বল অন্তরের ছোঁয়া—তাই ও 'ঐ মুখ ঐ হাসি কেন এত ভালবাসি' শুনে বারবারই মনে হয়েছে সমুদ্রের যদি অমনই অনন্ত তরঙ্গ না রইল তবে আর তাকে সাগর নামে অভিহিত করা কেন?

নাচের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অরুণেশ্বররূপী কুনাল দত্তের কথা। এর আগে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দেখতে বেজে বারবার মনে হয়েছে এতে সুদর্শনা এবং নৃত্য-কুশলা নায়িকার অভাব নেই—কিন্তু ঐ দুটি চাহিদার দাবী মেটাতে পারার মত পুরুষ শিল্পীর একান্ত অভাব। কুনাল দত্তকে দেখে মনে হোলো এ অভাব তিনি অনেকখানিই পূর্ণ করতে পারবেন। নৃত্য-লালিত্য, অনুভব, দেহলাবণ্য ইত্যাদি নৃত্য-শিল্পীর উপযুক্ত সকল বস্তুই এঁর আছে, আর আছে প্রতিভা। উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে ইনি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হয়ে উঠতে পারবেন—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

অরুণেশ্বরের বীণ ছাড়া, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতারে অপরূপ সুরে বেজেছে কেদারায় আহিরনে। বেহাগের আশঙ্কারী বেদনায় ও শরতের কমনীয় মীড়।

কমলিকার ভূমিকায় শাশ্বতী গাঙ্গুলী সত্যই কমলিকা হয়ে উঠতে পেরেছেন—শুধু নৃত্যে নয় ভাবেও। তবে সকলেই কিছু নিষ্প্রভ দাঁড়িয়ে পাড়া দিয়েছে। রাজার সহচরবৃন্দের নৃত্যাভিনয়ের বেলা এবং রাণীর শিশু সহচরীদের স্বাভাবিক অ-পরিণত—নৃত্য সামগ্রিক সাফল্যকে ব্যাহত করেছে। অবশ্য এ ত্রুটি অনেকাংশেই পূর্ণ করেছেন আলোকসম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া। সঙ্গীতে ও নৃত্য পরিচালনায় প্রভাতভূষণ মিনতি গুহ ও কুনাল দত্ত।

বেগম আখতারের কণ্ঠে বাংলা গজল

ঠুংরী গজল ও দাদ্‌রার রাজ্যের মহিমময়ী-স্বরূপা বেগম আখতার আজও স্ব-মর্যাদায় এবং সগৌরবেই আপন রত্ন-বেদীতে সমাসীন—দেওয়ানা বানানা যার শিল্পীর প্রকাশবৈভব, সুরোচ্ছল চিত্রের প্রসন্নতা এবং প্রতিটি সপ্তকে কণ্ঠের অনায়াসস্বচ্ছন্দ বিহার আজও দর্শকচিত্ত দুলিয়ে দেয়—ঠিক তেমনই করে যেমন করে দিত তাঁর যৌবনের 'কোয়েলিয়া মত কুকারি যা'-এবং আরো অনেক জনপ্রিয় গান—যে গানের সঙ্গে জড়িয়ে বেগম আখতার'-ই একাধিপত্য করছেন রসিকচিত্তে।

এই কথাটিই নতুন করে অনুভব করলাম সেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে। যখন এবারের পুজোর জন্য বেগম আখতারের কণ্ঠে দুটি বাংলা ঠুংরী ও দাদ্‌রা রেকর্ড করা হচ্ছিল। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ফৈজা-বাদী আখতারী বাঈ-এর কণ্ঠে বাংলা গান শুনতে যাবার আগে মনে সন্দেহ ছিল না তা নয়। বেগম আখতারের মুখে বাংলা গান সে কেমন হবে? বাংলা গানে কথার একটি বিশেষ ভাষ্যই শুধু নেই, তারও আছে এবং এ সম্বন্ধে শিল্পীরও একটা দায়িত্ব নিশ্চয় আছে। সে দায়িত্ব এই অবাঙালিনী শিল্পী কতখানি পালন করতে পারবেন—অথবা আদৌ পারবেন কিনা—শুধু শুধু নামকরা শিল্পীকে দিয়ে বাংলা ঠুংরী গাওয়ানোর স্টান্ট দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী তার সুনামের অমর্যাদা করছেন না ত? এইরকম হাজারটা প্রশ্ন মনে জেগেছিল।

কিন্তু রবি গুহমজুমদার রচিত দুটি গানের প্রথমটি 'ও মৌসুমী পরদেশী'—ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল দ্বিধা ও সংশয়কে ভাসিয়ে দিয়ে পরদেশী-র বিচ্ছেদ কাতর চিত্তের আর্তি—যেন কথা কয়ে উঠল,—যার সুরের ওঠা বেদনা ধারা ছিল চির স্বাদে।

ছোট্ট মীড়ের চকিত দ্যুতিতে—কখনও ঝমঝমার ধনিয়ে-ওঠা মধুরতায়, গানের মর্মলীন বেদনা আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের ওপর বিদ্যুৎলতার মতই ঝলকে উঠল। কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়ায় কি অনুভবের উজ্জ্বল কল্লোল শোনা গেল? হাওয়া যেন প্রতি সুরের বাঁকে বাঁকে কাঁপিত জলকণাকে ম্লান করিয়ে দেয়।

তার পরের দাদ্‌রা—'জোছনা করেছে আড়ি'তে ছন্দের বিলোল গতিতে বিলম্বিত লয়ের কি অপূর্ব সংযম।—কখন জেগে মুক্ত হতে হতে বলেই বুঝি নন্দনিকাদের আভাস এত রমণীয়? চাচর ছন্দের কি কৌতুকী দোলা—প্রতি স্তবকের বাঁকে বাঁকে। উচ্ছল মুহূর্তের উচ্ছ্বাস অনন্তের বুকে আছড়ে পড়ছে, জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রের বালুবেলা হেসে উঠছে—আর দাদরা গজলের বুলবুলি গেয়ে চলেছেন 'জোছনা করেছে আড়ি'—এই আড়ি-ভাবের রহস্য-লীলাকে ব্যঞ্জনাগভীর করেছে মহম্মদ সগীরুদ্দিন ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান। গ্রামোফোন কোম্পানীর এ মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায়?

—চিত্রাঙ্গদা

CENTRAL LIBRARY

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত রূপকৃৎ পিকচার্সের 'অন্য মাটি অন্য রং' ছবিতে শিবানী বসু ও অনুপকুমার।

প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকার যুব চলচ্চিত্রোৎসব এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনাচক্র

১৫ তারিখটি বাদে ৬ থেকে ১৭ আগস্ট—এগারো দিন ধরে একই প্রোগ্রাম নিয়ে (সকালে, বিকেলে ও সন্ধ্যায়) তিনবার করে দেখিয়ে আমেরিকার যুবকদের নির্মিত প্রায় শতেক চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল হো চি মিন সরণীস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে। প্রতিদিন প্রায় দেড়ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট-ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে কম দু'খানি থেকে তেরোখানি পর্যন্ত ছবি দেখানো হয়েছে প্রদর্শনীর মাঝে তিনটে ক্ষণকালের বিরতি দিয়ে। কর্তৃপক্ষ পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমেরিকাস্থ ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন এজেন্সী প্রায় পাঁচশো ছবি থেকে বেছে এই শতখানেক ছবি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনের জন্য পাঠালেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে আগে থাকতে ছবিগুলির প্রদর্শন-যোগ্যতা সম্পর্কে বিচার করবার সুযোগ হয়নি যথেষ্ট সময় থাকতে ফিল্মগুলি তাঁদের হাতে না আসার দরুণ। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, ছবিগুলির মধ্যে প্রায় ষাটখানি কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের তৈরী, কুড়িখানি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী দ্বারা নির্মিত এবং বাকী ছবিগুলি হয় তের বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েরা, আর নয়তো শিক্ষক ছাত্র-শিক্ষকদের সহযোগিতায় তৈরী হয়েছে। এবং সবশেষে এও জানানো হয়েছিল ছবিগুলিকে প্রধানত নাট্যধর্মী, তথ্যমূলক, অঙ্কিতচিত্রের সজীবীকরণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক—এই চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এগারোদিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সবকটি দিনই উপস্থিত হবার মতো সময় ও সুযোগ আমাদের হাতে ছিল না। আমরা মাত্র চার কি পাঁচদিন আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে উপস্থিত হয়ে কিছু ছবি—গোটা সাতচল্লিশ—দেখতে পেয়েছি। এদের মধ্যে কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট, কিছু আপাতদৃষ্টিতে আমার বিচারে কাহিনী এবং আরও কিছু ব্যাখ্যামূলক। বহু ছবিতে প্রচুর 'অপটিক্যাল'-এর ব্যবহার দেখে বিস্মিত হলাম; কারণ আমাদের সুদক্ষ কলা-কুশলীরাই 'অপটিক্যাল'-এর উপযুক্ত ব্যবহার জানেন।

ছবিগুলির মধ্যে 'ওয়াড অ্যাণ্ড দি ওয়াম', 'ইনসিডেণ্ট ইন এ গ্লাস ওয়ার্ক শপ', 'স্যাণ্ড কাসলস', 'দি থীফ', 'ফ্লাই ইন এক্সেস' 'রিপিটিভ প্রোসেশন', 'এম্বর বোন', '৭৩৬২', 'ওমেগা', 'ইটস আবাউট দিস কার্পেণ্টার' প্রভৃতি ছবি আমাদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে। আবার অনেক ছবির বক্তব্য মাত্র ছবি দেখে অনুধাবন করতে পারিনি। মনে হয়, সেগুলি ছবির জন্যই ছবি তাদের বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই।

—কিন্তু এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখে মোটের উপর যে-কথাটা আমাদের মনে উদয় হয়েছে, তা হচ্ছে এই : আমেরিকা হচ্ছে প্রাচুর্যের দেশ। তাই চলচ্চিত্র তৈরী নিয়ে খেলা করা সে-দেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভব। শুনলে আশ্চর্য হব না, সেখানকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছেলে-মেয়েরই পকেটে থাকে একটি করে ৮ মিঃ মিঃ ক্যামেরা। এবং তাদের মা-বাপ তাদের চলচ্চিত্র তৈরীতে উৎসাহ দেবার জন্য বেকসুর খরচ করতে পারেন। কাজেই ছবি তৈরীর খেলা করতে করতে তাদের পক্ষে দু'পাঁচটা দেখাবার মতো ছবি তৈরী করে ফেলা এমন কিছু আশ্চর্যের বা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়ের কাছে ব্যাপারটা অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। টাকার অভাবে আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির জন্যে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ কিনতে পারে না, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নাটকে এম-এতে 'ফিল্ম কোর্স' সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়েও তাকে কার্যকরী করতে পারে না, আমাদের দেশে ফিল্ম ফিল্ম খেলা অত্যন্ত বড়োমানুষী চিন্তা।

এই যুব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শেষে যে আলোচনা-চক্র বসেছিল, তাতে শ্রীসত্যদেব দুবের কারণ এ-বিষয়ে যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছিল। 'সমালোচক ও সহযোগী (ভিসানারি) রূপে নবীন চলচ্চিত্রকার-প্রসঙ্গে আমেরিকা থেকে আগত, 'আমেরিকান আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম'-গ্রন্থের লেখক, চলচ্চিত্র-সমালোচক ও পরিচালক শেলডন রেনান এদেশে ফিল্ম তৈরীর সহজ পথ বাৎলাবার জন্যে যে-কয়টি নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কথা মনে রেখেই বলছি, তিনি ব্যাপারটাকে যতখানি সহজসাধ্য ভেবেছেন, আসলে তা তার থেকে অনেক, অনেক কঠিন। এ-দেশের সরকারের ধারাকরণ যদি তিনি জানতেন, তা হলে তিনি একখানি আশাবাদী হতে দ্বিধা করতেন।

চিত্র-সমালোচনা

বিগত যুগের কাহিনী

কস্তুরী ফিল্মস-এর প্রথম নিবেদন, আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে গঠিত, মুকুল মজুমদার প্রযোজিত এবং দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ছবিটি এমনই এক ফেলে-আসা যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে-যুগে আমাদের সমাজে বিবাহে গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল, যানবাহন হিসেবে গরুর গাড়ী ও নৌকাই ব্যবহৃত হত এবং চিকিৎসার জন্য লোকে কবিরাজমশাইদের শরণ নিত। এমনই এক যুগে জন্মগ্রহণ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ রামকালী চাটুজ্যের মেয়ে সত্যবতী কি জানি কেমন করে সত্যপথের সন্ধান পেয়েছিল। সে জেনেছিল, পুরুষের তৈরী আইনই মেয়েদের চিরকাল অশিক্ষিত রেখে তাদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, তাদের পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছে নিজেরই স্বার্থে। তাই স্নেহপরায়ণ বাপের আদরের মেয়ে সত্যবতী

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীবৃন্দ অভিনীত 'উল্কা' নাটকের একটি মুহূর্তে নিশীথ বড়াল, ইরা মিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সেন ও শিপ্রা চক্রবর্তী।

পথে প্রান্তরে প্রকৃতির কোলে ঘুরে বেড়িয়েও লেখাপড়া শেখাকে প্রয়োজন মনে করেছে এবং সকলের অজ্ঞাতেই তা শিখতেও শুরু করেছে। ও লিখতে পড়তে শিখেছে শুনে ওর বাপ অবাক হয়ে গেছেন, কিন্তু ওর বুদ্ধির কাছে হার মেনে স্বীকার করেছেন, ও কিছু অন্যায় করছে না এবং তাই ওকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছেন। সহজ বুদ্ধি নিয়ে ও যেমন গ্রামের জটাধার পিছনে লাগতে ছাড়েনি স্ত্রীকে লাথি মারার অপরাধে, তেমনই পরের মেয়েকে কলঙ্কভ্রষ্ট হওয়ার সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ওর বাবা যখন ওর সদ্যবিবাহিত মেজদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছাঁদনাতলায় দাঁড় করিয়েছিলেন, তখনও ও মেজদার প্রথমা স্ত্রীর জন্য দুঃখবোধ না করে পারেনি। এই সহজ বুদ্ধিই ওকে শিখিয়েছিল, বাল্যকালে বিবাহিত হওয়ার দরুণ ওকে শ্বশুরবাড়ীতে যখন ওকে একদিন যেতেই হবে, তখন ওখান থেকে যখন ওকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে, তখন মিথ্যে তিক্ততার সৃষ্টি না করে ওর সেখানে সসম্মানে যাওয়াই ভালো এবং শাশুড়ী যতই ওর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে চান না কেন ওকে কিছুটা সহ্য করে ও কিছুটা যুদ্ধ করে সেখানে নিজের জায়গা করে নিতেই হবে—ও জানে, ঘটি বাটি একসঙ্গে থাকলেই কিছু-না-কিছু ঠোকাঠুকি হবেই। ওর স্বাভাবিক সৎ মনের মধ্যে আপনা থেকেই একটা আদর্শ গড়ে উঠেছিল, যে-আদর্শ ওর শ্বশুরের অমিতাচারের বিরুদ্ধে ওকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওকে ওর শ্বশুরগৃহে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল; এমনকি ওরই তেজোদৃপ্ত রূপ ওর ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর মধ্যে পৌরুষ জাগিয়ে তুলে তাকে ওর যোগ্য স্বামী করে তুলল।

ছবির সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না যে সত্যবতীই হচ্ছে এর মূল চরিত্র এবং ওরই মানসিকতার ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ছবির মূল বক্তব্য। কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত চিত্রনাট্যের প্রথমার্ধে এই সত্যবতী চরিত্রটিকে সব সময়ে কেন্দ্রস্থলে রাখতে পারেননি; ফলে কোনো সময়ে মনে হয়েছে এ-কাহিনীর নায়ক হয়ত রামকালী চাটুজ্জে, আবার কখনও মনে হয়েছে ওর মেজ ছেলে ও তার নববিবাহিতা স্ত্রীই (সমিত ভঞ্জ ও হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়) বুঝি কাহিনীর দুই প্রধান চরিত্র। গল্পের ভারসাম্য এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছবি অতিক্রান্ত হবার পরে সত্যবতীতে এসে থেমেছে। ফলে ছবির প্রথম দিকটা কিছু কিছু ছাড়া ছাড়া লেগেছে—যাকে বলে সুসংবদ্ধতার অভাব, তাই ঘটেছে পুনঃপুনঃ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে, যখন সত্যবতীর প্রতি সকল দর্শকের চক্ষু নিবিষ্ট হতে পেরেছে, তখন স্বভাবতই একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা গেছে চিত্রনাট্য তথা ছবিটিতে। নারীকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রথম প্রতিশ্রুতি যে সত্যবতীর কাছ থেকেই এসেছে, তা ছবির দ্বিতীয়াংশেই হয়েছে দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুট।

নায়িকা সত্যবতীর ভূমিকায় নবাগতা সোনালী গুপ্ত ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী রূপে অভিনয়ের মধ্যে এমন একটি প্রাণের স্পর্শ দিতে পেরেছেন, যার মাধুর্য ছবিটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ বিশেষ নাটমুহূর্তে তিনি ভূমিকাটিতে ব্যক্তিত্ব আরোপেরও প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। রামকালীর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। শাশুড়ী এলোকেশী বেশে গীতা দে একটু বেশী সোচ্চার। অপরাপর ভূমিকায় হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, কাজল গুপ্ত মঞ্জিলা দেবী, পদ্মা দেবী, অনুভা ঘোষ চিন্ময় রায় প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বহু জায়গায় ফোটোগ্রাফী বেশ কাব্যধর্মী, আবার কোনো কোনো জায়গায় নাট্যক্রিয়ার অনুসারী। সম্পাদক ছবির প্রথম অংশকে আরও কিছুটা

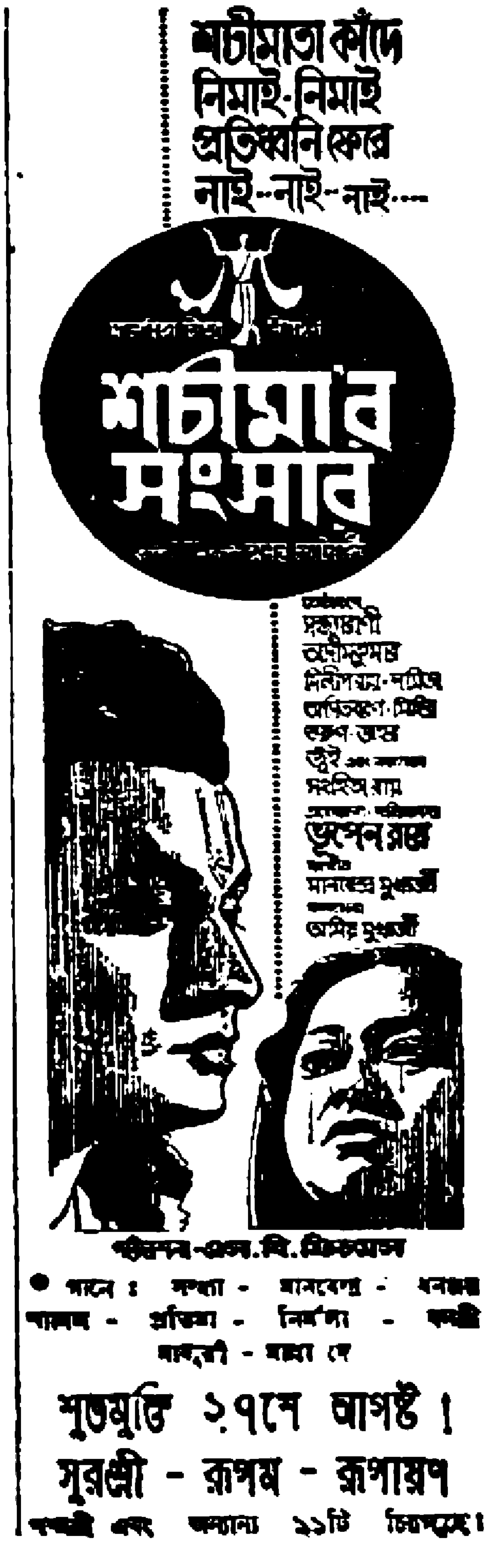

অরিন্দম/সন্ধ্যারাণী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

সুসংবদ্ধ করবার প্রয়াস পেতে পারতেন। ছবির আবহ-সঙ্গীত পরিস্থিতি রচনায় সাহায্য করেছে। গান দুখানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও আশানুরূপ ব্যঞ্জনাসৃষ্টিকারী হয়ে ওঠেনি।

কস্তুরী ফিল্মস নিবেদিত, পিয়ালী ফিল্মস পরিবেশিত ও দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' একটি তাজা উপভোগ্যতার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই বহন করে।

একটি নব্য ভাবনার ছবি

মহারাষ্ট্র রাজ্যে একটি বিশেষ ধরনের প্রথা চালু আছে। হাতে কিছুটা সময় থাকলেই শিক্ষিত যুবকেরা কোনো একটি রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে একটি নকল বিচারালয় খুলে বসেন; একজন দোষী সাজেন, একজন বিচারক, একজন অভিযোগী ব্যবহারজীবী, একজন আসামীপক্ষের ব্যবহারজীবী এবং বাকী কজন সাক্ষী। পথ-চলতি দর্শকও জুটে যায় অনেক। বেশ ঘণ্টা কয়েক কেটে যায় শিক্ষার সঙ্গে আমোদের মধ্যে। এই প্রথাকে অবলম্বন করে অনেক নাটকও গড়ে উঠেছে মারাঠী ভাষায়। বিজয় তেণ্ডুলকর প্রণীত 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' (সাইলেন্স, দি কোর্ট ইজ্ ইন সেশন) হচ্ছে এই শ্রেণীর একটি বিখ্যাত নাটক; এই নাটকটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাটকে সাতজন পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাটকে সাতজন সমাজ সেবক আমেরিকার ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে ঐ দেশের প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করে। কিন্তু ঐ একই বিচার করে করে ক্লান্ত হয়ে ওরা এবার সাব্যস্ত করল ওদেরই দলভুক্ত ভূতপূর্ব শিক্ষিকা লীলা বেনারেকে ওরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ভ্রূণ হত্যার অপরাধে। শ্রীমতী বেনারে তর্ক করতে ভালোবাসেন প্রতি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করতে ওঠেন; শ্রদ্ধা তাঁর কোনো কিছুরই ওপর নেই যেন। বেশ খেলাচ্ছলেই বিচার শুরু হল। মাঝে মাঝেই কেউ-না-কেউ অন্য কথা বলে পার্শ্ববর্তীকে; বিচারের কাজ বাধা পায়। বিচারকরূপে সর্বাশ্বত সমাজজ্ঞানী কাশীকর বলে ওঠেন : 'চুপ, চুপ, এখন বিচার চলছে।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় তখন দাঁড়িয়ে রোকড়ে বেচারা কেঁপে সারা হচ্ছে। লোকটি কাশীকর ও তাঁর নিঃসন্তান পত্নীর আশ্রিত, খানিকটা হেলাখেলা ধরনের। শ্রীমতী বেনারে তাকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে উত্যক্ত করে তুলেছেন। রোকড়ে হঠাৎ খেপে গিয়ে বলে ফেলল, সে শ্রীমতী বেনারেকে একদিন রাত্রিবেলা প্রোফেসর দামলের ঘরে একা থাকতে দেখেছে। প্রোঃ দামলেও ঐ দলেরই একজন; আজ তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে রঘু সামন্ত নামে একটি স্থানীয় লোককে। রোকড়ে এই কথাটি বলা মাত্র বিচারশালার আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকলের চোখ চকচক করে উঠল, জিব থেকে লালা ঝরতে লাগল, নাকের ডগা ফুলতে লাগল রক্তের স্বাদ পেয়ে। তখন সেনারে হয়ে পড়ল বেচারা। বেচারার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতম অধ্যায়গুলি নিয়ে ওরা যাচ্ছেতাই শুরু করে দিল। ও নাকি ওর পনেরো বছর বয়েসে ওর এক মামাকে ভালোবেসেছিল এবং তাতে ব্যর্থকাম হয়ে ও নাকি আত্ম-হত্যাও করতে গিয়েছিল। অধ্যাপক দামলের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ফলে ও সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ায় ও নাকি রোকড়ে ও পোঙ্কসে (দলের আর একজন)—এই দুজনেরই কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। এবং মাত্র ঐদিনই নাকি ওর স্কুলের চাকরীটি গেছে চরিত্রহীনতার অভিযোগে। নিজের জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়েই নাকি ও সব সময়েই এক শিশি বিষ সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। বেচারা শ্রীমতী বেনারেকে মাত্র দশ সেকেন্ড সময় দেওয়া হল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে। কিন্তু সবই যে সত্যি! কোন্ কথাটা ওদের খণ্ডন করবে ও? যে-বয়সে ও নিজের মামাকে ভালোবেসে-ছিল, তখনও সত্যিই জানত না ওর মধ্যে কিছু পাপ আছে। যখন ও তা জেনেছিল, তখনই ও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল এবং তাও নাকি অন্যায়। হ্যাঁ, প্রোঃ দামলেকে ও ভালোবেসেছিল; তাঁর মনের উদারতা ও সৌন্দর্য দ্বারা ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে-ছিল। কিন্তু তিনিও তো মানুষ। দেখা গেল, তিনি ওর দেহটাকেই চান। তাই ও ওর দেহটাকে ঘৃণা করে। ঐ দেহই ওর চারিত্রিক পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু তাই কি সত্যি? ঐ দেহ দিয়েই ও কি একটি মুহূর্তের জন্যেও স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেনি, যার ফল ও নিজের মধ্যে বহন করছে? কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ওর যাই হোক না কেন, স্কুল-শিক্ষিকা হিসেবে ও কি অপরাধ করেছে? মেয়েদের ও কি আনন্দময় জীবনযাপন করতে সাহায্য করেনি? পৃথিবীর মহৎ ও সুন্দর জিনিস-গুলি দেখতে ও কি ওর ছাত্রীদের শেখায় নি?—তবে কেন আজ ও যখন স্কুলে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময়ে ওকে ছাটাইয়ের সংবাদ দেওয়া হল?—এই কাহিনীটিকে মারাঠী ভাষায় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নব্যধর্মী পরিচালক সত্যদেব দুবে। ছবির আরম্ভ শ্রীমতী লীলা বেনারের কর্মচ্যুতি সংবাদ নিয়ে। তিনি মানসচক্ষে দেখছেন তাঁর ছাত্রীরা আনন্দে যেন নেচে বেড়াচ্ছে; তিনি সাদরে এক-একটি ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরছেন। টেলিফোন যুবলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের তাঁর কোনো রাস্তাই খোলা নেই। তিনি বেরিয়ে পড়লেন

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, অপর্ণা দেবী, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, শম্ভু ভট্টা, রেণুকা দাস, কুমারী মিঠু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

এবং ঐ সমাজসেবী দলের সঙ্গে ট্রেনযোগে চললেন 'বিচারালয়'-এর খেলা খেলতে কোনো এক মফঃস্বল শহরে। পরে যা ঘটল্ তা ওপরেই বলা হয়েছে।

ছাত্রীদের সম্বন্ধে স্লো-মোশানে ভাবনার দৃশ্য একটি নতুন অনুভূতি জাগায় দর্শকদের মধ্যে। পরে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটি প্রায় মঞ্চনাটকের ঢঙে তোলা হয়েছে; অভিনয়ও মঞ্চ-নাটকের পদ্ধতি অনুসৃত। কিন্তু যেইমাত্র রোদ্দুরে খেপে গিয়ে শ্রীমতী বেনারের ওপর যথার্থ দোষারোপ করল, সেই মুহূর্তেই ছবিটি এমন আচম্বিতে বিচিত্র আধুনিক রূপ নিল চিত্রগ্রহণ (শর্ট্ টেকিং-এ), বহির্দৃশ্যে ও আলোর খেলায় এবং জুম্‌লেন্সের সুচতুর প্রয়োগে, আলোকসম্পাতে, সংলাপের বৈশিষ্ট্যে, আবহ-সৃষ্টিকারী যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগে এবং সম্পাদনায় যে এমন আধুনিক ছবি ভারতবর্ষের বুকে তৈরী হতে আমরা ক'টা দেখেছি, তা ভাবতে হয়। শ্রীমতী বেনারে ও প্রসিকিউসন কাউন্সিল-এর ভূমিকায় শিল্পী দুজন যে কি আশ্চর্য নাট্য-নৈপুণ্যের অধিকারী, তা বলে বোঝাবার নয়।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর টাকায় তোলা এই সত্যদেব গোবিন্দ প্রোডাকসন্স নির্মিত ও থিয়েটার ইউনিট নিবেদিত 'নকতরঙ্গ'-এর মারাঠী ছবিটি মহারাষ্ট্র দেশে মুক্তি পাবার পরে যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা এবং অর্থলাভ করতে পারবে কিনা, তা আমরা জানি না। কিন্তু দুঃসাহসিক পরিচালক সত্যদেব দুবে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে যথার্থই আধুনিকতার যুক্তিবাদী পথে অগ্রসর করে দিয়েছেন 'শান্তাতা কোর্ট চালু আছে' ছবিটির মাধ্যমে, এ-কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

শ্রীদুবে 'টাং ইন চীফ' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি করেছেন ইংরিজী ভাষায় এক বিজ্ঞাপনের ভাষা-লিখিয়ের উন্মাদনা-ময় জীবনীকে অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য, এই ছবিটির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এর চিত্রগ্রহণের বিভিন্ন বিভাগে তিনি তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্টুডিও থেকে

মহাপূজার মহালগ্নে 'ত্রিনয়নী মা'

মহাপূজার মহালগ্নে রূপশ্রী চিত্রমের নিবেদন 'ত্রিনয়নী মা' শহর ও শহরতলীর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ভক্তি-রস গাথা দেবী-মাহাত্ম্যের অপরূপ চিত্রটির প্রযোজক হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। অনিল বাগচী সুরারোপিত ভক্তি-রস-প্রধান গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অলোক বাগচী ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ, গীত রচনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্যামল গুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, নবাগতা রূপা, শমিতা বিশ্বাস ও শিশু তাওরাজ। নৃত্যে সেবাপ্রিয়া (মাদ্রাজ)। বিশ্ব-পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার।

মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

এই সপ্তাহে 'শচীমার সংসার'

মালবিকা চিত্রের ভক্তি-রস-প্রধান চিত্র 'শচীমার সংসার' এই হপ্তায় সুশ্রী, রূপম, রূপায়ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব অনিল চট্টোপাধ্যায়ের। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে ননী দাস ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন অনন্যা শিল্পী সন্ধ্যারাণী। নিমাই, নিতাই, লক্ষ্মী-প্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে আছেন যথাক্রমে অসীমকুমার, দিলীপ রায়, নবাগতা সংহিতা রায় ও জহুই বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে : মিহির ভট্টাচার্য, অসিতবরন, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, অমরেশ দাস, কল্যাণী মণ্ডল ও শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

ছবিটির পরিবেশক এস বি ফিল্মস।

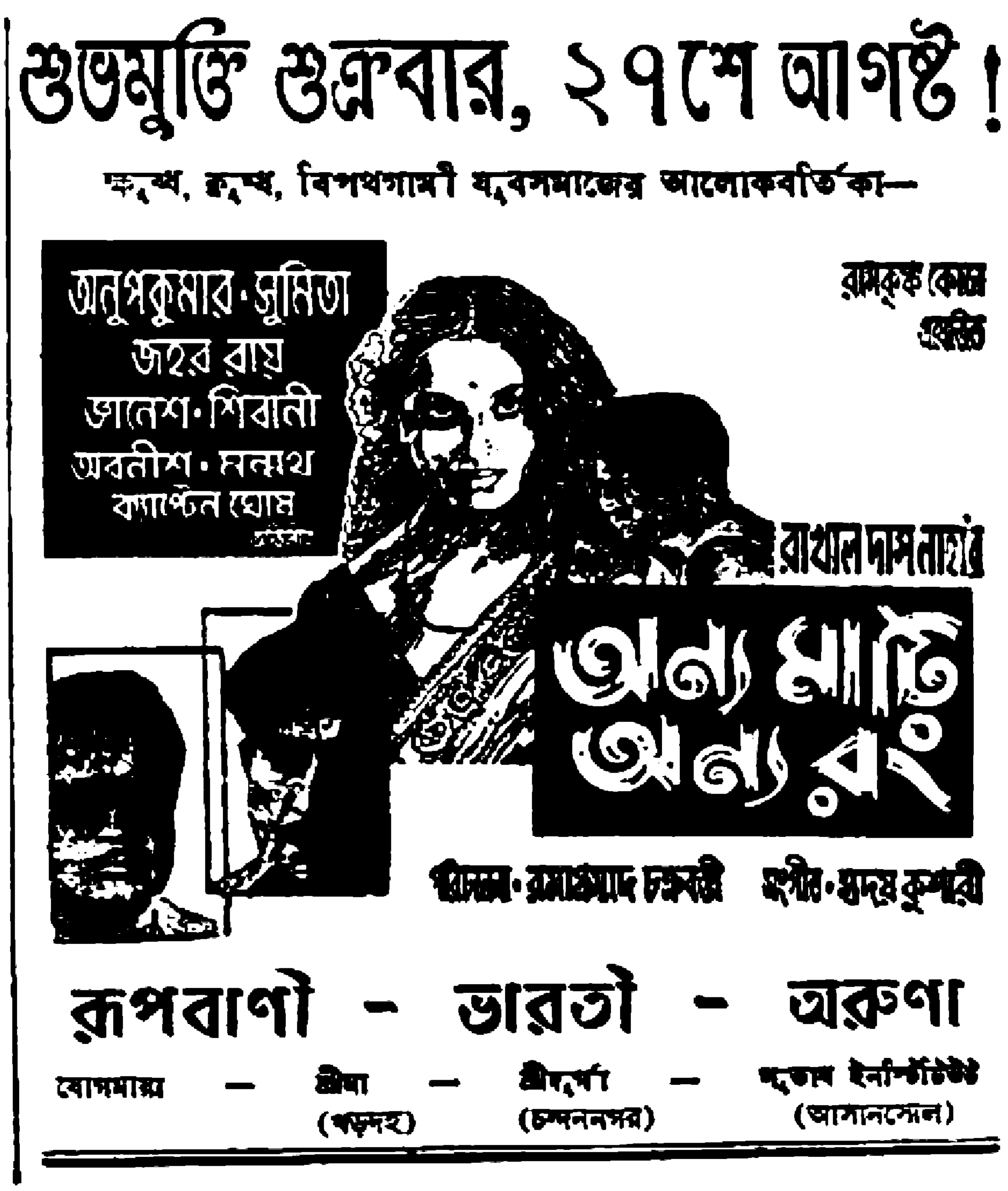

গেল রবিবার, ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই পাঠকেরা বড়ো বড়ো অক্ষরে পড়ে নিয়েছেন, 'বরানগর-কাশীপুরে খুনো-খুনিতে রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ'। এতো গেল শহর কলকাতার উত্তর প্রান্তের কথা। এবার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী টালিগঞ্জের কথা শুনুন। সেখানেও রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক তীব্র কর্মতৎপরতা ও হুমকি এবং ব্যাপক বোমাবাজি ও মারদাঙ্গার জন্য বেশীর ভাগই ফিল্ম স্টুডিওতে ছবি তোলার কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং কোনো স্টুডিওরই কর্তৃপক্ষ জানেন না, কবে এমন অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দেবে, যখন আবার নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে, নিশ্চিন্তচিত্তে কাজকর্ম শুরু করা সম্ভব হবে কিংবা আর কোনো দিনই তা হবে কিনা। বাংলার চলচ্চিত্রজগতের শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের মধ্যে আজ যে নিদারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে, তার থেকে মুক্তির উপায় কি, এই কঠিন প্রশ্নটি আমরা সবিনয়ে নিবেদন করছি, আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের কাছে।

মঞ্চাভিনয়

রূপায়ন-এর 'দেনাপাওনা' :

গেল রবিবার ৮ আগস্ট বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন তরুণ নাট্যকার ও পরিচালকবৃন্দ। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান তরুণ রায়, অশোক দত্ত, জ্ঞানশংকর পাণ্ডে ও গণেশবাবু।

উল্কা : কদর্যরূপে উৎপীড়িত সন্তান অরুণাংশু ও তাকে ঘিরে নানা ঘটনার ঘনঘটা ও শেষে চিরন্তন মাতৃত্বের দাবিতে কদাকার মৃত সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে হাহাকারে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকের সমাপ্তি। গত ১৫ আগস্ট স্টার মঞ্চে অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকগণ 'উল্কা' নাটক অভিনয় করলেন। বহু-পরিচিত নাটকের পূর্বাপর রসনিবিড় রূপ সাংবাদিকগণের অভিনয়ের গুণে নবপ্রকাশ পেল। অভিনয়ের চমক ও আঙ্গিক নাটককে নবরূপ দিয়েছিল।

অভিনয়-কৃতিত্বে সর্বপ্রথম স্মরণীয় শ্রীদিলীপ ঘোষালের অরুণাংশু। সুললিত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অরুণাংশু সু-অভিনীত হয়েছে। কমলার ভূমিকায় শ্রীমতী গৌরী বাগের অভিনয় মনে রাখার মতো। রাজীবের ভূমিকায় অভিনয় করলেন শ্রীসমীর মিত্র। রায়বাহাদুরী চালচলন ও ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয়ে সুস্পষ্ট। সুবীরের ভূমিকায় প্রবীর সেনের অভিনয় চলনসই। এছাড়া যাঁরা সু-অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃত সিন্হা, শ্রীদিলীপ দত্ত, শ্রীনিশীথ বড়াল, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ দে, শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র এঁদের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। শঙ্কর ঘোষের ভূমিকায় প্রকাশ ঘোষের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য।

আবহসঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীশচীন বসু ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ্য। তবে আলোক-সম্পাত নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে।

নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে সভাপতি হিসাবে শ্রীসুকমল ঘোষের ভাষণে সাংবাদিকদের কর্তব্যসচেতনতা ও প্রধান অতিথি হিসাবে পাহাড়ী সান্যালের ভাষণে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সেতুবন্ধনের কথা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। মঞ্চের নেপথ্য সহযোগিতায় শ্রীভবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দকুমার দাস, শ্রীধীরেন ঘোষ, শ্রীশরৎ মিত্র, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম অবশ্য উল্লেখ্য।

সবশেষে সম্পাদক শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নাট্যপূর্বে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখে কয়েকটি গল্প কিছুটা আনন্দদায়ক।

রক্তাক্ত ইস্তাহার : সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মাশালিক প্রযোজিত 'রক্তাক্ত ইস্তাহার' (নিয়মিত প্রতি শনিবার থিয়েটার সেন্টারে মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে) নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতম। একদিকে জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর বর্বরোচিত অত্যাচার, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অনমনীয় দৃঢ়তা নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে রূপায়িত হয়েছে। হৃদয়গ্রাহী ও সংবেদনশীল সংলাপে এবং নাটকীয় ঘটনার আবর্তে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত বিপ্লবকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। নাট্যকার কাজল ঘোষ সেজন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। নির্দেশনা (প্রদীপ কুণ্ডু) অভিনবত্বের দাবী রাখে, আলো (লক্ষ্মণ দাস)। সঙ্গীত (তরুণ সেন) এবং রূপসজ্জা (সুকান্ত দাস) নাটকটিকে বাস্তবানুগ করতে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে।

কয়েকটি দৃশ্যের সামগ্রিক অভিনয় ভোলা যায় না। চরিত্রানুগ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মাসুদ খাঁ (প্রদীপ কুণ্ডু), কামালুদ্দিন (সমীর বিশ্বাস), হাজি সাহেব (ব্রজেন দত্ত), বন্ধু (বিশ্বনাথ ব্যানার্জি), নজর আলী (সনাতন ঘোষ), কাদের (রবীন চ্যাটার্জি), মুস্তাক (পলাশ হালদার), সনাতন (নির্মল মিত্র), আসফাক (তরুণ সেন), বদরু (হারাধন ঘোষ), জাহিরা (সানন্দা ভট্টাচার্য), সোফিয়া (মঞ্জু ভট্টাচার্য) ও নুরজাহান (বাণীদাস শর্মা)।

আলিবাবা : আগামী ২১ আগস্ট রবিবার দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে নটলীলাগোষ্ঠী নৃত্যসঙ্গীত-মুখর জনপ্রিয় নাটক আলিবাবা মঞ্চস্থ করবেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন মঞ্চ এবং চিত্রজগতের স্বনামধন্যারা—মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট), গীতশ্রী দেবী, নরেশ মিত্র, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনা করছেন সজল মিত্র।

দিল্লীতে 'রাজা ওয়াদিপাউস' : দিল্লীর অপরাজিত সংঘের শিল্পীরা আগামী ২১শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় সর্দার প্যাটেল হলে শ্রীশম্ভু মিত্র কর্তৃক অনূদিত সোফোক্লিসের 'রাজা ওয়াদিপাউস' নাটকের অভিনয় করবেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীপরেশ দাস।

নটনীড় গোষ্ঠীর নিয়মিত অভিনয় : নটনীড় নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক 'হে বন্ধু বিদায়' নিয়মিত অভিনয় করবেন বলে স্থির করেছেন। প্রতি রবিবার সকালে মুক্তাঙ্গনে এই নাটকটি অভিনীত হবে। নাট্যপরিচালনায় রয়েছেন বিনয় চক্রবর্তী।

কেদার রায় : ব্রজেন গোস্বামীর সু-পরিচিত ঐতিহাসিক নাটক 'কেদার রায়' গত ২০শে আগস্ট রঙ্গনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। নাটকটি প্রযোজনা করেন ও-টি-সির প্রাইভেট লিমিটেড এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। মোটামুটি ভাবে নাটকটি দর্শকদের তৃপ্তিই দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক দিয়ে যাঁর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন 'শ্রীমন্ত' চরিত্রের রূপকার দেবদাস সরকার। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। 'স্বর্ণ'র প্রাণোচ্ছলতা শিবানী ভট্টাচার্যের অভিনয়ে ধরা পড়েছে। বিষ্ণুপদ পালের 'কেদার রায়' ও সিদ্ধার্থ বসুর 'কার্ভালো' হয়েছে মনোগ্রাহী।

অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন অতুল মণ্ডল, নরেশ হাজরা, জীবন ভট্টাচার্য, হীরালাল বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র নাগ, তারাপদ হালদার, বৃন্দাবন দত্ত, মদনমোহন প্রামাণিক, শিখা ভট্টাচার্য, অনন্তা চৌধুরী, রীণা ব্যানার্জী, নন্দিতা গাঙ্গুলী।

ক্রীতদাসী : হাওড়ার মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কালচারাল কমিটির শিল্পীরা কয়েকদিন আগে প্রণব বসুর 'ক্রীতদাসী' নাটকটি পরিবেশন করেছেন হাওড়া ই-আর মঞ্চে। সম্রাট শাহজাহানের হারেম থেকে পালিয়ে যাওয়া দুজন সুন্দরী বাঁদী সুলেখা আর হীরার জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ

এবার পূজায়
অনিল ঘোষের নূতন নাটক
ছুটির খেলা
নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে রমণীয় প্রকৃতির কোলে অবস্থিত একটি ছোট বোর্ডিং-হাউসে, যেখানে কয়েকজন শহরে স্ত্রী-পুরুষ উঠেছেন ছুটি কাটাতে। কিন্তু ছুটির খেলা তো শেষ হবেই।...সেই দিন ঘনিয়ে এল, স্বপ্নের ঘোর গেল কেটে।...
অফিস-ক্লাব বা যে-কোন অপেশাদারী সংস্থার অভিনয়-উপযোগী তিন অঙ্কের নাটিকা। অভিনয়ে দশটি পুরুষ ও দুটি মাত্র নারী-চরিত্র।
দাম দু টাকা।
[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]
জেনারেল বুকস্
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

নাটক। এই নাট্যকাহিনীতে আছে প্রচণ্ড চমক যা দর্শককে আপ্লুত করেছে এবং সমগ্র অভিনয়ে যে সংহতি ছিল তাও এনেছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। নির্দেশক সমর বসু যে অসম্ভব দ্রুত গতি এনেছেন নাটকে, অভিনয়ে আলোকসম্পাতের ও আবহসঙ্গীতের সেতুবন্ধনে তা হয়ে উঠেছে নতুনতর এক ব্যঞ্জনায় মুখর। কৃষ্ণা মুখার্জী ও বিপাশা গোস্বামীর দুটি প্রধান নারী চরিত্র সাবলীল অভিনয় বহু দিন মনে রাখার মত। রবি হালদারের 'আলো'ও হয়েছে সুপ্রযুক্ত।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমর বসু, নীরেন মিত্র, স্বপনকুমার ঘোষ, অসিত ঘোষ, অমলকৃষ্ণ ঘোষ, অরুণ চম্পটি, শান্তি ব্যানার্জি, অমরেন্দ্র মুখার্জি, পুলিনবিহারী মুখার্জি, গোকুলনাথ কুমার, শ্যামবিহারী সিং।

গিরিশ নাট্য সংসদ-এর বার্ষিক উৎসব: কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ-এর অষ্টম বার্ষিক উৎসব গত ১৫ই আগস্ট নববৃন্দাবন মন্দিরে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন এঁরা বয়স্বী নট শ্রীশম্ভু সেনকে সম্বর্ধনা জানান ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'বাঙালী' নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর হয়েছিল। সমগ্র সংহতি মনে রাখার মত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এত বাঁধা ও সংহত অভিনয় কম চোখে পড়ে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন শ্রীধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসমীর ব্যানার্জি, শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংহ, প্রদীপ ব্যানার্জি, অজিত সাহা, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র পাল, বাদল চক্রবর্তী, গৌর অধিকারী, সুরেশ ঘোষ, সুব্রত দাস, নিমাই দে, সুলেখা ব্যানার্জি, বুলা ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, অরুণা ঘোষ ও কার্তিক বাগচি। নাট্যনির্দেশনায় ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। সংসদের পক্ষ থেকে বয়স্বী যাত্রাভিনেতা শ্রীশম্ভু সেনকে অভিনন্দন জানানো হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীসেন বলেন যে, সকলকে আনন্দ দিতে পারাই শিল্পীর একমাত্র কাম্য। ভবিষ্যতে এই শিল্পের উন্নয়নে তিনি আরও চেষ্টা করে যাবেন। বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অষ্টম বার্ষিক উৎসবের সমাপ্তি হয়।

বিবিধ সংবাদ

ভিয়েতনাম চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা আগামী ২৯ আগস্ট সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে 'ওয়াল্স এগেন অ্যাবাউট লাভ' প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

এছাড়া সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা আগামী ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজেস্টিকে ভিয়েতনাম চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে তিনটি কাহিনীচিত্র লুসিয়া, মেমোরিজ অফ আণ্ডার-ডেভেলাপমেণ্ট ও দি ফার্স্ট চার্জ অফ ম্যাচেট এবং পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি —হানয়, জেলা সাইক্লোন, সাইমিং চেস ও দি স্টোরি অফ এ ব্যাটল দেখান হবে।

এপিক থিয়েটার গ্রুপের 'বিস্ফোরণ' নাটকে বেবী দে ও রঞ্জন বসু

দেবারতি ফিল্মসের 'অভিলাষ'

গেল ১৬ আগস্ট '৭১ সোমবার নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান দেবারতি ফিল্মস-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'অভিলাষ'-এর শুভ মহরত মেট্রোপোল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীনীলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান'-এর ছায়া অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রদ্যুম্ন চক্রবর্তী। সঙ্গীতপরিচালনায় আছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চরিত্রলিপিতে বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয় এবং প্রধান চরিত্র রূপায়ণে বাংলার কোন শক্তিমান অভিনেতাকে দেখা যাবে।

সংস্কৃতি পরিক্রমার আলোচনাচক্রে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী

রবিবার ৮ আগস্ট রবীন্দ্র সরোবরে সংস্কৃতি পরিক্রমার উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্থানীদের সর্বাত্মক শোষণ এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও কঠোরতার প্রতিক্রিয়াতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম—বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহম্মদ আবদুল জব্বার ও শেখ আবদুল আজিজ, এম পি এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। অধ্যাপক অরুণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার উদ্বোধন করেই মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সংগ্রামের গণমুখী চরিত্রের সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেন। অন্যদের দৈনন্দিন সমস্যার ভিত্তিতে নতুন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা এবং জন আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলনকারী হিসাবে মুজিবের নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে। এর সব কিছুই জনগণের মধ্য থেকে এসেছে, তাই এই ধরণের সংগ্রামের বুদ্ধিজীবীদের তেমন মুখ্য ভূমিকা থাকে না বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। এই জন্যই কথাটার উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপ জনগণ বিভ্রান্ত হন নি। সর্বশ্রী নিরঞ্জন হালদার, গোবিন্দ ঘোষাল, দীপক গুহ রায় এবং অরুণ ভট্টাচার্য আলোচনায় যোগ দেন।

রঞ্জনা বিশ্বরূপার সামনে মার্কুলার রোডের মোড় (৫৫-১৮৪১)

নান্দীকার

শনি ১, রবি ২৯ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে আগস্ট মঙ্গলবার সাড়ে ছ-টায়

একাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে

তিন পয়সার পালা

নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিনায়ক ওয়াদেকার

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফর বৃষ্টিতে খুবই মার খাচ্ছে। আগস্ট মাসের ৫ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে সফরের যে তিনটে খেলা ড্র গেল তার জন্যে বৃষ্টিই সম্পূর্ণ দায়ী।

ভারতীয় বনাম ইয়র্কশায়ার কাউন্টি দলের বরাদ্দ তিন দিনের খেলা বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয়নি। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পর খেলা হয়নি এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে একটা বলও মাঠে পড়েনি।

প্রথম দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৯৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইয়র্কশায়ার কোন উইকেট না খুইয়ে ১৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইয়র্কশায়ার দলের রান দাঁড়ায় ১০৭ (০ উইকেটে)। বৃষ্টির ফলে এই অবস্থায় খেলাটি থেমে যায়। খেলার ফলাফল ড্র দাঁড়ায়।

ভারতীয় দল : ১৯৫ রান (ওয়াদেকার ৫১ রান। ওল্ড ৩৩ রানে ৫, উইলসন ১২ রানে ৩ এবং হাটন ২৮ রানে ২ উইকেট)

ইয়র্কশায়ার : ১০৭ রান (০ উইকেটে)

ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের প্রথম জয় ও রাবার লাভ

ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষ প্রথম রাবার জয়ের গৌরব অর্জন করে সুদীর্ঘ উনচল্লিশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছে। এই জয়লাভের মূলে ছিল চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং চাতুর্য।

আগামী সংখ্যায় এই খেলার বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ এবং পর্যালোচনা থাকবে।

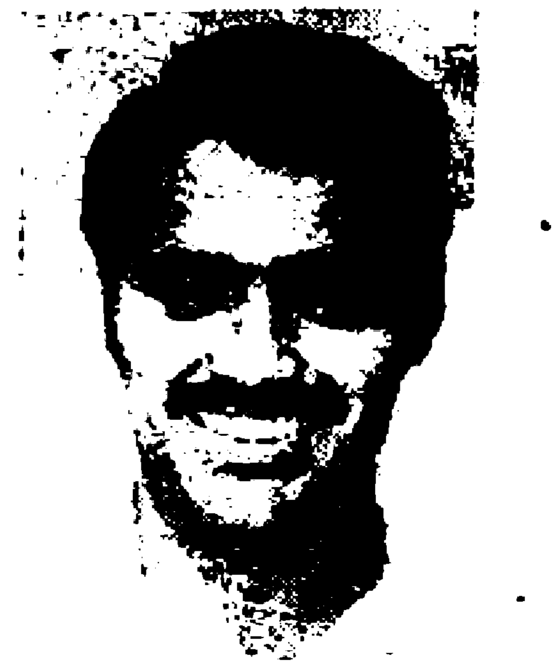

বি চন্দ্রশেখর : ৩৮ রানে ৬ উইঃ

ভারতীয় দল বনাম নটিংহামশায়ার কাউন্টি দলের তিনদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

প্রথম দিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভই হয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে বাকি সময়ে নটিংহামশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৩১ রান উঠেছিল, ৫টা উইকেট পড়ে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানের থেকে ৯৯ রানের পিছনে থেকে নটিংহামশায়ার দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৬৯ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। এর পর ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে নটিংহামশায়ার দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং যেখানে খেলায় তাদের জয়লাভের জন্যে ২৪৫ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে ১১৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ১৬৮ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সরদেশাই ৫৭ নটআউট এবং ওয়াদেকার ৪৯ রান। টেলর ৭৪ রানে ২ উইকেট)

● ১৪৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মানকাদ ৫০ নট আউট)

নটিংহামশায়ার : ৬৯ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আবিদ আলি ২০ রানে ৩ উইকেট এবং গোবিন্দরাজ ৩৭ রানে ২ উইকেট।

● ১১৫ রান (৬ উইকেটে। ফ্রস্ট ৫০ নট-আউট। চন্দ্রশেখর ৩৪ রানে ৬ উইকেট)

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৫শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে আবদুল রহমন ট্রফি জয়ী হয়েছে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়া চ্যাম্পিয়ান এবং ব্রহ্মদেশ রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছিল। এ বছরের সেমি-ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং ইন্দোনেশিয়া ১—০ গোলে তাইওয়ানকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ, ইতিপূর্বে ইন্দোনেশিয়া ৩ বার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৯) এবং ব্রহ্মদেশ ২ বার (১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ সালে যুগ্ম-বিজয়ী) আবদুল রহমন ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

চূড়ান্ত ক্রমপর্যায় তালিকা : ১ম ব্রহ্মদেশ ২য় ইন্দোনেশিয়া, ৩য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৪র্থ তাইওয়ান, ৫ম মালয়েশিয়া, ৬ষ্ঠ সিঙ্গাপুর, ৭ম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৮ম হংকং, ৯ম জাপান, ১০ম ভারতবর্ষ, ১১শ ফিলিপাইন এবং ১২শ থাইল্যান্ড।

এশিয়ান সন্তরণ প্রতিযোগিতা

টোকিওতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়ান সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জাপান চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে—মোট পদক ৭২ (স্বর্ণ ৩২, রৌপ্য ৩০ এবং ব্রোঞ্জ ১০)। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সিঙ্গাপুরের মোট পদক ৪৬টি (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ২০)

সিঙ্গাপুরের ১৭ বছরের সাঁতারু কুমারী প্যাট্রিসিয়া চান ৫টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক স্বর্ণ-পদক জয়ের গৌরব লাভ করেন। এ বছরের প্রতিযোগিতায় দশটি দেশ যোগদান করেছিল।

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জাকার্তায় আয়োজিত তৃতীয় এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—২ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট চোদ্দটি দেশ যোগদান করেছিল। ভারতবর্ষ প্রথম রাউন্ডেই ২—৩ খেলায় সিঙ্গাপুরের হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যায়। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন তান আইক মং (মালয়েশিয়া) এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন উত্তামী দেবী (ইন্দোনেশিয়া)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় স্তবক

৪৫ আর-পি-এম সিঙ্গলস্

অনুপ ঘোষাল
আরতি মুখোপাধ্যায়
আশা ভোঁসলে
ইলা বসু
চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
নির্মল মুখোপাধ্যায়
পিন্টু ভট্টাচার্য
বনশ্রী সেনগুপ্ত
রাহুল দেববর্মণ
লতা মঙ্গেশকর
শচীন দেববর্মণ
শ্যামল মিত্র
শ্রাবন্তী মজুমদার
সবিতা চৌধুরী
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

৪৫ আর-পি-এম এক্সটেন্‌ডেড্ প্লে রেকর্ড

গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
(পালা কীর্তন)
গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়
ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়
(সংস্কৃত স্তোত্র)
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(আবৃত্তি)
বেগম আখতার
(উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত)
শিশুগীতি—'চড়ুইভাতি'
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
(যন্ত্রসঙ্গীত)

লং প্লেয়িং রেকর্ড

রাধা-চণ্ডীদাস
(প্রেম-মধুর গীতিনাট্য)
সঙস্ অব অতুল প্রস

বিশদ বিবরণের জন্য এইচ-এম-ভি ডীলারের কাছে আসুন

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও জনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • কানপুর

EMI

GC 6631A

আমরা সবাই মাখি
বসন্ত মালতী তেল
বসন্ত মালতী তেল আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত।
এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে
বিখ্যাত জবাকুসুম তেলের প্রস্তুতকারক
সি কে সেনের প্রায় একশো বছরের অভিজ্ঞতা।
চুলের সহজাত সৌন্দর্য্য ধরে রাখতে যে সব
দেশীয় উপাদানের প্রয়োজন তার সবগুলিই
বসন্ত মালতী তেলে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে :
এই তেল মাখলে চুল বেশ পরিপাটী
থাকে। এর মন মাতানো গন্ধ সারা দিন
আপনাকে খুশীর আনন্দে ভরিয়ে রাখবে।
সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ০ দিল্লী

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৮শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 3rd September, 1971 শুক্রবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৭৮ 50 Paise

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৩২৫	সম্পাদকীয়		
৩২৬	পটভূমি		—শ্রীদেবকান্ত
৩২৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৩৩০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৩৩২	সহযাত্রী	(কবিতা)	—শ্রীকৃষ্ণ ধর
৩৩২	কিছু ছাড়া যায় কিছু সব নয়	(কবিতা)	—শ্রীহেনা হালদার
৩৩২	বাংলাদেশ	(কবিতা	—কামাল মাহবুব
৩৩৩	তীরে তীরে	(গল্প)	—শ্রীদ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়
৩৩৯	কলকাতার মানুষ : সেকাল একাল		—শ্রীসিপ্রা নন্দী
৩৪৫	গার্ড	(গল্প)	—শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়
৩৪৮	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৩৫১	পূর্বাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৩৫৭	পোল্যান্ডের লোকশিল্প		—শ্রীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫৯	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৩৬৫	এনড্রুজ বাংলা ও বাঙ্গালী		—শ্রীহিমচন্দ্র ঘোষ
৩৬৭	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৩৭০	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৩৭৮	কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩৮১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৩৮৭	মজার	(গল্প)	—শ্রীগোষ্ঠ শেঠ
৩৯০	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
৩৯১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৩৯৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৩৯৮	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীঅনিল

মিহিজামের টেকার্জি ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরেকটি মূল্যবান বই

গাইড বুক

হোমিও চিকিৎসায় বহুল প্রচারিত "প্যাকেট বই" হিসাবে সুপরিচিত। বাংলা/ইংরাজী এক সঙ্গে।

মূল্য ২ টাকা [ডাক খরচা আলাদা]

পি ব্যানার্জি
৫৩, মে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
ফোন ৫৫-৪২২১

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ও চমৎপ্রদ বই। লেখক নিজে একজন চিকিৎসক এবং একজন খ্যাত প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুত্র। তাই রোগ ও রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং এই অভিজ্ঞতাই বইটির উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি বইটিতে তাঁর পিতার চিকিৎসক-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে। যে চিকিৎসার ধারা এখানে উল্লেখিত তার নাম 'মিহিজামের চিকিৎসা ধারা'।

অসুখ ও ওষুধ—এই দুটি বিষয়ের ওপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি সহজবোধ্য। যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

—যুগান্তর, ২০শে জুন, ১৯৭১

একনজরে

শিল্পের জালিয়াতি ঃ

যা এট্রুস্কান সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন বলে গত দশ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম ও চিত্রসংগ্রহশালায় এবং শিল্পরসিকদের কাছে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড দরে বিক্রি হয়েছে তা সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ঝুটো মাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষাগারের ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ স্টুয়ার্ট ফ্লেমিং পরীক্ষান্তে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, অতি নিপুণ-হাতের একটা বড় রকমের আন্তর্জাতিক জালিয়াতি গত দশ বছর সারা বিশ্বের শিল্পী, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহলের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের কারবার চালিয়ে গেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে যে পাঁচশটি এট্রুস্কান টেরাকোটা প্যানেলের নিদর্শন কিনেছিল তা সবই সম্পূর্ণ ঝুটো মাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং, ডঃ ফ্লেমিং-এর সুনিশ্চিত অভিমত, আমেরিকার আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়ামগুলিতে লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে সংগৃহীত এট্রুস্কান সভ্যতার তথাকথিত নিদর্শনগুলিও জালিয়াতদের হাতে গড়া রদ্দী মাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডঃ ফ্লেমিং-এর অনুমান, ইতালির কেভেট্টোর অঞ্চলে আছে ঐ জালিয়াতদের কারখানা, যেখানে একদা গড়ে উঠেছিল প্রাক-রোমক যুগের এট্রুস্কান সভ্যতা এবং যেখান থেকে এট্রুস্কান সভ্যতার প্রকৃত নিদর্শনও পাওয়া গেছে। খৃস্টজন্মের নয় শতাব্দী আগে অজ্ঞাতকুলশীল এট্রুস্কানরা বর্তমান ইতালির টুস্কানি অঞ্চলে গড়ে তোলে তাদের নগরসভ্যতা। ডঃ ফ্লেমিং বলেছেন, ইতালির ঐ ঝুটো শিল্পের কারবারীরা খুব সাফল্যের সঙ্গে গত দশ বছর ধরে তাদের জালিয়াতির কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের কারখানায় তৈরি "প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনগুলি" সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত দিয়ে গোপনে পাচার করে বিদেশি শিল্পের কারবারীদের কাছে পৌঁছে দেয়। আর ঐ গোপন পথে রহস্যজনক চলাচলের মধ্য দিয়ে নিপুণ হাতে তৈরি ঝুটো মালগুলি আদি ও অকৃত্রিম শিল্পের অনন্য মর্যাদা লাভ করে। তখন প্রায় বিনা জিজ্ঞাসাতেই বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিত্তবান শিল্পরসিকরা সেসব সামগ্রী যে কোন দামে কিনে নিয়ে যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা থেকে যেগুলি কেনা হয়েছে সেগুলির কোন কোনটির জন্য দশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্য দিতে হয়েছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রীর প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য যে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে তার নাম 'থার্মো-লুমিনেসেন্স ডেটিং'। ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই জানা গেছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের হাচিলার থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃৎশিল্প বলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় এতদিন যা সযত্নে সংগৃহীত ছিল তা সবই ঝুটো মাল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে দারুণ আলোড়ন এনেছে, আর শঙ্কিত করে তুলেছে সেইসব বিত্তবানদের যারা নিজেদের শিল্পবোধের পরিচয় দিতে জলের মতো অর্থব্যয় করে হয়ত বা সবই ঝুটো মাল দিয়ে পূর্ণ করেছে তাদের সংগ্রহশালা।

রাজধানীর স্বস্তি ঃ

অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতিলাভের সুযোগ আইনসিদ্ধ হওয়ায় দিল্লীর চিকিৎসক মহল স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রতি বছর দেশে যে প্রায় ষাট লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার হয় রাজধানীতে। আর ঐ ব্যাপারে হাসপাতালগুলিকে যা করতে হয়—তা নেহাৎই 'মেরামতি কাজ' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে হাতুড়েদের হাতে অর্ধমৃত হয়ে বা মরাজীবনের মতো পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে অধিকাংশই হাসপাতালে আসে এবং তাদের কোনরকমে বাঁচিয়ে তোলাই তখন হাসপাতালের ডাক্তারদের একমাত্র কাজ হয়। তাঁরা আশা করছেন, এখন থেকে হাসপাতালের দ্বার অবারিত হওয়ায় কেউ আর আগে হাতুড়েদের কাছে অর্ধমৃত হয়ে হাসপাতালে আসবে না। নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নয়াদিল্লীর নটি হাসপাতালে যত রোগী আসে তার প্রায় বিশ শতাংশ হল গর্ভপাতজনিত রোগী।

নতুন যে আইন হল (মেডিকাল টার্মিনেশন অব প্রেগনান্সি) তাতে ১৮ বছরের বেশি বয়সের যে কোন অন্তঃসত্ত্বা নারী হাসপাতালে গিয়ে গর্ভপাতের দাবি জানাতে পারবে। ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের বা ১৮ বছরের বেশি বয়সের বিকৃত মস্তিষ্ক মেয়েদের গর্ভপাতের জন্য অভিভাবকের লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হবে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থা যদি বারো সপ্তাহের কম হয় তবে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক, আর তার বেশি দিনের হলে দুজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক গর্ভপাতের কাজে নিযুক্ত হবেন। গর্ভপাতের যাবতীয় কাজ হবে সম্পূর্ণ গোপনে এবং সব সরকারি বা সরকারনির্দিষ্ট হাসপাতালে এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে।

সংসদের সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী কান্তাম্মা বলেছেন, এ আইনের ফলে যাঁরা সমাজ রসাতলে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা বোধহয় জানেন না যে, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে যাঁরা অব্যাহতি পেতে চান তাঁদের মধ্যে শতকরা সাতাশি থেকে নব্বুই জন বিবাহিতা নারী। অপর সদস্যা শ্রীমতী সাবিত্রী শ্যাম বলেছেন, এমন একটা অত্যাবশ্যক আইন পাশ করতে সরকার কেন যে এতদিন অপেক্ষা করলেন তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও যে এ ধরনের একটা আইনানুমোদিত ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন ছিল একথা স্পষ্ট করে বলতেই বা সরকারের সঙ্কোচ হচ্ছে কেন? শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পঞ্চাশের দশকে যখন হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হয় তখনও সমাজ রসাতলে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেকে শঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু সে আশঙ্কা পরবর্তীকালে অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

জীবন ব্যাঙ্ক ঃ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বেড়েছে আর সেই নিরাপত্তাবোধ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। ব্যাঙ্ককে তাই সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি এমন কি প্রতীকও বলা যায়। আবার মানুষের প্রয়োজনের বৈচিত্র্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও ঘটেছে নানা রূপান্তর। আজ শুধু অর্থ ও সম্পদ রক্ষার জন্যই ব্যাঙ্ক নয়, জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনেও গড়ে উঠছে ব্লাড ব্যাঙ্ক, আই ব্যাঙ্ক। একের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা মূত্রাশয় অন্যের দেহে সংযুক্ত করার পরীক্ষা সফল হওয়ার পর মৃতব্যক্তির বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য প্রত্যঙ্গ সঞ্চয়ের জন্য 'হিউম্যান স্পেয়ার পার্টস ব্যাঙ্ক' স্থাপনের প্রস্তাবও বিজ্ঞানী মহলে আলোচিত হচ্ছে।

সর্বশেষ যে ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ আমেরিকায় শুরু হয়েছে তা হল স্পার্ম ব্যাঙ্ক।' আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটন এলাকায় দুটি স্পার্ম ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হবে যাতে, যেসব পুরুষ পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ভ্যাসেকটোমি অস্ত্রোপচার করবেন তাঁরা শুক্রকীট জমা রেখে আসতে পারবেন। ভবিষ্যতে সন্তান চাইলে তাঁরা ঐ সঞ্চিত শুক্রকীট ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যাঙ্কের মালিকরা বলেছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে শুধু ভাণ্ডারী ছাড়া আর কিছুই নন। সঞ্চিত শুক্রকীট মালিকেরই সম্পত্তি থাকবে। তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যতে যে কোন দিন তাঁর পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে ঐ সঞ্চিত জীবকণা কাজে লাগাতে পারবেন। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তারা আরও বলেছেন, তাঁদের প্রয়াস যদি সফল হয় তবে কোন বংশধারাই আর লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

২৬।৮।৭১ **প্রত্যক্ষদর্শী**

সম্পাদকীয়

বাংলা ছায়াছবির সংকট

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার ফিল্ম স্টুডিয়োগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সংবাদে প্রকাশ, ইতিমধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা খাটছে বিভিন্ন নির্মীয়মান ছবি বাবদ। ছয়টি স্টুডিয়োতে পাঁচশো টেকনিশিয়ান কাজ করেন, সমসংখ্যক ব্যক্তি ঠিকা হিসাবেও এই কাজে ব্রতী। এ ছাড়া আরো হাজারখানেক কর্মী নানাভাবে এই ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পুজোর মুখে এতগুলি মানুষের পরিবারবর্গ অন্নহীন হয়ে পড়বেন এই চিন্তা সকলকে আকুল করে তুলেছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে আরো অনেকরকম সমস্যা জড়িয়ে আছে। এই বাণিজ্যের যাঁরা মালিক সম্প্রদায় তাঁদের মতে এই অবস্থার জন্য সরকারই মুখ্যত দায়ী। ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৮—এই তিন বছরে তিনটি কমিটি বসানো হয়েছে। ১৯৬৬-তে যে "আর গুপ্ত কমিটি" সংগঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই কমিটি ফিল্ম শিল্পের অবনতির চারটি মূল কারণ হিসাবে বলেন যে পূর্ববঙ্গের বাজার বন্ধ হওয়া, কলকাতা ও আশেপাশে নতুন সিনেমা হলের লাইসেন্স দানে সরকারি কার্পণ্য, যৌন আবেদন এবং চটুলতাপূর্ণ বোম্বাই ও মাদ্রাজী ছবির অশোভন প্রতিযোগিতা এবং অস্বাস্থ্যকর বাণিজ্যনীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম শিল্পে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই কমিটি বলেছিলেন যে, ৬০টি নূতন সিনেমা হল খোলা সম্ভবপর। এ ছাড়া এই কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, সিনেমা অভিনেতৃ-গোষ্ঠী এবং কলাকারদের দ্বারা সংগঠিত সমবায় সমিতির হাতে নতুন সিনেমা খোলার ভার দেওয়া হোক। যে কোনো কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। ফিল্ম শিল্পপতিদের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, ফিল্ম ব্যবসায়ের আকস্মিক পতন ও মূর্চ্ছা রোধকল্পে সরকার অচিরাৎ স্টুডিয়োওলাদের এ্যাড হক অর্থদান করুন, প্রমোদকরের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রযোজকদের দেওয়া হোক, তার ফলে সিনেমা শিল্প উপস্থিত একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। ইতিমধ্যে দীর্ঘসূত্রী সরকারপক্ষ যা হয় একটা সমাধান স্থির করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ফিল্ম ব্যবসায়ের আর্থিক সংকট এমন কিছু নতুন সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের ফিল্ম শিল্প রোগজীর্ণ শিশুর মতো অতিকষ্টে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। স্টুডিয়োর কর্মচারীদের অবস্থা অতি শোচনীয়। ই আই এম পি এ-এর প্রেসিডেন্ট যে নিদারুণ সংকটের কথা বলেছেন তা থেকে মনে হয় কর্মচারীদের প্রাপ্য টাকাও হয়ত স্টুডিয়োগুলির দরজা বন্ধ করার সময় দেওয়া সম্ভব হবে না।

অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নেই। সরকার এই বিষয়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু ২৫শে আগস্ট তারিখে হঠাৎ কেন ঘোষণা করা হল যে, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে স্টুডিয়োগুলির দরজা বন্ধ করা হবে। এই বিষয়ে জনসাধারণকে ঠিকমত অবহিত করা হয়নি। কোনোরকম আলোচনা বা আন্দোলনের অভাবে এই দুঃসংবাদ অতিশয় আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী তরফে একজন মুখপাত্র নাকি বলেছেন—আমরা কিছু জানি না, শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খবরটুকু দেখেছি মাত্র। এই পরিস্থিতিতে তাহলে কার হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এই প্রশ্ন সাধারণের মনে জাগে। বোম্বাই ও মাদ্রাজী ফিল্মের নিম্নরুচির কাহিনী ও অভিনয়ভঙ্গীর ফলে তার জনপ্রিয়তা অসীম। হিন্দি ভাষা শিক্ষায় অনাগ্রহ থাকলেও হিন্দি গান শোনার জন্য, হিন্দি ছবি দেখার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা আকুল, ফলে বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকও কমেছে। তার ওপর আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির জন্য সিনেমা হাউসে ভীড় হ্রাস পেয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত ছিল এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টিদান করা কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে। বাংলার ছায়াছবির সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতির একটা অভিন্ন সংযোগ আছে। আজ ছয়টি স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ হলে শুধু যে কয়েক সহস্র কর্মী অন্নহীন হবেন তা নয়। বাঙালীর শিল্পচেতনার এক বিশিষ্ট নিদর্শন চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই গুরুতর সংকটের মুখ থেকে বাংলা ছায়াছবি শিল্পকে ত্রাণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

CENTRAL LIBRARY

পটভূমি

পশ্চিমবাংলার বরাতের কথাটা একবার ভাবুন!

সারাদেশে যতো জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি আছে তার তিন ভাগের এক ভাগই এই রাজ্যে, যতো কলকারখানা তার ছ' ভাগের এক ভাগ রয়েছে এখানেই, মোট যত মাল কল-কারখানায় তৈরি হচ্ছে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়—তবু প্রায় গোটা পশ্চিমবাংলাকেই শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করতে হল!

দেশের মোট ৮৮টি পাটকলের মধ্যে ৭৮টিই এই রাজ্যে, যতো ইলেকট্রিক পাখা তৈরি হয় তার চার ভাগের তিন ভাগ, মোট সেলাইকলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ, মোট রেল-ওয়াগনের অর্ধেকের কাছাকাছি, মোট বাইসাইকেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগই তৈরি হচ্ছে এই রাজ্যের কারখানায়—তবু পশ্চিমবাংলাকে শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করতে হল!

দেশের যতো কয়লা লাগে তার তিন ভাগের এক ভাগ জোগায় এই রাজ্য, দেশের মোট যতো ইস্পাত তৈরির ক্ষমতা তারও তিন ভাগের এক ভাগ এই রাজ্যের কল-কারখানায়। দেশের মোট যতো বিদেশী মুদ্রা রোজগার হয় তাতে অন্যান্য যে-কোনো রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার অবদানই সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বন্দর দিয়েই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশে চালান যায়, মোট আমদানির শতকরা ২৫ ভাগই আসে কলকাতা দিয়ে। তবু পশ্চিমবাংলাকে ঘোষণা করতে হল শিল্পে অনগ্রসর বলে!

পশ্চিমবাংলার প্রতি ভাগ্যদেবতার পরিহাস ছাড়া একে আর কীই বা বলা যায়? কিন্তু কেন এই অবস্থা হল? সরকারী হিসেবেই শিল্প-সমৃদ্ধিতে যে-রাজ্যের স্থান দেশের মধ্যে দ্বিতীয় (মহারাষ্ট্রের পরেই), তাকে শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যই বা কী?

উদ্দেশ্য দুটো। প্রথমতঃ, যে-সব এলাকাকে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ বলে ঘোষণা করা হয়, সেই সব এলাকায় কল-কারখানা খুলতে গেলে সরকারের কাছ থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়। ঋণ পাওয়া যায় কম সুদে। তাতে শিল্পপতিরা ঐসব এলাকায় কলকারখানা খুলতে আগ্রহী হন। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর এক ফর্দ তৈরি করেছেন ভারত সরকার। একচেটিয়া ব্যবসা যাতে আর প্রশ্রয় না পায়, সেই জন্যে ঐসব গোষ্ঠীকে আর ইচ্ছেমতো বাড়তে দেওয়া হবে না। তারা যদি নতুন কল-কারখানা খুলতে চায় তবে তার আগে অনেক রকম বায়নাক্কা, হাজার রকম সরকারী খবরদারির বেড়া পেরোতে হয়। কিন্তু অনগ্রসর বলে ঘোষিত এলাকায় যদি ঐসব গোষ্ঠী কল-কারখানা করতে চায়, তবে বাধানিষেধ অনেক কম। পশ্চিমবাংলার ১৬টি জেলার ১০টিকেই এখন অনগ্রসর ঘোষণা করা হল, সুতরাং ঐসব জায়গায় শিল্প প্রসারের সুযোগ বড় ব্যবসায়ীরাও কিছু কিছু পাবেন।

এইবার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর মে মাস নাগাদ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতেই তিনি প্রথম প্রস্তাব করেন যে, বড় ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবার বাড়াবার পথে যে-সব বাধানিষেধ খাড়া করা হয়েছে, অন্ততঃ এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সেগুলি কিছুটা শিথিল করা হোক। সরাসরি শুধু একটি বিশেষ রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা করার অসুবিধে আছে। তাই ১০টি জেলাকে অনগ্রসর ঘোষণা করে এ-ব্যাপারে কিছুটা সুবিধে দেওয়া হল।

তবে সব ব্যাপারটাকে শুধু ভাগ্যের পরিহাস বলেই কি উড়িয়ে দেওয়া চলে? পশ্চিমবাংলা যথেষ্ট অগ্রসর, শিল্পে সমৃদ্ধ, সুতরাং এখানে আর কল-কারখানা বাড়ানো উচিত নয়, নতুন কল-কারখানা অন্যান্য পশ্চাদপদ রাজ্যেই খোলা হোক—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা স্বাধীনতার পর থেকে অত্যন্ত সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে কি এইনীতিই অনুসরণ করে আসেননি? আর তার ফলেই কি আজ চাকা একেবারে উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে পশ্চিমবাংলাকেই অনগ্রসর রাজ্য বলে ঘোষণা করতে হল না?

এর ফলটা কী দাঁড়ালো দেখুন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬, এই দশ বছরে গোটা দেশে কল-কারখানা খোলার জন্যে মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল ১৪,০৮৪টি। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়েছিল ২২৯৫টি। খুব খারাপ বখরা মোটেই নয়, মোট আবেদনের সাত ভাগের এক ভাগের বেশি। এর মধ্যে ১৬৪১টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল, অর্থাৎ ঐ সংখ্যক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার চেয়ে বেশি লাইসেন্স পেয়েছিল একমাত্র মহারাষ্ট্র—২৭৪১টি। তারপর থেকেই কেমন যেন সব গণ্ডগোল হতে লাগল। পশ্চিমবাংলার ভাগে আবেদনপত্র বা লাইসেন্স দুই-ই কমতে শুরু করল।

তাছাড়া আবেদনপত্র বা এমনকি লাইসেন্স নিয়েও ধুয়ে খেলে তো আর পেট ভরবে না। লাইসেন্স পেয়েও আমাদের শিল্পপতিরা তা কেমন নানা গূঢ় উদ্দেশ্যে চেপে রাখতে পারেন, সে-কাহিনী ডঃ আর কে হাজারির বিখ্যাত রিপোর্টেই ফাঁস হয়ে গেছে। আসল কথাটা হল, নতুন লাইসেন্স পাবার পর কল-কারখানা খোলা। ১৯৬৬ সালের পর থেকেই এ-ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার অধোগতির শুরু। ১৯৬৫ সালে যেখানে ৬২টি নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, পরের বছর সেখানে হল মাত্র ৩৭টি। আর ১৯৬৭ সালে? মাত্র ৬টি। পরের দু' বছরে গোটা এগার করে নতুন উদ্যোগ শুরু হলেও ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র তিনে। গোটা দেশে ঐ বছর যতো নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এই সংখ্যা তার শতকরা এক ভাগের দশ ভাগ!

নতুন কলকারখানা খোলার ব্যাপারে এই যখন হাল, তখন ঐ ১৯৬৬ সাল থেকেই দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। আর তার সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এসে লাগল পশ্চিমবাংলার শিল্পের ওপর। কারণ, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বড় অংশই এই রাজ্যে এবং মন্দার ধাক্কা এই ধরনের শিল্পের ওপরই এসে লাগে বেশি। কারণ, দুরবস্থার মধ্যেও লোকে ওষুধ কিনবে বা পরবার কাপড় কিনবেই, কিন্তু তখন সরকার ব্রিজ বা ওয়াগন বানাবার কাজ মুলতুবি রাখতেও পারেন। সবচেয়ে দুরবস্থা হল যে-সব কারখানা ওয়াগন তৈরি করে তাদের। তৎকালীন রেলমন্ত্রী সদোবা পাতিলের হুকুমে রেল-দপ্তর ওয়াগনের অর্ডার রাতারাতি কমিয়ে দিলে, আর সেই ধাক্কাটা লাগল এসে পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি। এইসব বড় কারখানার সঙ্গে যেহেতু অনেক ছোট কারখানার টিকি বাঁধা, তাই ধাক্কাটা তাদেরও গায়ে লাগল বেশ জোরেই। আর যেহেতু ছোট কারখানার তাগদ কম, তাদের অনেককে পাততাড়িও গোটাতে হল তাড়াতাড়ি। অনেক লোকের চাকরিও যে গেল সে—কথা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। ফলে তৈরি হল অশান্তির উর্বর জমি। সেই অশান্তিতে উৎপাদন কমতে লাগলো আরো। এদিকে অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বা সরকার পশ্চিমবাংলার কারখানায় কোনো মালের অর্ডার দিতে ভয় পেতে লাগলেন—সময়মতো ডেলিভারি পাবেন না, এই ভয়ে। ফলে মন্দা হল গভীরতর।। তৈরি হয়ে গেল চমৎকার একটা দুষ্টচক্র। ১৯৬৭ সালে এল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন অভিযান ঘেরাও শুরু হওয়ার পটভূমি তৈরিই ছিল। শুরু হয়ে গেল সেই ঘেরাও।

দিল্লীর আরো দুটি অদূরদর্শী নীতি পশ্চিমবাংলার শিল্প-সংকটকে তীব্রতর করে তুলল। এমনকি যখন, অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত, এই রাজ্য যথেষ্ট লাইসেন্স পেয়েছে তখনও কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অর্থ-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে

অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে কম। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামালের অভাবে এই রাজ্যের কল-কারখানা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে। এই কাঁচামাল বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে-সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা তো এ-বিষয়ে বেশ কড়া মন্তব্য করেছেন। আর কাঁচামালের অভাব কি একটু-আধটু? পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার যে স্মারকলিপি দাখিল করেন, তাতেই দেখানো হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট বছরে পশ্চিমবাংলা তার প্রয়োজনের তুলনায় তামা পেয়েছিল শতকরা সাড়ে এগার ভাগ, দস্তা সাত ভাগ, সীসা মাত্র আড়াই ভাগ! আজও যে এই রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়, কাগজের কলে, কাপড়ের কলে ইস্পাত, পেপার পাল্প বা সুতোর অভাবের তেমন সুরাহা হয়নি। এতদিন পরে সিদ্ধার্থবাবু যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন তাতে কাঁচামালের একটা ভাণ্ডার খোলার কথা বলা হল।

•

দুটো কথা বোধহয় এখানে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের 'নৈরাজ্যের' সময় থেকেই পশ্চিমবাংলার শিল্পের প্রসার থেমে গেছে, এটা বড় জোর অর্ধ-সত্য। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ থেকেই আমরা শুনেছি যে, ১৯৬৫ সাল থেকেই এই রাজ্যে কোনো উন্নয়নের কাজ হয়নি। সেই সময়ে তো বটেই, তার পরেও বছর দুই কংগ্রেস সরকার চালু ছিল। সেই সরকারের নেতা ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সেই প্রফুল্লবাবুই এখন অশান্ত বীরভূমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন, দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও অবিচারের ফলেই বীরভূমের মতো ঘটনা পশ্চিমবাংলায় ঘটতে পারছে। ১৯৪৭ থেকে '৬৭—এই কুড়ি বছরের প্রায় সবটাই মন্ত্রিত্ব করেছেন প্রফুল্লবাবু। আত্মসমালোচনার এমন সৎ উদাহরণ নিশ্চয়ই বিরল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তির জন্যেই পশ্চিমবাংলায় শিল্পের প্রসার ঘটতে পারছে না, এ-যুক্তিই বা কতখানি সত্য? না, কখনোই এ-কথা বলছি না যে, এই রাজ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ নেই। কিন্তু সেটাকে শিল্পপতিরা যতোটা বড় করে দেখাতে চান, ততোটা কি ঠিক? ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫, এই তিন বছরেই পশ্চিমবাংলায় যতো সংখ্যক শিল্প-বিরোধ দেখা দিয়েছিল, মহারাষ্ট্রে হয়েছিল তার দু' গুণ থেকে তিন গুণ বেশি। এমনকি ১৯৬৮ সালে, যখন পশ্চিমবাংলায় রীতিমতো নৈরাজ্য, তখনও এই রাজ্যে যেখানে ৪০৫টি ধর্মঘট ও লক-আউট হয়েছে, মহারাষ্ট্রে হয়েছে সেখানে ৬১৬টি। কই, সেই কারণে মহারাষ্ট্রে শিল্প প্রসার তো বন্ধ হয়নি, সেখানে শিল্পপতিরা তো গেল গেল রব তোলেননি?

তবে পশ্চিমবাংলার প্রতি শিল্পপতিদের অনীহার কারণটা কী? কারণটা এই যে, পশ্চিমবাংলায় যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলার বাইরের লোক। একদিকে দিল্লীও যেমন তাঁদের এই রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কল-কারখানা খুলতে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনই তাঁরাও কোনোদিন পশ্চিমবাংলাকে নিজের রাজ্য বলে মনে করেননি। তাঁরা এখানে মুনাফা লুটেছেন, কিন্তু মনে রেখেছেন সর্বদাই রাজস্থান বা গুজরাটের নিজের গ্রাম-শহরের কথা। মহারাষ্ট্রে বা বোম্বাই শহরের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। পার্শী ব্যবসায়ীরা তো বটেই, বোম্বাইয়ের গুজরাটী ব্যবসায়ীরাও বোম্বাইকে নিজেদের শহর বলে মনে করে তার উন্নয়নে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন। মহারাষ্ট্রের বৈষয়িক বিকাশের প্রশ্নকেও তাঁরা উপেক্ষা করেননি।

আর, অবাঙালী শিল্পপতিদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? অন্ততঃ এক-আধজন বাঙালী শিল্পপতিও তো ছিলেন যাঁরা দেশের প্রথম দশজন শিল্পপতিদের মধ্যে স্থান পান। তাঁরাই বা পশ্চিমবাংলার মধ্যে কতোটুকু শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছেন, কতোটা উদ্যোগী হয়েছেন কলকাতাকে বাঁচাতে?

•

বড় বড় শিল্পপতিদের কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু যেখানে বাঙালিদের প্রাধান্য কিছু বেশি, পশ্চিম বাংলার সেই ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে তাকালে কী দেখা যায়? এককালে হাওড়ার নাম ছিল ভারতের শেফিল্ড। আর তার অবস্থা কী? ছোট শিল্পের ভাগ্য অবশ্যই বড় শিল্পের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা, কারণ বড় কারখানাকে মাল জুগিয়েই বেশির ভাগ ছোট কারখানা বেঁচে থাকে। আর বড় কারখানার যখন বরাত মন্দ তখন ছোট কারখানার সময় তো খারাপ হবেই। আসলে বড় কারখানার সঙ্গে এই টিকি বেঁধে রাখাটাই পশ্চিম বাংলার ছোট কারখানার দুর্ভাগ্যের একটা বড় কারণ। আর বড় কারখানার মতো ছোটগুলোর ঝোঁকও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের দিকে। যে পাঞ্জাবে ছোট কল-কারখানার এখন জয়-জয়কার সেখানে কিন্তু ছোট কারখানার মালিকেরা বেশি করে ভোক্তার প্রয়োজনীয় জিনিস, অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য তৈরিতে মন দিয়েছেন।

•

কিন্তু গত পাঁচ বছরে গোটা দেশে গড়পড়তা যেখানে প্রতি বছর প্রায় ১৭ হাজার নতুন ছোট কারখানা খোলা হয়েছে, সেখানে এই রাজ্যে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল কেন? আর যেগুলি খোলা আছে, সেগুলিই বা ধুঁকছে কেন? অপ্রিয় সত্যটা এই যে, এর জন্যেও দায়ী দিল্লীর নীতি। বড় কারখানার মতো ছোট কারখানাও মার খেয়েছে কাঁচা মালের অভাবে এবং ছোটদের কপালেই বোধহয় উপেক্ষাটা জুটেছে তাদের বরাতে আরো বেশি। বছরে যে পরিমাণ ইস্পাত দরকার তার শতকরা তিন ভাগ থেকে পাঁচ ভাগের বেশি জোটেনি তাদের। এইভাবে কি কোনো শিল্প বেঁচে থাকতে পারে? একে তো দিল্লীর এই মনোভাব, তার ওপর রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরও সময় মতো কাঁচা মালের প্রয়োজনীয়তার কথা কেন্দ্রকে জানাতে পারেনি।

সিদ্ধার্থবাবু যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তাতে ছোট শিল্প স্থাপনের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যদি সত্যিই প্রতি বছর দু হাজার নতুন ছোট কারখানা খুলতে হয় তবে এই ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসাটাই আগে দরকার।

আগের এক 'পটভূমিতে' বলেছিলাম যে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের দুর্দশাগ্রস্ততার অন্যতম কারণ দিল্লীর মনোভাব। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কি সেই মনোভাব পাল্টাতে পারবেন?—এই ছিল প্রশ্ন। ১৬-দফা কর্মসূচী এই কথাই বলছে যে, অন্ততঃ বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি দিল্লীতে নাড়া দিতে পেরেছেন। তার মধ্যে ওয়াগনের অর্ডার, কাঁচা মালের জোগান, আর্থিক সাহায্য, বন্ধ কারখানার ভার নেওয়া প্রভৃতি দরকারী বিষয় রয়েছে। এখন দরকার তিনটে জিনিস। প্রথমটা হচ্ছে অবশ্যই, দিল্লীর নানা প্রতিশ্রুতি যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্যে সিদ্ধার্থবাবুকে আরো চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ এর ওপর শুধু পশ্চিম বাংলারই নয়, তাঁর নিজেরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পপতিরা যে সব সুবিধের জন্যে এতদিন গলা ফাটাচ্ছিলেন তার অনেকগুলিই এখন তাঁরা পেতে চলেছেন। তাঁরা এই সুযোগ কি ছেড়ে দেবেন? শেষে থাকে, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কথা। এই কর্মসূচী যাতে সক্ষম হতে পারে তার জন্যে তাঁদের কি কিছুই করণীয় নেই?

২৮।৮।৭১ —দেব দত্ত

প্রণব সেন-এর
পটভূমি ৫·০০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু-র
অলঙ্কার জিজ্ঞাসা ৭·০০
বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
মানুষ শরৎচন্দ্র ৩·০০
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-এর
পরিকল্পনা প্রসঙ্গ ২·৫০
ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কবিতা
দশদশক ৪·০০
দিলীপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মেঘের আড়ালে সূর্য ১·০০
রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের
নিমজ্জিত খনির মাস্তুলে
৩·০০
ক্যাথারসিস প্রসংগ ১·০০
বিশ্বজ্ঞান । কলকাতা—৯

CENTRAL LIBRARY

দেশ বিদেশ

খাদ্য ফসল উৎপাদনে ভারত আবার রেকর্ড করেছে। ১৯৭০-৭১ সালের যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশে ঐ বছর মোট ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় এটা ৮·৪ শতাংশ বেশী। এই নিয়ে পর পর চারবার আমাদের দেশে গমের উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় বাড়ল। শুধু গমই নয়, চাল, মক্কা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদনেও এবার আমাদের দেশের চাষীরা রেকর্ড করেছেন।

এই সুফলনে উৎসাহিত হয়ে নয়াদিল্লীর কৃষি মন্ত্রণালয় একদিকে যেমন অদূর-ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছেন অন্যদিকে তেমনি ইতিমধ্যেই 'প্রাচুর্যের সমস্যা'র কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বিজ্ঞানভবনে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে চার ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, সরকার খাদ্যশস্যের ব্যাপারে 'প্রাচুর্যের সমস্যা' নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠেছেন। বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে বাজারে প্রচুর পরিমাণ গম আসায় সেই গম সংগ্রহ, গুদামজাত ও স্থানান্তর করা নিয়ে ফুড কর্পোরেশনকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল সেকথা মনে রেখেই কৃষিমন্ত্রী 'প্রাচুর্যের সমস্যা'র কথা বলেছিলেন এবং এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য এবার আগে থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সেটাই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীরা আলোচনা করছিলেন।

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, এখনই 'প্রাচুর্যের সমস্যা' নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে কি? আমাদের দেশে এখনও তো জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের ভরপেট খাওয়া জোটে না। তাহলে, সমস্যাটা কি প্রাচুর্যের? অথবা, বন্টনের? অথবা সরকারী ব্যবস্থাপনার? তাছাড়া, অদূরভবিষ্যতে আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার আশাই বা কতটা বাস্তব? সেই কবে লেখা হয়েছিল, 'ভারতবর্ষের চাষ-আবাদ হচ্ছে বৃষ্টি নিয়ে জুয়া খেলা।' এখনও কথাটা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতটা সত্য তত আর কোন দেশ সম্পর্কে নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষণের মুখ চেয়ে থাকে আমাদের দেশের খাদ্য ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। আর এই মৌসুমী বর্ষণের মেয়াদ মাত্র তিন মাস। ঐ তিন মাস আকাশ মুখ তুলে চাইল তো বছরে ফসল উঠল, না হলে গেল। যদিও চীনের বাইরে পৃথিবীর আর কোন দেশ নেই যেখানে ভারতের চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে, যদিও দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও আমাদের সেচ-ব্যবস্থা হাজার বছরেরও বেশী পুরানো, তাহলেও ভারতে এখন পর্যন্ত মোট চাষের জমির মাত্র এক-চতুর্থাংশে সেচের জল পৌঁছেছে। এবং এই এক-চতুর্থাংশেরও আবার এক-তৃতীয়াংশে অধিক ফলনশীল বীজ পৌঁছেছে। তার মানে, আমাদের এই তথাকথিত প্রাচুর্যের ভিত্তি খুবই সঙ্কীর্ণ। সামান্য একটু আঘাতেই এই প্রাচুর্যের বনিয়াদ ভিত্তিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন (ভারতে সবুজ বিপ্লবের পিছনে এই ফাউণ্ডেশনের যথেষ্ট সাহায্য রয়েছে) মনে করেন, ভারত আগামী এক দশকের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না।

আর কেউ নয়, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শের সিংও সম্প্রতি প্রচুর ফলনশীল বীজের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দিল্লীতে একটি সভায় তিনি বলেছেন, কতকগুলি অধিক ফলনশীল বীজে পোকা-মাকড় ও ব্যাধির উৎপাত উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। তিনি বলেছেন, অধিক ফলনশীল বীজে প্রচুর পরিমাণে সেচের জল, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এর দ্বারা আমাদের লক্ষ লক্ষ ছোট চাষীর চাহিদা পূরণ হবে না।'

বছর দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ দেশব্যাপী একটি অনুসন্ধান চালিয়ে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'সবুজ বিপ্লব লাল বিপ্লবে পরিণত হতে পারে।' ইতিমধ্যে এটা সকলেই বুঝেছেন যে, সবুজ বিপ্লব গ্রামাঞ্চলে ধনবৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। যারা এই বিপ্লবের দ্বারা উপকৃত হয়েছে আর যারা হয় নি তাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। যেসব জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা নেই সেসব জমির চাষীরা, যাদের জমির পরিমাণ কম এবং বেশী পরিমাণে সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করার সামর্থ যাদের নাই, যারা ভূমিস্বত্বহীন খেত-মজুর, এরা সকলেই সবুজ বিপ্লবের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। এসব বিষয় বিবেচনা করেই ভারত সরকার জলসেচহীন এলাকায় ফসল বাড়াবার, ক্ষুদ্র চাষীদের সাহায্য দেওয়ার, ভূমিহীন কৃষকদের সাময়িক কাজ দেওয়ার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

যে পাঞ্জাব আজকের সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থানরূপে গণ্য সেখানকার সরকারের কাছ থেকেই এই বিপ্লবের সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। কৃষি কমিশনের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে পাঞ্জাব সরকার বলেছেন : 'গম বিপ্লব ছোট চাষীদের অবস্থার উন্নতি করে নি, কৃষি মজুরদেরও উপকার করে নি। তারা জীবন ধারণের ন্যূনতম মানের নীচেই পড়ে থাকবে।'

•

চার বছর পরে সি সুব্রহ্মণ্যম সংসদের সদস্য হয়ে দিল্লীতে ফিরে এলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। ফলে ঐ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হয় নি। লোকসভার গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে দাঁড়ান নি। তা সত্ত্বেও নির্বাচনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচন কেন্দ্র বদল করে একটি উপ-নির্বাচনে জিতে এসে সুব্রহ্মণ্যম এবার নিজের আসন পাকা করলেন।

তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি থেকে এই উপ-নির্বাচনে সুব্রহ্মণ্যম বলতে গেলে এক রকম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঐ কেন্দ্র থেকে শাসক কংগ্রেসের একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্যমকে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পদত্যাগ করেন। ডি-এম-কে ও সি-পি-আই আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা সুব্রহ্মণ্যমকেই সমর্থন করবে। স্বতন্ত্র পার্টি এই উপনির্বাচনে নিরপেক্ষ ছিল আর বিরোধী কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে ছিল। তাহলেও এক ডজন নির্দলীয় প্রার্থী সুব্রহ্মণ্যমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একে একে এগারজন নাম প্রত্যাহার করে নিলেও ২৮ বছর বয়স্ক করুণা নৈশিকন্ অটল হয়ে থাকেন। তিনি বলেছিলেন যে, সুব্রহ্মণ্যম যদি প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দিয়ে কাবেরীর জলসংক্রান্ত বিরোধ তামিলনাড়ুর অনুকূলে মীমাংসা করিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। সুব্রহ্মণ্যম তাঁর এই দাবী মেনে নেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে নৈশিকনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। নৈশিকন্ অবশ্য এই নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর স্বপক্ষে পোস্টার পড়ে নি তাঁকে নির্বাচকমণ্ডলীর সমক্ষে কেউ দেখে নি। তাঁর কোন এজেন্ট ছিল না, তিনি নির্বাচনের জন্য টাকা তোলেন নি। অপর-পক্ষে সুব্রহ্মণ্যম শ দেড়েক জনসভা করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি, চিত্রাভিনেতা (ও ডি এম কে নেতা) জি রামচন্দ্রন তাঁর হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। নৈশিকনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং সুব্রহ্মণ্যম ১ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশী ভোটে জয়ী হয়েছেন।

•

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যাগুলির মধ্যে

বার্লিন সমস্যার চেয়ে দুরূহতর আর কোনটি নয়, এই একটি সমস্যার সমাধানের উপর যতগুলি প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে এমন আর কোন একটিও নেই।

নিকিতা ক্রুশ্চভ যে সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সে সময়ে তিনি একবার বলেছিলেন, পশ্চিম বার্লিন হচ্ছে 'কাপ্সারতুলা'; এটাকে কেটে বাদ দিতে হবে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভিয়েনাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ এই বলে হুমকী দিয়েছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করবে এবং তারপর বার্লিনের কোন অংশে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপস্থিতি পূর্ব-জার্মানীর সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে ও বলপ্রয়োগে সেই হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করা হবে। ক্রুশ্চভের এই মন্তব্যের দুই মাসের মধ্যেই পূর্ব জার্মান সরকার বার্লিন শহরের উপর কংক্রিটের দেওয়াল তুললেন। পরবর্তীকালে এই দেওয়াল দুই জার্মানীর সম্পর্কের পথে একটা বড় কাঁটা হয়ে রয়েছে। পশ্চিমের হিসাব অনুযায়ী, পূর্ব বার্লিন থেকে ঐ প্রাচীর অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে আসতে গিয়ে এযাবৎ ৬৫ জন প্রাচীররক্ষীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

২৩ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে, বার্লিনে বিশ্বের প্রধান দুই শক্তি, সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে প্রায় পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে পূর্ব জার্মানীর মাটির উপর দিয়ে পশ্চিম বার্লিনে আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে পশ্চিম বার্লিন অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে বিমানযোগে রসদ সরবরাহ করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম আয়োজন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর পূর্ব জার্মান সরকারও কিছু দিন পরে অবরোধ তুলে নেন। এভাবে, সেবারকার মত বৃহৎ শক্তিবর্গ বার্লিন প্রশ্নে একটা বিস্ময়কর সঙ্কটের কিনারা থেকে ফিরে আসতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে চারটি বৃহৎ শক্তির সৈন্য বাহিনী নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করেছিল কাগজে-কলমে তারাই পুরানো, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর এই রাজধানী শহরের শাসক। শহরটিকে চারটি চাকলায় বিভক্ত করে প্রত্যেকটি চাকলাকে এক একটি করে বিজয়ী শক্তির শাসনাধীন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। সোভিয়েট এলাকা পূর্ব বার্লিনে যেখানে পূর্ব জার্মানীর সরকার অর্থাৎ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিম বার্লিন হল মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা। বার্লিন নিয়ে যে কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা হল এই যে, এই শহর চতুর্দিকে পূর্ব জার্মানীর এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, এখান থেকে পশ্চিম জার্মানীর নিকটতম সীমান্ত হচ্ছে ১১০ মাইল। এক তরফে দুই জার্মানী আর এক তরফে বিচ্ছিন্ন দ্বীপভূমির মত বার্লিন, এর মধ্যে শহরটির সঠিক রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা কি? পূর্ব জার্মানীর সরকার মনে করেন (অন্তত এত কাল মনে করে এসেছেন) তাঁদের ভূমির উপর অবস্থিত এই শহর তাঁদেরই। সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব জার্মানীর এই অভিমত সমর্থন করে এসেছে। আবার কখনও কখনও সোভিয়েট তরফ থেকে ইঙ্গিত এসেছে যে, তারা বার্লিনকে একটি পৃথক ফ্রি সিটি হিসাবে গণ্য করতে রাজী আছে। অন্য দিকে, পশ্চিম জার্মানীর নেতারা পশ্চিম বার্লিনকে তাঁদের শহর হিসাবেই গণ্য করে এসেছেন। তাঁরা দুই-দুইবার এই শহরে চ্যান্সেলার নির্বাচন করে তাঁদের অধিকার পাকা করার চেষ্টা করেছেন। বনকে তাঁরা আগাগোড়াই তাঁদের দেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসাবে দেখে এসেছেন। বন্ পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত বড় শহর কোনকালেই ছিল না, এখনও নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম বার্লিনের উপর বন সরকারের দাবী স্পষ্টাস্পষ্টি মেনে না নিলেও এ ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিয়েছেন।

এই জটিল বিরোধ ও প্রায় ২৫ বছরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিকায় আজ থেকে আঠারো মাস আগে বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রদূতেরা বার্লিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। এই আঠারো মাস ধরে তাঁদের মধ্যে ধীর-মন্থর গতিতে আলোচনা চলছিল। আলোচনার একটি বিষয় ছিল, পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে পশ্চিম জার্মানী ও বার্লিনের মধ্যে যাতায়াতের অবাধ অধিকার দেওয়া হবে কিনা। যদিও সাধারণত পশ্চিম জার্মানী থেকে পূর্ব জার্মানীর মাটির উপর দিয়ে বার্লিনে যেতে দেওয়া হয় তাহলেও এটা একটা রেওয়াজ মাত্র, কোন যোগাযোগড়ার ভিত্তিতে পশ্চিম জার্মানী এই অধিকার ভোগ করে না। সোভিয়েট রাশিয়া বলে এসেছে যে, এই অধিকার চাইতে হলে পশ্চিম জার্মানীকে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কথা

নাটক — নাটক — নাটক

স্বপন সেনগুপ্ত রচিত বহুল অভিনীত শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামী নাটক

কবে বসন্ত আসবে

[১টি সেট, ২টি মেয়ে, ১০টি পুরুষ]

দাম—তিন টাকা

বর্তমান রাজনৈতিক পট-ভূমিকায়
স্বপন সেনগুপ্তের নতুন আঙ্গিকে

অশুভ আঁতাত

[১টি মেয়ে, ১০টি পুরুষ, ১টি সেট]

দাম—সাড়ে তিন টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

নদী বয়ে যায়

দাম—দুই টাকা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

মন্দাক্রান্তা

দাম—আড়াই টাকা

বিমল রায়ের তিনটি একাংক একত্রে

গ্রহ সম্মেলন, বীজ, অন্তরালে

দাম—দুই টাকা

—প্রকাশিত হইতেছে—

বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পটভূমিকায় মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা
স্বপন সেনগুপ্তের বলিষ্ঠ নাটক

হিরো

—: প্রকাশক :—

চক্রবর্তী এ্যাণ্ড কোং
৮সি, টেমার লেন, কলকাতা-৯

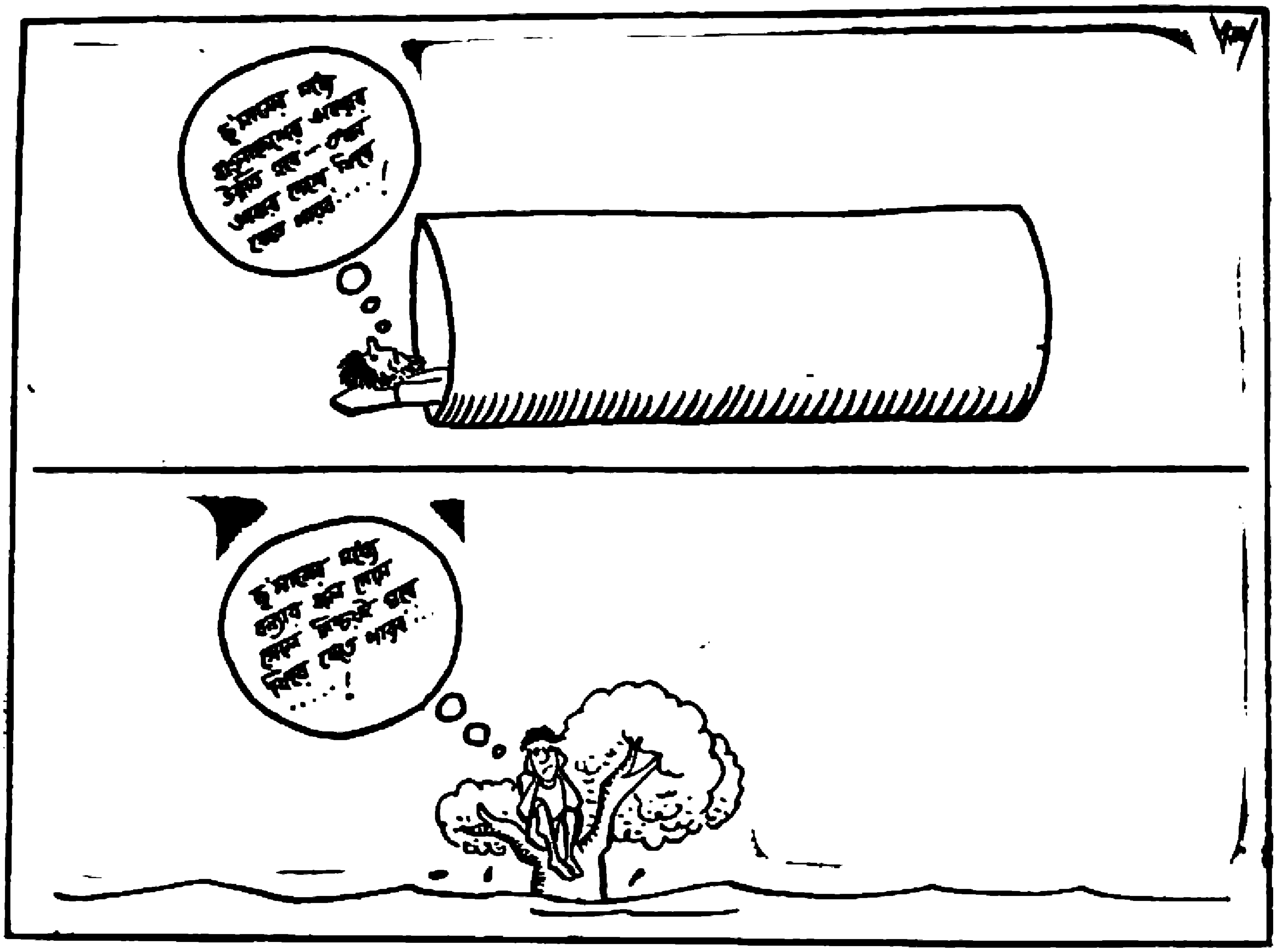

বদলাতে হবে। পাশ্চাত্য শক্তিরা তাতে রাজী নয়, তাঁরা পূর্ব জার্মানীর সরকারকে স্বীকার করে না, বার্লিনের উপর তাদের অধিকারও মানে না। এই নিয়ে আলোচনা যখন একটা অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন গত মে মাসে অকস্মাৎ সোভিয়েট রাশিয়া ঘোষণা করল, পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে রেল ও সড়কপথে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে বার্লিনের যোগাযোগ রাখার অধিকার তারা স্বীকার করে নেবে। এই ঘোষণার পর থেকেই এরকম আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যে, রাষ্ট্রদূতদের আলোচনায় মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

তারপর পাওয়া গেল সেই সুসংবাদ। আলোচনার শেষ তিনদিনে মোট প্রায় ২০ ঘণ্টা বৈঠক করে চার রাষ্ট্রদূত একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করেছেন। পশ্চিম বার্লিনে পুরানো প্রাশিয়ান হাইকোর্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রদূতরা চুক্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রুশ রাষ্ট্রদূত বললেন, "নিখুঁত," মার্কিন বললেন, "ভালো", বৃটিশ রাষ্ট্রদূত বললেন, "সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত," ফরাসী রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য : "সন্তোষজনক"। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সরকার ইতিমধ্যে খসড়া চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন। এখন শুধু মস্কো, ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও প্যারিসের অনুমোদনের অপেক্ষা।

খসড়া চুক্তির সর্তগুলি অবশ্য এখন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। তবে সংবাদের সূত্র থেকে যতটুকু জানা গেছে, খসড়া চুক্তিটিতে এই সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে :—

পশ্চিম জার্মানী থেকে পশ্চিম বার্লিনে যাতায়াতের পথ।

প্রাচীর অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিনবাসীদের পূর্ব বার্লিনে যাওয়ার অনুমতি। পশ্চিম বার্লিনে পশ্চিম জার্মানীর সর্তাধীন রাজনৈতিক উপস্থিতি।

বিদেশে পশ্চিম জার্মানীর মারফৎ পশ্চিম বার্লিনের প্রতিনিধিত্ব।

পশ্চিম জার্মানীতে সোভিয়েট কনসাল-জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব।

বার্লিন সম্পর্কে এই চুক্তির বড় গুরুত্ব হল, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের "অস্টপলিটিক" অর্থাৎ পূবের দেশগুলির সঙ্গে সমঝোতার রাজনীতির সাফল্য কতক পরিমাণে এই চুক্তির উপর নির্ভর করছে। পশ্চিম জার্মানী সম্প্রতি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে যে দুটি আক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলি হেয় ব্রান্টের "অস্টপলিটিক" [illegible]। কিন্তু বার্লিন সম্পর্কে চতুঃ[illegible] মধ্যে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এই দুটো চুক্তি কার্যকর করা যাচ্ছিল না।

এছাড়া সোভিয়েট রাশিয়া ইউরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। তারা ইউরোপে "ন্যাটো" ও ওয়ারস চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার প্রস্তাব দিয়েছে। ইউরোপে উত্তেজনা হ্রাস ও ঐ মহাদেশ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসায় সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা, দুই পক্ষেরই আগ্রহ রয়েছে। রাশিয়াকে এখন চীনের সীমান্তের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে আর আমেরিকাকে অর্থনৈতিক কারণে বিদেশে ডলার খরচ কমাবার কথা ভাবতে হচ্ছে।

কিন্তু ইউরোপে নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তাবই হোক অথবা সেখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব হোক, ঐ মহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল বার্লিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা হলে আপনা-আপনিই যে অন্যান্য সমস্যার নিরসন হয়ে যাবে তা নয়; কিন্তু বার্লিন নামক পথের কাঁটাটি দূর হয়ে গেলে অন্ততঃ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাবে।

—দূরদর্শী

শারদীয় অমৃত ১৩৭৮

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

খনির নতুন মণি ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কমরেড ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল

পারিধী ॥ বুদ্ধদেব গুহ

প্রবন্ধ

অলোক রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, দিলীপ মালাকার, নারায়ণ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

গেরিলা যুদ্ধের নায়ক হেমিংওয়ে ॥ ভবানী মুখোপাধ্যায়

* কবিতা *

অনিলবরন গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণ মিত্র, আশিস সান্যাল, উমা দেবী, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, কালিকা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তরুণ সান্যাল, দুর্গাদাস সরকার, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, নবনীতা দেব সেন, নমিতা চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত, বিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, মণীশ ঘটক, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, শক্তি চট্টো-পাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, শিশির ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীলকুমার লাহিড়ী, সুশীলকুমার গুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ।

সিনেমা ও খেলাধুলা

অজিতকুমার ঘোষ, অশোক মজুমদার, তপন সিংহ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, রবি ঘোষ, শম্ভু মিত্র, সন্ধ্যা সেন, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ রায় প্রমুখ।

সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে মিশিয়াছিলাম অল্পবয়সেই। তখন ভদ্রগৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতে ও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না, কিন্তু সে মহল হইতে পিঠের ওপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ আধুনিককালে সেই মহলটার দেউড়িতে তেমন লোকবল নাই, কিন্তু কবুল করিতে হইবে আমি আইন মানি নাই।" সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। স্বহস্তলিখিত অনুলিপিসহ।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য

স্বরাগমন

গল্প লিখেছেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গোষ্ঠ শেঠ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিব্যেন্দু পালিত, দীপক চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, প্রফুল্ল রায়, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, মিহির আচার্য, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, শেফালী চট্টোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, সতীকান্ত গুহ, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুশীল রায়, সুমথনাথ ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ।

বিশু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

সেকালের পুজোয় নক্সার রঙ

*** শিকার, রহস্য, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী**

অজিতকৃষ্ণ বসু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নির্মলকুমার সরকার, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম : সাড়ে চার টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা তিন

সহযাত্রী ॥

কৃষ্ণ ধর

হয়তো এখনো নয়
সময় হলেই আসবে, হয়তো তখন
মুখোমুখি তাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে থাকব চেয়ে
বলব, এই কি সময়?

এইভাবে কতদিন আকাশ আগুন-রাঙা দেখে
ভেবেছি নিজেই বুঝি হইনি তৈরি বুকে শুনে
ভেবেছি শিমুলে এমনি জ্বলজ্বল চৈত্রের হাওয়ায়
আগুন ছড়ায়।

তাহলে কি সারাক্ষণ বসে থাকব প্রতীক্ষায়
কখন সময় হবে বলে
কখন দরজায় দেবে টোকা
চুপি চুপি নিশুতির খাপ-খোলা ঝলসানো আঁধারে
পরিচিত কণ্ঠস্বরে ডাক দেবে, তয় কিরে চলে আয়
আমি তোর নিত্যসহচর!
তারপর অন্ধকারে পথ চিনে স্মৃতি বিস্মৃতির গন্ধ মেখে
চলে যাব হাত ধরে রাত মোহনার ধার ঘেঁষে
চলিষ্ণু নদীর কলরবে
সেখানে তরুণ আলোয় পরস্পর নেব মোরা চিনে
কার জন্য এ প্রতীক্ষা, কে বা সেই আকাঙ্ক্ষিত পথের দোসর।

কিছু ছাড়া যায় কিন্তু সব নয় ॥

রেনো হালদার

কিছু কিছু ছাড়া যায়, সব নয়।
সব কিছু ছাড়তে গেলে ঠিক কিছু হাতে
থেকে যায়। ধানের কুনকের গায়ে
মোহরের মত কিছু লিপ্সা আটকে থাকে......
যা থেকে আন্দাজ করা যায় কত ছিল
জমার খাতায়, গেছে কতটুকু
খরচের খাতে। অপিচ সাধের সঙ্গে
সাধ্যের দূরত্ব চিরকাল
দুরতিক্রম্য-ই থাকে। সমান্তরালে বহমান
যেন দুই নদী।
অথচ ছাড়বার ইচ্ছা ক্রমশ দুর্বার হয়ে হয়ে
ঝড়ের নৌকার মত নোঙর ছিঁড়েও
ফিরে আসে ঘাটে।
বাসনার সোনার পাখীর একটা ডানা কেটে
উড়িয়ে দিলেও
রিপ্লাই-কার্ডের মত নতুন সংবাদ নিয়ে
নীড়ে ফিরে আসে।

বাংলা দেশ ॥

কামাল মাহবুব

সমস্ত হৃদয় বাংলাদেশের দিকে থেকে যাচ্ছে
গাছপালা সব ছুটে যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে
নদীর প্রতিটি প্রবাহের মুখ তার উৎসের পথে
মেঘের ভেলাপুঞ্জ চিরকাল বাংলার মানচিত্র মানে না।

আমি যেদিকেই যাচ্ছি আমার সমুখে এসে দাঁড়াচ্ছে আত্মীয় পরিজন
কিংবা চিরচেনা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী
শৈশবের স্মৃতিময়তা, ভালোবাসা, দুঃখ-শোক, বেদনা ও ক্লান্তি
একবাক্যে সকলেই প্রশ্ন করছে : তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—

আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি কোথায়, কিছুই জানি না
কেবল শরণার্থীরা ছাড়া সবাই যাচ্ছে বাংলাদেশের পথে
বন পাখি, তরুলতা, প্রিয় ফুল, প্রকৃতির সাথে
নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছে উটের পিঠের মত রামগড়ের পাহাড়।

ফিরে যাব বলে আমি সন্তর্পণে বাংলাদেশ পেরিয়ে এলাম।

তীরে তীরে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভদ্রলোক শেষবারের মত আবেদন জানালেন, দিন না দয়া করে। আমি বড় আশা নিয়ে এসেছি। যদিও প্রায় অসম্ভব, তবু যে করেই হোক, ইংরেজী আর অঙ্কের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর রেখে দোব। আশা করি মেকআপ করে ফেলবে।

কমলা কোন কথা বলল না। অনেক বার বলেছে, অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, কিছুতেই বুঝতে চান না, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই একই কথা বলে চলেছেন, দিন না দয়া করে। যেন কমলা দয়া করলেই ওঁর মেয়ে একেবারে ফার্স্ট ডিভিশনে বেরিয়ে যাবে! কমলা কোন কথা বলল না, মুখ তুলেও চাইল না, আপন মনে লিখতে লাগল।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, আমাদের গ্রামের স্কুল সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা আছে। উনি আমায় কথা দিয়েছেন চামেলী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলেই ওকে প্রাইমারী সেকশনে নিয়ে নেবেন, তারপর প্রাইভেটে বি-এ দিতে পারবে। আবার একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চামেলীই সবার বড়, ও রোজগার শুরু না করলে একা সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার শরীরটাও কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে, রোজ বিকেলে টেম্পারেচার হয়, বুকের বাঁ পাশটা ব্যথা-ব্যথা করে—

কমলা এবার মুখ তুলল, খানিকটা বিরক্তিই বিচ্ছুরিত হল তার কথার সুরে, দেখুন, এসব ব্যক্তিগত কথা শুনে লাভ নেই। অত সময়ও নেই। এক সাবজেক্টে যারা দশ নম্বর কম পেয়েছে, এবার-তাদেরও এলাউ করা হয়েছে। আর চামেলীর দু-দুটো সাবজেক্টে শর্ট। কি করে ওকে এলাউ করা যাবে বলুন। তাহলে, ওর মত দুটোতে ফেল করেছে এমনি আরও মেয়ে আছে, ওদের কি করব? তাদের গার্জিয়েনরা এসে যখন বললে কি জবাব দোব?

ভদ্রলোক তথাপি বলতে লাগলেন, আমি হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, উনি তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে— মাপ করবেন, আমার কিছু করবার নেই। দুঃখিত।

কমলা লেখায় মন দিল। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপটি করে বসে রইলেন, তারপর ছাতাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, নমস্কার, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল বাসন্তীদির ওপর। উনি হেড মিসট্রেস, অথচ দমন্ত ঝাঁক কমলার ওপর। নিজে বেড়াবেন রাজনীতি করে। মাসের মধ্যে পনেরো দিনও আসেন কিনা সন্দেহ। আসেন না রাজনীতি করেন বলে। এদেও রাজনীতির পাণ্ডারা হানা দেয়, ক্লাশ কামাই হয়, খাতাপত্র পড়ে থাকে, স্কুলের অফিস রাজনীতির আড্ডায় রূপান্তরিত হয়। সেই কোনকালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে নাকি মাস ছয়েক জেল খেটেছিলেন, বাস, দেশ স্বাধীন হবার পর এক লাফে একেবারে হেড মিসট্রেস। রাজনৈতিক নির্যাতনের পুরস্কার। স্বামী দিল্লীতে ফরেন ডিপার্টমেন্টের বড় চাকুরে, সুতরাং খুঁটির জোর প্রবল, বাধা দেবে কে? বি-টি যখন দিলেন, দিতে

বাধ্য হয়ে, কারণ বি-টি না হলে হেড মিসট্রেস হওয়া যায় না, তখন বাসন্তীদির চুল পাক ধরে গেছে। দুই সাবজেক্টে ফেল-করা মেয়েকে যদি খাতির দেখাতে হয়, নিজে দেখালেই পারতেন! কমলা ভাবল, কি জানি, চামেলীর বাবা বাসন্তীদির রাজনৈতিক সাকরেদ হবে হয়ত।

কোয়ার্টার্সে ফিরে আসতেই হারানী-মাসী চা ও খাবার নিয়ে এল। বলল, মা-মণি, আরতি-মাসী আর মেনকা-মাসী দু-দুবার তোমার খোঁজ করে গেছে।

কেন, মাসী কিছু বলেছে?

তোমার নাকি ওদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। যত্র গেল, কমলাদিকে বলো মাসী, অনেক খোঁজ করে গেছি।

কমলা খাবার টেনে নিল। সত্যিই ত, সিনেমায় যাবার কথা ছিল। গাদাগাদা কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সেকথা আর মনেই নেই। সাড়ে ছটা বাজে। সিনেমা-টিনেমায় আর যাওয়াই হয় না। শেষ কবে গিয়েছিল? কমলার মনে পড়ল, সে প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু সেও কি আর সখ করে? চ্যারিটি শো হবে দেশবন্ধু পাঠাগারের জন্য, টিকিট খাটিয়ে গিয়েছিল, প্রভাতবাবুও কিনেছিলেন, তিনিই জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন। নইলে সখ-টখ কবে ছেড়ে দিয়েছে কমলা। সারাটি দিন স্কুল পাথরের দুর্যোগ পড়ে কাজ করতে হয়। মেয়েরা ভয় করে বাঘের মত। কত যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাজ জমতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে পরীক্ষা-টরীক্ষার পর কত যে মেয়ে এসে কাঁদে, কত অভিভাবক এসে সুপারিশ করেন, কিন্তু চোখের জলে বা চাটু কথায় ভিজে গেলে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না। বাড়ীতে ফিরে এলেও সেই মুখোসটা যেন আর ছাড়ানোই যায় না। হাল্কা জিনিস আর ভাল লাগে না। না, শনি রবিবারেও না। আরতি আর মেনকা নতুন এসেছে, বয়স কম, দায়-দায়িত্ব বিশেষ নেই, তাই ওদের সাজে প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বেড়ানো। সিনেমা বোধহয় একটিও বাদ যায় না আর স্কুলে ও পড়াতে যায় না, যেন যায় সাজ দেখাতে, বেড়াতে। কমলার আশ্চর্য লাগে, কি করে ওদের সঙ্গে এত দিদিদের এত ভাব হয়ে গেল। আরও ত কত টিচার আছে, তাদের সঙ্গে ওরা ভদ্রতা রেখে চলে আর যত খুনসুটি দুষ্টুমি কমলার সঙ্গে। সব সময় ভাল না লাগলেও রাগ করবার উপায় নেই, কারণ ভারী মিষ্টি মেয়ে দুটি। প্রায় বন্ধুর মত চলে, অথচ বয়সের ফারাক কত? এক যুগ বয়স ত নিশ্চয়ই।

ছুটি-ছাটায় বাসন্তীদির স্বামী যেই এলেন, অমনি দৃষ্টিতে স্পাইয়ের মত ওঁদের পরস্পর নজর রাখবে আর সব কথা ছুটে এসে রিপোর্ট দিয়ে যাবে। কমলাদি, কমলাদি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ না একবারটি, দেখ না একবার বাসন্তীদির ড্রেসখানা। [illegible] [illegible] সেই প্রীটিন এইটিনিকস-এর সাদা খোল কালো

পাড় বর্জন করে একেবারে যেন রঙের মিছিল। কর্তার মুখে পাইপ আর ঠাকরুণের হাতে ম্যাচ-করা ভ্যানিটি ব্যাগ। যা বলে সেজে উঠলেন দুজন ট্যাক্সিতে, চললেন বোধহয় মার্কেটিং-এ। আবার একদিন: কমলাদি, তুমি আজ কি হারাইলে জান না। আজ যদি বাসন্তীদিকে দেখতে, মাথা ঘুরে যেত। সেই যে আমরা পরলে তুমি ক্ষেপাও, সেই স্লিভলেস বটলগ্রীন ব্লাউজ পরেছেন শ্রীমতী। চাউল পেট দেখা যাচ্ছে আর কোমরের দুপাশে থাকে থাকে চর্বি। দুজনে বোধহয় বেরোলেন সান্ধ্য ভ্রমণে। আবার একদিন হাসতে হাসতে এসে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা কমলাদি, বাসন্তীদির বেড-রুমের আলো আজ নটা বাজতে না বাজতেই নিভে গেল কেন? রাত বারোটা পর্যন্ত যদি ড্রয়িং রুমে প্রতিদিন গরম পলিটিকস আলোচনা চলবেই, আজ ব্যতিক্রম কেন তার? বুড়ীর মধ্যে এত দেখ?

কমলার হাসি পেল। বেশ আছে দুটিতে। মাইনের পুরো টাকাটাই হেসে-খেলে উড়িয়ে দেয়। বাড়ীর অবস্থা ভাল, কাউকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। ওরা ত বলেইছে এটা ওদের সখের চাকরি আপাততঃ, বিয়ে হলেই ত ক্যারেক্টারের যাবে চলে ইস্তফা দিয়ে। হত কমলার মত অবস্থা, বুঝত কত ধানে কত চাল!

ছোটবেলায় এমনি প্রজাপতির স্বপ্ন কমলার বুকেও জেগেছিল। টৈসটৈসে হয়ে উঠেছিল মনেতে মনেতে। মনের লোভে পলে পলে করে উঠেছিল রঙের দল। আকাশ তখন মনে হত রামধনু রঙীন, বাতাসে ভেসে বেড়াত গোলাপের গন্ধ, নিমেষে বিলিয়ে দেবার নেশায় সেও একদা মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যার কাছে ধরা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য উতলা হয়ে বাবাকে সব জানিয়েছিলেন। দূরদর্শী বাবা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সবার বড় ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, ছোট ভাইবোনদের প্রতি তার দায়িত্ব অনস্বীকার্য। নিজের পানে চাইবার আগে তাদের পানে চাইতে হয়। তাই কমলাকেই গরীব সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। এই স্কুলেই প্রাইমারী সেকশনে ঢুকেছিল। তারপর কঠিন সমারোহে যেমন সে পর পর বি-এ, এম-এ এবং বি-টি পাশ করতে লাগল, স্কুলের কর্তৃপক্ষও পর পর তাকে প্রমোশন দিতে দ্বিধা করলেন না। আকাশের দিকে আর চাইল না সে, চাইল না নিজের দিকে। পাঁচ বছর আগে যখন সে এসিস্ট্যান্ট হেড মিসট্রেসের আসনে বসেছিল, তখন সে নিজেকে দেখেছে ফেলে এসেছে।

এখন আর তার জন্য কোন হায় হায়-হাপিত্যেস নেই কমলার। বোনটার ভাল ঘরে ও বরে বিয়ে হয়ে গেছে. ভাইটাও ভাল চাকরি করে। মা বাবা আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন যে, কমলা সংসারকে দাঁড় করিয়েছে। দুঃখের রাতি শান্ত প্রসন্ন প্রভাতে রূপান্তর করছে!

দরজা ঠেলে ঢুকল আরতি আর মেনকা।

এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আচ্ছা কমলাদি, তুমি কেমন মানুষ বল ত! তোমায় না বার বার বলে রেখেছিলাম সিনেমায় যেতে হবে, তাড়াতাড়ি এসো?

ভুলে গিয়েছিলাম ভাই, এত কাজের চাপ—এই ত দেখ, উইকলি টেস্টের এই খাতাগুলো বাসন্তীদি চাপিয়ে দিয়েছেন আমার ঘাড়ে। কমলা মৃদু হেসে বলল, একে নিজের কাজের অন্ত নেই, তার মধ্যে আবার অপরের,—আর বয়সও ত কম হল না, ভুলে যাই—

মাগো, আরতি চোখ কপালে তুলল, কি আর বয়স হয়েছে তোমার, তাই শুনি! তিরিশ পেরিয়েছ বটে, কিন্তু খুব বেশী দূর যাওনি—

কত? কমলা হেসে আরতির হাত ধরল, পাঁচ বছর আগে তিরিশ পেরিয়ে এসেছি—

তাতে কি হয়, আরতি বাধা দিল, দেখলে কার সাধ্য সেকথা বলে।

সবাই হেসে উঠল।

মেনকা বলল, কতক্ষণ ধরে রেডি হয়ে আমরা ভাবছি, এই বুঝি তুমি এলে। কিন্তু কোথায়? এখান থেকে দেখতে পেলাম, একে একে সবাই চলে গেল, এমনকি প্রভাত-স্যার, যিনি আসেন সবার আগে, যান সবার পরে, তিনিও চলে গেলেন, রইলেন শুধু বাসন্তীদি, তখন ত আর কারো করছেন না, দলের পাণ্ডা যারা সব এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছেন, আর তুমি—

গিয়ে ডাকলেই পারতে।

ওরে বাবা, তোমার অফিসে কে যাবে? যা গম্ভীর হয়ে বসে থাক না, মেয়েরা ত দূরের কথা, আমাদেরই ভয় করে।

কি ছবি দেখলে? কমলা জিজ্ঞেস করল।

ছবি? বলেই মুখ টিপে হাসল আরতি, সে আর জিজ্ঞেস করো না কমলাদি। দেখব "অজানা পথে," গিয়ে দেখি হাউস ফুল। আমি ফিরেই আসতে চেয়েছিলাম, ওর পাল্লায় পড়ে গেলাম হিন্দি ছবি দেখতে চাঁদনী রাত—উরে ব্বাস, কি ছবি কমলাদি, শুধু গান আর নাচ, নাচ আর গান। আর সেন্সর-সাহেবদের চোখে ধুলো দিয়ে সেই সব ভেজারাস পোশাক আর নায়ক-নায়িকার সেই সব যৌন্ট ডেঞ্জারাস— এই দুশ্চরিত্র, আবার চিমটি কাটছিস? চিমটি কেটে কেটে কি করে দিয়েছে, দ্যাখ না কমলাদি। বলেই বাঁ-পাশের ব্লাউজ খানিকটা তুলে দেখাল, কমলা দেখল, সত্যিই লাল হয়ে গেছে। আরতি বলতে লাগল, যেই না সেই সব মোক্ষম সিন আসে আর মেনকাটা আমায় চিমটি কাটে আর কানের কাছে মুখ এনে বলে ওঠে, মরে যাব আরতি—

কমলা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, ফিরতে এত দেরী হল যে, অন্য কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

নে, বল, এবার মেনকা বলে উঠল, খুব ত চিমটি কাটার নালিশ করলি, এবার বল দেরী হল কেন? একটু

হেসে নিজেই বলতে লাগল, রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম কমলাদি, আরতি খাওয়াল। কেন খাওয়াল জান?—আরতি ছুটে পালাচ্ছিল, মেনকা খপ করে ওর আঁচল ধরে ফেলতেই একেবারে বে-আঁচল হয়ে গেল আরতি, তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে বুকে চাপা দিয়ে বলে উঠল, অসভ্য। মেনকা ফোঁচ কেটে বলল, অসভ্য। অসভ্য আমি, না তোর ফিঁয়াসে? জান কমলাদি, আজ ওর ফিঁয়াসের চিঠি এসেছে। কি লিখেছে জানো? তোমার বিরহ আর সহিতে পারিতেছি না। মাকে বলিয়াছি সব, মা বাবাকে বলিয়াছেন, বাবা আপত্তি করেন নাই। সুতরাং আর কটা দিন পর বৈশাখ পড়লেই একেবারে প্রথম শুভ দিনটিতেই—ওরে বাবা, তারপর যা সব লিখেছে না কমলাদি, বলব তোমায় অন্য সময়। খুশীতে ডগমগ হয়ে তাই শ্রীমতী চিকেন রোস্ট খাইয়ে দিল।

বলেই দৌড়ল মেনকা, আরতিও তাড়া করে বেরিয়ে গেল বলতে বলতে, দাঁড়া মুখপুড়ী লক্ষ্মীছাড়ী, আমিও দোব তোর সব সিক্রেট ফাঁস করে।

কমলা চুপটি করে বসে রইল। অনেকক্ষণ।

ওদের ফিঁয়াসে আছে, সে আর বিরহ সইতে পারছে না, গোপনে চিঠিতে এমন সব কথা লেখে সে, যা গোপনে ছাড়া বলা যায় না, বিয়ের আনন্দে ডগমগ হয়ে ওরা রেস্টুরেন্টে খায়, এমনি উজ্জ্বল মধুরের মত নভোপরা দিন কমলার জীবনেও কি একদা চকমকিয়ে ওঠেনি? কিন্তু সে যেন বিদ্যুতের চকমকানি! দিকদিগন্তে মুহূর্তের জন্য আলোকরেখা টেনে দিয়েই নিঃসীম অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। প্রেমের সাগরে অবগাহনের আনন্দে ওরা রোমাঞ্চিত আর বড় আশা নিয়ে কমলা গিয়ে তীরে পৌঁছতেই পেছন থেকে গর্জন করে উঠল জলদগম্ভীর কঠিন কর্তব্যের আহ্বান। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওরা যখন মাতামাতি করছে, দাপাদাপি, কমলা তখন তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিক্‌ভ্রান্তের মত।

খাতা রইল পড়ে, কমলা চেয়ে রইল জানালার বাইরে। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত স্বপ্নের মত আস্তরণে ঢাকা খেলার মাঠ, ওপারের বিদ্যালয় ভবন। আগ্রার প্রাসাদে বন্দী অসহায় সাজাহান যেমন করে অপলক চোখে চেয়ে থাকত প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু তাজমহলের পানে, তেমনি করে চেয়ে রইল সে ঐ ভবনটির পানে, যেখানে সমাধিস্থ তার জীবনের সমস্ত হাসি ও আনন্দ।

সেদিন স্কুলে এক সাংঘাতিক ব্যাপার।

বাজেট তৈরী করেন প্রভাতবাবু। গতবছর ঠিক মোক্ষম সময়টিতে প্রভাতবাবু অকস্মাৎ দেড় মাসের ছুটি নিয়ে উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফলে, বাজেটের দায়িত্ব এসে পড়ে বাসন্তী সরকারের ওপর আর উনি সব দায়িত্ব যেভাবে পাশ কাটিয়ে যান, সেইভাবে কমলাকে ডেকে অনুরোধ করেছিলেন, কমলা-বোন, যাও না ভাই ওটা তৈরী করে। দেখতেই ত পাচ্ছ, ইলেকশনের ব্যাপারে আমার আর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কমলা কোন দিন করে নি, তবু অনেক পরিশ্রম করে দিয়েছিল একটা খাড়া করে। বছরের শেষে দেখা গেল তিন-তিনটে খাতে অ্যাকচুয়েল এক্সপেণ্ডিচার বরাদ্দ টাকার ডবল হয়ে গেল। এ নিয়ে কথা উঠেছিল ম্যানেজিং কমিটিতে।

এ বছরে গত বছরের ঘাটতি মেকআপ করে বাজেট তৈরী করতে হবে, তাই প্রভাতবাবুকে টেবিল দিয়ে কমলার অফিস কক্ষে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি সেদিন প্রতিটি হেড নিয়ে কমলার সঙ্গে আলোচনা করে করে লিখছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন ইলেভেনের ক্লাশটিচার মধুমতী দত্ত। হাতে এক টুকরো কাগজ। কমলার কাছে গুরুতর অভিযোগ করলেন। ক্লাশে অঙ্ক দিয়েছিলেন। তারপর অঙ্ক-কষা খাতাগুলো দেখতে দেখতে চৈতালীর খাতার মধ্যে একখানা বিচিত্র চিঠি পেয়েছেন। এই সেই চিঠি।

কমলা বলল, বাসন্তীদির কাছে যান না ভাই, আমরা একটু ব্যস্ত আছি—

গিয়েছিলাম, মধুমতী বললেন, এক্ষুণি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন তোমায় দেখাতে। পড়েই দেখ না একবার। বলে নিজেই প্রথম লাইনটা পড়ে শোনালেন, প্রাণের চৈতালী, কি মিষ্টি তোমার চিঠি, আমি বারবার ঠোঁটে ছুঁইয়েছি।—নাও, এবার কি করবে কর। বলে চিঠিখানা টেবিলে রাখলেন, বললেন, নিয়ে এসেছি ওকে, ডাকব?

এতক্ষণ মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন প্রভাতবাবু, কমলার মুখেও তাই হাসির আভা ঝিলিক দিচ্ছিল, কিন্তু মধুমতীর অভিযোগ এবং প্রেমপত্রের প্রথম লাইনটা শুনতেই সে ঝিলিক খপ্ করে নিভে গেল, কঠিন হয়ে উঠল মুখখানা, কপালে ফুটে উঠল কুঞ্চনরেখা, চিঠি হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ক্লাশ শেষ হতে এখনও বারো মিনিট বাকি, আপনি ক্লাশে যান, দরকার হলে আমি ওকে ডেকে নোব'খন।

মধুমতী উত্তেজিত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রভাতবাবুর পানে আড়চোখে চাইল

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ	॥ ১·৫০	জোড়াসাঁকোর ধারে	॥ ৪·০০
ভারতশিল্পে মূর্তি	॥ ১·৫০	ঘরোয়া	॥ নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ
বাংলার ব্রত	॥ ১·০০	পথে বিপথে	॥ যন্ত্রস্থ
সহজ চিত্রশিক্ষা	॥ ১·০০	আলোর ফুলকি	॥ যন্ত্রস্থ

●

শ্রীমতী লীলা মজুমদার-প্রণীত

অ ব নী ন্দ্র না থ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। মূল্য ২·০০

●

অবনীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

শ্রীমতী রানী চন্দ-প্রণীত

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

কমলা। ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে মাথা নীচু করে কাজ করছেন। এমনি ডেলিকেট ব্যাপার একজন পুরুষ মানুষের সামনে আলোচনা করা ঠিক হবে কিনা, ভাবল কমলা। লোকটি আবার ঠোঁটকাটা, চৈতালীর সামনেই হয়ত ফোড়ন কেটে বসবেন! তার চাইতেও কয়েক বছরের বড়, মানে চল্লিশের কাছাকাছি, তাহলে কি হবে, কমলার সঙ্গে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে কখনো কখনো যা মন্তব্য করেন না, তখন মনে হয় যেন চল্লিশ থেকে চব্বিশেই নেমে এসেছেন। অথচ লোকটা ভাল, শালীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেন না।

প্রভাতবাবু নিজেই বোধ হয় বুঝতে পারলেন, বললেন, আচ্ছা, আমি বরং একটু ঘুরে আসি—

কেন? বসুন না। কমলা কি জানি কেন, বাধাই দিয়ে বসল, আপনি থাকলে ও আরও ভয় পাবে—

না, না, ওসব প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার—

হা-হা, তা হলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। বসুন। কমলা জোর দিয়ে বলল।

বসলেন প্রভাতবাবু এবং বসে আবার খাতায় ডুবে গেলেন।

চিঠিখানা খুলল কমলা। নির্জলা প্রেমপত্র। শিবাজী নামে কে একজন লিখেছে। সেই একই ধরন। যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু শুধু চিঠিতে কি আশা মেটে? তোমায় না পেলে আমার জীবন অন্ধকার। জানাবে কবে কোথায় কখন তোমার কাছে পাব। কমলার মনে হল, প্রেমপত্রের যেন কোন সাইক্লোস্টাইল করা ফর্ম আছে, বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার প্রেমিক-প্রেমিকারা দরকার হলেই একখানা ফর্ম কিনে নাম-ধাম কিছু আপ করে পাঠিয়ে দেয়। সেই কত বছর আগে এমনি দু-চারখানা পত্র কমলার হাতেও এসেছিল, সেগুলোর সঙ্গে এই চিঠিখানা ভাষা ও ভাবের এমনি আশ্চর্য মিল হল কি করে? বাতাসে যেন চেনাদিনের গন্ধ পেল কমলা।

অফিসে। প্রস্তুত হয়ে ডাকল চৈতালীকে।

ধীর পায়ে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল চৈতালী।

কমলা দেখল, ওর বয়স একটু বেশী হলেও সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। সুন্দরী। একটু বাড়ন্ত শরীর। স্কুলের ইউনিফর্ম সাদা ব্লাউজটার গলা একটু ডিপ করেই কেটেছে। কাপড়টাও বেশ ফিনফিনে। নীচের শেমিজ দেখা যায়। কানের ওপরের চুল ছোট করে কেটে চূর্ণ অলক তৈরী করেছে। শ্যাম্পু-করা ঘন ঢেউ-খেলানো চুল। মোটা বেণী।

কমলা কড়াস্বরে প্রশ্ন করতে লাগল, শিবাজীটা কে শুনি! কোথায় থাকে? কি করে পরিচয় হল ওর সঙ্গে? এমনি কত দিনের চিঠি লিখেছে? আর তুই-ই বা কখানা লিখেছিস?

চৈতালীর মুখে [illegible]-আর ভয়ে [illegible]

কত বয়স হবে তোর, কমলা আবার সুরু করল, সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। এরই মধ্যে রোমান্স করতে শিখে ফেলেছিস, বদ মেয়ে কোথাকার।—কি, ভেবেছিস চুপ করে থাকলেই পার পেয়ে যাবি? তোর জামার চিঠিখানা এঁটে ক্লাসে-ক্লাসে ঘুরিয়ে আনব, তোর গার্জিয়েনকে লিখব, তোর নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দোব।

চৈতালীর চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়তে লাগল।

কমলা গর্জে উঠল, ইঃ, আবার কান্না হচ্ছে। ন্যাকা মেয়ে আর কি! স্কুলে পড়তে এসেছিস, না এসেছিস রোমান্স করতে? যা, এখখুনি বই-খাতা নিয়ে বাড়ী চলে যা, তোর গার্জিয়েনের সঙ্গে আগে কথা কইব, তারপর স্থির করা হবে তোকে স্কুলে রাখা হবে কিনা।—যা।

নমস্কার করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল চৈতালী।

একটু পরে গলা খাঁকারি দিলেন প্রভাতবাবু, বললেন, মেয়েটা কিন্তু দারুণ ভয় পেয়েছে—

ছাই পেয়েছে! কমলা বাধা দিল, আপনিও যেমন! ওসব লোক-দেখানো চোখের জল। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, বাড়ীতে গিয়েই সব জানাবে ছেলেটাকে আর এবার থেকে চিঠি লেখালেখি করবে না, গোপনে গোপনে মিট করবে। যার মাথায় একটিবার এসব পোকা ঢুকেছে—

পোকা বলছেন কেন? বাধা দিলেন প্রভাতবাবু, পোকা না হয়ে জেনুইন প্রেমও ত হতে পারে। সতেরো আঠারো যদি বয়েস হয়ে থাকে, তাহলে এ বয়সে মেয়েদের মনে একটুখানি রোমান্সের রং লাগা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় বলে আমার মনে হয়।

এইবার হেসে ফেলল কমলা, তা মশাই, মেয়েদের মনের খবর আপনি জানলেন কি করে? বয়স ত নিশ্চয়ই চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই—

আজ্ঞে না, ছুঁই ছুঁই নয়, ছুঁয়ে তার ঘাড় মটকে বছরখানেক হল খেয়ে হজম করে ফেলেছি—

বেশ, তাই মেনে নিলাম, একচল্লিশ। কমলা বলল, এই একচল্লিশেও যার ঘর আঁধার হয়ে রয়েছে, আজও চাকরের হাতে যার রান্নাঘরের চার্জ, বিছানা পাতার দায়িত্ব, সে আবার মেয়েদের মনে রং লাগার গোপন তথ্য জানল কি করে?

প্রভাতবাবুও হাসলেন, বললেন, তাহলে আমিও প্রশ্ন করি, যিনি আমার চাইতে মাত্র দুবছর কম পেছনে পেছনে আসছেন, আমার মতোই যাঁর ঘরের অধিষ্ঠাত্রী এক এবং অদ্বিতীয় হারানী-বালী, তিনিই বা কেমন করে জানবেন কখন কোথায় ফুল ফোটে, ফুলের গন্ধে কোন্ ভ্রমরের নিদ ভেঙে যায়? সুধাসমুদ্রের তীরে তীরে ঘুরেই ত জীবনটা প্রায় কাটিয়ে দিলেন—

আঃ প্রভাতবাবু, কি যা তা বলছেন, কমলা কপট রাগ দেখাল, যান, বাজে [illegible] না বাজে কথা নিয়ে?

[illegible]। যেদিন কমলা এই স্কুলে ঢুকেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক একই রকম দেখছে। সেই খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাতলা খদ্দরের ধুতি। টেল ফিগার। খদ্দর পরিষ্কার রাখা বেশ কঠিন-সাধ্য। একটুতেই ময়লা ধরে যায়। কিন্তু এতগুলো বছরের মধ্যে এমন একটি দিনের কথাও মনে পড়ে না কমলার, যেদিন প্রভাতবাবু পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসেননি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে হেসে বলেছিলেন, রঘুনাথ ত আমার জীবনের নাথ নয় যে সব কিছু ওকে সমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দোব। যত কিছুই ও করুক না কেন, ধুতি পাঞ্জাবি ও কেচে দিলেও প্রতিদিন বসায় ফিরে ইস্তিরি করাটি নিজের হাতে করে থাকি। শুধু ইস্তিরি কেন, আরতিরা লক্ষ্য করেছে, মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা প্রভাতবাবু রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই হাতাখুন্তি নাড়েন। ও'র কি কেউ নেই? কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত কখনো-সখনো বন্ধুবান্ধব ছাড়া কোনো আত্মীয়কে ও'র কাছে আসতে দেখা যায়নি। ছাত্রীদের কাছে দারুণ গম্ভীর প্রভাতবাবু, আবার শিক্ষিকাদের কাছে একেবারেই হালকা। ঠাট্টার একটি খোঁচা মারলে দশটি খোঁচা ফিরিয়ে দেন। বাসন্তী দেবী থেকে শুরু করে আরতি মেনকারাও যেন ও'র সমবয়সী।

একদিন আরতি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, আপনি স্যার বিয়ে করলেন না কেন?

কে বলল করিনি? পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন প্রভাতবাবু।

মেনকা বলেছিল, তাহলে স্যার, একদিন না একদিন বৌদিকে এখানে দেখতে পেতাম। না কি তালাক দিয়েছেন? না কি তিনিই আপনাকে—

যাঃ, বাজে বকিসনি, বাধা দিয়ে বলেছিল আরতি, উনি সত্যিই বিয়েই করেননি। সেই না-করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো করুণ কাহিনী-টাহিনী আছে যা বলতে চান না। নইলে স্যারের মত বিদ্বান, রূপবান, সংস্কৃতিবান—

দেখ আরতি, বাধা দিয়েছিলেন প্রভাত-বাবু, অত বান বান করে প্রশংসার বান ডাকিও না, মেনকা সন্দেহ করতে পারে তোমায়।

বৈশাখ এসে গেল।

আর দুদিন পরই আরতির বিয়ে।

ছুটিতে যাবার সময় বাসন্তী দেবী থেকে শুরু করে সব টিচার ও স্টাফকে ত কার্ড দিয়ে বলেই গেছে, মেনকাকে আবার ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে, প্রভাত-স্যার আর কমলাদিকে না নিয়ে যদি যাস, তাহলে মুখপুড়ী, তোর সঙ্গে আড়ি করে দোব, মনে রাখিস কিন্তু। তবে বাসে যাসনি, বাস-রাস্তা থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় এক মাইল। তার চাইতে ট্যাকসিতে যাস। বাস-রাস্তাতেই অনেকটা গিয়ে একটা শর্ট কাট আছে, গ্রামের রাস্তা হলেও খোয়া দেওয়া, একেবারে আমাদের উঠোনে গিয়ে মার্চ্চ। মাত্র ত পনেরো মাইল, ট্যাকসিতে খুব বেশী হলে-চল্লিশ মিনিট লাগতে পারে।

কমলাকেও হাতে ধরে বার বার মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে গেছে আরতি।

বিয়ের দিন।

স্কুল থেকে এসেই বাথরুমে ঢুকল মেনকা। সারাটা দিনের ক্লান্তিতে শরীরটা গরম হয়ে ওঠে। সে যেন একটা যন্ত্র, সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ঝকঝক করে চলে। এখন বিশ্রাম। শরীর-যন্ত্রের সমস্ত পার্ট খুলে যেন ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। শাওয়ারের ঝিরঝিরির মত ধারাগুলি যেখানটায় লাগে, সেখানেই আরাম। চুলটা বাঁচিয়ে মেনকা সমস্ত শরীর মেলে ধরে বার বার সেই আরামের ধারা নিতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে। জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে আরশির সামনে দাঁড়াল, তারপর মুখ টিপে। সারা শরীরে নিজেই ধনকে দাঁড়াল। প্রথমে ফ্রন্ট ভিউ, তারপর সাইড, তারপর আবার ফ্রন্ট। কোমরের দুপাশে হাত রেখে দাঁড়াল। কত হবে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক? ফিতে-টিতে নেই বটে, নিজে দেখে মনে হল ছত্রিশ-চব্বিশ-ছত্রিশ হতে পারে। আবার হাসল মুখ টিপে। তারপর সাজ শুরু করল।

সাজের শেষে সোজা চলে এল কমলার ঘরে।

এসেই চক্ষুস্থির।

ও মাগো! কমলাদি, এই তোমার বিয়ে-বাড়ী যাবার সাজ। শাড়ি দেখিয়ে বলল, আর এটা কি পরেছ দিদি? এটাকে ব্রেসিয়ার বলে? এত হাফ ব্লাউজ, যা পরে রোজ স্কুলে যাও মেয়ে ঠ্যাঙাতে। তাও আবার সাদা রং। শাড়ীখানার রংটাই বা কি, আকাশে এল! কেন, রঙীন শাড়ী নেই তোমার?

কমলা হেসে বলল, সত্যিই আর রঙীন শাড়ী টাড়ি পরতে হবে না—

বুড়ী! কপালে উঠল মেনকার চোখ, তুমি যদি বুড়ী হও না, মাসকাটি তাহলে বড়বুড়ী ঠানদি। সেই ঠানদি [illegible] তারাই পরে একটু আগে টালিগঞ্জ রওনা হলেন। —না, না, এসব ঠানদি-মার্কা কিছুই পরতে দেব না তোমাকে। এই পোশাকে তোমায় যদি নিয়ে যাই না, [illegible] তাহলে কনের পিঁড়ি থেকে উঠে এসে আমার চুল টেনে ধরবে। —চল, আমার ঘরে চল, বড় আরশি আছে আমি তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দেব। চল।

কমলা তবু বাধা দিল, যাও, পাগলামি করো না লক্ষ্মীটি। ওখানে অন্য টিচাররাও থাকবেন, হয়ত ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসবে। এসব দেখলে কি ভাববে?

যা খুশী ভাবুক গে, মেনকা জোর দিয়ে বলল, কে কি ভাববে মনে করে সাজবে না তুমি? বিয়ে বাড়ি সাজলেও দোষ হবে? লোকের চোখ টাটাবে? টাটাক। মেনকা হাত ধরে টানলে কমলাকে উঠে দাঁড়াতে হল, এখন আর তুমি এসিস্টেন্ট হেড মিসট্রেস নও, তুমি আমার কমলাদি। আর যদি হও-ই, তাহলে আমি এখন হেড-মিসট্রেস বাসন্তী সরকার। তারপর বাসন্তী দেবীর মত পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর গলার স্বর অনুকরণ করে মিঠে মিঠে করে বলল, কমলা, কমলা, তুমি ভাই একটু সাজ কর না ভাই, তাঁর একে আমি যেমন সাজি—

খি খি করে হেসে উঠল মেনকা, কমলাও না হেসে পারল না।

একেবারে, যাকে বলে এ্যারেস্ট, তাই করে মেনকা নিয়ে চলল কমলাকে।

ঘরে এসেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিল, তারপর টান মেরে খুলে দিল কমলার শাড়ীখানা, তারপর সাদা ব্লাউজ এবং তারপর কমলার হাজারো আর মানা না মেনে সেই যাকে বলে [illegible] হাফ ব্লাউজ, সেটিও। একেবারে আবরু করে ফেলল কমলার গা। কমলা জড়সড় হয়ে চেঁচিয়েই বলল, জানলা দরজা সব বন্ধ, কেউ দেখতে পাবে না।

কি আর করবে কমলা? কাঁচা মেয়েটার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আরশির সামনে টুলটায় হাত পা ছেড়ে বসল।

মেনকা বলে উঠল, দেখ দেখি। হাঁ, সমাজটা চলে যাবে। তারপর পাউডার মাখাতে লাগল কমলার ঘাড়ে, পিঠে, বুকে, পেটে। মাখাতে মাখাতে বলল, ইস, তোমার রং কি ফর্সা কমলাদি, পাউডারগুলো একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর চোখের নীচে কাজলের সরু রেখাটি একটু টেনে দাঁড়িয়ে দিল। আইব্রাও পেন্সিলটা নিয়ে বলল, এদিকে ফের, নড়ো না কিন্তু।

মুখের কাজ শেষ করে কমলাকে দাঁড় করাল মেনকা। আলমারি থেকে একটা ব্যাকওপন ব্রা বার করতেই কমলা আঁৎকে উঠল। না:, ও আমি পরতে পারব না।

না বললেই হল, মেনকা এবার এসিস্টেন্ট হেড মিসট্রেসের মতই গম্ভীর হয়ে বলল, বেশী গোলমাল না করে তুমি চেপে বস, আমি হুকগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। তারপর [illegible] দেখে বলে উঠল, ইস, কি চমৎকার ফিট করেছে কমলাদি! কে বলবে তুমি আমার চাইতে বড়। দেখ না, দেখ না একবারটি।

আরশির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কমলা হেসে ফেলল, আদর করে মেনকার গাল টিপে দিয়ে বলল, দুষ্টু কোথাকার!

তা-ই যদি বলল, তাহলে আর [illegible] আপত্তি করে কি হবে? আর তার ওপর [illegible] আঁচল টেনে দিতে আপত্তির বদলেই বা জুড়বে কেন মেনকা?

মনের মত করে সাজিয়ে [illegible] বসে রইল, [illegible] গর্বিনী আরতি মুখপদ্মটির মধ্যে চুনকালি লেপে দেব—

এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠল। মেনকা ডাকল, মহাদেব [illegible] ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। খুলে দেখ, [illegible]

না, আজ আর সাদা খদ্দর নয়, সিল্কের পাঞ্জাবি। পকেট থেকে রুমাল উঁকি মারছে। ভুরভুর করছে এসেন্সের সুবাস।

বললেন, চলে এসেছিলাম, [illegible] তোমার কোলিগটির জন্যে, [illegible] তাই বেরিয়ে পড়তে এলাম। আরে: এই যে, কমলা দেবী [illegible] দেখছি। আমি ত প্রথমটা চিনতেই পারিনি, কে এই [illegible] অপরিচিতা মহিলা! তারপর দেখলাম, ও—কমলাদি তো আমাদেরই স্কুলের—

মান। কমলা [illegible]

মেনকা বলল, তাইত এসব আপনাকে আর বাসে যেতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ট্যাক্সিতেই চলুন, একেবারে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মহাদেব ট্যাক্সি নিয়ে এল।

দরজাটা খুলে দাঁড়াল ক্যাবে। ওঠ কমলাদি, উঠুন স্যার। তারপর সে নিজে উঠে বসল।

ট্যাক্সি ছুটল।

শহরের রাস্তা ছাড়, পীচ ঢালা, রাস্তার পাশে পাশে লাইট পোস্ট। শহর ছাড়িয়েও অনেক মাইল পর্যন্ত ভাল রাস্তাই পাওয়া গেল। কিন্তু যেই শর্ট কাট নামল ট্যাক্সি, ঝাঁকানি শুরু হল লাফানো। হেড লাইটে দেখা গেল, মাটির সঙ্গে খোয়া মেলানো, সে খোয়া মাঝে মাঝে সরে গিয়ে তৈরী করেছে খন্দখন্দ। প্রবল ঝাঁকুনি লাগছে।

গাড়ী ছাড়বার পর থেকেই মেনকা একাই বকবক করে চলেছে। প্রশ্নের অন্ত নেই, তার মধ্যে অবান্তরই বেশী, নিজেই প্রশ্ন তুলে নিজেই জবাব দিচ্ছে, মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে খিলখিল করে। কিন্তু একটু অসুবিধা হচ্ছে, কারণ প্রভাতবাবু মাঝখানে থাকাতে কমলাকে কথার মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারছে না, হাতের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না বলে তার। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কথাবে নিয়েই চলেছে, আসলে আর্টিস্টের গোপন অবকাশ মত মনের মত কাজ সাজাতে পেরেছে কমলাদিকে আর প্রভাত স্যারের সঙ্গে ও আর বেশি কথা বলতে হব না। তাই মনের খুশিতে মাঝের থাম একেবারে আলগা করে নিয়েছে মেনকা। আজ যেন ওকে কথায় পেয়ে বসেছে।

জানেন স্যার, কমলাদির গর্ব, এখানে সব টিচার থাকে, ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসতে পারে, সুতরাং রাণীর গাড়ী ব্রেক পড়বে না, ওরা হাসবে। হাসবে ত হয় যাবে। টিচারগিরি করবার সময় ত আমরা লাইট রং পরে সভ্যভব্য হয়ে থাকছিই আর সেখানে কাঠের মুখোশ পরে থাকি, আনন্দের হাসতে মানা। কিন্তু বিয়ে-বাড়ীটাও কি স্কুল নাকি, আমরা ক্লাস নিতে যাচ্ছি নাকি যে, সিল্ক পরব না, সেখানেও গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে থাকব? বলুন, আপনিই বলুন, সত্যি বলছি কিনা। এই যে আপনি আজ খদ্দর ছেড়ে সিল্ক পরেছেন, কেউ দেখেছেন, অন্যায় হয়েছে কিছু?

কেউ কথা কইল না, অন্ধকারে কারুর মুখের চেহারাও দেখা গেল না, তবু মেনকা বকবক করতে লাগল, আমরাও যে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, আমাদেরও যে সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে, আশ্চর্য, লোকে তা ভুলে যায়। কোন টিচার যদি কাউকে ভাল-বাসে, ভালবেসে বিয়ে করে, ব্যস, অমনি লোকেরা চোখ বানাবড় করে বসে—

হঠাৎ গাড়ীখানা বাঁ দিকে এমনভাবে কাৎ হল যে, কমলার কাঁধ প্রভাতবাবুর কাঁধে চেপে গেল। সামলাতে গিয়ে পড়ে গেল সিল্কের আঁচল। আঁচল তাড়াতাড়ি তুলে নিতে গিয়ে কনুইটা ঠেকে গেল প্রভাতবাবুর গায়ে। ভাগ্যিস, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে কিছু দেখা যায় না। দেখা গেলে মেনকাটা কি ভাবত!

খিল খিল করে হেসে উঠল মেনকা, আর কমলাদি, আর্টিস্টো বলে কিনা ওর সঙ্গে বাসর জাগতে হবে। হৈম বলে ওর বরের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দেবে না। বল ত, আমার যেন আর কাজকে কাজ নেই, সারা রাত ওদের সঙ্গে কম্পিটিশন করি। আমি বলেছি, পারব না। ঘরে কি মুখপুড়ী, চল কমলাদি, বলে, বরকে নিয়ে তোমাকে পেজেন্ট করিয়ে রাখব। বলে আবার হেসে উঠল।

হঠাৎ আবার প্রবল ঝাঁকুনি। এমন আচমকা যে, কমলা প্রভাতবাবুর হাঁটুটাই ধরে ফেলে সামলে নিল। অভদ্র বেশামাল হয়ে গেছে। ওঁকে মাঝখানে না দিয়ে মেনকাকে দেয়া উচিত ছিল। ওঠবার সময় এটা আর খেয়াল হয়নি। দুষ্টু মেয়েটা দরজাটা খুলে অভ্যর্থনা জানাল আর আমিও সুড়সুড় করে উঠে পড়লাম। এখন আর কিছু করবার উপায় নেই। ঝাঁকুনি লাগতেই শরীরে শরীর ঠেকে যাচ্ছে, সামলাতে যাচ্ছি, অবাধ্য আঁচলটা বার বার পড়ে যাচ্ছে। সিল্কের দোষই ঐ, গায়ে থাকে না।

ইতিমধ্যে প্রভাতবাবুও কমলার অসুবিধা টের বুঝতে পেরে ডান হাতখানা সীটের ওপর প্রসারিত করে দিলেন।

কিন্তু কি সুবিধা হল তাতে? একটু আরাম হল বটে, কিন্তু কমলা যেন একটা বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেল।

ট্যাক্সি চলেছে, কিন্তু স্বাভাবিক স্পীড দেবার উপায় নেই। অনেকখানি ভালও আছে বটে, কিন্তু জোরালো হেড লাইটে মনে হচ্ছে যেন সারা রাস্তাতেই উঁচু নীচু খোয়া কিংবা খানখন্দ। দু পাশে গাছ গাছালি। মনে হয় যেন একটা সীমা-হীন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চলছে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে চাষীদের বাড়ী। ধানের গোলা, খড়ের গাদা, কুমড়ো মাচা, গোয়াল সব ছুটে পেরিয়ে যাচ্ছে। দু-একখানা পাকা বাড়ীও। কোনটার বাইরের বাগান নেই, সারা দেয়ালে ঘুঁটে দেবার দাগ। মাঝে মাঝে দীপ-জ্বালা দোকান। কোনটায় জলছে হ্যারিকেন, কোনটায় কুপিতে পড়ছে ধোঁয়া; কালি-পড়া লণ্ঠন। দু-চারজন লোক। গাড়ীর দিকে দেখছে। দু-একটা কুকুর। চোখ আলোয় ঝলকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোন কোনটা পালা দিয়ে ছুটতে গিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় শেষ হয়ে গেল গাছ-গাছালি। খোলা মাঠ। মাঠে কি শস্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কুমড়ো বা চালকুমড়ো হতে পারে কিংবা পটল, ঝিঙে বা শসাও হতে পারে। মেনকা বলে উঠল, আ-রে এসে গেছি, এই মাঠটা পেরোলেই আর্টিস্টের গ্রাম। তারপরই কলকল করে উঠল, দেখুন স্যার, দেখ কমলাদি, মাঠের ওপারে চাঁদটা দেখছ? ঠিক যেন একটা সোনার থালা, একটা সাইড একটু চাপা। তার মানেই আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়া হবে। এখনও হাইট হয়ে ওঠেনি। হাইট হলেই এমন মজা, সোনার থালাটা রুপোর থালা হয়ে যাবে, ঝকঝক করবে জোছনায় চারদিক মত। আর্টিস্টটার ভাগ্য ভাল, বুঝলে কমলাদি, বৈশাখ মাস, কালবৈশাখী ঝড়ের কথা, পরিষ্কার আকাশ, এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই, আকাশে ঝকঝকে চাঁদ, একটু পরেই জোছনায় ভরে যাবে—আর্টিস্টটা খুব লাকি।

গাড়ীর জানালা দিয়ে মস্ত খোঁপাটা বার বার প্রভাতবাবুর প্রসারিত হাতে ঠেকে যাচ্ছে। সোজা হয়ে বসাও মুশকিল, আঁচল সামলানো যায় না, বাতাসের তোড়ে উড়ে উড়ে প্রভাতবাবুর গায়ে ঘা মারে। আকাশে আধ সোনার থালাটার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে জেগে জেগেই যেন স্বপ্ন দেখল কমলা। থালাটা যেন হেড টেন করল একটি মন্দির আলপনায়, আর্টিস্টের উঠোন আঁকা, তার মাঝখানে মঙ্গলঘট, ঘটের শীর্ষে আম্রপল্লব। পাশেই বরণডালা, ডালার ওপর নানাবিধ উপচার আর সিঁদুর প্রদীপ। মাথার ওপর কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ, চতুর্দিকে আলোর ঝাড়, ফুলের মালা, সুবেশা মেয়ে ও মহিলাদের হাতে মঙ্গল শঙ্খ, পুরুষদের চিন্তিত গুঞ্জন, সকলের উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষা— বর ও কনের আসন এখনও খালি, অভ্যাগতদের সর্বআয়োজন সমাপ্ত অথচ এখনও কনের দেখা নেই। হঠাৎ কমলাদের গাড়ী গিয়ে থামতেই— ছি ছি, কি লজ্জা, বরণডালা নিয়ে এল সবাই, উলুধ্বনি দিল, প্রদীপ তুলে ধরল, তারপর, তারপর—ছি ছি, কি লজ্জা, কমলা আর—আর প্রভাতবাবুর হাত ধরেই—

হঠাৎ গাড়ীটা ডান দিকে মোড় নিতেই কমলা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ল। সামলাতে গিয়ে প্রভাতবাবুর হাঁটু ধরে ফেলল। না, না, হাঁটু ত নয়, হাঁটুর ওপর ছিল ওঁর বাঁ হাত, হাতে হাত ঠেকে গেল, আপনা থেকে আপনি জড়িয়ে গেল। ওঁর গায়েই ঠেস লেগে গেল, লেগেই রইল। খোঁপাটা কাঁধের নীচে বুকে, লেগেই রইল। ওঁর ডান হাতখানা ধীরে ধীরে নেমে এল কমলার কাঁধের ওপর, নেমেই রইল। না, আর ঝাঁকুনিকে ভয় নেই। বেশ এলিয়ে বসে গেছে কমলা। প্রভাতবাবুর আঙুলগুলো কি চঞ্চল! রুমালে কি মাদকতাময় সুগন্ধ। চোখ বুজে এল বুঝি কমলার।

আকাশের সোনালী চাঁদটা ততক্ষণে রূপোলী হয়ে উঠেছে। বাচাল মেয়েটার মুখে তখনও খৈ ফুটছে, নিউটন বলেছিলেন না স্যার, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে তীরে উপলখণ্ড কুড়োচ্ছি? আমরা মাস্টারনীরাও প্রায় তাই। হাসি, গান, আনন্দ ও প্রেমের স্রোত উত্তাল হয়ে বয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে আর আমরা মাস্টারনীরা কি করছি? আমরা সেই সুধা-সমুদ্রের তীরে তীরে দিশেহারার মত ঘুরে মরছি। কি স্যার, ঠিক হয়নি উপমাটা? বলুন, বলুন না—

নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল মেনকা।

দূরে বিয়ে-বাড়ীর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। সানাইয়ের সুর কানে ভেসে আসছে। প্রভাতবাবু বললেন, এই যে, এসে পড়েছি আমরা।

CENTRAL LIBRARY

কলকাতার যাদুঘর ○ সেকাল ○ একাল

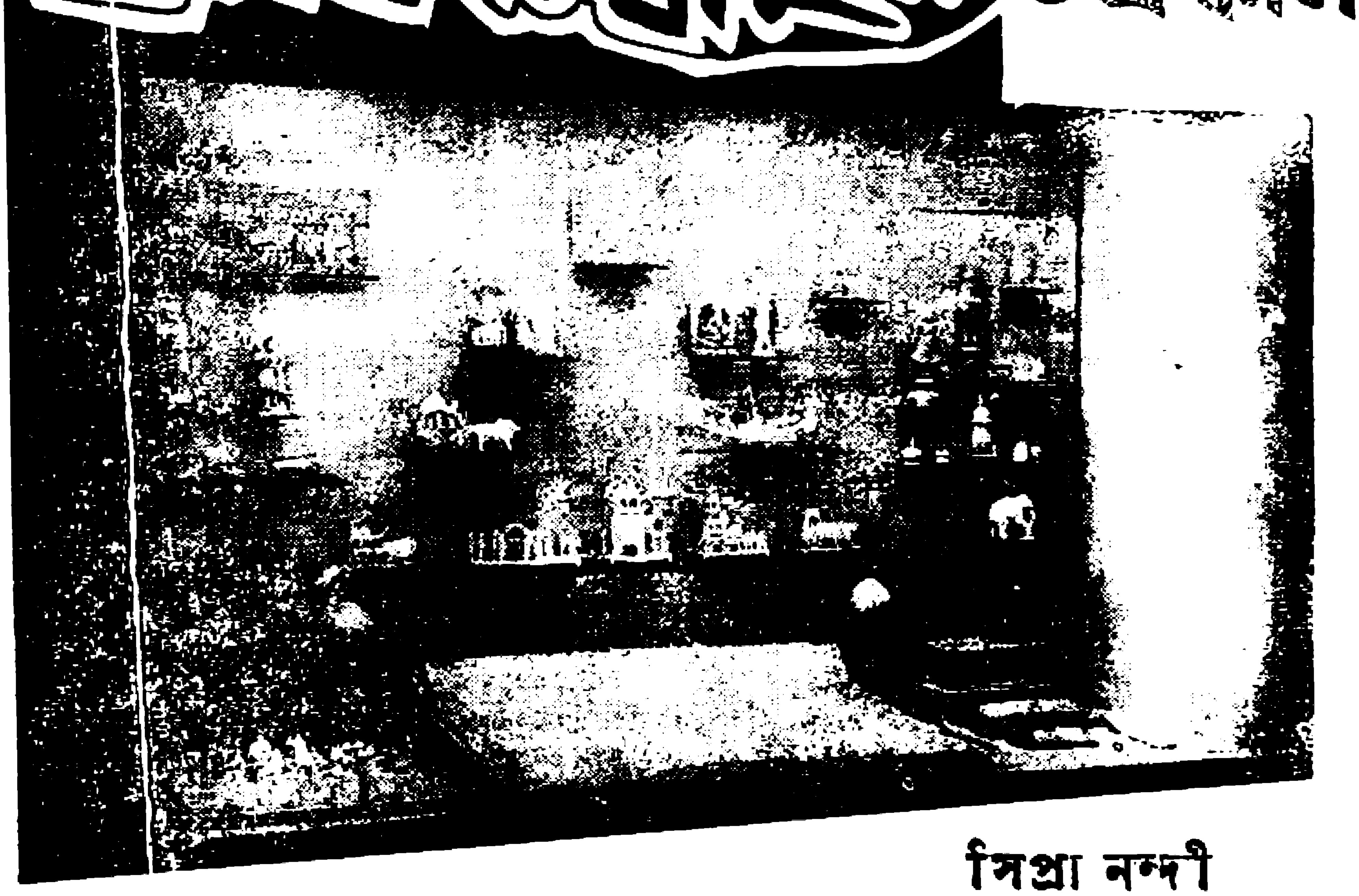

সিপ্রা নন্দী

কলকাতা যাদুঘরের সেকাল ও একালের পরিবর্তনশীল রূপ ও আদর্শ আলোচনার আগে 'মিউজিয়াম' বা যাদুঘর বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সাধারণত আমরা জানি 'মিউজিয়াম' কথার উৎস জড়িয়ে আছে গ্রীক উপকথার 'Muses' এবং 'Mouseion' এই শব্দ দুটির মধ্যে। গ্রীক উপকথায় রাজা জিউস (Zeus) -এর নব-কন্যা 'মিউজেসদের' ওপর ভার ছিল তাঁরা তাঁদের নৃত্যগীত এবং সৃজনীশক্তি কল্পনা পরিবেশনে যেন মানুষের দুঃখ-দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেন। সেইজন্যই অতীতের সকল প্রকার শিল্পসম্ভারে 'Muses -এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তবে আজকের যে মিউজিয়াম বা যাদুঘর জনগণের বহু আকর্ষণীয় বস্তুর অন্যতম বলে বিবেচিত তা কিন্তু রাজা এবং সম্ভ্রান্ত-বংশীয়দের আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছে। তাঁরা তাদের সখের নিমিত্ত যেকোন দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের সেই নিজস্ব সংগ্রহই বর্তমান বহু বিখ্যাত মিউজিয়াম বা যাদুঘরের গোড়াপত্তনে সাহায্য করেছে। ইউরোপেও এই একই ধারায় ধনী ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বহু মিউজিয়ামের প্রথম উৎস ও অনুপ্রেরণা। তবে শুধু যে তাঁরা কেবলমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন তা নয়, অনেক সময় এ-ধরনের 'curiosities' বা কৌতূহলের বস্তু সম্ভ্রান্তবংশীয়দের নিজেদের মধ্যে এক-প্রকার চিত্তাকর্ষক 'Intellectual game' বা জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষার খেলার নিদর্শনরূপে ও বাহবা পাবার লোভেও সৃষ্টি করা হত। ফলে দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ এবং বুদ্ধি-চাতুর্যের খেলার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুর সংগ্রহ হত এবং এই সংগৃহীত বস্তু-সম্ভারের মিউজিয়াম 'Cabinets de curiosities' আখ্যা লাভ করত। এই-ভাবেই বহু জগৎবিখ্যাত সংগ্রহশালা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে।

উনিশ শতকে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের সৃষ্টির পিছনেও কৌলীক পণ্ডিতদের যে অনন্য প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা কোনদিনও ভোলবার নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের রূপায়ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৭৮৪ খৃঃ স্যর উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নানাপ্রকার নিদর্শন সংগৃহীত হতে থাকে। এর মধ্যে স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন, তাম্রশাসন, প্রস্তরে খোদাইলিপি, প্রাচীন মুদ্রা এবং পাণ্ডুলিপি ও প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার সামগ্রী— প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব জাতীয় দ্রব্যের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এগুলি নানা উৎসাহী সভ্যের দানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ফলে ১৭৯৬ খৃঃ এই সমস্ত অমূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি মিউজিয়াম স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারই পরিণতি-স্বরূপ ১৮০৮ খৃঃ পার্ক স্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটির পুরাতন বাড়ীতে একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮১৪ খৃঃ শ্রীরামপুরে ইংরাজের সঙ্গে অবরোধ-সংঘর্ষে ধৃত ডেনমার্কদেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ সোসাইটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিউজিয়াম স্থাপনের অনুরোধ

নতুন বিন্যাসে অমরাবতী গ্যালারী

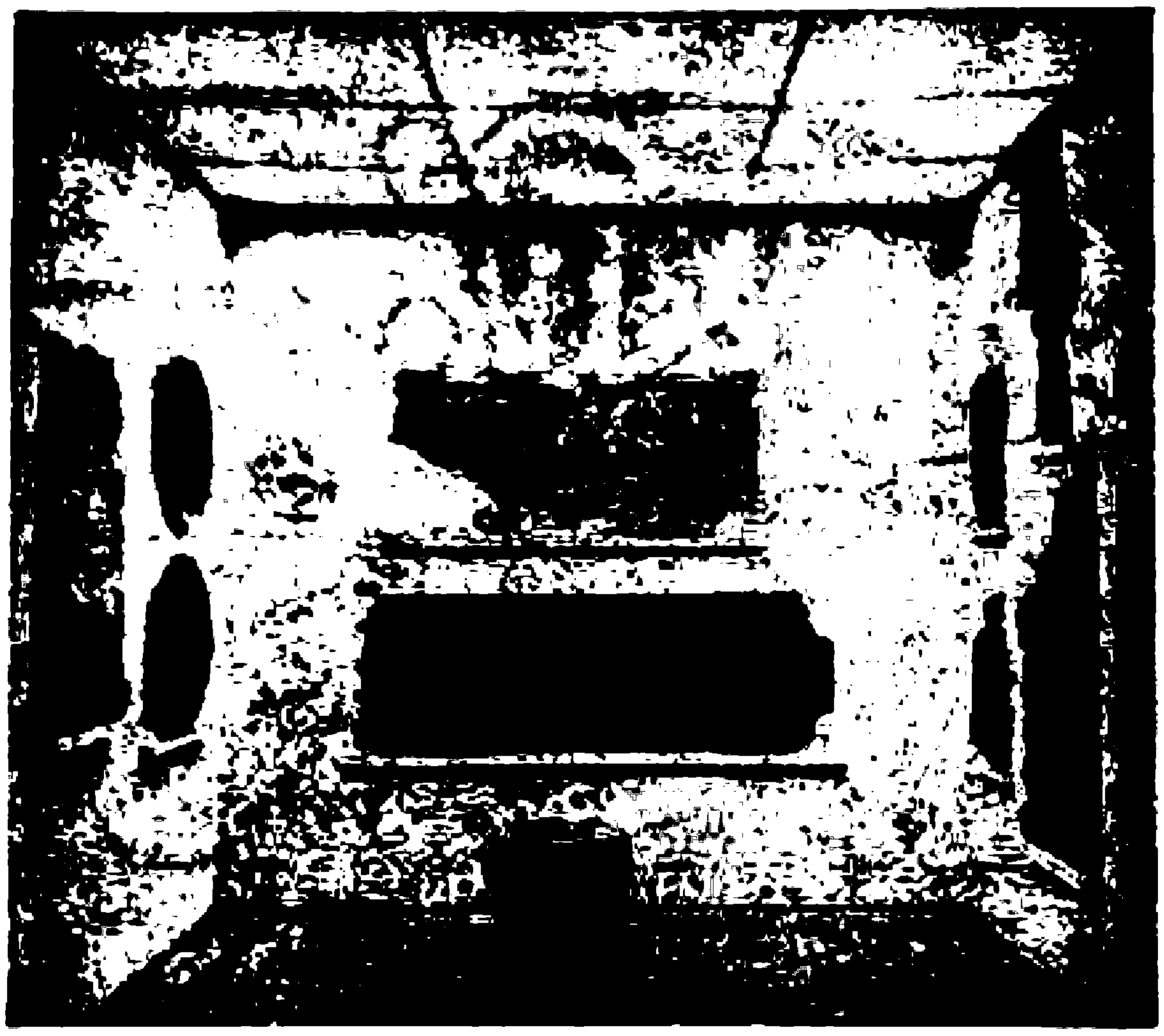

জানান। তিনি সেখানে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের নিদর্শন দানের প্রস্তাব করেন এবং নিজে অবৈতনিক কিউরেটরের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি লেখেন। এইভাবে ওয়ালিচের আগ্রহে এবং অক্লান্ত উদ্যোগে কলকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বহুমুখী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ১৮১৪ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে। এই সংগ্রহশালাকে তখনকার মত দুটিভাগে ভাগ করা হয়। একটি বিভাগ হল পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং কারিগরী, আর একটি বিভাগ হল ভূতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের নিদর্শনের সংগ্রহ।

এইভাবে ১৮১৪ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির অকৃপণ দানে এবং মার্টিনেজো

ওয়ালিচের সাধনায় 'ভারতীয় যাদুঘরের' গোড়াপত্তন। কলকাতার যাদুঘর তাই ভারতের যাদুঘর সমূহের পথিকৃৎ ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের কেন্দ্র বিন্দু। ভারতীয় এবং বৈদেশিক বহু বিদ্বজ্জনের, যেমন, কর্নেল স্টুয়ার্ট, ডঃ টিবার, জেনারেল ম্যাকেঞ্জি এবং বাবু রামকমল সেন প্রভৃতির দানে মিউজিয়ামের সংগ্রহ ক্রম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যরা ভারত সরকারের কাছে একটি জাতীয় সংগ্রহালয় স্থাপনের জন্য আবেদন জানান।

ভূতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্বের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব জিনিসগুলি বাদে সবই জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলে আসে এবং ১৮৫৭ খৃঃ ১নং হেস্টিংস স্ট্রীটে মিউজিয়ামটি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটি তার নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ (লাইব্রেরী) বাদেও অন্য সকল প্রকার সংগ্রহ দিয়ে একটি ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৫ খৃঃ ভারত সরকার এক অছি পরিষদ গঠন করেন এবং ১৮৬৬ খৃঃ ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অ্যাক্ট অনুযায়ী তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পীকক-এর সভাপতিত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ অছি পরিষদের স্থাপনা করেন। এই অছি পরিষদের কাছে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সকল বস্তু হস্তান্তরিত করা হয় এবং ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা 'ভারতীয় যাদুঘর' আখ্যা দেওয়া হয়। তারই পরবর্তী অধ্যায় হল

১৮৭৫ খৃঃ বর্তমান চৌরঙ্গী ভবনে ভারতীয় যাদুঘরের গৃহ-প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৬ খৃঃ ডক্টর জন এণ্ডারসন ভারতীয় যাদুঘরের প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হলেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে পুরাতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্বের সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ ১ এপ্রিল ভারতীয় যাদুঘর তার পুরাতত্ত্ব এবং পক্ষী সংগ্রহ নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। সেই বছরেই মামাল বা স্তন্যপায়ী জীবদের গ্যালারীও খুলে দেওয়া হয়। ১৮৯১ খৃঃ সদর স্ট্রীটের দিকে নতুন অংশ সংযোজন করে অর্থকরী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হল। ১৮৯২ খৃঃ এবং ১৮৯৩ খৃঃ আর্ট বা চারুশিল্প এবং নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়। ফলে ১৯০৪ খৃঃ ভারতীয় যাদুঘরের পাঁচটি বিভাগ হলঃ (১) প্রাণিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব (২) ভূতত্ত্ব (৩) পুরাতত্ত্ব (৪) আর্ট বা চারুশিল্প (৫) ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা অর্থকরী উদ্ভিদতত্ত্ব। পরে ১৯১১ খৃঃ চৌরঙ্গী রোডের দিকে নতুন অংশ যোগ করে পুরাতত্ত্ব এবং আর্ট গ্যালারীর সম্প্রসারণ করা হয়।

১৯১৩ খৃঃ ২৮ নভেম্বর বাংলার বরেণ্য মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় যাদুঘরের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ১৯১৪ খৃঃ ১৭ জানুয়ারী যে প্রদর্শনী হয় তাতে ছয়টি বিভাগ খোলা হয়—পুরাতত্ত্ব, চারুশিল্প, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং অর্থকরী উদ্ভিদতত্ত্ব। ফলে ভারতীয় যাদুঘরের বর্তমান সুনির্দিষ্ট বিভাগগুলির প্রথম সূত্রপাত ১৯১৪ খৃঃ সাধিত হয়েছিল। ভারতীয় যাদুঘরের ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ অধ্যায় শুরু ১৯৬০ খৃঃ যখন চারুশিল্প, পুরাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব একত্রিতভাবে একজন কেন্দ্রীয় অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে আনা হল।

ভারতীয় যাদুঘরের সেকাল এবং একালের তুলনামূলক বিচার করলে সম্ভব তা বলা নিতান্তই দুরূহ। তবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন যে অনেক হয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় নবজাগরণের সমকাল পর্যন্ত বিভিন্ন নিদর্শনের সমাবেশ বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে যার ফলে সকল স্তরের জনমানসে ভারতীয় যাদুঘরের আকর্ষণ ও সমাদর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে ভারতীয় যাদুঘর সার্বিকভাবে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তার অনুপম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহের জন্য। মৌর্যযুগের দুস্প্রাপ্য শিলালিপি সিংহ, ভারহুত স্তূপের প্রাচীন বেষ্টনী এবং তোরণদ্বারের অপূর্ব ভাস্কর্য, গান্ধার শিল্পে রূপায়িত বৌদ্ধ জাতকের ও বুদ্ধের জীবনাখ্যানের অপূর্ব নিদর্শনসমূহ, মথুরার কুষাণ বা কুষাণকালীন শিল্পের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মূর্তি, অমরাবতী-

চুঁচুড়ায় স্কুল প্রাঙ্গণে মিউজিয়মের বাস

যুগের অমরাবতীর অনুপম ভাস্কর্যাবলী, গুপ্তযুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচাররত বা বরদানরত বুদ্ধমূর্তি, পাল-সেন যুগে বাংলা-বিহারের হিন্দু-বৌদ্ধ মূর্তি—নালন্দার বাগীশ্বরী, বানরক্ষের সদাশিব, মানভূমের মহিষমর্দিনী, খাজুরাহোর প্রসাধনরতা নারী, পত্রলেখা নায়িকা অথবা পুত্রসমাদরবাগ্র মাতা, কোনারক, খণ্ডগিরি, খণ্ডগিরির ভাস্কর্যসুষমা, দক্ষিণ ভারতের পল্লব এবং হোয়্সল শৈলীর নমনীয় ও কারুকার্যমণ্ডিত ভাস্কর্য এবং যবদ্বীপ ও কম্বোজের শিল্পসাধনায় ভারতীয় শিল্প-শৈলীর প্রভাবের নিদর্শনগুলি যেমন গরুড়, গণেশ, মহিষমর্দিনী—সবকিছু অতীতের ভারতের একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে। তাছাড়াও রয়েছে ভারতীয় মুদ্রার এক বিপুল এবং অভিনব মূল্যবান সংগ্রহ, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার শীলমোহর, পোড়ামাটির মূর্তি, চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন, মিশরের মমী, ভিটা, কৌশাম্বী, তক্ষশীলা, ময়নামতী, পাহাড়পুর, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের পোড়ামাটির নিদর্শন এবং মানব ক্রমবিবর্তনে আদিম মানবের ব্যবহৃত পুরোন প্রস্তর এবং নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি। ভারতীয় যাদুঘরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাই প্রতিষ্ঠানের একটি গর্বের বস্তু।

অন্যদিকে কলা বিভাগে রয়েছে চিত্রকলা এবং বয়নশিল্পের অমূল্য এবং অপূর্ব নিদর্শন। ঢাকার মসলিন আর জামদানী, মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ী, পাঞ্জাবের ফুলকারী, চম্বার নকসী রুমাল, কাশ্মীরের শাল, পুনেবাটের পাঠোলা শাড়ী ও চিকণের কাজ, বেনারসের কিংখাব, পারসা, বোখারার কার্পেট ও সূচীকার্যখচিত সুজনী আর বাংলার কাঁথার অপূর্ব নিদর্শন। তেমনি পোশাকের বিপুল সংগ্রহও সমানভাবে আকর্ষণীয়। দিল্লী-লক্ষ্ণৌর সোনা-রূপোর তারের কাজ ও জরি-চুমকী বসান জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, বেনারসের কিংখাব জোব্বা, কচ্ছের কাঁচবসান নক্সা-করা সুন্দর পোষাক এবং তিব্বত ও পার্বত্য ধর্মীয় ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের পোশাক—সবকিছুই কলাবিভাগের সংগ্রহের প্রচুর্য এবং বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। অপরদিকে কারুশিল্পের প্রদর্শনে রয়েছে নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের ধাতুমূর্তি, কাঠের কারুকার্য ও মূর্তি, হাতীর দাঁতের ও লাক্ষামণ্ডিত কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন এবং চীন দেশের চিনামাটির নানারূপ চিত্রিত পাত্র। আর রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্প, বিদরী, জামদানী, এনামেল এবং রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতুর দ্রব্যাদি, ধাতুমূর্তি, হাতীর দাঁত, চামড়া, পোড়ামাটি, লাক্ষা ও কাঠের কারুকার্য। আর মিউজিয়ামের সর্বোচ্চ তলে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় চিত্রশৈলীর বিভিন্ন নিদর্শন।

নৃতত্ত্ব বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন নিদর্শন আর রয়েছে বিরাট ডায়োরামাতে একেরই জীবনের এক-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে রঙবেরঙের নানা জাতির পাখীর সংগ্রহ, জলচর, স্থলচর জীবজন্তুর সঙ্গে প্রাচীন জীবজন্তুর অস্থিপঞ্জরের কি বিশাল সংগ্রহ।

ভূতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে খনিজ আর বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তরের বহু নিদর্শন, তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল জীবাশ্মের সংগ্রহ। প্রস্তরীভূত হাতীর মাথার খুলির জীবাশ্ম তাদের মধ্যে অন্যতম।

তেমনি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বা শ্রমশিল্প বিভাগে আছে উদ্ভিদজগৎ থেকে শিল্প-কাজে ব্যবহারের জন্য বহুবিধ উপাদানের সংগ্রহ।

এক কথায় কলকাতার এই যাদুঘর সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন ব্যতীতও সকল জ্ঞানপিপাসুর কাছে একটি অনন্য ও অপরিহার্য ক্ষেত্র।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ভারতীয় যাদুঘরের আদিপর্বে সংগ্রহের বিপুলতা এবং বৈচিত্র্যের প্রাধান্যের ওপরই লক্ষ্য ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। যাদুঘরে সংগ্রহ বৃদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য। এ-কথা বোধহয় বিগত শতাব্দীর দেশী এবং বিদেশী প্রায় সব সংগ্রহশালার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। জনসমক্ষে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য তখন ব্যবস্থা ছিল সীমিত। এর সামগ্রিক সম্ভারকে শিক্ষার বিষয়বস্তু করে তোলার প্রচেষ্টাও ছিল নিতান্তই গৌণ। যাদুঘরের দর্শকদের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সবকিছু সংগ্রহ প্রদর্শন করার স্পৃহাই ছিল অত্যন্ত বেশী। ফলে এক-একটি শো-কেস বা গ্যালারী (প্রকোষ্ঠ) যাদুঘরের স্টোর-হাউস বা ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞের বা অনুরাগী ব্যক্তিরা ছাড়া সাধারণ জনমানসে যাদুঘরের কদর অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তবে যাদুঘরকে এভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। সেকালে সংগ্রহশালাগুলির ওপর জাতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পীঠস্থান হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হত। ফলে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতীক হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নিদর্শনের প্রাচুর্যের দিকে প্রাধান্য দেয়া হত অত্যন্ত বেশী। এজন্য সেকালে দেশে-বিদেশে সকল জায়গাতেই যাদুঘরগুলিকে জাতির গরিমাময় ইতিহাসের প্রতিভূরূপে বিবেচনা করা হত। যাদুঘরের পরিবেশ তাই ছিল ভাবগম্ভীর এবং সাধারণ লোকমানসে এর প্রভাবের গভীরতা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু ক্রমশ এই ভাবধারার পরিবর্তন হতে থাকে এবং মিউজিয়াম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুভব করতে থাকেন যাদুঘরে শুধু যে সংগ্রহেরই স্থান

গুপ্ত ভাস্কর্য গ্যালারির নতুন রূপ

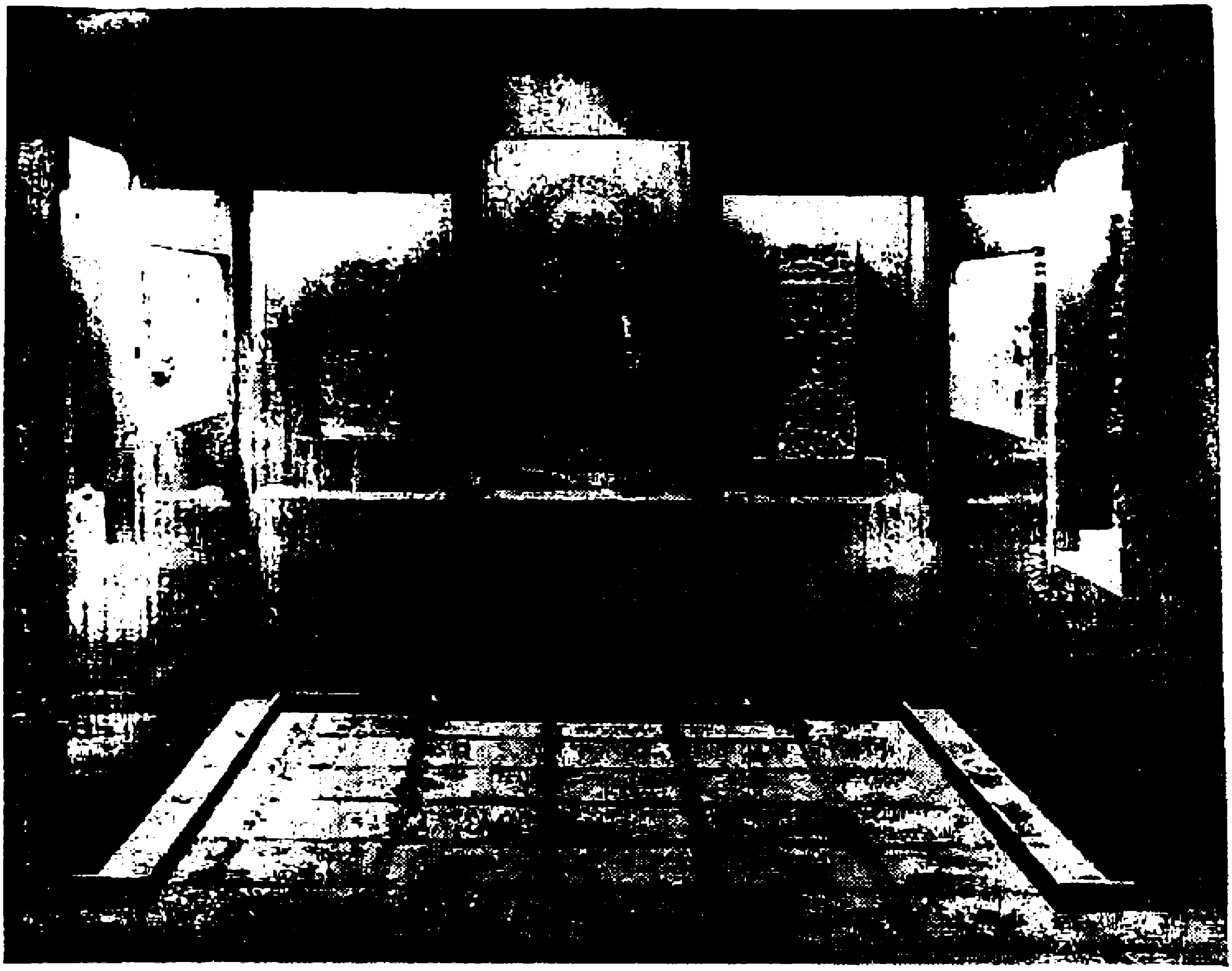

হবে তা নয়, এর দুয়ার খুলে দিতে হবে সকলের কাছে, জনসাধারণ, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেকের কাছে সমান ভাবে, ফলে শুধু গবেষণাগারের কেন্দ্রস্থল না হয়ে সকল স্তরের মানুষের আনন্দ লাভেরও স্থান হয়ে উঠেছে আজকের সংগ্রহশালাগুলি। ভারতীয় যাদুঘরও এই নবজাগরণের পথে এগিয়ে গিয়েছে এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হল গ্যালারীগুলির পুনর্বিন্যাস সাধন। স্থাপন করা হল প্রেজেনটেশান ইউনিট অভিজ্ঞ শিল্পীর পরিচালনায়। এই পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্য হল আকর্ষণীয়ভাবে আলোর সমাবেশ, উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের প্রদর্শন যথাযথ ভঙ্গিমায় ও প্রদর্শনীর বস্তুর উপযোগী পশ্চাৎপটে রঙের প্রলেপ। এই প্রদর্শন শৈলী যাতে একঘেয়ে না মনে হয় সেজন্যে বিভিন্ন উপায়ে বৈচিত্র্য আনয়ন করার আজও চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাছাড়া জনসাধারণ যাতে নতুন সংগ্রহ দেখেও আনন্দ লাভ করতে পারেন সেজন্য প্রদর্শনীতে মাঝে মাঝেই পুরোন সংগ্রহ বদলে নতুন সংগ্রহ দেখাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা সেকালে একেবারেই ছিল না। তখন স্থায়ী প্রদর্শনীই ছিল যাদুঘরের আদর্শ। কলা বিভাগের বস্ত্র এবং কারু-শিল্পের শো-কেস গুলিতে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তেমনি গান্ধার গ্যালারীতে যেভাবে বুদ্ধের জীবনালেখ্য প্রদর্শিত হয়েছে সে একদিকে যেমন শিক্ষণীয় অপর দিকে তেমনি চিত্তাকর্ষক। মথুরা, অমরাবতী, ভুমারা, গুপ্ত সব গ্যালারীতে স্থাপত্য ভাস্কর্যের প্রদর্শন এমন ভাবেই করা হয়েছে যা অনায়াসে মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে।

পুনর্বিন্যাস ছাড়া নতুন গ্যালারীর সংযোজনও এই যাদুঘরকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে। যেমন নালন্দা, উড়িষ্যা, বাংলা, দক্ষিণ ভারত, নেপাল, তিব্বতের ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিকে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে ব্রোঞ্জ গ্যালারীতে। প্রাগৈতিহাসিক ও মহেঞ্জোদারো হরপ্পার অমূল্য সংগ্রহ নিয়ে হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী। হয়েছে উৎ-কীর্ণ লিপির একটি নতুন ক্রমবিন্যাস। এতে রয়েছে প্রস্তর খোদিতলেখ ও তাম্রশাসন প্রদর্শনের বিস্তৃত ব্যবস্থা। এই গ্যালারীর সংগ্রহগুলি যদিও চিত্তাকর্ষক নয় তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিহাসের এগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক দলিল। ভারহুত, মথুরার উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপি ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের নামসহ এরন এর (মধ্যপ্রদেশ) চতুর্থ শতকের গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপি, মালয় থেকে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ প্রাচীন লেখ যাতে রয়েছে সফল সমুদ্রযাত্রার জন্যে রক্তমৃত্তিকাবাসী নাবিক বুদ্ধগুপ্তের প্রার্থনা ৫৮৯ শতাব্দীতে উল্লিখিত সিদ্ধমাতৃকা লিপি (সংস্কৃতালেখ) বোধগয়া থেকে প্রাপ্ত সিংহলী অধ্যাপক মহানামন কর্তৃক মন্দির নির্মাণ, দেওপাড়া, রাজসাহী থেকে প্রাপ্ত প্রাকবাংলা লিপি ১২শ শতাব্দীর, রাজা বিজয়সেন কর্তৃক শিব-প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির নির্মাণ, দেওগড় (উঃ প্রদেশ) থেকে প্রাপ্ত নাগরী লিপিতে ১৪০২ খৃঃ মালবের ঘোরী বংশীয় সুলতান হুশাঙ্গ শাহের সময় দুটি জৈন মূর্তির প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে নসখ, কুফী, তুঘরা, নস্তালিখ, সুলস লিপিতে আরবী ও ফারসী লেখমালা। বৈদেশিক লেখর মধ্যে রয়েছে তিব্বতীয়, চৈনিক ও ব্যাবিলনদেশীয় লিপি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য

প্রাচীন পুঁথি এবং কার্লিগ্রাফী ও সনদ-ফরমানের জন্য নতুন 'ম্যানাস্ক্রিপ্ট' বা পুঁথিপত্রের গ্যালারী। এখানে ষষ্ঠ শতাব্দীর সুস্ত ব্রাহ্মীতে লেখা 'প্রজ্ঞাপারমিতা', ১৩শ শতাব্দীর তালপাতার পুঁথিতে 'হরিবংশ', ১৫৫৩ শতাব্দীর বৈরামখানের 'সনদ', ১৩১৭ খৃঃ 'নেওয়ারী'তে লেখা 'পঞ্চরক্ষার' পুঁথি, অষ্টাদশ শতাব্দীর হাতে তৈরী কাগজে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মেশিনে তৈরী কাগজে শারদালিপিতে হস্তলিখিত কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' এবং নস্খ্ লিপিতে দুটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি (মিনিয়েচার) 'কোরান' ও 'জেন্দ আবেস্তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৃতত্ত্ব বিভাগে নতুন গ্যালারী হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে। আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে বিশিষ্ট উপজাতিদের আচার ব্যবহারের দ্রব্যসম্ভার দিয়ে নতুন বীথিকা। ভারতীয় যাদুঘরের অভ্যন্তরে নতুন গ্যালারী কলা বিভাগের সূক্ষ্ম চিত্রের প্রদর্শনীশালা। এখানে প্রাচীন তালপাতার পুঁথিচিত্র থেকে শুরু করে পারসিক, মুঘল, দক্ষিণ ভারতীয়, রাজস্থানী, পাহাড়ী, বাংলা চিত্রশৈলীতে পরিবর্তনের সূচনাপর্যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কালের অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতির চিত্র-নমুনা স্থান পেয়েছে। স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত ছবি এখানে দেখান হয়েছে এবং কিছুদিন অন্তর এগুলির পরিবর্তনের ব্যবস্থাও রয়েছে। যাদুঘরের নতুন এবং পুরোন সব গ্যালারীতে এখন জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্রামস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে।

যাদুঘরকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য আরও একটি ব্যবস্থা হল সুষ্ঠু গ্রন্থের প্রকাশন। শুধু গ্রন্থ নয় অল্পমূল্যে রঙিন পতাকার চিত্র প্রভৃতি এবং যাদুঘরের সংগৃহীত ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দিয়ে আজকের যাদুঘর প্রতি ঘরে এর দুর্মূল্য সংগ্রহ সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করতে প্রয়াসী হয়েছে। এটি এ যুগের যাদুঘর সম্পর্কে এক অতি অভূতপূর্ব অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে, এবং প্রাচীন কলা নিদর্শন সম্বন্ধে এক দুর্লভ শ্রদ্ধা ও অনুপ্রিয়তার চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছে।

এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে সংরক্ষণ বিভাগ। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত 'কেমিস্টের' তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ও নবীন বহু সাংস্কৃতিক নিদর্শনের এই সংগ্রহাগারে রাসায়নিক উপায়ে যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাদুঘরে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আজকের যে কোন যাদুঘরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য একটি গ্রন্থাগার। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে বিগত পাঁচ বছরে যে নিজস্ব গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি হয়েছে তা এই যাদুঘরকে একটি পূর্ণায়তন শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

ভারতীয় যাদুঘরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল এর শিক্ষামূলক কার্যসূচী। মিউজিয়ামের প্রতি বিভাগে বিভাগীয় গাইড লেকচারার অর্থাৎ প্রদর্শক বা প্রদর্শিকা নির্দিষ্ট সময়ে যাদুঘরে দর্শকমণ্ডলীকে বিভিন্ন প্রদর্শনশালায় সংগৃহীত বস্তুগুলিকে প্রয়োজনমত ইংরাজী, বাংলা বা হিন্দীতে বুঝিয়ে দেন। এতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তরা ছাড়াও সাধারণ মানুষও যাদুঘরের নিদর্শনগুলি থেকে অতি সহজ ভাষায় রস গ্রহণ করতে সমর্থ হন। তাছাড়া আজকের যাদুঘর যাতে ছাত্রদের কাছেও সর্বাধিক বোধগম্য হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ভারতীয় যাদুঘরে করা হয়েছে। ছাত্ররা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যাদুঘর পরিদর্শন করে পাঠ্য বিষয়বস্তু অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে—ইতিহাসের বা বিজ্ঞানের উপকরণ বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করে পুলকিত হয়ে উঠবে,—এজন্য প্রতি শনিবার এখানে ছাত্রদের জন্য বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুসারে স্কুল সার্ভিসের অন্তর্গত বিশেষ পরিদর্শন ছাড়াও শিক্ষা-মূলক চলচ্চিত্র দেখানর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রত্যেক শনিবারের এই প্রোগ্রাম সংগ্রহশালার আধুনিক কর্মসূচীর বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন স্কুলে এই প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানসূচী জানানো হয় এবং অনুস্মারক-পত্র লাভের পর ছাত্রদের আগ্রহ ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের আমন্ত্রণ জানান হয়। এই বিশেষ পরিক্রমায় ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করা হয়।

এছাড়া লোন সার্ভিসও একটি আধুনিক যুগের অপরিহার্য উপায় যার দ্বারা ছাত্ররা মিউজিয়ামের বিভিন্ন সংগ্রহের ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনীও করে থাকে। ভারতীয় যাদুঘরের আরও একটি আকর্ষণীয় ব্যবস্থা হল সাময়িক প্রদর্শনী। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হল 'মুক্তাঙ্গণীয় শিল্পকলা' 'বীরহোড়' উপজাতির ব্যবহারিক জীবন এবং যুগে যুগে বাংলার শিল্প। তবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের নাট্যবিষয়ক স্মারকচিত্রের এক বিরল সংগ্রহ বাংলার

মিডিয়াম ওয়েভ, ১১০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইক্লস্
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫১৫৫ ১১৭০০
মিডিয়াম-ওয়েভ	১১৮৭৫ ও ৯৭৪০
১১০ মীটার	১৫৮০

কলকাতার শিল্পপ্রদর্শনীতে যাদুঘরের নিদর্শন

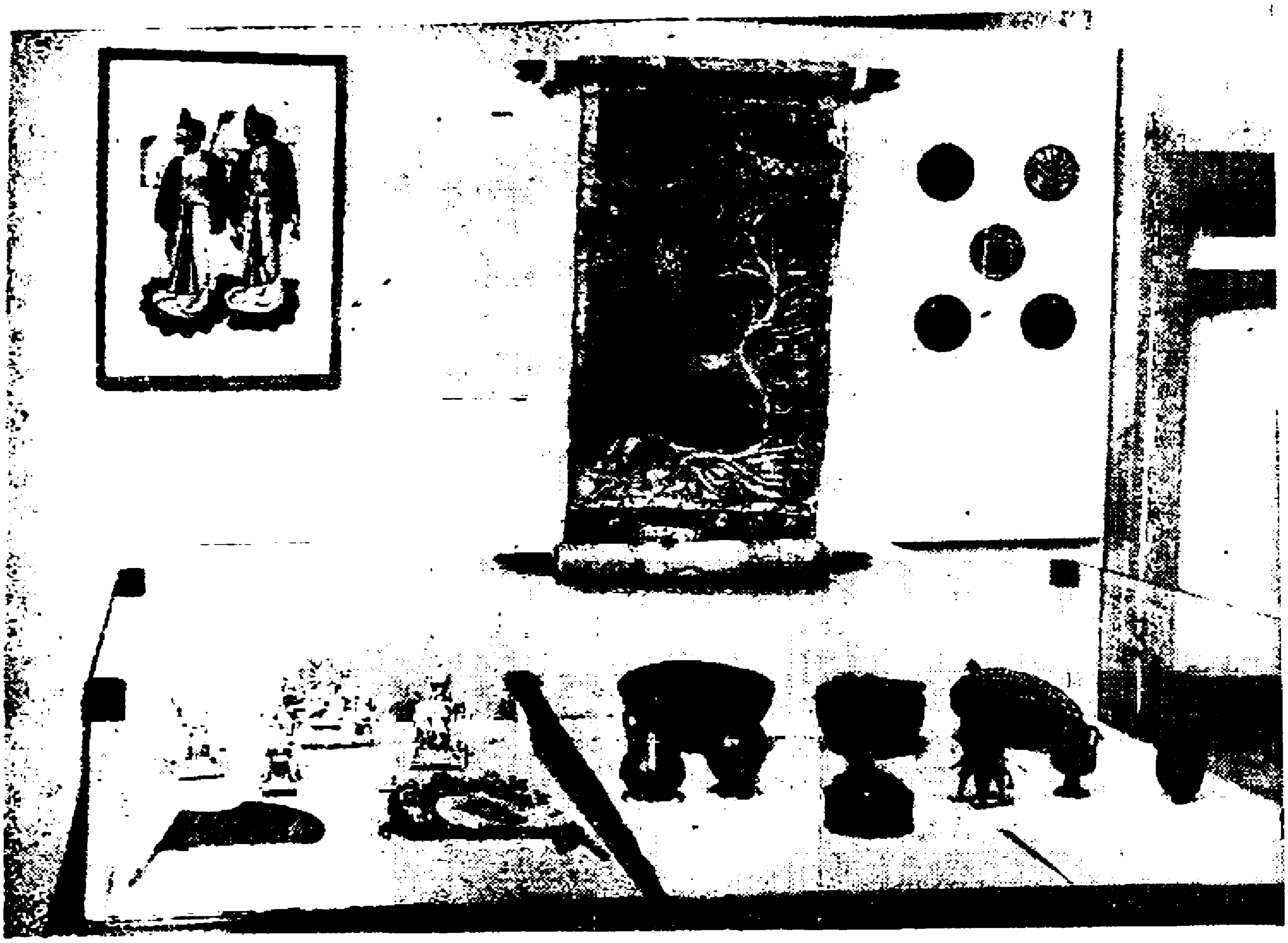

একক প্রদর্শনী জনসাধারণের মধ্যে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ভারতীয় যাদুঘরের অধুনাতম শিক্ষামূলক কাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, চলমান প্রদর্শনী। এই 'মিউজিওবাস' তৈরীর উদ্দেশ্য হল বহু দূরদূরান্তরের গ্রামবাসীরা,—যারা কলকাতার এই যাদুঘরের বহু দুর্লভ ও মনোরম সংগ্রহের দর্শনলাভ থেকে সাধারণত বঞ্চিত, তাদের কাছে যাদুঘরের নিজস্ব বাস এই 'ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর' মাধ্যমে ভারতের প্রাক্কীর্তির ক্রমবিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপিত করা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার নিদর্শনের 'মডেল' বা প্রতিকৃতি আমাদের গ্রামীণ দেশের কোণে কোণে পৌঁছে দেওয়া। এই প্রতিকৃতিগুলি এক বিশেষ আলোকসজ্জায় মণ্ডিত করে সেই সেই সমকার যথাযথ পারিপার্শ্বিক শিল্প বা স্থাপত্য নমুনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত এবং অঙ্কিত পশ্চাৎপটে প্রদর্শিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাগৈতিহাসিক মানব বা 'পিকিং মানব'। প্রায় চার লক্ষ বৎসর পূর্বে মনুষ্যদেহ উদ্ভবের এটি এক অপূর্ব অবদান,—পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালান

বা খাদ্য হিসেবে জন্তু শিকার, শিল্পীর সুদক্ষ হাতে এবং রঙে ও তুলিতে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সেই সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ, এবং বৃহৎ স্নানাগারের প্রতিকৃতি, ভারহুত স্তূপের প্রস্তর বেষ্টনী ও তোরণদ্বার, উৎকীর্ণ ধর্মরাজিক স্তূপের পটভূমিকায় বুদ্ধের জীবনের দু' একটি স্মরণীয় ঘটনা, যথার স্বপ্নদর্শন বা মহাভিনিষ্ক্রমণ, কনিষ্কের প্রতিকৃতি, সারনাথের ধামেক স্তূপ এবং ভিক্ষুদের বিহার আবহ-দৃশ্যে, বুদ্ধের মূর্তি আরিকামেড়ুর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ এবং মন্তেশ্বর সিক্রীর অপূর্ব কারুকার্য শিল্পীর নৈপুণ্যে সে যুগের এক ধারাবাহিক ও প্রাণবন্ত রূপদান ঘটেছে এই ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর মধ্যে। এজন্য এগুলির একটি বাস্তবানুগ আবেদন আছে যার দ্বারা সাধারণের কাছে প্রাচীন কীর্তিগুলি সঠিক চিত্রায়নে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এটি ভারতের মিউজিয়াম চিন্তাধারার এক নতুন প্রচেষ্টা। এই 'মিউজিওবাস' কলকাতার বাইরে গ্রামে এত সমাদর লাভ করেছে তা বলার নয় কারণ ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্বের ওপর এধরনের বাস এই প্রথম। এখানেও ভারতীয় যাদুঘরকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলতে কোন দ্বিধা নেই। এরই মাধ্যমে আমাকে

কলকাতার যাদুঘর শুধু শহরের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর জনপ্রিয়তা আজ পৌঁছে গেছে বহু দূরবর্তী স্থানে। যাদের হয়ত জিজ্ঞাসু ও রসপিপাসু মন আছে, কিন্তু শহরে পৌঁছবার সুযোগ বা সামর্থ্য নেই। এই অগণিত গ্রামীণ নরনারীর জ্ঞান ও রসাকাঙ্ক্ষায় চরিতার্থতায় এবং তাদের কাছে ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সাংস্কৃতিক জীবনের চাক্ষুষ পরিচয় প্রদানে ভারতীয় যাদুঘরের এই প্রচেষ্টা অনন্যসাধারণ। একালের ভারতীয় যাদুঘর এইভাবে সমাজের অন্তস্তলে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বার্তা পৌঁছে দিয়ে এক মহান সার্থকতা অর্জন করছে।

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের ব্যাপক কার্যক্রমের পরিধি তাই আজ সুদূরপ্রসারী আর এর কাহিনীও তাই আজ বহুবিস্তৃত। যুগোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ও সংবেদনশীল হওয়ার আগ্রহে যাদুঘর যে আর 'আজবঘর' নেই; এই প্রতিষ্ঠান যে আজ ভারতের লুপ্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মূর্তিমন্তরূপে যে আজ তা প্রতিভাত, আজকের ভারতীয় যাদুঘর তার সমৃদ্ধ সংগ্রহের সুষ্ঠু বিন্যাসে ও প্রসারিত কার্যসূচীতে তা' নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।

গার্ড

আশু চট্টোপাধ্যায়

ভোরবেলা কড়া নাড়ার শব্দে স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং এসে দরজা খুলে গার্ড তরুণ মজুমদারকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার তরুণবাবু? এত সকালে কি মনে করে?'

তরুণের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, চুল অবিন্যস্ত, চোখ দেখে মনে হয় সে সারা রাত ঘুমায় নি।

সে বলল, 'আমার এই অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে, স্যার। আমার সকালটা ছুটি দিন। দুপুরের ট্রেন আমি নিয়ে যাব।'

স্টেশন মাস্টার অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'আপনার বয়েস হয়েছে; বেশ কিছুকাল কাজ করছেন। নিজেই বুঝে দেখুন, আপনাকে ছুটি দেওয়া অসম্ভব। আটটার লোকাল কে নিয়ে যাবে? এই ট্রেনেই কলকাতার অফিস যাত্রীরা যায়।'

'কেন, জিতেনবাবু?'

'তিনি ত নটার ট্রেন নিয়ে যাবেন। পরিমলবাবু আজ ছুটিতে আছেন। আপনার যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কেন, কি হয়েছে, বলুন তো?'

তরুণ বলল, 'শেষ রাত থেকে আমার স্ত্রীর কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার ডাকতে গেছলাম, তিনি বললেন, বেলা আটটায় আসবেন। আমি না থাকলে কে ব্যবস্থা করবে বলুন? জানেন ত, আমার ছেলে দুটি স্কুলে পড়ে। আর বুড়ো মা আছেন মাত্র।'

একটু সময় চিন্তা করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'অবশ্য এটা কলেরার সময়, কিন্তু তা বলে কলেরাই যে হয়েছে তার কোন মানে নেই। আর হলেই বা আপনি কি করবেন। হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ত? আমি সাড়ে আটটায় আপনার কোয়ার্টারে লোক পাঠাব। আপনাকে নটার ট্রেন দিতে পারতাম, কিন্তু তখনও আপনি আসতে পারবেন না। নতুন নোটিশ এসেছে জানেন ত, ট্রেনের বিলম্বের জন্য যারা দায়ী তাদের চাকরী যাবে। এই বয়সে চাকরী হারাবেন। বাড়ীতে এতগুলি লোক। নিশ্চিন্ত মনে চলে যান, আমি আপনার বাসার খোঁজ-খবর নেব।'

এই বলে স্টেশন মাস্টার সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকেও স্টেশনে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে। তরুণ কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কোয়ার্টারের পথ নিল।

আটটার লোকাল যথাসময়েই ছাড়ল। তরুণ বাসার সকলকে সম্ভব পরামর্শ দিয়ে এসেছে। ডাক্তার না এলে বড় ছেলেকে যেন তাঁর কাছে পাঠান হয়। তাতেও তিনি না এলে বড় ছেলে যেন স্টেশনে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে। যদি ডাক্তার এসে হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলেন, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে যেন ডাক্তারকেই অনু-রোধ করা হয়। তিনি রাজি না হলে, তার জন্য যেন স্টেশন মাস্টারের কাছে যাওয়া হয়। কিছু টাকা সে ওষুধপত্রের জন্য রেখে

এসেছে, বেশী প্রয়োজন হলে যেন স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়।

ইলেকট্রিক ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি স্টেশন থেকে ইতিমধ্যে অনেক অফিস-যাত্রী উঠেছে। ভবেশ বন্দ-চালকের মত বাঁশ বাজিয়েছে, সবুজ পতাকা দেখিয়েছে। তার মন পড়ে আছে তার বাসায়। এতক্ষণ সেখানে কি হচ্ছে কে জানে। রোগ আর রোগী-সম্বন্ধে ডাক্তাররা অনেকে ত ক্রমশ ক্যালাস হয়ে যান। ঠিক সময়ে ডাক্তার যাবেন কিনা কে জানে? স্টেশন মাস্টার তাকে এই ট্রেন পাঠাবার জন্য ত অনেক আশ্বাস দিলেন, কার্যক্ষেত্রে কতটা করবেন কে জানে। আসবার সময় সে দেখে এসেছে স্ত্রীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বুধা মা আগুনে সেঁকে গরম করবার চেষ্টা করছেন। এই সময় স্ত্রীর মৃত্যু হলে সংসার দেখবে কে? আবার কাজে না গেলে চাকরী যাবে। তাহলেই বা সংসার চলবে কি করে!

সকালের বাতাসে সজীব উৎফুল্লতা, পল্লিময় পারিপার্শ্বিকে কোলাহল। অন্য দিন ভবেশ সকালের এই যাত্রাটি খুব পছন্দ করে। আজকে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, তার মন তার বাসায় পড়ে আছে। গার্ডের পক্ষে এই মনোভাব মোটেই ভাল নয়, ট্রেনটির সমস্ত দায়িত্ব তার হাতে। এতগুলি লোকের প্রাণ তার হাতে। কিন্তু তার নিজের মনের উপর তার হাত নেই।

বন্দ্যযানব ট্রেন নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলেছে। অফিস যাত্রীরা খোস গল্পে মত্ত। আশে-পাশের গ্রামগুলিতে নর-নারীরা কর্মব্যস্ত। শিশুসূর্যের আলো অবারিত প্রান্তরে; পুকুরে ডোবাতে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল ভবেশের মনে অন্ধকার।

বেলা তখন নটা। প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে এসে ট্রেন যে স্টেশনে এসে দাঁড়াল, সেখানে দাঁড়িয়েই রইল। নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বাইরে যাবার সিগনাল নামল না। ভবেশ গাড়ি ছাড়বার সংকেত দেবে কি করে!

পনেরো মিনিট পরেও যখন সিগনাল নামল না এবং ট্রেন ছাড়ল না, তখন যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমে উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কেউ গেল ইঞ্জিন-ড্রাইভারের কাছে, কেউ গার্ড ভবেশের কাছে। সকলেরই চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা, অফিসে যেতে বিলম্ব হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কি হয়েছে, কতক্ষণে ট্রেন আবার চলবে, তারা পরিষ্কার প্রাঞ্জলভাবে জানতে চায়।

ভবেশের নিজের দুশ্চিন্তাও কম নয়। যথা সময়ে ট্রেনটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরতি ট্রেনেই ফিরে আসবে, বাসায় তার ওই অবস্থা। সে হতভম্বের মত যাত্রীদের জানাল যে, ব্যাপার কি তা সে নিজেই জানে না।

একজন যাত্রী বলল, 'তাহলে স্টেশন-মাস্টারের কাছে গিয়ে জানুন। এতক্ষণই ত আপনার জানা উচিত ছিল, ট্রেনের সব দায়িত্বই ত আপনার। এতক্ষণ করছিলেন কি?'

একটু দূরে থেকে একজন মন্তব্য করল, 'যত সব অপদার্থ লোকের হাতে ট্রেনের ভার, তাই ত এত হাঙ্গামা। এই সব লোকেদের জন্য আমাদের আর চাকরী করে খেতে হবে না।'

যাত্রীদের ভাবভঙ্গি ভাল নয়, দোষটা সবই যেন ভবেশের। তাই আপাততঃ নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ভবেশ স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, সেই স্টেশন ও পরের স্টেশনের মধ্যপথে অনেকটা ইলেকট্রিক তার চুরি হয়েছে। সারানোর কাজ চলছে, তবে বেশ সময় লাগবে। কতক্ষণে ট্রেন ছাড়া যাবে বলা শক্ত।

বিমর্ষ মুখে ফিরে এসে ভবেশ যাত্রীদের যখন খবর জানাল, তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবশ্য একথা তারা বুঝল যে এ-ব্যাপারে ভবেশের কোন হাত নেই, সে তাদের মতই অসহায়। এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্য যাত্রীরা রেল-কর্তৃপক্ষের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

তার মানে সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে ভবেশ বাসায় ফিরতে পারবে না। ইতিমধ্যে তার স্ত্রীর যা ভাগ্যে আছে তাই হয়ে যাবে কেবল দুশ্চিন্তা করা ছাড়া ভবেশের করবার কিছু ছিল না। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য, নিজের কামরায় বসে যে একটু নিভৃতে বিশ্রাম করবে সে উপায় নেই। অনবরত নতুন যাত্রী এসে অবস্থাটার কারণ এবং কখন ট্রেন ছাড়বে তাই জানতে চাইছে। তবু সে গার্ডের কামরাতেই বসে রইল।

বেলা এগারটার সময় যেমন রোদের তাপ বাড়ল, তেমনি সে ক্ষুধা অনুভব করতে লাগল। এতক্ষণ কখন সে কলকাতায় পৌঁছাতে পারত! কিন্তু নেমে প্ল্যাটফর্মে কোন স্টলে যেতেও তার মন চাইল না, সেখানে উত্তেজিত যাত্রীদের ভীড়। কিন্তু শরীরটা তার অবসন্ন বোধ হতে লাগল। আগেকার কয়লার ইঞ্জিন ঢের ভাল ছিল, সে ভাবল। হয়ত আধ ঘণ্টা বিলম্বে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাত। তখনও মাঝে মাঝে পথে হাঙ্গামা কি হত না? কিন্তু এরকম তার চুরির হাঙ্গামা নিয়মিতভাবে ঘটত না। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো এখনও ত কয়লায় চলে, লেটও হয়, কিন্তু অনেকদূর থেকে আসছে বলে লোকে অতটা দোষ দেয় না। তাছাড়া সেগুলোতে অফিস-যাত্রীরা ওঠে না।

এতক্ষণ স্ত্রী বেঁচে আছে কিনা কে জানে। ভবেশের চিন্তা এবার অন্যদিকে মোড় নিল। জনতার হাত থেকে যদিও বা সে পরিত্রাণ পায়, ভাগ্যের হাত থেকে কি পাবে? যতদিন যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশঃ অবস্থার দাস হয়ে পড়ছে, অসহায় হয়ে পড়ছে। আজকের এই অবস্থায় ভবেশের কিছুই করবার নেই।'

ক্রমে ক্ষুধা অসহ্য হয়ে ওঠায় সে গাড়ি থেকে নেমে একটা স্টলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল, যাহোক কিছু খেয়ে নেবে। এমন সময় দেখল রেলের পোশাক পরা কে একজন তার দিকে আসছে।

লোকটি কাছে এসে বলল, 'আপনিই ত গার্ড? আমি এখানকার স্টেশন-মাস্টার।'

ভবেশ ভদ্রতা দেখিয়ে নমস্কার করল। তার তখন কথা বলার ক্ষমতা বা অভিরুচি ছিল না।

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'গাড়ি ছাড়ার জন্য তৈরি হোন। তার ঠিক হয়ে গেছে। আমি ড্রাইভারের খোঁজ নিচ্ছি।'

ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে গেছে।

পরের স্টেশনে গাড়ি মৃদু গতিতে পৌঁছে গেল পাঁচ মিনিটেই। কিন্তু ট্রেন থামবার পর সেখানে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সেখানে তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। অনেকে বাসের সন্ধানে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, তাতে অসম্ভব ভিড়, ওঠা যায় না। তাছাড়া দু-তিনবার বাস বদল করতে হবে। অফিসের হাজিরা ত শিকেয় উঠেছে, এখন তারা অনেকে ফিরতি ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু যাদের ভাব দেখে মনে হল, এদিন তারা ট্রেন লেট হবার ব্যবস্থার একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চায়।

শখানেক লোক লাইনের উপর বসে ছিল, যাতে ট্রেন না চলতে পারে। স্টেশনের একটা অংশে আগুন জ্বলছিল। ভবেশের মনে হল, ট্রেনেও তারা আগুন লাগাবে। ট্রেনের মধ্যে যারা ছিল, তারাও অবস্থা বুঝে নেমে পড়েছে এবং তাদের মনের ধূমায়িত অসন্তোষ অনুকূল বাতাসে আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে।

তাদের অগ্নি-সংযোগের আয়োজন দেখে ভবেশ ভাবল কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে তার মুক্তির সময় আসন্ন। ট্রেনটাই যদি পুড়ে যায়, তাহলে তার আর গার্ডগিরি

করার অবসর থাকে না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাসে করে নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারে। সেখানেও তার জন্য প্রশান্ত কর্তব্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে।

সে গার্ডের কোর্টটা খুলে ফেলল। তারপর সেটা পাট করে নিজের কামরার এক কোণে ফেলে রাখল। পরে আর একটা কোট বাগিয়ে নিলেই চলবে। টুপিটাও খুলে কোটের উপর রাখল। এখন তার শরীরে গার্ডের কোন চিহ্ন নেই। এখন সে একজন সাধারণ যাত্রীর মত। প্যান্ট আর সার্ট ত অনেকেই পরে আছে।

প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিক সে নিচে নেমে পড়ল। সকলেই ট্রেন পোড়ান নিয়ে ব্যস্ত। তার দিকে নজর দেবার কেউ নেই। স্টেশনের এলাকা পার হতে পারলেই মুক্তির অবারিত প্রান্তর, নিরুপদ্রব পথ। তারপর কিছু দূরে গিয়ে বাসের প্রতীক্ষা। তারপর নেড়ঘণ্টা পরে তার নিজের বাসা। সেখান-কার খবর নিয়ে পরে স্টেশন মাস্টারের কাছে রিপোর্ট। সে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু স্টেশন এলাকার প্রান্তে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল যে, সে এই ট্রেনের গার্ড। সমস্ত বিপদ থেকে সেটাকে রক্ষা করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়াই তার কর্তব্য। এই ট্রেনটির সম্পূর্ণ ভার তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনটিকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষা করা হবে তার সাধ্যে কুলাবে না। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা করার কর্তব্য অতি অবশ্য তার রয়েছে। এতগুলি যাত্রীর অনেকের বাড়িতে হয়ত অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, তবু তারা চাকরির কর্তব্য করতে বের হয়েছিল এবং তা করতে পারেনি বলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভবেশকেও তার কর্তব্য করতে হবে, তার অদৃষ্টে যাই থাকুক না কেন।

সে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল এবং জনতার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর ট্রেনের পাশে গিয়ে জনতার দিকে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

একজন বলল, 'আপনি আবার কে মশাই? কি বলতে এসেছেন?'

আর একজন বলল, 'রেলের কর্মচারি বলে মনে হচ্ছে।'

ভবেশ বলল, 'এই দেরীর জন্যে ট্রেনের কোন দোষ নেই। যারা তার চুরি করে নিয়ে গেছে দোষ তাদের। এই ট্রেন কেন পোড়াতে যাচ্ছেন, এই ট্রেন করেই ত আপনাদের রোজ অফিসে যেতে হবে।'

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। যাত্রীরা বুঝল ভবেশ রেল-কর্তৃপক্ষের লোক। সমস্ত রাগটা তার উপর পড়ল।

একজন বলল, 'ইলেকট্রিক ট্রেন চালাবার যখন মতলব, তখন তার রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনাদের করা উচিত ছিল। আমাদের চাকরিগুলো খাবেন? রোজই তো এই ঝামেলা।'

ভবেশ বলতে গেল, 'ইলেকট্রিক ট্রেন আপনাদের সুবিধার জন্য করা হয়েছিল। আর এতটা পথ সারারাত পাহারা দেবার এত লোক......'

তার কথা শেষ হবার আগেই একজন যাত্রী বলে উঠল, 'এই সেই গার্ড।'

অন্য একজন বলল, 'ওকে ভালরকম শিক্ষা দিয়ে দিন, কর্তৃপক্ষের সাফাই গাইতে এসেছে।'

তারপর তার শরীরের উপর অজস্র কিল চড় লাথি পড়তে লাগল। সে উপুড় হয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। তার পিঠের উপর অনেকে লাফাতে লাগল। যখন তার চেতনা নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে; সে শুনতে পেল পুলিশের গুলীর শব্দ, বহু পলায়মান পায়ের শব্দ। তারপর সে জ্ঞান হারাল।

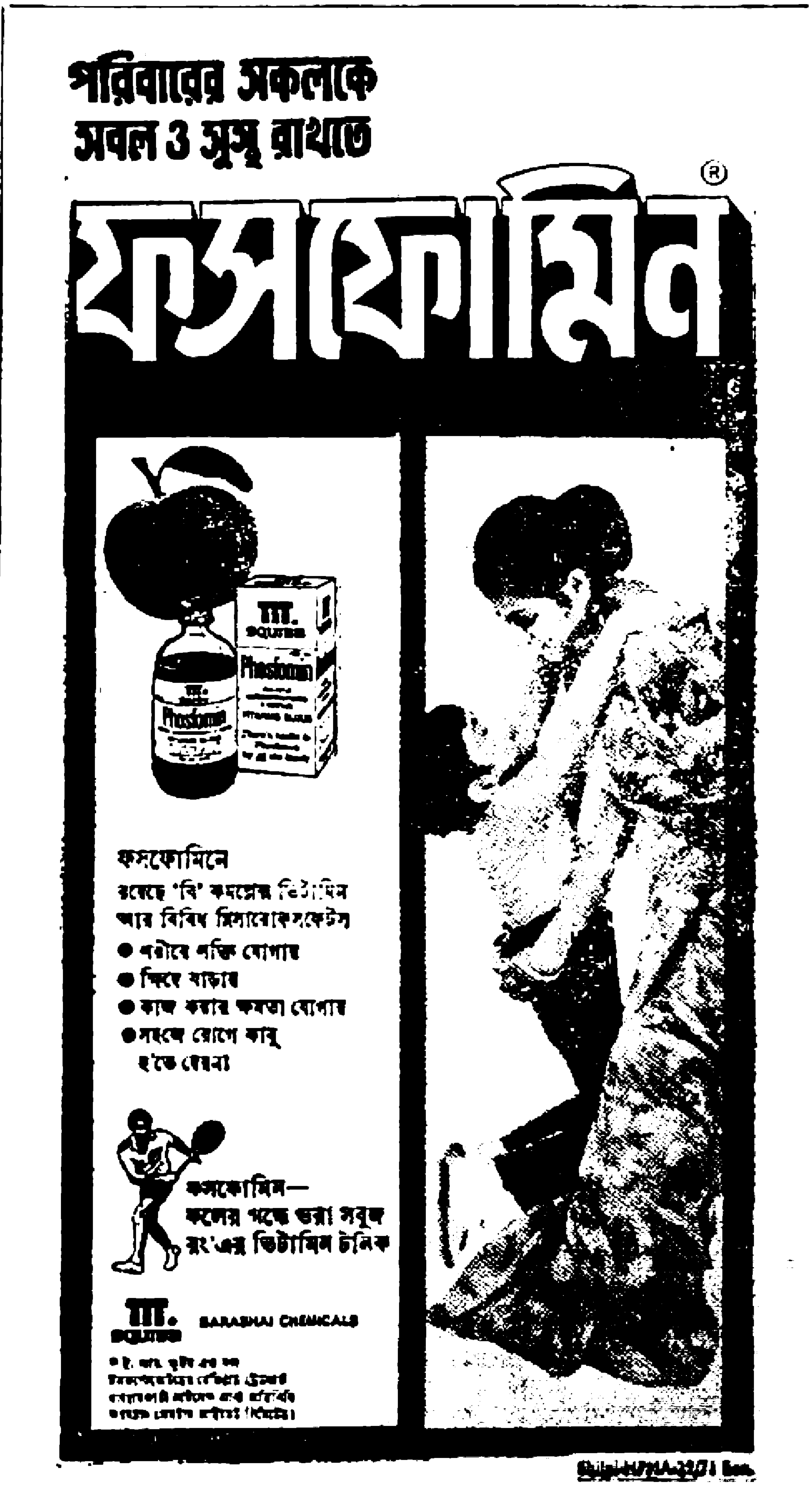

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনেকগুলি বই পর পর প্রকাশিত হয়েছে মানক্কের, কাউল, দালভী, থেরা, কুলদীপ নায়ার, রেজিন্যাল্ড ম্যাকসওয়েল, সুদীর্ঘ তালিকা। সকলেই ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্যকথা বলার চেষ্টা করেছেন। কারো কাহিনীর নাম 'আনটোল্ড স্টোরী' আর কারো বা 'ইন্ডিয়াস চায়না ওয়ার' অর্থাৎ ভারতের চীন যুদ্ধ। আমরা এই স্তম্ভে ইতিপূর্বে এই সব গ্রন্থের কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং মনে হয় বর্তমানে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতেও ভিতরকার রহস্য জানা না থাকলেও আমরাই একখানি স্বতন্ত্র চীনা যুদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থ লিখে ফেলতে পারি—যা মৌলিক এবং চমকপ্রদ হতে পারে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা উচিত যে কাউলের এবং ম্যাকসওয়েলের গ্রন্থ দুটির বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

উপরিল্লিখিত সাংবাদিক ও সামরিক হোমরা-চোমরাদের পর এইবার আসরে নেমেছেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তা বি এন মল্লিক। ১৯৪৮ থেকে পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর পর পর্যন্ত তিনি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরপদ অলংকৃত করেছেন। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্ণধার হিসেবে এমন অনেক গুপ্ত তথ্য তিনি জানেন যা আর কারো জানা সম্ভব নয়, এবং প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও কারো নেই। 'ক্লাসিফায়েড মেটিরিয়াল' নামক কস্তুরাজি সাধারণের নাগালের বাইরে। পণ্ডিত নেহরুর তিনি আস্থাভাজন ছিলেন এবং বল্লভভাই প্যাটেল থেকে গুলজারিলাল নন্দা পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রসচিবদেরও স্নেহধন্য। অনেক 'ডেলিকেট' এবং 'সিক্রেট' মিশনে তাঁকে কর্তৃপক্ষরা নিযুক্ত করেছিলেন তাই তিনি যে একজন অধিকারী ব্যক্তি এ বিষয়ে সকলে নিঃসংশয়। এই গ্রন্থটির মলাটের ওপর লাল কাগজের রিবন আঁটা আছে—

"The last word on the subject".

সুতরাং এরপর আর কথা বলা চলে না। কিন্তু গ্রন্থ শেষে রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে—' এই কথাকটি পাঠকের কানে গুঞ্জরিত হবে। এই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে—'দি চাইনিজ বিট্রেয়াল'—এবং অন্য-শিরোনাম 'মাই ইয়ারস উইথ নেহরু।' পাঠকের কাছে এ সবই মূল্যবান তথ্য হিসাবে গৃহীত হবে কারণ এসব বাদ দিয়ে গ্রন্থটির সুবিচার সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের প্রকাশক-প্রদত্ত পরিচয়ে গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অনেক কথা লিখিত হয়েছে—তার মধ্যে আছে 'হোয়াট লেড সরদার প্যাটেল টু রাইট দি লেটার পারটেনিং টু দি সিকিউরিটি প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া?'—এতদ্বারা সর্দার প্যাটেল কর্তৃক ৭ই নভেম্বর ১৯৫০ তারিখে পণ্ডিত নেহরুকে লিখিত একটি সুদীর্ঘ পত্রের কথা ইংগিত করা হয়েছে। 'ভবনস জার্ণালের' ১৯৬৭-র ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সমগ্র পত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল এবং তারপর দালভীর 'দি হিমালয়ান ব্লান্ডার' ও কুলদীপ নায়ারের 'বিটউইন দি লাইনস' গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরাও সম্ভবতঃ 'ভবনস জার্ণাল' থেকে পত্রটি গ্রহণ করেছেন। মিঃ মল্লিকও চিঠিখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায়। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'ভবনস জার্ণাল' এবং দালভী ও কুলদীপ নায়ারের গ্রন্থে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সর্দার প্যাটেলের এই চেতাবণী সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরু ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষায় তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করেননি। এই ধারণা খণ্ডনের চেষ্টায় পাঁচটি স্তবককে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে মিঃ মল্লিক বলেছেন সাতদিনের মধ্যেই সব কটি মন্তব্য বিচারবিবেচনা করে নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের প্রায় সূচনা অংশে সর্দার প্যাটেলের এই সুদীর্ঘ পত্রটি উদ্ধৃত হওয়ায় চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে সর্দার প্যাটেলের কুশাগ্র বুদ্ধি, স্বদেশপ্রেম এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাবেন। তিনি বলেছিলেন, ১৯৫০-এর এই চিঠিতে—

"Even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends".

তিব্বতের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যগুলি আজ এতকাল পরে পাঠ করলে চমকিত হতে হয়। তিনি বলেছিলেন এযাবৎ আমরা পাকিস্তানের চেয়ে সামরিক দিক থেকে শক্তিমান হওয়ার প্রয়াস করেছি। তারপর বলেছেন—

"In our calculations we shall now have to reckon with Communist China in the north and north-east — Communist China which has definite ambitions and aims and which does not, in any way, seem friendly disposed towards us".

সর্দার প্যাটেল বহিরঙ্গ বিপদ ছাড়াও আভ্যন্তরীণ বিপদের কথাও সেই ১৯৫০-এ চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এই দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। মিঃ মল্লিক নেহরুজীর সমর্থনে কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ইনটারন্যাল সিকিউরিটি'র নবতম সমস্যা বিষয়ে সব কটি মন্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। তাই যদি হত তাহলে ১৯৫০-এই সতর্কবাণীর পর ১৯৬২-র শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

যে তিব্বত সংক্রান্ত ভুল সিদ্ধান্তের ফলে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল তার উল্লেখ লেখক বার বার করেছেন। তারপর 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' সংক্রান্ত তদন্তের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তদন্তে তাঁর ভূমিকা, চু-এন-লাই কর্তৃক তদন্ত বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ, মিঃ মল্লিকের প্রতি অশ্রদ্ধের উক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাবলী নিছক যোগসূত্রহীন নয়, সেই কারণে, 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' বিমান দুর্ঘটনার পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্র হলেও মূল্যবান।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন এই গ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উৎসাহ পেয়েছেন শ্রীযশোবন্তরাও চ্যাবনের কাছ থেকে। শ্রীচ্যাবন তখন ডিফেন্স মিনিস্টার ছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই কালে তিনি যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সেই সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনেক অপ্রিয় ও অসংগত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মনে হওয়ায় শ্রীচ্যাবন মিঃ মল্লিককে যথাযথ তথ্য পরিবেশনে উৎসাহী করেন। যেহেতু অন্য লেখকদের পক্ষে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং

ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্য কাহিনী

যেহেতু সব তথ্যাবলীর চাবিকাঠি ছিল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর এই অধিকর্তার হাতে সেই কারণেই এই বিষয়ে 'দি লাস্ট ওয়ার্ড' বলার তিনি অধিকারী। তাঁর কাছে এই কর্তব্যপালন 'ওয়ার্ক অব লভ'—তাকে যথেষ্ট বিচারবিবেচনাসহকারে কতটুকু 'ইনফরমেশন' তিনি প্রকাশ করবেন এবং কতটা উহ্য রাখবেন তা স্থির করতে হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি তিনি নাকি স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখেছেন,—কোনো তথ্য অবসর গ্রহণের কালে তিনি সঙ্গে করে আনেননি কিংবা কোনো সহকর্মী সূত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করেননি। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁকে অপূর্ব স্মৃতিধর পুরুষ বলতে হয়, কারণ অনেক সন তারিখ এবং সরকারি মেমোরেন্ডামও তিনি যথাযথ প্রকাশ করেছেন—স্মৃতির সাহায্যে। অবশ্য তাঁর ডায়েরী ছিল এবং গতানুগতিক হিসাব রাখতেন।

ইতিপূর্বে যে সব লেখক এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা ভারত সরকারের 'ইনটেলিজেন্স দপ্তরের সমালোচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই সব সমালোচনা সংগত হয়েছে বলা যায় না। কারণ ইনটেলিজেন্স সর্বদাই গোপন ব্যাপার এবং সেই সমস্ত তথ্যাবলীর সবটুকুই চোরাপথে সংগ্রহ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না।

ম্যানেকেকর তাঁর 'দি গিলটি মেন অব সিকসটি টু' গ্রন্থে ভারত-তিব্বত-চীন এই তিন ত্রিভুজ নিয়ে যে অনধিকালের সমস্যা তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং খেরাও 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স প্রবলেম' গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু লেখকের মতে ভিতরকার তথ্যসম্ভার হাতে না পাওয়ায় তাঁরা 'গিলটি' মেন বলে নেহরুকে ফেলেছেন। মূলত নেহরুজীকে ঐ গিলটি প্রমাণের জন্য মিঃ মল্লিক প্রায় সাড়ে ছ'শ পাতার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি রচনা করেছেন একথা মনে করা অন্যায় হবে না।

খেরা ও ম্যানেকেকরের বক্তব্যের জবাব ১৭০—১৮৯ পৃষ্ঠায় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। তিনি নেহরুজীর 'পলিসি অব নন-এলাইনমেন্টের' উদ্দেশ্যের কথা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ঘরে ও বাইরে অনেক ত্রুটি সহ্য করতে হলেও ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে।

তিব্বতী পর্বের পর চীনের সঙ্গে ভারতের প্রণয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। দুর্গত তিব্বতীদের সাহায্যার্থে যে কমিটি করা হয়েছিল, ভারত সরকার এবং পণ্ডিত নেহরুকে চীনের সরকারী পত্র-পত্রিকায় প্রচণ্ড গালি-গালাজ করা হল। তার ভাষা অতি কুৎসিত, পণ্ডিতজীকে যে ভাষায় আক্রমণ করা হল তাতে ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ল। তিব্বতীদের সাহায্য করাটা যে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এমন কথাও বলা হল। দালাই লামাকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর সঙ্গে মুসৌরী গিয়ে নেহরুর সাক্ষাৎকার ঘটায় চীন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। তাঁরা বলতে লাগলেন তিব্বতীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে ভারতের কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান ও তার নেতাদের সক্রিয় অংশ আছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহরুর একটি চিঠির জবাবে চু-এন-লাই সর্বপ্রথম জানালেন, চীনা সরকার ম্যাকমোহন লাইন স্বীকার করেন না। এই পত্রে লাদক থেকে বর্মা পর্যন্ত সমগ্র চীন-ভারত সীমানা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হল, এবং চীনারা অধিকৃত হাজি-লাংগার-সামুল লুংপা-লানক লা রোড—তৈরী করতে লাগলেন, ভারত তাকিয়ে রইল নীরবে। কারণ সে সময় ভারতের ফরওয়ার্ড পোস্ট বাহিনী ছত্রভঙ্গ। ইনটেলিজেন্স প্রাপ্ত সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু চুপ করে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না:

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড 'কনফ্রন্টেশন' অর্থাৎ চীনাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হওয়ার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। চু-এন-লাই কি বলেছিলেন এবং নেহরুজী কি জবাব দিয়েছিলেন তার বিবরণ আছে। এমন কি নেহরুজী একটি চিঠিতে বলেছিলেন—চীনা সৈন্যদের ঘন ঘন ভারতের সীমান্তে আক্রমণ এবং আকসাই-চীনে চীনা সৈন্য সমাবেশের কথা ভারতের জনগণকে জানতে দেওয়া হয়নি পাছে চীন সম্পর্কে তাদের মনে একটা বিরূপ মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে। মিঃ মল্লিক বলেছেন এই নীতির ফলে পরবর্তীকালে যখন সমস্ত ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল তখন পার্লামেন্টে এবং পার্লামেন্টের বাইরে ভারতের জনগণকে সামলাতে সরকার যথেষ্ট বেগ পেয়েছেন।

আগামী সংখ্যায় এই আলোচনার শেষাংশ প্রকাশিত হবে।

—[illegible]

MY YEARS WITH NEHRU (THE CHINESE BETRAYAL) : By B. N. MULLICK : Published by ALLIED PUBLISHERS : Bombay, Calcutta, Price : Rs. Twenty five only).

নতুন বই

Cartoons : Kamal Sarkar
Ni-ran Books,
27, T. N. Chatterjee St. Cal-80

মূল্য ৬-০০ টাকা।

ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী কমল সরকার কিছুকাল হল ভারতে ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। এছাড়া বাংলার প্রাচীন শিল্পীদের জীবনী অনুসন্ধানেও নিরত রয়েছেন। দীর্ঘকাল যাবত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলিতে তিনি নিজে যতগুলি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন তার থেকে চল্লিশখানি বাছাইকরা নিদর্শন নিয়ে বর্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় সবগুলিই ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে আঁকা। অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়বস্তুই

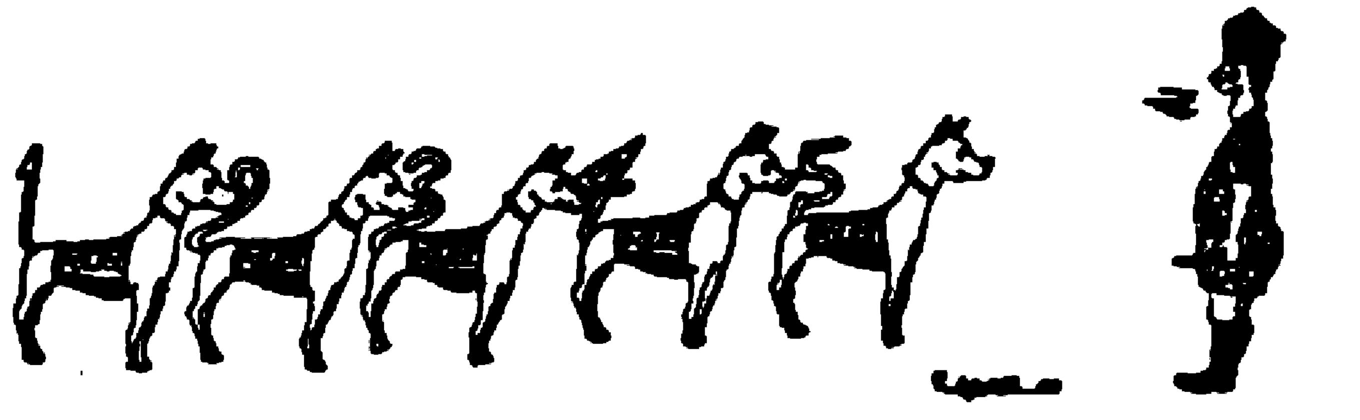

সামাজিক অল্প কিছু উৎকৃষ্ট চিত্রও আছে। ছবিগুলির একটি বৃহৎ অংশই পরিচয়লিপি-বিহীন বা যাকে ইংরিজীতে বলে ক্যাপশন-লেস কার্টুন। ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী মাত্রেই জানেন যে এধরনের ছবি আঁকতে কতখানি চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এই বিভাগে শ্রীসরকার বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার স্কুটার ভ্যান বা পুলিশের কুকুরদের রোল কল কিম্বা প্রাক্ বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের স্ট্রিপ কার্টুন ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। যেগুলিতে পরিচয়লিপি আছে সেগুলিও সব সময় সংক্ষিপ্ত। এছাড়া বইটির আরেকটি আকর্ষণ হল ভারতের প্রথম কৌতুক পত্রিকা 'হিন্দী পাঞ্চ'-এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেটি শ্রীসরকারের দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফল।

নির্বাসিত বর্বর বানর (নাটক)— রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ।। বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯ ।। দাম : তিন টাকা।

নাটক নিয়ে ইদানীং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে কম নয়। চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নাট্যসংস্থা, লেখা হচ্ছে নানা ধরনের নাটক। রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের এই নাটকটি বর্তমান সমাজ চিন্তার ফসল।

এই নাটকের নায়ক [illegible] একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ—[illegible] এবং নির্মম।

বাইরে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা সমস্ত মানুষকে বাস্ত করে তুলেছে, তখন গোপনুরুই-বা থাকবে কিভাবে? তার বাড়ীতেও এসেছে পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মীরা। নায়িকা পুষ্প তাকে মুক্ত করতে চায় বিচ্ছিন্নতা থেকে।

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ফুটিয়ের সঙ্গে নগরবাসী মানুষের সমকালীন স্বেচ্ছাচারণার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অসহায়তার আসল ছবিটিও।

এ নাটকের সবচেয়ে বিস্ময়কর চরিত্র নিওরোটিক ডাক্তার নচিকেতা। সে নতুন কলকের খোঁজে নিজেকে নিযুক্ত রাখে, বাঁচার জন্য উদ্দীপ্ত হতে চায়। এবং বিভ্রান্ত চরিত্র 'লতা' নচিকেতাকে বলে : 'আপনি তো বলেছিলেন, আমরা বন্দর খুঁজছি।......আপনি আমাকে বাঁচান। আমি মরতে পারব না।...... আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমাকে বাঁচিয়ে দিন।'—বেঁচে থাকার এই প্রবল ইচ্ছা নাটকটির বক্তব্যকে বলিষ্ঠতা দিয়েছে।

ব্রাত ক্যানসার (কাব্য সংগ্রহ)—উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সুক্ত প্রকাশন ২৬ বাবুপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা ।। তিন টাকা ।।

ইংরেজী অনুবাদসহ সাতাশটি কবিতার সংকলন এই 'ব্রাত ক্যানসার'। তারুণ্যের বিদ্রোহ ও অহংকার, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নিহিত-উত্তাপ প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য। নাম কবিতার কবি লিখেছেন : 'কেন জানে আরোগ্য কত দূরে/বলো বলো তার/ঠিকানা কোথায়, কোন খানে!'

বইটি পড়তে পড়তে এই তরুণ কবির ঔজ্জ্বল্যকতায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কোনো কোনো কবিতায় কবি এমন কিছু পংক্তি ব্যবহার করেছেন যা দীর্ঘকাল পরেও মনে থাকবে। বইটির প্রধান দুটি উজ্জ্বলসমৃদ্ধতা ও সংযমের অভাব! আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি তাঁর এই ত্রুটি কাটিয়ে একজন সফল কবি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সারস্বত (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৮)—সম্পাদক : অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ১-২৫ পয়সা।

কিছু কিছু সাময়িক পত্রিকা প্রথম দর্শনেই পাঠকদের নজর টানে শুধু বাহিরঙ্গেই নয় সুষ্ঠু চিন্তাশীল রচনা সম্ভারের সমাহারেও। সারস্বত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি সেই ধারা আজো বজায় রেখেছে। গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মধ্যে এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখ্য রচনা : তরুণ সান্যালের 'অন্য জন্ম এবার বিদায়' (কবিতা), অমলেন্দু বাগচির 'এসথেটিক্সের সমস্যা' (নিবন্ধ), সুরেন্দ্র বর্ধনের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে (নিবন্ধ)। এছাড়া লিখেছেন : বিমলচন্দ্র চৌধুরী, দিলীপ সেনগুপ্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেকদিন পরে কবিতা লিখেছেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখেছেন : দেবব্রত সরচৌধুরী।

মহিলা (আষাঢ় '৭৮) সম্পাদিকা : ডক্টর আশা দেবী। ১২০।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। এক টাকা।

মেয়েদের জীবনকে সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখবার জন্যে প্রশংসনীয়ভাবে এ পত্রিকাটি সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে। আলোচ্য সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস রহস্য কাহিনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত কবিতা ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি আছে দেশ-বিদেশের মেয়েদের কথা, এদেশের বিপ্লববাদিনী মেয়েদের কথাও। আছে রূপ-ছায়াচিত্র, সেলাই বোনা এবং রান্নাবান্না ইত্যাদি। একাধারে বহু বিষয়ের সমাবেশ এবং মেয়েদের জন্যেই সাধারণ মহিলাদের কাছে 'মহিলা'র জনপ্রিয়তা বেশি।

বিদগ্ধ (পাক্ষিক) সম্পাদকমণ্ডলী পরিচালিত। মিলন প্রেস, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগণা (নর্থ), দশ পয়সা।

ব্যারাকপুর মহকুমার জনসেবায় নিবেদিত একমাত্র পাক্ষিক পত্রিকা। জনসাধারণের নানান অভাব অভিযোগ দূরীকরণে, অন্যায় ও দুর্নীতি রোধে এবং জনমত গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে এ পত্রিকা। ২৫-তম স্বাধীনতা স্মারক ক্রোড়পত্র লিখেছেন পদ্মা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ।

ছন্দক : (শ্রাবণ আশ্বিন '৭৮)—সম্পাদক রবিরঞ্জন ভৌমিক। বিবেকানন্দনগর পুরুলিয়া। এক টাকা

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এটি। আকারে ছিমছাম, চেহারা পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক। সবটুকু মিলিয়ে প্রথম দর্শনে ওৎসুক্য জাগায়। লিখেছেন—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ন্তী সেন, রাজলক্ষ্মী দেবী, আনন্দ বাগচী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শোভন সোম, সুভাষচন্দ্র সরকার, হেনা হালদার, কৃষ্ণকিশোর রক্ষিত রায়, শম্ভু মহারাজ প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরে বাঙালীর অপ্রকাশিত রচনা। 'বাঙালীর লক্ষ্য ও তার সাধনা' বিশেষ উল্লেখ্য।

লোকবার্তা (জুলাই '৭১)—গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, ১২।ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা।

সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী এই মাসিক পত্রিকার নিয়ামক। এই পত্রিকার পিছনে সমাজহিতৈষণার পরিকল্পনা সমস্যা সমাধানে এমন সম্যক আয়োজন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর আগে দেখা যায় নি। 'কলকাতা সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিতে কলকাতার বিবিধ সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে বহু তথ্য তত্ত্ব এবং পরিসংখ্যান দিয়ে। সচিত্র প্রবন্ধগুলি এর অন্যতম আকর্ষণ। এমন সচিত্র বিশেষ সংখ্যা অভিনবত্বী সুন্দরভাবে ছাপা সাময়িক পত্রিকা অনেকদিন বাদে চোখে পড়ল। লিখেছেন : সুগত দাশগুপ্ত, শিবদাস ব্যানার্জি, আনন্দময় ভট্টাচার্য, সুভাষচন্দ্র সরকার, গুণদা মজুমদার, মনকুমার সেন প্রমুখ। কল্লোলিনী কলকাতাকে যাঁরা ভালবাসেন লোকবার্তার এই বিশেষ সংখ্যাটি তাঁদের অবশ্য পাঠ্য।

রাজধানী (কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র) সম্পাদক : নিশিথনাথ সেন। পদ্মলাপুর, বীরভূম। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা লিখেছেন : আলোকবিজয় রাহা, সুনীলচন্দ্র সরকার, শান্তিকুমার ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সত্য গুহ, মানিক রায়, আশিস সান্যাল, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক কবিতা জিজ্ঞাসা' নিবন্ধটিও উল্লেখ্য।

এক সাথে (শ্রাবণ, ৭৮)—সম্পাদিকা : কমল মুখোপাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আশী পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যাটি চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। লিখেছেন : সুপ্রিয়া আচার্য, শিপ্রা দত্ত, কুমকুম চক্রবর্তী, কণা চট্টোপাধ্যায়, বিভা ঘোষ, পদ্মা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রাপ্তি স্বীকার

ইস্পাত (বাংলাদেশ সংখ্যা)—ভূদেব পালিত। ১৫১।১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা : ২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যপত্র (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) সম্পাদক উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

বর্ণালী (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন) সম্পাদক : জয়দেব দাস। মধুবাটী, বলরামবাটী, হুগলী ।। তিরিশ পয়সা ।।

পদাতিক (আষাঢ় ৭৮) সম্পাদক : সুভাষ দাস পুরকায়স্থ। শিববাড়ি রোড, করিমগঞ্জ, আসাম।

ভুবন (বাংলাদেশ সংখ্যা) সম্পাদক : নয়নকুমার রায়। ২ ভুবনেনগর, চন্দননগর, হুগলী। এক টাকা।

আয়না (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক : অরূপ ভট্টাচার্য। যশলাপুর, বর্ধমান। এক টাকা।

শ্রাবণ প্রদীপ (মে-আগস্ট '৭১)—সম্পাদক মদন চৌধুরী। সদরঘাট, আরামবাগ হুগলী। ষাট পয়সা।

আয়না (সাহিত্য পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদিকা : আঞ্জুম আরা জাবি। ২০, কিলন লেন, কলকাতা—১৬/ ষাট পয়সা।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(৩১)

জয়া মাথায় হাত দিয়ে নত মুখে বসে আছে, দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে তার। পাশে উপবিষ্ট মদিরা। মদিরা অপ্রস্তুত হলেও দুঃখিত নয়—সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে আসল কথাগুলো বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখ যেখানে অনিবার্য সেখানে নিবারণ করবার কি উপায়।

কি জয়া, কি হল? আট-দশ বছর আগেকার কথা, এখন আর দুঃখ করে কি লাভ?

কালের বিচারে আট-দশ বছর হতে পারে আমার মনের বিচারে তো সদ্যঘটিত।

তোমার দুঃখের কারণটা কি শুনি। আমাকে মারতে পারোনি বলে না রাণী সীমন্তিনীকে মেরে দিলে বলে।

জয়া বলে, দু-ই। কিন্তু মদিরা তোমাকে শুধোই এসব কথা শুনে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে না।

গত জন্মের ঘটনায় সুখ-দুঃখ কি কেউ অনুভব করে। আমি তো কতবার বলেছি মদিরা মরে গিয়েছে, নূতন জন্মে সে ভুজাঙ্গনা।

কিন্তু আমি তো সেই জয়াই আছি।

তাই তো দেখছি তেমনি অবুঝ তেমনি গোঁয়ার। ভেবেছিলাম এতকাল পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে, দুঃখের পরে দুঃখের আঘাতে সম্বিত হয়েছে তোমার।

থাক্ উপদেশ রাখো।

মূর্খকে উপদেশ ছাড়া আর কি দেব। এখন চোখের জল মুছে ঘটনাগুলো গুছিয়ে বলো।

জয়া শুধায়, তুমি কেন বলেছিলে যে রাণী আমার প্রতি আসক্ত।

ভুল বলিনি, তখন তাই মনে হয়েছিল। পাপীর মন সর্বত্র পাপের ছায়া দেখে। দু'দিন না যেতেই বুঝলাম রাণী সীমন্তিনী সতীসাধ্বী, পতিগতপ্রাণা।

তখন আমার ভুল ভাঙালে না কেন?

বাপরে তাহলে কি আমার রক্ষা থাকতো। তখন তুমি মনে মনে জাঁকড়ে বসেছ, রাণীর মালা পেয়েছ, কৌস্তুভমণি হার আমার হাতে দিয়েছ তাঁকে উপহার দেবার জন্যে এমন অবস্থায় যদি বলি যে আমি ভুল বুঝেছিলাম তাহলে কি করতে বলো তো।

জয়া বলে, গলা টিপে মেরে ফেলতাম।

তবেই দেখো। তাই ভাবলাম যে বোকাটাকে নিয়ে একটু খেলানো যাক। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল—

আবার কি কারণ?

শুনলে কি বিশ্বাস করবে।

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি, দাবী করে জয়া।

আমি তোমাকে ভালবাসতাম কিন্তু তখন তুমি রাণীগতপ্রাণ, আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? তাই বানিয়ে বানিয়ে উপন্যাস বলে গেলাম। বললাম যে রাজা আমাতে আসক্ত, রাতে বাগানবাড়ীতে নিয়ে যান। তারপরে যখন তোমার কাছে শুনলাম যে আমাদের সন্ধানে বাগানবাড়ীতে গিয়েছিলে বললাম যে এখন আর বাগানবাড়ীতে নিয়ে যান না রাজবাড়ীতেই ঘটে আমাদের মিলন।

সেই কথা বিশ্বাস করবার ফলেই তো তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম।

কেন মেরে কি লাভ হতো?

জয়া বলে, আমার এ কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

না, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি।

তোমার উপরে রাজার আসক্তি শুনে বুঝলাম যে তোমাকে ভালবাসি।

মদিরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জয়া বলে যায়, যে রাজার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব তাই যখন দেখলাম রাজা তোমার সঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ এক তীরে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিলাম দুজনকে। কে জানতো মরলো সতীসাধ্বী নিরপরাধ রাণী আর দেবতুল্য রাজা। এতেও যদি আমি অভাগা না হই তবে অভাগা আর কে?

তারপরে জয়ার নজর পড়ে মদিরার মুখের দিকে, সেখানে পটপরিবর্তন দেখে, দেখতে পায় নেপথ্যের মানুষটিকে, সে বলে ওঠে, মদিরা এখনো তুমি আমাকে ভালোবাসো।

মদিরা নির্বিকার কণ্ঠে বলে, ভুজাঙ্গনাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে নেই।

মিথ্যা কথা! তোমার চোখ বলছে, মুখ বলছে, সর্বাঙ্গ বলছে তবু বলছ আর কাউকে ভালবাসতে নেই।

মদিরা পুনরায় অধিকতর অবিচলিত কণ্ঠে বলে, বাজে কথা রাখো, বলো এই ক'বছরের ঘটনা।

অগত্যা জয়া আরম্ভ করে।

রাতের বেলায় রাজবাড়ীর প্রাকারের উপরে আমি পাহারায় ছিলাম; ভোররাতে আক্রমণ হবে সবাই জানতো, তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম রাজবাড়ীর তেতালার ছাদে রাজা একজন রমণীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে দণ্ডায়মান, মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছিল না। অনুমান করলাম তুমি।

মদিরা বাধা দিয়ে বলে, ও আর কতবার শুনবো, তারপরে কি হল বলো।

তখন জয়া একে একে বলে যায় সুমন্তনগরের পরাজয়, লুটপাট, তার বন্দীদশা, নরেন্দ্রনগরে আগমন এবং সেখানে ভাগ্যের নাগরদোলায় পাক খাওয়া। এমনিভাবে পাহাড়ে পলায়ন, ছাগাবিন্ন

সঙ্গে সাক্ষাৎ, [illegible] অভিজ্ঞতা, চার্বাক আশ্রমে আতিথ্যলাভ, একজন সাধ্গুরুর তার অনুসরণ ভূগুরে দর্শন লাভ, অবশেষে বর্ষাকাল ও মুক্তি-মার কথা।

মদিরা তন্ময় হয়ে শোনে।

জবা বলে, এখানে তোমার কি হয়েছিল বলো।

আমার বৃত্তান্ত দুঃখের হলেও এমন কাহিনীবহুল নয়।

তবে তো যৌবন আসবে না, বলো শুনি।

রাজবাড়ীতে যখন লুটপাট শুরু হল আমাকে ধরে নিয়ে এল সেনাপতির কাছে। সেনাপতি আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, মন্দ নয়। তাঁর কথা শুনে যে সৈনিক আমাকে নিয়ে এসেছিল বললে, তাহলে আপনার জন্যে রাখি। সেনাপতি বললেন, না, এখন আমার অর্থের প্রয়োজন। একে নিয়ে যাও তক্ষশিলার বাজারে, দেখো যেন চড়াদামে বিক্রি হয়।

মদিরা বলতে থাকে তক্ষশিলার বাজারে মথুরার একজন বণিক, পরে শুনলাম তাঁর নাম শেঠ মধুরা দাস, আমাকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে মথুরায় নিয়ে এল আমাকে। তারপরেই বাধলো গোল।

কি রকম শুনতে আগ্রহ হলো জবা।

মধুরা দাসের নজর ছিল আমার দেহটার উপরে কিন্তু কুঠীতে এসে আবিষ্কার করে যেমন কৌতূহলাদির হয়। তখন নজর গেল ঐ হাতটার দিকে। বণিক তরুণ ব্যক্তি নারীদেহ সবই লোভনীয় হোক আর নাই আছে, বণিকের চিরকাল থাকে। যখন বুঝলাম যে ঐ হাতটা হাতাবার জন্যেই আছে বণিক, একদিন পালিয়ে চলে এলাম বৃন্দাবনে।

হাতটা নিয়ে এলে।

তা নয়তো কি তাকে উপহার দিয়ে আসবো।

সে কি জানে না তুমি এখানে এসেছ।

জানে না আমার।

তবে জানে না কেন? মথুরা থেকে বৃন্দাবন এইটুকু তো পথ।

এসেছিল বই কি।

কি বলল?

কি বললে? নারীকে ভোলাতে যত রকম মিষ্টি কথা শুনেছো জানা আছে সবই বলল।

গেলে না কেন?

পাগল নাকি! সংসারে যত অনাচার আছে হয় তা নারীঘটিত নয় অর্থঘটিত, অনেক সময়ে একসঙ্গে দুটোই। বলেছিলাম বলেই গেলাম না।

জোর করতেও তো পারতো।

পারতো করতো কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেন?

[illegible] পরিবার [illegible] [illegible] একলা ভুলতে পারে নি তাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

তাছাড়া না যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে—

কি কারণ আবার, শুধোয় জবা।

ব্রজেশ্বর আমাকে কৃপা করেছেন।

দু'দিনের মধ্যেই।

আগেই তো বলেছি পাপীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে আছে। সাধুদের সাতজন্ম ঘোরান, পাপী তিন জন্মে দেখা পায় একথা শোন নি।

তবে তো আমার আশা আছে।

আশা বলে আশা। তোমার যা পাপ তুমি এক জন্মেই তাঁর কৃপা পাবে। তাইতো বলছি চলো আজ সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময়ে তাঁকে দর্শন করে আসি।

জবা বলে, আজ থাক।

কেন থাকবে কেন? দুলোপাড়ে দেব দর্শন করতে হয়।

তাই মদিরা, আমার সর্বাঙ্গে ধুলো মুছেও যাবে না।

সেইতো ভরসা। ব্রজেশ্বর আমার খেলুড়িদের সর্দার, সারাদিন ব্রজবালাদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ছুটোপাটি করে খেলা করেন, ধুলো লাগবে না গায়ে।

মদিরা বলে, চলো মন্দিরে যাই।

জবা বলে, আজ থাক।

এমনি আজ কাল বলে কালক্ষেপ করে জবা মন্দিরে যেতে চায় না। কখনো একাকী, কখনো মদিরার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শ্রীধাম দর্শন করে। একদিন দু'জনে সাঁতরে যমুনার পরপারে গোকুলদর্শন করে এলো। মদিরা বলেছিল, চলো নৌকায় যাই।

জবা উত্তর দিল, সাঁতার দি, যমুনার জল লাগুক সারা গায়ে।

একদিন গিরি-গোবর্ধনে আরোহণ করলো। মাঠ ঘাট প্রান্তর কিছুই আর না দেখা থাকলো না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন জবা শুধালো, মদিরা ঐ বনটা তো দেখা হল না, চলো যাই। মদিরার সঙ্গে বনে প্রবেশ করলো, অধিকাংশ তমাল গাছ, কদম, শেফালিকাও আছে। খুব বড় বন নয়, তবে বাগান নয় বন সন্দেহ নাই। ছায়াটি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি অন্ধকার।

জবা বললে, মদিরা বনের মধ্যে দিনের বেলাতেও এক খণ্ড রাত্রি যেন বিরাজমান। রাতের বেলায় না জানি কি গভীর মায়া হয়।

হয় বইকি, কিন্তু কখনো রাতে যেন প্রবেশ করো না।

কেন? আমি তো ভাবছিলাম রাতে এসে দেখে যাবো।

সতর্ক করে দেয় মদিরা, বলে, এমন দুর্মতি করো না। এর নাম নিকুঞ্জবন। এখানে রাতের বেলায় ব্রজেশ্বর এসে গোপিনীদের নিয়ে বিহার করেন; তখন মানুষ এলে মারা যায় নয় পাগল হয়ে যায়।

বিস্মিত হয় জবা। মদিরা বুঝতে পারে না জবা কেন মন্দিরে যেতে চায় না। তার বুঝবার কারণও নেই। জবার মনের কথা একমাত্র জবা জানে। জবার ভয় অভিসারের মতো এখানেও যদি ভগবান দেখা না দেন, যদি দেখা না দেন। তবে তো আর সংসারে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। দুর্ভিক্ষা বলেছিল বৃন্দাবনে ভগবান পূর্ণাবতার। সেই পূর্ণাবতার নির্দয় হলে যাবে আর তো কিছুই থাকলো না। তখন যেমন পাপ তেমনি থাকবে মুক্তির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ। তখন কি গতি হবে তার।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই ছাড়লো না মদিরা, জোর করেই ধরে নিয়ে গেল মন্দিরে। শঙ্খঘণ্টা ধূপধুনো আলোকমালার মহাসমারোহ; পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছে; কাতারে কাতারে নরনারী যুক্ত করে গদগদলোচন; জবা সাগ্রহে তাকিয়ে দেখল বেদী শূন্য। কিছুক্ষণ কাটলো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে জবার মনে হল তার আগে পিছে উপরে নীচে ইহলোকে পরলোকে কোথাও কোন আশ্রয় নেই; সে অনন্ত শূন্যে নিরন্তর পতনশীল। জবার মুক্তি নাই, সদগতি নাই, পরিত্রাণ নাই। সে ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

রাতের বেলায় কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না মদিরা। পরদিনে অনুসন্ধান করতে করতে তাকে মূর্ছিতাবস্থায় পাওয়া গেল নিকুঞ্জ বনের প্রান্তে।

(১২)

জবার মাথা কোলে তুলে নিয়ে মদিরা বাতাস করতে করতে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেতনা হল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শিয়রের দিকে তাকাতেই মদিরাকে দেখতে পেলো, দেখতে পেলো কিন্তু কথা বলল না অবোধের মতো চেয়ে রইলো।

মদিরা বলে, জবা ভাই, তুমি এখানে এলে কখন? কখন তুমি মন্দির থেকে সরে পড়লে টের পাইনি, মঠে এসে তোমাকে না দেখতে পেয়ে কাল সারারাত তোমাকে খুঁজে ফিরেছি। সকালবেলায় একবার মনে হল কি সর্বনাশ, নিকুঞ্জ বনের দিকে যায়নি তো। চলে এলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। ব্রজেশ্বরের কৃপায় প্রাণে যে রক্ষা পেয়েছ এই যথেষ্ট।

জবা উঠে বসে বলল, প্রাণটা গেলে এমন কি ক্ষতি হতো।

কেন জীবনে এমন বিতৃষ্ণা কেন ভাই?

তৃষ্ণা না মিটলেই বিতৃষ্ণা।

কি হয়েছে খুলেই বলো না।

বলবার তো কিছু নেই মদিরা, তোমরা সকলে শ্রীমূর্তি দেখে আনন্দ করতে লাগলে আর আমি দেখলাম বেদী শূন্য।

বলো কি! বিস্মিত হয় মদিরা, ব্রজেশ্বর তোমাকে দেখা দিলেন না।

কই আর দিলেন! তখন ভাবলাম আজ রাতে নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করবো, হয় দেখা পাবো নয় প্রাণে মরবো।

কি সর্বনাশ! তোমাকে তো বলেছিলাম এখানে রাতের বেলায় এলে প্রাণ যায়।

আমার সঙ্গে এও বলেছিলে তিনি রাতের বেলায় এখানে আগমন করেন।

এ তো সবাই জানে।

তাই তো এলাম। তারপরে হঠাৎ জেগে উঠে বলে, দেখা দেবেন না বললেই হল। আজ দশ বছর ধরে পাহাড়ে হলো ঘরে ঘরে বেরাচ্ছি আর উনি মজা দেখছেন। একবার বর্ষাভিলাষে ফাঁকি দিলেন আমার এখানে।

কি করবে বলো তার দয়া যতক্ষণ না তো দেখা পাওয়া যাবে না।

সে তো শুনেছি কিন্তু দয়া না হবে কেন শুনি। এখন মনে হচ্ছে বেশ করে-ছিলাম উনিকে আঘাত করে, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছিল।

মন্দিরা তার মুখ চেপে ধরে, ছি ছি অমন কথা বলতে নেই।

কেন বলতে নাই শুনি। সবাই পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করে বেড়াচ্ছেন এটাই শুধু দুঃখি বাহনীর। আমার মুখ আছে বলবো, দেখি কি করতে পারেন তিনি। এই দশ বছরে আমার যে অবস্থা করেছেন তার বেশি আর কি করবেন।

প্রাণটা তো নিতে পারতো।

তা হলেই তোমার কুঞ্জেশ্বরের কীর্তি সম্পূর্ণ হতো। এই জন্যে মন্দিরা, জবা প্রাণের মায়া করে না।

সেসব কথা পরে হবে—এখন চলো দেখি বলে, তাকে টেনে নিয়ে মঠে এলো মন্দিরা।

বিকালবেলায় মন্দিরা শুধালো ওখানে গিয়ে কি দেখলে তুমি।

কিছুই না। নিকুঞ্জ বনের কাছে এসে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম বনের মধ্যে শত শত ঝিঁঝি ডাকছে। কান পেতে শুনে বুঝলাম, না, ঝিঁঝি নয়, নূপুরের ঝঙ্কার আর অনেক বামাকণ্ঠ থেকে উঠছে ললিত সঙ্গীত। ভাবলাম তবে তো কথা মিথ্যা নয় আবির্ভূত হয়েছেন কুঞ্জেশ্বর, গোপিনীরা তাঁকে ঘিরে নাচছে আর গান করছে। এই সুযোগ মনে করে দৌড়ে ঢুকতে গেলাম, তারপরে আর কিছু মনে নেই।

তবে তো তিনি তোমাকে দয়া করেছেন।

ওরকম শুধুমাত্র দয়ার ভিখারী জবা নয়। পূর্ণিবতারের কাছে পূর্ণ দয়া আদায় করে তবে ছাড়বো। আমি দয়ার ভিখারী নই দয়ার দাবীদার। আমার সব নিয়েছেন আর দয়ার কণাটুকু দিয়ে খুশি করবেন সে বাপের মেয়ে আমি নই।

মূর্ছার মধ্যে কিছু দেখতে পাওনি জবা।

মূর্ছার মধ্যে আর কি দেখবো। তারপরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, হাঁ দেখে-ছিলাম বটে একটা স্বপ্ন।

কি স্বপ্ন শুনি।

দেখলাম যে যাকে বিশ্ব জগতের একটা বাঁশিকে। সেটা সারাটা বন ছুটে ছুটে বেড়িয়ে ঘুরে চলে এলো তার বাসস্থানে, সেখানে পড়ে রইলো।

মন্দিরা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, স্বপ্নের অর্থ কিছু বুঝলে।

স্বপ্নের আবার কি অর্থ হবে।

বলো কি! ভগবান স্বপ্নের ইঙ্গিতে কথা বলেন। আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই বাণ পাওয়া হরিণ, বনে পাহাড়ে ছুটে ছুটে বেড়ালে তোমাকে ফিরে যেতে হবে তোমার বাসস্থানে, তবে মিলবে তোমার মুক্তির উপায়।

জবা ব্যঙ্গ করে বলল, বাসস্থানে শান্তি চলে দেখি।

না জবা, গাঁজা-গুলি নয়। কুঞ্জেশ্বরের ইঙ্গিত তুকবাসীতে বুঝতে পারে। তুমি দ্বারকায় ফিরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

দ্বারকা তো এখন সমুদ্র।

সমুদ্রই তো আদিকালে ছিলেন নারায়ণ। সেখানে তোমাকে দেখা দেবেন, তোমার চাওয়াটুকু পূর্ণ হবে সেখানে গেলে। তুমি যাও সেখানে।

তুমিও চলো না মন্দিরা।

না ভাই, আমি মন-প্রাণ দিয়েছি কুঞ্জেশ্বরের পায়ে, কুঞ্জমণ্ডপের বাইরে আমার যাওয়ার উপায় নাই। আর এক কথা। যাওয়ার সময় কৌস্তুভমণির হারটা নিয়ে যেয়ো।

সেখানে কাকে দেব?

সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ো, তা হলেই তিনি পাবেন।

কেন বলো সেখানে, যদি সেখানেও যদি না পাই তাঁর কৃপা।

পেতেই হবে।

পরদিন প্রাতে জবা যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। মন্দিরা দেয় তার হাতে কৌস্তুভ-মণিহার, বলে, সাবধানে রেখো, দেখ একদম অনাবৃত।

আমার মনের চেয়েও কি বেশি। চলো না আমার সঙ্গে মন্দিরা।

মন্দিরা বলে, না জবা কুঞ্জবনের জন্য কুঞ্জেশ্বরের পায়ে, তার আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

তখন মন্দিরার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করে। মহলো পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ তার দেহ বিদ্যুতে পরিণত

হয়ে মিলিয়ে না যায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মদিরা। তারপরে জরা অদৃশ্য হবে গেলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুই গালে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নিয়ে ফিরে চলে মদিরা। হায় রে রমণীর মন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

পঞ্চম খণ্ড

(১)

যমুনা পার হয়ে পশ্চিমদিকে চলতে আরম্ভ করেই জরা বুঝতে পারলো পথের ভয় সম্বন্ধে মদিরা যা বলেছিল তার এক-বর্ণ মিথ্যা নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার মনে হল যে মদিরা প্রকৃত বিবরণ সমস্তটা জানতো না। সকালবেলায় যাত্রা শুরু করে-ছিল দুপুরে নাগাদ কয়েকজন লোক এসে তাকে ঘেরাও করলো, বলল, বাবাজী যাও কোথাও?

জরা বলল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ তীর্থদর্শনে চলেছি।

ওরা বলল, বটে, তা দক্ষিণা দিয়ে যাও, আমরা যে তীর্থের পাণ্ডা।

জরা বলে, ভাই, সন্ন্যাসী মানুষ পয়সা কোথা পাবে?

উত্তরে শোনে, দক্ষিণা না দিলে দেবতা দেখা দেবেন কেন?

ভক্তিতে কি দেবদর্শন মেলে না?

জরার উত্তর শুনে ওরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

একজন বলে, তোমার দাড়ি আর জটা যে পরচুলা নয় কেমন করে জানবো। অনেক বেটা সাজা সন্ন্যাসী হয়ে দক্ষিণা এড়িয়ে পথ চলে।

অন্য একজন বলে জিজ্ঞাসাবাদের দরকার কি? পরীক্ষা করলেই হয়—এই বলে সে জরার দাড়ি আর জটা ধরে টানা-টানি শুরু করে।

না: দাড়ি আর জটা ওর নিজস্ব বলেই মনে হচ্ছে। যা: বেটা খুব বেঁচে গেলি।

এমন সময়ে দলের একজন বলে ওঠে, বাবাজি, তোমার গলায় ঝোলানো ঐ সৌখীন থলিটিতে কি আছে দেখি।

জরা বলে, ওতে আমার জপের মালা।

তবু দেখি না. অনেক বেটার জপের মালার সোনাদানা থাকে।

আমি ভিক্ষুক সোনাদানা কোথায় পাবো?

তবু দেখতে দোষ কি—এই বলে সেই লোকটা গলা থেকে থলি খুলে নিয়ে মালাটা বের করে এবং পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বলে ওঠে, না: কতকগুলো নুড়ো পাথর।

তারপরে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে সবলে গলায় এক ধাক্কা দেয়, বলে, অনেকটা সময় তোর নষ্ট করেছি এবারে জলদি এগিয়ে যা।

জরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে দ্রুত চলে পিছনে ফিরে তাকায় না।

তখন তার মনে পড়ে মদিরা কেন এই কৌশলটি করেছিল। কৌস্তুভমণির হারটি জরার হাতে দিয়ে সে বলেছিল, জরা পথ-ঘাটের যে অবস্থা তাতে যে এটা নিয়ে নিরাপদে পৌঁছতে পারবে তা মনে হয় না।

জরা অসহায় ভাবে শুধোয়, তবে উপায়?

উপায় একটা করতেই হবে।

এই বলে সেই হারটায় কতকগুলো ছোট ছোট নুড়ো পাথর গেঁথে দেয় আর কৌস্তুভমণিটা কাদায় এমনভাবে লিপ্ত করে যাতে তার দীপ্তি ঢাকা পড়ে যায়। তখন আর মালাটাকে সাধারণ জপের মালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

জরা শুধোয়, এমন করলে কেন?

মদিরা বলে, পথে চলতে আরম্ভ করলেই বুঝতে পারবে।

জরা এখন বুঝতে পারলো।

মদিরা আরও অনেক পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল, বলেছিল চর্মণ্বতী নদী (চম্বল) পার হলেই তখন জানবে প্রত্যেকটি লোক তোমার শত্রু। এই হল মৎস্যদেশের অবস্থা। তারপরে যখন মালবদেশে (মালোয়া) প্রবেশ করবে, তখন আর কি বলবো, ভগবান বাসুদেব তোমাকে রক্ষা করুন এই বলতে পারি।

জরা বলে, তা তো বটেই তবু কিছু পরামর্শ দাও।

পরামর্শ! অনেকক্ষণ ভাবে মদিরা. তারপরে বলে, পথে বড় বড় পাথর এড়িয়ে চলবে, রাতের বেলায় বনের মধ্যে থাকবে তবু কোন চটিতে আশ্রয় নেবে না। আর কোন রাহী লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করবে না।

বিস্মিত জরা শুধোয়, কেন এমন বলছ?

জানি বলেই বলছি। আজকার দিনে এই ব্রজমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেশ চোর-ডাকুর বাথান হয়েছে।

রাজা?

রাজা এখন চোর-ডাকুর সর্দার। লোক এখন আবিষ্কার করেছে ক্ষেতি করবার চেয়ে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করায় অনেক লাভ। আর যে-সব লোক ক্ষেতি করে তারা রাজস্ব দেয় না।

কেন?

কেন কি, ক্ষেত থেকে ডাকুরা শস্য কেটে নিয়ে যায় রাজস্ব জোগাবে কেমন করে?

রাজা শাসন করে না কেন?

আরে বোকা, এটা বোঝ না যে রাজস্ব না পেলে রাজা আর ভিখারীতে প্রভেদ কোথায়? তাই রাজারা এখন পেটের দায়ে চোর-ডাকুর সর্দার বনেছে. চুরি-ডাকাতির ভাগে এখন রাজার রাজগী।

জরা বলে, শুনেছি ইন্দ্রপ্রস্থে এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নাতিরা রাজত্ব করে। তাঁরা শাসন করেন না কেন?

জরা, দুঃখের কথা আর কি বলবো। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের বাইরে এখন তাঁদের শাসনদণ্ড অচল। রাজকর্মচারীরা ডাকু আর দস্যুদলের সঙ্গে যোগসাজসে পেট ভরায়। মহারাজ পরীক্ষিতের এখন প্রায় একটানা একাদশীর অবস্থা।

সব বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় জরা, মুখে কথা জোগায় না। কিছুক্ষণ পরে বলে, মদিরা, দশ বছর হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি সেখানে যে এর চেয়ে অনেক নিরাপদ।

হবেই তো, সেখানে মানুষ কোথায়? মানুষে এমন অমানুষ, বলে ফেলে জরা। মানুষ বলো কমানুষ বলো কিছুতেই আপত্তি করবো না।

জরা বলে, তাই মদিরা একটা কথা বুঝিয়ে দাও। দশ বৎসর আগে যখন দ্বারকা ছেড়ে রওনা হয়েছিলাম তখনো তো দেশের এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল না।

আরে, এটা আর বুঝলে না। তখনো যে অট্টালিকা দাঁড়িয়ে ছিল। যদিচ তখনই বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন. যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে, পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানে উদ্যত তবু অট্টালিকাটা ভেঙে পড়েনি। তারপরে গত দশ বছরের মধ্যে অট্টালিকা ভেঙে পড়ায় সব বিশৃঙ্খল লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

জরা উত্তর দেয় না। মদিরা শুধোয়, কি ভাবছ?

দেশের কথা।

দেশের কথা ভাববার তোমার আমার কি অধিকার? যেখানে স্বয়ং বাসুদেব আর পাণ্ডবগণ ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে তুমি আমি কে?

আবার জরা নিরুত্তর। মদিরা শুধোয়, কি হল?

জরা বলে, পূর্ণাবতার বাসুদেব যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে আর ভরসা কোথায়?

এবারে উত্তর খুঁজে পায় না মদিরা। জরা শুধোয়, কি বলো?

কি আর বলবো! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দি এমন জ্ঞান নেই। সত্যিই তো পূর্ণাবতার যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে মানুষে কোন ভরসায় জীবনধারণ করবে।

মদিরা, তুমি তো জানো যে আমি দুর্ভাগ্যদুর্বুদ্ধি জোয়াড় ব্যাধ, তার উপরে মার বাড়া পাপ নেই তাই করেছি। পাপীর মুক্তিসন্ধানে দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি। মুক্তির সন্ধান পাইনি তবে অনেক জ্ঞানী-গুণী যোগী তপস্বীর দর্শন পেয়েছি। তাদের উপদেশের সঙ্গে আজ তোমার কথা মিলিয়ে নিয়ে যেন বুঝতে পারছি পূর্ণাবতার নিজে হাতে-কলমে কিছু করেন না। দেখো না, কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সবাই যখন অস্ত্রধারণ করলেন তিনি অস্ত্র না ধরে ঘোড়ার বলগা-মাত্র ধারণ করলেন; তারপরে যদুবংশকে বিনষ্ট হতে দেখেও তাদের রক্ষার্থ কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করলেন না, তাই মনে হচ্ছে পূর্ণাবতার নিজে কিছু করেন না, দৃষ্টান্তস্বরূপ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত মনুষ্যসমাজকে পূর্ণাবতারত্বের পথে চলতে

আহ্বান করেন: পূর্ণাবতার সার্থ হননি, সার্থ হয়েছে মানুষ।

জয়ার মুখে এমন গভীর তত্ত্ব শুনতে পাবে মণিরার কল্পনাতীত ছিল, সে হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। তারপরে হঠাৎ উঠে এসে জয়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে ওঠে, জয়া তুমি তো মুক্তপুরুষ।

জয়া শশব্যস্তে সরে গিয়ে বলে, মণিরা একি করলে, একি করলে। ব্রাহ্মণ হয়ে ঘোর পাতকীর পাদস্পর্শ করলে। তবে ভরসা এই যে চরম পাপ যে করেছে তার পাপ আর বাড়বে কি করে? না মণিরা, আমি মুক্তপুরুষ নই, আমি মুক্তির সন্ধানী।

মণিরা বলে, যেখানে যাচ্ছ মুক্তি সেখানেই নিশ্চয়, মুক্তিদাতা তোমাকে ডাকছেন। তোমাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজেরও যে মুক্তি নাই। এ জেনো নিশ্চয় তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

জয়া রওনা হয়ে যায়। মণিরা সব রকম পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল কেবল একটি বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে ভুলে গিয়েছিল, না, ঠিক ভুলে যায়নি, তবে সে বিষয়টা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই বলা প্রয়োজন বোধ করেনি।

(২)

মথুরাপ্রসাদ কৌস্তুভমণিটার লোভ পরিত্যাগ করতে পারেনি। বরঞ্চ ঐ মণিটা নিয়ে মণিরা পালিয়ে বৃন্দাবন চলে গেলে ওটার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর দুর্নিবার হয়ে উঠল। কিভাবে ওটাকে হস্তগত করা যায় এখন তার দিবসের চিন্তা রাত্রির স্বপ্ন। মণিরা সামান্য লোক ও দুর্বল কাজেই লোক পাঠিয়ে লুঠ করে আনা কঠিন ছিল না, কঠিন ছিল না না, তবে অসম্ভব। মথুরাবাসী নরনারী সকলের সংস্কার ছিল যে বৃন্দাবনে গিয়ে হামলা করা চলবে না। সেই একবার কিশোর-বীর মথুরাপতি কংসকে বিনাশ করেছিল সেই স্মৃতি সকলের মনে কাজ করতো। আজ সে কিশোর বৃন্দাবনে নেই, মথুরায় নেই, পৃথিবীও পরিত্যাগ করেছে কিন্তু হলে কি হয় সংস্কার দুর্মর। অতএব জোর-জুলুম চলবে না। কিভাবে ওটি হস্তগত করা যায় উপায় চিন্তা করতো মথুরাপ্রসাদ।

তক্ষশিলার বাজার থেকে চড়া দামে কিনে এনেছিল মণিরাকে তার রূপের মোহে। কিন্তু একদিনও তাকে ভোগ করতে পারেনি। মথুরায় এসে নগরপ্রান্তে উপবন বাটিকায় বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিল মথুরাপ্রসাদ। মণিরা এরকম জীবনযাপনে অনভ্যস্ত নয়, এখানেও তার আপত্তি ছিল না। রাত্রেরবেলায় মথুরাপ্রসাদ যখন এসে উপস্থিত হল প্রথমেই তার নজরে পড়লো ঐ অলৌকিক রত্নটি। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। নারীর মোহ রত্নের মোহে পরিণত হল। মণিরার অত্যন্ত চক্ষু বুঝলো যে এখন তার চেয়ে ঐ মণিটার আকর্ষণ প্রবলতর মথুরাপ্রসাদের কাছে। কোন নারী এই অবজ্ঞা সহ্য করতে পারে। মুহূর্ত-মধ্যে তার মন পাষাণ হয়ে গেল, না কিছুতেই এই অরসিককে দেহদান করবে না সে। তার এহেন দৃঢ় সঙ্কল্পের আবশ্যক ছিল না, কেননা তখন মণিরা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে মথুরাপ্রসাদের চোখে।

মণিরার বিমুখতার আরও কিছু কারণ ছিল। এ মণিহার যে বাসুদেবের স্মৃতি-জড়িত সেটা কিনা শেষে অলঙ্কৃত করবে ঐ সামান্য কামুকটার কণ্ঠ। হয়তো বা কোন লোভের মুহূর্তে পরিয়ে দেবে অন্য এক পণ্য নারীর কণ্ঠে। সে আগেই স্থির করেছিল যার হার তাকেই ফিরিয়ে দেবে। দ্বারকায় ফিরে যাওয়া যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় কাজেই তো বৃন্দাবন যেখানে তিনি বাল্যলীলা করেছিলেন। এ মণিহার কার, কে দিয়েছিল, কোথায় পেলো, কত মূল্য প্রভৃতি উত্তর প্রত্যুত্তরে সে রাতটা কেটে গেল। মথুরাপ্রসাদ বুঝতে পারলো এ রত্ন সহজে হাতছাড়া করবে না মণিরা, আরও বুঝলো যে মেয়েটা সহজ লোক নয়। মথুরাপ্রসাদ ভাবলো সেও সহজ লোক নয়, ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করবেই ও জিনিসটা, কেবল কিছু সময় দরকার। মণিরাও বুঝেছিল এই সত্যটা। তাই আদৌ সময় দিল না, পরদিন প্রাতঃকালেই হারটা নিয়ে বৃন্দাবন পালিয়ে চলে এলো। এমন যে সম্ভব মাথায় আসেনি মথুরা-প্রসাদের নতুবা পাহারা বসাতো।

বৃন্দাবনে এসে সমবয়সী এক ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো। মণিরা জানালো যে মথুরার বণিক মথুরাপ্রসাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, এখানে আশ্রয় চায়।

মেয়েটি জানালো, যতদিন এখানে নির্ভয়ে বাস করো, বৃন্দাবনে এসে হামলা করবার সাহস কারো নেই, বিশেষ মথুরার লোকের তো বটেই। ব্রজেশ্বর এখানে সকলের রক্ষক। সেই মেয়েটি যে মঠে বাস করতো সেখানে এসে উঠল মণিরা। তার ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখলো কৌস্তুভমণিহার, কাউকে বিশ্বাস করে সে সংবাদ জানাতে পারলো না। তারপরে দশ বছর চলে গিয়েছে। যোড়শী সে ছিল পলাতকা নারী সে ক্রমে পরিণত হল কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজাঙ্গনায়।

মথুরাপ্রসাদ সমস্ত খবর রাখে কিন্তু করবার কিছু নাই। এই দশ বছরে তার অন্যান্য ইন্দ্রিয় শিথিল হলেও লোভটা বেড়ে গিয়েছিল, বস্তুতঃ লোভটা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়গত নয় বলেই বয়সের সঙ্গে বেড়ে যায়। স্বভাবলোভী মথুরাপ্রসাদের বেলায় তা একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছিল। সে তাকে তাকে থাকলো।

শিবপ্রসাদ আর বিজনাথ নামে তার দুই বিশ্বস্ত সহচর ছিল, সমস্ত দুষ্কর্মের সহায় তারা। যেমন প্রভু তেমনি অনুচর। দুজনেই কলির চর, তাদের অসাধ্য বা অকরণীয় কিছু ছিল না। মথুরাপ্রসাদের আজ্ঞায় তারা দুজনে ছায়ার মতো মণিরার কাছাকাছি থাকতো। সমস্ত খবর রাখতো, রত্নটা যে হাতছাড়া হয়নি জানাতো প্রভুকে। বৃন্দাবনে সকলেরই অবাধ গতিবিধি। তবে জুলুম করবার সাহস কারো ছিল না। মণিরাকে চোখে চোখে রেখে দশ বছর কেটে গেল।

একদিন তারা প্রভুকে জানালো যে সম্প্রতি জটাশ্মশ্রুধারী এক সন্যাসী এসেছে আর তার সঙ্গে মণিরার কিছু অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা, ভাবে গতিকে মনে হয় তাদের মধ্যে পূর্বপরিচয় আছে। মথুরাপ্রসাদ আদেশ দিল যে এবার যেন কড়া পাহারা রাখে, ঐ সন্যাসীবেটা মণিটা হাত করতে না পারে কিম্বা ঐ সন্যাসীর সঙ্গে সেটা না পাচার করে দেয় মাগীটা। ও বেটীর অসাধ্য কিছু নেই, নইলে এমন সুখের বাগানবাড়ী ছেড়ে মঠে গিয়ে থাকে, অলঙ্কারের বদলে গায়ে তিলক ফোঁটা কাটে, আর কিনা মদের বদলে পান করে চরণামৃত। অনুচরেরা জানায় প্রভুর আদেশ হলে ঐ মণিসুদ্ধ মাগীটাকে নিয়ে এসে হাজির করে দেয় বাগানবাড়ীতে। এ কথা শুনবামাত্র মথুরা-প্রসাদ দুই কানে আঙুল দিয়ে কপালে হাত ঠেকায়, শেষে কি কংসের মতো প্রাণে মারা পড়বে।

বিজনাথ ও শিবপ্রসাদ সুদক্ষ গুপ্তচর। প্রত্যেকটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাখত। ইতিমধ্যে জয়ার সঙ্গে নানা অছিলাতে আলাপ পরিচয় করে নিয়েছে, সে যে শীঘ্র দ্বারকায় রওনা হবে তাও জেনে নিয়েছে। মণিরা তাদের চিনতো না, তাই সন্দেহ করলো না। আর যাত্রার আগে জয়ার গলায় যখন একটি রেশমী থলি ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, জয়া এর মধ্যে রইলো তোমার জপের মালা, সাবধানে রেখো, তখন সমস্তই দেখলো অনুচরেরা। তারা বুঝলো ঐ মণিটা পাচার হতে চলেছে। তারা অবিলম্বে প্রভুকে গিয়ে খবর দিল।

সংবাদ শুনে মথুরাপ্রসাদ অনুচর দুই-জনকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে পথখরচের যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিল, বলল, দেখো, লোকটার পিছু

জেনে। লোকটা যখন মালখানায় প্রবেশ করবে তখন হলেনকোলিত্রে ঐ ধলিগন্ধে বাক্সটা হাত করে চলে আসবে। শেষ এবন অ্যাক্ট, খুন-জখম, রাহাজানি নিত্যকার ঘটনা, কে কখনো কোকে জানতে পারবে না। তারপর আরও জানিয়ে দিল ওটা পেলে তোমাদের জায়গীর দেবো।

ওরা প্রভুকে অভিবাদন জানিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল চোরদের বিশ্বাস কি, যদি নিজেরাই আত্মসাৎ করে, তখন। তাই মধুক্ষেপ্রসাদ ছদ্মবেশ ধারণ করে অলক্ষ্যে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহনে ওদের পিছু পিছু চললো। গুপ্তচরের উপরে গুপ্তচর। অনুচরদের সঙ্গে সামান্য ব্যবধান রক্ষা করে চললো স্বয়ং ছদ্মবেশী প্রভু। প্রভু ও গুপ্তচরদের মধ্যে সম্বন্ধটা চিরকাল বিশ্বাসের ভাবের উপরে স্থাপিত।

এসব ব্যাপার হামিতার জানবার নয়। আর দশ বৎসর আগেকার মধুক্ষেপ্রসাদের সেই লোকের বিবরণ এখন তার মনে প্রাচীন ইতিহাস মাত্র। সেদিক থেকে ভয় ছিল না তার মনে, তাই সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে বলে দিয়েছিল সাধুসন্ন্যাসী দেখলেই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বেশি মেলামেশি না করে, কারণ অনেক সময় চোর ছিনতাই ও দাগাবাজ সাধুবেশে কারোবার করে থাকে। আর কৌস্তুভমণির কথা সাধু-অসাধু কাউকে নয়।

(ক্রমশ)

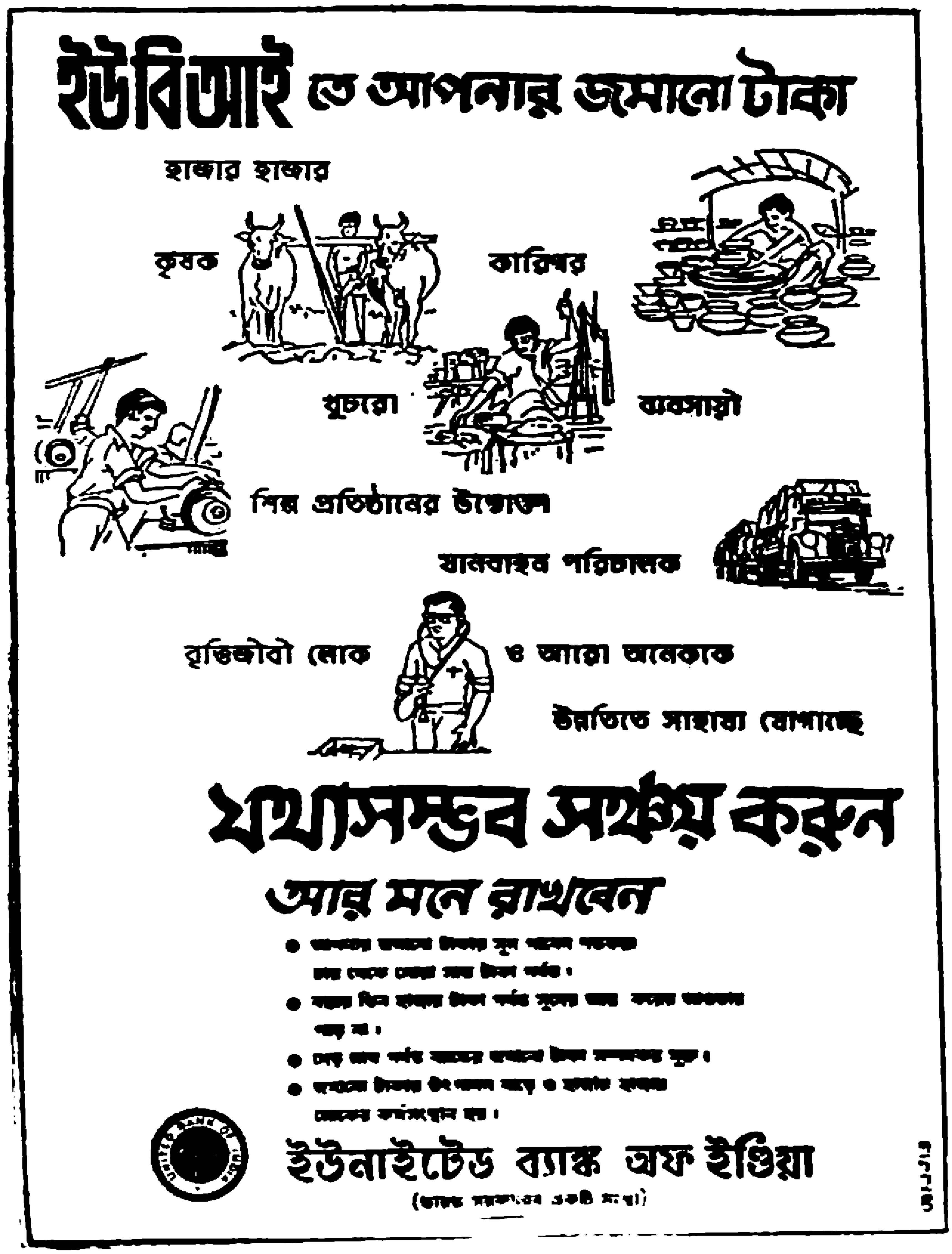

পোল্যান্ডের লোকশিল্প

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকশিল্পের মধ্যে চারুশিল্প ও কারুশিল্প দুরকমই পড়ে। অতীতের বহু শতাব্দী ধরে দেখা গেছে, পোল্যান্ডের মফস্বল বা গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর শিল্পসম্মত কারুশিল্প বা হাতের কাজের সৃষ্টি হয়ে এসেছে। এইসব সৃষ্টি অবশ্য ঐ দেশের আঞ্চলিক ও সাময়িক বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনুসারে চেহারা নিয়েছে সব সময়েই। শুধু তাই নয়, পুরুষানুক্রমে এইগুলি পালিতপোষিত ও হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। আরেকটি কথা বলা দরকার,—দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সেই-খানকার বৈশিষ্ট্য ও কারুকৌশল অনুসারে এবং স্থানীয় কাঁচা মালমশলার ওপর নির্ভর করেই কারিগরেরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করেছেন বা এখনও করে থাকেন।

পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনের ওপর দিয়ে বহুবার ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেছে, এই দেশের লোকশিল্প অসংখ্য উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু কখনই তার ধারা মরুপথে হারিয়ে যায় নি—সে-ধারা আজ পূর্ণ-প্রবাহিনী, প্রাণবন্ত। এর মূলে আমরা দেখতে পাই এই দেশের অধিবাসীদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অগ্রগতির বাসনা।

বিগত মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই পোল্যান্ডের মানুষ নজর দিয়েছেন তাঁদের যুগযুগব্যাপী শৈল্পিক ঐতিহ্যের দিকে, চিন্তা করেছেন কী করে একে পোষণ করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সামনের দিকে। এই বাসনা থেকেই জন্ম নিয়েছে অতীতকালের শিল্পসৃষ্টিগুলিকে যথোপযুক্ত-ভাবে সংরক্ষিত রাখবার সংকল্প। শুধু তাই নয়, দেশের নতুন নতুন শিল্পপ্রতিভা যাতে বিকাশের যথাযথ সুযোগসুবিধা পায় এবং কারুশিল্পগুলি যাতে সুসংবদ্ধ ধারা ও আকৃতি গ্রহণ করে সাধারণ্যে সম্প্রচারিত হয়; সেদিকেও এঁরা সচেতন হয়ে উঠেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, লোকশিল্প রক্ষণ ও বহন করবার দায়িত্বটা কার—সরকারের, না জনসাধারণের? উত্তরে বলতে হয়: উভয়েরই। সৃষ্টিকর্তা আসবে জনসাধারণের মধ্য থেকেই, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করবার দায়িত্ব বিত্তশালী ব্যক্তিগণের আর দেশের সরকারের। কার্যতঃও হয় তাই—পোল্যান্ডের লোকশিল্পের তত্ত্বাবধান করে থাকেন ওখানকার কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয় আর তার প্রাদেশিক বিভাগগুলো। কারুশিল্পীরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পেয়ে থাকেন পুরস্কার ও বৃত্তি। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের নানা স্থানে প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, শিল্পসম্মেলন, পরামর্শসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মনুষ্যজাতির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে দেশে যেমন যাদুঘর আছে, সেগুলির জন্যে এবং জাতীয় সংগ্রহশালা-গুলোর জন্যে রাষ্ট্র নগদমূল্যে কিনে নেন লোকশিল্পের উৎপন্নগুলি।

লোকশিল্পজাত সামগ্রীগুলির উৎপাদন, ক্রয় এবং সেগুলিকে বাজারজাত করার দায়িত্ব থাকে ওখানকার শিল্পসমবায়মূলক প্রতি-ষ্ঠানসমূহের ওপর। এই প্রতিষ্ঠানগুলির আবার একটি উচ্চতর সমিতি বা সঙ্ঘ আছে, তার নাম "সেপেলিয়া"। এই সঙ্ঘ সদস্য সমবায়গুলিকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। শিল্পসম্বন্ধীয় পরামর্শ ও নির্দেশাদি দিয়ে থাকে, নিজস্ব বিপণিতে ঐ সব দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করে থাকে, বিদেশেও কিছুটা রপ্তানি করে। সারা পোল্যান্ড থেকে এক হাজার বা আরও বেশি কারিগর "সেপেলিয়া"-র সভ্য। এ ছাড়া, দেড় হাজারেরও বেশি লোকশিল্পী

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে
তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ
। সমগ্র রচনাবলী ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২·০০

উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১২.০০ টাকার স্থলে ১০·২০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১২০·০০ টাকার স্থলে ১০২·০০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সময়ে অনিবার্যকারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; কলিকাতা ১২
ফোন : [illegible]

(এঁরা চারটি বিরাট কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত), নব্বইটি শিল্পসমবায় এবং পাঁচটি (ওয়ারশ-এ, কাটোউইৎস-এ, লডজ-এ, গ্ডানিস্ক-তে ও ক্রাকাও-এ) আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয় এই 'সেপেলিয়া'-র সদস্য।

পোল্যান্ডে লোকশিল্পের নানা প্রশাখা। যেমন, প্রধানত নাম করতে হয় এইগুলির:— বস্ত্রবয়নশিল্প, আসবাব তৈরি, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, বেতসশিল্প ও কর্মকারশিল্প। এদেশের লৌকিক বস্ত্রশিল্পের একটা বিশেষত্ব হল, কোন-না-কোন রকমের ডোরা-কাটা থাকবে তাতে। এ জিনিসটার উৎপত্তি ১১শ শতকে। আর রঙের ব্যবহার একেক স্থানে একেক রকম। রং প্রয়োগের এই আঞ্চলিক বিশেষত্বটি উল্লেখযোগ্য। ডিজাইন বা নক্সাগুলো বিচিত্র—কখনো জ্যামিতিক আদলে, কখনো লতাপাতার চেহারায়, কখনো অন্য কিছু। কাপড় বা ছিটের ওপর এসব অলঙ্করণগুলো খুব সুন্দর দেখায়। সুতির কাপড় ছাড়া পশমের ওপরেও নানা কারুকার্য করা হয়। সুতি বা পশমী স্কার্ট, স্কার্ফ, এগুলি খুব সুন্দর দেখায়। এছাড়া অন্যান্য জিনিসও তৈরি হয়, যেমন—কিলিম, কার্পেট, রাগ ও ঘর সাজাবার পর্দাজাতীয় নানা জিনিস। একেক অঞ্চলে প্রাপ্তব্য উপাদান অনুসারে একেক ধরনের লোকশিল্প বেশি তৈরি হয়।

সবচেয়ে সূক্ষ্ম ডোরাকাটা পরিচ্ছদবস্ত্র তৈরি করেন দেশের মধ্যাঞ্চলের কারিগররা। জ্যামিতিক ডিজাইন-এর রীতিটা পূর্বাঞ্চলের মাৎসোভস্‌সে জিলায় বেশি চালু —তাছাড়া পোডলাসি এবং মাজুরীতে। উল বুনোটের কার্পেট বুনতে আবার বিয়ালিস্টক অঞ্চলের শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত।

রাগ (কম্বল) ও পর্দাজাতীয় সরঞ্জাম (টাপেস্ট্রি) -গুলি যেমন সুরুচিতে হয়, তেমনি হয় সাজের জিনিস। এসবের নক্সা বা পরিকল্পনা আগে ক'রে দেন অঙ্কন-শিল্পীরা, তারপর সুদক্ষ তন্তুবায়রা তাঁত বোনেন সেগুলোকে। অনেকসময় নক্সা-শিল্পীরা তাঁত নিয়ে বসে যান। এইসব কম্বল ও সরঞ্জাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়, স্থান পায় সংগ্রহপ্রেমিকদের ভাণ্ডারে কিংবা অবস্থাপন্ন রুচিবান ব্যক্তিদের শয়নকক্ষ ও বৈঠকখানায়। এরা শোভাবর্ধন করেছে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের, অধুনা-স্বর্গত ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলের আর যুগোস্লাভিয়ার প্রধানপুরুষ যোসেফ টিটোর কক্ষসমূহের। এরা আছে লেনিনের সংগ্রহাগারে, ইরানের শাহান্‌শাহের তেহেরানস্থ প্রাসাদে—এরা আছে আরো অসংখ্য স্থানে।

পোল্যান্ডের লোকশিল্পে, এমব্রয়ডারি ও লেস তৈরি, এই দুটি জিনিসের ভারি কদর। পোডহেল অঞ্চলের পুরুষদের পোশাকই দেখি, আর কুর্পি-কুপিয়েজলো-লোউইজ-কিলগোয়াজ ইত্যাদি জায়গাকার মেয়েদের পরিচ্ছদই দেখি,—দেখতে পাবো কিছু-না-কিছু এমব্রয়ডারি আর লেসের কাজ তাতে রয়েছেই। বলা বাহুল্য, পোশাকের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই বেড়ে যায় এর দরুণ।

দেশজ লৌকিক পরিচ্ছদ এই দেশে যে কতরকম ধাঁচে প্রচলিত, তার হিসেব করা শক্ত। একেক জায়গার, একেক জেলার একেকটি বিশেষ ধাঁচ। আগেকার মানুষ প্রত্যহই ব্যবহার করত এসব পরিচ্ছদ, কিন্তু এখন আর অতটা চালু নেই—নিয়মিত কেউ বড়-একটা পরে না, পরে উৎসব-অনুষ্ঠান-গুলোতেই বেশি ক'রে। অল্প কয়েকটা জায়গায় কেবলমাত্র স্থানীয় বাসিন্দারা এখনো দৈনন্দিনকে ব্যবহার ক'রে চলেছে এই প্রাচীন পরিচ্ছদসমূহ।

পোশাকের পর মাটির জিনিস বা মৃৎশিল্প। এ ব্যাপারেও ওদের ঐতিহ্য খুব উদার। দেশের পূর্বাঞ্চলে ও মধ্যভাগে গ্রামাঞ্চলে বহুলোকের উপজীবিকাই এই, এবং তাঁরা এতে দক্ষতাও অর্জন করেছেন পুরুষানুক্রমে। তাছাড়াও ওস্তাদ কুম্ভকার দর্শন করে দেখতে পাওয়া যাবে দেশের সব জায়গাতেই। পূর্বাঞ্চলের কারিগরেরা কালো রঙের মৃৎপাত্রের ওপর নানা সুদৃশ্য কাজ করেন। অন্যান্য অঞ্চলে মুখ-গা-ওয়ালা পাত্রাদি তৈরি হয়, তাদের রং ঠিক সাধারণ মাটির রঙের মতনই বজায় রাখা হয়।

পোল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে যদি আপনি বেড়াতে যান, তাহলে নিসর্গদৃশ্য দেখে মুগ্ধ হওয়া ছাড়াও আরেকটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। দেখবেন, পথের ধারে ধারে বিভিন্ন সাধু-সন্ত ও ধার্মিক ব্যক্তির প্রতিমূর্তি সাজানো রয়েছে। এগুলো প্রায় সবই পাথরের, তৈরি করেছেন কোন-না-কোন অখ্যাত কিংবা অজ্ঞাতনামা প্রবীণ শিল্পী—হয়ত নিজের পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখে যাননি ভাবীকাল বংশধর ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্যে। সৃষ্টির আনন্দেই মূর্তি গড়ে রেখেছেন তাঁরা; তারপরে আর মাথা ঘামাননি, কেউ সেসবের কদর করল কিনা, তা নিয়ে। এই বস্তুত মূর্তিসৃজনের ঘটনাটা কিন্তু আজকাল আর ঘটে না, অনেককাল যা হয়ে গেছে তা গেছে —খোলা রোদে-জলে পড়ে থেকে নষ্ট হবার ভয়ে এর অনেকগুলিকেই এখন এনে রাখা হয়েছে বিভিন্ন যাদুঘরে।

কাঠ চিরে, কেটে বা খোদাই করে নানা-ধরনের শিল্পের জিনিস তৈরির প্রচলনটা পোডহেল অঞ্চলেই বেশি। এখানকার কাঠ-মিস্ত্রি কারিগরেরা কাঠের নানাজাতীয় জিনিসপত্র বানাতে সবসময়েই ব্যস্ত—কাঠের বেলচা, আলমারি, খাট, দেরাজ, নস্যিদানির বাকসো, বেড়ানোর ছড়ি, আরো কতরকম কী!

গৃহপরিসজ্জা, যা ইংরিজিতে যাকে বলে 'ইনটিরিয়র ডিজাইনিং', আর গৃহ-স্থাপত্য—এই দুটি ব্যাপারেও এদেশের লোকশিল্পীরা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এবং এটা ক্রাকাও-এর মতো অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে। চাষী-মানুষের বাড়ি, কিন্তু তাই বলে সেখানে রুচির অভাব থাকবে, এর কোনও মানে নেই —গিয়ে দেখুন ভিতরে ঢুকে : ঘরের ছাদ ও দেয়াল চিত্রময়, ঘরের গঠনে নিজস্বতা। সেসব চিত্রকলা ওদের একান্ত ঘরোয়া, একান্ত আপনিক।

যেমন নিজস্বতা ওদের আরেকটি ব্যাপারে : কাগজ কেটে ঘরদোর জিনিসপত্র সাজানো। কাগজ কেটে নানা শিল্পনমুনা সম্ভব এবং সে সম্ভাবনাকে ও'রা বাস্তবে রূপায়িত করতে বহুকাল থেকেই অভ্যস্ত। গৃহপরিসজ্জায় এই কাগজ-কাটা-শিল্পের বহুল প্রয়োগ ও'রা করে থাকেন। মাৎসোভসে জেলায় তো এ জিনিসের ছড়াছড়ি। মেয়েরাই এর প্রধান শিল্পী ও উপজীবিনী। সারা ইউরোপে এ-শিল্পের খ্যাতি, জুড়ি মেলে না এর কোথাও।

ধাতু ও ধাতব দ্রব্য নিয়েও গড়ে উঠেছে প্রচুর লোকশিল্প। পোডহেল অঞ্চলে, বিশেষ করে, যেসব নমুনা দেখা যায় সেগুলো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ঈস্টার উৎসব উপলক্ষ্যে পোল্যান্ডের একটি প্রাচীন প্রথা হচ্ছে চিত্রিত 'ঈস্টার ডিম্ব'। জন্তু-জানোয়ারের শিং থেকেও অনেক রকমের লোকশিল্প তৈরি হয়। হয় নানাধরনের খেলনা।

লোকশিল্পের সমগোত্রীয় হল লোক-স্থাপত্য। এই বিষয়েও পোল্যান্ডের কীর্তি সমুজ্জ্বল। এই শ্রেণীর স্থাপত্য সাধারণত শিল্পসম্মত সৃষ্টি হয়ে থাকে। লোক-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে পূর্বেবর্ণিত পোডহেল অঞ্চলের নাম করা যায়।

এই যে এতগুলি শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হল, এর অনেকগুলিতেই (যেমন, বস্ত্রবয়ন, বেতসশিল্প) পোল্যান্ডের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ওখানকার লোকশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুপরিস্ফুট। বস্তুত, লোক-শিল্পকে বাদ দিয়ে পোল্যান্ডের সর্বাঙ্গীণ সমাজচিত্রটি যেন মোটেই সম্পূর্ণ হয় না।

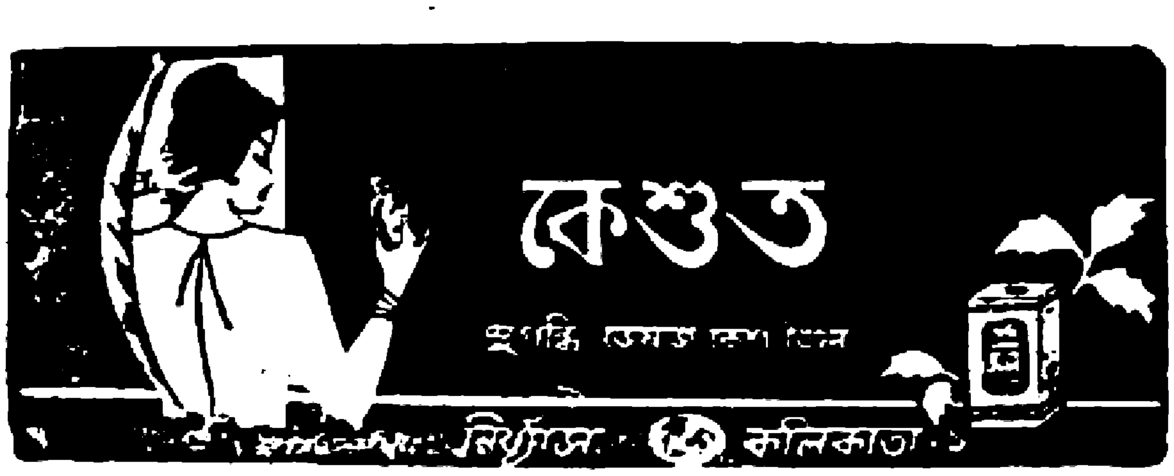

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধকারের মধ্যে হেডলাইট দুটো জ্বেলে অরুণ ফিরতিপথে এগিয়ে চলল। আশপাশে ঘন অন্ধকার নেমেছে। একটানা গম্ভীর আওয়াজটা হয়ে চলেছে শুধু। আরোহীরা নির্বাক। সীমা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোজা রাস্তার দিকে। মনটা তার তোলপাড় করছে। সব জিনিসটা সে স্থির হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে আরও যেন জট পাকিয়ে ফেলল বিশ্রীভাবে।

কি ভাবছ? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

কিছু না।

জায়গাটা ভাল লেগেছে?

হ্যাঁ।

কণ্ঠ তার অসংযমে হল নিস্তেজ।

না, তেমন আর কি।

বাবার খুব ভাল লেগেছে তোমায়।

কথার কোন জবাব দিল না সীমা। তার এখন কি করা উচিত তাই ভাবতে লাগল নিবিষ্ট চিত্তে।

আবার তাকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? সেটা পরে ভাবা যাবে। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে হবে যে কোন উপায়ে। অবশ্য উপায় বলতে একটাই আছে—উধাও হবে যাওয়া অজানা জায়গায়। হঠাৎ পিসিমাকে মনে পড়ল তার। শিমুলতলার মনোরমা পিসিমা। অনেকদিন সে পিসিমাকে দেখেনি।

এত চিন্তা কিসের তোমার?

কই না ত। রাম না হতেই রামায়ণ—ভাবল সীমা। অরুণ তাকে একইভাবে সম্বোধন করে চলেছে। তার বাবার কাছে তার সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেছে তার ধারণাটা অক্ষুণ্ণ রেখেছে নিজের জোরে? এখন থেকেই অরুণ বসু হয়ত তাকে স্ত্রীর মত একটা চলমান সম্পত্তি বলে গণ্য করে ফেলেছে। মনে মনে হাসল সীমা।

টায়ার্ড ফিল করছ? নানাভাবে আলাপ করতে চেষ্টা করছে অরুণ। সীমার ভাবান্তর তার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কিছুক্ষণ আগে যে মানুষ কথায়, গল্পে, কাজে মেতেছিল, সে হঠাৎ স্তব্ধ, নিশ্চুপ হল কি কারণে? মেয়েদের মনের কথা অবশ্য সে বলতে পারে না কিন্তু সীমার নীরবতা।

অরুণের গাড়ী থেকে মাঝপথে নেমে একটা ট্যাক্সী নিয়ে যখন ফ্ল্যাটে পৌঁছল সীমা তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তার সোমা দত্তকে মনে পড়ল। একটু থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল সীমা। না, কেউ নেই। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল সীমা। নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হল তার। পৃথিবীর সব ক্লান্তি যেন তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তার শরীর, মন, সত্তা যেন লুপ্তপ্রায়! অবশ দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিল সীমা। কাপড় জামা এমন কি জুতোটা পর্যন্ত খোলার

মত শান্তি সঞ্চয় করতে পারল না সে। চোখ দুটো বন্ধ করে নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে চেষ্টা করল সীমা। ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে এল একটু পরে। চেয়ে দেখল, সে তার খাটে শুয়ে রয়েছে। পায়ের দিকে নজর যেতে কাদামাখা জুতোটা চোখে পড়ল এবার। না, স্বপ্ন নয়, সত্যিই সে অরুণের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। উঠে বসল সে। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে এক গ্লাস জল খেল একটু একটু করে। গলাটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

অরুণের বাবা অসিতবাবু যখন বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন, তখন তাঁর একথা মনে হয়নি যে এতবড় বাড়ী একজনের জন্যে তৈরী হচ্ছে। অসিতবাবু নিজে থাকলেও শুধু কিছুটা মানাত। কিন্তু শহর থেকে দূরে যখন পল্লীগ্রামে তিনি থাকতে মনস্থ করলেন তখন এক অরুণ ছাড়া এ বাড়ীতে বাস করার মত আর কেউ রইল না। সেই কারণে অরুণ [illegible] নিজের জন্যে রেখে বাকীটা সবই ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এতে অসিতবাবুর কোন আপত্তি হয় নি।

সেদিন সীমাকে নিয়ে ফেরার পর গাড়ীটা গ্যারেজে রেখে অরুণ ওপরে উঠে গেল। স্নান এবং জলযোগ সেরে সে ডিভানে একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়তে শুরু করল। সাধারণত সে ধূমপান করে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে এ জিনিসটা সে পছন্দ করে থাকে। মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তিতে নিকোটিন তাকে সাহায্য করে। একটা সিগারেট ধরাল সে। হাতে এখন প্রচুর সময় তার। সীমা তাকে প্রথম থেকেই আকর্ষণ করেছে। দেখতে সে অপরূপ সুন্দরী নয় কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা করুণ শান্তি লুকোন আছে। সীমার সৌন্দর্য তাকে প্রলোভিত করে না এমনকি মুগ্ধও করতে পারে না—একথা সে জানে। বরং তার মধ্যে পুরুষালি দৌরাত্ম রয়েছে বলে সে লক্ষ্য করেছে। সীমার চলা, কথা বলার ভঙ্গী সবকিছুতেই একটা বলিষ্ঠতা আছে বলে সে মনে করে। সবচেয়ে আকর্ষণ করে তার অস্বাভাবিক স্বভাব। চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকি নিতে অরুণ বসু ভালবাসে। এটা তার একটা নেশা। [illegible] কোম্পানীতে সীমা যে টাকা চুরি করেছে এটা সে জানে। যেটুকু সন্দেহ ছিল তার নিরসন হয়েছে [illegible]। [illegible] কোম্পানীর ছাব্বিশ হাজার টাকা যেভাবে সরান হয়েছে তা থেকে অরুণ বুঝেছে সীমা একাজ নতুন করছে না। এখন [illegible] সেন হয়ে সে [illegible] কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে কেন সেটার কারণ অনুমান করা তার পক্ষে সহজ নয়। সীমাকে নিয়ে তার এতদূরে এগিয়ে যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা সেটা তার ভাববার সময় এসেছে। সীমার চরিত্রে এই যে বিরাট অসঙ্গতি আর অস্বাভাবিকতা রয়েছে এটা নিয়ে সে অবহেলা করছে কিনা সে প্রশ্নও তাকে বিচলিত করে তুলেছে এবার। এটা [illegible] একটা জটিল এক্সপেরিমেন্ট [illegible] যে শান্তি আর ঝুঁকি সে

জেনেশুনেই নিচ্ছে। একটা অবাধ্য দুরন্ত প্রাণীকে নিজের বশে আনার মধ্যে পৌরুষ আর উত্তেজনা আছে। অরুণ বসু উত্তেজনা ভালবাসে। টাকা চুরির ব্যাপার সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনা আছে। পুলিশ যে কোন সময়ে সীমাকে অভিযুক্ত করতে পারে এটা সে জানে। সেদিক দিয়ে অবশ্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। ক্রিমিনাল সাইডের নামজাদা উকিল বিমান মুখার্জির আজই আসার কথা আছে। ঘড়িটা একবার দেখল অরুণ। কিছুক্ষণ পরেই বিমানবাবু এলেন। অরুণদের ব্যবসা-সংক্রান্ত মামলা তিনিই চালিয়ে থাকেন।

আমায় ডেকেছেন? একটা চেয়ারে বসলেন বিমানবাবু।

হ্যাঁ। এটা কিন্তু অফিসিয়াল ব্যাপার নয়, আমার নিজের কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

বেশ ত বলুন, উৎসুক হলেন বিমানবাবু!

একজন যদি কয়েক জায়গায় চুরি করে থাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে তাহলে তাকে বাঁচাবার জন্য কি করা যায়?

খুব সহজ উপায় আছে। কিন্তু তার আগে বলুন, কোন কেস হয়েছে কিনা তার বিরুদ্ধে।

না, এখনও পর্যন্ত হয়নি।

তাহলে কোন হাঙ্গামা নেই। টাকাগুলো যথাস্থানে ফেরত দিলেই হল।

টাকা ফেরত দিলেও কেস করতে পারে নাকি তারা? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হ্যাঁ, সেরকম আদর্শবাদী লোকও থাকতে পারেন। চোরকে শাস্তি দিয়ে সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এঁরা সদাই সচেষ্ট। তবে সংখ্যায় এঁরা কম।

আর কি উপায় আছে?

অন্য উপায় হল, পুলিশের কাছে সব খোলাখুলি স্বীকার করা।

তার মানে কোর্টে অভিযুক্ত হওয়া? সঙ্গে সঙ্গে বলল অরুণ।

হ্যাঁ, তাই, তবে যে ক্ষেত্রে আসামী দোষ স্বীকার করে নেয় এবং টাকাটা ফেরত দিতে চায় সেখানে অপরাধ লঘু এবং সেই হিসেবে দণ্ডও কম হয়।

কোনটাই পছন্দ হল না অরুণের। সাধারণ লোক হলে এটা হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু সীমার ক্ষেত্রে এ দুটো উপায়ই প্রয়োজন হবে বলে মনে হল না তার। তাছাড়া সে চুরি করে সে স্বীকার করার জন্যে বাধ্য নিশ্চয় হবে না। আর টাকা ফেরত দেবার কথা ভাবাই যায় না। কত জায়গায় এবং কত পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ সে করেছে তার ঠিকানা নেই। যদি সীমা টাকাটা ফেরত দিতে রাজী হয়, ভাবল অরুণ। কিন্তু রাজী তাকে করাবে কে? এ প্রসঙ্গ উত্থাপনই বা করবে কি করে? [illegible] বিমানবাবুকে তার কাছে পাঠাল সে যে [illegible] রেখে এমন [illegible] মনে হল না অরুণের। হয়ত ভদ্রলোককে [illegible]

[illegible] সেরে! একটা বিরাট বোঝা সে স্বইচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে। বিমানবাবু অরুণকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে বললেন,

দেখুন, এ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু বিপদ আসবে। এ সম্পর্কে আমি শুধু একটা প্রশ্ন আপনাকে করছি। টাকা আত্মসাৎ কি এক জায়গায় হয়েছে না অনেক জায়গায়?

অনেক জায়গায়। আস্তে উত্তর দিল অরুণ।

তাহলে পাকা চোর। মন্তব্য করলেন বিমানবাবু।

না, আমার তা মনে হয় না। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অরুণ, আমার মনে হয় এটা তার বিকৃত মনের একটা প্রকাশ মাত্র।

ওটা সাইকোলজীর কথা। চোর কেন চুরি করে, অপরাধপ্রবণ মনের সৃষ্টি কিভাবে হয়, এসব উকিলদের আওতার মধ্যে পড়ে না। এ বিষয়ে সাইকায়াট্রিস্ট তার অভিমত দেবেন আর চিকিৎসাও করতে পারেন।

বিমানবাবু বিদায় নেবার পর অরুণ যেন আরও মুষড়ে পড়ল দুর্ভাবনার চাপে। একটা অপরাধপ্রবণ, বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মেয়েকে পাবার জন্যে তার মধ্যে এ দুরাকাঙ্ক্ষা এল কেন, এ প্রশ্ন তাকে পীড়িত করতে শুরু করল এবার। সীমার পক্ষ থেকে সে এ পর্যন্ত কোন ভালবাসার লক্ষণ দেখতে পায় নি। একমাত্র তার বাবার সম্পর্ক ছাড়া। তার বাবাকে যেভাবে সে আগ্রহ আর আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করেছে সেটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এর কোন কারণ সে খুঁজে পায় নি। এটা যে স্বার্থপ্রণোদিত নয় সেটা বুঝতে দেরী হয়নি অরুণের। সীমা তার কাছে একটা মূর্তিমতী হেঁয়ালীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চিন্তা অরুণকে পেয়ে বসেছে।

রাতটা কেমন করে কেটে গেল, সেটা সীমা বুঝতেই পারল না। সকালে উঠতে গতদিনের কথা তার মনে পড়ে গেল। [illegible] আর একটা প্রেজেন্টেশন এবং তার সঙ্গে একটা চিঠি নজরে পড়ল। তার সাহস যে আরও বেড়ে গিয়েছে এটা পড়ে সে বুঝল ভালভাবে। যে ভাষা সোমা ব্যবহার করেছে তাতে রুচির কথা ছেড়ে দিলেও ভদ্রসমাজের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট রয়েছে। এবার ভয় পেল সীমা। কেন ভয় সে বলতে পারল না। মনটা অকস্মাৎ দুর্বল হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল তার। তবে একটা সিদ্ধান্তে সে পৌঁছল, একটা উপায় খুঁজে পেল অনেক চিন্তার পর। তাকে পালিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ তার খোলা নেই। সোমা দত্ত, পুলিশ আর অরুণ বসু—তিনজনেই তার কাছে সমানভাবে অবাঞ্ছিত আর ক্ষতিকর। সীমা ঠিক করল অফিস থেকেই সে চলে যাবে পিসিমার কাছে [illegible]। একটা ছোট অ্যাটাচিকেস নিল সে। অরুণের [illegible] [illegible]। সীমা [illegible]

ভেবে দেখুন !

বঙ্কের জিগির তুলে
শরণার্থীর সাহায্য হবে?
সীমান্ত-প্রহরায় সাহায্য হবে?
না, শত্রুদের লাভ হবে?

ভেবে দেখুন

লক্ষ্য করে আশ্চর্য হল। অফিসে অ্যাটাচি-কেস আনার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। একটা সন্দেহ জাগল তার মনে। সে দৃষ্টি রাখল সীমার ওপর। লাঞ্চের সময় সে বাইরে গেল না। লক্ষ্য করল, সকলে চলে যাবার পরও সীমা বসে আছে তার সিটে। এটাও স্বাভাবিক নয়। লাঞ্চের পর অফিসের কাজ শুরু হলেও অরুণ তার কিউবিকল থেকে নজর রাখল। সে যা অনুমান করেছিল তাই হল। ছুটির একঘণ্টা আগে সীমা বড়বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে, টেবিলের তলায় রাখা ছোট অ্যাটাচিকেস নিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। লাঞ্চের সময় তার কাজটা সম্পূর্ণ করে নিয়েছিল সীমা। সেই কারণে বড়বাবু তাকে ছুটি দিতে আপত্তি করেনি। সবদিক ভেবে কাজ করে সে।

নিশ্চিন্ত মনে অফিসের গেটে পৌঁছিয়ে গেল সীমা। এখানেই তার বন্ধন শেষ! আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না। না, সৌম্য দত্ত, না অরুণ বসু। পুলিসের কথা সে পরে ভাববে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙল তার। অরুণ বসু আবার তার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ীতে ওঠো, আদেশ করল অরুণ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সীমা। অরুণ বসুর গলার স্বরে আর চাপাতে কাঠিন্য রয়েছে স্পষ্ট। কোথায় যেন একটা অলঙ্ঘনীয় শক্তির প্রকাশ আছে তাতে। এড়িয়ে যেতে পারল না সীমা।

ভেবেছিলে সহজেই পালাতে পারবে তুমি? অ্যাটাচিকেসে কি আছে? গাড়ীটা জোরে চালিয়ে দিল অরুণ।

আমার কাপড়-জামা।

আর টাকা? ট্রাফিকের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে অরুণ।

আছে। আস্তে উত্তর দিল সীমা।

কত?

পাঁচ হাজার টাকা।

বাকী টাকা কোথায়?

ব্যাঙ্কে।

কোন ব্যাঙ্কে এবং কি নামে টাকা জমা দিয়েছ?

বলব না।

না বললে তোমারই ক্ষতি, আর শেষ পর্যন্ত তোমায় বলতেই হবে।

আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ভয়টা নিছক মিথ্যা নয় আর তার পরিমাণটাও বোঝাতে পারব না হয়ত।

এ কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

পুলিসে। চিবুকের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল অরুণের।

ওতে আমি ভয় পাই না। শক্ত হয়ে বলল সীমা।

কতবার জেল খেটেছ? কথাটার উত্তর দিল না সীমা।

লজ্জায় ক্রোধে মুখটা তার রক্তবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পুলিসকে ভয় পায় না যারা দাগী আসামী, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় যা থেকে।

আর কোথাও চুরি করেছ?

না, মাথা নাড়ল সীমা।

কোলাডিক আর মোদী কোম্পানী, এই দুটোর কথা আমি জানি।

এছাড়া আর কোথা থেকে টাকা নিয়েছ বল। চুপ করে রইল সীমা।

তুমিই প্রথম একাজে নাম নি, বলতে লাগল অরুণ, তোমার মত অনেকেই এ ব্যবসা করে থাকে। আর তারা সকলেই তোমার মত নিজেকে চালাক মনে ভাবে। সব থেকে আশ্চর্যের কথা তারা প্রত্যেকেই নিজেকে ঠকায় শেষ পর্যন্ত। এবার বল, তুমি চুরি কর কেন?

এটা আমার ব্যবসা, অরুণের কথাটাই ফিরিয়ে দিল সীমা।

তোমার সঙ্গে আর কে আছে?

সেটা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।

আমার কাছে না বললেও পুলিসের কাছে বলতে বাধ্য হবে।

সে দেখা যাবে। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল সীমা।

তোমার কে আছে?

কেউ নেই।

বাবা, মা বা আত্মীয়স্বজন?

কেউ নেই। আবার বলল সীমা।

তাহলে তোমায় লেখাপড়া কে শেখালে, কে মানুষ করলে?

আমি একটা অরফ্যানেজে—কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সীমা। একথাটা বলা উচিত হয় নি বলে মনে হল তার।

কোন্ অরফ্যানেজে?

কোন উত্তর দিল না সীমা।

তুমি কার জন্য চুরি কর?

নিজের জন্যে।

কত টাকার তোমার প্রয়োজন হয়?

কেন দেবেন নাকি? ব্যঙ্গের হাসি হাসল সীমা।

না, সেকথা বলছি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি একটা লোকের এত প্রয়োজন কেন? অফিসের মাইনেই কি যথেষ্ট নয়?

না, যথেষ্ট নয়। গলার স্বরে উত্তাপ রয়েছে সীমার, যারা আপনার মত ধনী আর প্রয়োজনের বেশী টাকা জমিয়ে স্বচ্ছন্দে আর নিশ্চিন্তনার দিন কাটায় তাদের মুখে একথা মানায় না। দারিদ্র্য কি জানেন? খিদের কোনদিন ছটফট করেছেন? ভয় আর দুশ্চিন্তা কাকে বলে জানেন? যন্ত্রণা কখনও অনুভব করেছেন? রাতের পর রাত ভয়ে কুঁকড়ে একটা নোংরা আস্তাকুড়ে সময় কাটিয়েছেন?

অরুণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সীমার চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে! মুখটা তার হিংস্র হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

আমায় থানায় নিয়ে যাচ্ছেন? কিছুক্ষণ পরে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল সীমা।

একটু পরেই বুঝতে পারবে। গাড়ীটা আরও জোরে চালিয়ে দিল অরুণ।

এবার বল তুমি স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে চাও না কেন?

তাই কাটাই, আমার ভেতর অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

চুরি করাটা স্বাভাবিক?

আপনিও ব্যবসার নাম করে চুরি করেন, লোক ঠকান।

ব্যবসা মানে চুরি নয়, ব্যবসাতে অপরের টাকা ধোঁকা দিয়ে নেওয়া হয় না। সেখানে পরিশ্রম করতে হয়, মূলধন ফেলতে হয় তবে লাভ পাওয়া যায়। সেকথা থাক—তোমার কি সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই?

সেটা শরৎচন্দ্রের গল্পে আছে।

গাড়ীটা দাঁড় করাল অরুণ নিজের বাড়ীর সামনে।

এ কোথায় নিয়ে এলেন?

নাম, এ্যাটাচিটা আমায় দাও। এ্যাটাচিটা নিজে তুলে নিয়ে অরুণ সীমার দিকে তাকিয়ে আর একবার দৃঢ় স্বরে বলল—নেমে এস।

সীমা তার সঙ্গে ওপরে গেল। এটা থানা নয় সেটা বুঝতে দেরী হল না তার। কিন্তু একটা অজানা ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ল। একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল অরুণ। এ্যাটাচিকেসটা একটা সাইড টেবিলে রেখে সীমাকে বসতে বলল সে।

আমায় এখানে আনলেন কেন, কি মতলব আপনার? মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে সীমার।

মতলব একটু পরেই বুঝবে।

এটা কার বাড়ী?

আমাদের।

বুঝলাম, কিন্তু আপনাদের বাড়ীতে আমাকে এভাবে নিয়ে আসা হল কেন?

তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কোলাডিক কোম্পানীর টাকা কোথায় রেখেছ?

টাকাটা দিলে আমায় ছেড়ে দেবেন? একটা রফা করতে চায় সীমা।

আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নি এখনও। গলার স্বরটা গম্ভীর হল অরুণের।

একটা ব্যাঙ্কের নাম করল সীমা।

কি নামে টাকা জমা দিয়েছ? অমিতা রায়, সীমা সান্যাল না শ্যামলী সেন—কোন্‌টা? না আরও একটা নতুন নামকরণ হয়েছে!

না, অমিতা রায়ের নামে আছে।

মোদী কোম্পানীতে মিসেস মোদীর ছদ্মবেশে টাকা চুরি করেছিলে। তুমি কি ভেবেছিলে তোমার কৌশলটা কেউ ধরতে পারবে না। অনেক সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছ বোধহয়?

অরুণের দিকে তাকিয়ে দেখল সীমা। মুখে তার ব্যঙ্গের হাসি।

আমাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে এভাবে অপমান করতে পারেন না আপনি।

অপমান তুমি নিজেকে যতটা করেছ, অত আর কেউ করে নি—আস্তে করে বলল অরুণ।

আমায় যে বাড়ীতে আটকে রেখেছেন, এটা বে-আইনী তা জানেন?

আমি ত তোমায় আটকাই নি।

তাহলে আমি যেতে পারি। উঠে দাঁড়াল সীমা।

পার, তবে তার আগে তোমার অ্যাটাচিকেসের চাবিটা দাও।

না, দেবো না। ওতে আমার ব্যবহারের কাপড় জামা আছে।

তা থাক, আমি তোমার কাপড়-জামা চাই না, টাকাটা দরকার। তুমি বলেছ, ওতে পাঁচ হাজার টাকা আছে, সেটাই আমি দেখতে চাই, তোমার পোশাক নয়।

আরও বেশী টাকা আছে। আস্তে বলল সীমা।

জীবনে তুমি কটা সত্যি কথা বলেছ? মিথ্যে ছাড়া অন্য কিছুই জান না বোধহয়। পুলিশের কথা বললে তুমি ভয় পাও না এ-রকম একটা ভাব দেখাও, কিন্তু কথা বার করার জন্য অনেক রকম উপায় ব্যবহার করা হয়, তা জান?

অত্যাচারের কথা বলছেন? অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি।

সেটা বোধহয় অল্প বয়সে হবে থাকবে। আর তার জন্যেই যে তোমার মনটা এরকম বিকৃত হয়েছে এটা বেশ বোঝা যায়।

আমি কোলারিজ কোম্পানীর টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, আমায় যেতে দিন।

কোথায় যাবে? আর একটা নাম নিয়ে আবার টাকা সরাবে এইত?

তাই যদি হয়, সেটা আমার ব্যাপার, তাতে আপনার কথা বলার কিছুই নেই:

আছে; সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্য আছে। জেনে শুনে একজন চোরকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।

ভাল কথা, তাহলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করুন।

জেলে যাবার খুব সখ হয়েছে? ছোটবেলার অত্যাচারের জন্য যে চোর হয়, জেলের কষ্টে সে কি হবে?

আপনি আমার অভিভাবক নন, অযথা উপদেশ দেবার চেষ্টা করবেন না, কি করতে চান আপনি?

আই উইল টেক দি ল ইন্ মাই ওন হ্যান্ডস্। আমি পুলিশের সাহায্য চাই না, নিজেই ব্যবস্থা করছি। অ্যাটাচিকেস নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা লক করে দিল অরুণ।

হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে গেল সীমা তার ব্যবহারে। অরুণ নিজের বাড়ীতে তাকে তুলে এভাবে যে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখবে এটা নেহাতই আজগুবি আর অবিশ্বাস্য মনে হল সীমার কাছে। ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সীমা। মাঝারি ধরনের ঘর, সৌখীন আসবাবপত্রে ভর্তি। পাশে আর একটা দরজা দেখতে পেল সে। হাতল ঘোরাতে দরজাটা খুলে গেল—একটা বাথরুম। মাথাটা জ্বালা করছে সীমার। মুখে হাতে জল দিয়ে মুখটা মুছল সে। অনেকটা আরাম পেল। ঘরে এসে বাইরের দরজাটা দু-একবার টেনে দেখল। সেটা চাবিবন্ধ বলেই মনে হল। এবার একটা চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

ধরা পড়ে গেল সীমা। কিন্তু এভাবে যে ধরা পড়বে সেটা আশা করে নি। পুলিশ তাকে ধরবে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কেস হবে এবং হয়ত শাস্তি পাবে, এটাই সে ভেবে রেখেছিল। মাঝ থেকে অরুণ বসু তাকে ধরে তার বাড়ীতে বন্দী করে রাখল কেন? কিন্তু গতকালই সে অরুণ আর তার বাবার মুখে অরুণের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবটা শুনেছে। তাই যদি হয়, তার ওপর যদি অরুণের এতটুকু মমতা থাকে, তাহলে তাকে এভাবে বন্দী করে রাখল কেন? তাছাড়া একটা চোরকে জেনেশুনে অরুণ বিয়ে করতেই বা এত ব্যস্ত কেন? তার দিক থেকে এ পর্যন্ত সে কোন লোককেই প্রশ্রয় দেয় নি বলে সে জানে। অরুণ তাহলে কি চায়? সীমার ভয় করছে। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়ে নি। একবার ভাবল, খুব জোরে চীৎকার করলে হয়ত কেউ সাহায্য করতে আসতে পারে। কিন্তু তাতেই বা কি সুবিধে হবে? আশেপাশে ভিড় হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই পুলিশ! পুলিশ, থানা বা জেল সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সেটা যে খুব প্রীতিজনক ব্যবস্থা নয়, সেটা বুঝতে সীমার কষ্ট হয় নি। এখন সে কি করবে! অরুণ সেন্টিমেন্টের কথা উল্লেখ করেছে আবার অত্যাচারেরও ভয় দেখিয়েছে। অনেক অত্যাচার সে সহ্য করেছে। এই প্রাসাদে বসে অরুণ বসু তার কি খবর রাখবে?......

নানুবাবু তোর কে হয় রে? জিজ্ঞাসা করল লতা ভাল মানুষের মত।

আমার কাকা হয়। উত্তর দেয় সীমা।

কি রকম কাকা ভাই নিজের কাকা?

না, বাবার বন্ধু।

তাহলে তোদের বাড়ীতে থাকে কেন দিন-রাত?

বেশ করে থাকে, তাতে তোদের কি?

ঠিক বলেছিস, আমাদের তাতে কিছু নয়। কিন্তু তোর মত ছোটলোকের ঘরের মেয়ের সঙ্গে আমরা পড়ব কেন?

পড়তে হবে না।

আমরা ঠিকই পড়ব, তবে তোকে তাড়াব স্কুল থেকে। মাদারকে বলব একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে আমরা পড়ব না।

কি বললি? চীৎকার করে উঠল সীমা।

শুনতে পাস নি? বললাম, বেশ্যার মেয়ে তুই।

ঝাঁপিয়ে পড়ল সীমা লতার ওপর। তাই চাইছিল ওরা। দুজন ওর দুটো হাত বাঁকিয়ে পিছন দিকে ধরল। একজন তার মাথার চুলগুলো মুঠো করে টেনে রইল পিছন দিকে। আর লতা তার মুখে চড় মারতে লাগল সজোরে। একটা দুটো নয়, অনেকগুলো। ঠোঁট কেটে আর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল সীমার।......

কে, চমকে উঠেছে সীমা।

দরজা খুলে অরুণ ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসল।

আমায় ছেড়ে দিন। সীমার স্বরে মিনতি।

দেবো, তোমাকে আটকে রাখতে আমি চাই না। কিন্তু তুমি অন্যায় বলে, স্বাভাবিক মেয়ের মত তুমি ভাবতে শেখোনি কেন?

তার মানে বিয়ে করে সংসার করার কথা বলছেন? সীমা তাকাল অরুণের দিকে; আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

কেন? প্রশ্ন করল অরুণ।

একটা মিথ্যাবাদী চোরকে কে বিয়ে করবে?

যদি কেউ করে। আস্তে কথা উচ্চারণ করল অরুণ।

তাহলে বুঝব তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

আমি তোমায় বিয়ে করতে রাজী আছি।

ধন্যবাদ, আমি রাজী নই।

তার কারণ কি?

তার কারণ, বলল সীমা, বিয়ে বস্তুটাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। আর তাছাড়া আপনি দয়া করে বিয়ে করতে রাজী হলেও আমি রাজী হব

নিত্যানন্দের নতুন ঐতিহাসিক উপন্যাস
শাহানশা ৬·০০
দেব্রের সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ
কিউবা বিপ্লবের শেষ অধ্যায় ৭·০০
শম্ভু মহারাজের অনন্যসাধারণ উপন্যাস
শেষশিখা ॥ ৬·০০
পরিবেশক ঃ ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

বলুন? আপনার উদারতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

তাহ'লে তুমি, আর কাউকে পছন্দ কর।

না, আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

তবে তুমি কি পুরুষদের ঘৃণা কর?

বলতে পারেন। অরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে মনে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল,

আমি ছেড়ে দিলেও সৌম্য দত্ত তোমায় কিন্তু ছাড়বে না।

আপনি কি করে জানলেন? চমকে উঠেছে সীমা নামটা শুনে।

জানি; আরও জানি তোমার ফ্ল্যাটের ওপর পুলিশ নজর রেখেছে। তুমি যে আমার সঙ্গে আমার কাছে ফিরেছিলে এমন কি তুমি যে এখন এখানে আছ তাও পুলিশ জানে বলেই আমার মনে হয়।

চুপ করে রইল সীমা। ভাবতে লাগল এখন সে কি করবে, কি উপায়ে এগুলো থেকে এড়িয়ে যাবে।

তুমি হয়ত ভাবছ, আমি তোমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি। কিন্তু তা নয়, বলল অরুণ। ফোর্সাইথ কোম্পানী থেকে চলে আসার পরও আমি তোমার খোঁজ পেয়েছি।

তার মানে আপনি কি বরাবরই আমার ওপর নজর রেখেছেন?

হ্যাঁ রেখেছি, তা না হলে সৌম্য অনেকদিন আগেই তোমায় ধরিয়ে দিতে পারত।

আপনি তাকে বাধা দিলেন কিভাবে?

সেটা তোমায় আমি বলব না। তবে এইটুকু জেনে রাখ, আমি সৌম্যর হাত থেকে তোমাকে উপস্থিত বাঁচাতে পেরেছি।

বাঁচিয়েছেন না জিইয়ে রেখেছেন: আপনার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনি আমাকে সাময়িক রক্ষা করেছেন মাত্র।

তুমি নিজেকে ওইভাবে দেখতে অভ্যস্ত বলে সেইটেই মনে হচ্ছে তোমার কাছে।

আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে, বলল সীমা।

বল, কি?

আমি ছাড়া আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে আপনি নিশ্চয় এসেছেন।

হ্যাঁ, তা এসেছি।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরায়সিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

তবে তাদের মধ্যে একজনকে পছন্দ না করে আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করছেন কেন?

তা বলতে পারব না ঠিক, হয়ত ভালবেসে ফেলেছি।

মেয়েদের কোন চোখ দেখেই কেউ ভালবাসতে পারে, এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাহ'লে আমি তোমারই মত নিশ্চয় অস্বাভাবিক। তাই হয়ত তোমায় ভাল লেগে থাকবে। সে যাক্‌ তুমি ভালভাবে ভেবে দেখ আমায় বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কিনা। আমি তোমায় জোর করব না।

জোর করতে বাকীটা কি রাখলেন? ভয় দেখিয়ে বাড়ীতে আটকে রেখেছেন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে আর কি করবেন?

তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। সৌম্য দত্ত আর আমার উদ্দেশ্য তোমার কাছে একই ঠেকছে হয়ত। কিন্তু যদি ভাল করে ভেবে দেখ তাহ'লে বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। মানুষ হিসেবে সাধু নই না। তোমাকে পেতে হলে সৌম্য দত্ত বিয়ের প্রস্তাব নিশ্চয় করবে না। তার মানে আমি যে সৌম্য দত্তের চেয়ে উদার তা বলছি না। তবে আমার পন্থাটা আর যাই হোক ভদ্র বলে তুমি মেনে নিতে পার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল সীমা। তারপর বলল—আপনি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছেন। এতে আপনার অনেক ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক বা বংশ মর্যাদা আমার নেই সেকথা জানেন, তাছাড়া আমি বিয়ে করলেই যে আমার স্বভাব পাল্টে যাবে তাই বা আপনি ভেবে নিলেন কি করে?

সেকথা আমি ভাবি নি। তবে বিয়ের পর আমার টাকা বা সম্পত্তি আলাদা নিশ্চয় থাকবে না। তাতে তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আসবে। সে হিসেবে তুমি কষ্ট করে পরের টাকা নেবার মত ঝুঁকি নেবে না বলেই আমি আশা করছি।

বেশ আমি রাজী, তবে আমার দুটো সর্ত আছে।

বল।

প্রথম, আমার কুকুর কস্তুরা আমার সঙ্গে থাকবে।

কোন আপত্তি নেই, আমি নিজেও কুকুর ভালবাসি।

দ্বিতীয় আমি আলাদা ঘরে [illegible]

এটা ঠিক বুঝলাম না। [illegible] স্বামী-স্ত্রী আলাদা ঘরে থাকবে [illegible] অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গত [illegible] স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে সংসার [illegible] ভালবাসবে, সমস্যার সমাধান [illegible] সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে। [illegible] সত্য। এটা তুমি বা আমি [illegible] পারি না। তাছাড়া বাবা [illegible] যদি একথা জানতে পারেন, [illegible] হবেন। আমি [illegible] না।

বাবাকে দুঃখ দিতে পারব না।— সীমার মনে পড়ল সেও এই কথাটা ভেবেছে অনেকবার।......

উনুনে ভাত চাপিয়েছিলুম, দেখিস দি কেন? পুড়ে যে ছাই হয়ে গেছে।

সীমা পড়ছে, সামনেই তার পরীক্ষা। মা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

আমি জানব কি করে? মুখ না তুলেই বলল সীমা।

আহা, দেখ, কিছুই জানে না মেয়ে! গিলতে জান ত? মুখভঙ্গি করল মা।

ও যে মেয়েদের স্কুলে পড়ছে, মান্‌-কাকা সুলিল পরে পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়াল, ওকি ভাত রাঁধতে পারে? ওর বাবা যে ওকে মেমসাহেব বানাবে।

হ্যাঁ, বানাচ্ছি মেমসাহেব।

মা তেড়ে এসে খাতা বই ছোঁ মেরে উঠানে ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করাল। তারপর এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করল।

থাক থাক, আর মেরে কি হবে, ও সোনার মেয়ে। যত বড় হচ্ছে ততই কসাইন হচ্ছে।

মায়ের দম ফুরিয়েছিল তাই মারটা সেখানেই মত বন্ধ হল। কাঁদল না সীমা। এটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কপালটা বড় জ্বালা করছে তার। আয়নাতে সে দেখল দুর কাছে কেটে গিয়েছে একটু। উঠান থেকে বই খাতা তুলে এনে গুছিয়ে রেখে দিল আবার।

কি হয়েছে? কপাল কাটল কি করে? বাবা এসে জিজ্ঞেস করল ব্যস্ত হয়ে।

স্কুলে খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি, উত্তর দিল সীমা।

কাছে এস; বাবা ওষুধ লাগিয়ে বলল—বড় হয়ে একটু সাবধানে থাকবে, কেমন।

আসলটা বলল না সীমা, তাহলে বাবা দুঃখ পাবে...।

কি ভাবছ? অরুণ [illegible] [illegible] কোন জবাব [illegible] [illegible]

এনড্রুজ বাংলা ও বাঙালী

হেমচন্দ্র ঘোষ

কেম্ব্রিজ। বরফ পড়া শীতের দিন। প্রচণ্ড তুষারপাতের তীব্র আক্রমণে গাছগুলো সব আধমরা দাঁড়িয়ে আছে তারা শুধু বাঁচার তাগিদে।

রাজপথ প্রায় জনশূন্য। বরফ ঠেলে দু'একজন শুধু যাতায়াত করছে। রাস্তার ধারের ছোট ছোট সবুজ লনগুলো বরফের চাদরে মোড়া। জল-ভরা টলটলে খণ্ড মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতী সূর্যের নিস্তেজ কিরণটুকু শুধু পথ দেখিয়ে দেয়।

—হ্যালো! এনড্রুজ!

কপাল পর্যন্ত নামানো টুপিটা একটু উঁচু করে এনড্রুজ বললেন—হ্যালো · এখানে যে?

আগন্তুক এনড্রুজের ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন— এখানে এসেছি তোমায় অভিনন্দন জানাতে!

বিস্মিত এনড্রুজ বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন - দৃষ্টি অতি শান্ত—সমস্ত মুখখানা হাসি বিচ্ছুরিত।

—কিসের অভিনন্দন, বন্ধু?

—কেন!

ইউনিভার্সিটির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—এই বিশ্ববিদ্যালয়—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ফেলো হওয়া কি যে সে কথা!

এনড্রুজ হেসে উঠলেন।

—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি আমার প্রাণ আমার আত্মা (লাইফ অ্যান্ড সোল) কিন্তু এর ফেলোশিপ কখনই আমার জীবনের পাথেয় হতে পারে না বন্ধু!

—অ্যা! কি বললে এনড্রুজ! কেম্ব্রিজের ফেলোশিপ তোমার কাছে কিছু না—নগণ্য-তুচ্ছ!

বন্ধুর গলাটা ভারী হয়ে উঠলো। তার সমস্ত মুখখানা বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠেছে।

—আমি তো বলছি বন্ধু! কেম্ব্রিজ আমার জীবনের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু এর ফেলোশিপ আমার জীবনে কখন কোন দিনই আদর্শগত পূর্ণতা আনতে পারবে না! তাই বন্ধু!—একটু হেসে এনড্রুজ বললেন—ফেলোশিপটা প্রত্যাখ্যান করলাম। বিস্মিত বন্ধু এনড্রুজের মুখের দিকে তাকালেন।

—এত বড় সম্মান—রাজা-রাজড়ারাও যার জন্যে প্রলুব্ধ সেই সম্মান তুমি প্রত্যাখ্যান করলে! এই দুঃসাহসের জন্যে তোমায় শাবাস দিচ্ছি—এনড্রুজ!

এনড্রুজ বন্ধুর দিকে তাকালেন—তাঁর মুখখানা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে।

এদেশে চলেছে তখন ইংরেজের শাসন। চন্দ্র-সূর্য থাকতে ভারতে তাদের শাসন নাকি অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিশ্বের এমন কোন শক্তি নেই যে এই পাকা গদীটা নড়াতে পারবে—তাদের রাজত্বের বিনাশ নেই। এখন প্রয়োজন শুধু সাংস্কৃতিক অভিযান যার সাফল্যের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাদ্রীরা তাঁদের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামের শ্যামল শীতল ছায়ায় হাটে-বাজারে চললো প্রভু যিশুখৃষ্টের মহিমা কীর্তন। গ্রামে, গঞ্জে গড়ে উঠলো উপাসনাগার—গীর্জা। অশিক্ষিত গ্রামের মানব প্রলুব্ধ মন নিয়ে পাদ্রী সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ সুরু করেছিল। বাংলাদেশে পাদ্রী সাহেবদের সাফল্যের চিত্র এখনও অম্লান আছে। ইংরেজের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা: বিলিতী কৃষ্টি ও সাহিত্য ভারতীয় জনজীবনে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের মোহাবিষ্ট করে রাখা।

ভারত হবে নির্বীর্য—ভারত হয়ে থাকবে তাদের ক্রীতদাস। রুল ব্রিটানিয়া হবে জাতীয় সঙ্গীত।

১৮০৫ খৃঃ। বেন্টিঙ্ক বড়লাট—মেকলে ল' মেম্বার।

ইংরেজী শিক্ষাই যখন সভ্যতার মাপকাঠি তখন সব কিছু ইংরেজী এদেশে চালু করার দরকার। পেনাল কোড চালু হল। হেলালে দুলালে সামনে ঝুঁকলে পিনাল কোডের একটা না একটা ধারায় অভিযুক্ত হতে হবে। এখন শিক্ষার মাধ্যম ঠিক করার ভার পড়লো মেকলের ওপর।

মেকলের কথা: এদেশের সাহিত্য এদের কি কোন মূল্য আছে? যা আছে ইউরোপের যে কোন লাইব্রেরীর একটা বুক শেলফ ভরে যায়।

(এ সিঙ্গল শেলফ অফ এ গুড ইউরোপীয়ান লাইব্রেরী ওয়াজ ওয়ার্থ দি হোল নেটিভ লিটারেচর অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যারাবিয়া) এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা মেকলে ঘৃণার চোখে দেখেছিল।

মেকলের ডিক্টাম: ইংরেজী হবে শিক্ষার মাধ্যম। দেশে কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নেই। অবাধে ইংরেজী চালু হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে মাইকেলের আক্ষেপ লোকের মনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল।

—হে বঙ্গ
ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।
পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখনি পূর্ণ মণিজালে।

বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা তখন মাতৃভাষার চর্চা সুরু করে দিয়েছেন।

সরকারী হুকুমে: সহরে সহরে ইংরিজী পাঠশালা গড়ে উঠলো। মিঃ স্টেকর বারাসাতে একটা ইংরিজী পাঠশালা স্থাপন করলেন। ইংরিজী শিক্ষার স্বীকৃতি এযুগেও চলছে।

কার্জনী আমল।

১৯০৪ খৃঃ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট। বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটির যেটুকু ক্ষমতা ছিল সরকার সবটাই কুক্ষিগত করে নিলেন। ইংরিজী শিক্ষা অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগলো।

এনড্রুজ তখন এদেশে। সুনির্মল নীল আকাশের নীচে খুঁজে পেলেন তিনি নতুন পথ। গঙ্গার শীতল তরঙ্গ তাঁর বিক্ষুব্ধ মনটাতে শান্তির নীড় গড়ে তুললো। ভুলে গেলেন [illegible] কথা—ভুলে [illegible] সভ্যতা। [illegible] নির্মম স্বার্থ- [illegible] [illegible]। এনড্রুজ এখন

পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান—ভারতবাসী। অভ্রভেদী হিমালয়ের বাদল-ঘন শিখরের দিকে তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন—নীচে সমুদ্র মেখলার গুরু গর্জন তাঁকে অভিভূত করে। শ্যামল প্রান্তরে রাখালের বাঁশি তাঁর দুঃখ মনটিকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

উত্তরায়ণ। গোধূলির আমতলা। রাঙামাটির লাল সূর্যের সোনালি কিরণে আরও রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

এনড্রুজ চলেছেন এক মনে।

একদল পাহাড়ী মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—সাহেব, কোথায় যাচ্ছিস রে?

এনড্রুজ তাদের মুখের দিকে তাকালেন।

নিকষ পাথরে স্বাস্থ্যবতী মেয়েগুলোর সরল হাসি নিষ্পাপ মমতামাখা।

—ওদিকে যাসনে সাহেব!—ভাল হবে না।

—কেন?

—ওদিকে গেলেই তোরে গিলে খাবে।

একটি মেয়ে হাত নেড়ে বললো—এই এতো বড় জন্তু!

এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় তখন রাজনৈতিক চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কোন আন্দোলনই সহ্য করতে রাজী নয়। আফগানিস্থানের সঙ্গে রাশিয়ার মিতালি কার্জনের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ভারতে আন্দোলনের মূল উৎস ছিল বাংলায়। বাংলাকে দমন করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। বাংলা হলো দ্বিধাবিভক্ত। আন্দোলন প্রশমিত তো হলোই না বরং উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ করলো। কার্জনকে ভারত ছাড়তে হল। কার্জনী আমলের যাবতীয় অপকর্মের দায়িত্ব পড়লো মিণ্টোর ওপর। কংগ্রেস তখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইয়ংবেঙ্গল কেশব সেনের হস্তচ্যুত। ভিক্টোরিয়া গ্লাডস্টোন কেশব সেনকে বিলেতে ডেকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বাংলার জনগণের মন হতে চিরতরে বিলীন করে দিল। ইয়ংবেঙ্গল পরমহংস দেব ও স্বামীজীর আদর্শে সংগ্রামী হয়ে উঠলো।

সুরাটে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের কর্ণধার গোখলে। বিপিন পাল, অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল তাঁর বিরুদ্ধবাদী। ইংরেজের সাহায্যে গোখলে হলেন বিজয়ী। দেশের অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়া সত্ত্বেও এনড্রুজ সংকল্পচ্যুত হলেন না। ইংরিজী শাসনের বর্বরতা তাঁর মনটাকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। ভারত সরকারকে চিঠি দিলেন ১৯০৮ খৃঃ ১ মার্চ।

—ইংরেজীকে একখানি প্রাধান্য দেওয়াতে আমাদের (ব্রিটিশ) দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ধর্মান্ধতাটাই প্রকট হয়ে উঠবে। যাঁরা গ্রাজুয়েট তাঁদের বোঝাতে হবে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা আর ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য সম সমাদরের পর্যায়ভুক্ত। যাঁরা বাংলার অধিবাসীদের জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন—বাঙালী এক অসাধারণ অদ্ভুত জাত (ওয়ান্ডারফুল নেশান) এদের প্রখর বুদ্ধি, এদের নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেম একদিন জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের মহান গৌরব এনে দেবে। এরাই হবে ভারতের পথিকৃৎ।

এনড্রুজ কার্জনকে ক্ষমা করেন নি। কার্জনের অদূরদর্শিতা দেশে যে অমঙ্গল সৃষ্টি করেছিল সে কথা এনড্রুজ জানিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন : কার্জনের ভুল পদে পদে। এই সব ভুল সীমাহীন। বাঙালীদের তিনি দেখতে পারতেন না। বাংলার প্রোজ্জ্বল চিন্তাধারা কার্জনের নিদ্রালু চোখের পাতার ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেছে। তাঁর 'জনডিস' চোখের পাতা বাংলার মহান কর্মপন্থার উদ্যোগ যবনিকার অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিলো।

এনড্রুজ চেয়েছিলেন শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের সক্রিয় সাহচর্য।

তিনি লিখলেন : বঙ্গ বিভাগ একটা মারাত্মক ভুল। বাংলার সাহিত্য বাংলার সৃষ্টি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলায় শাসনের ভিত্তি একদিন বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। মাতৃভাষার অনুশীলনই জাতীয় সঞ্জীবনী মহৌষধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের জাতীয় ভাষাকে যাতে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে তার জন্যে সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত। পূর্ব গগনে উদ্ভাসিত হবে পশ্চিমের রূপরেখা।

জাপান এক সময়ে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তার সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে মুক্ত হয়ে জাপান এখন এক মহান শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজ এনড্রুজের কথা মেনে নেয় নি।

সেটা এক শীতের দিন। কলেজ স্কোয়ার। গোলদীঘির পূবে বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথা টোপরকে প্রভাতী সূর্যের রূপোর বিচ্ছিন্ন কিরণ বিরাট থামওলা হলটার গায়ে ছিটকে পড়ছে। কুয়াশার কান্নার জল আড়ষ্ট পাতার ডগা হতে তখনও ঝরে পড়ছে।

শীতের অসুবিধে উপেক্ষা করে এনড্রুজ দাঁড়ালেন।

পাশে বিদ্যাসাগর মশায়ের মূর্তি।

—হ্যালো এনড্রুজ!

এনড্রুজ চোখ ফেরালেন, ত্বরিতপদে কাছে গিয়ে ভদ্রলোকটির হাতটা টেনে নিয়ে বললেন— হ্যালো - হ্যালো!

—ইউনিভার্সিটির দিকে কি দেখছিলে, এনড্রুজ? এনড্রুজ একটু হাসলেন।

—দেখছিলাম এই বিরাট অট্টালিকার পদপ্রান্তে এদেশে কতগুলো মনীষীর সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ রায়—ইশারাতে সেনেট হল দেখিয়ে এনড্রুজ বললেন, এটা কি তোমার আলমামেটার!

—এনড্রুজ!

প্রফুল্লচন্দ্রের গলাটা ভারী হয়ে উঠলো।

—কলকাতা ইউনিভার্সিটি আমার হৃদয়-আমার গর্ব। এডিনবরা—হ্যাঁ—এডিনবরাকেও আমি প্রণাম করি।

এনড্রুজ প্রফুল্লচন্দ্রের হাতটা একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, রায় তুমি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগসূত্র।

ডঃ রায় একটু হাসলেন।

—আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির এক নগণ্য ছাত্র!

—না-না-রায় ও কথা বোলো না। কলকাতা ইউনিভার্সিটি শুধু ভারতের নয়—এটা বাঙালী জাতির ইউনিভার্সিটি। (ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইজ নট্ অনলি দি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ইণ্ডিয়া—ইট ইজ অলসো দি ইউনিভার্সিটি অফ্ দি বেঙ্গলী নেশান)

ডঃ রায় এনড্রুজের মুখের দিকে তাকালেন।

—ডঃ রায়! আমি লক্ষ করেছি বাঙালী ছেলে যেখানে থাকুক না কেন—দূর দেশান্তরে তার দেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা সব সময়ে অব্যাহত থাকে। বাংলার সংগীত গান ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্যের নিপীড়ন। আজ বজ্রকঠোর হৃদয়ে বাঙালী ছেলে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার পুণ্য-সংগ্রামে।

ডঃ রায়! বাঙালী সত্যি একটা জাতি—সে বিদ্যাবত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

ডঃ রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—এনড্রুজ, তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা! তুমি দীনের বন্ধু!

ইউনিভার্সিটির দিকে যোড় হাতে প্রণাম করে বললেন—বাগ্‌দেবীর পীঠস্থান! তোমায় প্রণাম জানাই।

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : [illegible]
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা-১

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

একাদশ অধ্যায়

বৃটেনের যুদ্ধ :
একক আত্মরক্ষার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ফ্রান্সের পতনের পর হিটলারের জার্মানী আনন্দে আত্মহারা হইল এবং বার্লিনের পথে পথে যুদ্ধোন্মাদ নর-নারীর নূতন রণসঙ্গীত শুনা গেল। এবার হিটলার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং বৃটিশ জাতিকে নতজানু করিয়া সারা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া বসিবেন—এই ছিল নাৎসী পার্টি ও তার ভক্তদের আশা। সুতরাং যুবকদের কণ্ঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধের গান 'We Sail against England' ধ্বনিত হইল :

Our flag waves as we
march along.
It is a symbol of the Power
of our Reich.
And we can no longer endure,
That the Englishman should
laugh at it.
So give me thy hand, thy
fair white hand,
Ere we sail away to conquer
Eng-e-land!

বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের যুদ্ধের গান আরও শুনা গেল, যেমন :

We challenge the lion of England
For the last and decisive cup.
We judge and say
An Empire breaks up.....
Listen to the engine singing—
Get on to the foe!
Listen, in your ears it's ringing—
Get on to the foe!
Bombs, oh Bombs, oh Bombs
On England!

এখানে উদ্ধৃত শেষ গানটির শেষ লাইন লক্ষ্য করার মত। কারণ, ইতিহাসে 'Battle of Britain' নামে যে-যুদ্ধ প্রসিদ্ধ, তার মূল কথা ছিল বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণ, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণের দ্বারা ইংলণ্ডকে কাবু করা এবং তারপর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রমণ। বোমাবর্ষণের উপর কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তারই প্রমাণ গানের শেষ লাইনে 'বোমা' 'বোমা' বলিয়া চীৎকার।

কিন্তু এই বোমাবর্ষণের সাঙ্গীতিক চীৎকারের জবাবে ইংলণ্ডের কাছ থেকেও পাল্টা গান শুনা গেল এবং সেই গানে হিটলারের প্রতি দম্ভপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সুর এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত বিদ্রূপও ধ্বনিত হইল :

Napoleon tried. The Dutch were
on the way.
A Norman did it — and a Dane
or two.
Some Sailor king may follow one
fine day;
But not, I think, a low land-rat
like you!
— A. P. Herbert, Sept., 1940.

এই গানে হিটলারকে মাটির গর্তবাসী ঘৃণ্য ইঁদুর (বা মেঠো ইঁদুর) বলিয়া গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এবং পরিষ্কার বলা হইয়াছে—'ইংলণ্ড জয় করা তোমার মত মেঠো ইঁদুরের কর্ম নয়!'

প্রকৃতপক্ষে হিটলারের ইংলণ্ড আক্রমণের অভিযান (১৯৪০) ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া বলা হয় যে, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সেই দীর্ঘ বিস্মৃত নরম্যান বিজয়ের পর প্রায় হাজার বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত আর কোন দুঃসাহসী ইংলণ্ড জয় করিতে পারেন নাই। অবশ্য ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের অপরাজেয় আর্মাডা ১২৮টি পালে খাটানো জাহাজ নিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিখ্যাত আর্মাডার ৬৩ খানা জাহাজ বৃটিশ প্রতিরোধ ও ঝড়ের কবলে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। অতএব ইংলণ্ড জয় আর হইল না। এমনকি বিশ্বজয়ী নেপোলিয়নও চাহিয়াছিলেন ইয়োরোপের নৌ-বহরকে চূর্ণ করিতে, কিন্তু 'সমুদ্রপীড়ার' অজুহাতে তিনি আর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গেলেন না কিম্বা ট্রাফালগার যুদ্ধের (১৮০৫ খৃঃ—যে নৌ-যুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে নেলসন বিজয়ীর মালা লাভ করিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছিলেন) পরাজয়েরও পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে চাহিলেন না। (২) অবশ্য হিটলারও নকল নেপোলিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন, (বিশেষভাবে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের দ্বারা) কিন্তু তাঁর সেই দুরাশা কিছুতেই পূর্ণ হইল না।

কিন্তু দুরাশা পূর্ণ না হইলেও ইংলণ্ড জয়ের জন্য তাঁর মনে মনে আশা ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। অবশ্য সেই আশা একা হিটলারেরই ছিল না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও জার্মান জেনারেল স্টাফ ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য কাগজেপত্রে একটা পরিকল্পনার কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু 'অবাস্তব' জ্ঞানে সেটা শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল। হিটলারের রণনৈতিক চিন্তা গোড়া থেকেই খুব উর্বর। সুতরাং পোল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্বেই ১৯৩৯, ২৩শে মে হিটলার তাঁর প্রধান সেনাপতিগণের এক গুপ্ত বৈঠকে বলিলেন—

England is the main driving force against Germany....our aim will always be to force Britain to her knees.

কিন্তু এই শত্রুকে কিভাবে নতজানু করা যাইতে পারে? হিটলার বিগত মহাযুদ্ধের কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন—'যদি আমাদের আরও দুইটি ব্যাটেলিয়ন এবং আরও দুইটি ক্রুজার থাকিত, আর জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধ যদি সকালে আরম্ভ হইত তাহলে বৃটিশ নৌবহর পরাজিত এবং ইংলণ্ড নতজানু হইত।'—এই নৌবহরের উপরেই বৃটেন নির্ভরশীল। অতএব ইংলণ্ড ও বেলজিয়াম দখল এবং ফ্রান্স পরাজিত হইলে পশ্চিম ফ্রান্সের উপকূল থেকে জার্মান বিমান ও নৌবহর ইংলণ্ডকে কাবু করিতে পারিবে। অবশ্য এই আলোচনা হিটলার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ব্লকেড বা অবরোধের যুদ্ধের কথাই ভাবিয়াছিলেন। কারণ, 'বিদেশ থেকে আমদানি ছাড়া ইংলণ্ড বাঁচিতে পারে না।' কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্সের ও মিত্রপক্ষের এত দ্রুত বিপর্যয় হিটলার যেন নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং ডানকার্কের পর তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে, ইংলণ্ড রণে ভঙ্গ দিয়া জার্মানীর কাছে সন্ধি প্রার্থী হইবে। এমন কি, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে (যেমন, লিডেলহার্ট) চার্চিলকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যই হিটলার ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর এভাবে পলায়নে কোন বাধা দেন নাই। কিন্তু চার্চিল অনমনীয় এবং অপরাজেয়।

The WAR — Louis I. Snyder U.S.A. 1960, 149 & 15'
(মূল জার্মানী থেকে ইংরাজীতে অনুদিত

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৬১

পশ্চিম রণাঙ্গনের সেই ঘোর দুর্দিনে ডানকার্ক থেকে পশ্চাদের সম্বন্ধে ৪ঠা জুন, ১৯৪০, তিনি কমন্সে ঘোষণা করিলেন :

"We shall fight on the beaches, we shall fight on landing grounds. We shall fight in the fields & in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle............".

তাঁর অনেক বক্তৃতার মত এটিও স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু কেবল বাগ্মীতার বাগাড়ম্বর নয়, তিনি ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য অনলসভাবে সর্বাত্মক আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনের বৃটেনে ফ্রান্সের মত পরাজিতের মনোভাবের প্রাধান্য ছিল না এবং জনগণের মধ্যে হিটলারের প্রতি কোন প্রীতিও ছিল না। চার্চিলের সন্দেহ ছিল না যে, ফ্রান্সের পতনের পর বৃটেনই হইবে হিটলারের প্রথম আঘাতের লক্ষ। অথচ তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী—হিংস্র বাঘের সামনে প্রায় নিঃসঙ্গ পথিকের মত। কিন্তু চার্চিল দমিলেন না, ভীত হইলেন না, ইতস্ততঃ করিলেন না। ১৮ই জুন (১৯৪০) তারিখ তিনি জাতির উদ্দেশে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন জার্মানীর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সেই বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন :

Let us therefore brace ourselves to our duties and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say : "This was their finest hour".

অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে নাই, টিকিতে পারিত না, তবু একথা সত্য যে, সেদিনের জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের একাকী আত্মরক্ষার সংগ্রাম সত্যিই ইংরাজ জাতির পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার দিন বা গৌরবের দিন ছিল।

এই আত্মরক্ষার সংগ্রামের জন্য তাঁর স্বভাবতঃই প্রথমে মনে পড়িয়াছিল নৌবল ও নৌবহরের কথা এবং সেই প্রসঙ্গে পরাজিত ফ্রান্সের নৌবহরের প্রশ্ন। বৃটিশ বন্দরে যে সমস্ত ফরাসী জাহাজ ছিল সেগুলি নিয়া কোন সমস্যা দেখা দিল না। ৩রা জুলাই, ১৯৪০, সেই জাহাজগুলি বৃটেন বিনা রক্তপাতেই দখল করিয়া নিল। ফরাসী লস্করেরা স্বদেশে নেতাদের কাছে গিয়া স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন, কিম্বা জেনারেল দ্য গলের (যিনি ফ্রান্স থেকে পলাইয়া লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছিলেন) ফ্রী ফেঞ্চ ইউনিট গঠন করিলেন এবং বাকী অন্যান্যরা স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। আলেকজেন্দ্রিয়া (মিশরে) বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া অনুরূপভাবে কোন সমস্যা দেখা দিল না। কিন্তু গোল বাঁধিল ফরাসী উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়া-স্থিত ওরাণ বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া। ফরাসী নৌবহরের অধিনায়ক যুদ্ধ কার্যতঃই

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা
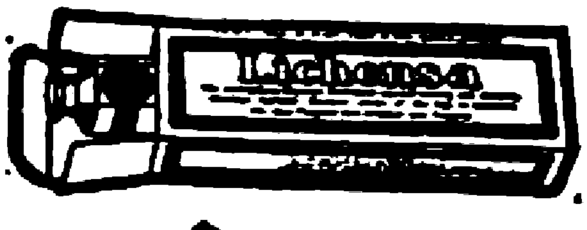

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা রেকমেণ্ড করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
DZ-1476 R-BEN

যোগদান করিয়াছিল এই বন্দরের অদূরে। সেখানকার ফরাসী নৌ-অফিসারেরা বৃটেনের হাতে কোন জাহাজ অর্পণ আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয়া মনে করিলেন এবং চার্লস দ গলের মত একজন 'অবাধ্য অফিসারকে' লণ্ডনে 'ফ্রী ফ্রান্স' গঠন করিতে দেওয়ার জন্যও তাঁরা বৃটেনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলেন। (৩)

কিন্তু বৃটেনের আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে বৃটিশ যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন—'এই নৌবহর অচল করিতেই হইবে'। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে অস্বাভাবিক, বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক সিদ্ধান্ত' ছিল এটা। সুতরাং ৩রা জুলাই, ১৯৪০, ভাইস-এডমিরাল স্যার জেমস এফ সমারভিলের নেতৃত্বে তিনখানা বৃহত্তর বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ওরানের দিকে রওনা হইল। বৃটিশ নৌ-সেনাপতি ফরাসী কমাণ্ডার ভাইস-এডমিরাল মার্সেল বি গেনসোলকে এই মর্মে এক চরমপত্র পাঠাইলেন—(১) হয় তিনি জার্মানদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে যোগদান করুন, (২) কিম্বা কোন বৃটিশ পোর্টে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন কিম্বা, (৩) ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চলিয়া যাউন এবং সেখানে জাহাজগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে কিম্বা মার্কিন আশ্রয়ে পাঠানো হইবে।

এই চরমপত্রের উত্তরদানের জন্য মাত্র ৬ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল। ফরাসী সেনাপতি এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তখন বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলির কামান গর্জন করিয়া উঠিল। তিনটি ফরাসী ব্যাটলশিপ, একটি সী প্লেন বাহী জাহাজ ও দুটি ডেস্ট্রয়ার হয় নিমজ্জিত কিম্বা অকেজো হইয়া গেল। কেবল একখানা ব্যাটলশিপ 'স্ট্রাসবুর্গ' প্রচণ্ড জখম হওয়া সত্ত্বেও এবং কয়েকটি ছোট ছোট পোত পলাইয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের তুলোঁ বন্দরে আশ্রয় নিতে পারিয়াছিল। পশ্চিম আফ্রিকার ডাকার বন্দরে অবস্থিত আর একখানা বৃহৎ ফরাসী যুদ্ধ জাহাজকেও অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা অকেজো করা হইল। ওরানে বৃটিশ আক্রমণের ফলে প্রায় দুই হাজার ফরাসী নাবিক হতাহত হইল।

ওদিকে হিটলার গর্জন করিলেন, শান্তির জন্য গর্জন করিতে লাগিলেন। মেঠো বক্তা হিসাবে হিটলারও অতুলনীয় ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা (যেমন, মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার) সেকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভ করার পর হিটলার মনে করিলেন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। একাকী ইংলণ্ডের পক্ষে আর যুদ্ধ চালাইয়া লাভ কি, এখন নিশ্চয়ই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন কোন নিরপেক্ষ দেশ এবং স্বয়ং পোপও শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি 'সম্মানজনক শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু চার্চিল বা বৃটেন শান্তি কামনার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। তখন ১৯শে জুলাই সন্ধ্যাবেলা রাইকস্টাগে হিটলার যে বক্তৃতা দিলেন, সেটা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির অন্যতম এবং রাইকস্টাগেও ওটাই ছিল তাঁর শেষ সেরা বক্তৃতা (অবশ্য মার্কিন সাংবাদিকের মতে)।

এই বক্তৃতার গোড়ার দিকে হিটলার চার্চিলকে 'অবিবেচক রাজনীতিক' বলিয়া গালি দিলেন এবং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—হাঁ তিনি কানাডায় পালাইয়া গিয়া বাঁচিবেন বটে, কিন্তু বৃটেনের বাকী লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতির কি হইবে?

তারপর শেষের দিকে তিনি ঘোষণা করিলেন :

> In this hour I feel it to be my duty before my own conscience to appeal once more to reason and common sense in Great Britain as much as elsewhere. I consider myself in a position to make this appeal since I am not the vanquished begging favours but the victor speaking in the name of reason.
>
> I can see no reason why this war must go on.

এই যুদ্ধ কেন চলিবে, তার কারণ তিনি দেখিতেছেন না, তিনি যুক্তির নিকট, সাধারণ বুদ্ধির নিকট আবেদন করিতেছেন। কিন্তু তার জন্য কেউ যেন একথা ধরিয়া না নেয় যে, 'আমি পরাজিতের মত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি', মনে রাখা দরকার 'আমি বিজয়ী এবং বিজয়ী বলিয়াই যুক্তির নামে আমি এই আবেদন করিতেছি'।

কিন্তু হিটলার বিজয়ীর দাম্ভিকতার সুরে যে বক্তৃতাই দিন না কেন, চার্চিলের কাছে বৃটেনের কাছে তা অগ্রাহ্য হইল।

[উইলিয়াম শাইরার লিখিতেছেন যে, এই বক্তৃতার সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। হিটলার হঠাৎ বক্তৃতার মাঝখানে থামিয়া গিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনের ও অন্যান্য যুদ্ধজয়ের জন্য গোয়েরিংকে রাইক-মার্শাল পদবীতে ভূষিত করিয়া সবচেয়ে সেরা সম্মান দিলেন এবং ৯ জন আর্মি-জেনারেল ও ৩ জন বিমানবাহিনীর অফিসার—মোট ১২ জনকে ফিল্ড-মার্শাল পদবীতে উন্নীত করিলেন। এঁদের নাম—ব্রাউখিৎস, কাইটেল, রুণ্ডস্টেড, বোক, লীব, লিস্ট, ক্লুগ, উইটজলেবেন, রাইখনাউ এবং মিলচ, কেসেলরিং ও স্পেরলে। একমাত্র বাদ গেলেন লেঃ জেনারেল হালডার। তাঁকে শুধু জেনারেল করা হইল। একসঙ্গে এতগুলি ফিল্ড-মার্শালের সৃষ্টি ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটনা।]

হিটলার মনে করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেই চার্চিল নরম হইবেন এবং শান্তি প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরেও যখন ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ১৬ই জুলাই তারিখ Directive No. 16 Operation Section বা ১৬নং নির্দেশনামা জারী করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেনাপতিদের নিকট এই গুপ্ত নির্দেশনামায় ইংলণ্ড আক্রমণের সাংকেতিক নাম ছিল 'সিলয়োভে' বা 'সীলায়ন'। সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপ আক্রমণের পক্ষে নামটি যথেষ্ট অর্থবহ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার এই যে, ১৯শে জুলাইয়ের শান্তি বক্তৃতার আগেই এই গোপনীয় নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে নুরেমবার্গের আদালতের দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহ পরেই হিটলার 'সিলয়োভের' পরিকল্পনায় মন দিলেন এবং ১৬ই জুলাই তারিখ যে নির্দেশ দিলেন, উহার সরকারী নাম ছিল

> 'General order No. 16 in the preparation of a landing operation against England' (Top Secret' —

—কথাটি যথানিয়মে উল্লিখিত ছিল) এই নির্দেশনামায় হিটলার বলেন যে সামরিক দিক হইতে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, তবু যখন বৃটেন জার্মানীর সহিত আপোষরফার কোনই ইচ্ছা দেখাইতেছে না, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল। ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে দখল করার জন্য কোথায় কোথায় সৈন্য অবতরণ করানো হইবে এবং অবতরণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য কি প্রকারের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে, তাও হিটলার নির্দেশ দিলেন। 'আগস্ট মাসের মধ্যভাগের মধ্যে আক্রমণের সমগ্র আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে।' জার্মান আক্রমণে বৃটিশ বিমানবহর যাতে বাধা দিতে না পারে, উহার জন্য এই বিমানবহর ধ্বংস করিতে হইবে। ইংলিশ চ্যানেলের পথ মুক্ত করিতে হইবে এবং ডোভার প্রণালীর উভয় পার্শ্ব সুরক্ষিত করিতে হইবে। 'আমার অধীনে এবং আমার হুকুমনামায় ১লা আগস্ট হইতে প্রধান সেনাপতিগণ তাঁদের

(3) Engl'sh History 1914-1945: Taylor 1965 Pelican P. 601.

বহুপ্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে—
"দুর্গামা"
শ্রীশ্রীসারদামাতার মানসকন্যা,
তপস্বিনী গৌরীমাতার উত্তরসাধিকা,
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা,
দুর্গামাতার অপূর্ব জীবনচরিত।
শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।
(৪৮৮ পৃষ্ঠা ৩১খানি ছবি- একখানি রঙীন
মূল্য—আট টাকা।
ডাকযোগে লইতে মনিঅর্ডারে দশ টাকা পাঠাইবেন – আশ্রম-সম্পাদিকার নিকট। রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে গ্রন্থখানি যাইবে।
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

দপ্তরসহ আবার সদর দপ্তর (Ziegenberg) হইতে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করিবেন।"*

কিন্তু শুধু নির্দেশ জারী করিলে কি হইবে। সত্য সত্যই ইংলণ্ড আক্রমণের কোন 'বাস্তব পরিকল্পনা' ছিল না এবং তাঁর নির্দেশনামায় "যদি দরকার হয়" এই কথাটিরও উল্লেখ ছিল। কারণ, হিটলার বা তাঁর সেনাপতিরাও এই বিষয়ে খুব 'সীরিয়াস' ছিলেন না। কারণ, প্রথমত হিটলারের নিজের এবং তাঁর সেনাপতিদের যুদ্ধ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র ভূমি-পথেই আবদ্ধ ছিল—সমুদ্রের কিম্বা জলপথ অতিক্রমপূর্বক আক্রমণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন কি, হিটলার জেনারেল রুণ্ডস্টেডকে একবার বলিয়াছিলেন—

On land I am a hero, but on water I am a coward !

অর্থাৎ স্থলপথে আমি একজন বীর, কিন্তু জলপথে আমি কাপুরুষ। (৪)

সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়া স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিরোধ বাধিল। কারণ, এভাবে ইংলণ্ড আক্রমণ

*The Nuremberg Trial —by R. W. Cooper 1947, Page 96.

(৪) উইলিয়াম শাইরার প্রণীত—দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইক। পৃঃ ৯০৭, পাদটীকা।

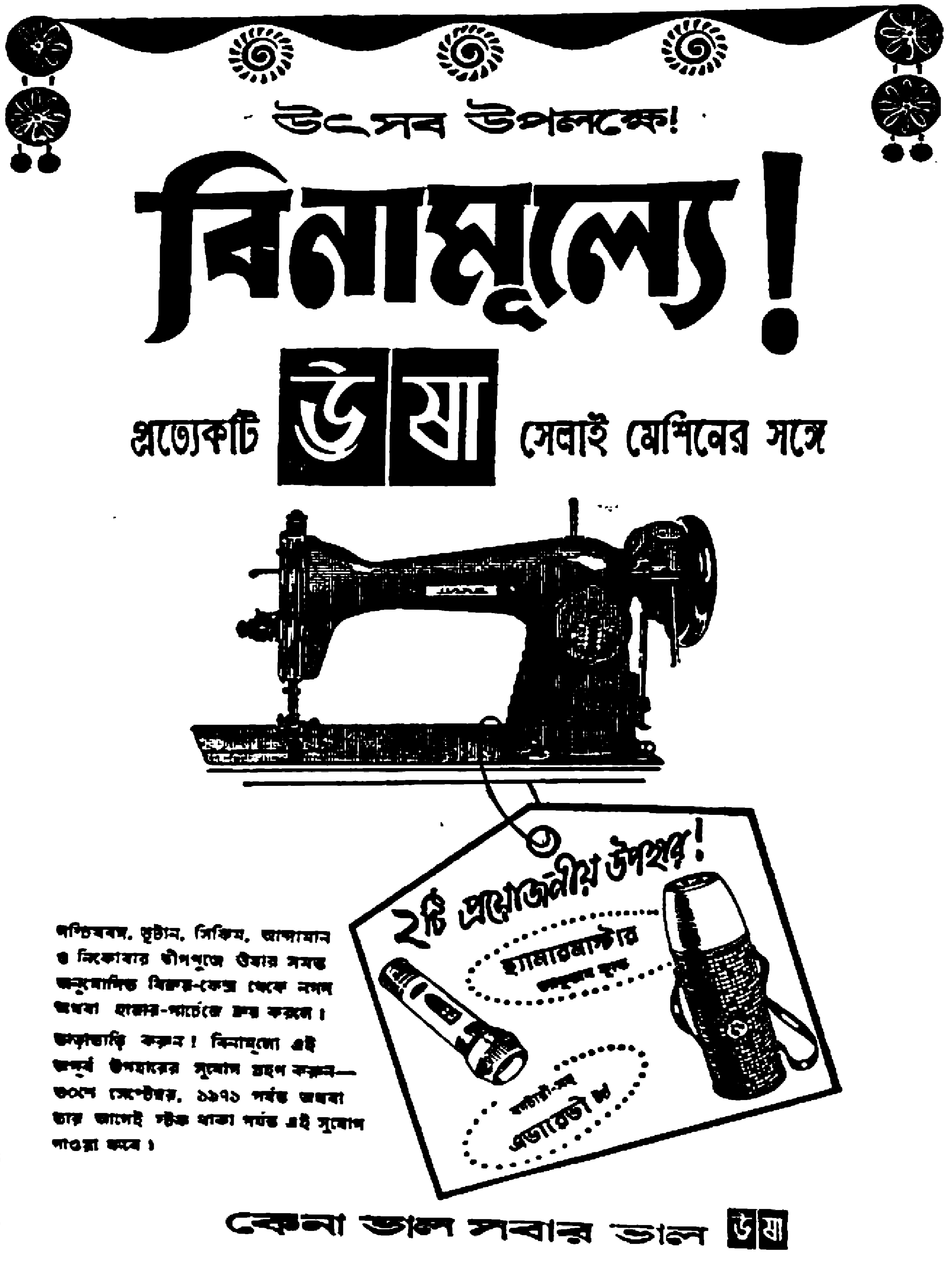

করিয়া জয় করিতে গেলে জল স্থল ও বিমানবাহিনীর যে প্রভূত শক্তির সমাবেশ দরকার, হিটলারী জার্মানীর তা ছিল না। সৈন্যশক্তি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেই সৈন্যদল ইংলিশ চ্যানেল পার হইবে কিরূপে? উপযুক্ত নৌশক্তি কোথায়? ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য আর্মির পক্ষ থেকে দাবী করা হইল ডোভার থেকে পোর্টল্যাণ্ডের পশ্চিমে লাইম রেগিস পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে পর পর কয়েক দফা সৈন্য অবতরণের জন্য। ডোভারের উত্তরে র‍্যামসগেট অঞ্চলেও অতিরিক্ত সৈন্য অবতরণ ঘটাইতে হইবে। জার্মান নৌ-বিভাগ অবশ্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করিল নর্থ ফোরল্যাণ্ড এবং আইল অব ওয়াইটের পশ্চিম প্রান্ত—এই দুই অংশের মধ্যে। আর্মি স্টাফ প্রথম দফা ১ লক্ষ সৈন্য নামাইবার প্ল্যান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ডোভার থেকে পশ্চিম দিকে লাইম বে পর্যন্ত বিভিন্ন বিন্দুতে আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য নামাইবার। আর্মি স্টাফের প্রধান কর্নেল জেনারেল হালডার বলিলেন যে, ব্রাইটন এলাকায় অন্তত ৪ ডিভিসন সৈন্য নামাইতে হইবে। ডিল্‌-র‍্যামসগেট এলাকায়ও এবং সমগ্র রণাঙ্গন ধরিয়া একই সময়ে অন্তত আরও ১৩ ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে। এ ছাড়া লুফ্‌টভাগে বা জার্মান বিমানবাহিনী দাবী করিল যে, অন্তত ৫২টি এ-এ ব্যাটারি জাহাজযোগে প্রথম দফাতেই পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু নৌবিভাগের কর্তারা পরিষ্কার বলিলেন যে, এত দ্রুত এবং এত বড় শক্তির সমাবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি পারাপারের সময় বিমানবলের প্রভুত্বও স্থাপন করা যায়, তবু নিরাপদে এককালে একবার মাত্র পার করা সম্ভব। আর দ্বিতীয় দফায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য চ্যানেল পার করিতে গেলে (সমস্ত সমরসম্ভারসহ) একবার অপারেশনের জন্যই ২০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তির দরকার। এটা নিতান্তই আজগুবী দাবী। অর্থাৎ সোজা কথায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া র‍্যামসগেট থেকে লাইম বে পর্যন্ত ২০০ মাইলের বেশী রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ ঘটানো নৌবহরের পক্ষে অসম্ভব।

এভাবে নেভী ও আর্মির মধ্যে যে বিতর্ক বাধিল সেটা চরমে উঠিল ৭ই আগস্ট। জেনারেল হালডার আর্মির পক্ষ থেকে নেভীর বড় কর্তা এডমিরাল স্নাইডউইন্ডকে শুনাইয়া দিলেন যে, নৌ-বিভাগের পরিকল্পনা অর্থাৎ ৪০ ডিভিসনের বদলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর রণাঙ্গনে ১৩ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাব সৈন্য বিভাগের পক্ষে সোজা আত্মহত্যার তুল্য।

সৈন্য ও বাহনের যুদ্ধ—রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সংঘাত

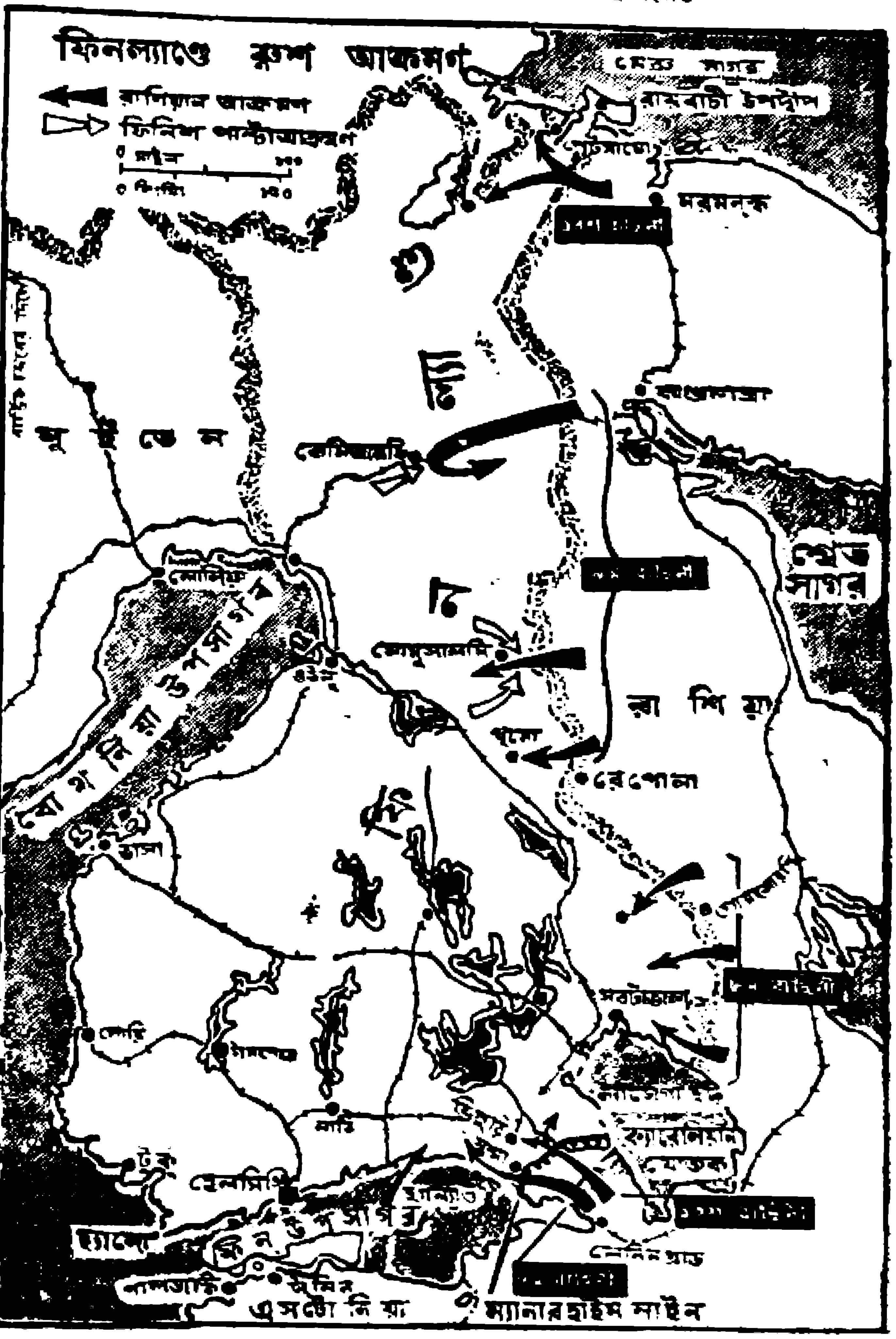

এর জবাবে এডমিরালও পাল্টা শুনাইয়া দিলেন যে, বৃটিশ নেভীর আধিপত্যের মুখে এত বড় চওড়া রণাঙ্গনে ৪০ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাবও জার্মান নেভীর পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য।

চওড়া কিম্বা সঙ্কীর্ণতর রণক্ষেত্রে সৈন্য নামানো ও আক্রমণ করা হইবে এই বিরোধের মধ্যে ফুয়েরার স্বয়ং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া নিজেই সংশয়ে পড়িলেন এবং আর্মির বড়কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর ১৬ই আগস্ট তারিখ হিটলার লাইম বে'তে অবতরণের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। আবার বলিলেন যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ সঙ্কীর্ণতর রণক্ষেত্রে অবতরণ ঘটাইতে হইবে। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত—'পরিস্থিতি পরিষ্কার' না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রহিল।

এই সমগ্র পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড ও আর্মি গ্রুপ 'এ' এবং এডমিরাল রেইডার এবং বিতর্কিত পরিকল্পনার আলোচনার সময় বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, বিমান শক্তির পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই অভিযান চালানো সম্ভব নয়। তখন বিমানবহরের কর্তা রাইখ মার্শাল গোয়েরিং আগাইয়া আসিলেন এবং সকলকে

আশ্বাস দিলেন যে, তিনি একাই জার্মান বিমানবহরের সাহায্যে ইংলণ্ডকে খতম করিয়া ফেলিবেন। তখন নৌ ও স্থল-বাহিনীর কর্তারা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের উপর দিয়াই তাঁরা ইংলেন্ড জয়ের পরীক্ষা চালাইতে চাহিলেন। 'ব্যাট্‌ল অব্ বৃটেন' বা বৃটেনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিমান অভিযানের এটাই ছিল মূল রহস্য। কিন্তু মার্শাল কেসেলরিং ও স্পেরেল এই বিমান আক্রমণ চালাইবার ভার পাইলেন।

●

চার্চিলও জানিতেন যে, ইংলণ্ডের ভাগ্য এক্ষণে আকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কারণ, ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য নামাইতে গেলে ইংলিশ চ্যানেল নির্বিঘ্ন করিবার জন্য জার্মানীকে বৃটিশ বিমানবাহিনী বা রয়েল এয়ার ফোর্স ধ্বংস করিতেই হইবে। ৩১শে জুলাই তারিখ হিটলার এডমিরাল রেইডারকে বলিয়া-ছিলেন—'যদি ৮ দিনের ঘোরতর বিমান যুদ্ধের পরেও জার্মান বিমানবহর শত্রু-পক্ষের বিমানশক্তি, বন্দর ও নৌবহরকে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করিতে না পারে, তবে, এই আক্রমণ ১৯৪১ সালের মে মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে।' (৫)

ফ্রান্সের পতনের পর যে মেয়াদ সময় পাওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে চার্চিল ও বৃটিশ সমরকর্তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইলেন আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী, ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপ পরাজিত। ডানকার্কের পর সমস্ত অস্ত্রসম্ভার প্রায় শূন্য। তখন ইংলণ্ডের উপকূল রক্ষার জন্য ছিল মাত্র ১৭ ডিভিসন বৃটিশ সৈন্য, আর রিজার্ভ ছিল ২২ ডিভিসন। আর জার্মানীর দুর্দান্ত ৪০ ডিভিসন সৈন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে উৎসুক। তবু ইংরাজ জাতি সেই তীব্রতম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইল। বাকিংহাম প্রাসাদে রাজসম্পতি থেকে শুরু করিয়া সাধারণ মেহনতী বা চাকুরীজীবী পর্যন্ত সমাজের সর্ব-স্তরে স্বদেশরক্ষার আশ্চর্য উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল। এই উদ্দীপনা, সাহস এবং প্রতিরোধের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ফ্রান্সের ছিল না। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটিশ সিংহ যেন অকস্মাৎ কেশর ফুলাইয়া পতনের অন্ধকার গহ্বর থেকে সংগ্রামের রক্তাক্ত দুর্গম পথে আসিয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণের নৈতিক বল এবং স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য ইচ্ছা প্রবল হইল। সুতরাং হিটলার নীতি-ভ্রষ্ট ও চরিত্রভ্রষ্ট ফ্রান্সে সহজ জয়লাভের যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইংলণ্ডে তাহা পাওয়া গেল না। এখানে লেনিনের সেই বহু মূল্যবান উপদেশ মনে পড়িতেছে, যখন তিনি রণনীতির ব্যাপারে বলিয়াছিলেন,

> The soundest strategy is to post-pone operations until the moral disintegration of the enemy renders the delivery of the mortal blow both possible and easy".*

*This Expanding War—by Liddell Hart Page 263.

এই 'নৈতিক অধঃপতনের' জন্যই হিটলার ইউরোপের বহু রণক্ষেত্রে 'শত্রুর' উপর একটিমাত্র আঘাত হানিয়াই দ্রুত ও সহজ জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের তীরভূমিতে আসিয়া সেটা সম্ভব হইল না, যার অন্যতম কারণ ছিল ইংরাজ জাতির নৈতিক শক্তির দৃঢ়তা। হিটলারের আসন্ন আক্রমণের জন্য বৃটেন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং যে কয়েক ডিভিসন সৈন্য তার হাতে ছিল, সেগুলিই নানা বিন্দুতে সন্নিবেশ করা হইল। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়া দেশের নানা অংশে মোট ১০ লক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক বা হোমগার্ড গঠিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে যথাসম্ভব লণ্ডন ও অন্যান্য বড় বড় শহরের বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া নেওয়া হইল (সারা বৃটেন থেকে মোট প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ লোক অপসারিত হইয়াছিলেন।) এবং আফিস হইতে শুরু করিয়া বিদ্যালয় পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠিত হইল যাতে ইংলণ্ড আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বলা বাহুল্য যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রকার সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। জার্মানী তখন প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের মালিক এবং উত্তর ইউরোপেও তার বাহু বহু দূরবর্তী নার্ভিক বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থাৎ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের উপকূল ভাগ তার দখলে—উত্তর সমুদ্র হইতে ইংলিশ চ্যানেল হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীর পর্যন্ত জার্মানী দণ্ডায়মান। জার্মানীর হেলিগোল্যাণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে স্কাপাফ্লো পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৫৫০ মাইল, আর এডিনবরা ৪৫০ মাইল। কিন্তু নরওয়ে দখলের দ্বারা এই দূরত্ব কমিয়া দাঁড়াইল মাত্র ৩২০ এবং ৩১০ মাইলের মধ্যে—নরওয়ের স্টেভ্যাঙ্গার ঘাঁটি হইতে। হল্যাণ্ডের তীর হইতে ইংলণ্ডের নরউইচ ১০৫ মাইল এবং খাস লণ্ডন ১৫৫ মাইলের মধ্যে পড়িল। আর

ফ্রান্সের পতনের ফলে জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ডোভার প্রণালীর সঙ্কীর্ণতম পথে দূরত্ব দাঁড়াইল মাত্র ২৬ মাইল। প্যারিস হইতে লণ্ডন ২১০ এবং দূরতম পাল্লার বিমানের পক্ষে বার্লিন হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ছিল ৫৭০ মাইল, আর ফ্রান্সের ব্রেস্ট বন্দর হইতে ইংলণ্ডের প্লিমাউথ বন্দর ১৪০ মাইলের মধ্যে পড়িল। (৬)

সুতরাং হিটলারী রণনীতি যেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই বৃটেনকে বিমান আক্রমণের নিকটতম পাল্লার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। বিমান অভিযানে সাফল্যের আশা করিয়া জার্মানী ইংলণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণের জন্য রটারডাম ও শেরবুর্গ বন্দরের মধ্যে ৩ হাজার 'বার্জ' (একপ্রকারের নৌকা) পর্যন্ত প্রস্তুত রাখিল এবং নরওয়ে দখলকারী সৈন্যদিগকে ইংলণ্ডে 'উভচর আক্রমণের' জন্য ট্রেনিং দেওয়া হইল। হল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের তীর পর্যন্ত প্রচুর বিমান-ঘাঁটি তৈয়ার হইল।

ইহার পর আরম্ভ হইল ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটেনের আকাশে ভয়াবহ বিমান যুদ্ধ—যাহা 'Battle of Britain' নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যাঁরা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁদের মতে এমন রোমহর্ষক সাংঘাতিক সংগ্রাম ইতিপূর্বে মানুষের সমাজে আর কখনও দেখা যায় নাই। আকাশপথের যে কল্পনাবিলাস মানুষের ছিল, কিংবা রামায়ণের পুষ্পকরথ অথবা মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের যে কাল্পনিক সংগ্রামের চিত্র বহু রোমাঞ্চের প্রেরণা জোগাইয়াছে, বৃটেনের মহাশূন্যে তাহা ভয়ঙ্কর বাস্তব মূর্তি লইয়া দেখা দিল। সাইরেনের তীব্র তীক্ষ্ণ ও আর্ত বংশীধ্বনিতে সচকিত ইংলণ্ডের নরনারী ভূগর্ভের আশ্রয়স্থল হইতেই দেখিতে পাইত ঊর্ধ্বে আকাশে চারি পাঁচ মাইল ধরিয়া শ্বেত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়াইয়া পড়িয়াছে যেন ধূমকেতুর পুচ্ছের মত। আর অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে ইংলণ্ডের বসুন্ধরা যেন আপন ভিত্তিমূল হইতে কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং মাটী ও প্রস্তর, অট্টালিকা ও প্রান্তর বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়া ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে। মস্তোচারী বিমানগুলি তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে পরস্পরকে হননের জন্য আসুরিক সংগ্রামে ব্যস্ত আর জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত তারা ছুটাছুটি করিত, যাদের গতি ছিল মিনিটে পাঁচ মাইল। নিঃসন্দেহে ইহা সেদিনের অবিশ্বাস্য যুদ্ধের অবিশ্বাস্য গতিবেগ।......

(ক্রমশঃ)

(৫) চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮১-৮২

(৬) আমেরিকার 'লিটেরারি' ডাইজেস্ট প্রকাশিত 'The War in Maps'—৫০ পৃঃ

নতুন উপন্যাস বের হলো
ড্যঃ বাসুদেবের
রহস্য উপন্যাস
কার্নিভালে খুন
মূল্য ৩·০০
সলিল সেনের
উপন্যাস
সোহাগবাতি
মূল্য ৪·০০
লিপিকা—৩০/১ কলেজ রো, কলি-৯

CENTRAL LIBRARY

আবহমান কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাইরে ঝকঝকে দিন, ঘরের মধ্যে আলোর দরকার নেই। স্টোভের শব্দ আসে, স্পিরিট আর ওষুধের গন্ধ হাওয়ায়। ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ফুটছে, কতগুলো চেয়ার টেবিল এদিক ওদিক করা হল। টুটুল বুঝতে পারছিল বড় রকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং সে সেই ঘটনার নায়ক। সে জন্যে একটা চাপা হর্ষও তার মুখে খেলা করে, বিশেষ করে দরজার বাইরে বুড়ী আর ছোঁড়ার করুণ মুখগুলো দেখে। কিন্তু বুঝবার আগেই ভবনাথ তার মাথার কাছে এসে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মাথাটা আলগোছে ধরেন, খাটের উল্টো দিক থেকে প্রতাপ উঠে তার পেটের কাছে পা মুড়ে বসে। পায়ে হাত পড়ায় টুটুলের এতক্ষণ নায়কোচিত মনোভাব নিমেষে কেটে যায়। অন্য দিন হরিচরণ পা ধরেন আলতোভাবে কিন্তু আজ ক্লোরোফর্ম বাদ দিয়েই অপারেশান—একথাটা জানান দিচ্ছে সাদা আলখাল্লা পরা মোটা লোকটার ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে, বাঁ-হাতের আলগা হেঁচকায় গোড়ালির ফুলোটার অস্পষ্ট মুখ থেকে তুলো টানতেই গলগল করে মোটা ধারায় ধূসর পুঁজ গড়াতে থাকে। তারপর হরিচরণ গ্লাভস-পরা মোটা দুই থাবায় চেপে ধরেন টুটুলের দপদপে ব্যথাস্থান। আর চার পাঁচটা ফুলো ফুটো হয়ে ফোয়ারার মতো পুঁজ উঠতে থাকে, হলুদ লালে সাদা আলখাল্লা রঙীন হয়ে যায়।

টুটুল প্রথমে কাতরাচ্ছিল ছটফট করছিল প্রতাপ ভবনাথ কম্পাউন্ডারবাবুর শক্ত হাতের মধ্যে। তারপর তার মুখ দিয়ে অসংলগ্ন গোঙানি অকস্মাৎ সংলগ্নতা পায় এক গোটা বাক্যে,—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না—ডাক্তার বাবু...' ছুরি চালাতে চালাতে হরিচরণের হাতও এক মুহূর্তে থমকে যায়। প্রতাপের দিকে একবার অবাক হয়ে তাকান। আর টুটুল যেন এই শব্দগুলোর তরণীতে যন্ত্রণার বৈতরণী পার হতে থাকে। ক্রমাগত চীৎকার করে বলে, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না।' যন্ত্রণায় যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ আরও স্পষ্ট, আরও জোরাল সাবালকতুল্য শোনায়। হরিচরণ আরও গভীরে ছুরি চালান, পুঁজের স্তর আরও নীচে, একেবারে হাড়ের জোড় পর্যন্ত। আর একদিন দেরী হলেই পা বাদ দিতে হত। ওপরের দিকেও অনেকখানি পর্যন্ত এই হলুদ ধূসর দাবানল এগিয়ে গিয়েছে। সেদিকে যত ছুরি উঠতে থাকে টুটুল আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে নতুন বাক্যবন্ধে 'মা জননী, মা জননী, একবার শেষ দেখা, একবার শেষ দেখা দেখতে দাও, মা জননী।' পাশের ঘরে তক্তাপোষের ওপর বসে স্বর্ণসুন্দরী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন। ছুরি চালাতে চালাতে প্রবল আত্মতৃপ্তিতে হরিচরণের মুখ ভরে আসে। বাস্তবিক তিনি তখন ললিত বাড়ুজ্জে, পঞ্চানন চাটুজ্যে ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তির একই সারিতে অন্তত তার ক্ষিপ্র আঙুলের কাজ, ছুরির ওপর তন্ময় দৃষ্টি থেকে সে কথাই প্রমাণিত। মুখ তুলে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, ছোকরা বড় হলে থিয়েটার করবে।' কিন্তু ইতিমধ্যে ঘন্টাখানেক প্রায় অতিবাহিত, ওপরের দিকে কিছু কিছু কাটা অংশে ছুরির আঘাতে লাল রক্ত অনেক দূর বেয়ে বিছানার সাদা চাদরে জমা হয়েছে। সেদিকে চেয়ে প্রতাপেরই মাথা ঝিমঝিম করে। ভবনাথের চোখে জল। টুটুলের গলা ভেঙে গেছে, কিন্তু বাক্যের ওপর আস্থা তার এখনও অক্ষুন্ন। তাই সেই গলা ভাঙা বাক্যগুলো যেন নেংচাতে নেংচাতে তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ভিখিরির মতো। হরিচরণ যন্ত্রের মতো কাজ করেন। নেহাত বয়েস কম বলে তিনি এত বড় ঝুঁকি নিয়েছেন, নইলে ক্লোরোফোর্ম বাদ দিয়ে এক ঘন্টার ওপর এই অপারেশন ভাবাই যায় না। এবার ক্ষত স্থানে গজ ভরে সেলাই বাকী। কম্পাউন্ডারবাবু দুই হাতে পাশে দাঁড়িয়ে। হলুদে আলোয়ান আর কেডস জুতো-পরা লোকটাকে অন্য দিন কেউ চোখ মেলেও দেখে না। আজ সেও এক রণক্ষেত্রের সৈনিক, তার স্থির দৃষ্টি আর যন্ত্রের মতো একটার পর একটা ছুরি কাঁচি, সাঁড়াসি এগিয়ে দেওয়ার ক্ষিপ্র শৃঙ্খলায় তাকেও দেখায় অন্য রকম। হরিচরণ ডাক্তার এবার ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করেন, হাঁটু অবধি বিশাল ব্যান্ডেজ মোড়ার পর সেদিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বোধহয় ঘুমের ওষুধ দেন থেকে। টুটুল ইতিমধ্যেই অবসাদে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন, সে এখন আর এক জগতের বাসিন্দা। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস তার অজান্তে উঠে তার ছোট্ট বুকখানা নাড়ায়।

ভেতরের বারান্দায় এসে সাবান দিয়ে কনুই পর্যন্ত হাত ধোন হরিচরণ ডাক্তার। আবার গোবেচারি মুখখানা ফিরে আসে তাঁর। আস্তে আস্তে ভবনাথের কাছে এসে বললেন, 'আর একদিন হলেই হাড়ে ধরে যেত স্যার।'

হরিচরণ ডাক্তার ফি নেবেন না। এত বড় অপারেশনটাও তাঁর সরকারী কর্তব্য। ভবনাথ ভাবলেন, একটা পার্কার ফাউন্টেন-পেন উপহার দিলে কেমন হয়!

কালের হাত লোহার মতো শক্ত বটে, সবাইকে সে একভাবে ধরে না, এটাই বাঁচোয়া। এমন অনেক মানুষ আছে যারা চিতায় শুয়েও সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের ইন্দ্রজালে স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল। এমন অনেক বাড়ি দেখা যায়, যেখানে যত্ন ও মনোযোগের দরুণ দুশো বছরের পুরনো কাঠের সিঁড়ির মেহগিনি পালিশ এখনও ঝকমকে প্রাণবন্ত। আর এটাও তো কোন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নয় যে, ভাল রেশমী বানারসি যত জীর্ণ হয় তত তাতে আলো খেলে: কালের প্রভাব জগৎসংসারে বাস্তবিক বিচিত্র।

এই ধরনের চিন্তাই ভবনাথের মনে আসে যখন তিন মাস পর সন্ধ্যের ট্রেনে ঈশ্বরদি স্টেশনে নেমে বিশ্বাস কোম্পানীর বাসে করে পাবনা বাড়িতে পৌঁছলেন। ঈশান চৌধুরীর মৃত্যু সবে বিশ বছর ঘটেছে। এর মধ্যে কাল শুধু কঠোর হস্তে পাবনাবাড়ি ধরে নি, ধরে চুর চুর করে গুঁড়ো করেছে। তিন বছর আগেও যখন এসেছিলেন তখনই ঠিক এরকমটি ছিল না যদিও ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল যথেষ্ট। সামনের বিশাল গাড়িবারান্দায় আলো নেই। দুটো বাস অন্ধকারে ভূতের মতো

পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। ভবনাথ লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছিলেন, একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এখন আবছা আঁধারে খেয়াল করেন বাড়ির সামনে গোলাপবাগানে একটা ভাঙা মর্মর বালার পোঁতা মাতলাভ' ঘাসে ভরে এসেছে।

'কে রে?' কর্কশ গলা আসে। বড়দার গলা চিনতে পেরে ভবনাথ পাশ ফিরে তাকান। ধুতির ওপর কালো গলাবন্ধ কোট পরে জানলায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক।

'আমি ভবনাথ।'

'দাঁড়াও।' লণ্ঠন হাতে নেমে আসেন। তারপর আলো তুলে ধরেন ভাইয়ের মুখের দিকে। বাসগুলোর পেছন দিকও হয় আলোকিত।

'বিশ্বেস কোম্পানীকে ভাড়া দিয়েছি। তুমি তো আর কিছু করলে না আমাদের জন্যে। এখন তো শুনছি সাউথ ক্যালকাটায় বাড়ি তুলছো, তা তো তুলবেই। আত্মীয়-স্বজন দেশ সব ভেসে গেল, এখন খালি নিজের পেট।' কথাগুলো বলেই কাশতে থাকেন। কাশির শেষে হাঁপান খানিকক্ষণ।

'শরীরটা খারাপ করেছেন,' ভবনাথ ধীরে ধীরে বলেন।

'এই হাঁপানিটা। শনিবার শনিবার কলকাতা পাবনা করি। তা বিশ্বাসবাবু সজ্জন লোক। সাপ্তাহিক ট্রিপে দেয় পাবনা টু ঈশ্বরদি।'

ব্যাপারটা খানিক আঁচ করলেও ভবনাথ জিজ্ঞাসা করে ফেলেন, 'শনিবার শনিবার কেন?'

সঙ্গেই বুঝতে পারেন নিজের গলায় নিজেই ফাঁস পরালেন।

দাদা বললেন, 'ছেলেগুলো ভেসেছে। ফার্স্ট ক্লাস বেরোলে ছেলেছোকরারা লিস নেয়। বিয়ে দিতে পারছি না। কিছু রোজগার-পাতি করতে হবে তো। তুমি যে আমাদের সবাইকে এমন লেট-ডাউন দেবে জানা ছিল না। এবারে কিন্তু একশোটা টাকা আমায় দেবে, ভব। তোমার নামে থেকব। বিয়েতে তোমার মাসিক আমায় আঙ্কেব। ঈশান চৌধুরীর ছেলে, আমার একটা কথার দাম নেই?'

ঘরে ঢুকতেই নিকষ কুলীন ঘরের নিকষ কালো মেয়ে শৈবালিনী চমকে উঠে বললেন 'ভব।'

'এই এলাম বৌদি।'

'বোস, বোস, ভাত চাপিয়ে দি।'

পাবনা বাড়ির বড় বৌ কলমলে কালো, লম্বা একহারা চেহারা। ঠোঁট দুটো হালকা বিদ্রূপে অস্বাভাবিক সুন্দর। মা বর মতো চোখের চেয়েও ঠোঁটের চার পাশটা ঘিরে যে সজীবতা খেলে শৈবালিনীর কথা বলার সময় তার সব থেকে আকর্ষণীয়। ভবনাথ চামড়ার মোড়া বিলাতি সোফাখানায় গা এলিয়ে চোখ বোজেন। টেবিলে সেজের ঠাণ্ডা আলো। সে আলোতেও দেয়ালের গায়ে গায়ে কাঁচা বল্কলে ভরাটের ছাপ ভবনাথের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু বড়দার চেষ্টায় ত্রুটি না থাকলেও কালো মার্বেলের কলমলে পালিশ এখনও অক্ষুণ্ণ।

বছর পঁচিশেকের একটি যুবক ঘরে ঢোকে। একবার লাজুক লাজুকভাবে ভবনাথের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বিদায় নেবার উপক্রম করতেই ভবনাথের চোখ খোলে। 'এই বিশু, কোথায় পালাচ্ছিস?'

বড়দার বড় ছেলে। এই ছেলেটি ছিল ভবনাথের পেয়ারের। মস্ত উঁচু কাঠের পুলের মাথা থেকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে ঝাঁপ খেত বিশু ইছামতীতে। নুয়েপড়া বাঁশঝাড়ের ঘা ঘেঁষে তার সেই উজ্জ্বল দেহখানা অস্পষ্টভাবে ভবনাথের স্মৃতিতে একবার ঝাঁপ খেয়ে নেয়।

'কদ্দুর পড়লি?'

'পড়া আর হয়নি সেজকাকা।'

'কি করছিস?'

'বিশ্বাস কোম্পানিতে ঢুকেছি। একশো টাকা মাইনে দেবে বলেছে।'

'একশো টাকা? কি কাজ?'

বিশু লাজুকভাবে হাসে, 'মেকানিক' তারপর বারান্দার দিকে পা বাড়ায়।

মেকানিক, কেরাণী, পেশকার—এই হল এখন পাবনা বাড়ির চেহারা। ঠিক বড়দার মতো ঈশান চৌধুরীর ছেলে বলে নয়, শহরের সবচেয়ে বড় বাড়ির ছেলেদের কুড়ি বছরেই এই সাধারণ শ্রমজীবীর পর্যায়ে দাঁড়ানোটা ভবনাথের মনে লাগে। খানি মেজদার এক ছেলে বি-এ পাশ করেছে। তাকে বলে কয়ে ভবনাথ একসাইজ ডিপার্ট-মেন্টে ঢুকিয়েছেন। সেই প্রকাশটা যদি কিছু করতে পারে।

বড়বৌদি ঘরে এসে ঢোকেন। আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখ মুছে বললেন, 'তারপর কি মনে করে?'

'মেজদা সেই চিঠি দিয়েছিলেন, আমার অংশটা বেচে দিতে ও'র কাছে। সেই ব্যাপারে ভাবলাম একবার আসি।'

শৈবালিনী হাসেন, চাপা বিদ্রূপ খেলে তাঁর মুখে।

'হাসছো কেন?'

'হাসতে নেই?'

'আমি তো আর থাকি না। তাছাড়া মেজদা যা বলছেন তাতে রাজী হয়ে যাই।'

'তাই যাও, ঠাকুরপো। তবে তোমার অংশটা ওকে দান করে দাও। টাকাপয়সা তো কিছু পাবে না।'

'বাঃ, আমার অংশের গোটা বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি...'

'এমনিতেই তো সেখানে সবাই জোগ-দখল করছে। তারপর তুমি কলকাতায় বাড়ি তুলছো শুনে এখানে যা অবস্থা। সবাই তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খাবে। তুমি কেন এসেছো ভব? কাল সকালে বাড়ির সকলে জাগবার আগেই পালাও। আমার কথা শোন।'

'বড়দার কবে থেকে যোগাযোগ হল?'

শৈবালিনী চুপ করে থাকেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করেন, 'বিশ্বেস কোম্পানীর কাছে বাড়ি মরগেজ।' আবার চুপ করে থেকে বলেন, 'ভেবেছিলাম ছেলে দুটো লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। কিছুই করল না। বিশ্বেস বাবুরা দয়া করে চাকরী দিয়েছে। মাস গেলে তিরিশটা টাকা ঘরে আনে।'

'পম্পর ছেলেরা কিছু করছে টরছে?'

'বড়টা পেশকারী করে। শুনি উপরি আছে। তবে সে তো আলাদা। আর এগারোটা ছেলেমেয়ে? তুমি কালই সকালে চলে যাও ভব। দেখলে কষ্ট হয়। একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। টাকায় বারো সের দুধ। কত আর পড়ে বলো? তাও ছেলেগুলো দুধ পায় না।'

ভবনাথের চোখের সামনে ফুটে ওঠে কাল সকালের দৃশ্য—ছোট বোনের পরিবার। বারো জোড়া চোখ, তার দিকে চেয়ে আছে, বারো জোড়া হাত তার দিকে বাড়িয়ে।

খালি পা দিয়ে মেঝের চকচকে কালো মার্বেলে পা ঘসেন ভবনাথ। কি দরকার আছে তাঁর কলকাতার বাড়িতে মোজেইক মার্বেল, এত যত্ন পরিশ্রম আর স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নের শেষ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। পাবনা আর বালিগঞ্জের অবস্থান তো দুটো আলাদা সৌরজগতে নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে পাবনা আর এ শতকের তৃতীয় দশকের বালিগঞ্জ—অনেকটা একই পরিক্রমা না? ভবনাথ আর ভাবতে পারেন না। অবসন্নভাবে বললেন, 'আর প্রকাশ?'

শৈবালিনী অবাক হয়ে তাকালেন, ঠোঁটের দু'পাশ অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও একটা মৃদু বিদ্রূপ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। নীচু গলায় বলেন, 'কেন শোন নি?' তারপর বিস্মিত ভবনাথের দিকে চোখ পড়তেই বল-লেন, 'প্রকাশ তো তিন মাস সাসপেণ্ড হয়ে আছে। মেজোবাবু অনেক ধরাধরি করে জেল থেকে বাঁচিয়েছেন।'

ভবনাথ একবার ভাবলেন সত্যিই বড়-বৌদির কথা মেনে কাল সকালে কেউ জাগবার আগেই পৈতৃকভবন থেকে কাট মারবেন। প্রতাপের চেয়ে দু বছরের বড় প্রকাশকে তিনি নিজের কাছে রেখে ম্যাট্রিক পড়িয়েছেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ থেকে পাশ করে বেরোলে চাকরির জোগাড় করে দিলেন। তারপর এই কাণ্ড। নিশ্চয় ঘুষ চুরি করে ধরা পড়েছে। ভবনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একথাও মনে আসে, এবারেই শেষ, এবার থেকে পাবনা বাড়ির সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক ছেদ। আর যত তাড়াতাড়ি ছেদ করা যায় ততই ভাল।

পরদিন ভোরে পালান না ভবনাথ। তবে সকলে উঠবার আগে পথেই কুমুদ-কাকার বাড়ি চলে গেলেন। কুমুদকাকা খুব আপ্যায়ন করলেন ভবনাথকে। ফুলকো গাওয়া ঘিয়ের লুচি আর আলুভাজা দিয়ে দার্জিলিং চা খেতে ভবনাথের ভালই লাগে। বেশ শান্তির পরিবেশ রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট

জজ কুমুদ সেনের বাড়িতে। কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে কুমুদকাকার সম্প্রতি তিনতলা বাড়ি উঠেছে। সেনের বাড়িতে পুজো হয়, আর এ সময়টা সিরাজগঞ্জের টকটকে লাল রুই খুব সস্তা, বাগানে আনাজপাতিও ফলে। কাজেই শীতটা কাটিয়ে যাবেন।

ফর্সা ছোটখাটো শরীর, চাঁদি ভরা টাক। বার্ধক্য মুখ শুকোতে না আরও বাড়তে দেখায়। কুমুদ সেন আরাম কেদারায় শুয়ে বিদ্যাসাগরের চটি পরা ফর্সা নীল শিরা ওঠা পাখানা নাচাতে নাচাতে বলেন, 'এটা তোমার ভব খুব ওয়াইজ ডিসিশন।'

'কিন্তু কাকাবাবু, সেনের বাড়ির পাট বোধহয় চুকল।'

'সকলেরই ভাই, সকলেরই। তোমাদের বাড়ির যেটা পরের বাড়ি, সেকেন্ড বিগেস্ট হাউস ইন পাবনা টাউন, তারাও তো বাড়ি বেচে দিয়ে রাসবিহারি এভিনিউ-এ বাড়ি তুলছে। তোমাদের বাড়ির পাশের নন্দু বাড়ি গনু আর ফনু—তাদের বাড়ি উঠছে কার্ন' রোডে—ছাদ ঢালাই হচ্ছে।' কথাগুলো বলেন মুশলো নিয়ে নাচ চিবোতে চিবোতে, চটিশুদ্ধ পা নাচাতে নাচাতে।

ডেমোনিভাবে বলতে থাকেন, ভব, সারাটা দেশ কলকাতায় উঠে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো না? এই আমার কথাটা মনে রেখো, আর ক বছরের মধ্যেই দেশের পাট চুকবে। যদ্দিন জমিদারির ছিল্দিন মাটি কামড়ে থাকা। আমাদের তাই জমিদারি নেই, সব ক্ষেত্রে

একই ধোপে ৩ সুরে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে— অন্য যে-কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১। ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোবালি ময়লাই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২। ডেট কাপড়ের ময়লা বার ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩। ডেট কাপড়ে বাড়তি সাদা বোলায়, রঙ্গীকাপড় উজ্জ্বল করে—সাদা কাপড় আরো বেশী সাদা করে আর রঙীন কাপড় ক'রে তোলে আরো বেশী ঝলমলে।
(এতে নীল বা সাদা করবার অন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

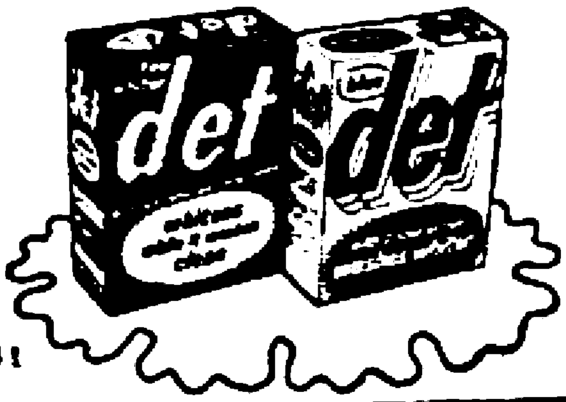

আজই কিনুন—ডেট! একমাত্র ডেট-এই পাবেন দুরকমের পাউডার—সাদা ও নীল।

বর্তিক ব্রাদার্স লিমিটেড, বোম্বাই

Shilpi-HPMA 81A/72 Beng

বসে আছি। বড় ছেলেটা এক, আর দি এস পাশ করে এসেছে। বড়দার ছেলেটাও পার্ক-স্ট্রীটে কেশিয়ার করছে। তুমি যেন সব জানো ভব।'

ভবনাথের এই নিমন্ত্রণ পা-নাচানো মোটেই বিরক্তি আসে। তাঁদের বাড়ির চেহারা, তাঁর বড়দার বোকা চোয়াড়েমি, দেবদার বিশাল পরিবার নিয়ে কোন রকমে দেড়চক্ক মেয়েদের একান্তভিত করে সংসার চালানো, কিম্বা বোনের অপরিসীম দৈন্য এসবের পাশে কুমুদ সেনের নিজের ও তার দাদার পরিবারের স্থিতিশীলতা এমন আড়ম্বর দিয়ে দেখানোর বিরক্তি বাড়ে।

'আর এক কাপ চা খাও ভব। ফার্স্ট ক্লাস লপচু টি। তুমি তো দার্জিলিং চা ভালবাস।'

ভবনাথ উঠি উঠি করেও উঠতে পারেন না। দ্বিতীয় কাপ চা-টা ভালই লাগে। কুমুদ চৌধুরীর পা নাচানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, 'তোমার বিকটার একবার ফিরে-ছিলে?'

'না, যাব।'

'তোমার মেজদা সাইকেলের দোকান দিয়েছে।'

ভবনাথ চমকে ওঠেন, 'সাইকেলের দোকান?'

'ও'র দুই ছেলে দেখে। তোমার দিকের একটা অংশ ভাড়া। ফজলের মেজো ভাই ওকালতিতে ভাল পসার হয়েছে।' তারপর আবার পা নাচানো শুরু করেন। বেশ একটা চাপল্যের ভাবও লক্ষ্য করা যায় তাঁর মুখে চোখে। সামনের টেবিলে ইংরেজী খবরের কাগজখানা ভাঁজ করতে করতে বলেন, 'শুনছি তোমার ভাড়াটে বড়বাবুর সঙ্গে মেজদার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হবে। তা হলেই ভাল। ঐ একটা ছোকরাই মানুষ হয়েছে, তার সব কটা ভাই বখেবাটে।'

আহত বিস্ময়ে ভবনাথ সামনের দিকে জানলার বাইরে জ্বলন্ত কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়-টার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তাঁর বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে তাঁর অজান্তে, সাইকেলের দোকান বসেছে নীচতলায়। আবার বড়বৌদির কথাটা মনে আসে। আবার সামনে প্রশান্ত বার্ধক্যের এই পা-নাচানো আত্মবিশ্বাস এক প্রবল মহাকর্ষে তাঁকে ধরে রাখে।

'এখানে থেকে কি করবে ভব? আমি সব জানি। তোমার বাবা থাকতে তোমাদের বাড়ির মাঠে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলেছি। তুমি তো অনেকদিন বাইরে। ইতিমধ্যে বাড়িটাও হাত বদলে গেছে। কোথায় তুমি মিস্ত্রি লাগাবে? তুমি নিশ্চয় জানো না—পার্কখানা নিয়ে ফৌজদারী কেস হয়ে গেছে তোমাদের বাড়ি? সারা পাড়া টাউন জানে। জিজ্ঞেস করো,—তোমাদের বাড়ির উল্টো দিকে মুদির দোকানে সবাই জানে।'

আসলে চুপ করে থেকে বলতে থাকেন, 'এখানে কোথায় আসবে? এই লাঠালাঠি, হৈ-হল্লা এখান থেকে চলে গিয়ে তুমি খুব ভাল করেছো ভব। তোমার স্বপনকুমারকে চিনতাম। আমি যখন বিহারে জামতাড়ায় তখন উনি ছিলেন জামুইয়ে। খুব বিচক্ষণ লোক। শুনেছি তোমার কলকাতার বাড়ি ও'রই পরামর্শে। এ তো ভেরি ওয়াইজ ডিসিশান।' কথার শেষে আবার পা নাচানো শুরু হয়।

'ইউ নো ইন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দেয়ার ইজ এ স্টোরি....আগে তো সংস্কৃত চর্চাটা ছিল, এখন একবার ঝালিয়ে নিচ্ছি...'

'কাকাবাবু, আমি আজ উঠি।' তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠলেন ভবনাথ।

কুমুদ সেন বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেকদিন পর একটা ভাল লোক পেয়েছিলেন কথা বলবার। বললেন, 'আরে অ্যাদ্দিন পর এলে, একটু বসেই যাও। তোমার কাকীমাকে ডাকি।'

'আজকে উঠি, মাত্র দুদিন ছুটি। এলামই যখন একবার বাড়িটা ঘুরে দেখি।'

'খাবারের খাওয়াটা...'

'না কাকাবাবু, পরের বার।' ভবনাথ বেরিয়ে যান হাল্কা পায়ে তাঁর [illegible]। কুমুদ চৌধুরী পা-নাচানো বন্ধ করে এক-মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকেন। তিনি জানতেন, আর পরের বার নেই এ ক্ষেত্রে।

দুদিন পর কলকাতায় ফিরে ভবনাথ দেখলেন কুমুদ সেনের কথাই ঠিক। বাড়ি বানানোর ধুম পড়ে গিয়েছে। একদিকে পুকুর বোজানোর কাজ, তার পাশেই বাড়ির ভিত গাঁথা—এরকম দৃশ্য হামেশা চোখে পড়ে। ট্রামে না গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস-বিহারী এভিনিউ ধরে ভবনাথ এগোন। দুধারে দু দু কাঠার মধ্যে এক একটা নতুন বাড়ি চারপাশের নির্জনতায় বিস্ময়। বাঁ-দিকে একটা মঠের চুড়ো, বেল আর চাঁপা-গাছের ধারে পুকুরের পাশে এক সার এক-তলা বাড়ি, দুপাশ একদম ফাঁকা। একটু এগোতেই সাদা ধবধবে কালো চকচকে রেলিং-দেওয়া তেতলা বাড়ি। মার্বেল পাথরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে এক বৃদ্ধ খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে লক্ষ্য করছিলেন ভবনাথকে। এবার গেটের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন। ভবনাথ একটু অবাক হলেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের পণ্ডিতমশাই। কতগুলো মানুষের চেহারায় কালের ছাপ কম। কিংবা কাল এক নির্দিষ্ট ছাপ মেরে দেয় কোন কোন মানুষের চেহারায়। তাদের ঠিক বয়স ধরা যায় না। কম বয়সে বয়স্ক লাগে আবার বেশী বয়সে তারুণ্যের দীপ্তি মরে না। এক এক টাইপ-গ্রুপের প্রভাবে এরা আজীবন থোয়াক্কেয়া করে। অন্তত জানকীজীবন চাটুজ্জেকে দেখে ভবনাথের এইরকম ধারণা জন্মায়।

'খুব অবাক হলে, ভবনাথ?' বেঁটে-খাটো, মেদমজ্জায়, ফর্সা ভদ্রলোকটি মোটা লেন্সের চশমার ভেতর থেকে গোল গোল চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠিক এইভাবে ক্লাসে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন ক্লাসে। ভবনাথ এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

'বাড়ি করেছেন স্যর?'

ভবনাথের প্রশ্নটা জানকীজীবন লুফে নিলেন। 'বিশ্বাস হচ্ছে না? মাস্টারমশাইদের এত বড় বাড়ি! কলেজ থেকে তো কিছু হয়নি, তিনটে ইউনিভার্সিটির হেড এগ্‌জামিনার, পেপার সেটার। রিটায়ার করার পর বরোদা ইউনিভার্সিটি নিয়ে গিয়েছিল। এলাহাবাদের অফার এখনও একটা আছে। তা আর এই বয়সে করতে ইচ্ছে করে না। বয়স ত কম হল না, কি বল?'

ভবনাথ এগোবার উপক্রম করতেই বল-লেন, 'আসলে সংসারে ওপরে আর কোন লোক নেই। তাই ভাবি, মিছিমিছি বসে না থেকে নিয়েই ফেলি। ছেলেটা কিছু করলে না ভব! কিছু করল না! শাস্ত্রে ঠিকই বলেছে, অবাধ্য পুত্রজনিত দুঃখ আর মৃত-পুত্রের শোক কল্পনা করলে মানুষের অপুত্রক থাকাই ভাল। বুঝেছো ভব।'

বিস্মিত ভবনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'বন্দেমাতরম্ আবার কি। গান্ধী কি করল, কে ফাঁসি গেল, কে ইংরেজের চাকরি ছেড়ে দিল, তাতে তোর কি বাপু! তুই একটা পণ্ডিতের ছেলে। সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোদের মানুষ করছি, তুই সব পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নেচে বেড়াবি? যার যা কাজ তাই করবে। রাজা দেশ শাসন করবে, চাষা আবাদ করবে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

আবার প্রশান্তচিত্তে ভবনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু বসে যাও ভব। চা খাও। আচ্ছা, প্রকাশটা কি করলে বলতো? আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল। একেবারে গোটা পরিবারটার মুখে চুনকালি দিল।'

ভবনাথ দু-হাত তুলে শূন্যে একটা নমস্কার ছুঁড়ে এগোতে থাকেন। একটু গিয়েই তাঁর বাড়ির মাথাটা দেখা গেল এক জ্বলন্ত রাধাচূড়ার মাথার ওপর দিয়ে। বেশ ঝকমক করে ছ কাঠার ওপর সদ্য সাদা রঙ চোপানো ধবধবে বাড়িখানা, কালো চকচকে রেলিং দেওয়া ব্যালকনিগুলো হাতছানি দেয়। এই কি তাঁর স্বপ্ন, বার্ধক্যের বারাণসী, অথবা? অথবা কী?

ভবনাথ আর চিন্তা করেন না। পাইপ আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন।

(ক্রমশ)

ছেলেদের জুতোর বিচিত্র ও বিপুল সমাবেশ এখন বাটার দোকানে-দোকানে। ছেলে বলতে—ইস্কুলে যাওয়া ছোট্টো ছেলে, দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ানো দুরন্ত ছেলে, ফ্যাশন-সচেতন তরুণ এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক সবাই—সকলের জন্যই হাল আমলের যাবতীয় জুতোর সমাবেশ এখন বাটার দোকানে। সব আলাদা আলাদা রঙের ও আলাদা আলাদা নকশার, যাকে যেটা সাজে। সুন্দর গড়ন, মার্জিত রুচি—সব মিলিয়ে চোখে-পড়া স্বাতন্ত্র্য—যেরকম চাইবেন সেই রকমেরই পাবেন। সেই সঙ্গে প্রতি জোড়া বাটার জুতো আগাগোড়া আরাম দিয়ে গড়া।
পিণ্টু ৭০
৮.৯৫
জুনিয়র ২০
১৪.৯৫—২০.৯৫
ওয়েরফাইন্ডার্স ৩৩
১১.৯৫—২৬.৯৫
সব বয়সের ছেলেদের জুতো
জুবিলী ৫১
১৭.৯৫
এক্সক্লুসিভ ৩৫
৪৬.৯৫
স্টেপমাস্টার ৬২
৩০.৯৫
এক্সক্লুসিভ ১১
৪৬.৯৫
Bata

CENTRAL LIBRARY

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবনীন্দ্রনাথ সত্যই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেশকে আত্মনিন্দা থেকে উদ্ধার করেছিলেন' আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছিলেন অবনীন্দ্রকে য়ুরোপ-আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখানো [illegible]। বিদেশের স্বীকৃতি, বিশ্বজনের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বিদেশে স্বীকৃতি না দিত, স্বামী বিবেকানন্দকে যদি আমেরিকা স্বীকৃতি না দিত, ইটালীর Caruso কে যদি মার্কিন দেশ স্বীকৃতি না দিত তাহলে কি আমরা বিরাট প্রতিভার পরিচয় পেতাম? উল্কোকার প্রতিভার আলো বয়ে নিয়ে যায় সং শিখায়। তারাই আনে গড়, প্রতিভার স্বাক্ষর।

অবনীন্দ্রনাথের আর্টের প্রতি আকর্ষণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ উদ্যানরচনা ও চিত্রশিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পিতা গুণেন্দ্রনাথ প্রথম যুগের আর্টস্কুলের একজন কৃতী ছাত্র। পিতামহী ছিলেন অতি স্বাধীনচেতা দৃঢ়চরিত্রের মহিলা। বৈধব্যপ্রাপ্তির পর গিরীন্দ্রনাথের বিধবাপত্নী যোগমায়া দেবী পৃথক হয়ে দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে (গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ, কাদম্বিনী ও কুমুদিনী) নিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ীতে উঠে আসেন। এটা ছিল ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানা বাড়ী।

অবনীন্দ্রনাথের শৈশবে শিক্ষাদীক্ষার মূলভিত্তি রচিত হয় প্রকৃতির পরিবেশে পল্লীশিক্ষায় ও আত্মসাধনায়। শিশুকাল থেকে ভৃত্যতন্ত্রের মধ্যে প্রতিপালিত হলেও অতি শিশুকালে সেই ঝিমঝিমে কান্না পদ্মদাসীর স্নেহ-মমতার স্মৃতি তাঁর মনে বার্ধক্যেও অম্লান ছিল। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, 'দাসদাসীদের কথা লিখে রাখলে মানব চরিত্রের বিশেষ এক দিক উদ্ঘাটিত হত।' তিনি দরদ দিয়ে উজ্জ্বলভাবে লিখেছিলেন পদ্মদাসীর কথা, মুক্তারামের কথা, চাকর রামলাল কুন্ডুর কথা, নবীন বাবুর্চি, হসমালি বাবুর্চির রান্না, ঈশ্বরা, বিপিন, মহাবীর, সন্তোষের কথাও বলতেন। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধ তাঁকে যথার্থ চরিত্র চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব সার্থকতা এনে দিয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন আত্মম্ভরিতা, কোন উন্নাসিকতা ছিল না, তাই তো তিনি তাঁর মরমী শিল্পী সত্তা প্রকাশে ও নানা চরিত্র চিত্রণে সার্থকতা আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীর 'ভিস্তি' আঁকতে শিশুকালের দেখা সেই লোকটির কথা মনে পড়ল যে হাতকাটা নীল জামা পরে, কোমরে খানিকটা লাল শালু জড়িয়ে নাহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মশোকে জল ভরতো। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ভিস্তি, যাত্রাদলে সাজার ভিস্তি, বহুরূপীর ভিস্তি দীর্ঘকালের সঞ্চিত ছাপ চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শাস্ত্রমতে ঠিক সময়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে রামখড়ি দিয়ে লিখে হাতেখড়ি হয়েছিল সত্য কিন্তু পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথেরও রবীন্দ্রনাথের মত নিয়মিত স্কুলের পড়া বেশী দিন ভাগ্যে জোটেনি। সেও এক আকস্মিক অঘটনে। তাও জুটলো এক ইংরেজ শিক্ষকের কাছে অপমাননাকর ও বিনাদোষে বেত্রাঘাত লাভে, আর যা আইনতঃ অচল। বাড়ীতে বসেই নানা বিদ্যার অনুশীলন চললো। কেন যে চিরাচরিত প্রথামত তাঁরা স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্য গেলেন না তা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। এত নিয়মতান্ত্রিক বাড়ীর সুব্যবস্থা সত্ত্বেও ছেলেরা কেন স্কুলে যায় না? ভীতি না কৌলীন্য মর্যাদা? যাই হ'ক, তাতে ফল ভালই হয়েছিল। তা না হলে কে পেতো রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে? কিছুকাল তিনি সংস্কৃত কলেজে ও ইংরেজি শেখার জন্য সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে বিশেষ ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করেন। এদিকে শিল্পচর্চায় পাঠও শুরু হয়ে গেছে বাড়ীতেই। প্রথমপর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রচেষ্টায় তিনি সাহেব চিত্রকর গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে শিল্পের পাঠ গ্রহণ করেন। ভাব ও ভাবনার রাজ্য থেকে তিনি নেমে এলেন জীবনের সত্য সাধনার পরিধিতে। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ যে সব ছবি আঁকলেন, তাতে পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পোর্ট্রেট অঙ্কনে পারদর্শিতা লাভ করেন।

একদিন প্রিন্স দ্বারকানাথের গ্রন্থাগারে চিত্রিত কাঠের পাটায় মোড়া মুঘলযুগের স্বর্ণাঙ্কিত পাণ্ডুলিপির চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হন। মন তাঁর প্রাচীন ভারতের শিল্পরীতি ও অঙ্কন ধারার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। কিন্তু ভারতীয় ধরনে যে ছবি আঁকবেন তার বিষয়বস্তু কি হবে? সেই সমস্যার দুর্গ থেকে উদ্ধারের পথ করে দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথকে মহাজন পদাবলীর অনবদ্য ভাব ও ভাষার চিত্ররূপ দেবার জন্য রং ও তুলিতে সাধনা সুরু করতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। ছবি-লিখিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লেগে গেলেন ভাবমধুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার রূপমাধুরী ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। বিশটি ছবি আঁকা হল। তবু ভরিল না চিত্ত। জন-জনের চিত্তে সাড়া জাগালো না।

শিল্পের অভিসার চললো। মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে, সকল বেদনা, সুখদুঃখের, মিলন বিরহের জোয়ার ভাটায় অসীম রসের শিল্পধারা যেন শত মুখী হয়ে গঙ্গা সাগরেতে ধায়।' 'মোগল, হিন্দু ও সাহেব' এই তিন আর্ট কোনো ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে মিলতে পারলো না। মোগলের আগে তুর্কীরা এসেছে বিজেতা হিসেবে এলো, তারা তুরস্ক শিল্পকেও সঙ্গে আনলে ও মিশিয়ে দিলে বৌদ্ধ শিল্পের শেষ যে ধারা চলছিল তার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথ এবার দেশী কায়দায় ছবি আঁকার সংকল্প গ্রহণ করলেন। দেখলেন 'মোগল শিল্পের সঙ্গে রাজপুত শিল্পের সংমিশ্রণ।' আপন প্রবৃত্তি অনুসারে নানা বিভিন্ন পথে শিল্পচর্চায় উন্মুক্ত পথের সন্ধানে শিল্পী এগিয়ে চলেন। এমন দিন আসবে যখন বিভিন্ন পন্থার হিসেব মিলিয়ে শিল্পের সামগ্রিক ইতিহাস রচিত হবে। নবীন শিল্পসৃষ্টির যুগসন্ধিক্ষণের এক অনন্য অনুভূতি অবনীন্দ্রনাথ অন্তরে অনুভব করলেন। তা' তাঁকে অস্থির করে তুললো। তিনি মনস্থির করলেন 'দেশী মতে ছবি আঁকতে হবে।' তিনি নিবিড় নিদিধ্যাসনে হৃদয়ঙ্গম করলেন 'মানবপ্রকৃতি ও শিল্পপ্রকৃতি এই দুইয়ের মিলনেই শিল্পের উৎপত্তি।' নতুন পথের সন্ধানে বিপ্লবী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এক প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেন. চিন্তা করলেন, ভাবের উন্মাদনায় রং ও তুলি নিয়ে নব নব

একটি বিশেষ মুহূর্তে শিল্পগুরু

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। অক্লান্ত সাধনায় রেখার সুকুমারত্বে, বর্ণের চমৎকারিত্বে রূপের অভিনবত্বে গড়ে তুললেন অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পী তাঁর আপন শিল্প-সাম্রাজ্য। আখ্যান ও চিত্রের বিষয়বস্তুর ভারতবর্ষে কোন অভাব নেই। মহাভারত, রামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ, কথাসরিৎ সাগর বৃহৎ কথা, জাতক প্রভৃতি মহাগ্রন্থ থেকে কত না অসংখ্য ছবি হতে পারে, তা অচিন্তনীয়। তাছাড়া পড়ে রয়েছে বিচিত্র এই দেশ ও মনোরম শোভা। অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন বুদ্ধ জীবন, কালিদাসের কাব্যসম্ভার থেকে শিল্পের বিষয়বস্তু।

তিনি স্বকীয়তার সন্ধানে স্বদেশী শিল্প-কলায়—গান্ধার শিল্প বৌদ্ধ চিত্রকলা, অজন্তার চিত্রকলা, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের চিত্রকলা, রাজপুত, মুঘল ও গুর্জর চিত্র-কলা, কাংড়া উপত্যকার চিত্রকলা, বাংলা পটশিল্পের চিত্রকলার বিশেষ অনুশীলন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে দেখি যে ছেলে-বয়সে বুড়ো আঙুলের ডগায় আঘাত পেয়ে যে চিহ্ন আমৃত্যু প্রকট ছিল, ছবিতে নরনারী-দের আঙুল লম্বা করে এঁকে তার প্রতি-শোধ নিয়েছেন। তাঁরই কথায় 'ছেলেবেলায় আঙুলের যে যন্ত্রণায় পার পেয়ে গিয়ে-ছিলাম, তারই শাস্তি বোধ হয় এই বয়সে লম্বা আঙুল এঁকে দিতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে।'

সমগ্র ভারতীয় শিল্পকলা মন্থন করে শিল্পে স্বকীয়তার সংযোগে তিনি নব্য-ভারতের আপন শিল্পপদ্ধতির উদ্ভাবনা আবিষ্কার ও প্রচলন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর Discovery of India মত প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পকে আবিষ্কার করেন।

ভারতীয় বোধকে উন্মেষ করতে হ্যাভেলের চিন্তাধারায় ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপর ভারতীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় শিল্পরচনায় অগ্রদূত হিসেবে পেলাম অবনীন্দ্রনাথকে ও শিল্প-সমালোচক ডঃ আনন্দকুমার স্বামীকে। ভারতীয় চিন্তাধারায় শিল্প সৃষ্টির ধরনকে প্রসারিত করার জন্য স্থাপিত হল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্যার জন্ উডরফের সভাপতিত্বে

'Indian Society of Oriental Arts'. এই সমিতি যথার্থই স্যার জন উডরফের ভাষায় has made the organised attempt at a reversal of the denationalising processes which have been at work. aided the growing national con-sciousness to reach the point of recovery which we trust, is the commencement of the rennais-sance of a true Indian Art".

প্রাচ্য শিল্প সমিতির উদ্যোগে ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। উৎসবের প্রথম স্মরণ স্থগিত হওয়ায় ১৯০৯ সালে, যখন কলকাতায় কোন শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালের শিল্পপ্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হল চীনা, জাপানী, মোগল ও কাংড়া চিত্রে, মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রে, ইউরোপীয় ধাঁচে আঁকা বহু শিল্পীর চিত্রে এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের আঁকা ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুত্থানের বহু চিত্রাবলী। সমিতির পক্ষ থেকে দুজন কৃতী শিল্পের ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃত্তির মূল্য হল পনের টাকা। একটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন উডরফ সাহেব অপরটি শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ; প্রথম বৃত্তিটি পান নন্দলাল বসু ও দ্বিতীয়টি সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিশেষ সমঝদার ও প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল, ব্লন্ট-স্টাইন, ডঃ কুমারস্বামী, ওকাকুরা, ক্রেমরিশ, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ ও আরও অনেকে। ভগিনী নিবেদিতা 'মডার্ন রিভিউয়ে' অবনীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কয়েকটি চিত্রের ওজস্বিনী ভাষায় তার বিশদ পরিচয় ও ভূয়সী প্রশংসাসূচক ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রাঙ্কনে স্বদেশীয়তার পরিচয় দিতে অবনীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব দেশী জিনিস ব্যবহার করতেন। নিজেও নানা দেশীয় রংয়ের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। নব উদ্ভাবিত অনেক রং উৎরে যায়। গুঁড়ো রং বেটে, গঁদ দিয়ে, গ্লিসারিন মিশিয়ে রংয়ের কেক তৈরি করতেন। গঙ্গামাটিও বিশেষ রংয়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সদ্য প্রকা-শিত দেশী রং পুস্তক থেকে রং প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করেন শিল্পগুরু।

আর্টস্কুলের উপ-অধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যখন আর্ট-স্কুলের উপ-অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময় কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কাজে ইস্তফা দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে সেই সময় প্রবল আন্দোলন হয়। তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯১৫ সালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে:—

We see the Secretary of State has been questioned in the House of Commons regarding Mr. Abanindranath Tagore's re-signation of the Vice-Principal-

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

ship of the Calcutta School of Art. Mr. Chamberlain however replied that he had no information and that as the matter was entirely in the hands of the Local Government, he was not prepared to make any enquiry into the matter. We think it was time that the Local Government issued a communique on the subject explaining their position in the matter and giving the facts of the case.

সলিল সেনের
উৎসর্গ
মূল্য ২.৫০
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবর থেকে বলছি
মূল্য ৩.০০ টাকা
শঙ্খবিষ
মূল্য—৩.০০
রক্ত কমল—৩.০০ দ্রৌপদী—৩.০০
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের
চরৈবেতি
মূল্য—৩.৫০
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা
অমর মুখোপাধ্যায়ের
মৃতদেহ
মূল্য—৩.২৫
এ আর পৃথিবী—২.৫০
শক্তিপদ রাজগুরুর বসন্ত ২.৫০
উমানাথ ভট্টাচার্যের জন্ম-মৃত্যু ৩.০০
জোছন দস্তিদার পথের মা ৩.০০
শচীন ভট্টাচার্যের অবতার ৩.০০
রঞ্জন সেনের অনুক্রমণ ২.০০
প্রতিবাদ ২.০০
দিলীপ মৌলিকের
ঝড় হাওয়া আলো ২.০০
মনীন্দ্র রায়ের কাক নাটক
নাটকের মত জীবন ৩.৫০
॥ নতুন প্রকাশ ॥
দিলীপ মৌলিক ও শান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত
আজকের একাঙ্ক
একসাথে ৮টি বিভিন্ন স্বাদের শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পৃথিবী। জোছন দস্তিদার। মনোজ মিত্রের। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের। শাম ভট্টাচার্যের। কিরণ মৈত্রের।
নির্মল—৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ চেম্বারলেন সাহেব চিরাচরিত পার্লামেন্টের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি I want notice বলে বসে পড়তে পারতেন। সেই সময় বাঙালী সমাজ তাঁর শিল্পের কত অনুরাগী ও তাঁর প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধা ও অসীম আস্থা রাখতেন তার প্রমাণ পাই ১৯১৫ সালের ১০ই ডিসেম্বরের ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তাঁকে সরকারের তরফে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি তাঁর ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন। হেমলেট ছাড়া হেমলেট নাটক অচল যেমন অবনীন্দ্র বিনা আর্ট স্কুলেরও সমদশা।

> The entire Bengalee community appeals to the patriotism of Mr. Abanindranath Tagore, C.I.E. to withdraw his resignation of the post of Vice-Principal of the Government School of Art. Without him the institution will be like the play of Hamlet with the part of Danish Prince left out. We appeal to Lord Charmichael to play the blessed role of a peace-maker which is so congenial to His Excellency's temperament. The retirement of Mr. Tagore from the School of Art will spell disaster for the cause of Indian —t.

সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেমের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যেন তিনি আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল পদ থেকে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বিনা ঐ প্রতিষ্ঠান হ্যামলেট নাটকের ডেনিস রাজকুমার হেমলেটের চরিত্র বাদ দিয়ে অভিনয় করার মত হবে। আমরা লর্ড কারমাইকেলকে আবেদন জানাচ্ছি যেন তিনি শান্তি স্থাপনের পুণ্য কার্যটি করেন। তাঁর কোমল স্বভাবের অনুগামী। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আর্টস্কুল থেকে বিদায় ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় আনবে।

এমনি ছিল তৎকালীন বঙ্গসমাজে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা। এই ঘটনা আজ থেকে বাপান্ন বছর পূর্বের কথা। তখন অবনীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বহু ছবি বিক্রী হয়ে গেছে, বহু ছবি নিজেই দান করেছেন, তা সারা ভারতবর্ষের রাজারাজড়া, বা ধনীলোক, শিল্পরসিকের কাছে বা আর্ট গ্যালারীতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'রাজনর্তকী', 'সাজাহানের মৃত্যু' প্রভৃতি দেখতে দেখতে বিস্মিত হতে হয়, তাঁর বহু চিত্র মুদ্রিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বহু চিত্র আজও অপ্রকাশিত ও অনাবিষ্কৃত আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক : ...

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রতিভা আবিষ্কারের এক অদ্বিতীয় পুরুষ। এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য কৃতত্তা উত্তরকালে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিল। যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, দর্শনে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, তেমনি শিল্প ক্ষেত্রেও তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন। খয়রার রাজার বদান্যতায় ও অনুগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। তারই মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপনার জন্য খয়রার রাণী বাগেশ্বরী দেবীর নামানুসারে 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের' পদের সৃষ্টি হয়। ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই সময় তিনি ধারাবাহিকভাবে উনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। সেই সময় 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু সেই লেখা প্রকাশিত হয়। উত্তরকালে প্রবন্ধগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই উনত্রিশটি প্রবন্ধে শিল্পাচার্য তাঁর অননুকরণীয় আপন স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় শিল্পতত্ত্বের ভাবময়, রসময়, রূপময় গভীর অন্তরের বাণী ও প্রকরণের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সত্যই আমরা পেয়েছি ছবি লিখিয়ে অবিন ঠাকুরকে।

শিল্প শিক্ষার বিস্তার :

চিত্র চিত্রন ছাড়াও তিনি প্রথম শিল্পবিষয়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'ভারত-শিল্প' নামক পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে 'চিত্রাক্ষর' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই তিনি 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা' সমাপ্ত করেন। পরে 'সহজ চিত্রশিক্ষা', ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারত শিল্পে মূর্তি' এক বিশেষ শিল্প বিষয়ের রচনায় এক বিরাট কীর্তি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও কৃতিত্বের মূলে রয়েছে—তিনি একজন জাত শিল্পী যিনি প্রগতির ও নবযুগের পথে অগ্রসর হতে দৃঢ়সংকল্প ও নিজ সাধনাকে নিশ্চিত পথে আনতে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুশীলনে সতত আগ্রহশীল ছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতে—

> "there is wrong notion about him (Tagore). People often refer his works to those of revivalists. But Tagore, as a matter of fact, vitalised many aspects of weakness in picture-making which existed in old form. His conception of pictorial themes hardly encroached into the domain of Moghul or Rajput miniatures, yet the spirit of his conception of pictorial themes was strictly Indian in Character".

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিজ্ঞানের কথা

আপনার স্বাস্থ্য আপনার নিজের হাতে

এই শিরোনামায় একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীর লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। বিজ্ঞানীর নাম নিকোলাই আমোসোভ। তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে এই বিজ্ঞানী এমন কতকগুলো কথা বলেছেন যা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। কিছুটা সংক্ষেপে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে প্রবন্ধটি উপস্থিত করছি।

শ্রী আমোসোভ বলছেন—কি ধনী কি দরিদ্র, বিশ্বের সব দেশেই স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যা দুশ্চিন্তার বিষয়। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কোনো কোনো দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্য উপকরণের অভাব, কোনো কোনো দেশে প্রাচুর্য।

কেউ কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, তা কেন হবে, মানুষের গড় পরমায়ু তো বেড়েছে, আর পরমায়ু বাড়াটাই তো দেশের মানুষের ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ—নয় কি? নিজেদের স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে লাভ নেই। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা মানেই সুস্থ-দেহে বেঁচে থাকা নয়। দীর্ঘ পরমায়ু অনেকের কাছেই দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে, তাঁরা বেঁচে থাকেন অনবরত অসুখে ভুগতে ভুগতে। হাসপাতালগুলোতে ঠাঁই পাওয়া দায়, ডাক্তারখানাগুলো রোগীতে উপচে পড়ছে। রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলার দিকে। শীঘ্রই এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়ে উঠবে উচ্চতর মাত্রায়। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের অধিক বয়স্কাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে চলার দিকে। সত্যি কথা গড় আয়ু পরমায়ু এখনো বাড়ছে কিন্তু তা খুবই ধীরে ধীরে। আর সম্প্রতিকালে গড় পরমায়ু যে বাড়ছে তার একমাত্র কারণ, শিশু-মৃত্যুর হার এখন খুবই কম।

তাহলে আমাদের করণীয় কী?

সবচেয়ে আগে যে-কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে স্বাস্থ্য পীড়া ও ওষুধ সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধ্যানধারণা আমূল পালটানো।

স্বাস্থ্যের গুরুত্ব

স্বাস্থ্যের গুরুত্ব যে কতখানি সে-বিষয়ে বিশদ করে বলার দরকার নেই। স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু যে-জিনিসটি স্বীকার করেন না তা এই যে নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে। তাঁদের ধারণা, স্বাস্থ্য হচ্ছে 'ভগবানের দান' আজ আছে কাল নেই। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে মানুষ নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের রক্ষক ও স্রষ্টা। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাকে শুধু সাহায্য করতে পারে মাত্র, সস্তা মেঠাইয়ের মতো থার হাতে স্বাস্থ্য কখনো তুলে দিতে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ডাক পড়ে তখনই যখন স্বাস্থ্য খোয়া গিয়েছে, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু এই সময়েও পুরোপুরি ওষুধের ওপরে নির্ভর করা চলে না। রোগীর নিজেরও খানিকটা চেষ্টা থাকা দরকার, খানিকটা ইচ্ছা-শক্তি, নইলে স্বাস্থ্যোদ্ধার কিছুতেই সম্ভব নয়।

কোন অবস্থাকে বলব সুস্থ অবস্থা? কোন অবস্থাকে পীড়া? শুনে মনে হতে পারে বোকার মতো প্রশ্ন করা হচ্ছে, যে কেউ বুঝতে পারে কোনটা সুস্থ অবস্থা কোনটা পীড়া। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মানুষ এমনভাবে তৈরী যে তার শরীর বিকল হওয়ার রেখাপাত তার মনের ওপরে যথোপযুক্ত মাত্রায় নয়। বাস্তব অবস্থা ও তৎসম্পর্কিত ধারণার মধ্যে ফারাক থেকে যায়। কখনো কখনো এমন ঘটে যে মানুষটি অসুখে পড়েছে কিন্তু সে তা টের পায়নি। আবার কখনো কখনো এমনও ঘটে যে মানুষটি সুস্থ কিন্তু তার ধারণা সে অসুখে পড়েছে। সভ্যতা, প্রায়োগিক অগ্রগতি, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান এমন অনেক বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে যার দরুন সে এক সময়ে স্বল্পায়ু হত। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন অসুখের কারণও। এই অসুখগুলো এমনিতে প্রাণঘাতী নয় কিন্তু অল্পে অল্পে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। যেমন, স্নায়ু বিকার, অনিদ্রা, অতি-উত্তেজনা, অ্যালার্জি, হাঁপানী ইত্যাদি। এসব রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন প্রায় অগুনতি।

আসল কথা এই যে শরীরের দিক থেকে মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছে, মনের দিক থেকে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খানিকটা হারিয়ে বসেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাভাবনার দায় চিকিৎসকের হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত।

আর এই সমস্যার মোকাবিলার (রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলা) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-কাজটি করা হচ্ছে তা হচ্ছে শুধু হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়িয়ে চলা, আরো অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করা, চিকিৎসার পদ্ধতি উন্নত করা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে ঠিক কাজই করা হচ্ছে। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান এভাবে হবার নয়।

মানুষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবান করে তুলতে হবে। মানুষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে হবে। অসুখ হওয়াটা মানুষের শরীরের ধর্ম নয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফল অসুখ, তাও ঠিক নয়।

নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। সে নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের রক্ষক ও স্রষ্টা। সেজন্যে অবশ্যই চাই তার নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগ—আন্তরিক ও একান্ত।

ভিত্তিহীন বিশ্বাস

নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষের দায়িত্বহীন মনোভাবের মূলে কিন্তু রয়েছে আপাতবিচারে একটি মহৎ উদ্দেশ্য। তা হচ্ছে নতুন নতুন ওষুধের প্রচলন এবং সাধারণভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ওষুধের চমকপ্রদ নিরাময়ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাস মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে। ফলে রোগ প্রতিরোধ করার জন্যে তার শরীরের—বিশেষ করে মনের—ক্ষমতা যে জোরদার করা দরকার, সেদিকে তার কোনো নজর নেই।

মানুষকে বলা হয়, শরীরের কিছুমাত্র গড়বড় টের পেলেই কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে হাজির হওয়াটাই সুবুদ্ধির পরিচয়। আবার সব সময়ে যে ডাক্তারের কাছে হাজির হবার প্রয়োজন আছে তাও নয়। হাতের কাছে অজস্র ওষুধ। কী হলে পরে কী ওষুধ, কী না-হলে পরে কী ওষুধ, বিজ্ঞাপন মারফৎ তা জানিয়ে দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা। মুড়ি-মুড়কির চেয়েও সস্তা দাম এসব ওষুধের, মুড়ি-মুড়কির চেয়েও নির্বিকারভাবে উদরসাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু একথা একবারও মনে রাখা হয় না যে একটি পেটেন্ট ওষুধ যতোই উপকারী হোক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনোদিকে তার দরুন কিছুটা অপকারও ঘটে যেতে পারে (যাকে বলা হয় সাইড এফেক্ট)। এবং এই অন্যদিকের অপকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল অসুখের চেয়েও মারাত্মক হয়ে পড়াটা অসম্ভব নয়।

সবচেয়ে আগে দরকার অসুখ সম্পর্কে ভয় কাটিয়ে ওঠা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বর্তমান স্তরে অধিকাংশ অসুখই সুস্থ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। আদৌ অসুখ হয়েছে কি হয়নি, শরীরের মধ্যে থেকে তার সংকেত পাবার জন্যে কান পেতে

থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, আঁতিপাঁতি করে তার লক্ষণ অনুসন্ধানও নিষ্প্রয়োজন। শরীরের কোথাও সামান্য একটু যন্ত্রণা হয়েছে কি ছোটো ডাক্তারের কাছে, সামান্য একটু অস্বাভাবিক লক্ষণ ধরা পড়েছে কি কিনে আনো ওষুধ, বিছানায় শুয়ে থাকো আর ওষুধ গিলে চলো—এমনটি যেন কখনো না ঘটে (মনে রাখা ভালো যে আজকের দিনে বিজ্ঞানের জোরে যে-সব পেটেন্ট ওষুধ বাজারের চলছে তার বেশির ভাগেই কোনো কাজ হয় না)। শরীরে যদি একটু যন্ত্রণা হয় তা সেরেও যাবে। শরীরই তাকে সারিয়ে তুলবে। শরীরে কোথাও একটু মোচড় দিয়ে উঠছে, কোথাও একটু অস্বস্তি হচ্ছে, তাই নিয়েই যদি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় তাহলে এই ব্যতিব্যস্ততাই হয়ে দাঁড়াতে পারে একটা অসুখের লক্ষণ, বিনা কারণে খানিকটা অশান্তি ছাড়া যা থেকে অন্য কোনো ফললাভ হয় না।

এই পর্যন্ত পড়ে কেউ কেউ হয়তো বলে উঠবেন, 'আমরা তো শুনেছি কোনো অসুখকেই তুচ্ছ করা উচিত নয়।' ঠিক কথা, অসুখ তুচ্ছ করা উচিত নয়। তাই বলে শরীরে সামান্য একটু মোচড় টের পাওয়া গেলেই 'অসুখ! অসুখ' বলে আতংকিত হয়ে ওঠা—তাও যেন না ঘটে। লক্ষণটি যদি এক-সপ্তাহ বা দু-সপ্তাহ ধরে বজায় থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

তাহলে আসল কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, অসুখকে ভয় করে চলার কোনো দরকার নেই, শরীরটাকে সর্বপ্রকারে সুস্থই অবস্থায় রেখে চলতে হবে।

তিনটি বিষয়

শরীরটাকে সর্বপ্রকারে সুস্থই রাখা—এটা তো আর কথার কথা নয়, বেশ খানিকটা চেষ্টাও সেজন্যে থাকা দরকার। কোন কোন বিষয়ে চেষ্টা? সর্বোপরি তিনটি বিষয়ে: ব্যায়াম, পরিমিত আহার, যথোচিত বিশ্রাম ও বিনোদন।

প্রথমে ধরা যাক ব্যায়াম মানুষের শরীরযন্ত্রটাই এমন যে তার মজুদ ভাণ্ডারটি প্রায় অফুরন্ত। এই ভাণ্ডারটিকে কাজে লাগাবার উপায় হচ্ছে ব্যায়াম। হৃৎপিণ্ডকে দিয়ে আরো দশগুণ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, ফুসফুসের ক্ষমতা আরো দশগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়, একইভাবে কিডনির সক্রিয়তা ও মাংসপেশীর ক্ষমতাও। তাই বলে চট করে কিছু হবার নয়, সারা জীবন ধরে ব্যায়াম করে চলতে হবে। ঢিলে দিলেই নাগালের বাইরে। আবার ফিরে পেতে হলে প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করা দরকার। অনেক সময়ে প্রচণ্ড চেষ্টাতেও আর ফিরে পাওয়া যায় না।

সাবধানী চিকিৎসক হয়তো এখানে বলে উঠবেন, 'শরীরটাকে অমন হেনস্তা করার দরকারটা কি বাপু, বাড়াবাড়ি ভালো নয়।' এই একটি ক্ষেত্রে সাবধানী চিকিৎসকের পরামর্শে কান না দিলেও ফল খারাপ হবে না এটুকু বলা যেতে পারে। ভয় পাবেন না, কষে ব্যায়াম করুন, দম বন্ধ করে ঘাম ঝরুক সারা শরীর থেকে, দম ফুরিয়ে যাক। একদিনে না হোক, সইয়ে সইয়ে। সাধারণ একজন সুস্থ মানুষের মাস ছয়েক সময় লাগা উচিত ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরটাকে পূর্ণমাত্রায় সুস্থই করে তোলার অবস্থায় পৌঁছতে।

যাঁরা কোনো সামান্য ধরণের ক্রনিক অসুখে ভুগছেন, বা যেখানে অসুখ যতোটা তার চেয়েও বেশি অসুখ হয়েছে এই ধারণা।—সেখানে ব্যায়াম হচ্ছে মোক্ষম ওষুধ। তবে এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করাটা ভালো। অন্ততপক্ষে কতখানি ব্যায়াম করতে হবে সেই পরামর্শটুকু। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের কোনো পরোয়া করার দরকার নেই।

কী ধরনের ব্যায়াম? বলতে পারা যায়, যা খুশি। এমন কোনো ব্যায়াম যাতে গোটা শরীরটা নাড়াচাড়া যায়। সাঁতার হতে পারে, দৌড় হতে পারে, মাটি কোপানো হলেও আপত্তি নেই। ব্যায়ামটা সকালবেলা সেরে নেওয়াই সুবিধের। আর যতোবার পারা যায় ততোবার, যতোক্ষণ পারা যায় ততোক্ষণ—হাঁটা, জোরে জোরে হাঁটা।

অতঃপর—পরিমিত আহার।

সাধারণত মানুষ খায় অনেক বেশি, যতোখানি তার প্রয়োজন তার চেয়ে। অভ্যাসটা শুরু হয় ছেলেবেলা থেকেই। শরীরটা ছেলেবেলা থেকেই অতিভোজনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে ভোজন মানুষের কাছে আনন্দের ব্যাপার।

মানুষের খিদে অনেকটা এই খাওয়ার অভ্যাস থেকে। খিদে যতোটা না শরীরের তার চেয়ে বেশি মনের। আসলে দেখা উচিত শরীরের ওজন ঠিক থাকছে কিনা। যতোটুকু খেলে শরীরের ওজন ঠিক থাকে ততোটুকু খাওয়াটাই ঠিক খাওয়া। শরীরের ওজন ঠিক থাকছে কিনা সেটা ঘন ঘন যাচাই করে নেওয়া দরকার। বাজারের ওজন যন্ত্রে অনেক সময়ে চার্ট লাগানো থাকে—উচ্চতা কত হলে স্বাভাবিক ওজন কত হওয়া উচিত তার নির্দেশ। বলা হয়ে থাকে, উচ্চতা যতো সেন্টিমিটার সেই সংখ্যাটি থেকে ১০০ বাদ দিলে যা পাওয়া যায় ততো কিলোগ্রাম হচ্ছে স্বাভাবিক ওজন। ভয় পাবেন না, শারীরিক মেহনৎ করে যদি আপনাকে জীবিকা অর্জন করতে না হয় তাহলে স্বাভাবিক ওজন আরো ৩-৪ কিলোগ্রাম কম হলেও ক্ষতি নেই।

কী খাবেন? আমাদের শরীরের জন্যে দরকার প্রোটিন, ভিটামিন ও কার্বোহাইড্রেট আরো কয়েকটি উপাদান। এগুলো আমরা আমাদের খাদ্য থেকে পাই, সেইসঙ্গে কিছু ক্যালোরিও। মনে রাখবেন শরীর সুস্থই রাখতে হলে যে দুটি না হলেই নয় তা হচ্ছে ভিটামিন ও প্রোটিন। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল, ডাল বা রুটিসহ—সামর্থ্যের বাইরে না হলে এই হচ্ছে খাদ্য। পেট ভরে খাবার দরকার নেই। যতোটুকু খেলে ওজন ঠিক থাকে ততোটুকু। কিছুদিনের চেষ্টায় নিজেই নিজের খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করে নিতে পারবেন। খিদে পেলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। খিদে নিয়েও সমান তেজে কাজ করা চলে। অল্পবয়সীরা ও মেহনতী মানুষেরা মিষ্টি ও স্নেহযুক্ত খাদ্য খেতে পারেন, অন্যদের বাদ দেওয়াই ভালো। পাতে নুন পারতপক্ষে খাবেন না।

তারপরে আসে বিশ্রাম ও বিনোদনের কথা। কিন্তু এই বিশ্রাম ও বিনোদনও এমন হওয়া উচিত যাতে তৎপরতার প্রয়োজন। আলস্যের জীবন আর যাই হোক স্বাস্থ্য ও পরমায়ু লাভের উপায় নয়। কাজ করতে করতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ুক। তাতে স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, মনও। তাই বলে ঘুম কমিয়ে সময় বাঁচাতে যাবেন না। ঘুম অবশ্যই চাই, একজন সুস্থ মানুষের যতোখানি প্রয়োজন। ঘুম যদি না আসে! এই ভয় কখনো মনের মধ্যে পুষে রাখবেন না। ঘুমোতে না পারার চেয়েও ঘুমোতে না পারার ভয় অনেক বেশি ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্যচর্চার একটি বিধি সব বয়সের পক্ষেই দরকার, বিশেষ করে বেশি বয়সের পক্ষে তো বটেই। কেননা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মজুদ ভাণ্ডার অনেকখানি খরচ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যচর্চা মজুদ ভাণ্ডারকে ফুরোতে দেয় না। যেমন সুন্দর থাকার জন্যে তেমনি সুস্থ থাকার জন্যেও খানিকটা কষ্ট করতেই হবে। কিন্তু তার পুরস্কারটাও কম নয়। শরীরটা যেন টগবগ

অক্টোবরের প্রথমেই প্রকাশিত হচ্ছে

চিকিৎসক সমাজ

একটি
ভিন্ন জাতের
শারদ সংখ্যা

২টি বৃহৎ উপন্যাস — ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, সন্তু বাগ

২টি বড়গল্প — ডাঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ডাঃ অমলকুমার দত্ত

গল্প
কবিতা
রম্যরচনা
নাটক
— বনফুল, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ডাঃ সোমনাথ নন্দী, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডাঃ নির্মল সরকার, ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র কবিরাজ, ডাঃ অশোক বাগচী, ডাঃ হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, আনন্দকিশোর মুন্সী, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিরাজ বনমালী মজুমদার, ডাঃ ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সিদ্ধার্থ পাল, ডাঃ নগেন নিয়োগী, তুষারকান্তি জানা, ডাঃ নিখিলরাম সর্দার, ডাঃ অসীম মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ — পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক/মনের আধার মস্তিষ্ক/আয়ুর্বেদে ডায়াবেটিস/দুধের পাস্তুরাইজেশন / জোঁকা বা নাছনা।

দাম—তিন টাকা

১৫১, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলি-৩৪

শিঙ্গার কুমকুম এ ললাটে অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে!

তুলে নিন, লাগিয়ে নিন শিঙ্গার কুমকুম। আপনার সুন্দর ললাট এর রঙের ছটায় হয়ে উঠবে অপরূপ। আপনার মুখকান্তিতে ফুটে উঠবে এক অপূর্ব শোভা—মনহর আভা… হৃদয়ে জাগাবে পুলক। ১২টি অনন্য বাহারি রঙের কুমকুম থেকে আপনার মনের ভাব বুঝে পছন্দমত মানানসই বেছে নিন আপনার রুচি মাফিক কুমকুম। আপনার প্রিয় শাড়ী, কুর্তা আর সবচেয়ে সেরা লুঙ্গী আর বেলবটমের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে লাগান শিঙ্গার কুমকুম—টিপ। দারুণ মানাবে।

চলুন—ফ্যাশন জগতে ভ্রমণ করুন।
শিঙ্গার—ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিকা মহিলাদের জন্যে কুমকুম বিন্দি

বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম

শিঙ্গার

ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি
ভেলভেট ফিনিশ

প্যারামাউন্ট উৎপাদন কলকাতা, বোম্বাই-৩৪ দ্বারা

করে, উড়ে উড়ে চলতে চায়। মুখধোয়া দাঁত মাজার মতোই নিয়মিত হওয়া চাই স্বাস্থ্য-চর্চা। শরীরের ক্রিয়াকাণ্ডগুলো তখন ছন্দোবদ্ধ হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকাটা আনন্দের ব্যাপার হয়।

ভিতরের ময়লা আগে পরিষ্কার করুন

প্রায় একই বিষয়ে একটি জোরালো প্রবন্ধ লিখেছেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী—প্রফেসর পিটার বীকনসফীল্ড—'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার গত ১৮ মার্চ সংখ্যায়। তিনি বলছেন, বাইরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে আমরা রীতিমতো একটা সোরগোল তুলেছি, কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরটাকে যে আমরা ক্রমশ দূষিত করে তুলছি সে ব্যাপারে কোনো সচেতনতা নেই। আমরা কি খবর রাখি যে বাজার-চলতি যে-সব ওষুধ আমরা অনবরত খেয়ে চলেছি তার অনেকগুলোই 'কোনো কাজের নয়' কিংবা 'অপকারী'? শুধু কি ওষুধ? আমরা কি জানি যে ফলের রস নামে যে পদার্থটি আমরা কিনে খাই তার পদার্থটি কৃত্রিম, রাসায়নিকের সাহায্যে তৈরি? আমরা কি জানি যে বাজার থেকে তৈরী অবস্থায় যে-সব খাদ্যদ্রব্য আমাদের ঘরে আসে তার অনেকগুলোতেই রাসায়নিকের সাহায্যে গন্ধ ও রং যোগ করা হয়েছে? এমন কি ওষুধের বড়ি ও ক্যাপসুলেও এই কৃত্রিম রং তৈরি করা হয়?

আমাদের শরীরের ভিতরটা দূষিত হচ্ছে তিন উপায়ে—(১) নিশ্বাসের সঙ্গে বাইরের দূষিত হাওয়াকে শরীরের ভিতরে নিয়ে, (২) খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে ভেজাল খেয়ে, (৩) পেটেন্ট ওষুধ খেয়ে। প্রথম কারণটিকে দূর করবার জন্যে রীতিমতো সোরগোল তোলা হচ্ছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণটি যদি দূর না হয় তাহলে প্রথম কারণটি দূর করায় কোনো ফল নেই।

এখনো পর্যন্ত আমরা ভালো করে জানি না পানীয় খাদ্য ও নানাজাতীয় পেটেন্ট ওষুধের সঙ্গে যে-সব অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক (যেগুলো যোগ করা হয় স্বাদ, গন্ধ, রং ইত্যাদি তৈরী করার জন্যে) আমাদের শরীরের মধ্যে যাচ্ছে সেগুলোর অপকারিতা কতখানি। কিন্তু দেখা গিয়েছে পরিবেশ দূষিত হওয়ার দরুণ মাছের শরীরে প্রজননগত বৈকল্যও ঘটে। মানুষের বেলাতেও না ঘটার কোনো কারণ নেই।

রাসায়নিকগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলা হচ্ছে কেন না এগুলো না থাকলেও চলে। তবুও এগুলো নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো পদার্থ মানুষের শরীরের পক্ষে অপকারী কিনা তা পরখ করে দেখার যে সাবেকী পদ্ধতি এখনো প্রচলিত তার সাহায্যে আজকের দিনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। প্রায় প্রতি-দিনই নতুন নতুন চেহারার খাদ্যদ্রব্য বাজারে ছাড়া হচ্ছে, নতুন নতুন নামের পেটেন্ট ওষুধ, সেগুলো পরখ করাটা প্রায় একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার—যদি না পরখ করার নতুন কোনো পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্য অপেক্ষা করতেই হবে, কিন্তু বাজার যে-ভাবে ভেজালে ছেয়ে গিয়েছে তার ফলে হয়তো কিছু একটা করার আগেই বড়ো রকমের সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।

গত পঞ্চাশ বছরে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত। তার ফলে শিল্পোন্নত শহুরে জীবনে চাপ পড়েছে এত বেশি যে আমরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারি নি, না শরীরের দিক থেকে, না মনের দিক থেকে। এবং আমরা প্রায় সকলেই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় হিসেবে হাত বাড়িয়েছি পেটেন্ট ওষুধের দিকে। জামা-কাপড়-জুতোর মতো ওষুধের একটি বাক্সও আমাদের জীবনে নিত্যসঙ্গী।

ওষুধের বড়ি কখন আমরা না খাই! ঘুম ভেঙে আনার জন্যে ওষুধ, ঘুম তাড়াবার জন্যে ওষুধ। শরীর মোটা করার জন্যে ওষুধ, শরীর রোগা করার জন্যে ওষুধ। বাচ্চা হওয়ার জন্যে ওষুধ, বাচ্চা না-হওয়ার জন্যে ওষুধ। দুশ্চিন্তা কমাবার জন্যে ওষুধ। উত্তেজনা কমাবার জন্যে ওষুধ। উৎফুল্ল থাকার জন্যে ওষুধ। স্নায়ু শান্ত করার জন্যে ওষুধ। প্রয়োজনের শেষ নেই, ওষুধেরও শেষ নেই। ঘুমের ওষুধ না খেয়ে অনেকে ঘুমোতেই পারেন না। পেটের গোলমাল নেই তা সত্ত্বেও নিয়মিত পেট পরিষ্কার করার ওষুধ খেয়ে চলেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। আর মহিলাদের ভিটামিন পিলের বাজার তো বেশ গরম।

এ ব্যাপার চলবেই। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে রাসায়নিক জগতে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে বলা চলে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে আরো মনোহর আরো সুগন্ধী করে তোলার জন্যে, আমাদের শরীরের সমস্ত রকমের গ্লানি দূর করার জন্যে অজস্র রাসায়নিক তৈরি হয়ে চলেছে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যিনি শরীরের মধ্যে কোনো গ্লানি খুঁজে পাবেন না তিনি অন্ততপক্ষে শরীরটাকে সুন্দর রাখার জন্যেও এমনি কোনো না কোনো রাসায়নিক সেবন করতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকে খেয়ে থাকেনও। এ ব্যাপার চলবেই। কিন্তু যে-জিনিসটি দেখা দরকার তা হচ্ছে এইসব অজস্র রাসায়নিকের অপকারিতা কতখানি, তা মারাত্মক কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানার একটা ব্যবস্থা।

রোগ নিরাময়ের জন্যে যে-সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর কোনো রকম অপকারিতা নেই সে-দাবি কখনো করা হয় না। যাকে বলা হয় এফেক্ট, তা থাকবেই। কিন্তু যেহেতু রোগটি সারবে, না সারলে রোগীর মারা যাবার সম্ভাবনা, কাজেই এই অসুবিধে মেনে নিয়েই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ব্যাপারটা ক্ষণস্থায়ী, কেননা রোগ সারলেই আর ওষুধ খাবার দরকার হয় না।

কিন্তু মুশকিল বাধে অন্য ধরনের ওষুধের বেলায়। যেগুলো বিশেষ কোনো রোগের নিরাময়ের জন্যে নয়, যেগুলো খাওয়া সাধারণভাবে শরীর ভালো রাখার জন্যে বা শরীরের নিত্যদিনের কোনো একটা উপসর্গ দূর করার জন্যে। এসব ওষুধের সাইড এফেক্ট একটু একটু করে জমতে জমতে শেষকালে যে কী চেহারা নেবে তা কেউ বলতে পারে না।

অন্তত এখনো পর্যন্ত বলতে পারার মতো অবস্থা তৈরি হয় নি। একজন মানুষের অসুখ করলে সেটা তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু জন-স্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। জন-স্বাস্থ্য বিপন্ন করে এমন সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সরকার আইন রচনা করতে পারেন। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ থাকা চাই। কিন্তু আমাদের সরকার হয়েছে যে নিছক এক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে নড়ানো চড়ানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। অতএব ভেজালের কারবার মহানন্দে চলছে, চলবে।

এই দুটি লেখা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার পরে অয়স্কান্তের পরামর্শঃ নিয়মিত ব্যায়াম করুন যতো পারেন হাঁটুন, অসুখের দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে ঠাঁই দেবেন না, নির্দিষ্ট অসুখ না করলে ওষুধ খেতে যাবেন না, কৃত্রিম রং ও কৃত্রিম গন্ধ (বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে) এড়িয়ে চলুন, বাজারের তৈরী খাদ্যদ্রব্যের ওপরে যতো কম নির্ভর করতে পারেন ততো ভালো।

—অয়স্কান্ত

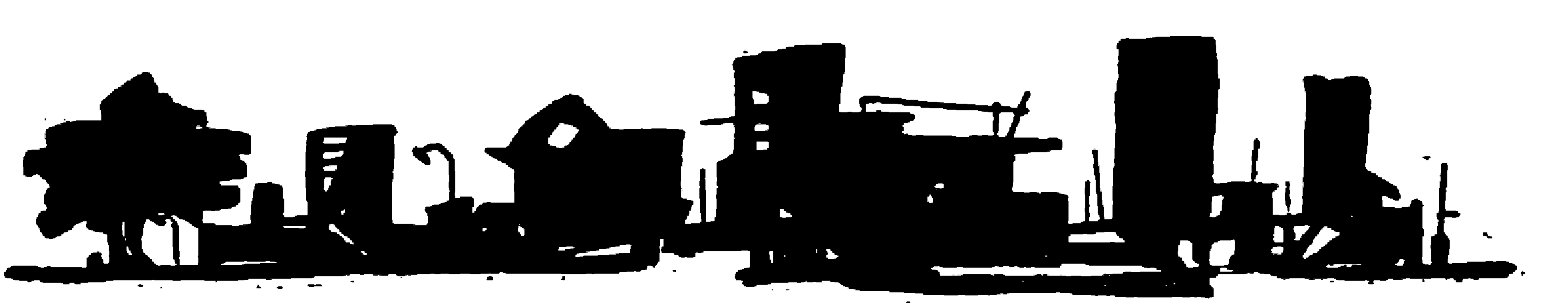

অঙ্গনা

পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরাই এখন নিজেদের নিয়ামক। অন্যান্য দেশের পক্ষে একথা যতখানি সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে। সে দেশে নারীসমাজ শুধু নিজেদেরই নিয়ামক নয় সেই সঙ্গে সমগ্র জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। সরাসরি দেশের শাসনব্যবস্থায় তাঁরা যে শুধু অংশগ্রহণ করেন তাই নয় একই সঙ্গে তাঁদের ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারার বলিষ্ঠ রূপায়ণে তাঁরা অবাধ সুযোগের অধিকারী। এই সুযোগের মূলকথা হল যে, তাঁরা সমাজজীবনের গোড়ার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ব জার্মানীতে এটি সার্থক হয়ে উঠেছে নারীসমাজের সার্থক সহযোগিতায় শিক্ষাব্যবস্থার পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে। এই কমিটির শতকরা ৭৫ জনই মহিলা। এমনিভাবে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের আরও নানা সংস্থায়। দেশের বাণিজ্যবিষয়ক সংস্থায় তাঁদের সংখ্যা শতকরা ৫০জন। সমবায় প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে নারীসমাজের একচেটিয়া। দেশের আইনজীবীদের মধ্যে তাঁদের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। বিচার ক্ষেত্রে তাঁরা এখনো পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে না পারলেও তাঁদের অগ্রগতি যে কোন দেশের নারীসমাজেরই ঈর্ষা উদ্রেক করবে। এই সঙ্গে দেশের শ্রম এবং কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলীতে তাঁদের যোগ্যতা গৃহীত হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে।

এই সংখ্যাগুলি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে নারীসমাজ খুবই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রতিফলন ঘটে দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পরিষদে। এদেশের সর্বোচ্চ পরিষদের নাম হল পিপলস্ চেম্বার। ৫০০ ডেপুটি এই পরিষদের মোট সদস্য। আর প্রতি ২৫ জনে একজন সদস্য হলেন মহিলা। এছাড়া মহিলাদের একটি সংসদীয় দলও আছে। সর্বোচ্চপরিষদ থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন অসংখ্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে—জেলা, শহর এবং বিভিন্ন অঞ্চলে। দুজন মহিলা হলেন সর্বোচ্চ পরিষদের প্রেসিডিয়ামের সদস্য।

এ সব ডেপুটিরা নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে যে কোন নাগরিক একুশ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। আঠার বছর বয়সে তাঁরা ভোটাধিকার পায়। ১৯৪৯ সালে পিপলস চেম্বারে মহিলা সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫০জন। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে প্রতি চারজনে একজন মহিলা ডেপুটি নেওয়ার কথা ছিল বর্তমানে মহিলা ডেপুটির সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশী। জেলা পর্যায়ে কোথাও কোথাও এই ডেপুটিরা পুরুষদের প্রায় অর্ধেক।

পূর্ব জার্মানীর নির্বাচনব্যবস্থাও বেশ অভিনব। এ দেশে নির্বাচনে দলই যে একমাত্র প্রার্থী মনোয়নের অধিকারী তা নয় দেশের সর্বত্র অজস্র সুসংগঠিত সংস্থা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে থাকে। এর ফলে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে এই সমস্ত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে তাঁরা বিশেষভাবে শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এর ফলে অনেক নাগরিক দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। ফলে দেশ ও রাষ্ট্রশক্তি আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

এই নির্বাচন কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর প্রার্থীকে যেতে হয় ভোটদাতাদের দরবারে। ভোটদাতারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। নানাভাবে তাঁরা প্রার্থীকে বাজিয়ে নেন এবং যাঁর উপর তাদের কোন আস্থা নেই তাকে সরাসরি নাকচ করে দেন। নির্বাচনের দিন ব্যালটে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তবে এই নির্বাচন শুধুমাত্র মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা এমনিতেই ভোটারদের সভা সমাবেশে নাকচ হয়ে যান তাঁরা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পান না। এভাবেই ভোটদাতারা চার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হন।

নির্বাচনে জিতলেই বাজীমাৎ হয়ে যায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব আরও সুকঠোর। তাদের নিরবচ্ছিন্ন জনসংযোগ বজায় রাখতে হয়। নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে নির্বাচকদের সামনে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। এই হাজিরা শুধু সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নয় যে কর্মক্ষেত্রে তিনি নিযুক্ত রয়েছেন সেখান থেকে সরাসরি তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদের সাহায্য করেন আঞ্চলিক কমিটিগুলো। তারাই সুযোগ এবং সুবিধা মতন ভোটদাতাদের সামনে তাঁকে নিয়ে আসেন। নাগরিকরা তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরেন। প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ হয় মহিলাদের জীবনের উন্নয়ন এবং পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত। কর্মীমায়েদের জিজ্ঞাস্য হলো সন্তানের লালনপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নানা বিধিব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস সংক্রান্ত। এই সঙ্গে জীবনধারণের উন্নতি প্রসঙ্গে তাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাও তাঁরা নিজেদের প্রতিনিধি মারফত রাষ্ট্রের গোচরে আনতে পারেন।

জনজীবনকে সুবিন্যস্ত করার জন্য নাগরিকরা প্রতিনিধি ছাড়াও নিজেরা নানাভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। সকল নাগরিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সেসব বহুল পরিবর্তনও করা যায়। তারপর তা আইনে পরিণত করে সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হয়। তখন তার মধ্যে আর নাগরিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছুই থাকে না। এর ফলে নাগরিকরা যেমন নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ পান তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের সঙ্গেও নিবিড় নৈকট্যবোধ করেন। এক কথায় তাঁরা নিজেরাই হলেন নিজেদের নিয়ামক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে নতুন পরিবারবিধি চালু হওয়ার আগে এরকম আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছিল ৩৪ হাজার। এতে অংশ গ্রহণ করেন প্রায় ৮ লক্ষ নাগরিক। তার মধ্যে আড়াই হাজার আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য।

মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নানা জীবিকায় রয়েছেন তাঁরাই এসব আলোচনায় যুক্ত অংশ নিয়ে থাকেন। সবসমেত পরিবারবিধির উপর ২৪ হাজার সংশোধনী পড়ে। এর মধ্যে অধিকাংশই নতুন আইনের সঙ্গে গৃহীত হয়। মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যাপারে এদেশের কেন্দ্রীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগই সর্বাধিক। রাষ্ট্র থেকেও একই উদ্দেশ্যে এই সংস্থাকে উৎসাহিত করা হয়।

এই সুষম ব্যবস্থার ফলে সে দেশের নারী সমাজ প্রগতির এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই এইসব সুযোগসুবিধা থেকে মহিলারা বঞ্চিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দেশে নারীই হচ্ছে আসল শক্তি। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, এক পক্ষ ভর করে পক্ষীর উত্থান কখনও সম্ভব নয়। অর্থাৎ নারী জাতিকে পেছনে ফেলে এগুতে চাইলে আমরা চিরকাল পিছটানেই ভুগব। এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না।

—[illegible]

সুবর্ণরেখার এপারের গ্রাম গোপীবল্লভপুর—মোহনপুর ওপারে। আদিবাসী সাঁওতাল ওরাং মুন্ডা মাঝিদের বসতি সে সব গাঁয়ে। আখের ক্ষেত, ফুটি তরমুজের বাগিচা, আম কাঁঠালের বাগান ঘেরা গাঁয়ের সীমানা। আলবাঁধা ধানের ক্ষেত, শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়া মডেলের মতন দেখতে। খড়িমাটি গোলা রঙে মাটির কুঁড়ে ঘর, লেপাপোছা উঠোনে আদিম মানুষের সৌন্দর্যবোধের ছোঁয়া। গেরস্তের হাঁস-মুরগী ঘুরে বেড়ায় উঠোনে উঠোনে। রাখাল ছেলে মোষের পিঠে চড়ে গরু ছাগল চরিয়ে বেড়ায় জঙ্গলের আশপাশে।

শহরের জটিলতা থেকে অনেক দূরে সুবর্ণরেখার তীরে তীরে অশান্ত ঝর্ণার উন্মাদ আবেগের মত মনের সুখে ঘর বেঁধেছে মুন্ডা মাঝিরা। গাঁয়ের বাসিন্দা বলতে তারাই, বিচার আচার সব তাদের হাতে। গাঁউটিয়ার কথা মেনে চলতে হয় সারা গাঁয়ের লোককে।

মোহনপুরের ঝগড়ু মাঝি, গোপীবল্লভপুরের কেন্দু মাঝির ভেতর বন্ধুত্ব অনেকদিনের। মন্বন্তরে, কুলিকামিন জোগাড়ে—সাথাসাথ তারা। নাড়ীর টান অনেক বহুদিনের। বোঙা পুজায়, ধরা পড়বে একসাথে মাদল বাজিয়ে নেচে না খেলে চলত না তাদের।

বাদ সাধে কুলিকামিনের মুক্তি-রোজগারির বাঁটোয়ারা নিয়ে—মুখ দেখাদেখি তাদের বন্ধ সেই থেকে। দু গাঁয়ের লোকেরও কথা বন্ধ। পথেঘাটে হাটেবাজারে দু' গাঁয়ের লোক ঝগড়া করে ছুতোনাতায়। মোহনপুর গোপীবল্লভপুরের দুশমন সেই থেকে।

বর্ষণমুখর আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে ঝর্ণাধারার মত সারা বিকেল ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। জ্যৈষ্ঠের খরতাপে পোড়ামাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে সবটুকু শুষে নেয় সে একচুমুকে। শালগাছের নতুন পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা দাগ কেটে গেছে পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। সুবর্ণরেখার বালুচরে বৃষ্টির জল পেতে দিয়েছে সমতল বালুর বিছানা। খাল বিল, নদীনালায় সোনাব্যাঙ মনের সুখে গান ধরেছে—কাঁকর কাঁকর করে।

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে সমরু মাঝি একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল পাহাড়ের গা বেয়ে সুবর্ণরেখার শুকনো বুকে পাহাড়ী ঢল নেমেছে। ছেলেবেলা থেকেই সে দেখে আসছে সুবর্ণরেখার রূপ ছুটে যায় সাগরের পানে। উজান বেয়ে সাগরের জল কোনদিন আসেনি তার শূন্য বুক ভরে দিতে। সুবর্ণরেখার বালুচরে দুকূল ভরে স্রোত বইতে দেখে সমরু ভাবতে থাকে নদীর মত যৌবনের দুকূল ভরা—সারীর মুখ। গোপীবল্লভপুরের ধানক্ষেতে কামিনের কাজ করে সে। কুলিসর্দার ডমরু মাঝির নেকনজর কেন্দুর মেয়ে সারীর দিকে, অনেকের মুখে শুনেছে সে।

সোমবারের হাটে এক ফাঁকে চাপাটির বগলে পাশ কাটিয়ে সারী ইসারায় তাকে জানিয়েছে—আজকের রাতে তার সঙ্গে দেখা করবে বোঙাবুড়োর ঘাটে। চাঁদনী রাতে নদীর পথে আধক্রোশ পথ ভেঙে যেতে মেয়েদের ডর লাগে। ভাম, ফেউ আর চিতা-বাঘের দৌরাত্ম্য আছে পথে। মেঘকালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সমরু ভাবে সে কি সারীকে এগিয়ে আনবে। গোপীবল্লভপুরের কারও নজরে পড়লে এভাবে গোপনে মেলা-মেশা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে।

কতদিন সে কাছে পায়নি সারীকে। দু মাঝির মুখ দেখাদেখি বন্ধের পর, তাদেরও দেখাশোনা বন্ধ। মোহনপুরের হাটে সারীর খোঁজে দু মাসের উপর ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছে সে। বোঙাবুড়োর

CENTRAL LIBRARY

জোয়ার তার দেখা পেয়েছে আজ। কিন্তু যদি সে রাতে না আসতে পারে? এমনি চাঁদনিরাত, প্রথম বর্ষার মাটির সোঁদা গন্ধ, সব মাটি হয়ে যাবে তাহলে। সারীর নিটোল স্তনের ঘ্রাণ পায় সমরু পোড়ামাটির সোঁদা গন্ধে। বুড়ো মাঝির চোখ এড়িয়ে সে শাল গাছের গোড়ায় দু' হাঁড়ি হেঁড়ে পুঁতে রাখে সারীর জন্যে।

সন্ধ্যের আগে পা টিপে টিপে সমরু বুনো তিতির ধরতে ফাঁদ পেতেছে শাল গাছের আড়ালে। আগুনে ঝলসানো মাংসের চাটে নুন ঝাল মিশিয়ে পেট ভরে হেঁড়ে খাবে তারা দুজনে। দিনের আলো পড়ে এলেও তিতিরের দেখা নেই। তাই সে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে দানা ছিটিয়ে রাখে ফাঁদের আশপাশে। মাটিতে মুখ চেপে, গামছায় মুখ ঢেকে ডাকতে থাকে তিতিরের ডাক।

ডাকতে ডাকতে সমরুর গলা ভেঙে আসে। এক ফাঁকে সে দেখতে পায় জোড়া তিতির তার ডাক শুনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ছুটে আসছে দানার গন্ধে। মাটির সাথে মিশে সমরু শুয়ে পড়ে গামছা ঢেকে। ঝটপটানি শুনে সে বুঝতে পারে, জোড়া তিতির আটকে গেছে তার পাতা ফাঁদে। চটপট মাটি ছেড়ে উঠে শালের ডাল মেরে তিতিরের ঝটপটানি বন্ধ করে দেয় সে। ফাঁদ উঠিয়ে ঘরে ফিরে বুড়ো মাঝিকে সে বলে—'বুড়োদাদা, বনমুরগী ধরতে ফাঁদ পাততে যাব নয়া গাঁয়ে—সুবর্ণরেখার তীরে।' তাকে সাবধান করে দিয়ে বুড়ো মাঝি বলে—'গোপীবল্লভপুরের দুশমনদের নজরে পড়িস নি যেন।'

তীর কাঁড় হাতে, ঝাঁকড়া চুলে শালের ফুটন্ত লতা জড়িয়ে, রঙিন গামছা কোমরে বেঁধে, সমরু সাজে অভিসার সাজে। আজকের রাতের বাসর জমজমাট করতে সে হাতে তুলে নেয় তিতির জোড়া, হেঁড়ের হাঁড়ি আর শালপাতার চুট্টা। কতদিন সে আদর করেনি সারীকে। তার কথা ভাবতে ভাবতে, এক চুমুকে শেষ করে ফেলে অর্ধেকটা হেঁড়ের হাঁড়ি।

বীরদর্পে নরম বালুতে পা ফেলে সমরু ধরে বোড়াবুড়োর ঘাটের পথ। পথে কোমরের টাঙ্গি তাক করে ছুঁড়ে মারে ছুটন্ত খরার দিকে। টাঙ্গির ঘায়ে খরার রক্তে ভিজে ওঠে সুবর্ণরেখার ভেজা বালু। কোমরে জড়ানো গামছায় খরা বেঁধে, কোমরে টাঙ্গি গুঁজে, কাঁধে তীর ধনুক ফেলে, সমরু জোর কদমে পা চালায় ঘাটের দিকে। একাদশীর আবো আলো ভরা চাঁদ উঁকি দিতে থাকে মেঘের বুক চিরে হাসির ঝলক ফেলে।

ছুটতে ছুটতে সমরু এগোতে থাকে তার অভিসারিকার খোঁজে। পথে কেয়ার ঝাড় থেকে কেয়া ফুল তুলে বানিয়ে নেয় হাতের বালা, মাথার বেণী—সারীকে সে উপহার দেবে রাতের আঁধারে। হেঁড়ের নেশা তার রক্তে জাগিয়ে তোলে অভিসারের উদগ্র কামনা। [illegible] জোছনায় সারীকে সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেখবে কোথায় তার অফুরন্ত প্রাণ-মাতানোর উৎস।

বোড়াবুড়োর ঘাটের কাছে আবছা অন্ধকারে মানুষের ছায়া পড়তে দেখে, দূর থেকে সমরু বোঝে, বাদল দিনের পড়ন্ত বেলার সুযোগ মোটেই অপব্যয় করেনি সারী। আঁধার নামতে না নামতে সে জোরে পা চালিয়ে এসেছে গোপীবল্লভপুরের ঘাট পার হয়ে। হাঁটু জল ভেঙে, দু' এড়িয়ে নদী পার হতে তার সময় লাগেনি মোটেও।

কাছে এসে চুপি চুপি সারীকে শাল জঙ্গলের ভেতর তার সাথে আসতে বলে সমরু। ডালপালা জড় করে চকমকি ঠুকে আগুন জেলে তারা বসে গাছের গোড়ায়। ঝলসানো তিতিরের সাথে হেঁড়ে খেয়ে দুজনে মেতে ওঠে ঘর বাঁধার কল্পনা জাল বোনায়। নেশায় রঙীন চোখ মেলে সারী বলে,—'তুই আমায় তোর ঘরে লে চল সমরু। বুড়া মাঝিটো বড় জ্বালায় আমাকে। সর্দারের সাথে সাঙা দেবে বোলে।'

বুকের কাছে সারীকে টেনে এনে, আদরে আদরে তার কালোচিক্কন মুখ রাঙিয়ে সমরু বলে—'বোলবে কেনে, বুড়াঠারে টাঙ্গির ঘায় সাবাড় করে ফেলবো তোর সাঙা দিলে।'

'ও কথা মুখেও আনিস না সমরু। বুড়াকেটো জিন। তার হাড় বের করা কাঁধ তোর কলজে ছিঁড়ে খাবে।'

আদরে সোহাগে সমরু জানায় সে চাকরী করবে পল্টনে। ছ' মাস বাদে হাতে পয়সা জমিয়ে সারীকে সাঙা করে নিয়ে যাবে তার সাথে। সারীর হাত দুখানি হাতে তুলে আদর করে পরিয়ে দেয় ফুলের বালা, খোঁপায় গুঁজে দেয় কেয়ার বেণী। বনজোছনায় ফাঁকে ফাঁকে দুজনে জড়াজড়ি করে চলতে থাকে ঘাটের দিকে।

পাতামাড়ানোর শব্দ শুনে দু কান সজাগ করে কোমরের টাঙ্গি তাক করে সমরু। ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সারী। শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। স্রোতের শব্দ পেয়ে বোঝে বনের প্রান্তে পৌঁছে গেছে তারা। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে সুবর্ণরেখার দু তীরে। ছলছল কলকল রবে নদী ছুটে চলে সাগরের পানে। মহুয়া গাছের পাশে সারীকে বুকে জড়িয়ে সমরু নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেয় বাসকতার পরশ। সারী কেঁপে উঠে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সমরুর বলিষ্ঠ দেহ। হাসতে হাসতে চাঁদের আলো ঢলে পড়ে নদীর জলে—আদিম নারী পুরুষের কামনার উৎসের সন্ধানে।

বিকেল থেকে সারীকে আনচান করতে দেখেছে ডমরু সর্দার। দিনের আলো পড়তে না পড়তে নদী তীরে মিলের কোয়ার্টার থেকে সারীকে হন্তদন্ত হয়ে নদী পার হতে দেখে, সন্দেহ জাগে তার। টাঙ্গি হাতে শিকার খোঁজার ছলে, নদী পেরিয়ে সে পিছু ধরে সারীর। বোড়াবুড়োর ঘাটের কাছে তাকে থামতে দেখে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়ে সর্দার মাঝি। অন্ধকারে পুরুষের সাথে সারীকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখে পা টিপে টিপে দূরে থেকে তাদের পিছু নেয় সে। আগুনের আঁচে সমরুকে চিনতে পেরে, গা ঢাকা দিতে দূরে সরে থাকে সে। তাদের রাতের অভিসারও তার চোখ এড়ায়নি। এ কান ও কান করে কেনারু মাঝির কানে তোলে ডমরু সে রাতের কথা। বুড়োকে টাকার লোভ দেখিয়ে সারীকে সাঙা করতে চায় সে। রোকবারের হাটে সারীর জন্যে কিনে আনে পেতলের বাউটি, বর্ণা শাড়ী, বুড়ো মাঝির জন্যে আনে ডিবা ভর্তি গাঁজার ছিলিম। আস্ত ছাগল কেটে মাংস তোলে বুড়ো মাঝির বাড়ী। কন্টীর ওরাং মাঝিদের নেমন্তন্ন করে আনে তার বাড়ীতে সাঙার কথা পাকা করতে। গাঁজার ঝোঁকে বুড়া বলে—'সর্দার বটেক ডমরু মাঝি। শালগাছের সমান তার কোমরের বেড়, মোষের মতন ছাতির বের। সারীর দুর্গা বর বটেক ডোমরু।'

কেনারুর কথায় সায় দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠে ওরাং মাঝিরা। ডোমরুর সাথে সারীর সাঙা পাকা হয়ে যায়। ফাগুনে সাঙার দিন ঠিক হয়। বান ডাকে হেঁড়িয়া আর ভেলাই মহুয়ার। মাংস ভাত খেয়ে মাঝিরা জঙ্গলের ঝুপড়িতে ফেরে রাতে। সমরু সারীকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে, দল ছেড়ে ফিরে আসে কেনারু মাঝির বাড়ী। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় সারীর রণচণ্ডী মূর্তি। মাটিতে আছাড় খেয়ে বুড়ো মাঝির পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে সে বলছে—'আমারে মেরে ফেলিস না তুই। উয়ার সাথে বিয়া দিলে আমি বাঁচবো নারে। শয়তানটো দুদিনে আমাকে ঠেঙায় মারবে।'

থমকে দাঁড়ায় ডমরু সর্দার। তার ইচ্ছে করে তখনি সারীর কথার জবাব দেয়। দুগালে আচ্ছা করে চড় কষিয়ে। সে মাতাল, গুন্ডা? দাঁতে দাঁত ঘষে ডমরু ফেরার পথে নিজের মনে বলে—'আচ্ছা দেখা যাবে তোর দেমাক কত। দুমাস সবুর কর। তোর রসের নাগর সমরুর লাশ টেনে খাবে শেয়াল শকুনে। লড়াই থেকে সে আর জ্যান্ত ফিরছে না জানিস। তখন এই ডমরু মাঝির পা ধরে কত সাধতে হবে তোকে।'

আসামের জঙ্গলে শিলপার মাইনারের কাজ পেয়ে সমরু আহ্লাদে আটখানা হয়ে, পল্টনের পোশাক পরে, মিলিটারি লরি চড়ে দূর দেশে পাড়ি দেয় সমরু। বোড়া বুড়োর ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আনমনা হয়ে পড়ে সে। সারীর মুখ মনে হতে, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে তার। যাওয়ার সময় সারীর সাথে দেখা হল না বলে, মনে মনে আক্ষেপ থেকে যায়। সেদিনের কথা ভেবে সমরু ঠিক করে টাকা জমিয়ে ঘরে ফেরার সময় সারীর জন্য গড়িয়ে আনবে রুপার বালা কোমরের গোট।

চীনের সাথে লড়াই বেধে যায়। চার ধারে সাজ সাজ রব। সমরুর ছুটি মেলে না। কাজের চাপ বেড়েই চলে ক্রমশ। নেফা সীমান্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এম্যুনিশন জোগাবার ভার তার কোম্পানীর উপর। তাদের দলে দেড়শজন সিপাহী। সঙ্গে

সমস্ত পাহারা। দল ছেড়ে চলে যাওয়ার উপায় নেই কারোও। পাহাড়ী পথে দিনে রাতে তদারকী করে, হাঁপিয়ে ওঠে সমরু। রাতের অন্ধকারে তাঁবুর ভেতর শুয়ে চোখ বন্ধ করে সে ভাবতে থাকে সারীর চিকন-কালো মুখ। সুবর্ণরেখার তীরে শাল জঙ্গলে ঘেরা তাদের কুঁড়ে ঘর। সামরিক জীবনের আদব কায়দা একঘেঁয়ে লাগে তার। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা বনের মানুষের চোখ সভ্যতার আলোতে ধাঁধিয়ে যায়, দিশেহারা হয়ে পড়ে সে।

নেফা সীমান্তের পাহাড় উপত্যকা, বনজঙ্গল অচেনা অজানার মত লাগে সমরুর। সুবর্ণরেখার তীরের পাহাড় জঙ্গল কত আপন তার কাছে। কনভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হয় তাকে। বৈরী নাগাদের হামলার ভয়ে নির্জন পাহাড়ী পথে তাদের সতর্ক থাকতে হয় সব সময়। নাগাবস্তীর আশেপাশে কনভয় বেঁধে সমরু মিশতে চায় তাদের সাথে। মানুষের সঙ্গ পেতে কত সাধ জাগে তার মনে। কিন্তু মনের মত সঙ্গী জোটে না তার। সেনা-বাহিনীর লোকেরা তাদের সঙ্গে মন খুলে মেশে না। শুধু একজনকে তার ভাল লাগে —সে কনভয়ের কমিশনড অফিসার মহিন্দর সিং।

ছাউনীতে ফিরে মহিন্দর সিংকে তার মনের কথা জানায় সমরু। সারীর সাথে তার সাঙার কথাও জানাতে সে ভুলে না। ঘরে ফিরতে দেরী হলে সারীর সাঙা হয়ে যেতে পারে ডোমরু মাঝির সাথে, তাও সে জানায় তাকে। কথা শুনে মহিন্দর সিংয়ের মনে কেমন যেন মায়া জাগে। সে ছুটির দরখাস্ত লিখে সমরুর সই করে সেদিনই পাঠিয়ে দেয় কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে। একমাসের ছুটি মঞ্জুর হয় সমরুর। দেশে ফেরার তোড় জোড় করে, ইম্ফলের বাজার থেকে চাঁদীর বালা, রুপোর হার গড়িয়ে আনে সমরু। মহিন্দর সিং তার ভাবী বউয়ের জন্যে পেছাপোট উপহার পাঠায় তার হাতে।

ট্রাক, ট্রেন, বাস বদল করে মোহনপুরে পৌঁছোতে পাঁচদিন কেটে যায় সমরুর। ঘরে ফিরে বুড়া মাঝিকে কত কথা সে শোনায় লড়ায়ের। ঝগড়ু মাঝিকে নোয়া লুঙ্গা পাট্টা পরতে দেয়। খাওয়াদাওয়া চুকিয়েই মোহনপুরের হাটে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে সে। হাট বসতে তখনও বেশ দেরী কিন্তু সমরুর সময় যেন আর কাটতে চায় না। সারীকে খুঁজে পেতেই হবে তাকে হাটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। খাঁকি হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরে বুট পায়ে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গট্‌গট্‌ করে সমরু হেঁটে চলে হাটের দিকে।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। সারীর দেখা নেই। সমরু হতাশ হয়ে পা বাড়ায় গোপীবল্লভপুরের ধানকলের দিকে। হাঁটুর জল ভেঙে নদী পার হয়ে মিলের ফটকে এসে দাঁড়ায় সে। চাতালে ধান শুকোতে দেখে সমরু ডাক দেয় সারীকে দূর থেকে। সমরুকে দেখে চমকে ওঠে সারী—যেন সে ভূত দেখছে রাতের অন্ধকারে। তার পা ভারী হয়ে আসে—মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বিস্ময়ে হতবাক্ সারী পা পা করে এগোতে থাকে ফাটকের দিকে। পেছন থেকে ডমরু মাঝির ডাক শোনা যায়—'আচ্চু কোথা যাবি র'।'

সমরুর সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সারী। মুখের কথা সে হারিয়ে ফেলে। সারীর সিঁথি দেখে সমরুর বুঝতে বাকী থাকে কিছু। সারীর মুখ চোখের নীরব ভাষা, তার সুডোল হাতে কালশিরা পড়া দাগ দেখে সমরু চমকে উঠে—তাকে সঙ্গে আসতে বলে।

সুবর্ণরেখার তীর ধরে তারা চলতে থাকে—আগে আগে সমরু পেছনে সারী। পথ চলতে সারী হাঁপিয়ে ওঠে। বোঙা বুড়ার ঘাটে এসে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে। সারীর হাতে চাঁদির বালা পরাতে গেলে রুখে পেছিয়ে সে বলে—'পরপুরুষের বালা হাতে দেব কেনে?' থমকে সমরু জিজ্ঞেস করে—'আমি তোর পর হলে, আপন তোর কে?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সারী। মুখ নীচু করে বলে—'আমার পেটে যে ডমরুর পুত।'

সারীর কথা শুনে সমরু পাথর বনে যায়। বালা জোড়া হাতে তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলে নদীর মাঝে। ছপাৎ করে শব্দ তুলে বালাজোড়া চিরদিনের মত হারিয়ে যায়—সুবর্ণরেখার বালুচরে। বন-বাদাড় ভেঙে পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে সমরু। যেন তার পেছন পেছন চাবুক হাতে তেড়ে আসছে ডোমরুর পুত।

কনভয় ছেড়ে ছাউনিতে ফিরে সমরুকে দেখে চমকে ওঠে মহিন্দর সিং। তার শুকনো মুখ, কোটরে বসা চোখ দেখে সে বোঝে কড় বইছে সমরুর মনে। সারীর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সে থেমে যায়। সমরুর চোখমুখের নীরব ভাষা তাকে জানিয়ে দেয় সব কথা। ধীর পায়ে সমরুর কাছে এসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মহিন্দর বলে—'দুখুর মানুষের কি এত সহজে ভেঙে পড়তে আছেরে? কত সইতে হবে আমাদের। জীবনভোর লড়াই আমাদের সঙ্গের সাথী।'

মহিন্দর সিংয়ের কাঁধে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সমরু বলে—'কিসের জোরে আর লড়বো সর্দার। সুবর্ণ-রেখার দরে আমি যে সব খুইয়ে এসেছি।' সমরুর দুঃখে সমবেদনা জানাতে টপটপ করে দুফোটা চোখের জল ঝরে পড়ে মহিন্দর সিংয়ের চোখ বেয়ে। লাহোরের পথে সমরুর মত সেও সব খুইয়ে পাষাণ বনে গেছে কতকাল আগে, জীবনভোর সেও লড়ছে একা।'

অভিনব সাড়া জাগানো অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী
বহু তথ্য সমৃদ্ধ অসংখ্য চিত্রশোভিত — যাত্রীর লেখা

মূল্য : ৬·০০

বইখানি খুবই সুন্দর হইয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ)।
ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী (বারাণসী হিন্দু বিদ্যালয়)।

প্রাপ্তিস্থান :
প্রকাশক : শ্রীউৎপলপ্রভ সরস্বতী, ফোন : ৪৬-৫৪০৭
৮৭।৫, রাজা সন্তোষকুমার মল্লিক রোড, কলি:-৪৭
কথা ও কাহিনী : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
দে বুক স্টোর্স : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ১৭ থেকে ২১ আগস্ট অবধি অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এখানে সর্বসমেত পঁচাশিটি ছবি প্রদর্শিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া বাইশ-জন শিল্পীর ছবি রাখা হয়েছিল। অবনীন্দ্র-নাথের নিজের আঁকা ছবির সংখ্যা ছিল পঁচিশখানি। এগুলির কোনটিই অবশ্য রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনীর ছবি নয়। আর পূর্বোক্ত প্রদর্শনীর চাইতে এই প্রদর্শনীর ছবির মাউন্টিং বাঁধাই ইত্যাদি অনেক ভাল। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি যদি অনুগ্রহ করে তাঁদের জিম্মায় রাখা ছবিগুলি একটু ভাল করে বাঁধিয়ে রাখেন তা হলেও কিছুটা উপকার হয়।

অবনীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রদর্শনীর ছবিগুলি বেশীর ভাগই ছোট মাপের। কয়েকটি পোস্ট কার্ড সাইজের বা তার চাইতেও ছোট এবং বেশীর ভাগই নিসর্গ দৃশ্য। এতটুকু ছবিতে বিশাল স্পেস সৃষ্টির কাজটি প্রথমেই চোখে পড়ে। পুরী দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এর দৃশ্যাবলীতে এই গুণ বিশেষভাবে দেখা যায়। কার্শিয়াং বাজারের টিনের ছাদের আলো এবং অল্প মেঘলা আকাশের সুদূর হাতছানি এই প্রায় মনোক্রোমে আঁকা ছবিটিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সমুদ্রতীরে রোদের ওপর বাউল এবং সমুদ্রতীরে একটি নির্জন বাড়ি প্রায় একই ধরনের কাজ হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন মুড সৃষ্টি করেছে তেমনি আরেকটি ছবির সাগর তীরের বালুকাবেলায় কয়েকগাছি ঘাস এক অদ্ভুত নির্জনতার পরিবেশ তৈরী করেছে। কতকগুলি গাছের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট পরিত্যক্ত বাড়ির নির্জনতা আবার অন্য মেজাজের ছবি। তেমনি প্রায় সিপিয়া রঙের বিকৃমূর্তির সামনে ক্রীড়ারত শিশু বিষয়বস্তুর অভাবনীয়তা ও সমসৃষ্টির চাতুর্যে দৃষ্টিকে ধরে রাখতে চায়। লণ্ঠন হাতে রমণীমূর্তি, মন্দিরদ্বারে ভিখারী মাধবিকা বা রাঁচীর দৃশ্যে তাঁর ছবির ট্রিটমেন্টের বৈচিত্র্য দেখতে পাই। ধর্মসভা ছবিটি মনে হয় তাঁর গোড়ারদিকের কাজ এবং জাপানী ধরণে আঁকা অগস্ত্যমুনি নামের ছবিটি আসলে কপিল মুনির ছবি কারণ তাঁর পিছনে অশ্বমেধের ঘোড়া এবং সামনে উদ্যতআয়ুধ সগর সন্তানগণ।

এখানেও দেখা গেল যে অবনীন্দ্রনাথ কোথাও নিজের ছবির পুনরাবৃত্তি করেননি। আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিও কম। কারণ কার্শিয়াং-এর বাজার ও একটি মাত্র গাছের পটভূমিকায় সুদূরের হিমালয় পর্বত একই অঞ্চলের দৃশ্য হলেও আঙ্গিক ও মেজাজে ভিন্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও দেখলে বোঝা যায় যে একটা মন

ধর্মসভা : অবনীন্দ্রনাথ

থেকেই এদের সৃষ্টি এবং এই মনটিই ছিল অবনীন্দ্রনাথের দুর্লভ রত্ন। যেটি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাজে বিশেষ দেখা যায় না। তাই তাঁরা ওয়াশ পদ্ধতির নকল হয়েছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তেমন কেউ শিক্ষা লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন নন্দ-লাল বসু, তাঁর নটীর পূজা (বৃহৎ কিন্তু জমাট নয়), সীতার অগ্নিপরীক্ষা, কালী, সাঁওতাল ইত্যাদি ছবি নিয়ে। আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের আনারকলি, রাধাকৃষ্ণ, ঈর্ষা ইত্যাদি ছবিগুলির প্রায় পারসিক রীতির পরিচ্ছন্ন রেখা ও বর্ণাঢ্য ওয়াশ নিয়ে বেশ জমাট ছবি। একটু বেশী রোমান্টিক হয়ত কোথাও বা একটু সেন্টি-মেন্টাল, কিন্তু ক্র্যাফটসম্যানশিপের গুণে পরিস্ফুট। চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্নানের ঘাট ছবিটির পরিচিত পরিবেশ ভাল লাগে। হীরাচাঁদ দুগাড়ের কেশরিয়াজী মন্দিরের কাছ থেকে দেখা রূপ খুব পরিচ্ছন্ন ছবি। মুকুল দে'র 'নৃত্যরতা' অনেক দুর্বল কাজ এবং অসিতকুমার হালদারের বঙ্গললনাও বিশেষ জোরালো নয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'পরশ' এবং শিবদুর্গা ও গণেশ বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত। নিছক দক্ষতা ছাড়া আরো কিছু রয়েছে— বিশেষ করে পরশ ছবিতে। চারু রায়ের পুরীর তীর্থ কাশী ও অসমাপ্ত বুদ্ধ ও সুজাতা দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের ছবি। শেষোক্ত ছবির রঙের ঔজ্জ্বল্য বেশী কিন্তু প্রথমটির টোনের কাজ সুন্দর।

গগনেন্দ্রনাথের কালীদর্শন ও মাকি জাপানী ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলের কাজ তবে খুব ভালো নিদর্শন নয়, এবং তাঁর বিরহিণী ছবিটি তাঁর নিজের কিনা সন্দেহ হয়।

প্রশান্ত রায়ের মুকুলন ছবিতে গগনেন্দ্র নাথের রীতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ চালিয়ে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। গোপাল ঘোষের 'প্যালেস ডল' সূক্ষ্ম ওয়াশে আঁকা পরিচ্ছন্ন ছবি তবে 'গৃহ প্রাঙ্গণ' ছবিটি তত জমেনি। চিন্তামণি করের তিনখানি পৌরাণিক ছবিতে ক্ষিতীন মজুমদারের রীতির প্রভাব বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। একদা তিনি তাঁরই ছাত্র ছিলেন।

এছাড়া প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালী-পদ ঘোষাল, দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় ইন্দু দুগড়, শৈলেন দে এমন কি গোষ্ঠকুমার প্রভৃতি আরো কয়েকজনের ছবি আছে। এঁদের সকলেই অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন না এবং সকলের কাজ খুব রসোত্তীর্ণ বলা চলেও না। তবে সুনয়নী দেবীর তাপসী উমা, রাধা, সরস্বতী এবং হর-পার্বতী তাঁর নিজের সরল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে। সমগ্র প্রদর্শনীতে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দুঃখের কথা এসব ছবি কেবলমাত্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কল্যাণেই লোক-চক্ষুর গোচর করা হয়েছে। নইলে এটুকুও অগোচরেই থেকে যেত। বর্তমানে যেটা একান্ত প্রয়োজন হয়েছে তা হল একটি জাতীয় শিল্প সংগ্রহশালা যেখানে বাংলার প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবরকম শিল্পকর্মের নিদর্শন ধারাবাহিক রূপে সংরক্ষিত থাকবে। অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে কি ধরণের ছবি আঁকা হত যার প্রতিক্রিয়ায় অবনীন্দ্রনাথ নিজের শিল্প-শৈলী সৃষ্টি করলেন সেটা না জানতে পারলে তাঁর কর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না। তেমনি তাঁর সমকালীন অথচ তাঁর শিষ্য নন এসব শিল্পীদের কাজও থাকা দরকার। তার পরে প্রয়োজন একেবারে আধুনিককালের শিল্পীদের শিল্পকর্ম সংরক্ষণের। এই ধরণের যুগ বিভাগ করে একটি সংগ্রহশালা করলে বোঝা যাবে শিল্পকলায় ক্ষেত্রে আমরা আগের চেয়ে এগিয়েছি না পিছিয়ে পড়েছি।

লীলা প্রদর্শনীর কালীবেশে জনৈকা শিল্পী

প্রেক্ষাগৃহ

বাংলা চলচ্চিত্রজগতে আবার সঙ্কটের কথা ঃ

ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি শ্যামধান জালান গেল বুধবার, ২৫ আগস্ট আচমকা একটি বোমা ফাটিয়েছেন। কারণ, শিয়রে সংক্রান্তি করে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে এমন একটি বিবৃতি দিয়েছেন, যাকে 'এস-ও-এস কল' বা বিপদসঙ্কেত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি সোজা জানিয়ে দিয়েছেন, কলকাতার ফিল্ম স্টুডিওগুলি ১ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের দরজা বন্ধ করবে এবং কর্মীদের মাহিনা চোকাবার জন্যে স্টুডিও-মালিকদের হয়ত স্টুডিওর যন্ত্রপাতি বিক্রয় করতে হতে পারে। কারণস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যে, ১৯৫৭ সালে যেখানে ৭২টি বাংলা ছবি তৈরী হয়েছিল, সেখানে এখন মাত্র ৭টি ছবি নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। কাজেই কয়েক মাস বাদে একখানিও নতুন বাংলা ছবি তৈরী হবে না এবং স্টুডিওগুলি বন্ধ হয়ে গেলে শত শত দক্ষ কলাকুশলী, অন্যান্য কর্মী এবং শিল্পীরা বেকার হয়ে পড়বেন। এই চরম বিপজ্জনক অবস্থা এড়াবার জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য দেবার জন্যে আর্জি জানিয়েছেন, একটি চলচ্চিত্র-উন্নয়ন-পরিষদ স্থাপন করতে অনুরোধ করেছেন এবং চিত্রগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে উদার লাইসেন্স প্রদাননীতি অবলম্বন করতে বলেছেন। এছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তিনি স্টুডিওগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে রাজ্য সরকারকে থোক হিসাবে অর্থসাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন এবং সংগৃহীত প্রমোদকরের অর্ধেক অংশ ছবির মালিকদের ফেরৎ দিতে বলেছেন। এটাকে ভরতুকি হিসেবে গণ্য করা হবে।

শ্রীজালান পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সেনকমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি চলচ্চিত্রশিল্প উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি জানান এবং ঐ সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীজালান আশা করেন, সরকার এই রাজ্যের বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গীন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং এই মুমূর্ষু শিল্পকে বাঁচাতে সাহায্য করবার জন্যে অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবেন। যদি সরকার এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অপমৃত্যুর জন্যে তাঁরা কর্তব্যচ্যুতির অপরাধকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। শ্রীজালানকে ধন্যবাদ, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গীন অবস্থা প্রকাশ করবার জন্যে।

লীলা প্রদর্শনীর পরিচালক
রুফাস কোলিন্স

বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী তিনটি বিভাগেরই প্রতি-

নিধিত্ব করে ইস্টার্ন মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন। কাজেই তার সভাপতিত্বের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে, আমরা আশা করব, শ্রীজালান নিশ্চয়ই জানেন, টালিগঞ্জের স্টুডিও অঞ্চল গোল কয়েক মাস ধরে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এবং ১৯৭১ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ওখানকার কোন্ স্টুডিওতে কি কি ছবির শুটিং চলছিল ও চলছে, সে কথাও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। প্রতি স্টুডিওর এসটাবলিশমেন্ট খাতে কি ব্যয় হয় এবং নির্মীয়মান ছবির প্রযোজকদের কাছ থেকে কত টাকা আদায়ের সম্ভাবনা, তাও তাঁর নখদর্পণে থাকা উচিত। কাজেই স্টুডিওগুলির আর্থিক অবস্থা যে ক্রমেই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে পড়ছে, তা জানতে পেরে তিনি তাঁর সংস্থা মারফত এবং এককভাবে এতদিন ধরে কি কি প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন, তা' আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে এবং মাত্র সাতদিন হাতে রেখে '১ সেপ্টেম্বর থেকে স্টুডিওগুলি বন্ধ হয়ে যাবে'—এই গুরুত্বর সংবাদটি সাধারণে ও সরকারের কাছে উপস্থাপিত না করে আরও সময় থাকতে করলেন না কেন, তাও আমরা জানতে চাই।

অথচ দেখছি, পশ্চিমবঙ্গের ৩০৫টি স্থায়ী চিত্রগৃহের মধ্যে যে ৬০টি মাত্র বাংলা ছবিই নাকি প্রদর্শন করে থাকে, সেগুলি লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে বলে তাদের পক্ষে ই আই এম পি এ রাজ্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়েছে, এই চিত্রগৃহগুলিকে যদি অবিলম্বে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা না হয়, তাহলে এরা হিন্দী ছবি দেখাতে বাধ্য হবে। এবং এই স্বাবলম্বী করার অর্থ হচ্ছে, এই চিত্রগৃহগুলিকে পাঁচ বছরের জন্যে প্রমোদকর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া, যাতে এদের মালিকেরা টিকিটের দামকে যথাযথ রেখে ঐ প্রমোদকর বাবদ টাকাটা নিজেরা নিতে পারে। অর্থাৎ যে-টাকাটা বাংলা ছবির প্রযোজকদের প্রাপ্য হওয়া উচিত তাদের লোকসানের ভার কমাবার জন্যে, সেই টাকাটা চিত্রগৃহের মালিকেরা হস্তগত করতে চান বাংলা ছবি দেখানোর খেসারত স্বরূপ। আর তা যদি নিতে দেওয়া না হয়, তাহলে তাঁরা হিন্দী ছবি দেখাবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। এবং তাও ই আই এম পি মারফত।

আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশান সত্যিই কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে—প্রযোজকদের, পরিবেশকদের, না প্রদর্শকদের অর্থাৎ চিত্রগৃহের মালিকদের? সভ্যসংখ্যায় ভারী বলে চিত্রগৃহের মালিকেরাই কি আজ ই-আই-এম-পি-এর আড়ালে কলকাঠি নাড়ছেন? তাঁরাই কি এ-হেন অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছেন, যাতে বাংলাদেশ থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজনা-শিল্প চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়? এবং হিন্দী ছবি দেখিয়ে তাঁরা যে-মজা লুঠছেন, সে মজা বোল আনা হয়? ই-আই-এম-পি-এর প্রযোজকশাখা কি বলেন?

সংবাদে প্রকাশ, গেল বৃহস্পতিবার, ২৬ আগস্ট তারিখেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সরকারীভাবে জানানো হয়নি স্টুডিও-মালিকদের ১ সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করবার সিদ্ধান্তের কথা। এবং মাত্র এক সপ্তাহের নোটিশে স্টুডিও বন্ধ করা যথেষ্ট আইনসংগত কিনা তাও বিবেচ্য।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের, বিশেষ করে প্রযোজনাশিল্পের আর্থিক কাঠামো যে আদৌ দৃঢ়ভিত্তিক নয়, উল্টে যথেষ্টই নড়বড়ে, এ-খবর রাজ্য সরকারের যে জানা নেই, তা' নয়। ১৯৬০ সাল থেকেই রাজ্য সরকার এই শিল্পটিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্যে কম-সে-কম তিনটি কমিটি নিয়োগ করেছেন এবং প্রতিটি কমিটিই যথাসময়ে তার রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু যেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভিশপ্ত রাজ্যটিতে কোনো নির্বাচিত সরকারই বেশীদিন টিকছে না এবং আইনশৃঙ্খলারক্ষণ রূপ সরকারের প্রাথমিক কর্তব্যটিই যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না, সেখানে চলচ্চিত্রশিল্প সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি যে সেলফজাত হয়ে পড়ে থেকে তাদের ওপর পুরু ধুলো জমতে থাকবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু প্রেসিডেন্টস রুল চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভার নিয়েছেন, তখন কেন্দ্রেরই উচিত, আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম বাহক এই বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পটি যাতে চিরতরে লুপ্ত না হয়ে যায়, তার জন্যে আশু প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করা। আমাদের মনে রাখা উচিত, মানুষ মাত্র ভাত-রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তার মনের খোরাকেরও প্রয়োজন এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই মনের খোরাক সুষ্ঠুভাবে যোগানোর ব্যাপারে বাংলা চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসামান্য।

বাংলা রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীর প্রণাম

ভারতের শ্রেষ্ঠ সমিতির নাট্যশাখা, পিপলস লিটল থিয়েটারের নেপথ্যকর্মী ও শিল্পিবৃন্দকে সাধুবাদ জানাই, তাঁরা গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতলাল প্রমুখ বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী স্মরণে প্রণাম জানিয়েছেন উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'টিনের তলোয়ার' নাটকটির অভিনয়প্রসঙ্গে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের আদিযুগের কিছুটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর 'টিনের তলোয়ার-এ। এর আছে তিনটে দিক। এক, সেই নাটকে লোকগুলির ছবি, যাঁরা মাতাল গেঁজেল ও বারবণিতাসক্তের অখ্যাতিকে শিরোপা জ্ঞান করে প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষার পীঠস্থান-স্বরূপ সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে গড়ে তুলেছিলেন ও শত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। দুই, রাস্তার মেয়ে ময়নার আঁতনেরীকুলরানী শঙ্করীতে রূপান্তরের

শক্তি সামন্ত নিবেদিত—বর্তমান যুগের ছবি—একটি বালক যে অপরাধের পর অপরাধ করে চলেছিলো এবং অবশেষে মায়ের আর প্রেয়সীর ভালবাসার স্পন্দনে সে পেয়েছিলো অমৃতের সন্ধান.........

৩রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শুরু হচ্ছে।

লীনা চন্দাভরকর • সন্ধ্যা রায় • বিনোদ খান্না • জয়শ্রী • হেলেন

প্যারাডাইস - কৃষ্ণা - জেম - গণেশ - দর্পণা - মেনকা
ছায়া - কালিকা - আলেয়া - নিউ রয়্যাল - শুকতারা
ও ২৭টি অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে।

ইতিহাস। ও পরে শঙ্করীকে উপঢৌকন দিয়ে নিজস্ব থিয়েটার স্থাপনের কথা। এবং তিনি, নাট্যশালার সমাজদর্পণ হিসেবে কাজ করতে করতে জাতির মনে বন্দিদশা উন্মোচনের আগ্রহ জাগানোর ভূমিকা গ্রহণের চিত্র।

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার ক্যাপ্টেন বেণিমাধবের মধ্যে আমরা গিরিশচন্দ্রের ছায়াকে দেখতে পাই এবং ময়নার জীবনে নটী বিনোদিনীর জীবনের কিছুটা ছাপ পাই বার্নার্ড শ'-এর 'পিগম্যালিয়ন'-এর সঙ্গে মিশ্রিতভাবে। অশ্লীলতা নয়, ইংরাজবিদ্বেষ ও স্বাদেশিকতাই যে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে ইংরাজ-শাসকের চক্ষুশূল করে তুলেছিল এবং তারই ফলে ১৯৭৬-এর কুখ্যাত ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্টের প্রবর্তন, তাও এই নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন শ্রীদত্ত। কিন্তু ময়নার আবিষ্কার দিয়ে যে-নাটকের আরম্ভ, 'সধবার একাদশী' হতে হতে 'তিতুমীর'-এর পালায় গান দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটানোর নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু যেন যথেষ্ট সরে গেল। প্রিয়নাথ-এর চরিত্রটি যদি আরও পরিস্ফুট হত, ময়না ও বেণিমাধবকে লক্ষ্য রেখে সে যদি 'তিতুমীর' নাটক রচনা করত এবং বীরকৃষ্ণ দাঁর সঙ্গে ময়না ও তিতুমীর—এই দুটি বিষয় নিয়েই যদি তার সংঘর্ষ বাধত এবং প্রথমে বেণিমাধব বীরকৃষ্ণের দিকে এবং পরে মানবিকবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে সে প্রিয়নাথের পক্ষাবলম্বী হত, তাহলে নাটকটির একটা পরিপূর্ণ চেহারা আমরা দেখতে পেতুম। লক্ষ্য করা গেল, হাল্কা কথার সাহায্যে পরিস্থিতি ও দৃশ্যরচনায় এবং চরিত্রচিত্রণে শ্রীদত্তের যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ পায়।

'টিনের তলোয়ার' নাটকটি যে রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। নাটকের মধ্যে নাটক দেখাশোনার পক্ষে রবীন্দ্রসদনের ঘূর্ণন-মঞ্চ এবং প্রশস্ততা অতিমাত্রায় সহায়ক হয়েছে। আগেকার যুগের নাট্যাভিনয়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল স্টেজের ঠিক সামনে পাদপ্রদীপের এ-পারে, প্রেক্ষাগৃহের একেবারে সামনের অংশে বসা 'অর্কেস্ট্রা' পার্টি। এই পার্টির বিভিন্ন যন্ত্রীর হাতে থাকত ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট, স্যাক্সোফোন, বেহালা, করতাল, অর্গ্যান, তবলা, ঢোল প্রভৃতি। আমরা স্টার থিয়েটারে দক্ষিণারঞ্জন সেনের "ব্যারিকা অর্কেস্ট্রাকে বাজাতে দেখেছি। সে-বাজনা শোনবার মতো। নাটক আরম্ভ হবার আগে এবং প্রতি অঙ্কের আগে এই অর্কেস্ট্রা-বাদন হত। এবং দর্শক যখন বাজনার তারিফ করত হাততালি দিয়ে তখন দলের নেতা দর্শকদের দিকে ফিরে অভিবাদন জানাতেন। শ্রীদত্তের 'অর্কেস্ট্রা' একটি অপপ্রয়াস মাত্র।

শ্রীদত্ত বোধ করি জানেন না, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যরথীদের বর্ণজ্ঞান আজকের দিনের কোনো নটপ্রবর থেকে বিন্দুমাত্রও কম ছিল না। এবং আরও জানেন না, সে-যুগের পোস্টার, হ্যান্ডবিল প্রভৃতি রচনা করতেন ওঁরা নিজেরাই এবং কোনো ছাপা জিনিস

[illegible] লীনা চন্দাবরকর

প্রুফ না দেখে সাধারণ্যে প্রকাশিত হত না। কাজেই 'রোহিন্দ্র' প্রভৃতি বানান বা 'গ্রান্ড প্রদর্শনী' গোছের ভাষা সে-যুগে আদৌ সম্ভব ছিল না।

মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা গৈরিশ ছন্দের আবৃত্তি সম্বন্ধেও শ্রীদত্ত এবং অন্যান্য শিল্পীর অপটুতা দেখে ব্যথিত হয়েছি। 'এগিয়ে যাও ও চেঁচিয়ে বল'—এ-নীতি অপটু, অশিক্ষিত শিল্পীদের দ্বারা অপ্রধান চরিত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই চালু ছিল। কিন্তু যখন ওঁরা নিজেরা বা মহেন্দ্র বসু, অমৃত মিত্র, বেলবাবু, তিনকড়ি, বিনোদিনী অভিনয় করতেন, তখন আবৃত্তি হত অর্থবহ—সুরেলা হলেও অর্থবহ—তাতে স্বরের উত্থান-পতন, উদারা, মুদারা, তারা—সব খাতেই স্বরের ধারা বইত প্রয়োজন বোধে।

বীরকৃষ্ণ দাঁর চরিত্রটি যেমন নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেছেন, সমীর মজুমদারও তাকে রূপায়িত করেছেন একটা গোটা রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে। এই চরিত্রটিই 'টিনের তলোয়ার'-এ সবচেয়ে সু-অভিনীত। এর পরেই বলব, আণ্ডুর বা কাপ্তেনবাবুর ভূমিকাটি জীবন্ত রূপ নিয়েছে শোভা সেনের অভিনয়গুণে; তাঁর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও প্রত্যয়পূর্ণ। তবে 'ছন্দ' আবৃত্তি ত্রুটিহীন নয়। ময়না বা শঙ্করীর ভূমিকায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায় আকর্ষণীয় অভিনয় করেছেন। কিন্তু প্রথম গানখানি ছাড়া অন্যান্য গানে তাঁর কণ্ঠের ক্ষীণতা প্রকাশিত। অসিত বসু অঙ্কিত প্রিয়নাথ চরিত্রটি প্রথম দিকে যতো সবল, শেষের দিকে ততটা নয়। অপরাপর অভিনয় সাধারণ পর্যায়ের এবং বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

নানারকম ত্রুটি সত্ত্বেও 'টিনের তলোয়ার' নাট্যরথীদের প্রশস্তিসূচক বলেই প্রশংসনীয়।

ইউনিটি থিয়েটারের
মৌনমঞ্জরী
নাটক / নিরূপ মিত্র
নির্দেশনা / অরুণ চৌধুরী
৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়
অঙ্গনায় টিকিট

(৩) হিন্দী নাটকে জীবন্ত অভিনয় :

আমরা পূর্বে "অনামিকা" নাট্যসংস্থা দ্বারা বাদল সরকারের "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটকটি ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল কর্তৃক হিন্দী-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হতে দেখেছি এবং সেই অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের মতামতও প্রকাশ করেছি। শুনেছিলুম, বোম্বাই শহরের থিয়েটার ইউনিট সংস্থাটিও অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে এই হিন্দী রূপান্তরটি অভিনয় করে থাকে এবং এই সুখ্যাতির মূলে আছে খ্যাতনামা নট-নাট্যকার-পরিচালক সত্যদেব দুবের সু-পরিচালনা এবং ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় সু-অভিনয়। সত্যদেব দুবে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন আমেরিকা ইউনিভার্সিটি সেন্টার পরিচালিত "যুব-চলচ্চিত্র" সম্পর্কে একটি আলোচনা সভায় যোগ দেবার জন্যে। তাঁর এই কলিকাতা আগমনের সুযোগে "অনামিকা" সংস্থা তাঁকে দিয়ে ইন্দ্রজিতের ভূমিকাটি অভিনয় করিয়েছেন তাঁদের "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাট্যাভিনয়ে গেল ২৮ আগস্ট কলামন্দির বেসমেন্ট থিয়েটারে। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের প্রতিটি অনুভূতির এমন বিচিত্র প্রকাশ আমরা আগে কখনও দেখিনি—বাচনে, ভঙ্গীতে, চলাফেরায় চরিত্রের এমন জীবন্ত প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ বিস্মিত। পূর্বে সাক্ষাৎকারের সময়ে শ্রীদুবে আমাদের বলেছিলেন, আমার প্রথম ভালোবাসা থিয়েটারের প্রতি (থিয়েটার ইজ মাই ফার্স্ট লাভ)। দেখলুম, অভিনয়কলাকে তিনি রীতিমত আয়ত্ত করেছেন। এই সঙ্গে আর একজনকেও দেখলুম, যার অভিনয়প্রতিভা আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। সে হচ্ছে "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর বিভিন্ন নারী-চরিত্রের একক অভিনেত্রী কুমারী যামা অগ্রবাল। এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চরিত্রান্তর, তার বাচনভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তির পরিবর্তন যে তার দ্বারা সম্ভব, মঞ্চের বাইরে এই সুশীলা, সুদর্শনা মেয়েটিকে দেখলে অনুমান করা কঠিন। এমন একজন পারঙ্গম অভিনেত্রী যে-কোনও সংস্থার গর্বের বস্তু। শ্যামানন্দ জালানের "লেখক" ভূমিকার অভিনয়-আমরা আগে দেখেছি এবং মনে হয়, তাঁর আগেকার রূপদান এবারের চেয়ে আমাদের বেশী আকৃষ্ট করেছিল। এবারে তিনি একটু বেশী দ্রুতলয়ে অভিনয় করার দরুন মানব-জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব (অ্যাটিচুড) ঢের বেশী প্রকাশিত হলেও অহিন্দীভাষী আমাদের পক্ষে তাঁকে সর্বত্র অনুসরণ করার আমরা অসুবিধা অনুভব করছিলুম। অপর চরিত্রগুলি মোটের উপর সু-অভিনীত। এবারে নাটকীয় চরিত্রগুলির গতিনিয়ন্ত্রণ, দৃশ্যপরিকল্পনা, আবহসঙ্গীত, আলোক-প্রক্ষেপণ প্রভৃতির দিক দিয়ে নাটকটি ঢের বেশী সু-প্রযোজিত হয়েছে শ্যামানন্দ জালান দ্বারা।

মঞ্চাভিনয়

তরুণ অপেরার 'আমি সুভাষ' : '...... তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো,'—উদাত্ত এই সংগ্রামী শপথের যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠ একদিন দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল উন্মোচনের প্রাণময় আন্দোলনকে সুদূরপ্রসারী করেছিল, কদিন আগের এক ধূসর সন্ধ্যায় তারই সঙ্গে হোল সংযুক্ত অনুভবের এক মরমী সেতুবন্ধন। নতুনতর এক দৃপ্ত আবেগের আগুন জ্বলে উঠলো উপলব্ধির প্রহরে। যেন মনে হোল দিকে দিকে আলোকাভাস ছড়ালেও আরো অনেক অন্ধকার মুছে দিতে বাঁশীতে অগ্নিস্নানের সুর তোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি আজো, শেষ হয়নি অনুচ্চারিত ভাষার প্রকাশ ব্যাকুলতা।

অনুভূতিলোকে এই তীব্রতর আলোড়ন সেদিন দুর্বার হয়ে উঠেছিল বিশ্বরূপায় তরুণ অপেরার সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'আমি সুভাষ'কে কেন্দ্র করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামের সঙ্গেই আমাদের যেন অশ্রু, রক্ত, আর স্বপ্নের সম্পর্ক, তাঁর কণ্ঠ যেখানে সোচ্চার, সেখানে আমরা কিছুতেই মুখর না হয়ে থাকতে পারি না। চলচ্চিত্রে, নাটকে যেখানেই আমরা নেতাজীকে দেখি সেখানেই যেন এক অলক্ষ্য আবেগে আমরা ছুটে যাই তাঁর উপলব্ধির কাছে। যাত্রার আসরে দু-এক জায়গায় নেতাজীর কর্মময় জীবনকে অবলম্বন করে পালা রচিত হয়েছে এবং অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেখানকার নেতাজীর সেই 'দিল্লী চলো' ডাক যেন প্রত্যাশিত কল্লোল তুলে ধরতে পারেনি। হয়তো এর জন্য নেতাজী চরিত্রের রূপকারের চরিত্রের অতলে ডুব না যাওয়াটাই দায়ী, নয়তো পালাগানের মধ্যেই এই সংগ্রামী মানুষের জীবনচর্যার সেই প্রখর দীপ্তির অভাবই দায়ী। সে যাই হোক না কেন, সে সব পালা সে রকম জনপ্রিয়তা পায়নি, যা পাওয়া উচিত ছিল। তরুণ অপেরার শিল্পীরা হয়তো এই ছবিকে সামনে রেখেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আর একটি পালা নির্বাচন করেছেন। সুস্থরুচির দায়িত্ব-বোধের দিক থেকে এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং এ কথা বলা যায় এ-পালায় নেতাজী আমাদের উদ্দীপ্ত করেছেন, দিতে পেরেছেন রক্তিম এক বেগ।

এখন প্রশ্ন হোল—এর জন্য নেতাজী চরিত্রের রূপদাতা জনপ্রিয় শান্তিগোপালের অপূর্ব রূপারণই দায়ী, না সামগ্রিক প্রযোজনা তথা নাটকের মধ্যে সেই দীপ্তি ছিল যা এই পালার আবেদনকে মনোগ্রাহী করে তুলতে পেরেছে। প্রথমেই বলি : তরুণ অপেরার 'লেনিন', 'হিটলার' প্রযোজনা আমাদের যেমন বিস্ময়ে হতবাক করেছে, 'আমি সুভাষ' একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে আন্দোলন তুলেও মনের গহনে সে বিস্ময়ের জোয়ার তোলেনি। অন্তর্ধানের পর থেকেই যে সুভাষচন্দ্রের আসল কর্মময় জীবনের শুরু তাকে কেন্দ্র করেই 'আমি সুভাষের' সংঘাত গড়ে উঠেছে। কাবুলে, জার্মানী প্রভৃতি জায়গায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাআন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য নেতাজী নানা রকম পরিকল্পনা, এবং সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব লাভ প্রভৃতি নানা রকম ঘটনার মধ্যে দিয়েই পালাটি এগিয়েছে। সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের সবারই পরিচিত জীবনকেই 'আমি সুভাষ' প্রকাশের আলোয় মুখর করে তোলার চেষ্টা করেছে। পালাটি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। নেতাজীর আন্দোলন পরিকল্পনার কয়েকটি দৃপ্ত মুহূর্ত বোধ হয় আরো সুগঠিত এবং নাটকীয় সংঘাতে ভরে থাকতে পারতো। নেতাজীর সংলাপেও বোধ করি দু'একটি জায়গায় প্রত্যাশিত দৃঢ়তা ফোটেনি। লেনিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সংলাপ যেমন প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল, নেতাজীর মুখে সংলাপের সেই প্রাণময়তা সব সময় আসেনি।

এবার আসা যাক প্রযোজনা আর প্রয়োগপরিকল্পনার কথায়। পালা রচয়িতা অমর ঘোষই নিয়েছেন নির্দেশনার দায়িত্ব। পালাটিকে প্রাণবন্ত ও শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় দ্যুতিময় করে তুলতে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেন নি। নেতাজীর মালা নিলামের স্পর্শকাতর মুহূর্তটি সত্যি অপূর্ব হয়েছে, দু'একটি জায়গায় নেতাজীর মানসিক বিবর্তনের ছবি তুলে ধরতে ক্লাস-ব্যাক সিসটেম-এ কিছু কণ্ঠের সমাবেশ বেশ যুক্তিযুক্তই হয়েছে। কিন্তু তবুও সামগ্রিকভাবে পালার গতি বোধহয় সব সময়ে জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। নেপথ্য কণ্ঠগুলোর মধ্যে আরো অনেক বেশী দৃঢ়তা আসা উচিত ছিল। সঙ্গীতাংশেও কোন উল্লেখযোগ্য দীপ্তি চোখে পড়েনি।

আঙ্গিকগত শৈথিল্য ঢেকে দিয়েছেন নেতাজীরূপী শ্রীশান্তিগোপাল। যখনই তিনি মঞ্চে এলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে, মনে হোল আমাদের চোখের সামনে আমাদের সাধের, স্বপ্নের নেতাজী এসে দাঁড়ালেন। ঠিক লেনিনের মতো নেতাজীকেও মূর্ত করে তুললেন শান্তিগোপাল। অসাধারণ তাঁর চরিত্রচিত্রণ-

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩১
— নতুন নাটক
জ্যোতিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, প্রেমিকা দাস, তুলসী চক্র, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

CENTRAL LIBRARY

দাচনভঙ্গির বলিষ্ঠতা ও আবেগ তিনি প্রয়োজনমত আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। এখানেই তাঁর অসামান্য শৈল্পিক নৈপুণ্য। আর একটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হয়েছে অনুপকুমারের 'ইয়াকুব'. এতো সাবলীল অভিনয় পালা গানের আসরে অনেকদিন চোখে পড়েনি। শিব ভট্টাচার্যের 'পরেশ রায়'ও হয়েছে প্রাণোজ্জ্বল। স্বর্ণালী মজুমদার 'জরিনার' ভূমিকায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন সত্যেন মুখার্জি, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন দে, বাবলু চৌধুরী অজিত দত্ত, রঞ্জিত চক্রবর্তী, অসীমকুমার, গোবিন্দ মাহান্ত, লিলি মন্ডল পুতুল দত্ত।

তরুণ অপেরার হিটলার, লেনিন, রামমোহন পরিবেশন করে পালাগানের আসরে যে পালা বদলের জোয়ার এনেছেন, সেই বলিষ্ঠতার আভাস 'আমি সুভাষ' আছে। তবে পালাটির মধ্যে আরো কয়েকটি মুহূর্তকে আরো গভীরতর সংঘাতে ভরিয়ে তোলার প্রয়োজন আছে এবং কয়েকটি শিল্পীর চরিত্রের সঙ্গে একাত্মভাবে একটু অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পালার নির্দেশককে আরো একটু চিন্তার ডুব দিলে ভালো হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। 'আমি সুভাষের পরবর্তী প্রযোজনা তরুণ অপেরার সৃষ্টির তারুণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, এই আশাই করছি।

সৌভনিক প্রযোজিত 'উট পাখি' : অপ্রিয় হোলেও একটা কথা মর্মান্তিকভাবে সত্য যে, জনসাধারণের কল্যাণকে পাথেয় করে আজ যে আন্দোলন বা সংগ্রামের বৃহত্তর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জনতা সেখান থেকে অপসৃত হয়, দলীয় স্বার্থের সমাবেশ ও সংঘাতই হয় সেখানে প্রকট, লক্ষ্য হয়ে ওঠে উপলক্ষ্য। আজকের সামাজিক ও রাজনীতির আকাশে এ মেঘের খেলা চলেছে প্রতিদিন। সাম্প্রতিক নাটক যদি এই ছবিকেই তুলে ধরে তাহলে তাকে রাজনৈতিক নাটক বলে দূরে সরিয়ে রাখার আজ কোন অর্থই হয় না। বিশেষ করে আজকের যুগে নাট্যকারকে একটা সুগভীর সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করতে হয়। সম্প্রতি সৌভনিক প্রযোজিত 'উটপাখি' নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের জীবনের ঐ নিদারুণ সত্যটিকেই হয়তো ভাষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে সমকালীন জীবন ও সমাজের ছবি এতো বলিষ্ঠভাবে এঁদের প্রযোজিত পূর্ব নাটকে হয়তো সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। একটি রূপকের আড়ালেই নিষ্ঠুর সত্যটির প্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর রচনা থেকে নাটকটি অনুবাদ করেছেন প্রতিভা অগ্রবাল।

কোন একটা দেশ। নাম তার স্বর্ণনগরী। সেখানে রাজা আছে, মন্ত্রীপরিষদ আছে, বিরোধী পক্ষের নেতা আছে, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি মামুলিরাম আছে। এই নগরীর রাজচিহ্ন সোনার উটপাখি স্থাপনা ও তার ওপর স্বর্ণছত্র বিছিয়ে

এপার ওপার / সৌমিত্র-অপর্ণা

দেওয়াকে কেন্দ্র করেই নাটকের ঘটনা এগিয়েছে। এ ব্যাপারে সাহায্য করতে শেষ পর্যন্ত কাজে এসে হাত লাগালো বিরোধীপক্ষের নেতা বিরোধিলাল। রাজার আনুকূল্যে সে হোল কল্যাণমন্ত্রী। একটি নাটকীয় মুহূর্তে মামুলিরাম এসে স্তম্ভিত হোল জনতার কল্যাণব্রতী নেতা প্রাচুর্যের আবর্তে পড়ে কিভাবে নীতি বিসর্জন দিয়েছে দেখে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এবং বোঝা গেল সোনার উটপাখি তৈরীই হয়নি, কিন্তু রাজকোষের সমস্ত অর্থ ফুরিয়ে গেছে। যে সব মন্ত্রীরা এ কাজের ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই রাজাকে ঠকিয়েছেন, বঞ্চিত করেছেন। শেষের প্রহরে সব অপরাধের বোঝা এসে পড়লো এই সব মন্ত্রীদের ওপর (যাঁদের বলা যায় সচেতন উটপাখি), যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজসিংহাসনে বসা। এই সব সচেতন উটপাখিদের মুখোস খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ নাটকে। সৌভনিক তার প্রচার-পুস্তিকায় বলেছেন : 'আপনার আমার চারদিকে এই রকম অসংখ্য সচেতন উটপাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তাদের এখনো চিনতে পারছি না। তাই আমরা মামুলিরামরা বাঁধা পড়ে আছি সিংহাসনের নীচে— আমাদের নিয়েই এ নাটক।

এই নাটকের মধ্যে বেশ সুন্দর শৈল্পিক ভঙ্গিমায় স্যাটায়ার করা হয়েছে, কিছু জিনিসকে। যেমন তদন্ত কমিশনকে কেন্দ্র করে যে মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে নাটকে তা হয়েছে অসাধারণ এবং এর মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কমিশন নির্যাতিত প্রহসনও ধরা পড়েছে। একটা কথা এ নাটক সম্পর্কে বলতে হয় যে, চূড়ান্ত রাজনীতির কথা থাকলেও, উটপাখি বিশেষ কোন 'ইজমকে' প্রকাশ করেনি, বা শুধুমাত্র প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি, আলোয় আঁধারে, সংলাপে সংঘাতে তা হয়েছে যথার্থ একটি নাটক। নাটকটির নির্দেশক হোলেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োগপরিকল্পনায় কয়েকটি মুহূর্তে তিনি সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। রাজার সূত্রধার হয়ে আসার ব্যাপারটাও গভীরতর এক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। মঞ্চসজ্জায় যে পরিচ্ছন্ন ভাব ফুটে ছিল তার জন্য সবটুকু ধন্যবাদ প্রাপ্য শঙ্কর গুপ্তর।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি সবার আগে দর্শকের মন কেড়ে নেন তিনি হোলেন অশোক মিত্র। তাঁর রাজার চরিত্রচিত্রণ সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। শ্রীমিত্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর মঞ্চাভিনেতা, এ চরিত্রের রূপায়ণ আবার সে সত্যকে নতুন করে প্রকাশ করলো। তারপরে উল্লেখ করতে হয় কাজল মুখার্জির রাণীর কথা, একটা স্বচ্ছন্দ অথচ স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় তিনি চরিত্রটিকে সজীব করে তুলেছেন মঞ্চের আলোয়। বিরোধিলালের ভূমিকায় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়, সপ্রতিভই হয়েছে, কিন্তু দু' একটি জায়গায় তাঁর সংলাপ বলার রীতিটি কৃত্রিম বলে মনে হোচ্ছিল। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য (অন্নমন্ত্রী), অসিত ঘোষ (জলমন্ত্রী), শিবু মজুমদার (রক্ষামন্ত্রী), নির্মল বামবণিক (মামুলিরামী), শঙ্কর গুপ্ত (বৃদ্ধ) ও সিপ্রা চক্রবর্তী (দাসী)।

চরিত্রহীন : শরৎচন্দ্রের বহু বিতর্কিত উপন্যাস চরিত্রহীনের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ কদিন আগে পরিবেশিত হোল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা ড্রামাটিক পারফরমেন্স কমিটির শিল্পীরা। সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয়টি মনোগ্রাহীই হয়েছিল এবং এর জন্য শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় নিষ্ঠাই দায়ী। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়ে-

রবি ৫ই সেপ্টেম্বর ৬টা
প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে
শতাব্দী-র নাটক
সাগিনা মাহাতো
গল্প : গৌরকিশোর ঘোষ
নাটক ও নির্দেশনা : বাদল সরকার
টিকিট : বেবী পুস্তকালয় (মেছুয়া মোড়)
ও অভিনয়ের দিন সকাল ১টা থেকে হলে

CENTRAL LIBRARY

ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য ও নিরঞ্জন লাহিড়ী।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন কৃষ্ণকুমার ঘোষ (শিবপ্রসাদ), অমরেশ ভট্টাচার্য (উপেন), পার্থ চ্যাটার্জী (সতীশ), বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য (নিশাকর), অমরনাথ ঘোষ (বেণারী), সুবোধ নিয়োগী (রাখাল), হটীন দাস (সুকুমার), সবিতা মুখার্জী (কিরণময়ী), মমতা চ্যাটার্জী (সাবিত্রী), হিমানী গাঙ্গুলী (সুরবালা), প্রতিমা পাল (সরোজিনী), গোকুল ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন রায়, পরিতোষ মুখার্জী, সুশীল দাস, অমর ভট্টাচার্য, ভূপাল ঘোষ, অজয় সাহা, সুধীন মাইতি, কৃষ্ণ দত্ত, সুধাময় চ্যাটার্জী, বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, নিরঞ্জন হিন্দী, অমর সেন, নমিতা দত্ত, মণিকা দত্ত।

নাট্যানুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নাট্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।

আনন্দম ক্লাবের ‘মসীলিপ্ত’: সম্প্রতি আনন্দম ক্লাবের শিল্পীরা উৎসাহের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন সুনীল মুখার্জীর ‘মসীলিপ্ত’ নাটকটি। দলগত অভিনয়ে এই নাটকটির প্রযোজনা মোটামুটি সফলই হয়েছিল। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অশোক মৈত্র, স্বপন সেন, রাজীব মিত্র ও সমীর পালের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। তা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্বাস, অজয় ব্যানার্জী, মদন ঘোষ, সুভাষ সেন, নিলিমা ব্যানার্জী, সমর বিশ্বাস, প্রদীপ নাথ, অরুণ দাস, তপন মৈত্র, সুজিত পোদ্দার।

প্রগতি পরিষদের নাটক: কয়েকদিন আগে প্রগতি পরিষদের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে সুধানায় অভিনীত হোল বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি। দলগত অভিনয় গুণে নাটকটি সবারই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন বিশ্বজিৎ রায়, তারক দত্ত, চৈতালী চ্যাটার্জী, সতীনাথ দত্ত, সুশান্ত দাস শ্রীমতী পাইন, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, অলোক ব্যানার্জী ও তপোব্রত দত্ত।

রঙ্গনা বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে সোজা কর্নওয়ালিস রোড (৫৫-৬৫৪৮)

নান্দীকার
শনি ৬ রবি ২।। ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা

১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ৬টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সাড়ে ছ-টায়
এ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
।। এ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ।।

সৌভনিক প্রযোজিত ‘উর্বশী’ নাটকের একটি বিশিষ্ট মুহূর্তে অশোক মিত্র ও নির্মল কসেরধিক

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার শিশু সদস্যরা তপোব্রত ঘোষ রচিত, পরিচালিত ‘মুক্তির আনন্দ’ রূপক আলেখ্যটি মঞ্চস্থ করে। শুধু সুখের মধ্যেই যে মানুষের মুক্তি নয়—সুখ ও দুঃখ দুয়ের মিলনেই যে তার মুক্তির আনন্দ এই ছিল আলেখ্যটির মূল বক্তব্য। নৃত্য ও অভিনয়ের সুসমন্বয়ে আলেখ্যটি বক্তব্য প্রকাশে নতুনত্বের পরিচয় বহন করে। সঙ্গীত পরিচালনা, নৃত্য পরিকল্পনা, মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসম্পাতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে অশোক ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার, সুশান্ত দে ও কাশীনাথ পাল। প্রত্যেকটি শিল্পীই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তবুও তার মধ্যে শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী মহুয়া ঘোষাল, রামনাথ গাঙ্গুলী ও শর্মিলা চক্রবর্তীর প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

কুচবিহার হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান: উত্তরবঙ্গের হিমছায় ছোট্ট শহর কুচবিহার। এখন উত্তাল অস্থির অনেকগুলো কারণে। একে বর্ষা, এ সময়ে অনুষ্ঠান বড় একটা হয় না, শরণার্থীদের ভীড় তাছাড়া রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার আহত সৈনিকদের উপস্থিতি। এসব সত্ত্বেও কুচবিহারের এম, জে, এন হাসপাতালের হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের জরুরী কর্তব্য কাজের মধ্যেও প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান করল গেল ৫ঠা জুন। ডাঃ সুবল কররগুপ্ত ও শ্রীমতী হিরণ মিত্রের পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুনীল দাশগুপ্ত, প্রণব চ্যাটার্জি, গায়ত্রী ভট্টাচার্য ও কিরণ লাহিড়ী। কিশোরী মুনমুন কররগুপ্ত ও প্রার্থনা চক্রবর্তীর গানও উপভোগ্য। সঙ্গতে ছিলেন শঙ্কর মজুমদার ও রবিশঙ্কর মিত্র। গিটার বাজিয়ে শোনান দীপিকা ঘোষ। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন ডাঃ হৃষীকেশ চ্যাটার্জি। বিচিত্রানুষ্ঠানের পর গৌতম রায় রচিত ‘অঘটন’ নাটক মঞ্চস্থ হয় ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তীর পরিচালনায়। বিচিত্র চরিত্রে সার্থকভাবে রূপদান করেন অনিমেষ সাহা, উদয়প্রসাদ সিংহ, সত্য চৌধুরী, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, জ্যোতিরঞ্জন গাঙ্গুলী, স্বপন রায়, অনিল কুণ্ডু এবং মীরা দাশগুপ্তা ও কালীবালা মণ্ডল।

প্রাচ্যবাণীর ‘কবিকুলকমলম্’

প্রাচ্যবাণী সংস্থার ২৮তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে ১৪ই জুলাই মহাজাতি সদন মঞ্চে ডাঃ রমা চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত সংস্কৃত নাটক ‘কবিকুলকমলম্’ কয়েক লহমার জন্যও যেন বর্তমানের সমস্যাক্লিষ্ট জীবনের গ্লানি ভুলিয়ে আমাদের মহাকবি কালিদাসের স্বপ্নময় কাব্যরাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

কবি কালিদাসের শেষজীবনের দ্বন্দ্ব-কণ্টকিত, আশ্চর্য জীবনের এক সুন্দর আলেখ্য ঠিক যেন গানের সুরের মতই মেলে ধরা হয়। সঙ্গীতছন্দী অতিসরল সংস্কৃত ভাষায়। কালিদাসের সকৌতুক সরস সংলাপ, তাঁর প্রতি বিক্রমাদিত্যের সশ্রদ্ধ সখ্যতা শত্রুপক্ষের হীন ষড়যন্ত্র ও অনুতাপ জীবন্ত করে তোলে পণ্ডিত অনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, সমীর চৌধুরী, সলিল আচার্য, দীলিপ মণ্ডল, অধ্যাপিকা শান্তি চক্রবর্তী, স্বপ্না সরকার, রূপধারা ঘোষ ও শঙ্করপ্রসাদ রায়।

যতীন্দ্রবিমল জয়ন্তী উৎসব

গেল ১০ই জুলাই রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীতে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর জন্মজয়ন্তী পালনের জন্যে প্রাচ্যবাণীর পক্ষ হতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ সরোজকুমার দাস। সভাপতির ভাষণে শ্রীদাস সংস্কৃত পণ্ডিত, গবেষক, লেখক ও নাট্যকার হিসেবে স্বর্গত ডাঃ চৌধুরীর বিচিত্রমুখী অনন্যসাধারণ প্রতিভার ও সৃজনশীল অবদানের ওপর আলোকপাত করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার কাজে যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ডাঃ রমা চৌধুরীর নিরলস শ্রম ও সাধনার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন উপস্থিত বহু গুণীজ্ঞানী। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রমা চৌধুরীর সহজ-সরল ভাষায় সংস্কৃত নাটক রচনা ও ভারতের নানা জায়গায় তার মঞ্চরূপ উপস্থাপনা দ্বারা বিদগ্ধ-সমাজে সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টিকরণকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সভান্তে এক রমণীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী মঞ্জু গুপ্ত, হিমাদ্রি রায়চৌধুরী, পূর্ণেন্দু রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী।

জলসা

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

সুরদাস সংগীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর অবধি একাডেমী অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হবে। শেষদিনের অধিবেশনটি সারা রাত্রিব্যাপী। জানা গেছে এ বছর ভারতবর্ষের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী এই প্রথম বাংলাদেশে তাঁদের সংগীত পরিবেশন করবেন। যন্ত্রে—ওস্তাদ হালিম জাফর খাঁন, ওস্তাদ আহমদ রেজা খাঁন (বিচিত্র বীণা—দিল্লী), বৈদ্যুত বীণা ও সেতারে—ভি রাঘবন ও এম জনার্দন (মাদ্রাজ), ভি জি যোগ, কালীজীবন সোম, পিটার রো, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, কন্ঠে—পণ্ডিত দিনকর রাও দেশপাণ্ডে (বম্বে), শ্বেতকণ্ঠে ওস্তাদ গোলাম সাদিক ও গোলাম সিরাজ (দিল্লী), দিপ্তা ঘোস, নৃপেন মুখার্জি, মুনওয়ার আলি খাঁন, আরতি বাগচী, ফাল্গুনী মিত্র (ধ্রুপদ) ও আশালতা গাঙ্গুলী, নৃত্যে—মাদ্রাজের নিরজা দেবী ও সম্প্রদায়, দর্মিষ্ঠা, মালতি সেন ও দেবযানী ভট্টাচার্য। এছাড়া সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মাদ্রাজের মৃদঙ্গ বাদক গুরুভায়ের দুরাই ও দিল্লীর সারেঙ্গী বাদক শ্রীইন্দর লাল।

সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক ও তানসেন সঙ্গীত সংঘের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সংগীত নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত। তাঁর সংগীতশিক্ষা পুস্তকও এ-বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাধারার এক প্রামাণ্য নজীর।

বোম্বাই-এ বাঙালী সঙ্গীতবিদ অভিনন্দিত

সম্প্রতি শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাই-এর একটি আলোচনাচক্রে উদাহরণসহ তাঁর মৌলিক অনুধাবনকে ওখানের সংগীত-সমাজে পেশ করবার জন্য আহূত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর নিজস্ব সংগীত-চিন্তা 'মানবদেহের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর সাদৃশ্য' সাদর অভিনন্দন লাভ করে। এ সম্বন্ধে ওখানের বিখ্যাত সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সমালোচকের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'আমাদের মধ্যে কজনই বা ভারতীয় মার্গ-সংগীতের সঙ্গে মানবদেহের আশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করি? কিন্তু শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-নিয়ে ভেবেছেন এবং মানবদেহের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর উপভোগ্য সাদৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

উদাহরণতঃ বলা যায়—প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী মানবদেহে প্রধানতঃ সাতটি স্নায়ু—আর সেই স্নায়ুদের যথাযোগ্য অবস্থানের ওপর শারীরিক সুস্থতা নির্ভরশীল। রাগ-রাগিণীও ৭টি স্বরেই প্রতিষ্ঠিত এবং উপযুক্ত স্বরসমন্বয়েই রাগের যথার্থ রূপ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব।

মনস্তাত্ত্বিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেও উভয়ের সাদৃশ্য সু-পরিলক্ষিত।

মানুষ সঙ্গী চায়। সঙ্গীতও চায় সঙ্গত। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রথম দিকের সংকোচ পরে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। রাগের ক্ষেত্রেও ঐ একই ধারা। রাগবিস্তারের ক্রম-উন্মোচনের প্রথমের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর; পরে নানান পকড়, জোড় ঝালা ও দ্রুত।

এইভাবে বিশ্লেষণের অভিনবত্বে বোম্বাই-এর সংগীত-মহল চমৎকৃত হন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে ওখানের সাংগীতিক আলোচনাচক্রে যোগ দেবার আহ্বান জানান।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান খার-এর দমরন্তী হলে অমৃৎ সঙ্গীতালয় দ্বারা আয়োজিত হয়।

মল্লার মিউজিক সার্কেলের অনুষ্ঠান

গত শুক্রবার ১০ই আগস্ট কাশিম-বাজার রাজবাটিতে মল্লার মিউজিক সার্কেলের মাসিক অধিবেশনে আমরা একটি উদীয়মান কিশোরী শিল্পীর উল্লেখযোগ্য কথক-নৃত্য দেখে খুসী হয়েছি। শিল্পীর নৃত্য সত্যিই আনন্দদায়ক। লয় ও আংগিকের দক্ষতা ছাড়াও যেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—সে তাঁর সাবলীল সুন্দর ভংগী। ষোড়শী শিল্পীর নাম মালবিকা সেন। ইনি মল্লার সংগীত প্রতিষ্ঠানের নৃত্যশিক্ষিকা শ্রীমতী রবী দত্তর ছাত্রী। এঁর সঙ্গে তিতালে প্রশংসনীয় তবলা সংগত করেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে এস্রাজ বাজিয়ে শোনালেন রণধীর রায়। বাদনকুশলতা ছাড়াও লুপ্তপ্রায় যন্ত্রটিকে পুনঃপ্রচলন করার কাজেও শ্রীরায়ের অবদান লক্ষণীয়। ইনি বাজালেন 'দেশ'—যথাঋতুর সঙ্গে সংগতি রেখে রাগরূপায়ন ও বিশ্লেষণে শিল্পীর অনস্বীকার্য কৃতিত্ব সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। ইনি একটি ধুন বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

সদারং সংগীত সম্মেলন—সর্বভারতীয় সদারং সংগীত সম্মেলনের পাঁচদিন ব্যাপী সংগীতোৎসব (আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর)। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ, সংগীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক, ওস্তাদ সরাফৎ হোসেন, ওস্তাদ মুশাব্বর খাঁ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ রায়, কুমারেশ বসু, মণি রায় (কার্শিয়াং), কুমার মুখোপাধ্যায়, সুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা কাঞ্জিলাল ও লীনা মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠ-সংগীত), যন্ত্রসংগীতে আছেন পণ্ডিত ভি জি যোগ, পণ্ডিত কিষণ মহারাজ, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান, কালীজীবন সোম, রইস খান, মণিলাল নাগ, অশোক পাঠক, আর ভি বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গতে—ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান, লচ্ছন খান, শ্যামল বসু, দ্বিজেন বসু, অমর দে, গোবিন্দ বসু, পঙ্কজ চক্রবর্তী। নৃত্যে—অর্জুন মিশ্র ও লতাকুমারী (কত্থক)।

প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী উৎপলা ঘোষ এবছর পলিডোর কোম্পানীতে যোগ দিয়েছেন। গত ২৮শে জুলাই মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে এবং শিবনারায়ণ ঘোষালের কথায় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এঁর দুটি রেকর্ড গৃহীত হয়। গানদুটি হোলো 'আয় আয় চাঁদমামা' ও 'মেঘ গুড়গুড়ে দুপুরে'—। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এইটিই পলিডোর কোম্পানীর প্রথম নন্-ফিল্ম ডিস্ক।

গীতিমালা-এর সঙ্গীতানুষ্ঠান

গেল ৩০ জুলাই প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা রবীন মজুমদার সঙ্গীত পরিবেশন করলেন গীতিমালার মাসিক অধিবেশনে। বহুদিন পরে আবার সঙ্গীত আসরে তাঁকে দেখা গেল। সুদীর্ঘ দেড় ঘন্টাব্যাপী তিনি তাঁর উদার কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, পল্লীগীতি ও তাঁর অভিনীত বিভিন্ন ছবির গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর গান পরিবেশনার রীতির সঙ্গে আজকের দিনের গান পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গেল। শ্রোতাদের অনুরোধে যে সব গান তিনি গাইলেন তার মধ্যে 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' ও 'কবি' বইয়ের 'এই খেদ মোর মনে' ও 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' এই গান তিনখানি শ্রোতাদের মনে বহুদিন জাগরূক থাকবে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন গৌর দত্ত।

—চিত্রাঙ্গদা

ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার (ডান দিকে) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে 'রাবার' জয়ের নগদ পুরস্কার দেড় হাজার পাউণ্ডের চেক। গ্রহণ করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৭ বার, ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ২ বার এবং দুবার সিরিজ অমীমাংসিত। ১৯৭১ সালেই ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ের সুবাদে ভারতবর্ষ আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে অতি সম্মানজনক আসন লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ওভালের এই তৃতীয় টেস্ট খেলার আগে ১৯৭১ সালের টেস্ট খেলার ফলাফল ধরে ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ অপরাজেয় ছিল—ইংল্যাণ্ডের ১১টি টেস্ট খেলায় ৪টি জয় এবং ভারতবর্ষের ৭টি খেলায় একটি জয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয়ের ফলে বিশ্বনিন্দুকদের মুখে ভারতবর্ষ সম্পর্কে 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে'—এই উক্তি আর শোনা যাবে না।

সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সমালোচকরা সংবাদপত্র মারফৎ ভারতবর্ষের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন সর্বকালের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান।

'সাবাস ওয়াদেকার—সাবাস তোমার দল' —এই জয়ধ্বনিতে আজ সারা ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত।

ওভালের এই শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলাটি ছিল উভয় দলেরই কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং জাতীয় মর্যাদার কথা মনে রেখে দুই দলেরই খেলোয়াড়রা জান দিয়ে খেলেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টের মত টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। খেলার পিচ পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই মাত্র ৫ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের অতি নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান লাকহার্স্ট আউট হন। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৯৭ (১ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন জেমসন (৫৪ রান) এবং এডরিচ (৩৩ রান)। এই দুজন দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১২৫ মিনিটে ১০৬ রান সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গার পর আবার ইংল্যাণ্ডকে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। তাদের ১০৫ রানে ৩য়, ১০৯ রানে ৪র্থ, ১৪৩ রানে ৫ম এবং ১৭৫ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। ভারতীয় বোলিং এতটা সাফল্য লাভ করেও শেষ পর্যন্ত ৭ম উই-

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড : ৩৫৫ রান (জেমসন ৮২, এডরিচ ৪১, নট ৯০ এবং হাটন ৮১ রান। সোলকার ২৮ রানে ০, বেদী ১২০ রানে ২, চন্দ্রশেখর ৭৬ রানে ২ এবং ভেংকট-রাঘবন ৬৩ রানে ২ উইকেট)

ও ১০১ রান (লাকহার্স্ট ৩৩ রান। চন্দ্রশেখর ৩৮ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৮৪ রান (ওয়াদেকার ৪৮, সরদেশাই ৫৪, সোলকার ৪৪ এবং ইঞ্জিনিয়ার ৫৯ রান। ইলিংওয়ার্থ ৭০ রানে ৫ এবং স্নো ৬৮ রানে ২ উইকেট)

ও ১৭৪ রান (৬ উইকেটে। ওয়াদেকার ৪৫, সরদেশাই ৪০, বিশ্বনাথ ৩৩ রান এবং ইঞ্জিনিয়ার নটআউট ২৮ রান। আণ্ডারউড ৭২ রানে ৩ উইকেট)

ওভালে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের শেষ তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ ৪ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে এবং টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়। এই দুই দেশের মধ্যে এই নিয়ে যে ১১টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে:

শেষ জুটি—উইকেটকিপার এ্যালেন নট এবং বোলার রিচার্ড হাটনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় স্তব্ধ হয়ে যায়। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২২৬ (৬ উইকেটে)। ৭ম উইকেটের জুটিতে তখন ৫১ রান উঠেছে। নট ৫২ রান এবং হাটন ১৭ রানে অপরাজিত। ইংল্যাণ্ডের ২৭৮ রানের মাথায় নট তাঁর ব্যক্তিগত ৯০ রান করে সোলকারের বলে ক্যাচ তুলে তাঁরই হাতে ধরা পড়েন। ৭ম উইকেটের জুটিতে নট এবং হাটন যে ১০৩ রান সংগ্রহ করেন তা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের ৭ম উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্ব রেকর্ড ছিল ১০২ রান (ইলিংওয়ার্থ এবং সোয়েটম্যান, ওভাল, ১৯৫৯) হাটন ৮১ রান তুলে খেলা থেকে বিদায় হন। ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৫৫ রানের মাথায় শেষ হয়। জেমসন বাদে ব্যাটসম্যান পর্যায়ভুক্ত খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত উইকেট-কিপার নট ৯০ রান এবং বোলার হাটন ৮১ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের মুখরক্ষা করেন।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে খেলা আরম্ভই হয়নি। লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর খেলা হবে না ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের খেলা সুরু করে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৪ রান তুলেছিল। ভারতবর্ষের খেলার সূচনা খুবই আলগা হয়েছিল—১৭ রানের মাথায় ১ম এবং ২১ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়।

তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং সারদেশাই ৯৩ রান তুলে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করেন। ভারতবর্ষের ১১৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ার পর ভারতবর্ষকে আবার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। ৫ম উইকেট পড়ে ১২৫ রানের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনিয়ার এবং সোলকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে অতি মূল্যবান ৯৭ রান যোগ করলে ভারতবর্ষের ২২২ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৩৫ (৫ উইকেটে)। উইকেটে ছিলেন সোলকার (৫ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (৮ রান)। তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২৩৪ রান (৭ উইকেটে) উঠলে হিসাবে দেখা গেল ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫৫ রানের থেকে তারা তখনও ১২১ রানের পিছনে এবং হাতে জমা মাত্র ৩টে উইকেট। খেলায় অপরাজিত ছিলেন আবিদ আলি (২ রান) এবং ভেঙ্কটরাঘবন (৩ রান)।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা এই দিন ৩টে উইকেটের বিনিময়ে ৬৫ মিনিটের খেলায় আরও ৫০ রান যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ড ৭১ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংসে খেলতে নামে। খেলার এই অবস্থা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে ছিল। কিন্তু তাদের

অজিত ওয়াদেকার

ভেঙ্কটরাঘবন

২য় ইনিংস মাত্র ১০১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষের অনুকূলে হাওয়া ঘুরে যায়। ওয়াদেকারের দল-পরিচালনা এবং চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং ইংল্যাণ্ডের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ। চন্দ্রশেখর একাই ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন ৩৮ রানে। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২৪ (৩ উইকেটে)। চা-পানের কিছু আগে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ১০১ রানের মাথায় শেষ হয়; এই রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে পুরো এক ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ১৭৩ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দুই উইকেটের বিনিময়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করে। জয় লাভের জন্যে আর মাত্র ৯৭ রান দরকার এবং হাতে ৮টা উইকেট জমা—খেলার এই অবস্থায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ওভাল মাঠ ত্যাগ করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় খেলোয়াড়রা জয়লাভের কঠিন পণ নিয়ে মাঠে উপস্থিত হন। কিন্তু যাত্রা শুভ হল না। কোন রান যোগ হওয়ার আগেই পূর্ব দিনের ৭৬ রানের মাথায় পঞ্চম দিনের খেলার দ্বিতীয় ওভারে অধিনায়ক ওয়াদেকার রান আউট হলেন। ৪র্থ উইকেট পড়ে ১২৪ রানের মাথায়। ৫র্থ উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং বিশ্বনাথ ৪৮ রান যোগ করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৪৬ (৫ উইকেটে)—আর মাত্র ২৭ রান সংগ্রহ করলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৩ রান পূর্ণ হবে—হাতে জমা ৫টা উইকেট। লাঞ্চের পর দ্রুত রান উঠতে থাকে। স্কোরবোর্ডে ১৭০ রান (৫ উইকেটে) উঠেছে—জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ৩ রান বাকি। উইকেটে আছেন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশ্বনাথ। জয়লাভের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ আউট হলেন। তাঁর আর একটুক রান সংগ্রহ হল না। তাঁর স্থলে উইকেটে আবিদ আলি খেলতে নেমে বাউণ্ডারীতে বল

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

বছর	স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র	সিরিজ জয়ী
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	১	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	২	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	২	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	১	০	২	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	৩	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	৫	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	০	২	৩	ভারতবর্ষ
১৯৬৩-৬৪	ভারতবর্ষ	০	০	৫	ড্র
১৯৬৭	ইংল্যাণ্ড	৩	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৭১	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	ভারতবর্ষ
[illegible]	মোট :	১৮	৪	১৮	

হাঁকড়ালেন—ভারতবর্ষের রান দাঁড়াল ১৭৪ —জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের থেকে এক রান বেশী। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় এবং টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়—ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, বিদেশের মাটিতে এই নিয়ে ভারতবর্ষ তিনবার 'রাবার' জয়ী হল। প্রথম জয় ১৯৬৭-৬৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডে এবং

ইংল্যাণ্ডের মাঠে টেস্ট খেলার ফলাফল

	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র
লর্ডস	৭	৬	০	১
ম্যাঞ্চেস্টার	৫	২	০	৩
ওভাল	৫	২	১	২
লিডস	৩	৩	০	০
নটিংহাম	১	১	০	০
এজবাস্টন	১	১	০	০
মোট :	২২	১৮	৪	১৮

এক নজরে
ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

	মোট খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র
স্থান				
ইংল্যাণ্ড	২২	১৫	১	৬
ভারতবর্ষ	১৮	৩	৩	১২
মোট :	৪০	১৮	৪	১৮

দ্বিতীয় জয় ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে।

ভারতবর্ষের এই জয়লাভে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যাণ্ডের শীর্ষাসন টলে গেছে। ১৯৬৭ সালের জুন মাস থেকে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড অপরাজেয় ছিল; তাছাড়া নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ের সূত্রে

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

চন্দ্রশেখর

ইংল্যাণ্ড বে-সরকারীভাবে যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছিল তা আজ হাতছাড়া হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসরে ভারতবর্ষের স্থান আজ কোথায়? এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক জয়লাভ প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ বলেছেন—'ভারতবর্ষ যে বিশ্বসেরা হতে পারে তা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করেছে।'

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় ফারুক ইঞ্জিনিয়ার উভয় দলের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন (গড় ৫৭-৩৩)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন অ্যালেন নট (গড় ৪৪.০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান লাকহার্স্ট (মোট ২৪৪ রান)। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করার গৌরব লাভ করেছেন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার (মোট রান ২০৪)। টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র এই দুজন—লাকহার্স্ট (১০১ রান) এবং ইলিংওয়ার্থ (১০৭ রান)। ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান করেছেন অধিনায়ক ওয়াদেকার (৮৫ রান)।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় নরম্যান গিফোর্ড উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন (গড় ১৫-৮৭)। অপরদিকে ভারতবর্ষের পক্ষে চন্দ্রশেখর (গড় ২১-০০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কটরাঘবন (প্রত্যেকে ১৩টি করে)।

এশিয়ান জিমন্যাসটিক চ্যাম্পিয়নশীপ

টোকিওতে আয়োজিত প্রথম এশিয়ান জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতায় জাপান চারটি খেতাবই জয় করে—বালক ও বালিকা বিভাগের দলগত এবং ব্যক্তিগত খেতাব। জাপান ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগের প্রথম ৬টি স্থানই অধিকার করে এবং বালিকা বিভাগে পায় প্রথম ৫টি স্থান। ভারতবর্ষ বালক এবং বালিকা বিভাগের দলগত অনুষ্ঠানে ৪র্থ স্থান জয় করে। প্রতিযোগিতায় এই ৬টি দেশ যোগদান করেছিল—জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ভারতবর্ষ, ফিলিপাইন এবং হংকং।

দলগত অনুষ্ঠানের ফলাফল

বালক বিভাগ : ১ম জাপান (২৮১-৬৫ পয়েন্ট) ২য় দক্ষিণ কোরিয়া (২৬০-০০), ৩য় তাইওয়ান (২২১-১৫) এবং ৪র্থ ভারতবর্ষ (২১৯-০০)।

বালিকা বিভাগ : ১ম জাপান (১৮৩-৩৫), ২য় দক্ষিণ কোরিয়া (১৭০-১৫), ৩য় তাইওয়ান (১৭০-৫০) এবং ৪র্থ ভারতবর্ষ (১১০-০৫)।

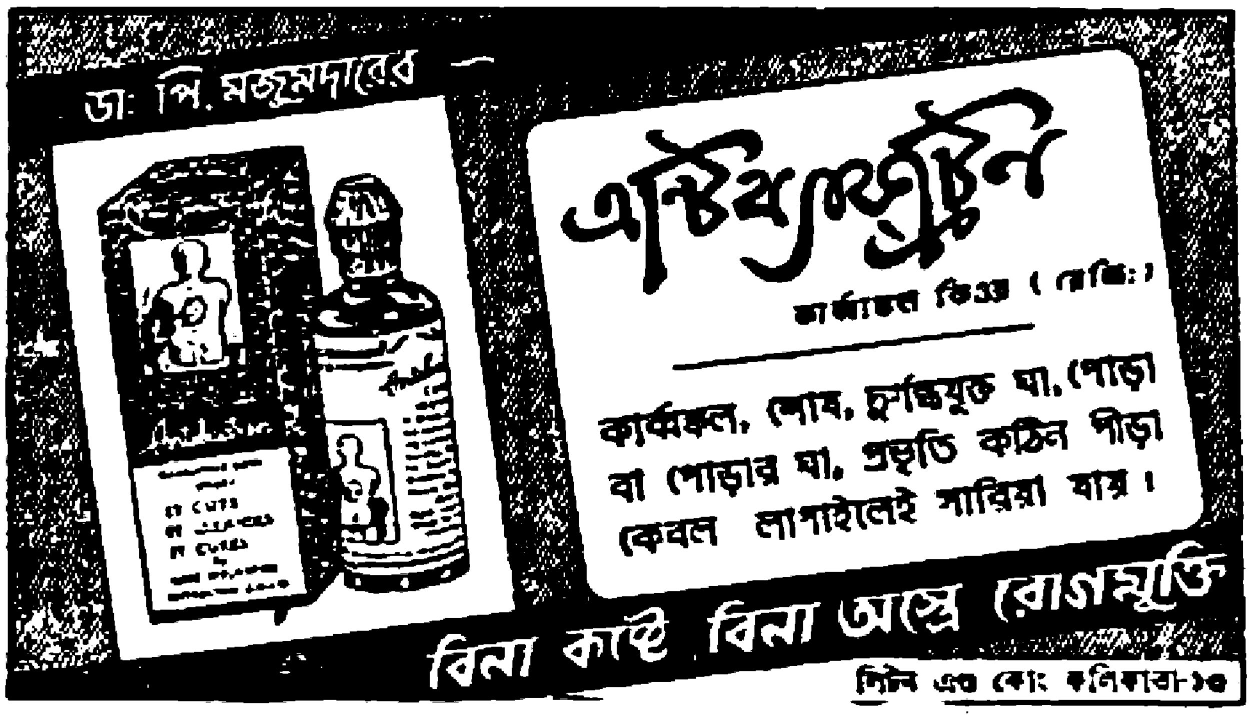

অমৃত পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিখ্যাত বিলাতফেরৎ ত্বক বিশেষজ্ঞ

ডাঃ এন. আর. গুপ্তের

রূপ ও প্রসাধন

॥ দশ টাকা ॥

বিশ্বের দরবারে রূপের সম্মান আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সৌন্দর্যের কর দিতে জগৎ করজোড়ে দণ্ডায়মান। যাঁদের রূপ আছে এবং যাঁরা রূপবান বা রূপসী হতে চান তাঁদের কাছে এই বইটি আমরা নিবেদন করছি। কী করলে রূপ খোলে, সুন্দর দেখায়, কোন্ কসমেটিক নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এবং কার কি দোষ—কী ভাবে তরুণ-তরুণীরা নিজেদের রূপ নষ্ট করছেন—সব কথাই এই বইতে পাবেন। অপরূপ রূপে নিজেকে দেখাতে হলে প্রবীণ এই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। মাত্র দশ টাকা খরচে বত্রিশ টাকা ফীয়ের কাজ পাবেন।

কম দামে দুটি বড় বই

বিমল মিত্রের

ফুল ফুটুক ২.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তবু মনে রেখো ২.

আপনার ভাগ্য আপনি অবশ্যই জানতে চান। তাহলে জ্যোতিষীদের কাছে হাটাহাঁটি না ক'রে এই বইটি পড়ুন। এর সাহায্যে নিজের রাশিচক্র আপনি নিজেই তৈরী করতে পারবেন, সেই সঙ্গে আপনার পুত্র-কন্যাদেরও। একটি কোষ্ঠী তৈরী করার খরচের এক দশমাংশ ব্যয়ে তৈরী হবে আপনার ভাগ্য পত্রিকা।

প্রখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিদ

কুগ্‌লাতকের

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন

॥ দশ টাকা ॥

অসামান্য লেখক

শংকরের

অসামান্য উপন্যাস

সীমাবদ্ধ

অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে

॥ ছয় টাকা ॥

বিভূতি রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে দাম চৌদ্দ টাকা। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম খণ্ড প্রতি খণ্ড—১৫. । প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ …

বাংলা পকেট বই

মোট চৌদ্দটি বই বেরিয়েছে। প্রতি বই—দু টাকা। যে-কোন পাঁচখানি বই নিলে ক্রেতাগণ মোট দাম থেকে মোট ১॥০ কমিশন বাদ পাবেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম ও শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস

শত রূপে দেখা

বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডী বৌ', 'প্রফুল্ল' 'ইন্দিরা' 'পিয়ারী বাইজী', 'বিন্দু', 'বিরাজ বৌ', 'মেজবৌ-রাণী', 'কেতকী'র মতোই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

॥ চৌদ্দ টাকা ॥

আবদুল জব্বারের

আর একটি অপূর্ব কথাচিত্র

মুখের মেলা

বাংলা সাহিত্য এখনও কৃত্রিম ভাষার বন্ধনে বদ্ধ যাঁদের ধারণা—তাঁরা এই বইটি পড়ুন। পাঠকদের মনে আগুন ধরাবার মতো উপাদান আছে এ বইতে। সৈয়দ মুজতবা আলীর উপযুক্ত উত্তরসূরী এই লেখক।

॥ আট টাকা ॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

অবধূত ও যোগী সঙ্গ ৯.

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের সর্বশেষ খণ্ড

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১০.

জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY

একটি ভিন্নধর্মী অভিনব শারদ সংকলন

পদক্ষেপ

সম্পাদক : সতীকান্ত গুহ

॥ কয়েকটি আকর্ষণ ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিক্‌কার কথা ॥

যে ভাষার কথা বলি, হাজার বছরের পথ পেরিয়ে কি করে তার এই রূপ ফুটল আমাদের কণ্ঠে, তারই মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন আচার্য ভাষাচার্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : অন্বেষণ ॥

পৃথ্বীশ, ফেলেনাপোতা আবিষ্কার-এর মত লেখকের আর একটি আশ্চর্য লেখা। নিরুদ্দেশেও যেখানে আলো জ্বালাতে হয় তেমনি এক অন্ধকার জগতে এ গল্পের নায়ক প্রশান্তর সাথে পরিচয় হয় পাঠকের।

অন্নদাশঙ্কর রায় : আহমদ্‌নগর ॥

ভাবে ও ভাবনায় যিনি স্বতন্ত্র তারই ক্ষুরধার চিন্তার তীক্ষ্ণতা, আলো পড়েছে বাঙালজনের নারকীয়, হতাশাময় মর্মকেন্দ্রে।

সন্তোষকুমার ঘোষ : স উবাচ ॥

কবিতার আবহে গল্প, যা লেখকের সমগ্র সাহিত্য জীবনের স্মরণীয় কীর্তি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সময়ের জালে ॥

একটি সুদীর্ঘ কবিতা। কবির সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অমিতাভ চৌধুরী : কয়েকটি ছড়া ॥

চলতি দিনের ঘটনার বুকে ছড়ার বুলেট। সুবেশিত্ দাস চিত্রিত।

দক্ষিণারঞ্জন বসু : প্রথম পাঠ ॥

যৌবনের প্রথম জাগরণের মুহূর্তে যে বড় প্রেয়সীর ভালোবাসার স্পর্শ আসে আড়াল-আবডাল দিয়ে, তারই এক তাৎক্ষণিক পরিচয় ফুটে উঠেছে প্রবীণ লেখকের কলমে।

দেবব্রত গুপ্ত : সংশিল্পের সম্পর্কে ॥

চলচ্চিত্র শিল্প একটি সুন্দর আলোচনা। সংশিল্পের পরিণাম সম্বন্ধে পাঠকের মনকে অবশ্যই আলোড়িত করবে।

কমলকুমার মজুমদার : মার্সেল প্রুস্ত ॥

শতবার্ষিকী উপলক্ষে একালের এক শক্তিমান ফরাসী লেখকের উপর বিস্তৃত আলোচনা।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় : রূপকথার রূপকার অবন ঠাকুর ॥

বাংলার রূপকার, ভারতের বরেণ্য স্মরণীয় পুরুষের প্রতি শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ।

ভবানী মুখোপাধ্যায় : সাহিত্যে নতুন তরঙ্গ ॥

এ কালের সাহিত্য কী ও কেন, ইউরোপের পটভূমিতে তারই মূল্যনিষ্ঠ বিচার ও বিবরণ।

শওকত ওসমান : আলোক অন্বেষা ॥

বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর জঙ্গীশাহীর অত্যাচারের এক জীবন্ত কাহিনী। গল্পটি সম্বন্ধে লেখকের অভিমত : তাঁর সাহিত্য জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

গৌরকিশোর ঘোষ : নিত্যযাত্রীর কথোপকথন ॥

কাজেই এই সময়ের মধ্যে আমরা কেমন ভাবে বেঁচে আছি, তা কি কেউ বলতে পারে? এই রম্য রচনাটির মধ্যে লেখক আমাদের অস্তিত্বের সেই সংকটকেই যেন দেখেছেন অন্তর্দৃষ্টিতে।

বিমল কর : সন্দেহ ॥

নতুন কালের কথাশিল্পীদের মধ্যে বিমল কর নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটি তাঁর লেখক-জীবনের আর একটি স্মরণীয় সংযোজন।

প্রফুল্ল রায় : চারদিকে কুয়াশা ॥

'পূর্বপার্বতী'র লেখক প্রফুল্ল রায়ের এক নতুন সৃষ্টি। গল্পটি পাঠকের মন আলোড়িত করবেই।

উপন্যাস :

চৌধুরী ক্যাসেল ॥ সতীকান্ত গুহ

একটি বৃহৎ উপন্যাস। শুধু ঘটনা বহুল কাহিনী নয়, কাহিনীর চূড়ার উপর মনোলোকের দীপ্তি, যা মানবচরিত্রকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে, তারই আলেখ্য।

কবিতা :

জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আতাউর রহমান, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, গোপাল ভৌমিক, সুনীল বসু, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার, রাণা বসু, পরমানন্দ সরস্বতী, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সামসুল হক, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, হিমাদ্রি বসু, শুভ মুখোপাধ্যায়, অমল ভৌমিক, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, স্বপ্নেন্দু ভৌমিক, নিশিনাথ সেন, মুকুন্দ সরকার ও সাধনা মুখোপাধ্যায়।

আরও গল্প :

লীলা মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, প্রতিমা সেনগুপ্ত, সুভাষ সিংহ ও আশিস সান্যাল।

অনুবাদ :

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহ, শচীরাউত রায় (ওড়িশা), ধর্মবীর ভারতী, শ্যাম পারমার, রঙ্গনাথ রাকেশ, প্রভাকর মাচওয়ে (হিন্দী), উমাশংকর যোশী (গুজরাটি), নবকান্ত বড়ুয়া, পরেশমল্ল বড়ুয়া (অসমীয়া)

এ ছাড়া থাকছে :

ক্ষেত্রনাথ রায়, মতি নন্দী, জ্যোতিপ্রসাদ বসু, শচীকান্ত গুহ, সাবিত্রী সেনগুপ্ত, কমল চৌধুরী ও ইন্দ্রনাথ গুহের কয়েকটি বিচিত্র রচনা।

অসংখ্য ছবি ও স্কেচ ॥ এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ॥

দাম চার টাকা ॥

অলংকরণে : শ্যামল নন্দী

পদক্ষেপ

১০ হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা—২৯

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 10th September, 1971 শুক্রবার, ২৪শে ভাদ্র ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪০৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৪০৫	সম্পাদকীয়		
৪০৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৪০৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪১০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৪১২	প্রতিরোধ	(কবিতা)	—শ্রীগোপাল ভৌমিক
৪১২	সবুজ বন্দরের যাত্রা	(কবিতা)	—শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১২	নির্জনতার পাথর ভেঙে	(কবিতা)	—শ্রীচন্দন সেন
৪১৩	প্রতিরোধ	(গল্প)	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
৪১৮	প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৃত্য		—শ্রীমঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী
৪২৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৪২৭	পূর্বাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৪৩০	আধুনিকতা ও শরৎচন্দ্র		—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী
৪৩৬	মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ		—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
৪৩৯	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৪৪৪	কৌতুক রসে ও মনোরঞ্জক চার্চিল		—শ্রীসুনীলকুমার নাগ
৪৪৭	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৪৫০	কালের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৪৫৪	শরৎচন্দ্রের কবিমানস		—শ্রীপ্রণতি সরকার
৪৫৮	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪৬০	সাদা রাত্রির ঘাঁটি এবং তারপরও	(গল্প)	—শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত
৪৬৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৪৭১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৪৭৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৪৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের
গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে
বাংলাদেশের লেখকদের
বই পড়ুন

● বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি সম্পাদিত

● রক্তাক্ত বাংলা
—বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ-সংকলন

● প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ
—সত্যেন সেন

● জাগ্রত বাংলাদেশ
—আহমদ ছফা

● তিনমাসের দিনলিপি
—আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

● বাংলাদেশ কথা কয়
—মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্পকারদের গল্প-সংকলন

তা' ছাড়া
বাংলাদেশে প্রকাশিত
প্রগতিশীল গ্রন্থসমূহ

মুক্তধারা

স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১ প্রাণকৃষ্ণ বাগান লেন, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫ ৬৭২০
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-০২৭৩

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত
শিক্ষা বিভাগ ও মনীষীবৃন্দ প্রশংসিত
COMMON WORDS
● পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪ ● ছবির সংখ্যা ৩৮০ ● দাম আড়াই টাকা
জেনারেল বুকস্
এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

এক নজরে

উভয়-পুরুষদের দাবী :

বৃটিশ পার্লামেন্টের সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে একদা এক বৃটিশ কূটনীতিক বলেছিলেন, পুরুষকে নারী এবং নারীকে পুরুষে পরিণত করার ক্ষমতা ছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের আর সব ক্ষমতাই আছে।

অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বৃটেনের যেসব পুরুষ নারীতে পরিণত হয়েছে তাদের বিভিন্ন দাবী আইনানুমোদিত করার জন্য একটা বড় রকমের আন্দোলন শুরু করেছেন তাদেরই মত একজন নারীতে পরিণত পুরুষ (উভয়পুরুষ বলা যায় কি?) শ্রীমতী জেনা আলেকজান্ডার। তিনি আগে স্কুল শিক্ষক ছিলেন ও মাঝে-মাঝে 'ডন্ডক' ছদ্মনামে অভিনয় করতেন। গত বছর কাসাব্লাঙ্কায় অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তিনি নারীতে পরিণত হন। বৃটেনের সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকা 'নিউ সোসাইটি'তে একটি চিঠি লিখে তিনি তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেছেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি যে সংস্থা গঠন করেছেন তার নাম—'জেন্ডার রিসার্চ এসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল জিরাস', সংক্ষেপে 'গ্রেস'। তাঁর প্রধান দাবী, তাঁর সংস্থার সদস্যদের যে কোন নারীর মত বিবাহের আইনানুমোদিত অধিকার দিতে হবে। তিনি বলেছেন: ফ্রান্সে জন্মালে আমার বিবাহের অধিকার থাকতো, দুর্ভাগ্যবশত বৃটেনে আজও আমাদের এ অধিকার স্বীকৃত হল না।

গত বছর ডাইভোর্স কোর্টে শ্রীমতী এপ্রিল অ্যাশলের সঙ্গে লর্ড বাওয়ালান-এর উত্তরাধিকারী শ্রীআর্থার কামেরন করবেটের বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, কারণ শ্রীমতী এ্যাশলে ১৯৬০ সালে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে পুরুষ থেকে নারীতে পরিণত হন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আসলে তিনি পুরুষ, সুতরাং বৃটিশ আইনমতে, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিবাহ আইনসিদ্ধ হতে পারে না।—ঐ রায়ের প্রতিবাদ থেকেই উভয়-পুরুষদের বর্তমান আন্দোলনের সূচনা। বর্তমান আইনের সংশোধনের দাবী জানিয়ে শ্রীমতী আলেকজান্ডার বৃটিশ পার্লামেন্টের বহু সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু তাঁকে সর্বত্রই নিরাশ হতে হয়। তিনি বলেছেন, আজ তাঁর সংঘের সদস্যসংখ্যা দুইশত অতিক্রম করে গেছে এবং তাঁরা সকলেই ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

তিনি বলেছেন, এটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা যে, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে লিঙ্গান্তর ঘটান বৃটেনের আইনসিদ্ধ হলেও লিঙ্গান্তরিত মানুষগুলির আইনগত অধিকার স্বীকারে বৃটেন বিমুখ হচ্ছে। তাদের জীবনবীমা নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হয়, চাকরীর ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মীমাংসা হয় না এবং সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে। তাদের বলা হয় এখন তোমরা যাই হও না কেন, তোমরা ত পুরুষ হয়েই জন্মেছিলে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তোমাদের জন্মের সময়ের রেকর্ড-গুলির কি করে পরিবর্তন করা যায়?

শ্রীমতী আলেকজান্ডার স্বীকার করেন, সমস্যা ও নানা জটিলতা অবশ্যই আছে, কিন্তু মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিকতা নিয়ে অগ্রসর হলে নিশ্চয়ই সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে।

রাবণের শব :

লঙ্কার কোন এক শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিবৃত দুর্গম পর্বতশৃঙ্গের এক গুহায় লঙ্কেশ্বর মহাবলী রাবণের শব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে—এক বৌদ্ধ পুরোহিত একথা বলায় সারা সিংহলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। এক দল লোক বলছেন—সম্পূর্ণ বাজে কথা, গাঁজাখোরের উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু অপর দল, এবং তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী, ঐ পুরোহিতের দাবী সত্য বলে মনে করছেন, এবং তাঁদের দাবীতে ইতিমধ্যেই সিংহল সরকারের এক কনিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রী টি বি এম হেরাতকে নিয়ে একটি রাবণের শব অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে। শ্রীহেরাত ঐ কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা। কমিটিতে সিংহলের আদিবাসী বেদ্দা উপজাতীয়দের থেকে তিনজনকে নেওয়া হয়েছে, যে উপজাতীয়রা নিজেদের রাবণের বংশধর বলে দাবী করে এবং তাদের সকলের নামেই রাবণ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়—যেমন রাবাংগে বিভূষণ, রাবাংগে কইরা, রাবাঙ্গে বেন্দা ইত্যাদি।

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে মধ্যসিংহলের বেলিগামুণ নামক স্থানের পোটগাল বুদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত সমনপুত্র সিদ্ধার্থ থেরাঙ্কর দাবী করেন, বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তিনি জানতে পারেন যে, রাবণের দেহ একটি স্থানে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, এবং সে জায়গাটিও তিনি মোটামুটিভাবে স্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু সে দুর্গম স্থানে পৌঁছান সহজ কাজ নয়। — ঐ বৌদ্ধ পুরোহিত দাবী সিংহলের বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় পত্রিকা সিলুমিনাতে প্রকাশিত হওয়ার পরেই ঐ দ্বীপরাজ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়।

অবশ্য সিংহলের প্রথম সারির প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ পরাণবিতান বলেছেন: এটা একটা বেশ বড় রকমের রসিকতা। যার কোন অস্তিত্ব ছিল না কোনদিন, যে এক পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র তার মৃতদেহ কি করে সংরক্ষিত থাকে তা বুঝতে পারি না।

আর এক পুরাতত্ত্ববিদ বলেছেন: রামায়ণে যে লঙ্কার উল্লেখ আছে সে আমাদের লঙ্কা নয়।

শহর ডুবছে :

অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বন্ধ জোয়ার চাপ, কয়েক কোটি ঘন ফুট মাটি জমায় জল নিষ্কাশন অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে জব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত, প্রায় তিনশ' বছরের পুরানো শহর কলকাতার এখানে-ওখানে বসে যাওয়ায়, ভেঙে পড়ার সংবাদ প্রায়ই কাগজে প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, অবিলম্বে একটা কিছু না করা হলে এই আদি শহরটির প্রাণ রক্ষাই শেষ পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

কলকাতা সম্বন্ধে যা সত্য, পৃথিবীর আরও কয়েকটি বড় শহর সম্বন্ধে সেকথা আরও বেশী সত্য। তবে কারণ সর্বত্র এক নয়। পূর্ব এশিয়ার দুই বৃহৎ শহর জাপান ও ব্যাঙ্কক যে আশঙ্কাজনকভাবে বসে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ পানীয়ের প্রয়োজনে মাটির তলা থেকে অত্যধিক জল উত্তোলন। ব্যাঙ্কক ভেনিস শহরের মত বসে যাচ্ছে, এবং অবিলম্বে প্রতিকার না হলে বিশ বছরের মধ্যে থাইল্যান্ডের সুরম্য রাজধানীটি সমুদ্রের জল-সীমার নীচে চলে যাবে। কতকগুলি জায়গায় এখনই নিয়মিত বানের জল ঢুকছে।

টোকিও শহরেরও প্রায় বিশ শতাংশ এলাকা সমুদ্রসীমার নীচে, এবং প্রায় ৫৪ শতাংশ এলাকা প্রতি বছর এক সেন্টিমিটার হারে বসে যাচ্ছে। দুটি শহরেই এখন তাই মাটির নীচ থেকে জল তোলা বন্ধ করে সমুদ্রের জল পরিশুদ্ধ ক'রে পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ওদিকে শৈলরাণী সিমলার বিভিন্ন এলাকাও আশঙ্কাজনকভাবে বসে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শহরের উত্তর-পূর্ব এলাকা ইতিমধ্যে তিন ফুট বসে গেছে। সিমলা শহর বসার প্রধান কারণ কয়েক বছর ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত। বহু বাড়ী-ঘর ভেঙে পড়েছে, ফাটল ধরেছে এবং ঐ সবের ফলে সিমলা শহরের ক্ষতির পরিমাণ নাকি ইতিমধ্যে দুশ কোটি টাকার অঙ্ক পৌঁছিয়ে গেছে।

২।৯।৭৯ —[illegible]

সম্পাদকীয়

অর্থপূর্ণ সংলাপ

সেদিন ছিল যে দিবসের মেঘমুক্ত আকাশ। ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত শ্রীব্রজেশ মিশ্রের দিকে তাকিয়ে মিঃ মাও সে তুং হেসেছিলেন এবং তাঁর করমর্দন করেছিলেন। অমনই সকলেই অনুমান করলেন বরফ গলতে সুরু হয়েছে। নয়াদিল্লীর টনক নড়ল। চীন-ভারত মন কষাকষির অবসান ঘটানোর জন্য একটা তোড়জোড় সুরু হল। কিন্তু মানভঞ্জনের পালা এত সহজ নয়, সুতরাং মানভঞ্জনের যত প্রকার প্রক্রিয়া আছে তা ব্যবহার করা সত্ত্বেও উভয় দেশের সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার ব্যাপারে তেমন অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা গেল না। ভারত বার বার নানাভাবে চেষ্টা করেছে, ন'বছর আগেকার ঘটনাকে ভুলে গিয়ে, স্লেটের দাগ মুছে আবার সুরু হোক নতুন খেলা, কিন্তু ওপক্ষ থেকে সাড়া আসেনি। 'অলি বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে, তবে ত' ফুল বিকাশে', কবির কথাটি এই ক্ষেত্রেও খেটে গেল প্রায় ঠিক ঠিক। বার বার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্সে গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আভাসে জানিয়েছেন উভয় দেশের মধ্যে একটা যোগাযোগের জন্য সক্রিয়-ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে তিনি নিজেই মিঃ চৌ-এন-লাইকে একটি চিঠি দিয়েছেন এবং চীনা তরফ থেকে একটা সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল হয়ে উঠেছে। একবার যদি দূরত্ব অতিক্রম করার সংশয়টুকু ঘুচে যায় তাহলে উভয় দেশের মধ্যে 'মিনিংফুল ডায়োলগ' বা অর্থপূর্ণ সংলাপ চালানোর সুবিধা হয়। এই বিলম্ব সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা সুরু হয়েছে। ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে সরকারিভাবে চীন কোনো মন্তব্য করে নি। জর্জ টাউন থেকে কম্যুনিস্ট চায়না ট্রেড ডেলিগেশনের একজন মুখপাত্র ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মন্তব্য করেছেন এই চুক্তিটিকে চীন মিত্রজনোচিত কর্ম মনে করে না। তাঁরা আরও বলেছেন, একটা চীন বিরোধী "যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ও ভারতের সম্মিলিত সহযোগ" গড়ে উঠছে সেদিকেও চীন লক্ষ্য রেখেছে।

এই উপ-মহাদেশের রাজনীতি বিষয়ে চীন এতদিন হিমালয়ের মত মৌন ছিল। তবে সম্প্রতি মিঃ চৌ-এন-লাই বলেছেন যে, দুটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে চীন এই অঞ্চলকে 'লিবারেট' বা বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের প্রভাবমুক্ত করবেন। কলিকাতার সাংবাদিকরা এই উক্তির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করতে অনুরোধ করলে তিনি কিছুই বলতে অস্বীকার করেন। অনেক সময় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অনেক সংকল্প পালনের প্রতিশ্রুতি থাকে কিন্তু কার্যকালে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কোনোরকম মন্তব্য না করে প্রধানমন্ত্রী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

যেদিক থেকেই হোক ভারত-চীন সম্পর্ককে সহজ করার পক্ষে এই সব সাময়িক উক্তিকে বাধা হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের মিত্রতার সম্পর্ক। সেই প্রীতির সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়ে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই কারণে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত চিঠি এবং পিকিংএ শ্রীব্রজেশ মিশ্রের উপস্থিতি একটা নতুন সম্ভাবনার আশা সঞ্চার করেছে। শ্রীমিশ্র ভারত সম্পর্কে চীনের বর্তমান মনোভাবের সঠিক বিবরণ হয়ত দিতে পেরেছেন। চীনের সঙ্গে সম্পর্কটা নিবিড় করে তুলতে অতঃপর ভারতের পক্ষে কি কি করণীয় তার ইঙ্গিত শ্রীমিশ্র দিয়েছেন। চীনের বর্তমান মনোভঙ্গী অনেক সহৃদয়। কালচারাল রেভোল্যুশানের প্রকোপমুক্ত হয়ে চীনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া এখন অনেক মনোরম। চীন অনেক দেশে নতুন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইতালী, কানাডা, ইথিওপিয়া, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি প্রভৃতি দেশ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান মুহূর্তে চীন শত্রুর সংখ্যা হ্রাস করে মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে অধিকতর আগ্রহী। সকল দিকে সংঘর্ষের সম্ভাবনা হ্রাস করাই তার লক্ষ্য। দেশকে শক্তিশালী করতে হলে চারপাশে শত্রু রাখা সঙ্গত নয়।

ইতিমধ্যে শ্রী ডি, পি, ধর মস্কো-ভ্রমণকালে চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করেছেন অনেকে মনে করেন ভারতের তরফ থেকে পিকিং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ভারত সরকার অচিরেই পিকিং-এ একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করুন এটা হয়ত একটা প্রাথমিক দাবী। শ্রীব্রজেশ মিশ্র সম্ভবত দিল্লীতে সেই কথাই বলেছেন। দিল্লীতে এই বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও মনে হয় অবিলম্বে একজন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে পিকিং-এ পাঠানো হবে এবং নয়াদিল্লীর চীনা দূতাবাসের সামনে থেকে 'নজরবন্দী শিবির' তুলে নেওয়া হবে। ভারত যদি সৌজন্য এবং শিষ্টাচার প্রদর্শন করে চীনের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে তাহলে সব দিক থেকে মঙ্গল, আর ভারত যদি বিফলও হয় তাহলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বাস্তববাদী মনোভঙ্গী প্রশংসিত হবে।

পটভূমি

বাঙ্গালোরের আবহাওয়া অবশ্য মনোরম, কিন্তু শুধু সেই কারণেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক সেখানে অনুষ্ঠিত হল কিনা বলা শক্ত। জুলাইয়ের শেষে পলিট ব্যুরোর বৈঠক বসেছিল দিল্লীতে, যদিও সর্বভারতীয় দলগুলির মধ্যে একমাত্র সি পি এমের সদর দপ্তরই দিল্লীর বাইরে, অর্থাৎ কলকাতায়। দিল্লীতে বৈঠক বসানোর উদ্দেশ্য ছিল বৈঠকের আগে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবের একটা আগাম হদিস নেওয়া। কলকাতায় বা ত্রিবান্দ্রমে বৈঠকের আয়োজন করলে তার আগে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শুধু মিনিট পাঁচেকের আলোচনার জন্যে জ্যোতি বসুর দিল্লী যাওয়াটা হয়ত খুব মানানসই হত না।

এবার অবশ্য সে-রকম কোনো কারণ ছিল না। তবু মহীশূরের রাজধানীতে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে অনেকে একটু অবাক হয়েছেন, কারণ ওখানে তো সি পি এমের তেমন ঘাঁটি নেই। সে-হিসেবে পশ্চিমবাংলা বা কেরলের কোথাও বৈঠকটাই হয়ত মানানসই হত, কারণ দলের সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া নিজেই বলেছেন যে, ঐ দুটি রাজ্য ছাড়া আর সর্বত্রই সি পি এম দুর্বল। দলের লাখখানেক সদস্যের মধ্যে এই দুই রাজ্যেই জুটিয়েছে ৭০ হাজার। তবে কিছু দিন আগে সি পি এমের পশ্চিমবাংলা কমিটি দাবী করেছিলেন যে, এই রাজ্যে তাঁদের সদস্য সংখ্যা ৩০ হাজারের মতো। সুন্দরাইয়ার হিসেবে ঐ সংখ্যা ২১ হাজার। পশ্চিমবাংলা বা কেরল ছাড়া আর যে রাজ্যে পার্টির কিছু প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করতেন, সেটি হল অন্ধ্রপ্রদেশ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সি পি আই এবং উগ্রপন্থীদের সাঁড়াশি আক্রমণে বি টি রণদিভের নিজ রাজ্যে দলের অবস্থা বেশ কাহিল। নেতাদের অনেকেই যোগ দিয়েছেন সংশোধনবাদী সি পি আই-এ, আর এক দল হাত মিলিয়েছেন উগ্রপন্থীদের সঙ্গে।

পলিট ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির এই বৈঠক ছিল আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্য। কংগ্রেস বসবে ডিসেম্বরে, তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুতেও অবশ্য দলের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। গত সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সি পি এম একটিতেও জিততে পারেনি। শুধু তাই নয়, দুটি আসনেই সি পি এম প্রার্থীদের জামানত হারাতে হয়। যাঁরা পরাজিত হন তাদের মধ্যে পি রামমূর্তির মতো নেতাও ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তামিলনাড়ুতে যে সি পি এম অনেক ভালো ফল করেছিল তার কারণ ছিল ডি এম কের সঙ্গে আঁতাত। এবার ডি এম কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সি পি আই। একা লড়ে গিয়ে সি পি এম মার খেয়ে গেল প্রচুর। তামিলনাড়ুতে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠান ঐ রাজ্যে পার্টির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য হওয়া অসম্ভব নয়।

পার্টি কংগ্রেস সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এবারের কংগ্রেসের গুরুত্ব দুটি কারণে বিশেষ করে বেড়ে গেছে। প্রথম কারণ, গত পার্টি কংগ্রেসের পর অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতি নতুন মোড় নিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন।

অবশ্য যে-কটি রাজ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা সেই সব রাজ্যে (যেমন মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি) পার্টি এমন কিছু শক্তিশালী নয়। গত লোকসভার নির্বাচনের ফলাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ১৩টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে সি পি এম মোট ৮৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জিতেছে ২৫টিতে কিন্তু সেই ২৫টির কুড়িটিই এসেছে পশ্চিমবাংলা এবং দুটি ত্রিপুরা থেকে। কেরলের কথা মনে রেখেও এ-কথা বললে অন্যায় হয় না যে, সি পি এম এখন মোটামুটি একটা আঞ্চলিক দলের চেহারা নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটির এবারের প্রস্তাবেও তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা বলা হয়নি তা নয়, কিন্তু আসল জোরটা পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির ওপর। সারা দেশে সি পি এমের রাজ্য ইউনিটগুলি যে দাবির ভিত্তিতে অভিযান চালাবে তা হল, ১৯৭২ সালের গোড়ায় পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন করাতে হবে।

পশ্চিম বাংলার ওপর এই জোর দেওয়ার কারণটা যে দুর্বোধ্য তাও নয়। এই রাজ্য ছাড়া সি পি এম আর যেখানে বামফ্রন্ট বাহিনীর দ্বারে ক্ষমতা দখলের আশা করতে পারে সেটা হল কেরল। কিন্তু কেরলে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে সবে এক বছর হল। কংগ্রেস সেখানে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে কিনা, এ-নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা থাকলেও মন্ত্রিসভার পতনের কোনো আশু আশংকা নেই। তাই নেই মাঝপথে নির্বাচনের সম্ভাবনাও। এই অবস্থায় সি পি এমের সব নজর পশ্চিম বাংলার ওপর পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সি পি এমকে কতোটা বাধিত করবেন? আর যদি না করেন, তা হলে কি দুপক্ষের মধ্যে একটা সম্মুখ সমরের ক্ষেত্র তৈরি হবে?

প্রধানমন্ত্রী এবার কলকাতা সফরে মোটামুটি এই রকম আভাস দিয়েছেন যে, ১৯৭২ সালের গোড়ায় পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনের আশা কম। তিনি সরাসরি অবশ্য এই সম্ভাবনা নাকচ করে দেননি, তবে আশাপ্রদ কোনো কথাও শোনাননি। তার কারণ একাধিক। প্রথম কারণ অবশ্যই এই রাজ্যে বাংলাদেশের লাখ লাখ শরণার্থীর উপস্থিতি। আগের এক 'পটভূমিতে' বলেছিলাম, শরণার্থী সমস্যার অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও একটি ফল শীগগিরই বোঝা যাবে এবং তা হল এই সমস্যার মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। এই সমস্যার গুরুভারে যেখানে কর্তৃপক্ষের শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়ার উপক্রম, অন্যান্য সমস্যা (যেমন আইন-শৃংখলা, বন্যা) তো আছেই। সুতরাং এর একটা ফয়সালা না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসকদের নির্বাচনের বাড়তি দায়িত্ব নিতে বলা চলে কী?

এটাই প্রধান ও বাস্তব কারণ, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কেন যে এখনই পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন চাইবেন না তার আরও কারণ থাকতে পারে। গত দুবারের রাষ্ট্রপতির শাসনের তুলনায় এবার পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে, দিল্লীর আগ্রহ অনেক বেশি স্পষ্ট। শিল্প প্রসারের ১৬-দফা কর্মসূচী, কলকাতার উন্নয়ন, ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মসূচী অনুমোদন, দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ তৈরির জন্যে উদ্যোগ, সর্বোপরি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নিয়োগ সেই আগ্রহেরই প্রমাণ। এইসব কাজই দীর্ঘমেয়াদী, তবু এ-সবের কিছু কিছু সুফল ফলতে শুরু করার আগেই কি কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন করতে চাইবেন? কারণ, এই সুফল ফললে তার কৃতিত্বটা তো শাসক কংগ্রেসের ওপরেই বর্তাবে, ফলে নির্বাচনে এই দলের সুবিধেও হবে।

আরো একটা কারণ রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বে আসন্ন পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিজয়সিং নাহারের পদত্যাগের পর নতুন পাকা সভাপতি নির্বাচনের কাজ এ-মাসেই শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী চান রাজ্য কংগ্রেসকে নতুন রূপ দিতে। নতুন সভাপতির ওপর সেই দায়িত্ব পড়বে। সেটাও খুব স্বল্পমেয়াদী কাজ নয়। কারণ আসল পরিবর্তন আনতে হবে জেলাস্তরে। সেই কাজ পুরোটা শেষ না-হোক, অন্ততঃ বেশ কিছুটা না এগোলে কি শাসক কংগ্রেস নির্বাচনে উৎসাহী হবে?

স্পষ্টতঃই, এইসব হল কংগ্রেসের তথা প্রধানমন্ত্রীর নিজের অংক। পশ্চিমবাংলা

সম্পর্কে সি. পি এম-এর অংকের সংগে তার মিল খামানাই। জুলাই মাসে দিল্লীতে পলিট ব্যুরোর বৈঠকে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে, পশ্চিমবাংলার ব্যাপারে (প্রধানতঃ আইন-শৃংখলার সমস্যার সমাধানে) সি পি এম একটি মাত্র শর্তেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা করতে পারে, তা হল নভেম্বরে নির্বাচন। বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রীর সংগে জ্যোতিবাবুর সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যও ছিল এই সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র তৈরি করা। স্পষ্টতই সি পি এম-এর শর্ত মেনে নেওয়ার মতো কোনোরকম ইঙ্গিত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, কারণ তাহলে সি. পি এম-এর গলার স্বরও কিছুটা নরম সুরে বাজত।

কিন্তু বাঙ্গালোর থেকে যে-সুর বেজে এল, তাতে তীব্র ঝাঁঝ স্পষ্ট। সি পি এম-এর বিচারে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেস দলই এখনও 'প্রধান শত্রু'। 'সি পি আই বাদে' 'কংগ্রেস-বিরোধিতার সাবেকী নীতি' বজায় রাখা হয়েছে। সি পি এম এখনও সেই পথেরই পথিক হয়ে থাকতে চায়। এই নীতি তাকে গত নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় সাফল্যলাভ করতে বেশ সাহায্য করেছে, সুতরাং এই নীতি পার্টি ছাড়বেই বা কেন? শ্রীসুন্দরাইয়া এটুকু স্বীকার করতে রাজী আছেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এখনও স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের চেহারা নেয়নি, কিন্তু পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্যে অবশ্যই এই সরকারের 'আধা-ফ্যাসিস্ট' চেহারা প্রকট। তাই এই 'বড় বুর্জোয়া ও জমিদারের দল' শাসক কংগ্রেসকে কীভাবে জনসাধারণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা স্থির করাই হবে পার্টির কাজ।

তবে কংগ্রেস সম্বন্ধে সি পি এম-এর মনোভাব যতোটা একরোখা ও স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে, আসলে কি ঠিক ততোটা তাই? নাকি কিছু কিছু দ্বিধা বা বিভ্রান্তির লক্ষণও আছে? শ্রীসুন্দরাইয়ার মতে, শ্রীমতী গান্ধী মার্কসবাদীদের সংগে লড়াইয়ে নেমেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র, জনসংঘ বা সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ার সাহস পাচ্ছেন না। আবার বাঙ্গালোরে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, গত সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের চরম পরাজয় ঘটেছে। সেই পরাজয়টা কে ঘটিয়েছে? নিশ্চয়ই সি পি এম বা অপর কোনো বামপন্থী দল নয়। দক্ষিণপন্থীদের ভরাডুবি ঘটেছে কংগ্রেসেরই হাতে। আর সেই লড়াই যদি শ্রীমতী গান্ধী না চালিয়ে থাকেন তবে কে চালিয়েছে? আবার, শ্রীসুন্দরাইয়া বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতি দলের নীতিকে কাজে রূপ দিচ্ছেন। এ-কথা যদি সত্যি হয়, তবে তো বলতে হয় সি পি এমও সেইসব নীতিকে রূপায়িত করতে বেশ সাহায্য করছে। কারণ, সাধারণ বীমা রাষ্ট্রীয়করণ, সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধন প্রভৃতি যে-সব ব্যবস্থা শ্রীমতী গান্ধীর সরকার নিয়েছেন, তাতে সি পি এমও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

তাহলে ব্যাপারটা কি কিছুটা গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে না? তা হলেও এটা খোলসা আশ্চর্যও নয়। কারণ [illegible] সালের কংগ্রেস ভাগের পর ভারতের রাজনীতিতে যে পালা বদল শুরু হয়েছে, সি পি এম সেটাকে কোনো তত্ত্বগত স্বীকৃতি দিতে পারছে না, অথবা চাইছে না। অথচ এত বড় একটা বাস্তব ঘটনা স্বীকার না-করে নিলে গোটা রাজনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নে বিভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। শ্রীমতী গান্ধী অবশ্যই বিপ্লব করতে নামেননি, কিন্তু গত কয়েক বছরে তাঁর কার্যাবলী অন্ততঃ অনেক বামপন্থী দলের পালের হাওয়া যে কেড়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবাংলা সোস্যালিস্ট পার্টির নতুন চেয়ারম্যান সমর গুহের সাম্প্রতিক আক্ষেপ থেকে এই কথা বেশ স্পষ্ট। সমরবাবু সেদিন বলেছেন, তাঁরাই অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীরাই এত দিন আইনী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বলে এসেছেন, আর আজ কংগ্রেস সেই পথে চলার চেষ্টা করে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সি পি আই অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিশীল নীতিকে তাদের থিওরির সংগে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, কারণ ঐ দলের মতে, কংগ্রেসের মধ্যে যে 'প্রগতিশীল অংশ' আছে, এটা তাদেরই চাপের ফল। কিন্তু সি পি এম প্রগতিশীলতার কথা স্বীকারই করবে না। তাই সংবিধান সংশোধনের জন্য তারা দাবি জানাবে, সরকার সংবিধান সংশোধন করলে তারা তা সমর্থন করবে, কিন্তু আবার বলবে, সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের মনে অহেতুক একটা মোহ সৃষ্টি করছেন। আবার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংগে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্য আহ্বান সি পি এম জানাবে, কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বলবে, এটা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়, কারণ এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা শ্রীমতী গান্ধী রুশ-চীন-মার্কিন বিরোধের সুযোগ নিচ্ছেন মাত্র। চীনের সংগে সম্পর্ক সহজতর করার দাবিও সি পি এম করেছে, লক্ষণ দেখে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারত-চীন বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা নয়। সেই দিন যখন আসবে তখন সি পি এম কী বলবে?

পশ্চিমবাংলার আশু নির্বাচনের জন্য সি পি এম অবশ্যই অভিযান শুরু করবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি সেই দাবি মেনে নেওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখান, তবে সি পি এম কী করবে? পার্টির ক্যাম্পেনই বা কী রূপ নেবে?

এর আগে প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতারা বারবার বলেছেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে কংগ্রেসই হবে প্রধান অস্ত্র, কারণ এছাড়া এখন আর কোনো পথ নেই। ময়দানে সভা করে অথবা রাস্তায় মিছিল করে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যাবে বলে স্পষ্টতই সি পি এম আর মনে করে না। এই অবস্থায় যে-পার্টি এখনও প্রকাশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেয়নি, তারা আর বন্ধ ছাড়া কোন্ পথেই বা যেতে পারে? ইংরেজি আগস্ট মাসে বাংলা বন্ধ হয়ে গেল হাতে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার সংগে সি পি এম-এর একটা শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেল। সিদ্ধার্থশংকর রায় ও কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী আর কে খাদিলকর বন্ধের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তবু প্রথম রাউন্ডে জয় সি পি এম-এরই। কিন্তু এখন যদি পর পর বন্ধ ডাকা হয়, তবে দিল্লী তাকে কী চোখে দেখবে? এইবার কলকাতায় এসেও প্রধানমন্ত্রী বন্ধের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। সরকারের তরফ থেকে বন্ধের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করা হয়েছে জোর উৎসাহে।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, সি পি এম-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ইউ টি ইউ সি নেতা যতীন চক্রবর্তী সি পি এম-এর ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটুর কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, বন্ধে এখন আর কোনো কাজ হচ্ছে না, আরো সক্রিয় কিছু করা দরকার। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনগোছের কিছু করার কথা বলেছেন। সি পি এম অবশ্য এই ধরনের আন্দোলনের কথা এখনও ভাবেনি। জুনের শেষে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠকের শেষে প্রমোদ দাশগুপ্ত কেন্দ্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু কোন্ পথে আন্দোলন হবে তা স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তিনি একটি প্রস্তাব করেছিলেন: কেন্দ্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আইনজীবী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি একটি কনভেনশন ডাকুন এবং সেই কনভেনশন থেকেই উঠুক প্রতিবাদ।

এ-থেকে মনে করা যেতে পারে যে সি পি এম এখন আইনী পথেই থাকতে চায়। সি পি এম-কে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দিয়ে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশংকা করেছিলেন, সি পি এম সে-ধরনের কিছুই করেনি। সি পি এম-এর প্রতিবাদ ছিল নিতান্তই মামুলি প্রতিবাদ, এমনকি একটা বাংলা বন্ধও ডাকা হয়নি। পার্টি কর্মীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্যে সি পি এম-কে একটা লড়াকু চেহারা বজায় রাখতেই হবে, কিন্তু সি. পি এম আইন অমান্য আন্দোলন বা আরো চরম কোনো পথ এখনই গ্রহণ করবে বলে অনেকেই মনে করেন না। তার কারণ দুটি। প্রথমতঃ, নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচণ্ড শক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশ পরিস্থিতি। এই দুটি কারণ মিলিয়ে দিল্লীর পক্ষে একটা যে-কোনো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব কঠিন নয়। সি পি এম সম্বন্ধে দিল্লী সেই ধরনের কোনো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, এমন কোনো সুযোগ কি সি পি এম দিল্লীর হাতে তুলে দিতে [illegible]? —[illegible]

দেশ বিদেশ

সরকারী হিসাবই বলছে, ১৯৫০ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে বন্যার ক্ষতি হয়েছে মোট ১১০৬ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে গড়ে ৭১ কোটি টাকা। গড়ে প্রতি বছর বন্যার ফলে দেড় কোটি মানুষ দুর্গতির মধ্যে পড়েন, ৬৫০ মানুষ মারা যান, দেড় কোটি একর জমির ক্ষতি হয়, পঞ্চাশ লক্ষ একরের বেশী জমির ফসল নষ্ট হয়, বত্রিশ হাজারখানেক গরুমোষ মারা যায়, পাঁচ লক্ষ কুঁড়ে ও কোঠাবাড়ী নষ্ট হয়।

এই ষোল বছরে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ যেখানে ১১০৬ কোটি টাকা সেখানে ১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ১৮ বছরে বন্যানিয়ন্ত্রণে খরচ করা হয়েছে ১৯২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর বন্যার মোট যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তার এক পঞ্চমাংশেরও কম টাকা খরচ করা হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য।

কাজ যে একেবারে কিছু হয়নি তা অবশ্য নয়। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দাবী করে থাকেন, দেশের যে প্রায় ৬ কোটি একর জমিতে সাধারণত প্লাবনের সম্ভাবনা থাকে তার এক চতুর্থাংশে বন্যা আয়ত্তে আনা গেছে। নদীর পারে নতুন বাঁধ দেওয়া হয়েছে মোট ৪০০০ মাইল, ৫৭০০ মাইল নিকাশী খাল খোঁড়া হয়েছে, ৪৫৮০টি গ্রাম নিচু জমি থেকে উঁচু ডাঙ্গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ১৭৮টি শহরকে বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক কোটি মানুষের পক্ষে এবার এই পরিসংখ্যান কোন সান্ত্বনাই নয়। কেননা, তাঁরা প্লাবনের জলে ভাসছেন। সামনে গোটা সেপ্টেম্বর মাস এখনও বাকী। এরই মধ্যে উত্তর ভারতে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে বন্যার্ত মানুষের হাহাকার শোনা যাচ্ছে। এবারকার বর্ষায় গঙ্গায় বিপদসীমার উপর দেড় কোটি একর-ফুট জল জমেছে, সাধারণতঃ যেখানে জমে মাত্র প্রায় ত্রিশ লক্ষ ফুট। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এবার সারা ভারতে বন্যার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বসাকুল্যে ৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর যা হয় তার চার গুণের বেশী। আর একটি অসম্পূর্ণ হিসাব হল, বন্যায় এযাবৎ মারা গেছেন ৪৫০ জন। গঙ্গায় জলোচ্ছ্বাসের ফলে বিহারের রাজধানী পাটনা বিপন্ন হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বারৌনি শহর সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। প্লাবনের ফলে বারৌনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বারৌনি শহরে জলমগ্ন হলে অবশ্য বিপদ আরও গভীর হত। কেন না, এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়াও সার কারখানা ও তৈল শোধনাগার রয়েছে এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিতে জলোচ্ছ্বাস ও অতিবর্ষণের ফলে দশটি জেলায় প্লাবন দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছে মালদহ জেলা। ঐ জেলার বারো আনা অংশই জলের তলায়। রেলপথে, সড়কপথে ও বিমানপথে জেলার সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মালদহে ত্রাণসামগ্রীও পাঠান যাচ্ছে না।

অন্যান্যবারের মতো এবারও অভিযোগ হয়েছে যে, নিম্ন বাংলার নদীগুলি যখন বৃষ্টির জলে এমনিতেই ফুলে ফেঁপে রয়েছে তখনই ডি-ভি-সি'র বাঁধ (এবং কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ) থেকে জল ছেড়ে মানুষের দুর্গতি আরও বাড়ান হয়েছে। ভারতবর্ষে গত কয়েক দশকে যেসব ড্যাম তৈরী করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে মাত্র তিনটিতে বন্যানিয়ন্ত্রণ অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে রাখা হয়েছে। এই তিনটি হল : হীরাকুদ বাঁধ, পাঞ্চেৎ বাঁধ ও মাইথন বাঁধ। এদের মধ্যে শেষোক্ত দুটিই হল ডি-ভি-সি'র বাঁধ। এ দুটি বাঁধই অবশ্য একসঙ্গে একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হয়েছে। টাকার সাশ্রয় করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যটিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং কখনও কখনও এইসব উদ্দেশ্য পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় (যেমন, বর্ষার জল আটকাবার জন্য জলাধারে যতটা স্থান খালি রাখা দরকার তা রাখতে গেলে সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকটা মার খায়)। কিন্তু, তবু, ডি-ভি-সি'র বাঁধগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের যতটা সুফল পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা পুরনো অভিযোগ। এর অনেকগুলি কারণ আছে। দামোদরের বাঁধগুলি যখন তৈরী করা হয়েছিল তখন এইসব বাঁধে প্রতি বছর যে পরিমাণ পলি পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ পলি জমছে। অর্থাৎ এইসব বাঁধের জল ধরে রাখার ক্ষমতা দ্রুতহারে কমছে। এই প্রতিরোধ করার জন্য বাঁধের উজান এলাকাগুলিতে ভূমিসংরক্ষণের কাজের উপর যতটা জোর দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, পাঞ্চেৎ জলাধারে যে স্তর পর্যন্ত জল রাখার কথা ছিল তা থেকে ২৫ ফুট নিচু স্তর পর্যন্ত জল রাখতে হচ্ছে। অনুরূপভাবে, মাইথনেও পাঁচ ফুট নিচু স্তর পর্যন্ত জল রাখতে এর কারণ বেশী জল রাখতে গেলে জলাধারসংলগ্ন আরও কিছু জমি সময়মতো দখল করার দরকার ছিল। এখন সেসব জমি দখল করতে হলে সেখানে ইতিমধ্যে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দিতে হবে এবং তার দায়িত্ব নিতে হবে বিহার সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গে বন্যার প্রকোপ কমাবার জন্য এই দায়িত্ব নিতে বিহার সরকার খুব উৎসুক নয়। তাছাড়া, সেটা করতে গেলে যে খরচ হবে সেই খরচ ভাগাভাগির জটিল প্রশ্নটাও রয়েছে।

তৃতীয়ত, ডি-ভি-সি'র জলাধারগুলি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে জল নিকাশের যে ব্যবস্থা করা দরকার ছিল তা করা হয়নি : তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী ও হাওড়া জেলার নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যা একটা চিরস্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হতে চলেছে। ডি-ভি-সি'র জেনারেল ম্যানেজার দেবেশ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, নিম্ন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদিও প্রারম্ভিক কাজ শুরু করার বাবদ দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন তাহলেও ঐ কাজ আরম্ভ হয়নি এবং আগামীবার অবস্থার যে কিছু উন্নতি হবে তার নিশ্চয়তা কিছু নেই।

*

তামিলনাড়ুই বলতে গেলে ভারতের প্রথম রাজ্য যেখানে মাদকবর্জন নীতি চালু করা হয়েছিল। তামিলনাড়ুর সরকার গত ৩০ আগস্ট তারিখে ২২ বছরের পুরানো সেই মাদকবর্জন নীতি বিদায় দেওয়ার পর ভারতে এখন আর একটি মাত্র রাজ্য রইল যেখানে মদ বিক্রি করা ও খাওয়া নিষিদ্ধ। সেই একটিমাত্র রাজ্য হল গুজরাট।

তামিলনাড়ু সরকার অবশ্য সরকারীভাবে একথা বলছেন না যে, তাঁরা মাদকবর্জন নীতি বিসর্জন দিলেন। তাঁরা শুধু বলছেন এই নীতি তাঁরা 'স্থগিত' রাখছেন। মাদকবর্জন সম্পর্কে একটা সর্বভারতীয় নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত চালু না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা এককভাবে মাদক নিষিদ্ধ করে লোকসান মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তামিলনাড়ু সরকার অনুমান করছেন,

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রবিবার লেক-সাইডের সর্বাঙ্গে পাকিস্থানে পবিত্রতার সম্পাদিত ভারতীয় মাদক সমিতির এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

অবাধে মদ কেনা-বেচা করতে দেওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের বছরে ২৬ কোটি টাকা আয় বেড়ে যাবে।

গত জুন মাসেই মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যপালের দুটি অর্ডিন্যান্সের দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হল। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে ৭৩৯৫টি তাড়ির দোকান ও ৩৫১২টি আরকের দোকান নীলাম করেছেন এবং শতখানেক বিলাতী মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছেন। শুধু এই থেকেই সরকারের ১৬ কোটি টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে।

নূতন উদার নীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলাও কারবার ফেঁদে বসার জন্য ইতিমধ্যে আরও অনেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। মাদ্রাজ শহরের রাস্তার আলোকস্তম্ভে মদের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। নারকেল ও তাল গাছ জমা নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সুযোগ বুঝে গাছের মালিকরা দাম চড়িয়ে দিয়েছেন। লোকে তাড়ি কাটতে ছুটে গেছে। যে অল্প কয়েকজন তাড়ি-কাটা পাওয়া যাচ্ছে তাদের অনেক টাকা কবুল করতে হচ্ছে। তাড়ি-কাটাদের ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেছে এবং তাদের দাবির লম্বা ফিরিস্তিও দেওয়া হয়েছে।

সকলেই যে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছেন তা নয়। তামিলনাড়ুর শুধু আইনটাকে এভাবে সংশোধনের ভিতর বেআইনি বিসর্জন দেওয়াটা যাঁরা পছন্দ করতে পারছেন না তাঁদের মধ্যে আছেন নিখিল ভারত মাদক বর্জন পরিষদের নেতারা। তাঁরা মাদক বর্জনের সপক্ষে তামিলনাড়ুর পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা চালাচ্ছেন। ভারতের মাদক বর্জন আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা ডাঃ সুশীলা নায়ার ঘোষণা করেছেন যে, জাতীয়ভাবে থেকে পানদোষ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হবেন না। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি মনে করেন যে, মাদক বর্জনের নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়াটা মূর্খতা এবং এজন্য ডি এম কে-কে পরে পস্তাতে হবে।

শুধু নৈতিক কারণেই নয়, অর্থনৈতিক কারণেও কিছু লোক ডি এম কে সরকারের নীতি পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন। একজন প্রথম শ্রেণীর তামিল চিত্রাভিনেতা সম্প্রতি বিভিন্ন মঞ্চ থেকে মদ্যপানে বিরত থাকার জন্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে সম্পূর্ণ নৈতিক কারণে তা করছেন তা নয়। তামিলনাড়ুর চলচ্চিত্র ও মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের ধারণা, তাড়ি ও আরকের দোকানের আকর্ষণে সিনেমা-থিয়েটারের চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে অনেক কমে যাবে। একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক বলেছেন, 'তামিলনাড়ুর গ্রামাঞ্চলে তাড়ির দোকান হলে চলচ্চিত্র শিল্পসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য শাখায় অবশ্যই মন্দা আসবে।' হোটেল-মালিক সমিতির একজন সদস্যের আশঙ্কা, হোটেলে চা ও কফির বিক্রি কমে যাবে, এমন কি হোটেলের ব্যবসায়ও টান পড়বে। একজন পরিবহণ ব্যবসায়ীর উদ্বেগের কারণ হল, মদের পাত্রে চুমুক দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ সম্প্রদায়ের মাদ্রাজ থেকে কাঞ্চীপুরম ও পন্ডিচেরীর যাওয়ার যে ভিড় পড়ত সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। কোথাও কোথাও মেয়েরা এই নূতন মদের দোকানগুলোর মধ্যে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছেন। মাদ্রাজ শহরের একটি এলাকায় একটি তাড়ির দোকান খোলার কথা ছিল। সেই এলাকার মেয়েরা প্রচণ্ড বাধা দেওয়ায় দোকান খোলা যায় নি।

তামিলনাড়ু সরকারের একজন মন্ত্রী বলেছেন, সরকারের টাকা দরকার, তাই মাদক বর্জনের নীতি স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু ডি এম কে মদ্যপানের বিরোধী, তাই তারা জনসাধারণকে মদ খেতে নিষেধ করবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথাটা প্রমাণ করার জন্যই যেন মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করেছেন—যে কমিটির কাজ হবে মদ খাওয়ার কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।

নূতন নীতি চালু হওয়ার প্রাক্কালে সরকার 'শুধু আইন' ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীদের মুক্তি দিয়েছেন। আর নূতন মদের দোকানাদি খোলার পর মাতলামি করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েক শ লোককে। একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সর্বোদয় নেতা এস আর সুব্রহ্মণ্যকে। তিনি মাদক-

বর্জন নীতি চালু করার দাবিতে মাদ্রাজে সচিবালয়ের সামনে অনশন করেছিলেন।

•

নারীঘটিত কেলেঙ্কারির সঙ্গে কর্তা-ব্যক্তিদের জড়িয়ে পড়ার তিনটি সাম্প্রতিক কাহিনী :—

গত ১৭ আগস্ট তারিখে লাখনৌ-এ চাকুরীজীবী নারীদের একটি হোস্টেলের মহিলা ওয়ার্ডেন বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। একটি অসাধারণ আকর্ষণীয়া তরুণী মেয়ে ওয়ার্ডেনের কাছে থাকতেন। ওয়ার্ডেনের চাকরবাকররা বলেন, মেয়েটি ঘরের ভিতর রয়েছেন। অনেক ডাকাডাকি করে সাড়া না পাওয়ায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। ময়না তদন্তে প্রমাণ হয় যে, মেয়েটি গর্ভবতী ছিলেন না। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় ব্যাপারটি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। ভারতীয় ক্রান্তি দলের একজন সদস্য প্রশ্ন করেন, লখনৌ-এর ডেপুটি কমিশনার মেয়েটিকে ঐ হোস্টেলে পাঠিয়েছিলেন কি না এবং জনৈক মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে মেয়েটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল কি না। উত্তরপ্রদেশের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অজিতপ্রতাপ সিং বলেন, কিসের ভিত্তিতে এইসব অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। মেয়েটি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে থাকত এবং গৃহস্থালির কাজে তাঁকে সাহায্য করত, এজন্য অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করছে।

গঞ্জাম জেলার মহকুমা শহর ভঞ্জনগর থেকে মহকুমা হাকিম-সহ পাঁচজন বড় অফিসারকে ওড়িশা সরকার বদলির আদেশ দিয়েছেন।

তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটি উপভোগ করতে তাঁরা ভঞ্জনগর থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী ছোট পাহাড়ী শহর রম্ভাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে দুজন আদিবাসী মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাঁরা একটি মেয়েকে নিকটবর্তী ডাক বাংলোতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করেন। অন্য মেয়েটির চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে আদিবাসীরা জড় হয়। ঐ অফিসাররা নাকি তখন কোনক্রমে সেখান থেকে চম্পট দেন। ডিভিশনাল কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেটা নাকি ঐ অফিসারদের বিরুদ্ধে গেছে।

অন্ধ্র রাজ্যের নেলোর শহরের অ্যাডভোকেট সি এল শাস্ত্রীর দুই মেয়ে কমলরাণী (২১) ও চন্দ্রিকারাণী (১৭) মাস তিনেক আগে একদিন একটি মিলিটারী জীপে বেড়ানোর নামে উঠেছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ছটা নাগাদ তাঁদের নেলোর থেকে মাইল ১৫ দূরে সমুদ্রতীরে একটি জায়গায় দেখা গিয়েছিল। জীবিত অবস্থায় ঐ শেষবারের মতো তাঁদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। এর বারো দিন পরে ঐ সমুদ্রতীরে পুলিশ একটি মৃতদেহের কিছু পচা-গলা অংশ শাস্ত্রীকে দেখান হয়। তিনি সেই অংশগুলি, একটা আংটি ও কিছু অন্তর্বাস দেখে মৃতদেহটি তাঁর মেয়ে কমলরাণীর বলে সনাক্ত করেন। আরও কিছুদিন পরে জানা যায় যে, কাছাকাছি আর একটি জায়গায় আর একটি মৃতদেহ ভেসে এসেছিল। স্থানীয় জেলেরা স্বীকার করে যে, মৃতদেহটি থেকে একটি হাতঘড়ি আর একটি কানের দুল খুলে নিয়ে মৃতদেহটি তারা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই মৃতদেহটি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেটি চন্দ্রিকারাণীরই মৃতদেহ ছিল। 'জমিন রায়ত' নামে একটি স্থানীয় তেলেগু পত্রিকা ব্যাপারটি নিয়ে অনুসন্ধান করে এবিষয়ে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করে। তারপর এসম্পর্কে একজন পুলিশ অফিসারকে ও একটি মদের দোকানের মালিককে ঐ দুই আধুনিকা ধামাম-দুরন্ত তরুণীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

•

আইনের বিচারে পৃথিবীতে যত লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তার অর্ধেকই দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ। এত বেশী মৃত্যুদণ্ড আর কোন দেশে দেওয়া হয় না। ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৭০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এক বছরে সেখানে ৮০ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের ৩০ জুন সেদেশের জেলে ৪৭ জন কয়েদী ফাঁসির অপেক্ষায় ছিল। তারা প্রায় সকলেই কৃষ্ণকায়।

—[illegible]

শারদীয় অমৃত ১৩৭৮

তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

খনির নতুন মণি ॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কলরোল ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল

পারিধী ॥ বুদ্ধদেব গুহ

* প্রবন্ধ *

অশোক রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, দিলীপ মালাকার, নারায়ণ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গেরিলা যুদ্ধের নায়ক হেমিংওয়ে ॥
ভবানী মুখোপাধ্যায়

* কবিতা *

অমিয়বরণ গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণ মিত্র, আশিস সান্যাল, উমা দেবী, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, গোপাল ভৌমিক, তরুণ সান্যাল, দুর্গাদাস সরকার, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, নবনীতা দেব সেন, নমিতা চক্রবর্তী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, মনীষ ঘটক, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, শিশির ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীলকুমার লাহিড়ী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার গুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র।

* সিনেমা ও খেলাধুলা *

তপন সিংহ, এন. কে. জি., পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শম্ভু মিত্র, সন্ধ্যা সেন, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ রায়।

সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

"সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে মিশিয়াছিলাম অল্পকালেই। তখন অগ্রজদের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না, কিন্তু সে মহল হইতে পিঠের উপর মারটা যে কম পড়িয়াছে তার কারণ আধুনিককালে সেই মহলটার দেউড়িতে তেমন লোকবল নাই, কিন্তু বন্দুক করিতে হইলে আমি আইন মানি নাই।"
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। স্বহস্তলিখিত অনুলিপিসহ।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য

বিরাগমন

* গল্প লিখেছেন *

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, অমিত গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গোষ্ঠ শেঠ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দিব্যেন্দু পালিত, দীপক চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, প্রফুল্ল রায়, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, মিহির আচার্য, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, লীলা মজুমদার, শেফালী চট্টোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, শচীকান্ত গুহ, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুশীল রায়, সুমথনাথ ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

বিশু মুখোপাধ্যায় লিখেছেন

সেকেলের পুজোর মজার রঙ

• শিকার রহস্য, ভ্রমণকথা, প্রেম কাহিনী •

অজিতকৃষ্ণ বসু, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নির্মলকুমার সরকার, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

দাম : সাড়ে চার টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা তিন

ন্দ্ব বিরোধ ॥

গোপাল ভৌমিক

নিসর্গ নবীন নয়, নবীন দুচোখ
পুরাতন দৃশ্য দেখে
খুঁজে পায় কি নতুন মানে।
শিল্পিত সৌন্দর্য তার
যুগে যুগে ধরা পড়ে
ছবি বা কবিতা কিংবা গানে।

যুগান্তরে ভিন্ন চোখে দেখি সেই রূপ
এবং মেলাতে চাই
অতীতের দেখা চোখ দিয়ে:
সত্য খুঁজে পেতে পেতে যত দিন যায়
তত গূঢ় কথা বলি
স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে।

নতুন দুচোখে যদি নাই মেলে
পুরাতন স্বাদ
ক্ষতি তাতে কোথায় কে জানে!
দুর্বিনীত অপবাদ জোটে এ কপালে
যেহেতু পাই না খুঁজে
মোটরের পরিস্কার সনাতন ভৌমিকী সাম্পানে।

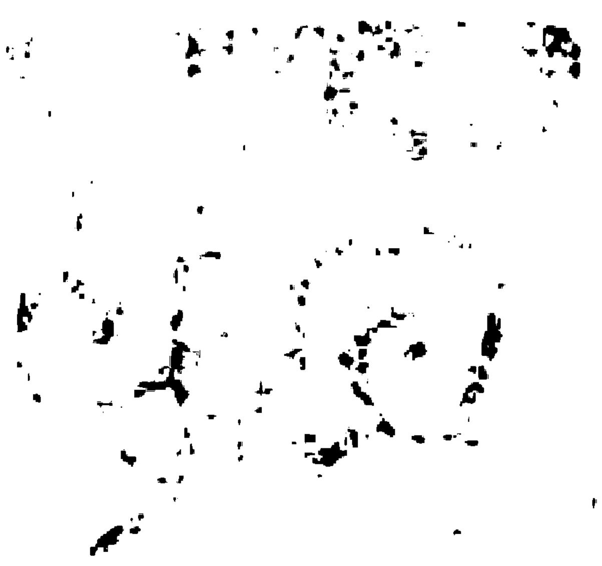

সময় দজ্জাল মাতা ॥

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলগুলি ছড়ান ছিটান
কথাগুলি এলোমেলো
তবু সত্য ফুটেছিল ফুল
কথাগুলি পেয়েছিল মুখের আদল

মমতায় তুলে নিলে বুকের নিকট
ফুলগুলি জয়মালা হতো
উত্তাপে হৃদয়ের
কথাগুলি হতে পারতো আদরে আবেগে
একটি কবিতার জন্যে বাঙ্ময়
মুখর মিছিল

ম্লান মুখ ফুলগুলি বিবর্ণ হেলায়
স্তব্ধ বুকে বোবাজল কথাগুলি মূক
সময় দজ্জাল মাতা বড্ড কঠিন
দুমড়ে [illegible]।

নির্জনতার পাথর ভেঙে ॥

চন্দন সেন

দুই তালুতে উজলে ওঠে আলো
যেন একটি জলপ্রপাত
জন্মভূমির মৃত্তিকাতে
যেন একটি চাঁদের হাওয়ার চিঠি
অথবা [illegible] নিনাদ
নির্জনতার পাথর ভেঙে
লোকালয়ে ছড়িয়ে যায় তা
দুই আকাশে উজলে ওঠে
অগ্রগতির দ্যুতি।

বিকালের সোনা-হলুদ আলোটুকু ইছাখালির গাং-এর ধারে আম-কাঁঠালের বাগানের গাছে-মাথায় রং-এর আভাস এনেছে, মিষ্টি আমেজ আনে। পাখ-পাখালির কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের শুরু—তাই এখনও মাটি তেতে আছে রোদের তাপে। গাং-এর ওপারে দেওয়াবের দিকে বাবলা বনের এপাশ-ওপাশের গ্রাম-গুলোর ছায়ারেখাকে ধূসর—অবসন্ন দেখায়।

বাঁশি ঝুরঝুরে মাঠে সবুজ পাটগাছ-গুলো বড় হয়ে উঠছে। বৃষ্টির ছোঁয়া পেলে ওরা লকলকিয়ে উঠবে—মানুষের নাগাল ছাড়িয়ে ওরা উঠবে চেরা চেরা পাতা মেলে। আকাশে জমবে কালো মেঘের দল, ইছাখালির গাং-এ তখন বর্ষার ঢল নামবে কুমারী মেয়ের সারা গায়ে যেমন করে যৌবনের ঢল নামে—ঠিক তেমনিভাবেই। তেমনি উছল হয়ে উঠবে গাং—দেওয়াবের বিস্তীর্ণ চরভূমিতে ওই বাবলাবনের কোল ছাড়িয়ে জলের সীমানা পৌঁছে যাবে।

মল্লিকা সেই ছবিটার কথা ভাবে—আজকের মেঘশূন্য রোদপোড়া আকাশ আর বৈশাখের খরস্রোতের নিষ্করুণ তাপ মল্লিকার সারা মনে বাদলমেঘের স্নিগ্ধতার ভাবনা আনে। তখন নুরুল থাকবে অনেক দূরে।

আজ সে রয়েছে মল্লিকা খাতুনের পাশেই। আর সেইজন্যেই এই পরিবেশ ওর ভালো লাগে। এমনি করে ওরা দুজনে নির্জন দুপুরে বের হয়ে পড়ে। মল্লিকা ওকে ডাকছে—এ্যাই! ওঠবানি? কতো ঘুমাইবা, এ্যাঁ?

পাশে একটা কাঁঠালগাছের ঘন ছায়ার নীচে নরম মাটিতে শুয়েছিল নুরুল, ওর ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠল। মিষ্টি সতেজ চেহারা—এখনও ঘুমের আমেজ জেগে আছে ওর চোখেমুখে, ঠাণ্ডা হাওয়ার মত স্নিগ্ধ ছায়ার নীচে জমাটি ঘুম দিচ্ছিল সে। নুরুল চোখ রগড়াতে রগড়াতে শুধুল—কি কইছিস?

মল্লিকার মিষ্টি গলাটা কলকলিয়ে ওঠে—দুফুইরে আগা পাইনা বাঁড়ছে? চাচীর কমু, তোমরাগো কি রাইতভোর পড়বার জানা ঘুমাইতেও দাও না?

হাসছে নুরুল। সোনা-আলা গাছ হলুদ কাঁঠালপাতা দু-একটা ঝরে ঝরে পড়ে। মল্লিকার চোখদুটো ইছাখালির গাং-এর পানির মতই কালো—কিন্তু আছে ওতে যৌবনের একটি প্রাণচাঞ্চল্য—গভীরতার অজানা কি রহস্য। ওর মুখের সবুজ পান-পাতার মত, চিবুকটা ধারালো রেখায় সৌন্দর্যকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। এই মল্লিকাকে যেন চেনে না নুরুল।

ওর মনে হয় জানাম মা দিয়েই যেন ইছামতির গাং-এ ভরা বর্ষার ঢল নেমেছে —দুলে দুলে ফাঁপিয়ে উঠেছে কলকল্লোল, ওর প্রবাহ সব কূলের বাঁধনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কান্নার সাগর মোহনায়। ওর কাজল কালো চোখে বাগানের ছায়া-স্নিগ্ধতার ইঙ্গিত জাগে, মল্লিকা যেন হাতে এখনি দাবদাহের থেকে কোন প্রশান্তি-ভরা জগতের সন্ধান দেয়। ওর হাসি-জড়ানো পাতলা ঠোঁটে কালো মেয়ের কোণে কোণে রৌদ্ররেখার ইঙ্গিত জাগে। কোন আশা-জাগানো ইশারা।

সদ্য ঘুমভাঙা চোখে কি স্বপ্নজড়ানো চাহনি মেলে নূরুল আজ মল্লিকার দিকে চেয়ে থাকে। পাখী ডাকছে—বউ কথা কও পাখীর ওই ডাক মল্লিকাকে এই শুভক্ষণে যেন আনমনা করে তোলে, হাওয়া-কাঁপা বাঁশবনে শির-শির শিহর জাগে, মল্লিকার সারা মনে সেই সুরের অনুরণন।

সবুজ ছায়াঘন বাগানে ওরা দুজনে আজ দুজনকে দেখে কি বিস্মিত চাহনিতে।

গাঁয়ের স্কুল থেকে পাশ করে নূরুল ঢাকায় পড়তে গেছে। নূরুলের মায়ের কাছে এটা প্রথম ভালো লাগেনি, স্বামী মারা যাবার পর ওই একটি মাত্র সন্তান নূরুলের মুখ চেয়েই মা সব কষ্ট ভুলেছিল। কিন্তু তার নিজের সামান্য সুখের জন্য ছেলেকে বন্দী করে রাখতে চায়নি সে।

নূরুলের বাবা ছিলেন গাঁয়ের নামকরা ডাক্তার। তখন এখানের গাঁয়ের সমৃদ্ধি ছিল, নকুল সাহা, গোবিন্দ দত্ত, বটকৃষ্ণ দাসদের রমরমা কারবার। নূরুল সেই দিনগুলোর কথা ভোলেনি। সে আর মল্লিকা বাবার সঙ্গে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতো।

নূরুলের বাবা সংভাবে ডাক্তারী করে বেশ কিছু বিষয়-আশয় করে গেছেন। নূরুলের মা ফাতিমা বিবি বলতো—আমাদের একটা মাত্র পোলা, আল্লার মর্জিতে তার দিন ঠিকই চলে যাবে। গরীবের চোখের পানি ফেলে পয়সা কেন না নাও।

স্বামী এই কথাটা আজীবন মেনে গেছেন তিনি। তাই আজ বাপ মারা যাবার পরও নূরুলের পড়াশোনার কোন বাধাই হয়নি। মা বলেছিল—ডাক্তারীই পড়বি তুই। বাপের চাইতে কীর্তি হবে তোরে।

গাঁয়ের পাট-মহাজন ইসলাম খাঁ ওদের সবের বড় বাড়িটা নিতে চেয়েছিল, ফাতিমা বিবিই কিন্তু সেই দামকে এটা ছাড়া দেয়নি। ওর আশা আজ একদিন নূরুল ডাক্তার হয়ে আবার এখানে বসবে।

নূরুলও জানে সেটা। মা, পাশের বাড়ির মল্লিকা, আরও অনেক বন্ধুবান্ধবও সেই আশা করে। তাই ঢাকাতে ডাক্তারী পড়তে গিয়েও গ্রামের কথা, মল্লিকার কথা সে ভুলতে পারেনি। সেখানের পড়াশোনা—ক্লাস—হাসপাতাল ডিউটির টান ছোকাই তাদের জীবন থেকে কদিনের জন্য এখানে এসে তার হারানো দিনগুলোকে ফিরে পায় সে।

মল্লিকাও হঠাৎ যেন বদলে গেছে। ওর সুন্দর পদ্মফুলের মত মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে নূরুল, মনে হয় ওখানে রয়েছে তার জন্য একটু নিভৃত—পরম আশ্বাস।

হঠাৎ বৈকালের পাখীডাকা সুন্দর পরিবেশে বিশ্রী কর্কশ যান্ত্রিক একটা কঠিন শব্দ ওঠে। ইছামতির গাং-এর শান্ত জলরাশির বুকে ঢেউ তুলে লঞ্চটা আসছে ওর পিছনে চলেছে দুটো পাটের গাঁট-বোঝাই নৌকা, সেগুলোকে টেনে আনছে লঞ্চটা। লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম খাঁ। দীর্ঘ দেহ—রোদে-জলে ফর্সা রং তামাটে হয়ে গেছে। ওর মেহেদী রং-করা দাড়ি ছুঁচলো করে ছাঁটা, ওর মনের ক্রূরতা আর লালসাকে ফুটিয়ে তুলেছে ওই দাড়ি ছাঁটার ভাবটা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সে এখানে এসে শাহানশাহের মত যেন তার সাম্রাজ্য কায়েম করেছে। গাঁয়ের বিরাট গুদামগুলো তার, সেখানে পাট বাঁধার মেসিন বসিয়েছে। ধানজমি, পাট, কাপড়ের গদি—সবই তার।

নূরুল-মল্লিকা এখানের সকলেই ওই লোকটাকে ভালো করে চেনে, শয়তান—এখানের যেন গ্রহ সে।

ওই ইসলাম খাঁ-ই ছলে-বলে-কৌশলে এখানকার অন্যান্য মহাজনদের হটিয়ে দিয়েছে। প্রথমদিকে তারা ওই শয়তানকে চিনতে পারেনি। ক্রমশঃ চিনেছে।

সেবার গাঁয়ের মধ্যে ওই-ই জোর করে ফৌজদারী বাধিয়েছিল বড় কারবারী নকুল সাহার লোকদের সঙ্গে, মোল্লাদের হাত করে এখানকার কিছু লোকের মুখ বন্ধ করে হিন্দুদের দোকান আড়তে আগুন লাগিয়ে লুটপাট করিয়ে দেয়। বটকৃষ্ণবাবুকেও ওরা পথের উপর নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল। গাঁয়ের সুন্দর সুস্থ পরিবেশটাকে বিষিয়ে তুলেছিল ওই ইসলাম খাঁ।

ওই লোকটাই, টাকা দিয়ে খুলনা থেকে বেশ কিছু বিদেশী পাঠান গুণ্ডাকে এনেছিল। সেই দিনগুলোর বিভীষিকা আর রক্তপাতের কথা ভোলেনি নূরুল। তখন সে স্কুলের ছাত্র, দেখেছিল কিভাবে ওরা নিরীহ লোকদের হত্যা করেছিল, তারা বাধা দিতে পারেনি। নূরুল শিউরে উঠেছিল—মনে হয়েছিল তারা কত বড় অসহায়, কত বড় পাপী। ওই নিরীহ নকুল সাহা, গোপাল দত্ত, বটকৃষ্ণ দাস—আরও কতজনকে বাঁচাতে পারেনি। ওদের অনেকে পালিয়েছিল প্রাণ-ভয়ে এদেশ থেকে। তাদের এতদিনের পরিচিত চেনাজানা আপনজনকেও তারা আশ্রয় দিতে পারেনি।

ওই ইসলাম খাঁ-ই এখানের কেউকেটা হয়ে বসেছে। পুলিশ এসে এখানকারই গোলাম মিঞাকে ধরে নিয়ে গেল। সে নাকি এই অশান্তির মূলে। এখানকার বড় মহাজন বাঙালী ওই গোলাম মিঞাকে এমনি করে ইসলাম খাঁ সর্বস্বান্ত করে তার ব্যবসায় দখল করেছিল। আজ ইসলাম খাঁ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নিজের দল, গাড়ি সবই করেছে। আরও অনেক দেশওয়ালী ভাই বেলাদারকে এনে এখানে বসিয়েছে।

নূরুল লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

একটা চাপা রাগে ওর মন বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় লোকটার লোভী হাতের থাবা তাদের অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সেবার জুম্মার নমাজের সময় বলেছিল—তারা নাকি কলমা পড়তে জানে না। সরকারের উচিত এই বেয়াদপদের ধরে ধরে চাবুকে ঠিক মত কলমা পড়ানো।

অনেকেই কথাটা শুনেছিল, রেগে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস করেনি। কারণ, থানা-পুলিশ পর্যন্ত তার কথায় উঠবস্ করে। ডি-এম সাহেব নাকি ওর এক বন্ধুর আদমী।

তাইই জোরে ইসলাম খাঁ সেবার স্কুলের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান প্রায় বাতিল করতে চেয়েছিল। বলেছিল—কমিটি মিটিং-এ—ওসব কাফেরের ব্যাপার। বিধর্মীর প্রতি সম্মান দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া গান-টান নাকি ধর্ম-বিগর্হিত কাজ।

তাই নিয়েই ছাত্ররাও প্রতিবাদ করেছিল। দরকার হলে ধর্মঘট করবে তারা। নূরুলও ছিল দলের পান্ডাদের অন্যতম। ইসলাম খাঁ শুনেছে সব কথা। তার পা-চাটা কুকুরের অভাব নেই। ওর পাটের আড়তে কাজ করে কালু শেখ, খাঁমিরুদ্দিন আরও অনেকে। কালু শেখই খান সাহেবকে তাদের নামগুলো দিয়েছিল।

খানসাহেব ব্যাপার একটু গড়বড় দেখে আর কথা বলেনি। কারণ, কারবারী লোক, মুখে সে মোলায়েম ভদ্রতাটুকু বজায় রাখতে চায়। শুধু নামগুলো যথাস্থানে পাঠিয়েছিল। আর পুলিশও হয়রান করেছিল তাদের।

ঢাকায় তখন কলেজের ছাত্ররা গুলীতে প্রাণ দিচ্ছে। বাংলাভাষাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের মাতৃভাষাকে তারা ওদের দুর্বিপাকে বিসর্জন দেবে না। ক্ষেপে উঠেছিল ছাত্রসমাজ।

ইসলাম খাঁও বোধহয় ভয় পেয়েছিল। তাই তখনকার মত চুপ করেছিল সে।

লঞ্চটা একটানা শব্দ তুলে চলেছে। পিছনে পাটের নৌকাগুলোকে টেনে-টেনে। নূরুল বলে—

—খাঁটি ডাকাত। লোককে দাদন দিয়ে দিয়ে কিনে নিয়েছে আধা দামে।

মল্লিকা চেয়ে থাকে ওই লঞ্চের দিকে। লোকটাকে চেনে সে। তাই বলে—আমাদের সর্বস্বই এমনি লুটে নিতে চায় ওরা। শয়তানের দল!

মল্লিকা নূরুলের চেয়ে আরও বেশী করে জানে একে। লোকটা টাকার লোভ দেখিয়ে গাঁয়ের অনেক মেয়েরই সর্বনাশ করেছে। তার নিজের কথাটাও মনে পড়ে। ওকে একদিন বলেছিল লোকটা। তেরা ভাই-এর কাম নেই আজ? উসকো নোকরি দেগা। কাম করেগা গদিমে। খুবসুরত এতনা সাজায় কিউঁ?

মল্লিকা একলা পথে ওর সুপারী-বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে, পিছনে উঠোনের। লোকটা হাসছে। মনে হয় ওই হাসির আড়ালে একটা দুর্বল জন্তুর মত তার থাবা গায়ে বিঁধছে। কোনরকমে সরে এসেছিল। মনে হয়েছিল লোকটা ভেবেছে সামান্য কিছুর বিনিময়ে ওদের সবকিছু কেনা যায়। নইলে ছিনিয়ে নিতেও তার একটুকু বাধবে না।

মল্লিকা অসহায় রাগে কাঁপতে থাকে—শয়তান! কুত্তার বাচ্চা ওটা।

—এতো হাঁপাচ্ছিস কেন?—নন্দলাল ওর মুখচোখের কালিমা দেখে শুধোয়।

মল্লিকার মনে হয় নন্দলালের কাছে নিজের এই অপমানের কথাটা প্রকাশ করাও যেন লজ্জার। বলে সে।

—না। চলো। ঘরে চলো।

নন্দলালের মাও দেখেছে ব্যাপারটা। দিনগুলো কেমন বদলে গেছে। দেশ-বিভাগের পর ভেবেছিল, যা হয়ে গেছে সেটার পরিণাম হয়তো ভালো হবে না। এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে তারা বাস করেছে। তাদের শোক-দুঃখে, বিপদে ওরাও গেছে, তাদের পরবে তারাও সামিল হয়েছিল।

ফতিমা বিবির মনে পড়ে বাবা মৌলবির কথা, চাটুজ্জেবাড়ির মেজো গিন্নী ছিল তার বন্ধু-সই। নন্দলালে গাজনের মেলা দেখতে গেছে।

তার ছেলে নন্দলালকে গিন্নী ভালোবাসতো ছেলের মত।

ওই পাড়াগুলো খালি হয়ে গেছে প্রায়। ওরা চলে গেছে—যাবার আগে ফতিমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল গিন্নী—যাবার বেলায় বলেছে—

—চললাম ফতিমা, তোরা আমাদের তাড়িয়ে দিলি?

ফতিমা জানে না কি তাদের অপরাধ। তবু ভয় হয়েছিল তার—ওরা থাকলে বেইজ্জৎ হবে। মানুষগুলো যেন খেপে উঠেছে। তখনই মনে হয়েছিল—বলেছিল তার স্বামীকে।

—এর ফল ভালো হবে না—আল্লা এই গোনাহ-এর দাম উসুল করে নেবে।

ওরা সবাই মানতে পারেনি, অনেকেরই মত দেখেছিল তাদেরই কতো আপনজন সব চলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এসেছে নতুন মানুষ। তারা সবকিছু লুটে নিতে চায়। এর ফলে অশান্তিই বাড়ছে—সবার একটা চাপা আক্রোশ গুমরিয়ে উঠছে, ক্রমে ক্রমে সেটাই বিক্ষোভ, সংঘর্ষের রূপে পরিণত হয়েছে। সামান্য আগুনের ফোঁয়ায় বারুদের মত জ্বলে উঠবে।

ভয় হয় ফতিমার তার স্বামী গত—ছিলেনসে গেছে, বাকিরা গেছে বন্ধুবান্ধব সবকিছু, একমাত্র সন্তান নন্দলালের মুখ চেয়ে বেঁচে আছে সে। তার ছেলে মানুষ হোক।

তাই ভয় করে ওই বাগানপাড়ার জোতদার থেকে তার জোট এই সংসার কি রক্ষা পাবে না? মায়ের মন আঁৎকে ভয়ে শিউরে ওঠে।

বিকালের ম্লান আলো পড়েছে ক্যানালের পাড়ে, ঘাসে ওরা নিশ্চিন্ত মনে পাশাপাশি বসেছে। মল্লিকাকে চেয়ে দেখে চেয়ে থাকে ফতিমাবিবি। মাঝে মাঝে একটা ভিন্ন ভাবনায় দেখে ওর দিকে চাইছে, ফতিমাবিবির স্নেহের সঙ্গে ভালোবাসে।

ওর বাবার অবস্থা তেমন ভালো নয়। মেকোশি বাগানের কেরানী, এখানে ছিল, তবু জমির থেকে টাকাটা পুরো হাতে পেতো। কোন নতুন খানসাহেব এসে তাকে বদলী করেছে বারো-ইপুরে। মল্লিকের প্রাণীগুলোর দুর্ভাগ্য ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা। তার বদলির কারণ ওই রহমান খাঁ—ও নাকি বকেয়াগুলো খাস বেআইনীভাবে বেকেশি করাতে চেয়েছিল, তাতে বাধা দিয়েছিল ওর বাবা। তার কিছুদিনের মধ্যেই ওকে বদলি হতে হয়। এখন জমিগুলো বেকেশি হয়ে গেছে তারপর।

নন্দলালের মা মল্লিকার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে—রেখে দে এটা। মল্লিকা জানে তাদের সংসারের অবস্থা। ওদের খাবার চালটার অর্ধেকটাই হয় এ-বাড়ি থেকে। তাছাড়া টাকা পয়সা তো নিতেই হয়। তাই বলে সে এখন নাইবা দিলে চাচী। মা নন্দুর জন্যে পাঠিয়েছিল ওগুলো। মল্লিকার কথার জবাব দিল না ফতিমাবিবি।

মনে মনে সেকথা বোধহয় তার জেনে ছিল, একটা আন্তরিক টান তাদের মনে জেগেছে। নন্দলাল চাকরি চলে যায়, মল্লিকাই তার মনের সব শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। মায়ের মনে হয় কথাটা। নন্দলালও মল্লিকাকে হয়তো ভালোবাসে। নন্দুর সুখের জন্য জানে, তাছাড়া ওকে বিশ্বাস করতে পারে ফতিমাবিবি মল্লিক থেকে।

মনে হয় নন্দলাল ডাক্তারী পাশ করে আসুক—তখনই কথাটা পাড়বে। কিন্তু একমাত্র বেপরোয়া নন্দলাল, পড়াশোনায় ভালো—তবু একে সামলানো দায়। মাঝে মাঝে ওর মনে একটা আগুনের হলকা যেন ঠেলে উঠতে চায়।

দেশের সংখ্যালঘু আন্দোলন গোপনে ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ওরা বলে—চুপ করে সব সইব না ওদের অত্যাচার, আর মায়ের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, আর চাইবে মাটি—একদিন ইজ্জতও ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চাইবে ওরা।

মল্লিকা হাসে—কি করবে?

—যা করার করবো। নন্দলাল গর্জে উঠতে চায়।

ফতিমাবিবি ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। ভয় হয় তার—এই মাতনে আগুন জ্বালানী না মেতে ওঠে!

মল্লিকার উপর তার আশা, সে হয়তো ফেরাতে পারবে নন্দলালকে ঠিক পথে। মল্লিকা বলে—

—ডাক্তার হবে হও আগে, শিক্ষা ওসব কাম করো। তবু লোকের জান পরাণ বাঁচানোর কাম তো আছে?

ফতিমাবিবির নানা চিন্তার মনে থাকে। কিন্তু একমাত্র নন্দলাল, এখানেও তার কাজের বিরাম নেই। মল্লিকাকে বলে—টাকাটা রাখ তুই। যাই—নন্দলালকে খুঁজতে হবে ওই দুপুরে বের হয়েছে।

মল্লিকা বলতে ভাবতে যায়। চাচী বোধহয় জানে না ওদের বাগানে মনে সুপারীগুলো গাছ সরাবার কথা। সেটা প্রকাশ করতেও লজ্জা বোধ করেছিল।

মল্লিকা জানে—একটু আগে দেখলাম—আইনুদ্দিন সাহেবের সাথে চলে গেল বিশ্বাসপাড়ার দিকে।

—ফেরে নেই না? যা কিছু কিছু বলে। মল্লিকার জন্য আসে ঘর এতেও ঘর হতে

পুজায় নূতন শাড়ী
বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান
সিল্ক হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

CENTRAL LIBRARY

না। নিরন্তর বন্দুকের আওয়াজ—ফিসফাস কথাবার্তা হচ্ছে। কথার আর শেষ নেই।

কোথায় একটা যন্ত্রণা—বুক ভরা অতৃপ্তি ওদের সব কিছুকে বিধ্বস্ত করে তুলছে। কাউকে ঠিক জানে না আজকের এই তীব্র স্পন্দন এর চঞ্চলতা।

মল্লিকা বলে—যাই পিসী, দেখলে পাঠাই দিস্।

মল্লিকা বের হয়ে এল। তখন ইছামতির পাড়-এর বুকে বৈকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামছে। শহরের বাজারে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। মসজিদ থেকে আজানের সুরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাঁশবনের মাথায় নারকেল গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠছে। বড় একটা থালার মত চাঁদটা তখনও আলোয় ভরে ওঠেনি। ওর বুকজোড়া লালচে ভাবটা ক্রমশঃ তরল যার ফিকে হয়ে আসছে। হাওয়ায় কাঁপছে নারকেল গাছের পাতাগুলো, আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। বাগানের ভিতর অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, ওপাশের নদীর কিনারে চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে উঠছে।

হঠাৎ বাগানের অন্ধকারের মধ্যে কাদের ছায়ামূর্তিগুলো দেখে থমকে দাঁড়াল মল্লিকা। নুরুলের গলা শোনা যায়, আইনুদ্দি—স্কুলের বড়মাস্টার—ওপাড়ার মহীউদ্দিন আরও ক'জন রয়েছে। নুরুল বলে—

—ওরা এসব সহ্য করবে না। বন্দুক দিয়েও থামাবার চেষ্টা করবে।

মহীউদ্দিন বলে—তার জবাব ওই বন্দুক দিয়াই দিমু। খানেদের জবাব দিমুই এবার।

ওরা কি সব সাংঘাতিক কথা বলছে। মল্লিকা অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে। নড়বার সাধ্যও নেই তার। বাগানের শুকনো পাতায় খস খস শব্দ উঠবে, ওরা ধরে ফেলবে তাকে। মল্লিকার মনে হয় একটা প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ের কালো মেঘ যেন আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে, ওরা মুখ বুজে অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে সেই ঝড়টারই প্রতীক্ষা করছে। জিব্রাইলের মত আগুনের ঝলকায় ওরা সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়, দরকার হলে নিজেদেরও। ওরা কোন দুর্বার দুঃসাহসী যৌবন, ওদের চেনে না মল্লিকা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ওই অন্ধকারে জানেনা মল্লিকা খাতুন। চাঁদের আলোটা গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ঝিকিমিকি রেখায়।

—তুই! হঠাৎ নুরুলের ডাকে চমকে ওঠে মল্লিকা খাতুন।

নুরুলও ওকে এখানে এইসময় দেখবে তা ভাবে নি; মল্লিকা কি একটা অন্যায় করে ফেলেছে ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দুজনের মাঝে একটা স্তব্ধতা থমথম হয়ে ওঠে।

নুরুল বুঝেছে মল্লিকা ওদের কথাবার্তা ও শুনেছে যেগুলো অন্য কেউ শুনুক তারা চায় নি। ওরা সবাই চলে গেছে। ওরা জানতে পারে নি তাদের আলোচনা আর প্রস্তুতির কথা আর কেউ শুনেছে।

মল্লিকা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নুরুল ওকে বিশ্বাস করতে পারে। শুধু বলে সে,

—এসব কথা কাউকে বলিস না।

মল্লিকার মনে জমাট আতঙ্কের কালো পাথর যেন চেপে বসেছে।

মল্লিকা নুরুলের কাছে এগিয়ে এসেছে, ওর মুখে পড়েছে পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদের আলো। কোথায় একটা কোকিল ডাকছে—সবুজ আলো আঁধারি ভরা এই পরিবেশে মল্লিকা কি ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলে সে—

এসব করলে পড়াশোনা কখন হবে? চাচী কত আশা করে তুমি ডাক্তার হবে, তাছাড়া—

নুরুল শান্ত মেয়েটিকে দেখছে। ওর দুচোখে কি নিবিড় আর্তি ফুটে ওঠে। নুরুল বলে তুই। তুই কি বলিস?

চমকে ওঠে মল্লিকা, নুরুল জানে না ওর কুমারী মনে কি আশার জোয়ার, ওর দেহের অণুপরমাণুতে কি ব্যাকুলতা মিশিয়ে আছে, মল্লিকা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, এই শান্ত সুন্দর পরিবেশ আর কখন আসবে জানে না। মল্লিকা খাতুনের দুচোখে জল নামে।

নুরুল অবাক হয়—কাঁদছিস কেন? এ্যাই!

ওর অন্তরের কান্না বাধা মানে না। নুরুলের দুহাতের বাঁধনে বন্ধ হয়ে মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে মল্লিকা।

এতদিন যে দুর্বলতাটিকে গোপন করে রাখতে চেয়েছিল নুরুলের কাছে, সেইটা কি বেদনায় ফেটে পড়েছে। এই কথাটা ভাবতে নিজেরই লজ্জা করে মল্লিকার।

শান্ত ইছামতির জলের বিস্তারে চাঁদের আলো পড়েছে, ঝকঝকে রূপ। নারকেল-কলাগাছগুলোর হাওয়া কাঁপা পাতায় বাতাসের ধ্বনির সাড়া জাগে।

লেবুফুলের গন্ধভরা বাতাস ওর মনে অনেক স্মৃতির আবেশ আনে। নুরুল বলে—কাঁদছিস কেন? সময় একদিন আসবে, যেদিন সুখী হবো আমরা সবাই। নোতুন করে বাঁচবো সব আশা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।

মল্লিকা ওর কথাগুলো শুনছে সারা মন দিয়ে। ওর নিবিড় ছোঁয়াটুকু তার কান্নাভরা বুকে পরম সান্ত্বনা এনেছে, উদার বাহু-বেলায় যেন কবিদের ছন্দের আবেশ আছে।

নুরুল বলে—ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। মাকেও বুঝিয়ে বলবি। মা যেন ভুল না বোঝে।

চাঁদের আলোটুকু গলে গলে পড়ছে ইছামতির পাড়-এ ওই গাছপালাগুলির মাথায় তারই ধারাস্নান চলছে। এই রূপকথার শহরে হারিয়ে গেছে আগামী দিনের স্বপ্নে দুটি তরুণ তরুণী।

...চমকে ওঠে নুরুল একটা বিস্ফোরণের শব্দে।

ওদিকের অন্ধকার দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আগুনের শিখায়। পুড়ছে হাট-গ্রাম-বসত-গঞ্জ। শত শত মানুষের আর্তনাদ কান্নার রোল ওঠে। সব ছাপিয়ে গুলির শব্দ উঠছে।

গর্জে ওঠে আইনুদ্দি—শয়তানের বাচ্চারা জাহান্নামে যাক।

কে লাফ দিয়ে উঠতে যাবে, তাকে থামিয়ে দিল নুরুল। —খবরদার! ওরা এই দিকেই ফিরবে ওই খান কুত্তার দল। তখনই বদলা নিতে হবে।

বাঁশঝোপ ভরা বাগানের মধ্যে গর্তগুলো খুঁড়ে ওরা প্রতীক্ষা করছে, চারিদিকে গাছ-গাছালিও অক্ষত নেই। বট অশথ গাছটাকে ওরা মর্টারের গোলায় ছত্রখান করে দিয়েছে; ডালগুলো জ্বলে জ্বলে আংরা হয়ে গেছে, ওপাশে কাজির দরগায় ঘরগুলো ধসে পড়ে আংরার স্তূপে পরিণত হয়েছে ওদের নেপাম বোমার আগুনে। সবুজ ইছামতির গাঁ-এর সারা গায়ে যেন দগদগে ঘা, তাদের সবকিছু স্বপ্ন—সবুজ সব ভবিষ্যৎকে ওই নিষ্ঠুর শয়তানের দল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

কমাসের মধ্যেই ঘটে গেছে এই আমূল পরিবর্তন।

নুরুল ভাবতেই পারে না এই কথা। নিষ্ঠুর কঠিন সত্যগুলোকে মনে হয় রাতের দেখা কোন দুঃস্বপ্ন—যা সত্য নয়। দেখেছিল ঢাকা শহরে সেই হিংস্র রাতের অন্ধকারে একটা লোককে গুলীতে একটা হাত বিদীর্ণ হয়ে গেছে—অন্য হাতটা নেই, হঠাৎ কি প্রাণপণে দৌড়োবার চেষ্টা করেই লোকটা ছিটকে পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার গায়ে এসে লেগেছিল তাজা গরম খুন।

সারা শহরে খানেরা হানা দিয়েছে, জ্বলছে জগন্নাথ হল। ইকবাল হল মর্টারের গোলায় ধসে পড়েছে, হাসপাতালের দেওয়ালে এসে লাগছে গুলীগুলো—অন্ধকারে ঝলকে ঝলকে আগুন বের হচ্ছে মেশিন গান থেকে। দিগন্তে শুধু লাল আভা আর কান্নার আর্তরোল ওঠে। কোন সর্বনাশা তাণ্ডব নেমে এসেছে ওদের উপর, রোজ কেয়ামৎ-এর দিনের বিভীষিকা নিয়ে।

...মৃতদেহ আর ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে রাতের অন্ধকারে ওরা কোনরকমে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে শুভাড্ডার পথ ধরে গ্রামের দিকে চলে এসেছিল। পিছনের সেই আগুনের শিখা তার চোখে-বুকে এনেছিল দুর্বার জ্বালা। ওদের বাঁচার সব দাবীকে বন্দুকের গুলী দিয়ে—বেয়নেট আর মর্টার দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চায় শয়তানের দল।

পথে পথে দেখেছে নুরুল সেই মৃত্যু আর অকথ্য অত্যাচার। বিদেশী হানাদাররা আজ তাদের শেষ করে—সেই মাটির উপর প্রেত-নৃত্য সুরু করেছে। গ্রামকে গ্রাম ওরা লুঠ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও দ্বিধা করেনি। মেয়েদের ইজ্জৎটুকুও রাখেনি তারা।

আজ নুরুলের মন ক্ষেপে উঠেছে সেই জ্বালায়।

সবকিছুর জবাব দিতে হবে। বাংলা-দেশের সবুজ প্রান্তর দিগন্তপ্রসারী বিলের জঙ্গল থেকে মাথা তুলেছে নব-জাগ্রত একটি সত্তা। যে ওই অত্যাচারীর কঠিন হাত তার মাতৃভূমির বুক থেকে হটিয়ে দেবে।

আজ তারা মরীয়া। হারাবার আর কিছুই নেই।

সেই অগ্নিজ্বালা, ওদের মনে, তার গ্রাম মাতৃভূমির সত্তা চারিদিকে, সর্বাঙ্গে।

...ইছাখালির গঞ্জের আর বাকী কিছু নেই।

নরেনের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সর্বনাশা ছবিটা। ক'দিন পথে পথে কেটেছে। বড় রাস্তায় দেখেছে রাতের অন্ধকারে হেডলাইট জেলে মিলিটারী ট্রাক চলেছে দুপাশে যা কিছু আছে সব তারা জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে চায়। মেসিনগান থেকে গুলীর ফোয়ারা ছিটিয়ে চলেছে পথের দুপাশে।

সরে গেছে দূরে নরেন—আরও অনেকে। ছিটকে উঠেছে ওই মৃত্যুর হানা-দারিতে। জানে না তাদের গ্রাম গঞ্জের কি অবস্থা।

তবু আশা নিয়ে ফিরছে সে, মনে হয় এই চরম বিপদ আর মৃত্যুর মাঝে ওই সবুজ গ্রামবাসীরা বাগান-ঘেরা বাড়িটুকুই তার একমাত্র আশ্রয়। মায়ের কথা মনে পড়ে —মনে পড়ে মল্লিকার কথা। মনে হয় যেন ওরা উষর মরুভূমির বুকে একটু স্নিগ্ধতার সন্ধান আনা মরূদ্যান, যেখানে পথহারানো কাফিলার জন্য রয়ে গেছে আশ্রয় আশ্বাস।

...কিন্তু সব কেড়ে নিয়েছে পশুগুলো। তার আগেই ইরসান খাঁ তৈরী হয়েছিল তার লুণ্ঠনের শেষ আঘাত হানতে।

এদের এই ষড়যন্ত্রের কথা সে জেনেছিল, এখানকার তাজা জোয়ানগুলোর কলজেতে আগুনের জ্বালা। তাই সব খতম করে দিতে চেয়েছিল—যাতে তার সাম্রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

খবর এনে দিয়েছিল তারই কর্মচারী ওই বাসর মিঞা, লোকটা কুকুরের জাত—একমুঠো এঁটো খানা পেলেই ল্যাজ নাড়ে। ইরসান খাঁ দলবল ঠিক করে রেখেছিল—যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দিতেও কসুর করেনি।

তারপরই সুরু হয়েছিল তাণ্ডব। বাসর এর দল হানা দিয়েছিল গঞ্জের বাজারে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গেছল সব বাজার। অসহায় মানুষগুলোকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে ওরা গুলী করেছে।

মল্লিকার মাও ছিটকে উঠেছিল, মানুষটা রয়েছে বাইরে চাকরির জায়গায়। সেখানেও কি হচ্ছে জানে না, গঞ্জের দিক থেকে ধোঁয়া আর আগুনের শিখা উঠছে। গুলীর শব্দ ওঠে। কারা এগিয়ে আসছে—সারা বাড়ি লুঠ করে ওরা গোলামদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে।

মল্লিকার মা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পিছনের বাঁশবন দিয়ে পালাচ্ছে—কোথায় যাবে জানে না, মল্লিকাই মাকে নিয়ে এসে উঠেছে নরেনদের বাড়িতে, নরেনের মায়ের চোখে কি জ্বালা আর ঘৃণা।

—ওরা সব শেষ করে দেবে মল্লিকা?

মেয়েটা হরিণশিশুর মত ভয়ে কাঁপছে —ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ফাতিমা বিবি।

কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি।

খাকি পোষাক পরা জানোয়ারগুলো দল বেঁধে এসে হানা দিয়েছে। ঘর থেকে যার তোরঙ্গ বের করে লাথি মেরে ভেঙে টাকা-গয়না কুড়োচ্ছে। হঠাৎ একজন দৈত্য লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে ওদের দিকে। তার চোখ-মুখে কি পৈশাচিক উল্লাস,—সে লুঠ করতে এসে যেন মাণিক পেয়ে গেছে।

ফাতিমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিয়ে মল্লিকার হাতখানা ধরেছে। চীৎকার করে ওঠে মল্লিকা খালুন--বাঁচাও! বাঁচাও!

কেউ নেই যে বাঁচাতে আসবে। ফাতিমা বিবি এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে ও বেয়োনেটের ধারাল ফলা দিয়ে ওর দেহটাকে ফালা ফালা করে দেয়।

মল্লিকার জ্ঞান হারিয়ে আসছে—ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে তার জ্ঞানহীন দেহটাকে জঙ্গলের দিকে। মল্লিকার মা লুটিয়ে পড়েছে একটা গুলী তার কলজে এ-ফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

ছাই আর ধ্বংসস্তূপের ওপাশে পড়ে থাকতে দেখেছিল মায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহটা, নরেন এসেছিল ক'দিন পর। তখন গ্রামের আর কিছু নেই, শুধু পোড়া ছাই—ভাঙা ঘর, দুচারটে কুকুর এদিক ওদিক ঘুরছে গলিত পচা মাংসের সন্ধানে।

—মা!

শ্রান্ত নরেন থমকে দাঁড়িয়েছে। তার মাকেও চরম নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত করেছে। তার শেষ আশ্রয় আশ্বাসটুকুও কেড়ে নিয়েছে ওরা। ব্যর্থ করেছে তার জীবন, স্বপ্ন, সব সাধনাকে। মা নেই!

—নরু!

কে যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে। চাইল নরেন। ধ্বসে পড়া মাটির স্তূপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে মইনুদ্দি। ওর কাঁধে হাতখানা রেখে বলে—

—চোখের জল ফেলার সময় নাই নরু, এখনও কাঁদবি? কেটে পড়ে উঠবি না?

নরেন মইনুদ্দির দিকে চেয়ে থাকে। ধ্বংসস্তূপ আর পোড়া ছাই-এর শ্মশানে কারা জেগে উঠেছে নোতুন একটি শপথ নিয়ে। মইনুদ্দির দু-চোখ জ্বলছে কি দুঃসহ জ্বালায়। নরেন ওকে শুধোয়—মল্লিকা! মল্লিকা কোথায়?

সবুজ বাঁশবনগুলো আগুনের শিখায় ঝলসে কালো হয়ে গেছে, মইনুদ্দি ওকে টেনে নিয়ে চলেছে গঞ্জের জঙ্গলের দিকে। এককালে এখানে সে আর মল্লিকা কাঠচাঁপা ফুলের সন্ধানে আসতো, পাখীর ডাকে ভরে থাকতো বনভূমি, বন-খেজুর, আর বেতের ঝাড় সবুজ লতাগুলো জড়াজড়ি করে বাতাসে শির-শির করতো। ওরা বোধহয় পালিয়ে এসে এই ঘন বনের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে; এখুনি যেন ছুটে আসবে মল্লিকা, এত সর্বনাশের মাঝেও সে এখানকে পাশে পাবে—বাঁচার আশ্বাসটুকু ফিরে আসবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নরেন। কেও বনের ওপাশে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মল্লিকার প্রাণহীন দেহটা, কাপড়-চোপড় নেই—বে-আব্রু বেইজ্জতের বাকী আর কিছু নেই। মল্লিকাকেও চরম অপমানে আর লাঞ্ছনায় শেষ করে গেছে। নরেনের মনে হয় সে যেন ছিটকে পড়ে যাবে। কি উত্তেজনায় ওর সারা শরীর কাঁপছে। দুঃসহ একটা অগ্নিজ্বালা ওর বুকে হাঁপিয়ে উঠে তাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো করে দেবে?

দস্যুর দল মল্লিকার সর্বস্ব লুঠ করেছিল জানোয়ারের মত, তারপর গুলী করে খতম করে যায়। তারপর শিয়াল-কুকুরের দল তার নরম দেহটাকে খুবলে খুবলে খেয়েছে। ওই দস্যুদল তাকে মেরে গেছে প্রাণ থাকতে, আর ওর প্রাণহীন দেহটাকে টুকরো করেছে শিয়াল কুকুরের দল। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই।

নরেনের চোখের সামনে আগেকার আশা-আনন্দে ঝলমল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আজকের প্রচণ্ড আঘাতে সব কেমন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে—আর আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে পুড়ে আংরা হয়ে গেছে।

মা—মল্লিকা—তার ঘর বাড়ি—ভবিষ্যৎ সব ওই ভস্মস্তূপের অতলে হারিয়ে গেছে। আজ সে নাম-পরিচয় হীন—নিঃশেষ অতীতের বুকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে একটি সর্বনাশকে।

—নরেন!

মইনুদ্দি ওকে ডাকছে। ওর দিকে চেয়ে অবাক হয় মইনুদ্দি। শান্ত সেই ছেলেটি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, ওর মুখ-চোখ ফুটে ওঠে কাঠিন্য আর জ্বালার অস্থির চাঞ্চল্য। মানুষের এই সর্বনাশে আত্মভোলা মানুষ নরেন বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

শক্ত হাতে নরেন ওর হাতখানা ধরেছে।

—ঠিক বলেছিস, মইনুদ্দি। আর কান্না নয়—এবার জবাব দেবার দিন এসেছে।

—রাতের তারাগুলো যেমন অন্ধকারে তাই ওরা জেগে আছে প্রহরীর মত, দুচোখে ওদের অগ্নিজ্বালা। ওরা মানবিকতার সজাগ প্রহরী—বর্বর অন্যায়ের মুখে দাঁড়াবার শপথে ওরা কঠিন দুর্বার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৃত্য

মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

নৃত্যের ইতিহাসের উৎস সন্ধানের প্রচেষ্টা সম্প্রতিকালে কোন বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে থাকলে উত্তরপুরুষদের এতো মাথা ঘামাতে হত না। পশ্চিমদেশে নৃত্যের বহু একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ করা যায়। কিন্তু ভারতে নৃত্যের ঐতিহ্য যদিও অতি প্রাচীন, তবুও তাকে ইতিহাস বলা চলে না। সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে আমরা নৃত্যের যে ইতিহাস পাই, তাকে ঠিক ইতিহাসের কোঠায় ফেলা যায় না। কারণ তা আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় না। স্বর্গলোকের দেবদেবীদের ক্রিয়াকলাপ কল্পনাপ্রসূত কাহিনীর রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং এগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত হতে পারে না। নৃত্যের ইতিহাসের সন্ধান করতে গেলে আমাদের মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সব দেশীয় নৃত্যের জন্ম একই সূত্রে গাঁথা। একই উৎসমুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে পরবর্তীকালে ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এবং বিভিন্ন সভ্যতার স্পর্শে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আধুনিক যুগে নৃত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আঙ্গিক অভিনয়ের সাহায্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়া। খেলো-পাওনার হিসেব গণ্ডগোল হলেই সেখানে শিল্পবস্তু সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। মানুষ যত সভ্যতর হয়েছে ততই তার শৈল্পিক মন আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। নৃত্য এই আত্মপ্রকাশেরই একটি রূপ।

নৃত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করে দেখা গেছে যে, যেদিন নতুন পৃথিবীতে নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটে, সেইদিনই নৃত্যের বীজ মানুষের মনে উপ্ত হয়েছে। অবশ্য এখানে তর্কের অবকাশ আছে। ছন্দ অথবা ধ্বনি কোনটা প্রাচীন সে বিষয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হয়, দুটি বস্তুরই একই লগ্নে জন্ম। কারণ আদিম মানুষ যে ছন্দে নেচেছিল অথবা যে স্বরে গেয়েছিল তার কোনটাই শিল্পপদবাচ্য নয়। তবে যে কোন জীবেরই জন্মমুহূর্তে প্রথমে আঙ্গিকক্রিয়া সুরু হয়। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে ছন্দ প্রাচীনতর।

বিধাতা তখনও সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পৃথিবীকে নিয়ে চলছে ভাঙাগড়ার খেলা। অপূর্ণ মানুষও পূর্ণ রূপ[illegible]এই অপূর্ণ মানুষের না ছিল ভাষা, না ছিল মানসিক অনুভূতিকে প্রকাশ করবার কোন সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট উপায়। কতকগুলি স্বভাবজাত জৈববৃত্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরে বেড়াত, কখনও বেঁচে থাকবার তাগিদে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করত, আবার কখনও প্রকৃতির প্রচণ্ড রূপে ভয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। প্রকৃতির খেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার মানুষের একটা প্রচণ্ড চেষ্টা ছিল। এই চেষ্টার ফলেই মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছিল, দল বেঁধেছিল, সমাজ গড়েছিল। মানুষের মনের এই স্বভাবজাত আবেগময় অনুভূতির প্রকাশকে বলা যেতে পারে ইমোশন্যাল এক্সপ্রেশন; পরবর্তীকালে সভ্যতার আলো স্পর্শে মানুষের মধ্যে যখন শিল্পময় সত্তাটি জাগ্রত হয়ে উঠল, তখন এই মানসিক অনুভূতিগুলি বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। এইভাবে শিল্পের এক-একটি রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে মিমিক্রিকে গণ্য করা হয়েছে। মিমিক্রি জীবনের বাস্তবরূপকে অনুকরণ করে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে প্রকাশ করে। শিল্পতত্ত্ববিদরা এর আরও গভীর ও ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে পরিত্যক্ত হলেও নৃত্যের সহোদরা বলে গণ্য করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটেল এই কারণেই শিল্পকে অনুকরণ বলেছেন। কারণ অনুকরণ মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি।

নৃত্য কিভাবে জন্ম নিল, সেকথা জানতে হলে আমাদের অনেক পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। পৃথিবীর প্রাথমিক সৃষ্টির যুগকে ঐতিহাসিকরা প্লিস্টোসেন যুগ বলে অভিহিত করেছেন,

মন্দির-গাত্রে খোদিত নৃত্যমূর্তি

এর ব্যাপ্তিকাল দুই লক্ষ বছর খৃষ্টপূর্ব থেকে তিরিশ হাজার বছর খৃষ্টপূর্ব পর্যন্ত। এই সকল আদিম মানুষের লিপিবদ্ধ কোন ইতিহাস নেই। এদের দেহের কোন কোন অংশ অথবা এদের ব্যবহৃত কোন বস্তুর কোন অংশ হাজার হাজার বছর ধরে পাথরের তলায় পড়ে পাথরে বা ফসিলে পরিণত হয়েছে। এইগুলি দেখে পুরাতত্ত্ববিদরা তাদের সময়, জীবনযাত্রা প্রণালী ও অবস্থান সম্পর্কে অনুমান করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত এই তথ্য থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নৃত্যের একটি খসড়া লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দেহভঙ্গী বা হস্তভঙ্গী সর্বকালে জাতিনির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, যার ইঙ্গিতগুলি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন 'এখানে এসো', 'ওখানে যাও', না ইত্যাদি। এই সকল ভঙ্গীগুলি পরবর্তীকালে সভ্য মানুষের শিক্ষিত মনের অবদান নৃত্যকলায় আদর্শায়িত রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় নৃত্যে রেচক প্রভৃতির সাহায্যে এইগুলিকে অলংকৃত করা হয়েছে। এইরকম আরও অনেক ইঙ্গিত আছে যেগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিই শিল্পিত হয়ে সকল দেশের সকল নৃত্যেই প্রায় স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানী নৃত্যের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের নৃত্যের কয়েকটি সাদৃশ্য দেখা যায়।

এবার নৃত্যের পারম্পর্য লক্ষ্য করে আমরা তাদের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হতে পারি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি ফসিল বা চিহ্নের সাহায্যে অনেক কিছুই অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। এখানে নৃত্যও অনুমানসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইগরট জাতির মধ্যে প্রচলিত 'বিজয় নৃত্য'। এই নৃত্যের প্রচলন এখনও পর্যন্ত আছে। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, এই নৃত্যের উৎস ছিল আদিম জীবনের জয়গান। মরণপণ যুদ্ধে মৃত্যু যখন হাতছানি দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ জীবনের জয় এসেছিল। জয়ের অপরিসীম আনন্দে মানুষ তখন নৃত্য করেছিল। এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে, হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে ও শত্রুর সঙ্গে। পদে পদে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত, কখনও বা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত, কখনও বা জীবন রক্ষা পেত। এই মরণঘাতী যুদ্ধে জীবন যখন রক্ষা পেত তখন সেই উল্লাস প্রকাশের ভাষা তো তাদের ছিল না। তা প্রকাশ পেত দেহভঙ্গীর অফুরন্ত শক্তির প্রকাশে। সেইজন্য বিজয়নৃত্যের মধ্যে অফুরন্ত শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্লিসটোসেন যুগে এই নৃত্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এরপর সুরু হয়েছিল প্রস্তরযুগ। এই

CENTRAL LIBRARY

শিকার নৃত্য

সংযোগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। কারণ মানবচেতনার প্রাথমিক ক্রিয়া বোধহয় এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল। শত্রুর কবল থেকে শুধু আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণ করবারও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। শত্রুপক্ষকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। এই যুগেই মানুষ শিকার করতে শিখেছিল।

এই সময় উত্তর ইউরোপ সম্ভবতঃ পাঁচটি বিশাল তুষার স্তূপের দ্বারা আবৃত ছিল। আফ্রিকার কিছু অংশ ও এশিয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল বলে এই অঞ্চল আদি মানবের শিকারের পক্ষে ছিল অনুকূল। শিকারের পর জয়ের বন্য উল্লাসে আদি-মানব শিকারকে বেষ্টন করে নৃত্য করত; অর্থাৎ লাফাত, মাটির ওপর পা দিয়ে আঘাত করত, হাত ছুঁড়ত, মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করত। এখনও আফ্রিকার নিবিড় পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসিদের মধ্যে এই ধরনের আদিম নৃত্য প্রচলিত আছে। এই সকল নৃত্যের মধ্যে পরাজিত শত্রুকে ঘিরে উল্লাস প্রকাশ করবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এতে সঙ্গীত হিসাবে শুধুমাত্র ড্রাম বা দামামা তাল রক্ষা করে। এই সকল নৃত্যই পরবর্তীকালে শিল্পিত হয়ে শিকার নৃত্য, যৌথ সমর নৃত্য ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সকল প্রকার শিকার বা যুদ্ধের নৃত্যেই পুরুষেরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তবে মাদাগাস্কার, পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকার কয়েকটি উপজাতির মধ্যে নারীদেরও সমর নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এঁরা গৃহের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে আগুনকে চারদিকে বেষ্টন করে নাচে। প্রায় সকল উপজাতি এবং আদিবাসিদের মধ্যেই সমর নৃত্য প্রচলিত আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একজন নর্তক জন্তুর মুখোশ পরে শিকারের অভিনয় করে এবং আর একজন শিকারী সাজে। নৃত্যের ভেতর দিয়েই নানা রকম যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শিত হয়। শিকার নৃত্যের সব থেকে প্রাচীন চিত্র পাওয়া গিয়েছে তুর্কীর অন্তর্গত দক্ষিণ অ্যানাতোলিয়ার হ্যারাক প্রাচীরে। দক্ষিণ অ্যানাতোলিয়ায় যখন নাগরিক সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয় তখন এই চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছিল। এই চিত্রটিকে নাগরিক সভ্যতার প্রথম নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছিল। এগুলি প্লাস্টার করা দেওয়ালে আঁকা। এই চিত্রের মর্মার্থ হচ্ছে যে, একজন শিকারী একটি চিতাবাঘ শিকার করছে এবং চিতাবাঘটি লাফ দিয়ে উঠছে। অনুমান করা হয়েছে এই লম্ফ-প্রদানকারী চিতাবাঘটি ছদ্মবেশ পরিহিত কোন নর্তক। এই চিত্রটি ৬০০০ হাজার বছর পূর্বের বলে অনুমিত হয়েছে। প্রাচীনকালে সমর-নৃত্য যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা সক্রেটিসের এই উক্তির দ্বারা অনুমিত হয়— দি বেস্ট্ ডান্সার ইজ অলসো দি বেস্ট ওয়ারিয়র। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্যালিওলিথিক যুগ এই ধরনের নৃত্যের জন্মদাতা।

এরপর পশ্চিম ইউরোপে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে মস্টেরিয়ান সভ্যতা বিকশিত হতে থাকে। এই সভ্যতার শেষার্ধের প্রতিভূ হিসেবে আমরা নিয়ানডারথাল মানবদের গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের মানবদেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা মৃতদেহ সমাধি দিত। এতদিন মানুষ প্রকৃতির একান্ত অনুগত ছিল এবং প্রকৃতিকে নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। সেইজন্য রহস্যময়ী প্রকৃতিকে সে ভয় করত। কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান শুরু হল। এর পূর্বে মানুষ মৃত্যু কি জানত না; মানুষের দেহ কেন বিকল হয়ে পড়ে বুঝতে পারত না। কালক্রমে বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পারল যে, এ প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। তখন থেকে মানুষের মনে জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বোধের উদয় হল। জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা সে উপলব্ধি করতে পারল। পারলৌকিক আত্মা সম্বন্ধে মনে একটি চেতনা জাগ্রত হল। চেতনার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পসত্তা অঙ্কুরিত হল। মৃত্যুর পরও যে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, বরং বিশ্রাম লাভ করে এই চিন্তাধারাটি মানুষের মনে পল্লবিত হয়ে উঠল। সেই অচেনা, অজানা, অদেখা জগতের প্রতি অপরিসীম কৌতূহল, ভয় ও শ্রদ্ধা মুকুলিত হয়ে উঠল। এই চিন্তাধারার সূত্র ধরে শিল্পবিকাশের পথ কি করে সুগম হল তাও আমরা কিছুটা অনুভব করতে পারি। এই যুগের মানবজাতি স্তন্যপায়ী জন্তু শিকার করত। এদের অস্তিত্ব ছিল দক্ষিণ রাশিয়া, মধ্য ইউরোপ থেকে স্পেন, ফ্রান্স ও ইটালি পর্যন্ত। এরা প্রাণীহত্যার সময় মনে করত যে, তারা প্রাণীর দেহটাকে নষ্ট করেছে বটে, কিন্তু আত্মাটি অবিনশ্বর থাকছে। এই বিশ্বাসে তারা প্রাণীটির অস্থিগুলি সমাধিস্থ করত—এবং অনেক সময় পাথরের গায়ে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি বা কঙ্কালের রূপ অঙ্কিত করে রাখত। তাদের ধারণা ছিল আত্মাটি পুনরায় ওই সকল পরিত্যক্ত বা অঙ্কিত দেহে প্রবেশ করতে পারে। এইভাবে পাথরের গায়ে আদিম মানুষের শিল্প-চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশের চিহ্নটি হাজার হাজার বছর পরেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এখনও পার্বত্য উপজাতি ও আদিবাসিদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে।

এই নিয়ানডেরথাল মানবদের মধ্যেই এক শ্রেণীর উদ্ভব হল, যারা একাধারে দলপতি, পুরোহিত, চিকিৎসক ও শিল্পী বলে গণ্য হল। অবশ্য অনেক সময় কাজের ধারা অনুসারে পুরোহিত ও দলপতির পদটি দ্বিধাবিভক্ত হত। পরবর্তীকালে এদের উত্তরপুরুষরাই যাদুকর, ডাইনী ইত্যাদি বলে অভিহিত হয়েছিল। মানুষ রোগাক্রান্ত হলে এরাই যাদুবিদ্যার দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা করত, মৃত্যু হলে পারলৌকিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করত এবং প্রয়োজনবোধে পাহাড় অথবা পাথরের গায়ে মন্ত্রপূত রেখা টেনে দেহনির্গত আত্মাটিকে আপন আয়ত্তে রাখবার আকাশ-কুসুম কল্পনা করত। ইহকাল ও পরকালের সংযোগকারী সেতু হিসেবে এরা সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা

লাভ করত। যখন তারা এই সকল পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে রত হত, তখন তারা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে একটি রহস্যময় ভাবজগতে বিচরণ করত। দামামাদের গুরু-গম্ভীর আওয়াজের তালে তালে সুরু হত দানের আত্মাকে আহ্বান করার অনুষ্ঠান। দামামার তালে তালে আহ্বানকারীর দেহ আন্দোলিত ও কম্পিত হত। ক্রমশ এই কম্পন তীব্রতর আকার ধারণ করত। অবশ্য একে শিল্পসমৃদ্ধ নৃত্য বলা যায় না, তবু ছন্দের তালে তালে সমস্ত দেহকম্পনের মধ্যে নৃত্যের বীজ লুকায়িত ছিল। এখনও ভারত এবং এশিয়ার অনেক জায়গায় ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানে এই ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে। একে আমাদের দেশে 'ভর' নৃত্য বলা হয়ে থাকে। চড়কের গাজনে এই ধরনের নৃত্য দেখা যায়। তাছাড়া গ্রামে অনেক সময় অনেকের ওপর 'ভর' হয়েছে বলা হয় এবং তারা যে পৃথিবীর অপর পারের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন করে এই রকম ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। একে অনেক সময় যাদু বা ঐন্দ্রজালিক নৃত্যও বলা হয়ে থাকে।

এইসূত্রেই মৃত্যুর সময় নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল। কারণ মৃত্যুর জন্যে শোকে এবং পুনর্জন্মের বিশ্বাসে আনন্দে মানুষ নৃত্য করত। তবে একথা ঠিক এগুলি পারলৌকিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হিসাবে গণ্য হত। নৃত্য তখনও পর্যন্ত কোন শিল্পিত রূপ নেয়নি। সে যুগে ভাষার অভাবে চিত্তের যে কোন অবস্থাকে বাইরে প্রকাশের জন্য দেহের ক্রিয়ার প্রয়োজন হত। আদিম মানুষের প্রবৃত্তিকে দমন করবার ক্ষমতা ছিল না। সেইজন্য যে কোন চিত্তবৃত্তিকে তারা বাহ্যিক আকারে প্রকাশ করত। প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত চলমান দেহের ক্রিয়াগুলি বাহ্যিক আকারে প্রকাশ পেত। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে ছিল মৃত আত্মার পুনর্জন্মের জন্য যাদুবিদ্যার প্রয়োগ, মৃত আত্মাকে রক্ষা করা এবং দুষ্টাত্মার বিতাড়ণ ইত্যাদি। এই সব ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা মনে হয় যে, তারা সর্বক্ষেত্রেই জীবনের পরিসমাপ্তি না টেনে তাকে অখণ্ড প্রবাহে প্রবাহিত করার চেষ্টা করত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের দুঃখের ভারও লাঘব হত। রেড ইণ্ডিয়ানদের কতকগুলি উপজাতির মধ্যে এই উপলক্ষে নৃত্যের আয়োজন দেখা যায়। ফিলিপাইনের 'ইগরট' জাতির মধ্যে যুদ্ধে নিহত মৃতদেহকে ঘিরে নৃত্য করতে দেখা যায়। (২) মৃতদেহটিকে মৃত্যুর হিমশীতল নিদ্রা থেকে জাগরিত করবার জন্যে তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাণপণ চীৎকার করে নাচতে থাকে। নিউ আয়ারল্যাণ্ডেও জুন মাসে জ্যোৎস্না রাতে বৎসরে একবার করে 'শোক'-নৃত্য পালিত হয়। এই নৃত্যে সব সময় মৃতদেহের প্রয়োজন হয় না। নর্তকরা মুখোশ অথবা

(২) The Book of the Dance Agenes De Mille

লোকের বেশভূষা পরে মৃতদেহের ভূমিকা গ্রহণ করে; গ্রামবাসীরা এই নর্তককে ঘিরে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে শোক জ্ঞাপন করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। পশ্চিম আফ্রিকায় 'জুজু' অনুষ্ঠান এই জাতীয় নৃত্য। এই অনুষ্ঠানে প্রেতাত্মাকে জাগান হয় এবং তার সঙ্গে আরও অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠানও হয়ে থাকে। প্রাচীন কোরিয়াতেও নাকি এই ধরনের নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। শোনা যায় এই ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল, ১৯৩০ খৃঃ পর্যন্ত। এই নৃত্য সাধারণত কোন বিশেষ জন্তুর প্রতিকৃতিচিহ্নিত করা হত মুখোশে। নর্তক প্রতিকৃতিচিহ্নিত মুখোশ ব্যবহার করে নৃত্য করত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের মৃত্যু সাধারণভাবে হয় না। প্রেতাত্মা বা মানুষের দ্বারাই মৃত্যু সংঘটিত হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা নৃত্যের ভেতর দিয়ে খুনীকে খুঁজে বার করে তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করত অথবা তার শাস্তিবিধান করত। আমাদের দেশেও মৃত্যুতে নৃত্যগীতাদির প্রচলন আছে। চণ্ডাল, মুচি, শবর প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির মধ্যে এখনও শব বহনের সময় সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় সব আদিজাতির মধ্যেই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় নৃত্যের প্রথা প্রচলিত ছিল। পরে অবশ্য সভ্যজাতির সংস্পর্শে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় এই প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে।

এই ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আদিম যুগে মানুষের মনে যখন জাগতিক এবং পারলৌকিক চিন্তাধারার একটা প্রবাহ বয়ে যেতে থাকে, তখনই শিল্পের জন্ম-লগ্ন। পূর্বে মানুষ প্রকৃতির খামখেয়ালীকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করত। কিন্তু এই সময় মানুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাবতে শেখে। তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে নিজেকে সমর্পণ না করে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে তার বিরোধিতা করতে চেষ্টা করল। তার ফলেই সুরু হয় নতুন করে সৃষ্টির প্রচেষ্টা, নিজেকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রাখার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কি করে সম্ভব হতে পারে? তার জন্য চলে নানা আয়োজন, নানা সমারোহ। এই আয়োজনের মধ্যে অঙ্কনশিল্পই ছিল প্রধান আর ছিল নৃত্যগীতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এইভাবে শিল্পসৃষ্টির প্রারম্ভেই আমরা দেখি চিত্র, নৃত্য ও গীতের একটি অমার্জিত রূপ। এই অমার্জিত রূপই সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুষ্ঠুভাবে মার্জিত আকারে পরিবর্তিত হয়েছে। এই নব চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তরযুগ ও নবপ্রস্তর যুগের অবসান ঘটে।

নিওলিথিক যুগের আগে পৃথিবীর অনেক জায়গায় দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যায়। বিশেষ করে সেই সময় ইউরোপের অধিকাংশ জায়গাই বরফে আবৃত ছিল। এই সব জায়গায় বরফ গলতে আরম্ভ করে। যার ফলে পৃথিবীতে দারুন ওলট-পালট হল। এই যুগকে 'বিপর্যস্ত' যুগ বলা যেতে পারে। যে সকল অঞ্চলে বরফ গলে মাটি দেখা দিল সেসব অঞ্চলের অনেক জায়গা জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গেল। এই সব জঙ্গলে জীব-জন্তু এমন কি মানবও আশ্রয় নিল। এই মানুষ জীবজন্তু

নিজের মতো প্রাণ ধারণ করতে লাগল। এদের কাছে জীবনের রহস্য তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটি গোষ্ঠী দেখা দিল যারা জীবনের রহস্য জেনেছে। মৃত্যুর পরেও যে আবার জন্ম আছে এ কথা তারা বুঝেছিল। সেইজন্য তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখল, মাটিতে ফসল ফলিয়ে জীবনকে অঙ্কুরিত হতে দেখল। খৃঃ পূঃ প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিযুগের সূচনা করে। প্রকৃতির খাম-খেয়ালীকে তারা ভয় করে চলে তখনও পর্যন্ত। সেইজন্য প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এরই ফলে বৃষ্টির দেবতা, ভূমির দেবতা, বৃক্ষের দেবতার পূজোর প্রচলন হল। এখনও অনেক দেশে এই ধরনের পূজোর প্রচলন আছে এবং সেই উপলক্ষে নৃত্য-গীতের আয়োজনও হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এই ধরনের উৎসব ও পূজোর প্রচলন বেশী দেখা যায়। বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণ, হেমন্তকালে ধানকাটা, পৌষ মাসে নবান্ন প্রভৃতির উৎসব উল্লেখযোগ্য এবং এই সব উৎসবে নৃত্যের আয়োজনও হয়ে থাকে। এই জাতীয় নৃত্য পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোমে 'ব্যাকানালিয়া' নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। এই নৃত্যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। পরস্পরের পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতির দেবতা যৌবনের প্রতীক ব্যাকাসের পূজো উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হত। মধ্য বর্ণিওর মহাকাম নদীর তীরবর্তী কায়ানদের মধ্যে ধান্য উৎসব এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে: গ্রামের মুক্ত অঙ্গনে নর্তকীরা মুখোশ পরে নাচেন, এই মুখোশের মধ্যে বড় বড় দাঁত ও কান থাকে। চোখের কাছে বড় গর্ত থাকে এবং ছাগলের লোমের দাড়ি থাকে। কলাপাতা দিয়ে কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢাকা থাকে। নাচবার সময় নাচিয়েরা মনে করেন তাঁরা যেন ফসলের আত্মা।

চীনেও কৃষি উপলক্ষে নৃত্যের প্রচলন ছিল। চীনে লোলো জাতিদের মধ্যে প্রচলিত কুনোন নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষেতের কাজের পর গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা যুবকদের সঙ্গে নৃত্যে মেতে উঠত। ভারতেও এই ধরনের নৃত্যের উল্লেখ করতে পারি। পাঞ্জাবের ভাংরা, সাঁওতাল পরগণার করম, বাংলার নবান্ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান এই বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

এইগুলিকে আমরা লোকনৃত্য এবং লোকসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছি। লোকনৃত্য বা লোকসংস্কৃতি বিশেষ বিশেষ জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

যাই হোক, আমরা এইটুকু অনুমান করতে পারি যে, পরবর্তীকালে কিভাবে এই নৃত্যগুলি প্রচলিত হয়েছে এবং কালের প্রবাহে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কৃষিযুগে প্রকৃতিকে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে কখনও অভিনন্দন জানান হয়েছে, কখনও আহ্বান জানান হয়েছে, কখনও বা পূজো করে প্রথাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এইগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশাচারের সংস্পর্শে বিভিন্ন রূপে পরিগ্রহ করেছে। ভারতেও জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে লোকনৃত্যের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি শুষ্ক, কঠিন অঞ্চলে নৃত্যের মধ্যে একটি উদ্দাম বলিষ্ঠতা ও সুগঠিত, পেশীবহুল দেহের প্রাণপ্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের লোকনৃত্যে একটি কোমল, পেলবতা লক্ষণীয়। অবশ্য রাইবিশে, ঢালী প্রভৃতি নৃত্যে যুদ্ধকৌশল প্রভৃতিও দেখা যায়।

কৃষিযুগে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শেখে এবং ধীরে ধীরে সমাজও গঠিত হয়। সমাজ সৃষ্টি হলে নগরজীবনের সূত্রপাত ঘটে। ৬০০০ হাজার বছর আগে দক্ষিণ অ্যানাতোলিয়াতে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে সব থেকে প্রাচীন বলা যায়। এরপর মধ্যপ্রাচ্যে সুমের সভ্যতা, ৩২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশর সভ্যতা, ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা এবং ১৫০০ খৃষ্টপূর্বে চীনা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নগর সভ্যতার সঙ্গে ধর্মবোধও মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং মন্দিরও গড়ে ওঠে। মন্দিরের পূজার্চনার ভার নিলেন পুরোহিতরা। পুরোহিতদের মধ্যে অনেক স্ত্রী পুরোহিতও ছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানে ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সঙ্গীতও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। যখন থেকে নগরজীবনের সূত্রপাত তখন থেকেই মানুষের ধর্মবোধ একটি সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল এবং দেবার্চনাও একটি নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হয়েছিল। অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় যে, এই সময় থেকে পুরোহিত প্রথা এবং দেবদাসী প্রথার প্রচলন ঘটে। সে যুগের মন্দির নির্মাণ-প্রণালী পূজার্চনা পদ্ধতি এই কথাই প্রমাণিত করে।

মিশর, আসিরিয়া ও ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করলে এই সব মন্দিরে যে পুরোহিত ও দেবদাসীদের প্রাধান্য ছিল একথা অনুমান করা যায়। পাশ্চাত্যের নৃত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দেবদাসী প্রথার সূচনা হয়েছিল ইজিপ্টে এবং সেখান থেকে ভারত, গ্রীস, রোম প্রভৃতি জায়গায় প্রসার লাভ করেছিল। প্রাচীনযুগের মন্দিরগুলির প্রধানত তিনটি অংশ ছিল। প্রথমাংশের অঙ্গন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই অঙ্গনে নানারকম অভিনয় হত। ইংরেজীতে একে কোর্ট বলা হত। এর পরের অংশ ইনার কোর্ট। এই দ্বিতীয় অংশে যারা প্রবেশাধিকার লাভ করত তারা নানারকম অভিনয় দেখবার সুযোগ লাভ করত। শেষের অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত। কারণ এতে প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান প্রধান নর্তকী ছাড়া অন্য ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারতেন না। এঁদের মধ্যে অনেক স্ত্রী-পুরোহিতও থাকতেন। এই অঙ্গনগুলি কক্ষগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। প্রথম অঙ্গনে কতকগুলি বড় বড় থাম থাকত। দ্বিতীয়টিও নানা ধরনের স্তম্ভে সজ্জিত ছিল। শেষ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এই অংশটি দিয়ে প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যেত। একটি বৃহৎ সিঁড়ির দ্বারা অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই অংশের সংযোগ থাকত। শেষ অংশটিকে জনসাধারণের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক এবং রহস্যময় করে তোলার জন্য নির্জন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা হত। এই অংশে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ধর্মসংক্রান্ত নানারকম অভিনয়ের আয়োজনও করা হত।

ঐতিহাসিকদের মতে মিশরের প্রধান পুরোহিতের পদ বংশগত ছিল এবং ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীতের ওতপ্রোত সম্বন্ধ ছিল। এ সম্বন্ধে স্যার ই. এ. ওয়ালিস বাজ অনেক সংবাদই প্রকাশ করেছেন। ইজিপ্ট থেকে যে এই ধরনের নৃত্য ও দেবদাসী প্রথা অন্য দেশেও স্থানান্তরিত হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। মিঃ বাজ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, চ্যান্সেলর হেমকের সঙ্গে সেমটি আসেন। সিংহাসনের ওপর ওসিরিস দেবতা শুভ্র মুকুট পরে বসে থাকেন। তাঁর সম্মুখে রাজা সেমটি নৃত্য করেন। এই সব থেকে বোঝা যায় যে, শুধু পুরোহিত বা দেবদাসী নয়, দেবতার সম্মুখে রাজারাও নৃত্য করতেন। নৃত্য করবার সময় রাজা যখন ভক্তিমার্গের দ্বারা পরিচালিত হতেন, তখন তিনি মনে করতেন তিনি ভগবানের দাস। যখন তিনি অহংভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নৃত্য করতেন, তখন তিনি মনে করতেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান। ইজিপ্ট থেকেই যে দেবদাসী প্রথার সূত্রপাত হয় তা আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি। এই জন্যেই বোধ হয় হ্যাভলক এলিস ইজিপ্টকে এ যুগে আধুনিক নৃত্যের ... বলেছেন। ইজিপ্ট থেকেই দেবদাসী প্রথা গ্রীস, রোম প্রভৃতি ও ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। হ্যাভলক এলিসের আর একটি উক্তিতে এই সম্বন্ধ প্রতিফলিত হয়—

"...and Nile and cadiz were thus the two great centres of ancient dancing, and Martial mentions them both together for each supplied its dancers to Rome."

গ্রীসেরও কয়েকজন পণ্ডিত মিশরে এসে মিশরের সংস্কৃতি ও শিল্পকে গ্রীসে নিয়ে গেছেন।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে মিশরের বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের প্রভাব বেশী

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

ক্রমই ছিল। প্রাচীন গ্রীসের নৃত্যের ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে হুবি পিনার বলেছেন—

—"The cities of Knossos and Phaistos in Crete were the centre of this civilisation, and from these cities Minoan culture spread to the islands of the Aegean, and to the mainland of Greece where the fortified cities of Mykenai and Tiryhs became important centre of this era. The people native to this early Aegean world were typical Mediterranean race *** they were excitable, passionate, superstitious, imaginative, lovers of colour and beauty, and they evolved many arts.

সুতরাং গ্রীসের প্রাচীন নৃত্যকলা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। চার্লস হয়েস তাঁর গ্রন্থে স্ত্রী-পুরোহিতদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

—"The priestess of the Minoan cult used to dance in a ring before a shrine in honour of the goddess.'

এই সব উক্তিতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমতঃ ইজিপ্ট ছিল ধর্মীয় নৃত্যের আদিস্থল। দ্বিতীয়ত এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানে স্ত্রীপুরোহিতদেরও প্রাধান্য ছিল এবং স্বভাবতই এঁরা দেবদাসী ছিলেন। এই প্রথা আমাদের ভারতেও প্রচলিত হয়েছিল এবং কালক্রমে তা দেবদাসী প্রথা বলে অভিহিত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে ধর্মীয় নৃত্যের মধ্যে অগ্নিঅঙ্গনে নৃত্য প্রচলিত ছিল। ক্রীটেও এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্য ইলিয়াডে রণভূমির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই নৃত্যেরই অনুসারী। মহাকবি ভার্জিলও এই নৃত্যের উল্লেখ [illegible] অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই অনুষ্ঠানে মশাল নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের ডেল্টাল ফার্মিন অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শোভাযাত্রায় অনেক শোভাযাত্রী (দেবসেবিকা) উপাচার নিয়ে অগ্রসর হতেন। ডর্থলিউ ফ্রি ব্লাকে এই স্ত্রী-পুরোহিতদের উল্লেখ করেছেন। খৃঃ পূঃ ২০০০ হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনে এবং আসিরিয়াতে মন্দিরের এইসব পুরোহিতরা রাজা ও প্রজাসাধারণের ওপর বিশেষ প্রভুত্ব করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— "The object of the hight, the solitude, the ritual was to ensure the tension required for a scene. 'The enquiry to the gods' which the priestess (deep in trance) would usually afford".

(1) — The Art of Dancing.
(2) — Gateway to the Dance,
(3) —ঐ ঐ ঐ — 'Crete the fore-runner of Greece —by Mr, Charles Howes.

এই স্ত্রী পুরোহিতরা নৃত্যগীতের সমন্বয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির প্রাঙ্গণের নির্জন দেব অর্ণটিতে প্রবেশ করতেন, এই সম্বন্ধে ডব্লিউ ফ্রি ব্লাকে আরও মন্তব্য করেছেন—

—"Silby priestess was escorted into the small shrine and there enthroned."

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে তিনটি জাতি মধ্যপ্রাচ্য এবং মেসোপটেমিয়ায় এক বিরাট সভ্যতার সৌধ নির্মাণ করেছিল, সেই তিনটি জাতি হচ্ছে সেমিট, সুমেরীয়, ও আর্য। মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ইজিপ্টের সভ্যতা থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সঙ্গীত। এইভাবে প্রাচীনকালে ইজিপ্টের কাছে তার সব দেশই কম বিস্তর ঋণী ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মধ্য এশিয়ার ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল, এমন কি ইউরোপও তার থেকে বাদ যায়নি।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্পাতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে সব ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেছেন তাতে অনেক রকম দ্রব্যের মধ্যে দেবদাসী বা নর্তকীর ব্রোঞ্জমূর্তি, নটরাজের ব্রোঞ্জমূর্তি, বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই চিহ্নগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে সঙ্গীত সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল এবং দেবদাসী প্রথারও প্রচলন ছিল। এটা অনুমান করা ভুল হবে না যে, মিশর বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই প্রথা ভারতে এসেছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, দেবদাসী প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় প্রথা ছিল। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রায় মধ্যযুগ পর্যন্ত এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এবং পরে নানা কারণে তা লুপ্ত হয়ে যায়।

এই অবলুপ্তির কয়েকটি কারণ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা সাধারণত দ্রাবিড় বা অনার্য সভ্যতার নিদর্শন। এই সভ্যতায় সমাজে নারীদের মর্যাদা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এর সাক্ষ্য আমরা বহু জায়গায় পেয়েছি। সর্বক্ষেত্রেই নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত।

দ্রাবিড় সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন ইতিহাসে তাঁরা অনার্য এবং ধর্মগ্রন্থে তাঁরা অসুর নামে অভিহিত। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে জানা যায় যে এঁরা নগরজীবন যাপন করতেন। আর্যরা এঁদের বিতাড়িত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এঁদের সঙ্গে অনার্যদের একটি চারিত্রিক বৈষম্য ছিল। অনার্যরা জীবনকে রূপে, রসে, গন্ধে উপভোগ করেছেন এবং শিল্প ও জীবনের প্রতি এঁদের একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। মৃৎপাত্রে বিচিত্র রঙে রঞ্জিত নকসাগুলি, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, বাদ্যযন্ত্র ও নর্তক-নর্তকীর উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি শিল্পবোধেরই পরিচয় দেয়।

আধ্যাত্মিক প্রেরণা কিন্তু আর্যদের জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ করে তোলে। আত্মজিজ্ঞাসা আর্যদের বাস্তববিমুখ করে তুলেছিল। আর্যরা সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম'কে জানতে চেয়েছিলেন, যার ফলে সমস্ত জগৎ তাঁদের কাছে মায়াময় বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এই সব কারণে শিল্পচেতনা তাঁদের মধ্যে তীব্র ছিল না। কারণ শিল্পসৃষ্টির প্রথম কথাই হচ্ছে বাস্তবজীবন বা বাস্তবজগৎকে অবলম্বন করে শিল্প সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং শিল্পের জগতে বাস্তবকে উপেক্ষা করে কঠিন সংযম ও ত্যাগের মধ্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এই জন্য তাঁদের মধ্যে শিল্পচেতনা তীব্রভাবে জাগ্রত হয়নি।

এঁরা অনার্যদের জয় করে তাঁদের শিল্পপ্রীতিকে ভাল চোখে দেখলেন না। ধর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রভুত্বকে অস্বীকার করলেন। অনার্যদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে বর্জন করে নিজেদের ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বেদের অংশ 'ব্রাহ্মণে' এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এর ফলে নারীদের প্রভুত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। তাঁরা একমাত্র সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়া মন্দিরের কোন মর্যাদা পেলেন না। অবশ্য তাঁদের ভরণপোষণের ভার মন্দির কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। এইভাবে স্ত্রীপুরোহিত বা দেবদাসীদের হাত থেকে সমস্ত কর্তৃত্ব আর্যদের হাতে স্থানান্তরিত হল। এই দেবদাসী প্রথা তার কর্তৃত্ব হারিয়ে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, পরবর্তীকালে আর্যরাও এই সঙ্গীতকলার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অমূল্য ধর্মসাহিত্য বেদেও তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন।

উত্তর ভারতে বিদেশীদের উপর্যুপরি আঘাতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিব্রত হয়ে পড়ল, বিশেষ করে ৭ম-৮ম শতাব্দীর মধ্যে ঐস্লামিক অভিযান দেবদাসী প্রথার ওপর বিশেষ আঘাত হানে। তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি এই দেবদাসীদের ওপর পড়েছিল। ১১০০ খৃঃ মামুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় অনেক দেবদাসী ধর্মচ্যুত হন। এই ধর্মভ্রষ্ট দেবদাসীদের অনেকেই ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হন অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন। দেখা যায় যে, এর ফলে এই প্রথা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এঁদের উত্তরপুরুষদের, অনেকেই এই প্রথাকে ত্যাগ করতে পারেননি এবং এঁদের বংশধর বলে পরিচয় বহন করেছিলেন, তাঁদের কেউই সমাজে হৃতসম্মানকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কি আর্থিক, কি সামাজিক কোনদিক দিয়েই এই প্রথাকে পরবর্তীকালে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। এর ফলে এই প্রথা একসময়ই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্য কাহিনী (২)

সমগ্র গ্রন্থটিতে মিঃ মল্লিক একজন প্রতিবাদী কৌঁসুলীর মত যুক্তিতর্ক-সহকারে ভারত সরকারের ক্রিয়াকলাপ তথা তাঁর মনিব নেহরুজীর পক্ষ সমর্থন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা অবশ্য দোষনীয় নয়, কারণ অধিকাংশ গ্রন্থ যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একতরফা ভারতের চীননীতি তথা চীন-ভারত যুদ্ধনীতির সমালোচনা আছে। ম্যাক্সওয়েলের গ্রন্থটির নামই ত' 'ইণ্ডিয়াস্ চায়না ওয়ার' অর্থাৎ ভারতই চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই সব মতবাদ খণ্ডনে যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগ করা অবশ্যই সমীচীন। তবে নিরপেক্ষ ইতিহাসের ছাত্র এই নীরক্রান্ত সরিয়ে ক্ষীরটুকুই গ্রহণ করতে পারবেন, কারণ অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ, আত্মম্ভরিতা, আত্মপ্রচার ও আত্ম-ধর্মিকা যা এই জাতীয় রচনার এক প্রধান ত্রুটী তা মিঃ মল্লিকের 'মাই ইয়ারস উইথ নেহরু' (ছোট অক্ষর)—এবং 'দি চাইনিজ বিট্রেয়াল' (বড় অক্ষর) গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রে পাওয়া যাবে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের এই যে প্রবণতা এটা স্বাভাবিক। যে কোনো ইনটেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে হবে আমরাই ঠিক, কেননা সামরিক অসাফল্যের পর সেনাবাহিনীর কর্তারা দুর্বল ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থাকেই দায়ী করে থাকেন। সরকার ইনটেলিজেন্স এবং সমর-বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন।

মিঃ মল্লিকের সরকার মাত্র দুজন। নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজী। এই দুটি মানুষেরই তিনি কাছের লোক বলে মনে হয়। কারণ কাশ্মীর প্রিনসেসের ব্যাপার থেকেই সর্ব কর্মে নেহরুজী এই বার্তাটিকে অন্যান্তকে ডেকে শলাপরামর্শ করেছেন। তিনি এক জায়গায় স্বীকার করেছেন—

> "To do Justice to our army leaders it must be stated that they were in complete tune with this policy (i.e. the enemy had to be met in the frontier wherever he transgressed it) and proceeded to implement it in right earnest" (P.P. 322).

অনেকরকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অতঃপর তিনি 'লেগ্‌হর্ন অপারেশনে'র কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন, কৃষ্ণমেনন এই সময় লাওস কনফারেন্সের সূত্রে জেনিভা গিয়েছিলেন এবং

> "Clinked glasses with Chenl in a last minute effort to avoid conflict but apparently got little of the Chinese Marshal".

লেখক বলেছেন, কৃষ্ণমেননের এই ক্রিয়াকলাপ এদেশে বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছে, তথাপি তিনি এই অভিযাত্রীর সমর্থক।

তিনি এক জায়গায় কাউল এবং মেননের মতবিরোধের কারণ প্রকাশ করেছেন। কাউল ১৯৬২-র মার্চ মাসে পেন্টাগন বোলজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মার্কিন সমরসম্ভারপ্রাপ্তির ব্যবস্থা স্থির করেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে উপেক্ষা করেছেন। একটা মার্কিন-অভিমুখী নীতি গ্রহণ করার জন্য মেননকে উপদেশ দিয়েছেন, মেনন রাজী হন নি। মেনন চেয়েছিলেন চারদিকে দরজা খুলে রেখে যেখান থেকে পাব অস্ত্র নেব। তাছাড়া মেনন বলেছিলেন আমেরিকা সামান্য মাল দিয়ে অনেকরকম শর্ত আরোপ করবে। ১৯৬২-তে কাউল ও মেননের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। এবং এই কারণে সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখে নেহরু যখন কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গেলেন, মোরারজীও ছিলেন না, সুতরাং শাস্ত্রী এবং কৃষ্ণমাচারীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে নেহরুকে যেতে হল।

তার আগেই ২রা সেপ্টেম্বর কাউল চলে গেলেন ছুটিতে। কাউলের অনুপস্থিতির নেপথ্যহেতু পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। কাউল অক্টোবরে ফিরে এসে কেমন কাণ্ড করেছিলেন তা এখন সকলেরই জানা। 'আন-টোল্ড স্টোরী'র অনেকখানি অন্য অনেকে বলে ফেলেছেন। কাউল অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন চীনা অবস্থান সম্পর্কে অবস্থার পরিচয় পেয়ে এবং চীন আক্রমণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসহায়ত্বের জন্য কেউ কেউ কাউলকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দায়ী মনে করেন। এই বৃত্তান্ত মিঃ মল্লিকের গ্রন্থের ৩৫৭ পৃঃ থেকে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাউল সম্পর্কে একটা মতামত গঠনের পক্ষে এই কয়টি পৃষ্ঠা যথেষ্ট।

একটি মজার ঘটনা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণ মেননের পদত্যাগের একদিন পরে জনৈক অতি প্রবীণ মন্ত্রী (নাম উল্লেখ নেই) ক্যাবিনেট মিটিং-এ অভিযোগ করেন যে তাঁর গতিবিধির ওপর আই বি নজর রেখেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে। প্রধানমন্ত্রী আসল ব্যাপার জানতে চান, মল্লিকসাহেব অস্বীকার করেন। তিনি বললেন, মন্ত্রীমহোদয়কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এমন উক্তির জন্য। নেহরুজী প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মারফৎ মল্লিকসাহেবকে জানালেন সেই প্রবীণ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে। পরবর্তী অংশ পাঠে মনে হয় মল্লিকসাহেব একটু চটেছিলেন। তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে সহজে দেখা করেন নি, নেহরুজীর চাপে পড়ে পরে সেই প্রবীণ মন্ত্রীটির ঘরে যেতে তিনি প্রায় নিম্নলিখিত ধরনে বলেছিলেন—

> "You have let down the country by being in league with the Defence Minister".

মল্লিকসাহেবও কম নন। তিনি বললেন, মুখ সামলে কথা বলবেন। "Minister should weigh his words carefully" ইত্যাদি।

মন্ত্রীমহোদয়ের পরবর্তী উক্তি অবশ্য হাস্যকর। তিনি বললেন, আপনি নন, 'ডি এম আই' আমার উপর নজর রেখেছে। সোজাকথা যেমন মন্ত্রী তেমনই তাঁর কর্মচারী। কারণ, আর যাই হোক, ইনফরমেশান ব্যুরোর চীফ একজন মন্ত্রীর কাছে অধঃস্তন কর্মী মাত্র। মিঃ মল্লিক সমগ্র গ্রন্থটিতে প্রত্যেক যার-তার সম্পর্কে এমন সব উক্তি করেছেন যা শুধু প্রধানমন্ত্রী বা ভারতের রাষ্ট্রপতির মুখে মানায়। অতিরিক্ত আদরে যেমন কারো কারো মাথা কিঞ্চিৎ গরম হয়, মল্লিকসাহেবের গ্রন্থপাঠে তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। একমাত্র তাঁর নির্দেশে, উপদেশে, আদেশে আসমুদ্রহিমাচল টলটলায়মান। ভারতের রাজকীয় রেলশকটের যেন তিনি ড্রাইভার, গার্ড সিগনাল্যার ও স্টেশনমাস্টার।

প্রকাণ্ড বই. অনেক চমকপ্রদ এবং আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে এমন কথা এই গ্রন্থে ছড়ানো আছে। সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়—তেজপুর থেকে ফিরে জেনারেল থাপার প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগ পেশ করলেন। জেনারেল চৌধুরীসাহেবের চাকরীটা কিভাবে মল্লিকসাহেবের দয়ায় হয়েছিল তার বিবরণ লেখক সবিস্তারে দিয়েছেন এই গ্রন্থের ৪০১ পৃষ্ঠায়। আমরা সেই অংশটুকু অনুবাদ করে দিলাম—

"সাউথ ব্লকে শ্রীশাস্ত্রীর ঘরে রাত ১১টার সময় আমার ডাক পড়ল। তিনি একা। কোনোরকম সন্দেহ বা উদ্বেগের মুহূর্তে তিনি ঘরে পায়চারি করতেন,

এখনও তাই করছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, থাপার পদত্যাগ করেছেন জানো কি! আমি সে সংবাদ জানি একথা বলার পর তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী চীফ অব আর্মি স্টাফ কাকে করা যায় সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছেন। তিনি আমাকে বসে কিছুটা চিন্তা করতে বললেন। আমি দেখলাম তাঁর খাওয়া হয় নি, বাড়িতে ফোন করে বলে দিলাম, কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে খাবার এসে গেল। আমি বললাম, সরকার যদি থাপারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে মনস্থ করে থাকেন—অবশ্য তার কোনো যুক্তি নেই—তাহলে পরবর্তী জেনারেল, অর্থাৎ চৌধুরীই এই পদ গ্রহণ করবেন। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন অন্য কারো কথা না বলে চৌধুরীর কথা বলছি কেন! আমি বললাম, পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, থাপারের পর চৌধুরীই সব থেকে সিনিয়র, আর তাঁর ঠিক পরে যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতার যে অধিকতর উত্তম রেকর্ড আছে তা জানি না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই চৌধুরীকে মনোনীত করতে হয়। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে চৌধুরীকে জানি কিনা। আমি বললাম, ১৯৫১ থেকে জানি, মুগ্ধনে অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং তাঁর যোগ্যতা বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই। তিনি আবার জানতে চাইলেন,—চৌধুরী যে কয়েক মাসের মধ্যেই সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করবেন আমি তা জানি কিনা। আমি বললাম, জানি। তবে তাঁকে প্রমোশন দিলে আগের অর্ডারের কার্যকারিতা বাতিল হবে। শাস্ত্রীজী তখন বললেন, চৌধুরীকে 'চীফ অব আর্মি স্টাফ' করার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি আছে, তা জানো কি! আমি জানতে চাইলাম এই চাপটা কি রাজনৈতিক? তিনি বললেন, কিছু সিভিলিয়ান এবং সার্ভিস অফিসারদের মত তাঁর বিপক্ষে। আমি বললাম আমি তা শুনেছি তবে এ সব চাকুরীগত ঈর্ষা মাত্র এর মধ্যে সুবিচারের প্রশ্ন নেই। শাস্ত্রীজী তারপর জানতে চাইলেন আমি সর্ব ব্যাপারে চৌধুরীকে সমর্থন করব কিনা। আমি আমার সম্মতি ও তার হেতু জানালাম। শাস্ত্রীজী জানতে চাইলেন আর কিছু বিকল্প আছে! আমি বললাম সে প্রশ্ন ওঠে না। আমি শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সে রাতে সাড়ে বারোটা অবধি ছিলাম। পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলেন।"

পরদিন অবশ্য জেনারেল থাপারের আসনে জেঃ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করা হল। মিঃ মল্লিক বলেছেন, জেনারেল কাউলকে এই গদীতে বসানোর কথা ছিল বলে যে গুজব আছে তার মূলে কোনো ভিত্তি নেই। তাঁর নাম কখনো ওঠেনি।

মিঃ মল্লিক জেনারেলদের সবাইকে থাপার, চৌধুরী ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র নেহরুকে প্রাইম মিনিস্টার বা নেহরুজী এবং শাস্ত্রীজী বলেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। মেননের কথা বলতে গিয়ে কোথাও কৃষ্ণ মেনন বলেছেন। মিঃ মল্লিক যে একজন অত্যন্ত সুপরিচিত কর্মকর্তা তা বোঝানোর বোধ হয় এই রীতি।

ইনফরমেন ব্যুরোর পদমর্যাদা ইত্যাদি সাধারণের জানার কথা নয়, মিঃ মল্লিকের গ্রন্থ পাঠ করলে একটু-আধটু ধারণা হবে। জানা যাবে, তাঁরা কত শক্তিমান। মিনিস্টার, জেনারেল, চীফ অব স্টাফ সবাই তাঁদের কাছে রাম-শ্যামের মতন।

তথাপি মিঃ মল্লিকের গ্রন্থটি অনেক দিক থেকে মূল্যবান। সরকারী মতবাদ এবং সরকারী ব্যবস্থাদির প্রকৃত ছবিটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং তার ফলে অনেক অস্পষ্টতা কেটে গেছে।

—অভয়ঙ্কর

MY DAYS WITH NEHRU — THE CHINESE BETRAYAL By--B. N MULLIK (ALLIED PUBLISHERS — Rs 25-00 P)

সাহিত্যের খবর

পি-ই-এনের অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী সভা

সম্প্রতি শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের পি ই এন-এর তরফ থেকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, ডাঃ সুধীর নন্দী, বাণী রায়, বিভা সরকার, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি সদস্যগণ আলোচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় দান করেন সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে।

ছড়া পাঠের আসর

'রূপসী বাংলা' এবং 'গল্প কবিতা' নামক সাময়িক পত্রিকা গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় সি-এল-টি হলে বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার পৈশাচিক অত্যাচারের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক নবীন ও প্রবীণ কবি স্বরচিত ছড়া পাঠ করলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, অন্নদাশঙ্কর বসু, উমা ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রেবতীভূষণ প্রভৃতি কবিবৃন্দের সঙ্গে অনেক তরুণ কবিও ছড়া পাঠ করেন।

অতুল প্রসাদ স্মারক পত্রিকা

'বাণীবিতান' নামক কলিকাতার বিখ্যাত সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঠিত অতুলপ্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কমিটি অতুলপ্রসাদ স্মারক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করছেন। এই জন্য যাঁরা অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে কমিটি সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। ৬এ, বাণী বসু লেন, কলিকাতা-৬, এই ঠিকানায় কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

বলাকা সঙ্ঘের গুণীজন সম্বর্ধনা

বলাকা সঙ্ঘের দ্বারা আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মান্নাকে সম্বর্ধনা

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৩রা আশ্বিন
(২০শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে
তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন
শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ
শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ
॥ সমগ্র রচনাবলী ১০ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২·০০
উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১২·০০ টাকার স্থলে ১০·২০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১২০·০০ টাকার স্থলে ১০২·০০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সময়ে অনিবার্য কারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাকমাশুল বা ভাড়া স্বতন্ত্র।
এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ১২
ফোন : ৩৪-১৭৮২

জ্ঞাপন করা হয়। রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ

সংবাদে প্রকাশ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৩০শে আগস্ট থেকে প্রবল রক্তচাপজনিত ব্যাধিতে শয্যাশায়ী আছেন। বর্তমানে তিনি নিরাময়ের পথে। ডাক্তারগণ তাঁকে দু মাসের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

মানুষের মুখ—সম্পাদনা : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্ত, বাক্সাবাজার, কটক-২ থেকে প্রকাশিত। দাম : একটাকা।

ভাবতেই পারা যায় না, বাংলাদেশের বাইরে এমন সুন্দর ছাপা এবং পরিচ্ছন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে। ওড়িশা থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা কবিতাপত্র 'মানুষের মুখ' সত্যিই বিরল ব্যতিক্রম। এতে আছে বাংলা ও ওড়িশা—দুই ভাষারই কবিতা। উদ্দেশ্য—উভয় প্রদেশের কবিদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ সহজ করে তোলা। বর্তমান সংখ্যাটিতেও এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের উপর যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের আল মাহমুদ ও মেজবাহউদ্দীন খান এবং পশ্চিমবাংলার মণীন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আশিস সান্যাল, ফণিভূষণ আচার্য, গণেশ বসু, শুভ মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নিশিনাথ সেন প্রমুখ উল্লেখ্য। এছাড়া রয়েছে বাংলাদেশের উপর লেখা ওড়িশার কবি রবি সিং, জগৎ মহাপাত্র, রুক্ষ্মী মোহান্তি প্রমুখের বঙ্গানুবাদ। স্থানীয় বাঙালী কবিদের মধ্যে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমময় দাশগুপ্তের কবিতা দুটি প্রশংসার দাবী রাখে।

লেখা ও রেখা (বৈশাখ-আষাঢ়) সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষর গ্রন্থাগার। শান্তিপুর। দাম একটাকা।

লেখা ও রেখার বর্তমান সংখ্যায় দুটি গবেষণাধর্মী আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সুকান্তের ছড়পত্র'-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে' লিখেছেন তপোবিজয় ঘোষ এবং 'মধ্য যুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান' লিখেছেন সুকুমার মিত্র। আনাতোলি লুনাচারস্কির মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা' আলোচনাটি অনুবাদ করেছেন নিত্যানন্দ ঘোষ। গল্প লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, অমল চক্রবর্তী এবং তারক চন্দ। কবিতা লিখেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্র বসু, [illegible] ঘোষ, রথীন ভৌমিক, রঞ্জিতকুমার সরকার, শ্যামল রায়, প্রণয় ভাদুড়ী, নারায়ণ ঘোষ এবং নন্দ চৌধুরী।

বিচিত্রা [এপ্রিল—জুন ১৯৭১]—সম্পাদক নলিনীকুমার চক্রবর্তী, সুব্রত রাহা ও জীবন ভৌমিক ।। ৪০ শান্তিরাম রাস্তা, বালি, হাওড়া ।। এক টাকা।

এ সংখ্যায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা 'পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে সমাজচিত্র', লিখেছেন শশধর রায়। এবং চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে 'তপন সিংহের চলচ্চিত্র ভাবনা' শীর্ষক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্তের প্রবন্ধটি। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দীপক রুদ্র, সুনীল ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, জীবন ভৌমিক এবং আরো অনেকে। নিখিল বিশ্বাসের একটি স্কেচ ও পূর্ব বাংলার শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি এ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কুশানু (কবিতা সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ১৪ বিবেকানন্দ রোড কলকাতা-৬। এক টাকা।

আটাশজন কবির নিজস্ব ভাব-ভাবনানুসারে রচিত কবিতা সংকলনে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিষ্ণু দে, প্রিয়ংবদা, গণেশ বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ। পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য।

দশদ্যা (প্রথম সংগ্রহ ১৩৭৮)—অমিতাভ বসু। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-১২। পঞ্চাশ পয়সা।

'ঐতিহ্য বিচ্যুত জীবন বিমুখ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে' বিদ্রোহ করে এবং আঘাত হেনে জনজীবন প্রবাহে নবজীবনের ঢল নামাবার দৃঢ় শপথ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় আগাছার ভিড়ের মধ্যে নবজাতক সাহিত্যপত্রে 'দশদ্যা'র উপস্থিতি উৎসাহজনক। কবিতার সংখ্যাই বেশি, গল্পও আছে। উৎপল চক্রবর্তীর : 'ঐতিহ্য : বাংলা সাহিত্য : একটি সমীক্ষা' এবং গৌরীশংকর দেব : 'হায় হায়বৃত্তা' উল্লেখের দাবী রাখে।

ছোটদের কাগজ (১১ বর্ষ : ১ম সংখ্যা ১৩৭৮) সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী। সত্তর পয়সা।

ছোটদের কাগজ ছোটদের জন্যে। বাংলা হিন্দী ও ইংরেজি ভাষার একত্র সমাবেশ দেখে চমক লাগে। অভিনব সত্যিই। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে প্রকাশিত এই সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন অনেক বড়রা—দক্ষিণারঞ্জন বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি গুপ্ত প্রমুখ। ছোটদের লেখাও কিছু কিছু আছে।

বাংলার মুখ (২য় সংকলন '৭১) সম্পাদক : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনের ঠিকানা নেই। পঁচিশ পয়সা।

কিছু নামী আর কিছু অনামী লেখকদের কবিতা সংকলন। কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ প্রমুখ।

সায়ক (জুন-জুলাই '৭১) সম্পাদক : সুদেব সানা। মানিকপুর, হাওড়া। চল্লিশ পয়সা।

বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা। এপার-ওপার বাংলার নামী কবিদের কবিতা সংকলন। উল্লেখ্য হলেন : হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়, শামসুর রাহমান, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ।

প্রাপ্তিস্বীকার

উত্তরীয় (জুলাই '৭১)—সম্পাদক : শ্যামল ধর। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

উষালোক (আষাঢ় '৭৮) সম্পাদক : সমরেন্দ্রকুমার রায়। ইমামবাজার রোড, হুগলী। পনেরো পয়সা।

সবুজ সংকেত (জুন '৭১) সম্পাদক : অশোক ভাদুড়ী, শ্যামল আচার্য। পলাশ খোলা, আদ্রা, পুরুলিয়া।

বনিবৃত্ত (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা '৭৮) সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। গরিফা, হালতু, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

শিল্প সাহিত্য (১০ম সংকলন '৭১) সম্পাদক : সুধাংশু সেন, বিমান চট্টোপাধ্যায় ১।২১ দয়ানন্দ রোড, দুর্গাপুর-৪। কুড়ি পয়সা।

অপূর্ব (ত্রৈমাসিক : ১ম সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ মিশন রোড, বিদ্যাপাড়া, ধুবড়ী, আসাম।

শিশু আলেপন (শ্রাবণ '৭৮) সম্পাদক : সঞ্জিতকুমার সাহা। সরযূপ্রসাদ রোড, মালদহ। পঁচিশ পয়সা।

সোমসপুর পাঠচক্র পত্রিকা (নববর্ষ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনিয়াখালি, হুগলী।

পদক্ষেপ (বর্ষ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদক : গোপাল নাগ। সতীন্দ নন্দী রোড, কাঁচরাপাড়া ২৪ পরগণা। কুড়ি পয়সা।

স্বাধীন (শ্রাবণ '৭৮) সম্পাদক : নারায়ণ চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, দি-৮ হাইড লেন, কলকাতা-১২। পঁচিশ পয়সা।

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

পঞ্চম খণ্ড

(৩)

সারা দেশটাই অরাজক তবে তার মধ্যে যদি তর-তম করতে হয় তবে চর্মণ্বতী ও নর্মদা মধ্যস্থ ভূভাগকে নির্দেশ করতে হয়। এই অঞ্চলের প্রত্যেক লোক ছিনতাই; দুর্বল লোকে শক্তির অভাবে ঠগ ও চোর; প্রবল লোকে লুঠেরা ও ডাকাত. প্রত্যেকটি গ্রাম সমাজবিরোধীদের আড্ডা, প্রত্যেকটি এই সব সমাজবিরোধীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা। আবার দুর্গে দুর্গে বিরোধ ও দাঙ্গা, তখন নিজ নিজ অভিরুচি ও স্বার্থ অনুসারে আশেপাশের লোকেরা যে কোন দিক অবলম্বন করে; স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগলেই দল পরিবর্তন করতে বাধে না। এই ভূভাগে যে সব অরণ্য আছে তার শ্বাপদগণ মানুষের ভয়ে সন্ত্রস্ত। দল-বহির্ভূত সজ্জনগণের পক্ষে প্রাণ বাঁচানো কঠিন, কাজেই প্রাণের দায়ে তারা কোন না কোন দলে যোগদান করতে বাধ্য হয়, শেষে এমন অবস্থা হল যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়. নিরীহ সজ্জন আর থাকলো না। বিদেশী পথিক এদিকে বড় আসে না, ভুলে এসে পড়লে মারা পড়ে। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকটা নিরাপদ. তবে সম্পূর্ণ নয়, জরার প্রতি তাদের ব্যবহারে তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই পথ ধরে জরা চলছে. কারণ অন্য পথ আর নাই—মথুরা থেকে দ্বারকা যাওয়ার এই একমাত্র পথ। জরা শাস্ত্রজ্ঞ হলে 'দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' শাস্ত্রবাক্যের নতুন অর্থ করতে পারতো।

সে যতটা সম্ভব পথ ও পথিক এড়িয়ে চলে, খাদ্য প্রধানতঃ বনফল ও কন্দ,, কখনো গাঁয়ের কাছ দিয়ে যেতে বাধ্য হলে সহৃদয় গৃহস্থ বাজরার রুটি আর চাটনি দেয়. পানীয় নদী বা ঝরণার জল। কোনো কোনো গাঁয়ের লোকে রাতের বেলায় সেখানে আশ্রয় নিতে বলেছে, ক্লান্ত জরার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন. তবু অস্বীকার করেছে, বলেছে তার বড় তাড়া।

পথটা প্রশস্ত যদিচ অনেক কাল মেরামতে যাবে মাঝে ভেঙে গিয়েছে. আর পাঁচ-ছয় ক্রোশ ব্যবধানে পথিকের আশ্রয়ের জন্য চটির চালাঘর। এগুলি এড়িয়ে যেতে বিশেষভাবে যদিদা পরামর্শ দিয়েছিল। আসল কথা রাহী লোকের সংবাদ রাখবার এগুলো ঘাঁটি। পথিক এক চটি থেকে পরবর্তী চটিতে পৌঁছবার আগেই তার খবর পৌঁছে যায়। জরা দু-চারবার লুঠেরার হাতে পড়েছে, তবে তার জীর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ দেখে দাড়ি চুল টানাটানি পরীক্ষা করেই ছেড়ে দিয়েছে। সে দিনের বেলায় পথ চলে, সন্ধ্যা হলে রাজপথ থেকে দূরে কোন গাছতলায় আশ্রয় নেয়। এই ভাবে কালীসিন্ধু নদী পার হয়ে তার মনে হল দ্বারকায় পৌঁছলেও পৌঁছতে পারে। মালব বা মালোয়া একটা মালভূমি কালীসিন্ধু চর্মণ্বতী বা চম্বলের একটি শাখা।

জরা আপনমনে না চললে এতদিনে বুঝতে পারতো তাকে অনুসরণ করে কিছু ব্যবধানে দুজন অশ্বারোহী তার পথে চলছে। ত্রিজনাথ ও ত্রিজপ্রসাদ অচিন্ত্য ব্যক্তি। ইচ্ছা করলে নিঃসঙ্গ জরাকে যে কোন মুহূর্তে হত্যা করে রত্ন উদ্ধার করতে পারতো। কিন্তু এ কাজের বাধা তাদের অভিজ্ঞতা। তারা জানে একটা রাণ-জানি হওয়া মাত্র চারদিকে লোক ছুটে যাবে তখন লুটের মাল বেহাত হতে কতক্ষণ। পূর্বতন অভিজ্ঞতার ফলে তারা জানে যে আপাতদর্শনে জনামাটি শূন্য নয় সজ্জন-অসজ্জন নানাস্থানে লোক ওত পেতে আছে, শিকারের গন্ধ পেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই সতর্কতা আবশ্যক। দিবা-রাত্রি জরাকে তারা চোখে চোখে রেখে অনুসরণ করছে।

কদিন পরে ভোরবেলায় তারা লক্ষ্য করলো জরার একজন সহযাত্রী জুটে গিয়েছে, তারও সন্ন্যাসীর বেশ।

ত্রিজনাথ বলল, ভাই একি হল, একটি ছিল দুটি হল যে।

ত্রিজপ্রসাদ বলল, তাই তো দেখছি। আশঙ্কা হচ্ছে ও বেটাও আমাদের মতোই শিকার সন্ধানে আছে।

সন্ন্যাসীর বেশ যে।

ভাই ত্রিজপ্রসাদ, একবার ভেবে দেখো তো কতবার ঐ বেশে আমরা কার্যসিদ্ধি করেছি।

তা বটে, কিন্তু আরও যদি সঙ্গী জুটে যায় তবে যে শিকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

দেখাই যাক না কতদূর কি হয়, বলে ত্রিজনাথ। মথুরাপ্রসাদজীর মুখে শোনোনি ক্ষাত্র ধর্ম বিধিমতে, কোপ বুঝে কোপ।

জরাকে চোখ ছাড়া না করে ওরা এক জায়গায় আহার ও বিশ্রাম করে নিল।

একদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে জরা দেখল যে অদূরে রাজপথের পাশে একটি চটি। পানীয় জলের সন্ধানে সেখানে পৌঁছলে একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল, বলল, সন্ন্যাসীজী, প্রণাম।

সেই ব্যক্তি সসঙ্কোচে বলে উঠল, সাধুজী, আমি সন্ন্যাসী নই।

জরা শুধালো তবে চুল দাড়ি বেশ সন্ন্যাসীর মতো কেন?

সেই লোকটি হেসে উত্তর দিল, সাধুজী, এ কি অন্যায় কথা হল। চুল দাড়ি সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই গজায় পথ [illegible] ওসব কোন নেই। আর দেখ, ভেক না হলে কি ভিক্ষা মেলে। সাধুজী, আমি গৃহী।

CENTRAL LIBRARY

জরা বলে উঠল, আমাকে যেন বাবা সাধু বলবেন না, আমি ঘোর পাপী, মহা-পাপী, আমি যদি সাধু হই তবে অসাধু কে?

আচ্ছা সাধু না হয় নাই বললাম, বাবা বলতে নিশ্চয় দোষ নাই—যদিচ আপনার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম।

তাহলে তো আপনি বলাও চলে না, আমাকে তুমি বলবেন এই আমার আকিঞ্চন।

বেশ তাই বলবো, 'আপনি' হল শিষ্টতা, 'তুমি' আত্মীয়তা। তা কোথায় চলেছ বাবা?

জরা বলে, পাপমুখে কেমন করে বলবো।

প্রশ্নকর্তা হেসে উঠে বলে, বা, বা উত্তরটা তো সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হল।

আপনি কোথায় চলেছেন।

আপাততঃ অমরকন্টকে, সামনেই, আর সামান্য কদিনের পথ।

জরা হতাশভাবে বলে, আমার যে সম্মুখে এখনো অনেক পথ।

সে তো আনন্দের কথা বাবা, পথ চলার মতো এমন আনন্দ আর আছে কি!

পথে যে চোর ডাকু রাহাজানের দল।

আজ ওরা কোথায় নেই বাবা। তবে ওরা আমাদের নেবে কি? তোমার গলায় ঐ জপের মালার থলি, আর আমার গলায় থলিতে শালগ্রামশিলা।

জরা বলে আপনাকে যদি ঠাকুর বলি।

খুব ভালো, ঠাকুর বলো, প্রভু বলো, বাবাজী বলো আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

তবে তাই হোক। দুঃখের কথা আর কি বলবো। এর মধ্যে তিন-চারবার আমার দাড়ি চুল টেনে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

সাজা সন্ন্যাসী কিনা মনে করতো।

হাঁ, ঠাকুর কি করে জানলেন।

আমার উপর দিয়েও যে পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, বাবাসব, চুল দাড়ির উপরে আমার মমতা নাই, একখানা ক্ষুর দাও কেটে দিচ্ছি। তাই শুনে ওরা বলে কি জানো?

কি বলে ঠাকুর?

আমরা কি নাপিত?

আমি বললাম, রাম রাম, নাপিতে চুল দাড়ি দেখেই বুঝতে পারে, টেনে পরীক্ষা করতে হয় না তাদের। তোমার গলায় থলিতে কি? শালগ্রামশিলা। বললাম, মানলে শালগ্রাম, না মানলে পাথর। তাই না শুনে ওরা বলে ওঠে চল্ চল্ সময় যাচ্ছে। এ বেটা আসল সন্ন্যাসী। আমি বললাম, বাবারা, এবার ঠকলে আমি সন্ন্যাসী নই গৃহী। শুনে ওরা বলে গৃহী তো গৃহ কোথায়? আমি বলি, আমি তো শামুক নই যে গৃহটা পিঠে করে বেড়াবো। আমার কথা শুনে ওরা এতই বিরক্ত হয় যে আর দ্বিরুক্তি না করে চলে যায়।

জরা বলে, ঠাকুর, তোমাকে সঙ্গী পেয়ে মনের বল বাড়লো।

শুধু মনের বল বাড়লেই তো চলবে না, দেহের বল বাড়াও আবশ্যক। এই নাও দুটি আর চাটনি, আর—ঐ দেখো ঝরনাতে জল।

তখন দুজন একত্র বসে পানাহার সমাধা করলো। ঠিক সেই সময়ে ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ অদূরে গাছতলায় বসে আহার ও বিশ্রাম করছিল। অশ্বের হুঁস থাকলে লক্ষ্য করতো তাদের কিছু পিছনে আর একজন ঘোড়সোয়ার গাছের আড়ালে বিশ্রাম করছে, পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াটা।

এই মানুষটিকে ভালো লেগে গিয়েছে জরার। সাধু কিন্তু ভেক বা ভড়ং নেই, গভীর কথা যে হেসে বলা যায় গাম্ভীর্যের প্রয়োজন হয় না এই প্রথম দেখলো; দেশে-বিদেশে ঘুরেছে লক্ষ্য করেছে সাধুরা হাসা-বিমুখ, কদাচিৎ মাঝে মাঝে হাসতো বটে কিন্তু সে হাসি যেন কয়াতের শব্দ, গা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, কাটলো বুঝি। সে ভাবলো যতটা পথ পাওয়া যায় এর সঙ্গে যাওয়া যাক।

দুজনে পাশাপাশি পথ চলছে, শাল মহুয়ার পথ, দুদিকে প্রবীণ গাছের সার, রোদ্দুরের তাত বাঁচিয়ে চলতে কষ্ট হয় না। জরা বলল, ঠাকুর, আমি বড় পাপী, মহাপাতকী।

ঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিল, কে নয়?

জরা বলে, আমার মতো কেউ নয়।

ওতেই তো তুমি বেঁচে গিয়েছ বাবা।

কেন ঠাকুর।

মানুষে নিজের পাপকে লঘু করে দেখে কিম্বা তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে হাল্কা মনে করে।

আমি যে পাপের ভারে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছি। আজ দশ বছর হল, ঠাকুর, পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে অরণ্যে কি করে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সন্ধান করে ফিরছি। কত সাধুসন্ন্যাসী যোগী তপস্বীর সঙ্গে দেখা হল তারা আমার প্রশ্ন শুনে শাস্ত্র আওড়ায়। কিন্তু বাবা ছবিতে জল দেখে তো তৃষ্ণা মেটে না। এদিকে যে সন্ধ্যা হয়ে এল।

ঠাকুর বলে, তবে তোমার মুক্তিও আসন্ন।

সে কি মৃত্যুর পরে।

পরে কেন আগেই।

কিছু যে বুঝতে পারছি নে বাবা।

তবে বুঝিয়ে দি। নদীতে মাঝি খেয়া পারাপার করে দেখেছ তো।

—মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জরা।

মাঝি ঘর থেকে ঘাটে আসবার সময়ে শিশুপুত্রটিকে নিয়ে আসে, তাকে একটা-কিছু খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখে, বলে, বাবা বসে বসে খেলো, এদিক-ওদিক যেও না। তারপরে সারাদিন ধরে খেয়ার লোক পারাপার করে, কত গাঁয়ের কত লোক এপার ওপার হচ্ছে। মাঝে মাঝে মাঝি তাকিয়ে দেখে ছেলেটা কি করছে। হাঁ, ও ঠিক জায়গায় বসে আছে, আপনমনে খেলছে। তারপরে যখন বেলা পড়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, পারাপার হওয়ার লোক আর থাকে না, তখন শেষ খেয়ায় ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে ঘাট-মাঝি। আপন লোক কিনা তাই তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে। বুঝলে না বাবা, তুমি তাঁর আপন লোক তাই তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছেন। এমন সৌভাগ্য কজনের ঘটে।

জরা নিরক্ষর হলেও বোঝে এ শাস্ত্র-বচন নয় জীবনের অভিজ্ঞতা। সে তাহলে ভগবানের আপন লোক, তাই পার হতে দেরী হচ্ছে, কেউ এমন করে তো বোঝায়নি। সে প্রশ্ন করে, ঠাকুর, নিজের চেষ্টায় কি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

ঠাকুর বলে, যায় আবার যায় না।

সে কি রকম ঠাকুর?

বাবা, তোমার আমার এমন কি সাধ্য যে পাপের ভার থেকে মুক্তি লাভ করি, তবে চেষ্টা করতে পারি এই পর্যন্ত। আমরা চেষ্টা করি আর তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন। যখন টের পান যে লোকটা প্রাণপণ করছে তবু পেরে উঠছে না তখন তিনি এগিয়ে এসে খানিকটা ভার ঠেলে ফেলে দিয়ে বোঝাটা অনেকখানি হাল্কা করে দেন, তাতেই তো মুক্তি সম্ভব হয়।

এসব কথাও জরার কাছে নূতন।

ঠাকুর আবার বলতে থাকে, তোমার আর্তি দেখে বুঝতে পারছি এবারে তাঁর আসন টলেছে, তোমার ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

আর্তভাবে জরা শুধায়, কবে এসে পৌঁছবেন তিনি।

ঠাকুর হেসে বলে, ফিরে গেলে বোঝা যায় যে তিনি এসেছিলেন।

আর তো অপেক্ষা করতে পারিনে বাবা।

তবে নিশ্চয় জেনো তিনিও আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

সকলের বেলাতেই কি তাঁর এই রকম দয়া।

তবে কি শুধু তোমার বেলায়? বাবা, মানুষের কাছে আমি তুমি, সে আছে, তাঁর কাছে, সবাই সে। সকলকে পার করে না দেওয়া পর্যন্ত যে তাঁর ছুটি নেই।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরে তাদের পথ অতিক্রান্ত হয়। পদাতিক, সোয়ার, শিবিকা-রোহী, সম্পন্ন ভিখারী পথিকের আর অন্ত নাই। এ অঞ্চলের দিগন্ত অবারিত, পাহাড় বা অরণ্য কোথাও বাধা সৃষ্টি করেনি। মাঝে মাঝে ছোট-বড় চটি। চলবার মুখে আবার প্রশ্ন জাগে জরার মুখে, ঠাকুর, আপনি তো গৃহী, তাহলে আপনার গৃহ আছে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, গৃহ আছে, গৃহিণী আছে, প্রতিপাল্য আছে।

জরা শুধায়, ছেলেমেয়ে?

কারো ছেলেমেয়ে নিশ্চয়।

তার মানে কুড়িয়ে আনা?

হাঁ গো হাঁ, পথ থেকে কুড়িয়ে আনা, তিনটে খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা, দুটো ছাগল, কয়েকটা ময়না আর শুকপাখী।

বিস্মিত জরা বলে ওঠে, এদের নিয়ে আপনার সংসার।

তা বইকি। এদের মায়া কি ছেলেমেয়েদের চাইতে কম। ছেলেমেয়েদের একটু বয়স হলেই তাদের ভাষা বুঝতে পারা যায়, এরা যে চির-অবোলা।

তবে এদের মনের কথা বোঝেন কি ভাবে?

ভালোবাসা দিয়ে। বিধাতা ভাষা সৃষ্টি করবার আগে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে ঠাকুর এরাই আপনাকে মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে।

আমিও বেঁধেছি তাদের, ছাড়া থাকে অথচ একটাও পালায় না।

শুকপাখী তো পোষ মানে না ঠাকুর।

খাঁচায় রাখে বলে পোষ মানে না, ছাড়া থাকলে আর পালাবে কেন?

এতগুলো পশুপাখীতে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে না।

বাধে বইকি বাবা, মানুষের সঙ্গ যে পেয়েছে—বলে তিনি হেসে ওঠেন, জয়াও হাসতে থাকে।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা আজ এই হাট-তলাতে রাত্রিযাপন করা যাক।

বিপদ-আপদ!

চটি হ'লে বিপদ-আপদের আশঙ্কা ছিল বটে। কিন্তু এ পোড়ো হাটতলায় কে আসতে যাবে। সপ্তাহান্তে একবার লোকের ভিড় হয় তারপরে চারচালা-গুলো শূন্য পড়ে থাকে। চোর ডাকুতে আস্তানা হানা দিয়ে শক্তি অপব্যয় করে না।

কাজেই দুজনে সেখানে বিশ্রামের আয়োজন করলো, তার আগে ঠাকুর তল্পি থেকে বার করলো খানকতক চাপাটি ও আচার, ইঁদারায় জল ছিল।

ঠাকুর বলল, দেখো আমি গৃহী কিনা, অন্ততঃ দুদিনের খাদ্য সঙ্গে না নিয়ে পথ চলি না।

আহারান্তে যখন দুজন একখানি চালাঘরের মধ্যে পাশাপাশি শয়ন করলো, বাইরে তখন পূর্ণিমার আলোয় দিগ-বিদিকের কানাটি অবধি পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর একবিন্দু বেশি হলে যেন উপচে পড়বে।

ঠাকুর স্নেহের সুরে বলল, নাও, বাবা নির্ভয়ে ঘুমোও। তারপরেই হেসে উঠে বললেন, 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে' মহাজন বাক্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আজ আমরা দুজনে।

ঠাকুর যখন জয়াকে অভয় দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হাটতলার অদূরে বট-গাছের ছায়ার আড়ালে দুজন অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল। আর তারও কিছু দূরে শাদা পথের ধুলোয় অঙ্কিত হয়েছিল তৃতীয় একজন অশ্বারোহীর ছায়ামূর্তি।

(৪)

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ত্রিজনাথ ও ত্রিজপ্রসাদ গাছের ডালে ঘোড়াদুটোকে বেঁধে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই চালাঘরের দিকে। সকাল থেকে লক্ষ্য করেছে তাদের শিকারের সঙ্গে আর একজন সন্ন্যাসী এসে জুটেছে, তাই তারা স্থির করেছিল আজকেই কাজ সমাধা করতে হবে, আরও সন্ন্যাসী জুটে যেতে কতক্ষণ, সংখ্যায় বেশি হলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সন্ন্যাসীরা নিরস্ত্র, নিরস্ত্র তবে সবল। কাজেই ঘুমের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করাই নিরাপদ। মথুরাপ্রসাদের নির্দেশ ছিল, পারতপক্ষে প্রাণে মেরো না, তবে যদি বলপ্রয়োগ করে যাবে তোমরাও করবে, মারা পড়লে তোমাদের উপরে সাধুহত্যার দায় বর্তাবে না।

দুজনে নিঃশব্দে কুটীরের পাশে এসে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনলো কেউ কথা বলছে না, তারপরে নাসিকাধ্বনি শুনে নিশ্চিন্ত হল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তখন ত্রিজনাথ ইসারায় ত্রিজপ্রসাদকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকলো। বাইরে যেমন আলো ভিতরে তেমনি

শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি....

শারদ ঊষার প্রথম লগ্নে দেবী দুর্গার অকাল বোধন। একাগ্রচিত্তে মহামায়া আদ্যাশক্তির বন্দনা, স্তুতিগান ও তাঁর কাছে আকুল প্রার্থনা।

পলিডর এল-পি রেকর্ডে শ্রীশ্রী চণ্ডী পাঠ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পলিডর শারদ অর্ঘ্যে আরও পাবেন শ্রীসনৎ সিংহ, শ্রীমতী রূপমালা ঘোষ, শ্রীমতী কুমকুম চ্যাটার্জী, শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী গাঙ্গুলীর মনমাতানো আধুনিক গান। প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে গেয়েছেন শ্রীমানস মুখার্জি। শ্রীবটুক নন্দী ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন চারটি দেশাত্মবোধক গান। নিকটস্থ ডীলারের সহিত যোগাযোগ করুন।

পলিডর রেকর্ড polydor পলিডর রেকর্ড

পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক:

দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • পাটনা • জব্বলপুর • কটক • গৌহাটী

BEEVAS/DPL/12

CENTRAL LIBRARY

অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে তার চোখ অভ্যস্ত হতেই বুঝতে পারলো পাশাপাশি সন্ন্যাসীদ্বয় মাটিতে শয়ান। সন্ধ্যাবেলাই সে লক্ষ্য করেছিল মহারত্নটি (প্রভু সেই রকম জানিয়েছিল) একটি থলিতে সন্ন্যাসীর গলায় ঝোলানো। গলায় সেই সুতোটি কাটবার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি সঙ্গে এনেছিল। এখন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। এবারে সে মস্ত একটা ভুল করে বসলো যে-কেউ করতো। জরার গলার থলিটি কাটতে গিয়ে অপর সন্ন্যাসীটির গলার থলি কাটলো। পাশাপাশি দুজনে শয়ান। দুজনের দীর্ঘ চুলদাড়ি, তার উপরে ঘোর অন্ধকার, কাজেই এমন ভুল খুবই স্বাভাবিক। থলিটি হাতে ধরে দেখল বেশ ভারি। বুঝলো ধনী বণিক মথুরাপ্রসাদের লোভ শুধু বস্তুতে হতে যাবে কেন! বাইরে এসে অপেক্ষমান ব্রিজপ্রসাদকে ইসারায় জানালো কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। তখন দুজনে পূর্ববৎ নিঃশব্দে সেই বটগাছটির দিকে চলল, ঘোড়ায় চড়ে মথুরায় ফিরতে হবে।

সেই কুটীর থেকে গাছটি খুব বেশি দূর তো দু' রসি। এইটুকু পথ যেতে যেতেই ব্রিজনাথের মনস্তত্ত্বে বিপ্লব ঘটে গেল আর তার কর্তা স্বয়ং শয়তান। শয়তানের মনোরথ গতি। সে ভাবলো এই অমূল্য দ্রব্য হরণ করাতে পাপটা তার হ'ল আর সুফল ভোগ করবে মথুরাপ্রসাদ—এ হচ্ছে নৈতিক অবিচার। প্রভু তাকে বড়জোর পঞ্চাশ কি একশ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে। বড়ই দিক তাতে আবার সমান সমান ভাগাভাগি হবে ব্রিজপ্রসাদের সঙ্গে। ব্রিজপ্রসাদ কি করেছে, আর প্রভু তো কিছুই করেনি, মথুরার প্রাসাদে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার মনে হ'ল পাপ যখন তার সুফলটাও তার হওয়া উচিত। প্রয়োজন হ'লে নিরীহ সন্ন্যাসীকে প্রাণে মারতে হ'তো, সে-পাপটা আগাম চাপিয়ে নিল নিজের ঘাড়ে। পাপ যখন করেছেই, তখন সুফলটাও তার পাওয়া উচিত। না, এটা কিছুতেই প্রভুর হাতে তুলে দেবে না। এমন কাজ করতে হ'লে ভাগ দিতে হয় ব্রিজপ্রসাদকে। কিন্তু তাতে অনেক বাধা, সে-বেটা রাজি হবে কিনা কে জানে, তার উপরে লুঠের মাল ভাগাভাগি নিয়ে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয় তার ফলে জানাজানি হয়ে যায়। আগে খুশী না হ'লে সে জানিয়ে দিতে পারে প্রভুকে। তখন! আর তাছাড়া ব্রিজপ্রসাদ তো একরকম কিছুই করেনি, চুরি করেছে সে প্রয়োজন হ'লে সন্ন্যাসী হত্যা করতো সে সে-পাপের ভাগ কি ব্রিজপ্রসাদ নিতো। তবে রত্নের ভাগই বা পাবে কেন? কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়ার কি উপায়! তখন শয়তানের কটাক্ষে আর এক বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল তার মস্তিষ্কে। সে হাত দিয়ে অনুভব করলো অসিখানা যথাস্থানে আছে।

মণি মাণিক্য হীরা পান্না চুনি মরকত সমস্তই প্রস্তরবিশেষ। পথের ঐ উপলখণ্ডের সঙ্গে তাদের প্রভেদ মনস্তত্ত্বগত বই নয়। এসব না লাগে গ্রাসাচ্ছাদনে, না লাগে আশ্রয় নির্মাণে। তবু এইসব বিচিত্র উপল প্রাপ্তির আশায় মানুষ কি পাপ, কি পণ্ডশ্রম না করে। অন্নপানীয় বিধাতার সৃষ্টি, মণিমাণিক্য সৃষ্টি শয়তানের। শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে শয়তানেরই ইঙ্গিত। এক্ষেত্রেও তারই জয় হ'ল। ব্রিজপ্রসাদ ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে ঘোড়ায় চাপতে যাবে সেই অসতর্ক মুহূর্তে ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্রিজনাথ অসি নিষ্কাশিত ক'রে তার মুণ্ড দেহচ্যুত ক'রে ফেলল, আর তারপরেই নিজের ঘোড়ায় চড়ে সবেগে ছুটলো মথুরার বিপরীত দিকে। সে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল কেউ অনুসরণ করছে না, কে আর করবে, একমাত্র যে-ব্যক্তি করতে পারতো তার দেহ দ্বিখণ্ডিত। তবু আশঙ্কা! একেই বুঝি ভূতের ভয় বলে।

শিক্ষিত ঘোড়া সবেগে ছুটেছে। সাদা ধুলোর পথের উপরে ছায়াতরুর সমান্তরাল কালো কালো ডোরাকাটা। ব্রিজনাথ হঠাৎ মনে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করলো। সে কি উল্কার গতির প্রেরণায়। না, সুনিশ্চিতভাবে সম্পন্ন পাপের কৃতিত্বে, কিম্বা ভাবী ঐশ্বর্যের মরীচিকার প্রলোভনে। পাপের প্রারম্ভে বড় সুখ।

হঠাৎ তার মনে হ'ল পিছনে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। তখনি বুঝলো এ তারই ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন স্পষ্টতর নিকটতর হচ্ছে। সত্য কি প্রতিধ্বনি পরীক্ষা করবার আশায় ঘোড়া থামালো, না শব্দ তো থামলো না। ধ্বনি নাই প্রতিধ্বনি আছে এমন তো হয় না। তখন পিছনে তাকিয়ে দেখল দূরে পথের সাদার পটে ধাবমান একটি কালো বস্তু। তখনি দ্বিগুণ বেগে হাঁকিয়ে দিল নিজের অশ্ব। কেউ কি তাকে অনুসরণ করছে কিম্বা নিজ প্রয়োজনে ধাবমান অশ্বারোহী। যেমনি হোক এত রাত্রের এমন শ্বাসের অশ্বারোহীকে বিশ্বাস কি! অশ্ব তীব্রবেগে সামনে ছুটেছে, মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে অনুসরণকারীর ব্যবধান লক্ষ্য করছে ব্রিজনাথ।

ছদ্মবেশী মথুরাপ্রসাদ প্রচ্ছন্নভাবে অনুচরদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল—এ-সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। সে দেখল দুজনে ঘোড়া বেঁধে রেখে কুটীরের দিকে অগ্রসর হ'ল; লক্ষ্য করলো তারপরে দুজনে গাছতলায় ফিরে এলো, লক্ষ্য করলো দুজনের বদলে একজনমাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তাও কিনা আবার উল্টো দিকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কি হ'ল? মথুরার বিপরীতে ঘোড়া ছুটলো কেন অপর ব্যক্তির। তখন মথুরাপ্রসাদ বটগাছতলায় এসে দেখতে পেলো একটি দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ। মরলো কে? তখনি বায়ুর আন্দোলনে পল্লব সরে গিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে প্রমাণ করে দিল মৃত ব্যক্তি ব্রিজপ্রসাদ। মথুরাপ্রসাদ দুর্নিবার পাপী, কাজেই এক লহমায় ঘটনার প্রকৃতি বুঝে নিল। রত্ন উদ্ধার ক'রে, ব্রিজপ্রসাদকে মেরে ফেলে বেপাত্তা হওয়ার চেষ্টায় আছে ব্রিজনাথ। সে ভাবলো বেটা শয়তান। শয়তান না হোক শয়তানের অনুচর নিঃসন্দেহ। সে তুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ব্রিজনাথের অনুসরণে। মথুরাপ্রসাদ সুদক্ষ অশ্বারোহী, অশ্ব সুশিক্ষিত।

দুটি অশ্বই শিক্ষিত, অশ্বারোহী দুজনেই শিক্ষিত, লক্ষ্যবেগে তারা ছুটেছে, একজন লোভে, একজন ব্যর্থলোভের প্রতিহিংসায়। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সাদা পথের উপরে ছায়ার ডোরাকাটাগুলি দ্রুততর এসে পড়ছে, দেখে এমন মনে হয় যে, সমস্ত পথটাই ডোরাময়, আবার এমন মনে হয় যে সমস্ত পথটাই সাদা। পলায়নকারী ও অনুসরণকারীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই ক্ষীয়মান। রাত্রি নিশুতি, নিস্তব্ধ, কেবল আটটি ধাবমান ক্ষুরের একটি শব্দ, একটি তবে আটগুণ প্রবল।

ব্রিজনাথ দেখল অনুসরণকারী যে-ই হোক তার লোভটা ঐ রত্নটির প্রতি, সেটি পেলে নিশ্চয় ফিরে যাবে। তাই সেই থলিটি নিক্ষেপ করলো, কিন্তু তা চোখে পড়লো না মথুরাপ্রসাদের, তার চোখ বিশ্বাসঘাতক অনুচরের দিকে নিবদ্ধ। মুহূর্ত পরে দুজনে কাছাকাছি এসে পড়লো, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল ব্রিজনাথ, চিনতে পারলো না ছদ্মবেশী প্রভুকে, তাকে দূর থেকে বিদ্ধ করবার ইচ্ছা, বল্লম ঋজুভাবে ধরলো। ঝোঁক সামলাতে পারলো না, বল্লমের উপরে এসে পড়লো, বুকে পিঠে বিদ্ধ হয়ে গেল, বল্লম এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'ল, দুজনের ব্যবধান গেল কমে, ঘোড়া থেকে টলে পড়বার আগে তলোয়ারের এক কোপে ব্রিজনাথকে নিহত করলো মথুরাপ্রসাদ। প্রভু-ভৃত্য এক শয্যায় হ'ল শয়ান।

(৫)

ব্রাহ্মমুহূর্তে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে সন্ন্যাসীঠাকুর শয্যাত্যাগ করলো, সেই মুহূর্তে জরাও উঠে বসলো। জরা তার বুকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ঠাকুর, তোমার শালগ্রামশিলা গেল কোথায়?

ঠাকুর চমকে বুকের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তো, থলিটা নেই, সুতোর আধখানা ঝুলছে। মনে হচ্ছে রাতের বেলায় কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। যাক, তোমার জপের থলি দেখছি যথাস্থানে আছে।

জরার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে-ই কেটে নিক তার লক্ষ্য ছিল জরার থলিটা অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে কেটে নিয়ে গিয়েছে ঠাকুরের শালগ্রামশিলার থলি। সে আরও বুঝলো যে কেটেছে সে জানে কি অমূল্য রত্ন রয়েছে জরার থলিতে। কে সে? কি ক'রে জানলো সে?

ঠাকুর বলল, বাবা, আর চিন্তা ক'রে লাভ নেই, যে নিয়েছে সে পাথরের টুকরো মাত্র নিয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি কি

হঠাৎ এমন কোন চক্র কোথা থেকে এলো? যার লোভ আমার শালগ্রামটির উপরে।

জবার কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাই তার বক্তব্য কিছু ছিল না। সে অনেকবার ভেবেছে ঠাকুরকে তার পাপের প্রকৃতি স্মরণে, কিছু ভূমিকাও করেছিল, ঠাকুর উৎসাহ দেয়নি।

জবা বলেছিল, ঠাকুর, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আপনাকে সব কথা খুলে বললে মনের ভার লঘু হবে।

ঠাকুর বলেছিল, বাবা, মানুষের সাধ্য কি পাপের ভার লাঘব করে। তা পারেন একমাত্র অন্তর্যামী। তাকে বলো আর নাই বলো তিনি তো সমস্তই অবগত আছেন। বাবা, দুঃখের কথায় কি ভার কমে?

জবা শুধায়, তবে?

ঠাকুর বলে, মনের বন্যায়। মন তোমার তীর কানে কানে নিত্যনিয়ত বলে চলেছে আজ দশ বছর ধরে।

জবা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ঠাকুর বলে, চলো বাবা আর বসে থেকে লাভ নেই, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে যাত্রা করা যাক।

কিন্তু ঠাকুর, আপনার নিত্যপূজার শিলা!

আবার মিলবে। আমি তো যাচ্ছি নর্মদা নদীর উৎস অমরকণ্টক তীর্থে, সেখানকার নদী-গর্ভে শালগ্রামশিলা পাওয়া যায়, এটিও ছিল সেখান থেকে পাওয়া।

এমন সময়ে ঠাকুরের মনে পড়ে যায় কাল রাতের ঘুমের মধ্যে ঘোড়ার দড়বড়ি যেন একবার কানে এসেছিল, তবে সেটা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা না বাস্তব ঘটনা বুঝতে পারেনি। এখন মনে হ'ল ঐ ঘোড়ার খুরের শব্দের সঙ্গে যেন শালগ্রাম খোয়া যাওয়ার যোগাযোগ আছে। কিন্তু শালগ্রামের প্রতি ঘোড়সোয়ারের লোভ কেন? হ'ত মণিমাণিক্য বোঝা যেতো।

শেষের শব্দকটি হয়তো উচ্চারিত হ'য়ে থাকবে, জবা চমকে ওঠে। ঠাকুর কি তবে কিছু সন্দেহ করেছে নাকি।

তবু সন্দেহ নিরসন করে দিয়ে ঠাকুর বলে, এমন নির্বোধ লোকও তবে সংসারে আছে যে নাকি সন্ন্যাসীর ঝুলিতে রাজার ঐশ্বর্য কল্পনা করে।

দুজনে পথে বের হয়ে পড়েছে। ঠাকুর বলে, বাবা, মনে হচ্ছে আগামীকাল সন্ধ্যাতক অবন্তীনগরীতে গিয়ে পৌঁছবো। সেখানে মহাকালেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে অমরকণ্টকের দিকে চলে যাবো, তুমি যাবে তোমার পথে।

জবা বলে, ঠাকুর এদিকের পথঘাট দেখছি আপনার জানা।

কি মুস্কিল জানা হবে না। আমি যে বছরে ছমাস ঘুরে বেড়াই।

জবা শুধায়, তীর্থ দর্শনে?

প্রকাশ্যে তাই, মনের কথা জানেন মনের মালিক।

ঠাকুর, বিদায় নেবার আগে বলে যান আমার মুক্তি কি হবে না? কি উপায়ে হবে ঠাকুর? আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই জপ-তপ ধ্যানধারণা কিছুই জানি না। আজ দশ বৎসর বাণ খাওয়া হরিণের মতো পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে জনপদে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, হেন তীর্থ নাই যেখানে না গিয়েছি, কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীকে শুধিয়েছি কই কেউ তো সন্ধান দিতে পারলো না, সবাই বলে হাত জোড় এগিয়ে দেখো, আর কোথাও যাও, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করো।

তারপরে অত্যন্ত নৈরাশ্যময় কাতরস্বরে বলে, আর কতদূর এগোব বাবা, আর কোথায় যাবো আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো। আপনাকে পেয়ে মনে বল লাভ করেছিলাম, আপনিও ছেড়ে চললেন।

তার আর্ত দর্শনে মনে ব্যথা পায় সন্ন্যাসী, বলে, বাবা, তোমার এত দুঃখ এত অনুতাপেও যদি তাঁর আসন না টলে তবে তাঁর দয়াময় নাম যে বৃথা হবে। এমন হতেই পারে না। তুমি যেখানে চলেছ যাও তোমার মনস্কামনা সেখানেই পূর্ণ হবে।

ঠাকুর পূর্ণাবতার কে? শুনেছি একমাত্র তিনিই আমার গতি করে দিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গ আর গড়াতে পারলো না, হঠাৎ দুজনে দেখতে পেলো পথের মধ্যে ঠাকুরের অপহৃত সেই থলিটা। ঠাকুর তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল শালগ্রাম যথাস্থানে আছেন, মাথায় ঠেকালো। তারপর বলল, কেউ মণি-মাণিক্য মনে করে সংগ্রহ করেছিল তারপর পাথরের নুড়ি দেখে ফেলে গিয়েছে।

বল্লেন কি ঠাকুর, শালগ্রাম পাথরের নুড়ি।

যে মানে না তার কাছে নুড়ি ছাড়া আর কি?

ঠাকুর পুনরায় মাথায় ঠেকিয়ে আবার ঝুলিয়ে নিল গলায়।

আর কিছু দূর অগ্রসর হতেই তারা দেখতে পেলো দুটো মৃতদেহ লুটোচ্ছে পথের উপরে। দুজনেই তাদের অপরিচিত।

এরা কারা ঠাকুর?

আপাতত দুটি মৃতদেহ।

এখানে মরে পড়ে আছে কেন ঠাকুর?

বাবা, তোমার প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে আজকাল ঘরের চেয়ে পথেই লোক মরছে বেশি।

কেন?

কেন কি, অরাজকতার ঐ নিয়ম। সমাজ যখন সুস্থ থাকে তখন মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যথাকালে ঘরে মারা পড়ে। অসুস্থ সমাজে মানুষ ঘরে ফিরবার অবকাশ পায় না, কেউ মরে পথে, কেউ ঘরের দরজায়।

জবা শুধায়, দেশের অবস্থার কি উন্নতি হবে না?

দেশ যদি উন্নতি না চায় তবে কি করে হবে?

এমন অরাজকতা কি কারো কাম্য?

অবশ্যই, নতুবা এমন হবে কেন?

কিন্তু কেন কাম্য সেটা তো বুঝতে পারছি না।

তার মানে তুমি অরাজকতা চাও না।

ঠাকুর, আমার মতো লোক হাজার হাজার আছে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ আছে।

তবে?

শান্তিপ্রিয় লোকেরা, সংঘবদ্ধ নয়, অন্যপক্ষে অরাজকতাকামীরা সংঘবদ্ধ, তাই সংখ্যাধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা নির্যাতিত। তারা ভাবে আমি তো প্রাণ বাঁচাই। আর তাছাড়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তারা জানে না যে রাজা নেই কিম্বা রাজা অসহায়।

রাজা না থাক দলপতি আছে তো।

দলের জন্য আছে, তোমার আমার জন্যে নয়। কিম্বা বলা উচিত দলপতি থেকেও নাই।

সে আবার কেমন?

গোড়ায় দলের লোক দলপতির শাসনে থাকে, কিন্তু যখনি বুঝতে পারে তাদের শক্তিতেই দলপতি শক্তিমান তখন দলপতির শাসনের বাইরে চলে যায়। তখন দলপতি হয়ে পড়ে দলাধীন। দলের লোক যা খুশী করে, দলপতি হাঁ, হাঁ, বেশ করেছ বলে, নইলে নামের কর্তৃত্বও যে থাকে না। ঐ দেখো একটা সাজ পরানো ঘোড়া, মনে হচ্ছে ঐ মড়ার লোক দুটোর কারো হবে।

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে অরাজকতার শত শত চিহ্ন দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে চলে।

ঐ দেখো বাবা পথের ডানদিকে একটা দগ্ধ গ্রাম।

আগুন লেগেছিল মনে হচ্ছে।

তার চেয়ে বলো আগুন লাগিয়েছিল।

কেন? কারা?

এখনো এরকম প্রশ্ন করছো। এগিয়ে চলো আরও দেখতে পাবে।

আবার ঐ দেখো এক পাল উট নিয়ে চলেছে জনদুই লোক।

ফিরেছে নিশ্চয়।

– না। আজকাল কেনাবেচা উঠে গিয়েছে, তার বদলে লুটপাট। পা চালিয়ে চলো বাবা, নইলে কালকে অবন্তীতে পৌঁছতে পারবো না।

দুজনে দ্রুততর চলতে থাকে।

পরদিন অবন্তীনগরে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল, আরও আগে পৌঁছবার কথা, কিন্তু মাঝপথে দু জায়গায় দাঙ্গা চলছিল বলে ঘুরে আসতে হয়েছে। অবন্তীনগরে সিংহদ্বার সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যায়, ঠাকুরের মনে ভয় ছিল পাছে রাতটা বাইরে কাটাতে হয় কিন্তু এসে দেখল খোলা দরজা হা-হা করছে দ্বারী বা শান্ত্রী কেউ নেই। ভিতরে ঢুকতেই জরা বাধা পেয়ে হোঁচোট খেয়ে পড়েছিল আর কি।

কি হল বাবা?

হোঁচোট খেয়েছিলাম বাবা।

তখন দুজনে তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে পথের উপরে দুটো লোক পড়ে আছে।

জরা শুধোলো, এরা অবেলায় এখানে পড়ে ঘুমোচ্ছে কেন?

ওদের এ ঘুম আর ভাঙবে না, আর জীবন কার যে কখন বেলা হয় তার কি ঠিক আছে।

মারা পড়েছে নাকি?

ঠাকুরের অভ্যস্ত চোখ দেখে নিয়েছে যে একজনের বুকে আর একজনের পিঠে ছোরা বিঁধে রয়ে আছে।

কে মারলো এদের, বাবা।

হয়তো পরস্পরকে খুন করেছে নয় আর কেউ খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছে।

সৎকার অবধি করেনি।

সৎক্রিয়ার ভার কি হত্যাকারীর।

চলো এখন মহাকালের মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক আরতির সময় হয়েছে।

যেতে যেতে জরা বলে, বাবা দেশব্যাপী যে খুনের বহর চলছে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে কিছুকাল পরে দেশ জনশূন্য হয়ে যাবে।

বিধাতার হয়তো তাই অভিপ্রায়। দেখো বাবা, পূর্বকালে বিধাতা এই উদ্দেশ্যে পরশুরামের মতো অবতার পাঠাতেন। পরে দেখলেন তাতে বিস্তর ঝামেলা তাই এখন নতুন উপায় অবলম্বন করেছেন। যখন কোন সমাজকে নাশ করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের হাতে অস্ত্র তুলিয়ে দেন, তারা পরস্পরকে হত্যা করে বিধাতার দায়িত্ব পালন করে।

জরা শুধায়, বিধাতার এমন উৎকট ইচ্ছা হয় কেন?

সমাজে ঘুণ ধরলে তাকে সরিয়ে দিতে হয় নয়তো সেই ঘুণ ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা। দেখলে না বাসুদেব কিভাবে যদু-বংশ নাশের ভূমিকা সৃষ্টি করলেন। তিনি কি ইচ্ছা করলে তাদের বাঁচাতে পারতেন না।

বাঁচালেন না কেন, শুনেছি তিনি স্বয়ং ভগবান।

সেই জন্যেই বাঁচালেন না। নিজের বিধানকে ভগবান লঙ্ঘন করেন না।

জরা কোনপ্রকারে আত্মসংবরণ করে জিজ্ঞাসা করে, শুনেছি তিনি এক ব্যাধের শরে মারা পড়লেন, কেন বাবা?

তুমি যা শোননি এবারে তা শুনে নাও, সেই ব্যাধ বাসুদেবের বৈমাত্র ভ্রাতা, তাকেই যে পথে যদুবংশকে প্রেরণ করেছেন সেই পথে নিজেও যাত্রা করলেন। বিধানকর্তা বিধানঘাতী হতে পারেন না।

এবারে জরা শুধায়, সেই ব্যাধটার কি হল?

নিশ্চয় করে কেউ জানে না। তবে তার সম্মুখে দুটো পথ খোলা আছে, হয় সে লোকটা নতুন নতুন দুষ্কৃতির গভীর থেকে গভীরতর পঙ্কে নিমজ্জিত হবে নতুবা অনু-শোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নির্মল হয়ে মুক্তি পাবে।

বাবা কি বলতে চান যে এ হেন মহা-পাপীরও মুক্তি সম্ভব।

বাসুদেবের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়।

মহাকালের আরতি দর্শন করে অতিথি-শালায় আশ্রয় নিল দুজনে। সেখানে নৈশ-ভোজন সমাপ্ত করে দুজনে শয়ন করলো।

মাঝরাতে মহা হলহলায় তাদের ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কি জানবার আশায় বাইরে এসে দেখে নগরের উত্তর দিকে আগুন জ্বলছে। যাদের ঘরবাড়ী পুড়ছে প্রাণভয়ে তারা ছুটে পালাচ্ছে, আর খুব সম্ভব যারা আগুন লাগিয়েছে লুটপাট শুরু করে দিয়েছে তারা। কেমন করে কি ঘটলো জানবার জন্যে ঠাকুর যখন লোকের সন্ধান করছে তখন মহাকালের পুরোহিতকে সামনে দেখতে পেলো, শুধালো, ঠাকুরমশায়, আগুন কেমন করে লাগলো?

সে বলল, সন্ন্যাসীঠাকুর, আগুন আপনি লাগে না, লাগাতে হয়।

কে লাগালো?

যারা লাগালো তারাই জানে কারা লাগিয়েছে।

তারা কারা?

সবাই তাদের জানে।

তবে বাধা দেয় না কেন?

আরে তাদেরও যে বাড়ীঘর আছে।

ঠাকুর বলে, তোষণ নীতির দ্বারা তারাই কি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে।

পাবে না তারা জানে।

তবে?

প্রত্যেকেই কুমীরকে খাদ্য জোগায় যাতে তাকে শেষ খায় এই প্রত্যাশায় আর কি?

রাজার সেনারা কি করে?

লুটের ভাগ পায়, এ হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে তাদের কি লাভ? মালাদেও বাঁধা থাকলে ঘাস বন্ধ হবে না।

রাজা কি করেন?

হয়তো তাঁর ভাণ্ডারেও লুটের ভাগ পৌঁছয়। এসব আলোচনা থাক সন্ন্যাসী-ঠাকুর, এ নগরে নিরীহ মানুষ সবচেয়ে বিপন্ন। কে কোথা থেকে এনেছে স্বয়ং মহাকালও রক্ষা করতে পারবেন না।

যা বললেন ঠাকুরমশাই, ভালো মানুষের কাল গিয়েছে। মানুষ দেখ [illegible] হয়ে দুর্জনে পারলাম যে হয়, ঐ সব গুণ্ডা আর দাঙ্গা-বাজদের দলে যোগ দিতে হবে নয় মরতে হবে। তৃতীয় পথ বলে আর কিছু নেই।

তখন সন্ন্যাসীকে সহৃদয় বলে জানতে পেরে পুরোহিত মৃদুস্বরে বলতে আরম্ভ করলো—যা বলেছেন। আজ উত্তরপাড়ায় আগুন লেগেছে বলে তাদের নিরীহ মনে করবেন না, ওরাই কালকে দক্ষিণপাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। আজ তার বদলা চলছে।

এমন বদলা-বদলি চললে সমস্ত নগরটা যে শ্মশান হয়ে যাবে, তখন?

কেন আশেপাশে কি আর জনপদ নেই।

এতক্ষণ জরা নীরবে শুনছিল এবারে বলে উঠল, ঠাকুর, এর চেয়ে হিমালয়ের অরণ্য নিরাপদ ছিল।

তার কথা শুনে পুরোহিত বলল, অরণ্যে থাকে শ্বাপদ তাদের উপদ্রবের প্রকৃতি তো সুপরিজ্ঞাত। এ যে মনুষ্য সমাজ।

বাবা, আজ নগরের চেয়ে পথ নিরাপদ, পথের চেয়ে অরণ্য।

পুরোহিত বলল, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাদের বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। আমি বলি কি আজ রাতেই অন্যত্রস্থানে যাত্রা করুন, নয়তো কাল সকালে হয়তো শান্ত্রীরা আপনাদের বন্দী করে নিয়ে যাবে।

আমাদের কেন, শুধায় জরা।

আপনারা ভালো মানুষ তায় বিদেশী। ওরা বলবে আপনারা অবন্তীপুরীর শত্রুদের চরদূপে এসে এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। সেদিন এই রকম অন্যায় অভিযোগে দুজন বিদেশী মারা পড়েছিল।

ঠাকুর বলল, বাবা চলো, এই মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

তখন তারা দুজনে পুরোহিতকে নমস্কার করে হাঁটতে শিপ্রা নদী পার হয়ে রাজপথের উপরে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর বলল, বাবা সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই, এবারে আমি দক্ষিণে যাত্রা করবো অমরকণ্টকের মুখে। তুমি কোন তীর্থে এখন যাবে শুনতে পারি কি।

জরা বলল, দ্বারকায় যাবো মনের ইচ্ছা।

খুব সদিচ্ছা বাবা, যাও, তোমার মন-স্কামনা পূর্ণ করবেন বাসুদেব।

আর কি দেখা হবে না ঠাকুর?

কে বলতে পারে যে হবে না। এ পৃথিবী যত বিশাল তত ক্ষুদ্র। আমারও দ্বারকায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

ঠাকুর এ কয়দিন আপনার সঙ্গে থেকে মনে বল আর আশা পেয়েছিলাম। এখন বড় অসহায় বোধ করছি।

কোন ভয় নেই বাবা, তোমার পথে যাত্রা করো, আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

তাই যেন হয় বাবা, তাই যেন হয়। এই বলে বিদায় নিয়ে দুজন দুদিকে যাত্রা করলো।

তখন শুকতারা দেখা দিয়েছে পূবে আকাশে।

(ক্রমশ)

আধুনিকতা ও শরৎচন্দ্র

শিবদাস চক্রবর্তী

অপেক্ষাকৃত একালের সাহিত্যকৃতিকে পাঠকমহলে পরিচায়িত করবার উদ্দেশ্যে 'আধুনিক' অভিধাটি অবাধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সর্ববিধ সাহিত্যকৃতির পূর্বেই 'আধুনিক' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। আবার সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-বিভাগের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত একালকে 'আধুনিক যুগ' নামে চিহ্নিত করা হয়। অথচ 'আধুনিক' অভিধাটি অন্যের স্বরূপ নির্দেশ করলেও তার নিজের স্বরূপ কিন্তু এখনও তর্কাতীতভাবে অনুদ্ঘাটিত।

মধুসূদন, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিদের নবীন ধারার কাব্য-কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের উপন্যাস এবং রাম-নারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল, সেই যুগ এখনও বহমান। অথচ তখনকার দিনের কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-নাটকের সংগে সাম্প্রতিককালের কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কতই না ব্যবধান। তখনকার সামাজিক পরিবেশ, সমাজ-মানস, রস-রুচি থেকে সাম্প্রতিককালের সামাজিক পরিবেশ, সমাজ-মানস, রস-রুচি কত ভিন্ন। তাই বলে মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দীনবন্ধুকে সেকেলে বা অনাধুনিক বলে বাতিল করবার চেষ্টাও মূঢ়তার নামান্তর। কারণ, সাম্প্রতিককালের সাহিত্য রবীন্দ্র-নাথের উর্বশীর মতো 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

প্রবহমান ধারার সাম্প্রতিকতম অংশকেই যদি 'আধুনিক' বলে আখ্যাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আধুনিকতা কোনো স্থিতিশীল ধর্ম নয়। আজ যা সাম্প্রতিক, কিছুদিনের ব্যবধানে তাই হয়ে যাবে অতীতের। কারণ, যেখানে প্রবাহ সেখানেই গতি, যেখানে গতি সেখানেই পরিবর্তন। কোনো বিশেষ কালে যদি বিশেষ কোনো সময় কোনো বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী অলঙ্কারের প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে সেই বিশেষ ভাব বা ভঙ্গীকেই আধুনিকতা বলে ঘোষণা করা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করতে চাননি। কাব্যে আধুনিকতার আলোচনা প্রসংগে তিনি বলেছেন—ইন-ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণও করে বলে ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এর বাধা। ইন-ফ্লুয়েঞ্জার অন্তরালেই আছে সহজ দেহ-স্বভাব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উক্তিতে স্পষ্টতই আধুনিকতাকে বহিরংগ আকৃতির দিক থেকে না দেখে অন্তরংগ প্রকৃতির দিক থেকে দেখার দিকেই অংগুলি নির্দেশ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহিরংগ আকৃতি উপেক্ষার বস্তু কখনই নয়; তবে তার সঠিক মূল্যায়ন পরিমাপের বেলায় অন্তরংগ প্রকৃতিই সম্ভবত চূড়ান্ত মানদণ্ড। কারণ প্রকৃতি বা স্বরূপ থেকেই কালে কালে বিচিত্র রূপের উদ্ভাবন ঘটে। স্বরূপের কথা বিস্মৃত হয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক।

শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরণের কিছু কিছু ভ্রান্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিককালের কথা-সাহিত্যিক এবং কথাসাহিত্যরসিক সমাজের একাংশে শরৎ-সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনায় উদ্যত। তাঁদের মতে শরৎ-সাহিত্যের আবেদনের দিন অতিক্রান্ত। কারণ তার মধ্যে আধুনিক যুগ-সমস্যার প্রতিফলন অনুপস্থিত। বিশেষত একালের 'অর্থনীতি-নির্ভর সংগ্রামী মানুষের বঞ্চনা বেদনার কথা শরৎ-সাহিত্যে নেই। অতএব সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র এ-যুগে বাতিল। অথচ একদা এই শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িককালে আধুনিকতার জন্য প্রাচীন রস-রুচির কাছে নিন্দিত এবং নবীন রস-রুচির কাছে নন্দিত হয়েছিলেন।

সাহিত্য সমাজ-নির্ভর, সমাজ সময়-সাপেক্ষ এবং সময় গতিশীল। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে তাই সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটে, সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটলে সমাজ-মানসের উপরি-তলেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এই ধরনের পরিবর্তনের আবহাওয়ায় লালিত মানুষের কাহিনীকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করলে সে-সাহিত্যকৃতিতে একটা বহিরংগ অভিনবত্ব প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। শরৎ-সাহিত্যের তুলনায় সাম্প্রতিককালের কথা-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের কারণ এখানেই। কিন্তু এই কারণেই শরৎ-সাহিত্যকে বাতিল বলে ভাববার কোনো

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গত কারণ নেই। শরৎ-সাহিত্যের মৌল সম্পদ এখনও নিঃশেষিত হয়নি, হয়তো কোনোদিনই একেবারে নিঃশেষিত হবেনা। পুনর্মূল্যায়নে হয়তো আবার একদিন নব মূল্যমান আবিষ্কৃত হবে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ—'কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী'।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্ট পরিবেশ ও মানুষের কাহিনীকেই তাঁর সাহিত্য রচনার উপাদানরূপে ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে, বিহারের ভাগলপুরে এবং মজঃফরপুরে, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে ও পেগুতে, বাজেশিবপুরে, সামতাবেড় এবং কলকাতায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই সমস্ত জায়গাই পটভূমি রচনা করেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে তিনি সমকালীন বাঙালী সমাজের ঘাঁটি থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রাণরস আহরণ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে বাংলার সেই ঘাঁটি, বাঙালীর সেই সমাজ আজ দ্বিধা-দীর্ণ। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের এক দশকের মধ্যেই বঙ্গবিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালী সমাজকে দ্রুত যুগান্তরের সম্মুখীন করে তোলে। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর পুনর্বাসন সমস্যা, কৃষিমুখ্য সমাজে দ্রুত শিল্প প্রসারের ফলে একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, গ্রামীন জীবনধারার যুগান্তরের ফলে বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ প্রথার ক্রমবিলোপ, সুপ্রাচীন সামাজিক রীতিনীতির পূর্বতন আধিপত্য হ্রাস, জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি ঘটনা স্বাধীন বাংলার সামাজিক পরিবেশে গুরুত্বের পরিবর্তনের সূচনা করলো। ওদিকে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত পুরুষের মতো শিক্ষিতা নারীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান হলো। বিপর্যস্ত অর্থনীতির আবর্তে পড়ে এযাবৎ অন্তঃপুরচারিণী নারী জীবিকার তাগিদে চারদেয়ালের চৌহদ্দি পার হয়ে বাইরের জগতের আলো হাওয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণের অবাধ সুযোগ লাভ করলো। আর্থিক প্রয়োজনে পুরুষের মুখাপেক্ষাহীনতা নারীর সুপ্ত ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে সহায়ক হলো। এর পর বহু বিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত হওয়ায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথের অনেক অন্তরায় দূর হয়ে গেল। এর ফলে বাঙালীর সমাজ-মানসের উপরিতলে দেখা দিল গুরুত্বের পরিবর্তন। বাঙালীর যে সমাজ পরিবেশে শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের নরনারীর ভিড় ছিল, তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে দূরে সরে গেল। শরৎ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমস্ত ঘটনার অবতারণা অপরিহার্য। কারণ এই সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইতিহাসকে অস্বীকার করে সত্যের সন্ধান করা বৃথা।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে বর্ণিত সমাজের পরিবেশে এবং মানসলোকে অনেকখানি যুগান্তর ঘটেছে বলেই কি সত্যই শরৎ সাহিত্যের মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে? সম্ভবত না। শরৎ প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একদা বলেছিলেন—'আমাদের জীবনের জীর্ণ ভিত্তির তলদেশে অন্ধকার গহ্বরে, যে সকল প্রেতমূর্তি পিপাসিত হইয়া এক বিন্দু জল প্রার্থনা করিতেছিল, শরৎচন্দ্র তাদের মূক আর্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর করিয়া দিয়াছেন; আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে।' সত্যই এইজন্য শরৎ-সাহিত্য আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের অমৃত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু নিবৃত্তি-মার্গের প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে আন্দোলিত চিত্তের প্রবল বিক্ষোভের চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে কম। কারণ রবীন্দ্রনাথের দিব্য আবেগ ও কল্পনা এই ধরণের চিত্র অঙ্কনের অনুকূল ছিল না। শরৎচন্দ্রই প্রথম প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রবৃত্তির সহজ আত্মপ্রকাশকে আপন হৃদয়ের উজাড়-করা সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত করে তুলেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাণের সহজাত তৃষ্ণা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার কাছেই তৃপ্তির বারি সন্ধান করে। অথচ শরৎ-সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতাও কোথাও প্রশ্রয় পায়নি। উদ্দাম প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাকৃত সংযমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

শরৎচন্দ্র আইডিয়ালিস্ট কি রিয়ালিস্ট, বিপ্লববাদী না শান্তিবাদী,—শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিতর্ক অনেকটা অবান্তর বলেই মনে হয়। শরৎচন্দ্র একটা বিশেষ সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনকে মুক্ত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার বঞ্চনা ও বেদনাকে দরদী শিল্পীর মন নিয়ে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। তিনি নর-নারীর বঞ্চনা ও বেদনার দার্শনিক মীমাংসা বা অর্থনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করেন নি, তিনি সেই বঞ্চনা বেদনাকে আপন সহানুভূতির মুষ্টিতে বন্দী করে সুবিচারের আশায় মানুষের দরবারে উপস্থিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের সেই সুপরিচিত উক্তি এখানে স্মরণীয়—'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতে অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে. এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ বিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।' একালে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক বলে যাঁরা নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যগত অঙ্গীকার কি মূলত খুব বেশী ভিন্ন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চার স্বর্ণযুগে এদেশের সমাজ ছিল ভূমিভিত্তিক, এদের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন যৌথ পরিবারের অধীন। তাই তখনও সমাজে আর্থিকসঙ্কট থাকলেও তা' একালের মতো এত তীব্র ও ভয়াল ছিল না। তখন স্থাণু সমাজের অনড় বিধি-নিষেধ নরনারীর ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের, হৃদয়গত যৌন-প্রেমের ঘোর অন্তরায় ছিল। শরৎ-সাহিত্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ অপেক্ষা সমাজনৈতিক নিষ্পেষণে নির্জিত পৌরুষ ও পরাভূত প্রেমের চিত্রই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম-জীবনের পরাভবের চিত্র অবশ্য পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী-চরিত্র আশ্রয় করেই বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ প্রেম পুরুষের কাছে তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ মাত্র, কিন্তু নারীর কাছে প্রেম তার সমগ্র অস্তিত্বের নিয়ামক ভাব। অবশ্য এ কথাও স্মরণীয় যে প্রেমের পরাভবের জন্য সর্বত্র একমাত্র সামাজিক রীতিনীতিকেই দায়ী করা সমীচীন নয়, অনেক সময় এই পরাভবের বীজ প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রের মধ্যেই সংগুপ্ত থাকে। আসক্তি ও বৈরাগ্যের টানা-পোড়েনে কার মন কখন আসক্তি বা বৈরাগ্যকে বরণ করে নেবে তা' প্রেমিক-প্রেমিকারও জানা থাকে না। জগতে প্রেমের সাহিত্যে তাই এত না-পাওয়ার ও পেয়ে-হারানোর ট্র্যাজেডি।

শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত নারী-চরিত্রগুলি মুখ্যত দুই জাতের—স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী রমণী। এই দুই জাতের নারী-চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে সার্থক রস-মূর্তি লাভ করেছে। তবে জননী চিত্রসমূহ একান্তভাবে বাঙালীর ঘরের জিনিস কিন্তু রমণী চিত্রগুলি সর্বদেশের, সর্বকালের। আর পরাভূতা প্রেমিকা রমণীর চরিত্র চিত্রণেই শরৎচন্দ্রের শিল্পীসুলভ সার্থকতা সর্বাধিক। প্রাণ-ভরা প্রেম নিয়েও যারা জীবনে সার্থক হতে পারল না, যেখানে সমাদরে অকৃত্রিম অনুরাগের অর্ঘ্যপাত্র আগ্রহে এগিয়ে দিয়েও যারা ধ্যানের ধনকে লোকসমাজে প্রকাশ্যে আপন বলে স্বীকার করে নিতে পারল না, যারা সংসারের কল্পলোকে অথবা ঘরেও প্রেমিকের কল্পলোকে চিরন্তনী স্বপ্নচারিণী হয়ে রইল, তাদের হৃদয়ের দাহ ও দীপ্তি শরৎ-সাহিত্যে যে পরিমাণ সার্থকতায় স্ফূর্তিলাভ করেছে, তা' বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা সৃষ্টির পাশাপাশি আলোচিত হবার দাবী রাখে।

প্রেম-জীবনে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা পার্বতী মাধবী, রমা, সাবিত্রী কি কমললতা, হেমনলিনী, অচলা কি রাজলক্ষ্মী জন্মসূত্রে বাঙালী। সমকালীন বাঙালীর সমাজ-পরিবেশেই লেখক তাদের মূক হৃদয়ার্তিকে মুখর করেছেন। পরিবর্তিত সমাজ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে তাদের পুরাতনী বলেই মনে হবে। কিন্তু উদার দৃষ্টি

থেকে তাদের মর্মতল পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ভিন্ন পরিবেশবাসিনী সাগর-পারের নায়িকা নারীদের মর্মবন্ত্রণার সঙ্গে এদের মর্ম-যন্ত্রণার কোনো ভেদ নেই। এই-দিক থেকে বিচার করলে তারা চিরন্তনী আধুনিকা। ওয়াল্টার স্কটের আইভ্যানহোর পরাভূতা প্রেমিকা 'রেবেকা' গোপনে অশ্রু-মোচন করে দুর্না হুদের প্রেমাস্পদের জন্য যেভাবে মঙ্গলকামনায় ভরে রেখেছিল তার সঙ্গে পার্বতী, মাধবী, রমার আচরণে কি সত্যিই মূলগত কোনো পার্থক্য আছে? আলেকজান্ডার ডুমার লেডি অব দি ক্যামেলিয়ার মার্গারেট গতিয়ে ও তো রাজলক্ষ্মীর মতোই প্রিয়তমকে কাছে পেয়েও হারিয়েছে, প্রিয়তমের কল্যাণের জন্যই নিজেকে সংবেদের আগুনে দগ্ধ করেছে তবু প্রিয়তমের কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি। টুর্গেনিভের অন দি ইভের 'হেলেন'-এর বৈরাগিনী তপস্বিনী মূর্তির সঙ্গে পরিবেশগত ভিন্নতা সত্ত্বেও 'দেনাপাওনার' ষোড়শীর স্বরূপগত স্বাতন্ত্র্য কি খুব বেশী? মনে হয়, না। চর্মের বর্ণ এদের ভিন্ন হলেও মর্মের বর্ণ অভিন্ন। সর্বদেশের সর্বকালের প্রেমিক পুরুষের কল্পনার স্বর্গে এরা শাশ্বতী প্রেমিকা-নায়িকা।

অচলা এবং অন্নদা দিদি স্বভাবে বিপরীত ধর্মী হলেও এরা চিরন্তনী নারী। অচলা আধুনিকা শিক্ষায় শিক্ষিতা; তার মনোজগৎ সনাতনী এবং অধুনাতনী উভয় ভাবের সমবায়ে গঠিত। এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। যাকে সে শ্রদ্ধা করেছে তাকে সে সর্বান্তকরণে ভালোবাসতে পারেনি; অথচ যাকে সে কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে পারে নি, অলক্ষ্যে অচলার মন তার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে, মনের উপরিতলের আবেগ চরিতার্থ করতে গিয়ে তার অঙ্কশায়িনী হতেও কুণ্ঠিতা হয়নি। এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণাম যে ট্র্যাজেডি সেই ট্র্যাজিডির দীপ্তিতেই অচলা চরিত্র মনোহারিণী। অচলা চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা নায়িকা-নারীর যে চিত্র উপহার দিয়েছেন, অতি আধুনিক কথা-সাহিত্যিকের কল্পনাও তাকে অতিক্রম করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠারূপে অন্নদা দিদি পৌরাণিক সতী নারী সীতা সাবিত্রীর দোসরা। আবার সহনশীলতার প্রতিমূর্তি-রূপে সে চিরন্তনী নারী,—যে সহনশীলতার মহিমা অস্বীকার করতে না পেরে নারী-বিদ্বেষী সোপেনহাওয়েরকেও বলতে হয়েছিল—'সে জীবনের ঋণ পরিশোধ করে কৃতকার্যের দ্বারা নয়, সহনশীলতার মাধ্যমে'।

শরৎ সাহিত্যে অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে নির্জিত নরনারীর চিত্র অপেক্ষাকৃত কম সন্দেহ নেই। কিন্তু ও দুয়েক দরিদ্র জীবনের রূপায়ণেও তাঁর নৈপুণ্যও উপেক্ষণীয় নয়। 'বিরাজ বৌ', 'অরক্ষণীয়া', 'হরিলক্ষ্মী', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসোপম রচনাগুলির মধ্যে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। এদের মধ্যে আবার 'মহেশ' অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে শরৎ-সাহিত্যের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতার বেদনাহত হয়েছি এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ'। শরৎচন্দ্র এই কঠিন আক্রোশপরায়ণ বিপুল শক্তিমান সমাজ-সত্তায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে তার চিন্তায় ও চেতনায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা রূপান্তরিত বিপ্লবের নামান্তর। শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট বিপ্লবোত্তর পরিবেশেই পরবর্তীকালের বাংলা কথা-সাহিত্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের লেখনী আশ্রয় করে যুগোচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নবীনতার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এখানেই শরৎ-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা অনুসারে 'শাশ্বতভাবে আধুনিক'।

সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ছিলেন আমূল রূপান্তরের পক্ষপাতী, সংস্কারে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সেই দিক থেকে তাঁকে বিপ্লববাদী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলেছেন—'আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরানো জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবীতে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কী। যেটা খারাপ জিনিস, অনেকদিন চলে চলে ধসে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার খাড়া করানো।......আমার মনে হয়, মেরামত করে জিনিসটা ভালো হয় না যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা neglect দ্বারা হয়তো আপনি ধসে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করানো উচিত নয়।' আধুনিক প্রগতিবাদী কথা-সাহিত্যিক যিনি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের আমূল রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন, তাঁর চিন্তা কি শরৎচন্দ্রের সমাজ-চিন্তাকে অতিক্রম করতে পেরেছে?

মিডিয়াম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইক্লস্
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫১৯৫ ১১৭০০
	১১৮৭৫ ও ৯৭৪০
মিডিয়াম-ওয়েভ ১৯০ মীটার	১৫৮০

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট। লাহোর বোরস্টাল জেলের কক্ষে তেষট্টি দিন ধরে পুড়ে পুড়ে একটি জ্বলন্ত প্রদীপশিখা অবশেষে নিভে গেল। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস তাঁর স্বপ্ন আশার অগ্নিশিখাকে প্রাণের আলোকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এর জন্য ইচ্ছাশক্তির জোরে ইংরেজ শাসকের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে তার পাশব বর্বরতার বিরুদ্ধে মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার আশাকে তিনি অর্ঘ্য দিলেন। সহযোদ্ধার ভাষা উদ্ধৃত করে বলি—'ভারতীয় শহীদদের গৌরবময় তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত হল। ভারতবর্ষের আর একজন যুবক মাতৃভূমির বেদীমূলে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করলো।'

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীরূপে যতীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এর ১৪ই জুন পুলিশের হাতে বন্দী হন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মির আরও উনিশজন সভ্যকে ইতিমধ্যেই লাহোর জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ—

"Conspiracy to wage war against H.M. the king Emperor and to deprive him of the sovereignty of British India. . ."

অর্থাৎ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা এবং তাঁকে বৃটিশ ভারতের সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র...ইত্যাদি।

পুরো ঘটনাটা বলতে হলে আর একটু পেছিয়ে যেতে হবে। হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন (পরে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আর্মি) বিপ্লবীদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা—যে সংস্থা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। ১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে নিহত হলেন। বিপ্লবীরা এর শোধ তুললো লাহোরের প্রধান রাজপথে পুলিশ থানার সামনেই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সকে হত্যা করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই আর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটলো। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন— ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। সভায় উপস্থিত সাইমন কমিশনের সভাপতি সাইমন নিজে। সেই সভায় দমনমূলক একটি নতুন আইন পাশ করানোর কথা। বিলটি পেশ করার মুহূর্তে হলের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে পর পর দুটি বোমা ফাটলো। তারপরেই দুটি রিভলবারের গুলি। সন্ত্রস্ত সভাবৃন্দের সামনে পুলিশ সার্জেন্টের হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলো দুই তরুণ যুবক—ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

এই ঘটনা সম্পর্কে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং বলেছিলেন—

"The attack was not directed towards any individual but against an institution itself".

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাব্যাপী এক ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করলো।

ঘটনাটা আরও একটু বিস্তৃত করে বলা যাক। ১৯২৪ সালে বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উদ্যোগে যখন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন হয়, তখনই যতীন দাস তাঁর দলের বিশ্বাসভাজন কর্মীরূপে গণিত হন। ভবানীপুরের বঙ্কিমবিহারী দাসের পুত্র যতীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজে যখন ১৯২৪ সালে বি-এ ক্লাসের ছাত্র, তখনই (সম্ভবতঃ) মেহের বোসের মাধ্যমে শচীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। শচীন্দ্রনাথ এই তরুণ যুবকের মধ্যে দৃঢ়তা ও প্রবল কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাঁকে কলকাতায় সংগঠনের ভার দিতে পেরেছিলেন। ডাঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের (গোরা) সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ দেওঘরে যান বোমা তৈরী শিখতে। শিক্ষক ছিলেন হরিনারায়ণ চন্দ্র।

১৯২৫-এর ৯ই আগস্ট রামপ্রসাদ বিসমিলের নায়কত্বে কাকোরি ট্রেন ডাকাতি সংঘটিত হয়। পুলিশ এই ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলে। ফলে সমস্ত ভারত জুড়ে ধরপাকড় সুরু হয়। এই ঘটনার সূত্র ধরেই দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথকেও গ্রেপ্তার করে।

যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। তাই তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারায় আটক করে। ১৯২৮ সালের শেষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় হিন্দুস্থান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কর্মীদের চরম শাস্তি হওয়ায় এই সংস্থার প্রাণশক্তি মুমূর্ষু হয়ে আসে। যতীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছেন। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার কোরের তিনি অন্যতম সংগঠক, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক। ঠিক এমনই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন লাহোর থেকে সর্দার ভগৎ সিং ও ভগবতীচরণ ভোরার সহধর্মিণী দুর্গা দেবী।

ভগৎ সিং, ভগবতীচরণ ভোরা, বিজয়কুমার সিংহ ও বীর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ চেষ্টা করছেন এইচ আর একে পুনরুজ্জীবিত করতে। ভগৎ সিং খবর পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বোমা তৈরী করতে জানেন। তাঁর একান্ত আগ্রহে যতীন্দ্রনাথ অন্যান্যদের বোমা তৈরী করা শেখাতে রাজী হলেন। এর জন্যে আগ্রায় কারখানা ঠিক করা হল আর যতীন্দ্রনাথ আগ্রায় এসে বোমা তৈরী করতে লাগলেন। যতীন্দ্রনাথের তৈরী বোমা নিয়েই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লি হলে গিয়ে হাজির হলেন।

ভগৎ সিং ও বি কে দত্তকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ লাহোরেও একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং সুখদেবকে ধরতে সক্ষম হয়। এখান থেকেই তারা জানতে পারে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ও লাহোর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!
DOL.137 BEN

ভগৎ সিং, যতীন দাসের সহকর্মী বিজয়কুমার সিংহ এই প্রসঙ্গে যা লিখেছেন (People's Path, Sept, 1967) তার থেকে একটু উধৃত করছি—

"I consider it my great fortune that as a member of the revolutionary party I could come in close touch with the band of martyrs of our country—Bhagat Singh, Chandra Sekhar Azad, Jatin Das; Mahabir Singh; Rajguru, Bhagwati Charan Bhora. They all belonged to the revolutionary organisation H.S.R.A....

যতীন্দ্রনাথ দাসকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করে লাহোরে আনা হল ১৬ই জুন তারিখে। বন্দী অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রত্যেকটি যুবকের প্রতি পুলিশ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। আদালতেও তাঁদের হাত-কড়া দিয়েই নিয়ে আসা হয়েছে। সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে তাঁদের রাখা হয়েছে। পুলিশের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ১৫ই জুন থেকে অনশন সুরু করেছিলেন। সরকারী মনোভাবের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় লাহোর জেলের অন্যান্য বন্দীরাও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন একমাত্র যতীন দাশ। তিনি বলেছিলেন—"অনশন যদি করতেই হয় তবে মাঝপথে তা ভাঙ্গা চলবে না; আর আমি জানি কর্তৃপক্ষ কোনদিনই আমাদের দাবি মানবে না। তার মানে আমাদের কয়েকজনকে অনশন করে মরতেই হবে। আর এটা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমি কিছুটা জানি।"

যতীন দাস জানতেন যে অনশন-মৃত্যুর পথ অত্যন্ত দুরূহ পথ। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশন করে ইতিমধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। কাজেই তিনি সহ-যোগীদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযোগীরা সেদিন তাঁকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ১৯২৯ এর ১৩ই জুলাই তারিখে সুরু হল সেই ঐতিহাসিক অনশন যার প্রধান নায়ক যতীন দাস ৬২ দিন অনশন করে—সেই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্রত সাধন করে ৬৩ দিনের দিন মৃত্যু বরণ করলেন: প্রমাণ করলেন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা।

এই ৬২ দিনের সংগ্রামের মর্মান্তিক ইতিহাস স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ফাইল থেকে জানা গেছে। জেলের ডাক্তার আটজন পাঠানরক্ষী এনে যতীন্দ্রনাথকে চিৎ করে ফেলে তাঁর বুকের ওপর বসে নাকের ও মুখের মধ্যে দিয়ে রবারের নল চালিয়ে দুধ পাম্প করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই অদম্য শক্তির জোরে যতীন্দ্রনাথ সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। অজ্ঞান হয়ে পড়া বন্দীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে ডাক্তার চলে গেছে; ভেবেছে, আজ হল না কিন্তু কাল হবেই। দুর্বল মুমূর্ষু এ কতক্ষণ আর লড়তে পারবে?

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেই ঊনিশজন বন্দীর মধ্যে একা; যতীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন, বিপ্লবী যে, সে মৃত্যুকে জয় করতে পারে। জীবন তার কাছে 'পায়ের ভৃত্য' মাত্র।

২রা আগষ্ট তারিখে ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব যতীন্দ্রনাথকে দেখতে এলেন।
(—File No. 36|IV — Hom-Poll.)

ডাঃ গোপীচাঁদ—সুপ্রভাত মিঃ দাশ।

মিঃ দাস (ফিস্‌ফিস করে)—সুপ্রভাত!

ডাঃ গোপীচাঁদ—আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না, এমনকি একটু জল পর্যন্ত না। কেন বলুন ত?

মিঃ দাস—আমি মরতে চাই।

ডাঃ গোপীচাঁদ—কেন?

মিঃ দাস—আমার দেশের জন্যে.........

৩রা আগষ্ট পাঞ্জাবের গভর্ণর এক গোপন তারবার্তায় ভারত সচিব মিঃ ইমার্সনকে জানালেন—মিঃ দাসের অবস্থা গতরাত্রে অত্যন্ত খারাপ গেছে। ভগৎ সিং তাঁকে কিছু ওষুধ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে রাজি হয়েছেন।

এর পরের প্রতিদিনের রিপোর্ট একই রকম—অবস্থা খারাপের দিকে। আরও খারাপের দিকে।

ইতিমধ্যে সুকদেব তার অনশন ভঙ্গ করলো। ভগৎ সিং আবার দেখা করলো যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে; অনুরোধ করলো অন্ততঃ একটু দুধ খাওয়ার জন্যে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অটল। ২১শে আগষ্ট তারিখে পুরুষোত্তমদাস টণ্ডন ও ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব আবার দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে রইলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত।

গভর্ণমেন্ট এতদিনে বুঝেছে, যতীন দাস খাঁটি ইস্পাতের তৈরী একটা মানুষ। তার অনশন ভঙ্গ করানো দরকার। কাজেই তারা ভগৎ সিং ও অন্যান্যদের বার বার আসতে দিচ্ছে তার কাছে। পুরুষোত্তমদাস টণ্ডন এসে বললেন—আপনার যে বেঁচে থাকা দরকার মিঃ দাস। অন্ততঃ আরও কয়েকটা দিন। যতীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—আমি ত' বেঁচে আছি।

পুরুষোত্তমদাস বললেন—কিন্তু কোন ওষুধ পর্যন্ত না খেয়ে আপনি কেমন করে বাঁচবেন?

যতীন্দ্রনাথ ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে।

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট যতীন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু জামিনে মুক্তি চান না তিনি। গভর্ণমেন্ট নিজেই অনুষ্ঠান রক্ষার জন্য জামিনের একটা ব্যবস্থা করলো। কিন্তু মুক্তি কে চায়? যতীন্দ্রনাথ বললেন—আমি যাবো না।

তারপর বিরামহীন দিন অতিক্রান্ত হল। আস্তে আস্তে তাঁর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেল। একদিন দেখা গেল তিনি বাঁ পাটা আর নড়াতে পারছেন না। গায়ের তাপমাত্রা ৯৫° ডিগ্রীতে নেমে এলো। অবশ্য দুবৃত্তের মত ছোটভাই কিরণচন্দ্রকে তাঁর পাশে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল।

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য সকলে অনশন ভঙ্গ করলো। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অচল। সকলের সমবেত অনুরোধকে উপেক্ষা করে তিনি আপন সত্যে দৃঢ়। ফিরে গেল ভগৎ সিং। তাঁর বাবা কিষণ সিং। ফিরে গেলেন ডাঃ গোপীচাঁদ, সর্দার শার্দুলসিং কবিশের। যতীন্দ্র-নাথের নিষ্কম্প বিশীর্ণ দেহ, শুধু উজ্জ্বল দুটি চোখ। একটিমাত্র উত্তর মুখে—আমি মরতেই চাই; আমার দেশের জন্যে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। মৃত্যুর খুঁটি আঁকড়ে ধরে তিনি পড়ে রইলেন। পনরো দিন সময় চেয়েছিলেন ডাঃ গোপীচাঁদ। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সে সময়ের মেয়াদ শেষ হল। যতীন্দ্রনাথ বমি করতে লাগলেন। গলায় কথা জড়িয়ে গেল। সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠা আকুল হয়ে চেয়ে আছে। বেদনায় বিবর্ণ পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ।

এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো শেষ মুহূর্ত। কেটে গেল ৬২ দিনের দীর্ঘ যন্ত্রণাময় প্রতীক্ষা। অবশেষে সেই ১৩ই সেপ্টেম্বর। বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট। অত্যাচারী বর্বর ইংরেজের কারাগারের অন্ধকার থেকে মৃত্যুত্তীর্ণ এক প্রাণ অমৃত আলোকের পথে পা বাড়িয়ে দিলো।

সলিল সেনের নতুন উপন্যাস
সোহাগ বাতি
মূল্য — ৪·০০

ডাঃ বাসুদেবের রহস্য উপন্যাস
কার্ণিভালে খুন
মূল্য — ৪·০০

সত্যবানের ২টি অনবদ্য গ্রন্থ
বেদ পরিচয়
মূল্য — ৫·০০

তন্ত্র পরিচয়
মূল্য — ৭·০০

লিপিকা : ৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়…তবে? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় রবারের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

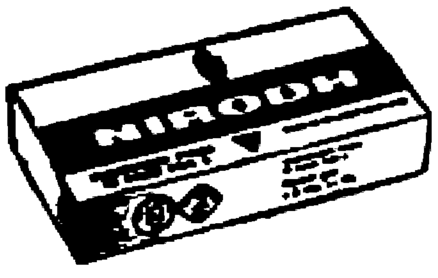

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সফল, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যাচ্ছে।

davp 70/580

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাবুকাকা সুটকেস নিয়ে এল, তারপর তারা তিনজন উঠে এল ওপরে। অরুণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল— কোন কষ্ট হয় নি আপনার।

একটু দাঁড়িয়ে দম নিলেন অসিতবাবু, তারপর বললেন, দেখ অরুণ, বুড়ো মানুষদের সঙ্গে সম্ভাষণ শুরু করা মানে আবার শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও তাই; সবটাই নিরর্থক। সে প্রশ্নগুলো এক সময় শুধু শিষ্টাচার বলে মনে হত; আমাদের মত বুড়োর কাছে এখন তার মানে অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। জান না, একবারে আমার বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা ছিল; তারপর যখন রোগে ধরল তখন রোগা হয়ে যেতে লাগলাম। সেটা স্বাভাবিক। একটা অসুস্থ লোক নিশ্চয় মোটা হবে না। তবে রোগা হওয়া নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত সকলেই যখন একই কথা বলতে লাগল তখন আমি শুধু বিপদে পড়লাম না, সত্যিই দমে গেলাম। রোজ আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, কতটা রোগা হয়েছি। আসল রোগের চেয়ে এই দুশ্চিন্তাটাই আমায় বেশী কাবু করে দিয়েছিল। তাঁর কথায় উপস্থিত হেসে উঠল সকলে।

কাপড়-জামা বদলাবে দিই? জিজ্ঞাসা করল হাবুকাকা। আগে চা খেয়ে তারপর অন্য কাজ, সোজা অসিতবাবুর হাস্য উত্তর দিল।

এইবার ঠিক হয়েছে হাবু। ঠিক বলেছ ত, আমি চা না খেয়ে নড়ছি না। সামনের একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

অনেক বোঝাবার পর অসিতবাবু বিছানাতেই শুতে দিলেন। তবে অন্যান্য অনুষ্ঠান তাঁর মনের মতই হল। বিকেল পরই অসিতবাবু, হাবুকাকাকে নিয়ে

CENTRAL LIBRARY

ফিরে গেলেন গ্রামে। নিতান্ত বাধা হলেই তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে, সীমা স্বাভাবিক আচরণই করল, কোন বিচ্যুতি ঘটল না তার। কিন্তু সেটা যে সেহাতই অভিনয় এটা বুঝতে দেরী হয়নি অরুণের।

বকুসারকে কাছে পেয়ে খুশী হল সীমা। এতদিন এত কোলাহল আর ভিড়ের মধ্যেও সে যেন একলা আর নিঃসঙ্গ ছিল। বিয়ের সময়ও সে নির্লিপ্ত ছিল। নতুন জীবনের অর্থ বা দায়িত্বের কথা সে একবারও চিন্তা করে নি। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে পুতুলের মত। অপরের পছন্দ অনুযায়ী সেজেছে, অন্যের নির্দেশমত আচার-আচরণ মেনে নিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশী আর কিছু নয়। যন্ত্রচালিতের মত শুধু উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ আর নিয়মগুলো পালন করেছে মাত্র। কিন্তু মনে তার জেগে আছে রাত্রের বিভীষিকার কথা! অরুণের আচরণ কেমন হবে সেই চিন্তায় সে মুহ্যমান হয়েছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে অরুণ ঘরে ঢুকে তাকে বলল, তুমি খাটে শুয়ে পড়, আমি কোচে শুচ্ছি।

কিছুক্ষণ আগে সীমা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছে। তার দেহের অলঙ্কারের মূল্য আর কিছু না হোক, বিশ তিরিশ হাজার টাকা হবে! কিন্তু কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি তার জন্যে। গয়নাগুলো তাই বিছানার একপাশে জড় করে রেখে দিয়েছে সে। অরুণ সেগুলো আলমারীতে তুলে রাখতে অনুরোধ করল। কথাটা শুনেও শুনল না সে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের বাজুটা ধরে।

কি হল—কাছে এল অরুণ।

না, কিছু নয়, আমি ভাবছি এ কি কল্পনায়। যে নিয়ম চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি, তাই শেষপর্যন্ত ঘটল আমারই জীবনে। এর জন্য দায়ী শুধু আপনি। এর ফল কিন্তু খুব খারাপ হ'তে পারে জানবেন। জোর করে আর সব পথ বন্ধ করে আপনি আমায় বিয়ে করেছেন। আমাকে নিঃসহায় জেনে আপনি এই জঘন্য সুযোগ নিলেন।

কিন্তু আমি ত কোন সুযোগই নিইনি এখনও। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়েছে মাত্র। সমাজ আর আইন জেনেছে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এছাড়া আমাদের মধ্যে কোন বন্ধনই জন্মায়নি। তুমি যদি আমার সঙ্গ পছন্দ না কর তাহলে সচ্ছন্দে বাবার কাছে গিয়ে থাকতে পার।

আপনার বাবার কাছেই বা আমি থাকতে যাব কেন? হারুকাকার মত আমিও কি আর একজন অনুগত ভৃত্য হ'লাম আপনাদের?

তাহলে তুমি কি করতে চাও?

তা জানি না; তবে এটুকু জেনে রাখুন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন আপনি।

একটা নতুন কথা শোনালে তুমি, একটা নতুন সম্ভাষণ শোনা গেল।

আমি আপনাকে স্বামী বলে স্বীকার করি না। সমাজ বা আইনের কোন মানে নেই আমার কাছে। একথা আগেও জানিয়েছি, এখনও বলছি।

কথা না বাড়িয়ে কোচে শুয়ে পড়ল অরুণ, ক্লান্ত বোধ করছে সে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখতে লাগল সীমা। উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে তবুও আলোগুলো জেলে রেখেছে ওরা। এত আলো কোথায় ছিল? তার জীবনকে কেন্দ্র করে সে শুধু অন্ধকারই দেখেছে—কাল মিশমিশে ভয়াবহ অন্ধকার!......

সন্ধ্যা হ'লেই বাড়ীতে থাকতে ভয় হয় সীমার। আরশোলাগুলো রাত্রেই বার হয়। এত আরশোলা দিনের বেলায় কোথায় লুকিয়ে থাকে? কি বিশ্রীভাবে চলে ওগুলো। এঁকে বেঁকে ঠিক গায়ে এসে বসবেই। বদাকার বীভৎস জীব। ইলেকট্রিক বেশী পুড়বে বলে তাদের ঘরের আলোটা না জেলে একটা মিটমিটে হ্যারিকেন জ্বালান হয়। তাতেই পড়ে সীমা। কিন্তু কম তেলের জন্যে একটু পরেই সেটা দপ দপ করে নিভে যায়। তখন হয় বিপদ। বাইরের আলো এসে ঘরের মধ্যে বিচিত্র আকৃতির ছায়া সৃষ্টি করে। এক একটা এক এক রকমের। কোনটা শুধু এক বিরাট মাথার মত, কোনটা দেখলে মনে হয় একটা দেহ যেন ঝুলছে শূন্যে থেকে। এ সময়টা চোখ বুজে সে বিছানায় শুয়ে থাকে। বাবার নাইট ডিউটি। পাশের ঘরে নান্টুকাকা আর মায়ের চাপা গলা আর হাসির শব্দ। বাবা বলেছেন ভয় পেলে রামকৃষ্ণকে জানাতে। অনেক বার সে জানিয়েছে, কিন্তু আলোও জ্বলল না, ভয়ও গেল না। অন্ধকারে আরশোলাগুলো অস্ফুট শব্দ করতে পারে। সামান্য কাগজের ওপর বসলে মনে হয় কে যেন দেয়ালে আঁচড়াচ্ছে। ওড়বার সময় পাখায় একটা বিশ্রী আওয়াজ করে ওরা—ফুর্‌রুর্‌! বোর্ডিংয়ে যখন ভর্তি হ'ল তখন সে ভেবেছিল এ ভয় আর থাকবে না হয়ত! কিন্তু তাও হ'ল না। রাত নটার পর আলো বন্ধ হয়ে যায়। লম্বা হলে পাশাপাশি বিছানা। কিন্তু তা হ'লে কি হবে? অন্ধকার হ'লেই তার মনে হয় সে যেন বাড়ীতেই রয়েছে। সেই ছায়াগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারিদিকে।

মুখ ফিরিয়ে দেখল সীমা। অরুণ অকাতরে ঘুমোচ্ছে কোচের ওপর। একটা বাহুর ওপর মাথা রেখে পাদুটো জুড়ে পাশ ফিরে রয়েছে সে। ঘটনাটা তার কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু। একটা পুরুষ বন্ধ ঘরে তার সঙ্গে রয়েছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না, এমন কি সেও আপত্তি জানাতে পারছে না। দুটো সইয়ের জোরে লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা সমান তালে বয়ে চলেছে। বিছানায় রাখা গয়নার দিকে তাকাল সীমা। স্তিমিত আলোতেও ঝলমল করে উঠল সেগুলো। তার এ্যাটাচি কেসটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এখনও জানে না সীমা। না হ'লে এ সুযোগ সে ছাড়ত না। উৎসবের পর সকলেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে অরুণের মত। তবে একটা বাধা রয়েছে। বকুসার। রাত্রে শেষে তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। তাই ফুলশয্যার রাত্রের সুযোগটা সে ব্যবহার করতে পারল না।

অসিতবাবুর গ্রামের বাড়ীতে চলে যাবার অপেক্ষায় ছিল সীমা। এই একটা লোককে সে সমীহ করে। তাঁর সম্মুখে সকলের অগোচরে পালিয়ে যেতে কোথায় যেন বেধেছিল তার। লজ্জা বা ভয় নয়। বাবার পকেট থেকে যেদিন একটা আধুলি নিয়েছিল সে, সেদিনও তার মনটা এরকম হয়েছিল। এবার সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সেদিন অরুণ অফিস যাবার পর সে একবার রান্না ঘরে গেল। দুজন লোক আছে বাড়ীতে একজন রান্নার কাজ করে অপরজন ঘরদোর পরিষ্কার করে। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতে হেমন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেল তাকে দেখে। বয়স তার কম, বছর সতেরোর মত হবে।

তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করল সীমা।

হেমন্ত দাস। লাজুক মুখে তাকিয়ে রইল সে সীমার দিকে।

কতদিন কাজ করছ? হেমন্তর শীর্ণ দেহের দিকে একবার নজর করল সীমা।

প্রায় এক বছর। আস্তে করে উত্তর দিল হেমন্ত।

তোমার বাড়ী কোথায়?

মেদিনীপুর।

কে আছে বাড়ীতে?

মা, বাবা, ভাই সবাই আছে। তাড়াতাড়ি বলতে গেলে হেমন্তর কথা আটকে যায়।

তার দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখল সীমা। পরনে একটা হাফ প্যান্ট আর ময়লা গেঞ্জি। মাইনের কথা আর জিজ্ঞেস করল না সে। গৃহকর্ত্রী হয়ে প্রশ্নটা করা অবান্তর হবে। সেখান থেকে সীমা ড্রয়িং রুমে ঢুকল। এই ঘরটাতেই তাকে উৎসবের দিন বসান হয়েছিল। একটা ফুল দেওয়া কোচে সে বসেছিল ঘন্টার পর ঘন্টা। অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা বলেছে শিষ্টাচার বজায় রেখে। অসহ্য লাগছিল তার সেই সময়ে। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আবার সে বেডরুমে ঢুকল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা টুলে বসে তাকাল সে নিজের ছায়ার দিকে। নিজেকে চিনতে অসুবিধে হ'ল তার। এই কয়েক সপ্তাহে এত বিরাট পরিবর্তন তার এলো কি করে সেটা চিন্তা করতে লাগল সীমা। চুলটা একটু বড় হয়েছে। মুখের, কপালের আর চোখের পাশে যে কুঞ্চিত রেখাগুলো জন্ম নিয়েছিল সেগুলো অদৃশ্য প্রায়। গালে একটা রক্তিম ছোঁয়াচ রয়েছে স্পষ্ট। অবাক হয়ে সীমা তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল বাথরুমের ভেতরে। অখণ্ড আর অজস্র তার সময়। কেউ তাকে বিরক্ত করছে না, পীড়িত করছে না কোন দুশ্চিন্তা। একটা দুঃসহ বেদনাজনক ক্লান্তি অনুভব করল সীমা। তার বাক্তিত্ব এমনকি তার পুরো সত্তাটা যেন পালটে গিয়েছে। প্রচণ্ড একটা টাইফুনের পর আর যেন দুর্বল হয়েছে।

কষ্ট হচ্ছে তার ঠিকমত ভাবতে যা কাজ করছে। সে যেন বেলাইন হয়ে গিয়েছে। পরিচিত সুগম রাস্তাটা সে আর খুঁজে পাচ্ছে না কোনমতে। না, ভাল লাগছে না সীমার। তার কারণটা সে এতক্ষণে অনুভব করতে পেরেছে। সে নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছে। উত্তেজনা অদৃশ্য হয়ে তাকে অকর্মণ্য আর জড়বৎ করে দিয়েছে। এরা তাকে সুক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে। ভোঁতা করে দিচ্ছে তার অনুভূতিগুলো। কিছুদিন পরে সে হাসুকোকার মতই এদের একজন ক্রীতদাস হয়ে পড়বে এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। এদের চালটা ধরতে পেরেছে সীমা। সাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে রইল সে। জলের ধারা তার শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিল বটে, কিন্তু মনে একটা তীব্র আক্রোশ জন্মাতে শুরু করল। নানারকম প্রলোভনের উপকরণ এঁরা তার চতুর্দিকে সাজিয়েছে তাকে বশ করার জন্যে। অপর্যাপ্ত সময় ভোগ বিলাসের আরামে তাকে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে এরা। এত বোকা সে নয়। নিজেকে সে এতদিন চালিয়েছে, বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত শক্তি আছে কিনা, এটা সে ভালভাবেই বুঝিয়ে দেবে ওদের। তোয়ালে দিয়ে গা মুছল সীমা। তোয়ালেতে একটা মৃদু সুবাস পেল সে। অরুণের ঘরেও এ গন্ধ সে পেয়ে থাকে। র‍্যাকের ওপর তাকিয়ে সে দেখল প্রসাধনের জিনিসগুলো। তার নিজের জন্যে যেগুলো সাজান আছে তার মধ্যে বেশীরভাগই সে ব্যবহার করেনি। মাত্র তেল আর ক্রীমটাই কাজে লেগেছে তার। অরুণের সেফটি রেজর, সেভিংক্রীম, আর লোশন রয়েছে, তার টয়লেটের পাশে। তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টাওয়েল স্ট্যাণ্ডে ফেলে দিল সে! হঠাৎ আর একটা তোয়ালের প্রয়োজন বোধ করল। এতদিন এটা লক্ষ্য করেনি বলে নিজের ওপর বিরক্ত হল সীমা। কাপড় বদলে সে ঘরের মধ্যে দাঁড়াতেই হেমন্ত জানাল যে টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। সীমার মনে পড়ল তাকে আর নিজের জন্য রাঁধতে হবে না। তার সুখ-সুবিধের জন্য এ-দুজন লোক সর্বদাই ব্যস্ত আর শঙ্কিত হয়ে রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে পঙ্গু হয়ে যাবে। তার মনের উত্তাপটা সে আর অনুভব করতে পারছে না যেন। আজকাল সে পাশের একটা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তার ঘরেতেই বকুসার থাকে। হসপিটাল থেকে আসার পর আবার নতুন জায়গায় আসাতে সেও সীমার মত সাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না।

অরুণ সেদিন একটু সকালেই অফিস থেকে ফিরল। সীমার ঘরে গিয়ে বসল।

আজ সিনেমার টিকিট কেটেছি চল।

আপনি যান, আমি বকুসারের কাছে থাকি।

তা হয় না, তাহলে আমারও যাওয়া হয় না।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। বকুসার [illegible]

তোমার কুকুর তোমারই মত অপছন্দ করে আমাকে।

আমি ছাড়া আর কাউকেই ও পছন্দ করে না।

ভাল কথা, মোদী কোম্পানীর টাকাটা আজ দিয়ে দিলাম।

কোন উত্তর দিল না সীমা। তার একবার মনে হল এ্যাটাচিকেসটার কথা জিজ্ঞেস করতে। টাকাটা তাই থেকেই নেওয়া হয়েছে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল চাবিটা এখনও তার কাছেই রয়েছে।

চল, আর দেরী কোরো না।

উঠে দাঁড়াল অরুণ। চুপ করে ভাবল সীমা। তারপর বলল, চলুন। আমি কাপড়টা ছেড়ে আসছি।

অনেক দিন সিনেমা দেখেনি সে। স্কুলের মাদার তাদের কয়েকবার নিয়ে গিয়েছিল সিনেমায়।

'সাউণ্ড অব মিউজিক'-এর টিকিট কেটেছে অরুণ।

কনভেন্টে মানুষ মারিয়া। গান ভালবাসে সে। সঙ্গীতের জন্যই যেন জন্ম তার। উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত মারিয়া। কনভেন্টের মাদাররা তাকে পেরে ওঠেন না। উধাও হয়ে যায় সে মাঠে ঘাটে। পাহাড়ে পর্বতে, কোথায় কেউ ঠিকানা জানে না। সেই মেয়ে কড়া মেজাজের বিপত্নীক কাউন্টের ঘরে তার ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনার জন্য নিযুক্ত হল। কিশোর-কিশোরী আর শিশুরা এতদিন বাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। মারিয়া তাদের গান গেয়ে, নেচে মন হরণ করে নিল। গাম্ভীর্যের দেওয়াল ভেঙে আনন্দের জোয়ার বইল। ......অবাক লাগল সীমার। মারিয়ার মত সেও মাদারদের সাহচর্যে মানুষ। কিন্তু সে কেন আনন্দ পায়নি কোন দিন; তার জীবন হাসি-আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল কি করে।

কেমন লাগল। জিজ্ঞেস করল অরুণ।

ভাল, কিন্তু অস্বাভাবিক। উত্তর দিল সীমা।

অস্বাভাবিক কোথায় দেখলে?

অত আনন্দ আর হাসি মারিয়া পেল কোথা থেকে?

ওর স্বভাব থেকে সেটা ফুটেছে।

কিন্তু দুঃখ, বেদনার কোন চিহ্ন নেই কেন?

সেটা যারা বড় করে ভাবে তাদের জীবনেই দেখা দেয় বেশী করে। কোন কথা বলল না সীমা—চুপ করে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে ডাক্তার সোমকে বিখ্যাত বলা যায়। অরুণ সেই কারণে তাঁর সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল।

ডাঃ সোম মন দিয়ে তার কথা শুনে বললেন, দেখুন, ক্লিপ্টোম্যানিয়াক যারা তারা সৌখীন চোর। এর তার বাড়ী থেকে বা দোকানের কাউন্টার থেকে সকলের অলক্ষ্যে একটা জিনিস তুলে নেওয়া তাদের কাজ। এতে তাদের দুঃখ ঘুচবে না কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এরা ধনী বলেই জানা গিয়েছে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস হলেও এদের আপত্তি নেই। ছিঁচকে চোরের মত জিনিসটা সরাতে পারলেই এদের আনন্দ। কিন্তু যারা ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে সাজিয়ে গুছিয়ে চুরি করতে অভ্যস্ত তাদের কথা আলাদা।

আলাদা মানে?

আলাদা মানে এরা ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে হঠাৎ করে না এবং সেই কারণে অপরাধীর দিক থেকে এদের প্রথম শ্রেণীতেই ফেলা উচিত।

এদের পেছনে যদি মনোবিকার থাকে? মুখ শুকিয়ে গেল অরুণের। প্রত্যেক অপরাধের পেছনেই মনোবিকার থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ সংকলন

নবম বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন
১৩৭৮

সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), রমা চৌধুরী ('ডাকা দেওয়া'), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা), দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শিল্প সুন্দর ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা), সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী), আশুতোষ ভট্টাচার্য (অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য), সুধীর নন্দী (অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পতত্ত্ব), উমা মুখোপাধ্যায় (পিতৃস্মৃতি), সুধা বসু (কুটুমকাটামের রূপকার অবনীন্দ্রনাথ), ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক (অবনীন্দ্রনাথের কবিতা ও অপ্রকাশিত রচনা 'খাপছাড়া উপাসক'), অজিতকুমার ঘোষ (সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ), অমর ভৌমিক (অবনীন্দ্রনাথ), চিত্তরঞ্জন রায় (শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

চিত্রসূচী । সুরমাধবের অবনীন্দ্রনাথ, ভারতমাতা (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), দেবদাসের শাহজাহান (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'খাপছাড়া উপাসক' চিত্র সংবলিত (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র : প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক : পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ। ১২/১ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

CENTRAL LIBRARY

তাহলে আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি করা যায়?

সাইকো এনালিসিস করলেই মনের জট খুলে যাবে। রোগী যদি তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে, তাহলে তাকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

আমার মনে হয় আমার স্ত্রী সব কথা খুলে নাও বলতে পারে। সাধারণতঃ সে নিজের কথা বলতে বা সত্য কথা এড়িয়ে যেতে নানা চাতুরীর আশ্রয় নেয়।

তার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। নিজের দোষ সকলেই গোপন করতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এই ধরনের মানসিক ব্যাধিতে যারা ভুগে থাকে তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক বলা যায়। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম?

আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই। আমি এক ঘরে আর সে আর এক ঘরে থাকে।

অন্য ধরনের মেলামেশা?—

প্রায় নেই। কথা বললে তার উত্তর দেয় মাত্র, এছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে বেশীর ভাগ সময়েই।

সংসারের কাজ কিছু করেন?

না; শুধু নিজের জামা-কাপড়গুলো নিজে কাচে, কাউকে হাত দিতে দেয় না।

সাধারণতঃ কে আপনাদের কাপড় কাচে?

চাকর আছে দুজন। তারাই এ-কাজটা করে থাকে।

কি নেই? [illegible]

না।

ওর ফ্যামিলির কোন খোঁজ জানেন?

না, বিয়ের সময়ও কেউ আসেনি। জিজ্ঞেস করলে বলে ওর কেউ নেই।

বাড়ীতে অন্য কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেন যা দেখেন বলে খবর রাখেন?

হেমন্ত বলে যে চাকরটা আছে তার সঙ্গে বেশী কথা বলতে দেখেছি।

কোন সখ আছে?

হ্যাঁ, কুকুর ভালবাসে; বিয়ের সময় একটা সর্ত ছিল যেন তার কুকুরকে বাড়ীতে রাখি।

আর কোন সর্ত ছিল?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করবে না। অবশ্য বাবা বর্তমান ছিলেন তখনও আমার ঘরেই ছিল; তবে আলাদা বিছানায় শুয়েছি আমি।

আপনার বাবাকে উনি ভয় করেন?

না, আমার বাবাই একমাত্র লোক যাঁর সঙ্গে কথা বলতে বা সেবা করতেও আমার স্ত্রী ভালবাসে। তবে কুকুরের ওপর একটা অস্বাভাবিক টান আছে সীমার।

কি রকম? ডাঃ সোম তাকালেন অরুণের দিকে।

নিজের ঘরের মধ্যেই কুকুরটাকে রাখে।

ছোট জাতের কুকুর?

না, বেশ বড় জাতের। ভয়ানক [illegible] দেখতে।

আচ্ছা ঘর থেকে অন্য কিছু — কথাটা শেষ করলেন না ডাঃ সোম।

না, অন্য কিছু হারায়নি এখন পর্যন্ত। গয়না বা মূল্যবান জিনিস যে আলমারীতে থাকে তার চাবি ওর কাছেই।

গয়না বা কাপড়-জামা ভালবাসেন?

একেবারেই না। বিয়ের সময় ভাল কাপড়-জামা আর গয়না পরেছিল। তারপর থেকে সাধারণ কাপড়-জামাই পরে থাকে।

সেগুলি কি আপনাদের দেওয়া?

হ্যাঁ, সাধারণ সুতীর কাপড়।

আপনাদের চাকর হেমন্তর কত বয়স?

বছর সতের হবে। সেই স্নানের কাজ করে।

আমি আপনার স্ত্রীর কেস নেব — উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ সোম, তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, এ চিকিৎসা সময় সাপেক্ষ।

তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি অপেক্ষা করব।

আপনার স্ত্রীকে চিকিৎসার কথা বলেছেন কিছু?

সামান্য উল্লেখ করেছি মাত্র।

কোন মন্তব্য করেছেন?

না, কিছুই বলেননি।

বেশ, সামনের সোমবার বেলা চারটের সময় ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন আমার চেম্বারে। কয়েকটা সিটিংয়ের পর ফলাফল সম্বন্ধে আপনাকে জানাব।

রবিবার সকালে অরুণ কথাটা পাড়ল সীমার কাছে। প্রস্তাবটা যে সহজ হবে না এটা সে অনুমান করেছিল। প্রশ্নের উত্তরে সীমা বলল, ডাক্তারের কাছে কেন? আমার শরীর-ত ভালই আছে।

ডাঃ সোম মানসিক চিকিৎসক, বলল অরুণ।

পাগলের ডাক্তারে আমার কি হবে, আমি কি পাগল?

না, তা নয়, তবে সব মানুষেরই মনের মধ্যে অনেক হেঁয়ালী আর ভয় লুকিয়ে থাকে। তার থেকে অনেক বিপর্যয় ঘটে যায়। অস্বাভাবিক রূপ নেয় মানসিক দুঃখিন্তাগুলো। চুপ করে রইল সীমা।

দেখ তোমার কাছে আমি কিছুই চাই নি। আমার স্বামী বলে না মান, সাধারণ ভদ্রলোক হিসেবে আমার এ অনুরোধটা রাখ।

আমি ওষুধ বা ইনজেকসন নেব না।

না, এতে ওষুধ বা ইনজেকসনের প্রয়োজনই হবে না।

তা হলে?

ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলবেন।

তাতে কি লাভ?

আছে, কথা বলেই উনি তোমার মনের কথা বুঝে নেবেন।

রাজী হল সীমা। এদের সব জিনিসগুলো জানতে চায় সে। এরা কিভাবে থাকে, ব্যবহার, এদের চালচলন এমন কি চিকিৎসা-পদ্ধতিটাই সে জেনে নেবে।

ডাঃ সোমকে দেখে মনে মনে হাসল সীমা। দেখতে নিতান্তই সাধারণ। প্রায় ষাট বছর বয়স। মোটা চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ একজোড়া। একটা সাদা এপ্রন পরে আছেন তিনি। এই লোকের নাকি দেশজোড়া নাম। সামনের চেয়ারে বসল সীমা।

দেখুন আপনি যে আমার রাজী হয়েছেন তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

(তা ত হবেনই, সেটা কি তা না হলে পারেন কি করে, ভাবল সীমা।) আমাদের সকলের মধ্যেই অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর জন্য অনেক সময় বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়।

(অরুণ বাবু চুরির কথা বলেছেন হয়ত। স্বামীকে কেউ অরুণবাবু বলে? কই ডাক্তারবাবু আপনি ত আমার মনের কথা ধরতে পারছেন না।)

অরুণবাবুকে আপনার কেমন লাগে?

ভাল নয়।

কেন?

অপরের সঙ্গে অযথা কৌতূহল আর অভদ্র ব্যবহারের জন্যে।

আপনি এই কৌচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ুন, বললেন ডাঃ সোম। শুয়ে পড়ব? চমকে উঠেছে সীমা কথাটা শুনে।

হ্যাঁ, রিল্যাক্স করলে আপনার সুবিধে হবে।

কৌচে শুয়ে পড়ল সীমা।

শরীরকে একেবারে ঢিলে করে দিন আর আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

বেশ মজা লাগছে সীমার। প্রশ্নের জবাব সে এমনভাবে দেবে যে ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে যাবে।

বিয়ে বললে আপনার কি মনে হয়?

কিছু না, শক্ত হয়ে উত্তর দিল সীমা।

একটা কিছু মনে নিশ্চয় হয় আর সেটা আপনি যদি না বলেন তাহলে চিকিৎসা হবে কি করে?

(চিকিৎসা না মুন্ডু; একজনকে শুইয়ে তাকে আজেবাজে প্রশ্ন করলেই চিকিৎসা হল?)

আচ্ছা, এবার বলুন বিয়ে বললে কি মনে হয়, কথাটা বললে আপনার মনে যা আসবে তাই বলবেন কিছু এসে যাবে না তাতে। তবে ভেবেচিন্তে বলার কোন দরকার নেই।

তবু চুপ করে রইল সীমা।

কি হল, বলুন কিছু; বিয়ে বললে কি মনে পড়ে?

লুচি, হাসল সীমা।

বেশ, আর কি?

সানাই, লোকজনের ভিড়—উলু-উলু-উলু—

বলুন—

গয়না - শাড়ী - ফুল - মালা-বাসরঘর-নতুন কাপড়ের খসখস আওয়াজ—হাসি-গান ফুলশয্যা-লাল আলো-খাটে মালা ঝুলছে—দরজা বন্ধ...না খোল, দরজা খুলে দাও। চুপ করল সীমা। এটা কি হল? নিজের

[illegible]

হয়েছে। হঠাৎ দরজা খুলে দাও বলল কেন সে?

আপনার বিয়ে কতদিন হয়েছে?

(ডাক্তার কি নার্সিং নেব, কথাটা নাকি সুরে কেন?)। আমার বিয়ে হয়নি। এরকম ইচ্ছে করে উল্টোপাল্টা কথা বললে আমাদের অসুবিধে হবে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই মিসেস বসু। একথা স্মরণ রাখবেন। এবার বলুন আপনার কে আছেন?

কেউ নেই।

বাবা কি করতেন?

অফিসে কাজ করতেন।

বাবাকে মনে পড়ে?

হ্যাঁ।

কিরকম দেখতে বলুন।

বেঁটে, মোটা চোখে চশমা, চুলটা ব্যাকব্রাশ করা। অবিকল নান্দুকাকার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বসল সীমা।

মা কেমন দেখতে ছিলেন?

ভাল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। ডাঃ সোম চুপ করে কৌচের পিছনে বসে আছেন, সীমা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

মা নিজে রাঁধতেন?

হ্যাঁ, নিজে রাঁধার অনেক সুখ। যা ইচ্ছে খাও, যাকে ইচ্ছে দাও, কেউ বলতে আসবে না। ডাল, ভাত, মাংস—বেশ গন্ধ! রান্নাঘর থেকে টগবগ করে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মাংস ফুটছে। মাংস করতে অনেক দেরী হয়। ঘুম পায়। বাসন-থালা, বাটি, রেকাব ছাই দিয়ে মাজতে হয়। কলে একটা কাপড়ের ফালি বাঁধা, জল পড়ছে। জল মানে বৃষ্টি? ঝড় উঠেছে—বাবা—

চুপ করলেন কেন, বলুন—। ডাঃ সোমের গলা।

কোন জবাব দিল না সীমা। এ লোকটা তার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। সাবধান হল সীমা।

আপনি কুকুর ভালবাসেন?

হ্যাঁ।

আপনার কুকুর আছে?

হ্যাঁ, বক্সার, মাঝে অসুখ হয়েছিল বলে হাসপাতালে রাখতে হয়েছিল।

ছোট জাতের?

না, বড়; একবার ধরলে শেষ করে ছাড়বে। দু-একজন লোককে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা তারপক্ষে কিছুই নয়। ওর ভয়ে কেউ ঘেঁষতে পারে না আমার কাছে। চোখের দৃষ্টিটা রুক্ষ হয়ে উঠল সীমার।

পুরুষ বললে আপনার কি মনে হয়?

সিগারেটের ধোঁয়া, ক্ষুর, প্যান্টসার্ট, বড় বড় জুতো, অসভ্যর মত হাসি, ঘামের গন্ধ, পুলিশ—পুরুষ আর নারী, নারীর পাশে পুরুষের প্রয়োজন নেই—নারীকে ক্রীতদাসী করে রেখেছে পুরুষ। স্বার্থপর, নির্লজ্জ ভণ্ডর জাত ওরা।

আপনি মন্দিরে গেছেন কখনও?

কোন মন্দির?

যে কোন দেবতার স্থান।

ছোট্ট হয়ত ছোটবেলায়।

ভগবান বললে কি মনে হয়?

ভগবান আবার কি? যীশু, মহম্মদ, কৃষ্ণ, কালী? সাঁওতাল বা নাগাদের ভগবানের নাম কি? ভগবানের লিঙ্গ আছে কি না কে জানে? মানুষের সংখ্যা বড় ভগবানের সংখ্যা কি তার চেয়ে বেশী না কম ভগবানের পরে অবতার পাপ পুণ্য—রামকৃষ্ণ, মানুলী। সেরে যাবে বাবা, এখুনি কাশি কমে যাবে। চুপ করল সীমা। ঘরটা নিস্তব্ধ।

ঝড় বললে আপনার কিছু মনে হয়? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

ধুলো, ঝড়ে উড়ে যাওয়া গাছের পাতা, ভিজে মাটি, স্যাঁতসেঁতে মেঝে, ভাঙা জানলায় আওয়াজ—ক্যাঁচক্যাঁচ। কে ওখানে? জল পড়ছে ঝমঝম করে। মেঘ ডাকছে। বাজ পড়ল একটা। উঃ বাবা—চীৎকার করে উঠল সীমা। আবার নিস্তব্ধতা।

আপনি বাজের শব্দে ভয় পান? একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

হ্যাঁ, চোখ দিয়ে জল পড়ছে সীমার।

থ্যাঙ্কস মিসেস বসু, আজ এই পর্যন্তই থাক। আবার কবে আসবেন? মনের বাঁধন আলগা হয়েছে বলে মনে হল তাঁর।

আবার আসতে হবে? জিজ্ঞেস করল সীমা।

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। কেন, এতে আপনার কিছু অসুবিধে হয়?

না, তা নয়, আচ্ছা আসব।

কেমন অদ্ভুত লাগছে যেন সীমার। তার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন আরও একজন কে রয়েছে। সে বেশ বুঝতে পারে তার অস্তিত্ব। অনেক সময় তার মনে হয় সে যেন নিজে কিছুই করছে না। তার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তার ভেতর সেই অপরিচিত মেয়েটা তার হয়ে সব করছে। একথাটা ডাক্তারকে বা অন্য কাউকে বলেনি সীমা। তার একথা কেউ বিশ্বাস করবে না তা সে জানে। সেই জন্যেই কথাটা গোপন করে রেখেছে সে।

বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়ল সীমা। অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সে। কি সব আবোলতাবোল বকিয়েছে লোকটা। মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছে।

অরুণের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল বাথরুম থেকে। রাতেও ভদ্রলোক কাশছেন কয়েকদিন ধরে। গত রাতে কাশির শব্দে বক্সারের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়ে সে আওয়াজ করেছিল বলে মনে আছে। সিগারেট খাওয়া অরুণের ছেড়ে দিয়েছে এটা লক্ষ্য করেছে সীমা। বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল সে। অরুণ পায়জামা আর কোর্তা পরেছে। সীমার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে, তারপর বলল, আসতে পারি?

আমিই আসছি, বলল সীমা। তার ঘরে আর কেউ আসুক এটা পছন্দ করে না সে।

বাইরে এসে অরুণের দিকে তাকিয়ে সীমা বলল, কি বলছেন?

ডাক্তার সোম কি বললেন?

আজেবাজে কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিলেন?

বিরক্ত লাগে তোমার?

না তা নয়, বরঞ্চ মজা লাগে। ডাক্তার নিজেই পাগল বোধহয়।

একজন বিখ্যাত লোক উনি, সহজে ওঁকে পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, ওয়েটিং রুমে বেশ ভিড় দেখেছি।

আজ রাত্রে আমি খাব না, হেমন্তকে বলে দিও। বোধহয় জ্বর এসেছে। অফিসেই শুরু হয়েছে জ্বরটা। কথাটা বলে কাশতে শুরু করল অরুণ। লম্বা একটানা কাশ।

অরুণ চলে যাবার পর সীমার মনে হল একবার অরুণকে ভাল করে প্রশ্ন করা তার উচিত ছিল। অন্য কিছু নয়। সামান্য ভদ্রতা বা শিষ্টাচারে বিশেষ কিছু ক্ষতি হত না তার। একবার ভাবল অরুণের ঘরে যাবার কথা। কিন্তু এক-পা গিয়েই আবার থেমে গেল সে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বক্সারের পাশে বসে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল ধীরে ধীরে।

বক্সার একবার তার দিকে তাকাল। এখানে এসে অবধি সীমা তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়নি। এ কাজটা আর একজন চাকর করুণাই করে থাকে। বক্সার তাতে মোটেই খুশী নয়। করুণা তাকে চেনে না। তার মেজাজ অনুযায়ী থামা বা চলার ইঙ্গিতটা সে বোঝে না মোটেই। এটা বক্সারের পক্ষে বিরক্তিজনক। বিরক্তি থেকে রাগ আসে। সুতরাং তার মেজাজ যদি হঠাৎ বিগড়ে যায় তাহলে তাকে দোষারোপ করা অন্যায় হবে। আর একবার সীমার দিকে তাকিয়ে সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করল। সীমা চেনটা খুলে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে। সামনের লনে বক্সারকে ঘুরিয়ে সে উঠে এল। রাস্তায় বার হবার ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু অরুণের বাড়ীটা অভিজাত পল্লীর মধ্যে। বক্সারের মত বিরাট কুকুর আর নিজে একটা গবু নিয়ে রাস্তায় যেতে তার বাধবাধ ঠেকল।

ঘরে এসে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে সীমার তন্দ্রা এল।

বৌদি, হেমন্তর আর্তস্বর।

কে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সীমা, কি হয়েছে?

দাদাবাবুকে একবার দেখবেন আসুন। বাইরে থেকে বলল সে।

হেমন্তর সঙ্গে অরুণের ঘরে গিয়ে ঢুকল সীমা। অরুণ শুয়ে আছে বিছানায় চিৎ হয়ে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর হেমন্তর দিকে তাকাতে সে বলল—

ডাকছি, সাড়া দিচ্ছেন না।

ঘুমোচ্ছেন হয় ত, তুমি একটু জোরে ডাক, বলল সীমা।

(ক্রমশঃ)

সুরসিক চার্চিল 'কৌতুক' ফ্রন্টও

সুনীলকুমার নাগ

অ্যারিস্টটলের একটা কথা আছে, যার অর্থ অনেকটা এইরকম : গাম্ভীর্যের প্রকৃত পরীক্ষাই হলো বিদ্রূপের কাছে; বিদ্রূপের আঘাতে যে গাম্ভীর্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং রসহানি ঘটায়, বুঝতে হবে, তা আদৌ প্রকৃত গাম্ভীর্য নয়। সে-ব্যক্তি তার কোনও দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে গাম্ভীর্যের বর্ম এঁটে ছিল নিশ্চয়ই। যে কোনও সত্য, যথার্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ব্যক্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চরম পরীক্ষাও অক্লেশে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে এই অন্তর্নিহিত গুণটিই হলো তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

গ্রীক ঋষির এই কথাগুলি মনে রেখে আমরা যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ইউরোপের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কৌতুক-রসবোধের আলোচনা করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো চরম পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কী শক্তির বলে তাঁরা দুঃসময় কাটিয়ে উঠে শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলেন।

সকলেই জানেন, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার নেভিল চেম্বারলেন অ্যানুইরিন বিভান যাকে 'কল্পনাশক্তি-বিবর্জিত বন্ধ্যা মানসিকতার অবতার' বলে খাস হাউস অব কমন্সেই গালাগাল দিয়েছিলেন তাঁর হিটলার-তোষণ নীতির চরমে উঠেও, অর্থাৎ অস্ট্রিয়া - চেকোস্লোভাকিয়া - মেমেল-ডানজিগ প্রভৃতি দখল করে নেবার প্রশ্নে সম্মতি জানাবার পরেও হিটলারকে পোল্যান্ড আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করবার দুদিন বাদে ব্রিটেনের জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বৃটেন ও ফ্রান্সকে একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হল। শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এ যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশক্তি জার্মানী ও ইটালীর কাছে প্রতি রণাঙ্গনেই যাচ্ছেতাই রকম হেরে যেতে লাগলো। ফ্রান্সে পনেরো-বিশদিন অন্তর, সাতদিন অন্তর, এমনকি সপ্তাহে তিনবার করে নতুন মন্ত্রিসভা দেশরক্ষার দায়িত্ব নিতে শুরু করলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও পারলো না। এদিকে ব্রিটেনেও চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সদস্যরা, খবরের কাগজ এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ সংগঠিত হয়ে উঠছিল।

একদিন চেম্বারলেন অবশেষে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করলেন : 'মাননীয় সদস্যগণ, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ব্রিটিশ জাতি এ দুর্দিন কাটিয়ে উঠবে, আমিও নিশ্চয়ই নির্বান্ধব হইনি। কেবল আমার কাজের সমালোচনা না করে, সকলে আমার পাশে এসে দাঁড়ান। স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ হন।'

এ বক্তৃতার জবাবে চেম্বারলেনের টোরী দলেরই অন্যতম প্রধান সদস্য (পরে চার্চিলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার ভারত-সচিব) লিওপোল্ড আমেরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের সামনে আমি আমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিতে চাইছি। লঙ পার্লামেন্ট বাতিল করার সময় ক্রমওয়েল যে কথাগুলি সদস্যদের বলেছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেই কথাগুলিই আমি বলছি : আপনি দীর্ঘকাল গদি-আঁকড়ে থেকে আপনার অপদার্থতা সপ্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন, আর কেন। ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের আপনার সঙ্গ-মুক্ত হবার সুযোগ দিন।'

আমেরীর উক্তিকে সব দলের সদস্যরাই 'হিয়ার হিয়ার' বলে সমর্থন জানালো। বৃদ্ধ চেম্বারলেন অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তাঁকেও কেউ সমর্থন জানাবে এ আশায়। কিন্তু না। তা হলো না। চেম্বারলেন অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ডেভিড লয়েড জর্জ (প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী) ধীরে ধীরে চেম্বারলেনের কথার সূত্র ধরে বললেন: 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা করবার কোনই হেতু নেই। তিনি নির্বান্ধব নন। এখানে সকলেই তাঁর মিত্র। তবে কিনা ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ব্যক্তিবিশেষের কে বন্ধু বা কে শত্রু, তাতে কিছুই যায় আসে না। বর্তমানের প্রশ্নটা আমাদের গোটা জাতিকে নিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আত্মত্যাগের কথা বলেছেন। তিনিও আমাদের নেতা। তিনি স্বয়ং ছোট একটু আত্মত্যাগ করে, অর্থাৎ কিনা প্রধানমন্ত্রীর পদটি ছেড়ে দিয়ে আর সকলের সামনে একটা দৃষ্টান্ত রাখুন না কেন।'

লয়েড জর্জ যথোচিত সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কটি বলে নিজের আসনে চুপচাপ বসে রইলেন। কমন্স সভার চারিদিকে নানা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো। একটু পরেই সেদিনের অধিবেশন শেষ হলো। পরদিন চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন।

এরপরে উইনস্টন চার্চিল এলেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে। জাতির এ দুঃসময়ে কেবল একটা দলের হয়ে যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করা উচিত হবে না মনে করে সব প্রধান দলগুলিকে নিয়ে তিনি 'ন্যাশনাল কোয়ালিশন' সরকার গঠন করলেন।

দুদিন বাদে প্রধানমন্ত্রীর ডাউনিং স্ট্রীটের বাসভবন থেকে পায়ে হেঁটে চার্চিল যাচ্ছিলেন নৌ-দপ্তরের অফিসে, সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম সমর উপদেষ্টা জেনারেল লর্ড ইসমে। পথে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষেরা তাঁদের থামিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিল : 'সুপ্রভাত উইনি। স্বাগত মহান চার্চিল। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।' ইত্যাদি।

নৌ-দপ্তরে ঢুকেই চার্চিল একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকে দরজা দিলেন: 'বুঝলে ইসমে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সবাই আজ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্যের কথা। এখনও ত বেশ কিছুদিন প্রত্যহ কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি আর পরাজয়ের সংবাদ জানানো ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।' জেনারেল ইসমে তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, কথাটা বলতে বলতে চার্চিল অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সুস্থ হয়ে চোখ মুছে সে ঘরের দরজা খুলে কাজের জায়গায় গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পার্লামেন্ট প্রবেশের পথে একজন সাংবাদিক প্রথম দিনই চার্চিলকে বললেন: 'মিঃ চার্চিল আপনার কি স্মরণ আছে উনিশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে আপনি 'হাড়-গোড়হীন সার্কাসের খেলোয়াড়' বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, যিনি আপনার মতে 'উঁচু জায়গা থেকে পতনের ব্যাপারে অদ্বিতীয় কৌশলী' ছিলেন?

প্রথম সাংবাদিকের কথা শেষ না হতেই আর একজন বলে উঠলেন : 'এবং চেম্বারলেনকে আপনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'নিশ্চিন্তভাবে কিছু না করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সন্দেহাতীত কথায় শান্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর' বলে!

চার্চিল চট করে উত্তর দিলেন : 'অবাক কান্ড! এরই মধ্যে তোমরা আমার কথার ক্রিয়াপদগুলিকে কমজোরী করে ফেলেছ দেখছি!' (You have weekened my verbes).

সাংবাদিক দুজন একটু হকচকিয়ে উঠেছিলেন চার্চিলের মৃদু ভর্ৎসনায় জন্যে। পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই চার্চিল কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ১৯৪০ খৃঃ অব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। ঐ বছরই ১৩ই মে কমন্‌স কক্ষে হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করলেন : 'বর্তমান সরকারে আমি যাঁদের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছি সেইসব মন্ত্রীদের আমি যা বলেছি আপনাদেরও সেই কথাই বলবো, বর্তমানে বেশ কিছুদিন রক্ত, অশ্রু আর শ্রম ব্যতীত আর কোন কথা নয়, শেষ পর্যন্ত বিজয়ী আমরা হবই, সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের বিজয়ী হতেই হবে। বিজয়ী না হলে বেঁচে থাকবার আর কোন উপায় থাকবে না।'

একটা গুরু-গম্ভীর বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চার্চিল সর্বদা এবং সর্বত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কৌতুকের আশ্রয় নিতেন। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পরে সকলেই সর্বক্ষণ আশঙ্কা করতো কখন কিভাবে জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে খাস ইংলন্ডে অবতরণ করে সেই জন্যে। এই সময় এক বেতার ভাষণে চার্চিল বললেন : 'ইংলিশ চ্যানেলের মাছগুলি যেমন, আমরাও তেমনি জার্মানদের অবতরণের অপেক্ষায় আছি।'

আর এক বক্তৃতায় তিনি মুসোলিনীকে আখ্যা দিলেন শৃগাল বলে : 'জার্মান নেকড়েটার পাশে ইটালীর শিয়ালটা যে চেঁচামেচি করে এটা একেবারেই অসহ্য। ক্ষিদের জ্বালায় করতো তবু না হয় বোঝা যেত, এ কিনা বিজয়দর্পে চেঁচাচ্ছে।'

হিটলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমন্স সভায় একদিন চার্চিল বললেন : 'ইদানীং অনেকেই দেখছি নেপোলিয়নের সঙ্গে হিটলারের তুলনা করে থাকেন, কিন্তু এটা কি উচিত? একজন মহান সম্রাটের সঙ্গে একজন কসাইয়ের কখনো তুলনা করা চলে না।'

হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার পরে চার্চিল যখন কমন্স সভায় রাশিয়াকে সাহায্যের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, তখন অনেক সদস্য তার প্রতিবাদ করলেন এই বলে যে 'মিঃ চার্চিল ত বরাবরই বলশেভিকদের বিরোধী।' উত্তরে চার্চিল বললেন : 'বিরোধী আমি এখনো। তবে কিনা হিটলারকে তারা প্রতিরোধ করছে তাই তাদের সাহায্য দেওয়া যেতে পারে বলে ১
আমি মনে করি। হিটলার যদি নরক অভিযান করে তাহলে স্বয়ং শয়তান সম্পর্কেও দুটো ভালো কথা বলবার চেষ্টা করবো।'

একজন সদস্য চার্চিলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কয়েক বছর আগের তাঁর একটি উক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানগণ কর্তৃক লেনিনকে সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়া যাবার সুযোগ করে দেবার ব্যাপারটাকে তিনি বাক্সবন্দী করে প্লেগের জীবাণু পাচার করার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

চার্চিল কপট বিরক্তির সঙ্গে বললেন : 'মাননীয় সদস্য মশাই অর্ধেক 'কোট' করেন কেন? 'কোট' করলে পুরোটাই করতে হয়। লেনিন সম্পর্কে আমি আরো বলেছিলাম যে তাঁর জন্ম হল জনসাধারণের পক্ষে প্রথম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং তাঁর মৃত্যুটা হলো দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

'ন্যাশন্যাল কোয়ালিশন' সরকার গঠিত হবার পরে কমন্স সভায় একটা অসুবিধে দেখা দিল। 'জাতীয় মন্ত্রিসভা' তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি কমন্স সভায় একবার পাঠ করে যে যার কাজে চলে যান, সদস্যরা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকেন। কারণ সরকারে ত তাঁদের প্রত্যেক দলেরই প্রতিনিধি আছেন, কে কার সমালোচনা করবেন? ব্যাপারটা অনেকেরই অসহ্য লাগছিল। অবশেষে লেবার সদস্য অ্যান্যুরিন বিভান একদিন ক্রোধে ফেটে পড়লেন : "অধ্যাপক ল্যাস্কির কথাই ঠিক দেখছি, এইভাবেই দলবাজী গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে থাকে। কিন্তু আমি তা' হতে দেব না। আমার দলের মন্ত্রীরাও যদি বিরক্ত বোধ করেন ত করবেন, কিন্তু সরকারের প্রতিটি কাজের পুরোপুরি আলোচনা এখানে হওয়া চাই।'

চার্চিল আশা করেছিলেন যে লেবার পার্টির নেতা, তাঁর দক্ষিণহস্ত, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলী বিভানের উক্তির প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু তা' করলেন না দেখে তিনি মৃদু সুরে বললেন : 'অনেক মেষ শুনেছি সিংহের চামড়া আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু ইনি দেখছি তার বিপরীত, মেষের চামড়াটা জড়িয়েই নির্বিকারভাবে বসে আছেন।'

সেদিনের অধিবেশনের শেষে একজন চার্চিলের কথাটা এটলীর কানে তুললেন। এটলী তাঁর স্বভাব-সুলভ নম্রতার সঙ্গে একটু হেসে বললেন : ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যতক্ষণ জেগে থাকেন কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সময়-মতো ছুঁড়ে দেবার জন্যে চোখা চোখা বাক্য তৈরির জন্যে মাথাটা খাটান। দেশের কাজ করবার তাঁর ফুরসৎ কোথায়!' লর্ড হার্বেনহেডও এটলীর মন্তব্য সমর্থন করলেন। কথাটা শুনে চার্চিল রেগে গেলেন।

—রচনাবলী গ্রন্থমালা—

গিরিশ রচনাবলী
প্রথম খণ্ড : ২১ নাটক, ৭ গদ্যরচনা; জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা [২০·০০]। দ্বিতীয় খণ্ড : ২২ নাটক, ২ উপন্যাস ও ৬ গল্প; গৌরিশছন্দ ও সাহিত্য-সাধনা [২০·০০]। চার খণ্ডে সমগ্র রচনা সঙ্কলিত হবে।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী
প্রথম খণ্ড : ৬ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতাপুস্তক ও ৩ গদ্যরচনা; জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা [১২·৫০]। দ্বিতীয় খণ্ড : ৮ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতা-পুস্তক, ৩ গদ্যরচনা, ১ ইংরেজি কবিতা; সাহিত্য-সাধনা [১৫·০০]।

দীনবন্ধু রচনাবলী
একখণ্ডে সমগ্র রচনা : ৮ নাটক ও প্রহসন, ২ গল্প-উপন্যাস, ৩ কবিতাপুস্তক; জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা [১০·০০]।

রমেশ রচনাবলী
একখণ্ডে সমগ্র উপন্যাস : ৬টি। জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা [১০·০০]।

মধুসূদন রচনাবলী
একখণ্ডে সমগ্র রচনা : ৬ কাব্যপুস্তক, ৭ নাটক ও প্রহসন, ৮ ইংরেজি রচনা; জীবনকথা ও সাহিত্যসাধনা [১৭·৫০]।

বঙ্কিম রচনাবলী
প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস ১৪টি [১৫·০০]। দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য-অংশ [১৭·৫০]। তৃতীয় খণ্ড : সমগ্র ইংরেজি রচনা [১৫·০০]। জীবনকথা ১ম খণ্ডে, সাহিত্য-সাধনা পঞ্চম খণ্ডে।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

CENTRAL LIBRARY

বোল্ড উইট প্রমাণ করবার জন্যে ছটফট করতে লাগলেন। সুযোগ এলো ক'দিন বাদে।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা সভায় দীর্ঘ একটি বক্তৃতা করে চার্চিল সবে বসেছেন। লেডী অ্যাস্টর বললেন : 'দেখুন উইনস্টন, আপনি যদি আমার স্বামী হতেন তাহলে এরকম বাজে বক্তৃতা দেবার শাস্তিস্বরূপ আপনার কফিতে আমি বিষ মিশিয়ে দিতাম।' একগাল হেসে চার্চিল বললেন : 'আপনার স্বামী হলে হৃষ্টচিত্তে সে কফি পান করে আপনার কবল থেকে আমি রেহাই পেতাম।'

এর ঠিক দু'দিন বাদে চার্চিল তাঁর বোল্ড উইট সপ্রমাণ করবার আর একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। ব্যঙ্গ-কৌতুকে অদ্বিতীয় স্বনামধন্য জর্জ বার্ণার্ড শ-এর একখানা নতুন নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয় হবে। শ' দু'খানা পাশ পাঠিয়ে দিলেন চার্চিলের দপ্তরে। সঙ্গে ছোট্ট একখানা চিঠি : 'প্রিয় উইনস্টন, দু'খানা পাশ পাঠালাম, একখানা তোমার জন্যে, অন্যখানা তোমার কোনো বন্ধুর জন্যে, অবশ্য যদি বন্ধু-বান্ধব বলে তোমার কেউ থাকে।' চার্চিলের মুখ-চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো উত্তেজনায়। উপস্থিত সবাই চিঠিখানা দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগলো। চার্চিল একটা খামের মধ্যে পাশ দু'খানা পুরলেন, তারপর চট করে দু'ছত্রের জবাব লিখে সবাইকে দেখালেন : 'মাননীয় নাট্যকার মহাশয়, সরকারী কাজে বড়ো বেশী ব্যস্ত, তাই আজ আর আপনার নাটক দেখতে যেতে পারবো না। পাশ দু'খানা ফেরৎ পাঠালাম। তবে দর্শকগণ যদি আপনার নাটকের দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ের প্রয়োজন বোধ করেন এবং বাস্তবিক তা হয়, তা' হলে আবার পাশ পাঠাবেন।' শোনা যায় শ' এ জবাব পেয়ে ঠোঁট কামড়েছিলেন।

যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য পাঠাবার কথা বললেও চার্চিল বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়াতে বিশেষ সাহায্য পাঠাতেন না, অজুহাত দিতেন, যদি হিটলার অকস্মাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করে বসেন। একদিন বিভান রেগে মেগে বলে উঠলেন : 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সর্বদাই 'নেকড়ের' দুঃস্বপ্ন দেখে থাকেন। কেউ কিছু বললেই 'নেকড়ে, নেকড়ে' বলে তিনি চেঁচামেচি করেন। অথচ বিশ্ববাসী সবাই জানেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে নেকড়ে ভালুকের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তা' ছাড়া, তাঁর সুপোক্ত মাথাটিতে কি একথাটা আসে না যে, নেকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবার সর্বোত্তম পথই হচ্ছে ভালুকের হাত দুটো জোরদার করা?'

এই ধরনের কথা, যার উত্তরে বলার কিছু নেই, তার জবাবের সময় চার্চিল ক্ষেপে ফেটে পড়তেন। হয় সরাসরি পার্লামেন্টে 'আস্থাসূচক' ভোট দাবী করে বসতেন, আর না হয় বলতেন : 'চেম্বারলেন পদত্যাগ করবার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর শূন্য আসনটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না, এ ক'বছরে ঐ আসনটির বাজারদরটা যে আমিই বাড়িয়েছি এ-কথা কে অস্বীকার করবে?'

১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের সূত্রেতে ভারত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও দেশব্যাপী ধরপাকড় ও উৎপীড়নের প্রতিবাদ করে বিভান একটা কাগজে জোরালো প্রবন্ধ লিখলেন। কয়েক সপ্তাহ বাদে পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কে বিতর্কের সময় সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করে বললেন : 'সাম্রাজ্যবাদী সিংহটা জেগে উঠেছে। শুনেছেন শুনেছেন, ক্লাইভ, হেস্টিংস ও ডায়ারের প্রেতাত্মার আশীষ কামনায় তার কি বিকট নিনাদ। গান্ধী, নেহেরু আজ কারারুদ্ধ, বাহাত্তর বছরের দিদিমা গান্ধীকেও জেলে পোরা হয়েছে, পাছে তাঁর দুর্বল কম্পিত কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি এই মহান সাম্রাজ্যের ভিত টলিয়ে দেয়, তাই। যে ট্যাঙ্কগুলি রাশিয়ায় পাঠালে নাৎসীদের ধ্বংসের কাজ এগিয়ে দিতো, চীনে পাঠালে ফ্যাসিস্ট জাপানকে পরাভূত করতে সাহায্য করতো, সেই ট্যাঙ্কগুলিই আমরা কোলকাতা এবং বোম্বাইয়ের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছি নিরস্ত্র কংগ্রেস-অনুগামীদের হত্যা করবার জন্যে।' কয়েকদিনব্যাপী এই বিতর্কের শেষেই চার্চিল একটি বিখ্যাত বক্তৃতা করে বলেছিলেন : 'মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর সাম্রাজ্য লাটে তুলবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি প্রধানমন্ত্রী হইনি।'

যাই হোক, যুদ্ধের স্রোত ক্রমশঃ ফিরতে লাগলো। মিত্রশক্তি আফ্রিকায় জিতলেন, ইটালীসহ সমগ্র দক্ষিণ ইয়োরোপে জিততে লাগলেন, ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করে জার্মানীর দিকে ধাবিত হলেন। ওদিকে রাশিয়াও জার্মানদের ক্রমশঃ পিছু হটিয়ে দিতে লাগলো। এমনি সময় 'ইয়ালটা' সম্মেলনের আয়োজন করা হল। এই সম্মেলনেই একটি বিশ্ব-সংস্থা গঠনের 'প্রথম খসড়া' তৈরী হবার কথা। রুজভেল্টের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তাই তিনি চার্চিলকে জানালেন : 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, দেখবেন যেন পাঁচ-ছয় দিনের বেশী সময় না লাগে।' উত্তরে চার্চিল লিখলেন : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, এটা কি কথা বললেন, বাইবেলের কথা কি ভুলে গেলেন? সর্বশক্তিমান স্বয়ং পরমেশ্বরও ত ব্রহ্মাণ্ড তৈরী করবার জন্যে সাত দিন সময় নিয়েছিলেন।'

মিত্রশক্তি বাহিনী প্যারিস দখল করে নেবার পরে একটি বিজয়-সভার আয়োজন করা হয়, এই সভায় চার্চিল ফরাসীভাষায় তাঁর যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল, তাই সম্বল করেই বলতে সুরু করলেন : 'আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন কিন্তু, আমি ফরাসী-ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করছি।'

কিছুদিন বাদে জন্মদিন উপলক্ষে অনেকেই চার্চিলকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন : 'আচ্ছা মিঃ চার্চিল, মৃত্যুর জন্যে আপনার মনে কি কোন আশঙ্কা নেই?' চুরুটটা দুই দাঁতের মধ্যে আটকে রেখে চার্চিল বললেন : 'বহুকাল ত হয়ে গেল, কাজেই সৃষ্টিকর্তার সামনে হাজির হতে আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই; তবে কি জানো, তাতে তাঁর যে-ঝামেলা বাড়বে তা সামলাতে তিনি প্রস্তুত আছেন কি না, আমার সন্দেহ আছে।'

অভিনব সাড়া জাগানো অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী
বহু তথ্য সমৃদ্ধ অসংখ্য চিত্রশোভিত — যাত্রীর লেখা

মূল্য : ৬·০০
তীর্থভূমিতে ভ্রমণের উদ্দীপনাময় কাহিনী মন-প্রাণ ভরে পড়েছি।
—শ্রীজগন্নাথ তলাপাত্র, ধানবাদ।
ভাবের সঙ্গে ভাষা ফুটে উঠেছে বেশ। - শ্রীবিভূপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বেনারস।
প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক : উৎপল প্রতাপচক্রবর্তী ফোন : ৪৬-৫৪০৭
৮৭।৫, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলি-৪৭
কথা ও কাহিনী : ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
দে বুক স্টোর্স : ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

অবিস্মরণীয় কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফাল্গুনের কাঁচা রোদে দেয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে টুটুল চেঁচিয়ে পড়ে যায় :

রাক্কস-খোক্কসেরা নানারকম ছল-চাতুরী করে, সকলের বড় খোক্কসটা সেই সব আরম্ভ করিল। বলিল, 'তোদের নখের ডগা দেখি?' লাল, নীলের মুকুটটা তরোয়ালের খোঁচা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন। সেটা হাতে করিয়া খোক্কসেরা বলাবলি করিতে লাগিল—'বাপ রে! যার নখের ডগা এমন, না জানি সে কি রে!'

আগাগোড়া চন্দ্রবিন্দুর জোরাল উচ্চারণে খোক্কসের খোক্কস এত প্রকট করে তোলে টুটুল যে বলাই হৈ হৈ করে হেসে উঠল। তার হাঁটু পর্যন্ত ব্যান্ডেজ কাঠে বাঁধা ডান পাখানা দু-হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিয়ে টুটুল পড়ে চলে :

খানিক পরে খোক্কসেরা আবার আসিয়া বলিল, 'তোদের জিভ দেখিব।' লাল, নীলের তরোয়ালখানা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাড়াইয়া দিলেন। বড় খোক্কস দুই হাতে তরোয়াল ধরিয়া, আর সকল খোক্কসকে বলিল, 'এইবার জিভ টানিয়া ছিঁড়িব—তোরা আমাকে ধরিয়া খুব জোরে টানন্‌।' সকলে মিলিয়া খুব জোরে টানিল, আর, তরতর ধার দেওয়া তরোয়ালে বড় খোক্কসের দুই হাত কাটিয়া কালো রক্তের বান ছুটিল। চেঁচাইয়া মেচাইয়া, সকল খোক্কস ভিড়াইয়া বড় খোক্কস পলাইয়া গেল।'

মাথা পিঠ দুলিয়ে দুলিয়ে সশব্দে হেসে উঠল বলাই চোখেও জল এসে যায়। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'তুমি হাইকোর্টের জজ হবে ছোট-দাদাবাবু। দেখো, আমি বলে দিলাম।'

পড়বার উত্তেজনায় পায়ে বাঁধা কাঠ-খানা আবার সরে যেতে ব্যথা লাগে টুটুলের।

'এবার আমি তোমাকে তুলে দিই দাদা-বাবু। আর না।'

'আর একটু, আর একটু!' ঘাড় বাঁকিয়ে মাঠ পার, জেলখানার রাস্তা, তারও ওপাশে কম্পাউন্ড মড়াকাটার ঘর, [illegible] জঙ্গল, কাছেই ব্রহ্মদৈত্যের আবাস কাঁচ কাঁচ সবুজ পাতায় ভরা মস্ত বেলগাছটা যার নীচ দিয়ে একজোড়া কালো ছিট ছিট বাদামি প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে সেদিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়। কত দিন প্রজাপতির পেছনে দৌড়ায় নি, কতদিন দেখে নি ঝাউ পাল-তোলা নৌকো চুর্ণীর ঘোলা জলে।

'নাও, নাও, আমাকে আবার যেতে হবে,' বলাই দাঁড়িয়ে ওঠে।

'আমাকে একবার নদীর ধারে নিয়ে যাবে পিঠে করে?'

'যাব যাব, এখন ওঠো তো। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে। জামা পরছে। এইতো, লক্ষ্মী দাদাবাবু।' টুটুলের কোন কথা না শুনেই বলাই তাকে আলগোছে তুলে নিয়ে খাটে শুইয়ে দেয়।

'মা-কে ডেকে দাও, বলাই।'

'মা, রান্নাঘরে। তুমি ডালিম কুমারের গল্পটা পড়ো দাদাবাবু। সেই নাক দিয়ে সাপ বেরোচ্ছে, চমৎকার গল্পটা।'

বলাই যেতে যেতে বলে, এইরকম বুদ্ধি দেওয়ায় টুটুলের ঘোর আপত্তি। তারা ছোটরা নিজেদের মধ্যে এর একটা নাম-করণও করেছে—ফুজুং ডাজুং। বোধহয় ছোটরাও নয়, প্রতাপই এই নামকরণের স্রষ্টা বুঝি। স্বর্ণসুন্দরীর কোন কথায় চোতা বুড়ী নিজেদের মধ্যে চোখ টেপে। তারপর মা চলে গেলেই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ফুজুং ডাজুং, ফুজুং ডাজুং!'

টুটুল চুপচাপ শুয়ে থাকে। চোতা-বুড়ী আধ ঘণ্টা আগে মাঠ ভেঙে চলে গেল স্কুলে। আগে স্কুল যাওয়া টুটুলের মোটেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার এই অচল অবস্থায় যে জীবনযাত্রায় সবাই চলছে ফিরছে ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে তাই তাকে আকর্ষণ করে। চোতা ছুটে দিলে সে চমকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সম্প্রতি স্কুল ফেরতা চোতা বুড়ীর ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পা-দানিতে ঝুলে পড়া কিংবা স্কুলের মাঠে সত্যিকার ফুটবল খেলার মতো চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রায়ই ঘটতে থাকায় তার অস্থিরতা বাড়ছে। তার [illegible] ঠাকুমার বুলি [illegible] সে ঠোঁট খাটের একপাশে ছুঁড়ে ফেলে। তার সমস্ত গল্প মুখস্ত।

আজ তার জন্মদিন, কিন্তু আজ সকাল থেকে তার কাছে সব বিস্বাদ লাগছে। গত জন্মদিনের কথা মনে আসে টুটুলের। চালের পায়েস আর গোকুল পিঠে হয়েছিল; তারপর তার আর বুড়ীর মাথায় ধান-দুর্বো দিয়ে পঞ্চম জর্জের দুটো রুপোর টাকা দিয়েছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। এবারেও তাই হবে কিন্তু এ জন্মদিন ও সে জন্ম-দিনের মাঝখানে এক দুর্যোগের ব্যবধান টের পায় টুটুল। প্রায় চার মাস হল শুয়ে আছে। সামনের সপ্তাহে কাঠ খুলবে হরি-চরণ ডাক্তার। তারপর? তারপর যদি সে হাঁটতে না পারে? এরকম একটা কানাঘুঁসো চলছে বাড়িতে। ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বিশাল কাটা ঘা বহুদিন পর্যন্ত হাঁ হয়ে থাকত, তা প্রায় বুজে গিয়েছে, চামড়া পড়ছে, খালি গোড়ালির হাড়ের জোড়ে ছোট পয়সার মতো গোল ছোট ক্ষত এখনও চারমাস আগেকার বিরাট দুঃস্বপ্নের স্বাক্ষর। একমাত্র ব্যান্ডেজ খোলা আর ব্যান্ডেজ বন্ধ করা ছাড়া এ ব্যাপারে হরি-চরণ ডাক্তারের বোধহয় করণীয় নেই।

'আজ তিনটে গোল দিলাম' চোতা স্কুল থেকে ফিরেই বললে। আর টুটুল ভাবে, রূপকথার রাজপুত্র হবার দরকার নেই, সে যেন ভাল মতো হাঁটতে পারে, গোল দিতে পারে।

রুপোর টাকা দুটো হাতে দিয়ে টুটুলের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করেন স্বর্ণসুন্দরী, 'বাবা বাবা-নাথ, বাবা বিশ্বনাথ, মা কালী, ছেলেকে নীরোগ করে দাও' বলে প্রার্থনা করলেন স্বর্ণসুন্দরী।

চোতা বললে, 'মা, তুমি খালি ঐ তিন-জনকে ডাকো, [illegible] ডাকো না, সরস্বতীকে ডাকো না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু, [illegible]কেই ডাকছি।'

'আর লক্ষ্মীকে? লক্ষ্মীদিদার চুলকে?'

স্বর্ণসুন্দরী অপ্রসন্নভাবে মেজো ছেলের দিকে তাকালেন। পরম পরিতৃপ্তিতে পায়েস

চাটতে চাটতে বুড়ী বললে, 'ভালই হবে, ভগবান পাপ দেবে। কাল তিনটে গোল খাবে।'

সাতদিন পর কাঠ আর ব্যান্ডেজ খুলে হরিচরণ ডাক্তার বললেন, 'কবি, দাঁড়াও তো।' অপারেশানের সময় টুটুলের কাবা-মর আর্তনাদে ডাক্তার এমন অবাক হয়েছিলেন যে, তারপর থেকে বরাবর তিনি ঐ নামে ডাকছেন।

টুটুল দ্বিতীয়বার হাঁটি হাঁটি পা করে অগ্রসর হয়। পা টলমল করে। পড়বার আগেই ডাক্তার ধরে ফেলেন। স্বর্ণসুন্দরী অনেক কষ্টে কান্না চেপে বসে থাকেন।

'চমৎকার, চমৎকার!' হরিচরণ ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠেন। তাঁর সন্দেহ যে যায় নি, তা নয়। হাড়ের জোড়ে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। নেংড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু এই মফঃস্বলে ছেলেটার জন্যে যা করা হয়েছে তার চেয়ে কিছু সম্ভব নয়। আর হয়ত ঠিকমতো হাড় জুড়েও যেতে পারে। কাঁচ হাড়, সবই সম্ভব। কত মৃত্যুপথ যাত্রী আবার বেঁচে উঠছে। পর্দার পোল ধরে লেংচানো ছেলেটার দিকে চেয়ে তৃতীয়বার বললেন, 'চমৎকার!' তারপর স্বর্ণসুন্দরীর উপহার একটা সুন্দর সবুজ রঙের পার্কার কলমে টুটুলের জন্যে একটা টনিক লিখে দিলেন।

টুটুলের আবার দ্বিতীয় জন্ম শুরু হল। ট্রাইসাইকেলে শীতের রোদ্দুরে সে জেলখানা বরাবর চলে যায়, বকুলতলা থেকে বেলগাছতলা, বেলগাছতলা থেকে গোয়াল-ঘর মাঠিয়ে বেড়ায়। দিন দশ বারোর মধ্যেই স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে চোখমুখ ঝকমক করে। কিন্তু সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্বর্ণসুন্দরী কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। আর সে যত এক-পায়ে হাঁটার কসরত আরম্ভ করে, এমন কি দৌড়য়, ততই তার মায়ের কাঁদতে ইচ্ছে করে।

বলাই সেদিন বললে যে সে ছোট দাদা-বাবুর পায়ের ব্যবস্থা করে দেবে। বাজারের পাশেই সিদ্ধেশ্বরীতলার মা-কে নিয়ে যাবে, 'দেবী খুব জাগ্রত মা। শুধু নকড়া-ছকড়াই আসে না, কলকাতা থেকে লোক আসে। পড়া পড়েছিল খেজুর গাছে হাঁড়ি বসাতে। একেবারে নেংড়া। দাদাবাবু তো তাও একরকম হাঁটতে পারে। বললে বিশ্বাস করবে না মা, এখন বাতাসের আগে ছোটে।'

কাজেই পরের রোববার সকালে সিদ্ধে-শ্বরীতলায় একখানা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি থেকে স্বপুত্র স্বর্ণসুন্দরী নামলেন। বিকেল পর্যন্ত উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেন ঠান্ডা শান-বাঁধানো চত্বরে। টুটুলের খেলা জমে করছিল। কারণ তার মায়ের ঠিক পাশেই এক গ্রাম্য মহিলা হত্যে দিয়ে আছে, তার বাঁ পায়ের বিশাল গোদ মায়ের শাড়ি প্রায় স্পর্শ করছে। মা-কে এখন ছুঁতে মানা, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আলগোছে কাপড়টা একটু সরিয়ে দেয়, একলা একলা ঠাকুর দেবতা দেখে বেড়ায়। তারপর মায়ের পাশে কখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে সেই খোলা চত্বরে।

স্বর্ণসুন্দরীর ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে ঘনায়মান আঁধারে এবং পশ্চিম আকাশের পড়ন্ত আলোর এমন মায়াটে আপনার লাগে মাঠের মধ্যে তাদের বাড়িটা যে টুটুল এক-দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে। খড়খড় মড়মড় করে আসতে আসতে বাড়ির একটু দূরেই গাড়িটা থামে, কারণ চেঁচাতে চেঁচাতে চোতা আর বুড়ী তাদের দিকে ছুটে আসছে।

'আশ্চর্য খবর। আশ্চর্য খবর!' চোতা খবরের কাগজের হকারদের মতো চেঁচায়। বুড়ীও মাথা ঝাঁকিয়ে কি বলে। এতক্ষণ ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকতে থাকতে স্বর্ণ-সুন্দরীর পা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। তিনি ধীরে ধীরে নামলেন। টুটুল লাফিয়ে নামতেই চোতা তার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমাদের কি মজা! কি মজা! আমরা জলের দেশে যাচ্ছি। আর তিনদিন পরেই। সেখানে কি জল। মাইলের পর মাইল খুব জল। পাহাড়ের মতো ঢেউ, হাঙর, কুমীর ...চোতা যে তার সদ্যপড়া ভূগোল থেকে এসব চালাচ্ছে, বুড়ী তা টের পেয়ে বলে, 'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আর তুই সাঁতার জানিস যে খুব বলছিস!'

বারান্দায় ভবনাথ দাঁড়িয়ে। হাসিতে মুখ উজ্জ্বল। পোস্টিংটা মনঃপূত হয়েছে তাঁর। যদিও এবার তাঁর শোক লাভ হল না, জেলার চার্জ পাওয়া থেকে বঞ্চিত রইলেন তবু ঢাকা শহরের মুন্সীগঞ্জ মহকুমা একটা প্রাইজ পোস্ট। আর জলের দেশ, জলে গেলেই দৈনিক ষোল টাকা টি-এ। প্রতাপের জন্যে খরচটা মানেজ হওয়া যাবে। স্ত্রীর পেছনে নেংড়ানো ছেলেটার দিকে চেয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'বদলি হলে নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাল পোস্টিং দিয়েছে। ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। টাকায় ষোল সের দুধ।'

বলাইয়ের সামনে বলেই বোধহয় স্বর্ণ-সুন্দরী একটু বিরক্ত হলেন। পেছনে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমাদের তো পাট উঠল বলাই।'

বলাইয়ের মুখ থমথমে, চোখ ছলছল করে। [illegible]

ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও সংক্রমণ রোধে বিশেষ উপযোগী, মধুর গন্ধযুক্ত
বোরোলেপ
এই এ্যান্টিসেপটিক ক্রীমের ব্যবহার সংক্রমণ হতে রক্ষা করে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখে। বিবিধ সাধারণ চর্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। সকল ঋতুতে নিয়মিত ব্যবহারে বোরোলেপ গাত্র চর্মকে রুক্ষতা ও শুষ্কতা হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ ও মোলায়েম রাখে।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা জয়পুর

সে বারান্দার এক কোণে দাঁড়ায়। স্বর্ণ-সুন্দরী বললেন, 'কি বলাই, কিছু বলছো না যে?'

'মা, আমি ভাবছিলাম, এত সুখ কি কপালে সইবে। কথায় বলে, সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস!'

স্বর্ণসুন্দরী হেসে বললেন, 'কেন, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হল নাকি?'

অদ্ভুত হাসলে বলাই। তার এই হাসির সঙ্গে সারা বিকেল সিদ্ধেশ্বরীতলা থেকে অন্তর্ধানের যোগসূত্রটা আবিষ্কার করলেন স্বর্ণসুন্দরী। খেজুরের রসের সময় বলাই সন্ধ্যের পর কোন কোন দিন এরকমভাবে হাসে। বড্ড বেশী রকম চেয়ে থাকে চোখের দিকে একদৃষ্টিতে।

বলাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজের মনে হাসতে হাসতে বললে, 'কি যে বলো মা! সোনা গাইয়ের চাটও সই। বুঝলে মা।'

'তুমি কাল সকাল সকাল এসো। অনেক গোছগাছ আছে। আর মাত্র তিনটে দিন।'

'আজ রাত্তির থেকেই গোছগাছ করি মা। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। মা, আমার কেউ নেই!'

'যাও, যাও, উঠে পড়ো।' স্বর্ণসুন্দরী ধমকে ওঠেন।

বলাই উঠে পড়ে। মুখে হাসি, চোখে জল। বারান্দায় বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে, 'বুড়ী মা চললাম। আর দেখা হবে না।' তারপর চিড়বিড় করে, 'সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস।'

'শ্যাখ শ্যাখ, বলাই কাঁদছে! আমার কি মজা লাগছে! কি মজা!' ছোড়া পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে।

পরদিন সকালে কেন গোটা দিনেও বলাইয়ের পাত্তা নেই। বলাই এল দুদিন পার করে যখন বাঁধাছাঁদা প্রায় সব শেষ। অবশ্য অসুবিধে কিছু হয়নি। আরও দুজন আর্দালি, ভৃত্য, জেলখানা থেকে রামসুন্দর সিং সবাই এসে পড়াতে চারদিকে ধুম ধাড়াক্কা লেগে যায়। বাগানের বেগুন তুলে বস্তা বাঁধা হয়েছে। নারকেলের দাঁড় নিয়ে স্বর্ণসুন্দরীর প্রায় গোটা ভাঁড়ারটাই বেঁধে ফেলা শেষ। বিরাট বিরাট আচারের বয়াম, অসংখ্য অব্যবহার্য তেলের শিশি-বোতল সব সঙ্গে চলেছে। স্বর্ণসুন্দরীর বিচারে বলাই মর্মাহত। বাছুর সমেত নতুন বিয়োন্ত মঙ্গলাকে গানের গোপাল মাস্টারকে দান করা হল।

আগামী কাল বিকেলেই ছোকরা আই-সি-এস কল্যাণ মিত্তিরের হাতে চার্জ দিয়ে ভবনাথ ট্রেনে উঠবেন। বাক্সোর মাল-পত্তরের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ছুটে বেড়ান, গোপীনাথকে এটা ওটা হুকুম করেন। সরকারী অফিসারদের এ সময়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এক পরিবর্তনের মুখে সে পরিবর্তনে হয়তো আছে বড় প্রোমো-শনের ইশারা। এই বোধ পরিবারের অনেকের [illegible] হয়। আর [illegible] হয়েও

গেল। একটু এক মেয়েও লাগছিল স্বর্ণ-সুন্দরীর। এখন এই পরিবর্তনের মুখে নতুন কর্মোদ্যমে মেতে ওঠেন। এবারে হয়ত গ্রেন ফেল করলেন তাঁর স্বামী, কিন্তু রিটায়ারের মুখে নিশ্চয় জেলার ভার পাবেন এ স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। সারা দিনটা এমন ছোটাছুটি করলেন আর সবাইকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালেন যেন সে রাত্তিরেই রানাঘাট ত্যাগ করছেন।

পরের দিন খুব সকাল সকাল বাজার করে নিয়ে আসে বলাই। গৌরীর জন্যে কেনা একটা লাল ডুরে বলাইয়ের হাতে তুলে দিতে তার মুখে স্বাভাবিক হাসি ফোটে। বলে, 'কি সুখে ছিলাম মা!'

'আবার নতুন মা আসছে।'

'সে তো মা নয়, মেমসাহেব!'

'একই ব্যাপার বলাই।'

'সব জিনিসে মুক্তো নেই মা!'

স্বর্ণসুন্দরী হাসতে হাসতে বলেন 'অনেক কথা ভুলে যাব বলাই, কিন্তু তোমার ছড়াকাটা চিরদিন মনে থাকবে।'

'আমার ভাগ্য মা!'

বলাই আজ তার তকমাটকমা সব এঁটে এসেছে। আজ থেকে সে নতুন সাহেবের আর্দালি।

বুড়ী বললে, 'দেখেছিস, বলাই আর আমাদের কথা শুনবে না।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দুটো ফার্স্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভ করে এস-ডি-ও সাহেব সপরিবারে রাণাঘাট ত্যাগ করলেন। তার আগে অবশ্য একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি হল। হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত মশাই সংস্কৃততে ভবনাথের গুণপনার প্রশংসা করলেন। পেস্কারবাবুর ভাই যে কলকাতার জলসায় গান করে, সে ছোকরা 'ভেঙেছো দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গানটি গাইলে, সঙ্গে গলায় বেহালা লাগিয়ে গোপাল মাস্টার সঙ্গত করলেন। স্টেশনে অনেকে এলেন। মালা, ফুলের তোড়া, পায়ের ধুলো ইত্যাদির দরুণ দশ মিনিট বেশী দাঁড় করাতে হল ট্রেন। গাড়ি ছাড়লে ভবনাথ আরাম করে নরম চামড়ার বিস্তৃত গদীতে গা মেলে দেন। 'নাঃ! নাথিং টু রিগ্রেট।' অবশ্য মুন্সীগঞ্জ টেররিস্টদের জায়গা। যাঁর হাত থেকে তিনি চার্জ নেবেন তাঁর স্ত্রী প্রায়ই আতপ চাল আর সাদা থান উপহার পান বলে শুনেছেন। কিন্তু ওসব কথা ভাবলে চলে না। সে লোকটাও একটু বাড়াবাড়ি করছিল বলে তিনি শুনেছেন। বাড়াবাড়ি ভবনাথ পছন্দ করেন না, বাড়া-বাড়ি ইংরেজের আইনে নেই। আইনের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে তিনি বরাবর হেঁটে এসেছেন, হেঁটে যাবেন কাউকে তোয়াক্কা না করে। আর জল আছে, মোটা টি-র আছে, টেকার বোল সের দুধ। আরামে চোখ বোঁজেন ভবনাথ।

স্বর্ণসুন্দরীর হঠাৎ পবার কথা মনে [illegible] চোখ [illegible] [illegible] এক

পলকা কাঁদা হয়ে গেছে। আবার চোখে জল আসে। তারপর ভাবেন, প্রতাপও যদি তার মামুদের মতো পড়াতে থাকে, একটার পর একটা বছর হুড়োহাতা করে কাটিয়ে দেয় বিলেতে। তারপর সেদিক থেকে চিন্তা সরিয়ে নেন। মাতুলের প্রভাবটা বাজে কথা। আসল সমস্যা তাদের টাকা। বাড়িটা করতে প্রায় ষাট হাজার পড়ে গেল। তাঁর গায়ের গয়না, সব কটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি খেয়ে নিয়েছে। তাছাড়া চায়ের ভাল শেয়ার ছিল সেগুলোও। এর মধ্যে বড় ছেলেও বেশ খিঁচে নিচ্ছে, আরও খিঁচবে। সস্তা গণ্ডার জায়গায় যাচ্ছেন, এইটাই বাঁচোয়া। পাশ ফিরে আরাম করে শোন। কলকাতায় একদিন বিশ্রাম নেবার কথা ছিল, তা আর হবে না। এই কামরা দুটো শেয়ালদায় কেটে আবার নতুন ট্রেনে জুড়ে দেবে। সারা দিনের উত্তেজনায় তাঁর চোখের পাতা জুড়ে আসে।

ছোড়া বুড়ীর সঙ্গে মহাতর্ক করে। বুড়ী রাণাঘাটের স্বপক্ষে, আর চোখে না-দেখা মুন্সীগঞ্জের ভক্ত। চূর্ণী যে আসলে নদী নয়, বড় জোর একটা খাল, সেটাই অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করে। তারপর ট্রেনের একটানা শব্দে চুপ করে যায়।

জানলার বাইরে ফুটেছিল টুটুল। দুপাশে গাছপালা অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে আসে জেলখানার সামনে কার্বাইডের আলোয় গরুর গাড়ির ওপর সেই সং। একটা রোগা হ্যাংলাপানা লোক গাইছিল 'রাণাঘাট সোনার শহর, এ বাবু মহাশয়।' আর সঙ্গে সঙ্গে দলের লোকেরা তালি দিয়ে বলছিল, 'তাইতো তাইতো, তাইতো।'

সেই গানটা মনের মধ্যে ঘোরে ফেরে টুটুলের আর ট্রেনের চাকা তালি দেয়, 'তাইতো, তাইতো, তাইতো।'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ জিজ্ঞাসার
বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক পত্র
আলেখ্য
শারদীয় সংখ্যা
আগামী মহালয়ার পূর্বেই
প্রকাশিত হচ্ছে।
বিশেষ আকর্ষণ :
বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত
মূল্যবান পত্র
এবং
অজানা বিভূতিভূষণের বিষয়ে
স্মৃতি-চিত্র

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশীবিদেশী নানা আরব্য উপন্যাসের সংস্করণ জোগাড় করে মনে প্রবল বাসনা জাগলো, তিনি আরব্য উপন্যাস চিত্রায়িত করবেন। একাধিক সহস্র রজনী যেমন বাদশাজাদী গল্পে ভরে দিয়েছিল তিনি তাকে চিত্র রূপায়িত করবেন, মনস্থির করলেন।

শিল্পালাপ :

তাঁর সদ্যসমাপ্ত একটি ছবি নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় আলোচনায় আমায় তিনি বললেন—

—যখনই যে ভাবের উদয় হয়েছে, তখনই তাই এঁকেছি। মাঝে মাঝে ছবির নেশা যখন পায় তখন আর ভাবনাচিন্তে নেই। অনেকদিন ছবি আঁকা স্থগিত রেখেছিলাম। হঠাৎ মনে হল 'ওমর খৈয়ামের' মত যদি আরব্য উপন্যাসের হাজার এক গল্পের ছবি আঁকি তা হলে কেমন হয়? যেমনি চিন্তার উদয়, তেমনি কাজ শুরু। নানা স্থান থেকে নানা সংস্করণের আরব্য উপন্যাস সংগ্রহ শুরু হল। প্রথমেই রামানন্দ বাবুর আরব্য উপন্যাস, বটতলার আরব্য উপন্যাস, ইংরিজি সচিত্র আরব্য উপন্যাস, উর্দু আরব্য উপন্যাস সংগ্রহ হল। পড়া হল। এবার ছবি আঁকতে শুরু করেছি। এঁকেই চলেছি। এক একটা ছবি পাঁচ-ছ' দিনে শেষ। তবে প্রথমে বেশ একটু বেশী সময় লেগেছিল যেখানে উজিরের মেয়ে শাহজাদী বাদশাকে গল্প বলা শুরু করছেন। আর লেগেছিল আলিবাবা গল্পের দর্জির দোকানের ছবি যেখানে কাসেমের চারখণ্ড মৃতদেহ দর্জি মোস্তাফার দোকানে সেলাই করিয়ে নিচ্ছেন আলিবাবা। সেই সময় একজন ভক্ত প্রশান্ত রায় এসে পাশে বসে নিবিষ্ট হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ছবি আঁকা দেখতো আর নিজের চেষ্টায় শিখতো। কাউকে কোন জিনিস গিলিয়ে খাওয়ানো যায় না। আরব্য উপন্যাসের ছবির পর্ব চলেছে রবীন্দ্রনাথ এলেন একদিন। এসে হাজার ও পরিকল্পনার কথা শুনে কি বলে, জানেন?

—তিনি তো কবি, ছবির কি বলবেন?

—তিনি বললেন এক সপ্তাহে গড় যদি একটা ছবি হয় তো এক হাজার এক ছবি আঁকতে আরও কিছু বছর যাবে। তাছাড়া শরীর সুস্থ-অসুস্থ, মনের উদ্যমও থাকা চাই। একটা জীবনে কি এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে?

—আপনি তখন রবিকাকাকে কি বললেন?

—ওগো কবি, তুমি ছবির কি জানো? হয়তো তুমি জানো না শিল্পী যখন ছবি আঁকতে শুরু করে, সে কি সময়ের হিসেব করে বসে। সে জানে তার সম্মুখে অনন্তকাল পড়ে আছে। আর আছে অনন্ত জীবন। এর শেষ নেই কোনদিন। এই রং, এই তুলি আর এই তুলোট কাগজ চিরন্তন হয়ে থাকবে। অজন্তার গুহার গায়ের ছবির কথা ভেবে দেখো। কত শিল্পী বংশানুক্রমে গুহার গায়ে শিল্পের ধারা কয়েক শতাব্দী ধরে অব্যাহত এঁকে গেছেন। তাদের কেউ তো ভাবেনি 'আমি নিজের সৃষ্টির মধ্যে আমি নিজের নাম রেখে যাব'—তাদের নাম কি আজ কেউ জানে? তবে সবাই জানে অমর শিল্পীর অমর চিত্রাবলীর কথা। তুমি কবিতা লিখছ কবিতা লিখে যাও। নকসী-কাঁথার মাঠ লিখতে যেন নকসা এঁকো না। বড় বৌমা, আরব্য উপন্যাসের কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল?

বড়বৌমা পারুলদেবী আমার দিকে চেয়ে বললেন—যতদূর মনে হয় পঁইত্রিশখানা ছবি এঁকেছিলেন, বাবামশাই। তা আরব্য উপন্যাসের হাজার কাহিনীর ছবিতে ছাড়িয়ে গেছে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন—ছবির নেশায় ছবি আঁকি। আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হবার জন্য তো ছবি আঁকিনি। আর ব্যবসায়ী বুদ্ধি তো আমাদের বংশের ধারার মধ্যে নেই যে কেমন করে ঐ শিল্পের ভেতর থেকে সোনার নির্যাস বের করতে হয়।

প্রশ্ন করলাম, আমি শুনেছি আপনাদের বাড়ীতে লাট বেলাট আসতেন?

—কত জনই না এসেছেন নানা দেশ থেকে। সেবার কি হল মন্টেগু সাহেব আমার 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবিখানা দেখে মুগ্ধ। রাজা রাজড়ার বাড়ীতে এসে বড়লাট সাহেব কিছুর প্রশংসা করলেই সেটা যাবার সময় গাড়ীতে তুলে দেওয়ার রীতি। তিনি দাম জানতে চাইলে আমি বললাম এগুলি পরিবারের সম্পত্তি হয়ে গেছে বিক্রীর উপায় নেই। এই ছবিই একখানি এঁকে দেবো। আমি ক্যানভাসে তেল রংয়ের ছবির বদলে জল রংয়ে কাগজের উপর নকল করে দি। মন্টেগু সাহেবকে পাঠানো হল তিনি তো মহাখুশী। শুনেছি অনেককে বলতে যে ঐ জলরঙা ছবি মূল ছবির চেয়ে নাকি ভাল হয়েছিল। মন্টেগু সাহেব যখন দেশে ফিরে গেলেন শুনেছি তিনি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহাগারে যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন ঐ ছবি।

—আমি দেখেছি বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা অমর চিত্র লুভার সংগ্রহশালায় গিয়ে নকল নবিশরা নকল করে চলেছেন দিনের পর দিন। ওগুলো কোন না কোন সংগ্রহশালায় টাঙিয়ে রাখবে। এসব শিল্পী এর জন্য অর্থ উপার্জনও করেন।

—আজকাল নকল করা এও একটা ব্যবসা হয়েছে। ছবি নাকি ঐসব যাদুঘর থেকে মাঝে মাঝে চুরিও যায়।

মাঝে মাঝে চুরি যাচ্ছে। ভারতবর্ষের কত মন্দিরের গা থেকে কত না মূর্তি বাইরে বিক্রি হয়ে চলে যাচ্ছে। আমি শিল্পী নই, তাই শিল্পগুরুর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কতটা ভাবনাবেগ, বর্ণিকাভঙ্গ, সারূপ্য এনাটমী, পারসপেকটিভ, ডেপথ, শেড এণ্ড লাইট, স্পেশ, মুভমেন্ট প্রভৃতির নিয়মাবলী কতটা নির্ভুল প্রযুক্ত হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করি। চিত্রের ভাবটিকে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু রংয়ের প্রয়োজন, তার একটুও বেশী তিনি প্রয়োগ করতেন না। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে চড়া রংয়ের চটক ছিল না—এই বৈশিষ্ট্যই আমার মনকে দোলা দিত। তিনি দশ জনকে ভাববার অবকাশ দিতেন—দেখো আর ভাবো।

চটকদারী প্রচার শিল্প হিসেবে তিনি চিত্র-শিল্পের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। শুধু তন্ময় হয়ে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। দেখা যেন মেটে না। মনে হয় শুধুই দেখি, আর ভাবি সেই শিল্পের যাদুকরকে। মনে পড়ে ভিক্টর হ্যুগোর আজীবন নির্বাসনে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকা আর ভাবা। আর মনে পড়ে সেই দক্ষিণের বারান্দা। সেই-খান থেকে মন চলে যায় কল্পনা রাজ্যে ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের দক্ষিণের জোড়া জোড়া থাম দেওয়া বারান্দায় যেখানে তিন ভাই বসে আঁকছেন—গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ (শেষ বয়সে)।

শিল্পজগতে অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান হল তিনি বর্তমান চিত্রশিল্পে স্বকীয় ভারতীয় ধারার প্রবর্তনা আনেন। সেই ধারার মধ্যে প্রভাব পড়েছে গান্ধার শিল্পের, বৌদ্ধ শিল্পের, অজন্তার শিল্প-কলার ও অন্যান্য স্থানীয় চিত্রকলার, কিন্তু তারা আপন স্বকীয় সত্ত্বা এখানে এসে হারিয়েছে যেমন নদী এসে সমুদ্রে আপন সত্ত্বা হারায়। তিনিই অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অপ্রচলিত ভারতীয় চিত্রশিল্পকে উজ্জীবিত করেন। কারণ সময় ছিল উপযোগী; সেই সময় স্বদেশী যুগ। ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বদেশীয় অভিযান চলেছে আর চলেছে বিলিতি বর্জনের পালা। স্বদেশী সঙ্গীতের গতি অব্যাহত রাখলেন রবীন্দ্র-নাথ প্রমুখ কবিগণ, রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর, গোখলে, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা, স্বদেশী ওষুধ শিল্পে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কার্তিক বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। শিল্প-ক্ষেত্রে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, শিল্প-বিশ্লেষণে আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ দিক-পালেরা। সেই ধারা অর্ধশতাব্দী অব্যাহত ছিলো। আজ আধুনিক শিল্প হিসেবে যা চলছে, তা হল বিদেশীয় শিল্পের নানান পরীক্ষা পর্যায়ের কোথাও সার্থক, বহুক্ষেত্রে বিকৃত অনুকরণ, কোথাও বা কিছুটা দেশীয় শিল্পের জারকরসে জারিত, কোথাও বা দেশীয় শিল্পের হালকা প্রলেপে ঢাকা।

একদিন প্রখ্যাত শিল্পী প্রথের বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (যিনি এযাবত অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার নানান ধরনের ছবি এঁকেছেন) মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলাম আপনার দেখা ও আঁকা আরব্য উপন্যাসের ছবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির কি পার্থক্য?

তিনি বললেন—আমার ছবি ফরমাস মত আঁকা।

—কে ফরমাস করল? আপনি নিজের ফরমাস মতই তো এঁকেছেন।

—মোটেই তা নয়। প্রকাশকরা ছাপাবেন আরব্য উপন্যাস তাই ঐ বইয়ের জন্য আঁকতে হয়েছে। আমি এঁকেছি অন্যের জন্য। শিল্পগুরু এঁকেছেন, ভাল লেগেছে বলে। ভাব এসেছে মনে, ভাবের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণার তাগিদে তিনি এঁকেছেন। প্রত্যেক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

দক্ষিণেশ্বরের জলকলের বাগানে অবনীন্দ্রনাথ

—দেখুন, আপনার এই আরব্য উপ-ন্যাসের ছবিগুলির এক অপূর্ব চোখ ধাঁধানো রং। দেখলেই টেনে নিয়ে যায় ছবির গভীরে।

—আমার তো কমার্শিয়াল আর্ট। চটকদার না করলে কেউ বই কিনবে না।

—আচ্ছা, আপনার আঁকার কি পদ্ধতি?

—আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলো কী পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন?

—একেবারে বিলিতি কায়দায়।

—কেন একথা রহস্য করে বলছেন? অজন্তা গুহাচিত্রের অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে আপনার ছবিগুলো কী তুলনীয় নয়?

—আরে না, না। একেবারে বিলিতি ছবির ধাঁচে আঁকা। শিখেছি সাহেবের কাছে। তাদের আঁকা বহু ছবি দেখেছি আর এঁকেছিও সেইমত। তাতে যদি কিছু স্বদেশীয় থেকে থাকে তো তা অজান্তে এসেছে।

—গান্ধার কলার সঙ্গে কী ছবিগুলি তুলনীয় নয়?

—শুনেছি অনেকে বলেন এতে গ্রীক প্রভাব রয়েছে।

—হতে পারে। নতুন কিছু এলে তার কমবেশী কিছু প্রভাব পড়বেই। সেকেন্দার সাহেব ভারত আক্রমণের পর গ্রীক শিল্প-কলার অল্প-বিস্তর প্রভাব ভারতবর্ষে এসেছিল সত্য, কিন্তু ভারতে এসে তার নিজস্ব ধারা হারিয়েছে। শিল্প হিসেবে তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। এ নিয়ে আনন্দ কুমার-স্বামী, ই. বি. হ্যাভেল বারবার সেই কথাই বলে গেছেন।

শিল্পগুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রকা-শিত হয়েছিল সেদিনের এই আলাপচারে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শিল্পশিক্ষণের এক বিশেষ ধারা প্রবর্তন করেন। তার মূল তত্ত্ব হল, 'দেখো, দেখো আর আঁকো। তিনি ঐ ওজন, গজ, দাঁড় সুতো, গড়, মাটামের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্তরের অনুভূতি ও প্রেরণায় দুই চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে তুলি ও রংয়ের স্পর্শে তাকে জীবন্ত করে তোলার শিক্ষা দিতেন। নিয়ম-তান্ত্রিক বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় তাই বারবার চোখ আর তুলির উপর নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দিতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য অঙ্কনের সাধারণ রীতিনীতি অবশ্যই অনুশীলনের প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ চিত্রচিত্রণে যদি প্রচুর স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন, তবুও তিনি শিষ্যদের কথা বিস্মৃত হন নি। তার প্রমাণ

CENTRAL LIBRARY

আমরা পাই পরিণত বয়সে 'সহজ চিত্রশিক্ষা বা 'চিত্রাক্ষর' প্রভৃতি পুস্তিকায়।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-কলার মূল তত্ত্বকে অতি সরল, অতি ললিত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত করেন তাঁর বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার উনত্রিশটি বক্তৃতায়। তাঁর বিশ্লেষণমূলক শিল্পের ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধে। আমরা ভারতবাসী হলেও নিজের শিল্প থেকে কতখানি দূরে সরে গেছি এবং বিদেশী হলেও তাঁরা এই ভারতশিল্পের মর্মকেন্দ্রের কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছেন, তার উদাহরণ দিয়ে শিল্পগুরু বুঝিয়েছেন। জাপানী শিল্পী 'ওকাকুরার' একান্ত ইচ্ছা জগন্নাথের মন্দিরের ভারতীয় শিল্পীর হাতে গড়া দেব-মন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার মায় দেবতাকে পর্যন্ত দেখবেন। তিনি তাই বললেন, শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন আইনবলে আমাদের হয়, সেই প্রথায় শিল্প কিন্তু আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হল 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। প্রবন্ধটির উপসংহারে এক অসাধারণ উক্তি করলেন: এত যে আয়োজন শিল্প শেখানোর—এর প্রয়োজন কোনখানটায়? যুগযুগান্ত ধরে বর্ষার আবির্ভাবে আকাশ মেঘে মেঘে ভরে যায় শুধু একজন কবির জন্য মেঘ অপেক্ষা করেছিল যিনি তাদের অমরত্ব দেবেন। কোন এক বিশেষক্ষণে কোন এক স্ফুলিঙ্গ কার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে; কোন এক পরমানন্দের কথা নিয়ে কোন আর্টিস্ট নিভৃতে বিচিত্র রূপ রসের সাধনায় নিমগ্ন হবেন। পৃথিবীর প্রচুর ধনরত্ন, মণি মাণিক্য রাজশিল্পী সাজাহানের জন্য অপেক্ষা করেছিল ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহল নির্মাণে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন করছি, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা শিল্পের হাট, কারুসঙ্ঘ, কলাভবন —এটা ওটা করছি সব সেই একটি আর্টিস্টের, একটি রসিকের জন্য যে হয়তো এসেছে কিংবা হয়তো আসবে।' শিল্পের অধিকার প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য বললেন নিয়তিকৃত, নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্য পরতন্ত্রা নব রস রুচিরার কথা শাস্ত্রের রেখায়-বাঁধা রূপ, ছবির ছন্দে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ সবই তো যে রস বইছে তারই নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে; অখণ্ড রসের খণ্ড-খণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ। এর অধিকার পাওয়ার জন্য কোন আয়োজন, কোন শাস্ত্র-চর্চাই দরকার করে না। শুধু দেখো আর লেখো, শুনে যাও আর বসে থাকো।

চিত্র শিল্পের বিশ্লেষণে শিল্প গুরু বললেন, কথা বলতে গেলে ব্যাকরণ মানতে হয়। কথার ব্যাকরণ হল ধাতু যা ভাষাকে ধরে থাকে তেমনি শিল্পের ব্যাকরণ হল কাঠামো বা Form। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার হিসেব করে পণ্ডিতরা বললেন, এটা হল 'প্রকৃত', এটা 'মাগধী', এটা 'ভোজপুরী' এটা 'অপভ্রংশ', এটা মিশ্রিত বা সংস্কৃত তেমনি আর্টের ক্ষেত্রেও শিল্পগুরুর বিশ্লেষণে শাস্ত্রীয় শিল্প (Academic Art) লোকশিল্প (Folk Art), পরশিল্প (Foreign Art) ও মিশ্রশিল্প (Mixed Art) 'লোকশিল্প' বলতে তিনি বোঝালেন যে সব আর্ট শাস্ত্রীয় লক্ষণের সঙ্গে না মিলেও মন হরণ করে যেমন পট পাটা, ঘটি বাটী, গহন গাঁটি, থালা বাসন, কাপড়-চোপড়, শাল দোশালা। শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে 'পণ্ডিতানাং মতম্' নিয়ে রচিত শিল্প হ'ল শাস্ত্রীয় শিল্প, যেমন দেব-দেবীর মূর্তি রচনা। পর শিল্পের উদাহরণ পাট গান্ধার শিল্প, একালের অয়েল পেন্টিং বা তেল চিত্র। মিশ্র শিল্পের পর্যায়ে পড়ে চীনের বৌদ্ধ শিল্প, জাপানের 'নারা' মন্দিরের শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা গান্ধার শিল্পের বৌদ্ধ শিল্প, এশিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার য়ুরোপীয় শিল্প এবং বর্তমানের বাংলার চিত্র কলার পর্যন্ত।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় সরস্বতী-যিনি নদীর জলের মত সরে সরে যান, স্থির থাকেন না। স্থির থাকার রীতি নয়, স্থির থাকলেই মৃত্যু: গমন করে বলেই এই চলমান হল জগৎ। সাহিত্যের গতি মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাবের গতির সঙ্গে ভাষার গতিরও পরিবর্তন হয়। গানের বেলাও সুরের গতি পরিবর্তিত হয় তেমনি ছবির বেলাও স্টাইল উল্টে-পাল্টে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলা ওর ধর্ম। কিন্তু অগ্রগতির মাত্রায় হয়তো সব সময় সমান উৎকর্ষতা লাভ নাও করতে পারে।

শিল্পের গতি সব সময় অব্যাহত; এর সৃষ্টিরহস্য সেই পৃথিবীর মত গঠিত কাঠামোর বিকাশে প্রবীণা হলেও চির নবীনা। যে হেতু মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব প্রকৃতির মিলনে যখন শিল্পের জন্ম; তাই তা শাশ্বত ও চিরন্তন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিলেতের এক খ্যাতিমান শিল্প-সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচিত 'ওমর খৈয়ামের' উপর চিত্র প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> Omar Khayam has been illustrated by some of the best English artists, but these illustrations of Mr. Tagore's hold their own against any in the field.

যেখানে ভারতীয় শিল্পী ইংরিজি নকলনবিশি করেছে সেখানে খ্যাতি পায়নি

> "The work of those Indian artists who have so long slavishly imitated south kensington methods have not stirred so much as a ripple in European art circles, but Mr. Abanindranath Tagore's work has, been treated with the utmost reverence by our foremost art journal."

এমনি করে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন: বোঝাতে চাইলেন শিল্পীর পরিভাষায় নয়, সহজে সাধারণ সবার কাছে পৌঁছতে পারে সরল ভাষায় গভীর ভাবের তত্ত্ব। দৈনন্দিন ঘটনা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে উপমা টেনে বোঝালেন শিল্পের সুগভীর তত্ত্ব, অপূর্ব নন্দনতত্ত্ব। চললো তাঁর বলা—দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শিল্প ও ভাষা, শিল্পের সচলতা ও অচলতা, সৌন্দর্যের সন্ধান, শিল্প ও দেহতত্ত্ব, অন্তর-বাহির, মত ও মন্ত্র, শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ, রস ও রচনার ধারা, শিল্পবৃত্তি, সুন্দর, অসুন্দর, জাতি ও শিল্প, অরূপ না রূপ, রূপবিদ্যা, রূপ-দেখা, স্মৃতি ও শক্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম, রূপ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গম।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পগুরুর অসামান্য দানের মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এই নব-মূল্যায়নের মধ্য থেকে আমরা ঠাকুরবাড়ির আর এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাব। বাংলার নবজন্মে যে-সব মনীষীদের দান অবিস্মরণীয় শিল্পগুরু তাঁদের মধ্যে এক বরণীয় পুরুষ এ-কথা বাঙালী সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

।। শেষ ।।

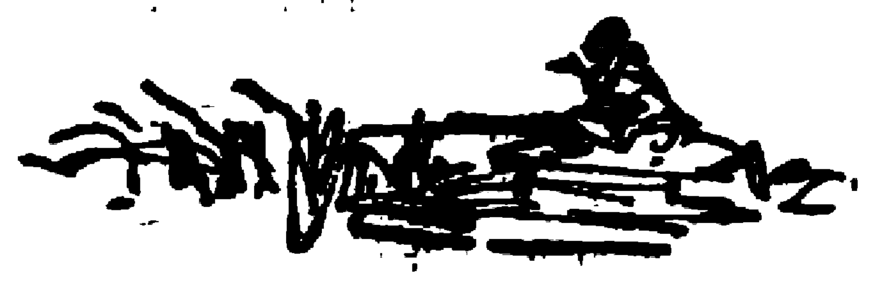

আজকালকার
ছেলেমেয়েদের
মতিগতির নকশা
যেমন তরুণ মনের, তেমনি তরুণ পায়েরও
তল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের
সারা জীবনের সাধনাই তো এই নিয়ে।
বাটার দোকানে এলে তাঁদের সেই
গবেষণা, অনুশীলন আর পরীক্ষা-
নিরীক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে।
আরামভরা ও টেকসই, বাহারেও মানানসই।
কাজও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে।
বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল ধকল
সইতে পারে এমনভাবেই এই জুতো
তৈরি। ছোটোদের যার যার নিজের
জুতো বেছে নিতে দিন।
Bata
৯.৯৫—১৪.৯৫
৭.৯৫—১০.৯৫
১৩.৯৫—২০.৯৫
১০.৯৫—১৭.৯৫
১৭.৯৫—২২.৯৫
১১.৯৫—২৩.৯৫
৩০.৯৫
৩০.৯৫

CENTRAL LIBRARY

শরৎচন্দ্রের কবিমানস

প্রীতি সরকার

শরৎচন্দ্রের মনের শিল্পশালায় উপাখ্যানগুলি উপন্যাস হিসেবে প্রকাশের পথ বেছে নিলেও শরৎচন্দ্র ছিলেন কবিপ্রাণ-পুরুষ। যৌবনাবধি তিনি সহজ ও সরল অভিব্যক্তির জন্য গদ্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিই তাঁর কবিমনের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। শরৎচন্দ্রের কবিসত্তার দুইটি প্রকাশ—একটি প্রাকৃতিক বর্ণনা, দ্বিতীয়টি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ উপলব্ধির কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গী।

কবিতা সর্বকালীন, কারণ আমাদের অনুভূতির আবেগের চিন্তার বিশুদ্ধতম নির্যাস কবিতায় প্রকাশ পায়। কবিতায় সেই মানুষটাই কথা কয়, যে মৌল মানুষ ঈর্ষা-প্রেম-ইচ্ছা-আশা-সুখ-দুঃখে জড়িয়ে আমাদের সকলের ইন্দ্রিয়রা আমার অন্তর ধুক-ধুক করছে। সমাজজীবনের বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও কবিতার রস পুরোনো হয় না। মানুষ নামে যে সামাজিক জীবটাকে আমরা বহির্জীবনে সব সময় দেখি, তার সাজপোশাক হাবভাব রীতিনীতি যুগে যুগে বদলাচ্ছে, কিন্তু তারই বুকের তলায় যে আদিমকালের জীবটা বাস করে, আমাদের অন্তর্জীবনের ভাঙাগড়ায় যার প্রবল প্রভাব অনুভব করে থেকে থেকে চমকে উঠি তার তো পরিবর্তন নেই। কবিতা তারই জীবনচরিত।

অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা না থাকলে কোনো কবির অনুভূতি বিচিত্র সুরে বেজে উঠতে পারে না। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর চিন্তাশীল কবি দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর কবি আছেন যাঁরা চিন্তা এবং বিচার দিয়ে জীবনের অনেক প্রশ্নের ও সমস্যার সমাধান করে ফেলে একটা নির্দিষ্ট সত্যে এসে পৌঁছান; দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা যত বিচিত্র ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, কবিতা লেখার সময়ে এঁরা যে অনুভূতিকে আশ্রয় করেন তা একাধিক বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত সত্য। সুতরাং সত্য যখন কবির মনের মধ্যে অনুভূতি হয়ে জেগে ওঠে তখনই তা একটি অখণ্ড নির্দিষ্ট অনুভূতি। কাজেই চিন্তাশীল কবি যখন অনুভূতিতে এসে পৌঁছন তখন তাঁর মধ্যে বিচিত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায় না। চিন্তা যত বিচিত্র হোক না কেন—এই বিচিত্র বিভিন্ন চিন্তাপদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তা একটিমাত্র অখণ্ড অনুভূতি। কিন্তু বৈচিত্র্য তো অনুভূতিতে নয়, বৈচিত্র্য এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে যাতায়াতের পথের মধ্যে। এই যে এক অনুভূতি থেকে অন্য অনুভূতিতে যাতায়াতের পথ, সেই তো চিন্তার পথ। সুতরাং অনুভূতির সঙ্গে যাদের চিন্তা জড়িত হয়ে না যায় তাদের অনুভূতির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না। চিন্তাশীলতা ও অনুভূতি পৃথক হয়ে থাকলে চলে না—একটির সঙ্গে অপরটির ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা চাই। চিন্তার যেখানে শেষ অনুভূতির আরম্ভ হয় সেইখানে। আর, অনুভূতিকে আশ্রয় করেই কবিতা গড়ে ওঠে। কবিতা হল পৃথিবীর প্রতি কবির ভাব ও আনন্দময় বাণী যার সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। আর কবি তিনি, যিনি বিশ্বলোকের সকল সৌন্দর্যরস পান করে সেই সৌন্দর্য থেকে উৎসারিত আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন।

কবিত্ব কি? কবির কাজ কি? কবি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে তার বিবিধ সত্য ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করেন। তাতে পাঠক বা শ্রোতা মুগ্ধ ও আলোকিত হয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যান, যে কবি তাঁর এই কবিত্ব দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ ও উন্নত করতে সমর্থ হয়েছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আর যে কাব্যে নব রস সুন্দর ও বিশদরূপে সঞ্চারিত হয়ে লোককে সুখ, দুঃখ, ভয়, ভক্তি ইত্যাদিতে অভিভূত করে তাই কাব্য। কবিত্ব লোককে উন্নত করে, কাব্য লোককে মুগ্ধ করে। আবার প্রত্যেক কাব্যেই কবিত্বের কিছু না কিছু বিকাশ থাকে। অলৌকিক বিভূতিতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যিনি সুন্দরভাবে দেখেন, সেই পরমবস্তুর দিকে

লোকের আস্থা আকৃষ্ট করতে পারেন, তিনিই তো কবি। রূপের মধ্যে রূপাতীত ভাব প্রত্যক্ষ করেন যিনি, প্রকৃতপক্ষে তিনিই কবি।

শরৎচন্দ্রের কবিমানসও এই দিক দিয়ে বিচার করতে হয়। সাধারণের চোখে অন্ধকারের কোনো রূপ নেই, শরৎচন্দ্র তাকে দেখেছেন অপরূপ রূপে, তাঁর গ্রন্থ শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডে তিনি আঁধারের রূপ বর্ণনা করে বলেছেন, 'রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জলমাটি, বন জঙ্গল, প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি অন্তহীন কালো আকাশের তলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল, মনে হইল কোনো মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই। এতবড় ফাঁকি মানুষেরা কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই যে আকাশবাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে। মরি! মরি! এমন অপরূপ

রূপের প্রকাশ আর কবে দেখিয়াছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর যত অচিন্ত্য যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার, সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার, কিন্তু সে কি রূপের অভাব? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দুই চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল তাহাও ঘনশ্যাম, কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই কোনোদিন এ পথে চলি নাই, তবুও কেমন করিয়া জানি না এই জরাজীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে তো কোনোদিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়, একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দুই চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো? হে আমার অভ্যাগত পরমাগত! হে আমার সর্ব দুঃখের দুঃখহারী অনন্ত সুন্দর, তুমি তোমার আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও। আমি তোমার অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল তাইতো? তাহার এই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তঃপুরবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য, একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?'

শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব সূচনাতে শরৎচন্দ্র ঘোষণা করে বলার মতন করে বলেছেন যে, তিনি কবি নন, তখন তাঁর সেই ঘোষণাই কবিত্বের দ্যোতনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যে প্রকৃতই কবি তাঁর এই ঘোষণার মধ্যেই তা ঘোষিত হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের পরমাত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠকবর্গকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জানবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, "আমার জানতঃ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিকতম রচনা কি, মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি সর্বদাই বলি, একটি কবিতা। উত্তর শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। কি আশ্চর্য, শরৎচন্দ্রও কবিতা লিখেছিলেন নাকি, কিন্তু এ কথায় প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হবার কোন হেতু নেই। খ্যাতনামা বহু লেখকের সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কবিতা রচনা দ্বারা। অবশ্য সময়মতো তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে গদ্যনারায়ণের সমৃদ্ধতর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কবিতা-সাধনাকালে আহৃত ছন্দ, লয় এবং ওজন সম্বন্ধে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান, গদ্যরচনার কালে যা পদে পদে তাঁদের কাজে লেগেছিল। সতর্ক লেখক মাত্রেই অবগত আছেন, গদ্যও একেবারে ছন্দোবর্জিত বস্তু নয়। একটি বাক্য রচনার পর কান যেন কেমন খুঁতখুঁত করতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যেন ওজনের কেমন একটু ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। একটু অভিনিবেশের ফলে যথাস্থানে যথোপযুক্ত শব্দ সংযোজিত হওয়ামাত্র পরিপূর্ণতার মহিমায় কান খুশী হয়ে উঠল। এমন অভিজ্ঞতা পাকা প্রবীণ লেখকের নিকটও বিরল নয়। গদ্যরচনাতে ছন্দ এবং মাত্রা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অতি সূক্ষ্ম চেতনা যে ছিল, ঈষৎ ধৈর্যের সহিত তাঁর কোনো একটা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখলেই তা ধরা পড়ে। এমন অনেকবার দেখা গেছে, সামান্য একটা হয়তো দুই অক্ষরের ক্ষুদ্র শব্দকে বাক্যের একই স্থানে বারবার দুইবার যোগ করে দুবারই কেটেছেন। তারপর তৃতীয়বার সেই শব্দটিকেই বাক্যের অন্য এক জায়গায় স্থাপন করে তবে নিরস্ত হয়েছেন। ছন্দ ও মাত্রা বিষয়ে এই জ্ঞান শরৎচন্দ্র কবিতা রচনার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, এমন কথা অবশ্য আমি বলছিনে, কারণ আমি তাঁর একটিমাত্র কবিতারই সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে কবিতার সন্ধান পেয়েছিলাম সেটি শরৎচন্দ্রের প্রথম চেষ্টার ফল বলেও মনে হয় না। তার মধ্যে শৈশবের অপরিণতির লক্ষণের চেয়ে কৈশোরের কতকটা সুপরিণতির লক্ষণ ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং আলোচ্য কবিতাটির রচনাকালের পূর্বেও শরৎচন্দ্র কবিতা রচনায় বিষয়ে খানিকটা হাত পাকিয়েছিলেন, সে কথা অনুমান করা যেতে পারে। তবে কপালে পড়ে যে কবিতাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ এবং যে কবিতাগুলির অস্তিত্ব আমি অনুমান করছি সবগুলিই সেই একই ধরনের পথে পথিক হয় নি। কবিতা রচনার কথা বাদ দিলেও, শরৎচন্দ্রের ন্যায় কবিতার অনুরাগী পাঠক খুব বেশী দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বড় বড় কবিতা এমন বিস্ময়জনকভাবে তাঁর মুখস্থ ছিল যে, পুস্তকের সাহায্য কিছুমাত্র না গ্রহণ করেও নির্ভুলভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করে যেতে পারতেন।

"শরৎচন্দ্রের যে কবিতাটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার আয়তনের চিত্র আমার মানসপটে এখনো সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের হাতের মুক্তোর মতো সুন্দর অক্ষরে বেগুনে কালিতে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একদিকেই শেষ করা তিন-বত্রিশ লাইনের একটি কবিতা। একমাত্র প্রথম লাইনটি ছাড়া তার অন্য কিছুই আমার মনে নেই। প্রথম লাইন হচ্ছে 'ফুলবনে লেগেছে আগুন'। মাত্র দশ অক্ষরের একটি অতি ক্ষুদ্র লাইন, কিন্তু অসাধারণ না হলেও একেবারে সাধারণও নয়। ফুলবনে আগুন লাগার কল্পনার মধ্যে নূতনত্ব শুধু নেই, এমন একটু মর্মান্তিকতার স্পর্শ আছে যা আমাদের মনকে সহজেই আহত করে। গোলাপ, মালতী, মল্লিকা, অপরাজিতা অগ্নির দহনে চড়চড় করে পুড়ে যাচ্ছে এ সত্যি একটা করুণ ট্র্যাজেডি, ফুলবন যদি উপমার ফুলবন হয় তা হলেও।"

"যদি প্রশ্ন ওঠে কাব্য কি, বলা যায় বাক্য রসাত্মক কাব্য। অর্থাৎ যে বাক্যের অর্থ কেবলমাত্র বাচ্যার্থের মধ্যে সীমিত না থেকে একটা অতিরিক্ত অর্থের দ্যোতনা করে তাই কাব্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সমাজ সংসার মিছে সব/ মিছে এ জীবনের কলরব।'

তেমনি শরৎচন্দ্রও শ্রীকান্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নদী ও রাত্রি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সে কথা আমি আজও ভুলতে পারি নাই, বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।'

কাব্য দু-প্রকারের —গদ্য কাব্য ও পদ্য-কাব্য। মেঘদূত পদ্যকাব্য। বিদ্যাসুন্দর পদকাব্য। গদ্যকাব্যের অভিব্যক্তি সহজ ও সরল। পদ্যকাব্য ছন্দের গণ্ডীতে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনশ্চ কাব্যে ছন্দ সম্বন্ধে ভীরুতা বর্জন করে কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহসী হয়েছেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মত প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ পদার্থকে পরিহার না করেও চলতে পারে। গদ্য ও কাব্যের সমন্বয় ভাবানুযায়ী পর্ব বিন্যাসে সহজ, তা পদ্যে একেবারেই সম্ভবপর নয়। কবি কোনো তুচ্ছ জিনিসকেই বাদ দেন নি তাঁর পুনশ্চ কাব্যে। তাই এসব কাব্যের পক্ষে গদ্য অপরিহার্য বাহন, কারণ গদ্যকাব্যের সুবিধে হচ্ছে তার অভিব্যক্তি সহজ ও সরল, পদ্য কাব্যের ঐশ্বর্য এতে নেই কিন্তু এর একটি শান্ত মধুর রস আছে যা এর নিজস্ব সম্পদ। গদ্যে লিখিত শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সাইক্লোনের বর্ণনা ভাবানুযায়ী পর্ব বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায়, তা এই—

রাক্ষসী সাত শ নয়, শতকোটি
উন্মত্ত কোলাহলে এ দিকেই ছুটিয়া
আসিতেছে
রাক্ষসী নয়—ঝড়, আসিয়াও পড়িল।
এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি সমগ্র চেতনা দিয়া
অনুভব
মানুষের সামর্থ্যের বাইরে।
শুধুমাত্র একটা জ্ঞান দুর্দান্ত সমস্ত অভিভূত
অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা
আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া ফেলিবে।

শরৎ রচনাবলীতে যে লিরিকাল আত্মাভিব্যক্তি শ্রীকান্তর মুখেই তা ব্যক্ত হয়েছে। এই লিরিসিজম শ্রীকান্ত গ্রন্থের ঐশ্বর্য। সাধারণ উপন্যাসে এই লিরিসিজমের অবকাশ থাকে না। তাই উপন্যাস হয়েও শ্রীকান্ত কাব্য। শ্রীকান্ত উপন্যাস নয়, কারণ কোনো একটি বিশিষ্ট আখ্যান বস্তুকে কেন্দ্র

CENTRAL LIBRARY

করে কেন্দ্রানুগ উপাদানে এক গড়ে তোলা হয় নি। কেবল রাজলক্ষ্মীর আখ্যানটিকে অনুসরণ করে একটি ছোট উপন্যাস পাওয়া যায় বটে ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে আখ্যানের যোগ সামান্য। এই প্রেমের কাহিনীতে ঘটনা-বাহুল্য নেই শুধু এই অংশেই আসল উপন্যাস, এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মিল আছে। বিদ্যাসুন্দর যেমন অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য শ্রীকান্ত-পিয়ারীর প্রণয়কাহিনী শ্রীকান্তের গর্ভকাব্য।

শরৎচন্দ্র যে কত বড় কবি তা শুধু শ্রীকান্তের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, শ্রীকান্তের ভাষণেও অভিব্যক্ত। ইন্দ্রনাথের নির্ভীক স্বার্থত্যাগ ও সহজ বৈরাগ্যে বিমুগ্ধ শ্রীকান্তের কণ্ঠে গীতিকবিতা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। শ্রীকান্তের মুখে বর্ণিত অন্ধকারের রূপ চমৎকার অদ্ভুতরসের চিত্র-বিস্ফারিত কবিতা। বিহারের গ্রামে সখের সন্ন্যাসী শ্রীকান্ত মাধুকরী করতে গিয়ে যে অভাগিনী বাঙ্গালী কন্যার শোচনীয় দশা দেখেছিলেন তার বর্ণনা করুণ রসের চমৎকার কবিতা। সাইক্লোনের স্মৃতিকথা বিবৃতি প্রসঙ্গে সমুদ্রের যে প্রলয়ঙ্করী মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন তাও অদ্ভুত রসের কবিতা। শ্রীকান্ত কমললতার কথোপকথনও যেন কবিতার পংক্তি পরম্পরা। আর মুরারিপুরের আখড়া শরৎচন্দ্রের কবিমনের সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন, 'বৈষ্ণবের আখড়া একাধিক দেখিয়াছি কিন্তু মুরারিপুরের আখড়ার মতো আখড়া দেখি নাই।' শরৎচন্দ্র তাকে আপন মনের মাধুরী দিয়ে রং ফলিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন। এও যেন একটি কাব্য। কমললতা এই কাব্যের নায়িকা। কমললতা পুরোদস্তুর ভাববিগ্রহ নয়। মৃণালকল্পের পঙ্ক তার সর্বাঙ্গে এখন যেন আর বিন্দুমাত্র নেই। প্রথমজীবন তার পঙ্কে বর্ণিত বলেই বোধ হয় সে কমল। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দে মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়, ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—ব্যাকরণের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।'

শুধু কাহিনী রচনায় কেন, শরৎচন্দ্রের পত্র-রচনায়ও কবিমনের পরিচয় আছে। রেঙ্গুন থেকে তাঁর বাল্যসহচর বিভূতিভূষণ ভট্টমশাইকে লিখিত একটি পত্রে আছে, 'আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম পুরোপুরি গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তুলনা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ বাধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম গৃহিণী আমার অভিমান-ভরে আর একজন সুপাত্রে জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি পোটলাপুঁটলী হাতে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম। এটা যে কি হইয়া গেল আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী, যখন শুনিলাম তিনি ব্রহ্মকন্যা কান মলিয়া এক হাত নাকখত দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি—চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা কবিতা মাথুরে লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি বধূ পূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা শুরু করিয়াছিলাম এইবার সেটা শেষ করিব।'

জীবনের যে ইতিহাস তার ভিতরও কোন জায়গায় লিরিক রসের সূক্ষ্ম অবসর থাকে। শরৎচন্দ্র সূক্ষ্মতম অবসরটুকু পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কবিদৃষ্টি ও বিশিষ্ট রস প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন।

যিনি জোড়া দিয়ে রাখেন তিনিই কাব্যলক্ষ্মী। এই কাব্যলক্ষ্মী যার অন্তরে তিনিই তো কবি। এই কাব্যলক্ষ্মী কবির অন্তরে দুভাবে কাজ করেন। তাঁর প্রভাবে কোন কবি জলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন আবার কোনো কবি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো আলোড়ন তুলে ভূকম্পনের সৃষ্টি করেন। কাব্যলক্ষ্মী প্রথম পর্যায়ে কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, আর দ্বিতীয় পর্যায় কাজ করেছেন শরৎচন্দ্রের মধ্যে।

যেমন শ্মশান সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে—শ্মশান একটি ভয়ঙ্কর স্থান। শ্মশান সম্বন্ধে আমাদের মনে ভীতিও আছে। আমরা অনেক সময় একাকী শ্মশান-ভূমিতে যেতে ইচ্ছে করিনে। এটি অত্যন্ত শান্ত জায়গা। একটা সাম্যও আছে। এখানে সবাই সমান। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলেই সমান। তাই শ্মশানের সবই নীরব, সবই নিস্পন্দ। এই জন্যে অনেক সময় কোনো শান্ত জায়গায় একটু বিকৃত বিবরণ দিতে গেলে আমরা বলি — শ্মশানের শান্তি, অর্থাৎ এ শান্তি যেন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শান্তি নয়।

অথচ শ্মশানের শান্তির মধ্যেও যে শ্রী আছে সৌন্দর্য আছে — এ কথা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। শ্মশানকে আমরা অকল্যাণভাবে ও সহৃদয়তার সঙ্গে দেখিনে, তাই বুঝি শ্মশানের প্রতি আমাদের এই ঔদাসীন্য।

কিন্তু যিনি কবি, যিনি ভাবুক, যিনি সহৃদয় তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিষই মর্যাদা পেয়ে থাকে। শ্মশানও তার কাছে সুন্দর হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্র এই শ্মশানের নিস্তব্ধ নিরাবরণ ও নিরাভরণ মূর্তির মধ্যেও রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। মধুমক্ষিকা ফুল থেকে মধু আহরণ করে শরৎচন্দ্রও শ্মশানের মধ্যে থেকে রূপ আহরণ করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত গ্রন্থে লিখেছেন জমিদার বন্ধুর আমন্ত্রণে শিকারের জন্য গিয়ে শ্রীকান্ত যখন শুনলেন ভীরু বাঙ্গালী বাবু-কালে ভেঙ্গে যায়, মহাশ্মশানের মতো একটা ভয়ঙ্কর স্থানে অমাবস্যা রাত্রে এক বাঙ্গালী বাবু এটা অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। শ্রীকান্ত তখন বাঙ্গালীর সাহস প্রমাণ করার জন্য একাই গেল অমাবস্যা রাত্রে—মহাশ্মশানে, সঙ্গে বন্দুক। শ্রীকান্ত বলছে, 'বাপ, চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্র-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মা নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে—এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে — মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহতারাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতর ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার বাপ বলিয়াই থামিয়াছিল সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুল গাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূর আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডালপালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকার রহিয়া রহিয়া কাঁদে। ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয় — শকুন-শিশু — অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে — না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে এবং তাহাদেরই একটা দুষ্টু ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।"

এই বর্ণনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের কবিচিত্তটি উদ্ভাসিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৃটেনের এই বিমানযুদ্ধ চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম দুই পর্যায়ে জার্মান বিমানবহর ইংলিশ চ্যানেলের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং উহা নির্বিঘ্ন করিতে চাহিল, আর বৃটিশ বিমানবহর (R. A. F.) ও বৃটিশ বিমান ময়দান ও ঘাটিগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড অভিযান করিতে হইলে ইহাই ছিল প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্বে ব্যর্থ হইয়া বাকি দুই পর্যায়ে জার্মান বিমানবহর একেবারে বে-পরোয়া আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্র লণ্ডনকে সম্পূর্ণরূপে চুরমার করিয়া দেওয়া, উহার যানবাহন ও সরবরাহ বিপর্যস্ত করা এবং তখনকার দিনের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা বৃটিশ জাতিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তার নৈতিক শক্তি ধ্বংস এবং এভাবে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

যদিও অল্পবিস্তর বিমান আক্রমণ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি ১৯৪০ সনের ৮ই আগস্ট (এই তারিখ বিতর্কিত) ছিল বৃটেনে জার্মান বিমান অভিযানের সরকারী উদ্বোধন তারিখ। ৮ই হইতে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত চলিল ইংলিশ চ্যানেল দখলের যুদ্ধ। তীরবর্তী শহর ও জাহাজগুলির উপর সারা গ্রীষ্মকালই আক্রমণ চলিল বটে, কিন্তু ৪০০ বিমানের ব্যাপক অভিযান শুরু হইল ৮ই আগস্ট তারিখ একটি কনভয়ের উপর আক্রমণের দ্বারা। ব্রাইটনের দক্ষিণ হইতে পোর্টল্যান্ড পর্যন্ত জার্মান বোমারুর হানা আরম্ভ হইল। বৃটেনের 'হারিকেন' ও 'স্পিটফায়ার' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মানীর মেসারস্মিটস এবং হেন্‌কেইল ও জাঙ্কার বিমানগুলিকে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত করিল। বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত বিমানগুলি বিদীর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। ১৫ই আগস্ট ১৮০ খানা নাৎসী বিমান ধ্বংস হইল, তিনদিন পর ১৫০ খানা, আর বৃটিশ পক্ষের মাত্র ৫৬টি বিমান ও ২৭ জন পাইলট নষ্ট হইল। প্রথম ১০ দিনে জার্মানী হারাইল ৬৯৭টি বিমান আর বৃটেন ১৫০টি।

জার্মান বিমানবহরের কর্তা ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং এই ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া কিছু সাবধান হইলেন এবং সপ্তাহখানেকের মত বিশ্রাম লইয়া নূতন উদ্যমে তাঁর স্কোয়াড্রনগুলিকে পুনর্গঠন করিলেন। ফলে ২৪শে আগস্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ এবং ক্রমেই অধিকতর জঙ্গী বিমানের পাহারায় ইংলণ্ডের ব্যাপকতর এলাকায় জার্মান বোমারু হানা দিতে লাগিল। ৩০শে আগস্ট তারিখ একদিনে ৮০০ বিমান ইংলণ্ডে হানা দিল এবং তখনকার দিনের সংবাদপত্রে ইহা হাজার বিমানের আক্রমণ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। আর এ এফ-এর সঙ্গে চলিল ঘোরতর যুদ্ধ, কিন্তু এবারও জার্মানীরই ক্ষতি হইল বেশী—৫৬২টি নাৎসী বিমান ও ২১৯টি বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইল, আর ১০২ জন বৃটিশ পাইলট বিমান-ছত্রযোগে নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করিল। নাৎসী বোমারুর দল দিবাভাগের এই যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমে রাত্রিযোগে হানা দিতে লাগিল।......

৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৫ই অক্‌টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ, যার প্রধান লক্ষ্য হইল লণ্ডন নগরীর ধ্বংসসাধন। দিবাভাগে ৩৮ বার হানা দিয়া এই শহরকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা হইল এবং সেই সঙ্গে ইহার সুবৃহৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিকদের মনোবল ভাঙ্গিবারও দুরন্ত চেষ্টা চলিল। স্বয়ং গোয়েরিং একবার উড়িয়া আসিলেন ইংলণ্ডে এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য। তাঁর ধারণা ছিল এই আঘাতেই লণ্ডন ধরাশায়ী হইবে। রাজধানীর চারিদিকে বিমানমারা কামানশ্রেণী সক্রিয় হইয়া উঠিল, আর 'স্পিটফায়ার' ও 'হ্যারিকেন' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মান বোমারু ও জঙ্গীগুলিকে পর পর তিনটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তের মত রেখাপথ ধরিয়া লণ্ডনের আকাশে বাধা দিতে লাগিল। নাৎসী বোমারুগুলি ('হেইঙ্কেল' ও 'জাংকার') একণে দিনরাত্রি উভয় সময়ে আসিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তারা আসিত একক, অর্থাৎ জঙ্গী বিমানের পাহারা ছাড়া—২০ হইতে ২৫০ খানা পর্যন্ত এক-একবারের আক্রমণে। আর দিনের আলোতে তারা দেখা দিত জঙ্গী বিমানের ('মেসারস্মিটস্') পাহারায়—জঙ্গীগুলি তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করিয়া চলিত। জার্মান বোমারু মরিয়া হইয়া লণ্ডনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল। ডক, কারখানা, রেলপথ, গ্যাস ও ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট এবং শত সহস্র গৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই ১০ হাজার বোমা লণ্ডনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।—যার মোট পরিমাণ ছিল ১ হাজার টন অতি-বিস্ফোরক। ৩ মাসে লণ্ডনের ১২,৬৯৬ জন অসামরিক নরনারী প্রাণ হারাইল। এভাবে জার্মান বোমারু বিমান যে তাণ্ডবলীলার সৃষ্টি করিল, তার তুলনা ছিল না। তারা অধিকতর সংখ্যক জঙ্গী-বিমানের পাহারায় আসিতে লাগিল এবং ৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন ডকের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে ভয়ঙ্কর বোমারু আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ৩৫০টি জার্মান বোমারু এই আক্রমণে যোগ দিল এবং বিখ্যাত টেমস নদী নিদারুণ অগ্নিশিখা ও ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইল। এক সপ্তাহ পর এক রবিবার রাত্রে ডিনারের শেষে ৫০০ বিমান পর পর দুইটি তরঙ্গের মত লণ্ডনের উপর নিদারুণ আঘাত হানিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই আর এ এফ অপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দিল এবং জার্মান বিমানগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিল।

বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানের চতুর্থ বা শেষ পর্যায় ছিল ৬ই অক্‌টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত। তখন দিবাভাগের আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া জার্মান বিমানবহর একান্তরূপে নৈশ আক্রমণেই মনোনিবেশ করিল। লণ্ডন এবং বৃটেনের অন্যান্য ছোট-বড় শহরগুলিতে ক্রমাগত আক্রমণ চলিতে লাগিল। সামরিক, অসামরিক সমস্ত বস্তু ও স্থানের উপরেই জার্মান বোমারুগুলি যেন চোখ বুজিয়া কেবল 'ধ্বংসের খাতিরে ধ্বংস' কার্য চালাইল। আর জনসাধারণের চিত্তে ত্রাস সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। সমগ্র লণ্ডন নগরী আগুনে ও বিস্ফোরক বোমায় জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিবার আন্তরিক চেষ্টায় গোয়েরিংয়ের বিমানবহর মাতিয়া উঠিল। সেই সময় দগ্ধ লণ্ডন নগরীর বহুদূরের রাত্রির আকাশকে দশদুর মশাল আলোকে দীপ্তশিখার মত বীভৎস করিয়া তুলিল। তথাপি লণ্ডনের নরনারীরা মনোবল হারায় নাই, আতঙ্কিত দিন বা রাতে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করে নাই। বরং সৈন্য ও নাগরিক, বৈমানিক ও স্বেচ্ছাসেবক, এ আর পি ও দমকল, নার্স ও পুলিশ—

অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর নরনারী একযোগে আত্মরক্ষার ও উদ্ধারকার্যে মন দিল। এমনকি সংবাদপত্রের প্রকাশ হইতে দৈনন্দিন অফিসের কাজকর্ম পর্যন্ত চালাইয়া যাইতে লাগিল। মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এমন অসাধ্য সাধনের কাহিনী আর শুনা যায় নাই।

'Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few!

অর্থাৎ এত অল্প লোকের কাছে এত বেশী সংখ্যক মানুষের ঋণী হওয়ার কথা এর আগে যুদ্ধের ইতিহাসে শুনা যায় নাই।

১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মান বিমান অভিযানের শেষ তরঙ্গ ভাঙিয়া গেলেও বৃটেনের উপর সারা শীতকাল এবং ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বিমান হানা চলিতে লাগিল—যদিও এর পর জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার দিকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। তারপরেও অবশ্য ইংলণ্ডের বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল প্রভৃতি শিল্পের শহরগুলিতে রাত্রিযোগে ইতস্ততঃ হানাদারি চলিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪০ সালের ১৪ই নভেম্বর পূর্ণিমার রাতে সুন্দর আবহাওয়ায় মিডল্যাণ্ডের বিখ্যাত কভেন্ট্রিতে ৪৫০ খানা জার্মান বিমানের যে আক্রমণ ঘটিল, তা আজও উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিখ্যাত গীর্জাটি ধ্বংস হইয়া গেল এবং ৫৫৪ জন লোক নিহত হইল। ৯০০ বছর আগেকার লেডী গডিভার উপাখ্যানের জন্য এই শহর বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রকাশ যে, স্থানীয় লোকদিগকে অত্যাচার থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি স্থানীয় শাসকের খেয়াল মিটাইতে গিয়ে বিবস্ত্রা হইয়া অশ্বারোহণে শহর পরিক্রমা করিয়া গিয়াছিলেন! ......

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডন মহানগরীকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার জন্য ১০০ নাৎসী বিমান ও ৩ ঘণ্টা ধরিয়া হানা দিল, ১৫০০টি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। এই দাবানলের কোন তুলনা ছিল না এবং বোধহয় এই নরককুণ্ডের কথা আজ কল্পনা করাও সহজ নয়।

১৯৪০ সালে বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানে লণ্ডনের অন্ততঃ ১০ লক্ষাধিক গৃহ ধ্বংস বা জখম হইল। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত এই অভিযানের ফলাফল হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনের উপর জার্মানী মোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমাণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং হতাহতের সংখ্যা ছাড়াইয়া গেল তখনকার দিনের বৃটিশবাহিনীর ক্ষতির চেয়েও বেশী। (৭)

(৭) "The World At War", 1945 U.S.A. Infantry Journal.

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ৮ই অক্টোবর (১৯৪০) মিঃ চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের বোমাবর্ষণে আনুপাতিক মৃত্যুর হার অনেক কম। লণ্ডনের এক রাত্রির বোমাবর্ষণের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ রাত্রে ২৫১ টন বোমাবর্ষণের ফলে ১৮০ জন নিহত হইয়াছে। কিন্তু আগেকার মহাযুদ্ধে প্রতি এক টন বোমায় ১০ জন লোক নিহত হইয়াছে। অর্থাৎ এবার ১ টন বোমায় ১ জনেরও কম লোক মারা পড়িয়াছে, কিংবা বিগত ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় ১০ ভাগের একভাগ মাত্র নিহত হইয়াছে। চার্চিলের মতে আধুনিক বোমা হইতে আত্মরক্ষার উপায়গুলিই ইহার প্রধান কারণ। তিনি অবশ্য অনেক বেশী হতাহতের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। প্রথম রাতের বোমাবর্ষণে ৩ হাজার নিহত এবং তারপর প্রতি রাতে ১২ হাজার করিয়া আহত হইবে, এই আনুমানিক হিসাবেই হাসপাতালে গোড়ার দিকে আড়াই লক্ষ হতাহতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফলাফল এত মারাত্মক হয় নাই।

*

যদিও বৃটেনের যুদ্ধ সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবু এর আরম্ভের সঠিক তারিখ সম্পর্কে খ্যাতিমান ঐতিহাসিকদের রচনায়ও যথেষ্ট মতভেদ দেখা দেয়। যেমন মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডারের মতে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং ৬ই আগস্ট তারিখে হুকুম জারি করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ আরম্ভের জন্য। মেজর-জেনারেল জে এফ সি ফুলার তাঁর বইতে আক্রমণের তারিখ ৮ই আগস্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেনরি পেলিং বলিয়াছেন ১২ই আগস্ট। অপরপক্ষে রণ-পণ্ডিত লিডেল হার্টের মতে বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমানযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল ১০ই আগস্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক ও এ জে পি টেলর উভয়েই বলিয়াছেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান অভিযান জার্মানীর মতে আরম্ভ হইয়াছিল ১৩ই আগস্ট এবং এই

কয়েকটি জিজ্ঞাসা

আপনি কি জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে সংক্রামক রোগের তালিকায় যৌনব্যাধির স্থান সব চাইতে ওপরে! আপনি কি জানেন, ভারতবর্ষের পঞ্চান্ন কোটি মানুষের মধ্যে চার কোটি মানুষ যৌনরোগে ভোগেন!

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার ধারণা হয়ত স্পষ্টই আছে, কিন্তু যৌনরোগগুলি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আপনার আছে তো? আপনি কি যৌনরোগগুলির লক্ষণ, আকৃতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে জানেন? আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর সুবেশ সুদেহ কোনো পুরুষ কিংবা রমণী যৌনরোগগ্রস্ত কিনা বুঝতে পারেন?

যৌনরোগের মধ্যে সব চাইতে সর্বনাশা রোগ সিফিলিস সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান কতটুকু? লোকের মুখে শোনা কথা ছাড়া বোধহয় আর কিছু না-জানার সম্ভাবনাই বেশি।

ওপরের বক্তব্যগুলো সম্বন্ধে কোনোরকম অস্পষ্টতা, কোনোরকম অজ্ঞানতা যদি আপনার থেকে থাকে তাহলে নীচের বইটি আপনাকে সঠিক সত্যের সন্ধান অবশ্যই দেবে।

বইটি লেখা হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্যে। আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। একথা মনে রাখবেন।

গোবিন্দ বিশ্বাস রচিত

সিফিলিস

রোগীদেহের অসংখ্য ফোটো-চিত্র সংযোজিত
এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা!

রত্নী : ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন ঈগল'। আবার অন্য বৃটিশ মতে, যেমন পীটার ইয়ং তাঁর 'ডিসাইসিভ ব্যাটলস্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ বহরের উপর আক্রমণের শুরু দিয়া এই যুদ্ধের উদ্বোধন হইয়াছিল ১০ই জুলাই তারিখ। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল তাঁর প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০ই জুলাই তারিখটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

> It was not until July-10 that the first heavy onslaught began, and this date is usually taken as the opening of the battle.

অর্থাৎ ১০ই জুলাই তারিখটিকেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের উদ্বোধন হিসাবে সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বয়ং চার্চিল বলিলে কি হইবে, ১০ই জুলাই তারিখটিকে বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভের নিশ্চিত তারিখরূপে গ্রহণ করা কঠিন। (লিডেলহার্ট লিখিয়াছেন যে, ১লা জুলাই থেকেই ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ-জাহাজের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল।) কেননা, ফ্রান্সের যুদ্ধের পর হিটলার বৃটেনের সঙ্গে যে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য তিনি ৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াছেন এবং ১৯শে জুলাই তারিখ রাইখস্ট্যাগের এক নাটকীয় বক্তৃতায় তিনি এই শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শান্তি-প্রস্তাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের দিকে মন দেন। সুতরাং ১৯শে জুলাইয়ের শান্তি-প্রস্তাবের সঙ্গে ১০ই জুলাই তারিখেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল, এটা ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কঠিন। বরং ৮ই, ১০ই বা ১৩ই আগস্ট, এই তিনটির মধ্যে একটা তারিখকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, ঐ সময় থেকেই নিয়মিত বিমান-যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল। অবশ্য তার আগে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ঘটিয়াছে, যদিও সেগুলিকে নিয়মিত যুদ্ধের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে, বৃটিশ বিমান দপ্তর জার্মান বিমানের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যে-বিবৃতি দিয়াছেন, তাতেও ১০ই জুলাই থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৃটিশ সরকারী মতেও ১০ই জুলাই তারিখই আক্রমণ বোধনের তারিখ—যদিও এই সম্পর্কে মতভেদ থাকিয়াই যাইবে।

জার্মানীর দুইটি বিমানবহরের বম্বার ও ফাইটার মিলাইয়া মোট শক্তি ছিল ২৮০০টি বিমানের আর বৃটেনের প্রথম শ্রেণীর বিমান ছিল মোট হাজার-দেড়েক। এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার হিউ ডাউডিংয়ের নেতৃত্বে রয়েল এয়ার ফোর্সের ৫৫টি স্কোয়াড্রন এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ স্কোয়াড্রনে দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ বিমান শক্তি উভয় পক্ষে প্রায় সমান সমান ছিল।

কিন্তু বৃটিশ বিমানবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে জার্মান বিমানবহর শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিল না। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে এক সময় বৃটেন প্রায় পরাপরাজয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। কেন্ট অঞ্চলে বৃটিশ জঙ্গী বিমানের বা ফাইটার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার জন্য জার্মানী যে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল, ৩০শে আগস্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার পরিণতি ভয়ঙ্কর বিপদ ডাকিয়া আনিতেছিল। কিন্তু বৃটেনের কপালগুণে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে জার্মান বিমানবহর তাদের আক্রমণের রণনীতি হঠাৎ বদলাইয়া ফেলিয়া লণ্ডন শহরের উপর বোমাবর্ষণ করিতে শুরু করিল। উদ্দেশ্য ধ্বংস ও ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ জনগণের মনোবল ও নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। যদিও এই বোমারু অভিযানের ফলে ৩০ হাজার নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিল, তথাপি বৃটেনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তেমন কোন প্রচণ্ড আঘাত ঘটে নাই। কলকারখানা ও আফিসের কাজ যথানিয়মে চলিয়াছিল। এমনকি শিশু ও বালক-বালিকাদের স্থানান্তরণের পরেও বোমাবর্ষণের দুর্যোগের

মধ্যেও ২ লক্ষ ৭১ হাজার স্কুল ছাত্র-ছাত্রী লন্ডনেই ছিল। বোমারু আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'এন্ডার্সন শেলটার' নামে যে আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল, তাতে এবং লন্ডনের ভূগর্ভস্থ টিউব রেলওয়ের স্টেশনে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার লোকে নিরাপত্তার সন্ধানে আশ্রয় নিত। এমনকি, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য পিকাডেলীর ভূগর্ভে ৭০ ফুট নীচে যে প্রকাণ্ড আশ্রয়স্থল ও দপ্তর নির্মিত হইয়াছিল, চার্চিল সাধারণতঃ সন্ধ্যা থেকে সেই পাতালপুরীতেই আশ্রয় নিতেন—অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে বছরের (১৯৪০) শেষ পর্যন্ত। চার্চিল বলিয়াছেন যে, সেখান থেকেই তিনি কাজকর্ম চালাইতেন এবং সেই ভূগর্ভে দিব্য নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেন। চার্চিল তাঁর এই ঘুম সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন এবং তাঁর বইতে অনেক বার এই ঘুম সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

বোমাবর্ষণের ফলে হাউস অব কমন্স ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং একদিন বাকিংহ্যাম প্যালেসেও বোমা পড়িল ও প্রাসাদের একটি অংশের প্রভূত ক্ষতি হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও রানী খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁরা রাজপ্রাসাদেই বসিতেন এবং ঐ দুঃসময়ে তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য স্বেচ্ছায় ভৃত্য বা পরিচারক ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ চালাইতেন। রাজ-পরিবারকে যখন লন্ডন ত্যাগ করিতে বলা হইল, তখন রানী বলিলেন—'ছেলেমেয়েরা আমাকে ছাড়া যেতে পারে না, আমি রাজাকে ছাড়া যেতে পারি না এবং রাজা অবশ্য আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' অবশ্য প্রাসাদের ভূগর্ভে তাঁদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণ আরম্ভের সময় রাজা এবং তিনি কোন কোন দিন মধ্যাহ্নভোজনের টেবিল থেকে প্লেট ও গ্লাস ইত্যাদি নিজেরাই হাতে করিয়া নিয়া শেলটারে যাইতেন। বোমাবর্ষণে ধ্বংসকাণ্ডের ফলাফল দেখার জন্য রাজা ও প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় একত্রে পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে বৃটেনের যে-বিপদ ঘটিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে রয়েল এয়ার ফোর্স (প্রায় হাজার-দেড়েকের মত পাইলট) অত্যন্ত কৃতিত্ব ও বীরত্বের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানীরা, বিশেষভাবে হেনরি টিজার্ড ও চার্চিলের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা অধ্যাপক লিন্ডম্যান এই সময় যে উন্নত ধরনের রাডার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জার্মান বোমারু বা জঙ্গী বিমানের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এমনকি, জার্মানরাও পরে এই নূতন রাডার যন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সময় ইংলণ্ড ইউরোপের নির্বাসিত গভর্নমেন্টসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, লাক্সেমবুর্গ, হল্যান্ড ও বেলজিয়মের গভর্নমেন্টসমূহ লন্ডনে আসিয়া আশ্রয় নিলেন এবং ফ্রান্সের স্বাধীনতার প্রহরী (চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে) জেনারেল দ্য গল 'ফ্রী ফ্রান্স' আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। এর ফলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধক্ষম লোকের সংখ্যা, আর্থিক সম্পদ এবং ৩০ লক্ষ টনেজের জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। ৩রা জুলাই ডঃ বেনেস (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) অস্থায়ী চেকোশ্লোভাক সরকারের রাষ্ট্রপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আর 'বামপন্থী সোসিয়েলিস্ট' স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস মস্কোতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিবিধানের আশায়—যদিও সে-আশা তখন পূর্ণ হইল না। এদিকে লন্ডনে কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ডেলী ওয়ার্কার' সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। অবশ্য কমিউনিস্টদের শক্তিও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। অপরপক্ষে বৃটিশ ফ্যাসিস্ট এবং জার্মান পক্ষপাতী লোকেদেরও দমন করা হইল। যুদ্ধকালীন জরুরী আইনের কবলে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে (চমৎকার বক্তা ছিলেন) ও তাঁর পত্নীকে এবং একজন এম-পিকে আটক-বন্দী করা হইল। মোট ১৭৬৯ জন বৃটিশ-প্রজা অন্তরীণ হইয়াছিলেন, এঁদের মধ্যে ৭৬৩ জন ছিলেন বৃটিশ ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯৪৩ সালে মোজলে দম্পতীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সমাজজীবনে সেই সময় উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক অশান্তি ছিল না এবং যদিও বৃটেনের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতি বোমাবাজি' বা বিমানের সময় ইংরাজ নরনারী যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি জীবনযাত্রার প্রভূত কষ্ট ছিল, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও প্রাণহানি (প্রায় ৩০ হাজার) এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার আহত ও বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়াও কিছু কিছু লোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং নানা কারণে অনেকের স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছিল। (৮)

•

বৃটেনের নাশে আপোষরফায় আসার জন্য হিটলারের জার্মানী যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হইতেছে প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড (যিনি ১৯৩৬ সালে একজন ডাইভোর্স-করা মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন) বা ডিউক অব উইন্ডসরকে বাগে আনিবার চেষ্টা। ফ্রান্সের পতনের পর ডিউক এবং ডাচেস প্যারিস থেকে (সেখানে বৃটিশ মিলিটারী মিশনের সদস্যরূপে তাঁরা ছিলেন) স্পেনে চলিয়া গেলেন জার্মানদের হাতে পড়িবার আশঙ্কার জন্য। কিন্তু সেই সময় জার্মানদের পক্ষ থেকে এমন একটা মতলব প্রচার করা হইতেছিল যে, ডিউক একান্তরূপেই চার্চিলের বিরোধী, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবারও পক্ষপাতী নন এবং তিনি সন্ধি চাহেন ও পুনরায় বৃটিশ সিংহাসনে বসিতে চান। এমনকি, ডিউক এবং তাঁর পত্নীকে বাহামা দ্বীপের নবনিযুক্ত গভর্নররূপে জাহাজযোগে বাহামা যাত্রার আগে লিসবনে পাকড়াও করার জন্য এবং সেখান থেকে ডিউকদম্পতীকে অপহরণ করার জন্য নাৎসী গোয়েন্দাদের এক আজগুবি চক্রান্তও হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে (১৯৫৭) এই সমস্ত কথা রটনা হওয়ায় ডিউক প্রকাশ্য বিবৃতি দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, সমস্তটাই বানানো গল্প মাত্র। আর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরও এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ডিউক কখনও বৃটেনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

কিন্তু ডিউকদম্পতীকে অপহরণের আজগুবী পরিকল্পনার মত, আর একটি

(৮) ইংলিশ হিস্ট্রী—টেলর পৃঃ ৫১২

• আলকাতরা টনিক • কিংস হেমাটোন
• কিংকোর আমলা হেয়ার অয়েল
• ক্যাসিকা সিরাপ • ইউট্রোটোন
কিং এণ্ড কোম্পানীর নিজস্ব গবেষণায় প্রস্তুত ঔষধগুলি
এখন আপনার সেবায় নিয়োজিত।
প্রস্তুতকারক:
কিং এণ্ড কোং
৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ল্যাবরেটরী:
৮৬, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ১২
GRACE/K/30/70
কিং এন্ড কোম্পানীর সকল শাখায় ঔষধ বিভাগ প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

CENTRAL LIBRARY

অনুরূপ পরিকল্পনাও ছিল নাৎসী জার্মানীর। যদি জার্মানী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জয় করিতে পারিত, তবে, ইংরাজদের অদৃষ্টে কি ঘটিত? ১৯৪০, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখ জার্মান জেনারেল স্টাফ যে নির্দেশ-নামা প্রচার করেন, তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে, জার্মান মিলিটারী প্রশাসন বৃটেনের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিবে। ১৭ থেকে ৪৫ বছরের সমস্ত ইংরাজ পুরুষকে ধরিয়া ইউরোপে চালান দেওয়া হইবে এবং বৃটিশ জাতিকে চিরদিন পদানত ও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইউরোপে তাদের দিয়া দাসশ্রমিকের কাজ করানো হইবে এবং যন্ত্র ও দ্রব্যাদিগকে পাইকারি হারে সাবাড় করা হইবে। অধিকৃত বৃটেনে গেস্টাপোর হাতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এর উদ্দেশ্য হইল—

> The purpose was to exterminate physically not only progressive leaders but all the cream of the British intelligentsia as well as many leaders of the Conservative and Liberal parties.

সোজা কথায় বৃটিশ সমাজজীবনের সমস্ত প্রগতিশীল এবং বাছাই-করা বুদ্ধিজীবীদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা হইবে!

এই সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত করার জন্য মোটামুটি 'আরম্ভ' হিসাবে ২০০০ জনের একটা নামের তালিকাও স্থির হইল। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকায় সর্বাগ্রে ছিল চার্চিলের নাম এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও সংবাদদাতারাও এই তালিকা থেকে বাদ যান নাই। এইচ জি ওয়েলস, ভার্জিনিয়া উল্ফ, এডওয়ার্ড এম ফরেস্টার, অলডুস হাক্সলি, জে বি প্রিস্টলি, স্টিফেন স্পেন্ডার, সি পি স্নো, নোয়েল কাওয়ার্ড, রেবেকা ওয়েস্ট, ফিলিপ গীবস, নরম্যান এঞ্জেল, গিলবার্ট মারে, বার্ট্রান্ড রাসেল, জন বি হালডেন প্রভৃতি জগৎ-বিখ্যাত বিজ্ঞানী, মনীষী, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম ছিল নাৎসীরা যাদের খুন করার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিল। (১)

•

সুতরাং ইংরাজদের খুব বরাত জোর যে হিটলারী ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

যুদ্ধের গোড়া থেকেই উইনস্টোন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই যুদ্ধ জয় সম্ভব নহে। একলা তিনি রুজভেল্টের সঙ্গে পত্র ও তার বিনিময় শুরু করিলেন। এই বিরাট 'পত্র-সাহিত্য' যুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে এবং কেউ কেউ (যেমন এ জে পি টেলর) বলেন যে, চার্চিলের এই পত্রগুলিই তাঁর রচিত সুবিখ্যাত মহাযুদ্ধের ইতিহাসের মূল উপাদান।

জার্মানীর আক্রমণের আশঙ্কায় অস্ত্র সাহায্যের জন্য চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তার ফলে ১৯৪০ সালের জুন মাসে আমেরিকার কাছ থেকে প্রথম কিস্তী হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের (১৯১৭-১৮) ৫ লক্ষ এনফিল্ড রাইফেল, ১০ কোটি গুলীবারুদ, ১০০ ফিল্ডগান (৭৫ এম এম) ও ১০ লক্ষ গোলাগুলী এবং ৮০ হাজার মেসিনগান পাওয়া গেল। এগুলির মোট মূল্য ছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। এছাড়া আগস্ট মাসে আমেরিকার কাছ থেকে ৫০ খানা পুরনো ডেস্ট্রয়ারও পাওয়া গেল। কিন্তু এর বিনিময়ে বৃটেনকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত এবং অতলান্তিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বারমুডা, বাহামা, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গিনি ইত্যাদি দ্বীপগুলি নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকাকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ দিতে হইল।

বিমান আক্রমণের দ্বারা বৃটেনকে ঘায়েল করিতে না পারিয়া অবশেষে হিটলার রণে ভঙ্গ দিলেন এবং ২১শে অক্টোবর 'অপারেশন সী-লায়ন' বা সিন্ধু ঘোটকের অভিযান বাতিল হইয়া গেল কিম্বা পরবর্তী বসন্তকালের জন্য মুলতুবী রহিল। বলা বাহুল্য যে, সেই অভিযানের আর পুনরাবৃত্তি হইল না। কারণ, ততদিনে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণের জন্য মন দিয়াছে। তথাপি জার্মান সেনাপতিদের (যেমন, ফিল্ড-মার্শাল রানস্টাইন) অভিমত এই যে, ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে না পারা কিম্বা না করা হিটলারের পক্ষে ভুল হইয়াছিল। কারণ, জার্মানী যদি বৃটেন জয় ও দখল করিতে পারিত, তবে পরবর্তীকালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপীয় ভূভাগে অভিযান চালানো সম্ভব হইত না।

পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিকদের (যেমন, কার্ল ক্লি — Karl Klee

ধারণা এই যে, ডানকার্কের পরেই ইংলণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণ সম্ভব ছিল এবং তখন ইংলণ্ড জয়ের সুবর্ণ সুযোগ গিয়াছে।

কিন্তু যা ঘটে নাই, তা নিয়ে তর্ক করা চলে না। তবে, অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখা যাইতেছে যে, বৃটেনের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর চার্চিলের মর্যাদা ও ক্ষমতা এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি যেন ইংরাজ জাতির সমগ্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার একমাত্র নিয়ামক হইয়া উঠিলেন। সমস্ত সমর বিভাগের উপরেই তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তথাপি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি চার্চিল যথাসম্ভব শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং রাজা ও সিংহাসনের প্রতি একটি রোমান্টিক অনুরক্তি বা আনুগত্য দেখাইতেন। কিন্তু বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা যেমন—টেলর, সীডেলহাট ও জে এফ সি ফুলার প্রভৃতি শহরের অসামরিক জনগণের উপর বোমাবর্ষণ যাকে সামরিক শাস্ত্রানুসারে স্ট্র্যাটেজিক বম্বিং বা রণনৈতিক বোমারু আক্রমণ বলা হয়, তা আগে শুরু করার জন্য চার্চিলের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কারণ, তাঁদের মতে গোড়ায় হিটলারের এদিকে তেমন ইচ্ছা ছিল না। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যে বোমারু অভিযান ঘটিয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে সে-কথা বলা হইতেছে না,—যেমন পোল্যাণ্ড ও পশ্চিম রণাঙ্গনে, কিন্তু বে-সামরিক জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙিবার জন্য যে 'রণনৈতিক বোমা' বর্ষিত হইয়া থাকে, ঐতিহাসিকগণ তার নিন্দা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ কর্তৃক বার্লিনের উপর প্রথম এই ধরনের বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ২৪শে আগস্ট, ১৯৪০, সন্ধ্যাবেলা এবং তারপরেও আর এ এফ এই ধরনের বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন ৪ঠা সেপ্টেম্বর হিটলার এর জবাবে এক বক্তৃতা দিলেন এবং যদিও হিটলারের কোন রসবোধ ছিলনা, তবু সেদিনের বক্তৃতায় তিনি চার্চিলকে 'সেই বিশিষ্ট সামরিক সংবাদদাতা' বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন এবং তারপর গর্জন করিয়া বলিলেন—'আমরাও প্রতিশোধ লইব, বৃটেনের শহরগুলি গুঁড়া করিয়া দিব!...'

এই সভার প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, সেদিনের হিটলারের সভায় যুবতী নারীদের খুব ভিড় ছিল। তারা হিটলারের বক্তৃতা শুনিয়া এমন অভিভূত হইল যে, দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে লাগিল এবং উত্তেজনায় তাদের বুক আন্দোলিত হইতে লাগিল।......

কিন্তু হিটলারী বক্তৃতার উন্মাদনা ও যুবতী নারীদের উত্তেজনা ঘটিলে কি হইবে, আসল সত্য এই যে, হিটলার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ ও জয় করিতে পারিলেন না। ১৯৪১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর এক গুপ্ত বৈঠকে হিটলার যে সমস্ত কথা বলিলেন, তার নির্গলিতার্থ এই যে, 'সিন্ধু ঘোটকের' পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু তখন থেকে তিনি একবার 'অপারেশন সী-লায়ন' ও অন্যবার 'অপারেশন বার্বারোসা' এই দুই বিকল্প পরিকল্পনার ধাপ্পা দিয়া চলিতে চাহিলেন, অর্থাৎ তিনি ইংলণ্ডকে হাতে কলমে আক্রমণ না করিয়াও সর্বদাই আক্রমণের ভয়ের মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—যদিও শেষপর্যন্ত 'সিন্ধু ঘোটকের' ভূত অপারেশন 'বার্বারোসা'র কাঁধে ভর করিয়া রাশিয়ার বিশাল প্রান্তরে গিয়া হাজির হইল।

(ক্রমশঃ)

---

(১) উইলিয়াম শাইরারের 'থার্ড রাইক' পুস্তক, পৃঃ ৯০৬—৪০ এবং ডি প্রুখালো-ভস্কি প্রণীত 'বৃটিশ কলোন পলিসি ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেণ্ড', পৃঃ ১১০।

সারা রাত্তির বৃষ্টি এবং তারপরেও…

গৌতম সেনগুপ্ত

রাত্রি তখন ফুরোতে চলেছে। মানুষের ঘুম ভাঙার সময় হয়ে এলো। কাক ডাকার শব্দ শেষ প্রহরের ঘোষণায় সোচ্চার হচ্ছে ধানের মাঠটাকে টুকরো টুকরো করে। মানুষের সঙ্গে সমস্ত বাড়িগুলোও ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু এস, মুখার্জি লেনের আঠারোর বি, বাড়িটা মনে হচ্ছে সারা রাত জেগে কাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

পশ্চিমের জানলার একটা পাল্লা সম্পূর্ণ খোলা। ঘরের ভেতরের অস্পষ্ট আলো খোলা জানলা দিয়ে প্রকৃতির দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে। আলোটাকে দেখে ঠিক শহুরে মনে হয় না। খানিকটা মিটমিট করছে যেন। টেবিলের ওপর প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া একটা মোমবাতি ঘরটাকে অতন্দ্র রেখেছে।

সন্ধে রাতে ঘুম ভেঙে, শ্যামল আর ঘুমতে পারে নি। কিংবা কে জানে আবছা ঘুম তখনও চোখে জড়িয়ে ছিল কিনা। চার্চের ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে সময় বলে দিল। কে জানে এই সময়টাই পৃথিবীর ঠিক সময় কিনা।

দোল খাওয়া আলোয় ঘরটাও দুলছে। কড়িকাঠ, দেয়াল, তাক, আসবাব সবকিছুই। শ্যামল নিজের শরীর স্পর্শ করে বোঝবার চেষ্টা করল তার শরীরটাও ঐ সবকিছুর মত দুলছে কিনা। কিন্তু কিছুই বুঝল না। শ্যামল আহত হলো না মোটেই। কেন না শ্যামল তো জানে বোঝাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

এবার মোমবাতিটা আরো জোরে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে শেষবারের মতন নিজের অস্তিত্বটা জাহির করে দপ্ করে নিভে গেল। শ্যামল রীতিমত আতংকে উঠল। ওর সমস্ত শরীরে ভূমিকম্প হলো যেন।

অন্ধকার। ঘন মিশমিশে অন্ধকার চারদিকে। কড়িকাঠ, দেয়াল, তাক, আসবাব এখন সর্বকিছুই অন্ধকারে। শ্যামলের মনে হলো নিজের দেহটাও ঐ জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন অন্ধকার শ্যামল জীবনে কখনও দেখেনি। একবার মনে হলো উঠে গিয়ে আর একটা মোমবাতি জ্বালায়। আবার ভাবল না থাক অন্ধকারেই যদি একটু ঘুমাতে পারে।

কিছুটা সময় ঘুমোবার চেষ্টা করে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল শ্যামল। না ঘুম আসছে না। কিছুতেই। শ্যামলের মনে হলো অন্ধকার অন্ধকার হচ্ছে আরো। কেমন যেন একটা ভয়-ভয় ভাব। একটা আড়ষ্টতা আর আতঙ্ক চারপাশের অন্ধকারের গায়ে লেপটে আছে। কেমন যেন একটা অবাস্তব অনুভূতি। সেই অন্ধকার নীরবতায় কি যেন একটা শব্দ শুনতে পেল শ্যামল। মনে হলো শব্দটা যেন কোনো পাখির। এবার আরো স্পষ্ট শব্দটা! হ্যাঁ, শ্যামল স্থির হকল তার ঘরের ভেতরেই একটা শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। ঝুমঝুম নূপুরের শব্দই মনে হলো। শ্যামলের মনে হচ্ছে কে যেন তার গলাটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। যেন সমস্ত স্বচ্ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। শ্যামলের চোখের সামনে একটা অস্পষ্ট মেয়েলী মূর্তি স্পষ্ট হলো। হ্যাঁ ঠিকই দেখছে শ্যামল। কিন্তু কি! কে! অন্তত কিছুই বুঝতে পারছে না। শ্যামলের হৃৎপিণ্ডটা এক ঝলক কেঁপে উঠলো। সমস্ত শরীর অসাড়। শ্যামলের চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে জোরে। অনেক জোরে। কিন্তু পারছে না। অনেক চেষ্টা করেও শ্যামলের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার সেই মূর্তি শ্যামলেরই দিকে এগিয়ে আসছে যেন। শ্যামল ঘেমে যাচ্ছে ক্রমশ। বিছানাটা গায়ের ঘামে স্নান করেছে। মূর্তিটা যে আরো এগিয়ে আসছে। শ্যামল মুহূর্তের মধ্যে কি করে যেন ঐ অসহায় অনুভূতির জগৎ থেকে নিজেকে হ্যাঁচকা টান মেরে নিয়ে এসে বিছানার সটান উঠে বসল। সেই মূর্তিটা পিছিয়ে গেল অনেকটা নূপুরের ঝুমঝুম আওয়াজ করে। শ্যামল মেঝেতে পা রেখে শক্ত করে। আবার ঘরের কোণের সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তির দিকে ছুটে গেল। আর প্রাণপণ চীৎকার করে কিছু বলতে চাইল। গলার শিরা অসম্ভব ফুলে উঠল। কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হলো না শ্যামলের গলা দিয়ে। শ্যামল এবার আর সেই মূর্তিটা দেখতে পেল না। সেই অস্পষ্ট ধোঁয়া মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের সেই অন্ধকার কোণে শ্যামল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু মুহূর্ত কেটে গেল। তবে শ্যামল নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। আবার বিছানায় বসল শ্যামল। কিন্তু কখন! কি করে! নিজেই জানে না। ঘরের মধ্যে সর্বকিছুই অন্ধকারে অদৃশ্য। কেবল টেবিল ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ অন্ধকারে জেগে আছে।

শ্যামলের কেমন যেন সব কিছু উলটে-পালটে যাচ্ছে। শ্যামলের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এমন কি অনুভূতিও যেন কিছু নেই। সেই গলা মোচড়, টেবিল ঘড়ির আওয়াজ নিজের ঘরের বিছানাটাও কোথায় যেন মিশে যাচ্ছে। এক দুই করে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ডুবে যাচ্ছে স্মৃতির নীল ঘরে। এ শ্যামলের এক জগত থেকে অন্য জগতে যাত্রা। একটা আলাদা অনুভূতি ঘিরে ফেলেছে শ্যামলকে। একটা পরিতৃপ্তি। একটা শান্তি। সেখানে কোনো বাধা নেই। কোনো বন্ধন নেই। সেখানে নিভাবনায় নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়া যায়। আবার পরিপূর্ণ খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে প্রত্যেকটা সত্তা এক-একটা ফুটন্ত ফুলের মত। কত কিছুই শ্যামলের চোখে এখন ছবির মত ভেসে উঠছে। কত সকাল দুপুর বিকেল রাত্রির আনাগোনায় শ্যামল চোখ রাখল।...

ক'দিনের জন্য শ্যামল অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল। সেদিন কপাট বন্ধ করে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা বই নিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ কি একটা ছোট্ট শব্দ হলো। চোখ তুলে তাকাল শ্যামল। দেখল একটা খাম বিছানার একপাশে পড়ে। সাগ্রহে খামটা হাতে তুলে নিল। কিন্তু কে দিল চিঠি! কে দিতে পারে! কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। খামের একটা দিক ছিঁড়ে ফেলল। তারপর এক নিশ্বাসে পড়ে নিল সবটা। চিঠির ব্যাপারটা খানিকটা অপ্রত্যাশিত হলেও আশ্চর্য হবার মত নয়। ক'দিন ধরেই এমন একটা কানাঘুষা শুনেছিল শ্যামল। তবে আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত শ্যামলকেই এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়তে হলো। চিঠিটা শ্যামলের অফিস থেকে এসেছে। শ্যামলকে রানীগঞ্জ যেতে হবে। ওদের কোম্পানীর একটা ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে রানীগঞ্জের বেশ খানিকটা ভেতর দিকে। প্রাথমিক কাজ-কর্মের দায়িত্ব পড়েছে শ্যামলের ওপর। অবশ্য ইনচার্জ করে পাঠানো হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার সান্যালকেই। আর বেশী দিনের জন্যও নয়। ছ'মাস। চিঠিতে সেই রকমই লেখা।

ভালই হলো। কিছু দিন ধরেই শ্যামলের মনটা বাইরের দিকে টানছিল। ভাবছিল কোথাও যেতে পারলে একটু ভাল হতো। এই কোলকাতার দিনগুলো ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। কাটতেই চায় না। নিজের জায়গাটাকে মাঝে মাঝে সবারই বোধ হয় এ রকম লাগে।

অফিসের এই সংবাদ শ্যামলকে একটা নতুন স্বাদ এনে দিল। শ্যামল ভাবল, যাক তাহলে কিছু দিনের জন্য কোলকাতার এই লোনধরা দিনগুলো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

পরদিন বেলা এগারোটায় ট্রেন। শ্যামল বিশেষ প্রয়োজন মত জিনিস নিয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল। মিঃ সান্যালকে ফোনে কথা বলে সর্বকিছুই ঠিক করা ছিল।

প্ল্যাটফর্মে বেশ খানিকটা ভিড়। শ্যামল প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটছিল আর ট্রেনের জন্য দাঁড়ানো লোকগুলোকে বেশ ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। পাছে মিঃ সান্যাল চোখের আড়াল হয়ে যায় এই ভয়ে। বেশ খানিকটা এগোবার পর মিঃ সান্যাল শ্যামলের দৃষ্টিতে এলো। হাতে একটা সুটকেস আর পাশে ছোট একটা বেডিং। হাত তুলে শ্যামলকে ইশারা করলেন সান্যাল।

এগোল শ্যামল। কাছে এসে শ্যামলের ছোট একটা শ্বাস পড়ল যাক্বা, আমি তো ভাবছিলাম আপনি এখনও এসে পৌঁছন নি। মিঃ সান্যাল স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে একটা উঁচু স্বর ছুঁড়েছিলেন শ্যামলের দিকে, ডোন্ট ভেক মি এন ইরেসপন্সিবল ওয়ান, মিঃ রয়। হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো আমি ভালো করেই জানি। শ্যামল একদমে বলে গেল। এবার মিঃ সান্যালকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হলো। হাতের ঘড়িটার দিকে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে মিঃ সান্যাল বললেন, নিন, একবার ভাল করে দেখে নিন সর্বকিছু ঠিক ঠিক আছে তো? শ্যামল বলল, না, আর দেখতে হবে না, আমি সব বেশ ভাল করেই দেখেছি। ট্রেন এসে দাঁড়াতে ওরা কামরায় হাঁ করা দরজা দিয়ে নিজেদের ঢুকিয়ে দিল।

বাতাস কেটে গাড়ী ছুটে চলেছে। কোলকাতার বাইরে এটাই শ্যামলের প্রথম যাওয়া নয়। কাজের তাগিদে আরো কতকবার এখানে সেখানে যেতে না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্য রকম যেন। একটা মিষ্টি অনুভূতি পড়েছে শ্যামলের মনের ঘরে ঘরে। কোনো অদেখা পৃথিবীর আলো প্রজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ: আকাঙ্ক্ষিত অথচ অপ্রত্যাশিত সব কিছুরই বোধহয় এমন একটা আলাদা স্বাদ আছে।

শ্যামল আধশোয়া হয়ে একটা বই নিয়ে পড়ছে। আর অভ্যাস মত সিগারেটে টান দিয়ে নিচ্ছে। মিঃ সান্যাল কিন্তু অফিসের কি সব কাগজপত্রে চোখ ডাসিয়ে আছে। কোম্পানীর হয়ে চোখ না পাকিয়ে ছাড়বে না দেখছি। শ্যামল ওর চোখের আড়ালে ঠোঁট বেঁকিয়ে মনে মনে বলে নিল, তুমি খাটতে যত পারো। আমার অত মাথাব্যথা নেই কোম্পানীর লাভের অংক বাড়াবার জন্য। নেহাত কাজ না করলে নয় তাই। না হলে বয়ে...। দিয়ে তো অফিস করতেই হবে। অত খাটছি বেড়ে কি হবে, চাঁদু। মিঃ সান্যাল খানিকটা তাজা করার সুরে মাঝে মাঝে ঠোঁট ফাঁক করছেন, কি রয়, বিমিয়ে পড়লেন মনে হচ্ছে? না, বেশ তো লাগছে। উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না শ্যামলের। শুধু কথা বলতে হবে বলেই বলল। একবার মনে মনে খিস্তি দেবার মতো বলে গেল, শালা তোমার মতন কোম্পানীর টাকা খাঁ-পকেটে নিলে তোমার চেয়ে অনেক বেশী তাজা থাকতুম। আর নিস্বার্থভাবে কাইল খাটা কাকে বলে তাও একবার চোখে

আপনাকে দিয়ে দেখিয়ে দিতুম, বড্ডো বাহাথন।

সময় মতই ওরা বাগানে পৌঁছেছিল। মিঃ সান্যাল একটা রিকসা নিলেন। শ্যামল খানিকটা সহজ করবার গলায় বলল, কারেক্ট অ্যাড্রেসটা আছে তো, মিঃ সান্যাল? হ্যাঁ আছে। আর না থাকলেও অসুবিধার কারণ ছিল না। কেন না, আমি যে কাজের শিলান্যাসে থেকে একবার এসেছিলাম। একটা ঘন আত্মবিশ্বাসের সুর ভেসে এলো সান্যালের গলা দিয়ে। শ্যামল বলল, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে কিনা, তাই ভাবছিলাম। ওরা পশ্চিম আকাশে সূর্যের শেষ হয়ে আসা লাল রঙে একবার চোখ রাখল।

রিকসাটা বেশ ছুটেই চলছিল। ক্রমে ওরা শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামের দিকে ঢুকেছে। কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে বড় একটা ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছে রিকসা। আকাশের নকশায় পশ্চিমের সেই লাল রংটুকুও পরিপূর্ণ ডুবে গেছে।

সহজ চক্ষ দিয়ে রাতের অন্ধকার পড়েছে। রাস্তায় লোকজন বেশ কমই যাতায়াত করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা লোক রিকসার গা ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে যেন। অবার দূরে কোথাও মাথায় মোট নিয়ে আর হ্যারিকেন এক হাতে নিয়ে একটা-দুটো লোক অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে গ্রাম ঠিক বোঝা না গেলেও কিছুটা অন্তর ছোট্ট ছোট্ট আলো অন্ধকারের হাত থেকে গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছিল।

রিকসাটা একটু গতি কমিয়ে দিল: মনে হলো ওরা প্রায় পৌঁছে গেছে। কখনও কোনো লোক রিকসার পাশ দিয়ে যাবার সময় আলোটা তুলে রিকসার যাত্রীদের চেনবার চেষ্টা করে চলে যাচ্ছে। ওরা দুজনেই বেশ চুপচাপ। নীরবতার একঘেয়েমী কাটাবার চেষ্টা করল শ্যামল।—এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে মিঃ সান্যাল? সময় অনেক বেশী বলে মনে হচ্ছিল শ্যামলের। কে জানে নীরবতারই নাকি। মিঃ সান্যাল শ্বাস নিয়ে বলল, হ্যাঁ এই তো আর কি এবার নামব।

দু-একটা কথা বলতে বলতেই ওরা একটা বস্তির মত জায়গায় থামল। কতগুলো ছোট্ট ধুকধুকে আলো জ্বলছে সারি বেঁধে। দেখে বস্তি বলেই মনে হয়। একটু দূরে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় হ্যাজাকের রুপালী আলো ছড়িয়ে আছে। তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ঐ জায়গাটাই ফ্যাক্টরীর কাজ হচ্ছে। হ্যাজাকের আলোর পাশের খালটাও দেখা যাচ্ছিল। আরো দেখা যাচ্ছিল একই রকম ধুকধুকে আলোর ওপারে সারি দেওয়া নিচু ছাউনী।

কয়েকবার রিকসার হর্ন বাজাতে কে যেন একজন লোক হ্যারিকেন জাতীয় একটা আলো হাতে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। আলোতে দেখা গেল লোকটার খালি গা আর পরনে তিন হাতি ধুতি। কাছে এসে নমস্কার করে পাড়াগেঁয়ে ভাঙা হিন্দিতে কিসব যেন বলে গেল লোকটা। বোঝা গেল সে ওখানকার মজুর। বলল, ওদের জন্যে একটু তফাতে একটা ঘরের বন্দোবস্ত আছে। এবং লোকটাকে অনুসরণ করতে বলল। শ্যামল আর মিঃ সান্যাল ওদের জিনিস নিয়ে ওর পিছু নিল।

দু-মিনিট হেঁটে ওরা একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা বেশ মাতব্বরি গলায় সেই আগের মতই ভাঙা-ভাঙা দেহাতী ভাষায় বলল, হ্যাঁ এই ঘরটাতেই থাকবেন বাবুরা। আমি পাশের তিন নম্বর সারির একটা ঝুপড়িতে থাকি। দরকার হলেই মুখিয়া বলে ডাকবেন। আবার একবার নমস্কার জানিয়ে লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মাঝারী সাইজের একখানা ঘর। খাটিয়ার মত নিচু দুখানা খাট দুপাশে পাতা। আর একখানা চেয়ার, টেবিল। শ্যামল ঘরে ঢুকে সুটকেস আর বেডিং নামিয়ে রেখে দাঁড়াতেই সান্যাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘরে ঢুকল। শ্যামল শান্ত গলায় বলল, বেশ ঘরটা, না? মিঃ সান্যাল ভুরু কুঁচকে কথা ছুঁড়ে দিল, হ্যাঁ চলে না গেলেও চালাতে হবে। মনে হলো সান্যাল যেন ঢোক গিলল। একটা সিগারেট শ্যামলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ঘরটা ভাল করে দেখে—সিগারেট খেয়ে আর গল্প করতে গিয়ে অনেক সময় চলে গেল। রাত নটা নাগাদ ওদের খাবার নিয়ে মুখিয়া এসে হাজির। ওরা খাবারের কথাই ভাবছিল। লোকটা বলল, কোনো চিন্তা করবেন না বাবুরা, আমিই আপনাদের খাবার নিয়ে যাবো। কোথায় কি আছে সব দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বিদায় নিচ্ছিল। আবার ফিরে এল। আঙুল তুলে বলল, ঐ উত্তরের জানলার পাল্লাটা রাতে খুলবেন না যেন। ওটার দুটো শিক নেই। রাতে এখানে খুব বনবিড়াল বেরোয়। সান্যাল চোখ বড় করে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে নাক দিয়েই সবখানি ধোঁয়া ছাড়ল। মুখিয়া ততক্ষণ চলে গেছে।

পরদিন সকালে, ওরা সব ঘুরে দেখে, সব কাজ বুঝে নিল। রাতের দেখা জায়গাটা দিনের আলোয় আর এক রকম লাগল। এক চোখ দেখেই বোঝা যায় কারখানার কাজ খানিকটা এগিয়েছে। মিঃ মল্লিক, মিঃ সরকার আর সুপারভাইজার মিত্র এরা প্রায় প্রথম থেকেই আছে এখানে। ওদের ভেতর কথা বিনিময় যথারীতি প্রথম সকালেই হয়ে গেছে। কাল রাতে সারি দেওয়া যে আলো দেখা যাচ্ছিল সেগুলো সাঁওতাল আর হিন্দুস্থানী মজুরদের খোলা আর প্লাইউডের ছাউনি। কারখানার তিন পাশে আর খালের ওপারে সব ছাউনি সাজানো।

এখানে কাজ হচ্ছে রীতিমত। পুরুষ আর মেয়েরা এক সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাটছে। ছবির মত খাটছে ওরা। শরীর দিয়ে গলগল করে ঘাম বেরুচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই ওদের। দেখে মনে হয় মানুষ এখনও খাটতে ভুলে যায় নি।

দুটো পয়সার জন্য ওদের সকাল দুপুর বিকেল জলের দামে বিকিয়ে দিচ্ছে। না কি জীবনের জন্য জীবনকে দুহাতে হরির-লুটের বাতাসার মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে? ওদিকে তাকিয়ে শ্যামল কিছু মুহূর্ত আনমনা হলো। হয়তো বাচ্চা ছেলেটা যে অথর্ব কোনো ভাই কিংবা চোখে ছানি পড়া বুড়ো মা একটা রুটির জন্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত হা-পিত্যেশ হয়ে বসে আছে ঐ মজুরের আসার পথ চেয়ে। সান্যাল শ্যামলের পিঠে হাত রেখে বলল, আসুন ওদিকটায় যাই। শ্যামল নিজের মধ্যে ফিরে এলো। সামনে পা বাড়াল।

এমন গ্রাম্য পরিবেশে শ্যামল এই প্রথম এলো। ছোট কোন গ্রামের নিকুঞ্জের মতই এই গ্রাম মাটির ঘাসের গন্ধ শ্যামলের ভীষণ ভাল লাগছিল।

বিকেলে কাজের শেষে মাঠ ঘাস-পাহাড় শ্যামলকে ভেতরের দিকে টানছিল। সান্যালের অপেক্ষা না করেই শ্যামল গ্রামের স্বাদে একাই বেরিয়ে পড়ল।

চোখ চারু মুক্ত আকাশ নাম-না জানা কত কি গাছ আর পাখী পাখালির আড্ডা মেলা দেখল শ্যামল। শ্যামল যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছিলই না। ঘুরতে ঘুরতে ছোট একটা শিমুলগাছের কাছাকাছি এসে শ্যামলের পা আটকে গেল। ওর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল গাছটার তলায়। দেখল ফুলের মতন কতগুলো সাঁওতালী মেয়ে পা ভাসিয়ে স্নান করছে। কত গল্পে ওরা হাসছে। এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। চুল ধরে টেনে সরিয়ে দিচ্ছে। কখনও বা গাল টিপে দিচ্ছে সোহাগে। ভীষণ মন ভরে জমছে ওরা সব। ওরা কি এত কথা বলছে কে জানে!

শ্যামলের ভারী ইচ্ছে হচ্ছে ওদের কথা বুঝতে। ইচ্ছে হচ্ছে ওদের মতন মন হয়ে চপল করতে। ওদের গাল টিপে দিতে। ওদের নরম শিরায় লুটিয়ে গড়িয়ে পড়তে। তাই আবার হয় নাকি। কি সব উদ্ভট ভাবনা। শ্যামল মনে মনে না হেসে পারল না।

শ্যামলের চোখ কিন্তু তবুও ওদের দিকেই অপলক। ওদের ভেতর মাঝখানের মেয়েটার দিকে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল। শ্যামলের কেমন অদ্ভুত লাগছে সব। আরো অবাক লাগছে ওই মেয়েটাকে। সাঁওতালী মেয়ে বলে মনেই হয় না একটুও। অনেক আপন লাগছে। এমন মেয়েটি কখনও দেখেনি। গাছতলাটা এক খণ্ড জোৎস্না স্থির হয়ে থাকার মত। যখন হাসছে তখন ফুলের পাপড়ি ঝরছে যেন একটা একটা করে। সমুদ্র ঢেউ যৌবন ওর বসন্তের গন্ধ মাখা শরীরময় ছড়িয়ে আছে। কি যেন একটা অচেনা ফুল ওর হাতে।

শ্যামল একটু এগিয়ে গেল। শ্যামলকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরা খানিকটা থতমত খেয়ে জড়সড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছু করতে চায় অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না এমন একটা ভাব সকলের। কিন্তু সেই মাঝখানের মেয়েটা নড়ল না একটুও। ও আরো স্থির হলো শ্যামলের চোখে। শ্যামলও। বড়, দূর

থেকে অপূর্ব মিষ্টি স্বরে একটা পাখি ডেকে উঠল। শ্যামলের মনে হলো অনেক পাতা ডাল বন অনেক প্রান্তর দূর থেকে পার হয়ে সে ডাক ভেসে এলো। শ্যামল জানে না এ কোন পাখির ডাক।

অবাক হয়ে চোখ এ-ওর দিকে চাইছে। কোনো কথাই আসছে না। একটুও না। ঠোঁট দিয়ে ফুলটা চেপে ধরে হাত দিয়ে চুল জড়াতে জড়াতে এবার মেয়েটা উঠে পড়ল। উঠে দাঁড়াতেই ওর সারা দেহের সবটা যৌবন ঠিকরে উপচে পড়ল।

এক পা দু'পা করে মেয়েটা শ্যামলের দিকে এগিয়ে এলো। সবাই নির্বাক। ওর দিকে চেয়ে অবাক হলো আরো। দু'পা এগিয়ে শ্যামলও থেমে গেল। মেয়েটা ধবধবে সাদা ফুলের ছোঁয়া ঠোঁটে বলল, ফুল নিবি বাবু? শ্যামলের ভেতরে ভেতরে অনেক কথার ঢেউ তোলপাড় করল। কত কথাই বলতে ইচ্ছে হলো শ্যামলের। অনেক-অনেক-অনেক কথা। অনেক কথাই তো বলার থাকে। কত কিছুই তো বলা যায়। আর শ্যামল তো কথার জন্যে ভাবে না। ওকে তো কথার ভাবনা আজ পর্যন্ত ভাবতে হয়নি কখনও। বেশ গুছিয়ে কথার পর কথা সাজিয়ে, সুন্দর করে কথা বলতে জানে শ্যামল। কিন্তু না। কোনো কথাই এখন শ্যামলের মুখে এলো না। সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলল। শুধু ওর শরীর থেকে চোখ জড়িয়ে রইল শ্যামল। ওর সব কিছু খুঁটেখুঁটে নিতে ইচ্ছে হলো দু-চোখ দিয়ে। আবার বলল মেয়েটা, ফুল নিবি না বাবু?

নিজের শরীরে ফিরে আসতে আসতে বলল, কই কিছু না তো। এবার ওরা সবাই একসঙ্গে খিলখিল করে হাসিতে ভাঙল। শ্যামল বেশ খানিকটা চিনে হয়ে যেতে যেতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ওর হাতের ফুলটার দিকে তাকিয়ে বলল, ওটা কি ফুল তোমার হাতে? শ্যামল কথা আরম্ভ করতে ওদের হাসি থেমেছিল। কিন্তু আবার মুখ টিপে হাসল।

হাতটা একটু তুলে বলল মেয়েটা, ই পারুল ফুল বটে বাবু। একটু থেমে হাতের দিকে চেয়ে আবার চোখ তুলে বলল, কেনে, তুই লিবি ই ফুলটা? হাতটা আরো তুলে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল। শ্যামল হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না। ওর হাতের ফুলটা তুলে নিল শ্যামল। ওর হাতের ছোঁয়ায় শ্যামলের বুক এক ঝলক কেঁপে যন্ত্রণা হয়ে বুকে বুকে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো মেয়েটাও কাঁপল একটু। কমুহূর্ত নীরব। তারপর ঠোঁট কাঁপিয়ে আবার বলল, তুই ফুল লিবি বাবুজি? হামি অনেক ফুল আনিয়ে দিবো। ওদের মুখ টেপা হাসি এবার বন্যা হলো। ওরা সবাই ছুটতে ছুটতে বাতাসে মিশে গেল যেন।

সন্ধ্যে হয়েছে সবে। শ্যামল আজও কাজ থেকে কামরায় ফিরেছে তাড়াতাড়ি। বিছানায় সটান শুয়ে একটা কবিতার বইয়ে চোখ ডুবিয়ে রাখে। কিন্তু সময় কেটে গেল। মুংলা খাবার দিয়ে আসার সময় হলো। তাড়াতাড়ি তুই তো আসিস এখন। সাঁওতালী বুধনী আসতে দেরী হয় রোজ।

শ্যামল একবার উঠে দরজার কাছে গেল। আবার ফিরে এলো। আবার কি ভেবে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল। আবার বইয়ে চোখ রাখল। বাইরে রাত আসছে গুটি গুটি। কিন্তু মুহূর্ত কেটে গেল নিঃসঙ্গ কবিতার সাঁতার কেটে।

এমন সময় দরজায় আওয়াজ শুনে শ্যামল সতর্ক হলো। কি যেন ভাবল শ্যামল। হয়তো নিশ্চয়ই বুধিয়া হবে। তড়াকসিয়ে উঠে দাঁড়াল। আবার ভাবল মা কি সামান্য এলো। সামান্যের কথা ভাবতেই ভেতরে ঠাণ্ডা বোধ করল। ঘড়িটার চোখ বুলিয়ে ভাবল, মা সামান্য এখনই আসবে কি।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল শ্যামল। দু হাতে কপাট খুলে দিল। দরজা খুলে মুহূর্তের মধ্যে শ্যামল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে, যাকে শ্যামল শিমুল তলায় আবিষ্কার করেছিল কোনো এক নির্জন পড়ন্ত বিকেলে। কোনো কিছুই ভাবতে পারল না শ্যামল। কোনো কিছুই মাথায় এলো না। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে আছে।

শ্যামল অস্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি? মেয়েটা আরো সহজ করে উত্তর দিতে চেষ্টা করল, বাপের বিমার হোল। হামি তুর খাবার লিয়ে এলাম বাবু। শ্যামল দেখল ওকে। লাল করে শাড়ি পরেছে। আঁচলটা টেনে সযত্নে কোমরে পেঁচিয়েছে। ওর শরীর অদ্ভুত লাগছে। দুটি পায়ের গোছে নূপুর পরেছে। হাত দিয়ে জড়ানো খোঁপায় কি সব এক গাদা ফুল গুঁজেছে। সব মিলে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। ওর চোখে চোখ তুলে শ্যামল বলল এসো ঘরে এসো। নূপুরের শব্দ তুলে ও ঘরে এলো।

খাবার মেঝেতে রেখে উঠে দাঁড়াল। শ্যামল সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, বুধিয়া বুঝি তোমার বাবা? হাঁ, বাবুজি। উত্তর দিল মেয়েটা। শ্যামল আবার দেখল ওকে। তারপর আবার বলল, তোমার নাম কি? মেয়েটা স্বাচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় জবাব দিল, ঝুমরী। শ্যামল ছোট্ট করে বলল, বেশ নাম তো। একটু লজ্জা পাবার মত ও চোখ নামাল।

কোনো কিছু মনে পড়ে যাবার মত ঝুমরীকে মনে হলো। আঁচলের আর একটা দিক থেকে কতগুলো ফুল শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিল।—ই পারুল আর মহুয়া ফুল বাবুজি। তুর-জন্য লিয়ে এইসেছি। শ্যামল ফুলগুলো নিতে নিতে বলল, বাঃ ভারী সুন্দর তো। শ্যামল ঝুমরীর প্রোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে তাকাল। ঝুমরীকে মনে হলো কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। চোখ মাটিতে রাখল আবার। শ্যামল কত কিছু ভাবতে চেষ্টা করে কিছুই ভাবতে পারল না। ঝুমরী চোখ নীচে রেখেই বলল, হামি রোজ তুর খাবার লিয়ে আসবেক। হম বলছে বাপের বিমার ভালো হবার নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ঝুমরী। চোখ তুলল শ্যামলের দিকে,— হামি যাচ্ছে বাবুজি। ঝুম ঝুম নূপুরের শব্দ তুলে ঝুমরী অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

সকাল বিকেল যায় বাতাসের মত উড়ে যায়। ঝুমরী সন্ধ্যায় রোজ ওদের খাবার দিয়ে যায়। শ্যামলের কাছে বসে অনেক কথা বলে। কত কথা। শ্যামলের কাছে শহর কলকাতা চেনে। আবার ওদের গ্রামের মাটির কথা বলে। ওদের জীবনের কথা। ওদের দিনগুলোর কথা। কি কথা আজ আর শ্যামলের স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু সেই সময়গুলো শ্যামলের বুকের মধ্যে চিত্রার্পিত হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝুমরী বলছিল, হামার মা নাই বাবুজি। কিন্তুক হাম কোথা থেকে হোথ। মা বলতো, শুধ ঝুমরী ইচ্ছা না লাগলে কুছু হবেক নাই। উতে ভালো হোয় নাই। যখন হামার বাপ ওই বুড়া মরদটাকে বিয়া করতে বলেক, হামি বলাম, মরদ তো হামি উকে বিয়া করবেক নাই। ই দিন ও বুড়াটা মারা গেলো। বাবুজি, তু বোল, হামি ঠিক করেছে নাই? শ্যামল অনেক কথা বলতে গিয়ে কোনো কথাই বলল না।

বিকেল সবে পা রেখেছে সন্ধ্যার দরজায়। অন্ধকার বৃষ্টির মত ঝরতে আরম্ভ করেছে। ঝুমরী খাবার নিয়ে এলো। একটা কপাট খোলা দরজা দিয়ে সটান ঢুকে গেল ভেতরে। শ্যামল বুকের ওপর একটা বই নিয়ে ঘুমিয়ে। রোজকার মত সামান্য ধরে ফেরেনি তখনও। কি করবে কিছুই বুঝতে পারল না ঝুমরী।

খাবারটা মেঝেতে রাখল। দু'পা এগিয়ে গেল খাটের দিকে। ডাকতে গেল শ্যামলকে। কিন্তু পারল না। কমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। আবার এগোল। কি যেন ভাবল। চোখ তুলে আবার শ্যামলকে ভাল করে দেখল। দেখল ওর শুয়ে থাকা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দেখল বুকের ওপর খোলা বই। নিজের অজান্তেই ঝুমরীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাবুজি—বাবুজি। ...শ্যামলের ঘুম ভাঙল না।

না আর ডাকবে না ভাবল ঝুমরী। ঝুমরী দরজার দিকে পা রাখল। দরজার কাছাকাছি গিয়ে পা আটকে গেল। আবার ফিরে এলো। একটু দাঁড়াল আবার ভাবল। খাটের ভীষণ কাছে এলো এবার। ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। শ্যামলের পা ছুঁতে গেল। ওর হাত থেমে গেল। নূপুরের শব্দ কেঁপে গেল। শ্যামলের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার দৃষ্টি রাখল পরিপূর্ণ। তারপর কি ভেবে হাতের আঙুল দিয়ে শ্যামলের বুক ছুঁলো। ডাকল, বাবুজি—। শ্যামল চোখ খুলল। শ্যামলের ঘুম ভাঙল। ঝুমরী মাথা নামাল মাটিতে। শ্যামল ভাল করে চোখ মেলে বলল, ঝুমরী তুমি! বাবুজি তুর খাবার — মাথা না উঠিয়ে মাটির স্বরে বলল ঝুমরী।

শ্যামল মেঝেতে পা রাখল। পাঞ্জাবির জামাটা দু-হাত দিয়ে খুলে দিল। বিছানায় শরীর এলাল। ঝুমরী দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ। শ্যামল একটা সিগারেট

ঠোঁটে লাগিয়ে ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই বলল, তোমার বাবা কেমন আছে, ঝুমরী? ঝুমরী শ্যামলের হাতের সিগারেটের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল, হাঁ, থোরা ভালো হইয়েছে। শ্যামল ঝুমরীর চোখ দেখে বলল, কি দেখছো ঝুমরী? সিগারেট? ঝুমরী দু' ঠোঁটে হেসে চোখ নামাল। আবার বলল শ্যামল, তুমি কি সিগারেট দেখনি কখনো? ঝুমরী এবার চোখ তুলে বলল, হাঁ দেখেছে বাবুজি। লেকিন হামাদের মরদরা ই খায় না। হাড়িয়া খায়। উ হামার ভালো লাগে না। খুব স্বাভাবিক লাগল ঝুমরীকে। শ্যামল হেসে ফেলল। ঝুমরীর ঠোঁটে লাজুক হাসি ঢেউ তুলল।

কিছু সময় চলে গেল। শ্যামল অন্য স্বরে বলল, ঝুমরী তোমার ভাই আছে তো না? হাঁ, আছে বাবুজি। উ হামার সাথে কাজ করে। কেন বাবু? ঝুমরী শ্যামলকে দেখল মুখ তুলে। বলছিলাম... এই সন্ধ্যে বেলা রোজ তুমি না এসে তোমার ভাই-ই তো আসতে পারে। ঝুমরীর চোখ দুটো লাল হলো। গাল তামাটে হলো। ঠোঁট কেঁপে গেল। কোনো কথাই বলতে পারল না। জানলার বাইরে দৃষ্টি নিশ্চল। পায়ের নূপুরের আওয়াজ হলো না একবারও। ঝুমরীকে নিস্পন্দ মূর্তির মত মনে হলো।

শ্যামলও কি বলবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। কিছু সময় দুজনেই নিঃশব্দ। শ্যামল বলল, কি ভাবছ ঝুমরী? মনে হলো পাতালে তলিয়ে যেতে যেতে ঝুমরী বলল, হামি না আসলে তুর ভালো হোবে? ওর গলার স্বরে বাষ্প মিশে গেল। আর কোনো কথাই বলতে পারল না। ভূমিকম্পের কাঁপুনির শেষ রেশটুকু তখনও ওর শরীরে লেগে ছিল। শ্যামলের দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। শ্যামল একবার ওর নাম ধরে ডাকল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কাঁধের ওপরে ওর নরম হাত ধরল। ঝুমরী ঘুরে দাঁড়াল। শ্যামল ওর চোখে জলভরা দৃষ্টি হেনে বলল, না মানে, আমার কথাটা শোন, আমি ঠিক তোমায় ও কথা বলিনি। বলছিলাম সন্ধ্যে-বেলায় তুমি একা আসো কিনা। তোমাদের কত লোকজন আছে আর যদি ...। ঝুমরী শ্যামলের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, হামার ইচ্ছা হোয় হামি আসে। হামি কাউকে ডর করি না। একটু থামল। মুহূর্তের মধ্যে ওর উজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখ অনেকটা নিষ্প্রভ হলো। অসহায় করুণ স্বর বহু দূর থেকে ভেসে আসার মত গলায় আরো এগিয়ে এসে বলল, তুই হামাকে কুছু বলিসনাই বাবুজি। ঝুমরীর বুকের মধ্যে বৃষ্টির প্রপাত স্বর শ্যামল শুনতে পেল। দেখল বাইরের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা অন্ধকার। টেরও পেল না কখন ঝুমরী চলে গেল।

রাত তখন সাতটা। সান্যাল আর শ্যামল ওদের ঘাটে আলসোয়া হয়ে সিগারেট টানছিল। সান্যাল অফিসের একটা কাগজ দেখছে। শ্যামল কড়িকাঠ দেখছিল। ভাবছিল আই. এম. কোম্পানীর ব্রাঞ্চ খোলার কাজে রাঁচিতে এই গ্রাম্য পরিবেশে আসাও যেমন অপ্রত্যাশিত, আর আশ্চর্যজনক। দু' হপ্তা যান চোখ ফেলতে না ফেলতেই দুপুরের মত উবে যাওয়াটাও আজকে শ্যামলের অতিপ্রাকৃত লাগছে।

সান্যাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মুন্সিবাবের মুশকিলগুলো সব ঠিক হয়েছে তো?

হ্যাঁ সব ঠিক করে দিয়েছি। শ্যামল উত্তর দিল।

ওদের সামনে মোটার ছাউনির স্লিপারও তা হলে কমপ্লিট হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ সবই মোটামুটি ঠিক আছে।

ঃ তা হলে অসুবিধা আর কিছুই নেই কি বলেন? তাছাড়া কিছুই বিদেশে ওদের দিকটাও একটু দেখতে হয় বইকি? সেই জন্যই তো কমপেনসেশনের কথা বললাম। একদমে কথাগুলো বলে সান্যাল যেন একটু দম নিল। আবার বলল, যাই দি যাই, আপনি এই কাগজগুলো নিয়ে যান। আপনি যখন কালই যাচ্ছেন তখন আর পোস্টে পাঠাই কেন।

শ্যামলের কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করল না। সান্যাল আগের মতই কাগজপত্রে চোখ রেখে বলে চলেছে।—আমার মনে হয় এবার মিঃ লাহিড়ি আপনার জায়গায় আসবেন। শ্যামল কোনো কথা শুনছে কিনা কে জানে। শ্যামলের চোখ তখন কড়িকাঠ থেকে জানলার বাইরে আকাশে। সান্যাল মুখ ঘুরিয়ে শ্যামলকে দেখল।

ঘরের মধ্যে আলো। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ আর ঝিঁঝির একটানা ডাকে অন্ধকার আরো অন্ধকার হয়েছে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড় থেকে পাখির ডানা ঝাপটানির শব্দ। অথবা পাশের কোথাও জঙ্গলে শেয়ালেরা ঝগড়া করছে। দূর থেকে ঢোল মৃদঙ্গ আরো কত কি বাজনার, আর সাঁওতালদের সংবদ্ধ গান কখনও আনন্দের বা উল্লাসের উৎসব চিৎকার ভেসে আসছে অন্ধকার ভেদ করে।

শ্যামলের রাতের এই বিছানা ছেড়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সাঁওতালীদের নাচ গানের আসরে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সনে নাচতে গাইতে হাড়িয়া খেয়ে বিভোর হয়ে থাকতে। ওরা মাতাল হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসছে। এই সময়টা সবাই ওদের প্রাত্যহিকের দৈন্য জীবন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে অন্য কোনো অপার্থিব জী নেয় যেন একটুখানি. পা ছড়িয়ে বসে এই দৈন্য জীবনের অনন্ত গ্লানিমা নিশ্বাস ফেলে [illegible] নিতে চায়। আর রাতের বিছানায় শুয়ে শ্যামল প্রথম উপলব্ধি করল এখনও পৃথিবীতে জীবনে জীবন খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ সব ভাবতে ভাবতে শ্যামলের দু চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো।

সূর্যের আলোয় আবার সকাল এলো। আজ সকালেই আবার শ্যামলকে কোলকাতায় ফিরতে হচ্ছে। শ্যামল নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। সান্যাল খানিকটা সহানুভূতির সুরে বলল, কিছু মনে করবেন না, স্যর, আমাকে বেরুতে হচ্ছে এখনই। শ্যামল শ্বাস ছেড়ে বলল, না, না তাতে কি। আপনি যান। দু-পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সান্যাল বলল, গিয়েই কিন্তু একটা চিঠি দেবেন। ভুলবেন না যেন। শ্যামলের শেষ কথা শেষ হবার আগেই ঘরের বাইরে পা রাখল সান্যাল।

সব কিছু ঠিক মত গুছিয়ে নিয়ে শ্যামল যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। আজ নিজেকে অনেক ভারী মনে হলো শ্যামলের। চলার গতি যেন হারিয়ে ফেলেছে। একটা বেদনা অনুভূতি শ্যামলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে হচ্ছে কি যেন করা হলো না। কি যেন বলা হলো না। হয়তো করার মত। করা উচিত ছিল। হয়তো বলার মত বলা উচিত ছিল। হয়তো বলতে পারত। কিন্তু না। কিছুই মনে এলো না। কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করল শ্যামল। সে ব্যথা ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

শ্যামল ভাল করে ঘরটাকে দেখল। ঘরের দেয়াল দেখল। দেখল জানলা। কড়িকাঠ। দেয়ালের বালি খসে যাওয়া জায়গাটাতে দৃষ্টি দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ মনে হলো। মনে হলো পৃথিবীতে তার মতন ভীষণ একা কেউ নেই।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেল। তারপর হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে খাট, টেবিল, চেয়ার, জানলার পাল্লা, খসে-যাওয়া বালি এমন কি মেঝে পর্যন্ত সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল। ঘরময় ছুটে ছুটে কি যেন খুঁজে ক্লান্ত হলো। শ্যামলের ভেতরের একটা পাগল যেন কোনো কিছুর সাহিত্য কামনায় নিজের ভেতর দেয়ালের ইঁটে বার বার মাথা ঠুকতে লাগল। আর ফাটা-পড়া মাথার রক্ত নিজেকে যেন স্নান করিয়ে দিল। নিজের শরীরের সব স্পন্দন বোধ হারিয়ে ফেলল। বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা অসম্ভব টনটন করে উঠল।

তারপর পটেলী বাঁধা বিছানা আর সুটকেসটা নিয়ে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে তাকাল সব কিছুর দিকে। নিজেকে শক্তি [illegible]। এবার চোখ দুটোকে সমস্ত ঘর, খাট, দেয়াল আর

চেয়ার থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে আছড়ে ফেলল সামনের রাস্তায়।

রাস্তায় পা রাখল। নিজের বিবর্ণ দেহটাকে টেনে হ্যাঁচড়ে নিয়ে চলল রোদ-জ্বলা রাস্তা দিয়ে। ফিনফিনে সকালের হাওয়া শ্যামলের বুকে বেঁধার মত লাগল। শ্যামল হাঁটছে হাঁটছে। বাঁ দিকের ছোট্ট জল জমা জায়গাটাতে এক ঝাঁক শালিক জল ছিটিয়ে স্নান করছে। শ্যামলের স্নান ভাল লাগল। ক' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর আবার সামনে চলার কথা মনে হলো।

শ্যামল এগিয়ে চলেছে। মনে মনে কত কিছুর হিসাব করতে চাইছে। কিন্তু কি হিসাব করবে শ্যামল। কি করেই বা করবে। কি আছে। কি থাকতে পারে হিসাবের। আর থাকলেই যে হিসাব করা যাবে এ কথাই বা বলল কে শ্যামলকে! খুঁজতে গিয়ে কোনো কিছুই মনে এলো না শ্যামলের। বস্তুত কিছু নেই বলেই নাকি। ভুলে যেতে যেতে মনে পড়ল, শ্যামল এখন রাস্তায়। হাঁটছে। আর হাঁটতেও হবে শ্যামলকে এমনি করে উঁচু নীচু রাস্তা পার হয়ে যতদিন না এ রাস্তা একেবারে শেষ হয়ে যায়।

কিছুটা এগিয়ে শ্যামলের পা আটকে গেল। মনে হলো কোনো ডাক শুনতে পেল যেন। মনে হলো সে ডাক গভীর পাতাল থেকে উঠে এসে বাতাসের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে। শ্যামল স্তব্ধ হলো। পিছন ফিরল। শ্যামলের অন্ধ হলেই ভাল হতো। দেখল ঝুমরী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। শ্যামল মাথা নামাল। চোখ বুজে গেল। আর তখনই দেখল একটা পাখী উড়ছে আকাশ দিয়ে। উড়তে উড়তে দূরে অনেক অনেক দূরে অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্যামল চোখ খুলল। দেখল ঝুমরী শ্যামলের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ দুটো দেখে মনে হলো শরীর থেকে বেরিয়ে শূন্যে নিশ্চল হয়ে আছে। শ্যামল নিশ্বাসে ওঠা নামা ওর বুকে দেখল। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই গভীর বন গলায় বলল বাবুজি, তু চলে যাইছিস? ঝুমরীর স্বর এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসার মত। শ্যামলের চার পাশের বাতাসে হু হু বিষণ্ণতার সুর ঢেউ হয়ে মিশে গেল। ঝুমরীর সেই হরিণী চোখ জমাট পাথর হলো।

নিজেকে মাটির ওপর আরো শক্ত করার চেষ্টা করে ঝুমরী আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কোনো কিছু শোনার আগেই অনেক সহজ করে বলবার চেষ্টা করল শ্যামল, হ্যাঁ ঝুমরী, আমার যে কাজ শেষ হয়েছে। ঝুমরীর বুকের ওঠা-নামা মুহূর্তের মধ্যে তাল হারাল। অতল সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে ঝুমরী বলে উঠল, আর আসবিক নাই?

শ্যামলের শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলো সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ হলো। নিজেকে অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগল। মনে হলো নিশ্বাস নিতেও ভুলে যাবে। জোরে ভীষণ জোরে স্ব-শব্দ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, হ্যাঁ ঝুমরী আসবো। আবার ফিরে আসবো আমি। না, বলতে পারল না। কিছুই বলা গেল না। শ্যামল কোনো কথা বলতেই ভুলে গেল। বুদবুদের মতই কথাগুলো বুকের মধ্যে মিশে হারিয়ে গেল। ঝুমরীর চোখ দুটো বর্ষার মেঘ আকাশের মাঝখানে বৃষ্টি হবার অপেক্ষায় থাকার মত।

ঝুমরীর চোখ থেকে চোখ তুলে আকাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল শ্যামল, কি জানি আসব কি না। জানি না তো। ঝুমরীর পায়ের তলায় মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। ঝুমরীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ ঝুমরীকে শ্যামল দেখেনি কখনও। দেখতে চায়ওনি। ঝুমরীকে ঠিক কেমন লাগল ভাবতে গিয়ে কিছুই ভাবতে পারল না শ্যামল। ঘুম ভেঙে ক' মুহূর্ত কোনো কিছু বুঝতে না পারার মতই সব কিছু মনে হলো।

শ্যামলের আকাশ ভাল লাগছিল না। শ্যামল মাটিকে দেখল। মাটি ভাল লাগল না। বাতাস দেখতে চাইল, দেখতে পেল না। তারপর দূরে শেষ হয়ে যাওয়া সবুজ প্রান্তরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল, কোনো কিছু খোঁজার মত। সেদিনের রাতের বিছানায় শুয়ে সাঁওতালীদের যে আনন্দ উৎসব শুনেছিল এখন সে উৎসব মনে করতে চাইল। মনে পড়ল না কিছুতেই। মাথাটা টনটন করে উঠল।

বাতাস নেই এখন আর। সূর্য গায়ে বিঁধছে। শ্যামলের শরীরটা জ্বালা জ্বালা করছে। শালিকগুলো জল খেলা শেষ করে চলে গেছে। কেউ কোথাও নেই। নিরবলম্ব বিস্ময় দুটো মানুষ অনন্তকাল ধরে সময়ের ছুটন্ত সিঁড়িতে পা রেখে দাঁড়িয়ে একজন আর একজনকে ছোঁয়ার জন্য অস্থির চেষ্টা করছে।

অনেক খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ঝুমরী কোনো কিছু আঁকড়ে ধরল মনে হলো। বাতাসের শরীর বেয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ার মত অনেক জমাট কথা ঝুমরীর গলায় ঝরে পড়ল,—হামাকে তুর সাথে লিয়ে যাবি বাবুজি? শ্যামল ঝুমরীর ঠোঁটে দৃষ্টি রাখতে পারল না। আবার মাটি, আকাশ আর প্রান্তর দেখল। মনে হলো শ্যামল কিছুই দেখতে পেল না। দৃষ্টি থেকেও যেন শ্যামলের দৃষ্টি নেই। নিজের কাছে নিজেকে অসহায় আর অসহায় মনে হলো। সেই পাখিটার ডাক শুনতে পেল শ্যামল। যে ডাক প্রথম দিন শিমুল তলায় দাঁড়িয়ে শুনেছিল। কিন্তু আজ সে ডাক অনেক মাঠ, সেই ধু ধু সৈকত, নদী, সমুদ্র পার হয়ে অনেক অনেক দূরে হারিয়ে গেল। এ ডাক শ্যামলের কর্কশ লাগল। এমন ডাক শুনতে চায়নি কখনও। কিন্তু শুনতে হলো। শ্যামল কত কি ভুলে যেতে চাইল। এমন কি এই ঝুমরীকেও ওর মন, স্মৃতি আর অনুভূতি থেকে দূরে রাখতে চাইল। কিন্তু কিছুই পারল না। সামনের ঝুমরীকে আবার দেখল শ্যামল।

নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল শ্যামল। —না ঝুমরী তা যে হয় না। শ্যামলের মনে হয়েছিল নিজেকে হাল্কা লাগবে। মনে হয়েছিল অনেকক্ষণ পর একটা নিশ্বাস নিতে পারবে। অথচ নিজের কোনো ওজনই বুঝল না। বুঝল না নিশ্বাস আটকে গেল নাকি।

শুধু ঝুমরীকে দেখতে হলো। দেখতে হলো ওর পাথর চোখ। দেখতে হলো স্পন্দনহীন শরীর। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া অসাড় বুক। দেখতে হলো সব কিছু।

ভেতরে ভেতরে শ্যামল কেঁপে উঠল। কত কিছু যেন শ্যামলের করতে ইচ্ছে হলো। ইচ্ছে হলো দুহাত দিয়ে ঝুমরীর অনড় দেহটাকে নাড়িয়ে দিতে। ইচ্ছে হলো ওর হাত কিংবা গাল ছুঁয়ে বলতে, ঝুমরী তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেলে? তোমার ঠোঁটে ঢেউ তোলা সেই কথা যে আমার শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তারপর কি হলো। কি হলো ঝুমরীর। কি কথা বলেছিল! শ্যামলের নিজেরই বা কি হলো! না। আর কিছুই মনে পড়ছে না।.....শ্যামল সব কিছুই ভুলে গেল।...

শ্যামলের খাটটা নড়ে উঠল। শরীর কেঁপে গেল। সাঁতার কেটে তীরে ওঠার মত অনেক হাতড়ে ক্লান্ত হয়ে চেতনার মাটি পেল আবার। মাথাটা টলছে। বুকের ব্যথাটা টনটন করছে আরো।

ঘরের অন্ধকার নেই এখন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার মত শ্যামল কড়িকাঠ দেখল। দেখল টেবিলে শেষ হয়ে যাওয়া গলা মোমবাতি। দেখল খোলা জানলার পাল্লা দিয়ে সকাল ঘরের ভেতর ঝুলে পড়েছে। বিছানার ওপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে। প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে জ্বলে জ্বলে করছে,—'রাণীগঞ্জ আই এস কোম্পানীতে অগ্নিকাণ্ড, তিনটে বস্তি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।' শ্যামল কিছুই ভাবতে পারল না। সকালের আলো ওর চোখে অন্ধকার হয়ে এলো। ওর প্রতিদিনের মাটিতে মনের অনেক জমাট কথা ধুলো হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

অঙ্গনা

প্রবাসেঃ বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে

লণ্ডনে বর্ণবিদ্বেষ দিনে দিনে তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কিছুদিন আগে একজন ভারতীয় ছাত্রকে লণ্ডনের এক পানশালা থেকে বের করে দেওয়া হয়। গাত্রবর্ণের জন্যই তিনি বর্ণ-বিদ্বেষের শিকার হন। গাত্রবর্ণের কাছে তার কোন পরিচয়ই ধোপে টিকলো না। ছাত্রটি নিজে লণ্ডনের ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং তার বাবা লণ্ডনের প্রাক্তন হাই কমিশনার। তবু ছাত্রটি বর্ণ-বিদ্বেষের হাত থেকে রেহাই পেলো না।

এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে প্রতিবাদও হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হলো ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের। যারা এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এবং এখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। লণ্ডনে তাদের প্রবেশাধিকার মিলছে না। ব্রিটিশ সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এবার উদ্যোগী হয়েছেন শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। এই সংস্থার নাম ইস্ট-ওয়েস্ট হারমনি। তিনি নিজেই এই সংস্থার চেয়ারম্যান। এই সংস্থা ছাড়াও তিনি এ-সংক্রান্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের এই সংস্থা ইতমধ্যে নানা প্রশংসনীয় কাজ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে সংস্থার মাধ্যমে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু মূল সমস্যা সব সময়ই প্রাধান্য পেয়েছে। লণ্ডনে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত যে সব বহিরাগত যাত্রিকদের থাকতে 'ডিটেনশন সেন্টারে' তিনি নিজে তাদের তত্ত্বাবধান-তদারকি করেন। একদিন তিনি 'ডিটেনশন সেন্টারে' হাজির আর এমনি সময়ে সাতচল্লিশ বন্দিশালাত এসে পৌঁছুলো। কর্তৃপক্ষ [illegible] দেখাশোনার দায়িত্ব পালনে খুব একটা উৎসুক যে নন তা আঁচ করতে পেরে [illegible] তিনি এই অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদ করলেন। [illegible] কাটাকাটি [illegible]। [illegible] তিনি নিজেই তাদের সামলালেন। ওদের খাওয়া-দাওয়া [illegible] সবই তিনি নিজের হাতে করলেন। শুধু জোরালো গলায় বক্তৃতা নয় [illegible] যে নিজে হাত লাগাতে পারেন, সে প্রমাণও তিনি রাখলেন।

এই সমস্যাভিত্তিক নানা আলোচনায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। স্বপক্ষ সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা করেন। একবার এমনি এক আলোচনা-সভায় চোখা চোখা বাক্যবাণে তিনি উত্তপ্ত করে তুললেন বিরোধী পক্ষের বক্তা এবং রক্ষণশীল এম-পি এনক পাওয়েলকে।

এসব তর্কের ঊর্ধ্বে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে জাতিগত বিদ্বেষের উৎস হলো সংস্কার এবং কিছু পরিমাণে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি। এ নিয়ে তিনি একখানা বইও লিখেছেন। বইটির নাম 'মিউচুয়াল মিসআন্ডারস্টান্ডিং'। সব ইংরেজই যে বর্ণবিদ্বেষী এমন নয় বরং তিনি মনে করেন যে, উভয় জাতিই যদি এ বিষয়ে সচেতন হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমঝোতার পথে এগোয়, তাহলে এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। এই সমস্যাকে আর একটু স্পষ্ট করার জন্য তিনি এ বিষয়ে একটি চলচ্চিত্রও তৈরি করছেন। মূল সমস্যার ভিত্তিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট হবে এই চলচ্চিত্র। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানান ব্রিটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস-এর সম্পাদক জন ট্রেভেলিয়ন এবং লণ্ডন ফিল্ম স্কুলের আর ডাইরেক্টর। লণ্ডন ফিল্ম স্কুল প্রয়োজনবোধে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে নিজস্ব স্টুডিও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে আর একটু উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো যে, তিনি স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন ইয়র্ক কলেজ-এর সহযোগিতায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়-এর মতে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য যে কোন ভারতীয়ের ঈর্ষা উৎপাদনে সক্ষম।

সমাজসেবী হিসেবেই শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সুখ্যাত পরিচিত। আর এই সুবাদেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা পৃথিবী। সেই সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রতীচ্যে অসংখ্য বক্তৃতা রেখেছেন। একই সঙ্গে তিনি 'ভারত-সঙ্গীত এবং সাহিত্যানুরাগীও বটে। ক্যালিফোর্নিয়ার ভিক্টোরিয়ার ইন্টারন্যাশনাল [illegible] এবং [illegible] শান্তি পরিষদের। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর চিত্রাঙ্কনের একাধিক প্রদর্শনী হয়েছে খাস লণ্ডন শহরে। [illegible] উপর তাঁর প্রদর্শনী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। এই প্রশংসার মূল কারণ হলো তাঁর স্বকীয়তা।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় কোথাও নিজেকে আটকে রাখতে চান না। নিজের চিন্তা যেমন ছড়িয়ে দিতে চান তেমনি পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো জ্ঞানভাণ্ডারের আস্বাদ লাভে নিজেকে ধন্য করতে চান। সেজন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, ফিল্ম টেকনিক এবং অ্যাডভারটাইজিং সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের থিয়োরেটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল উভয় জ্ঞানেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে সমাজমুখীনতাই হলো শিল্পের মূল কথা। শিল্পের যদি সামাজিক তাৎপর্য না থাকে তবে তা অর্থহীন। স্বাভাবিকভাবেই ফর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী নন। থীমের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন বেশি। ইমিগ্রান্টস সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্রটি থীমের দিক থেকে লক্ষ্য রেখেই তোলা হচ্ছে। শুধু এটিই নয়, তাঁর হাতে রয়েছে আরো অনেক ছবি। সব ছবিতেই ফর্মের চেয়ে থীম বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

বর্ণগত সম্প্রীতির জন্য যেমন চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারেও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তেমনি সিরিয়স। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সিনেমার স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন উৎসব নিয়ে তিনি কয়েকটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। এর মধ্যে আছে রাসযাত্রা, হোলি, ঝুলন, মাথুর প্রভৃতি। ধর্মীয় দিক থেকে প্রতিটি উৎসবের আনন্দঘন রূপটি তিনি উপহার দেবার চেষ্টা করছেন এবং সেই সঙ্গে উৎসব যে আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেকথাও প্রমাণ করেছেন। এগুলি যদি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় তবে বিদেশে হিন্দুধর্মের যথাযথ প্রতিনিধিমূলক ব্যাখ্যাতা হিসেবে এদের গুরুত্ব হবে অপরিসীম। হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদেশের ঘোর কাটাতে এই চলচ্চিত্রগুলি খুবই সাহায্য করবে। আর তা আমাদের দেশের পক্ষে হবে এক মহৎ কর্ম।

ফিল্ম স্ক্রিপ্ট তৈরি করা ছাড়াও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন ফিল্ম স্কুলে একাধিক রিসার্চ ফিল্ম তৈরি করেছেন। এসবই তাঁর হাত পাকানো এবং আরো অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। আর এই একই উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ কলাকুশলী থেকে শুরু সম্পাদনা এবং পরিচালনার কাজও করেছেন। এমনিভাবে প্রতিটি কাজেই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় নিজেকে বহু-বিস্তৃত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। শুনলে অবাক হতে হয় যে, তিনি আবার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স ট্রেনিং কোর-এর অনারারি সদস্যা। এবং সেই সুবাদে তিনি [illegible] একমাত্র 'গার্ড অব অনার'-এ বিভূষিত হয়েছেন। এই সম্মান ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পেলেন। এছাড়া আরো একটি ব্যাপারে তিনি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হবার দুর্লভ গৌরবের অধিকারী। লণ্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক ছাত্র ইউনিয়নের তিনি সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] এই পদে নির্বাচিত হননি [illegible]

দক্ষিণ কলকাতার শিল্পী প্রতিষ্ঠান নারী সেবা সংঘ ওই সমস্ত দুর্গাপূজার প্রাকালে সংঘের সার্বিক এবং কর্মীদের তৈরি কাপড়-চোপড়ের প্রদর্শনী আয়োজন করে। ছবিতে প্রদর্শনীর একটি অংশ

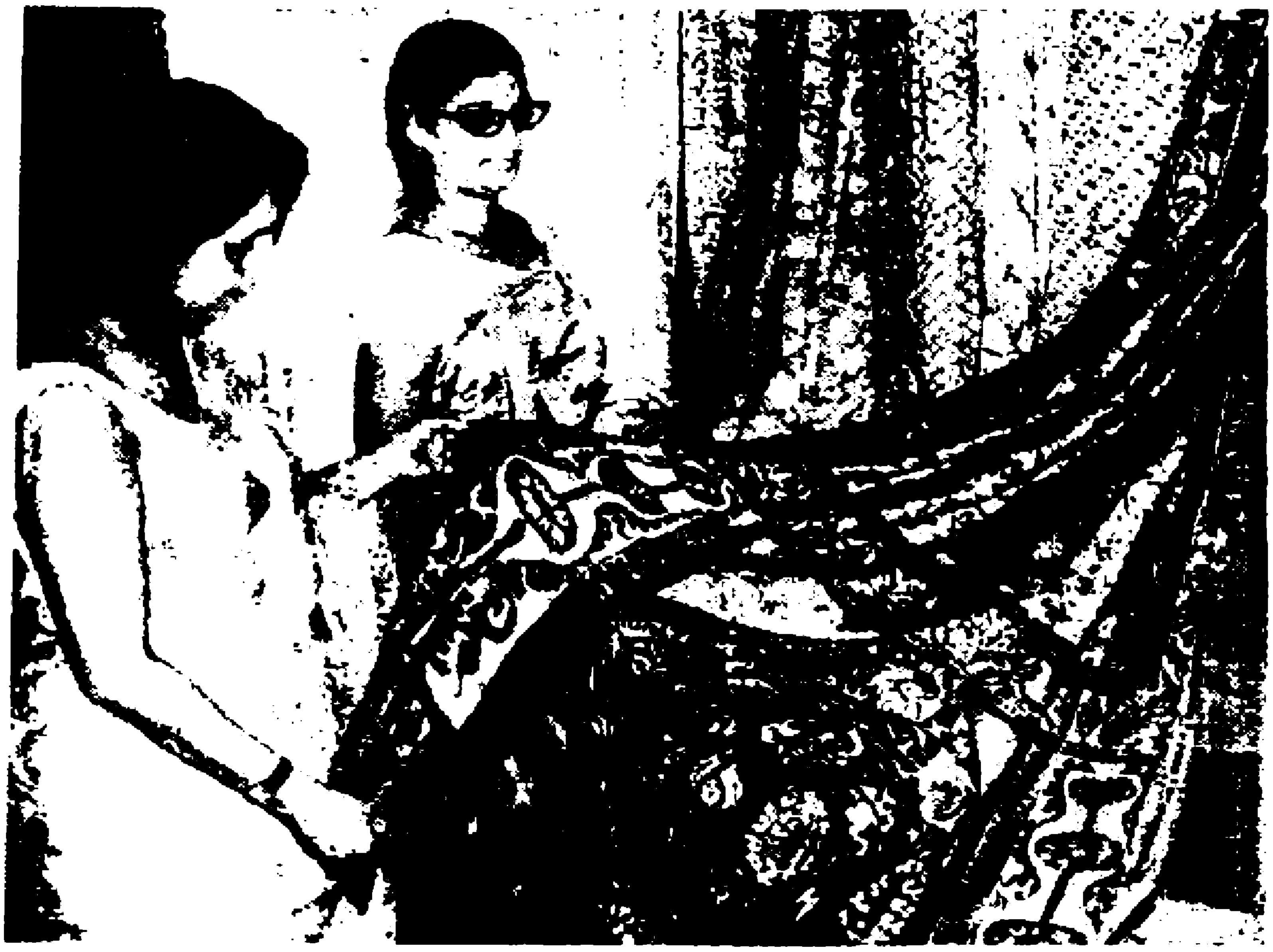

থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। পড়াশোনার অবসরে হাতে হাতে নেমে পড়েছেন টেবিল টেনিস খেলায়। আর খুব যে একটা খারাপ খেলতেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ায়।

চিত্রনাট্য রচনায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সুবিদিত। কিন্তু তা বলে কেউ যদি মনে করে থাকেন যে চিত্রনাট্য ছাড়া তার কিছু লেখার হাত তাঁর নেই তবে মস্ত ভুল করবেন। সৃজনশীল রচনায়ও তিনি সমান দক্ষ। কবিতা তাঁর হাতে বেশ ভালই আসে। নিজের লেখা কবিতা সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য, এদেশের সবাইকে বিস্ময়ভাবে অভিভূত করে। তাঁর রচনায়ও যে প্রতিফলন পাই। এর আসল কারণ, তিনি বলেন, গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। পরিবারের ঐতিহ্য ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁকে উৎসাহী করেছে এবং তা প্রচারের প্রেরণাও লাভ করেছেন এখান থেকেই। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব বক্তৃতা করেন তাও তাঁর দার্শনিক চেতনায় সমৃদ্ধ। বর্ণবিদ্বেষের মূল ঘাঁটিতে বসে বর্ণগত সম্প্রীতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া বৈষ্ণব ধর্মের উত্তরাধিকারীর পক্ষে একান্ত উপযুক্ত কাজ। জাতিগত সম্পর্ক সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা এবং মূল্যায়ন খুবই প্রশংসনীয়। তিনি লন্ডনের সকল ভারতীয় এবং এশিয়ান সংস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত এবং নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান হিসেবেও তিনি বেশ খ্যাতনামা। সর্বোপরি তিনি একজন সমালোচক। আরো উল্লেখযোগ্য যে, এসবের প্রতিটিতেই তিনি ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা পেয়েছেন। এবং কোন ব্যাপারেই একেবারে চুপচাপ বসে নেই। একাধিক নৃত্যনাট্য এবং নাটক তাঁর পরিচালনাধীনে মঞ্চস্থ হয়েছে। টেলিভিশনেও তিনি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকেন। এছাড়া ভাষ্যকার হিসেবে আই টি ভি রেডিফিউশন এবং রেডিওতে তাঁর অংশ গ্রহণ যথেষ্ট গর্বের। বর্ণগত সমস্যা সম্পর্কে যেসব সংবাদপত্র উৎসাহী সেখানে প্রায়ই তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় এবং নিজেও তিনি এ সম্পর্কে নানা নিবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। দেশ এবং বিদেশে ইম্প্রেসারিও হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এজন্য আমাদের রীতিমত গর্বিত হবার কারণ আছে। একাধিক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শও তিনি লাভ করেছেন। পশ্চিমী মতের মান্য লেখক, ইহুদী মেনুহিনের মত সঙ্গীতজ্ঞ এবং অসামান্য সফলতার মত বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। এছাড়াও আছেন ডঃ জোসেফ মার্শাল, পণ্ডিত ক্যাথারিন এবং সত্যজিৎ রায়।

নিজের দেশকে বিদেশে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য সম্প্রতি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। লন্ডনে তিনি ইতিমধ্যে একাধিক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন। ইমিগ্রান্টস সংক্রান্ত চলচ্চিত্রটিই হবে লন্ডনে দেখানো প্রথম ফিচার ফিল্ম। পরিকল্পনামত এই ৩টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র হবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সেতারী আবদুল হালিম জাফর এবং লেখক রাজেন্দ্র সিং বেদীকে নিয়ে। শ্রীমতী গান্ধী মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য অভিনয় করবেন। এবং চলচ্চিত্রে এটুকুই তাঁর ব্যক্তিগত অবদান।

দেশের সম্পদ নিয়ে চলচ্চিত্র করার আরো পরিকল্পনা তাঁর আছে। শিল্পী যামিনী রায় এবং কানন দেবীকে নিয়ে ফিচার ফিল্ম করারও পরিকল্পনা আছে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়-এর। তবে তিনি এখন বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি ফিচার ফিল্ম করার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত। হাতের কাজ একটু হালকা হলেই তিনি পরিকল্পনামাফিক এগোবেন। তাঁর বাংলাদেশ সংক্রান্ত চলচ্চিত্রটি সম্পাদনা করবেন সত্যজিৎ রায়। নিজের কাজে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব তিনি স্বীকার করেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

এসবের মধ্যে আরও একটি বাসনা শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় পোষণ করেন। কিছু প্রতিভাবান সংগীতশিল্পীকে তিনি এই সম্বন্ধে বিলেতে নিয়ে যেতে চান। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে তাঁর সময়ের সাফল্যের উপর। এবং আন্তরিকতার বলেই তিনি যে সাফল্য অর্জন করবেন।

—প্রমীলা

ছোটি বহু/ শর্মিলা ঠাকুর

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলা চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে আবার 'গেল' 'গেল' রব

বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা প্রথম 'গেল' 'গেল' রব তুলেছিলেন ১৯৬২ সালে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমস্যার সমাধানকল্পে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর রোটান্ডা হলে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় সভা ডাকতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপরে গঙ্গানদী দিয়ে বহু কিউসেক জল প্রবাহিত হয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকারের মেয়াদ ফুরোবার পরে নির্বাচনের মাধ্যমে গদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন প্রথম কোয়ালিশন সরকার এবং তারপরে আরও অনেক রকম পরিবর্তন ঘটে বর্তমানে 'প্রেসিডেন্টস রুল' চালু রয়েছে এই রাজ্যে। তবুও এত ভাঙাচোরার মধ্যেও তিনটি অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাধি নির্ণয়ের জন্যে এবং তার প্রতিবিধান সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্যে। কে কি সেন কমিটি, গুহ কমিটি ও শেষে ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি তাদের লিখিত সুপারিশ পেশ করেছেন যথাসময়ে। কিন্তু সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কোন সরকার? প্রেসিডেন্টস রুল অর্থে নিয়মমাফিক শাসকদের যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চালিয়ে যাওয়া। যেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে অন্যদিকে চোখ ফেরাবার সময় কোথায়?

আঞ্চলিক ভাষায় তোলা ছবির স্বাবলম্বী হওয়া কঠিন। একমাত্র তামিল ছবির আছে প্রকাণ্ড বাজার। তাছাড়া বাঙলা মারাঠি, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ছবির যা বাজার, তাতে নিয়মিত-বাঁচা ওঠা ভীষণ কঠিন ব্যাপার। চার বছর কুড়ি আগে একটি পরিসংখ্যান থেকে প্রকাশ পেয়েছিল যে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প যেখানে সামগ্রিকভাবে বছরে ১১ কোটি টাকা লাভ করে সেখানে শুধুমাত্র বাঙলা ছবির ২ কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হয়।

এইটি পড়ে বাঙলা দেশের একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী আমাকে বলেছিলেন, লোকসান দেবার জন্যে প্রস্তুত এত মূর্খ আর কতকাল পাওয়া যাবে। সর্বভারতীয় ছবির জগতের কথা বাদ দিয়ে মাত্র পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির কথায় চলে এসে বলি, সদ্য প্রদর্শনী সমাপ্ত হয়েছে, এমন একটি বিশেষ জনপ্রিয় ছবির তিনটি মুক্তি-চিত্রগৃহ থেকে প্রযোজক-পরিবেশকের আয় যেখানে হয়েছে কম-বেশী দু'লক্ষ টাকা, সেখানে চিত্রগৃহ তিনটি নিয়েছে তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রযোজক-পরিবেশকের মিলিত আয়ের প্রায় দ্বিগুণ নিয়েছেন প্রদর্শক। কিন্তু এ-অবস্থার পরিবর্তন আসবে কি করে? কোনো লেজিসলেশন বা আইন-কানুনের প্রবর্তন এ-অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে কি?—রাজ্য সরকার কি কোনো বিধানবলে রাজ্যের প্রতিটি চিত্র-গৃহকে বাঙলা ছবি দেখাতে বাধ্য করাতে পারেন? বাঙালী দর্শকের রুচির পরিবর্তন কাম আঞ্চলিকের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা যাবে কি? তারা তো ক্রমেই হিন্দী ছবির অর্থহীন চটুলতার দিকে ঢলে পড়ছে।

অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, যদি পশ্চিমবঙ্গে ছবিঘরের সংখ্যা ৩৫০-র বদলে অন্তত ১,০০০ হাজার হয়, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা ছবির প্রদর্শনী থেকে পাওয়া প্রমোদ-করের অংশ ফেরত দেন, যদি ছবির প্রযোজকদের [illegible], যদি বাঙলা ছবির প্রযোজক সহজ সুবিধাজনক শর্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পান এবং যদি বাঙলা ছবির প্রযোজকরা সম্মিলিতভাবে বাৎসরিক চিত্র-প্রযোজনা সম্পর্কে পুরো বছরের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

অন্যথায় যতই চেঁচামেচি করি না কেন, অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

গেল শনিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রযোজক-শাখার সভাপতি বিমল দে বলেছেন, অ্যাসোসিয়েশন যে প্রযোজক শাখাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে, তা তাঁর মনে হয় না। তাহলে অ্যাসোসিয়েশনের অংশ হয়ে তাঁরা কেন রয়েছেন, এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হয়ত এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হতে পারে। সকলেই জানেন, প্রদর্শকদের স্বার্থ আর প্রযোজকদের স্বার্থ কখনই এক হতে পারে না। কাজেই একই সংস্থার পক্ষে দুই বিরোধী স্বার্থরক্ষিত দলকে ঠাঁই দেওয়া রীতিমত শক্ত ব্যাপার। কিন্তু অপরূপ এই বাঙলাদেশ—এ দেশে একটি সংস্থার পক্ষে তিনটি দলকে প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকগোষ্ঠীকে একই ক্রোড়ে ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। এরা প্রযোজকেরা নিজেরাই পারেন, ই আই এম পি এর বাইরে স্বাধীন সংস্থা গঠন করুন, তাঁরা নাকি [illegible] হতে পারবেন না এবং করতে

স্ত্রী: উত্তমকুমার ও আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা : সলিল দত্ত   ফটো : অমৃত

পারলেও তাঁদের তৈরী ছবি মুক্তিলাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সব চিত্রগৃহই তখন হিন্দী ছবি দেখাতে থাকবে।

চিত্রসমালোচনা
নিমাই কাহিনীর নব চিত্রায়ণ

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিমাই সন্ন্যাস, শচীদুলাল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বিষ্ণুপ্রিয়া নীলাচলে মহাপ্রভু প্রভৃতি বহু সবাক বাঙলা ছবিই ১৯৩০ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে। আর একবার মহাপ্রভুর বাল্যকাল থেকে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত জীবনধারাটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করলেন পরিচালক তপন রায় মার্জা কা চিত্র-এর চিত্র 'শচীমার সংসার'-এ। গৌরজননী শচীমাতার অন্তরের ব্যথা, বেদনা, হাহাকারকে ব্যক্ত করাই যেন এই ছবিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ছবিতে দেখানো হয়েছে নিমাইয়ের বাল্যলীলার চপলতা, কৈশোরের পাণ্ডিত্য ও ন্যায়শাস্ত্রে দক্ষতা এবং যৌবনে ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা, যে আকুলতা তাঁকে সন্ন্যাসগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। গয়ায় বিষ্ণুপাদ দর্শনে মূর্চ্ছা ও ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ, সর্পাঘাতে প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর আকস্মিকতায় শোক এবং দ্বিতীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করবার অক্ষমতা প্রভৃতি উল্লেখ্য ঘটনাগুলিকে যথাসম্ভব নাটকীয়সমৃদ্ধ করে ছবিতে পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে। ছবির মধ্যে যে ঘটনাটিকে স্মরণীয়ভাবে দেখানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে নিমাইয়ের রাত্রিযোগে গৃহত্যাগের পরে শচীমাতার আর্ত অন্বেষণের দৃশ্য। 'শচীমাতা কাঁদে নিমাই নিমাই প্রতিধ্বনি কহে নাই, নাই, নাই'—কবির এই উক্তিকে দৃশ্য শব্দ ও সংগীতের সূক্ষ্ম মিশ্রণে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক শ্রীরায়। শচীমাতার এই হাহাকার এমন সার্থকভাবে চিত্রিত হতে আগে কখনও দেখা যায়নি।

বয়ঃপ্রাপ্ত নিমাই চরিত্রটিকে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে জীবন্ত করে তুলেছেন অসীমকুমার; তিনি নিমাইয়ের অপার্থিব ব্যক্তিত্বকে অবলীলাক্রমে পরিস্ফুট করেছেন—তিনি নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছেন চরিত্রটির গভীরে। বালকনিমাই রূপে শ্রীমান অরিন্দম মিণ্টু। নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার ভূমিকায় নবাগতা সংহিতা রায়কে মানিয়েছে যেমন, তেমনই মাধুর্যময় হয়েছে তাঁর অভিনয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া বেশে জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় আকৃতির দিক দিয়ে সুন্দর হলেও তাঁর বাচনভঙ্গী বিশেষ করে নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের রাত্রে—কেমন যেন কাঠিন্যপূর্ণ—আদৌ সরস নয়। ছবির প্রধানতম শচীমার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর অভিনয় আবেগের আতিশয্য-পূর্ণ।—তিনি নিমাইয়ের মা—কাজেই তাঁর আবেগপ্রকাশের মধ্যে আমরা একটি স্বাতন্ত্র্য আশা করি এবং যা আমরা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না দেখে কিছুটা নিরাশ হয়েছি। অদ্বৈত ও শ্রীবাসের ভূমিকায় যথাক্রমে মিহির ভট্টাচার্য ও শঙ্কর-নারায়ণের অভিনয় চরিত্রানুগ। অপরাপর ভূমিকায় দিলীপ রায়, অমরেশ দাস, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায় প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার অলৌকিকত্ব রূপায়ণে ফোটোগ্রাফীর কারসাজি সাধুবাদার্হ ও প্রশংসনীয়। ছবির সুষ্ঠু সম্পাদনা, যা ছবিকে একটি নাট্য গতিশীলতা দান করেছে, তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'শচীমার সংসার'-এর একটি বিশেষ সম্পদ হচ্ছে এর গানগুলি। কিছু প্রচলিত ও বেশীর ভাগ শ্যামল গুপ্ত রচিত গান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সুরসমৃদ্ধ এবং মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রভৃতি দ্বারা গীত হয়ে এই ছবিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং হয়ে ছবিটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

আজকের হিংসাজর্জর পশ্চিমবঙ্গে মার্গারিকা চিত্র নিবেদিত এবং তপন রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'শচীমার সংসার' বাঙালী দর্শককে স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মঞ্চাভিনয়

মঞ্চ-নাটকের যাত্রাভিনয়

একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন, আজ যাত্রাওয়ালারা থিয়েটারের পথে পা বাড়িয়েছেন। যাত্রাভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে তাঁরা রেখেছেন, প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীতের ঐকতান বাদন এবং তারপরেই একটি স্বেচ্ছ নৃত্য। আর একটি জিনিস তাঁরা রেখেছেন, মূল পালার ভিতরে একটি গায়কের চরিত্র এবং সেই চরিত্র প্রায়ই এক পুরুষ-পাগল। আসলে সে কিন্তু নিয়তি বা বিবেকের কাজ করে। আরও যেটুকু যাত্রার ছাপ আমরা আজকের যাত্রাভিনয়ে দেখতে পাই, সেটা আসলে গুণাত্মক নয়, দোষাত্মক। সেটা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ বাচনভঙ্গী, বিশেষ করে যা প্রকট হয়ে ওঠে ছন্দোময় আবৃত্তিতে হাস্যরসের ভূমিকাভিনয়ে। সংলাপ ভাবাবেগপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থবহ ও শ্রুতিগ্রাহ্যও হওয়া প্রয়োজন, এ-কথা সম্ভবত যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা বা হাস্যরসের ভূমিকাভিনেতারা গ্রাহ্যই করেন না। কি গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি সুরেলা হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অভিনেতা কি বলছেন, তা যদি দর্শকরা অনায়াসেই বুঝতে না পারে, তাহলে অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হবে কি করে? এই সাধারণ কথাকটি বর্তমানের প্রায় সকল যাত্রাদল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে লোকনাট্য যাত্রা-সম্প্রদায় অভিনীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসের সত্যপ্রকাশ দত্ত প্রদত্ত নাট্যরূপটি দেখতে-দেখতে উপরোক্ত কথাগুলি মনে হয়েছিল। এই যাত্রা-নাটকটিতে কিছু সংলাপের পুনরুক্তি-দোষ দেখতে পেলুম। এ-ছাড়া নাটকের দৃশ্য উপস্থাপনায় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশও মাঝে-মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে ক্ষমতাশালী নট-নটীর সমন্বয়ে গঠিত এই দলটির সামগ্রিক অভিনয় বেশ উচ্চাঙ্গের এবং সেইহেতু আকর্ষণীয়। রামেশ্বর চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র রায়ের চরিত্র দুটিতে যথাক্রমে বিজন মুখোপাধ্যায় ও ভোলা পালের ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় দর্শকদের প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল এবং তাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দক্ষ অভিনয়চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন সুনীতির ভূমিকায় সোনালী গোস্বামী এবং কমল মাঝির নাতনী সারিবেশে শর্মিষ্ঠা পাল। ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী ও কন্যার চরিত্রে যথাক্রমে বিভা ভট্টাচার্য ও রীতি দত্তও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন। এ-ছাড়া অহীন, মহীন, মিঃ মুখার্জির ভূমিকাভিনেতারাও যথেষ্ট নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। যোগেশ মজুমদারের খল চরিত্রে শিবদাস মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় রূপদান করেছেন। ক্ষ্যা পাগলাবেশী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের গান সাধারণ পর্যায়ের।

মহাজাতি সদনের এক বিশেষ বাংলা দেশ সাহায্যানুষ্ঠানে তরুণ অপেরার শিব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষে শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষের হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছেন।

লোকনাট্য পরিবেশিত 'কালিন্দী' যাত্রামোদীদের আনন্দ দেবে। —

জীবনাতিরিক্ত প্রদর্শনী

সেদিন এক নতুন অভিজ্ঞতা হল কলামন্দিরে গীতা কোম্পানী নিবেদিত মঞ্চ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে। দেখলুম, কয়েকজন বিদেশীর ভারতীয় সাধন-ভজন সম্পর্কে আগ্রহকে চরিতার্থ করবার জন্যে অন্তত তিনজন ভারতীয়—এক, পূর্ণদাস বাউল, দুই, যোগ-ব্যায়ামশিক্ষক বিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিন, ভারতনাট্যম ও কথাকলির প্রসিদ্ধ শিল্পী গুরু কেলু নায়ার তাঁদের বহু প্রকার শিক্ষাদীক্ষা দানের প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেই শিক্ষাকে ঐ বিদেশীরা মঞ্চ-প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথমেই তাঁরা তাঁদের দেহকে যোগক্রিয়ার উপযোগী করে তোলবার জন্যে কেমনভাবে দেহাভ্যন্তর ও নাসিকাকে প্রক্ষালিত করেন, তাই সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছেন। শান্ত, সমাহিত, শুচি দেহ-মন নিয়ে তাঁরা পরে পূজা-ভজনায় প্রবৃত্ত হন প্রথমে খঞ্জনী, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থেকে একে একে প্রণবনাদ 'ওঁ'—অ-উ-মকে নির্গত করবার প্রক্রিয়া দেখিয়ে। পরে সবগুলি যখন তাঁরা একসঙ্গে বাজান, তখন মঞ্চে প্রবেশ করেন পূর্ণদাস বাউল নাম-কীর্তন করতে-করতে। বাদ্যবাদনের মাধ্যমে ভগবানকে অন্বেষণ করায় এঁরা বিশ্বাসী মন নিয়েই যেন অগ্রসর হন।

এর পরে আসে 'মা' প্রদর্শনী; ভক্তেরা মায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়ছে—আকুতি জানাচ্ছে 'মা', 'মা' ডাকে। নিপীড়িত, নিগৃহীত জনগণ আর্তকণ্ঠে মাকে ডাকছে। মা নিজেও চিৎকার করছেন; যেন পৃথিবীর পাপী মানুষজনকে তিনি ধ্বংস করতে চান। তিনি শক্তি; যেমন সৃষ্টির, তেমনই ধ্বংসের।

যোগসাধনার একটি পর্যায়ে সকলে পদ্মাসনে বসেন। এরই মধ্যে পাপশক্তির অভিযান ঘটে গুরু কেলু নায়ারের পদক্ষেপের সঙ্গে। সকলকে যোগভ্রষ্ট করতে চায় এই পাপশক্তি। কিন্তু সাধনার অন্তর্ভুক্ত অবশ্য পাপশক্তি শেষ পর্যন্ত পরাজিতই হয়। গুরুর কথায় বলে, 'বাধাকে ভুলে যাও, সে তোমার কথা চিন্তা করে না।' কিন্তু ঢক বাঁশী বাজতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি আসে। ... এইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যেও সাধনা চলে।

সত্যিই আমরা কোন রঙ্গমঞ্চ থেকে কৃচ্ছ্রসাধন, ভজন-পূজন ও সাধনার দৃশ্য দেখতে কোন দিনই প্রস্তুত ছিলুম না এবং আজও প্রস্তুত নই। ব্রুমাস কোলিন্স এবং তাঁর সহধর্মীরা ভারতীয় সাধন-ভজনে দীক্ষিত হয়েছেন বা হতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের 'হাঁ', 'না' কিছুই বলবার নেই। এবং তাঁদের জীবনে

স্টার থিয়েটার
শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো. নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো. গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সন্তোষ দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, শম্ভু ভট্টো, তপন, কুমারী মিষ্টু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দু ভট্টো।

তাঁরা যা পেয়েছেন, তা বিদেশের বাজারে তাঁরা যাচাই করিয়ে নেবেন, তাতেও আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু আমাদেরই দেশে বসে তাঁরা আমাদের ধর্মীয় আচরণ প্রক্রিয়াকে কতখানি আয়ত্ত করেছেন, তাই প্রমাণ প্রদর্শনীতে দেখা আর্টিস্টদের পক্ষে নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যসূচক। তবে একটি প্রশংসার বিষয় এই প্রদর্শনী মারফৎ যা পরিবেশিত হয়েছে, সে হচ্ছে নানা পারিপার্শ্বিকতে এঁদের জীবনাচিত কম্পোজিশনে — গতিশীল ভঙ্গিমা সমন্বিত রেখাঙ্কনী। আর প্রশংসনীয় হচ্ছে এঁদের—বিশেষ করে সুকোমল কোমলতা ও এঁদের নারীশিল্পীর ভাবগত নৃত্যাঙ্কনতা।

বাংলাদেশের শ্যামাবোধ ভবনে কলাবীথিতে এই লীলা-প্রদর্শনী গেল ২৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে [illegible] সৌজন্যে।

প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর ৬৮তম জন্ম দিবসে সংবর্ধনা

গেল ১২ আগস্ট সকাল ৯টায় প্রাচী সিনেমা গৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আনন্দ মন্দির কর্তৃক প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে [illegible] পৌরোহিত্য করেন। উদ্বোধন করেন মন্মথ রায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পূর্ণ চক্রবর্তী। জ্যোতিষ মিত্র কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর আনন্দ মন্দিরের সভাগণ ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে প্রথায় শ্রীচৌধুরীকে বরণ করেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশে একটি সুরম্য অভিনন্দনপত্র তাঁকে প্রদান করেন আনন্দ মন্দিরের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি)। শ্রীচৌধুরীর গুণমুগ্ধ অনুরাগীরা তাঁকে একটি স্বর্ণ-খচিত তুলিকা উপহার দেন এবং সেটি শ্রীচৌধুরীর হাতে তুলে দেন আনন্দ মন্দিরের সদ্য-অবসারিত ক্যাপ্টেন [illegible]। সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ শ্রীচৌধুরীর বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর জীবনের নানা পর্যায়ের কথা বিবৃত করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীচৌধুরী সকলকে এবং আনন্দ মন্দিরের সভাবৃন্দকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিভাষণে ধন্যবাদ দেন।

নিউ প্রভাস অপেরার 'রাহুমুক্ত রাশিয়া' : বাংলা পালাগানের আসরে পালাবদলের জোয়ার যে কটি দলের পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে নিউ প্রভাস অপেরার প্রয়াস নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। গত বছরের 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম', 'জ্বলন্ত বারুদ' পরিবেশন করে এই দল যে বস্তুগত বিষয়বস্তু ও শৈল্পিক ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন, তা আরো বলিষ্ঠতর ও দৃঢ়তর সুরে মুখর হয়ে উঠেছে তাদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'য়। রমেন লাহিড়ী রচিত এই পালাটির যে একটি ব্যাপকতর ও গভীরতর আবেদন রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

বিশেষ একটি সময়ে (১৯১৪-১৯১৭) রাশিয়ার মাটিতে একটি প্রচণ্ড জন-বিপ্লবের প্রস্তুতি ও আয়োজনকে কেন্দ্র করে পালাটি গড়ে উঠেছে। মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার যে অসংখ্য সাধারণ মানুষ জারতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী ধনিক-গোষ্ঠীশাসিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সবশেষে জনতার বিপ্লবই যে জয়ের মালা পেয়েছিল; এই সমস্ত মানবিক সংগ্রামকেই প্রোজ্জ্বল ভাষা দিয়েছে 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'। রাশিয়ার তখনকার সম্রাট ছিলেন জার দ্বিতীয় নিকোলাস, কর্মক্ষমতা তাঁর খুব বেশি ছিল না। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি দাপিয়ে শাসন-কারিণী ছিলেন জারিনা আলেক্সান্ড্রা ফিওদোরোভনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিল তাদের রাজগুরু রাসপুটিন। তিনি ছিলেন সাধুবেশী এক শয়তান, লম্পট। তারই অঙ্গুলিহেলনে চলত সব-কিছু। কিন্তু রাসপুটিনের আসল স্বরূপ যেদিন সবার সামনে প্রতিভাত হোতে শুরু করলো, সেদিনই বিক্ষুব্ধ হোল জাগ্রত। নিকোলাসের কয়েকজন মন্ত্রী মিলে ষড়যন্ত্র করে রাসপুটিনকে হত্যা করলেন এবং তারপর ক্ষমতা কেড়ে নিলেন নিকোলাস আর জারিনার কাছ থেকে। এ ষড়যন্ত্রের নায়ক হোলেন যুবরাজ ইউসুপফ। রাসপুটিনের মৃত্যু হোল, নিকোলাসও ক্ষমতাচ্যুত হোলেন। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের বিপ্লব থামলো না; কেননা, তাঁরা দেখলেন তখনো চলছে শাসনের নামে শোষণ, সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অন্ধকার তখনো একই রকম ঘনীভূত হয়ে আছে, লাভ হয়েছে শুধু ক্ষমতার কয়েকটি পুঁজিবাদী ও স্বার্থান্বেষীর। তাই বিপ্লব চালিয়ে যেতে হবে—বলশেভিকেরা নিলেন দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা। প্রথম পর্বেতেই সাম্রাজ্য পুঁজিবাদী জারের কয়েকজন মন্ত্রীকে (যাঁরা রাসপুটিনকে হত্যা করেছিলেন) জনসাধারণের স্বার্থে অপসারণ করে দিলেন। তারপরই এলো জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা। মহানায়ক লেনিন নতুন সূর্যালোকে উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর। রাশিয়ার আকাশ রাহুমুক্ত হোল।

এই বিপ্লব, এই ষড়যন্ত্রের ঘটনাগুলোকে অসাধারণ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে মুখর করে তোলা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের মনকে তা আবিষ্ট করে রাখে। পালাটির সামগ্রিক প্রযোজনাতেও কোথাও এতটুকু শৈথিল্য ছিল বলে মনে হয় না। এর জন্য প্রতিটি শিল্পীর সঙ্গে নির্দেশক অমর লাহিড়ী নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি আমাদের মন একেবারে ভরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে বিস্ময়ে আপ্লুত করেছেন আমাদের তিনি হোলেন ননী ভট্ট। তাঁর 'রাসপুটিন' চরিত্রচিত্রণ ইদানীংকালে পালাগানের অঙ্গনে একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। এই চরিত্রটির রূপায়ণে অনেক আতিশয্য আনবার সুযোগ ছিল, কিন্তু শ্রীভট্ট তাঁর পরিণত শিল্পবোধ নিয়ে যে স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চরিত্রটির রূপ দিয়েছেন তার তুলনা সত্যিই মেলে না। তাঁকে মানিয়েছিলও অপূর্ব: চলনে-বলনে এমন নিবিড় করে চরিত্রের অন্তরে মিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। তারপরেই নাম করতে হয় 'জারিনা' বেশী কল্যাণী ভট্টাচার্যের। তাঁর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা, সংলাপ উচ্চারণের প্রাণ-মত্ততা পালাটির গতিবেগে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অভয় হালদার প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে যুবরাজ ইউসুপফের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর চোখের [illegible] ভোলা যায় না। অনাদি চক্রবর্তীর 'আলেক্সি'ও হয়েছে সংযত ও সহজ। আত্মভোলা, উদাসীন, অকর্মণ্য 'দ্বিতীয় নিকোলাস' চরিত্র চিত্রণে প্রবীণ অভিনেতা রাধারমণ পালের অসাধারণ নট-নৈপুণ্য আবার নতুন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। লেনিনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সব সময়েই জয়ন্তকুমার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন।

অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন অমলা ভট্টাচার্য, সাধন দাশগুপ্ত, রাজকুমার, মুকুল ঘোষ, মদন গোস্বামী, প্রতিমা ভট্টাচার্য, রীতা সেন, বিশ্বনাথ চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় দে, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, হীরালাল গাঙ্গুলী, কালিদাস ঘোষ, মুকুল মালি, সতীশ দাস।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত ও সুরারোপিত গানগুলো পালাটিকে একটি নতুন সৌরভ দিয়েছে। আলোকসম্পাতে যে নাটকীয় কোন কোন মুহূর্তে অসাধারণ শৈল্পিক ব্যঞ্জনা পেতে পারে তা প্রমাণ করেছেন '[illegible]'।

কারানটের '[illegible]' : ম্যাক্সিম গোর্কীর নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার নাট্যানুরাগীদের যে আন্তর পরিচয় আছে, তারই [illegible] কয়েকদিন আগে আবার নতুন করে মঞ্চের আলোয় চিহ্নিত হোল। এবারকার নাটকের নাম 'গুড ম্যান'। 'কারা-নট' গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই নাটকের কাহিনী

রূপকথা প্রযোজিত
বেন জনসনের
ভলপোন
বাংলা রূপান্তর/নির্দেশনা : সুনীল সেন
২০ সেপ্টেম্বর
মুক্ত অঙ্গন সন্ধ্যা—৭টায়
হলে টিকিট

রঙ্গনা [illegible] রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার
শনি ৬ রবি ৩॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলবার ॥ ১৪ই [illegible] ৬॥
এ্যাকাডেমী
অব্ ফাইন আর্টসে
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ অ্যাকাডেমীতে টিকিট ১০টা—৫টা ॥

অবলম্বনে লিখিত 'সেই বৃদ্ধ' নাটকটি সেদিন পরিবেশন করলেন যুক্ত প্রয়াস। বাংলা নাট্যরূপান্তর করেছেন ভোলা দত্ত। নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনায় কিছুটা শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতার আভাস ছিল। এ প্রসঙ্গে নাট্যনির্দেশক কালী ঘোষের প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

সুরেন্দ্র ও অনন্ত কারখানার ম্যানেজারের প্ররোচনায় কারখানারই আর একটি শ্রমিককে হত্যা করলো—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শুধু মাত্র অনন্তই পুলিশের হাতে ধরা পড়লো ও বিচারে তার কুড়ি বছরের জেল হোল। আর ইতিমধ্যে সুরেন্দ্র নাম পরিবর্তন করে হোল মহাদেব। সমাজের নানা আঁকাবাঁকা পথ এবং নানা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সে হয়ে উঠলো প্রতিপত্তিশালী এক ধনীলোক। এদিকে অনন্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তার নতুন সঙ্গিনী মল্লিকাকে নিয়ে মহাদেবের কাছে এসে দাঁড়ালো তাকে অভিযুক্ত করতে। তারপর থেকেই ঘটনাস্রোত বিবর্তিত হোল নতুন পথে। সংঘাত হয়ে উঠলো মুখর সুরে দুর্বার। প্রকৃতপক্ষে আসল নাটকের যাত্রা-শুরু এখান থেকেই। বৃদ্ধবেশী অনন্তের আগমন মহাদেবের সংসারে একটা ওলট-পালট এনে দিলো, মীরাকে নিয়ে মোটামুটি ভাবে একটি স্বচ্ছন্দ জীবনে এলো ব্যাঘাত। সেই বৃদ্ধ অনন্ত এসে মহাদেবের সামনে তুলে ধরলো তার অন্যায় আর পাপের কাহিনী। জোর করে সে বললো একই অপরাধের জন্য যখন দুজনেই তারা দায়ী ছিল, তখন একজন তার জন্য শাস্তি পাবে, আর একজন নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাবে —এ কিছুতেই হোতে পারে না। শাস্তি আর একজনকে পেতেই হবে। মহাদেব, মীরা, মেয়ে তনু সবাই এই বৃদ্ধের সংলাপে ও আচরণে ভীত সন্ত্রস্ত হোল। বিশেষ করে অতীত জীবনের সবকিছু পাপের কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার জন্য চরমতম গ্লানিতে ভরে গেলো মহাদেবের মন। নিজের অস্তিত্বের অর্থহীনতার কথা ভেবে শেষপর্যন্ত সে আত্মহত্যা করে গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলো। নাট্যকার মহাদেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হয়তো এই সত্যকেই ভাষা দিতে চেয়েছেন যে পাপ হয়তো লুকিয়ে ফেলা সম্ভব, কিন্তু পাপবোধ আমৃত্যু আমাদের দংশন করে চলবেই।

নাটকটির প্রযোজনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারে যে দুজনের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হোলেন পৃথ্বীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোবিন্দ চক্রবর্তী। এই দুই শিল্পীর 'মহাদেব' ও 'বৃদ্ধ' চরিত্রের রূপায়ণ সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনার দুটি বিশিষ্ট সম্পদ। 'খগেনের' খল চরিত্রটি নির্দেশক কালী ঘোষের অভিনয়ে সুন্দরভাবে রূপলাভ করেছে। 'মল্লিকা' চরিত্রে মমতা যে না-বলা কথাকেও চোখের তারায় তারায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়, (যাদব), মানব বোস (পরেশ), সত্যব্রত চক্রবর্তী (রামু), পিন্টু রায় (দারোয়ান), নিমাই বর্মণ (মিস্ত্রী), চন্দ্রশ্রী রায়চৌধুরী (মীরা), শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় (তনু)।

সংগীত-নির্দেশনা ও আলোকসম্পাতে দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল দাস স্বচ্ছ শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

প্রণব স্মৃতিসংঘের দুটি নাটক : দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম সমাজসেবী গোষ্ঠী প্রণব স্মৃতি সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দুটি নাটক পরিবেশিত হোল অশু হলে। নাটক দুটির নাম হোল 'ওরা কাজ করে' ও 'সুতরাং'। দুটি নাটকের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে এই সংঘের শিল্পীরা প্রায় সব নাট্যরসিকদেরই মুগ্ধ করেছেন।

'ওরা কাজ করে' নাটকটির সংঘাতকে নাট্যকার জগমোহন মজুমদার গড়ে তুলেছেন কারখানার শ্রমিক-জীবনকে কেন্দ্র করে। বীরু, বিশু, বিলু, সর্দার ও অন্তো—এই পাঁচজনের জীবনসংগ্রাম নিয়েই এই নাটক। অসাধারণ বলিষ্ঠ এই নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন প্রভাস দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থকভাবে রূপ দেন প্রভাস দত্ত (বীরু), গোপাল ব্যানার্জী (বিশু), মানস রাহা (বিলু), অসিত হালদার (সর্দার), অজিত ঘোষ (অন্তো)।

বীরু মুখার্জীর 'সুতরাং' একটি ব্যঙ্গ নাটিকা। অবশ্য কোন ব্যক্তি বা দলকে ইঙ্গিত করার কোন উদ্দেশ্য নাট্যকারের নেই। বেবীফুডের চোরাকারবারী ও ভেজাল ওষুধের কারবারী বটকৃষ্ণবাবু সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। স্বভাবতই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন সুযোগ-সন্ধানী অনেকেই। বটকৃষ্ণবাবু আর এঁদের নিয়েই এই ব্যঙ্গ নাটিকা। নাট্যনির্দেশক তড়িৎ চৌধুরীর উপস্থাপনার গুণে নাটকটির পরিবেশনা সার্থক হয়ে ওঠে। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন : তড়িৎ চৌধুরী (বটকৃষ্ণ বটব্যাল), সুবীর গাঙ্গুলী (মিঃ দাস), ইন্দ্রজিৎ দাস (পতিতপাবন), প্রভাস দত্ত (মদনমোহন), অজিত ঘোষ (সরকার), সুনীল মণ্ডল, গোপাল ব্যানার্জি, সুনীল পাল।

নাট্যানুষ্ঠানের আগে 'সংঘনাদ' পরিচালিত 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গীতিআলেখ্যে অংশ নেন মানস ভট্টাচার্য, গৌর গঙ্গোপাধ্যায় দেবদাস ভট্টাচার্য, অস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি মুখোপাধ্যায়, কলি মুখোপাধ্যায়, অসীমা মুখোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায় দীপক সেনগুপ্ত, সুনীল মজুমদার।

ইয়ং স্টার গোষ্ঠীর 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও 'সত্যান্বেষী' : ইয়ং স্টার গোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার নাশনাল হাই-স্কুল হলে তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও তপন রায়ের 'সত্যান্বেষী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। দুটি নাটকের পরিচালনায় যথার্থ সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রাখতে পেরেছেন অমর বোস।

প্রথম নাটকটিতে নির্দেশক অমর বোসের 'ভবদুলাল' চরিত্রে অভিনয় স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হোতে পেরেছে। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন দেবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন মুখার্জি, দুর্গাচরণ মুখার্জি, প্রবীর ঘোষ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠা 'সত্যান্বেষী' নাটকে 'ব্যোমকেশ' চরিত্রে দেবাশীষ রায়চৌধুরী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। 'অজিত' চরিত্রে সাত্যকী রক্ষিত সুন্দর মানিয়েছিল, তার চরিত্রচিত্রণ হয়েছিল খুব সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অনুপ রায়, মৃন্ময় চক্রবর্তী, পল্টু ঘোষ, অনুপ রায়চৌধুরী।

নীল পাখার কাহিনী : কদিন আগে ইন্দ্রজিৎ-এর প্রযোজনায় এ-বি-টি-এ হলে নাটকাভিনয় ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের এক আসর বসেছিল। অনুষ্ঠান শুরু 'অরুণের মত' 'বাংলাদেশ' বিষয়ক গানের মালা দিয়ে। পরিচালনা দেবনাথ চক্রবর্তীর, অংশ নিলেন আই-পি-সি-এ সভাবৃন্দ। এর পরেই হল গান নাচ আর আবৃত্তি। অংশগ্রহণ করলেন দীপক মৈত্র, সুশীল বড়াল, দীপালি সেনগুপ্ত, স্বপ্না মজুমদার ও ছোট্ট মেয়ে সীমা। সবশেষে হল সেদিন সন্ধ্যার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 'নীল পাখার কাহিনীর' মঞ্চাভিনয়। পরিচালনা করলেন ইন্দ্রজিৎ, সঙ্গীত সংযোজনার ভার নিলেন রাজেশ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করলেন : অনু চট্টোপাধ্যায়, ইভা সরকার, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, অকতোষ চক্রবর্তী ও উমা দাশগুপ্ত। নির্মম নিয়তির হাতে তিন পুতুল : নীলাক্ষী, বিপাশা এবং অমলা—এই প্রথমী

নাট্য-ষান্মাসিক ॥ ৩৬শ সংকলন

বহুরূপী

প্রকাশিত হয়েছে

॥ সূচীপত্র ॥

নাটক : নতুন কবিরের পালা/নজেন্দু সেন। মুক্তো/শকুন্তলা দেবী। সময় সেলফিশ জিবালার/বাদল বর্মণ। অমর/সুনীল চৌধুরী। একটি কাপুরুষের কাহিনী/চিত্তরঞ্জন ঘোষ। হে সময়, উত্তাল সময়/অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ : গণনাট্য/শম্ভু মিত্র। রাজা অয়দিপাউস/অমলেন্দু বসু। রাজা অয়দিপাউস সম্পর্কে/চিত্তরঞ্জন ঘোষ। হেগেলে ছায়ীগোল সম্পর্কে/বেটোল্ট ব্রেশট। ব্রেশটের সঙ্গে পরিচয়ের/আনন্দ/অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে কিশোর ও রবীন্দ্রনাথ/সুধীর রায়চৌধুরী। দুটি সাম্প্রতিক নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে/হারাভূষণ মুখোপাধ্যায়। ডেনমার্কের সেই কাপাটে মুবরাজ/কুমার রায়। প্রযোজনা সভু সেন-প্রসঙ্গ/অমিতাভ দাশগুপ্ত। পালা বাবস অমল ঠাকুর/শঙ্খ ঘোষ।

॥ প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় ॥

দাম চার টাকা

পরিবেশক : পত্রিকা সিন্ডিকেট ও মনীষা

॥ বহুরূপী ॥

১১-এ, নাসিরুদ্দিন রোড, কলকাতা-১৭

বিসর্জিত কন্যা জাহ্নবী বন্দ্যো/মধুছন্দা। পরিচালনা : হীরেন নাগ। ফটো : অমৃত

কৌশিকের টেমপোরেশনে গড়ে উঠেছে 'কাঁদা হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা' এই নাটকটির কাহিনী। সামগ্রিক অভিনয়ে বিশ্বনাথ মঞ্চের ওপর সার্থক ভাবে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরে ছিলেন। দুটি নাটকই উমা দাশগুপ্তের লেখা। মঞ্চসজ্জা প্রদর্শনে ও অভিনয়ে কুমারী দাশগুপ্তের কোন দুর্বলতা যাচ্ছে প্রথম রচনা হলেও নাটক রচনাতেও কোনো দক্ষতার ছাপ তিনি রাখতে পেরেছেন। সব দিক থেকে সৌমেনের সঙ্গীত আসরটি উপভোগ্যতার দিক দিয়ে ছিল মনে রাখবার মতো।

সত্য মারা গেছে : গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি সম্প্রতি বিশ্বরূপায়

যাত্রিক : মুক্তঅংগনে

১৪ই সেপ্টেম্বর ৬-৩০

জ্যোতিন্দ্র ভট্টাচার্যের

ঠিক বৃষ্টির আগে

নির্দেশনা/প্রশান্ত চ্যাটার্জী

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

অমর শহীদ গদাই

(হাসির প্রহসন)

নির্দেশনা/নিখিল ভট্টাচার্য

(হল টিকিট)

অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন সি-এল-এম-বি রিক্রিয়েশন ক্লাব। সামগ্রিক অভিনয়-মান বেশ উন্নত ধরনেরই হয়েছিল। তবুও জানকীনাথ পাল (কাবলা), সুকুমার বসু (মিঃ জি. দে, মিটার), অলকা গাঙ্গুলী (ডলি)র অভিনয় সত্যি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

বিবিধ সংবাদ

বাংলা নাটকের উৎসাহী দলগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গে বে-সরকারী উদ্যোগে একটি আদর্শ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সংকল্প নিয়ে বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকার প্রভৃতি সম্প্রদায় যৌথভাবে যে-সকল মঞ্চাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় বছর-দুয়েক ধরে, তা খুব শিগ্‌গির ফলপ্রসূ হতে চলেছে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব আরম্ভ হবার প্রাক্কালেই। শোনা যাচ্ছে, এঁরা বিভিন্ন নাট্যাভিনয় থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে অতি সত্বরই একটি উপযুক্ত জমি খরিদ করছেন এবং যে-দিন থেকে শতবর্ষ উৎসবের শুরু, ১৯৭১-এর সেই ৭ ডিসেম্বর তারিখেই সেই জমির ওপর নিবেদনকে একটি অস্থায়ী মঞ্চ খাড়া করে তার ওপর অভিনয় শুরু করবার আশা রাখেন। আমরা কামনা করি, ওঁদের এই অতি শুভ প্রয়াস ফলবতী হোক।

বিস্ফোরণ : বিশ্বরূপায় গত ১৬ আগস্ট এপিক থিয়েটার গ্রুপ তাঁদের নব-প্রয়াস 'বিস্ফোরণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের চরিত্র সমাবেশ ও সংলাপে নাট্যকার অজিত নন্দীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেল। নাটকের বিষয়বস্তু মোটামুটি ভাল ও কালোপযোগী হলেও কিছু কিছু পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে স্থানে স্থানে দীর্ঘ-কালব্যাপী ও দীর্ঘ সংলাপের পুনরাবৃত্তি একঘেয়ে ও বিরক্তিকরই লাগে। পরিচালক রমেন চৌধুরী এই যুগোপযোগী নাটকটি খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে উপস্থাপনা করেন। নাটকের চরিত্রসমষ্টির মধ্যে অভিনয়ের দিক থেকে বিচারে জগদীশের ভূমিকায় রমেন বসু সূচনা থেকেই তাঁর অভিনয়-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন। চালচলনে, সংলাপ প্রক্ষেপণে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশে তাঁর স্বকীয়তা দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর পরে নিবারণ, নেতা পণ্ডিত ও রোহিতের ভূমিকায় যথাক্রমে কালীশংকর ব্যানার্জি, তারাপদ দাস, নরেন্দ্রের চ্যাটার্জি, দিলীপ ঘোষের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। ভক্তের চরিত্রে সুখেন্দু মুখার্জি কিছুটা ম্লান। প্রবীরদেবী কমল মিত্র ও ইন্দ্রাণীর ভূমিকায় বেবী দে কিন্তু অভিনয়ে নাট্যামোদীদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

ছাত্র-যুব শরণার্থী ও দুঃস্থ ত্রাণ কমিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১২ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল নটায় প্রাচী সিনেমায় ছাত্র-যুব শরণার্থী ও দুঃস্থ

প্রেম ও অপ্রেম/স্বপন রায় ও মাধবী মুখার্জি। পরিচালনা : নির্মল ভৌমিক। ফটো : অমৃত

ত্রাণ কমিটি তাঁদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। উদ্বোধন করবেন কলকাতার মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং 'যুগান্তর'-বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কবি সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরী স্বদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবেন। সভাশেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 'মেড নাতীয়' চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

লুচিনো ভিস্কোন্তি সম্মানিত

ইটালীয় বৈদেশিক সংবাদপত্র সংস্থা (ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন) ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রযোজিত 'ডেথ ইন ভেনিস' ছবিটির পরিচালনা-নৈপুণ্যের জন্যে লুচিনো ভিস্কোন্তিকে বার্ষিক 'গোল্ডেন প্লোব অ্যাওয়ার্ড' দ্বারা সম্মানিত করেন। টমাস মান লিখিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে ডার্ক বোগার্ড ও সিলভানা ম্যাঙ্গানো। ছবিটি বছরের শেষের দিকে কলকাতায় মুক্তি পাবে বলে শোনা যাচ্ছে।

'বিলি জ্যাক' ছবি পুরস্কৃত

১৭তম বার্ষিক ফেস্টিভ্যাল অব দি নেশন্স ফিল্ম কম্পিটিশন উৎসবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স নির্মিত 'বিলি জ্যাক' ছবিটি 'গোল্ডেন কার্মিড' (শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার) লাভ করেছে।

বিসমিল্লা খান

প্রভাতী আসরে মিঞা বিসমিল্লা খান

নবরং সঙ্গীত সংস্থার পক্ষ হতে মিঞা বিসমিল্লা খাঁর একক সানাই-বাদনের একটি প্রভাতী আসর এক স্মরণযোগ্য অনুষ্ঠান।

'মিঞা কি টোরি' দিয়ে রাগলক্ষ্মীর আবাহন, বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের পুঞ্জীভূত বেদনাকে আভাসিত করা অতি কোমল গান্ধারের আবেদনের কি অপরূপ বিকাশে তার সুর রসের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল তা দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ ঐশ্বর্য। তাই প্রথম থেকে শেষ অবধি উনি যাকে বলে হাই টোন অব সিরিয়াসনেস অনেক কিছুর অভাবই পূর্ণ করে দিয়েছিলো। টোড়ির সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখে সুরু হোলো মিশ্র-ভৈরবীর ধুন। জমাট-বাঁধা বেদনার স্বচ্ছ মুক্তি ঘটল—হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত দুরন্ত সাপট-তানে। কখনও মাপাগম্ভীর মন্থরচারী ঝমঝমায় কখনও গৎ-এর-ধাঁচের সরস ভঙ্গিমাতে খেয়ালের তান। ঠুংরীর বোলের নিবিড় আনন্দ কি মধুর উন্মাদনার রসিক চিত্ত দুলিয়ে দেয়। হয়ত মাঝে মাঝে বয়সের ভারে একটানা বাজনায় ছেদ পড়ে দমের অভাবে। তবু এমন সানাই-বাদক আর হোলো না। এই দুরূহ-তম যন্ত্রে তন্ত্রকারী ও গায়কী অঙ্গের এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মিলন এর আগের কোনো সানাই-শিল্পীর বাজনায় দেখা যায় নি। পরেও অচিরাৎ দেখা যাবে সে আশা কম।

দ্বিতীয়ার্ধে জৌনপুরীতে মাপধ-মপ-র পরই অফ্‌ডট শ্রুতিতে মধ্যম ছুঁয়েই কোমল গান্ধারের নিষ্পলক স্থায়িত্বের রেশ, স্বর-লালিত্য ও ধ্বনিমাধুর্যের আবেশ কোনো-দিন ভোলার নয়। কারণ এ আবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরই মত 'কোটিতে গোটিক শিল্পী'—যাঁর ধ্যান ও ধারণা এক সুরে সঙ্গীতলক্ষ্মীর চরণে অর্ঘ্যের মতই নিবেদিত হয়েছে।

সর্বশেষে ভৈরবী, ধুন, চৈতী সব মেলানো এক মধুর অনুভূতি। সারংকে আশ্রয় করে নানা রসে, রং-এর কারুকার্য

শিল্পী যেন চিত্রকর হয়ে যেন্ন ধরেছিলেন। এমন এক ছবি যার সুকিঞ্চিত পারম্পর প্রভাতের আলো থেকে সুরু করে মধ্যাহ্নের দাহ, গোধূলির বৈরাগ্য ও রাত্রির অন্ধকারের রহস্য লোনায়িত। অসাধারণ দক্ষতা, গভীর বোধ, কল্পনার মধুময় সমন্বয়ে প্রকাশ-ভঙ্গীতে যে নবম ফুটে উঠেছিল তার মুগ্ধকারিতা অবর্ণনীয়। সেদিন যেন নতুন করে অনুভব করলাম শিল্পী বিধাতার সনদ নিয়েই আসেন। তাঁকে তৈরী করা যায় না।

ওস্তাদের সঙ্গে তবলাসঙ্গতে তাঁর তরুণ পুত্র আভিম খাঁর দক্ষতায় প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ আনন্দদায়ক।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের একক সঙ্গীতের আসরে

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত একক শিল্পীর একাধিক আসর শোনবার সুযোগ হয়েছে—সাধারণ মঞ্চে এ ধারার প্রবর্তক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক সঙ্গীতের আসরে প্রথম শুনলাম ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ভট্টাচার্যকে, এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা রূপান সঙ্গীতগোষ্ঠী।

এ ধরনের আসরে ভাবনা কল্পনার আকাশে আপনাকে সার্বাঙ্গিকভাবে মেলে ধরবার প্রশস্ত অবকাশ আছে বলেই শ্রোতা ও শিল্পীর হৃদয়ের মেল-বন্ধন হতে দেরী হয় না। অবশ্যই শিল্পী বলতে এখানে ধনঞ্জয়বাবুর মত ধ্যানী ও ভাবুক শিল্পীর কথাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তীর্থপরিক্রমার মতই দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, সুবল দাসগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্ত-

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

গুপ্ত, অনুপম ঘটক, সুধীরলাল, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ভট্টাচার্য তথা বিগত যুগের প্রতিভাধর সুরকারদের গানের পথ বেয়ে সুরের ধারায় যতি পড়ল এখনকার যুগের নচিকেতা ঘোষ ও সুধীন দাশগুপ্তে। গীতিকারদের মধ্যে প্রথমেই ছিল পথচলদাসের উত্তরসূরী প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য, মোহিনী ঘোষ ও বর্তমানের শ্যামল গুপ্ত, গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার। তেইশটি গানের দীর্ঘ দু ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে শিল্পীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠ শক্তির দীপ্তিতে বাংলা গানের এক আশ্চর্য রূপলোকই শুধু খুলে যায় নি। যেসব সুরস্রষ্টা ও বর্ষীয়ান শিল্পীর সার্থক সাঙ্গীতিক জীবনকে দিনে দিনে, তিলে-তিলে গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রতি ঋণ-স্বীকারের শ্রদ্ধানিবেদন সুন্দর-

তাকে পালিত হোলো শুধু তাঁর নয়। আমাদেরও। এইখানেই এ ধরনের আসরের সার্থকতা।

এবার নীরব করে দাও হে'-তে শিল্পীচিত্তের ব্যাকুল মিনতির আর্ত রাগিণী শ্রোতাদের মনে বেজে উঠতে দেরী হয় নি। এরপর 'তোমাকে ভালবেসেছিতে নববধূ-কান্নাভরার ছোঁয়ায় উপাত্ত অস্তুকে সুখ বেদনায় স্তব্ধতায় নন্দী করার পরিশ্রম শিল্পকুশলতার মুগ্ধতার সঙ্গে জেগেছিল বিস্ময়। কেউ ভোলে নাতো যখন পৌঁছালেন তখন শ্রোতার সঙ্গে শিল্পী-চিত্তের সংলাপ জমে উঠেছে নিবিড় মধুর ছন্দে। 'রাখে ভুল করে তুই'—যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এক লহমায় অতীতের গৌরব-ময় অধ্যায়কে মেলে ধরেছিল। তারপরই 'মোর জীবনের দুটি রাতি', 'বিদায় দিতে যে পারিব না', 'তোমার চরণ চিহ্ন ধরেছে আবেগের নাকিয়ো, ভাবের সঙ্গে সুরের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে কণ্ঠের মিতালী সুরের বাদুড়ে স্বরোচ্চারোধী ভাবাবেগের সমন্বয় যেন সাতরঙা রামধনুর বর্ণসুষমা সৃষ্টি করেছে। কখনও ভাবের রাজ্যে শিল্পী আত্মসমাহিত, কখনও ছন্দের দোলায় (কে তৌরঙ্গাত এই দুনিয়ায়) কৌতুক চঞ্চল। 'বিদায় দিতে যে পারিব না'র হাসির আড়ালে নীড়ের কি আকুল বেদনা। আবার 'তুমি যে কাঁদাও তাই ত হয় প্রিয় কাঁদি'র বৈবর্তীর সকল কারুণ্যের সম্মুখ পূর্ণতা যেন সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। 'রাখে ভুল করে তুই' নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর অনন্যসাধারণ কণ্ঠসম্পদকে যা অনায়াসে স্বচ্ছন্দে মন্দ্রসপ্তক থেকে তার-সপ্তকের শেষ পর্দায় অচঞ্চল স্থৈর্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে কোন রকম হেঁচকা-টানের চমক না লাগিয়ে।

কিন্তু শিল্পীসৃষ্ট সুরের এমন বর্ণ-বৈচিত্র্য যেন স্তিমিতদ্যুতি হয়ে পড়ল শেষের চারটি গানে। ধনঞ্জয়বাবুরই গাওয়া সলিল চৌধুরীর সুন্দর গানের অভাব ত ছিল না। 'ঝির ঝির ঝির বরষায়', 'আমায় তুমি ভুলতে পার', 'আমার ডাকে আজি', 'কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী', 'আমি চেয়েছি তোমায়' 'কবির খেয়ালে' গানগুলি আজও শ্রোতাদের অন্তঃপ্রান্তরে উজ্জ্বলিত। এ গানগুলি প্রথমের উত্তমান গানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারত।

তবে সকল বিতর্ক ও সমালোচনার কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভক্তিমূলক সাতখানি গানের সোপান বেয়ে শিল্পী পৌঁছে গেলেন নিস্তব্ধ অনুভূতির রাজ্যে। যখন বহিরঙ্গ আনন্দ শিল্পীর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে আসে তখনই আসে সেই বৈরাগ্য যে বৈরাগ্য আমাদের গুরুর মতই পথ দেখায়। অস্তিত্বকে চেনার অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মীলিত করে। সৌন্দর্য বিকাশের অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হলেও এই রকম লগ্নেই প্রাণের পরম প্রিয়-তমকে খুঁজে বলা যায় 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' ভাবসঙ্গীতে আবেশ জাগে। কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে না এই জন্য যে, সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, সহৃদয় শ্রোতার সাড়া তার চাই-ই। কিন্তু ভজন বা আরাধনার গানে গুণী রূপান্তরিত হন ভাবলোকে। সেদিন গানের শেষে দু হাতে মুখ-ঢাকা ধনঞ্জয়-বাবুর ভক্তিবিহ্বল আত্মহারা রূপ দেখে এই কথাই মনে হয়েছিল।

শিল্পীর সঙ্গে সার্থক তবলাসঙ্গতে ছিলেন রাধাকান্ত নন্দী। শ্রীনন্দীর সরস সুন্দর সঙ্গতে শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

রাধাকান্তবাবু গতানুগতিক তবলা-বাদক নন। উঁচুদরের শিল্পীমন আছে বলেই শিল্পীর গানের ছন্দই শুধু নয়, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমন্বয় করতে জানেন। সেদিন তবলা ও পাখোয়াজে দাদরা, কাহারবা, তিতাল, চৌতালের বিভিন্ন মাত্রার তাঁর দাপটই কখনও মৃদুধ্বনিতে কখনও ক্ষিপ্র-তালে যে উপভোগ্য মাধুর্য রচনা করেছে তার তুলনা বিরল।

হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী সঙ্গত বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আপনাকে জানান না দিয়েও অনুষ্ঠান সার্থকতার মস্ত সহায়ক শ্রীবিশ্বাস। নির্মল বিশ্বাস ও কুমুদ ঘোষের অবদানও সুরসংহতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ছিল।

নৃত্যনাট্যের সাগরিকা

সাগরিকা রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল। জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণকালে সেখানের জীবনযাত্রায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রভাব কবিকে বিহ্বল করে। অতীত সভ্যতার দীপ্যমান কোন ভারতসন্তান আপন ঐশ্বর্যকে বহন করে নিয়ে সমুদ্রস্নাত এই দ্বীপটিকে সজ্জিত করেছেন। এই ভাবকল্পনাশ্রিত 'সাগরিকা'র এক পরিচ্ছন্ন নৃত্যনাট্য-রূপ সুর-সম্মেলনের পক্ষ হতে রবীন্দ্রসদনে নিবেদন করেন বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসিত চট্টোপাধ্যায় পরিকল্পিত নৃত্য-রূপকে উল্লেখযোগ্য দক্ষতায় মেলে ধরেন নামভূমিকায় অবতীর্ণা পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়েও আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। নায়ক নরেশকুমারের নৃত্য-কুশলতা অনস্বীকার্য। অভাব ছিল চরিত্রোপযোগী ভাবের। সমবেত নৃত্যে ভারতনাট্যমের বোল ও নৃত্যে ভারতের এবং বালিদ্বীপের লোকনৃত্যের মাধ্যমে দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার পার্থক্য মেলে ধরার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আবহসঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত নির্বাচনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন ভাস্কর মিত্র। পার্থ ঘোষের আবৃত্তিও সুন্দর। সকলের বড় আকর্ষণ ছিল দেবব্রত বিশ্বাস ও কণিকার গান এবং তাঁরা শ্রোতাদের আশা পূর্ণই করেছেন।

পূজায় এবার এঁদের কণ্ঠে শোনা যাবে নতুন গান।

রাজকুমার বিশ্বাস (রাজু)

ললিতা ধরচৌধুরী

নির্মলা মিশ্র

ব্রিটেনের ব্রায়েন স্ট্রেঞ্জ (বয়স ১৭) আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। তিনি মোট ৫৫২ কিলো ওজন তুলেছিলেন।

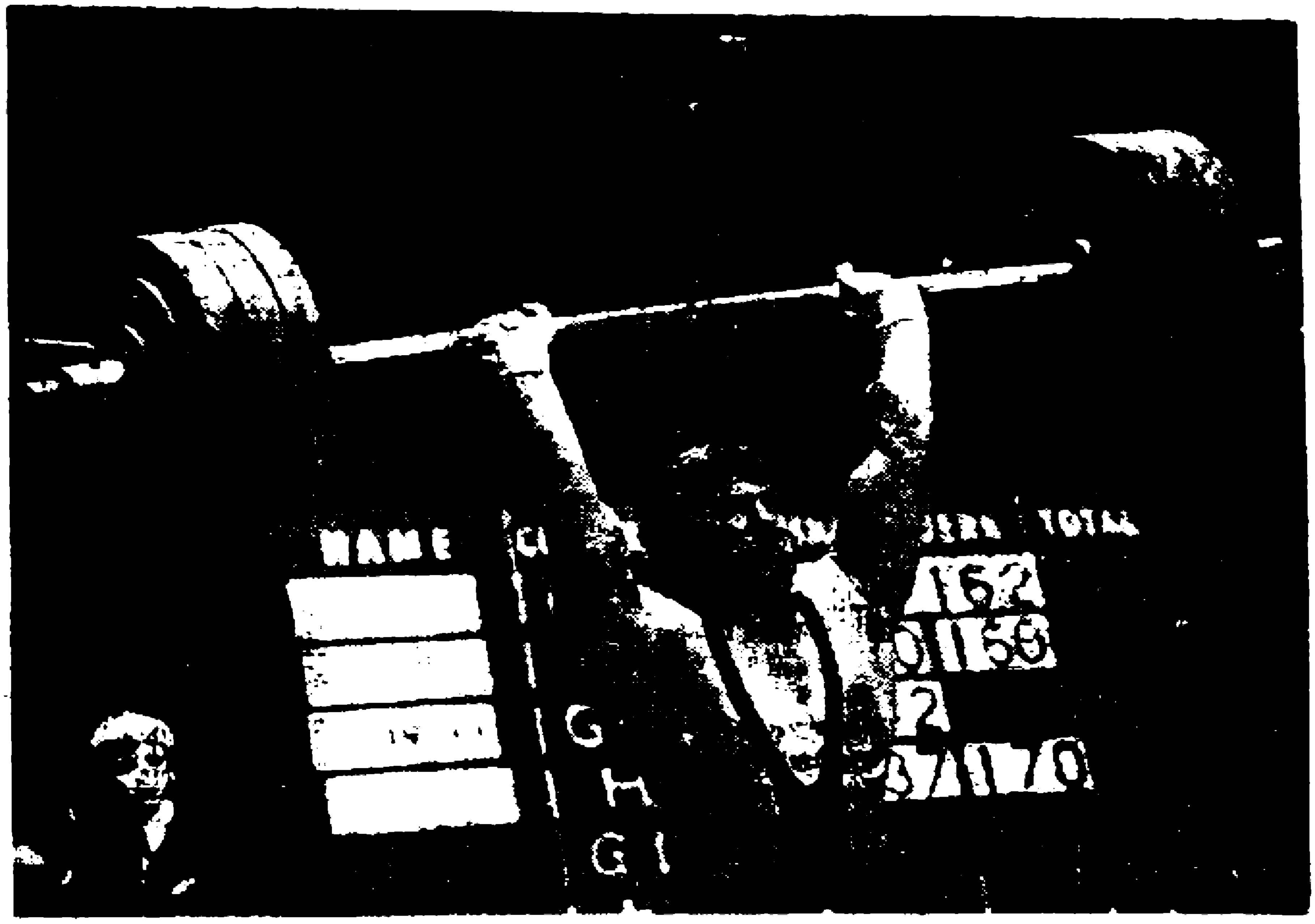

এম সি সি'র ভারত সফর বাতিল

বৃটিশ ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালের শীতকালে এম সি সির ভারত, পাকিস্থান এবং সিংহল সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না। ভারতে শরণার্থী সমস্যা এবং পাকিস্থানের রাজনৈতিক টালমাটালের দোহাই দিয়ে এম সি সি প্রথমে যে সফর বাতিল করেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শুধু ভারত সফরের জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের কাছে সে অনুরোধের কোন মর্যাদা রইল না। নানা অজুহাত দেখিয়ে বিলেতী কর্তারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ১৯৬৬ সালেই স্থির হয়েছিল এম-সি সি ভারত, পাকিস্থান এবং সিংহল—এই তিন দেশে যুক্ত সফর করবে। সুতরাং পাকিস্থান এবং সিংহল সফর বাদ দিয়ে শুধু ভারত সফরে গেলে তাঁদের পক্ষে কথার খেলাপ করা হবে। এই সফর বাতিলের পক্ষে কাউন্সিলের আর একটা যুক্তি—একনাগাড়ে ক্রিকেট খেলার ধকল খেলোয়াড়দের দেহ ও মনে সহ্য হচ্ছে না। কাউন্সিলের এই সব যুক্তির কোনটাই সমর্থনযোগ্য নয়। একনাগাড়ে খেলার ধকল সম্বন্ধে সফর তালিকা তৈরীর আগে কি চিন্তা করা হয়নি? কর্তাদের এই কি দূরদর্শিতার পরিচয়? তাছাড়া বর্তমানে যাঁরা ইংল্যান্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলছেন তাঁদের ছাড়া সারা ইংল্যান্ডে কি বিদেশ সফরে পাঠাবার মত আর খেলোয়াড় নেই? এমনই ইংলণ্ডের দৈন্য অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বলেছেন, রাজনৈতিক কারণেই এম সি সির ভারত সফর বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের কাছে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের ফলে ইংল্যান্ডের মনোবল আজ ভেঙে গেছে। বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে একটানা রাবার জয়ী হয়ে ইংল্যান্ড যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল ভারতবর্ষের কাছে তাদের পরাজয় একটা চরম ধাক্কা। এই ধাক্কার অব্যবহিত পর যদি ভারত সফরে আর একটা ধাক্কা আসে, তাহলে স্বদেশে ফিরে এম সি সির খেলোয়াড়দের পক্ষে লোকের সামনে মুখ দেখানো ভার হবে। অতএব সফর বাতিলই এখন একমাত্র মুখরক্ষার পথ।

খেলাধুলা

দর্শক

এশিয়ান মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

তেহরানে আয়োজিত এশিয়ান মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে ইরাণ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪)। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তৃতীয় স্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ফ্লাইওয়েট বিভাগে চন্দ্র নারায়ণ এবং লাইট হেভীওয়েট বিভাগে মহতাব সিং। লাইটওয়েট বিভাগে ভারতবর্ষের এম বেন্দু রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ইরাণ	৩	২	৪
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	০	০
ভারতবর্ষ	২	১	১
থাইল্যান্ড	১	২	৪
মঙ্গোলিয়া	১	২	২
ইন্দোনেশিয়া	১	০	২
ফিলিপাইন	০	২	১
পাকিস্থান	০	১	১
জাপান	০	০	১
ইসরাইল	০	০	০

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

অকটোবর মাসের ১৩ই তারিখে স্পেনের বার্সেলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১০টি দেশ সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে: তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলকে নিয়ে নকআউট প্রথায় খেলা হবে। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ব্রোঞ্জপদক বিজয়ী ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে এবং 'বি' গ্রুপে খেলবে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী পাকিস্থান এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া।

যোগদানকারী দেশ

'এ' গ্রুপ : ভারতবর্ষ, পশ্চিম জার্মানী, কেনিয়া, ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা।

'বি' গ্রুপ : পাকিস্থান, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, হল্যান্ড এবং স্পেন।

ভারতবর্ষের খেলার তালিকা

১৫ অক্টোবর : ভারত বনাম ফ্রান্স
১৬ " : ভারত বনাম আর্জেন্টিনা
১৭ " : ভারত বনাম কেনিয়া
১৯ " : ভারত বনাম পঃ জার্মানী

পেস্তা সুকান ফুটবল প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত পেস্তা সুকান ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ফাইনাল খেলায় কোন গোল হয়নি।

ন্যাশনাল ক্রস কান্ট্রি রেস

হায়দরাবাদে ন্যাশনাল ক্রস কান্ট্রি রেস মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্ভিসেস দলের বজরং রাম গত বছরের মত এ বছরও পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেস দল।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত অনুষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস, ২য় পুলিশ এবং ৩য় ভারতীয় রেল;

মহিলা বিভাগ : ১ম রেলওয়ে এবং ২য় দিল্লী।

জুনিয়র বালক বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা এবং ২য় অন্ধ্রপ্রদেশ;

সিনিয়র বালক বিভাগ : ১ম মহীশূর, ২য় দিল্লী এবং ৩য় অন্ধ্রপ্রদেশ;

বালিকা বিভাগ : ১ম অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ২য় পশ্চিম বাংলা।

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

পুরুষ বিভাগ : চ্যাম্পিয়ান—বজরং রাম (সার্ভিসেস), সিনিয়র বালক বিভাগ : দিলীপ সিং (দিল্লী), মহিলা বিভাগ : উমা দাস (বাংলা), বালিকা বিভাগ : ফাতিমা জ্যাকব (অন্ধ্রপ্রদেশ), জুনিয়র বালক বিভাগ : হরমিন্দর সিং (দিল্লী)।

এখানে উল্লেখ্য পশ্চিম বাংলার শ্রীমতী উমা দাস গত বছরও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট দল পরবর্তী তিনটি কাউন্টি ক্রিকেট দলের সঙ্গে খেলা শুরু করেছে।

ভারতীয় দল বনাম সাসেক্স

প্রথম দিনেই ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস ২২০ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে সাসেক্স ২১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে সাসেক্স তাদের ৩৮৬ রানের মাথায় (১ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে মাইক বুস এবং জিওফ গ্রিনীজ ১১১ রান তুলেছিলেন। ১৬৬ রানের পিছনে পড়ে ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ২য় ইনিংসের খেলায় ২০ রান তুলেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দলের ২৭৬ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। চা-পানের সময় ভারতীয় দলের রান ছিল ১১৯ (৬ উইকেটে)। খেলা ড্র রাখতে ভারতীয় দলকে খুবই লড়তে হয়েছিল। ভারতীয় অফস্পিনার উদয় যোশী সাসেক্স দলের পক্ষে খেলে ১০৭ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ২২০ রান (সোলকার ২০ রান। স্নো ৭৮ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২৭৬ রান (৭ উইকেটে। জয়ন্তীলাল ৫৭ এবং গোবিন্দরাজ ৬০ নটআউট। উদয় যোশী ১০৭ রানে ৫ উইকেট)।

সাসেক্স : ৩৮৬ রান (১ উইকেটে ডিঃ। বুস ১৪০ এবং গ্রীনিজ ৬২ রান। প্রসন্ন ১৩৭ রানে ৫ এবং বেদী ১০৫ রানে ০ উইকেট)।

ভারতীয় দল বনাম সমারসেট

প্রথম দিনে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩২০ রান তুলেছিল। সোলকার ১১০ রান করে আউট হন এবং আবিদ আলি ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় কার্টরাইট পাঁচটা উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল ১ম ইনিংসের ৩৪১ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। আবিদ আলি ১০২ রান করে নট আউট থাকেন। এই নিয়ে ইংল্যান্ড সফরে দ্বিতীয়বার ভারতীয় দলের এক ইনিংসের খেলায় দুটো সেঞ্চুরী হল। খেলার বাকি সময়ে সমারসেট তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ব্রায়ান ক্লোজ ৭০ রানে নট আউট ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার হিড়িক পড়ে যায়। সমারসেট ২২৬ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপরদিকে ভারতীয় দল ১৬২ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সমারসেট দলের জয়লাভের জন্যে ২৮৩ রানের প্রয়োজন ছিল। ঘন্টায় ৮০ রান তুলে তাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হয়নি। তাদের ১২৭ রানের মাথায় (২ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ৩৪১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোলকার ১১০ এবং আবিদ আলি ১০২ নট আউট। কার্টরাইট ৭১ রানে ৫টা উইকেট)।

ও ১৬২ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ৫৪ রান)

সমারসেট : ২২৬ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ক্লোজ ১০০ নট আউট)

ও ১২৭ রান (২ উইকেটে)

ভারতীয় দল বনাম উস্টারশায়ার

প্রথম দিনে ভারতীয় দল দুটো উইকেট খুইয়ে ৩৩৩ রান তুলেছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ৩২৭ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৮৩ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) ভারতীয় দল ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন উস্টারশায়ার দলের ১ম ইনিংস ২৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় দল ১৫০ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে উস্টারশায়ার দলের যেখানে ২৮৬ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তাদের ২৫০ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলা শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ৩৮৩ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাস্কার ১৯৪ এবং ওয়াদেকার ১৫০ রান)।

ও ১৫০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিশ্বনাথ ৫৩ রান। উইলকিনসন ৪৮ রানে ৩ এবং গ্রিফিথ ৫৮ রানে তিন উইকেট)

উস্টারশায়ার : ২৪৮ রান (জন পার্কার ৯১ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৬০ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৫০ রান (৫ উইকেটে। ওরমরড ৭৬ রান এবং ইয়ার্ডলি নট আউট ১০৪ রান।)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

যখন যেমন
তখন তেমন
আপনার পছন্দমতো বাটার দোকানটিতে একবার এসে দেখুন, উৎসবের জন্য সদ্য-আনা রকমারি জুতোর যেন মেলা বসে গেছে। রঙে-নকশায় সর্বাধুনিক। ফ্যাশনের জগতে যা আগামী কালের, সেখানে তা আগেভাগে আজকেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। পাবেন এমন জুতো যা একাধারে আটপৌরে আর পোশাকী—যেমন সব মেজাজে তেমনি উৎসবের সকল সাজেও নির্বিধায় পরা যাবে। আর সেই সঙ্গে বাটার জুতোর সেই উপভোগ্য আরাম তো আছেই।
লিলিপুট ৮৩
৮.৯৫
ওয়েফাই-ভার্স ৭০
১৭·৯৫—২২·৯৫
ইভা ৬৯
১০.৯৫—১৭.৯৫
ফ্যানফেয়ার ৩১
১৭.৯৫
কুমকুম ৩৩
১৪.৯৫
সিতারা ৬৭
১২.৯৫
Bata

এবারের সর্বশ্রেষ্ঠ শরৎঅর্ঘ

শারদীয়

গল্প-ভারতী

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

সেরা লেখকের লেখা

পঁচিশটি গল্প

ও

পাঁচটি উপন্যাস

যা পূর্বে কোথাও কখনও সম্ভব হয়নি।

এবং এ ছাড়া এক অপূর্ব সুন্দর

সচিত্র সংযোজন ঃ

আমাদের বঙ্গভূমি

চিরিশজন লেখক-লেখিকার বহুদিনের সমবেত প্রচেষ্টার ফল।

পাঁচশ পৃষ্ঠার এই অদ্বিতীয়

বিচিত্র বিরাট পূজা সংখ্যার দাম মাত্র ছ'টাকা

ডাকমাশুল পাঁচসিকা।

এজেন্টগণ অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে সত্বর অর্ডার দিন।

খুচরা ক্রেতাগণ অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া সত্বর অর্ডার দিন।

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—৬

ফোন ঃ ৫৫-১৩৫৫ — ৫৫-৩২৯৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২০শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 17th September 1971 শুক্রবার, ৩১শে ভাদ্র ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪৮৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৪৮৫	সম্পাদকীয়		
৪৮৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৪৮৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৪৯০	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৪৯১	খোঁজার শেষ	(গল্প)	—শ্রীঅনুরূপা খাস্তগীর
৪৯৫	ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই		—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী
৫০১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫০৪	এমন সবার বাঁচি	(কবিতা)	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
৫০৪	বাইরে থেকে ভেতর থেকে	(কবিতা)	—শ্রীদীপেন রায়
৫০৪	প্রার্থনার তন্ময়তায়	(কবিতা)	—শ্রীরবীন শূর
৫০৫	চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র		—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
৫১১	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৫১৫	বালুচর বুটিদার শাড়ী		—শ্রীমৃণাল গুপ্ত
৫২৫	বাজহাঁস	(গল্প)	—শ্রীমানবেন্দ্র পাল
৫৩১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫৩৩	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৫৩৮	মহাকাশের মানুষ ও নতুন সমস্যা		—শ্রীদিলীপ বসু
৫৪১	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৫৪৩	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৫৪৮	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৪৭	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
৫৫১	চলচ্চিত্রে প্রতীকের ব্যবহার		—শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৫৫৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীলচীন দাস

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ বই। লেখক নিজে একজন চিকিৎসক এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুত্র। তাই রোগ ও রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং এই অভিজ্ঞতাই বইটির উল্লেখযোগ্য উপাদান। তিনি বইটিতে তাঁর পিতার চিকিৎসক-জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে। যে চিকিৎসার ধারা এখানে উল্লিখিত তার নাম মিহিজামের চিকিৎসা ধারা।

অসুখ ও ওষুধ—এই দুটি বিষয়ের উপরেই বইটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি সহজবোধ্য। যাঁরা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে আধুনিক চিকিৎসা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

—যুগান্তর, ২০শে জুন, ১৯৭১

মিহিজামের বৈপ্লবিক ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরেকটি মূল্যবান বই

গাইড বুক

হোমিও চিকিৎসার বহুল প্রচারিত "প্যাকেট বই" হিসাবে সুপরিচিত। বাংলা/ইংরাজী এক সঙ্গে।

মূল্য ২ টাকা [ডাক খরচা আলাদা]

পি ব্যানার্জি
৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬
ফোন ৫৫-৪২২১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দুমাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

হারেম উন্মুক্ত হল :

তুরস্কের প্রাক্তন সুলতানদের বন্ধ হারেম এতদিনে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে উন্মুক্ত হল। দীর্ঘদিন পরে প্রথম যে সার্বভৌম ঐ হারেমের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন, তিনি রাজা নন, রাণী। ইংলন্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তুরস্কে রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন তখন প্রাক্তন সুলতানদের হারেম হবে তাঁর অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয়। ১৪৫৪ সালে তপকোপি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঐ হারেম নির্মিত হয়। তখন থেকে ১৯০৯ সালে তুরস্কে হারেম প্রথা লুপ্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত ঐ হারেমে পুরুষ বলতে শুধু মহাপরাক্রম অটোমান সম্রাটদেরই প্রবেশাধিকার ছিল; আর সেবকরূপে বন্দী অবস্থায় বাস করতো কিছুসংখ্যক একদা-পুরুষ খোজা, যাদের উপস্থিতিতে সম্রাটদের শত শত নারীসম্ভোগের একক সার্বভৌম অধিকার কোনভাবে বিঘ্নিত হত না। ১৯০৯, অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তুরস্ক-সম্রাটদের হারেম ছিল চাঁদের অপর পৃষ্ঠের মতো পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও রহস্যঘেরা এক দুনিয়া। তারপর ঐ বছর যখন অটোমান সুলতান আবদুল হামিদ সালোনিকায় নির্বাসিত হলেন এবং হারেম প্রথার অবসান হল তখন ঐ হারেম থেকে মুক্তি পায় ৩৭০ জন নারী ও ১২৭টি খোজা। ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের নারীরা তাদের মালপত্র নিয়ে যখন ৩১টি গাড়িতে চেপে ঐ বন্দীশালা থেকে মিছিল করে বেরিয়ে আসে তখন তাদের মুখে কোন আবরণ ছিল না। সে শুধু মুক্তির আনন্দ আস্বাদনের জন্যই নয়, দুধারে সমবেত অগণিত কৌতূহলী মানুষের মধ্যে কেউ যদি তাদের চিনতে পেরে আশ্রয় দেয় সে আশাতেও। অবমানিত মানবাত্মার মুক্তি দিয়ে কলুষিত পাষাণ সেই যে অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করে আজ তারও মুক্তি হচ্ছে।

হারেমের মধ্যে আছে ৩৬০টি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কয়েকটি হলঘর, অগণিত সংকীর্ণ বৃত্তাকার বারান্দা ও অন্ধকার চোরাপথ, নানা ছাঁদের স্নানাগার ও বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রায় সাতাশ কোটি টাকা ব্যয় করে তুরস্ক সরকার ঐ বিলাস জেনানা মহলটিকে সুসজ্জিত করে পর্যটক আকর্ষণের ব্যবস্থা করছেন। মূক পাষাণ যখন মুখর হবে তখন কতজনের কানে সে কত কথাই না বলবে। কেউ সেখানে শুনতে পাবে শিঞ্জিনী নিক্কণ ও প্রমোদপ্রমত্তা ললনাদের কলোচ্ছ্বাস, কারও বা কানে ভেসে আসবে অসহায়া বন্দিনী মানবীর বুকফাটা কান্না। হারেমের প্রতিটি ইটের-কণা তার কাছে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা অগণিত নারীর সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত বলে মনে হবে। কিন্তু, একটানা সাড়ে তিনশ বছরের নিষ্ঠুর নির্লজ্জ সম্ভোগ ও অসহায় আত্মদানের নীরব সাক্ষী ঐ ঐতিহাসিক প্রাসাদটি যে রহস্যময়ী নারীর মতো দুর্নিবার আকর্ষণে সকলকে কাছে টানবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামীজির শান্তিজল : উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে শেষ পর্যন্ত এক ভারতীয় সাধু, স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দ, এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, উত্তর আয়ারল্যান্ডে গত কয়েক মাস, এবং সত্য কথা বলতে কি, গত কয়েক বছর ধরে যে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট দাঙ্গা চলেছে, আর বৃটিশ সরকার বেপরোয়াভাবে পীড়ননীতি চালিয়েও যার মীমাংসা করতে পারছে না, তিনি শান্তির বাণী প্রচার করে সে অশান্ত পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবেন। লন্ডনের অভিজাত পাড়ার এক বড় হোটেলে সাংবাদিকদের এক ভোজসভার আয়োজন করে স্বামীজি তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজির এখন অগণিত শিষ্য এবং সেই সূত্রে স্বভাবতই তিনি এখন বিপুল বিত্তের অধিকারী ও অত্যন্ত ব্যস্ত ব্যক্তি। শিষ্যদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগরক্ষা করতে তাঁকে চার্টার্ড বিমানে তিন মহাদেশ ছোটাছুটি করতে হয়। সাংবাদিকদের তিনি জানান যে, দেবী লক্ষ্মী তাঁকে অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর শান্তি অভিযানও হবে অতি সহজ সরল। একটি স্বয়ংচালিত বিমানে তিনি উপদ্রুত অঞ্চলগুলির উপর দিয়ে উড়ে যাবেন (যেমন করে বন্যাদুর্গত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন দেশের ভাগ্যবিধাতারা), আর তাঁর দেবী নির্দিষ্ট বাণীসম্বলিত কয়েক হাজার প্রচারপত্র উড়িয়ে দেবেন ঐ এলাকার অশান্ত মানুষগুলির মধ্যে। তাতেই নাকি কাজ হয়ে যাবে। তারপর তিনি শান্তি অভিযান চালাবেন বার্লিন প্রাচীরের উভয় দিকে এবং তারও পরে বিশ্বের অন্যান্য অশান্ত ও উপদ্রুত স্থানে।

পশ্চিমের মানুষ আজ নানা কারণে দিশাহারা। হানাহানি, কাটাকাটি, ব্যভিচারে অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন। যে ধর্ম ও নীতিবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তাদের সভ্যতা, তা দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং তার আর কিছুই দেওয়ার নেই—এমন একটা ধারণা হয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ার অনেকের মনে। বিভ্রান্ত মানুষগুলির সেই মনের 'ভ্যাকুয়াম' পূরণের একটা বড় সুযোগ এসে গেছে ভারতের সাধুসন্তদের। যে কোন মহাযোগী মহার্ষি বা মহাপ্রভু কোনরকমে একবার পৌঁছাতে পারলেই হাজার হাজার শিষ্য জুটে যায় তাঁর। ভক্তদের উজাড়করা প্রণামীতে গুরুর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হতেও খুব একটা সময় লাগে না। কিন্তু বেশি ভেল্কি দেখাতে গিয়ে অনেক বিরিঞ্চিবাবাকেই শেষ পর্যন্ত বিপাকে পড়তে হয়। একদিন বীটলদের শিষ্যরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য যে মহার্ষির মাটিতে পা পড়ার অবকাশ হচ্ছিল না আজ তাঁকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর সাধনভবনের জন্য লোক জোটাতে হচ্ছে। আলস্টারে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করে স্বামী বিষ্ণু দেবানন্দজিও যে খুব বড় ঝুঁকি নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হত্যায় নজিরবিহীন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরে খুন হয়েছে ১৫,৮১০ জন এবং মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান, এডগার হুভার বলেছেন, যে হারে হত্যাকাণ্ড বেড়ে চলেছে মার্কিন মুলুকে তা পুলিশের পক্ষে আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে না। পুলিশ দপ্তরের বক্তব্য, যত মানুষ খুন হয় তার এক-চতুর্থাংশের প্রাণ যায় পারিবারিক বিরোধের ফলে। সে কারণে সেসব মৃত্যু প্রতিরোধে পুলিশের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। আর অন্যান্য কারণে হত্যা যে ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে তাতে সমস্যাটিকে আর কোনমতেই আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বলা যায় না, সেটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন মানুষ খুন হয়েছে। মোট যা মানুষ খুন হয়েছে সেটা দশ বছর আগের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি। ১৯৬০ সালে খুন হয়েছিল নয় হাজার মানুষ। পুলিশ খুনও ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে সে দেশে; '৬৯ সালে খুন হয়েছিল ৮৬ জন, গত বছর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০০, অর্থাৎ এক বছরে যোল শতাংশ বৃদ্ধি।

৯।৯।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পর লোকান্তরিত হলেন, বাংলার এই সংকট মুহূর্তে এই নিদারুণ দুঃসংবাদে আমরা মর্মাহত। বাংলা কথাসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক তারাশঙ্কর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ যে সাধারণ মানুষ চিরকাল নীরবে দুঃখক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে সেই মূক জনসাধারণের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে, অবক্ষয়ী সমাজের ছবি এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রে যার সূত্রপাত তারাশঙ্করে তা বিকশিত হয়ে উঠল। মাটির বুক থেকে যেন তিনি উঠে এসেছিলেন। বৈচিত্র্য, বলিষ্ঠতা, কল্পনাকুশলতা, নাটকীয়ত্ব ও বিশালতায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সমৃদ্ধ। অগ্রজ ও অনুজ সাহিত্যিকদের পরম প্রিয় এই মানুষটি বর্তমান বাংলাকে এক নতুন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমরা সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

CENTRAL LIBRARY

পটভূমি

আসছে বছরের গোড়ায় যে-সব রাজ্যে বিধানসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা, তার কয়েকটিতে প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার ইচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কিছু দিনের। তার মধ্যে রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। বিহার বা পশ্চিম বাংলায় অবশ্য ঐ সময়ে নির্বাচন হওয়ার কথা নেই, তবু এ দুটি রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেসের দিকেও যে তাঁর নজর আছে, এ-কথা শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল জানতেন।

প্রধানমন্ত্রী এই সেদিন যখন কলকাতায় এলেন তখনও তিনি জানিয়েছিলেন যে, রাজ্যের কংগ্রেসের নেতৃত্ব এমন লোকেদের হাতে থাকা উচিত যাঁরা দলকে নতুন রূপ দিতে পারবেন। পশ্চিম বাংলায় যে একটি বিশেষ বামপন্থী আবহাওয়া রয়েছে তার কথা মনে রেখেই তিনি এই কথা বলেছিলেন। তবে বিশেষ একজন প্রার্থীকেই তিনি রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দেখতে চান বলে যে-খবর রটানো হয়েছিল, পরে জানা গেল সেটা ঠিক নয়।

পশ্চিম বাংলাতে যেমন, অন্যান্য অনেকটি রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেসকে ঢেলে সাজার প্রস্তাবে সকলেই উৎফুল্ল হতে পারেন নি। যাঁরা বেশ কিছু দিন ধরে সংগঠন আঁকড়ে ধরে বসে আছেন তাঁরা সহজে নতুন লোকেদের জায়গা করে দিতে চাইবেন, এটা অবশ্য আশাও করা যায় না। তাই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাধা, এবং বেশ বড় রকমের বাধাই, আসে তাঁদের পক্ষ থেকে। গত মে মাসে সারা দেশের জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতাদের যে-বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন সেখানেও দলকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন, কিন্তু তারপরে ফলো-আপ অ্যাকশন আর বিশেষ কিছু হয়নি।

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের কাহিনী বিশদ আলোচনার আগে অন্যান্য রাজ্যের ছবিটা একটু দেখে নেওয়া যাক। অবশ্য সর্বত্রই বিবাদের কারণ দুটি গোষ্ঠীর স্বার্থের সংঘাত। যেমন বিহারে লড়াইটা প্রধানতঃ জগজীবন রামের সমর্থকদের সঙ্গে রামলক্ষণ যাদবের সমর্থকদের। ঐ রাজ্যে দলকে ঢেলে সাজানোর বা অ্যাড হক কমিটি গঠনের অর্থ হল জগজীবনবাবুর গোষ্ঠীর অস্তগমন এবং বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর উদয়। সুতরাং প্রথমোক্ত গোষ্ঠী তো এই ঢেলে সাজার চেষ্টার বিরুদ্ধতা করবেই। মধ্যপ্রদেশে ঝগড়াটা চলছে মুখ্যমন্ত্রী এস সি শুক্লার গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতা ডি পি মিশ্রের গোষ্ঠীর।। পশ্চিম বাংলার মতো ওখানেও প্রদেশ কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন একজন অস্থায়ী সভাপতি। নতুন পাকা সভাপতি কে হবেন, তাই নিয়েই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তার কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয়নি। রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মোহনলাল সুখাড়িয়াকে সম্প্রতি সরে যেতে হয়েছে প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীরই ইচ্ছা অনুসারে। তাঁর জায়গায় বসেছেন বরকতুল্লা সাহেব। নাথুরাম মির্ধাও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু এখন যাঁরা প্রদেশ কংগ্রেস চালাচ্ছেন তাঁরা সকলেই সুখাড়িয়া ও মির্ধার লোক। সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা স্বভাবতঃই চাইছেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বও তাঁদের গোষ্ঠীর লোকেদের হাতেই থাক। তাঁরা তাই প্রার্থিত পরিবর্তন আনতে চান। কিন্তু বাধা আসছে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে।

এটা জানাই ছিল, প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা যদি সংগঠনে বড় রকমের পরিবর্তন আনতে না চান তবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা একটা চরম ব্যবস্থা নিতে চাইবেন। ১ সেপ্টেম্বরের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের ওপর সকলের বিশেষ দৃষ্টি ছিল ঐ কারণেই। ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ঐ চারটি রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রীয় নেতারা এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন কেন? রাজনৈতিক মহলের ধারণা নির্বাচনের মুখে বলেই এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে হল। নির্বাচনের আগে যাঁদের হাতে সংগঠনের ভার থাকবে তাঁরাই প্রার্থী মনোনয়ন করার সুযোগ পাবেন। নতুন নেতাদের যদি দলের নেতৃত্বে নিয়ে আসা যায় তবে তাঁরাই নতুন প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে পারবেন। এইভাবে নতুন ও তরুণ মুখের আমদানিতে দলের চেহারাও পাল্টে যাবে— অন্ততঃ সেটাই হল উদ্দেশ্য।

•

পশ্চিম বাংলায় প্রথম অ্যাড হক কংগ্রেস হয় ১৯৫৭ সালে। তখন কারণটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। এখন যদি প্রয়োজনটা হয় নিজের দলকে নতুন করে গড়ার, তবে তখন প্রয়োজনটা ছিল বিপক্ষ শিবিরে ভাঙন ধরানোর। বিপক্ষ শিবির বলতে প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট। অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন না, একথা সকলেই জানতেন। তদানীন্তন অবিভক্ত কংগ্রেস অজয়বাবুর সেই অসন্তোষের সুযোগ নিতে চাইলেন। কিন্তু অজয়বাবু সাফ জানিয়ে দিলেন যে, যতো দিন অতুল্য ঘোষ ও তাঁর গোষ্ঠী প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকবেন ততো দিন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব বদলের জন্য অ্যাড হক কমিটি গড়ার প্রস্তাব ওঠে।

সেই উদ্দেশ্যেই ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে গুলজারিলাল নন্দা কলকাতায় আসেন এবং কংগ্রেসের নানা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার পর কলকাতাতেই ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হবে। কিন্তু নন্দাজী একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন কামরাজ। কামরাজের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অ্যাড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। পরে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন ওঠে, নন্দাজী কোন্ অধিকারে অ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন? কারণ তাঁকে তো শুধু পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস সম্বন্ধে বিশেষ রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, ঐখানে বসেই অ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করার জন্যে নয়।

•

ফলে হল কী, অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হবে বলে নন্দাজী কলকাতায় ঘোষণা করে গেলেও কমিটির সদস্যদের নাম সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা গেল না। কামরাজ যথেষ্ট সময় নিয়ে অক্টোবর মাসের বেশ কিছুদিন কেটে

যাওয়ার পর প্রফুল্ল সেনকে আহ্বায়ক করে অ্যাড হক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। কিন্তু যার জন্যে এত আয়োজন, সেই কমিটিই হল না। যথাসময়ে অ্যাড হক কমিটি গঠিত না-হওয়ার অজয়বাবু কংগ্রেসের কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না, আর তাঁর পদত্যাগ করাও হল না।

•

এবারে এই রাজ্যে কংগ্রেসের মধ্যে গোলযোগের সূত্র মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর থেকেই। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা স্থির করেন যে, একই লোক দলের বড় কর্মকর্তা এবং মন্ত্রীর পদে থাকতে পারবেন না। 'ওয়ান ম্যান ওয়ান পোস্ট' নীতির এইটেই হল সার কথা। এই নীতি চালু হওয়ার পরই জগজীবনবাবুকে খানিকটা অনিচ্ছাতেই কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যখন এই নীতি কার্যকর করা হচ্ছে তখন রাজ্যেই বা হবে না কেন? এপ্রিল মাসে যখন পশ্চিম বাংলায় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার হল তখন বিজয়সিং নাহার হলেন তার উপ-মুখ্যমন্ত্রী। বিজয়বাবু আবার কংগ্রেস সভাপতিও। তাই তখন দলের মধ্যে বিশেষতঃ তরুণ সদস্যরা প্রশ্ন তুললেন যে, বিজয়বাবুকে হয় কংগ্রেস সভাপতি থাকতে হবে, নয় মন্ত্রী থাকতে হবে, দুটো পদই আঁকড়ে থাকা চলবে না। মে মাসে যে-সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের কথা আগে বলেছি সেখানে তো পশ্চিম বাংলার একজন প্রতিনিধি এমন কথাও বললেন যে, রাজ্য কংগ্রেসের গোটা সদর দপ্তরটাই রাইটার্স বিল্ডিংসে চলে গেছে। তখন থেকেই নতুন সভাপতি কে হবেন, সেই জল্পনা সুরু হয়ে যায়। এমন কি, অ্যাড হক কমিটি গঠনের সম্ভাবনার কথাও তখন থেকেই শোনা যেতে থাকে।

কিন্তু বিজয়বাবু যে কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে তখন রাজী ছিলেন না তার কারণ তিনি জানতেন যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের আয়ু বেশিদিন নয়। আবার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদও যে তিনি চট করে ছাড়তে রাজী হন নি, তার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর মতো পাকা রাজনীতিকের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, তিনি বেশিদিন দলের সভাপতি পদে থাকতে পারবেন না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে চাপ ক্রমশই বড় হয়ে উঠছিল।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন বেশিদিন টিকল না, সুতরাং তারপর মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির পদ একই সঙ্গে আঁকড়ে থাকা সংক্রান্ত বিতর্কেরও শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না। নানা রকম পরস্পরবিরোধী সংবাদের মধ্যে বিজয়বাবু জুলাই মাসে জানালেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, তাই দিন সাতেকের জন্যে তিনি গোপালপুরে যাচ্ছেন, ফিরে এসে হয়ত কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দেবেন। সুরু হয়ে গেল আরো জল্পনা—বিজয়বাবুর পদত্যাগের পর কে সভাপতি হবেন? বিজয়বাবু গোপালপুর থেকে ফিরে এসে যখন সত্যিই পদত্যাগ করলেন তখন নাটক আরো জমে উঠল।

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে যাঁরা পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস, আই এন টি ইউ সি এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের নেতারা। তাদের স্পষ্টই ধারণা যে, চলতি নেতৃত্ব দিয়ে দলকে নতুন করে গড়া যাবে না। ছাত্র পরিষদ বা যুব কংগ্রেসকে অবহেলা করাও সম্ভব নয়। এখন শাসক কংগ্রেসের তারা দুটি বিশেষ শক্তিশালী স্তম্ভ। গত বিধান সভায় কংগ্রেসের ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের লোকই ছিল জন কুড়ি। প্রধানতঃ এই দুটি সংস্থার চাপেই গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। ছাত্র পরিষদ নেতা সুব্রত মুখার্জি প্রকাশ্যেই কোয়ালিশন সরকারকে 'কেরাণীদের সরকার' বলে অভিহিত করেছিলেন। যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ রায় খুন হওয়াই যে তার পদত্যাগের অন্যতম কারণ, অজয়বাবু নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং যুব কংগ্রেস-ছাত্র পরিষদকে উপেক্ষা করা কি সহজ?

অবশ্য চাপে পড়ে বিজয়বাবু কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেও তিনি বা তাঁর গোষ্ঠী একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন না। যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ প্রমুখ যাঁকে চাইবে তিনিই যাতে সভাপতি না হতে পারেন এবং দিল্লী থেকেও যাতে কাউকে চাপিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্যে চেষ্টা সুরু হয়ে গেল। যুব কংগ্রেস প্রভৃতি গোড়া থেকেই চাইছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে। দেবীবাবু কংগ্রেসে নতুন। ১৯৬৫ সাল নাগাদ তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তার আগে তার ঝোঁকটা ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে। শোনা যায়, দিল্লীরও ইচ্ছে দেবীবাবুই রাজ্য কংগ্রেসের হাল ধরুন। এদিকে বিরোধী গোষ্ঠী এসে মিলিত হন অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তার সাহেবের পেছনে।

নির্বাচন এড়িয়ে একটা সমঝোতায় (বা কনসেনসাসে) পৌছানোই কংগ্রেসের বরাবরের রীতি। এক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু প্রথমে তা সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। নির্বাচন এড়ানোটাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, এ-কথাও সকলে মেনে নিতে রাজী হন না। যেখানে মত-বিরোধ রয়েছে সেখানে ভোটের সাহায্যে সব কিছু ফয়সালা হবেই বা বাধা কোথায়। —এই হল তাঁদের যুক্তি। ইতিমধ্যে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের কাছে চিঠিপত্র লেখাও সুরু হয়ে যায়। ঐ সব চিঠিতে বলা হয়, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস পরিচালনার ভার এমন একজনের হাতে দেওয়া উচিত যিনি অভিজ্ঞ, পশ্চিম বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁর গৌরবময় ভূমিকা আছে। স্পষ্টতই এর লক্ষ্য ছিলেন দেবীবাবু।

এর পর একটা মিটমাটের চেষ্টায় সিদ্ধার্থশংকর রায় ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়িতে জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের বৈঠক ডাকেন। সেখানে স্থির হয়, দেবীবাবু সভাপতি পদের জন্যে প্রার্থী হবেন না, আবদুস সত্তারকেই সকলে সমর্থন করবেন। অবশ্য তার আগেই বর্ধমানের নারায়ণ চৌধুরী মনোনয়ন পত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, এটাই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন।

আবদুস সত্তারকে যাঁরা চাইছিলেন তাঁরা হয়ত ঐ সময় খুশিই হয়েছিলেন তাঁদের এই জয়লাভে, কিন্তু অ্যাড হক কমিটির খড়্গ নেমে আসতে দেরি হল না। এখন এ-কথা মনে করতে দোষ নেই যে, দেবীবাবুর নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটা ছিল দেবীবাবু - সিদ্ধার্থবাবুর ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট। কারণ দিল্লী কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তা সম্ভবতঃ তাঁদের অজানা ছিল না। অবশ্য বিপক্ষের নেতারা এই কথা ভেবে খুশি হতে পারেন যে, আবদুস সত্তার সাহেবকেই অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছে।

১০।৯।৭১ —দেবব্রত

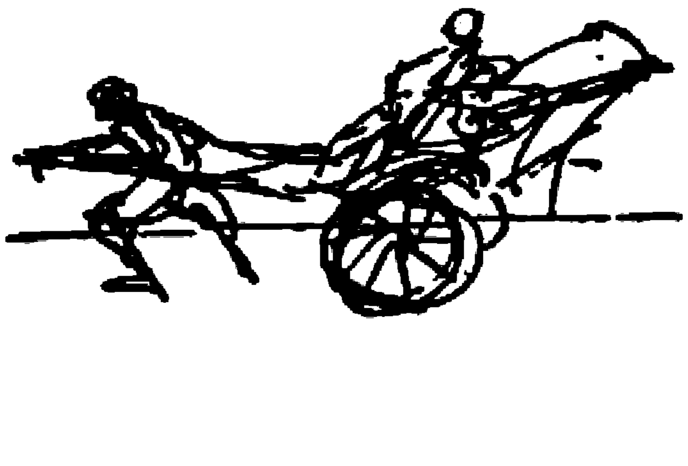

CENTRAL LIBRARY

দেশে বিদেশে

ভারত-চীন সম্পর্কের বরফ গলবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এমন অনুমান যাঁরা করেন তাঁরা তাঁদের অনুমানের সপক্ষে এখনও স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

সত্যি বটে যে, আগামী নভেম্বর মাসে চীনে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা আছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট চীন সরকারীভাবে ভারত সরকারকে একদল টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পাঠাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটাও ঠিক যে ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু এই ঘটনাকে কি ভারতের সঙ্গে চীনের তথাকথিত পিংপং কূটনীতির সূচনা বলে গ্রহণ করা যাবে? কিছু পর্যবেক্ষক আছেন যাঁরা চীন-আমেরিকার পিংপং কূটনীতির সঙ্গে এই ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজছেন। মার্কিন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের চীনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই ইদানীংকালে সর্বপ্রথম চীন ও আমেরিকার যোগাযোগের একটা রাস্তা খোলা হয়েছিল। সেকথা যাঁরা এই প্রসঙ্গে মনে করতে চান তাঁরাই বিশেষ করে চীনে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন। দুটি ঘটনার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, কমিউনিস্ট চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যখন কোন কূটনৈতিক যোগ ছিল না (এখনও নেই) তখন পিকিংয়ে আমন্ত্রিত পিংপং খেলোয়াড়রা এবং তাঁদের পিছু পিছু মার্কিন সাংবাদিকরা দুই দেশের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছিলেন। কিন্তু ভারত-চীন সম্পর্কটা এমন শূন্যাশ্রয়ী নয়। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। যদিও সম্পর্কটা পুরোপুরি রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে নয়, তাহলেও দুই দেশের মধ্যে একটা প্রাথমিক সংলাপ শুরু করার পক্ষে এই সম্পর্কের সূত্রটা যথেষ্ট মজবুত। সুতরাং এক্ষেত্রে পিংপং কূটনীতির ছল আশ্রয় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, যে আমন্ত্রণের তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে সেটি তৈরি করেছেন চীন, কোরিয়া, জাপান, নেপাল, মরিশাস ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে গঠিত একটি স্পনসরিং কমিটি এবং ঐ তালিকায় ভারতের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সব দেশের নাম আছে, বাদ শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজরায়েল ও জর্ডান।

আশাবাদীরা অন্যান্য কয়েকটি সুলক্ষণও দেখতে পাচ্ছেন। একটির জন্য সাক্ষী মানা হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার জেমস রেস্টনকে। তিনি সম্প্রতি পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে। পিকিং থেকে ফিরে এসে হংকং-এ একটি ভোজসভায় স্পষ্টি রেস্টন সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে চীনের যে সরকারী অভিমত তিনি জানতে পেরেছিলেন সেটা চীনারা তাঁকে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এ বিষয়ে পিকিংয়ের সরকারী বক্তব্য শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। যদি সে সময়ে এই বক্তব্য প্রকাশ করা হত তাহলে চীন এই চুক্তিকে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মিলিত ষড়যন্ত্র বলেই আখ্যায়িত করত, এই হচ্ছে রেস্টনের খবর। কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে চীন এখন পর্যন্ত নীরব, সরকারীভাবে শুধু বলা হচ্ছে, তারা চুক্তিটি পর্যালোচনা করে দেখছে।

চীনের এই নীরবতা কি ভারত সম্পর্কে তার দ্বিতীয় চিন্তারই ইঙ্গিত?

যাঁরা ব্যাপারটা এইভাবে দেখতে চান তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, নয়াদিল্লিস্থিত পিকিং-এর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হুয়াং মিং-টাও রাওয়ালপিন্ডিস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতকে প্রায় একই সময়ে পিকিংয়ে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান হয়েছিল, যার অর্থ হচ্ছে, পিকিং-এর নেতারা হয়ত ভারত-পাকিস্থান উপ-মহাদেশে তাঁদের নীতি যাচিয়ে দেখতে চাইছেন।

ইতিমধ্যে পিকিংয়ে ভারতের শার্জ দ্যাফেয়ার্স শ্রীব্রজেশ মিশ্র আলাপ-আলোচনার জন্য দিল্লিতে এসেছেন। প্রথমে শোনা গিয়েছিল যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতাদের মতো চৌ এন-লাইয়ের কাছেও শ্রীমতী গান্ধী কিছুকাল আগে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তারই জবাব নাকি শ্রীমিশ্র নিয়ে এসেছেন, এমন একটা খবর শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে জানা গেল, সে খবর ঠিক নয়। সর্বশেষ অনুমান হল এই যে, দুই দেশের মধ্যে আম্বাসেডর পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের জন্য ভারত যে প্রস্তাব দিয়েছিল চীন এখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের পলিসি প্ল্যানিং কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর যখন মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেইসময়ে একবার তিনি নাকি মস্কোস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতের কাছে ভারত ও চীনের মধ্যে আবার রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবটা পেড়েছিলেন। এতদিন চীন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করে নি। নূতন চীন-মার্কিন সংলাপ ও ভারত-সোভিয়েট চুক্তির পর এখন পিকিংয়ের কমিউনিস্টরা সেই পুরানো প্রস্তাবটির দিকে নজর দিয়েছেন, এই হচ্ছে হালের জল্পনা।

আর একটি চাঞ্চল্যকর গবেষণা হল, ডাঃ হেনরি কিসিঞ্জারের মতো শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধরও ইতিমধ্যে পিকিংয়ে একটি গোপন দৌত্য সেরে এসেছেন। বোম্বাইয়ের একটি ইংরাজী দৈনিক সংবাদ দিয়েছেন যে, গত ২৪ আগস্টের আগে সপ্তাহখানেক যাবৎ ধর মহাশয়ের গতিবিধি খুবই রহস্যাবৃত ছিল: এই সপ্তাহখানেক তিনি কোথায় ছিলেন সেবিষয়ে দিল্লির সরকারী মহল এক একবার এক একরকম খবর দিয়েছেন। কোন খবরই মেলে নি। একবার বলা হল, শ্রীধর কাশ্মীরে আছেন, একবার বলা হল তিনি আগরতলায়

মস্কো, ১১ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ আজ পরলোকগমন করেছেন।

সরকারীভাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৪ সালে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিনি অবসর ভোগ করছিলেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মস্কোর উপকণ্ঠে এক হাসপাতালে মারা গেছেন।

শ্রীক্রুশ্চেভ তাঁর বাড়ীতে কিংবা হাসপাতালে মারা গেছেন সে সম্পর্কে উক্ত সূত্র এখনই কোন খবর দিতে পারেন নি।

শ্রীক্রুশ্চেভ ১১ বছর ক্রেমলিনে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সোভিয়েট ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত থাকবেন।

তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে সোভিয়েট নভশ্চরেরা চন্দ্রাভিযান আরম্ভ করেন এবং এই সময়েই রাশিয়া চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহে অভিযানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

প্রচারে বিচক্ষণতা এবং তাঁর বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহ সোভিয়েট ইতিহাসে তাঁকে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত করেছে।

গেছেন. আরও একবার বলা হল তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁকে কাশ্মীরে, আগরতলায় অথবা নার্সিং হোমে, কোথাও খুঁজে পান নি। অপরপক্ষে, কেউ কেউ নাকি শ্রীধরকে বিভিন্ন এয়ারপোর্টে কারনাদক্ষেত্ত পোষাকপরা অবস্থায় দেখেছেন। সেই সঙ্গে সংবাদদাতার টিপ্পনী: শ্রীধর দেশের ভিতরে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যেতে আসতে এই ধরনের কারনাদক্ষেত্ত পোষাক পরেন না। অতএব প্রশ্ন, এই সপ্তাহখানেক সময় শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর কোথায় ছিলেন। সংবাদদাতার গবেষণা: তিনি হয় ওয়াশিংটন বা পিকিং ঘুরে এসেছেন।

এই গবেষণা সত্য হোক বা না হোক, দিল্লির মানুষ ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘ হিমঋতুর অবসানের আর একটি লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, দিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সামনে গত প্রায় আট বছর ধরে ভারতীয় পুলিশের যে তাঁবু গাড়া ছিল সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

শীত বিদায়ের এসব লক্ষণ দেখা গেলেও বসন্তের মলয়সমীরণ স্পষ্টতই এখনও অনেক দূরে। যুগোশ্লাভিয়ার একজন সংবাদপত্র-সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই যা বলেছেন তাতে আর যাই হোক, ভারত-চীন রাজনৈতিক বোঝা-পড়ার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ পায় নি। এই সাক্ষাৎকারে চৌ বলেছেন, ভারতীয় উপমহাদেশ ও ভারত মহাসাগর এখন দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, চীন এই অঞ্চলকে 'মুক্ত' করার জন্য সব কিছু করবে। আগামী দিনগুলিতে যদি চীনের এই মনোভাব অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ভারত ও চীনের মধ্যে দুই সমকক্ষ দেশ হিসাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার সম্ভাবনা খুবই কম।

●

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের নিগ্রো মহল্লার সন্তান জর্জ জ্যাকসন কিশোর বয়স থেকেই জেল খাটছিল। ১৯ বছর বয়সে সে তৃতীয়বার জেলে যায়। অপরাধ: একটি পেট্রল পাম্প থেকে ৭০ ডলার ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। সে আজ এগার বছর আগেকার কথা। এই একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধে সে ১১ বছরের মধ্যে জেল থেকে বেরোতে পারল না। আর কোনদিনই পারবে না। কেননা, ক্যালিফোর্নিয়ার সান কোয়েন্টিন কারাগারের রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গনে সেদিন কারারক্ষীদের গুলী জর্জ জ্যাকসনের মাথা ভেদ করে চলে গেছে।

বছর খানেক আগে আর এক আগস্ট মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার মেরিন কাউন্টি আদালতে গুলী খেয়ে মারা গিয়েছিল জর্জ জ্যাকসনের ছোট ভাই ১৭ বছর বয়সের জোনাথন। মেরিন কাউন্টি আদালতে সেদিনকার সেই রক্তাক্ত ঘটনায় একা জোনাথনই মারা যায় নি, মারা গিয়েছিলেন ঐ আদালতের বিচারপতি ও দুইজন আসামী। জোনাথন সেদিন আদালতের বিচারপতি ও ঐ আসামীদের জামিন রেখে তার দাদা জর্জ ও জর্জের দুই সঙ্গীর মুক্তি আদায়ের চেষ্টা করেছিল। জর্জের ঐ দুই সঙ্গীর একজনের নাম ফ্লিটা ড্রাম্বো আর একজনের নাম জন ক্লাচেট। দুজনই নিগ্রো। আর এই জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিটা ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেট, তিনজন মিলেই সেই ত্রয়ী যাঁরা ইদানীংকালে 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে সারা আমেরিকায় ও আমেরিকার বাইরে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

এই 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' পরিচয়ের পিছনে আছে সাম্প্রতিককালে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের আর একটি রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিটা ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেট তিনজনই তখন ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারে বন্দী। ঐ কারাগারের একজন শ্বেতাঙ্গ রক্ষী গুলী করে মেরে ফেললেন তিনজন কৃষ্ণকায় বন্দীকে। গ্র্যান্ড জুরি সেই শ্বেতাঙ্গ রক্ষীকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন এই বলে যে, ঐ তিন নিগ্রো বন্দীকে মারাটা 'ন্যায়সঙ্গত নরহত্যার ঘটনা'। এর কিছুদিন পরেই সোলেদাদ কারাগারে আটক নিগ্রো বন্দীরা একজন শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষীকে মেরে ফেললেন। যদিও এর আগে তিনজন নিগ্রো বন্দীর মৃত্যুর জন্য কাউকে সাজা পেতে হয়নি তাহলেও একজন শ্বেতাঙ্গ কারারক্ষী হত্যার ঘটনায় আমেরিকার আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন। এই হত্যার দায়ে আদালতে সোপর্দ করা হল জর্জ জ্যাকসন, ফ্লিটা ড্রাম্বো ও জন ক্লাচেটকে। সেই থেকে এই তিনজন নিগ্রো বন্দী 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' নামে পরিচিত হয়েছেন। এই 'সোলেদাদ ভ্রাতৃবৃন্দ' এখন মার্কিন

ফটো ঃ নেপাল মুখোপাধ্যায়

সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে নিগ্রোদের এবং বিশেষ করে নিগ্রো বন্দীদের সোচ্চার প্রতিবাদের মূর্তিমান প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এই সোলেদাদ ত্রয়ীর মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত ছিল সেই জর্জ জ্যাকসন এক সময় লিখেছিল, 'কালো মানুষের নম্রতা ও সংকোচের সবটুকু চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমার হৃদয় থেকে নির্মমভাবে নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। এই সব-পাওয়া ও সবহারা সমাজ আমাকে যে আঘাত দিয়েছে তাতে আমার মধ্যে একটা অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। এই অগ্নিশিখা জ্বলতেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে যতক্ষণ না তার আগুনে হয় আমার নির্যাতনকারীই শেষ হয় অথবা আমি নিজে শেষ হয়ে যাই।'

সান কোয়েন্টিনের রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গনে চিরমুক্তি লাভ করার আগে পর্যন্ত জর্জ জ্যাকসন তার দেশের সমাজ ও সরকারের কাছ থেকে যে ব্যবহার লাভ করেছে তাতে তার এই ক্ষোভের অভিব্যক্তি অপ্রত্যাশিত নয়। পেট্রল পাম্প থেকে ৭০ ডলার ছিনিয়ে নিতে সাহায্য করার অপরাধে বিচারক তাকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তার মেয়াদ নির্দিষ্ট ছিল না। বিচারকের রায়ে বলা হয়েছিল, তাকে এক বছর থেকে আজীবন পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুসারে এই ধরনের অনির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিক উদ্দেশ্য এই যে, জেলের ভিতরে গিয়ে চরিত্র সংশোধন হয়ে গেছে মনে করলেই কারারক্ষীরা আসামীকে ছেড়ে দিতে পারবেন। কিন্তু জেলের ভিতরে গিয়ে জর্জ জ্যাকসন দেখতে পেল, একবার জেলে ঢুকলে

নিগ্রো বন্দীদের সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। নানাভাবে জেলের ভিতরে নিগ্রো বন্দীদের উপর অত্যাচার করা হয়। যারা এইসব অত্যাচার মুখ বুজে নেয় অথবা এই ধরনের অত্যাচার করতে কারারক্ষীদের সাহায্য করে একমাত্র তারাই জেল থেকে বেরিয়ে আসার আশা করতে পারে। আস্তে আস্তে জেলের মধ্যে জর্জ জ্যাকসন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সাত বছরের বেশী সময় তাকে নির্জন কারাকক্ষে আটকে রাখা হল। এই সময় সে ব্যবহার করল পড়াশুনো করে। আস্তে আস্তে সে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হল, বিপ্লবের কথা বলতে লাগল এবং পুঁজিবাদী সমাজ ধ্বংস করার পক্ষে মতপ্রকাশ করতে থাকল। কারাগার থেকে তার লেখা চিঠির সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হল 'সোলেদাদ ব্রাদার' নাম দিয়ে।

শিকাগো নিগ্রো বস্তীর বাউণ্ডুলে ছেলে জর্জ জ্যাকসনের এই রূপান্তর ইদানীংকালে আমেরিকার প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। জর্জ নিজেই এক জায়গায় লিখছে, "আমি জন্মেই এমন ছিলাম না। হয়তো (কোন) মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ আমার অতিরিক্ত ক্রোধপরায়ণতা দেখে এই সিদ্ধান্ত করবেন যে, আমি শুধু তুই, মরা মানুষ নেই। এইজন্যই আমার - আমি আমাকে বলতে চাই যে, নিরীহ ও বিশ্বাস-প্রবণ স্বভাব নিয়েই আমি জন্মেছিলাম।"

সান কোয়েন্টিনের কারাগারে যখন জর্জ জ্যাকসনের অন্তরের ভিতরকার সেই বহ্নি-শিখা নিভল তখন সেই শিখার আগুনে সে নিজেই জ্বললো। কারারক্ষীরা বলেন, সে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, মাথার চুলের মধ্যে বন্দুক লুকিয়ে রেখেছিল এবং উদ্যানের হাতলের মধ্যে ভাংগা ব্লেড ঢুকিয়ে হামলা করেছিল। অন্যান্য বন্দীদের সাহায্য নিয়ে সে তিনজন কারারক্ষী ও দুজন 'দালাল' কয়েদীকে খুন করেছিল। শেষ-পর্যন্ত প্রাচীর টপকে পালাতে গিয়ে সে গুলী খেয়ে মারা যায়। জর্জের মা জর্জিয়া এবং আরও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এসব বানানো গল্প, আসলে জর্জকে খুন করা হয়েছে। জর্জিয়া জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে তাঁকে কয়েক সপ্তাহ আগেই বলেছিল যে, জেলের ভিতরে তাকে মারার চেষ্টা হবে। মাথার চুলের মধ্যে একটা নব ইঞ্চি লম্বা বন্দুক কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব? বিশেষ করে সান কোয়েন্টিন কারাগারে, যেখানে কয়েদীদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তল্লাসীর নিখুঁত ব্যবস্থা আছে?

জর্জ জ্যাকসন জীবিত থাকতে তাকে ঘিরে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। নিহত হওয়ার আগে তার অন্তরের বহ্নিশিখার অনেক আগুন যে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা তাকে মুক্ত করে আনার জন্যই বন্দুক চালান দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও নিগ্রো কম্যুনিস্ট অ্যাঞ্জেলা ডেভিস এখন আদালতে বিচারাধীন। তার জন্যই ক্যালিফোর্নিয়ার কারাগারগুলিতে কারারক্ষীরা ও আদালতগুলিতে বিচারকরা সন্ত্রস্ত। বিচারকরা বুলেটপ্রুফ কাঁচের আড়ালে বসছেন, কারারক্ষীরা সভা করে কারাগারের ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

মারা যাওয়ার পর জর্জ জ্যাকসন আমেরিকার কোন কোন মহলের কাছে একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। লাল রেশমী ঝাণ্ডায় জর্জ জ্যাকসনের প্রতিকৃতি লাগিয়ে মিছিল বার করা হয়েছে।

•

হিমাচলের বাগিচা মালিকরা আপেল ফেলিয়ে পস্তাচ্ছেন। বিলাসপুর-মাণ্ডি রোডের পাশে স্তূপীকৃত আপেল পচছে। ২৫ পয়সা কিলো দরেও সেখানে আপেলের খরিদ্দার নেই এবং বাইরে যে চালান দেওয়া হবে সেজন্য প্যাকিং বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।

হিমাচল বিধানসভায় এই খবর দিয়েছেন শ্রীশিবরাম ও শ্রীজয়বন্তরাম চৌহান মাত্র দুইজন সদস্য।

১০-৯-৭১ —দৃষ্টিদীপ

খোঁজার শেষ

মায়ের একটি পাশে আট বছরের ছোট ছেলে করিম ও অন্য পাশে এক বছরের ছোট্ট মেয়ে মমতাজ। তিনজনই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে। বাবা শুয়েছে বাইরের দাওয়ায়—বেশ গরম পড়ে গিয়েছে তাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শ্রান্ত দেহ চায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ঘুম ভেঙে গেল। সবারই ঘুম ভাঙলো। চীৎকার, চারিদিকে চীৎকার—পালাও, পালাও। কান্নার রোল উঠেছে—কী ভয়ঙ্কর। সবাই উঠে বসে। মা মেয়েকে বুকে চেপে ধরে—বাবা শক্ত করে ছেলের হাত ধরে। তারপর তারা বেরিয়ে পড়লো—বাড়ির বাইরে। তাদের সুখ-শান্তির আশ্রয় পিছনে পড়ে রইলো। ছুটছে, সবাই ছুটছে। তারাও ছুটতে লাগলো। কেন ছুটছে? কেউ জানে না। শুধু জানে ছুটতে হবে। কোন দিকে ছুটতে হবে? তাও কেউ জানে না। পিছনের এক ভয়াবহ দানবের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে। তাই দলে দলে লোক বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। করিমের বাবাও সেদিকেই ছুটছে—করিমের হাত শক্ত করে ধরে। করিমের মা-ও মমতাজকে বুকে চেপে সেদিকেই ছুটছে। ভাববার আর কিছু নেই। প্রতিটি লোকের শুধু একমাত্র ভাবনা—বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে।

কিন্তু বাঁচতে কি সবাই পারে? কেউ পারে কেউ পারে না। দানব যে দেখতে দেখতে বড় কাছে এসে পড়লো। গুড়ুম, গুড়ুম, ফটাস ফটাস কতরকম ভীষণ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো চারিদিক। তারপরেই দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো—চারিদিকের বাড়ি, ঘর দোর সব। ছোট ছোট খড়ের ছাউনি বাঁশের বেড়ার ঘরগুলি—এক নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে ভেঙে পড়ছে। কিছুই বাকি থাকছে না।

করিম একবার তাকায় পিছন ফিরে। তাদের বাড়িও জ্বলছে। কত সুখ-স্মৃতি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আগুনের শিখায় শিখায় চারিদিক উদ্ভাসিত। এক মুহূর্তের জন্য করিমের যেন মনে হয়—কী সুন্দর! হাজার হাজার বাজির খেলা। পর মুহূর্তেই বুকের ভিতর প্রচণ্ড এক আঘাত ধাক্কা দেয়। এ-কী বাজি! কী ভয়ংকর, কী ভীষণ বাজি! মরণ বাজি—মৃত্যু নিয়ে যার খেলা! কী সর্বনাশের সামনে এসে পড়লো তারা! কেন, কেন? কেন এ-সর্বনাশ? কি করেছে তারা? করিম কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ভাববার সময় তো নেই। বাবার হাত ধরে ছুটছে করিম। মা আছে, নিশ্চয়ই আছে, বোনটিকে কোলে নিয়ে তাদেরই পিছনে আছে।

কত লোক—গ্রামের প্রায় সব লোকই। আগুনের লাল হলদে আলোর আভায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগুনের হলকা তাদের মুখে এসে লাগছে—ঝলসে যাচ্ছে—জ্বালা করছে কিন্তু সে আর কতটুকু ক্ষতি। সম্পূর্ণ দেহটাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি এখনও! কিন্তু তা হতেই বা কত-

জন? সর্ব, সার্ব—সার্ব হয় প্রাণপণ বাঁচবার চেষ্টা। অসহায় মানুষগুলির উপর এসে পড়ছে আগুন—জ্বলন্ত বাঁশ, টিন, কাঠ, খড় আর সেই দানবের লেলিহান জিহ্বা। পিঁপড়ের মতো ছোট ছোট শক্তিহীন মানুষগুলিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—চিরদিনের মতো তারা মাটির উপর মাটি হয়ে ঝরে পড়ছে।

আবার, আর একবার করিম পিছন দিকে তাকায়। আম্মা আম্মা কোথায়? আম্মাজান তো সেই তাদের পিছনে? বোনটিও তো নেই, এতক্ষণ যে আম্মাকে আঁকড়ে ধরে ছিল! আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে করিম—'আব্বা, আম্মা, আম্মা নেই, মমতাজ নেই!' বাবা কথা বলে না—একটি কথাও না। করিমের হাত আরও একটু শক্ত করে ধরে— আরও একটু জোরে দৌড়তে থাকে। করিমকেও দৌড়তে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে।

থাক্ আম্মা—থাক মমতাজ—যেখানে ইচ্ছে থাক। মায়ের আদরের ছেলে করিম—বোনের আদরের ভাই করিম তাদের জন্য দাঁড়াতে পারবে না। করিমের বাবাও তার প্রিয় স্ত্রী, কন্যার খোঁজ নিতে পারবে না। শুধু ছুটবেই তারা। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে—যতক্ষণ না মাটির উপর শুয়ে পড়বে। আর তখনই হবে এই ছুটে চলার শেষ—হবে তাদেরও শেষ বিদায়।

তীব্র জোরে কি যেন একটা এসে ধাক্কা দিল করিমকে। সে পড়তে পড়তেও কি করে যেন উঠে দাঁড়াতে পারলো। কিন্তু আম্মাজানের হাত? আব্বার সে হাতটি তো নেই। এতক্ষণ শক্ত করে যে হাতটি তার হাত ধরে ছিল। সে-যে একা—একেবারে একা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে—একটি নিমেষ। না, আমার আম্মাজান নেই—কোথাও নেই। তবুও ছুটতে হয়—একাই ছুটতে হয়—কেবলই ছুটতে হয়।

আরও অনেক পরে, কত পরে জানে না, করিমের মনে হোল তার চারিদিকের লোকজন যেন বেশ কম। ভোর হয়ে আসছে। পূব দিকে সূর্য উঠছে। কিন্তু আজ ভোরের স্নিগ্ধ আলো আগুনের জ্বলন্ত আলোর মাঝে হারিয়ে গিয়েছে। সূর্য তার সোনার আলো নিয়ে যেন লুকিয়ে থাকতে চাইছে। কে দেখবে আজ তার এই সৌন্দর্য? কে অনুভব করবে তার উত্তাপ? আজ তার কোনই প্রয়োজন নেই। আজ যে জন্ম নেই, জীবন নেই—আছে শুধু মৃত্যু, ধ্বংস, বিনাশ।

করিম আর ছুটতে পারে না। পড়ে যায় মাটির উপর। উঠতে সে আর চেষ্টাও করে না। যেন শুয়ে পড়েছে নিজের বিছানায়। হোক্—যা হবার হোক—আর সে কিছু করবেও না—আর সে কিছু ভাববেও না।

ভাবতে হয়ও না। তারপরে যে কি ঘটেছিল সে কিছুই জানে না। অজ্ঞান অবস্থাতেই সে অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে ছিল। চোখ খুলল যখন, তখন বুঝতে পারলো সে এক খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে। বড় তেষ্টা, বড় খিদে! 'পানি, পানি' বলে সে চেঁচিয়ে উঠলো। কেউ কি দেবে না তাকে পানি? মা কি এখনও এসে দাঁড়াবে না, গেলাস ভরা ঠাণ্ডা পানি হাতে নিয়ে? হঠাৎ দুনিয়াটা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো কেন?

আরও অনেক লোক যে চেঁচাচ্ছে তারই মতো! সে কোথায়? কোথায় এসে পড়েছে? কে একজন জল হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো—কিন্তু এ-তো আম্মাজান নয়? একে তো করিম চেনে না? এ-তো পিপাসা, হাত বাড়িয়ে পানির গেলাসটি নিতে গেল—কিন্তু চোখ জলে ভরে উঠলো। যার উপর বড়ই অভিমান। জল খেতে খেতে করিম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলো—যেন তার মায়েরই মতো স্নেহে ভরা দুটি চোখ। জিজ্ঞেস করলো—'আমি কোথায়?' মেয়েটি কাছে এসে একটু আদর করে বললো—'তুমি হাসপাতালে আছ। আমরা তোমাকে ভাল করে তুলবো—কিছু ভেবো না।'

সে হাসপাতালে—কেন? তারপর ধীরে ধীরে সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা সব মনে পড়ে। উঠে বসে—অন্য খাটিয়াগুলিতে নিশ্চয়ই বাবা, মা, মমতাজ শুয়ে আছে। তারা কি এখনও ঘুমোচ্ছে? তারা কি করিমকে দেখতে পাচ্ছে না? কেন তাকে কেউ আদর করে ডাকছে না। প্রত্যেকটি খাটিয়ার উপর দৃষ্টি পড়ে—একটি একটি করে। কিন্তু সব মুখ অচেনা। কেউ নয় তার বাবা—কেউ নয় মা, কেউ নয় মমতাজ! তারা নেই—নেই—যেন ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে। করিম শুয়ে পড়লো আবার। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো—সেখানেই কি খুঁজে পাবে তাদের? তার আম্মাকে, আব্বাকে আর ছোট মমতাজকে?

আবার এল নার্স। যত্ন করে, আদর করে তাকে দুধ আর রুটি খেতে দিল। শরীর যত সুস্থ হয়—মন ততই অসুস্থ হয়ে ওঠে। বাড়িতে করিম মনে করতো সে বড় হয়েছে—দাদা হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে—সে কত ছোট। এত ছোটরা কি মা বাবাকে হারিয়ে বাঁচতে পারে? হাহাকার করে ওঠে মন—'আম্মা, আম্মাজান কোথায় তুই?' কেঁদে দিন কাটে রাত কাটে। সময় তবুও বসে থাকে না। চলতেই থাকে।

— মন ভাল হয় না, কিন্তু শরীর ভাল হয়। ধীরে ধীরে করিম সুস্থ হয়ে ওঠে। আট বছরের ছেলে—অবস্থাপন্ন চাষীর ছেলে সে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, বাড়ির গরুর খাঁটি দুধ, পুকুরের মাছ কিছুরই অভাব ছিল না। বাংলা দেশের ছেলে বাবুয়ানা শেখেনি—কাজ করতে শিখেছে, খাটতে শিখেছে। স্বাস্থ্য তাই ভাল ছিল, শরীর শক্ত ছিল। একটু যত্ন পেয়েই সে আগেকার স্বাস্থ্য ফিরে পেল—চেহারা সুন্দর হোল।

কিন্তু মন ভাল হবার কোন উপায়ই নেই। গভীর বিষাদের চিহ্ন লেগে থাকে ওই সুন্দর কচি মুখখানিতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ে—জল শুকোয়—আবার পড়ে। এমনি করে কাটে দিন।

কত লোক আসে সেই হাসপাতালে আসে না শুধু করিমের আপনার জনেরা

পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
আমার জীবন
ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি
১৯২০—১৯২৯
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পার্টির গোড়াপত্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই পুস্তকে পার্টির গোড়াপত্তনের সঙ্গে বহু ব্যক্তির ভূমিকার কথা ও বহু অনুদ্ঘাটিত চাঞ্চল্যকর তথ্য উপস্থিত করেছেন।
বিভিন্ন মহলে বহু আলোচিত বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।
সুলভ সংস্করণ ১০ টাকা / শোভন সংস্করণ ১৫ টাকা
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
শাখা : নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—১৩

কেউ। কত স্বামী তার স্ত্রীকে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে খুঁজে পায়—কত বাবা কিংবা মা তাদের ছেলে-মেয়েদের দেখা পায় এখানে—কিন্তু কই করিমকে চিনতে পেরে, বুকে টেনে নেয় না তো কেউ?

করিম যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো, তখন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল একটি রেফিউজি ক্যাম্পে। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্যাম্প। যেসব ছেলেমেয়েদের তখনও কেউ খোঁজ করেনি, তারাই রয়েছে এই ক্যাম্পে। এখানে করিমের আগের চেয়ে অনেক ভাল লাগে। এখানে ছেলেমেয়েরা সুস্থ তাই তারা কাজ করে। লেখাপড়াও কিছু কিছু শেখে, খেলাধুলোও করে। নানা কাজের ভার তাদের দেওয়া হয়। করিমের সব চেয়ে ভাল লাগে, যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবার ভার পায় সে। ছোট মেয়েদের মধ্যে করিম যেন মমতাজকে খুঁজে পায়—খুশিতে মন ভরে।

এখানেও কত লোক আসে। মাঝে মাঝে করিম দেখে, কোন কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা এসেছে—ঘুরে ঘুরে দেখছেন ক্যাম্পটি। কথা বলছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তারপর তাঁরা যখন ফিরে যান কোন একটি ছেলে কিংবা মেয়েও তাঁদের সঙ্গে চলে যায়। তারা আর কোনদিন ফিরে আসে না ক্যাম্পে। তাদের শূন্য জায়গা অন্য ছেলেমেয়েরা এসে পূর্ণ করে। করিম দেখে আর অপেক্ষা করে থাকে—কবে তার জীবনেও এমন দিন আসবে। আব্বাজান এসে বলবে—'চল করিম বাড়ি চল।' আম্মা এসে বলবে—'করিম, আয় আমার বুকে আয়।' মমতাজ আধ আধ কথায় বলবে—'দাদা আয়।' কিন্তু স্বপ্ন সবই স্বপ্ন।

একদিন ছেলেরা সবাই খেতে বসেছে। রোজ রোজ তাদের নিরামিষ খাওয়া—একদিন শুধু মাংস। কোন ছেলেমেয়েরই নিরামিষ খাওয়া ভাল লাগে না। মাছ ছাড়া যে খাওয়া যায়, তারা ভাবতেই পারতো না। সেদিনটি ছিল মাংস খাওয়ার দিন—কিন্তু খেতে বসে সবাই মাংসে ভীষণ পোড়া পোড়া গন্ধ পেলো—চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বিশেষ করে বড় ছেলেদের মধ্যে। ক্যাম্পের কর্মীরা এসে তাদেরই বকতে লাগলেন—যে রেঁধেছে আর গাফিলতিতে পুড়িয়ে ফেলেছে তাকে নয়। বেচারী করিম—সে বড় ছেলেদের দলেই—তাই তাকেও বকুনি খেতে হোল। তাদের শাস্তি হোল সেদিন শুকনো ভাত খেয়ে থাকতে হবে। দুঃখে লজ্জায় সে মাথা নীচু করে বসে রইলো। শুকনো ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর চোখের জল টপ্‌ টপ্‌ করে থালার উপর ঝরে পড়ছে।

মনে পড়ছে—রোজ দু-বেলা কাঁসি ভর্তি মাছ রান্না করতো আম্মাজান। খেতে না চাইলেই বকুনি খেতে হোত—আর আজ! তার মন ভালা মেলে দিল। চলে গেল বাংলাদেশের সেই স্নিগ্ধ শীতল বাড়িটির দিকে। বাঁশবাগানে ঘেরা বাড়ি। আম, জাম, কাঁঠালের বাগান বাড়ির পাশে। গোয়ালঘরে আম্মা গরু দোহাচ্ছে। আব্বাজান হাল কাঁধে মাঠে চলেছে—আর করিম পাঠশালা যাবার আগে মমতাজের সঙ্গে একটু খেলা করে নিচ্ছে। তার মন থেকে এই ক্যাম্পের পরিবেশ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে আছে—সে আছে—তার গ্রামেই আছে—তার বাড়িতেই আছে—নিশ্চয়ই আছে।

পিঠে কার কোমল হাতের স্পর্শ। 'আম্মা' বলে ডেকেই সে উঠে দাঁড়ালো—পিছন ফিরে তাকালো। স্বপ্ন গেল চুরমার হয়ে! কী লজ্জা! তার মুখ লাল হয়ে উঠলো—এ কী ভুল তার। ইনি কি মনে করবেন? সে ধপ্‌ করে আবার বসে পড়লো। মাথা তার আরও নীচু হোল। চোখের জলও আর বাধা মানছে না। অঝরে পড়তে লাগলো—এনামেলের থালার উপর, ভাতের উপর।

ঘুরে সামনে এসে দাঁড়ালেন যিনি পিঠে হাত রেখেছিলেন। করিমের নীচু মুখখানি দুহাতে তুলে ধরলেন—'আমিই মা—সত্যিই আমি মা। তোমারই মা হতে চাই, যদি তুমি আমাকে মা বলে ডাক—ডাকবে না? আমাকে মা হতে দেবে না?'

তাঁর চোখের জলও ঝরতে লাগলো করিমের সেই ভাতের থালাখানির উপর। দুজনের চোখের জল মিললো এক জায়গায়—মায় আর ছেলের। করিম মুখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে। কী মধুমাখা মুখখানি। উঠে দাঁড়ালো—এক মুহূর্ত, তার পরই 'আম্মা, আম্মা, আমার আম্মা' বলেই তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। তিনিও করিমকে জড়িয়ে ধরলেন।

পিছন থেকে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন—'চল, কমলা, ছেলে পেয়েছো, এবার চল ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাই।'

করিম এল তার নতুন বাড়িতে। মস্ত বড় বাড়ি—জিনিসপত্র, চাকর-বাকর কিছুরই অভাব নেই। অভাব ছিল শুধু একটি সন্তানের। তাও ছিল—তাঁদেরই ছিল একটি ছেলে। আড়াই বছর বয়স হতেই হঠাৎ একদিনের অসুখে সে মারা যায়। এই শোক এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা মায়ের পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। আর সেই থেকেই এই ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে খারাপ হয়ে যেতে থাকে। এমনকি ইদানিং ডাক্তাররাও সন্দেহ করছেন যে এমনিভাবে চললে তাঁর মাথারও গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ডাক্তারেরা বলেন তাঁর এই অবস্থার একমাত্র ওষুধ তাঁর সন্তানস্নেহ ফিরে পাওয়া। যদি কোনও শিশুকে দেখে আপন অন্তরের বাৎসল্য স্বতঃস্ফূর্ত জেগে ওঠে, তবেই তিনি আবার স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে পারবেন। মনের আনন্দ ফিরে পেলে স্বাস্থ্যও ফিরে পাবেন।

ডাক্তারদের অভিমত শুনবার পর থেকে, ভদ্রলোক নানা ছুতোয় স্ত্রীকে নিয়ে বাপ-মা-হারা ছোট ছেলেমেয়েদের অরফেনেজে, হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইদানিং অনাথ শিশুদের রেফিউজি ক্যাম্পের কথা শুনে স্ত্রীকে নিয়ে এমনি একটি ক্যাম্পে এসেছিলেন। আশা ছিল, এবার যদি কাউকে দেখে কমলা নিজের হারানো ছেলের স্থানটি পূরণ করতে পারে। তাই হোল, এই ঘুরে বেড়ানোর কাজ এবার শেষ হোল। ছোট একটি ছেলের সর্বহারা শোকের মূর্তি মহিলাটির কোমল মাতৃমনের স্পর্শ করলো। বাছারে, তোর দুঃখ আমি দূর করবো—আর তুই আমার বুকে—আমারও বুক জুড়োবে।

বাংলার মাটি ও মানুষের নিজস্ব পত্রিকা

নবান্ন ভারতী

শারদ সংখ্যা ১৩৭৮

মূল্য ৩·৫০ • সডাক ৪·৫০

ডঃ অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ সুরেশ মৈত্র, ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ রায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবধূত, অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), বেলা দেবী, প্রভাত দাস, নমিতা গাঙ্গুলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বোম্মানা বিশ্বনাথম, জ্যোতির্ময় বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম, ত্রিভঙ্গ রায়, বিনয় চৌধুরী, অবাক চৈতন্য, অমল মিত্র, পিনাকীরঞ্জন কর্মকার, শৈলেন দত্ত, শক্তিপদ রাজগুরু, বীরু চট্টোপাধ্যায়, রবিদাস সাহারায়, শান্তশীল দাস, বিনোদ বেরা, হিমাংশু জানা, রফিক আজাদ, দেবব্রত ভট্টাচার্য, অশোক দাশ, নীলমণি দাশ ও আরো অন্যান্য।

এ ছাড়া শান্তি মুখোপাধ্যায়ের দুর্লভ ফটোগ্রাফী ও অসংখ্য নিখোঁজ ছবিতে ভরপুর অভিনব শ্রেষ্ঠ শারদ সংকলন।

অগ্নিশিখা প্রকাশনী • ৪৩, নিমুগোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫

এই ভাবটিতে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠা মাত্র সব ঠিক হয়ে গেল। শান্তি এল প্রাণে।

মহিমবাবু ও কমলা তাঁদের হারানো সন্তান ফিরে পেলেন। করিমও তার মাকে বাবাকে ফিরে পেলো। করিম নয়—অরুণ-কুমার। পুরোনো জীবনের সমাপ্তি ঘটলো, নতুন জীবন শুরু হোল। অতি যত্নে, অতি আদরে অরুণকুমার বড় হতে লাগলো। স্কুলে যায়। লেখাপড়ায় সে ভাল। খেলাধুলোয় উৎসাহ, গান-বাজনা শেখে, ছবি আঁকে। এই সফলতার মধ্যে যে সুযোগই পায় তার কোনোটাই সে ব্যর্থ হতে দেয় না।

ছোট ছেলে যে ছিল করিম আর আজ যে হয়েছে অরুণকুমার, তার কাছে আগে-কার সেই ভয়ঙ্কর দিনরাতগুলো এবং তারও আগেকার সুমধুর দিনরাতগুলো সবই ধীরে ধীরে কেবল মাত্র স্মৃতিপটের ছবি হয়ে উঠছে। এই নতুন জীবনে মন হতে শৈশব-স্মৃতি তাকে সাহায্য করছে। তার মন আজ শান্ত। যা পাচ্ছে তাকেই পরিপূর্ণ সততায় অপার আনন্দে গ্রহণ করছে। নতুন পাওয়া এই বাবা, এই মা তার আপনারই জন, এতে কোনই ভুল নেই।

কি হয়েছে করিমের মা, বাবা, বোনের? সেই সে নির্মম রাতে—যখন করিম চীৎকার করে উঠেছিল, 'আম্মা নেই, মমতাজ নেই'—তখনই করিমের বাবা বুঝতে পেরেছিল তার জীবন থেকে মমতাজ ও তার মা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেল। তবুও, সেও ছিটকে কোথায় হারিয়ে গেল। পায়ে আঘাত পেয়ে করিমের বাবা সেখানেই পড়ে ছিল। কতক্ষণ কে জানে? যখন জ্ঞান হোল দেখলো মাটিতে একটা ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। জানতে পারলো তার উদ্ধারকর্তা ও আশ্রয়দাতা এক অতি গরীব মুসলমান চাষী। ক্ষতবিক্ষত দেহ দুটি পা অকর্মণ্য। করিমের বাবা চাষীভাইকে বার বার বলে—'আমাকে কোনও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর, ভাই। কেন মিছে আমাকে নিয়ে বিব্রত হচ্ছ?'

মুসলমান চাষী বলে—'আমাকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও ভাই। আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু দিয়েই তোমাকে সাহায্য করতে দাও। যদি না করি, আল্লার কাছে আমি কি জবাবদিহি দেব? মানুষ চরম নিষ্ঠুরতায় মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। যদি একটি মানুষের প্রাণও আমি বাঁচাতে পারি, তবে হয়তো আমার কাছে ক্ষমা চাইবার যোগ্য হবো—নয়তো ক্ষমা চাইবারও আমার অধিকার থাকবে না। এ পাপের কি ক্ষমা আছে ভাই?'

কতদিন কেটে গেল। করিমের বাবাকে নিজের অসহ দুঃখের বোঝা নিয়ে চুপ করে থাকতে হয়। চাষীভাইকে সে নিজের জীবনের কোনও কথাই বলে না। কি হবে বলে। চাষীভাইকে আরও বিব্রত করা হবে। সে জানে স্ত্রী আর মেয়ের খোঁজ করা বৃথা। কিন্তু করিম? তার কথাই বার বার মনে হয়। চাষীভাইকে বললে সে নিশ্চয়ই খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে কিন্তু সে কি সহজ কাজ? নিজেই সে এক বোঝা, তার উপর সে আরও এক কঠিন কাজের বোঝা চাপাবে কি করে? তাই কিছুই বলা হয় না। থাক—আল্লার হয়তো এই ইচ্ছা। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আমি নিজেই তাকে খুঁজতে যাব—যতদিন না পাবো খুঁজবো, শুধুই খুঁজবো—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আল্লার দয়া হলে নিশ্চয়ই পাব করিমকে। এমনি করে ভেবে ভেবেই তার দিন কাটে।

যেদিন করিমের বাবা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারলো সেদিনই সে বেরিয়ে পড়লো। করিমের হাতটি অনেকক্ষণ তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ছিল। তখন তারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে পশ্চিমবাংলায় এসে পড়েছিল। সেজন্যই সে আশ্রয় পেয়েছে পশ্চিম বাংলারই এই মুসলমান চাষীর বাড়িতে। করিমও তবে এখানেই আছে—পশ্চিম বাংলাতেই আছে। নিশ্চয়ই আছে আর ভালই আছে। আল্লা কি তাকে একেবারে নিঃস্ব করতে পারে? আশা হয়। প্রাণে বল আসে, পায় জোর বাড়ে।

হাসপাতালের পর হাসপাতালে খুঁজে বেড়ায়। খোঁড়া পা নিয়ে লাঠিতে ভর করে হাঁটে—কষ্ট হয়, সময় লাগে। তা লাগুক, হোক কষ্ট। সব সার্থক হবে, সব কষ্ট ভুলে যাবে যখন করিমকে সে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে।

একদিন শুনতে পেল, নানা জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্যাম্প হয়েছিল, এখনও আছে কয়েকটি। সুরু হোল তার ক্যাম্পে ক্যাম্পে যাওয়া। একটি একটি করে সে সব ক্যাম্পগুলোতে যেতে লাগলো। এসব ক্যাম্পে যেসব ছেলেমেয়েরা একবার এসেছে, কিংবা তখনও আছে তাদের সকলেরই ফোটো তুলে রাখা হয়। বলা তো যায় না—বহুদিন পরেও ছেলেমেয়েদের আত্মীয়স্বজনেরা তাদের হারানো সন্তানদের খোঁজ নিতে এসে উপস্থিত হত পারে। তখন এই ছবি থেকেই হয়তো খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে। প্রতি ক্যাম্পে ছেলেমেয়েরা তখন কে কোথায় আছে সে ঠিকানাও লিখে রাখা হয়।

খুঁজতে খুঁজতে করিমের বাবা সেই ক্যাম্পটিতেই এসে উপস্থিত হয়। যেখানে কতদিন কত রাত কত দুঃখে কেটেছিল করিমের। ক্যাম্পের কর্মীরা তাকে ঘুরে ঘুরে দেখে তার ছেলেকে খুঁজবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কোথায় করিম? নেই তো তার করিম এদের মধ্যে? নিরাশায় নিরানন্দে মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে—ঠিক সেই সময়ে একজন কর্মী অনেকগুলো ফোটো এনে তাকে দেখতে দিয়ে বললেন—'ছবিগুলি দেখতে পার—যারা এখন এখানে নেই, অন্য আশ্রয়ে চলে গিয়েছে, তাদের ছবি রয়েছে এর মধ্যে—দেখ, তোমার ছেলের ছবি থাকতে পারে।'

আবার আশা উঁকি দেয়। একটি একটি করে দেখে ছবি। না, না এটা নয়—এটা নয়, নয় এটাও। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—'পেয়েছি, পেয়েছি। পেয়েছি আমার ছেলেকে, এইতো, এইতো আমার ছেলে,—এই তো আমার করিম। বেঁচে আছে, সে বেঁচে আছে, আমার কী অসীম দয়া।'

মহিমবাবুর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে করিমের বাবা তখনই চললো সে বাড়ির খোঁজে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে। বাড়ি যে অনেক দূরে। তা সে যতই দূরে হোক—পথের শেষ হবেই। আর তারই শেষে আছে সকল দুঃখের অবসান।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। আলো আছে, করিমকে দেখতে কোন অসুবিধাই নেই। পৌঁছল করিমের বাবা, মহিমবাবুর বাড়ির গেটের সামনে।

কী বিরাট বাড়ি। কী জাঁকজমকের চিহ্ন সবকিছুতে। এখানে, এ বাড়িতে আছে করিম? অনেক দিন যে সে আছে এখানে। এঁদেরই ছেলের মতো? তবে? তবে কি সে আমাকে চিনবে? হয়তো বলবে—না, এ আমার বাবা নয়। না, না, এ হতেই পারে না। করিম কখনও এমন কথা বলবে না। খুশী হবে সে—দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার বুক জুড়াবে।

দাঁড়ালো গিয়ে গেটের এক পাশে। ঢুকবে কি বাড়ির ভিতর? মনে বড় দ্বিধা! কিন্তু কেন, কেন এ দ্বিধা? ঠিক সেই মুহূর্তে হর্ন বাজাতে বাজাতে মস্ত এক মোটরগাড়ি ঢুকছে সেই গেটের ভিতর দিয়ে।

ওই, ওই তো বসে আছে করিম। এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলার মাঝখানটিতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে করিমকে। কি খুশিতে হাসিতে ভরা মুখখানি।

এখনই, এখনই, থামাতে হবে গাড়ি। এখনই ডাকতে হবে—করিম, ওরে করিম—আমি এসেছি—আমি তোর বাবা—আমি তোকে খুঁজে পেয়েছি।

কিন্তু এ কি? মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হোল না। এত আদরের নাম সে উচ্চারণ করতে পারে না। কে যেন সজোরে বুকে এক ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো—'কি স্বার্থপর তুই! করিমকে নিয়ে যেতে এসে-ছিস? কোথায় নিয়ে যাবি? কি করবি তাকে নিয়ে? দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাকে নিয়ে লাভ কি তোর?'

ডাকা আর হোল না। পিছন ফিরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার সে পথ চলতে লাগলো। ঠিকই করেছি—আমি ঠিকই করেছি। আল্লারই এই ইচ্ছা। এমনি করেই আল্লা করিমকে মানুষ করবে—মানুষের মত মানুষ, হিংসা, দ্বেষ, পাপহীন মানুষ। দুহাত জোড় করে সে আল্লার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। করিমের উদ্দেশে আশীর্বাদ জানায়, অন্তরের নিঃশব্দ ভাষায় বলে—যাই, করিম আমি যাই। তুই ভাল হবি—খুব ভাল হবি, খাঁটি মানুষ কাকে বলে দুনিয়াকে তাই বুঝিয়ে দিবি, আমি শান্তি পাব।'

চলতে থাকে সে রাগ-রক্তিম সূর্যের দিকে চোখ রেখে যেন পলকহীন। ছেলেকে সে পেয়েছে—এবার পাবে আমিনাকে, পাবে মমতাজকে। পাবে নিশ্চয়ই পাবে তাদের। মিলবে আবার ওদের সাথে।

আর দেরী নেই—বেশী দেরী নেই। এ পথটুকু অতি সহজেই সে পার হয়ে যাবে।

এগিয়ে চলে করিমের বাবা পশ্চিম দিগন্তের দিকে—ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অস্তরবির শেষ রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে।

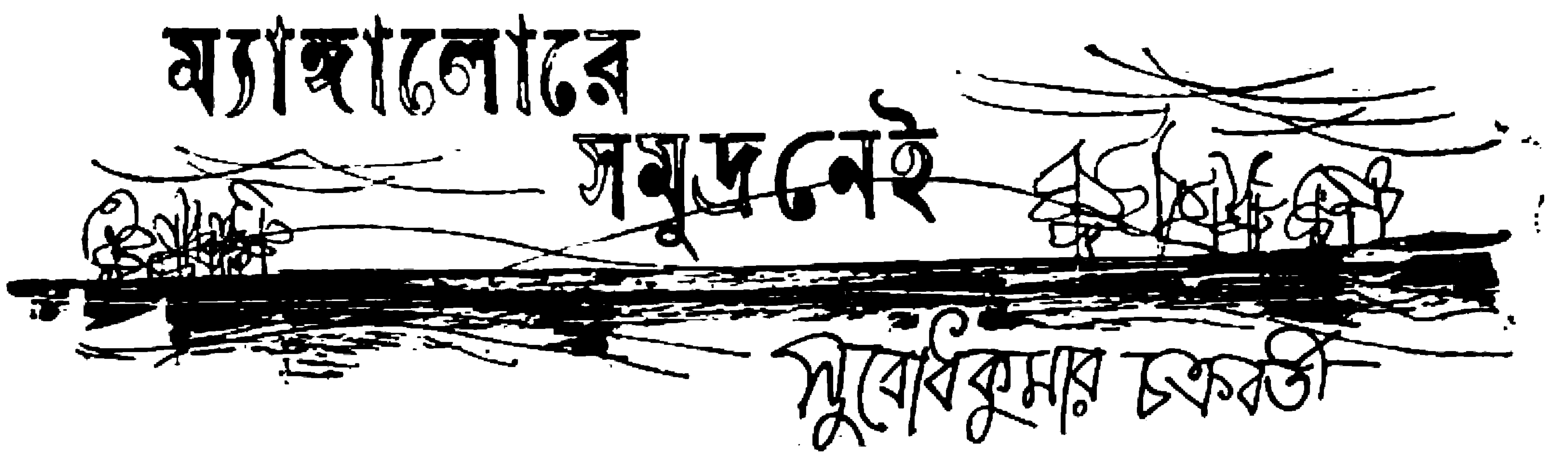

ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

দক্ষিণ ভারতের নতুন প্রাণকেন্দ্র ব্যাঙ্গালোর নয়, ম্যাঙ্গালোর। ভারতের মানচিত্র খুলে দেখুন, ঠিক আরব সাগরের তীরে একটি বিন্দু। তার নাম ম্যাঙ্গালোর। এই নামের কয়েকটা অক্ষর আরব সাগরের নীল জলের উপরেই পড়েছে। দক্ষিণে কালিকট, উত্তরে গোয়া। এরাও আরব সাগরের তীরে। ম্যাঙ্গালোর বন্দর, কিন্তু ম্যাঙ্গালোরে নাকি সমুদ্র নেই।

শৈশবে ভূগোলে পড়েছিলাম যে রাশিয়ার মস্কো থেকে ভ্লাডিভোস্টকের মধ্যে চলে সবচেয়ে দূরপাল্লার ট্রেন। কিলোমিটারের হিসাব জানি না। মাইলের হিসাবও ভুলে গেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন দূরপাল্লার ট্রেন আছে কিনা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে জেনেছিলাম যে ট্রেন না থাকলেও থ্রু কোচ আছে। পেশোওয়ার থেকে যে ফ্রন্টিয়ার মেল দিল্লী আসে, তাতে একটা ম্যাঙ্গালোরের কোচ আছে। দিল্লীতে সেই কোচ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে লাগে, তারপরে মাদ্রাজ থেকে ম্যাঙ্গালোর মেলে যায় সেই কোচ। কত মাইল পথ আর কতদিন সময় লাগে, সে সব কথা এখন মনে নেই। আর মনে থাকলেও কোন লাভ হত না। পেশোওয়ার এখন পাকিস্তানের শহর। অমৃতসর থেকে আজকাল ফ্রন্টিয়ার মেল ছাড়ে। দূরত্ব তাই অনেক কমে গেছে।

পাটনা থেকে যখন আমি দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম, তখন আমার এইসব কথা মনে এসেছিল। ম্যাঙ্গালোর কতদূর হবে, টাইমটেবল থেকে একটা আন্দাজ করেছিলাম—প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার, মাইলের হিসাবে দু হাজার মাইলের কম। ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছতে কতদিন সময় লাগবে, তার হিসাবও পেয়ে গিয়েছিলাম। চার দিনের যাত্রা। কলকাতা থেকে পুরো তিনটি দিন। অবশ্য ম্যাঙ্গালোর মেল ধরলে মাদ্রাজে একটা দিন সময় যায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সময়।

এত দীর্ঘ পথ একা কাটাবার কথা ভাবতেও ভয় হয়। পয়সা থাকলে লোকে কয়েক ঘণ্টায় উড়ে চলে যায়। আর তা না হলে রেল গাড়িতে শুয়ে — ঘুমিয়ে বই পড়ে অপরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো একটা দুরূহ ব্যাপার। অভ্যাস না থাকলে নরকযন্ত্রণা বলে বোধ হয়। আর অভ্যাস থাকলে—

না থাক সে কথা। নিজের চোখে না দেখা থাকলে বিশ্বাস হবে না আপনাদের। ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই বললে যেমন আপনাদের বিশ্বাস হবে না, এও তেমনি। মানচিত্রে সমুদ্র দেখেছেন নিজের চোখে, তেমনি রেলগাড়িতে পথ চলার অভিজ্ঞতাও আপনাদের আছে। তিন দিনের পথ ক্লান্তিকর হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য মনে হবে।

কিন্তু বলেছি তো, মোটর গাড়ি চালাবার মতো ভ্রমণ করাও শিখতে হয়। হিমালয়ের বেলায় শুধু শিক্ষার দরকার নেই। হিমালয় নিজেই শেখায়। দুর্গম পথ অতিক্রম করার শিক্ষা দুর্গম পথই শেখায়। কিন্তু রেলে বেড়াবার শিক্ষা অন্যরকম। সেই শিক্ষাও হয় রেলে বেড়াতে বেড়াতে।

আমি তো কাজ নিয়ে যাচ্ছি। আমি নিজের বার্থে শুয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু অভ্যাসের দোষেই আমি রিজার্ভেসন চার্টটা আগাগোড়া দেখি নিজের জায়গাটি খুঁজে জিনিসপত্র রাখবার পরে। কত বিচিত্র নাম, ভারতবর্ষের মতো বিচিত্র দেশের মতোই কৌতূহলজনক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই মাদ্রাজগামী ট্রেনে শুধু দক্ষিণ ভারতীয়রাই যাচ্ছে না, তাদের চেয়ে বেশি যাচ্ছে উত্তর ভারতের লোক। চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যায় এমন লোকও আছে।

হ্যাঁ, আমি একজন সর্দারজীর কথাই বলছি। তাঁর বিরাট পাগড়ি বাঁধা মাথাটি সরিয়ে নেবার পরেই পুরো চার্টটি আমি দেখতে পেলাম। এ থেকে জি পর্যন্ত সাতটি কম্পার্টমেন্ট, দুটি দু বার্থের কুপে, বাকিগুলি চার বার্থের। চব্বিশটি বার্থেই প্যাসেঞ্জার আছে। নাম ছাপা হয়েছে গোটা কুড়ি। তার কারণ, মিস্টার ও মিসেস আছেন, আর আছেন মিস্টার রঙ্গরাজন ও ফ্যামিলি। বাঙালী একজনও নেই।

তারপরে যাত্রীদের দেখবার পালা। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেখে নিলাম। সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন, কিংবা সব শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন। কেউ বা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফলের দাম করছেন, কিংবা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছেন। ট্রেনে ওঠবার সময় দু-একখানা পেপার ব্যাক বই কেনার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু সে সবই বিদেশী বই। হিন্দী বইও কিছু আছে, কিন্তু তার আভিজাত্য নেই। যাঁরা বই পড়েন, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ি থেকে বই নিয়ে বেরোন, আর যাঁরা স্টেশনে বই কেনেন তাঁরা কতকটা দেখানোর জন্যেই কেনেন। গোটা কতক পাতা উল্টেই বন্ধ করেন বই। তবে গল্প করে সময় কাটাতে চান, এমন যাত্রীর অভাব নেই। আমি সেইরকম যাত্রী খুঁজি। কখনও পাই, কখনও পাই না। এমনি অভ্যাসের দোষে যদি কেউ আমাকে খুঁজে বার করেন, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

এ যাত্রাতেও সেই রকমের ঘটনা ঘটল। গাড়ি ছাড়বার পরে কতকটা হতাশ হয়ে যখন আমি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লাম, তখন এক ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় মুখ বাড়ালেন, আর আমাকেই লক্ষ্য করে বললেন : অনেক দূর যাবেন বুঝি ?

পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলাম। আর আমার অবস্থাটা উপভোগ করে ভদ্রলোক বললেন : আপনার সঙ্গী খোঁজা দেখেই বুঝেছিলাম যে আপনি দূরের যাত্রী।

নিজের বার্থে একটু সরে বসে আমি বললাম : বসুন।

ভদ্রলোক বসবার জন্যেই এসেছিলেন, বসে বললেন : কোন বাঙালী নাম না দেখেই দমে গিয়েছিলেন, কিন্তু কলকাতায় অনেক বাঙালী-মাদ্রাজী আছে। বাপের দেওয়া মাদ্রাজী নামটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তারা বাঙালী।

এঁর নামই যে রঙ্গরাজন তা আমি বুঝতে পারলাম। তার কারণ এঁর সঙ্গে স্ত্রী ও এক কন্যা আছে যাদের আমি তাঁর কামরার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসে-

ছিলাম। খুব অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তিনি আমার নাম নিবাস পেশা ইত্যাদি সব কথাই জেনে নিলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন। দেখলাম যে এইখানে তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটু প্রভেদ আছে। আমরা বাঙালীরা দুদিন একসঙ্গে থেকেও যে সব প্রশ্ন করা সৌজন্য বিরুদ্ধ বলে ভাবি, এঁরা তা পরিচয়ের প্রথমেই জেনে নেন, এবং নিজের পরিচয়ও দেন অকপটে। আলাপ সহজ হয়ে যায়, অন্তরঙ্গ হয়, এবং অনেক সময়েই উভয়ের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বললেন : কদিন থাকবেন ম্যাঙ্গালোরে ?

বললাম : থাকা কি আর হবে! কাজ হলেই ফিরে আসব।

কিছু দেখবেন না সেখানে!

বললাম : সময় পেলে সমুদ্র দেখে আসব।

সমুদ্র !

বলে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রঙ্গরাজন, তারপরে বললেন : ম্যাঙ্গালোরে পাহাড় দেখতে চাইলে পাহাড় দেখতে পাবেন, কিন্তু সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা হলে নৌকোয় চেপে সমুদ্রের ধারে যেতে হবে।

মানে ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

আর তিনি বললেন : মানে বুঝতে পারলেন না! পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ছিটে-ফোঁটা প্রায় সর্বত্রই আছে, কিন্তু শহরটি হল নেত্রবতী নদীর তীরে। সেই নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

আমি বললাম : নদীর নামটিতো মিষ্টি।

রঙ্গরাজন বললেন : নদী একটি নয়, দুটি নদী ম্যাঙ্গালোরে—নেত্রবতী ও গুরুপুর। এই দুই নদী মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। ম্যাঙ্গালোর শহর হল নদীর তীরে, সমুদ্র শহর থেকে অনেক দূরে।

জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর তাহলে কোথায় ? সেও কি নদীর ধারে ?

ভদ্রলোক বললেন : বন্দর দেখতে হলে বাসে চেপে যেতে হবে। মাইল দশেকের কম নয় সেই পথ।

সমুদ্রের দূরত্ব শুনে আমি বললাম : যাক, সমুদ্র তাহলে আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : সমুদ্র দেখার শখ থাকলে কোঝিকোড় নামবেন।

সে আবার কোথায় ?

বলে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি সহাস্যে বললেন : ইংরেজী বানান কোঝিকোড, আর আপনারা বলেন কালিকট। পুরাকালে ভাস্কোডাগামা এসে যেখানে নেমেছিলেন সেই বন্দর।

তারপরে বললেন : এই শহরের পারেই হল সমুদ্র। স্টেশন থেকে একখানা অটো রিক্সায় চেপে সমুদ্রের ধারে বালির উপরে গিয়ে বসুন, সূর্যাস্ত দেখুন, আর দেখুন মানুষজনের মেলা। সমুদ্র দেখবার শখ মিটবে সেখানে।

আমি বললাম : কালিকটে নামা কি আর সম্ভব হবে!

কেন হবে না !

বলে ভদ্রলোক আমাকে বোঝালেন : কালিকট তো আর অন্য পথে নয়। ম্যাঙ্গালোরের পথেই কালিকট। এক ট্রেন থেকে নেমে আর এক ট্রেনে এগিয়ে যাবেন। ট্রেনের কোন অভাব নেই।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এ যাত্রা আমার বেড়ানোর উদ্দেশ্য নয়, কাজ নিয়ে যাচ্ছি। কাজের পরে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখব। তাড়াতাড়ি কাজ চুকে গেলে অবশ্য অন্য কথা।

ভদ্রলোক বললেন : আর একটা কাজ করতে পারেন। তাহলে আরও ভাল লাগবে আপনার।

কী কাজ ?

মাদ্রাস থেকে ম্যাঙ্গালোর মেল ধরবেন না, চলে যান ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাসে চলে যান ম্যাঙ্গালোরে। পথের শোভা দেখে মন ভরে যাবে।

আমি যখন আমার রিজার্ভেশনের কথা ভাবছিলাম, ভদ্রলোক তখন আমাকে সাহস দিয়ে বললেন : ভাববার কিছু নেই, বুঝলেন! ভোরবেলায় মাদ্রাস পৌঁছে ওপরতলার ওয়েটিং রুমে চলে যাবেন, আর ব্রেকফাস্ট করবেন পাশের রিফ্রেশমেন্ট রুমে। তারপরে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরবেন। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস পেলে তো কথাই নেই, ও অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল ট্রেন, দিল্লীর যেমন তাজ এক্সপ্রেস আর বম্বের ডেকান কুইন।

তারপর ?

তারপর ব্যাঙ্গালোরের রিটায়ারিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ম্যাঙ্গালোরের বাস ধরুন, কিম্বা রাতের ট্রেনেই মাইসোরে গিয়ে সকালবেলায় বাস। সন্ধ্যাবেলায় কেন, বিকেলেই পৌঁছে যাবেন ম্যাঙ্গালোরে। ট্রেনে গেলেও আপনার এই সময় লাগবে। তবে—

বলে তিনি ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন : সকালবেলায় ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরলে অবশ্য আগেই পৌঁছতে পারবেন। সে ট্রেন ম্যাঙ্গালোরে বোধ হয় সকালেই পৌঁছয়। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

এ ট্রেন সময়মতো না পৌঁছলে কানেকশন মিস হতে পারে। এত দূরের যাত্রা, বুঝতেই পারছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের তীরে মাদ্রাজ শহর। আর ম্যাঙ্গালোর পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে। এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হবে। ট্রেন দক্ষিণে নেমে পশ্চিম প্রান্তের কোচিনের দিকে গেছে। তারপর মালাবার উপকূল ধরে উঠেছে উত্তরে। আর ব্যাঙ্গালোর হল দেশের মাঝখানে, মাঝ পথে। ট্রেনে সেখানে গিয়ে বাসে যেতে হয় ম্যাঙ্গালোর।

রঙ্গরাজন কিন্তু থামলেন না, বললেন : ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে আর বেশি-দিন বাসে যেতে হবে না। হাসান পর্যন্ত ছোট লাইন আছে, হাসান থেকে ম্যাঙ্গালোর লাইন পাতা হচ্ছে দ্রুতগতিতে। আর কিছু-দিন পরেই ট্রেন চলবে। তখন ব্যাঙ্গালোরে রাতের গাড়িতে চেপে সকালবেলায় ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছবেন।

দেশ দেখতে বেরোলে এসব কথা শুনতে ভাল লাগে। আমি ভাবছিলাম আমার কাজের কথা। নির্দিষ্ট দিনে আমাকে পৌঁছতে হবে। তাই বললাম : এখন কোন রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।

কেন ?

যানবাহনের গোলমালে পৌঁছতে দেরি হলেই কেলেঙ্কারি।

ট্রেনেও তো দেরি হতে পারে!

তার জন্যে আমি দায়ী হব না। দায়ী হবে ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষের উপরে দোষারোপ করে নিস্তার পেয়ে যাব।

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন : হুঁ। চাকুরে লোক বলেই আমাদের চিন্তার ধারাটা এইরকম। নিজের কাজ হলে অন্য কথা ভাবতাম।

এই মন্তব্যের ভিতরে একটা খোঁচা আছে, কিন্তু কথাটা সত্যি বলেই তার বলবার নেই। আর ভদ্রলোক যে কোনও আঘাত দেবার জন্যে একথা বলেননি, তা বুঝতে পারলাম তাঁর পরের কথায়। বললেন : তবে একটা কাজ করুন।

বললাম : বলুন।

যেমন ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ভাবেই যান। বরং ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারলে তাই ধরুন। বিকেলের বদলে সকালে পৌঁছতে পারলে আপনার আরও সুবিধা হবে। কাজকর্ম হয়তো আগেই মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। ফেরার পথে আসুন ব্যাঙ্গালোর হয়ে।

আমি বললাম : এ খুব ভাল পরামর্শ।

ভদ্রলোক পুলকিত হয়ে বললেন : পরামর্শ যে আমি ভাল দিই, এ কথা সবাই বলে। আর যদি একটা দিন আপনি বেশি খরচ করেন তো এমন পরামর্শ দিতে পারি যে আপনি লাফিয়ে উঠবেন।

ভদ্রলোকের দুর্বলতা আমি ধরে ফেলেছি। বললাম : সত্যি নাকি!

রঙ্গরাজন এবারে তাঁর জুতো খুলে বার্থের উপরে পা তুলে বসলেন। ওধারের বার্থে বসেছিলেন তিনজন, তাঁদের দুজন ওপরের বাঙ্কের মালিক। এখন সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছেন। আর যিনি জানালার ধারে বসেছিলেন, তিনি চোখ বুজে বাইরের বাতাস উপভোগ করছেন। রঙ্গরাজন তাঁদের দিকে দৃক্‌পাত করলেন না, বললেন : আপনার ধর্মের টান বেশি, না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনি বেশি ভালবাসেন ?

উত্তর দিতে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আর আমার এই দ্বিধা দেখে ভদ্রলোক যেন বেশি খুশী হলেন, বললেন : দুটোর কথাই আপনাকে বলছি।

আমি বললাম : সেই ভাল।

রঙ্গরাজন বললেন : আপনাদের জাতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকেই বেশি আকর্ষণ দেখেছি। বিশেষভাবে আপনার মতো একা

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুসকি একেবারে সাফ ক'রে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুসকি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুসকির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2180

মন্দিরের আমি তীর্থযাত্রা করতে দেখিনি। আপনারা সস্ত্রীক তীর্থ করুন, তাই না?

এ কথা আমি মেনে নিতেই ভদ্রলোক বললেন: তবে আপনি সকালের প্রথম বাস ধরে ম্যাঙ্গালোর থেকে কুর্গের মার্কারা চলে আসুন। আড়াই শ পঁচাশি মাইল পথ, সময় লাগবে ঘণ্টা তিনচার। কেমন উঠতি পাহাড়ী পথ, দেখে ভাল লাগবে আপনার। ইচ্ছা হলে এক রাত থাকুন, না হয় শেষ বাসে মাইসোর চলে আসুন, কিংবা হাসানে। মাইসোর পঁচাত্তর মাইল, আর হাসান বোধহয় আরও কাছে। ট্রেন ধরে ব্যাঙ্গালোরে এসে বড় লাইনের গাড়িতে মাদ্রাসে চলে আসুন। যাবার পথে মাদ্রাসেই ফেরার রিজার্ভেশনটা করে নেবেন, আর কোন ভাবনা থাকবে না।

আমি বললাম: খুব চমৎকার আইডিয়া। এই সুযোগে কুর্গ দেখা না হলে জীবনে আর এ রকম সুযোগ আসবে না।

রঙ্গরাজন আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন: কোডাভালের দেশ এই কুর্গ। পাহাড়ী দেশ। পাহাড়ের গায়ে কফির চাষ, গোলমরিচ আর এলাচ। বড়লোক সব প্লাণ্টার, দুর্ধর্ষ সৈনিক, ভারতের প্রধান সেনাপতিরা এসেছেন এই দেশ থেকে। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসনেও এরা নিজেদের ঐতিহ্য হারায়নি।

মনে মনে আমি ঠিক করে ফেললাম যে সুযোগ পেলে কুর্গের উপর দিয়েই ফিরব। কিন্তু কিছু বলার আগে রঙ্গরাজনই বললেন: যদি পারেন তো তলাকাবেরী না দেখে ফিরবেন না।

তলাকাবেরী নাম আমি আগে শুনিনি। বললাম: এ কোন্ জায়গা?

রঙ্গরাজন বললেন: কাবেরী নদীর নাম নিশ্চয়ই জানেন।

বললাম: জানি।

রঙ্গরাজন বললেন: কাবেরীর উৎস হল তলাকাবেরীতে। মার্কারা থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে ব্রহ্মগিরি পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে কাবেরী নেমেছে। জনপ্রিয় তীর্থস্থান এটি, বাসেই যাতায়াত করা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি বুঝি এই তীর্থের কথা বলছিলেন?

না।

বলেই ভদ্রলোক পা নাচালেন শান্ত ভাবে। দরজার দিকে আমি চেয়ে দেখলাম যে একটি মেয়ে এসে দেখা দিয়েই সরে গেল।

পরে কথা হবে।

বলে ভদ্রলোক তৎপর ভাবে বিদায় নিলেন।

আমি ভেবেছিলাম যে ভদ্রলোক আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এলেন না। অনেক আগেই অন্ধকার নেমেছিল বাহিরে, ক্রমে সেই অন্ধকার গভীর হল। যাঁরা বই পড়ছিলেন, তাঁরা বই মুড়ে রাখলেন। যাঁদের সঙ্গে খাবার ছিল, তাঁরা খাবার খেয়ে নিলেন। বৃন্দাবনপুরে খাবার এল আমাদের। আমরাও খেয়ে নিলাম। তারপরে শোবার পালা। বাথরুম থেকে আসবার সময় আমি একবার রঙ্গরাজনের কামরার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে কামরা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেও আমি রঙ্গরাজনের দেখা পেলাম না। ব্রেকফাস্টের পরে খবরের কাগজ খানা আমার শেষ হয়ে গেল। বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, প্রসন্ন রোদে চারিদিক এখন ঝলমল করছে। আজ সারা দিন আমার এই গাড়িতেই কাটাতে হবে। আমার সঙ্গীরা সবাই স্বল্পভাষী। আজ তাঁরা অবসরের জন্য বই খুলেছিলেন। তারপর উপরে উঠে আবার শুয়ে পড়েছেন। শুয়ে সময় কাটানোই সবচেয়ে সহজ মনে হয়েছে তাঁদের।

কিন্তু এ সময়ে আমার শোবার ইচ্ছা হল না। পলাসোয় চা খেয়েছি, বিজয়নগরমে প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম। ওয়ালটেয়ারে লাঞ্চ পাওয়া যাবে। তার আগে স্নান করে নেব, খেয়ে দেয়ে ঘুম। রাজামন্দ্রীতে চোখ মেলে চা খাব, তার পরে বিজয়ওয়াড়ার বিরিয়ানি খেয়ে আবার ঘুম। এ সময়টায় রঙ্গরাজনকে পেলে গল্প করে খানিকটা সময় কাটানো যেত।

বিজয়নগরম থেকে ট্রেন ছাড়বার পর আমি তাঁদের কামরার দিকে আবার মুখ বাড়ালাম। ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন, আর তাঁর স্ত্রী বোধ হয় স্নান করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ভদ্রলোক এমন নির্বিকার যে আমাকে যেন দেখতেই পেলেন না।

নিজের কামরায় ফিরে এসে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। সহসা ভদ্রলোক এমন বদলে গেলেন কেন! কাল তো নিজেই এসেছিলেন গল্প করতে। আজ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না!

কিন্তু বেশিক্ষণ এ সব কথা ভাববার অবকাশ পেলাম না। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় ঢুকলেন, বললেন: কাল একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন: ম্যাঙ্গালোর থেকে যদি আপনি হাসান হয়ে ফেরেন তো একটি দিন আপনাকে হাসানে থাকতেই হবে। এক বাস থেকে নেমে আর এক বাস ধরলে চলবে না। শুধু বাসে চেপে হাসানের উপর দিয়ে চলে আসাও আমি সমর্থন করব না।

ভদ্রলোক যে আমার ভ্রমণের কথাই ভাবছেন, এ কথা জেনেই আমি বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম। হাসানে কেন নামতে হবে, সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল খুবই কম ছিল। কিন্তু রঙ্গরাজন আমার কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে বললেন: হাসানের কাছাকাছি দুটি এমন সুন্দর মন্দির আছে যে তা দেখে না এলে আপনার দক্ষিণ ভারতে আসা ব্যর্থ হয়েছে মনে হবে।

ভদ্রলোককে আমি আমার পাশে বসবার জন্যে জায়গা দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ তিনি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন: বেলুর আর হালেবিদ—হয়শাল রাজাদের তৈরি এই দুটি মন্দিরের তুলনা সারা ভারতে বোধহয় নেই। অথচ এ দুটি মন্দির দেখতে আপনার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। হাসান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এই মন্দির দুটি দেখে আসতে আপনার এক বেলা সময় লাগবে, আর পুরো দিনটা থাকলে শ্রবণবেলগোলাও দেখে আসতে পারবেন। শ্রবণবেলগোলার নাম শুনেছেন তো?

আমি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক বললেন: ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় গোমটেশ্বরের জৈন মূর্তি। একটা পাথর থেকে কেটে বার করা এত বড় মূর্তি নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বলে ভদ্রলোক নিজের কামরার দিকে একবার তাকালেন।

আমি বললাম: দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

রঙ্গরাজন এ কথার উত্তর দিলেন না, বললেন: আর একটা কথাও এই সময়ে বলে রাখি।

বলুন।

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে সাগ্রহে তাকালাম।

তিনি বললেন: ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত গিয়ে উড়িপি না দেখে ফিরবেন না। এ রকমের সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। উড়িপি জানেন তো?

উড়িপি নামটা চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু কী প্রসঙ্গে শুনেছিলাম তা মনে পড়বার আগেই ভদ্রলোক বললেন: উড়িপি হল মাধবাচার্য স্বামীর সাধনার স্থল। কৃষ্ণের মন্দির আছে। খুবই বড় তীর্থ। ম্যাঙ্গালোর থেকে বাসে যেতে হয় উত্তরে। ট্রেন যায় না।

চৈতন্য দেবের তীর্থ পরিক্রমায় বোধ হয় উড়িপির কথা শুনেছি। উড়ুপ কৃষ্ণের কথা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে আমি বললাম: আপনি দেখছি অনেক জায়গা দেখেছেন!

ভদ্রলোকের দুচোখ চক চক করে উঠেই সহসা নিবে গেল। একটু বিমর্ষ ভাবে বললেন: অনেক জায়গা আর দেখলাম কোথায়!

বলে বলতেই দরজার কাছ থেকে সরে গেলেন। আর ফিরলেন না।

ওয়ালটেয়ারে নতুন স্টেশন হয়েছে। সীমাচলমের পরে ওয়ালটেয়ার স্টেশন। সীমাচলমের পাহাড় দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু পাহাড়ের উপরে নৃসিংহদেবের মন্দির দেখতে পাই নি। তেমনি ওয়ালটেয়ার শহরটি সমুদ্রের উপরে। কিন্তু ট্রেন থেকে সমুদ্র দেখতেও পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে শুয়ে পড়লাম। দুপুরের আহারের পরে ঘুমটা ভালই হল।

বিকালে চায়ের অভাবে দেওয়াই ছিল। রাজামন্দ্রীতে চা পাওয়া গেল। তারপরে গোদাবরী নদীর পুল পেরোলাম। এত বড় রেলের পুল নাকি এ দেশে আর একটি আছে, সেটি ডেহরি অন শোন নদীর পুল। দিল্লী যাতায়াতের পথে সে পুল আমরা আধারাতে রাতে পেরোই বলে দেখতে পাইনে।

তারপরে একটু একটু করে অন্ধকার নামল। রঙ্গরাজন আর আমাদের কামরায় এলেন না।

বিজয়ওয়াড়ায় যাবার পরে আর একবার দেখা হল রঙ্গরাজনের সঙ্গে। বাথরুম থেকে তিনি যখন বার হচ্ছিলেন, আমি তখন দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম: সারাদিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন, তা না হলে আপনার কাছে আরও অনেক খবর পাওয়া যেত। —

CENTRAL LIBRARY

ভদ্রলোক যেন দুঃখ পেলেন আমার কথায়। বড় কাতর দেখাল তাঁর দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করলেন : কবে ফিরছেন আপনি?

তারিখটা আমি জানালাম। বললাম : মাদ্রাস থেকে রিজার্ভেসনের জন্যে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

ভদ্রলোক এক মুহূর্তে পুলকিত হয়ে উঠলেন, বললেন : তবে ঠিক আছে।

কেন বলুন তো!

আমরাও ঐ দিনে ফিরব।

দেশে থাকবেন না কিছু দিন?

তিনি বললেন : দেশে যাচ্ছি না তো, যাচ্ছি তিরুপতি। মেয়ে বড় হয়েছে, তার একটা বিয়ে দিতে হবে। ভেঙ্কটেশ্বরের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসব।

বলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুতপদে নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন।

রঙ্গরাজনের সঙ্গে যে কাল আর দেখা হবে না আমি তা জানতাম। মাঝরাতে গুন্টকল্ গাড়ি বদল করে তাঁরা তিরুপতি যাবেন। আর ভোর বেলায় আমরা পৌঁছব মাদ্রাসে। ফেরার পথে আবার দেখা হবে কিনা কে জানে।

ভোরবেলায় প্রায় সময় মতোই আমরা মাদ্রাসে পৌঁছলাম। রঙ্গরাজনের পরামর্শ মতো উপরের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে উপরেই ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। তার পরে এলাম নিচের রিজার্ভেসন অফিসে। রঙ্গরাজন ঠিকই বলেছিলেন। ওয়েস্টকোস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ে বেলা একটায়। আর ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছয় ভোর বেলায়। চেষ্টাচরিত্র করে এই ট্রেনেই রিজার্ভেসন পাওয়া গেল। লাঞ্চ সেরে আমি আবার ট্রেনে উঠে পড়লাম।

এবারে আর ঘুমোবার কথা মনে আসছে না, মনে আসছে রঙ্গরাজনের কথাই। গোটা একটা দিন আমার বেঁচে গেল। তবে কি সমুদ্র দেখবার জন্যে কালিকটে নামব। না উডিপি দেখে আসব ম্যাঙ্গালোর থেকে? কুর্গের কথাও আমার মনে এল, বাড়তি দিনটা আমি ইচ্ছা করলে কুর্গে কাটাতে পারি।

আমাদের ট্রেন এখন পশ্চিম মুখো চলেছে। একটার পর একটা বড় জংশন আসছে। বোম্বে যেতে হলে আরকোনাম থেকে উত্তরে যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোর যেতে হয় জোলারপেট থেকে, কোইম্বাতুর থেকে উটি আর শোরানুর থেকে কোচিনের পথ। এ ছাড়াও অনেক ছোট-বড় জংশন আছে, ছোট ও বড় লাইনের গাড়ি। ইরোড পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হল, ডিনার পাওয়া গেল কোইম্বাতুরে। তারপর ঘুম।

ঘুম ভেঙে দেখলাম যে ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছতে আর দেরি নেই। তাড়াতাড়ি আমি তৈরি হয়ে নিলাম। একটা ভ্রমণের বাসনা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা তাই আরো ছিল না।

ট্রেন এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। নেমে দেখলাম যে একটা বেশ পুরনো স্টেশন। দক্ষিণ রেলের শেষ স্টেশন এটি। কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন মনে হল না। কুলিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে, কিন্তু রেস্তোরাঁ নেই, লাইট রিফ্রেশমেণ্টের ব্যবস্থা আছে। ভাবলাম, দরকার নেই স্টেশনে থেকে। বাইরে একটা অটো-রিকসা ধরে আমি একটা হোটেলে গেলাম।

বেশ বড় শহর। দোকান-পাট বাজার জমজমাট হয়ে উঠল খানিকক্ষণ পরেই। যানবাহন প্রচুর, বাস চলাচল করছে। কলকাতাকে বাদ দিলে বাংলাদেশে এ রকম শহর আমরা দেখতে পাই নে।

আমার কাজ যে এমন সহজে মিটে যাবে, একথা আমি ভাবতে পারিনি। বিকেলের রোদ পড়বার আগেই আমার ছুটি হয়ে গেল।

যাদের সঙ্গে কাজ ছিল, তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম : শহরে কী দেখবার আছে?

সেই পরিচিত বিস্ময় দেখলাম ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে। অন্যত্র যেমন শুনেছি, এখানেও তেমনি শুনলাম : এখানে আর দেখবার কি আছে?

সমুদ্র?

সমুদ্র! সমুদ্রে কী দেখবেন! আর শহরে তো সমুদ্র নেই!

বললাম : তা হলে?

ভদ্রলোক বললেন : ম্যাঙ্গালোরে দেখবার কিছু নেই। কিছু দেখতে হলে আপনাকে দূরে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম : কত দূরে?

দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক খবর দিলেন। বললেন : উডিপি যেতে পারেন।

সে কত দূরে?

আবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তিনি। তারপরে বললেন : মাইল পঞ্চাশেক দূরে। কাল গেলে পরশু ফিরতে পারবেন।

কালই ফিরতে পারব কিনা, এ কথা আর জানতে চাইলাম না। ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

পথে নেমে আবার আমার রঙ্গরাজনের কথা মনে পড়ল। রঙ্গরাজনের মতো একজন সঙ্গী থাকলে আমার কোন ভাবনা ছিল না। সাগ্রহে তিনি যে আমাকে সব-কিছু দেখিয়ে আনতেন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। নিজের কাজের ক্ষতি স্বীকার করেও হয়তো এ কাজ করতেন।

এই শহরে সাইকেল রিকসা খুব ছুটোছুটি করছে। একটা রিকসা ধরে তারই উপরে উঠে বসলাম।

কোথায় যেতে হবে?

বললাম : নদীর ধারে।

রঙ্গরাজন আমাকে নেত্রবতী নদীর নাম বলেছিলেন। আর বলেছিলেন গুরুপুর নদী। কোনটা কাছে আর কোনটা দূরে তা জানি না। নদীর ধারে শহর। এ কথাটা মনে ছিল বলেই আমি নদীর কথা বললাম।

অনেকটা পথ ঘুরে, ফিরে, আমি নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। খেয়াঘাট এটি। মোটর লঞ্চ পারাপার করছে, দেশী নৌকোও আছে। কিন্তু সেসব ঠিক ওপারে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অনেকটা দূরে। সেখানেও বোধ হয় বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে।

সমুদ্রের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম যে এইসব নৌকোয় চেপে সমুদ্র দেখে আসা যায়। মোটর লঞ্চ তখন ছেড়ে গেছে, দেশী নৌকো ছাড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি না। আমি নৌকোয় চেপে সমুদ্র দেখতে যাবার কথায় উৎসাহ পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর কত দূরে।

উত্তর পেলাম, বন্দরে যেতে হলে আমাকে শহরের বাস-স্ট্যাণ্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

রঙ্গরাজনও আমাকে এই কথাই বলেছিলেন। সমুদ্রের চেয়ে নাকি পাহাড়

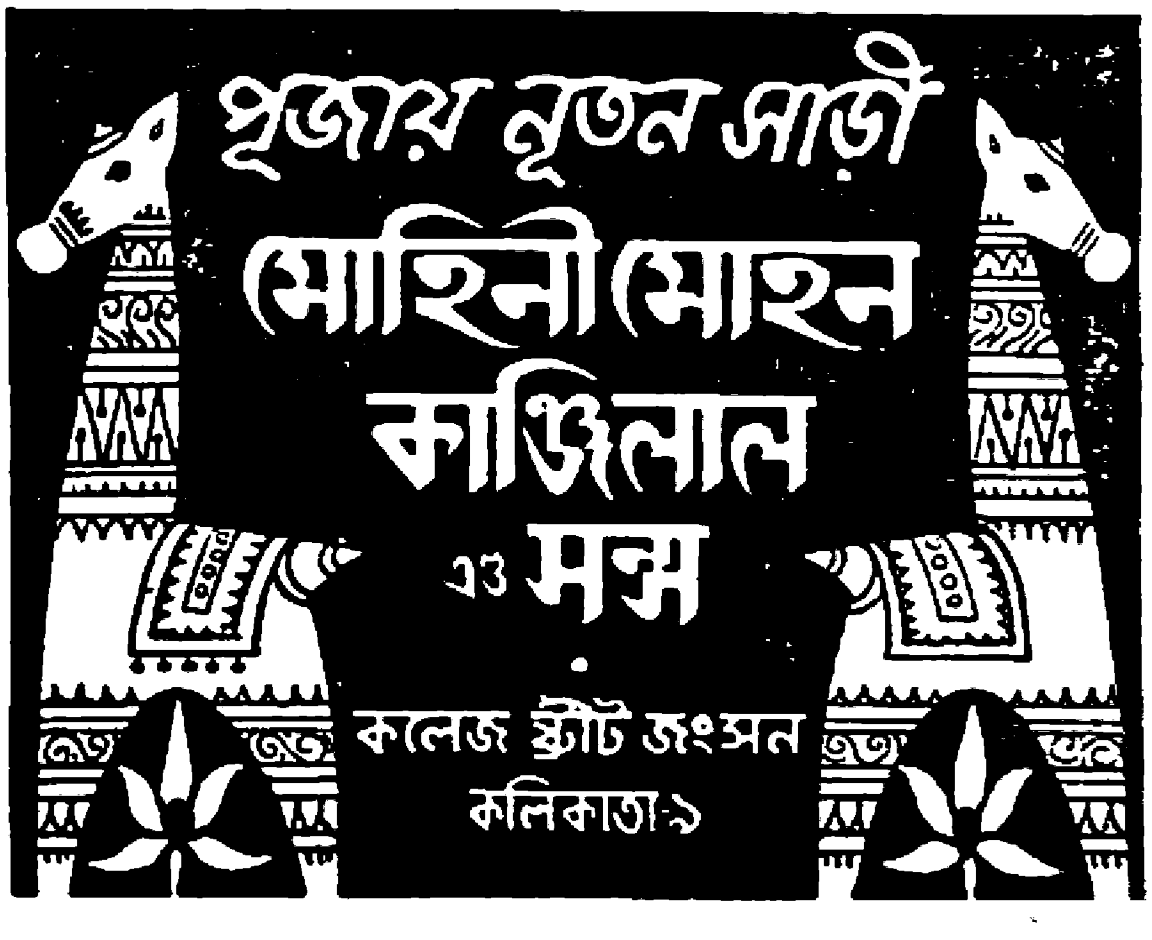

কছে। কিন্তু কোনও পাহাড় দেখতে পাই নি বলে সে কথাও জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর তখনই পেয়ে গেলাম ঃ কাদ্রি পাহাড়। সে বেশি দূরে নয়। ঐ রিকসায় চেপে চলে যান, মঞ্জুনাথ শিবের মন্দিরও দেখতে পাবেন।

তাহলে শিবের মন্দিরই দেখা যাক।

বন্দ সমুদ্রের দিকে না গিয়ে আমি একখানা অটো-রিকসায় পাহাড়ের দিকেই চলে গেলাম।

শহরের উপকণ্ঠে এই কাদ্রি পাহাড়, মাথা নিচু করে একটি মন্দিরকে যেন ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ঘরবাড়ি, নারিকেলের বন। আর নিচে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মাঝে মন্দির। তার সাদা চূড়া দিনান্তের আলোয় ঝলমল করছে। ব্যারাকের মতো যে গৃহ মন্দিরের চারদিক ঘিরে আছে, কেরালায় তাকে বলে নালাম্বলম। কিন্তু ম্যাঙ্গালোর হল দক্ষিণ কানাড়ার শহর। এখানে তার কী নাম তা জানিনে। কানাড়া ভাষী এই অঞ্চল মহীশূর রাজ্যের ভাগে পড়েছে, আর দক্ষিণের মালাবার অঞ্চল পড়েছে কেরালার ভাগে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের সময় এই সব অঞ্চল ভাগাভাগি হয়েছে নতুন মানচিত্রে। সব সময় আমরা সব কথা মনে রাখতে পারি নে।

মন্দির দেখে যখন বাইরে এলাম, তখন একটা ভুল বুঝতে পারলাম নিজের। অটো-রিকসাটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে যে রিকসা পাওয়া যাবে না, সে-কথা তখন মনে হয় নি। তাই এবারে নির্জন পথ ধরে আমাকে হাঁটতে হল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল নেমে। নির্জন পথ হল নিস্তব্ধ। পথের দুধারের ঘরবাড়িতে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু রিকসা মিলল না একটাও। পথের দূরত্বের একটা অনুমান ছিল আমার, তাই কোন দুর্ভাবনা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতেই আমি শহরের পথে পৌঁছে গেলাম। তারপরে একটা রিকসা পেয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

রঙ্গরাজন আমাকে ঠিকই বলেছিলেন। ভোর ছটা থেকেই মার্কারার বাস ছাড়ে। মার্কারা হল কুর্গের রাজধানী। ছোট পাহাড়ী শহর যে দিনে দিনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, তারই পরিচয় পেলাম বাসে উঠে। বহু যাত্রী নিত্য যাতায়াত করে। চুরাশি মাইল পথ সাড়ে তিন ঘণ্টাতেই পৌঁছে দেয়।

এই রাজ্যের অধিবাসীদেরও দেখলাম। এদের কোডাগু বলে। কিন্তু নীলগিরির টোডাদের মতো আদিবাসী এরা নয়। এরা সভ্য শিক্ষিত জাত, ভারতের যে কোন রাজ্যের অধিবাসীদের মতো। কিন্তু বীরত্বের গৌরব এদের অন্য রকম।

মার্কারা থেকে মাইশোরের পথে আমি ম্যাড্রাসে ফিরলাম। মোটর বাসে মাইশোর পঁচাত্তর মাইল, তারপর ছোট লাইনের ট্রেনে ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে বড় লাইনের গাড়িতে এলাম মাদ্রাস।

আমি ভাবতে পারিনি যে রঙ্গরাজনের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মাদ্রাসের ওয়েটিং রুমে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রঙ্গরাজনই আমাকে আগে দেখেছিলেন। দম দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

প্রথমে তিনি আমার সব কথা জেনে নিলেন, তারপর বললেন, নিজের কথা।

তিরুপতি থেকে তাঁরা এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন এক্সপ্রেস গাড়িতে। আমরা একসঙ্গেই ফিরব।

হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র দেখেছেন?

বললাম, না। কিন্তু আপনার কথা মতো পাহাড় দেখেছি।

মঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখেছেন, যাঁর নামে শহরের নাম হয়েছে ম্যাঙ্গালোর?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, এ মন্দিরের কথা তো আপনি আমাকে বলেননি?

দেখেননি? গণপতির মন্দির?

তাও দেখিনি।

সুলতানস ব্যাটারি নিশ্চয়ই দেখেছেন? টিপু সুলতানের দুর্গ? এ সবতো শহরের মধ্যেই ছিল।

বললাম, এসব দেখবার কথা তো কেউ আমাকে বলেননি!

ভদ্রলোক বললেন, তবে নিশ্চয়ই জৈন-তীর্থ মূর্দবিদ্রির আর উডিপির পথে কারকলার বিরাট গোমাতা মূর্তি দেখে এসেছেন!

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

রঙ্গরাজন বললেন, তাহলে বোধহয় অন্য ধারে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন?

আমি না বলতেই ভদ্রলোক বললেন, তবে এ কদিন আপনি কী দেখে এলেন?

আমি বললাম, যতটুকু বলেছিলেন, ততটুকুই দেখে এসেছি। আপনার পরামর্শ মতো ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরে যাবার জন্য একটা দিন সময় বেশি পেয়েছিলাম। তাই ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, তেমনি করে কুর্গ রাজ্যটা দেখে এসেছি। এই যাত্রার এইটিই আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে।

আমার এই কথায় প্রচুর আত্মপ্রসাদ পেলেন ভদ্রলোক। তারপরে নিজের স্ত্রী-কন্যার দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাষায় গড়গড় করে যা বলে গেলেন তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, স্ত্রীলোকের এই একটা দোষ। নিজেরাও কিছু জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না। আর ভাবে যে পুরুষেরা সুবিধা পেলেই মিথ্যা কথা বলে। তা বলব কেন! নিজের জানা থাকলে বলব, না থাকলে বলব না। তা নয়, আমাকে এরা ধরল যে কোনও কথা বলতে পারব না। তীর্থ করতে যাচ্ছি। কথা বললেই যখন মিথ্যা বলব, তখন বলবার দরকার কি। আপনার যে কিছুই দেখা হল না, তাতে কোন পুণ্য হল আমার।

ভদ্রমহিলাও বোধহয় বাংলা বোঝেন, অল্প অল্প, লজ্জিতভাবে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর কৌতুকের হাসি দেখলাম তাঁর কন্যার মুখে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

দুঃস্বপনের দিন

'সেকালের আদর্শবাদী মুরুব্বিরা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন চালে আর ডালে মিশিয়ে। মুসলমানে আর হিন্দুতে। এর কানাচ ওর ঘর, ওর উঠান দিয়ে এর বাড়ি যাবার পথ। কে হিন্দু, কে মুসলমান—এখন বাছাবাছি ও ভাগাভাগির দিন এসে গেল। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলেত থেকে বাটোয়ারা করতে এসে ভেবে পাচ্ছেন না, লাইনটা কোনখান দিয়ে টানবেন।'

এ হল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার মুহূর্তের চিন্তা। কী বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে পাশাপাশি ছিল অনেককাল সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে। মান-অভিমান, মনকষাকষি, মনান্তর মতান্তর হয়েছে। তবু ভাই-ভাই হয়েই ছিল বাঙালী হিন্দু-মুসলমান। রাগের মাথায় যার যা খুশী বলে কিন্তু আবার সব ভুলে যায়। একদিন কিন্তু পাকে বাধ পড়ল, দেশবিভাগের ব্যবস্থাটা র‍্যাডক্লিফ পাকা করে দিলেন। খুলনা জেলাটার হল ত্রিশঙ্কু অবস্থা। 'একদিন শোনা গেল, হিন্দুস্থানে দিয়ে দিয়েছে,—যেহেতু গুনতিতে বেশী এ জেলায়। মুসলমানের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়: কোনদিকে নৌকা ভাসাবে, ফরিদপুরে না বাখরগঞ্জ—' কিন্তু পরে সেটা হল পাকিস্থান। হিন্দুর মুখ শুকনো।

দেশবিভাগের ফলে দুটি আলাদা অঞ্চল শুধু সৃষ্টি হয়নি। হিন্দু ও মুসলমান একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন উদ্বেগে আর অজানা আশংকায়।

শক্তিমান কথাকার মনোজ বসু স্বয়ং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পূর্ব পাকিস্থানের সমস্তঅঞ্চলেই তাঁর প্রাণ-মন ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঠিক এই মানসিকতার ফলেই তিনি অজস্র গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে দেশবিভাগজনিত সমস্যার অনেক দিক অনেক ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেইসব রচনার একটি সুনির্বাচিত একত্রিত সংস্করণ 'সে এক দুঃস্বপন ছিল' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই অমনিবাস গ্রন্থটির ভূমিকায় অন্নদাশংকর রায় অনেক কথার মধ্যে বলেছেন—

'কথাবর মনোজ বসু দুই প্রান্তের মুসলমানের সঙ্গে একপ্রকার নাড়ীর টান অনুভব করেন। এ শুধু আজ নয়, [illegible] আছে তিনিই জানেন যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি।'

কথাটি ঠিক। মনোজ বসুর মন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প কলুষিত নয়। ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর অনেক গল্পের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সর্বনাশা দিকটির প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত আছে। দেশবিভাগ হয়েছে। কিন্তু ভাষা এক, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এক। আচার-আচরণে ফারাক সামান্য। অথচ রোয়েদাদের নির্দেশে পূর্বজার্মানী পশ্চিম জার্মানীর মত বাংলার মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া বসানো হল। ওপারের মানুষ আসবে না এপারে, এপার যাবে না ওপারে। ঠোকাঠুকি, মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সে অবশ্য অব্যাহত রইল। যারা লোভী, যারা পরস্ব-অপহরণে সমাজচ্যুত তারা চিরদিনই প্রতিবেশীর ধন-সম্পদ, সম্মান সর্বকিছু লুঠতরাজ করে এসেছে। দেশবিভাগের পরবর্তীকালেও সেই হানাহানির অবসান ঘটেনি। চোখের জল মুছতে মুছতে ওপারের হিন্দু এপারে এসেছে লাখে লাখে। যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁরা ফকীর হয়েছেন। যার আশ্রয় ছিল নিরাপদ তাকে রাস্তার ফুটপাথে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। এ সবই দেশবিভাগের অভিশাপ। বহু বছরের পুঞ্জীভূত পাপের অভিব্যক্তি।

কিন্তু হাওয়া বদল হল। সাত শতাব্দী ধরে যারা একত্রে বাস করেছে, তাদের এক জায়গায় মিল ছিল। হোক না ধনী, হোক না নিঃস্ব, তবু একটা মিল ছিল। সে মিল ছিল মুখের ভাষায়।

ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানালেন বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রে বাঙালী-মুসলিমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বাংলা-ভাষার প্রভাব বিষয়ে একটি প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর বক্তব্য সবিস্তারে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি সাধনে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা চক্রান্ত চলছে এটা তিনি বুঝেছিলেন। সাম্প্রতিক পাকিস্তানী বর্বরতার নিহত অশীতিপর বৃদ্ধ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্থান সংবিধান প্রণয়নী সংসদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে দাবী করেন যে, উর্দুর মতো বাংলা ভাষাতেও এই সংসদের কার্যসূচী পরিচালিত হোক। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকৎ আলি খান সাহেব, তিনি এই প্রস্তাব নাকচ করলেন নিম্নলিখিত মন্তব্য করে—

"Pakistan as a Muslim State must have a lingua-franca, language of the Muslim nation and that language can only be Urdu and no other language.".

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে মহম্মদ আলি জিন্না কার্জন হলে সমাবর্তন ভাষণে বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু আর কিছু নয়। যে ভ্রান্তপথে চালিত করার চেষ্টা করবে সে হল পাকিস্তানের শত্রু।

সেই সভায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুজিবর রহমান। তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানালেন এবং এই অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হল। সেই বছর ১৮ই মে তারিখে ঢাকা শহরে ডাঃ হবিবুল্লা বাহারের নেতৃত্বে মহা সমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হল। শত্রুর চর বলে তাঁরা ধিকৃত হলেন। তারপর ১৯৪৮-এ যে ভাষা আন্দোলন শুরু হল তার পরিসমাপ্তি ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক পুনর্বাসন ঘটল। তারপর ২৫শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে শুরু হল বাংলাদেশ বনাম ইয়াহিয়া চক্রের যুদ্ধ। তারপর বাংলাদেশ স্থাপিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় অন্নদাশংকর রায় বলেছেন—'বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এ আমাদের জীবনের পরম সৌভাগ্য।' কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে হিন্দু-মুসলমানের মনকষাকষির অবসান ঘটবে। যে দুঃস্বপ্নের রাত্রির বিভীষিকায় সমগ্র বাংলাদেশ আতংকিত হয়েছিল—সেই দুঃস্বপ্নের শেষ হবে।

মনোজ বসু দীর্ঘদিন ধরে এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘোচানোর কামনায় নানাভাবে কাজ করে এসেছেন। তাঁর 'রক্তের বদলে রক্ত' উপন্যাস ও 'মানুষ নামক জন্তু' নামক উপন্যাস দুটি ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই দুটি উপন্যাসই প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বত্র প্রশংসিত হয় তার বক্তব্যের জন্য। গতানুগতিক বিষয়বস্তুর পথ পরিহার করে যে-কাহিনী লেখক পরিবেশন করেছেন তা বাঙালীর কাছে অজানা নয়। এই সমস্যা এইভাবে তুলে ধরার মধ্যে লেখক এক অত্যাশ্চর্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নাটক 'নতুন প্রভাতে'ও এই সমস্যাই বিভিন্ন

অসামান্য লিপিকুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

এই সব উপন্যাস, নাটক ও গল্পগুলির মধ্যে যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা বাস্তবানুগ এবং সুস্পষ্ট। চরিত্রগুলি সর্বজনপরিচিত। তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ সকলেরই জানা। মনোজ বসুর কৃতিত্ব সেইখানে, সেই আটপৌরে ভঙ্গীটুকু তাঁর এই কাহিনীগুলিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

আজ নতুন প্রভাতের সম্ভাবনা। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে ধর্মগত ঐক্যের কোন মূল্য নেই। মুসলমানও মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবই তার কাছে কীট-পতঙ্গের মতো তুচ্ছ। যে অত্যাচারী যে শোষণ করে, তার কাছে শাসনের একমাত্র অর্থ শোষণ। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষেরা এভাবং পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয়দের দ্বারা শোষিত হয়েছে আজ তারা রুখে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমের অত্যাচারের প্রতিবাদে। এই সূত্রে তাদের এক মহৎ উপলব্ধি ঘটেছে, তারা বুঝেছে ভাষার বন্ধনই সবচেয়ে প্রবল। এই মুখের ভাষাই আজ তাদের নব-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দুঃস্বপ্নের যে অমানিশায় আকাশ আচ্ছন্ন ছিল সেই দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে এসেছে—নতুন প্রভাত সমাগত। এই পরম লগ্নে মনোজ বসুর এই কাহিনীগুলি নতুন মৈত্রীর রাখীবন্ধনে দুই বাংলার মানুষকে বাঁধবে আর সেই তার চরম সার্থকতা।

—বজ্রকণ্ঠ

সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল (অমনিবাস) মনোজ বসু। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম : এগার টাকা মাত্র।

সাহিত্যের খবর

বাংলাদেশ ও আঁদ্রে মালরো :

বিখ্যাত ফরাসী লেখক এবং জেনারেল দ্য গলের মন্ত্রিসভার সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী মঁ আঁদ্রে মালরো সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন—বাংলাদেশের সমস্যা বিশ্বের বৃহত্তম ট্রাজেডিগুলির অন্যতম। দিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসবে তার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণকে একটি পত্রে মঁসিয়ে আঁদ্রে মালরো এই উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক—আমরা সবাই হয়ত মরব, তবু আমরা আত্মসমর্পণ করবো না। বাংলাদেশ চিরদিন তার সাহসিকতার জন্য পরিচিত। আবেদননিবেদনের পথ নিরর্থক। যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হল বাংলাদেশের সামরিক সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্রও ভিয়েতনামকে ধ্বংস করতে পারেনি।

শেকস্‌পীয়র ও একজন অভিনেত্রী :

শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' মঞ্চস্থ হবে। ডাইরেক্‌টার পিটার ওইসটন মারমেড থিয়েটারে নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেসডেমনার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিভিন্ন পুরস্কারবিজয়িনী কে বার্লো (২৪)। সবই স্থির, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অভিনেত্রী বেঁকে বসেছেন, তিনি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ প্রদর্শন করতে পারবেন না। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন—

> "The idea was ridiculous. Nudity is just not necessary in this Classical Shakespearean role I am sure the Bard of Avon never wanted a nude death scene"

অভিনেত্রীর উক্তিতে মহাকবির সম্মান অক্ষুণ্ণ রইল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ :

সংবাদে জানা গেল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহসা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিগত বৃহস্পতিবার ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। শনিবার প্রাতে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে উন্নতির পথে।

মহিলা সাহিত্যিকের শোচনীয় মৃত্যু :

অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি উত্তর কলিকাতার একটি সরকারী বাসভবনে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁর প্রাণহীন দেহটি আবিষ্কৃত হয়। অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী চিরকুমারী ছিলেন এবং টেলিফোন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন।

সাহিত্যিকের দুর্গতি :

ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জনপ্রিয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। একদা তিনি 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', 'বাংলার কথা' প্রভৃতি বাংলা দৈনিকপত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গেও সম্পাদনাসূত্রে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। বর্তমান 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটি অবলুপ্ত এবং ফণীন্দ্রনাথ রোগজীর্ণ এবং অন্ধ অবস্থায় তাঁর আগরপাড়ার বাসভবনে অতিকষ্টে দিনযাপন করছেন। সরকার থেকে তাঁকে যে পেন্সন দেওয়া হয় তা কিছুকাল পূর্বে হ্রাস করে মাত্র পঁচাত্তর টাকা করা হয়েছে। সাংবাদিক শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় একটি সংবাদপত্রে প্রবীণ সাংবাদিকের এই করুণ অবস্থার কথা প্রকাশ করেছেন। ফণীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহীদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে :

পুজোর বাজারে যখন বহুবর্ণে মুদ্রিত কামোদ্দীপক প্রচ্ছদভূষিত অজস্র সাময়িকপত্রের বিশেষ সংখ্যা অবাধে বিক্রয় হচ্ছে, তখন অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত শুক্রবার ১০ই তারিখে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি বিরাট মিছিল রাজপথে নানাবিধ শ্লোগান উচ্চারণ করে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মানসিক সুস্থতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই দাবীকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

নতুন বই

বিদ্যাসাগর পরিচয় — রাসবিহারী রায়। কিশোরকল্যাণ পরিষদ। মূল্য—তিন টাকা।

এই অবক্ষয়ের যুগে 'বিদ্যাসাগর পরিচয়' আমাদের চোখের সামনে নতুনভাবে বাঁচার বাণী বহন করে আনল। বইটি কিশোর কল্যাণকল্পে প্রকাশিত, কিন্তু বড়দের কাছেও এর একটা পৃথক গুরুত্ব আছে। বর্ণপরিচয়ের সময়ে জীবনের প্রথম পাঠে হোক বা চরিত্র গড়ার প্রথম পাঠে হোক বিদ্যাসাগর হচ্ছেন আমাদের মহান আদর্শ। গ্রন্থটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিজীবনের কাহিনী আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিদ্যাসাগরের মায়ের চরিত্র-সুষমা লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ভগবতী দেবী সন্তানের কাছ থেকে তিনটি গহনা চেয়েছিলেন—গ্রামের ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয়, গরীব মানুষদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, আর দরিদ্র ছেলেমেয়েদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মায়ের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করেন।

লেখক ভাবের এবং ভাষার আতিশয্য সর্বদা পরিহার করেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য একই ধরনের উক্তির পুনঃ ব্যবহার দেখি। অবশ্য লেখক যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর সেই প্রকৃতির ব্যক্তি যাঁর নিজের আচরণই

আমাদের কাছে মহান বাণীস্বরূপ। লেখক যতটা সম্ভব বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বটিকে তুলে ধরেছেন।

চাঁদে পাড়ি—সুনির্মল রায়। বিদ্যাভারতী, ৮।সি টেমার লেন, কলিকাতা—৯। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেখক অ্যাপোলো — ১১ অভিযানের কাহিনী গল্পের মতো করে ছোটদের শুনিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কিছু বিজ্ঞানের কথা জানাতে চেষ্টা করেছেন। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র বসু এই বইয়ে একটি ভূমিকা লিখে আশা প্রকাশ করেছেন যে, 'অল্পবয়স্ক পাঠক মহলে বইখানির যথেষ্ট সমাদর হবে।' বইয়ের গল্পের অংশটি ছোটদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। বিজ্ঞানের কথার অংশে অল্প জায়গায় অনেক কথা বলতে চেষ্টা করার দরুন কিছুটা দুরূহতা ও অস্পষ্টতা এসে গিয়েছে। তাহলেও এই বইটি ছোটদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী করবে নিশ্চয়ই। অনেকগুলো ছবি থাকার জন্যে গল্পের আকর্ষণ বেড়েছে।

লোহ ও ইস্পাত—ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়। কল্যাণী প্রকাশন, ৩ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা—১। নয় টাকা।

এই বইটি বিশেষ করে টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রথম পর্যায়ের ছাত্রদের উপযোগী। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচনা আছে লাল মাটি, কোক ও চুনাপাথর সম্পর্কে। তার পরে একটি পরিচ্ছেদে লোহ ও অন্য একটি পরিচ্ছেদে পিগ আয়রন। বাকী এগারোটি পরিচ্ছেদে ইস্পাত। বিষয়টি দুরূহ, কিন্তু লেখক একদিকে উচ্চ ডিগ্রীধারী, অন্যদিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাই বিষয়টিকে সুন্দর বোধগম্যরূপে উপস্থিত করতে পেরেছেন। ধাতুবিদ্যা যাঁরা শিখতে চান তাঁরা তো বটেই, সাধারণ পাঠকরাও বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসংগীত — শম্ভুনাথ ঘোষ ও কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, লিলি লজ, কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার যাদুতে উন্মোচিত হল বৈচিত্র্যময় বাংলা গানের এক নূতন দিগন্ত। জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন প্রভৃতির সঙ্গে আসরে এল এক নবীন আগন্তুক, বাণী ও সুরের ঐশ্বর্যে যে অচিরেই নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিল। ক্রমে ক্রমে প্রতিটি হৃদয়েই এর জন্য সংরক্ষিত হল একটি চিরস্থায়ী আসন। তাই আজকের বাংলাদেশে প্রতিটি গৃহেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক অংশের যতটা চর্চা হচ্ছে, ঔপপত্তিক অংশ সেই পরিমাণে উপেক্ষিত। এই বিষয়ে কিছু পুস্তক থাকলেও তা যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী পুস্তকের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। অধ্যাপক ঘোষ ও চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত' সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি, যেমন—ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীতচর্চা, রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাউল, কীর্তন, প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শব্দোচ্চারণের মহত্ব, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, তানুসিংহ পদাবলীর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ এবং মনোগ্রাহী হয়েছে। পুস্তকটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যতীত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও একাধিক বিষয়ের উপর আলোচনা রয়েছে। যেমন—সঙ্গীত, শ্রুতি, ঠাট, গ্রাম, মূর্ছনা, অলঙ্কার, ছন্দ, লয় ইত্যাদি। বিভিন্ন তাল এবং বাদ্য-যন্ত্রাদির বিষয়ে আলোচনাও লেখকদ্বয় এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা সংযত এবং পরিমিত। বিশেষ করে এইগুলি দক্ষ উপস্থাপনার গুণে এবং সহজ-সরল বাচনিক ভঙ্গীর বিশিষ্টতায় আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পুস্তকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের যুগল-মিলনে সঙ্গীতের তত্ত্বগত শিক্ষায় একটি অপরিহার্য পুস্তক হিসাবে পরিগণিত হবে। আশা করা যায় পুস্তকটি সুনাম অর্জন করবে।

হেসে খুন (কৌতুক কাহিনী) — প্রবুদ্ধ। কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ঃ ৯। ছ' টাকা।

টুকরো টুকরো কৌতুককর ঘটনা, শুরু কিন্তু গুরুগম্ভীর প্রেক্ষাপটে। গোয়েন্দা গল্পের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ যেন। গল্পের গাঁথুনি একেবারে উঁচু পর্দায় বাঁধা, যাতে পাঠকমন মুহূর্তেই সচকিত হয়ে ওঠে। কাহিনীতে হঠাৎ ইতি টানার আকস্মিকতা পাঠককে সজোরে নাড়া দেয়, হাসির তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 'প্রবুদ্ধ' নামের আড়ালের মানুষ পাকা কলমবাজ—ঘটনার স্বাভাবিক বুননে, কাহিনীর কূট বিস্তারে, শব্দের কারু-কৃতিতে এবং ব্যঙ্গ-কৌতুককর ঘটনার সমাবেশে তারই সুস্পষ্ট ছাপ। জমিয়ে গল্প বলতে পারেন লেখক। কুড়িটি হাসির ঘটনা নিয়েই হেসে খুন। সবচেয়ে ভালো লেগেছে অথ 'হরধনু খণ্ডিত', 'বিজ্ঞাপন', 'কুকুর নিরুদ্দেশ' ও 'গল্প-লেখকের গল্পের গল্প'। আজকের এই বিষণ্ণ পরিবেশে বইটি টনিকের মতো কিন্তু নামকরণে কেমন যেন সাবালক-নাবালক গন্ধ।

মানব মন (জুলাই-সেপ্টেম্বর '৭১) — সম্পাদক ঃ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ ইনস্টিটিউট, ১০২।১এ, বিধান সরণী, কলকাতা ঃ ৪। ১·২৫ টাকা।

আনন্দের কথা আজকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ঔৎসুক্য এবং চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। বিজ্ঞান বিষয়ে সাময়িক পত্রিকার 'বিচরণ' এরই ফলশ্রুতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা আনবার মূলে এ-দেশের যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে 'মানব মন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিবিধ দুরূহ তত্ত্ব ও ধারার সঙ্গে জনমনের সংযোগসাধন করে আসছে এপর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে। এটা একটা সাময়িক পত্রিকার, বিশেষ করে বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক অধ্যায় নয়। এই পত্রিকার পিছনে যাঁরা নিরলসভাবে বিজ্ঞান এবং জনমনের সেবা করে যাচ্ছেন তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন ঃ জি নেসো-মিডিন, মনোবিদ, সন্তোষকুমার দে, কে তারাসভ ও এম ফেকলাভ, সবিৎ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ বসু। বিজ্ঞানতত্ত্ব জিজ্ঞাসুরা পত্রিকাটি দেখতে পারেন।

নবাঙ্কুর (বাংলাদেশ সংখ্যা) — সম্পাদক ধনঞ্জয় দাস ও বিকাশচন্দ্র দাস।। ৩৩, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪।। দাম ঃ এক টাকা।।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লেখা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'নবাঙ্কুর'-এর এই সংখ্যাটি। অন্যতম সম্পাদক বিকাশচন্দ্র দাস সঙ্কলিত কবিতা-গুলো সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'এই কবিতা-গুলোর মধ্যে রয়েছে মহৎ কাজে বাঙালীর পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া আর ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর।' উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফজলে লোহানী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, ধনঞ্জয় দাশ, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, গণেশ বসু, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, রজনীকান্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাদুলির পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

ভারতবর্ষ পরে (সংকলন) — সম্পাদনা ঃ মৈত্রেয়ী দেবী। ১০।১, পাম অ্যাভেন্যু। কলকাতা-১৯। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লেখা এই প্রবন্ধ সংকলনটি রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠককে মুগ্ধ করবে। দুই বাংলার লেখকদের সঙ্গে কয়েকজন বিদেশীর রচনাও সংকলিত হয়েছে। যাঁদের রচনা আছে প্রতিমা ঠাকুর, বিষ্ণু দে, সুসান কার্পেলেস, লুডভিক স্টোয়ানভ, জে বেলী, মৈত্রেয়ী দেবী, আনিসুজ্জামান, কমরুদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, শামসুর রাহমান, সৈয়দ মুর্তাজা আলি, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং আবুল ফজল।

CENTRAL LIBRARY

এখন সত্তায় বাঁচি ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

অনাদিকালের প্রথা নকলনবিশী,
আবির্ভাব অবস্থান আর তিরোধান!
বিশ্ব জুড়ে পরানুকরণ। অন্ধকার সৃষ্টি
আমাদেরই। প্রয়োজনে প্রদীপ জ্বালাই।
স্বপ্নেরা সহস্র চোখে আমাদের দেখে,
ঘটে তাই অস্তিত্বের বিস্মৃতি সহজে।
ক্লান্তির শরীরে হাত দিলেই চমক,
সুনিবিড় আত্মীয়তা এখন কোথায়?
সর্বত্রই অতি দীন ভিখারী মানুষ,
আশার টুকরোগুলি সীসের ওজন।
তবু চেষ্টা, বিষণ্ণতামাখা ক্রান্তিকালে
ধর্মনাশা কর্মনাশা গণ-টোকাটুকি!
কলকাতা নৈরাশ্যে কাঁদে বড়ই দুর্দিন,
প্রকল্পের গল্পে গল্পে বিমূঢ় যৌবন!
এখন পাহারা নেই নীতিবোধ শেষ,
জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেবল সত্তায়
কোনোক্রমে বেঁচে থাকা নিঃশর্ত সঙ্কোচে।
উভয় গোলার্ধব্যাপী শুধু গোলাগুলী—
নির্ভরতা নেই কিছু হতভম্ব বাধা,
তবু আমি দিগ্বিজয়ী সম্ভাব্য সংগ্রামে!

বাইরে থেকে ভেতর থেকে ॥
দীপেন রায়

বাইরে থেকে কে যেন ডেকেছিলো আর
কে যেন ভেতর থেকে বলেছিলো যা—
বছর কুড়ি কি আরো দুচার বছর
আস্ত পিছুর কথা এসব।
ভেতরে ভেতরে এত যে আনাগোনা
এত কথা উপকথার গাঁথুনি
রক্তে এত মেলামেশা
মেলায় না এলে যেন এত মানুষের অনুভূতি
তার কি চেতনা ছুঁয়ে ধরা পড়তো এতই সহজে।

বাইরে থেকে সে বলেছিলো আর
ভেতর থেকে যে বাইরে আনলো
তারা দুজনে এই উৎসব আলোয়
জন্মসাক্ষী হয়ে রইলো।
কাল আমাকে তারা ভেঙে ভেঙে
টুকরো বহু অস্তিত্বের প্রবাল ছড়িয়েই
যেন ডাক দেবে সংক্রান্তিতে পৌষের মেলায়
কপিল মুনির জন্য অদম্য উৎসাহে
সমুদ্রের মুখ থেকে ঠেলে আসা নতুন মাটিতে।

প্রার্থনার তন্ময়তায় ॥ রবীন দত্ত

যাকে চাই তার উদাসীন ব্যবহার ক্রমশ কুঁড়িটি আঙুলের
বাড়ন্ত নখের ধার বাড়ায়   হিংসায় ক্রোধে
বত্রিশ দাঁতের গোড়ায় কালকূট আক্ষেপের সঞ্চিত গরল
দু বাহুর পেশীর আগ্রহে ভয়ংকর জেদ
ময়ালের মত ক্রমাগত চারধারের বাতাস হাতড়াচ্ছে

বিস্তারিত দুই করতলে আবহমান প্রার্থনায়
অলীক পুরস্কারের শূন্যতায় যার অলৌকিক প্রতিমা
মূর্তির মহিমায় কিছুতেই উচ্চ হতে পারে না
সেই কুহকিনীর জ্বালায়
অহোরাত্র জ্বলে জ্বলে ঘুম নেই স্বপ্নের স্থপতি
নিজের নখেই ক্ষতবিক্ষত
ক্ষিপ্ত কামড়ে হৃৎপিণ্ডের রক্তাক্ত গহ্বরে
কোথাও নীলিমাবন্দিত নক্ষত্রের আকাশ নেই
হাহাকার গরলের দগ্ধ হাহাকারে

স্বপ্নগুলি নষ্ট হতে হতে হন্তারক চৈতন্যের অস্থির দুর্মতি
একা একা নিজেকেই নষ্ট করে
বিবাদ এড়িয়ে জন্মান্তরের প্রার্থনার তন্ময়তায়
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে থাকা
[illegible]।

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শংকরীপ্রসাদ বসু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একেবারে সূচনায় দেশবন্ধুর কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। সে হল ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা।[১] আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে, ১৯৪০-এর জুন মাসে সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত বিদ্রোহী নায়ক, যখন রাজনৈতিক জীবনের পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তখনো তিনি নিজেকে দেশবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্য বলেই ঘোষণা করেছিলেন। মধ্যবর্তীকালেও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে নিজ রাজনৈতিক গুরু বলে ঘোষণা করতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। তার মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত স্বীকৃতি পাই ১৯৩৪ সালে লেখা তাঁর সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের মধ্যে।

প্রথমেই প্রশ্ন করা যায়—এইসব স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সত্যই কি দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন? উভয়ের রাজনৈতিক কর্মজীবনে ঐক্যের মত পার্থক্যও কি কিছু কম ছিল? শেষ পর্যন্ত মনে হয়—মূলগত ব্যাপারে পার্থক্যই বোধহয় বেশী।

১৫ জুন, ১৯৪০ তারিখের 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় Long live Desbondu নামক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়ের লেখকরূপে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

"The writer was a devoted disciple of the Deshbandhu and when speaking of the departed great, it is difficult for him to do so with restraint. The debt he owes him is one that cannot be repaid. In fact, Deshbandhu's teachings have become a part of his being". (Crossroads)

সুভাষচন্দ্রের এই লেখাটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি কোনোভাবেই গান্ধী-প্রভাবিত নন। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এই ঘোষণার মূল্য যথেষ্টই ছিল। এর ৬ মাস পরেই সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ করে যাবেন।

বাহ্য ঐক্য প্রবল ছিল। ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন, তাঁর কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব কংগ্রেসে পরাভূত হলে পদত্যাগ করেছিলেন, এবং তারপরে স্বরাজ্য দল গঠন করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে পন্থ-প্রস্তাব পাস করা হলে সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। স্বরাজ্য দলের মধ্যে যেমন চিত্তরঞ্জন কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে নানা ধরনের মানুষকে সমবেত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি প্রথম দিকে ফরোয়ার্ড ব্লকও কোনো পার্টি ছিল না, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী দলগুলির একটি সাধারণ "প্ল্যাটফর্ম" ছিল। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে দেশবন্ধুর 'বেঙ্গল প্যাক্টের' ধারাপথেই সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র

পার্থক্যও যথেষ্ট। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে কারামুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রথম যে স্পষ্ট চেহারা দেখা গিয়েছিল সে মূর্তি দেশবন্ধুর অভিপ্রেত হত কি? গান্ধীজী তো তা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন, কিংবা মহাবিরক্তিতে জ্বলন্ত হেসে ফেলেছিলেন। ১৯২৮-এর ঐ কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সামরিক চেহারায় হাজির। শুধু তাই নয়—খোলাখুলিভাবে পণ্ডিতজীর ধ্যান-প্রস্থান কিংবা সবরমতীর গো-যানে উত্থানের সমালোচক। দেশবন্ধুর মুখের কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়, বলতেই হবে, তিনি শেষ পর্যন্ত অহিংসায় সত্যই বিশ্বাসী হয়েছিলেন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রান্তির বিরুদ্ধে

১° ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ তারিখে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ থেকে দেশবন্ধুকে এক দীর্ঘ পত্রের মধ্যে লিখেছিলেন :

'আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন ও নিজের এই তুচ্ছ শরীর।..... আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন।' ("তরুণের স্বপ্ন")

২ মার্চ তারিখের আর একটি চিঠিতেও সুভাষচন্দ্র একই কথা লিখেছিলেন।

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : [illegible]
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
গ্যারান্টিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

CENTRAL LIBRARY

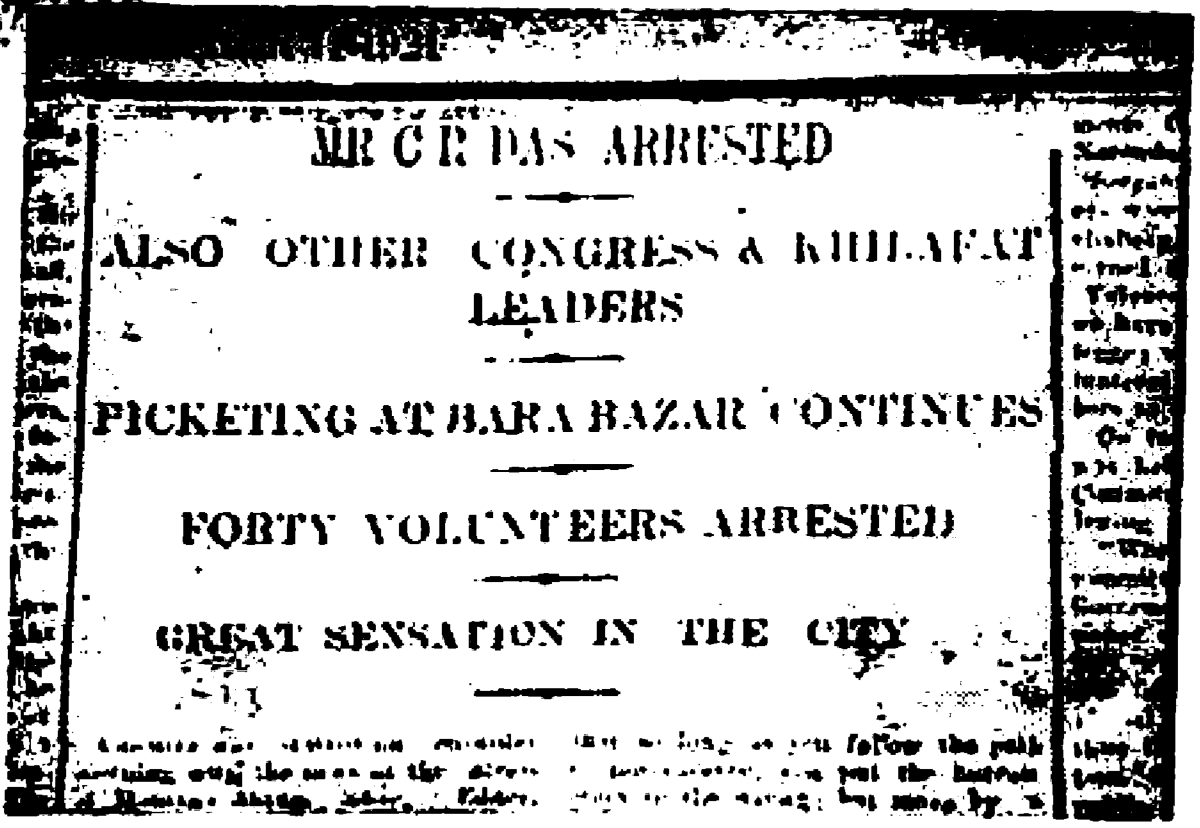
MR C R DAS ARRESTED

ALSO OTHER CONGRESS & KHILAFAT LEADERS

PICKETING AT BARA BAZAR CONTINUES

FORTY VOLUNTEERS ARRESTED

GREAT SENSATION IN THE CITY

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেপ্তার। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সংবাদ। মডারেটদের মুখপত্র বেঙ্গলী পত্রিকায় ১১ ডিসেম্বর, ১৯২১-এর সংবাদ

তিনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু গান্ধী-জীবননীতির প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাত বোধ করেছিলেন।*২ সুভাষচন্দ্র অপরদিকে কেবল রাজনীতিতে নয়, জীবননীতিতেও গান্ধী-বিরোধী। তাঁকে আমরা কংগ্রেসে 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং'-এর প্রবর্তকরূপে দেখতে পাই, যার মধ্যে বৃহৎ শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই বৃহৎ শিল্পায়ন কেবল গান্ধীজীর কুটীরশিল্প কেন্দ্রিক জীবনধর্মকে আঘাত করেনি—তার হৃদ্যতা ও বন্ধু চিত্তরঞ্জনের আধ্যাত্মিক স্পর্শকাতরতাকেও আহত করতে পারত।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পার্থক্যের আরও নানা বিষয় নির্দেশ দেওয়া যায়। অপরপক্ষে একথাও মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনস্বী মানুষ দেশবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের পক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখাতে নিশ্চয়ই সমর্থ ছিলেন। দেশবন্ধু কিভাবে, কোন্ অর্থে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু, তার প্রসঙ্গে পুনশ্চ আমরা আসব, কিন্তু তার আগে উভয়ের ব্যক্তি-সম্পর্কের ইতিহাসে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে, কারণ কেবল তাঁদের রাজনৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ই এই রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

॥ ২ ॥

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়ের চিত্রটি শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর স্মৃতি-অনুযায়ী এই রকম:

'প্রথম তাকে (সুভাষকে) কবে দেখি জানো? সে অনেককাল আগের কথা। ওটেনকে যেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে মার দেওয়া হয় সেদিন। ওটেনকে প্রহার দিয়ে তো বাবুরা এসে হাজির। আমরা-সব রাত্রে খাবার টেবিলে বসেছি—বয়টা এসে খবর দিল, প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ছেলে দেখা করতে চায়। উনি (দেশবন্ধু) তো অমনি বললেন, ডেকে দাও এখানে। আমি বলি কি কাণ্ড! আমরা যে খাচ্ছি, এখানে ডাকব কি! উনি বললেন, তা কি আর হয়েছে! ছেলের দলের সঙ্গে সুভাষ এসে দাঁড়ালো। সেই প্রথম দেখা। উনি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত ঘটনাটা শুনলেন। তারপর বললেন, যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন দেখা যাক ব্যাপার কি দাঁড়ায়।' *৩

চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—আই সি এস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসার পরে। গান্ধীজীর সঙ্গে নৈরাশ্যজনক সাক্ষাৎকারের পরে কী বিপুল

২* অহিংসা এবং অহিংসার ঋষি গান্ধীজী সম্বন্ধে দেশবন্ধুর অনেক স্তুতি তাঁর বক্তৃতা বা রচনায় দেখা যায়। দেশবন্ধুকে নিছক 'রাজনৈতিক' বলে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই। এখানে আমি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়োজনীয় রচনাংশ উদ্ধৃত করছি:

'বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি। দু' একখানা ফিরিঙ্গি সংবাদপত্র এরূপও বলিয়াছে যে, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেন। এসব কথা যে, কতদূর হেয় তাহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি। আমি যখন স্বরাজ্য দলের সভ্যরূপে আসি তখন তিনি আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, অহিংসা সম্বন্ধে স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও কার্যপ্রণালী আমি নিজ মানিয়া চলিব, এবং এমন কোনো লোককে স্বরাজ্য দলে টানিয়া আনিব না যিনি ঐ আদর্শে আস্থাবান নহেন। আমি একথা ভাল করিয়াই জানি যে, অহিংসাকে তিনি নিজের creed হিসাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন।'

(ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দেশবন্ধু-স্মৃতি' গ্রন্থ উদ্ধৃত)

এইসঙ্গে একথাও জানাতে হবে, ১৯২৪, ২৫ জুন, আমেদাবাদে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-সূচক প্রস্তাব নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই সংঘর্ষকে গান্ধীজী পরবর্তীকালে যতই প্রেমিকের কলহ বলুন, ব্যাপারটা ঠিক তাই ছিল না। কিছু পূর্বে সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে উক্ত ফাঁসি সম্বন্ধে গৃহীত শর্তাধীন শ্রদ্ধাপ্রস্তাবকেও গান্ধীজী নিতান্ত অপছন্দ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে কি ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য এখনো অনেকেই বেঁচে আছেন। গান্ধীজীর অদ্ভুত অহিংসা ১৯২৯ সালে বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে আত্মোৎসর্গের পরেও দেখা গিয়েছিল। ঐ মৃত্যুতে সারা দেশ যখন বিচলিত তখন গান্ধীজী অহিংসায় স্থির-কঠিন, তিনি বাণী দেননি, কারণ তা অনুকূল হবার সম্ভাবনা ছিল না—একথা তিনিই বলেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে অবশ্য কৃপাণধারী পাঞ্জাব ঐ কংগ্রেসী অহিংসাকে কিছু সুবিধাবাদী বা বিবেক করতে পেরেছিল, ভগৎ সিংহের ফাঁসীর পরে কংগ্রেসেই ভগৎ সিংহের উপরে শ্রদ্ধাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩* উপরের স্মৃতিকথা বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু যুগান্তর পত্রিকায় ২৩ জানুয়ারী, ১৯৭২ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র স্মৃতি-কথাটি অতি চমৎকার।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই প্রথম সাক্ষাতের কথা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীও তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে লিখেছেন। সেখানে কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন বিবরণ। চিত্তরঞ্জন খাওয়া ফেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন; ফিরে এসে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য ছেলে! তার কলেজের প্রিন্সিপাল (না, প্রফেসার) মিঃ ওটেন ছাত্রদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করাতে সুভাষ তাকে ভালভাবেই শিক্ষা দিয়ে এসেছে। কিন্তু এর ফল কী হবে ভাবছি!'

সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যেও এই প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করেছেন। 'কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ... মিঃ দাশ, যাঁর কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি একদা প্রয়োজনে গিয়েছিলাম, ...যিনি একদিনে বহু হাজার টাকা রোজগার করেন—তাকে খরচ করেন কয়েক ঘণ্টায়,...যিনি ছিলেন, তরুণদের চিরবন্ধু, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে সমর্থ ও তাদের বেদনায় সমবেদনা জানাতে প্রস্তুত...।'

ওটেন-প্রহারপর্বের পরেই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়েছিলেন, বাসন্তী দেবীর এই কথা ঠিক নয় বলেই মনে হয়; সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন তাই ঠিক, বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হবার পরে আইনের পরামর্শ নেবার জনাই সম্ভবত তিনি গিয়েছিলেন।

আশা নিয়ে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এসেছিলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, দেশবন্ধু তখন সফরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে অবিলম্বে সাক্ষাৎ পাননি, কিন্তু স্নেহময়ী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার পরে দেশবন্ধু ফিরে এলেন এবং উভয়ের দেখা হয়েছিল—সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলে সে সব বিষয়ে লিখেছেন সংক্ষেপে কিন্তু [illegible] আমার [illegible] এতদিনে [illegible]—তাঁর সেই বিরাট আকারের এখানে মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছি—' সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : [illegible] আইনজীবী, বড় [illegible] অধিকারী তিনি, [illegible] এবং [illegible] বড় [illegible] তাঁর [illegible]—তিনি কিন্তু তাঁর [illegible] সেই বিরাট আকারের [illegible] [illegible] করতে পারেননি। সেই [illegible] আনন্দকথা সুভাষচন্দ্র লিখেছেন :

[illegible] কথাবার্তার মধ্যে আমি [illegible] করতে লাগলাম, আমি সেই মানুষটির কাছে পৌঁছে গেছি, যিনি জানেন তিনি কি করতে চান, যিনি নিজের সর্বস্ব দিতে পারেন, প্রতিদানে অপরের সর্বস্ব দাবি করতে পারেন, যাঁর কাছে [illegible] নব [illegible]। কথাবার্তা শেষ হবার আগেই আমি মনস্থির করে ফেললাম। অবশেষে আমি পেয়ে গেছি—তাঁকে আমি অনুসরণ করব।'

[illegible] দৈনিক সুভাষচন্দ্র [illegible] তিন বছর [illegible]

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥
॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

পেরেছিলেন। ১৯২৪, ২৪ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন, এবং তাঁর অন্তরীণ-কালেই ১৬ জুন, ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দেশবন্ধু-সান্নিধ্যের তিনটি বছরকে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বিবেচনা করেছেন। কোনো বাঙালীমানুষ মহিমার কোন্ সমুচ্চ শিখরে উঠিতে হতে পারেন, অথচ সেখান থেকে নামতে পারেন স্বচ্ছন্দে সাধারণের কাছে—সেই ভালবাসা দিতে পারেন যা মানব সংসারের চিরদিনের ঐশ্বর্য—দেশবন্ধুর মধ্যে তার অপূর্ব রূপকে স্তব্ধ বিস্ময়ে সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন। রাজনীতির প্রবল আবর্তের মধ্যেও মহৎ চরিত্রের বিচ্ছুরিত আলোকে স্নাত হাসি-কান্নার সেই অপরূপ দিনগুলি! কান্না? হাঁ, কান্নার কথাই আগে শোনা যাক। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সস্নেহ কৌতুকে বলতেন, My Crying Captain.

ঐ বিষয়ে দেশবন্ধু পত্নীর স্নিগ্ধ স্মৃতি এই প্রকার:

সেইদিনই খুব আলাপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ছিল।...সেই যে শুরু হয়ে গেল আসা-যাওয়া—সেই থেকে সমানেই চলল। কত দিন এসেছে, কত রাত্রি পর্যন্ত থেকেছে। মনে হয় সেদিনের কথা। এই তো এই বারান্দায়, এই চৌকিতে শুয়ে থাকত। ঐ যে বাইরে ফুটপাথের কাছে আলোটা দেখছ, ঐখানে একটা লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। বুঝতেই তো পারছ কি লোক! আমি বলি, ও সুভাষ, এবার তুমি বাড়ি যাও, ওদিকে লোকটা যে মরে যাবে। ও রোগ বলত, কক্খনো যাব না—ভিজুক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুভাষ বড় সহজে কাঁদতে পারত। উনি তো নামই রেখেছিলেন Crying Captain. উনি বললেন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হতে হবে। শুনে তার কি কান্না। বলে, আমি কি এই জন্য আই সি এস ছেড়ে দিয়ে এলাম!...উনি তো সুভাষের রকম দেখে হতাশ। আমাকে বললেন, দেখো, তুমি যদি বুঝিয়ে সামলাতে পারো।

'কি, ব্যাপারটা কি সুভাষ?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি। 'তোমার হয়ত টাকার দরকার না থাকতে পারে, আমার অনেক দরকার আছে। তোমার চাকরির টাকাটা না হয় আমাকে এনে দিও, আমার অনেক কাজে লাগবে।'

'আরও কান্নার গল্প শুনবে? উনি হুকুম করলেন আমাকে পিকেটিং করতে যেতে হবে। সুভাষের প্রচণ্ড আপত্তি। বাড়ির মেয়েরা কেন যাবে আমরা থাকতে—আমি যাব। উনি বললেন, সে হয় না, তোমার যে বাইরে অনেক কাজ, তুমি জেলে গেলে এ সময় চলবে না। যাই হোক, তার সঙ্গে তাঁর গাড়িতে আমি গেলাম। খদ্দর হাতে আমাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। পুলিশ আমাকে ধরল, জেলে গেলাম। তারপরের ঘটনা তোমরা সব জানো। আগুনের মত এ-খবর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত বাংলাদেশ সেদিন বিচলিত। সেইদিনই গভীর রাত্রে হঠাৎ গভর্ণমেন্ট আমাকে ছেড়ে দিল। আমাকে ধরে রাখলে জনসাধারণের অসন্তোষ যে ফেটে পড়বে, তা তারা বুঝেছিল। আমি অতশত কিছু জানি না। বাড়ি ফিরে আসতে আমাকে দেখে খুশি হওয়া দূরে থাক, উনি তো চটেই গেলেন। খালি বলেন, 'এ তুমি কি করলে, কেন তুমি এলে?' সেদিন চাপা আক্রোশে সমস্ত দেশ ঝড়ের আগের মত স্তব্ধ হয়েছিল। একটা তুমুল আন্দোলনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

'আমার কি মুস্কিল দেখ তো! আমি বলি, গভর্ণমেন্ট আমাকে জেলেও স্থান দেবে না, আবার তুমিও ঘরে ঠাঁই দেবে না, আমি তাহলে দাঁড়াই কোথা?'

এমন সময় সুভাষ এসে হাজির। সে আমার ছাড়া পাবার খবর আগে পায়নি। আমাকে হঠাৎ সেখানে দেখেই তো শুরু হয়ে গেল তার কান্না। কি বিপদ! যত বলি—'ও সুভাষ, কাঁদছ কেন? এই তো আমি এসে গেছি! আমার তো কিছু হয়নি!'—তত সে আরো বেশী কাঁদে। এ-রকম ছেলেমানুষি কেউ দেখেছ কখনো!'

সুভাষের ওহেন 'ছেলেমানুষি' রোধ করবার জন্য বাসন্তী দেবীকে বছর পাঁচেক পরে একবার কঠিনতর আত্মসংযম দেখাতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর জীবনের চরমতম শোক-দৃশ্যের সামনে—চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য' বাসন্তী দেবী বৈধব্যের শুভ্রবাসে!! তারপর—বাসন্তী দেবী স্বয়ং বলেছেন—

'সুভাষের শরীর তখন অসুস্থ। আমি আগেই নিজেকে শক্ত করলাম—সুভাষের সামনে কিছুতেই ভেঙে পড়ব না। ছিলামও শক্ত, আমার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না।

স্নানের আনন্দ
বেঙ্গল কেমিক্যালের
গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড সোপ
ত্বকের রুক্ষতা থেকে দেবে নবীন লাবণ্য। বর্ণে আনবে স্নিগ্ধ সুষমা। চন্দনের মৃদু-বিধুর মিষ্টি সৌরভে প্রতিটি মুহূর্ত মন প্রাণ ভরের মত সুন্দর।
আজ থেকেই ব্যবহার করুন
কসমেটিক্‌স ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর
দিল্লী ○ মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ নাগপুর

নেসকাফে যাদের তৈরী তাদেরই
বিনামূল্যে!
একটি ক'রে মনোরম প্লাষ্টিকের জার
প্রতি ৫০ গ্রাম টিনের সঙ্গে
FREE!
চারটি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে।
COFFEE AND CHICORY
এই উপহার কেবল মাত্র কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মনোনীত সহরেই পাওয়া যাবে।
রিকরি
ইনস্ট্যান্ট
পূজো এসে গেল। এই সেই বিশেষ সময় যখন চাই রুচির পরিচয়। চাই রুচিকর স্বাদ রিকরি-ইনস্ট্যাণ্টের—যা কফি ও চিকরির নিখুঁত সংমিশ্রণ। সব মেজাজে, সব সময়ে চলে যে কফি। আর পূজো বলেই এই বিশেষ উপহার। প্রতি ৫০ গ্রাম টিন পিছু বিনামূল্যে পাবেন ১.২৫ টাকা দামের একটি মনোরম প্লাষ্টিকের জার।
দেরী করবেন না। যতদিন ষ্টক থাকবে।
নেসলের তৈরী
ACIL-B/171-B

কিন্তু সুভাষকে সামলাবে কে? শেষে আমি জানাম, তুমি যদি এ রকম করো, আমি কিন্তু এখনি চলে যাব।'

সুভাষকে যিনি 'কাঁদুনে সেন্টিমেন্টাল' বলে ঠাট্টা করতেন, সেই দেশবন্ধুই কি সুভাষচন্দ্রকে অশ্রুব্রতে দীক্ষা দেন নি—সেই করুণা যেখানে যা পবিত্র বারিতে বিগলিত হয়ে মানুষকে উদ্ধার করে? দেশবন্ধু-প্রসঙ্গে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠির মধ্যে পাই:

একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পরে কলিকাতার ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দন-পত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।...তিনি যখন সভায় অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু বেশী দূর বলিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বাহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।'

এতো গঙ্গার মন্ত্রধারা! বাকিগুলিও একান্ত অন্তরে সেই কয়েকটি বিন্দুও কি কম হৃদস্পর্শী?

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বকসী আমাকে কাহিনীটি বলেছেন। দেশবন্ধুর আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ, প্রায় ভাতে টান পড়ার দশা। কিরণশঙ্কর এবং সুভাষচন্দ্র চা-তেষ্টার এবং 'কর্তার প্রতি সহানুভূতিতে অস্থির হয়ে কর্তার বাড়ি থেকে নেমে নীচের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন, দেশবন্ধুর চোখে পড়ল তা। তাঁরা ফিরে আসার পরে বড় ব্যথিত কণ্ঠে চোখের জল নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি মনে করো, এক কাপ চা খেতে দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই!'

এই কান্না। হাসিও কিছু কম ছিল না। তার বিষয়ে বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের বর্ণনায় স্বাভাবিক নিরলঙ্কার স্বচ্ছতা পর্যন্ত উৎসাহে অলঙ্কারসন্ধান করেছে—"পর্বত নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার (দেশবন্ধুর) রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত।" দেশবন্ধু সারাক্ষণই নানা রকম রসিকতার দ্বারা সকলকে আমোদিত করে রাখতেন। তাদের মধ্যে সুভাষ মাত্র একটিকেই স্মরণ করে লিখতে পেরেছেন। দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির পাহারার জন্য জেলে সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত ছিল, পরে তাদের বদলে রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী দেওয়া হয়। তাদের দেখেই দেশবন্ধু বলে ওঠেন, 'কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী। আমরা কি এতই নিরীহ!'

সুভাষচন্দ্র রসিকতা অবশ্যই বুঝতেন, কিন্তু জীবনের এই পর্বে পরাধীনতার জ্বালায় এবং নিজের 'মিশন' সফল করার চিন্তায় এতই ব্যস্ত যে, ঠাট্টা-তামাশা করবার বা শুনবার বিশেষ সুযোগ করে উঠতে পারতেন না এবং তিনি এতই সুগভীর আত্মস্থ মানুষ ছিলেন যে, খুব কম জনই তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সাহস করতে পারতেন। যাঁরা পারতেন, তাঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে দেশবন্ধুর একটি প্রাকটিক্যাল তামাশার কথা বাসন্তী দেবীর স্মৃতিকথায় পাই। ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্রের 'অকৃতদারতা' নিয়ে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতারা স্বভাবতই দেশবন্ধুকে, বিশেষতঃ বাসন্তীদেবীকে এব্যাপারে ধরে পড়তেন, এবং ওহেন সুপাত্রের লোভে কন্যাজননীরা পর্যন্ত :বৈপ্লবিক মনোভাব অর্জন করে ফেলেছিলেন! বাসন্তীদেবী তাঁদের ঠেকাবার জন্য বলেছিলেন —"ওর আবার বিয়ে; ও-ছেলে কোনদিন ফাঁসিকাঠে ঝুলবে ঠিক নেই"—তাতে স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের মায়ের বাণী শুনেছিলেন—"আমার মেয়ে যদি বিধবা হয়ে বেঁচে থাকে, তাও জানব পরম ভাগ্য।' সুভাষের জন্য কন্যাপক্ষ দু-একটা দুর্দ্দমনীয়ের প্রোজেক্টও ঘটে গিয়েছিল সেকথা বলার পরে বাসন্তীদেবী মজার ঘটনাটি বলেছেন:

"তারপর এক মেয়ের বাপ আমাকে খুব ধরলেন। মেয়েটিও উপযুক্ত ছিল না তা নয়। ওরা খুব নাম করা বড়লোক। বললেন, বিয়ে যদি হয় আমি এক লক্ষ টাকা যৌতুক দেব। কথাটা কি করে যেন ও'র কানে গেল। হঠাৎ উনি বললেন, শীগ্‌গির সুভাষকে টেলিফোন করো, বলো, আমি ডাকছি। রাত তখন এগারোটা। টেলিফোন করা হল—সুভাষ তখনো বাড়ি ফেরেনি। তখন তার খুব খাটুনি যাচ্ছে, আমাদেরও। তিলকফান্ডের টাকা তোলার ব্যাপারে সবাই ব্যস্ত। সুভাষ বাড়ি ফিরল আরও অনেক রাত্রে। সবে রুটি খেতে বসেছিল এমন সময় শুনলো, দেশবন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোন এসেছে—জরুরী দরকার। ব্যস, রইল তার খাওয়া দাওয়া—তখনি ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। তাকে দেখে উনি মুখ-চোখ খুব গম্ভীর করে বললেন, 'দেখো, একটা খবর আছে। একজন ভদ্রলোক তিলক-ফান্ডের জন্য একলাখ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।' কি! সুভাষ তো আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'কে দেবে, কে দেবে' করে সে একেবারে অস্থির। উনি আরো গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে।' কী এমন শর্ত—সুভাষ ভাবছে—দেশের কাজে এক লক্ষ টাকা—তার জন্য সে তো সব করতে প্রস্তুত।

'ভদ্রলোকের মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

সুভাষ একেবারে বসে পড়ল। আমরা সবাই হাসতে শুরু করলাম। ঠাট্টা বুঝতে পেরে সুভাষ তখন চটেছে। বলল, 'আজ আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি, আর এই জন্য আমাকে দৌড়ে আসতে হল! এখন শীগ্‌গির সেদ্ধ ভাত খাওয়ান।' তাড়াতাড়ি তাকে তখন ভাতেভাত খাইয়ে ঠান্ডা করি।"

বাসন্তীদেবীর রান্না ভাতে ভাতের জন্য সুভাষচন্দ্র স্বয়ং কিন্তু দেশবন্ধুকে রীতিমত দামী রান্না করে খাওয়াতেন, যখন দেশবন্ধুর সঙ্গে তিনি একই জেলে ছিলেন। সত্যই তিনি ভাল রাঁধতে পারতেন, এবং সেই অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারতেন না। জেলে দেশবন্ধু খুব অসুস্থ ছিলেন বলে সরকার তাঁর এবং (তাঁর জেদে) তাঁর সঙ্গীদের আহার্য বাইরে থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। নচেৎ গোড়ার দিকে সকলের আহার্য ছিল, অপর্ণাদেবীর রচনা অনুযায়ী, লোহার থালায় বেলোনার দানার মত চাল, তার মধ্যে দাঁড়ির টুকরো, দেশলাই কাঠি, খুটিং, কেশগুচ্ছ, এবং ডাল, 'যার মতো কালো ডাল আগে দেখিনি।'

সুভাষচন্দ্র অসুস্থ দেশবন্ধুর কেবল রান্নার ভার নয়, সেবাভারও কিছুটা তুলে নিয়েছিলেন। 'সুভাষ খুব ভাল নার্স'—একথা দেশবন্ধু বলতেন। দেশবন্ধু অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারকে ভৃত্যরূপে পেয়েছিলেন। 'দাশ'-এর এই সৌভাগ্য একটি ঐতিহাসিক রসিকতার কারণ হয়ে আছে। কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আব্দার রহমান জেল পরিদর্শনে এসে সকৌতুকে বলেছিলেন, "দাশ, তোমার মত ভাগ্যবান কয়েদী আর হয় না। একজন আই সি এস তোমার পাচক এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তোমার চাকর।"

১৯২১-২২ সালে প্রেসিডেন্সী জেলে এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আট মাস কাটাবার সুযোগ সুভাষচন্দ্রের হয়েছিল। এই কয়েক মাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, দেশবন্ধু-চরিত্র সম্বন্ধে একদিক থেকে তা চরম কথা, কারণ, একথা মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি চরিত্রে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বড় মানুষ অল্পই সম্ভবপর। 'ঘনিষ্ঠতা দেশবন্ধু সম্বন্ধে শ্রদ্ধা কমায় নি, বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণে'—সুভাষচন্দ্রের এই উক্তির চেয়ে বড় প্রশস্তি আর কি সম্ভব? দেশবন্ধুর পাণ্ডিত্য, মনীষা, দূরদর্শিতার অজস্র যে-পরিচয় সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন, সেগুলি নয়, সুভাষচন্দ্রকে চিরদিনের জন্য কিনে নিয়েছিল অন্য বস্তু—সেই প্রেম তিনি দেখেছিলেন, যা খাদ্য ডাকাত মধুকুক বলতে সে মিজারেবল-এর চরিত্র করে তুলেছিল, এবং দেখেছিলেন সেই প্রাণকে, যা চিরদিনের জন্য নীচতাকে বর্জন করেছে। 'যে আটমাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনো দিন কোনো কাজে অথবা কোনো কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই।"

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আনাড়ি মানুষ কলার গাছে ভর দিয়ে বেশ ভেসে থাকে হঠাৎ গাছটা সরে গেলে যেমন অসহায় বোধ করে তেমনি অবস্থা হল জরার। বৃন্দাবনে মদিরার এবং পথে সন্ন্যাসীঠাকুরের সাহচর্য লাভে জরা মনে শান্তি না পেলেও স্বস্তি অনুভব করেছিল, গত দশ বছরের মধ্যে যার অনুরূপ অনুভূতি ঘটেনি তার জীবনে। মদিরার স্নেহ আর সেই সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্য, সন্ন্যাসীর সঙ্গীবনের স্পর্শ আর সেই সঙ্গে নিত্য চলমানতা অনেক পরিমাণে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার মনে আমৃত্যুবিদ্ধ গ্লানি। পাপ আর দুঃখ, মুক্তি আর সদ্গতি প্রভৃতি দুশ্চিন্তার দোলাতে দুলতে দুলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকবার আত্মহত্যা করে সমস্ত সমস্যার সমূলে সমাধান করবার কথা ভেবেছে কিন্তু মরণে নরকে গতি হবে এই আশঙ্কা তাকে নিবৃত্ত করেছে।

কিন্তু বৃন্দাবনে এসে যখন ঘটনাধীন মদিরার সাক্ষাৎ পেলো আশার ক্ষীণ রশ্মি ফুটলো তার মনে। মদিরার মত বারাঙ্গনা যদি শান্তি লাভ করে থাকে তবে সে-ই বা না পাবে কেন? অবশ্য মদিরার তুলনায় তার পাপের বোঝা অনেক ভারি তবে তার দুঃখও অনেক দুঃসহ তাতে কি বোঝা পড়ে গিয়ে খানিকটা হাল্কা হয়নি।

নরেন্দ্রনগর থেকে পলায়নের পরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোছায়া অতিক্রম করেছে ভাবতে গেলে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ছাগর্ষি, কিন্নররাজ্য, চার্বাক আশ্রম, হিমালয়ের নির্জন পথে যষ্টিধারী কুকুরমাত্রসঙ্গী নিঃসঙ্গ পথিক, বদরিকাশ্রমে পুনর্মিলনের দর্শন, গুহাবাসিনী বুড়িমা এমন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কখনো কি একজন মানুষের জীবনে ঘটেছে। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কেউ জানে না; চিরানন্দময় কিন্নররাজ্য পাপ শব্দটাই জানে না; মহাজ্ঞানী চার্বাক আনন্দের ভাণ্ডারী কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না; আর সেই নিঃসঙ্গ পথিক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন মুক্তির উপায় সন্ধানেই তিনি চলেছেন। জরার ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে যায় সে-ও তো মুক্তিসন্ধানী কিন্তু মনঃস্থির করবার আগেই তিনি পাহাড়ের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন, এগিয়ে দেখবার সাহস তার হল না।

সকলের দ্বারে দ্বারে জিজ্ঞাসার প্রদীপ নিয়ে ঘুরেছে শিখা জ্বালিয়ে দিতে কেউ পারে নি। কেবল বুড়িমা, সেই নিরক্ষর অন্ধ বৃদ্ধাটি একবার আলোর ফুলকি জ্বেলেছিল, প্রদীপ জ্বলল না সত্য তবে বোঝা গেল এখনো নিরাশ হওয়ার সময় আসে নি। তার কথাতেই এলো বৃন্দাবনে। কই সেখানেও তো দেখল মন্দির শূন্য। ঠিক তার মনে নেই কে তার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পূর্ণাবতার ছাড়া কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে নি পূর্ণাবতার কে? অবতারের সঙ্গে পূর্ণাবতারের প্রভেদ কি? এ প্রশ্নের সমাধান করতে হয়তো পারতেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রসঙ্গটা জরা তুলেছিল, এমন সময়ে পথের উপরে মৃতদেহ দর্শনে বিষয়টা চাপা পড়ে গেল।

জরা আশা করেছিল অবন্তীপুরীতে পৌঁছে রাতের বেলায় নিরিবিলি প্রসঙ্গটার মীমাংসা জেনে নেবে। কিন্তু সেখানে যে অরাজক অবস্থা রাতারাতেই নগর ছেড়ে বের হয়ে পড়তে হল। সন্ন্যাসী গেলেন অমরকন্টকে জরার ইচ্ছা হয়েছিল সে-ও যায় কিন্তু সন্ন্যাসী তেমন উৎসাহ দিলেন না, তাছাড়া কৌস্তুভমণিটা সত্বর [illegible] সমুদ্রজলে সমর্পণ করতে হবে। কতজনের কত স্রোত এড়িয়ে মদিরা তাকে রক্ষা করে এসেছে আর পথের মধ্যে রাহাজানি হতে হতেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছে মণিটা। না, আর কাছে রাখা নিরাপদ নয়। সে তাড়াতাড়ি পা চালায়।

কিন্তু পা চলবে কি। এমন উচ্চাবচ, অনুর্বর দগ্ধ তাম্র ভূখণ্ড আগে তার চোখে পড়ে নি, আর রাস্তা! মানুষের আর গোমহিষের যাতায়াতে একটা নিরিখ পড়েছে লোকে তাকেই রাস্তা বলে। ছায়াতরু বলতে কিছু নেই, উদ্ভিদের মধ্যে বুনো কুল আর বুনো খেজুরের গুল্ম—আর অখণ্ড কাঁটাগাছের ঝাড় যার নাম জানে না জরা। সে শুনে নিয়েছিল অবন্তী থেকে পশ্চিম দিকে দ্বারকা। সেই নির্দেশ অনুসারে চলেছে পশ্চিমে। তার উপরে আবার পথটা এমন বিরলপথিক যে প্রয়োজন হলে জিজ্ঞাসা করবার লোক মেলে না।

ও ভাই এই পথ তো দ্বারকায় গিয়েছে? শুধালো জরা দীর্ঘদেহী, দীর্ঘতর লাঠি-হাতে এক রাহী আদমিকে।

জরার প্রশ্ন শুনে অনেকক্ষণ লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো তার দিকে, তারপরে হেসে উঠে বলল, ঐ ফুল দাড়ি যদি পরচুলা না হয় তবে কোনদিন পৌঁছতেও পারো—হাঁ, এই পথটাই দ্বারকায় গিয়েছে বটে।

কেন এমন কথা বলছ ভাই?

এগোলেই বুঝতে পারবে।

কেন ডাকু আছে?

আজকে ডাকু নয় কেউ, রাতের বেলায় আমিও ডাকাতি করি।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিতে অবাক হয়ে গেল জরা। শুধালো, আর দিনের বেলায় কি করো ভাই?

যা করতে দেখছ। দিনের বেলায় যে-সব পথিককে পথ বাৎলে দি রাতের বেলায়

তাদেরই মাথায় এই লাঠি—বলে লাঠি দিয়ে এমন একটি ভঙ্গী করলো যার একটিই মাত্র অর্থ হয়।

তাহলে মনে হচ্ছে রাতের বেলায় পেলে আমাকেও মারবে।

না, তোমার চুল-দাঁড়িগুলো সত্যি বলে মনে হচ্ছে, সাধু-সন্ন্যাসীকে আমরা কিছু বলি নে।

তোমরা কি চুল দাড়ি দেখে সাধু-সন্ন্যাসী বোঝো নাকি?

আর কি দিয়ে বুঝবো বলো, ভিতরে ভিতরে তো সব শালা লোচ্চা।

আচ্ছা তবে আসি বলে জরা দ্রুত পা চালাল, এমন লোকের সান্নিধ্যে বেশিক্ষণ থাকা অনুচিত। যা লাঠির দৈর্ঘ্য আর গোঁফের বহর, রাতের কাজ দিনের বেলায় করলে ঠেকায় কে। তবে কিনা তার চুল দাড়ি পরচুলা নয়।

সূর্য যখন মাথার উপরে উঠেছে তখন দারুণ তৃষ্ণা পেলো জরার। কাছেপিঠে কোথাও না আছে গ্রাম না আছে নদীনালা। এমন সময়ে সে দেখতে পেলে অদূরে এক-জন রাখাল বালক কতকগুলো গরু চড়াচ্ছে, তাকে শুধালো, ভাই এখানে কোথাও ঝরণা কি নদী আছে?

প্রশ্ন শুনে রাখালটি হঠাৎ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পাচনিখানি বাঁশীর মতো আড় করে ধরলো মুখের কাছে আর তারস্বরে গেয়ে উঠল, 'যমুনাকি তীরে নীরে গাও চরাওরে, মিঠি তান শুনাওয়ে।'

তার ভাবভঙ্গীতে জরা তো অবাক। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলো, চাইলাম জল, আর তুমি গান ধরলে ব্যাপার কি।

কেন, গানের মধ্যেই তো যমুনা আছে যত খুশী জল পান করে নাও।

তারপরে হেসে উঠে বলল, আজ রাতে আমাদের গাঁয়ে পালাপালা আছে, আমি সাজবো শ্রীকৃষ্ণ, তাই একটু মহড়া দিয়ে নিলাম, সুযোগ পেলাম কিনা। জল খাবে তো আমার সঙ্গে এসো।

জরা চলল তার সঙ্গে, তিন-চার রশি ব্যবধানে পৌঁছে দেখতে পেলো একটা উঁট ইঁদারার চারদিকে ঘুরে ঘুরে জল টেনে তুলছে, সেই জল সরু নালা দিয়ে চাষের ক্ষেতে চলেছে।

নাও খেয়ে নাও, এই বলে ছোকরা উঁট-টাকে থামালো। একটা মাটির পাত্রে জল নিয়ে দিল জরাকে। জরা আকণ্ঠ পান করলো। আঃ কি শীতল আর নির্মল, পাতাল থেকে উঠছে কিনা।

স্নান করে নাও না ভাই, এমন জল আর কাছেভিতে পাবে না।

দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন ছিল না, জরা দেহ শীতল করে স্নান করে নিল। স্নান সমাধা হলে ছোকরা বলল, স্নানের পরে আহার। বলি খাবে কি?

ছেলেটিকে রসিক মনে হয়েছিল জরার, তাই সুরে সুরে মিলিয়ে বলল, বাতাস।

বাতাস নয় বাতাসা আর তার সঙ্গে দই চুড়া, চলো আমার ঘরে। সাধুভোজন করিয়ে আজ একটু উপরি পুণ্য লাভ করবো।

ক্ষুধায় জরার নাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, বিনা ওজরে চলল রাখালের ঘরে। ঘরে পৌঁছতেই ছেলের সঙ্গে জরাকে দেখে তার বুড়ি মা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ওরে পচা আজ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, ওরে পচা, আজ একটা সন্ন্যাসীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিস, তোদের পাপের ভারে মা বসুমতী যে তলিয়ে যাবে।

পচা অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠল, পাপের ভার হাল্কা করবার আশাতেই এঁকে নিয়ে এসেছি, সন্ন্যাসীভোজন করিয়ে পুণ্য করবো।

জরা বুঝতে পারে না ব্যাপার কি। পাপই বা কোথায়, পুণ্যই বা কেন?

তবে নে শীগ্গির বাইরে বিদায় করে দে, তোর দাদারা ফিরে এলে আর রক্ষা থাকবে না। ওরা আবার এমনি পাষণ্ড যে সাধু-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ কিছু মানে না।

নাও ঠাকুর বসে পড়ো, বলে পচা।

পচার মা শালপাতায় চিড়ে দই গুড় সাজিয়ে দিয়েছে, লোটাতে জল দিয়েছে। জরা বিনাবাক্যব্যয়ে বসে খেতে সুরু করলো। বুড়ি না শুনতে পায় এমন স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার মা কি সব বলছিল।

পচা চোখের ইসারায় ও প্রসঙ্গে যেতে নিষেধ করলো, বলল, এখন খাও পরে হবে।

জরার আহার শেষ হলে বুড়ির কাছে বিদায় নিল। পচা বলল, চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

তার মা বলল, দেখিস তোর দাদাদের সম্মুখে না পড়ে। আর কাকে ছেড়ে কার কথা বা বলি, একেবারে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিস।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে জরা শুধোলো, ভাই পচা, ব্যাপার কি বল তো।

ব্যাপার বুঝতে পারলে না? এ গাঁয়ে বিদেশী লোক এসে পড়লে মারা পড়ে।

কেন?

আরে কেন কি, এ গাঁয়ের লোকের ওটাই ব্যবসা, বেশ ভালো উপার্জন হয়। কালকেও তিনজন মরেছে।

তোমার দাদারা?

আমার সাত দাদা, তারা ঐ তিনের দুই জনকে মেরেছিল। টাকার ভাগ নিয়ে তার-পরে নিজেদের মধ্যে মারামারি।

কেন?

জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করা সহজ, কিন্তু তিন পাঁচ সাত বেজোড় সংখ্যাগুলো ভারি বেজাড়া, সহজে ভাগের আওতায় আসে না।

জরা বলে, তোমাকে ধরলেই তো আট হতো, দিব্যি মিলে যেতো।

আমি ওর মধ্যে নেই।

হঠাৎ দৈত্যপুরে প্রহ্লাদ হতে গেলে কেন?

বোধকরি যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজতে সাজতে মনে দয়ামায়া কিছু জন্মেছে।

জরা তার মনের কথা আরও জানবার আশায় বলে, কৃষ্ণ কি দয়াময়?

উত্তর শোনে, বেশ ঠাকুর, এদিকে বললে চলেছ দ্বারকায় আর শুধোচ্ছো কৃষ্ণ কি দয়াময়?

দ্বারকায় যে তীর্থ করতে যাচ্ছি কে বলল?

ওঃ বুঝেছি, বলে পচা, তবে নিশ্চয় যাচ্ছ মাছ ধরতে। তবে তা তোমার জন্য নয়।

কেন বলো তো?

সে জায়গা নদী নালা পুকুর নয়।

তবে কি?

যাও গেলেই দেখতে পাবে। তবে সাবধান করে দি পথে কোন গাঁয়ে আশ্রয় নিয়ো না।

সে ভয় করো না, আমি গাছতলায় থাকবো।

তার চেয়ে নিরাপদ যদি গাছের উপরে থাকতে পারো, বেশ ঝাঁকড়া দেখে গাছ বেছে নিয়ো।

তার পরামর্শ শুনে জরা হেসে উঠল।

হাসির কথা নয় সন্ন্যাসী, মনে রেখো।

ভুলবে না বলে বালকটির কাছে বিদায় নিয়ে জরা চলতে সুরু করে। পচা গান ধরে 'যমুনাকি নীরে তীরে গাও চরাওরে মিঠি তান শুনাওয়ে।' আজ রাতে যাত্রা পালায় তাকে কৃষ্ণ সাজতে হবে।

অনেক দূর চলে এসেছে জরা, তবু তার কানে বাজতে থাকে ঐ গানের কথা আর সুর। সে ভাবে এত দূরে কি ঐ কাঁচা বালকের কণ্ঠস্বর আসছে না ঐ সুর মনের মধ্যে বহন করে এনেছে তাই শুনতে পাচ্ছে। সে ভাবে এ কি শুধু যাত্রাপালার মহড়া না ঐ গানের মধ্যে অবোধ বালক এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যাতে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঐ সাত ডাকাতের ভাই কৃষ্ণ সাজতে সাজতে জাতব্যবসা অস্বীকার করে ফেলেছে তাই মনে মনে যমুনার তীরে গোরু চরাচ্ছে—আর মধুর গান শুনতে পাচ্ছে। আর সে জরা এমনি হতভাগ্য যে সশরীরে যমুনা তীরে গিয়ে না পেলো শান্তি, না পেলো মধুর সঙ্গীতের রেশ।

সেদিন মরীয়া হয়ে রাতের বেলায় মন্দিরের নিষেধ সত্ত্বেও নিকুঞ্জ বনে গিয়ে-ছিল, সঙ্কল্প করেছিল হয় দর্শন লাভ করবো নয় মৃত্যু হবে। কিন্তু না পেলো দর্শন না পেলো মৃত্যু। তখন তার মনে হয় মৃত্যু

হতে গেল কেন? হয়তো বাসুদেব ঐ মূর্চ্ছার ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ওরে নির্বোধ তোর মুক্তি এখানে নয়, এতকাল বাসুদেবরূপে যাকে মনন করলি তারই পীঠস্থানে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে মুক্তি। এই চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্র কেমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করে, যেন সমস্ত শরীর থেকে রক্ত-মাংসের ভার ঝরে পড়ে গিয়ে অশরীরী রূপ লাভ করেছে সে। আশায় আশ্বাসে দ্রুততর বেগে চলতে থাকে।

আবার তার হিসাব থেকে দিনের গণনা স্খলিত হয়ে গিয়েছে, যেমন গিয়েছিল হিমালয়ে। কতদিন গেল, কত রাত গেল মনে থাকে না, সূর্য অস্ত যায় সে পশ্চিমে সেই দিক লক্ষ্য করে চলে। কত সূর্য উদিত হয় কত সূর্য অস্তমিত হয় অথচ তার চলার আর বিরাম হয় না। অবশেষে একদিন রাত্রি প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। পরিশ্রান্ত দেহের শক্তি নাই সে পাহাড় লঙ্ঘনের, তাই সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো পাহাড়ের নীচে। কাল সকালে গিরি অতিক্রম করে আবার চলতে আরম্ভ করবে।

(৭)

ভোরবেলা জরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত হতেই তার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল তা সম্পূর্ণ অভাবিত। সে দেখতে পেলো সমুদ্র দেখা

একই ধোপে ৩ সুরে কাজ ক'রে...

ডেট বেশী সাদা করে— অন্য যে-কোন পাউডারের তুলনায়

কেন এবং কিভাবে তা করে দেখুন

১। ডেট-এ রয়েছে বিশেষ সক্রিয় পদার্থ যা কাপড়ের ভেতরের কঠিন ধুলোময়লা সহজেই দূর করে—কাপড় চমৎকার পরিষ্কার হয়।
২। ডেট কাপড়ের ময়লা দূর ক'রে আবার তা কাপড়ে বসতে দেয়না, কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়, বেশী পরিষ্কার থাকে।
৩। ডেট কাপড়ে বাড়তি সাদা যোগায়, জামাকাপড় উজ্জ্বল করে—সাদা কাপড় আরো বেশী সাদা করে আর রঙীন কাপড় ক'রে তোলে আরো বেশী ঝলমলে। (এতে নীল বা সাদা করবার অন্য কিছুই মেশাতে হয়না)

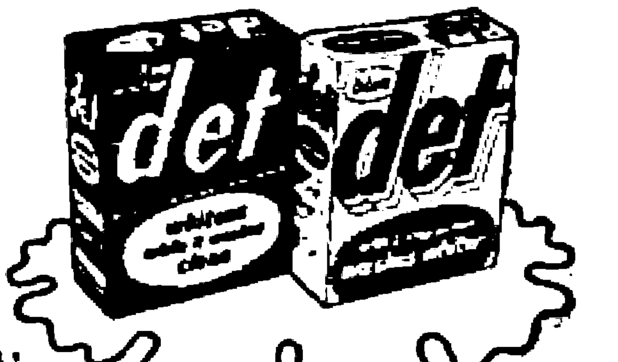

আজই কিনুন—ডেট! একমাত্র ডেট-এই পাবেন দুরকমের পাউডার—সাদা ও নীল।

স্বদেশী আয়রন মিলস, বোম্বাই

Shilpi-HPMA 81A/71 Ben

যায় অবারিত সমুদ্র। এখানে সমুদ্র এলো কোথা থেকে। সম্মুখে আর তো পথ নেই, কোথা দিয়ে কি ভাবে যাবে। সমস্ত পথ লুপ্ত করে দিয়ে প্রকাণ্ড সমুদ্র শায়িত। ঘন নীল তার জল, শিশুর বক্ষস্পন্দনের মতো মৃদুমন্দ কাঁপছে। তীরের কাছে সমুদ্রের জল যেমন সবুজ এখানে তা মোটেই নয়, গভীর সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল তার জল। বিস্মিত হয়ে বসে পড়লো। এবারে কি করবে সে।

জরা দেখতে পেলো পাহাড়ের উপরে একজন কাঠুরে কাঠ সংগ্রহ করছে। তার কাছে গিয়ে শুধালো, ভাই এখানে যদুদের রাজধানীতে যাবার পথ কোথায়?

কাঠুরে তার কথায় অবাক হয়ে গেল, বলল, এখানেই তো তাদের রাজধানী ছিল।

কোথায় সেই রাজধানী?

কাঠুরে একটুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, ঐখানে।

তার মানে?

[তুমি বুঝি বিদেশী?

] জরা বলল, হ্যাঁ।

তাই! সে রাজধানী তো আজ দশ বছরের উপর সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

বলো কি—বলে হতাশ হয়ে বসে পড়লো, তবে তো তার সমস্ত আশা ঐ সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। তখন তার মনে পড়লো খট্টাসের দলের সঙ্গে যাত্রা করবার সময় এই রকম একটা জনশ্রুতি তার কানে এসেছিল, তবে বিশ্বাস হয় নি। তখন আবার শুধালো, কাঠুরে ভাই, লোকজন সব গেল কোথায়?

যারা পেরেছে পালিয়েছে, যারা পারেনি হাঙর কুমীরের পেটে গিয়েছে।

তবে এখন উপায়? একথাটা ঠিক কাঠুরের প্রতি নয়, নিজের উদ্দেশ্যেই।

কাঠুরে বলল, উপায় আর কি, যেখান থেকে এসেছ ফিরে যাও, নইলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, কুমীর হাঙরের পেটে চলে যাও, সেখানে দেখা হলে হতেও পারে—এই বলে সে হাসলো।

জরা লক্ষ্য করলো, তার পুরু ঠোঁট দুখানি হাসিতে তরঙ্গিত। কাঠুরে নিজের কাজে মন দিল, জরা বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে। তার মনের মধ্যে সূক্ষ্ম স্থূল সুতোর বুনন চলছিল তবে সে বিষয়ে জরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। মানুষ মনের গতিবিধি সম্পূর্ণ জানতে পারলে তার জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

জরা ভাবছিল তবে তো তার পাপ থেকে মুক্তিলাভ হল না। মনে পড়লো মদিরার কথা, মদিরাও জানতো না যদুবংশের রাজধানী অতলে তলিয়ে গিয়েছে, তার আগেই সে-ও রাজধানী ছেড়ে যাত্রা করেছিল। তার মনে পড়লো মদিরা বলেছিল, জরা-ভাই, কৃষ্ণ বাসুদেব এখানেও তোমার মনস্কামনা পূরণ করলেন না, তোমাকে ফিরে যেতে হবে, যেখানে তিনি তোমার শরে নিহত হয়েছিলেন সেখানে তোমার মনস্কামনা পূরণ করবেন। কিন্তু এখানে যে অতল সমুদ্র।

বেলা বেড়ে ওঠে, সূর্যের তাপ প্রখরতর হয়, সেদিকে খেয়াল নেই জরার। তার এমনি মূঢ় অবস্থা যে, কিছু চিন্তা করছে বললে ভুল হবে। সে শক্তিও তার লোপ পেয়েছিল। তার মনের সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা, যেমন অরাজক অবস্থা আজ দেশের। দেশে যেমন নিরন্তর হানাহানি চলছে, নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন তেমনি হানাহানি তার মনের মধ্যে। একজন বলছিল, ওরে মূঢ় পাপ, পাপ করে এমন দুর্লভ মানব জন্মটা নষ্ট করলি, এত ঐশ্বর্য কিছুই ভোগে লাগল না। এ হচ্ছে মোটা সুতোর বুনন। আর সরু সুতোর বুনন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য তাতে বিপরীত কথা। পাপীর আবার ভোগ কি, কেবলি দুর্ভোগ। মনে নাই ছাগর্ষির দৃষ্টান্ত, রাজার ছেলে হয়েও কেন সে গুহাবাসী। আবার চার্বাক ঋষি তো আনন্দেই আছে, কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তো তিনি জানেন না। আর ঐ যে গিরিসঙ্কটে যষ্ঠিধারী নিঃসঙ্গ যাত্রী, হয়তো কোন রাজার ছেলে হবে, তিনিও তো স্বীকার করলেন পাপ থেকে মুক্তির উপায় জানেন না। আরে তোর মতো মহাপাপী তো ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নি, তুই হত্যা করেছিস, স্বয়ং পূর্ণাবতারকে। তোর আবার মুক্তি কি, তোর আবার সদ্গতি কি। ডুবে মর, মর, তাহলে আর কিছু না হোক এই যমযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবি। জরা দুই কানে এই দুই পরামর্শ শুনতে পায়। একজন বলে ভোগ কর, ভোগ কর, এখনো সময় আছে, ইন্দ্রিয়সমূহ সতেজ আছে। আর একজন বলে এখনো তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি, আরো দুর্ভোগ, আরো দুঃখ তোর কপালে আছে। আবার শুনতে পায়, দেখলি তো এত হাঁটাহাঁটি, এত দুঃখ ভোগ সমস্ত নিষ্ফল হল, কোথায় তোর যদুবংশের রাজধানী, সমস্ত সমুদ্র সাৎ, সেই সঙ্গেই কি সমুদ্রসাৎ হয় নি তোর আশা-ভরসা। দেখ্ তো কিন্নররাজ্যে সবই কেমন খোলা আছে। তা নয় কোথায় মুক্তি, কোথায় সদ্গতি বলে হনো কুকুরের মতো ঘুরে মরছিস। আবার তখনি অতিশয় মৃদু একটি কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, ওরে জরা, এখনো তোর চলা শেষ হয় নি, হতাশ হয়ে বসে থাকিস না, উঠে পড়, চল-চল। সমুদ্র? এমন সমুদ্র আর নেই যার তল না আছে, এমন সমুদ্র নেই যার পাড় না আছে। আর নৌকা থাকলে অতলে অপারে কি ভয়? কতক্ষণ সে স্থাণুবৎ বসেছিল তার খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পিঠের উপরে একটা আঘাত পেয়ে সম্বিৎ লাভ করলো, নড়তেই একটা কাঠঠোকরা পাখি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। তাকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মনে করে কাঠঠোকরা পাখিটা তাকে ঠোকরাচ্ছিল। সে উঠে দাঁড়ালো।

এবারে সে লক্ষ্য করলো অদূরে একখণ্ড ডাঙা জমি, তার উপরে কয়েকটা গাছও আছে। জমিটা পাহাড়ের লাগোয়া, অর্থাৎ সমুদ্রের জলে না নেমেও সেখানে যাওয়া যায়। বিস্মিত হল এতক্ষণ দেখে নি কেন ভেবে, ভাবলো একবার ওখানে যাওয়াই যাক না, দেখা যাক কি আছে। সেই দিকে সে যাত্রা করলো।

তার আগে একটা কাজ করলো। গলার থলি থেকে কৌস্তুভমণি হারটা বের করে নিয়ে খুঁটো পাথরগুলো খুলে ফেলে দিল। তারপরে কৌস্তুভটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল, সোনার সুতোয় উজ্জ্বল রত্ন ঝকঝক করে উঠে সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিল। তার মনে হয়েছিল এখন আর গোপনীয়তার কারণ নেই, কারণ হয় এখানেই তার মুক্তি হবে, নয় মৃত্যু—ধ্রুব সম্ভব মৃত্যু। যদি মরে মলিন রত্ন সঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? যার রত্ন অমলিন তার কাছে ফিরিয়ে দেবে।

ধীরে-ধীরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলতে-চলতে এক সময় সেই শুকনো ডাঙায় এসে পৌঁছল, দেখতে পেল শুধু গাছপালা নয়, গোটা দুই গরু-ছাগল চরছে, আর দেখতে পেল একখানি কুটির। এখানে এই নির্বান্ধব পুরীতে অতল সমুদ্রের মধ্যে বাস করে কে? হয় সাধু, নয় ডাকু। তার পক্ষে এখন দু-ই সমান। নির্ভয়ে সে এগিয়ে গেল, কুটিরের কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেলো, এসেছ বাবা, বলেছিলাম না যে আবার দেখা হবে।

এ কি ঠাকুর যে। বলে জরা প্রণাম করলো, প্রভুদয়াল জড়িয়ে ধরলেন তাকে বুকে। বলল, চলো বাবা বসি গে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(১)

দশ বছরের ব্যবধানে আসাতেই সঠিক হদিসটা ভুলে গিয়েছিলাম। পথ হাতড়িয়ে তাই কিছুটা সময় হারিয়ে সন্ন্যাসীতলায় এসেছিলাম। লালগোলা রেলপথের স্টেশন জিয়াগঞ্জ থেকে মাইল দুয়েকের হাঁটাপথ। তবে বর্ষায় বিগলিত কর্দমায় সে পথ বড় বিপজ্জনক ছিল। কাদা ভেঙে চারপাশের দৃশ্য দেখে আমরা সন্ন্যাসীতলার গ্রামে ঢুকেছিলাম। বারোয়ারী থানের পাশে সরু পথ, পানাপুকুর, বর্ণালী আলিম্পনে চিত্রিত নিকানো দেয়াল,—কোন কিছুই পাল্টায় নি। কেবল দুটো জিনিসের পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিয়েছিল। শশীবাবু ভয়ানক শীর্ণকায় হয়ে গেছেন। তাঁর হাতের নকশা তাঁতটি অকেজো হয়ে পড়ে থেকে ভেঙে গেছে। এই তাঁতেই এক দশক আগে আমি ওঁকে বালুচরী টেবিল ক্লথ নকশা তুলতে দেখেছিলাম। নানা রঙের সমন্বয়ে সুন্দর টেবিল ক্লথ কিন্তু কালের অনাদরতায়, সরকারী উদাসীনতায় বড় বেদনা বোধ নিয়ে এই সূক্ষ্ম কাজের পাট তিনি চুকিয়েছেন। সাথে সাথে মুর্শিদাবাদের বালুচরী বয়ন-চাতুর্যের সামান্যতম ক্ষীণ ধারাটিরও সমাধি হয়েছে। বৃদ্ধ শশীবাবু —শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস তাঁর সুদক্ষতার দুটো নজীর আমাদের দেখিয়েছিলেন। তাঁর হাতে বোনা বালুচরী একটি রেশমী টেবিল ক্লথ। বাপে এঁকেছেলো সুতো বাঁধা জটিল নকশা তোলার একটি জড়াসো কাঠি,—পুরনো বালুচরী নকশার সকল রহস্যের চাবিকাঠি।

আধুনিক শাড়ীর নানা নামের সমারোহে 'বালুচরী' এখন এক বিস্মৃতপ্রায় নাম। কিন্তু যাঁরা কলারসিক, বাংলার চারু ও কারুশিল্পের প্রতি যাঁদের মমত্ববোধ রয়েছে, মাঝে মাঝে সংগ্রহশালায় যাতায়াত যাঁদের নেশার বস্তু, চার অক্ষরের 'বালুচরী' নাম তাঁদের মনে দৃশ্য-অনুভূতির এক সুখকর আলোড়ন তোলে। তাই ছেঁড়া ফাটা বালুচর শাড়ীর শতাধিক টাকার বেচা-কেনার খবরেও এঁরা বিস্মিত নন।

বয়নশিল্পে বাংলার সুখ্যাতি চিরকালই ছিল দিগন্তপ্রসারী। সুপ্রাচীন কাল থেকে বিদেশে দেশীয় সংস্কৃতির প্রচারে বাংলার বয়ন-শিল্পের প্রশংসনীয় ভূমিকা আজও আমরা বিস্মিত হয়ে স্মরণ করি। সাজগোজের প্রতি বাঙালী সমাজের অতি সচেতনতা আর বয়নশিল্পীদের সৃজনী প্রতিভার মিলনে অতীতের বাংলার বৈচিত্র্যপূর্ণ বয়ন-সামগ্রীর সমারোহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে শুরু করে পোড়ামাটি ও পাথরের নানা মূর্তির অঙ্গ-আভরণে এই বয়ন-বৈচিত্র্যের কিছু কিছু নজীর আমাদের চোখে পড়ে। উপাদানের অপ্রতুলতায় এই

CENTRAL LIBRARY

শাড়ীতে তোলবার জন্য [illegible] গ্রাফে তৈরী একটি নকশা

বিষ্ণুপুরের জনৈক মহিলা শিল্পী বালুচরী স্টোল বোনার কাজে ব্যস্ত

বিচিত্রতার বিস্তারিত ইতিহাস, খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে এইটুকু আমাদের অজানা নয় যে, সূক্ষ্মতা ও সূচারুতায় ঢাকার মসলিনের যেমন জুড়ি ছিল না, তেমনি রংয়ের ঔজ্জ্বল্যে ও বয়ন-নৈপুণ্যে মুর্শিদাবাদের রেশমও ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মুর্শিদাবাদের রেশম তাঁতী-দের উদ্ভাবনী প্রতিভার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি ছিল বালুচর বুটিদার শাড়ী।

শাড়ীর সাথে 'বালুচর' নাম শুধুমাত্র অর্থহীন সংযোজন নয়। কোন আঞ্চলিক বয়ন-শিল্পীদের বিশিষ্ট ঘরোয়ানায় তৈরী বসনের নামকরণ সাধারণতঃ সেই অঞ্চলের নাম অনুসারে হবার রেওয়াজটি বহুকালের। খৃঃ পূঃ সহস্রাধিক বছর আগেও সিন্ধু উপত্যকায় তৈরী বসন বিদেশীদের কাছে 'সিন্ধু' নামে পরিচিত ছিল। পালি সাহিত্যে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাশীতে তৈরী বিখ্যাত শাড়ীকে 'কাশেয়ক' ও বাংলার তুষার শুভ্র মসৃণ মসলিনকে 'বঙ্গক' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। একই রীতিতে পরবর্তী-কালে বেনারসী, ঢাকাই, টাঙ্গাইল ও শান্তি-পুরী শাড়ীর নামকরণ। বালুচর শাড়ীর ক্ষেত্রেও এই রীতির কোন ব্যতিক্রম দেখি না। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ভাঙ্গা-গড়ায় 'বালুচরের' উদ্ভব। কালক্রমে এই বালুচরের উপর জনবসতির পত্তন। এই বালুচর গ্রামের রেশম তাঁতীদের বয়ন-কুশলতায় শাড়ী বালুচরীর জন্ম। কিন্তু বালুচর গ্রাম আজ আর গ্রাম নেই,—মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ টাউনে রূপান্তরিত।

কোন গুণে, কোন বৈশিষ্ট্যে বালুচর শাড়ী ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়? এই প্রসঙ্গ এখন স্বাভা-বিকভাবেই এসে পড়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, বালুচর শাড়ীর বিচিত্র নকশা, সূক্ষ্ম অল-ঙ্করণ, রংয়ের ঔজ্জ্বল্য ও সূচারু সমন্বয় বর্তমান যুগের কলারসিকদের বড় বিস্ময়ের বিষয়বস্তু। আনুপূর্বিকভাবে রেশম অথবা মটকা জাতীয় সুতো দিয়ে তৈরী বালুচর শাড়ী দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সাধারণ শাড়ীর মতই। এর অসাধারণত্ব হস্তচালিত তাঁতে বোনা নকশায়,—নানা রংয়ের সুষম সমন্বয়ে যা এর গায়ের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। হস্ত-চালিত তাঁতে বস্ত্র বয়নের সাথে সাথে যে কি পরিমাণ উচ্চাঙ্গের শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব দেড়শো দুশো বছরের পুরনো বালুচর শাড়ী প্রত্যক্ষ করেই তা উপলব্ধি করা যায়। বালুচর শাড়ীর সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এর আঁচলা। শিল্পী তার সমস্ত কুশলতার পূর্ণ বিকাশ অসীম ধৈর্য নিয়ে এখানেই ফোটাতে চাইতেন। শাড়ীর প্রান্তভাগে ৩½"×৫" আয়তক্ষেত্রাকার বা সাড়ে তিন ইঞ্চি বর্গাকার পরিসরকে নানা বর্ণালী রেশমে বুনটের মাধ্যমেই বিচিত্র ধরনের নকশা ও অলঙ্করণে শোভিত করার প্রবণতা দেখা যেতো। এই শোভিত করার পদ্ধতিটি বড় আকর্ষণীয় ছিল। মূল আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রাকার পরিসরের ভেতরে নানা ধরনের অল-করণ বা নকশাকে ক্রম হ্রস্ব-মান আয়তাকার বা বর্গাকার প্যানেলে পর-পর সাজিয়ে আঁচলের কেন্দ্রভাগের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। এই ক্রমহ্রস্বমান প্যানেলগুলির পর্যায়ক্রমে একটিতে থাকতো বলিষ্ঠভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত ফুল-লতা-পাতার লীলায়িত প্রকাশ আর অপরটিতে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বেশভূষায় নারী অথবা পুরুষের চলমান জীবনধারার আকর্ষণীয় খণ্ডচিত্র। এ ধরনের একটি খণ্ড-চিত্রকেই শিল্পী বারবার বুনটের মাধ্যমে বিভিন্ন রংয়ের বিন্যাসে প্যানেলের আকারে প্রকাশ করে একঘেয়েমি ক্লান্তির পরিবর্তে নূতনত্ব বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিতেন। আঁচলের মূল কেন্দ্রীয় পরিসরটিকে জমাট করতেন এক বা একাধিক সূক্ষ্ম কারুকার্য-ময় অনিন্দ্যসুন্দর কলকা দিয়ে। আঁচলার এই পর্যাপ্ত অলঙ্করণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শাড়ীর দুই পাড়ে থাকতো ফুল-লতা-পাতার বলিষ্ঠ 'মটিফ'। শাড়ীর বিস্তীর্ণ রঙ্গীন জমিনের উপর আড়াআড়ি সারি-বদ্ধভাবে ছড়ানো থাকতো নানা রংয়ের ছোট ছোট কলকা, উড়ে চলা হংসবলাকা, সারিবদ্ধ চকিত চপল হরিণ, বা প্রস্ফুটিত ফুলের সুষমা। ঘন রঙ্গীন জমির উপর প্রস্ফুটিত ফুলের 'মটিফ' কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের কথা মনে করিয়ে দিত অথবা স্নিগ্ধ প্রভাতের শিউলি ছড়ানো নিকানো আঙ্গিনার কথা। জমির এই অলঙ্করণের জন্যই এই শাড়ীর নাম-করণ হয়েছিল 'বালুচর বুটিদার শাড়ী'। দেশীয় রীতিতে রঞ্জিত নানা বর্ণালী রেশমের পরিমিত সমন্বয় বালুচর বুটিদার শাড়ীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাড়ীর জমিতে হলুদ, ম্যাজেন্টা, ময়ূরকণ্ঠী, বেগুনী, হালকা নীল রংয়ের প্রাধান্য থাকতো। এই জমির রংয়ের সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য রেখে লাল, গেরুয়া, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি রংয়ের বিভিন্ন 'সেডে' শাড়ীর উপর নকশা বা অলঙ্করণের কাজ তোলা হতো।

পুরনো বালুচর শাড়ীর সংগ্রহ কল-কাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস, ভারতীয় যাদুঘর, আশুতোষ সংগ্রহশালা ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায়—গেলে দেখা যাবে। এছাড়া কিছু কিছু ব্যক্তি-গত সংগ্রহেও রয়েছে। এদের মধ্যে একাডেমীর সংগ্রহই সবচেয়ে বেশী ব্যাপক। এই বিভিন্ন সংগ্রহের শাড়ীগুলির মধ্যে যে

সমস্ত 'মোটিফ' বা 'ডিজাইন' চোখে পড়ে আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলোকে তিন শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে— (১) ফুল-লতা-পাতার ফ্লোরাল মোটিফ, (২) নারী-পুরুষ ও জীবজন্তুর 'ফিগার মোটিফ', ও (৩) নানা ধরনের নক্সা 'মোটিফ'।

যে কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেশীয় শিল্পী মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সুজলা, সুফলা, শ্যামল বাংলার রকমারী গাছ ফুল লতা-পাতার বিচিত্র বিন্যাস ও গঠন বাঙালী শিল্পী মানসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। গ্রামীণ আল্পনায়, সূচীশিল্পে ও অন্যান্য কারুশিল্পে নানা ধরনের ও গঠনের 'ফ্লোরাল মোটিফে'র ব্যাপক ব্যবহার আমাদের চোখে পড়ে। মৃৎশিল্পের অলংকরণের ক্ষেত্রেও 'ফ্লোরাল মোটিফকে' যে একটা বড় মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত সীলমোহরে ও প্রাচীন পোড়ামাটির পাত্র অলংকরণে তার নজীর আমাদের চোখে পড়ে। বয়ন-শিল্পেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখি না। ফ্লোরাল মোটিফকে বিশেষ করে বালুচর বুটিদার শাড়ীর অঙ্গ অলংকরণে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শাড়ীর প্রান্তসীমার পাড়ের পরিসরকে ফুল লতাপাতার বর্ণালী মোটিফে ভরাট করা হতো। তাছাড়া অন্যান্য ধরনের অলংকরণের ক্ষেত্রেও ফ্লোরাল মোটিফের পরিপূরক ব্যবহার ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে।

এবার অবয়ব বা ফিগার মোটিফের কথা ধরা যাক। ফিগার মোটিফ বালুচর শাড়ীর সবচেয়ে বেশী কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য। সংগ্রহশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে আমরা যে সমস্ত বালুচর বুটিদার শাড়ী সচরাচর দেখে থাকি তাদের সময়কাল অনুমান করা হয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের মধ্যে। বিগত দু-তিন শতকে আমাদের দেশীয় শিল্পীরা এমন এক সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বসবাস করেছেন যেখানে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চালচলন ও জীবনযাত্রার মধ্যে অপরিসীম বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ছিল। অফুরন্ত ঐশ্বর্য আর ভোগবিলাসের রাজকীয় চৌহদ্দির মধ্যে যে সমস্ত নবাব-নাজিম, রাজা-মহারাজা, জমিদার, সুবেদার ও আমীর-ওমরাহরা জীবন কাটিয়েছেন শিল্পীরা যেমন তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন, তেমনি তাঁরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছেন নবাগত ফিরিংগী সাহেবসুবোদের চলন-বলন ও অশন-বসনের সর্বপ্রকার অভিনব ভঙ্গী-গুলোকে। তাঁদের এই অভিনিবেশের সফল রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই পুরনো মন্দিরের গায়ের পোড়ামাটির অলংকরণে, পটচিত্রে ও শাড়ী বালুচরীর আকর্ষণীয় ফিগার মোটিফে। বালুচর শাড়ীর এই ফিগার মোটিফগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ চোখে পড়ে অলংকৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট তাম্রকূট সেবনরত অথবা অশ্বারোহী নবাব, সুদৃশ্য বোট কিংবা মজলিসে ফিরিঙ্গী সৈন্য, অশ্বারূঢ়া নারী, ফুলের সৌন্দর্য-

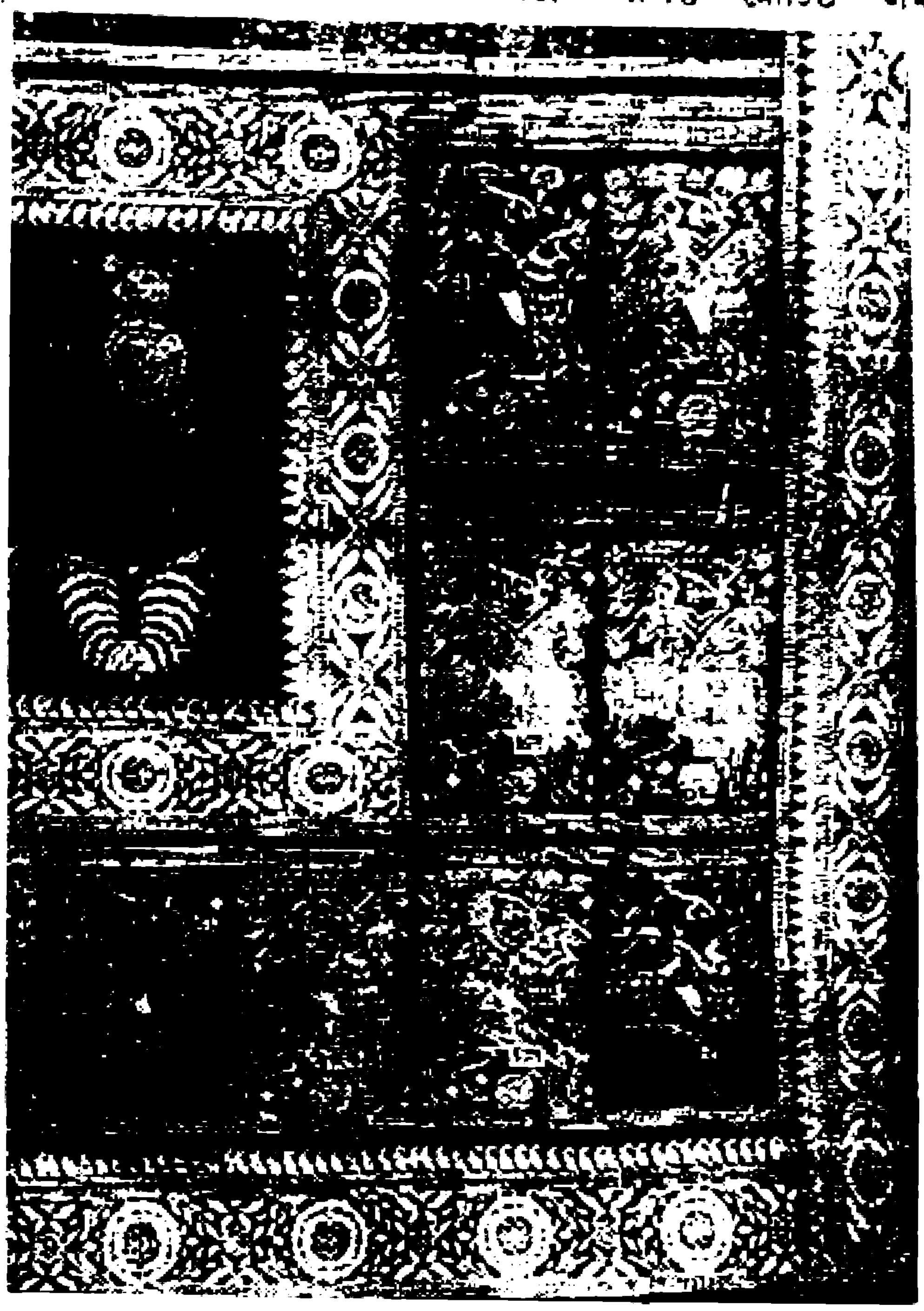

অশ্বারূঢ়া নারী। পাড়ের ফুল লতা-পাতার বলিষ্ঠ মোটিভ লক্ষণীয়।

দর্শনে বেগম, সুন্দর ভঙ্গিমায় ময়ূর, ভ্রমর, প্যানেলের মত করে হাতির সমাবেশ প্রভৃতি। কয়েকটি মোটিফের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। একটি শাড়ীর প্যানেলে দেখা যায় সজ্জিত চলমান অশ্বের উপর কেশবতী সুবেশা কন্যা, মাথার উপর অলংকৃত ছত্রের ছায়া আর তার চারপাশে ভাসমান ফুল-লতা-পাতা—যেন রূপকথার কোন রাজকন্যা অজানা দেশে অভিসারের যাত্রী। নদীবক্ষে স্টীমার ও রেলগাড়ীর প্রচলন বালুচর শাড়ীর বয়নশিল্পীদের মনে যে যথেষ্ট বিস্ময় ও কৌতুকের সঞ্চার করেছিল কয়েকটি মোটিফে তার চমৎকার পরিচয় পাই। একটিতে দেখি দ্বিতল স্টীমারের মাথার উপর প্রলম্বিত পতাকা উড়ছে, তার পাশে চোঙ থেকে ধুঁয়ো উঠছে। ফ্লোরাল মোটিফের মাধ্যমে উড়ে চলা ধূম্রশিখাকে রূপ দিতে চেয়েছেন শিল্পী। স্টীমারের প্রান্তসীমা দুটোকে মকরের মুখাবয়বে অলংকৃত করা হয়েছে। স্টীমারের দ্বিতলে বিচিত্র বেশভূষায় সাহেব-মেম মুখোমুখি বসে। মেমসাহেবের হাতে পোষা পাখি। সাহেবের ডান হাতে তাটিন্দ্র প্রস্ফুটিত ফুল। তাদের মাথার উপর বেলোয়ারী ঝাড় লন্ঠনের বাতি ঝুলছে। অনুরূপভাবে নীলনামার ফুল হাতে বসে সাহেব-মেম। ডেকে সামনে দূরবীন হাতে দণ্ডায়মান জনৈক ফিরিঙ্গী। পাশে নির্দেশদানের ভঙ্গীতে বোধহয় ক্যাপ্টেন। আর একটি শাড়ীর প্যানেলে দেখি রেল-গাড়ীর মত দ্বিতল দ্বিচক্রযান। বগায় শায়িত কুকুর। দুই তলেই উপবিষ্ট সাহেব-মেম। পাশে সশস্ত্র ফিরিঙ্গী। বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব অনেক সময় ফিরিঙ্গীদের মধ্যে অস্ত্রী মোকাবিলাতেও পরিণত হতো। বাংলার নবাবদের সাথে ফিরিঙ্গীদের দ্বন্দ্ব মূলতঃ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই এবং এই দ্বন্দ্বেরই চূড়ান্ত পরিণতি পলাশীর প্রান্তরে। যুদ্ধবাজ ফিরিঙ্গীদের এই জঙ্গী মনোভাবের কিছু কিছু চিত্রও বালুচর শাড়ীতে দেখা যায়। যেমন, বড় কামানবাহী শকটের দুপাশে যুদ্ধবেশে তিনজন ফিরিঙ্গী সাহেব। স্কেচের বলিষ্ঠতায়, অশ্বের বেশভূষায়, শিরস্থাপিত টুপির গঠনের পারিপাট্যে কোন ত্রুটি নেই। ফিরিঙ্গী বেশ-ভূষা ও রাজকীয় পরিচ্ছদের প্রতি শিল্পীদের সচেতনতা বালুচর শাড়ীতে আকর্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। নানা রঙের সমাবেশে ও সুচারু বয়নের কারিগরীতে ফিগার মোটিফগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য সুন্দর রিলিফের মত এফেক্ট আনা হতো যা প্রায় প্লাস্টিক আর্টেরই সমগোত্রীয়। বাংলার পুরনো মন্দিরের পোড়ামাটির গাত্র অলংকরণের মতই বালুচর শাড়ীর ফিগার

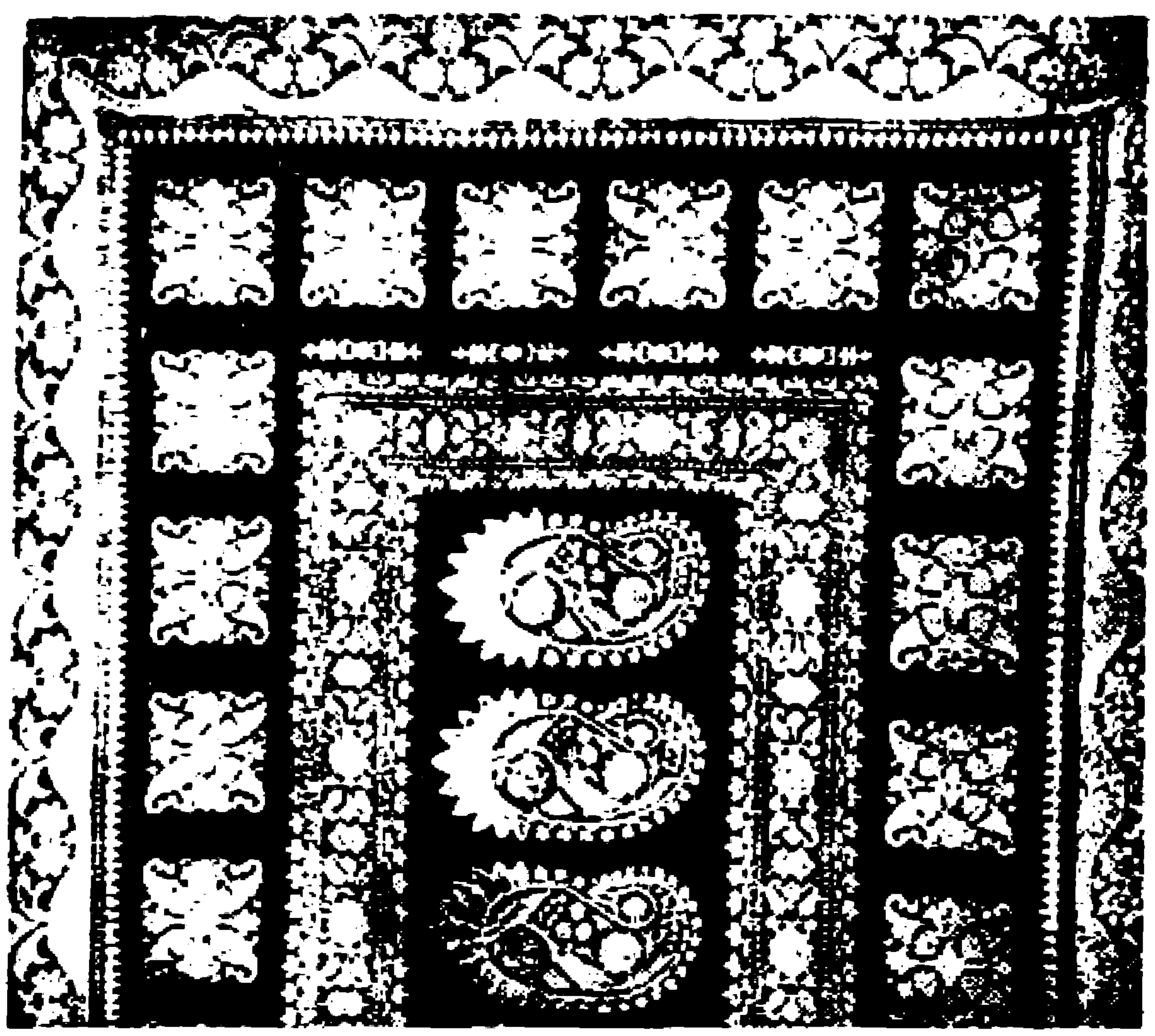

বিষ্ণুপুরে তৈরি বালুচরী স্টোল

মোটিফগুলো দর্শককে এক কথা ও কাহিনীর জগতে নিয়ে যেতে চায়—যে জগতে রাজা আছে, মহারাজা আছে, ফিরিঙ্গী সাহেবসুবো আছে, আবার ভারতীয় মহিলাদের শৌর্যের কথাও রয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শৌখীন শাড়ীর সাথে বালুচর শাড়ীর পার্থক্যটা এখানেই। বেনারসী শাড়ী বা দক্ষিণ ভারতীয় টেম্পল শাড়ীর দৃষ্টান্ত চোখে আছে ঠিকই, কিন্তু বালুচর শাড়ীর মত এরা চোখের চৌকাঠ ছাড়িয়ে মনের অন্দরে ঢুকে আমাদের ভাবনা ও কল্পনাগুলোকে আন্দোলিত করে না,—একটা সামাজিক কাহিনীর জগতে নিয়ে যায় না।

যে মোটিফকে বাদ দিয়ে বালুচর শাড়ীকে কল্পনা করাও সম্ভব নয় তা হল এর অনবদ্য কলকা মোটিফ। শিল্পমানের দিক থেকে কলকা মোটিফ বালুচর শাড়ীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ আঁচলায় আয়তাকার বা বর্গাকার প্যানেলগুলোতে ক্রমহ্রস্বমানভাবে যে কেন্দ্রীয় পরিসরের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো তাকে নানা বর্ণের ও গঠনের এক বা একাধিক সারিবদ্ধ কলকায় একনিষ্ঠভাবে শোভিত করার প্রবণতা দেখা যেতো। ভারতীয় শিল্পকলায় ব্যবহৃত কলকার কয়েকটি উৎকৃষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন আমরা বালুচর শাড়ীতে দেখতে পাই। অর্ধবৃত্তাকার একটি পরিসরকে ক্রমহ্রস্বমানভাবে ঊর্ধ্বমুখী অথবা নিম্নমুখী করে বঙ্কিমভঙ্গীতে এক বিন্দুতে মিলিত করার নামই কলকা মোটিফ। এই কলকা মোটিফ কখন বালুচর শাড়ীর সর্বাপেক্ষা বুটি হিসাবে ব্যবহৃত হতো আবার কখন শাড়ীর আঁচলের কোণায় কোণায় একটি করে বড় কলকাকে উপস্থাপন করা হতো। তবে কলকার গঠন নিয়ে বালুচরী বয়ন-শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফল অভিব্যক্তি আমরা শাড়ীর আঁচলের কেন্দ্রীয় পরিসরেই দেখতে পাই। বড় কলকার অর্ধবৃত্তাকার প্রান্তসীমাটি পদ্ম শোভিত বৃন্তের সাথে যুক্ত করা হতো। ভেতরের ক্রমহ্রস্বমান পরিসরকে কলকার গতিময় গঠনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রকমারী ফুল লতা পাতায় খুব সূক্ষ্ম কাজে শোভিত করা হতো। বঙ্কিম প্রান্তসীমাটিকে টিয়াপাখীর ঠোঁটের আকারে আনা হতো। পদ্ম পুষ্প শোভিত একটি বৃন্তকে প্রান্তসীমার শেষ বিন্দুটির সাথে কখন কখন এমনভাবে জুড়িয়ে দেওয়া হতো যে অনেক সময়ই দেখে মনে হতো যেন পাখী যেন নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষায় অভিসারী। বিভিন্ন কলারসিক বিভিন্ন বস্তুর গঠনের সাথে কলকার আদল খুঁজতে চেয়েছেন — যেমন আমের মঞ্জরীর সাথে, শঙ্খের সাথে, চেনার গাছের পাতার সাথে। কেউ কেউ মনে করেন যে, অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কলকা মোটিফের ক্রমবিকাশের সূত্রটি মুঘল যুগের চিত্রিত পুঁথির অলঙ্করণের মধ্যেই খোঁজা উচিত। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বলে থাকেন, বালুচর শাড়ীতে কলকা মোটিফ পারসিক প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের সপক্ষের যুক্তি হিসেবে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই বয়ন-শিল্পে কলকা মোটিফের প্রচলন চোখে পড়ে। সাসানিয়ান (খৃষ্টীয় ২য় শতক—৭ম শতক) যুগের রেশম বয়নেও আমরা কলকা মোটিফের নিদর্শন পাই। পরবর্তীকালে পারস্যদেশীয় বিভিন্ন বয়ন-সামগ্রীতে যেমন, কম্বলে, কাপড়ে, শালে নানা ঢঙের কলকা (মীর-ই-কলকা) মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। সেইজন্য ভারতীয় শিল্পে কলকা মোটিফের বহুল প্রচলন মুসলিম প্রভাবের ফল বলে অনেকে মনে করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, কলকার অবয়ব যে পুরোপুরি পারস্য-প্রভাবেই উদ্ভূত এমন সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় সঙ্গত নয়। কারণ, কলকা মোটিফের সমভাবাপন্ন অনেক বস্তুই বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশীয় শিল্পীদের কাছে দৃশ্যমান ছিল। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত "Shell motif" -এর সাথে কলকার অর্ধবৃত্তাকার অবয়বের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য কেউ কেউ লক্ষ্য করে থাকেন। সাঁচী ও ভারহুতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে কলকার ধাঁচে কিছু কিছু অলঙ্করণও আমাদের চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে অজন্তার গুহাচিত্রে অঙ্কিত আম্র গঠনের সাথে কলকার অবয়ব সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। তাই এমন অনুমান করা বোধহয় অসংগত নয় যে, পরিদৃশ্যমান অর্ধবৃত্তাকার বস্তুর গঠন-বিন্যাসের মধ্যেই দেশীয় শিল্পীদের কলকা সৃষ্টির প্রেরণাটি নিহিত ছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁদের এই সৃজনশীলতা পারসিক প্রভাবে আরও বেশী পুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে আকর্ষণীয় এক কলকা মোটিফে প্রকাশিত হয়। বালুচর বুটিদার শাড়ীর অনন্যসুন্দর কলকাগুলি মনে হয় এই মিশ্র প্রভাবেরই সফল অভিব্যক্তি।

বালুচর শাড়ীতে এত ভিন্ন ধর্মীয় অলঙ্করণের পাশাপাশি সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও কখনই তারা পারস্পরিক বিরোধী ভাব নিয়ে দর্শকের চোখকে পীড়িত করে না। বরং বিভিন্ন রং ও নানা অলঙ্করণ পরস্পরকে পরিপূরক হিসেবে সহযোগিতা করে সামগ্রিক সৌন্দর্য সৃষ্টির অংশীদার হতো। এই অলঙ্করণের কাজগুলো এতই সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন যে এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সূচীশিল্প বলে ভ্রম হয়। বয়ন-শিল্পীদের এতো পরিমিতিবোধ, সমন্বয় সাধনের এমন যাদুকরী বিদ্যায় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এই বয়ন-কুশলতার সঠিক উদ্ভবকালটি নির্ধারণ করা যদিও সম্ভব নয়, তবে যে সামাজিক পটভূমিতে এই শাড়ীর শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতে সচেষ্ট হওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। একথা স্বাভাবিক, যে কোন চারু বা কারুশিল্পই তার সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছোবার পশ্চাতে বেশ কয়েক যুগের শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একনিষ্ঠ সাধনার অবদান থাকে। যে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র বয়ন-পদ্ধতিতে আঠারো বা উনিশ শতকের বালুচর শাড়ীতে নকশা তোলা হতো তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ববর্তীকালের ধারাটির কোন সঠিক নজির দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হাতে নেই। যে যুগ কারিগরি ও যন্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর ছিল, সে যুগে শুধুমাত্র বয়ন-শিল্পীদের বুদ্ধি ও হাতের কারিগরির সমন্বয়ে তাঁকে নকশা তোলার কাজটি নিষ্পন্ন করতে হতো। তাতে কাপড় বুননের চেয়ে বোনার সাথে সাথে নকশার

তোলার পদ্ধতিটি অবিশ্বাস্য রকমের বেশী জটিলতর। এই জটিলতর শিল্পকর্মটির প্রচলন পূর্বে ভারতে তথা ভারতে প্রাচীনকালে ছিল কি না তাও সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। তবে মুসলিম-পূর্ব যুগের মূর্তি ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নারীমূর্তির অঙ্গবসনে ডিজাইন বা নকশার কিছু কিছু চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে। তবে সে নকশা কাপড়ের উপর চিত্রিত নকশা হতে পারে, সূচী-শিল্পও হতে পারে, আবার তাঁতে বোনা নকশা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে হেতু সুপ্রাচীনকাল থেকেই সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যের পূর্ব ভারতীয় বসনসামগ্রী এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী, সেই হেতু যুগে যুগে বয়ন-শিল্পীরা তাঁদের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে তাঁদের বসন-সামগ্রীকে যে আরও বেশী জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন একথা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ভারতের কোন কোন আদিবাসী সমাজে 'কোমর তাঁত' স্বল্প পরিসর কাপড় বয়নের সাথে সাথে হাতে নকশা তোলার এক পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাই তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি সম্পর্কে প্রাক-মুসলমান যুগের ভারতীয় বয়ন-শিল্পীরা একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন এবং একমাত্র মুসলমান প্রভাবেই এই কুশলতার উদ্ভব এমন সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে একথা ঠিক, মুঘল যুগে মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প উন্নততর কলা-কৌশলে ও রকমারি অলংকরণের সাজসজ্জায় নতুনভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্র-স্থল মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই যেমন প্রচলিত ছিল খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের Coptic textile এ ও পরবর্তী সাসানীয় যুগের রেশমবস্ত্রে ফিগার, জিওমেট্রিক ও ফ্লোরাল মটিফের সমাবেশই তার প্রমাণ। পরবর্তীকালে তাঁতে এই নকশা তোলার পদ্ধতিটি ইসলাম জগতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বালুচরী বয়ন-চাতুর্য এই ইসলামী সভ্যতার সংস্পর্শে উদ্ভূত না কি ভারতীয় বয়ন-শিল্পধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সঞ্জাত আমাদের বর্তমান জ্ঞানের পরিধিতে তা সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা এটুকু জানি, বহু প্রাচীনকাল থেকে মসলিন ও রেশমবস্ত্র বয়নে বাংলাদেশের এক গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা বহু কাল যাবৎই রেশম চাষ ও বয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই মুর্শিদাবাদের লাভজনক রেশম ব্যবসার উপর বৃটিশ বেনিয়ানদের সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতে ডাচ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ ও আর্মানীয় বণিকেরা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে বিদেশে কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য চালান দিতে শুরু করায় এই শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে আঠারো শতকের একেবারে গোড়াতেই মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করায় স্থানীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। যে কোন দেশের রাজধানী তার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জনজীবনের উপর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকেই এক পরিব্যাপ্ত প্রভাবের সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন নবাব কর্মচারী, আমীর ওমরাহ, জায়গিরদার ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাবেশ ঘটেছিল, তেমনি বিভিন্ন স্থানের কুশলী চারু ও কারু শিল্পীরা আমিরী পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চিন্ত ছত্রতলে এসে সমবেত হয়েছিল। এই সমুন্নত পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন নতুন শিল্পেরও যেমন প্রচলন হয়েছিল, তেমনি প্রাচীন শিল্পগুলোর শিল্পোৎকর্ষতাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই আমিরী রুচি ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখেই মনে হয় অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময় স্থানীয় শিল্পীদের বয়ন-কুশলতায় কিংবা কোন বহিরাগত শিল্পীর সহযোগিতায় এই বালুচরী বয়ন-চাতুর্যের উদ্ভব হয়। একটি বালুচর শাড়ী বয়নের পশ্চাতে যে পরিমাণ শিল্পীজনোচিত নিষ্ঠা, শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হত একমাত্র সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই তা সম্ভব ছিল। এমন জনশ্রুতি আছে যে, অনেকক্ষেত্রেই জমিদার ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিষ্কর জায়গীর দিয়ে বালুচরী বয়ন-শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতেন। তদানীন্তন বাংলার জনপ্রিয় ফ্যাশান হিসাবে বিবেচিত হত। সাধারণ শাড়ী অপেক্ষা এই শাড়ীর মূল্যমান বেশী থাকায় একটি বিশেষ সমাজেই এর জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতকে একটি ভাল বালুচর শাড়ীর মূল্য ৪০,—৫০, টাকার মত ছিল। অভিজাত মুসলমান সমাজেও এই শাড়ীর প্রচলন ছিল কি না তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কারণ জীবজন্তু চিত্রিত বিশুদ্ধ রেশমবস্ত্র পরিধান মুসলমান শাস্ত্রবিরোধী বলে মনে করা হতো। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মীয় ও বিবাহ অনুষ্ঠানে আবশ্যকীয় পট্ট, অর্থাৎ রেশম বস্ত্র হিসাবে অভিজাত হিন্দু পরিবারে বালুচর শাড়ীর প্রচলন ছিল। একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের সংগ্রহে অনেক বালুচর শাড়ীই উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হওয়ায়, উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাত মহলেও এই বালুচর শাড়ীর বাজার ছিল বলে মনে হয়।

বালুচর শাড়ীর জটিল বয়ন-পদ্ধতি ভাষায় সহজ করে প্রকাশ করা যথেষ্ট দুঃসাধ্য। সাধারণভাবে বলা যায় এই শাড়ীর অলংকরণের সমস্ত কাজই পূর্ব পরিকল্পিত কোন প্রকারের নকশা চিত্র (graphic design) ছাড়াই শিল্পীরা 'নকশা তাঁত' নামে এক বিশেষ ধরনের হস্ত-চালিত তাঁতে কাপড় বোনার সাথে সাথেই করে থাকতেন। শাড়ীর উপর প্রয়োজনীয় নকশাগুলো একটা বাঁশের কাঠিতে সুতো বাঁধায় নানা রকমের জটিল কারিগরিতে সাজিয়ে নিয়ে একাধিক রঙের রেশমী সুতোয় তাঁতে বয়নের সাথে সাথে শাড়ীতে তোলা হত। সুতো বেঁধে এই নকশা তোলার পদ্ধতিকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হতো 'ঝাপে তোলা।' শাড়ীর পাড়ের বুটি ও আঁচলের অলংকরণের জন্য প্রতি ক্ষেত্রেই দুটি করে নকশা ঝাপ ব্যবহৃত হত। অলংকরণের প্রাচুর্যের জন্য ১৫টি নকশা ঝাপ একত্রে ব্যবহারেরও রীতি ছিল। শাড়ী বয়নের সাথে সাথে এত বিভিন্ন রঙের

অভিনব সাড়া জাগানো অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী
বহু তথ্যসমৃদ্ধ অসংখ্য চিত্রশোভিত—যাত্রীর লেখা

দেবভূমি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থপথে

মূল্য : ৬·০০

সুন্দর ভাষায় লেখা বইটি যাত্রীদের খুবই উপকারে আসবে।
—শ্রীরথীন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, জামসেদপুর।
দ্বিধাহীন চিত্তেই স্বীকার করি যে, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। —কামনারঞ্জন ভট্টাচার্য, কলি-১২।

প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক : শ্রীউৎপলব্রত সরস্বতী, ফোন : ৪৬-৫৪০৭
৮৭।৫, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলি:-৪৭
কথা ও কাহিনী : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
দে বুক স্টোর্স : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

শাড়ীর আঁচলায় ফিতার মোটিফের বিন্যাস [illegible]

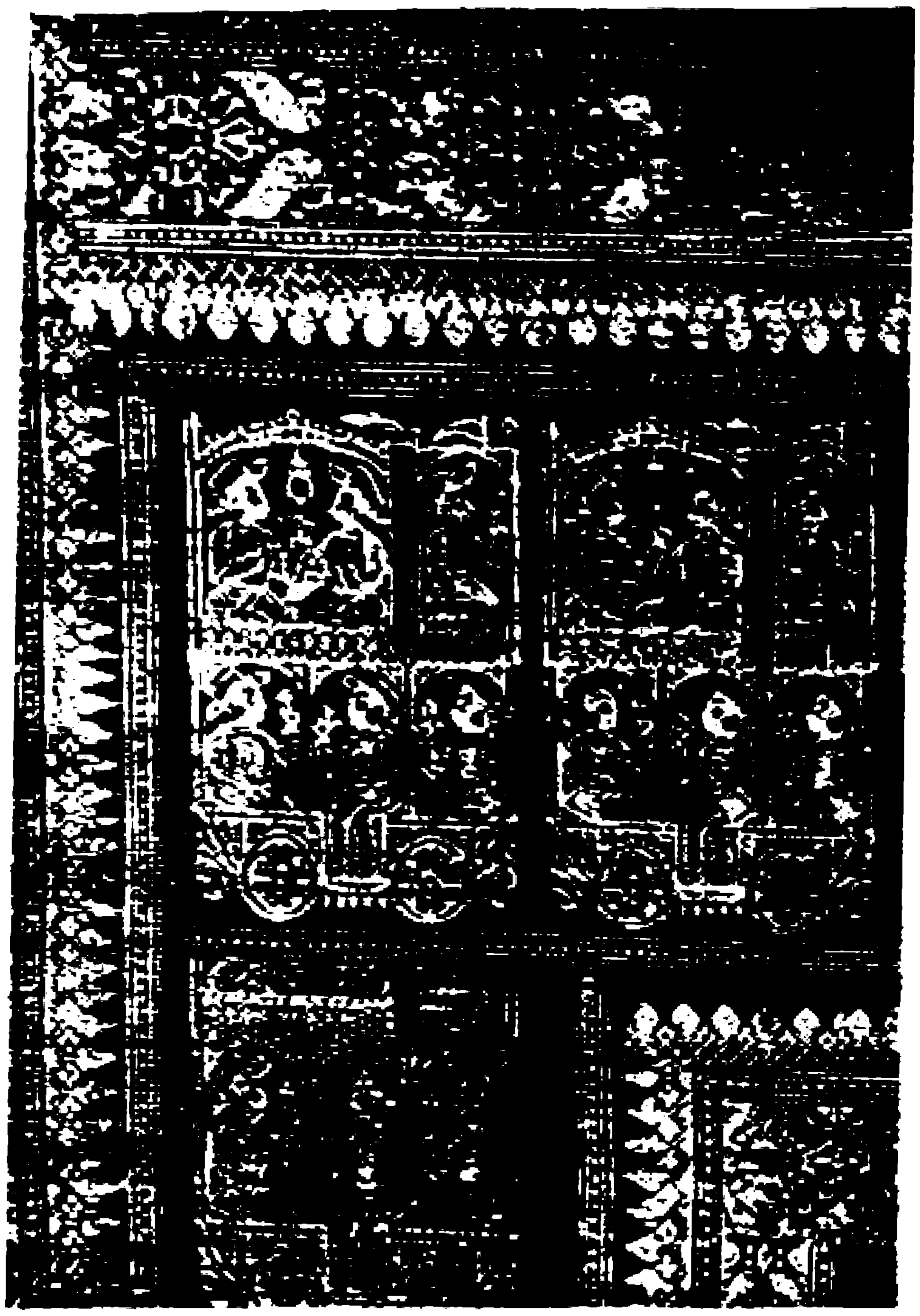

আঁচলার প্রান্তসীমায় ফুল-বুটির মাঝে অনন্য একক কলকা।

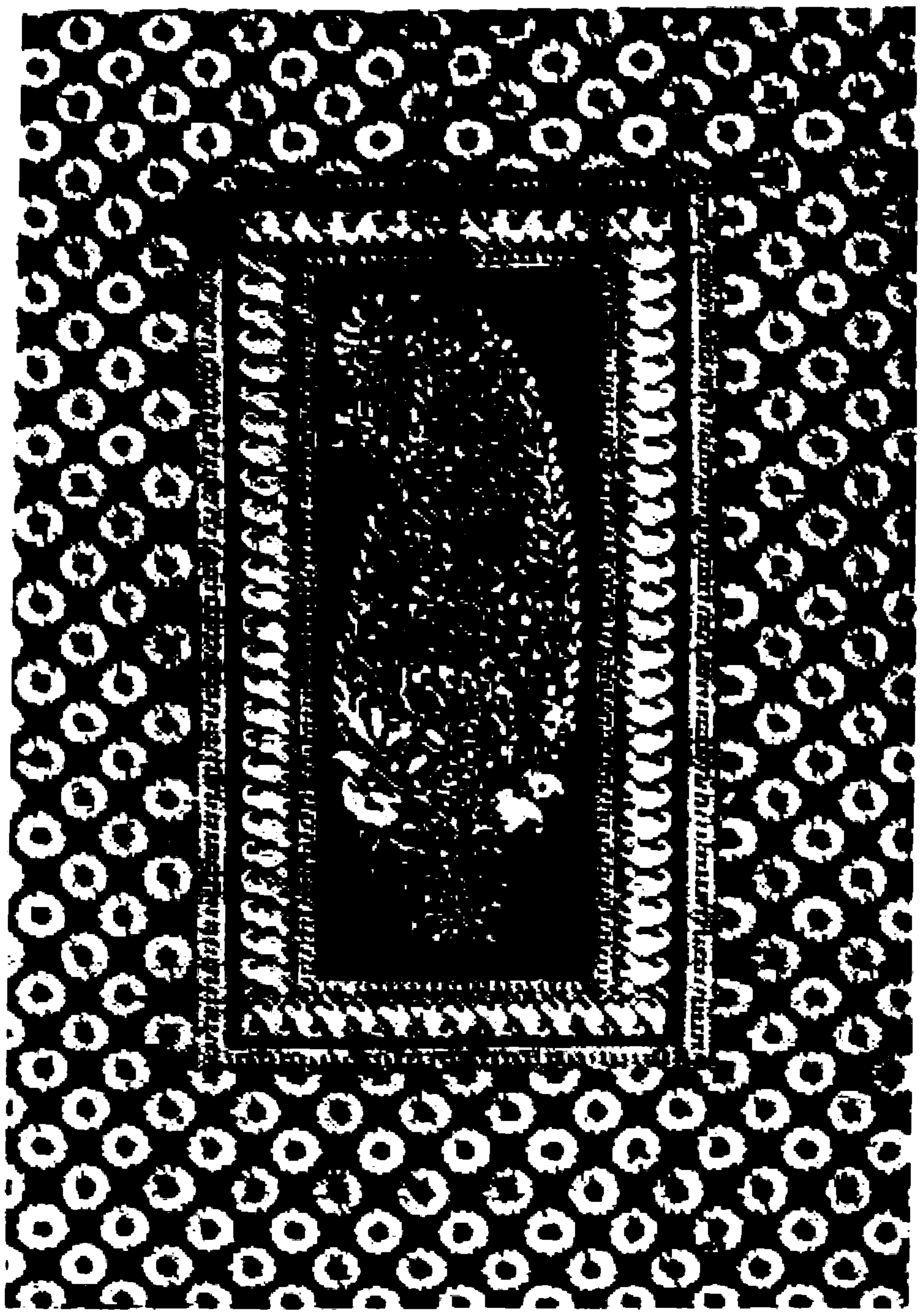

সুতো এবং সূতো [illegible] মধ্যে দিয়ে যে কেমন করে চালানো হতো তা সত্যি এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বয়নের সময় দুজন শিল্পীর সহযোগিতা করতেন আরও নতুন সহশিল্পী। এই তিনের সহযোগে একটি উৎকৃষ্টমানের বালুচর শাড়ী বুনতে প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত হতো। এই শাড়ী বয়নের সবচেয়ে জটিলতম নিপুণতা হচ্ছে অলংকরণের বর্ণসমাবেশ বা আয়তাকার প্যানেলগুলোর যোগ মেলানো। শাড়ী ছাড়াও শিল্পীরা এই পদ্ধতিতে বালুচরী টেবিল ক্লথ, গায়ের চাদর, নামাবলী প্রভৃতি বুনতেন।

যে সমস্ত শিল্পী বালুচরী বয়ন-চাতুর্যের অবিরাম ধারাটি বহন করে চলেছিলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের অন্য পাঁচটি চারু ও কারুশিল্পীর মতই তারা বিস্মৃত হয়ে গেছেন। তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমরা জানি না। তবে সৌভাগ্যবশত এঁদের মধ্যে একজন শিল্পী যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও আত্মসচেতন ছিলেন, যিনি তাঁর হাতে বোনা সকল বালুচরী সামগ্রীর উপর নাম ঠিকানার স্বাক্ষর রেখে নিজেকে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন। তিনি হলেন স্বনামধন্য শ্রীদুবরাজ দাস—এই শিল্পধর্মের শেষ শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কলকাতার সংগ্রহশালাগুলোতে শ্রীদুবরাজ দাস স্বাক্ষরে শ্রীদুবরাজ দাস—[illegible] ঠিকানার স্বাক্ষর সম্বলিত অনেক বালুচর শাড়ী সযত্নে রাখা আছে। উনবিংশ শতকের শেষ হবার মুখে প্রায় আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। যতদূর জানা যায় শ্রীদুবরাজ দাস চামারের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দুবরাজ জীবন শুরু করেছিলেন ঢোলক নির্মাণের কারিগর হিসাবে। পরবর্তীকালে নিরক্ষর দুবরাজ কবিগানের মস্ত কবিয়াল হিসেবে সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়ে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মধ্য জীবনে বালুচর গ্রামের একজন বিখ্যাত মুসলমান বালুচরী শিল্পীর সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দুবরাজ তাঁর জীবনে নানা ধরনের বালুচরী বসন সামগ্রী বয়ন করেছেন। যে কোন ধরনের অলংকরণের জন্য তিনি নকশা-তাঁত সাজাতে দক্ষ ছিলেন। দুবরাজ দাসের নাম ছাড়াও গোষ্ঠ কারিকর নামে আর একজন শিল্পীর নাম স্বাক্ষরিত একটি মাত্র বালুচর শাড়ী একাডেমীর সংগ্রহে রয়েছে।* গোষ্ঠ কারিগরকে দুবরাজের পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক বলে মনে হয়। দুবরাজের অধিকাংশ শাড়ীর অলংকরণ তাঁর পূর্বসূরীদের শাড়ীর অলংকরণের তুলনায় বেশ কিছুটা সহজ সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। অলংকরণের বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত করার চেয়ে সরল আবেদনের প্রতি ঝোঁকটাই যেন তাঁর বেশী ছিল। দুবরাজের শাড়ীর অলংকরণের মধ্যে রুচি ও ডিজাইনের পারস্পরিক বিবর্তনের ধারাটি কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। জনপ্রিয়তা হারাবার আশংকায় দুবরাজ দাস বালুচরী বয়ন চাতুর্যের সকল কলা-কৌশল তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে প্রকাশ করে যাননি। তাই তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই শিল্পের স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে বলা যায়। দুবরাজের গ্রামবাসী শ্রীহেম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করে এর কলাকৌশল কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাস, যাঁর পরিচয় দিয়ে এই নিবন্ধের সূত্রপাত করেছিলাম, স্বর্গীয় হেম ভট্টাচার্যের সহযোগী ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে এই বালুচরী বয়ন শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর বর্ণনায় ও পুরনো নথি-পত্রের বিবরণে জানা যায় বর্তমান জিয়াগঞ্জ (বালুচর) শহরকে কেন্দ্র করে বালুচরী শিল্পী [illegible]

---

* (যোগেশ্বর দত্ত সাং জিয়াগঞ্জ—' এই রকম একটি নাইন আঁচলার বোনা আর একটি শাড়ীর সন্ধানও আমি কলকাতায় পেয়েছি, তবে এই শাড়ীটি বেশী [illegible] ()

পাড়া, ময়নাপাড়া, রামচন্দ্র, মাজিয়াল্লাব, সাগড়দহ বেজিরাপুকুর, আমডহর ও রূপা গ্রাম। জিয়াগঞ্জের উত্তরে গঙ্গার পাশেই বাহাদুরপুর গ্রামে ছিল দুবরাজের বাস। মূলত তিনি ছিলেন বাহাদুরপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মীরপুরবাসী। তাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্মই মীরপুরে বসে করা। মীরপুর গঙ্গার ভাঙনে বিলীন হলে তিনি বাহাদুরপুরে উঠে আসেন। বালুচরী শিল্পী প্রধান গ্রামগুলোতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করে শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন কৈবর্ত, বৈষ্ণব, মাল, বাগদী, চণ্ডাল, মুসলমান ও জুগী সম্প্রদায়। আজ অবশ্য কোন গ্রামেই জীবিত কোন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। শিল্পের ক্রমাবনতির সাথে সাথে বাঁচার জন্যে সমধর্মী কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় কোন জীবিকাকে তাঁরা জীবনের সহযোগী করে নিয়েছেন।

সামাজিক রুচি ও চাহিদাকে সামনে রেখে যেমন শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ হয়, তেমনি কোন শিল্পের ক্রমাবলুপ্তির পশ্চাতে কতকগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। বালুচরী বয়ন চাতুর্যের এমন অনুপম শিল্পধারার অবলুপ্তির সম্ভাব্য কারণগুলোর অনুসন্ধানের ঔৎসুক্য তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হতে পারে। রাজনৈতিক তথা ও পলাশীর যুদ্ধ আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাবে আন্দোলিত করেছিল। যে অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত বঙ্গসমাজ আবহমানকাল থেকেই বাংলার চারু ও কারু শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রধান স্তম্ভ হিসেবে পরিচিত ছিল ইংরেজ প্রভুত্বের নতুন ছত্রছায়ায় তাদের দ্রুত মানসিক রূপান্তরের সূত্রপাত হল। এক উৎকট-বঙ্গ কদাচারের আবর্তে পড়ে দেশজ শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে সাহেবীয়ানার খাতে তাঁরা বেশী পরিমাণে অর্থ-ব্যয় শুরু করলেন। দ্বিতীয়তঃ, পলাশীর যুদ্ধোত্তর কাল থেকেই মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমার সাথে সাথে সাহেবী ধাঁচে কলকাতার নগর কেন্দ্রিক জীবনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় মুর্শিদাবাদের অভিজাত উচ্চমধ্যবিত্ত জনস্রোত ইংরেজ অনুগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুক্ত জীবিকার আশায় কলকাতামুখী হলে অন্যান্য শিল্পীদের মত বালুচরী বয়ন শিল্পীরাও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করলেন। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্বে বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলে ভাঙতে শুরু করায় সমস্ত গ্রামীণ শিল্পের সজীব ধারা আর্থিক প্রতিকূলতায় ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, কাশিমবাজারের ডাচ, ফ্রেঞ্চ, আর্মেনীয় ও ইংরেজ কুঠীগুলো সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে তাদের ব্যবসার খাতিরে রেশম বয়ন শিল্পীদের যে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন ইউরোপের শিল্পবিপ্লব তাদের এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা করল। তারা রেশম বস্ত্র সামগ্রীর উৎপাদনকে আর উৎসাহিত না করে কাঁচা রেশম চাষ ও নীল চাষে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করায় রেশম শিল্পীরা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এ সমস্তই হচ্ছে এই বালুচরী শিল্পের অবলুপ্তির অপ্রত্যক্ষ কারণ। প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যায়, এই শিল্প একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বালুচরী নকশা বয়নের মূল কলাকৌশল অর্থাৎ সুতো তোলা সাধারণ রেশম বয়ন শিল্পীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এমন কি এই বয়ন-চাতুর্যের পুরোপুরি ওস্তাদ শিল্পীরা তাঁদের গোষ্ঠীর সহশিল্পীদেরকেও এর সকল কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করতেন না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্পকৌশল ক্রমশই এক সংকীর্ণতর শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হতে থাকে। দুবরাজ দাসকেই এখানে উদাহরণ স্বরূপ রাখা যেতে পারে। জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কায় নকশা তৈরি সাজাবার কৌশলটি পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব করে রেখেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর এমন কোন দক্ষ একনিষ্ঠ শিল্পীকে পেলাম না যিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই শিল্পধারাকে আঁকড়ে থাকতে পারেন। অবশ্য শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামক একমাত্র শিল্পী নন, অনুকূল পরিবেশেরও প্রয়োজন। প্রতিকূলতার একাধিক কারণগুলোর সাথে যোগ করা যেতে পারে উনবিংশ শতকের গোড়াতে মুর্শিদাবাদের ম্যালেরিয়ার মহামারী ও পরবর্তীকালে রেশম-কীটের পেব্রিন রোগের প্রাদুর্ভাব। অবলুপ্তির সর্বশেষ, কিন্তু গুরুত্বে সর্বকনিষ্ঠ নয়, কারণ হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় রুচির বিবর্তন ও

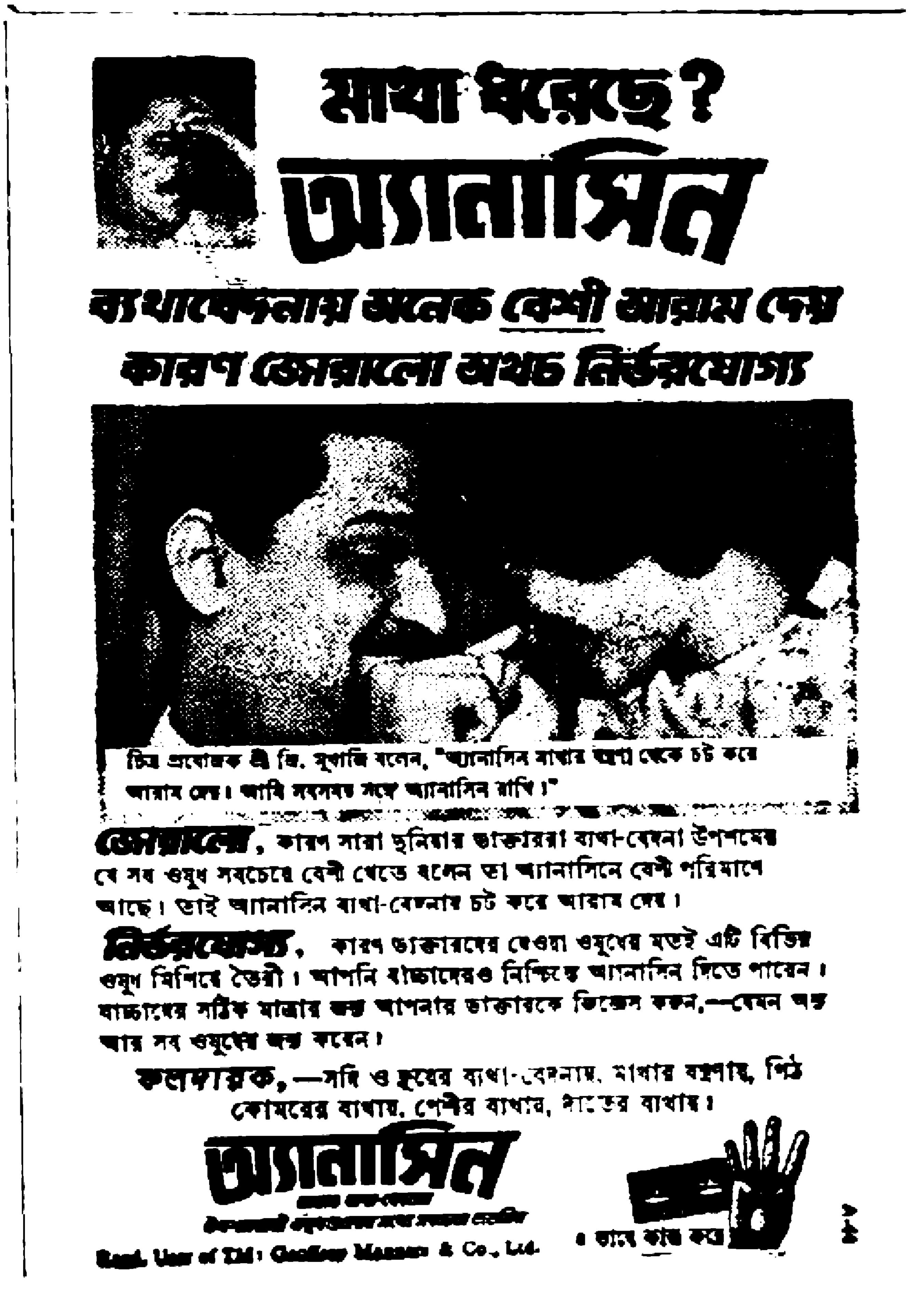

দুবরাজের নাম-ঠিকানাসহ ওঁর হাতের বালুচর শাড়ীর আঁচলার একাংশ। ওপরে ওঁর নাম ঠিকানা বাঁধভাবারে দেখান হয়েছে।

সাথে সাথে ফ্যাশানের ক্ষেত্রে বালুচরীকে হটিয়ে বেনারসী শাড়ীর দ্রুত অনুপ্রবেশ। ইংরেজ প্রভুত্বের পূর্বে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অব্যবস্থার দরুণ পণ্যসামগ্রী একটি নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে স্থানান্তরিত হবার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। ভারতে ইংরেজ শাসনের ক্রম প্রসারের সাথে সাথে এই দুই অসুবিধাই ক্রমে দূর হয়ে বিদেশে ও দেশের বিভিন্ন স্থানের বসন সামগ্রী কলকাতার বাজারে আসতে শুরু করে। হেস্টিংসের বেনারস বিজয়ের পর কলকাতার সাথে বেনারসের যোগাযোগ আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হলে বেনারসী শাড়ীর বাংলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মন জয়ের পালা শুরু হয়। বিশে শতকের একেবারে গোড়ায় জাপান ও জার্মানীর মেশিন তৈরী কৃত্রিম জরির ব্যবহারে বেনারসী শাড়ীর জৌলুষ বেড়ে গিয়ে অথচ মূল্যমান নেমে গিয়ে তা মধ্যবিত্ত সমাজে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নানা প্রদেশের ও বিদেশের প্রভাবে বাংলাদেশে রুচি বা ফ্যাশানের যে বিবর্তন শুরু হয়েছিল বালুচরী শিল্পীরা তার সমধর্মী হতে পারলো না। তাই বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে বিয়ের ও ফ্যাশানের বাজারে তাদের যে জনপ্রিয়তা ছিল বেনারসী শাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তা হারিয়ে গেল।

(২)

বাংলার বয়ন শিল্পধারার কিছুরকম প্রকাশ এই বালুচর শাড়ীর পুরনো নিদর্শন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারেই বংশপরম্পরায় তোরঙ্গে রক্ষিত হচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলার চারু ও কারুশিল্পের প্রতি বাঙালী সমাজে যে আগ্রহের সৃষ্টি করেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পরসিকেরা বালুচর শাড়ীর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন। দীনেশবাবু নিজেও কিছু কিছু বালুচর শাড়ী ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রীগুরুসদয় দত্ত সরকারী সফরের সূত্রে কিছু বালুচর শাড়ী বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়। প্রায় একই সাথে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রহশালা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা বালুচর শাড়ী সংগ্রহে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে শিল্পরসিকেরা এর শিল্পমান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বেশী করে সচেতন হতে শুরু করেন। সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে দুভাবে—ব্যক্তিগতভাবে ও সংগ্রহশালার মাধ্যমে। পুরোনো বনেদী পরিবার থেকে যেমন তাঁরা বালুচর শাড়ী সংগ্রহ করতে শুরু করেন, তেমনি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ করেন এক ধরনের ফেরিওয়ালা বাসনওয়ালীদের কাছ থেকে যারা পুরনো শাড়ীর বিনিময়ে মনোহারী জিনিসের লেনদেন করে থাকেন। বালুচর শাড়ীর ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে প্রথমেই নাম মনে আসে শ্রীশুভ ঠাকুর ও লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের। ১৯৫৮ সালে শ্রীঅশোক মিত্র ও কতিপয় শিল্পরসিকজনের উদ্যোগে শ্রীঠাকুরের সংগ্রহের ৫৭টি বালুচর শাড়ীর এক প্রদর্শনী কলকাতায় উদ্বোধন করা হয়। এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—বালুচরী বয়ন চাতুর্যের বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা ও এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকার ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা। একই উদ্দেশ্য নিয়ে '৬১ সালে একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহের ৭৫টি বালুচর শাড়ীর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই দুই প্রদর্শনী কলকাতার শিল্প ও শাড়ী-রসিক মহলে বালুচর শাড়ীর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চলতে থাকে। দুবরাজের ছাত্র হেম ভট্টাচার্যকে দিয়ে বহরমপুর টেক্সটাইল টেকনোলজি পুরনো পদ্ধতিতে বালুচরী বয়নের যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন হেমবাবুর মৃত্যুর সাথে সাথেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের কলকাতার উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের অধিকর্তা শ্রীনীরেন ঘোষের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ প্রথাগত পদ্ধতিতে বালুচর শাড়ী বয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় '৬০ সাল থেকে। শ্রীঘোষ একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। প্রথাগত বালুচরী মটিফ ও বর্তমান ক্রেতাদের রুচির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে তিনি বালুচরী ডিজাইন তৈরী করছেন। এর ভিত্তিতেই তাঁর সংস্থার কর্মী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ জেলার গলকর মির্জাপুরের বাসিন্দা) বিগত দশ বছরে যে সমস্ত বালুচর শাড়ী বয়ন করেছেন তা স্বদেশের ও বিদেশের ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়ে রসিকজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্পূর্ণ প্রথাগত পদ্ধতিতে এই শাড়ী তৈরীতে যে শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়, তার ফলে প্রতিটি শাড়ীর মূল্যমান নির্ধারিত হয় প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের—শাড়ী প্রতি প্রায় দু হাজার টাকা। বলা বাহুল্য, একমাত্র প্রথাগত বয়ন পদ্ধতির একটি নজীর বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া এই মূল্যমানে বালুচরী শাড়ীর জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা নিরর্থক। সম্প্রতি জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্যে শ্রম ও সময় বাঁচিয়ে বালুচর শাড়ীকে জনপ্রিয় করে তোলার যে এক বেসরকারী প্রচেষ্টা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে শুরু হয়েছে তা চাক্ষুষ দেখতে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলাম। মন্দিরময় বিষ্ণুপুর শহরের আশে পাশে রেশমশিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন। যে সমস্ত শিল্পীরা কেবলমাত্র বালুচর শাড়ী বা তার সমগোত্রীয় 'স্বর্ণচুরী' শাড়ীর কাজ করে থাকেন তাদেরকে সাধারণতঃ কয়েকটি এলাকায় একজোট হয়ে বসবাস করতে দেখেছি—কালীতলা, পাটেরাপাড়া, কৈলাসতলা, খাপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরে বালুচর শাড়ীর পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার পিছনে যে শিল্পীর প্রাথমিক উৎসাহ ও প্রতিভা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে, তিনি হলেন অশীতিপর যুবা শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস। আশ্চর্য উৎসাহী ও প্রাণবন্ত মানুষ অক্ষয়বাবু। বয়সের ভারে কিঞ্চিৎ নুয়ে পড়েছেন। মুখের নানা জায়গায় বলিরেখার সমাবেশ। চোখের দৃষ্টিও সমান সতেজ নয়। তবু তাঁর উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস আমাদের মত যুবা পুরুষদের রীতিমত লজ্জা দেয়। ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। আঁকার নেশা ছাড়াও ছোটবেলার ঢালাইয়ের কাজ, ডাকের সাজের কাজ, পাকা রং তৈরীর কাজে হাত পাকিয়েছেন। জাতিতে তাঁতী। তাই তাঁত চালাতে তো জানতেনই।

তামাকে ফিলটারে মিলেছে চমৎকার—তাইতো সবার প্রিয় উইল্‌স ফিলটার

উইল্‌স ফিলটার
সর্বাধিক দাম

WT 6457-4

আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবেও একদা বিষ্ণুপুরে অক্ষয়বাবুর একটা পরিচিতি ছিল। এ হেন অক্ষয়বাবুকে মধ্যমণি করে বিষ্ণুপুরের বালুচরী শিল্পীরা 'সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল' নামে এক সোসাইটির মধ্যে থেকে বালুচর শাড়ীর কাজ করছেন। অক্ষয়বাবু বালুচর শাড়ীর প্রতি তাঁর অনুরাগের সূচনাটি এক রোমান্টিক স্মৃতির মাধ্যমে আমাদের বলেছিলেন। বয়স তখন তাঁর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ভরা যৌবন তখন। গ্রাম বাংলার প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে কাপড় ফিরি করতেন। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে মনোহর ঠাকুরের উৎসব। বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মিছিল। সেই মিছিলের ভীড়ে এক সুবেশী যুবতী অক্ষয়বাবুর চোখ কেড়ে নিয়েছিল। তার শাড়ীর গায়ের বিচিত্র রং ও রহস্যময় নকশায় যুবক অক্ষয় একেবারে মোহাবিষ্ট। স্থান-কাল ও শালীনতা ভুলে রং ও নকশার টানে যুবতীটির পিছু নিয়েছিলেন বহুক্ষণ। সেদিনই বালুচর শাড়ীর সাথে অক্ষয়বাবুর প্রথম পরিচয়। তারপর লোকারণ্যের ভীড়ে যুবতী হারিয়ে গেল কোথায়, কিন্তু শাড়ীটি অক্ষয়ের চোখে বাঁধা পড়লো চিরকালের মত। অনেক অনুসন্ধানের পর বালুচর শাড়ীর শিল্পী সন্ধানে এক রকম প্রায় পায়ে হেঁটেই মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে এসেছিলেন। কিন্তু বালুচর গ্রামে তখন আর তেমন ওস্তাদ শিল্পী নেই। তাই এই কাজে হাত দেবার উৎসাহ পেলেন না। শেষ বয়সে কলকাতায় ডিজাইন সেন্টারে কাজ করার সময় শ্রীশুভ ঠাকুর তাঁকে বালুচর শাড়ী বয়নে উৎসাহিত করেছিলেন। ডিজাইন সেন্টার থেকে অবসর নিয়ে বিষ্ণুপুরে এসে বালুচর শাড়ী সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহকে পুরোপুরি কাজে লাগান স্থানীয় অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ী শ্রীভগবান দাস। ব্যবসায়িক বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও অধ্যবসায়ী ভগবানবাবু বাংলার সাবেকী বয়ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক ঝুঁকি ও দায়দায়িত্ব নিয়ে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের নির্জোজাল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে তা সুলভ হলে শিল্প-রসিকেরা উৎফুল্ল হতে পারতেন। এটা বড় আক্ষেপের কথা যে, মুর্শিদাবাদের কোন রেশম ব্যবসায়ী জেলার এই গৌরবময় শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হলেন না।

অক্ষয়বাবু কাজ করেন মাথা দিয়ে আর অন্য শিল্পীরা কাজ করেন হাত দিয়ে। উনি মাথা খাটিয়ে মাপজোক করে বড় বড় গ্রাফ কাগজে নকশা রচনা করেন। আর অন্য শিল্পীরা মাপ অনুযায়ী অসংখ্য পাঞ্চকার্ড কেটে তা জ্যাকার্ড তাঁতে চাপিয়ে শাড়ীতে রূপ দিয়ে থাকেন। সময় ও শ্রমের সাশ্রয়ের জন্য বিষ্ণুপুরের এই বালুচর শাড়ীর দাম পড়ছে ৩০০-৩৫০ টাকার মধ্যে। বালুচর শাড়ী ছাড়াও তাঁরা স্টোল ও দেয়াল সজ্জার জন্য প্যানেলাকারে বালুচরী পিস তৈরী করেন। তাঁদের তৈরী সমস্তই দেশের বাজারে পরিচিত হতে শুরু করেছে এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও প্রদর্শিত হচ্ছে। বিষ্ণুপুরী এই বালুচরী সামগ্রীর সাথে প্রথাগত বালুচরীর যে দুটো পার্থক্য প্রকট হয়ে ধরা পড়ে তা হচ্ছে—রং ও অলংকরণ। পুরনো বালুচর শাড়ীতে ছয়-সাত রকম রংয়ের যে সুষম ব্যবহার দেখা যেত বিষ্ণুপুরের সাম্প্রতিক বালুচরীতে তা অনুপস্থিত। জ্যাকার্ডে তৈরী এই শাড়ীগুলোতে তিন-চারটের বেশী রং ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, সাবেকী বালুচরী শিল্পীরা শাড়ীর আঁচলায় অলংকরণ সমাবেশের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ ও সামগ্রিক সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রতি অনন্যসাধারণ সচেতনতার পরিচয় দিতেন তা বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের কাছে একান্তই দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর হাতে তৈরী বালুচরী ডিজাইনে বিভিন্ন মটিফের সমাবেশ পারস্পরিক পরিপূরকতার কাজে না লেগে পরস্পরের বিরোধী হতে দেখেছি। অক্ষয়বাবুর মত প্রবীণ ও সপ্রতিভ শিল্পীর কাছ থেকে বালুচরী কাজে এ ধরনের বেমানান মটিফের সমাবেশ আশা করা যায় না। অক্ষয়বাবু অবশ্য সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এ ধরনের ডিজাইন সম্বলিত শাড়ীর নতুন নামকরণ করেছেন 'মধুকুম্ভ শাড়ী'। নামকরণ যাই হোক, শিল্পের সামগ্রিক সৌন্দর্যসৃষ্টির আবেদনটুকু তো চিরন্তনই। বালুচর মটিফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি কোন নতুন মটিফের আমদানী তিনি করতে চান তবে এই মটিফচর্চার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দিরের পোড়ামাটির গাত্রভূষণে। শিল্পী অক্ষয়বাবুকে এই অমূল্য সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হতে অনুরোধ করি।

যুগের পরিবর্তনের সাথে মানুষের রুচি ও চাহিদার বিবর্তনের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে এবং এই যোগের সুবাদেই প্রত্যেক দেশেরই একদা জনপ্রিয় অনেক শিল্প ও কারুশিল্প মিউজিয়ামের সংরক্ষিত বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে অতীতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রুচির আবর্তনশীলতায় কখনও কখনও মৃত শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হয়ে থাকে। তাই বালুচরী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা নিয়ে কলকাতার উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের অধিকর্তা শ্রীনীরেন ঘোষ, কলাসমালোচক অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপুরের রেশম খাদি সেবামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীভগবান দাসের সঙ্গে মত বিনিময় করেছিলাম। এ বিষয়ে সকলেই আমরা একমত যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা পেলে ক্রেতাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বালুচর শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব। সাবেকী পদ্ধতিতে বালুচরী বয়নের প্রচেষ্টায় শাড়ী প্রতি আকাশছোঁয়া মূল্য নির্ধারিত হওয়াতেই এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনে জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্য অপরিহার্য। একথা ঠিক, জ্যাকার্ডের বালুচর শাড়ী প্রথাগত প্রথায় বোনা বালুচরীর মত উচ্চমানের নয়। কিন্তু শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আশায় জনপ্রিয়তার স্বার্থে এর মূল্যমান নামাতে গিয়ে শিল্পমান সম্পর্কে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই কিঞ্চিৎ শিথিলতা দেখানো ছাড়া গত্যন্তর কৈ! পুনরুজ্জীবনের এই প্রচেষ্টায় সরকারী তরফের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বালুচরী ডিজাইন ও মটিফের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। বালুচরী ফুল-লতা-পাতা ও কল্কা মটিফের এক চিরন্তন আবেদন রয়েছে বলে এই দুই মটিফের উপর যথাসম্ভব বেশী গুরুত্ব দিয়ে অপ্রচলিত ফিগার মটিফগুলোর পরিবর্জন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন। পাইলট স্কীম হিসেবে সরকার নিজেই বালুচরী বয়নে উদ্যোগী হতে পারেন ও কয়েকটি উচ্চ মানের রেশম বয়ন সংস্থাকে অনুদান দিয়ে এই শিল্পকর্মে উদ্যোগী করতে পারেন। বিষ্ণুপুর ছাড়াও মুর্শিদাবাদের গঙ্গাপুর মির্জাপুরের দক্ষ রেশম তাঁতীরা এই জটিল শিল্পকর্মের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে। এই শিল্পের বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ী মহলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। জ্যাকার্ড তাঁতে বেশী সংখ্যায় বালুচর শাড়ীর উৎপাদন হলে শাড়ী প্রতি মূল্য আড়াইশো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে রাখা সম্ভব। সৌখীন শাড়ীর তুলনায় এই বালুচর শাড়ীর মূল্য বেশী এ কথা মনে রেখেও বলা যায়, সরকারী ও বেসরকারী প্রচার ও উদ্যোগ একজোটে কাজ করলে এই ঐতিহ্যপূর্ণ বয়নশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বাজার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। বিয়ের ব্যাপারে ধর্মীয় সংস্কারগুলোকে আজও আমরা প্রায় পুরোপুরি বজায় রেখে চলেছি। পট্ট বা রেশম বস্ত্র বিয়ের এক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বিয়ের বাজারে বালুচর শাড়ীর যে বিশেষ চাহিদা ছিল পরবর্তীকালে বেনারসী শাড়ী তা জবরদখল করে বসে। বিয়ের বাজারে বালুচর শাড়ীর সেই পুরনো জমিদারীটির পুনরুদ্ধার কি একেবারেই অসম্ভব? মধ্যবিত্ত অনেক পরিবারই বিয়ের বেনারসীর জন্য শ'তিনেক টাকা বরাদ্দ করে থাকেন। জরির আপাত চটকটুকু বাদ দিলে যেহেতু বর্ণালী মটিফ ও স্থায়িত্বে বালুচরী শাড়ী বেনারসী শাড়ীর তুলনায় উচ্চমানের, সেইহেতু ক্রেতা সমাজে এর জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা অসাধ্য কিছু নয়। যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কলকাতার কিছু প্রতিপত্তিশালী বস্ত্রব্যবসায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা। সম্প্রতি জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বালুচরী মটিফের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। শাড়ী ছাড়াও বালুচরী দেয়াল সজ্জা Wall decoration দরজা ও জানলার পর্দা, স্টোল জাতীয় সামগ্রী ক্রয় করতে অনেক বিদেশী সংস্থা আগ্রহী বলে বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা আমাকে জানিয়েছেন। তাই দেশের ও বিদেশের বাজারের সম্ভাব্যতাকে অনুধাবন করে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় সরকার ও বস্ত্র ব্যবসায়ী মহলকে যৌথভাবে এগোতে অনুরোধ করি।*

(*প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

বাঘ ছাল

মানবেন্দ্র পাল

এ অঞ্চলে শিকারী বলে আমার একটু নামডাক আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ দেখে পেয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা আবার 'শিকারী' কথাটার অন্যরকম অর্থ করে আমার ঠাট্টা করে। তাদের মতে, এই যে আমার একক স্ত্রীসংসর্গবর্জিত জীবন এটা আর কিছুই নয় নারী শিকারের জন্যেই সুনিপুণ জালবিস্তার।

এ ধরনের ঠাট্টায় আমি মোটেই খুশী হই না, বরঞ্চ কষ্ট পাই। কিন্তু সে কষ্ট মনের মধ্যেই চাপা থাকে। প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হয় না।

যাই হোক, আমি যে একজন শিকারী—তা যে ধরনেরই হোক, লোকে তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি যে ইতিমধ্যে বহুদূর ছড়িয়ে গেছে তা আমি প্রথম জানলাম আমার বন্ধু রণেন চ্যাটার্জির চিঠিতে।

রণেন চ্যাটার্জি থাকে কলকাতায়। একটা মস্তবড়ো বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্ট পেয়েছে রাঁচিতে। সেই উপলক্ষ্যে তাকে এখানে প্রায়ই আসতে হয়। আর এই আসা-যাওয়া করতে করতেই তার সঙ্গে আলাপ।

রণেন চ্যাটার্জিকে দু'একবার শিকারে নিয়ে যেতেই শিকারে ওর বেজায় নেশা ধরে গেল। পরের বার যখন কলকাতা থেকে এল সঙ্গে ·৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এত দামী রাইফেল পেলে কোথায়?

চ্যাটার্জি একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল—শিকার যখন ধরেছি তখন ভালো করেই নামব। কিনে ফেললাম।

এই চ্যাটার্জি হঠাৎ চিঠি লিখল ওর একই ক্লাবের বন্ধু জ্যাক কার্লসন শিকারের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ওর ঝোঁক লেপার্ডের ওপর। লেপার্ড স্কিন তার চাইই। অতএব—

অতএব নাকি আমিই একমাত্র ভরসা। নইলে বন্ধুর মুখরক্ষা হয় না।

পরিশেষে লিখেছে—সাহেব একা যাবে না। সঙ্গে বিবি থাকবে। সাহেবের চোখের মণি। একদণ্ড কাছ-ছাড়া করতে পারে না। আরো থাকবে আড়াই জন। তার মধ্যে ড্রাইভার আছে, সাহেবের দু' বছরের শিশুপুত্র আছে আর আছি আমি। যদিও আমার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারটা ভালো করেই জানো।

প্রতিজ্ঞার কথায় আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। চ্যাটার্জির স্ত্রী চন্দনা-দেবী কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না স্বামী শিকার করতে পারে। যে মানুষ কোনোদিন বন্দুক ধরেনি সে যে হঠাৎ একটা বড়ো শিকারী হয়ে উঠতে পারে এটা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। চ্যাটার্জি তাই জেদ ধরে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। শিকারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হল। আর সেই শিকারে চ্যাটার্জি একজন দক্ষ শিকারীর পরিচয় দিয়েছিল একটা হৃষ্টপুষ্ট ডো মেরে। কিন্তু ডোটাকে তুলতে গিয়ে দেখা গেল পেটে তার বাচ্চা।

নিঃসন্তান চন্দনা চ্যাটার্জি সে দৃশ্যে এমন মর্মাহত হয়েছিলেন যে, স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন আর সে কখনো শিকার করতে পারবে না।

চ্যাটার্জি সে প্রতিজ্ঞা তারপর রেখে-ছিল। তবে শিকারীর সঙ্গ ত্যাগ করার শর্ত ছিল না বলেই বোধহয় এবারের এই নতুন অভিযান।

অনেকদিন পর শিকারের প্রেরণা পেয়ে মন চনমন করে উঠল। রাঁচী থেকে প্রায় সাতাশি মাইল দূরে চাতরার রিজার্ভড ফরেস্ট। ছুটলাম চাতরা। সেখানে আমার আর এক শিকারী-বন্ধু বাবন জমাদার।

তার সাহায্যে আমার গেম লাইসেন্সের এন্ডোর্সমেন্ট একটা ভালো ব্লক রিজার্ভ করা হল। ভালো, অর্থাৎ যেখানে বেশি শিকার মিলবে—বিশেষ করে লেপার্ড।

ব্লক রিজার্ভ করে এসে পড়লাম বাড়ি নিয়ে। একা থাকি—সে একরকম। কিন্তু মাননীয় অতিথিরা কেউ কেউ এলে তখন বাড়ির ছিরি ফেরাতে হয়। আর বাড়িটা নিতান্ত ছোটো নয়। একতলা বাড়ি হলে কি হয় ঘরের যেন শেষ নেই। সব ঘরে তালা ঝুলিয়ে একটা ঘরে আমি শুই খাটে আর বাচ্চা ছেলেটা যে আমার রেঁধেবেড়ে দেয়, সে শোয় মাটিতে। ভূতের ভয় বলে একা শুতে চায় না।

শূন্য ঘরের ভার যে কতখানি তা এক এক সময়ে বুঝতে পারি। হাঁপিয়ে উঠি। তখন যে একটিমাত্র ঘরে আমার অস্তিত্ব সেই ঘরখানিতেও তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাঁচি।

তাই যখনই কেউ আসে—বিশেষ করে সস্ত্রীক, তখনই আমার মরা গাঙে যেন উৎসাহের জোয়ার বয়ে যায়। কোন্ ঘরটি তাদের বেডরুমের পক্ষে উপযুক্ত হবে, কোন্ ঘরটি বেশ নিরিবিলি, বা কোন্ ঘরটির কাছাকাছি বাথরুম এইসব হিসেব করে বেশ আনন্দ পাই।

কলকাতা থেকে যেবার চ্যাটার্জি এসেছিল মিসেসকে নিয়ে সেবার তারা কতখানি আনন্দ পেয়েছিল জানি না, কিন্তু আমাকে কিছুদিন একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। আমি তাদের সুখশান্তির জন্যে এতদূর করেছিলাম যেটা দেখলে যে কেউ বলবে, বাড়াবাড়ি। শুধু ওদের ঘরে রোজ টাটকা ফুল জোগাবার জন্যে একটা মালীকে পুরো এক মাসের মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছিল।

কেউ কেউ এমন ভাবতে পারেন, দাম্পত্যজীবনের ওপর এতই যদি মোহ তাহলে বাপু সময় থাকতে ব্যবস্থা করে নিলেই পারতে।

যুক্তিটা অকাট্য। কিন্তু ওই যে একটি কথা 'সময় থাকতে' ওইখানেই গন্ডগোল। আসলে সময় যখন আসে তখন তো মানুষ টের পায় না, টের পায় সময় চলে গেলে।

তাহলে একটা গোপন লজ্জার কথা বলি। এই বয়েসেও হঠাৎ ঘর বাঁধার শখ হয়েছিল। না, যাকে বলে বায়োলজিক্যাল নেসেসিটি ঠিক তার জন্যে নয়। আমি বরাবর আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর জীবনে এই একটা জিনিস লক্ষ্য করে অভিভূত হতাম যে, সামান্য একটি মেয়ের ভালো লাগার জন্যে একটা জাঁদরেল পুরুষও অবলীলাক্রমে কতখানি ত্যাগ করতে পারে। চোখের সামনেই এই সেদিনও দেখলাম চ্যাটার্জিকে। শিকারের অত নেশা—অথচ কী অক্লেশে স্ত্রীর একটি মাত্র সজল অনুনয়ে শিকারই ছেড়ে দিল।

ত্যাগের এই আনন্দটা কতখানি সেটা দেখার ইচ্ছেই একবার প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুযোগও জুটে গেল।

একজন নাচের শিক্ষিকা এসেছিলেন কিছুদিনের জন্যে এখানকার একটা মেয়ে-ইস্কুলে। দেখতে এমনকিছু আহা-মরি নয়, কিন্তু মেয়েটির ফিগার আর চলার ভঙ্গিতে কেমন যেন শিকারী চিতার মতো লিকলিকে ভাব। ভারী ভালো লেগে গিয়েছিল। শুধু ভালো লাগাই নয়, বলব কী মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত আমার এক পরিচিত মহিলা মারফৎ তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম। শিকারী চিতাটি আমাকে দেখতে চাইলেন। গেলাম। কিন্তু ভালুকে-কামড়ানো আমার এই ক্ষতবিক্ষত মুখটা দেখে তিনি আঁৎকে উঠলেন। ঘর-বাঁধার কথা আর উঠল না কোনো পক্ষ থেকেই।

যাই হোক, আমার কথা থাক। গল্প আমাকে বা চ্যাটার্জিকে নিয়ে নয়। যাকে নিয়ে তিনি এই সপ্তাহের মধ্যেই এসে পড়ছেন।

আমি মনের আনন্দে সাহেব-মেমের জন্যে ঘর সাজাতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম

শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি....

শারদ উষার প্রথম লগ্নে দেবী দুর্গার অকাল বোধন। একাগ্রচিত্তে মহামায়া আদ্যাশক্তির বন্দনা, স্তুতিগান ও তাঁর কাছে আকুল প্রার্থনা।

পলিডর এল-পি রেকর্ডে শ্রীশ্রী চণ্ডী পাঠ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পলিডর শারদ অর্ঘ্যে আরও পাবেন শ্রীসনৎ সিংহ, শ্রীমতী রূপমালা ঘোষ, শ্রীমতী কুমকুম চ্যাটার্জী, শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী ইন্দ্রাণী গাঙ্গুলীর মনমাতানো আধুনিক গান। প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে গেয়েছেন শ্রীমানস মুখার্জি। শ্রীবটুক নন্দী ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন চারটি লোকসুরবোধক গান। নিকটস্থ পলিডর ডীলারের সহিত যোগাযোগ করুন।

পলিডর রেকর্ড polydor পলিডর রেকর্ড

পূর্ব ভারতে একমাত্র পরিবেশক:

দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • পাটনা • জব্বলপুর • কটক • গোহাটী

BEEVAS/DPL /12

সাহেবের হঠাৎ চিতাবাঘের চামড়ার জন্যে ঝোঁক চাপল কেন? নিশ্চয় তাঁর মিসেসের শখ হয়েছে। আর সম্ভবত স্ত্রীর এই সামান্য ইচ্ছাটুকু পূরণের জন্যেই অতবড়ো একটা ম্যানেজারকে কলকাতা থেকে বন্দুক ঘাড়ে ছুটে আসতে হচ্ছে। ঠাট্টা করব কি প্রশংসা করব ভেবে পাই না।

সাহেব এলেন যথাসময়ে। জাতে সুইডিস। বছর তিরিশ বয়স। ছিপছিপে টল ফিগার। ব্যাকব্রাস করা কটা চুল, ব্রাউন চোখ প্রাণের আতিশয্যে ঝকঝক করছে।

চ্যাটার্জি আলাপ করিয়ে দিল। —দিস ইজ মিস্টার নন্দী।

—আই হ্যাভ হার্ড অব যু এনাফ। বলেই হ্যান্ডসেক নয়, একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল তরুণ সাহেব।

সেই আলিঙ্গনে সাহেবের বুকের উত্তাপটুকু অনুভব করতে পারলাম। বুঝলাম এর সঙ্গে কিছু দুঃসহ হবে না।

কিন্তু সাহেব একা কেন? মিসেস?

ম্লান একটু হাসল কার্লসন। বললে, ও আসতে পারল না। শরীরটা খারাপ হয়েছে।

আমি কিছু বলার আগেই সাহেব বললে, ও আসতে না পারায় আমার উৎসাহ এতদূর কমে গেল যে আমিও আসব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু আমার প্রাণাধিক ইনগ্রিড আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিল। বললে, জ্যাক, তুমি নন্দীবাবুকে কথা দিয়েছ, এখন না গেলে বড়ো অশোভন হয়।

বলে কার্লসন আবার একটু হাসবার চেষ্টা করল।

তারপর গলার স্বর পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, যাই হোক, ও নিয়ে মন খারাপ করলে চলবে না। আমরাই এনজয় করব। লেট আস ওপন এ স্কচ।

মন খারাপ শুধু সাহেবেরই হয়েছে যে তা নয়, আমিও যেন কেমন মিইয়ে গেলাম। আমি যে অনেক কল্পনায় ওদের জন্যে বেডরুম সাজিয়ে ছিলাম।

পরের দিন ভোরেই শিকারে বেরোন হল। সে এক এলাহি কাণ্ড।

সাহেব কলকাতা থেকে এসেছিল কারে। পেছনে ছিল লকেসিস জিপ দুর্গম জঙ্গলে চালাবার জন্যে। খাদ্যের আয়োজন কম ছিল না। প্রচুর স্যামন, টিনফুড, বিয়ার, হুইস্কি, চীজ। এছাড়া সঙ্গে এনেছে ষোলো মিলিমিটারের সিনে ক্যামেরা আর প্রচুর কালার্ড ফিল্ম।

আমাদের শিকারবাহিনী স্টার্ট করল। কার্লসন বলে উঠল, ওয়েট, আমাদের স্টার্টিংটা সিনেমায় তুলে নিই।

বলেই চট করে কার থেকে নেমে পড়ল। হাতে তুলে নিল সিনে ক্যামেরাটা। এক্সপোজার মিটারে লাইটটা দেখে নিয়ে ঘরঘর করে ছবি তুলে যেতে লাগল।

একপ্রস্থ ছবি তোলা হলে সাহেব গাড়িতে উঠে এল। গাড়ি চলতে শুরু করল। কার্লসন বললে, এই সিনে ক্যামেরাটা ইনগ্রিডের উৎসাহেই কেনা। ভেবেছিলাম শিকারেও ও থাকবে। এই ফিল্মে সফরের সঙ্গে ওকেও তুলে নেব। বাট ম্যান প্রোপোসেস গড ডিসপোসেস।

আমি বললাম, মিসেস কি সুইডেনে খুব শিকার করতেন?

—ওহ্, শী ইজ ভেরি ফন্ড অব শুটিং। কিন্তু আপনি জানেন আমাদের দেশে কার্নিভোরাস জন্তু পাওয়া যায় না। তাই নিরামিষ শিকার করেই মন ভরাতে হত। ওর সাধ ছিল লেপার্ড মারা। লেপার্ডের স্কিনের ওপর ভারী ঝোঁক। ঐ বিশেষ স্কিন দিয়ে এমন একটা কিছু তৈরি করবে যাতে আমারও তাক লেগে যাবে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তাঁর বদলে না হয় আপনিই লেপার্ড মারবেন। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। ইনার মিনিংটা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে শাস্ত্রবাক্যটা একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নিলে কিছু ক্ষতি হয় না।

কার্লসন কথাটা অন্যমনস্কভাবে শুনল। একটু হেসে মাথা দোলালো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তা ঠিক। তবু ও থাকলে আমাদের সকলেরই বেশ ভালো লাগত। শী উড হ্যাভ বীন এ ওয়ান্ডারফুল কম্প্যানিয়ন।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি উঠছে পাহাড়ে। বাঁদিকে গভীর খাদ, ডানদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। দূরে চৌরী রেল স্টেশন।

রেল স্টেশন।

অর্ধেক পথ আসা গেল। বাঁদিকে ডালটনগঞ্জ। ডানদিকে চাতরা। গাড়ি ঘুরল ডানদিকে।

এখান থেকে জঙ্গল শুরু। দুপাশে শাল-পলাশ কেন্দ আর খয়েরের গাছ। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপ্টাসের সারি।

কত যে নদী পার হয়ে এলাম—বালি ধু ধু, মাঝে সুতোর মতো জল। যুবকের মনের সাহেব এ-এক নতুন জগৎ দেখছে দু-চোখ ভরে।

একটা নদীর ধারে আসতেই আমি চ্যাটার্জিকে বললাম, মনে আছে এখানে একটা বাঘ মারা হয়েছিল?

চ্যাটার্জি হাসল একটু। সাহেব অমনি উঠে বললে, ওহ! লেট আস শুট দা স্পট অ্যান্ড ড্রিংক আওয়ার লাক।

বলেই সিনে ক্যামেরাটা নিয়ে ছেলেমানুষের মতো বালির ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সাহেবের এইসব ছেলেমানুষী আমার খারাপ লাগছিল তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি নানা চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলাম। অন্যবার যে শিকারে বেরোই সে যেন অনেকটা নিজের খেয়ালে। কি পেলাম, কি পেলাম না তার জবাবদিহির দায় নেই কারো কাছে। কিন্তু এবার তেমন নয়। এবার কার্লসনের সঙ্গে এমনকি চ্যাটার্জির সঙ্গেও যেন একটা অলিখিত শর্ত আছে। সে শর্ত - অন্য যা-ই শিকার কর লেপার্ড চাই-ই। আমি বোকার মতো আবার এখনো কথা দিয়েছি, লেপার্ড পাওয়া শুধু নয় লেপার্ড মারবে সাহেব নিজে হাতে।

কোথায় কোন বিদেশিনী নীলনয়না শিকারবিলাসিনী তরুণী! —তাঁর এই একটি খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে বিরাট ম্যাচ কোম্পানির সর্বেসর্বা জ্যাক কার্লসনকে ছুটে আসতে হল এই হতভাগোর মুলুকে। আর সেই না-দেখা বিদেশিনীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের একটি মিষ্টি হাসির কল্পনায় এক মধ্যবিত্ত বাঙালি অমনি কথা দিয়ে বসল লেপার্ড দেবই।

কিন্তু লেপার্ড পাওয়া যাবে তো? নাকি কতকগুলো হরিণ আর বনশুয়োর মেরে ফিরতে হবে?

প্রকাশিত হল — শারদীয় ১৩৭৮

সারস্বত

৪র্থ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ : নারায়ণ চৌধুরী/পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সংগীতের সমন্বয় প্রসঙ্গে। অশোকদেব চৌধুরী/ডি. এচ্. লরেন্স প্রসঙ্গে। কুমুদ দাস/ইংরেজদের কলকাতা জয়। প্রভাতকুমার গোস্বামী/দেশাত্মবোধক বাংলা নাটক॥

বিশেষ প্রবন্ধ : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য/সাধু ভাষার ভবিষ্যৎ॥

গল্প : মিহির সেন, চিত্ত ঘোষাল, বাসবেন্দ্র পাল, অমলেন্দু চক্রবর্তী, অশোকবিজয় ঘোষ॥

কবিতা : বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুশীল রায় মণীন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, [illegible] সেন, সুশীলকুমার গুপ্ত, রাম বসু, মৃগাঙ্ক রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ আচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মুস্তাফিজুর রহমান, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সত্য গুহ, সুশান্ত বসু॥

চিত্র : সমর সেনগুপ্ত/সুকান্ত ও সমকাল প্রসঙ্গে পাঁচটি লিনোকাট॥

দাম : দু টাকা

কার্যালয় : সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। ফোন : ৩৪-৬৪১২

জেন্ম একটা নাগাদ চাতরায় পৌঁছলো গেল। সেখান থেকে তুলে নেওয়া গেল জনসোয়ানকে। জনসোয়ান এবার নিয়ে চলল জঙ্গলে যেখানে আমাদের জন্যে বাংলো নেওয়া হয়েছে।

লোয়ালং ফরেস্ট বাংলো। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যেন আসমান থেকে ছিটকে-আসা এক টুকরো স্বর্গ। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে। লাল সিমেন্টের বারান্দা ফুলগাছ দিয়ে সাজানো। চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে সবুজ ঘাসের মধ্যে।

বাংলোর চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। তারপরেই বন আর বন। এইখান থেকে আমাদের প্রত্যেক দিন যেতে হবে ঐ বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে।

সাহেবও যে কেন খুশী তা ওর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়। একটু আগেই বনের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবেশে ময়ূর দেখেছে। জঙ্গলের এত কাছে এসে শিকারের নেশায় হাত নিশপিশ করে উঠল। একটা কিছু মারা চাই। যেমন বলল একটা বন-মুর্গি। অব্যর্থ লক্ষ্য!

সবই শুভ সূচনা। সাহেব কেবলই বলছে—কেন আমারই মনের কথায় প্রতি-ধ্বনি লেপার্ড তাহলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আমি অন্যমনস্কভাবে বলি, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। —বাট মিঃ নন্দী আই অ্যাম মিসিং মাই ওয়াইফ।

এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাহেব।

আমিও সেই পরস্ত্রীর কথাই ভাব-ছিলাম। যদি তিনি সঙ্গে থাকতেন তাহলে আমি কি এতক্ষণ নির্জীবের মতো বাংলোর এই বারান্দায় কাউকে বসে থাকতে দিতাম! সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। তবু আমি এই রহস্য ঘেরা অন্ধকারের মধ্যেই জঙ্গল-অভিযানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। হুড নামিয়ে দুর্ধর্ষ জিপটা ছুটত গভীর অরণ্যে। পিছন থেকে স্পটার স্পট করছে —জনসোয়ানের হাতে স্টিয়ারিং কাঁপছে থর থর। রুদ্ধ নিশ্বাসে মাঝের রো-এ বসে আছে কার্লসন, ইনগ্রিড আর চ্যাটার্জি। আমার হাতে উদ্যত -৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল।

এই রকম একটা ছবি কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ লাগে। কিন্তু তা তো বাস্তবে ঘটল না। তাই সাহেব যখন বললে, চলুন না, এখনই একবার ফরেস্টটা হান্ট করে দেখা যাক আমি তখন ক্লান্তস্বরে বললাম, আজ থাক।

সাহেবের উৎসাহ মুহূর্তে নিভে গেল। একটা হুইস্কির বোতল খুলতে খুলতে ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বললে, তাহলে এখন এমনিভাবে চুপচাপ বসে থাকা? এই পরি-বেশটা কি মনের ওপর খুব একটা চাপ দেবে না?

বুঝলাম, সাহেব স্ত্রীর কথা ভোলবার জন্যেই একটা আবকসনের মধ্যে ডুবে থাকতে চাচ্ছে।

স্ত্রীকে যে এতখানি ভালোবাসা যায় এও আমাকে মুগ্ধ করল। আমি অতি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, আচ্ছা মিস্টার জ্যাক, এখন যদি সমাজ সংসারের বাইরে, একেবারে বাঘে বনে স্বভাবের মধ্যে বসে খোলাখুলি দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি তাহলে কি অন্যায় হবে?

কার্লসন উৎসাহে সোজা হয়ে বসে বললে, কখনোই না। বরং আমার মনে হয় এমন নিরিবিলি পরিবেশে আলোচনার যোগ্য ঐ একটিই বিষয় আছে—দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে অন্তত খানিকখানেক প্রশ্ন করতে পার।

বলে চোখের কোণে হেসে চ্যাটার্জির দিকে তাকালো।

উত্তরে গম্ভীর প্রকৃতির চ্যাটার্জিও নিঃশব্দে একটু হাসল।

—আপনি ইনগ্রিডকে দেখেন নি, কিন্তু চ্যাটার্জি দেখেছেন। তিনিই সাক্ষী দেবেন আমার ইনগ্রিড শুধু সুন্দরীই রূপসীই নয়, প্রেমফুল।

সাহেব একটু থামল। তারপর আপন মনেই বলতে লাগল, দেখুন আমার মনে হয় প্রখর রূপের মধ্যে একটা প্রচণ্ড দহনা থাকে। তাতে নিজেও জ্বলে, পরকেও জ্বালায়। কিন্তু রূপের সঙ্গে যদি প্রেম থাকে তাহলেই রূপ সৌন্দর্যে পরিণত হয়ে যায়। ইনগ্রিড সেই ইটার্নাল সৌন্দর্যের অধিকারিণী।

এই বলে কার্লসন গেলাসে সোডা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি বললাম, দেখুন মিস্টার জ্যাক, আমি বিয়ে সাদী করিনি। জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারো ভালোবাসা কখনো পেয়েছি এমন তো মনে পড়ে না। কাজেই আমার কৌতূহলের জন্যে দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনাদের বিবাহটা প্রেমঘটিত কিনা।

—অর্থাৎ? সাহেব ঘোর ঘোর চোখে তাকালো।

—অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি আপনার এই অকৃত্রিম ভালোবাসা সেটা কি বিয়ের পর, না এইরকম ভালোবাসা ছিল বলেই বিয়ে করতে হয়েছে?

সাহেব হেসে বললে, দুটোই দৈব—ভালোবাসাও দুরকম। বিয়ের আগে এক-রকমের ভালোবাসা, একই মানুষকে বিয়ের পর আর একরকমের ভালোবাসা। ইন-গ্রিডকে আমি এক ভালোবাসা থেকে আর এক ভালোবাসায় ভাসিয়ে নিয়ে এসেছি। আর শুধু ভালোবেসে পাওয়াই নয়, ইন-গ্রিডকে ভালোবেসে জয় করে এসেছি। আ্যা ইউ আণ্ডারস্টাণ্ড মি?

সাহেবের এই একটা স্বভাব—প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকেন না। নিজেই উত্তর দিয়ে-চলেন। একেত্রেও তাই

মিডিয়াম ওয়েভ, ১১০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড — কিলোসাইকেলস্

১৯, ২৫ ও ৩১ — ১৫০১৫ ১১৭০০ / ১১৮৭৫ ও ৯৬৪০

মিডিয়াম-ওয়েভ ১১০ মীটার — ১৫৮০

করলেম। নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

—রাইভাল কম ছিল না মিস্টার নন্দী, আর তাদের যোগ্যতাও যথেষ্ট। তবু তাদের সবাইকে ফেলে ইর্নাগ্রড আমাকেই বেছে নিল। তার জন্যে আমি অবশ্যই ওর কাছে গ্রেটফুল।

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, গ্রেটফুল কেন? এ কি একতরফা ব্যাপার? তোমাকে বিয়ে করে তিনিও নিশ্চয় কৃতার্থ হয়েছেন?

সাহেব এই প্রতিবাদে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আরো লজ্জা পেল। এতক্ষণ সে কেবল নিজের দৈন্যই প্রকাশ করে এসেছে। কিন্তু তারও তো কোনো ঐশ্বর্য থাকতে পারে। নিশ্চয় আছে নইলে ইর্নাগ্রড তাকে বিয়ে করল কেন?

বন্ধু লজ্জা পেয়েছে দেখে এতক্ষণে চ্যাটার্জি মুখ খুললেন। বললে, ব্যাপারটা যে এক-তরফা নয়, তার প্রমাণ ও'র মিসেস ও'রই জন্যে দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় এসে ডেরা বেঁধেছেন।

কার্লসন এ কথায় চুপ করে থাকলেই পারত। কিন্তু স্বভাবটা সরল তাই সত্য কথা না বলে ফেলে পারল না। বললে, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি জানেন না ইণ্ডিয়ায় আসা নিয়ে ইর্নাগ্রডের সঙ্গে আমার বেশ গোল বেধেছিল। ও প্রথমে দেশ ছাড়তে রাজি হয়নি। কিন্তু আমার তখন এখানে আসা ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত ওর মন বদলাল। ও আমার সঙ্গে আসতে রাজি হল। এও আমার একটা ট্রাম্প। ওর অন্য প্রণয়ীরা ভেবেছিল ইর্নাগ্রড কিছুতেই ইণ্ডিয়ায় যাবে না। কিন্তু ইর্নাগ্রড তাদের মুখে ছাই দিয়ে এসেছে।

এই বলে কার্লসন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

কিন্তু স্ত্রীর কথা তার সহজে শেষ হতে চায় না। বললে, ও শিকারে আসতে না পারায় আমার সব আনন্দ মাটি। তবু যখন আমাকে একা আসতেই হল তখন ওর জন্যে ভালোরকমের প্রেজেন্টেশন কিছু নিয়ে যেতে হবে। এক নম্বর—লেপার্ডস্কিন, আর দু নম্বর হচ্ছে সিনে ক্যামেরায় তোলা এই শিকার-অভিযানের ছবি। আমি ওকে পাশে নিয়ে এই ছবিগুলো পর্দায় দেখাবো।

কিন্তু—কিন্তু আমার এই বিচ্ছেদ ব্যথা কোন্ জিনিস কেমন করে তার জন্যে ধরে রাখি বলতে পারেন?

এর পর হুইস্কি পেটে পড়তেই চ্যাটার্জিও মুখ খুললেন। একটু চাপ দিতেই তিনিও তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন, বিয়ের আগে প্রণয় ঘটা দূরে থাক বিয়ের আগে আমাদের কোনোদিন দেখাই হয়নি। যা কিছু ঘটেছে বিয়ের পর। আমি তো সুখীই, আমার বিশ্বাস তিনিও আমাকে পেয়ে কিছু কম সুখী নন। তবে—

এই পর্যন্ত বলে চ্যাটার্জি একটু থামলেন। মুখটা নিচু করে রইলেন।

আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, থামলেন কেন?

—সেতো আপনারা সকলেই জানেন, আমরা নিঃসন্তান। এটা চন্দনার যে কি দুঃখ তা এক আমিই বুঝি।

কার্লসন খুব অন্তরঙ্গের মতো চাপা গলায় বললে, আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি ডাক্তার দিয়ে নিজেকে ভালো করে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

—অবশ্য।

কার্লসন চিন্তিত মুখে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। তার পর একটু ভেবে প্রাচ্য দার্শনিকের মতো বললে, ঈশ্বরের কী বিচিত্র লীলা! কেউ সন্তান চায় না, কেউ সন্তানের জন্যে পাগল। আমরা দুজনে আবার এত উর্বর যে এতটা না হলে ভালোই হত। খুব ভয়ে ভয়েই থাকি। কী জানি কখন—আমরা তো আবার ঘর-পোড়া গোরু!

বলেই সকৌতুকে আমাদের দিকে তাকালো।

—ব্যাপারটা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারলেন। উদ্দাম প্রণয়। বহু প্রতীক্ষিত মিলনটাও হয়েছিল এমন জায়গায় যেখানে কারো উঁকিঝুঁকির সুযোগ ছিল না। আমার মতো আমার প্রণয়িনীরও বিশ্বাস ছিল যে, দুনিয়ায় প্লেটোনিক লাভ বলে কিছু নেই। কাজেই বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা ঘটে গেল বিয়ের আগেই। আর সে মিলন ব্যর্থ হয়নি।

একটু থেমে বললে, আচ্ছা, আপনাদের দেশে কি বলে—এই ধরনের মিলনে যে সন্তান জন্মায় তারা নাকি খুব প্রতিভাবান হয়?

এই নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলল। আমার কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছিল—চ্যাটার্জি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসে, কার্লসনও ইর্নাগ্রডকে ভালোবাসে। কিন্তু দুজনের একজন নীরব—আর একজন শুধু সরব নয় উচ্চরব। কার ভালোবাসা বেশি গভীর কে জানে!

পরের দিন বেলা দশটায় জঙ্গল থেকে 'মুখিয়া' এসে খবর দিল বিটিংএর ব্যবস্থা হয়েছে। দেড়শো লোক তৈরি।

যথাসময়ে আমরা সদলবলে জঙ্গলে ঢুকলাম। কিছু দূরে চওড়া একটা নদী। জল নেই, শুধু বালি আর মাঝে মাঝে বিরাট বোল্ডার আর পাথরের স্ল্যাপ। লাইন করে বিটাররা পার হচ্ছে। কারো হাতে টাঙ্গি, কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে তীরধনুক। এছাড়া ঢোল মাদল ক্যানেস্তারা তো আছেই।

কার্লসন আবার ছুটল সিনে ক্যামেরা নিয়ে। এমন মিছিলের ছবি তুলতেই হবে।

মুখিয়া আমাদের মাচানের পোজিসন দেখিয়ে দিল। মাচায় উঠলাম। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে বিট আরম্ভ হল। দূরে ঢোল, মাদল আর ক্যানেস্তারার শব্দ। সেই

প্রকাশিত হল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রচিত

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী

পল্লী বাংলাকে ভালবেসেছিলেন কবি : সোনার বাংলা তোমার আমি ভালবাসি। এ ভালবাসার অনুভূতি যে কি বিপুল ও বিচিত্র রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে, তা বলেছেন বর্তমানকালের মনস্বী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। [টা ৪·৫০]

অন্যান্য প্রকাশন

রবীন্দ্র চিত্রকলা
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত। নন্দলাল বসুর ভূমিকা, ২১টি মূল চিত্রের প্রতিলিপি। [টাঃ ১৫·০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি
ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত একটি সারগর্ভ বই। [টাঃ ১০·০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। ঠাকুরবাড়ীর তিন-পুরুষের ইতিহাস। [টাঃ১২·০০]

রবীন্দ্র-দর্শন
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। [টাঃ ২·৫০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৯

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে লোকের হৈ হৈ চিৎকার। আদিম অসভ্য মানুষ যেন জেগে উঠেছে।

কার্লসনকে নিয়েছিলাম আমার মাচায়। হাত ওর নিশপিশ করছে। ও রাইফেল লোড করে কাঁধে তুলে নিল যেন এখনি জন্তু এসে পড়বে।

আমি বললাম, ব্যস্ত হোয়ো না। জন্তু এলে তোমায় জানাব।

মিনিট দশ বাদে হঠাৎ জঙ্গলের মাঝ থেকে জানোয়ারের আওয়াজ পেলাম...... পৃথিবীর সব জন্তু যেন প্রাণভয়ে এদিকে পালিয়ে আসছে। তাদের পায়ের গতিতে ঝড়ের শব্দ......ধুলোর কুণ্ডল অন্ধকার।

ঠিক আমাদের সামনেই হঠাৎ একটা মাদী সাম্বার বেরিয়ে এল। কার্লসন মারতে যাচ্ছিল আমি ইশারায় অপেক্ষা করতে বললাম।

তারপর তিনটে হরিণ বেরিয়ে এল। তারপর এল বিরাট শিংওলা একটা স্ট্যাগ।

ইশারা করে কার্লসনকে পয়েন্ট আউট করতেই তার রাইফেল গর্জে উঠল জঙ্গল কাঁপিয়ে। গুড নেক-শট।

একটু পরে অন্য মাচা থেকে গুলির আওয়াজ। মনে হল জয়সোয়ালের মাচা থেকে শব্দটা এল।

কার্লসন ফিস ফিস করে বললে, হোপ ইট ইজ এ লেপার্ড।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝিয়ে দিলাম, বাঘ নয়। বড়ো জন্তু হলে দুটো ফায়ারের আওয়াজ পেতাম।

বিট শেষ হয়ে গেল। জানা গেল যাদব একটা ভালো শুয়োর মেরেছে।

কার্লসন মন-মরা। ও বোধহয় আশা করেছিল প্রথম দিনেই লেপার্ড পাবে—নিদেন একটা টাইগার।

কিন্তু মন-মরা হলেও ছবি তুলতে ভুলল না। আটজন লোকে মিলে সাম্বারটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য ফিল্মে তুলতে তুলতে কার্লসন বললে, এর মধ্যে কেমন করে পারি ইর্নাগ্রিডকে ধরে রাখবই। আশ্চর্য হচ্ছেন? ওকে নিয়ে যাব বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বন্দুক হাতে দাঁড় করিয়ে ছবি নেব পর পর। তারপর এডিটিং-এর সময়ে এইখানে ঢুকিয়ে দেব। আপনারা যখন দেখবেন তখন ধরতে পারবেন না ব্যাপারটা।

প্রথম দিনটা গেল ভালোই। কার্লসনের হাতে কিছু একটা বউনি হল। কিন্তু তারপর থেকে আট দিন কাটল সমস্ত বন চুঁড়েও বাঘ মিলল না। অস্বস্তির শেষ নেই। এত আশা এত আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহেবকে কি ফিরতে হবে শূন্য-হাতে? কি করে মুখ দেখাবে ইর্নাগ্রিডের কাছে? ইর্নাগ্রিডই বা কি ভাববে এই বাঙালী শিকারী বন্ধুটিকে?

এদিকে সাহেবও যেন কেমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। মন মন কেবল হুইস্কি খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে। ক-ত দিন ঘরছাড়া।

আসলে, আমার মনে হল, লেপার্ড পাচ্ছে না বলেই মনের এই অবস্থা

এক এক দিন দেখি সাহেব একা একাই রাইফেল নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশা, হয়তো লেপার্ড পেয়ে যাবে।

কিন্তু আমার ভয় হত, অনভিজ্ঞ বিদেশী শিকারী—বেঘোরে প্রাণ হারাবে না তো?

এ কথা মনে করতেই ইর্নাগ্রিডের প্রেম-বিহ্বল করুণ মুখখানি কল্পনায় ভেসে ওঠে। বিদেশে এই বিদেশিনী এত বড়ো দুর্ঘটনার মুখে একলা কোন অবলম্বনের জন্যে তখন হাত বাড়াবে? ভাবতেও শিউরে উঠি।

আমিও তখনি রাইফেল হাতে সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি।

এমনি সময়ে একদিন সকালে খবর পাওয়া গেল একটা 'কীল' হয়েছে।

কার্লসনের কী আনন্দ। ও যেন বাঘ মেরেই ফেলেছে।

সকালেই লোক পাঠিয়ে দেওয়া হল মাচা বাঁধবার জন্যে। বিকেল তিনটে নাগাদ কফি আর কিছু স্ন্যাক নিয়ে মাচায় গিয়ে বসলাম। আগেই পাগমার্ক দেখে বুঝতে পারা গেছে ওটা লেপার্ডের 'কীল'। তাছাড়া পিছনের খানিকটা খাওয়া। এও একটা মস্তবড়ো লক্ষণ।

রাত হল। আকাশে অল্প অল্প চাঁদের আলো। প্রায় পনেরো গজ দূরে কীলটা পড়ে আছে।

আমার পাশে কার্লসন। আনন্দে উত্তেজনায় ওর মুখটা চক চক করছে। ও কেবলই ফিসফিস করে বলছে, লেপার্ডটা দয়া করে আমায় মারতে দিয়ো। ইর্নাগ্রিড তাহলে ভারি খুশী হবে।

ওর ধারণা, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত লেপার্ড মারার কৃতিত্বটা নিয়ে নেব।

কিন্তু সাহেবের অনুরোধে আমি হ্যাঁ 'না' কিছুই বললাম না।

রাত এগারোটা নাগাদ বুঝতে পারা গেল বাঘ কীলে এসেছে। দুজনের রাই-ফেলে ক্ল্যাম্প দিয়ে টর্চ ফিট করে নেওয়া হয়েছে। বাঘ কীলে বসতেই কার্লসন নিশ্বাস আটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাইফেল তুললে আমি বাধা দিলাম। ইশারা করলাম অপেক্ষা করতে।

জন্তুটা ধীরে ধীরে কীলে মনোযোগ করল। এক মিনিট...দু মিনিট...তিন মিনিট জন্তুটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মোষের বাচ্চাটাকে খাচ্ছে...আমি কার্লসনকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েই টর্চ জ্বাললাম। টর্চের আলোর চমকে উঠে জন্তুটা মুখ তুলল। সঙ্গে সঙ্গে কার্লসনের রাইফেল থেকে গুলি ছুটল। জন্তুটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়তেই আমি আর একটা গুলি ছুঁড়লাম। ব্যাস সব ঠাণ্ডা।

বাক মুখরক্ষা হল।

সাহেব মনের আনন্দে সফল হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল। যাবার সময়ে আমায় বার বার করে অনুরোধ করে গেল কলকাতায় গেলে আমি যেন অতি অবশ্য তার সঙ্গে দেখা করি।

আমি কথা দিয়েছিলাম।

পরের বছর কি একটা কাজে কলকাতা যেতে হয়েছিল। কার্লসনের কথা ভুলিনি। চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করে কার্ল-সনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বাইরের ঘরে ঢুকতেই দেখি সেই বাঘ-ছালটা দেওয়ালে ঝুলছে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। এমন তো কথা ছিল না। তবে কি ইর্নাগ্রিডের স্কিনটা পছন্দ হয়নি?

কার্লসন আমায় দেখেই ঠিক সেই প্রথম দিনের মতো আমায় আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

হাউ ক্যান আই রিপে ইউ? লেট আস ওপেন এ স্কচ।

আদর আপ্যায়ন যথেষ্ট হল। তারপর খাবার পালা। খেতে বসলাম আমরা তিন-জন। কিন্তু যে চতুর্থ জনটিকে প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম তার দেখা পেলাম না। সাহেব তার গৃহলক্ষ্মীটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা একবারের জন্যেও তার কথা তুলল না। বুঝলাম ভদ্রলোক সাহেব বড়ো কনসারভেটিভ।

সেই ফিল্মটা দেখার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু সাহেব যখন নিজে থেকে কোনো কথা বলল না তখন আমিও আগ্রহ দেখালাম না।

চলে আসবার সময়ে কার্লসন আবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল—আই শ্যাল নেভার ফরগেট ইউ।

সেই আবেগপূর্ণ কথা। কিন্তু আর দেখা হবে কিনা সেকথা বলল না একটি-বারও। যেন এই শেষ দেখা।

রাস্তায় বেরিয়ে চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম ইর্নাগ্রিডের কথা। চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললে, জ্যাক তোমায় কিছু লেখেনি?

আমি মাথা নাড়লাম।

চ্যাটার্জি বললে, অত বড়ো লজ্জার কথা লিখবেই বা কী করে? ও যখন শিকারে ব্যস্ত সেই সময়ে ইর্নাগ্রিড তার এক পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে সুইডেনে চলে যায়। সাহেব ফিরে এসে দেখে শূন্যবাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে রাঁচি ফিরে এলাম। দেখি আমার নামে একটা খাম ডাকঘরের ছাপ মারা। সকৌতূহলে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম। বেশ লম্বা চিঠি। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। এ সেই নাচের শিক্ষিকা। অনেক আবেগপূর্ণ কথার পর লিখেছেন—একবার তিনি দেখা করতে চান। নয় আমি কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, অথবা ডাকলে উনিই এখানে আসবেন।

এ চিঠিটাকে কি বলব—প্রহসন? সৌভাগ্য? অথবা ভাগ্যের ভ্রুকুটি?

চিঠিটা টেবিলের ওপর পড়েই রইল। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আপাতত বিশেষ ইচ্ছে করল না। কারণ তখনো কার্লসনের বাইরের ঘরে সেই বাঘছালটার কথা মনে হচ্ছিল। দেহশূন্য, অবলম্বনশূন্য নির্জীব একটা অস্তিত্বের আভাস।

CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

কখনো বুড়ো না হওয়া

একটি মানব-শিশুর জন্ম হল।

এমন যদি হয় যে দু-সপ্তাহের মধ্যেই শিশুটির শৈশব শেষ, এক সপ্তাহের মধ্যে যৌবন, তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য—তাহলে? প্রকৃতিজগতে অবশ্য এমন বহু প্রাণী আছে যাদের আয়ু চার মাসের বেশি নয়। কিন্তু মানুষের বেলায় নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে ষাট-সত্তর-আশি বা এমনকি একশো বছর পরমায়ু তার আছে। ঢোলবাদক শ্রীকিশোর নট্ট তিন বছর আগেই একশো পেরিয়েছেন এবং এখনো তিনি জোয়ান মানুষের মতো ঢোল বাজাতে পারেন। শিল্পী যামিনী রায় অবশ্য একশোতে পৌঁছন নি, পৌঁছবেন আশা করা চলে কেননা এখনো তাঁর হাতের টান জোয়ানের মতো শক্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একাশিতে পৌঁছেও মৃত্যুর আগে যে কবিতা মুখে মুখে বলে গিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় শরীর যতোই ব্যাধিগ্রস্ত হোক তাঁর চিন্তা ছিল তরুণের মতো। এই ক্ষণজন্মাদের কথা বাদ দিলেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষরাও কম আয়ু নিয়ে বেঁচে আছি নাকি! তবে চার মাস বয়সে পৌঁছবার আগেই কারও যে মৃত্যু ঘটতে পারে না তা নয়। কিন্তু তখন আমরা বলে থাকি, চারমাসের একটি শিশুর মৃত্যু হল। কিন্তু চারমাসের মধ্যেই একটি মানুষের জীবনচক্র শেষ—তা কেমন করে হয়?

হয় না, কিন্তু হওয়াটা অসম্ভব নয়। মানুষের শরীরে রক্তের লাল কণিকা যদি নতুন করে তৈরী হয়ে না চলত তাহলে কতখানি হত এক-একজন মানুষের পরমায়ু? সাড়ে তিন মাসের বেশি কোনো ক্রমেই নয়। কেননা এই সাড়ে তিন মাসই হচ্ছে একটি লাল রক্ত-কণিকার আয়ু। রক্তের ক্যানসার বা লিউকোমিয়া হলে কদিন মানুষ বাঁচে? বারে বারে রক্ত দেবার পরেও একটা সময়ের পরে আর বাঁচানো যায় না। এখানেও কারণ একই। শরীরে লাল রক্ত-কণিকা তৈরি বন্ধ হয়ে যাওয়া।

সুখের বিষয়, রক্তের ক্যানসার মোটেই ব্যাপক রোগ নয়। লাখে একজনকেও ধরে কিনা সন্দেহ। আশা করা চলে আর কিছুদিনের মধ্যেই রোগটি কেন হয় তা জানা যাবে, কী করলে সারে তাও জানা যাবে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে মানুষের শরীরের মধ্যেই এমন আয়োজন আছে যে রক্তের একটি কোষ মারা পড়বার আগেই তার জায়গা নেবার জন্য নতুন একটি কোষ তৈরি হয়। আমাদের শরীরের রক্তে যতো লাল কণিকা আছে তার তিন ভাগের একভাগ প্রতিদিন এভাবে মরছে আর অন্যের জায়গা নিচ্ছে নতুন কণিকা।

আর শুধু কি রক্তের লাল কণিকা? যাকে বলা হয় রক্তের অক্সিজেন বাহক—সেই হিমোগ্লোবিনও এমনিভাবে তৈরি হয়ে চলেছে।

মানুষের দেহযন্ত্রের এই এক আশ্চর্য গুণ। যন্ত্রটি চালু থাকছে কিন্তু তার মেরামতীও সমানে চলেছে। চালু যন্ত্র নিজেই নিজেকে সারিয়ে নিচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

মানুষ কি একটা যন্ত্র হল! মানুষের শরীরটাকে একটা যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করাতে অনেকেই একথা ভাবতে পারেন। না, মানুষ অবশ্যই যন্ত্র নয়। আজ পর্যন্ত যতো নিখুঁত যতো আশ্চর্য যন্ত্র মানুষের হাতে তৈরি হয়ে থাকুক না কেন, মানুষকে তৈরি করা হয়েছে তার চেয়েও হাজারগুণ নিখুঁত আর আশ্চর্য রূপে। কেন? ইস্পাত বা কংক্রিট বা প্লাস্টিক তৈরি হতে পারে সবচেয়ে সেরা মালের, তা দিয়ে যন্ত্র তৈরি হতে পারে সর্বোত্তম ডিজাইনের—কিন্তু এই যন্ত্রের কোনো অংশ অকেজো হলে তার মেরামতী কি নিজের থেকেই হতে পারবে? কখনো নয়। কিন্তু মানুষের শরীরে তা অনবরত হয়ে চলেছে, জন্ম থেকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত। পুরনো অংশের জায়গায় বসছে নতুন অংশ, বিনা হট্টগোলে, বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলার কারণ না ঘটিয়ে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, যেখানকার যা হুবহু তাই। হাড়ের জায়গায় হাড়, পেশীর জায়গায় পেশী, চামড়ার জায়গায় চামড়া। একটির জায়গায় অপরটি কদাচ নয়। মানুষের হাতে তৈরি যন্ত্রে আজ পর্যন্ত এই আশ্চর্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নি। ব্যোমযানের কক্ষে একটি ফুটো হয়েছিল বলে আমরা তিন-তিনজন নভশ্চরকে হারিয়েছি। মানুষের শরীরযন্ত্রে কিন্তু এমন বৃহৎ একটি দুর্ঘটনার কারণ ঘটলে তার মেরামতীর আয়োজনটিও প্রস্তুত থাকত।

মানুষের হাতে তৈরী অনেক কিছুই মানুষের শরীরের নকল। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকে বলা হয় নকল মস্তিষ্ক, সেটা কিন্তু যান্ত্রিক গড়নের মিলের দিক থেকে নয়, অনুরূপ কাজ করার ক্ষমতার জন্যে। কিন্তু যান্ত্রিক গড়ন ও বিন্যাসের দিক থেকে হুবহু মিলের দৃষ্টান্ত অনেক আছে, এবং মিল যেখানে যতো বেশি সম্পূর্ণ, সেখানে দক্ষতা ও স্থায়িত্বও তাক অবাক হবার মতো। প্রায় একশো বছরের পুরনো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টান্তটি প্যারিসের ঈফেল টাওয়ার। ১৮৮৯ সালে প্যারিসের বিশ্বমেলা শুরু হবার আগে এই টাওয়ারটি তৈরি করেছিলেন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার আলেকজান্দার ঈফেল। তিনি শুনলে হয়তো অবাক হতেন যে, তিনি মৌলিক বা অভিনব কিছু সৃষ্টি করেননি, প্রকৃতিজগতে সংখ্যাতীত বার যা সৃষ্টি হয়েছে তিনি তারই একটি নিখুঁত নকল করেছেন মাত্র। জীব-বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মানুষের শরীরের নলের মতো হাড়ের গড়ন (জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়া) আর ঈফেল টাওয়ারের বিন্যাস হুবহু একরকম। এমনকি হাড়ের সঙ্গে হাড়ের কোণ আর ভারবাহী সমতলগুলোর কোণ পর্যন্ত মাপের দিক থেকে অভিন্ন। এই আশ্চর্য মিল থাকার জন্যেই সম্ভবত ঈফেল টাওয়ার এখনো চিড় খায়নি এবং আরো বহুকাল টিকে থাকবে। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা আর লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠা জীবন্ত শরীরের হাড়ের বিন্যাসের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল!

আর মিল তো শুধু বাইরের দিকেই নয়! এ-ধরনের একটি কাঠামো তৈরি করার সময়ে নির্মাণকারীদের সবচেয়ে বেশি নজর থাকে দুটি জিনিসের ওপর: ক্ষমতা ও হালকা ওজন। আর দুটি ব্যাপারেই টাওয়ারের সঙ্গে জীবন্ত শরীরের হাড়ের অসাধারণ মিল। খাড়া উঁচু দিকে উঠে যাওয়া ঈফেলের টাওয়ার আর আধ টন ভার বহনে সক্ষম মানুষের শরীরের হাড় উভয়েই তৈরি হয়েছে ক্ষমতা ও হালকা ওজন দুই-ই বজায় রেখে। বাড়তি বা ফালতু অংশ কিছুমাত্র নেই, না টাওয়ারে না হাড়ের বিন্যাসে।

ঈফেল টাওয়ার দেখে সবাই অবাক হন। একজন ইঞ্জিনিয়ারের এই কীর্তি অবশ্যই অবাক হবার মতো। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি অবাক হতে হবে হাড়ের ভিতরের জ্যামিতিক বিন্যাস দেখে। এমন শৈলী ও সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

শরীরের একটুকরো হাড়—নির্মাণকার্যের অতি নিখুঁত একটি দৃষ্টান্ত সেটি। প্রথমত সেখানে বাহুল্য বলে কিছু নেই। ঠিক যতোটুকু দরকার ততোটুকু, যেখানে যা দরকার তাই। হাড়ের কাঠামোটি শরীরের ভার বহন করে। আর নলের মতো হাড়গুলোর ভিতরে রয়েছে—সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকার মতো—রক্ত তৈরির কারখানা। যাকে বলা হয় মজ্জা। এই কারখানায় প্রতি সেকেণ্ড তৈরি হয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ কণিকা।

ঠেকা দেওয়া ও ঢাকনা দেওয়া—হাড়ের কাজ শুধু এইটুকুই নয়। আরো আছে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে হাড়ের যোগাযোগ আছে। রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে

প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যায়। ব্যাপারটা কত মারাত্মক তা শল্য-চিকিৎসকদের অজানা নয়। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে অপারেশন করার সময়ে যদি কোনোক্রমে সঙ্গের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডও কাটা পড়ে, তাহলে রুগীকে বাঁচানো প্রায় অসাধ্য।। কেন? প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড না থাকা মানেই শরীরের ক্যালসিয়াম বিপাকক্রিয়া বন্ধ।

রক্তে অনবরত ক্যালসিয়াম ছেড়ে দিচ্ছে হাড়, বেশ ভালোমতোই। আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, রক্তের গা থেকে ক্যালসিয়াম শুষে নিয়ে যাচ্ছে রক্ত। হাড় থেকে রক্তে ক্যালসিয়ামের যোগানে কখনো ছেদ পড়ে না। অর্থনীতির ভাষায়, রক্তে ক্যালসিয়াম যোগান দেবার ব্যাপারে হাড়ের ব্যবসাটি একচেটিয়া।

কখনো কি ঘাটতি পড়ে না? পড়ে। তাহলে শেষরক্ষা হয় কি করে, কিঞ্চিৎ-পরিমাণ ঘাটতি পড়লেই যেখানে প্রাণহানির আশংকা? হাড় এক্ষেত্রে খুবই উদার। ঘাটতি পূরণ করার জন্যে নিজেকেই রক্তের মধ্যে গলিয়ে দেয়। মাত্রা নিতান্ত কম নয় —প্রতি মিনিটে কয়েকশত গ্রাম। তাহলে তো এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি পড়তে যতো সময় লাগবে কথা ততোক্ষণের মধ্যে শরীরের গোটা কাঠামোই রক্তের মধ্যে নুনের মতো গলে যাবার আশংকা! ভয় পাবার কারণ নেই, শুধু গলে যাওয়ার ব্যাপারটি হলে তাই হত, কিন্তু একদিকে যতো গলে অন্যদিকে ততো তৈরি হয়ে চলে।

অর্থাৎ মানুষের শরীরে রয়েছে প্রায় একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার তৈরি হবার মতো আয়োজন। যতোই ঘাটতি পড়ুক, যতোই ক্ষতি হোক, তা পূরণ হয়। শরীরের কোনো অংশ অচল হলে তার জায়গায় নতুন অংশ এসে যায়।

কিন্তু রক্ত ও হাড় ছাড়াও তো শরীরে আরো অনেক উপাদান আছে যেগুলোর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। সেখানকার ক্ষতি-গুলোর কি-ভাবে পূরণ হয়?

এক্ষেত্রে সাবধানতা অত্যধিক বেশি। শরীরের যে-সব অংশের গুরুত্ব খুব বেশি সেগুলো তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত রকমেরই টেকসই পেশী ও নার্ভ দিয়ে। অর্থাৎ, এই অংশগুলোতে ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যেমন—হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্কের প্রায় দেড় হাজার কোটি নার্ভকোষ ইত্যাদি। যদি বাইরে থেকে রোগ এসে এই অংশগুলোকে আক্রমণ না করে তাহলে অন্তত দেড়শো বছর ধরে এই অংশগুলো পুরোপুরি চালু থাকার সম্ভাবনা।

হালের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, এমনকি 'চিরস্থায়ী' টিস্যুগুলোরও বাড়-বৃদ্ধি ঘটে। হৃৎপিণ্ড নিয়ে মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে জীব-বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরেও এই অংশগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নিজের থেকেই মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছে।

অথচ বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, স্নায়ুকোষ বা নিউরন কখনো ভাগ হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানীদের যেমন ধারণা ছিল পরমাণু অবিভাজ্য, এও অনেকটা তেমনি। আর কোষ যদি ভাগ হতেই না পারে তাহলে কোষের বৃদ্ধিও নেই। কেননা কোষের বৃদ্ধি ঘটে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, এমনিভাবে ভাগ হয়ে। তাহলে, স্নায়ুকোষ ভাগ হয় না কথাটা ধরে নিলে তার মানে কী দাঁড়ায়? মানুষের শরীরে স্নায়ুকোষ যা আছে তাই থাকে, সারা জীবনেও তা বাড়ে না। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক যেমন আছে তেমনিই থেকে যায়, এ-ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। তার ক্ষয় হতে পারে, পূরণ হয় না।

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা অবশ্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন, নিউরনের কেন্দ্রীন ভেঙে দু-ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের কোষও যে 'চিরস্থায়ী' নয় তাও এখন পরীক্ষিত সত্য।

রক্তের সাদা কণিকা সম্পর্কে এই তথ্যটি সবাই জানেন যে শরীরে যদি জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে এই সাদা কণিকারা তাদের বাধা দেয়। অর্থাৎ যাকে বলা হয় 'জীবন দিয়ে জীবন দান'—এই সাদা কণিকাদের ভূমিকা তাই। তাহলে ধরে নিতে হবে শান্তির সময়ে—অর্থাৎ যে সময়ে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হচ্ছে না তখন—সাদা কণিকাদের কোনো ভূমিকা নেই। তাও আছে। রক্তের প্রতি চতুর্থ সাদা কণিকা গঠনমূলক কাজ করে থাকে। এর জন্ম প্লীহায়, বিশেষ একটি লিম্ফনোডে বা লসিকা-নালীতে। সেজন্যে নাম লিম-ফোসাইট। গঠনমূলক ভূমিকায় রয়েছে এই লিমফোসাইটরাই।

বিজ্ঞানীরা, একসময়ে টের পেলেন প্রতি তিনটি লিমফোসাইটের মধ্যে রক্তের প্রবাহে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র একটিকে, বাকি দুটি একেবারেই বেপাত্তা। গেল কোথায়? খোঁজ, খোঁজ। উবে গেল নাকি?

প্রায় উবে যাওয়াই। কিংবা মিলিয়ে যাওয়া। লিমফোসাইটরা মিলিয়েই যায়, আর কোথাও নয়, শরীরেরই টিস্যুতে। নিজেদের মিলিয়ে দিয়ে তারা দান করে অতি মূল্যবান একটি পদার্থ—রাইবোনিউ-ক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর-এন-এ। শরীরের প্রোটিন নির্মাণের ক্ষেত্রে এই এ্যাসিডটি অতি সক্রিয় ভূমিকা থাকে: প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যেমন চাই নিশ্বাসের বাতাস, তেমনি এই প্রোটিন নির্মাণের আয়োজন। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনটি বজায় রাখার জন্যেই সাদা কণিকারা নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শরীরের মধ্যে এমনি নানা আয়োজনের আর শেষ নেই যেন। লিভার বা যকৃতের কথাই ধরা যাক। শূন্য স্থান পূরণের ক্ষমতা এই অঙ্গটিরও আছে পুরোমাত্রায়। মানুষের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যকৃৎ আধখানা কেটে ফেললেও পুরো যকৃতটি আবার তৈরি হয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগে না।

কিডনি বা বৃক্কের বেলাতেও একই ব্যাপার লক্ষ করা গিয়েছে। আগেকার কালের ডাক্তাররা শরীরের দুটি কিডনির একটিতেও হাত দিতে চাইতেন না। তাঁদের ভয় ছিল, একটি সরালেই অপরটি অচল হয়ে যাবে। হালের ডাক্তাররা এবিষয়ে একেবারেই নিশ্চিন্ত। শরীরে যদি একটি কিডনিও থাকে (কোনো কারণে অপরটি আগেই সরানো হয়েছে) তাহলেও তাঁরা সেই একমাত্র কিডনির খানিকটা অংশ সরাতেও ইতস্তত করেন না। তাঁরা জানেন, কিডনির এক-চতুর্থাংশও যদি শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে একবছর কি দু-বছরের মধ্যে তা পুরোমাত্রায় তার ভূমিকাটি পালনের অবস্থায় এসে যাবে।

আর হাড়ের বেলায় তো আরো নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। খানিকটা অংশ রাখারও প্রয়োজন নেই, পরিষ্কার জায়গা পেলেই নতুন হাড় গজিয়ে থাকে। হাড়ের একটি অংশে যদি অসুখ দেখা দেয় তাহলে ডাক্তাররা কী করেন? হাড়ের এই বিশেষ অংশটা বেমালুম কেটে বাদ দিয়ে দেন এবং সে-জায়গায় বসিয়ে দেন একটি জিপসাম রড বা দণ্ড। ব্যাপারটা কি? শরীরের মধ্যে খামখা একটা বিজাতীয় জিনিস থেকে যাবে নাকি? ভয়ের কোনো কারণ নেই। অকরুণ হাতে রুগ্ন হাড়ের অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তার আবরণীটি —যাকে বলা হয় পেরিঅস্টিয়াম—সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। রডটি ঢোকানো হয়েছে এই আবরণীর মধ্যে। কিছুকালের মধ্যে এই রডটিকে ঘিরেই তৈরি হবে নতুন হাড়। শূন্য স্থান পূরণ করার আয়োজন শরীরের মধ্যেই আছে। ডাক্তার তারই ওপরে নির্ভর করেছেন।

শরীরের এইসমস্ত আয়োজনকে পুরো মাত্রায় জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত দাবি করা চলে না। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয়, শরীরের যে-কোনো অসুখ সারিয়ে তোলার মতো আয়োজন শরীরের মধ্যেই সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। একই পদ্ধতিতে অবশ্যই নয়, ভিন্ন ভিন্ন অসুখে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। যেমন, কিডনির কতকগুলো অসুখের বেলায় বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে কিডনির মধ্যেই অসুখ সারাবার আয়োজন সক্রিয় করে তোলা গেছে। আশা করা চলে, হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক বা অন্যান্য অঙ্গের বেলাতেও অনুরূপ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। মানুষ যে বুড়ো হয় তাও, বলতে পারা যায়, একটা অসুখেরই লক্ষণ। কোনো না কোনো দিন এই অসুখের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাবার আয়োজন শরীরের মধ্যেই তৈরি করা যাবে হয়তো।

সেদিন?

সেদিন মানুষ আর বুড়ো হবে না।

—অরুণকান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাদাবাবু, জোরে ডাকল হেমন্ত। কোন সাড়া নেই।

গায়ে হাত দিয়ে ডাক, বলল সীমা।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে বৌদি। হেমন্তর মুখটা বিকৃত হ'ল।

তাহলে, সামনে রাখা চেয়ারে বসল সীমা।

মাথাটা ধুয়ে দিলে ভাল হয় বৌদি, বড্ড জ্বর। বলল হেমন্ত।

তুমি এক কাজ কর, ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল আর পরিষ্কার এক টুকরো কাপড় নিয়ে এস।

পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে শুয়ে আছে অরুণ। সীমা একবার তাকাল সেদিকে। মাথার চুল ভালভাবে আঁচড়ানো হয় নি। কোঁচকানো চুলগুলো অবিন্যস্ত-ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ভ্রূ দুটো মোটা আর ঘন কালো। ফর্সা মুখ রক্তাভ হয়ে গিয়েছে জ্বরের তাড়নায়। নাকের পাতাদুটো নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপছে বার-বার। শ্বাসটা তার অস্বাভাবিক দ্রুত চলছে বলে মনে হল সীমার। ঠোঁট দুটো জোরে বন্ধ রয়েছে যন্ত্রণার আধিক্যে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার-ভাবে কামান তবে জায়গাটা জুড়ে একটা লাল আভা ফুটে রয়েছে। হেমন্ত একটা প্লেটে ঠান্ডা জল আর এক টুকরো কাপড় এনেছে।

জলপটি দাও কপালে, অভিজ্ঞ নার্সের ভঙ্গীতে বলল সীমা। হেমন্ত কাপড়টা চওড়া করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিল তারপর সেটা অরুণের কপালে দিতে তার চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। তার সঙ্গে জল গড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সীমা তাড়াতাড়ি জলপটি তুলে নিয়ে অতিরিক্ত জলটা নিঙড়ে ঠিকমত পাট করে অরুণের কপালের ওপর দিয়ে দিল। কাজটা করতে দ্বিধা হল না তার। অরুণ শুধু অসুস্থ নয়, অজ্ঞান। কিন্তু তাকে বেশ বিপদে ফেললেন ভদ্রলোক।

ডাক্তারবাবুর ফোন নম্বর জান? জিজ্ঞেস করল সীমা।

না, ঘাড় নাড়ল হেমন্ত। কি নাম তাও জানি না তবে ঐ মোড়ে তাঁর ডাক্তারখানা।

তাহলে ডেকে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। ব্যস্ত হয়ে উঠল সীমা।

হেমন্ত চলে গেল। হাত দুটো বুক থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখল অরুণ। যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট শব্দ করল সে।

শুনছেন, ডাকল সীমা। কোন সাড়া নেই। অরুণের চোখের পাতা দুটো শুধু কাঁপল কয়েকবার।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সীমা অবাক হয়ে। এভাবে কোন পুরুষকে সে দেখে নি। স্বাস্থ্য আর সব লক্ষণ নিয়ে একটা অসহায়

পুরুষকে এরকম অবস্থায় আর এত কাছ থেকে সীমা কোনদিন লক্ষ্য করে নি। অরুণের কান দুটো লাল হয়ে রয়েছে। কানের ধার থেকে সূক্ষ্ম লোম বেরিয়েছে, ওপর থেকে প্রায় নীচ পর্যন্ত। জুলপীটা ঠিক কিন্তু নিখুঁতভাবে কাটা। ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালচে দাগ। সীমার মনে পড়ল অরুণ এই দিকেই সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। বুকের ওপর সূক্ষ্ম লোম আর কাল চুল। পুষ্ট বাহু থেকে সুগোল কাঁধ, তারপর গলা, তার পাশ থেকে শক্ত চিবুক দেখা যাচ্ছে। গলার ওপর একটা শিরা কাঁপছে বার-বার।

একটু পরে ডাক্তারবাবু এসে রোগ-নির্ণয় করে ইনজেকশন দিল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে বলে আশ্বাস দিলেন সেই সঙ্গে।

বৌদি খাবেন চলুন, আমি বসছি এখানে। বলল হেমন্ত।

না, আমি কিছু খাব না। উত্তর দিল সীমা। খাওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না। দুঃখ বা ভয়ের কথা নয়, আকস্মিক একাগ্রতা তার ক্ষুধাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

তাহলে দাদাবাবু রাগ করবেন আমার ওপর।

তুমি বার্লি করতে পার? অন্য কথায় গেল সীমা।

হাঁ।

তাহলে তোমার দাদাবাবুর জন্যে এক গ্লাস বার্লি করে নিয়ে এস।

হেমন্ত চলে গেল বার্লি করতে।

কপালের জলপটি বদলে দিল সীমা। তারপর আলতোভাবে অরুণের বাহুটা স্পর্শ করে দেখল উত্তাপটা। এখনও জ্বর রয়েছে একই রকম। সীমা আশা করেছিল ইনজেকশন দেওয়ার পর জ্বরটা কমবে, কিন্তু তা হল না। এবার দুর্ভাবনায় পড়ল সে। একবার ভাবল অরুণের বাবার কাছে খবর পাঠানোর কথা। কিন্তু এত রাত্রে তার কোন উপায় নেই। সারা রাত একজন অচৈতন্য রোগীকে নিয়ে সে কি করবে তাই ভাবতে লাগল। একটু পরে চোখ মেলল অরুণ। সীমা একটু জল দিল তার মুখে। কোন আপত্তি করল না অরুণ, অনেকটা জল খেল সে। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করল অরুণ।

কি কষ্ট হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল সীমা। কোন উত্তর নেই।

হেমন্ত বার্লি এনেছে এক গ্লাস। পাশের টেবিলে সেটা ঢাকা দিয়ে রাখল সে। সীমা তাকে ঘরের মেঝেতে শুতে বলল। রাত্রে দরকার হলে তার সাহায্য পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় অরুণকে নিয়ে সে একা ঘরে থাকতে দ্বিধাবোধ করছে।

একটু পরে সে লক্ষ্য করল অরুণের শ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিকভাবে পড়ছে যেন। ক্লান্তিবোধ করল সীমা। পাশের লম্বা কোচটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কাল সকালেই হাবুকাকা আর অরুণের বাবাকে খবর দিতে হবে। কিন্তু রাত্রে যদি কিছু হয়! ডাক্তারবাবু অবশ্য আরাম দিয়ে গেছেন। সেটা বড় কথা নয়, কারণ ডাক্তাররা দু' ধরনের স্তোক দিয়ে থাকেন। যদি এ রাতে অরুণ মারা যায় তাহলে কি করবে সে। তার আগে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে হাসপাতালে পাঠালে তার দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু সঙ্গে কে যাবে? চাকর দিয়ে পাঠালে অরুণের বাবাকে কি জবাব দেবে সে? অবশ্য সে নিজে সঙ্গে যেতে পারে। তাতেই বা লাভ কি? হাঁটু দুটো মুড়ে তার মধ্যে হাত দুটো দিয়ে পাশ ফিরে শুল অরুণ।

বৌদি, ডাকল হেমন্ত।

কি?

দাদাবাবুর শীত করছে বোধহয়। একটা চাদর চাপা দিয়ে দেব।

দাও। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা।

বাইরে চাদর দেখছি না, আপনি একটা বার করে দিন। উঠল সীমা। অরুণের আলমারীর চাবি অরুণের কাছেই থাকে। সাইড টেবিলের কাছে গিয়ে সে দেখল সেখানে অরুণের ব্যবহার-করা জিনিসগুলো ছড়ান রয়েছে। পাশে একটা কাল রঙের ডাইরী, গাড়ীর চাবি, সিগারেট কেস, লাইটার, পেন আর এক গোছা চাবি। বিপদে পড়ল সীমা। কোনটা আলমারীর চাবি তা সে জানেই না। হেমন্ত তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর দেরী না করে আল-মারীর সামনে গিয়ে সব থেকে বড় চাবিটা দিয়ে চেষ্টা করল সে। চাবিটা আল-মারীরই। দরজা খুলে তাকাতেই প্রথমে নজর পড়ল তার এটাচি কেসটার দিকে। একবার সেটা খুলে দেখার অদম্য ইচ্ছা হল সীমার। তার নীচের তাকে গোছা করা সার্ট, নানা রঙের আর ডিজাইনের। এ ছাড়া প্যান্ট, গেঞ্জি আর অন্যান্য কাপড়ে প্রায় বোঝাই রয়েছে। তার নীচের তাক থেকে অনেক খোঁজার পর একটা সিল্কের চাদর পাওয়া গেল। হেমন্তকে সেটা দিয়ে অরুণের গায়ে সেটা ঢাকা দিয়ে দিতে বলল সীমা। তারপর খোলা আলমারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল আবার। অ্যাটাচি কেসের চাবি তার কাছেই ছিল। সেটা নামিয়ে, চাবি দিয়ে খুলে সীমা দেখল সব জিনিষই একইভাবে রাখা রয়েছে। কেউ স্পর্শ করে নি। তারপর কি মনে হতে অ্যাটাচি কেসটা বন্ধ করে রেখে দিল যথাস্থানে।

অরুণ ঘুমোচ্ছে। নীল আলোটা জেলে হেমন্ত মেঝের এক পাশে শুয়ে পড়ল। অরুণ মারা গেলে তার কি হতে পারে তাই আবার ভাবতে লাগল সীমা। বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে সেই সব সম্পত্তির অধিকারী হবে। কত টাকা হতে পারে। দশ-পনেরো লক্ষ টাকা নিশ্চয়। তখন সে কি করবে এত টাকা নিয়ে। গ্রামে অরুণের বাবার কাছে থাকবে? তাই বা থাকবে কেন? তাহলে এই চাকর দুটো নিয়ে একলা থাকলে ক্ষতি কি? কোচে শুয়ে ভাবতে লাগল সীমা। মারা যাবার পর অরুণকে কি রকম দেখতে হবে কে জানে। মরে গেলে লোকে কোথায় যায়? বাড়ীতে মরলেই বা কি আর হাসপাতালে মরলেই বা কি? লোকটাকে ত আর ফিরে পাওয়া যাবে না। হাসপাতাল সম্বন্ধে তার ধারণা ভাল নয়।...

...ডাক্তারবাবু বাবাকে ভর্তি করে নিন। বাবাকে হাসপাতালে এনেছে সীমা।

বললেই ত হবে না। ফ্রি বেড খালি না থাকলে নেব কি করে?

বাবাকে এমার্জেন্সীতে রেখে সে বড় ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

আমার বাবাকে একবার দেখে যান দয়া করে, মিনতি করে বলল সীমা। ভদ্রলোকের দয়া হল। এসে দেখলেন তিনি তারপর নিজেই ভর্তি করিয়ে দিলেন।

মেজে বাবাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে দেখতে পেল সীমা। তাকে দেখে হাসতে চেষ্টা করল বাবা। সীমা বোর্ডিং থেকে রোজ বিকেলে বাবাকে দেখতে যায়।

সেদিন শনিবার, একটু সকালেই গিয়ে পৌঁছল সে। বাবার চেহারাটা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। একটু জল চাইল বাবা। সীমা জল খাইয়ে দিল একটু-একটু করে। তেষ্টা বেশ পেয়েছিল বলে মনে হল তার। লক্ষ্য করে দেখল অপরিষ্কার ময়লা বিছানায় শুয়ে রয়েছে বাবা। মেঝেতে জল, তার ওপরেই কয়েকটা রোগীর বিছানা। দু-তিনটে বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ। রোগীরা চিৎকার করে কথা বলছে নানা সুরে। বাবার অনেক অসুবিধে হচ্ছে বলে বুঝল সীমা। বড় ডাক্তারবাবুকে জানাতে তিনি সমবেদনা জানালেন, প্রতিকারের চেষ্টা করলেন কিন্তু বিশেষ ফল হল না। অসুবিধে ওঁর রয়েই গেল। সোমবার বাবার অবস্থা খারাপের দিকে গেল। নাকে একটা নল দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হল, তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ইনজেকশন। মঙ্গলবার সীমা দেখল ডাক্তার আর নার্সরা দাঁড়িয়ে আছে বাবার বেডের পাশে। করুণ দৃষ্টিতে তারা তাকাল সীমার দিকে। হাত দিয়ে দেখল বাবার শরীর বেশ ঠাণ্ডা। শ্বাস পড়ছে অনেক দেরী করে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বাবার দেহটা স্থির হয়ে গেল। চাদরটা নার্স ঢাকা দিয়ে দিল সর্বাঙ্গে। বুঝতে একটু দেরী হল সীমার। তারপরে হঠাৎ নানা রঙ-ভরা বেলুন তার চোখের সামনে ফেটে গেল। গাঢ় বেগুনী, সবুজ, উজ্জ্বল হলুদ, আর গাঢ় নীল রং ফোয়ারার মত গিয়ে তার চোখে পড়ল একসঙ্গে। সব রঙ মিশে একাকার হয়ে গেল...

বৌদি, বৌদি, হেমন্তের গলা।

কি হয়েছে? উঠে বসল সীমা।

আপনি চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? দাদা-বাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। অরুণ তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত উন্-মাদের মত তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সীমা।

দু-তিন দিনের মধ্যেই অরুণ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার যে একটা অসুখ হয়েছিল তাকে দেখলে কেউ বলবে না।

আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি তো আজে— বলল অরুণ।

না, হেমন্তই সব করেছে, আমি একবার গিয়েছিলাম মাত্র।

ডাঃ সোমের কাছে আজ যাওয়ার দিন না।

হাঁ, কিন্তু এতে কি ফল হবে তা আমি বুঝি না।

তা হোক, নেও, তোমার ত মজা লাগে বল। ও প্যাকেটে কি আছে?

হেমন্তর প্যান্ট, কোট, জুতো—বলল সীমা।

বেশ বড় প্যাকেট বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, ছটা করে আছে।

ড্রেনপাইপ প্যান্ট আর ছুঁচলো জুতো?

না, হেসে ফেলল সীমা। হাসলে সীমাকে বেশ দেখায়।

ডাঃ সোমকে আজ বেশ হাসিখুশী বলে মনে হল সীমার।

কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ভালই, চেয়ারে বসল সীমা।

আপনি সেদিন বলেছিলেন কুকুর ভালবাসেন। তাছাড়া আর কি পছন্দ করেন?

আর কিছু না। (লোকটার গোঁফ ঠিক টুথব্রাশের মত)

সেদিন আপনাকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু আপনি তাঁর বিষয়ে কিছু বলেননি।

আবার কি বলব? আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন তাই বলেছি, বিরক্ত হল সীমা। (লোকের নিন্দে শুনতে খুব ভালবাসে বলে মনে হচ্ছে)

তা দিয়েছেন। আচ্ছা আপনি রাঁধতে পারেন?

হ্যাঁ, পারি বৈকি! (খাবে নাকি? এমন ঝাল দেব যে গোঁফ জ্বলে যাবে!)

আপনাদের বাড়ীতে কে রাঁধে?

হেমন্ত (এবার কত মাইনে পায় নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে)।

আপনাদের দুজন চাকর আছে?

হ্যাঁ, হেমন্ত আর কৃষ্ণো।

এদের মধ্যে কে ভাল কাজ করতে পারে?

হেমন্তই বেশ ভাল পারে।

আপনি এবার কোচে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ুন সেদিনের মত।

কোচে শুল সীমা।

হেমন্তকে আপনি ভাল বললেন তার মানে খুব খাটতে পারে বলছেন?

না না, তা কেন, সব কাজেই ও এগিয়ে আসে সাহায্য করতে।

রান্না ছাড়া অন্য কিছু করে হেমন্ত?

না, অন্য আর কি করবে।

কেমন ধরুন আপনাদের কাপড়-জামা কাচা।

আমার কাপড়-জামা আমি নিজেই কেচে নিই।

স্বাবলম্বী হওয়া খুবই ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে যদি চাকররা কেচে দেয়, তাহলে আপনার আপত্তি হবে?

নিশ্চয়; মেয়েদের জামা-কাপড়ে পুরুষে হাত দেবে কি? সীমার স্বরে বিরক্তি। (ডাক্তারদের সামান্য বুদ্ধিও নেই)

মিঃ বোসকে আপনার ভাল লাগে না, সেদিন বলেছিলেন, তার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

না।

আপনি ছোট ছেলেমেয়ে ভালবাসেন?

ছোট ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ।

ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আমার মারতে ইচ্ছে করে।

কেন?

এমনি; বেশ কাঁদবে, প্রতিবাদ করবে না, কাউকে বলতে পারবে না। (তোমার নাতি থাকলে এমন গলা টিপে দিতুম, তখন বুঝতে)

আপনার যদি নিজের ছেলেমেয়ে হয়?

হবে না; স্বামী-স্ত্রীর নোংরা সম্পর্কটাকে আমি ঘৃণা করি।

আপনাদের চাকর কৃষ্ণোর চেয়ে আপনি হেমন্তকে বেশী ভালবাসেন; হেমন্তর মত দেখতে কাউকে চিনতেন?

হ্যাঁ, চিনতাম, আপনি কি করে জানলেন? হেমন্তর চেয়ে ছোট ছিল সে। আমাদের বাড়ীর কাছে থাকত ওরা। ওর মধ্যে ছিল। ময়লা প্যান্ট আর জামা পরে ঘরে বসে থাকত। আর প্রায়ই কাঁদতে দেখতাম।

আপনি তখন কি করতেন?

কি করব; আমার খুব ইচ্ছে হত ওকে সব জিজ্ঞেস করতে। ওর কান্নার সুরটা এখনও আমার কানে বেজে আছে।

হেমন্তকে তার মত দেখতে?

হ্যাঁ, তাছাড়া হেমন্ত গরীব।

আপনি বড়লোকদের পছন্দ করেন না বুঝি?

ঘৃণা করি। (তোমাকেও। লোক ঠকিয়ে অনেক টাকা করেছ তুমি।)

কেন?

তারা অপরের উপর সুযোগ নেয়।

আপনার বাবা কিসে মারা গিয়েছিলেন?

হাঁপানি ছিল বাবার।

আপনার কোন ছোট ভাই-বোন ছিল?

না না—সীমার স্বরে আতঙ্ক।

আপনার কোন কাকা বা জ্যাঠা ছিল?

কাকা! চমকে উঠল সীমা।

হ্যাঁ।

না, একটু পরে উত্তর দিল সীমা।

আপনি ছোটবেলার কথা কিছু বলুন।

কি বলব। (অনুপের চাবির গোছাতে সেফের চাবি আছে নিশ্চয়)

যা হোক বলুন। মিসেস বসু, আপনি আজ ঠিক আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। এর আগের দিন আপনি নিজের মনের ওপর এতটা চাপ দেননি। আজ আপনি উত্তর দিচ্ছেন খুব ভেবে-চিন্তে, নিজের মন আর কথাকে সংযত করে। (তাহলে কি করব, সৌম্য দত্ত আর কি তার পিছু নেবে?)

সেদিনের মত, মনে যা আসে তাই বলুন।

(মনে যা আসে তাই যদি বলি তাহলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে)

বেশ জিজ্ঞেস করুন।

লাল রং বললে কি মনে হয়?

লাল—? সিঁদুর—রক্ত—মাংস—চাপা পড়েছে একটা কুকুর—চারিদিকে রক্ত নাড়ী বেরিয়ে এসেছে। সধবা মরলে মাথায় চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে নিয়ে যায়। তাতে কি হয়? মায়েরা সিঁদুর পরলে ভাল লাগে। রেখার মা স্কুলে সিঁদুর পরে আসতেন।

আপনার মা? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

আমার মা সিঁদুর পরতেন কিনা মনে নেই। গায়ে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ মায়ের। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। ভারী পায়ের চলা দুম-দুম করে, চিৎকার করে কথা বলা, ঝগড়া-ঝগড়া—না জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল—ঝনঝন। কাঁচের কাপ-ডিস, গ্লাস, ভেঙে ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। আমার হাত কেটে রক্ত পড়ছে—লাল টকটকে রক্ত। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে সীমার। আমি কি বললাম আবোল-তাবোল, আস্তে বলল সীমা।

না, ঠিকই বলেছেন।

(তোমার মাথা বলেছি)

সাদা বললে আপনার কি মনে হয়?

চুন—

বেশ বলুন, উৎসাহ দেন ডাঃ সোম।

খড়ি, কাগজ, সাদা গাউন-পরা মাদার, থান-পরা বিধবা,—মা কিন্তু থান পরে নি, হাতের চুড়িও খোলে নি; মরে গেলে সাদা ফুল দেয় কেন? ফুলশয্যার দিনও যুঁইয়ের গোড়ে, রজনী-গন্ধা—বেশ গন্ধ। (আবার কি বলছি)।

থামলেন কেন, বলুন।

আমাদের স্কুলে একটা মেয়ে পড়ত, তার গালে সাদা দাগ ছিল, কি নাম যেন? ইলা। তাকে খুব রাগিয়ে দিতাম। কুষ্ঠ-রোগী বললেই কাঁদত ইলা, বেশ মজা লাগত আমার।

দুজনেই নিস্তব্ধ। লোকটা চুপ করে আছে কেন? আর কি জিজ্ঞেস করবে, কর না। আরে লোকটা মরে গেছে নাকি? আমিও কিছু বলব না। চুপ করে আমি খুব থাকতে পারি। নানুকাকা একটা কথাও আমায় বলাতে পারে নি। মারলে কি হয়? লাগে হয়ত! বেত দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে মারলে রক্ত পড়ে, ব্যথা হয়, তারপর ঠিক হয়ে যায়। ওতে আমার কি হবে? লাল, সাদা হল, এবার কি সবুজ না হলুদ? লোকটা ঘোর উন্মাদ।

আপনার স্কুল ভাল লাগত? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

ভাল লাগত না।

কেন?

এমনি।

মাদারদের কেমন লাগত?

মাদার ইলাইজা আমায় খুব ভাল-বাসতেন। উনি খুব লম্বা ছিলেন। ছুটে-ছুটে চলতেন। তাঁর সঙ্গে আমরা চলতেই পারতাম না।

আবার নিস্তব্ধতা। ডাঃ সোম অপেক্ষা করছেন সীমার জন্যে। এই রে আবার চুপ করেছে। লোকটা কত মানুষকেই যে যন্ত্রণা দিয়েছে এইভাবে। ডাক্তারবাবুর বয়স কত হবে। সত্তর-আশি হতে পারে। মর না তুমি। অনুপবাবু মারা গেলে সে বিধবা হবে। বিধবা কথাটা কি অদ্ভুত শুনতে? পিসিমা বিধবা হওয়ার পর শুচিবায়ু হয়েছে। তার কি হবে? ছাই হবে, সে বিয়েই করে নি। অনুপবাবুর রংটা তার চেয়ে ফর্সা। দাঁড়িতে অমন নীলচে রং হয় কেন? জামাটা সে রাতে খুলে দেখলেই হোত। প্যান্টটা মোটা ছিল। সেটাই বা দেখলাম না কেন? হেমন্ত থাকলেই বা, ও আমার কি করতে পারত? কিছু না। মোদীকে টাকাটা দিয়ে দিয়েছেন, ভেবেছেন আমায় কিনে নিয়েছেন। অত সস্তা নয়।

কি ভাবছেন? ডাঃ সোম বললেন।

না কিছু নয়।

আজ এই পর্যন্ত থাক।

উঠে পড়ল সীমা।

ডাঃ সোমের চেম্বার থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। [illegible]

আলোতে, কৌচের পেছনে অদৃশ্য থেকে কি সব আজে-বাজে প্রশ্ন করেন তিনি। তার মর্ম বোঝা সীমার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর দিতে গিয়ে যতই সামলে থাকার চেষ্টা করে ততই উল্টোপাল্টা জবাব দিয়ে ফেলে। এটা কেন হয় তারও কারণ সে ধরতে পারছে না। লোকটাকে জাদু বলে মনে হচ্ছে এবার। শুধু কৌশল জানে তা নয়, সম্ভবত হিপনোটিজম জাতীয় কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে। তা না হলে ও ধরনের দু-একটা তুচ্ছ কথা কি করে ছোটবেলার ঘটনাগুলোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। সে অবশ্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে সাজিয়ে-গুছিয়ে উত্তরগুলো দিতে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেটা বুঝতেও লোকটার দেরী হয় না। এতদিন সীমা অ্যানালিসিস এবং তার পদ্ধতি ও তার ফলাফলকে শুধু ব্যঙ্গ নয় উপেক্ষা করেছে। এবার কিন্তু তার মনের কোণে একটা আশঙ্কার উদ্রেক হচ্ছে বলে সে অনুভব করল।

সামনের ছোট রাস্তাটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল সীমা। মোড়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে খুশী হল সে। এ রাস্তায় ট্যাক্সি পেতে এর আগের দিন তাকে নাকাল হতে হয়েছে। নিউ মার্কেটের দিকে যেতে বলে সে গাড়ীতে হেলান দিয়ে বসল চোখ বন্ধ করে। অরুণ বসু তাকে বিয়ে করল কেন এ ভাবনাটা তাকে আর পীড়ন দেয় না। উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, লোকটা ভদ্র। তার কাছ থেকে কিই বা পেয়েছে অরুণ? অসুখ অবস্থায় তার ঘরে সে কিছুক্ষণ অবশ্য ছিল এবং হয়ত সেবাশুশ্রূষাও করেছে কিছুটা; কিন্তু তার বেশী কিছুই নয়। এমন কি মেয়েরা সাধারণত সংসারে যে সমস্ত কাজ করে থাকে তাও সে করে নি। কোন অবজ্ঞা বা বিতৃষ্ণার জন্য নয় একটা ক্রমবর্ধমান নিষ্ক্রিয়তা তার যেন মন আর শরীরকে অকেজো আর আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এটা সে ইদানীং বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছে। কেমন যেন হারিয়ে-যাওয়া ভাব জাগছে তার মনে। একটা শূন্যতা অনুভব করছে সে প্রত্যেক পদে-পদে। তার মনের দিক দিয়েও একটা পরিবর্তন আসছে বলে তার সন্দেহ হয়। না, অরুণকে সে ভাল-বেসে ফেলে নি। সেদিক দিয়ে হৃদয়াবেগকে সংযত করার মত কোন প্রয়োজন ঘটে নি এ পর্যন্ত। সে বন্নারকে ভালবাসে, এখনও তার ভালবাসা অটুট আছে। সীমার কাছে বন্নার চিরদিনই বন্ধু আর রক্ষক হয়ে থাকবে।

সৌম্য দত্তর কথা মনে পড়ল সীমার। তাকে যে সময় সৌম্য দত্ত অপমান করার চেষ্টা করেছিল সে সময় বন্নার হাতের কাছে থাকলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারত। অরুণ তার ঘরে ঢুকতে সাহস করে না একই কারণে বলে মনে হল সীমার। কথাটা ভেবে সে প্রচুর আনন্দ পেল। আর একটা বিষয়ে অশান্তিভোগ করছে সে আজকাল। সেটা [illegible]

তাদের সশ্রদ্ধ ব্যবহার। সকলেই তাকে সমীহ করে এটা আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সীমার পক্ষে এটা নতুন অভিজ্ঞতা, একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের মত। ইতিপূর্বে তার জীবনে এটা ঘটে নি। অরুণের বাড়ীতে সকলেই তাকিয়ে থাকে তার দিকে আদেশের অপেক্ষায়। সেখানে অরুণের চেয়ে তার সম্মান আর মূল্য অনেক বেশী। এতে একটা মোহ আছে, মাদকতার ছোঁয়াচ আছে; সেটা অনুভব করে সীমা শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বন্ধনের মধ্যে গিয়ে সে পড়ছে বলে বুঝতে পারছে। অদৃশ্য নাগপাশের মত সেটা তাকে গ্রাস করে ফেলবে বলেই তার বিশ্বাস। অরুণকে তার ভয় করে না। তবে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জেগে রয়েছে এখনও। সব পুরুষের মত অরুণেরও কর্তৃত্ব করার স্বভাব আছে এটা সে জানে। অসুখের সময় অরুণের ঘরে সে রাত্রে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছিল বলে তার মনে পড়ে। অরুণের পার্স বা চাবি তাকে প্রলোভিত করে নি কেন তার কারণটা এখনও পর্যন্ত তার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকছে। স্বচ্ছন্দে সে অরুণের যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত; সেইটেই তার কাছে স্বাভাবিক হত। কিন্তু সেই অদম্য নেশাটা যেন অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল তখন। দু-একবার কথাটা মনে হয়েছে হয়ত। তবে অদ্ভুত পরিস্থিতিটা তার কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আর নয়। এবারে সে পালিয়ে যাবে। না অরুণের কোন জিনিস সে চায় না। তার অ্যাটাচি কেসটা পেলেই যথেষ্ট। এখনও অরুণের জিনিসকে সে নিজের বলে ভাবতে পারছে না। অরুণকেও যেমন সে তার ওপর দখল প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট দেখেছে তারও তেমনি অরুণের ঐশ্বর্যের ওপর লোভ জন্মায় নি। গাড়ীটা থামতেই সীমা তাকিয়ে দেখল সে নিউ মার্কেটে পৌঁচেছে। আজ তার মনটা বেশ প্রফুল্ল রয়েছে। মনের গুমোট কেটে গিয়েছে কি কারণে তা সে নিজেই জানে না। ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে গেল মার্কেটের ভেতরে।

কাপড়-জামার ওপর তার বিশেষ লোভ নেই। শোকেসে উজ্জ্বল ঝকমকে শাড়ী-গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এ ধরনের কাপড় সে সম্প্রতি অনেক দেখেছে বিয়ে উপলক্ষ্যে। তার বিয়ে, একথাটা এখনও সে ভাবতে পারে না বা চায় না। বিয়েটা সে সাময়িক আশ্রয় বলে মেনে নিয়েছে মাত্র। এতে তার হাতও নেই, দায়িত্বও থাকার কথা নয়। মার্কেটে তার কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হবে। অ্যাটাচি কেস ছাড়া আর তার কিছুই নেই, সেই কারণে প্রথমে যে দিকে স্যুটকেসের স্টক আছে সেইদিকেই গেল।

গৃহত্যাগ করতে গেলে যে প্রস্তুতির দরকার সেদিকে নজর দিয়েছে সীমা। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সাধারণত সে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। তার ব্যবহার-করা জিনিস সে পারতপক্ষে ফেলে যেতে চায় না। কাপড়-জামা তার

বিশেষ শখের বিষয়। অন্য লোক তার পোষাক স্পর্শ করে এটা সে চায় না। তার কাছে এটা শালীনতার কথা নয়, সম্মানের ব্যাপার। তার অদৃশ্য হওয়ার পর অরুণ কি করবে সীমা তাই চিন্তা করছিল। সাধারণত অরুণ শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে রাগ হলে তার প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ধরনের হয়। এ অবস্থায় অসংযত আচরণ সে করে না। বরং আরও যেন ধীর, স্থির হয় অকস্মাৎ। তার মনের ভাবটা প্রকাশ করে না সে সহজে। সীমা এটা লক্ষ্য করেছে।

মোড় ঘুরতেই সীমা সৌম্য দত্তর সামনা-সামনি পড়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন? এগিয়ে এল সৌম্য।

স্যুটকেস কিনব একটা, বিরক্ত বোধ করে সীমা।

আসুন, আমার চেনা আছে একটা দোকান।

ব্যস্ত হবেন না, আমি নিজেই পারব।

তা পারবেন বৈকি। এটা আর এমন শক্ত কি? কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশনগুলো ফিরিয়ে দিলেন কেন, পছন্দ হয় নি? অন্ত-ভাবে তাকাল সৌম্য দত্ত।

প্রেজেন্টেশন আমি যার-তার কাছ থেকে নিই না।

একটু জোরে চলতে চেষ্টা করল সীমা।

ক্লাসি টাইপ, বুঝেছি। কিন্তু নিলে ক্ষতি হত না।

আপনি আমায় বিরক্ত করবেন না।

না করব না, কিন্তু কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন এতদিন? আমি ভেবেছিলাম হয়ত স্টীমারে আবার দেখতে পাব আপনাকে।

স্টীমারে!

হ্যাঁ, জেনে; আমরা একযোগেরই লোক এটা বুঝেছি।

সীমা একটা অসীম সাহসের কাজ করল। সৌম্য দত্তর গালে একটা প্রচণ্ড চড় মেরে বসল অকস্মাৎ।

সৌম্য দত্ত অবাক হয়ে গেল। এতটা আশা করে নি। জায়গাটায় ছোটখাট, একটা ভিড় জমে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। অনেক রকম সরস মন্তব্য শোনা গেল আশ-পাশ থেকে। কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সীমা। সে যে প্রকাশ্যে এ ধরনের দুঃসাহসের কাজ করতে পারে সে কথা ভাবতেই পারে না। তার জীবনে এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। এ সাহস সে পেল কোথায়? নিজেই বিস্মিত হল সীমা। মনটা তার চঞ্চল হয়ে উঠল। জায়গাটা থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে চুপ করে। মার্কেটে আসার কারণটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে সে। এতক্ষণে আবার তার স্মরণ হল স্যুট-কেসের কথাটা। একটা স্যুটকেস নিয়ে আবার যখন ফিরে গেল বাড়ীতে তখন অরুণ এসে গিয়েছে। হেমন্ত বা করুণা কাউকে না দেখতে পেয়ে সে নিজেই স্যুটকেসটা নিয়ে উপরে উঠল। সিঁড়ির পাশে স্টাডিরুম পেরিয়ে যাবার সময় সে অরুণকে টেলি-ফোনে কথা বলতে শুনল।

(ক্রমশ)

মহাকাশের মানুষ ও নতুন সমস্যা

দিলীপ বসু

এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে সুরু করে আজ যেমন এরোপ্লেনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত একেবারে যেন রোজানা ব্যাপার হয়ে গেছে, মহাকাশে রকেটে করে চাঁদে বা গ্রহান্তরে গমন নিশ্চয়ই একশ' বছর পর সেইরকমই হবে। উপস্থিত মহাকাশযানে চারবার আমেরিকানরা চাঁদে দুজন করে মানুষ পাঠিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন, খরচ পড়েছে অত্যন্ত বেশী, একবারে প্রায় আমাদের একটা পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সমান। কিন্তু ভবিষ্যতে এতো খরচ পড়বে না, কারণ আমরা যখন একই মহাকাশযান বা চন্দ্রগামী ব্যোমযান বার বার যাত্রীবাহী গাড়ী বা এরোপ্লেনের মতো ব্যবহার করতে শিখবো, তখনই আমাদের খরচ বহুলাংশে কমে যাবে। উপস্থিত চাঁদে পৃথিবীতে একবার যাতায়াত করেই চন্দ্রগামী ব্যোমযান বা মহাকাশযানের সব কিছু বরবাদ করতে হয় বলেই খরচ এতো বেশী।

অবশ্যই এরোপ্লেনে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত, আর মহাকাশে (বায়ুমণ্ডলের বাইরে) ব্যোমযানে যাতায়াত এক বস্তু নয়। পৃথিবীর জল, মাটি ও বাতাস—এ তিনের পরিবেশ আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অভীপ্ত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব কিছু কিছু সমস্যা থাকলেও, সেগুলি একেবারে আলাদা প্রতিকূল পরিবেশ নয়।

মহাকাশে কিন্তু অবস্থা তা' নয়। প্রথমত, বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্যে বাস করে আমরা যেমন আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে থাকি তেমনি বায়ুমণ্ডলের আবরণের বাইরে, মহাকাশে অক্সিজেনের অভাব ছাড়াও (সেটা মেটানো অপেক্ষাকৃত সহজ) নানারকম প্রাণঘাতী রশ্মি রয়েছে যার আঘাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসে সামনে চলা বা পুরো ঘুরিয়ে (১০০ ডিগ্রি) পেছনে ফিরে চলা, অথবা ইচ্ছা মতো বাঁয়ে বা ডাইনে পাশ ফেরা সহজেই করা সম্ভব। মোটর গাড়ীর ষ্টিয়ারিং চাকা, বা জাহাজের হাল বা এরোপ্লেনেরও হাল বা চাকা ইচ্ছা মতো (অবশ্যই খানিকটা হিসাব মতো) ঘোরালেই চলবে। মহাকাশে এটা কঠিন অসম্ভব। কারণ, মহাকাশে সব সময়েই আমাদের রকেটযুক্ত ব্যোমযান একটা-না-একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে চলেছে, যে কক্ষপথটির বৃত্তরেখা (মহাকাশে কোনো কিছুই সরলরেখা ধরে চলতে পারে না) পৃথিবীর বা চাঁদের বা সূর্যের বা অন্য গ্রহাদির মহাকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ধরা যাক, আমাদের ব্যোমযান পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবীর সমুদ্রতল থেকে ২০০ মাইল উচ্চে বা দূরে: তার উপর দুটো বল (ফোর্স) যুগপৎ কাজ করছে—এক, পৃথিবীর মহাকর্ষ (কেন্দ্রানুগ বল, যেন দড়ির টান একটি হাতের চার ধারে ঘূর্ণমান ঢিলের ওপরে), দুই, তার নিজস্ব গতিবেগ (কেন্দ্রাতিগ বল, দড়িটা ছেড়ে দিলে যেমন সেই মুহূর্তেই ঢিলটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে)। এই দুই বল-এর সমন্বয়ে ব্যোমযানটি একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এখন, ইচ্ছা করলেই এর ঘূর্ণনের গতিমুখকে ঘুরিয়ে উল্টো করা যায় না, (সেটা প্রায় অসম্ভব), এমন কি এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে তাকে চালনা বা স্থাপন করতে গেলেও বিশেষ শক্তি (energy) ব্যয় করতে হবে। এক কথায়, মহাকাশে ব্যোমযান নিজেই যেন আর একটি ছোট গ্রহ বা উপগ্রহের মতো খ-বর্তাবিদ্যার নিয়মাধীনে চলতে থাকে, যে খ-বর্তাবিদ্যার নিয়ম পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসের মধ্যে যাতায়াত করে এমন কোনো যানের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়ত, মহাকাশে ব্যোমযানকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নকল পৃথিবীর পরিবেশ (অক্সিজেন, আর্দ্রতা, ইত্যাদি) সৃষ্টি করে নিয়ে যেতে হয় এবং যেটি নষ্ট হয়ে গেলে বা কাজ না করলে ব্যোমযানের আরোহীদের মৃত্যু অবধারিত। এ সম্পর্কে বেশ কিছু বক্তব্য পরে আমরা পেশ করবো।

চতুর্থত, মহাকাশে ব্যোমযানের গতিবেগ এতো বেশী যে তার জন্য বিশেষ কিছু নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সেগুলি এবারে আলোচনা করা যাক। পৃথিবী প্রদক্ষিণরত ব্যোমযানের ন্যূনতম গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল, আবার পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে বা গ্রহান্তরে যেতে আরো বেশী, সেকেণ্ডে ৭ মাইল। কোনো কিছু ঘটলে একজন মানুষের তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হতে সময় লাগে ১।১০ থেকে ১/৫ সেকেণ্ড, অবশ্যই হাঁদা লোক হলে অনেক বেশী লাগবে, তবে মহাকাশচারীরা নিশ্চয়ই হাঁদা লোক হবেন না। আচ্ছা, ১/১০ সেকেণ্ডে আমাদের ব্যোমযান কিন্তু সরে যাচ্ছে ৫/১০ মাইল বা ৮৮০ গজ। অর্থাৎ বলা যেতে পারে একটা দ্রুতগামী ব্যোমযানের আরোহীদের সামনে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ গজ জায়গাটা হিসাবের মধ্যে ধরা চলবে না। আর এই হিসাব হলো খুব তাড়াতাড়ি প্রক্রিয়ার সময় সাবধান সম্পর্কে (যেমন সামনে সাপ দেখলে পা সরিয়ে নেওয়া গোছের আর কি!)। জেট-বিমানের পাইলট বা মহাকাশচারীরা যতো বুদ্ধিমান ও চালাক-চটপটেই হন না কেন, একটা বিশেষ ঘটনার সবকিছু বুঝে সেই অনুসারে কাজ করতে তাদের সময় লেগে যাচ্ছে (পরীক্ষা করা হয়েছে এ সম্পর্কে) ১½ থেকে ২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ, ততক্ষণে তাঁদের ব্যোমযান সরে গেছে ৭½ থেকে ১০ মাইল।

এই জন্যই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর না করলে দ্রুতগামী জেটবিমান (যা আজকাল দু' ঘণ্টায় কলকাতা-দিল্লী যাচ্ছে) বা মহাকাশযান চালানো সম্ভব নয়। তথাপি এটা বলাও দরকার যে, সব সময়েই যন্ত্রের অপেক্ষা যন্ত্রী বড়ো—যন্ত্র একটা বিশেষ কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে পারে বটে, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে যন্ত্রীরই।

একটি নকল পৃথিবী

ব্যোমযান যেখানে চলছে সেটা একেবারে বায়ুশূন্য মহাকাশ। যাত্রার সুরুতে এবং অন্তে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ব্যোমযানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে (বা আকাশে) যাতায়াত করে। পৃথিবীতে যেমন বাস করতেন মহাকাশযাত্রীরা তেমনভাবে করতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, জল, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার শরীর থেকে নিঃসৃত দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (নিশ্বাসের সঙ্গে), মলমূত্র, গায়ের ঘাম প্রভৃতি সবই বার করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারা পৃথিবী জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চালু আছে, আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছপালা বা উদ্ভিদরা গ্রহণ করে, সূর্যালোকের সাহায্যে সংশ্লেষ করে তাকে আবার অক্সিজেনরূপে ফেরত দেয়। প্রক্রিয়াটির নাম সালোক-সংশ্লেষ বা ফটো-সিনথেসিস। একটু ভেবে দেখলেই হয় যে, পৃথিবী গ্রহের বাসিন্দা আমরা ৩০০ কোটি মানুষ প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে নিশ্বাসের দ্বারা কার্বন ডাই অক্সাইডরূপে নির্গত করি, তাকে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে আবার অক্সিজেন রূপে ফেরত না পেলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। প্রসঙ্গত, পৃথিবীর জন্মের সুদূর অতীতে (৪৫০ কোটি বছর অতীতে) বহু কোটি বছর অবধি তার বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না, আমাদের আজকার শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন প্রায় সবটাই এসেছে সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে।

তেমনি আমরা খাদ্য গ্রহণ করে তাকে আবার নাইট্রোজেনরূপে নিষ্কাশন করি, যে নাইট্রোজেন আবার পৃথিবীর জমিতে মিশে সারের কাজ করে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে। পৃথিবীর জলরাশি বাষ্প হয়ে আকাশে

উঠে আবার বৃষ্টির জলের আকারে নেমে আসে। এইভাবে যে অক্সিজেন-কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্র বা নাইট্রোজেন চক্র তৈয়ারী হয়েছে, তাকে আমরা বলে থাকি "বাস্তব্য চক্র" (ecological circuit) এক কথায়, আমরা সহজেই ভেবে নিতে পারি যে, বাস্তব্য-চক্র দিয়ে সৃষ্টি আমাদের গোটা পৃথিবীটাই (অবশ্যই আমরা তার মাটি, জল, বাতাস, সব কিছুই বোঝাচ্ছি) যেন একটি অতিকায় ব্যোমযান বা স্পেসসীপ, যার বাসিন্দা আমরা ৩০০ কোটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী মহাকাশে সতত্ই ভ্রাম্যমান—সূর্য-প্রদক্ষিণ করছি, করতে করতে আমাদের তারা-জগত বা গ্যালাক্সির অন্যান্য বহু কোটি নক্ষত্রের সংগে বিরাট চাকার মতন (যার ব্যাস এক লক্ষ আলো-বর্ষ) পাক খাচ্ছি।

যাই হোক, পৃথিবী যেমন একটি অতিকায় ব্যোমযান, যেখানে নানা রকমের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব্য-চক্র রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর বাইরের মহাকাশে যখন আমাদের মনুষ্যনির্মিত ক্ষুদ্র ব্যোমযানগুলি চলাফেরা করবে বা ভেসে বেড়াবে, তখন তাদেরও যতোটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব্য-চক্র তৈরী করে দিতে হবে।

অবশ্যই প্রথম গাগারিন যখন মাত্র দুই ঘণ্টার সামান্য কম সময় মহাকাশে কাটিয়ে ধরার বুকে ফিরে এসেছিলেন, তখন হয়তো তাঁর না খেলেও চলতো, মলমূত্র নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও হয়তো না করলেই চলতো, অক্সিজেন প্রয়োজন মতো তাঁর 'ভোস্টক' মহাকাশযানে পুরে দিয়। কারবন ডাই-অক্সাইডকে বার করে দেবার একটা সাধারণ ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। কিন্তু গাগারিনের সময় থেকেই (১২ই এপ্রিল, ১৯৬১) বাস্তব্য-চক্রের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছিল। গাগারিনের পরেই আগস্ট মাসে (১৯৬১) টিটভ কাটালেন ১৭ ঘণ্টা, তারপর পরে পরে অনেকেই রাশিয়ান ও আমেরিকান, সপ্তাহাধিক এবং সম্প্রতি তিনজন সোভিয়েত মহাকাশচারী প্রায় এক মাস সময় কাটিয়েছেন। এই তিনজন অবশ্য মারা গেছেন, তবে বাস্তব্য-চক্রের কোনো গোলযোগে নয়।

এপোলো-১১, ১২, ১৪ ও ১৫-তে যে তিনজন করে আমেরিকান চাঁদে যাত্রা করেছিলেন, যার মধ্যে প্রত্যেকবারই দুজন করে চাঁদে নেমেছিলেন, তাঁরা মহাকাশযানে সময় কাটিয়েছেন মোটামুটি দশ দিন বা ২৪০ ঘণ্টা করে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেমন চাঁদে পৌছে, কিছুদিন বাস করার প্রয়োজন হতে পারে (এবং চাঁদে জল, অক্সিজেন খাদ্য, প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যাবে না) তেমনি গ্রহান্তরে যাত্রা করতে হলে, (যেমন মঙ্গলগ্রহ) যেতে আসতে এবং সেখানে থাকতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই বছর। বা ৩৬৫×২৪×২½ =২১,৯০০ ঘণ্টা।

এখন, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় মাথাপিছু আমরা খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য কাজে ৪ লিটার ওজনের মতন ব্যবহার করি, এবং অক্সিজেন গ্রহণ করি প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনের। মূত্র হিসাবে জল নিষ্কাশিত হয় প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক লিটারের সামান্য বেশী এবং কারবন ডাই-অক্সাইড সোয়া-এক কিলোগ্রাম ওজনের মতন। সমস্যা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এমন একটি বাস্তব্য-চক্র তৈরী করতে হবে, যাতে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে, যার কিছু কিছু আমরা এখানে পেশ করবো।

ক্লরেলা নামে এক ধরনের এলজি বা শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে অক্সিজেনরূপে ফেরত দেয়। অবশ্য এর জন্য সূর্যালোক দরকার, কিন্তু মহাকাশে রয়েছে অফুরন্ত সূর্যালোক, সূর্যের কোনো উদয়াস্ত নেই। ক্লরেলার চাষ করার জন্য প্রয়োজন নাইট্রোজেনের, যেটা অবশ্য আমাদের শরীর থেকে নির্গত হবে। জলের প্রয়োজনটা ডিস্টিল করার বা জলকে পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় মেটানো হতে পারে। উত্তাপের সমতা রক্ষা করার জন্য এয়ারকন্ডিশনিং শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ (air-conditioning) ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্যই এ ধরনের অনেক কাজের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ-শক্তির, যেটা সূর্যালোক থেকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সাহায্যে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চাঁদের বুকে সোভিয়েতের তৈরী যে স্বয়ংক্রিয় ক্যাটারপিলারের মতন ছোট্ট যান চলাফেরা করেছিল, তারও চালনা-শক্তি ছিল সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি।

তারপর, অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত অবস্থায় বা সাধারণভাবে ব্যোমযানটি এবং তার অভ্যন্তরস্থিত সব বস্তুরই ওজন থাকবে না। কেন?

ওজনবিহীনতা

একটা অত্যন্ত ভ্রান্ত চলতি ধারণা আছে যে, ব্যোমযানটি পৃথিবীর মহাকর্ষের আওতার বাইরে বলে, যেন মহাকর্ষ শূন্য স্থানে রয়েছে বলে তার ওজন থাকছে না। আসলে ইংরাজীতে 'ওজনবিহীনতা'কে বলা হয় 'Zero-g' কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ব্যোমযান কোনো 'মহাকর্ষ-শূন্য' স্থানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, সূর্যের প্রচণ্ড মহাকর্ষের আওতাতেই সকল গ্রহাদি রয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে পৌঁছলেও সূর্যের মহাকর্ষের অধীনে থাকতে হবে। আর ব্যোমযান যখন সমুদ্রতল থেকে মাত্র ১০০।২০০ মাইল বা তদূর্ধ্বে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তখনও পৃথিবীর মহাকর্ষের পুরো প্রভাবেই সে রয়েছে। তাহলে ওজন থাকছে না কেন?

আসলটা হচ্ছে, যে বল (ফোর্স) দিয়ে পৃথিবী আমাদের তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধী বল, সেইটে। এই প্রতিরোধী বল যদি বেড়ে যায়, তাহলে ওজন বৃদ্ধি হবে, আর কমে গেলে বা কোনো কারণে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন না হলে, ওজন লোপাট পাবে। কি রকম?

মহাকাশযানের রকেট-মোটর যখন প্রথম অবস্থায় চালিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বা মহাকর্ষের টানকে কাটাতে কাটাতে মহাকাশযানকে উপর আকাশে তোলা হচ্ছে, তখন মাধ্যাকর্ষণের টানকে ঠিক সমান সমান প্রতিরোধ করলে (এক-জি বলা হয়) মহাকাশযানটি উঠবেও না নামবেও না, দুই-জি বা দ্বিগুণ জোরে প্রতিরোধ করলে মহাকাশযানটি উপর আকাশে উঠতে আরম্ভ করবে, ভেতরের আরোহীদের ওজন বেড়ে দ্বিগুণ দাঁড়াবে, রকেট মোটর তিন-জি হলে (প্রতিরোধী বলের হিসাব) ওজন বেড়ে তিন গুণ হবে ইত্যাদি। আর তারপর রকেট-মোটরটি যখন বন্ধ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিরোধ যখন করা আর হবে না, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ওজন চলে যাবে। অবশ্যই রকেট মোটরটি বন্ধ করলেই মহাকাশযান কিন্তু তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর জমির দিকে পড়ে যাবে না, জাড্যের টানে উপর-আকাশে উঠতেই থাকবে, কিন্তু ওজন থাকবে না।

তেমনি যদি উঁচু জায়গা থেকে অবাধে জমির দিকে পতন হয়, তাহলেও ওজন থাকে না, কারণ এক্ষেত্রেও আমরা মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধ করছি না।

ওজনবিহীন অবস্থায় মানুষের দেহ তথা মন কিভাবে কাজ করবে এ নিয়ে পূর্বে বহু জল্পনা-কল্পনা ও খানিকটা আন্দাজ ছিল, এখন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

মহাকাশে জল বা পানীয় গেলাস থেকে ঢেলে পান করায় নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে, সেজন্য ফিডিং বোতলের মতো চুষে বা পাইপ দিয়ে খেতে হবে। খাদ্য গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে এই ভেবে গাগারিনের প্রথম মহাকাশযাত্রাতে তাঁকে টিউবে করে টুথপেস্টের মতো খাদ্য দেওয়া হয়: টিটভের ১৭ ঘণ্টা ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণেও একই ব্যবস্থা ছিল। পরে অবশ্য অন্যদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্যই দেওয়া হয়েছিল, অবশ্যই তাদের শরীরের প্রয়োজনানুসারে ক্যালরির মেপে খাবার দেওয়া হয়েছিল।

"শারদীয় আলো"

সম্পাদিকা — আয়েষা আরা আলি

বর্তমান কালিন্দ্র সমাজের পটভূমিকায় রচিত 'আলো'। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখায়, রুচিপূর্ণ শারদ সংখ্যা প্রকাশ হ'ল। সত্বর যোগাযোগ করুন। ডাকেও সুলভ, মাত্র ২ টাকা।

আলো সাহিত্য পত্রিকা : ২০, রিপন লেন, কলিকাতা—১৬

মহাকাশে বমির উদ্রেক হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে তা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আসলে ওজনবিহীন অবস্থায় আমাদের কানের 'অটোলিথ' যন্ত্রগুলি (কানের পাথর বলা যেতে পারে) কাজ করবে না ঠিকই, অতএব উপর-নীচ জ্ঞান গোলমাল হয়ে যাবে এই রকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল। তার প্রতি-বেধক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

মহাকাশে ভ্রাম্যমান অবস্থায় দরুন নিঃসঙ্গতাবোধের যে ভয় ছিল, কার্যক্ষেত্রে পৃথিবীর গ্রাউণ্ড স্টেশনের সঙ্গে অবিরাম রেডিও যোগাযোগ এবং সঙ্গীতের সাহায্যে এটা দূর করা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষা করে একথা আজ জোর করেই বলা যায় যে, আমাদের দেহের স্নায়ুর (নার্ভের) উপর অত্যধিক চাপ পড়লে সঙ্গীতের চেয়ে ভালো আর কিছু ওষুধ নেই।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের দেহযন্ত্র যদিও খুবই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে বাঁধা, তথাপি তাকে বিভিন্ন এবং একেবারে ভিন্ন পরিবেশে (ওজনবিহীনতা, ইত্যাদি) খাপ খাইয়ে খাতস্থ করে নেওয়া কিছু শক্ত নয়।

নতুন যুগের নতুন মানুষ নতুন পরিবেশে প্রকৃতিকে জয় করতে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে চিরকাল এগিয়ে যাবে।

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

সমাজসেবা : আর এক ভূমিকা

চিত্রা রায়

হাসপাতাল মানে ডাক্তার আর নার্স। এর বাইরে আর কিছু নেই। দীর্ঘদিনের সংস্কারে এরকম ভাবনাতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কালের ভারে সংস্কারের পলেস্তারা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন সেখানে শুরু হয়েছে নতুন চুনকাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যাসও বদলাচ্ছে। এতদিন হাসপাতাল সম্বন্ধে ভীষণভাবে ভীত ছিলাম আমরা। প্রাণ ধরে কাউকে সেখানে পাঠাতে পারতাম না। কি জানি যদি আর ফিরে না আসে।

এমনি ছিল হাসপাতাল-ভীতি আর সংস্কার। দিনে দিনে সব কিছুই বদল হচ্ছে। হাসপাতাল সম্বন্ধে এই সংস্কারও ফিকে হচ্ছে। এখন হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেকেই আগ্রহী। সবাই বুঝতে শিখেছেন যে বাড়িতে রেখে রোগীর ঠিকমত পরিচর্যা সম্ভব নয়। সেখানে ডাক্তার-নার্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান রোগীর নিরাময়ের প্রচণ্ড সহায়ক। আর দিনে দিনে যা সব রোগ বেড়েছে তাতে রোগীকে বাড়িতে ভরসা করে রাখতেও সাহস হয় না। ফলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, হাসপাতালে রোগী আর ধরছে না। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে অনেকদিন ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হচ্ছে। অবস্থাটা ঠিক সেই-রকম যখন কলকাতায় প্রথম ইংরেজী স্কুল চালু হলো তখন ছাত্র জুটতো না। ছাত্র জোগাড় করা ছিল এক সমস্যা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র ধরে আনতে হতো। সেদিনের সংস্কার ছিল যে, ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়লে ছেলে-পুলে উচ্ছন্নে যাবে। যখন দেখা গেল যে যারা উচ্ছন্নে যাবার তারা বাদে আর সবাই জীবনে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তখন স্কুলে যাবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আর এখন তো স্কুলে সীট পাওয়াই দুষ্কর। কোন কোন স্কুলে বছর দুয়েক ওয়েটিং লিস্টে থাকার পর হয়তো চান্স মেলে।

স্কুলের কথা আপাতত থাক। আবার হাসপাতালের কথায় আসা যাক। হাসপাতাল সম্বন্ধে আমাদের এই যে মনোভাব বদলে গেল এটা কিন্তু রাতারাতি সম্ভব হয়নি। বরং এখনো কেউ কেউ হাসপাতালের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচেন। তবু হাসপাতাল সম্পর্কে পূর্বের সেই ভীতির মনোভাব কমছে। এর আসল কারণ অবশ্যই যে, হাসপাতালে রোগীর সুষ্ঠু পরিচর্যা। এবং এই কৃতিত্ব পুরোপুরি পাওনা হচ্ছে ডাক্তার আর নার্সদের। এটা বাস্তব সত্য হলেও এই কৃতিত্বের এখন আরো কিছু অংশীদার এসে গেছে। আর হাস-পাতালের পরিবেশকে ভীতিমুক্ত করতে এঁদের অবদান অনেকখানি। রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে এঁরা হলেন যোগসূত্রস্বরূপ। সরাসরি ডাক্তার-নার্সের সংস্পর্শে না এসে এমনিভাবে একজনের সাহায্য পাওয়া যায় যিনি ডাক্তার নন। এটা সাধারণ রোগীর পক্ষের অনেকখানি ভরসার। হাসপাতালের এই পরিবেশই এখন রোগীকে টানছে। আর একাজে যিনি সাহায্য করছেন তিনি হলেন সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার।

সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার। সাদা বাংলায় সমাজসেবী। সমাজ যেমন বিস্তৃত তার সেবার পরিধিও তেমনি। তাই সমাজসেবীর ডাক পড়েছে এবার হাস-পাতালে—ইমার্জেন্সী এবং আউটডোরে। রোগী প্রথমে আসবে এই সমাজসেবীর কাছে। তিনি রোগ এবং রোগী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হয়ে একটি পূর্ণ বিবরণ তৈরী করবেন। তারপর তা পাঠাবেন ডাক্তারের কাছে। এবার শুরু হবে ডাক্তারের কাজ। ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করবেন। ওষুধপত্র দেবেন। কিন্তু ওষুধপত্র সম্বন্ধেও সমাজসেবীর দায়িত্ব আছে। রোগী যাতে ঠিকমত ওষুধপত্র ব্যবহার করে সেজন্য রোগীর সঙ্গে সবসময় তাঁকে নিবিড় যোগ-সূত্র বজায় রাখতে হয়। রোগী নিজের রোগ যতটা বোঝে এই সমাজসেবীকে তা আরো ভাল করে বুঝিয়েশুঝিয়ে নিতে হয়। যাতে রোগী ভীত না হয়ে নিজের রোগের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সমাজ ও নিজের জন্য ওষুধপত্র ঠিকমত খেয়ে রোগটা সারিয়ে নেয়।

এই কাজই করতে হয় শ্রীমতী চিত্রা রায়কে। নীলরতন সরকার হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে বসে তাঁকে এমনিভাবে সাহায্য করতে হয় রোগীকে। রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কর্মতৎপর হয়ে উঠতে হয়। রোগীর বিশদ বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেন। তারপর ডাক্তারের কাছে পাঠান। একে তো ইমার্জেন্সী। এখানে আর রোগীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিমুক্ত করতে হয় টেবিলে। টেবিল থেকে প্রয়োজনবোধে বেডে। শ্রীমতী রায়কেও চলতে হয় রোগীর সঙ্গে সঙ্গে। সব কথা যে তাঁর জানা চাই। নইলে যেমন তাঁর কাজ হবে না, তেমনি চিকিৎসারও ত্রুটি হতে পারে। আর রোগী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জিনিষটা রেডিমেড হাতের কাছে পেলে ডাক্তারের সুবিধা অনেকখানি। পাক্কা ছ' ঘণ্টা ডিউটির মধ্যে তাঁকে এমনিভাবে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীমতী রায় কিন্তু এতে একটুও ক্লান্ত নন। সমাজসেবার নেশা তাঁর রক্তে। সায়েন্স গ্রাজুয়েট হওয়ার পরই তিনি ভলান্টারি সোসালওয়ার্কার হিসেবে যোগদান করেন সোসাইটি ফর দি প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ইন ইণ্ডিয়া নামক সুবিখ্যাত সংস্থায়। প্রায় ছ' বছর তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি হাতেকলমে সমাজসেবার পাঠ নেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। পুরোদস্তুর সমাজসেবী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ভর্তি হন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোসাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিসনেস ম্যানেজমেন্টে। এখানে ভর্তি হওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সমাজসেবার তকমা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউ দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। অবশ্যই সেদিক থেকে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর দু' বছরের কোর্স।

অবশ্য এক বছরের কোর্সও আছে। কিন্তু তিনি সেদিকে গেলেন না। দু' বছরের সমাজসেবার লম্বা কোর্সই তাঁকে টানলো। আর সমাজসেবা করতে এসে এক বছরের জেনারেল সোসাল ওয়েলফেয়ারের তুলনায় দু' বছরের অ্যাডভান্স জেনারেল সোসাল ওয়েলফেয়ার-এর ডিপ্লোমা নিঃসন্দেহে বরণীয়। আবার দুটোই যখন পোস্ট গ্রাজু-য়েট ডিপ্লোমা। বলা বাহুল্য, দু' বছর বাদে তিনি অ্যাডভান্স কোর্সে সমাজসেবীর ডিপ্লোমা পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি একটু দুঃখিত যে, এই ডিপ্লোমা যদিও পোস্ট গ্রাজুয়েট কিন্তু এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি নেই। এত খেটেখুটে যে ডিপ্লোমা পাওয়া গেল তাতে যেন একটু ফাঁক রয়ে গেল। এই ডিপ্লোমায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদন থাকলে সবদিক থেকেই সুবিধা হয়।

ফটো : আর এন সিংহ

ডিপ্লোমা পাওয়ার পরই শ্রীমতী রায় চাকরি পেয়ে গেলেন। এবং এই চাকরি। সেদিন থেকে তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এরপর থেকে শ্রীমতী রায়ের জবানীতেই শোনা যাক সমাজসেবায় তাঁর এবং সগোত্রদের ভূমিকার কথা। রোগী আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাজ শুরু হয়ে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জানতে হয় রোগীর কাছ থেকে। পুরো বিবরণ ডাক্তারকে পাঠাতে হয়। নীলরতন সরকার হাসপাতালে ইমার্জেন্সীতে আছেন আমার আর একজন সহকর্মী। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত দুজনে ভাগ করে ডিউটি দিই। ডিউটির সময় খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু কোন সময়ই একটুও ক্লান্তি অনুভব করি না। রোগীর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে সমাজসেবায় যে মহৎ ভূমিকা পালন করা যায় এমনটি আর কোথাও সম্ভব কিনা জানি না।

কলকাতা এবং সব জেলা হাসপাতালেই এখন সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার আছেন। যাঁরা আউটডোরে কাজ করেন তাঁদের একদিক থেকে একটু সুবিধা হলেও আরেকদিক থেকে একটু বেশি খাটতে হয়। আউটডোরের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু রোগীকে এঁরা হোম ভিজিট করেন। কথাটা শুনে চমকে উঠবেন না। হয়তো ভাবছেন যে, এঁরা ডাক্তার নয় অথচ রোগীকে হোম ভিজিট করে কি করে? গোড়াতেই বলেছি যে রোগ এবং রোগীকে আমাদের জানতে হয় চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য। আর তাই এই হোম ভিজিট। রোগীর বাড়ীতে গিয়ে সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার একটা পূর্ণ বিবরণ আমরা ডাক্তারদের দিই। সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকটা দেখার সুযোগ হয়। বুঝতেই তো পারেন, সব রোগীকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য যাতে চিকিৎসার ত্রুটি না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আবার কোন কোন রোগী একটু সুস্থ হলেই ওষুধপত্র খাওয়া বন্ধ করে বসে থাকে। হোম ভিজিটের আর একটা উদ্দেশ্য হলো যাতে রোগী এই অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২০৫৯।

একটু মুশকিলে পড়তে হয় যখন সন্তানসম্ভবা কোন অবিবাহিতা মেয়ে হাসপাতালের শরণ নেয়। তখন আমাদের কাজও বেশ বেড়ে যায়। সব ডেলিশুনে নিতে হয় মেয়েটির কাছ থেকে। সে কি আর সব কথা সহজে বলতে চায়। গল্প করে আর নানারকমভাবে ভুলিয়ে সব কথা তার কাছ থেকে আদায় করা হয়। এরপর চেষ্টা করা হয় সেই ছেলেটিকে ধরার। যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। কাজটা যে খুব সহজ নয় সে তো বুঝতেই পারছেন। কিন্তু এই অসহজ কাজটাকে সহজ করার জন্য আমাদের খুব চেষ্টা করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্র আমরা সফল হই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নয়। তখন আমাদের ভাবনা বাচ্চাটার জন্যে। অনেক মা-ই বাচ্চা নিতে চায় না। সে বাচ্চার ব্যবস্থা করতে হয়। কোন অনাথ আশ্রমে তাকে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে ডাক্তাররাও সাহায্য করেন। তবু আমরা যে এত খাটাখাটনি করি ডাক্তাররা ঠিক যেন সেটা উপলব্ধি করতে পারেন না। কৃতিত্বের সিংহভাগটাই ওঁরা দাবী করে বসেন।

এতো গেল আমাদের হাসপাতালের কাজ। এবং হাসপাতাল সংক্রান্ত। এর বাইরেও আমাদের কাজ আছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেখানে আর আমরা সোসাল ওয়েলফেয়ার অরগানাইজার নই। একসটেনসন এডুকেটর হিসাবে সেখানে আমরা পরিচিত। পরিকল্পনার সুফল এবং প্রয়োজনীয়তা সকলের কাছে আমরা বিশদ ব্যাখ্যা করি। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা আমরা শুনি। সব শুনে সেরকম ব্যবস্থা নিই। এখানে বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আমাদের আছে। তবে কিছুর ঘোরাঘুরি করতে হয়। তবু সমাজসেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এতো কম আনন্দের কথা নয়।

হাসপাতালের আউটডোর-ইমার্জেন্সী এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের সংখ্যা প্রায় বারলো। চাকরি আমাদের ভালই লাগে। কিন্তু একটা অসুবিধা কি জানেন, ছুটিছাটা একদম নেই। এমন কি ছুটির দিন কাজ করলে তার বদলে কোন ছুটি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইমার্জেন্সীতে এই অসুবিধা আরো বেশি। তারপর ডাক্তারদের অবহেলা ভীষণ খারাপ লাগে। অবশ্য সবাই সমান নন। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। আর আমার স্বামীই তো ডাক্তার। তিনি কাউকে কোন দিন আণ্ডার এস্টিমেট করেন বলে শুনি নি।' এবার শ্রীমতী রায় ফিরে এলেন নিজের কথায়। চাকরি করি ঠিকই এবং চাকরিতে অনেক সময়ও যায়। কিন্তু দুবছরে মেয়ের জন্য সারাক্ষণ মন চঞ্চল থাকে। কাজ করতে করতে একটু অবসর পেলেই মেয়ের মুখটা মনে ছায়া ফেলে। ও যেন কাতর নয়নে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরার জন্য মন অস্থির হয়ে যায়। আর একদণ্ড কাজ করতে ভালো লাগে না। রোগীর রেজিস্টার মুহূর্তের জন্য ওপাশে রাখি। মেয়ে আর একটু বড় হয়ে গেলে এ ভাবনা শুধু আমার আর থাকবে না। এ ভাবনা শুধু আমার একারই নয়। সব চাকরিজীবী মায়েরই এক ভাবনা। চাকরি করতে এসে এ ভাবনা থেকে কোন মা-ই রেহাই পাবে না।

শ্রীমতী রায় নিজের কথা শেষ করলেন। ঠিক নিজের কথা নয়। ওঁদের সকলের কথা। কোন সময়ই তিনি নিজের জীবিকাকে শুধু একার মধ্যে আটকে রাখেন নি। সবাইকে সমান অংশ দিয়েছেন, পরিশেষে নিজেকে যুক্ত করেছেন চাকরিজীবী সব মায়েদের সঙ্গে। এবং বলেছেন, আমার তো তবু একটু সুবিধা আছে। কিন্তু আর সব মায়েদের তো সারাদিনই প্রায় বাচ্চাকে ছেড়ে থাকতে হয়। এ কি প্রচণ্ড পানিশমেন্ট বলুন তো?

সত্যিই তো এই ভাবনা থেকে চাকরিজীবী মায়েরা কবে রেহাই পাবেন?

—প্রমীলা

CENTRAL LIBRARY

অবিস্মরণীয় কাল

অসীম রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পর্ব

জল ফুঁসছে, জল ফুলছে, বাদামি জল আছড়াচ্ছে দুই পাড়ে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে কখনও জল আদিগন্ত রুপোলী ইলিশ, আবার ঘন মেঘের ছায়ায় তার থমথমে সমাহিত বিস্তার। স্টিমার যখন চলে তখন ইঞ্জিনের ধক-ধকিতে পারের আওয়াজ কানে পৌঁছয় না, কিন্তু গন্তে পৌঁছনোর আগে যখন ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভাঙ্গার শব্দ আসে। আর বাদামি জলে কমলালেবু রংয়ের পাল তুলে বড় বড় নৌকো আসে, বাতাসে বাতাসে মট্ মট্ করে মাস্তুলের জোড়। স্টিমারে পাক খাওয়া ঢেউ নাচায় নৌকোগুলো, জলের ওপর কখনও কখনও সাদা কালো তালিমারা আবার কখনও অক্ষত রোদ-বৃষ্টি লাগা ফ্যাকাসে গৈরিক পালগুলো ওঠে নামে।

'জলের একটা গন্ধ আছে, নাবে?' দোতলার ডেকে রেলিংএর ওপর ঝুঁকে চোঙা বলে।

টুটুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্টীমারের বিশাল প্যাডেলের দিকে। কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে পড়ে তাদের মুখে চোখে।

'নালা যেন দুধ জ্বাল দিচ্ছে, হাতায় করে দুধ উঠছে আর নামছে, উঠছে আর নামছে!' বুড়ী বললে।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ডুবে গেল।' চোঙা চেঁচিয়ে উঠল। এপার ওপার দেখা যায় না নদীর মাঝখান দিয়ে ডিঙি বাইছে দশ-বারো বছরের ছেলেটা স্টিমার কাছে আসতেই ঢেউয়ের উথালপাথালিতে মনে হচ্ছে এই ডুবে গেল। বিশাল ঢেউয়ের নীচে ডিঙি সমেত ছেলেটা এই অদৃশ্য হচ্ছে, এই ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দোতলার ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ছেলেটাকে। কালো ভেজা গা ঝলকাচ্ছে রোদ্দুরে, ঠিক যন্ত্রের মতো ক্ষিপ্র গতিতে বৈঠা উঠছে নামছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই, সামনের অতিকায় গর্জমান ঢেউয়ের বুদবুদগুলো ভ্রূক্ষেপ না করে সে বৈঠা বেয়ে চলেছে। স্টিমার অনেক দূর চলে গেলেও বিশাল জলরাশির ওপর কালো বিন্দুর মতো সে নড়ে।

এবার একটা গঞ্জ আসছে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই পাড় থেকে ঝুপ ঝুপ শব্দ বেশ স্পষ্ট। ভাসমান ফ্ল্যাটের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে পাটের গাঁইট, গুড়ের নাগরীর পাহাড়। সবুজ নীল চকরাবকরা লুঙ্গির উপর জালি-কাটা গেঞ্জী পরে দু-তিনটে লোক কাছি হাতে দাঁড়িয়ে, জাহাজ আসতেই কাছি ছুড়ে দিয়ে বাঁশের লম্বা পোল দিয়ে ফ্ল্যাটের পা ঠেকা দিয়ে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের এক পাশে চুনকাটার সেলুন। সাদা বোর্ডের ওপর বড় বড় লাল হরফে লেখা : প্রফেসর রমণীমোহন কর্মকার। দুটো সরু লম্বা পাটাতন ফেলে দিতেই হুড়দাড় করে নীচতলার লোক ওঠে। ডগডগে লাল, সবুজ আর নীল শাড়ির প্রাধান্য বেশী। বেশীর ভাগেরই কাঁখে ছেলে, হাতে ছেলের হাত। সরু তক্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পরস্পরের সঙ্গে চীৎকার করে গল্প করতে করতে সামনের লোককে ডাক দিতে দিতে তারা নীচ তলায় ওঠে। অনেকের হাতে লাউ। কয়েকটা ছেলে আখ্ চিবোতে চিবোতে স্টিমারে ওঠে। পাকা কলা আর গুড়ের চাপা গন্ধে সমস্ত গঞ্জ এলাকা ভুর ভুর করে।

এতক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে যে লোকটা তার গলা প্রচুর সাবানের ফেনায় সাদা করে বসেছিল তার দাড়ি কাটা হয়। স্টিমারের ঘন্টা দেয়। লোকটা চেয়ার থেকে আড়মোড়া ভাঙতে ভাংতে হঠাৎ দৌড় মারে। তারপর শূন্যে লাফ মেরে অপসৃয়মান পাটাতনে উঠে প্রচুর গালাগাল দিতে দিতে ও খেতে খেতে জাহাজে ওঠে।

'আমাদের জাহাজের নাম কি বলতো?' চোঙা জিজ্ঞেস করে ধাঁধার প্রশ্নের মতো।

রেলিংয়ের ওপরে একটু ঝুঁকে টুটুল পড়ে পাশ থেকে, 'কে-যাই-ডব্লিউ-যাই।'

'পারলি না, কিউই, কিউই। মানে কি বলতো?'

'একটা পাখি, আমি দেখেছি, বাবার জুতোর কালির ঢাকনিতে। কিউই ব্রান্ড কালি।'

'আমি চিড়িয়াখানায় দেখেছি।'

টুটুল যদিও বাবার জুতোর কালির ঢাকনায় পাখিটার ছবি দেখেছে কিন্তু সেই পাখির সঙ্গে এই সুন্দর ভাসমান অবলীলা-ক্রমে জল কেটে যাওয়া জাহাজটার সাদৃশ্য খুঁজে পায় না। বরঞ্চ 'সোয়ান' রাখলে পারত। 'সোয়ান' মানে রাজহাঁস, সম্প্রতি সে, জেনেছে। একটু পর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার চূর্ণী নদীটাই ভাল ছিল।'

বুড়ী ও চোঙা সশব্দে হেসে ওঠে। 'চূর্ণী নদীতো একটা নালা রে' বুড়ী বললে।

বিশাল ঢেউ আর ফেনা সর্বাঙ্গে মাখছে প্যাডেল-স্টিমারের অগ্রভাগের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে টুটুল বলে, 'আমার ছোট নদীই ভাল লাগে।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিমার ভোঁ দেয়। আর আদিগন্ত বিস্তৃত নদীর মাঝখানে সেই গম্ভীর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে তার ছোট হৃদয়ে। এ আর এক জগত, জলের জগত, মাঝ নদীতে ডিঙি বাওয়া মাঝির জগত, গঞ্জে গঞ্জে প্রাণচাঞ্চল্যের জগত, নৌকোর হালে সাদা-দাড়ি মাল্লার স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার জগত—এ জগত রাণাঘাটের ছোট ছায়ায় ঘেরা একতি ও কোয়ার্টারের দ্বীপ থেকে আলাদা। টুটুল বুক ভরে বাতাসে জলের গন্ধের সঙ্গে এই নবীন জগতের আঘ্রাণ নেয়। নিজের মনেই বলে, 'এত জল, আমার ভয় করে।'

'তোর ভয় করে, আমার ভাল লাগে। আমার বিশ্ব ভাল লাগে।' চোঙা বললে।

এবার যে গঞ্জটা আসছে তা আগের চেয়েও বড়। কাদায় বাঁশপোতা ভিতের ওপর নদীর দিকে পেছন করে সার সার টিনের ঘর। তাদের একটায় মস্ত বড় করে সাইন বোর্ড 'গ্রান্ড হোটেল।' কাছেই ফ্ল্যাট, তার গায়েই আর এক হোটেল। মাংসের ঝোলের গন্ধ মিশে থাকে নদীর তীরে পলি-মাটির গন্ধে।

ডেক চেয়ারে বসে আছেন ভবনাথ। চাঁদিতে টাক কিছুদিন হল বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় দোলে। এতক্ষণ রৌদ্র-ঝলকিত নদীবক্ষে গুনগুনে করছিলেন। গোপাল মাস্টার সম্প্রতি তাঁর বেহালায় ল্যান্সডাউনের আসরের অব্যবহিত পরেই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলেছিলেন গৌরীর জন্যে

সেই গানটা: যাঁর ভুবন মনমোহিনী, যাঁর নিমল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী ....রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কোন কোন গানের ভাষায় যদি যুক্তাক্ষর সন্ধি সমাসের বাহুল্য থাকে তবে সে গানগুলো তাঁর কাছে উৎকৃষ্ট ঠেকে। স্বর্ণসুন্দরী পাশে বসে চোখের পলক-ওতার বোজেন। একবার স্বামীর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'প্রতাপটার চিঠি পেতে এবার এত দেরী হচ্ছে, কেন বল তো। তুমি গিয়েই টেলিগ্রাম করে দাও। আবার টাকাটাকা বেশী লাগলে...

ভবনাথ সেদিকে কান দেন না। বলেন, 'ভজালার কথা মনে আছে?'

'কোন কথা?'

'সেই রাতগুলোর কথা? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা। উঃ কি মুস্লিমলেগই কান্ডটা ফেঁদেছিল। সতীন সেনের দল খঞ্জনী বাজিয়ে যাবেই সেই রাস্তা দিয়ে, আর ওদিকে সড়কি আর লাঠির একেবারে জঙ্গল। মিউনিক্ত বিক্ষোর মঙ্ক! উঃ কি সব দিন গিয়েছে।'

'সেইরকম দেশেই তো আবার যাচ্ছো।'

'তা যাচ্ছি।' ভবনাথ বলেন লোকজনে টেঁপুর টেঁপুর জেটিটার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাশেই দুটো মস্ত গহনা নৌকায় গাদি করে লোক উঠছে। জানলা দিয়ে বোধহয় নববিবাহিত এক কিশোরী তাকিয়ে আছে জলের দিকে। 'গ্রান্ড হোটেল' থেকে লোকে বেরোচ্ছে পান চিবুতে চিবুতে, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছছে কেউ।

স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ চোখ তুলে বললেন, 'এই যে সব কাগজে কাগজে লিখছে, ছেলেরা জেল খাটছে। ......তুমি ভাবতে পারো, ইংরেজরা নেই আমাদের দেশে? আমি ভাবতে পারি না।'

'আমিও পারি না স্বর্ণ। আমাদের মধ্যে এতরকম দল, এত মত। ইংরেজ চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে জানো? ইংরেজদের আসার আগে নবাবোয়ান রাজা যেমন দেশ শাসন করত ঠিক তেমনি। নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, অরাজকতা, এই হিন্দু-মুসলমান নিয়েই দেখবে কি ব্যাপার হয়ে যাবে।'

অদূরে সাদা কালো স্টিমার গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসছে। সেদিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'আমরা তো বলতে গেলে পার করে দিলাম আমাদের জীবন। ভাবছি ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের সময়ে পাল্টে যাবে অনেক কিছু। বলাই বলত......

'ও বাবা! তুমি এখনও বলাইকে ভুলতে পারো নি।'

'না: বলাইটা বেশ ছিল।'

'বলাই বলত, যা গাঁয়ের লোকে ইংরেজও বোঝে না, কংগ্রেসও বোঝে না, তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে চায়।'

ভবনাথ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমিও তাই বলি স্বর্ণ, আমিও তাই বলি। গাঁয়ে রাস্তা নেই, স্কুল নেই, শহরে চাকরীর ব্যবস্থা নেই, তার আগে একটা কিছু করো। মজুমদার আমাকে খোঁটা দিতেন ইংরেজের গোলাম বলে, কিন্তু গোলাম না হয়ে যদি পাবনা বাড়ি পড়ে থাকতাম, তাহলে কি এমন দেশের উপকারটা করতাম। যেখানেই গিয়েছি মেয়েদের স্কুল বসিয়েছি, রাস্তা বানিয়েছি, দু-চারটে লোকের চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। আর ইংরেজ লোকগুলো তো খারাপ না। এই ব্র্যাণ্ডি বলো, ফকাস বলো, চমৎকার এডমিনিস্ট্রেটর। কোন ব্যাপারে মাথা গরম করে না। সব ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করে। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে।'

'আমার বাবা একটু ভয় ভয় করছে, তোমার এ নতুন জায়গা। যেরকম সব শুনছি টেররিস্টদের ব্যাপার।'

'আমার তো আইন আছে স্বর্ণ। আমি আইনমাফিক চলব। আমার কাউকে ভয় নেই।'

'মা, ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ। খোকা দৌড়তে দৌড়তে আসে। স্বর্ণসুন্দরী নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন, আর একটা লঞ্চ আসছে। কয়েকটা পানসী এগিয়ে আসছে মন্থরগতিতে।

স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন ক্যাবিনে। ক্যাবিনের ভেতর স্টোভ ফোঁস ফোঁস করছে। এক কোণে লুচি বেলছে গোপীনাথ। কিছুক্ষণ পর বড় বড় চাকা চাকা করে বেগুন ভাজা আর একথালা ভর্তি লুচি নিয়ে আসে গোপীনাথ। জলের হাওয়ায় প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। প্রায় কাড়াকাড়ি করে ছেলেমেয়েরা খায়। আর সেদিকে চেয়ে চেয়ে স্নেহে ও প্রশান্তিতে ভবনাথ আনমনা হয়ে পড়েন। বন্দেমাতরম টেররিস্ট, ইংরেজ, চাকরীর জগতে উচ্চাশা তার মন থেকে সরে যায়। অন্তুর মতো বড়ো বড়ো মায়াবী দৃষ্টি দিয়ে তিনি চেয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন তিনি ঈশান চৌধুরী নন, নতুন নতুন দিকে কর্মৈষণায় উদ্যোগী পুরুষ নন, তিনি একজন শান্তিপ্রিয় আত্মমুখীন মানুষ। বাইরের জগতের উত্থান পতন আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করে কিন্তু তাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে না। ইংরেজের চাকরী তাই কোনদিন তাঁর পক্ষে ঠিক একটা মিশান নয়। আর মিশান নয় বলেই যে অপরূপ উন্নতি তাঁদের বয়সী অফিসারদের ঘটে তা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেনি। ব্র্যাণ্ডি ফকাস সত্যিই ভাল এডমিনিস্ট্রেটার, তারা বাজে ঘোড়া ধরেন না। ইংরেজের চাকরী যাঁদের কাছে মিশান না, যাঁরা আইনের বইয়ের বাঁধা রাস্তার যতটুকু বলা আছে ততটুকুই করবেন, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারা যায় যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করবেন এরকম লোক তাঁরা পছন্দ করেন না। তাঁরা নিজেরাই রুটিন বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু রুটিনের চৌহদ্দিতে কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে মুশকিল, আরও কিছু উপরি আছে, ক্লাব আছে, মেলামেশা করার ব্যাপার আছে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হবার ব্যাপার আছে এ সবের মধ্যে যাঁরা নেই সে সব অফিসার কখনই আদর্শ অফিসার নন।

খাওয়া পর্ব মিটলে স্বর্ণসুন্দরী ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার এই সাতে নেই পাঁচে নেই ভাবখানা আমি বুঝি না একদম। বাবা বলতেন, কাজ করতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সব সময় তাই নিয়ে ভাবতে হয়। শুধু ছাড়াছাড়াভাবে থাকলে চলে না।'

ভবনাথ হাসেন। 'তুমি যে কি বল স্বর্ণ। এমন জবরদস্ত চাকরি করছি, লোককে জেলে পাঠাচ্ছি, কলকাতায় বাড়ি বানাচ্ছি, ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছি, তবু তুমি বলছ ছাড়াছাড়াভাবে থাকি।'

আর ভবনাথের সেই শান্ত চোখভরা কোমল দৃষ্টির দিকে চেয়ে চেয়ে পাবনা বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে ভবনাথের প্রপিতামহ রঘুনাথের ছবিখানা ভেসে ওঠে স্বর্ণর মনে। এমনি শান্ত কোমল মায়াবী চাহনি। এর ঠিক উল্টো ঈশান চৌধুরীর চোখ দুটো, তীক্ষ্ণ তীব্র, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার চাহনি। তার নিজের বাপের চোখও ছিল বেশ আরক্ত ভাবগম্ভীর কিন্তু তা ভবনাথের মতো কোমল মায়াবী নয়। বেশ আত্মবিশ্বাসের ছায়া ছিল সে দৃষ্টিতে।

'এটা কি নদী?'

'ধলেশ্বরী।'

'সেই একইরকম তো দেখতে।'

'একই রকম।'

ভবনাথ ও স্বর্ণ দুজনেই সেই বিস্তীর্ণ বাদামি জলে রোদ্দুরের খেলা দেখতে থাকে। নদীর হাওয়ায় দুজনেরই মুখচোখ বেশ সতেজ।

'আর দুবছর পর থেকেই আমার বৃহস্পতি খুব তুঙ্গী, বুঝলে স্বর্ণ।'

'ওসব আমি বুঝি না। সাহেবদের সঙ্গে দহরম-মহরম করবে না! উন্নতি কি হেঁটে হেঁটে তোমার দোর গোড়ায় আসবে?'

'প্রতাপটা ফার্স্ট চান্সে বোধ হয় পারবে না। কিন্তু, সেকেণ্ড চান্সে যদি পারে, তাহলে মার দিয়া।' শিশুর মত ঝলমল করে ভবনাথের মুখখানা।

'তোমার নিজের জামাকাপড়গুলো একটু ভাল করো। একটা ভাল সুট নেই তোমার। সেই কবে গোলাম মহম্মদ থেকে একটা সার্জের সুট করিয়েছিলে। সুতো সরে গেছে, কেটে গেছে।'

'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।'

'এসব কথা আমার বোঝা না। ওরকম গেঁয়ো কথা ভাব বলেই এই দুর্দশা।' স্বর্ণসুন্দরীর গলায় ঝাঁঝ।

অপোগণ্ডেরা এখন ব্যারাকের সামনেই ডেকের একধারে চাক বেঁধে আছে গোপীনাথের চারধারে।

'এরকম জাহাজ তুমি কখনো দেখেছো দাদা?' টুটুল প্রশ্ন করে।

'এরকম কত আমি কত দেখেছি তোমার জন্মস্থানে। এত উঁচু, বাবুর বুকে হাঁফ ধরিয়ে দেয়।'

দাদা সব দেখেছে, দাদা সব দেখেছে। তুমি হিমালয় পাহাড় উঠেছো? বল উঠেছ!' চোংগা বললে।

'দার্জিলিং-এ হিমালয় পাহাড় নেই? কত বরফ পাহাড়ের মাথায়!'

'তুমি বিলেত গিয়েছো দাদা, বিলেত?' চোংগা মুখ ভেংচায়।

'এই যাঃ!' বলে টুটুল তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করতেই কুরুক্ষেত্র বাধে। দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকে গড়াতে থাকে। চোংগা টুটুলের চুল পড়পড় করে টানতে থাকে। থামাবার বৃথা চেষ্টায় ক্লান্ত দিদি বুড়ী দৌড়য় মায়ের সন্ধানে। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী যখন এলেন তখন ব্যাপারটা মিটে গেছে। দুজনেই সামনের রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।'

এবার অনেক লোক নামে, অনেক লোক ওঠে। লোকজনের ওঠানামায় তাড়া নেই। জাহাজ বেশ খানিকক্ষণ থাকে। গঞ্জের নাগরীতে ঢাকা কয়েকটা নৌকো জাহাজের গায়ে এসে লাগে। ঝাঁকাভর্তি লাউ-শশা কুমড়ো নামে জাহাজ থেকে। ধুতি লুংগি পাঞ্জাবী গেঞ্জি, হাফশার্ট, খালি গা বম। কদাচিৎ প্যান্টপরা একটা দুটো লোক, সোলার টুপি মাথায় একটা সাহেবও দেখা গেল। দুতিনটে সম্পন্ন হিন্দু পরিবার উঠলেন জাহাজে। চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, কারো হাতে পানের বাটা। এক ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীর হাতায় জাঁকাল গোড়ের মালা।

'কিসের জন্যে নারায়ণগঞ্জ বিখ্যাত বলতো?' বুড়ী হঠাৎ ফস্ করে প্রশ্ন করলে।

দু ভাইকেই বিব্রত দেখায়, বিশেষ করে চোংগাকে।

বুড়ী উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঢাকেশ্বরী কটন মিল।'

'মুন্সীগঞ্জ বলতো কিসের জন্যে বিখ্যাত?'

'মুন্সীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ? পাটের জন্য' বুড়ীর গলায় মরিয়া ভাব।

চাঁই করে একটা বুড়ীর গালে চড় কষিয়ে চোংগা চেঁচায় 'পারলি না, পারলি না!'

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু সে চেপে ধরে, 'বল, বল, তুই বল।'

এক মুহূর্ত বিপন্ন দেখায় টুটুলকে। তারপর তার দিদিকে রেলিং এর দিকে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'এই জন্যে!' বলেই সে দোতলার ডেক দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়য়।

সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে একদঙ্গল ছোট ছেলে মেয়ে। ডেকের পেছন দিকে এক দঙ্গল নামাজ পড়ছে। চোংগা থমকে দাঁড়ায়। তারপর তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। ওপরের দিকে চার পাশটা খোলা, আরও হাওয়া, চোঙার মুখে কানে হাওয়া ঝাপটায়। দুপাশে খোলা রেলিং তারপর স্টিমারের দীর্ঘ ছাতে বাঁশি আরম্ভ হয়ে যায়। সিঁড়ির মুখে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটা ঘর। হুইলে বসে, সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা একটা লোক, পরনে পাটভাঙ্গা [illegible] লুঙ্গি।

বুড়ো কোনদিকে তাকায় না। ফরফরে হাওয়ায় তার দাড়ি সামনের দিকে ওড়ায় আরও কুঁচলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখায় তার মুখ। সামনে খোলা কাচের জানলা দিয়ে আরও প্রসারিত সাদা নদীর বুক:

'এবার আমরা কোথায় আসছি?'

'মুন্সীগঞ্জ।'

একবার পেছনে তাকাতেই চোংগার মেজাজ খারাপ হয়। বুড়ী ও টুটুলও ওপরে উঠে এসেছে।

এবার সারেঙ আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখায়। দিগন্তবিস্তীর্ণ পাটক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট জলে ভাসছে। তিনজনই উদগ্রীব হয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। এই বিস্তীর্ণ বাদামি জলের গায়ে আকাশ পর্যন্ত ঘন সবুজের মাঝখানে তাদের জীবনযাত্রা আবার কিভাবে শুরু হবে ভেবে তারা অবাক হয়। সিঁড়ির নীচ থেকে গোপীনাথের হাঁক আসে। তারা উৎসাহে নামতে থাকে। মালপত্র ইতি-মধ্যেই নীচে নামানো হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ মানে সেই ভাসন্ত ফ্ল্যাটখানা ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। চোঙা আর সহ্য না করতে পেরে কট করে একটা চিমটি দিল বুড়ীকে। আবার একটা গোলমাল পাকাচ্ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজ ভোঁ দিতে সবাই ব্যস্ত হয়েছে। নদীর মাঝখান থেকে অর্ধবৃত্তাকারে পাক নিতে থাকে জাহাজখানা। জেটিতে পাটভর্তি

বুলওয়ার্কার শিশুসুলভ দেহকে শক্তিমান "পুরুষে" পরিণত করে

[illegible]

সহজ দিনে-৫-মিনিট বুলওয়ার্কার ব্যায়ামশিক্ষা গ্যারান্টি দেয় যে সুফল আপনি অনুভব করতে, দেখতে এবং স্বহস্তে মাপতে পারেন দুসপ্তাহের মধ্যে অন্যথা কোন দাম দিচ্ছেন না।

ঠিক তাই। দাড়ি কামাতে যে সময় লাগে তার চেয়ে কম সময়ে বুলওয়ার্কার যে "পুরুষোচিত" দেহ গড়ে দিতে পারে তা অন্য পুরুষের ঈর্ষা ও মেয়েদের অনুরাগ উদ্রেক করে। দিনে মাত্র ৫ মিনিট সময় লাগে [illegible] সরু হাতকে বিশাল, [illegible] পরিণত করতে; চওড়া, পেশীবহুল বুক তৈরী করতে, কাঁধ চওড়া করতে, ইস্পাত-কঠিন পেটের পেশী ঢালাই করতে, উরু ও পায়ের গুলি অর্জন করতে। যে সুফল আপনি নিজের চোখে আয়নায় দেখতে পারেন ও মাপবার ফিতে দিয়ে যার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন সেটা দু সপ্তাহের মধ্যে এই গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, অথবা আপনি কোনো দাম দিচ্ছেন না। পূর্ণ বিবরণের জন্য কুপন আজই ডাকে দিন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো সেলস-ম্যান আপনার সাথে যোগাযোগ করবে না।

© [illegible] Pvt. Ltd.
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

অনুগ্রহ করে শক্তিশালী, পেশীবহুল পুরুষোচিত দেহ গড়ার জন্য বুলওয়ার্কারের কার্যকরী ব্যায়াম প্রণালী সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ আমাকে পাঠিয়ে দিন।

60-9

AM 15

নাম ----------
ঠিকানা ----------
---------- বয়স

BULLWORKER SERVICE
15 Mathew Road, Bombay 4.

দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী দাড়িওয়ালা লোক এক লাফে নৌকোয় উঠে। বেঁটে রোগা লম্বা চেহারার ওপর তার নীল উর্দিটা একটু বেমানান। বয়স বড় কিন্তু তার কাঁচা পাকা দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ হাসিতে ভাবলেশহীন চোখ, আর মাথায় পাগড়ির ওপর সদ্য পালিশ করা ইংরেজ রাজার তকমা—সবটা মিলিয়ে জাঁকাল চেহারা।

ভবনাথকে সেলাম করে স্বর্ণসুন্দরীর দিকে তার হাসিভরা মুখখানা তুলে বলল, 'আমার নাম সাম্বের।' তারপর সাম্বের আলতো টুটুলের হাতখানা ধরে। টুটুল অবাক হয়ে শোনে, বাইরেই গমগমে সাহেবের চীৎকার, 'খবরদার, হটু যাও, হটু যাও।' যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা করে। ভবনাথ, স্বর্ণসুন্দরী ছেলেমেয়েরা, মুটের মাথায় মাল এবং সবার শেষ সাম্বের উড়োপাখ হয়ে জেটিতে নেমে গেটি ছাড়ার পর যাত্রীরা একে একে নামে। উঁচু বাঁধের ওপর পাকা চলার রাস্তা। প্রকাণ্ড এক বাদাম গাছের চেটাল পাতাগুলো যেন এইমাত্র কেউ গঙ্গা জলে ধুইয়ে দিয়েছে। তার নীচেই ঘাটে অপেক্ষমাণ নৌকো। সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য লাগে ছেলেমেয়েদের। টুটুলের হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে কি বলতে চায়। বোধহয় নৌকোর পেছনে ছোটো ছিপছিপে দেখা পায়খানার ব্যবস্থাও তাদের অবাক করে।

নীল উর্দিপরা সাম্বের নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক পতাকার মতো। খালের জল থেকে মৃদু কলকল আওয়াজ আসে, টুটুল হাত জলে ডুবিয়ে খানিকটা শেওলা দম তুলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুপাশে পড়ন্ত বাঁশ ঝোপ, জলের ওপর শুকনো পাতা একরাশ ছড়িয়ে আছে নুয়েপড়া কাঁঠাল। এক এক জায়গায় খালের দুপাশ দিয়ে নেমেছে গাছ, বাঁশ ঝাড় নৌকোর ঠিক মাথার ওপর এসে পড়ে। দেখতে দেখতে খাল চওড়া হয়। এক জায়গায় আর একটা খালের সংযোগে নদীর মতো দেখায়।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
অ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

জলে আরও বড় বড় ঢেউ দেয়। সাম্বের জানিয়ে দেয়, এ জায়গার নাম কাটাখালি। নদীর সঙ্গে সরাসরি যোগ। বড় একটা নৌকো থেকে পালের মতো চেটাল জাল একবার জলে ডোবে, আবার ওঠে। হঠাৎ ওপরে ওঠে চাঁদা, পুঁটি, আর মৌরলা ছোট ছোট মাছ ঝকমক করে লাফায়। এবার বাঁক নেয় নৌকো। গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায়, তাদের গন্তব্য স্থল। সাম্বের তার সরু লম্বা আঙুল তুলে দেখায় খাপরার ছাওয়া সাদা ধপধপে একতলা বাড়ি। টুটুল ঢোকা বড়ো আগে থেকেই ইন্দ্রপুর ফোর্টের নাম শুনেছিল। একটা অদ্ভুত কেল্লা, যার সামনে দুটো কালো কামান মুখ উঁচিয়ে আছে এরকম কল্পনা তাদের তিনজনেরই মাথায় চেপে বসেছিল। কিন্তু কাছে আসতে সেরকম ভয়ংকর কিছু মনে হোল না। তবে চারপাশের উঁচু পুরু পাঁচিলের গায়ে গায়ে কামান দাগবার জন্যে বড় বড় ফোকরগুলো দেখে তাদের বিস্ময় জাগে। কোয়ার্টারের ঠিক নীচেই পুকুর, তার আগে সারি সারি কামিনী জবা আর সুলতান চাঁপা ঝুমকো লতার গাছ। মগেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তিন-চারশো বছর আগেকার এই কেল্লা মানে এখন মাটি ভর্তি দেড়তলা সমান উঁচু গোলাকার পুরু ইঁটের পাঁচিলের ওপর বিশাল বাঁধানো চত্বর, আর তার ওপর একতলা খাপরার ছাওয়া সাদা ধবধবে এস ডি ও কোয়ার্টার। ছেলেদের সবচেয়ে ভাল লাগে ওপরে ওঠবার কিম্ভুত সিঁড়ি, যেন বিশাল খাটের সিঁড়ি নেমেছে অনেক উঁচু থেকে। ছেলেরা রেস দেয়। দুজনের এসব ছেলেমানুষী ভাল লাগে না। অল্প অল্প হাওয়ায় কাঁপা উঁচু সুপুরিগাছগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টোভের শব্দ শোনা যায়। গরম দুধ উথলায়। মাল-ভর্তি আর একখানা নৌকোও ঘাটে এসে লাগে। একটু পরে মাল উঠতে থাকে। চার-পাশে খাট আলমারী বেডিং ট্রাঙ্ক। নীচের জেলখানা থেকে ওয়ার্ডাররা ওপরে নিয়ে জমা করতে থাকে একটার পর একটা মাল। গোপীনাথকে লাগে মেজর জেনারেলের মতো। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সময় তার হাঁক-ডাক শোনা যায়। এখানে রান্নাবাড়িটা খুব কাছে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র। সামনে দালানে খুব হাওয়া খেলে। বড় বড় গেলাসে ভর্তি দুধ নিয়ে গোপীনাথ ঘোরে। দুপোর গেলাসে দুধ চুমুক দিতে দিতে ভবনাথ বলেন, 'মারভেলাস!' টাকার বারো সের বলে বোধ হয় আরও সুস্বাদু লাগে।

॥২॥

মাস তিনেক পর মর্নিং স্কুল সেরে টুটুল দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি ফিরছে। দু' চোখে জল ঝরছে আর সেই জল মুছবার চেষ্টায় হাতের কালি মুখে লেগেছে একাকার। স্কুলের প্রায় গায়েই বিশাল জলের আয়তক্ষেত্র যেখানে সে আর বাবা পুঁটি মাছ ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ইতিমধ্যেই। বাড়ির ফটকের সামনেই হাওয়ায় দোলা, বিশাল তিন-চারটে শিরিষ, তার একটার নিচে কয়েক দিন আগে চোখে-পড়া অনির্বচনীয় শোভার একদল চারটে বাদামি সাদা কুকুরের বাচ্চার খেলা, জলের ধারে শ্যাওলা দামের ওপর কখনও স্পন্দিত কখনও স্থির নীলচে লম্বাটে দুটো ফড়িং, প্রকাণ্ড চওড়া কাটা পুরনো ফটকের গায়ে খোদিত পঞ্জবার ছড়া, তাদের বাড়ির নীচেই টলটলে জলভরা ঘাট বাঁধানো পুকুর, সিঁড়িতে রিভলভার ধুলো সাফ করতে ব্যস্ত ভবনাথের দুই বডিগার্ড, প্রাণ-প্রসাদ আর রামস্বরূপ, ওপরে চাতালের কোণে রোদ্দুরে আচারের বয়াম—এগুলোর কোনটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

ওপরেই তাদের পড়ার ঘরের সামনে গৃহশিক্ষক মধুবাবু দাঁড়িয়ে। দুই ছেলেকে ও মেয়েকে পড়ানোর বেতন দশ টাকার নোট-খানা নীল শার্টের বুকপকেটে গুঁজতে গুঁজতে শীর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি থমকে দাঁড়ান।

'কি হল? পরীক্ষা কেমন হল?'

টুটুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'আমি স্যার রাইনোসেরস...মস... পারি নি।'

'কি বানান লিখেছো?'

'আর এইচ আই এন ও সি ই আর ও ইউ এস' এতক্ষণ মন্ত্রের মতো যে অক্ষরগুলো জপ করতে করতে আসছিল সেগুলো টুটুল উগরে দেয়।

মধুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন, ঠিকই তো আছে।' বিরক্ত হলেই শীর্ণ মুখখানা আরও ছুঁচলো দেখায় মধুবাবুর।

শার্টের হাতায় মুখ মুছতে মুছতে টুটুল হেসে ফেলে।

'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে? তাহলে ভাল করেছি।'

দুদিন পর রেজাল্ট বেরোল। টুটুল রেকোর্ডব্রেক ভাল করেছে প্রায় সব বিষয়ে। শুধু প্রথম নয়, দ্বিতীয় থেকে অনেক এগিয়ে প্রথম। দু' ক্লাস ওপরে ছোড়া সপ্তম, বড়ো পঞ্চম। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ডিপার্টমেন্ট স্বর্ণময়ীর। ভবনাথের এদিকে তাকাবার সময় নেই। সন্ত্রাসবাদীদের কার্য-কলাপে ইতিমধ্যেই প্রাণ অস্থির। বহু-যোগিনী গ্রামে কিছু বোমা ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গেছে। ঘন ঘন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আসছে, তার সবগুলোই নির্ভর-যোগ্য নয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

সেদিন দুপুরবেলায় চাতালের কোণে দুই ভাইয়ের তর্ক বাধে পরীক্ষার ফল নিয়ে। 'পরীক্ষায় কারা ভাল করে জানিস? জানিস টুটুল? কারা ভাল করে?'

'যারা ভালভাবে পড়াশোনা করে,' টুটুল সাবধানে জবাব দেয়।

'ঠিক বলেছিস, যারা আর কিছু জানে না, একেবারে বইয়ের পোকা।'

(ক্রমশঃ)

CENTRAL LIBRARY

প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৯ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর মিডসামার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি অ্যাকাডেমির সপ্তম প্রদর্শনী, একশ' আটষট্টিটি ছবি ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে চমকপ্রদ বিশেষ কিছু ছিল না। কিছু ছবি হয়ত বাদ দেওয়াও যেতে পারত। সর্বাধুনিক বিদেশী কাজের অনুপ্রেরণালব্ধ ক্ষুদ্র ভাস্কর্যও ছিল—যেমন উৎপল চক্রবর্তীর মনুমেন্ট ১ ও ২ এবং তপন মিত্রের দুখানি 'রিলিফ কনস্ট্রাকশন'। এই ধরনের কাজ আমেরিকান ক্ষুদ্র ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে।

রিপ্রেজেন্টেশনাল ছবির মধ্যে বিনোদ কর্মকারের দুখানি নিসর্গ দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ধানক্ষেতের ছবিখানিই রং ও প্যাটার্নের সারল্যে বেশী আকর্ষণীয়। নির্মল দত্তের ছোট্ট সবুজ ও ধূসরের সমাবেশে তৈরী 'ঝড়' ছবিতে আসন্ন দুর্যোগের শুরু হওয়ার চেহারাটি সুপরিস্ফুট। দীপ্তি পালের স্বপ্ন ও রাজকন্যা ছবি দুটির মধ্যে শেষোক্ত ছবিটি সুগঠিত। খানিক সুররিয়্যালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কিছুটা ভারতীয় মিনিয়েচারের আমেজ মিলিয়ে মন্দ কাজ হয়নি। শ্যামল বসুর দুস্থারমণী মূর্তিটি সুঅঙ্কিত। গীতা বর্মণের দুখানি কম্পোজিশনে শুভেন ঘোষালের রীতি পরিস্ফুট। দেবব্রত চক্রবর্তীর প্রতিমন্দনী ও মহাবীরের মূর্তিতে ভারতীয় পুঁথি চিত্রণের সঙ্গে মিল ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। ভুবনগোপালের টিম্বার মার্চেন্ট ও জেনারেল পোস্ট অফিসের দুখানি ড্রয়িং যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ নয় তবু গ্রাফিক বিভাগের সাধারণ দুর্বলতাপূর্ণ ছবির ভেতর থেকে এই কাজ দুটোই বেশী করে চোখে পড়ে। সুরেন দের কাঠ খোদাই করা বিরাট শায়িত টর্সোখানি বেশ সুগঠিত মূর্তি। তবে পুরুষ না নারী মূর্তি তা বোঝা যায় না। সম্ভবত এটিকে এক ধরনের দ্ব্যর্থবোধক মূর্তি হিসেবেই ধরতে হবে। ডব্লিউ. আর কাপুরের ভাঙা দালানের ছবিখানি মন্দ হয়নি। একটা বিশেষ ধরনের নৈঃশব্দ্যবোধ আছে। তবে পেন্টিং আর একটু উন্নত হতে পারত। সুরেন দের কাঠের তৈরী শায়িত রমণী মূর্তিটি ছোট মাপের সুন্দর পালিশ করা কাজ। বোধহয় কোন স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তি। বাসন্তী সেনের বসন্তের পূর্বে ছবির রঙের প্যাটার্ন প্রশংসনীয়। গণেশ হালোইএর জব্বলপুর-এর দুখানি নিসর্গ দৃশ্যে সুন্দর ক্যালিগ্রাফিক রীতি দেখা গেল। ইন্দ্র দুগারের বাজপাখির দৃশ্যটি জাপানী কাঠ খোদাই চিত্রের অনুরূপ। কমল দাশগুপ্তের একটি প্রতিকৃতি মডেলিং হিসেবে অনন্য। অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্যের মধ্যে অতুল বড়ুয়া, শাহেদা আহমেদ, তারক গড়াই, সুধন সাহা ইত্যাদি কয়েকজনের নাম করা যায়।

•

বিখ্যাত কমার্শিয়াল শিল্পী অন্নদা মুন্সী বর্তমানে আধ্যাত্মবাদ নিয়ে ছবি আঁকছেন। তাঁর আধুনিক ছবিগুলির উনচল্লিশখানির নিদর্শন ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর অবধি ইউ. এস. আই. এস অডিটোরিয়াম গৃহে প্রদর্শিত হয়ে গেল। তাঁর অধিকাংশই যীশুখৃষ্টকে অবলম্বন করে আঁকা। প্রধানত সবুজ, নীল, বাদামী ঘেঁষা লাল রং ও সাদা ক্যালিগ্রাফির সাহায্যে তিনি তাঁর ছবিগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ বিচার, রিভীলেশন, লাইফ পত্রিকার লোগোটাইপের সঙ্গে মেরী মূর্তি, যীশুর ক্রস থামানো মূর্তি, যীশু সবাইকে ডাক দিচ্ছেন—যার ওপরে লেখা 'যীসাস রেভলিউশন', সাদা ক্যালিগ্রাফিতে লেখা লর্ডস প্রেয়ার এবং 'ও ক্যালকাটা' যেখানে কলকাতা শহরের ওপর শূন্যে নানা প্রতীকচিহ্নের মধ্যে একটি 'বিলাতী পরী ভেঁপু বাজাইতেছে' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছবি দেখা গেল। এ ছাড়া ওম্, কালীয়দমন, পাণ্ডবদের প্রত্যাবর্তন ও বেটোফেনের ছবিও ছিল। আর ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট কার্ড সাইজের ডেকরেশন যার ওপর লেখা কিংডম অব হেভন। কিছু মুখে লিখিত মুখসমাচার থাকলেই প্রদর্শনীটি পূর্ণতা লাভ করতো বলে মনে হয়।

•

১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিড়লা অ্যাকাডেমিতে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সমিতি'র উদ্যোগে বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবি ও ড্রয়িং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। সতেরোজন শিল্পীর তেষট্টিটি ছবিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাবলীর একটা রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ অনেকটা সংবাদ পরিবেশনের মত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ঘটনার ওপরেই অনেক সময় জোর দেওয়া হয়। যদিও সেটাই সব নয়। শিল্পরীতিতেও তাই রিপ্রেজেন্টেশনের দিকেই জোর দিতে হয় এবং এখানেও তাই দেওয়া হয়েছে। কামরুল হাসানের বৈশাখী পূর্ণিমায় ভূপতিত শবদেহের মূর্তি এবং বাংলাদেশ, গণহত্যার পূর্বে ও পরে ছবিতে পরিস্থিতির একটা সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। শেষোক্ত ছবি দুটির প্রথমটিতে তিনটি রমণী মূর্তি জল আনতে যাচ্ছে ও দ্বিতীয়টিতে তারাই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। প্রাণেশ মণ্ডলের বাস্তুহারা ছবিতে সূর্যকে পেছনে ফেলে বাস্তুহারার দলকে আশ্রয়লাভের আশায় আসতে দেখা যায়। মোস্তাফা মনোয়ারের ছবিগুলি পোস্টারধর্মী এবং দু-একটি কাজে বক্তব্যকে জোরের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন একটি ছবিতে এক ডজন জান্তব মুখ ভূপতিত রমণী মূর্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। আরেকটিতে অর্ধচন্দ্র ও তারকা চিহ্নের সঙ্গে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কয়েকটি মনুষ্য মূর্তি দেখতে পাই। চন্দ্রশেখরের ছবিতে ফৌজী বর্বরতার শিকার হিসেবে অসহায় তরুণীর করুণ রূপ ফোটাবার চেষ্টা আছে। নাসির বিশ্বাসের ধর্ষণ ছবিটির ড্রয়িং রং ও কম্পোজিশনের দুর্বলতায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কাজী গিয়াসুদ্দিনের বাস্তুহারাদের জলরঙের ছবি সুঅঙ্কিত। কিন্তু সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রদর্শনী দেখলে বাংলাদেশের ট্র্যাজেডির যে ছাপ দেখা যায় তার চাইতে প্রেস ফটোগ্রাফের প্রদর্শনীতে মনে অনেক বেশী দাগ পড়ে।

•

ক্যালকাটা মাক্ক্যান রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৫ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বাহান্নখানি ছবি ও ভাস্কর্য এবং পাঁচশখানি ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী করলেন। এঁদের অনেকে সাধারণ চিত্রপ্রদর্শনীতেও প্রদর্শন করে থাকেন। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী বিভিন্ন টোনের জমির ওপর সরু রেখায় কয়েকটি সুন্দর ফিগার ড্রয়িং করেছেন। লোকশিল্পের মেজাজ ও আধুনিক ডিজাইন এগুলির বৈশিষ্ট্য। আশিসকুমার সেন ভারতীয় রীতিতে দুখানি পরিচ্ছন্ন মিনিয়েচার উপস্থিত করেছেন। অমল ঘোষের দুখানি মূর্তির মধ্যে স্নানরতা মূর্তিটিই উল্লেখ করার মত।

বিনোদ কর্মকারের ছোট ল্যান্ডস্কেপ উইন্টার মর্নিংটি বেশ সুগঠিত কাজ। জ্যোতিপ্রসাদ রায়ের অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘেঁষা ল্যান্ডস্কেপ মন্দ নয়। কনক মুখার্জির মাস্কেড ছবির প্যাটার্ন মন্দ হয়নি রঙের ব্যবহার সুন্দর। 'নৃত্য' ছবিটি ছাপা কমার্শিয়াল ডিজাইনের মত। সুশান্ত দাসের দুখানি নিসর্গ দৃশ্যে সুন্দরভাবে স্পেস সৃষ্টি করা হয়েছে। তাপস দত্তের সূর্যালোকিত জলরঙটি প্রশংসনীয়।

ফটোগ্রাফের মধ্যে অনেকগুলিই উন্নত মানের কাজ। এর মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জির একটি মাথার স্টাডি, অরুণ গাঙ্গুলীর ছেলেদের খেলা, সুনীল দত্তের একটি পরিচ্ছন্ন গ্রুপ ও অভিজিৎ রায়ের প্রতিমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি খুব পরিচ্ছন্ন হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব
প্রথম অধ্যায়
ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি
বৃটিশ ও ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত

ইতিহাসের উষাকাল থেকে ভূমধ্যসাগর ও নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া যেমন প্রাচীনতম সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সভ্যতা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, তেমনি এর গতিপথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, হানাহানি এবং রাজ্যলোভী ও ভাগ্যসন্ধানীদের অভিযানও এর ইতিহাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। সেই সুদূর প্রাচীনকালের রোমক দিগ্বিজয়ীদের সময় থেকে আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন রোমেলের দুঃসাহসিক অভিযান পর্যন্ত এখানকার সামরিক উত্থান-পতনের কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু জার্মান সেনাপতি রোমেলের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের আগে নূতন রোমক সাম্রাজ্যবিলাসী যে ব্যক্তিটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল মহাযুদ্ধের আসরে যাত্রার দলের ভীমের মত সেই মুসোলিনীকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবও নয়। কেননা ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বৃটেনের পরাজয়ের অনেক আগে থেকেই এই ভদ্রলোক ভূমধ্যসাগরের জল ঘোলা করিতেছিলেন। ১৯২২ সালের অক্টোবরে ফ্যাসিজমের গদিতে মুসোলিনী কর্তৃক ইতালীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে স্বপ্ন ইতালীর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যরূপে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নাই। ১৯৩৯, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফ্যাসিস্ট গ্রান্ড কাউন্সিলের এক বৈঠকে তিনি একজন তর্কবিশারদের মত ইতালীর অবস্থান, ভাগ্য ও লক্ষ্যের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন :

> Italy is borded by an inland sea which communicates with the ocean through the Suez Canal — an artificial means of communication which is easily blocked even by accident — and by the straits of Gibralter dominated by the government of Great Britain. Italy has in fact no free access to the oceans. She is really a prisoner in the Mediterranean and the more populas and powerful she becomes, the more she will suffer from her imprisonment. The bars of this prison are Corsica, Tunisia, Malta and Cyprus. Its sentinels are Gibralter and Suez. (1)

সোজা কথায় 'ইতালী একটি অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ, মহাসমুদ্রের সঙ্গে যার যোগাযোগ রহিয়াছে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া, যে-খালটি কৃত্রিম এবং যে-কোন দিন একটা দুর্ঘটনায় অবরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে, আর তার যোগাযোগ রহিয়াছে জিব্রাল্টারের মধ্য দিয়া, যার উপর প্রভুত্ব করিতেছে গ্রেট বৃটেন। অতএব কার্যতঃ ইতালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে মহাসমুদ্রে প্রবেশের কোন পথ নাই। সুতরাং ইতালী আসলে ভূমধ্যসাগরে বন্দী মাত্র এবং আগামী দিনে যতই তার জনসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই এই বন্দীশালার দুর্ভোগ তার বাড়িতে থাকিবে। এই বন্দীশালার গারদ হইতেছে কর্সিকা, টিউনিসিয়া, মাল্টা এবং সাইপ্রাস। আর এর প্রহরী হইতেছে জিব্রাল্টার ও সুয়েজ'।

বর্ণনাটা খুব হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই এবং এই বর্ণনায় উপস্থাপিত তত্ত্ব থেকে মুসোলিনীর সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপীয় ভূভাগে একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া ইতালীর আর কোন ভৌমিক লক্ষ্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রথমেই তাকে এই বন্দীশালার গারদ ভাঙ্গিতে হইবে এবং একবার এই গারদ ভাঙ্গিতে পারিলে ইতালীর একমাত্র জিগির হইবে :

> The March to the Ocean. Which Ocean? The Indian Ocean linking across the Sudan and Libya to Abyssinia or the Atlantic Ocean across French North Africa?

'চলো মহাসমুদ্রের দিকে মার্চ করি। কিন্তু কোন্ মহাসমুদ্র? সুদান-লিবিয়ার উপর দিয়া আবিসিনিয়া হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের দিকে, কিম্বা ফরাসী উত্তর আফ্রিকা হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দিকে?'

মুসোলিনী নিজেই এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, যে দিকেই মার্চ করি না কেন বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার মুখে পড়িতে হইবে। সুতরাং এমন অবস্থায় ইউরোপীয় ভূভাগে আমাদের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা বিধান না করিয়া আমরা এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে পারি না। রোম-বার্লিন এ্যাক্সিস এই ঐতিহাসিক প্রশ্নেরই জবাব-স্বরূপ।

—(পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৯)

অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ইতালীর যে মিত্রতা মুসোলিনীর পক্ষে তার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ইউরোপীয় ভূভাগে নিরাপত্তা বিধানের পর ভূমধ্যসাগরীয় বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভে এবং এই বন্দীশালার গারদগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা!

কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশ এবং তার অগাধ ঐশ্বর্য তো ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে দুই শতাব্দী ধরিয়াই লুটের মাল ছিল এবং এই লুটেরাদের মধ্যে প্রধান ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও পর্তুগাল। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (নেশন স্টেটস) মধ্যে যখন আফ্রিকা নিয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, তখন ইতালী ছিল তাদের মধ্যে বহু বিলম্বে উপস্থিত নবাগতের মত। পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলির মত তার শ্রম-শিল্পের শক্তি যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সামরিক বলও তার সামান্য ছিল। তবু আফ্রিকান সাম্রাজ্যের লুঠের বখরায় সে পিছনে থাকিবে কেন! ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে সুয়েজ খাল খুলিবার পর ইতালীও আফ্রিকার দিকে নজর দিল এবং ১৬ বছর পর পূর্ব আফ্রিকার মাসাওয়া দখল ও এরিত্রিয়ায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর পূর্ব আফ্রিকার ভারত মহাসাগরের কূলে ইতালীয় সোমালিল্যান্ড গড়িয়া উঠিল এবং এই দুই উপনিবেশের মাঝখানে ছিল বহু প্রাচীন রাজ্য ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া)। কিন্তু মাঝখানের এই রাজ্যটা কেনই বা ইতালী কাড়িয়া নিবে না? আর এটি দখল করিতে পারিলেই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের অন্যতমরূপে তার প্রেস্টিজ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং উনবিংশ শতকের শেষ দশকে সিনর ক্রিস্পি মার্চ করিলেন সদর্পে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতালীর দুর্ভাগ্য (এবং সেদিনও দুর্ভাগ্য!) ওই কালো আবিসিনীয়ানদের হাতে ইতালীর সৈন্যরা এমন প্রচণ্ড মার খাইল যে, ১৮৯৬ সালে আদোয়াতে তাদের একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ইতালীয় ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ইতিহাসে এজন্য 'Adowa' -এর নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই মার খাওয়ার পর ইতালী অনেক দিন আর আফ্রিকা অভিযানে বাহির হয় নাই। কিন্তু সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৯১১ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধের ডামাডোলে ইতালীর সেই সুযোগ আসিয়া

(1) The Brutal Friendship —by F.W. Deakin Penguin, 1966 P. 19

গেল এবং ইতালী উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ত্রিপোলি ও সাইরেনাইকা (নূতন নাম লিবিয়া) নিজের দখলে আনিয়া ফেলিল। তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র লাভের (প্রথম মহাযুদ্ধ) আশায় ফ্রান্স ও বৃটেন ইতালীর এই ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দখল অনুমোদন করিয়া লইল। পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার স্থানীয় বাসিন্দাদিগকে যেরূপ হিংস্রতা ও নির্মমতার সহিত দমন করিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গদের বসবাস ও ঐশ্বর্য যেভাবে ক্রমাগত বাড়িয়াছে, ইতালীর নূতন সাম্রাজ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

মুসোলিনীর আমলে উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর উপনিবেশগুলিতে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীর কঠোর সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইল। স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইল, ইতালীয় নাগরিকদের সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়া গেল, মরুভূমির পুনরুদ্ধার করা হইল, দুর্গ, বিমানঘাঁটি এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ ধরিয়া নূতন-নূতন সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত নবনির্মাণ ও আয়োজনের পিছনে ইতালীর জাত্যাভিমানের প্রেরণা ছিল—সেই ১৮৯৬ সালের আদোয়া যুদ্ধের শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসোলিনী ১৯৩৫-৩৬ সালে আবিসিনীয়া আক্রমণ ও দখল করিলেন। এভাবে পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। লিবিয়া, এরিত্রিয়া, আবিসিনীয়া, সোমালিল্যান্ড—এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় আড়াই লক্ষ এবং এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নেটিভ ও ইতালীয়সহ মোট ৪ লক্ষেরও বেশী সৈন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরে উৎকৃষ্ট বন্দর ও নৌঘাঁটি স্থাপিত হইল।

তখন ১৯৪০ সালের জুন মাস। ইতালী পরাজিত ফ্রান্সকে পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছে এবং ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে নিঃসঙ্গ বৃটেন বিপন্ন — সর্বদাই হিটলারী আক্রমণের মুখে। লোভী মুসোলিনীর পক্ষে এই সুযোগ। ভুলের ধারণা হইল ফ্রান্স তো ধরাশায়ী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনও আসন্ন। সুতরাং মিশর, বৃটিশ সোমালিল্যান্ড, ও বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা—বহু দূর বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি মালিক হইবেন। এত বড় সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ী সীজারের পর আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাউন্ট শীয়ানো (ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এই অবস্থার দিকে তাকাইয়াই বলিয়াছিলেন—৫ হাজার বছরেও এমন সুযোগ আর মিলিবে না।(২)

১৯৪০ সালের শেষ ভাগ থেকে ভূমধ্যসাগরের নীল বারিরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তার তরঙ্গে-তরঙ্গে যেন রণ-ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। এই সাগরের রণনৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ, এর চারি পাশে যে সমস্ত দেশ, যেমন উত্তর আফ্রিকা, মিশর, বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং মধ্যপ্রাচ্য, আর সেই সঙ্গে খাস ভূমধ্যসাগরের জলপথ —এই বিশাল এলাকা ছিল পুরাতন ও নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষতঃ বৃটেনের কাছে তো এই অঞ্চল ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ডের তুল্য। কারণ, জিব্রাল্টার, মাল্টা ও সুয়েজ খাল দিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে হাজার-হাজার মাইল দূরবর্তী ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে দূরপ্রাচ্যের সিঙ্গাপুর অবধি, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশপথ। সুতরাং এক কথায় এটা বহু দূর বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'লাইফ লাইন' বা প্রাণপ্রবাহের মত। এই প্রাণপ্রবাহের উপর লোভার্ত দৃষ্টি ছিল মুসোলিনীর ইতালী। আরও মনে রাখা দরকার যে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ দিকে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, মিশর ও সুয়েজ খাল কিম্বা লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এরিত্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ইত্যাদি। অথবা উত্তর দিকে গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া কিম্বা পূর্ব দিক মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি সমস্তই ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতির অন্তর্গত এবং যদিও ভৌগোলিক বিচারে এগুলি যাহাতঃ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন, তথাপি রণনীতির বিচারে এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ধরা যায়।......

১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ফরাসী ও বেলজিয়ান উপনিবেশগুলি মোটামুটি মিত্রপক্ষের দলে থাকিয়াই 'স্বাধীনতা' রক্ষা করে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিশর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা ও অতলান্তিক মহাসমুদ্র হইতে মধ্য আফ্রিকা হইয়া ভারত মহাসাগর পর্যন্ত মিত্রপক্ষের বিমানপথের যোগাযোগ অব্যাহত রহিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজখাল দিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ও সংক্ষিপ্ততম যোগাযোগের জলপথ বিপন্ন হইল। ফ্রান্সের পতনের পর ইতালী দ্রুত আঘাত হানিয়া এই ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য দখল করিতে চাহিল। তখন থেকে ১৯৪০ সালের মে মাস পর্যন্ত বৃটিশ জাহাজগুলিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের দিকে যাইতে হইত। তখন বৃটেনের ঘোরতর দুর্দিন—ইংলণ্ডের উপর জার্মানীর ভয়াবহ বিমান অভিযান চলিতেছে এবং ইংরাজ জাতি আত্মরক্ষার সঙ্কটে বিব্রত। ইতালী উত্তর ও পূর্বের দুইটি আর্মি সহ মোট প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিল—ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ট্রাক ইত্যাদি আধুনিক গতিশীল যুদ্ধের বাহনগুলি একত্র করা হইল। আফ্রিকায় ইতালী এক সুবৃহৎ সাঁড়াশীর চাপ অনুসরণের জন্য উদ্যোগী হইল। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার 'ভাইসরয়' ডিউক অফ অ্যাওস্টার অধীন একটি আর্মি মিশরে অভিযান করিতে চাহিল দক্ষিণ দিকের ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা হইতে এবং মার্শাল রডলফো গ্রাৎসিয়ানীর অধীন আর একটি আর্মি উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া হইতে পূর্বদিকে মিশর অভিমুখী অগ্রসর হইতে চাহিল। অর্থাৎ দুইদিকের চাপে মিশর দখল করাই ছিল মুসোলিনীর উদ্দেশ্য। এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন জোড়াতালি দিয়া মোট মাত্র ৭৫ হাজার সৈন্য সমবেত করিল—যাদের বলা যাইতে পারে 'সাম্রাজ্য বাহিনী'। কেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং বৃটেন—সাম্রাজ্যের এই সমস্ত অংশ হইতেই সৈন্যদল সংগৃহীত হইল। অস্ত্রবলের মধ্যে তাদের সম্বল ছিল কিছু পুরানো এরোপ্লেন এবং দুই শতেরও কম হাল্কা ট্যাঙ্ক। জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল (যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি এবং তারও পরে ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়াছিলেন) এই সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লিবিয়া ও আবিসিনিয়ার ইতালীয় সৈন্যরা পরাজিত ও নষ্ট হইল। যদিও পরবর্তীকালে এই যুদ্ধ চলিল প্রধানতঃ জার্মান সেনাপতি রোমেলের সঙ্গে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া।

১৯৪০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লিবিয়ার মরুভূমি হইতে ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মিশর আক্রমণ করিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, লিবিয়া ও মিশর উভয়ের সীমানা মিশিয়া গিয়াছে এই মরুভূমির অন্তহীন উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে এবং একমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছাড়া যোগাযোগের কোন উৎকৃষ্ট পথ ছিল না। এখানে তোব্রুক ও সিদিবারানীর প্রায় মধ্যস্থলে উভয়ের সীমান্তের সংযোগ। লিবিয়ার পশ্চিমে টিউনিসিয়া, কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের জন্য এই পশ্চাদ্ভাগ সম্পর্কে ইতালী নিশ্চিন্ত ছিল। ইতালীয় সৈন্যেরা মিশরের সীমানা পার হইয়া সিদিবারানী পর্যন্ত পৌঁছিল এবং সেখানে ঘাঁটি আগলাইয়া রহিল, যদিও বৃটিশের আত্মরক্ষার প্রধান ব্যূহ ছিল মার্সা মাত্রুত—সমুদ্রোপকূলের এই স্থানটি রাস্তা ও রেলওয়ের সংযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য।

গ্রাৎসিয়ানির সৈন্যেরা মরুভূমি এড়াইয়া যথাস্থানে সমুদ্রোপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং ইতালীয়দের সরবরাহ লাইন বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু মুসোলিনী ইতালীয় উপকূল ভাগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তার নৌবহরের অধিকাংশই ইতালীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তস্থিত টারান্টো নৌঘাঁটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া ১১ই নভেম্বর ১৯৪০ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সেই নৌবহর আক্রমণ করিলেন।

(২) The Second World War — Churchill Vol. 3, P 70-72.

ইলাস্‌ট্রিয়াস নামক বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ থেকে ১২টি বিমান পর পর দুই সারিতে উড়িয়া গিয়া ইতালীয় নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইল টর্পেডোযোগে। সেদিনের মহাযুদ্ধে বিমান থেকে টর্পেডোযোগে জাহাজ আক্রমণের প্রথম ঘটনাবলীর মধ্যে এটিই ছিল অন্যতম এবং এর সাফল্যও ছিল অপরিহার্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টেরেন্টো নৌপোতাশ্রয় অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। ৬টি ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটেলশিপের মধ্যে তিনটি ধ্বংস হইয়া গেল এবং আরও দুইটি ক্রুজার ও দুইটি সাহায্যকারী জাহাজও খতম হইয়া গেল। মাত্র দুইটি বৃটিশ প্লেন নষ্ট এবং একজন অফিসার নিহত হইল এই বড় আক্রমণে। বৃটিশ নৌ-শক্তির হাতে এভাবে মার খাইয়া ইতালীয় নৌবহর নিরাপদ দূরে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ভূমধ্যসাগরের জলপথে বৃটিশ নৌ-শক্তির কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

• •

১৯৪০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জেনারেল ওয়েভেলের সাম্রাজ্যবাহিনী সিদিবারানীতে ইতালীয়দিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল এবং বৃটিশ পক্ষে যুদ্ধের রণকৌশলী জেনারেল ও'কনোর তাদের লিবিয়ার উপকূল ভাগ ধরিয়া তাড়াইয়া লইয়া গেল। দুই মাসের মধ্যে এল সোলুম, বার্দিয়া, তোব্রুক এবং বেনগাজী সাম্রাজ্য বাহিনীর দখলে আসিল। বেনগাজী হইতে পলায়মান ইতালীয়দিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জেনারেল দক্ষিণ-পশ্চিমে এল মেকিলি হইতে মাত্র ২৫টি ট্যাঙ্কসহ একটি মোটরাশ্রিত সৈন্যদল ১৫০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। ইতালীয়দের পৌঁছিবার মাত্র দুই ঘণ্টা আগে সাম্রাজ্য সৈন্যরা সেই ঘাঁটিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ইতালীয় বাহিনী ফাঁদে পড়িল। বৃটিশ পক্ষের হাতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইতালীয় বন্দী হইল, এবং এই দ্রুত অগ্রগতিতে সাম্রাজ্য সৈন্যদলের মাত্র ৬০৪ জন লোক খোয়া গেল। এল আঘেইলা পর্যন্ত লিবিয়ার পূর্বার্ধ বা সাইরেনিকা দখল হইল—১৯৪১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী।

আফ্রিকায় নূতন সাম্রাজ্য জয় করিতে গিয়া মুসোলিনীর এই পরিণাম! ইতালীয় সৈন্যদের রণকৌশলে বহু ত্রুটি ছিল, তাদের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, বিমানগুলি মাটিতেই ধ্বংস হইয়াছিল এবং তারা বহুপ্রকার ভুল করিয়াছিল। উপকূলবর্তী প্রত্যেকটি শহরকে তারা কামান, কাঁটাতার ও ট্যাঙ্ক-মারা খাদের দ্বারা কেল্লায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ গতিশীল রণকৌশল অনুসরণ করিয়া ইতালীয়দের এই সমস্ত কেল্লা মাটি করিয়া দিল। তারা দ্রুততা, অতর্কিত আঘাত এবং প্রয়োজন মত ধাপ্পা দেওয়ার কৌশল বুদ্ধি সহকারে অনুসরণ করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম ট্যাঙ্ক ও ট্রাক এবং সাঁজোয়া গাড়ী বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে সমুদ্রের যুদ্ধজাহাজের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিল, যাহা ইতালীয়দিগকে বেকুব বানাইয়া দিল।

কেবল লিবিয়া নহে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় আবিসিনিয়ারও অনুরূপ দশা হইল। এরিট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়ার দুই লক্ষ ইতালীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়েভেল মাত্র ৩০ হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারিলেন। (৩) বিস্ময়ের কথা এই যে, লিবিয়ার জয়লাভের পর জেনারেল ওয়েভেল এই সামান্য সৈন্যশক্তির সাহায্যেই ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় মুসোলিনীর সাম্রাজ্যকে ধ্বংসসাৎ করিয়া দিলেন। গতিশীল যুদ্ধ, অতর্কিত আক্রমণ এবং নৌবহর ও বিমান বহরের সহযোগিতায়ই ইহা সম্ভব হইল। আর ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল শ্রেষ্ঠতর রণনীতি এবং দ্রুত আঘাত হানিবার রণকৌশল। ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় পশ্চিম সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ মাইল, সমুদ্র-তীরের দৈর্ঘ্যও অনুরূপ। আর এই বিচিত্র ভূভাগের ভৌগোলিক অবস্থাও অতি বিসদৃশ—মরুভূমি, দুর্গম ঝোপজঙ্গল, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপ, খাড়া পাহাড় এবং মাইলের পর মাইল আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, জলহীন দুর্গমদেশ! সুতরাং এখানকার সংগ্রামকে পেট্রোল ও জলের যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। (৪)

এখানে বৃটিশ পক্ষের দ্রুত আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হইল কর্নেল উইনগেটের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ। এর ফলে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ইতালীয়দের হাতে পড়িয়াছিল ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে। কিন্তু ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ পশ্চিম দিকের ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের কাসালো হইতে তারা এরিট্রিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইল এবং ৭ সপ্তাহ অবরোধ যুদ্ধের পর ২৭শে মার্চ কেরেনের পার্বত্য দুর্গ দখল করিল। তারপর তারা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া আসমারা এবং লোহিত সাগরের মাসাওয়া বন্দর অধিকার করিল। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে বাণিজ্য সৈন্যেরা পূর্ব আফ্রিকায় কেনিয়া হইতে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল এবং ১০ দিনে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিয়া মোগাদিসু দখল করিল। মোগাদিসু হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা ওয়েবি সেবেলি নদী উপত্যকা ধরিয়া আবিসিনিয়ার ভিতর ঢুকিল ও জিজিগা দখল করিল। ১৭ই মার্চ জিজিগা অধিকৃত হইল। এদিকে ১৬ই মার্চ নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর এক্য আক্রমণে এডেন উপসাগরের বারবেরা বন্দর দখল হইয়া গেল এবং এভাবে জিজিগা ও বারবেরার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। জিজিগা হইতে হারার হইয়া তারা আদ্দিস আবাবার দিকে অগ্রসর হইল এবং ৫ই এপ্রিল আবিসিনিয়ার রাজধানীর পতন হইল। এভাবে ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য স্থানও যেন চক্ষুর নিমিষে দখল হইয়া গেল এবং আম্বা আলাগির পতনের পর ১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা একণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে গিয়াছে। এটাই ছিল সেদিনের মহাযুদ্ধে বৃটেনের সব চেয়ে বড় জয়।

মুসোলিনীর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে যে আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়া ফ্যাসিস্ট নায়ক মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করিতেছিলেন, সেই রাজ্যই প্রথম গ্রাসচ্যুত করিল এবং সম্রাট হাইলে সেলাসী বৃটিশের সহযোগিতায় ২০শে জানুয়ারী তাঁর রাজধানী আদ্দিস আবাবায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু মুসোলিনী হারিলেও হিটলার হটিবার পাত্র নহেন। অক্ষশক্তির প্রোটেক্টের খাতিরেই হিটলার মুসোলিনীকে আফ্রিকা ও বলকান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এমন একজন প্রতিভাশালী দক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন, যাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক ইতিহাসকে বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁর নাম জেনারেল এরাইন রোমেল।

১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জেনারেল রোমেল বিখ্যাত আফ্রিকা কোরের অধিনায়ক রূপে লিবিয়ায় প্রেরিত হইলেন। এই বাহিনীতে ছিল দুইটি সংখ্যামপটু সাঁজোয়া ডিভিসন, উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া ইহারা গঠিত ছিল। এই ১৫নং ও ২১নং ডিভিসনে আট হাজার করিয়া সৈন্য এবং ১০৫টি করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল, আর ছিল ৯০নং হাল্কা পদাতিক ডিভিসন। রোমেলের নেতৃত্বে ট্যাঙ্কের অপরিসীম কৃতিত্ব দেখাইয়া এই সেনারা মরুভূমি যুদ্ধের নূতন ইতিহাস রচনা করিল। জার্মানীর নূতন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই সংগ্রামে প্রয়োগ করা হইল এবং প্রকাশ যে, হ্যামবুর্গের ট্রপিক্যাল ইনষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এজন্য বিশেষ ধরণের সাজসরঞ্জাম এবং মরুভূমির বালি ও উত্তাপের উপযোগী খাদ্য, পোষাক, আশ্রয় এবং ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল। মন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের প্রতিষেধক সাজসজ্জায় রোমেল বাহিনী প্রস্তুত হইয়া আক্রমণে অবতীর্ণ হইল। আর ইহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিল ৭ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য—ইহার মধ্যে এক ডিভিসন ছিল ট্যাঙ্ক এবং ইহারা প্রধানতঃ রোমেলের যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এবং তারা রোমেলেরই পরিকল্পনাধীন ছিল।

(ক্রমশঃ)

(3) 'The World At War' — page 70 U.S.A. 1945

(4) From Tobruk to Smolensk — by Strategicus P. 16.

চলচ্চিত্রে প্রতীকের ব্যবহার

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য, চিত্রকলা বা অন্যান্য সুকুমার শিল্পে প্রতীকের প্রয়োগ যেমন ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি চলচ্চিত্রেও এর সুষম ব্যবহার ভাব-দ্যোতনায় দার্শনিক তাৎপর্যে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। চলচ্চিত্রের প্রতীক প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিবাহিত হলেই তা অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়।

সব কলাশিল্পের মধ্যেই কিছু না কিছু বিমূর্তন বা ভাবময়তা (অ্যাবস্ট্রাকশন) আছে। শিল্পের অভিব্যক্তিতে সবটুকু প্রকাশ পায় না। কিছুটা অনুক্ত, কিছুটা অদৃশ্য থাকে। এই ফাঁকটুকু ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনায় পূরণ করে দেবার দায়িত্ব পালন করে প্রতীক। কবি ইয়েটস্ যথার্থই বলেছেন,

'A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence'.

প্রকৃতপক্ষে 'আর্ট'-এর ব্যঞ্জনাই নির্ভর করে 'সিম্বল' বা 'ইমেজ' সৃষ্টির ওপর। এবং কলাকৌশলীর অলঙ্কারই হল এই প্রতীক। এ নইলে শিল্পের কোন লাবণ্যই থাকে না। আর একটু ঘুরিয়েও বলা চলে যে, 'ডাইরেক্টকে ইনডাইরেক্টলি' প্রকাশ করার মধ্যেই থাকে আর্ট সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এই 'ইনডাইরেক্টলি' দেখানো মানেই 'সিম্বল'-এর প্রয়োগসাধন। মনের ক্ষণিক উল্লাস বোঝাতে আকাশে আতস বাজির ফুল ফোটানো যতখানি ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনায় মনে রেখাপাত করে, ততখানি নিশ্চয়ই করে না যদি সেই উল্লসিত ব্যক্তিকে ধেই ধেই করে চোখের সামনে নাচতে দেখি।

চলচ্চিত্রে সার্থক প্রতীকের প্রয়োগ নির্ভর করে চলচ্চিত্রকারের পরিণত শিল্প-প্রজ্ঞার ওপর। এই প্রজ্ঞার অভাবের দরুনই অনেক পরিচালককে যত্র তত্র সিম্বল ব্যবহার করতে দেখা গেছে, যেখানে এসবের কোন আবেদন সৃষ্টির অবকাশই থাকে না। স্থূল প্রতীকের ব্যবহারে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য হানিও করে থাকেন অনেকে। প্রতীক ব্যবহারে লক্ষ্য রাখা উচিত, কখনও তা কষ্ট কল্পনায় আরোপিত হচ্ছে কি না। কারণ, কষ্টকল্পিত বা উদ্ভট অথবা অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত প্রতীক কখনও রসাবেদন সৃষ্টিতে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে না।

প্রতীক ব্যবহারের বিন্যাসগত বিশেষ প্রবণতাটুকু অনেক সময় চিত্র-পরিচালকের শিল্পী মানসিকতাকেও উদ্ঘাটন করে দেয়। কোন নৈরাশ্যপীড়িত পরিচালক তাঁর ছবিতে প্রায়ই মরা ব্যাঙ বা টিকটিকি অথবা ঐ জাতীয় কিছু প্রতীক ব্যবহার করেন কিংবা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর রক্তাক্ত দেহের প্রতীকী প্রয়োগ করেন। তাঁদের ছবিতে বক্তব্য প্রায়শঃই নেতিবাচক অবশ্য। আবার আশাবাদী প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকার তাঁদের ছবিতে হয়তো সূর্যের আলো, কচিপাতা, প্রস্ফুটিত ফুল, আকাশবিহঙ্গী, শিশুর মুখ ইত্যাদি প্রতীকের ব্যবহার করতে পছন্দ করেন বেশী। অবশ্য প্রতীকের প্রয়োগসিদ্ধি ঘটে বিষয়বস্তুর সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই। এবং সামান্য দু'একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক ব্যবহারে বক্তব্যের জোরালো প্রকাশ ঘটে তীব্র ভাব-দ্যোতনায়, যা হয়তো সম্ভব হয় না অনেক অনেক সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়েও।

আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক' ছবিতে ধর্মঘটের কর্মবিরতি প্রত্যক্ষ রূপ নিয়েছে পর্দায় স্তব্ধ কারখানার ধোঁয়াবিহীন চিমনির ক্লোজ-শটে। 'অক্টোবর'-এ নিধন লীলার বীভৎসতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কসাইখানার পশুহত্যার রক্তাক্ত প্রতীকের আশ্রয়ে। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এ অত্যাচারের প্রতিবাদে পোটেমকিনের কামান গর্জে ওঠার পর মুহূর্তেই 'কাট্' করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভংগীর সিংহের ভাস্কর্যমূর্তি পর পর তিনটি ক্লোজ-শটে অতি দ্রুততায় দেখিয়ে জনমনে বিদ্রোহের পূর্বাভাসকে বোঝানো হয়েছে আশ্চর্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। এ জাতীয় 'শক্ এফেক্ট্' আইজেনস্টাইন আরও বহু ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছেন বিস্ময়কর [illegible]।

চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাশ' ছবিতে ক্ষুধার্ত জিমের চোখে চ্যাপলিনের মোরগ হয়ে যাওয়ার প্রতীকী কল্পনা কিংবা 'মঁসিয়ে ভের্দুর' প্রথম দৃশ্যেই মতলবী নারীঘাতী নায়কের ফুলবাগানে গোলাপফুল গন্ধে মোহিত হওয়া ও কাঁচি দিয়ে ফুলগুলি ছিন্ন করার নিষ্ঠুর উল্লাস সকৌতুকে দেখিয়ে সমগ্র চরিত্রকে ইংগিতময়তায় প্রকাশ করা অথবা 'লাইম লাইট'-এ ক্যালভেরোর মৃত্যুর পর মঞ্চে নর্তকীর অবিরাম নৃত্যলীলায় 'ইমেজ' ব্যঞ্জনা মনকে অবাক না করে পারে না। গুরুর মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকার যার, তার তো থেমে থাকা চলে না। আরব্ধ কাজ তাকে শেষ করতেই হবে। গুরুর সাধনাকে দিতে হবে ব্যাপ্তি। এভাবেই মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবন এগিয়ে চলেছে। চ্যাপলিনেরই মুখের কথা— 'Progress is [illegible].' এই মহৎ বাণীটি ছবির শেষ পর্বে যে 'সিম্বলিক' সোচ্চার মূর্ত হয়েছে, তা সত্যিই ভোলবার নয়।

মুরনোর 'সানরাইজ' ছবিতে ঝড় তুফানকে আশ্চর্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করা হয়েছে। হীন ষড়যন্ত্রের পাপচক্রে লিপ্ত স্বামী যখন নিষ্পাপ সরলপ্রাণা স্ত্রীকে হত্যা করতে অগ্রসর, তখন তার মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতকে অপূর্ব শিল্পীর ছোঁয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে নদীবক্ষে প্রচণ্ড তুফান আর দুর্যোগের দৃশ্য পরিকল্পনায়। কার্ল ড্রেয়ার পরিচালিত 'দি প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক' ছবিটিতে মানুষের মুখের 'ক্লোজ-আপ' যে কতখানি প্রকাশধর্মী হতে পারে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন স্বাক্ষরিত আছে। জোয়ান যখন সান্ত্বনার জন্য পাদ্রীর দিকে মুখ তুলল, তখন পাদ্রী ধীরে ধীরে মুখ নীচু করল। এই দ্বন্দ্ব 'ক্লোজ-আপ'-এর ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপকল্প তীব্র আবেদন সঞ্চার করে।

ডি সিকার 'দি বাইসাইকেল থীফ' ছবিতে কর্মজীবনের ঘটনাচক্রকে 'ক্লোজ-আপ'-এ সাইকেলের চাকার সংগে প্রতীকায়িত করা, আন্তোনিওনির 'ব্লো-আপ'-এ ফটোগ্রাফগুলির সাহায্যে হত্যারহস্যের উন্মোচন ইত্যাদি চলচ্চিত্রের দৃশ্যার্থটাকে শিল্প-তাৎপর্যে চিহ্নিত করেছে নিখুঁতভাবে। ফেলিনির 'লা দোলচে ভিতা' ছবিটির শেষ দৃশ্যে ভয়ংকর এক সামুদ্রিক দানবের বীভৎস চেহারাকে প্রতীকায়িত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার কলুষিত পাপাচারকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ক্লেদকর দৃশ্যধর্মী ব্যঞ্জনায়।

ত্রুফো পরিচালিত 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ' ছবির উৎকণ্ঠিত অন্তিম মুহূর্তে দ্রুত ধাবমান কিশোরটির সম্মুখে প্রচণ্ড তরংগাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে অকস্মাৎ 'ফ্রিজ' করে দিয়ে যে রূপকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা আমাদের রীতিমত হতবাক করে দেয়। কুরোসাওয়ার 'রশোমন' ছবিটিতে অবিরাম অন্তহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রাচীনকালের 'মীথ্'-এর স্তর থেকে এ যুগের পাপ আর গ্লানিতে সৃষ্ট নরকের অশুভ ইংগিতে রূপান্তর সাধনও রসাবহ।

বার্গম্যানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হল 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ'। ছবির টাইটেলটিই হল প্রেম ও প্রশান্তির প্রতীক। কিন্তু ছবিটির প্রারম্ভেই এক ভয়াবহ স্বপ্নের ইমেজে প্রধান চরিত্র অধ্যাপকটির মানসিক জগৎকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে অপূর্ব নৈপুণ্যে। মৃত দণ্ডায়মান বিকৃত মুখ মানুষ, শবাধার ভেঙে পড়ে যাওয়া, মাথা থেকে রক্ত পড়া, কাঁটাহীন ঘড়ি, খাঁ খাঁ শূন্য শহর, মৃতদেহ, [illegible]—এই সব খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের যোজনায় মনের নৈরাশ্য, অন্তঃসারশূন্যতা ও আত্মিক মৃত্যু অভিব্যক্ত হয়েছে। গাড়ীর মধ্যে স্বপ্ন-প্রতীকে অধ্যাপকের অপরাধ-চেতনা, বিজ্ঞানসাধনা ও অতীত জীবনের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে সংগে সংগে বিপরীত ঘটনার উপস্থাপনায় মৃত্যু চেতনা থেকে উত্তরণের ইংগিত দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে বিগতকালের চলচ্চিত্রে বেশ কিছু শিল্পসম্মত চিত্রকল্পের ব্যবহার

CENTRAL LIBRARY

দেখা গেছে, বোর্ডার ভাব-দ্যোতনার উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচায়ক নিঃসন্দেহে এবং প্রমথেশ বড়ুয়াই সে-যুগে সর্বপ্রথম তাঁর ছবিতে এ জাতীয় শিল্পব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রতীকের সার্থক প্রয়োগসাধন করেছিলেন। বড়ুয়ার ছবিতেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি, ডাইরেক্ট কিংবা ইনডাইরেক্ট প্রকাশ নয়, সেই বিশেষ দৈশিক স্টাইলটি এবং দৃষ্টিদীপ্ত শিল্পসুন্দর ইমেজ-এর মাধ্যমে মানব-মন ও চরিত্রের অন্তর্লোককে ফুটিয়ে তোলার সেই অসাধারণ ব্যঞ্জনা। ক্লোজ-আপ, মন্টাজ ও কাট শট-এর মধ্য দিয়ে প্রতীকীময়তা সৃষ্টি করে সে যুগেও তিনি যে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা আগামীকালেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রমথেশের 'রূপলেখা' ছবিতে দেখি, কারাগারে অরূপ গভীর রাত্রে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। একক অরূপের প্রতীক হবে একটি মোমবাতি শুধু অরূপের কাছে জ্বলছে। বাতির শিখা থর থর করে কাঁপছে অরূপের মানসিক অবস্থা চিত্রণের সহায়ক হয়ে। 'দেবদাস' ছবিতে নায়কের মুখের বিগ ক্লোজে ফ্লাশ-ট্রেনের ঘর্ঘর রূপকে ফুটিয়ে তোলা, আর উদ্‌ভ্রান্ততাকে ট্রেনের দ্রুতগতির সঙ্গে একাত্ম করা, ট্রেনের বেসিনে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা দেখে দেবদাসের আর্তনাদ— 'হরিদা, রক্ত', মুহূর্তে ইন্টারকাট কৌশলী শটে দূর হাতিপোতা গ্রামে পার্বতীর হাত থেকে নৈবেদ্যের থালা পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে উভয় মনের একাত্মতা ও সর্বনাশের অশুভ ইঙ্গিত দেওয়া, দেবদাসের মৃত্যু সংবাদে উন্মাদিনী পার্বতীর ছুটে বেরিয়ে আসার মুখে বিরাট সদর দরজাটি ধীরে ধীরে তার সামনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রূপকল্প রচনার বিস্ময়কর দৃষ্টান্তগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই ১৯৩৫ সালেই।

বড়ুয়ার 'গৃহদাহ' চিত্রে অচলার চলে যাবার পর নিঃসঙ্গ একা মহিমের সঙ্গে বিশাল প্রান্তরে একটি তালগাছ লং শটে রূপায়িত করা, 'মায়া' ছবিতে ডবল এক্স-পোজারে সেতারের ওপর আঙুলের নাচ, 'মুক্তি' ছবির শুরুতেই নায়কের একটির পর একটি দরজা খুলে নায়িকার সমীপবর্তী হওয়া, নিজের হাতে স্টুডিও চুরমার করার পূর্ব মুহূর্তে নায়কের দ্রুত পদক্ষেপের ক্লোজ-আপ শট, মুখের বিগ ক্লোজ, কাট করে দুটি মিড শটে রাস্তার ধারে রিক্সাওয়ালা ও শিশুকোলে ভিখারিণীকে দেখিয়ে মন্টাজ সিকোয়েন্স সৃষ্টি, 'অধিকার'-এর সূচনাতেই সুপার ইম্পোজিশন শটে নায়িকার স্বপ্ন দৃশ্যের উপস্থাপনা, নায়কের দ্রুত নিক্ষেপে সৃষ্ট জলাশয়ে তরঙ্গবৃত্তের সঙ্গে মনের ভাব তরঙ্গকে একীকরণ, শেষ দৃশ্যে লতাগুল্মের প্রতীকের আশ্রয়ে নায়িকার পরনির্ভরতাকে প্রত্যক্ষীভূত করা ইত্যাদি সিম্বলিক ব্যঞ্জনার দ্বারা চিত্রে মনের অনেক কথাই সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং ইমেজগুলি হয়েছে আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদায় ধন্য।

দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি' ছবিতে অনুরাধার হৃদয়লালসা রানী লছমীর মনোবেদনাকে সোচ্চার করে ফুটিয়েছে কনট্রাস্ট এফেক্টের দ্বারা। নীতিন বসুর 'জীবনমরণ'-এ উদ্দাম বেহালাবাদককে নায়ক নায়িকার সাময়িক বিচ্ছেদ বেদনার প্রতীকী চাবি হিসেবে হাজির করা হয়েছে। ফণী মজুমদারের 'সাথী' চিত্রে কুন্দর চলে যাবার পর নায়ক মনের হাহাকারকে মুখের ক্লোজ-আপ এবং ঘরের মধ্যে কুন্দর ব্যবহৃত জিনিসগুলোকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মিড শট কাট করে দেখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে' ছবিতে অভিজাতের উচ্চ মিনার থেকে নায়িকার অবতরণ ও জনতার মধ্যে জনান্তিক হয়ে নব অভ্যুদয়ের আলোকিত পথে হেঁটে চলার রূপকল্পটিও সুন্দর।

এ যুগের ছবিতে শিল্পব্যঞ্জনা ধনী চিত্রকল্পের ব্যবহারে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ প্রমুখ চলচ্চিত্রকার বিশেষ নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রতীক ব্যবহার সরল হলেও আবেদন সঞ্চারে অব্যর্থ। তুলনায় ঋত্বিক ঘটকের প্রতীকী ব্যঞ্জনা কিছুটা জটিল হলেও রসোত্তীর্ণ।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পর পুকুরে তার ঘটির গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য ও ছবির শেষে সপরিবারে হরিহরের বাস্তুত্যাগের পর পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িটিতে একটি সাপের প্রবেশ, 'অপরাজিত' চিত্রে হরিহরের মৃত্যু-মুহূর্তে কাশীর গঙ্গাঘাটের এক মন্দিরের স্তম্ভ থেকে এক ঝাঁক পায়রাকে অসীম আকাশে উড়িয়ে দেওয়া, 'অপুর সংসার'-এ অপর্ণার অকাল মৃত্যুতে অপুর [illegible] কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যটির অব্যবহিত পরেই কাট করে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই ব্যাকগ্রাউন্ডে ভাব-দ্যোতনায় তুলে ধরা, 'দেবী' চিত্রে পূজা প্রাঙ্গণে একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়ে কাট করে বলিদানের খড়্গ উত্তোলন ও সেই মুহূর্তে আকাশে আতসবাজির ঝিলিক ফোটানোর মধ্য দিয়ে ছেলেটির আগামী মৃত্যুকে সাংকেতিকতায় প্রকাশ করা, 'জলসাঘর'-এর শেষ পর্বে নদীতটে বিশ্বম্ভরের জীর্ণ পরিত্যক্ত নৌকো ও অপর প্রান্তে নবীন সূর্যের অভ্যুদয়, 'চারুলতা'য় বায়নাকুলারের ব্যবহার ও জুম শটের প্রয়োগ, 'নায়ক' ছবিতে চরম ভোগস্পৃহার অরিন্দমের টাকার পাহাড়ের ওপর স্বপ্নময় বিহার ও ধীরে ধীরে টাকার চোরা ঘূর্ণিতে ডুবে যাওয়া, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির সূচনায় নেগেটিভ ব্যবহারের রূপকল্প ইত্যাদি ছবির শিল্পশ্রীকেই বৃদ্ধি করেছে অভিনব ব্যঞ্জনায়।

ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার'-এ ছিন্ন রেল সংযোগকে বিভক্ত বাংলার প্রতীকরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে পথ চলতে চলতে বালিকা সীতার হঠাৎ বহুরূপীর ভয়ঙ্কর কালীমূর্তির সামনে পড়ে শিহরিত হওয়ার দৃশ্যকল্পনাটুকু অনবদ্য। অকস্মাৎ ঐ কালীমূর্তির আবির্ভাবকে পরিচালক সমগ্র মানব সভ্যতা যে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, তারই প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। আত্মহত্যায় ব্যর্থ ঈশ্বরকে হরপ্রসাদের সঙ্গে এক পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ির পরিবেশের মধ্যে মুখোমুখি দেখিয়ে উত্তর-জীবনের ট্র্যাজেডীকে প্রতিফলিত করা হয়েছে অসামান্য দৃশ্যধর্মিতায়। স্টেশনে অভিরামের মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ইঞ্জিন প্রবেশ ও অপর দিকে নির্বিকার এক শিশুর দোল খাওয়ার দৃশ্য যোজনার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দুর্বিপাক ও ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার প্রতি বহির্জগতের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যকে প্রকাশ করা হয়েছে চমৎকার প্রতীকীময়তায়।

মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ছবিতে নায়কের আদর্শনিষ্ঠ সুশৃংখল জীবনকে সমান্তরাল রেল লাইনের সঙ্গে প্রতীকায়িত করা, তপন সিংহের 'অতিথি' ছবির শেষে নৌকার পালের গায়ে আঁকা এক দুরন্ত হরিণের চিত্রণ মাধ্যমে বাঁধন ছেঁড়া পলাতক তারাপদর মুক্তিকামী চঞ্চলতাকে রূপ দেওয়া, অজয় করের 'মাল্যদান'-এ কুড়ানির মৃত্যু উচ্ছ্বাসকে তারই দুরন্তপনার ক্লোজ-শটকে নদীর তরঙ্গতলে 'মিক্স' করে চিত্রধর্মী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা সত্যিই সুন্দর। তরুণ মজুমদারের 'নিমন্ত্রণ' ছবির শেষ দৃশ্যে লোকটিকে মাটির বুক চিরে ঠেলে নিয়ে জলে নৌকো ভাসানোর প্রতীকটি নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ-মুহূর্তকে বিমূর্ত রূপায়িত করেছে আশ্চর্য ভাব-দ্যোতনায়।

আরও অনেক ছবিতেই শিল্পসার্থক প্রতীক প্রয়োগের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতীক বস্তুটি আসলে কি এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার ছবিকে কি পরিমাণ মাধুর্য দান করে সেটা শুধুমাত্র দৃশ্য ব্যঞ্জনায়, তাই প্রতিপন্ন করতেই দুটি একটি দৃষ্টান্তের শুধু উল্লেখ করলাম এখানে।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকার

এ মাসের বর্তমানে অভিনয় সূচী :
১৮ই ৬টায় তিন পয়সার পালা
১৯শে ২৪ ও ৬টায় তিন পয়সার পালা
২০শে ৬টায় বসন্ত একা
২৫শে ৬টায় তিন পয়সার পালা
২৬শে ২৪ ও ৬টায় হে মহা উত্তাল সময়
[নতুন নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়]
২৭শে ২৪ ও ৬টায় তিন পয়সার পালা
২৮শে ২৪ ও ৬টায় হে মহা উত্তাল সময়
৩০শে শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাকাডেমি : ২১শে মঙ্গলবার ৬টায়

নান্দীকার
অ্যাকাডেমী
অব্ ফাইন আর্টসে

তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
॥ অ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ॥

প্রেক্ষাগৃহ

কিউবার চলচ্চিত্রশিল্প

কিউবাকে আপনাদের মনে আছে ? সেই যে ছোট্ট দ্বীপটি আটলান্টিক সাগরের বুকে ভাসছে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব কোণে ? সেই যে যে-দ্বীপ অভিমুখে যুদ্ধ-জাহাজকে অগ্রসর হতে দেখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে গর্জে উঠেছিলেন : কিউবা থেকে তফাত থাকো ! কিউবাকে কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধবাজ দাবিয়ে রাখতে পারেনি। ফাইডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পতাকাকে উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছে।

সেই কিউবার চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাস কত আর দীর্ঘ হতে পারে? মাত্র দশবারটি বছর পূর্ণ হয়েছে। —কিন্তু এই নবজাত শিশুর শক্তি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়, বিস্মিত হতে হয় এর বিচিত্র বিকাশ দেখে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনের শেষে ১৯৭১-এর ১ মে তারিখে সাম্যবাদী কিউবা সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে ফাইডেল ক্যাস্ট্রো যে-কথা বলেছেন, সে-কথা মনে রাখলে কিউবার ছবির বিস্ময়কর রূপ কি কারণে সম্ভব হয়েছে, তা জানবার কিছুটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন : কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকেদের কাছে যা-কিছু তাদের আনন্দ দেয়, যা-কিছু তাদের জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়, তারই নাকি দার্শনিক মূল্য আছে। কিন্তু যে কর্মী, যে বিপ্লবী, যে সাম্যবাদী তার কাছে এইগুলি শিল্পবিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। তার কাছে কোনো সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক সৃষ্টির মূল্য নিরূপিত হবে জনগণের জন্য তার উপযোগিতা দ্বারা, মানুষকে সে কি দান করল, তার দ্বারা, মানুষের মুক্তি ও সুখের জন্য সে কি দান করে, তার দ্বারা। তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর জনসাধারণকে কাজে লাগাতে চেয়েছি, অগণিত মানুষকে উপার্জনের মাধ্যমস্বরূপ শিল্পসৃষ্টির কাজে লাগাতে চেয়েছি। আমরা যদি জানি, সমস্ত জাতিকে সৃষ্টিশীল করবার সম্ভাবনা আছে, তাদের লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করা যাবে, তাহলে আর চিন্তার কি আছে? সমস্ত জাতি! একেই তো বলি বিপ্লব, এরই নাম তো সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ!

জনশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বর্তমান শতাব্দীতে চলচ্চিত্রই হচ্ছে সর্বোত্তম শিল্পকলা। লেনিন বলেছেন, 'সকল শিল্পকলার মধ্যে চলচ্চিত্রই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।'

আমাদের কাছে শিল্পকলা হচ্ছে বিপ্লবের হাতিয়ার।

কিউবার ছবি মেমোরিজ অফ আন্ডার ডেভেলপমেন্ট-এর একটি দৃশ্য

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ-প্রযোজিত 'প্রবাহ' নাটকের একটি দৃশ্য

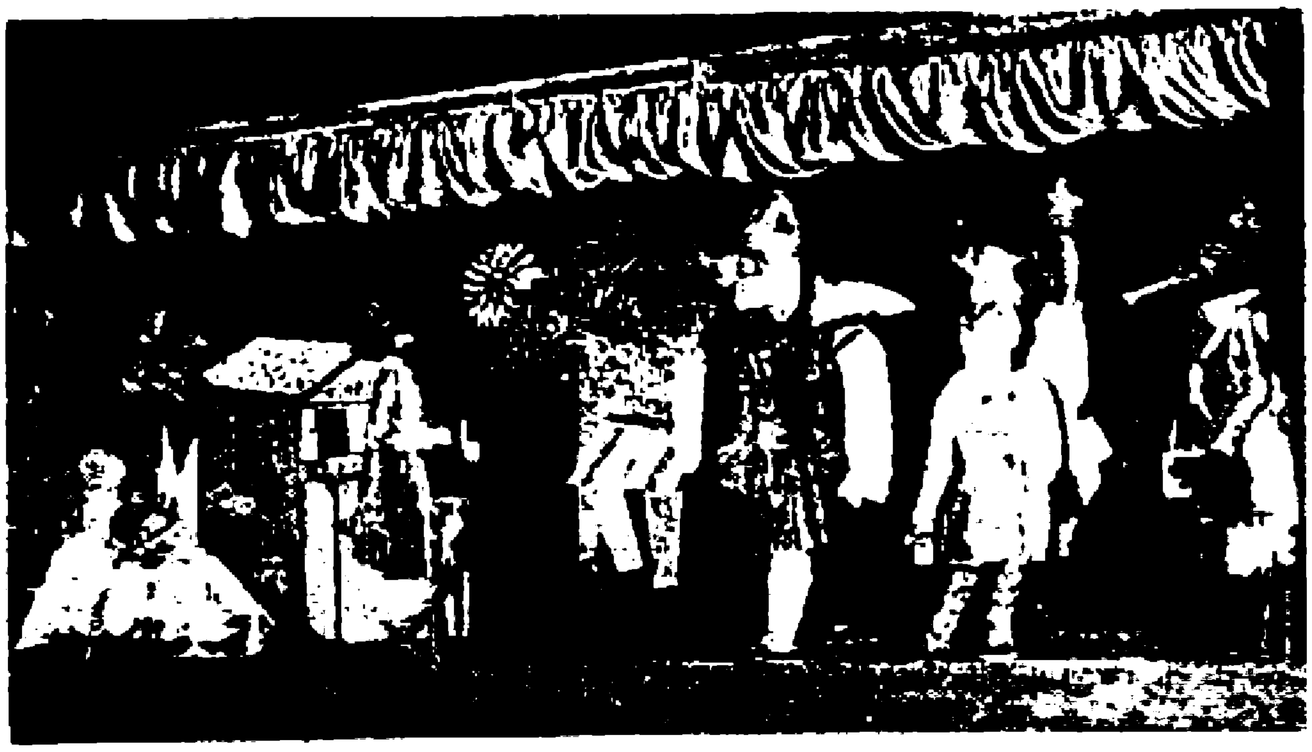

ইউথ পাপেট থিয়েটারের পুতুলনাচের দৃশ্য .

আমাদের জনগণের সংগ্রামী প্রেরণা থেকে তার জন্ম।

শত্রুর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে জন্ম।

●

আমাদের কিউবার সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো অর্জন হোলো এই সামাজিক বিপ্লব।

—শিল্পকলা সম্পর্কে এই বৈপ্লবিক চেতনা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই কিউবার চলচ্চিত্র কি চিত্রগ্রহণ, কি শব্দ-যোজনা, কি সম্পাদনা, কি আবহসঙ্গীত, কি সামগ্রিক পরিচালনা—সব দিক দিয়েই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব।

মাত্র ১৯৫৯ সালের ২৪ মার্চ বিপ্লবী সরকার অনুমোদিত আইন অনুসারে 'কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আর্ট' (আই-সি-এ-আই-সি) স্থাপিত হয়। আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে এইটিই হচ্ছে প্রথম বৈপ্লবিক আইন।

এই আইন বলছে : 'চলচ্চিত্র একটি শিল্পকলা।

এর বৈশিষ্ট্যগুণে চলচ্চিত্র একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করবার এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সচেতনতা বিকশিত করবার একটি যন্ত্র। চলচ্চিত্র গভীরতর ও স্পষ্টতর বৈপ্লবিক মানসিকতার বিকাশে এবং বৈপ্লবিক প্রেরণার পোষণে সাহায্য করতে পারে।

●

চলচ্চিত্রশিল্পের কাঠামো এমনই যে, এর জন্যে একদিকে যেমন উচ্চাঙ্গের কলা-কৌশলের, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক জটিল ব্যবসায়িক সংস্থা ও বিচক্ষণ পরিবেশনার প্রয়োজন।

চলচ্চিত্র বিবেকের কাছে আবেদনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং অজ্ঞতা দূরীকরণে, সমস্যা সমাধানে, সমস্যা পূরণের বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনেও মানবসমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে আধুনিক ও নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

—এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে যথার্থ জাতীয় চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে তুলেছেন কিউবা সরকার এবং প্রথম থেকেই তাঁদের ছবি যাতে আন্তর্জাতিক মান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ত্রুটি করেননি। এর জন্যে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে খুব কড়াকড়িভাবে সুষ্ঠুভাবে। গেল দশ বছর ধরে চলচ্চিত্রকে জাতীয় বিপ্লবের সামিল করে চালনা করবার ফলেই কিউবার চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রজগতে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। কিউবার চলচ্চিত্রশিল্প কিউবাবাসীর শতবর্ষব্যাপী বিপ্লবের সফল পরিণতির সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

কিউবার চলচ্চিত্রকারেরা—পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, চিত্রনাট্যলেখক, সম্পাদক, সঙ্গীত-রচয়িতা—অপর দেশের বিখ্যাত গুণশালী কর্মীদের সঙ্গে কাজ করবার এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। অনেক সময়ে তাঁদের কারুর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। নীতিগতভাবে কিউবার বিপ্লবাত্মক কর্মসূচীর সঙ্গে যোগ রেখে দৃঢ়ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে কাজ চালিয়ে আ-সি-এ-আই-সি (কিউবান ইনস্টিটিউট অব সিনেমা আর্ট) গেল ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে উৎপাদন করেছে :

পূর্ণদৈর্ঘ্য ও মধ্যদৈর্ঘ্য ছবি......	৪৭টি
তথ্যমূলক ছবি............	২০৪ „
শিক্ষামূলক ছবি............	৭৭ „
কার্টুন ছবি...............	৪৯ „
সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক ছবি......	১৪ „
ল্যাটিন-আমেরিকান সংবাদচিত্র......	৪০৫ „

১৯৫৯ ও ১৯৬৯ সালের মধ্যে তৈরী হয়েছিল : দিস ল্যান্ড অব আওয়ার্স, ফরগটেন ল্যান্ড, কুসংস্কার, গৃহসমস্যা, জাতিবৈষম্য, হিস্ট্রি অব এ ব্যাটেল, অ্যান্ড আই বিকেম এ টীচার, এভরি ফ্যাক্টরী এ স্কুল প্রভৃতি।

কিউবান চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। লিপজিগ তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসব এবং লন্ডন, কার্লোভি ভেরী, তাসখন্দ, মস্কো প্রভৃতির আন্তর্জাতিক উৎসব কিউবার চলচ্চিত্রকে স্বীকৃতি দান করেছে।

আই-সি-এ-আই-সির সাংস্কৃতিক বিভাগ হিসেবে ১৯৬০ সালে সিনেমাথেক অব কিউবা স্থাপিত হয়ে আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, দে সিকা, ফোর্ড, রেনী ক্লেয়ার, পুডভকিন, মুর্নো, প্যাবস্ট, রোসেলিনী, ফ্রিজ ল্যাং, অর্সন ওয়েলস্, কুরোসাওয়া, ভিগো, সিয়োস্ট্রোম, বুনুয়েল, জিগা ভের্তভ, আইভেন্স, বের্গম্যান, হিচকক, আন্তোনিওনি, জোসেফ লোসি, বার্দেম, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ছবি সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে কলকাতায় কিউবা চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

স্টুডিও থেকে

পুজোয় 'ছোটি বহু' :

শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র হিন্দী রূপ 'ছোটি বহু' নামে মুক্তিলাভ করছে কলকাতায় দুর্গাপুজোর মরসুমে। তিলক প্রোডাকসন্স নিবেদিত, শালিমার গোয়েঙ্কা ও সিন্ধু দত্তরাণী প্রযোজিত এই ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবিটির পরিচালনা করেছেন কে বি তিলক। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, নিরূপা রায়, শশিকলা, আই এস জোহর, মাস্টার সুরজ, ছোট মেহমুদ, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী, মধুমতী প্রভৃতি শিল্পী। সুরযোজনা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। চিত্রনিকেতন ছবিটির পরিবেশক।

পরলোকে জয়কিষেণ :

বিখ্যাত সুরকার-জুটি শঙ্কর-জয়কিষেণ-এর অন্যতম জয়কিষেণ পাঞ্চাল কিছুদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসিত হবার পরে ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

জয়কিষণের জন্ম হয় বুলসারে। চলচ্চিত্রজগতে যোগ দেবার আগে তিনি পৃথ্বিরাজ কাপুর পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত 'পৃথ্বী থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৃথ্বিরাজ-পুত্র রাজকাপুরের আগ্রহে তিনি চলচ্চিত্রজগতে পদার্পণ করেন এবং 'বরসাৎ' ছবিতে প্রথম সঙ্গীত-পরিচালনা করেন।

তাঁর স্ত্রী ও তিনটি সন্তানকে শোকসাগরে ভাসিয়ে তিনি অকালে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রেম ও অপ্রেম

একটি প্রেমের জটিল বিবর্তনকে কেন্দ্র করে চারজন মানুষের চতুষ্কোণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'প্রেম ও অপ্রেম'র চিত্র কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় ভার নিয়েছেন বিমল ভৌমিক। প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে স্প্যান প্রোডাকসন্স। আসছে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ছবিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের সুটিংয়ের প্রধান শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন মাধবী চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নির্মলকুমার ও স্বপন রায়। ছবিটির অধিকাংশই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে।

'খুঁজে বেড়াই' : পুজোর আকর্ষণ

এই দশকের জীবন-যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে শীতালি পিকচার্স নিবেদিত 'খুঁজে বেড়াই' পুজো-আকর্ষণরূপে রূপবাণী,

ষ্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সন্তোষ দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, সত্য বন্দ্যো, রেণুকা দাস, কুমারী মিঠু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র চট্টো।

ভারতী ও অরুণায় মুক্তিলাভ করবে। ছবির কাহিনীকার সলিল দত্তই চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সংগীত, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপকার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শোভা সেন এবং জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস বি ফিল্মস।

মহাপূজায় মাতৃ-আবির্ভাব : 'ত্রিনয়নী মা'

রূপকথি চিত্রে নিবেদিত দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বনে 'ত্রিনয়নী মা' মহাপূজার প্রাক্কালেই মুক্তি পাচ্ছে। ভক্তিরসাপ্লুত ছবিটির প্রযোজনা করেছেন হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিচালনার দায়িত্ব পূর্ণেন্দু রায়-চৌধুরীর। সংগীত পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপ এবং সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অনিল বাগচী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস ও নবাগতা রূপা ছবির প্রধান শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যেঃ দেবপ্রিয়া (মাদ্রাজ)।

ছবিটির পরিবেশনা করছেন এ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মঞ্চাভিনয়

সাম্য

দঃ কলকাতার 'সাম্য' গোষ্ঠী গেল ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার 'মুক্ত অঙ্গনে' দুটি একাঙ্ক নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করালেন। প্রথমটি অমিয় মিত্রের 'রিদম' এবং দ্বিতীয়টি সুভাষ বসুর 'মিছিল'।

নোয়া র‍্যাটক্লিফের 'উই গট রিদম' নাটক অবলম্বনে রচিত এই 'রিদম' নাটকে বর্তমান যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখক যে, যুগোপযোগী বক্তব্য তুলে ধরেছেন, প্রতিটি চরিত্রের ভিতর দিয়ে সেই বক্তব্য খুব স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে অভিনেতারা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

কিছু 'টেকনিক্যাল' ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ অভিনয়ের দরুণ সেগুলি দর্শকদের কাছে প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। বিশেষ ভাবে সুজনের ভূমিকায় সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, বৃদ্ধের ভূমিকায় সজল ঘোষ এবং আদর্শবাদীর ভূমিকায় প্রীতিনাথ চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয়। সলিল মুখোপাধ্যায় নাটকটির নির্দেশনা দেন।

কলকণ্ঠ/বাবলা/পরিচালনা : বিজয় ভাট্ট ফটো : অমৃত।

[illegible] জিজ্ঞাসা/উত্তমকুমার এবং কুমার রায়। পরিচালনা পীযূষ বসু। ফটো : অমৃত।

সীমাবদ্ধ/বরুণ চন্দ ও শর্মিলা ঠাকুর/পরিচালনা : সত্যজিৎ রায় ফটো : অমৃত।

অপর নাট্য প্রযোজনা সুভাষ বসু রচিত 'মিছিল' নাটকটির মধ্য দিয়ে লেখক সম্প্রতিক কালের বিভিন্ন সমস্যার কথা সুন্দর ভাবে পেশ করেন। অভিনয় দক্ষতায় নাটকটির মূল বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকতার সঙ্গে দর্শকগণের মন জয় করতে সক্ষম হয়।

দক্ষতার পরিচয় দেন মধুর ভূমিকায় মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাঘবের ভূমিকায় শম্ভু ভট্টাচার্য এবং সতীশবাবুর ভূমিকায় সুনীল মুখোপাধ্যায়। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীপ্রীতি প্রতিম।

ক্রান্তি থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা 'সওয়াল'

'মৃত্যুহীন' নাটকটির অভাবনীয় সাফল্যের পর ক্রান্তি থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা 'সওয়াল' মঞ্চস্থ হবে মুক্তাঙ্গনে আসছে ২৪ সেপ্টেম্বর ও ১৫ নভেম্বর। ১৯২১ সালের ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পট ভূমিকায় রচিত নাটকটির নির্দেশনায় আছেন নিমাই ঘোষ।

স্টেট ব্যাঙ্ক (হাওড়া শাখা) দ্বারা "সাহেব-বিবি-গোলাম"-এর অভিনয়

সম্প্রতি বিমল মিত্রের বহু পঠিত জনপ্রিয় উপন্যাসের এক সুন্দর নাট্যরূপ উপহার দিলেন "স্টেট ব্যাঙ্ক" এর (হাওড়া শাখা) সভ্যবৃন্দ 'স্টার রঙ্গালয়ে'।

শিল্পীদের দলগত অভিনয়ের ফলে নাটকটির পরিবেশনা খুব উচ্চাঙ্গের হয়। কয়েকটি দৃশ্যের উপস্থাপনায় পরিচালক কালী যে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সঙ্গীতের সুকল্পিত ব্যবহার সত্যই চমৎকার।

অভিনয়াংশে প্রথমেই কৃতিত্বের দাবী রাখেন পটেশ্বরীর চরিত্রে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীর কণ্ঠের গান এদিন নাটক পরিবেশনার অন্যতম বিশেষ অংশ বলে অভিহিত করা যায়। এরপরেই ভূতনাথ চরিত্রাভিনেতা বিভাস রায়চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই চরিত্রে তিনি যে ভাবরসের সৃষ্টি করেন তা সত্যই অনবদ্য। এরপরেই শশাঙ্ক রায়-চৌধুরীর (কৌস্তভমণি) ও সুধীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (পটুকা) উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। কমলেশ মুখোপাধ্যায় (বংশী), সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সুবিনয়বাবু) ও রেণু বসুমল্লিকের (মেজবৌ) অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়। অন্যান্য চরিত্রে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিমিরবরণ দত্ত সুঅভিনয় করেন।

অগ্রগামীর 'কেদার রায়'

অগ্রগামীর পঞ্চম নিবেদন ব্রজেশ গোস্বামী রচিত 'কেদার রায়' বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ৫ সেপ্টেম্বর। নাট্যাভিনয়ে অগ্রগামী গোষ্ঠীর শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমন্তের ভূমিকায় শম্ভুনাথ সিংহ অভিনয় দক্ষতার গুণে দর্শকসাধারণকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে সব্যসাচী মুস্তাফী (চাঁদ রায়), স্বপন সেনগুপ্ত (কেদার রায়), সুব্রত সাহা (আমু সর্দার), অরুণ মিত্র (কার্ভালো), পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (সোনা) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নেপথ্য সঙ্গীতে নীলিমা সেনগুপ্তের দক্ষতা লক্ষ্য করার মতো। মঞ্চ স্থাপনা ভালো। তপন সেনগুপ্ত এবং শম্ভুনাথ সাহার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন হয়।

থিয়েটার লাইবেরের 'পৃথিবীর কণ্ঠস্বর':

থিয়েটার লাইবেরের প্রযোজনায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে সম্প্রতি অভিনীত হল 'পৃথিবীর কণ্ঠস্বর'। জাহির রায়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইটে'র অনুপ্রেরণায় পরিচালক ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, স্বয়ং নাটকটি রচনা করেন বাংলাদেশের পটভূমিকায়। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে আন্ত-র্জাতিক ব্যাঙ্কার, অত্যাচার, বর্বরতা ও মুক্তিকামী ইতিহাসের যে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই নাটকে বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয়গুণে। এদের দলগত অভিনয়ও প্রশংসার দাবী রাখে। বর্বর অত্যাচারের দৃশ্যটি এতই নিখুঁত এবং মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেকটি দর্শককেই মনে করিয়ে দেয় আজকের বাংলাদেশের মুক্তিকামী ভাইদের ওপর জঙ্গী শাসকদের নিষ্ঠুর পীড়নের কথা।

অভিনয়ের ব্যাপারে যুথের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, রোগসাহেব ও মেজর কাদেরের চরিত্রে অশেষ যে বৈশিষ্ট চিহ্নিত অভিনয় প্রতিভার নজির রাখেন।

এ ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শ্রীমতী লিলি ভট্টাচার্য, বিমল রায়,

রূপকথা প্রযোজিত
বেন জনসনের
ভলপোন
বাংলা রূপান্তর/নির্দেশনা : সুশীল সেন
২০ সেপ্টেম্বর
মুক্ত অঙ্গন সন্ধ্যে—৭টায়
হলে টিকিট

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, দেবস্মৃতি রায়-চৌধুরী, শ্যামল ভট্টাচার্য, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, সজল দে, তপন গাঙ্গুলী, সমীর রায়চৌধুরী, শচীন মণ্ডল, অনিল দাস এবং রামগোপাল গোস্বামী।

পান্থজনার নাট্যাভিনয় :

আসছে ১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল ১০টায় 'পান্থজনা' নাট্য সংস্থা 'যথাটে' নামক নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন রঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে। নাটকটি পরিচালনা করবেন মন্টু গুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

মজিলপুরে দুশো বছরের বার্ষিক উৎসব

চারদিকে আজ ভাঙচুর আর পালা-বদলের পালা। পুরনো যা কিছু সবই যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে, সব কিছুই কেমন যেন ফিকে আর হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে। সংস্কার আর বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কালের প্রহারে আলগা হয়ে গেছে।

তবু এই ভাঙচুর আর অবিশ্বাসের বন্যা বেগ এড়িয়ে বাংলার নিজস্ব ধর্ম-উৎসবের শাশ্বত ধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে আজও আপন বিশ্বাসে মর্যাদায় ও প্রাণৈশ্বর্যে—মজিলপুরের প্রখ্যাত দত্ত-বাড়ির প্রায় দুশো বছরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোপালজিউ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজিউর ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব দেখতে দেখতে বারবার এই কথাই অনুভূত হচ্ছিল।

উৎসব হয়েছে তিনদিন : ৬ই, ১০ই ও ১৪ আগস্ট। আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। উৎসবের নানান—প্রধানত পূজাপাঠ ও হোমযজ্ঞ। এছাড়াও ছিল 'সুবল মিলন' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয়। ১৩ ও ১৩ আগস্ট ভবানীপুরের আদি কৃষ্ণলীলা নাট্য-সমাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই পালা দুটি মঞ্চোপস্থিত করেন। রসের বিচারে ও উপভোগ্যতার দিক দিয়ে পালা দুটি হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর।

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের এককালীন সংস্কৃতি আন্দোলনের পীঠভূমি ছিল মজিলপুরের এই দত্তবাড়ি। এককালে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্মরণীয় পুরুষরা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি অতুলপ্রসাদ প্রমুখ এই ধরনের উৎসবে উপস্থিত থাকতেন। 'কালিদাসের কাল' শেষ হয়ে গেলেও মজিলপুরের দত্তবাড়ি পুরোনো ঐতিহ্য ও উৎসবের ধারাকে আজও অব্যাহত রাখতে পেরেছেন—এইটাই আজকের তমসায় আলোকশিখার কাজ করবে।

দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব

আসছে ১৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় কলা-মন্দিরে দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে; উৎসবে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষণ দেবেন ও স্নাতকদের যোগ্যতাপত্র বিতরণ করবেন।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে যাতে দক্ষিণীর শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে।

পরলোকে অমিয় সেন

উত্তর কলিকাতার আদর্শ শিশু বিদ্যালয় 'মুকুল বীথি'র প্রতিষ্ঠাতা অমিয় সেন গেল বুধবার ২৫ আগস্ট তারিখে পরলোকগমন করেন।

১৯২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর শ্রীসেন বরিশাল জেলার গৈঠিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী, স্পষ্টবাদী, দৃঢ়চেতা ও দেশ-প্রেমিক। গৈঠিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকু-লেশন পাশ করবার পরে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী রেণুকা সেনও উচ্চ-শিক্ষিতা। বিবাহের পর থেকেই শ্রী ও শ্রীমতী সেন আমাদের দেশের শিশুদের জন্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করেন এবং একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিশুশিক্ষা বিষয়ে স্নাতক হয়ে পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শিশুশিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবার জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে দেশে ফিরে 'মন্তেসরী' প্রথায় ঢাকুরিয়ায় 'মুকুলবীথি' শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে নিঃসন্তান শ্রীসেন তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা সেন, বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিদ্যালয়ের সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রী-দের রেখে গেছেন।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর দিল্লী অভিযান

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন। দিল্লী কালীবাড়িতে আসছে ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁদের মঞ্চসফল সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' মঞ্চস্থ হবে। দিল্লী থেকে ফিরে এসে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নতুন প্রযোজনার কাজ শুরু করবেন পূর্ণোদ্যমে।

বলাকা : উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বলাকা'র বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে গত ৩০ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় রঙমহল থিয়েটারে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়, তার মধুর স্মৃতি সেদিনের পূর্ণ প্রেক্ষা-গৃহের অগণিত শ্রোতা বহুকাল স্মরণে রাখবেন সন্দেহ নেই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে গুণীজন সম্বর্ধনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে জরা-সন্ধ রচিত 'লৌহকপাট' নাটকের অভিনয়। গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শৈলেন মান্নাকে সম্বর্ধিত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ দিলীপ মালাকার প্রধান অতিথি ডঃ রমা চৌধুরী, অনুষ্ঠান সভাপতি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও উদ্বোধক প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধ।

শ্রাবণ সন্ধ্যায়/পরিচালনা : প্রান্তিক/উৎপল দত্ত, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং বনানী চৌধুরী। ফটো : অমৃত।

মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অভিনেত্রী ছায়া দেবী ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীএম আর আখতার। বিশিষ্ট বক্তাদের মনোরম আলোচনা ও ভাষণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 'কলাকার সদস্যদের প্লেহকপাট' অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। অপেশাদার দলের প্রচেষ্টা সফল বলা চলে।

পলিডর রেকর্ডে মহাপূজায় বাংলা গান :

পলিডর রেকর্ড কোম্পানী ইংরেজী ও হিন্দী ফিল্ম সঙ্গীতের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এবার পূজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর পলিডর রেকর্ডে সর্বপ্রথম বাংলা গানের প্রকাশ।

পলিডর শারদাঞ্জলি সাজিয়েছেন আটটি রেকর্ডে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে এল. পি রেকর্ডে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণে, পূজার যথাযথ অনুষ্ঠানসহকারে ভাবমধুর ভক্তিগীতি মনে আনে এক অপূর্ব চেতনা।

পলিডর আরও যেসব শিল্পীর গান উপহার দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : সনৎ সিংহ (দুটি কাব্যগীতি), রূপমালা ঘোষ (দুটি ছড়া-গান), প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বাংলা আধুনিক গান), কুমকুম চট্টোপাধ্যায় (আধুনিক), ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায় (আধুনিক)। শ্রীবটুক নন্দী ইলেকট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন চারটি দেশাত্মবোধক গানের সুর পলিডর এক্সটেনডেড প্লে রেকর্ডে।

প্রখ্যাত সুরকার শ্রীসলিল চৌধুরীর রচনা ও সুরে গান গেয়েছেন বোম্বাই-প্রবাসী নতুন শিল্পী মানস মুখোপাধ্যায়।

পলিডর নিয়মিত বাংলা গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

গীতিমালোর বাৎসরিক উৎসব :

গীতিমালোর বাৎসরিক উৎসব গেল ১৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্ববরেণ্য উদয়শঙ্করকে সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেছেন সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূপুর ধ্বনি'র নৃত্যনাট্য

গত ২৮ আগস্ট তারিখে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে "নূপুর ধ্বনি" সংস্থা আয়োজিত "শিল্পী" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী ছায়া হালদার। প্রধান ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া হালদার, দীপিকা দাশ ও সুব্রতা রায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কুমারী শিখা মুস্তাফি, গোপা দে সরকার, পার্বতী দাস ও অমৃতা মিত্রের নৃত্য উল্লেখ করবার মতো।

বিদেশে ইউথ পাপেট থিয়েটার

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া 'পাপেট ফেস্টিভ্যাল' ও 'কনফারেন্সে' যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকার সঙ্গীত নগরী ন্যাসভিল-এ যাত্রা করেন গত ২ আগস্ট। সেখানে বিমানবন্দরে রাত্রি ১১টায় ভারতীয় এই সংস্থাকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং 'ফেস্টিভ্যাল চেয়ারম্যান' টমাস এইচ, নান্‌কারভিস এবং আরও অনেকে।

শ্রীসুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ৫ আগস্ট সকাল ৯টায় উৎসব কমিটি কর্তৃক আহূত হয়ে ইউথ পাপেট থিয়েটার-এর পক্ষে বেতার সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ করেন সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়— আরও দুই দেশের প্রতিনিধি শ্রীমতী ভায়লেট ফিলপট (ব্রিটেন) ও টম টিচেনার (আমেরিকা)-এর সহযোগে। বিষয় বস্তু ছিল—ভারতীয় পুতুলনাচের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুতুলনাচের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্য রূপায়ণ। এছাড়া ভারতীয় পুতুলনাচের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ। সাক্ষাৎকারটি ওখানকার বেতারে প্রচারিত হয় ৮ আগস্ট। ৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শুরু হয় আলোচনাচক্রের উদ্বোধন উৎসব। সভাপতির ভাষণে এই 'কনফারেন্স'ও ফেস্টিভ্যালের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পরে, অংশগ্রহণকারী ১৩টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে ভারতের প্রতিনিধি ইউথ পাপেট থিয়েটারের দলনেতা হিসাবে শিশিরকুমার বিশ্বাস আহূত হন সেই উদ্বোধনী সভায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করবার জন্যে। আলোচনাচক্র চলে ৬ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত। ১৪ আগস্ট উৎসব কমিটির বিশেষ অনুরোধে আমেরিকান কম্যুনিটির জন্য চিল্ড্রেনস থিয়েটার হলে ইউথ পাপেট থিয়েটার পুতুলনাচের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানটি সর্বশ্রেণীর দর্শক তথা শ্রোতাদের দ্বারা ভীষণভাবে সমাদৃত হয়। স্থানীয় সংবাদপত্রের ভাষায়—

"Cleverly manipulated ....
.. ..Verbal economy"

১৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত চলে আমেরিকা ও বিভিন্ন অতিথি দেশগুলির পুতুলনাচের উৎসব। এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন পৃথিবীখ্যাত বহু পেশাদার 'পাপেট' গোষ্ঠী ও 'পাপেটিয়ার্স' যার মধ্যে উল্লেখ্য— রাশিয়ার সার্গেই ওব্রাদজভ, পঃ জার্মানীর আলব্রেস্ট রোসার, আমেরিকার জিম হেনসন, হল্যান্ডের শ্রীমতী বেক, কানাডার কেন ম্যাকে প্রভৃতি। ১৯ আগস্ট তারিখে উক্ত উৎসবে ইউথ পাপেট থিয়েটার দুটি এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান করেন —এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের নিমন্ত্রণ অনুযায়ী। বলাই বাহুল্য, দুটি অনুষ্ঠানই চিত্তাকর্ষক হওয়ার ফলে অত্যন্ত সমাদৃত হয় চতুর্দিকে ধন্যবাদ ও করতালির মাধ্যমে এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ আমেরিকান গভর্নমেন্টের ইনফরমেশন এজেন্সী তাদের অনুষ্ঠানে টেলিভিশন-এ প্রদর্শনীর জন্য 'টেলিভিশন ক্যামেরা' ও 'টেপ'-এ অনুষ্ঠানটি ধরে রাখেন। জানানো হয়েছে—ভারতীয় ওই পুতুলনাচটি টেলিভিশনে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নেটওয়ার্কে প্রদর্শন করা হচ্ছে এই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই। বলে রাখা ভালো, এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে একমাত্র ভারতীয় দল ইউথ পাপেট থিয়েটার।

ভারতীয় 'টেলিভিশন' নেটওয়ার্কে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে দেখা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পাপেট গোষ্ঠীটি বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করে, 'এডুকেশন ইন পাপেট্রি' ওয়ার্কশপে যোগ দেয় ও 'পাপেট' সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে সর্বদেশীয়দের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে, দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টায় নিযুক্ত হয় এবং উদারভাবে, শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ ও প্রদান করে। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত পাপেটিয়ার্স—যথা, পশ্চিম জার্মানীর রোসার, চেকোশ্লোভাকিয়ার ডাঃ জান মালিক, রাশিয়ার সার্গেই ও ব্রাদজভ, কানাডার কেন ম্যাকে, ব্রাজিলের শ্রীমতী ডালি, আমেরিকার জিম হেনসন, টম টিচেনার, জন মিলার, ফ্রেড কোয়েন প্রমুখ ও অন্যান্য দেশের সুধীদের সঙ্গে এরা সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা করেন। তাঁদের শুভেচ্ছা ও 'স্যুভেনির' পাথেয় করে নিয়ে এসেছেন (স্মারক গ্রন্থের মন্তব্য) ইউথ পাপেট থিয়েটার ন্যাসভিল-এ থাকাকালীনই অন্যান্য স্থান-এ পুতুলনাচ প্রদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ পান, সময়াভাবে তাদের সেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

ইউথ পাপেট থিয়েটারের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য আমেরিকার টেনিসি প্রদেশের গভর্নর এই গোষ্ঠীর দলনেতাকে 'অনারারী সিটিজেন অফ টেনিসি' সম্মানে ভূষিত করেন।

উল্লেখ্য, আরিজোনার শ্রীমতী জ্যান গ্রীনসবার্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ ব্যয়ে এই গোষ্ঠীকে Puppeteers of America র এক বছরের সভ্য করে নিয়ে এদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

উৎসব শেষে, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড ইতালী প্রভৃতি ঘুরে গেল ৯ সেপ্টেম্বর ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

দিল্লী বিমানঘাটিতে স্বদেশ প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দল। অধিনায়ক ওয়াদেকার হাত তুলে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড সফরের পর্যালোচনা

সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিরাট সাফল্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে স্বদেশের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয় ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম সাফল্য। এবছরের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯টি খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৭, হার ১ (বিপক্ষে এসেক্স কাউন্টি) এবং খেলা ড্র ১১। এবছরের ঠিক আগের ইংল্যান্ড সফরে (অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে) পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল কি শোচনীয় ব্যর্থতারই না পরিচয় দিয়েছিল—তিনটে টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ৭টা খেলায় হার এবং জয় মাত্র ২টো —ডার্বিশায়ার এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

এবারের ইংল্যান্ড সফরে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার খেলা ৪, ইনিংস ৭, নটআউট ২ বার, মোট রান ২৬২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬২ নটআউট এবং গড় ৫২·৪৩)। তিনি ছাড়া গড় ৪০ রান করেছেন আরও পাঁচজন—সোলকার (৪২·১৮), গাভাস্কার (৪৩·৮৮), মানকাদ (৪১·৮৪), বিশ্বনাথ (৪০·২৮) এবং ওয়াদেকার (৫০·৬৫)। সফরে মোট ১০০০ রান বা তার বেশী সংগ্রহ করার গৌরব লাভ করেছেন মাত্র এই দুজন —গাভাস্কার (১১৪১ রান) এবং ওয়াদেকার (মোট ১০৫৭ রান)। এই দুজন ছাড়া আরও তিনজন খেলোয়াড় ৭০০ বা তার বেশী রান করেছেন—বিশ্বনাথ (৯৩৮ রান), সোলকার (৮০২ রান) এবং মানকাদ (৭১৫ রান)। ভারতীয় দলের পক্ষে এই ৭ জন খেলোয়াড় মোট ১৩টা সেঞ্চুরী করেছেন—গাভাস্কার (৩টে), বিশ্বনাথ (৫টে), ওয়াদেকার (২টো), মানকাদ (২টো), সরদেশাই (১), সোলকার (১) এবং আবিদ আলি (১)। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেছেন গাভাস্কার—১৯৪ রান (বিপক্ষে উরস্টারশায়ার)।

টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে কোন সেঞ্চুরী হয় নি। অপরদিকে ইংল্যান্ডের এই দুজন সেঞ্চুরী করেছেন ২য় টেস্টে—ইলিংওয়ার্থ (১০৭ রান) এবং লাকহার্স্ট (১০১ রান)। অন্যান্য খেলায় ভারতীয় দলের বিপক্ষে ৭টা সেঞ্চুরী করেছেন—ব্রায়ান লাকহার্স্ট (কেন্ট), কিথ ফ্লেচার (এসেক্স), জন জেমসন (ওয়ারউইকশায়ার), মাইক বাস (সাসেক্স), ব্রায়ান ক্লোজ (সমারসেট), জিম ইয়ার্ডলি (উস্টারশায়ার) এবং রে ইলিংওয়ার্থ (টি এন পিয়ার্স একাদশ)। ভারতীয় দলের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান (২০১ রান)

শিবরাম কুমার সম্পাদিত

গ্যালারী

(ক্রীড়া সাপ্তাহিক)

শারদ সংখ্যা মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে।

এই সংখ্যার আকর্ষণ :

জয়ন্ত দত্তর ক্রিকেট উপন্যাস :

রূপসী ইডেনের রূপসী ক্রিকেট

এ ছাড়া আরও প্রখ্যাত অনেকেই লিখছেন। ছবিও থাকছে অসংখ্য।

দাম : দেড় টাকা।

শীঘ্রই বেরুচ্ছে : শিবরাম কুমার রচিত

পেলে ফুটবলের বাদ্‌শা

ফুটবল সম্রাট পেলের উপর প্রথম বই। যেমন লেখা, তেমনি সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। ২·৫০

গ্যালারী। ১৮১।৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৪

রোলাণ্ড মাথেস (পূর্ব জার্মানী)

করেছেন ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি দলের জন জেমসন।

এক ইনিংসের খেলায় ভারতীয় দলের দু'জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন এমন নজির আছে চারটি :

(১) গাভাস্কার (১৬৫) এবং ওয়াদেকার (১২৬), বিপক্ষে লিস্টারশায়ার
(২) গাভাস্কার (১১৪) এবং ওয়াদেকার (১৫০), বিপক্ষে উস্টারশায়ার
(৩) মানকাদ (১০৯) এবং বিশ্বনাথ (১২২), বিপক্ষে হ্যাম্পশায়ার
(৪) সোলকার (১২৩ এবং আবিদ আলি (১০২ নটআউট) বিপক্ষে সমারসেট

টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের কোন জুটিই শতরান সংগ্রহ করতে পারেন নি। সারা সফরের অন্যান্য খেলায় জুটিতে শতরান উঠেছে এমন নজির আছে ১২টি। উস্টারশায়ার কাউন্টি দলের বিপক্ষে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ২ উইকেটের জুটিতে যে ৩২৭ রান সংগ্রহ করেন তা ইংল্যাণ্ডের ১৯৭১ সালের ক্রিকেট মরশুমে যে-কোন উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রান।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন চন্দ্রশেখর (১২৯২ রানে ৫০ উইকেট এবং গড় ২৫-৮০)। সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন ভেঙ্কটরাঘবন—১৫৬৯ রানে ৬৩ উইকেট (২৪-৯০)। ভারতীয় দলের চারজন স্পিন বোলার—চন্দ্রশেখর (৫০টি), ভেঙ্কটরাঘবন (৬৩টি), বেদী (৫৮টি) এবং প্রসন্ন (২৬টি), যেখানে মোট ১৯৭ উইকেট পেয়েছেন সেখানে আবিদ আলি (১৬টি), সোলকার (১৪টি), গোবিন্দরাজ (১০টি), গাভাস্কার (৪টি) এবং মানকাদ (২টি) পেয়েছেন মাত্র ৪৬টি উইকেট।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক 'রাবার' জয়ের আনন্দের মধ্যেও আমাদের কিছুটা আক্ষেপ থেকে গেছে—টেস্ট সিরিজে আমাদের একটাও সেঞ্চুরী নেই। অথচ এই বছরেই শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষের দুটো ডাবল সেঞ্চুরী নিয়ে মোট ৭টা সেঞ্চুরী ছিল—গাভাস্কারের ৪টে এবং সারদেশাইয়ের ৩টে। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় গাভাস্কারের সর্বোচ্চ রান ছিল ২২০ এবং সারদেশাইয়ের ২১২।

১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ড—এই দুই দেশের সফরেই গাভাস্কার ১০০০ রান পূর্ণ করে ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ছিল মোট ১১৬৯ রান (খেলা ৮, ইনিংস ১৬, নট আউট ৪ বার এবং গড় ৯৭-৪১); অপরদিকে ইংল্যাণ্ড সফরে মোট ১১৪১ রান (খেলা ১৫, ইনিংস ২৭, নটআউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৮ এবং গড় ৪৩-৮৮)। দলের নবাগত খেলোয়াড় হিসাবে আর কোন ভারতীয় ক্রিকেটার বিদেশ সফরে গাভাস্কারের মত এইভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।

চন্দ্রশেখর

সদ্য প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার বোম্বাইয়ের সম্বর্ধনা সভায় বলেন, ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের মূলে ছিল এই তিনটি কারণ—স্পিন বোলিং, খুব ভাল ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং। বেদী, ভেঙ্কটরাঘবন এবং চন্দ্রশেখর যেভাবে প্রাণপণ করে বল করেছেন তাতে সবার আগে তাঁদেরই অভিনন্দন প্রাপ্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে রানের জন্য আমাদের প্রধানত গাভাস্কার এবং সারদেশাইয়ের মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছিল। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড সফরে রান সংগৃহীত হয়েছে দলগতভাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দল

বর্ণবৈষম্য নীতির ধারক এবং বাহক দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের হাতে আর একটা থাপ্পড় খেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের প্রস্তাবিত অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হয়ে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার খেলাধূলায় বর্ণ-বৈষম্য নীতির কারণে তাদের ১৯৭০ সালের ইংল্যাণ্ড সফরও এইভাবে বাতিল হয়েছিল। তবু কি লজ্জা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকান দল সর্বদাই সাদাদের দলই হবে, দল নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের পূর্ব-নীতির কোনমতেই পরিবর্তন হবে না।

সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড

আমেরিকা বনাম পূর্ব জার্মানীর দ্বৈত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু রোলাণ্ড মাথেস ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতার দুই মিনিট ৫-৬ সেকেণ্ডে শেষ করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড (২ মিঃ ৬-১ সেঃ) ভেঙেছেন।

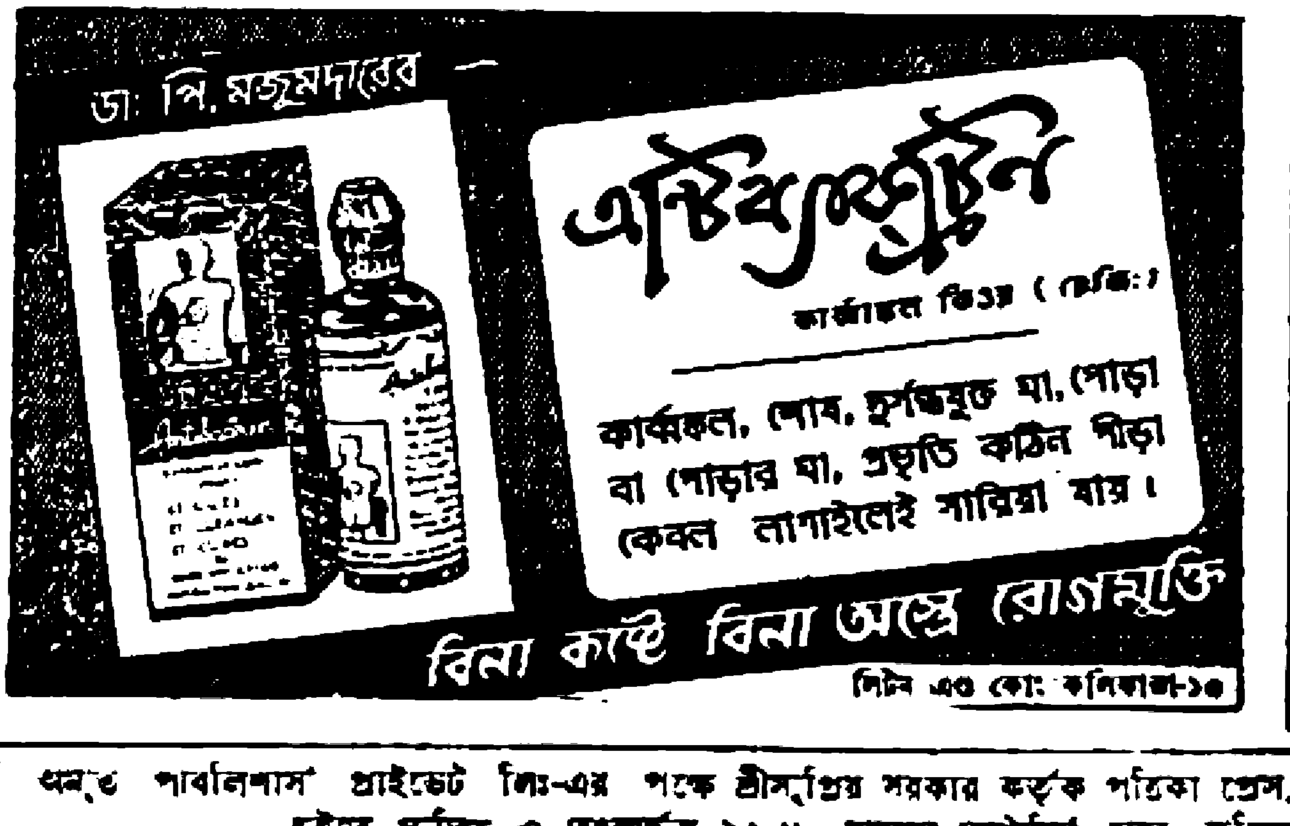

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সুবৃহৎ উপন্যাস

শত রূপে দেখা

— চৌদ্দ টাকা —

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
'তন্ত্রাভিলাষী' পর্যায়ের সর্বশেষ খণ্ড

অবধূত ও যোগীসঙ্গ

— ন' টাকা —

আবদুল জব্বারের
নতুন বই

দুখের মেলা ৮৲

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১০৲

অনুবাদ : শুভেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রমথনাথ বিশীর
বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস

লালকেল্লা ১৮৲

নূতন অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবীর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি

নূতন অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৲

অসামান্য লেখক
শংকরের

সীমাবদ্ধ

মাত্র ৭ মাসে অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল

।। ছ' টাকা ।।

বিভূতি রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।
প্রতি খণ্ড — চৌদ্দ টাকা
প্রথম খণ্ড (পুনর্মুদ্রিত)—আঠারো টাকা

বাংলা পকেট বই : দুই দফায় চৌদ্দখানি বই

বেরিয়েছে ।। উপন্যাস : অবরোধবাসী—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সাদা ঘরবার—অবধূত, দূরের জানলা—আশাপূর্ণা দেবী, মাধবী মালঞ্চ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তবু মনে রেখো—গজেন্দ্র মিত্র, সুরের বাঁধন—নরেন্দ্র মিত্র, নিরালা প্রহর—নীহার গুপ্ত, অর্ধদিনের দিন—বাণী রায়, কুল কুটুম্ব—বিমল মিত্র, আগুন কখনো যাবে না—মন্মথনাথ ঘোষ, স্বর্ণচাঁপার দিন—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ভ্রমণ কাহিনী : পুষ্করেশ্বর—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রূপ-চর্চা : রূপ ও প্রসাধন—এন আর গুপ্ত। ভাগ্যগণনার বই : নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন—জ্যোতিষার্ণব।

প্রত্যেকটি দু'টাকা। একত্রে পাঁচখানি ৮-৫০ টাকা

কথাসাহিত্য

শারদীয়া সংখ্যা অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাংলা-দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাসম্ভারে পূর্ণ হয়ে বেরিয়ে গেছে

কথাসাহিত্য যাঁরা নিয়মিত পড়েন তাঁরাই জানেন—কেবল শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ লেখাই এর শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়

— মূল্য ৩॥ টাকা —

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥ ফোন : ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭৯১

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে
ঠিকমতো লালন-পালন করতে
পারছেন কি না।

পর্যাপ্ত দুধ। পোশাক-আশাক, খেলনা-বাটি, বই-পত্তর—সব কিছু ঠিকঠাক হলে তবে তো সন্তানকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পিঠোপিঠি যদি আর একটি হয়···তখন? সবদিক সামাল দেওয়া কঠিন হবে না কি? তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া অবধি পরেরটির কথা তাঁরা ভাবছেনই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারবেন। নিরাপদে সহজে ব্যবহার করা যায় বলে নিরোধ সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের জন্মনিরোধক। আজই এক প্যাকেট কিনে নিন। **ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3টি নিরোধ পাওয়া যায়।**

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ ▼

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়।
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকান,
পানের দোকান ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফস্বল
বার্ষিক	টাকা	২৫.০০	টাকা	৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১২.৫০	টাকা	১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৬.২৫	টাকা	৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২১শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 24th September 1971 শুক্রবার, ৭ই আশ্বিন ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৬৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৫৬৫	সম্পাদকীয়		
৫৬৬	আমাদের তারাশঙ্কর		—সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়।
৫৭২	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৫৭৪	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৫৭৬	ব্যঙ্গচিত্র		—শ্রীঅমল
৫৭৭	মহিষাসুরমর্দিনীর একটি প্রাচীন মূর্তি		—শ্রীশিবদাস চৌধুরী
৫৭৮	আগমনী ও বিজয়াগানে বাঙালী ও বাংলাদেশ		—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মালা
৫৮১	মিলুকে নিয়ে	(গল্প)	—শ্রীনিবেন্দু পালিত
৫৮৬	দুটি ছড়া	(কবিতা)	—শ্রীবনফুল
৫৮৬	নদীর নাম ভালোবাসা	(কবিতা)	—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি
৫৮৬	অগ্নিকাণ্ড	(কবিতা)	—শ্রীগোরাঙ্গ ভৌমিক
৫৮৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৫৮৮	একটি প্রাচীন যাদুঘর		—শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্ত
৫৮৯	পূর্ণাবতার	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
৫৯০	দ্বিতীয় সত্তা		—শ্রীআশা দেবী
৫৯৬	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬০১	বাতিক	(গল্প)	—শ্রীসন্তোষকুমার দে
৬০৩	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৬০৭	ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিচন্দ্র বীরসুপার্থ		—শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
৬০৮	পুজোর ছুটি		—শ্রীরেবতীভূষণ
৬০৯	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীঅসীম রায়
৬১৫	চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র		—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
৬২১	মার্মার সাহেব		—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়
৬২৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৬২৮	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৬৩১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৬৩৮	খেলার কথা		—শ্রীদর্শক
৬৪০	চিঠিপত্র		

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

শিক্ষা বিভাগ ও মনীষীবৃন্দ প্রশংসিত

ছোটদের সচিত্র ইংরেজী—বাংলা অভিধান

COMMON WORDS

• পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪ • ছবির সংখ্যা ৩৮০ • দাম আড়াই টাকা

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

এক নজরে

সাদা-কালো বুদ্ধিতে সমান :

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের দুই প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ জর্জ মারেস্কে ও ডঃ জেন মার্সার দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের এক লক্ষ চব্বিশ হাজার শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, রেড ইন্ডিয়ান, চীনা, পুর্তোরিকান ছাত্রের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এবং তাদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্ণভেদে বংশভেদে মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার ইতরবিশেষ হয় না। তবু যে সর্বক্ষেত্রে অশ্বেতকায়রা শ্বেতকায়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না তার প্রধান কারণ পরিবেশের পার্থক্য। একই বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় সবাই, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিশুরা জন্মের পর আহারে বিহারে বাসস্থানে—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়, অন্যরা তা থেকেই বঞ্চিত বলেই শেষ পর্যন্ত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছিয়ে পড়ে। তাঁরা সমীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন মার্কিন নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে। গত সপ্তাহে আমেরিকান সাইকোলজিকাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষার কমিশনের পক্ষে ডঃ এডওয়ার্ড জে কাসাভান্তেজ বলেছেন—দুজন মনস্তত্ত্ববিদ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ও নিজ নিজ ব্যবস্থামতো সমীক্ষাকার্য চালিয়ে যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হয়ত শ্বেতাঙ্গদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত আত্মাভিমান দূর করায় কাজে কিছুটা সহায়ক হবে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ উইলিয়াম শকলে যে বলেছিলেন, নিগ্রোরা বংশগত কারণেই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বুদ্ধি মেধা ও প্রতিভায় হীন—দুই মনস্তত্ত্ববিদের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক সমীক্ষা ও সিদ্ধান্ত, এতদিনের সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মতবাদের বনিয়াদকেই সর্বাধিক কঠিন আঘাত হানবে।

প্রাণের বদলে প্রাণ?

অনেকদিন আগের কথা, ১৯২৪ সালে, আমেরিকার আদরে-মাথা-খাওয়া এক ধনীর দুলাল নাথান লিওপোল্ড শুধু মানুষ খুনের প্রতিক্রিয়া অনুভবের জন্য খেলার ছলে চৌদ্দ বছরের একটি বালককে হত্যা করেছিল। সে অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়ার কথা, কিন্তু বিচারক অপরাধীর অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে (লিওপোল্ডের বয়স তখন ১৯ বছর) তাকে জেনেবুঝে হত্যার অভিযোগে ৯৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডদানের সময় বিচারপতি একথাও বলেন যে, অপরাধীর দণ্ডের মেয়াদ কোন সময়েই হ্রাস করা সঙ্গত হবে না। যাই হ'ক, দণ্ড শিরোধার্য করে লিওপোল্ড জেলে প্রবেশ করে জেলের লাইব্রেরিটির সংস্কার করে, তারপর ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে এবং একে একে সাতাশটি ভাষা তার অধিগত হয়। সেই একই সঙ্গে সে গণিতেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে এবং অবকাশবিনোদনের বিষয়রূপে চর্চা করে পক্ষীতত্ত্ব। আর ঐ অধ্যয়ন ও অধীত বিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে যে পাঁচিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তা লিওপোল্ডের খেয়ালই থাকে না।

১৯৪১ সালে ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধ পরীক্ষার জন্য একজনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে তার উপর ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণের জন্য যখন একজন মানুষের প্রয়োজন হ'ল, জেল থেকে লিওপোল্ড জানাল, ও পরীক্ষা তার উপর করা যেতে পারে। লিওপোল্ডের আগ্রহে তারই উপরে পরীক্ষা চালানো হ'ল, আর তার ঐ আচরণে খুশি হয়ে ইলিনয় রাজ্যের তৎকালীন গভর্ণর এডলাই স্টিভেনসন লিওপোল্ডের দণ্ডের মেয়াদ ৯৯ বছর থেকে কমিয়ে ৮৫ বছর করে দিলেন। আর ঐ দণ্ড হ্রাসের ফলে লিওপোল্ড ১৯৫৩ সালে প্রথম সাময়িক মুক্তির (প্যারোল) জন্য আবেদনের সুযোগ পায়। কিন্তু তার আবেদন বার বার প্রত্যাখাত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে মঞ্জুর হয়। ৩৪ বছর পরে মুক্তি পেয়ে লিওপোল্ড মাসে দশ ডলার বেতনের এক চাকরি নিয়ে পুর্তোরিকা দ্বীপে চলে যায় এবং এক বছর বাদেই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'স্পেশ্যাল মেডিসিন' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে। সেখানেই সে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি কাজ নেয় এবং এক বিধবার পাণিগ্রহণ করে।

সম্প্রতি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে লিওপোল্ডের, মৃত্যুর পূর্বে সে তার চোখ দুটি স্থানীয় হাসপাতালে দান করে গেছে। সাতচল্লিশ বছর আগে এক বিপথগামী যুবক যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল তার জন্য তারও প্রাণ নেওয়া উচিত ছিল কিনা—এ প্রশ্নের উত্তর ঐ হত্যাকারীর জীবনের শেষ সাতচল্লিশটি বছরের আচরণ ও কার্যকলাপ থেকেই পাওয়া যাবে।

ইতালি এগোতে চায় :

শতাব্দীকাল সংগ্রামের শেষে ইতালিতে ডাইভোর্স আইন চালু হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞার একটা বড় অচলায়তন যেন ভেঙে গেছে সেদেশে। বন্ধনমুক্ত স্রোতধারার মতো ইতালির সমাজজীবন এখন দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলতে চায়। সেদেশের প্রগতিশীল সমাজ দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে ইতালিতে ইংলণ্ডের মতো গর্ভপাত আইনানুমোদিত করা হ'ক। তার জন্য ফ্রান্সের মতো ইতালিতেও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, লেখিকা, সমাজনেত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়েছে যাঁরা প্রকাশ্যে কবুল করবেন যে, আইনের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও জীবনের কোন না কোন সময় গর্ভপাত ঘটিয়ে তাঁরা অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এ ঘোষণা ইতালি সরকারের পক্ষে মর্যাদারক্ষা করে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইতালির আইন অনুসারে গর্ভপাতের সাজা দুই থেকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আইনের মর্যাদারক্ষা করতে হলে ইতালি সরকারকে ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারিণী দেশের কয়েক শত বিশিষ্ট মহিলাকে জেলে পাঠাতে হবে। কিন্তু সেটা ইতালি সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

ওয়াশিংটন : এক সঙ্গে ওরা বাস করেছে কয়েক বছর, সন্তানও হয়েছে ওদের একটি, কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস যে ওরা জানত না, ওরা মা ও ছেলে। পুত্রের নাম উইলে ক্রিজমিলার (বয়স ২৩), আর মায়ের নাম জেবেকা স্পেক্টার, বয়স ৪১। জন্মের পরেই পুত্রকে মা আর একজনকে দত্তক দিয়েছিল, তারপর আর তাকে সে কখনও দেখেনি; পুত্রও মা বলতে জানতো তার পালিকা মাকে। ইতিমধ্যে তার নিজের মাকে ত্যাগ করে যায় তার বাবা, কিন্তু ডাইভোর্স দেয় না। সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় জেবেকা আসে যুবক উইলের সংস্পর্শে যে তখন নাবিক হয়েছে। জেবেকার আরও দুর্ভাগ্য, স্বামী, সৌভাগ্য, আত্মীয়পরিজন সকলে তাকে ত্যাগ করলেও ত্যাগ করেনি তার দুরন্ত যৌবন, যার আকর্ষণে আগুনের নেশায় মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটে আসে যুবক উইলে। তারপর নাটকের শেষ অঙ্ক উদ্ঘাটিত হয় ব্যভিচারের অভিযোগে ওরা ক্যালিফোর্নিয়ার এক আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বন্যা মরণ জ্বালা

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে যে ধরনের বন্যার আক্রমণ ঘটে গেছে তার তুলনায় এইবার পূর্ব ও উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে যে বন্যা হয়ে গেছে তার ধারাটা অভিনব। মাত্র কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়িতে সর্বনাশা বন্যা হয়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রচন্ড প্রকোপে আসাম অঞ্চলে বন্যার আক্রমণ প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়েছে। বর্তমান বছরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল গঙ্গার জলে ভেসে গেছে। গঙ্গার এই আক্রমণ খানিকটা অভাবিত। তারপর লক্ষ্ণৌ শহরে গোমতী নদীর আক্রমণ। জল বাড়ছেই, কখনো গঙ্গা, কখনো গোমতী, কখনো পুন পুন। গঙ্গা এইবার মালদহ, পাটনা, বারৌনি, মুঙ্গের, খাগারিয়া প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত করেছে। বিগত পূর্ণিমার কোটালে গঙ্গার বানের প্রবাহে খাস কলিকাতা শহরও ভাসমান হয়েছিল। অনেক বাড়িঘর গঙ্গাজলে ধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। অনেকে অনুমান করছেন এই বছর বর্ষা তার 'মেঘময় বেণী এলাইয়া' যেভাবে দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভারতের পূর্বাঞ্চলে করুণাধারা বিতরণ করেছেন এই জলোচ্ছ্বাস নাকি তার অন্যতম হেতু। সাধারণ হিসাবে দু'বছর উত্তম বর্ষা ও দু'বছর মধ্যম বা অধম বর্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর সবই বিচিত্র। অন্য সব জায়গায় বন্যার প্রকোপটা প্রায় স্তিমিত হওয়াতে যখন দুর্গতদের দুঃখহরণের জন্য আকাশ থেকে চাল-ডাল বর্ষণ করার তোড়জোড় চলছে, তখন জানা গেল লক্ষ্ণৌ শহর ডুবুডুবু। বাংলায় এইবার মালদহ ভেসেছে এবং নদে ভেসে যায়। রাজস্থানে সম্বর হ্রদের জলের চাপে সেই অঞ্চলেও বন্যা হয়েছে। সুতরাং ভারী বর্ষার জন্য হয়ত এই বছরের বন্যা একটা বিচিত্র গতিপথে পরিক্রমণ করছে।

প্রতিবারই বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করার সময় কি কি করা উচিত ছিল এবং কি করা হয়নি সেইসব জল্পনা হয়ে থাকে। চোর তার কর্তব্য সম্পন্ন করে পিছন ফেরার পর যেমন তার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে, বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পর যে-ধরনের আলোচনা হয় তা প্রায় অনুরূপ। কোথায় বাঁধ আরো উঁচু করা প্রয়োজন, কোথাও বা বাঁধের ফাটল পূর্বে লক্ষ্য করা হয়নি, কোথাও বা নতুন বাঁধ দেওয়া দরকার—এইসব জল্পনায় কারো কল্যাণ হয় না। কারণ ক্ষতির পরিমাণ তখন এমনই বেশী যে ঠিক এইসব কথায় কর্ণপাত করার মত প্রবৃত্তি থাকে না।

যেসব রাজ্যগুলিতে বন্যার আক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক, তাদের উচিত সারাবছরব্যাপী কর্ম ও পরিকল্পনার দ্বারা বন্যা-নিরোধের জন্য সচেষ্ট হওয়া। মধ্যম শ্রেণীর বন্যায় অনেক সময় ফসল জন্মানোর সুবিধা হয়, কিন্তু জলের চাপ যদি নিয়মিতভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে কৃষিভূমিকে প্লাবিত করে তাহলে তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। পশ্চিমবঙ্গে অজস্র সমস্যা এবং সেইসব সমস্যা সমাধানেই সরকারের অনেক সময় ও অর্থ ব্যয়িত হয়, কিন্তু প্রতি বছর ফসল, গবাদি পশু এবং মানুষ ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ার ফলে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয় তা কোনোমতেই উপেক্ষনীয় নয়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী একটি ঘূর্ণমান তহবিলের পরিকল্পনা করেছেন। এই তহবিলের অর্থে বন্যা-নিরোধক পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হবে। বাকী টাকা হয়ত করদাতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দান এবং ঋণ হিসাবে ছিয়াশী ক্রোর টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সাহায্য, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের জন্য এই অর্থের প্রয়োজন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটি কেন্দ্রীয় স্টাডি টীম এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বচক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চল সরেজমিনে তদন্ত করে গেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের দাবী সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারী লালফিতার দীর্ঘসূত্রতার বদনাম দীর্ঘদিনের, অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে বন্যা-প্রপীড়িত অঞ্চলের মানুষগুলি নিদারুণ সংকটের হাত থেকে ত্রাণ পাবে।

আমাদের তারাশঙ্কর

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে যে পরম্পরা, যে ধারা প্রাচীন আর্য যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে—বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, ও নানা প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ, এবং তাহার পরে নানা নব্য বা আধুনিক আর্য ভাষা, যেমন বাঙলা, মৈথিল, ভোজপুরী, অসমিয়া, উড়িয়া, কোশলী, ব্রজভাষা, খড়ীবোলী, হিন্দী, উর্দু, নেপালী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী, কোঙ্কনী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, ডোগরী, কাশ্মীরী, ইত্যাদি—সেই মহান ধারা এ যুগেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মানুষের জীবনের বাহ্য এবং আভ্যন্তর তথ্য ও তত্ত্ব এবং সত্য, শিব ও সুন্দর ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রবহমান ধারায় নানা কাব্য ও মহাকাব্য, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা এবং আধুনিক কালে উপন্যাস বা নবল-কথা ও গল্পে যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম দুর্লভ বস্তু। এ যুগে এই ধারা যাঁহারা উপন্যাসের মাধ্যমে শক্তিশালী ও মহিমময় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবপূর্ণ পরম্পরার মধ্যে তারাশঙ্করের স্থান অতি উচ্চে। এই পরম্পরায় আছেন বাংলাদেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার ও আরও অনেকে, আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, উড়িষ্যার ফকিরমোহন সেনাপতি, উত্তর ভারতের পণ্ডিত রতননাথ দার 'সরশার' ও প্রেমচন্দ, মহারাষ্ট্রের হরিনারায়ণ আপটে, গুজরাটের গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী, পাঞ্জাবের ভাই বীরসিংহ প্রভৃতি। উপরন্তু সমগ্র ভারতে আর্য, দ্রাবিড় ও কিরাত গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে এমন বহু লেখক এখনও জীবিত আছেন, যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। তারাশঙ্করের স্থান ছিল আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে, এবং সেই হিসাবে ভারতের বাহিরেও ভারতবর্ষের প্রতিভূস্থানীয় সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার মর্যাদা ছিল। তাঁহার তিরোধানে বাংলাদেশ ও ভারতের সেই মর্যাদার বিশেষ হানি হইল।

তারাশঙ্করের প্রতিভা ছিল নানামুখী—কারয়িত্রী প্রতিভা, যাহা অপূর্ব সাহিত্য সর্জনা করিয়া গিয়াছে, তাহা তো ছিলই, উপরন্তু সামাজিক ও অন্যান্য নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবয়িত্রী প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মানুষ হিসাবে তারাশঙ্কর সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাইয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেশের ও বিদেশের-অনেক সমাদরের পাত্র হইয়া তিনি-[illegible]

করিলেন। আমাদের তো আর কিছু করিবার নাই, আমরা কেবল শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার লোকোত্তর সাহিত্যিক প্রতিভার এবং তাঁহার চারিত্রিক মাধুর্যের অনুধ্যান করিতে পারি।

—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল আগে পড়া একটি লেখার কথা মনে পড়ছে। এক দিকপাল সাহিত্যিক আরেক দিকপাল সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য লেখা লিখেছিলেন। দুই সাহিত্যিকের দেশ আলাদা, ভাষাও আলাদা, তবে দুজনেই পৃথিবীর অবিস্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য। সাহিত্যিকেরা হলেন নুট হামসুন ও ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কিই সে প্রবন্ধ লিখেছিলেন হামসুন সম্বন্ধে।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের অনেক দেরী। পৃথিবী সবে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিশাপ কাটিয়ে উঠেছে। হামসুনের নাম তখনও ফ্যাসিজম্-সঙ্ঘের সন্দেহে কলঙ্কিত হয়নি। 'হাঙ্গার', 'প্যান' পর্যন্ত হয়ে 'গ্রোথ অব্ দ্য সয়েল' 'সেগেলফস টাউন'-এর মত অসামান্য উপন্যাসে হামসুন তখন পৃথিবীর সাহিত্য সমাজকে বিস্মিত মুগ্ধ করে তুলেছেন।

ম্যাক্সিম গর্কি হামসুনের সাহিত্যসাধনার কথা বলতে গিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্য বিষয়েই এমন ক'টি কথা বলেছিলেন যা এখনো যেন মনে গাঁথা হয়ে আছে। সাহিত্যিক নানা জাতের হয়। তিনি বলেছিলেন, বুকটেবলের মত যারা একদিকে সরবে সাড়ম্বরে নিজেদের জাহির করার সঙ্গে পৃথিবীতে অন্ড ও মাংসে প্রচুর সুখাদ্যের যোগান দেয় তারাও অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু এ সবার ওপরে সাহিত্যিকের আরেক জাত আছে যাদের রচনা হামসুনের মত তাদের 'লোকি'-এর কাছে অবিরাম স্বগতোক্তি। 'লোকি' হলেন নরওয়ে সুইডেন নিয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের এক পৌরাণিক দেবতা। গর্কি স্বগত ভাষণ শোনাবার দেবতা হিসেবে লোকি'র নাম নিয়ে হয়ত একটু ভুল করেছিলেন, কারণ স্ক্যান্ডিনেভিয় পুরাণে এই দেবতাটির পরিচয় মোটেই সুবিধের নয়। তিনি সেখানে ধ্বংসের নায়ক ও মূর্তিমান অকল্যাণ। দেবতার নাম নেওয়ায় ভুল হলেও গর্কির আসল বক্তব্যে কোন ভুল ছিল না। সাহিত্য বিচারের একদিক দিয়ে শেষ কথাই তিনি বলেছিলেন। যে সাহিত্য সর্বোত্তম তা নিজের কাছে, নিজের অন্তর্দেবতার কাছে স্বগতোক্তি। সে অন্তর্দেবতার নাম যেখানে যার কাছে যেমনই হোক না কেন!

তারাশঙ্করকে সবে মাত্র হারিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনার কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই গর্কি'র ওই উক্তিটি বিশেষ করে মনে পড়ল। তারাশঙ্করের সমস্ত সাহিত্যজীবন যেন ওই উক্তিটিরই প্রমাণলেখা।

ক'দিন আগে তারাশঙ্করের রোজনামচার ক'টি উদ্ধৃতি পড়লাম। সে রোজনামচা তারাশঙ্করের সত্তর বছর বয়সের লেখা, কিন্তু সম্মান প্রতিপত্তির শিখরে পৌঁছেও তারাশঙ্করের মনের আকুতি যে কি তা ওই সামান্য একটু উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্কর এক জায়গায় লিখছেন,...উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি, জীবন ব্যর্থ মনে হচ্ছে। ...প্রশ্ন করেছি নিজেকে, বার বার প্রশ্ন করেছি, কিছু পেয়েছি কি?......নিজের জীবন বা অস্তিত্ব ছাড়া আর কি কিছু তেমন পেয়েছি? না পাইনি।

......গতকালের লেখা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে লিখছি, আড়াই পৃষ্ঠা লিখলাম। লেখার প্রতি অনুরাগহীন মনের জন্যে লেখা ভালো লাগছে না......

এই অকপট আত্মস্বীকার, সাফল্যের চূড়ার বসেও অপ্রাপ্তির আকুলতার সঙ্গে এই অনন্যতার, নিজের অন্তর পুরুষের কাছে নিজেকে এই মুক্ত করে দেওয়া, মহৎ সাহিত্যস্রষ্টার নিশ্চিত চরিত্রলক্ষণ যদি কিছু থাকে তা কি এই নয়।

তারাশঙ্করকে সবে আমরা হারিয়েছি। তাঁর সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হবার মত মন ও মেজাজ এখন নেই। সে সময়ও এখনো আসেনি। এইটুকু শুধু সে বিষয়ে বলা যায় যে তারাশঙ্করের মত সাহিত্যিকদের শুধু তাঁদের সৃষ্টির শিল্পবিচার দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা নিষ্ফল। কারণ সাহিত্য আর জীবনসাধনা তাঁদের অভিন্ন।

রচনায় ব্যক্তিত্বের ছায়া থাকে একথা সবাই মানবেন কিন্তু তারাশঙ্করের মত স্রষ্টার রচনাও জীবনের অভিন্নতা একটু আলাদা ধরনের। সাহিত্য রচনা এঁদের একটা স্বতন্ত্র মনের কাজ নয়, তা তাঁদের জীবন-সন্ধানী অভিযানেরই একটা অংশ।

এঁদের বেলায় রেশমের গুটি বুনে ও কেটে প্রজাপতির তা থেকে বেরিয়ে আসার উপমাটা মনে পড়ে।

গুটি কাটা প্রজাপতি রেশম যা ফেলে যায় তা পরম সম্পদ আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগায়, কিন্তু গুটি কেটে বেরিয়ে যে গেল তার কাছে এ অধ্যায়টা জীবন-সন্ধানের একটা ধাপ মাত্র।

সাহিত্য শিল্প জাতীয় সব কিছুরই প্রধানত দুটি দিক আছে। একদিকটা তার নিখুঁত নিটোল কারুকাজের, আর একদিক প্রাণোজ্জ্বল বিশাল বিস্তৃতির। প্রজাপতির পাখায় যেমন সূক্ষ্ম কারুকাজের বিন্যাস সামঞ্জস্যে আমরা মুগ্ধ হই, তেমনি আমরা অভিভূত হই সমুদ্র পাহাড় অরণ্যের বিশালতার মহিমায়।

তারাশঙ্কর সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্বন্ধে উদাসীন নন, কিন্তু আমার মনে হয় যে তিনি মুক্ত অরণ্য পর্বতের মত বিশালতার শিল্পী। জন নয় জনপদ তাঁর সাহিত্যবস্তু, ব্যক্তিকেই তিনি আঁকেন কিন্তু তার পেছনে থাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবাহ। আঙ্গিক ও বিন্যাসের পারিপাট্যই যাঁদের কাছে সাহিত্যসৃষ্টির সার কথা তাঁদের কাছে তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ধরা না পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিছক নৈপুণ্য ও নিটোল সম্পূর্ণতা ছাড়িয়ে—

মানুষ তারাশঙ্কর ও লেখক তারাশঙ্করের বিবর্তনের ধারা এককালে হয়ত আলাদা ছিল কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি একই স্রোতে শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে মিলিত হয়েছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে শুধু নয় যে কোন রচনাতেই জীবনের পরম রহস্য উদ্ঘাটন ও গহন সত্য উপলব্ধির একটি তীব্র আকুতির শিখা দীপ্যমান।

এ শিখা তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনা থেকেই জ্বালানো।

নাতিস্বল্পজীবনে আমৃত্যু পর্যন্ত তারাশঙ্করের মধ্যে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে রাখবার মত। সাধারণত সাফল্য-মণ্ডিত জীবনে যা স্বাভাবিক 'সব পেয়েছি' বলে সেই আত্ম-সন্তোষের জড়তা কোনদিন তাঁকে অধিকার করেনি, পাবার নয় বলে বিমুখ পতিতও তিনি হয়ে ওঠেন নি কখনো। অন্ততঃ বলে যা মনে হয় তারই অন্বেষণেই যে জীবনেরও সার্থকতা এই সুদৃঢ় প্রত্যয় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে অনলসভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে।

পৃথিবীতে কোনো খ্যাতিই চির অম্লান হয়ত থাকে না। সময়ের পরিবর্তনে অপব্যাখ্যার কুজ্ঝটিকায় তা আচ্ছন্ন হয়। নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি তার ওপর সংশয়ের ছায়া ফেলে। তারাশঙ্কর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ত হবেন না। কিন্তু সাময়িক বিচারের হাওয়া যে দিকেই ফিরুক, বর্তমানকালের বিরাট এক দিকচিহ্ন হিসাবে তারাশঙ্করের সাহিত্যমূর্তি কোনদিনই বিলুপ্ত হবার নয় বলে মনে করি।

—দেবেশ মিত্র

সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব ছিল নাটকীয় এবং আকস্মিক। আগে থেকে ভূমিকা নেই, অনুশীলনের ইতিহাস কিছু নেই, তিনি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন কক্ষচ্যুত এক জাজ্বল্যমান জ্যোতিষ্কের মতো। তাঁর পাকা হাতের কারুকার্য, প্রকাশের অভিনব ভঙ্গী এবং তাঁর ভাবনার সংবেদনশীলতা—তাঁকে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের আসনে বসিয়েছিল। তাঁর প্রথম তিনটি গল্পই 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। সে-গল্পগুলি অম্লান ঔজ্জ্বল্যে আজও ঝলমল করছে। তাদের নাম 'রসকলি, হারানো সুর ও স্থলপদ্ম'।

সাহিত্যের আদর্শে তারাশঙ্কর ছিলেন ঐতিহ্যপন্থী। তাঁর প্রত্যেক রচনায় মৌলিক চিন্তাধারার এমন সমাবেশ থাকত যেটি অনন্য। রাঢ়ভূমির জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, লোকযাত্রা,—এদের অনবদ্য ছবি তাঁর প্রতি গল্পে, গ্রন্থে, চরিত্রে এবং বর্ণনায় ভাস্বর হয়ে উঠত। এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর সাহিত্যের অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি বহুবার।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর একাগ্র অনুরাগ ও নিষ্ঠা তাঁকে বহু সময়ে কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করত। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা অনেক সময়েই শ্রমের উপর নির্ভর করে—এ তিনি জানতেন। একখানির পর একখানি গ্রন্থ তিনি নতুন করে লিখেছেন—এই সংবাদ তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের জানা ছিল।

তারাশঙ্করের মৃত্যুও অনেকটা যেন আকস্মিক। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে তাঁকে দেখেছি সুস্থ, সবল ও সহজ। মৃত্যুর আগে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির ভূমিকা নেই, আগেভাগে নোটিশ দেওয়া নেই, শোনপক্ষীর মতো মৃত্যু যেন নেমে এল নীলাকাশ থেকে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প একদা যে বিস্ময় এনেছিল, তাঁর এই মৃত্যুও তেমনি হতবাক করে রেখে গেল।

তারাশঙ্কর ছিলেন হৃদয়বান মানুষ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর ভাবপ্রবণতা এবং আবেগ আকুলতা—একজন পরম বৈষ্ণবকে স্মরণ করিয়ে দিত। দেবদ্বিজে তাঁর মতো ভক্তিমান মানুষ লেখক-সমাজে বিরল। কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তি-চরিত্রের এ সকল গুণপনা হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে না,—থাকবে তাঁর কীর্তি। তাঁর বিশাল সাহিত্যকীর্তিই তাঁর জীবন।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান সারা বাংলার জীবন ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইন্দ্রপাততুল্য।

নিয়তি নিয়ত অবাধ্য। তাকে ধিক্কার না হয় না-ই দিলাম। জীবনে পূর্ণতার কর্দাশুং আস্বাদ তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন, নইলে অজস্র রচনায় তাঁর এমন সহৃদয়তা ছড়িয়ে থাকে কেমন করে? কাল ব্যাধি তাঁকে পঙ্গু করে রাখার মতো কদাকার করেনি। সময় হয়েছিল; বাঁধন ছিঁড়ে তিনি চলে গেছেন।

কিন্তু বাঙালী জীবনে তারাশঙ্করের তিরোভাব যে বঞ্চনার সৃষ্টি করল তার পূরণ নেই। হয়তো এ-বঞ্চনা তেমন তীব্র মনে হবে না তাদের কাছে, যারা তারুণ্যের অভিমানবশে আমাদের এই মান্ধাতাপন্থী দেশের পরম্পরাকে নস্যাৎ করার জন্য উদগ্রীব। হয়তো এ-বঞ্চনাবোধ আসবে না তাদের, যারা বিশ্ববিরাজী বৈদেশ্যের মোহে স্বদেশজিজ্ঞাসা বিষয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে নাসিকা সঙ্কুচন করে থাকেন। সে যাই হোক, অগণিত বাঙালী, এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষ, যারা ছিল তাঁর অনুরক্ত পাঠক, আজ অনুভব করছে এই বঞ্চনার বেদনা, তারা জানে অনুরূপ কারও সন্ধান আর মিলবে না।

সন্দেহ নেই যে সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার ছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর রচনার নিছক শিল্পগুণ নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান লেখক হলেও তাঁর লিখনভঙ্গীতে অচেতন শৈথিল্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বিচিত্র জীবনবার্তায় যখন মুগ্ধ করছেন, তখনও যেন ভাষার উজ্জ্বল নীলমণি রূপের অভাব। বিষয়বিন্যাসে, রচনারীতিতে প্রায় যেন একরকম পৌনঃপুনিকতা। অনুভূতির গভীরে বিচরণের মধ্যেই যেন মাঝে মাঝে একধরনের অচেতন তরলতার লক্ষণ তাঁর অনেক রচনায়। কিন্তু খুঁৎ-সন্ধানী সমালোচককেও মানতে হবে, সব কিছু ছাপিয়ে তারাশঙ্করের মমতা, তাঁর জিজ্ঞাসু মন, তাঁর অধ্যবসায়, আপাত-দৃষ্টিতে তুচ্ছ মানুষেরও মহিমা সম্বন্ধে নিশ্চিতি, তাঁকে মহৎ লেখকের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যিনি লিখেছেন 'কবি' আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'গণদেবতা' আর 'পঞ্চগ্রাম', "মঞ্জরী অপেরা' আর 'ঝড় ও ঝরা পাতা', সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন সংখ্যাহীন ছোট-বড়-মাঝারি গল্প যাতে বাংলার রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ মিশে এক সম্ভারের সৃষ্টি করেছে, তাঁর লেখনী সার্থক, জীবনের যোগমায়ায় তাঁর রচনা সিদ্ধি পেয়েছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল এই প্রতিভাধর মানুষটিকে জেনেছি, তাঁর মনের বিস্তৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছি, তাঁর সহজ সরল আত্মীয়তার স্পর্শে আনন্দ পেয়েছি, হঠাৎ বহুদিন অদর্শনের পর ক্ষুদ্র এক পত্রে একান্ত বিপরীত চরিত্রের মানুষ সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য মমতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছি। বুঝেছি যে তারাশঙ্কর প্রকৃতই দোষে গুণে গড়া সকল মানুষকে আপন করতে পেরেছিলেন। বুঝেছি কেন তাঁকে যথার্থ মানব মাহাত্ম্যের সন্ধানে প্রায়শ যেতে হয়েছে সমাজের অন্তেবাসীদের কাছে। জেনেছি কেন শিল্পকর্মে ত্রুটি এবং সুনিবদ্ধ চিন্তার দক্ষতার অভাব সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন অবিসম্বাদিতভাবে সমকালীন বাংলার লেখক-শিরোমণি। তারাশঙ্করের দেহাবসান ঘটেছে, কিন্তু তাঁর কীর্তি ও তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল।

—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে বলব না। বলবার মতন গুণীজ্ঞানী বিস্তর আছেন, ভবিষ্যতে আরও সব আসবেন। ব্যক্তি-পরিচয়ও সৌভাগ্যক্রমে নিজেই তিনি অনেক লিখে গেছেন। সজনীকান্ত মধ্যমণি, তাঁকে ঘিরে শনিবারের চিঠির আসর গড়ে উঠেছিল। তারাশঙ্কর ঐ আসরের। এমন কি, শনিবারের চিঠির সহ-সম্পাদকও ছিলেন তিনি কিছুদিন। আমিও সেখানে যেতাম। বিস্তরকাল আগের কথা—সাল-টাল অত আমার হিসাবে আসে না। খুব গোড়ার দিকে 'আপনি' 'আপনি' ছিল নিশ্চয়, কবে সেই সম্পর্ক 'তুমি'তে নেমে এলো মালুম নেই। নাটানিকেতনে 'কালিন্দী'

নাটকের অভিনয়—মনোহরপুকুরের অন্ধ গলি খুঁজে খুঁজে তারাশঙ্কর আমায় নিমন্ত্রণ করতে এলেন। আমি নেই, বাড়িতে কেউ না—চিঠিতে অনুরোধ জানিয়ে ড্রাইভারের কাছে রেখে গেলেন। নাট্যভারতীতে আমারও 'প্লাবন' নাটকের অভিনয়—আমি নিজে গেছি নিমন্ত্রণ করতে। বেলগাছিয়ার ঐ তল্লাটে শহর গড়ে উঠছে—তখন, মাটি খুঁড়ে ডাঁই করেছে—সনৎ আলো ধরে আমায় বরানগরের রাস্তায় তুলে দিয়ে গেলেন মনে আছে। যশোরের সাহিত্য-সভায় যাচ্ছি—কলকাতা থেকে তারাশঙ্কর ও আমি। বিভূতিভূষণ বনগাঁ থেকে উঠলেন। বিভূতি-দা ও আমি উভয়ে যশোরের মানুষ বলে বাকি পথ আমরা তারাশঙ্করকে যশোর সম্পর্কে মহোৎসাহে জ্ঞানদান করে চলেছি। বেনাপোল বিখ্যাত স্থান, বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ হরিদাসের তুলসিমঞ্চ ওখানে আছে। কিন্তু বিভূতি-দার সে পরিচয় মনে পড়ল না—বললেন, মস্ত বড় গোহাটা এই বেনাপোলে, হাটের দিন বিস্তর গরু ওঠে। তারাশঙ্কর বললেন, ভাল হল, আমাদের জানা রইল তোমায় কখনো না পাওয়া গেলে এইখানে এসে খুঁজতে হবে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় দাদামশায়কে সম্বর্ধনা জানাতে আমরা বোম্বাই করে কলকাতা থেকে বিস্তর সাহিত্যিক আমরা পূর্ণিয়ায় যাচ্ছি। রাত-দুপুরে গাড়ি লাভপুর স্টেশনে থেমেছে, তারাশঙ্কর উঠলেন—খালি হাতে নয়। প্রবল হই-হই রব উঠল, প্রকাণ্ড তোলোহাঁড়ি লহমায় লোপাট, হাঁড়ির চাড়াগুলো রইল শুধু। সকালবেলা মনিহারি বনফুলদের বাড়িতে। তাঁর ঋষিতুল্য বাবা তখন আছেন, দেড়দিন জুড়ে সকলে মিলে সেখানেই বা কী উল্লাস! এই লেখনে, পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। অতএব থাক।

তারাশঙ্করের শরীরটা সে সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে। আচমকা ফোন : তোমার বাড়ি যাবো আমি, কখন থাকবে?

এখনই হয়ে যাক না। অসুস্থ শরীরে কষ্ট করে এতদূরে কি দরকার?

না, যেতেই হবে।

সেরেছে! তখন বেঙ্গল পাবলিশার্সের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। মনে মনে প্রমাদ গণি : খুব সম্ভব গোলমেলে কিছু-একটা ঘটেছে, প্রতিষ্ঠানের উপর রেগে টং হয়েছেন। টালা থেকে চলে এলেন বালিগঞ্জে, ধুঁকতে ধুঁকতে উঠলেন আমার তিনতলার ঘরে। উদ্বেগে তাকিয়ে আছি। বললেন, অমুক বইটা তুমি বড় ভাল লিখেছ হে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বইটা হয়তো আমি তাঁকে দিয়েছিলাম, অথবা নিজে থেকেও পড়তে পারেন। উৎকণ্ঠা গিয়ে আমার এইবার ক্রোধ প্রকাশের পালা : এটা কি টেলিফোনে হতে পারত না? এমন কী জরুরি জিনিস এই শরীর নিয়ে এতদূর ঠেলে আসতে হল?

টেলিফোনে হলে আসতে যাবো কেন, তারাশঙ্কর বললেন। লেখা ভাল লাগলে অধীর হয়ে উঠতেন, তার এক দৃষ্টান্ত।

আটই শ্রাবণের জন্মদিনে সকালবেলা টালার বাড়ি গিয়ে প্রণাম করলাম। এবং তারাশঙ্কর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। সন্তোষকুমার ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও গৌরকিশোর ঘোষ একটু আগে এসেছেন। বয়সের গুণে আমিই প্রণাম পেয়ে থাকি—সেই আমিও মাথা নুইয়ে প্রণাম করছি, ওঁদের কাছে কৌতুকাবহ দৃশ্য। বলাবলি করছেন তাই। পরের দিন আমার জন্মদিন। প্রহরখানেক বেলায় তারাশঙ্কর ফুল মালা ও বই নিয়ে আশীর্বাদ করতে এলেন। ঘোর অপরাধ আমার—ঐ সময়টা একটু বেরিয়েছি, উপহার উনি রেখে গেলেন, হাত পেতে নেবার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম আমি। বাড়ি এসেই অপরাধ স্বীকার করে ফোন করলাম : উপহার নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছি, পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণামটা বাকি রয়ে গেছে—একদিন গিয়ে সেরে আসব।

কথা রেখেছি আমি একমাস উনিশ দিন পরে, আচাণে ভাদ্র সকালবেলা। সজল-দৃষ্টি অগণ্য মানুষ শয্যা পরিক্রমা করে চলে যাচ্ছেন। মুদিত-নেত্র তারাশঙ্কর। এত রোগযন্ত্রণা সয়েছেন, কিন্তু ক্ষীণ হাসি মুখের উপর—যেন ঈষৎ বিদ্রূপ মেশানো চরণোপান্তে শ্বেত কুসুমাঞ্জলি দিয়ে দু-হাত দুই পদতলে রেখে অনেকক্ষণ ধরে আমি শেষ প্রণাম নিবেদন করলাম।

—মনোজ বসু

আমাকে লেখা তারাশঙ্করের একটি অপ্রকাশিত চিঠি :

টালাপার্ক,
তারাশঙ্কর কলিকাতা-২
ফোন ৫৫-৩০৭৮

পরমানন্দেষু,

ভাই অচিন্ত্য, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসে সেই তাঁকে ভালবাসে। তোমার ভালবাসার মধ্যে আমি তাঁর প্রেমের যেন স্পর্শ পাই।

তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলাম। জানতাম তোমার চিঠি আসবে এবং সে চিঠিতে গভীর অনুরাগীজনের অনুরাগের স্বাদ পাব।

ভয় হচ্ছে ভাই। কেন জান?

তাঁকে মা বলে ডাকি, পুজো করি। আমাকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে না তো? যাকে কান্নায় মেলে তাকে কি হাসিতে ভেঙে পড়ে পাওয়া যায়? কাঁদলেই মা ছুটে এসে কোলে তোলে। হাসলে, ভাবে, বেশ আছে, ছেলে হাসছে।

আমার নিভৃত মনের গোপন ভালবাসা গ্রহণ করো। যে ভালবাসার ডাক বাঁশীতে বাজে। ইতি তোমার
তারাশঙ্কর

এই সম্পর্কে ভক্ত কবি মহাপ্রস্থিত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা মনে পড়ছে :

ডেকে ডেকে ক্লান্ত যখন চেষ্টা করো কাঁদতে,
ডাকের চেয়ে কান্না দামী মাকে কাছে আনতে।।

সেই 'কল্লোলে'র তারাশঙ্কর আজ মহামৌনের তারাশঙ্কর। সেই মহামৌনে নিরন্ত কান শোনা যাবে তার ভালোবাসার ডাক, মাটিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের মাঝে যে পরমতম তাঁকে ভালোবাসা। লেখনী বিরাম মেনেছে কিন্তু বংশীধ্বনির বিরাম নেই।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শেষ দেখার পর ফিরছি, সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে এক বিরাট বাঙালীর মুখখানি। দেখলাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নামছেন, অগণিত প্রিয়জনের মধ্যে তিনিও এসেছেন শেষ দেখা দেখতে। মনে পড়ে গেল, পল্লীগ্রামের এক অজ্ঞাত অখ্যাত লেখককে 'কল্লোলে'র এই পবিত্র গাঙ্গুলী একদিন তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' পড়ে পোস্টকার্ডে লিখেছিলেন—"এতদিন কোথায় ছিলেন?" নবীন লেখকের অন্তরে সেই পোস্টকার্ডটি সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করেছিল। 'কল্লোলে' সেই গল্প অচিরাৎ প্রকাশিত হল।

এমন কথা যিনি বার বার লিখেছেন সেদিনের সেই লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের পর যে কজন প্রথম শ্রেণীর কথাকার বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। সমাজ সচেতনতা তাঁর সাহিত্যে যে ভাবে প্রকাশিত তা ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলুপ্তি তাঁর সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর সম্পর্কে সর্বদা এই একটি কথাই বার বার উচ্চারিত হলেও তারাশঙ্কর কিন্তু শুধু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন পর্ব, বিভিন্ন স্তর। পিকাসোর ছবি আঁকার জগতে যেমন বিভিন্ন পর্ব, তারাশঙ্করের সাহিত্যে তেমনই বিভিন্ন পর্ব। এক একটি তরঙ্গ এসে তাঁর অন্তরকে প্লাবিত করেছে আর সেই প্লাবনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তাঁর অজস্র রচনায়। তিনি নিজে এক জায়গায় লিখেছেন—"পৃথিবীর মায়াপুরীতে ওটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।" —তাঁর সেই সোনার কাঠি হল গ্রামবাংলার মাটি আর মানুষ। আজ থেকে ছ বছর আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—এই সোনার কাঠিটা কোনদিন হাতছাড়া করতে পারেন নি আপনি?

তিনি সেদিন একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—"ও জিনিস কি কেউ হাত ছাড়া করে ভাই, ও হারিয়ে যায়। আজও তা আমার কাছে আছে কি নেই, তোমরাই বলবে।"

এখানে এই 'তোমরা' শুধু আমি নই, বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠকপাঠিকা একথা বলা বাহুল্য।

তারাশঙ্করের সঙ্গে কতদিনের কাজে পরিচয় ঘটেনি, পরিচয় হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে হবে। তখন 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে 'পাষাণপুরী' উপন্যাস—লেখকের নামের পাশে তাঁর গ্রামের নামও উল্লেখ করা সেকালে রীতি ছিল। 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—লাভপুর' এই নাম 'পাষাণপুরী'র প্রতিটি কিস্তির ওপর ছাপা হত। সেই নবশক্তি অফিসেই সম্পাদক মনীষী তারানাথ রায়। সেই 'পাষাণপুরী'তেই তারাশঙ্করের রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় ছিল। তিনি সেদিন লিখেছিলেন—মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা তার চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কিছু নাই। এর পরে 'চৈতালী ঘূর্ণিতে' কোর্ট ও মালিকের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ইঙ্গিত আছে। এ এক দিক। অপর দিকে 'আগুন' আর 'কবি'। তিনি যখন চন্দ্রনাথ—ধীরা ও হীরু—যাযাবরীর কথা লিখেছিলেন তখনই তিনি যে আসামীদের লেখক এই ধারণা বাঙালী পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কবিয়াল আর ঝুমুরওয়ালাদের কাহিনী 'কবি' তাঁকে অসামান্য খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করল। তারাশঙ্কর আমাকে একদিন বলেছিলেন—জানো, একজন আমাকে 'কবি'র জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তিনি মোহিতলাল, তিনি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কবি' সম্পর্কে।

তাঁকে বলেছিলাম—অনেক প্রশ্নই ত' করা যায়, তাতে অনেক সময় লাগবে। আপনার 'পৌষলক্ষ্মী'র কাহিনীটি কেন অতীতের অন্তিম কাহিনী। তারাশঙ্কর সেদিন সহাস্যে বলেছিলেন,—"এ গল্প বোধ হয় ১৯৪০-এর রচনা। মুকুল পাল অতীতের প্রতীক। আমি জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছি। তাই বলেছি—গাড়ি চলে গেল, পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথের ভীমের মত—সেই সঙ্গে গেল অতীত।"

কথাটা শুনে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মঙ্গলবার চোদ্দই সেপ্টেম্বর তারাশঙ্করের মহানিদ্রামগ্ন পুষ্পসজ্জিত চন্দনচর্চিত দেহখানির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল তাঁরই সেই কথাগুলি—

"গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল। মহাপ্রস্থানের পথের ভীমের মত, সেই সঙ্গে গেল অতীত।"

তারাশঙ্করের সঙ্গে চলে গেল একটা অতীত। বাংলা ও বাঙালীজীবনের অতীত গৌরবের প্রতীক তারাশঙ্কর মহাপ্রস্থানের পথের সেই অমিত বীর্যবান পাণ্ডবের মত আজ পড়ে আছেন।

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

অনেক মানুষ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করে, মনের উপর ছাপ রেখে যায়, কিন্তু তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে আমার তা হয়নি। কিন্তু মানুষের বাইরের রূপটাই যে সব নয়, রুক্ষতার অন্তরালেও একটি মধুর, কোমল, হৃদয়বান মানুষ যে থাকতে পারে, তা পরে বুঝেছিলুম তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর।

অন্য মানুষজনের সঙ্গে, বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের প্রতি তারাশঙ্করের ছিল একটা অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা। কেউ সাহিত্যকর্ম করছে শুনলে তিনি তাকে তাঁর সবচেয়ে আপনজন মনে করতেন এবং তাকে সাহায্য করতে ও সহানুভূতি দেখাতে কখনও বিমুখ হননি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সাহিত্যিক-জীবনে নানাভাবে তাঁর কাছ থেকে উৎসাহিত ও উপকৃত হয়েছি। তাঁর তিরোধানে অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা আজ ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে; সব গুছিয়ে বলা এখন সম্ভব নয়। তবু দু' একটি বলি। স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' নামক গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থের ২য় সংস্করণে লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনার জন্য আমার উপর ভার দেন। এই উপলক্ষে একবার আমি তারাশঙ্কর-দার (আমি তাঁকে তখন দাদা বলি) বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করি এবং তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কিন্তু সেই সময় প্রসঙ্গত রহস্য করে তিনি যে কথাগুলি বলেন, সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'ভাই, তুমি সাহিত্যিকদের এসব সাহিত্যালোচনার মধ্যে না গিয়ে, বরং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও ঘরোয়া জীবনের কথা বেশী করে বলো, তাহলে সাধারণের কাছে সেটাই বেশী উপভোগ্য হবে।' তার উত্তরে আমি বলি, 'দাদা, এতে তো মারধোর খাবার বা অনেকের বিরাগভাজন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।' তার উত্তরে তিনি আরও রসিকতা করে বলেছিলেন, 'তুমি সাহিত্যকর্ম করবে, সাহিত্যিকদের সমালোচনা করবে, অথচ কারুর বিরাগভাজন হবে না, এ কেমন কথা!'

সামান্য বা নগণ্য সাহিত্যিকদের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় ছিল যেমন ভরা, তেমনি ছিল তীব্র সামাজিকতাবোধ। কোথাও কেউ তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করলে, (যতদিন শরীর ভাল ছিল) তিনি তা রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। বদান্যতা ও উদারতাও ছিল তাঁর মধ্যে যথেষ্ট। তাছাড়া প্রবীণ ও দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সরকারী সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-ভাতা একবার বন্ধ হয়ে গেলে আমি নিজে গিয়ে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, ঐ সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা করে দেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ও রামপদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভাতা সম্পর্কে তিনি সচেষ্ট না হলে হত কিনা সন্দেহ। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে আমি কয়েকবার যাতায়াত করার সময় একদিন তিনি যা বলেছিলেন, তার চেয়ে বড় কথা আমি আর কোন

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পর বন্ধুগণ কর্তৃক স্বর্গতঃ সুধীরচন্দ্র সরকারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা ।। (পিছনের সারিতে দাঁড়ানো—বামদিক থেকে) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি ঘোষ, ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ নির্মল সরকার। (উপবিষ্ট—বামদিক থেকে) বুদ্ধদেব বসু, চারু রায়, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুধীরচন্দ্র সরকার এবং বিমল মিত্র।

সাহিত্যিকের মুখে শুনেছি কিনা সন্দেহ। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে আমি কয়েকবার যাতায়াত করার সময় একদিন তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার চেয়ে বড় কথা আমি আর কোন সাহিত্যিকের মুখে শুনেছি কিনা সন্দেহ। তিনি বলেছিলেন, "বিশু, এত করে কারু জন্যেই তোমায় আমায় বলতে হবে না; এর চেয়ে বড় কোন পুণ্যকর্ম আছে বলে আমি মনে করি না। টাকা আমি নিজে দিচ্ছি না, অন্যের কাছ থেকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছি মাত্র। কে জানে, একদিন এই সাহায্যের জন্যে আমাকেই কারু কাছে হাত পাততে হবে কিনা!"

তখন অবশ্য তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার পাননি।

—বিশু মুখোপাধ্যায়

প্রথমে শরৎচন্দ্র এবং পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেবার পর বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। যে কোনো সাহিত্যিক তা তিনি যতো ছোটোই হন, মারা গেলে শূন্যতা একটা দেখা দেয়ই—কেননা প্রত্যেক সাহিত্যিকই স্বতন্ত্র, তাঁর বিশেষ স্থানটি অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারেন না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো মহৎ সাহিত্যিকের প্রয়াণে যে আমাদের মনে মহাবিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দেবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে আমি একটু অন্য ধরনের শূন্যতার কথা বলছিলাম। এ অভাববোধ জেগেছিল বিশেষ করে এই কারণে যে বাংলা সাহিত্যের পাঠক এবং লেখকরাও প্রায় অনেকেই তখন মেনে নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র যা লিখে গেছেন তারপর নতুন আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। অন্তত এমন কিছু লেখার নেই যা খুচরো কাজ নয়, বড় মাপের জিনিস, এবং স্বকীয় চরিত্রধর্মে যা নতুন পথের দিশারী। এই বোধ কাজ করছিল আমাদের মধ্যে অনেকদিন ধরে। তারপর ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে লাগল একজন নতুন লেখকের, যাঁর সূচনায় ছিল না তেমন কোনো সোরগোল, যিনি ছিলেন অনেক নতুন লেখকের মধ্যে একজন, তিনি প্রায় বটগাছের চারার মতো বাড়তে লাগলেন, এবং বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠলেন একটি মহীরুহের মতো। বলা বাহুল্য, এই লেখক তারাশঙ্কর।

কিন্তু এইটুকুই তারাশঙ্করের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। বরং আসল কথা বোধহয় এইটেই যে, তিনিও চলে যাবার সময়ে রেখে গেছেন একটা শূন্যতা। আর এ শূন্যতা একটি চ্যালেঞ্জের মতো—আমাদের মধ্যে যা কিছু বড় হয়ে ওঠার অঙ্কুর, তাকে কেবলই সূর্যালোকিত নীলাকাশে মাথা তুলে বনস্পতি হয়ে উঠতে তাগিদ দেয়।

—নবীন রায়

ফটো : সুকুমার রায়

পটভূমি

কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা গত বছর যা করতে পারেননি, এ-বছর তা পেরেছেন। পশ্চিম বাংলায় পার্টি শেষ পর্যন্ত সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের লাইনই মেনে নিয়েছে।

অবশ্য গত বারে পার্টির জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তটা পশ্চিম বাংলার পার্টির ঘাড়ে যেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে-ও এই সেপ্টেম্বর মাসেই। আর এ-বছর পার্টির রাজ্য সম্মেলনেই প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতীয় পরিষদের লাইন মেনে নেওয়া হল। গত বছরে জাতীয় পরিষদ নির্দেশ দিয়েছিল, বাংলা কংগ্রেসকে দলে নিয়ে আট-পার্টি জোটকে ব্যাপকতর করো, তারপর শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসো (এবং মার্কসবাদীদের একঘরে করো)। কথনীর মধ্যে যেটুকু বললাম, জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে অবশ্যই তা বলা হয়নি, কিন্তু উহ্য থাকলেও ঐটেই ছিল উদ্দেশ্য। তবে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা রাজ্য কমিটি জাতীয় পরিষদের ঐ নির্দেশ কার্যকর করেনি। তার কারণ, অনেক নেতার মতেই, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের চেহারা প্রগতিশীল ছিল না, তাই কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কথা ওঠেনি।

এ বছর আগস্ট মাসে দিল্লীতে পার্টির জাতীয় পরিষদের বৈঠকে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের জন্যে যে খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে শাসক কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-পন্থীদের কথা স্বীকার করা হলেও তার মূল সুরটা কিন্তু কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার। এর বিশদ আলোচনা আগেই পটভূমিতে করেছি, তাই পুনরুল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল, সি পি আইয়ের রাজ্য সম্মেলনও এবার কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার পথই মেনে নিলেন।

রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বছর তিনেক পরে। এই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে তো বটেই, এমন কি পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতেও যে-বিরাট পরিবর্তন এসেছে কোনো চক্ষুষ্মান রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ১৯৬৮ সালে যে কংগ্রেসকে মনে হয়েছিল অস্ত-গামী, ১৯৭১ সালে সেই কংগ্রেসই নতুন শক্তিতে আবির্ভূত। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এখনও এই রাজ্যে কংগ্রেসকেই প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত না-করে পারে নি। তবে মার্কসবাদীরা কংগ্রেসের চরিত্রগত কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না, সি পি আই তা পাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় নেতাদের মতো পার্টির পশ্চিম বাংলা শাখাও অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতার সাবেকী নীতি পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে চায়। পার্টি কংগ্রেসের খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবের মতো রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তাবেও বামপন্থী ঐক্য বানচাল করার জন্যে সব দোষই মার্কসবাদীদের দোরগোড়াতেই জমা করা হয়েছে।

তবে এ-কথা মনে করা ভুল যে, পার্টির রাজ্য সম্মেলনে প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি সম্পর্কে কেউই কোনো প্রশ্ন তোলেননি। মূল প্রস্তাবের অন্ততঃ একটি সংশোধনী প্রস্তাব উঠেছিল, যাতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে সি পি এমের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবে তেমন সাড়া মেলেনি, তাই ভোটাভুটিতে সেটা অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

সম্মেলনে কোনো কোনো প্রতিনিধি কংগ্রেস ও সি পি এম দুদল থেকেই সমদূরত্বের নীতি অনুসরণের কথাও বলেন। তাঁদের ধারণা, তাতে পার্টির ইমেজ অনেক ভালো হবে, শক্তিও বাড়বে। কারণ এই নীতি অনুসরণ করলে দুদল থেকেই লোক ভাঙানো যাবে। কিন্তু তাঁরাও বিশেষ সমর্থন পাননি।

আগস্টে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, এই নীতি পার্টিকে কংগ্রেসের লেজুড় করে তুলবে, ফলে পার্টির শক্তি কমে যাবে। বিহারের জন-দুই প্রতিনিধি বিশ্বনাথবাবুকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ঐ দুজনই মাত্র। কারণ জাতীয় পরিষদের শখানেক সদস্যের মধ্যে ঐ তিনজন ছাড়া আর সবাই খসড়া প্রস্তাবকেই সমর্থন করেছিলেন (এমন কি এস এ ডাঙ্গে পর্যন্ত, যিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধী বলেই এতদিন শোনা যেত)।

রাজ্য সম্মেলনেও বিশ্বনাথবাবু একই ধরনের যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। সোমনাথ লাহিড়ীও জাতীয় পরিষদের লাইনের বিরোধী, কিন্তু গত নির্বাচনের পর থেকে সেই যে তিনি মুখ বন্ধ করেছেন রাজ্য সম্মেলনেও তিনি বিশেষ মুখ খুললেন না। তবে এই মৌন সম্মতির লক্ষণ হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।

অবশ্য কেন্দ্রীয় লাইনের যাঁরা বিরোধী তাঁরা নেতাদের বিশেষ বেগ দেননি। তাই মূল প্রস্তাব গ্রহণেও কোনো অসুবিধে হয়নি। আর পার্টিকে যে কেন এখন একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হল, দলের সাধারণ সম্পাদক ডঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। এই ধরনের স্পষ্ট নীতি ছিল না বলেই গত নির্বাচনে পার্টির আসন সংখ্যা কমে যায়। এদিকে পার্টির সদস্য সংখ্যাও কমতে থাকে। তাই এখন সময় এসেছে একটা নির্দিষ্ট ট্যাকটিক্যাল লাইন বেছে নেওয়ার। স্পষ্টতই, পার্টির জাতীয় পরিষদ এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের অধিকাংশের ধারণা, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিই পার্টির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবে। তাঁদের এই নীতির যাথার্থ্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে ব্যালট বাক্সের রায় কোন দিকে যায় তার মধ্যে দিয়ে।

অবশ্য গোপালবাবু যে-কথাটা বলেন নি, আমরা সেটা এখানে যোগ করতে পারি। সি পি আই একটা সর্বভারতীয় এবং মোটামুটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি। সুতরাং দলের কেন্দ্রীয় নেতারা এক পথে চলবেন এবং পার্টির কয়েকটি রাজ্য শাখা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলবে, এটা বেশি দিন চলতে পারে না। তা ছাড়া, কেরলে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় আনার জন্যে সি পি আই কাকুতি-মিনতি করবে এবং কংগ্রেসের যে-কোনো শর্তই মেনে নেবে, অথচ অন্যত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে, এটাও রীতিমতোই বিসদৃশ নয় কি?

•

ইতিমধ্যে যে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি তৈরি হয়েছে, তাতে অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি কার্যকর করার পক্ষে বেশ কিছুটা সুবিধে হয়ে গেল। পুরোনো প্রদেশ কংগ্রেসের জায়গায় যে নতুন অ্যাড হক কমিটি তৈরি হল তার দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদেরই শক্তি বৃদ্ধি হল, এ-কথা বলতে ভবানী সেন কিন্তু একটুও সময় নষ্ট করেননি।

গত বছর যে কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির ছুঁৎমার্গ বজায় ছিল তার কারণ তখন কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন বিজয় সিং নাহার। বিজয়বাবুর পার্টি স্থিতাবস্থার প্রতিনিধি বলে মনে করে। কিন্তু এখন যে শুধু বিজয়বাবু প্রগতিশীলদের চাপে পদত্যাগ করতেই বাধ্য হয়েছেন তাই নয়, নতুন অ্যাড হক কমিটিতে প্রগতিশীলদেরই প্রাধান্য। সেখানে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুব্রত মুখার্জী প্রভৃতি যুব ও ছাত্র নেতারা তো আছেনই, তা ছাড়া আছেন ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তি দাশগুপ্ত ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। সুতরাং এখন আর কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার বাধা কোথায়?

তবে অনেকে বলতে পারেন তালি বাজাবার জন্যে যেমন, মিলনের জন্যেও তো তেমনই দুখানি হাত দরকার। সি পি আই বাম হাত বাড়ালেও কংগ্রেস ডান হাত বাড়াবে কী? নির্বাচনী বোঝাপড়া নিয়ে কংগ্রেসের এখনও ভাবার সময় আসে নি, তবে সব দলের মতো কংগ্রেসের মধ্যেও এ-বিষয়ে নানা মত আছে। অনেকে 'একলা চলো' নীতিতে বিশ্বাসী, অনেকে আবার সি পি এমকে একঘরে করার জন্যে যে-কোনো দলের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজী। তবে অ্যাড হক কমিটিতে প্রগতিশীলদের প্রাধান্য সি পি আইয়ের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে বেশি চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হয়।

সি পি আইয়ের পক্ষে এ-বিষয়ে আরো একটি আশার লক্ষণ ফুটে ওঠে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময়। প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই কোয়ালিশনকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই চান যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির সঙ্গে একত্রে সি পি এমের বিরোধিতা করুক, তবে রাজ্য নেতারা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু কংগ্রেস সহযোগিতায় ইচ্ছুক হলেও কি কম্যুনিস্ট পার্টি সি পি এর বিরোধিতার জন্যে এ-ব্যাপারে একাই অগ্রসর হবে? অথবা সি পি এম-বিরোধী অন্যান্য বামপন্থী দলকেও নিজের সঙ্গে পেতে চাইবে? অন্যান্য বামপন্থী দল বলতে অবশ্য প্রধানত ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি।

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে যাওয়ার পরই বিজয়বাবু গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে টিঁকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হন। অজয়বাবুও সেই চেষ্টা সমর্থন করেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক এই উদ্যোগে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। দলের সম্পাদক অশোক ঘোষের মতে, ঐ কোয়ালিশন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে গড়া হয়েছিল এবং বিধানসভা ভেঙে যাওয়ার পর ঐ কোয়ালিশনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ঐ একই যুক্তিতে এবার তাঁরা দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি, কারণ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের অংশীদার হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সম্পর্কে এই মনোভাব গ্রহণ করলেও ফরওয়ার্ড ব্লক কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনার পথ তখনও বন্ধ করে দেয়নি। কংগ্রেস যে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল, এই প্রশস্তিও আমরা অশোকবাবুর মুখ থেকেই শুনেছি। এখন দিল্লী থেকে আর একটি আকর্ষণীয় সংবাদ এসেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের ছজন নেতা এই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, তাঁরা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্ট তৈরি করে নির্বাচনে লড়তে চান। ফরওয়ার্ড ব্লক যদি এই নীতি গ্রহণ করে তবে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসে।

বাকি থাকে এস ইউ সি। এই দলের কথা অবশ্যই আলাদা। তারা কোয়ালিশনে তো ছিলই না, বরং বিধানসভায় সব ক্ষেত্রেই কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। তা ছাড়া যে-দল নিজেদের সাচ্চা কম্যুনিস্ট পার্টি বলে দাবি করে, তাদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো কঠিন বৈকি? দলের নীতির বিচারে এস ইউ সি তো সি-পি-এমের তুলনায় দক্ষিণপন্থী নয়ই, বরং বামপন্থীই। তবু যে এই দল এখন সি-পি-এম সম্পর্কে ঘোরতর সন্দিহান তার কারণ গত দুটি যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা। তবে আগামী নির্বাচনের আগে এস-ইউ-সিকেও একটা মনস্থির করে ফেলতে হবে, কারণ কংগ্রেস-সি-পি-আই ফ্রন্ট যদি সত্যিই তৈরি হয় তবে এই ফ্রন্ট এবং সি-পি-এমের ফ্রন্ট—দুই রণাঙ্গনে লড়াই চালানোও কি এস-ইউ-সির পক্ষে সম্ভব হবে?

অবশ্য, মনস্থির করার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়, কারণ পশ্চিম বাংলায় আবার কবে নির্বাচন হবে তা এখনও কেউ ঠিক করে বলতে পারে না—যদিও সি-পি-এম, সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি সকলেই আশু নির্বাচনের দাবিতে এক কাট্টা।

১৭-৯-১৯৭১ —দেবদত্ত

আর একটি মহত্তর সাহিত্য সুসংবাদ !
বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী
ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমগ্র রচনা
তারাশংকর রচনাবলী
খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।
•
যে-সকল ক্রেতা আগামী ১লা কার্তিক থেকে ৩০শে চৈত্রের মধ্যে দশ টাকা (১০্) জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা মুদ্রিত মূল্যের উপর শতকরা ২০্ কমিশন পাবেন। ডাকে নিলে ডাকব্যয় আলাদা পড়বে। জমার টাকা শেষ খণ্ডে শোধ হবে।
•
প্রতি খণ্ডেই খ্যাতনামা চিন্তাবিদ মনীষীদের ভূমিকা থাকবে।
•
উপদেষ্টা পরিষদ :
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়
মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

CENTRAL LIBRARY

দেশে বিদেশে

কুমারটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা উত্তর কলকাতার একটা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল সুখাড়িয়ার পর শাসক কংগ্রেসের আর একজন মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর গদী ছাড়লেন। তিনি হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি। সাত বছরের কিছু বেশী সময় মুখ্যমন্ত্রিত্ব করার পর তাঁকে বিদায় নিতে হল। আসলে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সংগে শাসক কংগ্রেসের সমঝোতার মূল্য দিতে হল তাঁকে সরে গিয়ে। এই মূল্য তাঁকে দিতে হল দলের সর্বোচ্চ নেতাদের চাপে।

গত বছর অবশ্য তিনি নিজেই বলেছিলেন, তেলেঙ্গানাকে পৃথক রাজ্যে পরিণত করার আন্দোলন শান্ত হলে তিনি সরে দাঁড়াবেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ইদানীং রেড্ডি তাঁর সেই পুরানো প্রতিশ্রুতির কথা আর মনে করতে চাইছিলেন না। তিনি ও তাঁর সমর্থকরা বলছিলেন, কেন্দ্রীয় নেতারা হস্তক্ষেপের চেষ্টা না করে যদি অন্ধ্রের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেন তাহলে তেলেঙ্গানা সমস্যা তাঁরা মিটিয়ে দেবেন। এজন্য তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির সঙ্গে কোন রাজনৈতিক আপোষ করার প্রয়োজন তাঁরা দেখেন না।

এদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমিতির নেতাদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমিতির নেতা ডাঃ চেন্না রেড্ডির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এমন একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ব্রহ্মানন্দ মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাবেন, তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবে এবং নূতন ব্যবস্থায় যদি ঠিকমত কাজ না হয়, তাহলে ১৯৭০ সালে আবার তেলেঙ্গানার স্বাতন্ত্র্যের দাবী তোলা যাবে ও তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে সেই দাবী বিবেচনা করে দেখবেন, এই সব সর্তে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি পৃথক তেলেঙ্গানার দাবী আপাতত তুলে নিতে এবং শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতে রাজী হবে।

এই আপোষ-মীমাংসায় আসার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর তরফে একটা বিশেষ তাগিদ ছিল। গত মার্চ মাসে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে ১৪টি আসনের মধ্যে দশটি দখল করে নেয়। এই নির্বাচনে সমিতি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে শ্রীমতী গান্ধী ও শাসক কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের উদ্বেগের কারণ ছিল। আগামী বছর অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে একযোগে অন্ধ্রেরও বিধানসভার নির্বাচন হবে। তেলেঙ্গানা অঞ্চল থেকে অন্ধ্র বিধানসভায় ১০০টি আসন রয়েছে। নয়াদিল্লীর খবর হচ্ছে, তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির নামে প্রার্থী দাঁড়ালে এই ১০০টির মধ্যে ৭০টিই সমিতি দখল করে নেবে। অন্যদিকে, ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সমর্থকরা নয়াদিল্লীকে ভরসা দিচ্ছিলেন, রাজ্যে সংগঠন কংগ্রেস এখন নিশ্চিহ্নপ্রায়, স্বতন্ত্র পার্টিও শক্তিহীন, এই অবস্থায় আগামী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে শাসক কংগ্রেসের অসুবিধা হবে না।

কিন্তু শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা অন্ধ্রের নেতাদের এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডে যখন প্রসঙ্গটি উঠল তখন বোর্ডের সদস্যরা একবাক্যেই মত দিলেন যে, সমিতি

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে বোঝাপড়ার পথের কাঁটাটিকে সরাতে হবে অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে বিদায় দিতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী রেড্ডিকে দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসে রেড্ডি সংক্ষেপে বললেন, 'যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমাকে সরে যেতে বলেছেন, সেহেতু আমি সরে যেতে রাজী হয়েছি।' এই মন্তব্যের আর কোন বিশদ ব্যাখ্যা দিতেও তিনি রাজী হননি। অপরপক্ষে শ্রীমতী গান্ধী একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, 'রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে' ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করার জন্য রেড্ডি নিজেই পদত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

রেড্ডির পদত্যাগের পর এখন প্রশ্ন উঠেছে, তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নারাসা রেড্ডি, উপমুখ্যমন্ত্রী জে ভি নরসিং রাও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেঙ্গল রাও, আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান জে চোক্কা রাও, প্রাক্তন মন্ত্রী কোণ্ডালক্ষণ বাপুজী প্রভৃতির নাম উঠেছে। যিনিই হোন তাঁকে তেলেঙ্গানার মানুষ হতে হবে এবং তাঁকে সমিতির সমর্থনও পেতে হবে। অন্য কাউকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে শাসক কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জীবায়াকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বলা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এই মুখ্যমন্ত্রিত্ব যদি শুধু আগামী নির্বাচন পর্যন্ত হয় তাহলে অবশ্য সঞ্জীবায়া এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন।

ইতিমধ্যে এরকম একটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পদত্যাগ করে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। অন্ধ্র বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের নূতন নেতা নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করার জন্য সুব্রহ্মণ্যম হায়দরাবাদে গেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিধানসভা ভাঙ্গা বা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হবে না।

আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, ৬২ বছর বয়স্ক ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির এখন ভবিষ্যৎ কি? শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বিবৃতিতে শেষে বলেছেন, 'আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, সামনে যে কঠিন দিন আসছে সেই দিনগুলিতে দল ও দেশ তাঁর কাছ থেকে কাজ পাবে।' শ্রীমতী গান্ধীর কথার মধ্যে হয়তো এই আশ্বাস রয়েছে যে, রেড্ডিকে ভবিষ্যতে অন্য কোন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সেই দায়িত্বটা যে কি তা এখনও কেউ স্পষ্ট করে বলেননি।

•

সেচমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও বলেছেন যে, এবার বন্যায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় মোট ৪০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে চূড়ান্ত হিসাব এখনও আসেনি।

ডাঃ রাও বলেছেন, গঙ্গার এবারকার বন্যা গত ২৫ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। এর আগে ২৫ বছরে গঙ্গার সর্বোচ্চ বন্যায় তিন লক্ষ একর ফুট জল (তিন লক্ষ একর জমিতে এক ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন জল) হয়েছিল। আর এবার ঐ নদীর বন্যায় দু কোটি তিরিশ লক্ষ একর-ফুট জল হয়েছে। গঙ্গার এই বন্যায় উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যা হয়েছে তারই ফলভোগ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলাকে। সেখানে গঙ্গার সঙ্গে মহানন্দাও যুক্ত হয়েছে। গঙ্গা নদীতে জল বাড়ায় ভাগীরথী ও হুগলীও ফেঁপে গেছে এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সেচমন্ত্রী বলেছেন যে, ড্যাম তৈরী করে গঙ্গার বন্যা ঠেকান যেতে পারে; কিন্তু সমতলে ড্যাম তৈরীর উপযুক্ত জায়গা নেই। তবে সরকার উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ে ড্যাম তৈরীর কথা বিবেচনা করছেন।

হাওড়া ও হুগলী জেলার বন্যার জন্য ডি-ভি-সি দায়ী, একথা অস্বীকার করে ডাঃ রাও বলেন যে, ডি-ভি-সির ড্যামগুলি না থাকলে পাঁচ লক্ষ কিউসেক জলের চাপ পড়ত। এই ড্যামগুলি ছিল বলেই বন্যার বেগ কমে মাত্র দেড় লক্ষ কিউসেক হয়েছে। তবে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, দুর্গাপুরের নীচে নদীর পাড় না বেঁধে যে

আগামী সংখ্যা থেকে
ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে
নতুন স্বাদের উপন্যাস
সুবর্ণশিরি
লিখেছেন :—
অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুল করা হয়েছে তার খেসারৎ হাওড়া ও হুগলী জেলাকে দিতে হচ্ছে। পাড় না বাঁধা পর্যন্ত। ঐ দুটি জেলায় বন্যা হতেই থাকবে। এই উদ্দেশ্যে ১৪ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরী করেও টাকার অভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। এখন দুটি পর্যায়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং সেই কাজ শীঘ্র আরম্ভ করা হবে।

বন্যার সমস্যাটি খুঁটিয়ে দেখার জন্য ও তার প্রতিকারে কি করা যায় বিবেচনা করার জন্য অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে দিল্লীতে বন্যাদুর্গত রাজ্যগুলির মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক আহ্বান করা হচ্ছে।

•

১৯৬০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান যখন বক্তৃতা করছিলেন সে সময়ে তৎকালীন রুশ প্রধানমন্ত্রী নিকিতা সার্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ সেই বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ নিজের পা থেকে জুতো খুলে টেবিল চাপড়াতে থাকেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে এমন অভাবিত কাণ্ড এর আগে কখনও ঘটে নি, এর পরেও না। বিশেষ করে, একজন রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশিত ছিল না। ঘটনাটি নিয়ে সে সময়ে তুমুল হৈ-চৈ হয়েছিল। যাঁর বক্তৃতায় বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য ক্রুশ্চেভ সেদিন এমন অভূতপূর্ব আচরণ করেছিলেন সেই হ্যারল্ড ম্যাকমিলান কিন্তু তাঁর এই আচরণের জন্য একটা দিক দেখেছিলেন। ম্যাকমিলান মন্তব্য করেছিলেন, 'একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষটি মানবিক গুণসম্পন্ন। যখন তিনি টেবিল চাপড়ান তখনও সেটা প্রকৃতপক্ষে মানবিক আচরণ।'

নিকিতা সার্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে এটাই সম্ভবত বড় কথা। দোষে-গুণে তিনি একজন জীবন্ত মানুষ ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর যিনি প্রায় দশ বছর কাল সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতিতে ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেছেন সেই মানুষটির নাম এক সময়ে সারা পৃথিবীর ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন খনি শ্রমিকের সন্তান ও প্রাক্তন ফিটারের মধ্যে এই প্রথম একজন বড় কম্যুনিস্ট নেতাকে দুনিয়ার মানুষ দেখতে পেল যিনি অনায়াসে ও যখন-তখন ক্রেমলিনের প্রাচীর অতিক্রম করে পৃথিবী পর্যটনে বেরোন, যিনি হাসতে ও হাসাতে, এমন কি কাঁদাতে ও কাঁদতে জানেন। ইনিই সেই মানুষ যিনি স্তালিনকে মাতৃপূজার সিংহাসন থেকে নামিয়ে কম্যুনিজমের একটি নূতন চেহারা দিয়েছেন। তার জন্য তাঁকে কোন কোন কম্যুনিস্ট মহল থেকে তীব্র ধিক্কারও শুনতে হয়েছে।

ক্রুশ্চেভের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলে সার্গেই ঠিকই বলেছেন, 'খুব কম লোকই তাঁর প্রতি উদাসীন থাকতে পেরেছেন। কেউ-কেউ তাঁকে ভালবাসতেন, কেউ-কেউ তাঁকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে গেছেন খুব অল্প কয়েকজনই।'

গত ১০ জুন তারিখে মস্কোর একটি স্কুল বাড়ীতে তাঁকে সস্ত্রীক ভোট দিতে আসতে দেখা গিয়েছিল। প্রকাশ্যে বাইরে বেরোন সেই তাঁর শেষ। সে সময়ে দুজন পাশ্চাত্য সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো এখন পেন্সনভোগী। একজন পেন্সনভোগীর আর বলার কি থাকতে পারে?'

একদিনকার এই সুপরিচিত রাষ্ট্রনায়ক ৭৪ বছর বয়সে যখন মস্কোর শহরতলীর একটি হাসপাতালে মারা গেলেন তখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রী নিনা ও মেয়ে রাদা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নি, তাঁর শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় নি, তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রুশ সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র ও বেতার তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারও করে নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা

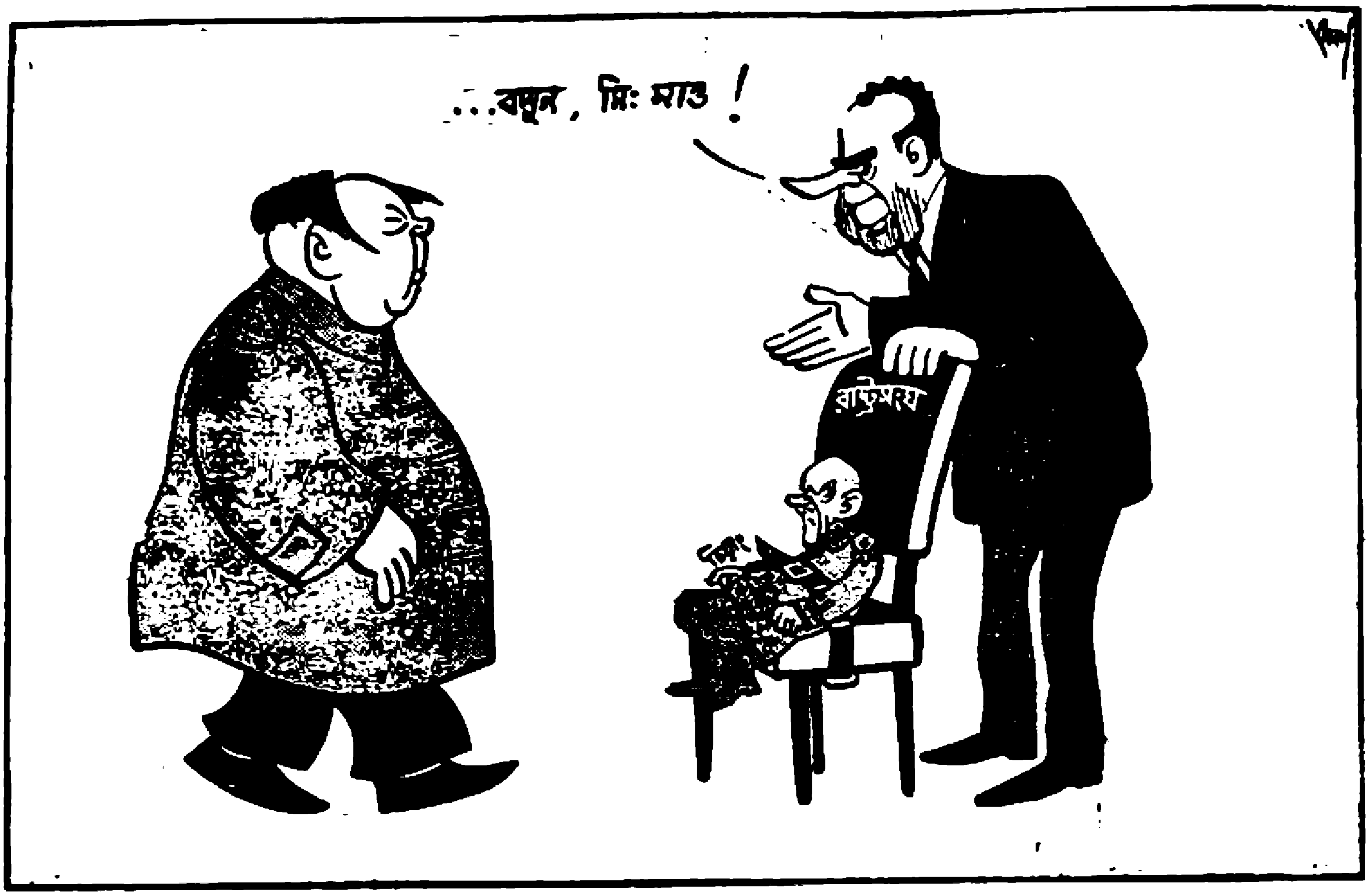

গান্ধী তাঁর শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ক্রুশ্চেভের বিধবা পত্নীর কাছে, রুশ সরকারের কাছে নয়। রাশিয়ার একজন বেসরকারী নাগরিকের মৃত্যুতে এটা শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত শোক। তাঁর বার্তাটিকে সেভাবেই গণ্য করা হবে।

●

সংবাদের স্তম্ভে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি অকথিত ইতিহাসের কাহিনী :—

জোসেফ ল্যাশ নামক একজন মার্কিন লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্টের পত্নী এলিনর রুজভেল্টের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিত্তিতে 'এলিনর ও ফ্রাঙ্কলিন' নামে একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তাঁর সেক্রেটারী লুসি পেজ মার্সারের সঙ্গে গোপন প্রণয় বন্ধ না করলে তাঁর স্ত্রী এলিনর বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন বলে ফ্রাঙ্কলিনকে ভয় দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কলিন ও লুসি দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে রাজী হন।

এলিনর রুজভেল্ট ১৯৬২ সালে মারা গেছেন। জোসেফ ল্যাশ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন।

ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলস সম্প্রতি একটা প্রবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে একবার আর ১৯৬৪ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার ভারতকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হওয়ার মুখে এসে বানচাল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে নেহরু নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন ভূমিকাকে সমর্থন করতে এবং সামরিক ব্যয়ের একটা সর্বোচ্চ সীমা স্থির করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তার ফলে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নূতন সম্পর্ক স্থাপনের পথ মুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে এ বিষয়ে তাঁর সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্য বোলস ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছবার ছয় দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হলেন। ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ল। ১৯৬৪ সালের মে মাসে আবার যখন এই বিষয়ে এক দল ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে মার্কিন সরকারের আলোচনা চলছিল এবং একটা বোঝাপড়া যখন প্রায় হয়ে এসেছিল সে সময়ে নেহরু মারা গেলেন। তার ফলে আলোচনা পিছিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার ঠিক করলেন 'পরিস্থিতি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে বিবেচনা স্থগিত রাখা হবে।' এর তিন মাস পরে ঐ একই ভারতীয় দল মস্কোতে গিয়ে ভারত যা কিছু চেয়েছিল সব নিয়ে নয়া-দিল্লীতে ফিরে এলেন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির প্রেস সেক্রেটারী পিয়ের স্যালিঞ্জার বি-বি-সি'র প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি যদি দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ব্যবধান দূর করার চেষ্টা করতেন।

স্যালিঞ্জার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি খুব সামান্য ভোটে জিতেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টগিরি করাটা খাটো মেয়াদের কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। এবং চীনকে তিনি তাঁর শাসনের দ্বিতীয় চার বছর-কালের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে ঐ চার বছরে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হতেন।

●

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের হাত দিয়ে খেতে দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছেন এক দল ইউরোপীয় সেবাকর্মী। তাঁরা তাঁদের দেশ থেকে বিমানযোগে শরণার্থী ক্যাম্পগুলিতে ছুরি, কাঁটা ও চামচ পাঠাবার পরিকল্পনা করছেন।

১৭।৯।৭১ —পুণ্ডরীক

মহিষাসুরমর্দিনীর প্রাচীন মূর্তি

সুপ্রাচীনকাল হতেই আসমুদ্রহিমাচলে শক্তি পূজা প্রচলিত আছে। শক্তিদেবীর অন্যতম রূপ হলো দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। বিভিন্ন রূপে দুর্গাদেবী ভারতের সর্বত্র। এমনকি এক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও আদৃত ও পূজিত হতেন।

সঠিক কাল নির্ণয় করতে না পারলেও দুর্গাদেবী যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে জনগণের আরাধ্যা দেবী ছিলেন ইহার সাক্ষ্য বহন করছে রাজস্থানের নগরে (প্রাচীন কর্কোট নগর) সম্প্রতিকালে আবিষ্কৃত মহিষাসুরমর্দিনীর একটি পোড়ামাটির মূর্তি। অষ্ট-চর্চিত এই চতুর্ভুজ মূর্তিটি দেবমাতৃকার গঠন; উচ্চতায় সাত ইঞ্চি, প্রস্থে চার ইঞ্চি। দেবীর নিম্ন-দক্ষিণভুজ মহিষের পৃষ্ঠোপরি রয়েছে; ঊর্ধ্ব দক্ষিণভুজে রয়েছে ত্রিশূল; বামপদ অর্ধশায়িত সিংহশিরোপরি স্থাপিত; ভালে শোভা পাচ্ছে চন্দ্রপ্রভ-তিলক। মহিষের সম্মুখের পা-জোড়া ঊর্ধ্বোত্থিত, পুচ্ছ খাড়া আর মুখ দেবীর নিম্নস্থ বামভুজের তলদেশে। মূর্তিটি পোড়ামাটির; তাই ইহাকে জনপ্রিয়তা ও প্রাচীনত্বের নিদর্শন মনে করা যেতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যে, তন্ত্রে, পুরাণে ও স্মৃতিশাস্ত্রেও দুর্গাদেবীর উল্লেখ রয়েছে; মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের বধের কাহিনী সবিস্তারে বলা হয়েছে। অরিকুলাধিপতি মহিষাসুর দেবরাজ্য আক্রমণ করেন; যুদ্ধে দেবকুল পরাজিত হন; অরিরাজ দেবরাজ্য দখল করে নির্মম অত্যাচারে দেবরাজ্যবাসীদের জর্জরিত করেন। নিপীড়িত দেবকুল ব্রহ্মার দরবারে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হলেন; ব্রহ্মা ওদের নিয়ে বিষ্ণুলোকে গিয়ে দেবতাদের করুণ কাহিনী বিষ্ণুর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সমস্ত শুনে বিষ্ণু ক্রোধিত হলেন। তখন ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর বদন হতে তেজোরাশি নির্গত হতে লাগলো। উপস্থিত দেবতাদের দেহ হতেও তেজোরাশি বিস্ফুরিত হলো। এই পুঞ্জীভূত তেজোরাশি এক অপূর্ব প্রাণবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। ইনিই হলেন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও উপস্থিত দেবকুল দেবীকে অস্ত্রশস্ত্র ও মনোরম বসনভূষণাদি দিয়া সজ্জিত করলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের পরে মহিষাসুরকে দেবী বধ করলে দেবরাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। তখন হতেই বোধহয় দুর্গতিনাশিনীর পূজা ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়। বাংলাদেশে এই পূজা জাতীয় উৎসব রূপে শরৎকালে তিন চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়।

—শিবদাস চৌধুরী

আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙালী ও বাংলা দেশ

গোবিন্দচন্দ্র বালা

অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বাঁধাধরা ছক ছিল। তখন কোন কোন বিশিষ্ট কবির রচনায় তার একটা-আধটু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তবে তখনকার অধিকাংশ রচনাতেই কম-বেশী জীবন-রস পরিবেশিত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলার আদিতম কাব্য 'চর্যাপদাবলী' থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-সাহিত্য, শাক্ত-সাহিত্য মুসলমানী সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেণীর সাহিত্যে বাঙালী ও বাংলাদেশের বিচিত্র চিত্র, জীবন-সত্য এবং বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; আর এটাই হয়তো স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্য যতই ভাবমুখর—(এ্যাবস্ট্রাক্ট) এবং প্রতীকধর্মী (সিম্বলিক) হোক না কেন; তবু দেশ-কাল- এবং পাত্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না। বাংলার অনাধুনিক সাহিত্যও নিতান্ত ধর্মভিত্তিক হয়েও পারেনি। কারণ, যখনি কবি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখনই মনে পড়েছে অন্যথা দেবীর কাহিনী কথা, মনে পড়েছে বাংলার ঐতিহ্যের কথা, বাংলার স্নিগ্ধ-কোমল প্রকৃতির কথা, মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির কথা। তা ছাড়া, একালের মতো তখন বসু-জননী বিশ্ব-জননীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাননি। ফলে সাম্প্রতিক সাহিত্যে দেশ-কাল-পাত্রের যে ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়, তখন তাও ছিল না। তবে বাংলার হৃদয়ের আবিষ্কার ও নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে অনাধুনিক কবিরা তাঁদের সবটুকু রঙ আরোপ করেছেন। তবে কখনো কখনো কালের অভিশাপে চরিত্র এবং চিত্র অস্পষ্ট এবং ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে শাক্তপদাবলীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে; শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি তত্ত্বগত দিকও আছে; কিন্তু রসিক পাঠকের কাছে এদের শিল্পগত দিকই মুখ্য। এগুলি তত্ত্বের চেয়ে আবেদনেই শ্রেষ্ঠতর। বিশেষত শাক্তপদাবলীর 'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতে তত্ত্বের দিকটা একেবারে গৌণ; বরং বাঙালীর জন-জীবনের একটি চিরন্তন আর্তিকে শাক্ত-কবিরা সুর-ছন্দ-কাহিনী এবং রসের সমন্বয়ে বেঁধে রেখেছেন। এর মধ্যে সাংসারিক বস্তুগত বা কল্পনার চেয়ে মানসিক বিরহ-বোধের হাহাকারই বেশী।

'আগমনী ও বিজয়া' গানের ফাঁকে ফাঁকে চিরন্তন বাংলার চিরজননী এবং প্রাতঃস্মরণীয়া বধূ উমার জগজ্জননী রূপ ফুটে উঠেছে। যেমন,—'যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আপনাকে আর ধরিয়া পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবমূর্তিটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া রহে কাঁদিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে।' ১

এই একাধারে মানবী ও দেবীতে দেবারোপণ—এমনটি বাঙালী কবি ও বাংলার জনগণ ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। কারণ এ গান বাঙালী কবিরই—

'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' ২

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জগজ্জননীর রূপ ও কাহিনী বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে দেবীর উমা-সুলভ মানবী-মাধুর্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। সমস্ত উগ্রতা ও রুক্ষতার চেয়ে নির্মিত রূপ বাংলার সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং পরিবেশের আবেশে বাঙালী শাক্ত কবিরা সমস্ত দেব-দেবীকে স্নিগ্ধ মমতাসিক্ত এবং বাঙালী-প্রকৃতি-সম্পন্ন করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথও এক স্থানে অন্য ভাষায় এই কথাই ব্যক্ত করেছেন।৩

'আগমনী ও বিজয়া' গানের সমাজ-সচেতনতা এবং জীবনবোধের নিবিড়তা ও গভীরতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। তাই অনেক সমালোচক এই গানকে লোকনাট্য কিম্বা ঔপন্যাসিক কাহিনী ও গুণসম্বলিত কবিতাবলী আখ্যা দিয়ে থাকেন।৪

'আগমনী ও বিজয়া' বাঙালী সংসারের মিলন ও বিরহ সংগীত। এর মাধ্যমে বাঙালী ধর্মচেতনা ও সমাজচেতনার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

শাক্তপদাবলীর উৎস রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে।৫ তারপর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী যেমন লোক-সাধারণের মধ্যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করায় জনসাধারণের কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত উপাদান ছড়া এবং গাথা ইত্যাদিতে অংকুরিত হয়ে উঠেছে, তেমনি উক্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে বিচিত্র ধরনের লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছিল।৬

'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতও সম্প্রদায়ভিত্তিক লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপ। তাই এতে লোকজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে।

প্রথমটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'আগমনী ও বিজয়া' সংগীতের বর্ণনার বেলায় এবং পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে দেবতা এবং দেবী ও এঁদের ক্রিয়াকর্ম দেবতার লীলা ছাড়া কিছুই নয়; কিন্তু ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, পল্লীবাংলার নিখুঁত সম্পূর্ণ পারিবারিক চিত্র এই গানগুলির মধ্যে সরলভাবে অংকিত হয়েছে। যেখানে জগজ্জননী মহামায়া দুর্গার শুভ উদ্বোধন প্রতি বছরই হয়, যাঁদের কন্যাকে যে কোন প্রকার বুড়ো এবং কুলীন স্বামীর হাতে সমর্পণ করতে হয়, সংবৎসরের পরে মায়ের আবাহনের সময়ে বিরহিনী জননীর সঙ্গে অভাগিনী কন্যার করুণ-মধুর মিলন এবং আগমনী শেষ না হতেই বিজয়ার বেদনা 'রাগিনীর' সুরে মাতৃহৃদয়ের অনন্ত ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের সাধনায় প্রেমই হলো সর্বসাধনার। শাক্তপদাবলী সম্পর্কেও একথা খাটে। এসম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,—'বাংলাদেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হলো ধর্মের প্রাণ। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ, অনেক বিপদ আছে; তবুও বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে; তবুও শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায়নি।' ৭ 'আগমনী ও বিজয়াতে এই প্রেমই প্রেমভক্তি অবলম্বন বিভাব। বাৎসল্য রসই এখানকার প্রধান রস।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতিকে একটু অন্যরূপে শাক্ত-কবিদের জিজ্ঞাসা করা যায়,—

'হেরি কাহার নয়ান মেনকার (রাধিকার) অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?'৮

সত্যই তো শাক্তকবিরা মেনকার 'অশ্রু-আঁখি' পল্লীবাংলার অসংখ্য মায়ের অশ্রু-সিক্ত নয়ন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন আর পারিবারিক চিত্র পেয়েছিলেন বাংলার পারিবারিক থেকে। বরং বৈষ্ণব কবিদের চেয়ে জীবন-রস পরিবেশনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শাক্তকবিদেরই বেশী।

পুরাণের জগজ্জননী 'আগমনী ও বিজয়াতে' হিমালয়কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে কবিদের সৃষ্টিপ্রভাবে বাঙালী ঘরের ননীর পুতলী, স্নেহধন্যা অঞ্চলের নিধি, অনন্ত ব্যাকুল বাঙালী মায়ের প্রিয়তমা কন্যারূপে চিত্রিত হয়েছেন। এখানে দেবীকে কন্যারূপে আরাধনা করা হয়েছে।

গিরিরাজ বাঙালী মধ্যবিত্ত মানুষ। তার স্ত্রী মেনকা কন্যাগতপ্রাণ। ভিখারী শিবের সঙ্গে কন্যা-বিবাহের পর থেকে তাঁর দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার অবধি নেই। অভিমান, স্বামীর দারিদ্র্য ঢাকার চেষ্টা, আত্মসম্মানবোধ, মাতৃস্নেহব্যাকুলতা,— সব মিলে উমা বাঙালী ঘরের কন্যা ও বধূরূপে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মেনকাও স্নেহশালিনী ও বিরহ-ব্যাকুলা বাঙালী মা। কন্যাকে দেখার জন্য অতিরিক্ত আকুলতা, স্বপ্নদর্শনে ক্রন্দন, স্বামীকে মান অভিমান ও তাড়না-ক্রন্দনের সাহায্যে কন্যাগৃহে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনায় এ সত্য অতি-স্পষ্ট। তারপর কন্যা এলে,—

"শুনিয়া এ শুভবাণী এলোচুলে
ধায় রাণী বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাবভরে ঝরঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে
অমনি কাঁদে গলাধরে।"

দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর বাঙালী মাও কন্যাকে কাছে পেলে ঠিক এমনি ভাবাতিশয্যই প্রকাশ করে।

দৈবক্রমে ভিখারী শ্মশানবাসী ভোলানাথের সঙ্গে উমার বিয়ে হলো। সেই থেকে রাজনন্দিনী হলো ভিখারিনী। এ কথা চিন্তা করে মা মেনকা ব্যথাতুরা। তৃষ্ণার্ত চাতকিনীর মতো শরৎকালের দিকে চেয়ে থাকেন; কেননা ঐ সময় তাঁর প্রাণাধিকা কন্যাকে তিনি দেখতে পাবেন। এই ভাব ও উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা-সুন্দর আর্তি—তা সবটুকুই বাঙালী মায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতি নবশ্রীরূপ, শরৎ সমাগত, পূজার আগমনীতে আকাশবাতাস আমোদিত। কন্যা-মিলনের কল্পনায় মাতৃহৃদয় পুলকিত, শঙ্কিত এবং রোমাঞ্চিত। তাই মেনকা গিরিরাজের কাছে নিবেদন করছেন,

"গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো
কথা শুনবো না।।"

বাঙালী মায়ের হৃদয়ের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—অন্ততঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুদুর্লভ।

উমা পূর্বজন্মে পতিনিন্দার ফলে দেহত্যাগ করেছিল বলে—মেনকা বলেন,

"আমি সেইটে করি ভয় ঝি-জামাই
আনতে হয়,
এস কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ
করে।"

এখানে জাতিস্মরত্ব এবং জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত লক্ষণীয়—যা আমাদের হিন্দু-দর্শনের তত্ত্বে স্বীকৃত। তাছাড়া, ঝি-জামাই আনা এবং সেই উপলক্ষে একটি উৎসব ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি প্রথা পল্লীবাংলায় অতি-চেনা মধ্যবিত্ত ঘরে সুপ্রচলিত। তাছাড়া,—

"আছে কন্যা সন্তান যার, দেখতে
হয় আনতে হয়,
সবাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে
অন্তরে।" (মেনকা)

এগুলি বাঙালী মায়ের উপযুক্ত উপদেশই বটে। এই সংলাপ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। বাঙালী পিতারা অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে মাঝে মাঝে মায়ের এমন উপদেশের কথা শুনতে হয়।

ভোলানাথ বৃদ্ধ-কুলীন বাঙালী পুরুষের প্রতীক। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে কচি মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে ১০ কৌলীন্যপ্রথার কথা এবং বাল্যবিবাহের কথা মনে পড়ে। উমাকে সতীনের ঘর করতে হয়। এখানে বহুবিবাহের কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশে এই দুটি প্রথা বহুদিন থেকে প্রচলিত।

বিশেষতঃ "নারীর জনম শুধু যন্ত্রণা সহিতে"—মেনকার এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাঙালী নারীর জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। সত্যই তো বাঙালী নারী যুগ-যুগান্তর ধরে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করছে। তারই সত্যরূপ এতে প্রকাশিত।

বাংলার আর একটি সংস্কার হচ্ছে মেয়েকে সামাজিক মতে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া। এই নিয়মে মেয়েও কাঁদে; কিন্তু তার চেয়ে বেঁচকা বাঁধে বেশী। আর অবলা অসহায়া জননীরই হাহাকার মর্মন্তুদ। কন্যা আনার জন্যে মা বার বার স্বামীকে অনুরোধ করেন, মিনতি করেন, কিন্তু পিতার পাষাণ হৃদয় এতো সহজে বিগলিত হয় না। তাই মার অভিযোগের মাধ্যমে সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে,—

"উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা
নিশিদিন,
মা হতে বুঝিতে চিতে, জানিতে
না দিতে এনে।"

এ অভিযোগ বাঙালী মায়েদের চিরন্তন অভিযোগ। তাছাড়া পূজার সময় জামাই-মেয়েকে আনা বাংলার একটি নিয়ম এবং মেয়ের সঙ্গে যে জামাইকে আনতে হয় এ সাধারণ জ্ঞান মায়েরই বেশী—

"গিরিরাজ হে জামাই এলো
মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেমন মন মায়ে বোঝে
কেমন।" ইত্যাদি

গিরিরাজ বাঙালী পিতার প্রতিমূর্তি। তিনি বুদ্ধিশীল, অচল, অটল এবং স্তব্ধ। কন্যার প্রতি তাঁরও মমতা কম নেই; কিন্তু তিনি জামাই-এর মনস্তত্ত্ব বুঝে বলেন,—

"বসন্ত ত্যজিয়ে যদি ক্ষণেক বাঁচয়ে
ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা
মারে।"

এখানে স্থৈর্য বাঙালী পুরুষের চিত্র উদ্ধৃত হয়েছে। যাদের স্ত্রীই সর্বস্ব।

গিরিরাজ উমাকে জানান যে, তার ভাই মৈনাক শুধু তারই বিরহে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, পাঠকের ঘোরতর সন্দেহ যে, কোন ভাই বোনের বিরহে আত্মবিসর্জন করেছে কিনা। কাজেই এখানে কিছুটা অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে।

গার্হস্থ্যপ্রধান হওয়ায় 'আগমনী ও বিজয়া' পর্বের প্রত্যেকটি চরিত্র মানবীয় রূপে জীবন্ত। দেবাদিদেব মহাদেবের দৈবমহিমা এখানে লেশমাত্র নেই। তিনি এখানে রক্ত-মাংসে গঠিত পরিপূর্ণ বাঙালী পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি ভিখারী, নিরাসক্ত, নিশাখোর, পত্নীগতপ্রাণ এবং রসরাজ। কারণ তাঁর উক্তি—

"জনক ভবনে যাবে ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব ভাব কেন আর।।"
(উমাকে)

উমাও সম্পূর্ণ বাস্তব। মুনি যাঁকে ধ্যানযোগে পান না, যে পদপঙ্কজ নাগিশকেন্দ্র যোগী হইয়া তাঁহাকে সতনে হৃদিমাঝে ধারণ করিয়াছেন, সেই উমা এখানে একদিকে চপলা, চঞ্চলা, অভিমানিনী পল্লীবালা, অন্যদিকে কর্তব্যপরায়ণ পতি-সোহাগিনী পল্লীবধূ।১১ তাঁর স্বামীর কাছে অনুমতি ভিক্ষা এবং অতীতের অশেষ সোহাগমমতার স্মৃতি উত্থাপন—এই সবকিছুর মধ্যে চমৎকার জীবনরস পরিবেশিত। মায়ের প্রতিও তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। তাই মার কাছে সতীনের জ্বালা এবং অভাবের যন্ত্রণার কথা তিনি গোপন করে যান,—

"শুনেছো সতীনের ভয় সে সকল
কিছু নয় মা।
তোমার অধিক ভালোবাসে সুরধনী..."
...ইত্যাদি।

তারপর উমা বাপের বাড়ীতে এলে তাঁর সন্তান বাপ-মা শিব—ইত্যাদিকে নিয়ে সত্যই বাঙালী পরিবারের একটি পূর্ণাঙ্গ মধুর চিত্র ফুটে উঠেছে। আমাদের ঘরের চির-পরিচিত চিত্রগুলি এর মধ্যে দেখে আমাদের মন আরো মুগ্ধ হয়।

পুরবাসীদের চরিত্র আমাদের প্রতিবেশীদের মত। বিজয়ার পরে মেনকার বিচ্ছেদ—বেদনাভরা হৃদয়স্পর্শী আর্তি হাহাকার বাস্তবভাবেই আকাশ-বাতাসকে কাঁদিয়ে তুলেছে।

বাংলার মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন বিচ্ছেদ-জনিত হাহাকার, সংশয় এবং দীর্ঘশ্বাস বহু কবির ভাষায় এমনি মর্মস্পর্শীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে,—

"যেয়ো না রজনী আজি লয়ে
তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।"
ইত্যাদি।

যখন উমা থাকতে নারাজ তখন মেনকার যুক্তি আরো স্বভাব-সুন্দর হয়ে উঠেছে,—

"বোকাব মায়ের বাধা গণেশকে
তোর আটকে রেখে।"

তাছাড়া তিনি উমাকে একটি রূঢ় বাস্তব সত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন,—

"এখন বুঝি ঘর চিনেছিস
তাই হয়েছিস পর;
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস
নিতে এলে হর।"

শিবের শিশু-সুলভ সরল এবং স্ত্রী-নির্ভরতার চিত্রে বাঙালী পুরুষেরই প্রতিচ্ছবি সুন্দর এবং প্রাঞ্জলভাবে ফুটেছে,—

"নিতে হয় মা মুখে তুলে
নয়তো খেতে যায় গো ভুলে।"(উমা)।

বাংলাদেশে বৃক্ষমূলে দেবতার নামে পূজোপার্বতি আদিকাল থেকে প্রচলিত আছে। এখানে সেই বৃক্ষপূজোর স্পষ্ট প্রমাণ মেনকার উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে,—

"বিল্বপত্রমূলে করিব বোধন।"

ঘর-জামাই করে রাখার নিয়ম আমাদের দেশে বহু পরিচিত। তার দৃষ্টান্তও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে,—

"ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাসে।"

বাংলার প্রসন্না প্রকৃতির সুশোভিত এবং মনোমুগ্ধকর চিত্রের কথা বাংলার বহু কবির রচনায় অত্যন্ত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। এখানেও শারদীয়া প্রকৃতির কতকগুলি অপরূপ রূপকল্প উপমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে,—

"শিউলিকা এলো উমার বর্ণমাখি"
বা,
"এই এল হেসে শান্ত শরদল"—ইত্যাদি।

আরো পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং" ইত্যাদি গান গেয়েছিলেন, তারই সমতুল বর্ণনা যেন আরো সহজ, আরো প্রাণবন্তভাবে মেনকার অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়েছে,—

"শরতের গন্ধ লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই প্রাণরাখা দায়।"

বাংলার শরৎ ও বসন্তের বায়ুতে যে যাদু আছে, আর কোথায়ও তেমন দুর্লভ।

বাংলার পূজো উপাচারের কিছু বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে,—

"শিবকে পূজিবে বিল্বদলে
সচন্দন আর গঙ্গাজলে।"

শিবপূজোয় বেশী উপচার লাগে না; কেননা বাংলার শিব সব দিনই একটু উদাসীন এবং অতি সহজে সন্তুষ্ট।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। তার প্রভাব যেমন বাংলার মানুষের উপরে প্রবল, তেমনি পরবর্তী মধ্যযুগীয় কাব্যেও বর্তমান। এখান থেকে তার নমুনা তোলা যায়,—

"ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী,
স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী।"

দরিদ্র বাঙালীর উদর যন্ত্রণার কথা এখানে উল্লিখিত,—

"তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে।"

উমার উক্তির বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের পারিবারিক সম্পর্কের একটি চিত্র তুলে ধরা গেল—মেয়ের ছেলে কিম্বা মেয়ে তাদের মার মাকে এবং বাবাকে দিদি এবং দাদা (অর্থাৎ দিদিমা এবং দাদু) বলে সম্বোধন করে।

বাংলার মাটিতে ঘটক বা দালাল বড় কম জন্মায় না। এরা কম বেশী পাওনার আশায় অপরের ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে। মিথ্যা কথা এবং জোড়াতালি দেওয়ার অভ্যাস এদের চেয়ে বড়ো একটা বেশী কারো থাকে না। এরা অন্ধকে 'পদ্মলোচন' এবং খাঁদা বা বোচাকে চন্দ্রবদনী করে তুলতে পারে শুধু কথার কৌশলে। এখানে এদের এক প্রতিনিধিকে মেনকা তুলে ধরেছে,—

"নারদের বাক্য কৌশলে,
না জেনে-শুনে কি বলে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর রমণি।"

আমাদের বহু প্রতিবেশী ভাল করতে পারুক আর না পারুক মন্দ করতে পারে। সেই ধরনের একটি চিত্র,—

"প্রতিবেশীর বাক্যবাণে,
কাতর হইয়া প্রাণে", ইত্যাদি।

বাংলাদেশে গুরুজন-প্রণামরীতি বর্তমান। কিন্তু অনেক গুরুজনেরা ছোটদের এতো ভালোবাসেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার আগেই দু-হাত দিয়ে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তেমনি একটি চিত্র,—

"জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করায় গিরি ধরি দু'টি করে।"

বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় বধূ ঠিক এমনিভাবে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে,—

"গণাধরহে শিব-শঙ্কর কর অনুমতি হর,
যাইতে জনকভবনে।" (উমা)।

বাংলার মা এবং মেয়ে বাংলার জল-বায়ুর প্রভাবেই অতিবিমলা এবং শান্তশীলা। মায়েরা কখনো তার কন্যাকে রণ-চণ্ডীবেশে দেখতে নারাজ,

"হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণবেশী কেন আসবে ঘরে?" (মেনকা)।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে পদার্পণ করার সময় মায়ের সঙ্গে যেমনভাবে তাঁর মিলন হয়—

"রথ হতে নামিয়া শঙ্করী
মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বারবার।"

তারপরে স্নেহে গদগদ হয়ে মাকে যেমন করে দোষারোপ করে তার মধ্যে অভিমান ঝরে পড়ছে—

"তোমার পাষাণ প্রাণ,
আমার পিতাও পাষাণ,
জেনে এলাম আপনা হতে।" (উমা)।

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাবার পরও তার জন্যে বাংলার মায়েরা নানা-রকমের খাবার জিনিস সযত্নে তুলে রেখে দেয়,—

"ঘরে ক্ষীর-সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন কমলে।" (মেনকা)।

মেয়ে অনেক দিন পরে মায়ের কাছে এলে মায়েরা এমন করে, এমনি মিনতিভরা সুরেই তাকে থাকতে বলেন,—

"এসেছিস মা, থাক না মা উমা দিন কত।"
(মেনকা)।

কিন্তু জোর করে জামাই যদি নিয়ে যায়, তাহলে অবলা-অসহায়া বঙ্গজননীর কি করার আছে?

"সঁপে দিছি পরের হাতে,
জোর আমার তো নেই তত।" (মেনকা)

সুতরাং বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস-প্রকৃতির সঙ্গে বাংলার পরিবারের হাসি-কান্না-বিরহ-বেদনার সুর এখানে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
২। " : "বৈষ্ণব কবিতা" "মানসী"।
৩। " : প্রাচীন সাহিত্য।
৪। ব্রজেন ভট্টাচার্য : "শাক্তপদাবলী—সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ"।
সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ"।
৫। "বেদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দর্শন ও পুরাণগ্রন্থ, বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে এর উৎস নিহিত। (ব্রজেন ভট্টাচার্যের —শাক্তপদাবলী —সাধনতত্ত্ব ও কাব্যবিশ্লেষণ)।"
৬। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্যগুলি, শিবায়ন, শাক্তপদাবলী ইত্যাদি। (শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবী চক্রবর্তী)।
৭। "বাংলার সাধনা" : ক্ষিতিমোহন সেন।
৮। "বৈষ্ণব কবিতা" : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। "শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা" : জাহ্নবী চক্রবর্তী।
১০। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য পদ (১৬,১৮), ঈশ্বর গুপ্ত (১৯), অন্ধচণ্ডী (২০) ইত্যাদি।
১১। শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবী চক্রবর্তী।

মিলুকে নিয়ে

দিব্যেন্দু পালিত

প্রিয়ব্রত

রাস্তায় বেরিয়ে মনে পড়ল মিলু শুধু আমাদের মেয়েই নয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। ওর আগে জন্ম নিয়েছিল আমাদের প্রথম সন্তান, একটি ছেলে। মৃত্যু নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে, তার জন্যে এখন আর কোনো মায়া নেই। দুঃস্বপ্নময় সে এক দিন গেছে। মিলু এসেছিল তারও দু'বছর পরে। আঠারো বছর ধরে রোদ ঝড় জল থেকে ওকে নিঃশব্দে আগলে রেখেছি কি এইভাবে চলে যাবার জন্যে!

মিলু কীভাবে ব্যাপারটা নিয়েছে জানি না। বেরুবার আগে দেখে এসেছি ওর পাথরের মতো মুখ। অনুভবের ব্যাপারে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত—আবেগ ধরে রাখে সহজে। এ-রকম অনেক ইতিহাসই আমার জানা। তিন বছর বয়সে একবার আয়োডিনের শিশি গলায় উপুড় করেছিল মিলু। যন্ত্রণায় নীল-হয়ে-আসা ওর স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যখন আর-একটি দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভেঙে যাচ্ছি, তখনো আশ্চর্য সংযমে নিজেকে ধরে রেখেছিল বন্দনা। পুরো দুটো দিন আর রাত হাসপাতালে কাটিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ও, [illegible] আমাকে ডেকে বলল, 'তুমি যে এতো দুর্বল জানতাম না। ছেলেমেয়ে মানুষ করা কি সহজ! তুমি সত্যি এতো আগেই হাল ছেড়ে দাও!' সেদিন যাই ঘটে থাকুক, মিলু সারাক্ষণ ছিল চোখের সামনে, স্পর্শের মধ্যে—আজ ও সেদিনের ঘটনার মধ্যে তফাত অনেকখানি। আজ যা বলার আমাকেই বলতে হবে। আশংকায় হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। নিঃশ্বাসে অব্যক্ত নিয়ে চীৎকার করে উঠলুম, 'মিলু, ফিরে আয়—' শব্দ ফুটল না গলায়।

রাত এখনো খুব গভীর হয়নি। তবু এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে এসেছে রাস্তা। দূর থেকে কাছে এসে আবার দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে এক একটি মানুষ। প্রায় সকলেই একরকম দেখাচ্ছে: আলোর স্বল্পতার জন্যেই সম্ভবত নিরালম্ব দেখাচ্ছে মুখগুলি, আর অস্পষ্ট, ইতিহাসহীন। এখন সূর্য ডুবলেই রাত, [illegible] সম্ভাবনা বুকে নিয়ে যে যতো তাড়াতাড়ি পেরেছে ঢুকে পড়েছে ঘরে। ব্রীজের চড়াইয়ে উঠতে আমার পাশ দিয়ে যাত্রীহীন একটা বাস ছুটে গেল দ্রুত। দূর থেকে হুইসল দিতে দিতে ছুটে আসছে একটা মালগাড়ি—ইস্পাতের লাইনের হৃৎকম্প ঢুকে পড়ল আমারও বুকে। খুঁজতে বেরিয়ে বুঝতে পারছি আশেপাশের সব দরজাগুলিই বন্ধ, এগোবার রাস্তা নেই। পুলিশকে জানাবো?

CENTRAL LIBRARY

নিরাপত্তার জন্যে পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করলাম। হাত কাঁপছে! দেশলাইয়ের আগুনে এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। আর্টারিগুলো পৌঁছে বুঝতে পারছি তোর অবস্থাটা কী খারাপ। বাড়িতে বসে এমন দুপুরে বাবার সঙ্গে কলেজের গল্প করার কথা— এই আশ্বিনে তোর জন্যে কতো কী করার কথা ভেবে রেখেছিলাম। মিনু ফিরে যাক—

এটা মিনুর একা হারিয়ে যাওয়ার বয়স নয়। এখন সেই বয়স যখন প্রবল আত্মবিশ্বাস ছেঁকে ধরে চারদিক থেকে, অথচ থাকে স্বচ্ছ, চতুর্দিকে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যবধান। এই বয়সেই বুঝে এসেছিল আমার স্ত্রী হবে; কী-রকম মাপা পদক্ষেপ ছিল তার এখনো মনে পড়ে। আমি সাত পা হাঁটলে সে একটো হয় তিন পা; বয়সেরই দোষ তা! এক একদিন আমার সঙ্গে বেড়িয়ে যখন হেঁটে যেতো রাস্তা দিয়ে, লক্ষ করতাম চারপাশ থেকে দৈত্য-দানা মানুষ চোখ দিয়ে অনাবৃতের গায়ে তাকে কেমন অবলীলায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে মিনু, দূরে, রাজহাঁসের মতো ভঙ্গিতে। আমার আনন্দ হতো, সুখ উপচে পড়তো সর্বশরীর ও মনপ্রাণ জুড়ে। ভাবতাম মিনু কি এতোটা স্বাবলম্বী ছিল! আধুনিকতার মধ্যেও এতোখানি নিরহংকার! আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মিনু কি কিছুই নেয়নি!

গত মার্চে মিনু দিল্লী যাবে। ছুটি-ছাটা নেই, আমি পড়লাম বিপাকে। একা মেয়েকে ভরসা কী করে! মিনু বলল, তুমি এতো ভাবছ কেন, বাবা। দিল্লীগামী এক্সপ্রেসে তুলে দিও আমাকে। মাসিমারা নামিয়ে নেবে, দিল্লীতে। ব্যস, তোমাদের আর ভাবনা!' আমি তবু স্বস্তি পাচ্ছি না, একা একা ছেড়ে দেবো। মিনু বলল, 'এসব তোমার মিথ্যে ভাবনা। মাঝপথে অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া আর কোনো বিপদ নেই, কাতারেই তো যাচ্ছে এত একা। আর কপালে অ্যাক্সিডেন্ট থাকলে তো বাড়ি বসেই হতে পারে।' প্রত্যেকটা কথা আলাদা আলাদা করে কী সুন্দর কথা বলতিস তুই, মিনু। ঠিক চলে গেলি একা একা, ঠিক ফিরে এলি। এর পর থেকে তোর সম্পর্কে আমার কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। পাড়ার স্কুল কোচিং ক্লাশ সব তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে নিরাপদে, ঠিক ঠিক সময়ে। আজ তোর কী হলো।

ভাবনাগুলো এইভাবে পড়ছে এ ওর গায়ে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। মিনু, মা আমার। ফিরে এসো।

আমি কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। নাকি এগিয়ে যাচ্ছি' নাকি থেমে-থাকা বা এগোনো দুটোই এখন সমান নিরর্থক।

বিস্বাদ সিগারেটটা ব্রীজের ওপর থেকে ছুঁড়ে দিলাম নিচে— সেটা পড়তে লাগল ঘুরতে ঘুরতে। জ্বলন্ত আগুনের ফুলকিটা খানিকক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকে চোখে। তারপরেই নিরাকার। অনেকক্ষণ: বোধহয় অনেকক্ষণ কেউ হেঁটে যায়নি আমার পাশ দিয়ে। দূর নদী থেকে ভাসা-ভাসা হাওয়ায় নিঝুম পথ, শব্দহীন মাথার ওপর দিয়ে অতর্কিত আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা পেঁচা।

মিনু ফেরেনি জেনেও কাছেই কোনো বাড়িতে পুরোনো ঘড়ি বাজছে। হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এলো শীতে, যদিও এটা জুলাই মাস—আত্মরক্ষার জন্যে কংক্রিটের পাঁচিলটা আঁকড়ে ধরলাম সজোরে। একটা যেন গাড়ি হাড়-পাঁজর গুঁড়োতে গুঁড়োতে চলে গেল আমার বুকের ওপর দিয়ে।

গাড়িটার রঙ কি রকম ছিল! এতো স্পষ্টতো যাদের চোখে তারা কেন নম্বরটা লক্ষ্য রাখল না। বিকেল চারটের এমন কী নির্জন ছিল রাস্তা যে তারা চীৎকার করে জানাতে পারল না সকলকে, মিনুকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তোমরা বাঁচাও! তারা কজন ছিল। সত্যি চারজন। চারটে পাষণ্ডের ধকল তোর ওই একখণ্ড রেশমের মতো শরীরে কি করে সামলাবি তুই, মিনু।

মিনু, ফিরে আয়।

গলার চামড়া ছিঁড়ে নিঃশব্দ হলো আমার ডান হাতের পাঁচটি আঙুল। মুখের ভিতর জিভটা কাত হয়ে পড়েছে বার বার, গলা ফেঁড়ানোর মতো পর্যাপ্ত থুথুও এখন বুকে নেই। থেকে থেকে তীব্র শীত নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। আমার কপাল জুড়ে ঘাম। অসম্ভব কাঁপা হাতে, আত্মরক্ষার জন্যে, আর একটা সিগারেট ধরালাম আমি। ফুটো কৌটোর মতো খালি বুকে ধোঁয়াটা নেমে গেল নিমেষে। এতোক্ষণে হয়তো সবাই জেনে গেছে, সবার কৌতূহল কি আর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে না মিনুকে। গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাওয়া মেয়ে তুই মিনু, এখন কোন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবি। তুই কি একা ফিরবি। হতভাগা মেয়ে, যদি একাবেই যাবি, কেন তুই সাক্ষী রেখে গেলি। কেন তুই আরো আগে অরুণের সঙ্গে পালিয়ে গেলি না। আমাদের অসম্মতি, আমাদের অভিমান, রাগ—এই সামান্য ব্যাপারেই তুচ্ছ হয়ে গেল তোর ভালোবাসার জোর।

মিনু, তোর সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। ফিরে আয়

দুই

দশটার কিছু পরে ও ফিরল। সঙ্গে অরুণ।

আলো না জ্বালাতেই নয় তাই কোনোরকমে ভিতর-ঘরের একটু আলো জেলে আমি বসেছিলাম অন্ধকার সদরে। প্রিয়ব্রত ফিরলে দরজা খুলে দিতে হবে। এ-কাজটা মিনুই করতো। কি জানি কেন মনে হচ্ছে দিনের পর দিন এই একটা কাজই আমি করে যাচ্ছি। মিনু ফিরবে, প্রিয়ব্রত ফিরবে, দরজাটা খুলে দিও।

অরুণকে দেখে ধ্বক করে উঠল বুকের মধ্যে। প্রিয়ব্রত আর অরুণ, কিছুতেই মেলাতে পারছি না পাঁচালাটা। শুধু বুঝতে পারছি মিনুকে পাওয়া যায়নি।

নতুন করে বিচলিত হলাম না। মনে মনে জানতাম আঠারো বছরের যুবতী একটি মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেলে এতো সহজে ফিরিয়ে দেব না। আমার প্রায় পঞ্চাশ হলো। কিন্তু ওবয়স তো একদিন আমিও পেরিয়ে এসেছি।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল প্রিয়ব্রত, দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আমাকে দেখেও দেখল না। বলো অরুণ, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। বলে তাকালো আমার দিকে। ওই চোখের ভাষা আমি বুঝি। চোখের মধ্যে দিয়ে আমি ওর বুকের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। হাড়-পাঁজরগুলো আঁটি করে বাঁধা, অনুভূতিগুলো এক করতে পারছে না। কদিন আগে মিনু হঠাৎ বলল, 'বাবা, তুমি যেন কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছ দিন দিন।' সেদিন হাসলেও কথাটার অর্থ এখনই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

বৌদি, আমাদের একটু চা দেবে? প্রিয়ব্রত গলায় স্বর বেঁকে গেল। আবার ভিতরে যাবার আগে আমি অরুণকে দেখলাম। সে বসে আছে মুখ নিচু করে। এক অপরাধের গ্লানি থেকে আর-এক অপরাধের মধ্যে কেন ওকে নিয়ে এলো প্রিয়ব্রত। আবার কোনোদিন অরুণ এ-বাড়িতে আসবে আমি কি ভেবেছিলাম। কখনো।

চায়ের জল চাপিয়ে আমি চলে এলাম ঘরে। চা-টা উপলক্ষ মাত্র, আসলে প্রিয়ব্রত সরাতে চাইল আমাকে। হয়তো আমি বিব্রত হবো ভেবে, হয়তো অরুণ অপমানিত বোধ করবে ভেবে। হয়তো ওরা এমন কোনো আলোচনায় ব্যস্ত, যেখানে আমার উপস্থিতিও কাম্য নয়। হঠাৎ কি-রকম একটা নিঃশ্বাস উঠে এলো আমার গলা পর্যন্ত, শরীর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ছুটে গেল কান্না। দেয়ালে মিনুর ছবি, আলনায় থাকে থাকে সাজানো মিনুর শাড়ি, জামা ব্লাউজ। নতুন জরির স্লিপারটা এখনো পড়ে আছে বাক্সবন্দী হয়ে। শ্রাবণের শেষদিকে ওর বন্ধু শর্মিষ্ঠার বিয়ে—হয়তো সেদিনই ব্যবহার করবে বলে তুলে রেখেছিল। মিনুহীন মিনুর ঘর আমার চোখে খুঁচে বিঁধিয়ে দিল। বাইরে আকাশে গর্জন করে উঠল মেঘ। ঘরপোড়া গরুর মতো দিগ্বিদিক ছুটে যাওয়া ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

চা দিতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো অরুণের সঙ্গে কি কোনো কথা বলা উচিত? অরুণ মুখ তুলছে না। আমার হাত থেকে কাপটা নেবার সময় সামান্য কেঁপে উঠল ওর হাত। নাকি আমারই হাত! কাপে ডিসে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ উঠল মৃদু। ওদের আলোচনা বন্ধ। চোখের কোণ দিয়ে প্রিয়ব্রতকে দেখলাম আমি—চোয়াল ঝুলে পড়েছে, ঠিক দুটো আঙুল মুখের ওপর চেপে ধরেছে ও। চোখের দৃষ্টি অরুণের ওপর নিবদ্ধ। আমাদের কোনো ছেলে থাকলে এই সময় প্রিয়ব্রতর মতো তার এইরকম সম্পর্ক হতো। আমি বিয়ে করবো না, ইদানীং মিনু বলতো, তোমাদের দেখবে কে। বলেছিলাম, আমরা মরে গেলে তোকে কে দেখবে। আমরা এখনো বেঁচে আছি প্রবল ও জীবন্ত হয়ে, মিনু এখন কোথায়। মিনু কি জানে আমাদেরই বাড়িতে প্রিয়ব্রত আর অরুণ এখন বসে আছে মুখোমুখি—হয়তো এমন কোনো সুতোয় গেঁথে তুলছে পরস্পরকে, যার হদিশ আমিও জানি না। এ-দৃশ্য দেখে মিনু কি হাসত না ঠোঁট টিপে।

CENTRAL LIBRARY

খানিক আগে পর্যন্ত মিলু ছিল আমার কল্পনার সবটুকু জুড়ে। মিলু আর স্বপ্ন এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি এই দুঃসময়ে অরুণ কীভাবে সাহায্য করতে পারে আমাদের। যে-অপমান নিয়ে একদিন ও চলে গিয়েছিল, এ-বাড়ি থেকে, তারপরও কি ওর পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব! কী বলেছে ওকে প্রিয়ব্রত! এ কেমন লুকোচুরি খেলা তার: মিলু নেই, এই কি প্রিয়ব্রতর আমার থেকে দূরে যাবার সময়!

ছবিটা এখনো স্পষ্ট ভাসছে চোখে। মিলু প্রি-ইউনিভার্সিটি দেবে। কোচিং দরকার। অরুণকে নিয়ে এলো প্রিয়ব্রত। 'ছেলেটি ব্রিলিয়ান্ট, বুঝলে, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। নতুন ঢুকেছে কলেজে।' আমাকে বলল, 'কাছেই থাকে: সুখেন্দুবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। মিলুকে পড়িয়ে দিয়ে যাবে—'

পড়াশুনোয় এলাকাটা প্রিয়ব্রতর। এ বিষয়ে আমার বলার কিছু ছিল না। ছেলেটিকে দেখে ভালোই লাগল। শান্ত, নম্র, কথাবার্তায় সুন্দর। মিলুকে পড়াতে আসতো সন্ধ্যাবেলায়। প্রথমে হপ্তায় তিন দিন, ক্রমশ রোজই। মিলুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কিরে!' মিলু বলল, 'পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। অরুণদা বলেছে—।' কথাটা শেষ করল না। বুঝে নেওয়ার ভার আমার। অরুণের সংস্পর্শেই কিনা জানি না, আজকাল মিলুও কথাবার্তা কম বলছে, আজকাল প্রায়ই ওকে গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখি। কথায় কথায় একদিন প্রিয়ব্রত বলল, 'একটু সীরিয়াস হওয়া ভালো।' হয়তো। কিন্তু, মিলুর অন্যমনস্কতা চঞ্চল করে তুলল আমাকে। মিলু যেন ক্রমশ নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। পরীক্ষার পর প্রিয়ব্রতর যাতায়াত কমে গেল, মিলুর বাড়ল। এখন ও বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, গানের স্কুলে যায়, কোনো কিছু স্পষ্ট না বলেই বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। দূর থেকে কি সব বাঙলার মানে বোঝা সম্ভব!

এইভাবেই চলছিল। একদিন হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল। বড় রাস্তার দিকে এ-পাড়ার শেষ বাড়িতে থাকেন বসুনাদি, আমার মাসতুতো দিদি। একদিন এসে বললেন, 'বুলু, এবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দে। লোকে নানা কথা বলছে। আজ নিজেই দেখলাম, তোদের সেই প্রফেসর ছেলেটির সঙ্গে মিলু ময়দানের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ট্রামে আসছিলাম—।' শুনে বুক শুকিয়ে গেল। বললাম, 'দেখাশোনার কী আছে সেজদি, মিলু তো বলেই গেছে।' 'ও। তাই বল, তোরা জানিস।'

মিলু ঘুমনোর পর সেদিন রাত্রে কথাটা বললাম প্রিয়ব্রতকে। প্রিয়ব্রত গম্ভীর হয়ে গেল। পরে বলল, 'আমিও দেখেছি একদিন। সেটা অবশ্য বাসস্টপে। ভেবেছিলাম হঠাৎই দেখা হয়েছে বুঝি। তুমি কি মেয়েকে কিছু বলেছো?'

বললাম, 'না। বলবো?'

প্রিয়ব্রত কঠিন হয়ে এলো। 'যা বলার আমিই বলবো অরুণকে। যে-জন্যে ওর বাড়িতে আসা, সে-কাজ তো হয়ে গেছে। এখন বিদেয় করে দিলেই হয়—'

প্রিয়ব্রত যে-ভাবে ভাবছে আমি সে-ভাবে ভাবি না। ওকে কঠিন দেখে ভয় পেলাম। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিজের মেয়েকেও তো বুঝতে পারি কিছুটা—তার সবটাই কি মিথ্যে? মিলুর পড়ার টেবিল গুছোতে গুছোতে একদিন আমি যে নীল চিঠি পেয়েছিলাম সে-কথা প্রিয়ব্রতকে বলা যাবে না। বলা যাবে না মিলুর অন্যমনস্ক চোখে আমি দেখেছি উড়ন্ত পাখির ছায়া। সেদিন দৌড় করে বাড়ি ফেরার পর ওর নরম হয়ে-আসা ঠোঁটও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। সবই কী অরুণের দোষ? প্রিয়ব্রত যেন মিলুকে আড়াল করে দাঁড়াল, এখন ওকে নিজের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। ও দেখছে না আড়াল পড়ে কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে মিলু।

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তুমিই তো বলেছিলে ছেলেটি ভালো। ওদের বিয়ে দিলে হয় না?'

'বিয়ে ওর সঙ্গে!' কথাটা ক্ষুরের মতো চকচক করে উঠল প্রিয়ব্রতর ঠোঁটে। 'বুলু, ভুলে যেও না মিলু আমাদের একমাত্র সন্তান। নিজের ভালোমন্দ ও এখনো বুঝতে শেখেনি। যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

এর আগে কখনো প্রিয়ব্রতকে এতো শক্ত হতে দেখিনি।। প্রিয়ব্রত কী করবে জানি না। কিছু নিশ্চয়ই করবে। ব্যাপারটা ভেবে ঝিম ধরে এলো শরীরে। খানিক পরে ওর পাশ থেকে উঠে মেয়ের ঘরে ঢুকলাম; মিলুর ঘুম ভেঙে না যায় এইভাবে আস্তে হাতে নীল আলোটা জ্বালালাম। ছায়াচ্ছন্ন আলোয় চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে মিলু, ঢেউ-খেলানো নিস্পন্দ শরীরে সমুদ্রের মৌন। ওই বয়সে আমি কেমন ছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। এটুকু বুঝি আমার ছোটখাটো শরীরে ধরে রাখতে পারিনি ওকে। মিলু যেন বুঝতে পেরেছিল ও আমাদের একমাত্র—আমার আর প্রিয়ব্রতর সবটুকুতেই ওর অধিকার। কপালে হাত রাখতেই হাতটা ধরে ফেলল ও, 'মা!' বললাম, ঘুমোস নি! মিলু বলল, ঘুম আসছে না মা। শুনে কপালটা চিনচিন করে উঠল কেমন।

বাইরে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনছি। তার মানে অরুণ চলে গেল। ওর আসা এবং যাওয়া দুটোই আমার কাছে সমান অর্থহীন। তবু অরুণের আবির্ভাব যে আমার মনে মিলু সম্পর্কে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল, তাই বা অস্বীকার করি কী করে! তাহলে কি মিলুর আশা ছেড়ে দিল প্রিয়ব্রত! না। ও-কথা ভাববো না। প্রিয়ব্রত কি জানে না মিলু যতোক্ষণ চোখের সামনে, আছে আমার স্পর্শের মধ্যে, এমন কি ঘোর মুমূর্ষু অবস্থাতেও ততক্ষণ আমি তার সব দায়িত্ব নিতে পারি। আজ আমি অক্ষম, মিলুকে ফিরিয়ে দিক প্রিয়ব্রত।

'বুলু—'

অন্ধকার দরজার বাইরে ওর গলা পেয়ে আঁচলের খুঁটটা দ্রুত বুলিয়ে নিলাম চোখে। বরাবর প্রিয়ব্রত আমাকে শক্ত ভাবে, বরাবর ও আমার খোলসটাকে দেখে। এখনও আমি এমন কিছু করবো না যাতে ও অন্য রকম ভাবে। নিজেকে আড়াল করা যে কী কষ্টের—অন্তত এই মুহূর্তে। মিলু মেয়ে, মিলু হয়তো বুঝতো।

অন্ধকারেই আমার মাথায় হাত রাখল প্রিয়ব্রত। মোটা মসৃণ রেখায় ওর আঙুল-গুলো কী খুঁজছে বুঝতে পারলাম না। খোকার জন্মের পর যখন আমি একাই ফিরে এলাম হাসপাতালের কেবিনে, নিঃশোণিত শরীর শূন্যতা ছাড়া আর কিছু চিনতে পারছে না, তখনো, মনে পড়ে, একইভাবে আমার চুলের ভিতর ঘোরাফেরা করেছিল প্রিয়ব্রতর আঙুল। কতোদিন হয়ে গেল। তবু, সব স্পর্শ কি ভুলে যাওয়া যায়? মিলুর জন্মের সমস্ত অনুভূতিও তো ধরা আছে শরীরে। কান্নায় ডুবে যাওয়া শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'অরুণ কেন এসেছিল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না প্রিয়ব্রত। পাশে বসল। আমি ওর গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। যেন বহুক্ষণ নিঃশ্বাসটা এক জায়গায় জমিয়ে রেখেছিল ও, এইবার আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল।

'ভেবেছিলাম ব্যাপারটায় ওর হাত আছে। এ-রকম তো কতোই হয় শুনি—'

'অরুণকে সন্দেহ করছো! তুমি কি পাগল হলে!'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল প্রিয়ব্রত। আমার এলানো হাতটা হঠাৎই তুলে নিল নিজের মুঠোয়।

'বুলু, তখন যদি তোমার কথা শুনতাম!'

'সে আর ভেবে কী হবে।'

যথেষ্ট সাবধান থেকেও আমার গলা কেঁপে গেল। সম্ভবত এই রূপান্তরের অপেক্ষাতেই ছিল প্রিয়ব্রত। প্রথম বৃষ্টির স্পর্শে গাছ যেমন আকস্মিক নুয়ে পড়ে, তেমনি, হঠাৎই আমার কাঁধের ওপর নুয়ে এলো ও—এমন অবর্ণনীয় স্মৃতি আমার আর নেই।।

'বুলু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমাদের কী হলো, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—'

দু হাতে আগলে ধরলাম প্রিয়ব্রতকে। ফুটন্ত জলের মতো কান্নার আবেগে ওর শরীর এখন দাপাদাপি করছে; কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে কণ্ঠস্বরের বিচিত্র ধাতবতায়। মিলু শুধু প্রিয়ব্রতরই সন্তান নয়, আমারও। নাড়ি শুঁকলে এখনো মিলুর গন্ধ পাওয়া যাবে। কিন্তু, প্রিয়ব্রত জানে আমি শক্ত। জেনেশুনেই বুঝি একবুক ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে।

ভগবান, আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুমি আমাকে শক্তি দাও—শক্তি দাও।

অরুণ

'যদি আমরা বিয়ে করি?'

কথাটা বলেছিলাম অনেক ভেবেচিন্তে, কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে। মিলুর সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলেও তখনো আমরা

বিয়ের কথা ভাবিনি। আমি মিলুকে বুঝতাম, হয়তো মিলুও আমাকে। এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়—সিদ্ধান্ত নেবার একটা সময় থাকে, বিদ্যুৎসঞ্চারের মতো দুটি তার একই সময় পরস্পরের ইচ্ছার পরিপূরক হয়ে ওঠে। হয়তো আরো কিছুদিন লাগতো। প্রিয়ব্রতবাবুর কথায় আমার সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত হলো।

সন্দেহ কী, আমার প্রস্তাব তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। এমন রুদ্ররূপে আগে কখনো দেখিনি তাঁকে। খানিক স্তম্ভিত থেকে বললেন 'তোমাকে ওয়ার্ন করে দিচ্ছি, অরুণ। আমার মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবার চেষ্টা কোর না। তাহলে ফল খারাপ হবে।'

এতো অপমান আমি জীবনে বোধ করিনি। জ্বালাটা আরো বেশি লাগল, কারণ সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমি মিলুকে ভালোবাসি। ভুল আমারই, পরে বুঝতে পেরেছিলাম। যে-আমাকে প্রিয়ব্রতবাবু স্নেহ করতেন সে ছিল মিলুর টিচার, যে-অরুণকে তিনি অপমান করে বের করে দিলেন বাড়ি থেকে, সে তাঁর মেয়ের, একমাত্র মেয়ের, পাণিপ্রার্থী। দুজনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতেই পারে। আজ, অনেক দিন পরে, প্রিয়ব্রতবাবুর মুখোমুখি হয়ে আমার সেদিনের কথাই কেন মনে পড়ল জানি না। অপমানের স্মৃতি বোধ হয় অগোচরে থেকেও পাহারা দেয় সারাক্ষণ।

আমার ঘরটা রাস্তার ধারে। একা থাকি। সন্ধ্যের পর আজকাল প্রায়ই বেরুই না। আজ হোটেল থেকে খেয়ে এসে টিউটোরিয়ালের খাতা দেখছি। জানলায় প্রিয়ব্রতবাবুর মুখ ভেসে উঠল। চেনা সহজ নয়। মুখটা আমার মনে মোটা রেখায় দাগানো আছে বলেই চিনতে পারলাম; না হলে প্রিয়ব্রতবাবুর এ-রকম চেহারা কল্পনা করা যায় না। সেই সময় দু হাতে জানলার শিক আঁকড়ে ধরা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম।

'আপনি! ভেতরে আসুন—'

'অরুণ, তুমি কি জানো মিলু কোথায়?'

'মিলু!'

'জানো না! শুনেছি গুন্ডারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।' উদভ্রান্ত প্রিয়ব্রতবাবুর চোখসর্বস্ব মুখটা এগিয়ে এলো আমার দিকে। 'সত্যিই কিছু জানো না?'

মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত বোধ করলাম আমি। এমন নয় যে ব্যাপারটা নতুন শুনেছি। হোটেলে খেতে গিয়ে শুনেছিলাম একটি মেয়েকে কারা জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে। যারা আলাপ করছিল তারা চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। এরপর আরো দুটো ঘটনা শুনলাম আমি। একজন এস-আইয়ের রিভলবার কেড়ে নেওয়া হয়েছে—অতর্কিত আক্রমণে সেপাইটি ও আক্রমণকারীদের একজন মারা গেছে এবং আগামীকাল টালীগঞ্জ বন্‌ধ্ পালন করা হবে। রোজই এ-রকম একটা না একটা ঘটনা শুনি, তারতম্যহীনভাবে এগিয়ে চলে জীবন। আপাতত প্রিয়ব্রতবাবুর কথায় বিমূঢ় বোধ করলাম। মেয়েটি তবে মিলু! মেঘের উপড়ে-করা কালো কাঁড়ির মধ্যে থেকে একখণ্ড হীরে যেন ছিটকে বেরুলো, পা দুটো নড়ে উঠলো ঈষৎ। পরমুহূর্তেই প্রিয়ব্রতবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন হয়ে এলো মুঠো। রূঢ় গলায় বললাম, 'গুন্ডারা আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে, আমি তার খোঁজ রাখবো মানে!'

'অরুণ!'

স্বরভঙ্গির তপ্ততা বোধ হয় ধরতে পেরেছিলেন প্রিয়ব্রতবাবু। তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটো ধরে ফেলে কাতর, প্রায় ভেঙে-পড়া গলায় বললেন, 'অরুণ, আমাদের বড়ো বিপদ। গুন্ডারা ধরে নিয়ে গেল, এখন মেয়েটার কী হবে! আমাদের মান সম্মান—'

কথাটা মুখেই থেকে গেল। শেষ হল না।

প্রিয়ব্রতবাবুর ধারণা তাঁর উদ্বেগের কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না, সত্যিই আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। এটা সত্যি নয়। তাঁর ব্যবহার আমাকে রুষ্ট করতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আদৌ তাঁর কথা ভাবছি না। মান-সম্মানের প্রশ্নই বা এখন ওঠে কী করে! ঘটনাটা মিলুকে নিয়ে। সেই মিলু, সেদিন আর-একটু সাহসী হলে যে অনায়াসে আজ আমার স্ত্রী হতে পারত; স্তব্ধ অবস্থায় যার তপ্ত নিঃশ্বাস এখনো বয়ে যায় আমার মুখের ওপর দিয়ে। হৃদয়ের যদি কোনো বিনিময় ক্ষমতা থাকে, কিংবা গাঢ়তম অনুভূতির, আমি কি অস্বীকার করতে পারবো মিলুর সঙ্গে আমি তা বিনিময় করেছি। এ-অপমান আমারও, ব্যক্তিগত।

কিন্তু, এখন আমি কী করবো! প্রিয়ব্রতবাবুর বর্ণনা ঠিক হলে ঘটনাটা ঘটেছে বিকেল চারটেয়, এখন প্রায় দশটা বাজতে চলল। ছ' ঘণ্টার অন্দরের যে-কোনো ক্ষতিই সম্ভব হতে পারে। এ-রকম নারীহরণের খবর প্রায়ই চোখে পড়ে—অপহৃত হয়ে, অপহৃত হয়ে একদিন তারা ফিরে আসে। ততোদিনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে তাদের শরীর আর মনের ওপর দিয়ে—এই পর্যন্ত এসেই খবরের শেষ টানা হয়। সম্ভবত তাদের সম্পর্কে আর-কিছু জানার থাকে না! পুরো বিবরণটা চিন্তা করে থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর। অসম্ভব রাগে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল; সম্মুখ-যুদ্ধে এখন আমি যে-কোনো শত্রুকেই ধরাশায়ী করতে পারি। কী লাভ, একই সঙ্গে ভাবলাম, সময় কী আর অপেক্ষা করে আছে আমার প্রতিবাদের জন্য। ছ ঘণ্টা তো অনেকটা সময়। মিলুর সারল্য মাঝে মাঝে বিব্রত করতো আমাকে। জানি না, সেই সারল্যই হয়তো তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রবল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। বিপুল অভিমান নিয়ে একদিন সে সরে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। অভিমান যায়, আকর্ষণও হয়তো যায়, কিন্তু বুকের মধ্যে এখন যে অস্থিরতা অনুভব করছি, সে তো যায় না!

প্রিয়ব্রতবাবু তখনো তাকিয়ে আছেন আমার দিকে; স্তব্ধ ও অপলক এমন এক চোখে যাতে মনে হতে পারে মিলুকে খুঁজে পাবার চাবিকাঠি আমারই হাতে; আমার নির্দেশটুকু পেলেই নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারবেন। খুব বেশি দুশ্চিন্তায় মানুষ এই রকম দিশেহারা হয়ে পড়ে—পূর্বাপর, সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না কোনো। প্রিয়ব্রতবাবুরও তাই হয়েছে, না হলে এই মুহূর্তে তাঁর আমার ওপর নির্ভর করার কোনো কারণ ছিল না। আর, সত্যি সত্যিই কি আমি কারো নির্ভর হতে পারি! যদি পারতাম, তাহলে নিজের কাছেই আজ এতোটা হীন মনে হতো না নিজেকে। যদি পারতাম, তাহলে আজ হয়তো এই বিড়ম্বনার সুযোগ থাকতো না কোনো—মিলু থাকতো আমারই কাছে, ঠিক যেমনটি উচিত তেমনি হয়ে। এ-সব অনুভবের কথা প্রিয়ব্রতবাবুকে বলা যাবে না। আমার অনেকটা সময় দ্বিধায় কেটে গেল।

পরে বললাম, 'পুলিশে জানিয়েছেন?'

প্রিয়ব্রতবাবু মাথা নাড়লেন, যার অর্থ না। কেন তা জানি না। এটা উচিত ছিল। এ-সব ক্ষেত্রে মানুষ যে-কথা ভাবে এবং যেমন করে, আমিও সেভাবে ভাবলাম। নানারূপে বিভক্ত হয়ে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল মিলু, যেন আস্তে আস্তে আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিচ্ছে ও, ভাবনাগুলো এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। শুধু বুঝতে পারছি, যা করার আপাতত আমাকেই তা করতে হবে। আমি করবো। অসমান হাওয়ায় পতপত করে উড়তে থাকলো টিউটোরিয়ালের খাতার পাতা। ভ্রূক্ষেপহীন আমি চলে এলাম প্রিয়ব্রতবাবুর পাশে। একজন মিলু অসংখ্য মিলু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম আমি আর প্রিয়ব্রতবাবু এইভাবে হাঁটবো পাশাপাশি—একই লক্ষ্যের দিকে।

বাড়ি থেকে থানায়। সেখান থেকে আমাকে জোর করে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেলেন প্রিয়ব্রতবাবু। বুঝি, এই মুহূর্তে আমাকে তাঁর খুব বেশি প্রয়োজন। আর কিছু পারি না-পারি, সম্ভবত ভরসা দিতে পারবো তাঁকে।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

ভরসা! নিজের কানেই কথাটা ঠাট্টা হয়ে বাজলো।

মিলুদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন দশটা বেজে গেছে। রাস্তা অসম্ভব নির্জন, তেমনি অন্ধকার। কোথাও কোনো শব্দ নেই বললেই হয়। আকাশে তাকালাম। ঘন, থোকা থোকা মেঘ ছুটে যাচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে। বাতাসে ধুলো। চারদিকে মিশুর অভাব ছড়ানো। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।

দরজা খুললেন মিলুর মা। অন্ধকার অন্ধকার মুখ। আলো জ্বালার পর দুর্বোধ্য চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন চকিতে। এইমাত্র আমি আকাশ দেখেছি, এইবার তার উপমা ধরা পড়লো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, 'বসো অরুণ, তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি।'

স্পষ্ট না জানলেও অনুমান করতে পারি কী বলবেন প্রিয়ব্রতবাবু। এতোক্ষণে যে-টুকু বুঝেছি, তার সামনে এখন দুটি প্রশ্ন, মিলু ফিরবে কি না এবং যদি সে ফিরে আসে—! মনে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা। উপায়হীন শূন্যতায় আমার নিঃশ্বাস 'বদ্ধশ্বাস হয়ে উঠলো।

আজ মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা, যেদিন আমার ঘর থেকে ছুটন্ত তারার মতো কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল মিলু। সে জানতো না তার অগোচরেই কবে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের পরিচয়ের মধ্যে; জানতো না ঠিক কবে এবং কেন আমাদের পারস্পরিক যোগসূত্র এগিয়ে গেল বিচ্ছিন্নতার দিকে। সেদিন ওর চেহারা অন্যরকম—দেখে চেনা যায় না এ সেই মিলু যার প্রতি মুহূর্তের আচরণে ঝরে পড়ে শিশুর উচ্ছলতা। মিলুর এমন সংহত রূপ আগে কখনো দেখিনি। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে তাকিয়ে শুধালো আমার দিকে, যেন তার আসার উদ্দেশ্য কী বলতে পারছে না। পরে বললো, 'আজ আমি বলতে এসেছি। আপনি আমায় বিয়ে করুন।'

এতো সোজাসুজি কথাটা বলা যায় আমি ভাবিনি। মিলুর কথায় কোথাও এতোটুকু অস্পষ্টতা নেই। অবাক হয়ে, কিছুটা হত-বুদ্ধির মতো, আমি তাকিয়ে থাকলাম ওর আরক্ত হয়ে-আসা মুখ ও স্ফুরিত ঠোঁটের দিকে।

'সেটা সম্ভব নয়, মিলু।'

'কেন।'

কেন! আমি একটু ভাবলাম, সময় নিলাম। তুমি কি তোমার বাবা মাকে ছেড়ে চলে আসতে পারবে! ভুলে যেও না—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিলু বলল, 'সমস্যাটা আমাকে নিয়ে নয়। আমি জানতে এসেছি। তুমি তোমার কথা বলো।'

এই প্রথম তুমি-তে নেমে এলো মিলু। ওর সমস্ত উপস্থিতি থেকে খসে পড়েছে সরল কৈশোর। আমি কী বলবো! মিলু জানে না প্রশ্নটা যতো সরল, উত্তরটা তা নয়! হয়তো উত্তরের জন্যে আরো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, 'আমাকে ভাবতে দাও—'

মিলু চুপ করে থাকল। ক্রমশ মিলিয়ে গেল ওর মুখের রক্তাভা। বুক জুড়ে ফ্যাকাশে শূন্যতা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে—যেন বালির ভিতর থেকে জল উঠে আসছে ক্রমশ। সেইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি—'

মিলুর কথার জবাব আজও আমি দিতে পারিনি। অপমানবোধ নয়, হয়তো অন্য কিছু আমাকে বিরত করেছিল। সম্ভবত আমার কাপুরুষতা, সম্ভবত সাহসের অভাব, হয়তো ভালোবাসা সম্পর্কে তখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। মিলু চলে গেল গাঢ় অভিমান নিয়ে, একটি তারা যেভাবে খসে পড়ে আকাশ থেকে—সে কোথায় যায় কেউ তার হদিশ পায় না!

আমার সামনে প্রিয়ব্রতবাবু। মিলুর মা খানিক আগে চা দিয়ে চলে গেছেন, আর আসেননি। কাপটা যখন আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, ওঁর হাত ছুঁয়ে গেল আমার হাত—কেন জানি না, হাতটা কেঁপে গেল হঠাৎ। তখনই আমি অনেকক্ষণের দ্বিধা কাটিয়ে মনঃস্থির করে ফেললাম। চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করলো, মিলু, ফিরে এসো। সেদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ আমিই ফিরে যেতে চাইছি তোমার কাছে।

হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে। কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। এখন শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছে, হয়তো মিলুর বিপর্যয়ের জন্য আমিই দায়ী। যারা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কোথায়! কেউ ফেলে দেয়, কেউ জোর করে কেড়ে নেয়—ভালোবাসার সঙ্গে এদের দূরত্ব সমান।

মিলু

চারদিকে এতো উদ্বেগ, এতো ভালো-বাসা, এতো আশ্বাসনের প্রস্তুতি, এ-সবের কিছুই স্পর্শ করল না মিলুকে। পদ্মপাতার মতো তার টলটলে বুকে লেগে আছে এক-বিন্দু জল—একটা পোড়া বাড়ি, তার শেষ স্মৃতি। পর পর ও ক্রমাগত, চারটি লোক বলাৎকার করার পর গায়ে নুন-ছড়ানো কেঁচোর মতো তার আঠারো বছরের শরীরটা সামান্য কুঁকড়ে উঠলো; অস্ফুট শব্দে নড়ে উঠলো ঠোঁট দুটো, চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়লো শেষ জলকণা। অন্ধকার মুখ নিয়ে সে ভাসতে থাকল রক্তাক্ত এক নদীর ওপর।

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড	কিলোসাইকল্‌স্
১৯, ২৫ ও ৩১	১৫০৯৫ ১১৭৫০
	১১৮৭৫ ও ৯৬৪০
মিডিয়ম-ওয়েভ ১৯০ মীটার	১৫৮০

দুটি ছড়া— বনফুল

পরিস্থিতি

সবাই চোর, সবাই চোর, সবাই চোর,
দিবারাত্রি এইটে শুধু শুনছি,
এবং বসে' ঘরের কোণে আপন মনে
ট্যাঁকের টাকা গুণছি।

বৃহৎ কাজ, মহৎ কাজ, দেশের ডাক, মায়ের ডাক
মাইকেতে বাজছে ঢাক
ঢাকীরা সব মাইনে পায়
তাই বাজায়
বেশ বাজায়
ডিউটি সেরে কিন্তু তারাও একই তুলো ধুনছে
ট্যাঁকের টাকা গুণছে।
হায়রে হায়
দেশ কোথায়
মা কোথায়!
বৃহৎ কাজ, মহৎ কাজ করবে কে
এই তুফানে হালটি এসে ধরবে কে
স্বার্থ-ঢেঁকি সকলকে করছে চিঁড়ে
শকুনিরা খাচ্ছে মড়ার মাংস ছিঁড়ে
কিন্তু তবু আকাশ জুড়ে বাজছে ঢাক
মহৎ কাজ, বৃহৎ কাজ
দেশের ডাক, মায়ের ডাক
ঢাকীরা সব মাইনে পায়
তাই বাজায়
হায়রে হায়।

গুজব

নানা রঙের, ভালো 'ফিনিশ'
গুজব একটা আজব জিনিস।
তার বহু পিতা, বহু মাতা,
নিজেও তিনি জন্মদাতা
অনেক কিছুর,
অনেক উঁচুর, অনেক নীচুর।
পাহাড়, নদী, সাগর, মরু, পর্বত
সব শরবত্
করে' গুলে খেয়েছেন তিনি।
কখনো 'কুইনিন', কখনও চিনি।
খুব চটপটে, খুব ছটফটে,
দেশের লোক তার কথায় বসে ওঠে।
দুমদুম বোমা ফাটায়, বোঁ বোঁ করে' ছোটে
কখনও মোটরে, কখনও প্লেনে, কখনও 'বোটে'।
তাঁকে ভয় করি কি? আরে না—না—
এলে আহ্লাদে হই আটখানা,
কৃতার্থ হয়ে উঠি বিলকুল
আড্ডা হয় জমজমাট, বন্ধুরা হন প্রশংগুল।
কেটে যায় সব মেঘ
কাপের পর কাপ চা আসে
পেগের পর পেগ।

নদীর নাম ভালোবাসা॥

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

শেষের খেয়ার মতো সে কখন চলে গেছে নদীর ওপারে
যে-নদীর অন্য নাম ভালোবাসা : সে নদীতে সূর্যাস্তের আলো,
যে আলো দেখার নয়—অনুভব, শুধু শান্ত অনুভব,
জীবনের সব দুঃখ যে আলোয় সন্ধ্যাবেলা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়।

সব খেয়া চলে যাক। সব প্রেম ভালোবাসা বিকেলের মতো
নিষ্প্রভ রোদের দৃশ্যে মহৎ বিষাদ হোক। আমি জানি, তবু
কোথাও সমুদ্র আছে, যে-সমুদ্রে যতো নদী বেলা শেষ হলে
শব্দহীন নিঃশেষিত। তখন পৃথিবী যেন নিভৃত আশ্রম!

জীবন সমুদ্র সেই, জীবন বিস্ময় সেই ; ভালোবাসা শুধু
নির্জন পবিত্র নদী, দুপারে অচেনা শস্য, ওপরে আকাশ!!

অগ্নিকাণ্ড॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এমন কাণ্ড ঘটে গেলো অসম্ভবের রাত-মোহনায়।
আমরা যখন খেলার সাথী মধ্যরাতে পালটেছিলাম,
সেই মুহূর্তে আগুন লাগলো,
অতর্কিতে, পাখির ঘরে।
অনভ্যস্ত হাতের মুঠোয়, মুখোস পরে, অস্ত্র নিলাম।

এখন দেখছি, জ্বলে যাচ্ছে—সারা জীবন, সকল শস্য।
সকল ঘরেই আগুন আগুন। ভয়-পাওয়া সব পায়রাগুলি
কেবল উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে,
উড়ে উড়ে আকাশ ডিঙোয়।
মুঠোর মধ্যে রাখছি ধরে পোড়া-চিঠির চিতা-ভস্ম।

ভাবছি, কোথায় হৃদয় ছিল, স্মৃতিমুখর ভালোবাসা?
সে সব এখন অর্থবিহীন, কেবল দেখছি চতুর্দিকে
যে-ঘরামি ঘর বানাতো,
(তার বুকে আজ কী পিপাসা!)
সে মানুষই চেঁচিয়ে মরছে, একটি শুধু সিঁড়ির খোঁজে।

CENTRAL LIBRARY

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নতুন বই

মাঝি (উপন্যাস) — পরেশ ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। সাড়ে ছ' টাকা।

উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণা, প্রেম-প্যাশান ও মন দেয়ানেয়ার কাহিনী নিয়েই প্রায়শই নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রায় সমস্ত কাহিনীর পটভূমি নগর-জীবন। শহুরে জীবনের 'বাবু' কাহিনীরই প্রাধান্য এতে বেশি। কিন্তু মাটির সন্তান যারা, যারা রয়েছে বাস্তব জীবনের সবচেয়ে কাছাকাছি, যারা ছড়িয়ে আছে জলে-জঙ্গলে ক্ষেতে-খামারে—যারা নিচুতলার মানুষ—তাদের জীবন সার্থকভাবে সাহিত্যে ইদানীং বড় একটা প্রতিবিম্বিত হয় না। সম্ভবত চার দেয়ালের বাইরের জীবনের সঙ্গে কথাশিল্পীদের সংযোগ-সম্পর্কহীনতা এবং অনভিজ্ঞতা এর কারণ। আনন্দের কথা, স্বল্পখ্যাত কিন্তু শক্তিমান লেখক শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য এই নিচুতলার এক মানুষকে নিয়ে লিখেছেন একটি ভালো উপন্যাস সুন্দরবনের পটভূমিকায়।

প্যাকাট-বরাবর্যারির জীবন ভূঁইয়ার ছেলে ধনপতি—বাপের মৃত্যুর পর মাটি থেকে হঠাৎ উৎখাত হয়ে যেন জলে পড়ল। আর এই জলই—সুন্দরবনের গহন নদী, নোনা গাঙ আর বাদাবন হয়ে উঠল তার জীবন। ঘর গেল ঝড়ে আর জাতি-পাঁতির ভেদবিচারে ভালোবাসার মানুষ বারুণী-বালাও হয়ে গেল পর। সৎ দিলখোলা পরোপকারী 'মাল-কাঠ-বাঁকা' ধনপতি মাঝি হয়ে এক নদী থেকে আরেক নদীতে, এক গাঙ থেকে আর এক গাঙে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে মানুষ পারাপার করে, কখনও শূন্যমনে উদ্ভ্রান্তভাবে জলে-জঙ্গলে বাদাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের চেয়ে পর, বসতের চেয়ে বন তার প্রিয়তর হল। বাঘ-সাপ কুমীর-কামটভরা সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি, বন, নদীনালা, অরণ্যচারী পশু-পক্ষী যেন তার প্রাণের দোসর হয়ে উঠল। দু চোখ ভরে তখনও চাঁদনী রাতের কখনও শ্রাবণধারার স্নাত সুন্দরবনের রূপকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখে যেন তার আশা মেটে না। পাগল গাঙ আর বাদাবন তার মনের মধ্যে যেন ঝড় তোলে। বুকের মধ্যে যেন সাগরের ডাক শুনতে পায়। একদিন ধনপতি ডিঙি নিয়ে সাগরে উধাও হল কিন্তু আর ফিরে এল না।

প্রকৃতিপ্রেমী জীবনদরদী দুর্দান্ত অথচ স্নেহময় ধনপতির জীবন-নদীতে কল্লোল তুলেছে বহু জীবনের ধারা। যেন তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে সুন্দরবনের বনজীবন ও জনজীবন। ভাবিতা বারুণী-বালা, নির্যাতিতা সেঁজুতি, গালপাগল নটবর ঘরামী, বন্ধ্যা বধূ ফুলটুসি, যাত্রা-পাগল কেষ্টো নস্কর প্রভৃতি চরিত্রগুলি সুন্দরবনের ভয়ালসুন্দর বিশাল প্রেক্ষাপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্র-চিত্রণে কাহিনী বয়নে-বিন্যাসে ঘটনার টানা-পোড়েনে এবং সর্বোপরি সুন্দরবনের প্রাণময় আলেখ্য অঙ্কনে লেখক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি, মমতা এবং শিল্প-কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। দুই কেন্দ্রচরিত্র : বারুণীবালা ও ধনপতি—উভয়ের জন্য উভয়ের অনুচ্চারিত ভালোবাসা নদীর মতো মনের গভীরে বয়ে কাহিনীকে আরো মানবিক ও চিত্তাকর্ষী করে তুলেছে। এটুকু বুঝতে পারা যায় যে লেখক স্বয়ং সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন বলেই প্রায়-অপরিচিত সুন্দরবন ছবির মতো ফুটে উঠে সমগ্র উপন্যাসটিকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছে।

সৌখীন সাহারায় অসংখ্য জোনাকি (কাব্য-গ্রন্থ)—কবি বন্দ্যোপাধ্যায়।। লিটল ম্যাগাজিন ফোরাম, ৫এ, ওল্ড মেয়র্স কোর্ট, কলকাতা-৫। দাম : দু টাকা পঁচিশ পয়সা।

কবি বন্দ্যোপাধ্যায় নিটোল ছন্দে একটি কবিতা লিখেছেন। তার কয়েকটি লাইন :

'সকাল বিকেল সন্ধে দুপুরে
উড়ুক উড়ুক প্রেমের নূপুরে।
তারায় তারায় জ্বলছে আগুন
জন্ম কি মানে ধূসর ফাগুন?'

প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই তিনি সাবলীল ও সচ্ছন্দ। অনেক কবিতাতেই নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। লাইন-ভাঙা, আঁকা-বাঁকা হরফের কবিতাও আছে একটি। তরুণ কবিদের কাছে সঙ্কলনটি উপভোগ্য মনে হবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

পদক্ষেপ (শারদীয়া ১৩৭৮)—সম্পাদক শচীকান্ত গুহ।। ১০, হিন্দুস্থান রোড কলকাতা-২৯।। দাম: চার টাকা।

বহুল বিজ্ঞাপিত এই শারদ-সঙ্কলনটি এবারের পুজো সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সাহিত্য মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯২৭ সালে লেখা জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সঙ্কলনটির গোড়ার দিকে। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, বিন্দু মুখোপাধ্যায়, শচীকান্ত গুহ, সাবিত্রী সেনগুপ্ত, ইন্দুনাথ গুহ, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদার। জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতা 'সমুদ্রের প্রাণে' ও সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, তরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শোভন ভৌমিক, জগন্নাথ চক্রবর্তী, হিমানীশেখর বসু, চন্দন সেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অমল ভৌমিক ও শুভ মুখোপাধ্যায়। অসাধারণ একটি উপন্যাসের লেখক শচীকান্ত গুহ। নাম চৌধুরী পাকল। ভাব ভাষা ও চরিত্র-চিত্রে অপূর্ব। গল্পকারদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ সিংহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশীষ সান্যাল, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শওকত ওসমান, বিমল কর, বানাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার ও প্রতিমা সেনগুপ্ত। সন্তোষকুমার ঘোষের 'স উবাচ', অমিতাভ চৌধুরীর কয়েকটি ছড়া (পূর্ণেন্দু পত্রী চিত্রিত), গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতিপ্রসাদ বসু ও শিবরাম চক্রবর্তীর রম্যরচনাগুলি বিস্ময়কর। চলচ্চিত্র ও খেলাধুলা প্রসঙ্গে লিখেছেন সেবাব্রত গুপ্ত, ক্ষেত্রনাথ রায় ও মতি নন্দী। পত্রিকাটির ছাপা ঝকঝকে। অঙ্গসজ্জা চমৎকার। দাম সে হিসেবে কমই বলতে হবে।

মৌসুমী—সম্পাদক মনোজ সেনগুপ্ত। ১০১।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯। মূল্য ৫-০০।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও মৌসুমীর শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। মৌসুমীর সম্পাদকের রুচি ও প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এর প্রধান বিশেষত্ব হল, এর সুনির্বাচিত রচনা সম্ভার। বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ

মুস্তাফা সিরাজ, হাসান মুর্শেদ, কুমার মিত্র ইত্যাদির লেখা মোট বারটি সুলিখিত ছোট বড় উপন্যাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, সমীর রক্ষিত ইত্যাদির রসোত্তীর্ণ গল্প এবং ভিন্ন রসের কয়েকটি চমকপ্রদ ফিচার ও সিনেমা সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনা শারদীয়া সংখ্যাটির রীতিমত গৌরব বলা যায়।

অমলা সাহিত্য... (ভাদ্র '৭৮)—সম্পাদক : সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। হালিশহর, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

আলোচ্য সাহিত্য পত্রিকাটি একালের ভাবনা-জিজ্ঞাসার সমন্বয়। সাহিত্যে নব-চিন্তার এবং লেখনরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ছাপ লেগেছে তারই স্বাক্ষর রয়েছে 'বিশেষ গল্প' সংখ্যার গল্পগুলিতে। লিখেছেন : উদয়ন ঘোষ, সমীরণ নাগপুরে, শেখর বসু, জীবন সরকার, ভরত সিংহ, সুবিমল মিশ্র, অজয় চন্দ, সুবিমল বসাক, সমীরকান্তি বিশ্বাস, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্বীকার

সাহিত্য মেলা (প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র '৭৮)—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৮।১ রামাপাড়া রোড, কলকাতা-৫০। ৫০ পয়সা।

বেদুইন (৫ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা, ভাদ্র, '৭৮) —সত্যেন্দ্রনাথ জানা। সুহাসিনী রায়, তমলুক রাজবাটি, তমলুক, মেদিনীপুর

অবেক্ষণ—সম্পাদক : রাধু গোস্বামী। বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা।

অন্যদের অভিযান (জুলাই, ৭১)—সম্পাদক : সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দেবনাথ। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা—২০।

বনশ্রম (বিশেষ সংখ্যা, '৭১)—সম্পাদক : অনুপম মিত্র ও মহাদেব মিত্র। ১০০ বঙ্কিম বসু রোড, কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা। ৫০ পয়সা।

মুক্তবন্ধ (আগস্ট, '৭১)—সম্পাদক : এস এম সিরাজুল ইসলাম। ২ ওয়াকিউল্লা লেন, কলকাতা—১৬। ৭৫ পয়সা।

উত্তর দিগন্ত (ত্রৈমাসিক) — সম্পাদক : সন্তোষকুমার চক্রবর্তী, মালদহ কাজীচারাল ইউনিট, মালদহ। ৫০ পয়সা

অর্থার্ক (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : স্বপন হাসাধিকারী ও সরোজ দাস। ৩৬ শক্তিগড়, কলকাতা—৩২। এক টাকা।

নবজাতক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, সাক্ষাৎকার অনুবাদ কবিতা, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদির সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

একটি প্রাচীন যাদুঘর

সাবিত্রী সেনগুপ্ত

'পুতুলের দেশ নুরেমবার্গ' এ কথাটা জার্মান দেশে খুবই প্রচলিত। এককালে নুরেমবার্গের হস্তশিল্পীরা তাদের কারু-কার্যে দেশবিদেশের লোকদের মুগ্ধ করত। আজ হয়তো সে দিন আর নেই, কিন্তু ঐতিহ্য রয়েছে। জার্মানীর যাদুঘর সেই ঐতিহ্যকে বহন করে বেড়াচ্ছে। নুরেমবার্গেই রয়েছে জার্মানীর সেই যাদুঘর।

ব্যারন হান্স ফন অ্যাণ্ড জু অফ সেস নামে একজন ব্যাংক এই মিউজিয়ামটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উক্ত আদর্শবাদী অমিত উৎসাহী দেশপ্রেমিক। ১৮৩০ সালে জার্মানিতে যে বিদ্রোহ হয় তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সে সময় জার্মান দেশের সমস্ত মানুষকে একটি উদার, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তার ফলে ফ্রাঙ্কফুর্টে স্থাপিত হয় আইনসভা। আর সেই বিদ্রোহের ফলে একটি জাতীয় যাদুঘর স্থাপনেরই পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

এ পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৮৫২ সালে। জার্মান ভাষাভাষী সকল জাতির শিল্প নিদর্শন ও সংস্কৃতির অমূল্য সংগ্রহ এখানে একত্রিত করা হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে। ব্যারন ফন অফ সেস বিভিন্ন দুর্গ থেকে প্রাচীন শিল্প-কলার বিপুল সংগ্রহ নুরেমবার্গে নিয়ে আসেন। সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় মিউজিয়ামের ভিত্তি। ১৮৫৭ সালে একটি পুরানো কার্থেলীয় আশ্রমে এই যাদুঘরটি স্থানান্তরিত করা হয়। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছিল। গথিক পদ্ধতিতে তৈরী এই বাড়ীটির চারদিকে যাদুঘরের জন্যে আরও বাড়ী সংযুক্ত হয়।

প্রাচীন কার্থেলিয়ান আশ্রম ও গীর্জার চতুর্দিকে এ পর্যন্ত এরকম ১২টি বাড়ী তৈরী হয়েছে, এবং এগুলিতে মোট ২০০টি কক্ষ আছে।

১৯৪৪ সালে তিনটি প্রকোষ্ঠ বোমা ও আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। বহু কক্ষে সেখানকার অমূল্য সংগ্রহগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বর্তমানে প্রায় একশোটি কক্ষ পুনরায় শিল্পকলা সামগ্রীতে সুসজ্জিত করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

এই মিউজিয়ামের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহগুলির সংখ্যা হল দশ হাজার। জার্মান চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চমৎকার সংগ্রহ রয়েছে এখানে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময়ে কেমন সাজপোশাক পরা হত এবং যুদ্ধ ও শিকার প্রভৃতিতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত তার প্রচুরসংখ্যক সংগ্রহ রয়েছে যাদুঘরে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুতুল নির্মাতা হিসাবে নুরেমবার্গের একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। কাজেই পুতুল সংগ্রহাগারটি হয়ে উঠেছে একটি অতুলনীয় সম্পদ।

মুদ্রা সংগ্রহ বিভাগে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা ও পনের হাজার পদক সংগৃহীত হয়েছে। এখানে সংগৃহীত অনান্য সম্পদ-গুলি হল—জার্মান সম্রাটদের নানারকম শীলমোহর, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েক হাজার জার্মান দলিল, নানা ব্যক্তির স্বাক্ষর এবং জার্মান সাহিত্যের প্রথম ও প্রাচীন সংস্করণসমূহ। প্রথম যুগের স্প্রিং ঘড়ি বা মার্টিন বেহাইমের বিখ্যাত 'টারনিকা' ঘড়ি আজও দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এই ঘড়ি তৈরী হয়েছিল।

প্রাচীন জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী-গণের নানা নিদর্শন যাদুঘরটিকে দান করেছে বিরাট ঐতিহাসিক মর্যাদা।

আমাদের কলকাতাতেও একটি যাদুঘর আছে। সেটা ছোট না হলেও তার সম্প্রসারণ সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি দিলে এখানেও একটি বড় আকারের যাদুঘর তৈরী করা সম্ভব।

CENTRAL LIBRARY

পূর্ণাবতার

প্রমথনাথ বিশী

পঞ্চম খণ্ড

(৮)

জবা বলল, ঠাকুর এখন থেকে আপনাকে প্রভু বলে সম্বোধন করবো।

বেশ বাবা, তাই করো—ওটাই যে আমার নাম।

বুঝতে পারে না জবা।

আমার নাম প্রভুদয়াল, লোকে প্রভু বলে ডাকে, কেউ কেউ আবার বলে প্রভুজী।

তবে আমিও তাই বলবো।

তারপর বলে, প্রভু এই কি আপনার কুটীর?

কুটীর বলছ কেন, বলো প্রাসাদ। প্রাসাদ তো ইঁট-পাথর দিয়ে তৈরি হয় না, তৈরি হয় মনের সন্তোষ দিয়ে। আমি যদি এখানে সন্তুষ্ট হয়ে বাস করি তবে এই আমার প্রাসাদ। তাছাড়া যেখানে বাসুদেবের পায়ের ধুলো পড়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রাসাদ আর কোথায়?

বাসুদেবের পায়ের ধুলো। প্রভু, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

প্রভুদয়াল হেসে উত্তর দেয়, দেখব না, এখানেই যে তিনি বাস করতেন।

এই সমুদ্রে—বিস্ময় প্রকাশ করে জবা।

সমুদ্রে বললে অন্যায় হয় না, শোন নি যে সমুদ্রে ছিল নারায়ণের অনন্তশয্যা। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এখানেই যে ছিল তাঁর রাজধানী।

ছিল যদি তবে এখন কোথায়—এ যে অতল সমুদ্র!

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেলে যজ্ঞস্থল জল দিয়ে প্লাবিত করে দিতে হয়। যে-কর্মযজ্ঞের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা শেষ হয় যেতেই সমস্ত প্লাবিত করে দিয়ে লীলা-সম্বরণ করেছেন তিনি।

তবে তো এখানে আসা আমার সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে।

সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বাবা, তাঁর আদি-আলয়ে তাঁকে দেখতে পেলে।

ব্যাকুলতার জন্য বলে কই দেখতে পেলাম প্রভুজী।

আর সকলকে চোখে দেখতে হয়, পূর্ণাবতারকে দেখবার ইচ্ছাতেই তাঁকে দেখা হয়। তাঁকে দর্শনের এমন ব্যগ্র ব্যাকুলতা তো আর কারো মধ্যে দেখিনি বাবা।

প্রভু, পূর্ণাবতার কি বুঝিয়ে দিলেন না তো, সেদিন কথা শুনতেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এখন আবার চাপা পড়ুক, যথাসময়ে হবে, আগে তোমার আহারাদির ব্যবস্থা করে দি।

এই বলে তিনি ডাকলেন, ওগো কালাপের মা, এদিকে এসো, তোমার আর একটি ছেলে এসেছে।

ডাক শুনে কুটীর থেকে একজন বয়সে প্রৌঢ়া, ভাবে তরুণ নারী বের হয়ে এলো—কই বাবা।

প্রভুদয়াল বলল—এই যে।

জবাকে দেখে প্রভুদয়ালের পত্নী বলে উঠল এ ছেলেটি যে আমার রীতিমত সন্ন্যাসী।

না মা, আমি মহাপাপিষ্ঠ নরাধম বলে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল।

সন্ন্যাসী পায়ে হাত দিল—না জানি কত পাপ হল আমার।

মা তোমাকে আর বাবাকে দেখে মনে হয় পাপের এখানে প্রবেশের পথ নেই।

কেবল পাপীর আছে কি বলো বাবা—এই বলে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে প্রভুজী।

প্রাণখুলে যে হাসতে পারে পাপ তার মনে জমতে পারে না। স্রোতের মুখে কি আবর্জনা জমে।

নাও এখন তোমার সন্ন্যাসী ছেলের আহারের ব্যবস্থা করে দাও।

এসো বাবা আমার সঙ্গে।

এই সময় গোটা দুই দৌড়ভুতো, তার মধ্যে আমার একটা খোকা, আর গোটা দুই ছাগল এসে উপস্থিত হল। একটা ছাগল তার আঁচল ধরে টানে।

কালাপের মা তার উদ্দেশে বলে—খেয়েছি, খেয়েছি খিদে পেয়েছে, একটু সবুর কর বাবা খেতে দিচ্ছি।

তারপর জবাকে বলে, এরাই আমার ছেলেমেয়ে। আরও একজন আছে জগন্নাথ-খুড়ো, সে আমাদের ভরণপোষণ করে।

কুটীরে প্রবেশ করে দেখে সেখানে তৈজসপত্র, খাট তক্তাপোষ বলতে কিছু নেই। মনে পড়ে তার কুটীরের কথা, যে কুটীর সেই কালবৈশাখীতে পড়ে গিয়েছিল তারপর ছেড়ে গিয়েছে, এ কুটীর তার চেয়েও নিঃস্ব। অথচ কুটীরবাসীদের মনে শান্তি ও সন্তোষের অভাব নাই।

আহার শেষ হলে প্রভুদয়াল জবাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে গিয়ে একখানি পাথরের উপরে বসে। জবা বলে—প্রভুজী, এবারে আমার উপর দয়া করুন, পূর্ণাবতারতত্ত্ব বুঝিয়ে দেন আমাকে।

প্রভুদয়াল বলে—দেখো বাবা ঐ যে পাহাড়ের কোলে একখণ্ড জমি দেখা যাচ্ছে—যেখানে একটা লোক লাঙল দিয়ে জমি চষছে।

জবা বলে হাঁ দেখতে পাচ্ছি।

ঐ হচ্ছে পূর্ণাবতারের প্রথম কলা। শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ যেমন কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পরিপূর্ণ আকার পরিণত হয়, ঐ দেখো আকাশের প্রান্তে পূর্ণচন্দ্র, তেমনি মানুষের কলায় কলায় পূর্ণতর হতে হতে পূর্ণাবতার পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তবে প্রভেদের মধ্যে চাঁদের ষোল কলা, পূর্ণাবতারের অনন্ত কলা, যত মানুষ তত কলা। বাবা, তুমি আমি সকলেই পূর্ণাবতারের খণ্ডকলা।

প্রভু, আমার মতো কলঙ্কীও কি সেই পূর্ণাবতারদেহের অংশ?

কেন নয় বাবা, চাঁদে কি কলঙ্ক নাই?

প্রভু তাহলে রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, ভগবদ্বিদ্বেষী প্রভৃতিও—এরা কি?

পূর্ণচন্দ্রকে মাঝে মাঝে রাহুতে আক্রমণ করে নাকি? এরা সেই রাহু।

এদের সৃষ্টি কেন?

এদের কণিকত্ব প্রদর্শনের জনাই। দেখো বাবা, অনুগত ভক্তের কলঙ্ককে আদরে তিনি বক্ষে ধারণ করেন, তার অভক্তের নশ্বরতা জ্ঞাপন করেন চন্দ্রগ্রহণের দৃষ্টান্তচ্ছলে।

প্রভু, ক্ষমা করবেন আমি স্বল্পবুদ্ধি। মানুষ যে অনন্তকাল ধরে জন্মগ্রহণ করতে থাকবে তবে অখণ্ড কথা সমন্বয়ে পূর্ণাবতারচন্দ্র পূর্ণতা লাভ করবেন কবে? কবে হবে সেই পূর্ণাবতারের পূর্ণিমা?

বাবা, এ বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে।

আপনার কাছেও কঠিন?

আমার কাছেও—তবু বলবার চেষ্টা করি, দেখি পারি কিনা? এই যে সমগ্র মনুষ্যসমাজ, মৃত, জাত ও অজাত নিজে-দের অগোচরে সেই পূর্ণতার দিকে চলেছে, এই পূর্ণতার অভিমুখিনতাই পূর্ণতা। তুমি আমি কে যে সেই পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ করবার স্পর্ধা রাখি?

তবে পূর্ণাবতারের মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

তোমার আমার মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?

কোথায়—প্রতিধ্বনি করে জরা।

হৃদয়ে হোক বা বুদ্ধিতে হোক বা ব্রহ্মরন্ধ্রে হোক অবশ্যই তিনি আছেন। সেই সমষ্টীয় 'আছের' সর্বাধিষ্ঠাতরূপে তিনিও আছেন, মানুষ যেদিন পূর্ণ হবে তিনিও হবেন পূর্ণ।

প্রভু, শুনেছি তিনি তো নিত্যপূর্ণ।

ভুল শোননি বাবা, তিনি নিত্যপূর্ণ, তবে কেন এই অপূর্ণতার ভান।

এতক্ষণে ঠিক শব্দটি উচ্চারণ করেছ—ভানই বটে। তোমার জিজ্ঞাসা যিনি নিত্য-পূর্ণ তার অপূর্ণতার ভান কেন? আচ্ছা বলতো, বাসুদেব হস্তিনায় গিয়ে রাজা মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ না করে বিদুরের খুদকুঁড়ো ভোজন করলেন কেন?

কেন?

তিনি যে ভক্তের অনুগত, ভক্তকে উৎসাহিত করতে চান, বলেন—দেখো আমি তোমার মতোই সামান্য ব্যক্তি। তিনি জানেন তাঁর ঐশ্বর্যময় রূপ সহ্য করবার শক্তি মানুষের নেই। অর্জুনের মতো বীর যোগী পুরুষও সে রূপ সহ্য করতে পারেনি। ভীত হয়ে অনুরোধ করেছিল—প্রভু, তোমার বিশ্বরূপ সম্বরণ করে কৃষ্ণরূপ আমাকে দেখাও। এ সেই বিদুরের খুদ-কুঁড়ার প্রার্থনা। শোন বাবা, তিনি অপূর্ণতার ভান করে মানুষকে উৎসাহিত করে আহ্বান করছেন পূর্ণতার পথে। শিশু চলতে গিয়ে পড়ে পড়ে যাচ্ছে তাকে উৎসাহিত করে বাপও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে পড়ে যাচ্ছে—যাতে শিশু নিরুৎসাহিত না হয়। নিজেকে পূর্ণতার অভিমুখী করে রাখাই পূর্ণতা, যার শাস্ত্রীয় নাম পূর্ণা-বতার। নিরুৎসাহ হলেই সব পণ্ড হয়ে গেল—নিরন্তর চলা চাই, থামলে চলবে না। আরও শোনো, সত্যযুগে চার পোয়া পাপ, ত্রেতায় তিন পোয়া, দ্বাপরে দুই পোয়া, আর কলিযুগে এক পোয়া। পাছে মানুষ গতির মন্থরতা দেখে হতাশ হয়ে থেমে যায় তাই ভগবান বাসুদেব দ্বাপর আর কলির সন্ধি-সঙ্কটে জন্মগ্রহণ করে মানুষের সম্মুখে পূর্ণাবতারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যেসব অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের পূর্ণা-বতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, গতি তখন প্রবল ছিল, মানুষও ছিল চালাক। কলিতে পাছে তার যাত্রায় ছেদ ঘটে তাই কলির প্রারম্ভে তাঁর পূর্ণাবতার জন্মদৃষ্টান্ত। চলা চাই বাবা চলা, কখনো কোন বাধায় কোন বিপত্তিতে থামলে চলবে না। তবে শুধু দেহটা চললেই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে মন বুদ্ধি হৃদয় সমস্ত দিয়া চলা চাই, তাতেই পাপের ক্ষয় তাতেই পূর্ণতার উপলব্ধি।

প্রভুদয়াল থামেন, ইচ্ছা করেই থামেন যাতে জরা সমস্ত বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তারপরে আবার, আবার আরম্ভ করেন, বাবা, তুমি কি পাপ করেছ জানি না, জানতেও চাই না, তবে এ জানি তুমি যত চলেছ, চলবার পথে বাধা-বিপত্তির ঐরাবত ঠেলে চলেছ, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তোমার মন বুদ্ধি হৃদয় তাতে তুমি যে সামান্য পাপী, পাপিষ্ঠের অধম জরা-ব্যাধেরও মুক্তিলাভ ঘটে যেতো।

বিস্মিত হয়ে জরা শুধায়, কি বললেন প্রভু? সে লোকটা যে বাসুদেবকে হত্যা করেছিল।

চলার বেগে এতদিনে সে পাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছে যদি সে সত্যই তোমার মতো আর্তি নিয়ে নিরন্তর চলতে থাকে।

সত্যি বলছেন প্রভু?

সত্যই বলছি।

তখন জরা আর্তচীৎকারে কেঁদে উঠে তার পা জড়িয়ে ধরে মাথা কুটতে কুটতে বলে, প্রভু, আমি সেই নরাধম, পাপিষ্ঠের অধম জরা।

প্রভুদয়াল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তুমি তো মুক্তপুরুষ, চলার গঙ্গাস্রোতে কবে তোমার পাপ-তাপ ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। পূর্ণাবতারের পথে তুমি আমার চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছ।

জরা প্রবোধ মানে না, কেবলি মাথা কুটতে থাকে তার পায়ে।

অনেকক্ষণ পরে জরা বলে—বাবা, আমি যদি মুক্তি পেয়ে থাকি তবে মনে এত তাপ কেন?

স্পর্শমণির স্পর্শে তোমার লোহার মাদুলি যে সোনা হয়ে গিয়েছে তা দেখবার অবসর হয়নি বলে।

তারপর বলেন, চলো বাবা, তোমাকে মুক্তিস্নান করিয়ে আনি। যে ভূখণ্ডে যে মহানিম্ব বৃক্ষতলে তিনি লীলা সম্বরণ করেছিলেন সেই ভূখণ্ড, সেই বৃক্ষটি আজও অক্ষয় হয়ে আছে—হয়তো বা তুমি ফিরে আসবে প্রতীক্ষাতেই। এসো আমার সঙ্গে।

মন্ত্রচালিতবৎ প্রভুদয়ালের পিছু পিছু চলতে থাকে জরা।

২

সমুদ্রপ্লাবনে যদু-রাজধানী সর্বাংশে ডুবে গেল কেবল জেগে রইলো দুটি উচ্চ ভূখণ্ড, প্রভুদয়ালের শান্তিধাম আর যেখানে বাসুদেব নিহত-হয়েছিলেন। অবশ্য জল

করতো প্রফুল্লদালের কুটীরে. মাঝে মাঝে যে বৃক্ষ-তলে শয়ান অবস্থায় বাসুদেব দেহত্যাগ করেছিলেন সেখানে গিয়ে প্রণাম করে আসতো। একদিন তার মনে হল এখানেই একখানা কুটীর তুলে বাস করি না কেন। মনোবাসনা জানালো প্রফুল্লদালকে। প্রফুল্লদাল ও কাশাপের মা প্রথমে আপত্তি করলেন, শেষে তার মনের অবস্থা অনুমান করে অনুমতি দিলেন, তাঁরাই কুটীর তুলে দিলেন, গ্রাসাচ্ছাদনও জোগাতেন তাঁরাই. এই জন মরুতে অরতী আর কোথায় কী পারে।

অরতী দিবারাত ঐ গাছতলায় পড়ে থেকে স্বামীর পাপস্খালন আশায় বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করতো, তার বিশ্বাস হয়েছিল যে তরা জীবিত আছে. প্রভুজীর আশ্বাসবাক্য তার একটি প্রধান কারণ। কালক্রমে মাটি দিয়ে বাসুদেবের একটি মূর্তি গড়লো সে, জলে ঝড়ে নষ্ট না হয় তার উপরে একটা ছাউনি তুললো। আর এ দের মধ্যে একটিমাত্র বাসুদেবের পূজা ও আরাধনা। মাঝে মাঝে প্রফুল্লদাল ও তাঁর স্ত্রী আসতেন, যোগ দিতেন তার সঙ্গে পূজায়। প্রভুজী বলতেন—বাছা, তরা যতই পাপিষ্ঠ হোক তুমি তার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছ, সে কি মুক্তিলাভ না করে পারে।

অরতী শুধালো—বাবা, তার কি আর দেখা পাবো না।

প্রভুজী বলতো, সে কোথায় আছে জানি না তবে আমার কেমন বিশ্বাস শেষ-

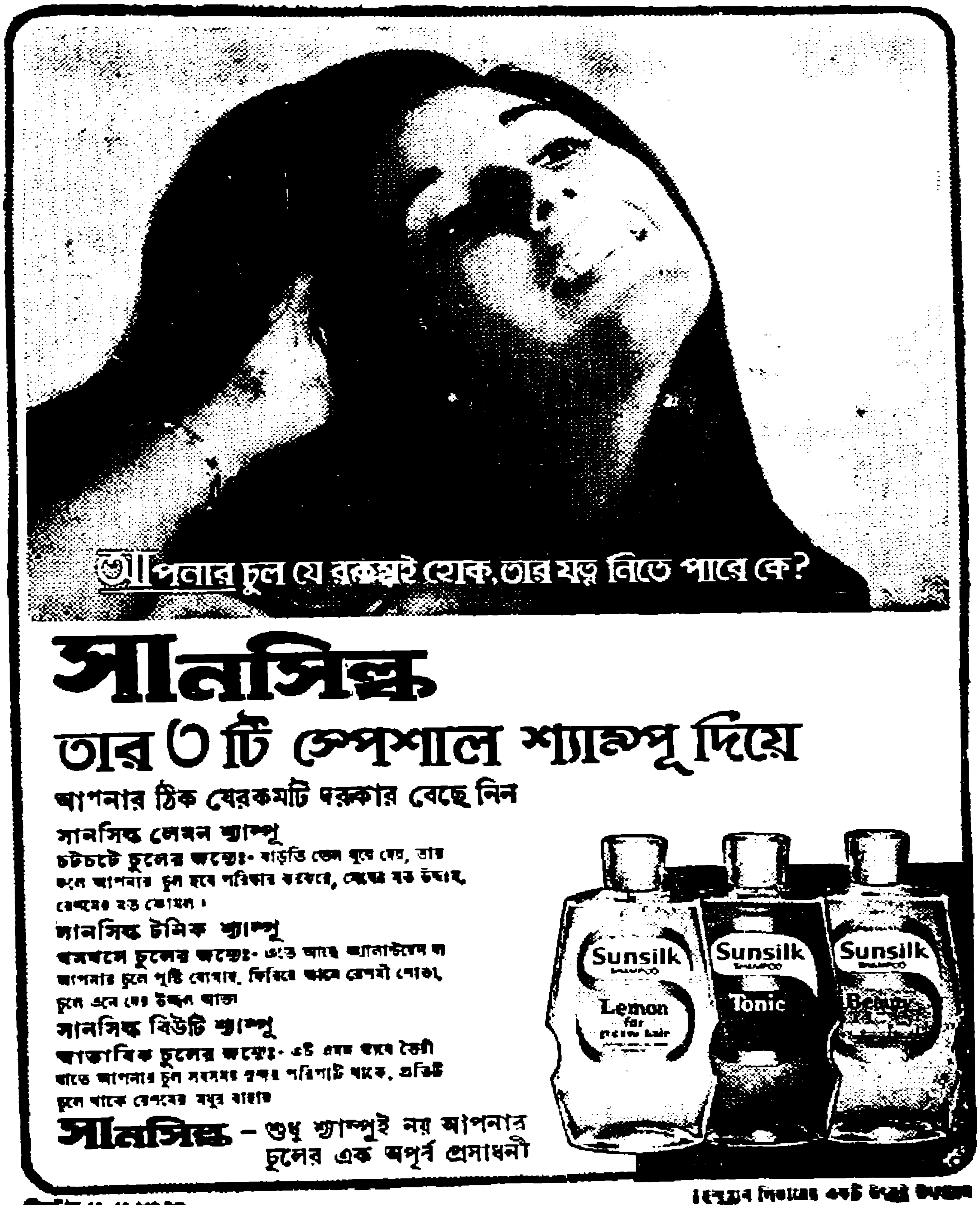

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

পর্যন্ত ঘুরে আসবেই এখানে। নিমজ্জমান ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিতের কাষ্ঠখণ্ড ধরে—আর প্রভুদয়ালের আশ্বাস তো নৌকা, জয়তী আশ্বস্ত হলো, কালক্রমে সে আশ্বাস প্রত্যয়ে পরিণত হল। এমনভাবে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হল।

জয়তীর আরাধনায় জরা পাপমুক্ত হল কিনা জানি না, তবে তার দেহে মনে বিপুল পরিবর্তন ঘটলো। প্রৌঢ়া জয়তীর এখন সৌম্যমূর্তি, দেবকান্তি, একটা স্নিগ্ধ আভা, একটা পবিত্রতা সারা দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হতো। এ যেন একালের তপস্যারতা উমা। তার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই চোখ আপনি নত হয়ে পড়ে। তার মনের পরিবর্তন। সে তো এত সহজে বুঝবার নয়, তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না, কারণ দেহের সৌন্দর্য মনের সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন। মন যার সুন্দর তার দেহ অসুন্দর হতে পারে না, মন যার পবিত্র দেহ তার অপবিত্র হওয়ার উপায় কি? পদ্মে ভিতরে বাইরে সুন্দর বলেই দেবতার অর্ঘ্য।

তখন পূর্ণ-চাঁদের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আকাশ উদ্ভাসিত করছে, সমুদ্রও। প্রভুদয়াল ও জরা চলেছে বাসুদেবের আশ্রমে। জয়তী ঐ স্থানটিতে বাসুদেবের আশ্রম বলতো।

জরা শুধাচ্ছিল, প্রভু আপনি এইমাত্র বললেন যে কলিযুগে এক পোয়া গতি, তিন পোয়া স্থিতি, আরও বললেন যে ধর্ম ও পুণ্য এই গতিরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সারা দেশে আজ যে সর্বজনীন অরাজকতা চলছে তা দেখে মনে হয় না যে ধর্মের এক পোয়াও অবশিষ্ট আছে।

প্রভুজী বললেন—দেখো বাবা, ধর্ম ও পুণ্য এখনো আছে তবে ঐ এক পোয়ার অধিক নয় কারণ কলিতে এখন গতি এক পোয়া। এই যে অরাজকতা, মারামারি হানাহানি সবকিছুই সে একপাদ গতি। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, লোকে এখনো চলিষ্ণু আছে তবে যদি তারা ভুলপথ অবলম্বন করে, কিম্বা সঙ্কীর্ণ পথে সবাই মিলে চলাতে শুরু করে তবে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি না হয়ে যায় না। তাকেই তো বলি অরাজকতা হানাহানি।

জরা অবাক হয়ে শোনে, ভাবে কি আশ্চর্য এই নিদারুণ অব্যবস্থার মধ্যেই ঠাকুর আশার আলো দেখতে পান, ভাবে সাধুপুরুষের চোখের গড়নই আলাদা। তারপরে শুধোয় কখন কিভাবে এর অবসান হবে।

অবসান। চক্রাবর্তন পূর্ণ হলে হবে অবসান।

জরা বুঝতে পারে না চক্রাবর্তন বলতে কি বোঝায়।

প্রভুদয়াল বলেন, কলির শেষে একটা সময় আসবে যখন এই এক পোয়া গতিও লোপ পাবে, তখন চন্দ্রসূর্য আর সেই সঙ্গে মনুষ্যসমাজ স্থবিরত্ব লাভ করবে গতিশূন্য হবে তখন—

জরা প্রতিধ্বনি করে তখন—

তখন বাসুকি মাথা নাড়া দেবেন, প্রচলিত ব্যবস্থা সমস্ত ওলটপালট হয়ে যাবে, বিধাতা ঢেলে সাজাবেন আপন সৃষ্টিকে। একেই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে মন্বন্তর, কল্পান্ত, মহাপ্রলয়, রাজনীতিকগণ বলে মহাবিপ্লব। তখনই পূর্ণ হবে চক্রাবর্তন, আবার আরম্ভ হবে সত্য যুগের যার চার পোয়া গতি। কেন এমন হয়? নবনীত তুলতে গেলে দধিকে মন্থন করা আবশ্যক। যে দীর্ঘিকা এক সময়ে অমৃত জলের আধার ছিল কালক্রমে তা পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়—তখন আসে পঙ্কোদ্ধারের পালা, নাড়া খেয়ে ভেসে ওঠে কত যুগের আবর্জনা। বিধাতা মাঝে মাঝে বিশ্ব-সরোবরে পঙ্কোদ্ধার করেন। এই যে এসে পড়েছি—ঐ দেখো বৃক্ষতলে কুটীরের মধ্যে বাসুদেবের মূর্তি।

জরা এক মুহূর্ত সেই মূর্তি নিরীক্ষণ করে বলল—প্রভু, তাঁর কৌস্তুভমণিহারটি নানা হাত ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে এটিকেই হরণ করবার উদ্দেশ্যে চটিতে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এবার যার জিনিস তাকে সমর্পণ করবো। কিন্তু ঠাকুর, একি এখানে মনে হচ্ছে, প্রত্যহ পূজার্চনা হয়—কে করে?

প্রভুদয়াল ভাবলো প্রথমেই জয়তীর নাম বলা উচিত হবে না, তাই বলল—একজন ভক্ত আছে।

ঠিক সেই সময়ে জয়তী অদূরস্থ পল্বল থেকে পানীয় জল আনতে গিয়েছিল—তাই তারা পরস্পরকে দেখতে পেলো না। জরা যখন মণিহার নিয়ে অগ্রসর হতে যাচ্ছে সেই সময় জল নিয়ে ফিরে এলো জয়তী।

প্রভুদয়াল বলল—এই সেই ভক্ত।

জরা চিনতে পারলো না, কেমন করে পারবে, একদিন স্বহস্তে যাকে হত্যা করেছে তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু দশ বৎসরের পরিবর্তন সত্ত্বেও এক পলকেই জয়তী চিনলো তাকে, ব্যাকুলভাবে বলে উঠলো—জরা, তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবেই, কালকে শেষ রাত্রে বাসুদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে দিলেন।

আর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল না, প্রভুদয়াল বলল—জরা, এই হচ্ছে জয়তী, সে মরেনি, বাসুদেবের কৃপায় সে বেঁচে উঠেছিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে, সেই বাসুদেব মূর্তি সেই জয়তী, সেই স্থান, সেই কাল, সেই পূর্ণিমায় চন্দ্র সবশুদ্ধ মিলে এক অভাবিত পরিবর্তন ঘটালো জরার জীবনে। জয়তীর সম্বোধনের উত্তর না দিয়ে সে চীৎকার করে উঠল একি, একি, চাঁদে গেরণ লাগলো কেন, চারদিক যে অন্ধকার হয়ে এলো, আকাশে এত অসংখ্য উল্কাপাত কেন, একি পায়ের তলায় পৃথিবী কেন কাঁপছে, ঐ যে তাড়া করে আসছে সমুদ্র! রক্ষা করো, বাসুদেব রক্ষা করো।

জয়তী বলে উঠল—ঠাকুর, একি!

প্রভুদয়ালও বুঝতে পারলো না হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন।

একি জরা ও কোথায় চললে? ওদিকে যেয়ো না, যেয়ো না, ওখানে অতল সমুদ্র—চেঁচিয়ে বলে জয়তী।

রক্ষা করো! বাসুদেব, রক্ষা করো! চীৎকার করতে করতে জরা ছুটেছে সমুদ্রের দিকে।

ঠাকুর, ধরো, ধরো, বলে পিছু পিছু ছুটলো জয়তী ও প্রভুদয়াল, কিন্তু তারা কাছে পৌঁছবার আগেই ব্যাকুল বাসুদেব ধ্বনি উচ্চারণ করে জোয়ারের উন্মত্ত জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জরা।

জয়তী লুটিয়ে পড়ে শুধালো—প্রভু, একি হল?

প্রভুদয়াল বললেন— দুঃখ করো না মা, মুক্তপুরুষের জীবন-মৃত্যু সমান, জরা মুক্ত-পুরুষ।

শরাহত মৃগীর মতো ছটফট করতে করতে জয়তী বলল, সে কি বলা না কান্না, প্রভু, আমার মুক্তপুরুষে প্রয়োজন নেই, আমি পাপী-তাপী নরাধম জরাকে চাই, মুক্তপুরুষ নিয়ে আমি কি করবো।

প্রভুদয়াল সান্ত্বনা দিয়ে বলল—বৎসে দশ বৎসরের সাধনার এই কি পরিণাম!

প্রভু, আমি কি বাসুদেবের সাধনা করেছি? মনে মনে তাই ভেবেছি বটে, কিন্তু তখন কে জানতো কখন অগোচরে বাসুদেবের স্থানে বসিয়েছি জরাকে। আমি তো তাঁর কাছে পাপ থেকে মুক্তি চাই নি, চেয়েছি পাপপঙ্কে নিমগ্ন জরাকে। প্রভু, প্রভু, এতকাল নিজেকে নিজে ঠকিয়েছি আজ বুঝি তার দণ্ড দিলেন বাসুদেব, পেয়েও রাখতে পারলাম না, হাতে পেয়েও হারালাম। এখন আমার জীবনের আর কোন আশ্রয় থাকলো। এখন আমি কি নিয়ে বাঁচবো।

চলো আবার সাধনায় বসি।

ক্লিষ্টভাবে জয়তী বলল, জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মাঝামাঝি স্বরে, কিসের সান্ত্বনা, কেন আর সাধনা।

প্রভুদয়াল বলল—পাপ থেকে মুক্তির, আমরা সকলেই জরা, প্রত্যেকেই আমরা আদর্শঘাতী।

সেকথা বুঝি কানেও প্রবেশ করলো না জয়তীর, মণিহারা ফণিনীর মতো লুটিয়ে লুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করে মাথা নাড়তে লাগলো। হয় প্রভুদয়ালের কথা তার কানে ঢোকে নি, নয় মনে ধরে নি, হয়তো দুই-ই।

(সমাপ্ত)

দ্বিতীয় সত্তা

আশা দেবী

আজ রাতে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবে, বলবে বৌটার মনেমনে এই ছিল। দেখে তো একটুও বোঝা যায়নি।

ভাবতে অনুপমার কান লাল হয়ে যায়। মুক্তোর মত ঘামের বিন্দু জমে ওঠে কপালে। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ ভেবে নেয় কেন কী। তারপর আপনাকেই আপনি বলে—পুরুষরা হাজার দোষ করুক কিছু এসে যায়না, আর আমার? যাই ভাবি মনে মনে, কাজে কিন্তু কিছুই করা যায় না। বুক কাঁপে, কেমন ভয় ভয় করে।

মনে হয় ঘর থেকে যেন সে চলেই যাবে কিন্তু খোকার কি হবে? এখন না হয় সাত মাসের ছেলে কিছুই বোঝে না। কিন্তু আরো পরে ও বড় হবে। স্কুলে যাবে—। তখন যখন বন্ধুরা জিজ্ঞেস করবে : তোর মা বুঝি বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছেন? অনুপমা ভাবে, নাঃ— পারা যাবে না। যত ভাবে তত ভয় পায়, কান লাল হয়ে ওঠে, কপালে মুক্তোর মত ঘামের বিন্দু জমে। কিন্তু স্বামী যে যা খুশী তাই করে বেড়াবে তাতে বুঝি কিছু না—যত দোষ তার বেলাতেই।

না! ওদের বেলায় কিছু না। ও যে পুরুষ মানুষ। শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে। জাঁকজমক মানুষটি কপাল বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেন—হাতীর দাঁতের মত গায়ের রং। ভাবলেই যেন কেমন গা-টা ছম-ছম করে ওঠে, ভয় হয়। জোনাকি-ঝিল-মিল এই অন্ধকার রাতের কুয়ো থেকে কলসীতে জল ভরতে ভরতে অনুপমার গা ছমছম করে, শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে।

শাশুড়ীই সবার অমতে অনুপমার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : না, মেয়েটি খুব লক্ষ্মীমন্ত—ওর মুখে-চোখে একটা বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। বাউন্ডুলে ছেলেকে ও ঘরে ফেরাতে পারিবে—এ আমার বিশ্বাস।

বাড়ীতে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। দিদি শাশুড়ী বলেন : তুই কি ছেলের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করলি। রমেনের যখন পছন্দ নয় তখন কি দরকার!

: তুমি দেখো—, এখন পছন্দ নয়, পরে পছন্দ না হয়ে যাবে না। তাছাড়া পছন্দ-অপছন্দের ও বোঝে কি?—আমি ওর মা : আমি বুঝি না কিসে ওর ভালো হবে? আমার একটাই ছেলে, ও সুখী হোক এটা কি আমি চাইবো না?

: তা ঠিক তবু আজকালকার দিন। ওর অমতে এমন করে—জোর ক'র শাশুড়ী রেগে ওঠেন : অমত আছে এ কথা তো ও একবারও বলেনি—। বরং মৌনতা-কেই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়েছি।

: মত আছে তাও তো বলেনি!—

: তা অবশ্য বলেনি।—শাশুড়ী মাথা দুলিয়ে থাকেন।

তারপর অনুপমার বিয়ের পর থেকে আরো যেন বাড়াবাড়ি শুরু করলো রঞ্জন। বাড়ীতেই আসতো না সে। আর যদি আসতো দুপুরে শুয়ে শুয়ে নভেল পড়তো। সন্ধ্যায় গিলে করা পাঞ্জাবীতে সেন্ট দিয়ে বেরিয়ে যেত, কখনও ফিরতো এগারটায়, কখনও বারোটায়, বাড়ীতে একটা চাপা অশান্তি ছিল তা নিয়ে।

বাড়ীতে ফিরলে শাশুড়ীর সংগে রাতে দেরীতে ফেরা নিয়ে ঝগড়া বাধতো। মা বলতেন : আমায় কাশী দিয়ে আয় রঞ্জন, আমি আর এখানে থাকবো না।

: যাবার সময় তোমার আদরের বৌকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।

: বেশ তাই হবে। শাশুড়ী বলতেন। আমি যখন ওর বিয়ে দিয়েছি। ওর সব দায়িত্বই আমার। হীরে ফেলে কাচের পেছনে ছুটেছিস—কিন্তু তুই।

ছেলে যেন কেমন মুখ বাঁকা করে হাসতো : হীরে? ফুঃ—যত সব বাজে কথা তোমার।

কিন্তু শাশুড়ীকে ভারি ভালো লাগতো অনুপমার। বৃষ্টি নামার আগে যে ভিজে হাওয়া শরীর ও মনকে জুড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি একটা স্নিগ্ধতা যেন তাঁকে ঘিরে থাকতো। মা ভোরবেলায় ভারি মিষ্টি গলায় সুর ধরতেন "ভোর ভঁই জশোমাতা বোলারে উঠ নন্দলালরে"—কথাগুলো সব কানে যেত না অনুপমার তবু গলার স্বরে আকাশটা যেন ভরে উঠতো—; তাঁর গলায় যেন ভোরের পাখির কাকলী। টিপটিপে ভোরের ভিজে ভিজে হাওয়ায় বয়ে আনতো সে গান। মিশে যেত ভিজে পাতার মর্মরের সঙ্গে। মনটা যেন ভরে উঠতো তার। সারা রাত খালি ঘরে একা থাকার শূন্যতা যেন পূর্ণ বোধ হতো মুহূর্তের মধ্যে অনুপমার।

কিন্তু ছেলের এই উচ্ছৃঙ্খলতা মার মনে আঘাত করেছিল। তিনি অর্ধোদয়যোগে স্নান করার উপলক্ষ্যে কাশী রওনা হলেন, আর ফিরলেন না। যাঁরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁরা বললেন স্নানের সময় ও'কে দেখেছে তারপর আর—

অনেক খুঁজেছে ওরা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু কোন খবরই পায়নি।

অনুপমার যখন মনে হতো চলে যায়—ঠিক তখনই যেন দূরে থেকে শিমুল বন পেরিয়ে,—মাঠ পেরিয়ে—নদীর বুকে কাঁপিয়ে একটা তীব্র ঝড়ো হাওয়ার ঝলক হা—হা করে বয়ে আসছে যেন, আর ঠিক মার মত মিষ্টি গলায় কান্নায় ভেঙে পড়ছে সে স্বর: না—না। যেও না, বংশের মর্যাদা—খোকার মর্যাদা। চমকে উঠতো সে। বুকটা কেঁপে উঠতো তার। ঠিক! স্বামী যা করে অনুপমার তা করা শোভা পায় না। অন্তত খোকার মুখ চেয়ে তাকে সব সহ্য করে থাকতে হবে—। আর বাইরে একবার গেলে তার ফেরার পথ বন্ধ। তখন খোকাকে কে দেখবে? সে কার মুখের দিকে চাইবে?

বাড়ীর সামনে একটা মজা নদী ছিল তাদের। অনেকখানি বালি ব্যবধান দিয়ে কটা তিরতিরে জলের ধারা। ওপারে বন—এপারেও ডানদিকে বুনো কুলের ঝোপ, শিমুল, পলাশ, বিলিতি পাকুড় সোনা আর জিলো গাছ মেশামিশি করে দূর-দূরান্তরে এগিয়ে গেছে। দিনের বেলা জায়গাটাকে বেশ ভালোই লাগে কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই নানা রকম ছায়া নামে। অচেনা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক ওঠে। মা যেন কেমন হয় হয়

UCO-1/71

স্বাচ্ছন্দ্যে-ভরা ভাবী জীবনের পথে একটু একটু ক'রে ইনি এগিয়ে চলেছেন

ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের সাহায্য নিয়ে!

প্রতি মাসে মাত্র কিছু কিছু ক'রে টাকা তিনি ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের নিয়মমত জমিয়ে চলেছেন। মেয়াদ শেষে বেশ কিছু মোটা টাকা তাঁর হাতে আসবে। মাসে কমপক্ষে ১০ টাকা আর সবচেয়ে বেশী ৪৫০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে হয়। রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউণ্ট একা কিংবা অন্য কারো সঙ্গে যুক্তভাবে খোলা যায়।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

ইউকোব্যাঙ্ক উন্নতির পথ সুগম করে

করে। হঠাৎ একদিন অনুপমার চোখে পড়লো বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছে শকুন দেখলে যেমন বুক কেঁপে ওঠে;—গৃহস্থ বাড়ীর ছাদে শকুনকে ডানা শুকোতে দেখলে যেমন বুকের মধ্যে দুড় দুড় করে কেঁপে ওঠে ঠিক তেমনি করে কেঁপে উঠলো তার বুক। পাড়ার একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরে সন্ধ্যার সেই আলোছায়ার মধ্যে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রঞ্জন। আলো-অন্ধকারেও মেয়েটির গোলগাল চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি—শকুনের ঠোঁটের মত বেঁকানো ঠোঁটের মত নাক ওর চোখ এড়ালো না। মেয়েটি যেন শ্মশানে শবের গন্ধ শুঁকছে। বুকটার মধ্যে ধপ করে উঠলো অনুপমার সেই অদ্ভুত প্রেতমূর্তি ডাইনীকে দেখে। বুঝতে বাকী রইল না—এই স্বামীকে গ্রাস করেছে।

না—আর নয়। ওকে প্রেত হাতছানি দিয়েছে। ও ধ্বংসের পথে যাবেই। তার আগে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে সে। এখানে আর নয়; একদণ্ডও নয়। কারণ আমি বেশ জানি সে জিজ্ঞাসা করলেও সত্যি কথা বলবে না রঞ্জন। আর ওকেও বিধবার শোকের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। সর্বনাশ হবার আগে চলে যাবে সে। যাবেই—। বাঘ যখন রক্তের স্বাদ পেয়েছে—স্বামীর আর নিস্তার নেই। চুপ-চুপ—। বলতে নেই। কে যেন গাছের পাতায় পাতায় ফিস ফিস করে বলে গেল। চুপ-চুপ ও অলুক্ষুণে কথা।

কেন চুপ করবো। কিসের প্রত্যাশায়। স্বামীর মঙ্গলের জন্যই আমার সংসার ছাড়তে হবে মনে মনে বললো অনুপমা। যে লোকের ফাঁদে উনি একবার পা দিয়েছেন সেখান থেকে পালাবার সাধ্য ওঁর নেই। জাল কাটতে চাইলেই ডাইনী অ্যাকমেণ করবে। সুতরাং—আর নয়। খোকা বড় হবে ও জানবে ওর মা মরে গেছে বাবার দুর্ব্যবহারে। তারপর আরো পাঁচজনের মত ও মার প্রসঙ্গ ভুলে যেতে চেষ্টা করবে। কখনও কারুর কাছে তুলবে না। কোন মতেই না। আর রঞ্জন সে ধাপে ধাপে নেমে যাবে ধ্বংসের অতলে বিধবার লালসার শীকার হয়ে। ফিরতে পারা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়, কারণ মানসিক দিক থেকে যে সে দুর্বল সেটা ও ডাইনীর আগুনের ভাঁটার মত গোল গোল চোখে এড়ায়নি। শকুনের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক যেন শবের পুতিগন্ধ পেয়েছে। সুতরাং—সর্বনাশ আসবেই।

বিকেলের রোদ পড়ে এসেছে। চারিদিক যেন কেমন কালো কালো হয়ে আসছে। আগেই পাশের বাড়ীতে খোকাকে দিয়ে এসেছে অনুপমা। ওরা বললে : ব্যাপার কী? আজ কী খোকাবাবু আমাদের বাড়ী রাতেও থাকবে? ও বাড়ীর গিন্নীর ছেলে-পুলে নেই তিনি খোকাকে খুব ভালো-বাসেন। রাতে রাখলে তো খুশীই হব খুব।

অনুপমা বল : আজ আমার একটু কাজ আছে। রাতে ও আজ ওর কাকীমার কাছেই থাকবে।—কাকীমা এ প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশীই হলেন যেন।

রঞ্জন তো আসবেই না। আজকাল সে প্রায় বাড়ীতে আসে না। সুতরাং বাড়ীতে থাকবার আর কোন আকর্ষণ ছিল না অনুপমার।

রাতে একা বেরিয়ে পড়লো সে। মিঠে মিঠে হাওয়ায় মজা নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলতে লাগলো হন হন করে। হঠাৎ আম, কাঁঠাল, জারুল গাছের একটা বন শুরু হবার আগে মা এসে পথে দাঁড়ালেন : বৌমা কোথায় যাচ্ছ এতো রাতে? ঠিক কি যে বলবে উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে বললো অনুপমা : না, কোথাও না। এই এখানে—যাচ্ছি—।

: এখানে? এতো রাতে—ঘরের বৌ কখনও এতো রাতে বাড়ীর বাইরে বেরোয়? খোকাকে কার কাছে রেখে এলে?

: ও বাড়ীর কাকীমার কাছে।—বল্ল অনুপমা।

: ছি—ছি। সাপেও রাতে বাচ্চা ছেড়ে ঘরের বাইরে যায় না। আর তুমি এতটুকু বাচ্চাটাকে অনায়াসে পরের কাছে রেখে দিয়ে এলে। রঞ্জন?—তার কি হবে ভেবেছ?

: সে তো আর রাতে আসে না। মুখ ভার করে বল্ল অনুপমা।

: আসে না? ঘরে ফেরাবার জন্য তুমি কি চেষ্টা করেছ বলো তো? সে ধ্বংসের পথে নেমে যাচ্ছে, তুমি তার স্ত্রী—সব জেনেও প্রতিকারের কোন চেষ্টা করছো না। আরো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। অনেক পথ হেঁটে এসেছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আমায় একটু জল দিতে পার?

: নিশ্চয়ই পারি। পেছন ফিরলো অনুপমা। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করলো অনেক দূরে এসে পড়েছে সে। বাড়ী এখান থেকে বহু দূর—সেই ধু-ধু করা খাতান জলা মাঠ—সেই শাল-শিমুল আর বৈঁচির বন পেরিয়ে সেই মজা নদীর চরের বালির ওপর দিয়ে বাড়ী গিয়ে জল আনতে অনেক সময় লাগবে তার।

: মা: অনেকক্ষণ কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। আমি জল আনতে যাচ্ছি ওই বাড়ীর দিক থেকে।—থাক চাইবার দরকার নেই মা বললেন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে এতদূর এত রাতে একা চলে এসেছ। এখুনি ফিরে যাও।—তুমি বৌ—বাড়ীর সম্মান তোমার হাতে। খোকার কথাও মা হয়ে ভাবলে না? ছি-ছি-ছি।

: চুপ-চুপ করুন মা। ফিরেই যাব। কিন্তু আপনাকে জল—? একটু দাঁড়ান। বাতিব্যস্ত হয়ে অনুপমা বললো। আমি পেছন ফিরলাম।—আচ্ছা আমার সাথেই আসুন না। এত রাতে আমি একাই বা যাব কেন? আর এতো আপনারই বাড়ী। এতো সংকোচের কারণ কি। বাড়ী চলুন। যেতেই হবে আপনাকে—আমি নিয়ে যাব। অনুপমা বললে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে।—মা—আসুন—। অনুপমা ডাকলো।—মা?—

কেউ এলো না। কেউ সাড়াও দিল না। শুধু বুনো ফুল, পলাশ, শিমুল, নানা আর বিশিষ্ট আমড়ার জঙ্গল থেকে তীব্র কর্কশ স্বরে রাত জাগা পাখি ডাকল একটা অন্ধ-কার আকাশ চিরে।

পথ রোধ করে আবার বাড়ী ফিরিয়ে দিলো কে অনুপমাকে—তার মা?—না তার দ্বিতীয় সত্তা?

পূজায় নূতন শাড়ী
বেনারসী শাড়ী
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাম্রাজ্যবাহিনী তখন সিরিয়ার এল-আঘালিয়ার দণ্ডায়মান। আসন্ন বলকান বা গ্রীসের যুদ্ধের জন্য তখন ইহাদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য ও অস্ত্র সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং তারা স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর জার্মান সেনাপতি দেখিলেন আঘাত হানিবার এই সুযোগ। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৪শে মার্চ রোমেল আঘালিয়ার ঘাঁটি (যেখানে মাত্র দুই ডিভিসন সাম্রাজ্য সৈন্য ছিল) বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বিদ্যুৎগতিতে বেনগাজী, ডের্না ইত্যাদি উপকূলবর্তী সহর ও ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া মিশরের সীমানায় পৌঁছিলেন। ৭ই এপ্রিল ডের্না এলাকায় 'ধুরন্ধর রণকৌশলী' জেনারেল ও' কোনার, জেনারেল নিম, জেনারেল প্যারি (সাঁজোয়া বাহিনীর বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি ৬ জন বৃটিশ সেনাপতি, ২ জন কর্নেল এবং ২ হাজার সৈন্য বন্দী হইলেন। এই আকস্মিক ঘটনা বজ্রাঘাতের মত চারিদিকে দুলন্দুল সৃষ্টি করিল এবং মরুভূমিতে রোমেলের প্রথম আবির্ভাব বহু উপকথা ও রোমাঞ্চকর গল্পের খোরাক জোগাইল! মাত্র ১০ দিনের বিদ্যুৎগতি আক্রমণে রোমেল এই অঘটন ঘটাইলেন।

সাম্রাজ্য বাহিনী বিতাড়িত হইয়া মিশর পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পথিমধ্যে তোব্রুক বন্দর উপকূলভাগে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোমেল এই বন্দরের পাশ কাটাইয়া দ্রুত মিশর সীমান্তে চলিয়া গেলেন এবং যাহাতে তোব্রুক তাঁহার সরবরাহ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে, এজন্য উহাকে অবরোধ করিলেন। হালফেয়া পাস, সিডি ওমর এবং বার্দিয়া—এই তিন বিন্দুকে সংযুক্ত করিয়া তিনি এক ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া তোব্রুককে অবরুদ্ধ করিলেন। সাম্রাজ্য বাহিনীর এক ডিভিসন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য এই বন্দর রক্ষায় রহিল এবং এই অবস্থায় দীর্ঘ ৮ মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া তোব্রুক অবরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবহর তোব্রুকের অবরুদ্ধ দুর্গরক্ষীদিগকে সরবরাহ দিতে লাগিল কিন্তু জার্মান বোমারুর প্রবল আক্রমণে জাহাজের প্রভূত ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৯৪১ সালের ১৫ই হইতে ১৭ই জুন তোব্রুকের উদ্ধারের জন্য বৃটিশ বাহিনী ট্যাঙ্কযোগে [illegible] আক্রমণ চালাইল। কিন্তু ট্যাঙ্কের নিয়োগ কৌশলে যেমন ভুল হইল, তেমনি গুণগত দিক দিয়াও এগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এদের স্পীড ছিল অত্যন্ত কম এবং ইঞ্জিনগুলি অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, এই ট্যাঙ্কগুলি জার্মানদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। (৫)

মধ্যপ্রাচ্য কম্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেলের প্রতি চার্চিল প্রসন্ন ছিলেন না। ওয়েভেল ছিলেন স্বল্পবাক, সতর্ক এবং হঠাৎ কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত বেপরোয়া ঝোঁক তাঁর ছিল না। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, গ্রীসে ও মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রের জন্য চার্চিল তাঁকে ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিলেন। অথচ তাঁর অধীনে না ছিল উপযুক্ত সৈন্যবল কিম্বা অস্ত্রবল—যদিও পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে প্রায় ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর একথা বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে মতান্তরের জন্য তাঁকে অপসারিত হইতে হইল। ১৯৪১ সালের ২১শে জুন জেনারেল ওয়েভেল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন এবং জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক তাঁর স্থানে আসিলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান অধিনায়করূপে। অকিনলেকও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য এই যে, ওয়েভেল যে সাহায্য ও সহযোগিতা পান নি (ইংরাজ ঐতিহাসিক টেলরের মতে) অকিনলেক সেই সমস্তই পাইয়াছিলেন।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জেনারেল রোমেল 'মরুভূমির মায়াবী' বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সামরিক মহলে সুপরিচিত ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর রচিত রোমেলের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্ট্র্যাটেজি বা রণনীতির ক্ষেত্রে জেনারেল ওয়েভেল ছিলেন রোমেলের [illegible] তোব্রুকের অবরোধ যুদ্ধ [illegible]ই সাহসিক সিদ্ধান্তের ফল এবং রোমেল পর্যন্ত ওয়েভেলকে 'একজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক প্রতিভা' বলিয়া স্বীকার করিতেন। এবং রোমেলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সৈনাপত্য সংক্রান্ত ওয়েভেলের লেখা একটি পুস্তিকাও রক্ষিত ছিল। (৬)

মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনের বৃটিশ সেনাপতি ওয়েভেলের হাতে ১৯৪০ সালের এই দুর্দিনে মিশরে ৩৬ হাজার, প্যালেস্টাইনে ২৭ হাজার, সুদানে ৯ হাজার, কেনিয়াতে ৮ হাজার ৫ শত এবং বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ১ হাজার ৫ শত মাত্র সৈন্য ছিল। এছাড়া কোন ভারী সামরিক সজ্জা তাঁর ছিল না এবং ট্যাঙ্কমারা গোলন্দাজী শক্তিও তাঁর সামান্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য শক্তি নিয়াই ওয়েভেলের পক্ষে বহুগুণ শক্তিশালী ইতালীয় সামরিক বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁর সাফল্যকে বিস্ময়কর বলিলে নিশ্চয় অত্যুক্তি হইবে না।

আফ্রিকার এই যুদ্ধ সম্পর্কে চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া, এরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের (পূর্ব আফ্রিকা) সৈন্য ছাড়াই উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকায় ইতালীয় ২ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য ছিল এবং অনেক দিন ধরিয়াই তাদের যুদ্ধের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলিতেছিল। এজন্য ত্রিপোলিতে ছিল তাদের মূল সামরিক ঘাঁটি এবং সেখান থেকে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকা (লিবিয়া) হইয়া মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত হাজার মাইলেরও বেশী দীর্ঘ একটি চমৎকার সামরিক সড়ক নির্মিত হইয়াছিল। এই উপকূল ভাগ ও সড়কের পার্শ্বে যুদ্ধের উপযোগী সরবরাহ ডিপো ও ঘাঁটি তৈয়ার হইয়াছিল এবং শরৎকালের (১৯৪০) মধ্যে এই সমস্ত এলাকায় অন্ততঃ ৩ লক্ষ ইতালীয় সমবেত হইল।...

ইতালী ৩রা আগস্ট বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করিল এবং এখানকার সামান্য সংখ্যক বৃটিশ সৈন্যরা জেনারেল গডউইন অস্টিনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করিল বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিল না। তারা পশ্চাদপসরণ করিল। আফ্রিকায় এই একটিমাত্র সামান্য যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পরাজয় ঘটিল ইতালীর হাতে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাতেই মুসোলিনী একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং রোম নগরী থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন শুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি মিশর বা নীল নদের উপত্যকা আক্রমণের জন্য উৎসাহী ছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে ইতালীয় সামরিক শক্তি মিশর জয়ের উপযোগী ছিল না। কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ৮ই আগস্ট, ১৯৪০,

(5) British History 1914 to 1945—Taylor, Pelican 1970.

(6) Rommel —The Desert Fox—Desmond Young. Fantana Books 1969, P. 102-3.

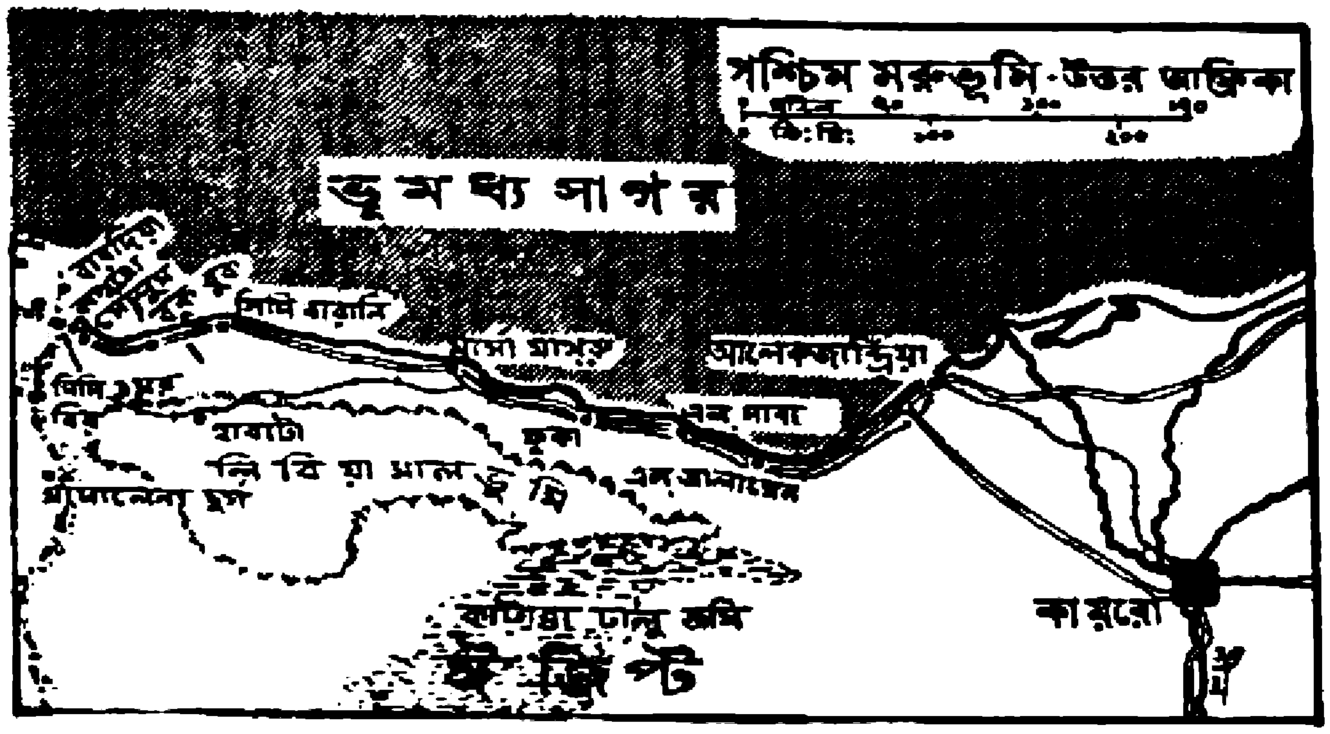

মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই আক্রমণের প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ঘটাইতে গ্রাৎসিয়ানি আরও ২।৩ মাস সময় চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনী এতে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং শ্লেষের সুরে মন্তব্য করিলেন যে, গ্রাৎসিয়ানির মার্শাল হওয়া ছাড়া আর কোন উচ্চাশা নাই!

এই ঘটনার এক মাস পরে গ্রাৎসিয়ানি আরও এক মাস অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। তখন মুসোলিনী ধৈর্য হারাইয়া হুকুম দিলেন—'যদি সোমবার দিন তুমি আক্রমণ না করো, তবে, তোমাকে পদচ্যুত করা হইবে!' মার্শাল তখন জবাব দিলেন—যথা আজ্ঞা! সিয়ানো মন্তব্য করিতেছেন যে, সেনাপতিদের এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন যুদ্ধযাত্রা আর কখনও দেখা যায় নাই। (১৩ই সেপ্টেম্বর মিশর আক্রমণ শুরু হইয়াছিল।)

এই পটভূমিকা থেকেই ইতালীর যুদ্ধের ফলাফল অনুমান করা যাইতে পারে। খাদ্যহীন, জলহীন মরুভূমিতে ইতালীর বাহিনী বৃটিশের হাতে যত্রতত্র বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১ লক্ষ ১৩ হাজার সৈন্য বন্দী হইল এবং ৭ শয়ের বেশী কামান ধরা পড়িল। ১২ই ডিসেম্বর গ্রাৎসিয়ানির কাছ থেকে এই বিপর্যয়ের বার্তাবাহী টেলিগ্রাম মুসোলিনীর নিকট পৌঁছিল এবং গ্রাৎসিয়ানী সেই তারবার্তায় অত্যন্ত রাগতভাবে অনুযোগ করিয়াছিলেন যে তাঁকে এক অসম যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল- এ যেন হাতীর সঙ্গে মাছির লড়াই। আর মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন যে, তিনি লোকটার উপর রাগিতেও পারিতেছেন না, কারণ, লোকটিকে তিনি ঘৃণা করেন!

•

সোমালিল্যান্ড, আবিসিনিয়া ইত্যাদি পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ পক্ষের আক্রমণের অনেক কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল বলিয়াছেন যে মেসোপটেমিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ইতালীয় বন্দর দখলের ফলে প্রচুর সরবরাহদ্রব্য বৃটিশের হস্তগত হইল। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ৪ লক্ষ গ্যালন মূল্যবান পেট্রোল। একসঙ্গে এত পেট্রোল ধরা পড়া নিশ্চয়ই অদ্ভুত।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতালীর রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা ডিউক অব ডি'আওস্টা ঘিন পূর্ব আফ্রিকার ইতালীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি পরাজিত হইয়া ১৭ই মে আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৯৪২ সালে নাইরোবিতে বন্দী অবস্থায় মারা যান। তিনি একজন ফরাসী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক ছিলেন—চার্চিলের মন্তব্য।

মিশর দখলের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইতালীয় সৈন্য বন্দী, ৪০০ ট্যাঙ্ক ও ১২৯০টি কামান ধরা পড়ে। মিঃ ডেসমন্ড ইয়ং তাঁর রোমেল সংক্রান্ত বইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সমস্ত সমরিকসম্ভার ছাড়াও অন্যান্য প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী বৃটিশ পক্ষের হাতে ধরা পড়িয়াছিল এবং এগুলির মধ্যে ছিল অজস্র প্রকারের পর্যাদ্রব্য, বিলাস ও প্রসাধনী দ্রব্য, দামী টয়লেট-সেট, গন্ধদ্রব্য, সুবাসিত জল এবং নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট মদ্য! আর সেই সঙ্গে কয়েক গাড়ীভর্তি ইতালীয় যুবতী নারী—

"a motor caravan of young women, of fevrs for the use of...."

অর্থাৎ ইতালীর যুদ্ধযাত্রা বেশ আরামদায়কই ছিল।—(ডেসমন্ড ইয়ংয়ের মন্তব্য)। একেবারে মদ ও মেয়েমানুষ সহ। আর এর বিপরীত দৃশ্য দেখা যায় যে, মুসোলিনী ১৭ই জুন ১৯৪০ এর যুদ্ধযাত্রার সমর্থনে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির কাছে বলিয়াছিলেন—

I need a few thousand dead to Justify my pre.ence at the peace table.

অর্থাৎ শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সাফাই হিসাবে আমার দরকার কয়েক হাজার মানুষের মড়া।' (৭)

অবশ্য ইউরোপে ও আফ্রিকায় ইতিমধ্যেই অজস্র মানুষের মড়া মুসোলিনীর বরাতে জুটিয়াছিল, তবু কিন্তু শান্তির টেবিলে যোগ দেওয়ার সুযোগ মুসোলিনীর কপালে আর জুটিল না।...

ইরাকের বিদ্রোহ

জেনারেল রোমেল যখন মিশরের দ্বারদেশে তখন মধ্যপ্রাচ্যে অকস্মাৎ একটি বিস্ফোরণ ঘটিল, যার গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল না। ইরাকের জাতীয়তাবাদী নেতা রসিদ আলী জিলানী ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ অফিসারদের সহায়তায় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিলেন। এর আগে জানুয়ারী মাসে তিনি ইরাকের মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী রসিদ আলী রাজধানী বাগদাদ দখল এবং ইরাকের রাষ্ট্রশক্তি নিজের হাতে আনিলেন। এই ঘটনায় বৃটিশ গভর্নমেন্ট বিচলিত হইলেন। কেন না উগ্র জাতীয়তাবাদী রসিদ আলীর সহিত জার্মানীর কোনও একটা গোপন সম্পর্ক আছে বলিয়া তাঁরা সন্দেহ করিলেন। কারণ, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর যদিও ইরাক জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল, তথাপি ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীর

(7) The War 1939-1945 by Snyden 1964, P. 170

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫.৫০ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮.০০ রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব। ২.০০ দি হার্টস অফ দি ফেস্টিভ্যালস। ডক্টর প্রসাদজীবন চৌধুরী ১০.০০ স্টাডিজ ইন এস্থেটিক্স। ৮.৫০ টেগোর অন লিটারেচার অ্যান্ড এস্থেটিক্স। ডক্টর ননীলাল সেন ১৫.০০ এ ক্রিটিক অব দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়। ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫.০০ স্টাডিজ ইন আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি। ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬.০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫.০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৩.০০ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ। সোমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫.০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা। শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ সিংহ-সংকলিত ১২.০০ রবীন্দ্রসংগীতবিচিত্রা। ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬.৫০ রিফর্ম অ্যান্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৭৪—১৮২৩। শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫.০০ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭
পরিবেশক: জিজ্ঞাসা ৩৩ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

সহিত ইরাকের সম্পর্ক বহিয়াই গেল। বাগদাদের ইতালীয় দূতাবাসে নাৎসী চর ও প্রচারকদের আড্ডা হইয়া উঠিল এবং নিখিল আরব ঐক্য প্রয়াসী জাতীয়তাবাদী মুশ্লিমগণ বৃটিশ বিদ্বেষের দ্বারা অসন্তোষ ছড়াইতে লাগিলেন। যদিও ইরাক বাহ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত ছিল, তথাপি ১৯৩০ সালে বৃটেনের সহিত সন্ধি-সর্তানুসারে ইরাকে বৃটিশ মিলিটারি মিশন, বিমানবহর, বিমানঘাঁটি এবং ইরাকী পুলিশ বাহিনীতে বৃটিশ ইন্সপেক্টরগণ ছিলেন। ইহা ছাড়া ইরাকের পেট্রোল লাইন, যাহা হাইফা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহা সুরক্ষিত ও পাহারা দেওয়ার অধিকারও বৃটেনের ছিল। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের অন্যতম ঘাঁটি ছিল ইরাক, ফলে বৃটেনের সহিত ইরাকের জাতীয়তাবাদীগণের সম্পর্ক আদৌ বন্ধুত্বমূলক ছিল না। যেমন ছিল না মিশরে, ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সমস্ত দেশে শোষণ ও শাসনের জন্য যে চাতুরি খেলিয়াছে, তাহা লইয়া তুরস্কের সঙ্গে পর্যন্ত দীর্ঘকাল মন কষাকষি ছিল। যদিও তুরস্ক বর্তমানে নিরপেক্ষ এবং ইরাকের আধুনিকতম বিদ্রোহে মধ্যস্থ হিসাবে আপোষ রফা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল, তথাপি অতীত ইতিহাসের বিবেচনায় তার আচরণ সম্পর্কেও সেই সময় প্রবল গবেষণা উদ্রেক করিয়াছিল। 'প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের তুর্কী সাম্রাজ্য ভাঙিয়াই বর্তমান ইরাক, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান,

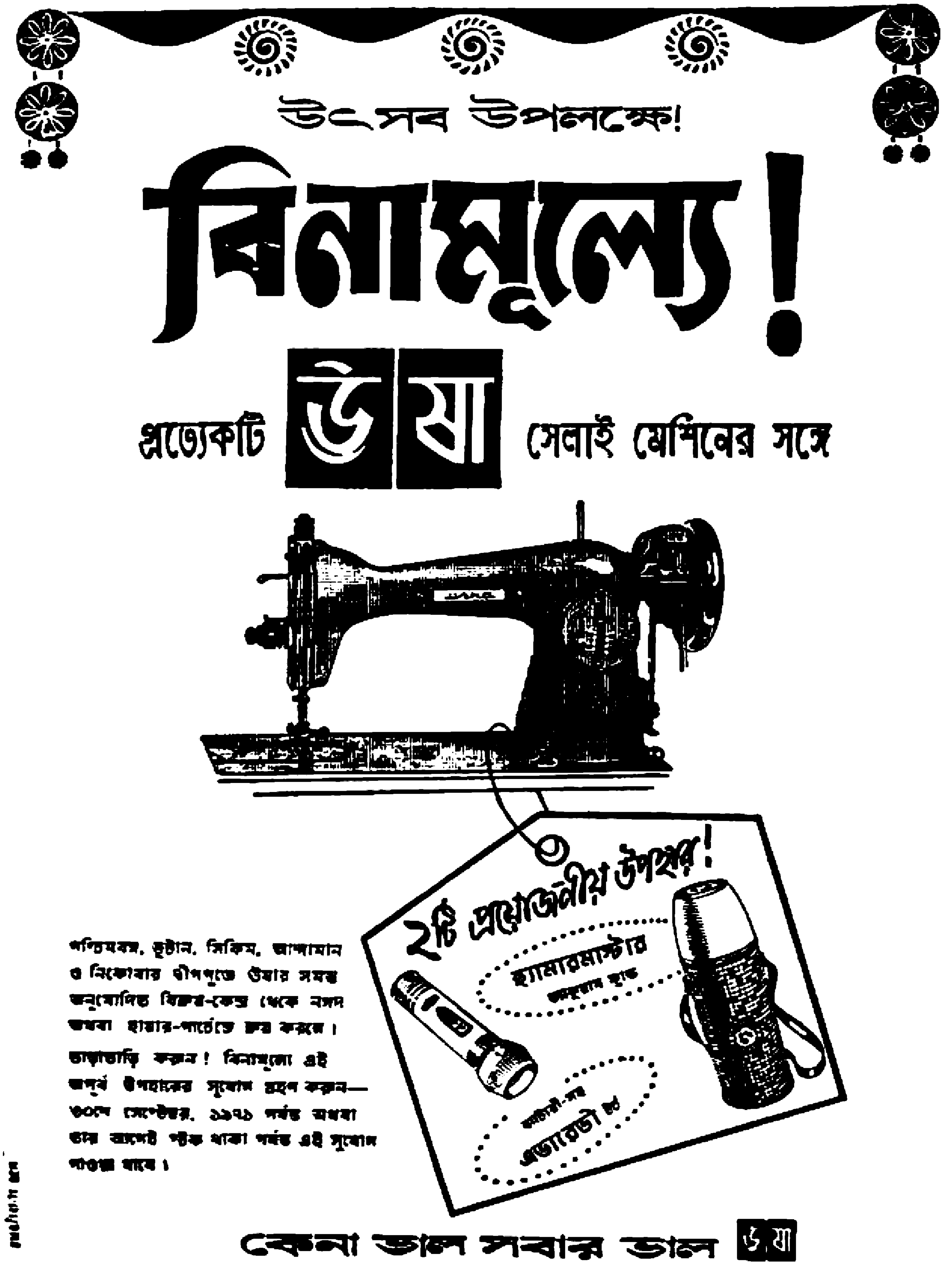

সিরিয়া ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে মেসোপটেমিয়া বা আধুনিকতম ইরাকের স্বতন্ত্র সত্তা তুরস্ক মানিয়া লইলেও মসুল প্রদেশ লইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমন কি মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বৃটেনের সহিত তুরস্কের তিক্ত মন কষাকষি ছিল। কামাল আতাতুর্ক'ও মসুলের বিরাট তৈল সম্পদ বৃটেনের হাতে চলিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ এখানকার কুর্দি অধিবাসীদের লইয়া তুরস্কের মনে নানা অভিযোগ ছিল। গোটা মসুল প্রদেশটা তুরস্কের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আত্মরক্ষার দিক হইতে তুরস্ক দুর্বল হইয়াছে। সমর বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, মসুলের উপর যাহাদের অধিকার থাকিবে, বসরা পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রশ্নে তাহারাই লাভবান হইবে। যুদ্ধের পর নানা সন্ধি-সর্তের আলোচনার সময় তুর্কী গভর্নমেণ্ট মসুলের উপর অধিকার দাবী করিলেও সেই দাবী স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ যখন মসুলের বাঁটোয়ারা ইঙ্গ-ইরাকীয়দের পক্ষে ঘোষণা করেন, তুর্কী গভর্নমেণ্ট তখন উহা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইরাকের উপর বৃটেনের ২৫ বৎসরের জন্য ইজারাসর্ত ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তুরস্ক আরও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন,

> "It was felt that the the twenty-five years' e-tension of the British mandate over Iraq was committing Great Britain to the danger of future war with Turkey." .... *

২৫ বৎসরের জন্য বৃটেনকে ইরাকের ইজারা দেওয়ায় গ্রেটবৃটেনকে ভবিষ্যতে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল। অবশ্য ১৯২৬ সালের পর মসুল সমস্যার মীমাংসা তুরস্ক মানিয়া লইয়াছিল।'

কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের রাজনীতি ও রাজনীতির সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট তুরস্কের মত মিশর এবং 'প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকে প্রবল জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এবং প্যালেস্টাইনের অসন্তুষ্ট আরবদের নেতা গ্রান্ড মুফতি ইরাকে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিগত মহাসমরে বিভিন্ন উপজাতি, সম্প্রদায় ও সর্দারগণের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং কর্নেল লরেন্সের মারফৎ স্বাধীনতা লাভ ও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উস্কানি দিয়া মিত্রশক্তি কূটনীতির যে খেলা দেখাইয়াছিলেন, আজিকের দিনে উহা পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য আরব দেশে বৃটেনের রাজ্যগত কোন লোভ নাই, কিন্তু ইরাকের প্রচুর তৈল ও ভারতবর্ষের সহিত রাস্তাঘাটের যোগাযোগের দিক হইতে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক স্বার্থ এখানে প্রচুর। সুতরাং আরবদের অগ্রগতি সম্পর্কে বৃটেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। জার্মানী ও ইতালীর প্রচারকার্য যাহাতে ঘোরতর অনিষ্ট করিতে না পারে, এখানকার বৃটিশ

কর্তৃপক্ষ এজন্য পূর্বাহ্নে সতর্ক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আরবদের মধ্যে নাৎসীর মত প্রচারকার্য ও সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য মেজর প্লাব নামে একজন বৃটিশ অফিসারকে কর্ণেল লরেন্সের স্থানে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ইরাক পেট্রোল কোম্পানী ও বৃটিশ সরকার ইহার সমস্ত খরচ বহন করিতেন কারণ, এই দুইয়ের স্বার্থরক্ষাই মেজর প্লাবের কর্তব্য ছিল। অবশ্য যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে কর্ণেল লরেন্স ও মিস বেল ছাড়াও জন ফিলবি, কর্ণেল উইলসন, গিলবার্ট ক্লেটন, স্যার পার্সি কক্স প্রভৃতি বৃটেনের অনুকূলে আরবদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইয়াছেন—দুর্দান্ত বেদুইনেরা আরব দেশকে আধুনিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী করিতে উৎসাহী নহে, কারণ, তাহাদের উষ্ট্র ও লুণ্ঠন ব্যবসায় ইহা দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। মোটর, এরোপ্লেন ও রেলওয়ের বিস্তারের জন্য এই সমস্ত স্বচ্ছন্দচারী আরবেরা স্বাভাবিক জীবিকার্জনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে অথচ ইরাকের যাহা প্রধান সম্পদ সেই পেট্রোল বিদেশীর হাতে। পূর্বে এই পেট্রোল ব্যবসায়ে ইতালীরও অংশ ছিল, কিন্তু আবিসিনিয়া যুদ্ধে ইতালীর আর্থিক দুর্গতির জন্য এই সমস্ত শেয়ার ইংরাজের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে মসুলের বিরাট তৈলখনির সম্পদগুলির শতকরা সাড়ে ৫২ ভাগই বৃটেনের হস্তগত এবং এই ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রধান অংশীদার রহিয়াছেন ইঙ্গ-ইরানীয় (পারস্য) অয়েল কোং, রয়েল ডাচ শেল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং এবং একটি ফরাসী কোম্পানী।

(এই শেষোক্ত কোম্পানীর অংশ সিরিয়ার ভিতর দিয়া ত্রিপোলিতে পৌঁছে)। অসন্তুষ্ট আরবেরা এই সমস্ত ব্যবসায় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তাহারা সুযোগ পাইলেই পাইপ লাইন, মোটর বা রেলপথের উপর বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করে। সমর-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, কোনও স্থানে রণক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার পূর্বে উহার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। যদি স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকে, তবে যুদ্ধযাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিবে। প্যালেস্টাইন, সিরিয়ার ও ইরাকে জাতীয় আন্দোলন প্রবল, তাহারা স্বাধীনতা চাহে, কোন বিদেশীর প্রভুত্ব কামনা করে না। সুতরাং জার্মানীর সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া রসিদ আলী কিলানী যেমন বৃটেনের বিরুদ্ধে অন্যায় করিয়াছেন, তেমনই বৃটিশ কর্তৃক ইরাক আক্রান্ত হওয়ায় আরবদের স্বাধীনতার স্বাভাবিক আগ্রহের প্রতি প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সুযোগ বৃটেনও দিয়াছেন। ১৯১৪-১৮ সালে যাঁহারা তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপাইয়াছিলেন, বিদ্রোহের সেই অস্ত্র পাল্টা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আর প্রযুক্ত হইবে না—এরূপ আশা করা ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার লক্ষণ নহে। কিন্তু বিগত বারের তুলনায় অবস্থা এবার আরও খারাপ। শক্তিশালী জার্মানবাহিনী মিশরের দ্বারদেশে উপস্থিত।' *

প্রকৃত পেট্রোল সম্পদ (যাহার উপর ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর নির্ভরশীল) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের জন্য ইরাকের গুরুত্ব ভাবিবার মত। কিন্তু এই গুরুত্ব অতীতেও অনুভূত হইয়াছিল। পুরাণো ইতিহাসের পাতা খুঁজিলে দেখা যায় যে, মেসোপোটেমিয়া বা বর্তমান ইরাকের গুরুত্ব সম্পর্কে কেবলমাত্র খাস বৃটেন নহেন, আমাদের ভারত গভর্নমেণ্টও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, বাগদাদ ও বসরা যদি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তবে আত্মরক্ষার দিক হইতে ভারতবর্ষ লাভবান হইবে। এই জন্য ১৯১৫ সালে ভারত গভর্নমেণ্ট অন্ততঃপক্ষে বাগদাদ ও বসরা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন মন্দা দেখা দিয়াছিল, তখন মিত্রশক্তি আত্মসম্মান ও সামরিক গৌরব দেখাইবার জন্য দার্দানেলিসের পরাজয়ের পর মেসোপোটেমিয়ার অভিযানে মন দিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টও খুব উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ অষ্টিন চেম্বারলেনের নিকট নিম্নলিখিত গোপন (private) টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন—

> The advance to Baghdad would create an immense impression in

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত জু, ১৯৪১।

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়, জু, ১৯৪১

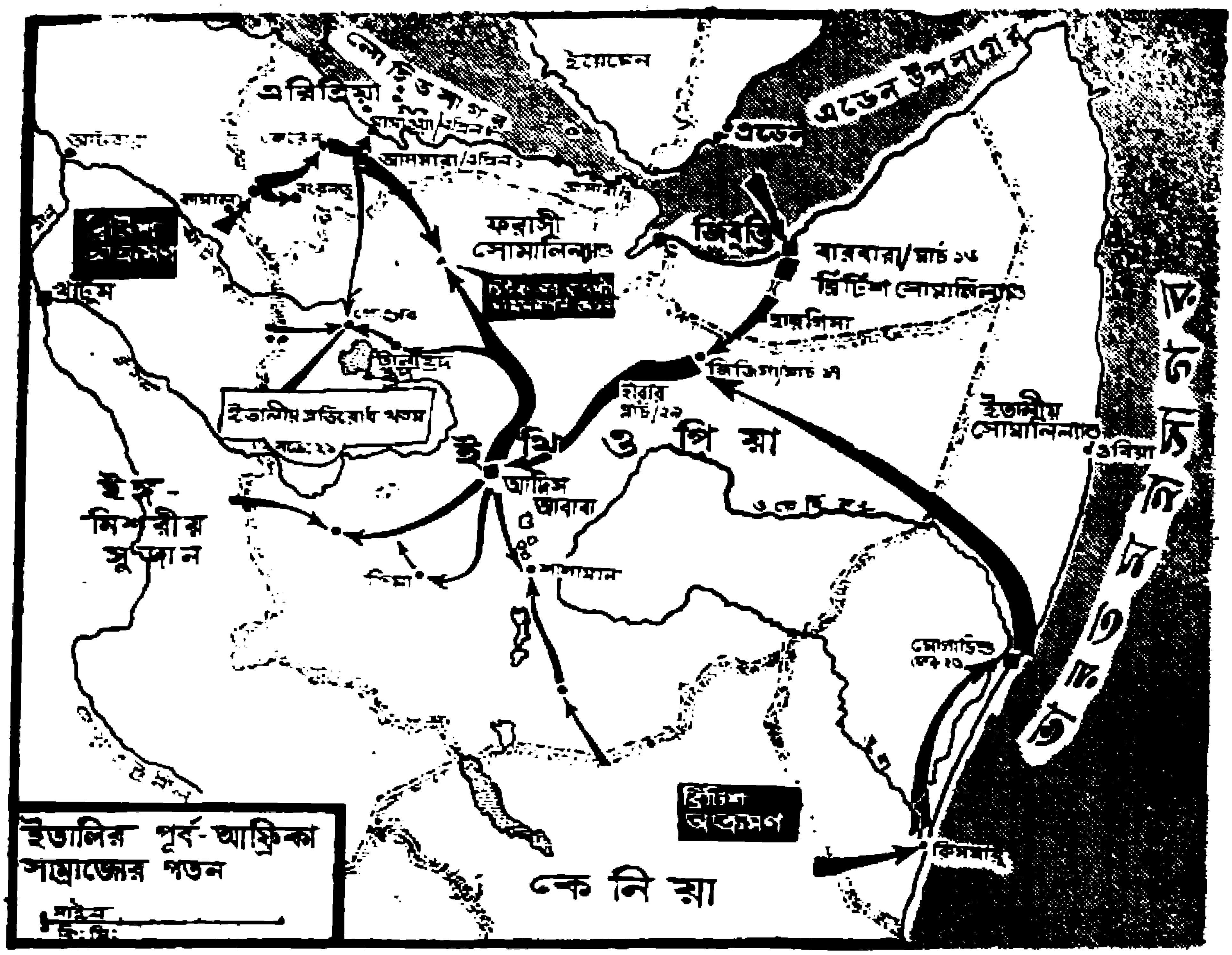

the Middle East, especially in Persia, Afganisthan and on our frontier and would counter-act the unfortunate impression in the Middle East created by want of success in the Dardanelles. It would also isolate German parties in Persia probably produce a pacifying effect in that country and frustrate the German plan of raising Afganisthan and the tribes while the impression throughout Arabia would be striking. In India the effect would be undoubtedly good.

বড়লাটের এই টেলিগ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষের (চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ) নিম্নলিখিত তারবার্তাও উল্লেখযোগ্য।

..that the possession of Baghdad would deprive the Turks of a well-equipped place of concentration; place us in a good possession to defeat them in detail as they moved down the rivers from Asia Minor or Syria; deprive the Turks of steamers material and resources and increase our prestige".

ভারতবর্ষের বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় মহলের এই মতামত যদিও পুরানো, তথাপি আজিকারদিনেও অবস্থাটা একই প্রকারের আছে। পারস্য বা ইরাণ, আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ীদের মধ্যে জার্মানীর প্রোপাগাণ্ডা ও কর্মকলাপের গুজব শুনা যাইতেছে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মতামতের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। সেদিনও বসরা ও বাগদাদ ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার দিক হইতে দূরবর্তী ঘাঁটিস্বরূপ ছিল এবং আজও তাহাই আছে।' *

ইরাকে রসিদ আলীর বিদ্রোহ এবং উহার রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে সেদিনের সংবাদপত্র থেকে যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করা গেল, সেগুলি থেকেই ঘটনার গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আদৌ উদাসীন ছিলেন না। ১৯৪১ সালের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল পারস্য উপসাগরের বসরা বন্দরে বৃটিশ সেনারা জাহাজযোগে উপস্থিত হইল এবং বাগদাদ ও হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালানো হইল। এদিকে প্যালেস্টাইন হইতে ৪০০ মাইল মরুপথ অতিক্রম করিয়া সাঁজোয়া গাড়ীযোগেও বৃটিশ সেনারা আসিয়া হাজির হইল। সুতরাং জার্মানী হইতে প্রেরিত কিছু কিছু সাহায্য সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ১লা জুন জেনারেল ওয়েভেল ইরাকের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। রসিদ আলী এবং জেরুজালেমের মুফতি উহার একদিন আগেই ইরানে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ইরাকের পর ফরাসী ভি সি গভর্নমেণ্টের অধীন সিরিয়াও দখল করা হইল—১২ই জুলাই, ১৯৪১। কারণ, সেখানেও জার্মানী চক্রান্ত করিতেছিল এবং জার্মান বিমান ও কারিগর সেখানে পাঠানো হইতেছিল। মিশর, সুয়েজ খাল ও ভারতবর্ষের যোগাযোগ পথের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইরাকের মত সিরিয়াও নিজের অধিকারে আনিলেন এবং এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে নাৎসী অগ্রগতি রোধ করিলেন।

• • •

পরে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ইরাণ সম্পর্কেও একই কারণে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া একত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ক্রীট দখলের পর হিটলার যদি রাশিয়ার বদলে মধ্যপ্রাচ্য জয় করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেন, তবে অনেক বেশী লাভবান হইতেন। তাঁর রণনৈতিক ভুলগুলির ত্রুটিও ছিল অন্যতম।

(ক্রমশঃ)

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়

বার্তিক

সন্তোষকুমার দে

সকাল থেকে অঝর বৃষ্টি চলছিল বলে রবিবারের দিনেও বাজারে বের হইনি। চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসবার ঘরে সময় কাটাচ্ছি এমন সময় এক হাঁটু জল ভেঙে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে হাজির হলেন। মুখখানা চেনা মনে হলেও নামটি ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না, তবু লৌকিক সৌজন্য প্রকাশ করে ভদ্রলোককে বসালাম।

তিনি সবিনয়ে বললেন, মুখুজ্জে মশাই পাঠালেন, আমিও ভাবলাম এমন ভর-বর্ষায় নিশ্চয় বাড়িতেই পাবো, তাই চলেই এলাম।

মুখুজ্জে মশাই আমার সহকর্মী, বড় একটা বাইন্ডিং কারখানার মালিক। তাঁর কাছে নানা ধরণের লোকের যাতায়াত—বলা বাহুল্য পাবলিশার প্রেস-ওনার এ সবই বেশী। কিন্তু আমার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের কি প্রয়োজন সেটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি করতে পারি?

ভদ্রলোক বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়লেন, বললেন—মুখুজ্জে মশাই-ও বললেন, আমিও জানি,—আপনি না পারলে এ কাজ আর কেউ পারবে না। সেদিন বিকেলে শুনলাম-তো আপনার বক্তৃতা, রেডিওতে আপনি বললেন সেদিন বাংলা দেশ সম্বন্ধে। আপনার এ বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে।

রেডিওতে কত বিষয়ই বলাতে হয়। খবরের কাগজে চাকরি করি, আমাদের কাজই তো খবরের সন্ধান নেওয়া আর খবর বিতরণ করা।

বললাম—আপনি কি জানতে চান? কার কথা বলছেন?

তিনি বললেন—আজ্ঞে—মুজিবর।

মুজিবরের খবর আমি আর নতুন কি বলতে পারি? সবাই যেটুকু জানেন আমিও তাই জানি। তাঁকে বললাম সে কথা।

তিনি বললেন—আজ্ঞে তা নয়, মুজিবরের নামে আমি একটি গান বেঁধেছি, গানটি আপনাকে শোনাতে চাই।

আমি যে গানের একজন সমঝদার শ্রোতা এমন কথা আমার নিন্দুকেও বলবে না, তবু ভদ্রলোক এই ঝড় জল ভেঙে এক হাঁটু জল

ছেলেন আমার একটি স্বরচিত গান গেয়ে শোনাতে এসেছেন আর আমি কি সে গান না শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি?

বললাম—বেশ তো, গেয়ে শোনান তবে।

ভদ্রলোক এবার গুছিয়ে বসলেন, তারপর বললেন,—তার আগে এই বর্ষার দিনে একটু গরম জল গলায় না পড়লে তো 'সা' সরবে না। যদি কিছু মনে না করেন—

আমি কিছু মনে না করলেও আমার গৃহিণীর বিলক্ষণ কিছু মনে করবার আশঙ্কা ছিল, কারণ ইতিমধ্যেই বৃষ্টির অজুহাতে আমার তিন পেয়ালা চা খাওয়া হয়ে গেছে, চতুর্থ পেয়ালা তখনও আমার হাতে। তবু ভয়ে ভয়ে খবর পাঠালাম—আর এক পেয়ালা চায়ের জন্য।

চা নিয়ে তার সঙ্গে একটা মুখরোচক কাউ দিতে এসে গৃহিণী লজ্জায় পড়লেন। আগন্তুককে দেখে ঘোর গোড়ায় থেমে গেলেন।

ভদ্রলোক কিন্তু খুব সপ্রতিভ, বললেন—বৌদি, বিরক্ত হলেন না তো। আপনাদের গান শোনাতে এলাম কিনা, তাই তার আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিতে চাই, এই আর কি! তা আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না দাদার কাছে ভদ্রলোকটার। আমি এক্ষুণি একটা প্রেম-নাড়ানো সাড়া জাগানো গান শোনাচ্ছি!

গৃহিণী রান্না চাপিয়ে এসেছেন, সুতরাং তক্ষুণি বসতে পারলেন না, তবে চা-পর্ব শেষ হতে হতেই তিনি এসে পড়বেন এই আশ্বাস দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

চা পর্ব শেষ করে আগন্তুক গান ধরলেন, মামুলি কথার এবং পরিচিত সুরে মুজিবরের জন্য লক্ষ লক্ষ হাত হাতিয়ার নিয়ে গর্জে ওঠার শপথ মন্দ লাগল না। আমার মৃদু-অভিনন্দনে সেই ভদ্রলোক পরম উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, জানি, ভালো লাগবেই। সেই জন্যই তো মুখার্জি মশাইকে ধরে বৃষ্টি মাথায় করে আসা। কিন্তু দাদা, শুধু ভালো বললেই তো হবে না, এখন গানটা যাতে রেকর্ড করা যায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। তার জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ইচ্ছা করলেই এটা হতে পারে।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। এ জানলে গানের প্রশংসা না করে চুপ চাপ থাকতাম। কিন্তু হাতের ঢিল ছুঁড়ে ফেলেছি, এখন তো আর উপায় নেই। তাই অসহায়ের মত বললাম—রেকর্ড করাবার হাত তো আমার নেই। যে যারা রেকর্ড তৈরী করেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার তো কোন আর্টিস্ট বন্ধুও নেই, মিউজিক ডিরেক্টরও জানাশোনা নেই!

ভদ্রলোক বললেন—কিন্তু খবরের কাগজ তো হাতে আছে। তাতে লিখে কিছু করতে পারেন না? অন্তত আমার এই গানটি ছাপিয়ে দিন না কাগজে!

ভদ্রলোক যে বেশ মতলবাজ এখন তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তাকে একটু বাজিয়ে নেবার জন্য বললাম, খবরের কাগজে গান ছাপা হয় না, গান ছাপাতে হলে তো কোন সাপ্তাহিক কি মাসিকে পাঠান।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ তো, আপনার জানাশোনা আছে তো সব পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেই, একখানা চিঠি লিখে দিন, এখুনি নিয়ে আসি।

আমি তবু বললাম—তা ছাড়া খবরের কাগজে টাটকা জিনিস চাই। এ গানটা নিশ্চয় অনেক দিন আগে লিখেছিলেন—তখন সবাই মুজিব মুজিব করছিল। এখন সবাই চিন্নাচ্ছে—নিক্সন নিক্সন করে। জাহাজ জাহাজ গুলি বারুদ বোমারু বিমান ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে যে যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে তার শ্রাদ্ধ-পুরুষের উদ্ধার করছে সবাই। এমন কোন টপিক্যাল বিষয়ের উপর লেখা হলে খবরের কাগজে চলে।

ভদ্রলোক এক মিনিট ইতস্তত করে বললেন,—একটা দিন সময় দিন, আগামী-কালই আমি দু'দুটো গান বেঁধে নিয়ে আসবো,—একটা ইয়াহিয়ার উপর আর একটা মার্কিন সমরাস্ত্র সরবরাহের উপর—যেটা আপনার পছন্দ হয় ছাপাবেন।

লোকটা দেখছি নাছোড়বান্দা, যেনতেন প্রকারেণ তার একটা লেখা ছাপানোই চাই। ভদ্রলোকের জন্য আমার কেমন সহানুভূতি জাগল—আহা বেচারী, হয়ত নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে দেখবার সুযোগই পায়নি।

কৌতূহল বশত জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি কাজ করেন?

আমার অন্তরঙ্গতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি বললেন—বারো বছর মার্টিন রেলে ছিলাম, রেল উঠে গেল, এখন আছি লোকার্স এন্ড বাকার্স কোম্পানিতে, মেকানিক্যাল ডিপার্ট-মেন্টে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। হাতের কাজ, সাকা কলকব্জার—কাজ ভালো জানি। তবে কবিতা লেখা, গান বাঁধা এটা আমার শখ, আমার স্ত্রী বলেন—বাতিক। এটা নিয়ে কিছু করতে চাই, সে প্রতিভা আমার আছে, কিন্তু বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার দুঃখ হল। মানুষ তো কেবল রুটি পেলেই বেঁচে থাকতে পারে না, তার জন্যই সে কবিতা লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে—এমন কত কি করে।

লোকার্স এন্ড বাকার্স কোম্পানীর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে যে লোকটি ডিউটি দেয় সে আর আমার সম্মুখে উপবিষ্ট লেখা ছাপাবার উমেদার এই দুজন কি এক ব্যক্তি? যদিও এক দেহধারী হলেও বস্তুত তারা দুই পৃথক সত্তা। একজন যন্ত্রের পৌন-পুনিকতায় ক্ষিপ্র হাতে নিপুণভাবে কাজ চালাতে ওস্তাদ। সে শুধু দিনগত পাপক্ষয়ের মত একটা কিছু কাজে জীবিকা উপার্জন মাত্রই উদ্দেশ্য।

কিন্তু যে মন তাঁকে এক হাঁটু জল ভেঙে এই ঘোর বর্ষায় লেখা ছাপাবার উমেদারীতে নিযুক্ত করেছে সে হল স্রষ্টার মন, শিল্পীর মন—এখানে সে অনেক বড়, অনেক মহৎ।—ভাবছিলাম এই সব কথা।

এমন সময় বর্ষাতি গুটিয়ে আমার ভাগ্নী বান্টি ঘরে এসে ঢুকলো এবং আগন্তুক ভদ্র-লোককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলতে লাগলো বড় মামা, তুমি এখনো তৈরী হও নি। আজ যে আমাদের ফাংশান। তোমাদের কাগজের তরফে তোমায় নেমন্তন্ন করেছিলাম—তাই তোমায় নিতে এসেছি, এক্ষুনি তৈরী হয়ে নাও।

ভদ্রলোককে আর একদিন আসতে বলে উঠতেই হল। বান্টি শুধু আমার ভাগ্নী নয়—আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, সে একজন ভালো ডাক্তার, বিলিতি ডিগ্রিও আছে।

কিন্তু তার-ও কি এটা বাতিক—এই জলসায় গান গাওয়া, শিল্পী হিসাবে নাম কেনার চেষ্টা। কাগজে ছবি ছাপানো?

তাকে কল্ নিয়ে রোগী দেখবার জন্য বালিগঞ্জ থেকে বসবার নিতে হিমসিম খেতে হয়, কিন্তু গানের জলসায় গাইতে নেমন্তন্ন করলে কোন্নগর চুঁচুড়া শ্রীরামপুরে যেতেও ক্লান্তি বোধ হবে না। একবার তো কল ফেলে দিল্লী ঘুরে এলো, শুধালাম ব্যাপার কি? না—রাজধানীতে গান শুনিয়ে এলাম।

বান্টির সঙ্গে তার গাড়িতে উঠে বসে নিজের কথাই ভাবতে লাগলাম। করি খবরের কাগজের চাকরি, কলম পেশা কাজ। কিন্তু তুলির টান কেন আমাকে এতো টানে? সেই ছোটবেলায় ড্রইং ক্লাসে ছবি আঁকবার যে ঝোঁক ছিল তা-তো মরেও মরে না। অ্যাকা-ডেমিতে যখনি কোন প্রদর্শনী হয়, তন্ন তন্ন করে দেখি, সময় সুযোগ পেলে শিল্পীদের স্টুডিওতেও যাই এবং বলতে দ্বিধা নেই, এখনও আমি ছবি আঁকি। আশায় আশায় আছি, শীঘ্রই একটা একক প্রদর্শনীর আয়োজন করব—যাতে সাংবাদিকরা আমাকে শিল্পী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা দেবে।

সংসারে এমন বাতিকগ্রস্ত লোক তবে আমি একা নই। আমি সাংবাদিক কিন্তু হতে চাই শিল্পী, বান্টি পাশ করা ডাক্তার—প্রতিষ্ঠা পেতে চায় গায়িকা হিসাবে, আর ঐ আগন্তুক ভদ্রলোক নিপুণ কারিগর কিন্তু তার মন পড়ে থাকে কবিতার আর গানের দরবারে। তবে কি যে যা হতে পারে নি তার উপরেই তার আকর্ষণটা আন্তরিক?

গাড়ি নিউ এম্পায়ারের কাছে এসে দাঁড়াল, সম্মুখে দেখলাম বান্টির মস্ত বড় একখানা মুখ এঁকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কারণ আজকের আসরে সেই প্রধান শিল্পী।

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪১৭০

হরপ্পার ফুল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ সোমের সংগে অরুণ সীমার চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা বলছিল।

আপনার কি মনে হয়? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

শিশুকালের একটা অসন্তোষ আর আঘাতের ফলে এ ধরনের অস্বাভাবিকতা আসতে পারে।

সেটা কি বুঝতে পারা যায়?

সঠিক এখনও জানা যাচ্ছে না অন্ততঃ কারণটা এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। তবে এটা বেশ স্পষ্ট যে, প্রবৃত্তিটা প্রতিশোধ বলে মনে হয়। এমন একজন কেউ ছিল যাকে উনি ঘৃণা করতেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু করার মত শক্তি ছিল না।

বাবা, মা, কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের ওপর এধরনের বিদ্বেষ জন্মাতে পারে। নিকট আত্মীয়ের ওপরেই অনেক সময় বিদ্বেষ তাবে জন্মায়, অন্য লোক হলে এতটা অসহ্য লাগে না। প্রতিশোধ স্পৃহাটা এত প্রকট হয় না। বাই দি ওয়ে ও'র ভেতর কোন অস্থিরতা লক্ষ্য করেছেন?

একটু ভেবে উত্তর দিল অরুণ—না। তাছাড়া ও'র মনের ভাবও সহজে প্রকাশ করে না। তবে সম্প্রতি একটা ঘটনায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

কি ঘটনা? ডাঃ সোম উৎসুক হলেন।

কিছুদিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল। আমার অজ্ঞান অবস্থায় ও সে রাতে আমার পরিচর্যা করেছিল। হেমন্ত মানে আমাদের একজন চাকরের কাছে শুনেছি সে সময় নাকি খুব উতলা হয়ে পড়েছিল।

দিস্ ইজ স্ট্রেঞ্জ, মন্তব্য করলেন ডাঃ সোম; একলা ছিলেন উনি?

না হেমন্তকে রেখেছিল ঘরে।

আই সি; অচ্ছা, কুকুরটা সম্বন্ধে ও'র মনোভাব এখন কেমন?

আতিশয্যটা এখন কমেছে বলে মনে হয়।

কি করে বুঝলেন?

একজন চাকর ওকে নিয়ে যায় বেড়াতে; এখন আর ও ওদিকে নজর দেয় না।

উনি কি খেতে ভালবাসেন?

একটু ভাবতে সময় লাগল অরুণের। এটা সে লক্ষ্য করে নি। বা করার মত সুযোগও হয় নি। সীমা তার সংগে কচিৎ খাবার টেবিলে বসে। তাছাড়া এ জিনিসটা মেয়েদের ব্যাপার, সচরাচর কেউ লক্ষ্য করে বলে মনে হয় না অরুণের। তাই সে বলল, আমি এটা ঠিক বলতে পারব না ডাঃ সোম।

ডিম কিংবা চিংড়ি মাছ ভালবাসে বলে জানেন?

ঠিক তার উল্টো: ব্রেকফাস্টে ডিম ও কোনদিনই খায় নি বলে জানি।

আমার কাছে কিন্তু উনি বলছেন যে ডিম আর চিংড়ি মাছ ওঁর প্রিয় খাদ্য। যাই হোক, একটা খেই খুঁজে পেলে জট ছাড়াতে সুবিধে হয়।

আর কটা সিটিং দিতে চান? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

বলা শক্ত, এটা সম্পূর্ণ রোগীর ওপর নির্ভর করে। যদি সহযোগিতা করেন আর বাধা সৃষ্টি না করেন তাহলে দেরী হবে না। আর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন সংসার বা আপনার সম্বন্ধে।

না, কয়েকদিন ধরে দেখছি একটু গম্ভীর হয়েছে, কথা কম বলে।

ঠিক আছে, আপনি বুধবার পাঠিয়ে দেবেন।

ফোনটা রেখে অরুণ প্যাসেজ দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সীমার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে সে ফিরে এসেছে বলে অনুমান করল। কিন্তু ডাঃ সোমের কথা অনুসারে তার প্রায় দেড়ঘন্টা আগে বাড়ী আসা উচিৎ ছিল। এসময়টা সীমা কাটাল কোথায়। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল অরুণ। সীমার দায়িত্ব সে নিয়েছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে তার কোন ত্রুটি হলে লজ্জার কথা হবে। সীমার বন্ধ দরজায় টোকা দিল অরুণ।

কে? সীমা তাড়াতাড়ি স্যুটকেশটা খাটের তলায় রেখে দিল।

আমি, একবার আসবে, বলল অরুণ।

বেরিয়ে এল সীমা। এতক্ষণ অরুণ ডাঃ সোমের সঙ্গে কথা বলছিল এটা জানে সে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সোজা ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল অরুণ।

ডাঃ সোমের চেম্বারে।

তারপর কোথায় গিয়েছিলে?

তাতে আপনার কি? চেঁচিয়ে উঠল সীমা।

না আমার কিছু নয়, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা পরস্পরের দিকে না নজর রাখলে আমাদের ক্ষতি হবে। শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলল অরুণ।

আমি একথা মানি না, আপনার মতে আমি সায় দিতে পারি না।

কেন?

গোয়েন্দাগিরি করার মত আমার স্পৃহা নেই। এটা গোয়েন্দাগিরি নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

আছে, আমি কি করি না করি সেদিকে আপনার নজর দেবার কোন অধিকার নেই।

আছে। মুখের ভাবটা শক্ত হল অরুণের।

আমার নিজের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই?

স্বাভাবিক হলে থাকত, কিন্তু তা তুমি নও।

এটা আপনার একটা জঘন্য চাল, আপনি একজন স্যাডিস্ট। জেনেশুনে একজন অপরিচিতা আর অসহায় মেয়েকে বিয়ে করেছেন কেন, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে।

তোমার বুদ্ধির শেষ নেই; তবে তুমি অপরিচিতাও নও আর অসহায় ত নয়ই। তোমার পরিচয় আমি ভালভাবেই জানি।

কি জানেন? হঠাৎ জ্বলে উঠল সীমা। মুখটা তার পাংশু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অসহায় বলে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করার মত সাহস হত না। আস্তে আস্তে বলল অরুণ।

আমি চোর, কিন্তু আপনার মত স্যাডিস্ট নই। আমার ওপর অত্যাচার করার সুবিধে হবে বলে, আমায় এভাবে বিয়ে করে আটকে রেখেছেন।

অত্যাচার আবার করলাম কোথায়?

ভদ্রতার মুখোশ পরে সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন এটা আমি বেশ বুঝতে পারি।

ওটা তোমার মনগড়া কথা; তুমি নিজে ভালভাবেই জান আমি কোনদিন সুযোগ নিইনি বা নিতে চাই না। আর আমি আর যাই হই না কেন, স্যাডিস্ট যে নই, সেটা তোমার কাছে আবার নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে বলে মনে হয় না। এবার বল, ডাঃ সোমের চেম্বার থেকে কোথায় গিয়েছিলে? গলার স্বরটা কঠিন হয়ে উঠল অরুণের।

বলব না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সীমা।

সীমার মুখ থেকে কথা বার করা শক্ত।

......গ্রীষ্মের ছুটি, স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ী এসেছে সীমা। বোর্ডিং খোলা থাকলে সে নিশ্চয় আসত না, কিন্তু উপায় নেই। আবার সেই স্যাঁতসেঁতে নোনা ধরা বাড়ী। এখন সীমার বয়সের চেয়ে বুদ্ধিটা বেড়ে গিয়েছে। তার ফিরে আসাতে নান্দুকাকা বা মা, কেউ খুশী নয়। এটা সে জানে, তাই মনটা তার প্রস্তুত আছে। সে এবার ওদের সঙ্গে শক্ত পরীক্ষা করতে চায়।

আমার সিল্কের নতুন শাড়ীটা ছিঁড়ল কে? হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠল।

আরে এতো ব্লেড দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে—নান্দুকাকার মন্তব্য।

এই, তুই আমার শাড়ী ব্লেড দিয়ে কেটেছিস কেন? সরাসরি আক্রমণ।

আমি ব্লেড কোথায় পাব? ভালমানুষের মত মুখ করল সীমা।

পেন্সিল কাটিস কি দিয়ে? জেরা করে নান্দুকাকা।

আমি ত পরশু মাত্র এসেছি, বই খাতা ত বার করিনি এখনও।

খোল্ তোর ট্রাঙ্ক, আমি দেখব—যা এগিয়ে এল।

বেশ, বাবা এলে দেখো, বাবার কাছে চাবি আছে।

সীমা নান্দুকাকার ব্লেড দিয়ে মায়ের কাপড় কেটেছে সকলের অলক্ষ্যে। বাবা আসতে তুলকালাম কাণ্ড হল। সীমার ট্রাঙ্ক খুলে ব্লেড পাওয়া গেল না। বাবা তার হয়ে কড়া কথা বলল খুব। সীমার এটা খুব ভাল লাগে। অবশ্য বাবা, মা আর নান্দুকাকার সঙ্গে পেরে ওঠেন না। মা একাই একশ। নান্দুকাকা মাঝে মাঝে শুধু ফোড়ন দেয়। তার পরের ঘটনায় সীমা আনন্দ পেয়েছিল প্রচুর কিন্তু খেসারতও দিতে হয়েছিল সেই সঙ্গে। মাংস চেপেছে উনুনে। বাবা নাইট ডিউটিতে। সীমা ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে আছে। নান্দুকাকা একটা নভেল পড়ছে দালানে বসে। মা ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুজনেরই বেশ হাসি হাসি ভাব। আজ একটা নতুন সিল্কের শাড়ী এসেছে মায়ের জন্যে। দুজনে মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। কথাগুলো বুঝতে পারছে না সীমা তবে হাসির আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

যাও তুমি মুখ ধুয়ে নাও, মাংস হয়ে এল।

যা যাচ্ছি, আর একটু বাকি আছে, বইটা ভারী ইনটারেস্টিং। নান্দুকাকা মাঝে মাঝে ইংরেজী বলে।

না, আর একটুও দেরী নয়, কপট রাগ করল মা।

যাচ্ছি রে বাবা, নান্দুকাকা টেবিলের ওপর বইটা ছুঁড়ে দিল সশব্দে।

নান্দুকাকা কলে গেলে মা রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে এসে বিছানা ঝাড়বে। এই সুযোগ। থালা, বাটি, গ্লাসের ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে। মা এবার আসন পেতে খাবার দিচ্ছে নান্দুকাকাকে। সীমা উৎকর্ণ হয়ে রইল।

ওরে বাপরে, নান্দুকাকার গলা।

কি হল? জিজ্ঞেস করল মা।

মুখ জ্বলে গেল রে বাবা—।

সীমা হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

কেন?

ঝাল আবার কেন? হিস হিস করছে নান্দুকাকা।

ঝাল, দেখি; ইস, তাইত, এ যে আগুনের মত; কিন্তু এত নুন হল কেন?

তা আমি কি করে বলব? নান্দুকাকার প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

আমি জানি। মা দুম দুম করে সীমার ঘরে ঢুকল।

এই সর্বনাশী ওঠ, চুলের মুঠি ধরে তুলল সীমাকে।

কি! সীমা অবাক হবার ভান করে।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

কি? হারামজাদী নচ্ছার মেয়ে, আবার জিজ্ঞেস করছে, কি?

ওকি করছ? নান্‌কাকা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না তখনও।

সব লঙ্কা বাটা আর অর্ধেক নুন মাংসেতে ঢেলেছে আর কিছু নয়।

না আমি করিনি, জোরের সঙ্গে বলল সীমা।

অমানুষিক অত্যাচার হল সীমার ওপর। গরম মাংসের ঝোল তার গায়ে ঢেলে দিল মা। মোটা জামা ছিল বলে কয়েকটা ফোস্কার ওপর দিয়ে গেল, তা না হলে বিপদ ঘটত। সীমা কিন্তু অত অত্যাচার সত্ত্বেও স্বীকার করল না শেষ পর্যন্ত।

কি ভাবছ অত? ভাববার কিছু নেই, জান অরুণ, তুমি যদি নিজের গলায় ফাঁস দিতে চাও তাহলে তোমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ফাঁসটা আপনিই পরিয়েছেন আমি সেটা খুলতে চাইছি।

তুমি তাহলে যা বোঝ কর কথাটা বলে অরুণ তার ঘরে চলে গেল।

তার পরের দিনের ঘটনা। সকালবেলা অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে অরুণ। কাপড়জামা পরে তার হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালের ঘড়ির ওপর। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাতঘড়িটা অন্যরকম বলছে। প্রায় আধঘন্টা স্লো। টেবিলের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি খুচরো জিনিসগুলো পকেটে ফেলে সে গাড়ীটা বার করে জোরে ড্রাইভ করল অফিসের দিকে।

অরুণের গাড়ীর আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর ধীরে সুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সীমা। তার প্রাথমিক কাজগুলো সাফল্যমণ্ডিত করেছে। দেয়ালের ঘড়িটা সে আধঘন্টা ফাস্ট করে রেখেছিল অরুণ যখন স্নানে ব্যস্ত। অরুণের হঠাৎ ঘড়ি দেখে উত্তেজনা হওয়ায় নিজের হাতঘড়ির সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে অবাক আর বিরক্ত হওয়ায় এবং শেষকালে টেবিলের ওপর তার সমস্ত জিনিসগুলো একত্র করে পকেটে পুরে তার কোনরকমে দৌড়ান, এ সবেই সীমা আনন্দ পেয়েছে। অরুণ সময় মেনে চলে বলে সীমা জানে। হাতের ঘড়িটা সে পারতপক্ষে খোলে না। সময়টা তার ছকে বাঁধা। একটু তফাৎ হলেই সে অস্থির হয়ে পড়ে। বিরক্ত দেখা দেয় তার কপালের কুঞ্চিত রেখায়। সেটা জেনেই সীমা দেয়ালের ঘড়ির কাঁটাটা আধ-ঘন্টা এগিয়ে দিয়েছিল। অরুণের মনের অবস্থা এতে কি হবে সেটাই আন্দাজ করেছিল সে। উত্তেজনায় টেবিলে রাখা তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলোর দিকে না তাকিয়ে সেগুলো পকেটে ভরে নিয়েছিল তাড়াতাড়ি। তার চাবির গোছা যে সীমা ইতিমধ্যে বদল করে নিয়েছে এটা লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা অরুণের ছিল না। খুশী হল সীমা সাফল্যের সূচনায়। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে আবার আগের মত কাজ করে যাবে প্রাণের আনন্দে। এবার সে মুক্তি পাবে। বন্দী জীবন থেকে।

অরুণের ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল। সবদিকেই তার নজর আছে। মস্তিষ্ক তার সজাগ থাকে সর্বদা। আলমারীর চাবি লাগিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। ধীরে সুস্থে সব জিনিসগুলো দেখতে লাগল সীমা। ওপরের তাকে অ্যাটাচি কেসটা পূর্ববৎ একই জায়গায় রাখা আছে। আগের বারই সে দেখেছে তার সবই অক্ষত আছে। তাই সে দিকে আর নজর দিল না। কেসটা সে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তার কেসের তলা থেকে এক গোছা পাট করা রুমাল, এলোমেলো মুচড়ে যাওয়া কতকগুলো টাই আর একটা ফটো বার হল।

ঝন ঝন করে টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে। চমকে উঠেছে সীমা হঠাৎ আওয়াজ শুনে। হেমন্ত রান্নাঘরে, করুণা বাইরে, সুতরাং তাকেই ধরতে হবে ফোনটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সীমা।

হ্যালো, বুকের ভেতর কাঁপছে সীমার।

মিঃ বোস আছেন?

না বেরিয়ে গেছেন, উত্তর দিল সীমা।

আপনি কে কথা বলছেন?

আপনার কি দরকার বলুন। সম্পর্কের কথাটা বলতে চায় না সে।

আমি "হীরালাল জুয়েলার্স" থেকে ফোন করছি। মিঃ বোস ওঁর স্ত্রীর জন্যে একটা নেকলেসের অর্ডার দিয়েছেন, সেটা রেডি হয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব না উনি নিজে ডেলিভারী নেবেন?

আমি বলতে পারছি না, মিঃ বোস এলে জানাব।

ধন্যবাদ, ফোনটা কেটে গেল।

অদ্ভুত একটা এলোমেলো অনুভূতি সীমার মনে এল। কে স্ত্রী? সে? তার জন্যে নেকলেস অর্ডার দিয়েছে অরুণ বসু। ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা তার চেতনা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে আবার

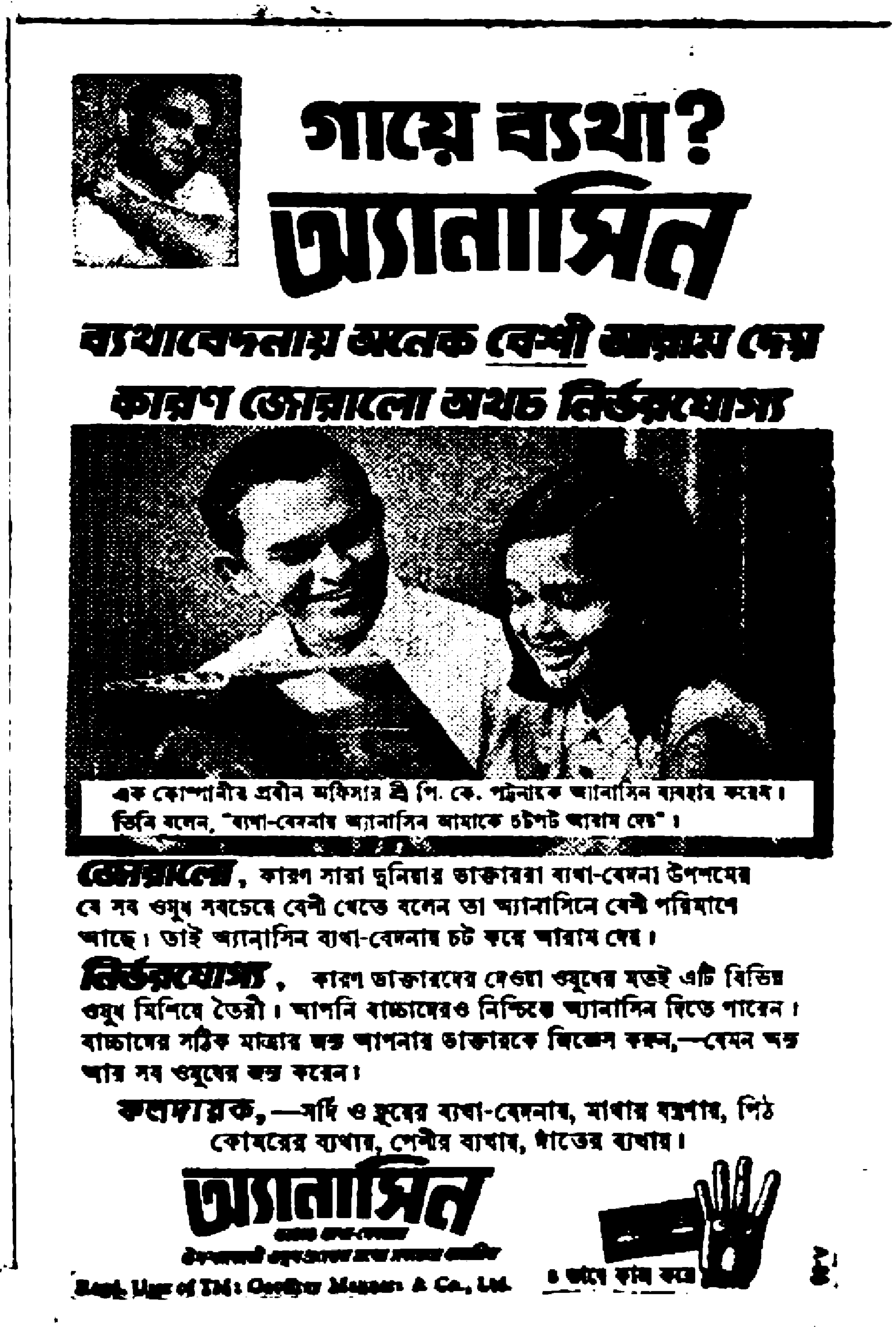

CENTRAL LIBRARY

অরুণের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। আলমারীর কাছে এসে তার ফটোর কথাটা মনে পড়ে গেল। একটা মেয়ের ছবি। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। ছবি দেখে ঠিক বোঝা যায় না তবে অত সুন্দর মুখ সীমা খুব কমই দেখেছে। ছবিটা নিয়ে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মাথার ভেতর সব ওলোট পালট হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করল সীমা। নিজের ভাবটা তার বুকেতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমত। টুকরো টুকরো কথা কতকগুলো শুধু তার কানে বাজতে থাকে। স্ত্রীর জন্যে নেকলেস, আপনি কে?........তোমার পরিচয় আমি জানি, নিজের গলায় ফাঁস লাগাচ্ছ তুমি। দুহাতে মাথা চেপে বসে রইল সীমা কিছুক্ষণ। একটু পরেই তার সম্বিত ফিরতে সে দেখল অরুণের বিছানায় এসে বসেছে। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে উঠল সীমা। হাতে মেয়ের ছবিটা তখনও ধরা রয়েছে। আর একবার সেটা দেখে নিয়ে ছবিটা সে রেখে দিল যথাস্থানে।

অরুণের বাথরুমে গিয়ে অঞ্জলিপুরে জল নিয়ে সীমা মুখে দিল তারপর ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে নিল এক নিশ্বাসে। তৃষ্ণায় গলাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে তার। অসুস্থবোধ করল সীমা। ক্লান্তি আর অবসাদ তাকে দুর্বল করে দিয়েছে অকস্মাৎ।

একটু পরে আবার আলমারীর সামনে দেখতে লাগল সে মনবেগে দিয়ে। সার্ট—হরেকরকমের আর ডিজাইনের। কটা হবে। পঁচিশ না তার চেয়ে বেশী? এক একটা করে গুনতে লাগল সীমা। ঠিকই, বত্রিশটা সার্ট। প্যান্ট কটা হবে? সেগুলোতে হাত দিতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গুনতে লাগল সেগুলো। প্যান্টের সংখ্যা কম, মাত্র চব্বিশ। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সীমা। এত পোশাক একটা লোকের কি দরকার হতে পারে!

......বাবার কটা জামা ছিল? তিনটে জামা আর তিনটে ধুতি; ব্যাস, আর কিছু নয়। নান্কাকার অবশ্য অনেক ছিল। সেদিকে সীমা কোনদিন তাকায়নি ভাল করে। তাদের আলমারী ছিল না। খাটের তলায় বাবার ট্রাঙ্ক থাকত। দরকারের সময় সেটা বাবা টেনে বার করত। সে সময় একটা ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হত। সেটা অনেক সময় তার মনে পড়ে এখনও। বাবার ট্রাঙ্কের রঙ ছিল কালো। মায়ের ঘরে একটা দেরাজ ছিল। তাতে মায়ের আর নান্কাকার কাপড়জামা থাকত। দেরাজ আর আলমারীতে তফাৎ কি? ওটাকে দেরাজই বলত কেন? আলমারীর চেয়ে সাইজে ছোট। তাতে দুটো পাল্লা, দুটো টানা আর মাঝে তিনটে থাক। মা সেটা রোজ পুঁছত বা করে।......

বৌদি,

কে? বুকটা ধড়াস করে উঠেছে সীমার।

আমি হেমন্ত, দুটো বাজে, কখন খাবেন?

আশ্চর্য হল সীমা। দুটো বেজেছে। এই ত সে ঘরে ঢুকল। অরুণ বেরিয়েছে আজ অন্যদিনের চেয়ে সকালে। কথাটা মনে পড়তেই সে দেয়ালের ঘড়িটার দিকে নজর দিল, আড়াইটে বেজেছে তাতে। সকালের কথাগুলো মনে পড়ল এবার। তার সমস্ত পরিকল্পনাটা সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আলমারীর জিনিসগুলো মায় তার অ্যাটাসি কেসটাও সে তুলে রাখল। চাবি বন্ধ করে দিল সীমা। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল হেমন্ত তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। কারণটা একটু পরেই বুঝল সে আরশির দিকে তাকাতে। মুখটা তার নিজের কাছেই অস্বাভাবিক লাগছে যেন। চোখ দুটো ফুলে গিয়েছে। মুখটাও যেন আরক্ত হয়েছে তার সঙ্গে। কাঁদলে এধরনের চেহারা হয় বটে। কি মুস্কিল, কিন্তু সে কাঁদল কখন? তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সীমা।

সচরাচর অরুণ যে কাজটার ভার নেয় সেটা শেষ পর্যন্ত করতে চেষ্টা করে। ব্যবসাক্ষেত্রে এধরনের বিশেষ শিক্ষা সে পেয়েছে। এটা তার প্রায় মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। সীমা একটা তার কাছে বিরাট সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত করতে পারবে কিনা সেবিষয়ে তার সন্দেহ জাগছে এবার। সীমার ব্যবহারে সে বিরক্ত হচ্ছে বলে অনুভব করল। অন্য কিছু নয় তবে যদি আবার চুরি করার কিছু মতলব করে থাকে তাহলে সে খুব বিপদে পড়বে এবার। সীমার এজিনিসটা কেন মাথায় আসছে না যে এত টাকার সম্পত্তির ওপর তারও ন্যায্য অধিকার আছে। পরক্ষণেই অরুণের মনে পড়ে গেল সীমার স্বভাবের মধ্যেই এ প্রকৃতিটা জোরাল শেকড় গেড়েছে। কিভাবে এবং কত জায়গায় সে সীমাকে রক্ষা করবে? কেসে জড়িয়ে পড়লে পুলিসও তাকে রেহাই দেবে না। সব থেকে লজ্জা হবে তার বাবার কাছে। অসুস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসঙ্কোচচিত্তে সীমাকে কন্যার স্থান দিয়েছেন তার মনে। হঠাৎ এরকম একটা দুর্ঘটনায় তাঁর অবস্থা কিরকম হবে সেটা চিন্তা করে অরুণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নাম যদি একারণে রটে যায় তাহলে সেটাও তার কাছে অসহনীয় হয়ে যেতে পারে হয়ত। নিজের কথা অরুণ ভাবছে না। সে ভাবছে সীমাকে কেন্দ্র করে যে তুমুল ঝড় উঠবে তার কথা। কিন্তু পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। ঘুঁটি চালা হয়ে গিয়েছে। ফল যাই হোক না কেন, তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অরুণের অন্য কোন উপায় নেই। আজ কাজ করতে তার মন লাগছে না। সকালের কাজগুলো কোনরকমে সারা হয়ে গিয়েছে। লাঞ্চের পর আবার একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে। সেগুলোর কথা ভেবে অরুণ বিরক্ত অনুভব করল। কাজ করতে সাধারণতঃ সে ভালই বাসে। বুদ্ধি এবং ব্যবসা বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারলে সে খুশী হয়। আনন্দ পায় সাফল্যের আস্বাদে। এখন কিন্তু অরুণের সে মনোভাব নেই। এখন একটা অজ্ঞাত অঘটনের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে অরুণ। ঝড়ের আগে গুমোট আর থমথমে আবহাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে যেন সে।

অরুণ কোন কোন দিন বাইরে লাঞ্চ খায়। এটা প্রয়োজনের খাতিরে তাকে মানতে হয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনায় এধরনের পরিবেশের মূল্য আছে। সম্প্রীতির মধ্যে আদান প্রদানের সুবিধে আছে। পকেট থেকে গাড়ীর চাবি বার করতে গিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে তার ঘরের চাবির গোছাটা বের করল। সেটার দিকে নজর করে পকেটে ফেলে দেবার সময় হঠাৎ দেখতে পেল চাবিগুলো তার নয়। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল অরুণের। বুদ্ধি, অনুভূতি, নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তকালের জন্যে।

সৌম্য দত্ত সহজ লোক নয়। জুয়েলারী ব্যবসাটা তার পৈত্রিক। সেটা তাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে। এর আড়াল থেকে মণিমুক্তো ছাড়াও অনেক জিনিসের কারবার করে সে। সৌম্য দত্তর চেহারা ভাল। কথাবার্তা মার্জিত না হলেও চলনসই। মাঝে মাঝে অবশ্য 'শ' এর জায়গায় 'স' এর ব্যবহারটা বেশী করে ফেলে। কোঁচান ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবী পরাই পছন্দ করে সে। ব্যবসাবুদ্ধি তার ভালই; তা নাহলে বৌবাজারের ছোট গয়নার দোকান থেকে সে লিণ্ডসে স্ট্রীটে এয়ার কণ্ডিশন করা প্রকাণ্ড দোকান দিতে পারত না। বৌবাজারের আদি দোকান আজও রয়েছে। "নটবর দত্ত এ্যাণ্ড সন্স"এর কর্মচারী আর কারিগররা এখনও পুরনো পদ্ধতিতে কাঁচা কয়লার আগুনে বা প্রদীপের শিখায় পাইপে ফুঁ দিয়ে কাজ করে যায় একমনে। লিণ্ডসে স্ট্রীটের অর্ডার এখানেই তৈরী হয়ে থাকে। তারপর সুদৃশ্য ভেলভেটের কেসে ভ্যাজলে গেলে তার দাম বহুগুণে বেড়ে যায়। এতে আরও একটা সুবিধে আছে। বৌবাজারের কারিগরকে লিণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানে বসালে বেশী মজুরি চেয়ে বসে। অবশ্য সৌম্য দত্তর এছাড়া আরও ব্যবসা আছে নানারকম। দেশে সোনার চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গয়না পরা কমিয়েছেন বলে শোনা যায়, কিন্তু বিয়ের সময় উভয়পক্ষ থেকে যে পরিমাণ সোনার অর্ডার আসে তুলনা করলে আগের দিনের চেয়ে কম বলে মনে হয় না। বিদেশ থেকে বহু উপায়ে সোনা আসে এবং সৌম্য দত্ত ভ্যাজেল ও কাউণ্টারের আড়ালে তার সামান্যতম অংশ নিয়ে থাকে। এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী অঞ্চলে এধরনের অনেক (বিলাইতি) মাল কিছু মুদ্রার বিনিময়ে আদানপ্রদান হয়ে থাকে নিয়মিতভাবে। কাঞ্চন ছাড়া কামিনীর ওপরও লোভ আছে সৌম্য দত্তর।

(ক্রমশঃ)

ভারততত্ত্ববিদ

ডঃ সুচিপ্তো বীর্যসুপার্থো

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারততত্ত্ববিদ ডঃ সুচিপ্তো বীর্য-সুপার্থ আর ইহজগতে নেই। মাত্র তিন মাস আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে কর্মরত অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন। কলকাতায় বসে ডঃ সুচিপ্তোর পরলোকগমনের খবর আমাদের কারুরই জানা ছিল না; জুলাইয়ের অপরাহ্নে একথা জানা গেল ডঃ এ এল ব্যাসহামের কাছ থেকে। ডঃ ব্যাসহামের নাম ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনিও অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ এশিয়ান সিভিলাইজেশনের অধ্যাপক।

ভারততত্ত্ব ও ইন্দোনেশীয় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গান্তরে ডঃ এ এল ব্যাসহাম ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে ডঃ সুচিপ্তোর প্রয়াণ সংবাদ জানালেন। পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা না জানালে জাতিগত ঋণ অপরিশোধ্য থাকে। তাই তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও শ্রদ্ধা জানানো অবশ্যকর্তব্য মনে করে স্মৃতিচারণায় প্রবৃত্ত হওয়া।

আমি ডঃ সুচিপ্তোর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তাঁর কার্যক্রম, পদ্ধতি ও ভারতবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন; প্রয়োজনমত চিঠি লিখেছি, সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরও পেয়েছি। শুধু উত্তরই নয়; বই, ফটো, প্রবন্ধাদি পাঠাতেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। পরিচিতির দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ান হলেও তিনি বৃহত্তর মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তি পারম্পর্য অনুযায়ী তথ্যবিন্যাস শুধু ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসেই নয়, ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করেছে।

মধ্য জাভার সুরাকার্তায় ডঃ সুচিপ্তোর জন্ম। যোগ্যাকার্তার গাজামাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ ডিগ্রী পাবার পর ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ খৃঃ এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ খৃঃ ইন্দোনেশিয়া সরকার তাঁকে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ১৯৫২—৫৪ সাল, মোট দু বছর তিনি দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সুধী অধ্যাপকদের কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় ছিল—ফাইন আর্টস। বিশ্বভারতীতেও তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। এর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬০ খৃঃ তিনি 'ঘটোৎকচ' গবেষণা নিবন্ধের জন্য ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট অফ এশিয়ান সিভিলাইজেশনের অধ্যাপক ছিলেন।

ডঃ সুচিপ্তো তাঁর মনীষা পাণ্ডিত্যকে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে বিকীর্ণ করে রেখেছেন—বিশ্ব ইতিহাস (৩ খণ্ড), ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস (দু খণ্ড), ভারতবর্ষের সুকুমার শিল্পের ইতিহাস, বিশেষ উপত্যকার প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কাভ-ইন্দোনেশিয়ান অভিধান। এই বইগুলোর সমস্তই ইন্দোনেশীয় ভাষায় রচিত। ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস, সর্ট গাইড টু বোরবুদুর—ইংরাজীতে রচিত। সম্প্রতি প্রকাশিত 'রাম স্টোরিস ইন ইন্দোনেশিয়া' ইংরাজীতে রচিত। রামায়ণ মহাকাব্যের ক্রমবিকাশের (ইন্দোনেশিয়ায়) আলোচনা, রামায়ণ কাকাবিনের ৩য় সর্গ, প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ, কাকাবিন প্রভৃতি বইতে আলোচিত হয়েছে। 'ভারত যুদ্ধ' অর্থাৎ মহাভারতের কাহিনী ও ইন্দোনেশিয়ায় তার রূপান্তর সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যাঁরা বৃহত্তর মানব সমাজের পটভূমিকায় আপন দৃষ্টি স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ সুচিপ্তো অন্যতম। ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস গ্রন্থে তিনি শান্তিনিকেতনের আত্মিক সৌন্দর্যকে অপরূপ ভাষায় ধরে রেখেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর ধীমান স্মৃতকীর্তি অধ্যাপকবৃন্দের ঋণ স্বীকার করতে ও তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মুক্তকণ্ঠ হয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ সুচিপ্তোর দান উল্লেখযোগ্য। প্রভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বতন পদ্ধতি পরিহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র নির্ণয়ের ও আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ সুচিপ্তো একালের অগ্রগণ্য মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অপরিণত মৃত্যু ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল। আমরা বঞ্চিত হলাম এক প্রজ্ঞাবান ভারততত্ত্ববিদের অসাধারণ ধীশক্তি থেকে — নিত্যনতুন গবেষণার ক্ষেত্র থেকে।

॥ নিত্যপাঠ্য দুইখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

— সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত —

অল ইন্ডিয়া রেডিও বেতারে বলেছেন,— বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

॥ বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—আট টাকা ॥

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা,—বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালির মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির জন্য শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন।

॥ বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—পাঁচ টাকা ॥

ডাকযোগে লইলে—আশ্রম-সম্পাদিকার নামে মনিঅর্ডারে গ্রন্থমূল্য এবং ডাকমাশুল বাবদ আরও এক টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। গ্রন্থ রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে যাইবে ॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

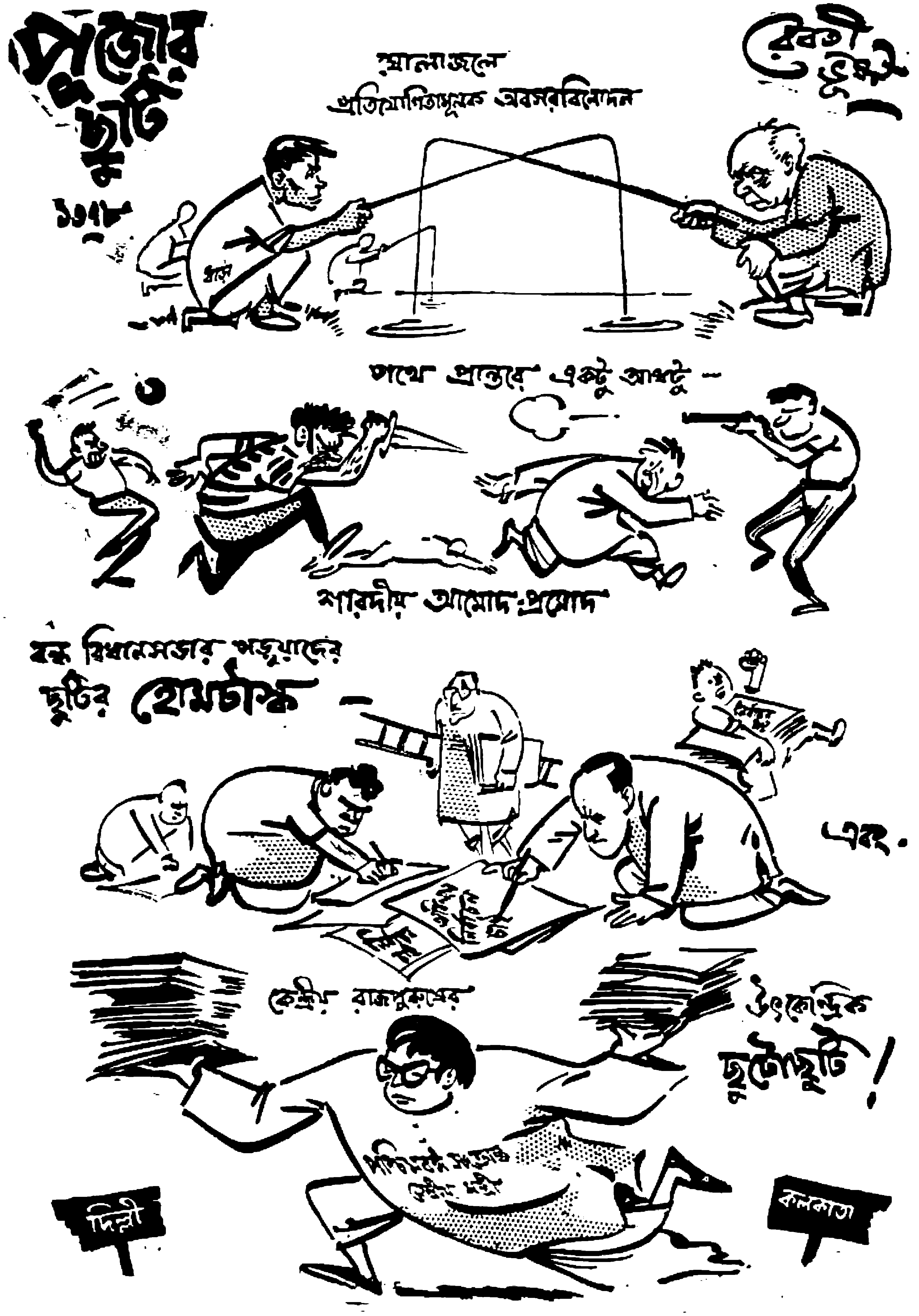
পুজোর ছুটি
১৩৭৮
রেবতী ভূষণ
ঘোলাজলে
প্রতিযোগিতামূলক অবসরবিনোদন
পথে প্রান্তরে একটু আধটু –
শারদীয় আমোদ-প্রমোদ
বন্ধ বিধানসভার সভ্যদের
ছুটির হোমটাস্ক –
এবং.
কেন্দ্রীয় রাজপুরুষের
উৎকেন্দ্রিক
ছুটোছুটি !
পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
দিল্লী
কলকাতা

অবিস্মরণী কাল

অসীম রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

টুটুল চুপ করে থাকে। সম্প্রতি তার পরীক্ষার ফলাফল নিজের কাছে ভাল লাগলেও একটু অস্বস্তিরও কারণ ঘটিয়েছে। চোত্তা যদি তৃতীয় স্থানের ভেতরে পড়ত তাহলে তার সাফল্যের সার্থকতা ছিল। কিন্তু যা ঘটেছে তাতে দু ভাইয়ের মধ্যে একটা সরু অথচ ধারাল বিভেদের রেখা মাথা তুলছে।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো পড়াশোনাই করে নি। খালি গান করত আর নচত।'

টুটুলকে এবার বিহ্বল দেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুলপালানো ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে শুনলেও ঠিক এভাবে শোনে নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'হয়তো অ্যানুয়েলে আর ভাল করব না।'

'তুই আবার করবি না' যেরকম গবেট হয়ে যাচ্ছিস!'

এরপর কথা চলে না। কিন্তু পরীক্ষার সার্থকতা ও জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে দুই ভাইয়ের আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ে। এতদিন ভাল করে নজর করেনি। চাতালের কোণে বেঁটে কাঁঠাল গাছটা, তার পাশেই পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে থ্যাবড়া ভামাটে গাছের মাথাভর্তি পাকা নারকেলি কুল। কিছুক্ষণ পরেই লগি নিয়ে কুল পাড়ায় ধুম লেগে যায়।

হঠাৎ নীচ থেকে পাঁড়ের গলা আসে, 'ও দাদাবাবু, দাদাবাবু।' দুজনে তিড়িং তিড়িং করে নীচে দৌড়য়। পুকুর ঘাটে তাদের সাঁতার শিক্ষক, জেলখানার হেড জমাদার ছাপরা জেলার অধিবাসী পাঁড়ে। ঘাটে পাতাকাটা কলাগাছ। উত্তেজনায় ধক ধক করতে থাকে টুটুলের বুক। চোত্তা চেঁচাতে থাকে, 'আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হব।' কিন্তু কলা গাছটা জলে নামানো মাত্রই কোথা থেকে বুড়ী এসে ঝাঁপিয়ে পাঁড়ের গায়ে হেঁচড়েম্যেচড়ে উঠে কলাগাছটার ওপরে চেপে বসে, তারপর তাদের চোখের সামনে দিয়ে বুড়ী সারা পুকুর ঘুরে বেড়ায়। পাঁড়ে সাঁতরে সাঁতরে তার সঙ্গে ছেড়ে চলে। একবার পুকুরটা ঘুরে আসার যে বিলম্ব তা দুজনের কাছেই ক্রমশঃ অসহ্য লাগে। চোত্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাদের আর শেখা হবে না।'

তারপর চোত্তার পুকুর পরিক্রমায় টুটুল সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বুড়ী সমানে ফোড়ন কাটে, 'জল টান, হাত দিয়ে জল টান একদম হচ্ছে না।' কত দূরে পারে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে যেন পাঁড়ে ডাকে, 'টুটুলবাবু, এসো।' টুটুল আড়ষ্টভাবে বসে থাকে কলাগাছের ওপর। গোল পুকুরটার ওপরে নুয়ে থাকা বটের নীচে জলটা ঠান্ডা আর কালো, টুটুলের একটু ভয় ভয়ও করে। মুখ দিয়ে কুলকুচি করতে করতে পাঁড়ের পাশে পাশে এগোতে থাকে। টুটুল প্রাণপণে দুহাত দিয়ে জল টানে। হঠাৎ হড়কে কলাগাছ থেকে সড়াৎ করে জলে পড়েই দুর্দান্ত চীৎকার শুরু করে। 'আমাকে উদ্ধার করো, আমাকে উদ্ধার করো।' চোত্তা ফুর্তিতে হাততালি দেয়। 'ইস্, কি রকম থিয়েটার করতে পারে টুটুলটা!' বুড়ী চেঁচিয়ে বলে। পাঁড়ে সঙ্গে সঙ্গেই টুটুলকে তুলে দিয়েছে কলাগাছে, কিন্তু তার মুখচোখে তখনও আতঙ্কের ভাব কাটে নি।

যে দিন সাঁতার শেখা নেই সে দিন, বিশেষ করে ছুটির সকালে, জেলখানার কনস্টেবলদের কোয়ার্টারে ব্যায়ামের ক্লাসে যোগ দেয় ছেলেরা। ছ ফুট লম্বা নেংটিপরা পাঁড়ে পাঁচশো ডন, পাঁচশো বৈঠক দেয়। তার ফর্সা তেলে ঘামে ভেজা চকচকে শরীরখানা ওঠে আর নামে, আর যত পরিশ্রম বাড়ে নিঃশ্বাস সশব্দে ওঠে পড়ে। পাঁড়েকে দেখে টুটুলের মনে হয় সে যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়। কাদের সঙ্গে এই যুদ্ধ? সেই সব ছেলেরা যারা 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচায়, জেলে যায়, যাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে বাবা-মা মাঝে মাঝে উদ্বিগ্নভাবে কথাবার্তা বলে, তারা?

পাঁড়ে আধঘন্টা ধরে জিরোয়, বারান্দার সিঁড়িতে বসে হাওয়া খায়, আর এক কলকে টিকেসমেত তামাক তাও ঘোঁটে কালো পাথরের নুড়ি দিয়ে। এক গেলাস সরবত এক চুমুকে শেষ করে ভারি নরম চোখে ছেলেদের কাপড় ছাড়তে বলে।

পাশের ঘর থেকে লেংটি পরে দুটো কাঁধে তালপাতার সেপাই বেরিয়ে আসে। এ অবস্থায় দুজনকে দেখে দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোত্তার নাম সার্থক, পাঁজরাগুলো বার করাই নেই। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে টুটুলের চোখে জল আসে। দুটো ইঁটে হাত ভর দিয়ে যতটা নামতেই পাঁড়ে বাঁ হাত দিয়ে চেপে মেঝের সঙ্গে ঠেসে দেয়। কয়েকবার ডন দেওয়ার পরই হাত ছিঁড়ে পড়ে। পাঁড়ে বিষণ্ণভাবে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তার দেশে এই বয়সের ছেলেদের স্বাস্থ্য মনে করে ঘাড় নাড়ে।

ছেলেদের সম্প্রতি হাসিতে পেয়েছে। বিশেষ করে শরীরের কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম প্রায়ই তাদের অকারণ হর্ষের কারণ ঘটায়। কয়েকদিন পর সেলাইয়ের কলে কমলাদিদের রঙিন পর্দা সেলাই করছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে শুনলেন, চাতালে চোত্তা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'পোদ, পোদ।' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই দুভাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্বর্ণসুন্দরী গলা ভারী করে হাঁকলেন, 'চোত্তা!' দুই ভাই-ই এগিয়ে এসে পর্যাপিত উৎফুল্ল মুখে। স্বর্ণসুন্দরী ধমক দিলেন, কিন্তু খুব সুবিধে হল না। দু দিনের পর টুটুলের গলায় আবার সেই নিষিদ্ধ ধ্বনির উচ্চারিত হল।

হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যাবেলা। চাতালে সতরঞ্চি পেতে লন্ঠনের আলোয় দুভাই পড়ে মধুবাবুর সামনে। হঠাৎ চোত্তার নজরে পড়ে মধুবাবুর নাকের ওপর। নাকের ফুটো দিয়ে কাঁচাপাকা নস্যিমাখা কয়েকগাছা চুল বেরিয়ে আছে। নস্যি নিতে করতে একটা খোঁচা খাটো শুনিয়ে হইই চোত্তা বলে, নাকে চুল অমনি ভয়ে কাঠ হয়ে যায় টুটুল। ব্যাপারটা আগেও খেয়াল করেছে কিন্তু এমন বিপজ্জনকভাবে হাসির দমক উঠে আসে না, চাপতে গিয়ে চোত্তার দিকে চেয়ে সে একেবারে স্তম্ভিত। চোত্তা মাথা নীচু করে খিঁচিয়ে

খিঁচিয়ে হাসছে। এর পর সহ্য করা যায় না, হা হা হা হা করে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য টুটুন হাসতে থাকে। ও স্যর হাসছে স্যর, ও স্যর হাসছে।' বলে ঢোঙাও সে হাসিতে যোগ দেয়। মধুবাবু এমনিতেই তিরিক্ষে, তার ওপর জলের প্রাতঃকালীন আক্রমণে সম্প্রতি বিপর্যস্ত। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের, মদ খেয়েছো?'

এরপর বাঁধ বাঁধার কোন ব্যাপার থাকে না। মদ খাওয়ার সম্ভাবনায় দুভাই হাসিতে আবার গড়িয়ে পড়ে। মধুবাবু তাঁর শীর্ণ আঙুলে কষ্ট করে কান মলে দিলেন ঢোঙাকে। তাতে সাময়িক কাজ হল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসির ফোঁপানি চলল। মধুবাবু সংস্কৃত শ্লোক লিখে দেন দুই ছেলেকে, মুখস্ত করবার জন্যে। 'রোজ সকালে উঠে বলবে, বুঝেছো?

পাপোহং পাপকর্মাহং
পাপাত্মা পাপসম্ভবম্।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ
সর্বপাপ হর ভব।।

মধুবাবু চলে গেলে ঢোঙা বললে, 'আমরা পাপী, আমরা মদ খাই, কি মজা।'

কয়েকদিন পর থেকেই সাঁতারের ধুম পড়ে যায়। ছুটি হলেই দশটা না বাজতে ছেলেমেয়েরা জলে পড়ে। উঠতে উঠতে কোন কোনদিন শোনে জেলখানার পেটা ঘন্টায় বারোটা বাজার ধ্বনি। 'ছেলে-মেয়েগুলো জোঁক হয়ে গেল। তুমি তো একটা কথাও ওদের বলবে না। সবই যেন আমার গরজ,' প্রায়ই স্বর্ণসুন্দরী অনুযোগ করেন স্বামীকে

কিন্তু ভবনাথের কোন দিকে আর তাকাবার সময় নাই। টেররিস্ট গ্যাং ধরা পড়েছে। তাদের চালান দেওয়া হয়েছে মুন্সীগঞ্জের জেলে। তার মানে তাঁদের বাড়িও এবার সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হয়ে পড়তে পারে।

ভবনাথের এ দুর্ভাবনার শরিক তাঁর ছেলে-মেয়েরা নয়, এমন কি স্বর্ণসুন্দরীও নন। কলকাতায় নতুন বাড়ির ভাড়া বাবদ একশো কুড়ি টাকা আসছে গত মাস থেকে, যদিও মরগেজ, ধার মিটাতে অনেক বছরের ধাক্কা তবু এই নতুন প্রাপ্তিযোগ স্বর্ণ-সুন্দরীকে আরও স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে।

ঢোঙা সাঁতরায় মাছের মতো। নিখুঁত হাতের পায়ের কাজ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে আয়ত্ত করে ফেলে। সে যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সমান তালে ছেড়ে ফেলে তরতর করে জল কেটে এগোয় তখন পাড়ারই বিস্ময় জাগে। টুটুন আর বুড়ী তত্তো এগোয় নি। দুজনেই পায়ের কাজে বেমানান, প্রায় বারেরের মতো দুপা চেতিয়ে জল কাটে, গতিও অনেক মন্দ।

কিন্তু ব্যাং কিংবা মাছ যাই তার তুলনা হোক এই জলে দাপাদাপি টুটুনের শৈশবের সবচেয়ে বড় ঘটনা। যেদিন হাওয়া দেয় সেদিন রোদ্দুরে জল ছল ছল করে, জল ডাকে। যাকে ভালবাসা যায় আদর করা যায় এমনি একটা সস্তা পুকুরের। আবার যেদিন সাঁতরে সাঁতরে ওপারে বটের ছায়ায় আরও ঠাণ্ডা জল কেটে এগোয় তখন ভয় করে, ভয়ে আরও হাঁফ ধরে, কোন রকমে জল ঠেলে ঘাটে উঠতে ইচ্ছে করে। আর তাদের ছোট

ছোট শরীরগুলোয় রক্ত চলাচল করে। তিন-জনেরই মুখে বেশ কালো ছোপ পড়েছে। কিন্তু চোখগুলো আরও জ্বলজ্বলে। সারা দিন ব্যাপী তাদের তিড়িংমিড়িং প্রবণতার স্বর্ণসুন্দরীর প্রাণ আরও অস্থির।

একদিন আর থাকতে পারলেন না। সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে। ভবনাথ বৈঠকখানায় অফিসের ফাইলপত্তর দেখ-ছিলেন। তাঁর বেড়ানোর ছড়িখানা আলনার কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন। 'আজ তোমাকে শাসন করতেই হবে। এর পর যদি নিউ-মোনিয়া হয় তখন তো আমাকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হবে।'

নীচে তখন সাঁতারের রেস চলেছে। একবার ও ঘাট ছুঁয়ে ফিরে আসা। ঢোঙা প্রায় দশ-পনেরো হাত সামনে সাঁতরে আসছে। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরী শাসনের প্রতিমূর্তি রূপে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেও ঢোঙার পারদর্শিতায় তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। 'একেবারে নিউমোনিয়ায় না পড়ে ছাড়বে না', স্বর্ণসুন্দরী বিড় বিড় করেন। তিনজনেই হুড়মুড় করে ঘাটে উঠে ছড়ি হাতে ভবনাথকে দেখে মুহূর্তের জন্যে ভড়কে দাঁড়ায়। তার পর তিড়িং তিড়িং করে তিনজনেই পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠে যায়। বুড়ী উঠেই ভেজা গায়ে ফ্রক পরে নেয়, দুভাই ভেজা প্যান্টে ঘাটের এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে হাঁপায়। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরী স্বামীকে সে ঘরে নিয়ে আসেন। হেঁট হয়ে ঘাটের নীচ দেখেই বলে, 'বাঁদরগুলো ঐখানে আছে, মারো, মারো।'

ছড়ি হাতে ভবনাথ যখন গুঁড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসেন তখন সেই দৃশ্যের অভাবনীয়তায় দুই ছেলেই স্তম্ভিত হয়ে থাকে। খুব আস্তে একবার করে ছড়ির আঘাত করে ভবনাথ বলে ওঠেন, 'স্টুপিড!' ভেজা গায়ে সে আঘাত জ্বলে।

সেবার বর্ষা শেষ হতে না হতেই ভবনাথের জলপথে যাতায়াত খুব বেড়ে যায়। গত মাসে একশো সাইত্রিশ টাকা টি, এ বিল হয়েছিল। প্রতাপের পরীক্ষার ফি, শীতের জামা বাবদ চাহিদা যত বাড়ে ভবনাথের জলপথে ভ্রমণ তত বেড়ে যায়। অবশ্য সাইকেলে ট্যুরের চেয়ে জলপথে ঘোরা অনেক আরামদায়ক। কিন্তু মাঝে মাঝে পদ্মা পার হতে হতে নৌকোর ক্রমাগত দোলানিতে, বিশেষ করে রাত্তিরে, একলা লাগে। একটু একঘেয়েও যে ঠেকে না তা নয়। এবার তাই সপরিবারে জলপথে যাত্রা।

ভবনাথের নৌকো যখন লৌহজঙের পথে তখন ভোর হয়। সারা রাত্তির নৌকোর দুলুনি, গলুইয়ে জলের ছলাৎ আওয়াজ এখন শান্ত। ভোরের হাওয়ায় সুরে বেঁধেছে নৌকো। হাওয়ায় যখন

প্রিয়া সুরভি মেখে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনার জয়-জয়কার।
আপনার সান্নিধ্য মধুর হবে সবার কাছে।

কসমেটিক ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর দিল্লী মাদ্রাজ পাটনা

নৌকো কাত হয় তখন কাঠে কাঠে ঘষে মট মট শব্দ। টুটুলের মাথার কাছেই এক চিলতে চৌকো ফোকর। সেখান দিয়ে এক ঝলক রোদ তার মুখে এসে পড়ে। চাঁদ দেড় মানুষ উঁচু ঘাসের জঙ্গল। গোপীনাথ মাঝিরা নেমে গেছে সেই বনের ধার দিয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্য। খড়ি দিয়ে দাঁত মাজছেন স্বর্ণসুন্দরী। সামনে বিরাট চর ধু ধু করছে। আখের সবুজ আখক্ষেত বাদ দিলে সামনে বহুদূর বালুর বালিতে ভোরের সোনালী রং। স্বর্ণসুন্দরী দাঁত মেজে তোলা জলে কুলকুচো করেন নদীতে। পাটাতনের ওপর ডেক চেয়ারে ভবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে! স্বর্ণসুন্দরী মুখ মুছে পাশের মোড়াটায় বসে বলেন, 'কি ভাবছো?'

'তোমায় বলি নি একটা কথা। কাল প্রতাপের চিঠি পেয়েছি। প্রথম চান্সে ওর আই. সি. এস পাশ করা খুব মুশকিল।......'

'প্রতাপ পাশ করে নি? আরও তো দুটো চান্স পাবে।'

'হ্যাঁ তাই ভাবছি।'

আখক্ষেতের পাশ দিয়ে বঁটি হাতে গোপীনাথ আসছে। কিছুক্ষণ পরই গোপীনাথ স্টোভ ধরায়। আর স্পিরিটের গন্ধে টুটুলের ঘুম ভাঙে। এই স্টোভের গন্ধের সঙ্গে বাইরে যাওয়া যেন জড়িয়ে আছে তার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চোঙা উঠে পড়ে ধড়মড় করে, তারপর ভোরের আলোয় রাঙা বিস্তীর্ণ চরের দিকে চেয়ে সে চিৎকার দেয়, 'জাঁহাপনা, বান্দী আমার প্রাণেশ্বর।' টুটুলের ঘাড়ে ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'চল চল, আমরা নামি।' চরে নেমে দুই ভাই ছোটে এত দূর পর্যন্ত যে প্রায় দুটো কালো বিন্দুর মতো লাগে। সেই বিস্তীর্ণ বালির মাঝখানে আবার একটু জল চিকচিক করে। তার পাশে কত-গুলো কাঠি, আখের শুকনো পাতা। মাথার ওপরে কালো, সাদা, পেটের কাছটায় খয়েরি দুটো লম্বাটে পাখি ক্রমাগত তাদের মাথার ওপর পাক খায় আর ডাকতে থাকে। 'টি-টি-টি-টি-টি, টি-টি-ট।' একবার তারা মাথার পাশ দিয়ে গালের কাছ দিয়ে পাক খেয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে এক মুহূর্ত ভাবলে চোঙা, তারপর টপ করে বালির ওপর পাতা আড়কাঠির ঢাকনাটা সরিয়ে দেয়। সরিয়ে দিয়ে দুজনেই অবাক। পাঁচটা ছুটে-লাল ছোট ডিম। এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে যে তাদের গা ঘেঁসে নীচু হয়ে সশব্দ পাখি দুটোর পাক-খাওয়া তাদের নজরে পড়ে না। খেয়াল হয় গোপীনাথের ডাকে, 'চল চল, নৌকো ছাড়ছে।' ডিমগুলো নেওয়ার প্রস্তাবে গোপীনাথ বললে যে, ওগুলো সাপের ডিম, আসবার সময় একটা খোলস দেখেছে, এবং চর ভর্তি সাপ।

হাঁসাড়ায় এক জমিদারবাড়িতে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ অঞ্চল বেশ বর্ধিষ্ণু, মধ্যবিত্তের বাস। নৌকো থেকেই খালের পাশ দিয়ে নারকেল সুপারিতে ছাওয়া টিনের চাল মাঝে-মাঝে কোঠাবাড়ী নজরে আসে। মেয়েরা বাসন মাজছে, ছেলেরা পুকুরের জলে দাপাদাপি করছে। অনেক বছর পর যখন টুটুলরা কলকাতায় পাকা পাকি বাসিন্দে এবং জলের দেশ থেকে একেবারে নির্বাসিত তখন বাংলা কবিতায় কল নদীর বর্ণনা পড়ামাত্রই তাদের এই জলপথে সফরের ছবিগুলো ভেসে উঠত মনে। যেমন সত্যেন দত্তের 'কার বহুড়ী বাসন মাজে' হাঁসাড়ার খাল পাড়ে বাসনের পাঁজা নিয়ে ব্যস্ত লালপেড়ে শাড়ি-পরা বউটার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এমন কি 'ফাঁকেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' আসলে সেই ভ্রমর যেটা ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে গঙ্গা-জলে তাদের চান করবার সময় পাড়ে শ্যাওলার ওপর একই জায়গায় ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছিল হেলিকপ্টারের মতো।

হাঁসাড়ার দুপুরের খাওয়াটা এক ভয়াবহ ব্যাপার। এত বড় ভাজা গলদা চিংড়ির মুড়ো তারা কখনও দেখে নি। ভয়ে-ভয়ে একটু মুড়ো ধরতেই গল-গল করে লাল ঘিলুতে থালার এক পাশ ভরে যায়। টুটুল ভয়ে-ভয়ে খেতে পারে না। তাছাড়া সবই এত বড়-বড় যে ছেলেদের কাছে বড় অপরিচিত লাগে। এক জোড়া করে কই মাছ প্রায় থালা জুড়ে। ফেলে-ছেড়ে খেয়ে তারা কোন রকমে ওঠে। তবে মনে-মনে মুগ্ধ স্বর্ণসুন্দরী। তিনি কাঁটা চিবোবার যম। এত রকমারী সুন্দর মাছ আগে কখনও খান নি।

খাওয়ার শেষে জমিদারবাড়ীর এক মেয়ে, বোধহয় নাতনীর সঙ্গে দুই ছেলের অসম্ভব ভাব হয়ে গেল। সারা দুপুর গাছে, খালের পাড়ে মেয়েটা বুড়ী, চোঙা আর টুটুলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। লাল ফ্রক-পরা মেয়েটার ওপর প্রভুত্ব জেগে যায় চোঙার। বিকেলে নৌকো ছাড়বার আগে ঘাটের ধারে একটা ছড়ি জোগাড় করে চোঙা। 'তুই কাকে ভালবাসিস গৌরী? আমি, টুটুল, না বুড়ী?' ছড়িহাতে চোঙা জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটার মুখটা ছুঁচলো, কটাশে রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল। ছোট-ছোট চোখ দুষ্টুমিতে চকচক করে। বোধহয় চোঙারই বয়েস, বললে, 'যাঃ, আমি তো বুড়ীদিকে...'

'হাত পাত, হাত পাত।' মেয়েটা বোকার মতো হাত পাততেই সপাং করে ছড়ি বসিয়ে দেয় চোঙা। মেয়েটার চোখে জল আসে। 'আমি বাবাকে বলে দিচ্ছি', বলতে-বলতে গলায় উথলে কান্না নিয়ে সে বাড়ীর দিকে দৌড়য়। বুড়ীও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমিও মা-কে বলে দিচ্ছি।' বলে সেও গৌরীকে অনুসরণ করে।

বিদায়ের সময় যখন জমিদারমশাইয়ের ছেলে বউ এসে নিজে তাদের সঙ্গে ঘাটে আসেন তখন সব মিটমাট। চোঙা গলা নীচু করে জলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে কেউ না ভালবাসলে আমার বয়ে গেল।' গৌরীও তেমনি ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'দূর, আমি তখন মিছিমিছি বলেছিলাম।' ছইয়ের ওপর উঠে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ায়, খালের বাঁক পর্যন্ত লাল ফ্রক-পরা মেয়েটাকে দেখা যায় হাত নাড়াতে।

পর দিন দুপুরে মীরকাদিম। সেদিন হাট। দূর থেকে চাপা গুঞ্জন ভেসে আসে। কাছে আসতেই মজা আর গুড়ের গন্ধে বাতাস ভারী লাগে। অন্তত পাঁচ-ছশো নৌকো গঞ্জের পাড়ে বাঁধা। ঢুকতেই জলের ওপরে মাচার মতো লম্বা পাটাতন। নীল উর্দি-পরা সাহেব হাঁকে, 'খবরদার, খবরদার', পাশের নৌকো সরে যায়। স্বর্ণসুন্দরী নৌকোয় বসে-বসেই বিশাল এক গুড়ের নাগরী আর প্রকাণ্ড এক কাঁদি পাকা কলা কিনলেন। সাহেবের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা ঘাটে নামে। প্রচুর কাপড়ের দোকান, নারকেলের আড়ত, পাকা, আধ-পাকা কলার পাহাড়, কাচের চুড়ি, কেরাসিন, চাল-ডাল। অনেক খুঁজে-খুঁজে পছন্দ করে দুটো রবারের বল, আর বুড়ীর জন্যে লাল ফুল তোলা মাথার ক্লিপ আর রিবন কিনলে সাহেব। রিবনটা প্রায় দাম না দিয়েই সাহেব যখন তুলে নেয় তখন দোকানী মৃদু আপত্তি জানালে সাহেব ভর্ৎসনা করে, 'কার সঙ্গে কথা কও সেডা খেয়াল আছে?' দোকানী কিছু বলে না। চোঙার গর্বে বুক ভরে যায় কিন্তু দোকানীর মুখের দিকে চেয়ে টুটুলের নিজেকে অপরাধী লাগে।

পরদিন ভাগ্যকুল। পদ্মার পাড়ে তাদের বজরা এসে লাগে সকালে। এখানে নদী খুব চওড়া, ওপার দেখা যায় না। ছেলে-মেয়েরা সাঁতার শিখেছে ভালই। কিন্তু জলের অসম্ভব টান। দুটো বজরা জোড়া করে লাগিয়ে মাঝখানে ছেলে-

ছেলেরা চায়ে নামে। টুটুল কোরা একখানা ধুতি পরে জলে নেমেছিল। তারপর স্রোতের টানে তা পায়ে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া পদ্মায় নেমেছে এই বোধটাই এমন অভাবনীয় রোমাঞ্চকর তার কাছে যে, পা জড়িয়ে যাবার পরই সে এত বেশী হাত-পা ছোঁড়ে যে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। কিছু বুঝবার আগেই ব্যাপারটা ঘটে যায়। চোঙার চিৎকারে সামেদ নৌকোর ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর পাগড়ি ফেলে দিয়ে উর্দি-পরা অবস্থাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নদীর স্রোতে তখন দুই বজরার মধ্যে যে তিন-চার হাত ফাঁক ছিল সেই ফাঁক দিয়ে টুটুল জল খেতে-খেতে বেরিয়ে যাচ্ছে। উর্দি-পরা সামেদ জলে পড়েই এক ধাক্কায় টুটুলকে ধরে ভেতরের দিকে ঠেলে দেয়। তারপর মাথা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নৌকোর ভেতরে ঘেরা জায়গার দিকে নিয়ে গিয়ে জমা দেয়। ইতিমধ্যে স্বর্ণসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ভবনাথও জলে নেমে পড়েছিলেন। স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'সামেদ ছিল বলে, ছেলেটা বেঁচে গেল।' সামেদ আস্তে-আস্তে জল ছেড়ে নৌকোয় উঠল। খালি মাথায় তার ছোট খুলির ওপর লেপ্টে-থাকা কাঁচা-পাকা চুলে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তাকে। সামেদ আস্তে-আস্তে বললে, 'সব আল্লার দয়া মা, আমরা কে?'

দুপুরে ভারে ভারে খাবার আসে। তিনটে না চারটে থালায় প্রায় দশজনের মতো খাবার আসে। আগের সেই পেল্লাই জালা চিংড়ির মতো, ফুটো করতেই গলগল করে ক্ষীরের মতো ঘি, সম্মানিত অতিথিদের জন্যে এসেছে মাথার মুড়ো, ইলিশ, রুই, সুকুমারী সন্দেশ, রাজভোগ, দই। এত খাওয়া দেখলেই ছেলে-মেয়েদের আঁতকে থেকে যায়। সবচেয়ে তাদের ভাল লাগল আলুবখরার চাটনি। ভবনাথ ও স্বর্ণসুন্দরীও খাওয়ার ব্যাপারে খুব দড় নয়। তবে গোপীনাথ, সামেদ আর তিন মাঝিমাল্লা খুব উৎসব করে খাওয়া-দাওয়া করলে।

সকালবেলার দুর্ঘটনার রেশ খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সন্ধেবেলা জমিদার বাড়ি নেমন্তন্ন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকগুলো দালান, ইলেকট্রিক আলো। প্রায় শখানেক লোকের সঙ্গে খাওয়া শেষ হতে রাত প্রায় দশটা। ছেলেরা তাদের বজরায় ফেরবার মতলব করছিল, কিন্তু শোনা গেল গানের জলসার আয়োজন হয়েছে। জলসা মানে কলকাতা থেকে দুটি মহিলা প্রথমে ঠুংরি গাইলেন, তারপর খেমটা নাচলেন। শেষের দিকে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রচণ্ড তবলার চাঁটি সত্ত্বেও। কটা চোখ কুতকুতে আঁটসাঁট করে হলদে জর্জেট-পরা মোটা মহিলাটি ভবনাথদের সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, দ্বিতীয়টির পরনেও জরির বর্ডার তোলা চকোলেট জর্জেট, কাজল দেওয়া তার জলজলে চোখ দুটি ছেলেদের মন্দ লাগে না। তিনি মাথায় জলের গেলাস রেখে নাচলেন, চারদিকে চটাপট হাততালি পড়ল। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে টুটুল চোঙাও হাততালিতে যোগ দিল। এরপর আবার দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগলো। সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট ও তবলা। চিকের অন্তরালে মহিলাবর্গের মধ্যে স্বর্ণসুন্দরী ও বুড়ীকেও দেখা যাচ্ছিল। তাঁরই নির্দেশে দুই পাইক ঘুমন্ত দুই ছেলেকে বজরায় তুলে দিল। পরদিনও প্রায় একই প্রোগ্রাম। টুটুল ঘোলা জলে স্নান করলে। ভবনাথ সাঁতরালেন পদ্মায়, পেছনে সামেদ। ভবনাথের সাঁতার দেখে ছেলেরা অবাক হল। বাবা কাছারি যায়, বৈঠকখানায় টেবিল ল্যাম্প জেলে রায় লেখে, ভোরে চাতালে পায়চারি করে, বিকেলে কপির ক্ষেতে মালিকে নির্দেশ দেয়। 'বাবা আবার সাঁতরায় রে!' চোঙার গলায় প্রবল বিস্ময়।

সন্ধেবেলা নৌকো ছাড়ে। চাঁদ ওঠে। চাঁদনি রাতে ছইয়ের ওপর সামেদের কোল ঘেঁষে বসে ছেলেরা। আলো ফেলতে ফেলতে স্টীমার চলে যায়। বজরা দুলতে থাকে মাঝ নদীতে। আর এমন হু হু করে বুকে কানে হাওয়া দেয় যে, ছই থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ভবনাথ হাঁক দেন, 'ওপর থেকে নেমে এসো, তোমরা।' স্বর্ণসুন্দরী অনেকগুলো দেবতার নাম করে যান, 'বাবা বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, মা কালী মা জগদ্ধাত্রী।'

সামেদ ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনে ছই থেকে। সামনে হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া বিশাল রুপোলী পদ্মার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে, 'সব খোদার ইচ্ছে, আমরা কে?'

হাওয়ায় আর জলের শব্দে টুটুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর বোধহয় চারটে, খালের ওপর একটু একটু আলো ফুটছে। বুড়ীকে জড়িয়ে টুটুল ঘুমোচ্ছিল। টুটুলের ঘুম ভাঙতেই জলের শব্দ হাওয়ায় কেমন বিভ্রান্ত বোধ করে। বুড়ীর দিক থেকে পাশ ফিরে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

তিন

গরমের ছুটির বিকেল। এতক্ষণ বাড়ির সামনেই পুকুরটা ঝলকাচ্ছিল রোদ্দুরে। কিন্তু জেলখানার দিকটা বেশ ঠান্ডা, ছায়ায় ঢাকা। পুকুর পাড়ে ঝাঁকড়া বটের মাথা সেপাইদের কোয়ার্টারের মাথাগুলো ঢেকে রেখেছে পশ্চিমের রোদ থেকে। পাঁড়ে পুকুরে ঘটি মেজে খড়ম পায়ে খট খট করে আসছে। বাঁধানো রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ভাঙা বেসুরো গলায় গান করে, 'ইয়ে ভবসংসার হায় রামো কি মায়া। কাঁহি ধূপ হ্যায় কাঁহি ছায়া।।'

পাঁড়ে সম্প্রতি দেশ থেকে ফিরেছে। দু মাস ছিল ছাপরার গাঁয়ে। এক বিঘে মতো জমি শুদ্ধ আমের বাগান কিনেছে। তার গপ্প করে হিন্দি বাংলা মিশিয়ে ছেলেদের সঙ্গে, 'খুব ফল আসে আমের পেড়ের পর ওর কত পাখ আসে। জলে নামে জলে ওঠে, ফিন উড়ে যায়। হামি আর ভাই কোপাড় বেঁধে পাহারা দিই। সারা রাত কি বাত। ফল কি বাত ফুল কি বাত। হাম সমঝে কি বৈকুণ্ঠ যে হ্যায়।' বলবার সময় পাঁচশো জন পাঁচশো বৈঠক দেওয়া শরীরখানার ওপর ছোট মুখখানায় এক বেমানান স্নিগ্ধতা নামে।

তারা জেলের গেটের দিকে এগোতেই পাঁড়ে তাদের সাবধান করে দেয়, তারা যেন এখন জেলখানার ভেতরে না যায়। গত রাত্তিরে একদল 'ভারি বড়া ডাকু' এ জেলে স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকা থেকে। সে জন্যই এই সাবধানবাণী।

টুটুল আর চোঙা বাড়ির দিকে না গিয়ে স্থানীয় সাঁতার চ্যাম্পিয়ান, ক্লাস সিক্সের ছাত্র গোপালের সঙ্গে ল্যাটু খেলে। গোপাল ছবির মতো সাঁতরায়, এক ঘাট থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে আর এক ঘাটে ওঠে। তিনটে কাপ পেয়েছে সাঁতারে। তবে সম্প্রতি সে দুভাইকে দেহতাত্ত্বিক কিছু জ্ঞান দিতে শুরু করেছে। তাতে চোঙার উৎসাহ জোরাল। কিন্তু টুটুল ব্যাপারটা হদিস করতে পারে না। পুকুর পাড়ে বসে বসে গোপাল মানুষের জন্মরহস্য অঙ্গভঙ্গী সহযোগে বর্ণনা করে। টুটুলের কাছে গোপালের আলাপ একেবারেই দুর্বোধ্য লাগে আর চোঙা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। গোপাল শুধু চমৎকার সাঁতারই কাটে না, কি করে ছেলে জন্মায় সে খবরও রাখে। চোঙা উত্তেজনা বোধ করে। আগে সে যা যা শুনেছে সবই স্বর্ণসুন্দরীকে বলেছে, কিন্তু এবার তার ভয় হয়, তার মা এসব শুনলে ঝড় তুলবে। আর টুটুলের সঙ্গে আলাপ করলে মন একটু হাল্কা হত, 'কিন্তু ও একটা গবেট' এই চিন্তা করে সে বাড়ির দিকে এগোয়।

মাঝপথে জেল গেট। গেটের গরাদ ধরে তাদের কে ডাকল, 'খোকা শোনো।'

টুটুল চমকে তাকায়। ধুতির ওপর সাদাকালো ডোরাকাটা ফুলহাতা শার্ট পরা এক যুবক। কালো চশমার ভেতর থেকে কোমল চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে।

টুটুল এগিয়ে যায় গেটের দিকে। 'এস-ডি-ও সাহেব তোমাদের বাবা?' যুবকটি জিজ্ঞেস করে।

টুটুল কিছু বলবার আগেই তার পেছনে চোঙা কটাস করে চিমটি কাটল। টুটুল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চোঙা পেছন থেকে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ডাকে, 'আয় না।'

গেট থেকে সরে আসতেই চোঙা ফিসফিস করে বললে, 'ওরা ডাকাত। বাবাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'কিন্তু ...'

'কিন্তু কি? ওরা বোমা মারে, পিস্তল মারে। ওরা সব করতে পারে।'

টুটুলের এতক্ষণে খেয়াল হয় পাঁড়ের সাবধানবাণী। কিন্তু লোকটাকে দেখে মোটেই তো ডাকাত বলে মনে হয় না। প্রতাপের মতো ফর্সা নয়, কিন্তু হাসিতে ভরা মুখখানা, বিশেষ করে ঠোঁটের ভাঁজ আর থুতনি অনেকটা বড়দার মতো। এমন সময়

নরম জামাকাপড় ধোয়ার নিরাপদ, অভিনব উপায়

সিন্থেটিক কাপড়

পশমের কাপড়

রেশমের কাপড়

জেণ্টীল

ধোয়ার জন্যে বিশেষ তরল ফর্মূলা

নরম, মোলায়েম, মৃদু জেন্টীল—বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী একটি ফর্মূলা যা বিশেষভাবে আপনার রেশম ও পশমের জামাকাপড় এবং 'টেরীন', ন্যাইলন, রেয়ন, প্রভৃতি সিন্থেটিক কাপড় ধোয়ার জন্যে তৈরী করা হয়েছে।

জেন্টীল তরল পদার্থ, তাই খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। আর নরম ফুরফুরে ফেনায় ভরে দেয়। এটি মামুলী ডিটার্জেন্ট পাউডার থেকে আলাদা।

জেন্টীল আপনার জামাকাপড় আগাগোড়া ভালো ক'রে···সব ময়লা দূর ক'রে···নতুনের মত মোলায়েম, ঝরঝরে, ঝলমলে ক'রে তোলে।

জেন্টীল—নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়ীতে ধোয়ার জন্যে

জেঠা-পিসেমশাই নিয়ে ডাকাতির সম্পর্ক বড় অশ্লীল লাগে তার কাছে।

ফুটবল খেলে সন্ধ্যের পর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায়। সাত হাত লম্বা জবরজং সমস্ত চেহারা জুড়ে সশস্ত্র সান্ত্রী। ডেনচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সন্ধ্যার পর সহরে এসেছে পুলিশ নয়। গত রাত্তিরে জেলখানার ভেতর থেকে আওয়াজ এসেছিল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী আজ রাতে সন্ত্রাসবাদীরা জেলখানা ও ট্রেজারি কোর্ট আক্রমণ করবে। ভবনাথ বৈঠকখানায় পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে কনফারেন্স করছেন। তাঁর নিজের আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় ছোকরা ডি-এস-পি এবং জেলা সদর কর্তৃপক্ষের চাপাচাপিতে স্বয়ং সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছে।

টুটুল এক চাপা উত্তেজনা নিয়ে ঘুরোতে যায়। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা সঙ্গীন-আঁটা নিস্পন্দ ইউনিফর্মধারী সান্ত্রী না চলমান দেহের থেকে হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ বাঙালী পুরুষ—এ দুজনার কোনজন বড়, গৌরবজনক শব্দ তা তার কাছে গুলিয়ে যায়। নাকী হলে এদের দুজনের মধ্যে কার কেমন উচিত সে সম্পর্কে সে মনস্থির করতে পারে না।

ছোড়া বললে সে আজ বাড়িতে ঘুমোবে না। রাত্তির জুড়ই জাগবে। সান্ত্রীরা ওপর থেকে রাইফেল ছুঁড়বে। তখন একটা দঙ্গল বাধবে। বুড়ী বললে, 'বাই লন ইংরেজের সঙ্গে কেউ পারবে না।' ছোড়া আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। তার মতে বাড়িতে কামান আসবে। কারণ কামান না হলে সহরও রক্ষা করা যায় না।

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস ছোড়া।' বুড়ী আপত্তি করল।

'তুই কি জানিস রে। তুই তো মেয়ে। আমি সব জানি। আজ বাড়িতে কামান আসবে। আমরা কামান চালাব।'

টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীও হাসছে। ভবনাথের ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর ছেলেমেয়েরা সচেতন থাকলেও তাঁকে গোলন্দাজ রূপে কল্পনায় হঠাৎ বিস্মিত করে তোলে ওঠে বুড়ী। 'তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ছোড়া।' বলেই সে চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নেয়। কারণ ছোড়া এখন মারলে স্বর্ণসুন্দরীকে নালিশ করে কিছু হবে না। স্বর্ণসুন্দরী এত রাত্তিরে বৈঠকখানায় [illegible] চা পাঠাতে ব্যস্ত। তাছাড়া এতও [illegible] হবে।

পরের রাতে জানলা দিয়ে টুটুল অবাক হয়ে দেখলে ভোরের তারার নীচে খাড়া নিস্পন্দ ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রহরী। শিশিরে সঙ্গীনগুলো আরও চকচক করে।

সে বছর বর্ষা শেষ না হতে হঠাৎ জেঁকে শীত পড়ল। দুটো মস্ত আয়োজন ছিল বিজয়া দুই ছেলের জন্যে স্বর্ণসুন্দরী। তার আয়োজন ঘড়ি নিয়ে বসে মধ্যবাবুর সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চাণক্য শ্লোক আওড়ায়:

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।।

অঙ্ক হোক, ইংরেজী হোক, চাণক্য শ্লোক একবার আওড়াতে হবেই। একদিকে সংস্কৃত শ্লোক আর ইংরেজী ব্যাকরণ অন্যদিকে অঙ্ক—এর মাঝখান দিয়ে মধ্যবাবু প্রতি সন্ধেবেলা তাঁর নৌকো বেয়ে চলেন। নৌকোর আরোহীরা এবং তাদের অভিভাবকও নিশ্চিন্ত। কোন এক ঘাটে নিশ্চয়ই ভিড়বে। প্রোগ্রেস রিপোর্টে সই করা ছাড়া ভবনাথ কোনদিন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খবরদারি করেননি, তবে পড়াতে বসানোর ব্যাপারে স্বর্ণসুন্দরীর শাসনে ঢিলেমি ছিল না একদম।

বড়দিনের ছুটি এগিয়ে আসছে। ম্যাপে কক্সবাজার দেখানোতে ডিকিং বিভ্রাট হওয়া ছাড়া টুটুলের সব পরীক্ষাই ভাল হয়েছে। ছোড়া অঙ্কেতে ফুলমার্কস, তবে ইতিহাস ভূগোল খুঁড়িয়েছে। বুড়ীর যে এবার কি হল, বোঝা গেল না, কোনমতে হেঁচড়ে পেঁচড়ে বেঁচেছে।

কিন্তু শৈশবে বিষাদ [illegible]। কয়েকদিন যেতে না যেতেই কৌতুক-কন্টকিত কৈশোরের আনন্দে ঝলমল করে বুড়ী। গত কয়েক মাসে অনেকটা লম্বা হয়েছে সে। বুকও উঁচু হচ্ছে। গান গাইছে। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে লম্বা পাতলা মেয়েটা দিন-রাত্তির এদিক-ওদিক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।

বড়দিনের ছুটির আগে বাদলা নেমেছিল। চারদিকে ছাঁক ছাঁক করছিল ঠাণ্ডায়। তারপর আবার মিঠে রোদ্দুরে ভরে যায়। এদিকে সচরাচর দুষ্প্রাপ্য একটা কমলা লেবু, বুড়ী আর টুটুল দুই ভাইবোনে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল আর গোপীনাথ কাঠ চিড়ছিল কুড়োল নিয়ে। জেলখানার পাশে দুটো মোটা আমের ডাল ভেঙে পড়েছিল। সে দুটো লুকিয়ে নিয়ে চেলা করা হচ্ছে। তালে তালে গোপীনাথের কুড়ুল পড়ে আর নতুন ছিটকায় চেলাগুলো। প্রায় গন্ডাখানেক কাঠ কাটা হচ্ছে। বারান্দার এককোণে চারপায় বসে বসে দুজনে দেখে।

এমন সময় উত্তেজিত ছোড়ার আবির্ভাব। 'দেখ না দেখে যা আমাদের বাড়ি কত জিনিস আসছে।'

তিনজনেই সিঁড়ির দিকে দৌড়ে আসে। প্রায় দশ পনেরো লোক ভারে ভারে রকমারি খাবার আনছে।

ছোড়া উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ভীম নাগ ভীম নাগ, আমি দেখেছি কলকাতায়।'

সামনের থালায় ভীম নাগের সন্দেশ। সন্দেশের বাক্সগুলো একটা পিরামিডের মতো উঁচু করে সাজানো, পরের থালাটা ছাঁট আপেল, দুটো বিশাল বর্ধমানের কেক—রাংতায় মোড়া চিত্র-বিচিত্র করা, এক পরাত ভর্তি মোটা মোটা কালো আঙুর আর শিল থেকে আনা মোড়ক। হরেক রকম সাজানো দুটো থালা, এক থালা ভর্তি কিসমিস পেস্তা বাদাম, খুবানি, শেষে পেল্লাই পাকা মর্তমান কলা।

স্বর্ণসুন্দরী প্রথমে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু খাবারের এই অতুলনীয় বৈভবে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। রাশভারি গাম্ভীর্যে হাঁক দেন, 'গোপীনাথ।' গোপীনাথও বোঝে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ওপর কাপড় নামিয়ে, বারান্দার কোণায় টাঙানো সাদা ফতুয়াটা চাপিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর পথ দেখিয়ে ভারীদের ভাঁড়ারঘরের দিকে নিয়ে যায়: দেখতে দেখতে ভাঁড়ারঘর ভরে ওঠে। ফলের মিষ্টির গন্ধে ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা আরও বাড়ে।

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সাহেবের আবির্ভাব। হাতে ভবনাথের চিরকুট। তাড়াতাড়িতে ভবনাথের বাঁকা হরফগুলো তাদের স্বাভাবিক [illegible] হারিয়ে ফেলেছে। ভবনাথ লিখেছেন: 'দুই ভাই দুই বড় জমিদার। চরের জমি নিয়ে দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়ছে। আমার কোর্টে মামলা। শুনলাম ঘাটে নৌকো ভিড়েছে, উপহার আসছে আমাদের বাড়ি। পত্রপাঠ সব ফিরিয়ে দেবে।'

স্বর্ণসুন্দরী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতভাবে লক্ষ করলেন পেছনে দাসী পরিবৃতা দুই [illegible] মহিলা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। কাছে আসতে চেহারাগুলো আরও স্পষ্ট হয়। জমিদারবাড়ির বউ এক নজরে বোঝা যায়। নাকে হীরের ফুল, পরনে চওড়া লালপেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি, আলতাপরা খালি পা পেছনে দুই দাসীর হাতে দুজোড়া চটি সিঁড়ির মাঝখান থেকেই সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে দুই বৌ।

সন্দেশ আর আপেলের থালার পাশে পাক খাওয়া ছেলেমেয়েগুলোর মুখ এক মুহূর্তে কেমন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এক শারীরিক ব্যথা নড়ে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর বুকের মধ্যে। তারপরেও মুস্কিল সামনেই উদিত দুখানি হাসিভরা মুখ। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করেন। স্বামীকে চেনেন স্বর্ণসুন্দরী। অনেক ব্যাপারে ভবনাথ খুব গোঁড়া, কিন্তু নীতিগত কোন কোন ব্যাপারে তাঁর বাবার চেয়েও ভবনাথ কড়া। ভবনাথের চিঠিও এই ভাবের কড়া হুকুম। গেটের থামের পাশে সরে গিয়ে বললেন, 'সাহেব, পেছনের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে সব খাবার ওদের লোকজনদের দিয়ে নৌকোয় তুলে দাও। কোন চেঁচামেচি হবে না। গোপীনাথ, লুচি ভাজ।'

তারপর সামনে এসে জোড় করে নমস্কার করলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যতঃ কিন্তু দেশবন্ধুকে নিজের রাজনৈতিক গুরুই বলেছেন, ব্যক্তিগত গুরু বলেননি। দেশবন্ধুভক্ত এই রাজনৈতিকের সঙ্গে এক্ষেত্রে গান্ধীভক্ত অনেক রাজনৈতিকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটবে। শেষোক্ত জনেরা গান্ধীজীকে আগে গুরু মেনেছিলেন, পরে রাজনৈতিক নেতা-রূপে তাঁর আনুগত্য করেছিলেন। সুভাষ-চন্দ্রের কাছে অপরপক্ষে আগে থেকেই এমন একজন মানুষের মূর্তি জ্যোতির্ময় আকারে বিরাজিত ছিল, যাঁর থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসে তিনি পাননি বা পাবার আশা করেননি—তিনি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবার কারণ—যে-বিবেকানন্দকে তিনি সাক্ষাতে পান নি, তাঁকেই কিছু অংশে যেন বাস্তবে প্রকাশিত দেখেছিলেন দেশবন্ধুর মধ্যে। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-চরিত্রের যে-ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে দেখা যায়, তিনি দেশবন্ধুর বহুমুখিতার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। "মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে"—তাই ছিল তাঁর বিস্ময়ের বস্তু। বিবেকানন্দের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যে সুগভীর জটিল বৃদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য প্রকাশের বিষয়ে জেনেছিলেন—দেশবন্ধুর মধ্যে তারই কিছু রূপ বাস্তবে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ যে-সমুচ্চ প্রতিভায় এবং উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় উত্তোলিত ছিলেন, দেশবন্ধু সেই লোকের অধিবাসী নন, একথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় নি, কিন্তু একথাও সত্য, লোকজীবনের ক্ষেত্রে বিচরণশীল মানুষের মধ্যে দেশবন্ধুর মত বৃহৎ মানুষের সাক্ষাৎও তিনি পাননি। সুতরাং সুভাষ-চন্দ্রের আত্মসমর্পণ যতখানি রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের কাছে, ততোধিক মানবিক চিত্ত-রঞ্জনের কাছে, তা স্বীকার করতেই হয়।

কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবেন। বর্তমান রচনা সেই প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করেছি। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিকভাবে দেশবন্ধুর কাছে কি পেয়েছিলেন? কয়েকটি দিক থেকে বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমেই বলা যায়, রাজনীতির একটা বাস্তব দিক আছে, যাকে সাধারণভাবে 'সংগঠন' বলেই অভিহিত করা হয়—সেই সংগঠনের খুঁটিনাটি সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাছ থেকেই শিখেছিলেন। সংগঠন অবশ্য সুভাষচন্দ্রের স্নায়ুশিরার মধ্যেই ছিল—সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর আবাল্য আকর্ষণ—কিন্তু সেই সংগঠনের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হলে মাটির মধ্যে পা কতখানি গেঁথে যায় এবং সেই অবস্থায় কিভাবে মাথা উঁচু রেখে চলবার শক্তি জাগিয়ে রাখতে হয়—সে শিক্ষা মনে হয় চিত্তরঞ্জনই তাঁকে বিশেষভাবে দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর তত্ত্বাবধানে আন্দোলন-সংগঠনে স্বরাজ্য পার্টির সংগঠনে, কর্পোরেশন পরিচালনায় ব্যাপৃত থেকে সুভাষচন্দ্র যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তী কর্মজীবনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, সুভাষ-চন্দ্রের মত বৈপ্লবিক চরিত্রসম্পন্ন নেতার কাছে পার্টি সংগঠন ব্যাপারটি মূলগত। ভারতীয় রাজনীতিতে ভাসমান মহত্ত্বের অভিমানে পরিতৃপ্ত নেতৃত্বের রূপে মুগ্ধ অনেক সাধু ব্যক্তি বুঝতে সমর্থ ছিলেন না, কংগ্রেস-সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কেন কর্পোরেশনের মেয়র হতে ব্যস্ত এবং কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র কেন কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হবার লোভ ত্যাগ করতে পারেননি।

*(৪) এঁরা জানতেন না সত্যকার সংগঠন শুরু হয় একেবারে তলার স্তর থেকে এবং ভিত্তিকে বাদ দিয়ে যে-নেতৃত্ব গড়ে উঠতে চায়, সেই পরগাছা-নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে মূলগত পরিবর্তন আনতে পারে না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজ-নৈতিক জীবনেই তার প্রমাণ।

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর মধ্যে অধিকন্তু প্রবল ভাবাবেগের সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধির সমন্বয়ের রূপ লক্ষ্য করেছিলেন এবং নিজ জীবনে তার প্রকাশ আনতে চেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ত্যাগ—কিন্তু বুদ্ধিত্যাগ নয়। আই সি এস ত্যাগ করে ইংলণ্ড থেকে ফেরার পথে সুভাষচন্দ্র প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই সাক্ষাতের যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই, গান্ধীজীর অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথাবার্তা তাঁকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছিল। গান্ধীজীর কাছ থেকে ধর্ম ও ত্যাগ শেখার দরকার আর যারই থাক, সুভাষচন্দ্রের ছিল না। বিবেকানন্দ যাঁর গুরু, তিনি ধর্ম ও ত্যাগের চরম আদর্শ ইতিপূর্বেই পেয়ে গেছেন। আর লৌকিক অর্থে ত্যাগ যাকে বলে তার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ অল্পপূর্বে চিত্তরঞ্জনের মধ্যে দেখেছেন। ইংলণ্ডে থাকা-কালেই চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের কাহিনী কিভাবে তাঁকে শিহরিত করেছিল, তা নিজেই তিনি লিখে জানিয়েছেন। গান্ধীজীর ত্যাগ অন্ততঃ চিত্তরঞ্জনের চেয়ে বড় ছিল না। সুতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন—ভারতীয় রাজনীতির তৎ-কালীন মূল নেতার কাছ থেকে তাঁর রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ রূপ জানবার জন্যই। তার অল্প পরেই চিত্তরঞ্জনকে যদি তিনি নিজ নেতারূপে বরণ করে থাকেন, তার মূল কারণ—চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের কাছে "আদর্শবাদ ও বাস্তব-বাদের বিরল সমন্বয়" বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। রাজনীতিতে 'প্র্যাগম্যাটিক' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা সুভাষচন্দ্র সর্বদা অনুভব করেছেন—তার বিশেষ প্রকাশ তিনি দেশবন্ধুর মধ্যে দেখেছিলেন, অথচ দেশবন্ধুর থেকে অধিক আদর্শবাদীও কল্পনা করা শক্ত। দেশবন্ধুর বাস্তববাদ কদাপি সুবিধাবাদ নয়, আপোষমুখিতা নয়; তা হল মূল আদর্শকে অম্লান ও অপরিহার্য রেখে চলতি পথের পরিস্থিতির সম্বন্ধে অবহিত থাকা, যাতে পদক্ষেপ ঊর্ধ্বমুখ নির্বুদ্ধিতায় ব্যাহত না হয়। নচেৎ দেশবন্ধুর থেকে গতিশীল আদর্শবাদী আর কে, যিনি তাঁর 'যুবক-বন্ধু' সহকারী-দের হতাশার সামনে অধৈর্য আক্ষেপের সঙ্গে বারবার না বলে পারতেন না—যদি আমি তোমাদের মধ্যে আমার গতি একটু সঞ্চারিত করতে পারতাম! সুভাষচন্দ্র এই

---

*৪ যেমন ধরা যাক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় A Nation in Making গ্রন্থে চিত্তরঞ্জনের মেয়র হওয়ার কঠোর সমালোচনা করেছেন। জহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিও কংগ্রেস-সভাপতির রাজসিংহাসন থেকে সুভাষচন্দ্রের কর্পোরেশনে অলডার-ম্যানের বেঞ্চে উপবেশনকে যথেষ্ট ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন।

১৮ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখের স্টেটসম্যানের রিপোর্ট। প্রিন্স অব ওয়েলস পূর্বদিন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেছেন। কংগ্রেস হরতাল ডাকলেও গান্ধীনগর বোম্বাইয়ে কিন্তু তা সফল হয়নি।

THE STATESMAN

GREAT WELCOME TO THE PRINCE AT THE GATEWAY OF INDIA

H. R. H.'S AMBITION TO RIPEN GOODWILL

THE KING-EMPEROR'S MESSAGE—"INDIA'S ANXIETIES AND REJOICINGS ARE MY OWN"

HUGE AND ENTHUSIASTIC CROWDS IN BOMBAY STREETS

ROYAL APPEAL FOR LOYAL CO-OPERATION: DESIRE TO UNDERSTAND INDIA'S DIFFICULTIES AND ASPIRATIONS

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁর গতিশীলতা তাঁকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়নি—টেনে নিয়ে গিয়েছিল সংগ্রাম থেকে সংগ্রামের মধ্যে।" দেশবন্ধু ছিলেন সেই নেতা,' যিনি যাকে সত্য বলে মনে করতেন—তাকে পাবার জন্য নিজের জনপ্রিয়তাকে বলি দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। 'কাউন্সিল প্রবেশ' প্রস্তাব বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' তার প্রমাণ।

বেঙ্গল প্যাক্ট সূত্রেই বলে নেওয়া যায়, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেশবন্ধুর দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বন্ধু দেশবন্ধু—সুভাষচন্দ্র সংগতভাবেই দাবি করেছেন। বেংগল প্যাক্টের মধ্যে দেশবন্ধু মুসলমানদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত সুবিধা দিয়েছিলেন, এই জন্যই তিনি মুসলমানদের বড় বন্ধু নন এবং তাঁর বেঙ্গল প্যাক্ট অবশ্যই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান নয়—ঐ প্যাক্টের পিছনে তাঁর যে-চিন্তা ছিল, সেটার জন্যই তিনি অভ্রান্ত রাজনৈতিক। দেশবন্ধু বুঝেছিলেন, মুসলমানদের হিন্দু-বিরোধিতায় একটা বড় কারণ তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। কিছু সময়ের বিশেষাধিকারের দ্বারা যদি অনগ্রসর সমাজকে অগ্রবর্তীদের সমপর্যায়ে তুলে আনা যায়, তাহলেই সুস্থ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। সুভাষচন্দ্র যে এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত তা সহজেই বোঝা যায়।

শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার সম্বন্ধে দেশবন্ধুর মনোভাব সুভাষচন্দ্রকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে চালিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র নিজেকে সমাজতন্ত্রী মনে করতেন এবং পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন—কিন্তু প্রথমে বা শেষে তিনি কখনই সমাজতন্ত্রকে আমদানীযোগ্য পদার্থ মনে করেননি। দেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত আকারে সমাজতন্ত্র সত্যই সফল হতে পারে, তাও তিনি মনে করেননি—অন্ততঃ ভারতের মত সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী কোনো দেশে। গায়ের জোরে যদি তাকে প্রবর্তন করা যায়ও, তা কল্যাণকর হবে, এমন ধারণা তাঁর ছিল না। সুতরাং ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসঙ্গে তিনি বিবেকানন্দ বা চিত্তরঞ্জনের চিন্তাধারার কথা না বলে পারেন নি। মান্দালয় জেল থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লেখা তাঁর নিম্নের কথাগুলি পরেও পরিবর্তনের কোনো হেতু তিনি দেখেছেন মনে হয় না :

"ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, একথা দেশবন্ধু যেরূপ জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোনো নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।...অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীর সে ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিধ্বনি (ভারতীয়) রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।"

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই দেশবন্ধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্বও করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তার দ্বারা তিনি ভেবেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দেশীয় ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিস্তারের পরিণতি থেকে দূরে রাখা যাবে, অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের সঙ্কীর্ণতা থেকে রক্ষা করা যাবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করে সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে দেশবন্ধুরা পথেই চলেছিলেন।

এই সমস্ত দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক থেকে সুভাষচন্দ্রের কাছে দেশবন্ধুই ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ চরিত্র। এবং সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সর্বদা প্রগতিশীল চরিত্র হিসাবেই রাজনীতিতে দেখেছেন। একদিকে অনগ্রসর জনগণের প্রতি

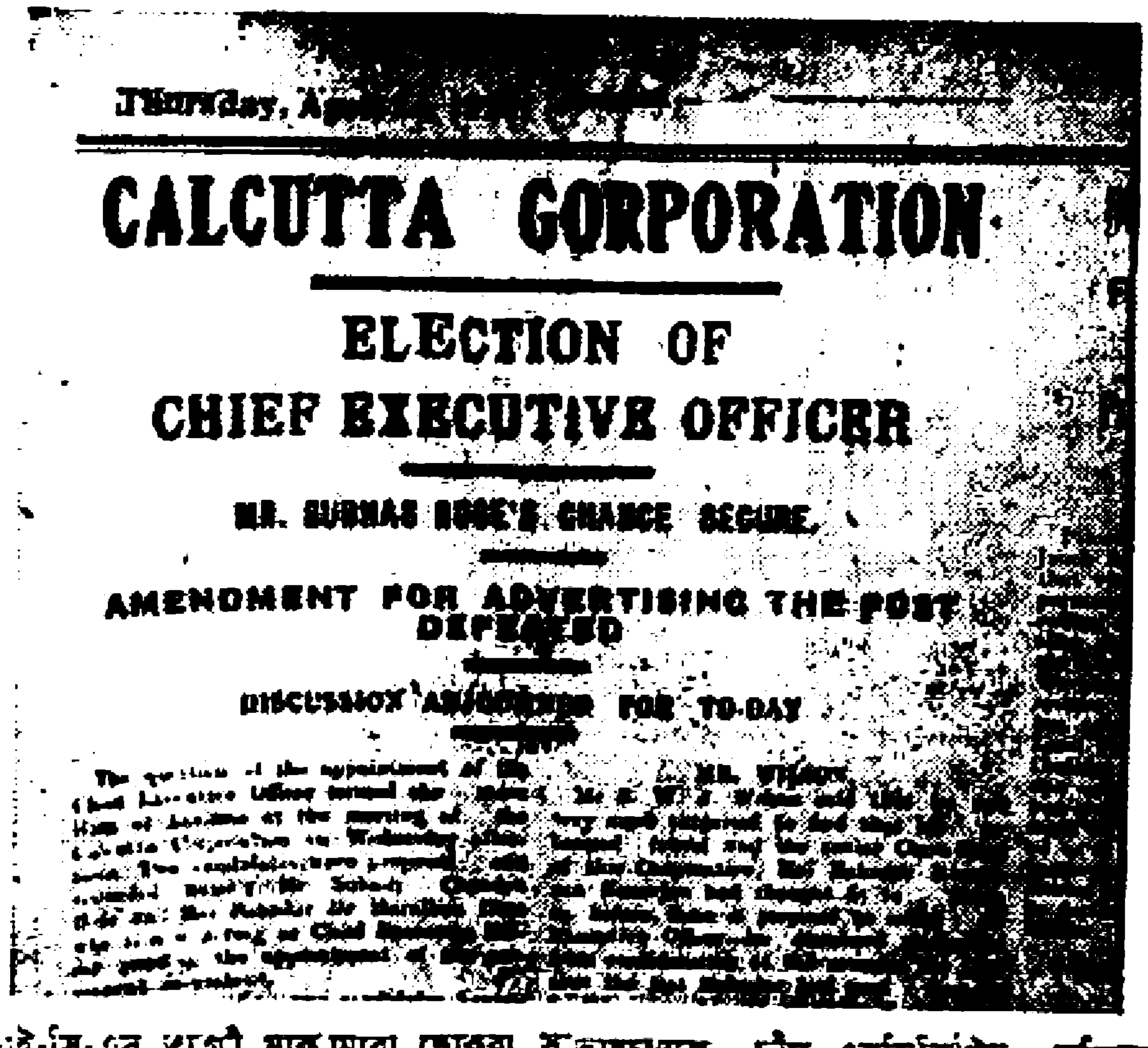
Thursday, A

CALCUTTA CORPORATION

ELECTION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR. SUBHAS BOSE'S CHANCE SECURE.

AMENDMENT FOR ADVERTISING THE POST DEFEATED

DISCUSSION ADJOURNED FOR TO-DAY

আই-সি-এস ত্যাগী মার্কামারা ছোকরা সুভাষচন্দ্রকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সহজে করা যায় নি। অনেক টানা-হেঁচড়া এই নিয়ে হয়েছিল। অমৃতবাজারের ২৪ এপ্রিল, ১৯২৪-এর সংবাদে তার ইঙ্গিত।

সুবিচারের আন্তরিক প্রয়াস, অন্যদিকে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে লড়বার ক্ষমতা—দেশবন্ধুর মধ্যে এই দুই গুণের বিকাশই সুভাষচন্দ্রের ঐ উচ্চ ধারণার মূলে। রাজনৈতিক হিসাবে গান্ধীজীকে সুভাষচন্দ্র কখনই দেশবন্ধুর সমতুল মনে করতেন না—এবং সেকথা তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁর ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে লিখেছিলেন। দেশবন্ধুর পাশে থেকে গান্ধীজীকে বিচার করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। গান্ধীজীর শক্তি ও দুর্বলতা দুইই তিনি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন। দেশবন্ধুর মত তিনিও লেখ-ছিলেন, "গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেন অপূর্বভাবে, অভ্রান্ত নৈপুণ্যতাকে গড়ে তোলেন, সাফল্যের পর সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আন্দোলনের শিখরে পৌঁছে যান—তারপরেই তাঁর স্নায়ু দুর্বল হয়ে যায়, দ্বিধায় ভরে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে যান, কি করবেন ঠিক করতে পারেন না।" এই দ্বিধা বা উভয় চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—চৌরিচৌরার ক্ষুদ্র ঘটনায় সর্বভারতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া। ১৯২১ ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামের অধিবাসীরা পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত হবার পরে উত্তেজনাবশে একটি পুলিশ থানায় আগুন ধরিয়ে দেয় ও কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলে। গান্ধীজীর কাছে সে সংবাদ পৌঁছলে "ঘটনার গতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে গান্ধীজী তখন বারদৌলিতে কংগ্রেস

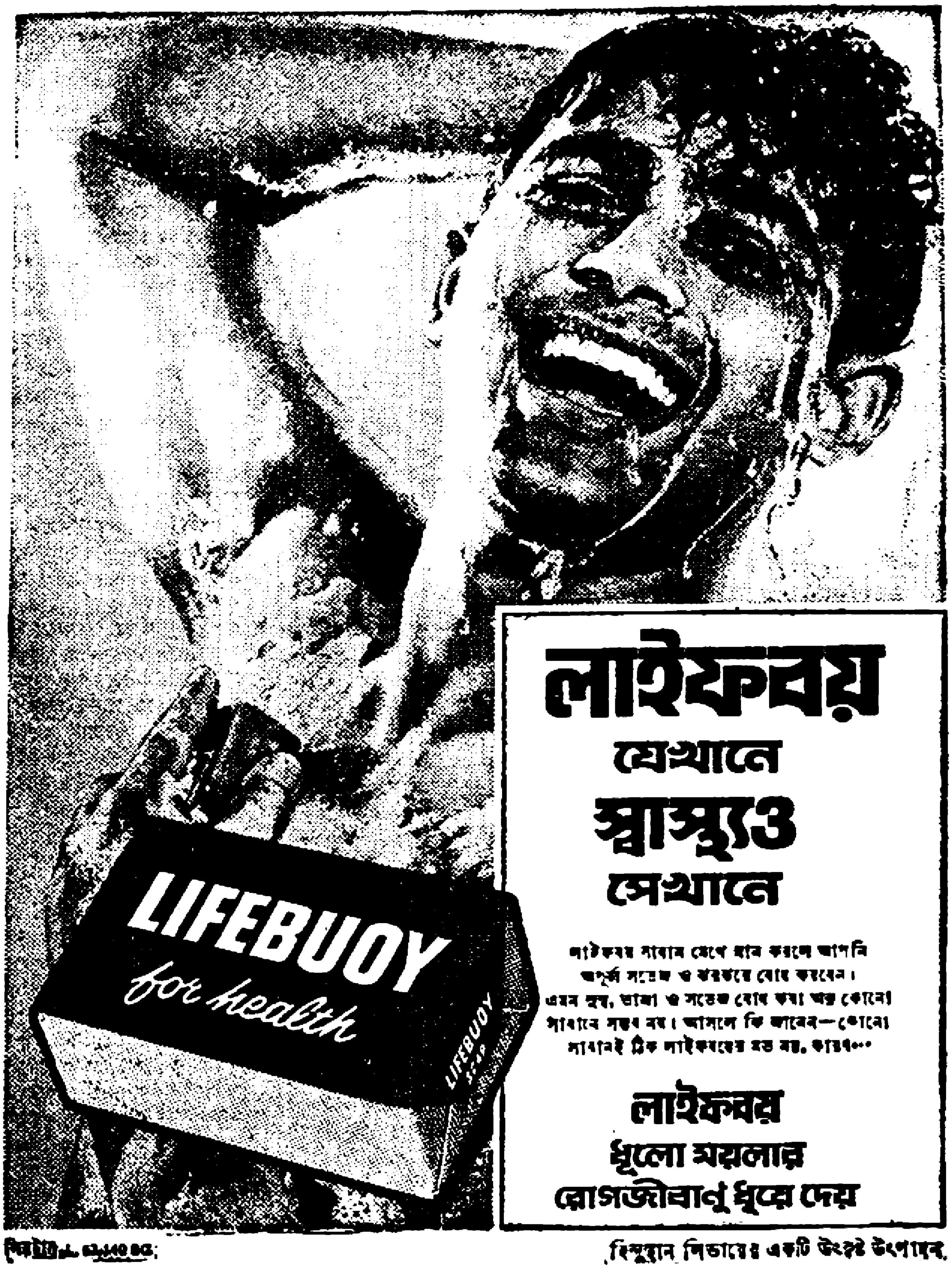

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকেন। তাঁর প্ররোচনায় ওয়ার্কিং কমিটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে বলে, সকল কংগ্রেস-সেবী যেন অতঃপর নিজেদের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত রাখেন।"

সমস্ত ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী গান্ধীজীর এই কাণ্ডে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা স্তম্ভিত হয়েছিল আনন্দে—এরকম ঐতিহাসিক নির্বুদ্ধিতা কোনো আন্দোলনের নেতা করতে পারেন তা তাঁদের কল্পনার অতীত ছিল। নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্তেরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন আনন্দে—এতবড় মূল্যে ইতিপূর্বে আর কেউ অহিংসাকে কেনেননি (বিবেকানন্দের মতে অবশ্য অশোক তা কিনেছিলেন, যিনি অস্ত্রের জোরে গোটা জাতকে নিরামিষাশী করে বহু শত বৎসরের পরাধীনতার কারণ হয়েছিলেন)। এবং বাকি সকলে স্তম্ভিত ক্ষোভে ও হতাশায়—জাতির ভাগ্য নিয়ে একটি মানুষের ছিনিমিনি খেলার এই ডিক্টেটরীতে। "ডিক্টেটরের নির্দেশ তখন মেনে নেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস-শিবিরে রীতিমত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল: কেউ বুঝে উঠতে পারল না—মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন সারা ভারতের আন্দোলনের গলা টিপে মারার কাজে ব্যবহার করলেন"—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন। * পণ্ডিত মতিলাল, লালা লাজপত রায় প্রমুখ সকল বড় নেতাই গান্ধীজীর কাজের প্রতিবাদ করলেন। আর দেশবন্ধু, অসহযোগ আন্দোলনকে প্রচণ্ড করে তোলার মূলে যাঁর দান গান্ধীজীর চাইতে এবং খুব পরে নয়, তাঁর অবস্থা, সুভাষচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই প্রকার :

"সেই সময়ে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম। দেখলাম—মহাত্মার ক্রমাগত আনাড়িপনা রাগে দুঃখে তাঁকে আত্মহারা করে ফেলেছে। (লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারে) ১৯২১ ডিসেম্বরের বিকট ভ্রান্তির স্মৃতি তিনি যখন সবে ভুলতে শুরু করেছেন—তখনি এল বারদৌলির পশ্চাৎ-অপসরণ—মর্মান্তিক আঘাতের মত।"

ভারতবর্ষে গান্ধী-প্রভাবের পূর্ণ প্রকোপের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক

কলকাতায় কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলসের সংবর্ধনা বয়কটের হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। ১৮ নভেম্বর, ১৯২১ তারিখে স্টেটসম্যানের আক্রোশপূর্ণ সংবাদ থেকে তা দেখা যাচ্ছে।

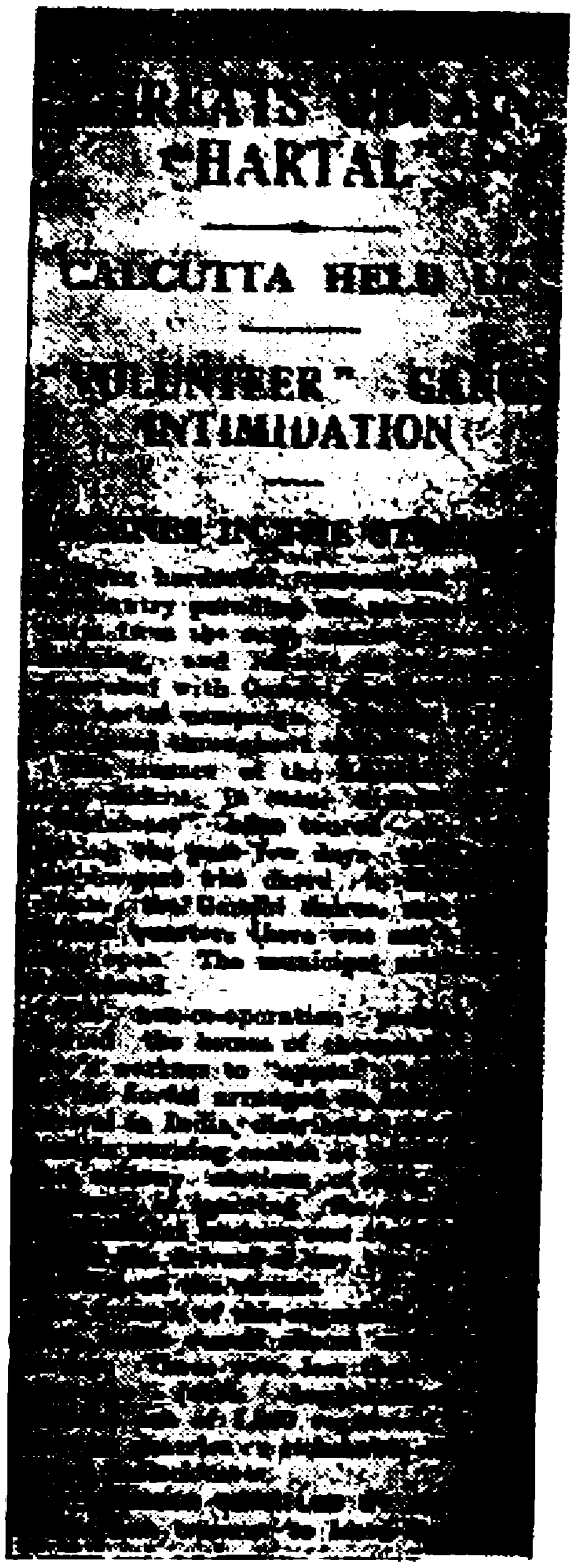
HARTAL
CALCUTTA HELD UP
INTIMIDATION

সাহসিকতার সঙ্গে গান্ধী ও দেশবন্ধুর রাজনৈতিক ভূমিকার তুলনা করে যেকথা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সহজ সত্য মনে হলেও সেদিন তা সুভাষচন্দ্রের গুরু-ভক্তির পরিচয় বা গোঁড়া গান্ধী-বিরোধী মনোভাবের নিদর্শন বলেই গৃহীত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন :

"১৬ জুন, ১৯২৫ তারিখে দেশবন্ধুর মৃত্যু ভারতের পক্ষে প্রচণ্ড ধরনের দৈব দুর্বিপাক। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন পাঁচ বছরও নয়—কিন্তু তাঁর উত্থান অদ্ভুত। যৌবন হৃদয়ের বোহিমেবী উন্মাদনার সর্ব-মনপ্রাণ নিয়ে তিনি রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেবল নিজেকেই দেননি—যা-কিছু তাঁর অধিকারে ছিল, সে সকলই দিয়েছিলেন স্বরাজের সংগ্রামে। তিনি যখন মারা গেলেন দেখা গেল—তখনো অবশিষ্ট সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি তিনি জাতির জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। সরকার তাঁকে ভয় করতেন, আবার শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর শক্তিকে করতেন ভয়, শ্রদ্ধা করতেন তাঁর চরিত্রকে। তাঁরা জানতেন, তিনি কথার মানুষ। তাঁরা এও জানতেন, তিনি সংগ্রামে কঠোর কিন্তু তাতে কোনো মালিন্য নেই। অধিকন্তু তিনি সেই মানুষ যাঁর সঙ্গে চুক্তির জন্য দরকষাকষি করা যায়। পরিষ্কার তাঁর মাথা, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি নিখুঁত, ভারতীয় রাজনীতিতে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন—যে-সচেতনতা মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ছিল না। অপর যে-কোনো মানুষের চেয়ে তিনি বেশী করে জানতেন যে, শত্রুর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার সুযোগ সহজে মেলে না; যখন সত্যই তা এসে হাজির হয়— বেশীক্ষণ থাকেও না। সঙ্কট-ক্ষণ বজায় থাকার মধ্যেই দরকষাকষি সেরে নিতে হয়। তিনি আরও জানতেন, জনসাধারণের উন্মাদনা যখন চরমে, তখন কোনো বোঝাপড়া করতে হলে খুব সাহসের দরকার হয়—তাতে কিছু জনপ্রিয়তা খোয়াতেও হতে পারে। কিন্তু তাঁর অন্তরে সাহসের অভাব ছিল না। নিজের সঠিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন—তা বাস্তববাদী রাজনীতিকের—তাই জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় তিনি করতেন না।

"দেশবন্ধুর পাশে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা মোটেই পরিষ্কার নয়। বহু ব্যাপারে গান্ধী চূড়ান্ত রকমের আদর্শবাদী ও স্বপ্নবাদী। অন্য অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি রাজনীতিক। কখনো তিনি ষণ্ডাণ্ডের মত অবুঝ একগুঁয়ে, অন্যত্র শিশুর মত আত্ম-সমর্পণকারী। রাজনৈতিক দরাদরির জন্য প্রয়োজনীয় সহজ-বোধ বা বিচারবুদ্ধির প্রকট অভাব তাঁর মধ্যে। দরাদরির যথার্থ সুযোগ যখন আসে, ১৯২১ সালে যেমন এসেছিল, তখন সামান্য জিনিস আঁকড়ে থেকে মূল জিনিস তিনি ভণ্ডুল করে দেন। আর তিনি নিজে যখন বোঝাপড়ার জন্য যান, যেমন ১৯৩১ সালে, তখন নিয়ে আসার চেয়ে দিয়ে আসেন বেশী। সব জড়িয়ে ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকদের সঙ্গে যুঝবার যোগ্য মানুষ তিনি নন।"

॥ ৪ ॥

দেশবন্ধু তাঁর সর্বাত্মক রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে গান্ধী-নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলনের সহ-নেতা। অসহযোগ আন্দোলন তারপর নেতৃত্বের ত্রুটিতে ব্যর্থ হলে দেশবন্ধু আন্দোলনকে নূতন খাতে প্রবাহিত করার ব্যাপারে প্রধান মূল নেতা। অসহযোগকে আইনসভার ভিতরে প্রবেশ করাবার জন্য তাঁর পরি-কল্পনা, ১৯২২-এর গয়া-কংগ্রেসে সভাপতিরূপে তাঁর সেই প্রস্তাব পেশ, পরিবর্তন-বিরোধী গোঁড়া গান্ধীবাদীদের হাতে তাঁর পরাজয়, কংগ্রেস-সভাপতি পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ ও স্বরাজ্য পার্টি গঠন, মতিলাল নেহরু প্রমুখের সহযোগিতায় সেই স্বরাজ্য দলকে ভারতীয় রাজনীতির বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করা, ক্রমে গান্ধী-বাদীদের পরাজয়ের মুখে এগিয়ে নিয়ে

* (৫) চৌরিচৌরার পরে খাস গান্ধী-মহলেও যে তাঁকে 'ডিক্টেটার' মনে করা হয়েছে, একথা টেণ্ডুলকরের জীবনীতেও পাই। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর চাপে পড়ে আন্দোলন-বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, কিন্তু প্রস্তাবটি অক্ষত আকারে বেরিয়ে আসেনি। টেণ্ডুলকর তাঁর 'মহাত্মা' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন :

"In the end Gandhi triumphed. But he suffered keenly, for he realised the majority was not backing him sincerely. He knew that some of those who voted for him called him 'dictator' behind his back. He knew that he no longer reflected the sentiment of the country.'

গিয়ে কংগ্রেসের কাছ থেকে স্বরাজ্য-নীতির অনুমোদন আদায় করে নেওয়া, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনকে অচল করে দেওয়া—দেশবন্ধুর এই সকল রাজনৈতিক কীর্তিকলাপ বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন এখানে নেই। আমরা যেহেতু দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক নির্ণয় করতে চাইছি তাই প্রথমতঃ সুভাষচন্দ্রের দিক থেকে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে এসেছি—সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু-চরিত্রের কোন্ গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং দেশবন্ধুকে কেন নিজের রাজনৈতিক গুরু বলেছেন। এর উল্টোদিকে আছে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবন্ধুর মনোভাব। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে—সুভাষচন্দ্রকে তিনি নিজের পুত্র এবং রাজনৈতিক পুত্র—উভয়ই মনে করতেন। দেশবন্ধুর বিপুল ব্যক্তিগত ভালবাসা সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন—দেশবন্ধুপত্নী বাসন্তীদেবী, দেশবন্ধুকন্যা অপর্ণাদেবী থেকে আরম্ভ করে সকল সূত্র থেকেই এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। দেশবন্ধুর অপূর্ব ভালবাসাকে অনুভব করে সুভাষচন্দ্র অবরুদ্ধ ভাষায় লিখেছিলেন, "ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না।"

রাজনৈতিক ভাবেও দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে নিজের 'ডান হাত' বলে মনে করতেন—একথা সেকালে সকলেরই জানা ছিল: একালে হয়ত প্রমাণ দেবার দরকার হতে পারে। তাহলে জীবনীকার ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অপর্ণাদেবী প্রভৃতির সাক্ষ্য সহজেই উদ্ধৃত করা যায়। (৬) দেশবন্ধুর একান্ত অনুগত এবং

(৬) ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন :

"সুভাষচন্দ্রকে ধরিবার পর তিনি বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। প্রায়ই তিনি বলিতেন, "মানুষের ডান হাত কাটিয়া নিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে, আমিও সেইরূপ যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতেছি।"

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে লিখেছেন :

"প্রিয় সহকর্মীদের অভাবে তিনি খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের অভাব তিনি বেশী উপলব্ধি করতেন। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বৃটিশ গভর্নমেন্ট সত্যিই পিতৃদেবের ডান হাতখানাই যেন কেটে দিল।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মাসিক বসুমতীর ১৩৩২, ভাদ্র সংখ্যায় 'রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন' প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন :

"সুভাষের পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব?......তিনি চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্যই তাঁহার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উপর কর্পোরেশনের গুরুভার অর্পণ করেন।"

চৌরিচৌরার ঘটনার পরে সহসা গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহার ভারতের মত ইংলণ্ডকেও বিস্মিত করেছিল। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ১৫ জানুয়ারী, ১৯২২-এর এই রিপোর্ট দেখা যায়, গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও ডেইলী টেলিগ্রাফ প্রভৃতি কাগজ কী প্রচণ্ড আক্রোশের মনোভাব দেখিয়েছিল।

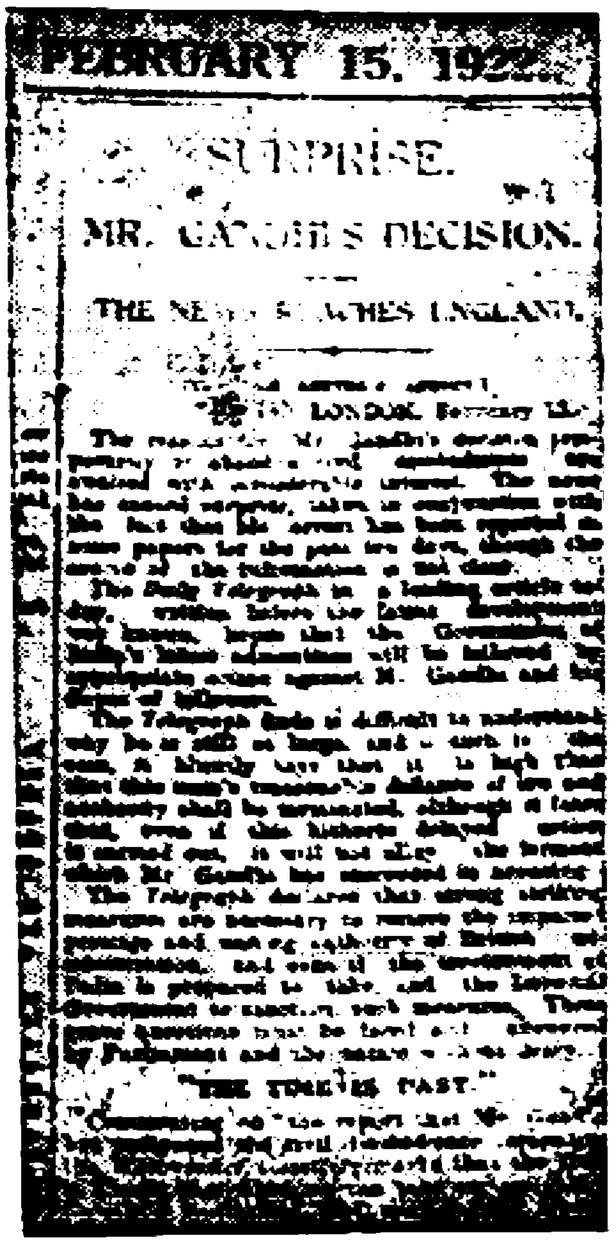
FEBRUARY 15, 1922.

SURPRISE.

MR. GANDHI'S DECISION.

THE NEWS REACHES ENGLAND.

LONDON, February

"THE SOONER THE FEELING PAST."

সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সহকর্মী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর কথা আর নাই উল্লেখ করলাম।

এখন প্রশ্ন—বহু প্রবীণ দেশকর্মী থাকতেও সুভাষচন্দ্র কেন দেশবন্ধুর ডান হাত? কেন দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে বলেছিলেন 'My best man?' আমার স্পষ্ট উত্তর—দেশবন্ধুর অধিকাংশ রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা প্রয়াসকে সফল করার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তেমন কয়েকটিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

(ক) অন্য প্রসঙ্গে আমার আগে বলে নেওয়া যায়, সুভাষচন্দ্রের আই সি এস-ত্যাগ ব্যাপারটিই বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। চিত্তরঞ্জন আদালত ত্যাগ করেছিলেন, আর তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আই সি এস ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র—যে আই সি এস তখন ভারতবাসীর কাছে স্বর্গোদ্ভূত চাকরি!' গণ-উন্মাদনা বৃদ্ধিতে আই সি এস-ত্যাগের বিশেষ মূল্য ছিল।

(খ) অসহযোগ যে-সমস্ত 'ত্যাগে' আহ্বান জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে সর্বাধিক সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল, স্কুল কলেজ-ত্যাগ। শিক্ষার সঙ্গে এই 'বিরোধকে' রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই বিশেষ অপছন্দ করেছিলেন। এবং বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা না করে শিক্ষা-নামক সামান্য যেটুকু বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, তার বর্জন সত্যই মনঃপূত হওয়ার কথা নয়। অসহযোগীরা এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার নমুনাব্যবস্থা অন্ততঃ করবার চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশে 'গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তন' স্থাপন করে, যার অধীনে ছিল 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' বা ন্যাশন্যাল কলেজ। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারটি পরিকল্পনায় যত বড় ছিল কাজে তত বড় হয়ে উঠছিল না, 'বিদ্যাপীঠ' রবীন্দ্রনাথের কথামত 'বিদ্যার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন' হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কারণ প্রথম অবস্থায় যাঁরা ভার পেয়েছিলেন বা নিয়েছিলেন, তাঁরা এই ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই আশান্বিত ছিলেন না, উল্টোপক্ষে বিদ্যাপীঠের আসরকে দলাদলি চর্চার চলাও আসর বলেই মনে করেছিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত ঘটে এবং ছাত্ররা সরে পড়তে থাকে। যারা তখনও বজায় থাকে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিদ্যাপীঠের অন্যতম অধ্যাপক কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এসব কথা তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে সবিশেষ জানিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধুর কর্মনিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে যখন আই সি এস-ত্যাগের মতলব করেছেন, তখনি তিনি 'বাংলাদেশের স্বদেশ সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক' দেশবন্ধুর কাছে পেট-ভাতায়

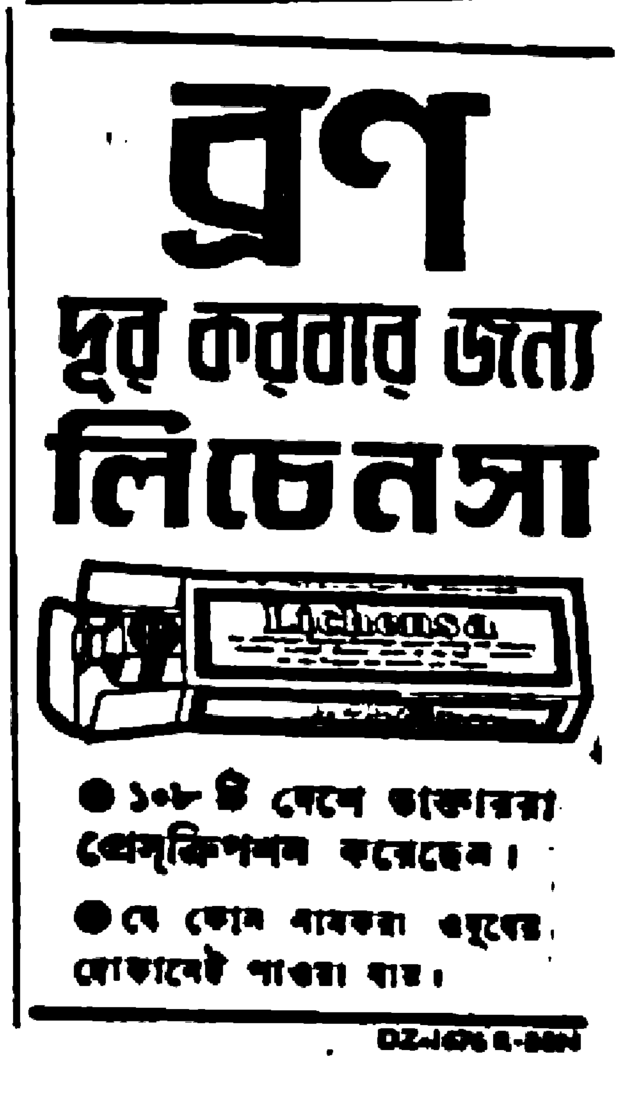

স্বদেশ সেবার চাকরির ("অবশ্য আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ দিবেন, কারণ চাকুরি ছাড়ার পর বাড়ি থেকে টাকা লওয়া বোধহয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না") আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ঠিক আবেদনকারীর ভঙ্গিতে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে কেবল কথা লিখেছিলেন, তার মধ্যে জাতীয় কলেজে নিম্নশ্রেণীতে অধ্যাপনার জন্য বিশেষ আবেদন ছিল।

• (৭) কলিকাতা বিদ্যাপীঠে উক্ত অবস্থার পটভূমিকায় দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন—তাঁকে অধ্যক্ষ ও কিরণশঙ্কর রায়কে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। বিদ্যায়তনের তৎকালীন কর্তারা এই নিয়োগকে পছন্দ করবেন না বলে দেশবন্ধুকে 'দখল' নেবার হুকুমনামা পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

• (৮) এবং সুভাষচন্দ্র যতদিন এই চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন জানুয়ারি থেকে প্রিন্সিপাল-সর্বকার্য সুচেষ্টারূপে সমাধা করে বিদ্যাপীঠের লুপ্ত মর্যাদা কিছু উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(গ) কংগ্রেসের 'ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' এবং 'পাব্‌লিসিটি ডিপার্টমেন্ট' থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্র পূর্বোক্ত পত্রে দেশবন্ধুকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। অবহিত দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের প্রার্থনামত তাঁকে কংগ্রেসের পাব্‌লিসিটি অফিসার নিযুক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সাফল্য বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়:

"কংগ্রেসের প্রচারসচিব হিসাবে সুভাষচন্দ্রের কাজ শত্রু মিত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপূর্ব ছিল তাঁর কর্মপদ্ধতি। প্রচারের ব্যাপারে সরকার কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উপর চড়ে বসতে চেয়েছে কি সুভাষচন্দ্রের শ্যেনচক্ষু সেখানে গিয়ে পড়েছে। পরদিনই কংগ্রেসের পক্ষ বেরুত মোক্ষম উত্তর, যা সরকারকে ধূলিসাৎ করে দিত। সরকারের প্রেসনোট বা বুলেটিনের মধ্যে যেখানেই দুর্বলতার লক্ষণ, অবিলম্বে তিনি তা ধরে ফেলতেন এবং কৌশলী বিশ্লেষণের দ্বারা তার দ্রান্ত চেহারাকে খুলে ধরতেন। কলকাতার ইউরোপীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে অস্বস্তি গোপন করতে পারত না। তাদের একটি লিখেছিল, সুভাষ বোসের পদত্যাগের দ্বারা সরকার সেরা একজন সেবক হারিয়েছে—যাকে পুরোপুরি পেয়ে অপরপক্ষে কংগ্রেস বলীয়ান হয়েছে। কংগ্রেস-প্রচারপত্রে তাঁর ভাষা সর্বদা অতি স্পষ্ট পরিষ্কার; তার আবেদন সরাসরি জনগণের হৃদয়ে পৌঁছে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলত। কী জানাতে চাইছেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র জাগত না কখনো, কারণ ভাবের অস্পষ্টতা কখনো তাঁর মধ্যে ছিল না এবং বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার উপযুক্ত ভাষার অভাবও ঘটত না।"

(ঘ) সুভাষচন্দ্র আবাল্য সামরিক শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। সুতরাং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়কত্বের পদকে বিশেষ পছন্দ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই—বিশেষতঃ এই সূত্রে যখন তাঁর প্রিয় তরুণদের সংগঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অসহযোগের পূর্ণ প্রাবল্যের সময়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্বের কাজের গুরুত্বের কথা না বললেও চলবে।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্ব সুভাষচন্দ্র সত্যই কী দারুণ দক্ষতার সঙ্গে করতে পেরেছিলেন, তার চরম দৃষ্টান্ত প্রিন্স অব ওয়েলস বয়কট আন্দোলনে। এই বয়কট আন্দোলনে সাফল্য দেশবন্ধুকে 'বিরাট মর্যাদা' দিয়েছিল—এবং তা সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা, যদিও আরও বহু জিনিস সক্রিয় ছিল এক্ষেত্রে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান—খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা।

১৯২১, নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনকে সুভাষচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে অতি মঙ্গলজনক মনে করেছিলেন, কারণ ডিসেম্বরের মধ্যে গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত স্বরাজের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছিল না এবং জনসাধারণের উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছিল। এই সময়েই প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন সংবাদ ঘোষিত হল এবং কংগ্রেস অবিলম্বে তাঁর সংবর্ধনা বয়কটের ডাক দিয়ে গণ-উন্মাদনা সৃষ্টির নতুন সুযোগ পেল। খুবই বিস্ময়ের কথা, গান্ধীজীর মূল প্রভাবক্ষেত্র বোম্বাইয়ে, কিন্তু ১৭ নভেম্বরের বয়কট (যেদিন প্রিন্স বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন) মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয়নি—অপরদিকে তা বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছিল কলকাতায়—সে সাফল্য এমনই সর্বাত্মক যে, সরকার বিচলিত হয়ে পড়েছিল রীতিমত। অথচ স্মরণ রাখতে হবে, কলকাতা তখন বৃটিশ-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, আর বোম্বাইয়ে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত শক্তি।

(ক্রমশ)

(*৭) দেশবন্ধুর কাছে স্বদেশ সেবার আবেদনপত্রটি সত্যই আবেদনপত্র ছিল। সুভাষচন্দ্রের ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১-এর চিঠিটির অর্থাবিশেষ সত্যই কৌতুকজনক, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঋজু স্পষ্ট চরিত্রের আর কোন্ অকাট্য প্রমাণ সম্ভব?—

"আপনি আমাকে বোধহয় চিনেন না—কিন্তু আমার পরিচয় দিলে বোধহয় চিনিতে পারিবেন।...কাজের কথা আরম্ভ করিবার পূর্বে আমাকে নিজের sincerity আগে প্রমাণ করিতে হইবে।...

"আমার পিতা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে সেখানকার গভর্ণমেন্ট প্লিডার ছিলেন। আমার একজন দাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার...। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। ১৯১৬ সালের গোলমালের সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে expelled হই। দুই বৎসর নষ্ট হইবার পর আমি কলেজে পড়িবার অনুমতি পাই। তারপর ১৯১৯ সালে আমি বি-এ পাস করি এবং অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এখানে আসিয়াছি। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করি। এই বৎসর জুন মাসে আমি Moral Science Tripos পরীক্ষা দিব। সেই মাসে আমি এখানকার বি-এ ডিগ্রি পাইব।...

"আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আমাকে স্বদেশসেবার যজ্ঞে কি কাজ দিতে পারেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, যৌবনোচিত উৎসাহ আমার আছে। আমি অবিবাহিত।

"লেখাপড়ার মধ্যে আমি Philosophy-টা একটু পড়েছি কারণ কলিকাতায় আমার ঐ বিষয়ে অনার্স ছিল এবং এখানেও আমি ঐ বিষয়ে Tripos পড়িতেছি। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কৃপায় সর্বসম্প্রদায় শিক্ষা খানিকটা হইয়াছে—যেমন Economics Political Science, English and European History, English Law, Sanskrit, Geography ইত্যাদি।"

• (৮) সাবিত্রীপ্রসন্ন এসম্পর্কে লিখেছেন:

"আমরা সেদিন যখন ট্রামে চেপে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে নামলাম তখন বেলা তিনটে বেজেছে। ফরবস্-ম্যানসনে বিদ্যাপীঠের অফিসে প্রবেশ করে দেখলাম—কেবল মাখনচন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও অমূল্য সেনকে। সুভাষচন্দ্র মাখনবাবুর হাতে দেশবন্ধুর চিঠিখানি দিয়ে বসে পড়লেন—আমি ও কিরণবাবু তখন দাঁড়িয়ে। মাখনবাবু চিঠিখানি পড়ে যেন একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেন, বললেন—'এরকম peremptory নির্দেশের অর্থ ঠিক বুঝলাম না। যাহোক, ভালই তো, আপনারা চালান না, আমরা তো বেঁচে যাই।' সুভাষবাবু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মাখনবাবু বললেন, চার্জ-ফার্জ বোঝানোর কিছু নেই—আমরা উঠলাম—আপনারা বসে পড়ুন।' এই বলেই তিনি শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন—আমরা সত্যসত্যই বসে পড়লাম।"

এর আগেকার বিবরণ, সাবিত্রীপ্রসন্ন প্রভৃতি দেশবন্ধুকে বিদ্যাপীঠের বিশৃঙ্খলার ও ছাত্র-বিদ্রোহের কথা জানিয়েছেন। "প্রায় ঘন্টাখানেক কথাবার্তা হওয়ার পরে ঠিক হয়ে গেল যে, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর ও আমাকে সেইদিনই কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের 'দখল' নিতে হবে। এই মর্মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে দেশবন্ধু একখানি ক্ষমতাপত্রে নিজের নাম সই করে সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন।"

কি জানি কেন অঘটন ঘটেছে আমার জীবনে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এই অঘটনের আবির্ভাব। যতদূর মনে পড়ে সালটা ছিল ১৯৭৭। মাসটা আমার মনে নেই। কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগে অভিযোগ আসছে লাগাতার একটার পর একটা। সে ঠকিয়েছে হাজার হাজার টাকা, লাখ-লাখ টাকা। শুধু টাকা নয়, মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, হীরামণিরত্ন আরও কত কি?

কিন্তু কে ঠকিয়েছে? এক স্ত্রীলোক। এক বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী। একের পর এক এল নালিশ। নালিশের স্রোত। নালিশ এল কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে, নালিশ এল বিখ্যাত বস্ত্রালঙ্কার-বিপণির মালিকদের কাছ থেকে, নালিশ এল মাদ্রাজ, বম্বে, সুদূর চট্টগ্রামের বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। গোয়েন্দা বিভাগ নাজেহাল। কে এই নারী? কে এই অশরীরি নারী যিনি নিমেষে উধাও হয়ে যান অপরাধের কোন চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করে দিয়ে? কে সেই নারী যিনি রহস্যময় বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন শুধু কলকাতায় নয়, চট্টগ্রামে, মাদ্রাজে, বম্বেতে ও সুদূর প্রাচ্যে? রহস্যময়ী নারী এক হাতে হাজার হাজার টাকার দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করেন এবং অন্য হাতে ভুয়া চেক লিখে দেন? সেই নারী ইংলণ্ডবাসিনীর মত কথা বলেন অপ্রতিরোধ গতিতে, নিমেষে জয় করে নেন ব্যবসায়ীদের সন্দেহপ্রবণ মন। তাদের দক্ষ চক্ষে ধুলো দিয়ে, ক্ষিপ্রগতিতে তাদের মহামূল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন—তারপরই মিথ্যা নাম, মিথ্যা ধাম, মিথ্যা পরিচিতি দিয়ে হাসিমুখে অদৃশ্য হয়ে যান? কে এই নারী?

কে সেই নারী যিনি দেন-তিনি দেন তার সম্ভ্রান্তের পরিচয়। আমরা তাঁর নাম জানি বিনীতা—যেহেতু তিনি বিনীতার অপভ্রংশ। তাঁর নামের সঙ্গে মনের মিল নেই—দেহেরও নেই। গৌরবর্ণা, ঋজু, তাঁর শরীর, স্থূলকায়া নন। দীর্ঘাঙ্গী বলতে পারেন, বিস্ফারিত নেত্র, ক্ষিপ্রগতি, নির্ভীক ভাব—আর ছিল সেই দেহে অনন্যসাধারণ রূপ, যে রূপ ছিল উদ্ধত, অপ্রতিহত,

ফটো : মার্কণ্ডেয় সিংহ

অপরাজিত। যে রূপ ছিল নিম্নগামী, চিত্তবিভ্রান্তকারী ও বিকৃত, যার মধ্যে স্নিগ্ধের কোন চিহ্নই ছিল না। এই রূপই তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল অকরুণ পরিহাস, নিষ্ঠুর পরিণাম। সবটাই কি জীবনে পাওয়া যায়? কিন্তু পাওয়া না গেলেও তাঁর জীবনে সবটাই যেন পাওয়া যেত। তিনি ছিলেন অর্থকারিণী, বিভ্রান্ত দৃষ্টিমাত্র, বিপদের পথে অপরূপ রূপ-রাপিনী।

প্রথম অভিযোগপত্র এল কলকাতা থেকে—হগ মার্কেটের কোন এক বিশিষ্ট 'শাড়ী-মহারানীর' কাছ থেকে। তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তারপর এল পার্ক স্ট্রীটের 'মাদাম্ মঁদ'-এর দোকান থেকে—সে 'মাদাম্ মঁদ' আজ আর নেই—তারপর এল বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। সবশুদ্ধ বারোটি নালিশ। পুলিশ অনুসন্ধানের পর এল আরও নালিশ—বম্বে, মাদ্রাজের বিশিষ্ট বণিকদের কাছ থেকে। কি করা যায়? সবই এক নালিশ—তিনি দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গেছেন, আর তার বিনিময়ে দিয়ে গেছেন ভুয়া চেক—যে-চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসেছে, যেহেতু সই জাল এবং যাদের নামে সই হয়েছে তারা বিখ্যাত রাজন্যবর্গের পরিবার। তাঁরা কেউ হয়তো বেঁচে আছেন—কেউ হয়ত বা বেঁচে নেই।

শুরু হোল পুলিশী অনুসন্ধান। হগ মার্কেটে যেখানে তিনি ভুয়া চেক দিয়ে দ্রব্যসম্ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীমতী বিনীতারই এক পরিচিত ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন তাঁদের বিপণিতে তাঁর আকস্মিক উপস্থিতিতে। তাঁর কাছেই জানতে পেরেছিলেন পরে কে এই রূপ-লাবণ্যময়ী নারী, যিনি তাঁদের ঠকিয়ে চলে গেছেন।

ভয় পেয়েছিলেন তাঁরাও আদালতে নালিশ জানাতে। প্রথমে চেয়েছিলেন সোজাসুজি পথ। যে-পথে নেই হাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলরব, নেই কোলাহল, আদালতের কঠিন কিউপজ্জ্বায়া, কেই বা চায়? কিন্তু বিধির বিধান? তাঁরা সদলবলে শ্রীমতী বিনীতার গৃহে উপস্থিত হলেন, অভিযোগ জানালেন, কিন্তু উপেক্ষিত হবার জন্যে। যে নারীমূর্তির আবির্ভাব হোল তাঁদের সমীপে, তাঁকে তাঁরা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন, কিন্তু শ্রীমতী বিনীতা তাঁদের চিনতে পারলেন না। তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন তাঁর অপরাধের কথা। যিনি কোনদিন হিন্দু দেবদেবীর নাম নেননি, তিনিই অঙ্গীকার করলেন দেবতার নামে, যে কোনদিন কোন সময়েই হগ মার্কেটে অভিযোগকারীদের বিপণিতে যাননি। এ-শপথ বাক্য শুধু যে তাঁদের সামনে হোল, তা নয়, তাঁর স্বামীর সম্মুখে। তাঁর এই শপথকে পুরোপুরি মর্যাদা দিলেন তাঁর স্বামী। শুরু হল ঝড়।

শুরু হোল গোয়েন্দার কাজ। তিনি কে? কোথাকার লোক তিনি? তাঁর হাঁদশ কোথায় ছিল? কে তাঁর মাতাপিতা? কে তাঁর স্বামী, যে ভুয়ো চেক তিনি ছাড়িয়েছেন বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন বিপণিতে, সারা দেশ জুড়ে, সেই চেকগুলির সবই কি তিনি মালিক? ব্যাঙ্ক থেকে উত্তর আসতে দেরী হোল না। উত্তর এলো এই জাল চেকের অর্ধভাগ এক ইংলন্ড নিবেশিনীর, যিনি জানিয়েছিলেন তাঁর চেক বই খোওয়া গেছে আর বাকী চেক শ্রীমতী বিনীতাকেই দেওয়া হয়েছিল তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে তাঁর যৌথ হিসাব ছিল এবং যেদিন সে চেক বই বিনীতা গ্রহণ করেন তার দুদিন পরেই শ্রীমতী ব্যাঙ্ককে জানান যে, তাঁর চেক বই খোয়া গেছে এবং নতুন চেক বই নেন।

কিন্তু কে তাঁর স্বামী? তার নাম মর্মর মিত্র—সবাই তাকে 'মারমার' বলে ডাকতেন। শিক্ষা তাঁর ইংলণ্ডে, কর্মস্থল ভারতে। তিনি ছিলেন ভারতের কোন এক রেল শাখার বিরাট রাজকর্মচারী। তিনি বিশ্বাস করলেন না, বিশ্বাস করলেন না তাঁর স্ত্রী এত অবৈধ কাজ করতে পারে বলে? কি করেই বা পারবেন? কোথায় তাঁদের অর্থের অভাব? কোথায় অর্থের অনটন? কিসের প্রয়োজনে তাঁর স্ত্রীর এই অবৈধ আচরণ? অবাস্তব! অসম্ভব! তাঁকে আর তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে শত্রুমহল বে-ইজ্জত করতে চাইছে।

একদিন সকালে আমার অফিসে মার্মার সাহেব এসে হাজির। মুখ থেকে চেস্টনাট পাইপটা নামিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, 'জানেন, এরা কি করতে চাইছে? করতে চাইছে ব্লাকমেইল, আমি কিছু বলব না। শুধু আমার অনুরোধ, আপনি সত্যকারের তদন্ত করুন—নিশ্চয়ই হদিশ পাবেন। তারপর, আমি তাদের ক্লাস করব, গুঁড়িয়ে দেবো'। এই ছিল আমার কাছে তাঁর আবেদন।

গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান একের পর এক চালালো। কিন্তু বারে বারেই, কি গুপ্ত, কি মুক্ত তদন্তের শেষ অঙ্গুলী-নির্দেশ বিনীতারই ওপর। যেথায়, যখন, যেভাবেই তদন্ত করেছি, সেইখানেই এক কথা, এক প্রশ্ন—উক্ত পরিবারের তরুণী, উচ্চশিক্ষিতা ও বৈভবশালী পরিবারের যদি কেন জায় শঠতা, চতুরতা করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে যায় এবং বেশ নির্লিপ্ত-ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, তবে কি বলতে হবে আমাদের দেশের আইন পঙ্গু? এদেশের এক আইন দরিদ্রের এবং আর এক আইন বিত্তশালীদের জন্যে? ভারতের অপরাধ আইনবিধি কি সবাকার জন্যে নয়?

বিনীতা খবর পেলেন যে, আদালতের নির্দেশে গোয়েন্দা দপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছে এবং শীঘ্রই পুলিশী তদন্তের রিপোর্ট আদালতের

CENTRAL LIBRARY

কাছে পেশ হবে। তিনি তখন অস্থির, চঞ্চল। কিন্তু কেন এ-অস্থিরতা? তিনি খবর পেলেন গোয়েন্দা সর্বত্রই তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে অথচ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আসছে না।

মনে মনে তিনি হাজারও জবানবন্দীর খসড়া করে ফেলেছেন, তাঁর স্বপক্ষে নিখুঁৎ নির্ভেজাল বক্তব্য খাড়া করে ফেলেছেন—শুধু পুলিশ এলেই হোল—তারপরই অবলীলাক্রমে তাঁর মন্তব্য বলে যাবেন যার মাঝে প্রমাণ পাবে কিভাবে তাঁকে আর তাঁর সংসারকে কয়েকটি লোক নেহাৎই অপদস্থ করার জন্যে ব্যস্ত, কিভাবে তাঁরা তাঁর সুনামকে হনন করে তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের চরিতার্থ করতে চায়।

কিন্তু হায়! পুলিশ এলো না। একবারও প্রশ্ন করতে না। যতদিন যায়, ততদিন তিনি গোয়েন্দারা তাঁর সম্বন্ধে কি জানতে পেরেছে তাই ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন না এতটুকু যে, যে গোয়েন্দা তাঁর সম্বন্ধে তদন্ত করছে, সে ইচ্ছে করেই আসেনি, ইচ্ছে করেই গা-ঢাকা দিয়েছিল, শুধু জানতে বিনীতার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

এইখানেই বিনীতার হোল পরাজয়। তিনি আর পারলেন না। এক সকালে যখন আমি অফিসের কাজে ব্যস্ত, শ্রীমতীর টেলিফোন এল। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এ আবার আপনাদের কি রকম তদন্ত? অপরাধীকে আপনাদের খুঁজে বার করার একি প্রয়াস? আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছেন অথচ আমাকে প্রশ্ন করার অবকাশ পাচ্ছেন না? একি একতরফা তদন্ত? কবে আসছেন তাই বলুন? আগে থেকে না বললে আমি বাড়ী নাও থাকতে পারি তো?' কথাগুলি বাংলায় বললেন না—ভকভকে, ঝরঝরে ইংরেজি ভাষায়—অক্সোনিয়ান ঢঙে। কণ্ঠে তীব্র ঝাঁজ—তিনি যে প্রভাবশালিনী, বিত্তশালিনী সে-কথা আমায় সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিতে তাঁর এতটুকুও বিলম্ব হোল না। প্রত্যুত্তরে সবিনয়ে তাঁকে জানালাম—আমি যথাসময়ে যাব, তবে যাবার দিনক্ষণ বলতে পারছিনে। তার কারণ একধারের তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

ইতিমধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের সাহায্যে যে বিদেশিনীর চেক ভুয়া নামে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা হোল। তিনি জানালেন ১৯৪৬ খৃঃ যখন চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আসছেন এক প্রথম শ্রেণীর কামরায়— সেই সময়ে তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন শ্রীমতী বিনীতা মিটার। কিছু সময়ের জন্যে তিনি স্নানঘরে যান। ফিরে এসে তাঁর চেকবুক পাননি। কি করে তাঁর চেক-বই অদৃশ্য হোল তা তিনি জানেন না। তবে ঐ সময়ে প্রচণ্ড বেগে রেলগাড়ী ছুটছিল এবং তাঁর কামরায় শ্রীমতী বিনীতা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

বিনীতার খবর আরও পাওয়া গেল। কোন সুদূর দাক্ষিণে, কোন এক মিশনারী স্কুলে পড়ার সময় তাঁকে স্কুলের কর্তৃপক্ষ বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন চুরির দায়ে। একটা শুধু চুরি নয়, একটার পর একটা অজস্র চুরি।

বিনীতার স্বামী বিদগ্ধ, বিত্তশালী এবং বিরাট সরকারী কর্মচারী। তাঁর না ছিল অর্থের অভাব, না ছিল সামর্থ্যের। উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি বহু অর্থের অধিকারী। কিন্তু এই আর্থিক অনুকূলতা সত্ত্বেও কিভাবে তাঁর স্ত্রী এই অবৈধ কাজ করতে পারে সেটা তাঁরও যেমন চিন্তার বাইরে, আমারও বাইরে।

ইতিমধ্যে এক অঘটন ঘটে গেল। এক সন্ধ্যায় শোবার সিনেমার সাড়ে ছটার প্রদর্শনী শেষ হবার পর যখন সিনেমা-যাত্রীরা ঘরমুখপানে চলেছেন, সেই সময় ভিড়ের মাঝে কোন এক বিখ্যাত বিপণির মালিক এবং তাঁর কর্মচারীরা বিনীতার পথরুদ্ধ করলেন—তাঁরা চিনতে পেরেছেন বিনীতাকে, যিনি হাজার হাজার টাকার রেশমী বস্ত্র নিয়ে তার বদলে ভুয়ো চেক দিয়েছিলেন। হায়! সেদিনই বিনীতার সঙ্গে ছিলেন এক বিরাট দেশকর্মীর সহধর্মিণী। সবাই হতবাক। হতবুদ্ধি। সে-যাত্রায় নিস্তার পেলেন বটে। কিন্তু তাঁর নাম-ধাম সর্বসমক্ষে দিয়ে যেতে হোল। সর্বসমক্ষে তিনি হলেন হতমানিনী।

ঠিক তার তিন-চারদিন পরের ঘটনা। আমাকে মাড্মার সাহেব টেলিফোন করলেন—জানতে চাইলেন কবে আসছি? দিন, তারিখ, ক্ষণ সব বলে দিলাম। জানালাম, আমি তদন্তে যা পেয়েছি সেই সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর জবানবন্দী নিতে হবে আর নিতে হবে শ্রীমতীর হস্তলিপির নমুনা।

যথাসময়ে গেলাম মারমার সাহেবের গৃহে। তিনি উপস্থিত। তার উপস্থিতিতে তার সহধর্মিনীর জবানবন্দী গ্রহণ করলাম—কিন্তু সেই জবানবন্দীতে আমার কোন প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে পারলেন না। এরপরই আমি তাঁর হস্তলিপির নমুনা নিলাম। যে নাম, যে কথা তিনি চেকে লিখেছিলেন, সে কথা এবং অক্ষরগুলি সমন্বিত করে এক তালিকা আমি পূর্বেই তৈরী করেছিলাম, সেই তালিকা আমি পড়তে লাগলাম আর তিনি লিখতে লাগলেন।

ক্ষিপ্রগতিতে লিখে চলেছেন, লিখে চলেছেন বিদ্যুৎবেগে আমার বলার আগেই তাঁর যেন লেখা শেষ হয়ে যাচ্ছে—শুধু লক্ষ্য করছি সারি সারি ইংরাজী অক্ষরের আঁচড়ের দাগ—ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাঁর লেখার সঙ্গে চেকের লেখার মিল কোথায়? ঠিক এই সময়ে বিনীতা চিৎকার করে উঠলেন

"Do you want my fingers to get cramped ?"

সবিনয়ে জানালাম যে আমার কাজ শেষ হয়নি। হঠাৎ মারমার সাহেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,

'No Binita! Let him be satisfied that there is nothing wrong with your writing. Anyway, would you care for a dash of Port and whisky for a pick up?'

তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। বেয়ারা Whisky Port punch নিয়ে এলো। এই হোল আমার সুযোগ—শ্রীমতী আর আগেকার মত স্বার্থরক্ষার্থ লেখনী নিয়োজন করতে পারলেন না—ধীরে ধীরে তিনি নিজের হস্তলিপিকে কোনভাবেই গোপন করতে পারলেন না। তাঁর হস্তলিপির নমুনা সর্বতোভাবে চেকের লেখার সঙ্গে আপাতঃ দৃষ্টিতে মিলে গেল। পরে হস্তলিপিবিদ যে অভিমত দিলেন তাতে দেখা গেল যে, হস্তলিপির নমুনা সর্বাঙ্গীনভাবে চেকের লেখার সঙ্গে এক। এবং আরও এক অভিমত পাওয়া গেল যে, যিনি এই সব ভুয়া চেক দিয়েছেন এবং যিনি হস্তলিপির নমুনা দিয়েছেন তাঁরা একই লোক।

আদালতে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমার তদন্ত বিবরণী পেশ করলাম। হাকিম হতবাক, হতবুদ্ধি। তিনি শ্রীমতীকে জানতেন পূর্ব থেকে—প্রশ্ন করলেন আমাকে, 'কেন সে করবে? টাকাকড়ির কোথায় তাঁর অভাব?' উত্তর দিলাম 'জানিনে। তবে যা ঘটেছে, তাই লিখেছি। হাকিম সমনজারীর নির্দেশ দিলেন।

তারপরই শুরু হোল অশান্ত বাতাস, ঝড়। সে ঝড়ের দোলা যে তদন্তকারীর মনে শুধু লাগলো তা নয়, সে দোলা লাগলো শ্রীমতী এবং শ্রীমতীর স্বামীর মনে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোল। চারধার থেকে চাপ আসতে লাগল—কোন রকমে মিটিয়ে নাও—এ তো খুন-খারাপি নয়? এ এক ঠকবাজি। যাঁরা অভিযোগ করেছেন, সে সম্বন্ধে তো তদন্ত করা হয়েছে। তারা তো খুসী। আর তারা যে টাকা ঠকেছেন সে টাকা যদি সাহেব দিয়ে দেন তো গোলমাল চুকে গেল? আর আইনে তো মিটমাটের কোন বাধা নেই?

মারমার সাহেব তখন বুঝতে পেরেছেন গোটা ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেছেন যে, যেটা তিনি সহজ সরল করে ভাবছিলেন সেটা অতটা সহজ নয়। তাঁর কাছে সমস্ত জিনিসটা গভীর জটিল বলে মনে হোল। মনে হোল যেন তিনিই অপরাধী, তিনিই অভিযুক্ত, সব আস্থা যেন হারিয়ে ফেলেছেন নিজের ওপর। তিনি বিশ্বাস করলেন না—বিশ্বাস করলেন না পুলিশকে, বিশ্বাস করলেন না তাঁর স্ত্রীকে, বিশ্বাস করলেন না অভিযোগকারীদের। তিনি

CENTRAL LIBRARY

নিজেই নেমে পড়লেন মঞ্চে—নিজেই তদন্ত শুরু করলেন, শুধু আমাকে জানালেন ভুলে যাবার পূর্বে তিনি যাচাই করতে চান কোনটা সত্যি। কোনটা মিথ্যে। পুলিশের ভাষণ? না তাঁর স্ত্রীর ভাষণ? ফল ভালই হোল। তদন্ত করে তাঁর স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার মত বেশ কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ পেলেন। আর তাঁর কোন আবেদন নেই, নিবেদন নেই, তিনি বুঝলেন ব্ল্যাকমেইল যদি কেউ কাউকে করে থাকে, তবে তাঁর স্ত্রী বিনীতা নিজেকেই নিজে করেছেন।

এক সন্ধ্যায়, আমার ক্ষুদ্র আলয়ে মারমার সাহেবের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। সঙ্গে এসেছেন তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু ও রাজকর্মচারী। সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি কৌচে উপবেশন করেই বললেন, 'আপনার কাছে আজ এসেছি তদন্তের জন্যে নয়, সাহায্যের জন্যে। আপনি মিটমাটিতে সাহায্য করুন—এই প্রার্থনা। আমি সবাইকে টাকা দিয়ে যাবো।' মারমার সাহেবকে তখন দেখাচ্ছিল উদ্ভ্রান্ত, অসহায়, অবলম্বনহীন, সম্পূর্ণ রিক্ত, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাঁর দৃষ্টি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে কোন অজানা ব্যথায়। ধীরে ধীরে ক্লান্ত জড়িত কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন, 'জানেন আমি বিনীতাকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিচ্ছি শুশ্রূষার জন্যে।'

মিটমাট হয়ে গেল। যাঁরা যে টাকা হারিয়েছিলেন তার কড়াক্রান্তি হিসাবে সবাই ফিরে পেলেন। কারুর কোন অভিযোগ রইলো না। আদালতে হাকিম মামলা খারিজের হুকুম দিলেন। এইখানেই সব নালিশের নিষ্পত্তি। এইখানেই যবনিকার পতন।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে গেল। বিনীতা কি করে এ কাজ করতেন? তদন্তে দেখা গেল আজ হয়তো কলকাতার কোন এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে ঠকালেন—সেই রাত্রেই তিনি চলে গেলেন মাদ্রাজে পনের দিনের সফরে। যেদিন মাদ্রাজ ত্যাগ করবেন সেই সন্ধ্যায় মাদ্রাজের এক ব্যবসায়ীকে ঠকালেন এবং সেই রাত্রেই বম্বে পাড়ি দিলেন। বম্বেতে পক্ষকাল থাকার পর আবার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। বম্বে ভ্রমণের শেষের দিন কোন বম্বে ব্যবসায়ীকে ঠকানো। এইভাবে চক্রবৎ তাঁর অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ফলে কলকাতায় এক অপরাধ অনুষ্ঠানের পর যখন পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসতেন তখন প্রায় মাস দেড়েক পেরিয়ে গেছে। ক্ষণিকের দেখা মানুষ কে মনে করে রাখে? ক্ষণিক স্মৃতির সুবিধাই তিনি পুরোপুরি নিয়েছিলেন।

অপরাধীর মনস্তত্ত্বে দেখা যায় যে, অপরাধী যে সব স্থানে অপরাধ করে, সেই সব স্থানেই পরবর্তীকালে তার আবির্ভাব হয় এবং এর কারণও আছে। অপরাধীদের মনে নিহিত থাকে এক সাফল্যের স্পর্ধা, পূর্ণকামের স্পর্ধা—এই স্পর্ধার যতক্ষণ উৎকট প্রকাশ না হয় ততক্ষণ সে অপরাধী শান্তি পায় না। বিনীতার ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ দেখা গেল বিনীতা যেখানেই অপরাধ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন, সেখানে তাঁর একাকিনী কখনও আবির্ভাব হোত না। তাঁকে ঘিরে থাকত কয়েকজন শক্তিধর রাজন্যবর্গ যাঁরা বিনীতার দুষ্কৃতি-সন্ধির সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁরা সুন্দরী বিনীতার বাহুর আলিঙ্গনে সঙ্গ দিয়েই কৃতার্থ বোধ করতেন।

বিনীতার কিন্তু তাদের প্রয়োজন ছিল দুই কারণে। প্রথমতঃ বিনীতার স্নায়ুজাল ছিল দুর্বল, চরিত্রের কঠিন আবরণ থেকে কোনদিনই তিনি মুক্তি পাননি। তাই সাহস সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রয়োজন হোত রাজন্যবর্গের সঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি কোনক্রমে ধরা পড়েন, বিপদে পড়েন, তবে সেই রাজন্যবর্গের উপস্থিতি তার পক্ষে অনেক সহায় হবে। কিন্তু এই চিন্তাধারাটি তার ভুল হোল। যথাসময়ে এই রাজন্যবর্গের কেউই তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন না—যা দিলেন তা বিনীতারই বিপক্ষে গেল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যা সাধারণভাবে মানুষের মনে জাগে সে এই যে, তিনি বস্ত্র-অলঙ্কারাদি, মণিরত্ন ঠকিয়ে নিতেন তা নিয়ে কি করতেন—সে কি তার সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল? তদন্তে দেখা গেল সেইসব দ্রব্যের তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনই প্রয়োজন ছিল না—প্রয়োজন ছিল শুধু আহরণ করবার। এক ঘাটে তিনি আহরণ করেছেন, আর অন্য ঘাটে তিনি দিয়েছেন বিসর্জন। এক ঘাটে চুরি করেছেন, ঠকিয়েছেন, অন্য ঘাটে দ্রব্য-সামগ্রীর বহু নিম্ন মূল্যে বিকিয়ে দিয়ে এসেছেন। এটা যেন সবটাই খেয়াল, সর্বনাশা খেয়াল, যে খেয়ালের বশে ধ্বংসের শেষ অস্তিত্ব ধরে রক্ষা করেছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন যা স্বাধিকারে মনে দেখা দেয় সে হচ্ছে বিনীতা কেন এই শঠতা-প্রবঞ্চনার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন? কেন এই সম্ভ্রান্ত ঘরণীর এই বিত্তশালিনীর জঘন্য চৌর্য-মনোবৃত্তি? তিনি তো অর্থের স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী? তাঁর কোথায় ছিল অভাব, অনটন, সংসারের দৃষ্টিহীন অর্থের দাবী? প্রশ্ন আমাকে করেছেন অনেকে। সম্যক উত্তর দিতে পারিনি। এটা কি সেই ভীষণ উন্মত্ততা, একটা প্রবল উন্মাদনা যা ব্যর্থ যৌবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনার শেষ ভস্মরাশি থেকে? যা উন্মাদ-বাসনায় ফেটে পড়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রথমে ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে, তারপর সমাজের বিরুদ্ধে? এ-কি সেই উন্মত্ততা যা বাধা মানে না, যা তার অন্তস্থলে জ্বলছে অনির্বাণ চিতার মত?—যে আগুনের শান্তি হয় শুধু তখনই, যখন আঘাত করা যায় সমাজকে, সংসারকে? কি জানি? জানি না, আমি মনোবিজ্ঞানবিদ নই। কেমন করে জানবো মনের কোন ঈশান কোণ থেকে জেগেছে ঝড়ের সূচনা, ঝড়ের ইঙ্গিত। কেমন করে সে ঝড় ছড়িয়ে পড়ল দিক-দিগন্তে, ধূলিসাৎ করে দিল অনেকদিনের গড়া খেলাঘর, নিশ্চিহ্ন করে দিল মান-সম্ভ্রমের বিশাল মহীরুহ, অর্থ-প্রতাপের শেষ চিহ্ন। একি মদ? না মতিভ্রম?

মনে পড়ে নালিশ নিষ্পত্তির শেষ দিনে আমাকে তলব করেছিলেন তদানীন্তন বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার এক গুরুজন। তিনি আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন—সে করবে কেন? কেন'র তুমি জবাব দাও। তুমি কি জানো সে কে? ধীরে ধীরে আমার বিবৃতি এগিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। পাঠ করলেন। পাঠান্তরে আমায় বললেন, তোমার কি মনে হয়? কেন সে, এ কাজ করলে?

উত্তর দিলাম সভয়ে, 'সম্ভবত চৌর্য-প্রবণতা ওঁর জন্মগত।'

মাথা দিয়ে বললেন, 'না, না—একে চৌর্যপ্রবণতা বলে না। যেখানে প্ল্যান থাকে, যেখানে পূর্ব পরিকল্পিত অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি থাকে সেখানে চৌর্যপ্রবণতা হয় না। অপহরণ প্রবৃত্তি একটা মানসিক দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত। সেটা হয় অকস্মাৎ—একটা ক্ষণিকের ঝলকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, তার পরই শান্তি। অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে তোমার মামলার অনেক তফাৎ।' আমার প্রশ্নকারী ছিলেন বিরাট চিকিৎসক। তাঁর প্রচণ্ড জ্ঞানের সম্মুখে আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে কি বিশ্লেষণ করব?

বহুদিন, বহু মাস গত হয়ে গেছে। একদিন লিণ্ডসে স্ট্রীটের পথে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট গাড়ী এসে থামলো। চেয়ে দেখি মারমার সাহেব। এড়িয়ে চলে যেতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং আমার কাছে হাজির। প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবেন, বলুন, আমি নিয়ে যাবো? আপনি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?'

উত্তর দিলাম, 'আমি পথচারী। আমার ঘুরে বেড়ানোই কাজ, আমার কোথাও যাবার নেই, আমার পথের নির্দেশ কে দেবে? অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আমার মত দরিদ্র পদাতিককে দেখে আপনি গাড়ী থামালেন।' তিনি লজ্জিত হলেন মনে হোল। উত্তর দিলেন এমন কি কারণ নেই যেখানে দুদণ্ডের জন্যে কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে? জানেন? কেন দাঁড়িয়েছি, শুধু একটা কথা বলবার জন্যে। বিনীতাকে সমুদ্রপারাবারে পাঠিয়ে দিয়েছি চিকিৎসার জন্যে। আপনি যা বলেছিলেন সব সত্য—আমারই বোঝবার ভুল হয়েছিল। আপনি বলুন সে ভালো হয়ে আসবে কি না?'

কি উত্তর দেবো জানি না। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে কিনা তাও জানি না। শুধু সহাস্যে বললাম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই তিনি ভালো হয়ে ফিরে আসবেন

—কেন আপনি ভাবছেন? মারমার সাহেব গাড়ীর স্টার্টারে পা চাপালেন, আমার দিকে চাইলেন—মনে হোল তাঁর চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বাঁ হাত ওপরে তুললেন আমাকে বিদায় অভিবাদন জানাতে, তারপরই জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছু হয়তো আমায় বলতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলবার সুযোগ হয়নি।

আর মারমার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেকদিন পরে হঠাৎ দৈনিক সংবাদপত্রে পেলাম মারমার সাহেবের মৃত্যু সংবাদ। পরক্ষণে ঠিক করলাম আমি তাঁর গোরে যাব, তাঁকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আসবো। যিনি নিঃসংশয়ে পার্থিব, হীনতা-দীনতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ক্ষোভ-অনুশোচনা অনেক উপরে। যিনি সরলতা, মহত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে গেলাম না—আমায় তো কেউ চিনবে না? আর যদি বা কেউ চেনে তারা আমার উপস্থিতিকে ভুল মনে করবে। কেউ মনে করবে না এক পথচারী পথিক তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে।

তিনি চলে গেছেন কিন্তু আমি তাঁকে ভুলতে পারিনি। যাঁকে তিনি মনে করতেন শত্রু, সেই তার নিকটতম বন্ধুত্বে উপনীত হয়েছে। এখনও দেখা দেন আমার স্বপ্নলোকের মাঝে, সাগরের তীরে তীরে। প্রশ্ন করেন বারে বারে—সে একই প্রশ্ন করেন, 'বিনীতা ভালো হয়ে ফিরে আসবে তো?'

শুনুন, চিত্রতারকা মুমতাজ কি বলেন:-
LUX WHITE
"লাক্স
আমার রঙরূপের তারুণ্য বজায় রাখে"
আপনিওতো কারো চিত্রতারকা,—লাক্সকে দিন তার আপনার রঙরূপ অপরূপ রাখার
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-LTS. 278-140 BG

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

সমস্যা সুতীব্র

বিয়ের কথা উঠলেই কেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এই একটি ব্যাপারে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মতের কোন তফাৎ নেই। সবাই প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। যেন এরকম একটি দায়িত্বের ভার বহন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এর ফলে অবিবাহিত জীবনের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরি উপেক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে বয়সের কোঠা অনেকটা পেরিয়ে ছেলে এবং মেয়ে অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ান। কেউ কেউ আবার লোকলজ্জা এড়ানোর জন্য ইদানীং কালের সহজ পন্থা গ্রহণ করেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ের পাটটা চুকিয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হোটেলে ভোজে বসেন। কিন্তু বিয়ে তাঁদের করতেই হচ্ছে। যে বিয়ের নাম শুনলে তাঁরা ভূত দেখার মতো চমকে উঠতেন অবশেষে সেই ভূত তাঁদের ঘাড় মটকালো। রেহাই তাঁরা পেলেন না। লাভের মধ্যে এই হলো যে বয়স অনেকটা গড়িয়ে গেল। বিবাহিত জীবনের পুরো স্বাদ তাঁরা পেলেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার কলেজ-জীবনের একটি ঘটনা। সে এক বিভ্রাট অভিজ্ঞতাও বটে। কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাশ। সবে স্কুল ছেড়ে এসেছি। সবাই চুপচাপ বসে অধ্যাপকের জন্য অপেক্ষা করছি। একটু পরেই তিনি এলেন। রোলকল শুরু হলো। এরই ফাঁকে তিনি সকলের পরিচয় নিচ্ছেন। প্রথম ক্লাশে যেটা স্বাভাবিক। রোলকল হয়ে যাওয়ার পরই তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। কিন্তু প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সব ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে তো বিবাহিত মনে হচ্ছে না। অধ্যাপকের এই বক্তব্যে আমরা সবাই সবার দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম। সে হাসি লক্ষ্য করে তিনি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, সেদিন আমার এক বন্ধুকে দেখলাম। আমারই বয়সী। একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে পার্কে বেড়াচ্ছে। আমিও পার্কে বেড়াচ্ছি নাতির হাত ধরে। বন্ধুটির সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা। কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞেস করলাম, নাতি নাকি? উত্তর পেলাম না ছেলে। আমার তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ার দশা। যে বয়সে নাতি কোলে নিয়ে বেড়ানোর কথা সেই বয়সে ছেলে। আমার এই সঙ্গিন অবস্থা দেখে বন্ধুটি বললো, জানো তো আমি লেট ম্যারেজ করেছি। তাই ছেলেও বিলম্বেই এসেছে।

অধ্যাপক ভদ্রলোক কথাটি বলে একবার পরিপূর্ণ চোখে ক্লাশঘরের দিকে তাকালেন। একটু বিরতি দিয়ে শুরু করলেন, লেট ম্যারেজের ব্যাপারটা বলতে গেলে আমাদের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু তখন এতটা ব্যাপক হয়নি। আমার সমসাময়িক এই একটি ঘটনার কথাই আমার জানা। আর এমন ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে হয়। অন্তত আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে তো নয়ই। কিন্তু লেট ম্যারেজ এখন বেশ বিস্তার লাভ করেছে। এর আসল কারণ, উপযুক্ত সময়ে এ ব্যাপারটাকে কেউ সহজভাবে মেনে নিতে চায় না। ছেলেরা বোঝা ভেবে বিয়ে করতে চায় না। মেয়েরা সংসারের দায়িত্ব নেবার ভয়ে বিয়ের কথা জোরভাবে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারে না। এমনিভাবে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিককে অস্বীকার করে তারা এগিয়ে যেতে চাইছে। কোথায় এবং কোনদিকে এগুবে তা তারা জানে না। জীবনের মৌল প্রশ্নই যে অনুপস্থিত। কিন্তু আমরা তা করিনি। আমাদের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। সময়কে আমরা মূল্য দিয়েছি। দায়িত্বকে মর্যাদামণ্ডিত করেছি। তাই কোনদিন কোথাও আটকালো না। আর আজ সব উল্টো। জীবন-সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সবাই মন্ত্র ভুলে বসে আছে।

সেদিন এই সমস্যা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি এবং মানসিক প্রস্তুতিও সেরকম ছিল না। এখন কলেজ ছেড়ে বাইরে এসেছি। বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছি। তাই সমস্যার ইতরবিশেষ বাদ দিয়ে সবকিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। মনে মনে ভাবি কেন এরকম হলো ?

এই নিয়ে সেদিন একজনের সঙ্গে কথা হলো। যার সঙ্গে কথা হলো তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবী ভদ্রমহিলা এবং আইনব্যবসার অবসরে সমাজসেবার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। তাঁর কাছেই প্রশ্নটা তুলে ধরলাম। তিনি এজন্য সরাসরি ছেলেদের দায়ী করলেন। তাঁর সোজা বক্তব্য হলো যে সাংসারিক চাপের ভয়ে ছেলেরা বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। ছেলেরা যদি বিয়ে করতে রাজি না হয় তবে মেয়েদের বিয়ে হবে কি করে ? একথাও তিনি স্বীকার করেন যে মেয়েরাও এখন চট করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হয় না। এটা ওরা করছে ছেলেদের দেখা দেখি আর এই আবহাওয়া আমদানির জন্য মূলত দায়ী হলো আজকের অর্থনৈতিক সঙ্কট। একজনের আয়ে আর সংসার চালানো সম্ভব নয়। ছেলেরা অপেক্ষা করে থাকে যদি চাকরিজীবী মেয়ে পাওয়া যায়। এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু বিয়ে খুব একটা দেরি হচ্ছে না। যেখানে মনের মতো হচ্ছে না সেখানেই দেরি। আর এই সংখ্যাটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। সবাই এই দোহাই পেড়ে বিয়ে থেকে পেছিয়ে আসছে।

মনে মনে ভাবি সেদিনের সঙ্গে আজকের তফাৎ অনেকখানি। অধ্যাপকের যুগে বিয়েতে আপত্তি করাটা ছিল গুরুতর অপরাধ। তাহলে সবাই ধরে নিত যে ছেলে বয়ে গেছে। আর তখন মেয়েদের আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতো না। সবাইকে নির্দিষ্ট দিনে ছাদনাতলায় হাজির থাকতে হতো। সেদিন ছেলে-মেয়ের মতামতের সামান্যই মূল্য দেওয়া হতো। যা করার অভিভাবকরাই ঠিক করতেন। আর একটা সুবিধা সেদিন ছিল। মেয়ে বিয়ে দিতে তাঁরা শুধু ছেলেই দেখতেন। স্বভাব চরিত্রের খোঁজ নিতেন। কিন্তু ছেলের আয় সম্বন্ধে তাঁরা খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ছেলের বাপের অবস্থা দেখেই তাঁরা মেয়ে পাত্রস্থ করতেন।

কিন্তু এখন ছেলের ব্যাপারটাই মুখ্য। মেয়ে দেওয়া হয় ছেলের কাছে। সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই। ছেলেরা এখন এটা বেশ বোঝে। দায়িত্বের গুরুত্বও তাদের অবিদিত নয়। তাই বেশ সতর্ক হয়ে পা ফেলে। এদিক থেকে মেয়েরাও অনেক সতর্ক হয়েছে। সেই সমাজ বদলে গেছে যখন বিনা মেয়েদের কোন প্রতিবাদ চলতো না। এখন তাদের কথা মোটেই ফেলনার নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটছে। নিজেদের তারা তুচ্ছ করে দেখতে প্রস্তুত নয়। তাই বিয়ের প্রশ্নে তারাও ধরা দিতে চায় না। সমাজে তারা ধ্বনি তুলছে বিয়ের কথা এখন আমাদের চিন্তায় অনুপস্থিত।

সেদিন একজন বললো, বিয়ে তো নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু সকলের মতো [illegible]-পটের সংসার আমি করবো না। আমার সংসার হবে বেশ ছিমছাম। সেখানে উনুন ধরানো বা রান্নাবান্নার পাট রাখবো না। সব কিছু হবে হোটেল থেকে। আর নিজে যদি রান্নাও করি তা হবে শখের। কোন ছুটির দিনে নিজে রান্না করে সেলিব্রেট করবো। রোজ রোজ রাঁধুনির কাজ অসম্ভব।

সে যতটা সহজে বললো কাজটা তত সহজ হবে বলে মনে হয় না। ঘর-সংসার পতি-পুত্র এই তো আমাদের কামনা। এই যদি কামনা হয়, তবে রান্নাবান্নার প্রশ্ন এসে যায়। উনুন ধরানো এরই একটি। তা সে যে উনুনই হোক। সংসারকে স্মার্ট করতে গিয়ে সব সময় হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত রাখতে গেলে খরচের আধিক্যটা নেহাৎ কম হবে না। তাছাড়া আমাদের নারীত্ব তো ডুকরে মরবে। দু'দিন এ-ব্যবস্থা ভাল লাগবে। কিন্তু তারপরই মনে হবে, কি অধিকার যেন আমার নেই। সে অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য নিজেই অস্থির হয়ে যাবো। যতক্ষণ না অধিকার ফিরে পাবো ততক্ষণ সোয়াস্তি নেই। এর পরের অধ্যায়েই শুরু হবে আমার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা যা আমাদের দেশে যুগ-যুগান্ত বহমান।

বিয়ে করতে রাজি না হওয়া এবং বিয়ে না করাই এতদিন প্রবলেম ছিল। এখন সেই সমস্যা ধীরে ধীরে কাটছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে বিয়ের ব্যাপারে কেউ দেরি করার পক্ষপাতী নয়। একসময় সেসব দেশে বিয়ের বয়স খুব উঠে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা আর সেই ভুল করছে না। যথাসময়ে বিয়ের পর্বটা চুকিয়ে ফেলে পরে অন্য কথা। সেদেশে হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে অগ্রণী

সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের মানুষেরা এখনও অবিরাম স্রোতের মত এগিয়ে আসছেন এপার বাংলায়।

ভূমিকা নিচ্ছে। খুব বেশী কুড়ি বছরের পর আর তারা অপেক্ষা করতে রাজি হচ্ছে না। লেট ম্যারেজের কুফল ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

লেট ম্যারেজের কুফল এখন আমরা টের পাচ্ছি। বিয়ে করবো না করে করে সবাই বেশ দেরি করেন। প্রায় বিগত-যৌবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিয়ে করা যে অপরিহার্য সে বোধ জন্মে আমাদের। এই বিয়েতে স্বাভাবিক যৌবনের উচ্ছ্বাস থাকা সম্ভব নয়। তখন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় ছেলেমেয়ে মানুষ করার সমস্যা। এর ফলে বিবাহিত জীবনের সব আনন্দই প্রায় শেষ হয়ে যায়। লেট-ম্যারেজের আর এক কুফল হলো ভুল বোঝাবুঝি। সামান্য কারণ নিয়ে মতান্তর গিয়ে পৌঁছায় মনান্তরের পর্যায়ে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরি হয় না। কোর্ট-কাছারিতে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তখন দুজনেই নিষ্কৃতি পেতে চায়। এর বলি হয় ছেলে-মেয়েরা। তাদের জীবনে এগুলো বিষময় প্রভাব সৃষ্টি করে। এর আসল কারণ হলো কিন্তু দুজনের জীবনেরই নানা আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। সময়ে বিয়ে হলে যেটা সম্ভব অসময়ে সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া তেমন বোঝাপড়াও গড়ে ওঠে না। সবকিছু মিলিয়ে শুরু হয় অশান্তি। তাতে সবকিছু ভেঙেচুরে যায়।

লেট-ম্যারেজের কুফল মোটামুটি আমাদের সকলেরই এখন জানা হয়ে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে গড়িমসি করা এখন অনেকেই পছন্দ করে না। বরং সম্ভব হলে বিয়ে যথাসময়ে মিটিয়ে ফেলার পক্ষে প্রায় সবাই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সবসময় উপায় হয় না। সে পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো আর্থিক সংকট। এই সংকটে পড়ে অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছে। দুজনে চাকরি করলে চলে কিন্তু সেরকম দুজন পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। পশ্চিমে এই সমস্যা তেমন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। ওদেশে চাকরির খুব সংকট নেই। এমনকি ওখানকার মেয়েরা বিয়ের পর, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করে। তারপর আবার চাকরিতে ফিরে আসে। কিন্তু যে-দেশে চাকরি পাওয়াই দুষ্কর সেদেশে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য আমার জানা আছে যে বিয়ের পর কোন মেয়ে চাকরি ছেড়েছে বিভিন্ন জীবিকায় এরকম কারো সংস্পর্শে আজ পর্যন্ত আসিনি। বরং একাধিক জায়গায় একটি বেমক্কা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে। একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য একাধিক অনুরোধ শুনেছি। সবিনয়ে জানিয়েছি যে সেরকম কোন ক্ষমতা আমার নেই।

এ অবস্থায় বিয়ের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট সমাধান নেই। তবু এটা সুখের কথা যে লেট-ম্যারেজের বদলে এখন অনেকেই উপযুক্ত সময়ে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণেও এগিয়ে আসছেন। এবার সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত এ পথের যে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক আর্থিক সংকট তা নিরসনে উদ্যোগী হওয়া।

—প্রমীলা

জলসা

নৃত্যম প্রযোজিত রূপকথা : নৃত্যমের বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী সভায় শ্রীপাহাড়ী সান্যাল অভিনন্দন জানালেন উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠাকে। ডঃ রমা চৌধুরী সভাপতিত্বকালে বলেন, "শিক্ষার দুটি দিক—একটি পঠন-পাঠন তথা জ্ঞানের, অন্যটি ললিতকলা তথা সুকুমার অনুভূতির লালন ও পরিমার্জনা। প্রথমটিকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যতটা মূল্য দিয়ে থাকি দ্বিতীয়টিকে দেওয়া হয় না—যদিও মানুষের চরিত্রগঠনে দ্বিতীয়টির মূল্য কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু শিক্ষালয়ে আমরা এ দিকটিতে সব সময় দৃষ্টি দিতে পারি না। আমাদের অবহেলিত এই সূক্ষ্ম দিকটির চর্চা করে এঁরা এই সব নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের সেবাই করছেন।

"বিম্বাবতী" কাহিনীঅবলম্বী নৃত্যনাট্য "রূপকথা"কে রূপকথারই ছন্দ ও মাধুর্যে ভরে তুলে ধরছেন যেসব শিল্পী তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে রাজকন্যার ভূমিকায় পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, রাজপুত্ররূপী চন্দ্র দে ও বিম্বাবতীর চরিত্রাংশে সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের কথা। রাজকুমারীর কুমারীচিত্তের লজ্জা, বিস্ময় ও নিষ্পাপ অনুরাগকে, নৃত্যকুশলতা ও ভাবসৌন্দর্যে মধুর করেছেন পূর্ণিমা। রাজপুত্রের বীর্য, কৌতুক ও প্রেম—চন্দ্র দের দৃপ্ত পদক্ষেপ ও ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত। সুনন্দা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রতিভায় অনেক কিছুর

গীতালির পঞ্চদশ বার্ষিকোৎসবে সঙ্গীত পরিবেশনরত (বামদিক থেকে) গৌরী সরকার, উমা সরকার, বাণী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী দাস ও পলি ভট্টাচার্য।

আশ্বাস পাওয়া গেল। সঙ্গীতাংশে সুনির্বাচিত গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন—অপর্ণা চ্যাটার্জি, সৌমেন্দ্র ঘোষ, চন্দনা চক্রবর্তী।

গীতালির অনুষ্ঠান : সম্প্রতি মহাজাতি সদনে শ্যামবাজারের ৪বি, ললিত মিত্র লেনস্থ প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন গীতালির পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন ও চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ বলেন যে সঙ্গীতের প্রভাব দেশের তরুণদের মনে বিশেষ মঙ্গলবোধ জাগরিত করে—তাই সঙ্গীতের প্রসার অতি প্রয়োজনীয়। প্রধান অতিথি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল গীতালির শিক্ষাপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। উদ্বোধনে গীতালির উপাধ্যক্ষা শান্তা সাহার নেতৃত্বে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর বৃন্দ সঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি এবং শিবনাথ সাহা ও শিবানী গাঙ্গুলীর সম্প্রদায়ের গীটার আকর্ষণীয় হয়েছিল। শিশুশিল্পী মধুমিতা দাসের কণ্ঠসঙ্গীত ও শম্পা চৌধুরীর নৃত্যে সকলেই মুগ্ধ হন। বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅনুপ ঘোষালের সঙ্গীত পরিবেশন অপূর্ব হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অধ্যক্ষ শ্রীপঙ্কজ সাহা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদসম্ভার : গ্রামোফোন কোম্পানী আনন্দময়ীর আগমনকে প্রণাম জানালেন ই, পি, রেকর্ডে ভক্ত শিল্পী শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তৎপত্নী মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের ভাবমধুর ধ্বনিগম্ভীর কণ্ঠের শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তোত্র, উমাস্তোত্রম, শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা ও জগন্নাথ স্তোত্রম নিয়ে। উচ্চারণ সৌন্দর্যে, আরাধনার পুণ্য আবেগে এই স্তোত্রগীত চারটি পূজামণ্ডপকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন সঙ্গীত "মহিরাখালে" শ্রীরাধার গোবিন্দদর্শনের ব্যাকুল আবেগে রাখাল সেজে গোচারণে যাওয়া, যোগমায়ার প্রভাবে বিমোহিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্কা, পরিশেষে যুগলমিলন, ভক্তির উজ্জ্বলতা, নাটকীয় চমক ও আত্মনিবেদন শিল্পীকে যেন নতুন করে চিনিয়ে দিল।

শৈলেন দত্তরায়ের সুর ও দীপঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গীত-পরিচালনায় শান্তিময় কারফরমা রচিত শিশুগীতি নাটিকা "চড়ুইভাতি" বনের ধারের পুকুর পাড়ে খিচুড়ী ভাঁড়ার চড়ুইভাতির এক উপভোগ্য ছবি মেলে ধরেছে।

আবৃত্তি শিল্পের জনপ্রিয় তারকা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদার, ভাবস্পন্দিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা, শঙ্খ (কবিতা) ও উদাসীন, মেঘলা দিনে (গদ্য) কবির মনের ভাবপরিবর্তনের আলোছায়ার এক চিত্রগ্রাহী রূপকে প্রত্যক্ষ করায়।

বেগম আখতারের কণ্ঠে ঠুংরী ও দাদ্‌রা শিল্পীর আশ্চর্য ক্ষমতাকে যেন জীবনের গোধূলিবেলার রাঙা আলোর করুণ-মধুর করে তুলেছে। কথা ও সুর রবি গুহর।

৪৫ আর পি এম লিসনার-এর কলাম্বিয়া সিরিজে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরোজ্জ্বল রঙিন কণ্ঠে দুটি গানের একটিতে খেলার সাথীকে কৌতুকী ডাকের আনন্দমুখরতা চিত্তে উল্লাস জাগায়। কিন্তু মধুর করে তোলে উল্লাসের অন্তরে আভাসিত বেদনার চকিত দ্যুতিতে। অপর একটি গান প্রেমসঙ্গীত।

শারদীয়া

মহিলা

পড়ুন !

বাংলার মহিলা সমাজের একমাত্র মুখপত্র

দাম — ৩·০০

ডাকে — ৪·০০

বাংলার সমস্ত বিখ্যাত
মহিলা-লেখিকাদের রচনা-সমৃদ্ধ

এ সংখ্যায় আছে—
৩টি উপন্যাস
১৬টি গল্প

তাছাড়া রম্যরচনা, প্রবন্ধ, কবিতা, ব্যঙ্গ, কার্টুন এবং লেখিকাদের ছবি সমেত।

যোগাযোগ করুন :
সেক্রেটারী : মহিলা
১২০।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬, ফোন : ৩৫-৩২৫০

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ভক্তি, বেদনা ও নানামুখী অভিজ্ঞতায় যে জীবনবেদ রচনা করেছেন—তা তাঁর একারই নয় সকলেরই এ অনুভূতিতে সমান অধিকার। এবং এই কথা মনে করানোতেই শিল্পীর শিল্পীত্ব।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক রুচির স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দেননি। আপন প্রকাশবৈশিষ্ট্যে অটল থেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি হেমন্ত মুখার্জি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন না, হবেনও না।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি গান তাঁর জীবন্ত গায়নশৈলীতে সুপরিবেশিত। আরতি মুখোপাধ্যায়ের দুটি গানই প্রাণোজ্জ্বলতায় যেন কলমল করছে। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে তাঁর "আমি রাতকে বলেছি কাল।"

ভূপেন হাজারিকার কাহিনীগীতি, ঘটনায়, বেদনায় প্রকাশের উদ্বেলতায় চিত্তস্পর্শী।

পিন্টু ভট্টাচার্যের গান এবারে যেন আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুগম্ভীর কণ্ঠে পরিবেশিত দুটি গানে তাঁর শিল্পী-মনের পথ হারানোর খবরটি শান্ত মাধুর্যে ব্যক্ত। ইলা বসুর দুটি গানে নাটকীয়তার নতুনত্ব উপভোগ্য। নির্মলা মিশ্রের দুটি গান তাঁর আপন মনেই প্রতিষ্ঠিত। হিজ মাস্টারস ভয়েস লেবেলে মাধুরী চট্টোপাধ্যায় হিমাংশু বিশ্বাসের সুরকে যথাযথভাবে মূর্ত করতে পেরেছেন। নির্মলেন্দু চৌধুরীর দুটি পল্লীগীতিতে আপন আনন্দে আত্মহারা ত হয়েইছেন। তাঁর ভক্তদেরও ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন অনাবিল আনন্দের স্রোতে। হতাশ করেছেন মান্না দে। শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবসায়িক সাফল্যেই শুধু নয়— অনুভবের মহত্বেও একটা বড় স্থান আছে তাঁর শিল্পকৃতিত্বে। জনপ্রিয় শিল্পীদের এ দায়িত্বজ্ঞান আরো সজাগ থাকা উচিত। কিন্তু মান্না দের এবারের গান শুনে মনে হোলো এ দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন নন।

ললিতা ধরচৌধুরীর প্রথম গানটি—(আকাশের সময়টা এখন) যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছিল—এবারের গান সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে পৌঁছবার আশ্বাসই দিয়েছে।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গায়নশৈলী, মার্জিত কণ্ঠ ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু কোনো কোনো কথায় উচ্চারণ দক্ষতা—প্রকাশের অতি সচেতনতা একটা কৃত্রিমতা সৃষ্টি করে গানের মাধুর্য ব্যাহত করেছে।

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় গীত গান দুটি সুশ্রাব্য। রানু মুখোপাধ্যায় সুন্দর গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত দুটি গান। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযোগ্যস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। বনশ্রী সেনগুপ্তর দুটি গানই প্রসাদগুণসম্পন্ন। চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ ভঙ্গীতে গাওয়া গান শুনলেই ভাল লাগে। শ্যামল মিত্রর গান তাঁর অনিবার্য আকর্ষণের এতটুকু ঘাটতি নেই। অনুপ ঘোষাল তাঁর প্রাণচঞ্চল কৌতুকী ঢঙেই দুটি গান গেয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। ইতিমধ্যেই প্রাক পুজোর মাইক্রোফোনে গান দুটি শোনা যাচ্ছে। প্রাবন্তী মজুমদারের দুটি গান সুগীত।

বোম্বাই শিল্পীদের গান—শচীন দেব-বর্মণের গানে অতীতের একটি গানের ছায়া—তাঁর জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। রাহুল দেববর্মণ—পিতার পুত্র না হয়ে এ যুগেরই প্রতিধ্বনি হতে চেয়েছেন। বস্তুত পদ-নির্বাচন তাঁর স্বধর্মেরই অনুকূল। সবিতা চৌধুরী—গীত দুটি গান আনন্দদায়ক। বোম্বাই প্রবাসী গীতা দত্তর মধুর কণ্ঠে যেন বাংলার মাটিরই এক ঝলক সজল হাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেল।

নায়ক বিশ্বজিতের গায়ক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা অনেককেই আনন্দ দেবে। এবারে স্ব-গীত তিনি সুরও দিয়েছেন।

সুমন কল্যাণপুর শ্রোতাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেননি।

লতা মুঙ্গেশকার ও আশা ভোঁসলের গান রত্নের মতই শিল্পীদের আপন মূল্যে মূল্যবান। প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে ওঠে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল আশা ও লতার রাগসঙ্গীতের ছোঁয়ালাগা ও সরগম্ অলংকৃত গানগুলি। এ গান কোনোদিন পুরানো হবে না। সাধারণের অনুকরণের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই এ গানের আকর্ষণ আরো বেশী।

অন্যান্য গানের মধ্যে নির্মল মুখোপাধ্যায়ের শ্যামাসঙ্গীতে ধনঞ্জয়বাবুর সুরের সঙ্গে তাঁদের ছায়াও শিল্পীর সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করেছে।

এ ছাড়া রাজকুমার বিশ্বাসের শিশু-গীতি, মিন্টু দাসগুপ্তের কৌতুকগীতি বৈচিত্র্যবর্ধক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক নক্সার কথা বলাই বাহুল্য।

এল পি ডিস্কে "রামী চণ্ডীদাস" ও "অতুলপ্রসাদের" ১২ খানি গান পরে আলোচিত হবে।

যেসব গীতিকার ও সুরকারবৃন্দ গানের ডালি সাজিয়েছেন তাঁরা হলেন—সুধীন দাসগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, ভবেশ গুপ্ত, সলিল চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও নারায়ণচন্দ্র মহাপাত্র, বরুণ বিশ্বাস, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু ঘোষ, শচীন ভৌমিক, মীরা দেববর্মণ, অভিজিৎ, নচিকেতা ঘোষ, রাহুল দেববর্মণ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, স্বপন, জগমোহন, রবীন্দ্র জৈন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রতু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, অনল চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু বিশ্বাস, মানব মুখোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ এবং ভি, বালসারা।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর পুজোর গান : ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর ২০খানি গানের সীমিত পরিসরেই আছে আধুনিক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ছড়াগান এবং কৌতুক-গীতি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সমর গুপ্তের নাম। তাঁর গাওয়া "বিরহ মধুর হোলো" ও "হার মানা হার" রবীন্দ্র-বার্তাকে মনে ঠিকই পৌঁছে দেয়।

সুস্মিত সেনের "অরূপ বীণা" ও "ওদের কথায়" নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশিত।

বছরের একই দিনে একই স্থানে সৃষ্টি হচ্ছে বরফের শিব লিংগ অমরনাথ, কেন এ নাম কি বা তার মাহাত্ম্য জানতে হলে পড়তে হবে —যাত্রীর লেখা

দেবভূমি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থপথে

মূল্য : ৬·০০

ভক্ত তীর্থ যাত্রীর দৃষ্টি কোণ থেকে লেখা এই বইখানার মত দরদ দিয়ে ভাবা খুব কম বইতেই লক্ষ্য করেছি।

— শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, কলিঃ ৪০

বইটি সাধারণ ভ্রমণকারীদের সত্যই খুব উপকার হবে।

—শ্রীঅমিয় নন্দী, কলিঃ ৫

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক : শ্রীউৎপলপ্রভ সরস্বতী, ফোন : ৪৬-৫৪০৭
৪৭।৫, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলিঃ-৪৭
কথা ও কাহিনী : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
দে বুক স্টোর্স : ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

বাণীবিদ্যাবীথির শিশুশিল্পীদের পুতুলের বিয়ে নৃত্যনাট্যের দৃশ্য। ফটো : অমৃত

সঙ্গীত পরিচালকরূপে হিমাংশু বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন জয়ন্তী সেন, সুলীনা দাশগুপ্তা, চন্দনা মুখোপাধ্যায় এবং মীনা চৌধুরীর গান-গুলির সুররচনায়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গান দুটি যথাযোগ্য অভিব্যক্তি দিয়েছেন জয়ন্তী সেন।

চন্দনা মুখোপাধ্যায়ও সুরের ধারাকে অনাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশের মর্মন্তুদ কাহিনীর পট-ভূমিকায় গাওয়া সুলীনা দাশগুপ্তর দুটি গান বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য এবং গাওয়ার ভঙ্গিমা উভয় বিচারেই চিত্তস্পর্শী।

অন্যান্য শিল্পীরা হলেন দিলীপ ভট্টাচার্য, শিশির সরকার, দেবকুমার সরকার, সুব্রত চন্দ, নির্মাল্য পাল, রঞ্জিত বসুরায়, ফ্যান্সি রায়, ভূপেন কুণ্ডু, রঞ্জিৎ ঘোষাল, বিদ্যুৎ দত্ত, গৌরীশঙ্কর, উদয় সরকার, সোমেন দত্ত, মীনা চৌধুরী (ছড়া গান), জয় রাহা (নকসা) এবং স্বপন বন্দ্যো-পাধ্যায় (কৌতুকগীতি)।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো এই যে প্রধানত অজানা তরুণ শিল্পীদেরই উদ্যোক্তারা আত্মপ্রকাশের প্রশস্ত অবকাশ দিয়েছেন এবং এঁরা অনেকেই তাঁর মর্যাদা রেখেছেন। প্রতিভাবান রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা প্রশান্ত ভট্টাচার্যর নাম বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

শারদ অর্ঘ্য

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস নিবেদিত শারদ অর্ঘ্যের ডালির প্রতিটি গান পুষ্পস্তবকের মতই সতেজ, সুন্দর ও মধুরই শুধু নয়—নতুনত্ব প্রয়াসী মনের এক শিল্পসম্ভার প্রকাশ।

এই কোম্পানীর এবারের পূজার রেকর্ড আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে সীমাহীন জনপ্রিয়তা ও অতুলনীয় কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী বড়ে গোলাম আলি খাঁর কথা—ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ যাঁকে বলেন এ যুগের তানসেন। ১৯০৮ অব্দে হিন্দুস্থান রেকর্ডে গৃহীত খাঁ সাহেবের চারখানি গান ই পি রেকর্ডে গ্রথিত হয়ে যেন নতুন করে শিল্পীকে মেলে ধরল। যৌবনের আবেগ, সুক্ষ্মাতি-সুক্ষ্ম কারুকৃতি ও আবেশের এক চিত্র-রূপ রূপ তার পাহাড়ী, কালেংড়া, মেঘ ও ধুনে। কালেংড়ার রেখাব ও কোমল ধৈবতের রেশ গানের পরেও কানে বাজে।

শচীন দেববর্মনের ৪খানি গানের ই পি—বধুগো এই মধুমাস, প্রেমযমুনার, প্রিয় আজো নয় ও মলয়া চল ধীরে তাঁর অতীতের এক গৌরবময় অধ্যায়কে মেলে ধরে। সে যুগের এইসব গান—এক চির-ন্তন সৌন্দর্যদ্যুতিকে যেন ধরে রেখেছে।

অমর পালের চারখানি পল্লীগীতিতে, গ্রামীণ ধারার এক সরস রূপকে তা ব্যক্ত করেইছে। শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা ছায়া-এ রূপকে মধুরতর করে।

কীর্তনের একনিষ্ঠ গায়িকা রাধারাণী দেবীর কীর্তন সঙ্গীত নাটিকা মাথুর—অবশ্যই এবারের পূজার গানের মণিহারে এক উজ্জ্বল সংযোজন। সঙ্গীত পরি-চালনা করেছেন বংশধারী চক্রবর্তী।

'সাতভাই চম্পা' রূপকথা নাটিকাটি ছোটদের জন্যই। কিন্তু শুনতে শুনতে বড়রাও মশগুল হয়ে উঠি। সাতভাই-চম্পা ও তাদের বোন পারুলের—আনন্দময় পরি-ণতি শোনবার জন্যও যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। গীতিনাট্য রচয়িতা আশীষ চট্টো-পাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং চরিত্র রূপায়ন করেছেন হৈমন্তী শুক্ল, জোনাকী মুখো-পাধ্যায় ও ঝুমকী রায়, কবি মজুমদার, মালবিকা ভৌমিক, সুস্মিতা মজুমদার, লক্ষ্মী সেনগুপ্তা, জ্যোৎস্না দাস, কুমকুম চক্রবর্তী, প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায়, রীণা সেনগুপ্ত, উপর্ণা মুখোপাধ্যায়, ঝুমকী রায়, উমা মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা দত্ত-গুপ্তা, অজন্তা সেনগুপ্ত, প্রণব সেন-গুপ্ত, রাজকল্যাণ রায় ও মধুছন্দা রায়।

এস এস এইচ স্টান্ডার্ড প্লে রেকর্ডে হীরালাল সরখেলের দুখানি ভক্তিমূলক গান শিল্পীর গাইবার আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেহতত্ত্ব ও শ্যামাসঙ্গীত ঐ ভাবেরই অনুসারী হয়েও পূজা নিবেদনের আর একটি দিককে প্রকাশ করছে।

অংশুমান রায়ের একটি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী ইতিমধ্যেই তাঁকে জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূজোয় গাওয়া পল্লী গীতি দুটি সেই প্রতিষ্ঠাকেই দৃঢ়তর করবে।

কবি মজুমদারের রবীন্দ্রসঙ্গীত আমা-দের আনন্দ দিয়েছিলো। আধুনিক গানেও ইনি সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—এ অভি-জ্ঞতাও কম আনন্দের নয়।

ওপারের শিল্পীর কণ্ঠের গান শীর্ষক সিরিজে কিশোর শিল্পী মহম্মদ আবদুল জব্বারের দেশাত্মবোধক দুটি গান শুনতে ভাল লাগে সমসাময়িক যুগের এক চিত্ত-স্পর্শী নজীর হিসাবে। গান দুটির রচ-য়িতা শ্যামল গুপ্ত সুর দিয়েছেন বাপী লাহিড়ী। আর একটি ডিসকে লালন ফকিরের কথা ও সুরে এবং অপরেশ লাহিড়ীর পরিচালনায় মকছেদ আলী খাঁর গান দুটি মন দিয়ে শোনবার মত।

এপারের শিল্পীর ওপারের গান দুটি আমরা পাইনি। রবি ঘোষ ও ভোলা দত্তর কৌতুকনাট্য বর্তমান যুগের সামঞ্জস্য-হীনতার ওপর এক উপভোগ স্যাটায়ার।

সুপ্রভা সরকার গীত দুটি নজরুল গীতি—জনম জনম গেল ও ভুলি কেমনে যুগপৎ কবির গানের এক বিশেষ দিককে এবং প্রতিভাময়ী শিল্পীর ব্যাপ্তির মধ্য-গগনকে উদ্ভাসিত করছে।

অনেক সম্ভাবনার আভাষ পাওয়া গেল দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া শ্যামলী বসুর দুটি গানে। রচয়িতা কামাখ্যা ঘোষ। একই কথা বলা যায় দীপেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে গীত নিতাই গোস্বামীর দুটি গানে।

প্রসূন দাশগুপ্তর ভরাট কণ্ঠে মিষ্টি করে গাওয়া দুটি গানে—রবীন্দ্র সঙ্গীতে আর এক নবাগতের আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। যন্ত্রসঙ্গীতে আছে গীটার। বাজিয়েছেন অভিজিৎ নাথ ও বিদ্যুৎ বসু।

পূর্ণদাস বাউলের ১২খানি গানের একটি এল পি এক মূল্যবান সম্পদ। বিভিন্ন বিষয়ক গানগুলি হোলো—প্রেম করা কি জ্বালাগো, উচিত কথা বলবো বন্ধু, যদি মন করতে পার, মন ফকিরা মনের কথা, যদি প্রেমানন্দে থাকি, দেশের দিনে, প্রেম কথাটি শুনতে ভালো, ওহে রাম রঘোবর, কে বানালো এমন ঘর, ও মানুষ কে আছে। —চিত্রাঙ্গদা

বি. এফ. জে-এর সংসাপত্র বিতরণী উৎসব : বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ৩৪তম বার্ষিক সংসাপত্র বিতরণী উৎসব যথারীতি সমারোহের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়ে গেল সোমবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে। সংস্থার সভাপতি মনুজেন্দ্র ভঞ্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোধা বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বি এফ জে-এর অনুষ্ঠানে বি এন সরকারের কাছ থেকে সংসাপত্র গ্রহণ করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দু রায় এবং অনুপ ঘোষাল।
ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

বি এফ জে-এর নির্বাচিত সহ-অভিনেতার পুরস্কার বিজয়ী আনন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার।
ফটো : অমৃত

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ও বাংলা ছবি

কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত দি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড ১৯৬০ সালের মার্চ মাস থেকে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে এর অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ভারত সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ স্বরূপ দান করেছে।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতীয় ছবির মনোন্নয়নকল্পে যে ছবির উচ্চ মান এবং উৎকর্ষ বিশিষ্ট হবার সম্ভাবনা, তাকে আর্থিক ঋণ দেওয়া। যাঁরা এই সংস্থার উদ্দেশ্যাবলী ও কর্মসূচী (পরিমেল বন্ধ ও নিয়মাবলী—মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকলস অব অ্যাসোসিয়েশন) রচনা করেছিলেন, তাঁদের মনে এও ছিল যে, কোনো ছবিতে লগ্নীকৃত টাকাটি উদ্ধারের দিক চেয়েও ছবিটি যেন জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক এবং সুস্থ অবোদোপকরণ হয়।

কিন্তু কার্যত যে-সব ছবি কর্পোরেশনের সাহায্য পেয়েছে, সেগুলি অন্য পাঁচটি ব্যবসায়িক ছবির মতোই স্টার হয়ে হওয়ার আর্থিক সাফল্য সম্ভাবনাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে ওইসব ছবিকে যে অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তার অধিকাংশই ফেরত পাওয়া যায়নি। সেই অপরিশোধিত ঋণের বোঝা আজও সংস্থাটির স্কন্ধে চেপে আছে বলে বর্তমানের চেয়ারম্যান বি কে করঞ্জিয়া

সেদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের জানালেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, যখন কোনো ছবির জন্যে কাউকে ঋণ দেওয়া হত, তখন তার কাছ থেকে উপযুক্ত জামিন নিয়েই তা করা হত। তাই যদি হয় তাহলে ঋণ আদায় হওয়ার পথে বাধা কোথায়?

তিন বছর আগে সংস্থার ডিরেক্টোরেট এই ঋণদান ব্যাপারে একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা স্থির করেন, অতঃপর তাঁরা প্রধানত মাত্র নিম্ন ব্যয়ের ছবিকেই—যা সাধারণত সাদা-কালোতে তোলা হবে তাকেই—আর্থিক সাহায্য দেবেন। এই সিদ্ধান্তকে সফল করবার জন্যে তাঁরা তিনটি বিশেষ দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন: (১) হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষার মানবিকতাগুণে সমৃদ্ধ কাহিনী নির্বাচন করা; (২) যে-সব প্রতিভাশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ চলচ্চিত্রকারের পক্ষে সহজে অর্থ যোগাড় করা সম্ভব নয়, তাঁদের বেশী করে সাহায্য করা এবং (৩) পুনায় অবস্থিত ভারতীয় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে শিক্ষিত নবীন চলচ্চিত্রকারদের সন্ধান করা।

সংস্থার ডিরেক্টরের মতে এই পন্থা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, এই পথে চলে তাঁরা কিছু কিছু লাভের মুখ দেখতে পেয়েছেন। ১৯৭৮ থেকে শুরু করে গেল তিন বছরে তাঁদের লাভ হয়েছে যথাক্রমে ১৩, সাড়ে ১১ এবং সাড়ে ১৪ হাজার টাকা। এই পদ্ধতি অনুসারে চলবার আগের যুগে যে-টাকা ঋণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা একেবারেই আদায় হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আরও ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের পরে আর পর্যন্ত কোনো ঋণকে অনাদায়ী বা ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা কম বলে মনে করবার প্রয়োজন হয়নি।

এই নতুন যুগের সূচনা হয়েছে মৃণাল সেনকৃত হিন্দী ছবি 'ভুবন সোম' থেকে। এর আগের যুগে যে-সব ছবিকে আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেই সব ছবির মধ্যে অন্তত ১১ খানি আজ পর্যন্ত শেষই হয়নি এবং কোনো কোনোটি শেষ হতে ৬ বছর পর্যন্ত সময় নিয়েছে। কিন্তু 'ভুবন সোম' থেকে শুরু করে যে-সব ছবি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন-এর আর্থিক ঋণ পেয়েছে, সে-সব ছবিকে ঋণও যেমন কম দিতে হয়েছে,

জয়বাংলা/মমতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র।

বি এফ জে-এ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী কাবেরী বসু, শ্রেষ্ঠ নায়ক দিলীপকুমার এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়।
ফটো : অমৃত

সেগুলি তৈরী হতেও তেমনই বেশ কম সময় লেগেছে। অবশ্য মাত্র আড়াই বছর হল এই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবং এই সময়ের মধ্যে 'ভুবন সোম' সমেত মাত্র ৫ খানি ছবি মুক্তি লাভ করেছে। আরও ৩ খানি কাহিনী-চিত্র মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে এবং ২টি তথ্যচিত্র সমেত ১৫ খানি নির্মীয়মান।

একটি অসুবিধা যা দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে নিম্ন ব্যয় নির্মিত ছবির মুক্তিলাভ সহজসাধ্য নয়। এমন কি, 'ভুবন সোম'ও কলকাতায় হিন্দী ছবির নিয়মিত ছবিঘরগুলিতে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। তার মুক্তি হয়েছিল ইংরাজী চিত্রগৃহ 'এলিট' সিনেমায়। বোম্বাই শহরে ছবিটি দেখানো হয়েছে প্রাতঃকালীন প্রদর্শনীতে।—এই মুক্তি সমস্যা মেটাবার জন্যে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাদের অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে 'আর্ট সিনেমা' খুলতে মনস্থ করেছেন। শোনা গেছে, আমাদের মধ্য কলকাতায় একটি ৫০০ আসনবিশিষ্ট চিত্রগৃহ ও'রা 'লীজ' নেবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন। এই 'আর্ট সিনেমা'র মাধ্যমে ও'দের ঋণলব্ধ নিম্ন ব্যয়ের ছবিগুলির মুক্তিলাভের পথ সহজ করে ও'রা এই ছবিগুলি 'মিনিমাম গ্যারান্টি' লাভে অসমর্থ হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তার সমাধান করতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

'ভুবন সোম' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আড়াই বছরের মধ্যে ৩০ খানি ছবির জন্যে ঋণ ধার্য করা হয়েছে। এই তিরিশ খানির মধ্যে ভাষাভিত্তিক হিসাব হচ্ছে:

(১) হিন্দী—১৬ খানি
(২) মারাঠি—৩ "
(৩) গুজরাটি—২ "
(৪) মালয়লম—২ "
(৫) তামিল—১ "
(৬) ওড়িয়া—৩ "
(৭) বাংলা—৩ "

নতুন আঙ্গিকের ও নতুন ভাবনার ছবিগুলি যে শুধু আমাদের দেশের চিত্রকারদের মধ্যে নবধারার প্রবর্তন করছে, তাই নয়, এই ছবিগুলি রপ্তানীর ক্ষেত্রে নতুন বাজারেরও সৃষ্টি করছে। 'ভুবন সোম', 'দাস্তাক', 'ফির ভী' (হিন্দী) ও 'কানকু' (গুজরাটী)—এই ৪ খানি ছবি ফিনিশ টেলিভিশনে বিক্রীত হয়েছে। আমেরিকা ও কানাডার বাজারে প্রদর্শিত হবার জন্যে 'দাস্তাক' ছবিটিকে একটি সংস্থা কিনেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই 'দাস্তাক' ছবির জন্যে যে-অর্থ ঋণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, তার সবটুকুই ফেরত পাওয়া গেছে মাত্র দিল্লী অঞ্চলে ছবিটির প্রদর্শনীলব্ধ অর্থ থেকে।

এইভাবে তোলা ছবিগুলির জন্যে নতুন ও প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক বাজারে ভালোভাবে প্রদর্শনী ব্যবস্থা করতে হলে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা স্থাপনকল্পে একটি কার্যকরী সংস্থার সৃষ্টি হওয়া দরকার।

নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের আগে যে-সাড়ে আট বছর কেটেছে, সেই সময়ের মধ্যে ন'টি বাংলা ছবি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছেন: (১) সাত পাকে বাঁধা, (২) ঘুমভাঙার গান, (৩) চারুলতা, (৪) কাঁচ-কাটা হীরে, (৫) নায়ক, (৬) স্বর্গ হতে বিদায়, (৭) পঞ্চশর, (৮) আঁধার সূর্য এবং (৯) গুপী গাইন বাঘা বাইন। দেখা যাচ্ছে, এক আর-ডি বনসালই ন'খানির মধ্যে চারখানির প্রযোজক। বাকী পাঁচখানি ছবির প্রযোজক হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন পাঁচজন। সংবাদে প্রকাশ, এই ন'খানি ছবির মধ্যে ঘুমভাঙার গান, স্বর্গ হতে বিদায়, পঞ্চশর এবং আঁধার সূর্য—এই চারখানি ছবি আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এবং মনে হয়, এই ছবি ক'খানিকে প্রদত্ত ঋণের অর্থও কর্পোরেশন ফিরে

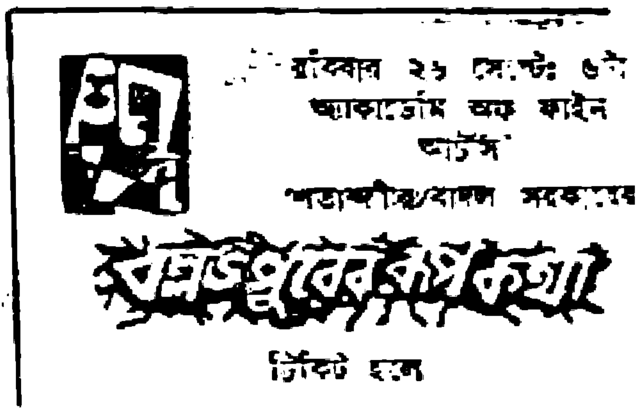

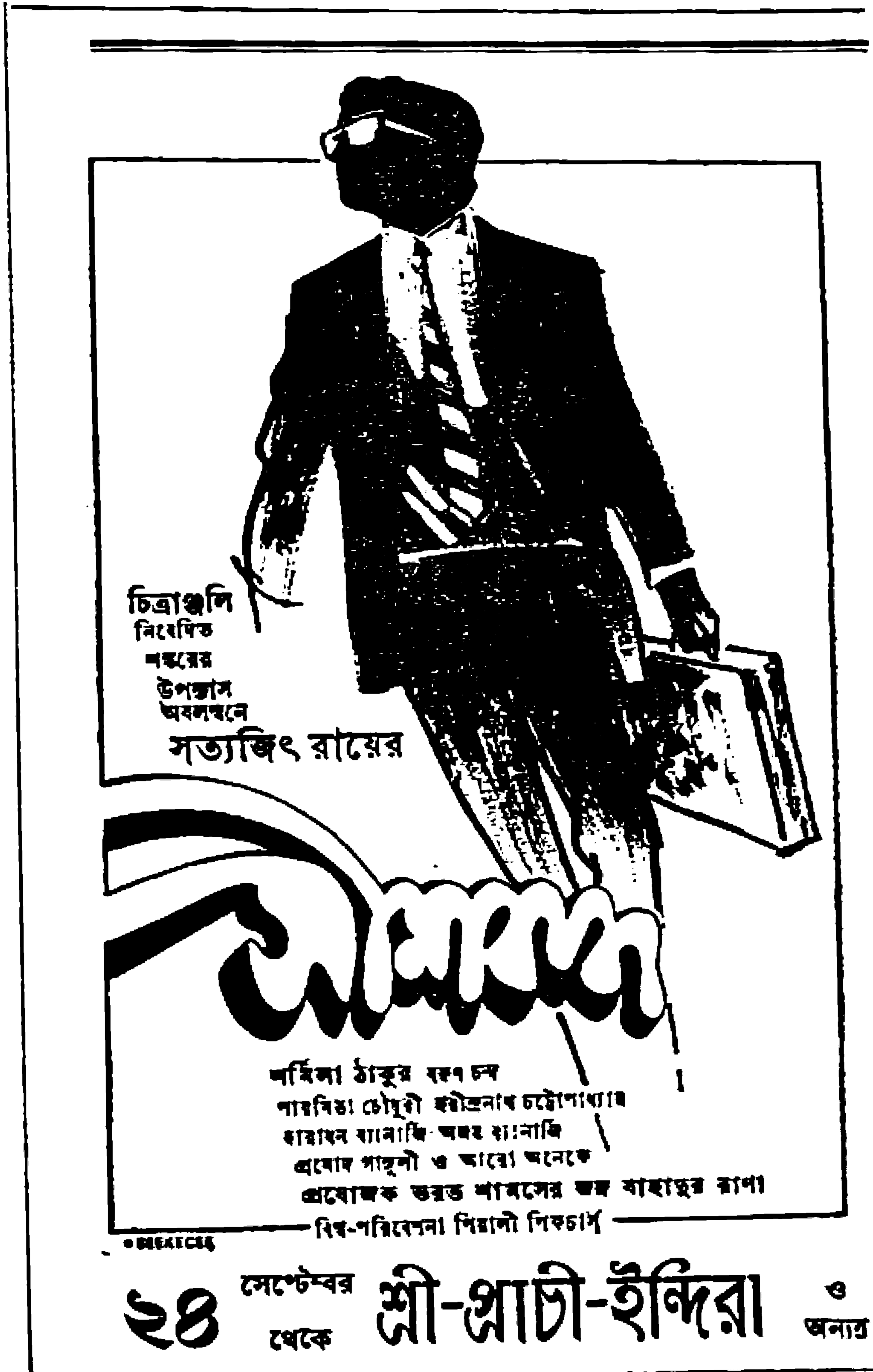

পাননি, যদিও ঋণ প্রদানের চুক্তি অনুসারে ফিরে পাওয়া উচিত ছিল।

গেল আড়াই বছরের মধ্যে যে-দুখানি বাংলা ছবি ইতিমধ্যেই ঋণ পেয়েছে, সে দুটি হচ্ছে: চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'বিলেত ফেরত' এবং অরুন্ধতী দেবী প্রযোজিত ও পরিচালিত 'পদী পিসির বর্মী বাক্স।' এছাড়া আর যে ছবিখানির প্রযোজক সংস্থা ঋণ মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি, তার নাম হচ্ছে-'সংসার সীমান্তে।' ছবিখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন রাজেন তরফদার।

আমরা ঠিক জানি না, দরখাস্তকারী প্রযোজককে ঋণ পেতে গেলে কিভাবে তাঁকে যোগ্যতার নিদর্শন পেশ করতে হয় এবং তাঁর যোগ্যতার বিচারই বা কিভাবে হয়। যতদূর জানি, আজ পর্যন্ত ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কোনো আঞ্চলিক পরিষদ নেই। কাজেই আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে সুবিচার হয় কি করে তাও জানবার কথা। শুনেছি, যে-সমিতি বিচার-বিবেচনা করেন, অতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র একজন সদস্য বর্তমানে আছেন।

স্টার থিয়েটার

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩১
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, দুর্বা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো, দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা, সেনকা দাস, কুমারী মিন্টু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

নতুন ছবি

সত্যজিৎ রায়ের সীমাবদ্ধ ছবিটি আসছে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শ্রী, প্রাচী এবং ইন্দিরা ও শহরতলীর আরও ১২টি চিত্রগৃহে শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে। প্রধান চরিত্রে আছেন শর্মিলা ঠাকুর, বরুণচন্দ্র ও পারমিতা চৌধুরী এবং পার্শ্বচরিত্রে আছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মল্লিক, প্রমোদ গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর দে, মনি আয়ার ও শেফালী, চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়, শ্রীভরত সমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা প্রযোজিত এবং চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত ছবি। বিশ্ব পরিবেশনায় পিয়ালী।

মহাপূজার মহা-আকর্ষণ চিন্ময়ী মা

দেবী মাহাত্ম্য গাথা অবলম্বনে রূপছবি চিত্রমের শ্রদ্ধাঞ্জলি চিন্ময়ী মা মহাপূজায় শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে।

হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপের দায়িত্ব নিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রগ্রহণ, গীতরচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, শ্যামল গুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

অনিল বাগচী সুরারোপিত এ ছবির ভক্তিরসাশ্রিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অলোক বাগচী।

প্রধান চরিত্রের শিল্পীবৃন্দ : কমল মিত্র অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, অমরেশ দাস, পদ্মা দেবী, সীমা জানা, নবাগতা রূপা, এবং দ্বিজু ভাওয়াল, নমিতা বিশ্বাস ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্যাংশে দেবীপ্রসাদ (মাদ্রাজ)

ফিল্ম-পরিবেশক : এ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মহাপূজার আকর্ষণ খুঁজে বেড়াই

অনিল দত্তের যুগযন্ত্রণা ও যুগচেতনার ছবি খুঁজে বেড়াই শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, পদ্মশ্রী ও শহরতলীর অন্যান্য ১২টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের এই অসাধারণ ছবিটি কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—পরিচালক শ্রীদত্ত স্বয়ং। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে : বিজয় ঘোষ এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায় বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, সোমা সেন, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ

শুক্রবার ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে
মহাপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

জ্যোতি - প্রভাত - খান্না - রূপালি
পিয়ালী : পরী : নবভারত : অশোক : মিনুয়া সিনেমা : নীলা
ভাটনী (ভদ্রেশ্বর) : শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) : রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর)
অন্নপূর্ণা (বাণ্ডেল) : অনুরাধা (দুর্গাপুর) : গোধূলী (আসানসোল)
জি, টি, টকীজ (জামসেদপুর) : লেইটী (সম্বলপুর) : জনতা (পুরী)
অশোক (পাটনা)

রায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, সুনীলেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

এপার ওপার

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত সমরেশ বসুর—এপার ওপার ছবির চিত্রগ্রহণ কাজ বর্তমানে স্টুডিওর বাইরে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় গৃহীত হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে এখন পর্যন্ত যাঁদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে তাঁরা হলেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, দিলীপ রায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, সমিতা বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু প্রভৃতি। এন এ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

ফাঁকি' ছবির আউটডোর

তরুণ সাংবাদিক চিত্রপরিচালক বুদ্ধ চক্রবর্তী তার দলবল নিয়ে বোয়ো খালি ও তমলুক অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনে 'ফাঁকি' ছবির কিছু বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেছেন গেল ১৯ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। এ পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জয়শ্রী রায়, সুবোধ দাশ, কল্যাণ চট্টোঃ, সূর্য পতি, শ্যাম লাহা, অজন্তা দেবী, অণু দত্ত, ও মাঃ অশোক, অমিত এবং বেবী, আলপনা। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন বিলায়েৎ খাঁ। চিত্রগ্রহণ করছেন বিমান সিনহা। রূপসজ্জা দুর্গা চট্টোঃ। বুদ্ধ ফিল্মস-এর পতাকাতলে গৃহীত এ ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক নিজেই।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ

চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু সম্প্রতি 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রীবসু পরিচালিত নির্মীয়মান ছবি জীবন জিজ্ঞাসা'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর পরেই তিনি 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ'-এর চিত্রনাট্য রচনায় হাত দিচ্ছেন।

সমসাময়িক অস্থির সমাজজীবনের পটভূমিকায় সদ্য প্রকাশিত 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' উপন্যাসটি লিখেছেন তরুণ কাহিনীকার ও সাংবাদিক শ্রীরণেন মোদক।

সবুজ নক্ষত্র' : সম্প্রতি পরিচালক সুব্রত সেন সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'সবুজ নক্ষত্র' উপন্যাসটি নিয়ে একটি ছবি করবেন বলে স্থির করেছেন। প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গেছে। আজকের দিনের উদ্যোগগামী এক শিক্ষিত তরুণের একটি ট্রাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনসত্যে উত্তীর্ণ হবার কাহিনীই এই ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটির প্রযোজনা [illegible]।

সগৌরবে চলছে

।। তথ্যচিত্র নয় পূর্ণাংগ কাহিনী চিত্র ।।

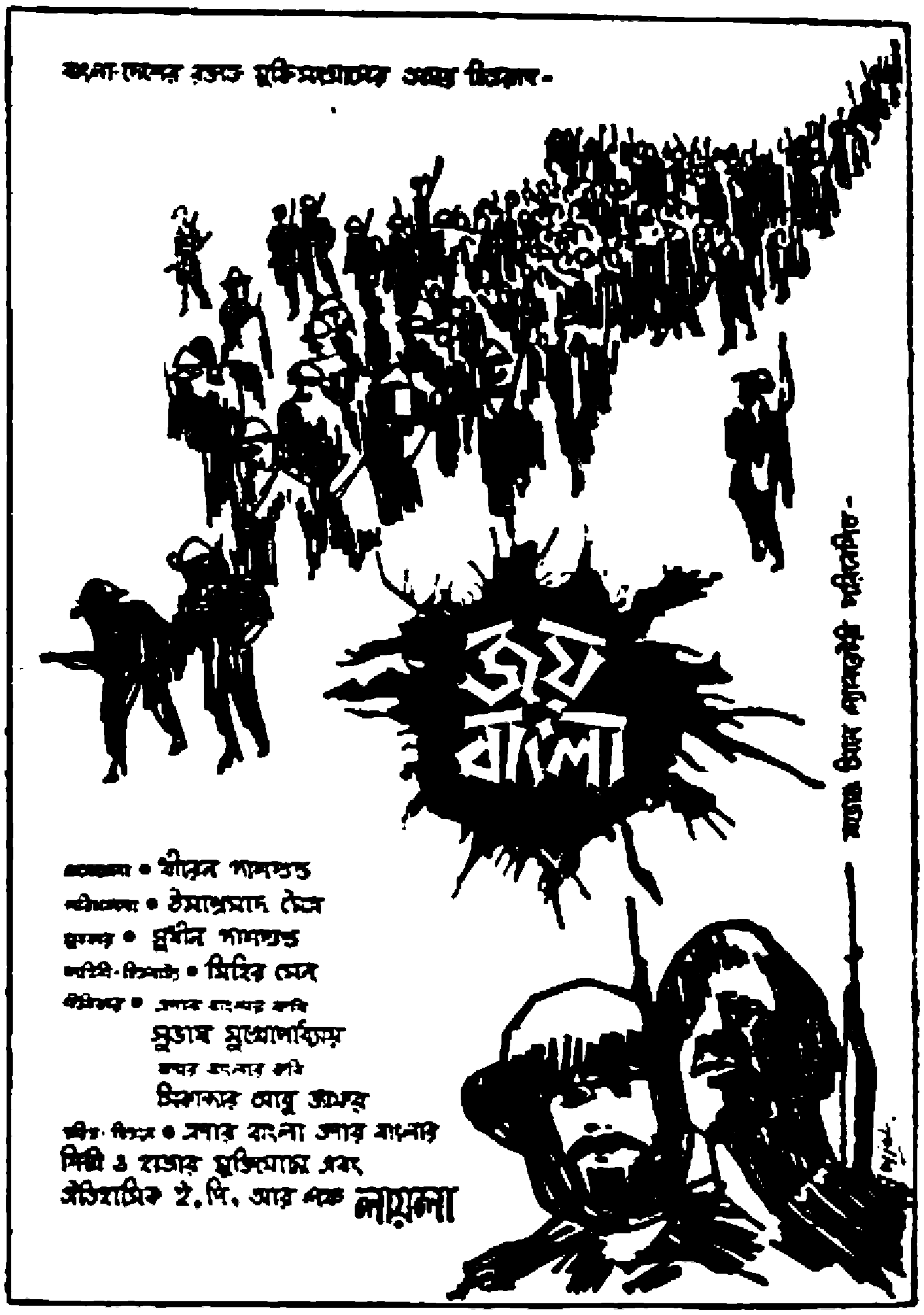

অভিনয়ে : সুচিত্রা মিত্র। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল। মমতা চট্টোপাধ্যায়। সীতা মুখোপাধ্যায়। জোনাকি ব্যানার্জি। চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। নন্দিতা দাস। শ্যামসেন্দু পাল। উজ্জ্বল সেনগুপ্ত। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। গোবিন্দ গাঙ্গুলী। অমর মুখার্জি। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই ঘোষ। ব্রজসুন্দর জানা। নবকুমার দাস। দেবকুমার ভট্টাচার্য। রণজিত রায়। শান্তনু দাস। শ্রীকুমার ঘোষ। কমল ঘোষ দস্তিদার। সুচারু দাস। তপন দত্ত। শ্যামল বর্মন। পি. কে। প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়। বেন্দু সেনগুপ্ত। সরোজ মুন্সী।

নিউ এম্পায়ার - সুরশ্রী - মিত্রা - পূরবী-প্রিয়া

(দ্বি প্রা হ রি ক প্র দ র্শ নী)

নেত্র (দমদম) : বনফুল (কৃষ্ণনগর) : শঙ্কর (হাওড়া) : বিমান (বারাসত), মিলনী (বসিরহাট) : ভারতী (চাকদহ) : মহুয়া (মেদিনীপুর) নিউ সিনেমা (কুচবিহার) ও আরও চিত্রগৃহে এবং তৎসহ

ইংলণ্ডে

মঞ্চাভিনয়

নিউ গণেশ অপেরার 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'

সমাজ জীবনের জটিল সমস্যা ও বিশ্লেষণমূলক জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে অথবা দেশের বা বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক আলোড়নের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আজকের পালাগান যেমন এক নতুনতর বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলভাবে মূর্ত করে তুলেছে; তেমনি আবার আমাদের দেশের ধর্মচিন্তা এবং কিছু কিছু ধার্মিক ও সাধকের বাস্তব ও অলৌকিক জীবনকেও আন্তরিকতায় পরিস্ফুট করে তুলছে। এ ধরণের একটি প্রয়াসের নিখুঁত রূপায়ণ হয়েছে সম্প্রতি নিউ গণেশ অপেরা প্রযোজিত সাধক বামাক্ষ্যাপা। বিনাচার্য পরিবেশিত এই পালাগানটি সামগ্রিকভাবে আমাদের মন স্পর্শ করতে পেরেছে।

তারাপীঠের কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে সাধক বামাক্ষ্যাপার সংঘাত। বামা কি করে শেষ পর্যন্ত তারাদেবীর দেখা পেলো, তাকে কেন্দ্র করেই এই পালাগানের সংলাপ, সংঘাত আর সুর মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। প্রযোজনার দিক থেকে আঙ্গিকগত কিছু স্মার্টনেস না থাকলেও, শিল্পীদের আন্তরিকতায় ভরা এই প্রয়াসটি সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

এই ভক্তিমূলক নাটকটিকে প্রাণময় করে তুলতে যে কজন শিল্পীর প্রতিভার উজ্জ্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় বামাক্ষ্যাপার রূপদাতা গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের। সত্যি কি আন্তরিকতা আর দরদ দিয়ে তিনি চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা আর একবার নতুন করে এই চরিত্রাভিনয়ে তা প্রমাণিত হোল বলে মনে হয়। মিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের তারাদেবী একটি মরমী চরিত্র সৃষ্টি, তাঁর গান আমাদের সমস্ত আবেগকে আপ্লুত করেছে। পালাগানের আসরে এমন মাধুর্যে ভরা সুমিষ্ট কণ্ঠ খুব কম শোনা যায়। আনন্দময়ের দুর্গাদাসও একটি স্বাভাবিক ও সংযত চরিত্র সৃষ্টি হোতে পেরেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মোহিত বিশ্বাস (কৈলাসপতি), সুধীর অধিকারী (যোগানন্দ), গোকুল দে (ভরত মৈত্র), মোহন চট্টোপাধ্যায় (সাধন), দাশরথী শেঠ (নগেন), নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (গনাই), অনিল দাস (সর্বেশ্বর), ইন্দু লাহিড়ী (উপেন), অজিত মুখার্জি, অরূপ ব্যানার্জি, প্রজাপতি পাত্র, আরতি দত্ত (আনন্দময়ী) ক্ষিপ্রা সরকার (রাজকুমারী) বিথীকা বাগচী (মৃণালিনী)।

সুরসৃষ্টিতে ও আলোকসম্পাতে ছিলেন পঞ্চানন মিত্র ও ফাল্গুনী।

পূজোয় নান্দীকারের নতুন নাটক

আসছে মহাসপ্তমীতে রঙ্গনায় নান্দীকারের নিয়মিত অভিনয়ের এক বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে নান্দীকার গোষ্ঠী ঐদিন (২৬ সেপ্টেম্বর) তাদের নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নাটকটির নাম হে সময় উত্তাল সময়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং নির্দেশিত উক্ত নাটকটি মৌলিকতা ও সাম্প্রতিকতায় দাবী নিয়ে নান্দীকার গোষ্ঠী প্রযোজনা করবেন।

বক্তব্য ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই নাটকটির মৌলিকত্ব দর্শকদের আকর্ষণ করবে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন গোষ্ঠী শিল্পীরা।

পূজোর সপ্তমীর (২৬ সেপ্টে) ও নবমীর (২০ সেপ্টে) দিন হে সময় উত্তাল সময় ও ষষ্ঠী (২৫ সেপ্টে) ও অষ্টমীর (২৭ সেপ্টে) দিন হবে তিন পয়সার পালা।

শুক্রবার ২৪শে শুভমুক্তি !
ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে বিরল সংযোজন — ভ্যারাইটি (নিউইয়র্ক)
বসু চ্যাটার্জির
সারা আকাশ
—প্রত্যহ ত্রিপ্রাহরিক প্রদর্শনী—
লোটাস : মেনকা : গণেশ

শুভারম্ভ শুক্রবার ২৪ সেপ্টেম্বর !
বড় গলায় বলার মত প্রেমের এক নিতান্ত গোপন কথা
এক নারীর মহান আত্মত্যাগের মহিমায় অভিনন্দিত—

পরিচালনায় ব্রিজ সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী
হিন্দ - মেনকা - ছায়া - গ্রেস - গণেশ -
ইন্টালী - তসবীরমহল অশোকা - নারায়ণী - লক্ষ্মী : হুগলী
বঙ্গবাসী - আলোছায়া - কমল
দীপক - জ্যোতি - আরতি (বর্ধমান) - চিত্রা (আসানসোল)
মীরা (বহরমপুর) - বিচিত্রা (মালদা) - কোনারক (রাউরকেলা)

নক্ষত্র-র নিয়মিত নাট্য-প্রয়াস : উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা নক্ষত্র ২রা অকটোবর ৭১ শনিবার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার থিয়েটার সেণ্টার হলে একান্তরক্রমে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ক্যাপটেন হুররা এবং নরেন্দ্র দেবের 'নয়ন কবীরের পালা' নাটক দুটি অভিনয় করার আয়োজন করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ স্মরণে এঁদের শ্রদ্ধার্ঘ, পরশুরামের কাহিনী অবলম্বনে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক নাট্য রূপায়িত সংগীতবহুল অপেরাধর্মী নাটক লম্বকর্ণপালা-র প্রস্তুতিও সমাপ্ত প্রায়।

"চেনা অচেনার নতুন নাটক" : উত্তর কোলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'চেনা অচেনা' এবারের শারদ অর্ঘ্য হিসাবে অভিজিতের লেখা দুটি নতুন নাটক **অথঃ শিব পার্বতী কথা** ও **বরাকফুলের মালা** আসছে ১১ অকটোবর সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে উপস্থাপিত করছেন। প্রয়োগ-প্রধান অসীম গুহের নেতৃত্বে চেনা অচেনার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ এতে অংশ নিচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মনোজ্ঞ-শ্রীকান্ত ভাষণ প্রদান করেন জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয়।

এর পর পুরস্কার বিতরণী উৎসবে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী প্রতিযোগীগণ পুরস্কার ও মানপত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর সারারাত্রিব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ হয়। জয়কৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। এর পর সুভাষ চাকলাদার, মণীন্দ্রচন্দ্র দে, অসিত তপাদার, সুখময় মজুমদার, সুহাস মুখোপাধ্যায় খেয়াল ও ঠুংরী পরিবেশন করেন।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে ডি. জি. যোগ মহাশয়ের ছাত্রী শ্রীমতী নিভা দাস বেহালায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অপূর্ব স্বাক্ষর রাখেন। সেতারে দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রথীন মজুমদার সাধনশৈলিতা প্রকাশ করেন।

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড় (৫৫-৬৮৪৬)

নান্দীকারের

২৫শে শনিবার ৬টায়
২৭শে সোমবার ২॥ ও ৬টায়

তিন পয়সার পালা

২৬শে রবিবার ও ২৮শে মঙ্গলবার
দু-বিন্দি আড়াইটে ও ছ-টায়
নতুন নাটক

হে সময় উত্তাল সময়

[আমাদের সময়ের আলোতে বঙ্গদেশের কাহিনী]

রচনা : হিমাংশু পাল
মঞ্চ : রাধারমণ তপাদার
নৃত্য পরিচালনা : লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়
নাটক গীতরচনা সুরারোপ নির্দেশনা :
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০শে বৃহস্পতিবার ২৫টে ও ৬টায়

শের আফগান

॥ রঙ্গনায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

বিবিধ সংবাদ

ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড আর্ট সেণ্টারের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ সেপ্টেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শঙ্করদাস বাগচী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন মণিদীপা দাস, কল্পনা সাহা রায়, দেবী দাস, রিনি সাহা, দীপ্তি রায়, সুপ্রিয়া দে ও শিবানী ঘোষ। নৃত্যের আসরে দক্ষতার পরিচয় দেন রেশমী চৌধুরী, সোমা নায়েক, বৈশালী রায়চৌধুরী, চুমকী চৌধুরী ও সঙ্গীতা দাস। গীটারে উল্লেখযোগ্য বীণা নায়েক, কল্যাণী রায়, মায়া রায় ও বাণী চট্টোপাধ্যায়।

পরিশেষে ছাত্রীরা অভিনয় করেন বীরেশ্বর বসু রচিত পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। নাট্য নির্দেশক পুলিনবিহারী চক্রবর্তী কয়েকটি মুহূর্ত রচনায় কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পী দলের সংঘবদ্ধ অভিনয় উল্লেখযোগ্য। চরিত্র সৃষ্টিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন মণিদীপা দাস, পদ্মসোনা সেনগুপ্ত, শম্পা পাল, দেবী দাস, কল্পনা সাহা রায়, আইভি পাল, রীণা রায়, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কাজল চক্রবর্তী, জয়া সাহা, আরতি চট্টোপাধ্যায়, মিতালী বসু ও আলপনা মিত্র। পরিচালনার গুণে নাটকটি রসোত্তীর্ণ করে তোলেন পঞ্চানন মিত্র।

সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার শিল্পী সংস্থা আয়োজিত সারা বাংলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব সোদপুরে এইচ-বি-টাউন, টাউন হলে মহা-সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহাপূজার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ!

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমরকাহিনী
'বিন্দুর ছেলে'-র অবিস্মরণীয় হিন্দী চিত্র-রূপ

শর্মিলা • রাজেশ খান্না • নিরুপা রায় • শশীকলা • সুরজ

অপেরা - নাজ - লিবার্টি - দর্পণা - চিত্রপুরী

অনন্যা (নব-নির্মিত) : বিজয়া ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

পরিবেশনা : চিত্রনিকেতন

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

এ পর্যন্ত বিশ্ব পর্যায়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। অথচ ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস প্রভৃতি খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনেক দিনের পুরনো। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সম্প্রতি ইন্টার ন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ফলে ক্রিকেট অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার অনেকটা আজ লাঘব হল। ইংরেজদের গোঁড়ামিই এই বিলম্বের প্রধান কারণ। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পরবর্তীকালে পাকিস্থানকে নিয়ে ইংলিশ ক্রিকেটের প্রভু মেরীলিবন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম সি সি) যে জোট তৈরী করেছিল সেখানে এম সি সি ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। ক্রিকেটের আইন সম্পর্কে এম সি সির ক্ষমতা ছিল সুপ্রীম কোর্টের সমান। অর্থাৎ তার উপরে কথা বলার অধিকার আর কোনদেশের ছিল না।

বর্তমানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় আগের মত এম সি সির দোর্দণ্ড প্রতাপ নেই। সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আসরে ইংল্যান্ডের যেমন আজ পড়তি অবস্থা তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও এম সি সির অবস্থা। যাক দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ক্রিকেট খেলা নিয়ে যে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসছে ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে আজ তা নিঃসন্দেহে সরস আনন্দের খবর।

খবরে প্রকাশ, প্রস্তাবিত বিশ্ব ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতায় ১৭টি দেশ চারটি গ্রুপে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশকে নিয়ে নক-আউট প্রথায় খেলা হবে। এই প্রতিযোগিতা চলবে দীর্ঘ চার বছর (১৯৭২—৭৫) প্রতিযোগিতার নক আউট প্রথায় খেলার আসর বসবে ইংল্যান্ডে, ১৯৭৫ সালে। লীগ পর্যায়ের প্রতিটি খেলার মেয়াদ তিনদিন এবং নক-আউট পর্যায়ের খেলা অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে, ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি খেলা পাঁচ দিন করে হবে।

লীগ পর্যায়ের তালিকায় যোগদানকারী ১৭টি দেশকে নীচের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

১নং গ্রুপঃ (১) ফিজি, (২) হংকং, (৩) নিউজিল্যান্ড এবং (৪) পাকিস্তান।

২নং গ্রুপ : (১) অস্ট্রেলিয়া, (২) সিংহল, (৩) ভারতবর্ষ এবং (৪) মালয়েশিয়া

৩নং গ্রুপঃ (১) বারমুদা, (২) কানাডা, (৩) আমেরিকা এবং (৪) ওয়েস্ট ইন্ডিজ

৪নং গ্রুপঃ (১) ইংল্যান্ড, (২) হল্যান্ড, (৩) ডেনমার্ক, (৪) জিব্রাল্টার এবং (৫) পূর্ব আফ্রিকা

মিউনিখে আয়োজিত প্রাক-অলিম্পিক গেমসের ৩,০০০ মিটার স্টিপল চেজ দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকারী কেনিয়ার বেন জিমচো (ডানদিকে)। এই দৌড় শেষ করতে তাঁর ৮ মিঃ ২১-৮ সেকেন্ড সময় লাগে।

ইউরোপীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের ইউরোপীয়ান বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় রাশিয়া প্রথম স্থান লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ১১ বার চ্যাম্পিয়ান হল।

চ্যানেল সাঁতারে নতুন রেকর্ড

হল্যান্ডের মহিলা সাঁতারু কোরি অ্যাবলেয়ার ১০ ঘন্টা ৪০ মিনিট সময়ে ইংলিশ চ্যানেল (ইংল্যান্ডের উপকূল থেকে ফ্রান্সের উপকূল পর্যন্ত) অতিক্রম করে চ্যানেল সাঁতারে মেয়েদের পক্ষে নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব রেকর্ড (১৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট) ছিল আমেরিকার গ্রেটা এ্যান্ডারসনের। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষদের পক্ষে চ্যানেল সাঁতারে যে রেকর্ড আছে তার থেকে কোরি অ্যাবলেয়ার মাত্র ২০ মিনিট বেশী সময়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বিশ্ব ক্রিকেট দল

শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১-৭২ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হওয়াতে বোর্ডের সভারা বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের একটি বিশ্ব ক্রিকেট দলকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ঘোষণায় জানা গেছে, এই বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর আগামী নভেম্বর মাসে শুরু হয়ে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হবে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রগুলির কাছ থেকে এই সফরের খরচ বাবদ মোট ৯০০০ স্টার্লিংয়ের প্রতিশ্রুতি পাওয়া

গেছে। সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষের সুনীল গাভাস্কার, দুই স্পিন বোলার ভেঙ্কটরাঘবন এবং চন্দ্রশেখরের এই বিশ্ব ক্রিকেট দলে স্থান পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ফুটবল প্রসঙ্গ

পূজোর আগে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। নানা কারণে দেরী হয়েছে—যেমন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা, একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত, খেলার মাঠে গঙ্গার বান, ভারতীয় ফুটবল দলের রাশিয়া সফর ইত্যাদি। প্রথম বিভাগের এখনও ৮টি খেলা বাকি। আগামী ১৬ই অক্টোবর থেকে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা পুনরায় আরম্ভ হবে। আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা নাকি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিকস

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে রাশিয়া মোট ১১টি পদক (স্বর্ণ ৭ এবং ব্রোঞ্জ ৪) জয় করে পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ইতালী—মোট পদক ৮টি (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১)।

ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল (১৯৩২—১৯৭১)

বিপক্ষে	মোট সিরিজ	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যান্ড	১১	২	৭	২
অস্ট্রেলিয়া	৬	০	৫	১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬	১	৫	০
নিউজিল্যান্ড	৪	৩	০	১
পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট	৩০	৭	১৭	৬

ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় জয়

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে—৪

১৯৫১-৫২: এক ইনিংস ও ৮ রানে মাদ্রাজ
১৯৬১-৬২: ১৮৭ রানে, কলকাতা
১২৮ রানে, মাদ্রাজ
১৯৭১: ৪ উইকেটে, ওভাল

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭

১৯৫৫-৫৬: এক ইনিংস ও ২৭ রানে, বোম্বাই
: এক ইনিংস ও ১০১ রানে, মাদ্রাজ
১৯৬৪-৬৫: ৭ উইকেটে, দিল্লী
১৯৬৭-৬৮: ৫ উইকেটে, ডুনেডিন
: ৮ উইকেটে, ওয়েলিংটন
: ২৭২ রানে, অকল্যান্ড
১৯৬৯-৭০: ৬০ রানে, বোম্বাই

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩

১৯৫৯-৬০: ১১৯ রানে, কানপুর
১৯৬৪-৬৫: ২ উইকেটে, বোম্বাই
১৯৬৯-৭০: ৭ উইকেটে, দিল্লী

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২

১৯৫২-৫৩: এক ইনিংস ও ৭০ রানে, দিল্লী
: ১০ উইকেটে, বোম্বাই

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১

১৯৭০-৭১: ৭ উইকেটে, পোর্ট অব স্পেন (২য় টেস্ট)

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন স্ট্যান স্মিথ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন শ্রীমতী বিলি

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

জিন কিং। দুজনেই আমেরিকার খেলোয়াড়। এখানে উল্লেখ্য, একই বছরে আমেরিকান খেলোয়াড়রা পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৬ বছর আগে—১৯৫৫ সালে পুরুষদের সিঙ্গলসে টনি ট্রাবার্ট এবং মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী ডরিস হার্ট। স্ট্যান স্মিথের পক্ষে এই প্রথম আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়, অপরদিকে শ্রীমতী কিংয়ের পক্ষে দ্বিতীয়বার। শ্রীমতী কিং ১৯৬৭ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে তাঁর ডাবলস খেলার দীর্ঘদিনের জুটি রোজমেরী ক্যাসালকে পরাজিত করে প্রথম আমেরিকান খেতাব জয়ী হন।

১৯৭১ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতাকে 'নিষ্প্রভ মেলা' বলা যায়। কারণ বিশ্ববিশ্রুত টেনিস খেলোয়াড়রা—যেমন রড লেভার, কেন রোজওয়াল, গত বছরের আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান কুমারী ইভোন গুলাগং (অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী) প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার প্রথম রাউন্ডে চেক খেলোয়াড় কোডেসের কাছে ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়াতে স্ট্যান স্মিথের পক্ষে সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। স্ট্যান স্মিথ ১৯৭১ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনালে নিউকম্বের কাছে হেরেছিলেন।

প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিভাগে খেতাব পেয়েছেন—পুরুষদের ডাবলসে জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) এবং রোজার টেলর (বৃটেন), মহিলাদের ডাবলসে রোজমেরী ক্যাসাল (আমেরিকা) এবং জুডি ডালটন (অস্ট্রেলিয়া) এবং মিক্সড ডাবলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং ওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া)।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা

সোফিয়াতে (বুলগেরিয়া) অনুষ্ঠিত বিশ্ব গ্রিকো-রোমান কুস্তি প্রতিযোগিতায় বুলগেরিয়া ৪৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। অপরদিকে রাশিয়া ৩৯-৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য রাশিয়া ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় যে একটানা শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল তার অবসান হল।

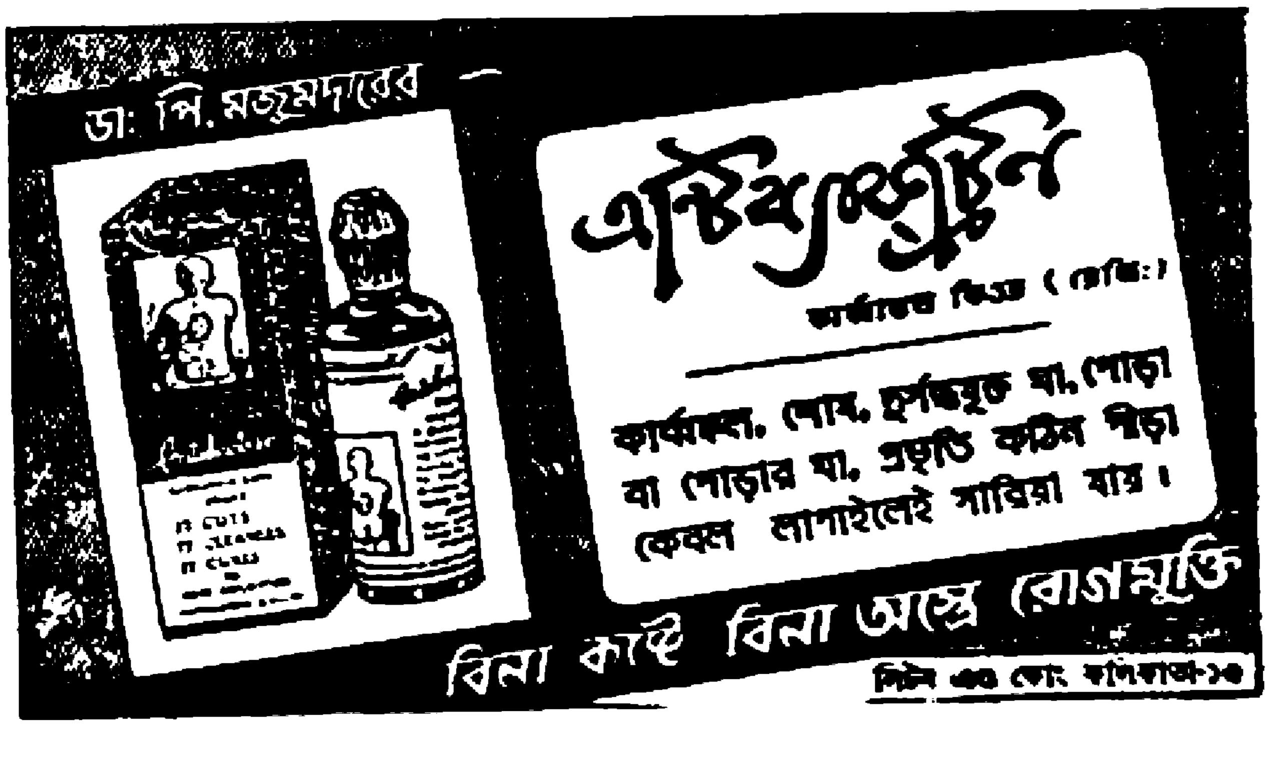

চিঠিপত্র

'বাঘ' প্রসঙ্গে

১৭শ সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় জনাব মহম্মদ আবদুল হক মিঞা লিখিত 'বাঘ' নামক রচনাটি পাঠ করে একসঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত হলাম। জনাব হক মিঞার 'বাঘ' গল্পটি প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'বাঘ' গল্পটির অনুকরণে এবং অনুসরণে রচিত। এই গল্পের মিস্ত্রী যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তা পাঠকের জানা প্রয়োজন। গল্পের সঙ্গে এই নামেরই অন্য লেখকের কলম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই একই কাহিনীর জের টেনেছেন লেখক—তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য আনন্দিত বোধ করি, কিন্তু কোনোরূপ টীকা না দিয়েই গল্পটি এভাবে প্রকাশ করতে দেওয়া অশোভন মনে করি, তাই এই উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বাঘ' গল্পটি তাঁর 'নির্বাচিত কথনো' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে।

একাকী মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৪।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে ২০শে শ্রাবণের অমৃত পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডুর চিঠি পড়ে ভালো লাগল। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী জাতীয় একটি সৎ ও নির্ভুল গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলাম। শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডু ব্যক্তিগতভাবে যে দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্প্রতি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র লেখকদের ঠিকানা, জন্মস্থানের তালিকা, সাহিত্যিকদের পুরস্কারের বিবরণ, তাঁদের জন্মমৃত্যুর তারিখ, তাঁদের জীবন ও জীবিকা, গ্রন্থ পরিচিতিই যথেষ্ট নয়, আমাদের অভিমত আরো কিছু অর্থাৎ গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীণ এবং প্রামাণিক করতে হলে শ্রীযুক্ত কুণ্ডুকে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হবে, আরো সতর্কতা হতে হবে। সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সংকলন, সাহিত্যিকদের দ্বারা পরিচালিত পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সাহিত্য সভা, উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের বিবরণী তথা অনুবাদ, লোকিকের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচকদের ধারণা, অনাবাসী লেখকদের পরিচিতি ও সংকলন, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ও বর্ষপঞ্জীটির অন্তর্ভুক্ত হলে তার গুরুত্ব বাড়বে এবং জনসমাদৃত হবে। বলা বাহুল্য, কাজটি সোজা নয় মোটেও। অশোকবাবু তো অগ্রণী হয়েছেন আগেই, আমরা যারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছি, তাদেরও যথাসাধ্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, নইলে কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাঁর পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে বাধ্য। কাজটা তাঁর একার নয়, আমাদের সকলের। আমাদের সম্মিলিত সহযোগিতার উপর এই সৎ প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে।

গ্রামবাংলায় তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাইরেও অনেক বাঙালি লেখক ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ করবার জন্যেও শ্রীযুক্ত কুণ্ডুকে অনুরোধ জানাব।

শ্যামলকান্তি দাস
মহিষাদল রাজ কলেজ
মেদিনীপুর

কাশ্মীর * শ্যামাপ্রসাদ * আবদুল্লা

অমৃতের (১০ই ভাদ্র, ১৩৭৮) পুলকেশ দে সরকারের লেখা উপরোক্ত প্রবন্ধ ভালো লাগল। তাঁকে অভিনন্দন জানাই স্পষ্ট কথা বলার জন্যে। তবে একটা ভুল সংশোধন করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। তিনি লিখেছেন : 'পণ্ডিত নেহরু নেই, তার বৃটিশ কূটনীতিক পৃষ্ঠপোষক লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেই। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু নেই।' তাঁর লেখা পড়ে মনে হতে পারে লর্ড মাউন্টব্যাটেনও মৃত, কিন্তু তা নয়, তিনি বেঁচে আছেন। টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করেন। এবং ভারতকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

আবদুল্লা প্রসঙ্গে একটা সত্যান্তরাল কোনো ঐতিহাসিক পাঠকের ভাল লাগতে পারে। শেখ আবদুল্লার প্রতি নেহরুর মনে হয়ত কোন দুর্বলতা ছিল। তাই আবদুল্লার দোষ তাঁর নজরে পড়েনি। যা উপলব্ধি করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

নিজের কথা প্রমাণ করার জন্যে শ্যামাপ্রসাদকে জীবন দিতে হয়।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য
একর, হুগলী।

ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-এর শরণার্থী ও মুক্তি-যোদ্ধাদের আরো সুষ্ঠুভাবে সেবা ও সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যে 'ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ'-এর [নেতাজী ভবন: ৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০, ফোন : ৪৭-৩৪১০] তরফ থেকে শ্রীবীণা ভৌমিক এদেশের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে যে আবেদন করেছেন তাতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। তাই আমরা আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি সেবা-সাহায্যের এই ডাকে সাড়া দিয়ে উদার হস্তে কমিটি ফাণ্ডে অর্থ সাহায্য করবার জন্যে।

—ডঃ রমা চৌধুরী,
(উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়),
— ডঃ আশা দেবী,
(সম্পাদিকা, মহিলা),
—কানন দেবী
(মহিলা শিল্পীমহল),
—ইন্দিরা দেবী
(আকাশবাণী কলকাতা)
প্রমুখ

বেহুলার কাহিনী প্রসঙ্গে

অমৃতের ১১ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৫শ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীসুরেশচন্দ্র দেবনাথ (এলাহাবাদ) মহাশয়ের 'বেহুলা ও লখীন্দর' শীর্ষক চিঠি প্রসঙ্গে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। আশাকরি সুরেশবাবুর কৌতূহল কেটোতে সক্ষম হবে। বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনীটি কবে ঘটেছিল এবং কোথায় ঘটেছিল এসম্পর্কে গ্রন্থের অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোৎকুমার মাইতি মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক পুস্তক

'Historical studies in the cult of the Goddess Manasa — a socio-cultural study'

(প্রকাশক 'পুঁথি-পুস্তক', ৩৪, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৪), পৃষ্ঠা—১৩১-১৪৮এ যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

কাহিনীটির উদ্ভবকাল সম্বন্ধে সুরেশবাবু লিখেছেন খৃষ্টজন্মের পূর্বে এবং মহাভারতীয় যুগের পরে। কিন্তু এটি ঐতিহাসিক সুরেশবাবুর মতের সমর্থক নয় (দ্রষ্টব্য)—পি কে মাইতি

'Historical studies in the cult of the Goddess Manasa'

পৃষ্ঠা ১৪৭)।

মনোরঞ্জন ভৌমিক
ছাত্র, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সর্বশেষ উপন্যাস

শাত রূপে দেখা

—চৌদ্দ টাকা—

কাল তুমি আলেয়া ১২॥০
নগর পারে রূপনগর ১৪৲

অবধূত ও যোগীসঙ্গ ৯৲
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

[illegible]
যমুনোত্রী হ'তে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫৲

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—[illegible] টাকা—
অনুবাদ—[illegible]

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন বই

সুখের মেলা ৮৲

বাংলার চালচিত্র ১০৲

শংকরের
অনবদ্য উপন্যাস

সীমাবদ্ধ ৬৲

—অষ্টম মুদ্রণ বেরিয়েছে—

বিভূতি রচনাবলী

[illegible]
[illegible]
[illegible]

আশাপূর্ণা দেবীর

প্রথম প্রতিশ্রুতি

নতুন মুদ্রণ—আঠারো টাকা
সুবর্ণলতা ১০৲

প্রমথনাথ বিশীর

লালকেল্লা

নতুন মুদ্রণ—[illegible] টাকা

কেরী সাহেবের মুন্সী ১০৲

লীলা মজুমদারের

আর কোন খানে

নতুন মুদ্রণ—[illegible] টাকা

চিত্রগুপ্তের

যদিদং হৃদয়ং মম

[illegible]

বাংলা পকেট বই : দুই দফায় চৌদ্দখানি বই

বেরিয়েছে : উপন্যাস : [illegible]

প্রত্যেকটি দু'টাকা। একত্রে পাঁচখানি ৮-৫০ টাকা

নারায়ণ ঘোষের — জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲
ডঃ [illegible] — বাংলা দেশের ছড়া ১০৲
কাজী নজরুলের শেষ গ্রন্থ — সন্ধ্যামালতী ৪৲

বিমল মিত্রের বেনারসী ৫॥, কুমারী ব্রত ৫৲, কলকাতা থেকে বলছি ৬৲, কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩৪৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : ফোন : ৩৪-৩৪৯২/৩৪-৮৭১১

১০০% প্রাকৃতিক

আঠারোটি
বহুগুণসমন্বিত গাছ-গাছড়া
দিয়ে প্রস্তুত
ভিকো
বজ্রদন্তী

ভিকো বজ্রদন্তী টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার সর্বপ্রকার টুথপেস্ট আর টুথ পাউডারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮টি নানাগুণসমৃদ্ধ বিভিন্ন গাছ-গাছড়াসহযোগে তৈরী। স্বতন্ত্রভাবে এই গাছ-গাছড়ার গুণগুলি সর্বজনবিদিত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদের সংমিশ্রণ অনেকগুণ বেশী কার্যকরী। বর্তমান ফরমুলা বহুবৎসর ব্যাপী গবেষণার ফল।

নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতের ক্ষয়, পায়োরিয়া, মাড়ি থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

একবার পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হউন

আয়ুর্বেদিক
টুথপেষ্ট
ও টুথ পাউডার
মুখাভ্যন্তরের
স্বাস্থ্যরক্ষায় অনন্য

ভিকো লেবোরেটরিজ
দাদার বোম্বাই-১৪

এজেন্টস্ ঃ— ডি সিটি কোর্প, ২০, ... স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬ টেলিফোন—২৩-০০১৬—২৩-৪৫৫৬
উত্তরবঙ্গ এজেন্ট ঃ এন, বি, মডার্ণ এজেন্সিজ, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 8th October, 1971 শুক্রবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬৪৪	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৬৪৫	সম্পাদকীয়		
৬৪৬	পটভূমি		—শ্রীদেবদত্ত
৬৪৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৬৫১	কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা		—শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য
৬৫৭	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৬৬০	শেষবার	(কবিতা)	—শ্রীআনন্দ বাগচী
৬৬০	আবর্ত	(কবিতা)	—শ্রীঅভয় বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬০	প্রত্যাহিক	(কবিতা)	—শ্রীসন্তোষ কর
৬৬১	সুবর্ণাজির	(উপন্যাস)	—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬৫	কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাংলার ঊনিশ শতক		—শ্রীপ্রেমরঞ্জন সেন
৬৬৭	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
৬৭১	চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র		—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু
৬৭৯	আবহমানকাল	(উপন্যাস)	—শ্রীসমীর রায়
৬৮৫	নামে আসে বিস্তর, যায়ও বহুত		—শ্রীবিমল বসু
৬৮৯	সূর্যের জন্য	(গল্প)	—শ্রীনির্মলানন্দ রক্ষিত
৬৯৪	শিশু ও পিতামাতার কর্তব্য		—শ্রীপ্রণবকান্তি দত্ত
৬৯৫	প্রদর্শনী		—শ্রীচিত্ররসিক
৬৯৭	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৭০১	গোয়েন্দার বিপদ	(গল্প)	—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
৭০৯	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
৭১০	প্রিয়ংবদা দেবী—১৮৭১—১৯৭১		—শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায়
৭১২	রূপ ও লাবণ্যে হংসেশ্বরী		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৭১৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭১৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীবিজয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মিহিজামের স্বর্গীয় ডাঃ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

ডঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরেকটি মূল্যবান বই

গাইড বুক

হোমিও চিকিৎসার বহুল প্রচারিত "প্যাকেট বই" হিসাবে সুপরিচিত। বাংলা/ইংরাজী এক সঙ্গে।

মূল্য ২॥ টাকা [ডাক খরচ আলাদা]

পি· ব্যানার্জি

৫০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ফোন ৫৫-৪২২১

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

পি, ব্যানার্জি

কলিকাতা-২৫

CENTRAL LIBRARY

এক নজরে

জনহীন জার্মানী : সারা পৃথিবী যখন জনবিস্ফোরণের আতঙ্কে দিশাহারা, জার্মানীতে তখন জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান বৃদ্ধির হার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এ ব্যাপারে উভয় জার্মানীরই সমান অবস্থা। তবে পূর্ব জার্মানীর পরিস্থিতি বেশী উদ্বেগজনক এবং তার জন্ম-মৃত্যুর বর্তমান হার যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে জনতত্ত্ববিদদের সুনিশ্চিত অভিমত, ২000 খৃষ্টাব্দে পূর্ব জার্মানী সম্পূর্ণ জনহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান লোকসংখ্যা ছয় কোটি। পূর্বে অনুমান করা হয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষে ঐ রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে ৬ কোটি ১৭ লক্ষ। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর জন্মহার যে দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে তা যদি পরে আরও হ্রাস না পায় তবে দু হাজার খৃষ্টাব্দে সেখানকার লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৭ লক্ষ। জনতত্ত্ববিদদের মতে, কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে হলে প্রতি ১০০ দম্পতির অন্ততঃ ২১৮টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে গত বছরেই প্রথম ঐ সংখ্যা ২০০-তে নেমে আসে। ১৯৬৪ সালে যে সংখ্যা ছিল ২৫৯, চার বছর পরে ১৯৬৮ সালে তা নেমে হয় ২৪২, পরের বছর তা আরও নেমে হয় ২২৪, এবং গত বছর তা জনসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখার জন্য ন্যূনতম জন্মহার সংখ্যা থেকেও নীচে নেমে আসে। পশ্চিম জার্মানীর সরকারী হিসাবমতে ১৯৬৫ সালে সেদেশে ৩১,000 কম শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে; ১৯৭০ সালে ১০,000 কম শিশু জন্মেছে এবং এ বছর লক্ষাধিক কম শিশু ভূমিষ্ঠ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর এই দ্রুত জন্মহার হ্রাসের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, সেদেশের প্রতি দুজন বিবাহিতা নারীর মধ্যে একজন জন্মনিরোধক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। তার ওপর আছে প্রতি বছর অন্ততঃ দশ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা। বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মানুষের আয়ু এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় পশ্চিম জার্মানীর কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, অনতিবিলম্বে জার্মানী এক বৃদ্ধের জাতিতে পরিণত হবে।

পূর্ব জার্মানীর পরিস্থিতি আরও বেশী আশঙ্কাজনক এই কারণে যে সেখানে জন্মহার প্রতি হাজার লোকপিছু তিন-এ নেমে এসেছে, যা ইউরোপের হিসাবে সর্বনিম্ন হার। এ ব্যাপারে পূর্ব জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত, একটি দম্পতির কাছে সন্তানের চেয়ে মোটর গাড়ী বেশী আকর্ষণের বস্তু হওয়ায় অধিকাংশ দম্পতি যতদিন সম্ভব নিঃসন্তান থাকার চেষ্টা করছে। এ কারণে তাঁরা জার্মানীর যুবক-যুবতীদের মনে অপত্য স্নেহ জাগিয়ে তোলার উপর বেশী জোর দিতে বলেছেন। পূর্ব জার্মানীর সরকারও সন্তানবতীদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আরও বেশী সন্তানের জননী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কতটুকু কি সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা উপরের হিসাব থেকেই বোঝা যাবে।

পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এখন জন্মহার দ্রুত হ্রাসমান। বর্তমান যুবক-যুবতীদের ক্রমবর্ধমান অপত্যস্নেহ ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি অধিক আকর্ষণ এই অভাবিত সঙ্কটের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক গণ-সহমরণ : যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে, সাভা নদীর তীরবর্তী গোমোলাভা নামক স্থানে লৌহযুগের সূচনাকালের একটি গণসমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে প্রথমে গত আগষ্ট মাসে ১৫টি নারীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। তারপর আরও উৎখনন চালিয়ে এ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশী নারী কঙ্কালের সন্ধান মিলেছে। কিন্তু এক স্থানে এতগুলি নারী সমাহিত হওয়ার প্রকৃত কারণ প্রত্নতত্ত্ববিদরা উপলব্ধি করতে পারেন একটি পুরুষের কঙ্কালের সন্ধান লাভের পর। ঐ বিশাল সমাধিটির মধ্যস্থলে শায়িত ছিল পুরুষের কঙ্কালটি। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করছেন, ব্যক্তিটি হয়ত গোষ্ঠীপতি ছিল, এবং তার মৃত্যুর পর তার অর্ধশতাধিক স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কোনকালে সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলে নি। এই কারণেই পুরুষটির কঙ্কাল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতত্ত্ববিদরা ঐ অর্ধশতাধিক নারীর একই কবরে সমাহিত থাকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

পুরুত ছাড়া বিয়ে : পুরোহিতবিহীন বিবাহানুষ্ঠান যে আমাদের কাছে শিবহীন যজ্ঞের মতোই অর্থহীন অধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে হয়, তামিলনাড়ুর 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলন দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে প্রমাণ করেছে যে, সেটা একটা অবাঞ্ছিত সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল সুসজ্জিত বিবাহ মণ্ডপে আলপনা অঙ্কিত কাষ্ঠাসনে বসে সুবেশ বর সালঙ্কারা বধূর পাণিগ্রহণ করবে আর মুহুর্মুহু উলুধ্বনি ও পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে বিবাহবাসর মুখরিত হবে, অদূরে চলবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়নে রসাল ভোজের অমেয় অপচয়—এমন না হলে বিবাহানুষ্ঠান সার্থক ও সম্পূর্ণাঙ্গ হল বলেই মনে হয় না আমাদের। কিন্তু ঐ আনন্দোচ্ছ্বাসের অন্তরালে একটি মানুষের যে কী গভীর দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে তা জেনেও আমরা যেন জানতে চাই না। ধরে নিই, মেয়ের বাবা হওয়ার 'অপরাধে' ও সমাজে মর্যাদা নিয়ে বাস করার জন্য এ গুরুভার অসহনীয় হলেও বহন করতে হবে। তার জন্য যদি ভদ্রাসন বিক্রি হয় হক, ঋণের ভারে যদি মাথা নুয়ে পড়ে পড়ুক। কিন্তু তামিলনাড়ুতে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলনের প্রবক্তারা ঘোষণা করলেন, বিবাহানুষ্ঠানের কোন আড়ম্বর বা অপচয়ই অনিবার্য নয়। নরনারীর মিলন ও দম্পতির সুখময় ভবিষ্যৎ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয় তবে সে মিলনবাসরে অঙ্গুরী বিনিময়ই যথেষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রবীণের উপদেশ ও প্রিয়জনের শুভেচ্ছাই সে মিলন মুহূর্তকে পূত পবিত্র করতে পারে। আর যে হিন্দুধর্মের সূত্রে কোন বর্ণবিভেদ ছিল না, তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদাই বা থাকবে কেন? বোধগম্য ভাষায় আপনজনের শুভকামনা বড় না একজন পেশাদার পুরোহিতের যন্ত্রবৎ মন্ত্রোচ্চারণ বড়?

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের নিরলস প্রয়াসে 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলন এখন তামিলনাড়ুর সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে এখন হাজার-হাজার হিন্দু বিবাহ পুরোহিত ও বৈদিক মন্ত্রপাঠ ছাড়াই সম্পন্ন হচ্ছে। অনাড়ম্বর বিবাহ-বাসরের একমাত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অঙ্গুরী বিনিময়, এবং তারপর প্রবীণদের উপদেশ ও আপনজনদের শুভাশীর্বাদ আধ ঘণ্টার মধ্যেই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। বঙ্গললনাদের হতভাগ্য পিতারা এমন সুদিনের মুখ কি কোনদিন দেখতে পাবেন?

৩০।১।৭১

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

পুনরাগমনায় চ

গঙ্গে আগমন। নৌকায় গমন। আসতে জল, যেতেও জল। জল, জল, জল। চারিদিকে জল থৈথৈ—তার উপর নবমীর মধ্যাহ্ন থেকে বিজয়াদশমী এবং একাদশী জুড়ে প্রচণ্ড আশ্বিনে ঝড়। এবার দেবীর আগমন এবং বিসর্জন দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যেমন ১৯৪২-এর মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর বিয়োগান্ত দিনগুলির বেদনাদায়ক স্মৃতি আজো অনেকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। অশ্রুভরা এ বিজয়া। সব দিক থেকেই অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত। আনন্দময়ীর আগমনে যে আনন্দের সূত্রপাত বিসর্জনে তার অবসান। বিজয়ার প্রভাতে দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিসর্জনদানের সময় সজল নয়নে পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্ব স্থানং দেবো মহেশ্বরঃ
সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।"

মহেশ্বর সকাশে যাও, সেটি পরস্থান, আবার সংবৎসরান্তে আগমন করে আমাদের আনন্দবর্ধন কোরো, হে জননী এই প্রার্থনা।

বাঙালীর কাছে দেবী দুর্গা জননী ও কন্যাস্বরূপিণী। বিসর্জন তাই স্নেহময়ী কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনের সমতুল, সেইজনাই পরস্থান। মাত্র তিনটি দিনের অধিষ্ঠান, আর সেই তিনটি দিনকে কেন্দ্র করে চলে বাঙালীর আনন্দোৎসব। ভক্তের কাছে এই তিনটি পুণ্য দিবসের মূল্য অসীম। সারা বছরের দুর্বিসহ ক্লেশভার, দুঃখ জ্বালা বিস্মৃত হয়ে সকল শ্রেণীর মানুষই এ কদিন আনন্দসাগরে অবগাহন করেন।

জননী দুর্গা তাঁর সন্তানদের কিন্তু ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তিনিই পরমা মায়া, পরমা বৈষ্ণবী, সর্বরূপিণী জগতের আধার স্বরূপিণী। সেই অখিল জগৎজননী প্রসন্ন হলে জগৎ প্রসন্ন হয়। তাঁর উপস্থিতি অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন মর্তের মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাই তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্তির সলিল সমাধিতে আমাদের অন্তর দুঃখ ও বেদনায় ভরে ওঠে। শক্তি আরাধনার অন্তর্নিহিত অর্থ শক্তির পূজারী বাঙালীর কাছে অজানা নয়। দেবীর এই বিসর্জন বাঙালীর মনে বেদনা সৃষ্টি করলেও, বাঙালীর অন্তরে দেবীর সাধনার ধারা নিরন্তর প্রবহমান।

শারদোৎসবের অপর নাম অকালবোধন। শ্রীরামচন্দ্র নাকি রাবণবধের জন্য অকালে দেবীর বোধন করেন এই ধারণা সাধারণে প্রচলিত। সারা ভারতে এই কালটি উৎসবের কাল।

উত্তর ভারতে দশেরা উৎসব, দশানন রাক্ষসরাজাকে বধ করার সমগ্র বৃত্তান্ত পক্ষকাল ধরে এক বিচিত্র লোক-নাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয় এবং দশেরা দিবসে রাক্ষসকুলতিলক রাবণের দশমুণ্ডবিশিষ্ট বিরাট কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই উৎসবটি রামলীলা নামে পরিচিত। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে নবরাত্র উৎসব। এই উৎসবগুলির সমাপ্তির পর আত্মীয়স্বজন এমনকি অপরিচিতকেও অভিনন্দন জ্ঞাপনের রীতি আছে।

উপলক্ষ্য যাই হোক উৎসবের শুচিশুভ্র স্পর্শ অন্তরের কালিমাকে মুছে দেয়। হিংসা, দ্বেষ, জ্বালা সব কিছুরই একটা সাময়িক বিরতি ঘটে। বাংলাদেশে বিজয়াদশমী এক অতি আশ্চর্য দিন।

তিমিরবিদারী এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দিনের অভ্যুদয়ে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়। অন্তরের অন্ধকারকে দূর করার এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না।

এই পুণ্য লগ্নে আমরা প্রার্থনা করি দেবীর শুভ আশীর্বাদ সকলের শিরে বর্ষিত হোক। পরিচিত, অপরিচিত, দূর এবং নিকটস্থ সকল মানুষের কল্যাণ হোক। সকলে সকলের মধ্যে মঙ্গল দর্শন করুন, রোগমুক্ত হোন, সুখী হোন। দুঃখের দুঃসহ জ্বালা থেকে মুক্তি হোক। আমাদের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাই।

পটভূমি

একথা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না যে, পশ্চিম বাংলা দিল্লীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য পুরোপুরি পায়নি এবং এই অঙ্গ রাজ্যের অনেক দুর্গতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ভ্রান্ত নীতিই দায়ী। সেই সব নীতি কীভাবে পশ্চিম বাংলার স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে তার কিছু কিছু আলোচনা এই বিভাগেই আগে করেছি। আজ এই রাজ্য সম্পর্কে দিল্লীর উদ্বেগ যে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে সেটা অবশ্যই সুলক্ষণ। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যদি নিতান্তই রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে থাকেন তবে তার মধ্যেও দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু আজ পশ্চিম বাংলার সমস্যার প্রতি মনোযোগ সহকারে নজর দিতে গিয়ে দিল্লীর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-সব বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে তার গুরুত্বও কিন্তু মোটেই কম নয়।

এই রাজ্যের প্রশাসনের ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁদের দায়িত্বের কথাই বলছি। পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক অবক্ষয়ের সবটুকুই কি দিল্লীর উপেক্ষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়? দিল্লীর কাছ থেকে হকের পাওনা আদায় করে নেওয়ার জন্যে রাইটার্স বিল্ডিংসে যাঁদের অবস্থান তাঁরা কতোটুকু চেষ্টা করেছেন? এবং যতোটুকু পাওয়া গেছে তার পুরো সদ্ব্যবহারও সব জায়গায় হয়েছে কী?

সেদিন কলকাতায় এক সেমিনারে কেন্দ্রের জনৈক মন্ত্রী যে অভিযোগ করলেন তাকে চাঞ্চল্যকর বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। অভিযোগটা ছিল কৃষির উন্নতির প্রয়াসের ব্যাপারে। খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএ পি শিন্দে জানালেন যে, তিনি নিজে যে-জেলার লোক (মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর) সেই জেলায় চাষের জন্যে বছরে ২২ কোটি টাকা ঋণ বণ্টন করা হয় চাষীদের মধ্যে। আর গোটা পশ্চিম বাংলায় এই খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ মাত্র দশ কোটি টাকা। চাষের কাজে ঋণ দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা আছে যার নাম এগ্রিকালচারাল রিফিনান্স কর্পোরেশন। ঐ কর্পোরেশন থেকে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর এবং অন্ধ্র প্রদেশ ঋণ নিয়েছে ৩০ থেকে ৫০ কোটি টাকা, আর সেই জায়গায় পশ্চিম বাংলা নিয়েছে মাত্র দুই কোটি টাকা। আরো যেটা পরিতাপের কথা, ঐ দুই কোটির মধ্যে আসলে খরচ হয়েছে মাত্র বারো হাজার টাকা।

খবরটা প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, কিন্তু শ্রীশিন্দে বাড়িয়ে বলেন নি। তবে এ-বিষয়ে আরো আলোচনার আগে এই কর্পোরেশন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিলে ভালো হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা কর্পোরেশন, বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কর্পোরেশনের অংশীদার। এই কর্পোরেশন যে সরাসরি চাষীদের ঋণ দেয় তা নয়। সমবায় ব্যাঙ্ক বা ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক চাষীদের যে ঋণ দেয় তার বড় অংশটাই ঐ সব ব্যাঙ্ক আবার ঋণ হিসেবে পায় রিফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে।

বছর আষ্টেক হল এই কর্পোরেশন তৈরি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কর্পোরেশন ৪৫৮টি কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে মোট ২১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। যে-সব কর্মসূচীর জন্যে ঐ টাকা মঞ্জুর হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল ছোট আকারের সেচের কর্মসূচী। এই সব কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশে ৪২ হাজারের বেশি নলকূপ এবং প্রায় ৫০ হাজার কূপ খনন করা হয়েছে, তাছাড়া এক লাখ ১৩ হাজারের বেশি বিদ্যুৎচালিত পাম্প বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই কর্মসূচীর ফলে গোটা দেশে মোট ছ'লাখ ৮৫ হাজার একর এলাকায় বছরে দু'বার ফসল তোলার ব্যবস্থা করা গেছে। কিন্তু এই কর্মসূচীর ফলে লাভবান হয়েছে কোন কোন রাজ্য? নলকূপ খনন কর্মসূচীর লাভের ভাগ গিয়ে পড়েছে প্রধানত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে এবং কূপ খনন কর্মসূচীতে লাভ হয়েছে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের। না, পশ্চিম বাংলার নাম কোনো তালিকাতেই নেই। তা ছাড়া, রিফিনান্স কর্পোরেশনের পয়সায় প্রায় সোয়া সাত লাখ একর জমির উন্নতি সাধন করে সেখানে বড় সেচ প্রকল্প থেকে জল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও লাভবান হয়েছে প্রধানত বিহার ও মধ্যপ্রদেশ। তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলার জন্যই এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম কর্মসূচী মঞ্জুর হয়েছে (মাত্র ছটি)।

কেন এমন হল? সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও দিল্লীর বৈষম্যমূলক নীতির প্রতি আঙুল দেখিয়েই চুপ করে বসে থাকা যেত, কিন্তু মুশকিল এই যে, কৃষির উন্নতির দায়িত্বটা রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরকেই উদ্যোগী হয়ে চাষীদের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, কোথা থেকে কীভাবে ঋণের টাকা জোগাড় করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে, কর্মসূচী পেশ করতে হবে। পশ্চিম বাংলার কৃষি দপ্তর কি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন?

এখন এই সব তথ্য ফাঁস হওয়ার পর রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলারা একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। এগ্রিকালচারাল রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ শুধু তারাই পায় যাদের অন্তত তিন থেকে পাঁচ একর পর্যন্ত চাষের জমি আছে। পশ্চিম বাংলায় যেহেতু সাধারণ চাষীর এই পরিমাণ জমি নেই, তাই অধিকাংশ চাষীই এই ঋণের ব্যবস্থার সুবিধে নিতে পারে নি। এ-কথা ঠিক যে, এই রাজ্যে জোতের পরিমাণ সাধারণত ছোট। কিন্তু এ-কথাও কি সত্যি নয় যে, মোট যতো জোত আছে তার মধ্যে বেশ একটা বড় অংশের আকারই তিন একরের ওপর? সেই সব জোতের মালিকেরা যাতে রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ পেতে পারে তার জন্য আমাদের কৃষি দপ্তর কতোটা চেষ্টা করেছে? আর যেটুকু টাকা পাওয়াও গেছে তার একশ ভাগের এক ভাগও যে খরচ করা যায়নি, তার কৈফিয়তটাই বা কী?

•

রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলারা আরো একটা অক্ষম যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নিতে চাইছেন। তাঁরা বলতে চান, পশ্চিম বাংলার চাষীরা স্বল্পমেয়াদী ঋণ চায় যা দিয়ে তারা সার, বীজ প্রভৃতি কিনতে পারে। কিন্তু রিফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ প্রধানত দেওয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী কাজের জন্যে (যেমন সেচ)। সেই জন্যেই ঐ কর্পোরেশনের টাকা এই রাজ্যে কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু এখানে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। সার, বীজ প্রভৃতি কেনার জন্যে টাকা সব চাষীরই দরকার হয়, শুধু পশ্চিম বাংলার চাষীদের নয়। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদী ঋণকে কাজে লাগাতে পারেন এমন চাষী কি এই রাজ্যে একেবারেই নেই? আর ছোট চাষীদের জন্যে ঋণ দিতে এগিয়ে এলেই কি রাজ্য সরকার দু'হাত তুলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন?

একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা এখানে বলা যাক। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এই রাজ্যে ভাগচাষীদের ঋণ দেওয়া কাজ সম্প্রতি শুরু করেছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী সার, বীজ প্রভৃতি কেনার জন্যে ভাগচাষীদের ছ'-সাত শ' টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে- [illegible]

কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হচ্ছে না। ভাবী ফসল বন্ধক রেখেই তারা এই ঋণ পাচ্ছে। এই প্রশংসনীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহাজনের কবল থেকে ভাগচাষীদের বাঁচানো। কিন্তু এই পরিকল্পনাটিও কতো দূর কার্যকর হবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তার জন্যে কিন্তু চাষীদের কোনো দোষ নেই, দোষটা শেষ পর্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংসের ওপরেই বর্তাতে বাধ্য। কারণ, এখন পর্যন্ত বর্গাদারের পুরো তালিকাই তৈরি হয়নি। অথচ সরকারী নথিপত্রে বর্গাদার হিসেবে নাম না-উঠলে ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার অসুবিধে।

আসলে, কৃষি দপ্তর যাই বোঝাতে চান না কেন, এই রাজ্যের কৃষির অধোগতির জন্যে তাঁরা যে বিশেষভাবে দায়ী, একথা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। চাষ-বাসের যে-কোনো ব্যাপারের দিকেই তাকানো যাক না কেন, পশ্চিম বাংলা পড়ে রয়েছে অন্যান্য অনেক রাজ্যেরই নিচে। পর পর দু বছর এই রাজ্যে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাল উৎপন্ন হয়েছে বলে কৃষি দপ্তর নিশ্চয়ই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই হিসেব দিয়ে কি অপ্রিয় সত্যটা ঢাকা যাবে যে, এখানে বিঘা প্রতি ধানের ফলন অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়েই কম? ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের একটি হিসেবে দেখা যায়, পশ্চিম বাংলায় চালের ফলন বেড়েছে শতকরা এক ভাগের তিন ভাগ হারে, অথচ সেখানে পাঞ্জাবের বেড়েছে শতকরা প্রায় পৌনে দু'ভাগ হারে এবং গোটা দেশের গড়পড়তা হার শতকরা প্রায় দেড় ভাগ। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় তথৈবচ। ১৯৬২ সালের পরও যে অবস্থার লক্ষণীয় তারতম্য ঘটেছে তা নয়। একটি হিসেবে তো দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে পশ্চিম বাংলার কৃষিতে মাথাপিছু উৎপাদন কমে গেছে, অথচ অন্যান্য অনেক রাজ্যে তা বেশ বেড়েছে। কৃষি উৎপাদন বাড়বেই বা কী করে? ফলন বৃদ্ধির চেষ্টার একটা বড় প্রমাণ জমিতে সারের ব্যবহার। এক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলা বেশ পিছিয়ে আছে। তামিল-নাড়ু, পাঞ্জাব বা অন্ধ্র প্রদেশ তো বটেই, এমন কি কেরলও তাকে এই ব্যাপারে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

•

পশ্চিম বাংলার চাষবাসের এই দুর্গতির হেতু কিন্তু রাজ্য সরকারের অক্ষমতার জন্যেই। দেশভাগের পর থেকে এই রাজ্যে খাদ্য সংকটের কথা সুবিদিত, কিন্তু তবু খাদ্যোৎপাদনের দিকে কখনোই তেমন নজর দেওয়া হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু দূরপ্রসারী প্রকল্পের কাজ সুরু হয়েছিল, কিন্তু কৃষি ছিল উপেক্ষিত। ডাঃ রায় নাকি বলতেন, তিনি চাষবাসের কিছু বোঝেন না। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভায় কেউই এ-সব বুঝতেন না তা সত্য নয়। এমন কি, গাঁয়ের মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র সেন যখন ডাঃ রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন তখনও তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ব্যয়ের শতকরা মাত্র সাড়ে চার ভাগ। সেটাই যথেষ্ট লজ্জার ব্যাপার, কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঐ পরিমাণ আরো কমে গিয়ে দাঁড়াল শতকরা সাড়ে তিন ভাগেরও কম। তৃতীয় পরিকল্পনাতে অবশ্য এই পরিমাণ কিছু বাড়ল (শতকরা প্রায় ৮ ভাগ), কিন্তু সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আরো বেশী পরিতাপের কথা, কৃষি খাতে যতোটুকু টাকাও বরাদ্দ হয়েছে তার পুরোটা কোনোবারই খরচ হয়নি। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে বরাদ্দ টাকা খরচ না-করতে পারার ব্যাপারে আমাদের কৃষি দপ্তরের ঐতিহ্য বেশ পুরানো!

এখন চাষবাসের প্রতি এই উপেক্ষার ফল কী হয়েছে? প্রথমত সাধারণ চাষীদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। ফলে গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের মধ্যে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে তা দিয়ে রাজ্যের চাহিদা মেটেনি। আর সেই ঘাটতি মেটাবার জন্যে বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে এবং সেই আমদানির পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে যেখানে বছরে গড়পড়তা সাড়ে পাঁচ লাখ টন খাদ্য-শস্য আমদানি করতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেখানে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে সাড়ে সাত লাখ টনের বেশি। এই-ভাবে বাড়তে বাড়তে এখন বছরে প্রায় কুড়ি লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করে এই রাজ্যের সাড়ে চার কোটি বাসিন্দার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে (অবশ্য সকলেই যে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, তা নয়)। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমদানির পরেও রাজ্যের পুরো চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না।

এই ঘাটতির ফলে সরবরাহ ঠিক মতো না-থাকায় শুধু যে দাম ক্রমশ চড়েছে তাই নয়, এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও প্রায়শই দেখা দিয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই অস্থিরতার আসল সূচনা ১৯৬৬ সালে এবং রাজ্য-ব্যাপী খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা চরমে ওঠে।

পশ্চিম বাংলার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য এখন নতুন করে যে উদ্যোগ সুরু হয়েছে তাতে সমস্ত মনোযোগটাই গিয়ে পড়েছে শিল্পের উন্নতির দিকে। কিন্তু খাদ্যশস্য তথা চাষবাসের সমস্যার সমাধান না-করে যে কী করে এ রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব তা বোঝা মুস্কিল।

১।১০।৭১ —বেদব্রত

আপনার অদৃষ্ট ?

—একখানি আশ্চর্য বই—

১৯৭২ কেমন যাবে

প্রতি রাশি ও নক্ষত্র এবং লগ্ন মিলিয়ে ১৯৭২ সাল আপনাদের কেমন যাবে—তারই বিচার করেছেন

বিখ্যাত ফলিত জ্যোতির্বিদ

ভৃগুজাতক

এর সঙ্গে থাকছে ভারত ও অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও ভারতের অচিন্তিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চর্য ইঙ্গিত।

বিস্তৃত বিচার সহ এই গ্রন্থটি সর্বসাধারণের ক্রয়যোগ্য রাখার জন্য মূল্য রাখা হয়েছে

॥ মাত্র ৩, টাকা ॥

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

দেশ বিদেশ

নয়াদিল্লীর সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ অবশ্য তাঁদের সরকারের হয়ে কথা বলার অধিকারী নন। সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁরা ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথম একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশের মঞ্চ থেকে এমন সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্থানের নির্মম সামরিক তাণ্ডবের নিন্দা করা হল, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশ সরকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সামরিক সাজসরঞ্জাম সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান হল।

২৪টি দেশ থেকে সমবেত দেড়শতজন প্রতিনিধির এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণ ও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসা করতেই হবে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের জনগণ যে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সেই লড়াইকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম হিসাবেই বিশ্ব-সমাজের গণ্য করা উচিত।

প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, এতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলির প্রতি এই বলে আবেদন জানান হয়েছে যে পাকিস্থান সরকারকে তাঁরা যেন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রাংশ ও সামরিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া বন্ধ করেন।

প্রস্তাবের আর একটি অংশে বাংলাদেশের সরকারকে আশু ও কার্যকর সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই অংশে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, কোন কোন দেশ ও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সাহায্য দেওয়ার মানে হবে সামরিক সাহায্য দেওয়া।

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার এই প্রস্তাব নিয়ে সম্মেলনে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন প্রতিনিধি এভাবে সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখের বিরোধী ছিলেন। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজে গান্ধীবাদী এবং তাঁর আমন্ত্রণে সম্মেলনে বিদেশ থেকেও কয়েকজন গান্ধীবাদী নেতা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেন, এই সম্মেলন থেকে শুধু অহিংস কর্মপদ্ধতিরই নির্দেশ দেওয়া উচিত। কিন্তু জয়প্রকাশজী বলেন যে, এই সম্মেলন শুধু গান্ধীবাদীদের নয় এবং গান্ধীবাদীদের ধ্যান ধারণাতেও হয়নি। উপরন্তু তিনি প্রস্তাব দেন যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গণতন্ত্রীদের হয়ে লড়াই করার জন্য যেমন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল এবারও তেমনি বাংলাদেশের জন্য একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠন করা হোক।

আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের এই প্রস্তাব অবশ্য সম্মেলনে গৃহীত হয়নি। অন্যদিকে, সম্মেলনের কিছু প্রতিনিধি একটি অহিংস কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেও পরে সেটা বাতিল করে দেন। এঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, এঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি 'গান্ধী-প্রদর্শিত পথে নাটকীয় আকার' দেওয়া যাবে বলে তাঁরা আশা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কর্মসূচী পালন করা হয়নি। বলা হয় যে, এই কর্মসূচী অনুসরণ করলে ভারত সরকারকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে হত, সেটা তাঁরা চান না বলেই তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন।

তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সাহায্য করার কোন বাস্তব কর্মপন্থাও গড়ে তোলা যায়নি, একথা সত্য। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে, এই সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা নিজের নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিশ্ব-জনমতের সামনে তুলে ধরে রাখবেন। ইয়াহিয়া খাঁর সরকার জোর গলায় প্রচার করছেন যে, পূর্ব বাংলায় অসামরিক গভর্নরের নেতৃত্বে অসামরিক শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, তাঁকে সময় দেওয়া হলে তিনি সবকিছু আবার স্বাভাবিক করে দেবেন। পৃথিবীর অন্যান্য বহু সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত বিশ্ব-জনমতও বাংলাদেশ নামক আর একটা উৎকট সমস্যার কথা ভুলতে আগ্রহী হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই অবসরে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন হয়ত বাংলাদেশ প্রশ্নটির উপর বিভিন্ন দেশের মানুষের দৃষ্টি আরও কিছুকাল ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।

●

এই প্রথম কোন রাজ্যে শাসক কংগ্রেস দল সি-পি-আই সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করল। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের কোয়ালিশন সরকারকে শাসক কংগ্রেস দল বাইরে থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল।

কিন্তু গত প্রায় তিন মাস যাবৎ সি-পি-আই কেরলের মন্ত্রিসভার ভিতরে কংগ্রেসকে টেনে আনার চেষ্টা করছে। বিধানসভায় যেসব দলের সমর্থনের উপর কেরলের মন্ত্রিসভা টিকে রয়েছে তাদের মধ্যে শাসক কংগ্রেস দলই সংখ্যায় সবচেয়ে ভারী। এই দলকে সরকারের বাইরে রেখে সি-পি-আই সহ যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেদের শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তাছাড়া, শাসক কংগ্রেস দলের যুব শাখা সম্প্রতি কেরলে নানা বিষয়ে আন্দোলন করে অচ্যুত মেননের সরকারকে বিব্রত করছিলেন। তাঁদের সংযত করার জন্যও যুক্তফ্রন্ট শাসক কংগ্রেস দলকে সরকারের ভিতর টেনে আনার প্রয়োজন অনুভব করছিল।

এর পর সম্প্রতি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ যখন শাসক কংগ্রেস দলের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করল তখন থেকে কেরলে সি-পি-আই অধিকতর উৎসাহ নিয়ে শাসক কংগ্রেস দলকে সরকারের শরিক করার চেষ্টা করতে লাগল।

যদিও কেরল বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের তরফ থেকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে কখনই বিশেষ আপত্তি ছিল না। তাহলেও তাদের যুব শাখা প্রথম থেকেই এই ব্যাপারে বাধা দিয়ে আসছিলেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য শাসক কংগ্রেসদল যুক্তফ্রন্টকে অনেকগুলি সর্ত দিল। প্রধান প্রধান সর্তগুলি হল, বর্ধিত মন্ত্রিসভার আয়তন তের-জনের বেশী হবে না এবং ঐ ১৩টির মধ্যে শাসক কংগ্রেস দলকে পাঁচটি আসন দিতে হবে, শাসক কংগ্রেস দল থেকে একজনকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে, স্বরাষ্ট্র, শিল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি শাসক কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। এই সব সর্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলছিল। যুক্তফ্রন্টের সামনে অসুবিধা দেখা দিল, ১০ জনের মন্ত্রিসভায় শাসক কংগ্রেসকে পাঁচটি আসন দিতে হলে বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে একজনকে বিদায় দিতে হয়। কোন্ দলকে তার মন্ত্রী সরিয়ে নিতে বলা হবে? এই অসুবিধা এড়াবার জন্য যুক্তফ্রন্ট প্রস্তাব দিল, ১৫ জনের মন্ত্রিসভা হোক এবং তার মধ্যে ছয়টি আসন শাসক কংগ্রেস নিক। কিন্তু শাসক-কংগ্রেস সেই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করল।

শেষ পর্যন্ত সি-পি-আই সমস্যার সমাধান করে দিল। তারা বলল, তারা মুখ্যমন্ত্রী বাদে তাদের অন্য তিনজন মন্ত্রীকেই সরিয়ে নেবে এবং ঐ তিনজনের জায়গায় এম এন গোবিন্দম্ নায়ার ও টি ভি টমাসকে বসাবে। এই প্রস্তাব দিয়ে সি-পি-আই এক ঢিলে দুই পাখী মারল। একদিকে তারা শাসক কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পথ করে দিল, অন্যদিকে

CENTRAL LIBRARY

প্রাক্তন দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীকেও তারা রাজনৈতিক পুনর্বাসন দিল।

সি-পি-আই দলভুক্ত দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী—এম এন গোবিন্দন নায়ার ও টি ভি টমাস—দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কেরলের প্রাক্তন নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের আমলে ঐ অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি আনন্দনারায়ণ মোল্লাকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনের রায়ের মেয়াদ মোট ১৪ বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কমিশনের পিছনে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার ঠিক প্রাক্কালেই এই কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেল। কমিশন ঐ দুইজন কম্যুনিস্ট নেতাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। বিচারপতি মোল্লা বলেছেন, এই ধরনের অসার অভিযোগ নিয়ে মাতামাতি করারই কোন দরকার ছিল না। তিনি শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের আচরণ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে বারবার তলব করা সত্ত্বেও তিনি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে আসেননি।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে কেরলে যখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই ও অন্যান্য দলের কোয়ালিশন সরকার গঠনের নতুন পরীক্ষা চলছে তখনই এই রাজ্যের এর্ণাকুলাম শহরে সি-পি-আইয়ের পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শাসক কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের যে লাইন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছে সেটি অনুমোদনের জন্য এই পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত করা হবে।

•

মহারাষ্ট্রের ভিওয়াণ্ডিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে, ষোল মাস আগে। এই ষোল মাস ধরে ঐ দাঙ্গার দায়িত্ব স্থানীয় কিছু মুসলমানের উপর চাপাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে হার মেনেছেন তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া খুবই গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা। ঘটনাটি হল এই রকম:—

গত বছর মে মাসে ভিওয়াণ্ডির দাঙ্গার পর যেসব স্থানীয় মুসলমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল দীর্ঘকাল তাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জই দেওয়া হয়নি। এই নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার পর ভিওয়াণ্ডির আদালতে মোট ১২৩ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়টি পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তারা ঐ দাঙ্গা বাধাবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মামলার ভারপ্রাপ্ত সি আই ডি অফিসারদের আচরণ সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পান। এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে মুখ্যমন্ত্রী নিঃসন্দেহ হন যে, অভিযোগগুলি মিথ্যা। তখন তিনি মামলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে তখন ঐ দাঙ্গা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মদনের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। ভিওয়াণ্ডির আদালতে দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের মামলার কথাটা যখন কমিশনের নজরে আসে তখন কমিশন পুলিশের কৌঁসুলীকে নির্দেশ দিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের নাম এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ কমিশনের সামনে পেশ করা হোক।' দুই সপ্তাহ পরে সরকারী কৌঁসুলী ১৬ জন ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা দেন। আদালতে অভিযুক্ত ১২৩ জন মুসলমানের মধ্য থেকেই এই ১৬টি নাম দেওয়া হয়। সরকারী কৌঁসুলী গত ৩০ জুলাই তারিখ তদন্ত কমিশনের সামনে ঐ ষোলজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। কিন্তু এই অভিযোগের সমর্থনে যখন সরকারী সাক্ষীদের দাঁড় করান হতে থাকে তখন সরকারী বক্তব্যে গুরুতর গলদ ধরা পড়ে। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকারী নথিপত্রে তারিখের কারচুপিও ধরা পড়ে। তদন্ত কমিশন তলব করা সত্ত্বেও ভিওয়াণ্ডি থানার কেস ডায়েরির হদিস সরকারের কাছ থেকে পাননি। অগত্যা, সরকারী কৌঁসুলী রাজ্য সরকারকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিলেন এবং তাঁর সেই পরামর্শমত মহারাষ্ট্র সরকার কমিশনের সামনে থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুমতি চাইলেন। বিচারপতি মদন অবশ্য সেই অনুমতি দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, 'পুলিশের সাক্ষীদের কথা সত্য হলে ধরতে হবে, মিথ্যা অভিযোগে মানুষকে ফাঁসান হচ্ছে। এও যদি সম্ভব হয় তাহলে পুলিশের হাত থেকে নিরাপদ কে? এটা এখন আর রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন না, আসলে নাগরিকদের জীবন ও নিরাপত্তারই প্রশ্ন।'

•

ফরাসী রেডিওর মতে, কম্যুনিস্ট চীনের উপরতলার নেতৃত্বের মধ্যে রদ-বদল ঘটে থাকতে পারে। অথবা হয়তো প্রেসিডেন্ট নিকসনের পিকিং সফর আসন্ন। কিম্বা চেয়ারম্যান মাও অসুস্থ বা মৃত। আবার জাপানের সংবাদ হল, আমুর নদী অঞ্চলে চীন-সোভিয়েট সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কারণটা যে কি হতে পারে তা নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবিষয়ে একমত যে, লাল চীনের ভিতরে গুরুতর কিছু ঘটনা ঘটেছে।

জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয় পিকিংয়েরই একটি ঘোষণা থেকে। ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে, এবার ১ অক্টোবর তারিখে চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে পিকিংয়ে অন্যান্যবারের মতো কুচকাওয়াজ হবে না। জাতীয় দিবসের দুই সপ্তাহখানেক আগে এই ঘোষণা করা হয়। পিকিংস্থিত বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিরা যখন চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরে ১ অক্টোবরের কুচকাওয়াজের জন্য আমন্ত্রণপত্র চান তখনই তাঁদের একথা জানান হয়।

জাতীয় দিবসের এই প্রথাগত কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখার যে সরকারী কারণ পিকিং থেকে দেখান হচ্ছে তাতে বলা হয়েছে যে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্যই এবার এই কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তার বদলে চীনের জনসাধারণ উৎপাদন ও নির্মাণের ক্ষেত্রে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে তাঁদের জাতীয় দিবস উদযাপন করবেন।

অন্যদিকে প্যারিসস্থিত চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র বলেছেন, এই কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখা 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা।' চীনের জাতীয় দিবস পালনের পদ্ধতি বদলাবার অভিপ্রায়ই এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সূচিত হচ্ছে।

পিকিং ও অন্যান্য স্থানে চীনের মুখপাত্ররা মাও সে তুংয়ের মৃত্যু অথবা অসুস্থতার সংবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু এই সব কৈফিয়তের কোনটিই পাশ্চাত্যের দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। কেননা, ১ অক্টোবরের কুচকাওয়াজ বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে চীনের ভিতর থেকে ভেসে আসা আরও কতকগুলি সংবাদ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, চীনে সামরিক বাহিনীর সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে দেশের ভিতরে সামরিক ও অসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। চীনা বেতার থেকে মাও বাণী প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মার্কিন সার্জন ডাঃ পল ডাডলি হোয়াইট সম্প্রতি পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। ইত্যাদি।

এই চীনা ধাঁধার কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। তবে, পশ্চিমের চীনা বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি এ বিষয়ে একমত যে, কারণ যাই হোক না কেন, চীনে কোনরকম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে।

চীনের ৭৮ বছর বয়স্ক নেতা মাও সে তুংয়ের নিজের নির্বাচিত উত্তরাধিকারী হচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও। কিন্তু লিন পিয়াও খুব সুস্থ বলে মনে হয় না। তাঁকে প্রকাশ্যে বেশোতে বিশেষ দেখা যায় না। তাছাড়া, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁদের মতো

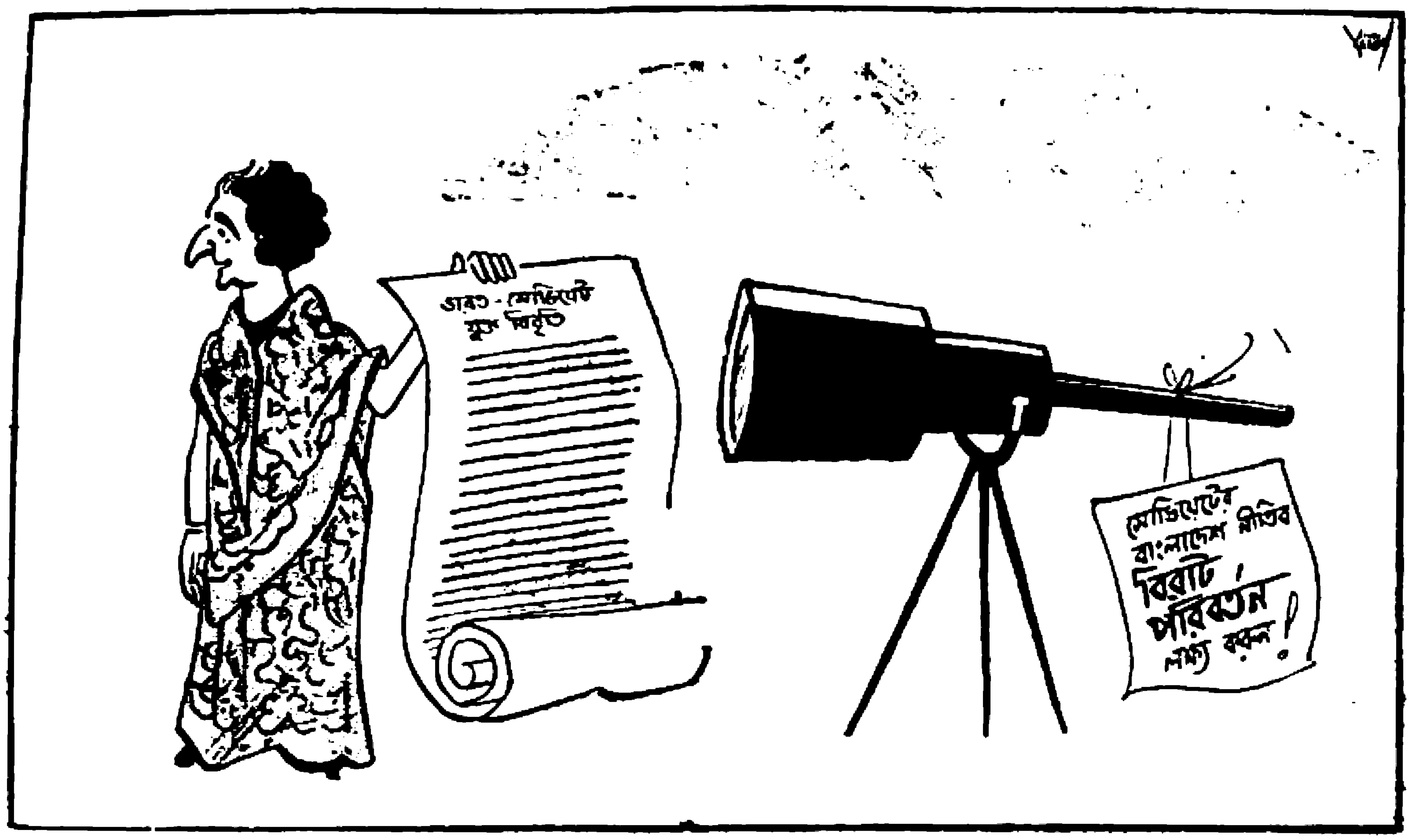

চলমান মাওয়ের শুধু প্রসঙ্গ। সেন-কাটনীর ক্ষমতার পাশে এসেছে। ১ অক্টোবর তারিখে কাতার বিদ্রোহ বুড়-কাওয়াকে বেলের নেতারা উপস্থিত হলে এই ক্ষমতার খবর প্রকাশ পেয়ে যত বলেই কি এই কুয়াকোরাম বন্ধ রাখা হয়েছে?

আপাতত এবিষয়ে জল্পনা-কল্পনাই সার। কেননা, সঠিক খবর জানার উপায় নেই।

৭ ●

বারাণসীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে চামারদের উপর বর্ণহিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণ, খুন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা জানা গেছে।

বারাণসী থেকে ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে বেহারা নামক এই গ্রামের চামাররা দীর্ঘকাল ধরে মরা গরু সরাবার কাজ করে এসেছেন। তাঁদের ঘরের মেয়েদের প্রথাগত বৃত্তি হচ্ছে দাইয়ের কাজ। গত ১২ সেপ্টেম্বর গ্রামবাসীরা স্থির করেন যে, তাঁদের পুরুষরা আর মরা গরু সরাবেন না এবং তাঁদের মেয়েরা আর দাইয়ের কাজ করবেন না। রামেশ্বর প্রসাদ নামে ঐ গ্রামের একজন শিক্ষিত চামার গ্রামবাসীদের সভায় বক্তৃতা দিতে বলেন যে, তাঁরা যেন এই 'নোংরা কাজ' করতে অস্বীকার করেন।

এই সংবাদ পাওয়ার পর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের ঠাকুররা নাকি সংঘবদ্ধ হয়ে বেহারার অধিবাসীদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। [illegible] তারা একটি স্থানীয় কাপড় ফ্যাক্টরিতে হানা দেয়। সেখানে কিছু হরিজন যুবক কাজ করে। কিন্তু পাল্টা মারের ভয়ে ঠাকুররা সেদিনকার মতো সেখান থেকে হঠে আসে।

বর্ণহিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে থানায় এজাহার দিতে যায়। থানার দারোগার সন্দেহ হলে তিনি অভিযোগকারীদের সঙ্গে নিয়ে তদন্ত করতে যেতে চান। তখন অভিযোগকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

দুদিন বাদে অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর প্রায় পাঁচ শত বর্ণহিন্দুর এক জনতা হরিজন বস্তীতে হামলা করে। তারা খড়ের চালে আগুন লাগিয়ে দেয়। হাঁড়ি-কলসী ভেঙে দেওয়া হয়। এমনকি নারী ও শিশুদেরও প্রহার করা হয়। প্রহারের চোটে একজন মারা যান। নারী সহ ১৮ জন গুরুতরভাবে আহত হন।

একজন বৃদ্ধ হরিজন অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা দুদিন কিছুই খেতে পান নি, কেননা, গ্রামের দোকানগুলি থেকে তাঁদের কাছে জিনিস বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনার পর জানা গেছে যে, বারাণসী জেলার বেহারা গ্রামের হরিজন গাঁর ভূমিহীনরা আজও ভূমিদাসের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ণহিন্দুদের জমি চাষ করে তাঁরা দিনে মাত্র দেড় কিলো চাল-মিশানো খাদ্যশস্য অথবা এক কিলো গম এবং মাসে নগদ মাত্র আড়াই টাকা পান।

ক্ষতিগ্রস্ত হরিজনরা উত্তরপ্রদেশের সেচ-মন্ত্রী রামলক্ষণের কাছে তাঁদের কাহিনী বলেছেন। রামলক্ষণ নিজে একজন হরিজন। তাঁর কাছে হরিজনরা অভিযোগ করেছেন যে, বিধানসভার কোন বর্ণহিন্দু সদস্য ঘটনার পর তাঁদের দেখতে যাননি। তাঁদের আরও অভিযোগ এই যে, বর্ণহিন্দুদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকে জানান সত্ত্বেও বারাণসী জেলা কর্তৃপক্ষ সতর্ক হন নি।

স্থানীয় গ্রাম সভাপতি সমেত যে ৫০ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ১১ জনকে পুলিশ এপর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পেরেছে।

●

[illegible]

একান্তভাবে হরিজনদের ব্যবহারের জন্য একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আগে যে রাস্তাটি ছিল সেটি হরিজনদের ব্যবহার করতে দিতে বর্ণহিন্দুরা আপত্তি করেছিল।

১।১০।৭১ —পুণ্ডরীক

কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

আমার বসবার ঘরের চৌকিতে বিছানো কাশীপুরে শিকার করা বাঘের ছাল আমার অতিথি অভ্যাগতদের মুগ্ধদৃষ্টি ও কৌতূহল জাগায়। কোথায় কবে কী ভাবে বাঘ মেরেছিলাম জানতে চান তাঁরা। আমি সকলকে আমার বাঘ মারার গল্প বলি।

পশুচর্ম-সজ্জাকুশলী জ্যান - ইনগেন, জ্যান-ইনগেনের কাছ থেকে ক্রোম ধোলাই করা বাঘছালটি যেদিন ফিরে পেলাম—লাল বনাতের পাড় লাগানো, খাকি জিনের অস্তর দেওয়া হলদে জমিতে কালো আঁচড়-কাটা মসৃন বাঘছাল, সেদিন পরম আনন্দে আমার প্রতিবেশী বন্ধু হিরণকুমারকে ডেকে পাঠালাম তা দেখতে। পশুপাখীর হালচাল সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল তেমনি তিনি শিকার কাহিনী, শিকার সাহিত্য অনুরাগী। বেশ করে শিকারের গল্প জমানো যাবে।

হিরণকুমার ঘরে ঢুকে বাঘছালটি পর্যবেক্ষণ করে বললেন—এ যে দেখছি পেল্লায় বড়। এই কি সেই বাঘ যে আপনার গুলিতে আত্মহত্যা করেছিল? কোথায় যেন মেরেছিলেন—কাশীপুরে; তরাইয়ে। জিম করবেটের শিকারের আঞ্চলিক প্রদেশে?

আত্মহত্যাই বটে! দুর্ভেদ্য শরবনে ভরা নালার ভেতর থেকে হাতীর তাড়া খেয়ে যেভাবে নির্ভয়ে নালার পাড়ে উঠে এসে আমার মাচানের সামনে উপস্থিত হয়ে আমার গুলি চালাবার সুযোগ করে দিলো তাতে তাকে আত্মহত্যা ভিন্ন আর কী বলা চলে? অসংশয়ে শরবনের আড়াল ছেড়ে না এলে তাকে মারতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কত না বার বাঘ শিকার করতে গিয়ে বিফল হয়েছি চতুর বাঘ গুলি করার সুযোগ না দেওয়ায়। গয়া, গয়পা-নর্মিশের জঙ্গলে, চাতরা, বেলাইগড়, বারবাঁকা ও সুন্দরবনের অরণ্যে, তরাইয়ে,—আরও কত স্থানে। বাঘের চলাফেরার পথ সন্ধান করে ঝোপ বেঁধে আড়ালে (hide) পেতে ওৎ পেতে বসে বা গাছের ডালে মাচা বেঁধে বসে শিকারী বাঘকে পাল্লার ভেতর পাবার চেষ্টা করেন। নিজেকে নিভৃত রেখে নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে বাঘের,—নরখাদকের অনুসরণ করেছি। উদ্দেশ্য বাঘের অগোচরে বা তাকে আতঙ্কিত না করে তার নিকটস্থ হওয়া। এই সুযোগ লাভ হলে শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্রের হাত থেকে বাঘের পরিত্রাণ সম্ভাবনা স্বল্পই। অবশ্য শিকারীর নিপুণতা থাকা চাই; কিন্তু সুযোগই হোলো প্রধান নিয়ন্ত্রক। সুযোগ হলে অনিপুণ শিকারীও সফলতা লাভ করেন। চতুর বাঘ যথাসম্ভব শিকারীকে এই সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত করে।

কাশীপুরে সে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। বাঘটি ছিল উত্তীর্ণ যৌবন বিশাল আকৃতি, চাতুর্যে সুনিপুণ। অনেক লুকোচুরি খেলার পর সে ভুল করলো, ও আমি সে ভুলের চূড়ান্ত সুযোগের অংশ গ্রহণ করলাম। আমার শিকার অভিযান সফল হোলো সেখানকার এক শরবনে (elephant grass) ভরা নালায়।

এই শিকারের শেষাঙ্ক ছিল অতি মর্মন্তুদ, বিষাদময়। আমার মর্মের নিভৃতে তাকে এতোদিন একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম। এবার তা উন্মোচন করলাম।

হিরণকুমার জিগ্যেস করলেন, কোথায় বুলেট লেগেছিলো। চোখের কোলে বুলেট প্রবেশ করার জায়গাটা বার করে দেখালাম। কড়ে আঙুলের ডগার মত ছিদ্র;—জ্যান-ইনগেন সেটা সেলাই করে দিয়েছেন। এখন দেখায় যেন মিহি কাজলের দাগ। চোখের কোল দিয়ে বুলেট ঢুকে মাথার ঘিলুকে ঘেঁটে ঘুঁটে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। মৃত্যু ঘটে নিমেষে।

হিরণকুমারকে আগাগোড়া সমস্তটা বলে গেলাম।

CENTRAL LIBRARY

শিকার দিনের মধ্যাহ্ন চলে গেলেও সে সময় তখনও তার সমাদ সমাপ্ত হয়নি। বন্যপশু সংরক্ষণ সম্বন্ধে সরকার কর্তৃক গৃহীত বা সাধারণের কাছে সম্যক উপস্থাপিত করা হয়নি। সার্বজনীন ব্যবস্থার প্রারম্ভিক কার্যক্রমের ভিত্তি একটা সংরক্ষিত হোতো যেখানে শিকার করা চলতো অধিকারীদের হুকুম নিয়ে। চল্লিশ দশকে কয়েকটি বন অভয় অরণ্যে (Sanctuary) রূপান্তরিত করা হয়। কাশীপুরে শিকারের মাত্র এক বছর পূর্বে ভারত সরকার বন্যপশু সংরক্ষণ সংস্থা—Wild Life Board প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বন্দুক রাইফেলের ব্যাপক ছড়াছড়িতে, শিকারের দ্রুত প্রসার ও উদ্যোগ্যতার, তদুপরি বিশেষ করে, চাষের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় ও বাস্তুহীনদের তাগিদে বনাঞ্চলের দ্রুত সংকোচসাধন চলতে থাকে। ফলে বাঘ, কৃষ্ণসার চিতল প্রভৃতি কয়েকটি জনপ্রিয় পশুপক্ষীর বিলোপ সাধন ত্বরান্বিত হয়। তিন চল্লিশ দশকে দিল্লী থেকে কলকাতাগামী রেলে আলিগড় আসতে সদ্য-ফোটা সকালের আলোয় দেখা যেত রেল-লাইনের দুপাশে ট্রেনের শব্দ পেয়ে কৃষ্ণসার হরিণের দল এখানে ওখানে খেতের ফসল ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কখনো ঊর্ধ্বমুখ করে ২০-২২ ইঞ্চি শিং উঁচিয়ে আকাশ মার্গে যেন উড়ে চলেছে। আজ আর কোন রেলযাত্রীর অপরূপ এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয় না। আগের মত আর খেতে, রেলের দুপাশে ময়ূর চরে বেড়াতে দেখা যায় না। ফিকে জঙ্গলে নীলগাই, চিতল, পাড়া, কাকর প্রভৃতির দেখা পাওয়াও দুর্লভ হয়েছে। বন্য পশুপাখীর বিলুপ্তি বিষয়ে দেশবাসীর কোন সম্বিত ছিল না। শিকারের নেশাও আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সেবার আমার শিকারে যাবার এক বিশেষ কারণ হয়েছিল। কাশীপুর থেকে আমার বন্ধু অনিল সেন তার করেছিলেন—'তিনটি বাঘ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের গরু-মোষ সাবাড় করছে শিকার ব্যবস্থা প্রস্তুত অবিলম্বে রওনা হোন।'

(২)

১৯৪৭ অব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মারফৎ কর্তৃত্বাধীন ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ সর্তের সূত্রে ভারত বিভাগ দেশনায়করা মেনে নিয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য-কল্প ভারত মাতাকে বিসর্জন দিলেন। দেশবাসী কর্তৃক এর ফলাফল উপলব্ধি ও বিচার করে দেখবার আগেই স্বল্প কালের মেয়াদে সার্বভৌম রাষ্ট্র বিভাজিত হোলো। যে অতিকায় উদ্বাস্তু সমস্যা এর ফলে দেখা দেবে তার না ছিল কোন ধারণা, চিন্তা বা তার জন্য কোন প্রস্তুতি। একেবারে অকস্মাৎ আনুমানিক তিন পঁচিশ লক্ষ পাকিস্তানবাসী সর্বস্বান্ত ও বাস্তুহারা হয়ে শরণার্থী হয়। অগণিত নরনারী শিশু আততায়ীর হাতে, অনশনে ও রোগে প্রাণ হারায়। সংখ্যাতীত যুবতী হয় ধর্ষিত ও অপহৃত। এ রকম মানব-সংহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর আগে লেখা হয়নি।

অপ্রস্তুতির প্রথম ধাক্কার পর সরকার এই হতভাগ্যদের জন্য উত্তরপ্রদেশে দুটি বৃহৎ প্রকল্প অনুষ্ঠিত করেন। প্রথমটি হস্তিনাপুর গঙ্গা-খাদের প্রকল্প ও অপরটি কাশীপুর প্রকল্প।* প্রথমটি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত করে অনিল সেন কাশীপুর প্রকল্পের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। পুনর্বাসন কাজে তিনি যেমন সুনাম অর্জন করেছিলেন, তেমনি তিনি ছিলেন নাম-করা শিকারী। সরকারী ও বন্ধুমহলে তাঁর ডাকনাম—'এ-ডি'। কাশীপুর প্রকল্পের শরণার্থীদের বসবাস ব্যবস্থা, জমি বণ্টন, রাস্তা তৈরী, ইঁদারা কাটা, জলসেচ, গরু-মোষ লাঙ্গল সবকিছু কেনার ঋণ, ট্রাকটর ব্যবস্থা, ঘর তৈরী, চিকিৎসা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে সুরাহা করার ভার অর্পিত হয় এ-ডির ওপর।

•

মোরাদাবাদ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রামগঙ্গা নদীর পুলের ওপর দিয়ে রেললাইনের এক শাখা রামনগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তারই দুই স্টেশন আগে কাশীপুর জংশন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। রামনগর থেকে ধীরে-ধীরে খাড়াই শুরু হয়েছে। নৈনীতাল কম-বেশী পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা। কাশীপুরের পূব কূল ঘেঁষে কোশী নদী। পশ্চিমে একটু দূর দিয়ে চলে গেছে খরস্রোতা রামগঙ্গা। কাশীপুরের সন্নিহিত নিচু জমির আর্দ্রতা চাষের অনুকূল। এক সময়ে এ জায়গা বসন্ত চাষে ও জনবসতিতে বর্ধিষ্ণু ছিল। রেল লাইন খোলার পর বর্ষার জলের বহতা বিঘ্নিত হওয়ায় প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া মহামারীতে দারুণ লোকক্ষয় হয়। অধিবাসীরা দেশ ত্যাগ করে। সারা অঞ্চল আগাছা ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গলে ভরে ওঠে। সেই সঙ্গে বন্য পশু ও শ্বাপদের আমদানীতে ও তাদের বংশ বৃদ্ধিতে অঞ্চলটি ছেয়ে যায়। গোঁদ (Swamp deer) কাকর (barving barking deer dek) পাড়া (hog deer) চিতল, শুয়োর, হায়না, গুলবাঘ আর ডোরা-কাটা বাঘের আবাসে পরিণত হয়ে শিকারের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। কাশীপুর প্রকল্পে এ-ডির প্রধান কার্যসূচী হল এ অঞ্চলের ঝোপ ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে বন্যপশুর প্রাচুর্য কমিয়ে জমি চাষোপযোগী করে তোলা। তাতে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। জঙ্গল সাফ করার ফলে হরিণ শুয়োর প্রভৃতি তৃণভোজীরা অন্যত্র চলে যাওয়ায় সাম্য বিনষ্ট হয়। পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে বাঘ সাহসী হয়ে উদ্বাস্তু বসতিতে এসে গরু-মোষ বধ করা শুরু করে। আবার দূর থেকে এসে খেতে ঢুকে লোকসান করতে আরম্ভ করে সম্বর, চিতল পাড়া গোঁদ প্রভৃতি। বাধ্য হয়ে এই সব পশুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সূত্রে বাঘ শিকারের আয়োজন।

(৩)

আগের বছরেও বাঘ শিকারে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়ে কাশীপুরে এসেছিলাম। দুটি বাঘ উদ্বাস্তু চাষীদের গরু-মোষদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। আর দুজনও এসেছিলেন এ-ডির আমন্ত্রণে; দুজন আমেরিকান। একজন কাশীপুরবাসীও যোগ দেন এই শিকারে। বাঘ দুটির একটি উদ্বাস্তুদের গোয়াল থেকে একটা মোটা মোষ মেরে তাকে কাশীপুরের উপকণ্ঠে একটি শরবনের নালায় টেনে নিয়ে যায়। বাঘের পাঞ্জা অনুসরণ করে খুঁজি-শিকারী এ-ডিকে জানায়। দুটি শিকার-দক্ষ হাতীতে সওয়ার হয়ে 'এ-ডি' তাঁর তিন অতিথিকে নিয়ে নালায় নামেন। আমার স্থান হয়েছিল নালার এক প্রান্তে এক আম গাছে-বাঁধা মাচায়। হাতীর তাড়া খেয়ে বাঘের এই দিক দিয়ে পালাবার কথা। পালাতে গেলে আমি তাকে মারতে বা রুখতে পারবো। হাতী দুটি শরবন থেকে বাঘকে বার করে। তারপর চলে দু পক্ষের এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম। বাঘকে দেখতে পেয়ে আমেরিকানরা বেঠিক গুলী চালান। বাঘের লাগে না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে। লাফিয়ে কাছের হাতীটার শুঁড়ে থাবা গেঁথে সওয়ারীকে ধরতে চেষ্টা করে। হাতী ছিল শিকার-পোষ; সে শুঁড় চালনা করে বাঘকে আছড়ে ফেলে। সওয়ারীরা ফের গুলী চালান, কিন্তু সেও যায় ফসকে। বাঘ আবার হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। হাতী আবার বাঘকে আছড়ে পা দিয়ে টিপে ধরে। আঁচড়ে কামড়ে বাঘ আবার নিজেকে মুক্ত করে শরবনের এক কোণে লুকিয়ে পড়ে। আম গাছের মাচায় বসে হাতী বাঘের দ্বন্দ্বের অলৌকিক দৃশ্যের অনেকখানি প্রত্যক্ষ করলাম উত্তেজনা-অভিভূত হয়ে। মাহুতের হাঁক, হাতীর নাদ, বাঘের হুঙ্কার রাইফেল-বন্দুকের আওয়াজ এক জোটে একটা আতঙ্ক-রোল সৃজন করেছিল। মিনিট পনেরো যুদ্ধে হাতীরা বাঘকে আবার বার করলো। এবার আমেরিকানদের নিরস্ত করে 'এ-ডি' তাঁর ৪৫০।৪০০ রাইফেল থেকে একটি বুলেট চালান। সেটি যথাস্থানে লাগল মনে হোল; বাঘ মাটিতে ছিটকে পড়লো ও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ে রণে-ভঙ্গ দিল। সন্ধ্যা হয়-হয়; 'এ-ডি' তখনকার মত শিকার থামাতে বললেন। আহত বাঘ শরবনে কোথায় লুকিয়েছিল। 'এ-ডি' বললেন সকালে তাকে হয় মরা নয়ত সাংঘাতিক জখম অবস্থায় পাওয়া যাবে। পর দিন সকালে হাতীতে চড়ে 'এ-ডি'র

---

*পাঞ্জাব আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন বাবদ সরকার ব্যয় করেন ২৫০০ কোটি টাকা। তুলনায় পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ হয় ৩২০ কোটি। ক্ষতিপূরণাদি ছিল শূন্য।

সঙ্গে আমি সরকলে নামলাম। অল্পক্ষণ খুঁজতেই মরা বাঘ পাওয়া গেল। দেখা গেল এ-ডির বুলেট বাঘের কাছে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে ও তাতেই বাঘের মৃত্যু হয়। আরও দুটি বুলেট বাঘের গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সেগুলি কোনটি মোক্ষম হয় নি।

দ্বিতীয় গরু-খোর মারা বাঘটিও এ-ডির হাতে মারা পড়ে। আমরা চলে গেলে হাতী দিয়ে সরকল বালাই করে গাছের একটা গাছের মাচা থেকে সেটি মারেন।

সেবার আমার এক গৌর (বারো শিঙা) শিকারও হয়েছিল বড় চমৎকার। শহর থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে মালধন নামের এক পাতলা জঙ্গলে শদুই গৌরের এক বিরাট দঙ্গল আড্ডা গেড়ে কাশীপুর শরণার্থীদের চাষের জমিতে এসে ফসল খেয়ে ও নষ্ট করে বড় উৎপাত করছিল। তাদের দু-চারটি মেরে গ্রামের সম্ভার করে কোন সুরাহা হয় কিনা তাই দেখা স্থির হয়। এ-ডির জীপে এসে মালধন জঙ্গলের মুখে নেমে একটা বয়েল গাড়ীতে চড়ে এ-ডি ও আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটা খোলা ফর্সা জায়গার এক প্রান্তে এসে পড়লাম। দুই-তিন ভাগে ভাগ করা সেই বিরাট গৌরের দঙ্গলকে দেখলাম সেখানে। বয়েল গাড়ীতে বসে থাকায় তারা বিশেষ কোন রকম আতঙ্কিত হোল না। শর্ট-শার্ট- না পরে ময়লা কাপড় পরে ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে চাষীদের মত সেজে গিয়েছিলাম, ওদের আশ্বস্ত করবার জন্য। দুশ' সওয়া দুশ' মিটার পর্যন্ত ওদের কাছে অগ্রসর হলে ওরা সন্ত্রস্ত হোল না; শুধু চেয়ে-চেয়ে বার-বার দেখতে লাগল। আর একটু কাছে যাবার প্রয়াস করতেই ওরা চলতে শুরু করলো। দু-তিন সেকেন্ডেই সেটা দুলকি কদমে ছোটায় দাঁড়াল। আর দেরী করা নয় 'এ-ডি' ইঙ্গিত করাতে আমি মাথায় বেশ বড় শিঙের ঝাড়ওলা গৌর বেছে নিয়ে রাইফেল সঞ্চালিত করে নলির মুখ তার বেহরেখা পার হতেই ঘোড়া চাপলাম। রাইফেলের আওয়াজে গৌরের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ধুলো উড়িয়ে ছুটেছিল। মাটিতে যেন তাদের পা ছুঁচ্ছে না, ধরাতল থেকে পাঁচ-ছ ফুট ওপর দিয়ে একটা গৌরের স্রোত বয়ে চলেছে। বিমোহিত হয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কিন্তু কৈ,—যার ওপর আওয়াজ করলাম সে পড়ল না ত? লাগে নি, মিস হয়েছে। তখনই সবিস্ময়ে দেখি, একটি গৌর দলের মধ্যে দৌড়ুতে থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। অকস্মাৎ সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল, দলের বাকী সব তাকে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল। লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি শিকারের কাছে গিয়ে দেখি সে একেবারে প্রাণহীন: শিঙে এগারোটি ছুঁচো। বিরাট সাইজ। গুলীটা সরাসরি

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলাদেশের প্রবন্ধকারদের লেখা অনবদ্য প্রবন্ধ সংকলন বিশিষ্ট

রক্তাক্ত বাংলা

সূচীপত্র

বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা ॥ রঞ্জন
আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী ॥ শেখ মুজিবুর রহমান
পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ॥ রমেশ দাশগুপ্ত
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ॥ জহির রায়হান
রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ॥ ডঃ আনিসুজ্জামান
বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ॥ শওকত ওসমান
বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায় ॥ রাজেন্দু মজুমদার
বাংলাদেশ পরিস্থিতি : একটি সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ ॥ মুনেকল ওসমান
মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥ সন্তোষ গুপ্ত
বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত ॥ মতিলাল পাল
ওদের ফেলে চলে এলাম ॥ সত্যেন সেন
বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি ॥ অনুপম সেন
দ্বি-জাতিতত্ত্বের অপঘাত-মৃত্যু ॥ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
পাকিস্তানের শিক্ষানীতি ॥ আহমদ হক
সংস্কৃতির বিকাশধারা ॥ আসাদ চৌধুরী
বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-ঐতিহ্যের চর্চা ॥ আবদুল হাফিজ
বাংলাদেশ আন্দোলন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র ॥ সৈয়দ আলী আহসান
বাংলাদেশে গণহত্যা ॥ জাফর সাদেক
পরিশিষ্ট : ঘটনাপঞ্জী ॥ কেয়াবোসী মজুমদার
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

সুন্দর প্রচ্ছদপট ও মনোরম বাঁধাই। মূল্য—দশ টাকা।

দেশবিভাগের শুরু থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন-শোষণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন উনিশ জন সংগ্রামী ও চিন্তাশীল লেখক.

মুক্তধারা

স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলি-৯ • ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

কলজিতে বিদ্ধ হয়েছে। কলজিতে গুলী বিঁধলে অনেক সময়েই শিকার প্রচণ্ডটা পূর্ণ বেগে ছুটতে থাকে তারপর হঠাৎ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে যায়। পাখীর বেলায়ও ঠিক এই রকম হয়। কলজিতে ছিটে বিঁধলে পাখী সটান উড়ে গিয়ে হঠাৎ ঝপ্ করে পড়ে।

সেদিন 'এ-ডি' পারা চিতল বরা প্রভৃতি মধ্য শিকারের উপযোগী এক আনকোরা ২৫০।০০০ উইনচেস্টার ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। দূরপাল্লাতেও সিধে মার এর। লম্বা পা ফেলার মাপে গোটাটি ২০০ পা দূরে ছিল।

(৪)

এ হোলো গত বছরের কথা।

এ বছর এ-ডি'র তার পেয়ে অমৃতসর থেকে এসে মোরাদাবাদ স্টেশনে নেমে গাড়ী বদল করে কাশীপুরের গাড়ীতে উঠলাম। জুন মাস, দুর্দান্ত গরম, লু চলছিল। সোরাইয়ে বরফ ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। সংগে নিয়েছিলাম চিনি ও পাতি লেবু। সরবৎ তৈরী করে সারা পথ তৃষ্ণা মেটালাম।

মোরাদাবাদে আমার কামরায় উঠলেন দুজন সম্ভ্রান্ত পাঞ্জাবী ও তাঁদের সঙ্গী পরিপাটি গেরুয়াবসনধারী একজন সাধু। অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে আলাপ জমে গেল। ও'রা বললেন সন্তজীর আশ্রম দিল্লীতে, যাচ্ছেন রামগড়ে। সন্তজী কয়েকটি গান করলেন মধুর সুরে, ভজন গান। আমি একটি গানের মর্ম জানতে চাইলে বললেন মর্মার্থ।—ভক্ত বলছেন প্রভু আমায় যদি দিবালোকে দেখা না দাও ও কৃপা করে স্বপ্নে দেখা দিও। সেই আশায় থাকব আমি। সন্তজী বললেন গান স্বয়ং নানকের রচনা। আমার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের গান—'জাগরণে তার নাহি দেখা পাই থাকি স্বপনের আশে, ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব প্রণয় পাশে।' কান্ত কবির গানে আছে:—স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, রেখেছি স্বপনে বাঁধিয়া। সত্যই ঘুমের আবেশে আকাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে মিলন কী প্রাণোন্মাদক। শিখ গুরুরা ভক্তের জন্য কত কল্পনা গান রচনা করে গেছেন। অমৃতসর স্বর্ণ মন্দিরে দিবারাত্র সেসব গান কীর্তন হয়।

সন্তজী আমার বন্দুক রাইফেলের সরঞ্জাম লক্ষ্য করেছিলেন। গান হয়ে গেলে অস্ত্রগুলি চেয়ে নিয়ে দেখলেন। বলতে হোলো বাঘ শিকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কাশী-পুরে। আমায় বললেন নানক ও অন্যান্য শিখ গুরুরা গান বাজনায় বাঘ ও বনের পশু-পাখীদের বশ করতেন। তারা কাছে এসে নিরীহভাবে বসে গান শুনে চলে যেত। ট্রেনে বাকি সময়টুকু সন্তজীর কথা মনের ভেতর টানা-পোড়েন করলো।

তখনও সূর্যাস্ত হয়নি, কাশীপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে দেখলাম 'এ-ডি' হাজির। মাল-পত্তর নামিয়ে তাঁর জীপে উঠে তাঁর বাংলোয় রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে বললেন, রাত্রে এক জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন আছে। বাংলোয় পৌঁছে একটু জিরিয়ে সেখানে যেতে হবে। তারপর শিকারের যা আয়োজন হয়েছে তা বললেন। অত্যাচার করছিলো তিনটি বাঘ, 'পরতাপ-পুরে' (প্রতাপপুরে) শরণার্থীদের বস্তিতে। তার দুটির খবর করা গেছে। কাছের একটা পাতলা জঙ্গলে মোষের কাটরা (বাছুর) বেঁধে একটাতে কিল হয়েছে দিন চার আগে। সেই বাঘটার জন্য দিন তিনেক আগেই এসেছেন সার আত্তার সিং, পশু-বিভাগের একজন ওপরওলা ও বড় শিকারী। মাচার ওপর মড়ির সামনে তিন রাত্রি বসেছেন। বাঘ কাটরা মেরে কিছুটা খেয়ে চলে গেছে, আর আসেনি। দু-নম্বর কাটরারা মারা হয়েছে গতকাল, খানিকটা তার খেয়ে গেছে বাঘ। সেই মড়ির কাছে একটা গাছের মাচানে বসেছেন স্যার আত্তার সিং আজ বিকেলে। রাত্রি নটা অব্দি তাতে থাকবেন। যদি বাঘ আসে মারা হয়ে যায় ভালো, নয়ত দশটার পর চলে আসবেন ডিনারের জায়গায়। আমরা অপেক্ষা করবো তাঁর না ফেরা পর্যন্ত।

এ-ডির বাংলোয় পৌঁছে চা-নাস্তা খেয়ে সন্ধ্যা হলে নিমন্ত্রণ স্থানে যাবার জন্য তৈরী হলাম। 'এ-ডির আরও দুজন অতিথি ছিলেন বাংলোয়, তাঁরাও নিমন্ত্রিত। কৃষি-ইঞ্জিনীয়ার নন্দী ও তাঁর স্ত্রী যমুনাদেবী। সস্ত্রীক এ-ডি, নন্দী দম্পতি ও আমি পাঁচ-জন 'এ-ডি'র জীপে চড়ে রওনা হলাম। নিমন্ত্রণ স্থান কিছু কম দশ কিলোমিটার দূরে,—এক ট্রাক্টর ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহকারী কারবারের ম্যানেজারের বাংলোয়। শহর পল্লী ছাড়িয়ে, চাষের ক্ষেত মাঠের ভেতর দিয়ে জীপের তেজী বাতির আলো ফেলে চলেছি পাঁচজন সওয়ারী। কী রাগপ্রধান, কী রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও অতুল-প্রসাদের গানে নন্দী ছিলেন সমানে সিদ্ধ। তাঁর গাওয়া ঠুংরি ও কীর্তনের গানে সারা দিন নির্জন পথ হোলো মুখরিত। তাঁর সংগে গলা মিলিয়ে আমাদের বাকি চার-জনকে বাধ্য করালেন গাইতে, 'সে কোন বনের হরিণ ছিলো আমার মনে।' নির্জন পটভূমিতে মানুষের গলার আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে দুটি পারা রাস্তার ধারের কুশ বন থেকে বেরিয়ে জীপের সামনে এক পার থেকে অন্য পারে চলে গেল।

আতিথ্যদাতার বাংলোয় পৌঁছতে বেশী সময় লাগলো না। কেয়ারি করা হাতা, তাতে কাঁকরা বিছানো ঘোরানো রাস্তা। রাস্তার ধারে ও কেয়ারিতে বেল ফুলের গাছে অজস্র বেল ফুল ফুটে বাতাস আমোদিত করেছে। গোলাপ গাছের গোলাপও মৃদু গন্ধ বিলোচ্ছে। লনেতে টেবিল চেয়ার পেতে অতিথি বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামীনী আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। বেয়ারা টেবিলে মিঠে ও কড়া পানীয় আর ভোজ্য রেখে গেল। নানা গল্পে ও প্রসঙ্গে আমরা সময় কাটালাম সিংজীর অপেক্ষায়।

আত্তার সিং ফিরে এলেন রাত্রি সাড়ে দশটায়। শূন্য হাতে ফিরলেন, মড়িতে বাঘ আসেনি। চতুর বাঘ কাটরা মেরে কিছুটা খেয়ে চলে যায় আর আসে না। দুবারই এই হোলো।

'এ-ডি' আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন;—আত্তার সিং বললেন—শুনেছি আপনার নাম আপনার সেন্টের কাছে। আমি ত বাঘ মারতে পারলাম না, বাঘ আপনি মারবেন।

আমি বললাম, নিশ্চয়।

ডিনার শেষে আমাদের ফিরতি রওনা হতে রাত বারোটা হোলো। দুটি মোটরে ভাগাভাগী করে বসলাম আমরা। একটিতে সিংজী 'এ-ডি', অপরটিতে বাকি কজন। আবার সেই তেজী বাতিতে খেত মাঠ কুশ-বনের ভেতর দিয়ে পথ আলো করে চলা। সিংজী এবার এ-ডির দেওয়া বন্দুকে বুলেট ও এস-এসজি ভরে নিয়েছেন। সামনে চলেছে ও'দের গাড়ী। কুশবনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গাড়ী গেল দাঁড়িয়ে। আলোর কিরণে দেখা গেল একটা জানোয়ার রাস্তা পার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হোলো বন্দুকের আওয়াজ; 'এ-ডি' বলে উঠলেন 'গির গায়া।' তাকে তুলে এনে সামনের গাড়ীতে রাখা হোলো। একটা পারা। পথে আর জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। বাংলোয় এসে বেশ পরিবর্তন ক'রে সকলে শুয়ে পড়লাম। লনে খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়েছিলো। উত্তাপ মাত্রা ছিল ১০৫ ফাঃ ঘরের ভেতরে শোয়া নরক যন্ত্রণা।

পরের দিন প্রত্যুষে উঠে চা খেয়ে আত্তার সিং চলে গেলেন। যাবার সময় বিদায় নিয়ে আমায় বলে গেলেন—কথা যেন ঠিক থাকে। বাঘ মেরে শরণার্থী চাষীদের আতঙ্ক দূর করা চাই। আমি আমার মত সামান্য ব্যক্তির প্রতি তাঁর এই সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আবার আশ্বাস দিলাম চাষীদের শত্রু অন্তত একটি বিনষ্ট করব ও সে খবর দিল্লী গিয়ে নিজে জানিয়ে যাবো।

(৫)

'এ-ডি' বললেন, সন্ধ্যায় সিংজীর পরি-ত্যক্ত মাচায় বসা হবে। কাল মড়িতে বাঘ আসেনি, আজ যদি আসে।...বেলা থাকতে 'এ-ডি'র গাড়ীতে আমরা দুজনা রওনা হলাম। পাঁচ-ছয় কিলোমিটার গিয়ে একটা জঙ্গলের কোলে পৌঁছে গাড়ী ছেড়ে একটা হাতীর পিঠে উঠলাম। দুজনে। হাতীটিকে

সেখানে পাঠানো হয়েছিলো আগেই। আমাদের দুজনের হাতিয়ার, কার্তুজ, রাতের খাবার জল কফি ও শোবার সরঞ্জাম প্রভৃতি গাড়ী থেকে বার করে হাতীতে তুলে নেওয়া হোলো। 'এ-ডি'র ছিলো ·৪৫০।৪০০ ওয়াটসন কৃত দোনলা রাইফেল, আমার ছিলো টমাস ব্র্যান্ডের ·৩৭৫ ম্যাগনাম, দোনলা। গজগমনে হেলে দুলে চলে হাতী বনের ভেতর একটা পাকুড় গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। হাতীর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে গাছের ডাল ধরে মাচায় উঠে গেলাম। একটা চারপাই উল্টে দুটি ডালে শক্ত করে বাঁধা। দড়ির বোনা জমির ওপর একটা তোষক ও গাঢ় সবুজ রঙের চাদর পাতা। পায়াগুলির ওপর দিকে, তাতে সরু ডালের বাঁধা' যেমন ঠেস দিয়ে বসায় সুবিধে তেমনি রাইফেলের নল ঠেকিয়ে হাতের কাছে শুইয়ে রাখারও যুৎ। সার আমার সিং এই মাচাতে আগের রাত্রে দশটা পর্যন্ত বসেছিলেন। মড়িটা গাছের গুঁড়ি থেকে হাত দশেক দূরে খুঁটিতে বাঁধা, তাতে গাছের ডাল পালা দিয়ে চাপা দেওয়া,—শকুনের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য। আমরা মাচায় উঠলে শিকারীরা সেগুলো সরিয়ে নিল। মড়িটা পচ ধরে ফুলে বীভৎস হয়েছে। দুঃসহ দুর্গন্ধ। 'এ-ডি' মাচায় উঠে আমার পাশে বসলেন। অনুচররা আমাদের হাতিয়ার কার্তুজ ব্যাগ, রাতের খাবার, জলের বোতল, কফির ফ্লাস্ক, রাত্রে গায়ে দেবার পাতলা কম্বল তুলে দিল। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ঠেস দিয়ে যুৎ ক'রে আমরা বসলাম। যে যার রাইফেলে টর্চ-বাতি লাগিয়ে কার্তুজ ভরে নিলাম। আমারটা একবার আমি হাতে ধরে কাঁধে চেপে মড়ির ওপরে নলের ডগায় মাছি ও পাছ-নিশানী এক নজর ক'রে ধরলাম। তার পর সেটা নামিয়ে হাতের কাছে মাচার বেড়ায় নল ঠেকিয়ে রেখে পরবর্তী পরিস্থিতির উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় বসে রইলাম। ঘন জঙ্গল, তাতে নিবিড় ছায়ার আস্তরণ। গাছের ডালপালা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে বিকেলের রোদ পড়ে আলো-ছায়ার নকশা তৈরী হয়েছে। মাচায় বসে মাথাটা এদিক ওদিক সরালে সূর্যের পাটে বসা দেখতে বড় মনোরম। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। মাঝে মাঝে বাতাসে দোলা লেগে পাতায় সর-সর শব্দ হচ্ছে। শুকনো ডাল খসে পড়লে তার আওয়াজটুকু শোনা যায়। পাইপে তামাক ঠেসে তা ধরিয়ে ধূমপান করলাম। চরকায় সুতোকাটার মত সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। 'এ-ডি' মৃদুস্বরে বেশী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে নিষেধ করলেন। যদি বাঘ কাছে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে; মাচায় আমাদের উপস্থিতি টের পাবে। বাঘকে নাগালে পাবার জন্য কত না সতর্কতা চাই। নিশ্চল নিথর হয়ে বসে থাকা চাই, যদি বাঘ এসে আড়াল থেকে মাচানে নজর চালিয়ে দেখে তবে আমাদের ভাববে গাছ পালারই সামিল। হাত মাথা নাড়াতে হ'লে এমন ধীর সঞ্চালন হওয়া চাই যে তা বাঘের বোধগম্যই হবে না। তিলমাত্র স্থানচ্যুতিও বাঘের চোখে বেমাক ধরা পড়ে।

সূর্যাস্ত হ'তে মনে হোল যেন যুগ-যুগান্ত সময় লাগলো। দিগন্তের পিছনে সূর্য ঢাকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীদের একটা চঞ্চলতা প্রকট হোলো। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঝট-পট্ আওয়াজ করে তারা উড়ে গেল তাদের বাসার খোঁজে। দূর থেকে ময়ূরের ডাক শোনা গেল 'ময়-উঁয়', দু-তিন বার। তারপর নিস্তব্ধতা। এ ঋতুতে এ সময়ে মাঠে, উন্মুক্ত স্থানে গোধূলির আলো বেশ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু জঙ্গলে তার বিপরীত। অন্ধকার তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো ও ক্রমেই গাঢ়তর হ'তে লাগলো। মনে হ'তে লাগলো আরও গাঢ় হয়ে অন্ধকার কি নিরেট হয়ে যাবে? কই বাঘের আসার ত কোন লক্ষণ নেই! বাঘ আসবে না জানা কথা, তবু তার আশায় এসে বসা! চকিতে মনে উদয় হোলো খোলা জায়গাটাতে কি মড়িটা দেখা যাচ্ছে? স্পষ্ট নয় অস্পষ্ট, চারিপাশের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ। বাঘ এসে মড়ি খেতে সুরু করলে কি দেখতে পাবো? না হোক মাংস ছিঁড়ে খাবার সময় আওয়াজ টের পাবো। একবার রাইফেল তুলে ধরে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিলে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তার চেষ্টা করতেই 'এ-ডি' আমার হাতের ওপর হাত রেখে রুখে দিলেন। কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—বাঘ হয়ত আড়ালে এসে বসে আছে, আমাদের ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এখন আলো ফেলা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ধরে—আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা—সে খুঁটিয়ে দেখবে; তার পর সন্দেহ মিটে গেলে মড়িতে আসবে। রাইফেল রেখে নিশ্চল হয়ে থাকুন। অগত্যা আলো ফেলার মতলব ছেড়ে দিলাম।

অতি বিলম্বিত লয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো। সেই সঙ্গে অরণ্য যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। এক পাল কীটপতঙ্গের জোট বাঁধা ঝিঁ-ইঁ-ইঁ ঐকতান মুখর হয়ে উঠলো। নিশাচর ছেপকাদের (night jol) টিক্-টিক আওয়াজ ধ্বনিত হোলো। রাত্তিরে এরা মাটিতে নেমে কীট-পতঙ্গ ধরে খায়। একটু পরেই কানে এলো চিতল হরিণের ভয়ার্ত 'টাউ-টাউ' ডাক। তার পরেই শোনা গেলো ফেউ-এর ডাক। বনের প্রান্ত ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরে সরে গেলো সে ডাক। তার পর আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করা কীটপতঙ্গের কিচির(?), কিরর্ আওয়াজ ও ছেপকার টিক্-টিক্ শব্দ। অন্ধকার ঢাকা ঈশ্বর একটা আভাস যেন(?) অনুভূত হোলো। অরণ্য প্রকৃতি তাঁর রহস্যের আবরণ খুলে দিয়েছেন। বিশ বছর ধরে কতবার তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ সাধিত হয়েছে,—শিকারে এসে। প্রথম প্রথম চাক্ষুস পরিচয়, তার পর অন্তরের যোগ, তারপর একান্ত মিলন। সেই মিলনে নিজেকে সমর্পণ করলাম।

কিন্তু ফেউ ডেকে যায় কেন? বাঘের সঙ্গে কি তার মিতালী? শিকারের সন্ধান যোগান দেওয়া ছাড়া না শিকার লাভ না হওয়ায় নৈরাশ্য? অথবা শিকারের ভাগ পাবার আশায় আগাম আনন্দ? এই চিন্তার সঙ্গে বাঘের প্রতীক্ষায় সময় কাটতে লাগলো।

হাত ঘড়িতে ন'টা হ'লো ঠিক যখন(?)

- একখানি চিরায়ত গ্রন্থ
- সর্বসাধারণের উপযোগী গ্রন্থ
- সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার গ্রন্থ

এল. লিয়নতিয়েভ রচিত

মার্কসীয় অর্থনীতির মূলসূত্র

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনীর পাঠক সাধারণের অনুরোধে সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৬০ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান গ্রন্থটির দাম পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

নিকটস্থ পুস্তক বিক্রেতার কাছে

অথবা

নিম্ন ঠিকানায় সরাসরি অর্ডার দিন

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী

১।১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

শুয়ে আমরা নিঃশব্দে রাত্রির খাবার খেয়ে নিলাম। 'এ-ডি'র অপছন্দ ভয়ে পাইপ ধরা-লাম না। রাত্রি দশটা নাগাদ অত্যন্ত ঘুমের ঝোঁকে চোখ জড়িয়ে এলো। 'এ-ডি' আমার দুর্বলতা লক্ষ্য করে কানের কাছে মুখ এনে বললেন শুয়ে। ঘণ্টা দুই পরে বা বাঘ এলে তুলে দেবেন। শুয়ে পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। সন্ত-র্পণে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। চট্-চট্, ও চিবোবার শব্দ? নিশ্চয় বাঘ এসে গেছে, মড়ির মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। 'এ-ডি' আমার পাশে হাত দিয়ে কোণাছি বুকে হাত বাড়িয়ে মড়ির দিকে দেখালেন। নিঃশব্দে আস্তে আস্তে রাইফেল তুলে নিয়ে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে দেখে নিলাম ঘোড়ার খিল খোলা। কাঁধে চেপে বাগিয়ে ধরে রাইফেল মড়ির দিক তাগ করে রাখলাম দু-তিন সেকেণ্ড। মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নিচে ছোট স্তূপাকৃতি কালো একটা কিছু। কিন্তু বাঘের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই নেই। বাঘ হলে হলুদ ও কালোতে মিলে একটা আকৃতির আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু সে রকম কিছু ঠাহর হোলো না। টর্চের বোতাম টিপে কালো স্তূপের মত জিনিসের উপর আলো ফেললাম। আলোটা এদিক ওদিক নাড়লাম। মড়ি ছাড়া আর কিছু নজরে হোলো না। আলো নিভিয়ে রাইফেল নামিয়ে রাখলাম।

(ক্রমশঃ)

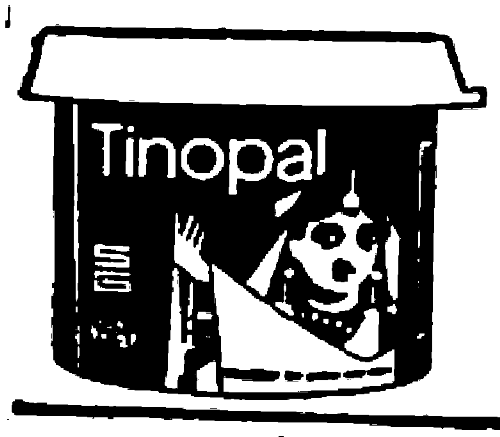

পরীক্ষা করে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব! আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন —রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"।

® টিনোপাল—জে আর গেইগী এস এ, বাসল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বছরও দুর্গা-পূজো উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে অজস্র পত্র-পত্রিকা। নিয়মিত সাময়িক পত্রগুলির বিশেষ পুজো-সংখ্যা ছাড়া অনেক অ-সাময়িক পত্রিকা যাদের মাত্র বৎসরে একবার মাত্র দেখা যায়, সেই সব পত্রিকাও সংখ্যায় নগণ্য নয়। এ-ছাড়া সিনেমা সম্পর্কিত কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও পুজো উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর পত্রিকা এ-বছর ব্যাঙের ছাতার মত আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাদের নামও যেমন বিচিত্র, প্রচ্ছদপটও ততোধিক বিচিত্র। বহুবর্ণে রঞ্জিত কামোদ্দীপক রূপসীর ছবি দিয়ে এঁরা প্রচ্ছদ সাজিয়ে যৌন বিষয়ক রুচি বিগর্হিত বিষয়বস্তু দিয়ে পাতা ভরিয়ে শ্রাবণ মাসের প্রায় শেষ সপ্তাহেই ফুটপাথে আবির্ভূত হয়েছিল। অনেকদিন ফুটপাথ আলো করে থাকার পর সম্প্রতি পুলিশের ভয়ে একটু অন্তরালে লুকিয়ে আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবশ্য মহালয়ার পূর্বে কোনো পত্রিকার পুজো-সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি ছিল না। পত্রিকাগুলির দামও চার আনা, আট আনা কিংবা বড়জোর এক টাকা ছিল। আকারও অনেক ক্ষীণ ছিল। ইদানীং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খাতিরে পত্রিকাগুলির দামও অনেক বেড়েছে এবং আকারও অনেকখানি পুষ্ট। সিনেমা পত্রিকাগুলি পত্রিকাগুলির চেয়েও মহার্ঘ্য।

সরাসরি পুজো সংখ্যা বলতে যাদের বাধে তাঁরা, শারদীয় সংখ্যা, শারদ অর্ঘ্য ইত্যাদি নাম দিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকেন। এইসব পত্রিকাগুলির আর্থিক সামর্থ্য যথেষ্ট না হলেও উৎসাহ ও উদ্যম এঁদের কম নয়। রচনা সংগ্রহ এবং পরিবেশন পদ্ধতিতে এই সব পত্রিকা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন তা প্রশংসা যোগ্য।

কিন্তু যাঁদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হয় তাঁরা হলেন লিটল ম্যাগাজিনের সহায় সম্পদহীন উৎসাহী তরুণদল। এঁদের পত্রিকার আকৃতি ক্ষুদ্র, সাজ-সজ্জা সাধারণ, অনেক সময় মুদ্রণের জন্য অজস্র ছাপার ভুল প্রভৃতি হ্যাণ্ডিক্যাপ সত্ত্বেও এই সব পত্রিকায় অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক প্রতিভাধর তরুণ গল্পলেখক এবং কবি একালে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন লিটল-ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায়।

একটু অতীতের দিকে পিছন হটে যাওয়া যাক। আমরা যতদূর জানি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' নামক পুজো-বার্ষিকী ১৩২০-২২ সালে এক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র। এই পুজো-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জলধর সেন প্রভৃতি সে যুগের সাহিত্য-মহারথীদের রচনা সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। এই সময় নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত একটি পুজো-বার্ষিকী প্রকাশিত হয় এবং সেই পুজোবার্ষিকীর প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি ব্লক করে ছাপানো হয়। স্মৃতিনির্ভর করে লিখছি, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 'ওগো সেকালী' কবিতাটি এই বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকাগুলির আশ্বিন সংখ্যাটি বিশেষ শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক প্রবাসী পত্রিকার একটি পুজোসংখ্যাতেই আদ্যন্ত হিসাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

এর কিছু পরেই মাসিক বসুমতী পত্রিকা মহা-সমারোহে প্রকাশ শুরু হল। মাসিক বসুমতীর বার্ষিক সংখ্যার নাম ছিল 'বার্ষিক বসুমতী'। তখনকার কালের এমন কোনো খ্যাতনামা লেখক ছিলেন না 'বার্ষিক বসুমতীতে যাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা', 'পরিত্রাণ' প্রভৃতি নাটক এই বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সময় বিদেশে সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ কেবলের পর কেবল পাঠিয়ে রচনা সংগ্রহ করেছেন। একথা রবীন্দ্রনাথই একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

সেই সময় সংবাদপত্রগুলির সাধারণ সংখ্যাই পুজোসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত—পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত, এবং অনেক সময় আগাগোড়া লাল রঙে ছাপা হত। সাধারণ সংখ্যার আকারে প্রকাশিত এইসব সংবাদপত্রে অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং রম্য-কবিতাদি প্রকাশিত হত।

একদা প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সব দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁরা তখন বয়সে তরুণ, তাই তাঁদের সম্পাদনার ভঙ্গীতে তারুণ্যের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তিরিশের দশকেই একটি সংবাদপত্রকে আধা-আধি ভাঁজ করলে যে আকার হয় সেই আকারে একটি হাফদাম মলাটে বাঁধাই করা অবস্থায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার পুজো-সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি চালু হল। এখন যখন পুজো সংখ্যাগুলির আয়তন ও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তখন একটু ভালো বাঁধাই ব্যবস্থা করে পুজো সংখ্যাগুলিকে মুদ্রিত গ্রন্থের মত প্রকাশ করলে বোধহয় অনেক দিক থেকে সুবিধা হয়। বহু মূল্যবান রচনা সম্বলিত এইসব পুজোর সংখ্যা আর দুই-এক মাস পরে বিক্রিওয়ার করলে পড়ে ঠোঙায় পরিণত হবে। তখন আর মাথা খুঁড়লেও এই সব সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যাবে না। আমরা জানি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও সেকালের অনেক পত্রিকার পুজো সংখ্যা পাওয়া যাবে না। সুযোগ এই জাতীয় বিশেষ সংখ্যার নাম এ্যানুয়েল নাম্বার, এবং সেইসব সংখ্যাগুলির বাঁধাই করা পরিচ্ছন্ন সংস্করণ ক্রিসমাসের অনেক পূর্বেই বাজারে প্রকাশিত হয়, ফলে উপহার দেওয়ার সুবিধা হয়।

শারদীয় সংখ্যায় সাহিত্য-সমারোহ। সর্বসাধারণের পক্ষে এত সহজে এবং সুলভে সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের সুযোগ আর মেলে না। রচনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে কি হ্রাস পেয়েছে তা বিচার করার অনুকূল সময় ঠিক এই মুহূর্ত নয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে জাতির সাহিত্যের প্রতি এতখানি প্রচণ্ড অনুরাগ, সে জাতির ক্ষয় নেই, ভয় নেই।

শারদ-সাহিত্যের একটি ব্যবসায়িক দিকও আছে। লাভ-লোকসানের খতিয়ান করার প্রয়োজন নেই। পাঠকের লাভ কতখানি সেটুকু দেখাই শ্রেয়। মনে হয় সতর্ক পাঠক হংসের মতো নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

—অভয়ঙ্কর

শারদ সাহিত্য-সমারোহ

সাহিত্যের খবর

তারাশঙ্করের মরণোত্তর সম্মান : বিগত শুক্রবার তারাশঙ্করের টালা পার্কস্থিত বাসভবনে এক বিশেষভাবে নির্মিত সামিয়ানার উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক মরণোত্তর ডি-লিট ডিগ্রী দান করা হয়। রাজ্যপাল মিঃ ডায়াস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে তারাশংকরের সহধর্মিনী উমা দেবীর হাতে সনদটি অর্পণ করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই বছর যাঁদের সম্মানিত করা হবে সেই তালিকার মধ্যে তারাশংকরও অন্যতম ছিলেন। দুঃখের বিষয় অনুষ্ঠানের পূর্বে তাঁর দেহান্ত হয়। সেই কারণে এই বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়। দুঃপান্তর কালের মানসিক চরিত্রে অন্তরঙ্গ প্রকাশে তারাশংকরের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কথা সকলেরই মনে উদিত হয়। সভায় অনেক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিকের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা : পরে পোয়েরনমো একজন ইন্দোনেশীয় লেখক। তিনি প্রায় এক পক্ষকাল ব্রিটিশ জেনারেল পোস্টঅফিসের সামনে অনশন ছিলেন। পূর্ব বাংলা থেকে শরণার্থীদের দুর্দশার প্রতি অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি অনশন ভঙ্গ করেছেন। মিঃ পোয়েরনমো দরিদ্র এবং অসুস্থ মানুষ ব'রে অনশন ভঙ্গ করেছেন। তাঁর বর্তমান বয়স সাঁইত্রিশ। এই অনশনকালে পথচারীদের কাছ থেকে তিনি ২০,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার সংগ্রহ করেছেন। ভারতীয় অঙ্কে এই অর্থের পরিমাণ ১,৬৭,৯৯৯। মিঃ পোয়েরনমো ৮৪-১ মিলিয়ন টাকা শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন এবং যদি সেই অর্থ না পাওয়া যায় তিনি পুনরায় অনশন করবেন।

খুশবন্ত সিং-এর ভাষণ : ইলাস্ট্রেটেড উইকলী অব ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক এবং ইংরেজী ভাষার উপন্যাস লেখক খুশবন্ত সিং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ান চাঁদ স্মারক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেছেন—ভারতীয় ভাষায় বিগত বিশ বছরের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। এর একটি কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, চাকুরী সূত্রে অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়। যাঁরা ছাত্র-জীবনে চমৎকার গল্প লিখেছেন উত্তরকালে চাকরীতে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা একেবারে 'মূর্খ' (খুশবন্তের ভাষায় ইডিয়ট) হয়ে পড়েছেন। নোট এবং মেমোর্যাণ্ডাম ভিন্ন আর কিছু লেখার শক্তি তাঁদের নেই। যে-সব ভারতীয় ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস লেখেন তিনি বিশেষ করে তাদের উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে অভাবভাবে সেকথা তিনি স্বীকার করেন। তবুও ভারতীয় লেখকদের সম্পর্কে তিনি নাম উল্লেখ না করে মন্তব্য করলেও ইংরাজী ভাষার লেখকদের অবশ্য নামোল্লেখ করে সমালোচনা করেন।

তিনি বলেছেন—ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি অজস্র ছোট গল্প নির্বাচিত পেয়ে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গল্প আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তাঁর ধারণা ভারতবর্ষের সব শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকরাই এই বাঙালী সম্প্রদায়ের।

অতঃপর তিনি বলেন—'আমি স্বয়ং আর উপন্যাস বা গল্প লিখবো না। কালি শুকিয়ে এলে লেখকের সেখানেই থামা উচিত। তাঁর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

এই বক্তৃতাটি যে বাংলা সাহিত্যের লেখক এবং সাহিত্য পাঠকদের কাছে নতুন চিন্তার খোরাক এনে দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শারদ সংকলন

বৈতানিক—সম্পাদনা : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু টাকা।

সাময়িক সাহিত্যে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'বৈতানিক' একটি সুপরিচিত নাম বিশেষ করে সৎ সাহিত্য পাঠকের কাছে। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিন্তাকর্ষী নিবন্ধ আলোচনায় পত্রিকাটি সকল রস এবং রুচির পাঠকদের সুদীর্ঘকাল ধরে মানসিক তুষ্টিবিধান করে আসছে। আলোচ্য শারদ-সংকলনটির লেখক তালিকা এবং লিখিত বিষয়সমূহের দিকে নজর ফেরালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'দেবী দুর্গার' বন্দনা করেছেন সূচনাতেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন : মনোজ বসু ('যুগপুরুষ মুজিবর'), প্রবোধকুমার সান্যাল ('রাজা রামমোহন'), সন্তোষকুমার অধিকারী ('রাজা রামমোহন'), ডকটর আশুতোষ ভট্টাচার্য ('বেহুলী রামায়ণ'), বিভা সরকার ('অবনী স্মৃতি'), ডকটর শিবেন্দ্রলাল নাথ ('সাহিত্যে কালচেতনা'), ডকটর শুক্লা দাশ ('হাম্বা খাতুন ও কাশ্মীরী লোক')। গল্প লিখেছেন প্রখ্যাত কথাকার নন কিন্তু প্রতিশ্রুতি আছে এমন কজন তরুণ গল্পলিখিয়ে। নামের ভার না থাকলেও ধার আছে পূর্ণমাত্রায়। এঁরা হলেন : অশোককুমার সেনগুপ্ত, নির্মলেন্দু গৌতম, অমরেন্দ্র সান্যাল ও মিহির পাল। বিরল বাংলায় সরস রচনা বড়-একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে শারদ-সংকলনে। প্রাত্যহিক জীবন থেকে একটি-দুটি ঘটনার ওপর জমিয়ে সরস কাহিনী : ডকটর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ('আমাদের পুরোনো ধোপা') ও সন্তোষকুমার দে ('কমপ্লিমেনটারি')। বিদেশী গল্প এবং বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে নির্মলেন্দু রায়-চৌধুরী এবং সম্পাদক স্বয়ং। শারদ সাহিত্যে অনুপস্থিত এবং প্রায় অবজ্ঞাত অনুবাদ-সাহিত্য কর্মটি এ সংকলনে সমাদৃত হতে দেখে সাহিত্য পাঠকরা নিশ্চয়ই খুশী হবেন। সুসম্পাদনা ও সুলিখিত রচনাসম্ভারের সমাবেশ গুণে 'বৈতানিক' শারদ সংকলনের প্রবাহের মধ্যে অনায়াসেই আপন বৈশিষ্ট্যে পাঠক সম্বর্ধনা লাভ করবে।

লোকসংস্কৃতি (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) সম্পাদক : দুলাল চৌধুরী। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর। ২৮৫, যোধপুর পার্ক। কলকাতা-৩১। দাম দেড় টাকা।

লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার প্রচারও ক্রমশ বাড়ছে। অ্যাকাডেমি অব ফোকলোরের উদ্যম এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। সংস্থার মুখপত্র 'লোকসংস্কৃতি'র নির্বাচিত রচনাবলীর দিকে তাকালেই [illegible] স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় এদের গবেষণার গভীরতা কত ব্যাপক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন : চারুচন্দ্র সান্যাল (মেচ উপজাতির বিবাহ-সংস্কার ও পদ্ধতি), রবীন্দ্র মজুমদার (দুর্গাপুজোর উৎস সন্ধানে), হরেন ঘোষ (নেপালীদের উৎসব : দশাই-তিহার) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতীয় কাঞ্চারাল অ্যানথ্রোপলজী অনুধ্যানে সংগীতের ভূমিকা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (লোকনৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব), আবদুল হাফিজ (লোকসংস্কার ও সংখ্যা মাহাত্ম্য), বিনয় ভট্টাচার্য (লোককথার পটুয়া জাতির উৎস), ব্রীন্দ্র মজুমদার (পুবে মুর্শিদাবাদ

CENTRAL LIBRARY

বিবাহ-গীতি), মুহম্মদ আব্দুর হোসেন (আঞ্চলিক শব্দ : বর্ধমান), তারাপদ সাঁতরা (মেদিনীপুর জেলার বিবিধ পুজো), আবদুর রহমান (মুর্শিদাবাদের মুসলমান সমাজে নতার পুজো)। তাছাড়া আরো কয়েকজন লিখেছেন এবং লেখক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। দুটি পটের আলোকচিত্র এবং আরো কয়েকটি আলোকচিত্র আছে।

নহবৎ—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ২নং হরিহরপুর। বারাসাত। ২৪-পরগণা। দাম দু টাকা।

নহবৎ বাজার-চলতি বস্তাপচা রচনার সংকলন নয়। সুস্থ জীবনধর্মী চিন্তার প্রসারে নহবৎ গোষ্ঠীর আন্তরিকতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। মফঃস্বলে বাংলা থেকে প্রকাশিত এই ধরনের উন্নত রুচির পত্রিকা খুব কমই চোখে পড়ে। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ কবিতা এবং বিচিত্র স্বাদের কয়েকটি রচনা লিখেছেন : বিজয় দেব, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, রজত শঙ্কর দত্ত, অমিয়শঙ্কর দেওয়ান, উৎপল চক্রবর্তী, সুজিত মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, সুভাষ সিংহ, তুষার সাহা, সনৎ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, সত্য গুহ, শংকর দে, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার রায়, রত্নেশ্বর হাজরা, অঞ্জন সেন, দীপন রায় এবং আরো কয়েকজন।

নক্ষত্রের রোদ (শ্রাবণ-আশ্বিন)-সম্পাদনা : সব্যসাচী দেব এবং সুব্রত ভট্টাচার্য। ১১০।১ যাদবগড় পূর্ব। কলকাতা-৩৫। দাম এক টাকা।

প্রচলিত চিন্তা ও ধ্যান ধারণা থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় পত্রিকাটি হাতে নিলেই। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ কবিতা, অনুবাদ গল্প সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। কবিতা লিখেছেন সুশান্ত বসু, সমর ঘোষ, সুশান্ত দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, অমিত দাশগুপ্ত, সুজন গুপ্ত, সব্যসাচী দেব। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি আলোচনা।

তর্পণিমা— সম্পাদক শ্রীহরিদাস ঘোষ। ৪০।১ বনমালি সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

তর্পণিমার শারদ সঙ্কলনটি হাতে করলেই প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর সম্পাদকীয় নিবন্ধটি। স্পষ্ট এবং নির্ভীক ভাষায় লেখা। মায়ের কাছে অভিমান এবং অভিযোগ করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সংকটের এক হুবহু ছবি সম্পাদক তাঁর জোরালো লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সম্পাদক হরিদাস ঘোষের 'বঞ্চিতের মিছিল' একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। বর্তমান যুগের ধনিক শ্রেণীর অবিচার অত্যাচার এবং ভণ্ডামিকে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসখানি বেশ হৃদয়গ্রাহী। সদ্য পরলোকগত অমর সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণী সম্বলিত এই তর্পণিমার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কবিশেখর কালিদাস রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রপাল আর এন চ্যাটার্জি, বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী, জয়দেব রায়, গোরাচাঁদ নন্দী, পুষ্পকুমার পাল, অলোক ঘোষ, পঙ্কজ, রমেশ ধর, মিহিরকুমার মুরারি, অলোক কাঞ্জিলাল, অধ্যাপক সুশান্ত অধিকারী, দীপক চক্রবর্তী, সুবিমল, প্রদীপ পালচৌধুরী, অমরেন্দ্র সমাদ, অমল ভট্টাচার্য, দীপককুমার পাল প্রভৃতি।

বেদুইন—সম্পাদক : সত্যেন্দ্রনাথ জানা। তমলুক রাজবাটী, তমলুক, মেদিনীপুর। দেড় টাকা।

পঞ্চম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যাটি শারদ সংকলন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লিখেছেন পরিচিত এবং প্রতিশ্রুতিবান কথাকাররা। এঁদের মধ্যে আছেন ডক্টর রমা চৌধুরী, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, কুমারেশ ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ প্রমুখ। মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আগমনী' ও সত্যেন্দ্রনাথ জানার নাটক 'মধুরেন' উল্লেখিত হবার মতো।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান—সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪-পরগণা। ১-৫০ পয়সা।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের রচনাসম্ভারে বিশিষ্ট এই পত্রিকাটিতে লিখেছেন : ডক্টর সুরেশ মৈত্র, ডাঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, কবিশেখর কালিদাস রায়, গোপাল ভৌমিক, জয়দেব রায়, ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবলাল বক্সী প্রমুখ। এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 'মৌনরোগ প্রসঙ্গে' লিখছেন 'সিফিলিস' গ্রন্থের লেখক গোবিন্দ বিশ্বাস।

চিকিৎসক সমাজ—সম্পাদক : ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা—৩৪। তিন টাকা।

সকল শ্রেণীর চিকিৎসকদের মুখপত্র 'চিকিৎসক সমাজ'-এর শারদ সংখ্যাটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সমাবেশ সকল রুচির পাঠকদের খুশী করবে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : কবিতায় : বনফুল, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ছোট গল্পে : ডাঃ নির্মল সরকার, ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী, উপন্যাসে : সত্য বর্মা ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, বিশেষ রচনায় : আনন্দকিশোর মুন্সী, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডাঃ অশোক বাগচী, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় : ডাঃ গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য।

গন্ধবণিক—সম্পাদক : নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু। ২১সি রাজেন্দ্র দেব রোড, কলকাতা—৭।

একান্ন বছরের আশ্বিন সংখ্যা 'গন্ধবণিক'-এর শারদ সঙ্কলনে সাহিত্যের কোন বিভাগই উপেক্ষিত হয় নি। প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, জীবনী, উপন্যাস, উপন্যাসোপম গল্প, গল্প, স্কেচ, কৌতুক নক্সা বিচিত্রা বৈঠকী, চিকিৎসা বিজ্ঞান, খেলাধুলা, কবিতা, ভোরের আলো (শিশু-কিশোর বিভাগ) সচিত্র প্রভৃতি বিভাগের বিশিষ্টরা হলেন : শঙ্কর, শিবরাম চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, রেবতীভূষণ, কাফী খাঁ, কৃষ্ণধন দে, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শান্ত মিত্র, সুধীর কর্মকার, রূপা মুখার্জি, অম্বর রায়, বিমল ঘোষ, ডাঃ হর্ষিশচন্দ্র প্রধান। গল্প-প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (সাক্ষাৎকার : বিকু দাস) বক্তব্য শিল্পরসিকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে। তরুণ লেখক সুখেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন নতুন স্বাদের উপন্যাস 'বিবর্ণ ঘোড়া'। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর রূপ স্বর্ণাঙ্কন-এর প্রতিলিপি, অজয় দে-র 'হস আফ্রিকা, এসরাজ বাদনরত অবনীন্দ্রনাথ আর্ট প্লেটগুলি শারদ সংখ্যাটিকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।

প্রাপ্তিস্বীকার

অভিনব অরণী : সম্পাদক—দিলীপকুমার নাগ। ৮০ বৈকুন্ঠপাড়া লেন, হাওড়া—১। এক টাকা।

ভুবন—সম্পাদক : নরনকুমার রায়। ৮ ভুবননগর, চন্দননগর, হুগলী। এক টাকা।

নতুন মুখ—সম্পাদক : ফণিভূষণ জানা। সোনাকুড়ি, বলদুক-হাট, মেদিনীপুর। এক টাকা।

কিন্তু—পরিতোষকান্তি পাল, স্বপনকুমার প্রামাণিক। সম্পাদক ১৭৮ এম বি রোড, নিমতা, কলকাতা—৭১। পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রাত্রী—সম্পাদিকা : বিশাখা বিশ্বাস। শান্তিকুটির, মাধাইপুর, বীরভূম। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

বনন—সম্পাদক : আনন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দভবন, ১১।৩, মণিভূষণ ঘোষ লেন, মাহেশ, রিষড়া, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

উন্মেষ—সম্পাদক : সোনার মল্লিক। হিরণ্যবাটী, ধনিয়াখালি, হুগলী।

উন্মীলন—সুভাষচন্দ্র পাল। ৭০, এম।৪ নিউ কেয়াম টাউন, জামসেদপুর-৩।

প্রতিশ্রুতি — মৃণালবন্ধু চৌধুরী। ৪২ গড়পাড় রোড, কলকাতা—৯। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রতিবিম্ব — সম্পাদনায় প্রতিবিম্বগোষ্ঠী। ১১২ বি বি ঘোষ রোড, বর্ধমান। পঁচিশ পয়সা।

শতাব্দীর অভিশাপ (নাটিকা) — শংকর ভট্টাচার্য। এষু প্রকাশনী, ২৭ বাদুড়বাগান লেন, কলকাতা-১২। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শেষবার

আনন্দ বাগচী

মনে হয় শেষবার চাঁদ উঠেছে শৈশবের বিস্মৃত শহরে
পোড়ো পাঁচিলের ধারে মজাদীঘি কিংবদন্তী ভরা
এখনো প্রাচীন শব্দে বৃক্ষশাখা দোলে দ্বিপ্রহরে
বুকের গহনে বাজে আজো কার তবলা-লহরা।
সেই চেনা পথ ভেঙে ফিরে আসছি গয়নার নৌকোয়
রূপসী বিলের মধ্যে যেন আশ্বিনের গন্ধ ভাসে,
মনে হয় শেষবার স্মৃতি ভীরু কিশোরীকে ছোঁয়
ভর দুপুরের ফেরিওলা শঙ্খচিল হাঁকে গভীর আকাশে।

ডিনামাইটের পরে মাথা রেখে শুয়ে আছে উলঙ্গ নগরী
নগরীও নিঃশেষ; স্বপ্নে আগ্নেয়াস্ত্র বুকে বন্ধ ঘড়ি।
গীর্জার মন্দিরে শুধু দমকলের ঘণ্টা বেজে যায়
আঁধার মগজে বাজে ফিরতি শব্দ ডায়াল করার,
তবু মনে হয় বুঝি চাঁদ উঠেছে, ফিরে আসছি গয়নার নৌকায়
শায়িত নগরীর কাছে শেষবার, বিস্মৃতির কাছে শেষবার।

আবর্ত

অভয় বন্দ্যোপাধ্যায়

হিংসার সঙ্গে মিতালি পাতালে নিজেকে শূন্য মনে হয়:
চওড়া বুকে ধকধক করে নিষ্ঠুরতা।
আমি ইতিহাস দেখি, ইতিহাসের মানুষ
জীবন যৌবনের সন্ধিক্ষণে আলোছায়ার বিশালতা।
দেখি, স্বপ্নের মুহূর্তে মাপা হয়
জ্যামিতির কৌতুক সূত্রে;
জীবনের মর্মমূলে আশ্চর্য কুয়াশা।
এইতো জীবন—
চারদিকে ছড়ানো নিষ্ঠুরতা আমার মতো
বর্শার মতো মাঝে মাঝে মাথা তোলে।
তবু এই মুহূর্তে
আমি জীবনের নতুন ইতিহাস দেখি।

প্রত্নতাত্ত্বিক

সন্তোষ কর

ঝুরঝুর করে ইট কাঠ পাথরের একশ' ক্রোশ
পরাজয়ের বিবর্ণ ক্লান্তিতে ঝরে পড়ল।
সন্তপ্ত বালুর মেঝের
দুটো থামের উপর ভর করা শরীর আজ অবসন্ন প্রাসাদ;
মাটির মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে
মাথা তুলে দাঁড়াবার সরব প্রতিবাদ
আজ আর নেই!

এখন শুধু একটানা আকাশকে তাকিয়ে দ্যাখা :
বিরল সাদা মেঘগুলোর বৈচিত্র্য
রিটায়ার্ড হাতে ডাকপিয়নের চিঠির মতোই সুস্বাদু:
এ ছাড়া নিঃসঙ্গ বিকেল।

অথচ অদূরেই সমুদ্রের উজ্জ্বল বন্দর!
ট্রামবাসগুলোর ভিড়ে পিঁপড়ের ব্যস্ততা।
বিক্ষুব্ধ নাবিকদের হাতে মৃত্যুর সচিত্র বিজ্ঞাপন
কিংবা লেকের ধারে মেয়ে-মাখামাখির উৎকৃষ্ট পানীয়
সন্ধ্যার সুদৃশ্য কাপে উপচে পড়ছে।
বাঁশি বাজিয়ে জাহাজ এসে থামলে

মাঝে মাঝে কিছু ইতিহাসের ছাত্র আমাকে ঘিরে ধরে,
আমার হাতটা পাটা মাথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে:
এবং অবশেষে আইন্জাসে কিছু বিসদৃশ ধরা পড়তেই
ওরা সব ছুটে পালায়।

এই বিংশ শতকেও
আমার বুকের উপর
যদি আবিষ্কৃত কোনো শিলালিপিকেই
দেখতে পেয়ে যেতো!

(উপন্যাস)

সুবনশিরি

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সুবর্ণশ্রীর জলে ঝাঁপ দেবে মেঘনাদ। তাই দূর থেকে ডিগবাজী দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে আসছে মেয়েরা। বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে মেঘনাদের বলিষ্ঠ দেহটা। ঘূর্ণি ধরেছে মাথায়—চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না। ছেলেটা চলে যায় মেয়েগুলোর মাঝখান দিয়ে। এপাশ ওপাশ সরে গিয়ে তারা রক্ষা পায়—খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সুবর্ণশ্রী নদীতে স্নান করে সখীদের সঙ্গে ফিরে আসছে শর্মিষ্ঠা। গায়ে ভিজে কাপড় জড়ানো। নাকিয়ে-ঝাঁপিয়ে কল-কল-রবে বনবীথিকা মুখরিত করে চলেছে সখীরা। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে শর্মিষ্ঠা বেশ একটু পিছিয়ে পড়েছে। এধার-ওধার ঘুরেও সে রেহাই পায় না, পড়ে গেল একেবারে মেঘনাদের সামনে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের স্বর।

মেঘনাদও থমকে দাঁড়ায়—একেবারে শর্মিষ্ঠার মুখোমুখি। টালটা সামলে নিয়েছে কোনমতে—নইলে পড়ে যেত তার গায়ের ওপর। তবুও সে অপ্রতিভ হয়।

সবে ঘাট থেকে উঠেছে, জল ঝরছে ভিজে কাপড় থেকে। কাপড়টা জড়িয়ে রয়েছে শর্মিষ্ঠার দেহের রেখায় রেখায়। নিষ্ফল আবরণের ভিতর থেকে ঠিকরে আসে দেহসৌষ্ঠব, যৌবনের দীপ্তি। সে দীপ্তির প্রভায় মেঘনাদের চোখদুটো মোহমুগ্ধ হয়ে যায়, মুহূর্তে মাতাল হয়ে ওঠে তার মন। সারাদিন কর্মরত পেশীগুলো সারা দেহে যে উদ্দাম উত্তেজনা এনেছে, দিনের প্রখর রৌদ্র-রশ্মির তেজ মেঘনাদের মস্তিষ্কে যে আগুন জ্বালিয়েছে সেই আগুনের আভায় তার চোখে পড়ে একটি তন্বীর পরিপুষ্ট অবয়ব, যেন একটি জীবন্ত সুষমা। কামনার বিকাশোন্মুখ রক্তের ঔজ্জ্বল্য ঝলমল করছে। মেঘনাদের নিরঙ্কুশ দৃষ্টি তা লেহন করে উন্মাদ হয়ে ওঠে, লুব্ধ ভ্রমরের মতো। অন্তর ছুঁয়ে উঠে আসা রক্তের ঝলকে রক্তিম তার মুখ। সেই রক্তিম মুখে ফুটে ওঠে একটা লোলুপ হাসি। সে বলে—হাই রে ছুঁড়িটে

সুবনশিরি টি এস্টেট-এর কলম-কাটার (চা-গাছ ছাঁটাই করবার কাজ) সর্দার রাঘবের একমাত্র মেয়ে শর্মিষ্ঠা। তন্বী, শ্যামা, সুগঠিতা, কেশুলী, মুখে তার শিক্ষা ও বংশ পরিমার ছাপ—সযত্ন-সংযত চলাফেরা।

মেঘনাদের অমন চাহনি, তার হাসি শর্মিষ্ঠার মোটেই ভাল লাগে না। বড় অস্বস্তি বোধ করে। মেঘনাদের অমন অশিষ্ট উন্মাদ আচরণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে শর্মিষ্ঠা।

চাহনির প্রতিবাদে চাহনি!

নিজেকে রক্ষা করতে শর্মিষ্ঠা রুখে দাঁড়ায়—কটমট করে তাকিয়ে থাকে মেঘনাদের পানে।

শর্মিষ্ঠার মুখের আভা মেঘনাদের সারা দেহে এনে দেয় রক্তের ঝলক। তার মনের সকল বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সে খপ করে শর্মিষ্ঠার বাঁ-হাতটা নিজের ডান হাতে চেপে ধরে। আবার বলে—হাই রে শুর্মি!

আরো কিছু চায়—সময় হল না, সুযোগ পেল না।

শর্মিষ্ঠার দুটি হাত এক সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক হাত সজোরে পড়ে মেঘনাদের গালে, আর এক ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নেয় অপর হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।

ঝোপঝাপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে সখীরা, যেন এক ঝাঁক পাখী। কিচির মিচির করে ওঠে—কী হোইলো রে?

মেঘনাদের সকল উদ্যম যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হল—তার মনের সকল আয়োজন চুরমার হ[illegible]। গালে হাত দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে [illegible] থাকে।

উন্মত্ত মহাসাগরের ঢেউ-এর মত তরঙ্গায়িত পর্বত বেষ্টিত একটি দেশ—অপূর্ব মোহময় সুষমা শোভিত, প্রাচীন কাহিনী-কিম্বদন্তী ও রূপকথার রহস্যজালে আবৃত কবিমানসের ধাত্রী। তৃণ-মাংস ভোজী হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত মহাঅরণ্য আকীর্ণ, ধরিত্রীর স্তন-সুধা-সিক্ত, হিমালয়ের তুষার বিগলিত সলিল বিধৌত উপত্যকা। যে দেশের মানুষের মুখ আজও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—সাক্ষ্য দেয় পরিবর্ধ বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তঃপ্রবাহের কথা, স্মরণাতীত দিন থেকে অদূর অতীত পর্যন্ত। যে দেশেরা জনপদ পৃথিবীর আদিম নরগোষ্ঠীর উর্বর রক্তে রঞ্জিত—গগনচুম্বী পর্বত পরিবৃত উর্বর উপত্যকা মানুষের অন্ন সমস্যার সমাধান করে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের মনোরম, ভাবময় জীবনে ভাবরসের সঞ্চার করে সেই দেশ। যে দেশের নদী-নদ, জনপদ, পর্বতের নামের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের যাযাবর জীবনের স্থিতিবিন্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, বিভিন্ন মানুষের বর্ণ-রক্ষণ ও বর্ণমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায় সেই দেশ।

রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত কৌলীন্যের দেশ—পুরাণ কথিত মানুষের কীর্তিবীর্যের দেশ। দেবাসুর অধ্যুষিত দেশ।

যুগে-পূর্ব যুগে বিভিন্ন আদিম নরগোষ্ঠীর দেশ—বিভিন্ন নরগোষ্ঠী উদ্ভূত বর্ণসঙ্করের দেশ; মঙ্গোল রক্ত মিশ্রিত জাতির উপনিবেশ প্রাগজ্যোতিষপুর।

হরপার্বতীর প্রসাদ-সলিল বিধৌত পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা—ভীষ্মকের বিদর্ভ, বাণরাজের শোণিতপুর, নরকাসুর শাসিত প্রাগজ্যোতিষ, কন্দর্প দর্পণের কামরূপভূমি, অহোম শাসিত অসম—ইংরেজ বিজিত অ-সম অসম।

ভারত স্বাধীন হল: বিভিন্ন পাহাড়ের দুর্গ জুড়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বংশধরের সাবলীল স্বতন্ত্র জীবন প্রবাহে স্বায়ত্ত শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কত বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন হল: নাগারা নাগা থাকতে চাইল; লুসাই হল মিজোরাম, খাসিদের বাঁশীর চলল ভাঙ্গাগড়া, গারোদেরও রূপ হতে হল; অকারা বাঁকা পথ ধরল না, ডাফলা থাকল সামলায় এক ধারে, কয়েক লক্ষ আবর অধ্যুষিত আবর পাহাড় রইল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত শাসনের আবরণে।

আসামের উত্তরে, সেই আবর পাহাড়ের পাদদেশে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে উঁচুনীচু ঢিপি। উত্তরে আবর, পশ্চিমে ডাফলা পর্বতমালা—দূরদিগন্তে যেন ধরে রেখেছে

আকাশটা। উত্তর-পশ্চিম কোণে হিমাবৃত পর্বতিকার হিমালয়—সূর্যকিরণে নানা রঙে ঝকমক করে, চন্দ্রালোকে পড়ে থাকে একরাশ তুলার মতো।

আবার পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে একটি উচ্ছল উপলবাধিত স্রোত। সুবর্ণশ্রী নদী—প্রান্তরের অন্তর চিরে মিলেছে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কোলে, অদূরে দক্ষিণে। ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণশ্রীর সংযোগ—সুবর্নশিরি মুখ।

সুবর্ণশ্রীর পূর্ব কূল ধরে কিছু উত্তরে এক চা-বাগান—সুবর্নশিরি টি এস্টেট। শাল-শিরীষের ছায়ায় ঢাকা পূর্ব-পশ্চিমের প্রশস্ত একটা পথ চা-ক্ষেতটাকে দু-ভাগে ভাগ করে মিলিয়ে গেছে সুবর্ণশ্রীর কোলে একটা বাঁধানো ঘাটে। তারই পাশে ফলের বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছে পাতা তোলার মেয়েরা—শর্মিষ্ঠার সখীরা।

পশ্চিম দিগন্তে ডাফলা পাহাড়ের মাথার আড়ালে সূর্যদেব তখনও দীপ্তিমান। গোধূলির দেরি নেই।

রক্তিম আকাশে ভাসাভাসা মেঘের কোলে দূরে অপসৃয়মান নানা রঙের খেলা। পলকে-পলকে কত রঙের খেলা। বনতলে কূজন-গুঞ্জন, ভ্রমরীর কল-কাকলি মুখর বসন্ত বাতাস।

—কী হোইলো রে শুর্মি? হেসে গড়িয়ে পড়ে সখীরা।

—শুর্মিকে ধর নারে মেঘু। কেউ বা খিলখিলিয়ে ওঠে।

আর কোন কথা নেই। একটি শিকার—আর একটি শিকারী যেন। সব জেনে গেছে। তবুও বড় মস্ত, বড় অস্থির। অন্য কোন দিকে চোখকান দেবার ফুরসৎ নেই তাদের—মেজাজও নেই।

দেহের হিল্লোল, কণ্ঠের কল্লোল, হাসির জলতরঙ্গ। সখীরা এগিয়ে আসে কাছে।

—ঈস্ রাম! শুর্মি মারি দিল কেনে রে মেঘু?

—তু এত্না যোয়ান মরদ—আরু এটা মাইকী মানুর থাপ্পড় খাইলি!

—খাইলি তো। মেঘুর জবাবে যেন লজ্জার বাহাদুরী।

—খাইলি তো! -বেহায়া ল—! লহরা-র (বেয়াদব) ল-পর্যন্ত বলে থেমে যায় শর্মিষ্ঠা।

মেঘু হাসে—থাপ্পড় বি দিলি, আউর খং (রাগ) বি উঠাইলি!

শর্মিষ্ঠা ফুঁসে ওঠে—দূর দূর, বেহায়া নিলাজ!

সখী হাসে—হাঁ, উ'র তো লাজ নাই আছে—সি খাতিরে থাপ্পড় তো খাইলো—

—তু আবার খং উঠাইছিস কেনে রে?

সখীদের ধমকে ওঠে শর্মিষ্ঠা—মেঘুর পানে তাকিয়ে থাকে আহত ফণিনীর মতো।

সুবর্ণশিরি চা-বাগানের পাতা-তোলার সর্দার রাঘবের ছেলে, মেঘনাদ। সুশ্রী, বলিষ্ঠ, পেশল, গৌরাঙ্গ যুবক। কর্মের তৎপরতা, শক্তির নির্ভীকতা, আশঙ্কার নির্বিকারত্ব ভরা মুখ—চোখে তার সহজাত দুষ্টুমি-ভরা। বাধাবন্ধহীন চালচলন। চোখ দুটো তার কোথাও স্থির রাখতে পারে না—একবার মাটিতে একবার শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর, তার সমস্ত দেহের ওপর ঘুরে বেড়ায়। মেঘনাদের অজ্ঞাতে ডান হাতটা গাল বেয়ে উঠে যায় নিজের মাথাটাকে সান্ত্বনা দিতে।

শর্মিষ্ঠার স্থির প্রখর দৃষ্টির ওপর আবার মেঘনাদের চোখ পড়ে, তার মুখ ফোটে—ঈ' রকম ভালি (তাকিয়ে) আছিস কেনে রে শুর্মি?

নিজের নামটা অপরের মুখে বহুভাবে বিকৃত হয়ে রোজই শর্মিষ্ঠার কানে আসে। আশৈশব মেঘনাদের মুখেও সে তেমন শুনে আসছে। কখনো কিছু মনে হয়নি। কিন্তু সেদিন মেঘনাদের সব কিছুই তার অসহ্য লাগে। এক অজানা পরিস্থিতির আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তার মন। তাই মেঘনাদের আচরণ, অমন দরদ-ঢালা কথা, তার নামের বিকৃতি সবই বেখাপ্পা লাগে। সে উত্তেজিত হয়, জ্বলে ওঠে।

—তু'র পানে ভালি থাকতে মোর দায় কাঁদিছে। বলে, শর্মিষ্ঠা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিজের পিঠ দিয়ে আড়াল করে দেহটাকে, মেঘনাদের দুষ্ট দৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

ধাক্কা লেগে মুখর মূক হয়—আবার মূক মুখর হয়ে ওঠে। মেঘনাদ স্থান-কাল বিবেচনা করে দেখল না। একান্ত নিভৃতের কথাটা নিতান্ত নির্বোধের মতো অকস্মাৎ রাস্তার কোলাহলের মধ্যে ফেলে দিতে যায়। বলে,—হমার কলব-লগা (কলার মতো) বহুত্ বাত্ আছিল্ রে, তু না দেখলে হামি কাঁহ কি রকম?

কথাটা তেমন কিছু নতুন নয়। এমন সে অনেক বলেছে—শর্মিষ্ঠাও শুনেছে। কান দিয়ে না হলেও চোখ দিয়ে শুনেছে, না হলেও মন দিয়ে শুনেছে। কিন্তু আজ মেঘনাদের কথা বলার ভাবভঙ্গির যতখানি পরিবর্তন হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী পরিবর্তন হয়েছে শর্মিষ্ঠার। বেচারা জানে না—যে মন একদিন মেঘনাদের জন উদ্গ্রীব হয়ে থাকত, সে মন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অভিমান-অপমানের চাপে ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় শিলার মতো জমাট বেঁধে গেছে।

শর্মিষ্ঠা তাচ্ছিল্য করে—মেঘনাদের কথায় তার কোন দরকার নেই।

মেঘনাদ তার মাঝে খুঁজে পায় শর্মিষ্ঠার আবদ্ধ অভিমান।

কৌতূহলি মেয়েরা এগিয়ে যায়, হাসে। বালা-বান্ধবীদের ঐ হাসিই মেঘনাদের ভরসা। যে কথা সে বলতে চায় তার জন্য মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারে না। বলে—বহুত্ দিনর বাত্ হামার মুকর ভিতর জাপি পুর্যারি আছে রে।

সখীদের মনে জেগে ওঠে কৌতুক। শর্মিষ্ঠা প্রমাদ গণে। সে ধমক দেয়—চুপ থাকিবি! লাজ নাই আছে?

—লাজ!

বাল্যের সাথী—তাদের সামনে লজ্জা করবার কি আছে? লজ্জার বাঁধ ভেঙে দিয়ে মেঘু বলে—এত্না দিন তো চুপ কইরে ছিলাম রে। এতোদিন তু'কে দেইখে আসেছি, আউর কেত্না বাদ্ তাইবে আসেছি। দিনরে কাম কোরতে নাই পারছি, রাতি চৌপনি (ঘুম) নাই আসছে।

সখীদের হাসি ফেটে পড়ে।

রাগে দিশাহারা শর্মিষ্ঠা। মারমুখী হয়ে সে ঘাড় নাড়ে—তু'র চৌপনি নাই তো মোর কী আছে?

মেঘনাদ ভেঙে দিতে চায় তার অভিমান। বলে—তু'র কারণেই তো মোর নিদ্ নাই রে।

বিরক্তির আসনে ভালবাসার স্থান হয় না। শর্মিষ্ঠার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে রাগের আগুন। কণ্ঠে মেঘেরই নাদ—দূর হ ইমার পরা (এখান থেকে)—বেহায়া!

রাগ দিয়ে প্রেমও দগ্ধ করা যায় না। শর্মিষ্ঠার চোখের আগুন মেঘনাদের গায়ে লাগে—তা পোড়ায় না, ঠান্ডা করে। সারসের নীরস কণ্ঠে দোয়েলের গান শোনে, হারিয়ে ফেলে নিজেকে। শর্মিষ্ঠার প্রীতি-মমতার দ্বারে সে দাঁড়ায়, যেন এক শাশ্বত ভিখারী। বলে—ঈস্ রাম! ইমান খং (রাগ) করছিস কির (কেন)? চাইল (দেখ) তর কারণে (তোর জন্য) ভাবি ভাবি কি মান দুবলা হই গেছু!

কথার সঙ্গে মেঘনাদের হাত দুটো চলে যায় দক্ষিণে ও বামে অর্ধমণ্ডলাকার রেখা টেনে। হাওয়ার গায়ে যেন উৎকীর্ণ করে তোলে নিজের বিরহ-দগ্ধ অর্ধনগ্ন দেহ।

শর্মিষ্ঠা তাকায় না। মুখ ফিরিয়ে বিড়-বিড় করে—দুবলা কির (কেন)—তর মরি গেলে মোর কি আছে?

ব্যথার গভীর স্পর্শে কেঁপে ওঠে কঠোর কণ্ঠস্বর—ছিঃ ছিঃ! এমন বলে? আমাদেরও ভাইবোন আছে—ওর মা শুনলে কত কষ্ট পাবে!

বর্তীর মমতা মেঘনাদের মনে জাগিয়ে তোলে ভালবাসার ব্যথা।

শর্মিষ্ঠা মচকায় না। দোষটা ঢাকতে ওপর-চাপ দিয়ে কথা বলে। ঘরে ফিরে সেও মাকে জানাবে—তাদের সঙ্গে এসে কি দিক-দারি, কি মুশকিলেই না পড়েছে সে।

ওরাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

হেসে কাত হয় কৌতি, বলে—কবে কেমন করে মেঘুর চোখে 'সুর্মা' লেগেছিল তা'ও জানাবি।

খেঁদি ঘাড় হেলিয়ে চায় কৌতির পানে—'সুর্মা' মুছে মেঘুর চোখে কেতকীর বীজ ছড়িয়ে দে রে।

বাতাসী টিপ্পনী কাটে—আহা! বেচারার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে যাবে।

কৌতির কণ্ঠ হেসেদোলে—ভয় নাই রে, 'সুর্মার' আবাসে কেতকী ফুটবে না।

সেনী জ্ঞান দেখায়—তোরা থাম! বড় বাজে কথা! মেঘুর কথাটা শোনা হল না। —বলরে মেঘু—

শর্মিষ্ঠা চলে যেতে চায় সেখান থেকে। বাতাসী চেপে ধরে তার হাত দুটো।

সেনী হাত নাড়ে—শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর। তাকে শুনতে হবে না কিছু—তারাই শুনবে।

মেঘু হতাশ হয়। ওর কথা, ও বাঁধ না শোনে—

CENTRAL LIBRARY

গেনীর চোখদুটো বড় হয়—তুই কি বোকা হলি রে! আমরা শুনলে, ওকি মা শুনে থাকবে নাকি?

—আর ও শুনলে, আমরা কি—

কেতি মুখ ভার করে—তোর যদি কোন গোপন কথা থাকে, তবে আমরা যাই।

কেতির কথায় সায় দিয়ে সবাই এগিয়ে যেতে চায়। শর্মিষ্ঠা টেনে ধরে রাগ করে।

—না, কেন যাব? মেঘুর কথাটা শুনব, তবে যাব।

শর্মিষ্ঠা মুখ ফেরায়—তবে তোরা থাক, আমি—

আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে কেতি ধমক দেয়—এখন কে যেতে চাইছে? চুপ করে দাঁড়া।

—বল ভাই মেঘু।

—ঘরে ফিরতে আন্ধার হবে।

—শুর্মির পায়ে কাঁটা বিঁধে পারে।

—বল্-বল্, ভিজে কাপড়—চটপট বল।

কথাটা মেঘুর মনের একান্তে অনেক দিন ধরে চাপা ছিল। শর্মিষ্ঠার সামনা-সামনি হতে হঠাৎ তার সমস্ত সংযমের বাঁধ সেদিন ভেঙে যায়। তখনই তা গড়িয়ে ঢেলে দিতে চায় শর্মিষ্ঠার অন্তরে। তার রাগের স্পর্শে তা রাগিনীর মতো মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এতগুলো কৌতুক-কৌতূহলের দোলা লেগে তা অন্তর্মুখী হয়ে যায়। লজ্জা নয়তো সংকোচ বা অমনই কিছু। মেঘুর আঙুলগুলো তার মাথার চুলের গোড়ায় কি যেন একটা খুঁজে বেড়াতে থাকে। সে বলে—কি বলব সব ভুলে গেলাম।

সখীরা হেসে ওঠে—ভুলাই গেলি!

—ইমান ডাঙ্গর কথা! এতনা দুখ্ কর্লি—

—হামদের বাট আগলি ধর্লি—

—তোর কথা শোনাবার জন্য আমরা শুর্মিকে ধরে রাখলাম।

—আর তুঁ ভুইলে গেলি!

এদের সব কথার প্রতিক্রিয়া হল শর্মিষ্ঠার চোখেমুখে, সে রাগে ফুলছে।

এমন মজার কথা! ভুলতে দেবে না ওরা।

বতী শাসন করে, সবাই যেন চুপ থাকে। আবার মেঘুর কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে মনে করিয়ে দেয় তার বক্তব্য।

মেঘুর হাসিটা যেন ফ্যালফ্যালে—হাঁ, মনে পড়েছে।

—পড়েছে? সখীরা ঘিরে দাঁড়ায়।

ব্যাগ পাইপ-এর থলিটা ভরে গেছে। শর্মিষ্ঠা বেজে ওঠে—তবে আমি যাই। তোরা কর ইয়ারকি-ধামাশী, যত পারিস। মাকে বলব—

—আবার রাগ করবি তো মেঘু আবার ভুলে যাবে। শুধু শুধু দেরী হবে—চুপ থাক।

—আর রে মেঘু, দেখি আমরা যদি কিছু করতে পারি।

—সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কোনটা আগে বলব, কোন্‌টা পিছে—

—আগেরটা আগে বল।

—সিটাই তো বুঝতে নারছি।

—তুই বলে যা, আমরা বুঝে নেব।

—কিছু যদি শুর্মি—

ঝাঁউ ঝাঁউ করে ওঠে শর্মিষ্ঠা—তোর কথায় আমার কিছু হবে না। আমার নাম মুখে আনবি না, অমন গো-মুখ্খুর মুখ থেকে তা বার হবে না।

তবু মেঘু হাসে—সত্যি, জিব বেন্টে (উল্টে) যায়, তবু ওটা পারি না। অনেক চেষ্টা করি, তবুও—

—তোকে পারতে হবে না! তুই মর মর! বলে, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যেতে চায় শর্মিষ্ঠা।

বোবা হয়ে গেল মেঘনাদ। এতদিন তবে কি দেখেছে, কি ভেবেছে? ফুলে ওঠে বুকটা—রাগে নয়, দুঃখে অভিমানে। নাঃ আর কিছু বলবে না। চোখে পড়ে শর্মিষ্ঠার মুখ। যেন সেই মুখ! যে মুখের ধ্যান সে করে আসছে এতদিন। মন ফিরে আসে। তবে কার কথা শুনছে?—নাঃ! আজই শেষ করতে হবে।

খেঁদির মুখ দেখে সবাই চুপ! গোমরা মুখে শর্মিষ্ঠার পানে তাকিয়ে আছে খেঁদি। একটা কাজ পায় সে। শর্মিষ্ঠার চোখা নাকটা ভোঁতা করে দেবে—তুই লেখাপড়া-করা ছোয়ালি (মেয়ে)—আমরা পাতা তুলে খাই। তোর নামতো আমরাও বলতে পারি না, তোর বাপ-মাও পারে না। তাতেই তোর এত গরব!

—বাবা—বাবাঃ!

এক ঝঞ্ঝাটের ওপর আর এক ঝামেলা! এদেরই সঙ্গে শর্মিষ্ঠার চলাফেরা। সে মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়।

হাসির ঢেউটা ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখে গেনী, চোখদুটো করে গম্ভীর। বলে—তবে চুপ থাক। আগে মেঘুর কথাটা শুনি—পরে তোর বিচার হবে। —আয়রে মেঘু?

—কেনে ভাত খাঁতে নাই পার্‌ছিস্ রে?

—কেনে কাম কোরতে নর্‌ছিস্ রে?

—রাতি নিদ্ নাই আইছে—

যেন তুবড়ি ফাটল। শর্মিষ্ঠা ঠোঁট জোড়া ছাড়িয়ে নিল নিজের দু-পাটি দাঁতের চাপ থেকে—কেন মরতে এলি?

দে-খ! কথা ভেঙে দায় বাড়াবি না।

শর্মিষ্ঠা মুখ ফেরাল।

—বলরে মেঘু, ভিজে কাপড়—আর থাকতে পারছি না। জলদি বল।

পদে পদে বাধা। এমন করে কি এমন কথা বলা যায়? এ যেন টেনে বার করা। মেঘুর হাতটা তার মুখটাকে পালিশ করে নেয়। মিনমিন করে বলে—কথাটা কি জানিস? —কোন ধরনে কথাটা পাড়ব?

—ভাল করে বল, আমরা যাতে বুঝতে পারি। বেলিটা (সূর্য) উঠলে চা-পাতির কুঁড়ি যেমন মুকুলি ওঠে—

গেনীর কথাটা মেঘুর মনের মধ্যে সব গোছগাছ করে দেয়। সে তার রেশ টেনে বললে—মুকুলি ওঠে! ঠিক ঠিক। কে যেন একদিন মুকুলি উঠেছে! আর আমার মনেও কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলেছে।

—তাই নাকি রে? বল বল—

—হাঁ, একটা পুলি (চারা)।

দিনরাত ওদের গাছগাছড়া নিয়ে কাজ। তাই গাছের সঙ্গে জীবনের ধারা মিলিয়ে কথা বলতে ওরা জানে।

—একটা পুলি! মেঘু বলে—সেই পুলি আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে। একদিন তাতে কুঁড়ি ধরে—আজ তা ফুটে উঠেছে। সেই ফুলের গন্ধ! আমার মনটাকে পাগল করে তুলেছে।—এই কথাটা মনের মধ্যে চেপে রেখে বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম—আজ হালকা হলাম।

—হালকা হলি?

—হাঁ।

যতখানি উৎসাহ নিয়ে সবাই কান পেতে ছিল, ততখানি নিরুৎসাহ হল। মেঘুর মুখে মুখে পালা গান। ছেলেমেয়েদের কত কথা শিখিয়ে দেয় সে। সবাই ভেবেছিল তেমনই ধরনের কত কথা শুনবে। তার কিছুই হল না। ওরা বোঝে না—পালাগান আর নিজের ভালবাসার কথা বলা, দুটো এক জিনিস নয়। তবুও বেয়েচেয়ে দেখতে চায় তারা।

গেনী বলে—বাস্, এরই মধ্যে হালকা হয়ে গেলি?

মেঘু বোঝে না গেনীর কথাটা। সে যখন হালকা হয়েছে, তখন শর্মিষ্ঠাও হালকা হয়ে প্রজাপতির ডানায় বসে উড়ে আসবে। তাই বলে—হাঁ শুর্মির নামটা আমি শিখে নেব। ও যদি মরম করে শিখিয়ে দেয়—

শর্মিষ্ঠার গায়ে যেন জল-বিছুটি লাগে। সে খেঁজে ওঠে—আমার অপমান করাবার জন্য ধরে রেখেছিস তোরা। এই অসভ্যটার মুখ দেখতে চাই না, জংলীটা ফের আমার নাম—

অসভ্য! জংলী! মেঘুর চোখদুটো ঘুরে আসে সকলের মুখের ওপর দিয়ে।

জল-বিছুটির ডগাটা সখীরা ভাল করে বুলিয়ে দেয় শর্মিষ্ঠার গায়ে, বলে—কি এমন খারাপ কথা বলেছে মেঘু? নামটা শিখাই দিব কহিছে—তো এতনা রং (রাগ) উঠাই দিলি!

—আর ন্যাকামি করতে হবে না। ইতরটা জানে না আমি কার ছোয়ালি? ওর আর আমার মধ্যে কতখানি ভেদ বোঝে না?

কথাটা গোলমেলে হয়ে গেল। সখীরা ধাঁধায় পড়ল।

মেঘু বিনয় করে—জানি তোর বাপ পুরানো সর্দার—আর আমার বাপ নতুন। এই কথা?—

শর্মিষ্ঠা নিরুত্তর।

মেঘু বলে যায়—আমার বাপ এতদিন সর্দার হয়নি, আমিও বলিনি কিছু। তোর বাবা কাম-সর্দার আর আমার বাবা পাতা-তোলার। তাই যদি তুই ধরে থাকিস তো শুন—আমি কালই বড়সাহেবকে ধরে বাবাকে

স্বস্তিক
পারফিউমড
ক্যাষ্টর অয়েল
অবিন্যস্ত চুল
সুবিন্যস্ত ক'রে
সারাদিন পরিপাটি
রাখে

নরম সুবিন্যস্ত চুল, চকচকে, সুন্দর চুল—সতেজ, সুবাসিত চুল হবে, সারাদিন তা পরিপাটি রাখবে স্বস্তিক পারফিউমড ক্যাষ্টর অয়েল।

তিন সাইজে পাওয়া যায়।

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই

কলম-সর্বায় [illegible] মন। [illegible], [illegible] হবে তো?

শর্মিষ্ঠার মনের গগনে তখন বৈশাখের উষ্ণ সূর্য। যেন স্টীম-ভরা বয়লারের এগ-জস্ট-পাইপটার মুখ খুলে গেল—ফের আমার নাম করছিস! তোর ফচ্‌কেমি বেড়েছে। কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোর ফচ্‌কেমিটা ভাঙতে হবে—।

পাকার বদলে পচা ফল পড়ে বুঝি গাছ থেকে!

শর্মিষ্ঠা থমকে গেল।

পড়েও পড়ে না। সখীদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে বাকীটুকু শোনবার আগ্রহ।

অমনি শর্মিষ্ঠার মনে ভেসে ওঠে ওদের কৌতূহলের পিছনকার যত কথা—মেয়েদের মেঘনাদের কথা, তাদের ব্যবহার আচরণের কথা। মুহূর্তে জ্বলে উঠল শর্মিষ্ঠার দেহ-মন। সব সঙ্কোচ পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে গেল কালবৈশাখীর ঝড়ে। সে বললে—বাপের নাম মুখে আনবি না—কে তোর বাবা?

—কি বললি? মেঘু থতমত খেয়ে গেল, নয়তো বুঝল না কথাটা। তাই জানতে চাইল—কি বললি?

এক হাসি থেকে আর এক হাসিতে—। হাসি? ও যদি জ্বলতে পারে—তারাই বা হাসবে না কেন?

যাদের কলকণ্ঠে এতক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছিল হাস্যরসের ধারা তাদেরই চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। দাঁত দিয়ে তারা চেপে রাখতে চায় ঠোঁটের কথা।

—কে তোর বাবা? দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে শর্মিষ্ঠার চোখদুটো।

—কেন? আমার বাবার নাম, রাবণ [illegible] নাম, তুই—তোরা জানিস না? বলে, হতভম্ব মেঘনাদ তাকায় এর পানে, ওর পানে।

তার ওপর নির্মম কশাঘাত করে শর্মিষ্ঠা—ঘরে গিয়ে তোর মাকে জিজ্ঞেস করবি। তারপর ভেবে দেখিস—তুই আমার সামনে দাঁড়াবার যোগ্য কি না?

মেঘুদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শর্মিষ্ঠা—সে হনহন করে চলে গেল।

অঙ্কুশাহতের মতো আর্তনাদ করে ওঠে মেঘনাদ—কী! এত্‌না অপমান্‌!

যে শর্মিষ্ঠা তার মাকে এত সম্মান, এত ভালবাসা দিয়ে এসেছে; যে শর্মিষ্ঠার প্রতি তার মায়ের অন্তরে সন্তানতুল্য মায়া-মমতা সেই শর্মিষ্ঠার মুখে এমন কথা।

সেখানে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ কাঁপতে থাকে। তার পায়ের তলা থেকে যেন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

সেই আগুনে ইন্ধন যোগ করে শর্মিষ্ঠার [illegible]

(ক্রমশঃ)

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাংলার উনিশ শতক

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর চোখে মধুসূদন ছিলেন বাংলার মিলটন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্র বাংলার বায়রন, আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলার জনসন বা কার্লাইল। সেকালের বাঙালীরা যে স্বদেশের প্রতিভাবান ও মনস্বী লেখকদের এইসব বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য ও মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। তাই বলা যায়, বঙ্গবাণীর এইসব একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি তাঁরা যথার্থ সুবিচার করেননি, যদিও, তাঁদের রচনা থেকে যে তাঁরা আনন্দ আহরণ করেছেন, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কালীপ্রসন্ন ছিলেন সে-যুগের একজন অসাধারণ বাগ্মী, গুরুগম্ভীর ও হাস্যরসোজ্জ্বল প্রবন্ধের লেখক, কবি ও সংগীত-রচয়িতা। তিনি বাংলাদেশে 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' ও 'নিশীথ-চিন্তা'র লেখক এবং 'বান্ধব' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদক-রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত, নানা তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এই পত্রিকাখানিকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ 'বঙ্গদর্শনে'র মতো 'বান্ধব'কে কেন্দ্র করেও একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি দীনেশচরণ বসু, 'রঘুবংশ' প্রভৃতি মহাকাব্যের পদ্যানুবাদক কবি নবীনচন্দ্র দাস, ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, মনস্বী চন্দ্রশেখর কর, গঙ্গাচরণ সরকার ও তদীয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। কালীপ্রসন্নর অধিকাংশ রচনাই বান্ধবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী এই ছদ্মনামে তাঁর দুটি ধারাবাহিক রচনা 'কিশোর গৌরাঙ্গ' ও 'স্বামী না তো কি' 'বান্ধবে' আত্মপ্রকাশ করে। এ দুটি রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়নি।

বাংলাদেশের স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষের মধ্যে আমরা তিনজন কালীপ্রসন্নের সাক্ষাৎ পাই,—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখক ও মহাভারতের অনুবাদক বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হিতবাদী' সম্পাদক, স্বদেশপ্রেমিক, কবি ও সংগীত-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ ও [illegible] বিশিষ্ট [illegible], 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যে এঁদের তিনজনেরই উল্লেখযোগ্য দান আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে 'বান্ধব' নামে একখানি সর্বাঙ্গসম্পন্ন মাসিকপত্রের সম্পাদনা (১৮৭৪) ও নবীন সাহিত্যিকদের সারস্বত-সাধনায় উৎসাহদানের জন্য 'সাহিত্যসমালোচনী সভার' প্রতিষ্ঠা—কালীপ্রসন্নের এই দুটি প্রধান কীর্তি। এই সভার পরিচালক সমিতির (অধ্যক্ষ কমিটির) সভ্যদের মধ্যে বাংলার অনেক যশস্বী সাহিত্যিক ছিলেন, যথা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অর্থানুকূল্যে এই সভা স্থাপিত হয় এবং ইনি কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারতের পদ্যানুবাদের সম্পূর্ণ মুদ্রণ-ব্যয় (বারো হাজার টাকা) বহন করেন।

কালীপ্রসন্ন যে-কালে জন্মগ্রহণ করেন (৮ই শ্রাবণ, ১২৫০ বঙ্গাব্দ, ২০শে জুলাই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ), সেটা ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির ভেতর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের যুগ। তখন বিজ্ঞানবুদ্ধি ও সাহসে ইয়ং বেঙ্গলের দলের অনেকে কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার খৃষ্টধর্মের প্রবল স্রোতকে বাধা দিচ্ছেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে আশ্রয় করে শিক্ষিত বাঙালীরা পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করছেন। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে নব-নব ভাবরসে পুষ্ট করছেন, তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করছেন, আর মতভেদ সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এদিকে জিজ্ঞাসু ও যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে নবজন্ম লাভ করছেন। আবার, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছেন, আর ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছেন [illegible] ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। এই সময়ে যাঁরা প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী আদর্শ স্থাপনে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের ভেতর বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কবি হেমচন্দ্রও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের ভিত্তির ওপর নতুন যুগের ধর্মের আদর্শকে স্থাপন করেছেন। আর কালীপ্রসন্ন অসাধারণ মনীষার বলে প্রাচী ও প্রতীচীর ভেতর সেতুবন্ধনের প্রয়াস পেয়েছেন।

তরুণ বয়সে কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম পুস্তক নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাবে সম্ভবত রাজা রামমোহনের 'সহমরণ-বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদের' প্রভাব আছে। তারপর, ফরাসী দার্শনিক আগস্ট কোঁতের মতবাদ তাঁর চিন্তাধারার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। শুধু কালীপ্রসন্ন নন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনস্বী পুরুষেরাও কোঁতের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন-রচিত 'নিভৃত চিন্তার' দুটি প্রবন্ধ 'ঐহিক অমরতা' ও 'বিরাট পুরুষে' আমরা কোঁতের মতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'ঐহিক অমরতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকা-গৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।' প্রত্যক্ষবাদী কোঁতের মতে মানুষের স্মৃতিতে চিরকাল সঞ্চিত থাকাই অমরতা,—যিনি কীর্তিমান, তিনিই অমর,—এই সমষ্টিগত অমরতাই যথার্থ অমরতা। কালীপ্রসন্ন এই নিবন্ধে পরলোক সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও, শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ইতিহাস যাঁদের ভোলে না, যাঁরা মানবস্মৃতিতে নিত্য বিরাজমান, তাঁরাই অমর, 'পৃথিবী তাঁহাদের তপশ্চর্যার পদ্মাসন, শ্মশান তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সোপান-মঞ্চ'। 'বিরাট পুরুষ' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বলেছেন—ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তের ঋষি যে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষের বন্দনা করেছেন, তিনি কে? তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই Grand Etre বা Collective Humanity, তিনি সেই মানব-সমষ্টি কোঁতের মতে যিনি আমাদের বন্দনীয়। (কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'জাতির পাঁতি' কবিতায়ও কোঁতের প্রভাব লক্ষণীয়।)

জীবনের তৃতীয় পর্বে কালীপ্রসন্ন বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। পরলোক সম্পর্কে তাঁর মনে পূর্বেই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তারপর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শচীর কথোপকথন পাঠ করে তিনি বিচলিত হন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ শচীদেবীকে বলছেন—

মর্ত্যবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে।।
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ,
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম পাপ।।

'চিত্ত দিয়া শোন মাতা জীবের যে গতি।
না হরিলে কৃপায় ঘটেক দুর্গতি ।।
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব অঙ্গে হয় পূর্ব পাপের প্রকাশ'।।
ইত্যাদি

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের নিদর্শন মিলে তাঁর রচিত 'ভক্তির জয় বা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ' গ্রন্থ এবং 'বান্ধবে' প্রকাশিত 'কিশোর গৌরাঙ্গ' নামক ধারাবাহিক রচনায়। ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি কৌতূহলী হয়েছিলেন। 'মা না মহাশক্তি' গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের শক্তিতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—প্রাণিসকল উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত, স্থিতিকালে ব্যক্ত, আবার বিনাশের পরে অব্যক্ত। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমরা কেউ জানি নে, জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলাম, আবার মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাব। তাই জন্ম-মৃত্যু মানুষের চক্ষে একটা দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তথাপি মানুষ অনাদি কাল থেকে মৃত্যুর যবনিকা উত্তোলন করার চেষ্টা পেয়েছে। মৃত্যুরাজের নিকট বালক নচিকেতার যে-জিজ্ঞাসা, সেটা চিন্তাশীল মানুষমাত্রেরই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা। মৃত্যু-রহস্য জানবার জন্য কালীপ্রসন্নের মনে যখন গভীর আগ্রহ দেখা দিল, তখন তিনি পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত ব্রহ্মবিদ্যা ও প্রেত-তত্ত্ব সম্পর্কে রাশি-রাশি গ্রন্থ আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা' ও 'ছায়াদর্শনে' পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'ছায়াদর্শনে' তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বের আধুনিক ইতিবৃত্তেরও আলোচনা করেছেন। ভারতের মহাকাব্যে ও পুরাণে পরলোকতত্ত্বের যে আলোচনা আছে, তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে তারও উল্লেখ করেছেন কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে তিনি গ্রন্থ মধ্যে শুধু বিদেশী কাহিনী সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রতীচীর বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। এই সব কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর। যিনি একদিন ছিলেন পরলোক-সম্পর্কে সন্দেহবাদী, তিনি পরবর্তী জীবনে এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ইহকালে হোক বা পরকালে হোক, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। মানুষের কর্মফল অখণ্ডনীয়, তাই 'কৃত-প্রণাশ' বলে কিছু হতেই পারে না, অর্থাৎ ভোগ ভিন্ন কর্মফলের ক্ষয় হতে পারে না, নাতুরাং জীবকে কর্ম ফলপাকোটিশতৈরপি। একালের বাঙালী পাঠকের সঙ্গে 'ছায়াদর্শনের' পরিচয় না থাকলেও সেকালে যে গ্রন্থখানি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা আমরা দেখেছি।

দার্শনিক কালীপ্রসন্ন যে পরিহাস-রসিকও ছিলেন, তার পরিচয় আছে 'প্রমোদলহরী বা বিবাহরহস্য' ও 'ভ্রান্তি-বিনোদ' নামক প্রবন্ধ পুস্তকে। 'প্রমোদ-লহরীর' অন্তর্গত 'বিবাহ (ব্যাকরণ-রহস্য) ও মুখরা ভার্যা অথবা গৃহিণীরোগ' এবং 'ভ্রান্তিবিনোদের' অন্তর্গত 'পটুকারক', 'বাংগালিবধ' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ সুখপাঠ্য। দুঃখের বিষয়, যাঁরা আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁদের নিকট উপেক্ষিত।

শুধু তথাকথিত প্রৌঢ় রচনাই নয়, শিশুপাঠ্য পুস্তক-রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত 'কোকিল কাঁদে' এককালে বহু শিশুর কণ্ঠস্থ ছিল। 'পারিব না', 'বদর বদর' প্রভৃতি কবিতাগুলো নানা সংকলন-গ্রন্থেও স্থানলাভ করেছিল। 'নরন মেলরে শিশু জয় জগদীশ বলে' 'পারিব না এ-কথাটি বলিও না আর' 'পারি গেয়ে দাঁড়ী নেয়ে বেয়ে যায় তরী',—এই পংক্তিগুলো একদিন সহজেই শিশুমনকে আকর্ষণ করেছে।

কালীপ্রসন্ন যে সকল ভক্তিরসাত্মক গান রচনা করেছেন, 'সংগীত-মঞ্জরী' নামক পুস্তকে সেগুলো স্থান পেয়েছে।

কালীপ্রসন্নের 'ছায়াদর্শন' থেকে তাঁর গুরুগম্ভীর রচনার একটি নিদর্শন দিচ্ছি।

'নিখিল জগৎ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও চক্ষে এক অনন্ত-বিস্তারিত রূপ-সাগর, কাহারও চক্ষে এক অপার, অতুলনীয় প্রেম-সাগর। যিনি এই রূপ-সাগর ও প্রেম-সাগরে ওতপ্রোত জড়িত রহিয়া, জগজ্জীবন জগদীশ্বর নামে, জীবের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন,—জীবের প্রাণভরা ভক্তি ও ভালবাসার আরাধনা সতত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কি? তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, তিনি রূপ-সাগরের অনাদি ও অনন্ত প্রস্রবণ রূপনিধান ব্রহ্ম, সেইরূপ আবার তিনি প্রেম-সাগরের অনাদি অনন্ত প্রস্রবণস্বরূপ প্রেম-নিধান জগদীশ্বর'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল গভীর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলাভাষাকে সম্পন্ন করতে হলে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি করা দরকার। তিনি স্বয়ং যে-সব নতুন শব্দের প্রয়োগ করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হোলো—

Tornado — তূর্ণণ্ড (তূর্ণম্ উড্ডীয়তে, যা অতি দ্রুত উড়ে যায়।)
Agnostic — অস্তিবিমুখ বা অজ্ঞমানী, যে নিজেকে অজ্ঞ মনে করে।
Theosophist — দিব্যাত্মিক।
Seance — প্রত্যাধিবেশন।
Psychic Philosophy — অধ্যাত্মদর্শন।
Psychic Science — অধ্যাত্মবিজ্ঞান।
Thought Body — চিদাত্মিকা তনু
Crutch — পঙ্গুপ্রশ্রয়া যষ্টি।

এছাড়া 'আত্মিক স্বভাব', 'অজগর-ভ্রান্ত' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগ লক্ষণীয়। কালীপ্রসন্ন সর্বদাই বলতেন—শব্দপ্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করলে মায়ের অবমাননা করা হয়।' (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, পৃঃ ৬৪)। এই প্রসঙ্গে এ-কথা বলতেই হবে যে, একালের অনেক লেখক শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নন। কালীপ্রসন্নের ভাষা ছিল ওজস্বিনী, অথচ সে-ভাষায় স্থানে স্থানে কবিত্ব-শক্তিরও অভাব ছিল না। অবশ্য, কালীপ্রসন্নের রচনায় কোথাও কোথাও ডাক্তার জনসনের রচনার মতো শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তারও পরিচয় আছে। তথাপি, তিনি যে বাংলার নিবন্ধকারদের ভেতর একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মৃত্যুর পর (১০ই শ্রাবণ, ১৩১৭, ২৯শে জুলাই, ১৯১০) একষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে আমরা তাঁকে বিস্মৃত হতে চলেছি। তাঁর রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য, 'বঙ্গদর্শনের' মতো 'বান্ধবের' সংখ্যাগুলোও পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তিনি যে ছদ্মনামে (জ্ঞানানন্দ সরস্বতী) প্রবন্ধ লিখতেন, সে-কথাও একালে কেউ বড়ো একটা জানেন না। তাই পল্লবগ্রাহী সমালোচকেরা তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। কিন্তু যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাঁদের এ-বিষয়ে এক মহান দায়িত্ব রয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে প্রবন্ধকার, দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কালীপ্রসন্নের দান সম্পর্কে যিনি নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন, তিনি সাহিত্য-রসিক বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আমরা এই বরেণ্য মনীষীর মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আর কবির ভাষায় বলি—

'Thou hadst a voice whose sound
was like the sea,
Pure as the naked heavens,
majestic, free'.

CENTRAL LIBRARY

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী অল্পবয়সেই তার বিয়ে হয়েছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে বছর দুই বাদে খুকীটি মারা গিয়ে সোমা দত্তর রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। সাতপাকে সোনা মোড়া পনের বছরের মেয়েটির কথা ভেবে এখনও সে ভয়ে আঁৎকে ওঠে। থাকলে সে এতদিন কোথায় পৌঁছুত। কোথায় থাকত কোঁচান ধুতি, কোথায় থাকত লিন্ডসে স্ট্রীটের এয়ার-কন্ডিশন করা [illegible]। সোনা নিয়ে যত নাড়াচাড়া করেছে সোমা দত্ত তার চেয়ে বেশী মাখামাখি করেছে মেয়েদের সঙ্গে। বৌবাজারের ওপর তার রীতিমত ঘৃণা জন্মেছে। নেহাত ব্যবসার খাতিরে তাকে সেখানে যেতে হয় তা না হলে সে রাস্তার নামও সে ভুলে যেত এতদিনে। সাবেকী বাড়ীতে কখনও ভুলে পদার্পণ করে না সোমা দত্ত। লিন্ডসে স্ট্রীট জায়গা ভাল। আশপাশ খুঁজলে সব প্রয়োজনীয় জিনিসই পাওয়া যায়। গঙ্গার ধার থেকে খিদিরপুরের চক পর্যন্ত তার ব্যবসার পক্ষে স্বর্গভূমি বলা যায়। তার পাশে আছে বিরাট ময়দান, সেটাও ভাল লাগে তার। অনেক মেয়ের নাগাল পেয়েছে এই জায়গায় দোকান করে। [illegible] মেয়েও তার কাছে [illegible] পণ্য। সেজন্য গাল থেকে শুরু করে তার দোকানের বিশেষ বিশেষ খরিদ্দারের মনোরঞ্জনের জন্য সে [illegible] ব্যবহার করে। জাত ব্যবসায়ী হতে হলে মানবতা বা দুঃখবোধ থাকলে চলে না। একথা সোমা দত্ত ভালভাবে জানে। সোনা বদল মত মেয়ে বদলে বিভিন্ন কায়দা জানা আছে তার। [illegible] যার ঐশ্বর্য দেখিয়ে সান্নিধ্যসহ আলাপ করা, কারণে অকারণে সাহায্য করা তারপর কিছুটা নিস্পৃহতা এবং শেষকালে প্রলোভনের পথে গ্রাস করা, এইটাই হল সোমা দত্তর মোক্ষম টেকনিক। প্রচুর সাফল্য সে লাভ করেছে এতে। সৌখীন লোকের এ জিনিস বেশীদিন ভাল না লাগাই উচিত। তাই কিছুদিন পরে প্রিয়াকে তার দোকানের সেলস গার্ল হতে হয়। তারপর সুযোগ বুঝে খরিদ্দারের তুষ্টি বা আদি ব্যবসা স্থানে চালান করে দেওয়া তার পক্ষে শক্ত হয় না। বিভিন্ন জায়গায় তার লোক আছে। এরা তার সঙ্গে নানা উপায়ে যোগাযোগ রেখে যায়। রোজগার করতে গেলে টাকা ঢালতে হয় এটা তার অজানা নয়। সুতরাং এদিক দিয়ে তাকে কার্পণ্য করতে কেউ দেখেনি। বরং দিলদরিয়া মেজাজের জন্য তার সুনাম আছে। এটা তাকে বাধা হয়ে ওঠে হয় তা না জেনে অনেক সময় অবাঞ্ছিত বিপদ এসে পড়ে। বিপদে সোমা দত্ত কয়েকবার পড়েছে কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নি। স্থানে স্থানে দর্শনীর অঙ্কটা বেড়েছে মাত্র।

সেদিন ডাক্তার থেকে বেরিয়েই শীলার দেখা পেয়েছিল সে। সুযোগটা ছাড়ে নি। কিন্তু শীলা তাকে এভাবে লোকের সামনে যে এভাবে একটা চড় বসিয়ে দেবে এটা সোমা দত্ত স্বপ্নেও ভাবে নি। মেয়েটার স্বামী আছে, ছেলে আছে; তাছাড়া অফিসে কাজ করে এবং একলা থাকে, এ কয়েকটা তথ্য তার জানা আছে। কিন্তু বাড়ীর কাছে ফ্ল্যাটটা তার অজ্ঞাতে সে কবে ছেড়ে পালিয়েছে তা সে টের পায়নি। সেদিকে তার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। সেটা করলে তাকে এভাবে লজ্জায় পড়তে হত না। কারণ অনেকদিন আগেই তাকে করতলগত করতে পারত সে। অনেক তেজী আর বেয়াড়া চালের মেয়েদের সে পোষা তোতা পাখী বানিয়েছে। কোন্ ঠাকুরের

কিভাবে পুজো করতে হয় সেটা তার কিছুটা জানা আছে। কিন্তু এটা কি হল। তার মানসম্ভ্রম যে ধুলোতে মিশিয়ে গেল। একে ব্যবসার জায়গা তায় অপরিচিত মানুষের ভিড়। এত সাহস মেয়েটা পেল কোথা থেকে। সুগন্ধি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে নিস্তেজ স্টাফের জায়গায় ঢুকল সোমা দত্ত। কাউন্টারে অবন্তী বসে আছে তার সঙ্গে গগনচাঁদ। গগনচাঁদের বয়স কত জিজ্ঞেস করলে বলে পঁয়ত্রিশ কিন্তু তার চেহারা দেখলে মনে হয় পঁয়ষট্টি। সোমা দত্তর ডান হাত গগনচাঁদ, আস্ত পাকা ঘুঘু। শুকনো, শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল কলপ, গাল দুটো বসা, চোখের দৃষ্টি অতলস্পর্শী, সামনের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান; পরনে ধুতি এবং পাঞ্জাবী। সোমা দত্ত অপরদিকের কাউন্টারে নিজের জায়গায় বসে ডাকল গগনচাঁদকে। শশব্যস্ত হয়ে গগনচাঁদ ছুটে এল তার কাছে।

খবর কিছু পেলে? জিজ্ঞেস করল সোমা।

এখনও পাইনি।

এখনও পাইনি, ভেংচে উঠল সোমা দত্ত। অবন্তীকে আবার কি ফুসমন্তর দিচ্ছিলে?

লম্বা জিব বার করল গগনচাঁদ—কি যে বলেন বাবু, আমি আবার ওকে কি বলব? তবে আমেদাবাদের জন্যে ওর মন কেমন করছে বলছিল।

তাই নাকি? মনের কথা তাহলে তোমায় বলছে আজকাল? সে যাক, তুমি আজ সকাল থেকে কি করলে বল শুনি, একটা সিগারেট ধরাল সে।

ভোর সাড়ে চারটের সময় পাটোয়ারী বাগানে ভর্তু সাউকে এক কিলো আটা দিয়েছি।

কি বললে, ভর্তু সাউ? -

জিজ্ঞেস করলে আমার বাবার নাম কি?

তুমি কি বললে? জিজ্ঞেস করল সোমা।

বনবাসী।

যাক, আসল নামটা বলে ফেলনি, এই ঢের। হাসল সোমা।

বললে কি হত, গগনচাঁদ তাকাল ওর দিকে।

তাহলে আর গুজরাটী মেয়ে অবন্তীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে হত না। ফেরার পথে গলিতে একটা লরি তোমায় চাপা দিয়ে চলে যেত।

গগন জিব দিয়ে তার শুকনো তালুটা সরস করতে চেষ্টা করল।

তোমায় কি দিয়েছে? জিজ্ঞেস করল সোমা।

কামারের দোকান থেকে একটা লোহার সাঁড়াশি আর হাতা দিয়েছে।

সে দুটো কোথায়?

ঐ যে শোকেসের তলায় রেখেছি।

যাও এবার ও দুটো ওজন করিয়ে বৌবাজারে গলাতে দাও।

সেদুটো নিয়ে গগনচাঁদ চলে যাবার পরই সোমা দত্ত ভেতরের ঘরে ঢুকে হাত-ঘড়িতে সময়টা দেখে নিল। তারপর কাবার্ড থেকে একটা জিনের বোতল বার করল। এ সময়ে সে জিন খায়। একটু পরেই একটা নম্বর ডায়াল করে সোমা কথা বলল,

হ্যালো, স্যানিটারী ফিটিংস?

হ্যাঁ কথা বলছি।

এক কিলো আটা পেয়েছেন? জিজ্ঞেস করল সোমা।

পেয়েছি। উত্তর এল।

একটু পরে পাইপও পাবেন। ফিট করে বেসিনটা মন্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে।

দেবো।

লাইনটা কেটে গেল।

বোতল থেকে গ্লাসে জিন ঢেলে তাতে একটু লেমন স্কোয়াশ মিশিয়ে নিল সোমা। তারপর একটু একটু করে খেতে লাগল।

এদের ব্যবসার কোড নামগুলো অদ্ভুত। এমনকি কোনটার মানে কি তাও বোঝা অনেক সময় শক্ত হয়ে পড়ে। এক কিলো আটার মানে কি সেও জানে না, ভর্তু সাউও না। স্যানিটারী ফিটিংসের মালিক হয়ত বেসিনটা পাঠাবার আগের মুহূর্তে এক কিলো আটার মর্ম বুঝতে পারবে। সেটা কার পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক এটা কেউ জানে না।

এক গ্লাস জিন পানের পর সোমা দত্তর মেজাজ শরিফ আর মাথাও ঠাণ্ডা হল। একটু পরে কাচের দরজা খুলে একজন কুলি এল একটা বাক্স নিয়ে। সেটা নিয়ে অবন্তীর কাছে দাঁড়িয়ে একটা চালান বার করে দিল, এটা সই করবে সোমা দত্ত। তাই চালানটা নিয়ে সোমা দত্তর দরজায় টোকা দিল অবন্তী।

কে?

আমি অবন্তী।

কাম ইন্।

এই চালানটায় সই দিতে হবে।

কি ওটা?

একটা টাইপ মেশিন।

কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসল সোমা। গোলাবী নেশাটাও উবে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওকে পাঠিয়ে দাও, জিনিসটাকে দেখে শুনেই ভাল করে।

বাক্সটা নিয়ে ঘরে ঢুকল কুলি। সোমা দত্ত দরজাটা লক করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

সকালেই বোতল চালাচ্ছ?

কুলি সোমা দত্তর চেয়ারে বসল।

না, এই একটু, মেজাজটা বড় খারাপ লাগছে তাই।

ভাল, মেশিনটা আজই পাঠিয়ে দাও ভাগলপুরে।

কাকে দিয়ে পাঠাব?

সে তুমি জান। তবে আটশ ভরি ওজন আছে মনে রেখ। তোমার টাইপ মেশিনটা ঠিক এইভাবে এখানে রেখে ওটা অন্য কোথাও রাখ।

তাই করল সোমা। লকারে মূল্যবান টাইপরাইটারটা রেখে দিল।

ও মেয়েটা কি গুজরাটী?

হ্যাঁ, সোমা দত্ত মাথা দুলকাল। বাজেলাক না মেলে।

না, আমি সাবধানে আছি।

তাই আছ, তাহলে মেয়ের পিছু নিতে গিয়ে মার্কেটে চড় খেয়ে বেইজ্জত হতে না।

অবাক হল সোমা দত্ত। এরই মধ্যে কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছে।

মেয়েটা কে? টেবিলের ওপর দুটো পা তুলল কুলি।

ঠিক চিনি না তবে পুলিশকে ভয় করে বলে জানি।

ও তোমার দ্বারা হবে না, আমি আরও লোক দেব তোমার সঙ্গে। প্রথমে ওর পেছনে লেগে থাক তারপর হালকান করে সরিয়ে নিও অন্য জায়গায়। আমি চলি। টেবিলের ওপর থেকে ময়লা পা দুটো নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুলি।

সোমা দত্ত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কয়েক মিনিট।

হেমন্তের পীড়াপীড়িতে সীমাকে কিছু মুখে দিতে হল। খাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। মাদক দ্রব্যের প্রভাবে যেন তার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে গিয়েছে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার অরুণের ঘরে ফিরে গেল সে। আর দেরী করলে তার চলবে না। নতুন স্যুটকেসটায় তার কাপড়জামা আগেই ভর্তি করে নিয়েছিল। দুটো জিনিসই সে সঙ্গে নেবে, একটা এ্যাটাচি কেস আর স্যুটকেশ। আলমারী বন্ধ করে চাবিটা অরুণের টেবিলের ওপর রেখে দেয়ালের ঘড়িটা কাটা পিছিয়ে দিল আধঘণ্টা। হাতের চুড়ি এবং গলার হারটা খুলে সে টেবিলের ওপর চাবির সঙ্গে রাখল তারপর হাতের আংটিটা খুলতে গিয়ে মনে পড়ল অসিতবাবু তাকে এটা কোনদিন খুলতে বারণ করেছিলেন। শীর্ণ ভদ্রলোক, আর শান্ত কোমল চোখ ও হাসিটার কথা মনে পড়ল সীমার। আংটিটা আর খুলল না সে। এবার বক্সারের কথা মনে পড়ল তার। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করল নানাভাবে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল সীমা। তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে এল ভাবাবেগে। ঘরের চতুর্দিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। অনেকদিন কাটিয়েছে সীমা এই ঘরে। মন্থরতা নেমেছিল তার শরীরে আর মনে, এতদিনের আরাম আর আলস্য। এর আগে এ ধরনের ভাবালুতা তার জন্মায়নি। অবিশ্রান্ত চলনে নড়তে শ্যাওলা ধরতে পারেনি এতদিন পর্যন্ত। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাযাবরের মত সে গিয়েছে আর এসেছে মাত্র। কোন জায়গায় বা বিশেষ কোন ঘটনায় দিকে সে মন দিতে পারেনি।

সাইড টেবিলে ট্রানজিস্টার, অনেকগুলো বই, টুকিটাকি প্রসাধনের সামগ্রী ছড়ান রয়েছে এলোমেলোভাবে। বিয়ের সময় এগুলো উপহার পেয়েছে সে, এতদিন এদের সঙ্গ ভাল লেগেছে তার। তার জীবনে উপহারের স্থান ছিল না। উপহারের মূল্য কি সেটাও কোনদিন অনুভব করেনি সীমা। নিজে কেনা আর উপহারের

পার্টকাটা যে এতদিন সয়েছে। অস্বাভাবিক লাগছে, অসহ্য লাগছে এই নবলব্ধ অনুভূতি। আর দেরী করলে চলবে না। দরজার দিকে একবার তাকাল সে, মাকে সে ফিরে পাবে কি করে? বোধহয় পাবে না। এই শেষ। বাবাকে ছাড়তে হয়েছে, মাদার ইলাইজাকে ছাড়তে হয়েছে, এবার মাকেও। আরও দুজনের কথা মনে পড়ল সীমার। অজিতবাবু আর হেমন্ত। অজিত-বাবুর প্রশান্ত হাসি আর স্নেহময় ব্যবহার। হেমন্তর শ্রদ্ধা, স্নেহ, নিষ্ঠা সহজে ভুলবে না সে। হেমন্ত আর কল্যাণ ভেঙে পড়েছে। এই তার সুযোগ। সাটকেশ আর এ্যাটাচিটা নিয়ে ধীরে ধীরে নামল সীমা।

সৌমা দত্ত কিন্তু উপদেশ অনুযায়ী অন্যের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করল না। তার পৌরুষে ভীষণ আঘাত লেগেছে। একটা সামান্য মেয়ে তাকে অপমান করবে আর বাইরের লোকের সাহায্য নিয়ে তার শোধ তুলবে, অসম্ভব! যে ট্যাক্সিটায় সীমা ফিরেছিল, তার নম্বরটা জোগাড় করতে দেরী হল না সৌমোর। লোকটা লোফার গোছের। মার্কেটের আশেপাশে যে ট্যাক্সিগুলো ঘোরে ফেরে, তারা অন্য কাজও করে থাকে অনেক। এরা চটপটে, চতুর এবং নানা বিষয়ের খবরও রাখে সব থাকে। সীমার ঠিকানা জেনে একাই অরুণের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হল সে। সৌমা দত্তর চোখ তার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমাকে তার সাটকেশ আর

এ্যাটাচি সমেত সেখানে পৌঁছে গেল গেটের কাছে। দুপুরবেলা, জায়গাটা ফাঁকা। অদূরে একটা পানের দোকানে আধখানা পাল্লা বন্ধ করে পানের দোকানী নিদ্রা যাচ্ছে।

সময় আর সুযোগ দুটোই তার অনুকূলে। খুশী হল সোমা দত্ত।

তোমার স্যুটকেশটা আমায় দাও, বলল সোমা দত্ত। পেছনে তাকিয়ে তাকে দেখে অবাক হল সীমা। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। তার হতবুদ্ধি ভাবটায় আনন্দ পেল সোমা। স্যুটকেসটা সীমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সীমা। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে।

চুপ থাক, ভয় কিসের? সীমার হাতটা ধরল সোমা।

ছাড়ুন, চীৎকার করে উঠল সীমা।

পাগল, এত সহজেই কি ছাড়া যায়? সোমার মুখে ক্রূর হাসি। হাতটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করে সীমা বলল, আমাকে ছেড়ে দিন না হলে পুলিশ ডাকব আমি। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল সীমা। পানওয়ালা উঠে পড়ল তার চীৎকার শুনে।

এ বাবু, ক্যা হুয়া?

হামারা জেনানা, গোস্সাসে ভাগনে মাংতা। সীমার হাতটা সজোরে ধরে রয়েছে সোমা দত্ত।

বাঙ্গালীরা হরদম ঝুটঝামেলা করে। দুপুরে একটু ঘুমোবার তারও জো নেই। বিরক্ত হয়ে পাল্লাটা আরও একটু বন্ধ করে দিল পানওয়ালা।

এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত চল। চেঁচামেচি করলে কোন কাজই হবে না। দেখলে, পান-ওয়ালা দরজা বন্ধ করে নিদ্রা দিয়ে পড়ল। স্ত্রীকে স্বামী নিয়ে যাবে এতে কেউ বাধা দেবে না। চল—। সীমার হাতটা মুচড়ে ধরল সোমা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

ছেড়ে দিন আমায়, এবার মিনতি করল সীমা।

দেবো বৈকি, দাঁড়াও, অনেক কাজ বাকী আছে যে।

আমি যাব না, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সীমা।

বিয়ে করা বউ, বাড়ী যাবে না মানে, লোকে বলবে কি? জোরে টানল সোমা।

আমার এ্যাটাচি কেসে সাতশ হাজার টাকা আছে, এটা নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন।

কথাটা শুনে সীমার হাত থেকে এ্যাটাচি কেসটা ছিনিয়ে নিল সোমা। থ্যাঙ্ক য়ু, এটা আমার উপরি পাওনা। তোমার কোমল হাতের ছোঁয়া পাব বলেই পারি। এখন দিনের আলোতে সকলের সামনে তোমায় তুলে নিয়ে যাব আমি। স্বামী স্ত্রীকে ওভাবে নিয়ে গেলে কেউ আপত্তি করবে না বরং বাহবা দেবে। সজোরে সে সীমাকে কাছে টেনে নিল।

দূরে একটা গাড়ী আসতে দেখল সীমা। এবার ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনে। বাস দুটো রাস্তার ওপর পড়ে গেল সশব্দে। ব্রেকের তীব্র আওয়াজে শুনতে পেল সীমা।

কি ব্যাপার, অরুণ দাঁড়িয়েছে সীমার সামনে।

আমায় বাঁচান, অস্ফুট স্বরে বলে উঠল সীমা। তার হাতটা ছেড়ে দিল সোমা দত্ত সঙ্গে সঙ্গে।

আমার স্ত্রী, ঝগড়া করে চলে যেতে চাইছেন। একটা কৈফিয়ৎ দিতে চায় সোমা দত্ত।

স্যুটকেশ আর এ্যাটাচি দুটো তুলে নিল অরুণ। সীমা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। সকলে মিলে বাড়ীর ভেতর ঢুকল তারা। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে অরুণ সোমা দত্তর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সোমা দত্ত কিছুই বুঝতে পারছে না।

এবার বলুন, কি বলছিলেন!

বলছিলাম, উনি আমার স্ত্রী।

তাই নাকি, কবে বিয়ে করেছেন? অরুণের মুখে কৌতুক। এই কয়েক বছর। একটা যেন বিপদের গন্ধ পেল সোমা।

আপনার নামটা বলেননি এখনও। অরুণ গলার টাইটা ঢিলে করল।

আমার নাম সোমা দত্ত। নিজেকে সীটেড আইনের মালিক আমি।

আলাপ করে খুশী হলাম। আমার নাম অরুণকান্তি বসু। কিন্তু একটা বিপদ হয়েছে।

বিপদ! সোমা তাকাল তার দিকে।

হ্যাঁ, এই মহিলাটিকে আমিও বিয়ে করে ফেলেছি; মাত্র মাসতিনেক আগে। অরুণের মুখে হাসি, এবার বলুন কি করা যায়।

আপনি আবার কি করবেন, আমিই নালিশ করব, রাগ দেখাবার চেষ্টা করে সোমা।

ভাল কথা, তাহলে প্রথমেই পুলিশকে ফোন করাই উচিত। অরুণ ফোন করল পুলিশে।

পুলিশের সঙ্গে সোমা দত্ত চলে যাবার পর সীমা কাঠের পুতুলের মত বসে রইল অনেকক্ষণ। সোমা দত্তর হাত থেকে সে যে রেহাই পাবে এটা সে ভাবতেই পারেনি। সিনেমার ছবির মত সব ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে ঘটে গেল একটার পর একটা। কত অসহায় সে! প্রতিবাদ করার মত জোরটুকুও তার ছিল না সে সময়। তার সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে এল না কেউ। অরুণই বা এত সকালে এসে পড়ল কি করে? অরুণই তাকে সোমা দত্তর হাত থেকে রক্ষা করল। কিন্তু কি লজ্জার কথা, অরুণের কাছে সে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল। কথাটা মনে হতে সীমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

এই নাও, তোমার আলমারির চাবিটা। অরুণ এসেছে আবার ঘরের মধ্যে। চাবিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের টেবিলের ওপর। মাথা নীচু করে রইল সীমা।

টাকাটাও ঠিক করে দিয়েছি, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল অরুণ, তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র কেউ ধরতে পারবে না। আর এক পা এগিয়ে এল অরুণ, আমার কথা ছেড়ে দিলেও এই বাড়ী, এই সংসার, আমার বাবার স্নেহ, লোকজনের শ্রদ্ধা, তোমায় কি একবারও শুভবুদ্ধি জাগিয়ে দিতে পারল না? আমার টাকা চুরি করলে?

না, আমি চুরি করিনি, বলল সীমা, আমি আমার নিজের জিনিসই নিয়েছিলাম।

সাতশ হাজার টাকা কোথা থেকে পেয়েছিলে, এরই মধ্যে সেটা ভুলে গেলে? তার বদলে আমাকেও ঠিক ঐ পরিমাণ টাকা শুধু ফেরত দিতে হয় নি, ম্যানেজারকে অনেক অনুনয় করার পর সে কেসটা তুলে নিয়েছে, এটা জান তো?

আমার পুলিশেই দিন, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। অন্য দিকে মুখ ফেরাল সীমা।

তাই দিতে পারতাম। পিছু ফিরে দাঁড়াল অরুণ, যদি না আমার বা বাবার সম্মান এতে ক্ষুণ্ণ হত। এখন তুমি কি করতে চাও আমায় বল।

কোন উত্তর দিল না সীমা।

তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? সামনে ফিরে দাঁড়াল অরুণ।

হাওড়া স্টেশনে।

সোমা দত্তর সঙ্গে?

না, ও আমায় রাস্তায় ধরেছিল।

তাহলে সোমা দত্তর সঙ্গে তোমার কোন যোগসাজস নেই।

না, প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাকাল সীমা, তারপর বলল, কোন লোকেরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, একথা আগেও বলেছি আপনাকে।

তাহলে সোমা দত্ত তোমায় ঠিক সময়ে রাস্তায় পেল কি করে?

সোমা দত্তর সঙ্গে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করে এটা বোঝা উচিত ছিল আপনার; তাছাড়া আমি আপনাদের সকলকেই ঘৃণা করি।

আই সি, তাহলে হাওড়া স্টেশন থেকে কোথায় যাচ্ছিলে?

শিমুলতলায়, পিসিমার কাছে।

সেখানে কি করতে? কয়েক মাস গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনও মতলব ছিল নাকি?

সেকথা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।

হ্যাঁ, বলতে বাধ্য তুমি, গলার স্বরটা একটু চড়াল অরুণ।

জোর দেখাবার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোন ফল হবে না।

(ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কলকাতায় এই বয়কটের সাফল্যের পক্ষে সর্ববৃহৎ প্রমাণ নিশ্চয়ই হবে বৃটিশ স্বার্থের মুখ্য মুখপত্র স্টেটসম্যানের বিবরণী—যে-সংবাদপত্র সর্বদা অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যকে সামান্য ক'রে দেখাতে চেয়েছে। বয়কটের সাফল্যের মূলে ছিল স্বেচ্ছাসেবক গুণ্ডাদের শাসানি—স্টেটসম্যানের রিপোর্টে একথা তারস্বরে জানানো হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটিকে স্বীকার করতে হয়েছিল, কলকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই হরতাল। সে সাফল্য পত্রিকাটির আর্ত স্বীকারোক্তি নিষ্কাশন করেছিল—ইংরেজ সরকারের বদলে যেন কংগ্রেস সরকার কায়েম হয়ে গেছে শহরে!! অথচ, স্টেটসম্যান উল্টোদিকে উল্লাসের সঙ্গে না লিখে পারেনি—গান্ধীর দুর্গ বোম্বাইয়ে প্রিন্সকে বিরাট সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে।

১৮ নভেম্বর, ১৯২১-এ স্টেটসম্যানে দীর্ঘ সম্পাদকীয়ের সূচনার কিছু অংশ :

> "The Hartal observed in Calcutta by the order of Mr. Gandhi was a great and dramatic success. A more than Sabbath-like silence reigned in the city.. No vehicles were to be seen in the streets except a few motor-cars, most of which were driven by their owners. No horse gharry was on hire, the taxi cars were at rest. All Indian shops were closed and the New Market, owned and controlled by the Corporation of Calcutta was deserted by customers. In a large number of workshops, probably in the majority of them, the workmen were absent. According to the desire of Mr. Gandhi, the whole city seemed to be in mourning over the arrival of the Prince of Wales in India. Not only was there the semblance of general sorrow, but the closing of doors of many private houses in the Indian portions of the city indicated a wide-spread, if vague, apprehension of impending trouble against which it was useless to look for protection from the constituted Government. The timorous may well be excused, for there was little evidence of the existence of British rule.....
>
> To be perfectly frank, it must be admitted that the Indian city of Calcutta spent yesterday under the Gandhi Raj."

কলকাতায় এই বয়কট-সাফল্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল প্রচণ্ড। প্রথমতঃ ইংরেজ মহলে এই হরতালের মধ্য সংগঠন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের বিরুদ্ধে যে সমূহ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল, তার ফলে পরদিনই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করে দেওয়া হয়। (এবং কংগ্রেস পক্ষে সুভাষচন্দ্র বহুগুণ অধিক উৎসাহে ঐ বাহিনী সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন)। দ্বিতীয়তঃ এই সাফল্য কংগ্রেসের বিরাট প্রভাবের পরিচয় দিয়েছিল বলে লর্ড রীডিং কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য উদ্গ্রীব হন। গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাব সেই সুযোগকে কিভাবে নষ্ট করে দেয়, সেকথা আগে বলেছি।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন বলেই নয়, বাস্তবপক্ষে সুভাষচন্দ্রের সংগঠনী শক্তিই যে ঐ বয়কটের সাফল্যের মূলে ছিল, তা নানা সূত্রেই জানা যায়। আমি সাবিত্রীপ্রসন্নের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি। তা আগে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের বয়স মাত্র ২৪।

সাবিত্রীপ্রসন্ন লিখেছেন :

'যুবরাজের আগমন ও সম্বর্ধনা বয়কট করার আন্দোলনে অগ্রণী হলেন সুভাষচন্দ্র। এ বিষয়ে কলকাতা শহরে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাঁরা যুবরাজের এই সম্বর্ধনা-বর্জনের বিপুল আয়োজন কলকাতায় কি রকম নিখুঁতভাবে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁরাই বলবেন যে, কী অদ্ভুতকর্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক এই সুভাষচন্দ্র। ১৯২১ সালের প্রবল পরাক্রান্ত বাংলা গভর্ণমেন্ট, তার ছায়ানুগ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সর্বদা সজাগ পাহারায় নিযুক্ত। ... তখন ইংরেজ শাসনে পরিতৃপ্ত, অনুগ্রহপুষ্ট রাজভক্ত প্রজার সংখ্যাও কম ছিল না। চারিধারের [illegible] বিরুদ্ধবাদী আত্মত্যাগী ভারতীয়দের সহায়তা সত্ত্বেও স্বীয় ক্ষমতার দম্ভে বিশ্বাসী রাজসরকারকে সেদিন বোধহয় আশঙ্কাতে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তির ফলেই এই যুবরাজের সম্বর্ধনা-বর্জনের চেষ্টা জনসাধারণের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছিল।'

বাংলা হিন্দী ও ইংরাজিতে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র কী দারুণ পরিশ্রমে ছাপানো হয়েছিল সেকথা সাবিত্রীপ্রসন্নের বিবরণে পাই, সুভাষচন্দ্র কিভাবে সর্বত্র ঘুরে সংগঠন করেছিলেন, ইস্টালি এলাকার মুসলমান মহল্লায় সুভাষচন্দ্রের কি রকম যাতায়াত ছিল, সেকথাও ঐ বিবরণ থেকে জেনেছি, এবং জেনেছি বাংলার যুবকদের নিয়ে তিনি যে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তার সদস্যরা তাঁকে কী গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

বয়কট আন্দোলনের সাফল্যের পরেই ১৯২১ ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে বাংলায় প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন দেশবন্ধু এবং সেই আন্দোলন পরিচালনার ভার গিয়ে পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপরে—স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই তা লিখেছেন। ২৪ বছরের একটি তরুণের উপরে আন্দোলন সংগঠনের ভার—বিস্ময়কর বটে। এই আন্দোলনের পরিণতি দেশবন্ধুসহ সুভাষচন্দ্র প্রমুখের গ্রেপ্তারে—তার আগেই কিন্তু হাজার হাজার দেশপ্রেমিক কয়েদীতে জেল ভরে গিয়েছে। 'হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে কলিকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের জেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। স্থানসঙ্কুলানে অসমর্থ হয়ে অবশেষে খিদিরপুর ও দমদমে স্পেশাল জেলখানা তৈরী হল।

...সেদিন আমরা দেখলাম, যেদিন জলতরঙ্গের গতিবেগে গভর্ণমেণ্ট চঞ্চল, বিব্রত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। গভর্ণমেন্টের যে যুদ্ধ-আহ্বান দেশবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে পরাজয় হল গভর্ণমেন্টের, সার্থক হল সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সংগঠন ব্যবস্থা।' (সাবিত্রীপ্রসন্ন)

(৬) জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় সেবাকাজে কর্তৃত্ব করেছিলেন এবং সে নেতৃত্ব ঐতিহাসিক হয়ে আছে। এ বিষয়ে অধিক তথ্য

তখনকার দিনে সংবাদপত্রে পাতাজোড়া শিরোনামা বেশী বেরুত না। ২৬ অকটোবর, ১৯২৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সংবাদ দেখিয়ে দিচ্ছে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের কী বিরাট গুরুত্ব ছিল জনসমাজে।

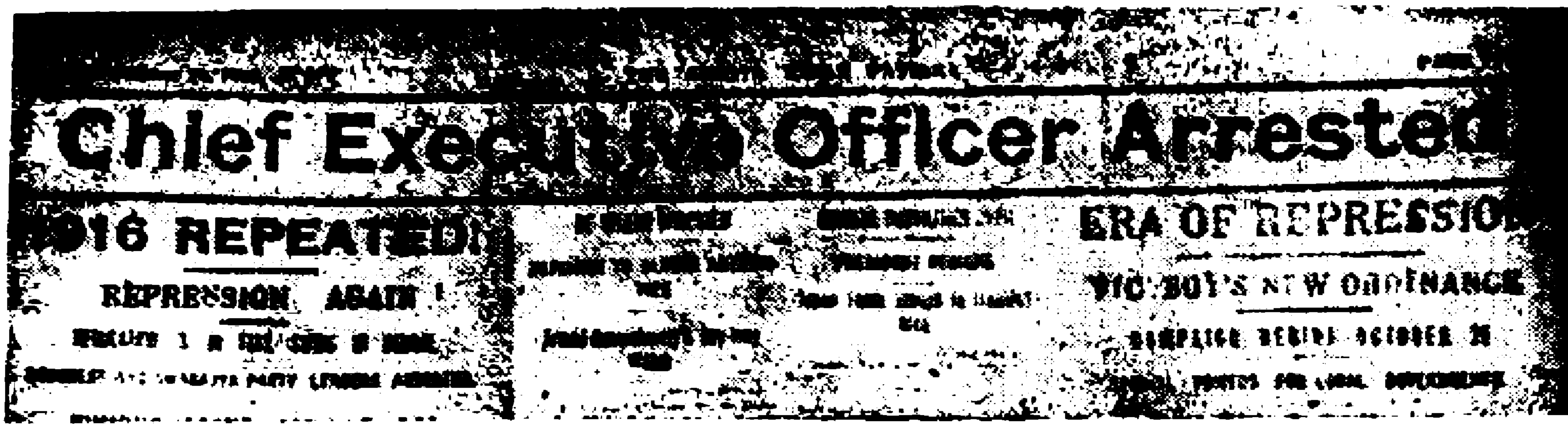
Chief Executive Officer Arrested
1916 REPEATED!
REPRESSION AGAIN!
ERA OF REPRESSION
VICEROY'S NEW ORDINANCE

সমাবেশের প্রয়োজন নেই, শুধু বললেই যথেষ্ট হবে, দেশবন্ধুর অন্যতম প্রধান অনুচর মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এতবড় সেবাকাজ চালাচ্ছেন—এটা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মর্যাদাভাণ্ডারে জমা পড়েছিল, এবং জনগণের বাস্তব দুঃখকষ্টের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট নয়—এই অভিযোগ কিছুটা দূর করতে পেরেছিল। এই সেবাকাজের প্রশংসা করেছিলেন বাংলার তৎকালীন গভর্ণর পর্যন্ত। প্রমাণ হয়েছিল অসহযোগীরা শুধু ভাঙতেই চান না—গঠন করতেও প্রস্তুত এবং পটু।

(চ) গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-পরিকল্পনার পরাজয়ের পরে তিনি কংগ্রেসকে অধিকার করার লড়াইয়ে নেমে পড়েছিলেন,—সে লড়াইয়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি—একথা রাজনৈতিক লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। অন্য সূত্র থেকেও একই কথা জানা যায়। স্বরাজ্য দলের আভ্যন্তরীন সংগঠনে এবং ঐ দলের সাক্ষাৎ কার্য নির্বাচন পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের নিশ্ছিদ্র পরিশ্রমের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করা সম্ভব নয়, এখানে সে চেষ্টার প্রয়োজনও নেই। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, দেশবন্ধুর সমস্ত রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ যে-ব্যাপারে সাফল্যের উপরে নির্ভর করছিল, সেই কাজে তিনি একটি 'বলিপ্রদত্ত' তরুণ প্রতিভাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন—এর থেকে বড় শান্তি তিনি আর কিছুতে পাননি।

(ছ) গয়া কংগ্রেসে গান্ধীপন্থীদের হাতে পরাভবের পরে দেশবন্ধুর অবস্থাকে শুধু একবাক্যে প্রকাশ করতে পেরেছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা : 'লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই ; অতি ছোট যাহারা তাহারা গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না—দেশবন্ধুর সে কী অবস্থা!' এই সূত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : 'সেদিনকার কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্য এবং অর্ধসত্য বাজারে সব খবর কাগজ ভরপুর। আমাদের পক্ষে যে কথা কেহই নাই, একটিও আমাদের জাতীয় তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। ......যে-বাড়িতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম।' সেই বাড়ির 'পূর্ণ গৌরব' ফিরে এসেছিল, কিন্তু 'কি রকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে (স্বরাজ্য) ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ হল, নিজেদের খবর কাগজ প্রকাশিত হল, এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হল, তা বাহিরের লোক জানে না, বোধহয় কোনোদিন জানবেও না।' 'এই যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত' দেশবন্ধু, তাঁর সর্বকার্যেই সুভাষচন্দ্রকে পেয়েছিলেন—এখানে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই দলের সংবাদপত্রের ব্যাপারটিকে।

আই সি এস-ত্যাগী সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাছে তাঁর পূর্বে-উল্লিখিত 'আবেদন পত্র' সংবাদপত্রের ব্যাপারে আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। আবেদনপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য আগ্রহ মেটানোর মত এই আগ্রহ মেটানোতেও দেশবন্ধু স্নেহকাতরতা দেখালেন। না দেখিয়েও উপায় ছিল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমগ্রতঃ স্বরাজ্য দল বিরোধী।......প্রচার-সহায়তার জন্য কলকাতা থেকে 'বাংলার কথা' নামে একটি দৈনিক পত্র বার করা হল। নেতার নির্দেশে আমি রাতারাতি তার সম্পাদক হয়ে পড়লাম' —সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।

'বাংলার কথা' নয়, দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র 'ফরোয়ার্ড'ই দেশবন্ধুর ও তাঁর দলের কাগজ বলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিখ্যাত। প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যে 'ফরোয়ার্ড' ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—সুভাষচন্দ্র দাবী করেছেন। এবং 'ফরোয়ার্ডের প্রথম পর্বের ইতিহাস সুভাষচন্দ্র বসুরই ইতিহাস'—একথাও জেনেছি ফরোয়ার্ডের তৎকালীন অন্যতম রিপোর্টার, পরে বিশিষ্ট সাংবাদিক শচীন দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা থেকে।

কেবল কি ঐ স্মৃতিকথা—সকল স্মৃতিতেই একই কথা। ফরোয়ার্ড প্রেসের ম্যানেজার সাবিত্রীপ্রসন্ন তা জানিয়েছেন, জানিয়েছেন সত্যরঞ্জন বক্সী—ঐ পত্রিকার পরবর্তীকালের অতিখ্যাত সম্পাদক। সকলেই সুভাষচন্দ্রের অতিমানবিক পরিশ্রম, সাংবাদিকতার নূতন নূতন উদ্ভাবনের রীতি-প্রবর্তনের নৈপুণ্য, তীক্ষ্ণ মর্মভেদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনার সামর্থ্যের কথা বলেছেন। দেশীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড কার্যতঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ফরোয়ার্ড পত্রিকায় ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত 'হিস্টরি অব ফরোয়ার্ড' নামক প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"Subhas Chandra Bose, had been the moving spirit of Forward during its strenuous days of storm and stress".

ফরোয়ার্ড প্রকাশিত হবে, এই ঘোষণা শোনবার পরে সরকার দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ফরোয়ার্ডের ম্যানেজার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সম্পাদকীয় বিভাগের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকস্মাৎ কারারুদ্ধ করেন। 'তখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আমলাতন্ত্রের ঐ কর্মপ্রয়াসকে ব্যর্থ করার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। আমলাতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের সামনে, সুভাষচন্দ্র বসুর যেমন স্বভাব, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। অবিলম্বে তিনি ফরোয়ার্ডের সেক্রেটারী ও ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন এবং অদম্য উৎসাহে কাজ করে যেতে লাগলেন'—ফরোয়ার্ডের উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছিল।

কীভাবে সুভাষচন্দ্র কাজ করেছিলেন, সেই আকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাসে প্রবেশ করবার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু ১৯২৬ সালে ফরোয়ার্ডের একই প্রবন্ধে ৩১ বছরের সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছিল 'দেশবন্ধুর পরে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন ফরোয়ার্ডের প্রেরণাশক্তি।'

ফরোয়ার্ডের প্রথম পর্বের ইতিহাস যদি সুভাষচন্দ্র বসুর ইতিহাস হয়, তাহলে একই সঙ্গে বলতে হবে, সুভাষচন্দ্র ঐ ইতিহাস সৃষ্টিতে নিযুক্ত ছিলেন দেশ ও দেশবন্ধুর প্রয়োজন সাধনের জন্যই। জাতীয় আন্দোলনে নেমে পড়ার সময় থেকেই দেশবন্ধু জাতীয় সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, স্বরাজ্য দল গঠনের আগেই তিনি দৈনিক পত্র প্রকাশের অভিপ্রায় ঘোষ

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙালী যত বেদনা পেয়েছিল—এমন আর কোনো মানুষের মৃত্যুতে সে পায়নি। কলকাতার ইতিহাসের সর্বাধিক শোকাচ্ছন্ন শোভাযাত্রা দেশবন্ধুর মরদেহ নিয়েই হয়েছিল। স্টেটসম্যানের ১১ জুন, ১৯২৫-এর রিপোর্টে তার কিছু আভাস।

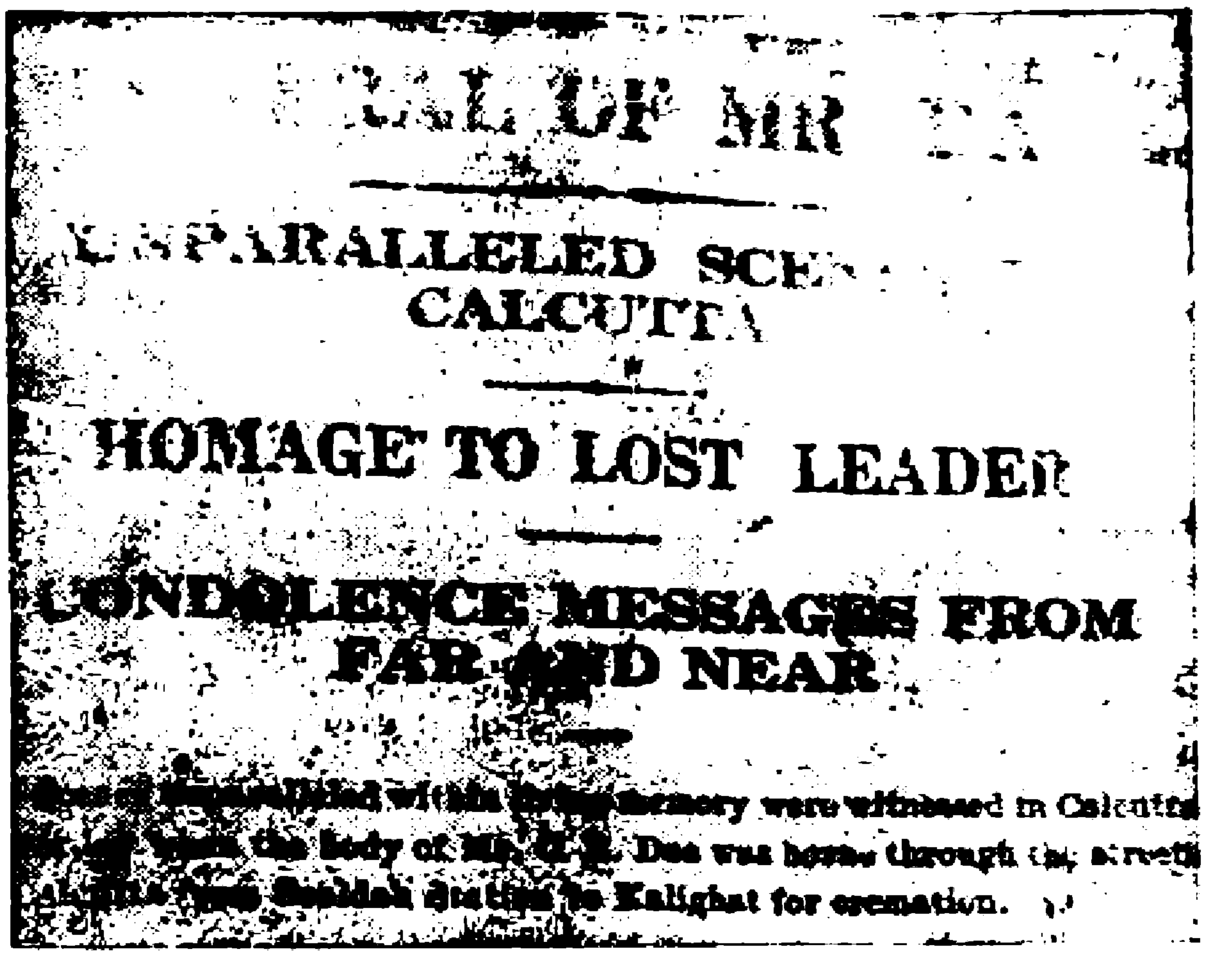

...AL OF MR ... DAS

...PARALLELED SCE... CALCUTTA

HOMAGE TO LOST LEADER

CONDOLENCE MESSAGES FROM FAR AND NEAR

...within ... memory were witnessed in Calcutta ... when the body of Mr. C. R. Das was borne through the streets ... from Sealdah Station to Kalighat for cremation.

করেছিলেন, গান্ধীবাদী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সার্ভেন্ট পত্রিকার নিত্য গালাগালি তাঁর অসহ্য ঠেকেছিল, ১৯২১-এর শেষে আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালে এই পত্রিকা-পরিকল্পনা নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, জেল থেকে বেরিয়েই 'ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড' গঠন করেছিলেন, গয়া কংগ্রেসের পরে পত্রিকা-প্রবর্তন অপরিহার্য মনে করেছিলেন, সার্ভেন্ট পত্রিকাত্যাগী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এ-ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন—কিন্তু দেশবন্ধুর সমস্ত ইচ্ছাই বিফলে পর্যবসিত হত যদি না সরকারী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র হাল ধরতেন। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে দেশবন্ধু কোন্ চোখে দেখেছিলেন, না বললেও চলে। মনে রাখতে হবে, দেশবন্ধু-নীতিকে সর্বসাধারণের গোচর করার ব্যাপারে ফরোয়ার্ড পত্রিকার ভূমিকা কোনো কিছুর থেকে কম নয়।

কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়ে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' সুভাষচন্দ্রই প্রবর্তন করেন।

(ঙ) সুভাষচন্দ্র প্রমুখের কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমে ফরোয়ার্ড পত্রিকা যখন স্বচ্ছন্দ গৌরবের জীবন লাভ করেছে, তখন দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের জন্য নতুন কাজ জোগাড় করে ফেললেন— একেবারে পরিষ্কার একটি চাকরি, এমন চাকরি যাকে ভাইসরয় লর্ড কার্জন পর্যন্ত নাকি সকল চিত্তে আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং সুভাষচন্দ্র আই সি এস ত্যাগ না করলেও তাকে অধিকাংশে পাবার আশা করতে পারতেন না—সেই তিন হাজার টাকা মাইনের চাকরির নাম—কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কলকাতা কর্পোরেশন অধিকার করলে দেশবন্ধু স্বয়ং মেয়র হন, সুভাষচন্দ্রকে দেন পূর্বোক্ত পদটি। দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত সুভাষচন্দ্র এই মোটা মাইনের চাকরি (যার অর্থ সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ) মোটেই পছন্দ করেননি, তা দেখেছি, দেশবন্ধুর কোনো কোনো সহকর্মীও তা পছন্দ করেননি, কারণ দেশবন্ধু নাকি তাঁর বা তাঁদের উক্ত চাকরির বেতন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং সবচেয়ে অপছন্দ করেছিলেন শাসক সরকার, যাঁরা কলকাতা কর্পোরেশনকে একজন সন্দেহজনক চরিত্রের ক্ষমতাশালী ভদ্রলোকের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না, বিশেষত উক্ত ভদ্রলোক প্রবীণ নন বলে জীবনে ইংরেজকে চার্জ করতে হবে।

দেশবন্ধু তাঁর 'সেরা লোকটিকে যখন কর্পোরেশনের জন্য উৎসর্গ' করেছিলেন তখন তার অর্থ—সেরা লোকটির সাহায্য থেকে তাঁর দলের সাক্ষাৎভাবে বঞ্চিত হওয়া? কথাটি সত্য। দেশবন্ধু কাউন্সিলের মধ্যে শাসনযন্ত্রের মধ্যে অসহযোগ নীতি নিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে দেখাতে চাইছিলেন—দেশের পিছনে রয়েছে তাঁর গঠনের পরিকল্পনা। কাউন্সিলে দেশবন্ধুর দলের হাত আর কর্পোরেশনে গঠনের হাত। কাউন্সিলে নেতৃত্ব করছিলেন তিনি স্বয়ং, কর্পোরেশনে বলা বাহুল্য সুভাষচন্দ্র ছাড়া কেউ যেতে পারেন না, যাঁর সামর্থ্যের উপরে ছিল দেশবন্ধুর নিঃসংশয় বিশ্বাস।

এই ঘটনার সম্পর্কে কোড়ো আবার দেশবন্ধুর নিজস্ব কিছু পরিকল্পনাও ছিল—তিনি কর্পোরেশনের গতানুগতিক কর্মপদ্ধতির অনুবৃত্তিই চাইছিলেন না, বা বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের ও সুবিধাভোগীদের প্রশ্রয় প্রস্তুত ছিল। দরিদ্রের, অনুন্নতদের জন্য কর্পোরেশন—এই ছিল দেশবন্ধুর নীতি। মেয়ররূপে প্রথম ভাষণে দেশবন্ধু মিউনিসিপাল সোশ্যালিজমের সেই নীতি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, যার কয়েকটি দফা ছিল:

"Free Primary Education, free Medical Relief for the poor, purer and cheaper food and milk supply, better supply of filtered and unfiltered water, better sanitation in bustees and congested areas. Housing of the poor, development of the suburban areas, improved transport facilities and lastly greater efficiency of administration at a cheaper cost."

সুভাষ বোস ছাড়া আর কে কর্পোরেশনের আবর্জনা পর্যন্ত নাড়াতে পারবে—এই ছিল বিশ্বাস, এবং কয়েক মাসের মধ্যে

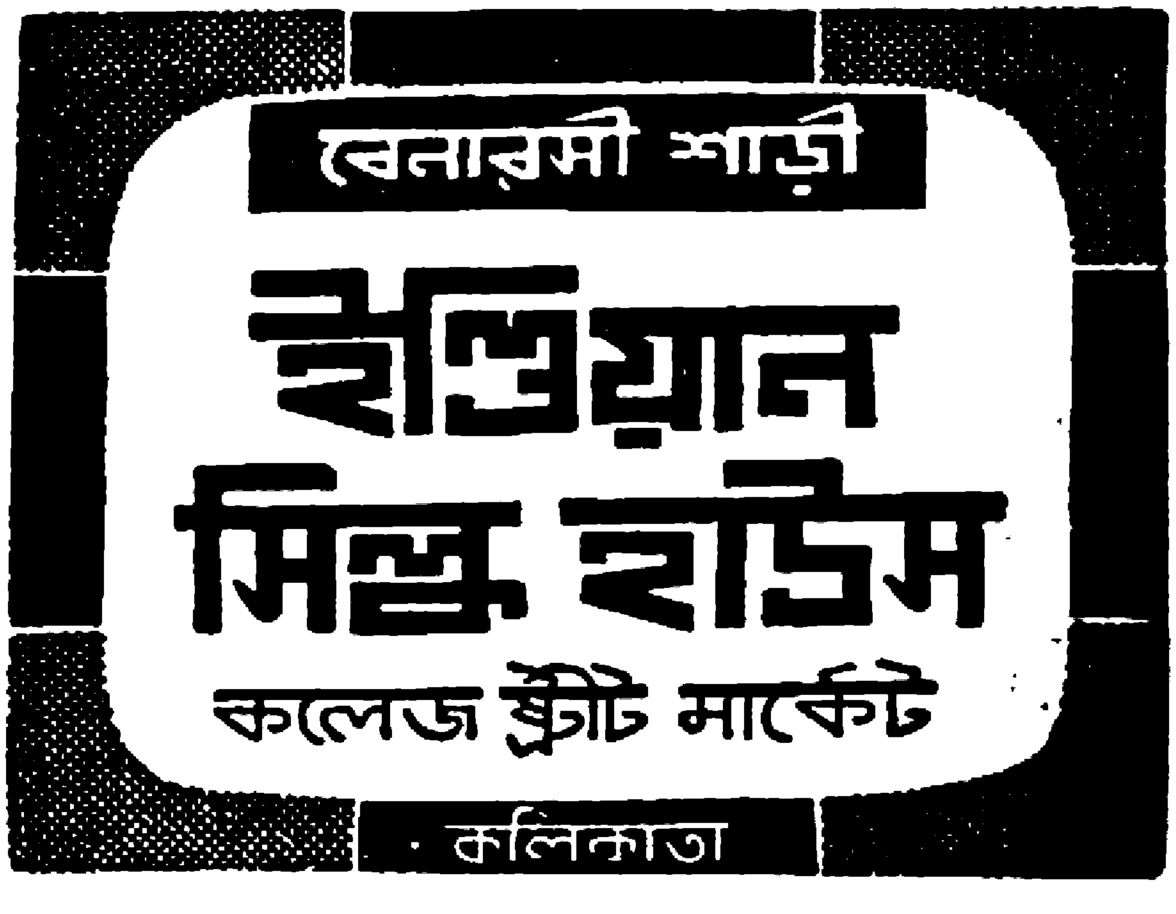

CENTRAL LIBRARY

ঐ আবর্জনা নাড়ানোর কাজ সুভাষচন্দ্র এমন সাফল্যের সঙ্গে করেছিলেন যে, তাঁর কীর্তি নিয়ে রূপকথার কাহিনী তৈরী হয়ে গিয়েছিল।'

॥৫॥

স্বরাজ্য দলের শক্তি ও মর্যাদা যখন তুঙ্গে, তখন সরকারকে একটা কিছু করতে হলই—দেশবন্ধুকে খর্ব করার জন্য—দেশবন্ধুর 'ডান হাত' সরকার কেটে নিলেন, আরো দু-একটি প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। মিথ্যা অছিলায় সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন দেশকর্মীকে। সুভাষচন্দ্র ছাড়া আরও যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁরা স্বরাজ্যদলের বড় কর্মী ছিলেন, কেউ কেউ আইনসভার সদস্যও ছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারই প্রধান উত্তেজনার কারণ হল, কারণ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সকলেই জেনে গিয়েছে—দেশবন্ধুর ঠিক পাশে দুর্ধর্ষ শক্তি নিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছেন। সুভাষচন্দ্রাদির গ্রেপ্তারে সারা দেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, সরকারের নীচতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও রাগ প্রকাশ হতে লাগল সহস্র সহস্র কণ্ঠে—সেই দারুণ উন্মাদনার মধ্যে, ঠিকভাবে বলতে গেলে, অসহায় হয়ে পড়েছিলেন একজনই—সুভাষচন্দ্রের নেতা দেশবন্ধু। সরকারী আক্রমণের হীনতা তাঁকে পীড়িত করল, এবং তার নিষ্ঠুর মর্মভেদী শক্তি তাঁকে রক্তাক্ত করে তুলল। সীমাহীন বেদনায় তিনি ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলেন। প্রতিবাদে যেসব ভাষণ দিতে লাগলেন সেগুলি বেদনার রক্তক্ষরণ ছাড়া আর কিছু নয়।*

চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ ২৯ অক্টোবর, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন কর্পোরেশনে—কর্পোরেশনের ইতিহাসে তা স্মরণীয়তম বক্তৃতা তো বটেই, ভারতীয় বাগ্মিতার ইতিহাসে তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যুক্তির সঙ্গে আবেগের তেমন সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়। সন্তোষকুমার বসু ঐ ঘটনার স্মরণে লিখেছেন, 'অগ্নি ও উত্তাপের বিপুলতা বক্তৃতাটিকে তুলে দিয়েছিল বাগ্মিতার এক অলঙ্ঘ্য শিখরে।' কলকাতার ইংরাজ বাণিজ্যস্বার্থের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি এই বক্তৃতার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'মিঃ সি আর দাশের রাজনীতির বিষয়ে যার যাই ধারণা থাক না কেন, সভার শেষে তাঁর বক্তৃতা তাঁকে অসাধারণ বাগ্মীরূপে দেখিয়ে দিয়েছিল। যুক্তি গ্রন্থন ছিল অপূর্ব, বাচনভঙ্গি অনবদ্য। সহজ যুক্তিতর্ক দিয়ে শুরু করে তিনি যখন তীব্রতম আবেগশিখরে উত্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর ভাষণ শুনে একথা মনে না হয়ে পারেনি—এখন এমন একজন মানুষের কথা আমরা শুনছি যিনি সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে স্থাপিত।' সুচীপতনিঃশব্দ কর্পোরেশনের সভায় দাঁড়িয়ে কলিকাতার মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ...তাঁর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; কণ্ঠে বজ্রমন্দ্র; দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত বার বার সজোরে সশব্দে নেমে আসছে তাঁর আসন-সম্মুখস্থ টেবিলের উপরে। চৌত্রিশ বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও দেখছি—সেদিন যেমন দেখেছিলাম—সেই শুভ্র বসন, দীর্ঘদেহ, দীপ্ত মূর্তি; আজও শুনছি যেন সেই আবেগকম্পিত ভাষণ'—অমল হোম লিখেছেন।

দেশবন্ধু কর্পোরেশনের ঐ সভায় সরকারের 'বে-আইনি আইনের' স্বরূপ খুলে ধরেছিলেন—ন্যায়ের অধিকার রক্ষার না দেবার বে-আইনের কোনো লক্ষ্য নেই, যা ধ্বংসাত্মক এবং মানবের মূলগত অধিকারের বিরোধী। এমন বে-আইনি আইন একদা ইংলণ্ডেও ছিল—স্টুয়ার্ট রাজবংশের অনাচারের দিনে। সরকার হিংসা নিবারণের জন্য এই আইন প্রবর্তন করেছেন—কিন্তু এই আইন সরকারের হিংসাকে নগ্ন ক'রে খুলে ধরেছে। সরকার দেখিয়ে দিয়েছেন, হিংসার প্রয়োগ ভিন্ন তাঁরা ভারত শাসনে সমর্থ নন। বিপ্লবীর বোমা বা পিস্তলের হিংসার চেয়ে সরকারের হিংসার পাপ অল্প নয়। এই হিংসার দ্বারা সরকার অর্জন করেছেন কতটুকু? বৈপ্লবিক আন্দোলনের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সেই স্বাধীনতা পাবার আগে যত অত্যাচারই চালানো যাক না কেন, তাকে দমন করা যাবে না। দেশবন্ধু বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বুক থেকে তোমরা একটা জাতিকে মুছে ফেলতে পারবে না; স্বাধীনতা চায় এমন জাতিকে তোমরা নোয়াতে পারবে না।' দেশবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, 'সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরকারের এ কী আচরণ? কর্পোরেশন তাঁকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করার পরে সরকার দীর্ঘ একমাস টাল-বাহানা চালিয়ে তবে অনুমোদন দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র কাজ আরম্ভ করেছিলেন। তারপর এক শুভ প্রভাতে যখন তিনি কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে কাজে বেরুচ্ছেন—দেখলেন যে, বাড়ির দরজায় পুলিশ বাহিনী। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দেওয়া হল না, তাঁর কাছে

* (১) সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে দেশবন্ধুর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু সাক্ষাৎ স্মৃতিকথা বলেছেন অপর্ণা দেবী:

'সুভাষ নিজদের ধৃত হওয়ার সংবাদে পিতৃদেবের সে উত্তেজিত অবস্থা কখনো ভুলবো না। 'সুভাষকে ধরেছে! এবার গভর্ণমেন্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।' সে দৃঢ়-সংকল্প তাঁর কথার ভঙ্গিতে এমন মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।...

"সুভাষ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত হল। সে সভায় পিতৃদেব জ্বালাময়ী ভাষায় বললেন, 'বাংলার যুবক তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক; স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এসো, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া ওঠো। এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব—তোমরা অনুসরণ করো। মা, একবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

যে-অর্ডিন্যান্স বলে সরকার সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করবার চেষ্টা হল বেঙ্গল কাউন্সিলে। দেশবন্ধু তখন নিতান্ত অসুস্থ—একেবারে শয্যাশায়ী। অপর্ণা দেবী লিখেছেন—'গিয়ে দেখলাম অত অসহ্য ব্যথার মধ্যে তাঁর এক কথা—'৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে। ডাক্তারদের বলো, আমার ব্যথা ভাল করে দিতে।'...মরফিয়া ইনজেকশন করে ব্যথার উপশম অনেকটা হল, কিন্তু জ্বরে শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। পরদিন রাত্রে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়াতে আবার মরফিয়া ইনজেকশন। তাঁর মুখে শিশুর মত এক কথা '৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে, মরি আর বাঁচি।' অসুখ ক্রমেই বেড়ে চলল। ৮ জানুয়ারী অবস্থা দেখে ডাক্তাররা প্রমাদ গুণলেন। সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণার পর ভোরের দিকে তিনি একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ।...৬ জানুয়ারী যন্ত্রণা না থাকলেও এতই দুর্বল ছিলেন যে, মা (বাসন্তী দেবী) শঙ্কিত হয়ে— আমার স্বামীকে বললেন, '৭ই যখন কাউন্সিলে যাবেন বলেছেন, তখন কিন্তু রক্ষা নাই পেলেও ও'কে নিবৃত্ত করা যাবে না।' ৭ জানুয়ারী তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। তবু সকলকে ডেকে বললেন, 'আজ আমাকে যেতে হবে। আমার শরীরের আগে কর্তব্য। এতে যদি মরেও যাই, তবু কারো বাধাই শুনবো না।...আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনা-বিচারে নির্বাসিত, আর আমি নিজের তুচ্ছ শারীরিক কষ্টের জন্য কি আমলাতন্ত্রকে দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়ে নেবার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতেও তা হতে দেব না।' উত্তেজিত হয়ে একথা বলেই অবসন্ন হয়ে পড়লেন।...কাউন্সিল থেকে জীবন্ত ফিরে আসবেন কিনা সন্দেহ হয়েছিল তখন।"

স্ট্রেচারে শায়িত দেশবন্ধুকে কাউন্সিলে দেখে 'দেশের প্রতিনিধিদের' বিবেক জাগ্রত হয়েছিল তখনকার মত—সরকারের প্রস্তাব পরাভূত হয়েছিল, যদিও বিশেষ ক্ষমতাবলে সরকার প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করে। এই ঘটনাটি আর কিছু যদি প্রমাণ করে—অনুচরদের প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসার পরিমাণ দেখিয়ে দেয়। ভালবাসার কাছে দেশবন্ধু নিজ মৃত্যুকেও গ্রাহ্য মনে করেননি।

কোনো কৈফিয়ত চাওয়া হল না, কোনো যুক্তি দেখানো হল না, কেবল জানানো হল, আমাদের আছে পশুর শারীরিক শক্তি—আমরা তোমাকে জেলে টেনে নিয়ে যাব।' দেশবন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন—এর নাম কি হিংসা নয়? সুভাষচন্দ্রের একমাত্র অপরাধ—তিনি দেশপ্রেমিক। তিনি দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করেছেন। দেশবন্ধু বললেন, 'স্বাধীনতার জন্য যদি সংগ্রাম, ও দুঃখবরণ অনিবার্য হয়—যদি প্রয়োজন হয় প্রতিটি রক্তবিন্দু দানের—আমি প্রস্তুত।... আমি আমার দেশকে ভালবাসি—আমার স্বাধীনতাকে ভালবাসি—সে অধিকার আমার চাই—চাই-ই স্বায়ত্তশাসনের জন্মগত অধিকার।'

তারপরে দেশবন্ধুর কণ্ঠে সেই কথাগুলি অনিবার্য বেগে উৎসারিত হয়েছিল—মন্ত্র বিশ্বাসের অংগীকার বাণী যা:

স্বাধীনতার দাবি যদি অপরাধ হয়—আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী। ঐ পাপের জন্য আমি ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছি।.. এইটুকু বলতে পারি, সুভাষচন্দ্র বসু আমার চেয়ে বড় বিপ্লবী নন। আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করছে না কেন? কেন—আমি জানতে চাই। দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় আমি অপরাধী। সুভাষচন্দ্র বসু যদি অপরাধী হন—আমি অপরাধী। কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কেবল নন, তার মেয়রও সমদোষে দোষী।'

কর্পোরেশনের সভায় বৃটিশ স্বার্থের অনেক প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন—সর্বশক্তিতে সেখানে দেশবন্ধু নিজেকে সংযত রেখে ভাষণ সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন—পারেননি টাউন হলের বিরাট প্রতিবাদসভায়, যেখানে তাঁর ভালবাসার দেশবাসীরাই কেবল সমবেত হয়েছিলেন। দু'চারটি কথা বলতে না বলতে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল—হা-হা স্বরে বলেছিলেন: মা মা গো, বাংলার ঘরে ঘরে আগুন জেলে দে, আগুন জেলে দে,— সব ছারখার হয়ে যাক।'

দেশবন্ধুর সেদিনকার চেহারা আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী। তারপরে দেশবন্ধুর বেদনাকে একটি বাক্যে ধরে ধরেছিলেন—

"It was the total reaction of a total man".

॥ ৬ ॥

দেশবন্ধু হার মানতে চাননি। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অতঃপর আরও সংগ্রাম চালিয়ে জয়ী হয়েছিলেন, দাশ-গান্ধী চুক্তি হয়েছিল, গান্ধীজী যার পরে বলেছিলেন, 'শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে ধরে, আমি তেমনি আঁকড়ে থাকব স্বরাজীদের।' সরকারের বিরুদ্ধে তিনি তুমুল বিক্ষোভের আয়োজন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলে দৈহিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে শেষ

কারান্তরালে সুভাষচন্দ্র—যাঁকে হারিয়ে দেশবন্ধু ভেঙে পড়েছিলেন। ২৭ বছরের তরুণ—কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক আকার—সৌম্য অথচ সুদৃঢ়। ফরোয়ার্ড পত্রিকার ১৯২৬, কংগ্রেস সংখ্যা থেকে গৃহীত।

সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। দেশের উপর বিরাট সংকট ঘনাচ্ছে, এমন একটা ধারণা তাঁর মনকে গ্রাস করেছিল। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেছিলেন—ফিরে পেতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে নিজের পাশে। ফরিদপুর সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠে যে নরম সুর শোনা গিয়েছিল, তার পিছনে তাঁর দুর্বলতা ছিল না—ছিল পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় শান্তি-কামনা। দেশবন্ধুর জীবনীকার এমন ইঙ্গিতও করতে চেয়েছেন, ফরিদপুর সম্মেলনে দেশবন্ধুর কণ্ঠে আপোষের সুরের পিছনে ছিল সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ কারাবাসের জন্য বিচলিত হৃদয়ের কাতরতা। রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে এতখানি প্রাধান্য দেবার মানুষ অবশ্যই দেশবন্ধু ছিলেন না, কিন্তু এমন কথাটা যে উঠতে পেরেছিল, তাতেই বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কতখানি হৃদয়ের মানুষ ছিলেন।

দেশবন্ধুর জীবনকথা হঠাৎ গতিহারা হয়ে গেল—১৬ জুন, ১৯২৫। গৌরবের শিখরে অবস্থিত যখন, তখনই তাঁর প্রস্থান। তাঁর মৃত্যু, সুভাষচন্দ্রের মতে, ভারতের এক-কালীন রাজনৈতিক সর্বনাশ। "১৯২৫ সালের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা একথা অনুভব না করে পারি না যে, বিধাতা যদি দেশবন্ধুকে আরও অনেক বছর বেশী আয়ু দিতেন, ভারতের ইতিহাস তাহলে সম্ভবতঃ ভিন্নগতি ধারণ করত"—সুভাষচন্দ্র লিখেছেন।

জাতীয় জীবনের কথা থাক—ব্যক্তিজীবনে সুভাষচন্দ্র কতখানি হারিয়েছিলেন? তাঁর বেদনার পরিমাপ করবে কে? কারাপ্রাচীরের মধ্যে কেবল বেদনার—আনন্দময় স্মৃতির জলদায়ক দহনের সাহচর্যে সুভাষচন্দ্রের দিন কেটেছিল অতঃপর, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মান্দালয় জেলে পাষাণের অবরোধের মধ্যে সুভাষচন্দ্র [illegible]

বাসন্তী দেবীকে লিখেছিলেন : "বাংলার যেসব তরুণ প্রাণ তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উদ্ধত পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল—যাহারা সুখে-দুঃখে আঁধারে-আলোয় তাঁহার আদেশবাণী অনুসরণ করিয়াছে, কখনো বা কারার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে—নৈরাশ্যের রজনীতে অথবা সফলতার প্রভাতে যাহারা কখনও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়ে নাই—যাহারা তাঁহার মধ্যে পিতা সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ পাইয়াছিল—আজ সেইসব তরুণ প্রাণের অবস্থা কি কথায় বর্ণনা করা যায়? ঐ চিঠিতেই সুভাষচন্দ্র আরও লিখেছিলেন, "আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।"

এমনকি ঐ চিঠিতেও নিজের ব্যক্তিগত বেদনাকে সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করতে পারেন নি, পারা সম্ভব ছিল না—কেবল শরৎচন্দ্রের লেখা একটি ছত্রে নিজের হৃদয়ের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন :

"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।"

॥ ৭ ॥

একটা শেষ প্রশ্নের মীমাংসা বাকি আছে, যার মীমাংসা কিন্তু সত্যই সম্ভব নয়, কেবল অনুমানমূলক কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু হারিয়েছিলেন—রাজনৈতিকভাবে হারিয়েছিলেন কতখানি? দেশবন্ধু আরও কিছুকাল জীবিত থেকে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে কি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে মঙ্গলকর হত?

খুবই মঙ্গলকর হত'—সুভাষচন্দ্রের আপোষবিরোধী রাজনীতিকে আপোষহীন বিরাগের সঙ্গে যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে একথা বলে থাকেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির বিরোধী নন, অথচ দেশবন্ধুর বিশেষ ভক্ত, এমন কোনো কোনো মানুষও একথা ভাবতে চান।

প্রথম ধরনের মানুষের বক্তব্যকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি, কারণ এঁদের কাছে দেশবন্ধু শেষপর্যন্ত ব্যারিস্টার-রাজনৈতিক। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের বক্তব্যে কিছু জোর অবশ্যই আছে। এঁদের মতানুসারে, সুভাষচন্দ্র যদি দেশবন্ধুর অধীনে আরও কিছুদিন থাকতে পারতেন, তাহলে দেশবন্ধু তাঁর বিপুল প্রভাবের দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন, ফলে তিনি গান্ধী-বিরোধী ভাবধারার সফল নেতৃত্ব করতে পারতেন। গান্ধী-বিরোধী নেতৃত্ব—এই কথাটা উগ্র আকারে বলবার প্রয়োজনও ঘটেত না পারত, কারণ দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে গান্ধীজীর একচ্ছত্র নেতৃত্ব হয়ত সম্ভবপর হত না। যে-সংগ্রামে গান্ধীজীকে নামাতে বামপন্থীদের অবিরত চেষ্টা এবং শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে—দেশবন্ধু থাকলে সেই প্রচেষ্টার সম্বাদের অংশ হয়ত তিনিই প্রধানাংশে গ্রহণ করে গান্ধীজীকে উপযুক্ত ক্ষণে সংগ্রামে নামাতে পারতেন, এবং পরে যখন বোঝাপড়ার সময় আসত তখন গান্ধী-ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি নিবারণ করতে পারতেন—যে-ভ্রান্তির সমারোহ বজায় ছিল ১৯৩০-এর আন্দোলনের পরেও, যখন গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে একক দায়িত্বে উপস্থিত হয়ে প্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে নষ্ট করে এসেছিলেন।

যেসব সম্ভাবনার কথা বললাম, তার উল্টোদিকেও কতকগুলি কথা আছে। দেশবন্ধুর দ্বারা রাজনৈতিক যৌবরাজ্যে আসীন হওয়ার মূল্য কি সুভাষচন্দ্রকে দিতে হত না—জহরলাল নেহরু যা দিয়েছিলেন, তাঁর সমাজতন্ত্রকে গান্ধীবাদের সঙ্গে মিশ্রিত করার দুশ্চেষ্টা করে? গান্ধী-মহারাজের যুবরাজ জহরলালের মিশ্র-নীতি ভারতবর্ষকে যে চিন্তাগত অস্পষ্টতা এবং কর্মগত শিথিলতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে—তেমন কিছু কি সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঘটত না? সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের যে-প্রকাশ ভারতবর্ষ দেখেছে, দেশবন্ধুর নিয়ন্ত্রণাধীন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তা কি বজায় থাকত—সেই সামরিকতা, আপোষহীনতা, বাঁধনছেঁড়া বৈপ্লবিক নেতৃত্ব? কিংবা যদি সুভাষচন্দ্র নিজের প্রত্যয়ে স্থির থাকতেন—কোনো বেদনাদায়ক সংঘর্ষ কি ঘটত না দেশবন্ধুর সঙ্গে? সুভাষচন্দ্র স্নেহে ধরা দিতে পারেন, কিন্তু আদর্শের গলায় স্নেহের হার পরাতে পারেন না। দেশবন্ধুকে সহসা হারানোর অন্ধকারের ভিতরেই কি সুভাষচন্দ্রের আত্ম-নির্মাণ এবং জ্যোতির্ময় উত্থান সম্ভব হয়নি?

এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে আমরা পারি না, এবং বোধহয় কেউই পারেন না। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানানো যায়—দেশবন্ধু বর্তমান থাকলে ভারতীয় রাজনীতিতে ধনতন্ত্রের যে-প্রবল প্রতাপ দেখা গিয়েছে পরবর্তীকালে, তা ঐ আকারে দেখা যেত না। শ্রেণীসংগ্রামে দেশবন্ধুর অবশ্যই বিশ্বাস ছিল না কিন্তু শ্রেণীপার্থক্য বজায় রাখারও তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সুবিচার-প্রচেষ্টাকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই মূলগত ছিল যে, একেত্রে কোনো আপোষ তিনি করতেন না। এবং তিনি যে-ধরনের বাস্তববাদী ছিলেন তাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সংগ্রামের নতুন পথ ধরতেন না—একথা কদাপি বলা যাবে না। বেঙ্গল প্যাক্টের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচারের সবচেয়ে সাহসী চেষ্টা কি তিনিই ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে করে যান নি? কলকাতা কর্পোরেশনকে গরীবের কর্পোরেশন করার ইচ্ছার মধ্যে কি একই মানুষকে পাই না? দেশবন্ধুর এই কথাগুলি কি তাঁকে অব্যর্থভাবে প্রকাশ করেনি?

"We are in the midst of a great Revolution in thought, word and deed......Revolution means complete change and we want complete change. I do not want that sort of Swaraj which will be for the middle classes alone. I want Swaraj for the masses, not for the classes. I do not care for the bourgeoise. How few are they! Swaraj must be for the masses and Swaraj must be won by the masses".

ভারতের স্বরাজ বুর্জোয়ারাই কিন্তু অর্জন করেছেন, সেইজন্য তার ফলভোগ বুর্জোয়ারাই করছেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার ১৯২৭ সালের দেশবন্ধু সংখ্যায় প্যারিস-বাসী ইব্রাহিম এক চমৎকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধুর বৈপ্লবিক অভিপ্রায় কিভাবে শান্তিবাদী গান্ধী এবং রক্ষণশীল স্বরাজীদের দ্বারা নষ্ট হয়েছিল। গান্ধীদের কথা থাক, দেশবন্ধু তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সমর্থন ও সফল করার উপযুক্ত মানুষ নিজ দলেও যথেষ্ট পাননি। যে দু'একজনকে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে সর্বসময়ে প্রগতিশীল বলে অনুভব করেছেন, এবং সেইভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। দেশবন্ধুর রাজনীতির বিচারের কালে তাই তাঁর সঙ্গে অন্য অনেকেরই মতপার্থক্য দেখা গেছে; যেমন ধরা যাক, জহরলালের দেশবন্ধু সম্পর্কিত মন্তব্য, যা তাঁর আত্মজীবনীতে পেয়েছি। সেখানে জহরলাল ভারতীয় রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের বিরাট ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো সাধুবাক্য বলে ওঠার সুযোগ করতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জন যে, স্বরাজ্য দলের প্রবর্তক, একথা জহরলালের লেখা থেকে আবিষ্কার করা দুরূহ। উল্টোদিকে দেখি, জহরলালের রচনায় স্বরাজ্য দলের ব্যাপারে তাঁর পিতা মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সমভূমিকা, যা কিন্তু সত্যই ছিল না। মোতিলালের চিন্তাশক্তি এবং ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ছিল, অন্যদেরও ভাবার কথা বলার সামর্থ্যও ছিল, কিন্তু ছিল না সেই প্রাণের স্পন্দন, যা না থাকলে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ও তিনিও

মত চিত্তরঞ্জনেরই ছিল, যিনি বুদ্ধিমত্তাতেও কারো চেয়ে পিছনে নন। স্বরাজ্যদলের প্রগতিশীল ভূমিকা সম্বন্ধেও জহরলাল নীরব, কারণ যে গান্ধীনীতির বিরুদ্ধে এই দলের উদ্ভব, সেই নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ না হলেও সেই নীতির প্রবক্তার সঙ্গে জহরলালের প্রাণের সম্পর্ক। আমরা দেখি, আত্মজীবনীতে স্বরাজ্য দলের যথাসম্ভব নিন্দা করার চেষ্টা জহরলাল করেছেন, এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁর পিতার নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল যখন সত্যই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল (যা সুভাষচন্দ্রও স্বীকার করেছেন) তখন জহরলাল স্বস্তির সঙ্গে 'সুবিচার' ঘোষণা করতে পেরেছেন।

সুভাষচন্দ্র অপরপক্ষে মানসিক বা আত্মিকভাবে কখনই নিজেকে গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্ত করেন নি, এবং সাধারণভাবে গান্ধীনীতিকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করতেন। তাই তাঁর কাছে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে স্বরাজ্যবিদ্রোহ প্রগতিশীল উত্থান ভিন্ন কিছু নয়। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার লিখছেন, "১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর প্রবল প্রভাবের দিকটা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, স্বরাজ্য দলের চমকপ্রদ অভ্যুত্থানকে কোনো হিসাবেই মাপা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই দলের নেতৃগণ ও সাধারণ কর্মীদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ছিল সত্য, কিন্তু এই দল খোলাখুলিভাবে গান্ধীবিরোধী এবং এই দল মহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা-অবসরগ্রহণে বাধ্য করবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।" সুভাষচন্দ্র অতঃপর বিস্তারিতভাবে (বিস্তারিত নির্মমতার সঙ্গে) ব্যাখ্যা করে বলেছেন, গান্ধীজীর মহাত্মাভাব, অর্থাৎ তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা, নিরামিষ আহার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে ঋষিদের জ্যোতির্বলয় দিয়েছিল। "তাঁর হাঁটুর উপরে কাপড় গুটিয়ে স্মরণ করায়, বক্তৃতার সময়ে বসার ভঙ্গি মনে করিয়ে দিত বুদ্ধকে।" গান্ধীজীর যাদু এমনই ছড়িয়েছিল যে, তিনি অবতার হয়ে পূজিত হচ্ছিলেন, এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বরাজ না আধ্যাত্মিক স্বরাজ এ প্রশ্ন পর্যন্ত বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের বিদ্রোহ সুভাষচন্দ্রের কাছে যুক্তিহীন অলৌকিকতার মোহের বিরুদ্ধে আধুনিক বিচারবুদ্ধির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে চিত্তরঞ্জন দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় অংশেরই সমর্থন পেয়েছিলেন। রাজনীতিতে মডারেটরা অনেক সময়ে আবার অলৌকিকতা-বিরোধী—তাই তাঁরা আংশিকভাবে চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন; আর বামপন্থীরা চিত্তরঞ্জনকে মহাত্মার তুলনায় বৈপ্লবিক মনে করতেন। সুভাষচন্দ্র শেষোক্ত দলের মনের মানুষ ছিলেন। দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের প্রভাব সত্ত্বেও তিনি জানতেন,

দেশবন্ধুর দেহান্তর সংবাদ—১৭ জুন, ১৯২৫-এর স্টেটসম্যান।

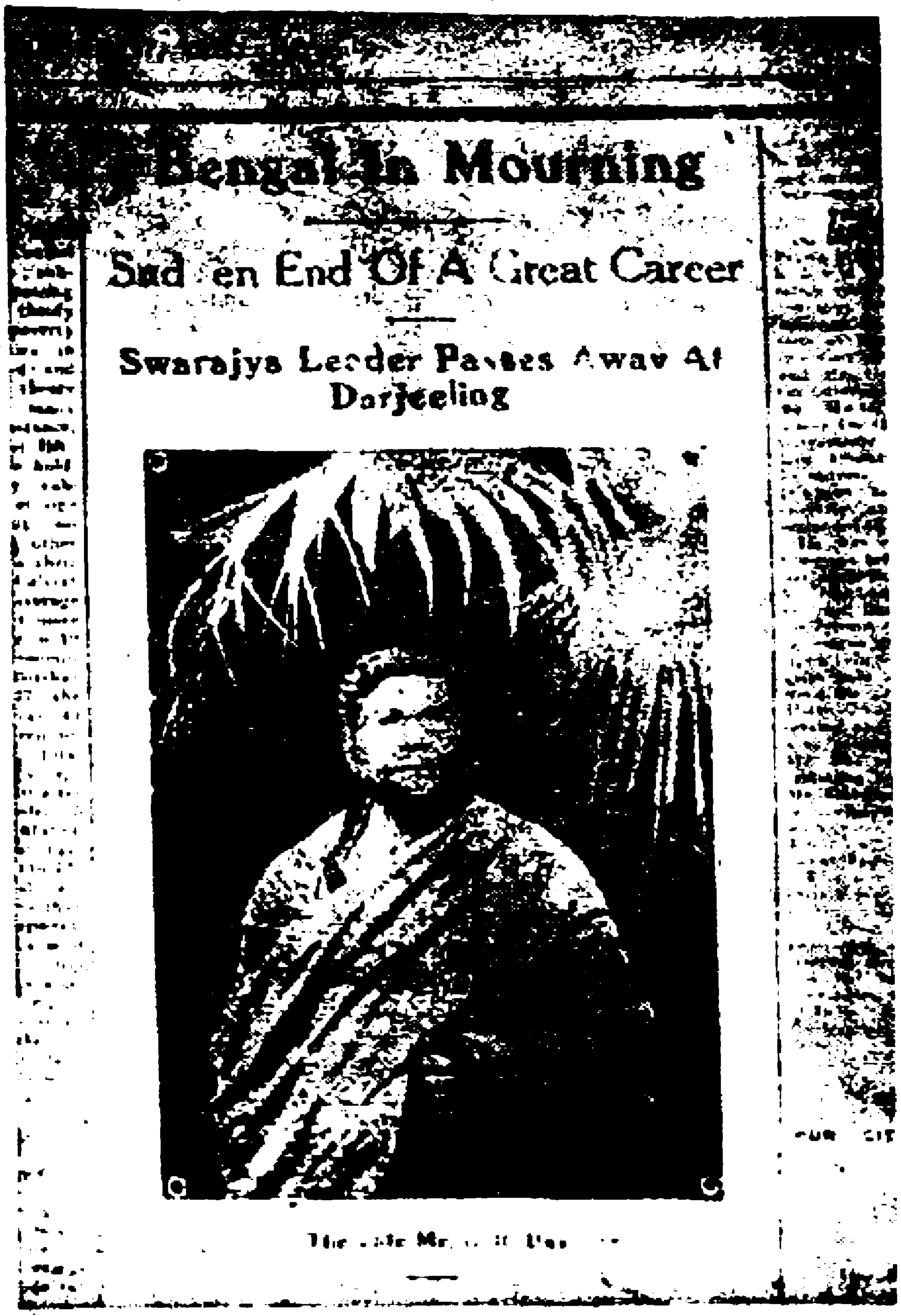

Bengal In Mourning

Sudden End Of A Great Career

Swarajya Leader Passes Away At Darjeeling

The late Mr. ... Das

দেশবন্ধু চরিত্রে বামপন্থী, এবং যখন প্রয়োজন ঘটবে তখন তিনি বামপন্থীদের দলেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সুভাষচন্দ্রের এই ধারণার মূলে ছিল—গণমানুষের প্রতি দেশবন্ধুর দায়িত্ববোধ। ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রকে সফল করবার জন্য দেশবন্ধুর মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তিনি দেখেছিলেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাও থেকে গিয়েছিল। জনজীবনের সঙ্গে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত যোগ সত্ত্বেও গান্ধী-আন্দোলন থেকে গণমুক্তি ঘটবে, এমন ধারণা তাঁর হয়নি, বরং বিপরীত আশঙ্কাই ছিল, কারণ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিপুল ঔদাসীন্যই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে জনগণের বাস্তব অধিকারই ছিল সমস্যা—এবং ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার হিসাব না নিয়ে ঐ পরিবর্তন ঘটানো যাবে—এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। একমাত্র চিত্তরঞ্জনকেই দেখেছিলেন—বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, এবং যথার্থই সর্বমানুষের অধিকারপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী। সমাজতন্ত্র বিদেশী গ্রন্থ বা স্বদেশী ভাবালুতা থেকে আসবে—এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখবেন—দেখাতে হবে তিনি জানতেন—জহরলাল নেহরুর কী বিচিত্র চেহারা।—এক হাত কার্ল মার্কসের গ্রন্থের উপরে, অন্য হাত গান্ধীজীর পায়ে।

বিদেশীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার হিসাব নেওয়ার পরে ভারতীয় পদ্ধতিকে সফল করার ভাবনাতেও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর শিষ্যই ছিলেন মনে হয়।*

* সংবাদপত্রের ছবিগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংবাদপত্র [illegible]

AIYARS M 216 BN

CENTRAL LIBRARY

অবিস্মরণ কাল

অসীম রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ছেলেমেয়েদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ম্যাজিকের মতো লাগে। কেনই বা তাঁদের দর ভর্তি করে রকমারি খাবার উঠল আবার কেনই বা সামাদের আদেশে বিস্মিত তাঁরা প্রথমে একটু ওজর-আপত্তি করে শেষে নিমরাজি হয়ে পেছনের ছোট নোংরা সিঁড়ি দিয়ে খাবারের থালাগুলো নিয়ে যাচ্ছে তার হদিস করতে পারে না তারা। চোঙা তো মরিয়া হয়ে একটা সন্দেশের বাকস তুলে নিল। কিন্তু বুড়ী সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার রেখে দেয়, শেষ পর্যন্ত একছড়া কালো আঙুর তুলে নেয় চোঙা। টুটুল দুটো প্যাসট্রি সরাল।

ইতিমধ্যে গোপীনাথ লুচি আলু ভাজছে। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে লুচি খেতে খেতে জামিদার গাঁড়ুল বড় আর ছোট বউ গল্প করতে থাকেন।

কলকাতায় গিয়ে তাঁরা 'চণ্ডীদাস' ও 'ভাগ্যচক্র' বলে দুখানা বাংলা ফিল্ম দেখেছেন। বিশেষ করে উমাশশীর যা পার্ট, বুঝলেন মাসীমা।' ছোট বউয়ের কাননবালা পছন্দ। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' বইতে পার্বতীর পার্ট—'অমন হয় না।' স্বর্ণসুন্দরী চণ্ডীদাস ছাড়া কোনটাই দেখেন নি। তবে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বুকটা যে দুরদুর করে না একেবারে তা নয়। ঘরের কোনের জানলাটা দিয়ে তিনি যে দিকটায় বসেছিলেন সেখান থেকে নীল উর্দিপরা সাহেবের চেহারা আর মাঝে মাঝে কেকের কিংবা মাংসের পরাত ভেসে ওঠে। উমাশশী যাতে কোলেশ্বরী আটকাতে পারে এজন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলা চিত্রজগতের নায়িকাদের চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

লুচি আলুভাজা চা খেয়ে বড় বৌ ছোট বউ উঠলেন। সামনের পুজোয় আসতে বললেন তাঁদের বাড়ি। বাড়ির সামনের মাঠে মস্ত মেলা বসে, চমৎকার পুতুল খেলার দল আসে, ছোট সার্কাসেরও তাঁবু পড়ে। টুটুলের গাল টিপে আদর করে ছোট বউ বললেন, 'ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসবেন কিন্তু। খুব মজা পাবে।'

স্বর্ণসুন্দরী সাহেবের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পাঠালেন বাঁধঘরের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। বুড়োই একটা ভাল সাজ পেয়েছে ভেবে সারা রাস্তা গল্প করতে করতে চলল। চোঙা সম্প্রতি যে ভার্জোবিকী জমিয়েছে এবং তিনটে সেট জার্মানীর স্ট্যাম্প পেয়েছে তার জামাইবাবুর কাছ থেকে সে সংবাদ দিতেও ছাড়ল না। খালি বুড়ী মুখ ভার করে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। তার মায়ের উদ্বেগের কারণ সঠিক বুঝতে না পারলেও কিছু অঘটন ঘটেছে এরকম ব্যাপার সে আঁচ করতে পারে। আর ঘাটেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ঘাটে একখানা গ্রীনবোট। পেছনে আর একটা নৌকো। বুড়ী লক্ষ করলে দুজন ভারী এগিয়ে এসে বড় বৌকে কি যেন বললে। সঙ্গে সঙ্গে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। বড় বৌ ফুঁসে উঠলেন বুড়ীর দিকে চেয়ে, 'কি! আমাদের এরকম অপমান! আমরা নিজেরা এলাম বাড়িতে।' ছোট বউও চীৎকার করতে থাকেন, 'অসভ্য, ইতর!' ইত্যাদি কথাগুলো কানে যেতে বুড়ীর কান ঝাঁ ঝাঁ করে। প্রায় কেঁদে ফেলে বুড়ী। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমি কি জানি! আমায় কেন বলছেন?'

বড় বউ নৌকো উঠতে উঠতে বললেন, 'তোমার মা-কে বলে দিও, আমরা অনেক হাকিম দেখেছি। কেউ আমাদের এমন অপমান করে নি।'

বুড়ীর চোখ ফেটে জল আসে। এতগুলো জিহ্বাআকর্ষক খাবার বরবাদ যাওয়ার তারও অন্তরের সায় ছিল না। প্রায় কেঁদেই ফেলে বুড়ী, 'আমাকে বকবেন না।'

চোঙা চেঁচিয়ে বলে, 'আমরা কি জানি? আমরা কি জানি?'

টিংটিং-এ মালাবাবুর বদন্যতায় বোধ সাহেবও এগিয়ে আসে। 'না, তোমাদের আমরা কিছু বলছি না,' বলে ছোট বউ নৌকোয় উঠলেন, বাটা থেকে সাজ করা পান এখনও তাঁর হাতেই ধরা আছে।

চার

নীচু কার্নিশ কাঠের জোলনা থেকে দেখা যাচ্ছিল পুরো বাড়ির নীচটাই। হঠাৎ এক সাহেব অসাড় দেখে দেখা খাওয়া বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবলে পালিয়ে যাবে জেলখানার দিকে কিন্তু এত কাছে সাহেবটা এসে গেছে যে পালানো বিফল। বাদামি রঙের স্যুট আর চকোলেট ফেল্টের টুপি পরা সাহেবটা বুড়ীর কাছে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'চলো, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল।'

স্বর্ণসুন্দরী আগেই খবর পেয়েছিলেন কিন্তু একদম না জানিয়ে নব-র সহসা আবির্ভাবে তিনি একেবারে আনন্দে হই পান না কি করবেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর চাকরাত বাড়ি গমগম। নব যে তার যৌবনের আঠারোটা বছর গৃহহীন আত্মায় ভাগ্যান্বেষে ছুটতে ফেলে দিয়ে এসেছে তাকিয়ে তাঁর স্বামীর মত দৃষ্টি দিলেন না স্বর্ণসুন্দরী। নব-র সাহেবের মতো চেহারা, তাঁর উজ্জ্বল চোখ, কোটের ভাঁজে বিলাতি সেন্টের গন্ধ, অসংখ্য বিলেতের গল্প—'আমরা কত দিন নাটোরে জন্য ভাই কাল পড়ার দিন। সেখানে চাটুজ্জের ছেলে রামু, সে বেটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিত। বেটা তেমন বাপ ছিল তো ইস্কুল মাস্টার।' ইত্যাদি নানা ধরনের গল্পগুজবে কথাবার্তায় স্বর্ণসুন্দরী মুগ্ধ। এই ফাঁকেই তিনি আবার বড় পাত্রের ব্যবস্থা করে জোয়ানের খাবারে দিয়ে ফেলে জেল ঘুম পাড়িয়েছেন ভেবে গর্বিত বোধ করেন।

যে দুদিন নব ছিল সে দুদিন ছেলেরা চানের চান করত কারণ প্রায় দু ঘণ্টা স্নানের পর্ব চলত। স্নান শেষ হবার পর অবশ্য স্নানঘরে ঢুকতে ছেলেদের খুব ভাল লাগত। বিলিতি ওডিকোলনের গন্ধে ভুরভুর করত চারদিক। তখনও বিকেলবেলায় ভাগনেকে ধুতি-পরা দেখাতে গলদঘর্ম। 'মামাবাবু, হাউ টু ইউ ম্যানেজ এ ধোতি, আই ওয়াণ্ডার।' বলে জল নব বললে। শেষে আপাতত স্থির হল। দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো ধুতি পরলে নব।

ছেলেদের একটা নতুন কাজ পড়ল। দুপুরবেলা সাহেব মামা-র পা টেপা ঘণ্টায় এক আনা। এ ব্যাপারে চোঙার উৎসাহই বেশী। দুদিনে চার আনা কামালে। টুটুলের কিন্তু পছন্দ নয় একেবারে অপরিচিত লোক

মেজে দেওয়া মানুষটার পায়ে পায়ে হাত বুলানো। অবশ্য স্বর্ণসুন্দরীর দিবানিদ্রার সময় আগে মাঝে মাঝে তাঁর পায়ে পাউডার বেশ উৎসাহের সঙ্গেই লাগিয়েছে টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ ছেলেরা কিরকম চপে জেরে, তাদের সৌজন্যবোধ আয়ত্ত করার রিহার্সাল চলে।

'এ একটা আপদ জুটল কোথা থেকে রে?' টুটুল বুড়ীকে ফিস ফিস করে বলে।

স্বর্ণসুন্দরীর এনার্জির ব্যাটারী প্রায় ডাউন মেরে গিয়েছিল। কোন ব্যাপারে উদ্দীপনা উত্তেজনায় নিজেকে ছুঁড়ে না দিলে তাঁর নিজের মধ্যে জীবনটা শুকিয়ে ওঠে। আগে জানাই ছিল, খানিকটা ছিল প্রতাপ, সকলের ওপরে ছিলেন তাঁর বাবা এই গমগমে সরগরম করা জীবনের প্রতীক। ভবনাথ তাঁর এ চাহিদা মেটাতে পারেন না। তিনি কতগুলো ব্যাপারে, বিশেষ করে নীতির ক্ষেত্রে অভ্রান্ত। যেমন তাঁর আদালতে মামলা পড়েছে বলে তিনি অসম্ভব কঠিনতা দেখালেন সেদিন কিন্তু এ কাঠিন্যের লক্ষ্য কি? ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনেদ আরও পাকা করা কিংবা নীতিজ্ঞানে নিষ্ঠার ব্যক্তিগত সন্তোষ?

নব যখন তাই পিতৃস্মরণে রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে কেঁদে ফেললে তখন স্বর্ণসুন্দরীও অভিভূত না হয়ে পারেন না। চোখ মুখ লাল করে নব বললে, 'তোমরা তো ভাব আমি হার্টলেস্। দাদাবাবুও নিশ্চয় আমাকে তাই ভাবেন। কিন্তু তোমরা তো জান না থোরাট এমাউন্ট অফ্ মিজারি আই সাফার্ড।' আবার প্রবল বিক্রমে নাক ঝাড়তে থাকে নব।

টুটুল পদ্মাকে ফিস ফিস করে বললে, 'সাহেবরা এরকমভাবে কাঁদে না রে?'

'আমাকে তোর কিছু বলতে হবে না নব। আমার কাছে তুই যেরকম ছিলি তেমনিই আছিস।' স্বর্ণসুন্দরীও কাঁদতে থাকেন।

'মধুবাবু এসেছিলেন', টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন।

'মধুবাবুর মা মারা গেছেন', বুড়ী বললে।

'ও, তোমরা তাহলে নিজেরা পড়তে বোস।'

উত্তেজনা যেমন সহজে আসে, কান্নাও তেমনি সহজে আসে স্বর্ণসুন্দরীর। ভালবাসা মানেই উত্তাপ, চেঁচামেচি কান্না, হৈচৈ, শূন্য ভালবাসার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অন্তত বড় বড় বিপদে ভরা পদ্মের মতো চোখ মেলে থাকা ভবনাথের যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ তা থেকে এ ভালবাসার জাত আলাদা। ভবনাথ কষ্ট পান কিন্তু কষ্টের প্রকাশ নেই, আনন্দিত হলে উছলে ওঠেন না কখনও। এ জন্যেই বোধহয় কোনো কোনো মহলে রাশভারি আখ্যা পেয়েছেন তিনি।

বাইরে চাতালে চেয়ার পাতা, মাথার ওপর ঘন নীল মখমলে অজস্র ঝলকানো হীরকখণ্ড। সে দিকে চেয়ে চেয়ে ভবনাথ সামনের টুর প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেন মনে মনে। স্বর্ণসুন্দরী হঠাৎ ভাইয়ের হাত ধরে বললেন, 'সবই তো হোল নব। আবার শুনছি বিলেত যাবি, আবার কেন? অতো বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি। সবই তো তোর। এবারে একটা ..'

নব কথাটা লুফে নিলে, 'কিসের জন্য এলাম বড়দি তোমার কাছে? সেই কথাটাই তো বলতে! বিয়ে ঠিকঠাক করেই এসেছি।'

উদ্বেগে গলা আটকে যায় স্বর্ণসুন্দরীর, 'মানে, আমাদের...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বড়দি। আমি কি সাহেব হয়ে গেছি নাকি? তাছাড়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি তো করলাম। ওরা অন্যরকম, আমরা অন্যরকম। মানে আমি চাই আপ-টু-ডেট মেয়ে—ঐ তোমাদের চর্চ্চাড় পড়্পাড় রাঁধলেই চলবে না। কিন্তু তার সোল-টা হবে ইণ্ডিয়ান।'

'ঠিক বলেছিস নব, ঠিক বলেছিস। ঠিক বোস বাড়ির ছেলের মতো কথা।'

'গোপীনাথ, বাঁড়ুর টিনটা চাতালে পড়ে আছে, ভেতরে নিয়ে যাও।' ভবনাথ রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বললেন।

'হাইকোর্টের জজের একমাত্র মেয়ে। বেশ আপ-টু-ডেট, ঘরোয়াও আছে।'

'দেনাপাওনার কথা কিছু?'

'তুমি বড়দি সেই রকমই আছো। ওসব যৌতুক-কৌতুক নেওয়া আজকাল উঠে গেছে। আর আমিই বা কি তাতে রাজী হব? তবে...'

'তবে কি?'

'আমি ওসব জানি না বড়দি। তবে মা বলছিলেন, বাবা নেই, বিয়ের খরচা বাবদ হাজার ছ-সাতেক টাকা ...'

'কি এমন অন্যায় বলেছেন?'

'আমি ও সবের মধ্যে নেই বড়দি।'

'তারিখ ঠিক হয়েছে?'

'সাতই অঘ্রাণ। দাদাবাবু, আপনাকে কিন্তু ছুটি নিতে হবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবেন, সেই জন্যেই তো এলাম।'

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভবনাথ এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন কালপুরুষের দিকে। কোমরে বেল্টপরা যোদ্ধা আশ্চর্য ঝকমক করছে আজ রাতে। সম্প্রতি ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেছেন বৃহস্পতি তাঁর তুঙ্গীতে। এ বছরটা বরাবর ভাল সময়। অঘ্রাণের আগে কিছু হবে না? বললেন, 'নিশ্চয় যাব নব, এতদিন পর বিয়ে করবে, যাব না?'

স্বামীর কথায় স্বর্ণসুন্দরী কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হলেন। খেলোয়াড়ি চেহারার মেদবৃদ্ধির আধিক্য এবং ঘনায়মান টাক সত্ত্বেও নব হাবেভাবে যথেষ্ট তরুণ। বললেন, 'আমাদের সময় কি আর আছে এখন? তাছাড়া, পুরুষমানুষের আবার বয়স কি?

'প্রতাপের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হয়?'

ভবনাথের প্রশ্নে নব হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। গাঢ় চকোলেটের ওপর মোটা সোনালী ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউনে দড়ির ঝুঁটি শূন্যে নাচাতে থাকে।

'কি, দেখা হয় না?'

'নাঃ!' দড়ির ঝুঁটি নাচানো আরও বেড়ে যায় নবর।

ভবনাথ বললেন, 'সে কি! একই জায়গায় থাকো!' তার গলায় চাপা উদ্বেগ।

'আচ্ছা দাদাবাবু, প্রতাপ কি রাজনীতি-টাজনীতি করত?'

'কেন? কি হয়েছে?' এমন কাতর বিস্ময়ে ভবনাথ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন যে নব প্রায় অপ্রস্তুত। 'না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু হয়নি। হি ইজ এ সেনসেবল বয়। কিন্তু হি ইজ ইন ব্যাড কম্পানি, আই মাস্ট সে।'

খুব ঘটা করে নব বললে, গম্ভীরভাবে। এতক্ষণ তাদের আলাপে ভবনাথের ঔদাসিন্যের ভাল জবাব দিতে পেরেছে ভেবে

আয়ুর্বেদের
আবিষ্কার
রসায়ন
চ্যবনপ্রাশ
আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত
চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দি কাশি,
যকৃত ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী
টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের
দৌর্বল্য ও রুক্ষতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি
সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

চাপা আনন্দে মুখটা আরও লালচে ফর্সা দেখায়।

ভবনাথ দু-তিনবার কেশে গলা সাফ করেন। কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে যান। স্বর্ণসুন্দরী বললেন, মেমসাহেবদের ফাঁদে পড়ে নি তো?'

'বড়দি যে কি বলো। ওখানকার মেয়েরা তো...কি যে বলে...তোমাদের অসূর্যম্পশ্যা নয়। মেয়েরা সব জায়গায়, কলেজে বাড়িতে, রাস্তাঘাটে। ওদের সমাজটা অনেক জীবন্ত বর্তমান।'

'ঐ যে রজনীপাম ডাটে বলে একটা কমিউনিস্ট উঠেছে আজকাল, খুব ক্রেজ হয়েছে। ওর মিটিংএ প্রতাপকে দেখা গিয়েছিল। তাছাড়া ওর কথাবার্তাগুলো একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ফ্যামিলি ফিলিংগুলো ঠিক...'

ভবনাথ গুম মেরে বসে থাকেন। বারো চোদ্দ বছর বিলেতে যৌবন উড়িয়ে যে ছোকরা পারিবারিক কর্তব্য করে এসেছে তার মুখে পরিবারপ্রীতির কথা শোভা পায় না। অনেক সময়ই হয়ে থাকে নানা কারণে নিজেদের মধ্যে অমিল। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু প্রতাপ বিলেতে গিয়ে একেবারে বিপথে চলে যাবে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পা দিয়ে মাড়িয়ে একথাটা ভেবে ভবনাথ বিচলিত হন। অন্ধকারে আবার জ্বলজ্বলে কালপুরুষের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন। তাঁর বাবার কথাটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, 'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সাবর্ডিনেট অ্যাণ্ড কেনট বি এনিবডিজ এম্বিশান।' প্রতাপ কি তাই ভাবছে? তাহলে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে ব্যারিস্টারি পড়ুক, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হোক। কিন্তু যে কথা নব বলছে সে তো আত্মহত্যার সামিল। সে পথে প্রতাপ পা বাড়াবে কেন?

পরদিনই ভেড়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন ভবনাথ।

পর দিন সকাল-বিকেল বিলেতের গল্প করে নব বিদায় নিল।

বিদায় নেবার মুখে সে একটা কাণ্ড ঘটালো যে কথা ছেলেমেয়েরা বহুদিন ভুলতে পারেনি। সকালে উঠে তারা তাদের বাবাকে চিনতে পারে না। তাঁর মুখে জাঁদরেল বাহারে গোঁফের চিহ্ন নেই। নব খুব ভোরে তার ছোট কাঁচি দিয়ে কাচ করে গোঁফ উড়িয়ে দিয়েছে।

'বাবাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে রে!' বুড়ী বললে।

'হ্যাঁ, কেমন বোকা বোকা।' চোত্তা ফোড়ন কাটে।

গরমের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারের ধুম পড়ে। এ বছর হাত আর পায়ের কাজে বুড়ী আর টুটুল কিছুটা রপ্ত হয়েছে। চোত্তার সঙ্গে পাল্লা না দিলেও জলটানা আরও সাবলীল। টুটুল আবার ডুব সাঁতারও দিচ্ছে। আর চোত্তা ছবির মতো সাঁতার কাটে। পাড়েকে আর জলে নামতে হয় না। একবার ঘাটে মলতে মলতে অথবা দাঁতন করতে করতে ঘুরে যায়।

তবে প্রথম প্রেমের মতো জলের প্রথম আকর্ষণও কমে গেছে। এখন আর ভয়ভর নেই, ভাবনা নেই, কল্পনাও নেই। এখন অনেকটা রুটিন ব্যাপার। চোত্তা পাঁচ-ছবার পারাপার করে, টুটুল বুড়ী তিনবার, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে। বুড়ী ফ্রকের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে ঘাটে বসে থাকে, কখনও কখনও জলে নিজের ছায়া দেখে। আর টুটুল ঘাট ধরে পায়ের কাজ করে, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত জল ছিটোলে বুড়ী চেঁচায়।

ছেলেমেয়েদের কিছুদিন হল মন খারাপ। পাঁড়ে দেশে যাচ্ছে ছ মাসের জন্যে। তিন-চার বছর ছুটি জমিয়েছে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেবে, চোত্তার মতো বয়স। আর হয়ত দেখা নাও হতে পারে। চোত্তা ঘাটে উঠে বললে, 'কি হয়েছে পাঁড়ে যাচ্ছে? পাঁড়ে আমাদের আত্মীয়?'

'আত্মীয়রাই সব সময় আপনার হয় না,' টুটুল গা মুছতে মুছতে বলে।

'ঠিক বলেছিস টুটুল,' বুড়ী সায় দেয়।

ক্রমে ক্রমে পাঁড়ের যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তার আগের দিন বিকেলে ঠিক হল, পাঁড়ের সঙ্গে নৌকোয় ঘুরে আসবে। ছই-তোলা ছোট্ট নৌকো পাঁড়ে ঠিক করেছে, বোধহয় বিনে পয়সায়। পাঁড়ের সঙ্গে যাবে বলে স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করলেন না।

সেদিন বোধহয় পূর্ণিমা। যখন নৌকো কাটাখালিতে পড়েছে তখন দূরে মেঠো রাস্তার ধানক্ষেতের ওপরে জেগে থাকা কালভার্টের পেছনে থালার মতো গোল হলদে চাঁদ উঠছে। ফুর ফুর করে হাওয়া দেয়। বুড়ী গান ধরলে, নিজে নিজেই, 'আমার সোনার বান্দের, তোর কিনারে বেঁধেছিলেম আমার পাতার ঘর।'

ভাটিয়ালি সুরে বুড়ী যখন গাইলে
নৌকা বেয়ে যাবে দরিয়ায় গিয়াছিলাম ভেসে
আমি সেই যে গেলাম আর না তারে
দেখতে পেলাম এসে

তখন চারদিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ায়, ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আর জলের ওপর কাঁচ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় দুই ভাই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে পাঁড়ের বিশাল কাঁধের দিকে চেয়ে। দুজনের মনেই বিদ্যুতের মতো খেলে যায় তেলে ঘামে চকচকে পাঁড়ের ডন-দেওয়া বিশাল বুকের ওঠা পড়া, খড়মের শব্দে মুখরিত তুলসীদাসের বাণী।

'ইস ভবসংসার ম্যায় ম্যায় কি মায়া,
কাঁহি ধূপ হ্যায় কাঁহি ছায়া।।

ফিরতি পথে অবশ্য এই চন্দ্রালোকিত ইন্দ্রজাল কেটে যায়। চোত্তা সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় একটা মোটর বোটের ছবি দেখেছে। স্টিমার আগে যায় না মোটর বোট আগে যায় এ নিয়ে দুভাইয়ের মধ্যে তর্ক বাধে। ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন বেশ সন্ধে।

উপহারে অনন্য
পরিকল্পনা ও রঙিন ছবিতে অপরূপ

আমার শৈশব

পরিকল্পনা : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
ছবি : শ্রীসমর দে

জন্মকাল থেকে নবজাতকের সাত বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি স্মরণীয় ঘটনার নথি ও ছবি রাখার অপূর্ব রেকর্ড বই। সারা জীবন যত্নে রাখার বই, বাঙলায় অদ্বিতীয় বই। [দাম : পনর টাকা; শোভন, পঁচিশ টাকা]

:: ছোটদের জন্য বই ::

রাঙাদির রূপকথা	[৫·০০]
খেলার সাথী	[২·৫০]
ছোটদের ছড়া-সঞ্চয়ন	[২·৫০]
যুগে যুগে ভারত শিল্প	[৭·০০]

আ র ও অ নে ক ব ই আ ছে।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

পরদিন ভোরে এক কাণ্ড। টুটুল তোতা তখনও ঘুমোচ্ছে। বাথরুম থেকে বুড়ীর আতঙ্ক-তীব্র গলা ভেসে আসে, 'মা, মা...দেখে যাও কি হয়েছে?'

স্বর্ণসুন্দরী তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতেই বুড়ীর আবার সেইরকম গলা ভেসে আসে, 'মা, আমার কি হবে? আমার টি-বি হয়েছে।'

বুড়ী সেদিন প্রথম ঋতুমতী।

পাঁচ

সে বছর অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি শুভ লগ্নে ম্যারাপ বেঁধে একদিন রোস্তে রাধা বিজিতের সঙ্গে বিয়ে হল নবেন্দু বোসের। সন্ধেটা ছেলেমেয়েদের মনে অনেক দিন পর্যন্ত গেঁথে ছিল। বিশেষ করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বড়ত্ব একদিনকা সুলতান বানাবার যে পদ্ধতি তা সবচেয়ে ভাল লাগল তাদের। লনের মাঝখানে দেবদারু পাতার মোড়া কুঞ্জ, তার গায়ে থোকা থোকা নীল বাল্ব জ্বলছে আর নিভছে। সামনেটা খোলা। সেখানে প্রায় সিংহাসনসদৃশ মেহগিনী রঙের বাহারে পুরু গদি আঁটা কেদারে জলায়মান টোপর হাত বুলোতে বুলোতে নবেন্দু বোস তাঁর দুই ভাগ্নের দিকে চেয়ে তাঁর বাঁ চোখ মারলেন। আগে থেকেই ভাগ্নেদের সঙ্গে কথা ছিল—যদি খুশি লাগে তাহলে বাঁ চোখ এবং নার্ভাস বোধ হলে ডান চোখ মারবেন।

'মামার খুব স্ফূর্তি লেগেছে রে', তোতা চাপা উত্তেজনায় বললে।

তাছাড়া উৎসাহবোধ করবার আরও কারণ ছিল। মুসলিমদের জলদাবা লণ্ঠন থেকে এই আলোর কলরব চাঁদোয়ার ঢাকা লন, পায়ের তলে টবে লাল নীল হলুদ বাল্ব, বৈদ্যুতিক আলো খচিত ঝোলোমোর ঝাড়, আর লম্বা সার দেওয়া সাদা আলোর ডোম, হাতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা সমবয়সী ছেলেদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, গাড়ি থেকে নামা মুখে পলাজ গোলা রং লাগানো জড়োয়া হীরে পরা ঝকমকে বেনারসীর পুটুলি, পোলাও আর চিংড়িমাছের মালাই কারির গন্ধ—এই সমস্ত ব্যাপারটার মানে যে বিয়ে একথা ভেবে দুজনেই আনন্দে টগবগ করে। এতদিন পর্যন্ত বিয়ের কোন প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তাদের সামনে ছিল না। এখন এই আলো চাঁদোয়া শাড়ি গয়নার ঝলক, হাস্যকৌতুক আর ফুরফুরে খাবারের গন্ধে তা এক রূপ পায়। 'মামা-র কি মজা!' টুটুল বললে।

তারপর সাহেবের মতো সাদা পাগড়িপরা বেয়ারাগুলো হাতে ট্রে নিয়ে যখন কোল্ড ড্রিঙ্ক দেবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর কাঠি দিয়ে ঘষে ঘষে সেই কনকনে ঠান্ডা সরবত খায় তখন তারা প্রায় স্বর্গে। তোতা পাত্রে থেকে সে তিনটে কাঠি হাতসাফাই করেছে। এইরকম আর এক স্বর্গ উপস্থিত খাওয়ার শেষে আইসক্রিম সন্দেশে। এরকম জিনিষ তারা জীবনে খায় নি। টুটুল-কে চাপা গলায় তোতা ধমকায়। 'ওরকম ইস্ ইস্ করিস নে। লোকে ভাববে পেটো। কোনদিন কিছু খায় নি।'

অনেক রাতে তারা ফিরল। বোধহয় শেষ ব্যাচ তখন বসেছে। গরদের পাঞ্জাবি-পরা টকটকে ফর্সা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক তখনও চেঁচাচ্ছেন, 'পোলোয়া, পোলোয়া।'

পানের পিকে টুটুলের পাঞ্জাবি রাঙিত। টুটুল-টা একেবারে গেঁয়ো।' টিটকিরিতে উঠতে উঠতে তোতা বললে।

পরের দুদিনও স্বপ্নের মতো কাটল। তবে সাজগোজ যথেষ্ট হলেও ঠিক হাই-কোর্টের জজবাড়ির মতো হয়নি অজয় বোসের বাড়ি। অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এখানেও বউয়ের জন্যে সিংহাসন। জ্বলছে নিভছে বাল্ব, সানাই, ফিল্মগাই রাগে বই। তবে কোল্ড ড্রিঙ্ক ছিল না, আর ওরকম খোলা বাগানও নেই। সব ছাতে ব্যবস্থা।

এখানেও সেই মখমলি বেনারসীর পুটুলি, বাড়ির সামনে গাড়ির সার। তোতা তো উত্তেজিত হয়ে পরিবেশনের পার্টিতে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিল। তারপর ঠোঁটে চেটাল লিপস্টিক মাথা জবজবে চোখ এক মহিলা ফাঁপানো চুলে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার ফিস ফ্রাই-এ আকুতি জানাতেই উত্তেজনায় ঠাকুরদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বিরাট ফাইভটি থালা নিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে ধুতিতে পা জড়িয়ে থালা উলটিয়ে পড়ে যায় তোতা। কুর্তাপরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, মামার সহপাঠী ছিলেন ভাঁড়ারের ইন-চার্জ। তিনি চট করে থালাটা টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র আঙুলে টকাটক করে প্রায় সব কটা ফ্রাই তুলে নিলেন। অপরিচিত আড়ষ্ট ছেলেটির সামনে তর্জনী তুলে বললেন, 'এক একটা ফ্রাই এক এক কোটি রুপ, জানোহে ছোকরা! যাও, তোমায় আর পরিবেশন করতে হবে না।'

তোতা আশেপাশে চেয়ে দেখলো টুটুল কিংবা বুড়ী আছে কিনা। কিন্তু টুটুল পানের থালা নিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আর বুড়ী ভেতরের ছোট উঠোনে, আলোকিত সিংহাসনে উপবিষ্টা মামীর সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলছে।

তোতা এসে টুটুলের হাত থেকে পানের থালা কেড়ে নেয়। ফিস ফিস করে বলে, 'মামাবাড়িটা একেবারে বাজে। কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই।'

সবচেয়ে টগবগ করেন স্বর্ণসুন্দরী। বোসবাড়ির ঐতিহ্য যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার ভাইয়ের এ বিয়ে মারফত। তাছাড়া রাধা বিজিতের বাপের বাড়ির গৌরবে যে এখন তাঁদের বাড়ির গৌরব আরও বাড়ল এ ভাবনায় তিনি অনেকখানি গুরুত্ব দেন। নব যে শেষ পর্যন্ত এক হেঁজি পেঁজি মেয়ে নিয়ে আসে নি, সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে করে নিজের সম্ভ্রম বাড়িয়েছে এ জন্যে তিনি গর্ববোধ করেন। বস্তুত তাঁর স্বামীর দেশের বাড়ির পড়ন্ত গৌরবের পাশে তাঁদের পরিবারের মর্যাদা আরও উন্নত বোধ হয়। গৌরী ও প্রতাপকেও যদি দুতিন বছরের মধ্যে এরকম এক সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাঁর জীবনে মূল কর্তব্যগুলো সম্পন্ন হয়েছে ভাবতে পারবেন।

গৌরী কলিজ হল হস্টেল থেকে মামা-বাড়িতেই আছে। তার চেহারা চমৎকার খুলেছে আজকাল। তাঁর এই ফর্সা লাফানো-ঝাঁপানো মেয়েটি বয়সের তুলনায় কিঞ্চিৎ মন্থর হয়েছে লক্ষ করলেন স্বর্ণসুন্দরী। বেগনি হাত কাটা ব্লাউজে এমন মানিয়েছিল বৌভাতের রাত্তিরে তাকে যে স্বর্ণসুন্দরী ফিরে ফিরে মেয়েকে লক্ষ করছিলেন।

কেবল একটু পথহারা দেখাচ্ছিল ভবনাথকে। বিয়ের কেনাকাটি, মাছ মাংসের জোগানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা এই দুটি প্রধান ব্যাপারের দায়িত্বই ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি থেকেও কিছু নেই। বিয়েবাড়ির ফাঁকে ফোকে বয়স্কলোকজনদের যে জমাট পারিবারিক আড্ডা তাতে তিনি ধাতস্থ নন। তাঁর মন কেমন করে ইন্দ্রাকপুর কোর্টের নীচেই সবে লাগানো কপির ক্ষেতের জন্যে। চারাগুলো ঠিকমত লাগল কিনা এক একবার ভাবেন। প্রতাপের দরুণ মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয়। তাঁর শ্বশুরমশাই নব-র জন্যে যে সাম্রাজ্য রেখে গেছেন তার তুলনায় প্রতাপ খুব একটা কিছু পাবে না, তাঁর বাড়িও খুব বড় নয়, তার তিন ভাগের এক ভাগে মাথা গুঁজবার জায়গা হবে মাত্র। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ভবনাথ তাড়া দিতে থাকেন স্বর্ণসুন্দরীকে।

'তোমার কপির চারা মরবে না, আমি বলছি। গোপীনাথ আছে। ও সব দিকে খেয়াল আছে। তোমার কোন ভাবনা নেই।' স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

কলকাতা ছাড়ার আগের দিন বিকেলে বাড়ির ঠিক সামনেই বিভৎস এক ব্যাপার ঘটে। ধূপকাঠি কিনতে গিয়েছিল রাস্তার ওপারে টুটুলের সমবয়সী একটা ছেলে। তার বাপের ডেকরেটারের দোকান এ ফুটে। পেছন থেকে লরিতে চাপা পড়ল ছেলেটা। মাথা চাকায় চেপ্টে ঘিলু মাংস ছিটিয়ে পড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। ছেলেটার বাপের পাগলের মতো চীৎকার, লোকজনদের হল্লা, পলায়মান লরীর পেছনে জনতার নিষ্ফল আক্রোশ, পুলিশের ভ্যান, এক মুহূর্তে নীল চাঁদোয়ার ঢাকা স্বপ্নের শহরকে রূপ দেয় নরকপুরীতে। ভবনাথের নিষেধ সত্ত্বেও টুটুল তোতা বুড়ী ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে। বাপ এক হাতে ছেলের রক্তমাংসের পুঁটলী আর এক হাতে ধূপকাঠির মোড়কটা হাতে নিয়ে ভিড় ঠেলে দোকানের দিকে এগোয়। তোতা বললে, 'দ্যাখ দ্যাখ।' তারা ফিরে দেখলে দুটো চিল রাস্তার ওপর পাখশাট খাচ্ছে আর বালতি বালতি জল রাস্তার মাঝখানটা ধুয়ে দিলেও আনাচে কানাচে যে সব ঘিলু মাংসের কুচি আটকে আছে তাই ছোঁ মেরে মেরে ঠোঁটে করে নিয়ে ওপরে উঠছে।

স্বর্ণসুন্দরী চীৎকার করে ডাকেন, 'চলে এসো, চলে এসো তোমরা ওখান থেকে।'

পরদিন যখন তারা ইন্দ্রাকপুর কোর্টের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল তখন

নরম জামাকাপড় ধোয়ার নিরাপদ, অভিনব উপায়

সিন্থেটিক কাপড়

পশমের কাপড়

রেশমের কাপড়

জেণ্টীল

ধোয়ার জন্যে বিশেষ তরল ফর্মূলা

নরম, মোলায়েম, মৃদু 'জেণ্টীল'—বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী একটি ফর্মূলা যা বিশেষভাবে আপনার রেশম ও পশমের জামাকাপড় এবং 'টেরীন', নাইলন, রেয়ন, প্রভৃতি সিন্থেটিক কাপড় ধোয়ার জন্যে তৈরী করা হয়েছে।

জেণ্টীল তরল পদার্থ, তাই খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। আর নরম ফুরফুরে ফেনায় ভরে দেয়। এটি মামুলী ডিটার্জেণ্ট পাউডার থেকে আলাদা।

জেণ্টীল আপনার জামাকাপড় আগাগোড়া···ভালো ক'রে···সব ময়লা দূর ক'রে···নতুনের মত মোলায়েম, ঝরঝরে, ঝলমলে ক'রে তোলে।

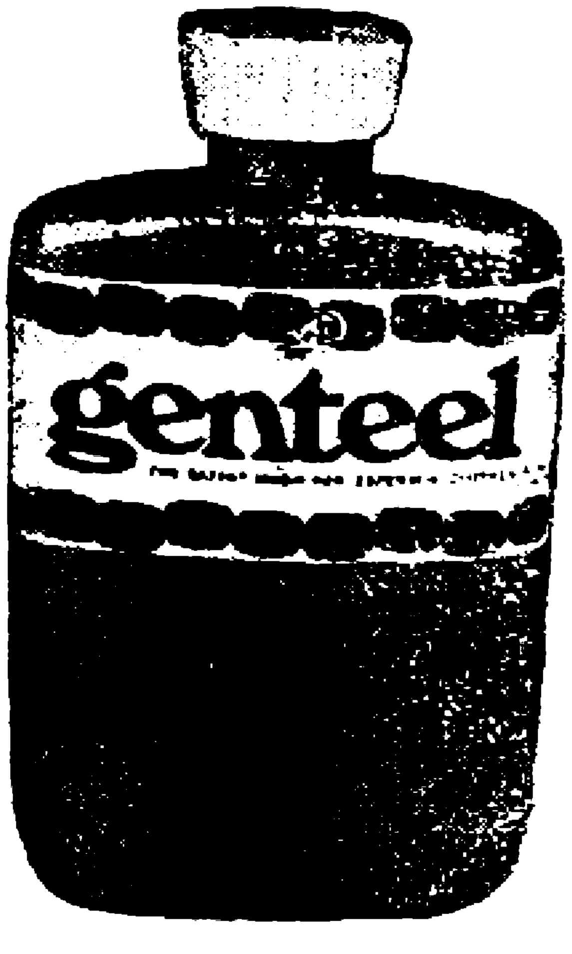

জেণ্টীল—নরম জামাকাপড় সবচেয়ে নিরাপদে বাড়ীতে ধোয়ার জন্যে

Shilpi-HPMA 88A/71 ben

এই পাড়ায় নতুন জেলখানা সম্প্রতি-কালে ওঠা বাড়িটাই তাদের নিজেদের বাড়ি মনে হচ্ছিল। কলকাতায় একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সম্প্রতি ভাড়া নেওয়া ছাদের নতুন ঝকঝকে বাড়িতে নিয়ে পৌঁছলেন ভবনাথ। সেখানে গ্যারাজ থেকে ডাক্তারের নতুন নীল রঙের গাড়ি বেরোচ্ছে, ওপরের বারান্দা থেকে কুকুরের ডাক আসছে—সে বাড়ি ঠিক তাদের নয়। তার সঙ্গে তারা সামান্য আত্মীয়তাও বোধ করে নি।

আসবার সময় গৌরী দুখানা বই তার ভাইদের উপহার দিলে, বড়টিকে দুধের টিন আর তিনজনের জন্যে তিনটে চকলেট। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' আর 'আবার যকের ধন' পড়তে পড়তে তাদের ভিতর বিস্ময় এল। বিশেষ করে টুটুলের রূপকথা আর কল্পনার রাজত্বে এল গুপ্তধন, বিভীষিকা। তারপর তিন-খানা চিঠি গেল কলকাতায়। গৌরীর পাঠানো এক রকমের বই। সন্ধ্যে পাড়ার প্রতিবেশী, 'মরণের ডঙ্কা' আরও ছাপানো রহস্য-রোমাঞ্চ বিভীষিকা।

কিছুদিন হল টুটুলকে দেখা যায় সন্ধ্যেবেলাতেও বইয়ের ওপরে মুখ গুঁজে থেকে পড়তে চাতালের এক কোণে।

'টুটুল এবার নির্ঘাত ফেল করবে,' বুড়ী অনুযোগ করছে মা-র কাছে। স্বর্ণ-সুন্দরীর উদ্বেগের ত্রুটি নেই। কিন্তু কাজ হয় না। দুই ভাই পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গুপ্তধনের সন্ধানে জেলখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে টই টই করে ঘুরে বেড়ায়, কামান দাগবার কোঁকড়া পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে বোম্বেটেদের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে, এক একবার সত্যি সত্যি বোধ হয় মাঠের পারে ধরে হাঁস মাইনবালকের হাতী বার হয়ে এলে মাঠের ধারে বিশাল নেড়া বটগাছটার গোড়ায় হীরের খনি আবিষ্কার হতেও পারে। কিন্তু পথে বিপদের জন্যে রিভলভার প্রয়োজন। বাবার বডিগার্ড রাম-স্বরূপের রিভলভার চুরি করবার সাহস জাগে হোতার। কিন্তু তা করতে গেলে, গল্পে যে রকম থাকে অর্থাৎ ক্লোরোফর্ম শোঁকানো দরকার। ক্লোরোফর্ম পাবে কোথায়? মাত্র এক শিশি ক্লোরোফর্মের অভাবে এত বড় সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ভেবে হোতার ক্ষোভ জাগে।

কিন্তু বড়দের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে টুটুল এবারও প্রথম হল বাৎসরিক পরীক্ষায়। হোতা হল তাদের ক্লাসে দ্বিতীয়। টুটুলের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর যেমন লোকেদের নেশার অভ্যাস হয়ে যায়, সিগারেটের অভ্যাস হয় তেমনি টুটুলের প্রথম হওয়া এক নিত্য প্রয়োজনীয় গতানুগতিক ব্যাপার। আর এ অভ্যাস এমন জোরাল যে সামান্য ব্যতিক্রম হলে, অর্থাৎ দ্বিতীয় তৃতীয় হলেই টুটুল কেঁদে ভাসায়, নিজেকে ভাবে একেবারে অপদার্থ। টুটুল বড় হয়েও ভেবেছে ব্যাপারটা কেন এরকম হত বারেবারে। আর একটা উত্তরই সে খুঁজে পেয়েছে। আসলে ইতিহাস ভূগোল বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সমস্ত বইয়ের বাড়ির কাজের আদ্যোপান্ত মুখস্থ হয়ে যেত। আর মুখস্থ প্রশ্নের যেখানে মুখস্থ উত্তরই আশা করা হয় সেখানে সে ভাল করবে না কেন?

কিন্তু আর সব ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ভবনাথের উৎসাহ নেই। কিছুদিনের মধ্যেই আই সি এস পরীক্ষার ফলাফল বেরোবে। ভবনাথ সেদিকে তাকিয়ে আছেন, একটা ছেলের দিকে যে কেবল তাঁর জীবন, তাঁদের সমস্ত পারিবারিক জীবনে এক নবীন গৌরব ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

গত বছর ব্রাইটন থেকে প্রতাপ যে ছবিটা পাঠিয়েছিল সেটা তিনি তাঁর মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছেন। পেছনে ব্রাইটনের সমুদ্র আর বালির ওপরে চানের জাঙ্গিয়া পরা প্রতাপ, একহাত কোমরে। প্রতাপ যেন যৌবনের, আশাবাদের মূর্ত প্রতীক। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বিদায় নেবার মুহূর্তে ট্রেনের কামরার হাতলে আলগোছে হাত লাগানো গোলাপের মালা গলায় প্রতাপের চেহারাটা মনে আসে। এইরকম ছেলেরাই তো আই সি এস হবে, ভবনাথ ভাবেন। তাঁর বড় ছেলে তাঁর মতো মেজাজি এটা তিনি টের পান। ফুর্তিবাজ অথচ অকারণ বাচাল নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে পারে অথচ স্বতন্ত্র একরকম ছেলের জন্য নিশ্চয় গর্ব করতে পারবেন। গতবার চিঠিতে খারাপ হয়েছিল। কিন্তু প্রতাপ লিখেছে এবার সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিচ্ছে। আর সব যা বলেছে, তা তিনি মানেন না। প্রতাপ এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাঁর প্রতাপের ওপর আস্থা এতটুকু টাল খায় নি।

পারিবারিক কল্যাণের আশায় স্বর্ণ-সুন্দরী কিছুকাল যাবৎ প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করছেন। মেঘঢাকা পূর্ণিমায় চাতালের এক কোণে কাঁটালের থালা, নারকেল ফুল, নারকেলের চিঁড়ে নাড়ু সাজিয়ে সেই চক আর কুবেরের উপাখ্যান সমান উৎসাহেই বলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর মানস ধবলময় হল কি হল না তাতে কিংবা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বেচারা বেপাত্তা কি উপায় খাড়া করেছিল সব পাত্র হতে সে সম্পর্কে ছেলেদের কৌতূহল কিঞ্চিৎ ফিকে। এমনকি টুটুলও ব্রতকথা শোনার চেয়ে নারকেলের নাড়ু কটা সাঁটাবে সেদিকেই বেশী মন দেয়। চক আর কুবেরের উপাখ্যানের চেয়ে ছুটির দিনে দুপুরে গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক।

সেবার সন্ধ্যায় পুজো শেষ হবার আগেই চাঁদ ঢেকে যায় মেঘে। ঝুঁই ঝুঁই করে বৃষ্টি নামে। বুড়ী হোতা টুটুল গোলমাল করে জলখাবারের থালা ঘরের মধ্যে টেনে তোলে। সারা রাত বৃষ্টি চলে। ভোররাত্তির থেকে বৃষ্টির জোর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দাপট। হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ এত বাড়ে যে ভয় হয়, বাংলোর চাল উড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব বাংলা জুড়েই সে রাত্তির ঘূর্ণিবাত্যা আর ঝড় চলেছিল। অনেক চাল ওড়ে, গাছ ওপড়ায়, গরু মোষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই অসময়ে বৃষ্টি হওয়ায় ছেলেমেয়েরা বিছানায় চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমোয়। স্বর্ণসুন্দরীর সারাদিন উপোসের পর ভালমন্দ খেয়ে গভীর নিদ্রা যান, ঝড় বর্ষায় বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ভবনাথের ভাল ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করেন। একবার স্বপ্নে দেখলেন তাঁদের পাবনার বাড়ি জলে ভেসে যাচ্ছে। ইব্রাহিমপুর ফোর্টের চারদিকেও জল। লণ্ঠনের পলতে উঠিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন নিশ্চয় অনেক চাল উড়েছে, ক্ষতি-টতির একটা হিসেব কালই নিতে হবে। এক চিলতে খোলা বারান্দার পরেই বাথরুম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, ভবনাথের মনে হল বাড়ির ওপরেই বাজ পড়ল। সকালে উঠেই দেখলেন ফটকের সামনে সবচেয়ে সতেজ সরস সুপুরী গাছটার ওপরেই বাজ পড়েছে। কয়েকদিন পরই পোড়া পাতাগুলো ঝরে গিয়ে গাছটার ন্যাড়ামুড়ো মাথা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

(ক্রমশ)

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

নামে আসে বিস্তর যায়ও বহুত

বিমল বসু

নামে কি আসে যায়? 'হোয়াট ইজ ইন আ নেম'।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকসপীয়র তাঁর নাট্য-চরিত্রের মুখে এই চমকপ্রদ উক্তিটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ধরতাইয়ে প্রয়োগ করে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন তাঁর দিবাস্বপ্নে অথবা মধ্যনিশীথের নিদাঘ স্বপ্ন-চারণে ক্ষণমাত্রের জন্যে কল্পনাও করতে পারেননি যে এই উক্তি সবিশেষের গণ্ডী ছাড়িয়ে আর এক দেশে আর এক কালে সর্বজনীন প্রবাদবাক্যে পরিণত হবে।

একথা তিনি জানতেন না। জানলে ভারতের ঋষিবাক্য : 'শতং বদ মা লিখ' শিরোধার্য করে একেবারে 'নিশার মতো নীরব' হয়ে থাকতেন।

ভারতের আদিকবি বাল্মীকি। শেকসপীয়রকে ইংলণ্ডের আদিকবি-অভিধায় যদি ভূষিত করি তাহলে ভারতীয় পেনালকোডের কোনও ধারায় অভিযুক্ত হয়ে অর্বাচীন বলে জনতার আদালতে ধিকৃত হতে পারি তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্যের দিকে গুণীজনের নজর ফেরাতে চাই। দস্যু রত্নাকর রামনাম জপ করে বহুত 'লিফট' আর 'প্রমোশন' পেয়েই না আদিকবি বাল্মীকি-পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন—স্টেজের 'সীন সিফটার' থেকেই তো শেকসপীয়র শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পদে পাকা হতে পেরেছিলেন আপন স্বপ্নসাধনায়। উভয়েই কবি—চারিত্রলক্ষণ লক্ষ করবার মতো। নাট্যকার মাত্রেই কবি—শূন্যগগনবিহারী। আর এদেশে ওদেশে সবদেশে কবিদের তো সাতখুন মাপ—আমাদের দেশে তো আগেভাগেই বেশ জোর গলায় বলা হয়েছে 'নিরঙ্কুশ কবয়ঃ' আর ইংরেজের দেশে কোনরকম পরীক্ষা-টরিক্ষা না করেই একেবারে 'এক' মার্কা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে 'পোয়েটিক লাইসেন্স' বলে। ইংরেজরা বিস্তর বুদ্ধি ধরে—সাহিত্য এবং ব্যবসা—সকল রসের রসিক ওরা। সাটে বা সঙ্কেতে কবিদের সম্পর্কে 'রায়' দিয়ে দিয়েছে 'লাইসেন্স' শব্দটা কায়দা করে বসিয়ে। যাদের 'সেন্স' (জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা) 'লাই' (অলীক-মিথ্যা-অসার) তারাই সত্যিকারের কবি। কাজেই নাট্যকার শেকসপীয়র কবি-লক্ষণাক্রান্ত বলে তাঁর এ হেন অসার উক্তি : 'নামে কি আসে যায়' —পোয়েটিক লাইসেন্সের রবার-স্টাম্প মেরে অনায়াসে বাতিল বলে গণ্য করা যায়। তা না হলে শেকসপীয়রের মতো সত্যদ্রষ্টা কি করে এমন ভ্রমোক্তি করতে পারলেন। অথবা এ উক্তি কবিযশপ্রার্থী কোন তরুণ কবি শেকসপীয়রের নাটক কপি করবার সময় কাব্য করার এবং দার্শনিক বচন ঝাড়ার লোভ সামলাতে না পেরে ঐ উক্তিটি জুড়ে দিয়ে রিপুকর্মটি মাকেরহাটের পাকা দরজির মতো এমন চমৎকারভাবে করেছেন যে আসল নকল চেনবার জোটি নেই। 'সাচ নকলে আসল খাস্তা' এই হয়েছে আর কি। শেকসপীয়রের নামে কবি-জনোচিত এই অসার উক্তিটি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটি প্রক্ষিপ্ত। একাধিক কালিদাস-চণ্ডীদাস-জয়দেবের মতো একাধিক শেকসপীয়রের সম্ভাব্য অস্তিত্ব নিয়ে শেকসপীয়র-বেশের গুণীজ্ঞানী-রসিকজনেরা মধ্যরাত্রের প্রদীপের তেল-সলতে পুড়িয়ে গবেষণা কর্মটি চালিয়ে প্রায় ইনসোমেনিয়া ধরাবার দাখিল করেছিলেন।

'নামে কি আসে যায়' এমন ভ্রমোক্তি সত্যিকারের শেকসপীয়র কিছুতেই করতে পারেন না। নামে আসে যায় বলেই তিনি বেছে বেছে নাম নিয়েছেন শেকসপীয়র—'পিয়র' (জ্ঞানী-গুণী-রসিক-প্রজ্ঞাবান)-দের তিনি শেখ (শাহানশাহ)। তাঁর নাম চালিয়ে দেয়া উক্তিটি তাঁর নামের আলোয় বিচার দিনের আলোর মতো সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কি?

আর সত্যিই যদি এটি 'আসল' শেকসপীয়রের উক্তি হয় তাহলে গান্ধীজীর কথা ধার করে বলতে হয় : উনি এমন 'হিমালয়ান (নাকি আলপসিয়ান?) ব্লাণ্ডার' করলেন কি করে? আমার মতে শেকসপীয়রীয় উক্তি 'নামে কি আসে যায়' সেকেলে এবং 'আউটডেটেড' কেননা এতে আসে বিস্তর যায়ও বহুত।

নামায়ন নিয়েই তো রামায়ণ। জীবন-রঙ্গমঞ্চে পা রাখবার প্রাক্-মুহূর্তে আমরা কাঁদি আর প্রস্থানের সময় কাঁদিয়ে যাই। জীবনের আদিতে কান্না এবং অন্তেও তাই। শুরু ও শেষ এই কান্না দিয়ে। কান্না দিয়ে ঘেরা মানুষের সামাজিক বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে বিভেদ হলেও এর আদ্যোপান্ত—আদ্য মধ্য অন্ত—এই নামের নামাবলী দিয়ে জড়ানো। অর্থে-সামর্থ্যে-সম্পদে মানুষে মানুষে আসমান-জমিন ফারাক থাকলেও জীবনের শ্রেণীবিন্যাসের নানান স্তরে কখনো নিম্নগ্রামে কখনো উচ্চগ্রামে উচ্চারিত সামান্য নামের ধ্বনিতে অল্পবিস্তর আমরা সকলেই ধনী। রাজা-প্রজা, কালো-ফর্সা, বেঁটে-লম্বা-কুৎসিত, সুন্দর, রূপবান-রূপহীন সকলেরই অঙ্গে এই নামের নামাবলী। এর হাত থেকে কারো রেহাই নেই। আমরণ অক্টোপাশের মতো তা জড়িয়ে থাকে পৃথিবীতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই। 'ধর্মের ষাঁড়' দাগানোর মতো সবাইকে নামের দাগে দাগী হতে হয়। এক নাম নয়, একাধিক নামে। 'অধিকন্তু ন দোষায়'-র মতো ওরফে আর 'এলাইস'-এর ছড়াছড়ি। জড়াজড়ি নেহাৎ কম নয় যদিও পোষাকী আর আটপৌরে প্রধানত দুটি নামের মাদুলি সবাইয়ের গলায় ঝোলানো। একটা নাম ঘরোয়া, একান্তভাবে অন্তরঙ্গরাই আর আপনজনেরা তা জানে আর একটা বাইরের নাম—'মিটিংকা কাপড়া' আর কি।

সাধু-সন্ত, আউল-বাউল, ফকির-দরবেশেরা 'যম'-এর হাত থেকে রেহাই পেলেও পেতে পারেন কিন্তু নামের দায় থেকে নৈব নৈব চ। অন্য ব্যাপার-স্যাপারে 'লীলাখেলা' বলে চালালেও দেবতারা শুধু নন স্বয়ং দেবীরাও এর হাত এড়াতে পারেন না। বরং বলা যায় নামের মালা এঁদের গলায়ই দোলে সবচেয়ে বেশি। শিব-কালী-কৃষ্ণ তাবৎ দেব-দেবীদের কণ্ঠে নামের সাতনরী হার—স্তবকবচমালার পাতায় কতশত নামের ছড়াছড়ি। দেব-দেবীদের বেলায় এই যদি হয় 'কুতো মনুষ্যাঃ'। একটি মানুষের মাত্র একটি নাম থাকাটা বেজায় রোদ দিনের চাঁদের আলোর মতো অসম্ভব। সম্বল যাদের কানাকড়ি, সামর্থ্য যাদের এক নয়া পয়সার সমান এমন মানুষেরা সহায়-সম্পদশূন্যতাটা 'নামেই সুখশান্তি' শিরোধার্য করে পুষিয়ে নেন একাধিক নামের সমারোহে।

ধরুন না কেন থার্ড পার্সন, সিঙ্গুলার নাম্বার, নমেনেটিভ কেস হরিহর হালদারের কথা যাঁর সাকিন হালিশহর। শ্রীকৃষ্ণের মতো ওঁর শতনাম না থাকতে পারে কিন্তু বাদসাদ দিয়ে অনায়াসেই বলা যায় স্বমতের মতে অন্তত পাঁচটা নাম ওঁর। শৈশবের অবোধ কাকলি, বিচিত্র রূপ দেখেই সবার মনে প্রশ্ন জেগেছিল : 'একটি ছোট্টো মানুষ', তাঁহার একশো রকম রঙ্গ তো/এমন লোককে একটি নামে ডাকা কি হয় সঙ্গত?' তাই এক হলেও একাধিক নাম হরিহরের। মা-বাবার কাছে 'খোকা' তিনি আজও, অফিস-পাড়ায় নামে না হলে 'সারনেমে' [হালদার] সুখ্যাত। ইয়ার-বক্সি আর অন্তরঙ্গরা ডাকেন 'হরো' বলে। বিবাহের মন্ত্রমালায় যে আয়ুষ্মতীকে তিনি বন্দিনী করেছেন সেই একাকিনী পুরাঙ্গনা তাঁকে ডাকেন নাম ধরে—কখনো হরি কখনো হর। আর বিবাহের চেয়ে বড় সম্পর্ক যাঁর সঙ্গে—যিনি হরিহরের 'ঘড়ার তোলা জল' নন—'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের মতো যিনি তাঁর ভালবাসার দীঘি, তিনি ডাকেন কানে কানে অস্ফুট আধ-উচ্চারণে চিরমধুর একটি নামে। সে নাম 'বীজমন্ত্রের মতো'। কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ নাম আছে অন্তরতমার মুখে আর ওর

করে।" এ নাম হল বে-সরকারী নাম। সংসারের বা অফিসের খাতায় একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কানের হল পাঁচ কানে গেলে খাস্তা হয়ে যাবে তাই এই কানে কানে ডাক ওঁরা দুজনে ছাড়া আর কারুর জানবার এক্তিয়ার নেই। 'সব পাখিতেই মাছ খায় কেবল ধরা পড়েছে মাছরাঙা' কি হয়? শুধু হরিপদ হালদার কেন, আপনি আমি তিনি সে—কেউই এর ব্যতিক্রম নই। আপনি আমি সিঙ্গলের নাম্বার হলেও আসলে নামের দিক দিয়ে বহু। আমাদের এই পোষাকী নাম, আটপৌরে নাম, ডাকনাম, সাজনাম, আদরে নাম—পঞ্চনাম থেকে যদি একটি নাম বাদ যায় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় বিয়েতে বর বরবাদের মতো—জীবন তখন বিস্বাদ মনে হয়। কেমন যেন খালি লাগে।

তা যদি হয় তাহলে কেমন করে বলি : নামে কি আসে যায়!

আসলে আমার এই বহু সংসারে এই নশ্বর পৃথিবীতে পদ্মপত্রে নীরসদৃশ জীবনে নামই সারসত্য। ইহকাল, পরকাল, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—'নাম' হলেই কান টানলেই মাথা আসার মতো সবকিছু অন্তি-অবশ্যই এসে হাজির হয়—যাকে বলে একেবারে চতুর্বর্গ লাভ। সেজন্যই নাম করার, নাম অক্ষর অক্ষরে লেখার, নিজ নামের জয়ধ্বনি তোলার বাসনা ও ইন্ধন চারদিকে এত ব্যাপক। উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন এটা আমাদের মধ্যে। নশ্বর পৃথিবীতে স্বল্পায়ু জীবনে কিছু চিহ্ন কিছু দাগ রেখে যাবার ব্যাকুল বাসনাই নাম-এর আর এক নাম। ছোট বড় মাঝারি সব মাপের মানুষের মধ্যে এই আসক্তি অতি তীব্র—অক্টোপাসের মতো তা ওতপ্রোতভাবে মানুষের জীবনকে জড়িয়ে থাকে। কোনমতেই এর হাত থেকে রেহাই নেই কারো। মনের অনেক গভীরে এই বোধ লুকিয়ে থাকে।

শৈশব পার হয়ে কৈশোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নাম-এর ব্যাকুল বাঁশরী বাজতে থাকে এবং যতই বয়স বাড়ে ততই দুঃসহতা এবং উন্মত্ততা বেড়ে যায়। বালক-বয়সে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে স্কুল-কলেজের হাই বেঞ্চে নিজ নামের কাঠখোদাই করার অপূর্ব রোমাঞ্চ আপনার জীবনে যদি না এসে থাকে তাহলে আপনি জানেন না আপনি কি হারিয়েছেন। মন্দির-মসজিদ-মিনারে কাঁচা হাতে ভুল বানানে লেখা কতশত নাম নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। 'যেমন আছ তেমনি এসো নাইবা হল সাজ' বলে হাঁক দিয়ে ডাক দেবার এক্তিয়ার যদি কারুর ওপর না থাকে, যদি দিবা সন্ধ্যার আলোছায়াঘেরা ক্ষণে সাগর-দীঘির বালুকাবেলায় সঙ্গীহীন জীবনের অলস মুহূর্তে আনমনে বসে থাকতে থাকতে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের নামের পাশে আর একটি প্রিয় নাম যদি আপনি কখনো না লিখে থাকেন তাহলে আপনার নিপাট সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য এবং তারকাজোড়া নাম সত্ত্বেও কিন্তু আপনাকে ঈর্ষা নয়, করুণা করতে ইচ্ছা হয় আমার। আপনার জীবনের কোন কোণে যদি এই ধরনের 'অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান বিফল বাসনা-রাশি' থেকেও থাকে তা কিন্তু শ্মশান-বন্ধুরা সম্পূর্ণ ও সার্থক করে দেবে মড়া-পোড়ানো ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কাঠকয়লা দিয়ে আপনার নাম শবযাত্রীদের বিশ্রাম-ঘরের দেওয়ালে কালো অক্ষরে লিখে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

বালক-বয়সে যে বাসনার শুরু অন্তিম-শয়নের ভববৈতরণী নিরাপদে পার করাবার সদিচ্ছায় প্রায়-বধির কর্ণকুহরে হরি-নারায়ণ-ব্রহ্মের নাম প্রক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি। জীবন থেকে মরণে নাম ছায়ারূপে পাছে পাছে নয় সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান, চারু এবং কারুকলায় যাঁরা মোহন্ত-মহারাজ তাঁরা কেউই এই নাম-রূপ ব্যাকরণের ব্যতিক্রম নন। বরং বলা যেতে পারে কম্পাসের কাঁটার মতো স্থিরলক্ষ্য সব সুকুমার কলা এবং বিজ্ঞান-আবিষ্কারের গভীরে প্রোথিত রয়েছে ব্যক্তিনাম সুপ্রতিষ্ঠ করার আন্তরিক আয়োজন—'আমি আছি আমি থাকব' সোচ্চারে। আমার আপনার কথায় গাড়ু মারুন, 'বহু ব্যবহারে মলিন' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বালক-বয়সে গোলাপ-ফুলের নির্যাসে কলম ডুবিয়ে নিজের নামটা সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং পেরেওছিলেন। আর 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' সম্রাট শাজাহান স্বয়ং 'কানে কানে ডাক' 'অনন্তের কানে' রাখবার জন্যেই তো পৃথিবীর বিস্ময় 'তাজমহল'-এর প্রতিষ্ঠা করলেন যখন বাংলা এবং গুজরাটে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ।

রাজা-বাদশার কথা বাদ দিয়ে হরিপদ কেরানীর কথাই ধরুন না কেন। কালের পাতায় নাম লেখার পুঁজি বিন্দুমাত্র নেই। প্রতিভা কানাকড়ি, উদ্যম ও চেষ্টা শূন্য, এক পারসেন্ট ইনসপিরেশন এবং নিরেনব্বই পারসেন্ট পারস্পিরেশন ডায়লুট করে কিছুএকটা সৃষ্টি করাবার দুর্বার বাসনার বাষ্পমাত্র যখন নেই তখনও কিন্তু নিজের নামটা জিইয়ে রাখতে আমরা পিছপা হইনে। নিজের নামটা বাঁচিয়ে রাখতে চাই বলেই তো রামভক্ত হনুমানের মতো ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মা-বাপের অতি বাধ্য সন্তানের ভূমিকায় আমরা সক্রিয় হয়ে উঠি বি-বহ ধাতু বধ করবার বেলায়। দ্বিপদ থেকে চতুষ্পদ হই। পুন্নাম নামক নরক থেকে ত্রাণ পাবার অভিপ্রায়ে 'ইট টেকস টু টু মেক ওয়ান' ফলো করে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' উন্মাদ হয়ে উঠি। যে আসে সাদরে তার নামকরণ করি 'বংশলোচন'। কালে এই বংশলোচনরাই যখন বংশদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় তখন অবস্থা হয় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' নবাগতরা যখন বাঁচে না, অকালে ছেড়ে যায় তখন ঠাকুর, দেবতার দোর ধরি। বাঁচলে, হরি রেখেছেন বলেই নাম হয় রাখহরি। হরি যখন রাখতে শুরু করলেন তখন 'পুত্রকন্যা প্রবল বন্যায়' ভরাডুবি হবার যোগাড়। তখন আর দেবতা নয় দেবীদেরই শরণ নিতে হয়। সেকালে 'লুপ' লাইনে যাবার রেওয়াজ উঠেনি, আয়োজনও ছিল না কোন দিক দিয়েই। ছোট পরিবার সুখী পরিবার এবং 'দো বাচ্চা আউর এক বাস খতম' শ্লোগানের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না। 'পনেরো পয়সায় তিনটি' পান আর মুড়ি-মুড়কির দোকানে তখন আর পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না বলেই দেবতা নয় দেবীদের সাক্ষী মানা হত—'আর না কালী'। আন্নাকালী নাম ধরে ডেকেও যদি পার পাওয়া না যেত তখন অযাচিত আগন্তুককে অভিনব নামে অভিহিত করা হত—হত 'ঘেন্না' নাম। আমার সঙ্গে ঘেন্না মিলের দিক থেকে চমৎকার। দেশ-কাল-যুগ বদলেছে, নামকরণের রকমফের ঘটেছে—আদ্যিকালের 'আন্না-ঘেন্নারা' মাঝের কালে 'ক্ষান্তমরী'-'ক্ষান্তমণি' হয়ে একালে এসে পেয়েছে অতি আধুনিক নাম : 'ইতি'। ইতি দিয়েই দাঁড়ি টানবার সুখপ্রদ সনাতন ব্যবস্থা আজও অটুট জন-বিস্ফোরণ-রোধের নানান আধুনিক আয়োজন সত্ত্বেও।

জনতা থেকে বিশেষ জনকে চিহ্নিত এবং পৃথক করার জন্যেই নাম। নামটা আবার সম্বোধন করার জন্যেও। স্বয়ং কবিগুরু কবুল করেছেন : 'নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না।' ফলে নাম না জানার জন্যে কম বিপত্তি আর বিরক্তির উদ্ভব হয় না। ইংরেজ-অ্যামেরিকানদের কিন্তু ভারী সুবিধে, ওদের ঝঞ্ঝাট কম। নাম-না-জানার ঝঞ্ঝাট ওরা এড়াতে পারে হেসে 'হ্যালো' বলে ডাক দিয়ে কিন্তু আমাদের বেলায় তেমন যুৎসই শব্দ কই। 'ওহে' 'এই যে' শব্দগুলো যেন কেমন-কেমন। এই নাম-না-জানার জন্যে আমার আপনার কথা বাদ দিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কাহিল হয়ে পড়েছিলেন : প্রথম দর্শনে শ্রীরাধা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কাতর উক্তি : 'নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে।'

পোশাকী নামটা জানা থাকলে তার পিছনে একটা লেজুড় (বাবু) বসিয়ে অপ্রস্তুতির ধাক্কা খানিকটা পুষিয়ে নেয়া যায়। ভদ্রলোকের বেলায় না হয় বাবু বসালাম কিন্তু মহিলাদের নামের সঙ্গে যদি বিবি যুক্ত করি তাহলে দেবীরা বিস্তর গোসা করবেন, অভিসম্পাৎ দেবেন। সত্যি 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলে উচ্চকিত কণ্ঠে যতই মুক্তকচ্ছ হই না কেন পথেঘাটে 'পল্লবিনী সঞ্চারিণী লতেব' সদৃশ পটে-আঁকা ছবির মতো বিবিদের সম্বোধন করার মতো শব্দের অভাব যথেষ্টই আমাদের এই ভাষা-ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন' সত্ত্বেও। যাইই বলুন এদিক দিয়ে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি তবু পদে আছে 'জী' অক্ষরটি উঁচিয়ে রেখে। হিন্দি-ভাষা যতই দুর্বল হোক এই অক্ষরটিকে কবচ-কুণ্ডল করে অকুতোভয়ে অবলাদের সঙ্গে সবলে ডায়লগ চালিয়ে যাওয়া যায়। আবার সাহেবি কায়দায় সারনেমটাকে মাত্র ধরে নিয়ে অন্তরঙ্গ কাউকে মিঃ রায়, কি

বোস বলে ডাকা গেলেও অন্তরঙ্গতার চেয়ে রুক্ষতাই হয়ে উঠবে। আসলে সারনেম ধরে এই ডাক 'একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা সমুদ্র থেকে কানের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।' এতে নৈকট্যের চেয়ে কাপটাই বড় বেশি সোচ্চার। দেশে কালে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই এটা অবৈজ্ঞানিক। তাই 'রিলেটিভিটি অব নেমস' প্রচার করে নামজাদা হবার আকাঙ্ক্ষায় মুখর হয়ে উঠেছিল 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়।

আর এই নামের কী বাহার! কত রূপ কত রঙ কত ঢঙ তার। আছে আকারে ছোট-বড়-মাঝারি নানান ধরন আর ধাঁচের নাম। অন্নপ্রাশন তো নামকরণের মহোৎসব। এই নামকরণের ক্ষেত্রে কম নাকাল হতে হয়নি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। আসলে তিনি ছিলেন নামকরণের কুলগুরু। এ ব্যাপারে তাঁর ছিল স্বাভাবিক স্বাধিকার। তাই বিদেশী নাম বেমালুম নিশ্চিহ্ন, 'বোগেনভেলিয়া' হয়েছে 'বাগানবিলাস'। বিদেশী ফুল 'পেট্রিয়া' হয়েছে 'নীলমণিলতা'। রূপের স্মৃতি নামের দাবী করলে দূরপ্রবাসে কবি এই বিদেশী ফুলের নামকরণ করেন।

নামকরণের পর্যবিচারে প্রধানত দুটি ভাগ ঃ আদি আর নব। আদিরা বুঝতেই পারছেন এইটটিনথ সেঞ্চুরীর—ব্যাকডেটেড সেকেলে—একেবারে পুরাতনপন্থী। কাজেই সেকেলে খুড়ো-জ্যাঠা দাদু-বাবা-কাকার দেয়া নাম থেকে পুরনো বাজারের রাঁধি মালের পুরনো-পুরনো গন্ধ ছড়াবে এ আর বেশি কথা কি। নবরা চলতি হাওয়ার পন্থী, রূপান্তর ও সংক্ষিপ্তকরণের ঝোঁক এদের মধ্যে বড় বেশি উগ্র। পরিমলহাসিনী শতদলবাসিনী নির্মলনলিনী নৃপবালা প্রমীলাসুন্দরী, হরিনফর বিপদবারণ-বৈকুণ্ঠবিহারী, গোলকগোবিন্দ, ভজহরি প্রভৃতি ভজকট নামগুলো বেজায় রকমের বড়া কর্তা-ব্যক্তিদের নামকরণের নজর-টানা নজীর একালেও গরহাজির নয়। সেলুলার সেলের শাস্তি ডাণ্ডা-বেড়ির মতো এই সেকেলে নামগুলো একালের ছেলে-ছোকরাদের এবং তরুণদের অসহ্য হয়েছে বলেই চটপট আধুনিকীকরণ হচ্ছে ধর্মাধিকরণে নাম-বদলের আর্জি পেশ করে। শুধু নাম নয় 'সারনেম' বদল হচ্ছে নির্বিবাদে। কিন্তু নবরা জানেন না এই নামের মধ্যেই নিহিত থাকে পিতৃকুল রক্ষণ ও কুলকর্মের স্বীকৃতি। নিজের খুশীমতো পছন্দমতো নাম-বদল সেই তিন গুণের নতি অস্বীকৃতি—আসলে তা আত্ম-অস্বীকৃতির সামিল। যাবৎ জীবেৎ সুখম জীবেৎ ঋণম কৃত্বা ঘৃতম পিবেৎ-এর বদলে আপনি বাঁচলে বাপের নামই হয়তো সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। নাম আধুনিকীকরণের ব্যাপারে একালিনী কন্যারাও পিছিয়ে নেই এক কদমও। 'ফিল্মার ফিল্ম' জগতে সাড়া তোলা রেখে নাম ও পদবী ছেঁটে-কেটে ছোট করে নিয়েছেন ওঁরাও। কেতকী মিত্র এখন রূপান্তরিত হয়েছেন কেটি মিটার। ভাষা-কারখানায় বকযন্ত্র-পরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা বিলিতি কৌলিন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স আর কি। নামের সংক্ষিপ্তকরণের সঙ্গে সমস্যা বিধানের জন্যে যুক্ত হয়েছে বেশে-বাসে বহিরঙ্গে বাহুল্য বর্জনের উদগ্র আগ্রহ।

কিন্তু মজা দেখুন নামের সঙ্গে নামধরের বা নামধারীর মিলের চেয়ে গর-মিলটাই বেশি। বৈপরীত্য নামে এবং অবয়বে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি। নিকষ কালো মেয়েকে কৃষ্ণকলি বলে ডেকে কবিত্ব করা চলে কিন্তু সে ডাকে শালীনং ন মুঞ্চতি। অপ্সরাসদৃশ সুন্দরীর নাম কৃষ্ণা। বাঁকা তরোয়ালের মতো সরু গোঁফ, ছোরার হ্যান্ডেলের মতো জুলপি, মোষকালো ভয়ালদর্শন গুণ্ডের নাম শান্তিময় আর বীরেন্দ্রকুমার যিনি তাঁর রোগা হাড়গিলে চেহারা গলায় মাদুলি হাতে কবচ—নড়তে চড়তেই আঠারো মাস। রমণীরঞ্জনবাবু কোন পাণফাণ না করেই বিশেষজ্ঞ একটি বিশেষ ব্যাপারে—ডিভোর্স। কিন্তু আশ্চর্য মিল দেখেছি একটি নামে—বিকলাঙ্গ, বধির ও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষায় ও সেবায় নিবেদিতপ্রাণ শ্রীমতী অনুভূতি বসু। মহারাষ্ট্রীয় ও মধ্যপ্রদেশীয়দের মতো আমাদের নামের মধ্যে বাপ-ঠাকুরদার নাম বহন না করলেও রসসাহিত্যিক 'আই হ্যাজ'-এর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ঃ 'খুঁট ধরে টানলে তিন পুরুষ বেরিয়ে আসে—মেনকা— মেয়ে দুর্গা— নাতনী লক্ষ্মী আজও।'

এই বাহ্য। ডাকনামে নামডাক কারো কারো। কেউবা নামের চেয়ে 'সারনেম'-এ পরিচিত বেশি। কালীঘাটের কীর্তিবাস লেনের নৃপেন্দ্রনারায়ণ নাগচৌধুরীর খোঁজ করতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল, ডাকনাম বলতেই মুখিয়ে উঠল ছেলেছোকরারা ঃ ওহ, তাই বলুন নাড়ু, আমাদের নেড়ুদা... চন্দ্রবদন বসুর নাম শুনলে পটে-আঁকা ছবির মতো দেখতে রিসেপশনিস্ট চোখ কপালে তুলবে কিন্তু যেই বলবেন ঃ মিঃ সি বি আপনার কথা কেড়ে নিয়ে চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে বরাননা বলে উঠবেন ঃ ওহ, মিঃ বাসু...। আবার দেখুন স্যার জে সি বোসের চেয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে আমরা বেশি চিনি যেমন চিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চেয়ে স্যর পি সি রায়কে। হলিউডের ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী পঞ্চবল্লভার স্বামী-বদলের পরেও শেষ-মেশ 'মিস'টাই বজায় রাখেন। ভারতীয় ছায়াচিত্রের জগতে তার কার্বন কপি শুরু হয়ে গেছে।

মিডিয়ম ওয়েভ, ১৯০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যাণ্ড — ১৯, ২৫ ও ৩১

কিলোসাইকল্‌স — ১৫০৯৫ ১১৭৯০ ১১৮৭৫ ও ৯৬৪০

মিডিয়ম-ওয়েভ ১৯০ মীটার — ১৫৮০

আর ‘পেন-নেম’—যাকে ‘ছদ্মনাম’ বলে তাও খুব কমজোরী নয়। এই ছদ্মনামের চলন, মহাভারতের যুগ থেকে—অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডু-পুত্রেরা এই ছদ্মনামের আশ্রয়ে থেকেই মান এবং প্রাণ দুটোই বাঁচিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানেন বিশ্বজগতের বিশ্ব মানুষ কিন্তু ভানুসিংহকে? ঠাকুরবাড়ির পরিচিত জনৈক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভানুসিংহ নব-আবিষ্কৃত পুরাতন লেখক এই বিষয়ে গবেষণা-কর্মটি করে জার্মানী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নাকি লাভ করেছিলেন। ছদ্মনাম অন্য সব পরিচয় মুছে দিয়ে কখনো-সখনো আসল নাম হয়ে ওঠে : আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), মারাজন বন্দ্যোপাধ্যায় (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), কিশোর-বন্ধু পুষ্পাদ (যোগেন্দ্রনাথ বসু) কলকাতাসমাজের দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), রসসাহিত্যিক পরশুরাম (রাজশেখর বসু) একই এক উজ্জ্বল নজীর। হালফিল বাংলা-সাহিত্যে ছদ্মনামধারীদের যেন প্লাবন এসেছে। ছদ্মনামের আড়ালে থেকে মেঘনাদের মতো অন্তরীক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ শায়কে প্রতিপক্ষকে জর্জরিত ও ঘায়েল করার বিচিত্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে সেকালের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। ছদ্মনামও কখনো-সখনো সোনার অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যায় যেমন হয়েছে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির বিপ্লবী তরুণ চন্দ্রশেখর আজাদের বেলায়। স্বাধীনতাপ্রেমী নিজ নামের সঙ্গে নিজেই যুক্ত করেছেন ‘আজাদ’ এই উপনামটি।

নামগুণে ধন পায়, বিদ্যা বলো ভাবে, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে—এ যুগে এ আর কবিকল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। এ নামের গুণে কত অঘটন ঘটে যাচ্ছে আপনার চারপাশে তা আপনার এখনও অজানা? বিদ্যা-বুদ্ধি-সামর্থ্য-যোগ্যতা সত্ত্বেও নামগুণে বাজিমাত ভুলে আপাদমস্তক হয়ে আপনি আঙুল কাঁক উচিয়ে বাঁশ-বিজ্ঞাপিতে বসে মুখে দরজার মাথা কুটছেন আর ওদিকে মামার, মেশোর নিদেনপক্ষে শালাবাবুর নামে কত আহাম্মক মজা কি লুটেই না করে বেড়াচ্ছে! ‘মুরুব্বির জোর’ এই সংক্ষেপটিকে সার করে কিসমতকে ছিনিমিনি প্রয়োজনমত গড়ে বেড়াচ্ছে দেখেছি একাধিক ব্যক্তিকে।

আসলে নামই হল পাসপোর্ট—সৈনিকদের ‘পাস-ওয়ার্ড’, চোরাকারবারীদের গুপ্ত-সংকেত, স্বার্থশিকারীদের ‘খুলেন আই’ আর সুযোগসন্ধানীদের সাফল্যের সিঁড়ি। নামে গুণে যেমন আগুনও তেমনি। পাত্রাপাত্র চেনে শুধু মাত্রা নির্ধারিত করে নিতে হবে। আপনার যদি টাইম-জ্ঞান থাকে তাহলে নামের টাইম-বোমা দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষকে অনায়াসেই ঘায়েল করতে পারেন। যেমন ক্ষমতা-মত্ত কর্তাব্যক্তিদের কাছে একটি বিশেষ মন্ত্রণার বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে, বিশেষণ করে। কেননা, কোম্পানীর মধ্যে সচল রাখতে আপনি কি গাঁটছড়াই না কাটেন, মাস গেলে যা পান তা নিজের বউকে পর্যন্ত জানাতে লজ্জা করে আর ওদিকে ভ্রূকুটি না নেড়ে আপনার কর্মদেবতাদের মাতব্বরাই তুলসীবাবু কর্তার কানে শুধু ফুসমন্তর দিয়েই প্রোমোশন বাগিয়েছেন।

আবার নাম নেয়া মাত্রেই প্রশংসা পাওয়া যাকে আর্যাবর্তের বলে ‘অর্থোডক্সি’ কথা। সার, আপনার খুব নাম, একথা শুনলে কোন সাহেবই না ‘ভদ্র’ হয়ে যান। আসলে নামের চৌঠা সংযোগের প্রভাবই, যাকে বলে একেবারে ধন্বন্তরী। শুধু পাত্রাপাত্র-ভেদে প্রযোজ্য। মানুষ তো ছার!—বাবা বাবা দেব-দেবীরা এই নামের গুঁতোয় কাত হয়ে পড়েন—রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আর পুরাণের গল্পে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। সামান্য কারণে ওঁরা যেমন ফুঁসে ওঠেন ‘তর’ হয়ে পড়ে যেতেও ওঁদের বেশি তর সয় না।

অন্তরঙ্গ আলাপে বাধা পড়তেই বাংলা-সাহিত্যের এক দিক্পাল রেগে ‘দুর্বাসা’ হয়ে কোন ধরেই হুঙ্কার দিলেন, অপরপ্রান্ত থেকে একটি বিশেষ নাম কেন-বাহিত হয়ে তাঁর কর্ণগোচর হতেই দীপকরাগিণী থেকে তিনি নেমে এলেন একেবারে কড়ি-কোমলে—শুধু উনি কেন—আমি আপনি তিনি—আমরা সবাই সেই একই পাখির পালক নই কি এই দিক দিয়ে? ‘পাখি কেবা শুনাইল শ্যামনাম’ বলে শ্রীরাধিকার মতো পরিচিত প্রিয়জনের সামনে আকুল-ব্যাকুল না হতে পারি কিন্তু একটি পরিচিত প্রিয়নাম শুনলে হৃদ-সরোবরে দোলা—এখনও এই ‘পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ’-এর বয়সে—লাগে না ধর্মাধিকরণে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে সত্য-ভাষণের শপথের মতো তা অসার। প্রগাঢ় প্রসন্নতার চিহ্ন— স্বেদ-হর্ষ-পুলক-কম্পন আপনার দেহে দেখা না দিতে পারে কিন্তু পুরনো দিনের মিলন-বিরহ-কাহিনীর টুকরো টুকরো ছবি ‘ফিল্ম শর্ট’-এর মতো স্মৃতির পর্দায় চকিতে ভেসে উঠে সেকাল সময়-সীমার পারে অন্য লোকে অন্য কোনখানে সহসা নিয়ে গিয়ে আপনাকে একদিনও বিবশ ও আনমনা করে তোলে কিনা কি বুকে হাত রেখে আপনি বলতে পারেন? তবু বলবেন : নামে কি আসে যায়...

নামে আসে কিন্তু, যায়ও বহুত। নামী হলেই যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা—যা মন চায় তা করে বেড়ানোর অবাধ অধিকার। সাধারণ মানুষের মতো প্রাণ খুলে তখন হাসা নয়, মেপে-জুপে কথা বলতে হয়। অনুগ্রহপ্রার্থী আর উমেদারদের জ্বালায় ত্রাহি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে, সাত কথায় এমনভাবে ঘাড় নাড়তে হয় যাতে ‘হাঁ’ ‘না’ দুই-ই হতে পারে। পার্টি আর পজিশন রাখতে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে আপনজনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে—সংসার ও স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হতে হয়—নামী আর দামী মানুষদেরই এই হাল হয়। হারমোনিয়মের মাথার বাঁশিতে যেমন চেয়ে বাইরের জন্যে আপনার মন উচাটন হয়ে থাকে। স্বয়ং কবিগুরুই বলে গেছেন : ‘নাম যার বড়ো তার সংসারটা বড়ো অল্প বাইরেই বেশি।’ দামী মানুষের অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে। নাম-জাদা মানুষের বিবাহ স্বরূপ-বিবাহ বহু-বিবাহের মতোই গর্হিত?

আপনার নাম নেই। কেউ চেনে না। কিন্তু এক পারসেন্ট ইনস্পিরেশন আর নিরেনব্বই পারসেন্ট পারস্পিরেশন দিয়ে অনেক খেটেখুটে যেই একটু নাম করলেন অমনি হু হু করে অনেক কিছুই আসতে লাগল। হাতে হাতে ফলশ্রুতি। নামী হলেই দামী হবেন তখন আপনাকে নিয়ে কি নাচানাচিই না শুরু হবে। পরিবার খুব্রেদুবে যাবে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। প্রশংসার পোঁ কানে তালা ধরিয়ে দেবে। গুণীজন-সম্বর্ধনার গুঁতোয় আপনি হাঁফিয়ে উঠবেন। আপনি যদি শিল্পী বা সাহিত্যিক হন তাহলে তো আর কথাই নেই। আপনার লেখা বা রেখা পাবার জন্যে বইপাড়ায় ও সাময়িকপত্রের কর্ণধারমহলে ‘র‍্যাকেট’ বেঁধে যাবার যোগাড় হবে। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের ক্ষেত্রে চলন ও অব্যাহত রাখার জন্যে ভাড়া-করা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক ও শিল্পীদের শিল্পকর্মের অখাদ্য বস্তুগুলোও আপনার নামী ও দামী নামের ছাপ্পা বসিয়ে উঁচু প্রাইস আমদানী করে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স স্ফীত করতে থাকবেন। স্কুলের বিদ্যে নিয়ে লেখা অপরের কলেজের নোটবইয়ে নামী অধ্যাপক হিসেবে, নাম দাম দিতে আপনার বিবেকে বাধবে না। সস্তাতাড়ানো আর নাম-ডাকের জন্য কৌশলমতো চালিয়ে আপনি বাড়ি গাড়ি করতে পারবেন অতি অল্পদিনেই।

এইভাবে নামে আসবে কিন্তু।

আর চাষ আর পাটি যদি দুই-ই আপনার দখলে থাকে তাহলে আর কাল-বিলম্ব না করে নিজ নামের জয়ঢাক বাজাতে শুরু করুন, নাম-ডাকের আওয়াজ শুনলেই ধুলো ঝরবার জন্যে আপনার ধনভাণ্ডারীরা আপনি এসে জুটবে। ছলেবলে কৌশলে যেভাবেই হোক নাম করুন : শুধু নামের অহোরাত্র স্মর নিত্যম অনিত্যতায়?

আর নাম যদি না-ও হয় তাহলে বদ-নামই সই—যদুর বদলে গড় আর কি—অন্ততঃ একালে শাস্ত্রের বচনার মোহাং সব তিতিক্ষেত দেয় না—অতএব বন্ধুগণ—নামে কি আসে যায় সে প্রশ্ন না তুলে নামজপ শুরু করে দিন :

নিরঞ্জন, নিরঞ্জন, নিরঞ্জন [illegible]
[illegible]

[illegible]

সূর্যের জন্যে

নির্মলেন্দু রায়গুপ্ত

সারা দুপুর ছটফট করল দীপক। চোখে-মুখে জল দিয়ে এল বারকয়েক। কিন্তু ঘুম এল না তবুও। অথচ যেদিন নাইট ডিউটি থাকত, এসে তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া সেরে ও পড়ে পড়ে ঘুমোত সেই বিকেল পর্যন্ত। এক-একদিন মা এসে ঠেলে তুলত ওকে।

আসলে তন্দ্রার মতো একটু এসেছিল একবার। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ও ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। একটা অস্বস্তিকর ভয় ছেয়ে আছে। এখনও যেন দীপক দেখতে পাচ্ছে লোকটাকে। কুতকুতে দুটো চোখ। মুখের এখানে-ওখানে কাটা দাগ। ইস্পাতের মতো কঠিন মজবুত একটা কালো কাঠামো।

প্রথমে গা ঘিন-ঘিন করে উঠল দীপকের। কিন্তু তার পরেই কেমন যেন একটা আতঙ্ক ওকে ছেয়ে ফেলল। একটা নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক আর অসহায়তায় ও চোখ বুজল। যেন দিনের আলোয় ও দেখতে পাচ্ছে ভয়ংকর কিছু। যেন চোখ বুজে থাকলেই সেই বীভৎসতাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

বাবার কথা মনে পড়ল দীপকের। বাবা থাকলে নিজেকে এত অসহায় মনে হত না। অবশ্য শেষ দিকে উনি কেমন যেন অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তবু ছিলেন তো মাথার ওপরে ছায়ার মতো।

সেদিনটার কথা মনে আছে দীপকের। বাবা বেরিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই ওকে খবর দেওয়া হয়েছিল। মাকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। সেই বয়সেও দীপকের মনে হয়েছিল যেন শুধু বাবা নয়, সংসারটাও যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

সাধ্যমত চিকিৎসা হল। বাবার সহকর্মীরাও কিছু কিছু সাহায্য করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

দীপকের পড়াশোনার সেখানেই ইতি। ও অবশ্য ক্লাসে স্ট্যান্ড করত। মাস্টারমশাইরা চেষ্টা করেছিলেন। হেডমাস্টারমশাইও যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।

পড়ার সুবিধে হয়ত পাওয়া যেত। কিন্তু সংসারের জোয়াল কাঁধে নেবে কে?

ছোটবেলায় বাবা ওকে ঘুম থেকে তুলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সূর্যস্তব করাতেন—ওঁ জবাকুসুম—

বলতেন—মনে রাখবি, সূর্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক। ঘুম থেকে উঠবি সূর্যোদয়ের আগেই। প্রাণভরে প্রার্থনা করবি। তারপর প্রাতঃভ্রমণ এবং অধ্যয়ন। অধ্যয়ন হল তপস্যা। আমাদের মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন রে। মন্ত্রের মতো মনে করবি এসব কথা। বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে।

বলতেন—অমৃতস্য পুত্রা—

এমনি আরও কত কি। দীপক সব কথা বুঝত না। কিন্তু ভীষণ ভাল লাগত কথাগুলো।

বাবার কথা সর্বাশিববাবু ওদের স্কুলে পড়াতেন। উনিও দীপককে খুব ভালবাসতেন। ও যেবার ফার্স্ট হল ক্লাস নাইনে, উনি দীপককে ডেকে অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন।

বলেছিলেন—বড়ো হও বাবা, উন্নতি করো—

ওর দু চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

দীপক মনে-মনে ঠিক করেছিল আরও ভাল করে পড়বে এবার থেকে। বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে। রাতে বাবা ওকে কাছে ডাকলেন। বললেন—দ্যাখো, তোমার ওপর এখন আমার অনেক আশা। একদিন আমিও স্বপ্ন দেখতাম অনেক। অনেক সাধই ছিল। কিন্তু সংসারের জন্য পারি নি। আমি চাই—

উনি আর বলতে পারেন নি।

তার কিছুদিন পরেই ওই দুর্ঘটনা। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে ভেঙে পড়ে নি দীপক। একটা প্রেসে কাজ জুটিয়ে নিল। সামান্য মাইনে। ওভারটাইম করলে আরও কিছু। নিজেকে অনেক বোঝাল দীপক। এছাড়া করার কি ছিল। তাছাড়া ওর হাত দিয়ে কত বইপত্র ছাপা হয়ে বেরুবে। কত ছেলে-মেয়ে পড়বে সেসব।

ওরা বড় হবে। মানুষ হবে।

রুমা বড় হবে। ঝুমাও হবে। একদিন।

ওদের ভালো করে বিয়ে দিতে হবে। বেশ সুখের সংসারে। ব্যাস, তারপর নিশ্চিন্ত। মাকে নিয়ে একটা ভালো ঘরে—

এদিক-ওদিক তাকাল দীপক। মনটা মুহূর্তে বিষিয়ে উঠল। এখানে-ওখানে ছেঁড়া জামা-কাপড় ছড়ান। ভাঙা ট্রাঙ্ক। একটা ছাতা ঝুলে রয়েছে। একদিকে একটা আলনা কয়েকটা ছাপা শাড়ি আর মেয়েদের টুকিটাকি জিনিস। একটা চেয়ারে কতগুলো এলোমেলো বই। ঘরের একটা দিকের বেড়া হাঁ করে আছে।

ওর মনে পড়ল এবার বর্ষায় ঘরে জল পড়বে টিনের চাল থেকে।

নাঃ, এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।

প্রেসে স্ট্রাইক চলছে আজ সতেরো দিন হল।

প্রথম দিন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলছিলেন—বন্ধুগণ, আমরা ঐক্যবদ্ধ। জয় আমাদের হবেই। মানুষের দাবীকে কিছুতেই আর চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। এই লড়াই বাঁচার লড়াই। এই লড়াইতে সবাইকে সামিল হতে হবে।

কি বিপুল উদ্দীপনা তখন। কি হাততালি।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্ট্রাইকের কথা শুনে দীপকের বুকটা কেঁপে উঠল। যদি মালিক মেনে না নেয় দাবী? যদি প্রেসটা বন্ধ করে দেয় একেবারে?

কিন্তু কখন কে জানে, ও সবার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এক কঠিন প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আজ এতদিন পরে এই মানুষগুলোকে ওর আত্মীয় বলে মনে হল। মনে হল এতগুলো লোক যদি এগিয়ে যেতে পারে, ও কেন ভয়ে পিছিয়ে যাবে?

প্রেসিডেন্ট আরও বললেন — আসুন, আমরা সব দ্বিধা, সব বিভেদ ভুলে আমাদের এই লড়াইতে সামিল হই।

দাঁতে দাঁত চেপে দীপক বলেছিল—হ্যাঁ, আমিও আছি। জয় আমাদের হবেই।

অথচ—

মা এসে ঢুকল।

বলল—কি রে, উঠবি না?

একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল দীপক। এ যেন মা নয়, অন্য এক মানুষ। বিবর্ণ একটা থান পরনে। জীর্ণ এক কাঙালী।

মা ওর কপালে হাত দিল।

আর তখনই টোনার কথা মনে পড়ল দীপকের। সেই কুতকুতে দু চোখ। শক্ত চোয়াল।

দীপক আস্তে আস্তে বলল—মা, আমার না, কেন কে জানে, ভীষণ ভয় করছে।

মা হাসল। বলল—তুই কি যে ভাবিস এত? এত লোকের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। ওঠ, চা খেয়ে নে।

দীপক উঠে বসল। তবু বলি-বলি করে মাকে সেই কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন বুকের মধ্যে গুমরে উঠল।

সেদিন চাকরীর খোঁজে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে হেঁটে ফিরছে লেকের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ চোখ পড়ল দৃশ্যটা। নিজেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারেনি ও প্রথমে।

একটা গাছের নীচে রুমা ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছে টোনার সঙ্গে।

মুহূর্তে আগুন হয়ে গিয়েছিল দীপক। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। বাড়ী ফিরে এল এক বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো।

বিষিয়ে উঠেছিল মনটা। মনে হয়েছিল এত কষ্টে-গড়া সংসারটা যেন দুলে উঠেছে। যেন অমোঘ রন্ধ্রপথ দিয়ে পাপের বীজ আমদানি হয়েছে ঘরে।

রাতে দীপক রুমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল।

বলল — আজ সন্ধ্যের সময় কোথায় গিয়েছিলি?

রুমা চুপ করে রইল।

চাপা গর্জন করল দীপক—ননসেন্স। লজ্জা করল না? একটা লোফারের সঙ্গে—উঃ। তুই বাবার কথা ভুলে গেছিস? ছিছি—

রুমা একটা কথাও বলে নি।

দীপক বলেছিল—আর যেন কখনও না হয়।

পরদিন বিকেলেই টোনা দীপককে ডেকেছিল।

কোমরে হাত রেখে বলেছিল—কি রে, খুব যে রস্তু, এাঁ—

গাম্ভীর্য রেখেই দীপক বলল—ভালভাবে কথা বলো। কি হয়েছে—

টোনা বলেছিল—খুব যে দিদিকে শাসন করছিস। বড় বড় বাত শুধু। এতদিন তো ঘুরলি খুব। বিয়ে দিতে পারলি? হাওড়ার ওরা পণ চেয়ে বসতেই তো ভিরমি খেলি। শালার কুল পার্টি।

থেমে গিয়ে টোনা বলল—চল, তোকে এগিয়ে দিই।

হাঁটতে হাঁটতে দীপকের কোমরে কি যেন শক্ত কোন বস্তুর স্পর্শ লাগল। একটু চমকে উঠল ও। হা-হা করে হেসে উঠল টোনা। বলল—ভয় পেলি? ও কিছু না রে।

মুহূর্তে একটা শীতল স্রোত দীপকের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল।

টোনা খুব ঘনিষ্ঠভাবে বলল—যাকগে, শোন, শুনলাম তুই নাকি ওই শালাদের দালাল পার্টি করছিস?

দীপক গাঢ়স্বরে বলল—আমি কোন রাজনীতিই করি না।

টোনা বলেছিল—হুঁ, একটু সামলে। তারপরেই ও ফিরে গেল।

ঘৃণায় সারা শরীর রিরিয়ে গেল দীপকের। তাহলে রুমা প্রতিশোধ নিয়েছে। যাকগে, এই ভালো।

আর কিছু বলবে না দীপক। যার যা ইচ্ছে করুক।

এখন একমাত্র—

—দাদা, তোমার খাবার।

ঝুমা বাটিটা টেবিলে রাখল।

মুহূর্তে প্রসন্নতায় ভরে গেল দীপকের মন। আহা, এই একটি বোন তার। ফুলের মতো নির্দোষ নিষ্পাপ। ক্লাস এইট-এ ফার্স্ট হয়েছে। মাইনে, বই এসব কিছু লাগে না। হেডমিস্ট্রেস একদিন দীপককে ডেকে ঝুমা সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করেছিলেন। কেয়ার নিতে বলেছিলেন একটু। দীপকের অবস্থার কথা শুনে ফি মাফ করে দিলেন।

গর্বে দীপকের মন ভরে গিয়েছিল।

ঝুমার প্রাইজের বইগুলো আর গুড কন্ডাক্টের মেডেলটা দীপক নিজের কাছেই রাখে। আনন্দে নাড়াচাড়া করে। যদি একটু উন্নতি হয় ওর চাকরীর, ঝুমার জন্য প্রাইভেট টিউটার রাখতে হবে। বইপত্র—

দীপক ডাকল, ঝুমা শোন, কাছে আয়—

—বলো। পাশে এসে দাঁড়াল ঝুমা।

দীপক বলল—নারে, কিছু বলব না। তোকে একটু দেখি। কি মিষ্টি হয়েছিস রে তুই। ঠিক বাবার চোখ, বাবার মুখ। শোন, তোকে একটা কথা বলি।

দীপক এবার ফিসফিস করে উঠল যেন। বলল—তুই কিন্তু দিদির মতো হবি না। ঝুমা, তুই আমার একটা মাত্র বোন। আমি জানি তুই আমার দুঃখ বুঝবি। বাবারও কত সাধ ছিল—

ঝুমা মাথা নীচু করে রইল।

দীপক বলল—যা, যা গিয়ে বোস্।

ঝুমা বেরিয়ে গেল। ফিরে এল একটা বই নিয়ে।

বলল—দাদা, সীমাদি এসেছিলেন। এই বইটা দিয়ে গেছেন।

নিস্পৃহভাবে দীপক বইটা নিল।

খবরের কাগজের মলাটটা খুলতেই একটা চিঠি বেরিয়ে এল। সন্ধ্যার সময় সেই গাছটার নীচে দাঁড়াতে বলেছে।

কিন্তু কোন আবেগ অনুভব করল না দীপক।

কি হবে কে জানে? ভয় কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে দেখা করার দুটো দিন গেছে। পালিয়ে বেড়িয়েছে দীপক। মনে হয়েছে সাক্ষাতের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এখন পিছনে সরে যাওয়া কাপুরুষতা।

কিন্তু এত কি দরকার? তবে কি ভবানীপুরের সেই সম্পর্কটা ঠিক হয়ে গেল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে এল।

জামা প্যান্ট পরল দীপক।

মা শুয়ে আছে।

দীপক জিজ্ঞেস করল—ওষুধটা খেয়েছো মা?

মা বললেন—হাঁ। শোন, বেশি রাত করিস না।

ও ঘরেও উঁকি দিল দীপক। না, দাদা নেই। থাক্, মরুক গে।

ভেতরে ঝুমা পড়ছে। কিন্তু ওকেও দেখা গেল না।

সীমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। জানাতে হবে সব কথা। পরামর্শ করতে হবে দুজনের ব্যাপারটা নিয়ে।

এখন পর্যন্ত কাউকে বলতে পারে নি। এমনকি মাকেও না।

ছোটবাবু ওকে ডেকেছিলেন।

ও তো শুনে অবাক। কিন্তু গেল, ছোটবাবু ডেকেছেন বলেই। ওঁর বয়স অল্প। মিষ্টি কথাবার্তা। মালিকদের মধ্যে উনিই এদের দুঃখকষ্টে সাহায্য করেন বেশি।

উনি বলেছেন—দীপক, কয়েকদিন আগে একটা কথা জানলাম। তুমি তো আমাদের স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রবাবুর ছেলে?

দীপ সায় দিল।

উনি বললেন—দ্যাখো, কি দুঃখের কথা। এতদিন আমি জানতামই না। তিনি আমার মাস্টারমশাই। যাই হোক, এতদিন না হয় ভুলই হয়েছে। এখন বরং একটা—

দীপক চমকে উঠল।

উনি বললেন—না, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। তোমার ওপরেই নাকি সংসার। আমি শুধু চাইছি তোমায় একটু সাহায্য করতে। বলতে পারো শুধু—

উনি কি যেন ভাবছিলেন।

বললেন—শোন, আমাদের বিহারে একটা প্রেস আছে মস্তো বড়ো। মেজভাই দেখেন, ভালো নিশ্চয়। তুমি বরং সেখানে চলে যাও। আমি লিখে দিচ্ছি। এটার আশা করো না। তোমাদের দাবি মানতে গেলে আমরা দেউলে হয়ে যাবো।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দীপক।

মনে পড়ল—প্রেসিডেন্টের কথা। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। এই লড়াইতে সকলে সামিল হলে জয় আমাদের হবেই। দাবি কিছুতেই—

কিন্তু বিহার কতদূর? মায়ের কথা মনে পড়ল দীপকের। চিকিৎসা হচ্ছে না। পথ্য দিতে পারছে না। আর কদিন কে জানে। দাদা খরচের খাতায় অবশ্য। কিন্তু ঝুমা? আহা, কি মিষ্টি, কি শান্ত। ঠিক বাবার চোখ, বাবার মুখ। ও নিশ্চয়ই বড়ো হবে। অনেক বড়ো হবে। একটু শুধু সুযোগ দেওয়া দরকার। বইপত্র, একজন প্রাইভেট টিউটার, কতকিছু চাই। সামনের বছর ও শাড়ি পরবে। রংবেরঙের শাড়ি যোগানো পারবেন। ওর হঠাৎ ঝুমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ঝুমাকে বড়ো করে দিতে হবে। বড় খুব বিদ্বান হবেন। ঝুমার অবস্থার কোন মাস্টারমশাই বা প্রফেসার। তাঁর ঘরেও প্রাইজের বই থাকবে, গুড কন্ডাক্টের মেডেল—

ছোটবাবু বললেন—কি ভাবছো?

দীপক হঠাৎ বলল—আমি যাবো।

উনি হাসলেন। বললেন—গুড।

খসখস করে কি যেন লিখে দিলেন একটা প্যাডের কাগজে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা একটা কথা, যোগাযোগ অবশ্য ছিল না। কিন্তু তুমি কি জানতে যে আমি তোমার বাবার ছাত্র?

দীপক বলল—হাঁ। কিন্তু বাবা পরিচয় দিতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, আপনি যদি নিজে থেকে—

ও থেমে গেল।

ওর কিন্তু মনে হচ্ছে কাজটা ভালো হল না। এইভাবে পালানো ভীরুতা। একবার ভাবল, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল যে আগে সীমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার।

বাইরে খোলা হাওয়াটা ঠেলে দিয়ে দীপক রাস্তায় নামল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেই গাছের নীচে দাঁড়াতে হবে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই সীমা পৌঁছে গেছে। হাল্কা একটা সুগন্ধ ভেসে এল। সীমার চোখদুটো মনে পড়ল দীপকের।

এই যে—

দীপক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। সদাশিববাবু আসছেন।

ওঁর সামনে আর দাঁড়ানো যায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীপক।

ও হাঁ, বাধা পড়ছে ভালোই হয়েছে। তাড়াহুড়োয় চিঠিটা আনতে মনে নেই।

দীপক বাড়ির দিকে ফিরল।

কলতলার ওপাশে একটা ফিসফিস শব্দ ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে ওখানে? নিশ্চয় ঝুমা। সঙ্গে হয়তো সেই বেটা শয়তানটা। একটা নিষ্ফল আক্রোশে ওর হাতদুটো নিশপিশ করে উঠল।

ওদের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে।

একটা পুরুষকণ্ঠ বলছে—কিন্তু ঝুমা, তাহলে তুমি এতদিন আমায় শুধু শুধু ঘোরালে কেন? বলো, জবাব দাও।

ঝুমার গলা শোনা গেল—আমার ভুল হয়েছিল। আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না মানিকদা। আমাদের বড়ো দুঃখের সংসার। বাবা দাদা—এঁদের অনেক আশা—

থাক্, আর শোনার দরকার নেই। চিঠিটা নিয়ে ও বেরিয়ে পড়ল।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২০৭৪

আচমকা একটা গুলী যেন এসে বিঁধেছে দীপকের বুকে।

আহারে, বুড়ো বুড়ো! তুইও? কি সরল নিষ্পাপ চেহারা। বাবার চোখ, বাবার মুখ—থাক। থাক। দুঃখ করে লাভ নেই।

যে যার পথ দেখে নিক্। কারো জন্য ভেবে লাভ নেই।

সীমাকে সব কথা জানাতে হবে। মাকে আর ওকে নিয়ে কালই বিহার চলে যাবে। নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে। ছোট্ট একটা নিরালা সংসার। টুকিটাকি জিনিস, সাধ-আহ্লাদ। আবার ও পড়াশোনা করবে। সীমা কতদিন বলেছে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে দিতে। কিন্তু এই সংসারটার জন্য হয়নি কিছু। নাঃ, আর নয় এই গোলকধাঁধায়।

বাবার কণ্ঠে স্বপ্ন ছিল। সূর্যের সেই প্রাণশক্তি—

—এই যে চাঁদ, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

অন্ধকারে মুখ-সাইকেল দোকান থেকে ফিরে দেখল।

—এই শালা, দুর্যোধনের বাচ্চা, দুঃশাসনের মালিকের সঙ্গে মিশেছিলি কেন? ভেবেছিলি কেউ টের পাবে না, না?

দীপকের জামার কলার টেনে ধরল একজন।

—বল শালা, কেন মিশেছিলি।

কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল লোকটা।

—শালা দালাল—

—মার শালাকে, মার, মার—

হঠাৎ লোকগুলো সজাগ হল। এলোপাথাড়ি ঘুঁষি আর লাথি পড়তে লাগল।

উঃ।

দীপক লুটিয়ে পড়ল। মুখ নোনতা হয়ে গেছে। রক্তের স্বাদের মত। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে জামা-প্যান্ট। শরীর দুমড়ে গেল যেন।

অনেকক্ষণ পরে মনে হল সব শান্ত হয়ে গেছে। বাড় এখন কই? কেউ কোথাও নেই কেন? সব যে এই অন্ধকার লাগছে। পৃথিবীটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি মরে গেল?

বাবা বলতেন—সূর্যের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক। হ্যাঁ, প্রাণ। শুধু বাঁচা নয়। বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে। অমৃতস্য পুত্রাঃ—

ওই সুন্দর মুখটা কার? আহারে, কি সরল, কি নিষ্পাপ। কে, বুড়ো? ওঃ, তুই। তোর প্রাইজের বই, পড়ে কন্ডাক্টরের ফেরতা—

না না, তুইও আমার বোন না। তুই কেউ না আমার। আমার কোনো বোন নেই। তুই কাঁদছিস? কিন্তু, শোন, কাঁদিস না। তুই যদি মানিককে সত্যি ভালবাসিস, কি আর করবি। আমার জন্য শুধুশুধু কষ্ট পাবি কেন? কুমারকে কি আমি কষ্ট দিয়েছি। দিই নি তো।

এই তো সীমা। সীমা, তুমি এসেছো? আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। জানো বিহারেও একটা প্রেস আছে—আমার পকেটে চিঠি—এটা দেখালেই—বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমায় ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করো। আমি আবার পরীক্ষা দেবো, বাবা বলতেন জ্ঞানার্থে অধ্যবসায় তপঃ। মুনি-ঋষিরা—

ওঃ, মা, মাগো। কি রোগা হয়ে গেছ তুমি। ময়লা একটা থান পড়েছ কেন মা? তোমার আর শাড়ি নেই? সেই যে ছোটবেলা আমায় নিয়ে পরেশনাথের মন্দিরে গিয়েছিলে—ঝিকমিক করছিল মন্দিরটা। ঢং-ঢং করে বাজছিল ঘণ্টা—আরতি চলছিল। আর তখন, তখন তোমাকে প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল—ঠিক যেন—

আঃ, কি ঘুম পাচ্ছে। কি ঘুম। সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। একটা সবুজ, নীল একটা আলো—একটা শাড়ি এসে তখন তার পাশে থামল।

আপনার স্বপ্ন সফল ক'রে তুলুন আজই ব্যাঙ্ক অফ বরোদা'য় রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট খুলুন

কি চান আপনি? টেবিল ফ্যান? রেডিও? সাইকেল? আপনার সেই চাওয়ার স্বপ্ন সফল ক'রে তুলবে-- ব্যাঙ্ক অফ বরোদার রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট। সঞ্চয় করুন অল্প অল্প ক'রে, মাসের পর মাস, আমরা তার সঙ্গে যোগ করবো ভালো সুদ। তারপর, খুব শিগগীর একদিন আপনার যথেষ্ট টাকা হয়ে যাবে, আপনার স্বপ্ন সফল করে তুলতে পারবেন।

চিরসমৃদ্ধির সোপান

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

হেড অফিস: মাণ্ডভি, বরোদা

ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যের সেবায় রত [illegible]টিরও বেশী শাখা।

ইউ.কে., পূর্ব আফ্রিকা, মরিশাস, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ও গিয়ানাতেও শাখা আছে।

পলিও ও পিতামাতার কর্তব্য

মৃণালকান্তি দত্ত

সাধারণের কাছে পরিচিত 'পলিও' সকল রকম শিশুদের জীবনেই একটা সাংঘাতিক রোগ হোয়ে আসতে পারে নানা কারণে। এদের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাত্র দুটি। প্রথমোক্ত কারণে শিশুরা কোন অঙ্গ বা অঙ্গবিশেষে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং সারাজীবন এইভাবে কাটাতে থাকে। শেষোক্ত কারণে শিশুদেরকেই এই রোগ আক্রমণ করে বেশি। সাধারণতঃ খাদ্য বিশেষ করে ঠান্ডা খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই রোগ সংক্রামিত হয়। এই সংক্রমণ শ্বাস-প্রশ্বাস, থুথু এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ মাধ্যম সহযোগেও হোতে পারে।

পলিও কি?

- এই রোগটা বাচ্চাদের ছেলেবেলা থেকেই শুরু করে দেয়—যাকে বলে বালা পক্ষাঘাত। যদিও সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত বয়স্কদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে।
- হাত, পা বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় পেশীগুলিই হয় এই রোগের শিকার।
- সাধারণতঃ ছয় থেকে বারো বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েরাই এই রোগের আক্রমণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এক থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে যখন নাকি শিশুদের পেশীচালনা শুরু হয়, তখনই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বেশি সম্ভাবনা।
- পলিও আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংক্রান্ত অসাড়তায় ভোগে। তবে দেহের অন্যান্য অংশেও এই অসাড়তা দেখা দিতে পারে—যেমন মস্তিষ্ক ইত্যাদি। তবে সেরকম দৃষ্টান্ত খুবই যৎসামান্য।
- পলিও জীবাণুসংক্রান্ত একটি রোগ। এর জীবাণুগুলি মেরুদণ্ডে (কশেরুক কিরীটে) সাধারণতঃ জমা হবার স্থান করে নেয়। পক্ষাঘাত আরম্ভ হবার আগে রোগের প্রাথমিক স্তরে এই রোগ নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ। এর জন্যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র, মাধ্যম এবং বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

রোগের প্রাথমিক লক্ষণ :

- পলিও রোগ আরম্ভ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার মত অত্যন্ত সাধারণ অসুস্থতা নিয়ে। সুতরাং প্রথমেই এই রোগকে পলিও বলা অত্যন্ত কঠিন। এক হাজার ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত রোগের মধ্যে মাত্র পাঁচটি পলিও হিসাবে নির্ণীত হতে পারে।
- এই রোগের প্রারম্ভে ২।৩ দিন ধরে অত্যন্ত অল্প বা বেশি জ্বর হয়, সারা গায়ের ব্যথা এবং মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি থাকে। এর পর ঐ যন্ত্রণা শরীরের কোন নির্দিষ্ট অংশে কেন্দ্রীভূত হয়।
- ইনফ্লুয়েঞ্জার সারা শরীরে একটা অস্পষ্ট ব্যথা হয়। কিন্তু পলিও রোগে ঐ অস্পষ্ট ব্যথা দেহের কোন নির্দিষ্ট অংশে হতে থাকে।
- তারপরেই আরম্ভ হয় অঙ্গে অসাড়তা অর্থাৎ অঙ্গ বা পেশী শিথিল হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত দেহাংশের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।
- এই রোগের প্রারম্ভে অথবা অধিকাংশ পেশীর অসাড়তা অনুভূত হয়। শেষপর্যন্ত ২।৩ দিন পরে ঐ অসাড়তা কিছু নির্দিষ্ট পেশীতে এসে সীমাবদ্ধ হয় এবং ঐখানেই স্থায়ী হয়।

যত্ন :

পলিও রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রাথমিক অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো খুব ভালো করে অনুধাবন করা দরকার:—

(১) শক্ত বিছানায় একেবারে বিশ্রাম
(২) কোনরকম নড়াচড়া করা নিষেধ
(৩) কোনরকম ম্যাসেজ একেবারে বন্ধ
(৪) কোন ইনজেকশন দেওয়া চলবে না
(৫) কেবলমাত্র গরম সেক দেওয়া যেতে পারে

মহম্মদপুর হাসপাতালে একটি শিশুকে চামচে করে পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানো হচ্ছে।

খাদ্য :

এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে ভাল এবং টাটকা প্রোটিনযুক্ত খাদ্যই খাওয়ান উচিত।

চিকিৎসা :

দুই সপ্তাহ পরে পেশীর যা-কিছু চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর এবং আদর্শ বাসস্থান ও খাদ্য প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজন।

পলিও ভ্যাকসিন :

* আজকাল পলিও ইনজেকসনের বদলে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি 'ওরাল ভ্যাকসিন' (তরল) বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।
* পলিও ভ্যাকসিন-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পনের বছরেরও বেশী শেষ হয়েছে।
* এই 'ওরাল ভ্যাকসিন' খুবই কার্যকরী এবং প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই দেওয়া উচিত।
* এই পলিও ভ্যাকসিন খুব সুক্ষ্মভাবে পরিমাপ মত ডোজে তৈরী। এর তিনটি ডোজ বাচ্চাদের দেওয়া উচিত।
* শিশু যখন সাধারণতঃ সুস্থ থাকে অর্থাৎ জ্বর, ডাইরিয়া, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা —এই রকম কোন রোগে না ভোগে, তখনই এই ভ্যাকসিন দিয়ে নেওয়া উচিত।

ভ্যাকসিনের প্রকৃষ্ট সময় :

* 'ভ্যাকসিনেশন'-এর প্রথম ডোজ শিশুর ৩ মাস বয়সের সময় দেওয়া উচিত। তারপর দুই ডোজ প্রত্যেকটি ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ব্যবধানে দিলেই হয়।
* পলিও ভ্যাকসিন-এর ফল খুব সুদূর-প্রসারী। তবুও ২।৩ বছরের সময় অতিরিক্ত ডোজও নেওয়া যেতে পারে বেশী সাবধানতার জন্যে।

আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় :

— ভারতে বেশির ভাগ পলিও রোগে আক্রান্ত হয় শিশুর বয়স যখন ১২ বছরের মধ্যে এবং এ-সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অবশ্য যদিও এটা পাশ্চাত্যের মত তত তীব্র নয়।

— আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশুর জন্যে প্রচুর ভ্যাকসিন আমাদের থাকে না।

— রোগ নির্ণয়ের ভুলের জন্য এবং যথাযথ চিকিৎসার অভাবে আমাদের দেশে বহু শিশু পলিওতে ভোগে।

— সঠিক চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে করা যায়, তবে পলিও থেকে রোগমুক্তি নিশ্চিত।

— পিতামাতা যদি শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তাহলে পলিও আক্রমণ থেকে শিশুকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা সম্ভব।

প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত ও চারুশিল্প আকাদেমির বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনী গৃহে গত ৯ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চাশখানি চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের মধ্যে কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পীদের অল্প কাজই উপস্থিত ছিল। শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক প্রদর্শনীর কাজও কিছু কিছু এখানে উপস্থিত করা হয়েছিল। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পকর্মগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। পেন্টিং-এর দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজের নিদর্শন অতি সামান্য। নির্বাচন কমিটির কাজ আরো প্রশংসনীয় হতে পারত। অমরেন্দুলাল চৌধুরীর 'লাভার' ড্রয়িংটি মন্দ নয়। অমিতাভ ব্যানার্জির সিটিং ফিগার একটু বেশী ডেকরেটিভ লাগল। গণেশ পাইনের 'ফল' একটু গুরুভার বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা। তবে পতনোন্মুখ আকৃতিটি পড়ছে না উঠছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কার্তিক সিংহের অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি সী স্কেপ কালো জমির ওপর শাদা অংশ যেন চিচিংফাঁক হয়ে দেখা দিয়েছে। সনৎ ভৌমিকের ইনভোকিং দি হোলি স্পিরিট ভারতীয়ত্বের ছাপ বহন করছে। গ্র্যাফিক বিভাগে শ্যামল দত্তরায়, লালু শা ও শৈলেন মিত্র কয়েকটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন অ্যাবস্ট্রাকশন উপস্থিত করেছেন।

ভাস্কর্য বিভাগেও উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে মাণিক তালুকদারের টর্সো এবং বার্ড ও সরল ঘোষের শরণার্থীর নাম করা যায়।

নির্মলকুমার দত্ত ম্যাক্সমুলার ভবনে ১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর টাইপরাইটারে আঁকা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতির একটি সুন্দর প্রদর্শনী করলেন। মা সারদামণি, বিপিন পাল, রাধাকৃষ্ণণ, গ্যাগারিন, ম্যাক্সিম গর্কি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জওহরলাল প্রমুখ কয়েকজনের প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল।

●

১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে বাংলাদেশের বিয়োগান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী সুবর্ণ পাল কুড়িখানি শাদা কালো এবং পেন্সিল স্কেচের প্রদর্শনী করলেন। ছবিগুলি ফিগারেটিভ ও প্রতীকধর্মী। পাক সৈন্যদের গোপন আক্রমণ থেকে শুরু করে তাদের বীভৎস হত্যালীলা, শরণার্থীদের পলায়ন ও দুর্দশা এবং বাংলাদেশের শৃঙ্খলমুক্তির অভিযান তাঁর স্কেচগুলির বিষয়বস্তু। শরণার্থী সিরিজের কয়েকটি ছবি বক্তব্যকে পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছে। পলায়নপর পিতা ও খেলনা নিয়ে মত্ত শিশুর ছবিটি মর্মস্পর্শী।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি ১৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর এপার বাংলার শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্যের এক বিরাট প্রদর্শনী করলেন। পঞ্চাশখানির অধিক শিল্পকর্মের এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের দুর্ঘটনার ভিত্তিতে অনেক বহুবর্ণরঞ্জিত ও বর্ণোজ্জ্বল ছবির সাক্ষাৎ মিলেছিল। বিপ্লবের যুদ্ধ, ধ্বংসের শিকার, স্বাধীনতার লড়াই ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিল্পীদের চিন্তাধারার বিকাশ প্রদর্শনীতে দেখা গেল। বেশীর ভাগই অ্যাবস্ট্রাকশন ঘেঁষা বা আধা ফিগারেটিভ কাজ। প্রচুর করণ কৌশলের সাক্ষাৎ এখানে মিলল। কোন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মানবিক ট্র্যাজেডি কলকাতার আধুনিক শিল্পীদের মনে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার নিদর্শন হিসেবে এটি বেশ তথ্যপূর্ণ প্রদর্শনী। প্রকৃতপক্ষে ওপার বাংলা ও এপার বাংলার শিল্পীদের এই প্রদর্শনী দুটি যদি কোন সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া যায় ত ভবিষ্যতের দর্শকবৃন্দ এর থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় অনুভব করতে পারবেন এবং সেদিক থেকে বুদ্ধিজীবীদের আয়োজিত এই প্রদর্শনী দুটি বিশেষ মূল্যবান। সমকালীনের চোখে এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তবে একটা কথা মনে হয়েছিল যে এই শিল্পকর্মগুলি দর্শনের পর রাগ দুঃখ

শাড়ীর মেলা
ফোন: ৩৪-৮৮৮৩
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট [illegible] (পূর্ব) কলিকাতা-৭

যা সমবেদনা ইত্যাদি বিশেষ ভঙ্গিক্রমে অঙ্কন করা যায়নি।

●

নেপালে প্রবাসী শিল্পী, বি, আর বজ্রাচার্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর নেপালের নাগরিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রায় চল্লিশখানি ছবির একটি প্রদর্শনী করেন। খাড়াই এবং আড়াআড়ি কম্পোজিশনের ছবিগুলির ফ্ল্যাট ট্রিটমেন্ট উজ্জ্বলবর্ণ ছবিগুলির বিশেষ আকর্ষণ। অবশ্য এই ধরনের কাজে মাঝে মাঝে পোস্টারের এফেক্ট এসে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক ছবির স্পেস সৃষ্টি এবং বিশেষ বিশেষ মুড সৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয়। ক্যানভাসের আর্কিটেক্ট ও আর্কিটেকচারাল বিভাজন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছে। কখনো কখনো সরল ফিগারেটিভ দেখা যায় ছবিতে একটা বিশেষ মাত্রা আনতে পেরেছে। আর ফিলেজ, চিত্রবান, কাঠমাণ্ডুর মন্দির প্রাঙ্গণ প্রভৃতি ও পাহাড়ী দৃশ্য, পাটনের দরবার, হনুমানধোকা ইত্যাদি ছবিগুলিতে তাঁর কাজের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

●

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রায় পাঁচশখানির মত ছবির একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। অবনীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের কাজের বিখ্যাত নিদর্শনের মধ্যে, অভিসারিকা, বিরহিণী, দেবদাসী, বুদ্ধদেবের পত্র, এবং বৈষ্ণব ইত্যাদি ছবিগুলি এবং শাজাহানের তাজ নির্মাণের স্বপ্ন ছবিখানি প্রদর্শিত হয়। শেষোক্ত ছবিটি তাঁর ওয়াশ টেকনিকের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গগনেন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে তাঁর কুরুক্ষেত্রের পর সন্ধ্যা বিধবা, কিউবিস্টিক ভঙ্গীর রহস্যপুরী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক তিনখানি ব্যঙ্গচিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের আঁকা নিজের ও অন্য কয়েকটি মুখমণ্ডল উপস্থিত করা হয়েছিল। ছবিগুলি সুন্দরভাবে বাঁধান কিন্তু প্রদর্শনের ব্যবস্থার দোষে ছবির ভেতর আলোর প্রতিফলন হওয়ায় দেখতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল।

●

২০ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ইউ এস. আই এস অডিটোরিয়ামে শ্যামল দত্তরায়, অমিতাভ ব্যানার্জি ও মৈত্রেয়ী ব্যানার্জির একটি যৌথ চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটি পরে ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর দিল্লীতে প্রদর্শিত হবে। তিনজনের কাজেই অ্যাবস্ট্রাকশন ও ফিগারেটিভ দেখা কাজ দেখা গেল। মৈত্রেয়ী ব্যানার্জির রং ও কম্পোজিশনের মধ্যে ফ্ল্যাট ভাবটাই প্রধান। রঙের টোনাল এফেক্ট আনবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। কোথাও কোথাও আর্কিটেকচারাল গঠনের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। অমিতাভ ব্যানার্জি ও শ্যামল দত্তরায়ের ডেকরেটিভ ডিজাইন খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে অবশ্য উভয়ের প্যাটার্ন আলাদা। শ্যামল দত্তরায়ের ডিপার্চার, প্রমিথিউস বাউণ্ড ও মিউজিক সেলফ এবং অমিতাভ ব্যানার্জির নিউ বর্ন, স্প্রিং অব লাইফ ও আনিউ উল্লেখযোগ্য ছবি। সমগ্র প্রদর্শনীর সজ্জা প্রশংসনীয়।

"ইণ্ডিয়ান অরিগ্যামিস্ট" সংস্থার উদ্যোগে বাগবাজারের গোপীমোহন বসু লেনে পূজোর সময় কাগজ ভাঁজ করা মডেলের একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়েছিল। অনেকগুলি কাজ ছোট ছেলেদের ছড়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়। জাপানী প্রথায় কাগজ ভাঁজ করে নানারকম জীবজন্তু পশুপাখি ইত্যাদি গড়ার কাজে ৮ থেকে ১৬ বছরের ছেলেরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নীহার চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা গুহ বেশ সুন্দর কয়েকটি কাজ উপস্থিত করেন।

—চিত্রদীপক

ইণ্ডিয়ান অরিগ্যামিস্ট-এর পক্ষ থেকে দুর্গা পূজোর পাঁচ দিন গোপীমোহন বসু লেনে কাগজ ভাঁজ করা মডেলের যে প্রদর্শনীটি হয়ে গেল, তার একটি মডেল—ব্যাঙ ও ব্যাঙের ছাতা। প্রদর্শনীটি দর্শকসাধারণের কাছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গে পূজা পার্বণ ও মেলা

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীঅশোক মিত্র (আই সি এস) কর্তৃক সম্পাদিত এবং
ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বিচিত্র পালাপার্বণ ও মেলার অপূর্ব বর্ণনা।

৬১৪ পৃষ্ঠার এই অনন্য গ্রন্থটিতে ১৬টি মূল্যবান মানচিত্র, বিভিন্ন মন্দিরের আলোকচিত্র ও অনেকগুলি রেখাঙ্কিত চিত্র আছে।

মূল্য ১০ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা সম্বন্ধে প্রথম খণ্ড এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলা সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ড বিদগ্ধজন, তথ্যানুসন্ধানী, গবেষণাকর্মী ও সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড দুটি (এখন প্রেসে) অচিরে প্রকাশিত হবে।

প্রাপ্তিস্থান :

ভারত সরকারের পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র :
৮, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—১
এবং
ম্যানেজার অফ্ পাবলিকেশনস্,
গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া,
সিভিল লাইনস্, দিল্লী—৬

বিজ্ঞাপন-৭৮/২৮৬

CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর কাহিনী

আফ্রিকায় প্রচণ্ড মার খাইয়া মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন একেবারে চুরমার হইয়া গেল এবং হতাশায় ও অপমানে তিনি অবসন্ন হইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁকে এবং অক্ষ-শক্তির মর্যাদাকে পুনরুদ্ধারের জন্য জেনারেল রোমেলকে পাঠাইয়াছিলেন আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রোমেলের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পরে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো এবং হিটলার এই দুই ডিক্টেটরের নাটকীয় কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। এখানে সেই কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর উইনস্টোন চার্চিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়া স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। দক্ষ সামরিক নেতা হিসাবে তিনি জানিতেন যে, কেবল ইংলিশ চ্যানেল নয়, ভূমধ্যসাগর নিয়াও টান পড়িবে এবং সেই ক্ষেত্রে স্পেন ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ হইবে। কারণ, পশ্চিম দিক থেকে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চাবিকাঠি জিব্রাল্টারে এবং সেই জিব্রাল্টার স্পেনের ভৌগোলিক আওতায়—যদিও জিব্রাল্টার দুর্গ বৃটেনের অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। কিন্তু চার্চিল জানিতেন যে, স্পেনের সিভিল ওয়ারে বা গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী যেভাবে সাহায্য দিয়াছেন এবং যার ফলে ফ্রাঙ্কো স্পেনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারিয়াছেন, সেই 'কৃতজ্ঞতা' দ্বারা ফ্রাঙ্কো হয়তো হিটলার-মুসোলিনীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে পারেন এবং জিব্রাল্টার দুর্গ ও প্রণালী ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দখলে চলিয়া যাইতে পারে! এজন্য বৃটিশ সরকারের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এই পরিণতি ঠেকাইবার জন্য এবং স্পেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য, [illegible] জন্য চার্চিল তাঁর একজন প্রাক্তন সহকর্মী ও দক্ষ কূটনীতিবিদ—স্যার স্যামুয়েল হোরকে মাদ্রিদে পাঠাইলেন বৃটেনের নূতন রাষ্ট্রদূতরূপে এবং পাঁচ বছর ধরিয়া এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন—অন্ততঃ চার্চিলের এই অভিমত।

এদিকে হিটলার ও জার্মান নৌ-বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি যেন এক নূতন চমকের অপেক্ষায় ছিল। কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর হিটলার বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না তিনি কোন্ দিকে যাইবেন—বৃটেনের দিকে, না রাশিয়ার দিকে। এই সময় জার্মান নৌবহরের গ্রাণ্ড এডমিরাল ও জার্মান নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি (১৯০৫-৪৩ সাল) এরিক রেইডার হিটলারের নিকট এক বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি হিটলারকে ভূমধ্যসাগর, উত্তর আফ্রিকার সন্নিহিত অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইম্পিরিয়েল বৃটেনের সবচেয়ে দুর্বল স্থান এখানে এবং এখানে আঘাত হানিলে বৃটেন কাবু হইবেই। ৬ই এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, হিটলারের সঙ্গে দুই দিনের বৈঠকে এডমিরাল রেইডার রণনৈতিক ছাড়াও অর্থনৈতিক যুক্তি খাড়া করিলেন এবং এই বিরাট অঞ্চলের প্রভূত কাঁচামালের (পেট্রোলসহ) সম্পদের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—যুদ্ধের মধ্যে জার্মানীর পক্ষে এই কাঁচামাল যে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, তা বলা বাহুল্য মাত্র। তা ছাড়া রেইডার আর একটি তথ্যের উপরেও জোর দিলেন—অতলান্তিক মহা-সমুদ্রের পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ দ্বীপপুঞ্জ হইয়া বৃটিশ, এমন কি মার্কিন নৌবহরও ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ ঘটাইতে পারে। এজন্য রেইডার কয়েকটি 'বাস্তব প্রস্তাব' উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জিব্রাল্টার ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ দখলে আনিতে হইবে এবং তিনি ফ্রান্সের বা মার্শাল পেতাঁর সরকারের সহযোগিতায় ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রক্ষা ব্যবস্থা [illegible]-ও শক্তিশালী করিতে হইবে সেই সঙ্গে ইতালীর সহযোগিতায় জার্মানীর উচিত হইবে সুয়েজ বা মিশরের বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড অভিযানে অবতীর্ণ হওয়া এবং সেখান থেকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তুরস্ক পর্যন্ত।

বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় জার্মানীর পক্ষেই এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র রণ পরিকল্পনা এবং রেইডার হিটলারকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি তাঁর এই পরি-কল্পনা গৃহীত এবং সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়, তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রয়োজনই আর দরকার হইবে না। অর্থাৎ এই রণ-পরিকল্পনায় বৃটেনকেই জার্মানীর আসল শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—জার্মান নৌবিভাগের পক্ষে অবশ্য এই চিন্তা অস্বাভাবিক ছিল না। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে ইতালী ও স্পেনের সহিত জার্মানীর মিত্রতার পূর্ণ ব্যবহার করা হইত এবং সোভিয়েট রাশিয়া জয় করার চেয়ে জার্মান সমরশক্তির পক্ষে এই পরিকল্পিত জয় অনেক বেশী সহজসাধ্য বলিয়া প্রতিভাত ছিল। এমন কি রাইখ-মার্শাল গোয়েরিং যাঁর সঙ্গে এডমিরাল রেইডারের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, এমন কি রেইডারকে যিনি দুচোখে দেখিতে পারিতেন না, সেই গোয়েরিং পর্যন্ত এই বিকল্প পরিকল্পনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করিলেন। (১)

যদি সমুদ্র ও নৌশক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে হিটলারের সম্যক উপলব্ধি থাকিত, তবে হয়তো রেইডারের এই বিকল্প প্রস্তাবের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু নৌশক্তি সম্পর্কে হিটলারের তেমন উৎসাহ ছিল না, তবু রেইডারের পরামর্শে তিনি কান দিলেন, এমন কি মন দিলেন এবং মোটামুটিভাবে তাঁর সঙ্গে একমতও হইলেন। এমন কি, মুসোলিনী এবং সম্ভব হইলে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনা করিতেও রাজী হইলেন। তিনি কেবল মৌখিক সম্মতিই জানাইলেন না, ১৯৪০ সালের শেষ চার মাস পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের রণ-পরিকল্পনা লইয়া বস্তুর-মত অনেক মাথা ঘামাইলেন। রেইডার প্রথমে মনে করিলেন যে, হিটলারকে বুঝি তিনি দলে টানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর এই ধারণা ভুল। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসের এই সমস্ত আলোচনা হইতেই বুঝা গেল যে, হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর মন স্থির করিয়া ফেলিয়া-ছেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি সম্পর্কে জার্মান জেনারেল স্টাফ বা নৌসেনানীমণ্ডলী যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করিতেছেন,

---

(1) Hitler—Allan Bullock
Pelican, [illegible], P. [illegible]

হিটলারের চিন্তা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার রণাঙ্গন সম্পর্কে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল দু রকমের। প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজের যাতায়াত বন্ধকরণের দ্বারা বৃটেনকে আরও বিব্রত করা এবং জার্মানীর সঙ্গে আপোষ রফায় আসার জন্য বৃটেনের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ বৃটেনের বিরুদ্ধে বোমারু অভিযান ও আক্রমণের ভয় দেখাইয়া জার্মানী যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, প্রস্তাবিত ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনের দ্বারাও হিটলার অনুরূপ লক্ষ্যই পূরণ করিতে চাহিলেন। তথাপি পূর্বদিকের সম্ভাব্য অভিযান ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে রাজী ছিলেন না।

হিটলারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই প্রতিরক্ষামূলক — প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও অতলান্তিকের দ্বীপগুলি, যেমন—কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, এজোর্স, ক্যানারিস ও ম্যাডেইরা দ্বীপসমূহকে রক্ষা করা। কারণ, ইউরোপকে "পিছনের দরজা" দিয়া আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অতলান্তিকের এই সমস্ত দ্বীপ অবলম্বন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ পশ্চিম আফ্রিকায় কিম্বা উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিতে পারে এবং এভাবে পশ্চিম ইউরোপের সুরক্ষিত উপকূল তারা এড়াইয়া যাইতে পারে। হিটলারের এই অনুমান অবশ্য মিথ্যা ছিল না, কারণ, দুই বছর পর ওটা হাতেকলমে ঘটিয়াছিল। কিন্তু হিটলার এই আলোচ্য রণাঙ্গনের দায়িত্ব কখনও নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ফ্রাঙ্কোর স্পেনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার জন্য, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যথাসম্ভব ভিসি ফ্রান্সের এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের রণক্ষেত্রের আসল দায়িত্ব ইতালীর হাতে অর্পণ করিবার জন্য। অর্থাৎ মুখ্য দায়িত্ব তাঁর নিজের বহনের ইচ্ছা কখনও ছিল না। বড় জোর দুই এক ডিভিসন জার্মান সৈন্য দিয়া তিনি ইতালী বা স্পেনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য জিব্রাল্টার দুর্গের প্রতিরোধ ভাঙিবার জন্য যে স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ সৈন্যের দরকার হইত, সেই সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়াড্রন ডাইভ বম্বার (ছোঁ মারা বোমারু) দিতেও তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কারণ, রাশিয়া আক্রমণের বিকল্প প্ল্যান হিসাবে তিনি রেইডারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কিম্বা ভূমধ্যসাগরকে জার্মানীর প্রধান রণক্ষেত্ররূপে গ্রহণের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু ডিক্‌টেটর হিটলারের এই বাঁধাবন্ধ রণনৈতিক অভিপ্রায়ও চক্রান্ত আটকাইয়া গেল আর এক ডিক্‌টেটরের পাল্লায় পড়িয়া—তিনি হইতেছেন স্পেনের সর্বময় প্রভু জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তিনি হিটলারের চেয়ে কম ঘুঘু ছিলেন না, বরং তিনি নিজেও ফ্যাসিস্ট ছিলেন বলিয়া বোধহয় সমধর্মী ফ্যাসিস্টদের ভালো করিয়া চিনিতেন। অতএব কূটনৈতিক প্যাঁচে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীকে খুব খেলাইলেন, কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন না।

১৯৪০ সালের জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন জার্মানী জয়লাভ করিতেছিল এবং যখন বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল এবং সামনে লুটের মাল ভাগবাটোয়ারার দিন আসিতেছে, তখন জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বৃটেন আত্মসমর্পণ করিল না এবং ইংলণ্ড দ্বীপ আক্রান্তও হইল না, তখন থেকেই ফ্রাঙ্কোর উৎসাহে ভাটা পড়িতে লাগিল এবং যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব এড়াইবার জন্য তিনি এমন সব সর্ত উপস্থিত করিতে লাগিলেন যেগুলি হিটলারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধে যোগদানের সর্ত দ্বারা ফ্রাঙ্কো ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করিয়া খাদ্য, অস্ত্রসম্ভার এবং পেট্রোল পর্যন্ত এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করিলেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক তাঁর 'হিটলার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রাঙ্কো পাঠাইলেন তাঁর ভাবী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরানো সুনেরকে বার্লিনে আলোচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের ভাবভঙ্গীতে ও দাম্ভিকতায় তিনি খুব বিরক্ত হইলেন, কিন্তু হিটলার কৌশলী এবং ধূর্ত ছিলেন, তিনি সুনেরের প্রতি এমন আচরণ করিলেন যে, হিটলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব ভালো হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, প্রথম দিনের সাক্ষাতের আগে হিটলার সমস্ত ব্যাপারটা বেশ রঙ্গমঞ্চের মত সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুনেরকে রাইখ চ্যান্সেলারির বিরাট সৌধের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের সারি এবং বিশাল মার্বেল গ্যালারির মধ্য দিয়া হিটলারের সামনে নিয়া উপস্থিত করানো হইল—যেন সেকালের কোন রাজদরবারে পৌঁছানোর মত। হিটলার স্পেনীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধির কাছে এমন একটা অভিনয়ের ভঙ্গী দেখাইলেন যেন তিনি একজন 'World historical genius' বা পৃথিবীর ঐতিহাসিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী এক বিরাট প্রতিভা। তাঁর মুখের ভাব অত্যন্ত শান্ত এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়—যেন সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের তিনিই প্রভু। তিনি ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এমন সহজ ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন যে কোন দিন ইচ্ছা করিলেই জিব্রাল্টার দখল করিতে পারেন। হিটলারের চোখের দৃষ্টিতে চুম্বকের মত যে আকর্ষণশক্তি ছিল, এবং যে দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক করিয়াছেন, সেই দৃষ্টি দিয়া তিনি সেরানো সুনেরকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইলেন এবং সারা কক্ষটির মেঝের উপর তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ করিয়া গেলেন বিড়ালের পা ফেলিবার মত। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের মানচিত্রের উপর তিনি চোখ বুলাইয়া দেখেন এবং খুব শান্ত কণ্ঠে বলিলেন যে, সমস্ত ইউরোপ ও সমগ্র আফ্রিকা নিয়া একটি ব্লক গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং বলাই বাহুল্য যে, এই নতুন ব্লকে বাইরের কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না—একটি নতুন 'মনরো ডকট্রিন' ঘোষণা করা হইবে। রিবেনট্রপের মত তিনি কোন মেজাজ দেখাইলেন না, কোন অভিযোগ করিলেন না এবং তাঁর দর্শনার্থীর উপর কোন চাপ সৃষ্টিও করিলেন না। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রের বা তৃতীয় রাইখের সমস্ত জাঁকজমক ও ক্ষমতার দম্ভ দিয়া স্পেনীয় প্রতিনিধিকে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর প্রতিনিধি ভুলিবার পাত্র নন। যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তিনি কোন কথাই দিলেন না, অথচ দাবীর তালিকা দীর্ঘই রাখিলেন। কিন্তু বার্লিন ত্যাগ করার আগে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতের সময় সুনের তাঁর প্রভু ফ্রাঙ্কোর পক্ষ থেকে যে দামী উপহার দ্রব্য হিটলারকে দিলেন, তাতে হিটলারের হেলেফেলানুবী দেখিয়া সুনের অবাক হইলেন। কারণ, জার্মানী ও ইউরোপের সর্বময় প্রভু এতক্ষণ যে বিরাট মহিমান্বিত ভাব দেখাইতেছিলেন, তার সঙ্গে এই হেলেফেলানুবী একেবারেই বেমানান ছিল।...

এই ঘটনার পর ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানো ২৮শে সেপ্টেম্বর যখন হিটলারের সঙ্গে দেখা করিলেন, তখন হিটলার দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করিলেন, 'ফ্রাঙ্কো যত নিতে চান, তত দিতে চান না!'

এক সপ্তাহ পরে হিটলার ও মুসোলিনী ব্রেনার গিরিবর্ত্মে একত্রিত হইলেন সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য। ফ্রাঙ্কোর দাবীর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মুসোলিনীকে বুঝাইলেন কেন ফরাসী মরক্কো স্পেনকে দেওয়া হয় না। কারণ, মধ্য আফ্রিকায় এক সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং এই সাম্রাজ্যের জনাই তাঁর নিজের দরকার ফরাসী মরক্কোর উপকূলবর্তী ঘাঁটি। দ্বিতীয়তঃ এই মুহূর্তে ফরাসী উপনিবেশগুলিতে হাত দিতে গেলে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা দ্য গলের ফ্রী ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হাত মিলাইতে পারে। বরং তিনি ভিসি ফ্রান্সের সঙ্গে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু ফ্রান্সকে অক্ষশক্তিবর্গের আরও দলে টানিবার প্রস্তাবে মুসোলিনী খুশী হইলেন না। কারণ, ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একটা মোটা অংশ তিনি নিজে গ্রাস করিবেন এই ছিল তাঁর মনে-মনে ইচ্ছা।

অবশেষে হিটলার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই স্পেনীয় সীমান্তে গিয়া ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। (২)

জীবনে ডিক্টেটর হিটলার এমন জব্দ বোধহয় আর কখনও হন নাই। তিনি গায়ে পড়িয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে খোসামোদ করিতে গেলেন এবং স্বেচ্ছায় দীর্ঘ রেল ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোটা ফ্রান্স পাড়ি দিলেন এবং ফরাসী-স্পেনীয় সীমান্তের হেণ্ডায়ে শহরে গিয়া হাজির হইলেন স্পেশাল ট্রেনযোগে ২৩শে অক্টোবর তারিখ। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনায় হিটলার গোড়াতেই জার্মানীর শক্তি ও ক্ষমতার বিজ্ঞাপন দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, ইংলণ্ডের দফা শেষ হইয়াছে। তিনি অবিলম্বেই স্পেনের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে উৎসুক এবং এই সন্ধি অনুসারে স্পেন ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধে যোগদান করিবে। ১০ই জানুয়ারী জার্মানীর দুর্গ-বিশেষজ্ঞ সৈন্যদের (যে সৈন্যেরা বেলজিয়ামের বিখ্যাত দুর্ভেদ্য দুর্গ 'ইবেন ইমায়েল' দখল করিয়াছিল) সাহায্যে জিব্রাল্টার দুর্গ দখল করা হইবে এবং এই দুর্গ তৎক্ষণাৎ স্পেনের অধিকারভুক্ত হইবে।

কিন্তু হিটলার যে এত আশা, এত প্রলোভন দেখাইলেন তাতেও ফ্রাঙ্কো কিন্তু এতটুকু সাড়া দিলেন না। অথচ মুসোলিনীর মত পাকা ডিক্টেটরকেও তিনি যখন অনায়াসে বাগে আনিতে পারিয়াছেন, তখন এই স্পেনীয় ডিক্টেটর অনড় রহিয়া গেলেন—জার্মান ডিক্টেটরের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন! ফ্রাঙ্কো তো হিটলারের কথায় সায় দিলেন না বটেই, উপরন্তু ভূমিগত (আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশসমূহ), অর্থনৈতিক এবং সামরিক দাবীগুলির উপর জোর দিতে লাগিলেন, এমন কি দাবীর পরিমাণগুলি পূরণ করার ক্ষমতা জার্মানীর আছে কিনা, ফ্রাঙ্কো এমন প্রশ্ন তুলিয়াও হিটলারকে বিব্রত করিলেন। অধিকন্তু বৃটেন সম্পর্কে হিটলারের মতে সায় না দিয়া ফ্রাঙ্কো আরও বলিলেন যে, যুদ্ধে হারিয়া গেলেও বৃটিশ গবর্নমেন্ট বশ্যতা স্বীকার করিবে না। বৃটিশ নৌ-বহরের সহায়তায় বৃটিশ সরকার কানাডা থেকে আমেরিকার সহযোগিতায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে! এই সমস্ত কথার পর হিটলারের আর ধৈর্য রহিল না, এক সময় কথার মাঝখানেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন যে, আর আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই! (৩)

৯ ঘণ্টা ধরিয়া এই ব্যর্থ আলোচনা চলিল এবং রাত অনেক হইয়া গেল। স্পেশাল ডাইনিং কারে হিটলারের নৈশভোজের অনেক দেরী হইয়া গেল। হিটলার তখন রিবেনট্রপের (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপর ভার দিলেন সেরানো সুনেরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা চালাইবার জন্য। যা হোক একটা চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা স্পেনের সাহায্যে ইংরাজকে জিব্রাল্টার থেকে তাড়াইতে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রবেশ রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে—হিটলার রিবেনট্রপকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন। বেচারা রিবেনট্রপ রাতে ঘুমাইতে পারিলেন না, সারা রাত জাগিয়া একটা চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। স্পেনকে দলে টানা গেল না। পর দিন সকালে রিবেনট্রপ হিটলারের একজন পার্শ্বচরের নিকট ফ্রাঙ্কোকে অভিশাপ দিতে-দিতে রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ! ব্যাটা আমাদের জন্যই সব কিছু পেয়েছে। আর আজ আমাদের দলে ভিড়তে রাজী নয়!'

আর হিটলার এই সাক্ষাৎকার বিষয়ে মুসোলিনীর কাছে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন 'আমার বরং তিনটা দাঁত তুলে ফেলা ভালো। তবু আর ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়!' (৪)

স্পেন ও ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে এখানে চার্চিলের মন্তব্য স্মরণীয়। কারণ, জিব্রাল্টার নিয়া তাঁর যে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চার্চিল ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন—

> General Franco's policy throughout the war was entirely selfish and cold-blooded. He thought only of Spain and Spanish interest. Gratitude to Hitler and Mussolini for their help never entered his head ....They had enough of war A million men had been slaughtered by their brothers' hands. Poverty, high prices, and hard times froze the stony peninsula. No more war for spain and no more war for Franco! (5)

অর্থাৎ সারা যুদ্ধব্যাপী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নীতি ছিল একেবারে স্বার্থান্ধ এবং নিষ্ঠুর। স্পেন ও স্পেনীয় স্বার্থ ছাড়া তাঁর আর কোন ভাবনা ছিল না। হিটলার ও মুসোলিনী তাঁকে যে সাহায্য দিয়াছিলেন (স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময়) সেই সম্পর্কে কৃতজ্ঞতাবোধের বালাইও তাঁর ছিল না। স্পেনীয়রা ঢের যুদ্ধের স্বাদ পাইয়াছে। ভাইয়ের হাত দিয়া ভাইয়ের হত্যায় ১০ লক্ষ লোক খতম হইয়াছে। দারিদ্র্য, অতিমূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভোগের দ্বারা এই পাথুরে উপদ্বীপ যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। অতএব স্পেন আর যুদ্ধ চায় না, ফ্রাঙ্কোও আর যুদ্ধ চান না!

চার্চিল আরও লিখিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো স্পেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বৃটেন এটাই চাহিতেছিল। কেননা, ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের সমস্ত উদ্যোগের চাবিকাঠিই ছিল স্পেনের হাতে এবং চরমতম দুর্দিনেও সেই চাবি ফ্রাঙ্কো বৃটেনের প্রতিপক্ষের হাতে তুলিয়া দেন নাই। ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের বিপদ এত গুরুতর ছিল যে, বৃটেনকে দুই বছর ধরিয়া ক্রমাগত পাঁচ হাজার সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে রেডি থাকার জন্য তৈয়ার রাখিতে হইয়াছিল ক্যানারি দ্বীপ দখলের জন্য। কারণ; ওই দ্বীপ দখলে রাখিতে পারিলে এবং জিব্রাল্টার প্রণালী বন্ধ হইয়া গেলে বৃটেন অন্ততঃ ওখানকার আকাশ ও সমুদ্রপথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ঘুরিয়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে পারিত।

বৃহৎ সাম্রাজ্য রক্ষার ও পাহারা দেওয়ার ঝামেলা অনেক সন্দেহ নাই এবং এই ঝামেলার জন্যই স্পেন সম্পর্কেও বৃটেনের এত উদ্বেগ।

চার্চিল ফ্রাঙ্কোর প্রসঙ্গে উপসংহারে মন্তব্য করিতেছেন যে, হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর এই সমস্ত চালবাজি এবং তাঁর অকৃতজ্ঞতা যতই তাঁর চরিত্রের মন্দ দিকের লক্ষণ হোক, যুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তি কিন্তু এর দ্বারা উপকৃতই হইয়াছিল।...

ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু পর দিন (২৪শে অক্টোবর) ভিসি সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল পেতাঁর সঙ্গে মন্টোয়ারে হিটলারের যে সাক্ষাৎ হইল, তাতে ফুয়েরার খুব খুশীই হইলেন। কারণ, বৃদ্ধ পেতাঁ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বৃটেনকে নতজানু করার হিটলারী প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সঙ্গে ভিসি সরকারের পূর্ণতর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন কি, কাগজে পত্রে এমন কথাও লিখিয়া দিলেন—

> The Axis Powers and France have an identical interest in seeing the defeat of England acomplished as soon as possible. ...."

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৩-৪

(৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৫

(৪) উইলিয়াম শায়ার প্রণীত দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ, পৃষ্ঠা ১৭৪

(5) The Second World War—Churchill, Vol. 3 P. 459.

টেলিগ্রাম : জুয়েলারী
ফোন : [illegible]
জড়োয়া গহনা • ঘড়ি
•
যন্ত্রপাতিযুক্ত ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স অ্যাণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

CENTRAL LIBRARY

অর্থাৎ 'অকর্মণ্যবর্গ' এবং ফ্রান্স উভয় পক্ষই তাদের সমান স্বার্থের খাতিরে যত দ্রুত সম্ভব বৃটেনের পরাজয় দেখিতে চায়।...'

পেতাঁর এই নূতন বিশ্বাসঘাতকতার বদলে স্বাক্ষরের পুরস্কারস্বরূপ হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, নয়া ইউরোপে ফ্রান্সকে তার 'যথাযোগ্য আসন' দেওয়া হইবে এবং ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া সমস্ত ভূখণ্ড জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তার বিনিময়ে ফ্রান্স ক্ষতিপূরণস্বরূপ আফ্রিকার বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে উপযুক্ত ভূখণ্ড পাইবে এবং সেটা ফ্রান্সের বর্তমান সাম্রাজ্যের সমান হইবে।

এই চুক্তি উভয় পক্ষই 'অত্যন্ত গোপন' রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু এই চুক্তির বিস্তৃত রূপায়ণ আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং পেতাঁ তাঁর এক বন্ধুর কাছে যে মন্তব্য করিলেন, সেটাও কম চমকপ্রদ ছিল না। তিনি বলিলেন :

It will take six months to discuss this programme and another six months to forget it!

অর্থাৎ এই চুক্তির কর্মসূচী আলোচনা করিতে ছয় মাস লাগিবে এবং আরও ছয় মাস লাগিবে একেবারে ভুলিয়া যাইতে।

কিন্তু মার্শাল পেতাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার গোপন চুক্তি সত্ত্বেও হিটলার পুরোপুরি খুশী হইলেন না। কেননা, তিনি চাহিয়াছিলেন ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়া হাতে-কলমে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক!

বিশ্বাসঘাতকতার পথ কত ভয়াবহ তা' এই ঘটনা থেকে আর একবার বুঝা যাইবে।

ফ্রাঙ্কো ও পেতাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে আর একবার দেখা করিলেন ২৮শে অক্টোবর ফ্লোরেন্সে। কিন্তু এই সাক্ষাতের পিছনে ছিল একটি ঘটনা যার জন্য হিটলার খুব বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর ইতালী হঠাৎ গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিল, হিটলারের সম্মতি ছাড়া তো বটেই, এমন কি হিটলারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হিটলার এতে বিরক্ত হইলেন। কারণ, বলকান সম্পর্কে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা এই আকস্মিক ইতালীয় আক্রমণের দ্বারা ব্যাহত হইল। আসলে বলকান অঞ্চলের উপর মুসোলিনীরও লোভ ছিল এবং হিটলার সর্বত্র একাভাবে দখল বিস্তার করুক, এটা মুসোলিনীর পছন্দসই ছিল না। আর হিটলার তো মুসোলিনীর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই অনেক কার্য করিতেছেন, এমন কি রাজ্য দখল করিতেছেন। অতএব মুসোলিনীও হিটলারের সম্মতি ছাড়াই গ্রীস আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে যেমন এখানেও ইতালীর আক্রমণ ব্যাহত হইল এবং হিটলারকে মুসোলিনীর উদ্ধারের জন্য বলকানেও সাহায্য দিতে হইল। ওদিকে বৃটেন ক্রীট দ্বীপ এবং আজিয়েন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দখল করিয়া নিল। ফলে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে জার্মান অভিযানের প্রস্তাব এবং সুয়েজ খালের দিকে ইতালীর অগ্রগতিতে সহায়তা দানের পরিকল্পনা বন্ধ রাখিতে হইল।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বরের সামরিক বৈঠকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টার জন্য যে পরিকল্পনা স্থির হইল, তার সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল 'অপারেশন ফেলিক্স'। জার্মান সৈন্যেরা স্পেনীয় দেশের সহযোগিতায় জিব্রাল্টার দখল করিয়া নিবে। কিন্তু হিটলার তখনও এই বিষয়ে নির্ভর করিতেছিলেন ফ্রাঙ্কোর উপরে। নভেম্বর মাসে তিনি ফ্রাঙ্কোকে তাগিদ দিলেন, কিন্তু ফ্রাঙ্কো যথারীতি এড়াইয়া গেলেন। ৭ই ডিসেম্বর এডমিরাল ক্যানারিস স্পেনীয় ডিক্‌টেটরকে প্রস্তাব দিলেন ১০ই জানুয়ারী জার্মান সৈন্যেরা স্পেনে প্রবেশ করিবে এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিবে। ফ্রাঙ্কো এই প্রস্তাবের জবাবে সরাসরি 'না' বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ইতালীর সৈন্যেরা উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে হারিয়া গেল। এই অবস্থায় হিটলার বাধ্য হইয়া 'অপারেশন ফেলিক্স' বাতিল করিয়া দিলেন।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশের জয়লাভে হিটলার শঙ্কিত হইলেন। কারণ, তাঁর ভয় হইল এই জয়ের পথ ধরিয়া ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে বিগড়াইয়া যাইতে পারে এবং বৃটিশের দিকে ভিড়িতে পারে। সুতরাং ১০ই ডিসেম্বর তারিখ হিটলার তাড়াতাড়ি 'অপারেশন এাটিলা' নামে এক জয়রী অভিযানের সিদ্ধান্ত করিলেন। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল দরকার মত সমগ্র ফ্রান্স দখল করা এবং সমস্ত ফরাসী নৌ-বহর ও বিমানবহর করায়ত্ত করা। কিন্তু ওয়েগাঁর দিক থেকে কোন নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না এবং জার্মানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার যিনি সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন তিনি মন্ত্রিসভার মধ্যে সেই লাভালকে পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করা হইল। অবশ্য জার্মানরা তাদের মিতা লাভালকে ছাড়াইয়া আনিলেন। মার্শাল পেতাঁর কাছ থেকেও সহযোগিতার আর সূত্র পাওয়া গেল না। এভাবে অপারেশন এ্যাটিলাও পরিত্যক্ত হইল।

১৯৪১ সালের নববর্ষে হিটলার আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ফ্রাঙ্কোকে দলে ভিড়াইবার জন্য। তিনি মুসোলিনীকে দিয়াও ফ্রাঙ্কোর মন ভিজাইবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, ফ্রাঙ্কো যদিও হিটলারকে পছন্দ করিতেন না, বরং তাঁকে ভয় করিতেন, কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অতএব ১২ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী বোর্ডিঘেরাতে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এর আগে অবশ্য ২৫শে আগস্ট (১৯৪০) তারিখ মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যেন তিনি "ইউরোপের ইতিহাস থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন না করেন।" কিন্তু ফ্রাঙ্কোর মন গলিল না। অবশেষে হিটলার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিলেন এবং তাঁর দর কষাকষি মনোভাবের জবাবে কড়া ভাষা জানাইলেন :

'একটি বিষয় আপনার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানা উচিত। আমরা আমাদের জীবন-মৃত্যুর জন্য কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত এবং এই সময় আপনাকে কোন উপহার দিতে পারি না'—

(We are fighting a battle of life and death and cannot at this time make any gift.......)

তিন সপ্তাহ পরে ফ্রাঙ্কো হিটলারের চিঠির জবাব দিলেন এবং তাতে জানাইলেন যে, তাঁর আনুগত্য যথাস্থানে ঠিকই আছে এবং তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, ইতালী ও জার্মানীর সহিতই তাঁর ভাগ্য জড়িত......।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। ধূর্ত ফ্রাঙ্কো হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়া একত্র যুদ্ধযাত্রার আসল প্রশ্নটি এড়াইয়া গেলেন।

এর পর হিটলার আর কি করিলেন? তিনি মুসোলিনীকে লিখিলেন যে, তাঁর আশঙ্কা হইতেছে ফ্রাঙ্কো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করিলেন।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিক্‌টেটরের মধ্যে দুই ডিক্‌টেটরই বড় ভুল করিয়াছেন। কারণ, মুসোলিনী হারিয়া ভূত হইতেছেন, আর তাঁকে উদ্ধারের জন্য হিটলার তার পিছন পিছন ছুটিয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় ডিক্‌টেটর ফ্রাঙ্কো কোন ভুল করেন নাই। অর্থাৎ স্পেনের ভবিষ্যতকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া তিনি ধ্বংস করেন নাই। কিম্বা হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে একযোগে প্রলয়তাণ্ডবে নৃত্যে জুড়িয়া দেন নাই।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতাঃ পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখাঃ ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৬৭-২০৫৯।

মার্বেল মেঝের উপর শায়িত পুলকেশের মৃতদেহ। বয়েস দুটো গভীর ক্ষতচিহ্ন— রিভলবারের বুলেটের। পুলকেশ সুপুরুষ। সুন্দর সুঠাম তার দেহ। চোখ দুটো মুদ্রিত, মুখে গভীর প্রশান্তির ছায়া। দেখে মনে হয় যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মৃত্যুও তার দৈহিক সৌন্দর্য আর কান্তিকে ম্লান করতে পারেনি যা একদা বহু নারীকে প্রলুব্ধ করেছিল।

মিনিট দুই হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম পুলকেশের মৃতদেহের দিকে। তারপর সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকালাম সমীর ঘোষালের দিকে। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল সমীর ঘোষাল আর প্রবীর চৌধুরী। সমীর ঘোষাল কলকাতা পুলিসের মার্ডার স্কোয়াডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। এক সময় কলেজে পড়েছিলাম একসঙ্গে। তারপর কাজের খাতিরে মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ হয় আমাদের। প্রবীর ডেইলি নিউজ পত্রিকার রিপোর্টার। ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল বটে, তবে অন্তরঙ্গতা ছিল না। ও ছিল পুলকেশের বন্ধু। আমাদের অফিসে আসত মাঝে মাঝে আর সেই সূত্রেই পরিচয়।

লাইটারটা জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল সমীর। সিগারেট ধরাতে বেশ একটু সময় নিল সে। আড়চোখে ও বারবার তাকাচ্ছিল আমার দিকে। ওর ঐ চোরা চাউনিটা খুবই খারাপ লাগল আমার। সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শান্ত গলায় সমীর বললে, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, অজয়।"

"কী কথা ?" প্রশ্ন করলাম ঈষৎ বিরক্তির সুরে।

মর্গের একজন জমাদার একখানা সাদা চাদরে মুড়ে ফেলছিল লাশটা।

সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে সমীর বললে 'এ ব্যাপারটা সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

"এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি এ আইডিয়াটা তোমার মাথায় এল কি করে ?" একটু রাগতভাবেই কথাটা বললাম আমি।

সমীর মৃদু হাসল। "তোমার পার্টনার ছিল পুলকেশ, তাই না ?"

"এক সময় পার্টনার ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি ওকে সরিয়ে দিয়ে একাই আমি ফার্ম চলাচ্ছি।"

আমার কথা সমর্থন করে প্রবীর বললে, "কথাটা ঠিকই। তুমি কি শোনো নি হালদার এণ্ড মুখার্জি, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর্স, পার্টনারশিপ ডিজলভ করেছে মাসখানেক আগে ? এখন অজয়ই একমাত্র মালিক।"

সমীর লম্বা আর বলিষ্ঠ। প্রবীর অপেক্ষাকৃত খাটো আর বেঁটে। দুজনের প্রকৃতিও বিভিন্ন। সমীর সব বিষয়েই সিরিয়াস আর প্রবীর লঘুচিত্ত। সমীরের বোনকে বিবাহ করেছে প্রবীরের ছোট ভাই। আত্মীয়তা থাকায় প্রবীর সমীরকে তেমন সমীহ করে চলে না।

"না, শুনিনি তো!" কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে জবাব দিলে সমীর।

মনে মনে ভারী চটে গেলাম আমি:

"তুমি ভালরকমই জানো পুলকেশ ইদানীং আমার ফার্মে ছিল না। পুলিশের লোক সবাই জানে আর তুমি জানো না এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যাক, তুমি যা বলতে চাও অনায়াসে বলতে পারো। তুমি কি মনে কর পুলকেশকে খুন করেছি আমি ?"

সমীর যেন একটু আহত হল। "আমার তুমি ভুল বুঝেছ অজয়। আমি তা মনে করি না।"

"বেশ। তুমি কি জানতে চাও বলো।"

সমীর এবার খুশী হল। হাসি মুখে বললে, "এখানে সুবিধে হবে না। চলো আমার অফিসে।"

আমরা তিনজনই রওনা হলাম পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের দিকে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে গেলাম। মোটর থেকে নেমে সমীর এসে ঢুকল তার ঘরে। প্রবীর আর আমি ঢুকলাম তার পিছু পিছু। টেবিলের ওপাশে তার চেয়ারটায় গিয়ে বসল সমীর। পাশের একখানা সোফায় বসে পড়ল প্রবীর। তারপর সিগারকেস থেকে দামী একটা সিগার বের করে ধরাল। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সমীর বললে, "পুলকেশকে তুমি ফার্ম থেকে সরিয়ে দিলে কেন ? আমার ধারণা ছিল তোমরা দুজন শুধু পার্টনার নয়, বন্ধুও বটে।"

"পুলকেশকে কেন ফার্ম থেকে সরালাম সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। অপরের কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে আমি অপারগ।" শান্তগলায় জবাব দিলাম আমি।

সমীরের ঠোঁটে যেন একটু মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। মনে মনে বিরক্ত হলাম আমি।

"আমি শুনেছি", একটু ইতস্ততঃ করে সমীর বলল, "পুলকেশ নাকি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছিল।"

প্রবীরের দিকে তাকালাম কটমটে। নিশ্চয় প্রবীরই একথা বলেছে সমীরকে প্রবীরের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বিব্রতভাবে সে বলল, "ওসব কথায় কান দিও না, অজয়। কত মিথ্যে গুজবও তো রটে।"

"তাই যদি সত্যিই ঘটে থাকে, তার জন্যে কি আমি পুলকেশকে—"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না আমি। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল!

"তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ঠিক আগে পুলকেশ কি কোনো কেস হাতে নিয়েছিল ?" প্রশ্ন করল সমীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে।

"না—অবশ্য আমি যতদূর জানি।"

"পুলকেশ কতদিন তোমার পার্টনার ছিল ?"

"সেটা তুমি ভালরকমই জানো। আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন ?"

"দু বছর ?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"তুমি কি জানো ঠিক কখন পুলকেশকে গুলি করা হয়?"

"আমি জ্যোতিষী নই।"

"গত রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।"

"আমার মনে হয় এখন তুমি জানতে চাইবে ঐ সময়ে আমি কোথায় ছিলাম। তাই না ?"

সমীর মৃদু হাসল। "ধরেছ ঠিকই। জানতে পারলে খুশী হব আমি।"

"গত রাত্রে দশটা থেকে প্রায় বারোটা পর্যন্ত আমি ছিলাম ভবানীপুরে জাস্টিস মল্লিকের বাড়িতে। ওঁর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী।"

সমীর শুনল মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু তার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

"আর কোনো প্রশ্ন আছে ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"হ্যাঁ। আরও দু-একটা প্রশ্ন আছে। পুলকেশের কোন শত্রু ছিল কি ?"

"প্রাইভেট ডিটেকটিভ মাত্রেরই শত্রু আছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করল সমীর। ও যে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠছে তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু ও যদি বিরক্ত হয় তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

"সেটা আমি জানি, অজয়। কিন্তু এমন কোনো শত্রু কি ওর ছিল যার সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ হতে পারে ?"

ঘাড় নাড়লাম আমি। "সে রকম কাউকে মনে পড়ছে না আমার।"

"মনে পড়ছে না, না তুমি ঐ সম্পর্কে মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক ?"

"যা খুশী তুমি ধরে নিতে পারো।" বিরক্তির সুরে জবাব দিলাম আমি।

প্রবীর এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল আমাদের কথাবার্তা। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল, "বীরেশ সান্যালের ব্যাপারটা মনে আছে তোমাদের ?"

প্রবীরের দিকে তাকাল সমীর। "বীরেশ সান্যাল কে ? কৈ, তার সম্বন্ধে তো কিছুই শুনিনি এখন পর্যন্ত।"

সমীরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আমার পানে তাকাল প্রবীর। "সিনেমা ষ্টার রুবী নন্দীকে নিয়ে পুলকেশের সঙ্গে বীরেশ সান্যালের যে সংঘর্ষ হয় সেটা তোমরা জানো না এ আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

"পুলকেশের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘদিনের, তার সব কিছুই তুমি জানো, আমরা জানবো কি করে ? যাক সে কথা, বীরেশ সান্যালের ব্যাপারটা বলো দেখি।" প্রবীরকে লক্ষ্য করে বললাম আমি।

প্রবীর হাসল মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে। তারপর নিবে-যাওয়া সিগারটা ধরিয়ে নিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে। এক মিনিট চুপ করে থাকার পর সে বলতে শুরু করল, "বীরেশ সান্যাল ধানবাদের এক কোলিয়ারি মালিকের ছেলে। রুবী নন্দীর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছে সে। মেয়েটার চেহারা খুব চটকদার, পুরুষকে আকৃষ্ট করার মত ঢংও জানে। পুলকেশের নজর পড়ে ওর ওপর। ওকে নিয়ে বেড়াতে যেত মাঝে মাঝে। বীরেশ সেটা জানতে পেরে একদিন চড়াও হল পুলকেশের ফ্ল্যাটে। মারপিট একটা হত নিশ্চয়ই, তবে আমি তখন ওখানে ছিলাম বলে বীরেশকে শান্ত করি কোনক্রমে

বীরেন গুন্ডা প্রকৃতির যুবক, রাগের বশে সে যে অনায়াসে খুন করতে পারে এ মনে করা অসঙ্গত নয়।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সমীর; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে, বীরেন সান্যাল হয়তো এই খুনের জন্যে দায়ী। তোমার কী মনে হয়?"

"পুলকেশকে কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না আমি।" নীরস কণ্ঠে জবাব দিলাম আমি। তারপর সমীরের দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলাম বাইরে।

দুই

বাড়ি ফিরে দেখি শোবার ঘরে একখানা কৌচের উপর সুলতা বসে আছে চুপ করে। এ সময় ও শোবার ঘরে থাকে না। নীচতলায় চাকরবাকরদের কাজকর্মের তদারকি করে। সুলতা সুন্দরী। গায়ের রং চাঁপাকলির মত না হলেও মুখশ্রী অতি চমৎকার। কালো ভুরুর নীচে তার টানা টানা চোখের তুলনা হয় না। তাছাড়া তার সারা দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য ছড়ানো যা সহজেই অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে তেমন সচেতন নয়। কেউ যদি তার রূপের প্রশংসা করে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করে—সাধারণ মেয়েদের মতো আহ্লাদে-আটখানা হয় না।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সুলতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'খবরটা কি সত্যি?'

রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললাম, 'হ্যাঁ। পুলকেশ খুন হয়েছে।' তারপর এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, 'আজ ভোরে বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে পুলিশ ওর মৃতদেহ দেখতে পায়। বুকে রিভলবারের গুলির দাগ।'

ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ়ভাবে সুলতা একবার তাকাল আমার মুখের দিকে; তারপর আস্তে আস্তে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল আমার দিকে পিছন করে। সুলতা কী ভাবছে কে জানে। মাস খানেক আগে পুলকেশের সঙ্গে আমার যে সংঘর্ষ ঘটেছিল হয়তো সেটাই ওর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সুলতাকে আমি যে কত ভালবাসি তা হয়তো কেউ ধারণা করতে পারবে না। সুলতাও যে আমাকে ভালবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে তাও আমি বিলক্ষণ জানি। পুলকেশের লুব্ধদৃষ্টি যে সুলতার উপর পড়েছে এ আমি ভাবতেই পারিনি। সেদিন যখন দেখলাম পুলকেশ সুলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছে নিতান্ত নির্লজ্জের মতো আর সুলতা ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে দূরে তখন আমার সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে মাথায় উঠে গেল। বাঁ হাতে ওর গলাটা চেপে ধরে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওর মুখে আর মাথায় আঘাত করতে লাগলাম ক্ষিপ্তের মতো। সুলতা যদি বাধা না দিত, তবে সেদিনই ওর জীবনের সমাপ্তি হত হয়তো।

মিনিট দুই তিন পরে সুলতা মুখ ফেরাল আমার দিকে। আস্তে আস্তে বললে 'কে খুন করেছে পুলিশ কি জানে?'

'না।' ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম আমি।

আমার চোখের উপর চোখ রাখল সুলতা। 'এ ব্যাপারে পুলিশ কি সন্দেহ করে কাউকে?'

আমি সত্য কথাই বললাম। 'হ্যাঁ, আমাকে।'

আমার অসঙ্কোচ ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে সুলতা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার আদৌ সম্বন্ধ নেই।

আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল সুলতা। তার মুখ বিবর্ণ চোখ দুটো জলে ভরা। পরম মমতায় আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম বুকে। ওর চোখের জলে আমার বুক ভিজে গেল। আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ভয় পেও না সুলতা। ভয় করবার কিছু নেই। সবই ঠিক হয়ে যাবে। পুলকেশ খুন হয়েছে কাল রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তুমি তো জানো ঐ সময় আমরা ছিলাম জাস্টিস মল্লিকের বাড়িতে। কাজেই পুলিশ আমাকে সন্দেহ করলেও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সুলতার চোখের জল বাধা মানে না। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে, 'যদি কোনো প্রমাদ হয় তখন কী করবো আমি?'

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছ সুলতা। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।'

সুলতাকে বললাম বটে, বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আমি নিজে আদৌ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না ও সম্বন্ধে। এক আসন্ন বিপদের অশুভ চিন্তা আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ধীরে ধীরে। তাই আরো নিবিড়ভাবে সুলতাকে জড়িয়ে ধরলাম বুকে।

কিন্তু সমীর ঘোষালের কাজের নিয়ম ছিল না। যে রাত্রে পুলকেশ খুন হয় সেই রাত্রে জাস্টিস মল্লিকের গৃহে আমি সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলাম কিনা এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করল সে শুধু গৃহকর্তার উক্তির উপর নির্ভর না করে অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথির কাছেও হানা দিল ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু সর্বত্রই আমার উক্তির সমর্থন পেল সে। [illegible] ওদিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে [illegible] পাওয়া গেল না।

তবে সে যে আমার সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল তা নয়। আমার উপর তার যে সন্দেহ রয়েছে এটা মুখে প্রকাশ না করলেও [illegible] পাওয়া গেল।

বসে রইল তা নয়। আমার উপর তার যে বিশ্বাস করত না ঠিকই, তবু [illegible] ধারণা ছিল, তার কাছ থেকে [illegible] [illegible] [illegible] রহস্য উদঘাটনে বিশেষ সাহায্য করবে। সমীর ভাবছিল, আমাকে যদি সে কায়দা করে একবার জেলে পুরতে পারে তাহলে

তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা শক্ত হবে না। নিজের গর্দান বাঁচাবার জন্যে আমি তখন অকপটে প্রকাশ করবো যা কিছু জানি। সত্য কথা বলতে কি, খুনের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও জানতাম না আমি। পুলকেশকে কে খুন করেছে তা যেমন পুলিশ জানত না, তেমনি আমারও জানা ছিল না। আমি শুধু জানতাম, পুলকেশ ছিল এক ঘৃণ্য বিবেকহীন লম্পট মৃত্যুই যার উপযুক্ত শাস্তি।

বীরেন সান্যালকেও রেহাই দিল না সমীর। তাকে একদিন পুলিশের সদর দপ্তরে ডেকে এনে জেরা করল এক ঘণ্টা ধরে। বীরেন স্বীকার করল, পুলকেশ যে তার প্রণয়পাত্রী রুবী নন্দীর পেছনে ঘুরত এটা সে জানত, কিন্তু সে এত নির্বোধ নয় যে ঐ সামান্য কারণে খুন করতে যাবে একজনকে। রুবীকে সে ভালবাসে ঠিকই, তবে সিনেমা স্টারদের ওপর অনেকের যে নজর থাকে তা কে না জানে? সে যদি রুবীকে ঠিকমতো খুশী করতে না পারে, তবে রুবী যে তার হাতছাড়া হবে এটা সে বিলক্ষণ জানে। তাছাড়া পুলকেশ যে সময় খুন হয় সেই সময় রুবীর শুটিং দেখছিল টালিগঞ্জের এক ফিল্ম স্টুডিওতে।

রুবী নন্দীকেও হাজির করা হল সমীর ঘোষালের সামনে। রুবী স্বীকার করল, পুলকেশের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। কিন্তু রীতিমতো চটে গিয়ে সে বললে, এত বড় বোকা মেয়ে সে নয় যে ঐ হাবঘরে কুখ্যাত লম্পটটাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের ভাবী নষ্ট করতে চাইবে।

খুনের কিনারা করতে না পেরে সমীর ঘোষাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। আর তার ঐ অসহিষ্ণুতার ফলে রাগ জমতে লাগল তার মনে। ঐ সঞ্চিত ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু যে আমি তা অনুমান করতে কষ্ট হল না আমার। অতি সাবধানে আমি চলতে লাগলাম, বিচার বিবেচনা না করে কোনো কাজেই এগোতাম না কি জানি যদি কোথাও সামান্য একটু ভুল করে বসি তাহলে আমার নিস্তার নেই। সমীরকে আমি জানতাম—ভালো করেই জানতাম। মেজাজ বিগড়ে গেলে ও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কখন যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা বলা কঠিন—অনেকটা টাইমবোমার মতো।

(তিন)

পুলকেশ খুন হবার ঠিক পাঁচদিন পরে একদিন সকালে মেয়েটি আমার অফিসঘরে এল। তখন দশটা বেজে পাঁচ সাত মিনিট। ড্রয়ার থেকে ফাইলপত্র বের করে কাজ শুরু করতে যাব এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল মেয়েটি। অনাহূতভাবে হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় প্রথমটা একটু বিরক্ত হয়েছিলাম মেয়েটির উপর, ভাবছিলাম ওকে বলবো বাইরে অপেক্ষা করতে। কিন্তু মুখ তুলে ওর পানে তাকাতেই চিনতে পারলাম ওকে। মেয়েটি আমার খুবই পরিচিত। নাম সুজাতা। একসময় আমাদের ফার্মের সাহায্য নিয়েছিল ভয়ানক একটা বিপদে পড়ে। লক্ষ্য করলাম ওর চোখে জল। অবাক

শিঙ্গার কুমকুমে ঐ ললাটে
অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে!
বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম
শিঙ্গার
ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি
ভেলভেট ফিনিশ
KUMKUM
Shingar
KUMKUM
Shingar
KUMKUM
Shingar
PRATIBHA 2018-11-BEN.
স্টকিস্ট : মেসার্স প্রভাত এজেন্সিজ
বি ১০১, বাঁগ্ৰ মারকেট, ৭১, বি, আর, বি, বি, রোড, কলিকাতা—১। ফোন : ৩৪-৭৫৪১

CENTRAL LIBRARY

গেলে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ওর মুখ বিবর্ণ, চোখের চাউনি মৃতের চোখের মত দীপ্তিহীন। ওকে আমি লক্ষ্য করছিলাম বটে, কিন্তু ওর ডান হাতে যে একটা ছোট রিভলবার ছিল তা আমার নজরে পড়েনি। হঠাৎ রিভলভারের নল থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল প্রচণ্ড বেগে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু মুছে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

মাথার একটা তীব্র যাতনা অনুভব করছিলাম এবং মনে হল আমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কি একটা তপ্ত তরল পদার্থ। হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলাম, রক্ত। অন্ধের মতো মেঝেটার দিকে এক পা এগিয়েছিলাম এটা বেশ মনে আছে। তারপর মনে হল ঘরের মেঝেটা সরে গেল আমার পায়ের তলা থেকে এবং আমি এক বিরাট অতলস্পর্শী—গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম।

যখন আমার চেতনা ফিরে এল তখন অফিসঘরে ভীড় জমে গেছে। লক্ষ্য করলাম একপাশে লম্বা একখানা কৌচের উপর শুয়ে আছি আমি। ডাক্তার মৈত্র—এই বাড়িরই নীচের তলার যাঁর চেম্বার—উদ্বিগ্নমুখে ঝুঁকে রয়েছেন আমার মুখের উপর।

দেখলাম, ভীড়ের মধ্যে একজন পুলিশ সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পরেশ গাঙ্গুলীর ক্লার্ক গোবিন্দ তাকে বলছে, দুবার সে গুলির আওয়াজ শোনে, তারপর আমার ঘরে ঢুকে দেখে, রক্তাক্তদেহে আমি পড়ে আছি মেঝের উপর।

গুলির আওয়াজ শোনার কতক্ষণ পরে সে আমার ঘরে প্রবেশ করে সেটা জানতে চাইল সার্জেন্ট। গোবিন্দ তখনও ভয় ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। বললে, 'আমাদের অফিসঘরটা হলের শেষপ্রান্তে, সম্ভবতঃ তিন চার মিনিট পরেই এ ঘরে ঢুকেছিলাম আমি। আওয়াজটা শুনে প্রথম এমনি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে নড়বার ক্ষমতা ছিল না আমার। তারপর যখন এদিকে এলাম তখন দেখি বিস্তর লোক জমা হয়েছে করিডরে। কোন্ কামরা থেকে যে গুলির আওয়াজটা এসেছে তা কেউই ঠিক করতে পারছে না। আমার মনে হল, অমরবাবু যখন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আর আওয়াজটা যখন এদিক থেকেই এসেছে তখন ওঁর চেম্বারেই হয়তো গুলিটা কেউ ছুঁড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢুকে পড়লাম এ ঘরে, দেখলাম যা অনুমান করেছি ঠিক তাই।'

আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে গোবিন্দ খুশীমুখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ডাক্তার মৈত্র আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না।

উঠে বসে হাত দিয়ে মাথাটা স্পর্শ করলাম। বললাম, 'না এমন কিছু নয়।'

ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'কয়েক ঘন্টা আপনার মাথায় একটা যাতনা থাকবে, তবে ভয় পাবার কিছু নেই। দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভাগ্যটা ভাল। বুলেটটা আপনার মাথার চামড়া সামান্য স্পর্শ করে চলে গিয়েছে। আর ইঞ্চি নীচে দিয়ে যদি সেটা লাগতো আপনার রক্ষা ছিল না।'

পুলিশ সার্জেন্ট এগিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনাকে গুলি করল, অমরবাবু?'

সার্জেন্ট আমার পরিচিত। একবার একটা কেসে ওর সাহায্য নিয়েছিলাম।

পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের ধোঁয়া অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হল। সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জানি না।' ইচ্ছে করেই সত্য গোপন করলাম।

'জানেন না?' সার্জেন্ট রীতিমত বিস্মিত হল।

আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটু দুটো একটু দুর্বল মনে হল, মাথার যাতনাটাও যেন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

'বললাম তো জানি না। দরজার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছিলাম, দরজা ঠেলে কে একজন ঘরে ঢুকল, তাকে দেখবার আগেই আমার দিকে দুবার গুলি ছুঁড়ে চম্পট দিল সে।'

গোবিন্দর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম সে কাউকে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে কিনা।

গোবিন্দ ঘাড় নাড়ল। অপর কেউ যে দেখেছে তাও মনে হল না। কেউই কোন উচ্চবাচ্য করল না। ভালোই হল। এমনটাই চাইছিলাম আমি।

সার্জেন্ট বললে, 'মনে হচ্ছে আপনার পার্টনার পুলকেশবাবুকে যে খুন করেছে সে-ই এসেছিল আপনাকে খুন করতে।'

'আশ্চর্য কিছু নয়,' মন্তব্য করলাম আমি।

'আমার বিশ্বাস মিস্টার ঘোষাল এ ব্যাপারটা জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। আপনার ফোনটা যদি একবার ব্যবহার করতে দেন তাহলে বড় সুবিধে হয়।' টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

'স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারো', জবাব দিলাম আমি।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সমীর ঘোষাল এসে হাজির হল। সঙ্গে প্রবীর। সার্জেন্টের কাছে যে কাহিনী বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করলাম ওদের কাছে। সমীর একটু শুষ্ক হাসি হাসল। আমার কথা ও যে মোটেই বিশ্বাস করেনি এটা ওর মুখভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেশ একটু রেগে গিয়ে সে বললে, তুমি কী ভাবছ অমর, তা বুঝতে পারছি না। মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি? এখন আমি বুঝতে পারছি পুলকেশের খুনের ব্যাপারটা তুমি জানো, কিন্তু কোনো কারণে তা চেপে যাচ্ছ। আমি তোমায় জানিয়ে দিতে চাই, তোমার এই লুকোচুরির খেলা চলবে না বেশী দিন। তোমাকে আমি খতম করে ছাড়বো।'

'খতম করতে চাও, বেশ তাই করো। এতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তুমি যে এরকম সহৃদয়বোধ এ আমার আগে জানা ছিল না।'

অযথা তর্ক না করে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি। রাগে গরগর করতে লাগল সমীর।

চার

রাস্তার ওধারে এক পরিচিত রেস্টুরেন্টে ঢুকে কতকখানি ওষুধ গিলে নিলাম। এক আউন্স ব্র্যান্ডিও জল মিশিয়ে গলাধঃকরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। মাথার যন্ত্রণাটাও কমে এল ধীরে ধীরে। এতক্ষণ গোবিন্দকে দুচার মিনিট জেরা করে সমীর ঘোষাল চলে গিয়েছে নিশ্চয়। হয়তো হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে প্রবীরের সঙ্গে মতলব আঁটছে আমায় কি করে জব্দ করবে। ওর যা খুশী ও করুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার। সুজাতার কথাও মনে এল। সুজাতা আমাদের অফিসে এসেছিল বছর দুই আগে। বনেদী বংশের মেয়ে। লেখাপড়াও শিখেছে। কলকাতার এক মেয়ে স্কুলের শিক্ষিকা। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে ও মানুষ হয় ওর মাসির কাছে। মাসি মারা যাবার সময় নাকি নগদ প্রায় লাখ খানেক টাকা দিয়ে যায় ওকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এক ধনী লম্পটের চক্রান্তে ও জড়িয়ে পড়ে এক প্রতারণার কেসে। পুলকেশ আর আমি সেই বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করি অনেক কষ্টে। যতদূর আমি জানি, মেয়েটি সৎ ও শান্ত প্রকৃতির। ও যে কেন আমাকে খুন করতে চাইবে তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, যেমন করেই হোক এ রহস্যের উদ্ঘাটন করতে হবে আর এ কাজে আমাকে লাগতে হবে এখনই।

অফিসে ফিরে এলাম আমি। পুরোনো ফাইল বের করে সুজাতার ঠিকানাটা টুকে নিলাম নোটবুকে। তারপর বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়-করানো আমার টু-সীটার মোটরে উঠে পড়লাম। দুচার মিনিট পরেই বুঝতে পারলাম আমার গাড়ির পিছু নিয়েছে পুলিসের একখানা জীপ। আড়চোখে দেখলাম, জীপের আরোহী পুলিসের গোয়েন্দা বিকাশ সমাদ্দার। বুঝতে দেরী হল না, সমীর ঘোষাল ওকে নির্দেশ দিয়েছে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। জোরে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম নিউ আলিপুরের দিকে।

নিউ আলিপুরের 'বি' ব্লকে একখানা বাড়ির দোতলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে সুজাতা। এ বাড়িতে বাস করে যারা, তারা যে পদমর্যাদায় ও আর্থিক সম্পদে সাধারণ মধ্যবিত্তের অনেক উর্ধ্বে তা বুঝতে দেরী হয় না কারো। নীচতলার দারোয়ানের কাছে খোঁজ করতে জানা গেল, মাস পাঁচেক

আগে সুজাতা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। সুজাতার নতুন ঠিকানা সে জানে কিনা জিজ্ঞেস করলাম দারোয়ানকে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দারোয়ান বললে, যাবার সময় দিদিমণি তাঁর নতুন বাড়ির ঠিকানা রেখে গেছেন। যদি কেউ আসে তাঁর খোঁজে, তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সুজাতার নতুন বাসার ঠিকানাটা নোট-বুকে লিখে নিয়ে ফিরে এলাম গাড়িতে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই টাকুরিয়ার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকলাম। নম্বর দেখে বাড়ি ঠিক করলাম। এক পুরোনো ছোট একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, মাত্র দুখানা মাঝারি সাইজের ঘর, মাঝখানে একটু খোলা জায়গা। একখানা ঘরে তৈজসপত্র সাজানো রয়েছে। রান্নাঘর বলেই মনে হল। অন্য ঘরটির দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারলাম। ভিতর থেকে কোন আওয়াজ এল না। আবার দরজায় আঘাত করলাম। এবার বেশ একটু জোরে। তবু কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু ইতস্ততঃ করে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

ঘরের একপাশে জানালার ধারে খাটের উপর শুয়ে রয়েছে সুজাতা। পরনে জরি-রঙের সেই শাড়ীটা যা পরে আমার অফিসে এসেছিল আমার খুন করতে। চিত হয়ে শুয়েছিল সে। চোখ দুটো বোজা, মেক-আপ করা গালে চোখের জলের সুস্পষ্ট দাগ। বাঁ হাতটা বুকের উপর ন্যস্ত, ডান হাতটা রয়েছে পাশে, মুঠোর মধ্যে এখনও ধরে আছে ছোট একটা শিশি। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ও যে সত্যিই ঘুমিয়েছিল তা নয়। ওর দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা, জীবনের কোনো লক্ষণই ছিল না তাতে।

খাটের কাছে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর একটা খালি কাচের গ্লাস আর এক শিশি দুধের ওষুধও দেখতে পেলাম। শিশিটা তুলে নিয়ে দেখি তার অর্ধেক খালি। বুঝতে দেরী হল না কীভাবে সুজাতার মৃত্যু ঘটেছে।

খাটের কাছ থেকে সরে এসে ওপাশে ড্রেসিং ড্রয়ারের কাছে গেলাম। ওর উপর উপরেই দেখতে পেলাম সুজাতার হ্যান্ড-ব্যাগটা তার ভিতরে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে অটোমেটিক পিস্তলটাও নজরে পড়ল। পিস্তলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, গুলি একটাও নেই।

ড্রেসিং ড্রয়ারের উপরকার ড্রয়ারে ব্যাঙ্কের পাস বই পেলাম। পাস বই খুলে যা দেখলাম তা একটু আশ্চর্য রকমের। এক বছর আগে ব্যাঙ্কে জমা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এখন রয়েছে মাত্র দু' হাজার টাকা। প্রতি মাসেই চার হাজার টাকা তোলা হয়েছে অ্যাকাউন্ট থেকে।

পিস্তলটা হ্যান্ডব্যাগে পুরে, ব্যাঙ্কের পাস বইটা ড্রয়ারের মধ্যে যথাস্থানে রেখে চলে এলাম বাইরে। তারপর গাড়িতে উঠে ফিরে চললাম অফিসে।

অফিসে সুব্রতা অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। কে একজন অফিসে এসে আমার খুন করার চেষ্টা করেছিল এ খবর পেয়ে ভয়ে সে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। তাকে আমি বোঝালাম, ভালোই আছি আমি এবং একজন বেয়ারাকে বললাম, সুব্রতাকে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য।

পুরোনো ফাইল বের করে আমার ও পুলকেশের পুরোনো মক্কেলদের বারো-জনের নাম ও ঠিকানা টুকে নিলাম নোটবুকে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে।

সুজাতার ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃসাময় মনে হচ্ছিল। ঐ বারোজন মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে নানা প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করলাম তাতে ঐ রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হল। বারোজন মক্কেলের মধ্যে তিনজন স্বীকার করল, বছরাধিক কাল তারা পুলকেশ ও অন্য একটি লোককে প্রতি মাসেই মোটা টাকা দিয়ে আসছে লোক নিন্দার ভয়ে। ওরা দুজনে তাদের শাসিয়েছিল, নিয়মিত ওদের টাকা না দিলে ওরা তাদের গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবে। এই তিনজন মক্কেলই বললে, সে-দিন সকালে পুলকেশের সহযোগী অন্য লোকটি তাদের ফোন করেছিল টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনজন মক্কেলের মধ্যে মাত্র একজন অন্য লোকটিকে চেনে, কারণ কিছুকাল আগে পুলকেশের সঙ্গে করে সে ওর কাছে একবার এসেছিল টাকার তাগাদা করতে। তার নামটাও ও জানে। এই অজ্ঞাত মহাপুরুষটি যে কে সে সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই নামটা শুনে একটুও আশ্চর্য হলাম না।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে প্রবীরের দেখা পেলাম বালিগঞ্জে তার ফ্ল্যাটে।

আমায় দেখে একটু আশ্চর্য হল প্রবীর। সহাস্যে বললে, "এ যে দেখছি মেঘ না চাইতে জল! হঠাৎ কী মনে করে?"

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। তারপর সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললাম, "সুজাতা চক্রবর্তী নামে একটি মেয়ের ব্যাপারে এলাম এখানে।'

সুজাতার নামটা শুনেই মুহূর্তের জন্য প্রবীরের চোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল। আমার সামনে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'সুজাতা চক্রবর্তী? মেয়েটির নাম কোনোদিন শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।" তারপর একটা সিগার ধরিয়ে অলসভাবে আমার দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "ওর ব্যাপারে আমার কাছে এলে কেন?"

"সুজাতা মারা গেছে", মৃদুকণ্ঠে বললাম আমি।

'মারা গেছে?' প্রবীর যেন একটু চমকে উঠল। ওর গলার আওয়াজটা যেন একটু শঙ্কাজড়িত।

'সুজাতা আত্মহত্যা করেছে।'

চিন্তান্বিত মুখে ঘন ঘন সিগারে টান দিতে লাগল প্রবীর। 'কত লোকই তো আত্মহত্যা করছে। আমাকে কী করতে হবে এখন? শোকযাত্রায় যোগ দিতে হবে কি?'

'ও আত্মহত্যা করেছে শুধু এই কারণে যে ওকে কেউ ভয় দেখিয়ে দীর্ঘকাল ধরে টাকা আদায় করে যাবে এটা ওর অসহ্য হয়ে পড়েছিল।' কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বললাম আমি।

'ও।' নিরাসক্তভাবে বললে প্রবীর।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম অ্যাশ-ট্রের ওপর। তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে শান্ত গলায় বললাম, 'তুমি আর পুলকেশ—তোমরা দুজনে মিলে মেয়েটিকে দীর্ঘকাল ধরে শোষণ করে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিলে। পুলকেশ যখন খুন হল তখন মেয়েটি ভাবল, এবার বুঝি শোষণ থেকে মুক্তি পেল সে। সে জানত না, এ ব্যাপারে ওর একজন ভাগীদার ছিল। তার ধারণা ছিল, পুলকেশ একাই শোষণ করছিল তাকে। আজ সকালে তুমি যখন ফোন করলে তাকে, তখন সে জানতে পারল তুমিও আছ এ ব্যাপারের মধ্যে। তবে তুমি যে কে তা সে ধরতে পারেনি: সে অনুমান করল, যেহেতু পুলকেশ আমার পার্টনার ছিল, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি। অনেক চিন্তাভাবনার পর সে স্থির করল, এতকাল যে অন্যায় অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করে এসেছে সেটাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে সে হত্যা করবে আমাকে। নিজেকে মুক্ত করার এ ছাড়া আর কোনো পথ সে দেখতে পেল না। আমার অফিসে এল সে এবং সে যা করবে স্থির করেছিল ঠিক তাই করল। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করল, ভাবল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার। বাড়ি ফিরে এসে যখন সে বুঝতে পারল তার ঐ কৃতকর্মের ফল কী মারাত্মক হতে পারে তখন সে আত্মহত্যা করল ভয়ে ও নৈরাশ্যে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল প্রবীর। তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বললে, 'তোমার গল্পটা খুবই ইনটারেস্টিং, অজয়; তবে কিনা প্রমাণ হাতে না করেই এসব আজগুবি গল্প সকলে বেড়ানো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় বলে আমি মনে করি। নিশ্চয় করে গল্পের সেই অংশটা যার মধ্যে অ-ভাবে উঠে আমা হয়েছে।'

'প্রমাণ? প্রমাণ আছে বৈকি—বিশেষ করে সেই অংশটার যাতে তোমার ভূমিকা রয়েছে।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম আমি।

আরেকটা সিগারেট ধরালাম। 'তোমার ও পুলকেশের শিকার হয়েছিল ক-জন তা

আমি ঠিক পারি না। তাই শুধু চাকচক্যের নষ্ট করতে পারি। সুজাতা চক্রবর্তী, মীনা গাঙ্গুলী, মিসেস মজুমদার আর মিসেস ঘোষ—এরা সবাই একসময় আমার ও পুলকেশের প্রায় [illegible] ছিল। সুতরাং মনে পেলে, বাকী তিনজনের দুজন পুলকেশের গোপন [illegible] সম্পর্কে আসেনি কোনদিন। কিন্তু [illegible] যে সৌভাগ্য হয়েছে। সে নয় কাছে তোমার। শুধু তাই নয়, আমাকে সঙ্গে করে সবাইয়ের কাছে গিয়ে সব কথা প্রকাশ করতে সে খুবই উৎসুক।'

উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ। কুৎসিত ভাষায় গালি দিল আমাকে। তারপর চোখ রক্তবর্ণ করে বললে, 'তোমার মতলবটা কী? আমাকে জেলে দিতে চাও?'

আস্তে-আস্তে আমিও চেয়ার থেকে উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, 'জেলে যাবার কাজ যদি করে থাকো, জেলে যাবে বৈকি।'

রাগে উত্তেজনায় দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে এল প্রদীপ।

এক পা পিছিয়ে গেলাম আমি। 'আমার উপর বল প্রয়োগের চেষ্টা করো না, প্রদীপ। তুমি যদি বল প্রয়োগ করো, আমি তার উত্তর দিতে জানি। গল্পের শেষটুকু তোমাকে বলা হয়নি এখনও। মনে পু-লকেশের হত্যা সম্পর্কে বলছি।' পকেটে তখন হাতটা ঢুকিয়ে চেপে রইলাম রিভলভারটা।

পুলকেশের হত্যার সঙ্গে আমার

সম্পর্ক কী?' গর্জে উঠল প্রবীর। তার কণ্ঠস্বরে যায় জমতে শুরু হল।

'সম্পর্ক আছে বৈকি; এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটু চিন্তা করেছি আমি। পুলকেশকে খুন করেছে দুটো পার্টির একটা। পুলকেশ যাদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত তারা হল এক নম্বর পার্টি। সুজাতা যে ওকে খুন করেনি তা আমি জানি। পুলকেশকে খুন করা হয়েছে .৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার দিয়ে। সুজাতার কাছে যে রিভলবার ছিল সেটা .২৫ ক্যালিবারের। মীনা গাঙ্গুলী, মিসেস মজুমদার বা মিসেস দত্ত—এদের কেউ যে পুলকেশকে খুন করেনি সেটাও সহজে অনুমান করা যায়, কারণ ওদের মধ্যে কেউ যদি খুন করে থাকতো, তাহলে পুলকেশ যে তাকে ব্ল্যাকমেল করেছে একথা আমার কাছে স্বীকার করে বিপন্ন করত না নিজেকে। ঐ চারজন ছাড়া আরও কয়েকটা শিকার হয়তো জুটিয়েছিলে তোমরা—যাদের নাম আমার জানা নেই। তাদের কেউ অবশ্য খুন করে থাকতে পারে। এ সম্ভাবনা যে নেই তা আমি বলি না।

দু' নম্বর পার্টি হলে তুমি, প্রবীর। কেন তুমি পুলকেশকে খুন করলে তা আমি জানি না। হয়তো ঝগড়া হয়েছিল তোমাদের কোনো ব্যাপার নিয়ে: হয়তো একজন অপরকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল: কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, আমার দৃঢ় ধারণা তুমিই ঐ ব্যাপারে প্রথমে জড়াবার চেষ্টা করেছিলে আমাকে এবং তার পর বীরেশ সান্যালকে।

তোমার বিরুদ্ধে অবশ্য এখনও তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে প্রমাণ সংগ্রহ করার পথ রয়েছে অনেক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, পুলকেশকে যে রিভলবার দিয়ে খুন করা হয়েছে সেই রিভলবারের ব্যাপারটা:

রিভলবারটা পাওয়া যায়নি। হয়তো তুমি ওটা ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলেছ। হয়তো বা তুমি ওটা কাছেই রেখে দিয়েছ, বিক্রি করতে ভরসা পাওনি। কারণ ওটা হয়তো রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল তোমার নামে এবং দৈবাৎ যদি ওটা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় তাহলে তোমার শাস্তি অনিবার্য। এর পর অ্যালিবাই-এর প্রশ্ন আসতে পারে। যে সময় পুলকেশ খুন হয় সেই সময় ঘটনাস্থলে তুমি যে ছিলে না এটা দেখাবার ব্যবস্থা হয়তো তুমি করে রেখেছ, কিন্তু কোনো মিথ্যা গল্প বানিয়ে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যায় না, বিশেষ করে সমীর ঘোষালের মতো ধুরন্ধর পুলিশ অফিসারকে। জানি সমীর তোমার আত্মীয়, কিন্তু ওকে যতদূর জানি, আত্মীয়তার সম্পর্ক ওকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারবে না।'

বক্তব্য শেষ করে পা বাড়ালাম দরজার দিকে। দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ালাম আস্তে-আস্তে। আমি যে কর্তব্যসাধনে দৃঢ়সংকল্প এটা প্রবীরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'সমীরের কাছে চললাম আমি। সব কথা জানাবো ওকে। হয়তো খুনের অপরাধে তোমাকে অভিযুক্ত করতে পারবে না সে। তুমি হয়তো যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছ সেদিক থেকে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আমার এক পুরোনো ক্লায়েন্ট-এর সাক্ষ্যের সাহায্যে সে তোমায় গ্রেপ্তার করতে পারবে ব্ল্যাকমেলের অপরাধে। কাজেই তুমি যদি ফাঁসির দড়ি থেকে নিষ্কৃতি পাও, জেলে তোমায় পচতেই হবে।'

প্রবীর কি যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম আমি।

আমার মোটরটা দাঁড়-করানো ছিল সামনের রাস্তার ওপর। সেদিকে যখন চলেছি তখন ওখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়-করানো আর একখানা মোটরের ওপর নজর পড়ল আমার। গাড়িখানা চিনতে দেরী হল না, গাড়ির চালককেও চিনতে পারলাম। দেখলাম, বিকাশ সমাদ্দার আমার পিছু নিয়েছেন—যদিও ঘণ্টা কয়েক আগে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিলাম দ্রুত গাড়ি চালিয়ে। লক্ষ করলাম মোটরের দরজা খুলে বিকাশ বেরিয়ে আসার উদ্যোগ করছে। হঠাৎ পিছনে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি প্রবীর এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার দুই হাত কোটের দুই পকেটের মধ্যে, মুখের চেহারা বীভৎস।

'সমীরের কাছে যাবে বলে ভেবেছ? ওখানে যাওয়া তোমার হবে না।' ওর গলার আওয়াজটা বিকৃত—'ওর কাছে যাওয়া কোনোদিনই ঘটবে না তোমার।'

হাতটা পকেটে ভরতে যাচ্ছিলাম রিভলবারটার সন্ধানে।

'খবরদার!' গর্জন করে উঠল প্রবীর, 'আমারও পকেটে রিভলবার রয়েছে। যদি কোনরকম চালাকি করো, এখনই গুলি করে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবো।'

'তাহলে কি আমি ধরে নেবো তুমিই খুন করেছ পুলকেশকে?'

'চুপ করো বেয়াদব। ভালো মানুষের মতো গাড়িতে গিয়ে উঠে বসো। আমি যেখানে বলবো, সেখানে নিয়ে চল আমায়।'

আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠলাম। আড়চোখে লক্ষ করলাম। বিকাশ এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। প্রবীরও লক্ষ করল তাকে। একবার সে তাকায় আমার দিকে, একবার তাকায় বিকাশের দিকে। তার এই ভুলের সুযোগ নিলাম আমি। চট্ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বাগিয়ে ধরলাম শক্ত করে। তারপর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম প্রবীরের সামনে।

'হুঁশিয়ার, বিকাশ। চট্ করে তৈরী হয়ে নাও।' চেঁচিয়ে বললাম আমি।

প্রবীর আমাদের দিকে তাকাল উন্মাদের মতো। তারপর ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করে বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে লাগল আমাদের দুজনকে লক্ষ করে। বিকাশ হতচকিত। একটা গুলি এসে লাগল তার বাঁ কাঁধে, আরেকটা আমার পায়ে। আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলাম না। গুলির জবাব দিলাম গুলিতে। দু এক মিনিট পরেই প্রবীরের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল রাস্তার উপর।

পায়ের যন্ত্রণায় আমি বসে পড়েছিলাম মাটিতে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলাম প্রবীরের দিকে। তিনটে গুলি লেগেছে ওর গায়ে। জ্ঞান হারিয়েছে প্রবীর, মরেনি। ওর ডান হাতের কাছে পড়ে রয়েছে ওর রিভলবারটা। পরীক্ষা করে দেখলাম, ওটা '৩৮ ক্যালিবারের রিভলবার।

বাঁ কাঁধটা রুমাল দিয়ে চেপে ধরে বিকাশ গালমন্দ করছে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে। ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আঘাতটা গুরুতর কিনা। বিকাশ জানাল, তেমন গুরুতর নয়।

ঐ ঘটনার পর দুদিন বেঁচেছিল প্রবীর। পরীক্ষায় জানা গেল, ওরই রিভলবারের গুলিতে পুলকেশের মৃত্যু ঘটে। খবরটা প্রবীরকে জানানো হলে, সব কিছুই সে সমীরের কাছে স্বীকার করল মরবার কিছুক্ষণ আগে। সে বললে, পুলকেশ একজনের কাছে ব্ল্যাকমেলের টাকা আদায় করে তাকে ভাগ দিতে অস্বীকার করে, এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধে, প্রথমে হয় ঘুষোঘুষি, তারপর দুজনেই চালায় রিভলবার, ফলে পুলকেশের মৃত্যু। ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়।

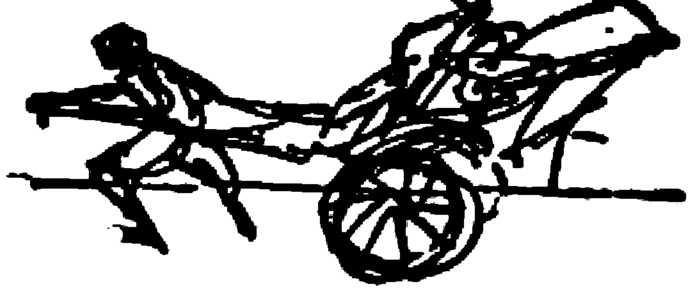

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

পথ কি—পথ কই?

সন্দেহ ছিল। আশংকাও কম ছিল না। কিন্তু সব সন্দেহ এবং আশংকাকে অমূলক প্রতিপন্ন করে সবগুলি পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুরুদুরু বুকে সবাই এবার রেজাল্টের অপেক্ষা করছিল। রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ফলাফলে দেখা গেল মেয়েদের জয়জয়কার। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় প্রথম দুটি স্থানই মেয়েদের দখলে। কৃতিত্বের দিক থেকে একে নয়া নজির বলা চলে। কয়েক বছর আগে একটি মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সাফল্যের নয়া ভিৎ স্থাপন করে। সেই ভিতে এবার সুদৃঢ় ইমারত গড়েছে ইন্দ্রাণী এবং অরুন্ধতী। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ওরা। দুজনে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছে। স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম দুটি স্থান সবসময় ওদের দখলেই থাকতো। এক বছর ইন্দ্রাণী প্রথম তো অন্য বছর অরুন্ধতী। এমনিভাবে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে ওরা এগুচ্ছিল পাশাপাশি। জীবনের সর্বপ্রথম পাবলিক এক্সামিনেশনেও ওদের পাশাপাশি অবস্থান অক্ষুন্ন রইলো।

ইন্দ্রাণী এবং অরুন্ধতী শুধু একই স্কুলের পড়ুয়া নয়, বাড়িও ওদের পাশাপাশি। আবার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি উপলক্ষেও ওরা একই জায়গায় সমবেত হয়েছে। দুজনেই ভর্তি হয়েছে খড়্গপুর আই, আই, টিতে। এবার পথ অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। ইন্দ্রাণী ম্যাথমেটিকসে অনার্স নিয়েছে আর অরুন্ধতী ভর্তি হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ। হায়ার সেকেন্ডারীতে দুজনেই চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে।

হায়ার সেকেন্ডারীতে সাফল্যের সূচনা মাত্র বলা চলে। দু'একদিনের ব্যবধানেই প্রি-ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট বেরোয়। এই পরীক্ষায়ও মেয়েদের সামনে ছেলেরা পিছু হটেছে। আর্টস এবং সায়েন্স এই দুই বিভাগেই প্রথম হয়েছে মেয়েরা। পি, কে, বালা এবং এন, কে, জয়লক্ষ্মী এগিয়ে এসেছে সাফল্যের এই ধারা অক্ষুন্ন রাখতে। প্রথম দুটি স্থান যেমন ওরা দুজন দখল করেছে তেমনি আরো সহযোগী এগিয়ে এসেছে নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় বহন করে। এই সার্বিক যোগ্যতার যোগফলে দেখা যায় যে, আর্টসে সাতটি এবং সায়েন্সে চারটি স্থান ওরা দখল করেছে। হায়ার সেকেন্ডারী এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় সাফল্যের কৃতিত্ব আরো উজ্জ্বল হবে অন্যান্য পরীক্ষায়। কারণ, এখনো অনেক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুতে বাকি।

এবার আর একটি জরুরী সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক। এই সমস্যা কলকাতা শহরে যতটা তীব্র মফস্বলে ততটা নয়। স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনোর পর অনেকেই কলকাতায় এসে পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু কলকাতা শহর দরাজ হস্তে সে সুযোগটুকু সবাইকে দিতে রাজি নয়। নানা কারণে এবার সমস্যার তীব্রতা সেরকম উপলব্ধি করা যাচ্ছে না কিন্তু আমাদের প্রতি বছরের অভিজ্ঞতায় যে তিক্ততা সঞ্চিত আছে তা থেকে একথা কারো অজানা নেই যে কলেজে সীট পাওয়া কি শক্ত ব্যাপার। আগে আগে এই সমস্যা এতো তীব্র ছিল না। দিনে দিনে সব ক্রমবর্ধমান সমস্যার মতো এটিও আমাদের নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে কম নয়। একটু দেরি হলে তো কোন কথাই নেই যথাসময়ে হাজিরা দিয়েও সীট না পেয়ে অনেককে মলিন মুখে ফিরে যেতে হয়েছে কলেজের দোরগোড়া থেকে।

সীট পাওয়া নিয়েই কিন্তু সমস্যা মিটে যায় না। আর একটি গুরুতর সমস্যা হলো হোস্টেল নিয়ে। বিশেষ, মেয়েদের প্রায়ই এই সমস্যায় ভুগতে হয়। কলেজে সীট পাওয়া গেল তো হোস্টেল বিমুখ করলো। কলকাতার অনেক কলেজে মেয়েদের জন্য আলাদা পড়বার ব্যবস্থা আছে কিন্তু থাকবার ব্যবস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষ করেন না। কো-এডুকেশন কলেজগুলিতেও মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে বলে জানি না। এর অর্থ দাঁড়ায় এরকম, তুমি বাইরে থেকে এসেছ তাই দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে কলেজে সীট দিয়েছে তা বলে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো না। ওটুকু নিজেকে করে নিতে হবে। কলকাতা শহরে এই থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার সে কথা আমাদের কারো অজানা নয়।

আসল কথা হলো যে মেয়েদের হোস্টেলের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাববার প্রয়োজনীয়তা এতদিন কেউ উপলব্ধি করেননি। অথচ কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে সীট না পেয়ে যে কি বিপাকে পড়তে হয় সেকথা একমাত্র ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি হোস্টেল অবশ্য আছে। প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যাল্পতার কথা বলাই বাহুল্য। এসব হোস্টেলে সীট পাওয়ার জন্য মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই দুর্ভোগের কাহিনী সবারই জানা, কিন্তু কার্যকরী ব্যবস্থা তেমন গ্রহণ করা হয় না। অথচ শুনেছি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, মেয়েদের কয়েকটি নতুন হোস্টেলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা আছে অথচ কাজে লাগানোর কোন ব্যবস্থা আজো হচ্ছে না। আর এ ব্যাপারে শুধু একা বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী নয় প্রতিটি কলেজও সমানভাবে দায়ী। প্রত্যেক কলেজের উচিত মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র হোস্টেলের ব্যবস্থা করা। কো-এডুকেশন কলেজগুলির দায়িত্ব এ ব্যাপারে সর্বাধিক। সবাই এগিয়ে এলে কলকাতায় পড়তে-আসা মেয়েরা অনেক দুর্গতির হাত থেকে রেহাই পায়। এ ব্যাপারে আর কোন বিলম্ব করা চলে না।

কিন্তু সমস্যা তো একটা নয়। হাজারো সমস্যা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজে সীট জোগাড় করে হোস্টেলের সমস্যা পাশ কাটিয়ে না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বেরুনো গেল কিন্তু তারপর তো নিঃসীম অন্ধকার। চাকরি পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ, যে দেশে এখনো অনেকের ধারণা যে মেয়েরা চাকরি করতে আসা মানেই একটি ছেলেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের এহেন ধারণার কারণ যে, বিয়ের পর তো আর চাকরির দরকার হয় না মেয়েদের। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য চাকরি করতে না এসে বরং চাকরির চেষ্টা থেকে মেয়েদের বিরত থাকাই ভাল। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আজকাল অনেকেই জানেন যে, এই ধারণাটি একান্তই ভ্রমাত্মক। অবশ্য বিয়ের পর যে কোন মেয়ে চাকরি ছাড়ে না এমন নয়। দু'একজন তো ছাড়তেই পারে। কিন্তু চাকুরিজীবী অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রে একথাটি খাটে না। বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত একাধিক মেয়ের সংস্পর্শে এসে আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে বিয়ের পর চাকরি তো কেউ ছাড়েই না বরং যারা বিয়ের আগে চাকরি করতো না তাদের কেউ কেউ চাকরির সন্ধান করে।

কে একজন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, যে দেশে চাকরি পাওয়া এতো কঠিন ব্যাপার সে দেশে ডিগ্রির বদলে হাতে হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিলে অনেক সুবিধা হয়। কথাটা এমন সত্য যে, পাশ করে বেরিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। চাকরি পাওয়া আর ভগবানের দেখা পাওয়া একই রকম। দুইই দুর্নিরীক্ষ্য। হাঁটতে হাঁটতে আর ধর্না দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম কিন্তু চাকরির দেখা মেলে না। একটা চাকরির খবর পাওয়া গেলে কয়েক হাজারের ভিড় হয়। সে চাপ থেকে নিজেকে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই ভিড়ের মধ্যে কার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে? যে বা যারা চাকরি পেল তারা ভাগ্যবান। তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে করতে বাদবাকি সবাই নতুন চাকরির চেষ্টা দেখে।

কিন্তু চাকরির ভরসায় আজ আর বসে থাকা যাচ্ছে না। না ছেলে না মেয়ে। কেউ চাকরির স্বপ্নে নিশ্চিন্ত বিলাসে কাটাতে সাহস পাচ্ছে না। তাই ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরাও পথে নেমে পড়েছে। নিজেদের পথ তারা নিজেরাই করে নিতে চায়। ছড়ানো-ছিটানো নানা জীবিকায় তারা নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। হকার্স কর্ণারে স্টল নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষায় তারা অনেক আগেই নেমে এসেছে। ফুটপাথেও তাদের অনেককেই এখন দেখা যায়। কিন্তু যেটা দেখা যেতো না তা হলো পুজোর ভিড়ে ফুটপাথে পশরা সাজিয়ে বসতে তারা ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। এবারের পুজোয় সে সংকোচও কেটে গেছে। এই কলকাতা শহরের কোন এক জনবহুল ফুটপাথে তারা এবার বসে পড়েছে। আশে-পাশে অসংখ্য পুরুষ প্রতিযোগী। সবাই বসেছে পুজোর আসল আকর্ষণ জামাকাপড় নিয়ে। ওরা কিন্তু সেদিক দিয়ে যায়নি। ওরা নজর দিয়েছে মেয়েদের দরকারী জিনিসপত্রের দিকে। নানা কাচের জিনিস, হার আর মালা নিয়ে ওদের ছোট ছোট দোকান। বাঙালী মেয়ে পুজোর মরশুমে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে অনেক ক্রেতাই সাগ্রহে এগিয়ে আসছেন।

এরকম দুটি দোকান দেখা গেছে। একই অঞ্চলে। ওরা দুজনেই শিক্ষিত অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু চাকরি পায়নি। চেষ্টা চরিত্র কম করেনি। ধরাকরা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত তবু কোন ব্যবস্থা হয়নি। এদিকে বাড়ির চাপ বাড়ছে। কজনের বাড়ির অবস্থা আর স্বচ্ছল? চাকরির যোগ্য ছেলে বা মেয়ে তা সে যেই হোক কেউ বসিয়ে খাওয়াতে পারে না। এতদিন ধরে লেখাপড়া শেখানোর পর সবাই আশা করে যে এবার ওরা রোজগার করবে, সংসার স্বচ্ছল হবে। কিন্তু দিনের পর দিন সবাই সে আশায় হতাশ হচ্ছেন। চাকরি নেই। সংসারের দৈন্য ঘুচছে না। উপরন্তু উপযুক্ত ছেলেমেয়ে সংসারের বোঝা বাড়াচ্ছে। বাড়ির সবাইকে ক্ষণিক স্বস্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওরা এই দুঃসাহসে পাড়ি জমিয়েছে। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবস্থা করে নেওয়ার সদিচ্ছা তো আছেই। ফুটপাথে বসতে বসতে ভবিষ্যতে যদি একটা দোকানের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়।

উদ্দেশ্য ভালো। উদ্যোগ আরও প্রশংসনীয়। কিন্তু এ পথে কি সমস্যার সমাধান হবে? জড়তা এবং সংকোচ কাটিয়ে যারা ফুটপাথ আশ্রয় করে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে তাদের না হতাশ হতে হয়? কারণ, এবারেই তো অনেক ফুটপাথ-দোকানের কাছে একটা কথা বারবার শুনেছি খরিদ্দারের চেয়ে বেচবার লোক বেশি এই যদি অবস্থা হয় তা ওদের সকল আশা অচিরেই শুকিয়ে যাবে। ওরা টিঁকে থাকলেও ওদের কথা শুনে যারা উৎসাহিত হবে তাদের হাল কি হবে? পুজোর আনন্দ উৎসবের রেশ না মিলোতে মিলোতেই সেই জলজ্যান্ত প্রশ্নটা আবার ঘুরেফিরে বিরাট জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন হয়ে চোখের সামনে দাপাদাপি শুরু করেছে, এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানের পথ কি? প্রমীলা

প্রিয়ংবদা দেবী ১৮৭১-১৯৭১

দীপন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্য গগনের সর্বশেষ সীমারেখা পর্যন্ত উদ্ভাসিত সেই সময় আবির্ভূতা হন প্রিয়ংবদা দেবী। রবিরশ্মির চারপাশে তিনি একটি সূর্যমণ্ডল রচনায় ব্রতী হন। অসামান্য প্রতিভা না থাকলেও আন্তরিকতা এবং সারল্যের জন্য অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

একটি প্রায়বিস্মৃত নাম : প্রিয়ংবদা দেবী। তাই বোধহয় তিনি অবহেলিত। বাংলা সাহিত্যের সুবৃহৎ ইতিহাসে সমালোচকরা কেউ কেউ তাঁর নামটি শুধুই উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। আমরাও কিছু জানতে পারি নি। তাই শতবর্ষের আলোকে প্রিয়ংবদা দেবী আলোকিত হন নি। ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্যের অন্ধকারের মতই সহৃদয় পাঠকের অন্তরাল থেকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়েছেন।

প্রিয়ংবদা দেবীর জন্ম ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। পূর্ব বাংলার অন্তর্গত পাবনার গুনাইগাছাতে তাঁর জন্ম হয়। অশান্ত জলকল্লোলে তিনি কৃষ্ণনগরে এসে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। নতুন জীবন শুরু হয়। মাতামহ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁরই প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এই কিশোরী বালিকার ভাসা-ভাসা চোখে ছিল সজল কবিত্ব। স্কুল পত্রিকায় তাঁর কবিতাই ছিল উত্তরকালের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। আবার শালাবকলের নাটক শুরু হয়। ১৮৮৮তে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হন। এর পর এফ-এ পরীক্ষাও পাশ করেন দু বছর পরে। ১৮৮২ থেকেই বেথুন স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন কবিত্বের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শহরের কংক্রিটের উপশিরায় তাঁর কাব্যস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। স্নাতক মানে অধ্যয়নের সময় তাঁর কবিত্বশক্তি সুচারুভাবে বিকশিত হচ্ছিল। এর পর তিনি গ্রাজুয়েট হন। সে যুগে মহিলা স্নাতক ছিল না বললেই হয়। ১৮৯২তে স্নাতক হন এবং সংস্কৃতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে তিনি রৌপ্যপদক বিজয়ী হন। এই তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার।

প্রিয়ংবদা দেবীর জীবননাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয় ১৮৯২তে। ছোটখাট পত্রিকায় তখন লেখার ডাক আসছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলা কবিও খুব সচেতন। তবু সুযোগ-সুবিধা প্রথম দিকে পান নি। অক্লান্ত নিষ্ঠা নিয়ে আর অপরিসীম অধ্যবসায় নিয়ে প্রিয়ংবদা দেবী এগিয়ে চললেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর বিবাহ হয় মধ্যপ্রদেশের এক সুখ্যাত ব্যবহারজীবীর সঙ্গে। তাঁর নাম তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয়ংবদা বাগচীর নাম এই সময় বদলে যায়। এর পর কবিতাগুলি 'দেবী' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর দাম্পত্য জীবন খুবই অল্প সময় স্থায়ী ছিল। ১৮৯৪-তে পুত্র তারাকুমার জন্মায় এবং পরের বছর স্বামীর মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে তাঁর একমাত্র সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এত শোক তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ফলে কাব্যের মধ্যে এর ছাপ পড়ে। অধিকাংশ কবিতাই শোকগীতি হয়।

তাঁর জীবনের এই দুর্ঘটনার জন্য কাব্যের মধ্যে একটি করুণ সুর প্রকাশিত হয়। একটি 'রোজিক' অনুভূতি কাব্যে প্রকাশিত হয়।

কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা প্রিয়ংবদা দেবী মাতা প্রসন্নময়ী দেবীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মাতা ছিলেন তাৎকালিক সংবাদ 'ধনকতার বর্তিরতা। মায়ের কাছ থেকেই তাঁর কাব্যপ্রেরণা হয়েছিল; আবার পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচীও তাঁকে সতত উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে পিতামাতার প্রভাবে কিছু আধ্যাত্মিক এবং রোমান্টিক কবিতা লিখেছিলেন। তবে পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের গভীর শোক তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রেণু'তে প্রোৎসাহিত হয়। তিনি চিরবিরহের বার্তা নিয়ে আবেগ দিয়ে বলেছেন :

'মেঘ নামিয়াছে আজ ঘোর চারিপাশ,
সব স্নিগ্ধ অন্ধকার। সজল বাতাস
হরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে
ছোটে গর্বভরে।'

এই 'রেণু'তে অমর শোক আছে। নিরাবাধা আছে। আকুল আর্তিও রয়েছে। অনেক শোকগীতি টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম'কে স্মরণ করায়; আবার কখন-বা কবি কাহিনী মায়ের পুত্রশোককেও মনে করিয়ে দেয়। তবে প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যরচনার মধ্যে পুত সংযম ও তপস্যার ভাবতন্ময়তা প্রতীয়মান হয়।

রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্যা প্রিয়ংবদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জহুরী—তাই মণি-মুক্তা তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তিনি প্রিয়ংবদা দেবীকে প্রথম প্রতিষ্ঠার মালাদান করেন। এইটি প্রিয়ংবদা দেবীর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতারূপে স্বীকৃত।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। এখানে কার্তিক সংখ্যায় পর-পর প্রিয়ংবদা দেবীর পাঁচটি কবিতা ছাপেন। সকলেই এই ঘটনায় বিস্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি ঠাকুরবাড়ীর পত্রিকাগুলি। এর মধ্যে উল্লেখ্য অবশ্যই 'ভারতী' বা 'বালক' — এমন কি রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'—তবে প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে 'লেখন' গ্রন্থের সম্পর্ক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

১৯০০ সালে 'রেণু' কাব্যগ্রন্থের পর একটি শোককাব্যগাথারূপে 'তারা' ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে তিনি 'পত্রলেখা' এবং 'অংশু' কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এগুলি যথাক্রমে ১৯১১ এবং ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয়। তারপর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'চম্পা ও পাটল' বা ১৯৩৯-এ প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল দীর্ঘায়িত। গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যবর্তীকালে তাঁর কবিতা নির্বাচনে যে সংযম ও ধৈর্য চিহ্নিত হয় তা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর কাব্যসাধনার আরাধনা 'সাধনা' কবিতায় বিধৃত :

'শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ বেদনা।।'

তিনি অজস্র কাব্য রচনা করেছেন। সব কাব্যই তাঁর মনে রেখাপাত করে নি। এজন্যই কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা স্বল্প। আবেগ বা উচ্ছ্বাস নিয়ে অজস্র কাব্য তিনি রচনা করেন নি। এই সংযম মহৎ কবিরই নিদর্শন। প্রিয়ংবদা দেবী এইভাবে আপন ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে যে কাব্য লেখেন তার পাঠকের সংখ্যা অল্পই থেকে গেছে।

প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যের মধ্যে গীতিসুর মৌল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 'লিরিকের' অতিরঞ্জনও দেখা দিয়েছে। বাউলের বৈরাগী সুরের একতারায় যে সুর ধ্বনিত হয়, প্রিয়ংবদা দেবীর রচনায় তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। 'আশাতীত' কবিতায় তার নিদর্শন পাওয়া যায় একটি বিশিষ্ট শিল্পিত ভাবনায় :

'ওরে মোর ভালবাসা,
তোমায় পারি না বাঁধিতে, তাবে রূপ দিতে
তেমন নাহিকো ভাষা।'

গীতিসুরের উন্মাদনায় তিনি মন্ময় কবিতা লিখেছেন। ফলে সাবজেক্টিভ দৃষ্টিকোণ প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যে দেখা গিয়েছে। কবিতা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মত তন্ময়তায় বিশ্বজনীনতায় সমুদ্ভাসিত হয় নি। তবু আত্মগত ধ্যানধারণায় মাঝখানে শোকে দুঃখে ক্লান্ত মহিলা কবি প্রিয়ংবদা যে আর্তি প্রকাশ করেন, তার আবেদন অসামান্য :

'আমার সকল আলো অঞ্জলি ভরিয়া,
প্রিয় সে, আপন করে রেখেছ হরিয়া।'

প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যসাধনার মধ্যে রোমান্টিক সুর থাকলেও, শোকগীতির সাহচর্যের জন্য এটি রহস্যময়তার মাঝখানে ক্রমশই মিস্টিক হয়ে যায়। তবে শেষকালে একটি সাবলাইম ভাবে আত্মজিজ্ঞাসা রচিত হয়। এখানে তিনি সঙ্কোচ বা স্খলন দূর করে বিশ্বস্রষ্টার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই অংশের কবিতাগুলি তিনি অধ্যাত্ম সুর-মূর্ছনায় উদ্বোধিত করেছেন। এর আবেদন অন্তরস্পর্শী। এর কাব্যমূল্যও অসীম। এখানে তিনি সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনের ঊর্ধ্বে গমন করেছেন। পরন্তু প্রান্তিকে তিনি দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছেন। আর অনুরাগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন :

'তুমি যে অসীমে তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে।'

রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শ থেকেও রবীন্দ্রনাথকে প্রিয়ংবদা দেবী কাব্যচেতনায় গ্রহণ করেন নি। এটি অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক সমালোচক 'খেয়া' (১৯১০) কাব্যের মধ্যে প্রিয়ংবদা দেবীর 'রেণু' (১৯০০)-র কিছু প্রভাব আছে বলে মনে করেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রিয়ংবদা দেবীর ভক্ত পাঠক ছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে' প্রিয়ংবদা দেবীর কাব্যকে স্থান দেন। এখানে তার 'আশাতীত' এবং 'সাধনা' কবিতা দুটি সংকলিত হয়। ১৩৪১-এ তাঁর মৃত্যু একটি বিশিষ্ট কাব্যচেতনার যবনিকা টেনেছিল। একটি যুগের অবসান হয়েছিল। তবে পরবর্তী যুগে তার প্রভাব পড়ে নি। নতুন যুগান্তরের যাত্রী তিনি হলেন কালেও, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা সবই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

যে ফুল ঝরে যায়, তাকে ত আর বৃন্তে স্থাপন করা যায় না; কিন্তু তার সৌরভ ধূপের ধোঁয়ার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালবৈশাখীর দমকা বাতাসে একটি জীবনদীপ একটি ফুৎকারে নিভে গেলেও প্রিয়ংবদা দেবী তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে অমর হয়েছেন। অন্ধ তিমিরের মানবযাত্রীর দল আলোকের সন্ধানে চলে অভিসারে— এই অভিসারের পথে যাঁরা সার্থক পরিচয় রেখেছেন প্রিয়ংবদা দেবী তাদেরই অন্যতম।

এইচ· এম· ভি·

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৭৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭২৩

রূপ ও লাবণ্যে হংসেশ্বরী

অঞ্জলি চৌধুরী

কথা হচ্ছিল মনসুর আলির সঙ্গে। মনসুর রিকসাওয়ালা, আমাদের পথ-প্রদর্শক। গুনগুনে গান গাইতে গাইতে বোধ হয় মনসুর আমাদের গল্প বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এক সময় রিকসা চালাতে চালাতে পিছন ফিরে সামান্য একটু হেসে বললো, 'আমি শুনেছি অনেক দিন আগে, তা কত দিন সে আর বলতে পারবো না, এখানে দেবরায়দের রাজবাড়ীতে খুব ঘটা করে একটা মন্দির তৈরী হয়েছিল কোন একজন রাজার সময়ে। রাজামশাই-এর নামটা আমার মনে নেই। লোকে বলে সেই কালীমন্দিরের কালীমূর্তিকে স্বপ্নে একজন মুসলমান পেয়েছিলেন। আর সেই মূর্তিটি হিন্দুদেবী হওয়ার জন্য তিনি এনে সঁপে দিলেন রাজার হাতে। এই রাজা মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন এত সুন্দর এক মন্দির।

এরপর মনসুর আর বিশেষ কথা বলে নি। কি জানি তার কোন পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো কিনা!

প্রায় পঞ্চাশ মিনিট বাদে অনেক চওড়া রাস্তা, সরু গলি পেরিয়ে মনসুর বললো, 'ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' ধীরে খোয়াফেলা রাস্তা দিয়ে অতি সন্তর্পণে রিকসা এসে দাঁড়ালো রাজবাড়ীর নহবত-খানার ভগ্নাবশেষের কাছে।

মনসুর বড় একটা গাছ দেখে তার নীচে রিকসা দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। আমরা দুজন এগিয়ে চললাম। সামনে প্রশস্ত চাতাল পেরিয়ে তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে পৌঁছতে হয়। ওখানে আলাপ হয়েছিল মন্দিরের পূজারী শ্রীযুক্ত অনিল-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অমায়িক ভদ্র-লোক হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 'প্রায় ত্রিশ বছর এ মন্দিরের পূজোর কাজ আমিই তত্ত্বাবধান করছি। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে আমিই এ মন্দিরের পুরোহিত। শুনেছি আজ থেকে একশো তিরাশি বছর পূর্বে রাজা নৃসিংহ দেবরায় মহাশয় তান্ত্রিক সাধনায় কাশীতে স্বপ্নে এই বিগ্রহটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরে এই মন্দিরটি নির্মাণ করে বিগ্রহটিকে এখানে স্থাপন করেন।'

হঠাৎ পাশ থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজে মনসুর আলির কিংবদন্তী আবার শুনলাম। কথা শুনে তাকিয়ে দেখি একজন স্থানীয় বর্ষীয়সী মহিলা উত্তরের অপেক্ষায় পুরো-হিত মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলাটি যে কখন এসে ঠিক আমাদের পাশটিতে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্যই করি নি। সম্বিৎ ফিরতে তাকিয়ে দেখি বাইরে অঝোরে বর্ষণ হচ্ছে। ঝড়ের দাপটে বড় বড় তাল, বটের সে কি মাতামাতি। মনে হচ্ছে নিমেষে সব ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

ততক্ষণে সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। আবার ফিরতে হবে, বাইরে জলে-কাদায় অপেক্ষমান মনসুর আলি। যত ঝড়-জলই হোক এরই মধ্যে ধন্য হতে হবে নিজেদের রাজা নৃসিংহদেব রায়ের অমর কীর্তিকে উপলব্ধি করে।

ইতিহাস বলে বাংলার নবাব তখন আলিবর্দী খাঁ। এ সময় বংশবাটীর রাজা গোবিন্দ দেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-গমন করলে তার বিশাল সম্পত্তি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে যায়। গোবিন্দ দেবের মৃত্যুর তিন মাস পরে রাজপুত্র নৃসিংহ দেবরায় জন্মগ্রহণ করলেও বিপুল সম্পত্তির মালিক হবার সৌভাগ্য তাঁর হলো না। তখন কোম্পানীর আমল। রাজা নৃসিংহদেব একবার সতের বছর বয়সে হেস্টিংসের কাছে ও পরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দরবারে তদ্বির করে নিজের হৃত জমিদারীর কিয়দংশ পুন-রুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেব রায় কাশীতে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের সহায়তায় তান্ত্রিক সাধনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি ফিরে এলেন বংশবাটীর রাজবাড়ীতে। কোম্পানী থেকে এসময় তাঁকে বিলাতে কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের নিকট আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু আবেদন-নিবেদনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পরি-বর্তে রাজা সেই ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণ করার চিন্তা করলেন। শোনা যায় মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনা রাজা নৃসিংহদেব রায় নিজেই করেছিলেন। 'মানবের দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক, সুষুম্না ও চিত্রিনী নামক যেরূপ নাড়ী বিদ্যমান আছে, সেইরূপ পদ্মতোলা ও ত্রয়োদশ মিনার বিশিষ্ট একটি সুউচ্চ মন্দির মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতি-ষ্ঠার তিনি সংকল্প করেন এবং পরে ষট্-চক্রভেদ প্রণালীতে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন'—হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ', সুধীরকুমার মিত্র।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্দিরটির দ্বিতলের কাজ অসমাপ্ত রেখে রাজা নৃসিংহদেব রায় ইহ-লোক ত্যাগ করলেন। তাঁর আরব্ধ কাজ তাঁর সাধ্বী স্ত্রী রানী শঙ্করী দেবী স্বামীর নির্দেশানুযায়ী সমাপ্ত করেন ও শ্রীশ্রীহংসে-শ্বরীদেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। রেভা-রেন্ড লং সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি মনোরম ইতিহাস জানা যায়। দেবীর উদ্দেশ্যে মন্দিরটি যখন উৎসর্গ করা হয় তখন প্রতিবেশী দেশগুলো হতে বহু পণ্ডিতব্যক্তিদের রানী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ত্রয়োদশ চূড়াবিশিষ্ট এই হংসেশ্বরী মন্দিরটির পরিকল্পনা ফুল চিহ্নের মত। প্রথম সারিতে আটটি, দ্বিতীয় সারিতে চারটি ও সর্বোপরি এবং সর্বোচ্চে একটি চূড়া। শিখর বা চূড়ার গড়ন ফুলের কুঁড়ির মত ও পাতার মত অলংকরণ দিয়ে চূড়াগুলি অলংকৃত। মন্দিরের চারদিকে বারোটি কালো ও উপরে একটি সাদা শিব-লিঙ্গ আছে। প্রবেশপথে একজোড়া করে চারটি ও ভিতরে একটি ফোয়ারার পাশে চারটি স্তম্ভ আছে। বছর পঞ্চাশেক পূর্বে এই ফোয়ারা দিয়ে গঙ্গা থেকে সরাসরি জল এনে তাই দিয়ে পূজোর নানাবিধ কর্ম সমাধা হত। গর্ভগৃহের সম্মুখ অংশের ছাদ অর্ধ-গোলাকার। গর্ভগৃহের খিলানে গণেশ-মূর্তির পাশে চামরধারী নারীমূর্তি। গণেশ পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তার দুপাশে সিংহমূর্তি। দর্শকের বাঁ-দিকের জানলায় মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি আছে। বর্তমানে এই মূর্তিটির মন্দির ভগ্ন হওয়ায় মূর্তি-টিকে এখানে স্থাপন করা হয়েছে—ত্রিকোণাকৃতিভাবে। ফলে গোলাকার গর্ভ-গৃহ চৌকো আকার ধারণ করেছে। শোনা যায় রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় পঞ্চবিংশতি

বিষ্ণু মন্দির

হংসেশ্বরী মন্দির।

থেকে এই মূর্তিটিকে উদ্ধার করেছিলেন। এই মন্দিরটিকে গড়বাটী বলা হয়।

মন্দিরের কালীমূর্তিটি নিমকাঠের তৈরী ও গায়ের রং নীলবর্ণ। বেদি থেকে মহাদেব পর্যন্ত একটি পাথর কেটে তৈরী। দেবী স্বয়ং পদ্মের ওপর উপবিষ্টা। মূর্তির চারিটি হাতের নিচের বামহস্তে মুণ্ডমালা, ওপরের বামহস্তে খড়্গ, ডান দিকের নিচের হস্ত অভয়মুদ্রা, ডানদিকের ওপরের হস্তে বরমুদ্রা।

মন্দিরটি কতক ইট ও কতক পাথর দিয়ে তৈরী। মন্দিরটি নির্মাণ করতে খুব সম্ভবতঃ পাঁচ লক্ষ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। বাংলা ১২২৬ সালে হংসেশ্বরী মন্দির হতে দেবীর অনেক অলংকার চুরি হয়ে যায়। স্নানযাত্রা, গঙ্গাপূজো, প্রতিপদ, দুর্গাপূজোয়, কালীপূজোয় মন্দিরে দেবীর সম্মুখে বলি দেবার রীতি এখনও প্রচলিত।

হংসেশ্বরী মন্দির থেকে বেরিয়ে বাসুদেব মন্দির অথবা শ্রীশ্রীঅনন্তদেবের মন্দিরে যাবার পথে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। মাথার ওপর প্রবল বর্ষণ। তবুও দুর্বার আকর্ষণে এগিয়ে চললাম: মন্দিরটির সবচেয়ে আকর্ষণ পোড়ামাটির কাজ। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর পরম ভাগবত মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের কষ্ঠিপাথরের বিষ্ণুমূর্তিটি বছর দশেক আগে চুরি হয়। বর্তমানের মূর্তিটি পরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটির প্রদক্ষিণ পথের চারপাশে এক সময় অপূর্ব পোড়ামাটির কাজে অলংকৃত করা হয়েছিল। বর্তমানে তার অল্প নিদর্শনই আছে। বর্ণাসত্ত হয়ে এই পোড়ামাটির কাজগুলি যেন আবার পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছে। এই পোড়ামাটির কাজ দেখে ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রতিটি পোড়ামাটির ফলক দিয়েই গৃহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা যায়। এই ফলকগুলি প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্তি যেমন—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কালী, শিব, দুর্গা, নৌকাবিলাস, নারায়ণের অনন্তশয্যা প্রভৃতি দিয়ে অলংকৃত। এছাড়া নৃত্যরতা নারীমূর্তি, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত বাজনরতা নারী ও পুরুষ মূর্তি, ধাবমান অশ্ব, অশ্বারোহী সৈনিক, যুদ্ধচিত্র, সশস্ত্র সৈনাবাহিনী সমেত দুস্তলা জাহাজ, বাঘ, হরিণ ইত্যাদির প্রতিমূর্তি যেমনি বাস্তবানুগ তেমনি প্রাণবন্ত। বিশেষ করে ধাবমান অশ্বের গতিশীলতা, পরিপুষ্ট গড়ন, সুচারু রেখা অপূর্ব।

মন্দিরটি বাংলার প্রথাগত এক চূড়া দেউলমন্দির। উচ্চবেদিকার ওপর সংস্থাপিত এই মন্দিরটি বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সৌধ। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলকের অবশিষ্টাংশ হয়তো অল্পকালের মধ্যে অবলুপ্ত ঘটবে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিরগাত্র আজ ক্ষত-বিক্ষত। অধিকাংশ স্থানেই (যেখানের পোড়ামাটির ফলক অপহৃত হয়েছে) আধুনিক যুগের বড় বড় ইটের গাঁথুনি, পুরাতন ছোট ছোট ইটের সঙ্গে ও পোড়ামাটির ফলকগুলির সঙ্গে এতই বৈসাদৃশ্য যে বিশেষ পীড়াদায়ক। অবহেলিত, অনাদরে ভগ্নাবশিষ্ট, অপূর্ব কারুকার্যখোদিত মন্দিরটি শিল্পরসিক মানুষকেই বিস্ময়ে মুগ্ধ করবে। কিন্তু এতই দুর্ভাগ্য আমাদের যে প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার মত সহায়সম্বল আমাদের নেই বললেই হয়। তবে বর্তমানে মন্দিরদুটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের হাতে। সুতরাং যথাসময়ে যদি মন্দির দুটির ওপর নজর দেওয়া চলে তবে হয়তো ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে প্রত্যক্ষ করবার কিছুটা সুযোগ পাবে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস একেবারে স্তব্ধ। মনে হয় কোন যাদুকরের স্পর্শে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল, দূরে-দূরে আলো জ্বলে উঠেছে। আমাদেরও ফেরার পালা।

মন্দিরের পূজোরীর সঙ্গে বিদায়পর্ব সমাধা করতে গিয়ে মনে হল এত স্বল্প আলোতে দেবীমূর্তি যেন বড় ম্লান। অবাক হলাম বিংশ শতকের এই প্রগতির যুগে কেন এখানে বৈদ্যুতিক আলো আনা হয় নি—অথবা পূর্বের সেই ছায়াঘেরা স্বপ্নময় ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে হয়তো দেন আর প্রদীপের আলোই যথেষ্ট?

'বড় আঁধার হয়ে গেল' মনসুর চঞ্চল হয়ে উঠলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। চারিদিক কেমন ঝাপসা হয়ে এলো।

[লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত মন্দিরের আলোকচিত্র—অমর নন্দী গৃহীত]

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সীমাবদ্ধ' চিত্রে পারমিতা চৌধুরী

ফলস্বরূপ শ্যামলেন্দুকে একটা গভীর সংকটের সামনে পড়তে হয়। মধ্য-প্রাচ্যে রপ্তানির জন্য তৈরি 'পিটার্স' কোম্পানীর এক চালান পাখার মধ্যে শেষ মুহূর্তে একটা গলদ ধরা পড়ে। শ্যামলেন্দু বুঝতে পারে পাখা সময়ে না গেলে চুক্তি নাকচ হবার সম্ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত 'পিটার্স' কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ ও দুর্নামের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য শ্যামলেন্দুকে দুর্নীতির পথ বেছে নিতে হয়। এর ফলে মানুষের আঘাত হয় তুচ্ছ। শুধু তাই নয়, শ্যামলেন্দুর কারসাজি তাকে ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হতে সাহায্য করে।

—চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত, ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা প্রযোজিত, শংকরের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি 'সীমাবদ্ধ'-তে ঘটনা বলতে এই একটি মাত্রই ঘটনা আছে। এবং এই ঘটনাটিই শ্যামলেন্দুর শ্যালিকা সুদর্শনার একমাত্র নারীসুলভ উজ্জ্বল মনে বিরূপতার সৃষ্টি করে এবং শ্যামলেন্দুর পদোন্নতির মূলের নীচতাকে বড়ো করে তুলে ধরে।

একটি মাত্র ঘটনাকে সম্বল করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা কাহিনীচিত্র তৈরী করা নিঃসন্দেহে অতি মাত্রায় দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক এবং সত্যজিৎ রায় সেই দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অন্যান্য ছবির মতো এ-ছবিতেও আঙ্গিকের পারিপাট্য ও কলাকৌশলের দক্ষতা লক্ষণীয়। এ-ছবিতে কোনটি যে কৃত্রিম সেট এবং কোন দৃশ্যই বা আসল ঘরবাড়ীতে তোলা হয়েছে, তা নির্ণয় করা কঠিন এবং তার প্রয়োজনও নেই। নিখুঁত চিত্রগ্রহণ এবং 'অপটিক্যালস'-এর ব্যবহার ছবিটিকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তবে আমরা সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছি ছবির মধ্যে হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেডের পাখার রঙীন বিজ্ঞাপনী চিত্রটি দেখে। 'পিটার্স'-এর তৈরী পাখা 'পট'-কে 'কুম্ভ'-এ পরিণত করে—এ-ব্যাপারটা চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে এই বিজ্ঞাপনী চিত্র-এর সাহায্যে।

সংযত, অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয় দিয়ে সুদর্শনা ওরফে টুটুল চরিত্রটিকে চিত্রিত করেছেন শর্মিলা ঠাকুর। দোলনচাঁপা শ্যামলেন্দুর স্ত্রী হলেও আসবাবের সামিল। এই রূপটি সহজেই ফুটে উঠেছে নবাগতা পারমিতা চৌধুরীর অভিনয়ের মাধ্যমে। জীবন-নায়ক শ্যামলেন্দুর কোটিপতি-লিপ্সিক উন্নাসিক রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে বরুণ চন্দের পোশাক-আশাকে, চালচলনে। একদা তার অন্তরে যে একটি সম্পদ ছিল, কিন্তু তাকে সে নিজের হাতেই টুঁটি টিপে হত্যা করেছে—এটিও তার কিছু কিছু সংলাপ, অভিব্যক্তি, পদচারণা এবং চিন্তা-মগ্নভাবে স্থির হয়ে থাকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামলেন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার প্রতি কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ রুণু সান্যালের ভূমিকায় প্রশান্ত মল্লিক সুযোগমতো সুঅভিনয় করেছেন। অহংকারী বিবি সান্যাল হিসেবে ইন্দিরা দেবরায় চরিত্রচিত্রণে ত্রুটি রাখেননি। শ্যামলেন্দুর সাহায্যকারী ট্যান্ডনরূপে অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জীবন্ত চরিত্র। কোম্পানীর ডিরেক্টর স্যার বরেন রায়ের ভূমিকায় হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চালচলন চমৎকার, কিন্তু তাঁর বাচনে কিছু অস্পষ্টতা আছে। অন্যান্য ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলাদ্রি), মণি আয়ার (রামলিঙ্গম), প্রমোদ গাঙ্গুলী (শ্যামলেন্দুর বাবা), দীপঙ্কর দে (মিঃ সেন), অনিতা চট্টোপাধ্যায় (মিসেস পালিত) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবিতে আবহ-সঙ্গীতের ব্যবহার সুষম। ক্যাবারে দৃশ্যে শেফালি এবং তার সঙ্গিনীর নৃত্যের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ।

অশান্ত যুবমানসিকতা ও ব্যর্থতার ছবি

আজকের শহরবাসী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাদের কি পরিমাণ অশান্ত করে তুলেছে এবং ফলে তারা কি রকম বিপথগামী হতে বাধ্য হচ্ছে, তারই একটি সম্ভাব্য চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক সলিল দত্ত গীতাঞ্জলি পিকচার্স-এর নিবেদন 'খুঁজে বেড়াই' ছবিতে।

প্রেক্ষাগৃহ

কলেজের অধ্যক্ষের বিরূপতা কোনো ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, আজ কোনো ভালো ছেলে যদি দুর্ভাগ্যবশে অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে যথেষ্ট খুঁটির জোর না থাকলে তাকে এম এস-সি পড়বার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। এবং তারপর খবরের কাগজের পাতা থেকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে সে যতই দরখাস্ত পাঠাক না কেন, তার শতকরা আশীভাগেরই জবাব আসে না, এবং দৈবাৎ যে-জবাবগুলি আসে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই 'দস্তখত'-মার্কা। ভাগ্যক্রমে যদি বা এক-আধটা 'ইন্টারভিউ'-এর সুযোগ আসে, সেখানেও 'অতীত কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা'—এই বাঁধা প্রশ্ন চাকরীর উমেদারকে নিরাশ হতে বাধ্য করে। মনে হয়, প্রশ্নটি আসলে হচ্ছে: তোমার কোনো মুরুব্বির সুপারিশ আছে কিনা।

এই ধরনের ইন্টারভিউ-এর দরুণ মরীয়া হয়ে যখন কোনো ভদ্রসন্তান 'খুঁজে বেড়াই'-এর নায়ক শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বি এস-সি-তে ফিজিক্সে সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পাওয়া সত্ত্বেও অফিসের দর-ওয়ানীর জন্যে দরখাস্ত দিয়ে বসে, তখন ও-পক্ষ থেকে উপদেশবাণী বর্ষিত হয়: তোমার মতো শিক্ষিত, সুদর্শন, ভদ্র-

বংশসম্ভূত ছেলেকে আমরা দরওয়ানের কাজ করতে দিতে পারি না, তোমার ভবিষ্যৎ বলে একটা জিনিস আছে। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সেই বান্ধবীর মুখেও একই কথা : তোমার পক্ষে ছোট কাজ করা সাজে না, অন্য কোনো ভালো কাজ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা কর।

অতএব, হয় ছিনতাই, বোম-বাজী বা ডাকাতী, আর নয়তো চোরাকারবারি—সে আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক, যাই হোক না কেন—এই সব ব্যাপারে যোগ দেওয়া ছাড়া ঐ ভদ্রসন্তানের গত্যন্তর কি? তাই নায়ক শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার পাঠ্যাবস্থার বন্ধু গোরার সাহায্যে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীর দলে ভর্তি হয় এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে বান্ধবী সীমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে। কিন্তু যখন জেরার ফলে সীমা জানতে পারে, শংকর কোন্ পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তখন সে তাকে সেই পাপ পথ থেকে ফেরাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করেছে। শেষপর্যন্ত অবশ্য শংকর দলের লোকের হাত থেকে গুলীর দ্বারা আহত হয়েছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হবার পরে জেল-হাজতে প্রেরিত হয়েছে।

কাহিনীকাররূপে সলিল দত্ত নায়ক শংকরকে 'নিয়মিত ঘুষ নেওয়া মস্ত বড় অফিসারের' ছেলেরূপে উপস্থাপিত করেছেন কেন, এতে তাঁর কি সুবিধে হয়েছে, তা বোঝা শক্ত। আমাদের তো মনে হয়, ঐ ধরনের অফিসারের ছেলেদেরই খুঁটির জোর সবচেয়ে বেশী এবং তাদের পক্ষে পরীক্ষায় ভালো ফল দেখানো বা চাকরী

মেরা গাঁও মেরা দেশ-ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, লক্ষ্মীছায়া, পরিচালনা : রাজ খোসলা

শুভক্ষণে ছবির মহরত ও সংগীত গ্রহণানুষ্ঠানে শ্যামল মিত্র, অনুপকুমার, সংগীত পরিচালক নিখিল চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ ও ক্যামেরাম্যান কানাই দে। ফটো : অমৃত

পাওয়া যথেষ্ট সহজ। এর চেয়ে যদি তিনি শঙ্করকে যথার্থ মধ্যবিত্ত ঘরের একজন গরীব কেরানীর সন্তান হিসেবে দেখাতেন, তাহলে তা ঢের বেশী বাস্তব হত। এমনকি শঙ্করের বিজয়েরও ভাত রাঁধা ও ঘর ঝাঁট দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। শঙ্কর এবং বিজয়ের পিতাকে ধনী করায় কাহিনীটি যথেষ্ট বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে পারেনি।

কাহিনী বিস্তারে চিত্রনাট্য রচনায় দুটি সামান্য ত্রুটি দেখা গেছে। এক, একটি দৃশ্যে শঙ্করের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সীমার গান গেয়ে ওঠা : জানি না স্বপ্ন সত্য হয় কি হয় না। দুই, শঙ্কর অন্যায় পথে পা বাড়িয়েছে, এটা জানার পরে সীমার কান্নায় ভেঙে পড়ার ছোট্ট দৃশ্যটি। —এই দুটি জিনিসই নির্মমভাবে কেটে বাদ দিলে চিত্রনাট্যটি নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে।

নায়ক শঙ্করের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটির আশাহত অবস্থা, স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারকে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে, অথচ বাস্তবভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সামাজিক অমানুষিকতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদকে তিনি সোচ্চার করে তুলেছেন। শঙ্করের প্রেমিকা সীমার চরিত্রের ভালোবাসা, ব্যথা-বেদনা, পঙ্গু মায়ের জন্যে চিন্তা, সাফল্যপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি লোভ, শঙ্করের বিপদসঙ্কুল অবস্থা উপলব্ধি করার পরে তার সম্পর্কে উৎকণ্ঠা—

বাংলাদেশ সাহায্য তহবিলের জন্য যাদুকর শ্রীপি সি সরকার (জুনিয়র) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে ৫০,০০১্ টাকার চেক দিচ্ছেন।

সমস্তই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়েছে অপর্ণা সেনের অভিনয় - মাধ্যমে। শঙ্করের প্রতিবেশিনী, প্রবঞ্চিতা অনুর ভূমিকায় জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় একটি শান্ত, সুন্দর চরিত্রচিত্রণ করেছেন। এবং অনুর প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল বিজয়ের চরিত্রটিও অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে রূপায়িত করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। মাতাল মোটর-মেকানিক মদনদা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তরুণকুমারের সু-অভিনয়গুণে। প্রতিশোধপরায়ণ কলেজ প্রিন্সিপ্যালের চরিত্রে এন বিশ্বনাথন-এর অভিনয় বাস্তবঘেঁষা। নারীলোভী বিভাসের ভূমিকায় সুনীলেশ ভট্টাচার্য চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন; বিশেষ করে দ্বৈত-নৃত্যের মাধ্যমে চরিত্রটির লোলুপতা সুপরিস্ফুট। অপরাপর ভূমিকায় বিকাশ রায় (নায়কের পিতা), দিলীপ রায় (স্মাগলিংদলভুক্ত গোরা), অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (স্মাগলিং দলনেতা), উৎপল দত্ত (সীমার প্রতি লোভাতুর ভূপতি), আনন্দ মুখোপাধ্যায় (অনুর মামাতো ভাই অলক) এবং 'না না চলে যেও না' গান-গাওয়া বারবণিতার ভূমিকাভিনেত্রী ও 'একটু আরো সরেই না হয় আসলে গো'—গানের সঙ্গে বিভাসের সঙ্গে দ্বৈত-নৃত্যরতা তরুণী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় যথাক্রমে বিশ্বরূপ ঘোষ, সত্যেন রায়চৌধুরী এবং অমিয় মুখোপাধ্যায় তাঁদের গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ছবির চারখানি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'আগুনে জ্বালো, আগুন জ্বালো' গানটি ছাড়া বাকী তিনটি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা এবং এগুলিতে সুরযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। সুরযোজনা গানের ভাব ও ভাষা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী। অবশ্য প্রথম গানখানি যে অপ্রয়োজনীয়, সে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানখানি। 'স্বার্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানখানি যেন দর্শকচিত্তেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

আধুনিক যুবমানসের অস্থিরতা, নিরাশা, যন্ত্রণার ছবি হিসেবে গীতালি পিকচার্সের নিবেদন, সলিল দত্ত পরিচালিত 'খুঁজে বেড়াই' একখানি অতিসার্থক চিত্র।

স্টার থিয়েটার

[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

স্থাপিত : ১৮৮০ • ফোন : ৫৫-১১০১

— নতুন নাটক —

দেবনারায়ণ গুপ্তের

সীমা

প্রতি বৃহস্পতি : ৬টায় • শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ২॥ ও ৬টায়

রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সত্য চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসবী চট্টো, দীপিকা দাস, শম্ভুনাথ ভট্টা, রেণুকা দাস, কুমারী মিঠু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন-এর তরুণ কণ্ঠ শিল্পীদের সংগঠন

বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী

শারদোৎসবের প্রীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের সহৃদয় আমন্ত্রণ পেতে চাই

: যোগাযোগ করুন : শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ
২৮/১সি, গড়িয়াহাট রোড, কলি—১৯

মঞ্চাভিনয়

বহুরূপীর নতুন নাটক 'অপরাজিতা' : কিছু স্মৃতি, কিছু প্রীতি; কিছু স্বপ্ন, কিছু যন্ত্রণা নিয়ে উদ্বেলিত একটি নিঃসঙ্গ মেয়ের হৃদয়। একটি নিবিড় নিরিবিলি সন্ধ্যায় সে হোল সমুদ্রের মতো মুখর, উচ্ছ্বসিত অনুভূতির দোলা লাগিয়ে জড়াতে চাইলো ওর জীবন আর হৃদয়ের গভীরে। মেয়েটির নাম

অপরাজিতা—ডাক নাম অপু। ওর জীবনকে ঘিরে আছে দাদা, বৌদি, আর ওদের ছোট্ট ছেলেটি বাবুনটু। স্বামীর সান্নিধ্যও ও পেয়েছিল, কিন্তু হয়তো পায়নি ভালোবাসার প্রগাঢ় প্রশান্তি। দাদার বাড়ীতে এসে নিষ্করুণ বাস্তব জীবনের রূঢ়তম রূপকে ও প্রত্যক্ষ করলো; আবিষ্কার করলো চারধারের অবিশ্রান্ত কলরবের মধ্যে ওর মন কি এক নিদারুণ নির্জনতার অন্ধকারে গুমরে গুমরে কাঁদছে। ওর মনে হলো সবার মাঝে থেকেও ও একেবারে একা। একটা চাকরীর চেষ্টা করেও কিছু হোল না। ওর আদর্শপুরুষ সঞ্জীবদার ওপর এব্যাপারে খুব ভরসা করেছিল ও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেলিফোন এলো হতাশার খবর নিয়ে। তাই ওকে সবশেষে বেরিয়ে পড়তে হোল কিছু পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। অপরাজিতা স্নিগ্ধ জীবন চেয়ে হয়তো হোল পরাজিতা; হয়তো বা আবার সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে নিজের নামের সার্থকতা খুঁজতে ও নতুন করে যাত্রা শুরু করলো। 'বহুরূপী'র নতুন নাটক 'অপরাজিতা' এই একটি মেয়ের কথাই বলেছে মঞ্চের আলো আঁধারে। এই একটি মেয়েই মঞ্চের বিভিন্ন বৃত্ত ঘুরেছে, আর বিভিন্ন মুহূর্তের সংলাপে নিজের মানসিকতাকে সঞ্চারিত করেছে সবার অনুভূতিলোকে।

নীতীশ সেনের একক চরিত্রের এই নাটকটির মধ্যে সাজানো গোছানো মাপা-জোকা কোন কাহিনী নেই। অপরাজিতা তার জীবনের টুকরো টুকরো গল্প বলেছে নিবিড়তার সুরে। হয়তো তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর সংঘাতমুখর জীবনের প্রতিটি প্রহর। একটি নির্জন ঘরে, ও আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে একটি বিশেষ খবর দেবার জন্যে। টেলিফোনে আসবে সে খবর। কি জানি কেন এই টেলিফোনটাকে বারবার মনে হয়েছে একটি প্রাণবন্ত চরিত্র। সংলাপ রচনার দিক থেকে 'অপরাজিতা' নাটকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে; পর পর প্রতিটি ঘটনার আভাস, আর মুহূর্তগুলো এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তার মধ্যে শৈথিল্য বা একঘেয়েমি আসেনি এতটুকু।

এই প্রযোজনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হোল একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে সব সময় ধরে একজন অভিনেত্রী শুধু একলা অভিনয় করেছেন। এ ধরনের প্রয়াস বোধ হয় আগে আমাদের দেশে কোথাও দেখা যায়নি। এই বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে নতুনতর নাট্য প্রযোজনায় 'বহুরূপী'র নিরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার বিস্তৃতি আর গভীরতা আরো অনেক বেশী করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিঃসঙ্গ মেয়ে 'অপরাজিতা' চরিত্রে রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। পরিকল্পনা আর নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি নিজে। আশ্চর্যের কথা শ্রীমতী মিত্র অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে এই দ্বৈত দায়িত্ব সাফল্যভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন। অপরাজিতার বিভিন্ন উজ্জ্বলতা আর বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশে শ্রীমতী মিত্র অসাধারণ দক্ষতায় সজীব মেজাজ ধরেছেন। অপরাজিতার সংস্পর্শে আসা, কিংবা দেখা কিছু লোকের সংলাপ যখন তিনি বলেছেন, তখন মনে হয়েছে সেই সেই বিশেষ লোকটি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এ ধরনের অভিনয় নৈপুণ্য খুব বেশী চোখে পড়ে না। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র যে অসাধারণ প্রতিভাময়ী অন্যতমা এক মঞ্চাভিনেত্রী, 'অপরাজিতা' নাটকে তাঁর অপূর্ব অভিনয় বোধ হয় তা আবার নতুন করে প্রমাণ করলো। অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল নিষ্ঠা আর সূক্ষ্ম শৈল্পিক চিন্তা—এই তিনের মরমী সম্মিলনই শ্রীমতী মিত্রের প্রয়াসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মঞ্চে তাপস সেনের আলো যে অন্তরতম অনুভূতির ছন্দ তুলে কথা বলতে পারে; আর প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণময়তার ভাষায় মুখর আর ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারে, 'অপরাজিতা' নাটকের দর্শক আর একবার সে কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। পরিচ্ছন্ন মঞ্চসজ্জায় খালেদ সেন আন্তরিক শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

বিশ্বরূপার নতুন আকর্ষণ রাসবিহারী সরকার পরিচালিত 'চৌরঙ্গী'

বিশ্বরূপার নতুন আকর্ষণ শংকরের 'চৌরঙ্গী'। বহু পঠিত এবং বহু আলোচিত এই উপন্যাসটির মঞ্চ-রূপায়ণ নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। চৌরঙ্গী ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের উজ্জ্বল আলোর অন্তরালে একালের সমাজজীবনের ঘোরতর অন্ধকারের চেহারাটা মূর্তিমান আছে। সেখানে বঞ্চনা, বেদনা আর হাহাকার যতটা মানবিকতা, মহত্ত্ব আর ভালবাসা ঠিক ততটাই। এ দশকের শক্তিমান নাট্যকার নির্দেশক-প্রযোজক রাসবিহারী সরকার বর্তমান যুগযন্ত্রণার চেহারাটি এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। চরিত্র রূপায়ণে আছেন—বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়,

"আর দিয়া যায়ে কি ছোড় দিয়া যায়ে
বোল তেরে সাথ ক্যা সলুক কিয়া যায়ে"
রাজ খোসলা উপস্থাপনা করলেন এক দস্যুতার কাহিনী, যাতে রয়েছে তীব্র গতি সংঘাত আর শিহরণ ... এতে আরো রয়েছে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীর সঙ্গীত মাধুরীমা আর চোখ-ঝলসানো নাচ আর নাচ!

শুক্রবার ৮ই অক্টোবর শুভমুক্তি!

ভীড় এড়ানোর জন্য অগ্রিম টিকিট ক্রয় করুন

প্যারাডাইস - রক্সি - দর্পণা - গ্রেস - লিবার্টি

রূপক (পাটনা) ও অন্যান্য ২৭টি অভিজাত চিত্রগৃহে

বৃহস্পতিবার ৭ই অক্টোবর থেকে অপ্সরায় (রাউরকেল্লা)

দিলীপ রায়, রবীন মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ গাঙ্গুলী, মন্টু মুখার্জি, মিস লতা, রত্না দত্ত, পুতুল দত্ত এবং জয়শ্রী সেন প্রমুখ শক্তিমান শিল্পিগোষ্ঠী। মঞ্চে আলো তাপস সেন, মঞ্চ সুরেন দত্ত এবং সঙ্গীত রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল বালসারার। ধ্বনি—কমল চৌধুরী। রূপসজ্জা ও সাজসজ্জা যথাক্রমে মহম্মদ সাত্তার ও দানী দাশগুপ্তে। এই প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় একজন সত্যিকারের ক্যাবারে নর্তকী এসে দাঁড়ালেন।

কানাই বলাই মুক্তিতীর্থের পরিচালনায় সংগীত মহাজাতি সদনে পরিবেশিত হল স্বপনবুড়ো রচিত পৌরাণিক নৃত্যনাট্য 'কানাই বলাই'। নৃত্যনাট্যটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হতে পারত যদি সঙ্গীত-পরিচালক সুনীল সাহা কণ্ঠশিল্পী নির্বাচনে একটু যত্ন নিতেন। নৃত্য-পরিচালক সুধীর সিংহ নৃত্যের জন্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন নিঃসন্দেহে। যন্ত্রসঙ্গীত সুন্দর। নৃত্য-শিল্পীরা প্রত্যেকেই দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছেন তাঁদের কুশলী নৃত্যপটুতার জন্য। সবচেয়ে দর্শকদের অবাক করে দিয়েছিল চার-পাঁচ বছরের মেয়ে সঙ্গীতা পাল শিশু কানাইয়ের ভূমিকায়। এ ছাড়া মঞ্জু দে, গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা দাস, শাশ্বতী হালদার, সৌকতি হালদার, সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্না ঘোষ, রুমা মুখোপাধ্যায় অন্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতি কুণ্ডু ও সুধীর সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্তরঞ্জন, দিল্লী ও চন্দননগর জয়ের পর
আবার রবিবার ১০ই সকালে রঙ্গনায়
রাজরক্ত
থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনা
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
১১ অক্টোবর সন্ধ্যে ৭টায় মুক্তঅঙ্গনে

১২ই মঙ্গলবার ৬টায়
নান্দীকার
অ্যাকাডেমী অব
ফাইন আর্টসে
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
।। অ্যাকাডেমীতে টিকিট ১টা—৭টা ।।

রঙ্গনা কিশোরপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকারের
৯ই শনিবার ৬টায়
হে সময় উত্তাল সময়
১০ই রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
১৪ই বৃহস্পতিবার ৬টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে চারু রায়

কেমন একে একে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগে নরেন্দ্র দেব, তারাশঙ্কর গেলেন, আবার গেল মঙ্গলবার, মহানবমীর রাত্রে গেলেন প্রথিতযশা শিল্পী চারু রায়। ১৮৯০-এর ৬ সেপ্টেম্বর হয়েছিল তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এস-সি পাশ করবার পরে তিনি ১৯১১-এ বার্ড কোম্পানীর ভূতত্ত্ব বহিঃকর্মী (ফিল্ড জিওলজিস্ট) হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের দরুণ তিনি বছর দুয়েকের মধ্যে কাজে ইস্তফা দেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে তিনি একজন ভারতীয় চারুকলার সার্থক শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। শীঘ্রই তিনি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রজগতেও শিল্প-নির্দেশকরূপে যশের মালা ভূষিত হন। শিশিরকুমার যখন সাধারণ নাট্যজগতে তাঁর "সীতা" নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রীরায়ই নতুন শিল্প-নির্দেশনার পরিচয় দেন ত্রিমাত্রিক দৃশ্য-পরিকল্পনা করে। আর্ট থিয়েটারের "শ্রীকৃষ্ণ"তে তাঁর শিল্পসম্মত দৃশ্যাবলী দর্শকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

চলচ্চিত্রের পরিচালকরূপেও তিনি নির্বাক ও সবাক যুগে তাঁর শিল্পভাবনার পরিচয় দেন। প্রথমে 'লাইট অব এশিয়া', পরে 'সিরাজ' ও 'থ্রো অব এ ডাইস'-এ শিল্পনির্দেশক ও নায়করূপে তিনি চলচ্চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে 'আনারকলি', 'বিগ্রহ', 'চোরকাঁটা', 'স্বামী'—এই চারটি নির্বাক ছবি পরিচালনা করবার পরে সবাক ছবিতে তিনি 'রাজনটী বসন্তসেনা', 'বাঙ্গালী', 'গ্রহের ফের' 'পথিক' প্রভৃতি ছবি পরিচালনা করেন। শিল্পনির্দেশকরূপে তিনি 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'মালঞ্চ' ছবিতে সুনাম অর্জন করেন।

শ্রীরায়ের স্ত্রী কয়েক বছর পূর্বেই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী ও অগণিত বন্ধুবান্ধবকে শোকে নিমজ্জিত করে গেছেন।

বিবিধ সংবাদ

যাদুকর পি সি সরকারের (জুনিয়র) বদান্যতা : গত ২২শে সেপ্টেম্বর, '৭১ তারিখে যাদুকর শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভবনে তাঁর হাতে বাংলাদেশ সাহায্য তহবিলের জন্য পঞ্চাশ হাজার এক টাকা দান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জুনিয়র সরকারের এই মনোবৃত্তি সারা ভারতের শিল্পীদের অনুসরণ করা কর্তব্য। যাদুকর সরকার (জুনিয়র) দৃষ্টান্তস্বরূপ।

জয়কিষণের মৃত্যুতে 'সংস্কৃতি'র শোকসভা : চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গত ১৬ সেপ্টেম্বর এক ভাবগম্ভীর ও পবিত্র পরিবেশের মাঝে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ জুটীর অন্যতম সঙ্গী শ্রীজয়কিষণের পরলোকগমনে এক শোকসভার আয়োজন করেন। নিমাই সাহা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সংস্থার বিভিন্ন সদস্য এবং সভাপতি পরলোকগত জয়কিষণের ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে অবদানের কথা আলোচনা করেন।

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন : গত ১১শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর হলে হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন কর্তৃক 'বর্ষামঙ্গল' পরিবেশিত হলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও নৃত্যে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানটির সব কটি গানই সুগীত। বিশেষ করে অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কিছুতেই যায় না,' বাঁশি দাসের 'যেতে দাও গেল যারা', শাশ্বতী গুপ্তের 'ঐ আকাশ পরে' ও প্রমিতা দাশের 'শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মণিদীপা শ্যাম, দীপ্তি রায়, শিপ্রা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা রায়চৌধুরী ও তোড়া সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যে শান্তা বসুরায়, চন্দনা বসু, শকুন্তলা বসুরায় ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী। যন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুশীল দে ভৌমিক, গৌর বসাক, কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। রূপসজ্জায় ননী দাশগুপ্তের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাতাবরণ অভিনয় : দুর্গাপুরের বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা মিশ্র ইস্পাত সংগঠনী ইস্পাত নগরীর কমিউনিটি সেন্টার হলে স্বপন সেনগুপ্তের নাটক 'বাতাবরণ' মঞ্চস্থ করেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। সংগঠনীর সভ্যরা তাঁদের অন্যান্য নাটকের মতই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন। নাটকের সমাজসচেতন বক্তব্য প্রতিটি অভিনেতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মঞ্চের কাজ ও সঙ্গীত নাটকের বক্তব্যকে দর্শকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সহযোগিতা করে।

CENTRAL LIBRARY

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

পেরুর লিমা শহরে অনুষ্ঠিত ২৫তম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ৬৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত খেতাব লাভ করেছে। এই নিয়ে রাশিয়া ১৭বার দলগত খেতাব পেল গত ১৯বারের বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়। ১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : ১ম রাশিয়া (৬৪ পয়েন্ট), ২য় পোলান্ড (২৪ পয়েন্ট), ৩য় জাপান এবং বুলগেরিয়া (প্রত্যেকে ১৯ পয়েন্ট), ৫ম হাঙ্গেরী (১৫ পয়েন্ট), ৬ষ্ঠ আমেরিকা, ফিনল্যান্ড এবং পূর্ব জার্মানী (প্রত্যেকে ৮ পয়েন্ট), ৯ম ইরাণ (৭ পয়েন্ট)। ৫ পয়েন্ট করে পেয়েছে ইতালী, নরওয়ে এবং সুইডেন।

প্রতিযোগিতায় সুপার হেভীওয়েট বিভাগেরই আকর্ষণ বেশী। রাশিয়ার ভ্যাসিলি আলেক্সিয়েভ এই বিভাগের চারটি শ্রেণীতেই (প্রেস, স্ন্যাচ, জার্ক এবং মোট ওজনে) বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে চারটি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন। তিনি প্রেসে ২৩০ কিলো, স্ন্যাচে ১৭০ কিলো এবং জার্কে ২৩৫ কিলো ওজন উত্তোলন করেন। তাঁর এই উত্তোলনের মোট ওজন দাঁড়ায় ৬৩৫ কিলোগ্রাম। প্রতিযোগিতার অপর কোন বিভাগে তাঁর মত চারটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড করে চারটি স্বর্ণপদক কেউ পান নি।

জাপান ৩য় স্থান পেয়ে এশিয়া মহাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। জাপান মোট ১৩টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৪, রোপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৬)। ফেদারওয়েট বিভাগের চারটি স্বর্ণপদকই জয় করেন জাপানের জোসিনোবু মিয়াকে। তাছাড়া জাপানেরই [illegible] এই বিভাগের চারটি রৌপ্যপদক লাভ করেন।

কম্প্যুটারে টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে হলঘরে কম্প্যুটার মেশিনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার কৃত্রিম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি সারা পৃথিবীর ক্রিকেট অনুরাগী মহলে যথেষ্ট আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। এই টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ১৬৫ রানে জয়ী হয়। খেলাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'শতাব্দীর টেস্ট খেলা'। গত ৫০ বছরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যাঁরা ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের থেকে বাছাই করে দল গঠন করা হয়েছিল। ইংল্যান্ড দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক 'গ্যাবি' অ্যালেন এবং অস্ট্রেলিয়া দল-গঠন করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। এই দল গঠন উপলক্ষ করে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। কাজটা খুবই কঠিন ছিল—'বাঁশ বনে ডোম কানা' হওয়ার মত দিশেহারা অবস্থা।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার গত ৫০ বছরের টেস্ট ক্রিকেট খেলার যাবতীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান উপলব্ধ করে এই কম্প্যুটার মেশিনটি পাঁচদিন ধরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল। তবে আসল-নকলের মধ্যে যে ফারাক থেকে যায় এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। যে অনিশ্চয়তায় ক্রিকেট খেলার এত মহিমা তা কম্প্যুটার মেশিনের পক্ষে পরিবেশন-করা মোটেই সম্ভব নয়।

আলোচ্য কম্প্যুটার টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান টস জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৮টা উইকেট পড়ে ২৮১ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৩২১ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডন ব্র্যাডম্যান মাত্র ২২ রান করে তাঁর অনুরাগীদের হতাশ করেন। তিনি ভেরিটির বল খেলে তাঁরই হাতে 'ক্যাচ'-তুলে খেলা থেকে বিদায় নেন।

ভ্যাসিলি আলেক্সিয়েভ (রাশিয়া) : সম্প্রতি ২৫তম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার সুপার হেভীওয়েট বিভাগের স্বর্ণ পদক বিজয়ী এবং বিশ্ব রেকর্ডধারী

জন গ্র্যাডম্যান

'বডি লাইন' বোলিংয়ের উদ্ভাবক লারউড একটাও উইকেট পান নি। তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা পরোয়া করেন নি। লারউডের বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৭৫ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২১৮ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ২৬৬ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের মাত্র একটা উইকেট খুইয়ে ২৫০ রান তুলে ৩০৫ রানে এগিয়ে যায়। গ্র্যাডম্যান ১১৮ রান এবং মরিস ১১৬ রান করে খেলায় অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৪০৭ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার এই ৪০৭ রানের মধ্যে গ্র্যাডম্যান একাই ২২২ রান করেছিলেন। মরিস করেছিলেন ১৪২ রান। এবারও লারউড শূন্য হাতে ফিরলেন—৭৮ রান দিয়ে একটাও উইকেট পেলেন না। খেলার জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ৪১৩ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ৮ ঘণ্টা সময়।

চতুর্থ দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ৩২৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৬৫ রানে জিতে যায়। ইংল্যান্ডের চারজন খেলোয়াড় হব্‌স (৬০ রান), লেল্যান্ড (৬০ রান), হ্যামন্ড (৫৮ রান) এবং অধিনায়ক মে (৫৪) ৫০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করলেও পরবর্তী খেলোয়াড়রা রিচি বেনোর লেগ-স্পিন বোলিংয়ে ঘায়েল হয়েছিলেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

অস্ট্রেলিয়া : আর্থার মরিস, বিল পন্সফোর্ড, জন গ্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), চার্লস ম্যাকার্টনি, নীল হার্ভে, বব সিম্পসন, কিথ মিলার, রিচি বেনো, রে লিন্ডওয়াল, জন গ্লেসন এবং বিল ও'রেলী।

ইংল্যান্ড : জ্যাক হব্‌স, লেন হাটন, ওয়ালি হ্যামন্ড, ডেনিস কম্পটন, মরিস লেল্যান্ড, পিটার মে (অধিনায়ক), গডফ্রে ইভান্স, হ্যারল্ড লারউড, মরিস টেট, জিম লেকার এবং হেডলে ভেরিটি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩২১ রান (পন্সফোর্ড ৮১ এবং মিলার ৭৫ রান। টেট ৮৬ রানে ৩, ভেরিটি ৩১ রানে ৪ এবং লেকার ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ৪০৭ রান (মরিস ১৪২ এবং গ্র্যাডম্যান ২২২ রান। লেকার ১০৫ রানে ৪, ভেরিটি ৭৪ রানে ৩ এবং টেট ৭৫ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ২৬৬ রান (হাটন ৮৬ এবং লেল্যান্ড ৮০ রান। লিন্ডওয়াল ৫৭ রানে ৩ এবং মিলার ৪৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ৩২৭ রান (হব্‌স ৬০, হ্যামন্ড ৫৮, লেল্যান্ড ৬০ এবং মে ৫৪ রান। বেনো ৬১ রানে ৪ এবং মিলার ৬৫ রানে ৩ উইকেট)

রিচি বেনো

এশিয়ান জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা

সিউলে (কোরিয়া) অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশিয়ান জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি খেতাবের মধ্যে ভারতবর্ষ বালক বিভাগের তিনটি খেতাব জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সাতটি দেশের ৩০ জন বালক এবং ১৭ জন বালিকা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিজয় অমৃতরাজ এবং জয়কুমার রয়াপ্পা। বালকদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতবর্ষেরই দু'জন খেলেছিল—অমৃতরাজ এবং রয়াপ্পা। বালকদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ভারতবর্ষের অমৃতরাজ এবং রয়াপ্পা ফিলিপাইনের খেলোয়াড়দের ৩—০ খেলায় পরাজিত করে 'উ থান্ট' কাপ জয়ী হয়। বালিকা বিভাগে ভারতবর্ষ অংশ গ্রহণ করে নি।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

আগামী ১৫ই অক্টোবর স্পেনের বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১০টি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। সেখানে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা এবং কেনিয়া। 'বি' গ্রুপে খেলবে পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং স্পেন।

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হয়েছে। এই দলে পাঞ্জাবের ৬ জন, বাংলার ২ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন, বোম্বাইয়ের ২ জন, সামরিক বিভাগের ২ জন, তামিলনাড়ু এবং ভূপালের ১ জন করে খেলোয়াড় আছেন।

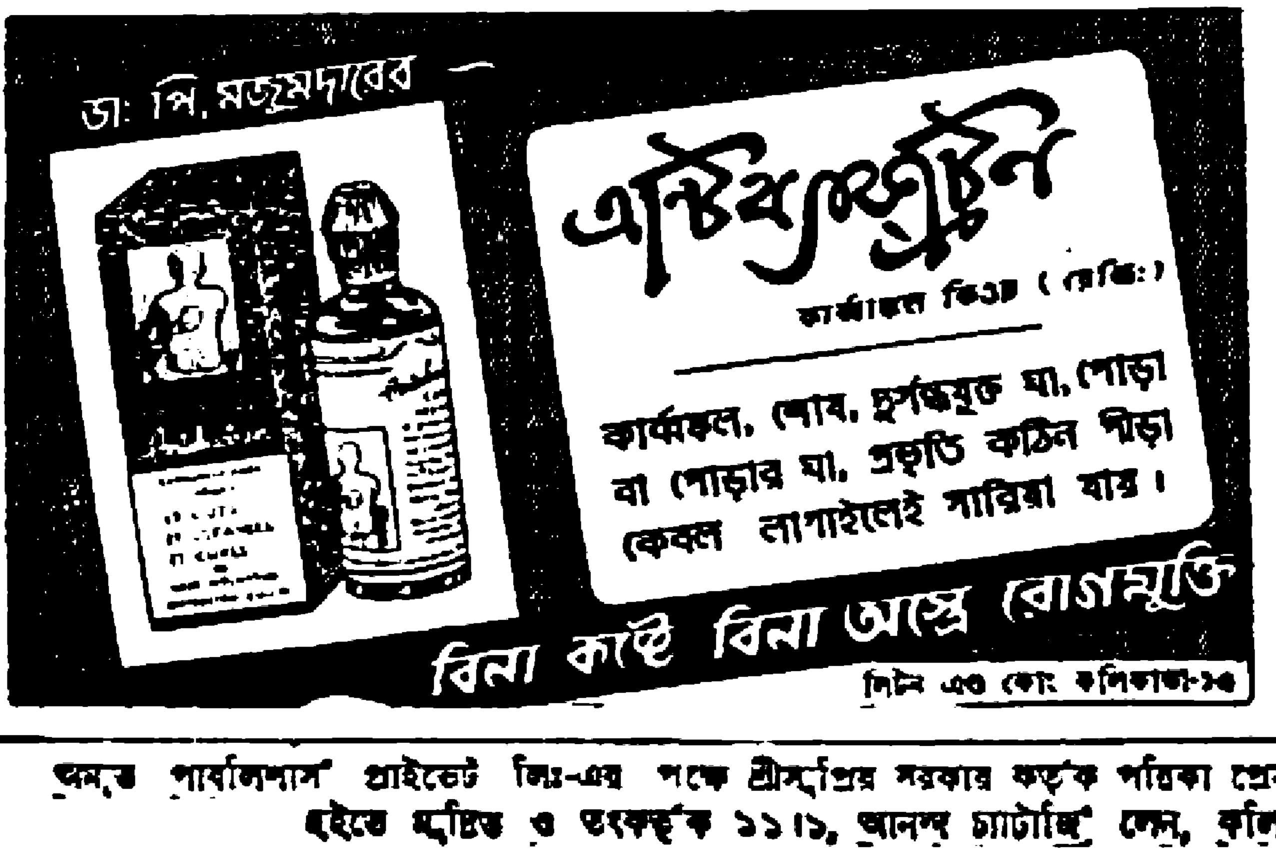

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শিঙ্গার কুমকুম ঐ ললাটে অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে !

তুলে নিন, লাগিয়ে দিন শিঙ্গার কুমকুম। আপনার সুন্দর ললাট এক রঙের ছটায় হয়ে উঠবে অপরূপ। আপনার মুখকান্তিতে ফুটে উঠবে এক অপূর্ব শোভা— অনবদ্য আভা— ভরবে আপনাকে পুলকে। ১২টি অনন্য বাহারী রঙের কুমকুম থেকে আপনার মনের ভাব বুঝে পছন্দমত মানানসই বেছে নিন আপনার রুচি মাফিক কুমকুম। আপনার প্রিয় শাড়ী, কুর্তা আর সবচেয়ে সেরা লুঙ্গী আর বেলবটমের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে লাগান শিঙ্গার কুমকুম— টিপ। দারুণ মানাবে।

চলুন—ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করুন। শিঙ্গার—ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিকা মহিলাদের জন্যে কুমকুম বিন্দি

বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম

শিঙ্গার

ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি

ভেলভেট ফিনিশ

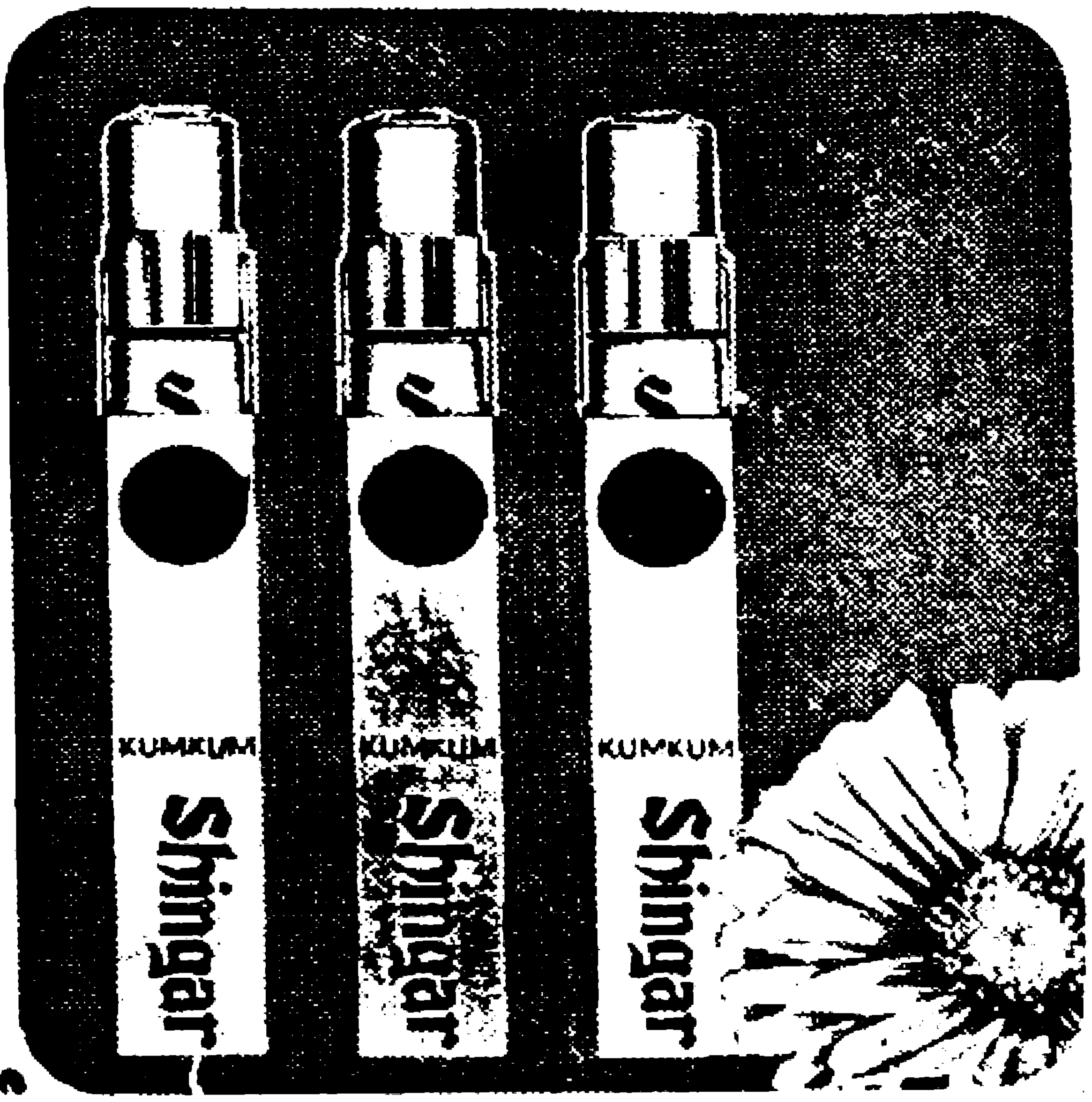

স্টকিস্ট : মেসার্স প্রভাত এজেন্সির
বি ১০১, বাগরি মার্কেট, ৭১, বি, আর, বি, বি, রোড, কলিকাতা—১। ফোন : ৩৪-৭০৫১

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুসকি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুসকি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুসকি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুসকির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

* টিসিসি = ৩, ৪, ৪, ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 15th October, 1971 শুক্রবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৭৮ **50 Paise**

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৭২৪	একনজরে	—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
৭২৫	সম্পাদকীয়	
৭২৬	ছবির পাতা	
৭২৮	পটভূমি	—শ্রীদেবদত্ত
৭৩০	ব্যঙ্গচিত্র	—শ্রীঅমল
৭৩১	ভালবাসার ঘর	(গল্প)—শ্রীকণা বসু (মিশ্র)
৭৩৮	বৈজিকতত্ত্ব	—শ্রীঅমিতসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত
৭৪১	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	—শ্রীঅভয়ঙ্কর
৭৪৭	কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা	—শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য
৭৫০	কৃত্রিম মৃত্যু	—শ্রীবিজ্ঞানপ্রিয়
৭৫৬	চাই	(কবিতা)—শ্রীগণেশ বসু
৭৫৬	অবিরাম লিখে যেতে থাকে	(কবিতা)—শ্রীআসাফ চৌধুরী
৭৫৬	এ বাঙলা ও বাঙলা	(কবিতা)—শ্রীসুতপা চক্রবর্তী
৭৫৭	সুবর্ণশিরি	(উপন্যাস)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৬০	লালন সাঁই-এর মাজারে	—শ্রীমোহিত রায়
৭৬১	হরপ্পার ফুল	(উপন্যাস)—শ্রীনির্মল সরকার
৭৬৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস	—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৭৭১	আবহমানকাল	(উপন্যাস)—শ্রীঅসীম রায়
৭৭৭	লটারির লট্	—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৭৭৯	চোখ	(গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
৭৮০	অঙ্গনা	—শ্রীপ্রমীলা
৭৮৫	অঙ্গনা	—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৮৭	সমকালীন ইউরোপীয় ছবির কথা	—শ্রীঅশোক মজুমদার
৭৯০	প্রেক্ষাগৃহ	—শ্রীনান্দীকর
৭৯১	খেলাধুলা	—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

পরিবর্ধিত নবম সংস্করণ
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত
শিক্ষা বিভাগ ও মনীষীবৃন্দ প্রশংসিত
ছোটদের সচিত্র ইংরেজী—বাংলা অভিধান
COMMON WORDS
• পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪ • ছবির সংখ্যা ৩৮০ • দাম আঠারো টাকা
জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY

"এক নজরে"

টোঙ্গা রাজা :

টোঙ্গার রাজদম্পতি এসেছেন ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে। সার্বভৌমের শুভাগমন, তাই রাজধানীর বিমানবন্দরে একুশবার তোপধ্বনি করে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি এগিয়ে আসেন রাজদম্পতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে, এবং সম্বর্ধনার উত্তরে টোঙ্গার রাজা আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এদেশে আগমনের ফলে ভারত-টোঙ্গা মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

ভারত-টোঙ্গা মৈত্রী বন্ধন! দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমমর্যাদায় পাশাপাশি চলার সঙ্কল্প ঘোষণা। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হবে, মিত্রতার যাত্রায় কে এই ভারতের নবসাথী? তাই এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদিত হচ্ছে টোঙ্গার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতি।

টোঙ্গা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দূরপ্রান্তে, ফিজির পূর্বে ও সামোয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপপুঞ্জ। আয়তন ২৬৯ বর্গমাইল (৬৯৭ বর্গ কিলোমিটার); লোকসংখ্যা, ১৯৭০ সালের হিসাবমতো কিঞ্চিদধিক ৮৭ হাজার। টোঙ্গাটাপু দ্বীপে অবস্থিত রাজধানী নুকুয়ালোফার লোকসংখ্যা ষোল হাজার। প্রায় দশম শতাব্দী থেকে একটি রাজপরিবার বংশপরম্পরায় টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ শাসন করে আসছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে টোঙ্গার সংযোগ ঘটে, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নাবিক জেকব লিমেয়ার ঐ দ্বীপরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার পর। তারপর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আবিষ্কর্তা ক্যাপ্টেন কুক টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করেন ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় টোঙ্গার রাজাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের একটি বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপ উপহার দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিবলে টোঙ্গা বৃটেনের রক্ষণাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, কিন্তু ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন আর এক সন্ধি অনুসারে টোঙ্গা পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার সামর্থ্য টোঙ্গার নেই, তাই কমনওয়েলথের সদস্য হয়েই টোঙ্গা খুশি।

কৃষি-নির্ভর টোঙ্গার শিল্পের সম্ভাবনা সীমিত, অথচ জনসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান। এখনই তার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩২০, যা ভারতের চেয়ে বেশি। তাই, ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আয়তনের নয় ভাগের এক ভাগ—টোঙ্গার অর্ধেক লোক কর্মহীন। টোঙ্গার একমাত্র আশা, অচিরে তার উপকূলে আবিষ্কৃত হবে খনিজ তেলের অন্তহীন উৎস, যা টোঙ্গাকে করে তুলবে দূরপ্রাচ্যের কুয়েট। সে অনুসন্ধানের কাজে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তার প্রার্থনা জানাতেই টোঙ্গার রাজা এসেছেন ভারতে।

টোঙ্গার জনজীবন প্রশান্ত মহাসাগরের মতোই নিস্তরঙ্গ, তাই টোঙ্গা কখনও সংবাদের বিষয় হয় না। কিন্তু তারও ব্যতিক্রম ঘটে কয়েক মাস আগে যখন টোঙ্গা জানায় যে তার রাজোদ্যানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ক্যাপ্টেন কুকের উপহার সেই কচ্ছপটির মৃত্যু হয়েছে।

রাজ উৎসব :

পারস্যে রাজ শাসনের সার্ধ-দ্বিসহস্র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন চলেছে ইতিহাসে তা নাকি প্রায় নজিরবিহীন। বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে যেদিন সূর্য অস্ত যেত না সেদিনও এমন জাঁকজমকের উৎসব খুব বেশি হয়নি। ঐতিহাসিক মহলের অভিমত, ইংরেজ সম্রাট অষ্টম হেনরি যখন ১৫২০ সালে ফরাসি সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেই সময় যে উৎসবের প্লাবন বয়েছিল ফ্রান্সে তাও ম্লান হয়ে যাবে ইরানের রাজকীয় উৎসবের কাছে। উৎসব কাকে বলে, জাঁকজমক বলতে কি বোঝায় বা রাজ-বিলাসিতাই বা কি—তা ফ্রান্সের বনেদি সমাজের চেয়ে আর কে ভাল বোঝে? তাই এ ব্যাপারে সব আয়োজনের দায়িত্ব ইরানের রাজকীয় প্রশাসন ফ্রান্সের শিল্পী, কারিগর ও বিলাসব্যবসায়ীদের উপর অর্পণ করেছে। ফলে সারা ফ্রান্সের অভিজাত ব্যবসায়ী মহলে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

গত ছয় মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে দুটি জেট বিমান প্যারী-তেহরান ছোটাছুটি করছে উৎসব সামগ্রী পৌঁছিয়ে দিতে বা উৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে। ফ্রান্সের শতাধিক কারখানা এখন শুধু নানা সুগন্ধি প্রস্তুতির কাজে লিপ্ত। ঐ সুগন্ধিতে সিক্ত হবে সম্মানিত অতিথিদের জন্য নির্মিত শিবিরগুলি। সোনালী কাপড়ের শিবিরগুলিও প্রস্তুত হচ্ছে ফ্রান্সের কয়েকটি কারখানায়।

ইরানের রাজদরবারের শীর্ষ-পারিষদরা যে স্বর্ণসূত্রের পরিচ্ছদ ধারণ করবেন তার জন্য এ পর্যন্ত ৩৫ মাইল দীর্ঘ স্বর্ণসূত্র প্রস্তুত হয়েছে। ঐ পোষাকগুলির 'ট্রায়াল' দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত ছয়বার, তার জন্য ফ্রান্সের দর্জিরা অতবার প্যারী-তেহরান ছোটাছুটি করেছেন। আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা যে শিবিরে বসে পানাহার করবেন, নীল ও সোনালী রঙে মেশানো সেই শিবির থেকে সর্বদা ইরানের আতরের গন্ধ বিচ্ছুরিত হবে, যদিও সে সুগন্ধিও নির্মিত হচ্ছে ফ্রান্সে। শিবিরের আলোকসজ্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফ্রান্স থেকে দশজন আলোকশিল্পী আসবেন।

শুধু উৎসবটাই হচ্ছে না ফ্রান্সে। কিন্তু তার জন্য ফরাসীদের কোন দুঃখ নেই। কারণ রাজ-উৎসবের প্রায় সব টাকাই চলে যাচ্ছে সে দেশে, যে দেশ রাজার শিরশ্ছেদ করে একদা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ইউ-বি-আই

বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চল। নাম গঙ্গাজলঘাটি। এতদিন এখানে ছিল না কোন ব্যাঙ্ক। ছিল না আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থার স্মারক-চিহ্ন। দেশের ব্যাঙ্কিং মানচিত্রে গঙ্গাজলঘাটি ছিল তাই অনুপস্থিত। অজানা অচেনা নামমাত্র। গত ৮ অকটোবর সেই গঙ্গাজলঘাটিতেই খোলা হল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নতুনতম শাখাটি। আর এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ইউ-বি-আই-র শাখা সংখ্যা দাঁড়ালো পাক্কা তিনশো।

ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছিল উনিশশো উনসত্তরের জুলাইয়ে। ইউ-বি-আই হল সেই ১৪টি বৃহৎ ব্যাঙ্কেরই অন্যতম। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ সত্যি সত্যিই বিস্ময়ের। তাই জাতীয়করণের সময় যেখানে ছিল ১৭৪টি শাখা, আজ সেখানে দাঁড়িয়েছে ৩০০টি। সবচেয়ে বড় কথা এর মধ্যে দুশোরও বেশি শাখা রয়েছে শহরতলি ও গ্রাম-এলাকায়। সম্প্রতি একটি খবরে জানা যায় চলতি বছরেই ইউ-বি-আই খুলবে আরো ৩১টির মতো শাখা, আর তার ভিতর ২১টিই কাজ করবে শহরতলিতে অথবা গ্রামাঞ্চলে।

৭।১০।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

রেল নিয়ে

স্বাধীনতাউত্তরকালে ভারতীয় রেল বিভাগ নিয়ে যে ধরনের নাড়াচাড়া হয়েছে তা অভূতপূর্ব। এক মন্ত্রী যাত্রীবাহী ট্রেনের শ্রেণীবিন্যাস করে ফার্স্টক্লাস ও ইন্টারক্লাস লোপ করলেন। পরে আবার অন্য হুকুমে ফার্স্টক্লাস হল তবে তা আসলে পুরাতন সেকেন্ড ক্লাস। রেলের পুনর্বিন্যাসের নামে কোথাও দুটি রেলকে এক করা হল, কোথাও একটি রেলকে দুটি করা হল, যখন যে অঞ্চলের দাবী প্রবল হয়েছে সেখানেই একটি নতুন রেলওয়ে "জোন" স্থাপন করা হয়েছে। এখানকার মাটি ওখানে এবং ওখানকার মাটি এইখানে এই নীতির ফলে রেলওয়ের কর্মদক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। গুলজারিলাল নন্দা এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া রেল বিভাগের মন্ত্রীরা বরাবর দক্ষিণ ভারতের কোনো না কোন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন—এর পিছনে কোনো টেকনিক্যাল কারণ আছে কিনা তা সাধারণের অজ্ঞাত। বর্তমানে মহীশূরের কে, হনুমন্তিয়া রেলমন্ত্রকের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। যাঁদের ওপর রেল পরিচালনার ভার তাঁদের সঙ্গে দফতরচূড়ামণি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কটা কোনোদিনই তেমন প্রীতিজনক হয়নি। কৃষ্ণ মেননের আমলের প্রতিরক্ষা দপ্তরের হালচাল ত' অবসরপ্রাপ্ত একাধিক সেনানায়ক রচিত গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এইবার রেল দফতরের অন্তর্বিরোধের জঘন্য কাহিনীও প্রকাশিত হল। উপর মহলের কোন্দলের ফলে রেল বিভাগ ক্রমশই তার দক্ষতা হারাবে এই আশংকা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ভারতবাসীর মনে জেগেছে। অনেকগুলি বিষয়ে রেল বোর্ডের অভ্যন্তরে প্রচন্ড মতভেদ শুরু হয়েছে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রের বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে জানা যায় যে রেল বোর্ডের ভিতরকার কলহ আর চাপা যাচ্ছে না। দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী বি, সি, গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়েছে। যে সব কারণে মতভেদ ঘটেছে তার সঙ্গে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি বা দক্ষতা বর্ধনের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রায় সত্তরজন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসরের ট্রানসফার নিয়ে প্রথম মতবিরোধ শুরু হয়; তারপর রাজধানী একস্‌প্রেস কানপুরে থামবে কি থামবে না তাই নিয়ে বিতর্ক। ট্রানসফার নাকি কর্মক্ষমতা বা এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির প্রয়োজনে করা হয়, অন্য কারণও থাকতে পারে। এরপর আগস্ট মাসে বোর্ডের ট্রান্সপোর্ট মেম্বারের সঙ্গে চেয়ারম্যানের প্রকাশ্য বিরোধ বাধে নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে একজন অফিসারকে নর্দার্ন রেলওয়ে বদলী করা নিয়ে; আদেশ, পুনরাদেশ ইত্যাদির ফলে একই পদের জন্য দুজন দাবীদার এসে হাজির হন। এর পর চক্রান্ত হল চেয়ারম্যানকে বিতাড়ন করা এবং বোধকরি তার পূর্ব ব্যবস্থানুসারে ২১শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তাঁর উত্তরাধিকারীও স্থির হয়ে গেল। এইখানে বলা প্রয়োজন যে চেয়ারম্যানের ৫৮ বছর বয়সে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে অবসর গ্রহণ করার কথা। তাঁর স্থলাভিষিক্ত মিঃ বি, এস, ডি বালিগার আজ থেকে এক বছর পরে অবসর গ্রহণের কথা, তাঁকে আগেভাগে আরো এক বছর একসটেনসন দিয়ে গদীতে বসানো হবে। এই সিদ্ধান্ত এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের সুপারিশ মত নাকি করা হয়েছে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ হনুমন্তিয়া। ট্রান্সপোর্টেশন মেম্বার মিঃ স্বামীনাথনও ডিসেম্বরে অবসর নেবেন তাঁর জায়গায় বসবেন ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের মিঃ কাউল। এর পর চেয়ারম্যান দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবেন বলে ছুটি প্রার্থনা করায় তাঁকে পুরা ছুটি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তিনি তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিলে তাঁর দফতর অপরকে বন্টন করা হয়। বি, সি, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান চাণক্যপুরীতে পরিবহণ মূাজিয়মের জন্য নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপনের সময় রটনা করা হয় তিনি তিন মাস পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেছেন। বোর্ডের (অধস্তন কর্মচারী) সেক্রেটারী চেয়ারম্যানকে সতর্ক করে দেন যে, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করার অধিকার তাঁর নেই। দুর্নীতি দূর করার প্রচেষ্টায় আজ রেল বোর্ডের সর্বাধিনায়কের এই অবস্থা। তিনি বলেছেন, "রেলওয়ে বিভাগকে কর্মক্ষম করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলাম সেই আমার অপরাধ।" এর পর সম্ভবতঃ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে। কিন্তু কলঙ্ক চাপা যাবে না। আজ সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ফলে কি দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা এই ঘটনায় আরো সুস্পষ্ট হল।

পূর্ব জার্মানীর ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর দক্ষিণে পূর্ব জার্মানীর কনসাল জেনারেল মিঃ মে।

কাম্বোডিয়ার ক্রেক শহরে উত্তর ভিয়েৎনামী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মার্কিণ ট্যাঙ্ক বহর ভিয়েৎনামের টেনিনে এসে সমবেত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি এই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে এক উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠানে ওড়িশার বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করছেন।

খিদিরপুরের ভূকৈলাস রোডের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ময়লা জল জমে নরককুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ মোমিনপুর পাম্পিং স্টেশন অকেজো হয়ে আছে। তারই ফলে এই অবস্থা।

পটভূমি

এ আই টি ইউ সি ভেঙে দু' টুকরো করে যখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটু গড়ে তুলে ময়দানে বিরাট সমাবেশ করলেন তখনও সেখানে বড় বড় হরফে প্রধান স্লোগান অবশ্যই এই লেখা ছিল—'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। সেটা গত বছর মে মাসের কথা। এ-বছর পুজোর মুখে আসানসোলে সিটুর যে প্রথম সম্মেলন হয়ে গেল সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানানো হল। তার ঠিক আগে বাঙ্গালোরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবেও 'ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের' জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম গড়ে তুলতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির আহ্বান জানানো হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি বললেন, সি পি এম শুধু একটা নির্বাচনী ফ্রন্ট চায় না, আরো বেশী কিছু চায়। সেই 'বেশিটা' কী? তা হল, সব গণতান্ত্রিক দল ও তাদের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন গণ-সংগঠন গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলবে। অর্থনৈতিক বোঝার বিরুদ্ধে এবং সাধারণ মানুষের আত্মরক্ষার সপক্ষে গড়ে উঠবে এই সংগ্রাম। ঐভাবেই শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে। তা যদি না-করা হয়, তবে জনসাধারণের অসন্তোষ অপচিত হবে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল পথে প্রবাহিত হবে, ফলে শাসকশ্রেণী খুব সহজেই গণ-সংগ্রামকে দমন করতে পারবে।

এই সব ঘোষণা ও প্রস্তাবের পরেই কিন্তু মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাত বছরের পৃথক অস্তিত্বের ইতিহাসে এসে হাজির হয়েছে একটা দারুণ সংকটের সময়। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রায়ই বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর প্রথম আঘাত আসে শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয়

আগামী সংখ্যা থেকে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নতুন উপন্যাস

পুর্ব পুরুষ

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে

সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বরখাস্তের ঘটনাকে মার্কসবাদীরা নিশ্চয়ই সেই আঘাতের একটা বড় উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার এমন একটা উপলক্ষও চট করে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবু কিন্তু পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী মানুষ এখনও সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করতে রাস্তায় নেমে পড়েন নি।

বন্ধ একটা হচ্ছে। সেটা যে এমন কিছু বড় কথা নয়, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাই তা স্বীকার করেছেন। বন্ধ দিয়ে আজকাল কিছু বোঝার উপায় নেই। এই তো গত জুন মাসে যুব কংগ্রেসের ডাকে কলকাতা এক দিন বন্ধ ছিল। তা থেকে নিশ্চয়ই একথা বোঝায় না যে, কলকাতার সব লোক কংগ্রেসের সমর্থক। এখন একদিন বাংলা বন্ধ হলেও একথা প্রমাণ হবে না যে, সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করার প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলার সব মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছেন। অবশ্য সি পি এম নেতারা এর আগে বারবারই বলেছেন, বন্ধ ছাড়া এখন আর প্রতিবাদ জানাবার কোন পথ নেই, তাই বার-বার তাঁদের বন্ধ ডাকতে হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়ন মহলেরও সকলে অবশ্য এ যুক্তি মানেন না। ২৭শে আগস্ট যখন বাংলা বন্ধ হয় তখনও বন্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন মোটামুটি এই রকম একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে, বন্ধ হচ্ছে হোক, বন্ধের পর সংগ্রামকে আরো 'উচ্চ পর্যায়ে' নিয়ে যাওয়া হবে। সেই উচ্চ পর্যায়টা কি হবে, তা ইউ টি ইউ সি (আর এস পি শাখা) নেতা যতীন চক্রবর্তী সিটুর কাছে লেখা একটা চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যতীনবাবুর একটা প্রস্তাব ছিল, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা, যেটা বন্ধের চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় প্রতিবাদ হবে। লক্ষণীয় যে, সি পি এম এই ধরনের প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি।

•

সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বহালের দাবীর সপক্ষে সংগ্রামের রূপ কি হবে, সে নিয়েও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একমত হতে পারছে না। কিন্তু মিলিত সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে এইটেই যে একমাত্র বাধা, তা ভাবলে ভুল হবে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, যে-কারণে সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী আন্দোলন বহুধা বিভক্ত, ঠিক সেই কারণেই সরকারী

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
ব্যবহার করুন!

কর্মচারীদের বরখাস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধতে পারছে না। সেই কারণটা কি? স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, একদিকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বা তাদের গণসংগঠনগুলি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরোপুরি নিজেদের হাতে রাখতে বদ্ধপরিকর। আর অপর দিকে, অন্যান্য বামপন্থী দল চায় এই সুযোগে তারাও এই আন্দোলনের নেতৃত্বের অংশভাক হয়ে উঠুক। এই টানাপোড়েনই মিলিত আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনের কথাই ধরা যাক। সেখানে কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাপটই বেশী। এই কমিটি আবার সি পি এম-নিয়ন্ত্রিত। যুক্তফ্রন্টের শাসনের সময় এই কমিটির প্রভাব ক্রমশঃই বেড়েছে। গত বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় এই কমিটিরই ডাকে সরকারী কর্মচারীরা তিন দিন ধর্মঘট করেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা সি পি এম অবশ্যই দাবী করবে এই ধর্মঘট বেশ সফল হয়েছিল, কিন্তু একথাও সত্যি যে, ঐ ধর্মঘটের পরেই সি পি এম ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পৃথক-পৃথক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক গড়ে তোলে যুক্ত কমিটি, সি পি আইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় অস্থায়ী যুক্ত কমিটি এবং এস ইউ সি গড়ে তোলে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন।

রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের যে ১০ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন তাঁরা যেহেতু প্রধানতঃ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গেই জড়িত তাই বিপন্ন এখন সি পি এমের এবং সেই জন্যেই মিলিত আন্দোলন গড়ে তুলতে তাদের দায়টাই বেশী হওয়ার কথা। তাই অন্যান্য বামপন্থী দল তথা ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে তাদের বাধ্য হয়েই খানিকটা নরম হতে হবে—এই কথা ভেবেই অন্যান্য বামপন্থী দল এই সুযোগে গণসংগ্রামের নেতৃত্বের ভাগ পাওয়ার জন্যে দাবী তুলেছে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণসংগঠনের মিলিত নেতৃত্বে এখন সি পি এমেরই অপ্রতিহত প্রভাব—১২ই জুলাই কমিটি থেকে শুরু করে রাজ্যীয় সংগ্রাম সমিতি পর্যন্ত সর্বত্রই। তাই এই সুযোগে অন্যান্য বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা দাবী করলো যে, অন্ততঃ সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন পরিচালনার ভার শুধু সি পি এমের ওপর না রেখে সকলকেই [illegible]। একটি যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ [illegible] হাই তারা প্রথম থেকেই

কিন্তু সি পি এম তাতে প্রথমে রাজী ছিল না। সি পি এমের ওপর সরকারের তরফ থেকে এই প্রত্যক্ষ আঘাত এসে পড়ার পরও পার্টি এই নীতিতে অটল যে, গণসংগ্রামের নেতৃত্ব পার্টির হাতেই থাকতে হবে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও বামপন্থী দলের সহযোগিতা অবশ্যই চাই, কিন্তু সেই সহযোগিতা আসবে সি পি এমের নেতৃত্ব মেনে নিয়েই। এখানে সাময়িক লাভের জন্যেও সি পি এম কোন আপস করবে না। এই ধরনের কোন আপসে রাজী থাকলে অন্ততঃ সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গোড়াতেই যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে সি পি এমের কোন বাধা ছিল না। সি পি এম বড় জোর ১৩ই অক্টোবরের বন্ধ পরিচালনার জন্যে একটা যুক্ত পরিষদ গঠনে রাজী হতে পারত। একবার তা হয়েও ছিল। কিন্তু তখন অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতারা বললেন যে, শুধু বন্ধের জন্যে একটা যুক্ত পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী নন। তখন যতীন চক্রবর্তীর উদ্যোগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে, শুধু বন্ধ নয়, সমগ্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্যেই এই যুক্ত পরিষদ গঠিত হবে। তখন রাজী হয়ে গেলেও কিন্তু পরের দিনই কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা আবার পিছিয়ে গেলেন। আগের দিন জ্যোতি বসুর সঙ্গে যতীনবাবুর আলোচনার পরেই একটা আপস হয়েছিল, কিন্তু সে-আপস টিকল না, কারণ পার্টির নেতৃত্বের একটা বড় অংশ এর বিরোধী। তারপর সি পি এম যুক্ত পরিষদের দাবি মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা কতো দূর কার্যকর হবে তা বলা মুস্কিল।

কেন সি পি এম এই পথ নিচ্ছে? একটা কারণ এই যে, সব বামপন্থী দল সম্বন্ধে সি পি এম সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়। যেমন সি পি আই। যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে সেখানে সি পি আই প্রতিনিধিকেও রাখতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই কোন বড় রকমের সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তুতি হয় তবে তাতে সি পি আইয়ের

'বেতাল' এর মত ছবিতে-কাহিনীর বাংলা মাসিক-পত্র

ওয়েস্টার্ন কমিকস্

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় এ-ধরনের মাসিক পত্র এই প্রথম। যদিও বোম্বাই থেকে একটি পাক্ষিকপত্র 'বেতাল' প্রকাশিত হয় তবু বলা যায়, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে ওয়েস্টার্ন কাহিনীর জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। বর্তমানে ওয়েস্টার্ন কাহিনী ইংরেজী ছাড়াও পৃথিবীর ৩২টি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হচ্ছে।

এখানকার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অভিমত :

'বেতাল' বা 'অরণ্যদেবের' চেয়েও রুদ্ধশ্বাস-কাহিনী এই 'ওয়েস্টার্ন কমিক্স'

এ মাসের সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আপনার কাছাকাছি পত্রিকা স্টলে খোঁজ করুন।

প্রতি কপির দাম এক টাকা। বার্ষিক চাঁদা বারো টাকা।

এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েস্টার্ন কমিকস্ ॥ ২০এ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

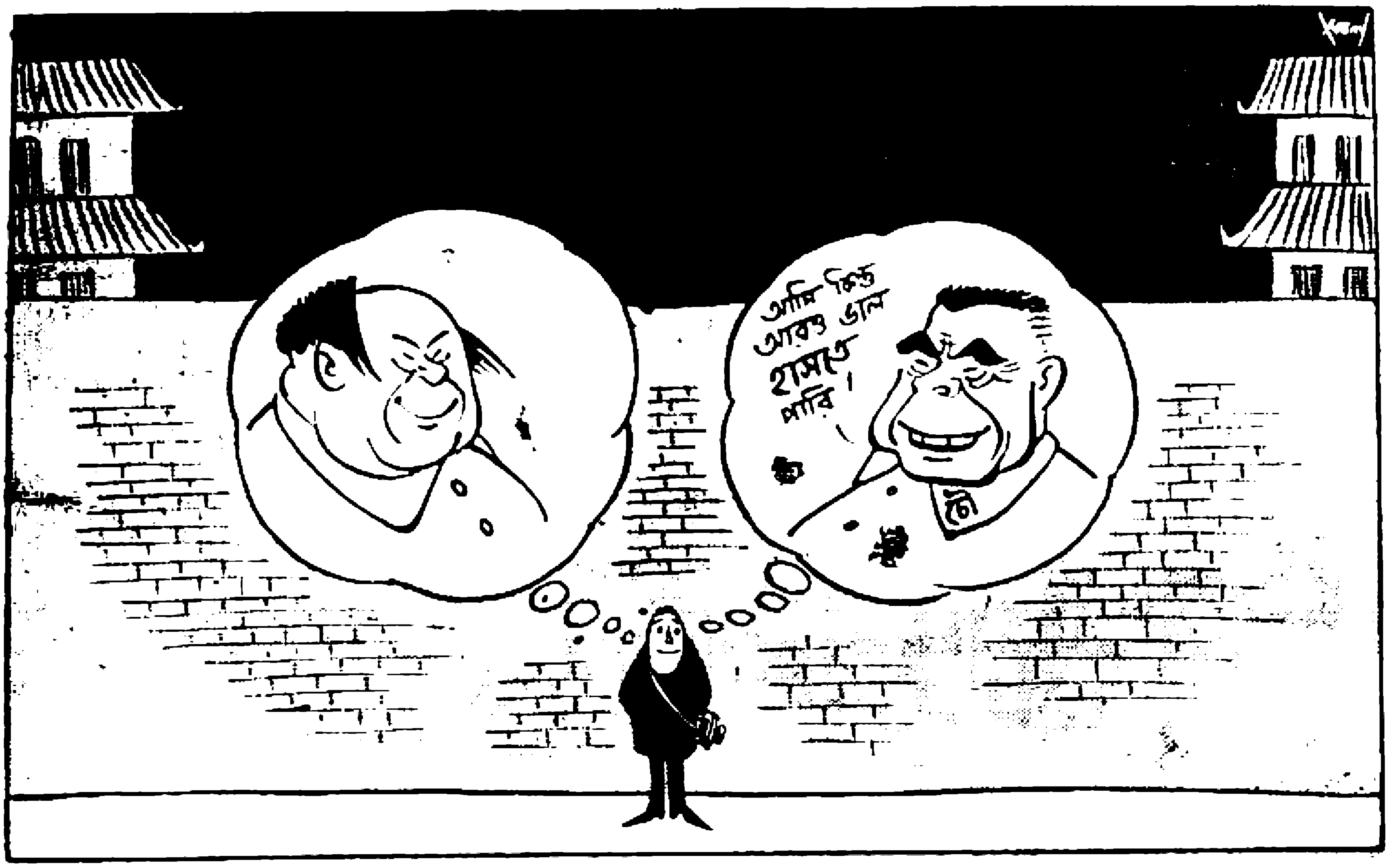

সমর্থন বা সাহায্য কতটা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে অনেকেরই সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের কারণ, সি পি আই এখন কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করতে খুবই আগ্রহী। এই অবস্থায় তারা কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ে কি বেশী দূর যেতে পারবে?

তবে এইটিই যে একমাত্র কারণ তা নয়। সি পি এম এটাও চায় যে, পশ্চিম বাংলার সব গণসংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাক। সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টি বা সুশীলকুমারের আর সি পি আইয়ের মত ছোট পার্টির নেতাদের স্থান হতে পারে, কিন্তু অন্য কারুর নয়। এটা রাজনৈতিক দিক দিয়েও দরকার। একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থী দলের ঐক্যই পার্টিকে গত নির্বাচনে সাফল্য-লাভে বিশেষ সাহায্য করেছিল। আর সেই সাফল্যের একটা বড় কারণ ছিল গণ-সংগঠনগুলির সাহায্য। পরবর্তী নির্বাচনের ওপর সি পি এমের অনেক আশা। কারণ ঐ নির্বাচনে সি পি এম এককভাবেই ক্ষমতায় আসতে চায়। তাদের সঙ্গে যদি কেউ হাত মেলাতে চায় তবে সি পি এমের শর্ত মেনে নিয়েই তা করতে হবে।

•

অন্যান্য দলের সম্মতির অপেক্ষা না-করেই তাই এখন সিটু একাই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিল। ২৭শে আগস্টের বাংলা বন্ধের ডাকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। তখনও সিটু একাই প্রথম বন্ধের ডাক দেয়। কিন্তু টানাপোড়েনের পর অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিও ঐ ডাকে গলা মেলায়—এমন কি আই এন টি ইউ সি পর্যন্ত। পরে অবশ্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী আর কে খাদিলকর বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আই এন টি ইউ সি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। এ আই টি ইউ সি প্রভৃতির মধ্যেও দ্বিধার ভাব দেখা দেয়। কিন্তু সিটু অটল থাকে। তখন আই এন টি ইউ সি ছাড়া অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকেও বাধ্য হয়ে বন্ধের ডাক দিতে হয়।

তার কারণ, কোন ট্রেড ইউনিয়নই চায় না যে, তারা অন্যান্যদের চেয়ে কম সংগ্রামী এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হোক। ঐ ধারণা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার পথে একটা প্রতিবন্ধক। এমনিতেই সিটু এখন এই রাজ্যে সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। প্রায় এক হাজার ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে সিটুর অধীনে। মোট সদস্য সংখ্যা পৌনে পাঁচ লাখের মতো। এ আই টি ইউ সি ভেঙে যখন সিটু তৈরী হয় তখনকার চেয়ে এই সংখ্যা বেশী। মোটা-মুটি বলা চলে যে, সিটুর যা সদস্য সংখ্যা অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা তার সমান। এখন সিটু তথা সি পি এম যদি আরো সংগ্রামী ভূমিকা নেয় তবে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন কোন্ পথ নেবে? তারা কি পৃথক সংগ্রাম গড়ে তুলবে? সেই সংগ্রামই বা কি রূপ নেবে? সি পি এমই যখন বন্ধ ছাড়া অন্য অস্ত্রের কথা এখনও ভাবতে পারছে না, তখন তারা কি আরো সক্রিয় পথ নিতে পারবে? আর বন্ধই যদি ডাকতে হয় তবে আবার অন্য এক দিন বন্ধ ডাকার সার্থকতা থাকে কি? বন্ধ সংগ্রাম পরিবেশ সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তাই অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে বন্ধের ডাকে গলা মেলাতে হচ্ছে।

১০।১০।৭১ —[illegible]

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

ভালবাসার ঘর

কনা (রেণু) মিশ্র

একটা বুড়ো ঘোড়ার মতন হাঁফাতে হাঁফাতে মাদ্রাজ এক্সপ্রেস ট্রেনটা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওরা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। অরিন্দম বলল, হোটেলেই যাবে তো?

একটা রাত্রের তো ব্যাপার, চল রিটায়ারিং রুমেই যাই।—নীলা বলল। অরিন্দম আর কথা কাটাকাটি করল না। কুলিকে বলল, চল ভাই, রিটায়ারিং রুম কোথায় আছে নিয়ে চল।

দোতলার ওপরে রিটায়ারিং রুম। কুলি আগে আগে চলল। পেছনে ওরা দুজন। দিল্লী থেকে ট্রেনে উঠেছিল ওরা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা আগে। ট্রেনটা অযথা লেট করল পথে। একালের মেয়েদের যেমন ফ্যাশান তেলের বদলে মাথায় শাম্পু করা, নীলাও তো সেই দলের। তারপর আবার ট্রেন জার্নির ধকল, ওর চুল সব রুক্ষ দেখাচ্ছিল। ওর চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ। কয়লার গুঁড়ো পড়ে মুখখানা কালচে দেখাচ্ছিল নীলার। মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু ওর কপালের ওপর জ্বল জ্বল করছিল লাল লিপস্টিকের ফোঁটাটা। বরং সেই তুলনায় অনেক বেশী তাজা দেখাচ্ছিল অরিন্দমকে। মালপত্রগুলো বন্ধ ঘরের সামনে নামাল অরিন্দম। নীলাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি রুমটা বুক করে আসি।

নীলা দেখছিল, বারান্দার কোণটায় কয়েকজন হিপি শুয়ে রয়েছে। শুয়ে শুয়ে তারা কল্কে টানছে আর কি সব বলাবলি করে হাসছে যেন। ওদের পরণে গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবি, লুঙ্গির মতন করে জড়ান ধুতি, পায়ে ধুলোর পুরু স্তর। নীলা ভাবছিল, আমাদের দেশের যুবকদের এর পরের ফ্যাশানটা হয়ত দাঁড়াবে গেরুয়ারংয়ের আলখেল্লা। সিগারেটের বদলে কল্কে। কথাগুলো ভেবে নীলা হাসল।

বারান্দার সাজান টবগুলোয় কিছু অর্কিড, জিনিয়া ফুটে রয়েছে। উর্দিপরা বেয়ারাটা বার কয়েক ঘুরে গেল নীলার সামনে দিয়ে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকাল নীচের দিকে, স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোয় টাঙ্গা, ট্যাক্সি, স্কুটারের হাঁক-ডাক। জায়গাটা ওর পরিচিত। নীলা আগ্রায় আগেও এসেছে। খুব বেশী দিন আগের কথাও নয়, মাত্র বছর চারেক। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কয়েকটা তারা উঠেছে। এখন শুক্লপক্ষ। চাঁদটা ঝিনুকের মতন সাদা, গায়ে তার কালো কালো ছবি। তাজে গেলে হয়, নীলা ভাবল। রাত তো খুব বেশী হয়নি। আর এই পূর্ণিমায় তাজ দেখবার জন্যেই তো এত তাড়াহুড়ো করে এখানে আসা। নীলা ডাকল বেয়ারাকে, এই শুনো। কিতনা রাত মে তাজ বন্ধ হোতা?—কথাগুলো বলেই নীলা হাসল। ভাবল, হিন্দীটা ঠিক হল তো? বেয়ারা বলল, সাড়ে এগারো।

তবে তো তাজে যেতেই পারে, নীলা ভাবল। সেবার যখন এখানে আসে, তখনও পূর্ণিমাই ছিল। কিন্তু সে তাজ দেখা আর নীলার হয়নি। এই চার বছরের মধ্যে ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওর সিঁথিতে উঠেছে সিঁদুর। ওর একটা ঘর হয়েছে ভালবাসার ঘর। আর ওকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেবার মতন একটি পুরুষ। কিন্তু আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের কোন পরিবর্তন নীলার চোখে পড়ল না। স্টেশনে নেমেই ও দেখছিল, হুইলারের বইয়ের স্টলটা তেমনিই রয়েছে। টিকিট কাউন্টার, রিফ্রেশমেন্ট রুম কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। এমনকি স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোর চেহারাটাও একই রকম রয়েছে। খোঁড়া ভিখারীটা এখনও ওখানে নিয়ম মতন বসছে তাহলে? তারপর তার উপন্যাসের নায়ক সুমন প্যাটেল এখন কোথায়? নায়িকা নীলা টাঁসার কথা কি আর সে মনে রেখেছে এত দিনে? আরে দূর, কে জানে, এখন ও আবার নতুন কোন নাটক করছে কিনা! নীলা যেন নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করল। ভাবল, সেটা মিথ্যে নয়। নায়ক হবার মতন চেহারা, চরিত্র আর

CENTRAL LIBRARY

আভিজাত্য, এ সব কিছুরই তো সে অধিকারী। মেক্রোসের বাগ মারার মতন অস্ত্র রয়েছে বইকি ওর চোখে, অসম্ভব বড় বড় আর টানা-টানা চোখের পাতাগুলো এত ঘন আর কালো, মনে হয় যেন সুর্মা পরেছে।

না, তবু নায়িকা দাঁড়ায়নি। নায়ককে ফেলে রেখে হন্ হন্ করে চলে এল স্টেশনে। চলতে চলতে হয়ত একবার না তাকিয়ে পারেনি নীলা। চোখে ওর আগুন জ্বললেও পাতাগুলো কাঁপছিল। থর-থর করে কাঁপছিল ওর শরীর। সুমন কি পারত না ওকে জোর করে টেনে রাখতে?......ওই তো ওই পোর্টিকোয় সুমন দাঁড়িয়েছিল স্কুটার নিয়ে, মাত্র চার বছর আগে।...ওর বলিষ্ঠ হাতের কব্জিতে একটা স্টীলের বালা। চওড়া বুক, শক্ত চোয়াল। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে পৌরুষের বলিষ্ঠ প্রকাশ। ওর শরীর দীর্ঘ কয়েক ফুট লম্বা।...বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ।—নীলা যেন সামনাসামনি লোকটাকে পেয়ে বলল।...ওইতো স্টেশনের পেছনের ওই সেই গেট। ওখান দিয়েই তো নীলা সোজা চলে এসেছিল লেডিস ওয়েটিং রুমে। পুরনো অ্যালবামের পাতা উল্টে নীলা দেখছিল। ওর ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়েছে এলোখোঁপা, ভুরু বাঁকা, চোখে যেন আগুন জ্বলছে।

আমি আম্বালায় যাচ্ছি, আর আধঘন্টা বাদেই আমার ট্রেন ছেড়ে যাবে, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর।—সুমন বলল। নীলার গলায় দৃঢ়তার সুর, সম্ভব নয়।

তুমি আমায় ভুল বুঝছ।

ভুল নয়, যা সত্যি তাই।

আমি কাল প্রলাপ বকেছিলাম।

সত্যটা মাঝে মাঝে প্রলাপের রূপ ধরে বেরিয়ে পড়ে।—কাটাকাটা কয়েকটা কথার বিনিময় হয়েছিল দুজনের। মাত্র চার বছর আগে। সেই চার বছর আগে কি নীলা ভেবেছিল, চার বছর পরে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার স্মৃতিচারণ করবে? মাথায় ঘোমটা তুলে আরেকজনের বউ হবে?......ওয়েটিং রুমের চেহারাটা ওর দেখতে ইচ্ছে করল সেই আগের মতই আছে কি না? কিন্তু কি লাভ?...... তবু ওর মনে পড়ে গেল রাজনাকে, সুহৃতাকে, মিসেস সিনাকে। ওরা একটা গোটা দল মিলে এসেছিল আগ্রায়। আজ ওরাও যেন হারিয়ে গিয়ে অ্যালবামের ছবি হয়ে রয়েছে। রাজনা কোন একটা স্কুলের টিচার, সুহৃতা লেকচারার হুকলীর কাছে কোন একটা কলেজে যেন। আর মিসেস সিনারা তো বিদেশেই পাড়ি দিয়েছেন। এদের সবার সঙ্গেই তো আগে চিঠিপত্রে আদান-প্রদান হতো নীলার। এখন আর হয় না। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা আলস্য এসে গেছে লেখা-টেখার ব্যাপারে। হয়ত এককালে একজনকে অনেক বেশী লিখেছে বলে।...ওয়েটিং রুমে ঢুকল নীলা, তখন যেন খড়ে বিধ্বস্ত ওর চেহারা। সঙ্গীরা তখন হট্টগোলে গুলজার করছিল চারদিক। নীলার মধ্যে কি অভিনয়ের বীজ রয়েছে? নইলে ও সেদিন তার উনিশ বছরের সবচেয়ে বড় অপমান চেপে রেখে সঙ্গীদের সঙ্গে অত হেসেছিল কি করে? হাসির একেবারে বন্যা বইয়ে দিয়েছিল নীলা। হাসতে হাসতে কেঁদেছিল। কিন্তু সে কান্নার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি।... হয়ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল সুমন। তার স্কুটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছিল বাইরে। আচ্ছা, সুমন কি আগ্রায় আসে মাঝে মাঝে? জানতে আগ্রহ হল নীলার। কিন্তু এই অদম্য কৌতূহলটুকু তাকে চেপেই রাখতে হবে। কারণ, এখন ও বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে হনিমুন করতে এসেছে এখানে।

সিঁড়িতে একটি ভারী জুতোর আওয়াজ। নীলা অন্যমনস্কের মতন একটু তাকাল। ভাবল, অরিন্দম কি? আওয়াজটা কাছে আসতে আসতে একেবারে শেষ সিঁড়িতে এসে থামল। নীলা দেখল, সানগ্লাস পরা এক লাস্যময়ী যুবতীর পাশে যুবক। ওরা বিবাহিত, কি অবিবাহিত বোঝা যায় না। বছর পঁচিশেক বয়েস ছেলেটির, মেয়েটির বয়েস অবশ্য ধরা যায় না। কুড়িও হতে পারে, আবার পঁচিশও। সিঁথিতে সিঁদুর নেই মেয়েটির। অথচ......। না বলা যায় না ওরা কেন এসেছে? ওরা কি মাদ্রাজী অথবা খৃশ্চান? যাদের সমাজে চল নেই সিঁদুরের। (যদিও অনেক খৃশ্চান, মাদ্রাজী সখ করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে।) কোন মালপত্র, সুটকেশ কিংবা অ্যাটাচী কিছুই নেই ওদের সঙ্গে। আরেকটা বন্ধ ঘরের দিকে ওরা এগিয়ে গেল। বেয়ারা মুখ টিপে হেসে লম্বা একটা সেলাম জানাল। ওরা কিছু টাকা গুঁজে দিল ওর হাতে। লোকটা দরজা খুলল। ওরা ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। রিটায়ারিং রুমের অতিথি আজ তাহলে আরও এক পেয়ার! নীলা ভাবল।

কেমন যেন একটা সন্দেহ হল ওর, হয়ত ওরা বিবাহিতা নয়, প্রেম-টেম করছে।... সুমনও কি ঠিক এভাবেই ভাড়া করতে চেয়েছিল রিটায়ারিং রুম। ও তো বলেছিল, তোমার সঙ্গীরা যাচ্ছে যাক না, তুমি ফিরে যাও, আমি কালই ফিরছি।—দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল নীলা, না।

নীলা।—সুমন যেন কাঙালের মতন বলল, কোন অসুবিধে হবে না, বেয়ারারা যদি জানে তুমি প্যাটেল সাহেবের রিলেটিভ।

চুপ কর। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই আমার শেষ কথা।

নীলার আজ খুব আশ্চর্য লাগছে। ও ভাবছে, অত কথা ও সেদিন বলতে পারল কি করে? যৌবনের দেমাক? নাকি আত্ম-সম্মানে আঘাত! কোন্‌টা নীলাকে অত-খানি হৃদয়হীন করে তুলেছিল সেদিন? অপমানের চাবুক পড়ল যেন সুমনের মুখে। ওর ফর্সা মুখ সেদিন একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল। ওকে যন্ত্রণা দিয়ে সে আঘাত কি নীলার বুকেই ফিরে আসেনি? এসেছিল অনেক পরে। তবে সেদিন সে-মুহূর্তে ওর কোন কষ্টই হয়নি। আচ্ছা, রিটায়ারিং রুমের বেয়ারাটা ওকে চিনত কি করে। কিছু সময় আগে ওই বন্ধ ঘরে ঢুকল যারা, তাদেরও তো আগেই চিনত বেয়ারা। তবে কি?...না, সুমনকে অত ছোট নীলার ভাবতে খারাপ লাগে। হোক তা সত্যি। তবু...। ও কি বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে সুমনকে এরা চেনে কিনা? না থাক। নীলা ভাবল, উত্তরটা যা শুনবে, তা হয়ত ওর ভাল লাগবে না।

আধঘন্টা হতে চলল, অরিন্দমের কোন পাত্তাই নেই। হয়ত ও জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেনি। নীলা ভাবল, শেষপর্যন্ত কি প্যাটেল সাহেবের আত্মীয়া বলেই নিজের পরিচয় দিতে হবে নাকি? ঠোঁট টিপে ও একটু হাসল। নীলার মাথায় ঘোমটা। সিঁথিতে গাঢ় সিঁদুর। ও ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল, প্যাটেল সাহেবের আত্মীয়া বলে নিজেকে বলা যায় কিনা। রিলেটিভ কথাটা তো ব্যাপক। আত্মার আত্মীয়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল নীলা। ভাবল, প্যাটেলের আত্মীয় বলে নিজের পরিচয় দিতেই বা যাবে কেন? নীলা এখন অরিন্দমের স্ত্রী। সুমনের ছাড়পত্র তার না হলেও চলবে। থাকবার মতন একটা জায়গা ঠিকই মিলবে। বেয়ারা সামনে দিয়ে একশোবার যাতায়াত করছিল। নীলা এক সময় ডাকল তাকে, এই শুনো।

কেয়া বাত?—ঘুরে দাঁড়াল বেয়ারা। নীলা আবারও একটু ভাবল। তবু কৌতূহলটুকু চেপে রাখতে পারল না।

নীলা বলল, তোম্ প্যাটেল সাবকো জানতা হ্যায়?

কোন্ প্যাটেল সাব?

এয়ার, এয়ারফোর্স কা?

হাঁ, হাঁ, জরুর জানতা হ্যায়। হাম তো তিন মাহিনা আগারী মে উস্‌কো দেখা হ্যায়। লেডী ডক্টর ভারোথী ব্যানার্জি বহুৎ আচ্ছি লেড়কী হ্যায়, উস্‌কো সাথমে...।

নীলা তখন অন্যমনস্কের মতন আকাশ দেখতে লাগল। মনটাকে ও খারাপ করতে চায় না। তবু যেন খচ্ করে কোথায় একটু লাগল। ওরা তাহলে এখনও স্বামী-স্ত্রীর মতন রাত-টাত কাটায়। আর ঠিক এই ঘরেই? যে-ঘরটা নীলারা হয়ত নেবে। আশ্চর্য, জীবনটা যেন নাটকের মতন। নীলা জোর করে হাল্‌কা হতে চাইল। ও ভাবল, কি লাভ? ওর সঙ্গে তো আজ আর কোন সম্পর্ক নেই। নীলা ভাবল, এই মজার খবরটা শুনিয়ে দেবে অরিন্দমকে। হ্যাঁ, অরিন্দম খুব উদার। নীলা তাকে গড় গড় করে বলে গেছে পূর্ব প্রেমিকের কথা, এতে সে অনুদারতার পরিচয় দেয়নি। বরং খুশি হয়েছে একদা কোন এক সুপুরুষকে ঘায়েল করে নীলা তার কাছে এসেছে বলে। প্যাটেল যে সুপুরুষ, এ-গল্পটা নীলা অনেকবার করেছে তার কাছে। সেজন্য অরিন্দমের ঈর্ষা হয়নি। বরং পৌরুষের দিক থেকে নিজেকে সে অনেক বেশি বড় বলে মনে করেছে।

হিপিরা হাঁটুর ওপর পা তুলে ইংরিজী সুরে কি একটা গান গাইছে যেন। যার অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। তুতুড়ে গাছের

পাতাগুলোর অন্ধকার। ওরা খুব কাঁপছে। নীলার চোখের কোণে জল নেই, জ্বালা নেই। সুমনকে এখন ওর ঘটনার মতন মনে হল। ওর অবিশ্বাস্য লাগল। নীলা খুব স্বাভাবিকভাবে কাঁধের ফ্লাস্ক থেকে একটু জল খেল।

অরিন্দম এল আরো মিনিট-দশেক পরে। লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে অরিন্দম। এখন ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘামে তেল তেল করছে ওর ফর্সা চওড়া কপাল। ওর আঁটোসাঁটো বুশ সার্টটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপ্‌টে রয়েছে। চশমার মধ্যে দিয়ে একজোড়া ব্যস্ত অশান্ত চোখ। নীলা বলল, কিগো জায়গা পেলে? অরিন্দমের পেছনে দাঁড়িয়েছিল উর্দিপরা একজন ওয়েটার রিফ্রেশমেন্ট-রুমের। নীলার কথার জবাব না দিয়ে তাকেই অরিন্দম বলল, আণ্ডি খানা মিলেগা?

কি আণ্ডি আণ্ডি করছ?—নীলা প্রায় ধমকে উঠল। তারপর খবরদারীর সুরে ওয়েটারকে বলল, আভি তুম্‌ যাও।

আরে সাড়ে ন'টার মধ্যে মিল বন্ধ হয়ে যাবে যে।—অরিন্দম বলল চাপা বিরক্তির গলায়। কিন্তু নীলা গ্রাহ্যই করল না।

হাত নেড়ে ওকে বলল, আমরা বাইরে কোথাও খেয়ে নোব'খন। চল, আগে তাজ দেখে আসি।

এই অবস্থায়? এখুনি? —পোড়া সিগারেটটাকে মাটিতে পিষতে পিষতে অরিন্দম বলল। বলল, একটু স্নান করে নিলে হত না? আর তুমিও তো কাপড় বদলাবে বলেছিলে?

ঘুরে এসে।—ছট্‌ফটে মেয়ের মতন নীলা বলল। যদিও ট্যারা চোখে ও তাকিয়ে একবার দেখে নিল নিজের ন্যাট হয়ে যাওয়া সিল্কের শাড়ীটার দিকে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পকেট থেকে রসিদটা বার করে দিল অরিন্দম। বলল, এটা রাখো।—রসিদটার ওপর চোখ বুলিয়ে নীলা ভুরু কোঁচকাল। বলল, রিটায়ারিং-রুমের ভাড়া চব্বিশ ঘন্টার জন্য কুড়ি টাকা?

তাই তো দেখলাম।

অথচ হাওড়া স্টেশনে শুনেছিলাম মাত্র পাঁচ টাকা লাগে?

প্যান্টের পকেটে রুমাল রেখে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল অরিন্দম। ও মউজ করে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, পাঁচ টাকায় এখানেও হয়, তবে সে-ঘরে পাঁচজনকে একসঙ্গে থাকতে হবে।

ঘরে ঢুকে নীলা তো অবাক, আর তার সঙ্গে খানিকটা খুশিও। ও দেখল, সিঙ্গল বেডের দুটো ইংলিশ খাট জোড়া দেওয়া রয়েছে একেবারে মাঝখানে। খাটের পায়ের দিকে দুটো সোফা, আর দুজন বিছানায় শুয়ে পড়লে তাদের উলটো দিকে মুখোমুখি একটা ড্রেসিং টেবিল। ওয়ার্ডরোবটা রয়েছে আরেক কোণে। ডানলোপিলোর খাদির বিছানায় ধপ্‌ করে শুয়ে পড়ল অরিন্দম। খুশির মেজাজে দুই করে একটা শিস্‌ই দিয়ে ফেলল। বলল, স্বামী-স্ত্রীর রাত কাটানোর মতন নিখুঁত সাজান একটি ঘরই বটে।

ঘরের সঙ্গে লাগান বাথরুম। নীলা বাথরুমে গেল। সেখানেও দেখল, শাওয়ার, বেসিন, আয়না। কোন আয়োজনেরই ত্রুটি নেই।...এই ঘরেই রাত কাটিয়েছে সুমন জয়োশ্রির সঙ্গে। এই বিছানাটা, এই বাথরুমটাই ব্যবহার করেছে তারা। নীলা হঠাৎ শিউরে উঠল। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করল। ও কিছু সময় যেন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবল, আরও কত বেওয়ারিশ মেয়েছেলেকে নিয়ে সুমন এখানে রাত কাটিয়েছে কে জানে! ওর ইচ্ছে হল, এখুনি ছুটে পালাতে, এ-ঘর থেকে। ও যেন নাটকের এক পরাজিতা নায়িকা, নায়কের কাছ থেকে যার মুক্তি নেই। ও হাসল আয়নায়। হাসিটা আত্মধিক্কারের। ভাবল, নায়ক তো বহাল তবিয়তে দিব্যি রয়েছে, ফূর্তি মারছে। অথচ...। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভালবাসাটাই হয়ত গভীর। ও ভাবল, বিয়ের পর প্রেমিকের কথা ভেবে তো কত মেয়ে আত্মহত্যাও করে। সেকালে মা, দিদিমার আমলেও করত। কেউ কেউ গোপন অভিসারেও যেত। একালেও যায়। কিন্তু ও নিজে কেন পারে না। ও কি ভীতু? ওর কি কোন সংস্কার আছে? কিছু না। স্বামীর ভালবাসায় যেখানে কৃপণতা থাকে, সেই মেয়েরাই প্রেমিকের কাছে যায়। অন্ততঃ সে-ব্যাপারে নীলার কোন ফাঁক নেই। তাই তার অন্য কোন অভিসারে যাবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মন? মনটা কেন বিশ্বাসঘাতকতা করে মাঝে মাঝে? বুকের মধ্যেটা যেন পোড়ায়।

ল্যাভেন্ডারভিউ সাবান মেখে নীলা শাওয়ারের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সাবধানে মাথাটা বাঁচিয়ে শুধু শরীরটা ভেজাল নীলা। ভাবল, চুলোয় যাক্‌ সুমন প্যাটেল। ও মনটাকে তাজা রাখতে চেষ্টা করল। মুখে, ঠোঁটে ঘষে ঘষে মাখল ল্যাভেন্ডার-ভিউ। কোন এক দিনের সুমনের আঁকা চিহ্নটা বোধহয় মুছে ফেলতে চাইল। গুন্‌ গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মনে করল, অ্যাটাচীর মধ্যে রয়েছে ওর বিয়ের লাল বেনারসী। বেনারসী পরেই ও আজ যাবে তাজে। হোক্‌ দেরী তবু। ওর স্বামী অরিন্দম যত অপছন্দই করুক, তাকে ও আজ পরাবে মটকার পাঞ্জাবি। মাত্র কয়েক মাস আগে তো বিয়ে হয়েছে, এমন কিছু পুরনো হয়ে যায় নি তারা। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে গেল ওর মন। একখানা হাত কপালে রেখে, আর এক খানা হাত কপালের ওপর আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করা, অরিন্দম চিত হয়ে শুয়েছিল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিল অরিন্দম। নীলা এসে তাড়া দিল, এই ওঠো, ওঠো। উঁ। —বলে সাড়া দিয়েই অরিন্দম চুপ করে গেল। নীলা বলল, কি গো যাবে না?

ছোট একটা হাই তুলল অরিন্দম। নীলার দিকে তাকিয়ে থাকল। অগোছালো ওর তাকানোর ভঙ্গিটা। ওর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিছু সময় আগের উৎসাহটা যেন চুপসে গেল নীলার। ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গা মুছছিল। বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল, তোমায় গরদের পাঞ্জাবিটা পরতে হবে বলে দিচ্ছি।—অরিন্দম বলল, হুম্‌।—নীলা বলল, আমরা কি এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাব বল?

আমরা না চাইলেও সংসার আমাদের বুড়ো করে ছাড়বে। আমাদের কোম্পানী হয়ত লক-আউট হয়ে যাবে তারপর...

তুমি এখানে এসেও ওসব কথা ভাবছ?

না ভেবে উপায়? অবশ্য আমার বি-এস-সি পাশ বউ।

আহ্‌ থামবে?—নীলা ধমকে বলল। অরিন্দম হাসল। ও চেয়ে চেয়ে দেখছিল আয়নার নীলার বুকের পুষ্ট স্তন, ওর সরু কোমর, ওর নিতম্ব। শরীরের

প্রতিটি ভাঁজ নীলা আলগোছে তোয়ালে দিয়েই মুছছিল যেন। ওকি তাকে উত্তেজিত করতে চায় ? অথচ আবার বাধার তাড়া দিচ্ছে। কোনটা সত্যি ? নাহ্ মেয়েরা বড় অস্পষ্ট, বড় দুর্বোধ্য। ওদের বোঝা দায়। অরিন্দম দেখছিল, ও শুধু ব্রা আর শায়াটা পরা অবস্থায় প্রসাধন সারছে। ঘরের বাতাসে ভুর্ ভুর্ করছে ল্যাভেন্ডার ডিউ-এর গন্ধ। নেশা ধরে গেল অরিন্দমের ওর মাখনের মত নরম আর ফর্সা দেহটার দিকে তাকিয়ে। ঘামে জব জব করছিল ওর নিজের শরীর। ক্লান্তি, ঘাম আর ল্যাভেন্ডারডিউ এই তিনটে জিনিস ওকে অবশ করে ফেলল। অরিন্দম আর থাকতে পারল না। ও জাপটে ধরল নীলাকে। আধো আধো গলায় বলল, মোহিনী, ছলনাময়ী।

এই কি হচ্ছে ছাড়?

অরিন্দম ছাড়ল না। বলল, তাজের চেয়েও আপাততঃ আরেকটা জিনিস আমার অনেক বেশী লোভনীয় মনে হচ্ছে। নীলা ঠান্ডা নিষ্প্রাণ গলায় আবারও বলল, ছাড়। —সুরটা অরিন্দমের কানে বাজল। ও বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। তারপর ছেড়েও দিল। নীলা তবুও হাঁপাচ্ছিল। অরিন্দম দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুমের আয়নায় নিজের ক্লান্ত চেহারাটা একবার দেখে নিল অরিন্দম। তারপর রেজারটা টেনে নিয়ে দাড়ি কামাতে লাগল। কিছু সময় আগে যে পাশবিক উত্তেজনাটা এসেছিল ওর, এখন আর তা নেই। নিভে গেছে। মেয়েরা বড় অদ্ভুত। ও ভাবল, ওরা যে কি চায় আর কি চায় না, সেটা বোঝা দায়। অরিন্দম ভাবে, তার তো সুখী হবার অধিকার রয়েছে, তার স্ত্রীরও রয়েছে। একথা নীলা বোঝে। অথচ এক্কে সময় কাছে এসেও কেন দূরে সরে যায় ? নীলার মধ্যে তো উত্তেজনার অভাব নেই। তবুও— অরিন্দম ভাবল, আমি তো অক্ষম পুরুষ নই। আসলে মেয়েরা হয়ত এক্কে সময় বাইরে অমনি একটা ভাব দেখায়, ভান করে নিজেকে দুর্লভ করার জন্যে।

সাজগোজের জন্যে নীলা সময় নিল আরো আধ ঘন্টা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরিন্দম বলল, সিল্কের পাঞ্জাবিই পরাও আর যাই কর, "বিলাতের প্রথর রাত্রিতে যে সুর বাজে সে রাগিণী চিরদিনের নহে।" কিন্তু সে রস আস্বাদন করার মতন রসিক মন নীলার তখন নেই। ও হঠাৎ বক্র বসল, জানলে গো, রিটায়ারিং রুমের বেয়ারা না সুমনকে চেনে।

সুমন, সুমন কে?—অরিন্দম যেন আকাশ থেকে পড়ল।

ওকি বুঝেও না বোঝার ভাব করছে? নীলা সন্দেহজনকভাবে তাকাল। তারপর ঝাঁঝ রেখে গলায় বলল আহা, সুমনকে তুমি চেনো না না? সুমন, সুমন প্যাটেল।

আহা! তোমার সেই পূর্ব প্রেমিকটি? হ্যাঁ, ওকে তো আমি জন্মে চিনি।—কপালে ভুরু তুলে অরিন্দম ঠাট্টার গলায় বলল। একি ওর ঠাট্টা ? না সাধ্য ? নীলা অনুভব করতে চেষ্টা করল। অরিন্দম অধৈর্যের মত বলল, তারপর ? থামলে কেন ?

বেয়ারা বলল, ও নাকি রাত টাত কাটায়।—নীলা বন্ধুর মতন বলল। বলল, তোমায় যে লেডী ডাক্তারটার কথা বলেছিলাম না, তার সংগে।

তুমি বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ?

হ্যাঁ। সুমন তো বলেছিল রিটায়ারিং রুমের বেয়ারারা ওকে চেনে টেনে।

তাই নাকি ? তা ওর মতন তুমিও অমনি অফার টফার পেয়েছিলে নাকি ?

মোটেই না, মশাই। —নীলা কৌতুকের সুরে বলল, সে সাহস ওর ছিল নাকি ? আমি কি ডরোথির মত ওর বেওয়ারিশ মাল।

আচ্ছা, তোমার কষ্ট হয় না?—অরিন্দমের গলায় সহানুভূতি। সকল একটা খাজা মেয়ের মত নীলা তাকাল। বলল, কেন?

এই যে তোমার ফিয়াসে একটি মেয়েছেলেকে নিয়ে রাত টাত কাটায়?

নীলা হাসল। ওর হাসির আওয়াজটা যেন কান্নার মত বাজল অরিন্দমের কানে। নীলা বলল, যখন ফিয়াসে ছিল তখন খারাপ লেগেছিল। তবে এখন আর লাগে না, এখন তো ও আমার কেউ নয়। —অরিন্দম ঠাট্টার হাসি হাসল। বলল, কেউ নয় নাকি ? আহা।

স্টেশনের পেছনের পোর্টিকোয় যেখানে টাঙ্গা, ট্যাকসি, রিকস, স্কুটারের ভিড়, সেইখানে এসে ওরা দাঁড়াল। নীলা বলল, টাঙ্গায় যাব জানলে ?—অরিন্দম বলতে যাচ্ছিল, কেন স্কুটার নয় কেন ?—তার আগেই সামনে একটা টাঙাওলা এসে হাজির হয়েছিল। ওদের কথা শুনে বলল, বাবু, উ জাদা রুপেয়া লেতা হ্যায়, হামকো টাঙ্গেমে আইয়ে।

ঘোড়া ছুটছে। বেপরোয়া চাবুক মেরে ঘোড়াকে উত্তেজিত করছে সহিস। সওয়ারীর আরামের দিকে তার লক্ষ্য নেই। জীবনে এই প্রথম টাঙ্গায় উঠল নীলা। অবশ্য আরেকবার ঘোড়ার গাড়িতে চেপেছিল নীলা কলেজে পড়ার সময়। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল ওর ঘোড়ার গাড়ীতে চড়বে। প্রচন্ড বৃষ্টি তখন। কলেজ স্ট্রীটে প্রায় কোমর জল। তার মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে সমস্ত কলেজস্ট্রীট চষে বেড়িয়েছিল ওরা কয়েক বন্ধু মিলে। সে এক হই হই কান্ড। সেসব দিনগুলো আজ কোথায় ?...অরিন্দম বলল, পিঠে লাগছে নাকি তোমার ?—অরিন্দম ডান হাতটা লম্বালম্বিভাবে ছড়িয়ে দিল নীলার সীটের পেছনে। বলল, এবার আর লাগবে না।—নীলা তখন ভাবছে, এখন যদি সুমনের সঙ্গে দেখা হয় ? বলা কি যায় হতেও তো পারে ? দেখা হলে নীলা সামান্য পরিচিতের হাসি হাসবে। কিম্বা নাটকের নায়িকার মত মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। শেষেরটা হয়ত ও পারবে না। ও হাসবেই। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেমন হাসে টাসে। এখন তো ওর আর কোন অভিমান নেই, অভিযোগও নেই। অরিন্দমের একটা হাত নীলার পিঠে, অন্য হাতে সিগারেট। মেজাজটা ওর বিগড়ে রয়েছে। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে নীলা নিজেকে গুটিয়ে নিল। ওকি তাহলে সুমনের কথাই ভাবছিল ? শালা, মেয়ে জাতটাই এমন। বিয়ের বাজারে সেকেন্ডহ্যান্ড। প্রেম করে একজনের সঙ্গে বিয়ে করে আরেকজনকে।...যাহ্ শালা, আর একটা সিগারেট ধরালে অরিন্দম, ভাবল, যাকগে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার ট্যাপার নিয়ে ও আর মাথা ঘামাবে না। নীলার দিকে ও তাকাল। দেখল, ও ঠান্ডা, নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ। কিছু সময় চুপ করে থাকল। ওর উদারতায় ফাটল ধরল। ও স্ত্রীকে ফেরাতে চাইল তার ভাবনার সূত্র থেকে।—তবু এ স্কুটার ট্যাক্সির থেকে ভাল।—এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে অরিন্দম বিনা ভূমিকায় বলল। ওর কথা বুঝতে না পেরে নীলা তাকাল। অরিন্দম বলল, এই টাঙ্গার কথা বলছি আর কি। স্কুটার ট্যাকসির থেকে ভাল, তাই না ? ওরা হলে সারা আগ্রা শহর ঘুরিয়ে ডবল করে ছাড়তো। দেখলে না দিল্লীতে ?

না মশাই, তুমি কিছু জানো না।—ঘুরে বসল নীলা। বলল, দিল্লীর মতন স্কুটার, ট্যাকসি এখানে মিটারে চলে না। জায়গার দূরত্ব বুঝে ওরা ভাড়া নেয়।

তাই নাকি ?—বিদ্রুপের হাসি হাসল অরিন্দম। বলল, এসব বুঝি প্যাটেল সাহেবের কাছে থেকে শোনা ?

তুমি, তুমি একটা পশু।—নীলা বলতে চাইল। পারল না। ভাবল, আশ্চর্য, এই লোকটাই কত আদর্শের বুলি আওড়ে তাকে ভাঁওতা দেয়। মনে পড়ল কদিন আগে অরিন্দমের কথা। ও বলেছিল, তোমার আর আমার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকা দরকার নীলা। তোমার তেইশ বছর বয়েসে আমার সঙ্গে পরিচয়। এই তেইশ বছরের মধ্যে তোমার জীবনে আর কোন পুরুষ আসবে না, সে কি হতে পারে ? তুমি বললেও আমিই বা বিশ্বাস করব কেন ? স্কুল, কলেজের এতগুলো দিন তুমি পেরিয়ে এসেছ যখন, নিশ্চয় বোরখা পরে হাঁটো নি?—নীলা বলেছিল, একথা কি আমিও তোমায় বলতে পারি না ?—অরিন্দম বলেছিল, নিশ্চয় পারো। বলেছি তো কলেজ জীবনে আমিও...

এই পথটাই সোজা চলে গেছে তাজমহলের দিকে। নির্জন হয়ে এসেছে ক্যান্টনমেন্টের রাস্তাঘাট। স্টেশনের সীমানা পেরোতেই ওদের চোখে পড়ল কিছু দোকান পাট, গোটা দুই সরাইখানা। অরিন্দম রসিকের মত বলল, ফেরার পথে লাগাও চাপাটি আর কষামাংস। এখানেই পাতা পেতে বসে পড়ব কি বল ? যা ভাল গন্ধ বেরিয়েছে না ! এরাই তো কলকাতায় গিয়ে হয় হোটেলের বিখ্যাত বাবুর্চি।—নীলা কোন মন্তব্য করল না। দূরে কোথায় যেন কর্কশ সুরে একটা ময়ূর ডাকছিল। টাঙার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হচ্ছে খটাখট। যেন তুফান ছুটেছে রাত দশটার ফাঁকা রাস্তায়। এই পথ, এই পথটা দিয়েই তো সুমনের সঙ্গে নীলা গিয়েছিল স্কুটারে। একটা হাত দিয়ে ও ধরেছিল ওর সীটের

CENTRAL LIBRARY

পেছনে অন্য হাতে জড়িয়েছিল ওর কোমর। ওরা তাজমহলে যাচ্ছিল। যাওয়া আর হয় নি। আজ অরিন্দমের সঙ্গে যেতে যেতে নীলার মনে হল, জীবনটা যেন সত্যিই নাটক। একেবারে গল্পের মত। ওকি হনিমুন করার আর জায়গা পেল না। সেই আগ্রা, সেই তাজ ওকে আবার টেনে নিয়ে এল।...অনেকগুলো কাগজে নানা জায়গায় নাম লিখে অরিন্দম লটারী করেছিল। অনেকগুলো দলা পাকানো কাগজের বল। নীলা যে বলটা ধরল, খুলে দেখল, তাতে লেখা দিল্লী, আগ্রা। বাহ্ চমৎকার!—উল্লাসে ফেটে পড়ল অরিন্দম। কিন্তু বুক কেঁপে উঠেছিল নীলার।

একটার পর একটা সিগারেট উড়িয়ে চলেছে অরিন্দম। মনোযোগ দিয়ে ও দেখছে রাস্তাঘাট। আর কখনও ও আসেনি আগ্রায়। ওর চোখে অপরিচিতের বিস্ময় এবং কৌতূহল। অরিন্দমের এখন আর মনে নেই সুমনকে। পাশে যে যুবতী স্ত্রী রয়েছে তাকেও। যার বেনারসির আঁচল উড়ে উড়ে পড়ছে তার গায়ে। নীলা ভাবছে, এখন তো ও ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারে তাকে। এই ফাঁকা রাস্তায়, নির্জন টাঙায় অরিন্দম তাকে অন্ততঃ একটা চুমু খেতে পারে। অবশ্য এই নির্জনতাই যে ভাল লাগছে নীলার। ভালই লাগছে অরিন্দমের এই অবহেলা কিম্বা ঔদাসীন্য। ওর বুকের মধ্যে পাথরের মতন ভারী একটা বাধা, অথচ ও কাঁদতে পারছে না। পাশে বসে থাকা এই লোকটা তার স্বামী নীলা ভাবছে। আশ্চর্য, যাকে সে চিনত না, কয়েক মাস আগেও সে হল তার স্বামী, সবচেয়ে নিকট আত্মীয়।

আর যাকে পাঁচ বছর ধরে চিনে এসেছিল, সে তার আজ কেউ না।

টাঙাঅলা বলল, দাদা, আপলোগ কালসে হিঁয়া রহেগা?

হ্যাঁ, ভাই।—সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল অরিন্দম।

আপলোক রাতমে তাজ দেখ লিজিয়ে আউর কাল সুবে ফির্তি আইয়ে।—টাঙাঅলা বলছিল, তাজমহল যে সব রূপ লাগতা, তব বহুৎ আচ্ছা লাগতা দাদা। —নীলা অন্যমনস্কের মতন বলল, জানি, আমি দেখেছি।

হাঁ, হাঁ, দিদি। আপ্‌তো পহেলী দেখা হ্যায়, লেকেন দাদা কো সাথমে নেহি দেখা। কাল ফিরতি আজা ও হামকো টাংগামে।

আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি, কালকের কন্ট্রাক্টটা আজই করতে চায়।—অরিন্দম কথাগুলো বলে হাসতে লাগল। অরিন্দম বলল, এদের এই কাজ টুরিস্ট ঠকিয়েই খাওয়া। —নীলা এবারেও চুপ। মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতন আকাশে অনেকগুলো তারা। সোনালী জরির বেনারসির আঁচলের গায়ে অসংখ্য বুটি, মিহি কাজ, সেই সূক্ষ্ম কাজের দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। ও ভাবল, অফিসের কথা। ছুটির মেয়াদ কদিন বাড়িয়ে নিলে হত। ফিরে গিয়ে তো আবার সেই একঘেয়েমী। সেই অফিস, অফিস থেকে বাড়ী। এখন কলকাতায় খুব গণ্ডগোল। খুনখারাপী রোজ লেগেই আছে। বোমা, পাইপগান, ছাত্রের মৃত্যু, পুলিশের গুলি...। এসব কলকাতার নিত্য দিনের ঘটনা। তাই অরিন্দম ভাবছিল, এখানে এসে এই কটা দিন বেশ নিশ্চিন্ত-ভাবে কাটানো গেল। বেশ লাগল।

নীলা ভাবছিল, ডরোথির কথা। স্কুটারে যেতে যেতে লেডী ডাক্তার ডরোথির কথা বলেছিল সুমন। ও নাকি একটা সস্তা মেয়ে, অথচ ওকে নিয়ে যমুনার পারে যাবার লোভটুকু ছাড়তে পারেনি সুমন। ওকে ভালবাসত না, কিন্তু কাছে টানত। প্রথম প্রথম নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষের দিকে আর পারেনি। ক্ষুধার্তের সামনে খাবার বেশীদিন ফেলে রাখা যায় না। এই ছিল সুমনের যুক্তি। উলঙ্গ হয়ে মেয়েটি নাচত হোটেলের নির্জন ঘরে। মডেল হবার মতনও ছিল নাকি ক্ল্যাসিক সুন্দরী। কিন্তু আমি? নীলা ভাবল, আমি তো আর অসাধারণ রূপসী টুপসী নই, লোকে বলে মিষ্টি আমার যৌবন আছে এই পর্যন্তই। পুরুষের মনটন ভোলানোর মত অত ছলনাই কি আমার জানা আছে? আজকাল মনটোনের দাম আর কজনই বা দেয়? অসৎ, ছলনাময়ীদের দিকেই লোকে হাত বাড়ায়। সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর যুবকদেরই তো মনের কথাটা এই। সুমন তো বলেই ছিল, পেটের যেমন খিদে থাকে, তেমনি শরীরেরও তো একটা খিদে রয়েছে, ডরোথির মতন মেয়েরা সেই খিদেই মেটায়।...সাবাস্ সুমন! নীলার আজ প্রাণপণে চেঁচাতে ইচ্ছে করল। জানতে ইচ্ছে করল, ওকি সুখী হয়েছে? ও বলতে চাইল, আমি সুখী হয়েছি সুমন। কোনরকমে খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবও। স্বামী আমার প্রতি কর্তব্য করছে, আমিও করছি। বন্ধুর মত আমরা একে অন্যের মন মেলে ধরতে পারছি! বন্ধুর মতনই কি? নীলা হাসল আবার। বন্ধুর মতন উদারতা স্বামীর থাকে না।... কলেজের এক মেয়ে বন্ধু বলেছিল, ছেলেরা উদার কখন জানিস? পকেটের পয়সা খরচা করে ফিঁয়াসেকে যখন সিনেমা দেখায়।...বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবাসার ব্যাপারে তাদের উদারতার সীমা থাকে না।...পরিচিত কোন মহিলার প্রেমের ব্যাপারে তারা উদার থাকে। অথচ নিজের স্ত্রীর যখন এসব ব্যাপার থাকে, তখন তারা জল্লাদ।...আজ নীলার মনে হল, বন্ধু ঠিকই বলেছিল।

অরিন্দম খুব গম্ভীর। নীলা দেখল, ওর সিগারেটের ক্ষয়। ওকি কিছু ভাবছে টানছে নাকি? সাধারণতঃ কোন ভাবনা চিন্তার সময় ও এত ঘন ঘন সিগারেট খায়। চাপা প্রকৃতির মানুষ অরিন্দম। মুখ ফুটে কিছু বলে না। জ্যোৎস্নার সাদাটে আলোয় ওর মুখ দেখল নীলা। ওর গায়ে গরদের পাঞ্জাবী। কয়েকটা বোতাম খোলা বুকের। ওর লোমশ চওড়া বুক। ওর সেই মুখে কেমন যেন পবিত্র ছাপ। দুর্বলতা বোধ করল নীলা। ওর মনে হল, সুমন যদি একবার দেখত। চুপ করে থাকতে থাকতে কোন এক সময় নীলা বলল, জানো গো, সুমনের সঙ্গে না ঠিক এই রাস্তা দিয়েই আমি স্কুটারে গিয়েছিলাম।—অরিন্দম বলল, ওর সঙ্গে তুমি আবার স্কুটারেও চড়েছিলে নাকি?

বাহ্, চড়িনি? ওই তো স্কুটারে করে আমায় তাজে নিয়ে গেছিল। অবশ্য তাজে আমি ঢুকিনি।

আধশোওয়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছে অরিন্দম। ও চেয়ে চেয়ে দেখছিল, টাঙাঅলার মাথার পাগড়ি, ওর ঘোড়ার দুটো খোড়া। নীলার কথার উত্তরে একটু হাসল। বলল, কেন? তাজে ঢোকোনি কেন সেদিন?

ও শুধু ডরোথি, ডরোথি করছিল বলে।

তা আর না করে কি করবে বল? তুমি তো ছিলে সেই হাজার মাইল দূরে।

চমৎকার। হাজার মাইল দূরে ছিলাম বলেই কি...

সেদিন ও তোমায় চুমুটুমু খায়নি?

বাহ্ অসভ্য। হাজার মাইল দূরে ছিলাম বলেই...

আর কি কি করেছিল ও?

সাহস পায়নি। হাজার মাইল দূরে ছিলাম...।

তারপর তুমি কি করলে?—অরিন্দম যেন চাপা দিতে চাইল ওই পুরনো প্রসঙ্গটা।

তারপর আর কি?—নীলা বলল, কোন মেয়ে প্রেমিকের মুখে আর এক মেয়ের নাম শুনতে পারে বল?

ওর গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে আমি নেমে পড়েছিলাম।

বাহ্ ফাস্টক্লাস। একেবারে হিন্দী ছবির হিরোইন।

নীলা হেসে ফেলল। ওর চোখের মণি দুটো জল জল করছিল। বলল, তুমি ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা কেন করব? ভাবছি, তোমার চড়ও ছিল কত সুইট।

নীলা আর সহ্য করতে পারল না। বলল, থাক্ তুমি আর বল না। তুমিও তো অনুরাধা না কি যেন মেডিক্যাল কলেজের একটা নার্সের সঙ্গে প্রেমট্রেম করেছিলে?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

মশাইয়ের আর কি কি করা হয়েছিল? --গলার স্বর খাদে নামিয়ে নীলা বলল।

অরিন্দম চোখে চোখে তাকাল। বলল, বেশী কিছু নয়। এই লেকে গিয়ে চুমুটুমু খেয়েছিলাম, সিনেমা, টিনেমা দেখিয়েছিলাম।

ছিটকে সরে গেল নীলা। বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল ওর চোখ। খুব আস্তে বলল, শুধু এই পর্যন্তই?

এই পর্যন্তই। করার মতন সুযোগ ছিল তবে ইচ্ছে হয়নি। মেয়েটা বড় সস্তা ছিল, ওকে ছুঁতে ঘেন্না করত।

বহুও নীনা তাকিয়ে থাকত। ও যেন দেখছিল, স্বামীর চোখের উপরে মিথ্যা-বাদীর ছায়া। অরিন্দম প্রত্যাশিত ইচ্ছ এক অনুশোচনার জ্বালায়। ভাবল, না বললেই হত কথাটা নীনাকে। সত্য ও ন্যায়ের বাণিজ্যিতায় এত কথা বলাটা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু নীনাই বা এত সঙ্কীর্ণ হবে কেন? অরিন্দম ভাবছিল, আমার মা ঠাকুমা মুখ বুজে সহ্য করেছেন আমার বাপ ঠাকুরদার প্রতাপ। ওরা তো সেকাল-থাকতেও পেতেন। আমার ঠাকুমার লালপেড়ে শাড়ী নিজে হাতে স্বামীর সাজিয়ে দিতেন বাইজীর ঘরে ঢোকার আগে। সে সব কি খুব বেশীদিন আগের কথা?...

হঠাৎ সাজাহান পার্কের পাশ।—রিকশাওলা বলে উঠল হঠাৎ। ওরা দুজনেই ফিরে তাকাল। দুদিকে বড় বড় গাছের সারিতে ঘেরা বাগান। চাঁদের আলোর লুকোচুরি চলছে পাতার জাফরীর ফাঁকে ফাঁকে। ঠিক এইখানে এই পর্যন্ত এসেই সুমনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল নীনা। নীনা! নীনা! সুমন ডাকল। ফিরেও তাকাল না নীনা। ও হাত দেখিয়ে একটা রিকশা থামিয়ে কোথা চলে এসে-ছিল সেখান থেকে, যেখানে হয়ত কেউ অপেক্ষা করছিল।

এই গোলাপ—অরিন্দম ডাকল। নীনা চমকে উঠল। একটা গোলাপ ফুল নিয়ে সে নীনার শরীর ঘেঁষে। ওর গায়ে হাত রাখল অরিন্দম। অরিন্দম

উৎসব উপলক্ষ্যে!

বিনামূল্যে!

প্রত্যেকটি উষা সেলাই মেশিনের সঙ্গে

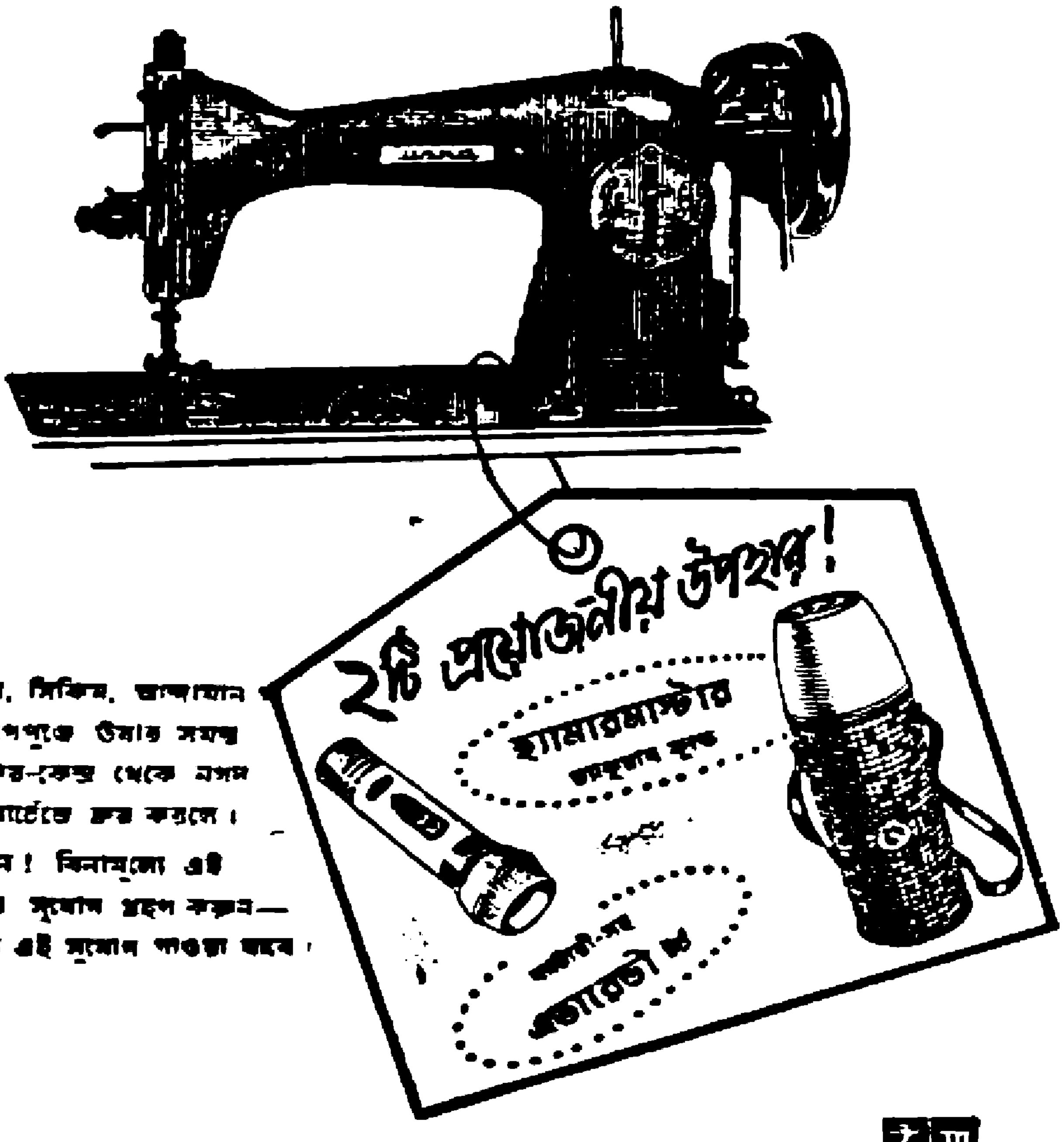

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে উষার সমস্ত অনুমোদিত বিক্রয়-কেন্দ্র থেকে নগদ অথবা হায়ার-পার্চেজে ক্রয় করলে।

তাড়াতাড়ি করুন! বিনামূল্যে এই অপূর্ব উপহারের সুযোগ গ্রহণ করুন—স্টক থাকা পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

যেমন ভাল সবার ভাল উষা

পরল। নীলা হাসল। অরিন্দম বলল, আরে দূর, কবে কোন একটা মেয়ের সঙ্গে একটু হৈ চৈ করেছিলাম, সেজন্যে তুমি মন খারাপ করছ?

নীলা চুপ করে রইল। ভেতরে ভেতরে ও অবাক হ'ল। ও দেখছিল, ওর স্বামীর মধ্যে কি অসঙ্গতি। কিছু সময় আগের ব্যবহারের সঙ্গে কিছু সময় পরের ব্যবহার, কথাবার্তার কোন সঙ্গতি থাকে না। টাঙাটা খুব জোর দুলছে। ছুটতে পারছিল না বাঁ দিকের ঘোড়াটা। সহিসের চাবুক পড়ল ওর পিঠে। একটা দুটো গাড়ীর হর্ণ, স্কুটারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল একটা সাইকেল রিকস। বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে সাজাহান গার্ডেনে। নীলার কাছ থেকে কোন জবাব পেল না অরিন্দম। বিরক্ত হ'ল। ভাবল, হায় স্ত্রীও তো সাধু নয়। ওকে আরেকবার একটু খোঁচা দিতে ইচ্ছে হ'ল অরিন্দমের, সুমন বোধ হয় এখানেই আছে, যাবে নাকি একবার এয়ার ফোর্সের মেসে?

লাইট পোস্টের মরা আলো আর জোৎস্নায় নীলা দেখল স্বামীকে। ও ভুরু কুঁচকে সরু করে তাকাল। বলল, উদারতা? নাকি দয়া?

যদি বলি সহানুভূতি?

কথা নয়, যেন চাবুক। নীলা আরেকবার আশ্চর্য হ'ল। হা হা করে হেসে উঠল অরিন্দম। সে হাসির অর্থ নীলা বুঝল না। টাঙা এসে থামল, তাজমহলের গেটে। টিম টিম করে একটা হারিকেন জ্বলছিল টিকিট কাউন্টারে। ওরা থামল। দাদা,—বলল টাঙাওলা। আপ্ লোক অন্দরমে যাইয়ে হাম ইধার রহেগা। তোমার টাকাটা?—বলে পার্সটা বার করতে যাচ্ছিল অরিন্দম। টাঙাওলা বলল, নেহি দাদা, এক সাথমে দেনেসে হো জায়গা।

আট আনা, আট আনা করে মোট একটি টাকা লাগল দুজনের টিকিটে। নীলা ব্যাগে রেখে দিল টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা, কেন যেন এসব টিকিট ফিকিটের ওপর তার খুব মায়া। কলেজে পড়ার সময় বাসের পুরনো টিকিট জমাতো নীলা। কি লাভ ওসব রেখে?—চশমার মধ্যে দিয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুঁড়ল অরিন্দম। বলল, অবশ্য চিহ্নটিহ্ন রেখে দেওয়াই ভাল। কে বলতে পারে আজকের এই চিহ্নটাই আবার চার বছর আগের মতন নতুন কোন স্মৃতি হ'য়ে থাকবে কি না?

বোবা দৃষ্টিতে তাকাল নীলা। কি বলতে চায় অরিন্দম? ওর সমস্ত বুকের মধ্যে একটা হাহাকার বাজছিল যেন।

কয়েকজন শ্বেতাঙ্গী ঘুরছিল বাগে। ওদের পিঠে ট্যুরিস্ট ব্যাগ, কাঁধে ক্যামেরা। ওরা তাজমহলের ছবি তুলছিল ফ্ল্যাশে। চাঁদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে আকাশে। জোৎস্নার আলোয় ধব ধব করছে মার্বেল পাথর। স্পষ্ট ফুটে উঠছে অসংখ্য কারুকার্য। কোথাও বিন্দুমাত্র অন্ধকার নেই। শুধু লনের গাছের মাথায় মাথায় কাজল কালো অন্ধকার। গোনা যায় না আকাশে এখন কটা তারা। নীলা একপা একপা করে এগিয়ে চলল তাজের দিকে। ওর পেছনে পায়ে পায়ে এল অরিন্দম। ওর হাতে টর্চ। ও টর্চ ফেলে ফেলে দেখাচ্ছিল কোন কোন জায়গা। অরিন্দম পেছনের ইতিহাস আওড়াচ্ছিল গাইডের মত। কোথাও কোন শব্দ নেই। একটা ভারী কণ্ঠস্বর গম গম করছিল প্রচণ্ড উঁচু তাজের ঘরে ঘরে। নকল সমাধি ঘরের আশে পাশে এই ঘরগুলো। দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলি। চাপা গুমোট অন্ধকার ঘরগুলোয়। ওরা নকল সমাধি দেখল সাজাহান, মমতাজের। তারপর আসল সমাধি। সুড়ঙ্গের মতন একটা সিঁড়ি চলে গেছে মাটির নীচে একটি ঘরে। নীলা খুব আস্তে বলল, নীচের ওই ঘরটায় রয়েছে আসল সমাধি।

নাকি?—অরিন্দম তাকাল। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম দুজনের খুব স্বাভাবিকভাবে কথার বিনিময় হ'ল। ওর মুখে হাসির আভাস পেল নীলা। অরিন্দম ধুতির কোঁচাটাকে হাতের মুঠোয় করে খুব সাবধানে নামছিল সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল নীলা। চোখে পড়ল দেওয়ালের গায়ের একটা নাম। ও যেন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য, চার বছরেও এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এখনও স্পষ্ট পড়া যায় ওটা। ব্লেড দিয়ে সেদিন দুপুরে লিখে গেছিল সুমনের নাম।

কি গো কি হ'ল?

কিছু না।

টর্চ জেলে জেলে তো চলছে অরিন্দম। ও কি দেখতে পেল? না, হয়ত দেখেনি। স্বামীর আড়ালে নীলা আলগোছে হাত বুলোল নামটায়।...সব সত্যি বলেছে ও ওকে, শুধু এটুকুই বলতে পারেনি কেন যেন। ও যেন লুকোতে চাইল ছোট্ট এই লেখাটুকু মনের একান্ত গোপন জায়গায়।

সেদিন দুপুরে কাটফাটা রোদে এসেছিল এখানে, ওরা কজন বন্ধু মিলে। নামটা তখনই লেখা। সুমনের সঙ্গে দেখা হয়নি তখনও। ও ভেবেছিল, সন্ধ্যেবেলা তাকে এসে বলবে দুজনে, আবার ওরা নাম লিখে যাবে।...অতীতকে কখনও কবর দেওয়া যায় না, সে ঠিক জেগে ওঠে বর্তমানের কোন এক সময়ে।

কি ব্যাপার পড়ে যাচ্ছিলে নাকি তুমি?—নীলার হাত ধরল অরিন্দম।

না, পড়িনি।

চাঁদের এমন আলো তবু তুমি পড়ে যাচ্ছিলে?

কথাটা খট্ করে বাজল নীলার কানে। ও বুঝতে পারল না কি বলতে চায় অরিন্দম? অন্ধকার সিঁড়িতে চাঁদের আলো এলো কি করে? ওতো ওর টর্চের আলো। নীলা তাকাল। স্বামীর চোখ দুটোকে ওর অচেনার মতন মনে হল।

দামী ধূপের গন্ধে ভুরভুর করছিল সমাধি ঘরটা। অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছিল সমাধির গায়ে আশেপাশে। কোরান পাঠ করছিলেন মোল্লা সাহেব। নীলাও একটা মোম জ্বেলে দিল। সেদিন দিয়েছিল আজও দিল।

রাত এগারোটা বাজল। ট্যুরিস্টরা ফিরে গেল অনেকেই। ফাঁকা হয়ে এলো চারদিক। একেবারে নির্জন। একপা একপা করে নীলা এগিয়ে গেল। ঠাণ্ডা মার্বেল পাথরের ওপর পা ফেলতে খুব আরাম লাগছিল নীলার। ও ঘুরতে ঘুরতে যমুনার দিকে চলে এল। তাজের পেছনে, অরিন্দম গেল লনের দিকে তাজের সামনে। অন্তত কিছু সময়ের জন্য ওরা দুজনেই যেন একা থাকতে চায়।

মার্বেল পাথরের গায়ে এখানেও তো রয়েছে সুমনের নাম। ধবধবে জোৎস্নার আলোয় নীলা দেখল স্পষ্ট। একদৃষ্টে ও তাকিয়েই থাকল। এ যেন নাম নয়, নামের মালিক। অসহ্য লাগল হঠাৎ, শ্বেতপাথরের গায়ের ওই কঠিন কয়েকটি আঁচড়। এই দাগগুলোই তো তার সেদিনের দুর্বলতার সাক্ষী।

আরে দূর, দূর, সব ছেলেমানুষী। নীলা চোখ ফিরিয়ে নিল। ও যমুনার দিকে তাকাল। শুকিয়ে এসেছে যমুনা। তার গায়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বালির সাদা চর। কোথাও কোথাও খানিকটা করে জল। নীলা দেখল, দূরের রেললাইনের ব্রিজটা, তারও খানিক দূরে আগ্রা ফোর্টের উঁচু মাথা। এত রাতেও এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল যমুনার আকাশে। ওর গলাটা আটকে আটকে আসছিল। কেন যেন ওর কান্না পাচ্ছিল। ও একান্ত নিঃস্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।......পেছনে একটা পায়ের শব্দ। নীলা তাকাল। ও দেখল, অরিন্দম।

কি গো যাবে না?—ওর খুতনীটা তুলে ধরল অরিন্দম। ও দেখল, ওর চোখে জল। একটু যেন অবাক হল। তারপর গভীর মমতার সঙ্গে ওর মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলল, চল, কালই ফিরে যাই।

ওদের মাথার ওপরে নক্ষত্রের আলো, নক্ষত্রের আকাশ।

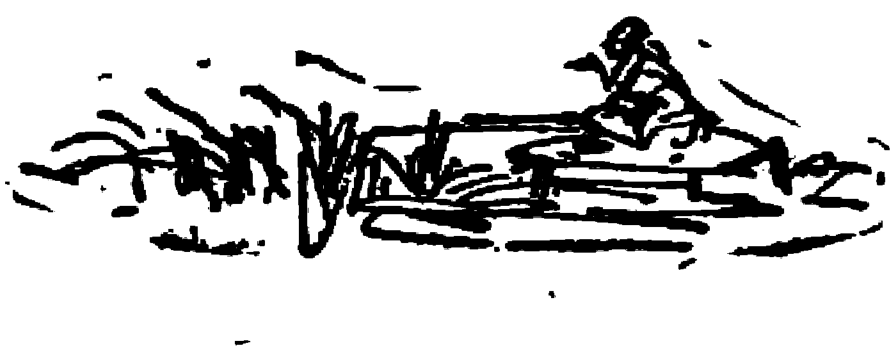

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত
অনাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক রচনা

বৈজিকতত্ত্ব

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত

[বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ, বিখ্যাত পালামৌ ভ্রমণ-কাহিনীর রচয়িতা, বঙ্কিম-পরবর্তী বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে একদা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন করেছিলেন, এবং তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ যে দীর্ঘকাল বঙ্গদর্শন পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, এ তথ্য এতকাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। সঞ্জীবচন্দ্রের এই রচনাটি তাঁর কোনো রচনাবলীতে অদ্যাবধি সংকলিত হয় নি, এবং আমাদের কোনো সাহিত্যের ইতিহাস বা অন্যত্রও এই রচনাটির সংবাদ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩২' গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই রচনাটির কথা নেই। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বৈজিকতত্ত্ব' নিবন্ধটিতে রচয়িতার নাম ছিল না। পরে রচনাটি আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই লেখাটি যে সঞ্জীবচন্দ্রের, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি থেকে। 'সঞ্জীবনী সুধার' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, " 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী' (দেবী চৌধুরাণী) তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'পালামৌ', 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন।" বঙ্গদর্শনে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র এবং ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ—এই পাঁচ সংখ্যায় 'বৈজিকতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়।

শুধু সঞ্জীবচন্দ্রের রচিত দুষ্প্রাপ্য রচনা বলেই নয়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসেও এই রচনাটির মূল্য অপরিসীম। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রও বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্বের একটিমাত্র বিষয় অবলম্বনে বাঙালী পাঠকের উপযোগী যে সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপহার দেন, তা উনবিংশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি দুর্লভ উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হবে।

লেখকের ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে পূর্ণাঙ্গ 'বৈজিকতত্ত্ব' রচনাটির সংক্ষেপিত রূপ এখানে সংকলিত হল। পাদটীকায় প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। টীকা-নির্মাণে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র সুকুল।]

বৈজিকতত্ত্ব

বৈজিকতত্ত্বের (১) প্রথম কথা এই যে সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়;

১। বৈজিকতত্ত্ব বা Genetics -এর মূল সূত্রগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২—১৮৮৪) এবং প্রকাশ করেন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে তা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মেন্ডেলসূত্র পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং তারপর থেকে মেন্ডেলবাদের দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং স্বভাবতই ধারণা করা যায় যে প্রবন্ধকার মেন্ডেলসূত্র সম্বন্ধে পূর্বে অবগত ছিলেন না। কিন্তু ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের রচনা থেকে তিনি উত্তরাধিকারতত্ত্বের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেন এবং উক্ত বিষয় অবলম্বনে বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে Genetics -এর প্রচলিত পরিভাষা উত্তরাধিকারতত্ত্ব প্রজননতত্ত্ব বংশগতিতত্ত্ব ইত্যাদি অপেক্ষা বৌজিকতত্ত্ব শব্দটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

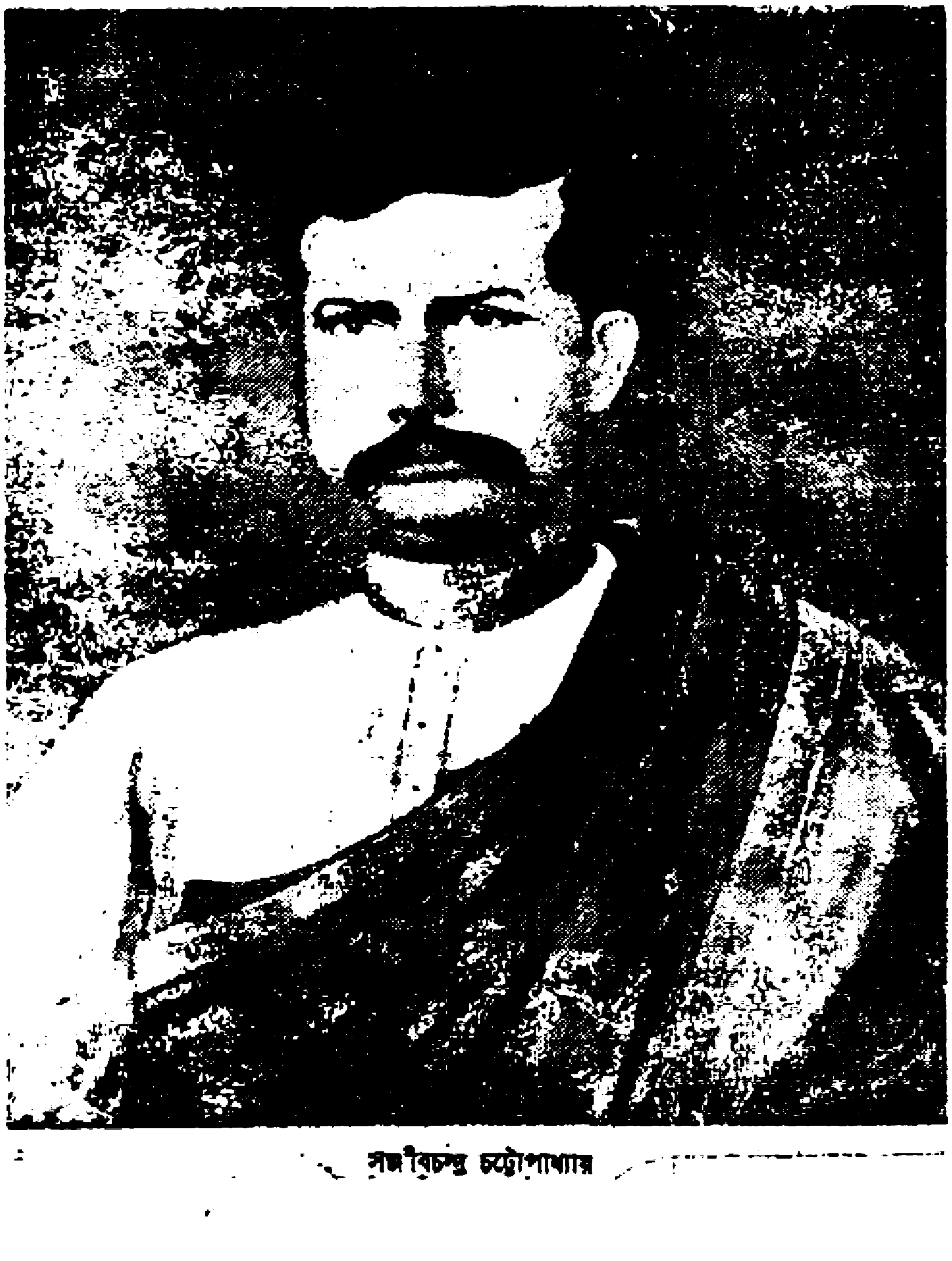

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং গোষ্ঠী অনুরূপ হয়। সাধারণতঃ জানা আছে যে কখন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না, অথবা ঘোটকজাতিতে গো জন্মে না। বিজাতীয় জন্ম যে অসম্ভব তাহা বালকেরাও অবগত আছে। তাহার পর অন্তর্জাতির মধ্যেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ বলবৎ, এক প্রকার মেষের বংশে অন্য প্রকার মেষ জন্মে না। চিতা ব্যাঙের বংশে নাগেশ্বরী ব্যাঙ জন্মে না। গোষ্ঠীসম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম: আমাদের দেশী ক্ষুদ্রকায় টেঁটুয়া ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন ওয়েলার বা আরবী ঘোটক জন্মে না অথবা আরবী ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন আমাদের পক্ষিরাজেরা জন্মগ্রহণ করেন না। আবার, অতি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিগোষ্ঠীতে কখন ইংরেজদিগের মত শ্বেতকায় সন্তান জন্মে না অথবা শ্বেতকায় ইংরেজদিগের গোষ্ঠীতে কখন কাফ্রিদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সন্তান জন্মে না। যদি কেহ কোন বংশে ইহার অন্যথা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন যে সে বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহাতে সঙ্কর দোষ এক সময়ে না এক সময়ে ঘটিয়াছে।

হারবার্ট স্পেন্সর সাহেব বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা সঙ্গীতবিদ্‌দিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রত্যেকের জনক সঙ্গীতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বৈজিক নিয়মানুসারে তাঁহারা পিতৃবিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়: সঙ্গীতবিদ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে তানরাজ যদুনাথ ভট্টাচার্য একজন প্রধান বলিয়া গণ্য, তাঁহার পিতা সেতারবাদ্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী দেশীয় সঙ্গীতবিদ্যার অধ্যাপক, তাঁহার পিতা ঐ বিদ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল 'খেয়াল ও ধ্রুপদী' আমাদের দেশে আইসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তানসেন বা অন্য কোন না কোন 'ওস্তাদ ঘরনা' বলিয়া পরিচয় দেন। বাস্তবিক তাহা সত্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের পরিচয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'ওস্তাদের' বংশে 'ভাল ওস্তাদ' জন্মে এ কথা কি বাঙ্গালা কি হিন্দুস্থান সর্বত্র চলিত আছে। (২)

প্রায় চিরস্থায়ী রোগমাত্রই বীজানুগামী। জনক জননীর হইলে সন্তান সন্ততির হইয়া থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের রোগ চক্ষের রোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তানের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের রোগ বিশেষরূপে বীজানুবর্তী চক্ষের যে প্রকার পীড়া ঘটক সন্তানের প্রায়ই তাহা জন্মে। দূরদৃষ্টি, নিকটদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ, বর্ণান্ধ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। ইহার মধ্যে বর্ণান্ধতা পুত্রে যায় না প্রায় দৌহিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে লোকে সচরাচর 'সূর্যকানা' (৩) বলে তাহাও সন্তানে যায়। নিকটদৃষ্টি অনেক প্রকার আছে; আমরা একজনের তাহার অতি প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি সম্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা চক্ষের নিকট লইয়া চক্ষু অতি সঙ্কুচিত না করিলে দেখিতে পান না। একদিন বালিকা কালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত একটি দ্রব্য আপন চক্ষের নিকট ধরিয়া নানা ভঙ্গী করিতেছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দেখিতে পাইয়া রাগতভাবে পুত্রবধূকে অভিসম্পাত করিলেন যে 'তুই যেমন আমার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস আমি বলিতেছি তোর সন্তানেরাও ঐরূপ অন্ধ হইবে।' পুত্রবধূর ক্রমে দুই তিন সন্তান হইল, আমরা সন্তানগুলি দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় অন্ধ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা বলেন যে, ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য ফলিয়াছে। কিন্তু যিনি বৈজিক নিয়ম জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের বড় আবশ্যকতা ছিল না। যাহারা জন্মান্ধ নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাহাদের পূর্বাবস্থায় চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া বা বিষাক্ত দ্রব্যাদি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, শারীরিক যে কোন পীড়া বা পরিবর্তন আপন হইতে হয় নাই, বাহিক কোন কারণবশতঃ হইয়াছে, সে পীড়া বা পরিবর্তন সন্তানে প্রায় যায় না। খঞ্জের সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার সন্তানেরা ভগ্নাস্থি হয় না। তথাপি কেহ কেহ বলেন যে, সময়ে সময়ে এরূপও জন্মে। একজনের একটি অঙ্গুলি অস্ত্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া কতকাংশে কাটে, অঙ্গুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন হয় নাই কেবল বাঁকিয়া যায়। তাহার পর ঐ ব্যক্তির কয়েকটি সন্তান জন্মে। সন্তানগুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি বক্র হইয়াছিল। প্রোফেসর ব্লেমেন্টান বলেন যে একজনের জানু কাটিয়া গিয়াছিল তাহার সন্তানের জানুতে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের কথা বলেন যে, তাহার চিবুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল সন্তানের চিবুকেও ঐরূপ ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। বসন্তরোগের ক্ষতচিহ্ন কখন সন্তানে যায় না। আমাদের দেশে পুরুষানুক্রমে স্ত্রীলোকদিগের নাসিকা ও কর্ণ বিদ্ধ করা রীতি চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখা যায় নাই। (৪) আমাদের বিশ্বাস যে, যে শারীরিক পরিবর্তন আপনা হইতে না জন্মে অথবা যে পরিবর্তন শরীরের অভ্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করে সে পরিবর্তন সন্তানে যায় না। তদ্ভিন্ন সকল পরিবর্তন, সকল পীড়া, সকল দোষ সকল গুণ বীজাবলম্বন করিয়া সন্তানে যাইতে পারে।

এক বংশে যদি কোন রোগ থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রোগ দৃঢ়বদ্ধ হয়। জনক-জননী উভয়েরই রক্ত আশ্রয় করিয়া সেই রোগ সন্তানে আইসে। জনক জননী ভিন্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের রোগাংশ অপরের রক্তদ্বারা (৫) সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল দেশে বহুকালাবধি জ্ঞাতিবিবাহ

২। বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার কুলজি অনুধাবন করে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা স্থির নিশ্চিত হয়েছেন যে গানের গলা বা কণ্ঠমাধুর্য উত্তরাধিকার সূত্রে আসে এবং 'ডমিনেন্ট জিন্' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (দ্রঃ Principles of Human Genetics, C. Stern, 1949.)

৩। সূর্যকানা বা 'রড্-মনক্রোমেটিজম' একটি বংশগত রোগ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিসকেটি প্রথমে এই রোগটির বিবরণ দেন। (দ্রঃ System of Ophthalmology, vol. III, Part, 2, Duke-Elder 1964). রোগটি সচরাচর 'অটোজোম্যাল রিসিসিভ জিন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের মধ্যে এই বংশগত রোগটির প্রাদুর্ভাব আবিষ্কৃত হয়েছে (দ্রঃ Observations on Rod Monochromatism, Bose, Joardar and sukul, 1968, In Transactions of the Asia Pacific Academy of Ophthalmology, vol. III). রোগটির বংশানুক্রমিক সংক্রমণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণিত হওয়ার বহু পূর্বেই একে বংশগত রোগ হিসাবে চিহ্নিত করে লেখক সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

৪। এই অংশে 'ল্যামার্কবাদ' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ল্যামার্ক বলেছিলেন যে, কোন প্রাণীর জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত হবে। পরে ভাইসম্যান (১৮৩৪—১৯১৪) এই তত্ত্বের খণ্ডন করেন। তিনি একটি মূষিক বংশের ৪০ পুরুষ ধরে লেজ কেটে যান এবং দেখান যে ৪০ পুরুষ পরেও ঐ ইঁদুরবংশের বংশধরদের স্বাভাবিক লেজ আছে। সঞ্জীবচন্দ্রপ্রদত্ত নাক কান বিদ্ধ করার উদাহরণ অত্যন্ত সহজভাবে ল্যামার্কবাদকে অপ্রমাণিত করে। এখানে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সামাজিক রীতি ও বিজ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন।

৫। তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল যে রক্তই জীবদেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক হল 'জিন্'। এই জিন্ জীবকোষের নিউক্লিয়াসে যে ক্রোমোজোম বা জিনসূত্র আছে তার মধ্যে নিহিত। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মূলে আছে একটি যুগল জিনের ক্রিয়া। এই যুগল জিনের একটি আসে জনকের শুক্রকীট থেকে এবং অপরটি জননীর ডিম্বাণু থেকে। জনক-জননী ভিন্ন বংশের হলে জিনযুগল ভিন্নধর্মী (heterozygeous) হওয়াই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ বংশগত রোগের উৎপত্তি নির্ভর করে জিনযুগলের সমধর্মিতার (homozygosity) উপর।

প্রচলিত আছে সে সকল দেশে সকল বিবাহই জাতির মধ্যে হয় না অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে যে দুই একটি জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে তাহাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল জানা যায় না। বিশেষত এই বিবাহ কোন বংশেই পুরুষানুক্রমে হয় না, একবার যদি কেহ নিজগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে, হয়ত তাহার সন্তানেরা আবার অপর বংশে বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় লক্ষ্য উপলব্ধি হয় না।

সগোত্র বিবাহ করা আমাদের নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃগোত্র সম্বন্ধে; মাতৃগোত্র সম্বন্ধে বিশেষ নিষেধ নাই। শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হইতে জন্মে মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এই জন্য পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধান, পিতৃবীর্য কেবল উত্তেজক মাত্র, (৬) পিতৃবীর্য অভাবেও গর্ভ হইতে পারে তাহার পরীক্ষা বড় হয় না। অনেকেই দেখিয়াছেন পিঞ্জরবদ্ধ পালিত পাখী গর্ভবতী হইয়া অণ্ড প্রসব করিয়াছে, পক্ষীর সহিত সংসর্গ নাই অথচ পক্ষিণী অণ্ড প্রসব করে। যাঁহারা গৃহে হংসী পালন করেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন নিকটে হংস নাই অথচ হংসী অণ্ড প্রসব করে। অতএব পক্ষী ব্যতীত পক্ষিণী গর্ভবতী হয়। কীট পতঙ্গের মধ্যে এরূপ গর্ভ অনেক পর্যন্তও জন্মে; তবে উদ্ভিদ নহে তাহাও জন্মে, তাহাও নির্জীবী হয় না। পুরুষ সংস্রব ব্যতীত জন্মকে ইংরাজিতে parthenogenisis বলে। জীবজন্তুর মধ্যে এরূপ জন্মের প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। মনুষ্য মধ্যে এরূপ জন্মের কোন বিশেষ প্রমাণ নেই, কেবল প্রবাদ আছে। খৃষ্টানদের খৃষ্টের জন্ম, হিন্দুদিগের কার্তিকের জন্ম ইহার উদাহরণের স্থল।

মনুষ্য মধ্যে স্বাভাবিক এরূপ জন্ম কখন ঘটে বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস থাকায় পূর্বতন পণ্ডিতবর্গদিগের এই সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সে সকল পরিচয় এ স্থলে অনাবশ্যক।

যাহা বলা হইল তাহাতেই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে জন্মবিষয়ে মাতাই মুখ্য। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বিবাহকার্যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র বর্জন করা আবশ্যক। (৭) আমাদের শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে জন্মসম্বন্ধে পিতাই প্রধান, তাই পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু একণে দেখা যাইতেছে যে, পিতৃবংশ অপেক্ষা মাতৃবংশ আরও নিকট। বোধহয় সেই মতে 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' কথা প্রচলিত হইয়াছিল। মাতৃগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় আমাদের দেশে প্রকারান্তরে জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে।

বল্লালের সময়ের নিয়ম যৌক্তিকতত্ত্বের অনুযায়ী। বিজ্ঞানশাস্ত্র তখন বাঙ্গালায় ছিল না, না থাকুক বল্লাল তাহা বুঝিয়াছিলেন, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির একেবারে মূল ধরিয়া তিনি আইন করিয়াছিলেন। গুণবানের সন্তান গুণবান হয়। অতএব গুণবানের বংশে গুণবানের বিবাহ দিয়া রাজ্যে গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এই তিনি স্থির করেন। পরে বাঙ্গালার মধ্যে ১৯ জন অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া, তাঁহাদিগকে কুলীন করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাদের বিবাহ কিরূপে কাহার সহিত হইবে তাহার নিয়মবন্ধ করিয়া দিলেন। এই শেষ ভাগটি নূতন। সকল রাজ্যেই রাজারা ইচ্ছানুরূপে কৌলীন্য বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুণগ্রাহী, গুণের পুরস্কার করেন, অর্থ দেন, সম্পদ দেন, কৌলীন্য দেন তাঁহাদের রাজ্যে আর গুণবানের অভাব থাকে না, কিন্তু তাহাতে একটি দোষ ঘটে। তথায় পুরস্কারের লোভে গুণের বর্ধন হয় কাজেই পুরস্কারের শিথিলতা হইলে গুণোন্নতির হ্রাস হয়। বল্লাল যে নূতন নিয়মবন্ধ করিলেন তাহাতে সে দোষ রহিল না। গুণবানের বংশে গুণবানের বিবাহ হইলে সন্তান অবশ্য গুণবান হইবে, ইহা যৌক্তিক নিয়ম, রাজা থাকুন, পুরস্কার থাকুক বা না থাকুক, রাজ্যে গুণবানের অভাব থাকিবে না।

কিন্তু যে নয়টি গুণ (আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই কুললক্ষণ) বল্লাল আপন রাজ্যে বিস্তার করিবার নিয়ম স্থাপন করিলেন তাহাতে রাজ্যের বড় উন্নতি বা খ্যাতির সম্ভাবনা ছিল না। গুণগুলি প্রার্থনীয় বটে, থাকিলে সংসার উজ্জ্বল হয় কিন্তু রাজ্য সম্বন্ধে তাহার কোনটিই বিশেষ নহে। সেই জন্য রাজ্যের কোন উপকারই হয় নাই। কিন্তু সংসার সম্বন্ধে ফল অতি চমৎকার হইয়াছিল। বাঙ্গালার ন্যায় পবিত্র সংসার, সুখের সংসার, বোধহয় আর কোন রাজ্যেই ছিল না। বহুদিন অবধি তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে তথাপি যাহা অদ্যাপি আছে তাহা বোধহয় আর অন্যত্র বড় অধিক নাই।

অন্য দেশের রাজারা কুলীনদিগের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিলে হয়ত রাজ্যের উপকার হইত। এক্ষণে প্রায় লোকে নিজ নিজ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত অথবা মর্যাদা রক্ষার্থ বিবাহ করেন। যে সকল বিবাহে নিজ সুখ সমৃদ্ধি ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি হয় না সে সকল বিবাহ দেশবিদেশের নিকট স্বার্থপর বলিয়া কথিত। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহ প্রণয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত হইত, তাহার অন্যান্য কারণে অনিষ্ট আছে, কিন্তু যে বিবাহ কেবল মর্যাদা রক্ষা নিমিত্ত সে বিবাহ অনেক সময় না হইলেই ভাল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে ধনবান বা উচ্চপদস্থ তাঁহাদের সন্তানেরা প্রায় নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় তাঁহারা আপন আপন বিষয় কার্যে অক্ষম, তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ার্ডস; প্রাপ্ত বয়সে দেওয়ান, বিষয় রক্ষা করে। এরূপ ব্যক্তি যদি অবস্থানুরূপ বংশে বিবাহ করেন তাহা হইলে তাঁহার সন্তান আরও অপকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৬। মনুষ্য ও অন্যান্য উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সন্তানের কোষের মোট জৈবসূত্রের অর্ধেক মাতা এবং অর্ধেক পিতার কাছ থেকে আসে। সুতরাং গর্ভাধানের (fertilization) পর একটি ডিম্বাণুর পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণতি লাভের জন্য মা বাবা উভয়ের জৈবসূত্রের সমান অবদান আছে।

৭। আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোতেও কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিমোফিলিয়া, লোহিত-হরিৎ বর্ণান্ধতা প্রভৃতি যৌনজৈবসূত্রজ ব্যাধি সাধারণত ছেলেদের হয়, মেয়েদের কদাচিৎ হয়। কারণ ছেলেদের যৌনজৈবসূত্রের X-সূত্রটি মাতা এবং y-টি পিতার কাছ থেকে আসে। y সাধারণত নিষ্ক্রিয় বলে X-এর রোগবাহী জিন সহজেই পুরুষের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েদের দুটি X-সূত্র থাকায় একটির দোষ অপরটি খণ্ডন করতে পারে। মাতৃবংশে বিবাহ হলে ঐ বংশের রোগবাহী X-এর সঙ্গে যখন পিতার ঐ একই প্রকারের X যুক্ত হয় তখন কন্যা সন্তানও যৌনজৈবসূত্রজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারত-চিত্র

বেদ মেহতা ইংরেজী ভাষার ভারতীয় লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি মার্কিন মুলুকে থাকেন এবং 'নিউ ইয়র্কার' নামক বিখ্যাত পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সম্প্রতি তিনি আর একবার ভারত ঘুরে গেছেন। একটি বিদেশী প্রকাশন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে গান্ধীজীর সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করাটাই তাঁর উপলক্ষ ছিল। চোখে তিনি দেখতে পান না, কিন্তু দৃষ্টিহীন হলেও তাঁর বোধশক্তি অসীম এবং মনে হয় চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের চেয়ে তিনি একটু বেশীই দেখতে পান।

শুধু বেদ মেহতা কেন, জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও যে সব ভারতীয় মানসিকতার দিক থেকে বিদেশী তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবন চিত্র লিখতে বসলে বিদেশী মেজাজের চেহারা তাঁদের কাছে জয় করে। ভারতবর্ষের বিকৃত এবং একপেশে চিত্রাঙ্কণেই এই সব লেখকদের উৎসাহ বেশী। এর একটি প্রধান কারণ হল বিদেশের হাটে এই জাতীয় জিনিসই বিকায় বেশী। তাই ভারতীয়দের সামাজিক কুসংস্কার, চরিত্রগত ত্রুটী-বিচ্যুতি (অবশ্য ইউরোপীয় মাপকাঠিতে), এবং সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করে প্রতিপন্ন করাই এই সব লেখকদের এক এবং সর্বপ্রধান নীতি। এই নীতি বা দুর্নীতি কিন্তু নিশ্চিত আর্থিক সাফল্যের পথে আগুয়ান লেখককে নিয়ে যেতে পারে। যাই হোক, বেদ মেহতা এই সব লেখকদের সমগোত্রীয় হলেও তাঁর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর মতামত আবেগবর্জিত নিস্পৃহ, উৎকট উগ্রতায় ভরা নয়।

বেদ মেহতার 'পোর্ট্রেট অফ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থটিও মনে হয় প্রকাশকের আশা আকাঙ্ক্ষা মতোই লিখিত। এই গ্রন্থে নানান প্রসঙ্গ কলকাতা, বোম্বে, নাগাল্যাণ্ড, ভুটান, সিকিম, আসাম, নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, [illegible] [illegible]-প্রসঙ্গ, [illegible], নারায়ণ মেনন, কলকাতার উৎপল দত্ত ও সমর সেন সেই সঙ্গে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর অক্টারলোনী মনুমেন্ট। হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কিছুই বাদ পড়েনি—সেই দিক থেকে সর্বতঃ দুর্গাচরণ রায় প্রণীত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থটির সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্যের অভাব নেই।

ভারতবর্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ, তাই যতই কেন সেকুলার বলে প্রচার করা হোক, বিদেশীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে শুধু হিন্দুরাই বাস করে, এবং সেই হিন্দুরা অতি গোঁড়া প্রকৃতির। এবং জাতিভেদপ্রথা মেনে চলে। বেদ মেহতা যে সময় এসেছিলেন সেই সময় এলাহাবাদে কুম্ভমেলা হচ্ছিল, তিনি কুম্ভমেলায় গেলেন হিন্দু-ভারতের আরতি দেখার জন্য। তারপর কাশ্মীর। সেই সময়টা কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে হজরত মোহম্মদের কেশ অপহৃত হয়। বেদ মেহতা এই ঘটনাটি ফলাও করে লিখেছেন। এই ঘটনার পিছে যে একটা রাজনৈতিক গুপ্তলীলা আছে তার সন্ধান পেয়ে তিনি প্রচুর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং স্টেটসম্যানের তদানীন্তন রাজনৈতিক ভাষ্যকারের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি কাশ্মীরের সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমির সন্ধানে নানা তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছেন। রাজনৈতিক তিক্ততার মধ্যেও কাশ্মীরে সাম্প্রদায়ি[illegible]রোধির তেমন প্রাবল্য নেই একথা লি[illegible]খেছেন।

কলকাতার বিদগ্ধসমাজে উৎপল দত্ত এবং সমর সেনের সঙ্গে তিনি আলাপ করেছেন, কলকাতার মেজাজ এবং মর্জির সঙ্গে এই দুটি মানুষ বেশ খাপ খেয়ে গেছেন। বেদ মেহতা বলেছেন—

"I fear Calcutta. I reject Calcutta. But how can I prevent Calcutta from obsessing me?"

শুধু বেদ মেহতা কেন খাস কলকাতার [illegible] মনেও এই একই প্রশ্ন জেগেছে। ভয় করি, বর্জন করি, তবু কলকাতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি না। কলকাতার লোকের কাছে কলকাতার মোহ অসীম। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'কলকাতা নয় গেছে কলকাতাতেই।'—তাই মনে হয় কলকাতা ভয়ংকরী এবং সুন্দরী। সি-এম-পি-ও-র কর্তাদের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং অক্টারলোনী মনুমেন্টের পর আছে মাদার টেরেসার আশ্রম এবং সেখানকার আশ্রিতের কথাও আছে। তারপর মনে পড়েছে রুশ লেখক লিওনিদ্ আন্দ্রিয়েভের 'লাজারাসের' কাহিনী। তিনি আন্দ্রিয়েভের এই লাজারাসের মুখোমুখি এসে পড়েছেন এই কলকাতায়।

লাজারাসের ইশারাটো যথাস্থানে পৌঁছাবে কি? এর আগের যাত্রায় বেদ মেহতা এবং তাঁর কবিবন্ধু ডোম মোরায়েস যে ছবি এঁকেছিলেন এবারকার ছবিটা তার চেয়েও কিঞ্চিৎ সহৃদয়।

আগেই বলা হয়েছে মিঃ বেদ মেহতা 'নিউ ইয়র্কার' সাপ্তাহিক পত্রের নিয়মিত লেখক এবং তাঁর ভারতচিত্র ধারাবাহিক ভাবে সেই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকপত্রের দাবী মেটানোর জন্য রচিত এই আলেখ্য রচনায় মিঃ বেদ মেহতা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। কুম্ভমেলা, কাশ্মীর-চীন যুদ্ধ সবই প্রায় পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি পরিবেশিত।

১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিস্থিতির নামকরণ করেছেন—
'Chini-Hindi Bye-Bye".

চীনি-হিন্দি ভাই-ভাইকে ব্যঙ্গ করে এই শিরোনাম রচিত হয়েছে একথা বলা বাহুল্য তবে ভাই-ভাই যেমন বাই-বাই হয়েছে তেমনই আবার যে কোনো মুহূর্তে ভাই-ভাই হতেও পারে, কারণ চীনদেশ এশিয়ার অন্তর্গত। এশিয়ার মানুষদের বিদ্বেষ-বিসংবাদ ভুলে মিলেমিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ বিষয়ে মিঃ বেদ মেহতা যে তথ্যরাজীর স্তূপ সংগ্রহ করেছেন তা মুখ্যত তৃতীয় ব্যক্তি মারফত সংগৃহীত, সম্ভবত সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করে থাকবেন। মিঃ বেদ মেহতা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সূত্রে প্রাপ্ত এই সব তথ্যাদি যথাযথ পরিবেশন করেছেন এবং তাঁর নিজের মন্তব্যগুলি সর্বদা সুপ্রযুক্ত না হলেও তার মধ্যে একটি পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ব্যাপারে চীনা বক্তব্যও যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনই আবার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কথাও মেনে নিয়েছেন। চীনারা বলেছেন যে আমরা কোনো যুদ্ধ করিনি, অন্তত যুদ্ধ করতে চাইনি, আর ভারতের রাজপুরুষেরা বলেছেন এটা সুস্পষ্ট আক্রমণ। মিঃ বেদ মেহতা ভারতীয় ভাষ্য মেনে নিয়েছেন। এই চীনা-ভারত যুদ্ধের কাজে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে মিঃ বেদ মেহতা তার উল্লেখ করে তার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের কথাও বলেছেন।

রিপোর্টধর্মী এই আলেখ্য কিন্তু পাঠকের আগ্রহকে তৃপ্ত করে। মিঃ বেদ মেহতার রচনাভঙ্গীর মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা আছে, মনে হয়, এই স্নিগ্ধতার জনাই তাঁর বক্রোক্তিও তেমন কটু মনে হয় না। তথ্য-নির্ভর বিভিন্ন ধরণের মাল-মশলার সাহায্যেই তিনি তাঁর বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সব তথ্য ভার হয়ে উঠেছে পরিমাণের বাহুল্যে। এর চেয়ে অল্প কথাতেও এসব বলা হয়ত যেত, কিন্তু তিনি যাদের জন্য লিখেছেন সেই সব পাঠকদের নাড়ীজ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে।

নেফা থেকে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ বেদ মেহতা যে সব মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন তা যে শুধু বিরাট তা নয়, ভারতীয়দের পক্ষে এসব তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়। নেফা, নাগাল্যাণ্ড, ভুটান, সিকিম, লাদক এসব অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্যাবলী দীর্ঘকাল ধরে গোপন করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজ আমলেও এই হাল ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিরাপত্তার প্রয়োজনে কড়াকড়ি বেড়েছে। মিঃ বেদ মেহতা একটি মূল্যবান ইঙ্গিত করেছেন ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীদের ঘাড়ে এখনও বৃটিশের ভূত চেপে বসে আছে। আগে চীন দেশ দুর্বল ছিল তাই তাঁরা এসব দেশ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। ব্রিটিশের পরাক্রমও কম ছিল না তাই এই দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা হয়ত তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজপুরুষেরাও সেই মনোভংগী আঁকড়ে বসে আছেন এবং সেখানেই তাঁদের দুর্বলতা। চীনদেশ যে ইতিমধ্যে এক প্রবল শক্তিসম্পন্ন পরিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের গদীতে যে ব্রিটিশ রাজ-পুরুষেরা নেই একথা দিল্লীর দফতরের কর্তাব্যক্তিরা এখনও ঠিক বুঝতে পারেন নি।

বেদ মেহতার 'ভারতচিত্র' এই মন্তব্যের জন্য নিখুঁত হয়ে উঠেছে একথা বলা যায়।

—অভ্রাঙ্কর

PORTRAIT OF INDIA : By: VED MEHTA. Published by WIDENFIELD & NICHOLSON : LONDON Price : 70 Shillings only :

জর্জ সেফেরিস পরলোকে

নোবেল পুরস্কৃত গ্রীক-কবি জর্জ সেফেরিস গত ২০ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে, বাহাত্তর বছরে পা দিয়ে। ১৯০০ সালে তাঁর জন্ম, স্মির্ণায়। প্রকৃত নাম জর্গস সেফেরিয়াডিস। আইন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এথেন্সে ও প্যারিসে। ছাব্বিশ বছর থেকেই প্রবাসী। কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কখনো থেকেছেন লণ্ডনে, কখনো তিরানায়, কখনো কায়রোয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে।

১৯৩৫ সালে বেরোল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মিথিস্তোরিমা'। ঠিক সেই বছরই বেরোয় গ্রীক-কাব্যে আধুনিকতার জনক নামে অভিহিত 'কাবাফি'র পূর্ণ কাব্য সংগ্রহ। অনেকে মনে করেন, আধুনিক গ্রীক-কাব্যের ইতিহাসে 'কবাফি'র পরেই তাঁর স্থান। 'নিয়া গ্রামাতা' বা নতুন সাহিত্য নামে একটি সাহিত্যপত্রের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এবং এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন গ্রীক-ভাষায় এলিয়টের অনুবাদক হিসেবে।

১৯৫০ সালে বেরোয় তাঁর ১৯২৪ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে লেখা কবিতাবলীর একটি নির্বাচিত সঙ্কলন : 'পোয়ৈমাতা।' অবশ্য এর আগেই বেরোয় তাঁর লেখা জার্নালের দুখণ্ড। প্রথম খণ্ড ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৪ সালে। এবং ১৯৪৭ সালে বেরোয় তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'কিচাল'। এই গ্রন্থে সেফেরিসকে মনে হয়, ক্লান্ত, বিষন্ন এবং গৃহকাতর। যেন প্রবাসের পালা শেষ করে ঘরে ফেরার জন্যই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

আমরা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মিথি-স্তোরিমা'র প্রথম কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ করলাম, প্রয়াণোত্তর শোকে আক্রান্ত হয়ে।

পৌরাণিকী : এক

সেই দূতের অপেক্ষায় ছিলাম
তিন বছর।
কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি,
উপকূলের ভূমি, নক্ষত্র এবং পাইন।

আমি ছিলাম
আদি-বীজের খোঁজে নিবৃত্ত,
লাঙলের ফলায়, আর জাহাজের
গলুইয়ে
একাগ্র হয়ে,
যার মধ্যে আবার সূত্রপাত হবে
পুরোনো পালার।

অবশেষে, নিজের ঘরে ফিরেছি
ভগ্ন হৃদয়ে,
নুন আর মরচের আস্বাদে
সারা শরীর অবশ এবং বিধ্বস্ত।

ঘুম ভাঙতেই,
আবার চলা শুরু করলাম উত্তরে,
অচেনা পথিক,
এমন এক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে,
যে-কুয়াশা শ্বেতহংসদের
অকলঙ্ক ডানায়
প্রসারিত।
নিরত গ্রীষ্মে, মৃত্যুর মতো অবশ
কোনো এক দিনের কল্পনায়
যেন হারিয়ে গিয়েছি।

দ্যাখো,
ফিরিয়ে এনেছি
কেবল এক দীন শিল্পের
ক্ষোদিত উপহার।

—শুভঙ্কর পাঠক

নতুন বই

জলবিন্দু (গল্প সংকলন)—বীরেন্দ্র দত্ত। লেখশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—১২। মূল্য—২·৭৫ পয়সা।

বাংলা ছোটগল্প তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস পেরিয়ে প্রকাশ রীতির ও বক্তব্যের ঋজু ভূমিতে দণ্ডায়মান। আজকের এই পূর্ণায়ত পরিণতির পেছনে বহু লেখকের অতন্দ্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রম রয়েছে। বীরেন্দ্র দত্তও তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যিনি সাম্প্রতিক বাংলা ছোট-গল্পের ইতিহাসে আপন বক্তব্য ও রূপরীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। সম্প্রতি প্রকাশিত লেখকের 'জলবিন্দু' উপরিউক্ত মন্তব্যের ইঙ্গিত বহন করে। আলোচ্য গল্পসংকলনে মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলির পটভূমিকা সাম্প্রতিক বাংলাদেশ; রচনাকাল আলোচ্য দশক। স্বাভাবিকভাবেই লেখক সামাজিক সমস্যা, দুঃক্ষয় ও মনোবিকলন ইত্যাদি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। প্রত্যেকটি গল্পেই লেখকের পরিমিতিবোধ, সংলাপ, পরিবেশ রচনা, চিত্রকল্প প্রভৃতি কৃতিত্বের দাবী রাখে। পৃথকভাবে প্রত্যেকটি গল্পের বক্তব্য ও কায়াগঠন আলোচনা করা সম্ভব নয়; যৌথভাবে এদের আলোচনায় দেখা যাবে যে, গল্পকার একটি/দুইটি বা তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। 'অসুখ' গল্পের বক্তব্য অভিনব; লেখক সুকৌশলে ভূপতির মনের বিকৃত বাসনাকে পোকার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। 'আলোর উৎস' প্রত্যয় দীপ্তিত গল্প। আধুনিক সমাজের নাস্তিকাবোধে অভিশপ্ত নিরুপম শেষ পর্যন্ত তথাকথিত সোসাইটি গার্ল—মধুমিতা, কঙ্করী, তনুশ্রী ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিকা অমিতার কাছে পরম নির্ভরতার আশ্রয় খুঁজে পেলো। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য গল্পকার এই আস্তিক্যবোধের মন্ত্রে নায়ককে দীক্ষিত করলেন—আর এইখানেই গল্পকারের সদর্থক জীবনবোধের ইঙ্গিত। 'জলবিন্দু' সাধারণ গল্প; তবে গল্পকার কেন যে আলোচ্য গল্পের নামে বইয়ের নামকরণ করলেন তা বোঝা গেল না। 'কান্না' গল্পে, বাঙালী পরিবারের চিরন্তন অভিশাপ মেয়ে দেখা অথচ পছন্দ না-হওয়ার কথা বলা হয়েছে আর সেই সঙ্গে লেখক সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের ছেলেমেয়েদের প্রাক্-বিবাহ জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ঘর' গল্পে মনোমিলের এক শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত—যেখানে প্রবাসী স্বামী মলয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য রুমা ইচ্ছা পোষণ করে। 'অন্য মনে' নিখিলেশ সোমার জন্য বেদনা পোষণ করে; বিয়ের রাত্রে আলোকসজ্জায় সজ্জিত বাড়ী তার কাছে বেদনার উৎস হয়ে দেখা দিল। গল্পের শেষে নিখিলেশ কিন্তু সোমার চোখের জলে তার জীবনের ভাষা খুঁজে পেলো। সোমার অনুচ্চারিত সংলাপ তাকে আশ্রয় দিলো। 'একটি নারিন্দার জন্য' এক অসাধারণ মিনি গল্প। সমস্যা প্রধানত আধুনিক। আনন্দের ভালবাসায় প্রবঞ্চিতা লেখা মাতৃত্বের অবলম্বনকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছে।

এ গল্পসংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সদর্থক জীবনদর্শন। চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও গল্পকারের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। 'অমাবস্যার নক্ষত্রের আলো', 'নীল নির্জন সময়', 'পরিচ্ছন্ন আকাশ দু-একটা নক্ষত্রের আলোয় কাঁপতে শুরু করেছিল'—ইত্যাদি যেন আধুনিক কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গল্পসংকলনটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। রণেন মোদক। সুজাতা, ৬০-এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৯। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীরণেন মোদক আলোচ্য গ্রন্থের আগে একখানি উপন্যাস, একটি গল্প-সংকলন ও একখানি নাটিকা রচনা করেছেন। 'স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ' সম্ভবত লেখকের চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস। কাহিনীর পটভূমি কলকাতা ও তার উপকণ্ঠ। কাহিনীর নায়ক অজয়, নায়িকা রিক্তা। কিন্তু লেখক শ্রীরণেন মোদক কাহিনীর নায়ককে করেছেন লেখক—যে লেখক তার কাহিনীর নায়িকা চরিত্রকে করেছে রিক্তার জীবনের বেদনাদায়ক কাহিনী এবং তা ব্যক্ত করেছে তাঁর সৃষ্ট স্বপ্না চরিত্রের মাধ্যমে। একদিকে বাস্তব জগতের সত্য রিক্তার মত নারী চরিত্র, অন্যদিকে স্বপ্নার মত তার কাল্পনিক চরিত্র,—এই বাস্তব ও কল্পনাকে পাশাপাশি রেখে লেখক কাহিনী শেষ করেছেন। উপন্যাসের শেষে কাহিনীর নায়কের লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির ছড়ানো পৃষ্ঠাগুলিই পড়ে থাকে। নায়ক বাস্তব রিক্তাকে কাছে পায়। উপেক্ষা ও বঞ্চনার ইতিহাসের শেষে দুটি তরুণ হৃদয় পাশাপাশি দাঁড়ায়। এদেরই সূত্র ধরে স্বপ্নার শ্বশুর, বন্দনা, মধুলা, বিভূতি, সুবোধদা, বিজয়, স্বপ্নার মা, মাসি, সুবিনয়, নিবারণবাবু ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র ও জটিল চরিত্রের ভিড় জমে ওঠে। লেখকের কাহিনী নির্মাণক্ষমতা ও লেখক-চরিত্রের অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। তবে কাহিনী বর্ণনায় একটি বাক্যে একটি প্যারাগ্রাফ রচনার চেষ্টা এবং অহেতুক একই চিন্তাকে এক-একটি বাক্যের প্যারা-গ্রাফে সাজানোর ব্যাপারটি অত্যন্ত ক্লান্তি-কর লাগে পাঠকের কাছে। ব্যবসার খাতিরে বইটির কলেবর বড় করার জন্যই কি এই প্রয়াস?

গৌড়মল্লার। শ্রীশাশ্বত। সুপ্রকাশন, ৩০/১, কলেজ রো, কলকাতা ৯। দাম চার টাকা মাত্র।

'গৌড়মল্লার' উপন্যাসটি একটি ইতি-হাসাশ্রিত রোমান্স। ইতিহাসকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনার প্রয়াস বিশ শতকের প্রথম দিকে বেশ ছিল। বিগত দুই দশকে বেশ কিছু ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স লেখা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মধ্যযুগের সুলতানী আমলের বাংলাদেশ-এর পট-ভূমি। এই পটভূমিতে রাজা গণেশের কালের গৌড়-পাণ্ডুয়ার কথায় সামান্য ঐতিহাসিক অংশ ও অধিকতর কল্পনারস মিশ্রিত করে লেখক কাহিনী রচনা করে-ছেন। কাহিনী সুখপাঠ্য।

এক দশক। শঙ্কর রুদ্র। স্ট্যান্ডার্ড বুক কোম্পানী, ১০।১, জি টি রোড, হাওড়া ময়দান, হাওড়া। দাম পাঁচ টাকা।

'এক দশক' গ্রন্থটি লেখক শঙ্কর রুদ্রের দিনলিপি। লেখকের ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখ্য তারিখে বিশেষ মুহূর্তে যে সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া—তা বহির্ঘটনা থেকে জাত বা অন্তর্দ্বন্দ্বময় অস্তিত্ব থেকে ব্যক্ত—দেখা দিয়েছে, তারই কালানুক্রমিক প্রকাশ এ-গ্রন্থে সংকলিত। ডায়েরীর পাতায় যুক্তি নেই, আছে আবেগ। যেখানে সামান্য যুক্তি আছে, বা থাকতে পারত, সেখানে লেখক কবিত্বময় প্রকাশভঙ্গিতে তা ঢেকে দিয়েছেন। পাপ, মৃত্যু, ধনী হওয়া, প্রেম, জীবন, সাম্প্রতিক খুন-জখম, পরোপকার ইত্যাদি বিষয় তাঁর ব্যক্তিগত মনে কি ধরনের চিন্তার উদ্রেক করে, 'এক দশক' তারই দিনলিপি। লেখকের প্রকাশভঙ্গি সহজ, সরল, সুখপাঠ্য।

শারদ সংকলন

ক্ষুদ্র পত্রিকা—সম্পাদক : বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড, কলকাতা-১০। দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যের একমাত্র দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি শারদ-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, কবিতা-বিষয়ক ও ললিতকলাশিল্প সম্পর্কীয় ভাবনাকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়াই এ পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য। রোমান হরফে বাংলা কবিতার প্রকাশ, ভিন দেশী কবিতার বাংলায় রূপান্তরকরণ এবং বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-এর এই বৈশিষ্ট্যই ক্ষুদ্র-পত্রিকাকে বিদগ্ধমহলে সমাদরের আসন দিয়েছে। শারদ সংখ্যায় এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতা লিখেছেন : হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুশীল রায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, রাম বসু, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ভিনদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন : বার্ণিক রায় ও গীতা দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু প্রমুখ কবিদের কবিতা রোমান হরফে রূপান্তরকরণ ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে সতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বার্ণিক রায় প্রমুখেরা। ননী-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা ও জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিত্রকর : পিকাসো অঙ্কিত একটি রূপসজ্জা রমণীর নিবন্ধটি কলা-রসিকদের নতুন চিন্তার খোরাক দেবে।

সাতপুরা—সম্পাদক : শ্যামল মুখোপাধ্যায়। ৩২১, পূর্ব ধামাপুর, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ। এক টাকা।

'সাতপুরা' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-প্রীতির রুচি-প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। অনেকগুলি গল্প আছে, কবিতা এবং প্রবন্ধও। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হল : বিষ্ণু দে, সেবক সেব-শর্মা, শোভন সোম, রেনো হালদার, নারায়ণ সেনগুপ্ত, সুখেন্দু চন্দ প্রমুখ।

সীমান্ত—সম্পাদক : তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু। ৩১।১, হরতুকীবাগান লেন, কলকাতা : ৬। এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন শারদ সংকলন। ভাবের ও ভাবনার দিক দিয়ে প্রতিটি রচনাই সুলিখিত—আরো পাঁচটা গতানুগতিক পাঁচমিশেলী পত্রিকা 'সীমান্ত' নয়—তারই দীপ্ত দীপ্তি সামগ্রিকতার সর্বাঙ্গে। তরুণ সান্যালের 'ধার্মিকের মাতৃভূমি আবিষ্কার' ও সঙ্কর্ষণ রায়ের নিবন্ধটি স্বাতন্ত্র্যধর্মিতার জন্যে পাঠক দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। সমরেশ দাশগুপ্ত ও দিলীপ সেনগুপ্তের গল্প দুটি নতুন স্বাদের। কবিতায় বিশিষ্ট হলেন রাম বসু, গোলাম কুদ্দুস, কৃষ্ণ ধর, আবদুল হাফিজ, সত্য গুহ, তুলসী মুখো-পাধ্যায় প্রমুখ। প্রায় সমস্ত কবিতার পট-ভূমি বাংলাদেশ।

আর্ষ—সম্পাদক : প্রশান্তকুমার গঙ্গো-পাধ্যায়। ১৭৮, বি বি ঘোষ রোড, বর্ধমান। তিন টাকা।

গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি নিয়েই আর্ষ-এর শারদ সংখ্যা। লেখক-তালিকায় নামী লেখকদের দর্শন না পাওয়া গেলেও রচনাগুলি সুনির্বাচিত। একাধিক উপন্যাস আছে কিন্তু বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞদের দিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলিও উল্লেখ করার মতো। বলাই দেবশর্মার প্রবন্ধ-নিবন্ধনিচয় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীকৃষ্ণ' শারদ সংকলনটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে।

একালীন—সম্পাদিকা : কুমকুম দে। ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দু' টাকা।

সপ্তম বর্ষের শারদ সংখ্যা।

গল্প, প্রবন্ধ, একাঙ্কিকা, কবিতা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি বিষয়ে সুলিখিত রচনা-গুলি একালীনকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। উল্লেখ্য হলেন : শঙ্খ ঘোষ, শুভঙ্কর ঘোষ, মণীন্দ্র গুপ্ত, অনীতা গুপ্ত, সুধা বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, অমিতাভ দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, কুমকুম দে প্রমুখ। বিবিধ বিষয়ের উপর লেখা চিত্তাকর্ষী নানা সাহিত্য-ভাবনার প্রোজ্জ্বল প্রবন্ধগুলি [কথুর ছন্দের দুর্গে, বিষ্ণু দে-র কাব্য-পরিচয় অলীক অলিন্দ, প্রতিধ্বনির গুহা, সুন্দরের সাধনায় অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র শিল্প-জিজ্ঞাসা ও মারকস ও আনাবেলা] সাহিত্য-পাঠকদের খুশী করবে।

সময়—সম্পাদক : উৎপলকুমার দত্ত। ৩, গোয়ালপাড়া লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এক টাকা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার অষ্টম বার্ষিক শারদ-সংকলনে প্রবীণের চেয়ে নবীনদের প্রাধান্যই বেশি। গল্প-কবিতা, প্রবন্ধের মধ্যে কবিতাই বেশি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রণব সেন, মানস রায়-চৌধুরী, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, কুমকুম দে, তাপস ঘোষ প্রমুখ। গল্পগুলি নতুন স্বাদের।

কঙ্কার—সম্পাদক নুরুল ইসলাম। কান-খুলি, পোঃ গার্ডেনরীচ, ২৪-পরগনা। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা 'আমার চোখে তারাশংকর' ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'তারাশংকর নেই' শীর্ষক রচনা দুটি মূল্যবান। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রচ্ছদে চিত্রতারকার ছবিসহ অন্যান্য রম্যরচনাগুলি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

মহুয়া—সম্পাদক : সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি।৭, গোয়ালপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা-৬০। এক টাকা।

তরুণদের দ্বিমাসিক পত্রিকা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানান লেখায় ভরা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিমল মিত্র, প্রসূন রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সরোজ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

চলন্ত—সম্পাদক : দিগ্বিজয় চৌধুরী। ১০৮বি, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৭। দাম এক টাকা।

আর যারই অভাব থাক, বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তার প্রমাণ হাতের কাছে 'চলন্ত'—ট্রেনের প্রথম যাত্রী সাধারণের নিজস্ব মাসিক পত্রিকাটি। অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপকও। বিশেষ সংখ্যায় বিশিষ্ট লেখক হলেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বিমল মিত্র প্রমুখ।

ভাগীরথী—সম্পাদক : প্রভাত মুখো-পাধ্যায়। খাগড়া, গোয়ালপাড়া, মুর্শি-দাবাদ।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকার শারদীয় সাহিত্য সম্ভার বহন করে এনেছেন নবীন ও প্রবীণ কথাকারেরা। নানান ধরনের লেখা পাঠকমনকে খুশী করবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : রেজাউল করিম, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো অনেকে। দিগেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল-এর প্রবন্ধটিতে 'আত্মা ও পরমাত্মার' চিন্তার খোরাক আছে।

অঙ্গনা—সম্পাদনা : বেতাল গোস্বামী। কামাখ্যা কলোনী, গৌহাটি—১২, আসাম। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রবাসী বাঙালীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয় উদ্যম। লেখাগুলি সুনির্বাচিত। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুখ্যাতি করার মতো।

CENTRAL LIBRARY

মানব মন (বিশেষ অক্টোবর পাক্ষাত সংখ্যা)—সম্পাদক : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০২।১এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৩। তিন টাকা।

আলোচ্য ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সাহিত্যপাঠক এবং সমাজকল্যাণকামীদের সানুরাগ সম্বর্ধনা ইতিমধ্যেই লাভ করেছে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের হাতিয়ার করে পত্রিকাটি প্রশংসনীয়ভাবে যুগপৎ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেবা করে আসছে নিরলসভাবে। নিছক সাহিত্যসৃষ্টিই নয়—সামাজিক সমস্যাকে বিজ্ঞানের আলোয় তীক্ষ্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথনির্দেশ করার বিজ্ঞানসম্মতভাবে চেষ্টাও চলছে। এই বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখ্য রচনা হল মনোবিদের : 'আক্রামকের মন ও সমাজ', রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের : বার্ধক্যজনিত মানসিকতা ও তার প্রতিরোধ', জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'কথায় কথায়', অরুণ চক্রবর্তীর 'শিশুর উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য'—অনুবাদ, আশুতোষ ভট্টাচার্যের : 'জনতার সাহিত্য', বি মুখার্জির : 'মানবমস্তিষ্ক ও মন', গোপাল হালদারের : 'কমলাকান্তের মন', বেলা দত্তগুপ্তের : 'সমাজবিজ্ঞান ও সোভিয়েট রাশিয়া', পরিতোষ গুপ্তের : 'সম্মোহন শক্তির বাস্তবতা' এবং ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্চর্য বাস্তবধর্মী নাটক : 'নাটকীয় সমীক্ষা'। আজকের ক্ষুব্ধ সমাজকে অন্ধকার থেকে চেতনার আলোয় ফিরিয়ে আনার নাটকীয় কাহিনী এ-নাটকের পটভূমি। এই নাটকটির জন্যে নাট্যকার এ-দেশের শুভানুধ্যায়ীদের অবশ্যই প্রশংসাধন্য হবেন।

সমকালীন— সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩। পঞ্চাশ পয়সা।

'সমকালীন' প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকাটি সাহিত্য-সংসারের 'জাত-কুলীন'। উনিশ বছর ধরে সে তার আভিজাত্য এবং বৈশিষ্ট্য মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে—ভাবতে অবাক লাগে। সমকালীন রচনাবৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে এবং মুদ্রণ-পরিচ্ছন্নতায় সৎ সাহিত্যপাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এবং পাচ্ছে বলেই সস্তা এবং লঘু রচনার গোঁজামিল দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লজ্জাকর প্রচেষ্টায় নিমজ্জিত হতে হয়নি। আজকের এই ভাঙচুর ও অবক্ষয়ের কালে এটাই সবচেয়ে আনন্দের ও গর্বের কথা। এই সর্বাঙ্গীণ কৃতিত্বের সিংহভাগ সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের।

আলোচ্য সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত সব নিবন্ধগুলিই পাঠককে প্রভূত চিন্তার খোরাক যোগাবে। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা হল : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাসের ভূমিকা, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্ণচন্দ্র দাসের মেদিনীপুর জেলার একটি লোকাচার, অতুলচন্দ্র ভৌমিকের নকশী কাঁথা, সলিল বিশ্বাসের লোকায়ত নদীয়া ও বসন্ত সরকারের ভারতীয় রাগসঙ্গীতে ছন্দ-স্বর সম্বন্ধ।

গল্প-সম্ভার (বিচিত্র গল্প-সংকলন) —সম্পাদনা : শ্যামলরঞ্জন ভট্টাচার্য। পত্রমহল, ১৬, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট কলকাতা-১। দু' টাকা।

এতকাল ধরে চলছিল যে-প্রথা, একালে দেখি তারই উল্ট-পুরাণ ঘটছে। লেখক-লেখিকাদের পশ্চাদ্ধাবনে সম্পাদককুল ব্যস্ত বিব্রত বিপন্ন কিন্তু হঠাৎ দেখছি সম্পাদকই পশ্চাদ্ধাবন করছেন সাহিত্যযশপ্রার্থীদের নতুন 'তারা'র আবিষ্কার-অন্বেষণে। গল্প প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত রচনার পাহাড় থেকে কয়েকটি গল্পের সমাহারে 'গল্পসম্ভার'-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশ—'যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখো তাই/মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন'। সম্পাদকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর নদীয়া, দু টাকা।

'লেখা ও রেখা' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি সুনির্বাচিত সাহিত্যগুণান্বিত রচনার আধার হিসেবে ইতিমধ্যে সাময়িক সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতি শারদ সংখ্যায়ও সুপরিস্ফুট। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন : কবিতায় : মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, তরুণ সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আনিস সানাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অনুবাদ কবিতায় : বিষ্ণু দে ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, গদ্য রচনায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মৃদুলকান্তি বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ছোটগল্প : শচীন বিশ্বাস, অশোককুমার সেনগুপ্ত, তপোবিজয় ঘোষ। সজল রায় ও মংগল কাওড-এর স্কেচ দুটি 'সতর্ক হও' ও 'প্রতীক' উল্লেখের দাবী রাখে।

অঙ্কুর—সম্পাদক : জয়দেব রায়, অজয় মালিক। বাওয়ালী, বজবজ, ২৪-পরগণা। এক টাকা।

তরুণদের ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অঙ্কুর' গ্রাম-বাংলা থেকে প্রকাশিত হলেও সুখ্যাত লেখক এবং প্রতিশ্রুতিময় নবীনদের রচনার যে সমাবেশ ঘটিয়েছে তা প্রশংসা করার মতো। এই সংখ্যার বিশিষ্ট কথাকাররা হলেন : বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, কবিতা সিংহ, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার, সন্ধ্যা কর, তীর্থঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ।

জাগরী—সম্পাদক : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩। এক টাকা।

ষোল বছরের আশ্বিন সংখ্যাটি শারদ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ-এর দুর্গাদেবী-বন্দনা দিয়ে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও আছে বঙ্গবন্ধু মুজিব ও বাংলা দেশ প্রসঙ্গ এবং তারাশঙ্কর স্মৃতি-স্মরণও। এই সংখ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ, কবিরু ঘটক, দিব্যেন্দু পালিত, শম্ভুপতি ভট্টাচার্য, মনবুলশঙ্কর দাশগুপ্ত, চিরঞ্জীব, নবকুমার শীল প্রমুখ। আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও রচনাগুলি সুলিখিত ও চিত্তাকর্ষী।

তীর-ভির্যক—সম্পাদক : শেখ সদরউদ্দিন। ১৪বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দেড় টাকা।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস নিয়েই শারদ সংখ্যা। ছায়াচিত্র সম্পর্কে আলোচনাও আছে। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন : বনফুল, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তশীল দাশ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, সুশীলকুমার সেন প্রমুখ। সত্যেন মিত্রের 'বিপন্ন বিস্ময়', শেখ সদরউদ্দিনের 'আমার সোনার বাংলা' নাটিকা এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বড় গল্পটি উল্লেখ্য হবার মতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় আঁকা 'অন্তরাল হলে যেন এক নদী'—বাণী চিহ্নিত সুগভীর অর্থবহ প্রচ্ছদটি সময়োপযোগী ও সুন্দর।

বিজয় তোরণ—সম্পাদক : সুধীরচন্দ্র দাঁ। বর্ধমান। দু টাকা পঁচিশ পয়সা।

বর্ধমান জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদ সংখ্যায় উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা, নাটিকা, কবিতা, বিজ্ঞান বিচিত্রা প্রভৃতি সুনির্বাচিত রচনায় সমৃদ্ধ। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে আছেন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ। 'বাংলাদেশ'-এর মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা বেগম নুরুন্নেসা গোমেদের 'অশান্ত পদ্মা ও অন্তহীন কান্না' এবং দামোদরের এক মাঝির জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত সুধীরচন্দ্র দাঁর 'নৌকো'—উপন্যাস দুটি ভিন্ন ধরনের উপন্যাস বলে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হবার মতো।

কান্দী-বান্ধব — সম্পাদক : সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কান্দী, মুর্শিদাবাদ। দেড় টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদ সংখ্যাটিতে নামী-অনামী বহু লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প, শান্তি হালদার, ডঃ পুলকেন্দু সিংহ, ডঃ হলধর দে, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফজলুল হক, ডক্টর শিশিরকুমার সিংহ, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সোমনাথ পাণ্ডে, দেবকুমার চক্রবর্তী, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধ এবং ইন্দ্রজিৎ শান্তিলোর 'বানে কান্দি' উল্লেখ্য। অন্য রচনাদিও সুলিখিত।

খোলা কথা—সম্পাদক : সদানন্দ দাস। ঠাকুরপল্লী, বর্ধমান। ১·৫০ টাকা।

সাপ্তাহিক 'খোলা কথা'র নবম বর্ষের শারদ সংখ্যাটি নানান ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, চম্পকাহিনী ইত্যাদি। লেখক তালিকায় আছেন সাহিত্যের সুধীজনেরা। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডঃ দিলীপ মালাকার প্রমুখ। ডঃ যোগেশচন্দ্র দত্তের শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ অসিত রায়ের 'ছবি লেখক' এবিন ঠাকুর রচনাদুটিও উল্লেখ্য।

দেয়ালা—সম্পাদনা : শুভঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। ১১।৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-২৬। দেড় টাকা।

আকারে ছোট হলেও ছোটদের জন্যে ছোটদের সম্পাদিত ছোট মাসিক পত্রিকা দেয়ালার শারদ সংকলনটি বাংলা-সাহিত্যের সেরা লেখক-লেখিকাদের সমাবেশ ঘটেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যও একেবারে কম ঘটেনি। নানান ধরনের রকমারী লেখার এই শারদ সংকলনটি একেবারে ঠাসা। মজার মজার ছড়া আছে, আছে ছবি, গল্প, কাহিনী, প্রবন্ধ, এমনকি অবনীন্দ্রনাথকৃত ধাঁধাও। সংকলনটি ছোটদের মন ছুঁইয়ে দেবে। বড়দের মন দোলাবে। ছোটদের লেখাও এর মধ্যে কিছু কিছু আছে। সেরা লেখকদের সবাইয়ের নাম বলা যাবে না, স্থানাভাব। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন : সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, হাসী খাঁ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়, সন্তোষ... আশা দেবী, কুমারেশ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

আঙিনা—সম্পাদক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিঃ-২৬। চার টাকা।

মঞ্চ এবং চিত্রজগতের মাসিকপত্র হিসেবে 'আঙিনা' নিজ বৈশিষ্ট্যে কলারসিকদের দৃষ্টি-ধন্য হয়েছে। শুধু প্রমোদ উপকরণের বিবিধ সম্ভার জনমনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আঙিনা-এর কর্তব্য শেষ হয়নি—মঞ্চ ও ছায়াচিত্র জগতের নানাবিধ ভাবনা সমস্যার দিকে সাধারণ মানুষের নজর ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমাধানের সূত্র খুঁজে বেড়ানোর আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নতুন আলো আন্দোলনের সামিল হওয়ার কৃতিত্ব তার। শারদ সংখ্যায় তার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। এই সংখ্যায় সাতটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, দুটি একাঙ্কিকা স্থান পেয়েছে। বর্তমান যুগ-জীবনের সমস্যাই এই সব নাটকের পটভূমি। 'বাংলা দেশ' মুক্তি-আন্দোলন নিয়েও রচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাট্যকারদের পুরোধায় আছেন মন্মথ রায়। অন্যান্য উল্লেখ্য হলেন দীপেন সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আসিফ কবিরজয়-এর অন্দিত নাটক 'ইনক্লাব' সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গ্রুপ থিয়েটারের আজকের সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন সবিতা মুখোপাধ্যায়।

পুষ্পাঞ্জলি—সম্পাদিকা : অনিলা দেবী। শ্রীসারদা আশ্রম, পি-৫১৩, ব্লক : এ, নিউ আলিপুর, কলকাতা—৫৩।

শ্রীসারদা আশ্রম-এর মুখপত্রটি 'পুষ্পাঞ্জলি' ভাবে-ভাবনায় রচনা-বৈশিষ্ট্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য শারদ-সংকলন। 'পুষ্পাঞ্জলি' অর্পণ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন : ডঃ রমা চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, ডঃ কমলা রায়, চিত্রিতা দেবী, অঞ্জলি বসু, প্রবুদ্ধজ্যোতি রায়চৌধুরী, বিজয়া সেন, বিজয়া দাশগুপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা মায়ের ওপর রচিত দুটি গান (স্বরলিপি সহ) দিয়েছেন সবিতা আচার্য। ছোটদের কিছু লেখা এবং কিছু ইংরাজি রচনাও এতে স্থান পেয়েছে। পত্রিকাটির সর্ব-অবয়বে শুভ্র-শুচী ও পরিচ্ছন্নতার ভাব পাঠকমনকে স্পর্শ করে।

আসানসোল—সম্পাদনা : অমিয়রঞ্জন দাশ ও দুলাল কর্মকার। হরি ভট্টাচার্য রোড, আসানসোল।

এই মধ্যাঞ্চলিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আন্তরিক • বাসনায় প্রতিনিয়ত অবাঞ্ছিত রাহুর কালিমাখা দিনের সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্ব-ভরসার ফলশ্রুতিই ডাবলক্রৌন্ডি মেশিনে মুদ্রণ এবং আত্মপ্রকাশ। ছবি, অলংকরণও আছে যথারীতি প্রচলিত নিয়মানুসারে। সাধুবাদের এ প্রশংসনীয় উদ্যম।

প্রাপ্তিস্বীকার

ধ্রুবদূ—সম্পাদনা : লোকেশ ঘোষরায়, গৌতম গোস্বামী প্রমুখ। ৫৩ডি, হরমোহন ঘোষ লেন। কলকাতা-১০।

নবীন সূর্য — সম্পাদক : সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪ তালীপাড়া রোড, বেহালা কলকাতা-৩৪। চল্লিশ পয়সা।

শিশু আলোপন—সম্পাদক : সঞ্জিতকুমার সাহা। সরযূপ্রসাদ রোড, মালদহ। ২৫ পয়সা।

লিরিক—সম্পাদনা : সুময় জোয়ারদার। ৮০।১৩, বাগুইপাড়া লেন, কলকাতা-৩৫। পনেরো পয়সা।

সৈকত—সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র পার্ক, ফুলিয়া কলোনী।

উষালোক—সম্পাদক : সমরেন্দ্রকুমার রায়। ইমামবাজার রোড, হুগলী। তিন পয়সা।

গান্ধার—২৬ মহেশ সরকার লেন, খাগড়া বহরমপুর। পঞ্চাশ পয়সা।

পালাজ্বর—সম্পাদনা : রঞ্জিতকুমার সরকার, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উখরা, বর্ধমান। পঞ্চাশ পয়সা।

অনুপম—সম্পাদক : মৃগাঙ্ক রায়, সমরেন্দ্র দাস। ১০ সিদ্ধেশ্বরীতলা লেন, হাওড়া-১। ষাট পয়সা।

সংকেত—সম্পাদক : পূর্ণচন্দ্র সাহা। ৩৩।৬ মুরারীপুকুর রোড, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা।

লেখনী—সম্পাদনা : মহাদেব নন্দী। হাটখোলা, চন্দননগর। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রান্তিকা—সম্পাদক : তারাপদ দে। গড়পড়িয়া, বাঁকুড়া। ত্রিশ পয়সা।

প্রশ্ন—সম্পাদক : বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য। শিলচর-১। আসাম। এক টাকা।

দৃক্—সম্পাদক : শিমূল রায়। ১ কান্তিচন্দ্র গোস্বামী লেন, বালী হাওড়া। এক টাকা।

জাগরণ—সম্পাদক : গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈত্রী সংঘ, দত্তপুকুর ২৪-পরগণা।

চন্দনী—সম্পাদনায় : স্বরূপ গুপ্ত। ডাঃ যোগেশ্বরী শ্রীমানী রোড, চন্দননগর, হুগলী। চব্বিশ পয়সা।

বঙ্গ স্বাক্ষর—সম্পাদক : নির্মল আচার্য। কাবেরীশা, ১৬ ধীরেন ধর সরণী, কলকাতা-১২। দু-টাকা।

বহিদৃষ্টি—সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ মন্ডল। গরিফা, হালতু, ২৪-পরগণা। এক টাকা।

কিশোর কল্যাণ বার্ষিকী—কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ২২ টেগোর কাসল স্ট্রীট, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা।

অরুণাভা : সম্পাদনা : অমলা গঙ্গোপাধ্যায়। সারাঙ্গাবাদ। বজবজ। ২৪-পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

সাহানা : সম্পাদনা—গোপেন লাহিড়ী। ২৫।১ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—২৫। দাম দু' টাকা।

সপ্তস্বর—সম্পাদক : সেখ নজরুল ইসলাম। ধূলাসিমলা, হাওড়া। দেড় টাকা।

বর্ণালী—সম্পাদক : জয়দেব দাস। মধুবাটী, বলরামবাটি, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

পার্থসারথি—সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ। ৩০, রাজকুমার মুখার্জি রোড, কলকাতা-৩০। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

রোদ্দুর—সম্পাদনা : বিজলী চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন দেব, প্রণব রায়। ১৭।২৭, এডিসন রোড, দুর্গাপুর-৫। পঁচাত্তর পয়সা।

CENTRAL LIBRARY

কাশীপুরের বাঘের আত্মহত্যা

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে বাঘ নিশ্চয় মাঁড় থেকে সরে গেছে। বেশ বুঝতে পারলাম পাশে বসে বন্ধু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, বাঘ দেখি নি। 'এ-ডি' অবরুদ্ধ স্বরে চুপি চুপি বললেন,— বাঘ এসেছিলো। অত দেরী করলে কি হয়? দূর থেকে মাঁড়ের কাছে আসা ও তার পাশে গিয়ে বসা তিনি বেশ দেখেছেন,— আমি দেখতে পাইনি। এমন সুযোগ নষ্ট করেছি। বাঘ চলে গেছে আর সে আসবে না। রাত একটার পর আমি তাঁকে শুতে বললাম। যদি বাঘ আসে আমি ঠিক তাকে কায়দা করব। তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাত্র মিনিটের পর গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোর ছোঁয়া লাগলো। মশার ভন ভন শব্দ, পোকার মিশ্র ডাক, নিশাচরের কর্কশ আওয়াজ অব্যাহত হয়ে রইলো। শুকনো পাতা ডাল মাড়িয়ে বাঘ আসার কোন শব্দ পাওয়া গেল না। ঘোর ঘোর জোট-বাঁধা অন্ধকার একটু পাতলা হয়েছে দ্বাদশীর চাঁদের আলোয়, ভোরও কাছে এসেছে। বসে থেকে মাঝে মাঝে তন্দ্রা এলো, দুঃস্বপ্নে চোখ বুজে গেলো। ঘুম কাটানোর জন্য ফ্লাস্ক থেকে একটু কফি খেলাম। ক্রমে অন্ধকারের নিবিড়তা একটু তরল হোলো। আকাশে ঊষার ছটা ছড়িয়ে গেলো। ঘুম ভেঙে 'এ-ডি' উঠে বসলেন। এবার যত্ন করে পাইপ ধরালাম। বেশ ফর্সা হয়ে এলো। হঠাৎ একটা, তারপর কয়েকটা 'খারগ' ডেকে উঠলো। দূর থেকে ময়ূরের ডাক বিঘোষিত হোলো 'কি-কও', 'কি-কও'। বনের পথ ধরে হাতী আসার আওয়াজ ও মাহুতের গলার স্বর শোনা গেলো। আমরা যে যার রাইফেল থেকে টোটা খালি করে নিলাম। একটু পরেই হাতী মাচার নিচে এসে দাঁড়ালো। মাচান থেকে একটা ডালে নেমে সেখান থেকে হাতীর পিঠে চড়ে এলাম। 'এ-ডি' আমাদের জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে দিয়ে নিজে নেমে এলেন। তারপর হাতীকে মাঁড়র কাছে নিয়ে যেতে বললেন 'এ-ডি'। আমরা নেমে মাঁড়টা ও তার চারপাশ পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম যে জানোয়ার রাতে এসে মাড়ির মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সে বাঘ নয়, শুয়োর। শুয়োরের খুরের দাগ রয়েছে স্পষ্ট। কাছেই ছিল একটা ভেজা ভেজা নালা, তার কাদায়ও ওই খুরের দাগ। বেশ বোঝা গেলো রাইফেল তুলে ধরবার সময় আমার নড়া-চড়ার ও টর্চের আলো ফেলায় সে নালা পার হয়ে চলে গেছে।

৬

বাংলোয় ফিরে এসে সেদিন শুধু বিশ্রাম ও নিদ্রায় কাটালাম। বাঘের খবরাদি পেয়েও দুবার শিকার চেষ্টা ব্যর্থ হোলো। 'এ-ডি' বললেন, খাঁটি শিকারী দুজন নতুন খবরের চেষ্টায় গেছে, বিকেলে তারা আসবে।

বিকেলে দুজন খাঁটি শিকারী এসে 'এ-ডি'কে সেলাম দিলো,—একজন ছ' ফুট দীর্ঘ শিখ হীরা সিং, দ্বিতীয়, মুসলিম যুবক নবি রাজা। ওদের খবর—দুটি কাটরা বাঁধা হয়েছিলো বাঘ চলাচলের পাঞ্জা দেখে দু-জায়গায়, তার একটারও মার হয়নি।

তাদের 'এ-ডি' বলে দিলেন দুটির একটিকে নরখনের নালার ধারে বাঁধতে, সেখানে গেলো বছর বাঘ শিকার হয়েছিলো। অপরটিকে একটু দূরে একটা হোগলার বিল আছে, তারই পাড়ে বাঁধতে। সেখানেও একবার বাঘ মারা হয়েছে। জায়গাটা একটু গ্রাম বসতির অন্তরালে ও বাঘের চলাফেরার রেওয়াজ আছে।

ওরা একটা নতুন প্রস্তাব করলো, কোশী নদীর কোল বরাবর আখের খেতে হাতী দিয়ে হাঁকা করে দেখতে পরদিন সকালে। কয়েকদিন আগে ওরা বাঘের পাঞ্জা ওখানে দেখছে। স্থির হোলো পরের দিন সকালে আখের খেতে বাঘের চেষ্টায় বসে না পাওয়া গেলে রাত্রে অন্য এক জঙ্গলে গাছে মাচা বেঁধে কাটরা রেখে বসা যাবে; সেখান দিয়েও বাঘের যাতায়াত হয়।

শিকারী দুজন চলে গেলে 'এ-ডি' বললেন,—হীরা সিং বাস্তুহারা শরণার্থীদের একজন। চাষের জমি ও থাকবার কুটির পেয়েছে। ওদের ক'জন একজোটে চাষের বলদ আর দুধেলা গরু পালে। সেই গোয়াল থেকে বাঘ গরু মেরে নিয়ে গেছে। তাই হীরা সিং-এর আক্রোশ।

নবি রাজা এই অঞ্চলেরই মুসলিম। আদি পেশা ছিল মোরাদাবাদে বাসন মিলের কাজ করা। সে কাজে মন্দা আসায় তার বাবা আলিরাজ ও সে মোরাদাবাদ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বসবাস করছে ও মোটর মেকানিকের কাজে কিছু উপায় করে। তা ছাড়া বাপ বেটা দুজনেই শিকারীর কাজ করেও রোজগার করে। সম্প্রতি নবি রাজার একটা খুব ক্ষতি হয়েছে। উদ্বাস্তুদের একটি মেয়ের সঙ্গে ওর আশনাই হওয়ায় মেয়েটি স্বেচ্ছায় চলে এসে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নবি রাজাকে বিয়ে করে। মেয়েটির জাত-ভাইরা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের বাড়ী চড়াও হয়ে মেয়েটির ধর্মনাশ করে। আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। কিন্তু উদ্বাস্তু ও পুলিশের কারসাজিতে ধর্ষণ প্রমাণ হয় না। মাত্র দিন দশ-পনেরো আগে রায় বেরিয়েছে যে আসামীরা নির্দোষ। ফলতঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক, মামলার ভিত্তে আসামীর দল নবি রাজাদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। নবির অবস্থা কাহিল। কিন্তু বাঘের খোঁজ-খবর নিতে ও শিকারের সংগত জায়গা বাছতে একেবারে ওস্তাদ। তাই ওকে ডেকেছি। আর এতে ওর মন একটু চাঙ্গা হবে।

সে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম, গাছের ওপর মাচায় বসেছি। নিচে ঝোপের খুঁটিতে বাঘ এসেছে। আমি রাইফেল তুলে তাগ করতে যাবো এমন সময় ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে মাচাকে জড়িয়ে ধরে আমার দিকে মুখ তুলে বলে—'মেরে মেরে ফেলবে? রক্ষাকর্তা-স্বরূপ বললো—আমি মাতঙ্গিনীর জেনানা। তুমি আমার ধর্মনাশ করেছিলে মনে আছে? এখন আমি বাঘ হয়ে তার শোধ নিলাম।'

পরের দিন সকালে চা'র পর আখের খেতের উদ্দেশে 'এ-ডি'র সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে রওনা হলাম। জায়গাটায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে হাতীর পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে একটা শিরীষ গাছের ডালে উঠে বসলাম। 'এ-ডি' উঠে এসে আর একটা ডালে বসলেন। শিকারী অনুচররা রাইফেল টোটা জলের বোতল তুলে দিল। ঠিক করে বসে রাইফেলে উভয়েই টোটা ভরে নিলাম। রিক্ত ডালে পা ঝুলিয়ে বসে মনে চিন্তা খেলে গেলো বাঘ দৌড়ে এসে লাফিয়ে যদি পা-টা ধরে নেয়? না, কখনই না। বেশ উঁচুতে আছি। বাঘ এলে লাফ দেবার আগেই তাকে গুলি করতে পারবো। কত উঁচুতে বাঘ লাফাতে পারে? ডালটা হবে আন্দাজ এগারো বারো ফুট উঁচু, বাঘ কি অতটা লাফিয়ে উঠতে পারে? কোনো কোনো শিকারের গল্প পড়েছি বাঘ লাফিয়ে মাচায় উঠে শিকারীকে জখম ও হত্যা করেছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি। গাঁড়ি বেয়ে মাচায় উঠতে পারে কিন্তু লাফ দিয়ে অতটা না। অবশ্য গাঁড়ি বেয়ে ওঠা বাঘকে মাচা থেকে গুলি করা শক্ত।

খানিকক্ষণ অন্যমনা হয়েছিলাম; দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ আসতে লাগলো। আখের খেতের প্রান্ত থেকে হাঁকাই সুরু হয়েছে। দুটি হাতী আগে থেকে পাঠানো হয়েছিলো; আমাদের গাছে তুলে দেওয়া হলে মাহুত শিকার অনুচরদের আরোহী করে হাতীদের খেতের প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলো। হাঁকাইয়ের আওয়াজ কানে আসতেই উৎকর্ণ হয়ে সেই দিকে প্রখর নজর রেখে নিস্পন্দ হয়ে বসলাম। রাত্রে আলো ফেলে স্থানু বাঘের ওপর স্থির নিশানা করে গুলি চালানো আর দিনে তাড়া দেওয়া পালায়মান বাঘের ওপর নিশানা বিনাই গুলি চালানো আসমান-জমিন তফাৎ। রিক্ত গাছের ডালে বসে থেকে ডালের নিচের দিকে বেদনা বোধ হতে লাগলো, যেন ভোঁতা দা দিয়ে ডাল আঘাত করছে। ঘড়িতে বেলা দশটা। রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বাতাস তেতে উঠেছে। দেখা গেল দূরে আখের দোল। দুটি হাতীর পিঠে বসা মাহুত ও হাঁকাই-কার শিকারীদের মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে; হাতীরা ঢাকা পড়েছে আখের আড়ালে আর মানুষগুলো যেন সাঁতরে আসছে আখের ডগার ওপর দিয়ে। এই সময় হঠাৎ দুটি হাতীরই আরোহী বলে উঠলো—'উস্ বাতা হয় শের'। মুহূর্তের মধ্যে যে দৃশ্য দেখা গেলো তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি সম্মোহক। কমবেশী পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা প্রোজ্জ্বল আগুনে রঙের বিরাট জানোয়ার আখের ওপর দিয়ে আকাশ সটান বিলম্বিত হয়ে তীরের মত দিয়ে দূরে পড়ে আখের ক্ষেতের মিলিয়ে গেলো। পলকের ভেতর আবার দিল লাফ। রাইফেল হাতে আকৃষ্ট হয়ে-বসা রইলো; মন সম্মোহিত। তিনবার হোলো বাঘের লাফ; তিনবারই আট-দশ ফুট আখের ওপর দিয়ে, দৈর্ঘ্যে বিশ-বাইশ ফুট জমি উত্তীর্ণ হয়ে। গল্প-বিবরণের কথা নয়, প্রত্যক্ষ দেখা। বাঘ কত উঁচুতে লাফাতে পারে, এক লাফে কতটা দৈর্ঘ্য ডিঙোতে পারে আমার কাছে তার মীমাংসা হোলো সেদিন।

হাতী দুটি এলে আমরা গাছ থেকে নেমে তাদের পিঠে সওয়ার হলাম, একটিতে 'এ-ডি', অপরটিতে আমি। 'এ-ডি' মাহুত-দের বললেন পাশের খেতে যেতে—যাতে বাঘ গিয়ে ঢুকলো,—হাতী চালিয়ে ছেঁকে দেখতে। রাইফেলে টোটা ভর্তি করে হাতে ঠিক করে নিয়ে বসে রইলাম, হাতী দুটি পরস্পরের মধ্যে শ'-মিটার ব্যবধান রেখে সারা খেত ছেঁকে এলো। এক একবার মাহুত 'শের উস্ বাতা' বলে ফিস ফিস করলো, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু দেখা গেলো না। সে খেত ও পাশের আরও দুটি খেত ছেঁকে দেখে শেষে বিফল হয়ে অবসন্ন মনে বাংলোয় ফিরলাম।

বিকেলে গোধূলির আগেই পূর্ব সংকল্প মত নিচে কাটরা বেঁধে একটা গাছে মাচায় উঠে আমরা বসলাম। যে জঙ্গলে স্যর আজার সিং-এর জন্য মাচা বাঁধা হয়েছিল এ জায়গাটা তারই এক প্রান্তে। চারপাইয়ের মাচা; তোষক চাদর বিছানো, ডাল পালা দিয়ে আড়াল করা। রাইফেল টোটা বাতি চা খাবার বালিশ ব্যাগ—সব মজুত। প্রথম রাতে শিকারে বসার পুনরাবৃত্তি। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে গেলো। বনের পশু পাখীরা এদিক-ওদিক চলে গেল। ক্রমে অন্ধকার, তারপর তা হোলো গাঢ়, গাঢ়তর। দূরে দূরে মিলিয়ে গেলো ময়ূর, চিতা, কাঁকরের ডাক। ছেপকার টিক শব্দ তীব্র ও কর্কশ হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে যোগ দিলো ঝিল্লি—সর-সর ঝিঁ-ঝিঁ-ঝপ ইত্যাদি বনের ঘুম ভাঙ্গা নানা শব্দ। অন্ধকার গাঢ় হতেই কাটরটা ভয় পাওয়া ডাক ডাকতে লাগলো। এতক্ষণ সে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে নিশ্চিন্তে তার মুখের সামনে রাখা ঘাস খাচ্ছিলো। তার ভয়ার্ত ডাকে বার বার মনে হচ্ছিল বুঝি বাঘ এসে পড়েছে তা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বাঘ আসার কোন চিহ্ন দেখা গেলো না।

রাত একটার পর একটা কাঁকরের ভয়ার্ত ডাক দূরে শোনা গেলো। কাটরা ততক্ষণ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পা গুটিয়ে বসে পড়েছে, আর ডাকছে না। কিছু পরে বনের অপর প্রান্তে ফেউ ডাকতে ডাকতে চলে গেলো। 'এ-ডি' কানের কাছে মুখ এনে বললেন—ওই দূর দিয়ে বাঘ চলে গেলো, তাই কাঁকরের ভয়ার্ত ডাক। ফেউটাও বাঘের পাশে পাশে বনের বেড় দিয়ে চলে গেলো। বাঘ এদিকে আর আসবে না। শুয়ে পড়ুন বলে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমিও নিদ্রাগত হলাম।

ভোরের আলো হলে দেখা গেলো কাটরাটি পা মুড়ে নিশ্চিন্তভাবে বসে

আছে। বাঘ আসেনি। হাতী দুটি এলে আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। চারপাই মাচারে নেওয়া হলো।

আগেই স্থির হয়েছিলো বাংলোর ফেরা হবে না। শরণার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটা নতুন রাস্তা গড়ন করা হচ্ছে, তার তত্ত্বাবধান ওভারসিয়রদের একটা তাঁবু পাতা হয়েছে,—যাওয়া হবে সেখানে। শরবনের নালার আর হোগলা-বনের পাড়ে যে দুটি কাটরা বাঁধা হয়েছিলো তাদের কারুর মার হয়েছে কিনা, শিকারী দুজন, হরা সিং আর নবি রাজা খবর আনবে সেখানে। যদি কোনটির মার হয়ে থাকে ও তাঁবু থেকেই যাওয়া হবে আর হাঁকা করা হবে হাতী দিয়ে। বাঘকে ফুরসৎ দেওয়া হবে না—বড় চতুর বাঘ।

তাঁবুতে পৌঁছে মুখ ধোয়া গোসলাদি সেরে হালুয়া-চা-এর প্রাতরাশ হোলো। দুজনের জন্য দুটি ডেক চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছিলো। তাতে গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে চোখ বুজে এলো। মাচায় দু রাত্রির আর গাছের ডালে একবেলা বসে কাটিয়ে গা-গতর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলো। বিফলতা থেকে এসেছিলো মানসিক ক্লান্তি, অস্পৃহা। ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখলাম মাচায় বসেছি। —একটা বাঘ এলো নিচে। তাকে বলছি, ৮—৯ ফুট উঁচু আখের ওপর দিয়ে ত অনায়াসে লাফ দিয়ে গেলে দেখলাম। কই লাফ দিয়ে উঠে এসো ত এই ১২ ফুট উঁচুতে। একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেলো। শিকারী হীরা সিং-এর সঙ্গে এ-ডি উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। হীরা সিং-এর খবর, কাটরা মার হো গয়া, শের ভি বৈঠ গয়া। মোষের বাচ্চা মেরে বাঘ শরবনে ঢুকেছে আর বেরিয়ে আসেনি। বাঘের আক্রমণ কালের পায়ের দাগ, কাটরার আত্মরক্ষার চেষ্টার খুরের দাগ, শরবনে বাঘের প্রবেশের থাবার দাগ আর বেরিয়ে আসার থাবার অভাব দেখে শিকারী সিদ্ধান্ত করেছে। হীরা সিং বলল, যেখানে বাঘ ঠাঁই নিয়েছে সেই প্রান্ত থেকে হাতী দিয়ে হাঁকা করে বাঘ তারা বের করে দেবে, তারপর তাকে মারতে পারা আমাদের হাতযশ।

খবর শুনে মুহূর্তে মধ্যে শরীর মনের অবসাদ দূর হোলো। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। অন্ততঃ পাল্লার ভেতর বাঘকে পাবো; আর আমার রাইফেল হোলো সিদ্ধ মার। পাল্লার ভেতর বাঘ পেলে মার ফস্কাবে না। রাইফেল কার্তুজ ব্যাগ নিয়ে হাতীতে উঠতে যাবো এমন সময় নবিরাজা এসে খবর দিলো দ্বিতীয় কাটরারও মার হয়েছে। শুনে এ-ডির মুখ হলো উজ্জ্বল, বললেন, এবেলা প্রথমটা সেরে ওবেলা দ্বিতীয়টায় বসা যাবে।

যে হাতী দুটি গত রাতের মাচা থেকে আমাদের নিয়ে এসেছিলো তাতে আমরা এক একজন বসলাম। এবার এ-ডি সঙ্গে নিলেন লণ্ডনের বিখ্যাত কারিগর বাঁধানির তৈরী তাঁর দোনলা ১২-বোরের বন্দুক।

তাঁবু থেকে শরবনের নালাটি ছিল কম-বেশী তিন কিলোমিটার। পথে পড়ে খানিকটা পতিত জমি, কুশ ঝাড় আগাছায় ভরা। এর ভেতর পাখী হরিণ পাওয়া যাবে এই আশ্বাসে 'এ-ডি' রাইফেলে কার্তুজ ভরে নিতে বলে নিজের বন্দুকেও 'এল-জি' ও বুলেট ভরে নিলেন। বাঘের ওপর গুলিক্ষেপের প্রথম চান্স আমার। না পারলে বা দরকার হলে তিনি চালাবেন তাঁর বন্দুক। এই বন্দুকে তাঁর হাতে চৌকস খেলতো। আর্টিই সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম এই সেরা হাতিয়ার।

যা বলেছিলেন 'এ-ডি' ঠিক তাই। নাক দিকে একটু যেতেই সামনের একটা কুশবন থেকে একটা 'পাড়া' বেরিয়ে এসে একবার দাঁড়ালো। পর মুহূর্তে অল্প একটু দৌড়ে গিয়ে আবার দাঁড়ালো। আমার হাতীর মাহুতকে বলে হাতী দাঁড় করিয়ে আন্দাজ করে ১৮০ গজ দূরের একটা স্ন্যাপ-শট। 'পাড়া'টা পড়ে গেলো। অনুচরেরা

UCO-1/71

স্বাচ্ছন্দ্যে-ভরা
ভাবী জীবনের পথে
একটু একটু ক'রে
ইনি এগিয়ে
চলেছেন

ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমের সাহায্য নিয়ে

প্রতি মাসে মাত্র কিছু কিছু ক'রে টাকা তিনি ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে নিয়মমত জমিয়ে চলেছেন। মেয়াদ শেষে বেশ কিছু মোটা টাকা তাঁর হাতে আসবে।
মাসে কমপক্ষে ১০ টাকা আর সবচেয়ে বেশী ৪৫০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে হয়। রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউণ্ট একা কিংবা অন্য কারো সঙ্গে যুক্তভাবে খোলা যায়।

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস। কলিকাতা

ইউকোব্যাঙ্ক উন্নতির পথ সুগম করে

তাকে হাতীতে তুলে দিলো। হাতীরা আবার চলতে সুরু করতেই আবার এক 'পারা' ঝোপ থেকে বেরিয়ে চোখে চমকলাগা বিদ্যুৎ কয়েকটা লাফ দিয়ে আমাদের ডানদিকে ছুটলো। এ-ডির হাতীটি ছিলো ডাইনে। হাতীর চলার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তাকে না থামিয়ে, চলন্ত হাতী থেকেই তাঁর বন্দুকের এক গুলী ছাড়লেন। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়লো পারা। এই অসামান্য গুলি চালানো দেখে সকলে সমস্বরে বলে উঠলো 'সাবাস'। সেটাকেও তুলে নেওয়া হোলো। সেদিনের এই প্রাথমিক সাফল্যে আমার মনে বাঘ শিকারের সাফল্যের আভাস অনুভূত হলো।

৮

শিকারের জায়গায় পৌঁছে দেখলাম লম্বায় চওড়ায় প্রকাণ্ড নালা, বেবাক শরগাছে—যার নাম Elephant grass, ভরা। আগের বছরের দেখা; দৈর্ঘ্যে কিছু বেশী এক কিলোমিটার, প্রস্থে আধা। নালার জল শুকোয় না, পায়ের পাতা ডোবা, কোথাও আধ হাঁটু জল থাকে। জল থাকায় শরগাছ খুব সবুজ তেজী,—অনেকের ডগায় ওদের ফুটে আছে শাদা ফুলের পালক। নালাটা এঁকে বেঁকে গেছে, শরগাছগুলি তাতে টৈমমগ করছে। নালার পাড়েও ইতস্তত শরগাছ ঝাড় ও ফুলের ঝাড়—জলাভাবে ও গরমে সেগুলো শুকিয়ে গেরুয়া রং-এর হয়েছে। মাঝে মাঝে কাকার, ঢাক (পলাশ), জাম শিরিষ, বাবলা-গাছ আর ছোট আগাছার ঝোপঝাপ। নালার দুই প্রান্তের মাঝ বরাবর পাড়ের এক ঢাক গাছে আন্দাজ বারো চোদ্দ ফুট ওপরে পাশাপাশি দুটো ডালে দড়ি বেঁধে গত-রাতের ব্যবহৃত চারপাইটা ঝুলিয়ে দিয়ে একটা বন্দুক-মাচা বানানো হলো। আর দুটো ডালের সঙ্গে টানা বেঁধে তাকে সবল্ত করা হয়েছে। মাচার সামনে আড়াল করা ডাল-পালা ছেঁটে ফেলা হলো। তারপর এ-ডির নির্দেশে শিকারী অনুচরেরা মাচার আড়াআড়ি সোজা নালার শরগাছ হাত তিন চওড়া স্থানে কেটে শুইয়ে দিল, যাতে মাচা থেকে একটা ফাঁকা গলি দেখতে পাওয়া যায়, শরবনের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত। হাতীর তাড়ায় বাঘ যখন এই গলি পার হবে ঠিক সেই সুযোগে তাকে গুলি লাগাতে হবে। নইলে শরের ভেতর দিয়ে বাঘ নিজেকে লুকিয়ে রেখে চলে যেতে পারবে: অস্পষ্ট বা অংশত দেখা গেলেও তাকে নিঃসংশয় মারা যাবে না।

হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে গাছের ডাল ধরে গাছে চড়ে মাচার দিকে বসলাম এ-ডি ও আমি। চারপাইটার তোষক ও খাকি রঙের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গাছের আর কয়েকটা গাছে পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে দূরে এক-একজন 'স্টপ' (stop) শিকারী বসে গেল। ওদের কাজ, বাঘ মাচা বরাবর পৌঁছবার আগেই যদি আড়পাশে নালা ছেড়ে পাড় উঠে আসার চেষ্টা করে ও নিকটের বৃক্ষ থেকে হাতের কুড়ল বা অন্য হাতিয়ার দিয়ে গাছের ডালে আঘাত করে-তার শব্দে বাঘকে নিরস্ত করবে। তাড়াখাওয়া বাঘ যাতে শরবনে দেখানো গলিটা হয়ে পৌঁছে যায় তাতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই বন্দোবস্ত। মাচার আড়াআড়ি কয়েকটা ঝোপে খবরের কাগজ মেলে বেঁধে দেওয়া হলো।—ওই একই উদ্দেশ্যে।

শিকারের প্রস্তুতি পুরো হলে হাতী দুটিকে পাঠানো হোলো যেদিকে বাঘ থাকার কথা নালার সেই দিকের প্রান্তে; প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে। হাতী খানিক ডাইনে, খানিক বাঁয়ে ঢুঁড়তে সামনে এগিয়ে আসবে এক লাইন ধরে যাতে সারা শরবন—ভালো ছেঁকে দেখা হয়। হাঁকা শুরু হতে বিশ-পঁচিশ মিনিট লাগার কথা,—এ-ডি আমায় জানালেন। রাইফেলে কার্তুজ পুরে ঠিক-ঠাক করে রেডি হয়ে বসতে বললেন, আর নিজের বন্দুকে বুলেট ও 'এল-জি' ভরে নিলেন। আমার ·৩৭৫ ম্যাগনামে আমি ৩০০ গ্রেণ বুলেট ভরে নিয়ে ঘোড়ার খিল খুলে দিয়ে রাইফেলটাকে দু-হাতে নিয়ে কোলের ওপর রাখলাম, মুখটা একটু উঁচুদিক করে। বাঘ এসে গেলে পলকের ভেতর তুলে নিয়ে কাঁধে ঠেকিয়ে মারতে পারবো। 'এ-ডি' আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, শরবনের ভেতর দিয়ে বাঘের চলে আসা ঠাহর করতে পারবেন না। নজর রাখবেন গলির আগের শরগাছগুলোর ওপর; ওদের ডগা দুললে বুঝবেন নিচেই বাঘ। তারপর চোখের নিমেষে গলিতে এসে পড়বে। বড়জোর দু-সেকেন্ড নেবে গলিটা পার হয়ে যেতে। এইটুকু সময় আপনি পাবেন তাকে মারতে। ওর ভেতর গুলি ছুঁড়তে না পারলে আপনাকে আর সময় দেবো না, আমি চালাবো বন্দুক।' আমি সম্মতি জানালে আমার রাইফেলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন,—আপনারা ওই নিজের তৈরী ব্যাকসাইট খুলে রাখুন রাইফেল থেকে। ওর নিজ-ব্যাকসাইট ব্যবহার করুন। নইত পস্তাবেন শেষ পর্যন্ত।

ব্যাকসাইট মানে পাছ-নিশানী, backsight. যা হয় সাধারণত খাঁজকাটা। কিন্তু অসুবিধা হয়ে থাকে এতে। শিকার-পশুর বহু অনেকটা ঢাকা পড়ে টিপ করার সময়। নলের সাথে দৃষ্টি-সংকেত হয়ে এলে পরিক্রম ঠিক হয় না। একালের রাইফেলে খাঁজকাটা নিশানীর বিকল্পে বিঁধ করা ছিদ্র নিশানী peep sight লাগানো হয়, অনেক ক্ষেত্রে। সোম্কায় এর ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। আমি কিন্তু আমার সোনলায় নিজের তৈরী বিঁধ করা পাছ-নিশানী বসিয়েছিলাম কেননা এতে শিকার পুরোপুরি দেখা যায় এবং সময় লক্ষ্যেও পরিক্রম ঠিক করা যায়। চাঁদমারিতে ও শিকারে ব্যবহারেই আমি সন্তোষজনক ফল পেয়েছিলাম। অতএব আমি 'এ-ডি'র আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমার নিশানী অপরিবর্তিত রেখে বাঘ আসার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসলাম।

একটু পরেই দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো। হাঁকাই সুরু হয়েছে। হাঁকার আওয়াজ ও শিকারীদের কথা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম,—এই বুঝি বাঘ দেখতে পাবো; গলির কাছের শরের ডগা দুলে উঠবে। শিকারীদের কথা ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। 'এ-ডি' আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—বাঘ হাতীর পাশ কাটিয়ে সরে পড়েছে। ওদের কথা থেকে তিনি বুঝেছিলেন। মুখে তাঁর গাঢ় হতাশার ছাপ। হাতী দুটি কাছে এলে মাহুতদের ও শিকারীদের কাছে ওই খবরই পাকাপাকি পাওয়া গেলো। বাঘ ঘাড় নিচু করে বসেছিলো, হাতী কাছে এসে পড়লে সামনে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে 'এ-ডি' মাহুত ও শিকারীদের বললেন, দিল্লী ও কলকাতার তাঁর দুজন দোস্ত শিকারী এসেছেন; পাঁচ-দিন ধরে খেল চলেছে বাঘের পিছনে। গ্রামের গরু মোষ মেরে সাবাড় করছে বাঘ। হাতে পাওয়া বাঘ এই পাঁচ-পাঁচ দিনে সামনে হাজির করে দিতে পারলে না তারা! যত সব বেকুবের দল! আজ বাঘ বার করে দিতেই হবে, যাও আবার ফিরে। নতুন করে শরবন ছেঁকে হাঁকা করো। মাহুত দুজন একটু মৃদু আপত্তি জানালো: প্রত্যহ পাঁচদিন হাঁকা করে ও বনে ঘোরাঘুরি করে হাতীরা বেদম হয়ে পড়েছে। কিন্তু 'এ-ডি' তাদের আপত্তি নামঞ্জুর করলেন। বলে দিলেন বাঘ হলে প্রত্যেকে তাদের মজুরির ওপর একটি করে কম্বল পাবে। মাহুতেরা খুশী হয়ে শিকারীদের নিয়ে ফিরে গেলো নালার আগা থেকে আবার হাঁকা করে আসতে।

৯

হাতীরা চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেলো দ্বিতীয় হাঁকা সুরু হতে। বেলা তখন বারোটা। রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে। তপ্ত হাওয়ায় আকাশের নীল রং গৈরিক হয়ে আসছে। কদিন ধরে উত্তাপাঙ্ক চলেছে ১০৫।১০৬ ডিগ্রী। চোখে ঝিমুনি আসছে: গত রাতের পাওনা ঘুমের আর্জি। আস্তে আস্তে দূর থেকে প্রথমে অতি ক্ষীণ পরে স্পষ্ট আওয়াজ কানে এলো। বোঝা গেলো এবার হাঁকার বাঘ কায়দা হয়েছে। পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে পারে নি। হাতী দুটির লাইনের আগে আগে আসছে। আমাদেরই দিকে। সব জড়তা নিঃশেষে কোথায় চলে গেলো। দু-হাতে রাইফেল ধরে নির্নিমেষ চোখে দেখছি হাতী আসছে, শরের ডগা দুলে উঠছে কিনা, দেখতে লাগলাম। সেকেন্ড মিনিট কাটতে লাগলো যেন যুগে যুগে। ওই যে শরগাছের ডগার নড়া দেখা যাচ্ছে। আরও কাছে,— আরও কাছে। হঠাৎ পি সি সরকারের ইন্দ্রজালের খেলার আকাশ থেকে পড়ার মত দেখলাম ডোরা কাটা ধুলো মাখা বাঘ গলিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সাথে সাথে যখন রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে ধরলাম, নিশানীর ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখা নলের মাছি বাঘের বাঁ কাঁধের কোণে স্থির দেখে ট্রিগারে চাপ দিলাম, নড়তেও পারি নি। যেন সম্বিতের অপলাপে। সম্বিৎ হোলো যখন কার্তুজ ফাটল না। ঘোড়াটা জোরে চেপে গেলো, ফেললাম ক্লিক শব্দ পড়লো। বাঘ কেটে পড়ে। 'এ-ডি' ধমক দিলেন,—'কোথেকে পচলো কার্তুজ নিয়ে এসেছেন বাঘ মারতে?'

আমার জানত আমি তাজা কার্তুজই এনেছিলাম। আমার সন্দেহ হলো হয়ত আমি রাইফেলের গর্তে কার্তুজ ভরে দিইনি। তাড়াতাড়ি রাইফেল ভেঙে দেখি, কার্তুজ ঠিকই আছে; পিনের ঘা-এর দাগও আছে। ফোটে নি,—যে কোন কারণে হোক।

বাঘ ইত্যবসরে নালির পথ ধরে উঠে এসেছে পাড়ের ওপর ফাঁকায়। রাইফেলের আওয়াজ হলো না, 'এ-ডি' যা বললেন তা ফিস ফিস করে,—বাঘ আমাদের উপস্থিতি টের পায় নি। এক মনে সে চলতে লাগলো পাড়ের ধার দিয়ে, ব্যস্তভাবে নয়, সহজ কদমে। আমার রাইফেল চালানো ব্যর্থ দেখে 'এ-ডি' তাঁর বন্দুক তুলে বাঘের ওপর বুলেট ছুঁড়লেন। এক চিলতে সেকেন্ডে দাঁড়িয়ে তার সামনে ডান পাটা বেঁকে নিয়ে বাঘ এবার আমার দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত কদমে চলতে সুরু করলো। গোড়া থেকে সব সমেত খুব বেশী হয়ত আড়াই তিন সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হয়েছে। আমি ততক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হয়েছি। তাক খোলা রাইফেল বন্ধ করে আমি বাঘের দু-চোখের ঠিক মাঝখানে, কপালে অতি সযত্নে টিক্ করে রাইফেলের অপর নলের—বাঁ-দিকের, বুলেট ছুঁড়লাম। বাঘের মুখটা আমাদের দিকে ফেরানো ছিল,—তাই টিক করলাম কপালে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ থমকে দাঁড়ালো; লাফ বা দৌড় দিল না, গর্জন করলো না। যেন চিন্তিত, কে আওয়াজ করলো, কোন্ দিকে? পর মুহূর্তে তার পিছনের পা, প্রথমে ডাইনের তারপর বাঁয়ের মুড়ে জমিতে বসে পড়লো। যেন বসতে আদিষ্ট সার্কাসের বাঘ। হতভম্ব হয়ে আমি দেখছি,—'এ-ডি' বার দুই বললেন, 'আর একটা গুলি চালান, আর একটা—!' ততক্ষণে বাঘ তার সামনের পা দুটিও মুড়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। অবাক হয়ে আমি ভাবছি,—'শেষ?' 'এ-ডি' উল্লাস স্বরে বলে ফেললেন—'ও ত মরে গেলো!' বাঘের ল্যাজটা সিধে লম্বা শক্ত হয়ে বার দুই-চার আন্দোলিত হয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়লো। 'এ-ডি' আবার বললেন,—'ওই রকম ল্যাজ শক্ত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে নেতিয়ে পড়া বাঘের জীবন ত্যাগের লক্ষণ।'

চুপচাপ বসে বসে ভাবছিলাম—কী নিরুত্তেজক এই জীবন অবসান! এই মাত্র যে ছিল কত জীবন্ত, প্রাণবন্ত সে হলো এক নিমেষে একেবারে প্রাণহীন, মাংসপিণ্ড মাত্র?

হাতী দুটি এসে পড়লো। মাহুতের নির্দেশে এক হাতী পায়ের কাছ থেকে একটা বড় মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে মাহুতের হাতে দিল। মাহুত সেটা বাঘের পিঠে ছুঁড়ে মারলেও বাঘ রইল নিস্পন্দ। তার পর বাঘের কাছে হাতীকে চালিয়ে এনে এক বল্লম দিয়ে মাহুত বাঘের পাঁজরায় খোঁচা দিল। কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। তখন মাহুত ও শিকারীরা রায় দিল—'একদম খতম!' বেলা তখন দেড়টা।

পুনরায় আমার মন অবসাদক্লিষ্ট হলো: —একদম শেষ! কী দরকার ছিলো আমার ওকে বধ করবার? শুধু একটা নির্মম খেয়ালের ঝোঁকে! বাঘ শিকারের বাহাদুরি নেবার লোভে!

হাতী এসে আমাদের উভয়কে মাচা থেকে নামিয়ে নিল। আমাদের হাতিয়ার সরঞ্জামও নামিয়ে নেওয়া হলো। বড় পদক্ষেপে মাপ নিলাম মাচা থেকে বাঘ ছিলো কম-বেশী বাট কদম দূরে। খুব হৃষ্টপুষ্ট বাঘ। কিন্তু লেজ ছোট। চিৎ করে দিয়ে বাঘের নাকের ও লেজের ডগায় খুঁটি মেরে বাঘের লাস সরিয়ে খুঁটি দুটির ব্যবধান হলো—নফুট পাঁচ ইঞ্চি। লেজের মাপ, দু ফুট ন' ইঞ্চি। দেহের মাপের অনুপাতে লেজের মাপ ছ-সাত ইঞ্চি কম। লেজ প্রমাণ মাপের হলে বাঘের মাপ হতো পাকা দশ ফুট। আধুনিক কালের বাঘের দীর্ঘতমের তালিকায় পড়তো।

কোথায় গুলি লেগেছিল পরীক্ষা করে দেখা গেলো ডান পায়ের উরুতে 'এ-ডি'র বন্দুকের গুলি লেগে চামড়ার নিচে চর্বিতে পিছলে কনুয়ের কাছে মাংসপেশিতে আটকে উঁচু হয়ে আছে; হাতে ঠেকে। রাইফেলের গুলি লেগেছলো বাঁ চোখের কোলে কানের দিকে চোয়ালে। সেইখানে রাইফেল বুলেটের প্রবেশ চিহ্ন। চামড়ায় কড়ে আঙুলের ডগার মত গোল করে কাটা। এই বুলেটই মাথার ভিতরে পৌঁছে ওর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। যাতনাহীন অনির্মম মৃত্যু।

শিকারী অনুচরেরা সকলে ধরাধরি করে বাঘের লাস হাতীর পিঠে তুলে দিল। আমার সঙ্গে সিনে ক্যামেরা ছিল; বাঘ শুয়ে পড়লে মাচা থেকে সেটা চালিয়ে ছবি নিয়েছিলাম। নালি ধরে বাঘ পাড়ে উঠে আসার সময় রাইফেল ব্যবহারের আগে তার ছবি নেবার উদ্যোগ করেছিলাম কিন্তু ক্যামেরার আওয়াজ বাঘের কানে যাবে বলে 'এ-ডি' আমায় নিরস্ত করেছিলেন। হাতীতে বাঘ তোলার সময় আর এক প্রস্থ ছবি নিলাম। হাতীদের রওনা করিয়ে দিয়ে আমরাও বাংলোয় ফিরলাম।

স্নানাহার সেরে সামান্য বিশ্রামের পর সেই দিনই বেলা থাকতে দ্বিতীয় কাটরার হত্যাকারীর তল্লাসে আমরা রওনা হলাম। হাতী দুটিকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল আগেই। কাটরা মেরে বাঘ একটা শরবন-হোগলা-আগাছা ভর্তি নিচু জলা জমিতে ঢুকেছিলো। তার পায়ের থাবার দাগ জলাটার কিনারায় দেখলাম। বিরাট থাবা; দেখে আমরা অনুমান করলাম বাঘ দশ ফুটেরও বড়। এখানকার বাঘেদের বড় ঠাকুর্দা। যথারীতি জলাটার পাড়ে একটা গাছের মাচায় আমরা রাইফেল বন্দুকাদি নিয়ে উঠে বসলাম। হাতী দুটি চলে গেলো জলার দূর প্রান্তে, হাঁকা করে ঠেলে আসতে। সেখান থেকে সুরু করে শরবন হোগলা চষে শেষে মাচার কাছে পৌঁছলে মাহুত ও হাতীতে আরোহী শিকারীরা [illegible] দেখলো বাঘ মড়ি থেকে নিজের [illegible] কয়েকটা বড় হাড় [illegible] মাথার খুলি [illegible] পড়া। [illegible] শিকার [illegible] তখন এ [illegible] শেষ করেছে।

খানিকটা নিরাশ মনে ও অতি ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় ফিরলাম। ইচ্ছা ছিল যে বাঘটি সেদিন মড়ির সবটা খেয়ে সরে পড়েছিল পরের বছর এসে সেটির মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তা ঘটে ওঠে নি।

তার পরিবর্তে সে বছর এপ্রিলের আরম্ভে আমেরিকার প্রখ্যাত শিকারী ও শিকার মাসিক আউটডোর লাইফের সম্পাদক মিঃ জ্যাক ও কনার কাশীপুরে এসে বাঘটিকে ছুটন্ত অবস্থায় অনন্য দক্ষতায় তাঁর ·৩৭৫ ম্যাগনাম 'ওয়েদারবি' বুলেটে ধরাশায়ী করেন। নাকের ও লেজের ডগার খুঁটি পোঁতা মাপ দশ ফুট দু ইঞ্চি।

কাশীপুরের গোধরক গোষ্ঠীর বৃদ্ধ পিতামহ বাঘ পাট্টে পরা একহারা চেহারা যেন লঘু-কালো পাথরে খোদাই করা অবয়ব। ছাল ছাড়ানোর ছুরির কোপের সঙ্গে তার বাহুর ও বুকের মাংস পেশী কম্পিত হচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হলো সে যেন আমার দোনলা রাইফেলের দোসর, [illegible] ছিমছাম লাগসই হাতিয়ার। সরু হয়ে আসা পা-জোড়া যেন রাইফেলের সরু হয়ে আসা ডাণ্ডা নলি, কোমরের খাঁজ যেন রাইফেলের কুঁদির খাঁজ, সুডোল ঊর্ধ্বাঙ্গ যেন রাইফেলের কুঁদো। দেহের রংও স্টীল—নীল। এটা অবশ্য নিতান্তই আমার মনের খেয়াল। কিন্তু ওর সারা দেহ জুড়ে এমন একটি সঙ্গতি ও সুষমা ছিল যা দেখে সুনির্মিত রাইফেলের সঙ্গতি ও সুষমার কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল।

জামগাছের ডালে একটা জোরদার বিজলী বাতি টাঙানো হয়েছিল, সন্ধ্যা হয়ে আসায় তা জ্বেলে দেওয়া হলো। মাথার ছাল ছাড়াবার সময় খুলির পেছনে ছালের নিচে থেকে থেঁতলানো বুলেটটি বার করে আমার হাতে দিয়ে নবিরাজা বলল, 'বিলকুল সাবাস মার হুয়া থা!' হাঁকাই করা হাতীর পিঠে বসে সে আমার শিকার দেখেছিল। চোয়ালের গণ্ডাস্থি ভেদ করে বুলেট মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে গিয়ে খুলি পার হয়ে চামড়ার নিচে আটকে ছিল। বুলেটটা হাতে নিয়ে খুশি হয়ে তাকে বললাম,—বেশ ত, আসছে বছর আবার আসা যাবে বাঘ মারতে। হাত দুটি নামিয়ে রেখে অত্যন্ত বিমর্ষমুখে সে বলল,—কাশীপুরে ওদের দানাপানি শেষ হয়েছে। এবার তাদের এ শহর ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আমার প্রশ্নে সে বলে গেল তার দুর্দশা ও দুঃখের কাহিনী, তার স্ত্রী মুনিয়ার মরণ, লাঞ্ছনার সব কথা। বিভক্ত পাঞ্জাবের বাস্তুহারা পাঞ্জাবী জাঠের মেয়ে মুনিয়া।

পাঞ্জাব ত্যাগ করে আসার সময় পথ-কষ্টে ও রোগে পথেই তার মার মৃত্যু হয়। মুনিয়ার বাবা ও মুনিয়া আশ্রয় পায় কাশীপুরের উদ্বাস্তু পল্লীতে। নিকটেই নবিরাজার বাবা আলি রাজার বাসা। আলি রাজা ও তার ছেলের কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ছিল না। দেশওয়ালী সকল শ্রেণীর

সম্পেই তাদের অবাধ মেলামেশা ও ভ্রাতৃভাব ছিল। মুনিয়ার বাবা ও জ্ঞাতীরা কাশীপুরে এলে আলি রাজা তাদের বাসা নির্মাণ কাজে, গরুর বলদ লাঙল সরঞ্জাম প্রভৃতি যোগাড় করে দিতে সাহায্য করত। এদিকে জেনানা মহলে আলি রাজার ঘরে এসে মুনিয়া গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজে সাহায্য করতে থাকে। আস্তে আস্তে নবি রাজার সঙ্গে তার আসনাই আরম্ভ হয়। পরিশেষে বাবার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় মুনিয়া নবি রাজাকে স্বামীত্বে বরণ করে। মুনিয়ার বাবার এ বিয়েতে অমত ছিল না, শুধু আত্মীয়-স্বজনের অমত ও বিরোধিতার ভয়ে বাবার আশ্রয় ছেড়ে,—মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নবিকে বিয়ে করে। তারপর থেকে শুরু হয় তাদের ওপর মুনিয়ার জ্ঞাতিগোষ্ঠির নানা জুলুম-বাজী ও ভয় প্রদর্শন। তারা চায় মুনিয়া নবি রাজাকে ত্যাগ করে চলে আসুক। মুনিয়ার পণ জীবন থাকতে নয়। এর ফলে, একদিন নবি রাজা আর একদল দিল্লী আগত শিকারীদের নিয়ে বাঘ শিকারে গেলে, মুনিয়ার জ্ঞাতিভাই কয়েকজন ওদের বাসায় চড়াও হয়। আলি রাজাও গিয়েছিল তার আপন কাজে। মুনিয়াকে একলা পেয়ে এদের দু-তিনজনে বলপ্রয়োগে ধর্ষণ করে। একটা টাঙ্গি নিয়ে তাদের একজনকে সে আঘাত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু সে তেমন অনিষ্টকর হয়নি। সংখ্যায় তারা ছিল বেশী, অল্প আয়াসে তারা মুনিয়াকে দমন করে ও একে একে দু-তিনজনে চরম বে-ইজ্জৎ করে। মুনিয়া কামড়ে ও অস্ত্রাঘাতে প্রত্যেকের রক্তপাত করে, কিন্তু রোধ করতে অপারগ হয়। নবি রাজা বাসায় ফিরে এসে সব শুনে থানায় নালিশ লেখায়। আদালতে মামলা হয়, কিন্তু জাঠ জাতীদের মিথ্যা সাক্ষ্য ও কতকটা পুলিশের কারসাজিতে ফরিয়াদি পক্ষের সাজানো মামলা এই রায় হয় ও আসামীরা বেকসুর খালাস পায়। এরপর কাশীপুরে বাস করা নবি রাজা ও মুনিয়ার পক্ষে প্রাণহানিকর হবে। রায় বেরিয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। এর মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে নানাভাবে।

শুনে নিষ্ফল উত্তেজনা ও ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে কিছুকাল বসে রইলাম। রাত্রি দশটা বেজে গেলো ছাল ছাড়ানো শেষ হতে। নবি রাজা বিদায় চাইলে তাকে বললাম—পরের দিন সে যেন বাংলোয় এসে তাদের বাসায় আমায় নিয়ে যায়। তার পাওনা বখশিসও তখন দেব ও অমন যার মনোবল ও সঙ্কল্প নিষ্ঠা সেই মেয়ে মুনিয়াকে দেখে আসবো।

(১১)

সেদিনের চিত্র স্পষ্ট করে মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। খাপরার চালের ইঁটের ছোট একটি কুটির। সামনে একটু বারান্দা। সকালে এক দফা হীরা সিং, নবি রাজা মাহুত দুজন আর শিকারী অনুচরদের তাদের পাওনা রোজ, বখশিস আর একটি করে কম্বল দিয়ে বিদায় করা হয়েছে। বিকেলে একটু তাপ কমলে নবি আমায় নিয়ে গেছে তাদের বাসায়। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে আমায় পরিষ্কার সুজনি পাতা এক চারপাইয়ে বসতে দিলো। দুটি বালুসাই রাখা প্লেট হাতে নিয়ে তার স্ত্রী মুনিয়া ভেতর থেকে এসে আমার সামনে এক টুলে রেখে দু-হাত জোড করে নমস্কার করলো। জাঠ মেয়ের দেহে উদ্ধত যৌবনের রূপ লাবণ্য। নবি রাজার হাতে চায়ের পেয়ালা পিরিচ।

দুষমণরা তার ওপর হামলা করেছে কিন্তু সে সুবিচার পায়নি বলে কত দুঃখিত হয়েছি। আর তাদের সঙ্গে সে লড়েছে, তাদের আহত করেছে,—এমন সাহসিকাকে দেখতে ও সাবাস জানাতে এসেছি,—বললাম মুনিয়াকে। থানত মুখে তার একটা ম্লান ছায়াপাত হলো। বললো, একলা সে ওই জানোয়ারদের রোখ সামলাতে পারেনি। জখম হয়েছে। কিন্তু জিৎ তারই হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল,—আদালতে সুবিচার পাওয়া যায়নি বলে তার দুঃখ নেই। তার আপশোষ ধর্ম নিয়ে হিন্দু-মুশ্লিমের বিভেদ দুনিয়ায় এই সেরা দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনকে কী বিপুল বিপর্যস্ত ক'রে চলেছে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হিন্দুস্থানকে ভেঙ্গে ছারখার করে দিলো। সেই একই বিদ্বেষ তার ব্যক্তিগত জীবনকে চুরমার করে দিতে চায়। কিন্তু ধর্ম নয়, মানব প্রীতি, প্রেমই বড় তার এই আদর্শ-চ্যুতি ঘটাতে পারেনি। সে জাঠ চাষীর মেয়ে হলেও স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। ইতিহাসের কেতাবে পড়েছে পাঠান মোগল যখন হিন্দুস্থানে সাম্রাজ্য গড়েছিল তখন এ বিদ্বেষ মাথা তুলে ওঠেনি। অনেক জাতির, অনেক ধর্ম-বিশ্বাসের সমন্বয় হয়েছে এখানে বলেই এদেশের গৌরব। আকবর বাদশা হিন্দু মুশ্লিম নির্বিশেষে তাঁর হারেমে রমণী বরণ করেছিলেন। তেমনি জাতধর্মনির্বিশেষে মন্ত্রী ও সেনানায়কত্ব পদে বসিয়েছিলেন। স্থাপত্যে, চিত্রাঙ্কণ শিল্পে, সঙ্গীতে ও নানা বিষয়ে হিন্দু-মুশ্লিম অবদান সমন্বয় হয়েছিল। শিখ ধর্মে হিন্দু-মুশ্লিম ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও কয়েকটি ছোটখাটো ধর্ম-সংস্কারও মুসলিম ধর্মের স্পর্শ ও ধাক্কা লাগার ফল। মুনিয়া বলে গেলো এসব কথা তার স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রীদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। আর ইংরেজ বণিক এসে রাজ্যপাট অধিকার করে তাদের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় তিনশ বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে আজ দেশ নায়কদের দিয়েই দেশ-বিভাগ সম্পন্ন করে হিন্দুস্থানের এক মহা সর্বনাশ সাধন করলো। এত বড় একটা সমন্বয়,—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এই দেশেই এতদিনে সুসাধিত হলে তার বিজয়—বৈজয়ন্তী ওড়াতে পারতো। আর কি কখনও তা হবে?

মুনিয়ার দৃপ্ত কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে রইলাম। উত্তর দিতে না পেরে নীরবে ফিরে এলাম।

আমার গল্প বলা শেষ হলে হিরণকুমার বললেন,—ওদের তারপর কী হলো?

বললাম, পরের বছরে আবার এ-ভিত্র আসলে কাশীপুরে গিয়ে শুনলাম নবি রাজা মুনিয়া ও নবির বাবা আলি রাজা কাশীপুর ত্যাগ করে গেছে।

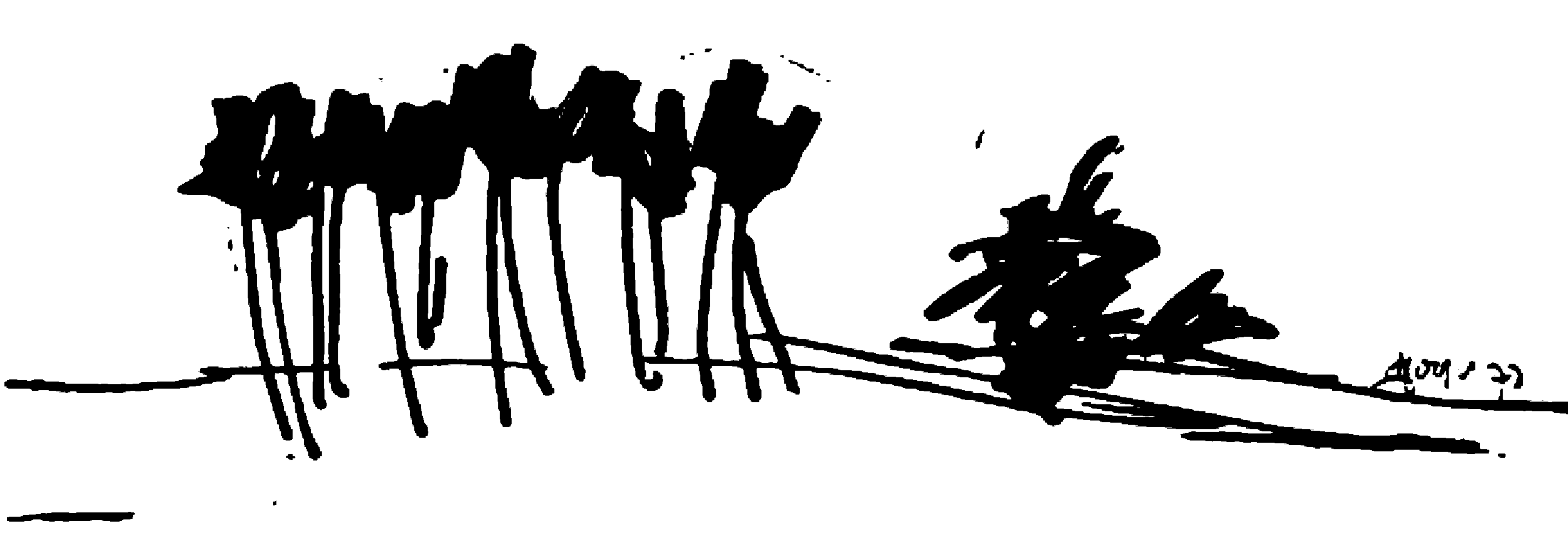

মুক্তা

কৃত্রিম মুক্তা

বিজ্ঞান প্রিয়

অন্ধকারময় শুক্তির গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তা কবে যে আলোর মুখ দেখেছিল, আর কবেই বা সে মানুষের দৃষ্টির গোচরে এসে তাকে মুগ্ধ করেছিল, অথবা কে যে তার আবিষ্কারক আমরা তা জানি না; তবে, এ-কথা বলতে পারি—হীরা যদি হয় রত্নরাজ, মুক্তা রত্নরানী।

সাগর-মণি মুক্তা হলো অন্যতম বিরল রত্ন বা জহরত। আমাদের শুধু বলি কেন, বোধহয় সকল দেশের সমৃদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যে, মুক্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ভূষণের উপাদানরূপে মুক্তার কথার ছড়াছড়ি। দেবদেবীর বর্ণনামূলক স্তোত্রে বর্ণনায় যেমন মুক্তাভরণের উল্লেখ আছে, তেমনি প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্যে দেখা যায় মুক্তার অলঙ্করণ। মুক্তার অপর নাম মৌক্তিক বা মোতি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় মুক্তাকে তেজস্কর ভেষজের উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। মুক্তাভস্ম-কে আধুনিক 'কোরামিন'-এর সঙ্গে বোধহয় তুলনা করা যেতে পারে। তবে, মুক্তার সবচেয়ে আদর নারীর সম্ভ্রান্ত অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে। তার একটি বিশেষ কারণ হয়তো এই যে, একমাত্র মুক্তাই অদ্বিতীয় রত্ন যা সকল বয়সের সকল গাত্রবর্ণের মেয়েদের গহনায় মানানসই হয়।

এ কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা যে, 'নীল নদের রানী' ক্লিওপেট্রা মুক্তাকে সিরকাতে গলিয়ে পান করেছিলেন তাঁর অনিন্দ্য রূপকে উজ্জ্বলতর ও অধিকতর আকর্ষণীয় করবার জন্যে। তাঁর ইয়ারিঙের পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি মুক্তার একটিকে ঐ ভাবে ব্যবহার করে অপরটি তিনি দিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিক মার্ক অ্যান্টনিকে। তখনকার দিনে সেটির মূল্য প্রায় পৌনে চার লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা।

আধুনিক যুগে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর বিয়ের সময় যে গাউনটি পরেছিলেন সেটি নানা বর্ণের নানান আকারের মুক্তাখচিত। তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে সে সময় যে নেকলেসটি যৌতুক পেয়েছিলেন সেটি মানানসই নিখুঁত পঁয়ত্রিশটি মুক্তার তৈরি।

ভূষণ-প্রিয়েরা সাধারণত মুক্তাপ্রেমী। জাপানে যে-সব ভ্রমণকারিণী যান তাঁদের অধিকাংশেরই বাসনা থাকে সেখান থেকে মুক্তা কেনবার। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট মুক্তার (কালচার্ড্ পার্ল্) জন্যে জাপান বিখ্যাত। জাপানের নারীদের মুক্তার হার, আংটির শখ সবচেয়ে বেশি। সেখানকার পুরুষদের মধ্যেও নেকটাইয়ে, জামার বোতামে মুক্তা ব্যবহার করবার প্রবণতা কম নয়।

জাপানের এই কৃত্রিম মুক্তার আবাদ বা উৎপাদন প্রক্রিয়াও রীতিমত কৌতূহলউদ্দীপক। মুক্তাকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্বাভাবিক বা আসল, কৃত্রিম (কালচার্ড্) আর নকল। রত্ন বললে আমরা যা বুঝি, সে অর্থে কৃত্রিম মুক্তাও রত্ন; তবে, এর দাম আসলের দামের তুলনায় অনেক কম। সেই জন্যে এর জগৎ-জোড়া চাহিদা এবং জাপানই তার প্রধান যোগানদার।

এই কৃত্রিম মুক্তার জন্মস্থান বা প্রজনন ক্ষেত্র দক্ষিণপূর্ব জাপানের শিমা উপদ্বীপের অন্তর্বর্তী মাই এলাকায়। কৃত্রিম মুক্তা আবাদের পথ-প্রদর্শক ছিলেন কোকিচি মিকিমোতো (১৮৫৮-১৯৫৪)। কেমন করে শুক্তি বা ঝিনুকের গর্ভে মুক্তার জন্ম হয় সে-সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জনের পর তিনি এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। বালির অতি ক্ষুদ্র কণা বা উত্তেজক অনুরূপ কোনো বাইরের বস্তু শুক্তির ভিতরে ঢুকে গেলে তাকে ঘিরেই সৃষ্টি হয় মুক্তার। এই তথ্য উদ্ঘাটন করবার পর মিকিমোতো ঠিক করলেন—সজীব শুক্তির মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোনো কেন্দ্রী-অংশ (নিউক্লিয়স) প্রবেশ করিয়ে শুক্তিকে সযত্নে ছেড়ে রাখলে হয়তো তার ভিতরে আসল মুক্তার সদৃশ-মুক্তা গড়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মিকিমোতো সাফল্য লাভ করলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি অর্ধ-গোলকের আকারের মুক্তা সৃষ্টি করে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নিখুঁত গোলাকার মুক্তার সৃষ্টিতে সফলকাম হয়ে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তিনিই জাপানকে দিয়ে গেলেন কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদনরূপ শিল্পকর্মটি।

এখন জাপানে মুক্তা-আবাদীর সংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি এবং তাঁদের সমগ্র উৎপাদনের অর্থ-মূল্য বহু কোটি ইয়েন। এখানকার কৃত্রিম মুক্তা পৃথিবীর দশ-বারোটি দেশে, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে রপ্তানী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিকিমোতো গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমার মুক্তা পৃথিবীর সকল নারীর [illegible]"

মুক্তার জন্ম

রঙ অনুযায়ী মুক্তার শ্রেণীকরণ বিশেষ নৈপুণ্যের কাজ

যে জাতের শুক্তি বা ঝিনুকের মধ্যে স্বাভাবিক মুক্তার জন্ম, কৃত্রিম মুক্তার জন্যে সেই জাতের ঝিনুকের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে যখন ঝিনুক-পোনা অর্থাৎ খুদে বাচ্চা ঝিনুক ভেসে বেড়ায় তখন তাদের সংগ্রহ করে তারের খাঁচায় দু-তিন বছর রাখা হয় সমুদ্রের জলেই। সে ঝিনুকের ওজন ২৫ থেকে ৪০ গ্রামের মতো হলে সেটি মুক্তার জননী অর্থাৎ মুক্তার জন্যে গর্ভ ধারণের যোগ্য হয়। তখন সেই ঝিনুকের মুখ এক সেন্টিমিটারের মতো ফাঁক করে তার যে অংশে প্রজনন ক্রিয়া হয় সেখানে অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ কেটে নিয়ে সেই খাঁজে একটি নিউক্লিয়াস বসিয়ে দেওয়া হয়। মিসিসিপি নদীতে এক রকম দ্বিপুটক (bivalve) মাছ, ক্লাম (clam) পাওয়া যায়, তারই খোলা থেকে কয়েক মিলিমিটার ব্যাসার্ধের গোলাকার অংশ কেটে নিয়ে সেটিকে নিউক্লিয়াস হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের চোখে বালিকণা সদৃশ সূক্ষ্ম কিছু পড়লে যে অস্বোয়াস্তিকর যন্ত্রণা হয়, ঐ নিউক্লিয়াস ঝিনুকের ভিতরে সেই রকম যন্ত্রণার সৃষ্টি করে; তার ফলে অতি স্বচ্ছ রস ক্ষরিত হয়ে সূক্ষ্ম সরের আবরণ পরতে পরতে পড়তে থাকে সেই নিউক্লিয়সকে বেষ্টন করে; এবং ক্রমে ক্রমে তা উজ্জ্বল চমৎকার একটি মুক্তায় পরিণত হয়।

ঝিনুকের ভিতরকার শাঁসের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ঐ স্বচ্ছ রসের মতো পদার্থ ক্ষরিত হয়। একটি পরিপুষ্ট মুক্তা-ঝিনুকের ভিতরকার ঐ রসক্ষরণকারী অংশ থেকে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার বর্গ পরিমাণ শাঁস কেটে কৃত্রিম মুক্তার শুক্তির ভিতরে অনুরূপ অংশে সেটিকে জুড়ে দেওয়া (গ্রাফ্‌ট করা) হয়। সেটি যখন কৃত্রিম মুক্তার ঝিনুকের মধ্যে জুড়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন সেই ঝিনুকের ভিতরে রসক্ষরণের কাজ দ্রুততর চলে। এই সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার এবং শাঁস বসানোর কাজে (গ্রাফটিং) জাপানীদের দক্ষতা অসাধারণ। অস্ত্রোপচার ও গ্রাফ্‌টিং-এর পর ঝিনুকগুলিকে তারের খাঁচায় রেখে খাঁচাগুলিকে ভেলার সাহায্যে সমুদ্রের জলে পাঁচ মিটার গভীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

যদিও এক বছরের মধ্যেই এই ঝিনুক থেকে বাজারে ছাড়বার মতো মুক্তা পাওয়া যায়, তবে, মাঝারি বা বড়ো আকারের মুক্তা পেতে হলে ঝিনুককে দুই থেকে চার বছর রাখা হয় জলের তলায়। সমুদ্রের যেমন পরিবেশে মুক্তা-ঝিনুক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, কৃত্রিম মুক্তার ঝিনুকের জন্যেও তেমনি পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয়; এবং এদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও কড়া নজর রাখা হয়ে থাকে। যেমন সামুদ্রিক আগাছা প্রভৃতি ঝিনুকের মুখ আটকে ফেলে তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত করে সেগুলিকে হাতে করে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে দিতে হয় নিয়মিত। যতদিন না ঝিনুক পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হচ্ছে ততদিন এই রকম পরিচর্যার আবশ্যক। মুক্তাগর্ভ পূর্ণাবয়ব ঝিনুক জল থেকে তোলবার পর তা-থেকে মুক্তাটি বের করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলেই তা ব্যবহার উপযোগী হয়—পালিস করার বা কাটার দরকার হয় না; হারে গাঁথবার জন্যে কেবল সূক্ষ্ম ছিদ্র করে নিতে হয়। মুক্তায় ছিদ্র করবার তুরপুনও অতি সূক্ষ্ম।

মাঝে মাঝে ঝিনুক মড়কও দেখা দেয়—তাতে অনেক ঝিনুক নষ্ট হয়ে যায়-; অনেক ঝিনুক এই সময় তার ভিতরকার নিউক্লিয়সটা উগরে দেয়। তার ফলে কৃত্রিম মুক্তার জন্যে পালা-ঝিনুকের প্রায় অর্ধেক থেকে মুক্তা পাবার আশা থাকে না।

সাধারণত দশ হাজার পালন করা বা পালা ঝিনুকের মধ্যে চার হাজার ঝিনুক থেকে বড়ো আকারের মুক্ত পাবার সম্ভাবনা থাকে। সেই চার হাজার মুক্তার মধ্যে বাজারে ছাড়বার মতো বেরোয় শতকরা দশ থেকে পনরটি। বাকি যা থাকে, তা থেকে, যে-মুক্তাকে সাগর-রত্ন বলা হয়, তেমনটি কদাচিৎ পাওয়া যায়। এইভাবে চাষ-করা মুক্তার শতকরা নব্বই ভাগ বাইরে রপ্তানি করা হলেও তার চাহিদা বেড়েই চলেছে।

কৃত্রিম মুক্তা কেনবার সময় তা ভালো জাতের কিনা চেনবার সচরাচর পাঁচটি লক্ষণ দেখা হয়। প্রথম হলো—ঘনত্ব; কেন্দ্রী অংশ—যাকে 'কোর' বলা হয় তার উপর সূক্ষ্ম ঝিল্লির আবরণ যতো পুরু হবে মুক্তা ততো উঁচুস্তরের বলে গণ্য হবে। সাধারণত ঐ আবরণ ·১৫ মিলিমিটারের কম পুরু হলে সে মুক্তাকে বিক্রি বা রপ্তানির যোগ্য মনে করা হয় না। মুক্তার আবরণের ঘনত্ব পরিমাপ করবার এক রকম যন্ত্রও আছে; তবে পাকা জহুরীরা দেখেই তা বলতে পারেন। দ্বিতীয় লক্ষণ—ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি। এই দীপ্তিই মুক্তার জীবন, অর্থাৎ ঐটির উপরই নির্ভর করে তার দাম। ঝিল্লির আবরণের ঘনত্ব যতো বেশি হয়, মুক্তার দ্যুতিও হয় ততো বেশি। অন্য শ্রেণীর মুক্তার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে মেলালে, মুক্তার দীপ্তির তারতম্য বোঝা যায়। তৃতীয় দ্রষ্টব্য হলো তার গড়ন। নিটোল গোলাকার গড়নই মুক্তার শ্রেণী বা ঘরানা নির্দিষ্ট করে দেয়। অবশ্য শিশিরবিন্দু অথবা অর্ধ-গোলক আকারের মুক্তারও আদর কম নেই—যথাক্রমে কানের দুল আর জামার হাতার বোতামে ঐগুলি ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ লক্ষণ—মুক্তার বর্ণ। নিভেজাল এক-রঙা মুক্তা নেই বা হয় না বললেই চলে; রকমারি রঙের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় মুক্তার রঙ। সচরাচর সাদা, রুপালী, ফিকে লাল, নবনী বা ক্রিম, সোনালি আর নীল রঙের মুক্তা পাওয়া

যায়—রঙের মোটামুটি সীমারেখার হিসাবে। কদাচিৎ কালো রঙেরও মুক্তা পাওয়া যায়।

মুক্তার বর্ণ নির্ধারণে ক্রেতার (নিজের) চোখের, চুলের বা গাত্রবর্ণের সঙ্গে মানানসই হয় সেইমতো মুক্তা বাছাই করাই রীতি। আবার, দেশবিশেষের লোকের এক-একটা বিশেষ রঙের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, ইওরোপ এবং জাপানেও ফিকে লাল রঙটাই লোকের পছন্দ। যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের কোনো কোনো অঞ্চলে সাদাটাই লোকে পছন্দ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সোনালি রঙের মুক্তাই জনপ্রিয়।

মুক্তার রঙ নির্ভর করে সমুদ্রের অবস্থা আর ঝিনুক-বিশেষের উপর। যেমন, মাই অঞ্চলের তোবা জেলার মুক্তায় রুপালি আর ফিকে লালের প্রাধান্য বেশি। ওয়াকাইয়ামা এলাকায় জলের তাপ অপেক্ষাকৃত বেশি—সেখানে ক্রিম বা নবনী রঙের মুক্তাই জন্মায় বেশি। মুক্তার রঙ সম্বন্ধে বোধহয় এই কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষের মুখ যেমন হুবহু এক কদাচিৎ হয়ে থাকে—মুক্তার রঙও তেমনি।

মুক্তা বাছাইয়ের ব্যাপারে রঙের পর দেখতে হয় তার গলদ বা খুঁত। অন্যান্য রত্নেও যেমন খুঁত থাকে, মুক্তাতেও থাকে। তবে মুক্তার খুঁত বা গলদ থাকার ব্যাপারটা অপরিহার্য, অবশ্য তা হয়তো এতো সূক্ষ্ম যে সেটা ধরা খুব শক্ত।

আভরণের আনুষঙ্গিক হিসাবে মুক্তার চলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে আছে তার অনুমান করতে পারি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মুক্তার গয়নার উল্লেখ থেকে। বর্তমান সভ্যতার কালে, মিশরে মুক্তার হারের ব্যবহার শুরু হয়, অনেকে অনুমান করেন, ষোড়শ শতকে—ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে মিশরে চটকদার চারুকলার যুগ বলা হতো। এই সময়ে অসম-গড়নের মুক্তার হারের চাহিদা ছিল সেখানে বেশি। কিন্তু এখন, নিটোল গোলাকার সুষম গড়নের প্রখর প্রভা-বিচ্ছুরণকারী সরেস বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং হারের জন্যে তার চাহিদাও বেশি।

হারের গড়নে সচরাচর তার কেন্দ্রের মুক্তাটি হয় সবচেয়ে বড়ো, তার দুদিকে থাকে ক্রমশ ছোট আকারের;—ধাপে ধাপে ছোট হতে থাকে। আবার সব সমান গড়নের

সমুদ্রে মুক্তা আহরণ দৃশ্য

মুক্তার হারও অনেকে পছন্দ করেন; কণ্ঠহার—সমান আকারের মুক্তায় গাঁথা, গলার সঙ্গে তা লেপ্টে থাকে। আংটিতে মুক্তার ব্যবহারেও মিশরীয়রাই নাকি পথপ্রদর্শক। আধুনিককাল পর্যন্ত তা সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্যোতিষী মতে নাকি জুন-মাসে জাতকের ধারণ করবার রত্ন হচ্ছে মুক্তা।

স্বাভাবিক মুক্তা প্রসবকারী ঝিনুকেই কৃত্রিম মুক্তারও জন্ম বলে তার দীপ্তি বজায় রাখবার জন্যে পৃথকভাবে কোনো যত্ন নেবার দরকার হয় না, নরম কাপড়ে পরিষ্কার করে মুছে দিলেই তার রূপ আর ঔজ্জ্বল্য ঠিক থেকে যায়। মুক্তার হার নিয়মিত পরা হলে সেটা বছরে দুবার নূতন সুতোয় গেঁথে নিলে হঠাৎ সুতো ছেঁড়বার আশঙ্কা থাকে না। আংটিতে বসানো মুক্তাকে মাঝে মাঝে নরম ব্রুশের সাহায্যে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়; তাহলে তাতে ময়লা জমতে পারে না।

মুক্তার মধ্যে থাকে শতকরা আশি ভাগ কার্বনিক য়্যাসিড কাজেই মুক্তার গয়নাকে ভিনিগার বা গন্ধক থেকে সাবধানে রাখতে হয়। রান্নার সময় অথবা উষ্ণ প্রস্রবনে স্নানের সময় মুক্তার গয়না খুলে রাখাই নিরাপদ। প্রত্যক্ষ তাপ থেকেও মুক্তাকে দূরে রাখা দরকার।

স্বাভাবিক বা আসল মুক্তা আর কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বা 'কালচার্ড' মুক্তায় তফাত মাত্র একটি জিনিসে—কৃত্রিম মুক্তায় 'কোর' বা কেন্দ্রী অংশটি, যাকে ঘিরে ঝিল্লির পরদা পড়তে থাকে পরতে পরতে, সেটিকে প্রবেশ করানো হয় ঝিনুকের ভিতরে; তার ফলে ঝিল্লির আবরণ সেই কোরের উপর দ্রুততর গতিতে পড়ে থাকে। দীপ্তি আর স্থায়িত্বের দিক থেকে আসল ও কৃত্রিম এই দুই শ্রেণীর মুক্তাই সমান।

আসল ও কৃত্রিম মুক্তা থেকে নকল মুক্তা চিনে বার করা বেশ কঠিন। কারণ, আসল ও কৃত্রিম মুক্তার যাবতীয় গুণ, এমন কি তার খুঁতও রাখা হয় নকল মুক্তায়। তৈরি করা হারের মুক্তাগুলো নকল কিনা, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তা ধরা যায়। আসল বা কৃত্রিম মুক্তা হুবহু এক রঙের বা একই গড়নের হয় না, খুব সূক্ষ্ম তফাত থাকেই; কিন্তু নকল মুক্তার রঙ আর গড়ন একই রকমের হয়। তৈরি-করা হারে মুক্তা পাশাপাশি একসঙ্গে দেখা যায় তাই নকল কিনা ধরা শক্ত হয় না। কিন্তু একটিমাত্র মুক্তার বেলা চেনা খুবই কঠিন।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তার অর্থাৎ 'কালচার্ড' মুক্তার আবাদীরা সাধারণত আকার অনুসারে মুক্তাকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন : যেমন, ব্যাসার্ধে তিন মিলিমিটারের কম, তিন থেকে পাঁচ মিলিমিটারের মধ্যে, পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার, ছয় থেকে আট মিলিমিটার, এবং আট মিলিমিটারের ঊর্ধ্ব ব্যাসার্ধের। নয় মিলিমিটারের বেশি ব্যাসার্ধের মুক্তার সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তার দামও হয় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য, মুক্তাচাষীরা বারো মিলিমিটার ব্যাসার্ধের মুক্তাও সাফল্যের সহিত উৎপাদন করেছেন। এ-পর্যন্ত নাকি কৃত্রিম মুক্তার আকারের ঐ সীমা অনতিক্রান্তই রয়েছে।

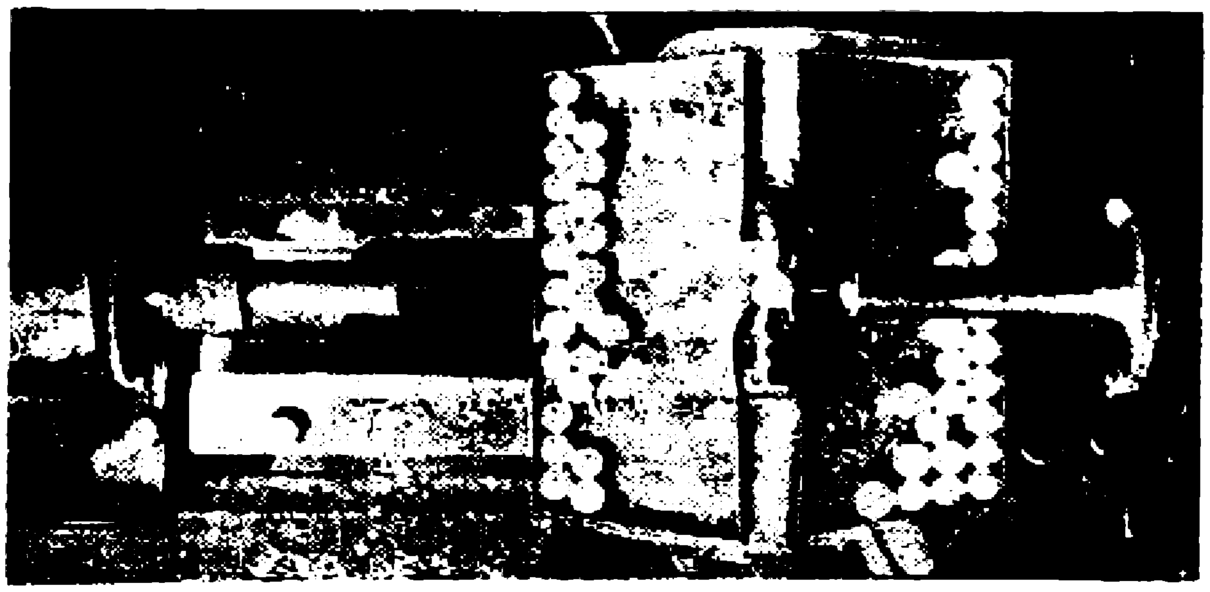

মুক্তাকে যন্ত্র সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী করা হোচ্ছে

চাই

গণেশ বসু

কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন চাষীর ঘাম শিরার লবণ স্বাদ করে তোলে চারা শস্যবতী
খর মৃত্তিকার বুক চিরে রি রি যন্ত্রণার রাগে;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন বন্দীর চোখ অনির্বাণ জ্বলে শুধু কুরে কুরে খায়
অবাধ্য স্মৃতিকে, পোষে তৃষ্ণা, অসহায় ভালোবাসা;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন পিতার ভার সন্ততির কাঁধ ছুঁয়ে পরম্পরা বাড়ায় পতন,
মৃত দুঃস্বপ্নের ভিড় ঠেলে ঠেলে দিগন্ত উজ্জ্বল;
কেউ কেউ রেখে যেতে চায়
যেমন মায়ের ডুকরে কেঁদে ওঠা গলা টিপে মেরে ফেলে নিজেরই ছেলেকে
পাথর চাপিয়ে বুকে হা হা স্পর্ধা দীর্ণ আকালের;

আমি শুধু রেখে যেতে চাই এই সময় তিমিরে
সহস্বপ্নব্রতীদের না-বোঝা বুকের চাপা অভিমান কালো কালো মেঘের বিদ্যুতে
উপেক্ষার, সমুদ্রে কুজ্ঝটির যেন ছোটে,
রক্তের চেয়েও নোনা স্বাদ যার সেই অশ্রু দীর্ঘশ্বাসগুলি
অশ্বারোহী শব্দের আড়ালে।

অবিরাম লিখে যেতে থাকে

আসাদ চৌধুরী

মৌন পাহাড়ের ধ্যানের দোসর হতে সাধ ছিল,
সাধু সন্ত বাঘ, বিষধর সাপ ঘুমায় পাহাড়ে।
সাধ ছিল, আমার শিক্ষক হবে বিনয়ী দরিয়া
তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেব সংযমের গোপন চলার।
পাহাড় শেখায় কেমন সহজে নিসর্গ স্বীকার করে
মানুষের আনুগত্য,
নখদন্তহীন অসহায় জীবের মতন
মানচিত্রে শুয়ে থাকে—
মানুষের নির্মমতা, দর্প, স্বার্থ পৃথিবীর মুখ কালো করে—
অভিশাপ, মৌন প্রতিবাদ, করুণ বিলাপ
মহাগ্রন্থ লিখে যায়—
অবিরাম লিখে যেতে থাকে রক্তে, ঘামে, অদৃশ্য অশ্রুতে—
অথচ কী গভীর তৃপ্তির ছাপ নিসর্গের ঠোঁটে।

এ-বাঙলা ও-বাঙলা

সুতপা চক্রবর্তী

অসংখ্য নিহত মানুষের আত্মা
আমায় যেন সর্বক্ষণ ঘিরে আছে।
সেই আত্মাগুলিকে দুহাতে সরিয়ে
কষ্টেই আমাকে পথ চলতে হয়।
অভিশাপের তপ্ত নিঃশ্বাসের স্রোত
দিনরাত আমায় অস্থির করে রাখে।
দিশেহারা হয়ে যাই প্রতি মুহূর্তে,
চলতে গিয়ে কেবলি চমকে উঠি।
দিন যাচ্ছে আর হত্যার সংখ্যাও
যেন পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠছে।
এরপর পাহাড়ের স্তূপ ডিঙিয়ে
কোনোদিকে আর যাওয়াই যাবে না।

ওদিকের সবুজ বাঙলাদেশও
এখন একেবারে পুরো লালে লাল।
রক্তপলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার মতো
চাপ চাপ রক্ত সে দেশের সর্বত্র।
তবে মানুষের আত্মার মুক্তিতে
বাঙলাদেশে বড়ো বেশি তফাৎ।
সেখানকার জনতা কৃতসঙ্কল্প—
অত্যাচারের বন্যাকে এক গণ্ডূষে
পান করে নিয়ে জন্মভূমিকে তারা
মানুষের বাসযোগ্য করে তুলবে।

CENTRAL LIBRARY

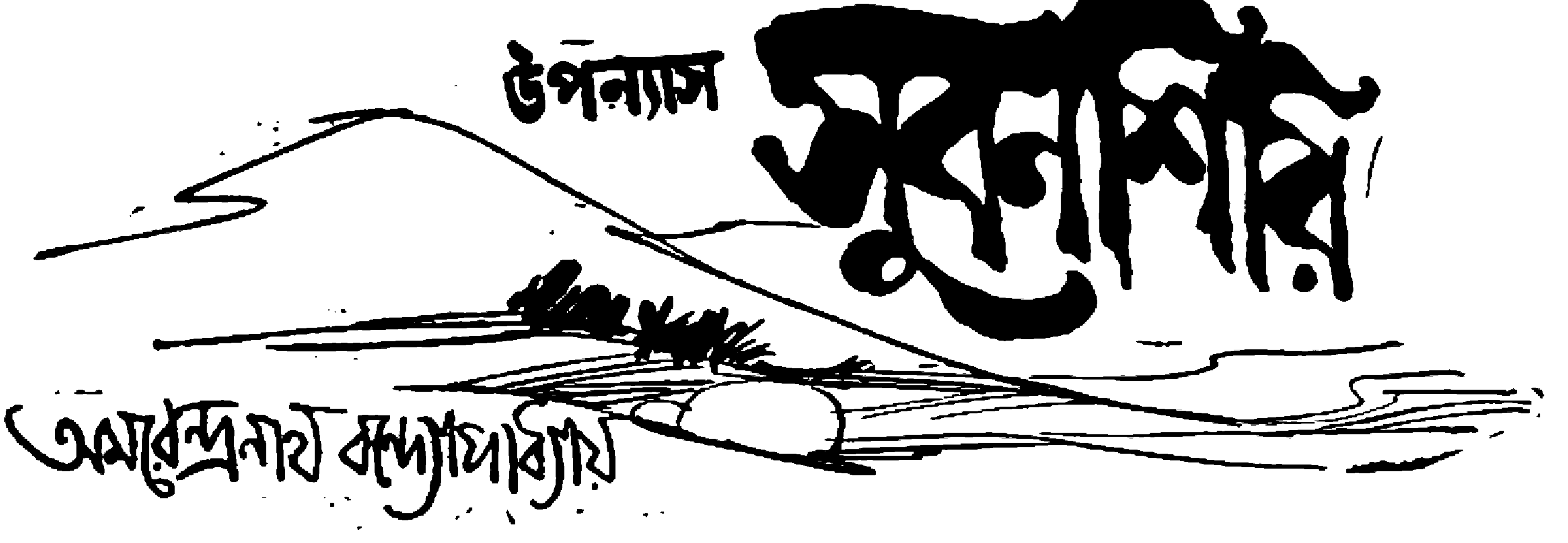

।। দুই ।।

কার্সিয়াং-এর এক চা-বাগান। ওরাই হাসপাতালের ল্যাপ্‌চো ধাত্রী রাজকুমারী। যার গোপন প্রণয়ের পরিণতি মাতৃত্বে। সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস, প্রাণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিংড়ে সৃষ্টি, ধাত্রীর কোলে এক ফোঁটা শিশু, মেঘনাদের মা—বিলি। স্বপ্নের স্বর্গ মর্তের বাস্তবতা। এরই মাঝে বিলি। বিলির বুক ভরে আছে মায়ের স্নেহ-মমতার স্মৃতি—এই তার সম্বল। এই নিয়ে সে ঢেকে রেখেছে মেঘনাদকে।

স্বর্গের দেবতা মর্তের জননী—তারই মাঝে মেঘনাদ। মেঘনাদের বুক জুড়ে আছে মায়ের গভীর স্নেহ-মমতা।

অতীতের ঘৃণা ও গৌরব থেকে বিলি মুক্ত করে রেখেছে তার ছেলেকে। নিজের জীবনের গ্লানি ও গৌরব এবং পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছুই একদিন তার ছিল। কালের পলিমাটির চাপে, হৃদয়ের তাপে সে-সব স্মৃতি পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেছে। সে-সব কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিল বিলি। কিন্তু সংসারে যা অনিবার্য তা ঘটবেই। তাই একদিন বিলির বিস্মৃতির স্তূপ কেঁপে উঠল। তার স্মৃতির বন্ধ লোহ কপাটও গেল ভেঙে।

বিলির শৈশব পার হল কন্‌ভেন্টের কঠোর ডিসিপ্লিনের মধ্যে। যৌবনে মাতৃহারা—সংসারের কিছুই জানবার বা বোঝবার অবকাশ হয়নি তার। সেদিনকার রূপ-লাবণ্যের স্রোতে তার ভেসে যাবারই কথা। ভেসেই যেত। এমন সময় যেন একটা কূল পায়। জানতে পারল—দুর্গাধারিয়া টি এস্টেটের মালিক মি. জনসন. তার প্রতি আকৃষ্ট। সুন্দর সুপুরুষ অবিবাহিত জনসন। বিলির জননী সুযোগ দিল তাকে জানতে।

একদিকে কনভেন্টের শিক্ষা অপর দিকে অতীত। মায়ের স্নেহ, কনভেন্টের শিক্ষা—মহিমান্বিত করে তুলতে চায় তার জীবনকে। তার অতীত, তার জন্মের গ্লানি—এতটুকু হয়ে পড়ে মন। সংস্কারমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে না। এ জীবন নিয়ে কি করবে সে। ভাবে, আর ভাবে—।

রাত্রির অন্ধকারে তার সমস্যার কোন সমাধান হল না। শরতের স্বচ্ছ প্রভাত। নীল দিগন্তে অরুণ আভা। সীমান্তের ভালে ফুটে উঠল একটি রক্তলাল তিলক। এ-যেন সেই তিলক, যা সে আশৈশব পথেঘাটে দেখে আসছে। যা সে দেখেও দেখেনি এতকাল। যে তিলকের এতখানি মহিমার কথা ভাবতেও পারেনি কখনো। একটি তিলকের মাধুর্য, একটি তিলকের গৌরব চায় বিলি।

জনসনের কাছে বিলি জানতে চাইল—সে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে কি না?

ইংরেজের আভিজাত্য সে পথে বাধ সাধে। হলই বা বিলি শিক্ষিতা, সুন্দরী—নাই বা রইল তার চোখেমুখে পাহাড়ীর ছাপ। তবুও ল্যাপ্‌চা নার্সের অবিবাহিত জীবনের সন্তান সে, চা-বাগানের ইংরেজ কর্মচারীর ঔরসজাত। তার সঙ্গে ইংরেজ প্ল্যান্টারের বিয়ে? অসম্ভব! প্রণয় চলতে পারে। যেদিন বিলি জনসনের ঘরে যাবে, সেদিন তার তৃপ্তির জন্য একটা ছোটখাটো পার্টিও দিতে পারে। তার ভবিষ্যতের সংস্থানও করে দেবে। এক কথায় বিয়ের সকল সুবিধা, সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে—কিন্তু গির্জায় গিয়ে তা হলফ করতে পারবে না। ইংরেজ কথায় পটু, তার ওপর জনসনের মতো শিক্ষিত লোক। মনের কথাটা জনসন বেশ মোলায়েম করে পরিবেশন করল বিলির সামনে।

জনসনের কথায় বিলির মন গলে গেল, ভরে গেল। ভেবে দেখল নিজেদের সমাজ। তার তো নেই—তার মায়ের সমাজ, ল্যাপ্‌চা সমাজের পাঁচজনের রীতিনীতি। বিয়ে আর হয় কটা! দুজন পালিয়ে যায় দূর দেশে। হয় থেকে গেল সেখানে, নয়তো কিছুদিন পর ফিরে এসে রইল বস্তিতে। কটা লোক আর লামা সামনে রেখে, গাঁ-শুদ্ধ লোক খাইয়ে বিয়ে করে। তাই তো তার মায়েরও বিয়ে হয়নি। যৌবনে এমন একটা পুরুষ পায়নি সে, যে তার ভার নিতে পারে। সেই সমাজের লোকই নানাভাবে তাকে নিগ্রহ করে, তার জন্মের প্রতি কটাক্ষ করে।

জনসন যা দিতে চায় তার চাইতে বেশী দাবী করবার মতো কিছু খুঁজে পায় না বিলি। তবুও কি যেন একটা কথা বড় হয়ে উঠতে চায় তার মনে। কনভেন্টে পড়া বিলিও সজাগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সমস্ত জীবন ভেসে ওঠে তার মনের আকাশে—মায়ের সুখদুঃখের কত ছবি। বিলির মন শোকসন্তপ্ত মন বিচলিত হয়, বিচলিত মন শেষে স্থির হয়। মন থেকে উপড়ে ফেলে দেয় যত বাসনা-কামনা। সংসারে সে চায় একটু ঠাঁই—দুটি অন্ন। আর! আর চোখের সামনে তুলে ধরতে চায় কামনার প্রতিশ্রুতি। তার মায়ের কাছ থেকে যে সম্পদ সে পেয়েছে, রেখে যেতে চায় তার উত্তরাধিকারী, তার মায়ের স্নেহের উত্তরাধিকারী। এইটুকু নিয়েই সার্থক করে তুলতে চায় নিজের জীবন। তার মা এ সংসারে যা পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি জনসন দিয়েছে তাকে। তার ওপর বিয়ের মর্যাদা! তা সে চায় না। জনসনের অনুরোধেও না।

জনসনকে বিলি পাকা কথা দিয়ে দিল।

কর্তব্যপরায়ণ মিষ্টভাষী জনসন। ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র। প্রণয়ের রসসমুদ্রে বিলি ডুবে রইল। কেটে গেল কয়েকটা শীত-বসন্ত। শীত নয়, শরৎ নয়, হেমন্তও নয়—সে যেন একটানা বসন্ত। এক বসন্তের হাওয়া লেগে তার ইচ্ছার গাছে ফুল ফুটল। ফল ফলবে। দুজনে দিনরাত ব্যস্ত। পাশ্চাত্য দেশীয় প্রথামতে প্রসূতি ও শিশু রক্ষণাবেক্ষণের যেসব বিধিনিষেধের পুস্তিকা বর্তমান সেসব দুজনে মিলে শেষ করল, আয়ত্ত করল। সেখানকার বিধিব্যবস্থার সঙ্গে বিলি খতিয়ে মিলিয়ে দেখল তার নিজের সমাজের ব্যবস্থা—নিজের কেন, সারা ভারতবর্ষের। ঐ শীতের স্বাস্থ্যকর দেশেই যদি এত নিয়ম মেনে চলতে হয় প্রসূতিকে, এত সাবধানে লালন-পালন করতে হয় শিশুদের, তবে তো এখানে আরো বেশী দরকার। কত অজ্ঞ এখানকার মায়েরা, কত তাচ্ছিল্য এখানকার শিশুদের লালন-পালনে। তাই না এত শিশুরিষ্ট এদেশে—এদের মৃত্যুটা কিছু নয়, বেঁচে থাকাটাই দৈব ঘটনা। দৈবের হাতে পড়তে চায় না বিলি। তাই সে-সবের প্রত্যেকটি অক্ষর শিরোধার্য তার কাছে, সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশ্যে বিলির কাছে।

CENTRAL LIBRARY

ডাক্তার ও ধাত্রী আসে, দেখে যায় নিয়মিতভাবে। উপদেশ দিয়ে যায় বেদনা-বিহীন প্রসবের কথা। শেষের প্রসঙ্গে যেসব অনুশীলনের পদ্ধতি পেল তার সঙ্গে মিল পায় ভারতীয় যৌগিক প্রথার।

অনাগতের অভ্যর্থনার আয়োজনে ঘর ভরে যায়। সকালে বিলি চোখ খুললেই ধরে কুরুশকাঠি, পশম। ঘুমের মধ্যেও তার আঙুল চলে বোনার ভঙ্গিতে। আশা আর মেটে না যেন। যতখানি ইচ্ছার মধ্যে তার গর্ভে সৃষ্টি হয়েছে, ততখানি ইচ্ছা যেন ফুটে উঠছে না তার অভ্যর্থনার আয়োজনে, তাকে লালন-পালনের প্রতিকল্পনার মধ্যে।

বিলির ইচ্ছার প্রতীক তখন অন্তরালে পূর্ণ অবয়ব ধারণ করেছে। দেখতে চায় সে পৃথিবীর মুখ। ঝাঁপিয়ে পড়বে সে ধরিত্রীর কোলে, দেখবে তার মায়ের মুখ। যে কোন দিন দেখবে। এমন অবস্থায় জনসনের ডাক পড়ল দেশে। জরুরী কাজ। এ অবস্থায় বিলিকে নিয়ে এতদূর যেতে পারে না, ছেড়েও যেতে পারে না। সে যাবে না। 'কেবল'-এর ওপর 'কেবল'। বিলি জোর করে তার বিলেতে যাবার ব্যবস্থা করল। জনসন গেল, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায়।

প্রতিদিন সকালে বিকেলে বিলির হাতে জনসনের খবর—জনসনের হাতে বিলির।

হঠাৎ খবর আসা বন্ধ হল। বিলি অস্থির হয়ে জনসনের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে 'কেবল' পাঠাল। জবাব এল জনসনের এটর্নির কাছ থেকে :

'জনসনের সেরিব্রাল অ্যাবসেস হয়েছিল, তাতেই তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। যদিও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। পরে বিস্তারিত খবর দেব।"

আকাশটা ভেঙে পড়ল বিলির মাথার ওপর। জনসনের সঙ্গে বিলির সবকিছু গেল। এমন কি তার বোধশক্তিও হারাল।

বিপদ যত বড়ই হোক একটু ধৈর্য ফিরে পাওয়া চাই। তা সে পেল—জনসনের ম্যানেজারের ব্যবহারে। আগে রোজই সে দু-চারবার বিলির খবর নিয়ে যেত, কিন্তু জনসনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আর সে এ-মুখো হয় না।

কি হল? কি হবে? কোথায় যাবে? কার কাছে?—কিছুই ভেবে পায় না সে।

পাশে এসে দাঁড়াল রাবণ আর লছমী।

।। তিন ।।

রাজকুমারী যে বাগানে কাজ করত সে বাগানের এক বৃদ্ধ সর্দারের একমাত্র মাতৃহীন সন্তান রাবণ। আশৈশব বিলির খেলার সাথী। সর্দার ছিল রাজকুমারীর বড় অনুগত, রাবণও বিলির। সর্দারের সঙ্গে রাজকুমারীর দেখাশোনা পরিণত বয়সে। তবুও তাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বিলি ও রাবণের সম্বন্ধটা অন্য ধরনের।

নামেই রাবণ, যেন রামই—চেহারায়, স্বভাবে ও ভক্তিতে। তাই সকলেরই প্রিয় সে। শৈশবের খেলাধুলো, মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে বিলির সঙ্গে রাবণের সম্পর্কটা আরো নিবিড় গভীর-হয়ে ওঠে। রাবণকে পেয়ে রাজকুমারীর পুত্রস্নেহ পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাবণও কি না পেয়েছে এদের কাছ থেকে।

বয়সের সঙ্গে জীবনধারার কত পরিবর্তন হয়েছে দুজনের। বিলির বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে রাবণেরও বর্ণপরিচয় শেষ হয়েছে। বিলি চলে গেছে কতদূরে—কত ওপরে, আর রাবণ পড়ে থেকেছে নীচে। বিলি যায় পড়াশোনা করতে ইস্কুলে, দার্জিলিং-এ। রাবণ যায় বাপের সঙ্গে কাজ করতে, বাগানে। তবুও কেউ কাউকে হারায়নি।

বিলির অদল-বদল হয়েছে—দেহের রূপ-লাবণ্যের, খেলার প্রথার। পুঁথির পাতা ওলটানোর সঙ্গে বেড়েছে মনের প্রসারতা, বদলেছে কথার ধরন-করন। শীতের ছুটিতে বিলি ফিরে এসেছে মায়ের কাছে। সঙ্গে এনেছে নতুন খেলা, নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার। অমনি রাবণ ছুটে এসেছে। ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেছে, তারপর বলেছে—ওঃ! সেবার পৃথ্বীরাজের কথাটা শেষ না করেই চলে গেলি—আমি হাঁকপাঁক করে বেড়িয়েছি বাকীটা জানতে। শেষে টি-হাউস বাবুর ছেলেকে মিঠাই খাইয়ে শুনে নিলাম।

বলবার মতো একটা জিনিস বিলির হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তার আশঙ্কা হল—হয়তো রাবণও চলে যেতে পারে বাবুর ছেলের হাতে। তাই সে রেগে উঠল—কেন আজেবাজে খরচা করতে গেলি? দুদিন সবুর সইলো না!

—দুদিন? কতদিন পর এলি। অমন অর্ধেক শুনিয়ে গেলি কেন? আমার যে মাথ-কপালে ধরে। ছেলেটা যে আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায় না।

বাবুর ছেলে তাকে পাত্তা দেয় না শুনে বিলি নিশ্চিন্ত হল। খুশী হয়ে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করেছিস। আর যাবি না কাছে, বুঝলি?

যাক, অল্পতেই রাগটা নেমে গেছে। রাবণ তাড়াতাড়ি বললে—আচ্ছা, এবার কিন্তু ছাড়াছাড়ি নয়। নতুন যা-যা পড়েছিস সব শুনে তবে ছাড়ব। আর অর্ধেক নয়।

বিলির বিদ্যা জাহির করবার একটি মাত্র স্থান। তাই রাবণ যেমন বলেছে তেমনই চলতে হয়েছে তাকে।

—ইতিহাস! রাজা-বাদশার কথা? বল বল, চটপট।

বিলিকে বলতে হয়েছে ইতিহাসের কথা। তারপর ভূগোল।

—ভূগোল!—পৃথিবী গোল? চোখের সামনে দেখে কার্সিয়ং থেকে দেখতে পায় শিলিগুড়ি—সমান পড়ে আছে। হো-হো করে হেসে ওঠে রাবণ—এইবার ধরেছে।

—বটে!—এই দেখ ম্যাপ।

—ম্যাপ কি? এতো আঁকাজোকা না হিজিবিজি—ছবির মতো রঙ বেবড়ানো। ছবিও নয়! ছবি তো হয় রাম-সীতার, ঠাকুর-দেবতার।

[illegible] হাসতে গিয়ে বিলির বকুনি [illegible] রাবণ।

—একটুও খেলবি না?

—না-না, এবার আর খেলা নয়। ঐ করে তুই বড় ফাঁকি দিস আমায়।

—আচ্ছা আর ফাঁকি দেব না। কিন্তু একটা নতুন খেলার জিনিস এনেছিলাম।

—কই দেখি।

—নাঃ, তোর যখন ভাল লাগে না—

—রাগ করলি? আচ্ছা, একটা একটু খেলব। রাগ করিস নি, দেখা না।

রাবণের বাপ মারা গেল। ছেলেটাকে তুলে দিয়ে গেল বিলির মায়ের হাতে। রাবণের দুপাশে দাঁড়িয়ে তাকে পিতৃশোক ভুলিয়ে রেখেছিল দুজনে মিলে, মায়ে-ঝিয়ে।

রাবণ আরো নিবিড় করে এদের পেল। তাদের অনবদ্য স্নেহ-মমতায় ভরে রইল রাবণের বুক।

রাজকুমারী চায় নিজের ঘরেই রাবণকে রেখে দিতে। অত কষ্টের কাজ করতে দেবে না।

বিলি বলে—বাগানের কাজ করলে উন্নতি হবে। ওকে তো সংসার করে দিতে হবে একদিন।

খুকির মুখের পাকা কথায় নিরুত্ত হয় বিলির মা।

রাবণ সর্দার হল। ঘর-সংসার পাতল। বিলি দেখেশুনে ভগলু-সর্দারের মেয়ে লছমীর সঙ্গে রাবণের বিয়ে দিলে। লছমীর রঙটাই যা কালো—নইলে আর সবই নামের মানানসই। আশৈশব বিলির খেলার সাথী।

জনসনকে হারাবার পর পথচলা বিলির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেহটা অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। লছমী কোলে তুলে নেয় তার মাথা—রাবণ দাঁড়ায় পাশে। দুজনে কত সান্ত্বনা দেয় বিলিকে। অন্ততঃ অনাগতের কল্যাণের জন্য তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে—তারা বোঝায়।

বিলির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে লছমী—কাতর আবেদন ভরা দুটি ছলছল চোখে।

বিলির শোক-বিহ্বল চোখ দুটো পড়ে থাকে লছমীর মুখের ওপর। যেন লছমীর কথা সে বুঝতে পারেনি, বলবার মতো কিছু হাতড়ে পায়নি, তেমন কিছু করবার শক্তিও সে হারায়।

দিনে দিনে ভেঙে পড়ে তার দেহমন।

এক মৃত্যুর দিনে আর একটি মৃত্যুর কথা জড়িয়ে গেল। যেদিন বিলির মা মারা যায়, সেদিনও তো এরাই দুজনে এমনি ভাবে ছিল তার পাশে। মা যখন রোগশয্যায় এরাই তো তখন তার সেবা করতো। বিলি তখন ইস্কুলে। খবর পেয়ে ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে যায় সে।

রাজকুমারী সংসার ছেড়ে চলে গেল, এদের দুজনের হাতে বিলিকে তুলে দিয়ে। বলে গেল—এদের কাছে থাকতে, এদের অবাধ্য না হতে।

মায়ের শেষ কথা, শেষ ইচ্ছা বিজি সব সময় যেন চলেছে। তার সকল সমস্যা সে তুলে ধরেছে রাবণ ও লছমীর কাছে। জনসনের সঙ্গে গোপন দেখা হয়েছে সবই সে পুনরাবৃত্তিও করে গেছে লছমী ও রাবণের সামনে।

সাহেব রাখতে চায়? ভাল কথা, ভাগ্যের কথা! ক-জনের ভাগ্যে এমন আসে?

তারা যেমন পরামর্শ দিয়েছে তেমন-ভাবেই সে কথা বলেছে, কাজ করেছে।

এবার জনসনের সঙ্গে যেতে হবে। এক সমস্যা যায়, আসে আর একটা। এদের ছেড়ে যেতে হবে। কথাটা এতদিন মনে হয়নি। বড় সমস্যায় পড়ে যায় বিজি।

রাবণ বোঝায়, ঐ তো দার্জিলিং। যখন তখন যাওয়া-আসা যায়। ইস্কুলের বোর্ডিং-এও তো সে থাকতে গেছে এতকাল।

সে যাওয়া, আর এ যাওয়া অনেক তফাৎ। বিশেষ করে তার মায়ের মৃত্যুর পর। বিজি চায়, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। লছমী সাবধান করে—না-না, এখনই এতটা করো না। দু-চার মাস গেলে, মন-মেজাজ বুঝে তবে সাহেবকে আমাদের কথা বলবে।

বিজি তা পারবে না, ওদের কথা মানতে চায় না। সাহেবের কাছে সে বলে দিল মায়ের মৃত্যু-কালীন ইচ্ছার কথাটা। রাবণ তখন সর্দার, তাকে অমন একটা কাজ দিলেই সে খুশী। আর লছমী বাগানের সব কাজই জানে।

সাহেব রাজী হয়: সে সর্দারের বেতনই পাবে—বাংলোর মালী, বেয়ারা-বাবুর্চীর কাজকর্মের তদারক করবে। থাকবে বাংলোর পাশেই ছোট্টো একটা কটেজে। লছমী দেখাশোনা করবে ঘর-সংসারের কাজ, অর্থাৎ বিজিকে সাহায্য করবে।

ঠিক যেমনটি সে চায়। বলার কিছু থাকে না আর। জনসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় বিজির মন। এমনই সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে রাবণের সঙ্গে বিজির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাবণের মধ্যে বিজি পায় একনিষ্ঠ বিশ্বাস, স্নেহ-মমতা যেন আরো কিছু যা মন দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না।

রাবণের বিচিত্র পরিবেশ তাকে বিচিত্র-ভাবে গড়ে তোলে। একদিকে শ্রমজীবীর সহজ-সরল ঘরকন্না—অপরদিকে বিজিদের আঁকাবাঁকা পথের বিচিত্র জীবন। একটি নিছক জীবন ধারণের উপযোগী অনুস্যূত আচার-ব্যবহার সমাচ্ছন্ন এক প্রাচীন কোণ; অপরটি আংলো-পাহাড়ীর সংমিশ্রণে এক অপরূপ সৃষ্টি—সহজ, সরল জীবনের অন্তঃ-প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে বৈদেশিক আচার-বিচার ও সুদূর প্রসারী ভাবধারা—যা নিছক জীবনধারণের বাইরে আরও কিছু পাওয়ার জন্য উন্মুখ, উৎসুক। এই দুটি বিরোধী জীবন-প্রবাহের মধ্যে রাবণ যেন এক উভচর জীব। তবুও তার শ্রমিক দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে রূপ নিয়েছে একটি ভাবের মন। বিজির ভক্ত সে। সে চায় তার সেবা করতে। এতেই আনন্দ তার। এই আনন্দের আড়ালে থেকে অনেক জিনিস সে দেখতে পায় না, চায়ও না। ম্যানেজারের ব্যবহারটা তাই তার চোখে পড়েনি। তার কোন চিন্তা হয়নি সেজন্য। বিজিকে এক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যেতে পারে তার মনের অবস্থা ভেবে। কিন্তু লছমী অন্য ধরনের। সে নিজের সমাজের সুখ-দুঃখের কোলে মানুষ। সে কথা কয় কম। কিন্তু শোনে সব, বোঝেও। নিজেকে দেখাতে চায় না, কিন্তু দেখতে পায় সবই। ম্যানেজারের ঔদাসীন্য তার চোখ এড়ায় না।

কোন মতেই যখন বিজিকে প্রকৃতিস্থ করা গেল না, তখন লছমী তুলে ধরল ম্যানেজারের উদাস ব্যবহারের কথা। দুঃখের দিনে এতটা খাঁটিয়ে দেখেনি কেউ। দেখবার মতো মনও ছিল না। রাবণের উৎকণ্ঠা বাড়ল। বিজি পড়ল আর এক ভাবনায়।

এটর্নির টেলিগ্রামটা বারবার উল্টেপাল্টে দেখল, পড়ল। কোন আশার কথা খুঁজে পেল না তাতে। জনসনের বাবা, ভাই! তারা তো কোন খবর দিল না। কি আর খবর আছে? দুদিন পর হুকুম আসবে ম্যানেজারের কাছে। বার করে দেবে এখান থেকে। এ অপমান সে সহ্য করবে কি করে? এত নীচ হবে জনসনের ভাই, বাবা? হবে নাই বা কেন? সম্পত্তি হাতছাড়া করে কে? যাদের বিষয়বুদ্ধি আছে, তারা করুণা দেখাতে যাবে কেন? তাদের কাছে বিজি দয়ার পাত্রী হতে পারে না। খাল কেটে কে কুমির আনবার পথ করতে যাবে। তাকে বহিষ্কৃত করাই কর্তব্য। আর দুদিন পর সেও দাবী দিতে পারে জনসনের উত্তরাধি-কারী। সন্তানের জন্য সেও তো দাঁড়াতে পারবে! প্রমাণ? প্রমাণ সংসার ছেড়ে চলে গেছে। প্রকাশ্য আদালতে কত কলঙ্কের কথা উঠবে! কত বিদ্রূপ-ভরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে!

ম্যানেজারের কাছেও নিশ্চয়ই একটা টেলিগ্রাম এসেছে—দেখায় নি তো সেটা। কি লেখা তাতে? যদি ভালই কিছু থাকবে, তবে সে এমন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কেন? অলক্ষুণে যা হবে কিছু বলতে চায় না হয়তো। অপেক্ষা করছে, মানে মানে তারা বিদায় হয় কিনা—নিশ্চয়ই তাই। তাই সে একবারও আসে না।

ঠিক করল বিজি নিজের পথ।

(ক্রমশঃ)

মিডিয়াম ওয়েভ, ১১০ মিটারে শুনুন—

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা অনুষ্ঠান

প্রতিদিন রাত ৯-৩০ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত

শর্টওয়েভ মীটার ব্যান্ড — কিলোসাইকল্‌স্‌

১৯, ২৫ ও ৩১ — ১৫০৭০ ১১৭৫০ ১১৮৭৫ ও ৯৬৪০

মিডিয়াম-ওয়েভ ১১০ মীটার — ১৫৮০

লালন সাঁই-এর মাজারে

মোহিত রায়

সেঁউড়িয়া।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া শহরের উপকণ্ঠে কালীগঙ্গা (মরা কালী গাঙ) নদীর বুকে জেগে ওঠা চরভূমি। এখানে ধর্মপ্রাণ বাউল লালন ফকিরের সাধনপীঠ আখড়ায় আছে এক অপরূপ স্থাপত্যকীর্তি সমাধিগৃহ। সকলের কাছে 'লালন সাঁই-এর মাজার' নামে পরিচিত। সমাধিগৃহের ভিতরে লালনের কবরের পাশে লালনের সাধনসঙ্গিনীরূপে পরিচিতা মতিবিবির কবর। মাজারের চারপাশে লালনশিষ্যদের কবর।

দুত এগিয়ে এসে মাজারের বর্তমান অধিকারী ফকির বেলাল শাহ বলতে লাগলেন : ভাবের ভাব নেই একথা ভেবো না। সাঁইজী আছেন। চিরদিন থাকবেন। আমাদের সকলের হৃদয়ে। লোকের মুখে মুখে সাঁইজীর গান......।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি ফকিরের কথা। ফকির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের মাজারের সবকিছু দেখালেন। দেখলাম—'লালন সাহিত্যকেন্দ্র'। উদ্বোধন করেন প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খাঁ ১৩ আশ্বিন ১৩৭০। এখানে লালনের ছাড়াও অন্যান্য লোকায়ত সংগীতের বিরাট সংগ্রহ আছে, আছে লোকসাহিত্য গবেষণারও সুব্যবস্থা। বকুলগাছের তলায় ছায়াসুনিবিড় বিশ্রামস্থানে বসতেই গুনগুন করে ওঠেন ফকির বেলাল :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন কয় জাতের কি রূপ
দেখলাম না এ নজরে।

লালন বলে হাতে পেলে
জাত পোড়াতাম আগুনে দিয়ে।

—হঠাৎ এ গান কেন? কুষ্টিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদ্বয় এম. এ. রেজা (ইত্তেফাক) এবং কাজী রাশিদুল হক পাশা (পূর্বদেশ) স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাকে : মাজারে ধর্মের ভেদাভেদ নেই। সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ এখানে এসে একাকার।

চৈত্র পূর্ণিমায় মাজারে বসে বিরাট মেলা। হাজার হাজার মানুষের মেলা। দূর-দূরান্ত থেকে বাউলেরা আসেন, একতারাতে বেজে ওঠে লালনের গান :

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে—
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
পড়শি বসত করে।

কুষ্টিয়া শহরের কাছে গড়াই (গোরাই) নদীর তীরে ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম ১ কার্তিক ১১৭৯ (১৭ অক্টোবর ১৭৭২) এবং দেহত্যাগ সেঁউড়িয়ায় ১ কার্তিক ১২৯৫ (১৭ অক্টোবর ১৮৮৮)। বিচিত্র লালনের জীবনকাহিনী। গাঁয়ের লোকজন নিয়ে নৌকায় গঙ্গাস্নানে চলেছেন বাউল দাস, সঙ্গী হলেন তরুণ লালন। ফেরার পথে লালনের বসন্ত রোগ হলে নৌকার গলুইয়ের কাছে তাঁকে রেখে সকলে দূরে সরে রইলেন। শেষে বাউল দাসের কুপরামর্শে সকলে অচেতন লালনের মুখে আগুন দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। গাঁয়ে ফিরে বাউল দাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সকলে বললেন যে, পুণ্যবান লালনের গঙ্গাস্নানে গিয়ে গঙ্গালাভ হয়েছে। যথারীতি শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়াও হয়ে গেল। এদিকে মৃতপ্রায় লালন ভাসতে ভাসতে এক ঘাটে গিয়ে ঠেকলেন। এক দয়াবতী মুসলমান রমণী স্নান করছিলেন। তিনি লালনকে দেখে তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। লালন সুস্থ সবল হলেন অল্পদিনের ভিতরেই। এমন সময় সিরাজ সাঁই নামে এক মুসলমান দরবেশ তাঁকে প্রকৃত ধর্মপথের সন্ধান দিলেন।

লালন নিজের গাঁয়ে ফিরে গেলেন কিন্তু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করল না। সবাই বলল যে লালনের ভূত এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই লালনের জীবনের আদর্শের সঙ্গে সমাজের বিরোধ বাধল। নিঃসঙ্গ লালন সমাজ ছেড়ে লোকালয় থেকে দূরে নীরবে নিভৃতে সেঁউড়িয়ার আখড়ায় একমনে সাধনায় রত হলেন। সাধক লালন সহজ সরল গানের মধ্যে দিয়ে জীবনের আদর্শের কথা প্রচার করে গেছেন।

অনেকে বলেন যে, লালন নিরক্ষর ছিলেন। মুখে মুখে গান বেঁধেছেন, লেখেন নি। লালন দীর্ঘদিন নবদ্বীপে ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ যবন বলে তাঁকে দূরে থাকতে দিয়েছিলেন কিন্তু শাস্ত্রচর্চা করেছেন পাশাপাশি বসে। অনেকেই মনে করেন যে, লালন জন্মত হিন্দু ছিলেন। নিজের জীবন সম্পর্কে লালনের সীমাহীন নির্লিপ্ত থাকায় এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহ করে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি লালনের আখড়ায় নিয়মিত আসতেন। নিরক্ষর গাঁয়ের মানুষ থেকে প্রাজ্ঞ মানুষেরাও লালনের সঙ্গে ধর্মালাপ করতেন। লালনের শিষ্যের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজারের উপর।

ফেরার সময় কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। ফকির আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : মনের ময়লা তাঁর চন্দনের গন্ধে ধুয়ে মুছে ফেললে মনের মধ্যেই তাকে মেলে—যাকে খুঁজছ। সাঁইজীর কথা—এই মানুষে চেয়ে দেখ—সেই মানুষ আছে।

চাঁদে বধ মোহিনী বিলের পাশ দিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা সড়ক ধরে বোমাবিধ্বস্ত কুষ্টিয়া শহরে ফেরার পথে তখনও ভেসে আসছিল ফকিরের উদাত্ত গলায় লালনের গান :

'আমার আপন খবর আপনার হয় না—
আপনারে চিনলে পরে
যায় অচেনারে চেনা।।

হরপ্পার ফসিল

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠিক বলেছ, কোন ফল হবে না; কোন লাভ নেই তোমার সঙ্গে এভাবে যুদ্ধ করে। হঠাৎ গলার স্বরটা নেমে গেল অরুণেরও, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে। জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

সীমা ঘরে ঢুকে দেখল তার অবর্তমানে হেমন্ত আজ ঘরটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখেছে। সে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে, এটা যেন হেমন্ত জানত। বকসার তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সাঙ্কেতিক কোন প্রকাশের চেষ্টা করল। একটু আগেই অরুণ তাকে বেড়িয়ে নিয়ে এসেছে, তাতে তার মন ভরেনি। ঘরের আলোটা নিভিয়ে সীমা নিজের কথা ভাবতে লাগল। এখনও তার মনটা স্বাভাবিক হতে পারছে না। সৌম্য দত্তর ব্যবহার, তার নিজের দুর্বল অবস্থার কথা আর অরুণের নিশ্চিন্তভাব দেখে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। অরুণ তাকে নিয়ে কি করতে পারে? পুলিশের ব্যাপারে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাকে অভিযুক্ত করতে হলে অরুণকে নিয়েই টানাটানি পড়বে। এটা বন্ধ করতেই অরুণ সচেষ্ট থাকবে এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। নিজের বংশ মর্যাদা এবং অসিতবাবুর সম্বন্ধে অরুণ যেন বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। অবশ্য তাকে ডাইভোর্স করতে পারে অরুণ। এটাতে অসুবিধে নেই। তার নামে কলঙ্ক দেওয়ার মত অনেক প্রমাণ অরুণের হাতে মজুত আছে বলে সে জানে। ডাইভোর্স হয়ে গেলে সবদিক থেকেই মঙ্গল। সীমা নতুন করে একটা নতুন হীনমন্যতা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। অরুণ যদি তার ওপর জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত, যদি সে রূঢ় আর অভদ্র ব্যবহার করত, তাহলে তাকে নিজের কাছে এত ছোট মনে হত না। অন্ততঃ এ অসহায়ভাবটা সে কাটিয়ে উঠতে পারত আহ্লাদে। এ কথাটা নিজেকে বলতে পড়তে হত না বারবার।

রাতটা কেটে গেল অশান্তি আর অনিদ্রায় মধ্য দিয়ে। সকাল হতে তার মনে পড়ল ডাঃ সোমের সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অরুণ অফিস চলে গেল নিঃশব্দে। তার গলার স্বরটাও আজ শুনতে পারনি সীমা। হঠাৎ যেন সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

একটু আগেই হাজির হল সে ডাঃ সোমের চেম্বারে। আজ তাকে অন্য ধরনের বলে মনে হল ডাঃ সোমের। কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে সীমার মধ্যে। মুখটা তার শুকনো, চোখ দুটো নিষ্প্রভ।

যথারীতি কৌচে হেলান দিয়ে বসল সীমা।

আপনার শরীর ভাল আছে? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সোম।

হাঁ।

আজ আপনাকে নতুন কোন প্রশ্ন করব না। আপনি নিজেই বলুন কিছু?

ডাক্তার কৌচের পেছনে পাড়ে নিয়ে বসলেন। কি বলব?

যা ইচ্ছে।

চুপ করে রইল সীমা।

আচ্ছা, বিয়ের আগে আপনি কাকে ভালবাসতেন?

কাউকে না।

আপনি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন না, বললেন ডাঃ সোম, আমি বলতে চাই, বিয়ের আগে কাকে ভাল লাগত আপনার।

এতক্ষণে প্রশ্নটা যেন বুঝল সীমা। বলল, বাবাকে আর মাদার ইলাইজাকে।

মাকে?

একটু চুপ করে রইল সীমা; তারপর বলল, না, মাকে আমার ভাল লাগত না।

মায়ের কথা মনে পড়ে?

মায়ের কথা আমি ভাবতে চাই না। মা আমার কেউ নয়। আমি কনভেন্টে পড়তে শুনেছি মায়ের খুব অসুখ করেছিল; সেই সময় মরে গেলে ভাল হত। মা না থাকলে নানু—হঠাৎ চুপ করল সীমা।

বলুন, নানু কে?

নানুকাকা, বাবার বন্ধু বলে ঢুকেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ করে ছাড়ল আমাদের।

আপনার মা মারা গেছেন?

জানি না।

সেদিন বলেছিলেন, মারা গেছেন।

মিথ্যে কথা বলেছিলাম, মাকে আমি কিছুদিন আগেই দেখেছি।

কোথায়?

রাস্তায়, ট্রেনের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছিল। হাঁ, ভিক্ষে করছে, আমি ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ভাল লাগল আমার, বেশ ভাল লাগল। কত যন্ত্রণা দিয়েছে বাবাকে। ও আর নানুকাকা বাবা মারা যাবার পরও বাড়ীতে থাকত। আমি সেই বছরেই পাশ করে চাকরি নিলাম। তারপর মেয়েদের হোস্টেলেই থাকতাম। ও বাড়ীতে আর একদিনও যাইনি। নানুকাকা কোথায় গেল? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সেও ভিক্ষে করছে কোথাও। না, মরেনি, মরে গেলে ত সব দেনা-হয়ে যাবে, শাস্তি পাবে কখন? আমি নিজে সব দিন ওদের নোংরামি দেখেছি, ওদের নির্লজ্জ অত্যাচার সয়েছি মুখ বুজে। ওদের লজ্জা ছিল না, ঘৃণা ছিল না। ওদের কথা ভেবে ভেবে আমি নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলেছি শুধু। কিছুই করতে পারিনি, কোন শোধই তুলতে পারিনি। এখন আমি সব করতে পারি। অনেক টাকা আছে আমার। অনেক সাহস সঞ্চয় করেছি। কিন্তু টাকার অভাবে বাবাকে বড় কষ্ট হয়েছে। এখন আমার এত টাকা কিন্তু বাবার জন্যেই ত সব। কাঁদতে লাগল সীমা। এর আগে সে কোনদিন কাঁদেনি এভাবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে যে এত আনন্দ তা সে কোনদিন বোঝেনি।

সীমা বাড়ী ঢুকেই দেখল অফিসের কাপড় পরে অরুণ বসে রয়েছে ড্রইংরুমে। তাকে দেখে অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবার কাছে যেতে হবে।

কেন? থমকে দাঁড়াল সীমা।

সব জিনিসটা আমি তাঁর কাছে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই।

তাতে কি হবে, তার চেয়ে আপনি আমায় ডাইভোর্স করে দিন।

আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাবার সামনে সব কথা হওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি।

আমি করি না, তাকে এর মধ্যে টেনে আনার কি প্রয়োজন?

আছে, সেটা বোঝার মত সুবুদ্ধি তোমার নেই।

কিন্তু আমি যদি যেতে না চাই?

তাহলে জোর করব, দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল অরুণ।

জোর করবেন? একজন ভদ্রলোক হয়ে একথা বলতে বাধল না আপনার?

না, সৌম্য দত্তর মত আমি অবশ্য সব কিছুতেই জোর করতে চাই না, কিন্তু প্রয়োজন হলে তাতেও পেছপা হব না। এই ভাষাটাই আমি বোধ এখন শিখেছি। ক্রোধে মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল অরুণের।

সীমার ক্লান্তি লাগছে। সমস্ত দিন ধরে তার উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে। তার জের এখনও সীমার স্নায়ুতন্ত্রী আর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ আর করল না সে। গাড়ীতে গিয়ে বসল পিছনের সিটে। অরুণ একবার তাকিয়ে দেখল তার দিকে, কোন আপত্তি করল না সে। গাড়ীটা জোরে চালিয়ে দিল।

রাস্তার ভিড় তার গতি প্রতিহত করতে লাগল বারবার। বিরক্তবোধ করছে অরুণ। তার মনটা যত বেগে ছুটে চলেছে, তার গাড়ীটা কিন্তু সে তুলনায় মন্থর। এটা তার চাঞ্চল্যের কারণ। অবশেষে কলকাতা ছাড়িয়ে সে মনোমত ফাঁকা রাস্তা পেল। গাড়ীর স্পিড বাড়িয়ে দিল অরুণ।

পিছনের সিটে মাথা রেখে সীমা চোখ দুটো বন্ধ করে শুল। এইবার তার বেশী খারাপ বোধ হয়। ভাবল সে মনে মনে।

নিজেকে আজ বড় দুর্বল মনে হচ্ছে তার। পৃথিবী যেন অকস্মাৎ তার কাছে বড় বেশী শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যে সমুদ্রের যে গর্জনটা অহর্নিশ জেগেছিল আজ সেটার শব্দ যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। রক্তের নিরন্তর যে দুঃসহ জ্বালা আর বিষের ক্রিয়াটা অনুভব করত হঠাৎ সেটা হিম স্রোতে পরিণত হয়েছে বলে বুঝতে পারল সীমা। এতদিন পরে বাড়ীর সেই রামকৃষ্ণদেবের ছবির কথা মনে পড়ল তার। করুণামাখা দৃষ্টিতে তার দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

মনটা তার এরকম বিকল হল কেন তাই ভাবতে চেষ্টা করল সে। তার শরীরের কথা সে ভাবল এবার। না, শরীর তার ভালই আছে তো। বরং মাথায় সেই অসহনীয় চাপটা আর অনুভব করতে পারছে না। কানের মধ্যে যে অস্বস্তিকর আওয়াজটা তাকে কোনদিনই নিষ্কৃতি দেয়নি, সেটাই যেন মিলিয়ে গিয়েছে হাওয়ার সঙ্গে।

মাদার ইনাইজা এখন কোথায় কে জানে? আবার তার স্কুলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। অরুণের দিকে তাকাল সীমা। পাশ থেকে অরুণের মুখটা অন্যরকম দেখাচ্ছে। গালের ওপরে একটা কাটার দাগ রয়েছে দেখতে পেল সে। হয়ত ছোটবেলায় কেটে গিয়ে থাকবে। তারও থুতনিতে একটা দাগ আছে। স্কুলে পড়ে গিয়েছিল খেলতে খেলতে। রক্ত বেরিয়েছিল বেশ কিছুটা। মাদার ইনাইজা তাকে নিয়ে খুব হৈচৈ করেছিলেন। মাদার জানতেন না তার হৃত-বার রক্তপাত হয়েছে অন্য ধরণের আঘাতের ফলে।

অরুণবাবুর এই দাগটা কিসের হতে পারে?

সম্ভবত দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গিয়ে থাকবে।

বাবাও নিজে দাড়ি কামাত। একটা ভাঙ্গা সাবানের বাক্সের মধ্যে বাবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম থাকত। একটা লম্বা ক্ষুর, একটা ছোট পাথর, একটুকরো চামড়া, এক কুচি সাবান, আর একটা ব্রাশ। বাবা যখন দাড়ি কামাত সীমা দেখত অবাক হয়ে। ভারি ভাল লাগত তার। প্রথমে ক্ষুরটা ধার করে একবার পাথরের ওপর তারপরে চামড়ার টুকরোতে ঘসত ধীরে ধীরে। তারপর মুখে জল মাখাত ব্রাশটা ভিজিয়ে। তারপর সাবানের ওপর ব্রাশ দিয়ে ফেণা করে সেটা লাগাত দাড়ির ওপর। এরপর হাতের তালুতে ক্ষুরটা বারকতক ঘষে নিত। এসময় তার বেশ ভয় করত। যদি ক্ষুরে হাতটা কেটে যায়। কিন্তু কোনদিনই কেত না। ক্ষুরটা তারপর সাবানের ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেত বাবা নিশ্চিন্ত মনে। এসময়ে কিন্তু সীমার ভীষণ হাসি পেত। বাবা এসময়ে কতরকম যে মুখভঙ্গি করত তার ঠিক নেই। কখনও গাল দুটো ফুলিয়ে নিত, কখনও ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে রাখত অদ্ভুতভাবে আবার কখনও বা হাতের তালু দিয়ে মুখের চামড়া টেনে ধরত বাঁকা-ভাবে। ভারি অবাক লাগত তার। বাবা মুখের ওপর নানারকমের কায়দা দেখাত ম্যাজিকের মত। সেটা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে অনেকদিন পর্যন্ত। অবশ্য অরুণ-বাবুকে সে দাড়ি কামাতে দেখেনি। তবে এটা সে জানে বাবার মত লম্বা ক্ষুর অরুণবাবু ব্যবহার করে না। বাথরুমের র‍্যাকে তার কয়েকটা রেজার এমন কি ইলেকট্রিক রেজারের সেটও চোখে পড়েছে তার।

অরুণের জ্বরের সময় সে লক্ষ্য করেছে, অরুণ নিখুঁতভাবে দাড়ি কামায়। বাবা কিন্তু অত পরিষ্কার দাড়ি কামাতে পারত না। যখন হাঁপানি বাড়ত তখন আর কামানই হত না। দু-তিন দিন ধরে দাড়ি জমা হয়ে মুখ ভর্তি হয়ে যেত। খুব খারাপ লাগত তখন বাবাকে।

ডাঃ সোমের কথা মনে পড়ে গেল সীমার। ভদ্রলোকের গোঁপটা ঠিক টুথব্রাশের মত খোঁচা খোঁচা। কিন্তু ভারি ভাল লোক। প্রথমে তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল সে। শুধু গল্প করে মোটা ফি নিতেন বলে মনে হত সে সময়। কিন্তু আজ তার চোখ খুলে গিয়েছে। আজ তার কি হয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। গতকাল সৌম্য দত্ত আর অরুণের সঙ্গে গোলযোগের ফলে তার মনটা হয়ত এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই সে ডাঃ সোমের কাছে সব কথা বলতে পেরেছিল মন খুলে। নিজেকে কোন বাধা দেয়নি। বানিয়ে আজে-বাজে কথাও বলেনি কিছু। এমন কি জোর করে নিজের মনের কথা লজ্জা পেয়ে চেপেও রাখেনি। সহজ সরলভাবে সে সবকথা-গুলোই খুলে বলেছিল অকপটে। দ্বিধা হয়নি তার মায়ের আর নানুকাকার বিশেষ বর্ণনা দিতে। বাবার অসহায়তা, তার নিজের মনের ভয় আর দ্বন্দ্ব, কোন কথাই গোপন করেনি সে। কিন্তু ভাল লেগেছিল সীমার। কথাগুলো বলার পর তার মন থেকে জগদ্দল পাথরটা কে যেন সরিয়ে দিয়েছিল ম্যাজিকের মত। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তার কাঁদতে। চোখের জলে যে এত আনন্দ তা সে কোনদিনই কল্পনা করতে পারেনি। অদ্ভুত স্বস্তি পেয়েছিল সে। এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে তাকে ঘিরে। ডাঃ সোমের কথাগুলো মনে পড়ল তার—জীবনে দুঃখ সকলেরই আসে, আপনার একা নয়। শিশুকালের মানসিক আঘাত অবশ্য সাংঘাতিক হয় অনেক সময়। স্নেহ, আদর আর যত্নের জন্যে মন উন্মুখ হয়ে থাকে। মানসিক দুর্যোগের ফলে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায়। একেলা সে কখনও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে কখনও বা অন্য ধরনের অস্বাভাবিকতা এসে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়। সকলের বিরুদ্ধে সে একটা কল্পিত অভিযোগ খাড়া করে দাঁড়ায়।'

হঠাৎ গাড়ীটা দাঁড় করাল অরুণ।

কী হল? জিজ্ঞেস করল সীমা।

দেখি কি হল, বুঝতে পারছি না। স্টার্ট বন্ধ করে অরুণ গাড়ী থেকে নেমে বনেটের তলায় মাথা গলিয়ে কি দেখতে লাগল।

সীমাও নামল। একটা মাঠের পাশে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। তার পাশেই একটা পুকুর। সবুজ পানাতে প্রায় সবটাই ভরে গিয়েছে। ফুল হয়েছে তার মাঝে মাঝে ভায়লেট রঙের ফুল। বেশ দেখতে লাগছে সীমার। সে একটু এগিয়ে গেল মাঠের ওপর দিয়ে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলোভাবে। সূর্য দূরের বটগাছটার ওপর এসে পড়েছে। তেজ কমে গিয়েছে তার। পুকুরের অপর-দিকে গিয়ে ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসল সে। জলের দিকে তাকিয়ে রইল সীমা চুপ করে। ছোট ছোট অদ্ভুত আকৃতির মাছ আর পোকাগুলো অশান্ত-ভাবে ছুটে চলেছে চতুর্দিকে। একবার দেখল সে গাড়ীটার দিকে। অরুণ একটা ছোট বালতি নিয়ে পুকুরের অপরদিক থেকে জল নিচ্ছে। জল নিয়ে অরুণ রেডিয়েটারে ঢালতে লাগল। ভদ্রলোকের বিপদ লক্ষ্য করে সে একটু অস্বস্তি বোধ করল। এ অবস্থায় সে অরুণকে কোনদিন দেখেনি। পুকুরের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নীচে নামার অরুণের ভঙ্গি দেখে তার বেশ মজা লাগল। পা পিছলে পুকুরে পড়লে ভদ্রলোকের দামী স্যুটটা নষ্ট হয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

সূর্য এবার বটগাছের আড়ালে চলে গেছে। রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল রিক্সা আর গরুর গাড়ী চলছে। বেশ লাগছে সীমার। হঠাৎ খেয়াল হল অরুণ তাকে ইশারা করে ডাকছে। মাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল সে। এতক্ষণে গন্তব্যস্থানের কথাটা মনে পড়ল তার।

অসিতবাবুর কাছে অরুণ তার বিরুদ্ধে যখন বলবে তখন তিনি কি বলবেন? অসিতবাবু নিশ্চয়ই তাকে কোন রূঢ় কথা বলবেন না। হয়ত বেদনাকাতর চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন নির্বাক হয়ে। অরুণ তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে কি? না এমন কিছু নয়। বরং তার উদাসীনতা অনেক সময় তাকে অবাক করেছে। ব্যথা পেয়েছে সে সেই কারণে কোন কোন সময়। সৌম্য দত্তের সঙ্গে জড়িয়ে গতকাল যে ইঙ্গিত করেছিল অরুণ তার জন্য সে রীতি-মত দুঃখ পেয়েছে, অপমান বোধ করেছে। অরুণের আলমারীর মেয়ের ছবিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল সীমার। লুকিয়ে আলমারীর ভেতরে সুন্দরী মেয়ের ছবি রেখে অপরকে দোষারোপ করতে একটুও বাধল না ভদ্রলোকের।

অরুণ এবার তার পাশের দরজাটা খুলে দিল। দ্বিরুক্তি না করে সীমা তার পাশে গিয়ে বসল। গিয়ার চেঞ্জ করে অরুণ এক-বার সীমার দিকে তাকিয়ে দেখল সে সাম-নের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আজ ডাঃ সোমের কাছে যাবার কথা ছিল না? জিজ্ঞেস করল অরুণ।

হ্যাঁ।

CENTRAL LIBRARY

কি বললেন ডাঃ সোম, প্রশ্ন করল অরুণ।

আপনার জেনে কি হবে? আমার ভাল হোক, মন্দ হোক তাতে আপনার কি এসে যায়। সীমার স্বরে অভিমান।

তাহলেও বল; আর তোমার ভালমন্দে আমার কিছু এসে যায় কিনা, সেটা এখন না বলাই ভাল।

আপনি আমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন মাত্র। আপনার গিনি-পিগ হয়েছি আমি, আর কিছু না।

কথাটা শুনেই জোরে হেসে উঠল অরুণ।

অনেকদিন সীমা এ ধরনের হাসি শোনে নি। ভাল লাগল তার।

হাসলেন যে, সীমা তাকাল অরুণের দিকে।

হাসলাম তোমার মত পরিবর্তন লক্ষ্য করে। এর আগের বারে তুমি আমায় স্যাডিস্ট বলেছিলে এবার আমায় সায়েন্টিস্ট বানালে। আমি দুটোর মধ্যে একটাও নই।

তাহলে?

যদি বলি তোমায় আমি ভালবাসি তাহলে কি মনে হয়?

চুপ করে রইল সীমা কিছুক্ষণ. বলল - অন্যদিন হলে হয়ত এর একটা মুখ জবাব দিতাম কিন্তু—

কিন্তু কি? সীমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল অরুণ।

আজ হঠাৎ জবাবটা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কেন বল ত, খুব আশ্চর্য লাগছে তোমার পরিবর্তন দেখে।

কোন জবাবই দিল না সীমা। বাইরের দিকে একমনে তাকিয়ে দেখতে লাগল পল্লীর মনোরম গোধূলিদৃশ্য।

এবার আপনি নিশ্চিন্ত হবেন। হঠাৎ বলল সীমা।

এ ধারণা তোমার হল কি করে?

তা না হলে এধরনের চরম ব্যবস্থা নিতেন না. লোকের সামনে ছোট করার চেষ্টা করতেন না আমাকে।

সীমার কথা শুনে হঠাৎ গাড়ী দাঁড় করাল অরুণ। সীমা তাকে অবাক করে দিয়েছে।

আমি তোমায় ছোট করতে চাইছি, কি বলছ তুমি! অরুণ এত বিস্মিত কোনদিন হয়েছে কিনা সন্দেহ!

ঠিকই বলছি, ভেবে দেখুন, আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগগুলো বাবার সামনে বলবেন—

বাবার সামনে? তুমি ত কোনদিন আমার বাবাকে এ সম্বোধন করনি! বিস্ময়ের সীমা নেই অরুণের! তাই বুঝি? সীমার ভঙ্গীটা অপরূপ লাগল অরুণের কাছে। তোমার পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি অবাক হচ্ছি শ্যামলী—

আমার নাম সীমা শ্যামলী ডাঃ সোমের চেম্বারে মারা গিয়েছে আজ।

সীমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ীটা ছাড়ল অরুণ। সন্ধ্যার আগেই সে পৌঁছতে চায় বাবার কাছে। গাড়ীর স্পীডটা তাই বাড়িয়ে দিল সে।

আমি একটা অন্যায় করেছি, হঠাৎ বলল সীমা।

আবার কি? ভয় পেল অরুণ।

আপনাকে না বলে আলমারী থেকে একটি মেয়ের ছবি দেখেছি।

বুঝেছি, বন্দনার ছবি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অরুণ।

কে বন্দনা? কথাটা সীমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল।

আমার বোন—কাকার মেয়ে বন্দনা; এখন স্বামীর সঙ্গে বিলেতে আছে।

নিস্তেজ হয়ে সিটের ওপর হেলান দিল সীমা। একটা দুর্দমনীয় লজ্জার বেগ তাকে যেন সংজ্ঞাহীন করে দিল সেই মুহূর্তে।

রাস্তাটা ক্রমশঃ নির্জন হয়ে আসছে। বাস কিংবা সাইকেল রিক্সা এ রাস্তায় চলে না। বড় রাস্তা থেকে এটা উত্তর দিকে বেঁকে গিয়েছে। গাড়ীর গতিটা আরও বাড়িয়ে দিল অরুণ। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল বাইরের দিকে। বড় বড় গাছগুলো এক এক করে চলে যাচ্ছে গাড়ীর পাশ দিয়ে। জায়গাটা চিনতে পারল সীমা। গতবার কত জলের জন্যে এখানেই অরুণ গাড়ী থামিয়েছিল। রাস্তায় আর কোন লোক নেই। এমনকি দূরে মাঠের মধ্যেও কাউকে নজরে পড়ল না তার। আজ নিশ্চয়ই হাটবার নয়, ভাবল সীমা। তাহলে লোকের বেশ ভিড় থাকত। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে।

একটু আস্তে চালান, বলল সীমা আর থাকতে না পেরে। অরুণের এই খুদে গাড়ীটা যে এভাবে উড়ে যেতে পারে এটা জানত না সে। কিন্তু কেমন যেন একটা ভয় করছে তার। নিস্তব্ধ, নির্জন আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীব্র বেগে গাড়ীটা ছুটে চলেছে। অরুণের মুখের দিকে তাকাল সে। শক্ত চোয়ালের রেখাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরে আছে সে। অপলক দৃষ্টিটা তার অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধ। পাশের চওড়া নালার দিকে তাকাল সীমা। গতবারের মত সেটা আর ভর্তি নেই বটে তবে জল আর কাদা রয়েছে প্রচুর। ঘন অন্ধকার এখনও নামেনি। তাই হেডলাইট দুটো জ্বালেনি অরুণ।

প্রায় অর্ধেকের ওপর রাস্তা পার হয়ে এসে অরুণ এবার ভাবছে, কিভাবে সে বাবার কাছে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করবে। কথাটা মনে পড়তেই তার মনটা বিষাদে ভরে গেল। না, সে হেরে গেল। এত চেষ্টা করেও সে সফল হল না। শেষ অবধি পরাজয়ের গ্লানি আর লজ্জা তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। আশ্চর্য! তাহলে ডাঃ সোম কি করলেন? সাইকো এনালিসিস, তার নিজের সহিষ্ণুতা, বাবার অকুণ্ঠ স্নেহ, কোনটাই কাজে লাগল না, ফেরাতে পারল না সীমাকে স্বাভাবিক পথে! ডাইভোর্স হলেও লজ্জার কথা হয়। সমাজের কথা বাদ দিলেও তার বাবার মুখের দিকে সে তাকাবে কি করে? কি কৈফিয়ৎ দেবে সে নিজেকে? একটা অসঙ্গত খামখেয়ালীর পরিণতি এছাড়া আর কি হতে পারে! একটা মূল্যবান প্রচেষ্টার অর্থহীন পরিশেষ!

পাশের ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা গরু এসে পড়ল রাস্তার ওপরে। তাকে বাঁচাতে চকিতে স্টিয়ারিংটা অপর দিকে ঘোরালো অরুণ। সীমার কণ্ঠের একটা ক্ষীণ আর্তস্বর তার কানে পৌঁছেছিল মাত্র; তারপর আর সে কিছুই জানে না।

প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীটা উল্টে খানার ভেতরে গিয়ে পড়ল। সীমা ছিটকে খানার পাশে পড়েছে। একটু পরেই জ্ঞান হয়েছে তার। এতক্ষণে সে বুঝেছে যে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এটা ভাবতেও সময় লেগেছে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে তার মনটাও কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। হাতে ভর দিয়ে সীমা উঠে দাঁড়াল কোন মতে। একটা তীব্র বেদনায় তার সমস্ত শরীর আর মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখল একটু দূরে গাড়ীটার প্রায় তলায় অরুণ শুয়ে রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে গেল সে। অরুণের পায়ের দিকটা জলের নীচে রয়েছে, সেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোমরের নীচ থেকে দেহটা কাদায় প্রায় বসে রয়েছে। সীমা অরুণের দিকে দেখল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে। মুখটা ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, চোখদুটো বন্ধ। গলা থেকে টাইটা খুলে দিল সীমা। তারপর অরুণকে ওপর দিকে টানতে লাগল প্রাণপণ শক্তিতে। কিছুটা তোলা সম্ভব হল। কিন্তু আর পারছে না সীমা। অরুণ আর বেঁচে নেই, ভাবল সীমা। একটা অস্বাভাবিক গোঙানীর আওয়াজ শুনতে পেল সে। গাড়ীর ভাঙা যন্ত্রের না অরুণের গলা থেকে আওয়াজটা বেরোচ্ছে? একটু পরে সীমা বুঝল এটা তারই কান্নার শব্দ।

অরুণের মুখটা শাড়ীর আঁচল ভিজিয়ে মুছিয়ে দিল সে। সর্বাঙ্গে তার কাঁচের টুকরো আর কাদা। কিছু সরিয়ে দেবার পরই তার হঠাৎ মনে পড়ল অরুণ আর বেঁচে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে উদভ্রান্তের মত চারিদিকে দেখতে লাগল সে। না, কেউ কোথাও নেই। শরীরের মধ্যে অসহ্য একটা কাঁপুনির বেগ এল তার। চীৎকার করে কাঁদবার ইচ্ছে হল। কিন্তু কোন স্বর ফুটল না তার গলার ভেতর। হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বোবার মত তাকিয়ে রইল সে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। তাই একটু পরেই লোকজন এসে উপস্থিত হল। সকলে মিলে অরুণকে তুলে আনল। অরুণের পায়ের একটা হাড় ভেঙে গিয়েছে। সাদা হাড়টা রক্তাক্ত ক্ষতের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে। একটা গাড়ীও জোগাড় করল ওরা। তারপর অরুণ আর সীমাকে নিয়ে পৌঁছে দিল হাসপাতালে।

অরুণকে নিয়ে গেল ভেতরে। সীমা বাইরে বসে রইল চুপ করে। এতক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে সে। ভাবতে পারছে সব জিনিসটাকে ঠিকভাবে। তার নিজের দেহেরও বেশ কয়েক জায়গায় চোট লেগেছে। এতক্ষণে সেটা অনুভব করতে পারল সীমা।

একটু পরেই ডাক্তার এল।

উনি আপনার কে হন? জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

আমার স্বামী। বুকটা কেঁপে উঠল তার অজানা ভয়ে। আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত আসছে তার। ভয়ে তার স্নায়ু আর দেহ শক্ত হয়ে উঠল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল সে।

না, কিছু হয়নি। উত্তর দিল ডাক্তার, পায়ে একটা ছোট অপারেশন করতে হবে; তাই কাগজটায় আপনার একটা সই দরকার।

কেমন আছেন? বিবর্ণ মুখে তাকাল সীমা।

ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন, আশ্বাস দিল ডাক্তার।

কাগজটায় বড় বড় অক্ষরে নিজের নামটা লিখল সে— সীমা বসু।

॥ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

নাৎসী গ্রাসে বলকান অঞ্চল।

ইতালী জার্মান ও বৃটিশ সংঘাত

১৯১৪ সালেরও পূর্ব হইতেই বলকান অঞ্চল ইউরোপের বারুদাগার নামে পরিচিত ছিল। বহু জাতি ও খণ্ডজাতি এবং মাইনরিটি সমস্যায় বিব্রত এই বিচিত্র পর্বতবহুল দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা মর্মকেন্দ্র ছিল। ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভের জন্য এখানকার ইতিহাস রণকীর্তির 'গৌরব' দাবী করিতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, আলবেনিয়া এবং ইউরোপীয় তুরস্ক—মোট এই ছয়টি দেশের একত্র ভৌগোলিক সংস্থাপনকেই বলকান অঞ্চল বলা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে খাদ্য আছে, পেট্রোল আছে এবং জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষক, অর্থাৎ দরিদ্র। কিন্তু ইহার রণনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অঞ্চল দিয়াই এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে ইহার ভূমিপথের সংযোগ এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের উপর আধিপত্য বিস্তারের ইহা পথ। জার্মাণীতে কাইজারের আমল হইতেই ইতিহাসের পাঠক এখান দিয়া বার্লিন-বাগদাদ লাইনের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কল্পনা ছিল এই যে, বার্লিন হইতে একটা রেলপথ বলকান অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এবং তুরস্ক হইয়া বাগদাদ ও মসুলের তৈলখনি, এমনকি ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবে। কিন্তু এই রেলপথ কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে।

বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া (এবং কিছু পরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সকলেই বলকান অঞ্চলে প্রভাব খাটাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী দীর্ঘকাল আর সুবিধা করিতে পারে নাই। সেই সুযোগ আসিল ১৯৩১—৩২ সালের পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার এবং জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর। হিটলারের দৃষ্টি ছিল পূর্ব এবং দক্ষিণ—পূর্ব ইউরোপের দিকে। নাৎসী জার্মানীর 'অর্থনীতির যাদুকর' ডাঃ শাক্ট এ বিষয়ে হিটলারের সহায় হইলেন এবং তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আগে 'অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের প্রয়োজন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধিমান ডাঃ শাক্ট দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান রাজ্যে হানা দিলেন—এই রাজ্যের দ্বার তখন বহিঃপৃথিবীর আর্থিক মন্দা, শুল্ক প্রাচীর বিনিময় নীতি নিষেধবিধি ইত্যাদির জন্য রুদ্ধ ছিল। ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রধান খরিদ্দার হইল জার্মানী। যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া ইত্যাদি বলকান অঞ্চলের রাজ্যগুলি হইতে ডাঃ শাক্ট প্রচুর পণ্য আমদানী করিতে লাগিলেন এবং বিনিময়ে জার্মানী 'শস্যের বদলে শেল' অর্থাৎ গোলাগুলী ও অস্ত্র জোগাইতে লাগিলেন। গ্রীসের রাজা খুশী হইয়া ডাঃ শাক্টকে একটা সম্মানজনক পদবীতে পর্যন্ত ভূষিত করিলেন। আর এথেন্সের হোটেলে ইউরো-মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন—

> "In the Hotel Granade Bretagne at Athens arms merchants from Britain, France, Italy, Sweden and the United States mourned their six months of wasted hotel bills tipsters' fees". (1)

ডাঃ শাক্টের এই অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ সত্য সত্যই বলকান রাজ্যে নাৎসী প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা দিল এবং 'শস্যের বদলে শেল' সমরাস্ত্রের নীতি এই অধবর্ণ দেশগুলিতে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করিল। কিন্তু কেন?—এর উত্তর পাওয়া যাইবে একে একে সমস্ত বলকান রাজ্যে। অতি সংক্ষেপে এর সারমর্ম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(1) 'Hitler's Drive to the East— by F] Elwyn Jones, Page 44 — 1937

গ্রীস

৬০ লক্ষ অধিবাসীর দেশ গ্রীস ১৯৩৬ সালের ৫ই আগস্ট তারিখ সকাল বেলা সহসা সৈন্যদলের বুটের আওয়াজে চমকিত হইয়া গেল। আগের দিন রাত্রে পুলিশ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান দখল করিল সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করিয়া দিল এবং রাজধানী এথেন্সে রাজা দ্বিতীয় জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল মেটাক্সাস গভর্ণমেন্ট দখল করিলেন—'কমিউনিস্ট উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষার জন্য—মস্কোর বেতনভুক রক্তপিপাসু এই কমিউনিস্ট, সমাজশৃঙ্খলা, পিতৃভূমি, পরিবার এবং ধর্মের ঘোরতর শত্রু।'

কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা ও শক্তি উভয়ই ছিল তখন সামান্য। তথাপি এই আক্রোশ তাদের বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়িল এই কারণে যে, ৫ই আগস্ট তারিখ একদিনের জন্য জেনারেল স্ট্রাইক বা সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হইয়াছিল এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি একত্র হইয়াই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পীড়ন-নীতি ও তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট আহ্বান করিয়াছিল। গ্রীসের জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র—বহু স্থানে অর্ধনগ্ন ভিক্ষুকের দল ভীড় করিত। হাজার হাজার স্ত্রীলোকের ভদ্রভাবে জীবননির্বাহের কিংবা জীবিকার্জনের কোন পথ ছিল না। গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষকেরা ছিল মহাজনের নিকট ঋণে আবদ্ধ। এই অবস্থায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু জেনারেল মেটাক্সাস সাধারণ আতঙ্কের ছুতা ধরিয়া এই সুযোগে রাজা, ব্যাঙ্কার ও সেনাপতিবৃন্দের সাহায্যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, পার্লামেন্ট ও গণতন্ত্রী দলগুলিকে দমন করিলেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিলেন এবং বিরোধী দলকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় গ্রীসে বৃটিশ প্রভুত্বের বদলে নাৎসী প্রভুত্ব প্রসারলাভ করিল। জেনারেল মেটাক্সাস জার্মানভক্ত ছিলেন, তিনি বার্লিনের সামরিক শিক্ষার্থীরূপে ক্রুসে মল্টেকে নামে পরিচিত ছিলেন। (২)

সুতরাং নাৎসী অর্থনীতিবিদ ডাঃ শাকটের পক্ষে গ্রীসের শাসকমণ্ডলীকে হাত করা এবং শস্যের বদলে অস্ত্র সরবরাহে বেগ পাইতে হইল না। মেটাক্সাসের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারে জনগণ উৎপীড়িত হইতে লাগিল আর জেলখানাগুলি নরক-কুণ্ডে পরিণত হইল। মেটাক্সাস 'আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রী' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই অবস্থা চলিল ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সঙ্কটে গ্রীস ময়দানে পড়িল। ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের অবস্থানের গুরুত্বের জন্য বৃটেন তাকে হাতছাড়া করিতে পারে না এবং গ্রীসের রাজপরিবারের সঙ্গে বৃটেনের ছিল একান্ত যোগ। আর রাজাকে কেন্দ্র করিয়া ছিল একদল বৃটিশ পক্ষপাতী রাজনীতিক। তাঁদের সহিত শলাপরামর্শে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন গ্রীসকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং গ্রীস নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। কিন্তু তার মনপ্রাণ রহিয়া গেল ফ্যাসিজমের দিকে। ডাঃ শাকটের ছায়ামূর্তি গ্রীক শাসকদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল। আর ডাঃ গোয়েবল্‌সের প্রচারবিদ্যায় গ্রীসে নাৎসীবাদের জয়ধ্বনি চলিতে লাগিল।......

রুমানিয়া

বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুমানিয়া সর্ববৃহৎ, এর লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। রাজা দ্বিতীয় ক্যারলকে কেন্দ্র করিয়া রুমানিয়া দস্তুরমত 'রোমান্টিক' দেশে পরিণত হইয়াছিল। একদিকে অভিজাত মহলের প্রেম, ব্যভিচার বিলাস এবং অন্যদিকে ঘরহারা জিপসী ও দরিদ্রের দল। রাজধানী বুখারেস্ট শহর রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং বীভৎস দুর্নীতির একটা বৃহৎ আড্ডা। রাজা ক্যারল তাঁর বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মাদাম লুপেস্কু নাম্নী এক রক্ষিতাকে লইয়া বাস করিতেন এবং এক সময় এই নারীর জন্য তিনি পিতার মৃত্যুর সময় সিংহাসনের দাবী পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ দরবারের অন্তরালে মাদাম লুপেস্কুই আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন এবং এই 'রাজকীয় কেলেঙ্কারি' একদা ইউরোপীয় সমাজের রসালোচনার বস্তু ছিল। কিন্তু একা ক্যারলই নহেন আরও অনেকে এই পথের পথিক ছিলেন।

রুমানিয়ার জনগণের দারিদ্র্য ছিল ভয়াবহ। উপবাসী ক্ষুধার্ত নরনারীর অদৃষ্টে রুটির টুকরাও জুটিত না অনেকে আবর্জনা কুণ্ড হইতে খাদ্য কুড়াইয়া খাইত। স্বভাবতঃই এই দরিদ্র কৃষকেরা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। আমাদের দেশের গরীব ও অজ্ঞ গ্রামবাসীরা যেমন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া এবং পরলোকের উপর নির্ভর করিয়া চলে, এখানেও সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে বোয়াক্কিয়ার কিসিনেভ গ্রামে একজন পুরোহিত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই পুরোহিতের কাছে 'স্বর্গের মানচিত্র' ছিল এবং 'মানচিত্রে' বিস্তৃত ঘর কাটা ছিল। অজ্ঞ ও সরলবিশ্বাসী কৃষকেরা বিশেষভাবে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পুরোহিতের নিকট 'স্বর্গের জমির' জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিয়া যাইত। যে 'জমি' ভগবানের যত নিকটে উহার দাম তত বেশী চড়া ছিল এবং ভগবানের কাছ হইতে যত দূরে তত কম দাম। স্বর্গের এই কম দামী স্থানগুলির মূল্য ছিল ৩০; টাকার মত। অনেক কৃষক তাদের ক্ষেত-খামার বা হালের শেষ গরুটি পর্যন্ত বিক্রি করিয়া 'ভগবানের একান্ত কাছের স্থানগুলি' কিনিয়া রাখিত। (৩)

এই যেখানে অবস্থা সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া চিন্তা করিবার মত। রুমানিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান, পেট্রোল এবং গম জার্মানীর পক্ষে লোভনীয়। ডাঃ শাক্টের অর্থনৈতিক দৃষ্টি রুমানিয়ার উপর পড়িল, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানীর সহিত রুমানিয়ার বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং রুমানিয়ার এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য জার্মানীর হাতে গেল। পেট্রোলের জন্য রুমানিয়া প্রসিদ্ধ, ১৯৩৯ সালে ৮০ লক্ষ টন পেট্রোল সেখানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং একদিকে পেট্রোল এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল জার্মানী অনুসরণ করিল। ১৯৩৬ সাল হইতে ইহার সুরু।

মঃ টিটুলেস্কু যতদিন পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন ততদিন রুমানিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি এবং ফ্রান্স, রাশিয়া বা চেকোশ্লভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু বার্লিন ও বুখারেস্টের ফ্যাসিস্টপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে মঃ টিটুলেস্কু পদচ্যুত হন। বলা বাহুল্য যে রাজা ক্যারলের নির্দেশ অনুসারেই ইহা ঘটিল। তিনি ছিলেন জার্মানী ও রাশিয়ার ভূতপূর্ব সম্রাট পরিবারদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং ক্যারল একদিকে হিটলারপন্থী এবং অন্যদিকে নিদারুণ সোভিয়েট বিদ্বেষী ছিলেন। আর ফ্যাসিস্ট ও আধা ফ্যাসিস্টপন্থী রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী দলেরও অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে 'লৌহরক্ষীর' দল ছিল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তারা মাদাম লুপেস্কু এবং রাজপরিবারের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইচ্ছামত খুন-জখম করিয়া বেড়াইত। প্রকাশ্যে আইন অমান্য করিত এবং শেষ পর্যন্ত রাজা ক্যারলেরও সিংহাসন নড়িয়া উঠিল। তখন ক্যারল স্বয়ং ডিক্টেটরি ক্ষমতা হাতে লইয়া দমনকার্য সুরু করিলেন। কিন্তু তাতেও কুলাইল না। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল—পুত্র মাইকেলের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া। এদিকে ফ্যাসিস্ট দলপতি এবং 'Iron Guard' এর নেতা আন্তনেস্কু ডিক্টেটর হইয়া বসিলেন। উহার আগে ১৯৩৬ সাল হইতে রুমানিয়ার ফ্যাসিস্টবিরোধীদের উপর অত্যাচারের বান ডাকিল। বেসারাবিয়ার একটি ১৩ বৎসরের মেয়েকে ১০ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল এবং জেলখানাগুলি এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আর দরকার রহিল না। (৪)

---

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

(৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

(৪) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক। পৃঃ ৭০

৪। বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়া

বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার ইতিহাসও প্রায় একই রকম—সেই সাম্যবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্রবাদীদের পীড়ন, জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং ফ্যাসিজম ও মিলিটারীর দৌরাত্ম্য। ম্যাসিডোনিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা এই অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল,— যেমন যুগোস্লাভিয়ার ক্রোট সন্ত্রাসবাদীরা এই ক্ষুদ্রদেশে দলাদলি ও মারামারির ইন্ধন ছিল না। জনৈক ফরাসী বিদ্রূপরসিক বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"One Bulgarian is a peasant
Two Bulgarians are a political party.
Three Bulgarians are three political parties".

অর্থাৎ একজন বুলগেরিয়ান চাষী মাত্র, দুজন বুলগেরিয়ান মিলে একটি রাজনৈতিক দল, আর তিনজন বুলগেরিয়ান তিনটি রাজনৈতিক দল।

তথাপি বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস ১৯৩৮ সালের মিউনিক সঙ্কটের সময় ফ্রান্স ও বৃটেনের দলে ভিড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হিটলারের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। প্রকাশ যে, অনেক কষ্টে তিনি চেম্বারলেনের সহিত ৭ মিনিটের আলাপ করিতে পারিয়াছিলেন। (৫)

যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে নিহত হইবার পর তার জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রিন্স পল রাজপ্রতিভূরূপে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সোভিয়েট বিদ্বেষ ও নাৎসীবাদের এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যের জন্য ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর সহিত যুগোস্লাভিয়া প্রকাশ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বলা বাহুল্য যে, বলকান রাজ্যগুলিতে জার্মানীর এই আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটেন শঙ্কিত ছিল এবং বৃটিশ কূটনীতিবিদগণও যথাসম্ভব পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়িতেছিলেন। আর বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষপাতী একদল প্রভাবশালী গণতন্ত্রবাদী লোকও ছিলেন। এদিকে নির্যাতিত জনসাধারণও ফ্যাসিস্টদের ও শাসক শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। সুতরাং একদিন মধ্যরাত্রে (মার্চ ১৯৪১) অকস্মাৎ এক নাটকীয় বিদ্রোহ ঘটিল অক্ষশক্তিবর্গের সহিত যুগোস্লাভিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর। সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্য ব্যক্তিরা এক চক্রান্ত করিলেন, রাজপ্রাসাদের রক্ষীরাও ইহাতে যোগ দিলেন—বালক রাজা পিটারকে রক্ষার জন্য। মন্ত্রীদিগকে গ্রেপ্তার এবং সরকারী ভবনগুলি দখল করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির হইল। সেই অনুসারে মধ্যরাত্রির পর ক্যাপ্টেন ম্যাকোৎকোভিক প্রধানমন্ত্রীর গৃহে হানা দিলেন এবং তাঁহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া অনুরোধ করিলেন অনুসরণের জন্য। বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী স্বেৎকোভিস্ ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুকুম দেওয়ার তুমি কে? তোমার কথা আমি গ্রাহ্য করি না।' ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ রিভলবার বাহির করিয়া হুকুম করিলেন— 'March or I fire' হয় আমার অনুসরণ কর নতুবা আমি গুলী চালাইব।' প্রধানমন্ত্রী সুবোধ বালকের মত অনুসরণ করিলেন। এভাবে পুলিশ হেড কোয়ার্টার ও সমস্ত সরকারী ভবন দ্রুত দখল হইয়া গেল। বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সিমোভিচ রাজপ্রাসাদে গেলেন এবং নিদ্রামগ্ন বালক রাজা পিটারকে জাগাইয়া অনুগত প্রজার মত অভিবাদন করিয়া বলিলেন,

"Your Majesty from now you are king of Yugoslavia exercising full sovereign right"

এই অভিনব ঘটনাটি অত্যন্ত নাটকীয় এবং বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ঘটনাটি হইতেই ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সেরাজেভোর ঘটনার মত 'বলকানের বারুদাগারে' বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। সে কথা নিম্নে বলা যাইতেছে। (৬)

• •

হিটলারের দিগ্বিজয়ের দৃষ্টান্তে মুসোলিনী লুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজের ব্যক্তিগত দুর্দাম্পাশার সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাও তাঁকে পাইয়া বসিল। সুতরাং প্রথমত তিনি হাতের কাছে গ্রীস এবং পরে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করিলেন। দুর্বল ফরাসী সাম্রাজ্যের দখল এবং বৃটেনকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা হইতে উচ্ছেদসাধনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনী আলবেনিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীসকে আক্রমণ করিলেন।

বলকান ও ভূমধ্যসাগরের উপর এভাবে ইতালী ও জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় বৃটেন স্বভাবতই শঙ্কিত হইল। ১৯৪০ সালের ২০শে ডিসেম্বর চেম্বারলেনীয় আপোষ ও তোষণনীতির সঙ্গী পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হইলেন বৃটিশ রাজদূতরূপে এবং মিঃ ইডেন তাঁর স্থলে পুনরায় পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইলেন। বলকান অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নাৎসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য মিঃ ইডেন, বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ স্যার জন ডিল এবং অন্যান্য সদস্য সামরিক কর্মচারিগণ ১৯৪১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় গেলেন তুর্কি নেতাদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। দুর্বল তুরস্কের পক্ষে জার্মানী বা বৃটেন কাহাকেও চটানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং তুর্কি গভর্নমেণ্ট উভয়ের নিকটই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আঙ্কারা ভ্রমণের পর মিঃ ইডেন ও স্যার জন ডিল গেলেন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। তখন গ্রীস ইতালীর দ্বারা আক্রান্ত (যাহা হিটলারের পছন্দসই ছিল না) এবং এথেন্সে রাজতন্ত্রবাদী ও বৃটিশ পক্ষপাতী দলও শক্তিশালী ছিল। বিশেষত গ্রীস আক্রান্ত হওয়ায় স্বভাবতই মিঃ ইডেন গ্রীক গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিলেন এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা, উত্তর আফ্রিকা ও সুয়েজের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্ণ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। গ্রীসে বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হইবে এবং ক্রীট ইত্যাদি দ্বীপে বৃটিশ ঘাঁটি তৈয়ার হইবে ইত্যাদি পরামর্শ ও প্ল্যান স্থির হইল। ইহার পর মিঃ ইডেন সদলবলে চলিয়া গেলেন কাইরোতে উত্তর আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য।

১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের বসন্তকালের মধ্যে ইতালী-জার্মানী এবং বৃটেন, উভয়ের মধ্যে বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকা লইয়া কূটনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। হিটলার অনেক আগেই বলকান অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন ডাঃ শাকটের অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের কৌশল দ্বারা এবং তারপর ঘটাইলেন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ। এই সমস্ত দেশ সামরিক দিক দিয়া শক্তিহীন এবং রাজনৈতিক বিচারে ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং বলকান রাজ্য গ্রাস করিতে হিটলারের বেগ পাইতে হইল না। বিগত মহাযুদ্ধের ভার্সাই সন্ধির জন্য এই সমস্ত রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে সীমানা ও ভূমিগত দখল লইয়া বিরোধ ছিল, আর ছিল বহু জাতি, খণ্ড জাতি ও মাইনরিটির সমস্যা। সুতরাং 'divide and rule' নীতি অনুসারে প্রথমেই হিটলার বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটাইলেন রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার ভূমির বিনিময়ে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বের দ্বারা। ১৯৪০ সালের ৩০শে আগস্ট তিনি "ভিয়েনা বাঁটোয়ারা" দ্বারা রুমানিয়ার উত্তর ট্রান্স-সিলভানিয়া হাঙ্গেরীকে এবং যুগোস্লাভিয়ার দক্ষিণ ডবরুজা বুলগেরিয়াকে অর্পণ করিলেন। ইহার ফলে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হইলেন এবং ১৯৪০ সালের ২৩শে নভেম্বর রুমানিয়া অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিল। হাঙ্গেরীও নভেম্বর মাসে রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রে যোগ দিল এবং ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ জার্মানীর সহিত চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়াও নাৎসী সৈন্যদলের গ্রাসে পড়িল। বাকি রহিল যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ দিয়া এবং পারস্পরিক ভূমিগত লোভের উস্কানি দিয়া জার্মানী ধূর্তের মত বলকান রাজ্যগুলিকে একটি একটি করিয়া গ্রাস করিল। যে দুইটি বাকি রহিল, সেগুলিকে তারা সামরিক থাবা মারিয়া কব্জা করিল।

কিন্তু এসবের যবনিকা অন্তরালবর্তী একটু গোপন ইতিহাস আছে, যাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও চমকপ্রদ।

(৫) Quarterly Record of the War —Vol. 6 P. 105-8.

(৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক

১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনীর সৈন্যেরা আলবেনিয়ার পর্বত-সঙ্কুল সীমান্ত দিয়া গ্রীস আক্রমণ করিতে গিয়া অত্যন্ত ফ্যাসাদে পড়িল এবং করিটজা ও আর্জিরোকাস্ট্রো রণাঙ্গনে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। ক্ষুদ্র গ্রীসের কাছে মদগর্বী ইতালীর এই পরাজয় এবং অন্যদিকে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যুগোস্লাভিয়ায় অকস্মাৎ বৃটিশ পক্ষপাতী বিদ্রোহ ও বালক রাজা পিটারকে পুরোভাগে রাখিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দুঃসাহস—এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হিটলার বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। এই প্রসঙ্গে আবার উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থাও স্মরণীয়।

সুতরাং পর্দার আড়ালের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায় যে, হিটলার এই অবস্থায় বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১২ই আগস্ট, তখনও যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু জার্মান সামরিক চক্রান্তের নক্সা পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল। ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব সিয়ানো এবং জার্মান পররাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ উভয়েই বার্সেটিসগাডেনে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের গুপ্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, সিয়ানো হিটলারের নিকট স্বীকার করেন যে, আলবেনিয়া নিতান্তই অনুন্নত দেশ, সুতরাং বলকান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় এই দেশকে কোন সক্রিয় সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা যাইতে পারে না। অন্তত কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কারণ রাস্তাঘাট তৈয়ার করিতে হইবে, খনিজ সম্পদ যথা, লোহা, তামা, ক্রোম, পেট্রোল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর স্যালোনিকা কিংবা বলকানের অন্য কোন দিকে অভিযান চালানো যাইতে পারে। (৭)

অথচ এই অভিমত সত্ত্বেও মুসোলিনী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং পরাজিত হইলেন। কিন্তু এই আক্রমণের পিছনে হিটলার ও তাঁর হাইকম্যাণ্ডের সমর্থন ছিল না। অর্থাৎ জার্মানীর মতে আক্রমণটা 'সময়োচিত' হয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, ১৯৪০ সালের ৭ই নভেম্বর জেনারেল জড্ল এক 'গোপনীয় বক্তৃতায়' বলিলেন,

> 'The attack which they (Italians) launched in the autumn of 1940 from Albania with totally inadequate means was contrary to all agreements......"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ১৯৪০ সালের শরৎকালে আলবেনিয়া হইতে ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ জার্মানীর অভিপ্রেত ছিল না, যদিও জেনারেল জড্ল ঐ বক্তৃতারই শেষাংশে বলিয়াছেন যে, পরে অবশ্য এই আক্রমণের প্রয়োজন হইত যুক্রেনকে গ্রীসের ঘাঁটি ব্যবহারে বাধা দেওয়ার জন্য। এজন্য হিটলারের প্ল্যান ছিল আগে যুগোস্লাভিয়াকে জয় করা এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার করা। কিন্তু মুসোলিনীর 'অপ্রত্যাশিত' গ্রীস আক্রমণে এই প্ল্যান বানচাল হইবার জো হইল। (এই সম্পর্কে হিটলারের অসন্তোষের কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে।) সুতরাং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে হিটলার বিরক্ত হইয়া মুসোলিনীকে এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাতে তিনি বলেন, "ফ্লোরেন্সে যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন গ্রীস আক্রমণের আগে আমার মনের ভাব আপনাকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদি সম্ভব হয়, তবে, এই আক্রমণ স্থগিত রাখিবার জন্য, অন্ততঃ অনুকূল সময়ের আশায় অপেক্ষা করিবার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিতে চাহিয়াছিলাম। বিদ্যুৎগতিতে ক্রীট দ্বীপ দখল করার আগে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করা আপনার পক্ষে উচিত ছিল না।......যুগোস্লাভিয়াকে দলে টানা উচিত ছিল এবং যুগোস্লাভিয়ার দিক হইতে নিরাপদ না হইয়া বলকানে সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ কখনো সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মার্চ মাসের (১৯৪১) আগে আমার পক্ষে বলকান সংগ্রামে কোন সাহায্য দান সম্ভব হইবে না।" (৮)

সুতরাং বুঝা যাইতেছে মুসোলিনীকে এই যুদ্ধে অন্তত কয়েক মাসের জন্য নিজ বাহুবলের উপরেই নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিটলার বুঝিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। সুতরাং ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশে (ওয়ার ডিরেকটিভ নং ২০) গ্রীস আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন সাঙ্কেতিক ভাষায় যাহার নাম ছিল 'অপারেশন মেরিটা' এবং যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের নাম ছিল 'অপারেশন-২৫'— কারণ, আলবেনিয়ায় ইতালীর যুদ্ধ 'বিপজ্জনক অবস্থায়' পৌঁছিল। উত্তর আফ্রিকায়ও অনুরূপ ফল দেখা দিল এবং ট্রিপোলিটানিয়ায় প্রস্তাবিত জার্মান আক্রমণের সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল—'অপারেশন সান ফ্লাওয়ার'।

১৯৪১ সালের ১৯শে এবং ২০শে জানুয়ারী হিটলারের সদর দপ্তরে মুসোলিনী ও উভয়পক্ষের বড় বড় নায়কগণ একত্র হইলেন। তাঁরা স্ব স্ব দিক হইতে যুদ্ধের অবস্থা আলোচনা করিলেন এবং হিটলার বলকান ও উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত করিলেন। ঐ বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হিটলার তাঁর সেনাপতিবৃন্দের সহিত এক গুপ্ত বৈঠকে মিলিত হইলেন এবং রাশিয়া আক্রমণের আগে বলকান ও আফ্রিকার সমস্যা মিটাইতে চাহিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও গ্রীসে ইতালীর সামরিক শক্তির দৈন্য এবং ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ায় অতর্কিত বিদ্রোহের ফলে হিটলার উদ্বিগ্ন হইলেন। ১৯৪১ সালের ২৭শে মার্চ এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হিটলার এক গুপ্ত বৈঠকে ঘোষণা করিলেন, 'যুগোস্লাভিয়ার অবস্থা সর্বদাই অনিশ্চিত। সুতরাং নূতন গভর্নমেন্টের কাছ হইতে জার্মানীর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই এবং কোন চরমপত্র না দিয়াই উহাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করা হইবে।' এই সমস্ত দেশের ভূমিগত বিরোধেরও সুযোগ লওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ হিটলার রোমের জার্মান দূতের মারফৎ মুসোলিনীকে আর একটি পত্র পাঠাইলেন। উহার আগের দিনই তিনি জার্মান হাই-কম্যাণ্ডকে যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুসোলিনীকে এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া তিনি লিখিলেন,

> 'Now I would cordially request you, Duce, not to undertake further operations in Albania in the course of the next few days.

অর্থাৎ গ্রীসের বিরুদ্ধে আলবেনিয়া হইতে আগামী কয়েকদিনের জন্য তিনি যুদ্ধ না চালাইবার জন্য মুসোলিনীকে অনুরোধ করিলেন এবং উহার বদলে যুগোস্লাভিয়া হইতে আলবেনিয়া যাইবার গিরিসঙ্কটগুলি 'পাহারা' দিতে বলিলেন! কিন্তু এই সমস্ত 'খুব গোপনীয়তার অন্ধকারে আবৃত' করিয়া রাখিতে হইবে এবং গোপনীয়তার উপর তিনি চিঠির শেষাংশেও আবার জোর দিলেন—যার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মুসোলিনী ও ইতালীর উপর হিটলারের বিশ্বাস ছিল না (৯)।

যুগোস্লাভিয়াকে কেন্দ্র করিয়া (অবশ্য সেই সঙ্গে গ্রীসও) বলকান বারুদাগারে অগ্নিসংযোগের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে ইতালী ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্কের যেমন আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনই জার্মানীর পূর্ব সঙ্কল্পিত চক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

• • •

বলকান অঞ্চলের উপর ইতালী ও জার্মানীর লুব্ধ দৃষ্টি ও পরস্পরের সন্দেহ সম্পর্কে খ্যাতনামা বৃটিশ ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক হিটলারের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ মুসোলিনী বলকান অঞ্চলে এবং দানিয়ুব নদী এলাকায় ইতালীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে জার্মানীও যদি থাবা মারে, তবে তাঁর উচ্চাশা পূরণের পক্ষে বাধা হইবে। এমন কি দক্ষিণ পূর্ব থেকে জার্মানীর এই থাবা বিস্তারের আশঙ্কাতেই মুসোলিনী গোড়ার দিকে জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের (নাৎসী ভাষায় যেটা 'অস্ট্রো-জার্মান মিলন' নামে অভিহিত) বিরোধিতা করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে হিটলারের

(৭) The Nuremberg Documents—by Peter De Mendelssohn, page 171

(৮) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৭

(৯) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

CENTRAL LIBRARY

অনেক মিষ্টবাক্য সত্বেও মুসোলিনীর সন্দেহ কিন্তু যায় নাই— দানিয়ুব বা অ্যাড্রিয়াটিকের দিকে জার্মানীর যে কোন অগ্রগতির লক্ষণকে মুসোলিনী ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন। অবশ্য হিটলার মুসোলিনীর মনের ভাব জানিতেন এবং তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে, বলকান অঞ্চলে জার্মানীর সহিত ইতালীর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় তিনি মনে মনে বিরক্ত। এমন কি, জার্মানীর উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য মুসোলিনী আগেই এই অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন। একদা ৭ই জুলাই, ১৯৪০, ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হিটলার তাঁকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন যে, ইতালীর পক্ষে যুগোশ্লাভিয়ায় এখন হানা দেওয়া ঠিক হইবে না। এদিকে পরিকল্পিত ইতালীর সাম্রাজ্যের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়াকেও মুসোলিনী মনে মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তারপর গ্রীসকে। কিন্তু হিটলার তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে এই দুই রাজ্যের উপরেই মুসোলিনীর লুব্ধ দৃষ্টিকে সংযত করিতে চাহিলেন এবং সীয়ানোর সঙ্গে পরে একটি সাক্ষাৎকারে হিটলার আবার বলকান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, এখন এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। তবে, হিটলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিলেন যে, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের উপর ইতালীর যে দাবী আছে, সেই দাবীর মীমাংসা করার অধিকার মুসোলিনীর আছে, তবে সেটা অবস্থা আরও একটু অনুকূল হইলে করিতে হইবে।

সীয়ানো বুঝিলেন যে, হিটলারের এই সমস্ত পরামর্শের উদ্দেশ্য হইতেছে ইতালীকে আর বলকানের দিকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া— 'It is a complete order to halt all along the line' অর্থাৎ এই লাইনে আর আগাইয়া না যাওয়ার হুকুম। বলা বাহুল্য যে, মুসোলিনী বিরক্ত হইলেন, তবু হিটলারের মন রক্ষার জন্য ২৭শে আগষ্টের এক চিঠিতে তাঁকে এই বলিয়া ভরসা দিলেন যে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভ সীমান্তে ইতালী যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, তা সমস্তই আত্মরক্ষামূলক। আসলে ইতালীর সমস্ত সামরিক শক্তি মিশর আক্রমণেই নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু এই সমস্ত লেখা সত্বেও সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি যখন রিবেন্ট্রপ রোমে গেলেন, তখন কিন্তু মুসোলিনী গ্রীস আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গোপন করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন যে, গত এপ্রিল মাসের (জার্মানীর আক্রমণ) আগে নরওয়ের যে প্রয়োজন ছিল জার্মানীর কাছে, গ্রীসেরও প্রয়োজন তেমনি ইতালীর কাছে। তবে, তিনি রিবেন্ট্রপকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত না করার আগে তিনি গ্রীসে অভিযান করিবেন না।

এই সময় সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে যে নূতন ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব চলিয়াছিল সেটা দানা বাঁধিয়া উঠে। অবশ্য রিবেন্ট্রপ অনেক আগেই ১৯৩৮ অক্টোবরে এই ধরনের একটা চুক্তির প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিলেন। দুই বছর পর তিনি পুনরায় মুসোলিনীর নিকট সেই আগেকার চুক্তির্দিন পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, প্রস্তাবিত ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধবাদীগণের হাত শক্তিশালী হইবে এবং যাঁরা নিরপেক্ষতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাঁরা আরও জোর পাইবেন। তবে, রিবেন্ট্রপ স্বীকার করিলেন যে, ইতালী জার্মানী ও জাপানের মধ্যে এই নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিতে পারে। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, (রিবেন্ট্রপের মতে) রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি নির্দিষ্ট একটা সীমারেখার মধ্যে রাশিয়াকেই অনুসরণ করিতে হইবে। (১০)

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ এই চুক্তি বার্লিনে স্বাক্ষরিত হইল। চুক্তির ১ নং ও ২ নং অনুচ্ছেদে ইতালী ও জার্মানী কর্তৃক ইউরোপে নূতন ব্যবস্থা (নিউ অর্ডার) প্রবর্তনের অধিকার জাপান মানিয়া লইল এবং এর পাল্টা জার্মানী ও ইতালীও বৃহত্তর পূর্ব এশিয়াতে জাপানের নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার স্বীকার করিল। ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হইল যে, যদি চুক্তি স্বাক্ষরকারীর কোন এক পক্ষ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে, পারস্পরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। অবশ্য চুক্তির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া আমেরিকার নামোল্লেখ ছিল না।

সিয়ানো এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বার্লিনে গিয়াছিলেন। তখন সেপ্টেম্বরের শেষ, অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। অর্থাৎ কবে যুদ্ধ শেষ হইবে তা নিয়া স্বভাবতঃই লোকে বলাবলি করিতেছিল। এজন্য মহাসমারোহে ঢাকঢোল পিটানো হইল এই চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে এবং গোয়েবলসের দপ্তর দারুণ প্রোপাগাণ্ডা চালাইল জনচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। দিন সাতেক পরে আবার ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং অক্ষ শক্তিবর্গের ঐক্য ও সংহতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল। সিয়ানো মন্তব্য করিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলোচনা যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল এবং হিটলার সরলভাবেই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেন এবং রক্ষণশীল মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা আবার অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—'এই মতবাদ সেই সমস্ত লোকের যারা সভ্যতার একেবারে নীচু ধাপে রহিয়াছে।' কিন্তু হিটলার সব কথা বলিলেও জার্মানী যে ইতিমধ্যেই রুমানিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে, সেই আসল কথাটি কিন্তু গোপন করিয়া গেলেন।

অতএব পরের সপ্তাহে যখন রুমানিয়া থেকে জার্মান সৈন্যদের চলাচল সুরু হইল, তখন মুসোলিনী হিটলারের কপটতায় রাগিয়া টং হইলেন। তাঁর মনে হইল হিটলার এবারও তাঁর উপর এক হাত নিয়াছেন। অথচ তিনিও যে এক দফা ইতালীয় সৈন্য রুমানিয়া দখল করিতে পাঠাইবেন, এমন সুযোগও তাঁর ছিল না। সুতরাং ক্রুদ্ধ মুসোলিনী সীয়ানোর কাছে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন :

> Hitler always faces me with a fait accompli. This time I am going to pay him back in his own coin. He will find out from the newspapers that I have occupied Greece. In this way the equilibrium will be re-established. I shall send in my resignation as an Italian if anyone objects to our fighting the Greek (11).

—হিটলার সব সময়েই সব ঘটনা আমার কাছে যেন নিয়তির বিধান রূপে হাজির করেন। কিন্তু এবার আমি তাঁর পয়সাতেই তাঁর দাম দিব। আমি যে গ্রীস দেশ দখল করিয়া নিয়াছি এই সংবাদ তাঁকে এবার খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতে হইবে। এভাবেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে যদি কেউ আপত্তি তোলেন, তবে, একজন ইতালীয়ান হিসাবে আমি পদত্যাগপত্র পেশ করিব।...

ওদিকে তখন (১৩ই সেপ্টেম্বর) উত্তর আফ্রিকায় মিশরে মার্শাল গ্রাৎসীয়ানির আক্রমণ সুরু হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অনেক বেশী সৈন্যসংখ্যা সত্বেও ইতালীর বাহিনী মুষ্টিমেয় বৃটিশ সৈন্যের কাছে হারিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় ইতালীর জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ মার্শাল বাদোগ্লিওও নূতন কোন যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর জিদের জন্য সেই আপত্তি টিকিল না। ২৮শে অক্টোবর আলবেনিয়া থেকে ইতালীয় সৈন্যেরা গ্রীস আক্রমণ সুরু করিল।

হিটলার তখন ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের নৈরাশ্যপূর্ণ মন লইয়া ফিরিতেছিলেন। রাস্তায় তিনি গ্রীস আক্রমণের খবর পাইলেন। এই সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী তাঁকে এক পত্র দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ২৪শে অক্টোবরের রাত্রির আগে সেটা তাঁর কাছে পৌঁছিল না। হিটলার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখন মুসোলিনীর বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। সুতরাং সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি ফ্লোরেন্সে গিয়া হাজির হইলেন তাঁর স্পেশাল ট্রেনযোগে। (এই ট্রেনে করিয়াই তিনি স্পেনীয় সীমান্তে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।) সেখানে পিটি প্যালেসে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং হিটলার তাঁর সমস্ত মনের ভাব গোপন করিয়া মুসোলিনীর

(10) Hitler—Allan Bullock—Pelican P. 6 12-13.

(11) Ciano's Diary—London, 1947 p 297

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা চালাইলেন এবং গ্রীস ও ক্রীট আক্রমণে তিনি জার্মান বিমান বাহিনীর সহায়তা দানেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে মস্কোর গোয়েরিং একটা রিপোর্ট দিলেন মুসোলিনীকে আশ্বস্ত করার জন্য। বাহ্যতঃ দুই পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মনের মিল ও পারস্পরিক মৈত্রী দেখা গেল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে হিটলার যে পাকা অভিনেতা ছিলেন, এই ঘটনা তার আর একটি প্রমাণ। কিন্তু হিটলারের পার্শ্বচর পল শ্মিড্‌ট্‌ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—বাহ্যতঃ দুই নেতার মধ্যে মতের মিল দেখা গেল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিটলারের মনের ভাব অত্যন্ত তীব্র ও তিক্ত ছিল। কারণ, পরপর তিনবার তিনি হতাশ হইলেন—ফ্রাঙ্কোর নিকট, পেতাঁর নিকট এবং একণে মুসোলিনীর নিকট। আগামী কয়েক বছর দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় এই দীর্ঘ ক্লেশকর ভ্রমণ এবং সেই সঙ্গে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত অক্ষশক্তির আশীদার বন্ধুগণ ও প্রতারক ল্যাটিনদের স্মৃতি হিটলারকে বারবার পীড়া দিয়াছিল।' (১২)

বলাই বাহুল্য যে, মুসোলিনী ও ইতালীর সামরিক শক্তির উপর তাঁর বিশেষ কোন ভরসা ছিল না। সুতরাং জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি সামরিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন এবং ১২ই নভেম্বর ১৮ নং নির্দেশনামায় উত্তর আফ্রিকা ও বলকান অঞ্চল অভিযান সম্পর্কে হুকুম জারী করিলেন।

●

বলকান দখল

১৯৪০ সালের ২৮শে অকটোবর ইতালী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিল এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের আরম্ভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইল। কোরিট্‌জা এবং আড্রিয়াটিক উপসাগরের উপকূল ও কালামাস নদী উপত্যকা ধরিয়া—মোটামুটি এই দুই পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল, কিছুকাল যুদ্ধের পরেই ইতালী তাতে পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকালের প্রচণ্ড বরফ ও ঝড়ের জন্য উভয়ের অবস্থাই অচল হইয়া পড়িল। পর্বতারোহী সৈন্যেরা অনেক কষ্টে পাঁচ মাসের অধিক কাল ধরিয়া যে অনিশ্চিত যুদ্ধ চালাইল, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল জার্মানীর অভিযানের দ্বারা।

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিল জার্মানী যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করিল এবং ১১ দিনের মধ্যে উহা দখল করিয়া ফেলিল। রাজধানী বেলগ্রেড 'খোলা শহর' বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ভয়াবহ বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না এবং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড বিস্তৃত হইল। স্বাধীন যুগোস্লাভিয়া মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল।

একই সঙ্গে স্ট্রোমা নদী ধরিয়া গ্রীসও আক্রান্ত হইল। তখন মিশর হইতে একটি বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী জেনারেল স্যার হেনরি মেটল্যান্ড উইলসনের অধীনে গ্রীসে প্রেরিত হইল। গ্রীসের সহিত চুক্তি অনুসারেই এই সাম্রাজ্য বাহিনী সেখানে প্রেরিত হইল। কিন্তু জার্মানীর রণকৌশলের মুখে বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। ৪টি পর্যায়ে এই যুদ্ধ শেষ হইল, যথা— (১) পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ার আত্মরক্ষা (২) অলিম্পাস গিরিবর্ত্ম ও থেসালিয়ান গিরিসঙ্কট দিয়া জার্মানীর অগ্রগতি (৩) এপিরাসে গ্রীক সৈন্যদলের বেষ্টন এবং (৪) বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। মাত্র ৭৪ হাজার সাম্রাজ্য সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল, যার ফলে গ্রীস রক্ষা করাও সম্ভব হইল না, আবার উত্তর আফ্রিকায়ও এর জন্য বৃটেনের অবস্থা কাহিল হইল।

৬ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল, মাত্র ৩ সপ্তাহের যুদ্ধে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের পতন হইল। জার্মানী এই সংগ্রামে ২৪ হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল এবং পার্বত্য যুদ্ধের উপযোগী হাল্কা ট্যাঙ্ক ও বিমান নিয়োগ করিয়াছিল। পর্বত ও গিরিসঙ্কট জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ও সাহসিক রণকৌশলকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। পোল্যান্ড বা ফ্রান্সের যুদ্ধের মতই যান্ত্রিক সৈন্যেরা পদাতিকের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বিদ্যুৎগতি জয়লাভ করিল। এই বলকান সংগ্রামে জার্মানীর মাত্র ৫৫০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল (হিটলারের মতানুসারে) কিন্তু একমাত্র গ্রীসের যুদ্ধেই সাম্রাজ্য বাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্য নষ্ট হইল। বাকি ৪৪ হাজার সৈন্য ক্রীট ও মিশরে অপসারিত করা হইল। কিন্তু এই অপসারণ কার্যে বৃটেনকে বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। জার্মান বোমারুর আক্রমণে সমুদ্রপথে পলায়মান সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল।

বিমান সৈন্যের ক্রীট দখল

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অভিনব এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হইল ক্রীটদ্বীপ, যাহা তখনকার দিন পর্যন্ত ইতিহাসে অতুলনীয় ছিল। গ্রীস হইতে ১৮০ মাইল দূরবর্তী সমুদ্রবেষ্টিত ক্রীটদ্বীপ জার্মান বিমান সৈন্যেরা এক সাংঘাতিক সংগ্রামের দ্বারা মাত্র ১০ দিনের মধ্যে জয় করিয়া লইল—২০শে মে হইতে ৩০শে মে, ১৯৪১। সমগ্র পৃথিবী যেন 'হাঁ করিয়া' এই অদ্ভুত বিমানযুদ্ধে লক্ষ্য করিল এবং জার্মান প্যারাস্যুট সৈন্যেরা আশ্চর্য দক্ষতা ও অপরিসীম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই দ্বীপ দখল করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, বিমান সৈন্যেরা ভারী অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও স্থল ও জলপথের শ্রেষ্ঠতর বাহিনীকে পরাভূত করিতে পারে। বৃটিশ নৌবহর কতকগুলি নাৎসী কনভয়কে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু জার্মান বোমারু ও টর্পেডো-বিমান বৃটিশ জাহাজগুলিকে এমন ব্যারেল করিল যে, নৌবহর ক্রীট এলাকা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ক্রীটে সাড়ে ৩ হাজার প্যারাস্যুট অবতরণ করিল এবং ইহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। তথাপি দলে দলে গ্লাইডার ও সৈন্যবাহী বিমান-যোগে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণ করিল। জেনারেল ফ্রেবার্গের অধীন বৃটিশ বাহিনী তাহা রোধ করিতে পারিল না। ৩৫০ মাইল দূরবর্তী আফ্রিকার ঘাঁটি হইতে বৃটিশ বিমান কোন সাহায্য দিতে পারিল না। ৩৫ হাজার বিমানবাহী সৈন্য ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া লইল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর অর্ধেক বা ২৭ হাজার সৈন্য ত্রাণ পাইল। আর জার্মানীর হতাহত হইল ১৭ হাজার। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের জয়ের মূল্য অপরিসীম ছিল।

মিঃ চার্চিল সেই সময় কমন্স সভায় ক্রীট দ্বীপের অদ্ভুত মারাত্মক সংগ্রাম সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

> 'A strange and grim battle is being fought one in which our side has no air support because they have no aerodromes— not because they have no aeroplanes —while the other side has very little or no artillery or tanks and neither side has any means of retreat.
> It is a desperate grim battle and I certainly will send wishes and encouragement to the men who are fighting what is undoubtedly the most important battle which will affect the whole course of the campaign in the Mediterranean".

অর্থাৎ এক অদ্ভুত এবং নৃশংস যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের বিমান আছে, কিন্তু বিমানঘাঁটি নাই, ফলে বিমানের কোন সাহায্য আমরা পাইতেছি না, আবার শত্রুপক্ষেরও কামান, ট্যাঙ্ক ও গোলাগুলী নাই —এবং কোন পক্ষেরই পিছনে হটিবার কোন জায়গা নাই। নৃশংস ও দুর্ধর্ষ এই যুদ্ধ—এই যুদ্ধ যাহারা চালাইতেছে, সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে নিশ্চয়ই আমি আশা ও উৎসাহের বাণী পাঠাইব। এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, ইহা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রামের গতি নির্ণয় করিবে।'

ক্রীট দ্বীপ দখলের দ্বারা সমগ্র বলকান অঞ্চল জার্মানীর মুঠোর তলায় আসিয়া গেল এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তিবর্গের প্রভাব বিস্তৃত হইল। রাশিয়া আক্রমণের পূর্বে ইহাই ছিল জার্মানীর শেষ ইউরোপীয় অভিযান এবং বৃটেনকে আর একবার ইউরোপীয় ভূমিভাগ হইতে বিতাড়ন। হিটলারের জয়ধ্বনিতে তখন পৃথিবী মুখরিত হইল এবং সেই সঙ্গে আবার শুরু হইল উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে রোমেলের মশতাড়ুর্বের বিস্ময়।

(ক্রমশঃ)

(১২) Hitler—Allan Bullock P.616.

আবহমান কাল

অসীম রায়

তৃতীয় পর্ব

মাস ছয়েক পরে গরমের সন্ধ্যা। বাগানের মাঝখানে লাল টিনের চালওয়ালা দোতলা লাল বাংলোর বারান্দায় ইলেকট্রিক আলো, সেকালের জলপাইগুড়ি শহরটা ফিটফাট নির্জন, ছাড়া-ছাড়া। গেটের গায়েই সেন্টিগ্রেডের মাথায় প্রস্ফুটিত চাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। টেবিলের ওপাশে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা যুবকটিকে বুড়ী প্রশ্ন করে, 'সার, এটার মানে কি?'

মানে, মানে একটা কবিতা...একটা একটা...গান, রবীন্দ্রনাথের।

যুবকটি তোতলায়। বুড়ী ভুরু কুঁচকায়। গত কয়েক মাসে অনেকটা বেড়ে উঠেছে সে। গোলাপী কুঁচতোলা খাটো স্কার্টের ওপর সাদা অর্গান্ডির ব্লাউসে গ্রাম নাইনের মেয়েটিকে লাগে অপরূপ যুবকটির কাছে। ওপরের দিকে টেনে তোলা চুলের ওপর অনায়াসভাবে হাত বুলিয়ে ঠোঁটটা দুবার চেটে নেয় বুড়ী। অস্পষ্ট হাসির রেখা তার ঠোঁটের দু পাশে ফুটেই মিলিয়ে যায়। আবার ভুরু কুঁচকিয়ে বলে, 'তা অঙ্কের খাতায় কেন?' বুড়ী আলোর নীচে খাতাটা মেলে দেয়। ছোকরাটির হাতের লেখা নিঃসন্দেহে ভাল। খুব যত্ন চাইনিজ ইঙ্কে খাড়া অঙ্কের খাতার শেষে লেখা :

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ
দিয়েছিনু জল ছলছল মেঘে মেঘে...

তারপর সশব্দে হেসে ফেলে বুড়ী। তারপর হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে 'এটা কি মাস সার?'

'যে মাস'. ছোকরাটির ফর্সা কান লাল হয়ে দেখায়।

'শ্রাবণ মাস আসতে সার আরও দু মাস।'

পরদিন বিকেলে মমতা আসে। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের মেয়ে মমতা বুড়ীর চেয়ে আরও দু বছরের বড়। বেশ চলচলে লাবণ্যময় ফর্সা চেহারা মমতার। সব সময়ই হাসছে। আর হাসলে গালে চমৎকার টোল পড়ে। বুড়ীর সে সহপাঠী কিন্তু জগত সংসার সম্পর্কে অনেক বেশী খবর রাখে। বুড়ী তখন দোল খাচ্ছে বাগানের কোণে ঝাঁকড়া একলা আমগাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায়। মমতা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর পায়ের বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ক্রমাগত বুড়ী ওপরে উঠতে থাকে। শানা থেকে দূরে করলা নদীর ওপরে ব্রিজটার মাথা চকিতে চোখে পড়েই মিলায়।

'বু...ড়ী' গানের সুর ধরে মমতা ডাকে।

বুড়ী কাত হয়ে ওপর থেকে তাকায়। মনো মেয়ে বলে স্বর্ণসুন্দরী এ মেয়েকে একটু [illegible] দেখতেন। তবে বছর-খানেক হল এই শ্যামলা মেয়ের মুখশ্রী যে অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠেছে কৈশোরে তারও চোখ খুলেছে। দোলনা থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমেই তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ী।

'এনেছিস, আমার জন্য এনেছিস বইটা?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই নীল শাড়ির আঁচলে লুকানো বইটা টেনে নেয়। মলাটের ওপর চোখ রাখতেই তার [illegible] মুখ-চোখ স্নিগ্ধতা নামে। বইটার নাম 'প্রথম প্রেম', লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

দিন দুই আগে বইটার গল্প করেছে মমতা। আমগাছের কোলের ওপর বইখানা রেখে বুড়ী মমতার কাঁধে হাত রেখে দুলতে থাকে। বরফের মতো কুঁচি কুঁচি সাদা ফুলে ঢাকা দূরে কুলগাছটার দিকে চেয়ে আছেন মা মাটিতে ঠেকিয়ে যায়। 'আচ্ছা, পানুদা এমন করে কেন বলত?'

'পানুদা? তাই নাকি! ওকে তো একদম ভিজে বেড়াল ভাবতাম!' মমতার বিস্ময় কৌতূহলেই বুড়ী একটু অস্বস্তি বোধ করে।

'না না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না।'

'ঠিক আছে। তাই নাকি বাপু। আমিও কিছু বলব না তোমাকে।'

বুড়ী ঘাড় নাড়ায়, 'সত্যি বলছি সেরকম কিছু নয়।'

'কি রকম কিছু?' মমতার চোখ জ্বলে কৌতূহলে।

'এই যেমন দিদির বেলায় হয়েছিল,' বুড়ী বললে অন্যমনস্কভাবে।

'গৌরীদির বেলায়? দেখেছো আমাকে তুমি কিছুই বল না আর আমি সব কথা আদ্যোপান্ত তোমাকে বলি। বেশ, ঠিক আছে।' মমতা দোলনার তক্তা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

'বোস বোস।' হাত ধরে টেনে বসায় বুড়ী মমতাকে। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'সেরকম কিছু না, একটা মাঝবয়সী লোক হীরালালবাবু পড়াতে পড়াতে দিদির হাত চেপে ধরেছিল একবার। দিদি মাকে বলে দিল। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। সেরকম কিছু না। পানুদা খুব ভাল লোক।'

বুড়ীর শেষ কথায় মমতার মুখে চোখে কৌতুক ঝিলিক মারে। 'পানুদা খুব ভাল লোক না-রে? ঐরকমই মনে হয় প্রথম প্রথম।'

বুড়ী জবাব দেয় না। মমতা তার চেয়ে জগৎসংসার সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু পানুদার ব্যাপারেও জানিয়ান বুড়ীর পছন্দ হয় না। পানুদাকে সে অনেক ভাল করে জানে। তিনমাস আগে জলপাই-গুড়িতে ভবনাথের বদলি হবার দিন সাতেক পর থেকেই স্কুলের ভাল ছাত্র ইন্টার-মিডিয়েট পাস সুরঞ্জন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কেরাণী পানু মিত্র বুড়ীর গৃহশিক্ষক। তিন ভাই বোন কাবেরী পড়লে পড়াশোনার অসুবিধে হতে পারে বলেই এ ব্যবস্থা। আর একটি তরুণ সেনপাড়ার ক্যাপ্টেন দুই ভাইকে পড়ায় একজন নীচের ক্লাসে। ক্যাপ্টেন স্থানীয় স্কুলের নীচু ক্লাসের মাস্টার এবং রবীন্দ্রানুরাগী মাস্টার।

দুই বন্ধু আবার পাশাপাশি বসে দোল খায়। বুড়ী দোলনার ওপর হাঁটুতে মাথা রেখে [illegible] [illegible] আসতে [illegible] [illegible] [illegible] পড়েই উড়ে পালায়। গেট খোলার শব্দ

CENTRAL LIBRARY

আসে। ভবনাথ তাঁর বহুদিনের ব্যবহৃত সাইকেলখানা ঠেলতে ঠেলতে বাগানে ঢোকেন। তাঁর সাম্প্রতিক পদোন্নতিতেও বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। সাদা প্যান্টের ওপর কাঁধকাটা ঘিয়ে তসরের কোট। বুড়ীর মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই ভবনাথ কোর্ট থেকে ফিরতেন রাণাঘাটে, মুন্সীগঞ্জে।

'কথা বলছিস না যে! পানু-দার ব্যাপারে আমি মোটেই জেলাস নই', মমতা বললে।

বুড়ী অবাক হয়ে তাকায়। মমতা বুড়ীর কানের কাছে মুখ রেখে বললে, 'ছেলেরা মেয়েদের কাছে কি চায় জানিস?'

'কি আবার। আমি যা তোর কাছ থেকে চাই।'

'দূর, তুই কিছু জানিস না, একেবারে ছেলেমানুষ।'

'আমি জানতে চাই না', বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বললে।

মমতা গুন গুন করে সুর ভাঁজে। তারপর খুব মিহি চাপা চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় গায়:

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভোলালরে ভোলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভোলানো গান।

গান থামিয়েই বললে, 'তুই দেখিস নি?'

'কী?'

'সে কি? মুক্তি! আমরা কাল দেখেছি। ফান্ট্যা! দেখে আয় দেখে আয়! উঃ কি মারভেলাস! প্রমথেশ বড়ুয়ার কি অ্যাক্টিং মাইরি!'

বুড়ী সেই উদ্ভাসিত মুখখানা মুগ্ধ হয়ে দেখে। তার এই দামালো কণ্ঠটির প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে।

'আমরা শনিবার যাব', বুড়ী আস্তে আস্তে বলে।

'এবার নাম, আমি একটু দুলি।'

মমতার পায়ের দাপে দোলনা কেঁপে কেঁপে অনেক ওপরে উঠে। তার থোপা থোপা চুল হাওয়ায় ওঠে নামে। লাল মুখলো বেরোন ঝকঝকে দাঁতের হাসি ভরা মুখে এক-একবার বুড়ীর দিকে তাকায়। আর এক এক ঝলক মিষ্টি হাওয়ার মতো মমতার সান্নিধ্য তাকে স্পর্শ করে। সে যেরকমভাবে মমতাকে কাছে পেতে চায় পানুদাকেও চায় তেমনিভাবে কাছে পেতে। ঠিক এমনিভাবে বিকেলের আলোয় দোল খেতে খেতে বা সিনেমার গল্প করে। ছেলেরা মেয়েদের কাছে আবার কি চায়?

কিন্তু দুদিন পর 'মুক্তি' ছবিটা বুড়ীর মনে যেরকম আলোড়ন আনে সেকথা অনেক-দিন সে ভুলতে পারবে না। পরেও কখনো যে চিত্রকল্প জন্মেছিল পানু-দার সান্নিধ্যে মুক্তি ছবির নায়ক প্রমথেশ বড়ুয়া তাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিল। ঠিক সে গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছেলেরা চাইবে, জোর করবে, মোটা গলায় কথা বলবে, মেয়েদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে না, তাকাবে আদায়ের ভঙ্গীতে, দাবীর ভঙ্গীতে। আর মেয়েরা সেই আদায়ের ভঙ্গীই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে, বরং তা না থাকলেই সে হবে অদ্ভুত। এইরকম কতগুলো আবছা ধারণা অস্পষ্টভাবে বুড়ীর মাথায় খেলতে থাকে। এক কথায় পানুদার যে ছবিটা তার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল রূপোলীপর্দার নায়ক সে স্থান অধিকার করে নিলে। শয়নে স্বপনে এখন প্রমথেশ বড়ুয়া বুড়ীর সঙ্গী।

'আপনি মুক্তি দেখেছেন স্যর?'

পরদিন বুড়ীর প্রশ্নে পানু চমকায়। ভুরু কুঁচকিয়ে বলে, 'না দেখি নি, দেখব না।'

'দেখবেন না, কেন?' বুড়ীর চোখেমুখে কৌতুক খেলা করে।

'ওসব তুমি বুঝবে না। সিনেমা দেখা ভাল না।'

বুড়ী তার গৃহশিক্ষকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'আমার খুব ভাল লাগে। আপনারও ভাল লাগবে।'

পানু ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। মেয়েটিকে তার বরাবরই ভাল লাগে। তার চেহারা ছটফটে মেজাজ তাকে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দু ছত্র জ্যামিতির খাতায় যে লেখে নি · তা নয়। কিন্তু তাই বলে সিনেমা নিয়ে তার ছাত্রী তার সঙ্গে খোসগল্প করবে এতে তার আত্মসম্মানে লাগে। তারপর সে নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তার ছাত্রীকে দেখাতে অভ্যস্ত কিন্তু তার ছাত্রীও যে তাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে, সে যখন মাথা নীচু করে অঙ্ক দেখছে তখন তার খাতার ওপর না পড়ে এক জোড়া চোখ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে এই নতুন পরিস্থিতিতে সে বিচলিত বোধ করে। মাস গেলে পনেরোটা টাকা আসত অস্বচ্ছল সংসারে সে পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে ভয় হয়।

'আপনার অফিস কখন ছুটি হয়?'

'কেন? পাঁচটা। কেন?'

'পাঁচটা হলে হবে না। পাঁচটা হলে দেরী হয়ে যাবে। চারটে হয় না?'

সেই কৌতূহলী উৎসুক মুখখানার দিকে চেয়ে পানুর অসোয়াস্তি হয়, আবার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে।

'কেন, কোথাও যাবে?'

'চলুন না, সেই একবার বোটে গঙ্গার ধারে গিয়েছি। কাল যাবেন?'

'মাসীমাকে বলে নিও। আমি চারটেতে আসব একটু সকাল সকাল ছুটি করে।'

'মা-কে? কেন?' বুড়ীর মুখে বিরক্তি। একটু হাসেও। গলায় ঠাট্টা স্পষ্ট। 'কেন, ভয় করেছে বুঝি?'

আবার কান লাল হয় পানু মাস্টারের। এরকম ব্যাপার গল্পেটল্পে পড়েছে, অমুকা কোর্ট কেসের রিপোর্টের লাইনটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে, 'তাহাকে ফুসলাইবার অভিযোগে', আস্তে আস্তে বললে, 'না ভয় কেন, মাসীমা ভাববেন তাই বলছি।'

'মা-কে বলব মমতার বাড়ি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

পড়ার শেষে উঠবার মুখে বুড়ী বললে, 'আপনি রাস্তার মোড়ে থাকবেন। ওখান থেকে আমি ধরে নেব।'

পরদিন দুপুরে চারটেতে তার একমাত্র সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পানু নির্জন রাস্তার মোড়ে মেহগিনী গাছের নীচে। কিছুক্ষণ পরই বুড়ীকে আসতে দেখা যায়। খাটো ধূসর স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজের সঙ্গে সাদা হিলতোলা জুতোয় অনেকটা লম্বা দেখায় তাকে। মাথায় নীল রিবন প্রথমেই চোখে পড়ে। নির্জন পিচঢালা রাস্তা ধরে গাছের তলা দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে থাকে। অদূরে ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে টেনিস মাঠে কতগুলো লালমুখ দেখা যায়।

'আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে কি বিশাল নদী।' বুড়ী মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

পানু সামনেই বিকেলের রোদে পাণ্ডুর বিস্তৃত বালির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'তিস্তাও বিশাল।'

'ও তো খালি বালি। আর এই টুকুন জল। পদ্মা দিয়ে যখন স্টিমারে যেতাম তখন যে কিরকম মনে হত। আপনার দেশ কোথায় পানু-দা?'

'আমার? মেটেলি।'

'মেটেলি? কি অদ্ভুত নাম!'

'সেখানে নদী নেই, খালি পাহাড় আর আশেপাশে চায়ের বাগান।'

'চায়ের বাগান?'

'তোমরা যদি ডুয়ার্সে যাও কিংবা দার্জিলিং-এ, অনেক চায়ের বাগান দেখবে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বললে, 'আমার মেটেলিই সবচেয়ে ভাল লাগে। বাবা ছিলেন চা বাগানের ডাক্তার।'

নার্ভাস ভাবখানা পানুর কেটে যায়। চা বাগানের গল্প করে, একবার চিতা এসেছিল একেবারে তাদের কোয়ার্টারের কাছে। চারপাশ থেকে বেড়া দিয়ে সড়কি দিয়ে মারা হল বাঘ। পানুর সেই নার্ভাস ভাবখানা একেবারে কেটে যায় ছেলেবেলার গল্প বলতে বলতে, অনেক স্বাভাবিক দেখায় তার ছুঁচলো ফর্সা মুখখানা। কিন্তু বুড়ী ভেতরে ভেতরে অসোয়াস্তি বোধ করে। তার এ ধরনের আলাপ যে ভাল লাগে না, তা নয়, কিন্তু এ ধরনের আলাপ ছাড়াও সে আরেক ধরনের

কথাবার্তা শুনতে চায়। অন্তত কয়েক মাস ধরে এইরকম একটা স্বপ্নের কথাই সে ভেবে এসেছে আর এই শরতে রোদে বালির চড়ায় বসে বসে সেই স্বপ্নটার মাঝখানে সে ডুবিয়ে যেতে থাকে। এক ঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। 'দেখুন দেখুন!' বলে বড়ী তার ডান হাতখানা ওপারের দিকে তুলে পানুর কোলে আলগোছে রাখে। কাঁচ কাঁচ করে কতগুলো গরুর গাড়ি আসে পাশের গ্রাম থেকে।

সন্ধ্যে নামছে কিন্তু পানুর খেয়াল নেই। সে তার শাশ্বতীর হাত ধরে বসে থাকে। তার আর ভয় নেই, অস্বোয়াস্তি নেই, এক নবীন বন্ধুত্বের আত্মবিশ্বাসে তাকে সম্মোহিত দেখায়। একটু দূরে এক ঝোপে খেজুর গাছের গোড়া থেকে বোধহয় একটা ছাগল কাশে।

'পানুদা, তুমি একটা বোকা!' বড়ী হঠাৎ বললে।

'বোকা! কেন?'

বলেই বুঝতে পারে পানু। আর সেই অস্পষ্ট অস্বোয়াস্তি তার চিন্তাশক্তি আবৃত করে। বড়ী তার দিকে মাথা হেলিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে চাপা কৌতুক। সেদিকে চেয়ে পানু গাঢ় গলায় বললে, 'পারুটী!' তারপর তার ছোট মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে গভীর চুম্বন করে।

ঠিক এই সময় অনতিদূরে খেজুর গাছের গোড়া থেকে ছাগলটার কাশির মাত্রা বেড়ে যায়। তারপর খিক খিক করে হাসির আওয়াজ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ বড়ী পানুর খুব কাছেই মাটির ঢেলা পড়ে। তারা চমকে দাঁড়িয়ে উঠতেই স্পষ্ট ভোম্বলের গলা পাওয়া যায়, 'কি মশা! বাবা রে!' আর সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারে টুটুল ভোম্বা ছিটকে বেরিয়ে যায়। টুটুলের হাসি জল-তরঙ্গের মতো বাজতে থাকে।

(২)

সম্প্রতি চোঙার জন্যে ক্রিকেট ব্যাট আসার পর থেকে খুব জমিয়ে ক্যাম্বিস বলে খেলা চলছে। তখনও তিস্তার বাঁধ হয়নি এবং যেখানে সেখানে মাঠের মধ্যে পাকা বাড়ির করুণ বিসদৃশ সমারোহ দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না। দেশ ভাগের চাপও উত্তর-বঙ্গে আছড়ে পড়ে নি। শহরটা তখন নিঝুম, ছিমছাম। তাই ছেলেদের নড়বার চড়বার জায়গা প্রচুর। বিকেল গড়িয়ে এলে ভোম্বল, তপন দস্তিদার, দেবী, জয়ন্ত, ঢেঁকী বা বনবিহারী সাহা চোঙা টুটুলের জমজমাট ক্রিকেট টিমকে প্রায়ই ক্রীড়ামত্ত দেখা যায় আম-বাগানের ধারে মাঠে। ঢেঁকী তাদের মধ্যে বয়সে বড়। দুর্দান্ত সাইকেল চালায়, মারাত্মক বল করে। টুটুলের সহপাঠী তপন দস্তিদারের গায়ের জোর সবচেয়ে বেশী। খুব হাঁকড়িয়ে ব্যাট করতে যায় এবং প্রায়ই আউট হয়। বল সবচেয়ে ভাল লোফে চোঙা। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সে বল, লোফে যেখানে সেখানে যে সে [illegible] সবচেয়ে ভাল ব্যাট

ভোম্বল। তাকে আউট করতে বোলারের হাত কন-কন করে। আর ভাল ব্যাট করে টুটুল। টুটুলের এই অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা চোঙার ঈর্ষার কারণ হয়। টুটুলকে সে খেলাধুলোর ব্যাপারে বরাবরই এলেবেলে ভেবে এসেছে। কিন্তু তার ছোট-ছোট হাত-পা নিয়ে সে অবলীলাক্রমে ব্যাট ঘুরিয়ে বেশ তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে।

তপন-কে কেন-জানি পনরী-ছাড়া ভাবা যায় না। বয়সে টুটুলের চেয়ে একটু বড় হবে কিন্তু হাব-ভাবে সে বিশেষ ভাব-গম্ভীর। টুটুলকে সে তিনখানা নাইজিরিয়ার স্ট্যাম্প দিয়েছে, দিনিদ দুটো দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু টুটুলের পছন্দ নয় তপন-কে। তার এই ভাবগম্ভীর ভঙ্গির মেজাজটা তার অপছন্দ। তার চেয়ে সে চোঙার সহপাঠী ভোম্বলকে ভালবাসে। ভোম্বলের চোখ দুটো চমৎকার, ভুরু নাচিয়ে কথা বলে। তার দুটো ফাউন্টেন পেন আছে। তার ওপর নতুন র‍্যালে সাইকেল। টুটুল আর চোঙার সাইকেলও আয়ত্ত হয়েছে। তবে টুটুলের হাফ প্যাডেল।

ভোম্বলের সঙ্গে চোঙারই সবচেয়ে ভাব। কাঠালগাড়ি টি এস্টেটের পাশা-পাশি চারখানা চায়ের বাগানের মালিক অমিয় মৈত্র বেশ সম্পন্ন লোক, বোধহয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে সুধীর সম্প্রতি বি-এ পাশ করেছে। দ্বিতীয় ছেলে মনা একটু পাগলাটে। তৃতীয় সন্তান ভোম্বল তার সুখের আর অন্ত নেই। ভোম্বলের সঙ্গে চোঙার কতগুলো বিশেষ ধরনের কথা হয় যেগুলো ঠিক ধরতে পারে না টুটুল, আর আন্দাজে কিছুটা ধরতে পারলেও তা নিয়ে এত ফুসফাস গুজগুজ করবার কি কারণ আছে বোঝে না। আর এ সময় টুটুল কাছে এলেই তাদের আলাপ হঠাৎ বন্ধ। ভোম্বল অমনি চোখ নাচিয়ে বলে 'সাইকেল চড়বি না টুটুল?' টুটুল অপ্রসন্নভাবে সরে যায়। একদিন সে আড়িও পেতেছিল। ভোম্বল ফিসফিস করে বলছিল। আধেক কথা শোনা যায়, আধেক শোনা যায় না। এক রাজকুমারীর মনে সুখ নেই। সবাই সুখ দিতে আসে কেউ পারে না।

ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় ও সংক্রমণ রোধে বিশেষ উপযোগী, মধুর গন্ধযুক্ত

বোরোলেপ

এই এ্যান্টিসেপটিক ক্রীমের ব্যবহার সংক্রমণ হতে রক্ষা করে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে। বিবিধ সাধারণ চর্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। সকল ঋতুতে নিয়মিত ব্যবহারে বোরোলেপ আপনার চর্মকে রুক্ষতা ও রুক্ষতা হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ ও মোলায়েম রাখে।

কসমেটিক ডিভিশন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, নাগপুর

সমুদ্দুরেই পগার পার। তারপর নায়ক এলেন। সে এক মুখ নিলে...এবং ভোম্বল অদ্ভুত কতগুলো অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে আর ছোড়দা হেসে গড়িয়ে পড়ে। চোখ দিয়ে ছোড়দার জল বেরিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে। সেইভাবে জিজ্ঞেস করে, 'তার-পর?' 'তারপর আর কি? তারপর তারা জলের মধ্যে থাকতে লাগল আর এই রকম করতে লাগল।' ভোম্বল হাসতে-হাসতে চোখের জল বের করে উত্তর দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে দরজার পেছনে টুটুলের দিকে নজর পড়ে তার। 'ইস, আবার এলেবেলেটা এসেছে।' টুটুল দৌড়ে পালিয়ে গেল। এ ঘটনার পর প্রায় সাত দিন সে ভোম্বলের সঙ্গে কথা বলে নি।

এদিক থেকে ভোম্বলের ছোড়দা মনার সঙ্গে তার বনে ভাল। অবশ্য বলতে গেলে মনা-ই তার প্রতি আকৃষ্ট। জামিরবাবুর বড় ছেলে বেশ দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই একটা টি এস্টেটের ম্যানেজার। ভবনাথ-কে সপরিবারে তাদের সদ্য-কেনা চকোলেট রংয়ের বি-এইট ফোর্ডে চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে, সবাই মিলে ভুয়ার্সে বাবার প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছে স্বর্ণসুন্দরীর কাছ থেকে। ছোট ছেলে ভোম্বলও বেশ চালাক-চতুর, তার সৌখিন মেজাজ তার যথেষ্ট সফল বাপের পছন্দ। মনা এর ব্যতিক্রম। সে কলকাতার স্বামী প্রণবানন্দ অথবা অন্য কোন মহারাজের শিষ্য। কালো, বেঁটে, রোগা, ভেতো, দুই স্বাস্থ্যবান ভাই থেকে একেবারে আলাদা। মনা এসে বাগানের এক কোণে বাতাবি লেবু গাছের নীচ থেকে তার সাইকেলের বেল দেবে। বাড়ীর ভেতরে সে যাবে না। কারণ বুড়ী কিম্বা অন্যান্য কোন নারীর সঙ্গ তার অপছন্দ। টুটুল দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এসে বলে, 'মনা-দা চকোলেট এনেছো?'

মনা বুক পকেট থেকে চকোলেট বার করে। টুটুল চট করে ছবিগুলো সরিয়েই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'কি মজা, মোটা গার্বো।' মোড়কের ভেতর থেকে নীল জামা আর মুক্তোর হার-পরা গার্বোর ছবি। মনা সেদিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললে, 'ওটা ফেলে দে। ওটার জন্যে তো আমি চকোলেট আনি নি। তুই খাবি বলে এনেছি।'

'বাঃ আমি যে জমাই। আমি জমাই, দাদা জমায়।'

'আচ্ছা চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

মনার নতুন সাইকেলের রডে চড়ে আরাম আছে। ভবনাথের সাইকেলটা অনেক পুরনো। আর ছোড়দা তাকে রডে নিয়ে চালালে গাড্ডাগর্তে পড়লেই পাছা ব্যথা করে। নদীর দিকে নির্জন রাস্তা ধরে চলতে-চলতে মনা বললে, 'বাঙালীর কি অভাব জানিস? আত্মশক্তি। বুঝেছিস?'

টুটুলের জিভ তখন চকোলেটের সরলতার মধ্যে। 'হ্যাঁ বলনা!' তাড়াতাড়ি মাথা দুলিয়ে উত্তর দেয়।

'স্বামীজী কি বলে জানিস? আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বেশী লোকের দরকার নেই। মাত্র বারোজন। এই বারোজনের ওপরেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

টুটুল লক্ষ করছিল নতুন সাইকেলে বেগ বাড়লেই কেমন একটা সাঁ-সাঁ শব্দ বেরোয়। বাবার সাইকেলে সে রকম হয় না। বোধহয় নারকেল তেল দিলে শব্দ বেরোতে পারে।

নদীর ধারে কয়েক মাস আগে পান্নু আর বুড়ী যেখানে বসেছিল তার কাছেই তারা বসে।

দুজনে পাশাপাশি বসার পর মনা বললে, একটু তোতলিয়ে, 'তো-তোর দিদির কিন্তু নাম খারাপ হচ্ছে।'

'নাম খারাপ?' অবাক হয়ে চেয়ে থাকে টুটুল। একটু ভয়ও করে। তিস্তার ধারে সেই সন্ধ্যেটার ছবি মনের মধ্যে খেলে যায়।

'হ্যাঁ, পান্নু-টা একটা রাসকেল। ও ছি-ছিক্কে বেড়াল। আগেও এরকম করেছে। তোর দিদির সর্বনাশ করবে বলে দিচ্ছি।'

টুটুল ঘাবড়ে যায়। জিভে চকোলেটের মিষ্টি স্বাদ, একটু দূরেই রোদ্দুর ঝলকানো জলের হাওয়া সব কিছু বিস্বাদ লাগে। 'আমি ওসব জানি না মনা-দা। আমি কিছু জানি না।'

'তোমার মাসীমাকে বলতে হবে। ভোম্বল আমাকে সব বলেছে।'

টুটুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে। 'আমি পারব না বলছি, মনদা,' প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে।

'পারতে হবে। তোমাও স্বারাই হবে। আ-আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হবে। স্বামীজী অন্তর্দৃষ্টিতে সব দেখতে পান। যে বা-বারোজনের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তার মধ্যে তো-তোমার নামও আছে। স্বামীজী কখনও মিথ্যে বলবেন না। তোমার ওপরে অ-অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের শুরুতেই মনা তোতলায়। একবার বাধা দূর করতে পারলেই গোটা বাক্যটা নির্বিবাদে পার হতে বিশেষ অসুবিধে হয় না।

'বল, বলবে?'

টুটুল যান্ত্রিকভাবে বললে, 'বলব'। আজ বিকেলে নতুন সাইকেলে বেড়ানোর আনন্দ, চকোলেটের স্বাদ তার কাছে মাটি হয়ে যায়। আমবাগানে ক্রিকেটেই গেলে পারত সে, এরকম ফ্যাসাদে পড়তে হত না, টুটুল চিন্তা করে।

'এবারে আয়, আমরা আসন করি।' মনা পা মুড়ে পিঠ খাড়া করে, পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে। টুটুলকেও তার পাশে বসতে আহ্বান করে। মিনিট পনেরো কেটে যায়। টুটুলের বাঁ হাঁটুর নীচটা চুলকোয়। সেদিকে হাত বাড়াতেই মনা সজোরে তোতলায় 'ন-ন-নড়িস নে।' আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট কেটে যায়। হঠাৎ তিস্তার পারে পুলিশ-লাইন থেকে বিউগল বাজে। একটানা বেজে আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। এবার বোধহয় ঝিঁঝিঁপোকা কানতাচ্ছে ঘাসের মধ্যে থেকে।

'ঠিক কপালের মাঝখানটায় কিছু মনে হচ্ছে? একটু গরম লাগছে? মানে এক রকম জ্যোতির মতো জিনিস ঠিকরে বেরোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?' চোখ বন্ধ করেই মনা প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার আড়চোখে মনা-দার দিকে তাকিয়ে বেশ করে চুলকিয়ে নেয় হাঁটু, নাকের ডগাটাও হাতের তালু দিয়ে ঘষে নেয়।

'অমন নড়িস নে। অধৈর্য হলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?'

আরও বোধহয় পাঁচ-সাত মিনিট কাটে। আধমরা আমগাছটা থেকে 'কু-উ-ক', 'কু-উ-ক' করে পাখী ডাকে। আবার দূরে বড় করে উড়ে পালায়। আরও দূরে কাকেশ্বরের ডাক, তারপর শব্দ পাওয়া যায় না। এবার পড়ন্ত স্বাদের চেষ্টাটা ক্রমশই অসহ্য লাগে টুটুলের কাছে।

'এবার পাচ্ছিস? একটু গরম লাগছে ঠিক কপালের মাঝখানটায়?'

'একটু,' অস্ফুট উত্তর আসে টুটুলের।

'আমি বলছি, তোর হবে। স্বামীজীর কথা কখনও মিথ্যে হয় না। আরও হবে। একেবারে জ্যোতি বেরোবে।... এবারে কি রকম?'

'গরম লাগছে মনা-দা।'

'হবে, তোর হবে।' আনন্দে চোখ খোলে মনা। 'আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক। আস্তে আস্তে হবে। হুড়বড়ালে চলবে না।'

আবার যখন তারা ফেরে তখনও সাই-কেলের মিষ্টি সাঁ সাঁ শব্দ টুটুলের কানে আসে। কিন্তু সেদিকে তার নজর ছিল না। এক অস্পষ্ট আশঙ্কা তার বুকে চাপ বাঁধে।

ওদের বাড়ির পথ কিছুটা দূরে রাস্তার মোড়ে সাইকেল থেকে টুটুলকে নামিয়ে মনা আবার তোতলায়, 'আ-র আ-র একটা কথা। তো-তোর দিদিকে বলবি মস্তানের সঙ্গে না মিশতে। মস্তো ভাল মেয়ে না। তু-তুই ছোট ছেলে বুঝবি না। স্বামীজী বলেছেন, স্ত্রীলোক তু হতে তার মত তু আর কিছু নাই।'

মনা সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে আম-বাগানের পা দিয়ে রাস্তাটা ধরে মিলিয়ে যায়। টুটুল হতভম্বের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে। একবার ভাবলে সামনে এগোবে নাকি, কিন্তু ক্রিকেট-পর্ব

CENTRAL LIBRARY

নিশ্চয়ই এতক্ষণ সমাপ্ত। টুটুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোয়। আর কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। চেনা গলার কথা ভেসে আসে। তাদের ঠিক কম্পাউণ্ডের বাইরে মাঠের দিকটা থেকে ফিস-ফিস করে কথা আসছে, মাঝে মাঝে হাসিরও আওয়াজ। এ জায়গাটায় পৌঁছতে কতগুলো। কেয়ার ঝোপ সচরাচর তারা এদিকে যায় না। কিন্তু এক অদৃশ্য টানে টুটুল সেদিকে এগোয়। সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে। কেয়ার ঝোপের ভেতর থেকেই স্পষ্ট দুটো মূর্তিকে দেখা যায় একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে। টুটুল আর একটু এগোতে গিয়েই পিছু হটে! পান্দো বুড়ীকে জাপ্টে ধরে চুমু খাচ্ছে।

চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড় মারে। মনা-দার কথা শোনার পর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা এতক্ষণে কাটতে থাকে. এতক্ষণে তার ফাঁকা মন একটা লক্ষ্যে ধাবিত হয়। তিস্তার ধারে সে দৃশ্য কয়েক মাস আগে দেখেছিল তার মধ্যে একটা মজা ছিল, তার পর ছোড়া কয়েকবার দিদিকে শাসালে সে বড় দুটো চকোলেট দিয়ে তার দু ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধি করেছে। কিন্তু মনা-দার কথার পর তার আজ সন্ধ্যার কেয়াবনের দৃশ্য অন্যরকম লাগে. পান্দা-কে এক শত্রু শিবিরের লোক মনে হয়। দৌড়তে দৌড়তে সে গেট পার হয়। তারপর সমান তালে. ঘোড়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই দোতলায় উঠে আসে। স্বর্ণসুন্দরীকে সামনে দেখেই তার গলা দমে যায় 'মা মা!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলেই চুপ করে আরও হাঁফাতে থাকে।

'কি হল? ওরকম হাঁফাচ্ছিস কেন? খ্যাপা-দা আসে নি?'

'নাঃ, পান্‌দা দিদিকে চুমু খাচ্ছে!'

হুড়মুড় করে কথাটা বলে সে বিমূঢ় ভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল আসে। কান্নায় বোজা বিকৃত ভাঙা গলায় বলে "আমি কিছু জানি না মা মনা-দা বলতে বলেছে।"

স্বর্ণসুন্দরী যখন ভুরু কুঁচকে সামনে এসে দাঁড়ান তখন হঠাৎ মা-কে জাপটে ধরে টুটুল ফোঁপাতে থাকে। বারে বারে জেরা করেও বিশেষ কিছু জানতে পারেন না স্বর্ণসুন্দরী। অথচ টুটুল সচরাচর বাজে কথা বলে না। কাজেই কথাটা মোটেই ফেলার নয়। তা ছাড়া মেয়ের উড়ু-উড়ু ভাব তিনি কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছেন। ফিটফাট থাকা তাঁরও পছন্দ। সেদিক থেকে বুড়ীর কাপড়-চোপড়ের দিকে সাম্প্রতিক অভিনিবেশ তাঁকে বিচলিত করে নি। কিন্তু মমতার বাড়ি যাচ্ছি বলে সময়-অসময়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার একটা অর্থ তিনি খুঁজে পান। পড়ার ঘরে টিক-টিক করা পছন্দ নয় তাঁর। কিন্তু একদিন পাশ দিয়ে যেতে তিনি একটু থমকে ছিলেন। টেবিল ল্যাম্পের ওপর দিয়ে এমন ভাসাভাসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে পান্দর দিকে চেয়ে ছিল তার মেয়ে যে মুহূর্তের জন্যে তাঁর নিজের আত্মবিশ্বাস ঘা পড়ে। তারপর ব্যাপারটার অসম্ভাবনা এতই প্রচণ্ড যে সেদিকে আর চোখ ফেরানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু যে কারণে তিনি সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তা কোল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কেরানীর আস্পর্ধা। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে কথাটা বলেই ফেলেন বিহ্বল টুটুলকে। তার পর ওপর থেকে হাঁক দিলেন 'বুড়ী!'

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো বুড়ী নিস্পৃহ গলার নীচ থেকে জবাব দেয় 'যাই মা।'

সেবার শীতের সকালে হঠাৎ একখানা নতুন চকোলেট রঙের ফোর্ড গাড়ি নিঃশব্দে এসে থামে ডেপুটি কমিশনারের বাগানে। গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে পাজামা পাঞ্জাবীর ওপর নীল চকোলেট চেকের কোট আঁটা সুধীর দ্বারে নামে। কুচকুচে কালো এবং আশ্চর্য সুপুরুষ সুধীর। সাড়ে ছ' ফিট লম্বা হাল্কা খেলোয়াড়ি গড়ন দাঁড়িতে প্রখর কপাল ও চোখ, আর হাসলে ঠোঁটের দু-পাশ চমৎকার আকর্ষণীয়। বলতে গেলে, সুধীর সব সময় হাসছে কিংবা হাসবার উপক্রম করছে। আর সে হাসলে স্বর্ণসুন্দরীদের নীচতলায় তার আওয়াজ ভেসে আসে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'বাঃ সুধীর, তুমি যে রাজার মতো হাসছো!'

'হাসব না মাসীমা? আপনি যেরকম ঘাবড়িয়ে দিয়েছিলেন! হাঃ হাঃ হাঃ!'

স্বর্ণসুন্দরী বুঝতে পারেন না সুধীরের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহের সুযোগে সে অসভ্যতা করছে কি না। একবার ভুরু কুঁচকালেনও, কিন্তু সুধীর এমন প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে যে তিনিও হেসে ফেলেন। সুধীর হাসতে হাসতে বললে, 'বুড়ী? ওটা তো একরত্তি মেয়ে! আর পান্টো তো মহা ইডিয়েট। নিজের কেরিয়ার নিজে নষ্ট করল। তবে আপনি মাসীমা এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন!'

'না না সুধীর। তোমরা আজকালকার ছেলেরা ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্ব দিতে চাচ্ছো না। আমার সবচেয়ে রাগ হয়েছিল কেন জানো?'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি, আপনি বলছেন স্ট্যাণ্ডার্ডের কথা, না?' সুধীর এবার গম্ভীর হয়ে বললে।

'হ্যাঁ অনেকটা...'

'আচ্ছা মাসীমা, পান্দু-র যদি স্ট্যাণ্ডার্ড থাকত তাহলে...'.

'বাঁদির কথা নদীতে!'

'তা অবশ্য!' সুধীর চেয়ারে বসে পা নাচায়।

'আমার বরাবরই মিনমিনে লোক ভাল লাগে না।'

'আমাকে কেমন লাগে?' সুধীরের ঠোঁটে আবার হাসির উপক্রম। আর সে হাসিতে সামান্য বিদ্রূপ নেই। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে চেয়ে হেসেই ফেলেন, 'তুমি নিজেই জানো।' বলেই মনে মনে ভাবলেন রংটা যদি সাফ হত তাহলে গৌরীর সঙ্গে কি চমৎকারই না মানাত! সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেই বলেন, রং-এর কথা বাদ দিলে সুধীরের সবও তাকে সুপুরুষ বলায়। তাছাড়া এ বয়সে দুটো নামকরা টি-এস্টেটের ম্যানেজার। সুন্দর স্বভাব। বাড়িঘরের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল। এরকম ঘরে গৌরী গেলে তিনি খুশিই হবেন। তাছাড়া বুড়ীর হঠকারিতায় তিনি এমন ঘা খেয়েছেন যে, গৌরীর ব্যাপারে তাকিদ হয়ে পড়েছেন। গৌরী বি-এ দিল। এবার ধরেছে এম-এ পড়বে। কিন্তু তাঁর মেয়ে তো আর চাকরী করবে না, সুতরাং বিদুষী সে যথেষ্টই হয়েছে, আর হবার প্রয়োজন নেই। স্বর্ণসুন্দরীর ইচ্ছে গৌরী কলকাতার পাট চুকিয়ে এখানেই উঠে আসুক বড়দিনে। সুধীর এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পর থেকেই এ ইচ্ছা আরও বলবতী হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক কারণে গৌরীর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হোস্টেলে বাস তুলে দিতে তিনি মনস্থ করেছেন। তা হল তাঁর বড় মেয়ের চিঠিতে তাঁর সদ্য ইউরোপ ফেরত জামাইয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

'চা-বাগানে তোমার ফাঁকা লাগে না সুধীর?'

'আমার এখন খুব ভাল লাগে মাসীমা। কলকাতায় হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের হট্টগোলের পর বাবা যখন বাগানে ঠেলে দিলেন তখন বেজায় খারাপ লেগেছিল। ভীষণ আড্ডাবাজ জানেন তো! কথা না বলতে পারলে হাঁক পাঁক করতাম। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছাতি মাথায় করে জল ঠেলে এপাড়া ওপাড়া করতাম শুধু আড্ডা দেবার জন্য। আর এখন ঠিক উল্টো, মাইলের পর মাইল, চায়ের ক্ষেত, আর একটা দুটো পাখীর আওয়াজ।'

'এরকম নির্বান্ধব পুরী বাপু আমার ভাল লাগে না।' স্বর্ণসুন্দরী যেন তাঁর মেয়ে গৌরীর হয়ে কথা বলছেন।

'আমারও তাই মনে হত। এখন আর হয় না।'

'কেন বাবা? এক বছরেই এমন বদল হয়ে গেলে?'

'ঠিক তা নয় মাসীমা। দেখলাম অ্যাকাডেমিক জগতটা কেমন ফক্কা হয়ে গেল এই ক'বছরেই। যেসব জিনিস নিয়ে ভাবতাম, সেগুলো আসলে কোন ভাবনাই ছিল না। খালি কথা আর কথা, কথার পিঠে কথা। কথার বন্যায় আমরা ভেসে বেড়াতাম!'

'তা মানুষ কথা বলবে না? কথা না বললে প্রাণ বাঁচে?'

সুধীরের পা নাচানো বন্ধ। তার ঠোঁটের পাশে হাসির উপক্রম এখনও আছে কিন্তু চাহনি অনেক কোমল স্নিগ্ধ। বললে, 'এখন বেশ ভাল আছি। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাই

ফ্যাক্টরীতে। সেখান থেকে একবার আমি বাড়িতে যেতে। বিকেলে সাইকেল করে ছাই মাইল দূরের দূরে আমাদের লোকজনদের জন্যে ব্যারাক উঠছে তার তদারক করতে। যখন বাংলোতে ফিরি সন্ধ্যা নামছে। এই বেশ ভাল মাসীমা। জীবনটা বেশ ছকে ফেলা গেছে। আগে জীবনের কোন ছক ছিল না। এই গাড়িতে করে কাশ্মীর গেলাম, সারা রাত্তির ধরে হল্লা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। এখন আর ভাল লাগে না।'

'এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে চলবে কেন?'

বুড়ো না মাসীমা, এটা ঠিক বুড়ো হওয়ার লক্ষণ না। কোন একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই। তাতে ইন্টারেস্ট নেওয়ার থাকে বলে, এইটাই জীবন। এছাড়া যা আছে সেগুলো কথা, কি বলেন?'

'কি জানি বাপু, আমার তো মনে হয় বেঁচে যে আছি এটাই যদি না বুঝতে পারি তাহলে আর বেঁচে কি লাভ?'

সুধীর অন্যমনস্কভাবে গাড়ির চাবি আঙুলে পাক দিতে থাকে। আস্তে আস্তে বলে, কলেজ জীবনে বাবাকে খুব দুঃখ দিয়েছি। আমরা এত মজা করছি, হুল্লোড় করছি, আর বাবা সারা জীবন পড়ে আছেন চায়ের বাগানে। আগে আসামে ছিলেন: ছেলেবেলায় আমিও আবপাক করতাম বাগানে কিছুদিন থাকলে। সময়ে সব পাল্টে যায়, না মাসীমা?'

'হ্যাঁ, মানুষ বুড়ো হয়ে যায়।'

'আমি ওরকম ভাবি না। আমার মনে হয় সময় আমাদের শেখায়। আমরা সময়ের কাছ থেকে শিখি।'

স্বর্ণসুন্দরী উসখুস করে বললেন, 'তুমি আবার কবিতা টবিতা লেখো না তো?'

সুধীর অবাক হয়ে বললে, কবিতা? না না, সাত জন্মে কবিতা লিখি নি। যদি বলেন গাড়ির মেকানিক হতে, পারি, টেনিস প্লেয়ার হতে পারি। তবে কবিতা টবিতার মধ্যে নেই।'

'যেরকম কথা বলছো আজকে আমার তো ভয় হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাও কিনা।'

সুধীর আবার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললে। 'সাধু, আমি নই মাসীমা, সাধু মনা। কলকাতায় গেলেই কোনো মঠে যায়। সাধু সঙ্গ করে। ওর মাথাটা খুব পরিষ্কার মনার। দেখবেন, ও আমার চেয়েও ভাল বাগান চালাবে।'

'যদ্দিন বয়স আছে আমোদ আহ্লাদ করে নাও। আমি খুব হৈ চৈ পছন্দ করি, আমার মেয়েও।'

'আপনার বড় মেয়ে?'

'না, কমলা বরাবরই খুব শান্ত, বিচক্ষণ। আমার মেজ মেয়ে গৌরী একেবারে দুরন্ত। ওকে বকতাম ছেলেবেলায় কিন্তু মনে মনে হিংসেও করতাম। আমিও ঐরকম ছিলাম ছেলেবেলায়। তুমি তো গৌরীকে দেখোনি। ও আসছে বড়দিনে। আমি লিখে দিয়েছি ওসব এবে টেমে হবে না।'

'তাহলে চলুন, বড়দিনে একটা আউটিং করা যাবে।'

'আমার জামাইও আসছে, বড় মেয়ে আসছে।'

'বেশ তো!' সুধীর আঙুলে চাবি জড়াতে জড়াতে উঠে পড়ে।

ভবনাথের জামাই, বড়মেয়ে, গৌরী বড়দিনের সুরুতেই তাদের লটবহর নিয়ে হাজির। গৌরী গত দু বছরে আরও সুন্দর হয়েছে, কিন্তু একটু বিষণ্ণ, তার কলেজে হস্টেলের বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হল্লার জীবনে ছেদ পড়ায় গম্ভীরও। তার অনেকদিনের লাল ট্রাঙ্ক গাড়ি থেকে নামাতেই চোতা চেঁচায়, দিদি, আমাদের সঙ্গে থাকবে রে, আর যাবে না।'

বড়মেয়ে কমলা অনেকটা লম্বা, আর কালো। চেহারায় গৌরীর ঠিক বিপরীত। ছটফটানি নেই, হাসিও ম্লান। আস্তে আস্তে ঘাড় তুলে বড়বড় চোখে তাকায়। মুখের রেখা কোমল, খুব স্পর্শকাতর। নবুর বিয়েতে ক'দিনের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছিল। স্বর্ণসুন্দরী বড় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুম্বন করেন।

জামাই মদন ঘোষের এখন বয়স চল্লিশ। কালো, বেঁটে। রোগা, কিন্তু প্রচণ্ড এনার্জির আকর। সাত বছর জার্মানীতে, বিয়ের আগে চার বছর, পরে তিন বছর। বি-ই কলেজ থেকে পাশ করে কিছুদিন চুন সুরকির দোকান নিয়েছেন, ট্যাক্সি চালিয়েছেন, কানা ঘোষা শোনা যায় জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তবে এখন সে অধ্যায় কেটে গেছে। এখন মদন ফিলিপ্স কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার।

মদন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই হাঁক দেয়, 'সাবধানে নামাবে, কাঁচের জিনিস আছে।' স্বর্ণসুন্দরীর অনেক দিনের সাধ মদন পূর্ণ করেছে। দামী বিলিতি ডিনারের সেট এনেছে সঙ্গে।

থামচে থামচে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে শ্বশুরকে বললে, 'বললাম, গাড়িতে আসব। কোন অসুবিধে নেই। আপনার মেয়ে রাজী হল না। আমার সম্পর্কে একেবারে কনফিডেন্স নেই।'

ভবনাথ মৃদু হাসেন। জামাইয়ের গাড়ি হয়েছে অথচ তাঁর এখনও হয়নি। তাঁর বড় ছেলের সাম্প্রতিক অকৃতকার্যতার কথাও স্মরণে আসে। প্রতাপকে এতগুলো টাকা দিয়ে মাসে মাসে পুষতে না হলে ইতিমধ্যে তাঁর গাড়ি হয়ে যেত। কয়েকটা ইংরেজ প্লান্টারের কাছ থেকে অফারও এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী আবার আনন্দে হৈ চৈ করলেন। নাতনি বুলু, যে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে গৌরীর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাকে কোলে টেনে নিয়ে হাঁক ছাড়েন, 'গোপীনাথ, গোপীনাথ, স্টোভ ধরাও।'

সন্ধ্যের পর দোতলার বারান্দায় পারিবারিক মজলিশ বসে। এ মজলিশের চেয়ারম্যান স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথ দূরে ক্যাম্পচেয়ারে বসে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি একটু বেশী নীরব। প্রতাপের আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং প্রায় বছর খানেক বছর দেড়েক টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পড়ার অনির্দিষ্ট তীর্থযাত্রা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। জোরাল আলোয় দেয়ালের গায়ে জ্বলন্ত বোগেনভিলিয়া ঝলমল করে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তিনি টের পান যে তাঁর ভাগ্যাকাশের সূর্য এবার হেলেছে পশ্চিমদিকে, যদি প্রতাপটা দাঁড়াত তাহলে আরও কিছুদিন বোধহয় খাড়া হয়ে থাকতেন।

'জুরিখ থেকে টমাস মান এসেছিল আমাদের ক্লাবে' মদন কথার তুবড়ি ফোটায়। একবার গৌরী আর একবার স্বর্ণসুন্দরীর দিকে চেয়ে বলে 'আমাদের দেশের হেঁজি পেঁজি সাহিত্যিক না। নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, সবটার ওপরে বললে। সে এক অন্য রকম দেশ মা, সব মানুষ কাজ করছে, সব মানুষ চিন্তা করছে, আমাদের দেশের মতো ঘুমিয়ে নেই।'

গোপীনাথ আরও এক কাপ সুগন্ধ দার্জিলিং চা নিয়ে আসে। 'ডাঙ্কে ডাঙ্কে।' উৎসাহের সঙ্গে পুরনো অভ্যাসে চেঁচিয়ে ওঠে মদন। তারপর শাশুড়ী ঠাকরুণের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করে। জার্মানে ধন্যবাদ দিলাম। গৌরীর দিকে চেয়ে বললে, তোমাদের কি ছাতা ইংরেজী সাহিত্য পড়ায়? তাতে কোন কথার জোর আছে?' মদন নির্ভুল উচ্চারণে হাইনে আবৃত্তি করে। তাকে অন্যরকম দেখায়। ভবনাথও চমকিয়ে সেদিকে চোখ মেলেন। তাঁর চাকরি ও পারিবারিক জীবনে এই ধূমকেতুটির আবির্ভাব মন্দ লাগে না। খানিক ক্ষণ পরে অবশ্য তাঁকে উঠতে হয়। রায় লিখতে বসেন বৈঠকখানায়।

স্বর্ণসুন্দরী কিছুই বোঝেন না। কিন্তু এই জুরিখ, বার্লিন, হামবুর্গের গল্প, সম্পূর্ণ আলাদা জগত এক অপরিচিত গন্ধ মন ভরে নিয়ে আসে। গৌরী ভক্তের মতো চেয়ে থাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে জামাইবাবুর দিকে। খালি কমলা প্রবল বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো বসে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী দু-তিনবার খোঁচা দিলেও তার কোন পরিবর্তন হয় না। 'আমার মাথা ধরেছে' মেয়ে বললে।

'আপনার মেয়ের কথা আর বলবেন না। ও যে কি চায়, বুঝি না। খালি সংসার করো, খাও দাও, ব্যস। আর কোন চিন্তা নেই, কোন আইডিয়া নেই।' মদনের শেষ কথায় প্রতিবাদের একটা কাঁপুনি হঠাৎ কমলাকে নাড়া দিয়েই থেমে যায়।

স্বর্ণসুন্দরী মেয়েকে বলেন, 'কিরে কিছু বলছিস না যে?'

'বলছি মাথা ধরেছে!'

(ক্রমশ)

CENTRAL LIBRARY

লটারির লট

পশুপতি ভট্টাচার্য

লট্ হলো একটি ইংরেজী শব্দ, যার মানে ভাগ্য, বরাত। তার থেকে হয়েছে লটারি, অর্থাৎ ভাগ্যের খেলা। আজকাল এই ভাগ্যের খেলায় খুবই চল হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই লটারির আয়োজন, তার জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন। অনেকেই ভাগ্য পরীক্ষা করছে।

ভাগ্যে থাকলে এক একজন এই লটারিতে জেতে, হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যায়। ভাগ্য তো বটেই, কিন্তু তা সুভাগ্য না কুভাগ্য তা কে বলতে পারে? যারা পায় তাদের পরবর্তী জীবনের কথা কজন জানে? সে টাকার কিভাবে কি গতি হয়?

আমি একজনের কথা জানি যে একবার লটারিতে জিতেছিল।

আমাদেরই জানাশোনার মধ্যে। তার ভালো নামটা ছিল দুর্গাপতি বা অমনি একটা কিছু, ঠিক মনে নেই, কিন্তু ডাক নাম ছিল প্যাংলা। সেটাই সবাই জানতো।

প্যাংলা বেশ ভালো বংশেরই ছেলে। কিন্তু হলে কি হবে, সে লেখাপড়া বিশেষ করেনি। তার দাদারা এম-এ, বি-এল, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, কিন্তু সে ম্যাট্রিকও পাস করেনি। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখা, ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ দেখে এসে তাই নিয়ে সোচ্চারে আলোচনা এবং সমালোচনা করা, পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ে উঠলে সেখানে গিয়ে মোড়লি করা, দলে দলে দাঙ্গা বাধলে সোৎসাহে তাতে যোগ দেওয়া, আর হরদম বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ফোঁকা, এই ছিল তার কাজ। এত পয়সা কোথায় পেতো? তা একরকম করে জুটিয়ে নিতো, বাবার কাছ থেকে, মায়ের কাছ থেকে, দাদাদের কাছ থেকে। সকলেই জানতো যে ওর আর কিছু হবে না, এমনি করেই দাদাদের সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। তাই বয়স হলেও কেউ ওর বিয়ে দেয়নি, যদিও বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। তখনকার দিনে ও বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত খুব অল্প জনই থাকতো কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে। এখনকার দিনের কথা নয়, বিশ বছর আগের কথা বলছি। তখনও কুলীনের কিছু ছিল।

কিন্তু অমন নিষ্কর্মা [illegible] ধরনের হয়েও [illegible] দরদী। পরোপকারী বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। কারো দুঃখকষ্টের কথা বা বিপদের কথা শুনে অন্য পাঁচজনের মতো তূষ্ণীভাব নিয়ে নীরব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারত না, তার নিবারণকল্পে যথাসাধ্য যাহোক একটা কিছু করত। তবে ওর আর সাধ্যের সীমা কতটুকু! তথাপি চেষ্টা করতে ছাড়ত না, ক্ষমতাবান লোকদের গিয়ে ধরত। অপমানবোধ তার ছিল না।

আর ছিল তার মাতৃভক্তি। সে এমন নিরেট নির্বোধ ভক্তি যাকে আমরা বলি অন্ধভক্তি। অর্থাৎ মা-ই যেন তার জীবনের একমাত্র সহায়। মা যখন রয়েছেন তখন আর কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু সে ভক্তির কোনো বাহ্য প্রকাশ ছিল না। মায়ের উপর উৎপীড়ন এবং আব্দারের অন্ত ছিল না। খুঁটিনাটি সব কিছুতেই মাকে চাই। ওমা, এদিকে এসো, পিঠটা চুলকে দাও, ঘুম আসছে না মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, ইত্যাদি। আর মায়েরও তাতে বিরক্তি ছিল না, তিনিও ওকে একটু বেশিরকম স্নেহ করতেন। মায়েরা কৃতী সন্তানদের চেয়ে প্রায়ই অকৃতী সন্তানদের একটু বেশি স্নেহ করে থাকেন, তাদের অন্যায় আবদারগুলো সহ্য করেন। এটা প্রায়ই দেখি।

এমন ধরনের মানুষদের সাধারণত টাকার লোভ থাকে না। তবে সে লটারির টিকিট কিনতেই বা গেল কেন? তাও সে কিনেছিল দায়ে পড়ে, একজনের নেহাৎ পীড়াপীড়িতে।

তারও একটু ইতিহাস আছে। পাড়ার হাঁদু মাস্টার রেঞ্জার্স লটারির টিকিটের একটা বই আনিয়েছিল, কিন্তু সেই টিকিট বিক্রি করতে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। লোকে সহজে কিনতে চায় না, বলে যে টাকাটা অনর্থক জলে ফেলা হবে। তাই সে এসে ধরেছিল প্যাংলাকে, একখানা টিকিট তাকে নিতেই হবে। যখন কিছুতেই ছাড়ে না, তখন সে বললে, দাঁড়াও দেখি।

বাড়ির ভিতর গিয়ে সে মাকে বললে, লোকটা কিছুতে ছাড়বে না, কি করি বলো তো মা? মা শুনে বললেন, একটা মাত্র টাকা তো, এই আমার আঁচলে বাঁধা আছে নিয়ে যা।

এমনি করে হলো তার লটারির টিকিট কেনা।

সেই টিকিট থেকে সে পেলে পঁচিশ হাজার টাকা। ফার্স্ট প্রাইজ নয়, সেকেণ্ড কিংবা থার্ড প্রাইজ। তা হলেও পঁচিশ হাজার টাকা ওর পক্ষে কম কথা নয়।

পাড়ায় পাড়ায় এ কথা রটে গেল, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সবাই জানলে, এমন কি নিজেদের দেশে অর্থাৎ ওদের দেশের পল্লীগ্রামেও এ কথা অবিদিত রইল না।

প্যাংলা তখন প্যাংলাবাবু হয়ে গেছে, 'তুমি' থেকে 'আপনি' সম্বোধন চলছে।

কিন্তু এ টাকা নিয়ে অতঃপর সে কি করবে? পাঁচজনে পাঁচরকম মতলব দিতে লাগল। দাদারা বললে, টাকাটা ব্যাংকে ফিক্সড্ ডিপোজিটে রেখে দে, ওর থেকে যা সুদ আসবে তাই কেবল নিবি, টাকাটা জমা থাকবে। কিন্তু অনেকেই এটা পছন্দ করলে না, বললে একটা কিছু ব্যবসাতে লাগান স্যার, টাকায় টাকা বাড়ে, অমন করে ফেলে রেখে লাভ কি। একটা ইটখোলা করুন, আজকাল ইটের ব্যবসাতে অনেক পয়সা। কেউ বললে, তা নয়, একটা হোটেল খুলুন। কেউ বললে, ঐ টাকাতে কলকাতায় একটা বাড়ি কিনে ফেলুন। কেউ বললে, মোটরগাড়ি কিনে ট্যাক্সি করুন, প্রত্যহ নগদ টাকা ইনকাম হতে থাকবে। কেউ বললে, মোটরবাস কিনে ফেলুন, ওতে প্রচুর লাভ। এমনি আরো কত কি।

ওর মা বললেন, ও সব কিছু শুনিস না, তুই একটা কাজ কর। টাকাটা তোর মামার হাতে দিয়ে দে। মামা তেজারতির কারবার করে, ঐ টাকা তেজারতিতে খাটাবে। তারও লাভ হবে, তোরও লাভ হবে। আর যখন যা দরকার হবে, মামার কাছে চাইলেই পাবি।

অতএব প্যাংলা তাই করলে। টাকাটা মামার কাছে জমা করে দিলে।

কিছুকাল পর্যন্ত প্যাংলার বেশ ফুর্তিতেই কাটল। শৌখিন কাঁধে-বোতাম আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবী পরে, পায়ে চকচকে পাম্পসু, হাতে গোল্ডফ্লেকের সিগারেট টিন, সোনালি রিস্টব্যাণ্ড দেওয়া দামী হাতঘড়ি। বলা বাহুল্য, সঙ্গীসাথীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, অনেক স্তাবক ও কুসঙ্গী জুটে গেল।

এর ফলে যা হয়ে থাকে তাই প্যাংলার বেলাতেও ফলল। আর সে তখন একেবারে

মিলনরিয়া। আমুদেই পসে ছিল পয়্যাকড়ী, সকলেই সে কথা জানতো, তাই অনেকেই তার সুযোগ নিতে লাগল। কারো বা কন্যাদায়, কারো মাতৃদায়, কারো পিতৃদায়, কারো স্ত্রী ভুগছে টি. বি.তে অথচ চিকিৎসা হচ্ছে না, কোনো ছাত্র পরীক্ষা দেবে কিন্তু ফী জমা দেবার টাকা নেই, ইত্যাদি কত রকমের অভাবের বিবরণ নিয়ে এসে ওর কাছে কান্নাকাটি করে। বিশেষত ওদের গ্রামের লোকেরা, তারা এসে ওর হাতে পায়ে ধরে। ও তার খোঁজ নিয়েও দেখে না যে কথাটা বাস্তবিক সত্য কিনা। ও তখনই মামার কাছে একটা চিরকুট লিখে দেয়, মামার কাছে গিয়ে চিরকুট দিলেই তিনি টাকা দিয়ে দেন,—দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো, দুশো, যখন যেমন লেখা থাকে।

এতো গেল দান খয়রাতি। তা ছাড়া নিজের হাতখরচের জন্যেও যথেষ্ট টাকা চাই, সে ইচ্ছামতো মামার কাছ থেকে চেয়ে আনে। মামা অবশ্য তার হিসেব রাখেন, কিন্তু ওর কোনো হিসেবপত্র নেই। যখন যেমন দরকার নিয়ে আসে। তখন সঙ্গদোষে সে জুয়া খেলা, রেস খেলা প্রভৃতি শুরু করেছে।

সঙ্গদোষে আর একটি মারাত্মক অভ্যাস তার ঘটল। মদ্যপান। সে দেখলে যে এতে মন প্রফুল্ল হয়, খিদেও বাড়ে, ঘুমও ভালো হয়, অতএব এতে দোষ কি আছে। অর্থ যখন হাতে আছে তখন প্রত্যহই চলতে পারে। এই করতে করতে ওটা অভ্যাস হয়ে গেল।

বাড়ির লোকেরা এটা জানতে পারলে। তারা চেষ্টা করেও এর কোনো প্রতিকার করতে পারলে না। মায়ের তিরস্কারেও কোনো কাজ হলো না। এ জিনিস একবার অভ্যাসে দাঁড়ালে ছাড়ানো খুব কঠিন। সে লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে লাগল। কেউ আটকাতে পারলে না।

ওর দাদারা তখন ওর স্বভাব চরিত্র নষ্ট হবার আশংকা করতে লাগল। অসৎসঙ্গে কোথায় কখন গিয়ে পড়বে, আর ওর মতো দিলদরিয়া কাপ্তেন মানুষ অনায়াসে কোনো একটা ফাঁদে পড়ে যাবে।' সবাই মিলে পরামর্শ করে স্থির হলো, তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেওয়া যাক।

ওর বড়োদাদাই উদ্যোগী হয়ে বিয়েটা ঘটিয়ে দিলে তার অবিবাহিতা বয়স্থা শালীর সঙ্গে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, অর্থাভাবে তাকে পাত্রস্থ করতে পারেনি। তিনি নিজেই এসে প্যাংলার হাত চেপে ধরলেন, তাকে সম্মত করালেন। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু সুরুচিসম্পন্না, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা।

বৌটি এসেই প্যাংলাকে বশ করে ফেললে। তা অবশ্য সব জায়গাতেই হয়ে থাকে, কিন্তু সে বুদ্ধিপূর্বক লেগে থেকে ক্রমশ ওর অনেক কুঅভ্যাস ও খামখেয়ালি ছাড়িয়ে দিলে। জুয়া খেলা, রেস খেলা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গেল। অনর্থক অর্থের অপব্যয় করা অনেক কমে গেল। ধূমপানের মাত্রা হ্রাস পেলো। মদ্যপানও অনেক কমে গেল, কিন্তু এটি একেবারে ছাড়ানো গেল না। তা হলেও তখন স্ত্রীর সদাসতর্ক তত্ত্বাবধানের মধ্যে থেকে প্যাংলা তখন বেশ সংযত জীবনযাপন করতে লাগল, আর বেগতিক দেখে লুব্ধ বন্ধুবান্ধবের দল তাকে পরিত্যাগ করলে।

দু তিনটে বছর এইভাবে কেটেছিল। তার পরে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অনিবার্যভাবে জলের মতো অর্থব্যয় করতে হলো।

ওর বাবার ক্যানসার রোগ হলো। গলায় ক্যানসার, তাঁর বন্ধণাদায়ক। তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতে হলো। দাদারা কিছু কিছু দিয়েছিল বটে, কিন্তু প্যাংলাকেই দিতে হলো অধিকাংশ, কারণ টাকা তার মজুত রয়েছে যখন, তখন ও দেয়াই বা দেবে কেন। চিকিৎসা অনেকদিন ধরে চলল, বিস্তর অর্থব্যয় হয়ে গেল, তারপর তিনি মারা গেলেন।

বাবা যতদিন ছিলেন ততদিন ওদের ছিল যৌথ পরিবার। তিনি মারা যাবার পরে ভাই ভাই পৃথক হলো। বসতবাড়িটা ছিল একতলা, সেটাকে তিন ভাগ করা হলো। ভিতরে উঠোন, দুপাশে তিনখানা করে ছখানা ঘর, সামনের দিকে তিনখানা। বড়ো দাদারা দুপাশের ঘরগুলো নিলে উঠোন সমেত, প্যাংলা পেলে সামনের তিনখানা, ভিতরের দিকে দুটো, বাইরের দিকে বৈঠকখানার মতো একটা।

প্যাংলার স্ত্রী বললে, তা ভালোই হয়েছে, ঐ বৈঠকখানা ঘরটাকে আড্ডাখানা না রেখে ওটাকে ভেঙেচুরে একটা দোকানঘর বানিয়ে নাও, আর ঐখানে তুমি একটা মনিহারি দোকান করো। তাতে তোমার একটা কাজও হবে আর পয়সাও কিছু আসবে।

সুতরাং আবার একচোট অর্থব্যয়। ঘরগুলো ভেঙেচুরে নতুন করে নেওয়া, দোকানঘর সুবিধামত গড়ে নেওয়া, ইত্যাদি। তার পর মনিহারির দোকানে সাজিয়ে রাখার মতো জিনিসপত্র কেনা, কাচের বাক্স আলমারি প্রভৃতি অর্ডার দিয়ে করানো, আলো পাখার ব্যবস্থা, অবশেষে সাহায্যের জন্য পাড়ার এক ছোকরাকে মাইনে করে রাখা। বিস্তর খরচ।

এর উপরে আবার এক দমকা খরচ এসে গেল। বাড়িটা ছিল এক পুরোনো গলির মধ্যে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সেটিকে চওড়া করে বড়ো রাস্তা বানালে। ওর বাড়ির দিকটা তার মধ্যে যদিও পড়ল না, কিন্তু বড়ো রাস্তা হওয়াতে জমির দর বাড়ল, সুতরাং অনেকগুলো টাকা বেটারমেন্টের জন্য খেসারত দিতে হলো।

এর পরে যখন মনিহারির দোকানের জন্য আরো কিছু মাল কিনতে মামার কাছে টাকা চাইলে, তখন মামা বললে, আর আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। সুদ সমেত সবই তুমি নিয়েছ। আমার কাছে ভাউচার আছে, দেখাতে পারি।

প্যাংলা তাই শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এতগুলো টাকা, সব যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল! এখন কিছুই আর নেই! কেবল ঐ দোকানটি সম্বল।

ওতো ঘরে গিয়ে বসে পড়ল। স্ত্রী বললে, কোনো ভাবনা নেই। আমি এখনকার মেয়ে স্কুলে একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিচ্ছি। আর তোমার তো দোকানই রইল।

তখন থেকে এইভাবে ওদের সংসার চলে। ওদের একটি ছেলে একটি মেয়ে। স্ত্রী মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আর প্যাংলা মনিহারি দোকানদার।

ফতুয়া গায়ে দিয়ে দোকানে বসে বিড়ি ফোঁকে। অন্য সকল রকমের বাবুগিরি ঘুচে গেছে, তবে মদ্যপান একেবারে যায়নি, সুবিধা সুযোগ হলে ওটি চলে পরের পয়সাতে।

আগেকার কালের বন্ধু বিপিন দাস ওকে ত্যাগ করেনি। মাঝে মাঝে এসে ওকে ডেকে নিয়ে যায়, মদ্যপানের সাথীরূপে। তার এখন অবস্থা ভাল। লোহার ব্যবসাতে পয়সা করেছে।

সে ওকে দুঃখ করে বলে—দেখলি তো কী হলো! আমি তখন বলেছিলাম আমার ব্যবসাতে পার্টনার হয়ে যা, তখন আমার কথা যদি শুনতিস! আজ তাহলে এই অবস্থা হয়!

প্যাংলা বলে—ওরে ভাই, লটারিতে কারো কখনো লট্ পাল্টায় না। যার যেমন কর্মভোগ তাকে তা ভুগতেই হবে। আমার স্ত্রী বলে, ধনী থেকে গরিব হওয়া, এটাও একটা শিক্ষা। আর আমার মা কি বলেছেন জানিস? তিনি বলেছেন—এর জন্যে তুই দুঃখ করিস না। বানের জল যেমন এসে ঢুকেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে গেল। কিন্তু তুই আমার যে ছেলে সেই ছেলেই রইলি। আমার আশীর্বাদে তোর ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। মায়ের সেই আশীর্বাদের জোরেই তুই দেখিস্ আমি ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবো।

চোখ

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

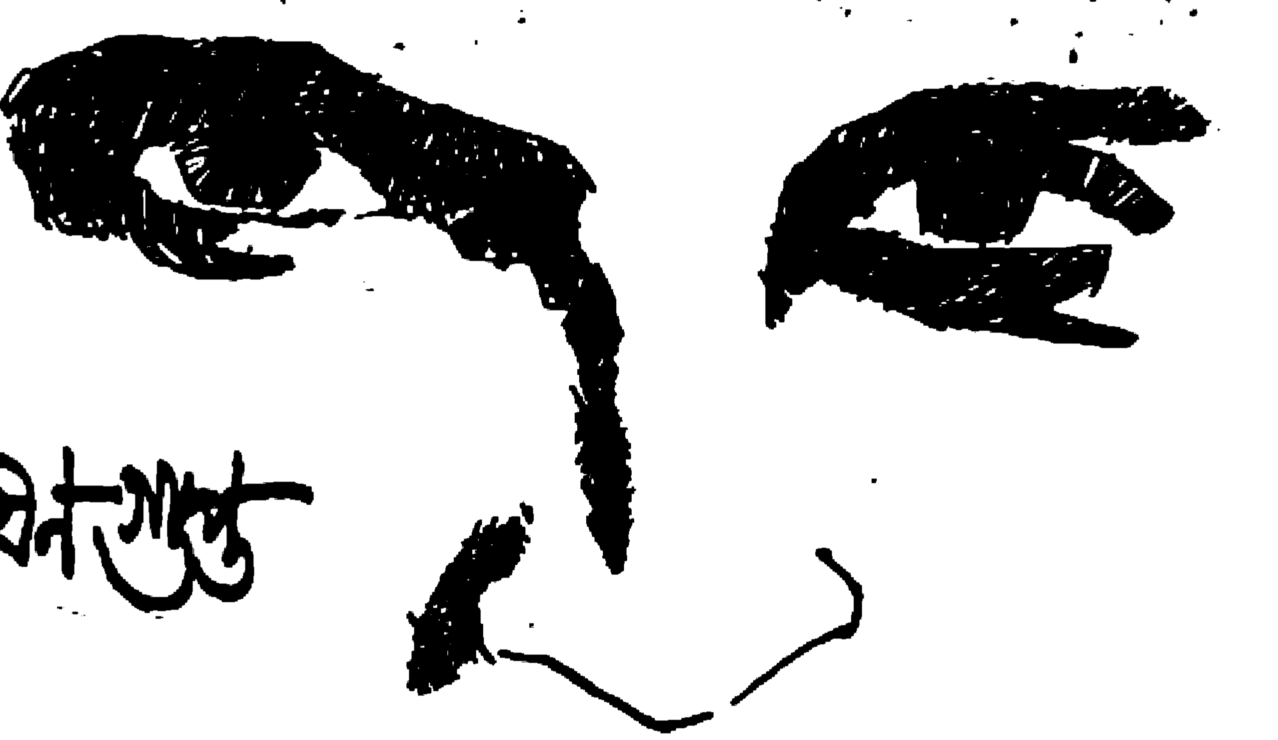

দুটি চোখ। দুটি চোখই বিমানকে সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেছিল। উপমা দিয়ে ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কি ছিল ঐ দুটি সুন্দর চোখে তিনি নিজেও তা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন নি সেদিনে। চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বিমান। তারপর পায় পায় এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলেন, তুমি এ পাড়ার ছেলে নিশ্চয়? আমাকে চেন?

লাজুক হেসে বিনীতভাবে জবাব দিল ছেলেটি, চিনি বইকি। আপন নতুন বাড়ী করে গত মাসে এসেছেন।

বিমান আপিস যাচ্ছিলেন। বেশি সময় তাঁর হাতে ছিল না। যদিও আরও কিছুটা সময় দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন।

বললেন, সময় করে একদিন যেও। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসব। সন্ধ্যাবেলা তোমার সময় হবে?

ওর দৃষ্টি যেন একটু বদলে গেল। সেই সঙ্গে মুখের হাসিও। ম্লান গলায় বলল, সময়......যখন বলবেন তখনই হবে। অফুরন্ত সময় আমার কাটতেই চায় না।

সামান্য দুটি কথার মধ্যে হয়তো অনেক কথাই লুকিয়ে আছে। সুতরাং তখনকার মত বিমানকে চলে যেতে হলো।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ছেলেটিকে বিমানের বাড়িতে দেখা গেল। হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখের সঙ্গে চোখ দুটিও হাসছিল।

বিমান সস্নেহে আহ্বান জানালেন, এসো।

প্রবেশ করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল ছেলেটি। দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য ঘরের যোগাযোগের প্রতি আটকে গিয়েই আবার সহজ হয়ে উঠল। পায়ের ধুলোমাখা অপরিচ্ছন্ন স্যান্ডেল জোড়া বাইরে রেখে ঘরে প্রবেশ করল।

বিমান বললেন, বসো। ঐ দেখো তোমার নামটাই এখনও জানা হলো না।

তবে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল, নীলাদ্রি রায়।

কি পড়ছো.....

মৃদু হেসে নীলাদ্রি জবাব দেয়, চুকে গেছে। গত বছর এম-এ পাশ করেছি। এখনও বেকার।

বিমান লক্ষ্য করলেন ওর হাসির পরিবর্তন—লক্ষ্য করলেন ওর দৃষ্টিতে একটা চাপা হতাশার ভাব। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই চোখ দুটি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি ইচ্ছে করেই পড়াশুনার প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন। বললেন, তোমার বাবা কি করেন নীলাদ্রি?

আবার নিভে গেল ওর দৃষ্টির উজ্জ্বলতা। অসহায় কণ্ঠে বলল, নেই। গত বছর মারা গেছেন। মাথা গোঁজার মত দুখানি ঘর আর আমার লেখাপড়ার খরচ চালাতে গিয়ে বাবা আমাদের নিঃস্ব করে রেখে গেছেন।

বিমান বললেন, নিঃস্ব বলছো কেন নীলাদ্রি? তিনি তো তোমাকে পথ চলার পাথেয় দিয়ে গেছেন......

সহসা ওর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, পাথেয়......কিন্তু পাথেয় থাকলেই কি পথ পাওয়া যায়। এক বছর ধরে ত' কম খোঁজা হয়নি। যে পথেই এগোতে গেছি সেখানেই প্রতিবন্ধকতার উঁচু দেয়াল পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু ডিঙোতে গিয়ে বারে বারেই আছাড় খেয়ে পড়েছি। তাই বলে......

বিমান নীলাদ্রিকে থামিয়ে দিয়ে কিছু বলতে উদ্যত হতেই সে বারকয়েক মাথা নেড়ে বিনম্র কণ্ঠে বলল, আমি জানি আপনি কি বলবেন। কিন্তু দয়া করে আর উপদেশ দেবেন না। শুনতে ভাল লাগে না। তাছাড়া বুঝবার মত কিছু জ্ঞানও আমার আছে, বয়েসও হয়েছে। পা ভেঙে অচল হয়ে না পড়া পর্যন্ত থামলে যে আমার চলবে না তা আমি বুঝি। একথা আর কাউকে বলতে হবে কেন।

হঠাৎ কথার মুখে রাশ টেনে ধরল নীলাদ্রি। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমার কথায় আপনি যেন রাগ করবেন না। আপনাকে অসম্মান দেখাবার জন্য একটি কথাও আমি বলিনি।

বিমান কোন জবাব না দিয়ে ওর চোখের পানে চেয়ে থাকেন। দেখছিলেন একই চোখের বিভিন্ন রূপ। আর বুঝবার চেষ্টা করছিলেন এই বিক্ষোভের আসল কারণটা।

নীলাদ্রি পুনরায় বলে, আমি বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমার কথা থাক, আপনাকে নিয়ে কবে বেরুতে হবে তাই বলুন।

বিমান বললেন, কাল রবিবার—সকালের দিকে তোমার সময় হবে?

নীলাদ্রি জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসল।

ঐ হাসির মধ্যেই বিমান তাঁর প্রশ্নের জবাব পেলেন। বললেন, তাহলে একটু সকাল সকালই এসো। দুজনে একসঙ্গে বসে একটু চা খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কি বলো?

তাই আসব। বলেই নীলাদ্রি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তখনই যাওয়া হলো না।

বিমানের স্ত্রী কমলা দেখা দিয়েছেন। সঙ্গে এনেছেন কিছু আহার্য এবং চা।

বিমান বললেন, একটু বসেই যাও নীলাদ্রি। নাহলে উনি দুঃখ পাবেন।

নীলাদ্রি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, আমার জন্যে আবার—

বাধা দিয়ে রমলা বললেন, তোমার জন্যে আলাদা করে কিছু করা হয়নি বাবা। যা ঘরে ছিল তাই এনেছি।

খাবার ইচ্ছে নীলাদ্রির ছিল না। তবুও তাকে বসতে হলো—খেতেও হলো।

পরদিন নীলাদ্রি যথাসময় এসে উপস্থিত হলো। বিমানকে সঙ্গে নিয়ে কাছে-পিঠের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে প্রথম পরিচয়ের কাজটি সমাপ্ত করে সে চলে গেল। এরপরে কি জানি কেন প্রায় প্রতিদিনই বিমান আশা করছিলেন নীলাদ্রির উপস্থিতি। কিন্তু সে আসেনি। তাই বলে রাস্তাঘাটে যে একেবারে দেখা হয়নি তা নয়। চোখাচোখি হতে দূর থেকেই হাসিমুখে চলে গেছে। কাছে এসে অন্তরঙ্গ হবার কোন চেষ্টাই তার মধ্যে দেখা যায় নি। বরং একটু যেন এড়িয়ে চলতে চায় বলেই বিমানের ধারণা হয়েছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বয়েসের ব্যবধান হয়তো বা চিন্তারও, তাঁর সম্মানবোধকে আঘাত করেছে।

প্রথম দর্শনে বিমানের মত তাঁর স্ত্রীকেও নীলাদ্রি আকৃষ্ট করেছে। খানিকটা শুনে তারপর চোখে দেখে। একথা বহুবার রমলাকে বলতে শোনা গেছে। এমনকি মাঝে মাঝে ডেকে আনবার কথাও স্বামীকে বলেছেন।

বিমানও যে মাঝে মাঝে একই পথে চিন্তা করেননি তা নয়, কিন্তু স্ত্রীর মুখে তাঁর মনের কথা প্রতিধ্বনিত হতে আবার নতুন করে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল।

বললেন, কি এমন সম্মানিত ব্যক্তি যে নেমন্তন্ন করে তাকে বাড়ি ডেকে আনতে হবে।

স্বামীর এই অকারণ উষ্মায় রমলা খানিকটা বিস্মিত হলেন। তাঁর এই বিরাগের হেতু আবিষ্কার করতে না পেরে বললেন, এ আবার কেমন কথা তোমার। ঐ এক রত্তি ছেলে তোমার রাগের পাত্র নাকি?

অভিযোগটা সত্যি। মনে মনে স্বীকার করেন বিমান, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু না বলে চুপ করে থাকেন।

রমলা কিন্তু থামতে পারেন না। বলতে থাকেন, তোমার তো কথাবার্তার কোন ছিরি ছাঁদই নেই। কি বলতে কখন কি বলেছো তাই হয়তো—

বাধা দিলেন বিমান। স্ত্রীকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর অনুমান সত্য নয়।

এরপরে বহুদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ছেলেটিকে নিয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। আলোচনা করবার মত খুব বেশী আগ্রহ কারুর মধ্যে আছে বলেও মনে হয় না। দৃষ্টির আড়ালে সরে গিয়ে সম্ভবত অনেকটা মনের আড়ালে সরে গিয়েছে।

রাস্তাঘাটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে এর বিপরীত চিন্তাই কিন্তু বিমানের মনে উদয় হয়। অদ্ভুত লাগে, মনের এই বিচিত্র গতি-প্রকৃতি অনুভব করে। অথচ এই ছেলেটির সঙ্গে তার কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবুও দেখা হলেই একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেন। হয়তো এই বিশেষ আকর্ষণই তাকে বারে বারে কাছে ডাকার পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু নীলাদ্রি নিজে থেকে এগিয়ে এলে বিমান খুশি হন—পিছিয়ে গেলে দুঃখ পান।

এমনি যখন তার মনের অবস্থা ঠিক সেই সময়ই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুজকে নিকটে টেনে নিয়ে এল। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল নীলাদ্রি—এল আরও বহু চেনা অচেনা, যুবকের দল। একই উদ্দেশ্যে একই পথ ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

শহরের উপান্তে নিজের পাকা বাড়িতে বসেও বিমানকে ভাবতে হচ্ছে এর পরে কি হবে। আশ্চর্য এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দিন কয়েক একটানা বৃষ্টির ফলে। পা রাখার শক্ত মাটি জলের তলায়। বাড়িগুলি সব জলের উপর যেন ভাসছে। শুধু জল আর জল। কোথাও এক কোমর, কোথাও এক গলা। অথচ পৌরপ্রতিষ্ঠানকে উচ্চ হারে কর দিতে হয় প্রত্যেকটি মানুষকে। যাদের এগিয়ে আসার কথা তারা হয়তো প্রতিকারের বড় বড় প্ল্যান করছেন আর ভাল ভাল কথার মালা গেঁথে চলেছেন। আর ছেলের দল নিজেদের জীবন বিপন্ন করে স্নানাহার ভুলে দলে দলে ছেলে, মেয়ে-বুড়োকে নৌকায়, ভেলায় তুলে এনে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছে।

চেয়ে চেয়ে দেখছেন বিমান। এরই মধ্যে কোন সাহায্যের দরকার আছে কিনা জেনে গেছে নীলাদ্রি। যতটা দূরে সরে গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে এগিয়ে এসেছে। বাড়ি বাড়ি হাঁক দিয়ে যাচ্ছে—কার কি প্রয়োজন জেনে নিচ্ছে। পানীয় জল থেকে বাজার হাট পর্যন্ত সবই ব্যবস্থা করছে। সাবধান করে দিয়েছে। বিষাক্ত সাপ

বেড়ে উঠতে
অনেক সময়
লাগবে বলে
মনে হতে পারে…
কিন্তু দেখতে দেখতেই সময় চলে যায়।
এখনই আপনার সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলুন।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

ব্যক্তিও আশ্রয় নিতে পারে বলে কিছু কার-বলিক অ্যাসিড দিয়ে গেছে প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য। ভাল লাগছে বিমানের—মানুষের প্রতি মানুষের ভাল-বাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে।

জল আরও বেড়েছে। আর ইঞ্চিখানেক বাড়লে ঘরের মধ্যে জল এসে যাবে। সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠেছেন বিমান। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আর বোধহয় থাকা যাবে না রমলা। আশেপাশের অনেকেই ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে।

রমলা চলে যেতে রাজি নন। বললেন, সিঁড়ির ঘরে থাকব।

বিমান স্ত্রীর মুখের পানে নিষ্পন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তিনি কি ভেবে এ কথা বলছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। বলেন, এটা আবার কোন ধরনের কথা বললো রমলা?

রমলা জবাব দিলেন, তুমি হয়তো এই মুহূর্তের কথা ভাবছো, আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। ফিরে এসে হয়তো—

কথাটা শেষ হলো না নীলাদ্রির আহ্বানে। ও বলছিল, জল নাকি আরও অনেক বাড়বে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কোথাকার কোন লকগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় হবার আশঙ্কা আছে।

তবুও রমলা অন্যত্র চলে যেতে আপত্তি জানালেন। আপত্তির কারণ শুনে নীলাদ্রি গর্জে উঠলো। বলল, মানুষের এতবড় বিপদের সুযোগ যদি কেউ নিতে আসে মাসীমা—তবে সে জ্যান্ত ফিরে যাবে না। আমরা আছি কিসের জন্য।

বিমান একটি কথাও বললেন না। তিনি শুধু দেখছিলেন আর শুনছিলেন।

নীলাদ্রি বলল, সব গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন আমরা একঘন্টার মধ্যে বোট নিয়ে আসব।'

নীলাদ্রি চলে গেল।

বিমানের নিঃশব্দ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে একটি নিঃশ্বাস ফেলে রমলা বললেন, সেইতো কাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হবে।

বিমান শান্ত হেসে বললেন, তুমি বিপদে পড়ে যাচ্ছ রমলা—অভাবের জন্য নয়। এ দুটোর জাত আলাদা। এ সময় চুল-চেরা হিসেব করতে বসো না। তাহ'লে দুঃখ দুঃখই বাড়বে।

জবাব না দিয়ে নীরবে চলে গেলেন রমলা এবং আধঘন্টার মধ্যেই মোটামুটি গুছিয়ে নিলেন।

নীলাদ্রিও ঠিক সময় এসে উপস্থিত হলো।

যাবার আগে চাবিটা নীলাদ্রির হাতে তুলে দিতে উদ্যত হ'তেই সে বাধা দিয়ে বলল, এত বড় দায়িত্ব আমার মাথায় চাপাবেন না মাসীমা। আমাকে হয় জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে। কোথায় ফেলে দেব তার পর...না চাবি আপনি সঙ্গেই নিয়ে যান।

বাসোপযোগী অবস্থা ফিরে আসতে তিন সপ্তাহ লাগল। বিমান ফিরে এলেন আরও দিনকয়েক পরে। কিন্তু চলে যাওয়া এবং ফিরে আসার মাঝের এই সামান্য কটা দিনের ব্যবধানে কোথায় যেন প্রকাণ্ড একটা পালটা ঘটে গেছে। বাড়িতে পা দিয়েই বিমান অনুভব করলেন। সর্বত্রই একটা অস্বস্তিকর থম থমে ভাব—একটা ভীতি আর সন্দেহের ছাপ। বিমানের খুবই আশ্চর্য লাগছে। কি যে ঘটেছে তার অনুপস্থিতিকালে এ-কথা কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেও ইতস্ততঃ করছেন তিনি। এগিয়ে এসে কেউ মুখ খুলছেন না বলেই তার এই দ্বিধা। বিমান মনে-প্রাণে যাকে চাইছেন সেই নীলাদ্রির দেখা নেই। মন যখন সংশয় আর জানবার আগ্রহ নিয়ে দোলা খাচ্ছে এমনি দিনে নিতান্ত আকস্মিকভাবে নীলাদ্রির সঙ্গে অফিস পাড়ায় দেখা হয়ে গেল। সেদিনে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলেন না বিমান। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে আর দেখি না কেন নীলাদ্রি?

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল নীলাদ্রি, কেন আপনি কিছু শোনেননি?

না...

তাহ'লে আপনাকে বোধ হয় কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমার অপরাধ?

ম্লান হেসে নীলাদ্রি বলল, তা জানি না। মনে হ'লো তাই বললাম।

এটা একটা কথাই নয় নীলাদ্রি।

তাহ'লে বোধ হয় আমাকে স্নেহ করেন বলে।

কাউকে স্নেহ করা কি অন্যায় নীলাদ্রি?

ন্যায় অন্যায়ের হিসেব ক'রে আর কে আজকাল চলে। জানেন না বোধ হয় ও পাড়ায় আমরা এখন নেই?

সন্দেহ হ'য়েছিল। কিন্তু কেন?

থাকতে পারলাম না। থাকা সম্ভব হ'লো না। রাজনৈতিক ভাগবাটোয়ারায় আমি এখন অনাবশ্যক—অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি।

হঠাৎ যেন হোঁচট খেল নীলাদ্রি। ওর চোখে চোখ রেখে অপলক চেয়ে আছেন বিমান। এই কি সেই নীলাদ্রি! কোথায় ওর সুন্দর দুটি চোখের স্নিগ্ধ মায়ানাভরা চাহনি! তার পরিবর্তে ফুটে উঠেছে নিষ্ঠুর একটি ভাব। বিমান কিছু বলতে উদ্যত হতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার তাঁর একান্তে এসে দাঁড়াল, অসংলগ্নে গলায় বলল, ভবিষ্যতে আমার নামটাও এড়িয়ে চলবেন। নইলে অকারণে ভুল বোঝাবুঝি হবে। অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। এমন কি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও হতে পারে।

নীলাদ্রি...বিমানের কণ্ঠস্বরে এক রাশ বিস্ময়।

নীলাদ্রি ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নীলাদ্রি চলে গেলেও বিমান অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থেকে, তার পর আপন গন্তব্য পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার মধ্যে থেকে থেকে একটি কথাই পাক খেতে লাগল। রাজনৈতিক ভাগ-বাটোয়ারায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি...প্রত্যেকটি মানুষের মত এবং পথ এক হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলে একে অপরের কাছে অবাঞ্ছনীয় হবে কেন একথা পুরাতন পন্থী বিমান কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

কিন্তু বুঝবার যে তাঁর আরও ঢের বাকী ছিল এ কথা কি সেই মুহূর্তে বিমান একবারও কল্পনা করতে পেরেছিলেন!... তাই পরবর্তীকালে প্রতিদিন সংবাদপত্রে খুনের খতিয়ান দেখে দেখে বিমানের সুস্থ চিন্তা ভাবনাগুলি কেমন যেন অসার হ'য়ে পড়েছে। নীলাদ্রি কি এই কথাই ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে অনুভব দেখেছিল? পরিণামের কথা ভাবতে গিয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছেন বিমান। শুভাশুভের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত বোধ করছেন। অথচ যাওয়া যেভাবে এলোমেলো বইতে সুরু করেছে তাতে প্রাণ খুলে একটা ভাল কথা বলবারও উপায় নেই। অবিশ্বাস আর সন্দেহের কালো ছায়া চতুর্দিক থেকে চেপে ধরেছে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রার তার রূপ, রস, সৌন্দর্য লোপ পেতে বসেছে। অবাঞ্ছিত বন্দে বেঁচে থাকার অধিকার হারান ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথাটাই যেন এক নিষ্ঠুর সত্য রূপে পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। কেন হচ্ছে এটা বিমানের বুদ্ধির সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছে না। কেমন যেন জড়ভরত হ'য়ে পড়ছেন দিনকে দিন। ইদানীং মন আর প্রাণ খুলে স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে পারেন না। সেখান থেকেও আসে বাধা।

রমলা বলেন, চুপ করো। ইট কাঠের মধ্যেও ভূত ঢুকেছে।

চমকে ওঠেন স্ত্রীর এই অতি-সাবধানতায়। এমনি করে কি মানুষ বাঁচতে পারে? এরই নাম কি জীবন?

প্রতিবাদ করেন বিমান, তা বলে অন্যায়কে অন্যায় বলতে পারবো না। তাকে—

বিমানের কথায় আবার বাধা দিলেন রমলা। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, পর্যাপ্ত প্রমাণ অন্যায় আর অবিচারের মধ্যে যার জন্ম তাকে নীতিকথা শোনালে বিশ্বাস করবে কেন। ওখানে বুদ্ধি আলাদা, নীতিবোধ আলাদা... কার্যক্রম আলাদা।

আবার চমকে উঠলেন বিমান। স্ত্রীর চোখে চোখ পড়তেই এই চমক। ওখানেও

কি বিভ্রান্তি বাসা বেঁধেছে? ওখানেও কি জাদি আর আমার জন্য এই আকুলতা আর সাবধানতা? কিন্তু এই চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে থাকার এই সতর্ক সাবধানতার পরমায়ু কতদিন?

অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকেন বিমান। এ কেমন হাওয়া চতুর্দিকে বইতে শুরু করল। ঘরে-বাইরে কোথাও যে প্রাণ-ভরে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না।

তবুও বেঁচে আছেন বিমান, বেঁচে আছেন তাঁর স্ত্রী, বেঁচে আছেন তাঁদেরই মত আরও অনেকে। অনেক কষ্ট-কাঁতে তার বিবেকবোধ বর্জন করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে চলেছেন অদ্ভুত এক জীবন যন্ত্রণার পিচ্ছিল রক্তাক্ত পথ বেয়ে। আছাড় খেতে ভয়...ডিঙিয়ে যেতে আতঙ্ক...প্রতিরোধ করতে কাপুরুষোচিত দ্বিধা।...

স্ত্রীর আহ্বানে বিমানের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

রমলা বলছিলেন, এই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে আছো? কে একটি ছেলে যে তোমাকে ডাকছে। ওকে বরং ভিতরেই ডাকি। বাইরে গিয়ে কাজ নেই। কি বলো?

তাই ডাক—

চোরের মত সাবধানে ঘরে প্রবেশ করেই ছেলেটি ককিয়ে উঠল, নীলাদ্রিদাকে ওরা গুলী করে মেরে ফেলেছে...

আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন বিমান, কি বললে! নীলাদ্রিকে খুন করেছে? কারা...কারা খুন করেছে তাকে...

চিৎকারে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ছেলেটি। তারপর ফিস-ফিস করে বলল, ওরা...মানে আমি তা জানব কেমন করে...নীলুদা তার মার জন্য একটা ওষুধ নিতে এসেছিল...চুপি চুপি এসেছিল...সেখানেই বলেই সে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন বিমান। দেহ টলছে। মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করছে। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নীলাদ্রির শান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখ। যে চোখের দৃষ্টির মধ্যে একদিন তিনি দেখেছিলেন সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ, আশা-আকাঙ্ক্ষার নীরব প্রকাশ, দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত ভালবাসার সুগভীর ব্যঞ্জনা, তারপর...হাঁ আর একদিন ঐ চোখেই দেখেছিলেন নৈরাশ্যবাদের করুণ ছবি। সে ছবিও মুছে গিয়েছিল সময়, পরিবেশ আর অবস্থার বিপরীত হাওয়া লেগে। বিমান লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে। আর আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সে চোখে হিংসার বিদ্যুৎ চমক দেখে। এ রূপান্তর কেন ঘটল...কে ঘটাল...

রমলার স্পর্শে আত্মস্থ হলেন বিমান। তিনি বলছিলেন, এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ তুমি! যাবে না?

কেমন এক অসহায় ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকালেন বিমান। ভিজে গলায় বললেন, যেতে হবে বইকি, কিন্তু তুমি...তুমিও যাবে নাকি?

দৃঢ় কণ্ঠের জবাব পাওয়া গেল, হাঁ।

খবরটা মিথ্যে নয়। নীলাদ্রি নেই। তার রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। চোখ দুটি খোলা। শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ পলকহীন চেয়ে আছে। এই দুটি সুন্দর চোখই একদিন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল: আকর্ষণ করেছিল তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার আশা ভরা স্বপ্নালু দৃষ্টি দিয়ে, সেবা-পরায়ণতার গভীরতা দিয়ে। তার পরের দিনগুলির কথা ভাবতে গিয়েই তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন, বিচলিত হয়ে পড়েন। নিজেকে নিজে বারে-বারে প্রশ্ন করেন, কেন...কার অভিশাপে দেশের ভবিষ্যৎ বুনিয়াদ এমন বিভৎসভাবে ধসে পড়ল। কাদের স্বার্থ-পরতা, দুরপনেয় লোভ আর অবিবেচক নিষ্ঠুর কর্মধারা এই মহামূল্য জীবনগুলি নিয়ে জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে দেশের সমাজকে পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে দিচ্ছে।...মৃত্যু এই ছেলেটির চোখে যে আনন্দসুন্দর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল জীবদ্দশায় তা ফিরে পাওয়া কি এমনই অসম্ভব ছিল?...

স্বামীর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে কান্না ভেজা গলায় রমলা বললেন, আমি যে আর দেখতে পারছি না। চলো—

কোথায়...

বাড়ি...

বাড়ি...একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে ভগ্ন কণ্ঠে বিমান বললেন, তাই চলো।

মাথা ধরেছে?
অ্যানাসিন
ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়
কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

চিত্র প্রযোজক শ্রী বি. মুখার্জি বলেন, "অ্যানাসিন মাথার যন্ত্রণা থেকে চট করে আরাম দেয়। আমি সবসময় সঙ্গে অ্যানাসিন রাখি।"

জোরালো, কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য, কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

ফলদায়ক,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

৪ ভাবে কাজ করে

Regd. User of T.M.: Geoffrey Manners & Co., Ltd.

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

যে অভিযোগের অন্ত নেই

ট্রেনে সেদিন অসম্ভব ভিড়। লোক গাদাগাদি। আমি এবং আর দু'একজন কাছাকাছি কোন এক জায়গাতেই যাব। বাসে যেতে আসতে এমনিতেই সময় অনেকটা লেগে যায়। তাই হঠাৎ স্থির করে ফেললাম যে ট্রেনেই যাব। সময়ও বেশ কিছুটা বাঁচবে আর রেলভ্রমণও হয়ে যাবে। আর ইদানীং তো খুব কোথাও একটা যাওয়া হয়ে ওঠে না। অনেকখানি পুলকিত হয়ে সহকর্মীদের নিয়ে স্টেশনে ঢুকে ট্রেনের অবস্থা দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। তখনই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। প্যাসেঞ্জার নামছে আর সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোক উঠছে। অবস্থা দেখে মনে হলো ট্রেনে ওঠা যাবে না এবং বাধ্য হয়েই বাসের শরণ নিতে হবে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি আর রাস্তায় দাঁড়ান আমাদের অদৃষ্টের লিখন। এসব কিছুতেই এড়ানো যাবে না। এমনি সাত পাঁচ ভাবনা সকলের মনেই উঁকি মারছে। এদিকে টিকিট কাটা হয়ে গেছে। প্রাণে ধরে সেই মায়াও ছাড়তে পারছি না। অনেকটা বাধ্য হয়েই একটু জায়গার চেষ্টা করে ওঠার জন্য সবাই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথাও জায়গা নেই। এমন যে লেডিস কামরা তাও একদম ভর্তি। একটাই মাত্র কামরা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু মহিলা যাত্রীর সংখ্যা তো আর নেহাত কম নয়। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কথা সবাই বলেন। মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে এ সম্পর্কে নানা কথার প্রচার দেখতে পাই। অথচ বাস্তবে যাত্রীদের যে কি দুর্ভোগ পোয়াতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের। আর মহিলাদের কথাই নেই। ট্রেন বাস আর ট্রামে প্রায়ই তাঁদের শুনতে হয়, জায়গা নেই। রাস্তায় বেরিয়েই যেন তাঁরা মস্ত ভুল করেছেন। অথচ পুরুষ সহযাত্রীরা ভুলে যান যে, পেটের তাগিদেই এই মহিলারাও রাস্তায় বেরিয়েছেন এবং সেজন্যই তাঁদের ট্রেন-বাসে একটু জায়গা করে নেওয়া দরকার। আর সকলের মতো রেল কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সমান উদাসীন। ওরা মহিলাদের জন্য একটি কামরা দিয়েই দায় সেরেছেন। এদিকে নিত্য মহিলাযাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মের কোন পরিবর্তন আজো হলো না। ট্রাম-বাসেরও একই অবস্থা। মাঝে দু একটা লেডিজ স্পেশাল বাস-ট্রাম ছাড়া হয় বটে কিন্তু সে আর কতটুকু। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। আর এই ট্রাম বা বাস সব জায়গা থেকে ছাড়ে না। অগত্যা সকলের গতি মেনে নিয়ে ঠেলা-ধাক্কা সহ্য করেই যাতায়াত সারতে হয়। কত মেয়েকে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস-ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দু'তিন-খানা বাস ছাড়ার পরও উঠতে না পেরে যখন তাঁরা মরিয়া হয়ে ওঠেন তখন হয়তো বাসের ভেতর থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে, এভাবে যেতে পারবেন না পরের বাসে চেষ্টা করুন। যেন পরের বাস শুধু মহিলা যাত্রীই বহন করবে অথবা সেটা খুব ফাঁকা হবে। এদিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। বাদুড়ঝোলা বাসেই একটু জায়গা করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

ভাবতে ভাবতে অনেকটা এগিয়ে গেছি। প্রায় সারা ট্রেনটা চষে ফেললাম। কিন্তু জায়গা কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের একজন এভাবে যাওয়ায় আপত্তি তুললো। আমি তাকে বোঝালুম যে, এভাবে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। রোজই তো আমরা এই ধকল পোয়াই। সুতরাং পেছিয়ে গেলে চলবে না। এই ট্রেনেই উঠতে হবে। জেদটা এবার সকলের মনে সমান হলো। এদিকে ট্রেন ছাড়ার সময়ও কাছিয়ে আসছে। আমরাও পিছতে পিছতে সেই লেডিজ কামরার সামনে দাঁড়িয়েছি। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হাত বাড়িয়ে সবাই হাতল ধরে ফেললাম। তারপর ঠেলা-ঠেলি করতে করতে কোন একসময় পুরো ভেতরে ঢুকে এলাম। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই দাঁড়ালাম। যদিও ঘামে তখন সারা শরীর ভিজে জবজবে। তবু উঠতে পারার আনন্দে সে কষ্টকে আমরা কেউ আমলই দিলাম না। একটু পরে ট্রেন চলতে শুরু করলেই এই কষ্ট থাকবে না এই একটা অনিশ্চিত ভাবনায় সবাই সান্ত্বনা পেলাম। আমাদের আশা পূরণ করে ট্রেন দুলকি চালে চলতে শুরু করলো। কিঞ্চিৎ হাওয়াও লাগলো। মন এবার অনেকটা হালকা হয়ে গেল।

হঠাৎ এক কোণে চোখ আটকে গেল। একটি মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে কোন হাসি নেই। যাত্রীদের রঙ্গ-রসিকতায় সে শরিক নয়। কারুর কথাতেও সে হাসছে না। অথচ বয়স তো এমন কিছু নয়। এই কামরার অনেকের চেয়েই সে কমবয়েসী। সবাই যখন হাসিতে যোগ দিয়েছে সে তখন সম্মানের ভয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে এরকম তো দেখে মনে হচ্ছে না।

একটু পরে একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এলো। এতক্ষণের প্রাণান্তকর পরিবেশ থেকে এবার রিলিফ পাওয়া গেল। সেই মিষ্টি গন্ধ ধীরে ধীরে গোটা কামরা ভরিয়ে তুললো। এবার সকলের হুঁশ হলো। সকলের নজর অন্বেষণ করে সেই মেয়েটির উপর চোখ আটকে গেল। তার হাতে একটা ধূপকাঠি জ্বলছে। সেই গন্ধেই কামরা আমোদিত। আমরা ছাড়া তাকে সবাই চেনে। দু-একজন হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে ধূপকাঠি কিনলো। সে নিঃশব্দে ধূপকাঠি দিয়ে গেল। কারো সঙ্গে কোন কথা বললো না। এমন কি আমরা যে ওর অপরিচিত—আমাদের না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে কিরকম মনে খটকা লাগলো। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে বারবার আমার নজর ওর দিকেই আটকে যাচ্ছে। মেয়েটিও সেটা লক্ষ্য করছে। কয়েকবার চোখাচোখি হতে সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমার ক্রমাগত তাকানো দেখে এবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই সুযোগে মেয়েটিকে পুরোপুরি দেখবার সুযোগ পেলাম।

কঠিন মূর্তি। মুখমণ্ডল যেন পাথরে খোদাই। এমন বয়স নয় তবু মুখে দু একটা ভাঁজ পড়েছে। লাবণ্যের কোন রেশ কোথাও নেই। দৃঢ় সংগ্রামের শপথ ওর মধ্যে স্থির হয়ে আছে। কাঁধে একটা ব্যাগ। সেই ব্যাগেই ওর ব্যবসার সরঞ্জাম। এমনিভাবে ট্রেনেই সে নিয়মিত ধূপকাঠি বিক্রি করে। যাত্রীদের চেনাশোনা থেকেই সে কথা বুঝতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু বেছে বেছে লেডিজ কামরা কেন? এই একটা প্রশ্ন ঘুরেফিরে মনটাকে ভীষণ আন্দোলিত করতে লাগলো। আমি নিয়মিত ট্রেনের যাত্রী না হওয়ায় এর সদুত্তর পাচ্ছিলাম না। বারবার সে কথাটাই মনে ভেসে উঠছিল, এখানে আর সে এমন কি পায়? অথচ এটাই তো এর জীবিকা মনে হচ্ছে। এমনি ভাবতে ভাবতে দু একটা স্টেশন ছেড়ে এসেছি। কেউ কেউ নেমে গেছেন। উঠেছেন দু-একজন। কামরাটা একটু হালকা হয়েছে। আর একটু ফাঁকা হলেই আমি ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াব এমনি একটা চিন্তা সবেমাত্র মনে এসেছে হঠাৎ দেখি সে সকলকে পাশ কাটিয়ে একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত দেরি না করে জিগ্যেস করে বসলো, আপনি আমার দিকে ওরকমভাবে তাকাচ্ছিলেন কেন? খুব করুণা হচ্ছিল বুঝি? আর দয়া করে কেউ করুণা করবেন না।

এরকম আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে গেলাম। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আর একদম প্রস্তুতও ছিলাম না। কি বলবো ভাবছি। মেয়েটির দিকে তাকাতেই দেখলাম সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে মনে তখন ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছি।

ফটো : গৌর দত্ত

মেয়েটির সম্বন্ধে এমনি কৌতূহল প্রকাশ করতে গিয়ে যে কেন কামেলায় পড়লাম। এটা যেন একটা মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। এখন জবাবদিহি করে তবে রেহাই পেতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি এই প্রথম।

হঠাৎ মেয়েটি মুখ খুললো, যার বাবা নিজের মেয়েকে দেখে না তার জন্য দরদ দেখিয়ে কেউ আর সেই দগদগে ঘা-টা চাপা দেওয়া যাবে না। কথাগুলি ভীষণ কাটা কাটা। সেজন্যেই আরো কৌতূহল বাড়লো। দরদ ভরা চাউনি আমার ছিল না। কৌতূহল অনেকটাই ছিল। কিন্তু মেয়েটি আমার মধ্যে দরদের সন্ধান পেয়ে ছুটে এসেছে সতর্ক করে দিতে যে সে গোড়াতেই ● সম্পদে বঞ্চিত তাই তাকে দরদ দেখিয়ে আর ভোলানো যাবে না—সে কথাটাই সে জানিয়ে দিল।

ট্রেন এবার একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। অনেক যাত্রী নেমে গেল। একটু বসার জায়গা হলো। মেয়েটিও আমার পাশে বসে পড়লো। মেয়েটি আর একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, কথাটা কেন বললাম জানেন—বাবার কাছ থেকে যে [illegible] বঞ্চিত ছিল সেটাই পেয়েছে—

পাবি, পাইনি তো। আপনার স্নেহ মমতা নিয়ে আমি কি করবো। একটু বড়ো হয়ে শুনেছি যে আমার জন্মের সময়েই মা মারা যায়। তারপর আত্মীয়স্বজন নয় একমাত্র বাবার স্নেহেই আমি মানুষ। ছ' সাত বছর বয়সে আমি বাবার কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। না, কোন দুর্যোগে নয়। বাবাই আমাকে সরিয়ে দিলেন নিজের কাজকর্মের সুবিধার জন্য। আমাকে ভর্তি করে দিলেন এক বোর্ডিংয়ে। পরে বুঝেছি বাবার কাছ থেকে এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুর্যোগ। ভর্তি হয়ে এক নতুন স্নেহমমতার জগতে এসে পড়লাম। দিদিমণিরা সবাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। যত্ন করে পড়া শেখাতেন। বাবা আসতো মাঝে মাঝে। হাতে টফির বাকস। নানারকম খেলনা নিয়ে আসা বাবার একটা নিয়মিত অভ্যেস ছিল। কখনো খালি হাতে আসতো না। সপ্তাহে একদিন তো বটেই কোন কোন সময়ে দু'দিনও হতো। এমনি ছিল বাবার যাতায়াত।

আমার বাবা খুব বড়লোক ছিল না। কিন্তু আমার জন্য কোন জিনিসের অভাব রাখেনি বাবা। এসে বাবা আমাকে খুব [illegible]

এক একদিন আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত চিড়িয়াখানা, যাদুঘর কত জায়গা যে বাবার সঙ্গে ঘুরেছি তার ঠিক নেই। বিশেষ, বড়দিনের ছুটিতে কথা ছিল না। সেটাই ছিল বেড়ানোর মরশুম। বাবা আগে থেকে এসে যেতো আবার করে আসবে। আমি সেকেণ্ডকে গুনে থাকতাম। বাবা এলেই বেরিয়ে পড়তাম।

এমনিভাবে দিনগুলি কাটছিল মন্দ নয়। বছরের পর বছর পাশ করে ক্লাশের সিঁড়ি উঠেছিলাম। পাশ করার পর বাবার সে কি আনন্দ। মনের মতো জামাকাপড় কিনে দিতো। মাঝে মাঝে আবদার ধরতাম বাড়ি যাবার। বাড়ির কথা উঠলেই বাবা এড়িয়ে যেতো।

কিছুদিন থেকেই বাবাকে কিরকম অন্যমনস্ক দেখছিলাম। কোন কথার ভাল উত্তর দিতো না। অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকতো। এদিকে আমাকে দেখতে আসাও কমিয়ে দিয়েছিল। এরপর বাবার আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আমি রোজ পথের দিকে তাকিয়ে থাকি এই বুঝি বাবা আসে। কিন্তু আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকাই সার হয়। বাবা আর আসে না। এমনি-সময়ে একদিন বড়দিমণি আমাকে ডেকে বললেন যে, এখানে আর আমার থাকা সম্ভব নয় কারণ বাবা এখন আর আমার কোন খরচ দেয় না। আমি বড়দিমণিকে বললাম বাবাকে চিঠি দিতে। এর উত্তরে তিনি আমায় জানালেন যে বাবাকে একাধিক চিঠি লিখেও কোন ফল হয় নি। সব চিঠি ফেরত এসেছে। একথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। তখন আমি ক্লাশ এইটে পড়ি। তখন স্বপ্ন দেখছি স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ আর কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন। বড়দিমণির একথায় সব স্বপ্ন যেন নিমেষে খানখান হয়ে গেল। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। না, সেখানে কেউ নেই। পাশের ভাড়াটে জানালো যে, আমার বাবা বিয়ে করেছেন এবং এ বাড়ি ছেড়ে গেছেন। নতুন ঠিকানা তার জানা নেই।

বাবার সম্বন্ধে সব ভাবনা মুহূর্তে খানখান হয়ে গেল। তারপর অনেক ঘুরে ঘুরে নিজের চেষ্টায় আজ এই পর্যন্ত পৌঁছেছি। কারো করুণার পথ চেয়ে থাকি না। যে করুণা করে তাকে আমি ঘৃণা করি।

ট্রেন এসে স্টেশনে থামতেই মেয়েটি নেমে গেল। পাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আর একটি [illegible] এবং সেই মেয়েটির [illegible]

CENTRAL LIBRARY

জলসা

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টার আয়োজিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য সঙ্গীতের মহোৎসব ইভেন্ট-এ পিয়ানোবাদক জন কুপার, চেলোতে আইনার হোম, বেহালায় এল. বৈদ্যনাথন, তবলায় মহাপুরুষ মিশ্র এবং তানপুরায় রূপশ্রী ভট্টাচার্য।

রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসব

পুজোর ঠিক আগেই রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে চারদিনব্যাপী রবীন্দ্রসংগীতের ও নৃত্যনাট্যের উৎসব কলা-রসিকদের আনন্দের কারণ হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান (সুচিত্রা মিত্রের একক সঙ্গীতের আসর)—পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দুদিন "তাসের দেশ" নৃত্যানুষ্ঠানের একদিন সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়। এ ছাড়া ছিল—বাল্মিকী-প্রতিভা ও শাপমোচন। কবিগুরুর অন্তহীন সৃষ্টির বিভিন্ন অধ্যায়কে নতুন করে উপলব্ধি করা এবং কলানোর কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যনাট্যপরিকল্পনা ও সঙ্গীতপরিচালনার দ্বিবিধ দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদনাই প্রমাণ করেছে প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয়া গায়িকাই নন—অসাধারণ শক্তিসম্পন্না সংগঠিকাও বটে। সংগীত-পরিচালনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী। নৃত্যপরিচালক রামগোপাল ভট্টাচার্য। নৃত্যরচনায় আঙ্গিক কুশলতা ব্যঞ্জনাবাহী দেহভঙ্গী ও মুদ্রার রূপান্তরে তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয় রেখেছেন।

আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় দীনেশচন্দ্রের সুরসৃষ্টি সংলাপ ও গানের ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছে অবর্ণনীয় মধুরতায়। তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র (দিলরুবা), চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায় (তারসানাই)। অমরচন্দ্র (বাঁশী), জলতরঙ্গ (গোপেশ্বর দত্ত), বৃন্দাবন দে (চেলো)। সঙ্গতে ছিলেন বিপ্লব মণ্ডল, জয়দেব গড়াই, কেশব মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু ও রবীন গঙ্গোপাধ্যায়। একক বীণা ও সেতার-বাদনে—মায়া মিত্র ও দীনেশচন্দ্র। সুরেন চক্রবর্তীর মঞ্চসজ্জা ও সজ্জা পরিকল্পনা—ননী দাসগুপ্তের রূপসজ্জা সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অনন্য করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। সমস্ত বিষয়বস্তুর ভাব থেকে ভাবান্তর গমনের গতির ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত।

"তাসের দেশ"এ প্রযোজনায় রবিতীর্থের পূর্বখ্যাতি ম্লান হয়নি বরং পরিমার্জনা ও পরিশীলনার গুণে আরো গভীর আরো সরস ও চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। নৃত্যে (রাজপুত্রের ভূমিকায়) শিবশঙ্কর, (সদাগরপুত্ররূপী) শম্ভু ভট্টাচার্য, (পত্রলেখা) শান্তা বসুরায়, (রাণী) সুস্মিতা রায়চৌধুরী, (ছক্কা) ভানু দে, (গোলাম) রামগোপাল ভট্টাচার্য, (টেক্কানী) চন্দনা বসু, ইন্দ্রা সেন, (সদাগরপুত্র) শম্ভু ভট্টাচার্য, রাজা সন্তু মুখোপাধ্যায়, (রুইতন) শান্তি বসু, (পঞ্জা) পিনাকী রায়, (হরতনী) জয়শ্রী লাহিড়ী ও (ইস্কাবনী) শান্তা বসুরায়, বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন জয়শ্রী লাহিড়ী, রামগোপাল ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর ও শান্তি বসু।

সঙ্গীতাংশের সুসংবদ্ধ সম্মিলন, শ্রীমতী মিত্রের অনুপম কণ্ঠের গান (বিজয়মালা এনো) সংলাপ ও ভাষ্যে প্রদীপ ঘোষ, কল্যাণ রায়, প্রণব দাসগুপ্ত এবং সুচিত্রা মিত্র বক্তব্যের সুর ও নাটকীয়তার মেলবন্ধনে—রসভোগতার দিক দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে করে তুলেছিল অবিস্মরণীয়। 'শাপমোচন'-এর নৃত্যের ছন্দকে মুক্ত-ধারার মতই ঝরিয়ে গেছেন শ্রীমতী মিত্র। দুই-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় যেন এগিয়ে চলেছিল বাল্মিকী-প্রতিভা গীতি-নাট্য। সরস্বতীর আবির্ভাব মুহূর্তের ভাস্কর্য-সৌন্দর্যবাহী ভঙ্গীর গতিতে রূপান্তর (সুস্মিতা রায়চৌধুরী)—মুগ্ধ করে দেবার মত।

সব মিলিয়ে রবিতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসবটি সত্যিই মনে রাখার মতো স্মরণীয় শারদ অনুষ্ঠান।

নটরাজ প্রযোজিত অবনীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব—"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতিদান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।... তাই আজ আমি তাকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।"—অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ স্নেহোক্তি।

পুজোর আগে একাডেমী অব ফাইন আর্টস অবনীন্দ্র শতবার্ষিকীকে তাঁর শিল্পকীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নটরাজ সংস্থা সুধীবৃন্দের অভিনন্দন অর্জন করেছেন।

সুররচনা, অনুষ্ঠানপরিচালনা—আর্টিস্ট-কাবের দ্বিবিধ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন বিশ্বজিৎ রায়। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মানসধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিতই হয়েছে জয়ন্তী উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠানে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও শেষের সমবেত সঙ্গীত দুটি—"তোমার সুরের ধারা" ও "লহ লহ তুলে লহ"—অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত।

অবনীন্দ্রনাথের কথা ও সুরে "নীল আকাশের রঙিন পাখী" শুনতে পাওয়া যায় না বলেই আরো আদরণীয়।

অবনীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা "দুকড়ো" পাঠ করে শোনালেন বিশ্বজিৎ রায় ও প্রদীপ্ত ঠাকুর। বিশ্বজিৎ রায় রচিত সুরে অবনীন্দ্রনাথের "অতল জলের তলে তলে" ছিন্তনৃত্য প্রদর্শিত হয় এবং সমবেত ও একক গান ছিল শান্তিদেব ঘোষের সুরে অবনীন্দ্রনাথের গান "দিনে রাতে দিনার দেবার গান।" প্রতিটি অনুষ্ঠানই পরিচ্ছন্ন সুন্দর। দ্বৈত নৃত্যে ছিলেন বাসবী চক্রবর্তী ও কাজরী চক্রবর্তী। সমবেত নৃত্যে সুদক্ষিণা দত্ত, জয়তী গুপ্ত, সোমা সেন ও বিপাশা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশেষে "ক্ষীরের পুতুল" অবনীন্দ্রনাথের রসসিক্ত নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। অংশগ্রহণে ছিলেন আভাস সেন, মধুমালা চক্রবর্তী, বসন্তী গুপ্ত, জনজিৎ রায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রোদয় ঘোষ, অশোক দত্ত, সুশিষ রায়চৌধুরী, তপন মল্লিক, অমিত বসু, অজয় সাউ, প্রিয়ব্রত রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গো-

পাধ্যায়, সৌমিত্র বাগচী, সৌমেন্দু ঘোষ ও স্বরজিৎ রায়।

সুরবচনায় ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, অভিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসেনজিৎ রায়, শুভময় ঘোষ ও বিশ্বজিৎ রায়।

যন্ত্রসঙ্গীতে প্রসূন চৌধুরী, রবি বিশ্বাস, কেদার নন্দী, বিশ্বজিৎ রায়। রূপসজ্জায়—বন্দনী রায়। স্মারক—শ্রীমতী শুভরঞ্জু ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জা-কাহিনী—শর্বরী সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সুপর্ণা বসু।

"সৌরভ" প্রযোজিত রামায়ণ নৃত্যনাট্য—"সৌরভ"-এর প্রাণস্বরূপা নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু কুশলতার পরিচয় অনস্বীকার্য এই প্রতিষ্ঠানের অভাবনীয় বিস্তার। আমরা আরো খুশী হব যদি অজ্ঞকের নৃত্যনাট্যে রামায়ণে রামের চেয়ে হনুমান বড় হয়ে না ওঠেন" রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ সৌরভ-এর বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী সভায় বলেছিলেন সৌরভের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ।

সৌরভের সভাপতি শ্রীঅমিতা মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সকল পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে যাঁদের সাহায্য ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের এমন অকল্পিত প্রসার ও উন্নতি কল্পনাই থেকে যেত।

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য লায়নস ক্লাবের প্রেসিডেন্টের হাতে ১০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করেন শ্রীমুখোপাধ্যায়।

এর পরই মঞ্চস্থ হোলো রামায়ণ নৃত্যনাট্য। সম্পূর্ণ রামায়ণের নৃত্যরূপ দেবার প্রচেষ্টা এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই এই অভিনব প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের উদার অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। নৃত্যরচনা, সংলাপ-রচনা ও নাট্যরূপদান ও পরিচালনায় এতগুলি দায়িত্ব বহন করা সহজ নয়। কিন্তু অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এ ভার সম্পাদনের কৃতিত্ব সানন্দেই বহন করেছেন।

শিল্পবিচারে অবশ্য এ প্রযোজনা ত্রুটীহীন নয়। তবে অভিনয় এবং নৃত্যে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই শিক্ষার্থী। শিল্পীর পূর্ণাঙ্গতা এঁদের কাছে আশা করা যায় না। তবু শিশুশিল্পীদের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার দৃশ্যটি মনকে জুড়িয়ে দিয়েছে প্রকাশভঙ্গীর স্বতঃস্ফূর্ততায়। চরিত্রগুলির অতি-নাটকীয়তা আর একটু সংযত হলে ভালো হত। বিশেষ করে মন্থরার বিশাল্যকরণী। যদিও এই দৃশ্যটিই দর্শকবৃন্দের হাততালি পেয়েছে প্রচুর। শুধু সম্ভব বিচিত্রশ্রেণীর দর্শকের রুচির কথা ভেবেই নন্দিতা দেবী জোড়া আঁচড়ের আন্তরলাইন দিয়ে অবিচ্ছেদ্য আবেদনটিকে দেখাতে চেয়েছেন।

আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। বাঙালীনী হয়ে হিন্দী নাট্যরূপ ও সংলাপ রচনাকারা অবাঙালী (বিশেষ হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা) দর্শককে খুশী করা সহজ নয়। এই কঠিন কাজ স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করার কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য। তবে নেপথ্য থেকে চড়াসুরে সংলাপ পাঠ সংলাপের সৌন্দর্যকে ক্ষুন্ন করেছে।

রবিরেখার ঋতুবন্দনা— গত ৬ই সেপ্টেম্বর থিয়েটার সেন্টার প্রেক্ষাগৃহে রবিরেখা নিবেদিত ঋতুবন্দনা এক উপভোগ্য আলেখ্য। প্রতি ঋতুর ওপর কবিগুরুর দুটি করে গান নিয়ে এই গীতি-অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা করেন রেখা দাশগুপ্ত। আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে সংলাপ-পাঠ করেন শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে শোনান দেবী দাস, রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। ইলেকট্রিক গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজান অনীমকৃষ্ণ দেব। ঋতুবন্দনা গীতি-আলেখ্যে অংশগ্রহণ করেন : রেখা দাশগুপ্ত, শুভা পালিত, গোপা দত্ত, মালা মিত্র, খুশী দাস গুপ্ত ও ভাঁজ দাসগুপ্ত। যন্ত্রসঙ্গীতে সহায়তা করেন অমিয় ভট্টাচার্য (সেতার), নন্দলাল মুখোপাধ্যায় (বাঁশী), ভাস্কর মুখোপাধ্যায় (বেহালা), লক্ষণ ভাণ্ডারী (তবলা)।

নৃত্যের তালে-তালের উৎসব—দক্ষিণ কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "নৃত্যের তালে তালে"-র ৬ষ্ঠ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল "অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা" শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাত ভাই চম্পা', অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়ের "গঙ্গা-ভারতী", আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের "সূর্যের অতিথি" এবং উচ্চাঙ্গ নৃত্য। পরিচালিকা—নৃত্যশ্রী মীরা দাসগুপ্তা। "শকুন্তলা" নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতভিত্তিক এবং এক নতুন রূপধারাবাহী। সঙ্গীত-পরিচালনায় ছিলেন নীরদবরণ। ডলি ভট্টাচার্য (শকুন্তলা), সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (দুষ্মন্ত) এবং পূরবী শীল ও চম্পা মুখোপাধ্যায় (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) প্রশংসাযোগ্য অভিনয় করেছেন। "সাত ভাই চম্পা"র সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন প্রীতি দাসগুপ্তা। শিশুশিল্পীদের অভিনয় খুব উপভোগ্য হয়েছে। "গঙ্গাভারতী" ও "সূর্যের অতিথি"র সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন প্রভু মুখোপাধ্যায় এবং বলাই বাহুল্য সঙ্গীতই ছিল এই নাট্যদ্বয়ের প্রধান আকর্ষণ।

অভিনয়ে ছিলেন শ্যামা লাহিড়ী, চম্পা মুখোপাধ্যায়, সম্পা দাসগুপ্তা তুহিনা চক্রবর্তী, রূপা দাসগুপ্তা এবং মিতা চৌধুরী। সঙ্গীতে সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু রায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, আলপনা সেন, নবনীতা সরকার, বাসন্তী বসু, প্রণব ঘোষ ও সম্প্রদায় ছাত্রবৃন্দ।

গ্রন্থনায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দিন উচ্চাঙ্গনৃত্যের আসরে পরিবেশিত হয় কথাকলি, মণিপুরী, ভারতনাট্যম ও সমবেত কথকনৃত্য।

এই পরিচ্ছন্ন উৎসব-সূচীর জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ ব্যবস্থাপক অমিয়ের বসু ও সনৎকুমার দাশগুপ্ত।

লেকগার্ডেন্স পার্কের গীতি-অঞ্জলি সঙ্গীত শিক্ষায়তনের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিড়লা একাডেমীতে একটি মনোরম নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে শিশু ও কিশোরদের অংশ ও ছাত্রছাত্রীদের গীটারবাদন দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। বিমলভূষণ দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীখাদেশ খাঁ মেঘ-মল্লার রাগে তাঁর অপূর্ব সরোদ বাদনে সকলকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন স্বপন চৌধুরী।

রবীন্দ্রসদনে 'সরগম'-এর আনন্দমেলা

গত ২২শে আগস্ট রবিবার সকালে সরগম সঙ্গীতায়নের বার্ষিক উৎসবে যাঁরাই উপস্থিত হয়েছিলেন, সবারই মনে সব কিছু ছাপিয়ে বারবার উঁকি দেবে কয়েকটি কচি কচি মুখ। নাচে গানে অভিনয়ে সেদিনকার আসর মাতিয়ে রেখেছিল ওরাই। মনে হচ্ছিল যেন সারা রঙ্গমঞ্চ জুড়ে একদল দেবশিশু আনন্দের হাট বসিয়েছে। নিজেদের আনন্দমেলায় যার যার পসরা নিয়েই যেন ওরা মশগুল। এমনি সহজ সাবলীল ওদের গতিভঙ্গিমা। এমনি অনায়াস ওদের পদচারণা—কথা থেকে গানে, গান থেকে নাচে। যে নাটিকাটিকে ঘিরে সেইসব কুঁদে শিল্পীদের আনন্দ-আসর, সেই 'পাপড়ি' নাটিকাটি রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন 'সরগম'-এর পরিচালিকা সীমা দাস। শ্রীমতী দাসকে ধন্যবাদ সেদিনকার সেই অমৃতধারায় অবগাহনের দুর্লভ সময়টুকুর জন্য। অন্যান্য যেসব সঙ্গীতানুষ্ঠান ঐদিনের উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে 'সরগম'-এর ছাত্রছাত্রীদের সমবেত গীটার বাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শিশু-শিল্পীদের কথক নাচ উপস্থিত দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়েছিল।

রবিচ্ছায়ার 'শাপমোচন' : রবিচ্ছায়ার শিল্পীরা কয়েক দিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সদনে। নৃত্যের ভঙ্গিমায় আর সুরের লহরীতে অনুষ্ঠানটি সত্যি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সাধন গুহ, পলি গুহ, শিখা সেন, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী ঘোষ, বেণুবানী ঘোষ, কবিতা ঘোষ, রত্না ঘোষ, ভারতী নন্দী, সীমা চৌধুরী, পলি চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, প্রতিভা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য, আলো ঘোষ, রাখী রানা, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুশ্রী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দীপিকা চক্রবর্তী, রঞ্জনা গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে। সঙ্গীত-পরিচালনা আর নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন প্রতিভা মুখোপাধ্যায় ও অমিত চট্টোপাধ্যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

সমকালীন ইয়োরোপীয় ছবির কথা

অশোক মজুমদার

ফ্রান্স :

ফরাসী ছবির জগতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর সাম্প্রতিক ছবি 'দি স্যাভেজ বয়' এবারের বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'-এর মতো এ ছবিটিও এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কিশোরকে কেন্দ্র করে গঠিত। কিশোরটি একদা একটি মেয়ে-নেকড়ে বাঘ দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছে: নেকড়েটির স্তন দুগ্ধ পান করেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে। নেকড়েদের মধ্যে থেকে সে চতুষ্পদ জন্তুদের মতোই চলা-ফেরা করতো—পায়ের সঙ্গে হাত দুখানিকেও সামনের পা হিসেবে ব্যবহার করতো। পরিচালক ত্রুফো দেখিয়েছেন, কেমন করে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা এই জড়-বুদ্ধি কিশোরটির মনুষ্যত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা হল। ছবির আঙ্গিক তথা ট্রিটমেন্ট ছবির কাহিনীর মতোই সহজ ও সরল। জীপ ও জাম্পকাট ছবির মধ্যে বিশেষ কোথাও নেই। বলা চলে, ছবিটি 'পথের পাঁচালীর' মতোই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ। ত্রুফোর অপর সমকালীন ছবি 'দি মিসিসিপি মার্মেড' হচ্ছে একটি রহস্য বা সাসপেন্সধর্মী ছবি, যদিও রহস্য ও রোমাঞ্চের পাশাপাশি রয়েছে দারুণ রোমান্স ও প্রণয়মূলক দৃশ্যাবলী। এই ছবিতে নব পরিণীত স্বামী-স্ত্রীর মন দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্যাবলী ওঁর পূর্বেকার ছবি 'দি সিল্কেন স্কিন'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌনতা আছে, কিন্তু নগ্নতা নেই। একজন যুবক তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, কিন্তু সেই যুবকের ভগ্নী ও তার ব্যবসায়ী স্বামীর প্ররোচনায় ওদের মধ্যে ভুল বোঝা-বুঝি হল। এরই মধ্যে ওদের একজন অতর্কিতে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভকে গুলী করে বসল। ফলে রহস্য হল ঘনীভূত, মনে হবে, যেন হিচককের 'ভার্টিগো' জাতীয় ছবি দেখছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে উনি 'কাহিয়ার দ্যু সিনেমা'তে লিখেছিলেন, 'কাগজ যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনই সেলুলয়েডও, অথচ কাগজের বুকে কলমের সাহায্যে যেমন নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশী লেখা যায়, সেলুলয়েডের বুকে তেমনই খুশীমত ছবি তোলা সম্ভব।' ওঁর মতে চলচ্চিত্র তখনই আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়, যখন কাহিনী, চিত্রনাট্য, আলোকচিত্র এবং অভিনয়—সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের উপর নির্ভরশীল; কারণ চলচ্চিত্র শিল্পের তিনিই হচ্ছেন সর্বময় কর্তা।

জাঁ লুক গোদার্দ-এর প্রথম ইংরেজী ছবি 'লা অ্যালফাভিল' আজও এদেশে মুক্তি পায়নি। পূর্বেকার 'লা পিড পিয়েরো' বা 'পিয়েরো দ্য ফুল'-এর মতো একটি সমসাময়িক ফরাসী কাহিনীকে অবলম্বন করে ওঁর সাম্প্রতিক ছবি 'সিমপ্যাথি ফর দি ডেভিল' নির্মিত হয়েছে। যাঁরা গোদার্দ-এর 'নব তরঙ্গ' ছবির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন, কোনো সহজ সরল গল্পকে ওঁর ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর এ ছবিটি আরও রূপকধর্মী। কারণ, ছবিটির বেশ কিছু জায়গা জুড়ে রয়েছে বিদ্রোহের দৃশ্যাবলী। বিদ্রোহের বিস্ফোরক সঙ্গীতের সঙ্গে যে-সব দৃশ্য দেখা যাবে, তাতে মনে হবে এটি যেন কোনো পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশের ছবি। গোদার্দ-এর ছবিতে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। চিত্র-সমালোচকদের মতে মার্কসবাদ, লেনিন-বাদের সঙ্গে বিস্ফোরক ধ্বনি, বিদ্রোহ, বোমা ও গুলি এবং হত্যার মধ্যে দিয়েই ছবির মূল বক্তব্য এগিয়ে চলেছে। মনে প্রশ্ন জাগবে, তবে কি পরিচালক জাঁ লুক গোদার্দ ভিয়েতনামের যুদ্ধ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু না, আসলে তিনি দর্শকদের কাছে ছবির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে ছবির পরিভাষাকে বিভিন্ন প্রতীকধর্মী (সিম্বলিক) শটের সাহায্যে বর্ণনাত্মক করে তুলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি শিল্পী-দের সংলাপের মাধ্যমেও বর্তমান কারিক, সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য রাজনৈতিক বক্তব্যগুলিকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক মতবাদকে বাদ দিয়ে যদি ছবিটিকে দেখা যায়, তাহলে ছবির কলা-কৌশল, সম্পাদনা, চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনা এবং আলোক-চিত্র গ্রহণের কাজ দেখে সকলেই মুগ্ধ হবেন। গোদার্দের সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে এইটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। সব সংগ্রামেরই শেষ আছে, বর্তমানের রাজনৈতিক আন্দোলনও একদিন শেষ হবে, কিন্তু সংগ্রাম এবং আন্দোলনকে পটভূমিকা করে নির্মিত এই ছবিখানির মাধ্যমে গোদার্দ যে নব-কল্পনার সৃষ্টি করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'ম্যান অ্যান্ড ওম্যান' ছবির পরিচালক ক্লদ লেলুচ-এর সাম্প্রতিক ছবির নাম হচ্ছে 'লাভ ইজ ফানী থিং।' ছবিটির নায়িকা এক দুঃস্বপ্নকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দরজার দিকে ভবিষ্যতের আশায় কোনো সুন্দর সুখের কথা ভেবে। ফরাসী ছবির ভবিষ্যৎ পরিচালকেরা ছবিখানি থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, এই কথা মনে রেখে পরিচালক ছবিটিকে তাঁর 'ম্যান অ্যান্ড ওম্যান'-এর মতো সহজ সরল প্রেম ও প্রণয় কাহিনীমূলক না করে করেছেন মনস্তত্ত্ব-মূলক ও রূপকধর্মী। ম্যাক গোডার্ড 'বেঞ্জামিন' (১৯৬৯) ছবিটিকে ব্রিটিশ 'টম জোন্স'-এর ফরাসী সংস্করণ বলা চলে অনায়াসেই, কারণ দুটি ছবিতেই নগ্নতা ও যৌনতা বিদ্যমান সমভাবেই। তবে রঙের ব্যবহার এবং অন্যান্য কলাকৌশল ছবিটিতে যথার্থ উপভোগের। যেমন জ্যাক ডার্টফ পরিচালিত এবং কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'দি গার্ল অ্যান্ড দি মোটর সাইকেল'-এ নগ্নতা ও যৌনাবেদনমূলক দৃশ্যগুলিতে রঙের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ভাবের পরিবর্তন সূচিত করবার জন্যে—এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে, একেবারেই নতুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে 'বেঞ্জামিন' ছবিটি দেখানো হয়েছিল।

ইতালী :

ইতালীর ছবির জগতে 'নব্য বাস্তবতা'র (নিও রিয়ালিজম-এর) শুরু থেকেই প্রখ্যাত প্রবীণ পরিচালক ভিত্তোরিও দা সিকা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি করেছেন। অবশ্য ওঁর 'বাইসিক্ল থীফ' থেকে 'ম্যারেজ ইতালীয়ান স্টাইল' পর্যন্ত ছবিগুলির মধ্যে বহু ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তিনটি ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে রচিত 'ইয়েস্টারডে, টুডে অ্যান্ড টুমরো' ছবিটির পরে একটি চিত্র-ধর্মী উপভোগের প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে তিনি গড়ে তুলেছেন 'সান ফ্লাওয়ার' ছবিটি ইতালী ও রাশিয়ার সহযোগিতায়। আমরা দেখেছি, রাশিয়ার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সূর্যমুখী ফুলের খোঁজ। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বহুদিন ছাড়াছাড়ি হবার পরে 'আমার স্বামী কখনও মারা যেতে পারে না', এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে স্ত্রী ছুটল রাশিয়াতে স্বামীর খোঁজে। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস, যখন সে সত্যিই স্বামীর সন্ধান পেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল তার স্বামী একটি সুন্দরী রুশ তরুণীর সঙ্গে নতুন করে ঘর বেঁধেছে। ক্ষোভে, দুঃখে স্ত্রী সটান ফিরে এল ইতালীতে নিজের বাড়ীতে। স্বামী জানতে পেরে ছুটে এল স্ত্রীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এবং তাকে বোঝাতে, কি পরি-স্থিতিতে সে ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করে সন্তান সম্ভাব পালন করা হয়েছে। কিন্তু অভিমানিনী নারী আহত মন নিয়ে

[illegible] থাকে, তার কাছে ক্ষমা পাবার আশা কোথায়? স্ত্রীর ভূমিকাতে সোফিয়া লোরেন যে আশ্চর্য নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। স্বামী ও দুই স্ত্রীর ভূমিকায় মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানী ও ভর্জিনিয়াকে দেখা গেছে। এরপরে দা সিকা মাস্ত্রোয়ানী ও ফে ডানাওয়েকে নায়ক-নায়িকা রূপে নিয়ে লাভার্স ট্রাজিডি নামে এক প্রেমধর্মী ছবি তৈরী করেছেন।

লা দোলচে ভিতা-খ্যাত ইতালীয় অপর পরিচালক ফেডেরিকো ফেলিনির সাম্প্রতিক ছবির নাম হচ্ছে 'স্যাটিরিকন'। ছবির কাহিনী পৌরাণিক, মনে হয় যেন রোমের সম্রাট নীরোর সমসাময়িক ঘটনা। কিন্তু পরিচালকের মতে এটিকে পৌরাণিক না বলে বিজ্ঞানভিত্তিক রূপক ছবি বলা চলে। ছবির নায়ক হচ্ছে সমকামী এবং তার কাণ্ড-কারখানা নাকি ছবিটিকে করে তুলেছে অশ্লীল। অবশ্য পরিচালক বলেছেন ছবিটির সব কিছুই কাল্পনিক। ছবির একটি নাটকীয় দৃশ্যে অনেক নারী তাঁর অমূল্য ধন-সম্পদ তাঁর কন্যদের মধ্যে দান করতে করতে তাদের যৌনাবেদনের দ্বারা উত্তেজিত করছেন ক্ষণে-ক্ষণে। পরিচালক ফেলিনি নীরোর পতনের দৃশ্যেই যৌন বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং প্রাচীন রোমের দৃশ্যসজ্জার ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর তরুণ-তরুণীদের যৌনবিকার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকালের মতো আজও রোমে হবে সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, হিংস্রতা ও যৌনপরায়ণতার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই ফেলিনি বলছেন, এখনও সময় আছে: হয়তো বা এরই মধ্যে নতুন খৃস্টের আগমন সম্ভব হবে এবং সব কিছুরই পরিবর্তনের পরে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। প্রখ্যাত ইতালীয় পরিচালক আন্তোনিয়নি ব্রিটেনে 'ব্লো-আপ' তৈরী করার পরে আমেরিকার আধুনিক সমাজের ব্লো-আপ রূপে জেবরিস্কী পয়েন্ট ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ওখানকার তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ছবিটির বক্তব্যের চেয়ে বড়ো করে দেখিয়েছেন যৌনতাকে। আশা করা যাচ্ছে, যৌনতা ও নগ্নতার দৃশ্যগুলিকে বাদ দিয়ে আন্তোনিয়নি ও ফেলিনির ছবি দুখানি ভারতে মুক্তি লাভ করবে।

ইতালীয় তরুণ পরিচালকদের মধ্যে প্যাসোলিনী 'ঈডিপাস দি রেক্স' ছবিটি শেষ করে 'মেদিয়া' নামে নতুন ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অপর বিশিষ্ট তরুণ পরিচালক বের্তোলুচির 'দি কনফর্মিস্ট' ছবিটি যে বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এ-কথা নিশ্চয়ই পাঠকদের মনে আছে। মোরাভিয়ার কাহিনীকেন্দ্রিক ছবিতে ফ্যাসী বিরোধিতার ঘনঘটা যেমন আছে, আবার তেমনই আছে স্বদেশপ্রেম, বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি, হত্যা, সমকামিতা ও যৌনতা। ১৯৪০ সালের ৩রে যখন ফ্যাসি-বিরোধী সরকারের পতন হোলো, তখন ছবির নায়ক জানতে পারল, তার একমাত্র সুহৃদ তার নিজেরই বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছে। কে ওকে হত্যা করেছে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে তার উত্তর রয়েছে ছবিতে। কাহিনী বিন্যাস, পরিচালনা, অভিনয় এবং ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগ—সব দিকেই তরুণ পরিচালকের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় ছবিটিতে। শিল্পীরাও চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়ে বাস্তবসম্মত অভিনয় করে পরিচালকের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। ইতালীয় অন্যতম তরুণ পরিচালক ভার্সিনির ছবি 'ব্লো হট, ব্লো কোল্ড' যে আমাদের দেশে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল, এ-কথা আশা করি সকলেরই মনে আছে।

সুইডেন :

সুইডেনের ছবি বললেই প্রথমে ইঙ্গমার বেরগম্যান-এর নাম মনে আসে। উনি যে ট্রিলজিটি তৈরী করেছেন, তার মধ্যে মাত্র উইন্টার লাইটটিই এদেশে চলচ্চিত্র উৎসব মারফৎ প্রদর্শিত হয়েছে, বাকী দুটি দি সাইলেন্স এবং থ্রু দি গ্লাস ডার্কলি এদেশে এখনও আসেনি। এমন কি তার সাম্প্রতিক ছবি পার্সোনা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবে আশার কথা, উনি বর্তমানে দি টাচ নামে একখানি ইংরেজী ছবির পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই ছবিতে ওঁর কোনো সুইডিশ তারকা থাকছে না, তার পরিবর্তে উনি এলিয়ট গোল্ড নামে এক তরুণ মার্কিণ শিল্পীকে দিয়ে ছবির একটি প্রধান ভূমিকায় কাজ করাচ্ছেন। এই ছবিটি হবে ওঁর আগেকার সকল ছবি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর এক অপূর্ব পরীক্ষানিরীক্ষামূলক হবে ছবিটি। ওঁর ধারণা, এই ছবি সুইডেনের খ্যাতি বর্ধিত করবে।

যৌনাবেদন ও নগ্নতার জন্যে সুইডেনের ছবিগুলির খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। বিশেষ করে ম্যাক্স ভিটোরিনিক্স-এর মাইণ্ড গেম লাভিং কাপলস্, ডকটর গ্লাস ও দি গার্ল ছবিগুলির নাম এই প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখিত হয়। এদের পরেই মনে আসে ভিলগট শোম্যান পরিচালিত যৌনতা বা নগ্নতার ছবি—আই অ্যাম কিউরিয়াস ইয়েলো '(৬৭), আই অ্যাম কিউরিয়াস ব্লু (৬৮) এবং ইউ আর লায়িং-এর কথা। সুইডেনে কেবল যৌনাবেদনমূলক ছবি তৈরী হয়, এ কথা মনে করলে ভুল হবে। ওখানে রয় অ্যান্ডারসন পরিচালিত 'এ সুইডিশ লাভ স্টোরী' এবং জন বার্গেন শ্লুলার পরিচালিত 'দি বাল্টিক ট্রাজেডি'র মতো ক্লাসিক উচ্চমানের ছবিও তৈরী হয়ে থাকে। প্রথম ছবিতে কিশোরকিশোরীর প্রণয়কে কেন্দ্র করে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থায় প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল অভিভাবকদের চিন্তাধারার সঙ্গে আজকের তরুণদের চিন্তাধারার যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তারই একটি বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরেছেন পরিচালক। দ্বিতীয় ছবিটি হচ্ছে যুদ্ধ-

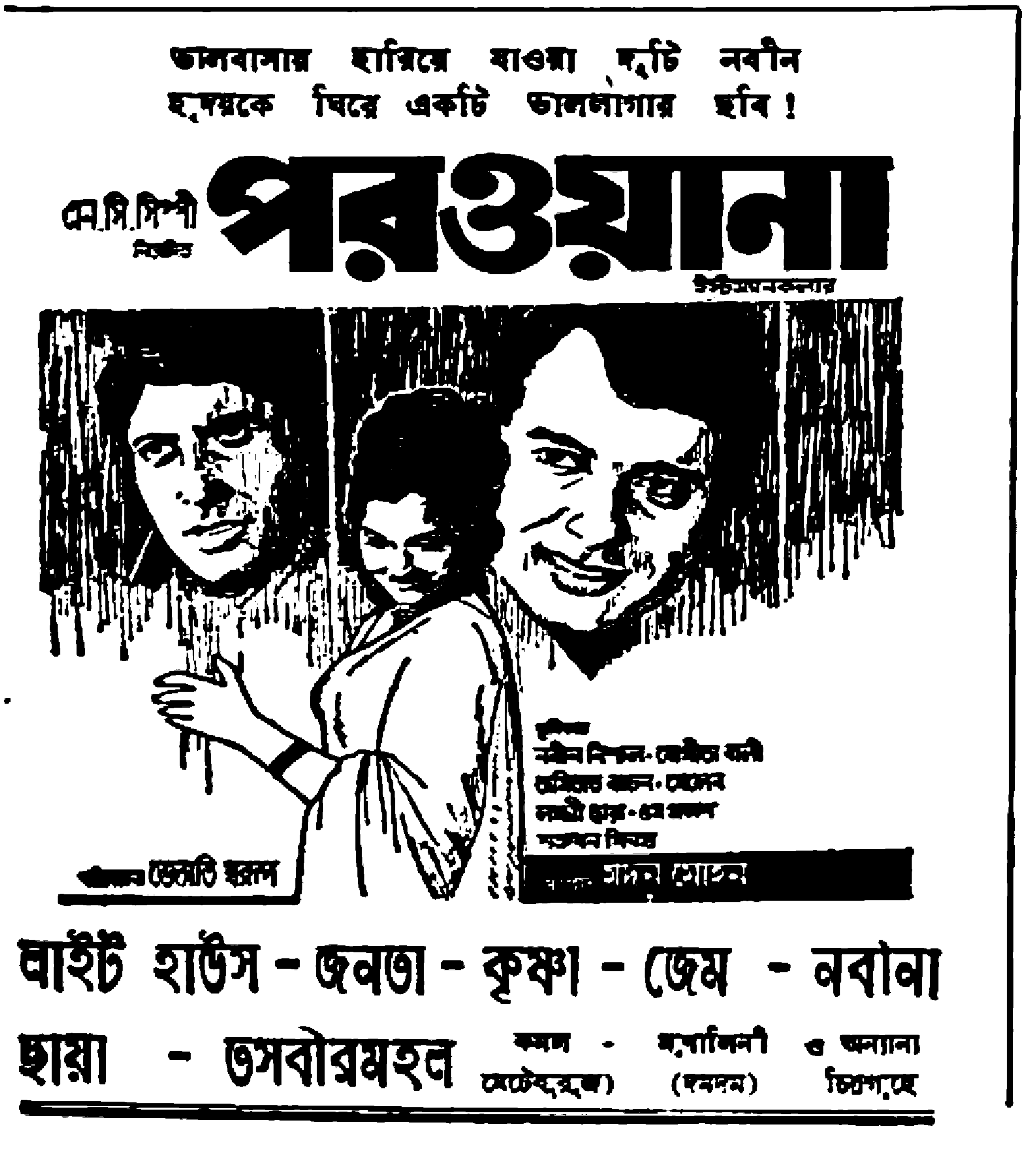

কৌশুক। বন্দিদশার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায় তিন হাজার জার্মাণ সৈন্য সুইডেনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে সুইডেন সরকার তাদের ঐ রাজ্য ত্যাগ করবার আদেশ দিলে তারা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে এবং অনশন ধর্মঘট করে তাদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। মৃতপ্রায় সৈনিকদের মর্মবেদনা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই এই সুইডিস ছবিটির মূল আবেদন। বো ওয়াইডারবার্গ তাঁর 'রাসভেন্স এন্ড' ছবিটির জন্যে সুইডিস চলচ্চিত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি অ্যাডালেন ৩১ (দি অ্যাডালেন রায়টস্) ১৯৩১ সালে সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে একটি কারখানায় যে গণ-সত্যাগ্রহ হয়েছিল, তাকেই কেন্দ্র করে গঠিত। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মিলিটারী সৈন্যদের যে সংঘর্ষ হয়, তারই করুণ আলেখ্য আছে ছবিটিতে।

পশ্চিম জার্মানী :

১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে সবচেয়ে বিতর্কমূলক ছবি ছিল পশ্চিম জার্মাণীর 'ও কে'। ছবির কাহিনীতে ছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পটভূমিকায় কয়েকজন মার্কিণ সৈন্য একটি ভিয়েতনামী তরুণীকে ধর্ষণ করবার পরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ছবির পরিচালক তরুণ এবং শিল্পীরাও নবাগত। কিন্তু ছবির মানবিক আবেদনকে অগ্রাহ্য করে আমেরিকান জুরী-সদস্যরা ছবিটি সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি তোলায় চলচ্চিত্র উৎসবটাই ভন্ডুল হয়ে যায়। রাইনার ফাসবিন্ডার পরিচালিত 'হোয়াই ডাজ হের্ ক্ রান?' ছবিটি সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, কিন্তু ছবির শেষাংশে দেখা যায়, নায়ক তার স্ত্রী, পুত্র ও প্রতিবেশীকে হত্যা করবার পরে নিজে আত্মহত্যা করে জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেলেন। পরিচালক কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমানের সমাজব্যাধিকে, কেমন করে পশ্চিমী সমাজ থেকে প্রেম, প্রীতি, মানবিক অনুভূতি ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে আসছে কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, কৃত্রিমতাই মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে একের থেকে অন্যকে দূরে, সৃষ্টি করছে শূন্যতা, হাহাকার। পরিচালক বলছেন, যান্ত্রিক সভ্যতাই এই কৃত্রিমতার জনক।

পশ্চিম জার্মাণীর সমকালীন ছবিগুলির মধ্যে কলকাতায় প্রদর্শিত দু-একখানি ছবি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। 'সাইনস অব লাইফ' ছবিটিতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধে আহত কয়েকজন জার্মাণ সৈন্য দিনের পর দিন কিভাবে একটি নির্জন দ্বীপের অধিবাসীদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। ওদের মধ্যে একজন তরুণ সৈন্য সব কিছু হারিয়ে পাগল হয়ে যে দুর্গের মধ্যে গোপনে গোলাবারুদ রক্ষিত ছিল, তাকেই আক্রমণ করে বসে। ছবির মানবিক আবেদন, আলোকচিত্র গ্রহণ, অভিনয় ও পরিচালনা—সবই অনবদ্য। সিলভার বিয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবির পরিচালক হচ্ছেন ওয়ার্ণার হেরজগ্। 'ইয়েস্টার্ডে গার্ল' খ্যাত পরিচালক আলেকজান্ডার ক্লুগের 'দি আর্টিস্ট আন্ডার দি বিগ টপ' ছবিটি ভেনিসে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিল। একজন তরুণীর খ্যাতনামা শিল্পী হবার স্বপ্নকে কেন্দ্র করে ছবিটি গড়ে উঠেছে। ছবির টেকনিক্যাল দিক, সম্পাদনা ও পরিচালনা—সবই উচ্চাঙ্গের। প্রয়োজন অনুসারে কোথাও সাদাকালো, আবার কোথাও রঙীন আলোকচিত্রের ব্যবহার পরিচালকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে।

চেকোশ্লোভাকিয়া :

ক্যারেল কাচিনা পরিচালিত 'দি কানি ওল্ডম্যান' ছবিটি ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। যার অকেজো হৃদয়ের বদলে নতুন হৃদয় অস্ত্রোপচার করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন এক হাসপাতালের বৃদ্ধ রোগীর নিজের হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে ব্যস্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত সদ্য আত্মহত্যাকারিণী মেয়েকে দেখে শোকে প্রাণত্যাগ করার ঘটনাকে অবলম্বন করে এই বিস্ময়কর মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ছবিটি গড়ে উঠেছে। ইভালড স্করম্ পরিচালিত 'দি এন্ড অব দি প্রিস্ট' ছবিতে এক ভন্ড ধর্মযাজকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেও তার পতন রোধ করা গেল না। ছবিটি নবতরঙ্গ-এর নয় এবং কমেডিই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পোলিশ পরিচালক স্কোলিমোস্কি ডায়ালগ ২০-২০ ও ৭০-৭০ নামে একটি সুন্দর চেক ছবি পরিচালনা করেছেন।

যুগোশ্লাভিয়া :

'আর্লি ওয়াকস' ছবিটির পরিচালক হচ্ছেন জিলিক্। ছবির কাহিনীতে দেখানো হয়েছে তিন তরুণ ও এক তরুণী স্বদেশের জন্যে অভিযানে বেরিয়ে যখন বিপদের সম্মুখীন হল, তখন তরুণেরা তরুণীটিকে উপভোগ করে দূরে সরে গেল। দুঃখে, যন্ত্রণায় তরুণীটি নিজের দেহে পেট্রল ঢেলে চিরকালের জন্যে মুক্তিলাভ করল। রাজনীতি থেকে স্বদেশপ্রেমিকতা বড়ো, এই বক্তব্য চেক ছবি থেকে যুগোশ্লাভিয়ার ছবিতে বেশী করে পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

পোলান্ড :

আঁদ্রে ওয়াইদা পরলোকগত পোলিশ চলচ্চিত্রাভিনেতা চিবুলস্কির কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে 'এভরি থিং ফর সেল' ছবিটি করেন। তাঁর পরবর্তী ছবি 'হান্টিং ফ্লাইজ'এ তিনি ওয়ারশর বিভিন্ন যুবসম্প্রদায়ের পটভূমিকায় তরুণ-তরুণীদের সামাজিক পরিবেশ, তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং তাদের প্রেম ও প্রণয়পর্ব উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। এরও পরে উনি ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতির ভিত্তিতে 'দি ল্যান্ডস্কেপ আফটার এ ব্যাটল' ছবিটির কাজ শেষ করেছেন। প্রখ্যাত পরিচালক রোমান পোলানস্কী লন্ডনে 'ম্যাকবেথ' ছবিটি নতুন করে নির্মাণ করেছেন।

শুভ আবির্ভাব
শুক্রবার ১৫ই অক্টোবর !

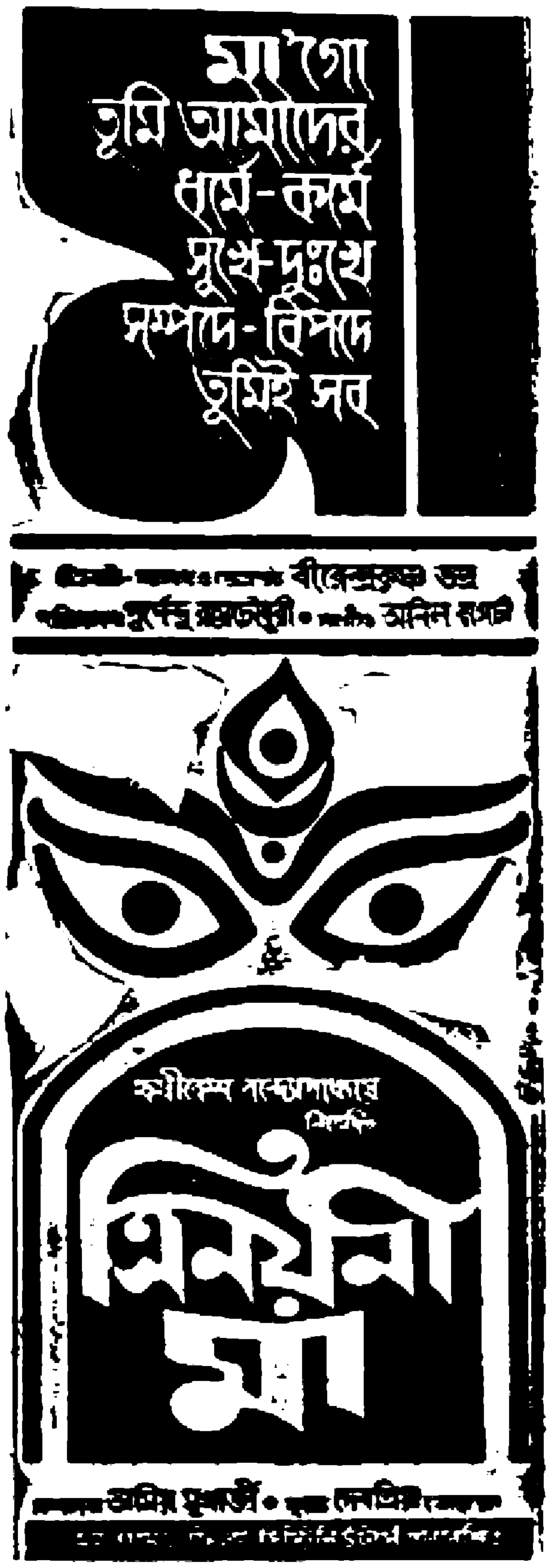

ডাঃ কমল মিত্র ॥ বসন্ত চৌধুরী ॥ পাহাড়ী সান্যাল ॥ অজিত বন্দ্যোঃ ॥ কালীপদ চক্রবর্তী ॥ আনন্দ ॥ বীরেন ॥ বিজু ॥ শচীন মল্লিক ॥ মানিক রায় ॥ তাপস ॥ সন্ধ্যা সাহা ॥ পদ্মা ॥ পারমিতা ॥ মধুমিতা ॥ সীমা ॥ অর্পা ॥ সন্তোষ ঘোষ ॥ মাঃ শিবাজী ॥ মালা দাস ॥ নবাগতা মুন্সী এবং নৃত্যে দেবীপ্রিয়া (মাদ্রাজ)

রূপম - কালিকা লীলা (হাওড়া)

যোগমায়া ॥ শ্রীমা (খড়দহ) ও অন্যত্র

অপর্ণা সেন/আজের অতিথি ।।
পরিচালনা : অগ্রদূত

মাধবী চক্রবর্তী/প্রেম ও অপ্রেম ।।
পরিচালনা : নির্মল ভৌমিক

মীনাক্ষী গোস্বামী/সংসার ।।
পরিচালনা : সলিল সেন
ফটো : অনন্ত

চলচ্চিত্র কি শুধুই প্রমোদোপকরণ?

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ওপর প্রমোদকর বসান হয় নিশ্চয়ই এই কারণে যে, সরকারী মতে চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি প্রমোদোপকরণ। কিন্তু আজকের দিনে একটি চলচ্চিত্রকে শুধুই প্রমোদোপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয় কি? খোসলা কমিশন স্পষ্টই বলেছেন, এতকাল ভারতীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড খালি নেতিবাচক কাজই করে এসেছেন। কিন্তু এখন প্রয়োজন হচ্ছে, সেন্সার বোর্ডের এমন কিছু করা যাতে, চলচ্চিত্রের শিল্পগত ও নান্দনিক গুণ বৃদ্ধি পায়। এবং এর জন্যে তাঁরা চলচ্চিত্রের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে অধিকতর স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত এবং যৌনবিষয়ক বক্তব্যপূর্ণ কাহিনী চিত্রায়ণে কোনও বাধা না রাখার সুপারিশ তাঁরা করেছেন। এবং তাঁরা আরও বলেছেন যে, অতঃপর উচ্চ নান্দনিক, শিল্পগত ও সংস্কৃতিবিষয়ক গুণসম্পন্ন ছবিকে শুধু প্রদর্শনীর ছাড়পত্র না দিয়ে বিশেষ মর্যাদার সার্টিফিকেট যেন দেওয়া হয়। এই বিশেষ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছবির জন্যে প্রযোজক প্রমোদকর থেকে অব্যাহতির আবেদন করতে পারেন।

অর্থাৎ আজ আর চলচ্চিত্র যে শুধু প্রমোদ মাধ্যমরূপে গণ্য হচ্ছে না, একথা সরকার নিযুক্ত খোসলা কমিশন দ্বারা স্বীকৃত। ভারতের দৈনিক ৬২ লক্ষ চলচ্চিত্র দর্শকের মধ্যে শতকরা ঠিক কতজন চলচ্চিত্রকে আর মাত্র প্রমোদোপকরণ স্বরূপ মনে করেন না, এ-হিসাব যদিও আজ করা হয়নি, তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সোসাইটিগুলির (১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি থেকে যার শুরু এবং ১৯৭০-এর শেষে যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯) কৃপায় ও বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈদেশিক ফিল্ম ম্যাগাজিন এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত বহু পুস্তকের পঠন-পাঠন এবং সর্বোপরি ভারতে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আজ ভারতের বুদ্ধ সম্প্রদায়ের একাংশ চলচ্চিত্র দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না, এদেরও শিল্প-ভাবনা তেমনই চলচ্চিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। স্টানলে কাউফম্যান এঁদেরই নামকরণ করেছেন—ফিল্ম জেনারেশন। এরা ফিল্মকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে কেন, তার কয়েকটি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন :

১। বর্তমান টেকনোলজির যুগে চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটেছে টেকনোলজি থেকে। স্থাপত্যবিদ্যাকে বাদ দিলে চলচ্চিত্রই হচ্ছে একমাত্র শিল্প, যা প্রত্যক্ষভাবে ও বহুল পরিমাণে এই যুগের গণিত বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আত্মসাৎ করেছে। জ্যামিতিক অঙ্কন-শিল্পীরা যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রোনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন, কবি ও চিত্রকরেরা কম্পুটারকে কাজে লাগিয়েছেন, সুরকারেরা ইলেকট্রোনিক টেপ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এগুলি হচ্ছে পছন্দের ব্যাপার—ইচ্ছা করলে তাঁরা এগুলিকে বর্জনও করতে পারেন। কিন্তু চলচ্চিত্রকারের ক্ষেত্রে তা নয়; তিনি ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাকে জটিল ইলেকট্রোনিক ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেই হবে—এছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। এই একমাত্র কারণেই তাঁকে তাঁর সমাজের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে রেখেছে, বর্তমানের তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। তাঁর শিল্পের উপাদানস্বরূপ তিনি যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন, তারাই তাঁকে যুগচেতনার সঙ্গে মানসিক আদান-প্রদানে সংশ্লিষ্ট রেখেছে।

২। দর্শনযোগ্য বাহ্যবস্তু তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত আবার শিল্পকলার বা আর্টের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জার্মান লেখক রোল্ফ হোকুথ বলেছেন, "ইঙ্গমার বেরিয়ম্যানের 'দি সাইলেন্স' ছবিটি দেখে যখন আমি হামবুর্গের

প্রেক্ষাগৃহ

নিজের থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন আমার মনে একমাত্র এই প্রশ্নটিই উদিত হল যে, আজকের ঔপন্যাসিকের কলমে তাহলে করবার রইল কি? সেখানে যেখানে একটি শট-এর সাহায্যে কি কাজটাই না করেছে?—রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি বারান্দার ওপর দিয়ে চলে একটি নারীর নগদে এসে পৌঁছেছে। একটিও কথা ব্যবহার না করে সে কত কথাই না বলল!"

সত্যিই চলচ্চিত্র উপন্যাসকারের কাছ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা সৃষ্টির প্রাথমিক কাজটি কেড়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, সে একে উচ্চস্তরের বস্তুতে পরিণত করেছে; দরজার হাতল, সকালের চায়ের টেবিল, ঘরের আসবাবপত্রকে সে সহজ-সহজ কবিতার রূপ দেয়। যে-সব ছোট-ছোট জিনিস দিয়ে আপনার-আমার জগৎ তৈরী, চলচ্চিত্রকার তাকেই ইঙ্গিতময় করে তোলে, কল্পনার রঙীন লোক তৈরী করবার জন্যে।

৩। আমাদের যুগের বহু প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের যোগাযোগ চলচ্চিত্রের আকারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মানুষের মনের ভিতরকার বিরাগ, সন্দেহ বা বিকর্ষণকে নানাভাবে রূপায়িত করে চলচ্চিত্র। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে এমন অনেক জিনিস আছে, যা রঙ্গমঞ্চের চেয়ে চলচ্চিত্রে ঢের সহজে দেখান যায়।

৪। চলচ্চিত্র হচ্ছে একমাত্র শিল্পকলা, যা প্রথমে যেভাবে তৈরী হয়েছে, ঠিক সেই অবস্থাতেই সারা জগতে এক সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কোন একটি বিশেষ ভাষার সংলাপ থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাষায় লিখিত সাব-টাইটেলের সাহায্যে সেই ভাষাভাষী দর্শকরাও ছবিটিকে উপভোগ করতে পারে। ছবিটির পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে তাদের বেশ একটি আবেগময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের এই দেশ-কাল-পাত্রের সীমালঙ্ঘনকারী ব্যাপ্তি আমাদের সকলকে সমভাবে ভাবিত একটি বৃহৎ পরিবারের মানুষে পরিণত করেছে।

৫। ঘটনাচক্রে চলচ্চিত্র সর্বকনিষ্ঠ শিল্প হওয়ায় এর আছে একটি যৌবনের দীপ্তি। এবং বয়স অল্প বলে এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। উপন্যাস এবং কবিতা সজীবতা সত্ত্বেও এদের গড়ে উঠেছে বড় রকম ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য সম্পর্কে সাচেতনভাবেই ওরা ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলেছে। চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্যশিল্প এত পুরাতন যে, যুগে-যুগে এরা নব-নব ধারা প্রবর্তন করতে বাধ্য।

কিন্তু এদের তুলনায় চলচ্চিত্রকে শিশু বললেও চলে; এর জীবন সবে শুরু হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে কতই না অঘটন ঘটে গেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, এডিসনের ক্যামেরার যুগ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে অসংখ্য ওয়েলস-

পীযূষ বসু পরিচালিত জীবন জিজ্ঞাসায় সুপ্রিয়া দেবী

এর 'সিটিজেন কেন' জন্মলাভ করেছে। বিকচক্রবাল এখনও সুদূরপ্রসারী হয় নি। কাজেই আজকের যুগের যারা তরুণ, তারা এর সঙ্গে একাত্মবোধ করে—এর সঙ্গে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে — চলচ্চিত্র তাদেরই সম্পত্তি।

চিত্রসমালোচনা

বাংলাদেশের চলমান মুক্তিসংগ্রামের ছবি

তরুণ অধ্যাপক তাহের-এর বিশ্বাস ছিল, ব্যাপক গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত জাহানারা জানতো পৃথিবীর কোনো দেশেই জঙ্গীশাসক শ্রেণী সহজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজী হয় না।

—বাংলাদেশে তখন ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনার অজুহাতে বাংলাদেশের ওপর হামলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়ার হিংস্র ফৌজ। শুরু হয়ে গেল জঙ্গীশাহী বর্বরতা, যা আজও থামেনি, সমান বেগে চলেছে বাংলাদেশের মানুষগুলোকে পর্যুদস্ত করবার জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষ—প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল দিকে দিকে। বাংলাদেশ জঙ্গীশাহীর বশ্যতা স্বীকার করবে না।

তরুণ অধ্যাপক তাহেরের নির্যাতিতা মা যখন তারই হাতে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, তখন এবং মাত্র তখনই সে তার দেশমাতৃকার সন্তানে পরিণত হতে পারল—সে নিজেকে উৎসর্গ করল মুক্তিযুদ্ধে। উল্কাবেগে জাহানারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে তাহেরের সম্মুখীন হল—দুজনে পরস্পরকে নতুন করে উপলব্ধি করল। কিন্তু যেদিন জাহানারাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তাহের নিহত হল, সেদিন জাহানারার শোক করবার সময় নেই। সে তাহেরের মৃতদেহকে প্রীতির স্পর্শ দিয়ে সযত্নে সরিয়ে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এগিয়ে যায় তার সংকল্প অটুট রেখে।

বেশ কিছুটা সংবাদচিত্রের মিশ্রণ ঘটিয়ে আমার দিকে গ্যাবকোরীর নিবেদন

ধীরেন দাশগুপ্ত প্রযোজিত এবং উমাপ্রসাদ মৈত্র পরিচালিত "জয় বাংলা" ছবিটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী ওপরে লিপিবদ্ধ হল।

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ • ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নতুন নাটক —
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬টায়
রূপায়ণে : অজিত বন্দ্যো., নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো., গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, বাসন্তী চট্টো., দীপিকা দাস, পঞ্চানন ভট্টা., রেনুকা দাস, কুমারী বিন্দু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা।

ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনসাধারণের মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতা, যাথার্থ ও সর্বময়ত্ব ছবিটির অংশে অংশে প্রতিফলিত এবং এদিক দিয়েই ছবিটির সার্থকতা। ছবিটিকে যতদূর সম্ভব উত্তেজক ও বাস্তবধর্মী করবার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও পরিমিত সামর্থ্য এই চেষ্টার পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে পদে পদে। তবু যখন দেখি, কর্মকর্তারা এই ছবিটিতে অবতীর্ণ হবার জন্যে সুচিত্রা মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রভৃতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, তখন তাঁদের একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারি না। বাংলাদেশের তেজস্বিনী তরুণী জাহানারার বেশে মমতা চট্টোপাধ্যায় ভূমিকাটির প্রতি যথাযথ সুবিচার করেছেন। খুশী হতুম, যদি তাহেরের মৃত্যুর পরে জাহানারাকে 'মাইন বুকে বেঁধে ট্যাঙ্ক ধ্বংস' করার সেই ঐতিহাসিক দৃশ্যটিতে আত্মাহুতি দিতে দেখতুম।

সংবাদ-চিত্রেরই মতো ছবির অধিকাংশ ফোটোগ্রাফী। ছবির গানগুলি এবং আবহসঙ্গীত ছবির মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক।

"জয় বাংলা" একটি যথার্থ সমসাময়িক চিত্র এবং এইদিক দিয়ে এর সার্থকতা।

অন্যান্য ভূমিকায় : বঙ্কু ব্যানার্জি, সুনন্দা দাশগুপ্তা, চন্দ্রাবতী, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে, নমিতা বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী, অনুপকুমার, তুষার রায়, অজিত চক্রবর্তী, জনরাজ চক্রবর্তী, রবীন ব্যানার্জি, নীরেন ব্যানার্জি, কালু, [illegible] দত্ত প্রভৃতি।
উত্তরা - পূরবী - উজ্জ্বলা : অন্যান্য চিত্রগৃহে ও শহরতলীতে

ছোটি বহু

মাতৃহৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে নিঃসন্তান রাধা তার ভাসুরের একমাত্র ছেলে গোপীকে আদর্শ শিশু করার সাধনায় মেতে থাকে। স্বামী ডাঃ মধু, তার বড় ভাই শ্রীরাম ও বৌদি সীতা ও গোপীকে নিয়ে গড়ে-ওঠা রাধার সুখের সংসারে ভাঙনের দমকা হাওয়া নিয়ে আসে ননদিনী পারো। নিজের ছেলে নিক্কোকে গোপীর আসনে বসাবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনে পারো। সংসারে আসে ভাঙন। চরম ভাঙনের মুহূর্তে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়, অবসান হয় সব ভুল বোঝাবুঝির। গোপী আবার ফিরে আসে তার মা রাধার বুকে।

শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র সঙ্গে তিলক প্রোডাকসনের 'ছোটি বহু'র কাহিনীগত মিল এইটুকু। এর বাইরে বইটিতে যে নাচ-গান, রঙ্গরসিকতা রয়েছে তাকে হিন্দী বইয়ের প্রায় স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে মেনে নিলে 'ছোটি বহু' সম্পর্কে আর কারুর কোন অভিযোগ থাকবে না।

শুধু পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনই নয়, মূল গল্পটিকে এত দীর্ঘ (১৭ রিল) একটি ছবিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিত্রনাট্যকার বিশ্বামিত্র আদিলকে মূল কাহিনী বহির্ভূত অনেক কিছুরই আশ্রয় নিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বইটিতে কিন্তু 'স্নেহবিহ্বল করুণা-ছলছল' মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্যধারা, মায়ের প্রতি সন্তানের বন্ধনহীন ভালবাসা, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠ ভাইয়ের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার আবেগসিঞ্চনে দর্শকরা ক্ষণে-ক্ষণেই অভিভূত হয়ে পড়বেন। আর এর জন্য পরিচালক ও শিল্পীদের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার শ্রীআদিল নিঃসন্দেহে সকলের প্রশংসা পাবেন।

অতিদীর্ঘ হওয়ার মাঝে-মাঝে যে একঘেয়েমি এসেছে তাকে কাটিয়েও বাঞ্ছিত আবেগকে তুলে ধরতে পারার জন্য পরিচালক কে বি তিলকের মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে হয়।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিল্পীই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর যে অসাধারণ অভিনয় করেন তাতে তাঁর পরিণত শিল্পীমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আদরিণী কন্যা, সোহাগিনী স্ত্রী, স্নেহময়ী মাতা ও অভিমানিনী বধূর বিভিন্ন রূপে শ্রীমতী ঠাকুরের দীপ্ত অভিনয় মনে রাখার মত। রাধার স্বামীর ভূমিকায় রাজেশ খান্নার করার মত কিছু ছিল না। তবে প্রাপ্ত সুযোগগুলিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। নিরূপা রায়ের সীতা বাস্তব ও অভিনয়ের গুণে সকলের ভাল লাগবে, ভাল লাগবে শ্রীরামরূপী তরুণ বসুকেও। পারোর ভূমিকায় শশীকলা অতিরিক্ত মাত্রায় অভিনয় করলেও চরিত্রের কূট দিকটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রেমনাথ

হার মানা হার চলচ্চিত্রে দৃশ্যগ্রহণের মহরতে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তারাশংকর।   ফটো : সুকুমার সেন

চরিত্রে থাই এস জোহরের অভিনয় হাস্য-কৌতুক বাড়াবাড়ি হলেও অনেকেরই ভাল লাগবে। ছবিটির দুই শিশুশিল্পী গোপী-রূপী মাঃ সুরেশ ও নিত্যরূপী জুনিয়র মেহমুদ অপূর্ব অভিনয় করেছে। অন্যান্য ভূমিকার শিল্পীরা পরিচালকের প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

কল্যাণজী আনন্দজী সুরকৃত এই ছবিটিতে গান রয়েছে ৮টি। দুটি বাদে বাকীগুলির কোন প্রয়োজন এছবিতে ছিল বলে মনে হয় না। তবে আলাদাভাবে সুর ও গায়ন পদ্ধতির জন্য প্রতিটি গানই সুখ-শ্রাব্য। রাধা ও মধুর বিবাহ উপলক্ষ্যে মধুমতী ও জয়শ্রীর আদিরসাত্মক নাচগান যে বক্স অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরি-বেশিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্টম্যান কালারে তোলা ছবিটির অন্যান্য বিভাগের কাজের মান উন্নত ও সুন্দর।

এ সপ্তাহে

জীবন জিজ্ঞাসা

আবেগমথিত প্রেম ও ভালবাসার ছবি বি. এম. ডি মণ্ডলের 'জীবন জিজ্ঞাসা' এই সপ্তাহে (১০ই অক্টোবর) উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলা ইত্যাদি চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। উত্তম ও সুপ্রিয়া অভিনীত এই ছবির অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মন্টু বানার্জী, সুনন্দা দাশগুপ্ত, চন্দ্রাবতী, সুলতা চৌধুরী, শামিতা বিশ্বাস, রাজলক্ষ্মী, অসীম চক্রবর্তী, তরুণকুমার, কুলজার চক্রবর্তী, কুমার রায়, কমু, শান্ত দত্ত প্রভৃতি। সুচিত্রা সেন পরিচালক [illegible] শ্যামল মিত্র। 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবিটির পরিবেশক ট্রাইক পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

নিমন্তী মা

হৃদয়রাজ চিত্রমের 'নিমন্তী মা' এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে মুক্তা, রূপম, কালিকা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের, পরিচালনা পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরীর। অনিল বাগচী সঙ্গীত পরিচালিত ছবিটির কণ্ঠ-শিল্পীরা হলেন মান্না, সন্ধ্যা, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র ও অলক বাগচী। এ্যালায়েন্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, মধুমিতা প্রভৃতি।

পরওয়ানা

এন. সি. সিপ্পী নির্বেদিত একটি প্রেমমধুর চিত্র—"পরওয়ানা"— এ সপ্তাহের মুক্তিপ্রাপ্ত একটি নতুন হিন্দি চিত্র। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জ্যোতি স্বরূপ, সঙ্গীত পরিচালনায় মদনমোহন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন নবীন নিশ্চল, যোগীতা বালী, অমিতাভ বচ্চন, হেলেন, লক্ষ্মীছায়া, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। লাইটহাউস, জনতা, কৃষ্ণা, জেম, নবীনা, ছায়া প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে।

স্টুডিও সংবাদ

দ্বন্দ্ব-এর শুভ মহরৎ

গান রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে রূপবাণীর প্রথম নিবেদন দ্বন্দ্ব ছবির শুভ মহরৎ হয় [illegible] ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে গেল রবিবার ১১ সেপ্টেম্বর সকালে। হেমেন্দ্র প্রসাদ পরিচালিত ছবিটিতে সুরযোজনা করবেন নিখিল চট্টোপাধ্যায়।

জীবনটাই নাটক-এর শুভ মহরৎ

২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৌতম চিত্রম-এর প্রথম নিবেদন 'জীবনটাই নাটক' ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হল। ছবির কাহিনী-কার, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, গীতিকার, চিত্রশিল্পী [illegible] ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে [illegible] চক্রবর্তী, অভিযাত্রী, অজিত বাগচী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, বিজয় দে, শান্তি সেনগুপ্ত এবং অজিত দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে সমিত ভঞ্জ, চিন্ময় রায়, আরতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পীকে।

অসমীয়া ছবি "মরীচিকার" সঙ্গীত গ্রহণ : অসম আজকের চলচ্চিত্র জগতের একটি নাম। আগের ঘুমিয়ে থাকা অসম আজ জাগ্রত। তার চলচ্চিত্র শিল্পকাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন নামকরা পরিচালকের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা। তার ভিতরে অন্যতম মামাও একজন। বঙ্গদেশের এই চলচ্চিত্র নির্মাণের দুর্দিনে, যেখানে স্টুডিও, ল্যাবরেটরী সব কাজের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে, সে সময় বেশ কয়েকটি অসমীয়া ছবি বঙ্গদেশের স্টুডিওপাড়াকে কর্মব্যস্ত করে রেখেছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর টেকনি-সিয়ানস স্টুডিওতে জোয়ারপাড়া (আসাম) প্রযোজিত [illegible] চিত্রম প্রযোজিত অন্যতম [illegible] পরিচালিত অসমীয়া ছবি মরীচিকার

চারটি গান রেকর্ড করা হয়। আমাদের সঙ্গীত পরিচালক জুটি হিন্দু-তপনের সুরে আরতী মুখার্জি, বন্দ্রী সেনগুপ্ত ও নির্মলেন্দু চৌধুরীর কণ্ঠে সঙ্গীত গ্রহণ করা হবে। সঙ্গীত গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে প্রমথেশ বড়ুয়ার পত্নী শ্রীমতী যমুনা বড়ুয়া শুভকর্মের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্পাদকের বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত সবাই প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রের উৎসাহজনক কাজের প্রশংসা করেন। ১১ অক্টোবর থেকে এক নাগাড়ে স্যুটিং করে এই বছরের ভিতরে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার উপযোগী করে তুলবেন বলে প্রযোজক সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ছবিটিতে অভিনয় করছেন আমাদের স্বনামধন্য শিল্পীদের ভিতরে উত্তমকুমার, ইউটুপল, নিতাই গোস্বামী, কমল চৌধুরী, পদ্মা দাস, কৃষ্ণা দাস, পুষ্প দেবী ও অনেকে। ছবির কাহিনীকার শ্রীনৃপেন বড়ুয়া, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অমূল্য মাঝা, ক্যামেরা বিকাশ চক্রবর্তী (বম্বে)। সহযোগী পরিচালনায় শ্রীনির্মলবাবু। ছবিটির দৃশ্য সম্পূর্ণ আসামের পটভূমিতে গৃহীত হবে।

মঞ্চাভিনয়

কানাড়ী নাটকের বঙ্গানুবাদের মঞ্চরূপ

গিরীশ রঘুনাথ কার্ণাড একজন আধুনিক নামকরা নাট্যকার। তাঁরই রচিত 'তুঘলক' নাটকটির বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায়েরই পরিচালনায় এটি অভিনীত হয়েছে থিয়েটার ইউনিট দ্বারা রবীন্দ্র সদনে।

মোহাম্মদ বীন তুঘলক সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বাদশা। তাঁর চরিত্র হচ্ছে অদ্ভুত: বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীর যোদ্ধা, স্বৈরাচারী, নিরীশ্বরবাদী। দিল্লীর প্রভাবশালী গোষ্ঠী থেকে দূরে থাকবার জন্যে তিনি তাঁর রাজধানীকে আটশো মাইল দক্ষিণে দৌলতাবাদে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছিলেন দিল্লীর সমস্ত প্রজাকে যেতে হবে দৌলতাবাদে। আর করেছিলেন তাম্র মুদ্রার প্রচলন। কূটবুদ্ধির বলে তাঁর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট ধার্মিক নেতা

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার প্রযোজিত 'যায়াতি'-র নাট্য মুহূর্তে, নিত প্রভাস অপেরা প্রযোজিত মাদুমহর রাশিয়া-র একটি অসাধারণ নাটামুহূর্তে নন্দী ভট্টাচার্য (রাসপুটিন) ও অরুণ গোস্বামী (জারিনা)।

শেখ ইমামুদ্দীনকে তাঁরই বলে শাস্তির দূত হিসেবে পাঠিয়ে তার হত্যার কারণ হয়েছিলেন। কূটবুদ্ধির বলেই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা রেখেছিলেন। রৌপ্য দীনারকে তিনি তাম্র দীনারের তুল্যমূল্য করেছিলেন কিনা, সেকথা ঐতিহাসিকই বলতে পারেন তবে তাঁর সিদ্ধান্তের ফলে নকল তাম্র মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। এমন অরাজকতা দেখা দিয়েছিল যে তুঘলক অসহায় বোধ করেছিলেন।

গিরিশ কার্ণাডের 'তুঘলক' নাটকটির মধ্যে নাকি সমকালীনতা আছে—থিয়েটার ইউনিটের সভাপতি মৃণাল সেন অন্তত সেই কথা বলেছেন। ১৩২৭ সালে রাজ আজ্ঞায় দিল্লীর প্রজাপুঞ্জ দলে দলে আটশো মাইল দক্ষিণে নতুন স্থাপিত রাজধানী দৌলতাবাদে গিয়েছিল অশেষ কষ্ট স্বীকার করে এবং ১৯৪৭-এ ভারত-বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ লোককে চিরকালের জন্যে যে জন্মভূমি ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল, তার চরিত্রগত বা ভাগবত মিল কোথায়? তুঘলকের আমলে প্রজাপুঞ্জের কষ্টের সীমা ছিল না; হাল আমলেও তাই।—এই কি 'তুঘলক' নাটকের সমকালীনতার পরিচয়?

কোন বিশেষ গুণে গিরিশ কার্ণাডের রচনাটিকে বাংলায় পরিবর্তিত করে (আশা করব, মূল কানাড়ি ভাষায় অনুবাদকারকের প্রচুর দখল আছে) মঞ্চস্থ করা হল, তা অনুধাবন করতে পারলুম না। ভদ্রলোক কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন মাত্র—এর বেশী কিছু নয়। বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে গ্রীক, আমেরিকান এবং ইয়োরোপীয় নাটককে অনুবাদ করবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাই আরও বিস্তৃত হয়ে ভারতের অন্য ভাষায় রচিত নাটক পর্যন্ত এগিয়েছে, দেখা যাচ্ছে। নিজেদের প্রতি হীনমন্যতার পরিচয় ছাড়া একে কি বলব? আমাদের এমনই অবস্থা যে, আমরা ভিন্ন রাজ্যবাসীকে আয়ার সাহেব, কার্ণাড সাহেব, যোশী সাহেব, মেহতা সাহেব বলে সম্বোধন করে ধন্য হই। কাজেই বাংলার বাইরে যা কিছু লেখা হচ্ছে, সবই মহৎ সবই উপাদেয়, এই চিন্তাও আমাদের পেয়ে বসেছে। শ্রীকার্ণাড বলেছেন: ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে বটে, কিন্তু শাশ্বত মূল্য-সম্পন্ন কোনো জিনিসই এ থেকে জন্মায়নি। ভদ্রলোক বাংলা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কতটুকু জানেন, তা জানতে ইচ্ছে করছে এবং জিজ্ঞেস করব, কখানা বাংলা নাটক তিনি পড়েছেন বা দেখেছেন। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কথা কইতে গেলে এগুলো জানা দরকার। —অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ও শক্তিমান অভিনেতা সহসা গিরিশ কার্ণাড সম্বন্ধে এতখানি 'গদ-গদ' হয়ে উঠেছেন।

স্বীকার করি, তুঘলক চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রচুর নাটকীয় উপাদান রয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে তার সমসাময়িক ঘটনাবলীকে চতুরের সঙ্গে সাজাতে পারলে একটি সুন্দর বসবৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক রচিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাংলা 'তুঘলক' যদি গিরিশ কার্ণাডের রচনাকে হুবহু প্রতিফলিত করে থাকে তাহলে দুঃখের সঙ্গেই বলব, গিরিশ কার্ণাড তা পারেননি। তুঘলকের খাম-খেয়ালীপনা প্রজাপুঞ্জের দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তুঘলককে রক্ত-মাংসের শরীর বিশিষ্ট মানুষ করে তুলতে পারেনি।

এবং সেই কারণেই 'তুঘলক'-এর অভিনয় নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়েছে। এ যেন অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখলুম—চিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়নি। কোথায় সেই চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্ত কিংবা কোথায় সেই বাহ্য পরিস্থিতির সঙ্গে বুদ্ধি ও শক্তির সংঘর্ষ, যা দেখে মন বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে?

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নাট-নৈপুণ্যের কথা আমাদের অজানা নয়। এই সেদিন তিনি 'বেগম মেরী বিশ্বাস' নাটকে ক্লাইভের ভূমিকায় তার একটি স্মরণীয় পরিচয় দিয়েছেন। 'তুঘলক'-এর চরিত্রে তিনি মোটামুটি সু-অভিনয় করেছেন; কিন্তু কোনো একটি স্মরণীয় মুহূর্তের স্তরে তা উঠতে পেরেছে কি? সে সুযোগ তাঁকে নাট্যকার দেননি। বরং বলব, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগেশ ভাঁড়ের চরিত্রটি, যাতে ছিল

রঙ্গনায় 'শতাব্দী'
শনি ১৭ই অক্টোঃ
সকাল ১০টা
দলে টিকিট ৪টা—৫টা
সাগিনা মাহাতো
গল্প : গৌরকিশোর ঘোষ
নাটক ও নির্দেশনা : বাদল সরকার

মুসলমান ধোবা: পরে হল হিন্দু ব্রাহ্মণ, তারও পরে পেল রাজকর্মচারীর পদ; পকেটমার বন্ধুর সংগে যখন জাল তাম্রমুদ্রা তৈরী করতে ব্যস্ত, সামনে পেল খলিফ ঘিয়াসুদ্দীন আবাসীদকে। তাকে হত্যা করে নিজে খলিফ ঘিয়াসুদ্দীন সেজে বসে সুলতানকে নাকাল করে দিল। একে বলি নাটকীয় চরিত্র। অভিনয়ও করেছেন উত্তীয় দেব সাধ্যের অতিরিক্ত ভালো। পকেটমার আকরম-এর চরিত্রটিতে অলোক রায়চৌধুরীর অভিনয় হয়েছে জীবন্ত। ঘিয়াসুদ্দীন আবাসীদ-এর চরিত্রটিকে লঘু-ভাবে চিত্রিত করেছেন শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। জানি না, চরিত্রটিকে অতখানি লঘু করা উচিত হয়েছে কিনা। অপরাপর ভূমিকায় ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রতন সিং), নরেন্দু গুপ্ত (নাজির), সুজিত সরকার (বারাণসী), অরুণ ঘোষ (ইমানুদ্দীন), সাধনা রায়-চৌধুরী (বিমাতা) প্রভৃতি সুযোগমত সু-অভিনয় করেছেন।

দৃশ্যসজ্জা প্রতীকধর্মী। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে যাবার দৃশ্যটি স্মরণীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলো, শব্দ ও সঙ্গীতযোজনা নাটকটিকে অতিরিক্ত গতি দিয়েছে।

অঙ্গারের বিজয়া—পূর্ব রেলওয়ে কর্মীদের শিল্প সংস্থা অঙ্গার কৃষ্টি সংসদের সভ্যরা স্টার মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' মঞ্চস্থ করেন। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উক্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি ওয়ারিয়র, পৌরোহিত্য করেন এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (এম টি পি), শ্রী জে এন রায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। সম্পাদক শ্রীঅজয় চৌধুরী সমাগত সকলকে স্বাগত জানান।

পরিচালক বিনয় লাহিড়ী নাটকটি সুন্দরভাবে সম্পাদনা ও 'দত্তা' উপন্যাস অবলম্বনে দু' একটি চরিত্র ও দৃশ্য সংযোজনা করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সামগ্রিক অভিনয় বিগত দিনে পেশাদার মঞ্চে অভিনীত এই নাটকের অভিনয়ের কথা তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। রাস-বিহারীর দুরূহ চরিত্রে শ্রীলাহিড়ীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। বিজয়া চরিত্রে সঙ্গীতা করের অভিনয়ও প্রাণবন্ত। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় মানিক সরকার (বিলাস), সলিল ঘোষ (নরেন), প্রাণনাথ সরকার (পূর্ণ), ফকিরদাস কুমার (নীল-মাধব), চিরঞ্জীব মুখার্জি (দয়াল) ও মন্দিরা রায়ের (নলিনী) নাম। সুশীল দাশের আলোকসম্পাত ও মুরারি ভড় সম্প্রদায়ের আবহসঙ্গীত প্রশংসনীয়।

শতাব্দীর 'সাগিনা মাহাতো': চলচ্চিত্রে সফল একটি গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করার ব্যাপারে একটা ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে। যদি ভালো না হয়, ছবি দেখে লোকের মনে যে ইমপ্রেশন জন্মেছে, নাটক দেখে সেই ইমপ্রেশন যদি না সৃষ্টি হয়—এই [illegible] চিন্তা [illegible] প্রযোজনার প্রস্তুতিপর্বে মনে ভীড় করে আসে। কিন্তু নাট্যপ্রযোজনায় হয়তো দেখা যায় চলচ্চিত্রের দেখা একই দর্শক নাটক দেখেও বেশ পরিতৃপ্ত মন নিয়েই চলে যায়। হয়তো ঠিক এই ধরনের ব্যাপারই ঘটেছে 'শতাব্দী' প্রযোজিত 'সাগিনা মাহাতো' নাটকের প্রযোজনায়। গৌরকিশোর ঘোষের এই গল্পটি সিনেমায় নানা কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আর এই জনপ্রিয় গল্পটিকেই 'শতাব্দীর' শিল্পীরা সীমাহীন নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চের আলোয় পরিবেশন করে প্রমাণ করেছেন সিনেমায় পরিবেশিত একটি গল্পকেও আরো বিশুদ্ধ শৈল্পিক উপায়ে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নতুন আলোয় মূর্ত করে তোলা যায়। একটা কথা খুব সত্যি যে 'শতাব্দী' প্রযোজিত 'সাগিনা মাহাতো'র দর্শক গল্পের প্রাণবিন্দুতে গল্পকারের সঙ্গে [illegible] এগিয়ে দিয়েছেন।

এন, সি, সিপ্পির প্রযোজনা চিত্রে যোগীতাবলী

শ্রীবাদল সরকার গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন, তাঁর নাট্যরূপও হয়েছে চমৎকার। নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর; মঞ্চ পরিকল্পনায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। কয়েকটি কালো রঙ করা বাক্স ব্যবহার করে কোম্পানীর অফিস, পার্টি অফিস, মজদুর ইউনিয়ন, সাগিনার ঘর সব বোঝানো হয়েছে। মঞ্চসজ্জায় এতটুকু বাহুল্য কোথাও নেই।

সম্মবন্ধ অভিনয়ে শতাব্দীর শিল্পীরা এবারেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। প্রায় প্রতিটি চরিত্রের শিল্পীই সরস অভিনয় করতে পেরেছেন। সাগিনার ভূমিকায় রজতকুমার নিজেকে বেশ দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁকে মানিয়েও ছিল সুন্দর। গোরাবেশী পঙ্কজ মুন্সীর স্পষ্ট সংলাপ উচ্চারণ সামগ্রিক প্রযোজনায় একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করে।

ভারতী সরকারের 'শান্তা' হয়ত আরও একটু প্রাণচঞ্চল হতে পারত।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বাদল সরকার, মুরারী চক্রবর্তী, মেঘনাদ দে, দেবেন গাঙ্গুলী, রেবা রবসন, রঞ্জিত কর্মকার, সুবোধ দাশ, দিলীপ দত্ত, অদিতা মিত্র, দিলীপ ভট্টাচার্য, সমর ভৌমিক, অপূর্ব বসু, রঞ্জিত সরকার, কালীপদ মুখার্জি, তপন চ্যাটার্জি, কালীপদ চ্যাটার্জি, অভিজিৎ সরকার, চন্ডী ব্যানার্জি। আলোকসম্পাতে ছিলেন তপন দাস।

উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় নাটক 'উল্কা' আবার কয়েক দিন আগে 'রঙ্গনায়' পরিবেশিত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের শিল্পীরা। প্রথমেই বলি, সামগ্রিক অভিনয় বোধ হয় সব সময়ে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। এর জন্য কয়েকজন শিল্পীর শিথিল চরিত্রাভিনয়ই দায়ী। সুফল পালের 'রাজীব ঘোষ' আমাদের প্রত্যাশা মেটায় নি, ডাঃ চিত্ত রায় 'সুহৃৎ সরকার' চরিত্রের ব্যক্তিত্ব মোটেই পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন নি। রবি চৌধুরীকে 'সুধীর' হিসেবে ভেবে নিতে মনে দারুণ হোঁচট লাগছিল। একমাত্র 'অমৃতাংশু' চরিত্রের রূপকার উনিশের বিশ্বাস মোটামুটি নৈপুণ্যের সঙ্গে চরিত্রটির যন্ত্রণা আমাদের উপলব্ধির প্রহরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। শঙ্কর দাশগুপ্তের 'শানু'ও একটি প্রাণোচ্ছল চরিত্রচিত্রণে হোতে পেরেছে। গায়ত্রী দেবীর করুণাও মোটামুটি সার্থক একটি সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

অন্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন মহুয়া বোস, মিস পাপন, দেবেন্দ্রবিজয় ঘটক, অজয় গাঙ্গুলী, শিশির বিশ্বাস, মেজো রায়, জগন্নাথ চ্যাটার্জি, মুরারী জানা, অজিত চ্যাটার্জি, নীলিমা বোস, তাপস সেনগুপ্ত। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদীনেন রায়।

আর্ট থিয়েটার কাঁকরাপাড়া : গত ৩রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার আর্ট থিয়েটারের বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্য পরিচালক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। এই জন্য আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা ক্লাব প্রাঙ্গণে গত ৫ই সেপ্টেম্বর এক শোকসভা করেন। শিল্পীর শিল্পসাধনা এবং কর্মপ্রেরণা জনমানসে যে প্রতিফলন ছিল তাকে বিবেচনা করেই আর্ট থিয়েটার এবং অতিথাত্রী সম্প্রদায় গত ২০ সেপ্টেম্বর স্থানীয় কর্ণিরাম বসু মঞ্চে যৌথভাবে এক শোকসভা এবং নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ এই সভায় উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় পৌরপিতা শ্রীঅমূল্য উকিল এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ৫০১ টাকা সম্বর্ধনা হিসেবে মৃতু পত্নীর হাতে অর্পণ করা হয়। শিল্পী সুনীল মুখোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই নাটকের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে জীবনরঙ্গ নাটকে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। শিল্পী হিসেবে তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আশীর্বাদধন্য ছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পী হিসেবে তিনি বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পরিচালিত নাটকের তালিকায় আছে তুলসী লাহিড়ীর লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার, দুখীর ইমান, ঝড়ের মিলন ও ছেঁড়া তার। ঋত্বিক ঘটকের দলিল এবং বীরু মুখোপাধ্যায়ের রাহুমুক্ত। সুনীল বাবুরই উদ্যমে ছেঁড়া তার নাটককে যাত্রায় রূপান্তরিত করে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাত্রা উৎসবে অভিনয় করা হয়। চলচ্চিত্রেও তাঁকে দেখা গেছে, সাঁঝের প্রদীপ নামক ছবিতে। মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে মফঃস্বল নাট্যমঞ্চের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

শ্রীরামপুর প্রিমরোজ থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন : সমিতির ৭৭ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ৯ দিনব্যাপী বিরাট নাট্যোৎসব শ্রীরামপুর রবীন্দ্র ভবনে গত ৪ সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর '৭১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৮ দিনব্যাপী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা এবং নবম দিনে গত বৎসরের বিজয়ীগণকে পুরস্কৃত করা হয় ও সমিতির সভ্যগণ কর্তৃক 'মাটির কেল্লা' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। নবম দিন অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর '৭১ তারিখের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী এন কে চক্রবর্তী (মহকুমা শাসক) এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী নন্দিতা চক্রবর্তী। বর্তমান বৎসরের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকা :—১ম — লেকরঙ্গ : মহাকাব্য, ২য়—ইষ্টার্ন থিয়েটার ক্লাব : ইতিহাস কাঁদে, ৩য়—অনির্বাণ : তালাচাবির দ্বন্দ্ব, ৪র্থ—পুনশ্চ সাহিত্য পরিষদ : ঘরে ফেরার ডাক এবং ইউথ থিয়েটার : পুরাতন কাহিনী, ৫ম—রুদ্রচড়া : কবর থেকে বলছি, এবং ৬ষ্ঠ—মহুয়া সাহিত্য পরিষদ : সভ্যতা ভয় পেও না।

রক্তকরবী অভিনয় : গত ২২শে সেপ্টেম্বর কুচবিহারের সরকারী জেনকিনস স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রের 'রক্তকরবী' স্থানীয় রাষ্ট্রীয় পরিবহন মঞ্চে। নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে কিন্তু আলোকসম্পাত ও ধ্বনি প্রক্ষেপণের কাজ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। নাটকের আবহসঙ্গীত সুপ্রযুক্ত হলেও কণ্ঠসঙ্গীতে আরও যত্নের অবকাশ ছিল। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় 'গোসাঁই' চরিত্রাভিনেতা প্রশান্ত গোস্বামীর। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এই চরিত্রটি। শ্রীগোস্বামী তাঁর পরিণত শিল্পবোধ নিয়ে যে অপরূপ অভিনয় করেন এই ছোট্ট চরিত্রটিতে তা সত্যই ভোলা যায় না। তার পরেই নাম করতে হয় 'চন্দ্রা'বেশী শ্রীমতী গোপন দাসের। তাঁর অভিনয়ও দর্শকমনে দোলা দেয়। মঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত রাজার ভূমিকায় বিনয় সেনের অভিনয় সুন্দর। কিন্তু নন্দিনীবেশী শ্রীমতী ডলি ঘোষ দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারেন নি। অধ্যাপক ও সর্দারের চরিত্রে যথাক্রমে শঙ্করদেব চক্রবর্তী ও দিলীপ দত্তের অভিনয় যথাযথ। অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, খগেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা, রামপ্রসাদ নায়েক ও নীরেন হোড়।

বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজের পরবর্তী নাটক : বেহালার বনমালী নস্কর রোডের এই সংস্থার সত্তেরো বাৎসরিক 'শারদ অনুষ্ঠান' উপলক্ষ্যে সুপ্রকাশ ব্যানার্জির পরিচালনায় 'সংক্রান্তি' ও 'কর্দমাক্ত' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন স্থানীয় ইন্সটিটিউট-ভবন প্রাঙ্গণে। সভাপতিরূপে শ্রীকৌস্তভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং দুই দিনে প্রধান অতিথি থাকবেন দুইজন প্রবীণ চলচ্চিত্র শিল্পী। সংস্থার ৮৮তম ও ৮৯তম নাট্যরজনী দুটিতে অংশ নেবেন প্রকাশ চ্যাটার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ পাল, অতুল চক্রবর্তী, মানিক গাঙ্গুলী, প্রবোধ ব্যানার্জি, সুধীর দাস, অরবিন্দ ব্যানার্জি, প্রভাত ব্যানার্জি প্রমুখ।

লোকতীর্থের 'পঞ্চমিত্র' : দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় নাট্যগোষ্ঠী 'লোকতীর্থ'র শিল্পীরা কয়েকদিন আগে অফুরন্ত হাসির উচ্ছলতায় ভরা নাটক, 'পঞ্চমিত্র' আর একবার পরিবেশন করলেন 'থিয়েটার সেন্টারে'। সংসারে অভাব অনটন ও বেকারত্ব বাধাকে ধীরে ধীরে পাঁচজন ভিন্ন প্রতিভাসম্পন্ন [illegible] করলো, তাই বিষণ্ণতায় [illegible] এই নাটকের দর্শকের মনকে [illegible]

অপূর্ব টিমওয়ার্ক, সুষ্ঠু পরিচা[illegible] এবং প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত নিখুঁত চরিত্রানুযায়ী অভিনয় প্রযোজনাটিকে সফল করে তুলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যথাক্রমে মনি ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু রায়, প্রযোজনাটিকে সফল করে তুলেছে। বিভিন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্ত, স্বপ্না মিত্র প্রভৃতি। নাট্য পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন বিমল [illegible] ও প্রকাশ-

রঙ্গনা
বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড় (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
১৬ই অক্টোবর শনিবার ৬টায়
১৮ই অক্টোবর সোমবার ২॥টেয়
হে সময় উত্তাল সময়
১৭ই অক্টোবর রবিবার ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৬টায়
যখন একা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার সাড়ে ৬-টায়
আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে
শের আফগান
॥ অগ্রিম টিকিট ১টা—৭টা ॥

ভূষণ। কণ্ঠসঙ্গীতেও প্রভাতকুমার যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

বন্ধু মহলের সোনার সিঁড়ি

কিছুদিন আগে বন্ধু মহলের শিল্পীরা গীতা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপকৃত সোনার সিঁড়ি নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন বিশ্বরূপায়।

অভিনয়ের ব্যাপারে নীলমণি চরিত্রাভিনেতা অজিত মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এরপরেই কল্পনা মুখোপাধ্যায়ের প্রীতি ও অরুণ সেনের নাট্যকার চরিত্র দুটি খুব প্রাণবন্ত হয়। অন্যান্য চরিত্রে মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, প্রকাশ বসু, কালীশ লক্ষণ প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণ সেন।

উজ্জ্বল সংঘের মুক্তিমুখ : বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম আত্মত্যাগ ও জঙ্গী পাকিস্থানি সেনাদের বর্বর অমানুষিক নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা একটি জ্বলন্ত বাস্তব নাটক কিছুদিন আগে পরিবেশিত হোল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। নাটকটি প্রযোজনা করলেন হালদারবাগান উজ্জ্বল সংঘের শিল্পীরা। সজল ভট্টাচার্য রচিত এই নাটকটির পরিবেশনা মোটামুটিভাবে সুন্দরই হয়েছে বলতে হবে। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন অজয় পোদ্দার, মনোজেন্দ্র চক্রবর্তী, শংকর মুখার্জি, সজল ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু ও গোরাচাঁদ মুখার্জি নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনায় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন।

থিয়েটার কমপ্লেক্সের দুটি নাটক : থিয়েটার কমপ্লেক্সের শিল্পীরা সম্প্রতি রঙ্গনায় দুটি নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করেন। নাটক দুটি হোল বসন্ত ভট্টাচার্যের 'সারি সারি পাঁচিল' ও কিরণ মৈত্রের 'অন্য ছায়া'।

প্রথম নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অভিনয়ে কিছুটা শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে এর প্রযোজনাটি [illegible] সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। নাটকের শেষ বিশেষ [illegible] আবদুলের চরিত্রাভিনেতা শ্যামল (বিক্র [illegible]) দর্শকদের চিত্ত জয় করতে সরকার [illegible]ছেন। এই নাটকের অন্যান্য মাধব [illegible] ছিলেন অনিল দাশ (শংকর), আশীষ ভট্টাচার্য (নির্মল), সমর চক্রবর্তী (নকুল), অসিতবরণ দাশ (সনৎ) ও শশাঙ্কশেখর হাজরা (ইন্সপেক্টর)। নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অনিল দাশ।

পরবর্তী নাটক 'অন্যছায়া'র পরিবেশনা অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর জন্য প্রথমেই প্রশংসার দাবী রাখেন পরিচালক শ্যামল রায়চৌধুরী। তাঁর শিল্প-

নায়িকার ভূমিকায় অপর্ণা সেন। পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত।

বোধের স্বচ্ছতা কয়েকটি মুহূর্তে সুন্দর ধরা পড়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে বর্তমান যুব সমাজ কিভাবে বিপথে চালিত হয়ে অজানা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই নাটকের বিষয়বস্তু রচিত।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হোলেন শ্যামল রায়চৌধুরী (নিমে), দিলীপকুমার (মন্টু), মান্টার মিঠু (পল্টু)। এঁরা তিনজনই যেন নিজেদের চরিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে পেরেছিলেন।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমর চক্রবর্তী (পন্টু), হরদেব সাধুখাঁ (মেজনবাবু), অজিতকৃষ্ণ দে (রামচরণ), অসিতবরণ দাশ (হরি), শ্যামল রক্ষিত (ভবনাথ), অনিল দাশ (গুপী), সুমন দীক্ষিত (সুরেশ্বর)। আবহসঙ্গীত মোটামুটিভাবে নাটকটির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে।

চোর : শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' নাটকটি কিছুদিন আগে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল 'কলামন্দিরে'। অভিনয়ের আয়োজন করেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (পার্কসার্কাস শাখা) কর্মচারী সমিতির শিল্পীরা। নাটকটির প্রযোজনায় যেমন শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয় বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি স্পষ্ট হয়েছে পরিচালক শ্রীকুসুম নাগের আন্তরিক নিষ্ঠা আর মৌলিক চিন্তা।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত হয়েছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজলাল', রমেশ ভট্টাচার্যের 'ধর্মদাস', সুকুমার দাসের 'ডাঃ মুখার্জি' ও পুতুল চক্রবর্তীর 'কাজল'

সত্যি কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। অনান্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন প্রশান্ত গুহ, বিজন ভট্টাচার্য, রাধাশ্যাম বন্দোপাধ্যায়, বরুণ চক্রবর্তী, বিমল ভৌমিক, ভরত ধর, রথীন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্কিম মাইতি, নলিনী বেরা, লিলি গাঙ্গুলী, সংগীতা কর, মৃণাল ঘোষ দস্তিদার।

সপ্তার গোষ্ঠীর 'বাকী ইতিহাস' : সপ্তার গোষ্ঠীর শিল্পীরা করেছিলেন আগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটকটি পরিবেশন করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন মাধব চট্টোপাধ্যায় (শরদিন্দু), দুলাল রায়, তৃপ্তি দাস (সীতানাথের স্ত্রী), বাদল রায় (সীতানাথ), নবগোপাল চক্রবর্তী (বিজয়), বিশ্বনাথ মুখার্জি (বাসুদেব), প্রফুল্ল রায় (নিখিল), রথীন বসু (বিধুবাবু), শিবানী ভট্টাচার্য (বাসন্তী)।

ত্রিতীর্থের ছুটির খেলা : বালুরঘাটের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী ত্রিতীর্থের শিল্পীরা সম্প্রতি অনিতা রায়ের মিষ্টিমধুর নাটক ছুটির খেলা মঞ্চস্থ করে নাট্যরসিকদের প্রচুর স্বীকৃতি পেয়েছেন। এটি রুমানিয়ান নাট্যকার মিখাইল সেবেস্তিয়ানের নাটক অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নাটকটির মুখ্য দুটি চরিত্রে পুলক সেনগুপ্ত (রঞ্জন), করবী রায় (করুণা) অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন পল্টু সাহা, ধীরেন ঘোষ, কানাই দত্ত, যতীন ভৌমিক, রতন ঘোষ, অর্ধেন্দু সরকার, প্রভাস সমাজদার। মঞ্চপরিকল্পনা ও নির্দেশনায় মাধব মুখার্জি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখেন।

বিবিধ সংবাদ

টি-ভি-তে শিশুনাটিকা : রাজধানী দিল্লী তথা সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের শিল্পসংস্কৃতির আসরে আর একটি প্রোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হোল। এই প্রথম ভারতীয় টেলিভিশনে একটি শিশুনাটিকার প্রাণোচ্ছল পরিবেশন সংস্কৃতানুরাগীদের সত্য করলো আপ্লুত। এর পরিবেশনের দায়িত্ব নেন দিল্লীর করোলবাগের শিশুদের একটি প্রখ্যাত সংস্থা 'দেবকলামন্দির'। নাটিকাটির নাম হোল 'গগনে উদিল রবি'। ছোট ছোট কয়েকটি সবুজ মনের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা সে নাট্যানুষ্ঠানটির মধ্যে শুধু উজ্জ্বলতা ছিল না, ছিল পরিণত শৈল্পিক মনের স্বাক্ষর।

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে এই নাটিকাটি লিখেছেন স্বপন-বুড়ো। সুষ্ঠু পরিবেশনের জন্য যেমন নাট্যনির্দেশক অমর দাস সবার অভিনন্দন লাভ করবেন, তেমনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পাবেন সঙ্গীতনির্দেশক ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবকলামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। তাঁর মর্মস্পর্শী সুরসংযোজনা অনুষ্ঠানটিকে প্রাণময় করে তোলে। নাটিকাটির বিষয়বস্তু প্রথমে হিন্দীতে ব্যাখ্যা করা হয়, যাতে অবাঙালী শ্রোতারা এর মধ্যে আন্তরিকতার জোয়ারে ডুব দিতে পারে। জাপানের শিশুনাট্য ও চলচ্চিত্র উৎসবে এ নাটকটি প্রদর্শিত হবে বলে জানা গেছে।

সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা : গুসকরা (বর্ধমান) 'সম্প্রদায়' সংস্থা আহুত ৬ষ্ঠ বর্ষ স্বরূপ স্মৃতি সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছেন। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 'সম্প্রদায়'-এর সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাছে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে সম্প্রতি কুমরাতিলাইয়ার (বিহার) স্থানীয় বৃন্দাবন প্রেক্ষাগৃহে দুদিনব্যাপী এক মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জনপ্রিয় শিল্পী কার্তিক-বসন্ত, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত। নৃত্যে মাধুরী, জয়শ্রী, সীমা দে, দীপা ও রত্না। অর্কেস্ট্রায় ছিলেন মথুরা দাস ও সম্প্রদায়। তবলা সঙ্গতে অরূপ, বুলন ও মন্টু। অনুষ্ঠানের শেষার্ধে মূকাভিনয়ে অংশ নেন কলকাতার প্রতিভাবান তরুণ মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ। শ্রীঘোষের 'জয় বাংলা' ফিচারটি এখানেও অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এ-ভি-এম-এর নতুন দান :

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে মাদ্রাজের এ-ভি-এম বহু নতুনত্বের সূচনা করেছে। ১৯৭১-এর ৯ আগস্ট এ-ভি-এম স্টুডিও তার পঁচিশ বছরের জীবন পূর্ণ করেছে। এবং এই দিনই এ-ভি মায়াপ্পান-এর পঁচাত্তরতম জন্মদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমায়াপ্পান আনন্দ উৎসবের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর কর্মীদের জীবনে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করবার জন্যে তাদের প্রত্যেকের জীবনবীমার সুযোগ দেবেন। প্রায় ৮৫০ জন কর্মীর জন্যে ২০ লক্ষ টাকার জীবনবীমা করা হয় এবং এর জন্যে প্রতি বছর ১,২৫,০০০ টাকা বাৎসরিক কিস্তি হিসেবে দেওয়া হবে। কর্মীরা যতদিন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, ততদিন শ্রীমায়াপ্পান তাদের জীবনবীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম দিতে স্বীকৃত হন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ এম, করুণানিধির উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীএন, ভি, নটরাজন কর্মীদের মধ্যে বীমাপত্রগুলি বিতরণ করেন।

পুনর্মিলন উৎসব

সম্প্রতি ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে 'ভবানীপুর সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলন উৎসব এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিপুল সার্থকতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল বহু বিশিষ্ট শিল্পী এবং বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি শ্রীসাতাইলাল, কে শা উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্তা বাংলা ছায়াচিত্রের নায়িকা শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানান। সভাশেষে মিঃ গিমি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও দর্শকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা শেষে সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা ও তরুণকুমার এবং আবৃত্তিতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষে উত্তমকুমার মাধবী চক্রবর্তী অভিনীত 'ধন্যি মেয়ে থেকে আসছি' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শকগণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

রক্তকরবী সবপেয়েছির আসর

সুকুমার রায়ের বিখ্যাত ছড়ার বই 'আবোল তাবোল'কে মঞ্চে বাস্তবায়িত করা এক দুরূহ প্রয়াস। কিন্তু সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে রক্তকরবী সবপেয়েছির আসরের ভাইবোনেরা রসোত্তীর্ণ মঞ্চাভিনয় করে সেই দুরূহ প্রয়াসকে সফল ও সার্থক করে তুলেছে। 'আবোল তাবোলে'র মঞ্চাভিনয় সম্ভবত এই প্রথম। ছড়াগুলির কাহিনী ও কৌতুকরসকে যথোপযুক্ত সুরে-তালে-লয়ে নৃত্য-গীত ও মূকাভিনয়ের মাধ্যমে অপূর্বভাবে মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হয়। সংস্থার শিশু ও কিশোর শিল্পীদের একক ও দলগত অভিনয় বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই প্রয়াসকে সার্থক করেছে শ্রীপ্রণব চৌধুরীর সুরারোপ ও সঙ্গীত-পরিচালনা, শ্রীমতী ঝর্ণা দত্তের নৃত্য-পরিচালনা এবং পরিমিত আবহসঙ্গীতের নেপথ্যভূমিকা। কিন্তু আলোক-সম্পাতের ত্রুটি ঈপ্সিত পরিবেশকে বিঘ্নিত করেছে বহুবার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বপনবুড়ো এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়।

বার্ষিক উৎসব

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের ৩১তম বার্ষিক উৎসব বিপুল সমারোহে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কদিন আগে উত্তরা সিনেমা মঞ্চে। পৌরোহিত্য করেন ডিভিসনের সভাপতি শ্রীসুধীরকুমার বোস এবং প্রধান অতিথি হয়েছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত। রোগ প্রতিকার ও নিরাময় ও নানা সেবাকাজের মধ্যে দিয়ে ডিভিসন যেভাবে আর্ত মানবের সেবা করে আসছেন সুদীর্ঘকাল ধরে উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদত্ত তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতি শ্রীবোস ডিভিসনের সেবাকাজের বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং সহায়তা-সহযোগিতার জন্যে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে 'জতুগৃহ' ছায়াচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের ১৯৭১-৭২ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল করে তার জায়গায় বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর মঞ্জুর করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হওয়ার কারণ খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের বহুনিন্দিত বর্ণ বৈষম্য নীতি। অস্ট্রেলিয়ার জনমত এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের রায় মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্ব ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্যোক্তারা ৬টি দেশের মোট ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেট দল তৈরী করেছেন—ভারতবর্ষের ৩ জন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩ জন, পাকিস্তানের ৩ জন, দক্ষিণ আফ্রিকার ৪ জন, ইংল্যাণ্ডের ২ জন এবং নিউজিল্যাণ্ডের ১ জন খেলোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার ৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পোলক ভ্রাতৃদ্বয় ডিসেম্বর মাসে সফরের খেলায় যোগদান করবেন। বিশ্ব ক্রিকেট দলের সফর শুরু হবে ৫ই নভেম্বর এবং

...গারফিল্ড সোবার্স

তারা শেষ খেলায় নামবে ২৮শে জানুয়ারী। অস্ট্রেলিয়া সফরের তালিকায় আছে মোট ১৬টি খেলা—৫ দিন ব্যাপী খেলা ৫টি, ৪ দিনব্যাপী খেলা ৫টি, ৩ দিনব্যাপী খেলা ৩টি, ২ দিনব্যাপী খেলা ১টি এবং

মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড : পশ্চিম জার্মানীর হিলডে ফেলক, রুস্টা মেটেন, সিলভিয়া শেক এবং এলেন টিটেল ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড (৩ : ১৩·৮ মিনিট) করার পর হাসিমুখে পোজ দেন।

একদিনের খেলা ২টি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচদিনব্যাপী যে পাঁচটি খেলা হবে তার নাম টেস্ট খেলা দেওয়া হয়নি, অন্য কিছু একটা নাম দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। যে নামই দেওয়া হোক না কেন এই খেলাগুলি টেস্ট খেলার পদমর্যাদা লাভ করবে।

ভারতবর্ষ থেকে এই বিশ্ব ক্রিকেট দলে স্থান পেয়েছেন এই তিনজন খেলোয়াড়—ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বিষেণসিং বেদী এবং সুনীল গাভাস্কার।

বিশ্ব দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : গারফিল্ড সোবার্স (অধিনায়ক), ক্লাইভ লয়েড এবং রোহন কানহাই

ভারতবর্ষ : ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, বিষেণ সিং বেদী এবং সুনীল গাভাস্কার

পাকিস্তান : ইন্তিখাব আলম (সহ-অধিনায়ক), আসিফ মাসুদ এবং জাহির আব্বাস

ইংল্যাণ্ড : রিচার্ড হাটন এবং নরম্যান গিফোর্ড

দঃ আফ্রিকা : গ্রেমী পোলক, পিটার পোলক, হিলটন অ্যাকারম্যান এবং টনি গ্রেগ

নিউজিল্যাণ্ড : বব কুনিস

পাঁচদিনব্যাপী খেলার তালিকা

ব্রিসবেন : নভেম্বর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ এবং ডিসেম্বর ১।
পার্থ : ডিসেম্বর ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫
মেলবোর্ন : জানুয়ারী ১, ২, ৩, ৫ ও ৬
সিডনি : জানুয়ারী ৮, ৯, ১০, ১২ ও ১৩
এডিলেড : জানুয়ারী ২৮, ২৯, ৩১ এবং ফেব্রুয়ারী ১ ও ২

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ

জয়পুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে ছাত্র-বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল ছাত্র-বিভাগে উপর্যুপরি ১১ বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হল। এবার ছাত্র-বিভাগের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র সঞ্জীব সাহা।

চূড়ান্ত ফলাফল

ছাত্র বিভাগ

দলগত : ১ম কলকাতা (৬৬ পয়েন্ট), ২য় বোম্বাই (১৪ পয়েন্ট), এবং ৩য় কেরালা (১১ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত : ১ম সঞ্জীব সাহা (কলকাতা) ১৭ পয়েন্ট, ২য় রাজীব সাহা, হৃদেন্দুনারায়ণ দাস (কলকাতা) এবং শশীধর নায়ার (কেরালা) ১০ পয়েন্ট এবং ৩য় পি নাথ (কলকাতা) ৯ পয়েন্ট

মহিলা বিভাগ

দলগত : ১ম গুজরাট এবং পুণা (৫০ পয়েন্ট), ৩য় পাঞ্জাব (৮ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত : কুমারী দীপ্তি দীক্ষিত (গুজরাট) ২৭ পয়েন্ট. ২য় কুমারী মেধা জোগলেকার (পুণা) ২৪ পয়েন্ট

ডেভিস কাপ

১৯৭১ সালের ৬০তম ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকা ৩—২ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত করে মোট ২৩ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমানে সর্বাধিকবার (২৩) ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড আমেরিকারই। এই নিয়ে আমেরিকা ৪৭ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ২৩ বার কাপ জয়ী হল। অপরদিকে রুমানিয়ার দ্বিতীয়বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলা। তারা ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকারই কাছে ০—৫ খেলায় হার স্বীকার করেছিল।

১৯৭১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে নিয়মিত খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস এবং ক্লিফ রিচি না খেলাতে আমেরিকা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন এই সুযোগে রুমানিয়া কাপ জয়ী হবে। প্রথম দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই আমেরিকা জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় এগিয়ে যায়। ডাবলসের খেলায় রুমানিয়া জয়ী হলে খেলার ফলাফল আমেরিকার পক্ষে দাঁড়ায় ২—১। তৃতীয় সিঙ্গলস খেলায় স্টান স্মিথ স্ট্রেট সেটে রুমানিয়ার টিরিয়াককে পরাজিত করলে আমেরিকা ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ডেভিস কাপ জয়ী হয়।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্মশ্রী উপাধি গ্রহণের পর বিশিষ্ট মহিলা এ্যাথলেট শ্রীমতী কমলজিৎ সান্ধুকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীমতী সুর্মাহ ঘোষবজারীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

বছর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী	
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী	
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেক্সিকো	
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ভারতবর্ষ	
১৯৬৭	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	
১৯৬৮	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	
১৯৬৯	আমেরিকা	৫	:	রুমানিয়া	
১৯৭০	আমেরিকা	৫	:	পঃ জার্মানী	
১৯৭১	আমেরিকা	৩	:	রুমানিয়া	

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড
(১৯০০-৭১)

দেশ	মোট খেলা	জয়	পং :
আমেরিকা	৪৭	২৩	১
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	
ফ্রান্স	৯	৬	
ইতালী	২	০	
স্পেন	২	০	
রুমানিয়া	২	০	
বেলজিয়াম	১	০	
জাপান	১	০	
মেক্সিকো	১	০	
ভারতবর্ষ	১	০	
পঃ জার্মানী	১	০	

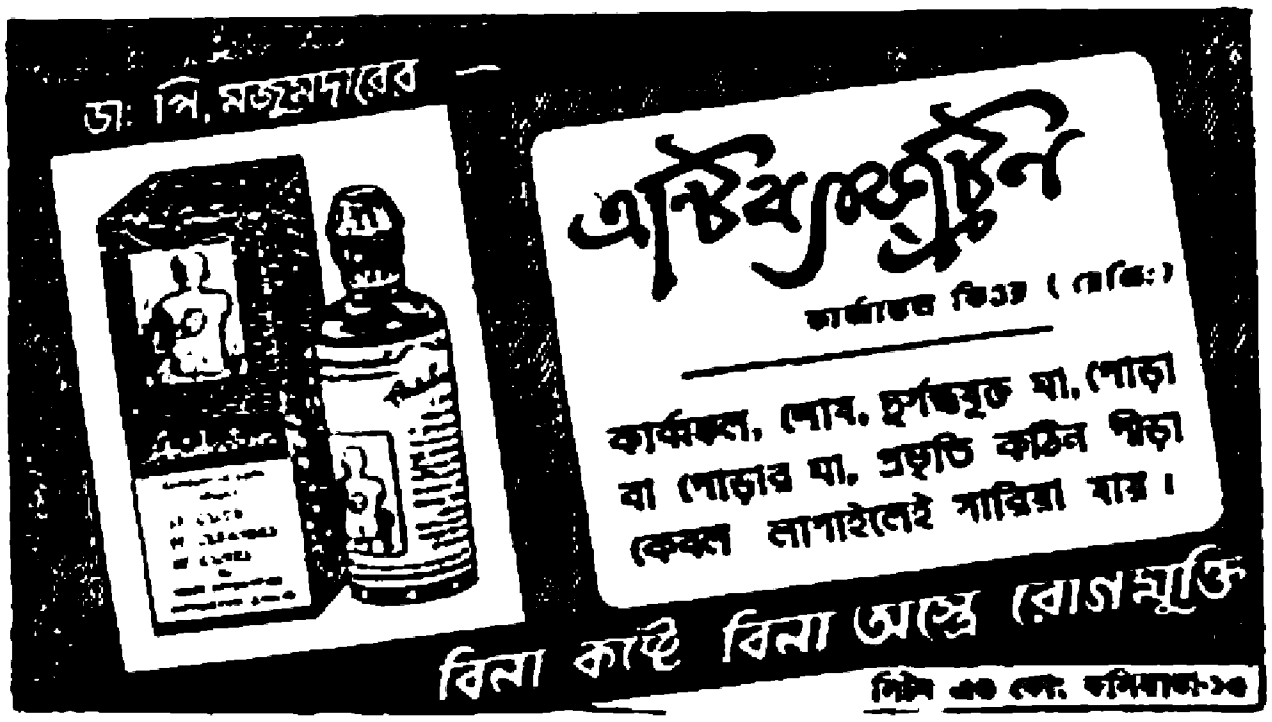

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।